











৩৬শ বর্ষ ]

১৩৬৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত

[ ১ম খণ্ড ]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
<b>যুগবাণী—</b>			<b>কবিতা—</b>		
<b>জীবনী—</b>			১। অক্ষুট	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৭৪৪
১। অঘোর-প্রকাশ	৮প্রকাশচন্দ্র রায়	৭৮, ২২০, ৩৯৭	২। আকর্ষণ	অমৃতা দেবী	৮০০
২। বিন্দবী উটর জাদুচক্র			৩। আলো আলো চোখে	জয়ন্তী সেন	১০৩
দাশগুপ্ত	অনিলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৪১	৪। আলো চাই	মৃণালকান্তি দাস	৮৮৫
৩। রবীন্দ্রায়ণ	৮খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২, ১১১, ৩৮৭, ৫৭২, ৭৪৯, ৯২৫	৫। আষাঢ়ের মেঘকে	প্রজ্ঞেশকুমার রায়	৩৬২
৪। র্যালবার্ট আইনষ্টাইন	ক্ষিতীশচন্দ্র সেন	৭১৪	৬। উত্তরণ	সাধনা সরকার	৪৭৮
<b>প্রবন্ধ—</b>			৭। এই বনশীর্ষ নদী	রবীন চৌধুরী	১১৮
১। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং	দেবব্রত ঘোষ	৩৭০	৮। এক প্রত্যয়	সন্তোষ চক্রবর্তী	৭৭৮
২। কোথায় চলোছ	নরেশ দাশগুপ্ত	৫৩৮	৯। একটি আশ্চর্য মেয়েকে	দেবী রায়	৮৫৯
৩। ছবির কথা সাধারণের	বিনায়কশঙ্কর সেন	৫৬৯	১০। এরা আঁর ওরা	রমলা দেবী	৬৫২
৪। তীর্থগোষ্ঠীর ভাষা-সম্বন্ধ	আদিত্যপ্রভেন্দ্র কাব্যতীর্থ	৩৫৬	১১। কালভরা আকাশ	সৈয়দ হোসেন হালিম	৮৮৩
৫। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য	বিমলকুমার দত্ত	৩৯৪	১২। কৃষ্ণ	প্রজ্ঞেশকুমার রায়	৮২০
৬। প্রাচীন মিশরে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব	রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ	৬	১৩। কোন এক বর্ষার রাত্রে	অরুণাচল বসু	১৭২
৭। ভূমিকম্প	স্বপ্নাকেশ রায়	৭১৯	১৪। ক্ষণলিখন	নিজন দে-চৌধুরী	৭৫৯
৮। সংস্কৃতি ও বাঙালী	দেবব্রত সেন	৩৫৪	১৫। গতকাল : আজ	অর্ণব সেন	৪১৩
৯। জ্ঞান-শিক্ষার আদর্শ	হরিহর শেঠ	২১৪	১৬। ছুটির গান	অমৃতা দেবী	১০৪০
<b>উপজ্ঞাস—</b>			১৭। ছেঁড়া জীবনের স্মৃতি	৮শিবনাথ শাস্ত্রী	৭২২
১। এক মুঠো আকাশ	ধনঞ্জয় বৈরাগী	১০৩, ২৫৮, ৪৩৬, ৬১৮, ৭৭০, ৯৫২	১৮। জন্মদিনে	দিলীপকুমার রায়	১০৩৮
২। চায়না টাউন	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩৬, ২৪২, ৪৭৪, ৬৮২, ৮৭০, ১০১০	১৯। অর	কৃষ্ণ ধর	৩৯১
৩। তামসী	জরাসন্ধ	৪৩, ২৬৫, ৪২৯, ৬২৬, ৭৫৩, ৯৬২	২০। তমসো মা জ্যোতির্গময়	তপতী মুখোপাধ্যায়	৪১৩
৪। পঞ্চতপা	আভুতান মুখোপাধ্যায়	৫৪, ২৪৮, ৪১৮, ৬০৪, ৮২২, ১৩৮	২১। তুমি এসেছিলে	মাধবী সেনগুপ্ত	৪৫০
৫। বর্ণালী	জ্যোতি দাশগুপ্ত	৪৮০, ৬৩৬, ৮৪৪, ৯৭৬	২২। নালন্দা	আহমদ নওয়াজ	২১১
৬। রাজার-রাজার	উদয়ভানু	২১, ২০৬, ৩৮৩, ৫৬৫, ৭৪০, ১০৪৬	২৩। পত্র লেখা	বাসবী বসু	১১১
৭। সিদ্ধপায়ে	নীলকমল দাশগুপ্ত	৩৭১, ৫৯৬, ৮৩২, ৯৪৭	২৪। পলাতক	বিভূতিভূষণ বাগচী	২১৬
<b>ব্যবসা-বাণিজ্য—</b>			২৫। পালতে মাদার	উমানাথ ভট্টাচার্য	৪১৬
১। বেকারতা			২৬। বিব্রত দিনের কবিতা	বন্দে আলী মিয়া	৬৭৯
			২৭। বৃষ্টি ঝরে	বেথা দত্ত	২৮৩
			২৮। বৈশাখ-বন্দনা	শেফালী সেনগুপ্ত	৪৫
			২৯। ভগ্নবীণ	দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৮৩১
			৩০। মালতীর ঘুম	জসীম উদ্দীন	৫১৫
			৩১। রাজধানীর পথে পথে	উমা দেবী	৭১২, ১১০, ১০০১
			৩২। সীমারে	অমলকুমার নাগ	৯২৪
			৩৩। সিগারেট	মৈত্রেয়ী দত্ত চৌধুরী	১০৩৬
			<b>জীবনী-কবিতা—</b>		
			১। গিবেকানন্দ-স্তোত্র	স্বপ্নাশ্রিত	১১২, ২৮৬, ৪১৬, ৬৫৮, ৮৫২, ৯৮২

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
<b>রূপপট—</b>					
আলপাকার কোট	অখিনাশ সাহা	১৪৬	মন্তব্য—		
ওড় পায়রা	নির্মল চট্টোপাধ্যায়	২৭০	১। লোকমাত্র ভিলক : প্রামাণ্য ছায়াচিত্র		৭০২
কাঠমলিকা	ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৮০০	<b>শিল্পী-পরিচিতি—</b>		
গবেষণা	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৮৪	১। জহর রায়	রমেশচন্দ্রক গোহাষী	৭০৫
জন্মদিন	মানবেন্দ্র পাল	৬৪১	২। জয়ন্তী সেন	" " "	১৭১
তিনরঙ্গ	মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৮১৩	৩। সুমিত্রা দেবী	" " "	৫২৬
কেরারী দিন	বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য	১৪২	<b>চিত্র ও নাট্য-সমালোচনা—</b>		
বাঁশি	অখিনাশ সাহা	১৪৬	১। অভয়ের বিয়ে		১০৪২
ভুল	কৃষ্ণর ভট্টাচার্য	৮০৪	২। আমি ঝড় হব		ঐ
মাটি	সিরাজুল হক	৪৮৬	৩। ওগো শুভ		ঐ
মিসেস ডার্সন	সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য	১০২২	৪। কাঁচামিঠে		৭০৩
লেসলি থারল্ডের গল্প	শ্বেতার সুরত দত্ত	১০৫১	৫। কুখা		৩৪৬
হারমোনিয়াম	মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১০	৬। খেলা ভাঙার খেলা		ঐ
<b>ইদের আসর—</b>			৭। তাসের ঘর		৫২৪
সি—			৮। মকুন প্রভাত		৩৪৬
রত্নবেদী	প্রভাতকিরণ বসু ১২০, ২১৮, ৪১৪, ৬৬৮, ৭৬০. ১০০২		৯। নীলাচলে মহাপ্রস্থ		৫২৪
ডাকঘরের ইতিবৃত্ত	সুধাংশুকুমার গুপ্ত	১০০৬	১০। বসন্তবাহার		৭০৩
সি—			১১। মমতা		ঐ
ইয়েরোগী টিপ	এ. সি. সরকার	৫০২	১২। সুরের পরশে		৫২৪
ছোট মেয়ে বাণী	সলিল মিত্র	৬৭৬	১৩। হারানো সুর		৮৮৪
সি—			বার্ষিক বিবরণী—বাঙলা ছবি ও ১৩৬৩		১৬৬
আমার মনের মানুষ	দেবদত্তা রায়	৪১১	রূপপট প্রসঙ্গে—( নির্মায়মান চিত্রসমূহের বিবরণী )		৩৪৮, ৫২৬, ৭০৪, ৮৮৫, ১০৪৪
গল্প হলেও সত্যি	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	১০০৭	<b>নাচ-গান-বাজনা—</b>		
সাহিনী—			১। গাজন গাম	জয়দেব রায়	১৫২
বুদ্ধগয়া	বলাইকৃষ্ণ সরকার	১০০৭	২। ধৌর গান	" "	৮৬৬
খা—			৩। চট্রগ্রামের লোকসঙ্গীত	শিপ্রা দত্ত	৬১৬
আমার দেখা সুনির্ভর বসু	বিনায়ক সেন	১২৩	৪। জারি গান	জয়দেব রায়	৫১২
খা—			৫। ভাহুর গান	সুন্দরগোপাল ঘোষ	১০২৬
একটি চমকপ্রদ ম্যাজিক	এ. সি. সরকার	৩০৪	৬। রাগসঙ্গীতে সময়	লক্ষীকান্ত মুখোপাধ্যায়	৩৩৫
রূপকথা—			৭। আমার কথা	গৌরীকেশ্বর ভট্টাচার্য	১৫৪
বয়েস তার সাত	চিত্তরঞ্জন দেব	৩০৪	৮। " "	হুর্গা সেন	৭০০
সোনার পাখী	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	৪১১	৯। " "	প্যারীকৃষ্ণ পাল	১০২১
কুশিচয়ান র্যাগারশানের রূপকথার অনুবাদ—			১০। " "	প্রতাপনারায়ণ মিত্র	৫১৪
একে পাঁচ—পাঁচে এক	মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৫	১১। " "	জাম গঙ্গোপাধ্যায়	৮৬৮
জলকড়া	" " "	৬৭৩, ৭৬৩	১২। " "	সুপ্রীতি ঘোষ	৩৩৮
স্বর্গজয়ের বিডঘন!	" " "	৩০২	১৩। রেকর্ড পরিচয়	১৫৪, ৩৩৮, ৫১৫, ৭০০, ৮৬৮	
হাতি জাম্প	দেবানীষ চট্টোপাধ্যায়	১০০৮	<b>বড় গল্প—</b>		
			১। অজ ও প্রত্যহ	নীলকণ্ঠ	১২, ১৩৬, ৫০৮, ৬৬৪, ৮৫৫, ১১৮
			<b>পত্রগুচ্ছ—</b>		
					১, ১১৫, ৩৫৭, ৫৫১, ৭০১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
<b>অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ—</b>			<b>অনুবাদ—</b>		
<b>জীবনী—</b>			<b>উপন্যাস—</b>		
১। জীজীসারদা দেবী	মালতী গুহ-রায়	১৩০, ৩১০ ৪৬০, ৬৮৮	১। জীমতী আর্ডেরএর দিনপঞ্জী	তরু দত্ত : পৃথ্বীজনাথ মুখোপাধ্যায় : ১০, ২৩৬, ৪৫৪, ৫৮১	
<b>উপন্যাস—</b>			<b>প্রবন্ধ—</b>		
১। বাতিঘর	বারি দেবী	১৩৪, ৩১৬, ৪৬৩, ৬১০, ৮৩৬, ১১০	১। তরু দত্তের জীবনী ও রচনা	ক্লারিস বাদের :	
<b>প্রবন্ধ—</b>			<b>কবিতা—</b>		
১। ওমরের সপক্ষে দু'টি কথা	মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়	৮৩১	১। একটি গ্রীসীয় পাত্রের প্রশংসা	কীটস : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় : ১০২১ ট্রিফেন স্পেণ্ডার :	
২। বৌদ্ধ ত্রিশরণ	আশা রায়	৩১৪	২। এন্থ্রোস	দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়	২২৭
৩। রবীন্দ্র-কাব্যে স্তূত্য	ইন্দ্রাণী বসু	৬১৩	৩। দুঃখের সেতু	টমাস হাড : বীরেন্দ্রকুমার রায় ৬৫৬ মিণ্টন : তপতী চক্রবর্তী ১৩৭	
৪। রাধাচরিত্রের বিবর্তন	শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮	৫। ফড়ি ও ঝিঁঝি	কীটস : বীরাঙ্গ প্রদাস ভট্টাচার্য ২৪১	
<b>কবিতা—</b>			৬। ভালবাসার গোপন কথা	ব্লেক : বীরেন্দ্রকুমার রায় ১৭৫	
১। আন্ধ এই সন্ধ্যায়	অনুজা দেবী	৬১৩	৭। রাজির রেলগাড়ি	মেরি এলিজাবেথ কোলরিজ : মঞ্জু দাশগুপ্ত ৩৫	
২। উদ্বোধন	অরুণা ঘোষ	১৩৪	৮। লোকটি বাহাকে হত্যা করিয়াছিল	টমাস হাড : তমালকৃষ্ণ নাথ ৫৪০	
৩। বঙ্গাল-বিদ্যায়	সুতপাপুরী দেবী	১৩৭	৯। সে মেয়ে ছিল তো সবই	হ্যালডার লাত্রানস : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৫২৩	
৪। বর্ষণান্তে	রাণী দেবী	৬১০	১০। হে উদ্দাম পশ্চিম বাতাস	শেলী : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ২১১	
৫। ভালো লাগা মুহূর্ত	অন্নপূর্ণা গোস্বামী	৪৬৩	<b>দীর্ঘকাব্য—</b>		
<b>গল্প—</b>			১। কুবাইয়াৎ	ওমর খৈয়াম : নজরুল ইসলাম ১৭৮, ৬৮৫, ১২১	
১। তুচ্ছ	দীপালি বিশ্বাস	১১০	<b>গল্প—</b>		
<b>কাহিনী—</b>			১। ক্যামিলি বাজেট	ভি. ভি. বোকিল : অনুগ্রাধা ভট্টাচার্য ৪১২	
১। বেদবতীর উপাখ্যান	অর্ণিমা মুখোপাধ্যায়	১৩৩	২। ক্রোয়স্টাইন	মোঁপাসা : কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৭১৪	
<b>ভ্রমণ-কাহিনী—</b>			৩। স্কোলাস্তিকা	আনাটোল ফ্রাঁস : সুবীরকান্ত গুপ্ত ৭১৮	
১। স্রদানের পথে	লীলা মজুমদার	৪৬৬	<b>আত্মজীবনী—</b>		
<b>অনুবাদ-কবিতা—</b>			১। ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা	ক্যাসানোভা : শাস্তা বসু ৭৮, ২২৮, ৪০৬, ৫৮৮, ৭৭১, ১৩১	
১। কাল আসছে	শমিতা গুপ্তা	১১০	<b>শ্লেষ-রচনা—</b>		
<b>বাঙালী-পরিচিতি—(চার জন)</b>			১। কলা-বিলাস	কেমেন্স : প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৩, ২১৭, ৪১৪, ৫৭৮	
১। কালিদাস রায়, রেজাউল করীম, শিবুলীধর চট্টোপাধ্যায়, বলাইলাল চন্দ্র		১৬০.....	<b>বিজ্ঞান-বাতর্জী—</b>		
২। সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, স্তম্ভীর চট্টোপাধ্যায় উপেন্দ্র ঘোষ, শ্রুতমলকান্তি ঘোষ		২০১.....		পঞ্চধর মিশ্র ১২৮, ২১২, ৪৫২, ৬৫৫, ৮৬০, ১১৮	
৩। নৃপেন্দ্রনাথ সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্তামণি কর, অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		৩৭৭.....			
৪। শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য, মনীশ ঘটক, জিতেন্দ্র লাহিড়ী		৫৬.....			
৫। অভুল বসু, পুলিনবিহারী সরকার, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, রণদেব চৌধুরী		৬৩৫.....			
৬। মহারাজী সুরচন্দ্র দেবী, গোপেন্দ্রনাথ দাস, সুধান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমনাথ সান্নাল		১২.....			

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
<b>সত্য-সমর্থিত গল্প—</b>			<b>সংগ্রহ—</b>		
১। চিতাভ্রম	প্রয়াগী	৮৭৫, ৯৭০	১। ইনস্টিটিউশন-নিরোধক ব্যবস্থা		৬১৬
২। ফগানী বিপ্লবকালের			২। কালীমূর্তির ব্যাখ্যা		২৬৪
একটি প্রেমের কাহিনী	অমিয়কুমার ঘোষ-রায়	৬৫৪	৩। চাকরী বদলদলের সমস্যা		১৪০
<b>স্মৃতিকথা—</b>			৪। নারী ও পুরুষের পরমায়ুর প্রশ্ন		১১৬
১। ব্যক্তিতে রামেন্দ্রসুন্দর	অজয়েন্দ্রনাথ রায়	৩৩২, ৪৪২, ৬৩০, ৭৮৮	৫। বিলেতে ধূমপানের বহু		৩৭৬
২। শরৎ-স্মৃতির টুকটাকি	অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৬১, ২১৪, ৪৪৬	৬। মানবদেহের অন্তস্তর		৩৪৮
<b>আত্মস্মৃতি—</b>			৭। মোটর চুরি এড়াতে হ'লে		১৪৫
স্মৃতিচিত্রণ	পরিমল গোস্বামী	২৫, ১৮২, ৩৬৩, ৫৪৪, ৭২৩, ৯০৪	<b>ত্রিবার্ণ চিত্র—</b>		
<b>জন্ম-কাহিনী—</b>			১। চু-এন-লাই	রথীশচন্দ্র চক্রবর্তী	আখিন
১। গুহার আঁধারে	সিদ্ধার্থ	২৭০	২। দেওয়াল চিত্র	তাইকান ইয়াকোয়ামা	প্রাবণ
২। বিচিত্র ভ্রমণ	জ্ঞানাজ্ঞান পাল	২০৯	৩। বেলা-শেষে	মুনি সিং	জ্যৈষ্ঠ
৩। সোবিয়েতের দেশে দেশে	মনোজ বসু	৮৪, ১১৮, ৩১২, ৫৫৫, ৭৩০	৪। লক্ষ্মী	মহাতোষ বিশ্বাস	ভাদ্র
<b>সাহিত্য-পরিচয়—</b>			৫। হাটবাজার	অরবিন্দ দত্ত	আবাত
১। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের গতি ও সঙ্গ প্রকাশিত পুস্তকাদি			৬। হিমালয়	গোপাল ঘোষ	বৈশাখ
সম্পর্কে অভিমত সমূহ		৩২৭, ৫২১, ৬৯৪, ৮৩২, ১০৩৪	<b>রেখা চিত্র—</b>		
২। ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত বাঙলা পুস্তকের সমগ্র তালিকা		১৬২	১। জুতা-পালিশ	চুণীলাল ভট্টাচার্য	১৫
৩। গ্রন্থকার ও পাঠক	বরদাচরণ ভট্টাচার্য	৩২৭	<b>প্রচ্ছদ—</b>		
<b>খেলাধুলা—</b>		১১৭, ৩২৬, ৫০৪, ৬৭৮, ৮৮২, ১০০০	১। একটি গ্রাম্য বালিকার		
<b>আলোকচিত্র—</b>		২৪৮, ১৪৪৮, ২০০৮, ৩২৮৮, ৩৮৪৮, ৫০৪৮, ৫৬৮৮, ৬৪৮৮, ৭৪৮৮, ৮৪৮৮, ৯২৮৮, ১০২৪৮	আলোকচিত্র	জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়	বৈশাখ
<b>আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—</b>			২। একটি গ্রাম্য বালিকার		
গোপালচন্দ্র নিয়োগী		১৫৬	আলোকচিত্র	জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়	জ্যৈষ্ঠ
<b>সাময়িক প্রসঙ্গ—</b>		১৭৪, ৩৪৯, ৫৩৩, ৭০৮, ৮৮৬, ১০৫৮	৩। দিলওয়ারা মন্দিরে অবস্থিত খেতপ্রস্তরে খোদিত		
			এক স্তম্ভের আলোকচিত্র	শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়	আবাত
			৪। নিখোঁয়মান দুর্গা প্রতিমার		
			এক আলোকচিত্র	ভাষ্কর রমেশ পাল	ভাদ্র
			৫। "পুরুষ ও প্রকৃতি" শীর্ষক খেতপ্রস্তরে খোদিত		
			এক স্তম্ভের আলোকচিত্র	কনক দত্ত	প্রাবণ
			ভুবনেশ্বর মন্দিরস্থ শ্রীশ্রীগণেশমূর্তির এক		
			আলোকচিত্র	পারিতোষ মিত্র	আখিন

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন-

এই অগ্রিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্বিবহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, ঐতিহ্য, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, নারী বহু বৎসর তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্য স্তম্ভ আবেশের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা। প্রস্তুত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা ছেনে ধুপী চব্বেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই বিষয়ে কে-কোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার, বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



मसिह दशमती  
॥ देवनाग, १९७७ ॥

( ३०२६ )

हिमालय  
—मसिह दशमती—







## মাসিক বসুমতি

৩৬শ বর্ষ—দ্বৈশাখ, ১৩৬৪ ]

॥ স্থাপিত ১৯২৯ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

### কথায়ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। “কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতে একটু একটু খেলান, আর তাদের পাতা মাখায় ঠেকালান। হলধারী তখন আমায় বললে,—‘তুই করছিস কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলের পিলের বিয়ে হবে কেমন করে?’ আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দালা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বললাম, তবে যে শালা, তুমি না গীতা বেলাস্ত পড়? তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলের পিলে হবে তুমি ঠাউরেছ? তোর গীতা পাঠের মুখে আগুন। দেখ, শুধু ঝড়াতনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।”

“ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই চারি দিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব জ্ঞান হলে তবে চারি দিকে হৃদয়ে দেখা যায়। তখন আবার ‘তিনিই আমি’ এইটি বোধ হয়। মাতালের বেশী নেশা হলে বলে ‘আমিই কালী’। গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগলো—‘আমিই কৃষ্ণ’। তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিক পরে চারি দিকে শিখাময় দেখা যায়।”

“সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমন। মহাভাব,—ঈশ্বরের ভাব। এই দেহ-মনকে তোলপাড় করে ছায়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়েঘরে ঢুকেছে, ঘর তোলপাড়, হয়তো ভেঙ্গে চুরে যায়।”

“ঈশ্বরের বিবাহ-অগ্নি সামান্য নয়। ঋণ সনাতন যে গাছের তলার বসে থাকতেন, ঐ অবস্থা হলে, এই রকম আছে যে, গাছের পাতা বলসা পোড়া হয়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিন দিন অন্ত্রান হয়ে ছিলাম,—নড়তে চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁস হলে, বামনী আমায় ঘরে প্রান করতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ঘরে নিয়ে গিছিলো। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল, সে সব মাটি পুড়ে গিছিল!”

“যখন এই অবস্থা আসতো, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে ঘেন ফাল চালিয়ে যেত। প্রাণ যায়, প্রাণ যায় করতাম। কিন্তু তার পর খুব আনন্দ।”

“হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বললাম,—আমি মুখা, তুমি আমাকে জানিয়ে দাও, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমার জানিয়ে দাও। পূরণতন্ত্রে কি আছে, আমার জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমার সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।”

“কথা কয়েছে,—শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বটতলার দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে তার পর কত হাসি। খেলার ছলে আজুল মটকান হলো। তার পর কথা!—কথা কয়েছে। তিন দিন করে কেঁদেছি, আর বেদ পূরণতন্ত্রে—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছেন।”

# রবীন্দ্র যুগ

৮খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও জীবনের নানা ঘটনাটি ঘটনা জানেন না এমন লোক বোধ হয় বিরল। তথ্যপি মহামানব-প্রসঙ্গ যত আলোচিত হয় ততই আমাদের পক্ষে মজল। আত্মীয়তাসূত্রে, সাহিত্যসম্প্রদায়ী হওয়ায়, ভারতগৌরব বিশ্ববরণ্য কবিকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিকট হইতে দেখিবার যে সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, সেই দিক হইতে তাঁহার সখ্যকে বাহ্য কিছু আমি আমার লেখার ভিতর দিয়া ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি, তাহা এতদ্বারায় প্রকাশ করিতে আজ সাহসী হইলাম।

বাস্তবিকের পক্ষে আবাস-নির্মাণে যেমন প্রথমে ভিত্তিস্থাপন করিতে হয়, মানুষের বেলায়ও জীবনী লিপিতে প্রথম প্রয়োজন হয় বংশের প্রতিকাকালের আদিপর্ব। তাই প্রস্তাবনায় দ্বিলায় সবাখ্যা কুলপরিচয়-পর্ব, বাহ্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় সহনয় পাঠক-পাঠিকার নিকটে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করি। শতদল যেমন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া একদা তাহার সকল দল বিকশিত করে, অসাধারণ প্রতিভাবান আমাদের কবিও সৈদিক হইতে মহৎ বংশের বংশানুক্রমিক দলের অন-পর্বায়ে বিকাশের পূর্ণতা। স্বনামধাত পিণামহ দ্বারকানাথ ও স্বনামধন্ত পিতৃদেব মহবি দেবেন্দ্রনাথ হইতে স্বীয় প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায় জগৎ-পূজ্য রবীন্দ্রনাথের স্বয়ম্প্রকাশ। রত্নপ্রসূ ঠাকুরবংশে অগ্ৰাঙ্গ দিকপালেরও অভাব হয় নাই। রাষ্ট্রজ্ঞানী ও জ্ঞানবিদ প্রসন্নকুমার, বাঙাল এক কালে রাষ্ট্রনিকপাল কবি মহারাজা বতীন্দ্রমোহন, তাঁহার অল্প বয়সেই বিখ্যাত সংগীতাচাৰ্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন, কবিগুরু-জ্যোতিষ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, অগ্রতম অগ্রজ সংগীত-বিজ্ঞাবিশারদ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কবিগুরু-ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ কত প্রতিভা দল মেলিয়াছে বাহ্য একই বংশে কদাচিৎ দেখা যায়।

## কুলপরিচয় ও বংশবিবরণ

এদেশের রাষ্ট্রশ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সখ্যকে ইতিহাস—গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক বজ্রাহুষ্ঠানের জন্ত তাঁহার গৌড়ীয় সপ্তমতী ব্রাহ্মণদের হস্তে কনৌজের রাজা বীরসিংহের নিকট পত্র দিয়া পাঁচ জন পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তাঁহারা বজ্র অহুষ্ঠান করিয়া ফিরিয়া যান, কিন্তু সেখানে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজে চলিতে পারিবেন না বলিয়া সামাজিকেরা আপত্তি উপাধন করেন—কারণ তীর্থযাত্রা ভিন্ন তৎকালে কোথাও আসিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয় এই বচনের আদর সেই সমাজে ছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকৃত হইয়া নিজেদের দ্রোণপুত্রদের সহিত গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে রাজা আদিশূর তাঁহাদের সমাদর করিয়া বঙ্গদেশের

বিভিন্ন স্থানে বাস করিবার জন্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বেদচর্চা প্রচারই আদিশূরের উদ্দেশ্য ছিল। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম লইয়া মতান্তর দৃষ্ট হয়। যে সকল কুলশাস্ত্র এখন পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, শাণ্ডিল্য গৌড়ীয় ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গৌড়ীয় ঐহর্ব, কাশ্যপ গৌড়ীয় দক্ষ, সাবর্ণ গৌড়ীয় বেদগর্ভ এবং বাৎস গৌড়ীয় ছান্দড় এদেশে আসিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচিত। এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র ও বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্র মতে ইহাদের পিতৃগণ শাণ্ডিল্য গৌড়ীয় ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজ গৌড়ীয় মেধাতিথি, কাশ্যপ গৌড়ীয় বীতবাগ, সাবর্ণ গৌড়ীয় সৌভরী ও বাৎস গৌড়ীয় সুধানিধি বঙ্গদেশে আসেন এবং তাঁহাদের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে বাৎসারা রাঢ় দেশে (পশ্চিম বঙ্গে) বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর এবং বাৎসারা বারেন্দ্রভূমিতে (উত্তরবঙ্গে) বাস করেন তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর বলিয়া পরিচিত।

আদিশূরের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ায় রাঢ় ও বারেন্দ্র প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে চিরদিনই বেদ হিসাবে প্রথম বিভাগ হয় এবং পরে গোত্র ও প্রাচীর বিভিন্ন বংশের পরিচয় হয়। আবার এক গোত্রমধ্যে বাৎস, বজ্রাদি বৈদিক অহুষ্ঠানের জন্ত বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের নামে সেই গোত্রের প্রবরের পরিচয়। গোত্রকার ঋষিদের সহিত এই প্রবরকার ঋষিদের নামোল্লেখ করিয়া বজ্র অগ্নিকে আহবান করা হইত। এই সকল ঋষিরা বহুবিধ বজ্রাহুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নির নিকট বিশেষ পরিচিত থাকায় বজ্রকর্তাকে সেই পরিচয় অগ্নির নিকট চিনাইয়া দিবে, এইরূপ মনোভাব এই সকল বংশ-পরিচয়ের মূল ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের দেশ হিসাবে বিদ্যাচলের উত্তরে পঞ্চ গৌড়ীয় ও বিদ্যাচলের দক্ষিণে পঞ্চদ্রাবিড়ী এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হয়। পঞ্চ-গৌড়ান্তর্গত কাশ্যকুলের বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকায় আদিশূর সেইখান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

কোন সময়ে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন তাহা লইয়াও কুলশাস্ত্রে বর্ষে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ৬৫৪ শকে (৭৩২ খৃঃ) কেহ কেহ বলেন ১৫৪ শকে (১০৩২ খৃঃ) 'বেদবাণীকশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ', আবার কেহ বলেন ১১০ সন্বতে বা ৮৫৬ শকে (১৩৪ খৃঃ)। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়ে শতবর্ষ চারপুরুষ হিসাব ধরিয়া সময় নির্ণয়ও এক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, কারণ বিভিন্ন বংশের বংশলতায় পুরুষের ঐক্য নাই। কাশ্যকুলান্তর্গত ব্রাহ্মণ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ১২০০ বৎসরে ৪৮ পুরুষ কোনো বংশই দেখা যায় না। ইহাতেই মনে হয় যে, বংশলতা ঠিক সমসাময়িক ভাবে

যক্ষিত না হইয়া পরবর্তীকালে নানা বংশের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং অনেকগুলি নামেরই ছাড় পড়িয়াছে। কাজেই বংশলতাগুলি অসঙ্গত বলা যায় না। তবে একটা কথা স্মরণযোগ্য। দেখা যায়, অনেক বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ মূলতঃ ভারতে প্রযুক্ত হয় না। ইহার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের অর্থনীতিশাস্ত্রের অনেক মূল সূত্রের এদেশে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেইরূপ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার সহিত অল্প দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় সাদৃশ্য নাই।

ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় যে, যিজেরা তিনটি বেদ, অথবা দুইটি অন্তত একটি সমগ্র অধ্যয়ন সমাপনান্তে গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই গৃহস্থশ্রমে প্রবেশের সময় ২৫।৩২ বৎসর ছিল। সুতরাং গড়পড়তা শতবর্ষে তিন পুরুষ ধরা অসঙ্গত হইবে না। এ হিসাবে যে সকল বংশে অন্তত ৩৫।৩৬ পুরুষ হইয়াছে তাহা কতকটা নির্ভরযোগ্য। আবার একই সময়ে এক বংশের বিভিন্ন শাখায় কোথাও ১ পুরুষ কোথাও বা ১১ পুরুষ দেখা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীশ্রেণীর মূল পুরুষদের ৫৬টি সন্তান হয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর মূলপুরুষদের ১০০টি সন্তান হয়। আদিশূরের পুত্র রাজা ভূশূর এই ১৫৬ জন ব্রাহ্মণকে ১৫৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভূস্বামী করিয়া দেন। তাহাতে তাঁহারা সেই সেই গ্রামে গ্রামীন বলিয়া পরিচিত হন। এই গ্রামীন শব্দ অপভ্রংশে গাঁই (গাঞী) হয়। এই গ্রাম অনুসারে নামের সহিত উপাধি ব্যবহৃত হইত। এই কারণেই রাঢ়ীশ্রেণীর ভিতর একটা বাক্য প্রচলিত আছে—“পঞ্চগুণ্ড ছাপান গাঁই, ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।” বি. ৫৬ গাঁইয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বংশলতা ও গাঁইবোধক ‘পদবী দৃষ্টে আমরা বুঝিতে পারি যে অন্তত ৫১ গাঁই ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬টি সন্তান ১৬টি বিভিন্ন গ্রাম পাওয়ার তাহাদের ১৬টি গাঁই উপাধি হয়।

আজকাল এ বিষয়ে সেরূপ চর্চা না থাকায় অনেকেরই ধারণা যে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় হইলেই বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে। কিন্তু একমাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের ভূস্বামী আদি বরাহের বংশধরেরা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাঁড়যো। ভট্টনারায়ণের অসঙ্গত বংশধরেরা নিজ নিজ গ্রাম অনুসারে উপাধি ব্যবহার করিতেন। পরবর্তীকালে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্রভূমে গিয়া এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ে গিয়া বাস করিলেও তাহাদের পিচিয়ে শ্রেণী ও আদিম গাঁইমূলক উপাধির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ঠাকুর বংশীয়েরা ভট্টনারায়ণের কোন সন্তানের বংশধর সে স্বত্বকে ‘প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু ও ‘ব্যোমকেশ মুস্তাফি প্রণীত ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ তৃতীয় খণ্ড, ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১ম খণ্ড, ব্রাহ্মণকণ্ডের বর্ষ অংশ (২৬৮—২৬৯ পৃঃ) তে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহাদের কুশারী গাঁই এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণের চতুর্দশ পুত্র কোয় বা দীন। ইহারা খুলনার গাঁইভোগ গ্রামের গোষ্ঠীপতি কুশারী বংশীয়ের একটি শাখা। রাঢ়ীশ্রেণীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের জায় ইহাদেরও সামবেদ, কৌথুমী শাখা। শাণ্ডিল্য গোত্র হওয়ার ইহাদেরও প্রবর শাণ্ডিল্য, আসিত ও দেবল।

বঙ্গাল সেন যখন কৌলীজ মর্ধাদা স্থাপন করেন তখন তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কুলীন ও শ্রোত্রীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত

করেন এবং শ্রোত্রীয়দের মধ্যে সিন্ধুশ্রোত্রীয়, সাধ্যশ্রোত্রীয় ও কঠশ্রোত্রীয় এই তিনটি ভাগ হয়। বঙ্গাল সেন নয়টি লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে কৌলীজ-মর্ধাদা দিয়াছিলেন। ষাঁহাদের কোনো একটি গুণের অভাব থাকিত তাহাদের এক এক শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত, যাঁহা হইতে শ্রোত্রীয়দের শ্রেণীবিভাগ হয়। সর্বজনপরিচিত নয়টি কুললক্ষণ—

আচারো বিনয়ো বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।

নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।

কুলাচার্যের আবৃত্তি শব্দের অর্থ করিতেন সমান ঘরে বৈবাহিক আদান-প্রদান। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কুলীনের কৌলীন্য ভঙ্গ হইত। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন তত্ত্বশাস্ত্রে ও তাত্ত্বিক আচারে পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালংকার মধ্যে মধ্যে আমাদের খুলশিতামহ গোкулনাথের সহিত দেখা করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, রাজা বঙ্গাল সেন তাত্ত্বিক ধর্ম ও আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞ কুলাচার ও কৌলশব্দ হইতে এই কুলীন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণেরা এই ধর্মে আস্থাযুক্ত ও ইহার অনুষ্ঠানে যত্নবান ছিলেন তাহাদেরই সমাজে কুলীন আখ্যায় মর্ধাদা দান করিয়াছিলেন। কুলীনের এই নয় লক্ষণের একটা গুহ্য অর্থ আছে। আমরা তাত্ত্বিকধর্মে দীক্ষিত না থাকায় পণ্ডিত মহাশয় সে গুহ্য অর্থ আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলেন। কাজেই এই লোকের গুহ্য অর্থ মানিবার সৌভাগ্য আমাদের হইল না।

বঙ্গাল সেন প্রথমে নিম্নলিখিত আটগাঁই ভুক্ত সকল ব্রাহ্মণকেই কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাদের বঙ্গালপুঞ্জিত আটঘর কুলীন বলে। ১। শাণ্ডিল্যগোত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় গাঁই, ২। ভরদ্বাজগোত্রে মুখুটি গাঁই, ৩। কাশ্যপগোত্রে চাটাতি গাঁই, ৪। সাবর্ণ গোত্রে গাঙ্গুলি গাঁই ও কুল গাঁই, ৫। বাৎস গোত্রে ঘোষাল গাঁই, পুতিতুণ্ড গাঁই ও ও কাজীলাল গাঁই। তাহার পরে তিনি পুনরায় বাছাই করিয়া গুণানুসারে প্রত্যেক গাঁই হইতে কয়েক ব্যক্তিকে কৌলীজ মর্ধাদা দেন। তাহারা সংখ্যায় ১১ জন। এই কয়জন ভিন্ন সেই গাঁইভুক্ত অসঙ্গত সকলের কৌলীজ রহিত হইয়া যায়।

পরে রাজা লক্ষণ সেন ব্রাহ্মণদের মর্ধাদা নির্ণয়ের সময় সাবর্ণ গোত্রে কুল এবং বাৎস গোত্রে পুতিতুণ্ড ও কাজীলাল গাঁইভুক্ত ব্যক্তিদের কৌলীজ মর্ধাদা রহিত করেন। ষাঁহারা কৌলীজ পাউয়াছিলেন কিন্তু পরে রহিত হয়, তাহাদের বংশধরেরা বংশজ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। লক্ষণ সেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় গাঁইভুক্ত ১। জাজল, ২। দেবল, ৩। বামন, ৪। মকরল, ৫। মহেশ্বর, ৬। ইশান; ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখুটি গাঁইভুক্ত ৭। উৎসাহ, ৮। গরুড়; কাশ্যপ গোত্রীয় চাটাতি গাঁইভুক্ত ৯। বহুরূপ, ১০। ভলায়ুধ, ১১। শুভ, ১২। অরবিন্দ, ১৩। বাঙ্গাল; সাবর্ণ গোত্রীয় গাঙ্গুলী গাঁইভুক্ত ১৪। শিশু; বাৎস গোত্রীয় ঘোষাল গাঁইভুক্ত ১৫। শিরোমণি শংকর এই পনেরো জনকে কুলীন্য মর্ধাদা দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে বাছাই করার পরিবর্তে কৌলীজ মর্ধাদা বংশগত করিয়াছিলেন এবং কুলীন কুলমর্ধাদানুসারে কার্য করিতেছেন কি না তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অল্প কয়েক জনকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন। ঘটকদের তালিকা

ইহাবাই লক্ষণপূজিত কুলীন এবং ইহাদের উত্তর পুরুষই বর্তমানে কুলীনশ্রেণী বলিয়া আখ্যাত।

কয়েক শত বৎসর পরে মুসলিম অধিকারে শাণ্ডিল্য-গৌড়ীয় সংকেত বন্ধকার বংশধর দেবীর ঘটক কুলীনদের তৎকালীন অবস্থা পাবা করা যাইবে যে, সকল বংশেই অল্পবিস্তর দোষ ঘটিয়াছে। ফলে 'দোষ নাই বংশ, কুল নাই তার' হইয়াছে। তখন এক জাতীয় দোষকে এক একটি গুণে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ১০৮ মেলের সৃষ্টি হইল, 'দোষানুং মেলকো মেলং।' কোন্ কোন্ মেলের সৃষ্টি কোন্ মেলের বৈবাহিক কার্য প্রাপ্ত তাহাও নিরূপিত হইল। কাছারী দেবীর ব্যবস্থা মানিলেন না; তাহার ন্যায় ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে চলিয়া গেলেন; এইরূপে যথাস্থি স্থানান্তরিত হইল। কাছারী দেশে রহিলেন কাছারী নিম্নলিখিত অর্থবা দেবীর-কাছারী বসিয়া অজিত হইলেন। কুলশাস্ত্র মতে মেলবন্ধন ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) হইয়াছিল। ইহা কেবল কুলীনদের জ্ঞান, শ্রোত্রীদের সহিত ইহার কোনো সংঘর্ষ ছিল না। যে সকল শ্রোত্রীয়বংশ কেবল কুলীনদের কল্যাণ করিতেন এবং বহু কুলীনের পরিপোষক ছিলেন, তাহাদের দেবীরের পূর্ব হইতেই গোপীপতি আখ্যা চলিয়া আসিতেছিল।

এই মেলবন্ধন ব্যাপার আমাদের নিকট বিশেষ জটিল রহস্যবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। বংশে কোনোরূপ দোষ থাকিলে লোকে স্বভাবত তাহা প্রকাশ করিতে কুঠিত হয়। কিন্তু দেবীরের ব্যবস্থায় এই দোষের পরিচয় দিয়া নিজেদের বংশমর্যাদা স্থাপিত করিতে হইত। এখন আমরা এ সকল বিষয়ে অনভ্যন্ত হওয়ার মেলকে কুলীনদের শ্রেণীবিভাগের একটি নামমাত্র এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা গাইয়া থাকি। কিন্তু দেবীরের সময়ে এই মেলের অর্থ অস্পষ্ট ছিল। কোন্ মেলের কী কী দোষ বুঝায় তাহা মেলের নাম করিলে লোকে বুঝিতে পারিত। বঙ্গদেশের সর্বত্র এইরূপে সকল কুলীনকে দোষযুক্ত পরিচয় দিতে বাধ্য করিল—দেবীরের পশ্চাতে এমন কী শক্তি ছিল? কিংবদন্তী আছে যে, দেবীর কামাখ্যায় তপস্যা করিয়া এই বরলাভ করেন যে বঙ্গলা সমাজে তিনি যে ব্যবস্থা চালাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই চালাইতে পারিবেন ও ৫০০ বৎসর সেই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই সময়েই অনেকে দেবীরের ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত দেখাইয়াছিলেন।

অন্যমন হয় যে, কোনো প্রবল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে এইরূপ ব্যবস্থা সমস্ত দেশব্যাপী করা সম্ভবপর হইত না। যে সকল পাঠান সম্রাটেরা হিন্দু ধর্মপ্রাণ ও শ্রুতির সম্মত ব্যবস্থা সংকলনের জন্ত হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে এ বিষয়ে তাহাদের কোনো সন্দেহ ছিল কি না? বিশেষত যখন দেখি যে মুসলমান সময়ে জাতিমালা নামে একটা কাছারী ছিল, যেখানে জাতি-ঘটিত সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইত। রাজা নবকৃষ্ণ ইংরাজের প্রথম আমলে এইরূপ জাতিমালার কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। ইংরাজ এরূপ কাছারীর স্রষ্টা নয়, বঙ্গবিজয়ের পর দেশে এইরূপ কাছারী প্রচলিত আছে দেখিয়া সেই কাছারীর কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়াছিল রাজা। হয়তো এইরূপ কাছারীতে ব্রাহ্মণদের জাতি-মর্যাদা নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে বাদশাহের নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রধানরূপ দেবীর মেলবন্ধন সৃষ্টি করেন ও সেই মেলবন্ধন

অনুসারে পরিচয় দিতে রাজাদেশ সকলকে বাধ্য করে; ইহা যদিও অসম্মত মাত্র। মনে হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নাই, ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাতের জন্ত এখানে এই কথাই উল্লেখ করিলাম।

কায়র বংশীয়েরা সিদ্ধশ্রোত্রীয়। (বিশেষ বিবরণ হরিলাল চট্টো প্রণীত ব্রাহ্মণ ইতিহাস গ্রন্থে ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) আমরা বংশান্তর ব্রাহ্মণভাঙা নিবাসী যতনাথ সার্বভৌমের দ্বারা তিন শত বৎসর পূর্বে লিখিত কায়র বংশলতা নামক পুঁথির সাহায্যে এবং স্ক্রিপ্স কোর্টের কয়েকটি মোকদ্দমার নথিপত্র ঘূঁটে ইংরাজিতে যে বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার মুদ্রিত এক একখণ্ড "ঠাকুর" বংশ" নামে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে, ভাণ্ডারাল লাইব্রেরি এবং শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। প্রয়োজন হইলে কৌতূহলী পাঠকপাঠিকা তাহা দেখিতে পারেন। ঐ বংশলতা হইতে কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কায়র অধস্তন পুরুষ ভট্টনারায়ণ হইতে ২৩শ বংশধর জগন্নাথ কুশারী জায়পকানন পিঠাভোগ হইতে বংশোদর জেলার ইসফপুর বা চেলোটিয়া পরগণার শুকদেব রায়চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া যশ্বর-প্রদত্ত বারপাড়া নরেন্দ্রপুর গ্রামে বসবাস করেন। এই শুকদেব রায়চৌধুরী প্রথম পীরালী দোষগ্রস্ত হওয়ার সামাজিক ব্যবস্থানুসারে জগন্নাথ ও তৎবংশীয়গণ সিদ্ধশ্রোত্রীয় থাকা সত্ত্বেও পীরালী থাকভুক্ত হইয়া গেলেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ঐ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। ঘটকগ্ৰন্থে আছে 'কার্পণ্যদোষঃ পীরালী'। ঘটকদের যথেষ্ট অর্থ দিয়া সমুদ্র করিতে যে সকল বংশ অসমর্থ ও অসম্মত হয়, তাহাদের পীরালী দোষ স্থায়ী হইয়া যায়। নতুবা কুলীনদের রাজবংশ, রায় রায় গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশ এবং হলদা মহেশপুরের অনেক পীরালীদোষগ্রস্ত বংশ 'ঘটকেন মার্জিত' হইয়া কুলীনবহুল সমাজেও গোপীপতি করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কাল হইতেই এই পীরালী সমাজের কল্যাণদোষগ্রস্ত কুলীন ও শ্রোত্রীয় সমাজ হইতে পাত্র সংগ্রহীত হইয়া এই সমাজের বিভূতি ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে। সেই প্রাচীনকাল হইতে অজ্ঞাবধি ইহা দেখা যায় যে কুলীন বা শ্রোত্রীয় সমাজ হইতে যিনি আসিয়া এ সমাজে বিবাহ করিতেন তিনি স্বসমাজ পরিভ্যাগ করিয়া যশ্বরাজ্যে গৃহ-জামাতারূপে বাস করেন।

এই জগন্নাথের বিবাহ সম্বন্ধে নীলকান্ত ভট্ট ঘটকের কারিকা বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস হইতে উদ্ধৃতি দিলাম—

জগন্নাথ জায়পকানন

বড়ই পণ্ডিত বিচক্ষণ

বড় বজ্রায় পুরানো কসবায করতেন গমন।

ভীমরব ভৈরবের জলে,

বাছে বজরা ভাসছে কুতুহলে,

ভট্টনারায়ণ বংশধর

জগন্নাথ, তারপর

এমন সময় ঝোড়ো কোণায় কালো মেঘের দরশন।

জগন্নাথ আজ হবেন চুঁটো,

পবন ধুলো উড়ায় বুড়ো বুড়ো,

তাই গুড় গুড় মেঘেরা ডাকে,  
কমে বাড়াবাড়ি চিকুর ইঁকে,  
জগন্নাথ পড়িয়া বিবম পাকে,  
চেস্টিয়ার কেসাতলায় করলেন মাকে দরশন।  
কেসাতলায় কালীবাড়ির পাড়া,  
রাজবাড়িতে প'ড়ে গেল সাড়া,  
বটে বটে বটে ভাটেরা কহ  
খট খট চলে রাজার চর,  
মুড়ের মাথায় চললেন রায় আরামিতে পঞ্চানন।

• রতনেতে জগন্নাথ বশ,  
আতিথ্যের কিবা স্থয়শ,  
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,  
রাখো মেরা বাৎ, চমো মেয়ে সাথ,  
চোকে সোয়ার এতি খোড়ে পর  
নম্ভ দিক্ হৈ তো রাজভবন।  
পুরুষোত্তম জগন্নাথ,  
চললেন শুকদেবের সাথ,—  
দেগিয়া সুন্দরী মেয়ে  
পুরুষোত্তম করলেন বিয়ে  
মুখমিষ্টি গুড় খেয়ে—

এই যে গোষ্ঠী মুখমিষ্টি জানে তা তো সর্বজন।

শুকদেব রায়চৌধুরীরা কান্তকূড়াগত কাঞ্চনগোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ দক্ষের পুত্র ধীরের বংশধর। রাজা ভূশুর ধীরকে মূর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত গুড় গ্রামের ভূস্বামী করেন। তিনি ধীরগুড়ী নামে অভিহিত হন ও তৎবংশীয়দের গুড়গাঁই হয়। শুকদেবের এক পূর্বপুরুষ রঘুপতি আচার্য কনকদণ্ডি নামে আখ্যাত হন এবং তাঁহার বংশীয়েরাও কনকদণ্ডি গুড় বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিম্বদন্তী এই যে, রঘুপতি দণ্ডিসন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং কালীতে তাঁহার বিজ্ঞাবত্তা ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া দণ্ডিরা তাহাদের নিজেদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই প্রাধান্য স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ একটি স্তবর্ণ-নির্মিত দণ্ড উপহার দেন এবং সেই হইতে তিনি কনকদণ্ডি আখ্যায় ভূষিত হন। আবার কেহ বলেন, তিনি কনকদাঁড় গ্রামে বাস করায় কনকদণ্ডি আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেই কারণে “গুড় গুড় মেঘেরা ডাকে” এবং “মুখ মিষ্টি গুড় খেয়ে” এই যে “গোষ্ঠী মুখ মিষ্টি জানে তা তো সর্বজন” প্রভৃতি বক্তব্য দ্বারা গুড় গাঁইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

“চেস্টিয়ার কেসাতলায় করলেন মাকে দরশন”—শুকদেব পীরালী হইবার বহুপূর্বে তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ দক্ষিণানাথ রায় কেসাতলায় যে কালী প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার বখেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল ও এখনো আছে। গুড় চৌধুরী বংশীয়েরা এখনো উক্ত কালীর

সেবায়ত। বিদেশাগত পণ্ডিকদের আশ্রয় স্থান ও অতিথি-সংকারের এই কালীবাড়িতে ব্যবস্থা ছিল। কারিকায় উক্ত পুরুষোত্তম বিবাহবার্তা জগন্নাথের বিশেষণ। এই চৌধুরী বংশের কন্ডাদের মুখমিষ্টি ও অঙ্গসৌষ্ঠবের সুখ্যাতি থাকায় পরবর্তীকালে কলিকাতার ঠাকুর বংশীয়েরা চিরদিন এই বংশ চইতে কন্ডা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। জোড়াসাঁকোর নীলমণি-শাখায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এই বংশে চইয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ-শাখায় দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও ৬৮নং প্রফুল্লনাথ ঠাকুরও এই বংশের কন্ডা বিবাহ করেন। এই চেস্টিয়ার পূর্বগণা হইতে কলিকাতা ঠাকুরগোষ্ঠীতে এত বহু সমাঙ্গম হইয়াছে যে বংশোদ্ভূত ঠাকুর বাবুদের মাতৃভূমি বলিলে অত্যাক্তি হয় না। এই রায়চৌধুরীদের অন্ততম বংশধর লখনৌ শিল্প কলেজের স্বনাম-প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিরণ্য রায়-চৌধুরী মূর্তি শিল্পী (Sculptor) বিলাতে প্রস্তর খোদাই ও গঠনাদি শিল্পে শিক্ষা করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাতের A. R. C. A. (Associate of the Royal College of Art) হন এবং ইহার ডাক্তারপুত্র রণজিৎ স্বরোদ যন্ত্রবান ও কুস্তির জ্ঞাত উত্তর-ভারত অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাঞ্জাবী মল্লদের প্রতিযোগিতায় লাহোরে পরাজিত করিয়া নিখিল ভারতের Wrestling Championship Trophy লাভ করিয়া শরীরচর্চা বিষয়ে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বিবাহের পর জগন্নাথ স্বীয় সমাজ ত্যাগ করিয়া যশোহর নরেন্দ্রপুর বারপাড়া গ্রামে স্বস্তর-প্রদত্ত ভূমিতে বাস্তুভিটা পত্তন করেন। সেই থানেই জগন্নাথের চার পুত্র হয় :—(১) প্রিয়ংবুর বা সদাশিব, ইহার বংশ নাই, (২) পুরুষোত্তম বিজ্ঞাবাগীশ, (৩) হ্রবীকেশ ও (৪) মনোহর। পুরুষোত্তম বিজ্ঞাবাগীশের পর তাঁহার অধস্তন বংশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞাবত্তার উপাধি না থাকায় তাঁহারা কুশারী ও চক্রবর্তী উপাধি ব্যবহার করিতেন। মুসলমান সরকারে কর্ম করিয়া হ্রবীকেশ ও মনোহর মজুমদার ও মুন্সী উপাধি গ্রহণ করেন। হ্রবীকেশের অধস্তন বংশীয়েরা বংশোদ্ভবের শাখাবিগাতির মজুমদার বংশ বলিয়া পরিচিত। মনোহরের অধস্তন বংশীয়দের এক শাখার বন্ডী ও এক শাখার মজুমদার উপাধি হয়। এই মুন্সীবংশ, বন্ডীবংশ এবং মজুমদার বংশ যশোহরের জগন্নাথপুর ও উত্তরপাড়ায় বসবাস করেন এবং বিভিন্ন উপাধিধারী হইলেও ঠাকুরবংশীয়দের গাঁই-গোত্রীয়-জ্ঞাতি। জগন্নাথ-পুত্র পুরুষোত্তম বিজ্ঞাবাগীশের অধস্তন পঞ্চম-পুরুষে মহেশ্বর ও শুকদেবের জন্ম। মহেশ্বর-তনয় পঞ্চানন ও তাঁহার পিতৃব্য শুকদেব নিজেদের ভাগ্যোন্নতির জন্ত ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে গোবিন্দপুরে কালী-ঘাটের নিকটে আসিয়া আদিগঙ্গাজাতীয়ে বাস করেন। তখন আদি-গঙ্গার নাম ছিল গোবিন্দপুরের খাঁড়ি (এখনকার দিনে ‘টালির নালা’ )।

[ ক্রমশঃ ।

॥ মাসিক বঙ্গমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ববাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥



# প্রাচীন মিশরে হিন্দু - সভ্যতার প্রভাব

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ মিশর দেশের গুরুত্ব অল্প

নহে। আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হইলেও শিক্ষার, সভ্যতার এবং সামরিক গুরুত্বে এই দেশ বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে সময়ে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ অজ্ঞানতার তিমিরে সমাচ্ছন্ন, সেই সুদূর অতীতেও এই দেশ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উচ্চ শিকরে আবোহণ করিয়াছিল। হেরোডোটাস্ ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে প্রাচীন মিশরের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা ছাড়া খৃষ্টানদের মধ্যযুগ বাইবেলেও এই দেশের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরীয় পুস্তক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর এডলফ্ এরমান (Adolf Erman) এবং কৈলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস এই বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

মিশর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন, সেমিটিক মূসর (Musr) অথবা আরবী মসর (Mosr) শব্দ হইতে মিশর শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যদের মতে সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দ হইতে এই শব্দটি আসিয়াছে। আমরা শব্দোক্ত মতটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

মিশরের উর্বর ভূগুণ বিভিন্ন দেশের কৃষকদিগকে এই দেশে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। পরবর্তী কালে ভারতীয় আর্যগণ আসিয়া এই দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর নিজেদের উন্নত সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নামেরও পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন— এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বিভিন্ন জাতির লোকের সম্মিশ্রণে যে দেশের জনসাধারণের উদ্ভব হইয়াছিল, ভারতীয় আর্যগণ তাহাদের সকলের সমান মর্যাদা স্বীকার করিবার জন্যই সেই দেশটিকে মিশ্রদেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সেমিটিক বা আরব জাতির সভ্যতা অপেক্ষা মিশরের সভ্যতা বহু পুণাতন। সুতরাং ঐ সকল জাতির প্রভাবে এই দেশের নাম পরিবর্তনের কল্পনা অপেক্ষা পূর্বোক্ত যুক্তিই অধিকতর বিচারসহ। সেমিটিক মূসর এবং আরবী মসর শব্দ সংস্কৃত মিশ্র শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি।

অতি প্রাচীন কালে মিশরের অধিবাসিগণ তাহাদের দেশকে 'কমিত' (Kamit) নামে অভিহিত করিত। অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে এই 'কমিত' শব্দটি সংস্কৃত 'কম্মত' শব্দের অপভ্রংশ। মিশরের যুক্তিকার কৃষ্ণ বর্ণ দেখিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ উক্ত দেশটিকে এই নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া অধ্যাপক দাস মনে করেন। অধ্যাপক দাসের এই অনুমান সত্য হউক আর না হউক, মিশর শব্দের মূল যে সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দ, এই সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

মিশরের ইংরাজী নাম 'ইজিপ্ট' (Egypt)। গ্রীকগণ এই দেশকে বলিতেন 'ঐজিপ্টস্'। এই ঐজিপ্টস্ শব্দ হইতেই ইংরাজী ইজিপ্ট শব্দটি আসিয়াছে। অধ্যাপক দাসের মতে ইহা সংস্কৃত 'আগুপ্ত' শব্দের অপভ্রংশ।

অল্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অধ্যাপক হীরেন (Heeren) মিশর এবং ভারতের নবককালসমূহ পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই উভয় দেশের লোকেরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত (Ibid, vol 1 page 77) অধ্যাপক হীরেন তাঁহার রচিত 'ঐতিহাসিক গবেষণা' (Historical Researches) গ্রন্থমালার এক স্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, মিশরবাসিগণের আদিপুরুষ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই দৃষ্টি ভারতবাসিগণের উপর পতিত হইবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'শকর' নামক একজন নরপতির অধীনে প্রাচীন মিশরের অধিবাসিগণ পূর্বদিকের 'পুন্ড' (Punt) নামক প্রদেশ হইতে এই দেশে আসিয়াছিলেন (Rigvedic India, by A. C. Das, Page—259) আমার মনে হয়, এই পুন্ড শব্দ সংস্কৃত 'প্রান্ত' শব্দের অপভ্রংশ। অর্থাৎ ভারতের এক প্রান্ত হইতে (সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত) উক্ত রাজার অধীনে প্রাচীন ভারতের এক দল লোক এই দেশে আসিয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। যে রাজার অধীনে তাহারা এই দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার নামও খাটি ভারতীয়ই বটে।

মিশরের প্রাচীন দেব-দেবীর নাম, বর্ণনা ও অর্চনা-পদ্ধতির সহিত ভারতীয় দেবদেবীগণের নাম, বর্ণনা ও অর্চনা পদ্ধতির বহুলাংশে মিল আছে। (ভারতীয়) ঈশ্বর = (মিশরীয়) ওসিরিস (Osiris) (ভারতীয়) ঈশ্বরী = (মিশরীয়) ঈসিস (Isis)। এইরূপ তর (বা সূর) = হোরাস (Horus)। সূর্য = সিরিয়াস (Sirius) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস্ এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কল্পনায় ও প্রাচীন মিশরীয়গণ বৈদিক চিন্তাশারা হইতে বেশী দূরে যান নাট (Historians' History of the world, vol I, Page—280)

'ওসিরিস' দেবের অর্চনা পদ্ধতি ভারতীয় শিবলিঙ্গের অর্চনা-পদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ বলিয়া বুঝা যায়। শিবলিঙ্গ পূজার অনুরূপেই ওসিরিস দেবকে নিশ্চিত লিঙ্গমধ্যে অর্চনা করা হইত। এমন কি, উক্ত 'ওসিরিস' দেবের অর্চনার প্রচলন সম্বন্ধে মিশর দেশে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাও ভারতের দক্ষবজ্র বিনাশ উপাখ্যানের অনুরূপই বটে। বিশ্ববোধ অভিধানে এই কিম্বদন্তীটি নিম্নলিখিত ভাবে লিপিত আছে। বখা—

"টাইফন নামক দেবতা হস্তগত পূর্বক ওসিরিসকে নষ্ট করিয়া তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন! এই অন্তত সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভাৰ্গ্যা আইসিস দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাইয়া প্রতীমূর্তি নির্মাণ পূর্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন।"—বিশ্বকোষ, লিঙ্গশব্দ।

দক্ষবজ্র বিনাশের উপাখ্যানে কথিত আছে যে, পতিনিদ্রা প্রবণে ঈশ্বরী সতী দেহভাগ করিয়াছিলেন এক তাঁহার দেহ বিক্ষুব্ধ চক্রবর্তী খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল, আর এখানে ওসিরিস বা সূর্য

ঈশ্বরের দেহ বিনষ্ট ও খণ্ডীকৃত করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইমাত্র বিশেষ্য।

বদিও মিশরীয়দের পূর্বপুরুষগণ এই পবিত্র ভারতভূমি হইতেই গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তথাপি পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের বংশধরগণও যে ভারতবর্ষ হইতে নব নব চিন্তাধারাসমূহ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। হেরোডোটাস, ডিওডোরাস প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে মিশরীয় নৃপতিগণ একাব্দিক বার ভারতবর্ষে বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন। হেরোডোটাস বলিয়াছেন—খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মিশরাধিপতি দ্বিতীয় রামশেষ ( Ramses ) [ ইতিহাসে ইঁহাকে the great or মহামতি উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে ] দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সিডিয়া, পারস্য ও বেকট্রিয়ানা বিজয়ের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

দ্বিতীয় রামশেষের ভারত অভিযানের ফলে তদানীন্তন মিশরীয়গণ ভারতীয় চিন্তাধারার সম্পর্শে আসিয়া এক নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই রামশেষের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরীয় মনোবিগণ বিবিধ কাব্য, অলঙ্কার ও দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। বাহা পূর্বে 'অসিসলিয়াস-এর ( অসকার ) মন্দির' নামে পরিচিত ছিল, রামশেষ তাহাকে এই সময় হইতে 'রামেশিয়াম' ( Ramesseum ) নামে পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে 'সেতুবন্ধ-রামেশিয়াম' নামক পবিত্র তীর্থে সিংহল বিজ্ঞতা ভারতীয় আরা নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রকে দেবতার মত গুজিত হইতে দেখিয়া এই বংশোদ্ভূত নরপতি স্বকীয় কীর্্তি প্রাতিষ্ঠার জন্ত উল্লিখিত অভিনব নামকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'রামশেষ' এই উপাধিটিও সম্ভবতঃ ভারতীয় নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রের নামের অনুল্লেক্য গৃহীত হইয়াছিল। মিশরীয় পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, মহামতি দ্বিতীয় রামশেষের প্রকৃত নাম ছিল 'সেসোহস্ত্রী' ( Sesostri ) সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর। তিনি 'রামশেষ' ( শেষরাম বা দ্বিতীয় রাম ) এই উপাধি ধারণ করেন।

দ্বিতীয় রামশেষের পূর্বেও যে মিশরদেশে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় রামশেষের পূর্ববর্ত্তী নৃপতি 'সেতি' ( Seti ) 'অবিদোয়' ( Abydos ) নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ দেবতা 'ওসিরিস' এর অর্চনার জন্ত এক মনোরম মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতির পূর্বে যিনি মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিও রামশেষ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, অধ্যাপক এরমানের মতে উক্ত প্রথম রামশেষের সিংহাসন আরোহণের কাল খৃঃ পূঃ ১৩৬৫ অব্দ। ভারতীয় সভ্যতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের কীর্্তি-কলাপের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সম্ভবতঃ প্রথম রামশেষের 'রামশেষ' এই উপাধি ধারণ সম্ভব হইত না। এতদ্ব্যতীত 'ওসিরিস' দেবের লিঙ্গপূজা এবং তৎসংক্রান্ত প্রবাদসমূহ যে ভারতীয় সভ্যতারই প্রভাবের ফল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু বিষয়ে প্রাচীন মিশরে হিন্দু সভ্যতার

আলোক সম্পাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। চূড়ান্তরূপে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি—

(১) ভারতের সুপরিচিত বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে ভগ্নাত্মক বহুস্তর উল্লেখ আছে, প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও তাহাতে সন্নিবিষ্ট বিশ্বাস দেখা যায়।

(২) প্রাচীন ভারতের লেখকগণ কোন লেখাতেই নিজদের নাম বোগ করিতেন না, ইহার অবিকল অনুল্লেক্য প্রাচীন মিশরের লেখাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক অধ্যাপক এরমান ইহা লক্ষ্য করিয়া সন্নিবেশে লিখিয়াছেন—

"Poetry, we see, flourished at the time of Ramses, and the manuscripts of the works have been preserved, but the names of the authors were not added."

(Historians' History of the World, vol—I, Page—147)

বঙ্গার্থ—আমরা দেখিতে পাই, রামশেষের সময়ে কাব্যরচনা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সকল কবিতার পাণ্ডুলিপি সমূহও সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোথাও লেখকের নাম সম্বোধিত হয় নাই।

(৩) গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরে পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল এবং এই জাতিটি জন্মানুযায়ী বিবেচিত হইত। সময়ে সময়ে রাজবংশীয় ব্যক্তিদিগকেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখা যায়। সমাজের উপর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রভাব ছিল, এমন কি নৃপতিগণ পঞ্চাশ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। পুরোহিত সম্প্রদায়ের পরেই সমাজে বোদ্ধ সম্প্রদায়ের স্থান ছিল। ইহাদের জাতিও জন্মানুযায়ী বিবেচিত হইত। পুরোহিত ও বোদ্ধগণ প্রভূত পরিমাণ ভূমির অধিকারী হইতেন এবং এইজন্ত তাঁহাদিগকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হইত না। অবশিষ্ট জনসাধারণ কৃষিকার্য, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিত এবং তাহারাই রাজ্যের প্রকৃত প্রজা হিসাবে বিবেচিত হইত। এই সম্প্রদায়ের কেহই পুরোহিত অথবা সৈনিক হইতে পারিত না।

ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা সহিত মিশরের এই জাতিভেদ প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেবলমাত্র, ভারতে বৈশ্য নামে একটি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু মিশরে এই শ্রেণীর লোকদিগকে শূদ্রপর্গায়ে গণনা করা হইত। এতদ্ব্যতীত আর সকল বিষয়েই এই জাতিভেদ প্রথাটিকে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার অনুল্লেক্য বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক এরমান এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The Egyptians are said to have been divided into castes, similar to those of India."

(Historians' History of the World, Vol-1, page 200)।

বঙ্গার্থ—মিশরীয়গণও ভারতীয় জনগণের মত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(৪) মিশরীয় নরপতিগণ যেমন ভারতীয় নৃপতি জীবনের নামের অঙ্কন করিতেন, তেমনি তাঁহার অগ্রগত গুণাবলীর অঙ্করণেও তাঁহার কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বদেশের জনসাধারণকে তাঁহার জীবনের মত এক পত্নীভূত পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(৫) যে সময়ে মিশরের মনোবিগণ অধ্যাত্ম আলোচনায় বিবর্ত হইয়া বস্তুতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের মনোবীর ফলে সহস্র সহস্র বৎসরের জ্ঞান মৃতদেহ সমূহকে অবিকৃত রাখার কৌশল আবিষ্কৃত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিস্ময়স্থল পিরামিড সমূহ নির্মিত হইতে লাগিল, তখন মিশরের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বদেশীয় সভ্যতার অবনতি বলিয়া মনে করিতেন। 'প্রিন্সে পেনিয়ারাস' নামক নুপ্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চায় বিবর্ত হইয়া নালীক (বন্ধু ও পিতৃল) মহানালীক (কামান), অগ্নিচূর্ণ (বান্দ) ও অস্ত্রাশ্রয় মারায়ক সমরোপকরণ নির্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সনাতনপন্থী মনোবিগণ তাঁহাদের এই কার্যকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিতেন। শুক্রনীতিসার প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নালীক, মহাজালীক ও অগ্নিচূর্ণের সাহায্যে যুদ্ধ করাকে যুগান্তরে 'আত্মরিক যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পরবর্তীকালে যেমন রক্ষণশীল দলের চেষ্টার ফলে বান্দ প্রভৃতি নির্মাণের নৃত্র (ফরমুলা) পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি মৃতদেহ অবিকৃত রাখার বিজ্ঞাটিও ক্রমশঃ মিশরদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল। ইহাকে ভারতীয় ভাষাভাষার প্রভাবের ফল মনে করা অসঙ্গত হইবে না। ধ্বংসাত্মক কার্য হইতে মানুষকে বিরত করিবার জন্য ভারতীয় মনোবিগণ বান্দ নির্মাণ-বিজ্ঞা বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আর মানুষকে অপব্যয়ের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মিশরদেশের মনি-নির্মাণ-বিজ্ঞা (মৃতদেহ অবিকৃত রাখার বিজ্ঞা) সেই দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিলোপিত হইয়াছিল।

(৬) প্রাচীনকালের ভারতীয়গণের মধ্যে একরূপ বিশ্বাস ছিল যে, অশেষ পুণ্যশালী মনুষ্যগণ দেবতা বা নন্দ্রজ্ঞ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জুব, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী প্রভৃতির নন্দ্রজ্ঞলাভ এবং নহবের ইন্দ্রজ্ঞলাভ প্রভৃতির বিবরণ প্রদর্শন করা বাইতে পারে। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ বিশ্বাস ছিল। হেরোডোটাস্ ডিওডোরাস, ডাঃ এরমান প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৭) অবৈধাধিপতি রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ 'সূর্য' দেব ছিলেন বলিয়া ভারতীয়গণ বিশ্বাস করিতেন; আর প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাদের রাজবংশের আদিপুরুষ দেবতা সূর বা সোল (Sol)। সংস্কৃত ভাষার 'সূর' শব্দে সূর্যকেই বুঝায়; এবং র ও ন এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন।

(৮) মিশরীয় বীরগণ যে সময়ে দিগ্বিজয় ব্যপদেশে নুতন ভাবে ভারতীয়গণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হইতেই ভারতীয় অঙ্করণে মিশরের সর্বত্র অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হইতে থাকে। পেট্রোনিয়াস (Petronius) নামক নুবিখ্যাত

পর্যটক মিশরের অসংখ্য দেবমন্দির দর্শন করিয়া আশ্চর্যবিত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"This country is so thickly peopled with divinities, that, it is easier to find a god than a man." (ডাঃ এরমানের প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত)।

বঙ্গার্ধ—এই দেশে দেবতাগণের এতই ঘনবসতি যে, একজন মনুষ্যকে খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষা একজন দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করা অধিকতর সহজ।

অঙ্করণকারিগণ যাহার অঙ্করণে প্রবৃত্ত হন, অনেক সময়ে কোন বিষয়ে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। দেবমন্দির নির্মাণ ব্যাপারে মিশরবাসিগণও তাহাই করিয়াছেন।

(৯) ভারতবর্ষে যেমন মিথিলার রাজপুত্র কুশধ্বজ প্রমুখ কোন কোন নৃপতিনন্দন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া তপস্বীয়ায় আত্মনিয়োগ করিতেন, মিশর দেশেও তেমনি কোন কোন রাজপুত্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া দেবমন্দিরে দেবতার সেবাকার্যে নিযুক্ত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় রামশেষের জ্যেষ্ঠপুত্র 'খামুস' (Khamus) এর উল্লেখ করা হইতে পারে।

(১০) 'পেনিয়ারাস' নামক প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সমুদ্রে জাহাজ ভুবিয়া বাওয়ার ফলে জটিল নাবিক ভাসিতে ভাসিতে মৃতদেবতার দেশে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেইখানে থাকিয়া কিছুদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের পর পুনরায় একখানি স্বদেশীয় জাহাজের সাহায্যে মিশরে প্রত্যাবর্তন করে। এই উপাখ্যানটি দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে, ইহা কঠোপনিষদে বর্ণিত নচিকেতার উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

(১১) প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যেমন অনুলোম বিবাহের প্রচলন ছিল, প্রাচীন মিশরেও তেমনি বিভিন্ন জাতিঃ মধ্যে অনুলোম বিবাহের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পশুপালক সম্প্রদায়ের কস্তাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

(১২) প্রাচীন ভারতে যেমন ব্রহ্মবাদিনী নারীগণেরও উপনয়ন, বেণাধ্যয়ন প্রভৃতি সংস্কারের অধিকার ছিল, প্রাচীন মিশরেও তেমনি নারীদিগকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে অধিকারী হইতে দেখা যায়।

(১৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যগণ যেমন চিকিৎসা ও অন্ত্রোপচার বিজ্ঞার অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন প্রাচীন মিশরীয়গণও তেমনি এই দুইটি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কানীরাজ ধনুস্ত্রীর মত এত প্রাচীন না হইলেও মিশরের আদিরাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি টেটা (Teta) টাইটর জয়ের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে শরীর ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞা (Anatomy) সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মিশরের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নূন্য ভাবে সমালোচনা করিলে ইহাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুসভ্যতার প্রগাঢ় ছায়া অবলোকন করা যায়। এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মিশরের জনসাধারণ আবারেই দূরবর্তী জাতি এবং সভ্যতার বিকাশেও তাঁহার বহুলাংশে আমাদের সমশ্রেণীভুক্ত।



# ব্রাহ্ম

## অক্ষয়কুমার দত্তের পত্রাংশ

অক্ষয়কুমার মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল পত্রের অংশ-বিশেষ ১৩১১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল :—

### মাতৃত্বকি।

আমি শারীরিক এক প্রকার সুস্থ আছি। কিন্তু পরমারাধ্যা মাতারীকরণীর চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে। বোধ হয়, তাঁহার স্নেহময় মুখমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয়, এক দিন পরে আমার একান্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মূলিত হইল। যদিই তাগাই ঘটে, আপনকার রচিত, মধুময়, শোক-সংগত প্রস্তাবটি পাঠ করিব।—

### সহৃদয়তা।

আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের হৃদয়ে হৃথিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন, তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এতকণ করিয়াই পরমাণু ক্ষেপণ করিতে হইল।—

### বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি।

তথাকার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকালয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অতি শুভশ্রুত বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তদর্থে নূতন নূতন গ্রন্থ অমুদ্রিত বা রচিত হইলে বহু উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বেঙ্গি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারপণ করিয়াছেন, তাহা লিখিতে অবগত বহু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্বারা লোকের বিশ্ব উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই সকল কার্য ধারাই এ দেশের স্বার্থ হিত হইতে পারে। (ইং ১৮৫১)।—

### বিধবা বিবাহ প্রচলন।

আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা বিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্ট আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আশ্রয় করিবেন না। বিভাগসংগত মনের সহিত আশীর্বাদ করিতেও ক্রটি করিবেন না। জয়োহস্ত! জয়োহস্ত!

### সুস্বাসিকতা।

এবার অতিশয় শিথল হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃত্তাস্তর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে [১২৫৮] রজনীযোগে অপরাহ্নে বারিবর্ষণ দ্বারা মেদিনী সুশীতল হইয়াছে। বৃত্তকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল বায়ু সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তাস্তর এখানে

পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্বক দক্ষিণ দিকে [অর্থাৎ মেদিনীপুরে] গিয়া উদয় হয়, এই আমার শঙ্কা হইতেছে। আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রার্থনা, সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উডউয়মানা হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীর সুস্থিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।

আপনাকে মহারণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ হইবেক।

আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। তুনিলাম, তথায় মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিছু মন্ত্রতন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটার ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? “বিশ্বা বিশ্বমোষণঃ।” বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া বড় বাবু [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন। আপনি প্রোতঃপ্রান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়াংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু গলনা করিবেন। আর নিজ হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।

### ব্রাহ্মসমাজ।

এখানে [তত্ত্ববোধিনী] সভা ও [ব্রাহ্ম] সমাজের কার্য পূর্ববৎ চলিতেছে। গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সকলেই স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি ত্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী বাবু এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সমাজে বিলক্ষণ লোকসমাগম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্মের বাঙ্গালা ভাষা প্রস্তুত হইতেছে। বড় বাবু তাহার কিঞ্চিৎ আপনার দৃষ্টার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। এ ভাষা বিশিষ্টরূপ উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।— (জুন ১৮৫২)

তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা কোন তারিখে উঠিয়া যায়, যদি অমুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, অগ্রগ্রহপূর্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার একটি বক্তৃতা সংক্রান্ত মোকদ্দমাই উহা উঠিয়া যাইবার কারণ। অতএব আপনি সহজে জানিতে পারিবেন বোধ হয়।

### উইলিয়াম কেরীর চিঠি

১৮০১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীচরণ এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। চণ্ডীচরণের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয় তাঁহার ‘তোতা ইতিহাস’ের জন্য। ইহা কাদির বংশ-প্রণীত কাঙ্গী ‘তুতিনামা’র বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ

করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস'ের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১৬ই জানুয়ারী ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। এসম্বন্ধে কেরীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

Sir...Accompanying this is a translation of the 'Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him. W. Carey.

AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.—Home Mis. No. 559, p. 304.

'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪ এবং আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

তোতা ইতিহাস।—বাক্সানি ভাষাতে শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সীরে রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৫।—

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'তোতা ইতিহাস' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৬ বোড়শ ইতিহাস।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।—

বখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন ষোড়শস্তা প্রেম্যানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তোতার অগ্রে ঘাইয়া কহিলেক, ওহে শ্রামবর্ণ তোতা, তুমি প্রত্যাহ জানবাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না, কেন না যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক, তুমি কত্ৰী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কাণ্য করে, সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারি জন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়াছিল? ষোড়শস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে, সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

'তোতা ইতিহাস' বহুল-প্রচারিত পুস্তক। লগুন হইতেও ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চণ্ডীচরণ আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ৮০ টাকা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—ইহা ভগবদ্গীতার পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ। ইহার পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১২ই নবেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এসম্বন্ধে কেরীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

To the Council of the College of Fort William. Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishna Chunder Roy (late of Krishnagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvat Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tootch numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am, Gentlemen,

Your most obedient humble servant,  
W. Carey.

College, 5th Oct. 1804

RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language, and 100 copies of the 'Translation of the Tootch namah into the Bengalee Language be subscribed for by the College.

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.—Home Mis. No. 559, pp. 384-85.

চণ্ডীচরণ-কৃত ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। ২৬শে নবেম্বর ১৮০৮ তারিখে চণ্ডীচরণ মুন্সীর মৃত্যু হয়। পর-বৎসরের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে অমৃত্যু কলেজ-কাউন্সিল-অধিবেশনের কাণ্য-বিবরণে প্রকাশ :—Chundee Churn a

Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December 1808 to succeed him: (Home Mis. No. 560, p. 554.)

### রামমোহন রায়ের চিঠি

রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেজ্ঞ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্ম গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্পয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া ‘মীরাং-উল-আখবার’ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বাহা লেখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাং-উল-আখবার

শুকবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিবিক্রম সংখ্যা)

পূর্বেই জ্ঞান হইয়াছিল যে, মহামায়া গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, বাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিশ আপিসে স্বাধিকারী দ্বারা হস্তাক্ষর না করাইয়া ও গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসম্মত হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এ-এ-জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে মুর্শীদ কোটের বিচারপতি মাননীয় সার ফ্রান্সিস ম্যাকনটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাহার জন্ম, মনুষ্য-সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও চাঞ্চল্য সহিত এই পত্রিকা (‘মীরাং-উল-আখবার’) প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সত্বিত যে-সকল ইউরোপীয় জরুলোকের পবিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্ত ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুঃস্থ ; এবং আমার বিবেচনায় বাহা নিষ্পয়োজন, সেই কাজের জন্ম নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পায় হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আজ কে বাস্‌ খুন ই জিগব বস্ত দিহদ

বা-উমেদ-ই করম-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে

মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাণ্ড আদালতে সম্ভাস্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হস্তাক্ষর করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিম্নাচ’ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, বাহার জন্ম কাল্পনিক স্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হস্তাক্ষর করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শাস্তি বিনষ্ট হইবে। কাব্য, মানুষ স্বভাবতঃ ভ্রমশীল ; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত একপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, বাহা গবর্ণমেন্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাটী শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজ! মাখরোশ

কমুক-ই-মসলিহ-ই খেগ খুসরোয়ান দানন্দ।

—হাফিজ! তুমি কোণার্ষেয়া ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজ্যবাই জ্ঞানেন।

পাশ্চাত্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহাত্ম্যব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ‘মীরাং-উল-আখবার’কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায তাঁহারা যেন আমার মত সামান্ত ব্যক্তিকে সর্বদাই তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজেক্ট্রিকৃত হইবার পূর্বে ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া তিনি তাঁহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধু সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইংলণ্ডের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে যুদ্ধাশ্রয় বিষয়ক আইন বিতর্মান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অল্পতম স্বাধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা ১ই মে ১৮২১ তারিখের প্রকাশিত ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’।

... এ মাসের প্রচুদপট ...

[ এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি প্রামাণ্য-বালিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত। ]



নীলকণ্ঠ

একুশ

লোকে বিলাত যেত; এখন স্ট্রীলোকেও যায়। টেলিউভের কুমার আর মেবীদের দল্লর বিলাত যাওয়া নয়; বোম্বাই যাওয়া। বিলাত ফেরতের চেয়ে টেলিউভে বোম্বাই-ফেরতের কদর আজ অনেক বেশী। বিলাত-যাত্রীর ডায়েরীর চেয়ে টেলিউভ থেকে বোম্বাই-যাত্রীর ডায়েরিয়া আর ফিল্ম মাগাজিনে অনেক উল্লেখ্যক সন্ধান। লোকে বিলাত যেত ব্যারিষ্টার হতে; আই-সি-এস হতে; ইঞ্জিনিয়ার হতে, ডাক্তার হতে! শুধু বিলাত নয়, ইরোপ। ফিরে আসত একজন খ্রীস্টবান হয়ে, একজন সুভাষ বোস হয়ে, কেউ মোহনদাস হয়ে গিয়ে ফিরে আসত মহাত্মা গান্ধী হয়ে, কেউ মতিলালের ছেলে হিসেবে বেক, ফিরে আসত পৃথিবীর অকৃতম শ্রেষ্ঠ অটোবায়োগ্রাফার হবার জ্ঞান। এরা সংখ্যার আড়লের অঙ্ক অতিক্রম করে 'না। বাকী অসংখ্য নগণ্যরা, অগণ্যরা বাপের পরস্রা ওড়াবার জ্ঞান, ব্যক্তিগত নামে বীন্দ্রামি, প্রগতির নামে মঙ্গলান, শিক্ষার নামে বিলাতী বীন্দর নাচ, আর থাকা খাওয়ার খরচার নামে বারবানিতা নয় বড় জোর ওয়েস্টের পেছনে খরচা করত। এবাই দেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের কুকুরকেও কোল দিত অনেক বেশী। সেদিনকার বিলাত-যাত্রী আর আজকের দিনের বিলাত-যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই কিন্তু দৃষ্টিকোণের কোনও পরিবর্তন হয় নি। সেদিন শুধু একদল ছিল যারা বিলাত না গিয়ে সাহেব হত, আজ তারা বিলাত না গিয়ে বিলাতের গল্প লেখে, সেই সব গল্প বাংলা দেশে প্রচুর বিক্রী হয়। ডি, এল, রায়

মিথ্যাই লিখেছিলেন বিলাত দেশটা মাটির। বিলাত দেশটা আজও অনেক এদেশীয়র চোখে সোনারপার!

সেই সোনারপার দেশ থেকেও আসত লোকে মাটির ভারতবর্ষে। তারা হচ্ছে মিস মেয়ো। মহামানবের এই সাগরতীরে ভারত তীর্থে তারা তীর্থঙ্কর হয়ে আসত না; তারা আসত এখানে সেখানে যত নন্দ্যমা আছে; তার খবর বয়ে নিয়ে যেতে খবরের কাগজে। Drain Inspectors' report দিত মিস মেয়োরা। বিদেশিনীর সেই ভারত-বিদ্বেষ, তার অর্থ আবিষ্কার করতে বেশী দূর না গেলেও চলে। কিন্তু একদল এদেশীয় ভীষ বিলাত ঘুরে এসে আত্ম-জীবনী উপলক্ষ্য করে স্বদেশ এবং স্বজাতি নিন্দায় যে বীভৎস রস সৃষ্টি করে আজও তার বহুস্ত অমুখাবন করা অসম্ভব। এরা মিস মেয়োরা দল নয়, এরা তার চেয়েও সাংঘাতিক। এরা আসলে মানুষের আকৃতিতে-সারমেয়র দল। এই সব সারমেয়রাই চিরকাল দেশের ঠাকুর দেখলে পা কামড়ে দিতে এসেছে বিদেশী কুকুরের সম্পর্কে আসা মাত্র স্বাভাব্যপ্রীতিতে গলে গিয়েছে। তাদের দিন হয়ে এল বলে! এখন আর বিলাত নয়, এখন বিলাতের বদলে বোম্বাই। বোম্বাই,—A land of glamour; goggles; gabadine & GOATS.

ভারতবর্ষের টেলিউভ হচ্ছে টালিগঞ্জে বাংলা দেশের ফিল্ম ষ্টুডিও; ভারতবর্ষের হলিউড হচ্ছে বোম্বাইয়ের ফিল্ম ষ্টুডিও। বোম্বাই ফেরৎ না হলে বাংলা দেশ আজ পাতা পাতা শব্দ। বিলাত-যাত্রীদের মধ্যে যেমন কখনও কখনও কেউ কেউ ফিরে আসত খ্রীস্টবান, সুভাষ হয়ে,—বোম্বাই থেকে কেউ ফিরে আসত, সার না; ফিরে আসতে বাধ্য হলে বাংলা দেশে এসে তারা অশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বাই-ইন্ডিয়ায় পজু হয় তারা চিরকালের মত। বাংলা দেশের ছায়াছবিব জগতে সমান পাল্লায় দৌড়তে গিয়ে এরা দ্বিটকে পড়ে ল্যাড়া হয়ে যায়; তারাই বোম্বাইতে গিয়ে ল্যাড়া আম বনে যায় বাতাপ্রাতি; তারপর হারান-জল-রশিদের রাত ভোর হবার আগেই আমচুর হয়ে মুখ চূর্ণ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে। তাদের মধ্যে থেকে যেটুকু রস নেবার সেটুকু শুধে নিয়ে ভিবেড়ে করে ফেরত পাঠিয়ে দেয় রেজিষ্ট্রি করে with acknowledgement due! শাসটুকু বার করে নেবার পর ছোবড়ারা যখন আবার টেলিউভের আনাচে কানাচে চুঁ মাঝতে বাধ্য হয় তখন বাকী জীবনভোর তাদের বাকী থাকে শুধু দর্শনাস। বোম্বাইয়ের সঙ্গে নতুন দিল্লীর এই এক জায়গায় ভেঙ্কর মিল। বাংলা দেশকে যেখানে নাহলে অচল সেখানে বাঙ্গালীকে নাও। কান্স ফুরিয়ে গেলেই বার করে দাও। নতুন দিল্লীর মন্ত্রিসভাতেও যা; বোম্বাইয়ের ছায়াছবিীদের মঞ্জুর সভাতেও তাই!

কিন্তু এই সব বাঙালী ছায়াশিল্পীরা যারা বোম্বাইয়ের চোরাবালিতে পা বাড়ায় তাদের অপমৃত্যুর ইতিহাস, বালারা কি দিয়ে ভাত রাঁধেন, চুল বাঁধেন তার খবর ছাপা ফিল্মের খবর কাগজে বোঝায় না; বেবোয় না বলেই বকে বসে নরকগুলজার করা ছেলেছোকরার দল ভাবে ভিক্টোরিয়া টামিনাস পঞ্চম টিকিট কেটে অথবা টিকিট না কেটে একবার পৌঁছতে পারলেই ভিক্টরী অবশ্যকরী। বাংলা দেশ থেকে যারা বোম্বাই যায় হয় অশোক নয় হেমন্তকুমার হওয়া তাদের সবার বাঁধা, এই মনোভাবই বর্তমানে উড্ডীয়মান বাঙালী ফিল্ম

ষ্টার অথবা টেকনিশিয়ানদের একমাত্র স্বপ্ন। শুনে কৃষ্ণচন্দ্র দেব সেদিনকার কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে স্বপ্ন যদি মধুর এমন...।

বোম্বাইওলা নয়; বোম্বায়ের প্রবাসী বাঙালীই এখান থেকে সত্ত্ব উপস্থিত বাঙালীর সব চেয়ে বড় শত্রু ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বায়ের ফিল্ম-ইন্ড্রির বিপুল সাম্রাজ্যে। হেমন্তকুমারের ইতিহাসই জানি। বোম্বাইতে যাতে তিনি কিছুতেই কাজ না পেয়ে, কাজ কোনও রকমে পেলো কাজ করতে না পেয়ে ঢলে যেতে বাধ্য হন তার জন্য বোম্বাইবাসী ফিল্মী-বাঙালী করে নি এমন কোনও অস্ত্রায় নেই! বড়বজ্ঞ থেকে শুরু করে মারগ উচাটন মায়ের পায়ে পূজা পর্যন্ত বাকী তারা রাখে নি কিছুই। একজনকে বলতে শুনেছি হেমন্তের উদ্দেশ্যে: 'This is your last chance before the final kick! অবশ্য সেই কিক্ হেমন্তকুমারকে শেষ পর্যন্ত দিতে পারেন নি কেউ! সব ক্রিক; সব ক্রিকেট মিস ক্রিক প্রতিপন্ন করে বোম্বায়ের হলিউডে কীর্তিমান হেমন্তকুমার শুধু নিজের নয়, সমস্ত বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছেন।

হেমন্তকুমারের কণ্ঠই কেবল বিশ্বের বঙ্গ নয়; মানুষটির বিষয়কর। এখনও; আজও; এই মুহূর্তে হেমন্ত যেমন ছিলেন তেমনি-আছেন। সেই সাতটির হাতা কয়টি পর্যন্ত গটানো। ধৃতিব কোঁচা হাতে ধরা; পায়ে চটি। নমস্কার করবার আগেই গাড়ীর ড্রিয়ারিং বসে যে কোনও পরিচিতকে আগেই অভিবাদন জানানোর সেই পুরানো রীতিতে পরিবর্তন আসে নি এতটুকু। আজ পুঙ্খ কখনও কাউকে আগে নমস্কার করতে দেখলাম না হেমন্তকে। হেমন্তই ননকালে ভঙ্গীতে হাত তুলবেই আগে। স্বর্ণকণ্ঠসমূহ হেমন্তকুমার সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ এ কথা বললে অপলাপ হবে; কিন্তু পরিচয় যদি প্রতিভার কোনও পরিচয় হয়; হুঃসহ, হুঃহ হুঃহ হুঃহ বয়ে বয়ে ট্রান্স হবার ক্ষমতা সিদ্ধান্তমতে যদি কোনও প্রমাণ হয় প্রতিভার তবে হেমন্ত নিঃসংশয়ে প্রতিভাবান। কি বিপুল বৈদ্য; দুবছ প্রথম দেখলে কি আশ্চর্য আরোহণ সাক্ষ্যের শীর্ষে, হেমন্তের এই সাক্ষ্যের ইতিহাসের সঙ্গে যারা নেই ওতপ্রোত জড়িয়ে তাদের অধুগমন অসম্ভব সে অভিজ্ঞতা। ধাপে-ধাপে; বীরে-বীরে; শলক নয় শলুক গতিতে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছে পিছন ফিরে তাকালে অতিক্রান্ত সেই হস্তর পথ আজ হেমন্তের নিজের কাছেই এক প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে; কৈমন করে অতিক্রম করে এল সেই অসুস্থীন পথ সে কি সত্যই নিজেরই জানে তার উত্তর।

অভয় সরকারের প্রায় অন্ধ গলিতে বন্ধুর বাড়ীতে বসে কয়েক বছর আগেও মনে আছে আমরা সবাই বখন নাওয়া-খাওয়া ভোলা আড্ডার আত্মনিমজ্জিত তখনও স্রুড়ং করে হেমন্ত সবে পড়েছেন নিশেদৌকখন টের পাইনি। ফিরে এসেছেন আড্ডায় এক ঘটা বাদে পনের টাকার টুশনি সেয়ে; টুশনির মায়ায় প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে তখন; কিন্তু আড্ডার চেয়ে যে কাল বড়ো এবিখাস তখনও তাঁর অফুরন্ত। সেই বিখ্যাসের বলেই তিনি আমাদেরই মত আড্ডা দিগেও গাড্ডায় পড়েন নি কখনও। এই দেখেছি একদিন; আর আরেক দিন এই সেদিন দেখলাম সারা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রশ্রবকার হেমন্ত এসেছেন কলকাতায় বাংলা ছবির গানে সুর দিতে। সকাল থেকে রাত ছটোর মধ্যে স্বরলিপি করে; সুর তুলিয়ে শিল্পীর কণ্ঠে; মহলার

পর গান রেকর্ড করে শেষ রাতে সমদম থেকে উত্তোভাহাজে উড়ে গেছেন সাঁটা ক্রুজে।

এ হল হেমন্তের বাটবের দিক। ভিতরের মানুষটি আরও আশ্চর্যকর। নিজের মা-বাপ-ভাইয়ের জন্য হেমন্ত বা করেছেন এবং এখনও বা করছেন বাঙালী বড় হলে তা কোনও দিন করে নি; তা কোনও দিন করে না। হুঃহ বন্ধুকে বিশ্বরণ; মা-বাপ-ভাইকে তাগ; এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করাটী ছোট থেকে বড় হওয়া বাঙালীর দম্বর। দম্বর মত বড় হওয়া হেমন্তকুমার সেই নিয়মেরই প্রমাণ হিসাবে একমাত্র ব্যতিক্রম। পরকে ভালোবাসতে পেয়েই দেশকে ভালোবেসেছেন তিনি। তাই বোম্বাই গিয়েও তিনি বাঙালীই আছেন। তাঁর বাড়ীর সোফের কাছেই শুধু জানতে পারা সম্ভব যে ফিল্ম লাইনের দল-ছাড়া জীবন ও জীবিকা গ্রহণ করেও যরকে তিনি বাটবের থেকে আয়রক্ষা করেছেন; ছন্দ রেখেছেন বজায়। শুধু লক্ষ্যী নয়; লক্ষ্মীও হেমন্তের ঘরে বাঁধা! এমন মানুষটি বড়-মানুষটি হলো মানুষ; কাজে আসে। না হলে মানুষ শুধু বড়লোক হয়; বড়-মানুষ হয় কোথায়?

কিন্তু হেমন্তকুমার হাজার মানুষের সাক্ষ্য একা গলায় পরলেও তিনি একজনই; দ্বিতীয় নেই তাঁর দ্বিতীয় বোম্বায়ের বাঙালী-পল্লীতে। আর অশাক-কুমার? তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তিনি ফ্রিক অন্নেচো। Superman যদি বার্বারি শ'ন বই ছাড়া কোথাও অস্তিত্ব-অসম্ভব হয় তবে সে অশোককুমার হিউমান হলেও তাঁর কপাল সুপার-হিউমান। অসম্ভব ক্ষুদ্র কৃষ্টি অশোককুমারের ক্ষেত্রে বাঙালী-অবাক্যে হেম বাম্বাই যোগে চৌক নি! ভাগ্যের তোপের মুখে টো-পেড়ে ছায়াগের মিছিল। তাই দ্বিতীয় মহামুন্দের অনেক আগে থেকে দ্বিতীয় মহামুন্দের যুগোমুখী এসেও এসেও ভারতীয় ছায়াচিত্রকাব্যের অশোককুমার এখনও Evergreen Hero! তিনি ভয়াকাতের ভীতু জিজ্ঞাসন তিনি, 'Still going strong! জামরা চাই আর না চাই; ভাগ্য চায়, তাই তাঁর ক্ষয় হক; কাহন সব কিছুই পড়ে বা অবিস্মরণ-যোগ্য ঘটনা,—তা হল তিনি বাঙালী। বাংলা ভাষা তাঁর মাতৃভাষা; হিন্দি তাঁর বিমাত্রভাষার তুলনায় তা যেমনই বলুন না তিনি বাঙালী!

কিন্তু বোম্বায়ে যেমন কতটী হক সে সব বাঙালীরা টিকে গেছেন, তাঁরা বাঙালীর বত বড় ঘরের শত্রু বিলিগন একে ভীষণ শত্রু কিন্তু বোম্বাইওলাও নয়। এখানে ইন্ডিয়ানরা যেমন ইন্ডিয়ান সুনাই নাক সিটকায় সাংসদের চেয়েও বেশি; বোম্বের এই সব বাঙালীর তেমনই বাঙালী বিষয়ে বিদেশের ওপর চৌক দেয়। এরা হল বোম্বাই আর বেঙ্গলের সন্ধি নয়; এদের অভিসন্ধি শুধু বাঙালীরা পেটের বম্বের হয়ে bamboo দেওয়া। তাই এরা হলো বোম্বাই প্রাস বেঙ্গল ইকোয়াল টু বাম্‌লোবেঙ্গলী। এরা একেকটি মিছ! বাঙ্গলা ছবি রাষ্ট্রপতি পদক পেলে বোম্বাইওলা মানে; কিন্তু ব্যাম্‌লোবেঙ্গলী-সম্প্রদায়ের পাণ্ডুরা প্রত্নবাদ কানায়; মৌলিক প্রত্নবাদ নয় শুধু কেমলীয় কমিটিতে ঢুকে লিপিক প্রত্নবাদ জানালে তাই বঙ্গদেশে জন্ম বোম্বায়ের মাটিতে সার্থক মনে করে! এই সব বিবধর বাদের ধরে ধরে কোতল করা উচিত বোম্বাইতে পদাৰ্পণ করা মাত্র এদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বঙ্গবাসী! তাহা জানে না যে বোম্বাইতে না খেতে পেয়ে বাঙালী মারা গেলে এরাই বঙ্গবাসীর চিতায় দেবে বাঁশ!



## বাইশ

ভারতীয় হলিউড, বোম্বায়ের ফিল্ম ষ্টুডিওর তুলনায়, টলিউড, —টালিগঞ্জের ষ্টুডিওগুলি তীর্থক্ষেত্র। বর্ণনা অসম্ভব, বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যের আনন্দাওয়া এতদূর দূষিত যে সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া শক্ত। এমন কোন অশ্রায় বা অশ্রুতিত হয় না এই সব ষ্টুডিওতে; এমন কোনও বিবেক বিকল্প কাজ নেই বা বোম্বায়ের ষ্টুডিওতে করতে বাধে; এমন কোনও পাপ নেই বা পুনরাবৃত্তিতে এখানে কাকুর বুক কাঁপে; পা আটকায়! বিড়লাবাড়ীর রহস্য লিখে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়েছেন দেবজ্যোতি বর্ষণ; বোম্বের ফিল্ম রাজ্যের রহস্য প্রকাশ করতে পারে যদি কেউ তাকে দিয়েও কম কাজ হবে না কিছু! অতলান্তিক পাপের পঙ্ককুণ্ডে আবক্ষ নিমজ্জিত ছায়াবাহক্যে কখনও যদি দুটি একটি পদ্ম প্রসন্নতার প্রভিমুখিত হয়ে ফুটে উঠে; যদি দৃশ্যব তপস্যার অন্তরীণ অঙ্কুরার বাতে অপেক্ষা করে অব্যাহতাবী নূতন প্রভাতের,—তবে রাত ভোর হবার অনেক আগেই দুহাতে পদ্যকে টুকরো টুকরো করে; দুপায়ে তাকে দলে পিয়ে পাকের অন্তরে মিশিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয় এই দূষিত মায়ালাক। প্রয়োজন ও প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে পেয়ে বোম্বায়ের ফিল্মটির আর টেকনিশিয়ানরা ধরাকে শুধু সরা দেখছে না; ধরাকে সত্য সত্যিই খানো মনে করে সুরা আর শাক! সহযোগে উড়িয়ে দিয়ে নিজে, ফুরিয়ে যাওয়াও মনে করছে মনুষ্যত্বের একমাত্র সার্বিকতা। বোম্বাই শহরে মদ্য নিষিদ্ধ। তাই বেআইনি মদ্যের সঙ্গে বিকৃত আমোদের বেসাতি বোম্বাইকে চরম মার্কিনী অধঃপতনের প্রান্তদেশে পৌঁছে দিয়েছে আজ। আর এক পা এগলেই তার অপমৃত্যু অবধারিত। এবং যেখানে গিয়ে মুখ খুঁজে পড়বে মনুষ্যত্ব, সেখান থেকে কোনওদিন মুখ তুলে আবার ঝাঁড়াবার মত জোর আর দুপায়ে সে পাবে না কোনদিন। সেদিন অবশ্য সহস্র সত্যকীরণের পরেও বেশী দূরে নয়! অতএব মা ভেঁঃ।

বোম্বায়ের ছায়াবাহক্যে পা দিয়েই মাথাগুলিয়ে বাবে আপনাব। এখানে আসল আর নকলে; খাঁটি আর ভেজালে; মাহুবে আর মেরে মাহুবে কোনও তফাৎ নাই। আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই। সাম্যের জয় গাই। সত্যকারের সাম্য কেবলে হয়েছে কে বলে! সত্যকারের সাম্য দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যে। কোন প্রোডিউসারের টাকা আছে; কোন প্রোডিউসারের এক পয়সা নেই; কাজ আছে আর কে বেকার; কে সত্যিই ছবি করতে চায় আর কার শুধু ছবি করার নাম করে শেঠ কামানোই কারবার যুগরা ঝাঁপ লোকেরও তা বোঝা শক্ত; ঐতিক করে বলা অসম্ভব। গাড়ী, অফিস, কামাকাপড় দেখে কে বলতে পারে কোনটা গোল্ড আর কে কেমিক্যাল গোল্ড? গোল্ড ক্রেকের টিন থেকে এরা চারমিনার টানে এমন কায়দায় যেন তলোয়ারের খাপ থেকে দাড়ি কামানোর ক্ষুব্ধ বেকলে যে অবাক হয় আসলে সেই বুড়বাক; যে বার করে তার যেন এতে লজ্জার; বিশ্বাসের; অশাভাবিকতার কিছুই নেই!

বোম্বায়ের চিত্ররাজ্যে নকল ও আসল চেনা এত শক্ত যে ওখানে

থেকেও না। তাই ভারতবর্ষের কত মুসলিম-টাকা যে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে হিন্দু ছদ্মনামে কে তার খবর রাখে! হিন্দুস্থানে অভিনয় করে পাকিস্থানে ঘর বাড়ী বানিয়ে জাম-কুল দুই বজায় রাখার দৃষ্টান্ত হুলুভ নয়। কিন্তু জাল আর অকৃত্রিম প্রকারভেদ করা শক্ত যে বোম্বাই ফিল্মরাজ্যে তার মোদ্ধা কারণ হচ্ছে এখানে সব ভাড়া পাওয়া যায়। ফার্মিচার-ঘর থেকে পোষাক এবং ঘরপাী পর্যন্ত ঘটীর হিসাবে ভাড়া দেওয়া বোম্বাইয়ে সাংঘাতিক চাল। তাই ফার্মিগুড কমে বসে গাবাভিন পোষাক পরতে, বিরাট গাড়ী চড়তে এবং গোল্ড স্লক ফুঁকতে দেখে যাদের মনে হয় যে এদের টাকার অক্ষিগন্ধি নেই তাদের সবটাই যে কাঁকা; সিগারেট ফুঁকে শেষ হবার আগেই ব্যবসার শিজা ফুঁকে দিয়ে সরে পড়ার ইতিহাস যে তাদের ডাল ভাত, বাইরে থেকে তা হুদিনে বোঝা সহজ নয়। কারণ ব্যবসার নাম পালটানো এদের কাছে কিছুই নয়; বাপের নাম পাণ্টাতেই না আছে পুরের লজ্জা; না বাপের অসম্মতি।

টলিউডে প্রতারণা চলে হাজারের অঙ্কে; বোম্বায়ের হলিউডে লাখে। সাত আট লক্ষ টাকা নিয়ে বারা খেলছে আর সত্তর-আশী লক্ষ টাকা নিয়ে খেলাচ্ছে বারা বোম্বাইতে তাদের দু দলের লক্ষ্যই এক। চরৈবেতি! চরৈবেতি! বোম্বায়ের ফিল্মী অভিধানে এর অর্থ! এগিয়ে চল; এগিয়ে চল!—নয়; এর অর্থ: সরে পড়ো, সরে পড়ো! অল্প লোককে সারতে সারতে এবং নিজেরা সরতে সরতে সমস্ত ফিল্ম-রাজ্যকে এরা সেইখানে এনে উপস্থিত করেছে যার পবে ডাড়া নেই; শুধু জল! জলে-ডাডায় তাদের এই খেলা উপভোগ করে সবাই; বিশ্বাস করে না কেউ। তিন চারটি প্রযোজক ছাড়া আর সকলেরই খেলা এখানে খতম হয়ে আসছে। আসবারই কথা। তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে: খেলা খতম, পয়সা হতম। ১৭ম বর্ষ সর্বসলেই করতে পারে না। বদহজমের খাঁড়ীর তখন অগোপালের আকাশ-বাতাস নাকে কমাল চাপা দিয়েও রেহাই পায় না।

প্রোডিউসাররা এই রকম বলে আর্টিষ্টরা আরও সেয়ানা। বড় অভিনেতা থেকে চুনাপুঁটি পর্যন্ত কনট্রাক্টের ধার ধারে না; আইনের করে না তোয়াক্কা। বড় কোনও অভিনেতার বাড়ীতে যে সব চেয়ে আগে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, সেদিনকার মত তার ছবিতে কাজ হয়। Date-এর ধার ধারে না যেমন Debt-এর ধারও না। তাই বোম্বায়ের ছোট প্রযোজকরা ভাড়া করা টাক্সীতে যাওয়া করে বেড়ায় আর্টিষ্টের পেছনে; ধরতে পারলে কাজ হলো; না হলে নয়। তারই ফলে স্মৃতি শেষ করতে একটা ছবির কাকুর লাগে কয়েক মাস; কাকুর কয়েক বছর। শুধু তাই কি? বোম্বায়ের প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহ পর্যন্ত সারা বছরের জন্ত ভাড়া নিয়ে রেখেছে বড় বড় প্রোডিউসাররা। ছোট প্রযোজকদের ছবি বিলিজ করাই তাই এক সমাধান-হুলুভ সমস্ত। টাকা চুরি থেকে কাহিনী চুরি; গানের কথা থেকে সুর চুরি; প্রাসাদ থেকে পুকুর চরির পর্যায়ক্রম ইতিবৃত্তের এক কথার নাম হলো বোম্বাই ফিল্মের জোচ্ছুরী।

একটি ইতিহাস শুধুন।

বোম্বায়ের পয়সা নম্বর অভিনেতা প্রযোজক একজন কলকাতায় চারখানা গল্প কিনলে কল্লোল যুগের একজন লেখকের পরে যিনি

নিজেও চিত্র-পরিচালক হন। চারখানা গল্পের দাম ঠিক হলো বিশ হাজার টাকা। দু'হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে চলে গেলেন বোম্বাই প্রযোজক। চার খানা গল্প বেচবার পর একখানা গল্প নিয়ে আইনগত অনুবিধা দেখা দেওয়ায় বিক্রির, কলকাতার লেখক সে গল্প ফেরত চাইলেন। বোম্বাই প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাপণ করলেন গল্পের স্বত্ব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাতে ভুললেন না যে, যে গল্পটির স্বত্ব ছেড়ে দিলেন তিনি তারই দাম ধরেছিলেন আঠারো হাজার টাকা; আর বাকী দু'হাজার মোট তিনটি গল্পের দাম। অতএব যে দু'হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া ছিলো তাতেই পূর্ণ মূল্য শোধ; এখন Received in full রিসিটটা পাঠিয়ে দিলেই

তিনি একটি গল্পের দলিল স্বত্ব ফেরৎ পাঠাতে পারেন বাঙালী লেখককে।

সেই বাঙালী লেখক অনেক চরিত্র খেঁটেছেন; সৃষ্টি করেছেন; এখনও করার দাবী রাখেন। কিন্তু এরকম চরিত্র বোধ হয় সৃষ্টি করা লুপের কথা; তাঁর অভিজ্ঞতারও অনেক বাইরে! এ চরিত্র কালে-ভাঙ্গ্রে একটি ছুটি জন্মায়।

হ্যাঁ; আসল কথা বলা হয় নি। যে বাঙালী লেখককে এই ভাবে কঁাসিয়েছেন বোম্বাই প্রযোজক, তিনি আবার বহুজাতিতে বোম্বাইওলা হলে কি হবে, জাতিতে বাঙালী যে!

[ ক্রমশঃ



জুতো পালিশ

শ্রীচন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত

Library

১৪৬৩

২২.৮.৭৬

# চন্দ্রজল

কবিশেখর কালিদাস রায়

স্নেহ-বিশ্বাস, ককণা-চলচল বজ্রজননীর অল্পময় রূপমাধুরী বিভিন্ন কবি প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে। ধনধাত্তো-পুষ্প ভরা বাঙলার প্রাকৃতিক শোভা তৃপ্ত করেছে কত কবির চাতকি-চিরকে তা সঙ্গায় নিরূপিত হয় না। কত কবি জীবনব্যাপী উপলব্ধি করেছেন বাঙলার বিশিষ্টতম রূপকে, অন্তরের সঙ্গে তাকে করে নিয়েছেন গাঢ়ভাবে একীভূত আর সেই যুগপৎ উপলব্ধি ও অন্তরে গাঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার বিকাশ ঘটে তাঁদের কাব্যের মধ্যে দিয়ে। এই কবির অসমিকার জালে নিজেদের ভড়িয়ে দেন নি। আত্মপ্রচারের বেড়াভাল থেকে থাকেন শত হাত দূরে, বিনয়-গুণ, নম্রতা, শিষ্টাচারের জীবাশ্ম প্রতিনিধি তাঁরা—এদেরই মধ্যে অনায়াসে নাম করা যায় কবিশেখর কালিদাস রায়ের।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অমর হয়ে আছে অজয় নদী। অজয় নদীর তীর একদিন ধল হয়েছিল জয়দেবকে বৃকে ধারণ করবার সৌভাগ্যে। তার তীরবর্তী কোগ্রামের বক্ষও ধল করে গেছেন সাধক কবি লোচনদাস। তাঁরই বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাস আর টালিগঞ্জবাসী হলেন কোগ্রাম কবিশূন্য নয়। বর্তমান বাঙলার জীবিত-শ্রেষ্ঠ কবি শ্রদ্ধাঙ্গদ

কুমুদরঞ্জন মল্লিককে আজও দেখা যাবে কোগ্রাম আলো করে এখনও নিত্য-নব অবদানে ভরিয়ে দিচ্ছেন দেশকে।

কোগ্রামের পূর্ব রায়েরা আসেন বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে কবিশেখরের জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় কালীমবাজারের মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। প্রথমে গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু, পরে খাগড়া লতন স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন ১৯১২ খ্রষ্টাব্দে। এখানকার অধ্যক্ষ হুইলার সাহেবের শিক্ষার গুণে সাহিত্যের প্রতি কবির অনুরক্তি জন্মায়। স্কটিশচার্চ কলেজে দশনশাস্ত্রে এম-এ পড়তে পড়তে চলে যান বহরমপুর জেলার উলুপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে, সেখানে সাত বছর কাটিয়ে কলকাতার ফিরে আসেন। বাড়িবা স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকতা করবার পর ১৯৩১ খ্রষ্টাব্দে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশানে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রষ্টাব্দে দীর্ঘ বাইশ বছর গৌরবের সঙ্গে অতিবাহিত করে অবসর গ্রহণ করেন।

যুবক কবি কালিদাস রায়কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপারিসীম উৎসাহে বঙ্গপুত্র সাহিত্য পরিষদ কবিশেখর উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫৩ খ্রষ্টাব্দে বৃদ্ধ কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জগদ্যাদিনী 'পদক'-এ বিভূষিত করে। 'লীলা কোচারা'র এর আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সময়ে বৈকব পদাবলীতে তিনি একটি সৃষ্টিস্বিত ও সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল, ১৯০৮ খ্রষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে কবিশেখরের লেখনী। আজও তার ধারা অশ্রান্ত, গতিবেগ আজও প্রখর, অনুভূতি আজও তীব্র। ঐ সময়ে অর্থাৎ তাঁর পঠদশায় 'কুম' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিশলয় পর্ণপুট, (দুই খণ্ড) বলরী, ব্রজবেণু, ঋতুমঙ্গল, হৈমন্তী, আহরণ, বৈকালী, আহরণী, (নির্বাচিত কবিতা সংকলন) আহরণ (শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন), গাথাঞ্জলি (গাথা কবিতার সংকলন) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। এ ছাড়া তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতার কাব্যমুবাদ, গীতালহরী, চিত্রে গীতগোবিন্দ, কাব্যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, ইন্দুমতী (রঘুবংশের কয়েক সর্গ), মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত মেঘদূতের নাম সত্যিই উল্লেখযোগ্য। গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে দুই খণ্ডে সাহিত্য-প্রসঙ্গ, তিন খণ্ডে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (এইগুলি সবই বি-এ ও এম-এ ছাত্রদের জন্যে অনুমোদিত) শরৎ সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য দেখা দিয়েছে পাঠক-সাধারণের সামনে। রসরচনাতেও তাঁর সুদক্ষ লেখনীর পরিচয় পাওয়া গেছে। 'রসকদম্ব' নামে তাঁর একটি হাসির গানের বইও আছে। বর্তমানে তিনি



কালিদাস রায়



আত্মসম্মতি রচনার ময়। হিন্দী অমুবাদ সহ বাঙলা কবিতার একটি সুবহুৎ সকল সম্পাদনা তিনি বর্তমানে শেষ করেছেন।

কবিশেষের সাহিত্য-জীবনে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান, তার নাম উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি বসন্তে সাহিত্য-সংসদ। শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ প্রমুখ সাহিত্যিক এবং সত্যীন্দ্র সিংহ, বমেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীরা নিয়মিত দেখা দিতেন এই চক্রে।

কবিশেষের অমুজ সম্প্রতি পরলোকগত রাশেচন্দ্র রায়ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। কবি-পুত্র শ্রীজয়দেব রায়ের নামও মাসিক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গীত-পিপাসা পাঠক-পাঠিকার কাছে অজানা নয়। কবি-কলা সযুক্তার পানিগ্রহণ করেছেন আর একজন বরণ্য কবি স্বর্গীয় বটেশ্বর শ্রীমান শ্রীমন্তের এক পুত্র।

কবিশেষের ভবিষ্যৎ অবদানগুলির আশায় আমরা অপেক্ষা করে রইলাম।

### রেজাউল করীম

**রেজাউল করীম।** বিগত ৩০ বৎসর বাঙ্গলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজে নামটি প্রচার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসছে, তাঁর উদাত্ত ভাষণ সাম্প্রদায়িক অতৈক্যের মূলে কুঠারাঘাত হানতো, তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ সত্যের যুক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধ সকল জাতীয় জীবনে আনতো যুক্তির আবহাওয়া; গ্রানিযুক্ত করতো সংস্কারোদ্ভূত মন, সমস্ত ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের একা স্থাপনে যে-কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি করেছেন রেজাউল করীম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বাবুদেব জেলার রামপুরহাট থেকে ৪ মাইল দূরে মারগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা হাজী আবদুল হামিদ ছিলেন আরবী ও ফারসীতে সুপণ্ডিত।

গ্রামের মাইনব স্কুলের পড়া শেষ করে কোলকাতার ক্যালকাটা মাদ্রাসা হাই স্কুলে ভর্তি হন, সেট জেভিয়ার্স আই, এ, পড়ার সময় দেশের ডাক এলো, সাড়া দিলেন তিনি, সমগ্র দেশ জুড়ে বয়কট আন্দোলন। আসমুদ্র-হিমাচলবাসী বাপুজীর নন-কো-অপারেশনের স্রোত, বাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে প্রতিষ্ঠা করলেন জাতীয় স্কুল।

কোনও কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে আবার কলেজে প্রবেশ করেন। অতঃপর এম, এ, ল, পাশ করেন তিনি।

দেশ জুড়ে তখন হিন্দু-মুসলমানের অতৈক্য; মুসলীম লীগ তার বিভাজিতত্বের ব্যাখ্যা রত। এই সময় করীম সাহেব (এই নামেই সর্বাধিক খ্যাত) তাঁর শক্তি ও সময় নিয়োজিত করেন এর বিরুদ্ধে। জিন্না এবং লীগের স্বভাভিত্তিগত অশুষ্টি খণ্ডন করে ইনি দেখাতে লাগলেন—ভারতবাসী এক এবং অবিভাজ্য, জাতি হিসাবে পৃথক নয়।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের সমর্থক, তৎকালীন বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক টেউ-এর মাঝে ও তাঁর আদর্শের সত্যকে নির্ভয় নিঃশঙ্কচিত্তে ধারণা করেছেন, এজ্ঞে আঘাতও কম আসেনি।

ফজলুল হক (অনুনা পূর্ব-পাকিস্থানের গভর্নর) প্রতিষ্ঠিত নবযুগ

পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ পালন করেছেন। দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত তখনই সবিশেষ প্রকাশ দেয়, জাতির অর্থনীতি শিক্ষা কুসংস্কার একা সকল দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কিছুকাল আলিপুর ও ব্যাংকশাল কোর্টে তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই আইন ব্যবসায় জটিল এবং সত্যমিথ্যার এক বিচিত্র অধ্যায় তাঁর অন্তরকে গভীর ভাবে পীড়িত করে। তিনি উপলব্ধি করেন এ পথ তাঁর জ্ঞানে নয়। অতঃপর বহরমপুর গার্লস কলেজে অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, আজ অবধি সেই কাজেই ব্যাপৃত।

বিপ্লবীক নিঃসন্তান করীম সাহেব বহরমপুরের গোরাবাড়িতে একাকী বাস করেন,—সঙ্গী অসংখ্য পুস্তক আর পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য মানুষ। অজ্ঞাতপত্র তিনি,—সদাশ্রম্য এই মনুষ্য স্বভাবের মানুষটির দ্বার সকলের ভ্রষ্টই উন্মুক্ত,—তা সে যে কোনও মত ও পন্থা থেকে নাগেদন। চট করে মানুষের মন জয় করে নেবার মাত্র যোগ্য তাঁর সরলতা।

সাংস্কৃতিক সভাসমিতি ও সাহিত্য আলোচনার কবীন সাহেবের উপস্থিতি নিয়মিত,—এবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃপক্ষ বাংলার সুযোগ্য সন্তান বারীন ঘোষের সভাপতিত্বে সভায় রেজাউল করীমকে সভাপতি হিসাবে বরণ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এখনও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিজ্ঞমান। বর্তমানে ‘মুর্শিদাবাদ পত্রিকা’ সম্পাদনার ভার তাঁর উপর দৃষ্ট।

ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রায় উল্লসনধারক বই তিনি লিখেছেন। মোটামুটি রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখ। তন্মধ্যে (১) বন্ধিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ (২) ফরাসী বিপ্লব (৩) নয়া ভারতের ভিত্তি (৪) Pakistan examined (৫) For India and Islam ইত্যাদি -

বিখ্যাত। তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যবান অসংখ্য প্রবন্ধ সংকলনের অপেক্ষা রাখে।

দুর্লভজন্মের অধিকারী এই সহজ মানুষটিকে আমাদের বর্তমান যুগ ও সমাজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—“ভারত বর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শত বাণ্যবির সঙ্ঘে ও ভারত তাহার মহৎ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। একদিন ভারতবর্ষই



রেজাউল করীম

জগতকে আলো দান করিবে। জাতির বিশ্বাস, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রত্যাশিকতার আর শেষ চইয়া আসিয়াছে। নতুন যুগের নতুন পরিবেশে এমন একটি মহৎ মনোভাব সৃষ্টি; হইবে বাহার কলে ভারতবর্ষ বিশ্বসভার ভাণ্ডারে অনেক কিছু দান করিতে পারিবে।

### শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

[ হাট্য়ারাজ্যের সুপরিচিত কর্ণধার ]

প্রায়ের প্রবর্ততা আর বেন সহ হয় না। এই অসহ উৎকর্ষা মানুষের মধ্যে তিলে তিলে সঞ্চার করছে অবলাদ, ক্রান্তি, অকর্মণ্যতা। মাঝে মাঝে কোথা থেকে এক এক রাশি বলকা বাতাস আসছে আর ছড়িয়ে পিছে মূর্খা মূর্খা উত্তাপ। এ হেন পরিবেশে ধর্মতত্ত্ব কর্তব্য একটা অটালিকার এক কোণে আমর তিন বাহুন জমায়েত হয়েছি—প্রথম জন বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের কর্ণধার শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন ভারতের একজন সুদক্ষ প্রচারণাবিদ শ্রীপ্রদীপকুমার সাক্ষার তৃতীয় জন এই অখম। এক অখ্যাত নগণ্য রাজ্যে সম্ভাবন।

আলাপ আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে চলছে পান-ভোজন। চলচ্চিত্রের গোড়ার আলোচনা কথা। কেমন করে হ'ল, কার দ্বারা হল, ছায়া-রাজ্যের কে কি কেন-কবে-কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মুরলীধরের নিজের কথাও। শেষেরটি অবশ্য তিনি নিজে মোটেই বলতে চান নি। আমাকে সোজা করে বার করে নিতে হয়েছে। ছায়াছবির মধ্যেই মুরলীধর নিজেকে বুঝিয়ে রাখতে চান, নিজের পৃথক সত্তা বিলীন করে নিতে চান ছায়াছবিব নব নব সৃষ্টির বেলীমূলে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিচ্ছে ঘট্টক তাঁর বিকাশ। এই তাঁর কাম্য।

মুরলীধরের আনিমিষাস যশোভর জেলাব কানীপুর গ্রামে। ২৮ এপ্রিলের ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুরলীধরের জন্ম। পিতৃদেব ছিলেন



শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অগ্রজ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পরবর্তী জীবনে মহারাজা তাঁর প্রভোতকুমার ঠাকুরের "টেগোর রাজ এজেন্ট" এর টিক ম্যানেজার স্বর্গীয় দাশরথি চট্টোপাধ্যায় ও তদুপ বর্তমান ছায়াছবিজগতের আর একজন সুপরিচিত পুরুষ শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মুরলীধর। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মুরলীধর। তারপর পড়তে লাগলেন এম-এ ও আইন। এর পরই এলো এক বিরাট পরিবর্তন, ছন্দে বাঁধা জীবনকে অতিক্রম করে দেখা দিল আগামী দিনের দিবাকরের জাগরণের পূর্বাভাস। পড়া ছেড়ে দিলেন মুরলীধর। মনে বাসনা হল নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে, বাইরের জগতে পা দিলেন মুরলীধর। যদি পড়া না ছাড়তেন আইনের সত্য-মিথ্যার বেড়াফালে চিরকালের মত জড়িয়ে যেতেন মুরলীধর, হয় তো বা ভারতের আইন জগতে আজ তিনি হতেন একজন অদ্বিতীয় পুরুষ, সারা ভারতের আইনে হয় তো নাগানো থাকত তাঁর প্রভাব কিন্তু ছায়াছবির রাজ্যের একটি দিকই হয় তো শূন্য থেকে যেত মুরলীধরের অদুপস্থিতিতে। মুরলীধরের বিদ্যুততা থাকলে বাঙলার ছবির রাজ্য কিছুতেই আন্ধারের মত পুটে হতে পারত না। আবির্ভাব হত না এত যুগান্তকারী ছবি, এত কণা-বুশলী ও শিল্পীর আগমন, অসমাপ্ত থেকে যেত শিক্ষা-বন্দনা।

নানা ব্যবসারে নিজেকে ভরিয়ে রেখেছিলেন মুরলীধর। তারপর জে, এন, বহুর সম্পর্কে এসে তাঁর ব্যবসারে যোগ দিলেন মুরলীধর। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণতির ফলে সেই প্রিটিষ্ঠান দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুরলীধর যোগ দিলেন ম্যাডান কেম্পানীতে তাঁর মাসভূতো দাদা সম্প্রতি দেহান্তপ্রাপ্ত বাঙলার চলচ্চিত্র লোকের শ্রষ্টাকুলের অকৃতম বিশেষ পুরুষ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে। এখানে তিনি ছবি পরিবেশকের ভারপ্রাপ্ত হলেন। বারো বছর সম্মানে এই দায়িত্ব বহন করে ম্যাডান ত্যাগ করলেন মুরলীধর। তার পর পুত্রের নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করলেন রীতেন গ্যাং কোম্পানীর। এঁরা তখন নির্বাক ছবি পরিবেশন করতেন। কর্ণওয়ালিশ ও ক্রাউন (বর্তমানে উত্তরা ও দ্বী) এর নবরূপায়ণের রূপদাতা ও পরিচালকগোষ্ঠীর হলেন অকৃতম, এই সময় পরিচালকগোষ্ঠীতে আর বঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহারাজা প্রভোতকুমার, দাশরথি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তার পর ক্রমাগত পুরবী, উজ্জ্বলা, রূপম, নবরূপম ওরিয়েন্ট প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহগুলির পরিচালক মণ্ডলীতে যোগদান ও একটি বিশেষ স্থান অধিকার। এ কথা জানন্দের সঙ্গে স্বীকার করা যায় যে এতগুলি প্রেক্ষাগৃহের শীর্ষস্থানে একজন বাঙালী এ দেশের বাণিজ্যিক গৌরবই ঘোষণা করছে। মুরলীধরের প্রথম প্রযোজিত নির্বাক চিত্র 'তরুণালা।' তার পর কমলা টকিজ নামক প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান গঠন করে রাজকুমারের নির্বাসন ও স্বামিন্দ্রা ছবি দুটি নির্মাণ করেন। এর পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করল এম, পি, প্রোডাকশনস্ (মায়ের প্রাণ প্রোডাকশনস্)। মায়ের প্রাণই এঁদের প্রথম ছবি। মুরলীধরই ছিলেন এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী

তার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এম. পি. একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সানবাইজের হল প্রতিষ্ঠা। বিখ্যাত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ডি-লুয়ের প্রধান কর্মকর্তা ইনি। বি. এম. পি. এ নামক ছায়ালোকের বিরাট প্রতিষ্ঠানটিরও ইনিই অগ্রতম স্রষ্টা (১৯৪৫) ও পাঁচ বার এর সভাপতির আসন করেছেন অলঙ্কৃত, তাঁর এ গৌরবও লক্ষ্যণীয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মুনসীধর অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সয়লতার প্রতিভা তিনি এবং তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ যে, যে কোন আলোচ্য বিষয় মতই তা জটিল হক মুনসীধর মাত্র দু' এক মিনিট সময় নেন তার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে, একটি বাপার নিয়ে বিনের পর দিনে তাই নিয়ে বলে থাকা ও অপরকে বলিয়ে রাখা মুনসীধরের স্বভাব-বিশিষ্ট। বর্তমানে বারাকপুর কলেজের পরিচালক-মণ্ডলীরও অগ্রতম সদস্যরূপে মুনসীধর সেই মহাবিজ্ঞানটির উন্নতিকল্পে সত্যতা করেছেন।

মুনসীধরের একটি বহুদিনের ইচ্ছা শিল্পের ক্ষেত্রে একটি ছায়াছবি নির্মাণ করা। এ ক্ষেত্রে আসার তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ছবির মাধ্যমে সমাজ গঠন করা, সমাজের সেবা করাই তাঁর আদর্শ। এ ক্ষেত্রে ব'ঙ্গ-সংস্কার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের, সে সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন সত্য বলতে আমি পরামুখ নই; তবে সত্যের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও আমার উপাত্ত, সেইজন্যে শান্তিভঙ্গ্য আশঙ্কায় অগ্রিম সত্য বলতে আমি অনিচ্ছুক। ছবির ব্যাপারে আত্মকে যে গল্প এসেছে তার কারণ সমাজ-কিছুটা কথার উত্তর আসে—এ গল্প ঠিক ছবির বাজ্যেই গড়িয়ে এসেছে জাতীয় জীবনবাহা থেকেই। আমার কোন কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র পয়সার লোভেই প্রয়োজকরূপে দেখা দেন তারপর ছবি না আগলে বহু লোককে দেয় টাকাও আর দিতে পারেন না ও সাবধান—এটিকে অসংখ্য নতুন লোকেরা (যারা এ ক্ষেত্রে স্বাধীন বান্ধা নন) যে দুর্ভাগ্য নিয়ে গেলেন—এত করে সেই দুর্ভাগ্যে অংশ তাঁদের সমভাবেই এই শিল্পের গায়ের লাগল এবং এইভাবেই এই বিরাট ক্ষেত্রে গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। আরো একটি কারণ আছে আন্তর্জাতিক ও সহানুভূতির অভাব। এ দুটি জিনিষ না থাকলে কোন বিরাট রূপ লাভ করতে পারে না। আমার পরবর্তী প্রহ্ন আত্মকের দিনে জাতীয় জীবনে সিনেমার ভূমিকা কোথায় এবং কতখানি—মুনসীধর উত্তর দেন ঠিকমত এবং সত্যতার সঙ্গে সারগর্ভ বক্তব্য দিয়ে ভরা ছবি যদি করা যায় সে ছবি জাতিকে চরিত্রগঠনের প্রভূত সহায়ক হতে পারে। আজ অবধি প্রায় পঁয়তাল্লিশটি বিখ্যাত ছবির নির্মাণের মূলে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন মুনসীধর। তাদের মধ্যে শেষ উত্তর, যোগাযোগ, পথ বেঁধে দিল, সাত নম্বর বাড়ী, ভূমি আর আমি, স্বপ্ন ও সাধনা, বিহুবা ভাণ্ডা, আভিজাত্য, সঙ্গর, উল্লুনাথ, বানপন্থ, বিজ্ঞানাগর, সহযাত্রী, প্রত্যাধর্ষন, বাবলা, সঞ্জীবনী, বনু পরিবার, আঁধার, কার পাগে, অগ্নিশিখা, সবার উপরে, বহু ভট্ট, পুত্রবধু, ত্রিষায়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমার এদেরই মধ্যে বিজ্ঞানাগর, বাবলা, কার পাগে, শেষ উত্তর, যোগাযোগ, বনু পরিবার, সাত নম্বর বাড়ী প্রভৃতি ছবিগুলি এক কথায় মুনসীধরের এক একটি মহাবর্তম উপহার।

ছায়ামোদীরা দিমে দিমে মুনসীধরের অবদানে নিজেদের আরো পরিচুস্ত করুন, এই কামনাই করি।

### শ্রীবলাইলাল চন্দ্র

[ট্রিপিক্যাল মন্ত-বিশেষজ্ঞ]

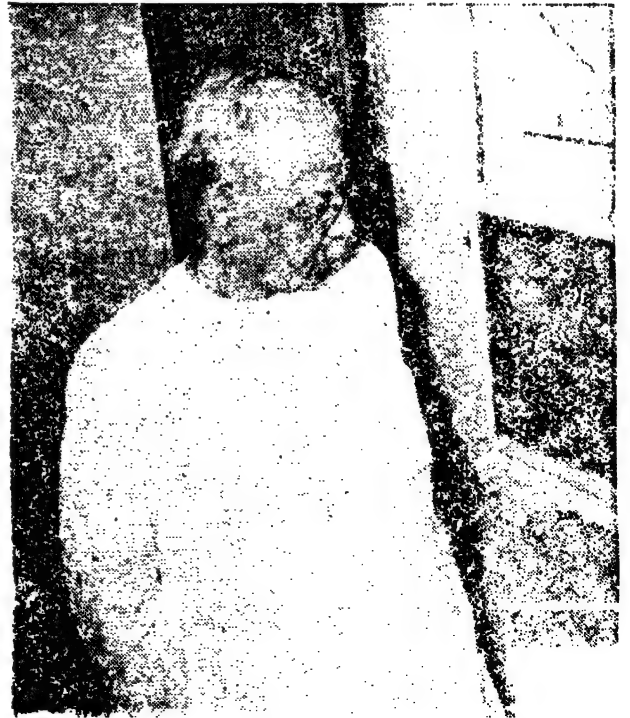
“মাছ—গাছ—পাখী—এসব ‘হবি’ নিয়েই আমরা জাছি।

এক পুরুষ নয়—কয়েক পুরুষ ধরেই। মাছের সঙ্গে বিশেষ করে আমাদের যেন একটা আত্মীয়তাই হয়ে গেছে। গৃহে মাছ পোষা এখন আর আমার কাছে নিছক কোন ‘সখ’ নয়—তাঁর চেয়েও নিশ্চয়ই অনেক বেশী।”

কথা করটি শোনা গেল বাংলার ‘ট্রিপিক্যাল’ মন্ত-বিশেষজ্ঞ শ্রীবলাইলাল চন্দ্রের মুখে এই সেদিন।

চমৎকার ভঙ্গলোক! মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই—আপাচনে প্রতিফল ব্যস্ত। দেখলেই মনে হয় এঁকে—একটি খাঁটি বাঙালী প্রাণ। প্রায় ২৫ বছর ধরে অলঙ্কৃত জীব মাছকে (ডেইম) নিয়ে এঁর চলেছে অব্যাহত গবেষণা। কর্মজীবনে অপব্যাপন দাঁড়িয়ে পালনের সঙ্গে এইটিও তাঁর না করলেই নয়। দুবস্ত্র আগ্রহ, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও অসীম উত্তর—এ কয়টি গুণাবলীর অপূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটেছে এই মাছখটর ভেতর এবং অনিবার্য ফলস্বরূপ একজন ‘ট্রিপিক্যাল’ মন্ত-বিজ্ঞানীর মর্যাদাই দাবী করতে পারছেন আজ তিনি অন্যায়সে।

১৮১৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীবলাইলাল চন্দ্রগণ করেন কলকাতায় (৫৭নং লিওনালিস্ট্রীট) এক সহায়



বলাইলাল চন্দ্র

বঙ্গবাসী দে ক্রীটের ক্রীড়ক পাঠশালায় (বর্তমান কমলা হাই স্কুল) তাঁর প্রথম পড়াশুনা। কলেজ-জীর্ণনে তিনি ছিলেন বিভাগগণ কলেজের ছাত্র। ১৯২১ সালে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হলেও ছাত্রাবস্থাতেই মস্ত পালনের দিকে তাঁর ঝোঁক যায়। এর একটা কারণও ছিল বটে এবং সেইটো তাঁর নিষেধই ভাষায়—ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীর সকলেই একটু naturalist-minded অর্থাৎ জীবজন্তু ও উদ্ভিদতত্ত্ব অমূল্যলিপ্সুর। বাবা (৮তম বৈব চন্দ্র) হাছ, গাছ ও পাখী নিয়ে অনেক গবেষণা করে গেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে এইটো বৈশিষ্ট্য hereditary (পুরুষাত্মক) বলতে বোঝা যায়।

এইদায় বঙ্গা ধোঁস—মস্ত পোনা ক্রীলাইজালের আবাল্য একটি মস্ত সখ বা যোণা। বাদী আমলের কব বড়ান মাছই (চান্দা fish) স্থায়ী পোষ্যে তাঁর সঙ্গহাগারে সেই থেকে। তাঁরই কৌশল আজ তিনি বয়সে গিয়ে চুপচন, মাছের সঙ্গে সেই বোম্বটানের আসা যোগাযোগ কোথায়? অথচ এমনি ত'ল—সেখানে থেকেই মস্ত পালনের এবং মস্ত সম্পর্কে গবেষণার অতীত সুযোগ ও প্রেরণা তিনি পেয়ে চলে। যুগীলাল কমলাপত নামে যে বিরাট ফাখের একটি বিভাগীয় হেড এসিষ্টেণ্টের (বড় বাবু) পদ তিনি নিযুক্ত, উহারই অত্যন্ত অশীর্ষক ক্রীকলাসপৎ মিডানিয়ার 'ট্রপিক্যাল' মাছ পোষার সখ দীর্ঘদিনের। সেই সখই নিয়ম কখা ও মস্তবিশালী ক্রীকলাকে আরও উৎসাহিত করে তুলে অনেকখানি।

মাছের জগতে প্রাকৃতিক কী বৈচিত্র্য ও বহু সত্যি ক্রিয়ের, সম্বন্ধ করবার জগ্রে ক্রীলাইজালের প্রচেষ্টার বিরতি নেই। 'ট্রপিক্যাল ফিশ' বা বড়ান মাছ নিয়েই বলতে গেলে আজও তাঁর সফল খেলাধুলো, আমোদ-খানন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৭ সালেই ক্রীকলা ট্রপিক্যাল মাছের জন্ত নিজগৃহে একটি বিজ্ঞানসম্মত 'একুইরিয়াম' বা জলাধার স্থাপন করেন। আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে থেকে সংগৃহীত মস্ত বিষয়ক গ্রন্থাদি এনে সঙ্গে সঙ্গে চললো তাঁর গভীর পথ্যাসেচনা। আর চললো আমেরিকা, ব্রুটন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের মস্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পত্রালাপ ও চিন্তা-বিনিময়। ইত্যবসরে 'ট্রপিক্যাল' মাছ সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন—বিদেশী পত্রপত্রিকাতেও বা সমাদৃত হয়েছে বিশেষ ভাবে।

'একুইরিয়াম' বা বিজ্ঞান অনুমোদিত মস্তাধার আজকাল এদেশের অনেক কচি-সম্পন্ন লোকের বাড়ীতেই দেখতে পাওয়া যায় এবং এইটো শুধু গৃহশোভাই নয়, প্রকৃতির অত্যন্ত লীলাকেস্র কপেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে এবং

দেশবাসীর মনে এর মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে 'একুইরিয়াম' ক্রীলাইজালের অবদান অনস্বীকার্য। 'একুইরিয়াম' রাখার বিশেষ 'হবি' সৃষ্টির জাগিয়ে ১৯৫০ সাল থেকে তিনি ক্রমাগত কয়েক বছর নিজদেশের কর্ণওয়ালিশ ক্রীটের বাড়ীতে 'ট্রপিক্যাল' মস্ত বা পোষা বড়ান মাছের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বাংলা কেন, সমগ্র ভারতেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এমন ধরনের সুসংগঠিত প্রদর্শনী আর কখনও হয়নি। এর পর থেকেই 'ট্রপিক্যাল' মস্ত বিশালাদ ক্রীকলা দেশ-বিদেশে সুখী-সমাজের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জাতীয় সরকারও তাঁর স্রষ্ট্রিতা ও গণবক্তার স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসেন।

ক্রীলাইজালের সঙ্গে বিশিষ্ট মস্তা-বিজ্ঞানী ও জুগুপ্সাকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় ডিবেটোর পরলোকগত ডাঃ এস এল হোবার যথেষ্ট জ্ঞাতা ছিল। 'ট্রপিক্যাল' বা বড়ান মস্ত বিষয়ে ক্রীকলা যে আজকের দিনে একজন 'অথরিটি' (authority)—ক্রীকলা তা বৃকতে পেরেছিলেন সমগ্রতা নিয়ে তাইই জগ্রে মস্ত বিষয়ে গবেষণার সুবিধার্থে কলকাতা মহানগরী বন্ধে একটি সরকারী মস্তা লাগনাগার ('একুইরিয়াম') স্থাপনের যখন কথা উঠল—তখন ক্রীকলা ক্রীলাইজালকেই সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগী হন। সরকারের দিক থেকে এ পদিকল্পনা বাস্তবে রূপদান এখনও পর্যন্ত অবশ্য বাকী আছে কিন্তু এর জগ্রে ক্রীকলা অস্ত্রের অকুঠ দাবী ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, বলা চলে না।

কুশলী সংগঠক হিসাবেও ক্রীলাইজাল চন্দ্র প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বহুক্ষেত্রে। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে ও বলিষ্ঠ অগ্রগণিতায় ১৯৫৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের একুইরিয়াম নিয়ে গড়ে উঠেছে 'একুইরিয়াম এসোসিয়েশন অব ওয়েস্ট বঙ্গ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির তিনি আজও অসি সভাপতি এবং একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গত দুই বঙ্গের ধরে উক্ত সংস্থার প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় বড়ান মাছের যে বিরাট প্রদর্শনী তয়—তাতে প্রদর্শনী সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিই। এ ছাড়া বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বঙ্গের সম্মিলিত নেতাজী জগদীশবর সমিতির তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। পিপলস' গিল্ফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সহ-সভাপতি পদেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। সাইকেল চড়া, অখাবোহণ ও মোটর চালনা প্রভৃতিতেও তিনি সুদক্ষ। এমন কখা মানুষ ও উদ্যোগী পুরুষ সহসা খুঁজে পাওয়া বুঝি কঠিন!

[ মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে অনিলধন ভট্টাচার্য্য, কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রতন ঘোষ লিখিত। ]

## আমার কারবার

"সংসারে যারা শুধু দিলে, শেল না কিছুই, যারা বকিত, যারা দুর্গল, উৎপীড়িত, মানুষ বাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিকপায় হৃৎকম্প জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই শেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নাশিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দৃঃসহ অবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।"—শরৎচন্দ্র

# রাজায় রাজায়



উদয়ভাসু

মাটিতে পা পড়লে আগুনের ছোঁয়া লাগে।

ওপরে সাদা আকাশ আর নীচে কালো মাটি। দ্বিপ্রান্তরিক পৃথিবীতে আসমান-জমি মহাকাশের চিত্রের মত চলছে। আগুনের বর্ণ হলুদ-লাল নয়, বৌখা-সুন্দর। মাটি-বাট জালিয়ে দেয় এই প্রাণের দাহনে, কোমল মাটির বস্তু চিরে দেয়। জল শুকিয়ে যায় ইনারায়। পুকুর আর নদীর চতুর্দিকেই অস্থি-পঙ্খর দেখা দেয়। রাজ-অস্ত্রপুর্বে পুকুরের তীরে, গন্ধরাজ গাছের আড়ালে তবু এক ফালি ছায়া। পাশাপাশি গাছ কয়েকটা, গন্ধরাজ ফুটেছে অভয়। গন সবুজ পাতার মধ্যে থেকে সাদা ফুল উঁকি দেয়। লাল নিপদের আক্রমণ স্থব্র করে, দুপুরের সূর্যকে সয়। গন্ধ হারায় না কেন কে জানে! গাছের তলায় মাটিতে ফট পরেছে, মাটিতে জল দেয় না হাতো, কাছে ফাঁকি দেয়। গাছের আড়ালে নিজেই লুকিয়ে চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। গাছ-কোমর বেঁধেছে পরনে: সাদার জাঁচলে। শুধু মাত্র লালপাট পাংসা কাঁতার শাড়ীখানা এঁটেসেঁটে পরা। নজর ফট-ধরা মাটিতে, পায়ের বুড়ো আঙুলে শুকনো মাটি ভাঙছে। স্থান সেয়েছে কখন, ভিজে চুল চড়িয়ে দিয়েছে পিঠে। কোমর ছাপিয়ে নেমেছে কেশের রাশি। ডান হাতের মুঠোয় গন্ধরাজের একটা শক্ত ডাল। মাটি থেকে চোখ তুললো শিবানী। চৌতের কোণে হাসির কিলিক তুলে চোখ-ইশারায় ডাকলো যেন কাক।

নিরাশা এমন এ অকল। কেউ আসে না। জন-মনিষির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। পাণীর কিচির-মিচির ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পুকুর-তীরে গোলা পায়বর সারি। কাঠ-কাটা বোনে জল খেতে এসেছে। আকর্ষণ জল গেয়ে একে একে উড়ে পালাবে ডানা ঝাপটে। অন্ধরে চাল-ডালের ভাগ্যব আছে, তাই পায়বর বাসা ঘরে করে।

শিবানী একবার চমকে উঠলো পায়বর-ওড়ার পাখা-ঝাপটানি শুনে। বাম হাতের মুঠোয় ছিল বাদশাহী মোহর, শিবানীর চমক লাগায় ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। কেমন যেন ক্ষান্ত-ভক্তির হাসি ফুটলো তার মুখে। গরমের চাউনিতে আবেগ বাব ইশারায় ডাকলো চিবুক নাচিয়ে। দ্বিভঙ্গ হস্ত দাঁড়িয়ে ছিল, উর্দ্ধদেহ আনত করলো। এখান সেখান থেকে তুললো মোহর দু'খানি।

চোখে টাটকা কাজল। দ্বি-মনসার গভীর কালো কাজলের রেখায় শিবানীর চোখ যেন দীর্ঘতর দেখায়। চোখের সাদা স্পষ্ট হয়। তার দু'টি চকল যেন।

নিভৃত-নির্জন। শুধু ক'টা শালিখ ডাকাডাকি করছে করবীর ডালে সভা সাক্ষিয়ে। করবীর-শাখা মুয়ে পড়ছে।

শব্দ নেই চলনের। চোখের ইঙ্গিত না পান-রাতা চৌতের ইশারা ঠিক ধরা যায় না। শিবানীর লাল অধরও কিছু চকল। কথা-ফোটর মুখ; টকটকে লাল ওষ্ঠে যেন কত অশ্রুট কথা নাচানোটি করছে। কেমন বিষ্ময়ের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে শশিনাথ।

শিবানীর চোখে যেন সম্মোহন। শশিনাথ থমকে দাঁড়াতেই আবার একবার ডাকলো শিবানী। চিবুক বুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

—ভয় হয়, কেউ যদি দেখে কোথাও থেকে।

সত্যিই ভয়ে ভয়ে কথা বললে শশিনাথ। দেখলো ইদিক মিলিক। বকফুলের গাছের মগ ডাল পর্যন্ত দেখলো।

—খিড়কিতে আমি কুলুপ এঁটে দিয়ে এসেছি ভেতর থেকে।

শশিনাথ এখনও ভয়ে ভয়ে জয় করতে পারে না। কথা বলে সশঙ্কিত সুরে। শিবানীর আপাদমস্তক দেখে নেয় একদৃষ্টিতে। বনের উজ্জল আলোর দেখতে পেয়েছে ক্ষণেকের জন্য।

গন্ধরাজের গাছের ছায়ায় বসে পড়লো শিবানী। তপ্ত হাওয়ার ভিজে চুল শুকাতো দুই হাতে চুলের গোছা ধরে ছড়িয়ে দিলো পিঠে।

শশিনাথ বললে,—রাজমাতা আজ তো দানসত্তা খুঁজছেন। যে যা চাইছে তাই দান করছেন। রাজসুবাতে আজ হাসির ঢুকান বইছে। সকলেই খুশী।

—হুমি? হেসে হেসে বললে শিবানী।

—আমিও খুশী। শশিনাথ কথা বলে আর দেখে ঘাটের দিকে। কেউ যদি আসে হঠাৎ অতর্কিত!

—বাহুমাতা কি দান করলেন? তোমার কিছু লাভ হয়েছে?

শিবানী প্রায় ফিস-ফিস শব্দে বললে। পছন্দইন চোখে তাকিয়ে থাকলো মুখে একটু হাসি মাগিয়ে।

শশিনাথ বললে,—আমি কিছু চাই নাই। কে যায় দান ভিক্ষা চাইতে?

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো শিবানী। মুখে দুই হাত চাপলো তৎক্ষণাৎ। হাসি-খামিয়ে বললে,—এসো, একটা প্রণাম করি।

শশিনাথ বললে,—কেন?

দেহ হেলিয়ে হাত ছোঁয়ালো শিবানী। মোহর দু'খানি মাটিতে রেখে বললে,—এই নাও বরপণ। আমি তোমাকে দিলাম। কথা বলতে বলতে শশিনাথের পাদমূল্যের ধূলি তুলে কপালে ঠেকায় শিবানী।

আকবরী মোহর। ফাদী ভাবায় লেখা দ্বিভবা সাল। দুপুরের সূর্য আলোয় স্বলজলিয়ে গঠে। শিবানী মোহর তুলে শশিনাথের হাতে ধরিয়ে দেয়। শশিনাথ সেই হাত আর ছাড়ে না। শিবানীর নরম হাত, ধরে রাখে নিজের হাতে।



—খিড়কিতে কুলুপ, এসেছো কোন্ পথে? চুপি চুপি বললে শশিনাথ। ভয়ে ভয়ে কথা বলছে সে।

—বাঁশের বেড়া ডিক্সিছেছি তোমাকে ফুল তুলতে দেখে। ছাদ থেকে দেখতে পেরেছি।

হাতের সান্ধি নামিয়ে রাখলো শশিনাথ। বললে,—তোমাকে একবার দেখতে দাও। উঠে দাঁড়াও। কথার শেষে শিবানীর ধরা-হাত ধরে টেনে তুললো তাকে।

হাওয়া চলছে দক্ষিণের। আঙনের ছোঁয়া যেন হাওয়ায়। শিবানীর এলোচুল উড়ছে।

রাজ-অস্ত্রপুত্র থেকে ভয়ানকির ভৈরব-দ্বাস্য ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। রাজমাতার মহলে তখনও পর্দাস্ত দান খরবাতি চলছে। সোনা, রূপা আর বস্ত্র দান করছেন বিলাসবাসিনী। অকৃতজ্ঞ ভাণব না কি তাঁর। অতঃপর অর্ধের অধিকারিণী তিনি।

—আমাকে আবার কি দেখাবে! হেসে হেসে বলে শিবানী। কাজল-কালো চোখের দৃষ্টি ঝাঁকিয়ে বললে,—তেমন যদি রূপ থাকতো তবু।

—তোমার অনেক রূপ, সচরাচর দেখা যায় না এমনটা।

শশিনাথ মুক্তচোখে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে চুপি চুপি। কথার শেষে শিবানীর চিবুক ধরে তুলে ধরলো তার লজ্জারাত্রী মুখ।

—তোমার পায়ে টাই হবে তো? না আমার আশ্রয় বজায়িত হবে?

—হী, তুমি আমার হবে।

এক বলক মিটি হাসি হাসলো শিবানী। বললে,—এ তোমার মুখের কথা না মনের কথা?

—আমার অন্তরের কথা। এতটুকু মিথ্যা নাই।

—চল এখান থেকে পালানি। শিবানী মিনতির সুরে বলে। বলে,—কেউ যদি দেখতে পায় কোথাও থেকে! চল ঐ দিকে, নদীকে বাঁশের বেড়া। কারও চোখ পড়বে না।

—অভয় দাও তো ঘাই। কলক বটনার ভয় হয় যে!

শশিনাথ এগিয়ে চল কথা বলতে বলতে। পায়ে-চলা পথ ধরে এগোয়। ইদিক সিদিক দেখে সাবধানী চাউনিতে।

পেছন থেকে শিবানী বললে,—তোমার মা যদি অসুস্থতি না দেয়, তখন?

শশিনাথ বললে,—না, তা হবে না। মাকে আমি পত্র লিখে জানিয়েছি, পাত্রী আমার পছন্দের।

—তবে আমার সাতভাইর ভাগ্য বলতে হবে।

—রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনী আসছে সুনছি। জানো কিছু?

—হ্যাঁ, আগে উদ্ধার হোক কসাই খোরামীর কবল থেকে। ছোটকুমার গেছে মান্দারগে। দেখা যাক কি হয়।

—কুমারবাগানের কাশীশঙ্কর বখন যাত্রা করেছেন তখন আর কোন চিন্তা নাই।

—এই কথা সকলেই বলে। কঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে বসে পড়লো শিবানী। বললে,—যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসেন, প্রার্থনা করি।

—তোমার খোঁজ পড়ে যদি অন্যরে? শশিনাথ বললে অল্প

হেসে। বললে,—কেউ যদি ডাকাডাকি করে? রাজমাতা যদি ডাক দেন এখন?

হতভঙ্গার মুখভঙ্গীতে শিবানী বললে,—ডাকলে সাড়া পাবে না। জানবে আমি পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছি। যে যাই বলুক, তোমাকে এখন ছাড়ছি না। তুমি এখন থাকবে আমার কাছে।

—কেন? চুপি চুপি শুধায় শশিনাথ।

শিবানী বললে,—আমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমাকে যে কাছে পাওয়া যায় না।

শশিনাথ বসলো বেড়ার আড়ালে, পুকুর-তীরে। বললে,—আমারও সাথ হয় তোমার সাথে হৃদয় কথা বলি। মনের আনন্দে তোমাকে দেখি। খানিক খেয়ে আবার শশিনাথ বললে,—তোমাকে দেখার জন্য আমার মন অস্থির হয়।

অহঙ্কার প্রকাশ করে না শিবানী। গলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। টোটেব্রো প্রান্তে মুহু মুহু হাসি ফোটার। বলে,—আমাবও তাই। আমি জ্বাতে মেয়ে, তাই মুখ ফুটে বলতে পারি না। গুমরে গুমরে মরি।

—মোহর হুঁখানি থাক তোমার কাছে। শশিনাথ মোহর ফিরিয়ে দিতে চায়। বলে,—আমার স্বপ্ন, থাকুক হোমার কাছে।

মাটি-ফাটা বোদ। শিবানীর গাল-গলা ঘামতে থাকে। কোমরের আঁচলের পাক খুলে মুখ মুছতে থাকে চেপে চেপে। বলে,—তোমার মনটা বদলে যাবে না তো? পুকুরের মন, বলা যায় না, কখন কেমন থাকে।

সলজ্জ হাসি হাসলো শশিনাথ। বললে,—তুমি চিত্তাকুল হ'তে পারো।

বৃকের আঁচল সামলায় শিবানী। দক্ষিণের হাওয়ায় আঁচল ঝিক ঝিক না হয়তো। বলে,—আজ শুদ্ধতথির রাতে থাকবো তায় এখানে। তোমার অপেক্ষায় থাকবো। আসলে তুমি তখন?

—সাহস হয় না আমার। ভয়ে ভয়ে বললে শশিনাথ। বললে,—রাজপুত্রীতে কত লোক। জোড়া জোড়া চোপকে কাঁচি দেওয়া যায় না যে! কার কখন নজর পড়ে!

—আমি ভয় পাই না। কেমন যেন বেপদোয়ার মত বললে শিবানী। নিজের হাতখানি শশিনাথের হাতে বেগে কথা বলছে। বললে,—রাতের বেলায় এসো, সারা রাত বসে বসে কথা কইবো। তোমার কাছে গল্প শুনবো। চাঁদের জ্যোৎস্নায় দেখবো তোমাকে।

—দেখা যাক, যদি পারি তো আসবো। ফিসফিসিয়ে বললে শশিনাথ। ইদিক সিদিক নজর দেনে বললে,—লাল শাড়ীখানা পরবে বল, তবে আমি আসতে পারি।

মুহু হাসির সঙ্গে খানিক অবাক চোখে চেয়ে থাকে শিবানী। বলে,—লাল শাড়ীতে কি মানায় আমাকে?

—হী খুব মানায়।

—তবে রাখবো তোমার কথা।

শিবানী কথা বলতে বলতে বাঁধানো ঘাটের দিকে চোখ ফেঁদায়। কাঁকে যেন সহসা দেখতে পেয়ে হাসি চাপে মুখের। বলে,—এখন তবে যাই আমি। পাকশালের জানলা থেকে আমাদের বড়বাগী দেখছেন। আড়ি পেতেছেন।

শশিনাথের মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তার চোখের সমুখের

পৃথিবী যেন অদৃশ্য হয়ে যায় চকিতের মধ্যে। শিবানী কিন্তু হাসতে থাকে গিলখিল শব্দে। হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়।

বড়বাণী! ভাবতেও চমক লাগে শশিনাথের। উমারানী স্বচক্ষে দেখেছেন। অজানা ভয়ে আশান্ত হয়ে ওঠে সে। বড়বাণী যদি জানিয়ে দেন রাজবাড়ীতে, যা দেখেছেন তা যদি বাক্য করেন অন্ধবে। রাজাবাহাদুরের কানে যদি তুলে দেন।

—পোড়ামুখী মেয়ে, আমি সব দেখতে পেয়েছি।

শিবানী কাছে আসতেই উমারানী হোস হোসে বললেন। তামাসার হাসি তাঁর মুখে। সত্যতো বললেন,—কি বলে শশিনাথ? এতক্ষণ কি কথা কইলি?

মুখে আঁচল ঢাপলো শিবানী। চোখ ঢাকলো। কিন্তু হাসি তার থামতে চায় না যেন। খিলখিল হাসছে শিবানী।

উমারানী হাত চেপে দাঁড়ালেন শিবানীর। সজোরে চেপে ধরে বললেন,—চোর দাঁড়ি, চল তোর সাজা হবে আজ। রাজমাহার কাছে নিয়ে যাবো। কীস কীসে দেবো সব।

—একটি বড়বাণী! হাসির ভেতর টেনে শিবানী অগ্রবোধ জানায়। বলে,—তোমার হুঁটি পায়ে পড়ি।

—তাব বল শশিনাথ কি বললে। উমারানী ভেরা করতে থাকেন নকল গাভীদ্বারের সুরে। বললেন,—শশিনাথ রাজী আছে তোমার বিরুদ্ধে?

মাথা নত করলো শিবানী। খানিক থেমে থেকে মাথা তুলিয়ে বললেন,—না। তাব আপত্তি নেই।

—তোকে তার পছন্দ? মুখের হাসি লুকিয়ে উমারানী বললেন।

—জানি না আমি।

—আমার কাছে মুকতে নেই শিবানী। সত্যি কথা বলতে হয়।

বড়বাণী বুঝি বাগের সঙ্গে কথা বলছেন। শিবানী এত বিপদের কেমন যেন অবাক মানে। বড়বাণীর মুগখানি দেখতে দেখতে। নিবৃত্ত নিটোল মুখ, কোমরের ছাচে ঢাল। কত কাস থেকে বেগছে শিবানী, তবু দেখার তৃপ্তি হয়নি এতদিনেও। উমারানীর মুখে অদৃষ্ট কমনিয়তা, মোতে যেন পবিপূর্ণ। সন্ধ্যা দেখলেও অতৃপ্তি আসে না।

—চোর আমি না তুমি? শিবানী এতক্ষণে যুক্তিসহ কথা বলার প্রয়াস পায়।

—ওরে পোড়ামুখী, তোর মত বড় মুগ নয় তত বড় কথা! বড়বাণী চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন নকল বাগের সুরে। বলেন,—আমাকে চোর বলিস যে?

—তুমি যে বাড়ি পেতে দেখছিলে, তাই।

হেসে ফেললেন উমারানী। বললেন,—তা বেশ কথা, কি শাস্তি তুই নিতে চাস আমাকে?

ভেবে ভেবে শিবানী বললে,—তোমার মহলে তোমাকে বন্দী করে রাখতে চাই, যাতে আর কোথাও তোমার চোখ না যায়।

আবার হাসলেন বড়বাণী। বললেন,—আমি যাতে আর এই পুঙ্খ ধারে আসতে না পাই, তাই?

—হা ঠিক তাই। জোরালো সুরে বলে শিবানী। বলে,—কোথা থেকে তুমি টের পাও, বলতে পারো?

—আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে, তা বুঝি জানিস না? আমি চোখ বন্ধ করে সব দেখতে পাই।

খানিক চুপ করে থাকে শিবানী। কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললে,—আচ্ছা বল দেখি, রাজাবাহাদুর এখন কোথায়? কি করছেন?

এক-রাশ কালো মেঘ, কোথা থেকে যেন উড়ে এসে চাঁদের রূপকে স্তান করে দিয়ে যায়। তেমনি লজ্জা, অভিমান না অপমানে উমারানীর মুখে কালো ছায়া নামে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মধ্যে। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। অনেক দূরের আকাশে দৃষ্টি রেখে বললেন,—রাজা এখন হয়তো নেশার মত্ত হয়েছেন। দরবারের গদীতে বসে বসে সুরাপান করছেন কি না কে জানে! হয়তো মুসলমানীদের সঙ্গে বসলাপে ব্যস্ত আছেন। হয়তো তাদের নানা অলঙ্কার পরিয়ে তাদের রূপসুখ পান করছেন।

—আর তুমি কি করছো? অন্ধবে লুকিয়ে থেকে সহ্য করছো বিরহ যন্ত্রণা!

—উপায় কি বল। হতাশ কণ্ঠে কথা বলেন বড়বাণী। বলেন,—ক কার কথা শোনে!

শিবানী বললে,—চল তোমার মহলে যাও। এ সব কথা থাক এখন। কথা বলতে বলতে সে দালান ধরে এগিয়ে চলে। উমারানীর একটি হাত তার হাতে। শিবানী এগোয় মন্থর গতিতে। বড়বাণীর মুখে ধীরে ধীরে গাভীদ্বা। ঠাট্টা-তামাসার স্পর্শ নেই আর। শূণ্য কোণ প্রকাশ পায় তাঁর চলনে। নিবে যাওয়া তুঘের আগুন হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে থাকে।

নবাবের মনসবদাররা এসেছে দরবারে। সঙ্গে এসেছে নবাবের আমীল-গুজার।

দরবারের দ্বারে বন্দুকারী প্রহরীরা। ছুঁজন, ছুঁকি থেকে আসা-যাওয়া করছে। রাজা কালীশঙ্কর একমনে আলোচনা চালিয়েছেন। তাঁর সমুখে তুলট কাগজের ভূপ। জমির নজা, ফার্সী ভাষায় লেখা পরিমাপ।

—সেলানী লক্ষ টাকা; নগর চাই। ততপের জমির বিষয়ে কথা হবে।

মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন। নিজের ডান হাতের আঙুলগুলিতে চোখ বুলালেন। পকাশ বাস্তির বাড়-লঠন বলছে দরবারের চাঁদোয়ার। হীরার আঙুটি অলঙ্কার করে সেই আলোয়। কমল হীরার শোভা দেখেন কালীশঙ্কর।

আমীল গুজার আর মনসবদাররা পরস্পরের দিকে একবার দেখাশোনি করে। কেউ কোন সিদ্ধান্ত বাক্য করতে পারে না।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন,—আমার গঙ্গামহলের প্রজায়া মুসলমান নবাবের ফৌজী খাতায় নাম লেখাতে পারে না। নবাবের পক্ষে তারা অস্ত্র ধারণ করবে, তেমন আশা দেখি না।

মনসবদাররা মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ে। একজন বললে,—  
র, তাই যদি হয় তবে তো আপনার গঙ্গামহলে পড়ু গীজের রাজ্য  
হবে। তখন আর নবাবকে ছুঁতে পারবেন না।

—পড়ু গীজ রাজত্ব, মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে তুলনা হয় না।  
কালীশঙ্কর সাহসে বললেন। বললেন,—পড়ু গীজরা অশিক্ষিত  
বর্বর নর। তাদের অর্থলিপ্সা থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মবিৎস্ব  
নাই!

মনসবদারদের মধ্যে থেকে আবার কথা আসে। একজন বললে,  
—হজুরের অমুমান ঠিক নয়। গঙ্গামহলের প্রজারা দেখবেন একদিন  
বিলকুল খুশান হয়ে গেছে।

—খুশানদের তবু সন্তুষ্ট করতে পারি। নীতি মানে তারা,  
অত্যাচার অর্থ করে না।

হাসতে হাসতে কথা বলছেন রাজাবাহাদুর। কথার শেষে যুগে  
যুগে নতুন তুললেন। বাম হাতে গোফের প্রান্ত পাকিতে থাকলেন।  
একস্থির ঘোঁরা ছেঁড়ে দিয়ে বললেন,—বাই হোক গঙ্গামহলের  
প্রজাদের আশা প্রতিভাগ্য কবন।

আমোল গুজার বললে,—ওড়, জমির কথা কি স্থির  
করলেন।

রাজাবাহাদুর ক্রী কুঁচকে বললেন,—ঐ তো বললাম। সেলামী  
চাই নগদ এক লক্ষ টাকা। ততঃপর কথা হবে।

খানসামা আসে, সোনার খালা হাতে। সুরার পেয়লা  
সাজানো সারি সারি। খালা এগিয়ে ধরে খানসামা, একেকজনের  
সমুখে। যে বার পেয়লা তুলে নেয়। রাজাবাহাদুরের প্রতি  
সন্মান দেখিয়ে পেয়লা কপালে ঠেকায় কেউ কেউ। বিড়বিড়িয়ে  
কামনা করে রাজার সৌভাগ্য, সুস্বাদেহ।

কালীশঙ্করের জন্ত পৃথক পাত্র। লাল বেলোয়ারী কাচের  
সুরাপাত্র। টকটকে লাল রক্ত যেন, টলমল করছে। আলবোলায়  
ফরসি রেখে লাল পাত্র তুললেন রাজাবাহাদুর।

—নবাব এই টাকা দিতে সমর্থ নয়। আমোল-গুজার কথা বলে  
যুগে পেয়লা তুলতে তুলতে।

—তবে, এই প্রসঙ্গ উপাধন করেন না আর। এখানেই  
চাপা থাক। কালীশঙ্কর কঠু ভিজিয়ে নিয়ে বললেন অমুরোধেব  
স্বরে।

—বিবেচনা করুন রাজাবাহাদুর। পকাশ হাজারের অধিক না  
ওঠেন।

একজন কাননগো কথা বলে মিনতির সঙ্গে। বলে,—আপনি  
হজুর একজন রাজার মত রাজা, আপনি যদি দর কষাকষি করেন,  
আমরা কোথায় বাই!

আর এক চুমুক পাত্র শূন্য করে কালীশঙ্কর বললেন—আপনার  
কথার প্রতিবাদ জানাই আমি। দর কষাকষি আপনারা  
চালিয়েছেন, আমি এক দর বলেছি। সেলামী নগদ এক লক্ষ  
টাকা। অগ্রিম দেয়।

—নবাবের সামর্থ্যে কুলাবে না হজুর।

আমোল-গুজার কথা বলে আর পাকা দাড়িতে হাত বুলায়।

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজাবাহাদুর। গগন-  
বিদায়ক হাসি হাসলেন যেন। হাসতে হাসতে বললেন,—আর

হাসাবেন না মিঞা গাহেবরা, বাঙালার নবাবের চক্ষুরে লাগ টা-  
মিলবে না?

—পরিহাস নয় রাজাবাহাদুর, নবাব এই টাকা সেলামী দিতে  
পারবেন না।

—তবে কত দিতে পারেন? কালীশঙ্কর প্রশ্ন করলেন  
একচোখ বন্ধ করে।

আমোল গুজার বললে,—বিশ পচিশ হাজার তক দিতে পারা  
যাবে।

আবার হাসলেন রাজা। হো হো শব্দে হাসতে থাকলেন।  
হাসতে হাসতেই বললেন,—বিশ পচিশ নয়, তবে আমি বা বলি  
তাই শুনে। মাত্র এক টাকা সেলামী দিন নবাব।

কথা শেষ হ'তে না হ'তে আবার হাসি ধরলেন রাজাবাহাদুর।  
হাসি যেন কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত।

—তাই হবে হজুর? আপনার যুগী রাজাবাহাদুর। আপনি  
যেমন বলবেন।

—না না! এপাশে ওপাশে মাথা হুলিয়ে কালীশঙ্কর  
বললেন,—না না, তাহা হয় না। নবাবের মত একজন গণ্যমান্ত  
আমাকে সেলামী দিবেন কেন? সেলামী আমি চাই না।  
এখন কততে জমা হবে তাই বলেন।

—বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকার কড়ারে।

—ওটাকে চল্লিশ কবন। আর আপত্তি করবেন না।

—তথাস্ত হজুর। রাজাবাহাদুর, আপনার কথাই থাকবে।

শূন্য পাত্রটা ভর্তি করলেন কালীশঙ্কর। এক চুমুক খেয়ে পাত্র  
নামিয়ে রেখে ফরসি তুললেন যুগে। বললেন,—জমিটার নবাব কি  
কাজ করবেন?

—খাজনাখানা বানাবেন নবাব। আমোল, ফৌজদার-  
একাত্তারালের কাছারী বসাবেন। খাজানী, সিকদার আর পায়কের  
সং তৈয়ারী হবে।

—বেশ ভাল কথা। বললেন রাজাবাহাদুর। দরবারের লীর্থে  
চাঁদোয়ায় চোখ রেখে বললেন,—হু কিস্তী বন্দোবস্তের টাকাটা আগাম  
চাই কিস্তুক।

—আলবৎ, আলবৎ।

—একসঙ্গে চাই। এক কিস্তিতে।

—আলবৎ। আগামীকাল এই টাকা দেওয়া হবে।

—ঐ, ততঃপর কাগজপত্রে সই হবে। কথার শেষে যুগনল  
তুললেন কালীশঙ্কর। আলবোলায় গজ্জন তুললেন। ভামাকের  
সুগন্ধ ভাসালেন।

খানসামা ফলের পাত্র ধরে। রুপার গামলায় আপেল, নাসপাতী,  
আঙ্গুর, শা-আলু। কেউ একটা আপেল, কেউ নাসপাতী, কেউ  
ক'টা আঙ্গুর আর কেউ শা-আলু তুলে নেয়।

কালীশঙ্কর আগেরোট খেতে ভালবাসেন, সুরার সঙ্গে। তিনি  
জীর নির্দিষ্ট বেকাব থেকে আংঘোট তুললেন। রাজার মন থেকে  
থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে যেন! কেমন যেন আনন্দান করতে থাকেন।  
চিন্তাময় দেখায় তাঁকে। তখন মনে মনে 'প্রার্থনা' জানান,—  
কালীশঙ্কর যেন নির্বিঘ্নে ফিরে আসে। সুস্বাদেহ।





[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে  
নাম ধাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না ]

সিঁড়ীলাভ  
—সুন্দর ঘোষ



—রবীন্দ্র বাসু

বর্ষার দিনে



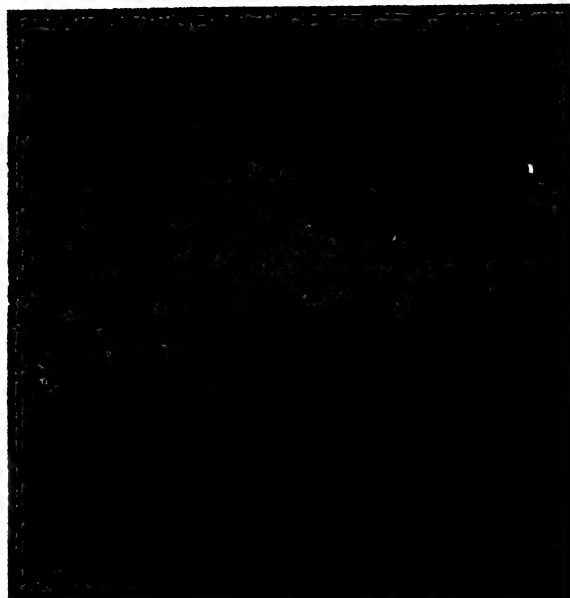




—গোবিন্দলাল দাস

তাই তো ।

ফুলের তোড়া  
—শিবনাথ পাণ্ডা



—সজিল গোস্বামী



# স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

১

মিষ্টানের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে আসতে অনেকগুলো দোকান ডিঙিয়ে আসা সহজ ছিল না। দুই বেলা একই ভাবে বিপন্ন হয়ে শেষকালে একটি সহজ সন্ধান আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম নতুন পথে। পাবনায় তখন চার পরসায় এক সের দুধ। আমার সঙ্গে ছিল ষ্টোভ। এই দুয়ের যোগাযোগে বিকেলে এক সের দুধ জ্বালিয়ে ক্ষীর করে খেতে লাগলাম। চা খাওয়া তখন অজ্ঞাত ছিল। পাবনায় কোনো চায়ের দোকান দেখেছি কি না মনে পড়ে না, সম্ভবত দেখিনি। ১১১৫—১৬ সালের পাবনা শহর।

কিন্তু আমার ব্যবস্থিত জলযোগের সেই নববিধান দিন সাতকের বেশি টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। নিজ হাতে প্রতিদিনের সংসার করা আমার পক্ষে নেই। আমার সবই অব্যবস্থিত, এলোমেলো, বেহিসেবা। নিত্যন্ত দায়ে না পড়া অবশি হিসেবের খাতায় হাত দিইনি। অতএব গৃহস্থালীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেলাম। মেন্স রীতিতে হাটেল চলত। পালা করে এক এক জনকে এক এক মাস মেন্স পরিগলনার ভার নিতে হত। এ কাজটি আমার কাছে একটি বিভীষিকা বলে বোধ হল, এড়িয়ে গেলাম।

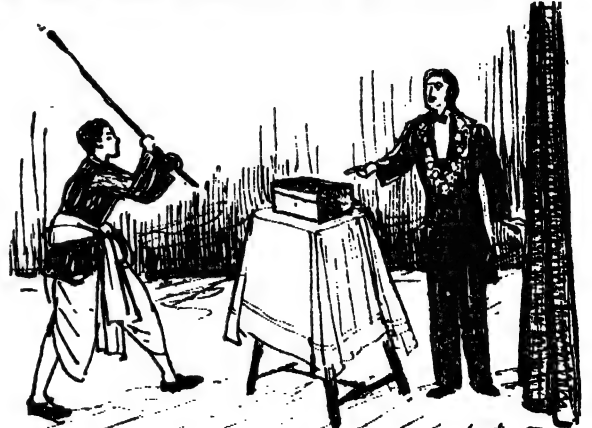
বিকলে কয়েকজনে মিলে বেড়ানো হত নিয়মিত। পয়্যার দিকেই বেশি, কখনো বাজিতপুর ঘাটে, কখনো সার্কিট হাউসের পথে সোজা, কখনো শহরের উত্তরের শড়কে। ইছামতী নদীর তপারে রাধানগর গ্রামে তখন এডওয়ার্ড কলেজের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। একদিন সে কলেজ-বাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হতে দেখলাম; আমরা শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে আসা পর্বন্ত বাড়ি তৈরির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল।

বতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের অঙ্গনে, গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক দেখানোর আয়োজন হয়। উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক সম্পর্কে তৎপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না। বেঙেনীদের ভোজবাজি দেখেছি শুধু। ম্যাজিকে আমার ভীষণ আকর্ষণ, অতএব গণপতির ম্যাজিকে টিকিট কিনে চুকে পড়লাম। ইলিউশন বক্সের খেলা দেখে বেশ

ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। অলৌকিকত্ব কোনো বিশ্বাস ছিল না, অথচ নিজের বুদ্ধিতে কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা নেই, এ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। বাতুকরের রসসৃষ্টির ক্ষমতায় পুলকিত হয়েছিলাম। পর পর তিন দিন দেখলাম, তবু রহস্য রহস্যই থেকে গেল। শুধু এই ভেবে সাহসনাশিত করলাম যে কৌশল একটা আছেই, শুধু আমার তা জানা নেই। বারা আত্মিক ব্যাপার বলে বোঝাতে এসেছিল তাদের সঙ্গে কিছু বিরোধ হয়েছিল মনে আছে।

একটি খেলা খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল। বাতুকর ছোট টেবিলে ছোট একটি কাঠের বাক্স রেখে খুব খানিকটা বড়ুতা দিয়ে নিলেন। বললেন, “এর মধ্যে মারাত্মক এক সাপ আছে, এ খেলাটা তাই খুব বিপজ্জনক। দর্শকদের মধ্যে সাহসী যদি কেউ থাকেন তবে উঠে আসুন।”

একজন সাহসী উঠে গেলেন। একখানা লাঠি তাঁর হাতে দিয়ে বাতুকর বলতে লাগলেন, “আমি ওয়ান, টু, থ্রী, বলার সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্স খুলব, দেখবেন একটি প্রকাণ্ড সাপ মাথা তুলে আছে, আপনি বিদ্রূপ গতিতে তার মাথার এই লাঠির বাড়ি মারবেন। একটু দেরি করলে সাপের হাঙত মারা পড়তে পারেন—অতএব খুব সাবধান! মনে রাখবেন, সাপকে দেখামাত্র মারতে হবে।”—বলে বাতুকর সেই সাহসী লোকটির গায়ের চাদর তাঁর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে তাঁকে



এই বাক্স সাপ আছে, খুললেই তার মাথার লাঠি মারতে হবে



লাঠি উঁচু করে ধরে কেমন করে দাঁড়াতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। লোকটি হাজার লোকের সামনে হুঁপা কঁাক করে লাঠি উঁচু করে সেই বাজের সামনে দাঁড়িয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! সমস্ত দর্শক নীরবে, কি পরিণাম ঘটে দেখার জন্য দম বন্ধ করে বসে আছে। বাহুর আবার সাহসী লোকটিকে বললেন, “মনে রাখবেন, ভয় পেলে চলবে না,—বলে তিনি আবার লোকটির উত্তত ভঙ্গির দাঁড়ানোকে বধাবধ সাশোষন করে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—“কাঁপবেন না, এইবার প্রস্তুত থাকুন—ওয়ান!”

বলে বাহুর নিজেই কিছু কাঁপতে লাগলেন, এবং ভীত স্বরে বলতে লাগলেন, “কাঁপবেন না—ভয় নেই—টু!”

সাহসী লোকটি ততক্ষণে সত্যিই কাঁপতে আরম্ভ করেছেন। বাহুরও কাঁপছেন। তিনিই যেন বেশি ভয় পেয়েছেন। এবারে তিনি একটু দূরে সরে ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন—“এইবার আমি থা বসব, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না।”

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সাহসী লোকটির মাথার উপর তোলা লাঠি সহ উত্তত হাত দুখানি ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এইবার দর্শকদের দম বন্ধ করা প্রতীক্ষার তীব্রতা চরমে তুলে বাহুর ভীষণ চিন্তার কবে, ভীষণ কঁপে এবং পালিয়ে বাবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বাজের ডালা এক থাকায় খুলে থা বলেই তিন লাফে সরে গেলেন ওখান থেকে, লোকটি লাঠি মারতে মারতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বাজের মধ্যে সাপ নেই, মারবেন কার মাথায়?

“আঁা, সাপ নেই? তা হলে আপনি ভয় পাওয়াতে সব গোল-মাল হয়ে গেছে”—বলে বাহুর এগিয়ে এসে লাঠিখানা ফিবিরে নিয়ে সাহসী লোকটিকে বললেন—“আসনে কিরে বান।”

এই ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটি ধাপ। সাপের ব্যাপারটা একটা ইন্টারলিউড, বিস্তৃত আমোদ সৃষ্টিই ছিল তার উদ্দেশ্য। আসলে ঐ ছোট বাস থেকে শেষে এত ফুল বেরোতে লাগল যে তিনখানা টেবিলে তার জায়গা হয় না।

ম্যাজিক নিয়ে এর পর অনেক চিন্তা করেছি এবং নিজের বালাকাল থেকে কিছু কিছু তাদের ম্যাজিক শিখে বন্ধুদের কতবার চমকিয়ে দিয়েছি। অনেক ম্যাজিকই এখন দেখলে তার রহস্যটা বুঝতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত বুঝছি যে রহস্য উন্মোচনে কোনো আনন্দ নেই। সামান্য উপকরণকে সফল করে বাহুর যখন একটা কিছু গড়ে তোলেন, তখন সেই গড়ে তোলাতেই শিল্পীর পরিচয়, ভাঙতে নয়। শিল্পীর ছবি, কবির কাব্য, সবই তো ভ্রান্তি। রঙ্গ-মঞ্চে যে নাটক দেখি সেও তো ভ্রান্তি। ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়ার বদলে যদি টেচিয়ে উঠে প্রচার করি ধরে ফেলেছি; কাগজ, তুলি, আর রঙ দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে; কাব্য পড়ে মুগ্ধ হওয়ার বদলে অল্পরূপ ভাবে বলি, হুঁ সব বুঝতে পেরেছি—ঐ শব্দগুলো অভিধান থেকে সংগ্রহ করে সাজানো হয়েছে—কাকি ধরে ফেলেছি; তা হলে তাতে শিল্প বা কাব্য-ম্যাজিকের কি কিছুমাত্র ক্ষতি হয়? যে ধরে ফেলল, সে নিজে শুধু প্রতারণিত হয় না কি? শিশিরকুমার ভাড়াড়ি রাম সাজেছেন জেনেও কি সেই রামের হুঃখে আমরা হুঃখ পাইনি নাট্যমন্দিরে? সেই রামের গায়ে সাবান ধবে শিশিরকুমার ভাড়াড়িকে ধরে ফেলার চেষ্টা করেছি কি?

কিন্তু এই ‘ধরে ফেলা’ও সম্বানের জিনিস হয় যদি মাথাটি

নিচু করে শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে ধরতে আসা যায়। বিজ্ঞানীদের মনোভাব হচ্ছে এটি। তাঁরাও ধরে ফেলার দলে, কিন্তু তা নিয়ে তাঁদের দম্ব নেই, তার মধ্যে ‘শু’ নষ্ট করার দৃষ্টবৃত্তি নেই, বিশ্ব-ম্যাজিকের অপরিণীম বিশ্বয় ধ্বংস করার দুরভিসন্ধি নেই। বরং বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য এর বিপরীতই। তাঁরা রহস্য বত ভেদ করছেন রহস্য তত বাড়ছে।

কলেজে কেমিস্ট্রি পড়তে গিয়েই প্রথমে বিশ্ব-গঠন সম্পর্কে ধারণা কিছু স্পষ্টতর হয়, এবং এটি যে এক বিরাট ম্যাজিকের পর্যায় পড়ে এটি সহজেই মনে আসে। অ্যাটম তখনও অবিভাজ্য ছিল আক্ষরিক অর্থে। অ্যাটম ও মোলিকিউল—পরমাণু ও অণু বস্তুসৃষ্টির পথের আদি এই দুটি ধাপ আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ করল। বস্তুর আদিত মাত্র একটি পরমাণু কণিকা, বাক্য-আর ভাগ করা যায় না, এই পর্যন্তই তখন আমার জ্ঞান। রাদারফোর্ড তখনো প্রোটনে এসে পৌঁছান নি। রোয়েটগেন-টমসন-বেকেলে-কুবি-গোল্ডষ্টাইন এবং রাদারফোর্ড-সডিং গবেষণা তখনো ফিজিক্সের পাতা ছেড়ে ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্য, সার পি-সি রায় লিখিত, ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রির পাতায় আসেনি। স্তরতঃ আমাদের কাছে (বইতে এবং অধ্যাপকের বক্তৃতায়) তখন অ্যাটমই চরম। সবার উপরে অ্যাটম সত্য তাহার উপরে নাই।

কেমিস্ট্রি আমার জীবনে এলো একটি পূর্বম আত্মবীর্ষদরূপে। আমার কল্পনা উধাও হয়ে গেল বস্তুজগতের সীমাহীন রহস্য রাজ্যে। এত বড় ম্যাজিক আর নেই। কেমিস্ট্রির ফরমুলাগুলি আমার চোখে ছবির মতো ভাসতে লাগল। পি-সি রায়ের একখানি মাত্র বই, তারই মধ্যে দিয়ে বিশ্বভ্রমণের পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে এলো লজিকের পথ। সেও আমার কাছে এক নতুন জগৎ। সিলোজিসম-এর ধাপগুলোয় কোথায় ফ্যালাসি, সিদ্ধান্তে কোথায় ফ্যালাসি, লজিকের রীতিতে বাচাই করছি, মাঝে মাঝে বুস্তের সাহায্য নিছি। মাঝে মাঝে কল্পনারাজ্যে হারিয়ে যাছি। বতটুকু কম চিন্তা করলে পরীক্ষার ভাল ফল হয়, তা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না, পাঠ্যের যে কোনো অংশ ভাল লাগলে তাকে আশ্রয় করে কল্পনায় উড়ে যেতাম অনেক দূরে।

কলেজের পড়া অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল এখানে। ভাড়া পুরনো দরিদ্র পরিবেশে আমাদের মধ্যে একটা গভীর আত্মীয়তাবোধ জেগেছিল, যা পরে আর কোথায়ও গেলাম না।

হষ্টলে আমাদের নানা বিষয়ে তর্ক প্রায় লেগে থাকত। রবীন্দ্র-কাব্য তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয়। অভুলানন্দ ও আমি রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার ভার নিয়েছিলাম। সে সব বালকোচিত তর্কবিতর্ক, তার বেকর্ড থাকলে আজ নিশ্চিত বোঝা যেত যে রবীন্দ্রনাথ তার অপেক্ষায় বসে নু থেকে নিজ ক্ষমতাতেই বড় হয়েছিলেন।

বাই হোক, এই উপলক্ষে অভুলানন্দের সঙ্গে একটা বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল এক আজও সেই ১৯১৫-১৬ সালের কলেজে পাওয়া বন্ধুদের মধ্যে সেই একমাত্র বন্ধু যাকে এখনও দেখতে পাই। তার নিজস্ব প্রতিভার চলার পথে আমি এককালে বাধা সৃষ্টি করে তাকে প্রহকার হতে প্রলুব্ধ করেছিলাম, এবং সে পথের অনেক সজার

অভিজ্ঞতা সর্ব্বের পর সে সেই দুই প্রভাব বর্তমান অনেকখানি কাটিয়ে উঠে আত্মস্থ হইবে। সে সব কথা পরে বলা বাবে বখাসময়ে।

১১১৬ সালে অনেক দিক বিবেচনা ক'রে আমাদের রতনদিয়াতে বাস করা স্থির হল। বিধে দুই ভূমি নিয়ে তাতে বাড়ি উঠল। বাবা এ বিষয়ে নিশ্চিহ্ন ছিলেন। তাঁর মতে, কোথাও স্থায়ী বাস অর্থহীন। ভবিষ্যতে যার যেখানে খুশি থাকবে, কাউকে কোথায়ও বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ের লোকের নগদ টাকার অভাব, তাই ভূমি কিনতে চাইলে যত ইচ্ছে পাওয়া যেত। ধানের ভূমি খুব শস্তা ছিল। এমন অবস্থায় অল্পায়াসে প্রায় ভূমিদার হয়ে বসা যেত তখন। বংশ বংশ ধ'রে নিশ্চিত কিন্তু বাবা ঠিক এরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাবাবরী বৃত্তি সম্ভবত সবাইই মজ্জাগত ছিল। এখন ভাবি, তা না হলে আজ কি হত? কোনো ভূমিতেই মূল প্রবেশ করানো হয়নি বলেই আজ হয়তো অস্তিত্বটুকু বজায় আছে।

বাবা পড়াশোনার ভূবে থাকতেন। নানা ভাষা শিক্ষা তাঁর একটি নেশা ছিল। উচ্চারণ শিক্ষায় একান্ত নিষ্ঠা। ইংরেজী সংস্কৃত ফার্সি—সব বিদগ্ধ উচ্চারণ হওয়া চাই। ম্যাট্রিক ক্লাসে তিনি আমাদের সংস্কৃত অনেক ছন্দের সূত্র সমেত শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই সবই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান আনন্দ। ইংরেজী বলতেন খাঁটি ইংরেজের অনুকরণে।

চেষ্টে পরীক্ষা শেষে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে যাবার সময় গেলাম হেঁটে, কুষ্টিয়া থেকে। রাজবাড়ির দুজন ও পাংশায় একজন সহপাঠী ছিল সঙ্গে। গভাই নদী পার হয়ে সাত আট মাইল বা আরও বেশি হাঁটতে হবে। যত এগিয়ে চলেছি তত দেখছি মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুন আর আগুন।—কুসুম ফুলের আগুন। কুসুম ফুল এক রকম রক্তক ফুল, জ্বালতাম না তার চাব এখানে এমন ব্যাপক ভাবে হয়। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ শুধু এই কুসুম ফুলে ছাওয়া, কিছু কিছু সরষের হলুদ ফুলের মিশ্রণও আছে। ঘন লালের সঙ্গে হলুদ বেশালে যেমন রং হয় কুসুম ফুলের রং তেমনি। নীল আকাশের পাঁচটা থেকে সোনালি রোদ যেন নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে সেই রঙের সমুদ্রে। চোখ বলসে যায় এমন তার উজ্জ্বল্য।—কুসুম ফুলের এমন ব্যাপক চাব আগে দেখিনি, পরেও না। এরই মধোকার পায়ে চলার পথ ধ'রে এগিয়ে চলেছি। সেদিন ঝড়ের রাতে এরই কাছাকাছি স্থানে এই আকাশেরই নিচে মৃত্যুর ক্রকুটি দেখেছিলাম, আজ সেখানে সেই একই প্রকৃতির প্রসঙ্গ অভ্যর্থনা দেখছি। মন ভরে উঠল।

কুষ্টিয়া থেকে বেলা সাড়ে নটার রঙনা হয়ে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌছলাম পাবনা শহরে। পুত্রা পার হয়েছিলাম খেয়া নৌকায়।

এর পর কয়েক সপ্তাহ ধ'রে শুধু পড়ার পালা। আমরা কয়েক জন মিলে বিকেলে বেড়াতে যেতাম পরীক্ষার পড়া ছেড়েও। পথের দুধারে আমগাছের নিচের ভূমি বরাবু বুকুলে আচ্ছন্ন। তার মাদকতাপূর্ণ গন্ধে মন উদ্ভাসিত হয়ে যেত। হাজার হাজার বৌমাইরি গুলন অদৃশ কোকিলের গান আর অজস্র আমের বুকুলের

সেই উগ্র গন্ধ—এই পটভূমিকে ঠেলে “Milton! thou shouldst be living at this hour” পড়ছি চোঁচিয়ে! ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৮-২ সালে মিলটনকে ডেকেছিলেন ইংল্যান্ডের বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু তার শতাধিক বছর পরে সেদিনের সেই ১১১৭ সালের পাবনা শহরে, এক আই-এ পরীক্ষার্থী বালকের কাছে, সে ডাকের সঙ্গে পরীক্ষা পাস ভিন্ন সুর মেলাবার আর কি দরকার ছিল ভেবে দেখিনি। বসন্ত কালের সেই উন্মাদকরা পরিবেশে মিলটন কেন, অতীত কালের সকল দেশের সকল কবির বেঁচে থাকার দরকার ছিল; আর কোনো কারণে নয়, শুধু পাবনা শহরের বসন্তকালের ভ্রাণ নিতে আর কোকিলের ডাক শুনতে।

পরীক্ষা শেষে কত বড় মুক্তি! প্রথমে বিশ্বাসই হয় না যে রাজ্যে আর পড়তে হবে না। হঠাৎ চমকে উঠি, এখনও ব'সে আছি, এখনও বই খুলিনি? অবশ্য বই আমি সামান্যই খুলেছি। নোট মুখস্থ করিনি কোনো দিন, সে ক্ষমতাও ছিল না। অন্তের ভাষা নিজের ব'লে চালানো ভাল লাগত না। নিজে ষেটুকু বুঝেছি মাত্র সেইটুকু লিখতে পারতাম, না বুঝে কিছুই লিখতে পারিনি। কোনো রকমে পাস করার ব্যাপার।

হষ্টেল থেকে চিরবিদায়। দু'দিন ভীষণ হৈ হুলোড় চলল। তারপর বিদায়ের আয়োজন। তখনকার দিনে মফঃস্বল শহরে উপভোগের উপায় নিজেদেরই উদ্ভাবন ক'রে নিতে হত। তখন রিলায়েন্সন মানে ঘুম, লিবারেশন মানে হৈ হৈ চিংকার। এখন যেমন সিনেমায় বসলে একই সঙ্গে দুটো প্রযুক্তি চরিতার্থ হয়, তখন তা ছিল না, কারণ তখন সিনেমা ছিল না। ঘোর সেকলে ব্যাপার।

বিদায়ের আগের দিন তারাপদ সাত্তালের মাধ্যম বায়ুর প্রকোপ দেখা দিল। সে ঘর থেকে খান দুই তন্তাপোষ টেনে বের ক'রে উঠানে গেটের কাছে রাখল। তারপর প্রত্যেকের পায়ের দুতিন জোড়া ক'রে ছুতো এনে জড় করল তার উপর। লম্বা দড়ি টাঙিয়ে তাতে সবাই জামাকাপড় ঝোলাল। তারপর একটি টিন বাজাতে বাজাতে ‘নিলাম! নিলাম!’ ব'লে চোঁচাতে লাগল। স্বদের ছুটে গেল কিছু। তারা সীরিয়াস। নিলামওয়ালার আগন্তিকি ছিল না বেচে দেওয়ার।

আমরা চার পাঁচজন যারা ষ্টিমারে গোয়ালন্দে দিকের বাড়ী, ঠিক হ'ল পরদিন সকালে রঙনা হব। ঘোড়াগাড়ি এলো দুখানা। তারাপদ আমাদের সঙ্গী, তার বাড়ি বরখাপুর, তাকে নামতে হবে



কতুয়া গায়ে পাগড়ি মাথায় হ'কে টানতে টানতে চলল।

খজিলপুর (পাবনা), আমাকে নামতে হবে বেলগাছি (ফরিদপুর)। একটি ঠেগনের ব্যবধান। তারাপদ বলল, “আমি শহরের মধ্যে গাড়িতে উঠব না, তোমাদের গাড়ির সঙ্গে হেঁটে যাব এবং শহর ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠব। কি তার উদ্দেশ্য তখন বুঝিনি, একটু পরেই বোঝা গেল। সে ফতুয়া গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলল হেঁটে তার লম্বা হাঁকোটি টানতে টানতে।

তার পর ঈমার পদ। তারাপদ একাই ভুমিয়ে রাখল গল্প ক’রে গান গেয়ে। কিন্তু তার আগ্রও একটি প্রণাম ভূমিকা তখনও বাকী। এই প্রণামেই তার শেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সে বিদায় হয়েছে, তারপর এখন সে কোথায়, তা আর জানি না।

যতদূর মনে পড়ে সাতবেড়ে ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আমাদের ঈমার গেল চড়ায় আটকে! মণ্টা মাসের শেষ তখন, পদ্মাস কুক তখন কত চর ভেগে উঠেছে। তাদের এড়িয়ে এড়িয়ে খুব সাবধানে চলছিল ঈমার, কিন্তু এড়ানো গেল না। ঘটা দুই পরে গন্তব্যে পৌঁছে যাব আশা করছিলাম, এমন সময় এই বিপদ! খাওয়ার চিন্তাই তখন বড় হয়ে দেখা দিল। তারাপদ বলল, কোনো চিন্তা নেই।—সে উঠে গেল ব্যবস্থা করতে।

কিরে এলো মিনিট দশেক পরে। বলল, সব ঠিক আছে। ঠিক আছে, মানে, সারেরেডের কাছে গিয়ে সে আমাদের কয়েক জনের জন্ত খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ক’রে এসেছে। ঈমারে তখন রাগা হচ্ছিল। খালাসীদের জন্ত এই রান্নার লোভনীয় গন্ধ ঈমারখাত্রীর পরিচিত। ইতিপূর্বে সে গন্ধই পেয়েছি, এবারে স্বাদ পাওয়া গেল। খিচুড়ী, প্রচুর পেঁয়াজ সংযোগে রান্না। আরও শুনে অবাক হলাম, এ জন্ত কোনো পরস্যা লাগবে না।

এক বেলা চেষ্টার পর ঈমার চড়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। আমি বেলগাছি ঘাটে নামলাম বিকেলে। আমার সঙ্গে একটি বড় ট্রাক ছিল, তাতে বই ছিল অনেক, বেশ ভারী সে বাস। বেলগাছি ঘাটে মুটে ছিল না একটি। যাত্রীদের সাহায্যে বাসটি নিচে নামিয়েছি, কিন্তু তারপর?

একটি স্থলের ছাত্র, যতদূর মনে পড়ে ঐ ঈমারেই ছিল কিংবা হয় তো বা শূণ্য থেকে আবির্ভূত হল আমার প্রয়োজনে। সে কাছে এগিয়ে এসে বলল, চলুন বাস আমি নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি। আমার অসহায় অবস্থা দেখেই সে সব বুঝতে পেরেছিল! মুখখানা শান্ত এবং গম্ভীর। বলল, বাস আমার মাথায় তুলে দিন। আমি বললাম “সে কি ক’রে হবে, বাস ভারী এবং বেলস্টেশন মাইলখানেক।” সে শুধু বলল, “আমার কষ্ট হবে না, তুলে দিন।” না দিয়ে উপায় ছিল না।

ছেলেটি সেই প্রায় আধ মণ ভারী ট্রাকটি মাথায় বয়ে বেলগাছি ঠেগনে এনে নামিয়ে দিল। দগ্ধবাদ জানাবার রীতি তখন পল্লীতে প্রচলিত হয়নি। কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোনোই উপায় ছিল না। তার হাতটি ধরে চেপে বইলাম কয়েক মুহূর্ত। হয় তো পেল কিছু, হয় তো পেল না, কিন্তু সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে সে চল গেল। অপরিচিত শত শত অতি সাধারণ স্থলের ছেলেদের সে এক জন, কিন্তু কি অসাধারণ। কোথায় তার বাড়ি, কি তার নাম, কিছুই মনে নেই এখন। জানবার অবকাশ পেয়েছিলাম কিনা তাও মনে পড়ে না। অথচ কি

আশ্চর্য, সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও সে আজ আমার মনের এক কোণে কত বড় একটা স্থান অধিকার ক’রে আছে।

কলেজ জীবনের গোড়াতেই সম্ভবত, সঞ্জীবনী কাগজে কিছু কিছু লিখছি মনে পড়ে। সমাজের অসঙ্গতি বিষয়ে মন খুব আলোড়িত হয়েছিল জাতিভেদ প’ড়ে। লেখার বিষয়-বস্তুতে নতুনত্ব ছিল না, কিন্তু তাতে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস যোগ হয়েছে। “স্থানীয় সংবাদ” এর পর, এই প্রথম আমার নিজস্ব মত, লেখার সঙ্গে যুক্ত হল।

গল্প বা উপন্যাস পাঠে আমার খুব আকর্ষণ ছিল না, আমার শুধু প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগত। তারতবর্ষে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা প্রথম থেকেই পড়ছিলাম। এই প্রবন্ধগুলি আমার কাছে খুব ভাল লাগত। প্রাণময় জগৎ, বাউময় জগৎ-এর বস্তুব্য বুঝতে চেষ্টা করতাম খুব মন দিয়ে। কলেজেও পাঠ্য উপন্যাসখানায় খুব মনোযোগ দিইনি, আমার অন্ত্যস্ত প্রিয় ছিল ষ্টীল অ্যান্ডিসনের রচনাগুলি। গল্প বা উপন্যাস বিষয়ে আমার এই মনোভাব আমি বিশ্লেষণ ক’রে দেখেছি। গল্প উপন্যাসে বর্ণিত কোনো বেদনা বা আবেগময় মুহূর্ত আমাকে একটু বেশি পরিমাণে বিচলিত করত, তাই দুঃখ-বেদনার কাহিনী আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। ১৯২১—২২ সালে যখন আমার ছোট বোন মঞ্জুর বয়স প্রায় চার, সেই সময়ের একটি দৃশ্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাবা তাকে ‘পুরাতন ভূত’ পড়ে শোনাতেন বোজ। ঐ গল্পটির প্রতি মঞ্জুর ভীষণ লোভ ছিল, অথচ পুরো কাহিনীটি সে সহ করতে পারত না, কঁদে ফেলত। শেষে সে নিজেই আবিষ্কার ক’রে নিয়েছিল, কঁদে ফেলার জায়গাটায় অর্থাৎ যেখানে আছে—

“লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ঘরিল করে

বিল সে আমার কালব্যাবিভার আপনার দেহ-পরে।”

এইরান থেকে শেষ ছত্র—“আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভূত।” পর্যন্ত যদি সে না শোনে, তা হলে আর তাকে কঁদতে হয় না। তাই সে, “যাবে দেশে কিরে, মাঠাকুরানিরে দেখিতে পাইবে পুন” অবধি শুনেই বাবার মুখ চেপে ধরত। দিনে দু’তিনবার এটি শুনতে হবে, এবং প্রত্যেকবার শেষ দৃষ্টে মুখ চেপে ধরা চাই।

আরও একটি কবিতা সম্পর্কে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বাবা মঞ্জুরকে একদিন বধু কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনে যে গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর এক সময় দেখা যায় সে বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে কঁদছে। অনেক জেরা ক’রে জানা গেল ‘বধুর হৃৎথে সে মর্মাহত। “একটা আলোও দেয় না তাকে?—কেন দেয় না?” বলে আবার কঁদতে লাগল। কবিতাটির শেষ দিকে আছে—

“দেবে না ভালবাসা দেবে না আলো।

সদাই মনে হয় স্রীধার ছায়ায়

দীঘির সেই জল সীতল কালো,

তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভাল।”

বধুর এ দুঃখ শিশু মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। আমার নিজের মনের কিছু প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম এই ছুটি ঘটনার মধ্যে। কিন্তু এ তো অনেক পরের কথা। আমি যথাসময়ে নিজের সম্পর্কে অনেকখানি সত্যিকার হবার চেষ্টা করছিলাম খুব মনোযোগের সঙ্গে।



প্রথম বার্ষিক প্রেক্ষিতে আদর্শবাদ চুকেছিল মনে। বিছানার ভোবক বাদ পড়েছিল, চুল খাটো করে ছাঁটা, পায়ে ক্যাশিসের জুতো। এ সবই প্রফুল্লর প্রভাব। প্রফুল্লর উপর বিবেকানন্দের প্রভাব। মাস দুই কুচলু সাধন করেছিলাম ঠিকই।

মনোজগতে ভাঙাগড়ার কাজ চলছে অবিরাম।

পাবনা থেকে রতনদিয়া আসবার পর এক মাসের জন্ত রতনদিয়া মাইনের স্থলে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হলাম। স্থায়ী হেডমাষ্টার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছুটি নিয়েছিল, তারই স্থানে। পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত এবং কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি হত না। এই আমার প্রথম চাকরি—বেতন পেলাম ত্রিশ টাকা।

তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেই আই-এ বা আই এমসি, সেটি পাস করলে ডিগ্রীর জন্ত পড়া, এবং তার পরেও সামর্থ্য থাকলে আইন পড়া অথবা এম-এ বা এম এমসি। এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন ছিল না, একেবারে স্বতঃসিদ্ধ, কেন না তখন ছাত্রদের জন্ত আর কোনো পথ ছিল না। অন্তর্ব্যব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তখনকার দিনেব শেষ লক্ষ্য। সাহিত্যে বার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই, তাকে বিশ্বসাহিত্যের রস পান করতে হচ্ছে অনিচ্ছুক রোগী যেমন ভাবে পান পান করে তেমনি ভাবে। জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যেমন করে তোক কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করা। আর এই জন্তই পড়া অনেকের কাছে বিভীষিকা ছিল। একজন ছাত্র ডাক্তারি পড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু বছর তিনেক পরে পুলিশের চাকরি পেয়ে চলে গেল! পড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক ছিল না, শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণের পক্ষে ছিল শুধু একখানি ডিপ্লোমা।

নিজের কথাও ঐ একই। কোনো অ্যাডিশন নেই, জীবনের লক্ষ্য কিছুই স্থির নেই, পাঠ শেষে সেটি ভাবা যাবে, তার আগে ভাবার কোনো প্রশ্নই নেই কারোই ছিল না। অন্তর্ব্যব বি-এ পড়তে এলাম কলকাতায়।—সেটি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম। এবং এইখান থেকে আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল ব'লে আমার বিশ্বাস।

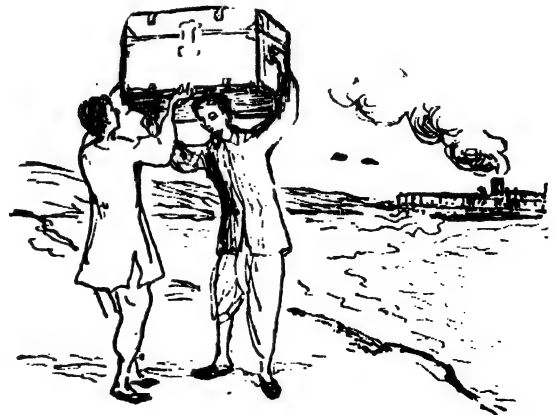
ভর্তি হতে এলাম মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। কিছুদিনের মধ্যেই এর নাম বিজ্ঞানগণ্য কলেজ হয়। এই কলেজটিকেই বেছে নিয়েছিলাম কেন তা এখন আর মনে পড়ে না, এসে কোথায় উঠেছিলাম তাও মনে পড়ে না। এ রকম ছোটখাটো হু একটি ঘটনা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মনে করিয়ে দিলে হয় তো আবার সব জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলি, এটি মনোবিজ্ঞানীদের কাছে লাগতে পারে। পাবনা কলেজের দক্ষিণ দিকের অনেকখানি অংশ আমার স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল। বড় রাস্তাটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, পাবনা ইনস্টিটিউশনটি ঠিক কোন জায়গায়, পথ বেয়ে কল্লনার কলেজ পথান্ত এসে আর এগোতে পারি না। অথচ হুট বছর এইখানে ঘোরাফেরা করেছি, এর প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার পরিচিত ছিল। এই এলাকাটা মনে আনতে কিছুদিন ধরে কি চেষ্টাই না করেছি, এবং না পেয়ে ছটকট করেছি। নিজের স্মৃতির কাছে এমন পরাজয় এর কোনো অর্থ হয় না। ভীষণ

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হল অতুলানন্দ ক্রেতাবর্তী ছিল পাবনার স্থায়ী বাসিন্দা, তাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন। পাবনা পর্যায় লেখার আগে আমার অনুরোধে অতুলানন্দ পাবনার বড় রাস্তাটির একটি মাপ আঁকতে আরম্ভ করতেনই একটি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সবখানি বিস্মৃত এলাকা আমার মনের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে পাবনার প্রকাণ্ড খেলার মাঠটি ছিল। এই মাঠে ব'লে ফুটবল খেলার মরশুমে বড় বড় ম্যাচখেলা দেখেছি, পাবনা কলেজের জয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছি। এ মাঠের সঙ্গে অন্তরের যোগ ছিল। অথচ এমন করে ভুলে গিয়েছিলাম সব। শুধু মনে পড়েনি তাই নয়, এ রকম যে একটি প্রিয় স্থান ছিল, যেখানের প্রত্যেকটি গাছ আমার পরিচিত ছিল, তার অশ্পষ্ট কোনো আভাসও মনে পড়েনি। সেদিন একটি মুহূর্তে সব কিরে পেলাম। হয় তো আপনা থেকেই কোনো এক শুভ মুহূর্তে এই বিস্মৃত জায়গাটির অতিপ্রিয় মাঠ, পথ, গাছপালা, ডাকঘর, এম-ব্যাঙ্কমেন্ট, পাবনা ইনস্টিটিউশন, ইছামতী নদী, তার উপরকার ব্রিজ সমস্ত স্মৃতিতে জেগে উঠল, কিংবা হয় তো কোনো দিনই আর এদের কিরে পেতাম না। স্মৃতির এই শূন্যতা এখন বহু জায়গায় ঘটেছে। সে সব জায়গায় আলো নিবে গেছে। কখন কোনটা ঝলবে ঠিক নেই, কোনটা ঝলবে কি না তাও ঠিক নেই। তবে সেদিন একটু ছোঁয়া লেগে যখন সব দপ করে জেগে উঠল, তখন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মধুর স্মৃতি বিজড়িত একটি হারিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য প্রাপ্ত জমিতে আমার পুনর্বাসন ঘটল যেন।

এই যে বিস্মৃতি বিলোপ করে হঠাৎ এক একটি ভুলে যাওয়া মুহূর্তকে কিরে পাওয়া, এরই কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বার বার স্মরণেছেন তাঁর নানা কবিতায়। "They flash upon that inward eye"—এই কথাটির মধ্যে পাওয়া যায় এর মাদুর্ঘ্য, ভুলে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে কিরে পাওয়ার মাদুর্ঘ্য।

কলেজে ভর্তি হওয়ার দিনটি পরিষ্কার মনে আছে। ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে দেখি রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি দরকার হয়, এবং আরও গুনলাম খেলাধুলায় ভাল হলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয় না।

ফর্মে খেলার জায়গায় লিখলাম বিশেষভাবে জানি ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি। ফুটবল শেষ খেলেছি সম্ভবত ১৯০৮ সালে, সে সময়ে ডান পায়ের হাড় (টিবিয়াতে) চোট লেগে ভেঙে যাওয়ার



বাক্সটি তার মাথায় তুলে দিলাম

মতো হয়েছিল। আঘাত লাগা জায়গার হাড় খানিকটা উঁচু হয়ে ছিল। ক্রিকেট খেলেছি ঐ সময়েই গ্রাম্য বাট বল দিয়ে, হকি খেলা তখনও দেখিনি। লিখে তো দিলাম, ভাবলাম যদি কখনো ডাক পড়ে, বলব, জানি কিন্তু খেলব না।

রেজিষ্ট্রেশন নম্বরটি নিয়ে তল মুশকিল, ওটি সঙ্গে আনি নি। দরকার হয় খেয়াল ছিল না, অথচ দেখি হলে ভর্তি অনিশ্চিত। বুদ্ধি খুলে গেল। ভাবলাম, এখন আর তো কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, এখন যে-কোনো একটি নম্বর বসিয়ে দিই, পরে জানালেই হবে ভুল হয়েছিল। একটি কার্নিক নম্বর বসিয়ে দিলাম। সে নম্বর আজও বদলের দরকার হয় নি।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের উপর তলায় ছিল কলেজের মেস। এই মেস-এর দোতলায় বড় ঘর যেটি পথের ঠিক উপরে, সেইখানে আরও চার জন ছাত্রের সঙ্গে পেলাম একটি সীট। আমার সীটটি একেবারে পথের ধারে—ছাত্রদের পক্ষে সাধারণ, কিন্তু আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল মনে হল। তার কারণ এত দিন থেকেছি খোলা জায়গায়, এখন হঠাৎ তার সম্পূর্ণ বিপরীতকোণে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাই পথের উপরের বাসস্থানটি আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বোধ হল। নদীর ধারে ব'সে বাসককাল কেটেছে, আবার এসে বসলাম আর এক নদীর ধারে। এখানে দিনরাত বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। বিছানায় ব'সে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যেত স্রোতের মতোই বেগে। আমি জানতাম আমার গৃহবাসীরা তাঁদের পছন্দ মতো সীটগুলো আগেই নিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁদের অনুবিধাজনক সীটটি আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা জানতেন না এই সীটটি না পেলে আমার পক্ষে সে ঘরটি জেলখানা মনে হত।

ব'সে ব'সে চলমান জীবন-স্রোত দেখার আমার ক্লাস্তি ছিল না। দেখতে দেখতে হঠাৎ চেতনা হত, পথের স্রোতের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া মনকে ফিরিয়ে আনতে হত কষ্ট ক'রে। মনের এমন এক একটি অবস্থা আসা সম্ভব, যখন মন প্রকৃত থাকে, সব ভাল লাগে। খুব কাছের দৃষ্টিতে স্বার্থের সংঘাতে বা অপ্রয়োজনের উদাসীনতায় যে মানুষটি অত্যন্ত বিরক্তিকর, যার সম্পর্ক এড়াতে পারলে আরাম, সেই লোকটিকেও তখন অত্যন্ত স্নেহের মনে হয়। 'বিশেষ' থেকে মনকে এ ভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া অসম্ভব নয়। সমস্ত মানুষের মিলনে যে অথও একটি মানবতার সভা তাকে দেখতে পেলে তখন প্রত্যেকটি বিশেষ মানুষকে তার একটি অপরিহার্য উপাদান বলে চেনা যায়।

আমার নিজের সম্পর্কেও এই কথা। সেই সে দিনের আমিকে আজ আমি এই ভাবেই দেখছি। আমি অগত্য একটি মানুষ, কিন্তু বিশ্বপরিকল্পনার আমার স্থান তুচ্ছ নয়। সবার সম্পর্কেই এ কথা সত্য। অতএব আমি যে আমিই, এ জন্য আমি লজ্জিত নই। আমার গর্ব শুধু এই যে, আমার জীবন যে স্থান ও কালের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে, সে স্থান ও কালের পনোয়ো আনা অংশ হয় তো বা আমার মনেরই সৃষ্টি। প্রত্যেকটি মানুষের মনেই এই জগৎ রচনার ক্রিয়া চলেছে।

৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের উপরে ব'সে আমি প্রত্যেকটি মানুষকে স্নেহ দেখেছি। কখনো এমন কল্পনা ক'রেছি যে আমি অল্প গ্রহ থেকে এসে সম্পূর্ণ নতুন চোখে যদি এই সব বাড়ি ঘর

মানুষকে দেখতাম তা হলে এদের কেমন লাগত। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এ কল্পনার পথে অনেক দূর এগিয়ে শেষে ভয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা ফিরে এলে নিজেকে ফিরে পেতে দেখি হত। আমি কোথায় আছি তা বুঝতে দশ পনেরো সেকেন্ড কেটে যেত।

এ রকম চেষ্টা আর করিনি।

তখন মোটর গাড়ি খুব বেশি চলত না, মাঝে মাঝে হু'-একখানা। পথের ভিড়ও আজকের মতো নয়। কিন্তু তখনকার দিনের সেই ভিড়কেই যথেষ্ট মনে করা হত। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম। তাঁর সঙ্গে একবার পাড়াগাঁয়ের একটি লোক কলকাতা এসেছিল। সে শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে এসে পথের ভিড় দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আজ কলকাতার হাট না কি?' বোটার হাট ভিন্ন এত লোক এক সঙ্গে কখনো দেখে নি।

লক্ষ্য করলে কত বৈচিত্র্য। নটার পর থেকে তখন যে কেরানি-কুল ডালহৌসি স্বয়ংস্বয় দিকে ছুটত, তাদের গোবাক অস্ত্র রকম ছিল। পায়ে চকচকে জুতো, ক'বে ফিতে বাঁধা। গায়ে শার্টের উপরে ওপনজের কোট, বোতাম আঁটা নয়। ধূতিতে মালকোঁচা মারা। এই ছিল তাদের সাধারণ সাজ। বেশ একটা স্বকীয়তা। গোবাকের এই চরিত্রের এখন বদল হয়েছে। তখনকার পথের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ছিল প্রায় নারীবর্জিত, আধুনিকাদের দেখা মিলত না-আদৌ। একেবারে হুলভদর্শনা। ট্রামে নয়, দোকানে নয়, কলেজে নয়, ইউনিভার্সিটিতে নয়। দৈনিক একটি দেখলেই যথেষ্ট মনে হত। কলেজের ছাত্রীরা তো শকটগ্রস্তা ছিল, তখনকার মেয়ে স্কুলের নাম 'পদা' স্কুল, নইলে ছাত্রী হত না। তখন যুবকদের প্রেম করতে হত বিয়ে করার পর, আপন স্ত্রীর সঙ্গে। তখনকার বাংলা কথাসাহিত্য তাই দুর্বল ছিল, স্বাধীন প্রেমের কথা উঠলে বহু পাঠকমহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হত।

আমাদের মেস-এ কয়েকজন ওড়িয়া ছাত্র ছিলেন। তাঁদের নাম মনে নেই, তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমেছিল। আমি তাঁদের কাছে ওড়িয়া পড়তে শিখলাম এবং তাঁদের কাছে থেকে চেয়ে নিয়ে তাঁদের তখনকার মাসিক পত্র 'উৎকল সাহিত্য' নিয়মিত পড়তাম। ওড়িয়া সমসাময়িক সাহিত্যে তখন অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয় নি, পত্রিকাখানাও বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠার ছিল। ছেলেদের উপযুক্ত গল্প, সেও আবার অনুবাদ, তাতে ছাপা হতে দেখেছি। তখন যুদ্ধের সময়, অতএব রাজভক্তিমূলক কবিতাও থাকত। নবুনা হিসেবে একটি কবিতা আমি মুখস্থ করেছিলাম, তার কয়েকছত্র এখনও মনে আছে।

“সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা দেখ রক্ত বর্ণে লিখা

সে ধ্বজার কোলে আজি লভ হে আশ্রয়,

দেখ বিশ্ব ব্রিটনের কি শক্তি অক্ষয়।”

বাংলা ভাষা ও অক্ষরের সঙ্গে ওড়িয়ার অনেক মিল। আজকের দিনে ওড়িয়া সাহিত্য অনেক এগিয়েছে, উৎকৃষ্ট ছোট গল্প ওড়িয়া ভাষায় লেখা হচ্ছে।

বেশ ভাল লাগল ৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। মেস-জীবনের আরম্ভেই এত বড় একটা রাজপথের দখল পাওয়া কম কথা নয়। এ যেন আমারই জীবনের রাস্তাপথ। বতসুর মনে পড়ে এই ১৯১৭ সালেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনি। বক্তৃতার

বিষয় ছিল 'আমার ধর্ম'। তিনি বলতে চেয়েছিলেন তাঁর জীবন চলছে, বার সন্তাননা এখনও শেষ হয়নি, সে জীবনের মর্ম কথা আগেই আবিষ্কার করে, লেবেল মেরে, জাহ্নবীর পাঠানো ঠিক নয়। বক্তৃতাটি সমসাময়িক সমালোচনার জবাবে। রবীন্দ্রনাথ আরামের কবি, বিলাসের কবি ইত্যাদি কথা তখন খুব শোনা যেত। এখনও বোধ হয় শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর কবিতা ও নাটক থেকে পর পর অনেক অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কবিরূপে কোন তথ্যটি তাঁর ভিতরে ভিতরে কুপায়িত হচ্ছে তারই চিহ্ন তিনি তাঁর নানা রচনা থেকে উদ্ধৃত করে অনেকটা নিজেরই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন। সমাজ-মন্দির মারাত্মক ভিড় হয়নি। এটি বড়ই আশ্চর্য লাগে।

কবি-কণ্ঠে সে কি তেজোদৃশ্য আবৃত্তি। শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। আজও সে ধ্বনি কানে বিঁধে আছে। কি এক অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম কবির সমস্ত সত্তায়।

“অন্তে দীক্ষা দেহ

রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ  
ধনিতা উঠুক আজি কঠিন আদেশে।  
করো মোরে সম্মানিত নব-বীর বেশে,  
দুঃসহ কর্তব্য ভাবে, দুঃসহ কঠোর  
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর  
ক্ষত চিহ্নঅলঙ্কার।”...

কিন্ধা

“হবে হবে, হবে জয় হে দেবী, করিনে ভয়  
হব আমি জয়ী  
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব বাণী,  
হে মহিমাময়ী।

তারপর বর্ষশেষ থেকে, তারপর মরণমিলন থেকে। এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় সমস্ত ঘর যেন কেঁপে উঠল—

“কহ মিলনের এক রীতি এই

ও গো মরণ, হে মোর মরণ।

তার সমারোহ ভার কিছু নেই

নেই কোনো মজলাচরণ?

তব পিঙ্গলছবি মহাজট

সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?

তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট

সে কি আগে পিছে কেহ হবে না?

তব মশাল-আলোকে নদীতট

আঁখি মেলিবে না রাজাবরণ?

জ্বাসে কেঁপে উঠিলে ধ্বজপট

ও গো মরণ হে মোর মরণ।”

আবৃত্তি শুনতে শুনতে সহসা সমুখস্থ সমস্ত দৃশ্য কোথায় মিলিয়ে গেল। ভুল হয়ে গেল হলঘরে বসে বক্তৃতা শুনছি। একটা অশরীরী কণ্ঠস্বর যেন বিহ্বল-ভরজের মতো সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। হৃৎপিণ্ড উত্তেজনার লাফাচ্ছে; অমুভব করতে পারছি, সেই মুহূর্তে ব্রহ্মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি—

যদি আহ্বান আসে। হল-ঘরে শাশানের শূন্যতা। কারো মুখ থেকে একটি শব্দ নেই, শুধু তীব্র কবিকণ্ঠ ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

একই সঙ্গে অনেক বিষয়। রবীন্দ্রনাথকে দেখা আমার সেই প্রথম। তাঁর চুলেদাড়িতে তখন কালোর প্রাধান্য। ঠোঁটের চারদ্বারে কিছু বেশি পাকা। দেহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, তার প্রায় চার বছর আগে কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁকে দেখার বিষয় কাঁটতেই তো অনেক সময় লাগার কথা; সে সময় কোথায়? একই সঙ্গে দেখা এবং বক্তৃতা শোনা চলছে। এ যেন মনের উপর অত্যাচার। তাঁর প্রত্যেকটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। এক এক সময় চমকে উঠি, খেয়াল হয়, কথা তো কানে যাচ্ছে না! রবীন্দ্রনাথ-রূপ স্বপ্ন জীবনে এই প্রথম মূর্তি ধরে সমুখে এসেছে, সেই বিষয় কাটিয়ে উঠব কি করে? স্তম্ভিতবৎ শুধু সেই বিরাট ব্যক্তির দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি, এই সেই কবি, এই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বীর ভাষা ও ছন্দ আমার রক্তের সঙ্গে মিশেছে। বীর ছবি এঁকেছি পেন্সিলে, তুলিতে। সকল কথা এক সঙ্গে জেগে ওঠে, শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকি, কথা কদাচিৎ মর্মে প্রবেশ করে। এই দেখা এবং এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার স্মৃতি আমার জীবনের একটি বড় সঞ্চয় হয়ে আছে। এরই কাছাকাছি সময়ে, কখন ঠিক মনে নেই আবার রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা শুনি রামমোহন লাইব্রেরিতে। বক্তৃতার বিষয় ছিল সঙ্গীত, নাম ছিল “সঙ্গীতের সঙ্গতি।” পরে ছাপার সময় এর নাম হয় সঙ্গীতের মুক্তি। কথার সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ বক্তৃতাতেও ভিড় খুব মারাত্মক রকমের হয় নি। এই দুটি আয়গাতেই লিখিত-বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন।

বক্তৃতা তখন একটিও বাদ দিতাম না। বিশিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা এর আগেই শুনেছিলাম কলেজ স্বরূপে। এ সময়েও অনেক বার শুনেছি। আন্তোভোব চৌধুরী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা অনেকবার শুনেছি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি আরও পরে। একবার মাত্র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে।

এই মেস-এ থাকতে সাহেবগঞ্জ-বাগী প্রবেশ প্রায়ই আমার কাছে আসত এবং তার সঙ্গে আসত বলাইচাঁদের অল্পজ্ঞ ভোলানাথ। সে শুলে পড়ত। এই ভোলানাথ কিছুদিন পরেই গল্পলেখক হয়েছিল এবং প্রবাসীর একটি গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। আরও কিছু দিন অভ্যাসটি বজায় রেখে তার পর ছেড়ে দিয়েছে। ভাল লিখত।

আমাদের মেস-এ একটি ছাত্র কলেজের মেয়েদের গাড়ি দেখে এসে এক দিন খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, সে মফঃস্বল থেকে এসেছে, এই প্রথম কলেজের গাড়ি দেখল। এই ঘটনা থেকে তখনকার দিনের পথের অবস্থা অনুমান করা যাবে। প্রবোধের সঙ্গে বেরিয়ে একদিন একটি মজার জিনিস ‘আমার ধর্ম’ বক্তৃতারত রবীন্দ্রনাথ



দেখেছিলাম। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের মেস-এর কাছে ছিল ইকনমিক জুরেলারি, হুজুরে সেখানে গিয়েছিলাম বাইরের কারো অর্ডারি জিনিস কিনতে। খুব কমিক শোনাবে, কিন্তু তবু বলা দরকার যে, সেই ১৯১৭ সালে সেই দোকানে একটি মহিলাকে দেখেছিলাম যিনি স্বাধীন ভাবে একা সেইখানে এসেছিলেন। দ্বিবিধ কারণে এটি মনে আছে। প্রথমতঃ ‘দুর্ভাগ্যবশতঃ’ (এবং প্রধানতঃ) তাঁর অঙ্গে ছুটি ঘড়ি ছিল বলে। এ বকম কখনো দেখিনি। একটি ঘড়ি হাতে, অঙ্কাটি বুকে, আঁচলের পিনের সঙ্গে বোলানো। বুকোটি আমরা দেখছি, হাতেঘটি তিনি নিজে। এর উদ্দেশ্য ভাবতে পারি নি। শুধু অলঙ্কারের জন্ত কেউ কি ছুটি ঘড়ি ব্যবহার করে?

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সারদারঞ্জন রায় (এস রায় নামে খ্যাত), সংস্কৃতের নোট লিখতেন এবং ক্রিকেট খেলতেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জে, আর ব্যানার্জি)। অধ্যাপকবৃন্দ সবাই আদ্যাক্ষরে পরিচিত ছিলেন, সেজন্ত কোনো কোনো নাম এখন ভুল হয়ে গেছে। এ, ডি—অচ্যুত দত্ত, এস, বি—শিশিরকুমার ভাট্টা, এম, এস, (মনি সেন), কে, বি—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কে, এন—কুঞ্জলাল নাগ; ইউ, এন—উপেন্দ্র নাগ; আর, কে, ডি (রামকৃষ্ণ বিজ্ঞানবদ্ব?), পি, আর—পূর্ণ রায়; কে, জি—ক্ষীরোদ গুপ্ত; আই, বি, এস—ইন্দ্রবর্ণ সেনগুপ্ত।

আমার কন্সনেশন ছিল সংস্কৃত ও দর্শন। কয়েকজন অধ্যাপকের শিক্ষণরীতি স্পষ্ট মনে আছে। জ্ঞানরঞ্জন ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। তিনি অবিবাহিত বহুতা দিতে পারতেন। ইংরেজী ক্লাসে বার্ক পড়াতেন ও দর্শনের ক্লাসে সাইকোলজি পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে কখনো কোনো উপলক্ষে নিজের কথা বলতেন। কি ভাবে তিনি গ্রীক-ল্যাটিন শিখেছিলেন, বলতেন। প্যারাডাইস লষ্ট প্রায় সব মুখস্থ করেছিলেন। তিনি বলতেন আমি স্বভাবতঃ কবি, কিন্তু দার্শনিক হয়েছে ঘটনাক্রমে। জার্মান ও ফরাসী ভাষা সম্পর্কে বলতেন ‘Only a smattering of German and French.’ সাইকোলজি পড়াতে পড়াতে একটি গল্প বললেন একদিন। তাঁর বাড়িতে রাতে চোর ঢুকছিল। শব্দে জেগে উঠে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে পিস্তলটা নিয়ে আর, চোর এসেছে।—আসলে পিস্তল তাঁর

কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু চোরকে ভয় দেখানো দরকার, নইলে অনিষ্ট করবে, তাই এই উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়েছিলেন এবং তাতে সফল হয়েছিলেন। চোর পিস্তলের কথা শোনাযাত্র পাহিরে গিয়েছিল। পড়বার সময় তিনি বার বার বলতেন ‘to take recourse to’ কখনো লিখো না, ওটি ইংরেজী নয়—ওটা বাঙালী-ইংরেজী।—ইংরেজরা বলে ‘to have recourse to’—। আরও একট বাঙালী-ইংরেজী তোমরা কখনো লিখবে না—অর্থাৎ ‘class friend’ লিখবে না, বলবে না। ইংরেজরা ঐ কথাটি জানে না, তাদের ভাষায় সহপাঠীকে class-mate বা class-fellow বলে। মগজে হাতুড়ি পিটিয়ে এই কথাগুলি তিনি ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতেন।

শিশিরকুমার ভাট্টা ডি যেমন ছিলেন চেহারার, তেমনি ছিলেন পোষাকে। প্রায় প্রতিদিন নতুন সাজে আসতেন। সর্বদা বেশ একটা হাসিখুশি ভাব। উচ্চারণ এবং বলবার ভঙ্গি ছিল চমৎকার। ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। ক্লাসে এক দিন বহুতা দেবার সময় দেখেন একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। তিনি মাথা উঁচু করে বার বার তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর মুহু-মুহু হাসছেন। তখন তার পাশের ছাত্র তাকে জাগিয়ে দিলে শিশিরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন “were you sleeping?” ছেলেটি উত্তর দিল “No sir.” শিশিরকুমার আরও হেসে বললেন “Oh, I beg your pardon.” কথাটি এমন ভঙ্গিতে বললেন যাতে ক্লাসের সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল। এই ভাষাতত্ত্বের ক্লাসেই এক দিন এক ছাত্র একটি অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ “Do I look like a dictionary?” বলেই যেমন পড়াছিলেন তেমনি পড়িয়ে যেতে লাগলেন গম্ভীরভাবে।

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসও নিতেন তিনি মাঝে মাঝে, কিন্তু তাঁর ইংরেজী রচনা-লেখা শেখানোর রীতি ছিল তাঁরই নিজস্ব। এক দিন ‘শাক্তাহান’ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন আগা-গোড়া। তার পর বললেন যা শুনে তা সংক্ষেপে ইংরেজীতে লেখ। আরও এক দিন ‘মুদিত আলোর কমল কলিকাটিবে রেখেছে সন্ধ্যা-আঁধার পর্ণপূর্বে’ ইত্যাদি সর্বটাই আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির নাম কলিকা। বললেন ‘যা শুনে তার ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ।’ শিশিরকুমারের আবৃত্তি আমার এই প্রথম শোনা। [ ক্রমশঃ। ]

## ● মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য ●

### ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে.....২৪  
বাৎসরিক “ “ .....১২  
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ).....২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

### ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সভাক ১৫  
“ বাৎসরিক সভাক .....৭।।

প্রতি সংখ্যা ১।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৫।০

( পাকিস্তানে )

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১।

বাৎসরিক “ “ .....১০।।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা “ “ .....১৫।০

# ফলো-বিলাস

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের মন্থরে যিনি আসন পেতে বসে থাকেন তাঁর নাম “মদ”।

তিনি শত্রু। মানুষের শরীরের মধ্যে তিনি একবার আবিষ্ট হলে, মানুষ আর স্বকীয় হয়ে কিছু শোনে না, কিছু দেখে না। ১

বিস্ত্রিতাঙ্গা মানবদের কাছে, সত্যযুগে, যিনি “দম” নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই কলিযুগে...সব ভিটে যায় বলে...“মদ” নামে স্থান লাভ করেছেন। ২

মৌন হয়ে বসে থাকা, মুখটিকে বিশেষ ভাবে কৌচকানো, উদ্ধে নয়ন তুলে বসা, চক্ষুর যের অস্ত্র-লক্ষ্যতা, যাকে স্বগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার, মাথায় মুকুট পরা,—এইগুলি হচ্ছে ‘মদে’র প্রধান রূপ। ৩

শৌধ-মদ, রূপ-মদ, শৃঙ্গার-মদ ও কুসৌরভ-মদ,—এইগুলি দেহীদের মদ-বৃক্ষ। এদের মূল হচ্ছে বিভব-মদ, অর্থাৎ দৌলতের দেমাক। ৪

অতি মাত্রার ভোগের পর এই বিভব-মদকে মনে হয়—শূলে চড়াব মত, বাত-বোগে স্তম্ভিত হওয়ার মত, ভূতে পাওয়ার মত, প্রথম কাঁপুনি দিয়ে আর আসার মত। ৫

যিনি শৌধ-মদে মাতাল, তিনি ঘড়ি-ঘড়ি নিজের হাতের গুলু দেখেন; যিনি রূপের গর্বে ফটিছেন তিনি চলতে-ফিরতে নিজের চেহারা দেখেন দর্পণে; যিনি কাম-মদে বিহ্বল, তিনি রাঁহ রহি স্ত্রীলোকের দিকে নয়ন-বাণ হানেন; কিন্তু যিনি বিভব-মদে মত্ত, তিনি জ্ঞানী। ৬

জগতে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, বাঁদের আখ্যা দেওয়া হয় “আত্মারাম”। তিনি স্রবের রসে মূর্ছা বান, নয়ন মুদ্রিত করে থাকেন; যেন ধ্যানে সমাহিত। তিনিই সর্বশেষ উপমান “ধন-মদে”র। ৭

“মূঢ়-মদে”র কিছু বিকাশের অস্ত নেই। গুণের লেশমাত্রও গাতে নেই। তিনি কেবল মনুষ্যকুল-উদ্ভাদনা ছুঁগিয়ে বেড়ান...বর্ধনশে। তিনি বিচিহ্ন। নির্গাণধ হয়েও বিজয়ীর মত দাপিরে বড়ান সংসারে। ৮

আর এক বকমের মদ রয়েছে, তাঁর নাম “তপস্বি-মদ”। মাটি, খুঁটি, কিছুই তিনি দেগতে পান না হুঁনয়নে; কেবল কলজাস্ত্র আকাশে আকাশে দর্শন পান বিজ্ঞাধরদেব।

“ভক্তি-মদ” এক একটি অমৃত কণ্ঠ করে বসেন। দেহের

অস্তির তিনি তুলে যান। কিন্তু বৎসগণ, জেনে রেখো, প্রকৃতিটি তাঁর নিতাই থাকে চপল। ৯

“শাস্ত্র-মদ” সর্বদাই যেন ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ-রাড়িয়ে রয়েছেন। গরের মুখের তুলু কধাও তাঁর অসহ্য। তিনি শ্রমপী। মনুষ্য-নেতাদের মধ্যে তিনি মূর্ধধর একটি গাতৃ-কোভ। বৈবম্যের রাজা। ১০

পুরুষদের মধ্যে যে “অধিকার-মদ”-টি রাজমান থাকেন, নিত্যা-করাল তাঁর প্রকৃতি। নিদারুণ নির্মম তাঁর বর্জন, গর্জন, বচন। সখ্যে সে আখ্যাত করে বসবেন তার স্থিরতা নেই। তিনি সর্ব-বাদক, খুব রাক্ষস-বিশেষ। ১১

পুরুষদের মধ্যে যে “হৃদ-মদ”-টি বিরাজ করেন, তিনি কেবল পূর্বপুরুষের প্রতাপের কথাই শতরূপে কণ্ঠচান, ভুলে যান নিজের ইতিকর্কবাত। নিজেই ভাবেন স্তম্ভকর্ক ও মহাজ্ঞানী। ১২

“শৌচ-মদ” নামে আর একটি মদ রয়েছে। নিত্যা সঙ্কোচে তিনি পূর্ণ। জনতার দৃশ্য থেকে সর্বদাই নিজেই বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলেন। সকল সময়েই ভাবেন, তিনি ডাড়া ভগন্তের সব কিছুই অশুভ। আত্মাশয় তিনি গোবরের ছড়া নিয়ে চলেন। ১৩

বৎসগণ! এই যে ‘মদ’-গুলির কথা বলা হলো, এদের প্রত্যেকটিই একটি কীর্তি কীর্তি শিক্ষা সোনা আছে। নিজের নিজের মূল ক্ষয় করলে রিমই হুঁয় যান। কিন্তু এদের চেয়েও প্রসিদ্ধ একটি মদ রয়েছে। তাঁর নাম নেই, তিনি কুটিল। ঐ দেশ তিনি বিবাত বিবাত ছাড়া বুঝে যান। তিনি অসীম ভোগী। তাঁর নাম “পান-মদ”। পানাস্ত্রভঙ্গার কারণে তিনি কলঙ্ক হয়ে ওঠেন। বিশ্বের তিনি ঘুরাব পাশ। মুক্তিমান মহিমাম্বিত এক মোহ। অগ্নিক হলেও তিনি দুদ্ধান্ত আগ্নেয় হরণ করে নেন মানুষের হাজার বছরের অজিত জীল। মজ্জমদে যিনি মাতাল, তাঁর বাড়া চোখে সবই সমান। বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, গুরু, ভাস্করী, কুঁকর, চিড়াল...সবাই সমান। আত্ম-পর ভেদ তিনি জানেন না।

সং-অসং-ভেদ তাঁর থাকে না...গাল ঘাব। ইট পাথর সোনা...তাঁর কাছে সবই সমান। যোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হলেও, মাতাল নিজেই পড়েন নবকে।

ইনি কখনও ভেউ ভেউ করে কাঁদেন, কখনও হোঃ হোঃ করে হাসেন, গান গান, বিলাপ করেন, কখনও সম্বোধিত হয়ে পড়েন



মুহুর্তে মুহুর্তে ঘনঘটা ক'রে আকারে প্রকারে অদ্ভুত প্রদর্শনী করেন বিকারের। সংসারের আদর্শ ফণা-ধর এই মাতাল। নিজের প্রেমসীটি পবের পতিকে চুম্বন করছেন, চোখে দেখেও মাতাল সমস্ত হয়ে ওঠেন না। রক্তের মত গাঢ় লাল মধু পান ক'রেও, বুঝি না, মাতালের কেমন ক'রে আসে বৈরাগ্য!

দূরে বিসর্জন দেন বসন, বরণ করেন হুঃসহ বাসন। অধিক কি... মাতাল নিজের অঙ্গ-পায়ে নিজের মূত্র ধ'রে তাতে চাঁদের ছায়া পড়লে, সেই ছায়াটিকেও পান করে বসেন। ১৪-২০

পুরাকালে, অখিনীকুমার হুঃজনের হৃৎপাশ মহশি চাবন একদা ফিরে পান তাঁর যৌবন। হৃৎকৃত হয়ে মহশি স্বয়ং যজ্ঞাহুষ্ঠান করেন, এবং সোমাই অখিনীকুমার হুঃজনকে আবাহন করেন পানোৎসবে।

ভ্রুঙ্ক হন ইন্দ্রদেব;—এগিয়ে আসেন। তৌঃকণ্ঠে বলেন—

“মুনি, আপনি কি জানেন না, যজ্ঞে অখিযুগল সোমাই হসেও, বৈজ্ঞানিকভাবে তাঁরা অপাংক্ত্য?”

সুবরাজ বহু নিবেশ করলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র-গরিমায় অটল হয়ে বইলেন চাবন। তাঁকে যে জ্ঞাত করতেই হবে অখিযুগলকে! আপন কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হলেন না চাবন।

ক্রেপে অগ্নিবর্ষ হয়ে উঠলেন জজ্ঞারি। তাঁর বিশাল ভুজস্তুভে উত্তত হয়ে উঠল বজ্র। কী ঘটে কী ঘটে! সহসা মুনীন্দ্র চাবন স্তম্ভিত করে দিলেন ইন্দ্রের ভুজস্তুভ। এবং ইন্দ্রকে বধ করবার উদ্দেশ্যে নিম্নে সৃষ্টি করে ফেললেন... দোহুল্যমান কালসর্পের মত এক চতুর্ভুজ, সংস্র যোজন বিপুল, ‘কৃত্য’-দেবীর মত ভয়াল-দর্শন, ঘোর মহাশয়। অকস্মাৎ দানবের আবির্ভাবে ভীত হয়ে পড়লেন বজ্রী, শরণ নিলেন চাবনের। বললেন—“দেববৈজ্ঞ হুঃজনকে সোম দেওয়া হোক”।

ইন্দ্রের তখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে দৈর্ঘ্য। করুণাসিদ্ধি মুনিও তৎক্ষণাৎ আত্মদান করলেন ভীত-প্রণত মহেশ্বকে। এবং ততঃপর ঐ ঘোর ‘মহাশয়’কে উৎসর্গ করে দিলেন...

দ্যুতে, বসগাঁতে, হরিরায়ে ও মৃগয়ায়। ২১—২৭

বসগণ, ভ্রুঙ্ক মুনি যে প্রমাণী অন্তরটিকে নিম্নে নির্মাণ করেছিলেন নিজের ছনয়ে, তিনি অধুনা স্তম্ভাকারে পাশবিক অবস্থায়, বসবাস করেন শরাদেবের মধ্যে। তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় :—

ক্রীমতদের মৌনভাষ,

হঠাৎবড়লোকদের নিস্পন্দ দৃষ্টিতে,

ধনিকদের ভ্রান্ত আঁকা মুখের বিকারে,

বিটুদের ভুঙ্ক ছুটিতে।

তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়—

দূত ও বিদ্বানদের জিহ্বায়;

রূপবান্দের দর্শনে, বসনে, কেশে;

বৈজ্ঞানের গঠপুটে;

শুণীদের, নিয়োগীদের, গণকদের গ্রীবায়ে;

সুবীরদের স্বকৃততে;

বনিকদের স্বরসে;

শিল্পীদের হাতে;

ছাত্রদের কণ্ঠে, লিখমপত্রে ও অঙ্গুলিভঙ্গে,

তরুণীদের স্তনভটে;

শ্রমের উদরে;

পত্রবাহকদের ভজ্যায়।

তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়—

কুঞ্জের গণ্ডে,

ময়ূরের পেখমে,

মরালের গতিতে। ২৮—৩২

এই নাম ‘নাম-মদ’। ইনি একটি মহাগ্রহ। অসংখ্য বিকারের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে ওঠে এর মোহ-বন্ধন এবং ইনি নিজে ‘কেটো’ না হয়েও, নিখিল প্রাণীর সঙ্গে কাঠ হয়ে বসে থাকেন সর্বদা। ৩৩  
ইতি মদ-বর্ণনং নাম যঃ সর্গঃ।

### সপ্তম সর্গ

মামুষের অগ্নি কাঞ্চল্যপের প্রাণ হচ্ছেন ‘অর্থ’। এই নলোকে সেই-হেন অর্থকেও, আশ্চর্য, হরণ করেন অতি ধূর্ত গানোপজীবীরা। তাঁদের অস্ত্র... কণ্ঠ। কোমল, মনোহর, পরিবর্তনশীল, চাঁচা-ছোলা কণ্ঠ। ১

পদ্মের ভাঁড়ার নিঃশেষে লুটে-পুটে গেছেও আশ যেটে’ না এই গায়ক-ভূসদের। তাঁরা ছোট্টন কুহুদ ফুলের আশাদ নিতে। তাতেও তাঁরা স্থল হয়ে ওঠেন না, ক্ষণই থেকে যান। তখন আবার প্রণয় করতে দৌড়ন মাতঙ্গের সঙ্গে। ২

এই গায়কেরা সাক্ষাৎ যোনি-শিশাচ পৃথিবীর। ঘট, পট শকট ইত্যাদি কাঁখে চাপিয়ে ঘোরেন। সঙ্গে ফেরে মূর্খ ছেলের দল। বাব্বী চুল উড়তে থাকে বাতাসে। রাজারাজড়ার মাথায় হাত বুজিয়ে যান। ৩

এর যায় চুপি করতে। কেউ যদি তখন হাঠাকার দিয়ে ওঠে, বেচারী চোরকেও তখন ত্রস্তপদে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হয়। কিন্তু এই গায়ক-চোর প্রকাশে হাঠাকার ক’রেই লুঠ করে নেন সকলের সর্বস্ব। ৪

পা পা ধ ধ নি নি গ ম মা, ধা ধা মা মা’স মা স গা ধা মা।

এই রকমের স্বরপনশ্রেণী সৃষ্টি ক’রে পৃথিবী মজিয়ে ঘুরে বেড়ান ধূর্ত গায়কেরা। ৫

কুটিল বর্ণীর মত কখনো ঘরপাক খেতে খেতে গান গেয়ে ওঠেন। কখনও বা গাইতে গাইতে উঠে গিয়ে বেশ বদলে আসেন। সে কত রকমের সাজ! আর গাইতে গাইতে মুখের মে কী বিকৃতি! কখনও আবার বহুক্ষণ ধ’রে মৌনী হয়েই গান গা’ন, মর্দল বাজতে থাকে হাতে। ৬

গাইতে গাইতে কখনো বা আয়তন করে ওঠেন, কখনো বা জয় দিয়ে ওঠেন। এক এককুলি গান করেন, আর হাজার ছাড়েন। গলার সে কী ঘর-ঘরে কাককাঙ্ক্ষা থেকে থেকে নিজেই বাহবা দিয়ে ওঠেন নিজেকে। ৭

ছাত্রের কণা জলে ফেলে দিলে মাছে খায়, তাতেও কিছু ধর্ম-লাভ হয়; কিন্তু গায়নদের পায়ে কোটি কোটি ঢাললেও, একটি দানাও লাভ হয় না কল। ৮

নালাব মত বিকট হাঁ করে বসে থাকেন এই গায়কেরা।



বিধাতার বিধান, সেই প্রণাল-পথে বস্তার স্রোতে বেরিয়ে যায় মূর্খদের  
অন্ধরূপ কোথাগোবের রুদ্ধ ধনরাশি। ১

গায়ন ধূর্তেরা সব সময়েই যে দাঁত হাসিয়ে গান করেন তা নয়,  
এই ধূর্তেরা গতানুগতিক ভাবে অর্থ গ্রহণ করেও হাসেন। ১০

এঁরা প্রাতঃকালে খীর থাকেন; গলায় দোলান হার; হাতে  
বাঁধেন কেয়ুর। মধ্যাহ্ন পার হতে না হতেই এঁরা...নয়, ভয়,  
নিরাশার, পাশায় সর্বস্বাস্ত। ১১

এঁদের গীতগুলি তোষামোদের ভাল দিয়ে বোনা; এঁদের গীতের  
বচনগুলি শরের মত তীক্ষ্ণ; এঁদের বচনগুলির রচনাশৈলী অতি কূট,  
অতি কপট।

সঙ্গীত-নিষাদের গানের কাদ পেতেই মূর্খ ভরিণের মত ধনিক  
বেচারীদের হরণ করেন সর্বস্ব। ১২

স্বয়ের ঠিক নেই, পদের ঠিক নেই, রেজাঙ্ক দেখান গায়নেরা।  
মুহূর্তে তাতান লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। হাতিয়েও বলেন...“দাসীর পো কী  
দিলেন একবার দেখো”; চুঃখিত হয়ে বিদায় নেন। ১৩

যে লক্ষ্মীকে সাধুসন্তেরা, ভ্রাক্ষণ-শ্রেষ্ঠেরা, প্রবীণারা বর্জন করে  
চলেন, যিনি নিগিল শোকের নিমিতি, সেই লক্ষ্মীর এঁরা অভিষাপ!  
তাকেই ভোগ করেন গায়নেরা। ১৪

পূর্বাকালে বহু বিলম্ব করে নারদ একদা ফিরে এসেছেন  
দেবলোকে। ইন্দ্রদেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন—

“ভূপালদের গবর কি, মহীতলে?”

নারদ বললেন—“সুমনাথ, মর্ত্যলোকে ভূপালদের জয়জয়কার।  
অকুরন্ত তাঁদের দান। ধর্মযজ্ঞের ইয়ত্তা নেই। ঘুরতে ঘুরতে  
নরলোকের স্রী দেখে অবাক হতে হল। ইন্দ্রের উপযুক্ত স্রী।  
ভূপালদের এত বৈভব যে বরুণকে কুবেরকে এমন কি আপনাকেও  
তাঁরা স্পর্ধা করেন। একবার নয়, এত বার তাঁরা এত বিবিধ  
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন যে, সুমনাথ, আপনার “শত-মথ”  
নাথটি আজ উপহাস্যাপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।” ১৫—১৭

নারদ মুনির বচন শুনে ত্রিমায় ফোট পড়লেন ইন্দ্র। ক্রোধে  
হসে উঠলেন। নারদের আবার ইন্দ্র! তৎক্ষণাৎ তিনি পিশাচদের  
আহ্বান করলেন: এক—

“নরেন্দ্রদের ঐশ্বর্য হরণ কর।...এই আদেশ সহ পৃথিবীতে  
দিলেন পাঠিয়ে।

ইন্দ্রের আদেশে পিশাচসজ্জ নিখিল নৃপতিরদের অধিস ঐশ্বর্যের  
লুপ্তন ব্যাপদেশে উপনীত হলেন ভূতলে। “গীত” হল তাঁদের লুপ্তন-  
মন্ত্র।

অষ্ট পিশাচ আসেন ভূতলে। তাঁদের নাম বধাক্রমে:—  
মায়াদাস, উষরদাস, বজ্রদাস, ক্ষয়দাস, লুপ্তদাস, খরহরদাস, প্রসিদ্ধ-  
দাস এবং বাতুরদাস।

অতি ভয়ানক তাঁরা। শীতলে ভয় হয়। ভীষণ গলা।  
পৃথিবীতে এসেই তাঁরা অতিবিকট একজন গায়ক সৃষ্টি করে  
বসলেন।

গায়কদের কৃপায় দিকে দিকে ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল নৃপতিরদের  
বৈভব, স্বর্গস্বাস্ত হতে লাগল মনুষ্য। যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে শিথিল  
হয়ে গেল ভূপালদের উদ্ভন।

মহাঘোর এই কর্ণ-পিশাচের দল কর্ণবদ্ধ পথে প্রবেশ করতে  
লাগল গীতচ্ছন্দে...ভূপালের হৃদয়ে। আকস্মিক তাঁদের হৃদয়-  
হরণ। ১৮—২০

বৎসগণ,

সেই হেতুই বলছি, এই বিকারীদের যে ভূপাল প্রবেশাধিকার  
দান না করেন তাঁর রাষ্ট্রে, তাঁরই একমাত্র অধীন থাকেন নিখিলা-  
সম্পদ যজ্ঞবতী ভূমি। ২৪

ঐ গীরা দেশে বিদেশে প্রচাপ-নৃত্য দেখিয়ে বেড়ান, কীর্তন করে  
বেড়ান রাজ-মহিমা, বীরা নাটক করেন, নাচেন, বাতুর দেখিয়ে ধাঁধা  
লাগান, বীরা নিজের সর্বস্ব খুঁয়ে বারাননার তন্ন গেয়ে জীবন ধারণ  
করেন...ঐশ্বর্যের শানিবাগ-ক্ষেত্রে তাঁরা পঞ্চপাল। তাঁদের হাত  
থেকে লক্ষ্মীদেবীকে বাঁচিও। ২৫

গায়নসজ্জের ঐক্যতান থেকে উপান লাভ করে এক সুমহান  
গীত-নিঃস্বন শুনলে মনে হয়, লক্ষ্মীদেবী যেন অস্থানে এসে উপস্থিত  
হয়েছেন, ভয়ের আবেগে কুকু ছেড়ে কঁাদছেন। ২৬

ইতি গায়ন-বর্ণনঃ নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

। ক্রমশঃ।

## রাত্রির রেলগাড়ী

শ্রীমঞ্জম দাশগুপ্ত

[ Mary Elizabeth Coleridge এর ‘The Train’ কবিতার অনুবাদ। ]

রঙীন-সবুজ চক্ষু-হুটি চলছে রাতের অন্ধকারে,  
উঠছে ধোঁয়া অগ্নিকণা—বীলীর ধনি ডাকছে কারে!  
হোখায় ছিলো—হেখায় এলো—...গীলিয়ে গেলো আবার ছুটে—  
বলতে পারো কোথায় যাবে রেল-গাড়ীটা বাঁধন-টুটে?

রাত্রি ভেদি দানোর মত ছুটেছে কেবল ছুটেছে সে  
চলার সাথে রাতের আঁধার হুই ভাগে ভাগ করছে সে।  
নীরবতা দিচ্ছে ভেঙে তার ওই বিরাট চিংকারে  
বিজ্ঞানেরই সাধের ছেলে এই রাতেরত খুঁজছে কারে?

থাকতে পেলে তুষ্ট হতো এমন জনে নি’ছে দূরে  
কঠিন ব্যথা-দুঃখ দিয়ে তাদের সারা স্বপ্নগুণে।  
প্রেমিক এবং বন্ধুজনে আনন্দ সে দেবার তরে  
তাদের নিয়ে যাচ্ছে ছুটে বিদেশ হতে নিজের ঘরে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ .

লাহিড়ী এক দিন আমায় এসে বললে—গোঁসীন্দার সিং মরু  
করলো—ভাই গোঁসীন্দার, আমাদের কাগজে আমি একটি  
নতুন ফিচার লিখছি : ইনসাইড ক্যালকুলা। আগের তুঁটো সংখ্যায়  
জোড়াবাগানের উপর লিখেছি, চৌরাস্তার উপর লিখেছি। ভাবছি  
এবার চায়না টাউনের উপর লিখবো। তুমি তো ওদিকটা জানো,  
আমায় নিয়ে এক দিন দেখাতে পারো?

নিশ্চয়ই, আমি বললাম, হবে খরচা-পত্তর তোমার। সে বাজী,  
আমিও খুশি। হ্যাঁ লাক, হ্যাঁ ডিনার, হ্যাঁ ড্রিন্স—আর লাহিড়ীর যদি  
তেমন হেমন শখ হয়, হ্যাঁ গালস্—এমন মওকা কে ছাড়ে বলে?

তাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলাম আমার এক চাইনিজ  
বন্ধু লিয়াং কুয়ো ফান্-এর সঙ্গে। কুয়ো ফান ব্যবসা করে, কিসের  
ব্যবসা আমরা ঠিক জানি না, কিছু কিছু জাঁচ করি স্টে, তবে  
জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করি না। তার সঙ্গে আমি আর  
লাহিড়ী একটি জুয়ার আড্ডা দেখলাম, একটি চতুর আড্ডা দেখলাম,  
একটি মেয়েছেলের আড্ডা দেখলাম। লাহিড়ী খুব খুশি। সে ভাবলো  
সে চায়না টাউন সখ্কে অনেক কিছু জেনেছে। এক দিন সে বললে,  
এবার একটু সাধারণ লোক দেখবে সে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা  
সখ্কেও কিছু জানবে এবার। একদিন সে সারা দুপুর বসে  
রইলো চি-শিউ-চি-এর জুতোর দোকানে। তার পর বললে, একটা  
দুপুর কাটাতে কোনো একটা সাধারণ চীনে রেস্টুরাঁ, যেখানে সাধারণ  
চীনেরা খেতে আসে, আড্ডা দিতে আসে। এখন, এসব কি আমার  
ভালো লাগে? নো ড্রিন্স, নো গালস্, নো ফান্, চুপ-চাপ বসে অল্প  
লোকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা আমার কি পোষায়?  
হ্যাঁ হোক, ওখানে তিরোঁট বাজারের কাছেই একটি ছোটো গলির  
ভিতর ত-শিউচুয়ান নামে একটি লোকের একটি ছোটো রেস্টুরাঁ  
আছে। তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিউচুয়ানকে বললাম, আমার  
এই বন্ধুটি খবরের কাগজের লোক। এখানে বসে একটু লোকজন  
দেখতে চায়। ওর বা লাগে সেবে। আর দেখো, ওর বেন কোনো  
অসুবিধে না হয়।

বাক, স্নেকে সেখানে রেখে তো আমি আমার আফিসে চলে এলাম।  
আমি সেখানেই একটি মজার খ্যাডভেকার গেলো: লাহিড়ীর, মজার  
বিপদে পড়লো সে। চতুর আড্ডা, জুয়ার আড্ডা, জীলোকের আড্ডা

সব নির্নিম্ন হবে এসে সেই পুণ্ডর লাহিড়ী কি না বিপদে পড়লো ভালো  
মানুষ ত-শিউচুয়ানের অতি সাধারণ একটি রেস্টুরাঁয়।

বলে গোঁসীন্দার সিং আবার হাসতে লাগলো। “হাসতে হাসতে  
বিহার শেষ করলো সে। আরেক বোতল বিহারের অর্ডার দিলো।  
তার পর আবার আরম্ভ করলো।

—আমি লাহিড়ীর কাছে বেরকম শুনেছি, সেরকমই বলে যাচ্ছি  
তোমায়। লাহিড়ী তো সেখানে বসে চা খেতে খেতে দেখলো  
সাধারণ ছ’চার জন চীনা এসে কাঠের চপ-টিক দিয়ে সাধারণ ভাত  
তরকারি খাচ্ছে, চপ-স্বরে নয়, চাও মিয়েন নয়, ফ্রাইড রাইস নয়,  
শার্কস্ ফিন্ সুপ নয়, ওসব কিছু নয়,—প্রেন এ্যাণ্ড সিম্পল্ কারি  
এ্যাণ্ড রাইস। কয়েক জন বসে শুধু গল্প করছে, ছ’একজন ফিরিসিও  
আসছে মাঝে মাঝে।

লাহিড়ী বসে বসে ভাবছিলো, এই ক’দিন যা দেখলো তা নিয়ে  
একটা জমকালো রোমাঞ্চকর ফিচার কি করে লেখা যায়।

হঠাৎ একজনর ডাকে তার চমক ভুললো।

বুথ ফিরিয়ে দেখে শার্ট-প্যাট পরা একজন ভদ্রলোক পরিষ্কার  
বাঙলার তাকে জিজ্ঞেস করছে, “আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যে মিষ্টার দত্ত  
ছিলেন, উনি কোথায় গেলেন?”

“মিষ্টার দত্ত!” লাহিড়ী অবাক, “আমার সঙ্গে তো ও নামে কেউ  
ছিলো না?”

“ছিলো না? ও, ‘তা’ ভলে আমারই ভুল হয়ে থাকবে,” বলে  
সেই ভদ্রলোকটি চার দিক তাকিয়ে দেখলো। খাচি টেবিল নেই  
একটিও। তখন লাহিড়ীকে বললো, “আচ্ছা, আমি কি ছ’চার  
মিনিট এখানে বসতে পারি?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই”, উত্তর দিলো লাহিড়ী।

লোকটির হাতে ছিলো একটি এটাচি কেস। সেটি রাখলো  
টেবিলের উপরে। তার পর একীট সিগার ধরলো। চুপচাপ বসে  
চুকট কুকলো কিছুক্ষণ।

তার পর বললো, “আমি অপেক্ষা করছি এক ভদ্রলোকের জন্যে।  
একটার সময় আসবার কথা, এখন দেড়টা প্রায় বাজে। এখনো  
দেখা নেই!”

লাহিড়ী উত্তর দিলো, “আজ-কাল” সময় ঠিক বাপার বড

অসুবিধে। ট্রায়ে-বাসে এত ভিড়, ঠিক মতো ওঠা যায় না। তা ছাড়া অনেক দেড়টায় টাইম দিলে আড়াইটার আগে আসে না।”

এমন করে গল্প করতে শুরু করে দিলো ওরা দু'জন। লাহিড়ী খুব গল্পের লোক, এক জন কাউকে পেলেই চেনা হোক, অচেনা হোক, আলাপ জমিয়ে ফেলে। আর এ ভদ্রলোকও দেখা গেল, গল্প করতে একটুও গরবাজী নয়।

খানিকক্ষণ পর ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, “আরে! দুটো বাজে যে।—ম—একটা টেলিফোন করতে পারলে হতো। এখানে তো টেলিফোন নেই। দাঁড়ান, আসবার সময় ওদিকে একটি ওয়ুশের দোকান দেখেছি। ওদের নিশ্চয়ই ফোন আছে। আচ্ছা, আমি আসছি একুশি—”

ভদ্রলোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। লাহিড়ী দেখলো যে, এটাচি কেসটি উনি বেখে গেলেন। গা করলো না সে। ভাবলো, ফোন করতে গেছে। একুশি ফিরে আসবে।

দোকানটা তখন প্রায় কাঁকা হয়ে এসেছে। শুধু এক কোণে একটা লোক বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আরেক জন লোক এলো। অল্প লোকটির টেবিলে বসলো। দু’একটা কি যেন কথাবার্তা হলো তাদের মধ্যে। তার পর চুপচাপ এক কাপ চা খেয়ে লোকটি চলে গেল। আগের লোকটি আরেক কাপ চা নিয়ে বসে বইলো সেই টেবিলে।

লাহিড়ী লক্ষ্য করলো যে, লোকটি মাঝে মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাহিড়ী একটু উদ্বিগ্ন হলো। আড়াইটে বেজে গেছে। সেই ভদ্রলোকের দেখা নেই। এতক্ষণ ফোন করছে সে?

একবার ভাবলো, যাক গে। সে যখন আসবে আশ্রক। আমার কি? আমি চলে যাই। তার পর ভাবলো, নাঃ, সে ঠিক হবে না। ভদ্রলোক তাঁর ভরসায় এটাচি কেসটি বেখে গেছে। লোকটি ফিরে আসুক, তার পর চলে যাবে।

তিনটে যখন প্রায় বাজে, লাহিড়ী শু-শিউ-চুয়ানকে ডাকলো। সে বসেছিলো দরজার কাছে, তার কাউটারে। সেখান থেকে উঠে লাহিড়ীর কাছে আসতে, লাহিড়ী বগলো, “দেখ, একটি লোক এখানে এসে বসেছিলো, সে গেছে ওদিকে একটি ওয়ুশের দোকানে টেলিফোন করতে—”

“না তো”, বললো শিউ-চুয়ান, “ও একটি ট্যান্ডিতে চড়ে এসেছিলো। সঙ্গে আরেক জন লোক ছিলো। সে বতরুণ এখানে ছিলো, ট্যান্ডিও ওদিকে অপেক্ষা করেছিলো ততক্ষণ। লোকটি বেরিয়ে গিয়ে সেই ট্যান্ডিতে চড়েই চলে গেছে।”

লাহিড়ী অবাক! বললো, “দেখ, সে এই এটাচি কেসটি এখানে ফেলে গেছে।”

শিউ-চুয়ান একবার এটাচি কেসের দিকে, একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তার পর বললো, “আমি দেখি নি।”

“যানে?”

“আমি ওই লোকটিকে এটা নিয়ে চুকতে দেখি নি।”

“তা’ হলে? এটা কি আমি এনেছি নাকি, না আমি আসবার আগে এখানে ছিলো?” জিজ্ঞেস করলো লাহিড়ী।

“আপনি এনেছেন কি না তাও আমি দেখি নি”, শিউ-চুয়ান

উত্তর দিলো, “তবে আপনি আসবার আগে এটা আমি এখানে দেখি নি।”

লাহিড়ী বললো, “বাই তোক, এটা বেগে দাও তোমার কাছে, ও নিশ্চয়ই মনে পড়লে ফিরে আসবে। তখন এটা নিয়ে দিও।”

মাথা নাড়লো শিউ-চুয়ান। “জিনিসটা কার না ভেনে আমি এখানে ওটা রাখতে পারবো না।”

“তা হলে আমি কি করবো?”

শিউ-চুয়ান চুপ করে বইলো একটুখানি। তার পর বললো, “আমার ধারণা, আপনি ভুলে গেছেন যে, এটা আপনার। কিংবা হয়তো এখন আপনার মনে হচ্ছে, এটা আপনার না হকৈ ভাঙা হয়।”

শিউ-চুয়ানের কথাই মান প্রথমটা বুঝতে পারলো না লাহিড়ী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। কিছু দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে। ট্রেনে এক ভদ্রলোক আরেক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নিলো। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। যাত্রী শুধু ওরা দু’জন। সারাটা পথ বেশ গল্পগুস্তা করতে করতে এলো। হাওড়ায় এসে পৌঁছতে লোকটি বললো, আপনি বসুন, আমার মালগুলো বইলো। আমি কুলি ডেকে আনি। কুলি ডাকতে সেই যে গেল আর দেখা নেই। তার পর বিরক্ত হয়ে যখন কুলি ডেকে নিজের মালগুলো নামাতে যাবে এমন সময় পুলিশ আর আবগারীর লোক এসে উপস্থিত। লোকটির বাস্তু খুলতে আপত্তি বেরোলো। তখন এ লোকটিকে নিয়ে টানাটানি। সে বললে, ও মাল তার নয়। কিন্তু এরা তুললো না তার কথা। তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। অনেক হাসামার পর প্রমাণিত হলো যে এ বাস্তু তার নয়, গাড়িতে অল্প যে লোকটা উঠেছিলো, তার। সে চোরা আপিং চালান দেয়। হাওড়ায় এসে সেমন সে টের পেলে আবগারী পুলিশ সন্ধান পেয়েছে যে এ গাড়িতে চোরা আপিং আসছে এবং পাচারী রেখেছে চার দিকে, সে আপিংয়ের মায়া ত্যাগ করে সঙ্গে পড়েছে।

মনে পড়তেই বেগে উঠলো লাহিড়ী। এটাচি কেসটা ভুলতে গিয়ে দেখলো, না, বেশ ভারী।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে।

আর এরকম ভয় পেয়েই সে ভুল করলো। তা নইলে সে দিন তার বা জুর্ভোগ হয়েছিলো, সে রকম তোতো না।

তার যখন সন্দেহ হোলো যে এখানে এরকম স্কটেকস ফেলে বাওড়ার মধ্যে কোনো গোলমাল আছে—বাগীন্দার সিং বলে চললো—সোজা পুলিশ ডেকে ব্যাপারটা খুলে বললেই চুকে যেতো। এটা যে তার, এরকম কোনো প্রমাণ তো নেই, মনে করবারও কারণ নেই। সে খবরের কাগজের সাব এডিটর, তার একটা পরিচয় আছে। শিউ-চুয়ানের দোকানে সে আমার সঙ্গে গেছে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তা ছাড়া আমাদের দেশের পুলিশও অতো কাঁচা নয় যে ঝট করে বিশ্বাস করে নেবে যে ওই এটাচি কেস লাহিড়ীর।

কিন্তু লাহিড়ী হঠাৎ বেদম ভয় পেয়ে গেল। বললো, “না, ওটা আমার নয়। আমি নিয়ে যেতে পারবো না।”

“কি আছে ওর মধ্যে?” শিউ-চুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

“আমি জানি না,” লাহিড়ী উত্তর দিলো।

“ওটা খুলে দেখা যাক,” শিউ-চুয়ান বললো।

কিন্তু লাহিড়ী বেনয় নার্তাস হয়ে বললো “না, না, অস্ত্রের জিনিস তুমি খুলে দেখতে যাবে কেন? আর এটা তো আমি আনিনি।”

“কে এনেছে আমি তো দেখিনি।”

“ওই লোকটাকে তো আমি চিনি না।”

“আমি কি করে জানবো সে কথা। আমি দেখছি সে লোকটা ট্যান্ড্রি চেপে এলো, আপনার সঙ্গে বসে গল্প করলো কিছুক্ষণ, তার পর চলে গেল সেই ট্যান্ড্রিতেই।”

“তুমি ওকে চেনো?”

“না, তবে নানা রকম লোক আসে এখানে। আমি দেখলে একটু একটু টের পাঠ,” শিউ-চুয়ান উত্তর দিলো।

“ও কি রকম লোক?”

“আমি জানি না।”

লাহিড়ী আন্তে আন্তে উঠে পড়লো। এটাচি কেসটা কিছুতেই বেখে যেতে পারলো না। শিউ-চুয়ান মানবে না কিছুতেই। ওকে নিয়ে আর বেশী খাঁটাবিটি করতে সাহস করলো না লাহিড়ী। এটাচি কেসটা নিয়ে বেরিয়ে এলো আন্তে আন্তে।

বাইরে এসে ভাবলো এটা নিয়ে এখন কি করা যায়?

এমন সময় দেখে অস্ত্র যে লোকটি এক কোণের টেবিলে বসেছিলো সেও উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লাহিড়ী তখন আরো ঘাবড়ে গেল। তার-খাবণা হোলো, এ নিশ্চয়ই আবগারীর লোক। সে তাড়াতাড়ি পা চালায়ে গেলো বেষ্টিক স্ট্রীটের দিকে, পেছন ফিরে দেখলো সে লোকটিও আন্তে তার পেছন পেছন।

আরো কোরে কোরে পা চালালো লাহিড়ী। বড়ো রাস্তায় এসে দেখে, পেছনের লোকটি তখনো গলির ভেতরে রয়েছে। কাছে এগুটি ট্যান্ড্রি। লাহিড়ী চট করে উঠে পড়লো ট্যান্ড্রিতে। ট্যান্ড্রি ছেড়ে নিতে দেখে অস্ত্র লোকটিও আরেকটি ট্যান্ড্রিতে উঠেছে।

লাহিড়ীর মুন তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে এতক্ষণে তার ভুল বুঝতে পারলো। শিউ-চুয়ানের দোকানেই ওটা খুলে কি আছে দেখে, পুলিশ টুলিশ ডেকে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রথম কাজ পেছনের লোকটিকে এড়ানো। দ্বিতীয় কাজ এটাচি কেসটাকে দূর করা কোনো রকমে।

এসপ্লানেডের কাছে আসতে দেখে, সবুজ আলো জ্বলছে। লাহিড়ীর ট্যান্ড্রি রাস্তা পেরোতে লাহিড়ী পেছন ফিরে দেখে, লাল আলো জ্বল উঠেছে। পেছন দিকে গাড়ির ভিড়ে আর অস্ত্র ট্যান্ড্রিকে দেখা যাচ্ছে না।

লাহিড়ী তখন একটু নিশ্চিন্ত হোলো।

গাথাটা যদি তখন সোজা আমার অফিসে চলে আসতো—বলে গেল বোগীন্দার সিং—সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যেতো তখনই। কিন্তু লাহিড়ী সে কাজ করলো না। সে তখন ভাবছে কি করে এটাচি কেসটা দূর করা যায়।

হঠাৎ তার মাথায় মতলব খেলে গেল। ভাবলো, এ তো খুব সোজা, ইচ্ছে করে ভুল করে ট্যান্ড্রিতে ফেলে গেলেই হয়।

সে গ্যাণ্ডের সামনে ট্যান্ড্রি থামালো, ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো তাড়াতাড়ি, যেন তার ভীষণ তাড়া।

কিন্তু ভুল করে কোনো জিনিস ফেলে যাওয়া কি এতই সহজ? শুনলো, ট্যান্ড্রি-ড্রাইভার তাকে ডাকছে। তাকে ফিরে তাকাতে হোলো। দেখলো এটাচি কেসটি হাতে নিয়ে লোকটি তার পেছন পেছন আসছে। নিরুপায় হয়ে সেটি নিতে হোলো।

কিছুক্ষণ পর ভাবলো, আবার চেষ্টা করে দেখা যাক। সে আরেকটি ট্যান্ড্রি নিলো, ট্যান্ড্রিতে চেপে কিছুক্ষণ পার্ক স্ট্রীট, কামাক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড ঘুরে, অবশেষে গ্লোবের সামনে এসে নামলো। বাজটা ইচ্ছে করে সীটের সামনে গ্লোবের উপর রেখেছিলো যাতে ড্রাইভারের চোখে না পড়ে। গ্লোবের সামনে এসে নামলো এই ভেবে যে ড্রাইভার যদি পরে টের পেয়ে ডাকেও বা, সে আর শুনবে না, সোজা ভেতরে ঢুকে, অস্ত্র দিকে যে আরেকটি পথ আছে পাশের গলিতে বেরিয়ে যাওয়ার, সেদিক দিয়ে সরে পড়বে।

গাড়ি থেকে নামলো, ভাড়া মিটিয়ে দিলো। ড্রাইভারও লক্ষ্য করলো না যে এই ফ্যাকাসে-মুখ যাত্রী তার এটাচি কেস কেলে গেছে ট্যান্ড্রিতে। ভাড়া নিয়ে সে চলে গেল ট্যান্ড্রি হাঁকিয়ে। লাহিড়ী এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

গ্লোবের ভিতরে ঢুকলো সে। মতলব—অস্ত্র পথ দিয়ে পাশের গলিতে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলসলিতে এসে ট্রাম ধরা।

কিন্তু সে আর হোলো না। অনীতা নামে একটি ঘেরের মতো লাহিড়ীর তখন খুব ভাব। আর ভেতরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সেই অনীতার সঙ্গে।

“নিশ্চয় দেখতে এলে বন্ধি?” জিজ্ঞেস করলো অনীতা।

“না, এই একটু ওজন নিতে এসেছি,” লাহিড়ী উত্তর দিলো আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে।

অনীতা বললো, “আমি এসেছিলাম এ বইটি দেখবো বলে কিন্তু টিকিট পেলাম না। ঢলো কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।”

অনীতাকে দেখলে লাহিড়ী সব কাজ ফেলে তার সঙ্গে লেপটে থাকতে চায়, কিন্তু সেদিন লাহিড়ী অনীতাকে এড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলো না। অনীতা তাকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এলো। আর বেরিয়ে আসতে দেখে, সেই ট্যান্ড্রি ফিরে আসছে।

অনীতার উপর ভীষণ রাগ হোলো লাহিড়ীর। ‘কিন্তু কিছু করার নেই। রাগ হোলো ট্যান্ড্রি-ড্রাইভারের উপর। ওরা এত সাধুপুত্র কবে ছিলো, লাহিড়ী ভাবলো। নিরুপায় হয়ে এটাচি কেস ফেরত নিতে হোলো। আট আনা পয়সা বখশিস দিয়ে হারানো মাল ফেরত পাওয়া—অস্ত্র খুশি হওয়ার ভাণ করতে হোলো।

অনীতা দেখতে চাইলো এটাচি কেসের মধ্যে কি আছে। লাহিড়ী দেখে, আরো বিপদ! বললো, “অনীতা, কিছু মনে কোরো না। চা খাওয়া আর আমার হোলো না। আমার এখন ভীষণ কাজ। কাল তোমার কোন করে কোথায় দেখা হবে ঠিক করে নেবো। আমি এখন চলি।”

অনীতা রাগ করে চলে গেল। লাহিড়ী নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনার্ভায় এলো।

মিনার্ভার কাছাকাছি আসতে সে ভাবলো, আচ্ছা, এটি সিনেমার ক্লোক রুমে রাখলে কি রকম হয়? ওরা তো ট্যান্ড্রাইভার নয়। ওরা নিশ্চয়ই আমার পেছন পেছন ছুটে এসে এটা গছিয়ে দেবে না। আর ভিড়ের মধ্যে কখন বেরিয়ে যাবো কেউ খেয়ালও করবে না।

মিনার্ভায় ঢুকে পড়লো সে। প্রথমে একটি ব্যালকনির টিকিট কাটলো। তার পর ভেতরে গিয়ে দেখে, ক্লোকরুম এটেন্ডেন্ট নেই। সেদিন লোক বেশী হয়নি। একজন আশায় বললে, এই এটাচি কেস আপনি সঙ্গেই রাখতে পারেন।

সেটি হাতে নিয়েই উপরে উঠে ভিতরে ঢুকে সে নিজের সীটে গিয়ে বসলো। প্যাসেঞ্জের পাশেই তার সীট, লোকজন বেশী নেই।

তখন তার মাথায় আরেকটি মন্তব্য এলো। এটাচি কেসটি সীটের তলার রেখে দিয়ে এমনি বেরিয়ে পড়লেই হয়।

একবার ভাবলো এখনই বেরিয়ে পড়ে। তার পর ভাবলো, না। ঢুকবার সময় লোকটি দেখেছে যে একটি এটাচি কেস নিয়ে ঢুকছে। সে যদি লক্ষ্য করে সে এমন গালি হাতে বেরোচ্ছে? ঘটা ছুঁয়েক পরে বেরুলেই নিরাপন্ন। ততক্ষণ আর লোকটার মনে নাও থাকতে পারে।

ঘটা ছুঁয়েক বসে বইখানি দেখলো অতি কষ্টে। নাচ গান ভল্লোড়ের বই—সাধারণত লাহিড়ীর ভালোই লাগে, কিন্তু এখন একটুও উপভোগ করলো না সে।

বই শেষ হতে বখন সে চুপচাপ গালি হাতে বেরিয়ে পড়ছে, তখন হঠাৎ স্তনলো পেছন থেকে কে যেন ডাকছে,—আই সে, মিষ্টার।

তার তিনটে সীট পরে বসেছিল একটি লোক। সে ওই শ্রীবীর পরোপকারী দর্শক যারা বেরোবার সময় সীটগুলো তুলতে তুলতে বেরোয়। লাহিড়ীর সীটটা তুলতেই সে লক্ষ্য করলো লাহিড়ীর এটাচি কেস।

যাই হোক—তাকে অনাস্থনিক পদ্ধতি দিয়ে এটাচি কেস হাতে লাহিড়ী বথম মিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, তখন দেখে অনীতা আর আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে। ওরা ছ'টার শো'এর টিকিট কিনেছে।

লাহিড়ীকে দেখে অনীতা বললো, “ও, এই তোমার ভীষণ কাজ?” সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই অনীতা তার বন্ধুকে নিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু অনীতার অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করার সময় লাহিড়ীর তখন নেই। সে রকম মেজাজও নেই।

সে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এটাচি কেসটা দূর করতেই হবে। যে করেই হোক, কলকাতা শহরে, যেখানে এত লোকের এত জিনিস হারানো, খোঁজা যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে—সেখানে একটি সামান্য এটাচি কেস কিছুতেই ইচ্ছে করে হারানো যায় না?

সেদিন অনেক চেষ্টা করলো লাহিড়ী। পেবে উঠলো না কিছুতেই।

নিউ মার্কেটের ভিতর একটি নিরিবিলা দেখে চায়ের ঠেলের কেবিনে বসে চা আর প্যাটিস খেয়ে, টেবিলের নিচে এটাচি কেসটি বেখে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওখানকার বয় কী সাধুপুরুষ, তাকে ডেকে এটাচি কেসটি ফিরিয়ে দিলো।

এদিক ওদিক ঘুরে একটা নিরিবিলা ডাষ্টবিন পেলো না কোথাও, সব ডাষ্টবিনের আশে-পাশেই লোকজন গিজগিজ করছে! লাহিড়ী ভাবলো, কলকাতা শহরের জনসাধারণের রুচি কোথায় নেমেছে? ডাষ্টবিনের পাশেও এত ভিড়!

তারপর গেল ময়দানে। তখনো ভালো করে সন্ধ্যা হয়নি। আলো আছে চার দিকে। খুঁজে পেতে একটি নিরিবিলা জায়গা দেখে এটাচি কেসটি বেখে আবার মনের আনন্দে হাড়াহাড়ি হাঁটতে লাগলো সে।

এবার তাকে পেছন থেকে যে ডাকলো, তার গলা খুব কাঁচ! পেছন ফিরে দেখে, একটি বাচ্চা স্কাউট ছুটতে ছুটতে তাকে ডাকছে।

মনে মনে লর্ড বেডেন পাওয়েলকে গালাগালি দিতে দিতে সে তার হাত থেকে এটাচি কেসটি গ্রহণ করলো। ছেলেটি তাকে তিন-আঙলের সেলিউট মেরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে অন্ধকার হয়ে এলো। তখন ময়দানের এদিক ওদিক খুঁজে পেতে দেখে, এতক্ষণ যদিও বা নিরিবিলা ছিলো, এখন তাও নেই। সারা কলকাতার অসংখ্য ছেলে-মেয়ের জুড়ি এদিকে ওদিকে বসে ফিস-ফিস করে কথা বলছে।

সে তখন ফিরে এলো চৌরঙ্গিতে। ভাবলো, কী করা যায়! ভাগা তাকে নিয়ে পথিহাসও করলো একটুখানি। কপৌরেশান প্লেনের ওদিকে একটি ছেলে আচমকা তার এটাচি কেসটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় মারলো।

কি যেন ভাবছিলো লাহিড়ী। ওটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই ‘চোর চোর পাকড়ো! পাকড়ো!’ বলে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করে উঠেই থেমে গেল সে। কি করলো সে! বেশ তো ছেলেটা এটাচি কেস চুরি করে পালাচ্ছিলো। কেন সে বোকার মতো চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ক্ষতি বা হওয়ার তা হয়ে গেল। কলকাতার পার্লিক-স্পিরিটেড জনতা ততক্ষণে ছেলেটিকে ধরে ফেলেছে। এটাচি কেস তার হাতে আবার ফিরে এলো। সে আবার পথ চললো সেটি হাতে নিয়ে। তার মনে তখন খুব সমবেদনা ছেলেটির জন্তে—তাকে লোকে ঠ্যাঙাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বখন সে মিউজিয়াম পেরিয়ে কিড স্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়ালো, তখন সে আর ভাবতে পারছে না কি করবে।

এমন সময় লুঙ্গিপর্য একটি লোক এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ফিস-ফিস করে বললো, “ছুকরি চাহিয়ে সাঁহাব? বহুত আচ্ছা আচ্ছা খাপসবত এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, বেঙ্গলি কলেজ গার্ল, পাঞ্জাবী, নেপালী, চীনা,—”

তখন লাহিড়ীর মাথায় আরেকটি মন্তব্য এলো। বললো, “চীনা ছুকরি হায়?”

গলির ভেতর দিকে একটি অন্ধকার একটি ফিটন গাড়ি



পাড়িয়েছিলো। সে লোকটির পেছন পেছন সেই গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ভেবেছিলো লোকটি যখন চীনা ছুকবির খোঁজ দিচ্ছে, তাকে নিয়েও যাবে চায়না টাউনে।

কিন্তু লোকটি কোথা নিয়ে কোথা দিয়ে তাকে নিয়ে এলো গ্রেসেসসি অঞ্চলের এক নোংরা গলিতে।

লাহিড়ী ভেবেছিলো, ওখানে কোনো মেয়েছেলের ঘরে এটাচি কেসটি ফেলে আসা। ওরা নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ নয়। সে ভুল করে একটি এটাচি কেস ফেলে যাচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তাকে ডেকে সেটি ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু যা ভেবেছিলো তাও হোলো না।

লোকটির সঙ্গে একটি জীর্ণ বাড়ীর নোতলায় উঠে একটি আধো অন্ধকার ঘরে ঢুকে লাহিড়ী পড়লো কয়েক জন গুপ্তার হাতে।

তার বাড়ি গেল, ফাউন্টেন পেন গেল, আঙুলি গেল, টাকাজুটি মানিবাগ গেল। তাতে তার মনে এমন কিছু দুঃখ হয়নি যখন সে দেখলো তার এটাচি কেসটিও ওরা নিয়ে নিলো।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন এটাচি কেসটি এককোণে নিয়ে গিয়ে সেটি খুলে দেখলো। দেখে একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তার পর সেটি বন্ধ করে লাহিড়ীর হাতে দিয়ে বললো, “এটি আমাদের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান।”

আরেক জন জিজ্ঞেস করলো, “আপনি থাকেন কোথায়?”

“সে জ্ঞেনে কি হবে?” লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলো।

“না। শুধু জ্ঞানতে চাইছিলাম আপনার বাস ভাড়া কতো লাগবে। ঠেটে গেলে তো তফলিফ হবে—। আচ্ছা, সাহাব, এই এক টাকা নিয়ে যান।”

সর্ব্ব্ব খুঁইয়ে এটাচি কেস হাতে নিয়ে বাড়ী বগুনা হোলো লাহিড়ী। খানিকটা পথ গিয়ে ভাবলো, না, এটা নিয়ে বাড়ী ফেরা ঠিক হবে না, সবাই জানলে চাইবে এর মধ্যে কি আছে। সে আরেক বিপদ।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? একটু ভেবে স্থির করলো, না—অফিসে ফিরে যাই। আজ তার রাত্তিরে ডিউটি নেই বটে। কিন্তু ওখানে গিয়ে একটু নিবিড়ি বসে ভাবা যাবে, এটা নিয়ে কি করা যায়।

ওই এক টাকা খরচা করে সে কিছু খেয়ে নিলে একটা ছোটো রেস্টুরাঁয়। খুঁচরো যা বাঁচলো তাতে ট্রায়ে চেপে অফিসে ফিরে এলো। অফিস থেকে সে তাদের পাড়ায় এক প্রতিবেশীর কাছে ফোন করে দিলো, যেন বাড়ীতে পথ দিয়ে দেয় সে অফিসে আছে।

তার সহকর্মী সাব-এডিটরেরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, আজ তার ডিউটি নেই, সে এখানে কেন।

সে এলোমেলো হুঁচাবটি কথা বলে তাদের কৌতূহল এড়িয়ে অল্প গল্প কাঁদলো।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা।

কেটে গেল আরো আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের মধ্যে বসে আস্তে আস্তে তার সাহস ফিরে এলো। ভাবলো, সত্যিই তো। এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। রাত একটু বেশী হলে পথঘাট নির্জন হয়ে আসবে। তখন একটি ডাষ্টবিনে ফেলে দিলেই হোলো।

এগারোটা বাজলো। ভাবলো, এবার ওটা থাক। তখন এগারোটা দশ।

ঠাৎ একজন ঘরে ঢুকে বললে, “আপনি এখানে? মিষ্টার দত্ত পুলিশকে বলছিলেন আপনি এখানে নেই। কারণ আজ আপনার নাইট ডিউটি নেই। কিন্তু ওরা নাকি আপনার বাড়ীতে পথ নিয়েছে। বাড়ীতে বললে, আপনি নাকি এখানে।”

“পুলিশ!” লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

“হ্যাঁ। ওরা মিষ্টার দত্তের ঘরে বসে আছে।”

“ও, আচ্ছা, যাচ্ছি—।” এটাচি কেস হাতে নিয়ে উঠে পড়লো লাহিড়ী। সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? সে বললে, কি জানি কি ব্যাপার। দেখে আসি একবার।

বেরিয়ে এসে কিন্তু দত্তের ঘরে ঢুকলো না লাহিড়ী। সোজা রাস্তায় নেমে এলো।

গলিটা-পেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তায় পড়তেই একটি বাস পেয়ে গেল। তাতে উঠে পড়লো সে।

চৌরঙ্গি পেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সে বাস থেকে নেমে পড়লো। তার পর হাঁটতে লাগলো পার্ক স্ট্রীট দূরে। এখন চার দিক নির্জন। কোনো কাঁকা জায়গায় একটা ডাষ্টবিন পেতেই হয়।

অনেকটা পথ হেঁটে তার পর ডাইনে কামাক স্ট্রীটে ঢুকলো। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। একটু এগুতেই একটি ডাষ্টবিন। কাছাকাছি এসে যেই এটাচি কেসটি ফেলতে যাবে এমন সময় দেখলো ডাইনের গলির ভেতর থেকে একটি পুলিশ-ভ্যান বেরোচ্ছে।

মনে পড়লো, আজ-কাল একটু বেশী রাত্তিরে কাঁকা জায়গায় কোনো ভয়বেশী কাউকে ডাষ্টবিনে কিছু ফেলতে দেখলে পুলিশেরা খুশি হয় না। কয়েক দিন আগে কোথায় যেন কাঁকে হাতে নাতি ধরে ফেলেছে একটি নবজাত শিশুর মৃতদেহ শুদ্ধ।

তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়লো,—তাই তো, কেন পাগলের মতো ঘুরে মরছে সে। তার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশান্ত দাশগুপ্ত, আবগারী বিভাগের বড়ো অফিসার। তাকে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেই হয়।

সে থাকতো বেকুবাগানে। খুঁকতে খুঁকতে তার বাড়ী এসে উপস্থিত হোলো লাহিড়ী। তখন বারোটা প্রায় বাজে। বাড়ীতে থাকতো প্রশান্ত, তার ছোটো ভাই, আর একটি চাকর। ছোটো ভাই দরজা খুলে দিলো। এত রাত্তিরে লাহিড়ীকে দেখে সে অবাক!

বললে, “দাদা তো বাড়ি নেই। কি একটা জরুরী কেসে বেরিয়েছে সেই সন্ধ্যাবেলা।”

“সাই হোক, ফিরবে তো, আমার খুব দরকার,” বলে লাহিড়ী বসবার ঘরে গিয়ে বসে পড়লো।

প্রশান্ত যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত প্রায় একটা। লাহিড়ীকে দেখে সেও অবাক হোলো, জিজ্ঞেস করলো, “তুমি এত রাত্তিরে?”

“ভাই, খুব জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে। কতক্ষণ বসে আছি তোমার জন্তে।”



দেবী তাকে দেখে বেটিক প্লীটের ওদিকে চোখাই  
আপিতের বেশ একটি বড়ো চামনি ঘরা পড়লো। সেই ব্যাপারেই  
বেরিয়েছিলো।” প্রশান্ত উত্তর দিলো।

“বেটিক প্লীটের ওদিকে?” লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

“আ, একটি চীনেম্যানের সেক্টরায়।”—

“আ—,”—চমকে উঠলো লাহিড়ী।

“কেন কি হয়েছে?” প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলো।

লাহিড়ী তখন সব খুলে বললো প্রশান্তকে।

“শিউচুয়ান-এর সেক্টরায়?”—প্রশান্ত সব শুনে জিজ্ঞেস  
করলো।

“আ, কেন?” প্রশান্ত লাহিড়ী বললো।

“তা হলে ‘মিউটি’-এ?” জিজ্ঞেস করলো প্রশান্ত।

“মিউটি-এই স্থান?”

প্রশান্ত কান্নাকাতি শুরু করলো। “হাসতে হাসতে বললো, ‘এটাটি  
কেউ একবার খুঁজে নেবে নিশ্চয় পারবে না?’”

“তবে বুঝিনি,—উত্তর দিলো লাহিড়ী।

“আজ্ঞা, প্রশান্ত খুঁজে নেবে তো?”

লাহিড়ী হাতে হাতে এটাটি কেসটি খুললো। তার ভেতরে  
চারটে কাগজের বাঁক মামুলাসি করে রাখা। প্রত্যেকটি খুলে  
দেখলো লাহিড়ী। প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ।

“বুকেসে সন্দেশ, প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ,” বলে যোগীন্দার সি  
আবার হাসতে শুরু করলো।

“সন্দেশ?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “লাহিড়ীর  
সঙ্গে বসিষ্ঠতা করছিলো নাকি কেউ?”

যোগীন্দার বিস্ময় খেলো হুঁ তিন চুপক। তার পর উত্তর দিলো,  
“না। কেউ বসিষ্ঠতা করেনি। কলকাতার দু’জন নামজাদা  
আগমারের একটা পাঠ ছিলো এর মধ্যে।”

“কি বকম?”

“বুকেসে না? শিউচুয়ানের দোকানে ওই দু’জন লোকের  
কেনা হওয়ার কথা ছিলো আরেক জনের সঙ্গে, যার হাত দিয়ে  
কিছু আপিস পাচার করে দেওয়ার কথা। ওই দু’জনের  
একজন বাড়ালী, আরেক জন চীনেম্যান। যার সঙ্গে দেখা  
হওয়ার কথা ছিলো সেও বাড়ালী, কিন্তু এদের কি বকম বেন সন্দেশ  
হয়েছিলো যে আগমারীর লোকেরা এই খবরটা পেয়েছে এবং নজর  
রাখছে দোকানটির উপর। তখন আর অল্প লোকটিকে খবর দিয়ে  
অল্প জাদগায় কেনা হওয়ার ব্যবস্থা করার সময় ছিলো না। তাই  
এরা ভাবলো, আগমারীর লোকের চোখে খুলো নিতে হবে। যে বকম  
এটাটি কেসে ওদের আপিস পাচার করে দেওয়ার কথা, সে বকম  
এটাটি কেসে সন্দেশ প্রসেসিট নিয়ে গেল, তাদেরই দলের  
একজনকে দেওয়ার জন্তে, যাতে আগমারীর লোক তারই পিছু নিয়ে  
বেরিয়ে চলে যায় সেখান থেকে, আর যথাসময়ে আসল লোকটি এলে  
তার হাতে আসল মালটি নিরাপদে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো  
কারণে প্রথম লোকটি সময় মতো এসে পৌঁছুতে পারলো না। এদেরও  
আর সেবি করার সময় ছিলো না। লাহিড়ীকে দেখে ওরা বুকে  
নিলো যে সে ভালোমানুষ। এ পাড়ার খবর সে বেশী রাখে না।

তাই একটু বুঁকি নিয়ে তারই কাছে সন্দেশ-ভর্তি এটাটি কেসটা গেছে  
সব পড়লো। তবে কোথাও বাঁধ নি, কাছেই আরেক জায়গায় বসে  
লক্ষ্য করেছিলো। যখন দেখলো যে লাহিড়ী বেরিয়ে গেল, আর  
তার পিছু নিল আরেক জন লোক, লাহিড়ী বাস্তব গিরে ট্যান্সি নিতে  
সেও ট্যান্সিতে চাপলো—তখন পথ পরিষ্কার ভেবে ওরা দিবে এলো  
শিউচুয়ানের দোকানে। তার পর আসল লোক এসে পৌঁছুতে তার  
হাতে খুলে দিলো আপিস-ভর্তি এটাটি কেসটি।”

“তুমি কি করে জানলে এত সব কথা?” আমি জিজ্ঞেস  
করলাম।

“লাহিড়ীর কাছে শুনেছি।”

“সে কি করে জানলো?”

“সে শুনেছে আগমারী বিভাগের সেই অফিসার বন্ধু জগদীশ  
দাশগুপ্তা কাছে।”

“দাশগুপ্তাই বা কি করে জানলো?”

“বেশ বজ্রন,” যোগীন্দার উত্তর দিলো, “আগমারী বিভাগের  
লোকেরা অস্তো কাঁচা নয়। সহজ কাজ নয় ওদের চোখে খুলো দেওয়া।  
ওই আগমারীর দু’জন যে ট্যান্সিতে ঘুরছিলো, সেই ট্যান্সির ডাইভার  
আসলে পুলিশের লোক। ওদের সন্দেশ কিনে একটি এটাটি কেসে  
খুলে দেখে সে ওদের মতসবটা ঠিক ধরে বেগেছিলো। আপিস-ভর্তি  
এটাটি কেসটা ওদের সঙ্গে ছিলো বলে ওদের আগেই ঘরা যেতো, কিন্তু  
সেটা কতদিন, যার হাত দিয়ে মালটি পাচার করে দেওয়া হবে তাকেও  
ধরা যেন। সে সময় মতো খবর দিয়েছিলো আগমারীর লোককে।  
তাই লাহিড়ী যখন শিউচুয়ানের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো,  
একজন লোক তার পিছু নিয়ছিলো এদের চোখে খুলো দেওয়ার জন্তে,  
যাতে এরা নিরাপদ মনে করে পরে ফিরে আসে শিউচুয়ানের  
দোকানে। ওরা যদিও জানতো না পুলিশের লোক তারা  
কয়েক জন ছিলো, সেই দোকানের আশে-পাশে। সুতরাং আসল  
তিন জন লোক যখন একত্র হোলো, বামুন-উদ্ধ ধরে ফেলা হোলো  
ওদের সবাইকে। অফিসার দাশগুপ্তা সেই কেসের ব্যাপারেই অস্তো  
রাত অবধি বাইরে ছিলো।”

“আর যে লোকটা লাহিড়ীর পিছু নিয়েছিলো?”

সে তো লোকদেখানো। খানিকটা, এই এসমানেড অবধি,  
ওব পেছন পেছন গিয়ে সে চলে যার অল্প দিকে।

“আজ্ঞা, তা’লে লাহিড়ীর আপিস এটা পুলিশ ওর খোঁজ  
করছিলো কেন?”

যোগীন্দার হাসলো। বললো, “সে আরেকটি ব্যাপার।  
সেই যে গুপ্তাগুলো লাহিড়ীর কাছে থেকে ওর ঘড়ি, কেন, মানিব্যাগ  
সব কেড়ে নেয়, সেদিন ওদের মধ্যে কি একটা গুপ্তাগোল বাঁধতে  
একজন ছুরির ঘায়ে জখম হয়। পুলিশ ওর কাছে মানিব্যাগটি  
পায়; তার মধ্যে লাহিড়ীর নাম লেখা ভিজিটিং কার্ড ছিলো।  
তাই ওরা গিয়েছিলো লাহিড়ীর খোঁজে।

যোগীন্দার বলতে বলতে হেসে খুন। বললো, “পুলিশের  
কাছে পরে লাহিড়ীর কি কাকুতি-মিনতি। ওর টাকা ঘড়ি পেনের  
দরকার নেই, বাড়ীতে বা আপিসে যেন জানতে না পারে যে সে  
ওরকম একটি জাদগায় গিয়েছিলো। একটি অব্যাহিত এটাটি  
কেস ফেলে আসবার জন্তে যে একজন স্বেচ্ছাসিদ্ধ লোক ওরকম

পাড়ার যাবে, এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। বাই হোক, প্রশান্ত দাশগুপ্তের সাহায্যে সে কোনো রকমে এসব কামেলা এড়াতে পেরেছিলো।

“মিথো ভয়ে একটা দিন তার কি অশান্তিতে কেটেছে,” আমি বললাম, “বাই হোক, অনীতা নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে লাহিড়ীর মিটমাট হ'ল গিয়েছিলো তো?”

যোগীন্দ্র একটু হাসলো। কিন্তু অল্প রকম সেই হাসি। বিষন্ন, ম্লান।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর না দিয়ে সে বিয়ারের বোতলটি শেষ করলো।

তারপর বললো, “রঞ্জন, আজ হু'বোতল বিয়ার খেয়েই কি আমি একটু মাতাল হলাম না কি?”

“কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“তোমায় আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে।” একটু থামলো সে। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, “না, এ আলোচনা বেশী করে লাভ নেই। লাহিড়ী আমার বন্ধু। ও আর অনীতা এখন বিয়ে করে খুব সুখে সংসার করছে। অনীতার সঙ্গে আমার আগেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো লাহিড়ী। হঠাৎ দেখি, অনীতা আমার সঙ্গে খুব আলাপ কামাখার চেষ্টা করছে। আমি তো জানতাম না ওদের মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছে। আমি ভাবলাম, লাহিড়ী যদি অনীতাকে সামলে রাখতে না পারে সে আমার দোষ নয়। দিস ইজ এ বী কানট্রি। অনীতা যদি আমার সঙ্গে ঘোরাকেরা করতে চায়, কার কি বলার আছে? ইফ উই হ্যাভ সাম ফান টুগেলার, ভালোই তো। আর জানোই তো, আমরা এমনিতেই বাঙালী মেয়েদের খুব এডমায়ার করি। ক'দিন বেশ কাটলো। একদিন দেখি, ভিক্টোরিয়া মোমোরিয়ালের ওখানে ওরা হাত ধরাধরি করে বসে আছে। অনীতার গলা খুব ভারী, যেন একটু কঁদেছে পানিক আগে। বলছিলো, তুমি আমায় আগে কেন বলোনি, কেন খুলে বলো নি।—এই এরকম সব মিষ্টিমিষ্টি কথা। যা ওরা বলে থাকে। আমরা ওরা দেখিনি। আমি সরে গেলাম। হাসি পেলো খুব। কি রকম বোকা, সেন্টিমেন্টাল, ওরা হ'জন। বাড়ী ফিরে এসে দেখি—এই বেসারা, আউর একটো বিয়ার লাও—বাড়ী ফিরে এসে দেখি হাসি আর পাচ্ছে না। খুব মন খারাপ মনে হচ্ছে যেন। চুপ করে বসে ভাবলাম, আগে কেন জানতে পারলাম না নিজের মনকে। তারপর ভাবলাম, যাক, ভালোই হয়েছে। আমি পাঞ্জাবী, অনীতা বাঙালী। ওর মা বাবা তো রাজী হোতো না। তা ছাড়া, সে যখন সত্যি সত্যি লাহিড়ীকেই ভালবাসে, তখন আর এ কথা ভেবে কী লাভ!”

বেয়ারা আরেকটি বিয়ার আনলো। গলাসে বিয়ার ঢেলে যোগীন্দ্র আস্তে আস্তে বললো, “লাহিড়ী ওর বিয়েতে নেমস্তন্ন করেছিলো। খুতি পাঞ্জাবী পরে বিয়ের বরযাত্রীও গিয়েছিলাম। এখনও শ্রাদ্ধই বাই ওদের বাড়ি; খুব ভাব ওদের সঙ্গে। ওরাও বেশ সুখে আছে।”

সেই বোতলও আস্তে আস্তে শেষ করলো যোগীন্দ্র সিং। বললো, “তবে রঞ্জন, আমার এমন কিছু লোকসান হয়নি। আর কিছু দিন পরেই আলাপ হলো টিং-লিং-এর সঙ্গে। ওর তাই ফে-চো-শিয়াং-এর

সঙ্গে কিছু কিছু ব্যবসার লেন-দেন আছে। একদিন ওদের বাড়ীতে গিয়েই আলাপ হলো। টিং-লিং অদ্ভুত মেয়ে,” জিত দিয়ে ওপরের চৌক, নিচের চৌকি চেটে নিলো যোগীন্দ্র সিং, বলে গেল, “জানোই তো, আমি খুব সিরিয়াস টাইপ-এর ছেলে নই। আমি চাই টাকা, আমি চাই ভালো ভালো মেয়ে-বন্ধু, আমি চাই ভালো বিয়ার, ভালো স্বচ্ছ ভাইস্কি—বাস, এতেই আমি সুখী। অনীতার ক্ষেত্রে সব চাইতে ভালো লাহিড়ীরা, যারা ছোটোখাটো চাকরী করবে, ছোটো খাটো স্ম্যাটে সুখে ঘর করবে। আমি অল্প রকম। আই ওয়াণ্ট ফান্ ফান্, এ্যাণ্ড নাথিং বাট ফান্।”

যোগীন্দ্র উঠে দাঁড়ালো।

হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিষ্পেষিত করে কন্ডমর্দন করলো, বললো, “ওয়েল রঞ্জন। তুমি একটি ফাইন কেলো। তোমায় আমার বেশ লাগছে। আমি ইতিমধ্যে একদিন টিং-লিং কে নিয়ে বেরোছি। তুমি আসবে নাকি? যদি আসো তো আরো একটি মেয়েকে বলবো সো ছাট নী মে কৌপ ইউ কাম্পেনি। গিভ মি এ বিং টু মরো, আমি ডেট ফিল্ম আপ করবো। ওকে, বাই বাই।”

যোগীন্দ্র সিং যখন চলে গেল, তখন লাইট হার্ডিস বার-এ অনেক মেয়েপুরুষের ভীড়, বাইরের পথে অনেক আলো, আর বন্ধ জানালার ওপারে অনেক দূরে নিখর নীল আকাশে লাল-নীল-সবুজ নিওন সাইনের ঝাপসা আভাস।

যোগীন্দ্র সিং বেলেছিলো চীনে-পাড়ার জুতো পাওয়া যায় খুব সস্তায়, সে কথা মনে ছিলো। ভাবলাম, সৌখিন দোকানে জুতার দিয়ে তৈরী করানো জুতো তো অনেক পেরেছি, এবার চীনে পাড়ার জুতো চেষ্টা করে দেখা যাক। যোগীন্দ্র সিংয়ের পায়ে যে জুতো দেখেছি, সে মজা! জুতো সস্তা হয় তো নিউ মার্কেট বা কলেজ স্ট্রীট বা ভবানীপুর থেকে জুতো কেনার কোনো মানেই হয় না।

এক দিন জুতোর খোঁজে গিটছিলাম বেটিং স্ট্রীট ঘরে। হঠাৎ দেখি, একটি দোকানে বিলীপ বসে আছে।

আমায় দেখে সে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। বাস্তায় নেমে এ পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, “সিগারেট আছে?”

“হ্যাঁ।”

“দে একটা, তারপর, এদিন তোর দেগা নেই কেন? এখানে কি করছিল?”

আমার বেটিং স্ট্রীট অভিযানের কারণ ব্যক্ত করলাম।

“ও, জুতো কিনবি? বেশ তো,” বললো বিলীপ, বলে কি যেন ভাবলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, “কতো টাকার মধ্যে চাস?”

“এই টাকা পনেরোর মধ্যে—।”

“দে আমায় পোনরো টাকা—।”

“আগে জুতো তো পছন্দ করি—।”

“টাকাটা আমায় দে না! আমি তোকে তিরিশ টাকার জুতো পোনরো টাকায় কিনে দেবো। টাকাটা তোর কাছে থাকলে তোকে এরা পাঁচ টাকার জুতো পোনরো টাকায় ঠিকিয়ে দেবে।”

“যোগীন্দ্র সিং বলেছিলো—।”

“যোগীন্দ্র সিংয়ের কথা বিজ্ঞানের ধর্মবোয় বাইরে বকেই মনে করে। ও নিশ্চয়ই তোকে চি-শিউ-চি-এর দোকান থেকে কিনে

লছে। ওই সিংহ-কুল-কলক প্রবন্ধের কথা বাদ দে। সে শিউ-  
র'এর কাছে কমিশন খায়। ওদের এখনো চিনিদ না? কমিশন  
টা ওরা মানব জীবনের অঙ্গ কোন? জীবন-দর্শন ভাবতেই পারে  
।। তুই আর আমার সঙ্গে। এটি আহ-তং'এর দোকান। এ  
আমার অনেক দিনের বন্ধু।"

"কোন আহ-তং, দিলীপ দা? সেই যে সেদিন রাত্তিরে টাংরা  
গয়েছিলে এর খোঁজে—"

"হ্যাঁ রে। সে-ই। এর ভাই আহ-কিম'র সেদিন মাথা  
কটেছিলো। আয়ু-ভেতরে আর। না, না, আগে টাকা পনেরোটা  
।। ওদের সামনে দিলে ওরা কি'মনে করবে।"

দোকানের ভেতরে উঠে এলাম আমরা দু'জন।

বেটিংক স্ট্রিটের চিনেমানের সাদাসিধে জুতোর দোকান।  
কানো রকম সাজসজ্জার বাহার নেই। দিনের বেলা আলো  
হলছে। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত কোলানো  
ড়িগুলো থেকে বুলছে সারি সারি বুট জুতো, ক্যান্ডেল  
স, কাবলি অর পানত। কালো চামড়ার, লাল চামড়ার,  
সাল-সাদা কবিশেষানের, সাদা সুরেডের, কালো সুরেডের,  
বাগদামী সুরেডের। দেওয়ালের ত'পাশে দু'টো লম্বা বেঞ্চি।  
বরের ভেতর একটি বাচ্চা ছেলে টাইসাইকেল চালাচ্ছে, আর  
সামান্টি দিয়ে বেড়াচ্ছে আরো বাচ্চা একটি মেয়ে। ভারী ফরসা,  
ভারী কুটকুটে মিষ্টি দেখতে, সোজা সোজা কালো কালো চুল, নাক  
তো নেই-ই, চোখ দু'টোও প্রায় নেই বললেই হয়।

দরজায় বসে এক এদেশী মুসলমান—দোকানদারের এগিষ্ট্যান্ট।  
পথের লোকজনকে এক নাগাড়ি ডেকেই চলেছে—এই যে সুর, কী চাই  
বলুন না সুর, প্রায় মাগনা দিচ্ছি সুর, না জিবেন তো না জিবেন,  
একবার এন্ট দেখে লিন। ক্যা মাংতে হো ভাই সাহাব, আও না  
জী। আইয়ে, আইয়ে সদাবজী, বভত বভিয়া চপ্পল মিসেসে।  
হোয়াট মিষ্টার, শুড মোকাসিন? কাম ইন গ্রাণ্ড লুক, সেন বাই,  
মাগনায় দিচ্ছি সুর, লিয়ে যান, লিয়ে যান,

যতো সোরগোল, সবই কিছুর বাইরে। দোকানের ভেতর  
নিম্নক প্রশান্তি, সুদূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ মন্দিরের মতো। কাউন্টারের  
ওপাশে একজন জুতোর বং দিচ্ছে। এক কোণে একটি মেয়ে বসে  
মেশিনে চামড়া সেলাই করছে। কাউন্টারের পেছনে একটি পাতলা  
পর্দা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ। আবছা দেখা যায় তার পেছনে  
একটি মেয়ে কাঠের চিকরী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

"আহ-তং! আহ-তং!" দিলীপ হাঁক ছাড়লো।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন, তার গায়ে ধবধবে  
ফরসা গেঞ্জি, পরনে ফরসা খাকি হাফপ্যান্ট, পায়ে কাঠের খড়ম,  
কোমরে বাঁধা লংকুথের আধময়লা এপ্রন? এক হাতে একটি জুতো,  
অঙ্গ হাতে জুতার লাস। পাট কুদে আঁচড়ানো চুল, ধবধবে ফরসা  
বং, মুখে সোনালী-ঝিলিক-মারা হাসি।

"আহ-তং, এ আমার বন্ধু রজন, জুতা কিনতে এসেছে।"

আহ-তং হাসি মুখে বেঁকিটা দেখিয়ে দিলো।

সে অন্ন কথার মানুষ। ভিজেন্স করলো পরিষ্কার বাংলাতেই,  
"কি রকম জুতো চাই?"

"বাইন শু, ডাবাটা সোল হলেই ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, হবে।" পাতের দিকে তাকিয়ে মাপটা স্থির করে নিলো  
সে। তার পর চট করে উপর থেকে দু'তিন জোড়া পেড়ে নিলো।

দু-এক জোড়া পরে দেখতে পাতের সাইজ মতো পাওয়া গেল।

"কতো দাম?"

"আঠারো টাকা।"

"আঠারো টাকা? কী যে বলো আহ-তং! আঠারো টাকার  
শিউ-চি তিন জোড়া জুতা দেয়," দিলীপ বললো।

"শিউ-চি পিচবার্ডের জুতো দেয়। আহ-তং দেয় না। তুমি  
চায় তো আমি আঠারো টাকার আঠারো জোড়া পিচবার্ডের জুতো  
দেবে। চামড়ার জুতো হলে আঠারো টাকার এক জোড়া।"

"আহ-তং, রজন আমার বন্ধু।"

"দিলীপ বাবু, বিজনেস ইজ বিজনেস।"

"না, আহ-তং, এ জুতো পাঁচ টাকা জোড়া।"

"বাবু কী বলছি। হিঃ হিঃ—" হাসলো আহ-তং, "আচ্ছা,  
বাবুর বন্ধু তাই পনেরো টাকা।"

"না, পাঁচ টাকা।"

আমি দিলীপকে আস্তে আস্তে বললাম, "দিলীপ দা, ফর ফিফটিন,  
এটা খুব চিপ।"

"শাট আপ," বললো দিলীপ, "আহ-তং, তুমি আমার ফ্রেণ্ড।

রজন আমার ফ্রেণ্ড। তাই এ জুতো দু'টাকা।"

"না বাবু, তেরো টাকার কমে হবে না।"

"সাত টাকার বেশি এক পয়সাও নেবো না।"

"আচ্ছা, বারো টাকা দিয়ে দিন।"

"আহ-তং, তোমার জঙ্গ সাত টাকা। বাস।"

"আমার প্রফিট কোথায় বাবু?"

"কেন, পাঁচ টাকা কষ্ট, তিন টাকা প্রফিট—"

"আচ্ছা, আট আনা পয়সা বেশি দিন—"

"ঠিক আহে", আমি বললাম। আট টাকা আট আনায় এ  
জুতো, ভাবাই যায় না।

দিলীপ একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর পকেট  
থেকে বাব করলো দশ টাকার নোট। ভাগ্যভিত্তি ফেরত নিয়ে  
আবার নিজের পকেটেই পুরলো।

তার পর আমার মুখের ভাব দেখে বললো, "তুই তো পোনরো  
টাকা খরচা করবাব জঙ্গে রাজী ছিলি। এ টাকাটা আমার কমিশন  
হয় তা'হলে। তবে তুই আমার ভায়ের মতো। তোর কাছ থেকে  
মার্জিন মেবে কী হবে। এ টাকা খার বসেই নিলাম, পরে  
ফেরত পাবি।"

আহ-তং জুতো-জোড়া আরেক জন অল্পবয়সী চীনের হাতে  
দিলো। সে একজোড়া স্নকতলি আর আঠার বোতল নিয়ে বললো।

আহ-তং বললো "দিলীপ বাবু, তোমার বন্ধু চা খাবে?"

"আলবৎ খাবে। আমিও খাবো।"

আহ-তং চীনা ভাষায় পর্দার অন্তরালবর্তিনীকে কি যেন বললো।  
দেখলাম অন্তরালবর্তিনী এক কোণে একটি টোভের উপর একটি  
কেতলি চাপিয়ে দিলো।

আহ-তং একবার ভেতরে যেতে আমি দিলীপকে বললাম, "কী  
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর! এরা খুব খাটে, না?"

“হ্যাঁ। খুব। সারা দিন খাটে,” দিলীপ উত্তর দিলে, “এখন তো দেখছি গোলি আর হাকপ্যাট পরে বসে আছে। সকালের পর দেখবি শার্কিনের প্যাট আর নাইলনের হাওরাইআন শার্ট পরে যেটোতে সিনেমা দেখছে।”

আহ-তং জুতোর কাগি আর বুরুশ নিয়ে বেরিয়ে এসে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার ভাই এখন কেমন আছে, বাবু?”

আহ-তং একবার আমার দিকে, একবার দিলীপের দিকে

দেখিয়ে বললো, “আমার ভাই ভালোই আছে। এ আমের একটু খাবার। খুদে পরামর্শ দেবে না কি?”

“খাবার? হ্যাঁ, খাবার।”

“কিন্তু খুব ভালো খাবার। খুদে পরামর্শ দেবে তো?”

“না, ভাবি—”

“একদিন ওকে দেখে এসো। খুব ভালো লোক। অনেক জানে। অনেক দেখেছে। ওরও দিন হলো।”

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো আরেক জন তরুণ চীনে। পরনে হাকপ্যাট আর প্যাট। মাথায় বাগেজ বঁধা।

দিলীপ আলাপ করিয়ে দিলো। আহ-তং এর ভাই আহ-কিম।

আমি বাংলার কথা বলতে সে ইংরেজিতে বললো, “আমি বাংলা বুঝি কিছু বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে শুধু ‘দাই-কো’ (বড়দা) বাংলা জানে।”

এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাউজার আর স্যাকট-পমা চীনে মহিলা। অতি সাধারণ চেহারা, গেরস্থবরের মেয়েদের মতো ব্রিদ্ধ।

আহ-কিম বললো, “আমার দাই-সাও।” অর্থাৎ বড়বোদি।

আহ-তং এর বো আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমরাও একটু হাসলাম। আমাদের চা দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

চায়ের চুমুক দিয়ে দেখি, ঠিক বাঙালী বাড়ির চা—ছুধ, চিনি যেমনো। শুধু একটু বেশী পাতলা।

“লেশের কি খবর,” আহ-কিমকে জিজ্ঞেস করলাম।

“বেশ ভালোই,” আহ-কিম উত্তর দিলো, “যুদ্ধ চলছে, কিন্তু খবর ভালোই।” উত্তর দিতে গিয়ে আহ-কিমের মুখ ঝলঝল করে উঠলো।

“কাদের খুব আগ্রহ তোমাদের সংকে জানবার জন্যে,” দিলীপ বললো।

“জানবার বেশী কিছু নেই,” আহ-তং হেসে বললো, “সারা দিন খাটে, আঠারো টাকার জুতো আট টাকার বেচি, আর বা কামাই তাতেই খুশি হয়ে দিন চালাই। এমনই চলছে, এমনই চলবে।”

“জানবার অনেক আছে,” আহ-কিম বললো, “আমার একটি লগি আছে বেস্টিক স্ট্রিটের ওদিকে। ওরাংদের যেরে মিলি আমার দোকান দেখা-শোনা করে। সে খুব ভালো মেয়ে। তবে আমার দাই-সাউর মতো অতো ভালো এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। পরে হবে।”

আহ-কিম আর আহ-তং হুঁজুন হুঁজুনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে হাসলো। আহ-তং তাদের ভাবায় টেঁচিয়ে কি বেন

বললো পদার ওপারে তার বোকে। তার বোয়ের হাসিও শোনা গেল।

আহ-কিম বললো, “আমার দাই-কোর তিনটি ছেলে, দু’টি মেয়ে।”

আহ-তং বললো, “আরো একটি শীগগিরই হবে।”

হুঁভাই পরাম্বরের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে হাসলো।

আহ-তং আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “এর বেশী জানাবার নেই।”

“আহ-কিম বললো,” এমনি করে আমাদের প্রায়তঃকালের সম্বন্ধে একটু একটু করে জ্ঞানলে আমাদের মনের দৃষ্টি অনেক দিগ্ধ হয়েছে।”

বলছিলেন।”

আহ-কিম উত্তর দিলো, “ওদের সংকে বলে কি হবে। কে ভাং তার’ এর’ ছেলে যে খাবার’ এর কথা বলে, যাকে ফুকিয়েন প্রদেশের লোক এখনো ভেবেছিল। হ্যাঁ, আমিও তা জানি। ছেলে’ বেলায় তার আত্মীয়গণ তাকে কল্যাণীতা থেকে নিয়ে গেল ব্যাংককে। সেখানেই বড়ো হোলো সে। তার পর তার কী নাম ডাক। তিব্বতী খান জাকের মালিক। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জাহাজের ক্যাপ্টেনরা তার নাম শুনেলে খরখর করে কাঁপতো। আমায়, ফুকিয়েনের সমুদ্র-তীরের লোকেরা তাকে প্রাদেশিক শাসনকারীরা চাইতেও বেশী মানতো। আর তেমনি ছিলো তার ছেলে ফেংচিয়েন-চুং। বাপে ছেলেতে মিলে বিদেশী শোষকদের কতো জাহাজ লুণ্ঠ করেছে ওরা। কিন্তু দেশের লোকের কোনো ক্ষতি কোনো দিন করেনি। আর সম্রাটের লোকেরা বিদেশী শোষকদের প্ররোচনার বার বার তাদের ধরতে চেয়েছে, বিদেশীদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। ১৮৬৮ এ ক্যান্টনের দক্ষিণে এক ওলন্দাজ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় ওদের বামানের গোলায় ডুবে যায় চিয়েন-চুং’ এর ভাই। সে মীতরে তীরে গিয়ে ওঠে। আর বিদেশীদের কুকুর ক্যান্টনের শাসনকারীরা লোকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে কোতল করে, কোনো বিচার না করেই।”

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, “কিন্তু বছর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাকের বহন নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বৃটিশ জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই, চোখের জল ফেলেছিলো তার জঙ্গে। এই ফেং-পাও-চুং’ বোই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas.”

“সে কোনো দিন বলকাতায় আসেনি।” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমি যদি জানি আসেনি,” উত্তর দিলো আহ-কিম।

কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর তার ছোট্টা ছেলে ফেং-চিং-ও বলকাতায় চলে এসেছিলো; কারণ তাকে ধরতে পারলে চীন সরকার তাকেও কোতল করতো। তার তখন খুব তল্ল বয়স। বছর বারো এরকম হবে। সুদূর প্রাচ্যের অজ্ঞাত শহরগুলিও তার পক্ষে নিরাপদ ছিলো না। কারণ সে সব জায়গায় তার বাবার অনেক শত্রু। তাই তার বাবার বন্ধুরা তাকে বলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। এখানে ওদের কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিলো।”

“সেও কি পরে বাপের মতো হয়েছিলো নাকি?”

“না,” বিবর ভাবে মাথা নাড়লো আহ-কিম, “সে ছিলো এক বিখ্যাত বারাদনার রাঁধুনী।”

“কার জানো?” দিলীপ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “আমেলিয়া বিবির, যার গল্প সেদিন করছিলাম—।”

“যার নামে বিবি আমেলিয়া সেন,” বলে গেল আহ-কিম, “সেই বিবি আমেলিয়ার রাঁধুনী ছিলো ফে-চি-আও। আমেলিয়া বিবি চীনা খাবার ভীষণ ভালবাসতো। আর খুব ভালো রাগা করতো চি-আও। তাই-সে আমেলিয়া বিবির খুব পেটের রোগ ছিলো। হ্যাঁ, রাগা করা সেও খুব জানী লোকের কাজ। কিন্তু ফে-পাও-হুং-এর ছেলে ফে-চি-আও কলকাতার এক নামী বিজ্ঞানের পেটের রোগের রাঁধুনী, সে ভাবা যায় না।”

“কিন্তু এই চি-আও তোলা ফে-হুং-মিং-এর বাবা, সে কথা ভুলে যেও না,” গম্ব কবিয়ে দিলো আহ-হুং।

“ফে-হুং-মিং কে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ফে-হুং-মিং?” আহ-কিম-এর মুখ আবার ঝলমল করে উঠলো।

ফে-হুং-মিং ছিলো এই কলকাতার চাঘনা টাউনের রাজা। সিপাই বিদ্রোহের কিছু পরে জেবেছিলো সে, মারা গেছে ১৯০১-এ। গত শতাব্দীর শেষ পচিশটা বছর সেই ছিলো চাঘনা টাউনের আইন, সেই ছিলো আনাসক্ত, সেই ছিলো সব। ও একমুঠো জ্ঞান হবে না।

আহ-হুং বললো, “না হলে ভালো। সবাই হোক শুধু আমার মতো, আমার বোয়ের মতো, তোমার মতো, এদের মতো। খাটবে, যোগ্যতার কববে, ফুটি কববে, বিয়ে কববে, ছেলে-মেয়ে মানুষ কববে, বুড়ো হয়ে সুখে মরবে। বাস। এনাফ।”

“হাই-লো। হাই-লো,” বললো আহ-কিম। তখন বিনি। পরে দিলীপের মুখে শুনেছিলাম “হাই-লো” মানে “হ্যাঁ, ঠিকই।”

“হাই-লো। হাই-লো,” বললো আহ-কিম তার দাই-বাবার কথা শুনে। তার পর চলে গেল আমাদের দিকে ফিরে, “আর মজার কথা কি জানো? হুং-মিং-এর বাবা চি-আও ছিলো ইত্বনী বারাদনা আমেলিয়া বিবির রাঁধুনী! আর হুং-মিং

ছিলো আমেলিয়ার মেয়ে কলকাতার বিখ্যাত মুল্লারী রেবেকা বিবির—কি বলবো? স্বামী নয়, বিয়ে হয়নি ওদের—রেবেকা বিবির প্রভু। তখনকার দিনে রেবেকা বিবি আর ফে-হুং-মিং-ই এই অঞ্চল চালাতো। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ এখানে চুকতো না। আর তাকে কী খাতির করতো ইংরেজরা। সেও ছিলো দক্ষিণ-চীন সমুদ্রের এক দস্য। তার মাথার উপর গুবদার বোঝা করেছিলো চীন সরকার। যাঁহু-কোন একটা যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাহায্য করে সে তাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়। এতো বড়ো একজন ক্রিমিনাল আর ক্যাফেটিরার কলকাতার জন্মের নি। আদিত, কোকেন ইত্যাদির চোনা ব্যবসায়ের বেসরকারি অফিস টাকা রোজগার করে গেছে, তেমনি অফিস টাকা দানও করে গেছে।

“এই হুং-মিং আর রেবেকা বিবির মেয়ে হোলো জুসিয়ানা,” দিলীপ আমার দিকে ফিরে বললো, “তবে সে নামে তাকে কেউ চেনে না। কলকাতার বসিক সমাজ তার নাম জুলেখাবাদি।”

জুলেখাবাদি! পচিশ-তিনিশ বছর কাগজকার কলকাতার সব চেয়ে নামকরা বাদীজী।

ওরকম হুঁরি নাকি আজকাল আর কেউ গায় না। বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা নবাবদের বাড়িতে তো বটেই, লাট বড় লাটের প্রাসাদও নাহি তার মুজরার আয়তন আসতো। পুরোনো দিনে তার বেকর্ডের বিক্রি ছিল খুব, আজকাল আর পাওয়া যায় না। নানা একরকম কিংবদন্তী ছিলো তার সম্বন্ধে, সাধারণ লোকে জানতো না কেমন জাঁতের মেয়ে। কেউ বলতো, সে কাশ্মীরী, কেউ বলতো সে ইত্বনী, কেউ বলতো সে ভারতীয়। তার পর একদিন হঠাৎ সে চলে গেল কলকাতা ছেড়ে। কোথায় গেল কেউ জানলো না।

সেই জুলেখাবাদি? দিলীপের দিকে তাকানাম। সে একটু হাসলো।

এতক্ষণ তার বেগে আমার নবুন জুতো-জোড়টা পালিশ করছিলো আহ-হুং। সেটা শেষ করে বাজের মুড়ি দিদি দিয়ে বেঁধে ছেঁবে আমার এনে দিলো।

বেখলাম তার মূণ হাসিতে ঝলমলে, কপাল ঘামে চিক-চিক করছে। [ক্রমশঃ]

## বৈশাখ-বন্দনা

শেফালি সেনগুপ্তা

কদম্ব-বহি ভালে মধ্যাহ্নে খর্যের মতন  
পতুষ্ক আবভিষা বর্ষে বর্ষে তব আগমন  
হে বৈশাখ, এই ধরাভলে। পত্র-বরা চৈত্রের শেষ  
বসন্তের আমত্ব অস্তিম্ব বাতাসে—  
বার্তা বহি নব-বরষের সুনালে তোমার গান  
ওগো সুন্দর! বাণীভরা কণ্ঠ তব চির-অগ্নান।  
ওগো সর্বভাগী! নিঃশ্ব মহাযোগী,  
নিখিল জনতা হিয়া এক কণা আশ্বাসের লাগি,  
চেষ্টে আছে তব মুখপানে। তাহাবের বিস্ত চিত্ত যত  
মুহূর্তে লহুক শক্তি মহাবীর ক্ষত্রিয়ের মতো  
তোমার নবীন মস্তে। প্রলয়ের মস্ত কলবোলে  
দিগন্তের বন্ধে বন্ধে রক্তধরা ঈশানের কোলে  
ওঁ তুমি জেগে। বজ্রবে পূর্ণ করি নিখিল ভুবন,

জাগো জাগো বর্ষবীর ভীষণ নৃহন।  
এ ধরাব যত হুং পুষ্প-পুষ্প যত অভ্যাচার,  
কঠোর কঠিন হাতে তুমি তার করো সাধার।  
এখানে দেখ না চেয়ে কত দৈব কত হত্যাধাম,  
বক্ষিতব পাণ্ডিত্যের নিবিড় বেদনাঘন নিঃশ্ব প্রয়াস  
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে সঙ্গর। কত প্রাণ ব্যর্থ হাহাকারে  
ভূবিত্তেছে মরণের ঘন অন্ধকারে।  
এই জরা-জীর্ণ তার ভয় কণি জালা  
শৃগগর্ভ মর্মমূলে জীবনের আলো।  
নবীন সৃষ্টির প্রয়োজনে, তের জলে বজ্রশিখা  
নব-বরষের। স্বর্ণ-বর্ণ পুত সেই জ্যোতির্লেক্ষা  
মাঝে, প্রাক্তন যত গ্রানি হয়ে অপগত,  
হে বৈশাখ। আসন্ন তোমার উৎসবে ধরাভল হোক মুগ্ধরিত।



# তামসী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জ্বরাসক্ত

স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীকে আবার পেয়ে বসল তার সেই আগের দিনের ছুটো-নেশা—আড্ডা আর তামাকপাতা।

প্রথমটার জন্তে সাধারণ ওয়ার্ডে যাওয়া দরকার, আর দ্বিতীয়টার জন্তে চাই রাণীবালার অনুগ্রহ। সে দক্ষিণ্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণার প্রয়োজন। সেটা যোগাবার মত গোপন সক্ষম বুড়ীর তখনো শেষ হয়ে যায়নি। ইদানীং হেনার কাছে সে ঘন ঘন ছুটির আদ্যার জানাত, এবং মঞ্জুরও করিয়ে নিত। আসল ব্যাপারটা হেনার অজানা ছিল না। মাঝে মাঝে বলত, বুড়ো হয়েছ; এবার ঐ বদ নেশাগুলো ছাড় তো দেখি। ফোঁকলা দাঁতে এক-গাল ভেসে বুড়ী একেবারে আকাশ থেকে পড়ত—কী যে বল দিদিমণি, এই তোমাকে ছুঁয়ে দিয়াব করে বসছি, নেশা টেশা কবে ছেড়ে দিচ্ছি। ও-সব ছাই আর পাই না। ঐ কালীর মা মামুষটা বড় ভালো। হু-চাটটা সুখ-দুঃখের কথা ও-ও কর, আমিও কই। মনটা একটু ভুলে থাকে, এই আর কি।

হেনার সঙ্গে বুড়ীর বিচিত্র সম্পর্ক। রোগশয্যায় মা, স্বস্ত্র অবস্থায় দিদিমণি।

আজ সে দুপুরের দিকেই বেরিয়ে পড়েছিল। একটা সেলাই হাতে করে নিজের মনের মধ্যে ভুবে ছিল হেনা। সমস্তটা দিন কখন গড়িয়ে গেছে, টের পায় নি। হঠাৎ জলো হাওয়া গায়ে লাগতেই জানালা দিয়ে দেখল, কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি আসন্ন। বুড়ীর জন্ত চিন্তা হল। বুকের দোষ এখনো কার্টেনি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। দেখতে দেখতে বড় বড় জলের কৌটা পড়তে শুরু করল। ডেকে আনতে হবে কি না ভাবছে, এমন-সময় দরজায় সাড়া পেয়ে সেদিকে না তাকিয়েই বলল হ্যাঁ, বেশ করে ভেঙ্গে এবার পড়লে আমি আর টানতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

—না টানলে যাবো কোথায়?

হেনা চমকে উঠল, ও মা, তুই! বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ?

—কী করবো, তুমি তো আর খোঁজ-খবর নেবে না। তাই, আমিই এলাম।

—খোঁজ নিয়ে লাভ? আমার কথা তো আর শুনবি না? ভাত্যার এসে ফিরে গেলেন একবার। দেখা পর্যন্ত করলি না।

—বাঃ, ভালো হয়ে গেছি যে। এই জাপ না, বলে কমলা তার

সেদিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে হেনা বলল, ভালো হওয়ার কী একখানা নমুনা!

—যাকগে ও-সব বাজে কথা, হেনার খাটের উপর বসে পড়ে বলল কমলা। তোমার ঐ বই থেকে একটা গল্প-টের পড়, শুনি। হেনা সেলাইটা জড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল, না; আজ তোর গল্প শুনবো।

—আমার গল্প!

—হ্যাঁ; তোর নিজের গল্প। সেদিন যে শোনাবে বলেছিলি?

—ও—ও হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। সে-সব কাহিনী ঠিক গল্পেরই মত। শুধিয়ে লিখতে পারলে তোমার ঐ নামজাদা লেখকদের বানানো গল্পের চেয়ে মন্দ হবে না। কিন্তু আমি তো আর একজন লেখিকা নই। শেষ পর্যন্ত তোমার ধৈর্য থাকবে কি না, তাই ভাবছি।

—বেশ তো; পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। অনেক দিন অনাবৃষ্টির পরে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ। এরই জন্তে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছে তৃপ্ত পৃথিবী। গাছপালার পাতার পাতার সজ্জা নানের আনন্দ। ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে চারদিক ভরপুর। জানালা দিয়ে একটু একটু ছাট আসছিল। কিন্তু হৃৎকেন্দ্রের কারুরই সেদিকে খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ নিঃশব্দ চোখে বাগানের দিকে চেয়ে বইল কমলা। তারপর মুহূর্তে শুরু করল তার কাহিনী :—

বাপ-মায়ের শেষ বয়সের সন্তান আমি। ভাই বোন, কেউ নেই। হবার যখন আর আশা নেই, যা তাঁর এক বিধবা জ্ঞাতি-বোনের একটি মেয়েকে কাছে বেধে মালুষ করেছিলেন। আমি জন্মবার আগেই আমার সেই মাদী মারা গেলেন। দিদি মার কাছেই রয়ে গেল। তার যখন বিয়ে হল, আমার বয়স বোধ হয় বছর ছয়েক হবে। ভালো করে মনেও পড়ে না। তারপরই বাবা অবসর নিলেন। ইন্সুল-মাঠার ছিলেন। সামান্য পুঁজিতে সংসার চলে না। তাই ছেলে পড়াতে হত। কারো বাড়ি গিয়ে পড়াতে না, ছেলেরাই আসত ওঁর কাছে। উনি পড়াতে; আমি পাশে বসে থাকতাম। একটু বড় হলে সকলের দেখাদেখি আমি শুরু করলাম। ছাত্রেরা চলে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে বসতেন। বাবার সঙ্গে খাই, বাবার হাত ধরে বেড়াতে যাই, তাঁর পাশে শুয়ে গল্প শুনি।



বাপের অভাবনি সঙ্গ বোধ হয় কোনো মেয়েই পাশ না, অতটা আদরওলা। মাকে বড় একটা কাছে পাইনি। আমার বিয়ের ভাবনার আড়ালেই যেন তার সব স্নেহ, সব আদর চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাড়ন্ত গড়ন। সেমিকে দেখতেন আর আপন মনে বলতেন, পোড়ারমুখী এলি, ক'টা বছর আগে এলি না কেন? বাবার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়ছে। আমাকে পাব করবার আগেই পাছে তিনি চোখ বোজেন, এই ভয়ে মার চোখে ঘুম ছিল না।

দেখতে দেখতে আমি বড় হয়ে উঠলাম। বেশির ভাগ সময় পড়াশুনা নিয়েই থাকি। বাবার ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই আমার উপরে পড়ত, কেউ কেউ আমার সঙ্গে। অঙ্কে আমার সঙ্গে প্রায়ই কেউ পেবে উঠত না। আমাকে দিয়ে ওদের হারিয়ে বাবা ভারী আনন্দ পেতেন। কাউকে হয়তো একটা শব্দ অঙ্ক দিলেন। খানিকটা চেষ্টা করে বখান পারলো না, তার খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, জাখ তো কমল, তুমি পার কি না। আমি সহজেই করে দিতাম। আড়চোখে দেখতাম, ছেলেটার মুখ কালো হয়ে গেছে। খাতাটা আমার কাছে আসবে বলে কেউ কেউ আবার ইচ্ছা করে ভুল করতো। বাবা বুঝতেন না; আমি না বোঝবার ভাগ করতাম। যার খাতা, সে বুঝতো ভুলটুকু ঠিক জায়গায় ধরা পড়েছে। বোজ বোজ ভুল বেড়েই চলত, আর সেটা শুধবে দেবার বাড়তি কাজটুকু আমারও নেহাৎ মন্দ লাগত না।

মীরস অঙ্কের সঙ্গে একটু-আগুট সপ্তম কাবোর আমদানীও যে না হত, তা নয়। একদিন একটি ছেলের অঙ্কের খাতা দেখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল কোণের দিকে ছোট ছোট করে লেখা—কমল, তোমার জন্মে আমার সপ্তম 'বিদিশ' হচ্ছে। আমি ঐ 'বিদিশ' শব্দটার নিচে একটা দাগ দিয়ে লিখে দিলাম, 'বানান ভুল'। এ সবই ছিল খেলা। কিন্তু খেলতে খেলতেই একদিন জড়িয়ে পড়লাম। সে যেদিন এল, সেদিনের কথাটা বেশ মনে আছে। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। গায়ের রংটা চাপা। কিন্তু কী চমৎকার গড়ন! অনেকটা যেন তোমার মত।

হেনা হেসে উঠল, দূর; আমার মত কি রে?

কমলা একটু অপ্রতিভ সুরে বলল, মানে, ধন, তুমি যদি ব্যাটা ছেলে হতে—

—ও, সেই জন্মেই বৃদ্ধি আমার ওপর এত টান?

—না দিদি, তোমার উপর টান আমার আগের জন্মের। তা না হলে এখানে এসে দুটোতে জুটলাম কী করে?

হেনা এ কথাই কোনো উত্তর দিল না। কমলার একটা হাত সপ্নে ছেলে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল।

কমলা ফিরে গেল তার গল্পে—সব চেয়ে সুন্দর ছিল ওর দু'খানা টানা টানা ক্র। যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এদিকে কিন্তু বেজার গুলী লোক। দু-দু'বার ম্যাট্রিক কেল করে বার বার স্ত্রিন বার বলে খুলে পড়েছেন। বাপ বড় ব্যবসায়ী। ছেলে পাশ না করলে তাঁর মান থাকে না। টিউটর হিসাবে বাবার নাম ছিল। তাই এসে এক বকম ধনী দিয়ে পড়ল, পাশ করিয়ে দিতেই হবে। তখন কি জানি, তারই হাত দিয়ে আসছে আমার মরণ-বাণ! বাবার এত ছাত্র। কাউকে দেখে কখনো এতটুকু সঙ্কোচ হয় নি। তারাই

বয়স আমাকে দেখে সেয়ে নেয়ে একসা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যেদিন প্রথম এসে বসল আমাদের বাইরের ঘরে, জানলা দিয়ে একবার চোখাচোখি হতেই পা দুটো আর টেনে তুলতে পারলুম না। বুকের ভেতর সে কী বড়! বাবার ডাকডাকিতে কোনো রকমে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মাথা তুলে চাইব, সে শক্তি রইল না।

অল্প সব বিষয়ে দু'চারটা প্রশ্ন করে বাবা তাকে Algebra থেকে একটি অঙ্ক দিলেন। নিত্যন্ত সহজ অঙ্ক। খাতাটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে বলল, হল না, মাষ্টার মশাই! বাবা হেসে বললেন, হল না? আচ্ছা। হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিলেন এবং এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমার হাত কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল অক্ষরগুলো। একটা ক্রমশাও মনে পড়ল না। এত দিন পরে আমার হার হল। তার কাছে হেরে গেলাম। শুধু হেরে গেলাম নয়, মনে মনে হার মানলাম। সেই প্রথম বুঝলাম, জীবনে হার মেনে কত সুখ।

সেই দিন থেকে বাবার ইস্কুলে পড়া আমার শেষ হল। কেউ ছাড়িয়ে দেখনি। আমিই ছেড়ে এলাম। তুমি হাসছ, হেনাদি! কিন্তু সেদিন যদি দেখতে আমার অবস্থা, তোমার দয়া হত। একটু দেখবার জন্মে, সামান্য একটা কথা শোনাবার জন্মে মনের সে কী কাঁপলপলা! অথচ সামনে গিয়ে বসতে পারি না। তারও কি সেই দশা? তা না হলে এক ঘণ্টার পড়া হঠাৎ তিন ঘণ্টার ঠাঁড়াল কেমন ক'রে? কোপেকে এল এত মনোবাগ? লিখছে গ্রামারের প্রশ্ন, চোখ দুটো রয়েছে জানালায়। তার পাশ দিয়ে এক কাজ ও কাজ আমার বাবার-আসবার পথ। বাবা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো খুশীও হয়েছিলেন মনে মনে। প্রায়ই বলতেন, সনৎ ছেলেটি বড় ভালো। এত ছেলে পড়লাম, এমন একটা প্রশ্ন আর চোখে পড়েনি। তার পর একদিন আড়ি পেতে শুনলাম খেতে বসে কথা হচ্ছে মার সঙ্গে। কী একটা কথার উত্তরে মা বলে উঠলেন, তুমি ক্ষেপেছ! ওরা হচ্ছে বড়লোক। ছেলে তোমার মেয়ের রূপ দেখে ভুলতে পারে, কিন্তু বাপ তোমার রূপো না পেলে ভুলবে না। সেই হিসেব করে তবে এগিয়ে।

কিন্তু হিসাব শেষ হল না। আমাদের হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট করে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি বিছানা নিলেন। আর উঠলো না। আমাদের সন্তানের মধ্যে রইল গোটা কয়েক ঘটিবাটি বাজ-প্যাটরা, আমার হাতে দু'গাছা হালকা চুড়ি, গলায় একটা স্ক্র হার, সুরেকেসের তলায় লুকিয়ে রাখা তার খানকয়েক চিঠি, বার মধ্যে উচ্ছাস অনেক, ভরসা অতি সামান্য। তবু মাকে বলে করে কিছু দিন অপেক্ষা করলাম, যদি কোনো ডাক আসে। তার পর একদিন জিনিষপত্রগুলো বিক্রী করে সামান্য ক'টা টাকা হাতে নিয়ে কলকাতায় দিদির বাসায় গিয়ে উঠলাম।

বিয়ের পর সেই গোড়ার দিকে দু'এক বার ছাড়া দিদি আমাদের বাড়িতে আর আসেনি। জামাইয়ের সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ ছিল না। আজ সব হারিয়ে যখন এসে তারই আশ্রয়ে উঠলাম, দিদির মুখ গভীর হল। আমি ছিলাম মার পেছনে। এগিয়ে গিয়ে প্রশ্নাম করতেই এমন করে তাকিয়ে রইল, যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। পাশের ঘরে চলে গেলাম। শুনলাম, দিদি

বলছে, এখনো ঘরে পুণ্য পেয়েছে। ওর দিকে তাকাও কেমন করে? মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না তাকিয়ে কী করি, বল? উনি কি আমার কথা শুনতেন? জানো তো মাই। এবার এলাম তোমাদের আশ্রয়ে। বিনোদনে বলে বসে শীগগির পাব, যেমন তেমন একটা জুটিয়ে দাও। গলা দিয়ে আমার ভাত নামে না।

—মামি আর কী বলবে? বাড়ি আসুক; হুমিই বলে বা বলবার, বলে দিদি তার কাজে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই জামাই বাবুর গলা পেলাম। তখনই ফিরলেন। শাওড়ীর একগাধা কথার উত্তরে শুকনো গলায় টেনে টেনে বললেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বা' দিন-কাল পড়েছে... তাব পর এই তো দেখছেন, আড়াইখানা ঘর। আমাদেরই কুপোষ ন'।

—কী করবে, বাবা, বাবা! আর কোন্ পড়ে থাকবে আমাদের থাকতে হবে। ঐ মেয়েটাকে নিয়ে... কী? কোথায় গেল? তোর জামাই বাবুকে স্বপ্নাম মনিয়ে?!

বেরিয়ে এলাম। আমার ভগিনীপতির জুতো মুগুণান! হঠাৎ জলধর করে উঠল। একগাধা ভয়ে বললেন, বা' বেশে হাগবটি হয়ে উঠেছে তো কমলা! এলো, এসো, লজ্জা কি! কী বলবে দিদি, মানুষের হাসি যে এত কুৎসিত, এই প্রথম দেখলাম। আর সেই ছোটো চোখ যেন গিলে খেয়ে চাইছে। এক বার ভেসেই আপনা থেকে আমার চোখ নেমে এসে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল; ভয়ে নয়, ঘৃণায়। মনে পড়ল, এ চোখ কোথায় যেন 'দেখেছি। হ্যাঁ, তখন আমার বয়স সবে সাত আট বছর। আমাদের বাড়ির পেছন দিকের বস্তীতে একটা সোফা ছিল। তার নাম গণি মিত্রা, অনেকগুলো মুগুণী ছিল তার। পড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ও বিকটায় পেসে দেপতাম। মুগুণীর খন্দের এসেছে গণি মিত্রার। মাথা এড়ি বেঁধে পাখীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে কুড়ি ভরে। একটা মুগুণী ছিল। ভাবী ওপরে দেখতে, আর তেমন নাড়স করত। উপবস করে চলত। আমরা বলতাম বাগী। এক দিন জিজ্ঞেস করলাম, ওটা বেড়ে ন'। গণি মিত্রা নাড়ল। তার পর কান পর্যন্ত হাঁসি ছড়িয়ে বলল, দেখছ না খুকী, একেবারে তৈরি মাল। ওটা কি আর চেঁচা যায়? একটা পবন টরব আসুক, হু-চাবরন ম্যান্ডবান ডাকি, তার পর... বলে কী এক অদ্ভুত জলধর চোখে তাকাল সেই মুগুণীটার দিকে। এত দিন পরে আমার জামাই বাবুর কপালের নিচে দেখলাম সেই গণি মিত্রার চোখ। বুকের মধ্যে কেমন দুক দুক করে উঠল। মার ধমক পেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রণাম করলাম। উনি আমার কাঁধে দুটো ধরে একটু ঝাঁকানি দিলেন। সমস্ত শরীরটা গিন্-গিন্ করে উঠল।

কী সব ব্যবসা ছিল আমার ভাগিনীপতির। সকালে চান্দাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। বাবোটা-একটায় আসেন। খেয়ে দেয় ঘুম। তার পর আবার বিকেলে বেরোন। ফিরতে সেই রাত বাবোটা। কোনো কোনো রাতে নাকি একেবারেই ঘেঁসেন না। থাকেন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই দিদি ঘরে চলে গেল। আমি আসবার পর তাঁর এই কটন বহলে গেল। সকালে বেরোতে দেখি হয়। বিকেলে বেরোতেই চান না। সময় নেই, অসময় নেই। কমলা, এটা নিয়ে এসো, সেটা দিখে যাও। কাছে

গেলে আমাদের নাম করে যা আমাদের সইতে হয় মনে হলে আজও আমার গা পাক দিচ্ছে ওঠে। একগা কাছে বাওয়া এড়িয়ে চলি। কিন্তু সকলের সামনেও রেহাই নেই। এমন ভাব দেখান, যেন কচি খুকী আমি, আমাকে নিয়ে যা খুকী করা চলে। মা দেখেও দেখেন না। দিদি চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঐ সাপের মত হাত দুটো মুচড়ে ভেঙ্গে দিই। কিন্তু জানি, সেই সঙ্গে আমাদেরও কপাল ভাঙবে। শুধু, আমার হলে ক্ষতি ছিল না সেই সঙ্গে মারও। সে কথা ঐ লোকটার জানা আছে বলেই, আমাদের অসহায় অবস্থার সুরোগ নিতে তার দ্বিধা নেই। বাবা দিতে দিতে শেখটায় ক্রান্ত হয়ে পড়লাম। ভাবতে শুরু করলাম, আমার এ দেহটা যেন রক্ত-মাসের নয়, পাথরের। পাথরের তো কোনো বোধশক্তি নেই, মান-অশমন, লজ্জা-সন্ত্রমের বালাই নেই। আস্তে আস্তে আমিও যেন তেমনি পাথর হয়ে গেলাম।

একটা কথা ভেবে বেগেছে, দিদি? মেয়েমানুষের এই দেহটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ; একটু বড় হবার পর থেকেই একে নিয়ে তার ভয়ভাবনার অন্ত নেই, একে নিয়ে তার পদে পদে বিধব, পদে পদে লাঞ্ছনা। একে সামলে রাখা, আগলে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা,—সেইটাই যেন তার সবচেয়ে বড় দায়। এর ওপরে সকলের খরদৃষ্টি, আশ্রয়, পর, মেয়ে পুত্র, কাব নয়? পুত্রের দেহটা হল তার সম্পদ, আর মেয়েমানুষের হল বোঝা। তাই পৃথিবীর সেই শুরু থেকে তাজ পর্যন্ত বড় কিছুই সে করে উঠতে পারল না। এই বোঝা বয়ে বয়েই জীবন কেটে গেল।

এটা তোর বাগের কথা, মুহু হেসে প্রতিবাদ করল হেনা। নিজেই বলে দেখছিস। কিন্তু তোর মত ঐ অবস্থায় ক'জন পড়ে?

—সে কথা ঠিক। আমার মত ভাগ্য আর ক'জনের? কিন্তু তার পর আমার আসল কথাটা বলে গেল। তুমি যাবের কথা বলছ, আমার দলে যারা পড়ে না, এই শরীরটাকে নিয়ে তাদেরও হুম নেই। সেও এক রকমের দায়। দেহকে গুটিয়ে রাখবার দায় নয়, ফুটিয়ে তোলার দায়। তাকে যথেষ্ট মেজাজে, সাক্ষিয়ে পরিচয়, সাধুভাবার যাকে বলে, রমণীয় লোভনীয় করবার কী আশ্রয় সাধনা! তার জগৎ কত আয়োজন, কত উপকরণ; তার পেছনে কত সময়, কত অর্থ, কত পরিশ্রম। কই, পুত্রের তো সে বালাই নেই! তাই বলছিলাম, মেয়েমানুষ জাতটাই দেহ-সর্দধ।

—আচ্ছা, হয়েছে। বড়তা বেখে এবার নিজের কথায় এস দিকিন।

বলে হেনা বালিসে ভাব দিয়ে আশ্রয় করে বলল। 'কমলা উঠে গিয়ে ঘরের কোণে ঢাকা-লেওয়া কলসী থেকে এক বাটি জল গড়িয়ে গেল। তার পর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল, কতখানি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা ভাগ করে টের পেলাম, যেদিন এল আমার চরম সর্বনাশ। এমনি বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। দিদি হানপাতালে। সেবারটা বোধ হয় তার পাঁচ বার। আগের চারটি আগেই গেছে। কোনোটা আড়ুরে, কোনোটা ক'দিন পরে। মা তার জামাইএর সঙ্গে মেয়েকে দেখতে গেছেন। সেখান থেকে আর কোথায় যেন বাবার কথা। একটা কী বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, আমার ভগিনীপতি দরজার পিল এঁটে দিচ্ছেন। চোঁচাতে পারতাম বৈ কি? ফল হোক

আর না হোক, চেষ্টা তো করা য়েত। কিন্তু চেষ্টাই নি। যদি বল কেন, ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। শুধু এই দেহটা নয়, মনটাও অসাড় হয়ে পড়েছিল। সত্যিই পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

মাকে বা দিদির মতো খুশি হতে পারিনি। মাস দুই পরে সে কাজের ভার নিল আমার এই শরীর। দিদি এবার ফিরে এসেই বিছানা নিয়েছিল। সেখানে বসেই মা'তে মেয়েতে কী সব পরামর্শ চলল কয়েক দিন। তার পর একদিন। রাত বোধ হয় বাতোটা একটা হবে। আমি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে নার ভাষগাটা কাঁকা ঠেকতেই জেগে উঠলাম। ঠিক তখনই মাও ঘুম থেকে উঠলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন আমার পাশটিকে। তার পর বললেন, বিনোদকে তো অনেক বলে দিয়ে রাজী করলাম। তোর দিদিরও মত আছে। তুই যেন আবার বাগড়া দিয়ে বসিস না।

ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বললেন, শেষ কালে এই ছিল তোর কপালে! কিন্তু উপায় কি? বিয়ে ছাড়া এখন তো আর অন্য পথ নেই, মা!

মনে আছে, মা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর কোনো কথাই বলতে পারিনি। তার পর প্রায় সমস্ত রাত ধরে আমার গায়ে ঝাঝ হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কী বলেছিলেন মা, তার একটা বর্ণও আমার মাথায় ঢোকে নি।

মা ঠিকই বলেছিলেন। এ ছাড়া আর আমার পথ কোথায়? দামাই বাবু যে রাজী হয়েছেন, সেইটাই তো আমার পরম ভাগ্য, আমিও যে রাজী, এইটুকু শুধু জানিয়ে দেওয়া। তাই হয়তো দিতাম কিন্তু সকালেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে করে আমাদের বা ব্যবস্থা ভেঙে গেল।

নীচে কাজ করছিলাম। ডাকঘরের পিওন এসে চিঠি দিয়ে চলে গেল। এমন প্রায় বোজাই দেয়। সব জামাই বাবুর চিঠি। মাকে বা আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। শুধু আমায় কোনো কাঁতুলও ছিল না। সে দিন কী মনে হল। একটা পুরানো বিস্কুটের টিন পেরেক দিয়ে দেয়ালে রাখা। সেইটাই চিঠির বাস। তার ভিতর থেকে চিঠিখানা তুলে দেখলাম। এ কি! এ যে আমার মাম। আর এ লেখা, এও তো আমার ভুলবার নয়! চিঠিটা ক্রের মধ্যে লুকিয়ে ছুটে গেলাম উপরের ঘরে। দরজা বন্ধ করে খুলে ফেললাম খামখানা। বকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। নী জানি, যদিও সে না হয়। ভাঁজ খুলতেই বুকটা ভরে উঠল।

মস্ত বড় চিঠি। প্রথম দিকে, এক পাতা জুড়ে, কী করে আমাকে খুঁজে পেল, তারই সব মজার কাহিনী। তার পর নতুন করে বলা সেই পুরানো দিনের রঙীন স্বপ্ন। শেষটুকু যেন শেষ হতে গয় না। বার বার করে পড়লাম,—জানো কমল, আজকের মত এমন করে আর কোনো দিন বুলি নি, তোমাকে না পেলে আমার লবে না। তোমাকে পাবার পথে সেদিন যে-সব বাধা ছিল, আজ তার কোনোটাই নেই। তুমিও যে বাঁধা পড় নি, সেখবর আমি পয়েছি। কিন্তু তোমার মন? সেখানে একটু জায়গা পাবো তো? যতি যুহুর্ন্তে দিন গুণছি, কবে তোমার ডাক আসবে।

সেই দিনই জবাব দিলাম। লিখলাম, তোমার ডাক আসবে

বলে আমিও যে কত দিন থেকে পা বাড়িয়ে আছি, সনৎলা! বাঁধা পড়ি নি বাটে, তবু ভয় হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখানে থেকে সবার সামনে দিয়ে তোমার কাছে যাবার সবল পথটা আমার গোলা নেই। তুমি এসো। যেমন করে পার, আমাকে বাঁচাও।

সনৎ কী বলেছিল, জানি না। ক'দিন পরেই আবার চিঠি এল—অমুক দিন, অমুক সময়ে তৈরি থেকে। তৈরি হয়েই ছিলাম। গভীর রাতে সনৎ এল টাক্সি নিয়ে। তর্প শুনেই নিশেধে বেরিয়ে এলাম। মার দৃষ্টি মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম। আজ তো আমার কান্দবার দিন নয়। একবার ভেবেছিলাম, মাকে সব জানিয়ে যাবো। সনতের হাতে মেয়ে দিতে হয়তো তার আপত্তি হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা হয়নি। যদি ওঁরা রাজী না হন, যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায়? তাই বাড়ির অন্ধকারে পালিয়ে এলাম। সবাই জানল, কমলা কুলে কালি দিয়ে গেল, কমলা মরল। কিন্তু বেনরকে ছিলাম, তার চেয়ে মরণে খাঁপ দিবেও স্ত্রী। যদি বল, কলর? বা পেলাম, তার কাছে সে কত তুচ্ছ!

সনতের পাশে বসে উঠলাম এসে তার কানোঘাটের বাসায়। সেখানে নিয়ে তুলল, বাড়ির মধ্যে সেইটাই সব চেয়ে ভাল ঘর। দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। একবার চোখ বুলিয়েই বোঝা যায় তাব সঙ্গে ভড়িয়ে আছে একজনর হাতের কত বন্ধ, তার মনের কত সাধ। দরজায় কাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার ঘর। আজ শুধু হেঁদেব। যদিও হুঁজনার না হচ্ছে, তবু এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। তার পর একটু হেসে গলা খাটো করে বলল, সেদিনের আর দেরি নেই।

পরদিন সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরের দিনও না। অথচ সাড়া-শব্দ পাই। জানতে পারি বাড়িতেই আছে। ঠাকুর চাকর কি-এর হাতে এটা-ওটা পাঠাচ্ছে। শুধু আসল মানুষটির দেখা নেই। তিন দিনের দিন ডেকে পাঠিয়ে বললাম, কী ব্যাপার বলতো? একটি বারও কি আসতে নেই?

ও হেসে বলল, একটি বার কেন, একশ'বার আসবারই তো আয়োজন করছি। তখন আবার বলবে, একটি বারও কি বাইরে যেতে নেই? আমি রাগ করে বললাম, ও সব বাজে কথা। আসলে টান ঘেঁটুকু, দুবে ছিলাম বলে। হাতের কাছে পেয়ে সব চলে গেছে। সনৎ একটু কী ভাবল, তার পর বলল, শুধু হাতের কাছে থাকে পাওয়া যায়, তার বেলায় হয়তো তোমার কথা খাটে। কিন্তু আমি যে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছি। পেয়েছি মনের কাছে। কাজেই হারাবার ভয় নেই, আগলে রাখবারও দরকার নেই। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। পাছে আমার মনের কোনো সন্দেহ জাগে, তার আশ্রয়ে আছি বলে সে তার অস্ত্রায় অযোগ্য নিচ্ছে, তাই নিজেকে একেবারে দুবে সত্যিয়ে নিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেও ফেলেছিল, তোমাদের বাড়িতে যেমন ছিল, এখানেও তোমাকে ঠিক তেমন দেখতে চাই। মনে ক'রো মাষ্টার মশাই বেঁচে আছেন। কাছাকাছি কোথায় অপেক্ষা করছেন আমাদের আশীর্বাদ করবেন বলে।

সে যদি এতখানি ভাল না হত হয়তো ঠকাতে পারতুম।

আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, সে কথা সনৎ বুঝতে পারে নি, কিন্তু যেনতুন ঝিটা আমার জন্তে বহাল করেছিল, তার চোখ এড়াই নি। আমার মনের মধ্যে যে-বড় চলছে, তার কারণটাও মোটাছুটি অহুমান করতে তার ভুল হয় নি। সেও আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, 'চূপ করে থাকো, দিদিমণি। বিয়েটা হয়ে থাক।' ভরসা দিয়ে বলেছিল, তাতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু পারলুম না। বার বার মনে হতে লাগল, প্রতারণা বলে যে একটা পাপ আছে, আর সব জায়গায় হয়তো চলতে পারে, কিন্তু সনতের বেলায় চলে না। বিয়ের আগেই ওকে সব খুলে বলতে হবে। তারপর কপালে যাই হোক। ঐ দিকে দিয়েই একদিন সন্ধ্যার পর তাকে ডাকিয়ে এনে কোনো রকমে নিঃশাস চেপে বলে ফেললাম। তার সেই উজ্জ্বল মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। ঠাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ বসে পড়ল। তার পর টলতে টলতে চলে গেল নিজের ঘরে। ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার সব কথা তো তোমায় বলা হয় নি, সনৎমা! দয়া করে শোনো; তার পর আমার বিচার করো। কী অবস্থায় পড়ে—

এইটুকু বলতেই সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, যা শুনেছি, তার বেশি আর কিছু শুনেতে চাই না, কমল! তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

পরদিন সকালে উঠেই সুনলম, সনৎ কোথায় চলে গেছে। একটা চিঠি রেখে গেছে আমার জন্তে। তিন লাইনের চিঠি— "কিছু দিনের জন্তে আমি বাইরে বাছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে যেতে পারলুম না। আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। বত দিন বাঁচবে, তোমার সমস্ত ভার আমার। আমাকে না বলে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

তোমারই সনৎ।"

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, "এখানে তোমার সব সব ব্যবস্থাই রইল। তবু যদি কখনো কিছু দরকার হয়, জানাতে সঙ্কোচ করো না। নিচে ঠিকানা রইল।"

ঠিকানা কান্দীর। এ চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম, "আমি তোমার বোঝা হরে থাকতে চাই না। আমাকে মুক্তি দাও। যেদিকে হুঁচোখ যায়, চলে যাই।

সনৎ লিখল, "আমার ওপর নিজেকে সাঁপে দিয়ে এক দিন গভীর রাতে তুমি সর্বথ ছেড়ে চলে এসেছিলে। সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমাকে রাখতে দাও, কমল! তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। শেষ ফল তার বাই হোক, তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে?"

একবার আর কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি।

সনতের বাবা-মা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। মাথার উপর অভিব্যক কেউ নেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে উঠত ওদের বাগার। তাদের কাছে আমি বেবোতেও পারি না, লুকিয়ে থাকতেও পারি না। কী করবো ভাবছি, এমন সময় চিঠি এল, আমার জন্তে নববীণে বাড়ি ঠিক করা হয়েছে। ঝি আমার সঙ্গে যাবে। সরকার মশাই আমাদের পৌছে দেবেন। অতঃপরেও আমার হাসি পেল। ঠিক জায়গায় বাছি এবার। মহাপ্রভুর

দেশ। আমার মত কলঙ্কের কালি মেখে যারা সঙ্গারের বাইরে চলে গেছে, নববীণই তাদের একমাত্র গতি।

ওখানে গিয়েও দেখলাম, যা তোমাকে আগেই বলেছি। এই দেহটাই হল মেয়েমানুষের চিরকালের অভিশাপ। এক মল লোক পেছনে লাগল। গুণ্ডা নয়; ভদ্র লোক, মানী লোক। কেউ কেউ আবার ঝিটাকে হাত করে ফেলল। কী করে নিজেকে বাঁচাই। এক বার ভাবলাম, সনৎকে লিখি। কিন্তু সেই বা কী করবে! হয়তো আর এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা তো হুনিয়ার বাইরে নয়। আর কোনো পথ না দেখে ঝিটাকে বিদায় করে দিলাম। সে শাসিয়ে গেল, এর শোধ নেবে।

তার পর একদিন নিতান্ত অকালে পেটের মধ্যে শুরু হল দাক্ষণ যন্ত্রণা। সেইতে না পেরে নতুন ঝিকে পাঠালাম ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার আসবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। আট-দশ ঘণ্টা পরে যখন জ্ঞান হল, চোখ মেলেই দেখি, পুলিশ। সুনলম, ময়া বাচ্চাটাকে ফেলতে গিয়ে আমার নতুন ঝি ধরা পড়েছে, পাড়ার বাবুদের কাছে। সেই অবস্থায় রিকশ করে নিয়ে গেল থানায়। ডাক্তার ছাড়া পেলেন, ঝিএর জামিন হয়ে গেল। আমাকে যেতে হল জেল-হাজতে।

প্রথমটা মনে হল, বাঁচলাম। নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবো। কিন্তু হুঁমিনেই বুঝলাম, ভুল করেছি। কথা বলবার শক্তি নেই; তবু হাজার গুণ্ডা প্রেমের জবাব দিতে হবে। যা বলি, কেউ বিশ্বাস করে না। কয়েক-মাসেরা মুখ টিপে হাসে; জমাদারগণ টিটকারি দেয়। জেলের বাবু এক দিন জানতে চাইলেন কী হয়েছিল। বলতে গেলাম, আমি কিছুই জানি না। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। মুচকে হেসে চলে গেলেন। অর্ধাৎ ওসব আমার জানা আছে। এক জন বুড়ো ডাক্তার আসতেন। তিনি বলেছিলেন, 'হাফিমের কাছে সত্যি কথা বলো। ছাড়া পেয়ে যাবে। তারিখের পর তারিখ পড়তে লাগল। এক দিনও উনি আমাকে কোর্টে যেতে দিলেন না। তখন অনেকটা সেয়ে উঠেছি। বললাম, এবার যেতে পারবো। ডাক্তার বাবু সুনলেন:না। চুপি চুপি বললেন, বোকা মেয়ে! যদি ছেড়ে দেয়? বাইরে গিয়ে এসব গুণ্ডা-পথ্য কোথায় পাবে?

ডাক্তার বাবু ভরসা দিয়েছিলেন। আমারও বিশ্বাস ছিল, খালাস হয়ে যাবো; বিনা দোষে শাস্তি হবে কেন? যা ঘটেছে খুলে বলবো। কিন্তু হল না। আসামীর কাঠগড়ার ঠাঁড়িয়ে চমকে উঠলাম। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। উকিলদের পেছনে ঠাঁড়িয়ে আমার জামাই বাবু। একজন উকিল আমার হয়ে আজগুবি কাহিনী শুরু করলেন। বুঝলাম আমাকে ছাড়িয়ে নেবার মতলব। তার বক্তৃতার মাঝখানেই সোজা হয়ে ঠাঁড়িয়ে বলে উঠলাম, ওসব মিথ্যা কথা। যা ঘটেছে, তার সব দায়িত্ব আমার। আমার পেটের ছেলেকে আমি ইচ্ছা করেই অকালে নষ্ট করতে দিয়েছি।

হাকিম স্তম্ভাসা করলেন, কেন?

কলঙ্ক থেকে বাঁচবার জন্তে।

হেনা এইখানে প্রসন্ন করল, তোর খোঁজ পেল কী করে লোকটা?

কমলা বলল, সে কথা আমিও অনেক ভেবেছি, দিদি! আজও কোনো হদিস পাইনি।

—সনত্তের কোনো চিঠি কি ওর বাড়িতে ফেলে এসেছিলি?

—হতে পারে। তাড়াতাড়িতে সবগুলো হয়তো নেওয়া হয়নি।

—যাক, তার পর?

—তার পর আর কি? ছোট হাকিমের কাছ থেকে গোলাম বড় হাকিমের কাছে। সেখানেও ঐ এক কথাই বললাম। বিপক্ষে সাক্ষীও কম ছিল না। আমার সেই পুরানো ঝি বলে গেল, এ ব্যাপারে আমি তার সাহায্য চেয়েছিলাম; বাকী হয়নি বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। পাড়ার ক'জন বাবুও হলপ করে বললেন, ঝিএর কাছে এ কথা তারা আগেই শুনেচে পেয়েছিলেন এবং আমার ওপর নজর রেখেছিলেন, ইত্যাদি। নতুন ঝি বোধ হয় আমার কথার ওপরেই খালাস হয়ে গেল। আমাকে জেলে পাঠালেন জজ সাহেব। কিছু দিন পরে ছোট জেল থেকে চলে এলাম বড় জেলে। তার পর গোলাম তোমাকে।

অনেকক্ষণ একটানা বসে থেকে থেকে কমলার শিরশীড়া টনটন করছিল। ক্রান্তও হয়ে পড়েছিল অনেকখানি। হেনার বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে রইল। হেনা তার মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে তার কক্ষ চুলগুলোর মধ্যে ঘোরে ঘোরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাবার পর কমলা বলল, কী মজা জাখ, দিদি! সব ছেড়ে এলাম। সাহাী আমাকে ছাড়ল। কিন্তু আমার পুঙ্খনীর ভগিনীপতির হাত থেকে বেড়াই পেলাম না। তাঁর আদরের শেষ চিহ্ন এই কাল ব্যাধি আমার দেহে অক্ষয় হয়ে রইল।

হেনা দুট বিধাসের সুরে বলল, না, কমলা; ব্যাধি অক্ষয় নয়। ওটা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যে জিনিষ তোর জীবনে সত্যিই অক্ষয় হয়ে আছে, তাকে যেন একদিন ফিরে পাস, এইটুকুই আজ কামনা করি।

কমলা আবার কোনো কথা বলল না। যে স্মৃতিসৌর্য হাতখানা পদ্মকোরকর মত তার কপালের পাশটিতে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল, তাকেই আন্তে আন্তে টেনে নিয়ে বুকের উপর বেখে চোখ বুজে পড়ে রইল।

দেবতোষের মনে হল নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন, কিংবা স্মৃতিলাই হয়তো ভুল বলছে। এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত! তবু যেটা এক বার শুনেছেন, সেই কথাটাই আরেক বার শুনেবার জন্তে প্রেরণ করলেন, কার কথা বলছে?

শ্রীসারস্বতীর বিরক্তি ফুটে উঠল, বাঃ শুনেচে পাচ্ছেন না! হেনা। আপনার নাম। এক বার যেতে বলছে আপনাকে।

ডাক্তারের মনের মধ্যে বিশ্বাস এবং আনন্দ একসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটোই চেপে রেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, কেন? বুড়ীটা আবার পড়ল না কি?

—বুড়ী! আপনিও যেমন! সে তো গোটা জেনানা ফাটক চষে বেড়চ্ছে।

—তাহলে, ওর নিজের কিছু হয়নি তো?

—না, অসুখ বিষুখ করলে, আমাকে নিশ্চয়ই বলতো। তা'হাড়া, চোখ-মুখ তো ভালই দেখে এলাম।

—তবে?

—তবে-টবে জানি না। আপনি এক বার ঘুরে যাবেন।

দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তার। জমাগারগী এই মাত্র বেখবর দিয়ে গেল, সেটা পাবার পর কাগজের খবরগুলো! সব যেন একাকার হয়ে গেল। আশাদের এই চোখ দুটোর কাজ শুধু চাওয়া, শুধু তাকানো। দেখে আর এক জন; তার নাম মন। যে চোখেরপেছনে মন নেই, সে অন্ধ। ডাক্তারের চোখের সামনে খোলা পড়ে রইল একটা বর্ণহীন কাগজের পাতা; মনের সামনে ভেসে উঠল একটি কুচাশা-ঢাকা শীতের রাত আর তার পরের কতগুলো বর্ণোজ্জ্বল দিন। কিন্তু বাক্য আশ্রয় করে তার জীবনে এই বর্ণ-সমাবেশ, সে থরা দেয়নি। নিজেকে জড়িয়ে বেখেছে হৃর্ভেজ কঠিন বর্মের আবরণে। এমন একটা মুহূর্তও মনে পড়ে না, যখন সে নিজের মনে বিনা প্রয়োজনে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কিংবা মুখ ফুটে বলেছে এমন কোনো কথা যেটা নিছক কাজের কথার এলাকায় পড়ে না। ঐ ছোট হাসপাতালের নিভৃত কোণটিতে দিনের পর দিন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করে গেছে, দু'টি নিরলস নিপুণ হাতের কাজ। তার কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন, সাহচর্য পেয়েছেন। সারিখাও পেয়েছেন, কিন্তু মনের দুহাচ খোলা পানি। এত কাছে থেকেও সে ঘুরেই রয়ে গেছে। মাঝখানে একটা বেড়া, যার পাশে দাঁড়িয়ে জেল-ডাক্তার দেবতোষ ঘোষ আর ওপাশে ৩১০ নম্বর মেয়ে-কয়েদী হেনা মিত্র। পরস্পরের কাছে এই টুকুই যেন তাদের পরিচয়। তাব বাইরে কিংবা তাব বেষ্টী আর কিছু নয়। সম্পর্ক টুকু, সব শুধু কাজের: শুধু আইনের। সেই কাজের সূত্র ধরেও তাঁর কাছে কোনো ইচ্ছা, কোনো অমুরোধ সে জানায় নি। কখনো কাছে এসে বলেনি নত মুখে লাজনত্র সুরে: কাল এক বার আসবেন; কাজ আছে। আজ যে ডাক এসে, এটাও হয়তো তার নিজের তরফ থেকে নয়। এব পেছনে যে প্রয়োজন, তার সঙ্গে তার নিজের কোনো সংশ্লিষ্ট নেই। তবু যে সে ডেকে পাঠিয়েছে, মুখ ফুটে জানিয়েছে তাকে তার প্রয়োজন, এইটুকুই আজ দেবতোষের মনের মধ্যে ছড়িয়ে রইল একরাস মিষ্টি গন্ধের মত।

ডাক্তারের বৈকালিক ডিউটি শুরু হতে চারটা, সাড়ে চারটা। অল্প দিন সে সময়টা যেন জড়জড় করে এসে পড়ে। চায়ের পেয়ালা শেষ করবার সুযোগ দিতে চায় না। আজ ঘড়ি চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সাড়ে তিনটা বাজতেই লেগে গেল সাড়ে তিন দিন। চাকরটাকে তাড়া দিয়ে ডেকে তুললেন দেবতোষ। চা তৈরি হলে কোনো রকমে গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে ধড়াতুড়। এঁটে বেরিয়ে পড়লেন। গেট পার হয়ে পা দুটো ধরতে চাইল বাঁ দিকের পথ। কয়েকটা ওষাড পেরিয়েই ফিমেল ইয়াড। হঠাৎ খমক দাঁড়ালেন ডাক্তার। মনে হল চার পাশের লোকগুলো যেন জেনে ফেলেছে তাঁর মনের পবর। তার পর কী ভেবে আবার সেই পথেই পা বাড়িয়ে দিলেন।

আশ্রয় বুড়ী ঘরে নেই। দরজায় দিকে পিছন ফিরে পা ছড়িয়ে বসে ছিল হেনা। হাতে ছিল সেলাই। সোফেটারটা আজ শেষ করতেই হবে। কিন্তু হাতে একমনে কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফিমেল ওষাডায়ক বাইরে থেকে ডাকবার জন্তে ফটকের এ-পাশে যে দড়ি-বাঁধ ঘণ্টা ঝুলছে, তার গিট্টা শব্দটা এক বার



তার কানে এসেছিল। সুশীলার উচ্চকণ্ঠের সাড়াও শুনতে পেয়েছিল। হয়তো রাউণ্ডে আসছে বড় জমাদার, নয়তো খাটনি বুঝে নিতে দেখা দিয়েছে গুদামী সিপাই কিংবা অল্প কোনো কাজে আর কেউ। ভাবতে ভাবতে আবার ভ্রমর হয়ে গিয়েছিল নিজের কাজের মধ্যে। পিঠের উপর গড়িয়ে পড়েছে কালো মেঘের মত একরাশ এলো চুল। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, খুঁড়োল গ্রীবার অস্পষ্ট আভাস। দু'পাশ দিয়ে নেমে গেছে হুঁটি পেলব বাহু; উঠছে-নামছে, কাঁটা চালনার তালে-তালে। বেশবাস শিথিল, হয়তো একটু অসংবৃত। হঠাৎ সিঁড়ির নিচে জুতার শব্দ শুনতে পেয়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল হেনা। বুকে-পিঠে আঁচলখানা জড়িয়ে নেবার কঁাকে চকিতে এক বার চেয়ে দেখল ডাক্তারের দিকে। তার পর না পারল চোখ তুলে চাইতে, না পারল জানাতে তার প্রয়োজন। কোন এক অনগ্রভূত সলজ্জ সন্ধেতে জড়িয়ে গেল সকল অঙ্গ।

ডাক্তারই কথা পাড়লেন, ডেকে পাঠিয়েছ, সুনলাম! কী ব্যাপার? তোমার পেশেন্ট তো দেখছি দিবা পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জড়তা কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করল হেনা। ঘাড়টা তুলে মুহূর্তে হঠাৎ বলে ফেলল, শুধু ওকে দেখতেই আসেন না কি আপনি?

চমকে উঠলেন দেবতোষ। কী বলতে চার হেনা! এ কি শুধু সরল পরিহাস, না তাঁরই মনের গহনে অঙ্গুলি-নির্দেশ? ঐ কথা, ঐ হাসি, ঐ চাহনি, সবই যেন একটা নিগূঢ় অর্থ নিয়ে দেখা দিল তাঁর কাছে; সহসা খুলে দিল তাঁর অন্তরের একটি কক্ষের অর্গল। হেনার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে বললেন, কী বলছিলেন? ওকেই শুধু দেখতে আসি কি না? তার জবাব কি আজও তুমি জানতে পারনি, হেনা?

হেনার বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। অসতর্ক কর-স্পর্শে যে স্রোতের মুখ সে খুঁজে দিয়েছে, ভয় হল, তাকে হয়তো আর বন্ধ করা যাবে না। তবু এক বার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই, যেন বুঝতে পারেনি, এমনি ভাবে তরল কণ্ঠে বলল, বাঃ! কী যে বলেন আপনি। বুড়ী ছাড়া কি আর কারো অসুখ-বিসুখ করতে নেই? আরো তো কত জন—

কত জন আজ থাক, হেনা, বাধা দিয়ে অধীর কণ্ঠে বললেন দেবতোষ। সেই এক জনের কথা বলতে দাও, যাকে সত্যিই দেখতে আসি। কিন্তু শুধু দেখতে চাই, বললে কিছুই বলা হল না। তার চেয়ে অনেক বেশী আমার লোভ, অনেক বড় আমার আশা। তুমি কি জানো না—

—ডাক্তার বাবু! কল্পনা বলে উঠল হেনা। বেদনার্ত কণ্ঠের করুণ আবেদন। সেই করুণ চোখ দু'টির দিকে চেয়ে ডাক্তার হঠাৎ খেমে গেলেন। মুহূর্তকাল বিরতির পর আবার বললেন, আমাকে

ভুল বুঝো না। আমি জানি, বার কথা বলছি, তার উপর আমার কোনো দাবি নেই। তবু আমাকে বলতে হবে। আজ না বললে হয়তো কোনো দিনই বলা হবে না।

—কিন্তু তার কোনো কথাই তো আপনি শোনেন নি? আপনি তো জানেন না কী সে, কী তার পরিচয়, কী তার ইতিহাস।

—জানতে চাই না। তার দরকারও নেই। আমার কাছে সে যা, তাই। এর বেশী আর কিছুই জানবার নেই।

—আর কিছু জানবার নেই?

—না। যে কথা আমার জানবার, সে তো তুমি জানো। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে দাঁখ। তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর। তার পর বল, কী তার উত্তর, কোথায় তার বাধা।

দরজার চৌকটে ভর দিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে রইল স্পন্দনহীন মুর্তির মত। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে মুহূর্তকোমল কণ্ঠে ডাকলেন দেবতোষ, হেনা—

—বলুন।

—চূপ করে রইলে কেন? জবাব দাও। যদি আজও তোমার মন তৈরি হয়ে না থাকে, আমি অপেক্ষা করবো। যত দিন বলবে, তত দিন অপেক্ষা করবো। আজ শুধু তোমার শেষ-কথাটা শুনে যেতে চাই।

হেনার ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠল। বেরিয়ে এল কয়েকটি অশ্রু-সিক্ত অক্ষুট শব্দ—না, না; সে ভয় না; আমার কোনো উপায় নেই—আমি যে—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ব্যথানুত কণ্ঠে এই ক'টি কথা বলেই সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘরের ভিতর ছুটে চলে গেল।

সেই ছুটি ছোট 'না' ডাক্তারের বুকে এসে বিধল সুতীক্ষ্ণ তীব্রের ফসার মত। বাইরের দিকে তাকালো। মনে হল এই আলোক-উজ্জ্বল অপ-বস্তুর বুকের ভিতর থেকে সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জীবনের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ঘরে ফিরে চললেন ফটকের দিকে।

খাটনি-ঘরের কাছাকাছি আসতেই সুশীলা বেরিয়ে এসে নমস্কার করল। ডাক্তার নিঃশব্দে চোখ তুলে চাইলেন। সুশীলা চমকে উঠল, এ কি! আপনার কি অসুখ করেছে, ডাক্তার বাবু?

—না; বলা কী বলবে।

—বলছিলাম, কমলা বলে যে মেয়েটা আছে, তার অসুখ। হেনা বলেছিল তাকে এক বার দেখিয়ে দিতে। আপনাকে বলেনি?

—কী অসুখ?

—কী জানি, কি সব পুরোনো রোগ।

—কাল দেখবো, বলে তেমনি আচ্ছন্নের মত এগিয়ে গেলেন।

[ ক্রমশঃ ]





অপকল্প ও অনিন্দ্য

অপরাধ অলকদামের শিখরে শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের যে  
উচ্ছসিত রূপ-তরঙ্গিমা—তারই  
স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
শতাব্দীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাধেয় প্রসাধনী।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম এল. বসু য্যাও কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

লক্ষ্মীবিলাস বার্নি অতুলনীয়



## পত্র ত পত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৮

মুড়াইয়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে, সেটা বেশ বোঝা যায় এখন। প্রতিরোধের এক একটা সাল পাঁচাণ-অঙ্কুর গজাচ্ছে এখানে-সেখানে। দিনে-দিনে বাড়ছে সেগুলো। শুকনো গৈরিকের মাধুরী বিদীর্ণ করা খেতকায় ক্ষীত স্তম্ভগুলো পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলবে একদিন, বাতাস চলাচলেরও ঝাঁক থাকবে না মাঝে, সেটা এখনো অবশ্য বোঝা যায় না। ওগুলোকে এরা বলে ব্লক। যে যার পৃথক সত্তায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এখন। ওর প্রত্যেকটার পিছনে যে এত ভরসা-কল্পনা এত কারিগরী, এত অসংখ্য ছোট-বড় প্রয়াস পাঁচাণ-বন্দী হয়ে আছে, চোখে দেখেও ঠাণ্ডা করা শক্ত।

কিন্তু ঋজু-কঠিন এক প্রকাশের তপশ্যায় বসেছে মুড়াই, তার আভাস সর্বত্র। মুড়াইয়ের বুকের এক একটা অতিকায় গহ্বর যেন অমনি করে নিটোল পাঁচাণ-প্রাচীরে ভরে ওঠার জন্য উন্মুখ তাগিদ দিচ্ছে নিঃশব্দে। কাজ বাড়ছে। কাজের তাগিদ বাড়ছে। মাগুলও দিতে হচ্ছে এক এক সময় বড় কম নয়। ছোটখাট অঘটন ঘটে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। গোড়ায় গোড়ায় এত হয় নি। কিন্তু এত বড় সৃষ্টির বেদিতে এটুকু অর্ঘ্য না দিলে নয়, এও যেন মেনে নিয়েছে সকলে। দুর্ঘটনা হয়, জীবনেরও অবসান হয় হুঁটো-চারটে। কেন হল বা কার দোষে হল সেটা পরের ব্যাপার, নথিপত্রের ব্যাপার। মুড়াইয়ে বোবা শঙ্কর ছায়া নামে কিছুক্ষণের জ্ঞান বা কিছুদিনের জ্ঞান। তার পর আবার কাজ, আবার কাজের তাগিদ। তুমি চাও বা না চাও। ওই সৃষ্টির সঙ্গে তোমার সকল গ্রন্থির অমোঘ ঝাঁপ পড়ে গেছে একটা।

কিন্তু সেদিনের অঘটনটা অল্প রকমের। যেমন ঘটে সচরাচর, তেমন নয়।

ছেঁটে এক দৃশ্যত ক্ষত যেমন পাবে গোটা একটা দ্রুত বিধিয়ে পজু করে ফেলতে, টীফ ইঞ্জিনীয়ার বাদল গাঙ্গুলির চোখে তেমনি হঠাৎ এক ধ্বংসকীট বৃষ্টি গোঁচর হল, এত বড় সৃষ্টি সমারোহের মর্যাদা। কিন্তু খুব সহজে নিমূল করার মত কীণায় নয় সেই ধ্বংসকীট। ফলে অনাগত এক কালবোশে নীর শঙ্কা লাগল অনেকের মনে।

ঘুরে ঘুরে মুড়াইয়ের কাজ দেখছিল। আরও জনা দুই অফিসার ছিলেন সঙ্গে। কথায়-কথায় একজন অফিসার খবর দিলেন, অল্পক ব্লক-এ বড় রকমের একটা ফাটল দেখা গেছে, মাটির নিচে বা আছে আছে—ওপরের এক ঝিক ভেঙ্গে আবার নতুন করে জুড়তে হবে। মাটির ওপর সামান্যই তোলা হয়েছে, কাজেই অসুবিধে হবে না খুব।

শুনে টিফ ইঞ্জিনিয়ারের মনে খটকা লাগল কেমন। বলল, চলুন দেখে আসি।

দেখে খটকাটা বাড়ল আরো। আড়াআড়ি ফাটল একটা। অনেক কারণে হতে পারে। পকাশ-বাট ফুট চওড়া দেয়ালের সেই ফাটলের দিকটা ভেঙ্গে আবার মেরামত করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ভিতরটা খুঁত খুঁত করতে লাগল বাদল গাঙ্গুলির। ভাবল কিছুক্ষণ। ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্টদের ডেকে পাঠালো।

নির্দেশ মত তারপর সিমেন্ট কনক্রীট তুলে নিয়ে বথাবিধি পরীক্ষা-পর্ব। ফিজিক্যাল টেষ্ট, কেমিক্যাল টেষ্ট, প্রেসার টেষ্ট। পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ালো আরো। মিকশারে সিমেন্টের অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অনেক কম। এক ঝাঁক খুঁড়তে তিন ঝাঁক বেরলো। কনক্রীট তৈরী হচ্ছে যেখানে সেখানে থেকে সিমেন্টের স্ট্রাম্পল এনে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একে একে আবার বাবতীর পরীক্ষা করলে বাদল গাঙ্গুলি। পাথরগুঁড়ো আর জমাট-বাঁধা সিমেন্টও মেশানো তাতে।

মাথাটা ঘুরে উঠল কেমন।

মিকশারে সিমেন্টের পরিমাণ পরীক্ষা করার কথা নিজেরের তরফ থেকেও। মাঝে মাঝে করাও হয়। কিন্তু নিয়ম যাই হোক, এত বড় কাজে হামেশা সম্ভব নয় সেটা। বিখ্যাসের ওপরেই ছেড়ে দিতে হয় বেশির ভাগ। আর এ ধরনের অঘটন হয়ও না বড়। বিশেষ করে যৌগিকালারের মত এতদিনের এতবড় ফার্মকে অবিখ্যাস করারও কারণ নেই কিছু। সরকারের কাছ থেকেই সিমেন্ট কিনে বরাবর সরকারী কাজ চালিয়ে আসছে।

পায়ে পায়ে মুড়াইয়ের দিকে চলল আবার বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গে নরেনকে ডেকে নিল।

—কী ব্যাপার? নিশ্চয় মৃত্তি দেখে নরেন অবাক!

—এসো। ব্লকটার কাছে এসে আঙুল দিয়ে ফাটলটা দেখিয়ে দিল।

—ফেটে গেছে? তেমন না ভেবেই নরেন বলল, তা ভালো করে একটু প্রাষ্টার করে দিলেই তো হয়।

—খামো! নিশ্চয়-মৃত্তি মানুষটা ঝাঁকিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর সংক্ষেপে বলল ব্যাপারটা।

চূপচাপ অনেকক্ষণ। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে সরে যাচ্ছে বাদল গাঙ্গুলির। অস্বাভাবিক জলজল করছে চোখের তারা দুটো। ওই গ-করা ফাটলটা বড় হয়ে হয়ে যেন সমস্ত মুড়াই জুড়ে বসছে, আর, এত বড় ড্যাম কন্সট্রাকশন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

সব শুনেও ব্যাপারটা অন্তরঙ্গ করে দেখেনি নরেন চৌধুরী। তবু নীরব সেও। এই অসহিষ্ণু বিক্ষোভের চেতনা জানে। নিজের হাতে-গড়া যে সৃষ্টি-সমারোহ ভেঙ্গে পড়িয়ে পান-খান হয়ে গেছে

একদিন, মাহুঘটার ভিতরের সেই ফাটল মিলায়নি আজও।  
এখানকার এতবড় এই স্থষ্টির কণায় কণায় একদিনের মর্মচ্ছেদী  
পরাজয়ের নিখুঁত একটা পান্টা জবাব লিখে রাখতে চায়।  
এই অমরতার আয়োজন দিয়ে হৃদয় নিটোল করে ভরে তুলতে  
চায় সেদিনের সেই বার্ষিকতার ফাটলটা। ব্লকের এই ফাটল দেখে  
সেই পুরানো স্মৃতিই মুখব্যাধান করে আসছে আবার।

—চলো, কি এমন হয়েছে, আপিসে বসে বা হয় ভেবেচিন্তে  
ঠিক করা যাবে'খন। হালকা করে দিতে চাইল নরেন চৌধুরী।

কিন্তু আপিসে ফিরেই যে ব্যবস্থা করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাতে  
অল্প সকলেই উত্তলা হয়ে পড়ল বেশি। অফিসার এবং কর্মচারীদের  
ডাকিয়ে সোজা হুকুম দিল, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেন্ট দিয়ে যেখানে  
বা কাল হচ্ছে সব বন্ধ করে দিতে। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারকে  
তলব করে পাঠালো তারপর।

অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, অর্থাৎ, রংগার বাবা মিঃ চ্যাটার্জী।  
দুই টি-পাটি দিন আর ঘাট করুন, ভ্রলোক অমুকুল আশা পোষণ  
করেন না খুব। ওপর-অলাটিক মনে মনে বরং সমীহই করেন একটু।

—বসুন। শুনেছেন সব?

মিঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, শুনেছেন?

—কি করবেন এখন?

চিন্তিত মুখে ভ্রলোক ভাবলেন একটু। কি আর করা  
যাবে...গ্লাউণ্ড-ওয়ার্ক-এর কাজে লাগিয়ে দিতে বলি এ লটের  
মেট্রিয়াল, আর ঘোষ-চাকলাদারকেও নোটস্ দিই একটা, কেন  
এরকম হল...।

মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন জবাব মনঃপুত হয়নি।

—কিন্তু না জানতে পারলে ওই দিয়েই আমরা ইরেকশনের  
কাজ করতাম, তার পথের কথা ভাবুন।

নিরুপায় মিঃ চ্যাটার্জী হাসলেন একটু। বললেন, কিছু কাল  
বাদে ক্রাক হত, রিপেয়ারের হাজারী লেগে থাকত...এরকম অবস্থা  
হওয়া উচিত নয়, কিন্তু 'দেখলাম তো অনেক...

চোরার ছেড়ে উঠে স্বল্প পরিসর ঘরের মধ্যেই বারকতক পাগচরী  
করে নিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সামনে স্থির হয়ে ঝাঁড়াল তারপর।  
—শুধুন, হেড অফিসে ইন্টিমেশন পাঠান, আর ঘোষ-চাকলাদারকে  
একুনি নোটস দিন মাল তুলে নিয়ে যাক। হেড অফিস থেকে  
ইন্সট্রাকশন এলেই বলে দেবেন সাত দিনের মধ্যে গো-ডাউনও  
খালি করে দিতে হবে।

ভ্রলোক মহা কাঁপরে পড়লেন যেন। নরেন একটা কথাও  
বলেনি একত্ব। নির্দেশ শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সেও!  
অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার হুঁতাবনাটা প্রকাশ না করে পারলেন  
না শেষ পর্যন্ত। একবারে এতটা কি ঠিক হবে...?

—বা বললাম করে পাঠিয়ে দিন, আমি সই করছি।

চোরার বসে অসহিষ্ণু হাজত একটা ফাইল টেনে নিল সে।  
আর বাকাব্যয় না করে সোজা প্রস্থান করলেন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ  
অফিসার।

নরেন তেমনি চুপচাপ বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। হালকা  
শিস দিল একটু। হাসলও।

—বেশ।

সাড়াশব্দ নেই।

—বলব কিছু না সরে পড়ব?

—হু...। ফাইল নিবিষ্ট।

—চিফ ইঞ্জিনিয়ার না বাদল গাঙ্গুলি...কাকে বলি?

খুঁট করে বন্ধ হয়ে গেল হাতের ফাইল। সোজা তাকালো  
মুখের দিকে। খুব স্পষ্ট করে জবাব দিল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে।

বিরূপ না হয়ে হাসিমুখেই বলল নরেন, তাহলে আর হল না  
আপাতত, পরে হবে'খন কথা—।

পরদিন গো-ডাউন-এ দ্বিভ্রেন চাকলাদারের হাতে পড়ল  
নোটসটা। রংবীর ঘোষ কাছাকাছি গেছে কোথায়। শুধুনি  
লোক পাঠালো তাকে ডেকে নিয়ে আসতে।

এসব বামেলা পছন্দ নয় দ্বিভ্রেন চাকলাদারের। লাভ বস্ত  
বাড়াতে পাথবে বাড়াত, সে জগ্রে বা করা দরকার করো, কিন্তু  
গোলযোগে পড়ার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু কোরো না। যদিও  
অর্ধে সামর্থ্যে যে পর্দায় এসে ঝাঁড়িয়েছে আজ ঘোষ-চাকলাদার কার,  
তাতে অল্পবয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের এরকম চোখ রাতানিকে খুব একটা  
পরোয়া করে না দ্বিভ্রেন চাকলাদারও। দু'পুরুষের ব্যবসা, সরকারী.  
কাজও কম করল না আজ পর্যন্ত, এখানেও এতবড় কাজ নিয়েছে  
বাদল গাঙ্গুলির সুপারিশে নয়, হেড অফিসের দাক্ষিণ্যে। তবু  
এসব বামেলা কে চায়। আর কিছু না হোক দুর্নাম তো একটা।  
কিন্তু দ্বিভ্রেন চাকলাদারের পক্ষে রংবীর ঘোষকে সামলানো শক্ত।  
এই সাত সকালেই কোথায় কার পিছনে ঘুরছে ঠিক কি...।  
ব্যবসায় কুশাগ বৃদ্ধি, কিন্তু যা হচ্ছে দিন কে দিন, ব্যবসা করা  
কাকে দিতে!

রংবীর ঘোষ এলো। নোটস্ পড়ল। টোন্টের কীকে  
বজুরেখা।—ও বাবা! একেবারে বাতিল! নোটস্টা ফেরৎ  
দিয়ে হাঁটুর ওপর পাইপ ঠুকল বারকতক। ছেলে ছোকরার  
হাতে এতবড় কাজের ভার, ওরা যুগিতির ভায়রাভাই-ই হয়ে থাকে  
প্রথম প্রথম। চলো, পিঠ চাপড়ে আসি।

প্রথম যোগাযোগে রংবীর ঘোষের ওপর মনে মনে প্রেসন্ন ছিল  
চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তার ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসেনি কখনো। তবু  
সজ্ঞতা ছিল কিছুটা।

সেটা কর্মগত।

মড়াইয়ের কাজে প্রথম দিকের বিঘোস্তরনের সময় রংবীর  
ঘোষের সহায়তা ছিল কিছু। গোড়ায় গোড়ায় কুলি আমদানীর  
ব্যাপারে সাহায্য করেছে। একটা সময় গেছে যখন একসঙ্গে  
পঞ্চাশজন কুলির আবির্ভাবও শুভ সূচনা বলে ভাবত। রংবীর  
ঘোষের কাজের অন্তর্গত নয় এটা। নয় বলেই এই সহযোগিতায়  
তার কর্মক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিজের স্বার্থের দিক থেকে মাহুঘাক বাচাই করার এবং খুশি  
করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে রংবীর ঘোষের। প্রথম সংযোগে  
কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে তার 'সুপট্টি বিশ্লেষণ। খুশি হতে সকলেই চায়'।  
পরিতোষণের ভক্ত নয় কে? শুধু জেনে নাও, খুশি করার বাহু  
নীতিটি কার বেলায় কি।

মড়াইয়ের এই সর্গাধিনারকটিকে বুঝে নিতে অল্প সময়

লাগেনি একটুও। একমুহুর্তে কোনরকম দুঃখ জটিলতার আবরণও ভেদ করতে হয়নি তাকে। সিমেন্টের সঙ্গে বালু মেশানোর মত কাজের সঙ্গে কাজের আড়ম্বরটুকুও নিপুণ সমতায় বেশ করে মিশিয়ে দিতে পারলে নিবিড় আশ্বাস ভিতটা পাকাপোক্ত হবে, এটুকুই বেশ করে বুঝে নিয়ে নিশ্চিত ছিল রণবীর ঘোষ। কাজের বাইরে এই ক্ষণেই আর কোনরকম ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টাও করেনি সে। করলে ভুল হবে, জানত। দেখা হয় প্রায়ই, যে বার 'নড' করে শুধু। আলোচনা টুলে সম্মতিভিত্তি অথচ সম্মতসং চোখে কল্যাণ-শনের কাজের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, এ চোখ জলবীর চোখ মিঃ গাজুলি... এই মড়া জায়গায় প্রাণ আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

সেই গোড়া থেকেই তার জলবীর চোখ বাদল গাজুলির সামনে এই মড়া জায়গায় প্রাণ সঞ্চারের সূচনা দেখে আসছে।

ব্যক্তিগত তোষামোদে নয়, এ ধরনের কর্তৃগত তোষণে চিফ ইঞ্জিনিয়ার তুষ্ট হত বইকি।

পার্টনারের কাছে সবিধানে এই পিঠ চাপড়ানোর কথাই বলছে রণবীর ঘোষ।

সকালের রাউণ্ডে বেরিয়ে বাদল গাজুলি মড়াই থেকে সব উপরে উঠে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল জনা দুই কর্মচারীকে। সঙ্গে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, নরেন আছে। জিপ থেকে নেমে টক টক করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রণবীর ঘোষ। গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং, ভালো আছেন?

বাদল গাজুলি ফিরে তাকালো। চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা শেষ করে বলল, আসুন।

ওপর থেকেই একাগ্র নিবিষ্টতায় নিচের কল্যাণকামের দিকে চোখ রেখে অগ্রসর হল রণবীর ঘোষ। ব্রাণে বাতাস বোঝে। জলবীর আজ মড়া জায়গায় প্রাণ সঞ্চারের বিপুল উদ্ভাস মুখে ব্যক্ত না করে চোখেই ফোটে।

নীচেই আপিসের দিকে চলেছে বাদল গাজুলি। পিছনে নরেন এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার। রাস্তার পাশে দ্বিজেন চাকলাদার জিপে বসে। ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে রণবীর ঘোষ হালিমুখে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পাশে পাশে চলল।

আপিসঘরে সকলে বসল। ঘোষ বাদল গাজুলির সামনে, মুখোমুখি। হুঁচকার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

বলুন—

ঘোষ হাসল।—আপনার নোটস পেলাম।...আই অ্যাম সারপ্রাইজড...ব্যাট ইটস ওয়াণ্ডারফুল...আই মাট সে ইট ইজ ওয়াণ্ডারফুল! এরকম শব্দ হওয়াই দরকার—

বাদল গাজুলি চেয়ে আছে। প্রত্যক্ষ করছে।

রণবীর ঘোষ আবার বলল, আপনি ঠিকই করেছেন, তবু একটা কথা কি জানেন মিঃ গাজুলি, সিমেন্ট তো আমরা নিজে হাতে তৈরী করিনে, কিনে নিয়ে আসি মাত্র, কি করে জানব বলুন এই কাণ্ড হয়ে আছে!

এবারে জবাব দিল বাদল গাজুলি। শাস্ত্রমুখে বলল, আপনার তো জলবীর চোখ—জলবীর চোখ শুধু খাঁটি চেনে না মিঃ ঘোষ, নকলও চেনে!

ঘোষ ধমকে গেল। সজোরে হেসে উঠল তারপর।—ওয়াণ্ডারফুল! যাট মানছি আপনার কাছে, কিন্তু এ ভুলটা সত্যি ভুল।

—মিস্টারে যে প্রোপোরশান সিমেন্ট মেশানোর কথা, মেশানো হয়নি—

—নিশ্চয় হয়নি! শেষ করতে দিল না ঘোষ।—হলে আর আপনি সিখবেন কেন?...কথা হল, আপনাদের যেমন লোক আছে প্রোপোরশান যাচাই করে নেবার জন্য, অথচ দেখা হয়ে ওঠে না সব সময়, তেমন আমাদের নিজেদের চোখেই দেখার কথা সব, কিন্তু আসলে নির্ভর করতে হয় দশ জনের ওপর। বাক, সেদিকটা ভালো করেই দেখছি এবার আমি।

কর্তৃপক্ষের গলদে কথাটাও পুরোক্ষের অরণ করিয়ে আরো ভুল করল।—কিন্তু আপনার সিমেন্ট এ স্টোনডাষ্ট পাওয়া গেছে—জমাট-বাঁধা সিমেন্টও গ্রাইণ্ড করে মেশানো হয়েছে।

—বললাম তো, এ ব্যাপারে আমাদের হাত কোথায়, সরকারের কাছে থেকে যেমন পাই কিনে নিয়ে আনি...

—তাহলে তাদের দায় তারা বুঝবে, আপনার আর কি! আমি শুদিয়ে কাজ হতে দেব না।

—বাপার কি জানেন, মুখে অমারিক হাসিটুকু লেগে আছে, এ ভুলের দায় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাঁধেই চাপবে, মাল বখন একবার বুঝে নিয়েছি, ঠিক জিনিস পাইনি প্রমাণ করব কি করে! কিন্তু এতদিনের এতবড় কার্য আমাদের, তাদের কাছে থেকে খাঁটি নিয়ে আমরা গুণগোল করেছি এ তো আর আপনি বলবেন না... এখন কি করতে পারি তাই বলুন।

ক্রমে বৈধব্যতা ঘটেছে। তবু ক্ষুদ্র জবাব দিল, মাল তুলে নিয়ে যান, আর গো-ডাউন খালি করে দিন।

এ কথা শোনার ক্ষণে আসেনি ঘোষ। সূক্ষ্ম হতানার ভঙ্গি করল একদম।—এ তো মশা মারতে একেবারে কামান, থাকগে—। হুঁচকার মুহূর্ত ভেবে একটা সমাধান বার করল যেন, বলল, এ মালটা আপনি না হয় ভিতটিটএর কাজে লাগিয়ে দিন, এর পরে আমি দেখছি—

—কি আর দেখবেন? অল্প কটন কাঠে বলল বাদল গাজুলি, আমাদের চরিত্রের ভিত্তিও ভেজাল মিশে মিশে এমন হয়েছে যে ওর ওপর আর পাকা কিছু টেকে না। বাক, গুণগোল আরো বাড়ার আগে যা বললাম তাই করুন—এদিকে হেড অফিসকে বা ইন্সপেকশন দেবার আমি দিয়েছি।

—হেড অফিস...! সম্মতিভিত্তি ভাবটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ঘোষের মুখ থেকে। বলল, দেখুন মিঃ গাজুলি, হুঁপুড়বের এত-বড় ফর্ম আমাদের, লাখ হুঁলাখ গেলেও খুব যায় আসে না, কিন্তু এতে গুড উইলটা যাচ্ছে...সেটা ঠিক...বুঝতেই পারছেন। হেড অফিসের ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি শুধু আপনার অর্ডারটা তুলে দিন। একেবারে নিখুঁত আর কোটা জিনিসটা হয় বলুন?

বাদল গাজুলি বলল, আপনার ওই হুঁপুড়বের গুড-উইলও খুঁত একটু থাকুক তাহলে। আপনি বলতেন, মড়া জায়গায় প্রাণ আসছে—কিন্তু আমি নিখুঁত প্রাণই আনতে চাই, বিকল প্রাণ নয়।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। ঘরের বাকি দু'জন নির্বাক

মৃত্তির মত বসে। কষ্টান্তের চোখে-মুখে বিষেব, বিজ্ঞপ, কৌতুক।  
হাতের পাইপ আস্তে আস্তে টেবিলে ঠুকল দু'চারবার।

—আর তাহলে আপাতত কোন কথা নেই?

—আপাতত নেই আর এ সম্বন্ধে পরেও নেই।

—পরের কথা ভবিষ্যতের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে  
সহাত্রেই বলল ঘোষ, কে আর জোর করে বসতে পারে বলুন, হতেও  
পারে আবার কথা, বাট ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্টারফুল! ভারী  
খুশি হলাম!

বকবকে চকচকে এক জোড়া চোখ সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে  
নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজালকে নিখুঁত করার জন্য ওই সিমেন্টের সঙ্গে একটা অস্ত্রত  
জালন্ত মানুষকে চটকে মিশিয়ে দিতে পারলে দিত।

সন্ধ্যার পর বাদল গাঙ্গুলির কোয়াটার থেকেই ফিরছিল নরেন।  
ভেবেছিল বলবে কিছু। কিছু গোম্বায়ে। কিন্তু সে চেষ্টা আর  
করেনি। মাটির কণায় আকর্ষণ, বালুর কণায় বিচ্ছেদ। মাটির  
আভাস পেলে চেষ্টা করে দেখত।

অবনী বাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে পা দিয়েই নিশ্চল দাঁড়িয়ে  
পড়ল। এককম আশ্রয়-গলানো কষ্টের আর বড় শোনেনি।

—কেটে কুচি কুচি করে ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে না কেন  
তোমরা? সাধনা বলছে।

—কি বকচিস যে তুই পাগলি আবেল তাবোল! অবনী বাবু।

সাধনা বলতে যাচ্ছিল আবার কি। পাগলের শব্দে সে গেল।  
এ ঘরে এসে নরেন বাপ মেয়ে দু'জনকেই দেখল একবার। পরে  
সাধনার উদ্দেশ্যে বলল, কি ব্যাপার, ধান ফেললে যে খই ফোটে!  
অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কেটে কুচি কুচি করছে?

অবনী বাবু হেসে জবাব দিলেন, কন্ট্রাষ্টের রণবীর ঘোষকে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠল নরেনও। ফলে তার ওপরই বেগে গিয়ে  
ভেঙে চটে উঠল সাধনা। হা হা হা—যেন কি একটা মজার  
কথা হল!

মনে মনে এ সময় এমন হালকা অবকাশ বিনোদনই চাইছিল  
ঘোষ হয় নরেন। জাঁকিয়ে বসল অবনী বাবুর কাছাকাছি। বেশ,  
মজার কথা না হয় নাই হল, ধরা থাক কেটে কুচি কুচি করা হল  
লোকটাকে, কিন্তু গঙ্গায় ভাসাবে বসছিলে, এখানে গঙ্গা পাবে  
কোথায়?

বাবার অসঙ্কে আবার বড় রকমের একটা ভেঙে চটে কাটতে  
যাচ্ছিল সাধনা। কিন্তু তার আগেই অবনী বাবু বললেন, তুই  
এবার তোর কাজে যা দেখি, খবর শুনতে নে এদিকের। নরেনকে  
জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, বুঝিয়ে বললে তাঁকে?

—নাঃ। বলে লাভও নেই কিছু।

—কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়। এতবড় প্রতিপত্তিশালী  
লোক-কত কুলি মজুর পণ্ডিত তার মুখের কথায় ওঠে বসে,  
কি ফ্যাসাদ যে বাঁধায়...তা ছাড়া হেড অফিসেও তো তার  
জোর কম নয়।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল সাধনা। নরেন কিছু বলার  
আগে সেই অসহিষ্ণু কণ্ঠ বলল উঠল, কি যে তুমি বলো বাবা ঠিক

নেই, প্রতিপত্তিশালী বলে যা খুশি তাই করবে! আর পাঁচজন  
নেই? নাকি হেড আপিসের চোখ কাণা?

নরেন এবারে নিজের মাথাব ওপর এক ঢেঁকির আঙুল ঘুরিয়ে  
টিপ্পনী কাটল, তোমার এই হেড আপিসের সঙ্গে যে হেড আপিসের  
কিছু তফাৎ আছে।

সাধনা চটে গেল। —আর আপনার হেড আপিসের সঙ্গে সে  
হেড আপিসের পরম মিল আছে।

একরকম রাগ করেই ঘর ছেড়ে চল গেল।

নরেনের সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবুও হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু হাসি  
থেকে গেল ১০০-ভাবছেন কিছু। ভদ্রলোকের এ ধরনের বিমুখিতা  
নরেন আগেও দেখেছে।

সেই পুরানো কথাই ভাবছেন ওভারসিয়ার অবনী বাবু।  
ভাবনাটা প্রকাশ করেই ফেললেন আজ। বললেন, নিজের আগ্রহে  
বদলী হয়ে এসেছিলাম এখানে...কিন্তু প্রায়ই মনে হয়, কাজটা যোগ  
হয় ভালো করিনি।

কন্ট্রাষ্টের রণবীর ঘোষের সমস্ত আপাতত নরেন গেছে মন থেকে।  
নরেন চুপচাপ চেয়ে বইল তাঁর দিকে। এই জল নিয়ে বা ড্যাম  
নিয়ে এত আগ্রহ কেন সাধনার এতদিনে অনেকটাই জেনেছে। কিন্তু  
ভদ্রলোক আজ হঠাৎ এ কথা বললেন কেন বুঝে উঠল না।

এতবড় কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের এক বার্থ অপমানকে পেরিয়ে  
চলছিল বাদল গাঙ্গুলি।

অনেকদিন হয়ে গেল তাই? কিন্তু মাত্র সেদিন যেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এক আটতলা ম্যানসন তুলে দেওয়াব কন্ট্রাষ্ট  
নিয়েছে নরেন বিলডার্স লিমিটেড। এতবড় দায়িত্ব ও কোম্পানী  
নিয়ে পাবে অবলীলাক্রমে।

সেই প্রথম নিজের হাতে এতবড় কাজের ভার পেল বাদল  
গাঙ্গুলি। হোক বিল্ডিং জার্মান ফেরং ইঞ্জিনিয়ার, হোক পদস্থ  
কর্মচারী, হোক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভারী জামাই—বাসনার ভার  
জোয়ারে সেই ওর প্রথম অবগাহন আর প্রথম রোমাঞ্চ।

প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সুদৃশ্য। দিন পাঁচবার করে গিয়ে সাইট  
দেখে আসছে। কাজ আরম্ভ করলেই হয় খবর। কর্তৃত্বও হবে।

কিন্তু মনে খটকা বাঁধল একটা।

ছোট কাঁটার মত কি যেন একটা খট খট করতে লাগল ভিতরে  
ভিতরে। বিজিস-এর ডিজাইন করেছেন স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।  
খাওয়ার পাটি, খাতিরের তাগির। পাকা হাতের পাকা ডিজাইন।  
বলার নেই কারো কিছু। বাদল গাঙ্গুলিরও না। কিন্তু তার  
হুশিয়ার হেতু অজ্ঞ।

সর্বপ্রথম নরেন চৌধুরীর কাছে সন্ধেহটা ব্যক্ত করেছিল।—  
কেমন যেন লাগছে হে. আগে একবার সয়েলটা টেষ্ট করে নিতে  
পারলে হত, ওরকম জমিতে এত বড় কন্ট্রাকশন যদি না টেকে?

সাড়খের নিজের দুই কান ঢাপা দিয়েছে নরেন।—সর্বনাশ!  
তুমি না হয় জামাই হতে চলেছ, আমার চাকরীটা থাকবে? আমি  
বাবা এসবের মধ্যে নেই। পরে পরামর্শ দিয়েছে, উড-বি ফানার-  
ইন-ল'কে বলেই ফেল না চোখ-কান বুজে।

সেটা পেয়ে উঠেছে না বলেই বত অবশিষ্ট। আপিসের দু'

চার জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করল এ নিয়ে। কিন্তু সুরাহা হল না কিছু, একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শুধু ফার ডেকে পাঠালেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করলেন, সব রেডি তো ?

—জাছে হাঁ।

—বেশ। রাইট আর্নেস্টসি কাজ আরম্ভ করে দাও, পাটির জোর তাগিদ, দেখার দেখতে কাজ শেষ করে দিতে হবে। বাট বি ভেরি কেয়ারফুল, কোথাও গলদ না থাকে।

বাদল ঘাড় নাড়ল। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল তারপর।

—সাইট দেখে এসে আবার একটু খটকা লাগছে...ওরকম জমিতে এত বড় ডিজাইন...হাগে সরলতা অস্বস্ত একবার টেষ্ট করে নিলে হত...।

তখন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দুই বোচকাছেন প্রশ্ন। টোটে বীকা হাসির মত দেখা গেল বদলে। ওদিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন বার দুই।—অনেক শিখল ফিল্ডে বয়েই সমস্ত বামেলার কথা মনে আসে তোমার, নট ব্যাড—।

বকেজি শুনে হাঁকান লাল হয়ে গেল। আবারও বসতে বাজিল কি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খামিয়ে দিলেন। এ সুর ভিন্ন।

—ওয়েট নাই বয়...কথটা ডিপার্টমেন্টের আরো কাকে যেন তুমি বলেছ শুনেছি। তা কোম্পানীর একটু বিশ্বাস টিকাস আছে আমার ওপর, এই হ্যাঁচোখের শাদা অভিজ্ঞতায় তোমাদের ওই সব টেষ্টই ঠিক ঠিক হয়ে আসছে। তোমার কাকের পুনাম খুব, কিন্তু সেটা টেনে বাড়াতে যেও না, ও আপনি আসবেন—নাও গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর জব।

কিন্তু বিপুল বাড়ী নেখানেই থাকেন নি। বাড়ি এসে স্ত্রীর কাছেও বলেছেন কথটা। কিছুদিন হল ভাবী জামাইয়ের ওপর একটু কৈতে আছেন মতিলা। বাদলের মা কিছুদিনের জন্য দেশে গেছেন শুনেই সাগ্রহে তাকে এ বাড়ি এসে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। আশা, ওর মা সেটা শুনলে দেশেই থেকে যেতে পারেন ববাবর। কিন্তু ভাবী জামাই প্রস্তাবটা একবার ভেবে দেখেনি পর্যন্ত। মেয়ে বা মেয়ে বাবার কাছে কোত চাপা থাকেনি মিসেস বাড়ীর। এভাবে ওকে মাথায় তোমার ফল ভুগতে হবে সে ভবিষ্যৎগী অনেকবারই করেছেন তারপর।

তাকে বৃশি কথার জটাই সেদিনের কড়া শাসনের খবরটা ব্যক্ত করলেন বিপুল বাড়ীর। শুনে একেবারে যেন হাঁ হয়ে গেলেন মিসেস বাড়ীর। এবং সে হাঁ হওয়া বিষয়টুকু পক্ষপন্নের সাজিয়ে মেয়ের কাছেও প্রকাশ না করে পারলেন না।

সারাক্ষণই মনটা খারাপ হয়েছিল বাদলের। এরকম কটুক্তি কখনো শুনেও হয়নি। সেদিন পাঁচটার চন' বাজতে নব্বেন এসে পঞ্চাশের করে দাঁড়াল যখন, তাও ভালো লাগেনি। এবং বিরক্ত হয়েছে। অথচ, অগ্রাগ্র দিনের মত পড়িমরি করে যে ছুটেছে তাও নয়।

নীলার প্রথম কথাতেই মেজাজ যেন আরো বিগড়ে গেল। চুপ-চাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে নীলা বলল, এরকম অবস্থা কেন মুখের, বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে বলে ?

বাদল গাঙ্গুলি বলে বসল আক্ষে আক্ষে। চুপচাপ চেয়ে বইল অথ।

আবার বলল নীলা, বেশ করেছে বকেছে, বকবে না তো কি ! বাবাকে পঞ্চাশ রাগাতে সাহস করো তুমি, বাবা ডিজাইন করে দিলেও নিঃসন্দেহ হতে পার না এত ও.মার তোমার—ক'দিনের ইঞ্জিনিয়ার হে তুমি ?

খানিক চুপ করে থেকে বাদল বলল, এসব আলোচনা আমার ভালো লাগছে না নীলা।

—তা তো লাগবেই না। হাসি আর রাগ মেশানো কটাক্ষ। তেতো কথা কার আর ভালো লাগে, দুখানা ভ্রমণ হাঁড়পনা করে বসে থাকবে না যাবে কোথাও ?

সবকিছু মন থেকে কেড়ে ফেলেই হাঁড়িমুখে হাসি ফুটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে মন দিতে চেষ্টা করোচ্ছ তারপর।

কিন্তু নেশান এলডান-এর ওই অটুতলা ম্যানরন আর ওঠেনি।

তার অগেই খামতে হতেছে।

সমস্ত কোম্পানীর সভাগ দৃষ্টি পড়েছে গ্রনিকে। ছোট বড় সকলের। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের আকির্ষার ব্যটেছে। তাঁরাও মাঝা নেড়ে গেছেন। একটা জুটু গুঞ্জন উঠেছে আপসময়। অটুতলা বাড়ীর সফল ছ'তলায় শেষ, কে কার মুখ চাপা দেবে। কারো মতে কোম্পানীর গুডউইলটি গেল এবার, কারো বিশ্বাস বাদল গাঙ্গুলি কাঁচা ছেলে নয়—একমটা হয় কেন! কারো জবাব, ওই প্লান আর ডিজাইনেই গোলমাল আছে শুনে রাগো, বিশ লাখ টাকার কনট্রাকশনে কম করে দেড়লাখ টাকা পেয়েছে ডিজাইন করে—অভেন নেই, লোভি করতে গেছে, বেশ হয়েছে।

এই খামার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্পন্দন খেমে গেছে যেন বাদল গাঙ্গুলির। ধমনীর বক্ত চমকিল খেমে গেছে। দিনেব আশ্রয় দর ঘুচে গেছে চোখ থেকে। বাতের নির্জনতাও বাতনা-মুখর পবিত্রাঙ্ক বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বটার পাব গড়া কেতে কেছে।

বাড়ি নয়, বাড়ির ককাল। মাছুয় নয়, নিস্পাণ মৃতি।

বোঝাপড়ার ডাফ এসো।

কৈফিয়ৎ থাকলে এতবড় বিপর্যয়ও কিছু নয়। বিপুল বাড়ীর কাছে অন্তত নয়। বড় কোর হু'পাচ লাখ টাকা ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে কোম্পানীকে। কিন্তু বড় উঠন এই কৈফিয়ৎ দেওয়া এবং কৈফিয়ৎ মেওয়ার ব্যাপারেই।

সাইণ্ড-প্রক স্বর তাঁব। বাইরে থেকে কিছু শোনা গেল না। কিছু বোকা গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফেটে পড়লেন, উত্তেজনার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।—ননসেন্স! রিডিকুলাস! শ্রিপস্টারাস!

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, নিশ্চল।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এতবড় ইঙ্গিত বরদাশ্ত করে উঠতে পারছিলেন না বিপুল বাড়ীর। পাঁচটার করলেন ঘরের এ মাথা ওমাখা। রাগে সমস্ত মুখ শাদা।—তোমারই ভবিষ্যৎ গড়বার জ্ঞান এতবড় দায়িত্ব দিয়েছিলাম, বদলে মুখে একেবারে চুনকালি দিয়েছ তুমি! কোথায় লাজিত হবে তা না...। কোথায় না ভুল হতে পারে? প্রিন্স-এ ভুল হতে পারে, কনট্রাকশনে ভুল হতে পারে--



—জানিত এসবে কোন ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

—জ্ঞানত—জ্ঞানত—জ্ঞান! কতটুকু জ্ঞান তোমার? ক'টা মানসন তুলেছ আজ পর্যন্ত? না কি একবার ওই বাইবে যুগে এসেছ বসেই জ্ঞানের আর বাকি নেই কিছু?

বাদল উঠে দাঁড়াল চেয়ারে ছেড়ে। কোন মীমাসা জবাব নয় জানাটী ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানোজি ডাইবের্টের তক্তার দিয়ে উঠলেন আবার। সিট ডাউন প্রীত আঁগু সেট মি থিঙ্ক।

নিজের পুরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন আবার। খানিকক্ষণ দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শাস্ত্রমুখে বললেন, এতবড় ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী গো আর চূপচাপ বসে থাকবে না। বোর্ড বসবে, তোমার কৈফিয়ৎ নেবে, রীতিমত বিচার করবে।... বেশ ভেবে চিন্তে আন-কোরসিন বিকনস-এ কিছু একটা গোলযোগ হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট দাও।

—তাব মানে, খুব শাস্ত খুব সংঘত ক'টা বাদল গাঙ্গুলি বলল, আমারই কোথাও ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেব?

টেলিফোন চাপড়ে বিপুল বাড়রী বলে উঠলেন, ওঁ নেবে নেবে—তোমার ওপর ছিল দায়িত্ব আর তুলনা কি স্বীকার করবে বাইরের লোকে এসে? রিপোর্ট দাও, তারপর দেখা যাক—

নিশেদ দৃষ্টি বিনিময়। সমস্ত জড়তা কাটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। স্পষ্ট জবাব দিল, কিন্তু আমি তাতে রাজি নই। সিটিজেনের পাশের জমি থেকে এখনো সমস্ত টেক্সট করে নেওয়া যেতে পারবে। ওই জমিতে আর ওই ডিজাইনের ফার্মেশপনে এতবড় কনস্ট্রাকশন দাঁড়ায় কি না আমার স্টেটমেন্ট এ সেটাই আগে আমি পরীক্ষা করে দেখতে বসব। তাতে কোন গলদ না থাকলে বোর্ডের বিচার আমি মাথা পেতে নেব।

শাস্ত্র মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সংসা পাশবিক দোর্দণ্ড কেশরীর নিকৃষ্টাঙ্গ স্তম্ভতার মত ভয়লোক স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সর্বাঙ্গে গলিত দাছ অমুভূতি একটা। আপদে বসে থাকা সম্ভব হল না আর। স্বপ্নের বেগে বেরিয়ে বাড়ি ছুটলেন মানোজি ডাইবের্টের বিপুল বাড়রী।

...পরিস্ফুট বাডিটার সামনে দাঁড়িয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। সামনে বেন পরই হাড় পাঁকরাগুলো দেখছিল চেয়ে চেয়ে। সন্ধ্যার জায়গা দিনের আলো ধূসর হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেল একসময়। ক্লান্ত, মগ্ন গতিতে ফিরে চলল।

নিম্ন দরজা খুলে দিল। কিছু বলতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু বলা হল না। ক'দিন ধরেই মনিবের কবরের মত থমথমে মুখ দেখে ভয়ে কাঁপে হয়ে আছে। বাদল গাঙ্গুলি সোজা নিজের ঘরে চল গেল। থমকে দাঁড়াল তারপর। নীলা বসে আছে শান্ত মুখে।

ওর ওপর দিয়েও বড় গেছে একটা। জানা নেই, কিন্তু অনুমান করা কঠিন হল না। তার আভাসও পেল। নীলাই কথা বলল প্রথম, আশা করিনি দেখছি...

—না...তুমি এ সময়?

নীলা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—আগে তো যে কোন সময়ে আসতুম, এখন তাহলে সময় ধরে আসার মত কিছু একটা হয়েছে?

জবাব না দিয়ে গায়ের কোটটা খুলে শালিনাথ এগিয়ে বাদল গাঙ্গুলি। নীলা বিচিনার ওপরেই বসে। খানিকটা ব্যাধানে বসল সেও।—বলবে কিছু?

নীলা তেমনি নিবীর্ণ কবছিল শব্দে —বলবে কিছু, কিন্তু স্তন্যতে হয়ত তোমার খুব ভালো লাগবে না।

জোর করেই বাদল এবারে হাসতে চেষ্টা করল একটু। শব্দায় শরীর ছেড়ে দিল খানিকটা। হালকা জবাব দিল, তার থেকে স্তন্যতে ভালো লাগে এমন কিছুই না হয় বলো।

যা বলার স্পষ্ট বসনে বসেই এসেছে নীলা। আর জানেও স্পষ্ট বলতে। কিন্তু তবু বলার আগে খুব ভালো করে মেনে নিতে চায় যেন।—বাবার বিরুদ্ধে বাবার হুমকিস তোমার হল কি করে? নিজেই তুমি কি ভেবেছ? আজ পর্যন্ত তুমি যা করেছেন তোমার স্তন্য সব ভুলতে পারলে?

—আমার স্তন্য কিছু করেননি, নিকৃষ্টাঙ্গ জবাব করেছেন তাঁর মেয়ের স্তন্য... এখন দেখছেন, যা করেছেন সবই ভুল করেছেন।

—ভদ্র বাবা নয়, সকলেই তাই শেখেন। অত্যাচারে নীলা কাঁদিয়ে উঠল প্রায়, ভুল না হয় হয়েছে, ভুল মাহুদেরই হয়, কিন্তু সে লাফটা বাবাম ওপর চাপাতে সজ্জা হল না তোমার? সংকোচ হল না?

ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল বাদলের সমস্ত মুখ। সামলে নিয়ে শাস্ত্র মুখেই জবাব দিল আবার, ভুলের দায় আমি কারো ওপর চাপাতে চাইছি না নীলা, সত্যি নিজে ভুল করেছি কি না সেটুকুই বুঝে নিতে চাইছি। ওই জমিও আছে আর তোমার বাবার ডিজাইনও আছে—এ দু'টা একবার তিনি একপাট দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তাতে কোন গলদ না থাকলে, তুলে আমার তো বটেই...কিন্তু তোমার বাবা তা করেন না, কারণ, তাঁর মনে সন্দেহ আছে।

কি বলছে, খানিক চূপ কবে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল নীলা! কিন্তু বোঝা অসম্ভব। বিশেষ করে যেখানে ভালো করে কিছু বোঝাবার জন্যেই এসেছে আসা। উটে বেগে গেলে আরো। শাস্ত্র বৈষ্ণবিকুণ্ড তিবোহিত হল।—বলিহারি আশা তোমার নিজের ওপর। বাবার কাজ ঠিক আছে কি না জানা এতপাট থেকে সেটা যাচাই করতে হবে?

নিরুত্তর

—অত্যাচার আমি বুঝি, তোমার আমার ভালোর স্তন্য বাবা না বলছেন তাই তোমার করা উচিত, আর তাই তুমি করবে, অন্তত আমার স্তন্যও করবে।

—কিন্তু তোমার বাবা যা বলছেন তাই করলে যেখানে আমার নেমে আসতে হবে তাতে তোমার আমার কানোই ভালো হবে না।

—হবে হবে হবে। নীলার বৈষ্ণব বাঁধ ভেঙ্গে এসেছে। আরো সামনে ঝুঁকে এলো। বলে গেল, হয়ত তোমার দুর্নাম হবে কিছু, হয়ত বা উন্নতিও বন্ধ থাকবে কিছুকাল, কিন্তু বাবা ঠিক আবার টেনে তুলবেন তোমায়। তার বললে তাঁকে অপদস্থ করতে গেলে তাঁর নাগালও পাবে না তুমি, উটে সবই বাবে তোমার—তার অর্থটা ভেবে দেখেছ?

স্তম্ভ গুমোট একটা। একটানা। দুঃসহ।

আগে দেখিনি। এখন দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কেউ বাবে, সব ছেড়ে নিজেকে আর আমার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবে না, এই তো ?

সোজা হয়ে বসল নীলা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে উঠল তারপর, ইঞ্জিনিয়ার না হলে কাব্য করলেই তো পারো। তুমি কি ভাবো এ পর্যন্ত তোমার টেনে তোলা হয়েছে তোমার ভাবের ঘোরে বৈরেগী হবে বলে ? সে বকম লোকের কি খুব অভাব ছিল ?

এর থেকে স্পষ্ট আর বোঝ হয় কিছু শোনার ছিল না বাদল গাঙ্গুলির। ওকে টেনে তোলা হয়েছে। ইচ্ছে হল বলে, আভিজাত্যের কীস পরিষে টেনে থাকে তুলচ, উঠলে এবারে একটা মরা মানুষই উঠবে। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে একখানা হাত রাখল শুধু ওর কাঁধে।—নীলা...!

—বলো। হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন মূর্তির মত বসে রইল নীলা।

—তোমার আমার সম্পর্কটা এর বাইরে আর কিছু নয় তা হলে ?

—তোমার এতবড় যা খেয়েও সেটা ভাঙবে না এমন কিছু নয়। বাবাকে তুমি অপমান করেছ, তাঁর মানসঙ্গম নষ্ট করতে বসেছ। নিজের ভুল স্বীকার করে নাও, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁর ক্ষমতা তুমি ভালই জানো।

কিছুক্ষণ।...অনেকক্ষণ। একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কটিল বেন।—এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

—হ্যাঁ। হাত বাড়ি দেখে নীলা উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, কালকের মধ্যে তোমার জবাব পাব আশা করি, গুড নাইট—

...আর দেখা হয়নি।

কিন্তু জবাব নীলা পরদিনই পেয়েছিল। নীলা ঠিক নয়, বিপুল বাড়রী পেয়েছিলেন।

নীলা চলে যাওয়ার পর সে রাত্রিরও অবসান হয়েছিল বইকি। এতবড় জবাবের দুর্ভাগ্য বোঝা বহন করে নিঃশব্দে কেটেছে সে রাত। তিলে তিলে, পলে পলে। আবার সকাল হয়েছে। আবার আপিসের সময় হয়েছে। আবার আপিসে এসেছে...।

শেষবার।

স্টেটমেন্ট লিখেছে। যেমন চেয়েছিলেন বিপুল বাড়রী তেমনি। যে জবাব নীলা আশা করে গেছে তেমনি। স্টেটমেন্ট সই করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আর সেই সঙ্গে পদত্যাগ পত্রও দাখিল করেছে নিজের।

ওটুকু কাজ শেষ করেই ফিরে এসেছে আবার। একটা বোবা শূন্যতায় ধড়কড় করে উঠেছে থেকে থেকে। তারপরই মনে হয়েছে মা নেই এখানে। অনেকদিন নেই।...মায়ের কাছে যাবে।

নরেন এসেছিল তার আগে।

তেমনি হাসি। তেমনি খুশি। আরো বেশি হাসিখুশি বেন। আপিস কামাই করে ঠেগানে পৌছে দিয়ে গেছে ওকে। অনর্গল কথা বলেছে। কতক কানে গেছে, কতক যায়নি।

...সুজিতা বেন ওই। কেন মা ওকেও ভালবাসত এত, সেটা বেন ভারী সহজে চোখে পড়েছিল সেদিন।

মা অবাক হয়েছিল বইকি। অবাক নয়, ভয়ই পেয়েছিল। একসঙ্গে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছিল ঠিক নেই।—এমনি চলে এলি

কি রে!...তা বেশ করেছিস...কিন্তু এরকম হঠাৎ...শরীর ভালো আছে তো ? হ্যাঁ রে ? এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

অত হাসছিল তাও ওই কথা!...তারপর আস্তে ধীরে মা শুনেছে সব। শুনেও মস্তব্য করেনি কিছু। কিন্তু মায়ের ভিতরটা যেন দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে তাঁর দিকে চেয়ে। খুশিতে বলেই ফেলেছিল। আসার দিন নরেন সারাক্ষণ সঙ্গে ছিল মা, গাড়ি ছাড়ার আগে বলল, ওদের অতবড় অবিচার মাথা পেতে নিলে তোমার মুখের মা ডাকও আর ভালো লাগত না তোমার ওই মায়ের—গিয়ে দেখো।

শুনে মা হেসেছিল। আর নরেনের 'পরে মায়ের নীরব অসীমার ব্যরতে দেখেছিল দুই চোখে।—তা তো হল, কিন্তু তোর মুখ-চোখের এ অবস্থা কেন, অতবড় চাকরীটা গেল বলে ?

মিথোই অত হাসছিল। অত হাসতে চেষ্টা করছিল।

একদিন নয়। আরো একদিন ধরা পড়েছে।

খাঁচা ভেঙ্গে এসেছিল। কিন্তু বড় অভ্যস্ত খাঁচা। সুজিতা ঠিক সুজিতার মত লাগছিল না। নীলার ফোটো ছিল ট্রান্স ভরতি। অনেক সঙ্গলত হাসি-খুশি মুহূর্তকে বন্দী করেছিল একে একে। একা ঘরে সেগুলো বার করে বসেছিল সেদিন। ছিঁড়ছিল একটা একটা করে। ঠাণ্ডা মাথার। শান্ত মুখে। সমনোযোগে।...মনের অনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করে আশার আলোয়। উঁকিঝুঁকি দেয় আকাঙ্ক্ষার নটারা। কে জানে, সেদিনের সেই একরাতের তিলে তিলে পলে পলে দাহ করা ভয় থেকে আবার তারা উঠে আসবে কি না। আবার তারা হাতছানি দেবে কি না। আবার তারা সোনার কীস ওর গলায় পরাবে কি না।

মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি। যুহু ভংগনার চমকে উঠেছিল।—এই করে কি কিছু সুবিধে হবে ?

অগন্ততের একশেষ। শেষে হেসেই ফেলেছিল। নাঃ তোমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করারও জো নেই।

খণ্ডছিল ফোটোগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থেকে ভারী অজুত কথা বলেছিল মা তারপর। হাঁরে, এত বুঝিস আর এটুকু বুঝিনে, অর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায় ? ও যেমন আছে থাকতে দে, আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলের অনেকক্ষণ আর বাকফুরণ হয়নি তার পর। চেয়েই ছিল শুধু। তার পর বলেছিল, এত বুঝি, কিন্তু তোমার মত যদি সব কিছু এত সহজ করে বুঝতাম মা...।

—থাক, খুব হয়েছে। তেমনি শাদাসিধে কথা তাঁর।—কি করবি এবারে ঠিক করে ফ্যাল। কাজের মানুষ তুই, দিন-রাত এমন শুয়ে-বসে ভালো লাগবে কেন ? কোথায় যাবি চল, আমিও না চম্ব যাই তোর সঙ্গে।

মড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। মড়াই ঘেরা পাগড়গুলো ঘুমিয়েছে। মড়াইয়ের রাত্রিও ঘুমিয়েছে। নিটোল ঘুম সর্বত্র। মাথার ওপর ওই আকাশতারা তারাগুলো জেগে আছে শুধু। খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মড়াইয়ের চিক ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি তাদের দেখছে চেয়ে চেয়ে।...ছেলেবেলার গল্প শুনে জীবনের শেষে নাকি ওই তারা হয়ে থাকার জীবন।

তাই যদি হয়, কোনটি তার মা ?

[ ক্রমশঃ।

# শ র ৭ - স্মৃতি র টুকিটাকি

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ১৩৪৩ সালের ফাল্গুন মাসের এক অপরাহ্নে আমি আমার বরানগরের বাসার খুব কাছে, গঙ্গাতীরবর্তী একটা নির্জন স্থানে একাকী বোসেছিলাম। ঠিক যে গঙ্গার শোভা দেখছিলাম, তাঁনিয়। চোখের সামনে অনেক কিছুই দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনের চোখে কিছুই দেখছিলাম না। বোসে-বোসে এলো-পাতাডি অনেক কিছুই ভাগছিলুম। ভাবনাগুলো খাপছাড়া; না ছিলো তার শৃঙ্খলা, না ছিলো তার পূর্ণতা। সময় কাটানোর জগাই হয় ত নিরর্থক বোসেছিলাম। হঠাৎ পিছনে পদশব্দ ও তার সঙ্গে প্রশ্ন—“একলাটি এখানে বসে আছেন যে?” পিছন ফিরে দেখলাম, পরিচিত মুখ; এখানকারই একটি যুবক। এঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, কথা-বার্তা একটু অনন্ত-সাধারণ অর্থাৎ কবিকবি ভাব। চুলগুলো কৃষ্ণ-কৃষ্ণ এবং সমুদ্রে অলঙ্ঘ্য-বিকৃত; টিলা-পাঞ্জাবীটার ওপর নেহাৎ অমনোযোগের সঙ্গে একখানা সূদৃশ্য চাদর বেশ কায়দা-দোরস্ত ভাবে ফেলা; পায়ের তালতলার টেণ্টো চটি—অর্থাৎ বিজ্ঞাসাগরী চটি। কথা বলবার ভঙ্গী মধুর ও মোলায়েম; কথাগুলোও বেশ সরস ও মিষ্টি এবং তা সাধারণের থেকে একটু বাইরের। এখানকার যুবক-মহল একে কবি আপা দিয়েচে, যদিও এঁর কোন কবিতা মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় কখনো কারো নজরে পড়েনি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না কোরে তিনি মৃদু মৃদু হাসির সহিত দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন—“গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছেন?”

তার মুখের দিকে চেয়ে আমিও এরূপ হাসতে হাসতে বললাম—“এখন ঋতুরাজ তাঁর দক্ষিণ হুয়ার খুলে দিয়েছেন, এখন কি আর গঙ্গার হাওয়ার দিকে কান্নর মন থাকে? মা-গঙ্গা নিজেই এখন ওই সোভে দক্ষিণ দিকে ছুটেছেন, দেখতে পাচ্ছেন তা?” বলা বাহুল্য, তখন গঙ্গার দক্ষিণমুখী ভাঁটার শ্রোত বইছিল।

তিনি মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললেন—“ঠিক বলেছেন। এখন বসন্তরাণী প্রত্যেকের হৃদয়ে এসে ছুটোছুটি করছেন।”

জানদবেল কবিতার লিঙ্গজ্ঞানে সচকিত হয়ে পড়লুম; বললুম—“আপনার কবিত্বের অগ্নি-ক্ষুণ্ণিঙ্গে লিঙ্গালিঙ্গ পুড়ে একাকার হয়ে বসন্তরাণীর আসবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েচে, আমাদের সে সৌভাগ্য হয় নি; তাই আমাদের দোরে এসে দাঁড়ান স্বয়ং ঋতুরাজ তাঁর রাজদণ্ডে তাকে নিয়ে।”

জানি না, তিনি আমার কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলেন কি না, শুধু হাসতে-হাসতে বললেন—“সুনিচি আপনি নাকি বরানগর থেকে আবার লেক রোডের দিকে চলে যাচ্ছেন?”

“হ্যাঁ”—বলেই উঠে পড়লুম। ইনিই মাস-দুই আগে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে সাক্ষাৎ ভাব্য পরিচিত হবার ইচ্ছায় আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানকার সেই ‘S’-য়ের ব্যাপারের পর আমি বিশেষরূপে সতর্ক হয়ে যাওয়ার ফলে, এঁর অমুখোখাটো কোনরকমে তখন কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

মনটা ক’দিন ধরেই খারাপ ছিল। বিদেশে সঞ্জিহীন অবস্থা যেমন, ঠিক সেই রকমটা বোধ কছিলাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত

হবার আগ্রহটা দিন-দিনই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। এখানে এই একটা বছর থেকে মোটেই আর ভাল লাগছিল না। পরের দিন সকালে চা খেয়েই আমি লেক রোডের ঐ দিকে চলে গেলুম—সুবিধামত একটা বাসার খোঁজে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর, পেয়েও গেলুম একটা।

সুতরাং দু’-একদিন পরেই আমি বরানগরের বাসা ছেড়ে দিয়ে আবার লেক রোডে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর কাছেই চলে এলুম। যেদিন এখানে উঠে এলুম, সেই দিনই রাত্রে সব গোছ-গাছ শেষ করে সারা দিনের খাটাখাটুনির পর আগারাস্তে যখন বারান্দার একখানা মাদুরের ওপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লুম, তখন আমার স্বী বললেন—“শুয়ে পড়লে যে? বাও!”

“কোথায়?”

“যাঁর জন্তে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলে;—শরৎ বাবুর কাছে।”

“এত রাত্রে?”

“তা হোলোই বা; নইলে, রাত্রে ঘুমতে পারবে না হয়তো।”

অর্থাৎ আমার স্বী বরানগর থেকে আসবার ইচ্ছেটা ছিল না। তাই তাঁর কথার এই খোঁচাটুকু সহজেই বুঝতে পারলুম। সুতরাং কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই শুয়ে থাকলাম এবং আমার ক্লান্ত দেহকে নবাগত দক্ষিণ বাতাস কখন যে সে-রাত্রে ঘুম পাড়িয়ে ফেললে, তা জানতে পারলুম না।

পরদিন সকালেই শরৎচন্দ্রের কাছে গেলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললাম—“দাদা, ওখান থেকে বাসা তুলে নিয়ে আবার এইখানেই চলে এলাম।”

“আসবে যে, তা আমি জানি।”

“কি কোরে জানলেন?”

“তা বলতে পারি না; তবে, আমার মন তাই বলছিল; আর চাইছিলোও তাই। তাই জানতুম যে, তুমি আসবেই।”

এই ক’টা কথার মধ্যে কি ছিল জানি না এবং এই নিয়ে একটুখানি কি যে আমি ভাললুম, তাও জানি না, কিন্তু আমার চোখ ছুটো জলে বাপসা হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রও কণিকের জ্ঞান যেন একটু অজ্ঞমনস্ক হয়ে পড়লেন। জানি না, বহু দিনকার কোনও অকপট, সরল এবং সরল সখ্যতার ভুল-বাওয়া একটুখানি কথা, একরকমি ব্যথা, আমার ব্যাপারে তাঁর আজকের পরিণত মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন পরে আবার নতুন করে কণিকের একটা তরঙ্গ তুলেছিল কি না। তখনকার এই ঘটনাটা আজ লিখতে বসে আমার এখানকার এই বৃদ্ধ মনের ওপর এই কথাটাই বড় হোসে ফুটে উঠছে যে, মাদুরের অস্ত্রের অস্ত্রস্তলে যে প্রকৃত সরল, সত্য ও পবিত্র জিনিষটি প্রথমেই সেখানে গেরস্থালী সাজিয়ে বাস করতে থাকে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের শত কাজের চাপে, সহস্র যাত-প্রতিযাত ও কোলাহল-কলরবের মধ্যে তা কিছুতেই বিকৃত হয় না; আবশ্যিক সময়ে এবং অমুক অবস্থায়, সে তার সেই আদিম বরণানির

মধ্যে থেকেই তার সেই প্রকৃত রূপ নিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে চাইতে থাকে।

কিছু দিন থেকে শরৎচন্দ্র ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন বোলে আমাদের অনুরোধে তিনি কালী চলে যান। কিন্তু অল্পকিছু দিন পরেই আবার কোলকাতায় চলে আসেন। আমি বললাম—“কিছু দিন থেকে এলে ত' ভাল হোত ; তাড়াতাড়ি চলে এলেন কেন দাদা ?”

বেশ সহজ কণ্ঠে শরৎচন্দ্র বললেন—“শীগগিরই মরে যাব, তাই অনেক দিনের একটা শেষ সাধ মেটাতে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।”

“শীগগিরই মরে যাবেন ? কি করে বুঝলেন ?”

“হ্যাঁ, আমি বুঝছি ; দেখো।”

মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো। তবুও সেটাকে চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—“ওসব বাজে কথা আর বলবেন না। যাক, শেষ সাধটা কি শুনি ?”

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবলেন ; তারপর বললেন—“জীবনে অনেক জায়গা থেকে অনেক ‘অভিনন্দন’ আমি পেয়েছি ; অর্থাৎ আমি খালি নিয়েছি, কারকে কিছু দিই নি। সেই ভুলে অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, আমি একজনকে ‘অভিনন্দন’ দিয়ে যাব।”

“খুব ভাল কথা। কা'কে দেবেন ?”

“দেবো একজনকে।” একটু থেমে আবার বললেন—“উপযুক্ত পাত্রকেই দেবো।”

কা'কে দেবেন, তা যখন তিনি বললেন না, তখন বার বার জিজ্ঞাসা করার অসত্যতাটা আমি আর করলুম না। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, শরৎচন্দ্র নিজ হাতে অভিনন্দন দেবেন যাকে, তিনি কে হোতে পারেন ? হুঁ-তিন জনের নাম আমার মনে হোল, যারা খোদ শরৎচন্দ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হবার পক্ষে সত্যই উপযুক্ত। তাঁদের মধ্যে অশ্বীতিপুর বয়স্ক বার বাহাদুর জলধর সেন মশা'য়ের নামটাই বেশী কোরে আমার মনে হোতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না কোরে পারলুম না—“জলধর সেন কি ?”

“না।”

তখন আরো দু'জনের নাম করলাম ; কিন্তু তিনি তাঁর ঐ নেতিবাচক প্রথম উত্তরটাকেই কলার রাখলেন। এর পর আর জিজ্ঞাসা করা চলে না ; সুতরাং নীরব রইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে ঐ ক'জনের নাম জোয়ার-ভাটার মত কেবলি আসতে-যেতে লাগলো। অথচ ঔৎসুক্য ও অভ্যস্ততার কাছে হার মেনে, মুখ ফুটে এর পর আর জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

হুঁ-একদিন পরে একদিন কবিশেখর কালিদাস বায়ের সঙ্গে দেখা হোল। তিনি বললেন—“শরৎচন্দ্র আপনাকে ‘অভিনন্দন’ দেবেন।” চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—“আমাকে ?”

“হ্যাঁ।”

বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করলাম—“আমাকে কেন ?”

“তা বলতে পারি না। যে কারণেই হোক, শরৎচন্দ্র আপনাকে খুবই পছন্দ করেন এবং আপনার লেখাও তাঁর খুব ভাল লাগে ; সেই জন্যে তিনি আপনাকে অভিনন্দন দিতে চান।”

সম্প্রতি করেক মাস পূর্বে কবিশেখর ‘দেশ’ পত্রিকার ‘রসচক্র’ ও

শরৎচন্দ্র' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে আমার এই ‘অভিনন্দন’ সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেছেন, তার মোটামুটি কথা এইরূপ—“অসমঞ্জ বাবু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লিখিত একখানা বই পাঠিয়ে দেন। সেই বই পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ পত্র দেন। তার পর অসমঞ্জ বাবু তাঁর আর একখানা উপক্ৰাস—‘মাটির স্বর্গ’—পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’তে এ বইখানার খুব বিকল্প সমালোচনা করেন। এতে অসমঞ্জ বাবু খুবই ব্যথা পান। এই সূত্রেই শরৎচন্দ্র এক দিন আমাকে বলেন—‘ও বড় মন-মরা হোয়ে আছে, ওকে সাহুনা ও উৎসাহ দেওতা দরকার। তোমার ‘রসচক্র’র একটা বড় অধিবেশনের মাধ্যমে ওকে একটা অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা কর। আমি নিজেই ওকে অভিনন্দিত করবো।’—”

—শরৎচন্দ্র এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাত, তার কিছু দিন পরেই ‘রসচক্র’র এক প্রকাশ্য অধিবেশন হয় এবং তাতে শরৎচন্দ্র অসমঞ্জ বাবুকে অভিনন্দিত করেন।—এই ব্যাপারে যা ব্যয় হোয়েছিল, শরৎচন্দ্র তার একটা মোটা অংশ দিয়েছিলেন—...—ততাদি।

অনেক দিনের কোন পুরোনো ব্যাপারে একটু আগটু ভুল-ভ্রান্তি এবং অসামঞ্জস্য হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া সেই সামান্য ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে আমার ‘অভিনন্দন’ ব্যাপারের বিশেষ কোন সম্বন্ধও নেই। তা'হোলেও ব্যাপারটা এই যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে আমি একখানা নয়, আমার সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত চয়খানা বই পাঠিয়েছিলাম ও তিনি সব বইগুলি পড়ে, অত্যন্ত প্রশংসা করে আমার পত্র দেন। পরের মাসেই আবার আর একখানা উপক্ৰাস (মাটির স্বর্গ) বার হ'লে, আমার প্রকাশক ওগানাও রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে-সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। সে সময় কবির দেহ-মন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। তখন তিনি বাবু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিংয়ে অবস্থান করছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি ‘মাটির স্বর্গ’র বিকল্প সমালোচনা করে ‘প্রবাসী’তে পাঠিয়ে দেন। এটা ১৩৩৮ সালের কথা। এ জন্য যদি সে-সময়ে আমি কিছু মনো-ব্যথা পেয়ে থেকে থাকি, তা নিরশনের জন্য শরৎচন্দ্র ঐ সময়েই আমাকে সাহুনা দিতেন ; বা ছ'মাস এক বছর পরেও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমার ‘অভিনন্দন’ দেন ১৩৪৪ সালে, অর্থাৎ ছ' বছর পরে। সুতরাং কবিশেখর আমাকে অভিনন্দন দেবার ঘে-কাণটার কথা লিখেছেন, সেটা, আমার মনে হয় যথার্থ নয়। কবি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি তাঁকে চিরকাল যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এসেছি এবং এখনও করি, এবং বত দিন বাঁচবো, করব। কোন কারণে শ্রদ্ধাঙ্গাদ প্রবাসী-সম্পাদক স্বর্গতঃ রামানন্দ বাবু আমার ওপর একটু ক্ষুণ্ণ হন। ঐ সূত্রে সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথও হন। এটা শরৎচন্দ্র জানতেন। কিন্তু কবির এই ক্ষুণ্ণ ভাব অল্প দিন পরেই দূরীভূত হয়, এ সংবাদ সে সময় পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমাকে অভিনন্দন দেবার জন্যে শরৎচন্দ্রের এই প্রবল ইচ্ছার কথা সেদিন কবিশেখরের মুখে শুনে মনটা খারাপ হোয়ে গেল ;—সত্যই খারাপ হোয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার পক্ষে যে খুবই গৌরবের, তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু এর আর একটা দিক ছিল। এই গৌরবলাভের পেছনে কত বড় যে একটা বিপদ আছে, তা ভাল ভাবেই আমি জানি। সুতরাং সেই নিশ্চিত বিপদের জন্য

আমি ভীত হোয়ে পড়লুম। আমাকে শরৎচন্দ্র 'অভিনন্দন' দিলে, কোন কোন লোকের সেটা মোটেই ভাল লাগবে না এবং আমাকে তাঁরা বিশ্ব-নজরে দেখবেন। আমার লেখ্য বসন্ত পাঠক-পাঠিকাদের একটু ভাল লাগে এবং তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন,—এটাই অনেকে সহ করতে পারেন না এবং এতদ্বারা তাঁদের মন অবশ্যিকর ও পীড়াগ্রস্ত হোয়ে পড়ে। এর ওপর, শরৎচন্দ্র যদি আমাকে অভিনন্দিত করেন, তা হোলে ত কখাই নেই। এখন এ-বয়সে হলে, ও-সব গ্রাহ্যই করতাম না বা ভয়ও পেতাম না; কিন্তু তখন ও জিনিষটা আমাকে সত্যই আতঙ্কিত ক্বোরে হুঁললো।

অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু ভেবে-চিন্তেও এর কোন উপায় বার করতে পারলুম না। শরৎচন্দ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হওয়ার লোভটাও বড় কম নয়। কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে যেতে লাগলো— উপরে লিখিত ওই সবের ভয় ও আতঙ্ক। বাই হোক, শরৎচন্দ্রকে আমি এ সম্বন্ধে অনেক বোঝালুম, অনেক অল্পবোধ করলুম, কিন্তু কোনই ফল হল না। তখন হু-পাঁচজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের কাছে পরামর্শ চাইলুম—কি করা যায়। তাঁরা সকলেই বললেন—“এ ত সৌভাগ্য, এতে অমত কববার আছে কি?” আমার ভগিনীপতি, কালীঘাট নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গতঃ গুরুদাস হালদার বি, এল, দর্শনশাস্ত্রী মহাশয় একটা সংকৃত শ্লোক শুনিয়া বললেন—“উপবাচক হোয়ে মাত্ৰ নিরুৎ নেই, কিন্তু তা আপনি এলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই।” যাঁহা; প্রত্যাখ্যান আর করলুম না। বিশেষতঃ এই সময়টাকে শরৎচন্দ্র ঘর ঘন অল্পবে পড়ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায়

বাধা দিয়ে তাঁর মনে ব্যথা দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করলুম না। বরঞ্চ মনে মনে একটা ভয় হোল যে তাঁর সুখের ঐ 'শীর্ণগির' মরে বাবা'র কথাটা সত্য হ'য়েই কলে বাবে না কি?

এই সময় একদিন তাঁর শরীরের অবস্থা জানবার জন্তে আমার এক ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলুম। ছেলের হাত দিয়ে তিনি একখানা চিঠি পাঠালেন। সেটা এখানে হৃৎক ভুলে দিলুম।

24, Aswini Dutt Road.

Sarat Chandra Chatterjee

Phone—South 84

1—5—'37

প্রিয়বরেবু—

অর এবং অর্শের রক্তপাত সমভাষেই চলচে, বরঞ্চ একটু বেশী বললেও অনায়াস বলা হয় না।

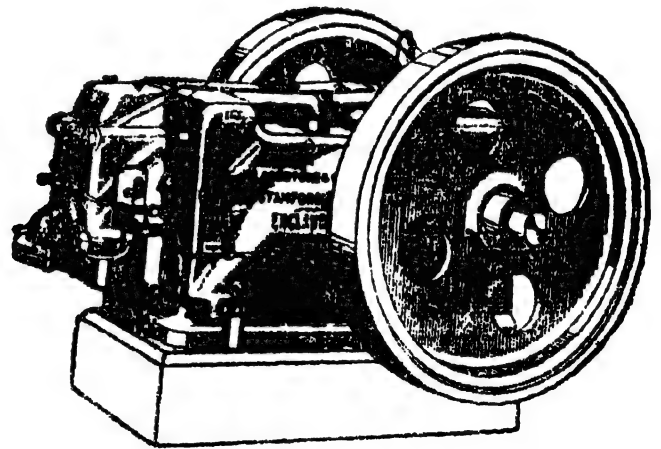
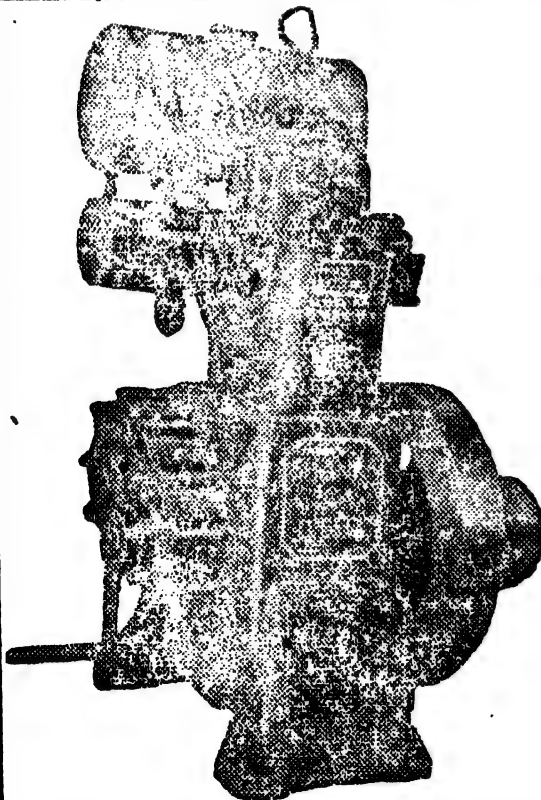
তোমার ছেলে আমার পায়ের ধুলা নিয়েছে, আশীর্বাদ করেছি।

শরৎ দা'

পুঃ—বাড়ীর সকলের অভ্যন্তর অমত থাকলেও প্রারম্ভিত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করচি। সম্মানে এটিই শেষ কাক্স।

শচ

মূল চিঠিখানা 'বঙ্গলক্ষ্মী'-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর কাছে আছে। ওর প্রতিলিপি আমার কাছে আছে। চিঠিখানা পোড়ে মনটা আমার খুবই খারাপ হোয়ে গেল।



অর চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল ও কৃষিকাষী দেশের অর ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিট্টার, ব্রাকটোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং মেট, আক্সস ডিজেল ইঞ্জিন আক্সস পাম্পিং মেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :—

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, দিল্লী কলিকাতা—১

ফোন :—২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বরলার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানাঃ ব্যবসায় সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে



কয়েক দিন পরে 'রসচক্র'র এক সভা-বন্ধু আমার বাসায় এসে জানিয়ে গেলেন—“আর কয়েকটা দিন পরেই, ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার শরৎচন্দ্র আপনাকে ‘অভিনন্দন’ দেবেন।” আমি তাঁকে বললাম—“আমাকে না দিয়ে, শরৎচন্দ্র যদি আর কাঁকেও দিতেন, ভাল হোত। আমার চেয়ে বহুগুণ উপযুক্ত লোক রয়েছেন, তাঁদের কাঁকেও দিলে”...

“না—আপনাকেই তাঁর দিতে ইচ্ছে, এবং ইচ্ছেটা অনেক দিনেরই। শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার দিয়েছেন, রাধেশ দা’র ওপর।” রাধেশ দা—অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। রাধেশের সঙ্গে আমারও দেখা হোলো। রাধেশ বললেন, “আপনার জ্যেষ্ঠ মূর্শিদাবাদী গরদের ‘জোড়’, রূপোর চন্দন-বাটি, ‘ট্রে’ প্রভৃতি সব কিনে কেলেচি। শরৎদা’র লক্ষ্য, কোনও জিনিষ যেন খারাপ না হয়। যেটাকা তিনি আমাকে দিয়েছেন, তাতে যদি না কুলায়, আরো যদি টাকা লাগে, তিনি চেয়ে নিতে বলেছেন”—ইত্যাদি।

মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করতে লাগলাম, যদি হঠাৎ কোন কারণে কোনও রূপে ব্যাপারটি বন্ধ হোয়ে যায়। সে ভগ্ন একে-তাকে জিজ্ঞাসা করি সে, কতদূর কি গোছে। আমার মনোমত উত্তর কারো কাছ থেকেই কিছু পাই না। সকলেই বলেন—“কাজ এগুচ্ছে। রাধেশ বাবুর ওপর শরৎচন্দ্র ভার দিয়েছেন, ও আর দেখতে হবে না।” একজন বললেন—“আজ বোধ হয় অভিনন্দন-পত্র ছাপাতে দেওয়া হোল।”

মনে মনে বুঝলুম, আর কোন আশা-ভরসা নেই, অভিনন্দনটা হবেই। জানতে পারলুম, বেলগাছিয়াতে ‘দাবকা-কানন’ নামে একটি সুন্দর বাড়ীতে অভিনন্দনের আয়োজন হবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ অভিনন্দনের দিন। ১লা জ্যৈষ্ঠ শরৎচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখে আমার এক ছেলের হাত দিয়ে পাঠালাম। লিখলুম—“দাদা, ঠিকই কাল অভিনন্দনের ব্যাপারটা হবে? আমাকে কি তাহোলে যেতেই হবে? আপনার শরীর কেমন আছে?” আমারই চিঠির এক পাশে শরৎচন্দ্র লিখে দিলেন—

১৬/২, লেক রোড

১লা জ্যৈষ্ঠ '৪৪

Injection দিয়ে আজ / দাদা,

শর্যাগত। দিন কয়েক একটি মেয়ের অস্ত্রের জন্ত পূর্বে রাধেশ এসেছিলেন—আমার সব কাজ প্রায় বন্ধ। সব ঠিক করেছেন বললেন, আপনার শরীরের অবস্থা যে কেমন তার পরে আর কোন সংবাদ তাহারও কোন সংবাদ লইতে পারি জানিনে।

‘রসচক্র’ ব্যাপারেরও কোন সংবাদ পাই নি। রাধেশ বলিয়াছিল যে, পাতিপুকুরে কোথায় বাগান ঠিক হোয়েছে। কালই ত’ রবিবার। আমাকে ত কোন খবর দেয় নাই। আপনি কি খবর পেয়েছেন? কাল যেতে হবে কি না কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কোন খবর জানেন ত জানালে সুখী হ’ব।

আপনার শরীর কেমন আছে তা লিখবেন। ইতি।

আপনারই

শ্রীঅসমজ

অভিনন্দন সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্তর, পাশ কাটিয়ে যে এড়িয়ে যাবার মতলব, তা বেশ বুঝতে পারলুম। পাছে, শেষ মুহূর্তে আমি বৈকে বসি, তাই সংক্ষেপে যে জনানাতে চাইলেন—‘কোন সংবাদ জানিনে।’

পরদিন বেলা আন্দাজ ১টার সময়, আমি বেলগাছিয়ায় বাত্মা করলাম। আমার সঙ্গে আরও দু’চার জন কে কে গিচ্ছিলেন, তা ঠিক আমার স্বরণ নেই। সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের যাবার আগেই ‘দাবকা-কানন’ গুলজার; হৈ-হৈ বৈ-বৈ ব্যাপার। বহু সাহিত্য-রসিক, কবি, শিল্পী প্রভৃতির উপস্থিতিতে বাগান-বাড়ী কোলাহল-মুখর। নীচের গ্রান্ডাবডিতে শ্রীমান রাধেশের তত্ত্বাবধানে আহাৰ্যাদির প্রস্তুতি ব্যাপার পূর্ণোৎসাহে চলছে। রাধেশ সেখানে একখানা চেয়ার নিয়ে বেশ জুত কোরে বসে আছেন। আরোজন প্রচুর; সুপ্রচুরও বলা যেতে পারে।

বেলা ১১টা আন্দাজ, শরৎচন্দ্র তাঁর মোটরে কোরে এসে পড়লেন। সেদিন তাঁর শরীর, গত কয়েক দিনের তুলনায় একটু ভাল থাকলেও, মোটের উপর ভাল ছিল না। এইরূপ অসুস্থ দেহে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম বোদে এতদূর আগাটা, আমার মনকে লজ্জা এক পীড়া হুট-ই দিল।

বাই হোক, বথাসময়ে দ্বিতলের বড় একটা হল-ঘরের মধ্যে সকলের উপস্থিতিতে একখানি আসনে আমি বসলাম এবং আমার সামনের আসনে শরৎচন্দ্র বসলেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অভিনন্দন-দান হবে; তার কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে না। সুতরাং ধাতু-দূর্বা, ফুল-চন্দন, মানা ইত্যাদি কোন বিষয়েই কোন ত্রুটি রহিল না। আসনে বসবার আগে, আমার পরিহিত কাপড়-লম্বা ছেড়ে, তাঁর দেওয়া গবদ পবতে হোল এবং গবদের উত্তরীয় গায়ে জড়াতে হোল। তারপর বথানীতি ধান-দূর্বা দিয়ে তিনি আমায় অভিষেক করলেন। এই সব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ কোরে তিনি যে বাণী দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করেন, সেই বাণীযুক্ত অভিনন্দন পত্রখানির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল :—

“পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুন্দর

কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত অসমজ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে—

হে রসশিল্পী, তুমি তোমার শাস্ত্র-সংবত অনাড়ম্বর সাহিত্য-সাধনার দ্বারা যে অনাবিল আনন্দ দান করিয়াছ, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আজ তোমাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দিত করিতেছি।

উপেক্ষার খবর রোজ-বাহে, দৈব-দুর্বিপাকের বঞ্চা-বঞ্চে, দৈন্ত-দুঃখের তুণ্য-বাত্তে কখনও তোমার চিস্তার বসন্ত-শ্রী ও জীবনের রস-প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয় নাই। তোমার জীবনের বহিরঙ্গের সকল রস-মাধুর্য্য নিষ্করণ কাল ক্রমে শোষণ করিয়া লইতেছে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে যেখানে তোমার রসপ্রবাহের উৎস, সেখানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে তোমার জীবনের সকল গরল খালা, সকল ক্ষুদ্রতা, সকল অজ্ঞ, রসধারার পরিণত হইতেছে।

হে গুণি, আমাদের এই দুর্গতদেশে বাহারা সাহিত্য-তীর্থের বাত্মা, তাহারদের অনেকেরই পথ ধলিকক্ষয়ময়, কটকাধীর্ণ ও



ছায়াবর্জিত। তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বরূপ গণ্য করিয়া, আজ তোমাকে আমরা যে মর্যাদা দান করিলাম, তাহা তাপস্ফালক্ৰিষ্ট, উপেক্ষা-লাঞ্ছিত, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বঙ্গকুণ্ডে নিবেদিত সকল আহুতি যেমন হতবহ দেবতাগণের সকাশে বহন করেন, তুমিও তেমনি আমাদের শ্রদ্ধাভিবাণন তোমার দুর্গম পথের সহযাত্রীগণের হৃদয়দ্বারে বহন কর।

বাঁহাদের পদ-মর্যাদা, পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও আভিজাত্য-গৌরব আছে, বাঁহার লক্ষীর বরপুত্র, বাঁহাদের আত্মকল্যে ও অভিভাবকতায় বহুলোকের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাঁহাদের স্তাবকের অভাব ঘটে না। যে সকল সাহিত্যসেবীর ধন, মান, পদ-গৌরব, প্রতিষ্ঠা ও কৌলীজ-বল আছে, তাঁহাদের বন্দনা গাহিয়া বহু লোকই কৃতার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্য-মাধুরী ছাড়া বাঁহার অল্প কোন সখল নাই, রস-সাধনা ছাড়া বাঁহার অল্প কোন ব্রত নাই, তাঁহাকে কেহই কোন দিন মর্যাদা দান করে না। হে সর্বগৌরবতীন অনন্তব্রত রসশিল্পী, আজ তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা অবিমিশ্র সাহিত্যসেবাকেই সম্মানিত করিলাম।

হে রসলক্ষীর মালঞ্চের মালীকর, রসরাজের চরণে আমাদের আকিঞ্চন, তোমার কুটারস্বত্বের মালঞ্চখানি সকল দীনতা, সকল রিক্ততা, সকল কষ্টকরুণ এমনি নব নব পুষ্প সমারোহে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া যেন মধুমাসকে বন্দী করিয়া রাখে। ইতি—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সাল।”

অভিনন্দন-বাণী পাঠ কোরে শরৎচন্দ্র অভিনন্দন-পত্রে সহি করলেন। তারপর কবিশেখরের দিকে চেয়ে বললেন—“রসচক্রের সেক্রেটারী হিসেবে তুমিও এতে স্বাক্ষর কর। কবিশেখরও সহি করলেন।

অভিনন্দন-পত্রের লেখাটা শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা নয় বলেই মনে হয়, কারণ অভিনন্দন-পত্র লেখার মত ভাষা শরৎচন্দ্রের তেমন আবৃত্ত না থাকায় কবিশেখরের ওপরই ওটা লেখার ভার পড়ে, এই রকমই শুনেছিলুম। এ রকম সমৃদ্ধ, সুন্দর ও সালঙ্কার শব্দসম্ভারপূর্ণ রচনা কবিশেখর কালিদাস রায়ের দ্বারাই সম্ভব। মনে মনে তাঁকে অল্পস্বল্প ধন্যবাদ জানালাম।

শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনপত্র পাঠের পর আরো অনেকেই—আমাকে সম্বন্ধিত কোরে কিছু কিছু বলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমোজ বসুর আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রদ্ধার কথাগুলি আজ বার বারই আমার মনে পড়চে। এতদ্ভেদেদিন সকলকে আমি বঙ্গ কথার আমার অন্তরে

ধন্যবাদ-জানিয়েছিলুম; আজ দীর্ঘ উনিশ বছর পরে, সে বিষয়ে লিখতে বসে, আবার আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যাক। অভিনন্দনের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার যখন শেষ হোয়ে গেল, তখন নীচের প্রশস্ত দালানে ভোজনের আয়োজন শুরু হোল। লম্বা দালানে সারি সারি হু’ পঞ্জিতে শ’খানেক পাতা পড়লো। মহা আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে প্রত্যেকে এক-একখানা পাতা অধিকার করে বসলেন। খাতের আয়োজন সুন্দর, প্রচুর ও ক্রটীশূন্য। মাছ, মাংস, পোলাও, কালিয়া, লুচি, তরকারী, দই, মিষ্টান্ন—কিছুই বাদ পড়ে নি। রাধেশ ভায়া যেখানে ‘ইন-চার্জ’, সেখানে কোন দিনই কোন ক্রটি হবার কথা নয়।

শরৎচন্দ্র অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সেদিন সকলের সঙ্গে আহায়ে বসলেন এবং পেট ভোরে সব কিছুই খেলেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি দৈহিক অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করতেন না, গ্রাহ্য করতেন—মনের আনন্দটাকে। সবাই মিলে এক সন্দের এই আনন্দ-ভোজনে তাঁর মত লোক কি অংশ না নিয়ে থাকতে পারেন? ভোজনের ওজনের চেয়ে, আনন্দ-কোলাহলের ওজনটাই সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল।

অভিনন্দনের ব্যাপারও চুকে গেল। আমার ভয় হোয়েছিল যে ঐ দিনের অনিয়ম অন্যাচ্যারে হয়ত শরৎচন্দ্রের শরীর আরও অসুস্থ হোয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর থেকে রোজই আমি তাঁর খবর নিয়ে জানতে পারতুম যে তিনি ভালই আছেন।

আমার অভিনন্দনের খবরটা যাতে কোনও কাগজে না বেরোয় তার জন্তে আমি খুব চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তা সত্ত্বেও হু’চারখানা কাগজে খবরটা ছাপা হোয়ে গেল। ‘সাহানা’তে বা খেরিয়েছিল। তা এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল।—শৈলজানন্দ ছিলেন তখন ‘সাহানা’র সম্পাদক।

“বেলগাছিয়ায় ‘দ্বারকা-কাননে’ রসচক্রের এক উত্তম-মিলনের আয়োজন করিয়া গত ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, উপভাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করেন। এই আয়োজনঘটিত সর্ব কাৰ্য্যই শরৎচন্দ্রের নির্দেশমত সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রায় সকল লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের পর ভূবি-ভোজনেরও বিশেষরূপ আয়োজন হইয়াছিল।”

(‘সাহানা’—শনিবার, ২২শে মে, ১১৩৭)

‘মাসিক বহুমতী’র সম্পাদক বর্গভঃ সত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর দৈনিক ‘বহুমতী’তে সংবাদটা কলাও কোরে ছাপেন। [ক্রমশঃ।

## শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিস্ফোর দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক হৃদয়বহ বোঝা বহনের মামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মাহুজের সঙ্গে মাহুজের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, বন্ধে আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপমরনে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকাৰ্য্যতায় আপনি ‘মাসিক বহুমতী’ উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধ’রে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

‘মাসিক বহুমতী’। এই উপহারের জন্য অসুস্থ আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে ধুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জাতবোয় লজ লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বহুমতী। কলিকাতা।



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

অসম্ভবকে যদি সম্ভব করে তুলতেই হয়—প্রেমসীকে যদি পরিণিতাক্রমে পেতেই হয় তবে আর দ্বিধা নয়—সঙ্কোচ নয়—বিলম্ব নয়.....আমার একমাত্র বিধিত বন্ধু, অভিভাবক শুভাকাঙ্ক্ষী মাসিয়ে দা ভাগাঙ্গীকে অকপটে সমস্ত নিবেদন করে তাঁর সাহায্য চাইলাম। অবশ্য বহুদূর অকপটে তাঁর কাছে জানানো চলে—বাই হোক কঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে সি সি ছাড়া আমার চলবে না—যদি ওর বাবা আমাদের বিবাহে সম্মতি না দেন তবে আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। তাও ঠিক করেছি বললাম।

তার পর মাসিয়ে ভাগাঙ্গী আর তাঁর দু'টি অভিভাবক বন্ধুর সঙ্গে ছুটি ঘণ্টা ধরে বহু তর্ক, বিতর্ক, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জল্পনা বহু শপথ আর প্রয়োজনের পর তাঁদের কিছুটা সম্মত করতে পারলাম। শেষ অবধি ঠিক হলো মাসিয়ে ভাগাঙ্গীই আমার হোসে ওর বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাবটা তুলবেন।

এসব ঠিক করে সি সি'কে জানাতে গেলাম—গিয়ে দেখি, মা মেয়ে দু'জনাই বিবাহ মুখে বসে—দু'জনাই চোখ ভলে ভেসে যাচ্ছে। আমি তো শুদ্ধিভ—শেবে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওর দাদাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে—হাঙতে দিয়েছে। দেনার দায়ের ঘটনাটা—তার পি সি আমার জন্মে একটা দিদিও রেখে গেছে এই মধ্যে—যাতে আমি ওকে সাহায্য করি কিন্তু আমার অবস্থাও তখন সুবিধার নয়।

আগামী সূত্রে রঙীন করণার যখন দু'জনাই মন ভরপুর সেই সেই সময় পি, সির এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটা আমাদের দুজনকেই ভারী জমিয়ে দিলো। তার উপর আবার শুনলাম, সি সির বাবাও সেই রাতেই ওদের পল্লীভবন থেকে বাড়ী ফিরেছেন। ভাবাকাল মনেই সে রাতে বিদায় নিলাম—চলে আসছি, এমন সময় সি সি আমার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে পালালো। বাইরে এসে দেখি কাগজে মোড়া একটা চাবি—আর ভিতরে লেখা আছে ওই চাবির সাহায্যে যেন রাতে বাড়ীর দরজা খুলে ওর কাছে চলে আসি। দাদার পরিত্যক্ত ঘরে ও আমার জন্মে অপেক্ষা করবে...

সে রাতের অভিনয়ে কোনো বাধা? আসেনি। কিন্তু আমার মনটা হতাশার ভরে যেতে লাগলো সি সির কথাগুলি শুনে। আমার বাহুপালে আবছা হোলেও স্নান হেসে সি সি বললে,—

—“বাবা বেশ শ্রম শরীরে নিরাপদেই ফিরেছেন...কিন্তু জানো, এসে থেকে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমি একটা ছোটো খুক। আমি যে আর খুক নই এটা বুঝলে তাঁর মনের কি অবস্থা হবে জানি না...আবার তার উপর যখন শুনেব, আমার প্রেমিকও আছে...উঃ ভগবান! তখন যে কি করবেন আমি জানতেও পারি না—”

—“কি আর করতে পারবেন? আমার হাতে তোমাকে দিতে না চান তো সোজা তোমার নিয়ে পালিয়ে যাবো—তার পর আর কি? ধর্মবাহকদের আশীর্বাদ থেকে তো আর বঞ্চিত হবো না...আমাদের মিলনে কোনো দিনও কেউ বাধ সাধতে পারবে না—”

—“আমিও তো তাইই চাই...কিন্তু বাবা?...উঃ আমার বাবা যে কি ভীষণ, তা তো তুমি জানো না...”

পরদিন সি সির মা বাবার সঙ্গে মাসিয়ে ভাগাঙ্গীর বক্তৃতা করে তর্ক আর আলোচনা হোলো—কিন্তু সবই নিঃশেষ হোলো শেষ অবধি। এমন কি সি সির মা বতটা আশঙ্কা করেছিলেন আগে থেকে তার চেয়ে আরও খাপখাপি ঠাঁড়ালো। ওর বাবা সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন এখনও তার বছর গুণে বেহেরা বিয়ের কথা উঠান ভাববেন—আর এই তার বছর ওকে কোনো কনভেন্টে রাখবেন। পরে প্রত্যাখ্যানটাকে একটু সহনীয় করার জন্তেই বোধ হয় বললেন—সে সময় আমার পদমর্যাদা, সম্মেলতা সব বিচার করে যদি উপযুক্ত মনে করেন, আর আমাদের ভালোবাসাও যদি তত দিন টিকে থাকে তবে তিনি মত দিতে পারেন।

সে শব্দে ছোটো চাবিটা কোনো কাজেই লাগলো না। ভিতর থেকেই দরজাটা বন্ধ করা ছিলো। একেবারে হতাশার চরম সীমায় পৌঁছলাম। ওর দাদাও জেলে...কোথা থেকে এতটুকু খবর পাবারও উপায় নেই। মরিয়া হোসে ভাবলাম, সোজা ওর মাঘের সঙ্গে দেখা করবো—কিন্তু দরজা থেকেই পরিচালিকার কাছে শুনলাম, কেউই নেই, সবলেই পল্লীভবনে চলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

হুভাগ্য কি একা আসে? কখনও না। চরম হতাশায়, ব্যর্থতায় মনের বিক্ষোভ আর ছাণা জুড়োজে জুয়ার নেশায় মাতলাম। একটা বারও একটা দানও জিততে পারিনি...ক্রমে ক্রমে সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হোসে মাথার চুল অবধি দেনার দায়ের বিক্রিয়ে দিলাম। তখনও অশ্রুশিষ্টা ছলো একটু মন্থ...পুতানো শুভাখীদের দরজায় হাত পেতে ঠাঁড়ানোর মত চক্ষুজল। ঠ্যা একসময় আত্মহত্যা করতেও উজ্জ্বল হোসেছিলো...কিন্তু সেই মুহূর্তটি থেকে আমাকে উদ্ধার করলে আর এক ছুড়ী আঁতোনিয় ক্রোসে।

বর্ষ পরিচ্ছেদ

একজন লোক নাম বলেছিলো মাদ্রুসি, তার পেশা হোলো জরুরী—কিন্তু দামী জরুরে আমাকে ধারে পাইয়ে দেবে, এই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলো—আর এটো সূত্রেই আমার ঘরে অবাধ প্রবেশের অধিকারটুকু জোগাড় করেছিলো—কিন্তু পরদিন

সে ছিলো গুপ্তচর...রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগেরই কর্মচারী। কিন্তু সে পরিচয় তো প্রথমে পাইনি। সে আমার ঘরে এসে আমার বইপত্র নাড়াচাড়া করতো আর আমার সেই স্বাভাবিকতার উপর লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে মুগ্ধ ও উচ্ছ্বাসিত হোয়ে উঠতো। আমিও নিরীক্ষার মত তাতেই পুলাকিত হোয়ে কিছু কিছু ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়ে আরও মুগ্ধ করার চেষ্টা করতাম। আসলে তো সবই কীকীর খেলা—শুধু মজা দেখবার জুড়েই...

কিছু দিন পর গোয়েন্দাটা আমার আবার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এবার বললে যে, একজন পুস্তক-সংগ্রাহক আছেন, তিনি তাঁর নাম জানাতে চান না—তিনি হাজার সেকুইন দিয়ে আমার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি কিনে নিতে চান—অবশ্য প্রথমে এক বার দেখতে চান ওগুলো পড়ে। মামুংসি এ-ও শপথ করলো যে চরিত্র গুপ্তচর মতোই ওগুলি আমাকে ফিরিয়ে দেবে। কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই রাজী হলান। পরদিনই মামুংসি এগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল—ক্রেতা নাকি বলেছেন ও সব জাল। বেশ কয়েক বছর পরে জেনেছিলাম মামুংসি ওগুলো সোজা নিয়ে গিয়ে হাজার করেছিলো। গোয়েন্দা বিভাগে...প্রমাণ করা হোয়েছিলো আমি একজন উচ্চতরের বাহুরক।

দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও...হয়নি—আমার বিরুদ্ধে আমার ভাগ্যচকের চক্রান্ত তখনো চলছে। এই সময়তেই জর্নৈকা মাদাম যেমোর মাধার ঢুকলো যে তাঁর দুই ছেলেকে আমি নাকি পুরোপুরি নাস্তিক করে তুলেছি। আমার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ আনলেন...

...অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ অধিবর্তী সৈনিক তিনিও জানালেন তাঁর ক্ষোভ যে, আমার গুপ্তবিত্তার সাহায্যে তাঁর ভাইপোর আমি নাকি সর্বনাশ করেছি...সে একেবারে গোল্লায় গেছে। এ সব অভিযোগ গুরুতর হোয়ে উঠলো। পবিত্র চার্চের মধ্যস্থতা মানা হোলো...যখন প্রত্যেকের সাগ্রহ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রেপ্তার করা গেল না, তখন ওরা সমস্ত ব্যাপারটা সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে জানালেন। সেখানে আমার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ জমছিলো। আমি নাকি ঈশ্বর মানি না, শত্রুতানের পূজা করি, আমি মাংস খাই প্রতিদিন, অথচ কোনো দিন উপাসনায় বাই না। এই সবের সঙ্গে সকলের চেয়ে বিপ্লবজনক অভিযোগ ছিলো যে আমি নাকি বিদেশী পুতাবাসগুলির সঙ্গে অতিমাত্রায় মেলামেশা করি...আর রাজ্যের গুপ্ততথ্য পরিবেশন করে মোটা টাকা উপার্জন করি।

অশ্রুচর্য! এই সব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে, অথচ এগুলির কোনোটিরই মূলে এতটুকু সত্য ছিল না। অথচ এই সব অভিযোগ তুলে আমাকে সাধারণের শত্রু, রাজদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতকরূপে অভিযুক্ত করা হোলো...একেই বলে ভাগ্য!

ইতিমধ্যে আমার শুভার্থীরা আমাকে বেশ ছেড়ে যেতে উপদেশ দিলেন। তখনও আমার বিচার শেষ হয়নি আলোচনা চলছে...কিন্তু তাই-ই যথেষ্ট। কারণ সে সময় ভেনিসে শান্তিতে থাকতে পারতো শুধু তারাই বাদে অস্তিত্বটুকুও গোয়েন্দা বিভাগের অজানা—কিন্তু আমারও জেন কম ছিলো না...সত্যিই কোনো জন্মের যখন



উৎসবের দিনে

ক. হোডের

মুদ্রামিত

প্রমাণিত সাক্ষ্য

ক. হোড এও কোং

কলিকাতা-১৪

করিনি তখন কেন পালাবো? তাছাড়া তখন আমি একেবারে নিঃশব্দ, বা কিছু মূল্যবান ছিলো সব বাঁধা। তবু বুদ্ধি করে কাগজ পত্র, চিঠি, দলিল ইত্যাদি সব একজন পুরানো বন্ধুর জিম্বায় রেখেছিলাম।

একদিন রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরে দেখি, আমার ঘরের দরজা জোর করে ভেঙ্গে খোলা, আর সমস্ত জিনিষপত্র ছড়ানো, সমস্ত ঘরখানা কে যেন তহনছ করে রেখে গেছে। বাড়ীওয়ালীর কাছে শুনলাম, গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা, একদল পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন, বলেছেন যে বে-আইনী মুণের বস্তা রাখা আছে ঘরে, তারই খোঁজে এসেছেন। যদিও আমার যথাসর্বস্ব তহনছ করে খুঁজেও শুধু হাতেই ফিরে গেছেন। বুঝলাম আসল উদ্দেশ্য আমার জিনিষপত্র তরাসী-মুণের বস্তাটা ছলনা।—

“আমারও তাই বিশ্বাস, মুণের ব্যাপারটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়, সবকায় গোয়েন্দা বিভাগে আমিও কয়েক মাস ছিলাম। ওদের চালচলন কিছু জানি” ম’সিয়ে ব্রাগার্দা সব শুনে আমাকে বিবর গভীর স্বরে বললেন,—“আমার একটা কথা বিশ্বাস করো। এখনি পালাও তুমি ভেনিস ছেড়ে। ফুসিনাতে যাও, সেখান থেকে ফ্লোরেন্সে—আর বত দিন না আমি জানবো তোমার বিপদ কেটে গেছে তত দিন ফিরো না—”

অন্ধ জেদ আর গৌরবতুমি পেয়ে বসলো আমাকে। কানই দিলাম না বুকের উপদেশে,—অনুরোধে। শেষে ম’সিয়ে ব্রাগার্দা আমাকে সত্যের মিনতি জানালেন অন্ততঃ ওঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকার জন্ত। কারণ ওঁর মত সম্ভ্রান্ত, প্রতিষ্ঠাবান প্রতিপত্তিশালী লোকের বাড়ী আমার পক্ষে অনেক নিরাপদ। কিন্তু জানি না কেন যে তাঁর শেষ অনুরোধটুকুও সেদিন রাখিনি, তাহলে হয়ত আমার জীবনে আবার বিপদার ঘটতো না। মনে পড়ে শেষে উনি আমার সামনে বসে বসে কঁদে ফেললেন। সেই দেখে আমার সমস্ত বুকেটা মোচড় দিয়ে উঠলেও নিজের জেদ থেকে এক পাও টলতে পারিলাম না—কেন কে জানে? ততশ চোখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্নেহে আলিঙ্গন করে করুণ কণ্ঠে উনি বললেন—“কে জানে হয়ত এই শেষ দেখা।” আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলাম। কে জানতো ওঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল হবে—আর দেখা হবে না ওঁর সঙ্গে! ঠিক এগারো বছর পরে উনি মারা গিয়েছিলেন।

ভারাক্রান্ত অথচ দৃঢ় মনেই বাড়ী ফিরলাম। মনে পড়ে, সেদিন ছিলো ২৫শে জুলাই, ১৭৫৫ সাল। ম’সিয়ে ব্রাগার্দার ওখানেই আহাঙ্গারির পালা সারা হয়েছিলো—বাড়ী ফিরে সোজা আশ্রয় নিলাম শয্যায়।

\* \* \* \*

সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। এমন সময় কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি সর্বনাশ! পুলিশের বড়কর্তা আমার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—“আপনিই কি ক্যাসানোভা?” আমি স্বীকৃতি জানাতেই তিনি সেই মুহূর্তে আমাকে হুকুম করলেন উঠে পড়ে কাপড়-জামা বদলে তৈরী হোয়ে নিতে আর বা

কিছু কাগজপত্র ঘরে আছে সমস্ত পুলিশের হাতে দিতে।

—“টাইবুনালের আদেশ।”

আমার খোলা ডেকের উপর আমার বাবতীর কাগজপত্র, খাতা ইত্যাদি ছড়ানো। সেই দৃশ্যে অজুলি নির্দেশ করে আমি বললাম—“বা কিছু কাগজ দেখছেন ও-সব নিতে পারেন। একটা মস্ত খলির ভিতর সমস্ত কাগজপত্র ভরে ফেলা হোলো। তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায়? ওঁরা জানেন আমার কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি কাছেই আছে—এমন কি নামও জানেন দেখলাম—সেই দিন সেই মুহূর্তে আমার চোখ খুললো। বুঝলাম এসবই মাহুৎসির কীর্তি। সেই আমাকে মিথ্যা ছলনার ভুলিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে সমস্ত জানিয়েছে। সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি পুলিশে হস্তগত করলো, এমন কি পেত্রার্ক, হোরেস থেকে শুরু করে সমস্ত বইগুলিও—তার সঙ্গে চিঠিপত্র ইত্যাদি বত কিছু কাগজের টুকরো ছিলো ঘরে—সমস্তই নিয়ে নিলে—আর আমি এই সময়টা ঠিক বয়চালিতের মত মুখ বুজে পোষাক বদলে, দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে তৈরী হোয়ে নিচ্ছিলাম, একটি প্রস্থ, একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হোয়ে আমি যখন পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম তখন দেখে অবাক যে, পাশের ঘরে প্রাক্ত চম্পিশ জন পাহারাবন্দী আমার জন্তে রয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি আমাকে ধরবার জন্তে এতগুলি পুলিশ-পাহারাবন্দীর প্রয়োজন—জন হুই হোলেই যেখানে যথেষ্ট হোতো।

বাই হোক, চার পাশে চার জন পুলিশ-বেষ্টিত করে বড়কর্তা আমাকে একটা গণ্ডোলাতে তুললেন। তার পর যখন ওঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন আমাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন এক কাপ কফি খাবার ইচ্ছা আছে কি না। আপত্তি জানালে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হোলো। আমার মনের তখন এমনি অবস্থা যে, কি করে মুক্তি পাবো, বা কি ভাবে পালাতে পারবো, কিছুই ভাববার ক্ষমতা ছিল না। একটা সোফার উপর তল্লাছরের মত পড়ে রইলাম—মাঝে মাঝে এক একবার চমকে উঠে আবার তল্লাছর হোয়ে পড়ি। প্রায় তিনটির সময় ইনসপেক্টর এসে জানালেন যে, হুকুম এসেছে আমাকে পিয়োনীতে যেতে হবে। অর্থাৎ ‘লেডস’ এ থাকতে হবে। ঐ জেলখানাটার নাম ‘লেডস’, কারণ ওঁর ছাতটা টালির বদলে সীসার পাতে মোড়া। তাই ওঁর নাম ‘দি লেডস’। নিঃশব্দে অহুসরণ করলাম ইনসপেক্টরকে।

গণ্ডোলাতে চড়ে অনেক অলিগলি, অনেক বাঁক নিয়ে শেষ কালে বন্দিশালার সামনে এসে ভিড়লাম। তার পর অনেক সিঁড়ি আর অনেক উঠা-নামার পর একটা সেতু পার হোলাম, ঐ সেতুটা ‘দোজের প্রাসাদের সঙ্গে বন্দিশালার সংযোগ করেছে সেতুটাকে বলে ‘রিয়ো দি পালান্সো’। সেতুটা শেষ হোতেই ম লম্বা গ্যালারি। সেটা পার হোয়ে আর একটা ঘরে এলাম সেখানে অফিসারের পোষাকে একজন বসেছিলেন। আমাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে হুকুম দিলেন—আপাততঃ একটা সে

ঠিক করে বন্ধ করে রাখো। আমাকে এবার কারারক্ষকের হাতে দেওয়া হোলো। বিব

হুজর রক্ষীর প্রত্যয় নিয়ে সে এগোলো। প্রথমে ছোটো সিঁড়ি উঠে একটা গ্যালারি। তার পর চাবি খুলে একটা লম্বা হল, তার পর আর একটা গ্যালারি। আবার চাবি খুলে আর একটা গ্যালারি। সেটার পর আবার চাবি খুলে একটা ছোটো খুপরি। হুঁফুট চণ্ডা অন্ধকার খাঁচার মত ঘর, মাথার চেয়ে উঁচুতে ছোটো ফুলগুলির মত এতটুকু জানলা দিয়ে আলো আসে। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম এই বুঝি আমার কারাকক্ষ! না, ভুল আমার ধারণা, কারণ এবারও একটা মস্ত চাবি বেরোলো, একটা প্রচণ্ড ভারী লোহার শিক-জাঁটা দরজা খোলা হলো। আরও চমৎকার একটি খুপরি, সাড়ে তিন ফুট উঁচু। আর দরজার মাঝখানে আট ইঞ্চি গোল একটা গর্ত।

আমাকে যখন ঢুকতে বলা হলো, তখন আমি অবাক হোয়ে দেখছিলাম, দেয়ালে একটা ঘোড়ার খুরের আকায়ের অন্তত লোহার যন্ত্র। কারারক্ষক সেটা লক্ষ্য করে বললে,—‘বুঝেছি মশায়, ওটা কি আপনি জানতে চান না? ওটা হলো যখন ওপরওলারা কারো কানীর হুকুম জান, তখন তাকে ওর সামনে একটা টুলের উপর বসানো হয়, তার পর তার মাথাটাকে এমন ভাবে পিছনে হেলিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঐ যন্ত্রটা ঠিক গলার মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, তার পর গলার একটা সিকের দড়ি বেঁধে ঐ গর্ত ছোটো ভিতর দিয়ে

দড়িটাকে চুকিয়ে পিছনে যে চাকার মত যন্ত্র, তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর চাকাটা ঘরে ঘোরানো—যতক্ষণ না প্রাণটা বেরোয়—

—বা: বা: চমৎকার! আমার মনে হয় ঐ চাকা ঘোরানোর মহৎ কার্যটি আপনিই সম্পাদিত করেন—যুগ দিয়ে বেরিয়ে গেলো আমার।

কোনো উত্তর না দিয়ে কারারক্ষক তখন সোজা আমাকে সেই খুপরিটার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে। তার পর দরজার চাবি লাগাতে লাগাতে ফুটোটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কি খেতে চাই। আমি সজোরে উত্তর দিলাম—এখনো ভেবে ঠিক করিনি। বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা চলে গেল—পিছনে একের পর এক দরজার সতর্ক ভাবে তালা লাগাতে লাগাতে।

এতক্ষণে আমি নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন প্রচণ্ড বিক্ষোভে আর্তনাদ করে উঠলো—ঐ অন্ধকার অপরিসর গর্তের মধ্যে দুঃখে, হতাশায়, ক্ষোভে পাগলের মত হোয়ে উঠলাম। জানলাটা দুই হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ইঞ্চি পুরু লোহার জায়রীকাটা জানলা। পাঁচ ইঞ্চি চৌকো কোরে কাটা বোলোটা গর্ত তাতে। আলো একটু আসতে পারতো কিন্তু সামনের দেওয়ালের জানলার উপরই ছাদের মস্ত বড় বরগাটা এমন ভাবে এসে পড়েছে যে, একটু আলোর



অজন্তার চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাজমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৬৪-৬১৪০৭- জুয়েল-কুমারী ষড়িকার-গ্রাম-গিনিমার্ট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

ব্রাঞ্চ:

২০৮, রাসবিহারী এভিনিউ-কলিকাতা-১২

— কিন্তু —

কিছুটা নিরেন্স করিয়া কতকটা সম্ভা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন কোর জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নহারী নিকৃষ্ট সম্ভা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিরাচরিত কলাবৈপ্লবের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোর সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোরদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



সম্মানটুকুও ঢেকে গেছে। খয়ের ভিতর চেয়ে দেখলাম বিছানা, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি কিছুই নেই, কেবল একটা টাব, আর দেওয়ালে গাঁথা একটা কাঠের তাক ছাড়া। তাকের উপরই আমি আমার সিকের জোকা, নতুন কোট আর স্পেনের লেশের কাজকরা সাদা টুপীটা রাখলাম।

গরম, কি অসহ্য গরম—একটু বাতাসের আশায় আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি মাত্র জায়গা যেখানে কমুই ছুটোর উপর ভর দিয়ে একটু দাঁড়াতে পারি। কিন্তু সে সুখটুকুও সহ্যলো না। দাঁড়াতেই দেখি, সামনের খুপরাটাতে অসংখ্য বড় বড় ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। আমার রক্ত যেন জল হয়ে গেলো—চিরকাল ঐ প্রাণীটাকে ভয় ও ঘৃণা করে এসেছি। তাড়াতাড়ি কাঠের পালাটা টেনে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।

পুরো আটটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে, নিঃশব্দ হোয়ে। সে যে কি অল্পভূত তা' প্রকাশের অতীত। আমার একটুও ক্ষুধা ছিল না কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণা। মুখের ভিতর কেমন একটা তক্ত স্বাদ পাচ্ছিলাম। আরও তিনটি ঘণ্টা এই ভাবে কাটিতে আমি ফ্রোন্সে, ফ্রোন্সে, যন্ত্রণায় উদ্ভূত হোয়ে উঠলাম, চাৎকার করতে লাগলাম, আর্জিনাদ করতে লাগলাম দেওয়ালে আর দরজায় পাগলের মত লাথি মারতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে এই ভাবে ক্ষুধার মত পারিশ্রম্য করে ইত্যাশায়, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে যেকের উপর সোজা শুয়ে পড়লাম। আমার স্থির বিশ্বাস হোয়েছিলো যে, নিশ্চয়ই ঐ বর্বর অসভ্য গোয়েন্দা অফিসাররা আমাকে না খেতে দিয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মেরে ফেলবে ঠিক করেছে। কিন্তু কি যে আমার অপরাধ তা সত্যিই ভেবে পাচ্ছিলাম না, বার ফল আমার এই হুঁজুগ। হোতে পারি লম্পট, জুগাড়া, স্পষ্টবাদী, জীবনের নন্দোষ আমোদগুলির একটু বেশী প্রায় কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজই তো করিনি,—আইনের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই তো করিনি। ভাবতে ভাবতে আর মনে মনে শাপ শাপান্ত করতে করতে এক সময় ক্ষুধার জ্বালা আর অসহ্য ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বহন ঘুম ভাঙ্গলো তখন চারি দিকে নিকবকালো অন্ধকার! চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধু কালো কালো, আর কালো...বা নিক করে শুয়েছিলাম। সেই একই ভাবে থেকে হাত বাড়িয়ে ডান দিকের পকেট থেকে কমানটা বার করতে গেলাম...

কি সর্বনাশ! আমার আঙুলগুলো গিয়ে ঠেকলো একটা বরফের মত ঠাণ্ডা হাতে—

পা থেকে মাথার চুলগুলো অবধি আঁতকে খাড়া হোয়ে উঠলো। জীবনে এত নিদারুণ আতঙ্ক কোনো দিনও অনুভব করিনি। পুরো তিন চার মিনিট বোধ হয় আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। একটু সাড় হোতেই একবার মনে হোলো, আমার কল্পনা নয়তো ওটা? আবার হাত বাড়ালাম, আবার হুঁবারই সেই মৃতদেহের হিমশীতল হাতের স্পর্শ।

গলা চরে বেরোলো ডাক্তার, তীব্র, প্রচণ্ড আর্জিনাদ।

একটু সামলে নিয়ে ভাবলাম, বহন আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন বোধ হয় একটা মৃতদেহ এনে আমার পাশে ফেলে রেখে গেছে। কারণ, আমি বহন ঘরে প্রথম ছুঁকি তখন যে কিছুই ছিল না ঘরে,

সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার মনে কোলো কাউকে দেওয়া হোয়েছে, এটা তারই মৃতদেহ, আর আমার ঘরে ফেলে বাবা অর্থ বোধ হয় জানিয়ে দেওয়া আমার বরাতের ঐরকম মৃত রয়েছে। একথা মনে হোতেই সমস্ত ভয় প্রচণ্ড রাগে পরিবর্তিত হোলো। ওদের ঐ বর্বরতার বিরুদ্ধে যেন সমস্ত দেহ-মন প্রতিবা জানালো—রাগের আলায় উঠে বসতে গিয়েই এক মুহূর্তে বুঝলাম আমার এত আতঙ্ক সবই সৃষ্টি করেছে আমারি বা হাতখানি বা দিক ফিরে বা হাতখানি চেপে শোবার দরজা বন্ধ চলাচল করে হোয়ে গিয়েছিলো আর সেই জন্য অসাড় আর ঠাণ্ডা হোয়ে উঠেছিলো হাতখানি।

সমস্ত ঘটনাটা শেষ অবধি হাত্তরসের পর্যায়ে পড়লেও আমি কিছু এতটুকুও কৌতুক বোধ করিনি। বরং উদ্ভটটাই মনে হোয়েছিলো যে এমন ভয়ানক জীবন আমার শুরু হোলো যেখানে সত্যি ও মিথ্যার রূপে প্রকাশ পেতে পারে, অথচ বিচারশক্তি ক্রমেই হারাতে হবে...হয় অনন্তবের আশা নয় নৈরাশ্রের উদ্ভূত এই দুয়ের মাঝখানে দোল খেতে খেতে বুদ্ধিবৃত্তি সবই হবে ক্ষান্ত...

সমস্ত রাতের পর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ পেলাম দু'থেকে একের পর এক তালা খোলার। শেষ অবধি দরজার পা' থেকে কারাকরকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল—'কি খেতে চা' ভাববার সময় পেয়েছিলেন তো?'

বেশ ভয়ভাবেই আমি চাইলাম একটু, ভাত, স্থাপ, সিদ্ধ মাংস কিছু কটা, মদ আর জল। লোকটা একটু অবাধ হোলে দেয়লাম, আমার কাছ থেকে কোনোরকম নালিশ না শুনে সেটাই আশা করেছিলো। আমাকে বললো যে, 'আমি বিছানা কিংবা কোনো কিছু আসবাব চাইলাম না দেখে ও অবাধ হোয়ে গেছে। কারণ আমি যদি ভেবে থাকি যে আমাকে দু'একদিনের জন্যে আনা হোয়েছে এখানে তাহলে মদ ভুল করবো।

—যা' দরকার মনে করেন দিতে পারেন—

—আমি আবার কোথায় ছুটবো তার জন্য? এই পেলিস আ' কাগজ নিন—এতে লিখে দিন যা দরকার।

আমি জামাকাপড়, আসবাব ইত্যাদির একটা তালিকা দিলাম আর সেই সঙ্গে আমার যে বইগুলি পুলিশে নিয়ে গিয়েছিলো সেগুলিও লিখে দিলাম।

—আহা অত তাড়া নয়, অত তাড়া নয়। ওসব বই-পত্র কাগজ-কলম আয়না ফ্রু ওসব কাটুন...ওসব দেওয়া কে-আইনী বরং আপনার খাবারটা কেনার জন্যে কয়েকটা টাকা দিন—

আমি ওই অভদ্র বর্বরটার হাতে একটা সেকুইন দিলাম লোকটা চলে গেল। পরে শুনেছিলাম আরও সাত জন বন্দী ও 'দি জিডস্' এর সেলে রয়েছে। প্রায় দুপুরবেলা লোকটা ফিরে এলো খাবার আর আসবাবপত্র নিয়ে। একটি মাত্র হাতীর দাঁতের চা'—কাঁটা-ছুরী দেওয়াও বাবণ।

—কালকের বা দরকার সেটাই জানিয়ে দিন। কারণ, দি' একবারের বেশী আমি আসতে পারি না। আর আপনার কতকগুলি শিক্ষণীয় বই পাঠানো হবে। আপনার তালিকায় লে' বইগুলি দেওয়া বাবণ। সেজেটারী ছুঁম তাই—



# দেখুন! মাত্র অঙ্কে সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড়  
কাটা যায়!

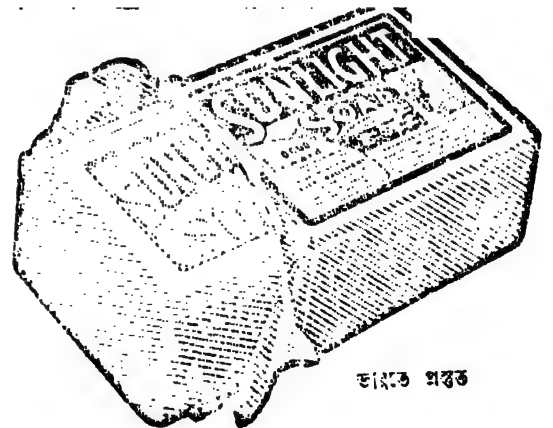


**সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ !**

ফেণার আধিক্যের দরুনই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অঙ্কে কত সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাটা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুনই প্রতিটি  
অয়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যকর মাদা এবং উজ্জ্বল !

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুনই জামাকাপড়  
বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

**সানলাইট জামাকাপড়কে মাদা ও উজ্জ্বল করে**

—বশ কথা, আমাকে একলা থাকতে দেওয়ার জন্য আমার ধন্যবাদ তাঁকে জানাবেন।

—বসতে বলছেন যখন বলবো। কিন্তু এসব ঠাট্টা-তামাসার ফল কিছু ভালো হবে না—

ঠাট্টা নয়, বদম্যেয় কয়েদীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার চেয়ে এ তো অনেক ভাল হোয়েছে—

—বদম্যেয় কয়েদী! কি বলছেন মশাই? আশ্চর্য্য! আমাদের এখানে কেবল মহৎ সম্ভ্রান্ত ভয়লোকদেরই রাখা হয়—অবশ্য তাঁদের বন্দী করার কারণ বিখ্যাত বিচারকই বলতে পারবেন, আপনার শাস্তি কঠোরতর করার জন্যেই আপনাকে এভাবে রাখা হোয়েছে আর আপনি আমার দিয়ে ধন্যবাদ পাঠাচ্ছেন?

—ও: আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

কারাবন্ধক চলে যাবার পর আমি টেবিলটা টেনে এনে দরজার সামনে রাখলাম একটা আলোর আভাস পাবার জন্যে—তার পর খেতে বসলাম। কয়েক চামচ স্যুপ ছাড়া কিছুই গিলতে পারলাম না—দীর্ঘ ষাটচল্লিশ ঘণ্টা উপবাসের পর কেমন যেন বমির ভাব আসছিল। সমস্ত দিনটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে কাটিয়ে দিলাম। নিদারুণ অবসন্নতা আমার দেহ-মন ছেয়ে ফেলেছিলো। এলো রাত্রি। ছুঁচোখের পাতা সারা রাত্রেও এক হোলো না। আলো-বাতাসহীন বন্ধ খুপরি—প্রতি পনের মিনিট অন্তর সেন্ট মার্কার্‌র গীর্জার প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনি...আর সারাক্ষণ মস্ত মস্ত ইদুরদের ছুটোছুটি আর কিচ্‌কিচিনীর শব্দ...আর সবার উপর হাজার হাজার পোকা আমার সর্বত্র যেন ছেঁকে ধরেছিলো, সমস্ত গায়ের রক্ত যেন পান্প করে শুবে নিছিল আর এই অসংখ্য পোকার বুদ্ধবুদ্ধ দংশন...আমার সমস্ত পেশীর আক্ষেপ শুরু হোলো—নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হোয়ে আসতে লাগলো...সমস্ত রক্ত যেন বিবাক্ত হোয়ে উঠলো...সে যে কি বহুদারুণ, নিদারুণ তিক্ততম অভিজ্ঞতা, সেটা অনুভব করার মত শক্তি কারো আছে বলে জানি না।

ভোরবেলা কারাবন্ধকটি আবার এলো, সঙ্গে কয়েক জন প্রহরী—কারাবন্ধকটির নাম জানলাম লরেন্স। ওই প্রহরীরাই আমার খুপরিটা ধুয়েবুছে বিছানা করে দিলে। এক জন হাত-মুখ ধোবার জন্য জল এনেছিলো—আমি জিজ্ঞাসা করলাম সামনের ছোটো খুপরিটাতে বেরোতে পারবো কি না...লরেন্স জানালো হকুম নেই।

দিনের পর দিন কাটলো আশা আর নিরাশায়—হতাশা আর ব্যর্থতায়—কোভে আর উদ্বাস্ততায়। প্রতি দিনই আশা করতাম, হয়ত কাল সকালেই দেখবো আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে। অবশ্য নিরাশও হতাম কারণ বা হওয়া উচিত, বা জার ভা কখনও পিয়োসীতে ঘটে না। অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর...দীর্ঘ ভারাক্রান্ত দিনগুলি কেটে গেল। নভেম্বরের প্রথম দিকে নিরাশায় আর ব্যর্থতায় মরিয়া হোয়ে ঠিক করলাম, যেখানে আমাকে জোর করে ধরে রাখা হোয়েছে সেখান থেকে আমি জোর করে বেরিয়ে যাবো।

এই একটা খেয়ালই মাথায় ঘুরতে লাগলো...সারাক্ষণ ওই একই চিন্তা করতে লাগলাম।

১৭৫৬ সাল। নববর্ষের দিন লরেন্স এসে হুকুলো হাতে একটা মস্ত প্যাকেট নিয়ে। তার ভিতর রয়েছে একটা ডেসিং পাউন্ড, ভালো চামড়ার লাইনিং দেওয়া, মস্ত ভালুকের চামড়ার ব্যাগ পা

লুকিয়ে বসার জন্যে আর সিকের সেপ। সেই অসহ্য নীচের ঠিকই এমন উপহার পেয়ে আনন্দে আমার চোখ কেটে জল এলো...বিশেষ করে যখন শুনলাম, মাসে ছয়টি সেকুইন আমাকে দেওয়া হবে ইচ্ছামত বই কিনে পড়বার জন্য। এই উপহার এই অতুলনীয় দান—সবই আমার পিতৃতুল্য, অকৃত্রিম বন্ধু, বৃদ্ধ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাছ থেকে। লরেন্সের কাছে শুনলাম, তিনি তদন্ত কর্মচারীদের কাছে, বিচারকের কাছে নতজানু হোয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রার্থনা করেছেন তাঁর স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ এগুলি আমাকে পাঠাতে। আমার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। একখানি কাগজে লিখে দিলাম—‘টাইবুনাালের সদাশয়তার জন্য আর ম্যাসিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের স্নেহের অকুরান উৎসবের জন্য ধন্যবাদ জানাই।’

এক দিন ভাগ্যক্রমে অনুমতি পেলাম ঘরের সামনের ছোটো খুপরিটাতে বেড়াবার। অবশ্য অল্প সময়ের জন্য। বাই হোক, হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়লো, একটা বিশ ইঞ্চি লম্বা লোহার পুরু শক্ত খিল (অর্গস) পড়ে রয়েছে—চকিতে মনে হোলো, এটা দিয়ে আত্মরক্ষার কাজ চালানো যেতে পারে হয়তো। তখন সেটা ডেসিং গাউনে ঢেকে নিয়ে এলাম। অবশ্য আরও অনেক লাভ্যচোরা জিনিষপত্র ও একটা ভাড়াগোছের সিন্দুক দেখলাম। ওই লোহার লম্বা রডটাকে নিয়ে পড়লাম পুরো আটটি দিন ধরে...এক টুকরো মার্বেল পাথরের উপরে, ক্রমাগত যবে যবে মুখটা তীক্ষ্ণ হুঁচালো করে তুললাম। আটটি ধারওলা পিরামিডের আকৃতির মত হোলো—সব কোণগুলি ক্রমেই হুঁচগ্র হোয়ে নেমে এসেছে। অবশ্য এত ব্যাপার বড় সহজে হয়নি। অনেক পরিশ্রম করে, তবে। একটুও তেল নেই, খুঁতুতে ভিজিয়ে নিয়েছি পাথরটা। ডান হাতের পেশীতে এত ব্যথা হোয়েছিলো যে, নাড়তে পারতাম না, হাতের চোটোতে তো দগদগে যা...কিন্তু বহুস্তে প্রস্তুত আমার শাপিত অন্তরের দিকে যখন চাইতাম, সব যন্ত্রণা তুল বেতাম। অবশ্য তখন ওটা নিয়ে কি কাজে লাগাবো বুঝতে পারি নি, তবে প্রথম কর্তব্য হোলো যে: ওই গোয়েন্দাটা আর প্রহরীদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে ওটা লুকিয়ে রাখা: সেটা বুঝেছিলাম।

একটা বেশ ভালো নিরাপদ জায়গা ঠিক করলাম ইজিচেয়ারের পিঠের লাগানো কুশানের ভিতরটা, সেখানে ওটা রেখে যে কী বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম সেটা পরে বুঝেছি।

আমি নিশ্চিত জানতাম যে আমার এই ঘরখানার নীচেই সেই জায়গাটা যেখানে সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার দেখা করানো হয়েছিলো। ঘরটা রোজ সাক্ষ করা হোতো। আসল কাজ হোলো এই অস্ত্রটা দিয়ে মেঝেতে গর্ত করে-তার পর বিচ্‌/৭/৭ চামড়ার সাহায্যে নীচের ঘরটার নেমে পড়া। আর বতরুপ না দরজা খোলা হয় টেবিলের নীচে লুকিয়ে থাকা। \* বেই কেউ আসবে তখন আছে আমার অস্ত্র—মুক্তির পথ খুঁজে দেবে। কিন্তু ভাললাম, এখন রোজ যে মেয়ে খুঁড়বো তাহলে খুলোর আর মেয়ে খোঁড়া গুঁড়োর ছুপ কোথায় লুকবো? লরেন্স আর প্রহরীর ভো বিছানার নীচটা রোজ পরিষ্কার করে—আমার বিশেষ করে বলা আছে রোজ ভালো করে সাক্ষ করতে।

ভাগ করলাম দারুণ ঠাণ্ডা লাগার, আর খুলো উড়লেই কাঁচি বাড়বে। কয়েক দিন এই চলতে বোধ চললো কিন্তু ওই

গোয়েন্দা লয়েলটা ঠিক সম্ভেহ করলো কিছু...এক দিন একটা বাতি জালিয়ে নিয়ে এসে ঘরের প্রত্যেকটি কোণ তন্ন তন্ন করে দেখে সাক করলো। আমার প্রবল আগ্রহি সত্ত্বেও। পরদিন সকালে আমি করলাম কি, আজুলে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে ক্রমালে লাগলাম। তারপর লয়েল এলে বললাম যে, কাল ধুলো ওড়ার ফলে কি হয়েছে দেখুন—আমার অসম্ভব কাশি বেড়েছিলো, সম্ভবত গলার কোনো শিরা ছিঁড়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হোলো, আমি আমার রোগের কারণ জানালাম, তিনি বললেন আমার কথাই ঠিক, ধুলোর মত ফসফুসের আর শত্রু নেই, এমন কি একটি সুবক কয়েক দিন আগে ঠিক এই রকম কারণে মারা গেছে... সাবাস, আমি বোধ হয় সুব দিয়েও এত ভালো স্বপক্ষে ওকালতী করাতে পারতাম না।

আমার লাভ হোলো প্রচুর, কারণ প্রহরীদের বারণ হোয়ে গেল যে আমার ঘর খুঁটি দিয়ে সাক করে আমাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। লয়েল আমার কাছে বার বার ক্ষমা চাইলে, শপথ করে বললে যে আমাকে খুশি করবার জন্যেই ও ঘর পরিকারের দিকে অভিমুখ করিতে।

দীর্ঘ শীতের রাত্রি...আমাকে প্রায় উনিশটি ঘণ্টা অন্ধকারেই কাটাতে হতো। রাত্রাঘরের মিটমিটে আলোও একটা ছুটলে কী ভালোই না হতো? কিন্তু কোথায় পাবো? এ কথা ঠিক 'অভাবই আবিষ্কারের শ্রষ্টা'—আমার একটা মাটির ভাঁড় ছিলো, তাইতে আমি ডিম রাগা করতাম, সেইটাকে শ্রালড মেন ভাঙি করে লেপ ছিঁড়ে তুলো বের করে সলিতা তৈরী করলাম, কিন্তু আগুন জালি কি করে? লয়েলকে বললাম যে দাঁতের ব্রশায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি আমাকে একটু 'পিউমিস ষ্টোন' (আগ্নেয়গিরির প্রচুর ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার পাথর) এনে দিতে হবে। স্বভাবতঃই ও বললে জিনিষটা কি তা জানেই না, তখন আমি যেন নেহাৎই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, তাহলে একটা চকমকি পাথর হোলেও চগবে যদি বেশ করে ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখা যায়। ওই বোকা শরতানটা প্রায় আধ ঘন্টা আমাকে দিলে।

আমার পা-জামাতে একটা মস্ত বকলস ছিলো। ইস্পাতের...চকমকি, ইস্পাত যাই ছুটলো বলে বেশ গর্ব হোলো তখন। কিন্তু আরও বাকী বেগান্ডের...আগেকার পুরানো দাগ দেখিয়ে ডাক্তারকে চর্খরোগের ভাঁওতা দিয়ে কিছু সালকার পর্যন্ত আগায় করলাম নিজেই অল্প তৈরী করে নেবো বলে। যেন অল্প তৈরীর জন্যেই চাইছে এই ভাবে এমন সোকারজি লয়েলের কাছে দেশলাই চাইলাম যে ওর পকেটে যে কয়টা কাঠি ছিলো ও সব কয়টাই দিয়ে দিলো কিছু না ভেবেই। এবার শেষ দরকার কিছু জিনিষের বা সহজেই অগ্নে উঠবে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার দর্জিরের বলা

আছে আমার সব পোষাকের বগলের তলার কাপড়ের ভিতরে 'টাকউড' দেওয়া থাকে যেন; কারণ তাতে ঘাম শুবে নেয়। আর ওই বিশেষ ধরণের কাঠটা সহজেই অগ্নে ওঠে জানি, সামনেই কোটটা পড়ে রয়েছে দেখে আশায় আনন্দে বুট্টা ছলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও জাগলো, কি জানি এটাতে হয়তো দেয়নি। মাঝে মাঝে এক একটাতে তুলে যাওয়াও তো কিছু বিচিত্র নয়। আশা আর নিরাশার ছলতে ছলতে খুলে ফেললাম ভিতরটা—জয় ভগবান! এই তো রয়েছে। আর কি চাই? সব উপাদানই তো পেলাম। সে যে কী আনন্দ...সেই নিকষ-স্বন অন্ধকারে এই প্রথম আলোর আভাস জানালাতে...যে আলো আমারি হাতের সৃষ্টি। আঃ কি তৃপ্তি আর সেই ভয়াবহ দীর্ঘ ভাবাক্রান্ত রাত্রির আক্রমণ হবে না—

মেঝেটা কাঠের ছিলো। প্রায় ছটি ঘণ্টা খোঁড়বার পর প্রায় এক তোয়ালে-ভরা গুঁড়ো জড়ো হোলো। এক পাশে ঢেলে রাখলাম, ভাবলাম সামনের খুপরীটাতে বেড়াবার সময় সিন্দুকের পাশে ঢেলে দিয়ে আসবো। প্রথম তক্তাটা প্রায় ছ ইঞ্চি পুরু, সেটা গর্ত হোলে দেখি, তলার আবার একটা তক্তা। প্রায় তিনটি সপ্তাহ লাগলো আমার তিনটি তক্তার ভিতর গর্ত করতে। কিন্তু তার তলটা দেখে হতাশ হোয়ে পড়লাম। এবার দেখি মার্বেল পাথরের মোজেক...আমার হস্তটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটু দাগও বসাতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে গল্প মনে পড়ে গেল হানিবল কি করে আলস পর্বতের ভিতর পথ করে বেরিয়েছিলো—পাহাড়টাকে ভিনিগারে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে—আমিও দিলাম ঢেলে সমস্ত ভিনিগারটা ওই গর্তটা দিয়ে। পরদিন সকালে দেখি, যে কারণেই হোক মোজেকের গাঁথনির বাঁধনিটা গলে গিয়ে ওপরটা কুঁকড়ে গিয়েছে। তখন আমার ওই লোহার বড় দিয়ে প্রাণপণে ঘষে ঘষে গর্ত করতে পারলাম। দেখি, তলার আর একটা কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে—মনে হোলো এটাই নিশ্চয়ই শেষ স্তর।

ফোন  
৩৪-৫০০২

সবকিছুটি সম্মত  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
গিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাঙ্গ

কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বঙ্গ বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

উঃ, মনে পড়ে তখন মনের কী অবস্থা না গিয়েছিলো—কী একাগ্র কাতর প্রার্থনার আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটতো! শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তা হইতো তর্ক করবেন প্রার্থনা করে লাভ কি—ও তো ভুয়া ইত্যাদি কিন্তু তাঁরা জানেন না আমার আপন অভিজ্ঞতার আমি যা জেনেছি একাগ্র গভীর প্রার্থনার যে কি শক্তি পেয়েছিলাম বলতে পারি না—ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি নাই স্বীকার করি, একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসের মনের জোর থেকেই এ শক্তি আসে।

তেইশে অগাষ্ট আমার সব কাজ শেষ হোলো। শুধু গ্লাটারটুকু থানো বাকী। ছোটো একটা ফুটো দিয়ে সেক্রেটারীর ঘরখানা এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার বুদ্ধির দিনটাও আগে থেকে ভেবে রেখেছিলাম। সেট অগাষ্টনের জোজের উৎসব হবে সাতাশ তারিখে...এই প্রাসাদেরই অন্তঃস্থ সমস্ত কর্মচারী এবং কর্তব্যবুদ্ধির একটা সম্মেলন আর উৎসব হবে। এদিকটোতে কেউ থাকবে না, অতএব এই তারিখেই পালাবার সবচেয়ে সুবিধা...

কিন্তু কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবী আমার! পঁচিশে অগাষ্ট আবার নামলো তাঁর কৌতুক অভিশাপের ছদ্মবেশে। সেদিনের কথা ভাবল অজ্ঞ ও শিউরে উঠি। মনে পড়ে দুপুরের দিকে ঠাণ্ডা তালু আর খিল খোলার শব্দ শোলাম। লাক্ষিয়ে উঠে পড়ে ইন্জিচেরারে বসে পড়লাম—পরমুহূর্তে ঘবে ঢুকলো লরেন্স। রীতিমত উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে বললে—‘সুসংবাদ এনেছি মশায়, সত্যিই সুসংবাদ।’

প্রথমটা ভাবলাম বুদ্ধি আমার ক্ষমার আদেশ এসেছে, তাই বুদ্ধি পেলাম। কিন্তু ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠলো পাছে গর্ভটা ঘরা পড়ে। সে ভাবটা চেপে বললাম—দাঁড়ান সোবাক বললে আসছি—না, না তার দরকার নেই। আপনাকে শুধু এই নরককুণ্ডের মত ঘর থেকে অন্তঃস্থ ঘরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে। সে ঘরখানা বড়, সবে কলি কেবানো হয়েয়েছে, তাছাড়া বড় বড় দুটো জানলাও আছে—সেখান থেকে প্রায় অর্ধেক ভেনিসটাই দেখতে পাবেন। ...এমন কি সোজা হোয়ে দাঁড়াতেও পারবেন এমন উঁচু ঘর—

আমার মনে হোলো মুর্ছা যাবো।—একটু ভিনিগার দিন, কোনো মতে আমি বললাম, ‘আর সেক্রেটারীকে গিয়ে বলুন আমি তাঁকে আর ট্রাইবুনালকেও বস্ত্রবাহ জানাচ্ছি এই করুণার জন্য, কিন্তু আমি এই ঘরেই থাকবার অনুমতিটুকু তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাই। আমার বেশ অভ্যাস হোয়ে গেছে। আমি বল করতে চাই না।

—আপনি কি পাগল হোলেন নাকি মশায়? কিসে আপনার ভালো হবে বুঝতে পারেন না? লরেন্সের সেই অতি বিনীত গা-ঝালানো চিবিয়ে কথা যেন কানে গরম সীসে ঢালতে লাগলো—আপনাকে বলে নরক থেকে উদ্ধার করে বর্গে নিয়ে যাওয়া হোচ্ছে আর তাইতে আপত্তি? আশ্রন, আশ্রন, হুকুম তো মানতেই হবে। আমার হাত ধরে চলুন, বই আর ভিনিবগার ওরা আনবে—

জানতাম বিদ্রোহ করা মিথ্যা। হুশিয়ার মৃতপ্রায় অবস্থা তখন, কোনো মতে ওর হাতে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম।

দুটো সফ বাবান্সা পেরিয়ে তিন খাপ ওঠে আবার একটা হল পেরিয়ে আরও একটা সফ বাবান্সা পেরিয়ে আবার নতুন জারগাটোতে পৌঁছলাম। ঘরের ভিতর অব্যক্ত একটা ভাল মেওয়া জানলা কিছু ঢাকা বাবান্সাতে দুটো ভাল ঢাকা জানলা ছিলো—তা থেকে বহুদূর প্রায় ভিড়ো অবধি দেখা যায়। জানলা দিয়ে নরম মিলি খোলা হাওয়া আসছিলো—খোলা হাওয়া তো আমার কাছে বড় দিন অপরিচিত... কত দিন বুকভরা নিঃশ্বাস নিইনি! কিন্তু এসব কিছুই সে সময় ভালো লাগছিল না—একমাত্র সাধনা যে আমার ইন্জিচেরারটা ইতিমধ্যেই এসে গেছে আর তারই পিঠে লুকানো আছে যন্ত্রটা। আমার বিছানাটাও এলো এবার অন্তঃস্থ ভিনিগারলি আনতে গিয়ে প্রহরীরা আর ফিরলো না, দু’টি ঘটা কি অসহ্য হুশিয়ার কাটলো...আমার সেলের দরজা অবধি খোলা রয়েছে...এর চেয়ে অস্বাভাবিক এখানে আর কি হবে? কি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর দুর্ভাবনার মুহূর্তগুলি কাটতে লাগলো—এমন সময় মনে হোলো কে যেন দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে...পরমুহূর্তে লরেন্স এসে ঢুকলো...রাগে বিবর্ণ হোয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কেনা বেরোচ্ছে আর স্পন্দনশাপাঙ্ক করছে। হুকেই আমাকে বললে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা কিছু আছে সব ঘরে দিতে আর যে প্রহরী আমাকে এই সব সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তার নাম বলতে। আমি বললাম ওর কথা আমি কিছুই বুঝি না। তখন সঙ্গে লোকদের হুকুম করলে আমার দেহ তল্লাসী করতে—আমি লাক্ষিয়ে উঠলাম, সমস্ত জামাকাপড় নিজেই খুলে ফেলে দাঁড়িয়ে বললাম—যা করবার আছে কর...কিন্তু খবরদার আমাকে ছোঁবার সাহস কোরো না—

ওরা আমার বালিস বিছানা সব তল্লাস করে খুঁজলো। ইন্জিচেরারটার কুশন অবধি, কিন্তু পিছনের স্পীংএর ভিতর খুঁজে দেখার মত বুদ্ধি ওদের ছিল না। লরেন্স বললে,—মেবের উপর কি যন্ত্র দিয়ে গর্ভ খোঁড়া হোয়েছে?...জানি সহজে বলবেন না। কিন্তু আমরাও কথা বার করবার উপায় জানি—

—‘বদি সত্যিই মেবোতে গর্ভ খোঁড়া থাকে...আর এই নিয়ে বদি আমাকেই প্রেরণ করা হয় তাহলে আমি সোজা বলবো আপনিই আমাকে নিজের হাতে এই সব যন্ত্রপাতি এনে দিয়েছিলেন...আর সেগুলো আমি আপনাকেই আবার ফিরিয়ে দিয়েছি—’

আমার বলার ভঙ্গীতে আর দৃঢ়তায় ও ভক্তিত্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর নিরুপায় কোতো আর ক্রোধে নিজের মাথার চূড়, হিঁড়তে হিঁড়তে বেরিয়ে গেল। বাবার সময় প্রচণ্ড আক্রোশে বাবান্সার জানলা দু’টিও সশব্দে বন্ধ করে দিলে। আবার সেই কুদ্বাস কারাক...

সারা দিনের পর এনে দিলে পুতিগন্ধময় নোংরা খানিকটা মদ, মাংস, কুটি আর জল। সে আমি স্পর্শ করতও পারলাম না। মাংসটা পর্যাপ্ত সম্পূর্ণ পচা। সমস্ত দিন রাত্রি কাটলো অনিয়ার অনাহারে তৃষ্ণার আর অসহ্য গরমে। পরদিন আবার এরকম দুর্গন্ধময় খাদ্য নিয়ে ঢুকলো—আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম—আমাকে অনাহারে আর বাসরোধ করে মারবার হুকুম এসেছে কি? কিন্তু আমার কোনো কথায়ই ও কর্পণাত করলো না। প্রায় আটটি দিন কাটলো এমনি প্রায় অনাহারে আর উত্তপ্ত বাস-রোধকারী বন্ধ ঘরে। এক এক সময় মনে হোতো এবার ওকে খুন

। কেলো ঘরে ঢুকলেই। সেদিন রাতে যে কারণেই হোক হুনিয়া ভায়েছিলো। সকালে ঘরে ঢুকতেই প্রহরীদের সামনে ওকে বস্ত্রপঞ্জীর ঘরে বললাম—আমার হিসাবপত্র ঠিক করে এনে দেখাতে। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কি কি খরচ আমার জন্তে করেছে তার পাই পরসাতার হিসাব অবধি দিতে হবে। এই কথার লয়েল স্পষ্টই একটু হতভম্ব হোয়ে গেল। অবশেষে সঙ্গে বললে, পরদিন সব হিসাব আমাকে দেখাবে।

পরদিন ভোরেই ও হাজির হোলো এক বুদ্ধি সেবু নিয়ে, যাঁসিরে ব্রাসপাঁদীর উপহার। তা ছাড়া আমার খাতেরও চমৎকার পরিবর্তন। একটি আন্ত হুয়গীর রোট, এক বোতল ঠাণ্ডা সুবাহ্ জল। আমাকে হিসাবও দিলে। চোখ বুলিয়ে দেখলাম চার সেকুইন অবশিষ্ট। লয়েলকে বললাম তিনটি সেকুইন ওর দ্বীকে দিতে, বাকী একটি প্রহরীদের ভাগ করে দিলাম। এইটুকুতেই ওদের প্রসন্নতা লাভ করলাম।—গভীত খুঁড়বার জন্তে আমি বস্ত্র এনে দিয়েছি—এটা বা কি করে হোলো তা'ন বুঝলেও আপনাকে অধিখাস করছি না। কিন্তু দয়া কর বলবেন এ আলো তৈরীর উপকরণগুলো কে—কোনো—লয়েলের অনুমতের ভিত্তিতে, বললাম,—সেও আপনি। আপনিই তো আমাকে তেল, চকমকিপাথর দেশলাই সবই দিয়েছেন—আমি সবই আপনাকে বলতে পারি আর সত্যি কথাই বলবো তবে এখানে নয়। সেক্রেটারী আর টাইবুনালের সামনে—রক্ষা করুন। হার ভগবান! আপনাকে কিছু বলতে হবে না। গরীব ছাণোবা মানুষ আমি। আমার চাকরী বাবে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে বসতে হবে—বলতে বললে লয়েল পালালো।

এক দিন আমি বই কিনতে গিয়ে লয়েল বললে—এই পরসাতা নষ্ট করে কেউ বই কেনে! আপনাদের বসন এত পড়বার সখ তখন আমাদের আর একজন বন্ধীর কাছ থেকে আপনাকে বই ধার করে এনে পড়াতে পারি, তাতে পরসাতাগুলো বাঁচবে—

—উপস্থান? আমার দুগা হয় পড়তে।

—না না, বিজ্ঞানের বই। আপনাদের কি গারণা মন্দাই, যে আপনিই একমাত্র বিদ্যান লোক?

—বেশ অল্প বিদ্যানটিব কাছ থেকেই বই আহুন। বয়ঃ আমার একখানা তাঁকে পড়তে দিয়ে বাকী একটা আহুন—

আমি তাঁকে দিলাম 'বেশনারিয়াম' আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লয়েলের হাতে এলো 'উলক' এর প্রথম খণ্ড।

বইখানার ভিতরে একটি পাতার মার্জিনে লেখা দেখলাম 'ভবিষ্যতের জন্য হুচিচ্চাই সর্বনাশ আনে।' লেখাটা দেখেই মনে হলো এই বন্ধীর সঙ্গে পত্র-বিনিময় করলে ভো হয়। কিন্তু কালি, কলম, পেন্সিল? কিছুই নেই না থাক, আমার ডান হাতের তর্জনীর নখটিকে বাড়িয়ে হুচালো করে ঠিক কলমের নিবের মত করেছিলাম জামের সঙ্গে ডুবিয়ে এখন কালির মত করে লিখতে পারিগাম। ওরই বইএর পাতার লিখে দিলাম একটি আট লাইনের লাতিন কবিতা আর আমার কাছ থেকে সব বই আছে তার তালিকা। লেখার পরই মনে দারুণ আগ্রহ কি উত্তর আসে জানার—দীর্ঘ দিনের পর বাস্তবের মনের সন্ধান। এ কিংকর কথা! লয়েল ভোরে আসতেই বললাম—এ বইখানা আমার পড়া অল্প

একটা বদলে আনবেন। দ্বিতীয় খণ্ড এলো ভিতরে ভাঁজ করা ছোট কাগজ—

আমরা দু' জনে একই কাগজের বন্ধী। এখানে আপনাদের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগে অভ্যন্তর আনন্দিত। আমার নাম 'মার্ভিন বালবি'। আমি ভেনিসবাসী। মঠের সাধু ছিলাম—এখানে আমার সদৌ কাউন্ট আদ্রিয়া। তিনি বলেছেন তাঁর সব বই আপনি খুঁচী মত পড়তে পারেন। সে সবকে এই বইটার মলাটের শিহনে লেখা আছে। কিন্তু একটা কথা, সাবধান হবেন—লয়েল যেন আমাদের পত্রালাপ সবকে কিছু জানতে না পারে—

চললো আমাদের পত্রালাপ। ওদের জানালাম আমার পরিচয়। উত্তরে দীর্ঘ বোলোটি পাতার বালবির পরিচয় পেলাম। চার বংশ ও এইখানে বন্ধী। তিনটি তর্জনীর সঙ্গে ওর অবৈধ সংসর্গের ফলে যে সব অবৈধ শিশুর জন্ম হোয়েছিলো তাদের 'বালবি' নিজের নামে ব্যাপটাইজ (দীক্ষিত) করে এই তার অপরাধ। অবশ্য বালবির বস্তব্য এই যে বেহেতু তারা ওরই সম্মান সেই হেতু তাদের নিজের নামে দীক্ষিত করাই ওর সত্যসঙ্গত কর্তব্য।

সে বইই হোক, আমি এদিকে বেশ বুকেছিলাম যে মুক্তি যদি পেতে হয় নিজের চেষ্টাতেই পেতে হবে বা আপাত হুঁটিতে অসাধ্য। কারণ এবারে বেরোতে হলে ছাদ ফুটো করে বেরোতে হবে। অথচ আল-কাল আমার ঘরের দেয়াল মেঝে বোজ তর তর করে দেখা হয়। ছাদ ফুটো করতে হলে প্রয়োজন পাশের ঘরের ওই সাধুটির সাহায্য। ওই দিক থেকেই করতে হবে। লিখে জানালাম হুঁটি পেতে চায় কি না। উত্তর এলো তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। আমি লিখলাম তাহলে শপথ করতে হবে আমার সব কথা বিনা প্রতিবাদের শোনার। বাকী হোলো আমার হুঁটির বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম প্রথমে ওর ঘরের ছাদ ফুটো করতে হবে তার পর দুই ঘরের মাঝখানের এই দেয়ালটা—বাস, তাহলেই ওর দারিদ্র্য শেষ বাকী সব ভার আমার। ওই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম লয়েলকে বলে কিছু সাধু মহাত্মাদের বড় বড় ছবি আমিই ঘরের চার দিকে টাঙাবার ব্যবস্থা করতে। কারণ ছবি দিয়ে দেয়ালের গর্ত সহজেই ঢাকা যাবে।

এখন কথা হোলো লোহার রডটা পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়ে। চট করে মাথার একটা মতলব এলো। একটা পরের দিনে লয়েলকে বললাম যে আমি কিছু ম্যাকারনি রাখতে চাই নিজের হাতে নিজের কচিনত বশলা ইত্যাদি দিয়ে—বাতো খানিকটা সেই সাধুটি, বিনি আমাকে বই পাঠান তাঁকেও পাঠাতে পারি। নির্দিষ্ট দিনে একটা মোটা বড় বাইবেলের শিহনে মলাটের কাঁকে সেই লোহার রডটা গুরে বইটার উপর মস্ত একটা ভিলে ম্যাকারনি, আর পল্লীর মাথনে ছাপা-ছাপি করে লয়েলের হাতে দিলাম। গলানো মাখনের ভিতর ম্যাকারনির আর পল্লীরের গন্ধে লয়েলের চোখ আর নুখের ভাবটি যে কি উপভোগ্য হোয়েছিলো—আর কোনো দিকে মন দেবার মত অবস্থা ওয় ছিল না। যিনিটি পাঠকের মধ্যেই এসে বললে বখাওয়াত শৌছে গেছে সেটা।

কাজ সফল হোলো। কিন্তু এমন বরাত আমার যেদিন 'বালবি' জানালে যে ছাদ ফুটো করা হোয়ে গেছে, একটা ছবি আঠা দিয়ে সেই গর্তটিতে সঁটে দিয়েছে। আমাদের দেয়ালের ফুটোও প্রায় শেষ শুধু একখানা ইট সন্ধান বাকী। সেই ওসে আমি ঠিক করলাম



পরদিন রাতেই আমাকে পালাতে হবে—এক বার ছাপ ফুটো করে বেরোলেই বাইরে বাবার পথ ঠিক বুঝে নেবো। কিন্তু ঠিক দুপুর দুটোর সময় তখনতে পেলাম বাইরের সেলের দরজা খোলার শব্দ। তক্ষুণি তিনটি টোকা দিয়ে ইশারা করলাম বালবিকে কাজ থামাতে, শব্দ না হয়। একটু পরেই লয়েল ঢুকলো যবে সঙ্গে প্রহরী দুই জন আর একজন বিশৃঙ্খল পোশাকের উজ্জ্বল চেহারার বন্দী। হাত দুটো খুব কষে ধাঁধা। লয়েল আমার কাছে ক্ষমা চাইলে, এক জন চুশরিত্রকে আমার একই ঘরের সঙ্গী করে দিতে হোচ্ছে বলে। আমি শুধু বললাম—“টাইবুনাালের আদেশ মানতেই হবে। আপনার কি দোষ—”

লোকটির সম্পত্তি একটি ছেঁড়া মাত্র। আর দিনে দশ পরসা খোরাকী। কিন্তু আমার সমস্ত মন চরম হতাশায় ভেঙে পড়লো—প্রতি বারই মুক্তির যুগুর্ভে একী নতুন উপদ্রব! বাই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবার চেষ্টা করলাম। লোকটিকে আমার খাতের অংশ গ্রহণ করতে বলায় দেখলাম ও কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। পরে লক্ষ্য করলাম আমার সেলের চতুর্দিকে চেয়ে ও কি যেন বুঝে বেড়াচ্ছে—জিজ্ঞাসা করতে বললে, ভার্জিন মেরীর কোনো ছবি আছে কি না তাহলে ও প্রাণ দিয়ে হারি কাছে প্রার্থনা জানাবে। আমি ভাবলাম ও হয়তো আমাকে একজন ভক্ত ইহুদী ভেবেছে। সেইটার সুযোগ নিয়ে দেখলাম আমি একজন গোঁড়া ক্রীশ্চান—ওকে পবিত্র ভার্জিনের ছবি দেখলাম বই খুলে—ও ছবির সামনে নতজাহ্নু হয়ে মালা জপ করতে লাগলো। পরে আহাবাদি সেরে আমার অবশিষ্ট সুরাটুকু শেষ করে দিলে—তার পরই শুরু হলো নেশার প্রলাপ আর কায়া। ওর অসলগ্ন কথা থেকে বুঝলাম—গোয়েন্দা বিভাগে গুপ্ত-চরের কাজ করতো—অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করায় এই শাস্তি।

বালবিকে আবার খবর দিলাম ঘটনাটা জানিয়ে। আশা দিলাম ভেঙে পড়ার কারণ নেই, শুধু কাজটা এখন বন্ধ থাক বত দিন না আবার জানাই। লোকটার নাম সোরাদাচি। ওকে দেখলাম দু'বার বিচারের জন্ত নিয়ে যাওয়া হলো—দু'বারই কিরে এলো। বুঝলাম এর হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। অতএব প্রথম পছাটাই কাজে লাগলাম। প্রথমতঃ ওকে পরীক্ষা করবার জন্ত দু'বারই যখন ওকে টাইবুনাালের বিচারের জন্ত নিয়ে যাওয়া হয় একটা চলনার উপায় বার করেছিলাম। দু'বারই দেখলাম ও সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তাই নিয়ে যেন আমার সর্বনাশ হোয়ে গেছে এমন ভাণ করে ওকে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি করলাম, তারপর বিহানার অনড়, অচল নির্বাক হোয়ে শুয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে লয়েলকে দিয়ে একটি পবিত্র ক্রশ, আর দু'বোতল পবিত্র জল এনে রেখেছিলাম। আমার ধার্মিকতা সন্দেহে সোরাদাচি যথেষ্ট অভিভূত ছিলো। এখন আমার এই অবস্থা থেকে ওর ভয় হলো—বহু অমুনর, বিনয়, কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি কোনো কিছুতেই কান দিলাম না। মনে মনে তখন এক বিচিত্র হান্তরসের অভিনয়ের মহড়া দিছি। সেই দিনই বালবিকে জানালাম—ভয় নেই, তবে আমাদের মুক্তি অতি কঠিন সতর্কতার সঙ্গ হত্যোর যুলছে—খুব সাবধান—আজই রাতে...

আমি ততক্ষণে মোটামুটি দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছিলাম। জানতাম নভেম্বরের প্রথম তিন দিন বিচারালয় আর তদন্ত বিভাগের

সমস্ত কর্মকর্তারা ডেনিসের বাইরে চলে যান। আর এই সুযোগে এই তিন দিন রাতে লয়েল মনের স্বখে নেশায় বুদ্ধ হোয়ে থাকে—

সবচেয়ে সুবিধা হোয়েছিলো, সোরাদাচি আমাকে অসম্ভব ভয় করতে শুরু কোয়েছিলো—ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মত সাধুর অভিশাপ সহজেই ফলবে। সেদিন সারা দিন না খেয়ে পড়েছিলো—আমি ভাবলাম ওর নিক্রোধ দুর্বল মনের যুক্ততাকে কাজে লাগানোর এই সুযোগ। ডাকলাম ওকে—উঠ এসে আমার পায়ের তলায় পড়ে হাউ-হাউ করে কাদতে শুরু করলে। বললে, আমি ক্ষমা না করলে ওর নিশ্চিত মৃত্যু হবে। সুযোগ নিলাম অন্ধ বিশ্বাসের—গভীর স্বরে বললাম,—“বসো, কিছু খাও। জানো আজ ভোরে আমাদের পবিত্র দেবী ভার্জিন মেরীর আবির্ভাব হোয়েছিলো—তোমাকে ক্ষমা করতে আদেশ দিয়ে গেছেন—। তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় আমার কতবড় সর্বনাশ হোতো সেই ভেবে আমি পাগল হোয়ে গিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সাধনা ছিলো যে, আমার অভিশাপে তিন দিনের মধ্যেই তোমাকে মরতে হবে। হঠাৎ ভোরবেলা দেবীর আবির্ভাব—আহা আমার কত জন্মের পুণ্যফল!—যা হোক দেবী-মঙ্গলেন, সোরাদাচির ভক্তিতে আমি তুষ্ট, ওকে ক্ষমা কর আর ওকে এই-স্বার জন্ত তোমার পুরস্কার হোলো মুক্তি—আমি মানুষের বেশে এক ঈশ্বর দেবদূতকে পাঠাচ্ছি, সে ছাত ফুটো করে তোমার ঘরে আবির্ভূত হোয়ে তোমাকে উদ্ধার করবে। তুমি সোরাদাচিকেও তোমার সঙ্গে মুক্ত করতে পারো, যদি সে প্রতিজ্ঞা করে গুপ্তচর বৃত্তি ছাড়বে জন্মের মতো—” এই বলে দেবী মেরীমাতা অদৃশ হোলেন—

মনের আনন্দ চেপে রেখে লক্ষ্য করতে লাগলাম বিশ্বাসঘাতকটার মুখের ভাব। ওর হতভব ভাব দেখে আরও বিশ্বাসটাকে পাকা করবার জন্মে সমস্ত ঘরে পবিত্র জল ছিটিয়ে শুদ্ধ ভাবে বাইবেল খুলে পড়তে লাগলাম—আর ভার্জিনের ছবির সামনে মাঝে মাঝে নতজাহ্নু হোয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। সমস্ত দিন জল ছাড়া কিছুই খেলাম না আর সোরাদাচি সমস্ত সুরাটুকুই শেষ করলে।

নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনাক্রমে আগে আমি খুব আড়ম্বরের সঙ্গে নতজাহ্নু হোয়ে প্রার্থনায় বসলাম। গভীরকণ্ঠে আদেশের স্বরে সোরাদাচিকেও বললাম প্রার্থনায় বোগ দিতে। তখন ও আদেশ পালন করলে, চোখে দেখলাম ভয়, সন্দেহ, সংশয় সব জড়ানো অন্ধুত দৃষ্টি—মনে মনে হাসলাম দেবদূতের আবির্ভাবে সংশয়ের শেষ রেশটুকুও কেটে যাবে।

যেই শোনা গেল অপরিচিত শব্দ দেওয়ালের ওধারে তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সোরাদাচিকেও ঘাড় ঘর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দিলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম—দেবদূত! দেবদূতের আবির্ভাব হবে—স্পষ্ট তখনতে পেলাম শেষ ইটটি সরানো হোলো—বালবিও নেমে গেলো।

—সারা দিন প্রার্থনা করো, চুপ করে শুয়ে থাকো দেওয়ালের দিকে মুখ করে। আর মৌনব্রত নাও, তাহলেই হবে। না, কারো সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ করতে পারবে না। আজ সারা দিন এই ভাবে প্রার্থনিক্ত করো। বিনা প্রতিবাদে মনে নিলো সোরাদাচি। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো লয়েল।

[ ক্রমশঃ ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু





ফুলের মত...

আপনার লাভণ্য রেয়োনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেয়োনা সাবান ব্যবহার করলে  
আপনার লাভণ্য অনেক বেশি সতেজ,  
অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার  
কাছ, একমাত্র সুগন্ধ রেয়োনা সাবানেই  
আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ফুলের সৌন্দ-  
র্যের জন্যে করেকটি তেলের এক  
বিশেষ সংমিশ্রণ।  
রেয়োনা সাবানের সরের মত ফোঁপার  
রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ  
করুন; এই সৌন্দর্য সাবানটি প্রতিদিন  
ব্যবহার করুন। রেয়োনা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



রেয়োনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

BP. 146-X52 BG

রেয়োনা কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে প্রস্তুতকৃত

# অঘোর প্রকাশ

( স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

## ছাত্রাংশ পরিচ্ছেদ

যোগ ও অর্থচিন্তার ভাব

১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবের পর ৩রা ফেব্রুয়ারী বেচার হইতে রাজগৃহ গমন করিতেছিল। বাবার সময় পুত্র মাঘুয়ের সহায়তা ত্যাগ করিয়া একাকিনী পথ জননীকে সহায় করিয়া গ্রাম্য পথে সামান্ত বেশে প্রার্থনা পূর্বক হরিনাম গান করিলে, ও কোন কোন বাটীতেও গমন করিয়া নাম গান করিলে। বঙ্গনারীর পক্ষে এ অতি আশ্চর্য ব্যাপার। রাজগৃহে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৩০ কি ৪০টার সময়ই উঠিয়া প্রাঙ্গণে নাম গান হইত।

এই ফেব্রুয়ারী তুমি দৈনিকে লিখিয়াছিলে, “স্বামীর সহিত একতা ঘন হইতে ঘন হইতেছে। এবার এই ভাবপ্রবণ নারীকে বড় করিয়া জননীর সম্মান রক্ষা করিব। এ বিষয়ে স্বামী সর্বদাই সাহায্য করেন। এবার কেবল জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছা প্রবল। এসকল খুব ভাল ভাবে, শুদ্ধ ভাবে চলিতেছে, মন ভাল।”

এই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলে। বাজারে মেয়েরা হরিনাম গান করিলেন। সংসার অনিত্য, সেই নাম সত্য, এ বিষয়ে মেয়েদের বলিলে। শ্রদ্ধের অন্ততাল বহু মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন।

এই সময়ে তোমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। পরিশ্রম ও চিন্তা দুই-ই খুব বেশী হইত। অত বড় বিজ্ঞানটি বন্ধে পড়িল, তাহার জন্ত কত খরচ। বা অভাব হয় তোমাকেই দিতে হয়। টাকার বিষয় আর কেহ ভাবেন না, বড় কেহ লেনও না। নিজের সংসারের খরচ, আত্মীয়দের সাহায্য করা, সমাজের যে ব্যয় হইত নীরবে তাহার অধিকাংশ নিজে বহন করা, ইহা ছাড়া বিজ্ঞানবের পাড়ীর খরচ বহন করা, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। সুতরাং তোমার অর্থভাণ্ডার প্রায় শূন্য থাকিত। তার পর সেই যে লক্ষ্যেতে শরীর তালিয়া গিয়াছিল, সে অসুস্থতা সবেও কাজ করিতে বাধ্য হইলে। ঈশ্বর লাগিলে বাস্তব যতন হইয়া শরীর ফুলিয়া উঠিত, তখন শব্দা আশ্রয় করিতে হইত। রাজগৃহের পরিশ্রমের পর নর্যাটোলার বাটীতে আসিয়া একটু বসি লাগিয়া তোমার বিশেষ পীড়া হইল। পাতের পোড়া ফুলিয়া গলা ফুলিল, মুখ বন্ধ হইল, কথা বন্ধ হইল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। একদিন এমন হইল যে তোমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। অবশেষে পালের ভিতরের কোঁড়া আপনি ফাটিয়া গেল। আমার মন একটু ঢেঁল হইয়াছিল, মনে হয় বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারি নাই। ক্রমশঃ তুমি সারিয়া উঠিলে। এবারকার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অনেক শিখিল, তুমিও অনেক শিখিলে। এই পীড়ার কথা তুমি নিজে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছ,—“শয়ন করিয়াই এবার দুই মাস উপাসনা করিলাম। রোজ নিত্য নতন ভাবে স্বামীর কখনও পাপে, কখন নিকটে বসিয়া মার নম্র করিতেন। চুপ করিয়া থাকিতে ভাল লাগিত, কিন্তু যত্ন চুপ করিয়া থাকিতে দিত না। সময়

সময় বৈধব্য করিয়া ফেলিত। অল্প কাহাকেও কিছু বলিতাম না, সময় সময় স্বামীর উপর সম্মানবৎ আচার করিতাম; অভিমানও করিতাম, তিলেকের জন্ত; কিন্তু তাঁহার মাতৃসম্নেহে তখনই ভুলিয়া বাইতাম। এই সময় তাঁহাকে আমি মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, সম্মানের দ্বারা তাঁহার কোলে কখনও কখনও মাথা রাখিয়া জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতাম। স্বামী যে মা হইতে পারেন তাহার প্রমাণ এইখানেই। কিছু ঝাইতে পারিতাম না বলিয়া রাজকর্ম পূর্ণমাত্রায় শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় \* বাটা আসিয়া নিজে রন্ধন পূর্বক ভোজন করাইয়া দিতেন।”

তুমি ভাল হইয়া উঠিয়া কিছুকাল শব্দা শয়ন করিয়াই কাজ করিতে লাগিলে। আমার শরীর যদি ভাল থাকিত, তোমার অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কলিক ও ডিসপেন্সি আমার শরীর চূর্ণ করিয়াছিল। সুতরাং আমার জন্তও তোমাকে চিন্তা করিতে ও পরিশ্রম করিতে হইত। মধ্যে কুলের কোনও না কোনও ব্যবস্থা করিয়া নিজের বা আমার বা কোনও সম্মানের স্বাহ্যের অমরোদে মঞ্চস্থলে কিবা গঙ্গার ধারে চলিয়া বাইতে হইত। ইহাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতেন। মাঘুয়ের সহায়ত্ব না পাইলে, যে কাজ করে তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তুমি এই সময় খুব বুঝিতে লাগিলে, আর ভগবানের উপর নির্ভর বাড়িতে লাগিল। বড় ক্লেশ হইলে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে মনের সকল দুঃখ তাপ বলিতাম।

কতরূপ টাকার ব্যবস্থা যে তোমাকে করিতে হইত, নিম্নোদ্ভূত কয়েকখানি পত্র হইতে কিছু পরিমাণে তাহা জানা বাইতে পারে। তোমার সেই পূর্বপরিচিত খুঁটান-পরিবারটির সঙ্গে তোমার কিরূপ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, এ পত্রগুলি তাহারও নিদর্শন।

“Chandernagore 25th August 1893.

প্রিয় দিদিমণি!

আপনাকে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার স্বামী এই মাসের ১৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন আমি অত্যন্ত মনের কষ্টে আছি; আমার নিকট আমার ভগিনী মিসেস চক্রবর্তী ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা কলকুমারী আছে। \* \* \* আপনি অনুগ্রহ করিয়া—রাজ্যে যে টাকা পাঠান তাহা এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। কারণ, দিদি এখন আমার নিকটে আছেন। \* \* \*—আপনার স্নেহের এলিস।”

“Chandernagore 5-9-93.

প্রিয় ভগিনী!

আপনার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। আমি এখন এলিসের কাছে আছি ও এখানেই কিছু দিন থাকিব। এলিস ও খোকা এখন ভাল আছে। চাক ও তকণ কুলে আছে। আপনি কেমন

\* এই সময় কাহারো সন্ধানবেলা হইত।

আছেন আমার জানাইবেন। হেলেরা সকলে কেমন আছে? দাদাকে আমার নমস্কার জানাইবেন ও হেলেরের ভালবাসা দিবেন।

আপনার ভগ্নী বিন্দুবাসিনী চক্রবর্তী।

“Somerset House, Chandernagore.

প্রিয় দিদিমণি,

অনেক দিবস হইল আপনার অন্তরের কথা শুনিয়াছি, এখন আপনি কেমন আছেন লিখিয়া জানাইবেন। আর আপনাকে আমার দুঃখের বিষয় কি লিখিব। এখন চাকুর অত্যন্ত অশুখ করাতে আমি তাকে চন্দননগরে আনিয়া এখানে চিকিৎসা করাইতেছি। এ সময়ে যদি টাকা পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আপনার নিকট চিরকাল বাধিত থাকিব। আপনাকে বিরক্ত করি বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আমার বড় ইচ্ছা যে চাকুরে একবার আপনাদের ওখানে ডেকের ভ্রম নিরে বাই। আপনি কি বড়দিনের সময় ওখানে থাকিবেন? আমাদের ছোট বোনের একটি যেরূপ ইচ্ছা। সকলে ভাল আছে। আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সকলকে দিবেন ও আপনি লইবেন।—আপনার প্রথম ভগ্নী B. B. Chukerbatty.”

তোমার শুণে সত্য সত্যই চাকুর তোমার হেলেরের বড় ভালবাসেন। এখন ইনি একজন graduate এবং কলেজের প্রফেসর। তোমার সন্তানেরা ইহার চিরদিনের ভালবাসার অধিকারী হইয়াছেন; তোমার শুণে তাঁহারা একটি খুঁটান ভাই লাভ করিয়াছেন। ইহার মূলে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা।

আর একখানি পত্র এই,—“৮ই জানুয়ারী ১৮৯৩। অস্ত্র আপনার আশীর্বাদ পত্র সহ প্রায় দশ টাকার নোট পাইলাম। আমি বোধ হয় মাঘোৎসবের পরে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে একবার বাইব। \* \* \*—বসন্ত।”

আর একখানি পত্র এই:—

“১০ই জানুয়ারী ১৮৯৩। আপনাকে পূর্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। বকুর মাহিনা ৪ মাসের বাকী পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে ২ মাসের বেতন আপনি দিয়াছিলেন, আর ২ মাসের বেতন বাকী আছে, এবং এই মাসের মাহিনা হইল। সুতরাং তিন মাসের বেতন আপনার কাছে পাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দিতেছেন বলিয়া আমি পড়াইতে পারিতেছি।”

অনেক সময় কাহারও বিপদ আসিয়া পড়িলে তাহার সহৃদয় ব্যয়ের তার আপনার মস্তকে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইতে। লক্ষ্মী কলেজের একটি কন্ডার বিন্ এইরূপে তোমার উপর পড়িয়াছিল। সে সময়ে মিস্ খোবর্গ তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই:—“লক্ষ্মী, ১০-৩-৯৩। প্রিয় মিসেস্ রায়, তোমার কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম; তোমার প্রিয়জনের নিকট হইতে ও তোমার কার্যক্ষেত্র হইতে তুমি যে এখনই অপসারিত হইলে না, এমন কৃতজ্ঞ হইতেছি। আশা করি, তোমার স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে, এবং শীঘ্রই তুমি তোমার পূর্বের স্বাভ্য প্রাপ্ত হইবে। আমি—বিলের ভ্রম একটুও বাস্তব হই নাই; আমি নিশ্চিত আছি যে সময় মত সে টাকা পাওয়া যাইবে; তুমি সে বিষয়ে চিন্তিত হও, আমি তা ইচ্ছা করি না।—ব শরীরটা ভাল ছিল না, বিশেষ গুরুতর কিছু

নয়। তার একটা দাঁতের গোড়ার যা হইয়াছিল, কিন্তু তোমার মতন তেমন খারাপ হয় নাই। এখন তো তাকে ভালই মনে হইতেছে। ঈশ্বর তোমাকে তাঁহার সেবা করিবার ভ্রম সৃষ্টি ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমার সমগ্র প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা, যে আমি তাঁহাকে যেমন যত্নরূপে জানিয়াছি, তুমিও যেন তেমনি জানিতে পার। তাঁহার আশীর্বাদ তুমি প্রাপ্ত হও, যদিও তাঁহাকে তুমি অন্য নামে সম্বোধন করিয়া থাক। ভালবাসা লও। তোমার বন্ধু আই খোবর্গ।”

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হীরানন্দ

ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সকলেই ইহাকে জানেন। ইনি ১৮১৩ সালের প্রথম ভাগে নিজের কন্ডারের শিক্ষা কোথায় ভাল হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া তোমার আশ্রমে আসিয়া সেখানেই কন্ডারের রাখিবেন স্থির করিলেন। ইনি সিক্কী, তুমি বাঙ্গালী, কিন্তু সরল মনে তুমি ইহাকে দাদা বলিতে; আমিও ইহাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখিতাম।

সে সময়ে তোমার পরিবারে দৈনিক জীবনের বিধি ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এ বিষয়ে আমাদের কাহারও কিছু লেখা নাই। সুখের বিষয়, ভাই হীরানন্দ এ সময়ে তোমার পরিবার সম্বন্ধে কাগজে কিছু লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে তখনকার দৈনিক জীবন অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি বাঙা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ এই:—

“\* \* \* কিন্তু বাকিপুরের সর্দাপেক্ষা দর্শনীয় অন্তর্ধান একটি সাদাসিধে রকমের বাড়ি; একটি ব্রাহ্ম মহিলা ও তাঁহার দুই কন্ডা এটিকে চালাইতেছেন। মিসেস্ রায়ের স্বামী গভর্নমেন্টের একটি

\* মূল পত্রখানি এই:—

“Lucknow 10-3-93

My dear Mrs. Ray,

I was very sorry to hear of your severe illness, and thankful that you were not taken now from your family and your work. I hope you have continued to improve and that you will ere long be in your usual health. I am not at all anxious about—’s bill. I am sure it will be settled in the course of time, and I do not wish you to be put out—has not been well but nothing serious. She had an ulcerated tooth but not so bad as yours. She seems well now. May God grant you many years of health in which to serve Him. With all my heart I wish you knew Him in the person of Jesus Christ as I do. May His grace be yours, although called by another name. With love, Your friend—I. Thoburn”

উচ্চ কার্য করিয়া থাকেন, তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল। ৩৫ বৎসর বয়সে ইঁহারা স্বামিন্দ্রী উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন, এবং আজ পর্য্যন্ত উভয়ে তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। স্বামীর পূর্ণ অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মিসেস্ রায় কত্কা দুটিকে লইয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে মিস্ থোবর্নের কলেজে পড়িতে গিয়াছিলেন।

কত্কাবয়ের মধ্যে একটির বয়স ২৪, অন্ডটির অনেক কম। জ্যেষ্ঠা কত্কাটি বিবাহিতা \* \* \* কিন্তু তিনি এখনও পিতামাতার কাছেই থাকেন ও তাঁহাদের সকল মঙ্গল অমুষ্ঠানে সাহায্য করেন। কনিষ্ঠা কত্কাটি একটি মুক্তাবিশেষ। কুমারী হইয়াও তিনি ছোট একটি মায়ের মতন বোর্ডিঙের শিশুগুলিকে বহু করেন, আবার বোন হইয়া কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, আত্মবলিদান করিতে হয়, তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মিসেস্ রায় দ্রুত ইংরাজী বলিতে পারেন; তিনি বেশ সুশিক্ষিতা।

“প্রত্যয়ে পরিবারের কত্কারা সবল ভাবে আপনাব আপনাব প্রার্থনা করে। বাঁধা প্রার্থনার ব্যবহার নাই; শিশুগুলির কোমল বিবেকের উপর একটুও চাপ দেওয়া হয় না। বড় বড় মেয়েদের প্রত্যেকের উপর ছোট একটু-দুটি মেয়ের ভার দেওয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকের একখানি ছোট ডায়েরী আছে, তাহাতে সে প্রতিদিনের দুর্বলতা ও ত্রুটি কিছু থাকিলে তাহা লিখে। মেয়েরা মিসেস্ রায়ের পরিদর্শনে পরিচালিত বালিকা বিতালয়টিতেই পড়ে; বাড়ীতে মিসেস্ রায় ও তাঁহার কত্কাবর মেয়েদের পড়া বলিয়া দেন। পড়ার ও খাওয়ার আকারে পয়চ মাসে সাত টাকা করি কিছু বেশী পড়ে। শিশুগুলিকে দেখিয়া বেশ প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ মনে হয়; উপদেশে ও দুর্বলতায় উচ্চাদের যে পবিত্রতা, আত্মচেষ্টা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া বোধ হয়। লাভের জন্য এ বোর্ডিং খোলা হয় নাই। বস্তুতঃ বোর্ডিংদের কাছে যা লওয়া হয়, তাতে খরচ কুলায় না। যেটা কম পড়ে তা মি: রায় পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁর পত্নী ও কত্কাবর কাছে তাঁহার গভীর সহানুভূতি আছে।” \*

\* মূল কথাগুলি এই :—

(The Indian Spectator.—April 2, 1893.)

“By far the most notable institution, however, at Bankipur, is an unpretentious Boarding house, managed by a Brahmo lady and her two daughters. Mrs. Prokash Chandra Rai is the wife of a gentleman who holds a respectable Govt. appointment, and who is in well to do circumstances. At the age of 35 she and her husband took the vow of Brahmacharya, and both have religiously observed it up to date. With her husband's full consent, Mrs. Rai (perhaps I should spell ‘Ray’) went with her two daughters to Lucknow to study at Miss Thoburn's Institution there. One of the

দেখিলে? ৪ খানা ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া কি প্রশংসা পাইলে। দু'একটা কথা বুঝি একটু তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলে, বিদ্বান্ হীরানন্দ তাহাতেই তুলিয়া গেলেন, ও ‘বলিলেন, তুমি দ্রুত ইংরাজী বলিতে পার। কিন্তু কি জানি কোন মত্রে হৃদয় হইয়া বলিলেন, যে তুমি weel read, অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছ। অথবা, যখন মাহুব মাহুবকে ভালবাসে, তখন কোনও অপূর্ণতা দেখিতে পার না; তাহাই বুঝি হীরানন্দের ঘটনাছিল। তোমার ছাত্রী-নিবাসকে তুমি ‘পরিবার’ বলিতে, কারণ ছাত্রীদের দ্বারা পরিবার নিৰ্ম্মাণ করিবে, এই সাধই ছিল। হীরানন্দ যে ৭৮ টাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও সকলে দিতেন না। কেহ অধিক, কেহ কেহ কিছুই দিতে পারতেন না। বাহা অপূর্ণ থাকিত তাহা তুমিই পূর্ণ করিতে, আমার কাছেও আবেদন করিতে হইত না। খরচ পত্রের ভার তোমাই মস্তকে ছিল। কখনও দেখিতে, যে সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও কত্কাবর পিতামাতা তাহাদের ব্যয়ের জন্য কিছু সাহায্য করিতেছেন না; তুমি কিন্তু

daughters is now 24, the other is much younger. The elder is married, but \* \* \* continues to live with her parents, and to help them in their beneficent works. The younger girl is a pearl. She is unmarried, and looks after the children in the Boarding House with a little mother's care, and sets there the example of true sisterly love and self-sacrifice. Mrs. Ray speaks English fluently, and is well read.

Early in the morning the children in her home offer their prayers in their own simple way, for no set prayers are used, and no compulsion is put upon their tender consciences. Each of the elder boarders is in charge of one or two of the younger, and each keeps a small diary in which she notes down every day her failings and backslidings if any. The boarders attend the female school conducted under Mrs. Ray's supervision, and are helped in their studies at home by her and her daughters. The whole cost of education and boarding amounts to Rs. 7 and odd per month. The children look blithe and lively and the lessons of purity, self-help and self-sacrifice, taught to them by example and precept, are likely to have an enduring influence on their after life. The Boarding House is not kept for profit; indeed, the amount charged to the boarders is much less than the actual cost. The deficit is made up by Mr. Ray who takes the deepest interest in the work of his wife and daughters.”

কাহারও কাছে চাহিতে না, নীরবে সকল ব্যয়ভার বহন করিতে। কখনও কখনও অচল হইয়া উঠিত, তবু কাহারও নিকট আপনাদের দুঃখবাহার কথা জানাইতে না। একদিন আহার করিতে করিতে একজন বন্ধুর কাছে তোমার অর্থাভাবের কথা বলিতেছিলাম। আহা! নিঃশব্দে নিঃশব্দ হইলে তুমি আমাকে অনুযোগ করিলে, এবং বলিলে, “কেন বন্ধুর নিকট অভাবের কথা জানাইলে? ইহাতে যে ভগবানের নিন্দা করা হয়।” আপনাদের সম্মানদের বঞ্চিত করিয়া, নিজে অর্দ্ধাংশে দিন কাটাওয়াও তুমি তোমার ছাত্রীনিবাসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে। ইহা দেখিয়াই হীরানন্দ তোমার পরিবারে মুগ্ধ হইলেন, এবং স্বদেশে গিয়া আপনাদের দুটি কন্যাই তোমার হাতে দিব্যর সঙ্কল্প করিলেন। যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কার্য্য করা তাঁহাদের স্বভাব ছিল। কন্যা দুটি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। কোথায় সিদ্ধ প্রদেশ, আর কোথায় বেহার, কন্যা দুটিকে এত দূরে পাঠাইতে হইবে বলিয়া সঙ্কচিত হইলেন না। লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহাদের একটি কন্যা পীড়িতা হইলেন। হীরানন্দ যৎপরোনাস্তি সেবা করিলেন; কন্যা নীরোগ হইলেন, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে তিনি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তোমার গৃহে আসিয়া যখন আশ্রয় হইলেন, আমি তখন বাটীতে উপস্থিত ছিলাম না। তুমি নিজেই চিকিৎসার ও সেবার আয়োজন করিলে। এবং যাহাতে হীরানন্দের কষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলে। নিজ গৃহের ঘরটি স্বাস্থ্যকর ময় মনে হইবা মাত্র পরেশের স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহাদের একটি ভাল ঘর চাহিয়া লইলে। হীরানন্দের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল। পরেশ বাটা ছিলেন না। অল্প একজন ডাক্তারদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলে, “আপনি চিকিৎসার ভার লউন, যত ব্যয় হইবে আমার কাছে পাইবেন।” ডাক্তার বাবু তোমাকে জানিতেন। তোমার উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। হীরানন্দ স্থানান্তরে রহিলেন বটে, কিন্তু তোমার পরিশ্রম বাড়িল। পরিবারের, বিদ্যালয়ের, ও হীরানন্দের সেবার কার্য্য অকাতরে করিতে লাগিলে। যখন রোগ বাড়িতে লাগিল তোমার সেবাও বাড়িতে লাগিল। আহা! ঔষধ তোমার হাতে খাইতে ভালবাসিতেন। শেষ মুহূর্ত্ত যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই রোগী ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে দাঁত বন্ধ করিলেন। সকলে ঔষধ দিতে বিরত হইলেন। তুমি কোথায় গিয়েছিলে, গৃহে প্রবেশ মাত্র জিজ্ঞাসা করিলে, ঔষধ পাওয়ায় হয় নাই কেন? উত্তরে জানিলে যে রোগী মুখ বন্ধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ এখন আর ঔষধ খাওয়াইয়া বিরক্ত করা কেন? তুমি বলিলে, তাও কি হয়? যতক্ষণ শ্বাস আছে, ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য করা উচিত। ঔষধের পাত্র লইয়া হীরানন্দের মস্তকের নিকটে গেল, আর “দাদা, দাদা, ঔষধ,” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলে। শব্দমাত্র তিনি মুখ খুলিলেন, এবং ঔষধ পান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি ১৪ই জুলাই ১৮১৩ মহাপ্রয়াণ করিলেন। কন্যা দুটির বিদ্যালিক্ষা বন্ধ হইল, তাঁহারা সিদ্ধপ্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আরও ত্যাগ, আরও বিখ্যাস

পূর্বেই বলিয়াছি, এখন কর্তব্যের অনুরোধে তুমি অনেক সময় বাঁকপূরে বাঁা থাকিতে, কর্তব্যের অনুরোধে আবার আমাকে অনেক



নিয়মিত

নিম টুথ

ব্যবহার করুন!

বাল্যকাল থেকে নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেষ্ট-এ নিমের সহজাত সকল গুণাবলী সম্মিলিত তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দস্ত-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্রোমোফিলও আছে। ইহা দস্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চল ও সুরভিত করে।

অম্লান্ধ টুথ পেষ্ট অপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির

উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী

সমৃদ্ধ নিম টুথ পেষ্ট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে

সমুজ্জল।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২২



সময় বাহিরে থাকিতে হইত। ইহাতে তোমার অনেক সময় ক্লেশ হইত। ইহার উপরে ভাগের ধর্ম পালন মনের সংগ্রামকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিত। এক এক বার তোমার অতিশয় কঠিন বোধ হইত। তোমার দৈনিকে সে সংগ্রামের চিহ্ন অনেক স্থানে আছে, কিন্তু পশ্চাৎপদ কখনও হও নাই। আমি যখন কোনও নূতন নিয়ম বা সাধন তোমার নিকটে ধরিতাম, কখনও কখনও তোমার তাহাতে ক্লেশ পাইতে হইত। কখনও বা তোমার মনে হইত, যে আমি ইচ্ছা করিলে আরও অধিক সময় তোমার কাছে থাকিতে পারি। ইহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু আমার অভিপ্রায় কি? যে শরীর নিশ্চয়ই থাকিবে না, তাহার উপর যদি তোমার ও আমার যোগ স্থাপিত থাকিত, তাহা হইলে আজ কি হইত বল দেখি?

তোমার এই সকল সংগ্রামের ছবি তোমার দৈনিকে ও পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রধানতঃ সে সকল তইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

“৩০শে জুলাই ১৮১৩। স্বর্গের সঙ্গি! তোমাকে নমস্কার করিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে। তোমার মূল্য এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। তাই এত কষ্ট পাইতেছি। তা বেশ হইতেছে; এখনও দিন আছে। মার রূপা হয় তো অবশ্যই বুঝিতে পারিব। তবে নমস্কার করি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমার মূল্য বুঝিতে পারি। আজ বিদায়। তোমার বোরি।”

“আজ ১ই জুন ১৮১৩, ‘মনের’ নামক স্থানে আসিয়াছি। উপাসনা ভাল, মন ভাল। এই স্থানে অনেক মুসলমান পীরের গোর আছে। ১০ই জুন একটি বড় গোরস্থানে সন্ধ্যার সময় স্বামিসহ অনেককণ বসিয়া পরলোক চিন্তা করিলাম। একবার মন চঞ্চল হইয়াছিল। বাহিরে সিঁড়ির উপর গায়েব রাসের রাখিয়া আসিয়াছিলাম, খুব বাতাস হইতেছিল, মনে হইতেছিল, যদি উড়িয়া যায়! অমনি চেতনা হইল, আর সে চিন্তা বহিল না, নিরাপদে নাম করিয়া, পরলোক চিন্তা করিয়া ফিরিলাম। এই শিক্ষা হইল যে সাধনের পূর্বে সংসারকে এমন করিয়া দূরে রাখিয়া আসিতে হইবে, যেন ঐ সময় আমার মত কাহারও বিপদে পড়িতে না হয়। মনটা কিছু মুগ্ধে গেল, পাপবোধে।

“১১ই আর একজন পীরের কথা শোনা গেল। তিনি কাপড় বুনিতেন, তাঁতের দ্বারা কোরাণ রাখিতেন। যখন যে দিকে আসিতেন, তখন একবার করিয়া কোরাণ পড়িয়া লইতেন। আজ উপাসনার ঠিক হইল, শরীরের স্পর্শমুখ পরিত্যাগ না করিলে সেই চিন্ময় স্থখ, অনন্ত যোগ হইবে না। উপাসনা খুব ভাল হইল, কিন্তু আমার মনের উপর যেন একটা কি ভার পড়িল। এত চেষ্টা করিলাম কিছুতে সে ভার যেন কমে না। বুঝিলাম, স্বামিনের শরীর স্পর্শেতেও আমার আসক্তি আছে, ছাড়িতে হইবে।

“১১ই জুন, উপাসনা ভাল। আজ হইতে আমরা উভয়ে ১বার করিয়া উপাসনার জ্ঞান ব্রতী হইলাম। মন ধারাপ। ১৩ই, উপাসনা ভাল। আমার মনে কয় বার নিরাশ ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু স্থান পায় নাই। মনের ভার এখনও যায় নাই। ১৪ই, উপাসনা ভাল, মনকে ভাল করিবার জ্ঞান উভয়ে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু পারিতেছি না। পাপও দোষ ছাড়িতে এত

কষ্ট! ১৫ই উপাসনা ভাল, মন সেইরূপ ভার, একটু ভাল।

“১৬ই উপাসনা ভাল। রাত্রে স্বামিনের শয়নের পূর্বের প্রার্থনা শুনিয়া মনের স্বককার দূর হইল। প্রাণে যেন কে আলো ছালিয়া দিল। এ কয় দিন যেন একখান খুব বড় কাল মেঘ আমার মনের উপর রাখা ছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন মন্দ ভাব ছিল না; কিন্তু মন যেন মেঘে-ঢাকা ছিল। যেমন আলো ছলিল, অমনি স্বামিনের স্বক্কে মাথা দিয়া অনেক চক্ষের জল পড়িল, ও কয়দিনের অনেক কথা ছিল, সকল বলিলাম। কেমনে জীবনে পূর্ণতা আসিবে, এ বিষয়ে অনেক কথা কহিয়া উভয়ে শয়ন করিলাম।

“আজ ১৭ই জুন ১৮১৩, আজ দানাপুর আসিতেছি। পথে উপাসনা খুব ভাল, আমার গাছের তলায় বসিয়া। দৈশ্বর যেন রসস্বরূপ হইয়া আমার মধ্যে বাস করিতেছেন। সকল আমারই এক রস; আমাদের এই পরিবারের সকলেরই যেন এক চরিত্র হয়।

“২১শে জুন, সন্ধ্যায় স্বর্গা অন্ত বাইতেছেন, তাহার ভিতর ব্রহ্মদর্শন। শয়নের সময় একবার তর্ক করিলাম। একটু পরে বুঝিয়া অনুতাপ হইল, সেই জ্ঞান রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না।

“২৩শে জুন রাত্রি ৩টার শযায় উপাসনা, মন ভাল। অঃ প্রকাঃ, যিনি আমার, তাঁহাকে সমস্ত দিন প্রাণের ভিতর দেখিতেছি। এই যোগ যদি খাঁটি হয়, তবেই সত্য মিলন। অভাব বোধ কম। আজ স্বামী বেহায়ে গিয়াছেন। ১২টার সময় বড় পুত্র সহ তাঁহারই জ্ঞান ছোট উপাসনা আবার করিলাম। এখনও জননীর উপর পূর্ণ নির্ভর হয় নাই, কারণ স্বামীন নাই বলিয়া রাত্রে চোরের ভয় আসিতেছে; কিন্তু কাহাকেও বলিতেছি না। এক একবার বোধ হইতেছে যেন স্বামীন আমার নিকটেই আছেন; ইহা ভয় নয় এমন বোধ হইতেছে। এইরূপে বিশ্বাস বাড়ি। রাত্রে স্নান হইল, কোন চিন্তা হইল না। মা কোল পাতিলেন, সেই কোলে সকলকে লইয়া শয়ন করিলাম।”

১লা জুলাই তোমার নয়াটোলার বাটতে দোতালার নূতন ঘর উৎসর্গ করা হইল। এ গৃহে কোনও অন্তঃস্থ আচরণ হইবে না, শারীরিক ভোগ লইয়া এ ঘরে বাস করা হইবে না, এই সঙ্কল্প লওয়া হইল। বত দিন দেখে ছিলে, এ সঙ্কল্প পালন করা হইয়াছিল। তুমি ঐ নূতন গৃহকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলে। আজও এ ঘরটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

১১ই অক্টোবর, রাত্রি ১১টার সময় বন্ধু খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কস্তা শ্রীমতী সুকুমারী পরলোক যাত্রা করিলেন। খেলাতচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী এত বড় করিলেন, তুমিও সাধ্যানুসারে সেবা করিলে, কিন্তু প্রিয় কস্তা দেহে থাকিলেন না। মাতাপিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। বাহার ঘন তিনি ফিরাইয়া লইলেন। তুমি সেই রাত্রে শোকাভূত মাতার সঙ্গে ছিলে। সাধ্যমত সাহস দিতে চেষ্টা করিলে। সুকুমারীর যথেষ্ট বড় করিতে পার নাই বলিয়া তোমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিদ্যালয় আরম্ভ, কাহার লেখাপড়া হইতেছে না বলিয়া ঐ স্থলস্থ লাক্কো নগরীতে কালযাপন। সেই সুকুমারী চলিয়া গেলেন। শোকসন্তপ্ত পিতামাতার কথঞ্চিৎ শান্তি হইবে



বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। হরিদ্বার ও লক্ষ্ণৌ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে।

১৮১০ সালের ডিসেম্বর মাসের ডায়েরী পাইয়াছি। কয়েক দিনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। “১ই ডিসেম্বর,—সাপু অঘোরনাথের বার্ষিক শ্রাদ্ধ। প্রার্থনা,—আমি অবস্থার দাস হইয়াছি, তাই তোমার দাসত্ব করিতে পারি না। অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তোমার দাসত্ব বাহাতে করিতে পারি, তুমি সেই বল দাও। ১০ই একবার বিধানের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যায় সময় অনেক গোলমালের ভিতর শান্তভাবে রক্ষা হইয়াছিল। প্রার্থনা এই ছিল, যে চরিত্রে তোমাকে পাই, তোমার সম্মান হইতে পারি, সেই চরিত্র দাও। উপাসনা ভাল, কিন্তু মনটা একটু শুক ছিল। কেন একদম হইল তাহা ধরিতে পারি নাই। ঘরে তুলো ছিল, তাহাতে একটি মেয়ে আঙুন লাগাইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া একটু দৌড়ে আসিয়াছিলাম। আসিবার সময় বোগ ছিল না। পরে ভগবানকে শ্রবণ হইল। সেই মেয়েটিকে একটু মিষ্ট করে বকিয়াছিলাম।

১১ই ডিসেম্বর। আজ মার বাৎসরিক ছিল। প্রার্থনা ছিল, চিরায় বোগে আরও বাড়িতে দেও। আজ একটি অনাথ পরিবারের নিকট গিয়াছিলাম। এই জীলোকটির সম্মান হইয়াছে, ও এই অবস্থায় দ্বার ও বিকার হইয়াছে। বধাসাধ্য তাঁহার কিছু কাছ করে সুখী হইলাম। কিছু ছিন্ন বস্ত্রাদি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করে দিলাম। সন্ধ্যায় বাড়ী আসিয়া একটি ধনী পরিবারের নিকট গিয়া ঐ অনাথ পরিবারের গল্প করায় তাঁহারাও কিছু বস্ত্রাদি দিলেন। তাহা লইয়া ফটকে আসিয়া দেখি গাড়ী নাই, স্ততরাং ঠাট্টাইয়া বাড়ী আসিতে হইল। একবার মনে হইল, ধনী পরিবার যদি জানিতে পারেন, কি বলিবেন। কিন্তু অমনি মনে হইল, আমার তো এই কাজ। সেই জীলোকটির একখানি লেপের জন্ত দুইটি বস্তুর বাটা গিয়াছিলাম, কিন্তু একজন গ্রাহ্য করিলেন না, অল্প ভগিনী একটি টাকা আনিয়া দিলেন। মনটা বড় গরম হইল। তখনই যেন ভিতর হইতে কে বলিল, ভিক্ষকের আবার বিচার অভিমান কি? তখনই সে ভাব চলিয়া গেল। টাকাটি লইয়া বাটা আসিলাম; আসিয়া আহারে বসিয়াছি, একটি বস্তু লেপের আর বাহা লাগিবে ততটুকু সাহায্য নিজেই করিলেন, আশ্চর্য্য হইলাম।”

এইরূপে বোগ, শোক, অর্থচিন্তা, কাৰ্য্যভার ও ত্যাগের ক্লেশ বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলে। আপনি যে শুধু উঠিতেছিলে, তা নয়, আমাকেও উঠিবার সাহায্য করিতেছিলে। আমাকে ভালবাসিতে বটে, আসক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইত তাহাও সত্য, তথাপি স্বীকার করি, তোমার ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা ছিল না। ৩০শে ডিসেম্বর আহার করিবার সময় আমার অহঙ্কার হইয়াছিল, তুমি

তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলে। নির্জনে এক অত্যন্ত প্রিয় ভাষায় তুমি আমার অহঙ্কার দেখাইয়া দিলে। আমি পূর্বে নিজের দোষ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার ভালবাসার গুণে এ সংশোধন কাৰ্য্যও অত্যন্ত মিষ্ট মনে হইল। ভালবাসা দোষ দেখিলে চূপ করিয়া থাকে না, মিষ্ট ভাষায় উপযুক্ত সময়ে দোষ ধরিয়া দিয়া প্রেমাস্পদের চরিত্র সংশোধন করিয়া উন্নতির সহায়তা করে। দোষকে তুমি কখনই উপেক্ষা করিতে না, এ বিষয়ে আমি সাক্ষী।

এ বৎসর খৃষ্টোৎসবের সময় ভগবান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। খৃষ্টোৎসবের ব্যয়ভার তুমিই বহন করিতে। কিন্তু এখন পরিবারে এতগুলি কষ্ট থাকেন, তাই পূর্বের মতন আর সব সময় হাতে টাকা থাকে না। বরং অনেক সময়, বিশেষতঃ মাস শেষের সময় বিশেষ টানাটানি হয়। এবার খৃষ্টোৎসবে কি হইল, তাহা তোমার দৈনিকে লেখা আছে।

“২৫শে ডিসেম্বর, ষষ্ঠমাস, বাগানে উপাসনা। প্রায় ৫৪জন উপাসনায় উপস্থিত। তাহার ভিতর পাঁচ-ছয়টি বালক-বালিকা। এতগুলি লোক আহা করিবেন। আজ আর কিছু নাই আহাযের। গত রজনীতে একবার মনে হইল কি হইবে? কিন্তু মার উপর নির্ভর করিয়া নিদ্রা গেলাম। সকালে ৭টা পর্যন্ত বিছানায়, শরীর অসুস্থ থাকায় কষ্টারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইবে? বলিলাম, সকল মেয়ে-ছেলেদের নিকট ভিক্ষা কর। দু’পরস, আড়াই পরস, এইরূপে এক টাকা হইল। এই পরস দ্বারা চাউল ইত্যাদি খরিদ করিয়া বাত্ৰা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি, অনেক পরিবার হইতে পুবি, মিঠাই, কুটি, মুড়ি ইত্যাদি আসিয়াছে। সেবু কিছু লইয়াছিলাম, কিছু অন্ত্রের আনিয়াছিলেন। এইরূপে খুব ভাল আহাযাদি হইল। পায়েসও আসিয়াছিল। ৫৪জন আহা করিয়া কিছু চাউল বাঁচিল এবং ৪ জনের ভাতও বাঁচিল। ঈশার কৃপা মনে পড়িল, তিনি দুটি মাহ ও দুইখানি কুটিতে কেমন করিয়া এত লোককে খাওয়াইয়াছিলেন, আর বাঁচিয়া ছিল। ফলে বিশ্বাসই মূল। সন্ধ্যায় অবশিষ্ট বাহা ছিল সকলে আহা করিলেন। যিনি ভাগ্যবানী ভিনি বলিলেন, কালিকার জন্ত জল ও লবণ ভিন্ন কিছু নাই। বলিলাম, আজকের তো হইয়া গেল, কালকার বিষয় আজ আর ভাবিব না। কাল যেমন হয় হইবে, তাঁহারাও তাই বলিয়া বিদায় লইলেন। ঘরে আসিবামাত্র স্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার লও। এই বলিয়া ৫ টাকা দিলেন। পাইয়া অবাক হইলাম; কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া পাইলাম না। পরে বলিলেন, মোকামা হইতে শ্রম্ভের তাই অপূর্বকৃত্য পাল এই টাকা পাঠাইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পরিবারের জন্ত। মার দয়া দেখিয়া সকলের বিশ্বাস শতগুণ বাড়িল। আজ প্রার্থনা ছিল, বিশ্বাসরূপ শিশুকে যেন যত্নে রক্ষা করিতে পারি।

[ ক্রমশঃ।

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]

# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২৩

সুন্সালে বেক্সাম ফিনল্যান্ড উপসাগর যে দিকটায়। শহরতলী। জলা-জায়গা মাঝে মাঝে, সবুজ ক্ষেত, কাঁকা কাঁকা বাড়ি। দূর থেকে এই যেন পাহাড় বলে মালুম হচ্ছে। উঁহ, পাহাড় নয়—খেলানুলার ষ্টেডিয়াম, ক্রিকেটের নামে বানিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। চোখ খুঁড়িয়ে গেল—আহা-হা, সীমাহীন সমুদ্র! ফিনল্যান্ড উপসাগর। সবুজ দীপ একটা—দীপটা এদের নয়, ফিনল্যান্ডের এলাকায়। বড় রকমের একটা সাফ দিলেই তবে তো ফিনল্যান্ডে গিয়ে পড়া যায়। আমার বাঁ-হাতের দিকে অনেকটা দূরে জাহাজ গাদাগাদি হয়ে ভাসছে। বন্দর। খাসা বেড়াবার জায়গা—ঘরে ঘরে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছি। বসবার আসন ধরে ধরে নেমে গেছে ভিতর দিকে। সমতল কেন্দ্রভূমে খেলার জায়গা।

শহরে দিগের মোটরগাড়ি ছেড়ে দিলাম। পায়ে না হাঁটলে মজা পাওয়া যায় না। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় গরি, বোঁকানে ঢুকে এটা-ওটা সওদা করি। যেখানে ছুঁকি, সাড়া পড়ে যায়। মুখে না বলুক, চাইনিতে হাঁচর পাট। পাবার কিনে থাকে বল লোক পথে দাঁড়িয়ে—আমার দেশে হামেশাই যেমন দেখতে পান তাই দেখে এসাম, মানুষ সকল জায়গায় এক। সেই একদিন মাঝাস দেখেছিলেন, গাড়িদোড়া অগ্রাহ্য করে রাস্তা পার হয়ে মানুষ উপস্থানে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কি—কোন সিনেমা-ষ্টার বেরিয়েছেন নাকি পথে। অতঃপর তুচ্ছ প্রশ্ন গাড়ির নিচে যায়ই যদি, কী করা যাবে! শুধু এদেশের মানুষকে মিছামিছি দেখেন আপনারা।

কেনাকাটায় কোট-পাউন্ডনুর বিশাল উদরগুলো ভর্তি। এ-রাস্তা ও-গলি দূরে দূরে হোটেল ফিনল্যান্ড, বেশ দেরি হয়ে গেছে। নাকে মুখে লাক পুঁজে তুড়ি আবার কেউ কেউ বেরুবেন এদেশের আদালতে কি ধরনের বিচারক হয় দেখবার জ্ঞান।

কিছুদিন থেকে এক বিদেশি সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি। মস্কোর দেখেছি, তাসখন্দও দেখেছি একবার। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও নজরে পড়ে যাবে এমন বেচুপ লম্বা। গুপ্তরাজ্যে এক ভাল-বুদ্ধ। সেই ভদ্রলোক আন্তোরিয়ার এসে উঠেছেন। আমাদের দেশ এবং বৃটিশ আমল হলে ভাবতাম পুলিশের স্পাই পিছু নিয়েছে। আমাদের দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক। তাকাতাকি এখন আর আমাদের মধ্যে আনিনে। বিধাতাপুরুষ রূপ দিয়েছেন—কুচকুচে কালো বঃ, কালোবরণ চুল—অভাগ্য বর্ণহীন সাদা-চামড়ার দল দেখবেই তো তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখে হিংসার ফেটে মরবে।

লাউঞ্জে বসে ভদ্রলোক। হঠাৎ আজ কথা বলে উঠলেন, মাপ করবেন, আপনাকে এর আগে দেখেছি।

গোপিত, কিছুই আমি মনে করতে পারছি নে।

থাকেন কোথায় আপনি? কলকাতায়? তবে কলকাতায় দেখে থাকব।

আমি জানি তাঁওতা এটা। আলাপ জমানোর কায়দা। তর্ক না করে মনে নিতে হয়। অবাচিতভাবে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে : ওয়াশিংটনে থাকি আমি। ব্যবসায় আছে। কংগ্রেসের মেম্বর। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো নেশা-বিশেষ। আমায় মশায় কেউ নেমস্তন্ন করেনি, গাঁটের পয়সায় এসেছি, পয়সা খরচ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

থাকবেন কতদিন?

থাকবার জো আছে? ছাঁটা মাস এ-রাজ্যে থাকলে ফতুর হয়ে যাব, ব্যবসা লাটে উঠবে। পরের আতিথেয় আছেন—টের পান না, কী সাংঘাতিক খরচ এদেশে। এক্সচেঞ্জের চড়া হার—এমনি কায়দা করে রেখেছে, বিদেশের কেউ যত টাকাপয়সা নিয়ে আসুক পলকে সব কপূর হয়ে উবে যাবে। মানেটা দাঁড়াচ্ছে, বিদেশিরা আসাযাওয়া করুক এরা সেটা চায় না।

আমরাও বুঝছি। অনেকেই আমরা ট্যাভোরাস-চেকে টাকা নিয়ে এসেছি, এটা-ওটা কিনে নিয়ে যাবো। কিন্তু দর শুনে উৎসাহ একেবারে হিম। একছোড়া জুতো দেড় হাজার রুবল—হোন না আপনি রাজা রাজবল্লভ, ওজুতোর একটা পাটিও তো টাকাকে সহিবে না আপনার। অবশ্য রোজগার করলে পুথিয়ে যায়—রোজগারও হাজারের মাপের। একটা ছোটগল্পের হাজার রুবল দক্ষিণ। অত ঘোরাবুরির মধ্যেও বক্তৃতাদির ব্যাপারে সহস্রাধিক রোজগার হয়েছিল, দরাজ হাতে সেই অর্থ ব্যয় করে এলাম। রূপকথায় সেই যে আছে, তোর বউ তোকে দিয়ে খাওয়ালাম এই আমার কলা!—সেই জিনিষ আর কি!

কার্ল মার্কস ফ্যাঙ্করিং গেলাম বিকাল বেলা। টিপটিপে বৃষ্টি—বছরের এই সময়টা লেনিনগ্রাদ মুখ পুড়িয়ে থাকে। জাবের আমলের ফ্যাঙ্করিং—পকাশ বছর হয়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা, অসংখ্য যন্ত্রপাতি। আগে খালি নৃত্যের কাপড় হত, এখন রেহন তৈরির বিরাট ব্যবস্থা করেছে। নতুন কয়েকটা যন্ত্র বানিয়েছে এখানকার মিস্ত্রিরা—তার জ্ঞান বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয় তাদের!

\* \* \* \*

বিদায় লেনিনগ্রাদ! বিপ্লবের শতক স্মৃতি বার সর্বজ ছড়ানো। নিপীড়িত জনগণ নতুন আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ল যেখানে। নতুন সমাজব্যবস্থার সর্বপ্রথম পত্তন। রাত ১১-৪০ এর ট্রেনে চেপে মস্কো কিয়ছি। বিশেষ ট্রেন দিয়েছে। ইঞ্জিন জোরে ছোটায় না। স্প্রিংয়ের দরাজ ব্যবস্থায় বাঁকুনিও নেই। ট্রেনে যাচ্ছেন না তো—মনে হবে, কোন নবাব-বাদশার খশমহলে আরামে গদিরান হয়ে আছেন। কাচের আঁটা জানলার বাইরে তাকিয়ে তখনই কেবল

মালুম হবে। আমাদের ইতরসাধারণের জ্ঞান তো এই—পিতার উপরেও পিতামহ আছেন। মলের নেতা-উপনেতার। যে কামরার বাচ্ছেন, যেখানে চুকে মনে হবে ইন্দ্রলোকের খানিকটা কেটে এনে ইঞ্জিনে জুড়ে দিয়েছে। একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। সাম্যবাদের দেশ বটে, কিন্তু নেতা ও সাধারণের মধ্যে ঐরা দস্তুরমতো ফারাক রেখে চলেন। রেলের কামরা, হোটেলের ঘর এমন কি পথে-বাটে সাময়িক ব্যবস্থার মধ্যেও তফাৎটা তিলেকের তরে ভুলতে দেন না।

রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল ঠিক আটটার আবার রেডিও শুরু। কেমন করে থামানো যায়, বাতে কিছুতে ধরতে পারি নি। দিন মানে আধ-মিনিটের মধ্যে কায়দা পেয়ে গেলাম। নটা—দশটা। মস্তোয় পৌছতে আর পঞ্চাশ মিনিট কুয়াশায় চাষিগিক ভরে আছে। দিনমানে রোদ হয়, এবস্প্রকার ধারণা ভুলে গেছি ইদানীং। জলা জায়গা অনেক দূর ব্যাপ্ত। বড় জঙ্গল—অজস্র ফারগাছ। মাঠ আসছে মাঝে মাঝে—চরা খেত। ক্ষেতের ধারে গ্রাম। সাদা ফুল যেন মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষেতের উপর। বরফ পড়ে আছে বোধ হয়। মুরগির দল খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। সবুজ ভূগভূমি আসে হঠাৎ ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। ভূশ-ভূশ করে এক একটা ষ্টেশন পার হয়ে যাচ্ছি। প্রাটফরম বেশির ভাগ কার্টের উঁচু পাটাতনের উপর। অত্যন্ত নাবাল অঞ্চল, অতএব মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

সেই হোটেল মেট্রোপোল। ঘর পালাটে গেছে অনেকের, আমরা কপাল ক্রমে পুরানো ঘর পেয়ে গেলাম। নিতান্ত নইলে নয় এমনি হু-চারটে জিনিষ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বেশির ভাগ গাঁটরি বাঁধা ছিল এখানে। গাঁটরি খুলে ছড়িয়ে আবার দিবা গৃহস্থালি ভাণ্ডারে বসা গেল। কাল ৭ই নবেম্বর—সারা সোবিয়ত দেশ জুড়ে নবেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব। আজকের দিনটুকু অবজ্ঞা বুধা কাটাচ্ছি না—বিকালবেলা সিনেমা, রাত্রে পুতুল-নাচ। উৎসবের জন্ত চতুর্দিকে সাজ সাজ পড়ে গেছে, বাতারাতির মুখে সমস্ত দেখা বাবে।

সপ্তাহে সপ্তাহে একরকম চটি বই বেরোয়—মস্তোয় সহরের চুয়াগিষ্টা থিয়েটার ও যাবতীয় সিনেমায় কবে কোন পালা হচ্ছে, ছাপা থাকে সেই বইয়ে। তাই থেকে বুঝে নেবেন; যে পালা দেখবার ইচ্ছা, যথাসময়ে সেখানে হাজিরা দিতে পারবেন। আমাদের নিয়ে হাজির করল, সে-বাড়ির একতলায় দোতলায় দুটো সিনেমা হল। নিচেরটা ছোটদের। পালা সেই মাত্র শেষ হয়েছে, হলের ভিতর দিয়ে চললাম। শিশুরা হাততালি দিয়ে যোবতর খাতির জানাচ্ছে।

সিনেমা ছবি চলে বটে বাণিশায়, তোড়জোড়ও বেশ, জনপ্রিয়তা কিন্তু থিয়েটারের মতন নয়। ছায়ায় মন ভরে না, জীবন্ত মানুষদল দেখতে চায় মানুষ। আমার অন্তত এই ধারণা। নীচে ক্রাস (creche) আছে বাচ্চাদের জন্ত; নানান রকম খেলনা, খেলা-মুলায় ভুলিয়ে রাখবার জন্ত নার্স মোতায়েন আছে। এইখানে বাচ্চা রেখে মায়েরা ছবি দেখতে গিয়ে বসেন। পালা ভেঙেছে, ঘরে যাবেন এইবার—খেলা

ছেড়ে ছেলে কিছুতে উঠবে না। কত রকমে মা লোভ দেখাচ্ছেন—বাড়িতে গিয়ে হেনো দেব তেনো দেব—বাচ্চা কানেও নেয় না। কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে এই মজা দেখলাম স্বপ্নকাল।

পুতুল-নাচ। আমেরিকায় সিনেমা-ছবি তোলায় ব্যাপার নিয়ে ঠাটাবিজ্ঞপ। পুতুলের মুখে ভাববিকার নেই, কিন্তু তড়িগড়ি অঙ্গ-চালনায় হুবহু জীবন্ত বানিয়ে তুলেছে। ছবি তুলবেন ডিরেক্টর; সেই ছবি চালান হয়ে যাবে ইউরোপে। রেডিও শুনেন বিষয়টা তাঁর মাথায় এসে গেল। টেলিফোনে তগব দিচ্ছেন সহকারীদের। সেক্রেটারি মেয়েটা ঘুমুজিল—আলুখানু ভাবে ছুটে এসে টেলিফোন ধরল আধেক-বোজা চোখে। সেক্রেটারি খসখস করে নোট নিচ্ছে ডিরেক্টর যেমন-যেমন বলছেন। মেয়েটার চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠে পড়ে—ওটা মুজা দোষ, অথবা ব্যাধি। এর পরে লোক বাচ্চাবাচ্চি। নটনটাদের মাপজোপ হচ্ছে—ফিতে ধরে ডিরেক্টর পেট মাপছেন, বুক মাপছেন। নায়ক-নায়িকা বাহাই হয়ে গেল অবশেষে—নায়িকাকে খুদ মালিক মশায় সঙ্গে নিয়ে এসে সুপারিশ করলেন। আর এক কুৎসিত পুরুষ—ভিলেন সাজবে সে। এদিককার এক রকম হয়ে গেল। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে গটাগট টাইপ করে যাচ্ছে—ডিরেক্টর বলে যাচ্ছেন। একজনকে বলছেন গল্প, একজনকে সালাপ, আর একজনকে শট ডিভিশনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক সঙ্গে সমস্ত। গল্পটার নাম 'কারমেন'—ক্রেমলিনকে চ্যাপটা চারস করে নাম কাঁড়াল।

সুটি শুরু এবারে। নায়ক নায়িকাকে চুখন করবে কিছু লম্বা সময় নিয়ে। গাছ থেকে টুপ করে একটা ফুল বয়ে পড়বে, সেই সময়টা চুখনের ইতি। ফুল কখন পড়বে, ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত হচ্ছে, এরা দুজন কিছুতে মুখ ছাড়বে না। ডিরেক্টরের হুমকিতে শেখটা ছাড়াছাড়াই হল তো নায়িকা আয়নায় দেখে ক্ষেপে আগুন। মুখ ইনসিওর-করা, হাসির বিস্তার দাম, চুখন করতে গিয়ে দাঁত বসিয়েছে সেই মহা মূল্যবান মুখের উপর।—নায়িকা গান গাইবে—কি পরিমাণ দূর থেকে হলে কত টাকা, আগেভাগে তারও বেট বেঁধে কট্টাষ্ট পাকা করা আছে। গল্পের প্রয়োজন সিনের মধ্যে। হস্তদস্ত হয়ে খবর দিল, গল্প পাওয়া যাচ্ছে না। তবে লাগাও মহিষ। মালিক এসে পড়ল এমনি সময়ে—ছকের কাগজগুলো পড়ছে। কিছু হয় নি, কিছু হয় নি—কম্যুনিষ্টের নিদেমন্দ গালিগালাজ আরও বেশী করে ঢোকাতে হবে। কালেক্টিভিস্ফারমে চাববাস নয়, আসলে মিলিটারি ব্যাপারে। এমনি সব। মালিক কাগজপত্র দল পাকিয়ে ছুড়ে দিল। বতদূর ছবি তোলা হয়েছে, সমস্ত বাতিল। গল্প গোড়া থেকে আবার বানাতে হবে।

পুতুল নাচ শেষ হল যারা সব নাচাচ্ছিল, বাইরে এসে দাঁড়াল। পুতুল আমরা নেড়েচেড়ে দেখছি।

২৪

৭ নবেম্বর। বিপ্লবের স্মৃতি-উৎসব। এই বস্তু দেখবার জন্ত আমরা পূর্ত-মক্কার পার হয়ে এত আকাশ উড়ে এসেছি। লাল পতাকা আর কাস্তে-হাতুড়ির ছবিতে চাষিগিক ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার ধারে দুটো হাত দেয়ালেও বোধ করি আজকের দিনে খালি পাবেন না।

রেড স্কোয়ারে অস্থান। আমাদের হোটেল-মেট্রোপোল থেকে দু-পায়ের পথ। হামেশাই যাই ও দিকটার, ক্রেমলিনের সামনে

দিয়ে চক্কোর মেরে আসি। আজকে সে পথ বন্ধ। শহরের বাবতীর মানুষ ঐ জায়গায় জমায়েত হবে, বাইরে থেকেও বিস্তর এসেছেন—বন্ধ-তন্ত্র হাঁটবার হুকুম নেই। গাড়ি তো চলবেই না।

খানাপিনা তাড়াতাড়ি সারা হল। দোভাষি সবগুলো এসে জমেছে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে—কোন পথে কি ভাবে, গিয়ে স্কোয়ারের কোনও অংশ ঠাই নেবে, সেই সব ঠিকঠাক করছে নিজেরদের মধ্যে। হুস্তি-পাঞ্জাবি পরে যাব আমি। নিচে অবশ্য আঁটোসাটো গরম কাপড় থাকবে। চীনের উৎসব-দিনে পিকিনে যেমনধারা পরে ছিলাম। দোভাষীদের মধ্যে মীরা সকলের মাতব্বর। সে আড় হয়ে পড়ল : না, কক্ষণে নয়। মস্তো কী জায়গা, জান না। এই হিমের মধ্যে কাঁকা রাস্তায় তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়ালে নিউমোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে। সে দায়িত্ব কে নিতে যাবে?

হাঁটছি মস্ত বড় দল হয়ে। যেকিকে রেড-স্কোয়ার, তার ঠিক উল্টোমুখে নিয়ে চসপ। যাচ্ছি তো যাচ্ছি। রাজপথ ছেড়ে শেখটা গলিতে ঢোকাগ। অনেকজন এমনি এ-গলি সে-গলি করে হঠাৎ এক সময় দেখি বেসিল-ক্যাথিড্রালের পিছন দিকে এসে পড়েছি। উৎসবের বাবতীর মিছিল রেড-স্কোয়ার পার হয়ে এইখানে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

লেনিন-মুসোলিন্যামের ডান দিকে ক্রেমলিনের দেয়াল বেসে গ্যালারি, সেইখানে আমাদের ঠাই। নানান দেশের বিস্তর মানুষ—রকমারি ভাষা ও বেশভূষা। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। বসতে বাধা নেই, কিন্তু বসে পড়লে কিছু নজরে আসে না। রেড স্কোয়ারের ওপারে আমাদের ঠিক সামান্যামনি বিরাট অটালিকা—গুম, অর্থাৎ সর্ববস্তুর সরকারি দোকান। বেসিল-ক্যাথিড্রালের উপরে মোভি-ক্যামেরা বসিয়েছে—মিছিল এঁমুখো যাবে, ওখান থেকে ছবি উঠবে ভাল। স্ত্রোপটীন মৃত্যুবেদী আজ ফুল ও পতাকা'য় সাজানো—ফুলশরায় পালঙ্কের মতো বলমল করছে। লোকারণ্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, শব্দসাদা নেই।—এই হাজার হাজার মানুষ হঠাৎ যেন ক্লুপ এঁটে দিয়েছে। কয়েক দল সৈন্ত গোর্কি রোডের দিক দিয়ে এসে বিপ্লব-মিউজিক্যামের ওদিকটার মার্চ করে চলে এল। তাদের পদ-দাপ ক্ষণ হয়ে মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

সময় হয়ে আসে। বসেছিলাম, উদ্ভ্রম হয়ে সকলে উঠে দাঁড়িয়েছি। ক'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এদিকে-ওদিকে—আপেল আর চকোলেট আমাদের হাতে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। ক্লক-ক্লক কোটো নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করে, কোন দেশের মানুষ গো তোমরা? ক্রেমলিনের ঘড়িতে সাড়ে-ন'টা। স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বাজনা ওঠে কোন দিকে; আর উল্লাসের কণ্ঠ। ন'টা-পঞ্চাশ। দূর প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে আসে—যানে ব্রি না, গম্ভীর তীব্র তীক্ষ্ণ এক ধ্বনি। সেই আওয়াজ সারবন্দি সৈন্ত-পুলিশের মুখে মুখে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেল দূর-দূরান্তে।

ঠিক দশটা। কী আশ্চর্য, বাতাস উঠল এই সময়ে এক দমক, উপরে নিচে দূরে নিকটে পতপত করে নিশান উড়ল। লাখ লাখ লাল পাখী পাখনা ঝেড়ে উঠছে যেন। একটা জিনিষ দেখছি। লেনিন-ষ্ট্যালিনের ছবি বস্ত্রতন্ত্র—মেলেনকভ তো এখানকার কর্তা (মনে রাখবেন, ১৯৫৪ অব্দ এখন), তাঁর ছবি দেখা যায় না কেন? অল্প কয়েক জায়গায় দিয়েছে। একলা নয়। ক্যাবিনেটের তাবৎ

মন্ত্রীরা ছবি একসঙ্গে। তাই জিজ্ঞাসা করি দোভাষিকে : লেনিন-ষ্ট্যালিন থাকলেন তো জলজ্যান্ত মেলেনকভ মানুষটার কি দোষ হল?

লেনিন-ষ্ট্যালিনের বিপ্লবে এতদ্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ওঁরা তাই জাতীয় নেতা। ওঁদের পরে আর কেউ কখনো জাতীয় নেতা হবে না।

সাড়ে-দশটা ক্রেমলিনের ঘড়িতে। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। মিছিলের শুরু। সজ্জিত দু'খানা মোটরে কারা দু'জন সকলের আগে—মেলেনকভ নেই ওর মধ্যে। একটি হলেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন; অপর জন মুসোলিন্যেঙ্কো, মস্তো বিভাগীয় সৈন্তদলের কমান্ডার ইন-চীফ। দলের পর দল সৈন্ত দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি ঘুরে ঘুরে যায় তাদের কাছে। গিয়ে অভিনন্দন জানায়। সৈন্তরাও আকাশ ফাটিয়ে পাণ্টা জবাব দিচ্ছে।

নেতারা তারপর মুসোলিন্যামের ছাতে দাঁড়ালেন। বহুতা হবে। সামনে দিয়ে মিছিল যাবে, সালাম নেবেন ওখান থেকে। এসে অবধি দেখছি, মুসোলিন্যাম ঝাড়পোছ হাচ্ছে, দেয়ালে নতুন করে রং ধরাচ্ছে, কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। আমাদেরও তাই লেনিনকে 'পুষ্পার্থ্য দেওয়া হয়নি এত দিনের মধ্যে। সমস্ত আজকের এই দিনটার স্তব্ধ। দুই দল ব্যাণ্ড মার্চ করে চলল রেড-স্কোয়ারের দু'পাশ দিয়ে, মচমচ মচমচ জুতো বাজিয়ে বিপ্লব-মিউজিক্যামের ওধারে গিয়ে দাঁড়াল। সারা মাঠ নিস্তব্ধ ছিল, কলরোল ছাপিয়ে পড়ছে এখন।

অষ্টোবহ-বিপ্লবের সাইট্রিশ বছর পুরল। সাহতামামি বহুতা করছেন—কে উনি? মেলেনকভ তো নয়। দেখা যাচ্ছে, প্রধান-মন্ত্রীকে এবার পাতা দিচ্ছে না। কৃষিকর্মীদের জয়-জয়কার। বিস্তর পতিত জায়গা উদ্ধার হয়েছে, ধারণাতীত ফসল। কাজাক-গণতন্ত্র সকলের সেরা ফসল ফলিয়েছে এবার। বৈজ্ঞানিকতাও খুব কাজ করেছেন। জল ও স্থল সৈন্ত অনেক বাড়ানো হয়েছে। লড়াইয়ের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। গণতন্ত্রের শক্তি অনেক বেড়েছে এই এক বছরে। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে অনেকজন এসেছেন। এদেশ থেকেও অনেক গিয়েছে বাইরে। বিদেশি অভিধারা জেনেবুঝে গিয়েছেন, সত্যিকার শান্তিকামী আমরা। কিন্তু বাইরের অনেকে লড়াইয়ের পায়তারা ভাঁজছে, তাদের সামালবার স্তব্ধ প্রতিরক্ষার কড়া ব্যবস্থা করেছি। দেশব্যাপ্ত এই শান্তির পরিবেশে যে আঘাত হানবে, তার রক্ষা থাকবে না। সেজন্তেও তৈরি আমরা।

বহুতা থামতেই বজ্রনির্ঘোষ। এক সঙ্গে অনেক কামান গর্জে উঠল ক্রেমলিনেব ভিতর দিকে। কামান দেগে বজ্রার অভিনন্দন। রেড-স্কোয়ারের চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ি—কামানের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

প্যারেড এবারে। গুমের গুদিককার জনতা পদাতিক-বাহিনী আঁড়াল করে ঝেলেছে। চলছে তো চলছেই। বিপ্লব-মিউজিক্যামের শিছনে এরা সব জমায়েত হয়ে আছে—মানুষের মহাসমুদ্র, এতদূর আগে ধারণার আসনি। খালি-হাতের মিছিল। এদের পরে তলোয়ারধারীরা। তারপরে এক পট্টন এলো, বন্দুক কাঁধে ঝেলে তারা চলেছে। পরের দলের বন্দুক আকাশমুখো তুলে ধরা। মেসিনগান উঁচিয়ে আসে এবার। যান্ত্রিক বাহিনী—বিচিত্র চেহারা

এই শিশুটির জন্য  
এক মুহূর্তও  
ভাবতে হয় না



কারণ সে

# ল্যাকটোজেন

খেয়ে পুষ্ট



LC/৯/২১৪

সিলোন রেডিয়ো থেকে 'ল্যাকটোজেন' হিন্দী  
প্রোগ্রামে বীণা রায়ের কথা শুনুন।

রবিবার...রাত্রি ৭টা-৪৫ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা এবং  
বৃহস্পতিবার...রাত্রি ৮টা-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি  
৮টা-৪৫ মিঃ।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

21

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসল্‌স প্রডাক্টস ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পোস্ট বক্স নং ৩২০ পোস্ট বক্স নং ৩১৫ পোস্ট বক্স নং ১৮০  
কলিকাতা বোম্বে মাদ্রাজ



রাফুসে গাড়িগুলো গর্জন করে চলেছে, হুনিয়া নখে ছিঁড়বে যেন। বুকের মধ্যে গুরুগুরু করে, কানে তাল লাগে। প্যারাটুপ—প্যারাটুপ নিয়ে চলেছে ট্রাকে। বিমানবন্দরী কামানের বাহিনী—লরী-বোম্বাই সৈন্য, সেই লরী পিছনে একটা করে কামান টেনে নিয়ে চলেছে। ভারী কামান; হালকা কামান—রকমারি কামানের মিছিল। মাইন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইটবন্দি ট্রাকের উপর। ট্রাক চলছে—গতিতে আসে না। ভীষণ আওয়াজ।—পাথরে বাঁধানো রেডস্কোয়ার গুলো গুলো করবে নাকি?

বাগ-পাউন্ট মাঝে মাঝে চুকে পড়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কালিমা-কোস্তার মাঝে চাটনিটা ঘুরিয়ে নেবার মতন।

পৌনে এগারো। মিলিটারি প্যারেড চুকল এককণ্ঠে। পতাকাবাহী দল আসে নীল পোশাকে। যোল গণতন্ত্রের যোলটা আলো পতাকা দার দিয়ে আসছে। নীল পোশাকে তরুণ-তরুণীরা—তারের পতাকায় নেতাদের ছবি। সারা দেশ জুড়ে শত সহস্র উত্তোগ—সেই সব দলের লোক আসেও ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। রামধনুর তো সাতটা রং—আজকের উৎসবে ঝলমলে কত রঙের বাহার, তার কোন লেগাজোপা নেই।

জনসাধারণের মিছিল। মাথার উপরে পতাকা। একটু উপর থেকে দেখছি তো—মেরিকে তাকাই, ঝিলমিল পতাকা উড়ছে। আর ফুল। সত্যিকার ফুল নয়—যা দেখেছিলাম পিকিনের উৎসবে, ঠিক দু-বছর আগে। সত্যি ফুল ক'টাই বা ফোটে এই হাড়-কাঁপানো শীতবাত্তে! দেদার কাগজের ফুল। দলছাড়া কয়েকটা মেয়ে এদিকে এসে বিদেশি আমাদের অভিনন্দন দিয়ে যায়। আকাশ-ফাতানো উল্লাসধ্বনি। ফুল দিয়ে কাস্তে-হাতুড়ি বানিয়েছে, বানিয়েছে ক্রেমলিন-চুড়ার তারা। এ সত্যিকারের। কাগজের অতিকায় কলসি। মার্কস ও এঙ্গেলসের ছতিন মানুষ আকাশের ছবি। ছবি আর প্লাকার্ডের মিছিল—কতকি লেখা তুলে ধরে চলেছে, মূর্খ মানুষ পড়তে পারিনে। আনন্দসমুদ্রে তুফান উঠেছে। কয়েকটা বাচ্চা বাপ-দাদার কাঁধে চেপে মিছিল বয়ে চলেছে। ফুলের মতো চেতারা, মুঠিভরা ফুল—মিষ্টি বিনরিনে গলার জকার দিয়ে যাচ্ছে তারা।

পিছনে চলে যাউ, আরও উঁচুতে উঠে সারা মিছিল ভাল করে দেখব। আনন্দোজ্জ্বল জনতরঙ্গ অবিরাম বয়ে যাচ্ছে—শেষ নেই, সীমা নেই। কঁাকা রাস্তা বয়ে এসেছিলাম, পুলিশে আটকে রেখেছিল, মানুষ দেখে দেখে পথ করে দিচ্ছিল। স্তব্ধ গাড়ী চারিদিকে। লক্ষ ধারা হঠাৎ উচ্ছলিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। লাল রঙের বিশাল বাড়ি বিপ্লব-মিউজিয়াম—তারই এদিক-সেদিক থেকে বেরিয়ে আসছে। কুশুমগুপ্ত ও সবুজ হাসে ভরা একটুকু মাঠ ঐ। সারা সোবিয়েত দেশের সব চেয়ে মূল্যবান ভূমি। কত জনে নিঃশব্দ গুরু নিচে—বিপ্লবের বলি, নাম জানা নেই, গুলি করেও রাখেনি ক'জন ছিল তারা। আর শুয়ে আছেন মুসোলিন্যামের পাভালকফে কাচের আবরণের নিচে লেনিন ও ষ্ট্যালিন। শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা বাইরের এই কলবোল?

ফিরে আসছি। রেডিওর একজন পিছু নিয়েছেন : লেখক মানুষ আপনি—এই উৎসবের ব্যাপার রেডিওর আজ বলতে হবে। বাংলায় বলবেন, আপনার বাংলাদেশের মানুষ শুনবে।

ভালো রে ভালো! শহর জুড়ে দেওয়ালি, বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরিয়ে দেবে, মন্দির একটা মানুষ আজ সন্ধ্যায় ঘরে থাকবে না। আমি সেই সময়টা বন্ধ ঘরের মধ্যে মাইকের সামনে ভানব-ভানব করব? ও সব হবে না মশায়! তা ছাড়া লিখে নেবারই বা সময় কোথা?—কাল। ভোরে উঠে লিখে ফেলব; রেকর্ড করে আসব তার পরে এক সময় গিয়ে।

দো-ভাষিণী মীরাও সাং দেয় : কালকের বন্দোবস্ত করুন। সন্ধ্যাবেলা এঁরা দেখে শুনে বেড়াবেন। বলসই থিয়েটারে একটা ভাল পালা আছে—‘বড়ের আলো’। টিকিট করা হয়েছে।

### বেতার-ভাষণ—স্কো, ৭ নবেম্বর

সাতই নবেম্বর—মানুষের ইতিহাসে পরম স্মরণীয় সোবিয়েত-বিপ্লবের এই দিনটি। কোটি কোটি নিষ্পিষ্ট মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াল। নতুন জগৎ গড়ে তুলবে তারা—শ্রমের জগৎ, শান্তির জগৎ।

এদেশে পা দিয়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, এই মহা-মহোৎসবের জন্ম সকলে দিন গুণছে। সোবিয়েত-রাষ্ট্রের নানান অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছি—যেখানে বাই, আগামী উৎসবের তোড়জোড়। মানুষ হেসে নেচে তাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি দেশের সামনে জাহির করবে, তারই সর্বব্যাপ্ত আয়োজন।

নতুন রঙ ধরাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে, আলো আর পতাকা দিয়ে সাজাচ্ছে। ৩ই রাত্রে সারা স্কো জুড়ে আলোর প্রাবন। ঘরে ঘরে এপথ-ওপথ হয়ে বেড়াচ্ছি। আট-শ বছরের সুপ্রাচীন নগরীর বুকের উপর বড় বড় সড়ক, আকাশচুম্বী প্রাসাদ। প্রবীণ সংস্কৃতি আর নবীন জীবনোন্মাদ গলাগলি হয়ে আছে এখানে। এই রাত্রে বিচিত্র আলোর মালা পরে ভুবনমোহন রূপ ধরেছে স্কো।

৭ই সফালবেলা কনকনে শীতের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা ভারতীয় দল। রেড স্কোয়ার আমাদের হোটেল মেট্রোপোলের অতি নিকটে। পাঁচটার করতে করতে সকালবেলা অথবা সন্ধ্যার পর কতদিন লেনিন-স্ত্যালিনের সমাধিভবনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আজকে কিন্তু চললাম একেবারে উল্টোদিকে। পথে মানুষজন সামান্য—কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ পথ থা-থা করছে আজ। পুলিশের দল বাহ রচনা করে আছে মাঝে মাঝে। এমনি অনেক বাহ পার হয়ে হাজির হলাম ক্রেমলিনের সামনে সমাধি-ভবনের ডানদিকের গালাগিতে। আমাদের জায়গা এখানে, এখান থেকে উৎসব দেখব।

উৎসব দশটায় শুরু। ক্রেমলিনের বড়-ঘড়িতে সাড়ে নটা—আধ ঘণ্টা বাকি এখনো। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রেড-স্কোয়ারের এক প্রান্তে সুপ্রাচীন বেসিল গির্জা, অল্প প্রান্তে ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। আর সামনে স্কোয়ারের ওপারে গুম অর্থাৎ সর্বদ্রব্য-বিপণির সুবিশাল প্রাসাদ। বেসিল গির্জার পাশে পুরানো গোলাকার বেদী—সকালে রাজাজ্ঞার নৃশংস ভাবে হাত-পা-গলা কেটে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এর উপরে। সেই বেদী ঘিরে ফুল আর পতাকায় অপরূপ সাজিয়েছে। লাল পতাকা বাতাসে উড়ছে—অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। গুমের গায়েও এমনি শত শত পতাকা। মোভি-ক্যামেরা সাজিয়েছে বেসিল গির্জা গুম আর মিউজিয়ামের উপরে। তিন দিক দিয়ে আক্রমণ—বিপুল এই উৎসব-সমারোহের যতখানি ধরে রাখা যায়।

গুমের লাগোয়া ওপারের ফুটপাথেও অগণ্য দর্শক। তাদের আড়াল করে সৈন্তবাহিনী ছবির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে রেড-স্কোয়ারের প্রান্তে। ব্যাণ্ড-বাহিনীর সোনার বরণ বাজনাগুলো বিকশিত করছে। একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছি, বাছা ফ্রেন্স-মেয়েরা বোঝেন। বিষম দানশীল হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলো—বাড়ির লোকে আপেল-টকি-চকোলেট দিয়েছে খাওয়ার জন্তে, সমস্ত নিঃশেষে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের। না নিলে শুনবে না—রাগ করে, জ্বরদস্তি করে। অগত্যা হাত পেতে নিয়ে, আবার কঁাকমতো তাদের পকেটে ফেলে দিচ্ছি। টের পেয়ে পকেট চেপে সামাল হয়ে গেল। তখন আবার নতুন কায়দা খুঁজি। এই লুকোচুরি খেলা চলছে আমাদের। ক্লিক-ক্লিক কোটো তুলছে এদিক-ওদিকে। কামানের মতো দুটো বড় মোতিও আক্রমণ করতে খেয়ে এসেছে এতদূর অবধি।

নটা পক্ষার। ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের দিক থেকে কী-এক শব্দ। সেই শব্দ সবলরেখার গতিতে সারবন্দি পুলিশ ও সৈন্তদলের মুখে মুখে ছুটে বেসিল গির্জা ছাড়িয়ে আরো দূর প্রান্তে মিলিয়ে গেল। প্রস্তুত সকলে। দশটা বাজল ফ্রেমলিনের ঘড়িতে। নেতার সমাধি-ভবনের অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন আর মস্কো-বিভাগের সেনাপতি মুস্কালিয়ানকো দুই মোটরে সৈন্তবাহিনীর সামনে ঝেঁড়ের বেগে অভিনন্দন দিয়ে চলছেন। তারা প্রতি-অভিনন্দন জানাল। চারিদিক নিঃশব্দ ছিল, আনন্দ উত্তাল হল এক মুহূর্তে। দুই দল ব্যাণ্ড এগিয়ে এল দু-দিক থেকে। বাজাচ্ছে তারা সমাধি-ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে। বিপুল আনন্দ-কলরব—আকাশ ফেটে যায় বুঝি বা।

চুপ। বুলগানিন সম্ভাষণ করছেন সবজনকে। দেশজোড়া বিপুল শিল্প-প্রগতি ও কৃষি-সাক্ষ্য—তার পরিচয় দিলেন। বিশ্বের পতিত ভূমি উদ্ধার হয়েছে। রাশিয়া আর কাজাকিস্তান এই দুই গণতন্ত্র নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকদের বিপুল কর্মিষ্ঠতা। স্থল, জল ও আকাশে সৈন্তদল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে শক্তিশালী। সোবিয়ত জনগণ অসীম পরিশ্রমে দেশের সর্বত্র ঐশ্বর্য ও আনন্দ বহন করে এনেছে। গণতন্ত্রের শক্তি বেড়েছে পৃথিবীতে। শান্তির প্রচেষ্টা বহু ব্যাপক হচ্ছে। সাংস্কৃতিক বোগাযোগ চলেছে দেশে দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা ক্ষেত্রের জানী-গুণীরা দলে দলে এসে সোবিয়ত দেশের পরিচয় নিলেন যাচ্ছেন। এদেশের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে ভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। বিদেশের প্রতিনিধিরা নিঃসংশয়ে বুঝে যাচ্ছেন, সোবিয়তের মানুষ একান্ত শান্তিকামী। কিন্তু লড়াইবাজও আছে হুনিয়ায়। তারা চক্রান্ত করছে; তাই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আমরা দৃঢ়তর করেছি। বাতে শান্তির পরিবেশ কেউ ক্ষুণ্ণ করতে না পারে—

ভাষণ শেষ হল ফ্রেমলিন থেকে কামান-নির্ঘোষ। তার যেন শেষ মেই, সীমা নেই। প্রতি নির্ঘোষে জনতা প্রবল চিৎকারে উল্লাস জানাচ্ছে। ধোঁয়ার আচ্ছন্ন হয়ে গেল গির্জার ওদিকটা।

তার পরে সৈন্তবাহিনীর মিছিল—বালি-হাতের সৈন্ত, তরোয়ালধারী, বন্দুক কাঁধে ঠেঁশান দেওয়া, আকাশযুগ্মে বন্দুক, সামনের দিকে উত্তত বন্দুক—এমনি চলেছে দলে দলে।

বাস্তবিকবাহিনী মোটরগাড়িতে। মেশিন-গান দিয়ে সজ্জিত যেটার, বিমান-স্বাসী কামান মোটরে টেনে নিয়ে চলেছে। সেল

নিয়ে যাচ্ছে, মটার নিয়ে যাচ্ছে। ভারী কামান, ভারী বিমান-স্বাসী কামান, ক্যাটারপিলার বিমান-স্বাসী কামান, পাঁচাট-বাহিনী—আওয়াজে কাঁপছে চারিদিক। দেখতে আনন্দ লাগে, আতঙ্ক লাগে, বিষয়ে হতবাক হতে হয়।

বণবাহিনীর মিছিল ক্রমশ বেসিল গির্জা পার হয়ে গেল। একটু স্তব্ধতা। বাতাস প্রবল হয়েছে ইতিমধ্যে। পতপত আওয়াজ করে পতাকা হুলছে গুমের শীর্ষে। বহু সহস্র নবীন প্রত্যাশা কেন্দ্রিত হয়ে যেন মর্মরিত উর্ধ্ব আকাশে।

তারপর থেলোয়াড়ের দল। সামনে বড় বড় পতাকার মার্কস এঙ্গেলস সেনিন স্তালিনের ছবি। তারপরে সোবিয়ত নাগরিকদের। মাও-সে-তুঙের ছবিও দেখছি। সবুজ, নীল, বেগুনি, খয়েরি—কত রঙের পোশাক। ঝলমল করছে চোখের সামনে, ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন সোবিয়তের প্রস্তুত ধৌবনশক্তি।

জন-সাধারণের মিছিল তারপরে। সেই জন-সমুদ্রের তুলনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাই না। পতাকার সমুদ্র। হাতে-ফুল প্রায় সকলের—কাগজের ফুল, নানা রঙের। ফুল নেড়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। কত দেশের মানুষ এক হয়ে মিশেছি আমরা। আমি ভারতের, ডানদিকে চীনা এক মেয়ে, পিছনে পোলিশ বৃদ্ধ ১০০ নিম্পলক বিষুগ্ন চোখে অসংখ্য মানবের এই বিচিত্র আনন্দলীলা দেখছি। সমাধি-ভবনের অলিন্দে স্থিরমূর্তি নাগরিকের। আর ভিতরে অনন্ত নিদ্রায় নিযুক্ত লেনিন ও স্তালিন। ফুল দিয়ে বানিয়েছে প্রকাণ্ড কাস্তে-হাতুড়ি, ফুলের তৈরি ফ্রেমলিনের তারা। বাচ্চা কাঁধে তুলে মিছিলে বয়ে চলেছে, বাচ্চাদের হাতেও ফুল। ফুলে ফুলে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। এই হাজার হাজার মানুষ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে আর এক দিনের রক্ত-পরিগ্রাণিত আত্মদানের গুণ্যে ভাস্বর এই রেড-স্কোয়ারে।

জন-প্রোতের অন্ত নেই। সীমাহীন উল্লাস। একবার পিছনে গিয়ে উঁচু জায়গার উপর উঠে দেখলাম। অশ্রান্ত সমুদ্র বয়ে চলেছে—তারই মাথায় মাথায় জাহাজের চূড়ার মতো অসংখ্য পতাকা। আর দেখলাম, যবস্থা বটে! একেবারে কাঁকা রাস্তা দিয়েই তো এসে পৌঁচেছি—দশটা বাজবার আগ পর্যন্ত এতটুকু শব্দ ছিল না কোন দিকে। কোন নিভৃত কন্ঠে এত আনন্দ লুকিয়ে রেখেছিল—জীবন-কল্লাস সহসা নিযুক্তি ভেঙে বিপুল প্রবাহে দশদিক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ফিরে চলেছি হোটলে। এবার কাঁকা পথ নয়। রাস্তা-গলি ছাপিয়ে শতধারে ছুটেছে আনন্দ। হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে, সেকছাণ্ড করে যাচ্ছে কত ছেলে-বুড়ো পুরুষ-মেয়ে, কত চীনা কোরীয় আরবী জার্মান মানুষ! উপহার-পাওয়া ফুলে দু-হাত ভরতি। আমরা বাকে পাচ্ছি, সেই ফুল বিলোতে বিলোতে চলেছি। গান গাইতে গাইতে চলেছে দলে দলে, কাছ্ এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে। নতুন নতুন মিছিলের দল এখনও চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে। অপরাহ্ন গড়িয়ে আসে, উল্লাস-প্রবাহ চলেছে তবু অবিরাম।

চব্বিশ বছর আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এদেশে এসে বলেছিলেন, 'না এলে একজনের তীর্থদর্শন অপূর্ণ থাকত।' বহু মানবের আনন্দের পবিত্র তীর্থ সলিলে অবগাহন করে আজকে বাংলা দেশের সাহিত্যিক আমি পরিতুষ্ট হলাম। [ক্রমশঃ]

# শ্রীমতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

অফিসারটি বললেন, “মানমোয়াজ্জেল, তুল হলে ত বর্তে যেতাম; কিন্তু অস্বীকার করবার আর পথ নেই, জমিদার তাঁর ভাইকে খুন করেছেন।”

“ভাইকে খুন করেছেন?” আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। জমিদারের দিকে তাকালাম; ওর বিস্মারিত চোখ দুটি খাবার ঘরের টেবিলের ওপর নিবদ্ধ। নাক দাক্ষণ ফুলে উঠছে, চোটে কঠিন নির্মমতা—কি মর্যাস্তিক যন্ত্রণায় ও জলে মরছে আমি স্পষ্ট জাঁচ করতে পারলাম। তবু অফিসারকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এর মধ্যে নির্ঘাত কোনও ভুল আছে।

“দয়া করে এদিকে এক বার আসবেন?” খাবার ঘরের দরজা খুলে উনি আমার ডাকলেন। গেলাম। উনি ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এ কী? উঃ যা চোখে পড়ল, জীবনে কখনো ভুলব না। গান্ধীর দেহটা টেবিলের ওপর শোয়ান। চোটে ঈর্ষ কঁাক করা; কাচের মত স্বচ্ছ চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। জামা-কাপড় কালো রঙে ভরা; আর ডান দিকের বুকাটা গুলীতে ছাঁদা হয়ে গেছে।

“এ কি সত্যিই ওর ভাইয়ের কীর্তি?” অস্বুট ঘরে আমি বললাম।

“আজ্ঞে হ্যাঁ মানমোয়াজ্জেল।”

—“ঠিক জানেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ মানমোয়াজ্জেল; জমিদার নিজে এসে আমাদের হাতে ধরা দেন যখন আমরা টেবল দিচ্ছিলাম।” সখেদে উনি জানালেন।

দরজা খুলে ছানোয়ার কাছে গেলাম। ওর হাতে হাত রাখলাম: চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। হায় রে! কি পরিবর্তনটাই না ঘটে গেছে! ডাগর দুটি চোখে যেন আগুন ছুটছে। দুই রঙের শিরা ফুলে দপদপ করছে।

“ছানোয়া, আমি নীচু গলায় ডাকলাম, “তোমার শরীর খারাপ, চল, যাবে আমার সঙ্গে?”

অদ্ভুত ফল ফলস আমার কথায়। চট করে ও ফিরে দাঁড়াল; দৃষ্টি খানিক কোমল হয়ে এল; এক বলক হাসি দেখা দিল। আমার বুক যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল; মা গো, এত যন্ত্রণা!

“তোমার সঙ্গে? হাত্তার বার যাব, এখনি যাব।” ও জবাব দিল। তার পর ওর নজর পড়ল শেকল-বাঁধা হাতের দিকে। কেমন যেন উদাস অসহায় দৃষ্টিতে ও তাকাতো লাগল। ভয় পেলে শিক্তরা যেমন করে, সেই ভাবে ও আত্ননাদ করে উঠল।

“মার্গরিৎ, মার্গরিৎ, এ কী?”

ওকে মুক্ত করে দিয়ে আমি ওর সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম।

নীরবে আমার কথামত ও চলতে লাগল। দরজাটা আমি বন্ধ করে দিলাম। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ও একটা সোফায় শুয়ে পড়ল। ওর পাশে বসে ওর দিকে চেয়ে রইলাম আমি। হায় শ্রিয়! কত তোমায় ভালবাসি তুমি জান না। আমার হাতে তুলে নিলাম ওর হাত। সারা গারে যেন জ্বর বয়ে যাচ্ছে। দাক্ষণ গরম। আমি চুপ করে রইলাম,—এমন সময় কঁতসের মিষ্টি আহ্বান শুনলাম।

“কি হল রে? কই, আমার বাছারা কই?”

হড়মুড় করে ছানোয়া উঠে বসল। দরজার দিকে সন্নিহনে চেয়ে ও যেন কান পেতে কি শুনতে লাগল।

“মা মা গো!” ও নিজের মনেই আঙড়াতে লাগল।

খাবার ঘরের দরজা খুলল কে; তার পরই বুকফাটা এক চিংকার শুনে ছানোয়া হকচকিয়ে গেল। আবার শোনা গেল মহা আতঙ্কে ভরা সেই আত্ননাদ, “ওরে গান্ধী, বাবা, বাচ্চা রে আমার।”

খানিকক্ষণ কান্না আর ফিসফাস শব্দের দাক্ষণ রোল উঠল; তার পর সব থেমে গেল হঠাৎ। উঠে গেলাম; ওই কান্নার ডয়ে সজোরে চোখ দুটি বন্ধ করে ছিল ছানোয়া; আমি নড়তেই ও শিউরে উঠল। আবার নীরবে বসে রইল। আমি বেরিয়ে গেলাম। কঁতস আমার দিকে ছুটে এলেন—“মার্গরিৎ, মা, এ আমার কি হল মা?” অদম্য কান্নায় উনি ভেঙে পড়লেন।

“চুপ, চুপ!” আমি বাস্তব হয়ে উঠলাম, “পাশের ঘরেই ও রয়েছে; অবস্থা উদ্বেগজনক! আপনাকে ওর একান্ত প্রয়োজন।”

ঘরে ঢুকে উনি দু’হাতে আঁকড়ে ধরলেন জীবিত পুত্রকে। আমি লোকজন সমেত অফিসারকে চলে যেতে আদেশ দিলাম; ঘরে গিয়ে দেখি উনি কাঁদছেন; এত হটগোলের কোন অর্থই ছানোয়া বুঝতে পারছে না। অবাক-বিস্ময়ে মূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। তিন তলায় কঁতসেব ঘরে মা-ছেলেকে নিয়ে গেলাম। ওখানেই ওদের রেখে চলে আসছিলাম; কঁতস আমার হাত ছাড়লেন না।

“বাস নে!” উনি বললেন। বসে পড়লাম আমি। “ছানোয়া, এ তুমি কি করলি বাপ? কেন এমন করলি ছানোয়া?” ওর আচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে উনি প্রশ্ন করলেন। সন্নিহনে ও তাকাল, তার পর বিরক্তির সুরে অমুরোধ করল, “মা-মণি, বড় ঘুম; খুলে দে না মাথার এই জ্বালা!”

ওর মাথা উনি বুক টেনে নিলেন। ছানোয়া চোখ বুঁজল। কপালে হাত রেখে ও স্বপ্নতোক্তি করল, “উঃ মা, বড় জ্বলেছে।”

খুঁটিরে সব কথা ওকে জিজ্ঞাসা করতে বাচ্ছিলেন ওর মা।

আমি বাধা দিলাম। ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। ম'সিয়া শাঁতো অবিলম্বে এসে পড়লেন। ওর পেছন পেছন আমি বৈঠকখানায় গেলাম। আমার বর্ণনা উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। জ্বান শেষ হলে বললেন, "তুনে মনে হচ্ছে উদ্ভাদ অবস্থায়ই একাজ ও করেছে। দুর্ঘটনার কারণ কিছু জান? পূর্ণাভাস?"

"না; নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব কোন দিনই ওদের ছিল না। হুঁজুনাই হুঁজুনকে খুব ভালবাসত।"

"বগড়া-বাঁটি কিছু হয়েছিল?"

"না, তবে গত মাস থেকে জমিদারের হাব-ভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম; কেউ সেদিকে বিশেষ নজর দেয় নি।"

করণা ও স্নেহমিশ্রিত নয়নে উনি আমায় দিকে তাকালেন।

"তোমার বাবার কাছে খবর দিয়েছ?"

"আমি মিই নি, তবে এতক্ষণে ওর কানে কথাটা উঠেছে নিশ্চয়।"

অলক্ষ্য চূপ করে উনি জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, জমিদারকে কি একবার দেখতে পারি? ওর অবস্থাটা ঠিক মত জানা দরকার; মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলেই একাজ ও করেছে যদি প্রমাণ করা যায়, বিচারের সময় তবে অনেক সুবিধে হবে।"

ওর একথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কি লাজনাটা ওর কপালে লেখা আছে; ওকেই যে আমি সঁপেছিলাম আমার হৃদয়, মন! ওকে আমি অন্তরের গভীরতম অমুভূতি দিয়ে ভালবাসি। ভগবান যেন ওর সহায় হন।

দয়াময়, চেয়ে দেখ ওর বিপত্তি, ক্ষমা কর ওর পাপ।

কঁতেসের ঘরে গেলাম। ডাক্তারবাবু খুব সহজ সুরে কথা শুরু করলেন, "এই যে ছানোয়া, কেমন আছ হে?"

ও তাঁর দিকে চেয়ে রইল। হাসল।

"মনে হচ্ছে ভালই।"

"নাড়ী দেখি?"

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন তিনি অতি মনোযোগ দিয়ে।

"আচ্ছা কোথায় ব্যথা লাগছে?"

"আজ্ঞে, এইখানে।" বলে ও কপাল দেখাল।

"তাই নাকি? বলতে হয়। এখুনি সারিয়ে দেব।"—এই জাতীয় কথাবার্তার কাকে ভাল ভাবে শুঁড়িয়ে উনি নানা প্রহ্ন করলেন। চলে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ইজিতে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

"ওর অন্তর খুবই বাড়াবাড়ি কি?"

মাথাটা খায়াপ হয়ে গেছে। সর্বদা ওর দিকে নজর রেখ, আর সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়, সে-ব্যবস্থা কর; আর ভুলেও এ-ঘটনার উল্লেখ ওর কাছে কোর না। আর একটা কথা, ওর মামা কোথায় এখন?"

কর্ণে দেহে এখন স্পেনে। তাঁর ঠিকানা দিলাম।

"এখুনি ওকে টেলিগ্রাম করছি। ওর আসা নিতান্ত প্রয়োজন। তবে মার্গারিৎ, শরীরটার দিকে যদি নজর না দাও, ভুগতে হবে যে মা।"

উনি চলে গেলেন। রোগীর ঘরে গেলাম আমি। ছানোয়াকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওর তত্ত্বা আসছিল। কঁতেসকে ইশারায় ডাকলাম। খুলে বললাম সব কথা। উনি নীরবে কান্দতে লাগলেন।

ছানোয়া ঘুমিয়ে পড়ল। কি অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে লাগছে ওকে! হঠাৎ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বকতে আরম্ভ করল, "ওই যে, আগুন! আগুন! পাগল করে দেবে! উঃ, পুড়িয়ে দিল সব!"

চট করে একটা ভিলে রুমাল নিয়ে ওর কপালে রাখলাম। ও তা ফেল দিল। বিকারের ঘোরে সজোরে আমার হাত চেপে ধরল। বাবা আর মা এলেন। বৈঠকখানায় গেলাম। আমায় ওরা নিয়ে যেতে এসেছেন। আমি ঘরে বসলাম, এখানেই আমায় থাকতে দেওয়া হোক। অতিকষ্টে ওঁদের মত পেলাম। মা-ও থাকবেন বলে জিদ করতে আমি আপত্তি জানালাম।

১৭ই জামুয়ারী।—ওর অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। গায়ে বেশ জ্বর। গত দুই সপ্তাহ অনবরত প্রলাপ বকছে, বেহঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, রাতে ঘুম নেই। কি নিদারুণ ভোগান্তি! ভগবান, একবার এদিকে ফিরে তাকাও, ভগবান! এতদিন পর ওর মা একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। আমরা এখন পালা করে ওর শুক্রবা করছি। গেল মাসের ১১ তারিখ সকালে ওর মামা এসে পৌঁছেছেন! আমায় দেখে উনি অসম্ভব বিচলিত হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন: ওঁকে আত্মোপাস্ত কাহিনী জানালাম।


"হায় ভগবান!" উনি আপন মনে বলতে লাগলেন, "কি

ফোন : ৩৪-৪৯০৭

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিনি ভবন** পূজন কুশলী  
মাসিক ও অর্ধমাসিক

১০২, বহুজার স্ট্রীট, কলি:- ১২



গ্রাফ :—২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

(রাজা গীতেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

যে করি এই অবস্থায় !”—তার পর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, “না না, ওর বিচার—কোনও দরকার নেই ; চলে যাব এখন থেকে ওকে নিয়ে !”

ঘটনাটা ওর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে উনি সামলে নিচ্ছেন বুঝলাম। আমার হাত ছুটি ধরে উনি শুগলেন।

“আচ্ছা মা, ওকে তুই এখনো ভালবাসিস ?” নিরুত্তর মুখে আমি তাকালাম ওর পানে। ওর পক্ষে আমার উত্তর পড়ে নিতে দেয়ী হল না।

“বেচারি মা আমার !” বলতে গিয়ে দু ফোঁটা জল ধরে পড়ল ওর গাল বেয়ে।

১৮ই জানুয়ারী।—কাল রাত্রে ছানোয়া বেশ ভাল ছিল। শান্তিতেই ঘুমিয়েছিল। রাত তিনটে নাগাদ বসেছিলাম ওর বিছানার ধারে। আমার কাঁধে ও হাত রাখল। আগশোয়া অবস্থায় ও জানলার দিকে নির্দেশ করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল,—

“ওই যে দেখছ—যীত হচ্ছেন উনি যিনি মৃত, যিনি পুনরুজ্জীবিত, যিনি ভগবানের ডান দিকে বসে আছেন, আর আমাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রার্থনা করছেন সুবিচার।”

ও টেনে টেনে শেষের কথাগুলো বলল। তৃপ্তির হাসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল। আমি কি বলতে গেলে ও খামিয়ে দিল, “চুপ, চুপ ! শোন, ওই শোন !”

একদৃষ্টে, অত উৎকর্ণ ভাবে ও কি দেখছিল জানি না ! দিগন্তে চাঁদ আর তারার উদ্ভাস। বেশ কিছুক্ষণ পরে ও আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল।

“সব শেষ !” করুণ কণ্ঠে ও জানাল।

ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ভগবান যেন মুখ তুলে চেয়েছেন মনে হয়। ওর পাপ উনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। আমরা কে-ই-নিজেকে নিষ্পাপ বলতে পারি ? অবিরত শুধু ঘরে বেড়াচ্ছি ভেঁড়ার পালের মত ; নিজের নিজের পথে আমাদের চলা ছাড়া উপায় নেই ; তাই ত চিরন্তনের আদেশে যীত টেনে নিয়েছেন আমাদের সমস্ত পাপ তাঁর নিজের অঙ্কে। ভগবান—আমাদের ঈশ্বর কি সর্বদা বলছেন না, “আমি, আমিই যুছে দিই তোমাদের পাপ-তাপ, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার আমার ভালবাসা,—আমি ভুলে যাব তোমাদের বাবতায় পাপ।”—ভগবান, ক্ষমা কর ওর পাপ, ওর প্রতি মেলে ধর তোমার বরাভয়-পাণি, তোমার মাঝেই ওর আত্মা যেন খুঁজে পায় পরম শান্তি।

সকালে জমিদারের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ত অবাক ! প্রলাপের ঘোর কেটে গেছে, তবে মাথাটা এখনো দুর্বল, সামান্য বিকার আছে।

২০শে জানুয়ারী। ওর বিছানার পাশে আজ সকালে বসেছিলাম। চোখ বুজে ও শুয়ে আছে দেখে ভাবলাম ঘুমুচ্ছে। কিন্তু একবার চোখ তুলে দেখি, স্থির নয়নে আমার দিকেই ও চেয়ে আছে। ইশারায় আমার কাছে ডাকল ও, “কি দুঃখের বে দেখছিলাম। শান্ত কই ? একবারও কই ও ত’ আমার দেখতে এল না ?”

আমি কি বলব জেবে শেলাম না।

“এখনো ও কি আমার ওপর চটে আছে ? ডাক না ওকে, ওর সঙ্গে মিটমাট করে নিই ; যাও লক্ষ্মীটি, ওকে ডেকে আন।”

—আমি বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম মসিয়া দেহে। ওঁকে একথা বলে আমি জানালাম যে সজ্জি বা ঘটেছে ওকে এখন খুলে বলা বোধ হয় ভাল।

আমরা ঘরে ঢুকতে ছানোয়া সখেদে বলল, “বুঝেছি, ও আসতে চায় না এখনো।”

“ও আসতে পারে না বাপ !” কাঁপা গলায় ওর মামা জবাব দিলেন।

“কেন ?”

“ও যে আর বেঁচে নেই !”

“এ্যা, পাশ্চ মাঝা গেছে ? আমার স্বপ্নই সত্যি হল ?” ও ব্যগ্র ভাবে ওর মামার দিকে খুঁকে পড়ল, “আমি যে দেখলাম লেকের ধারে ও মরে পড়ে আছে, আর ওর চোখ উঃ, কি সে চাউনি ! দারুণ ভাবে চেয়ে বয়েছে। আমি ওর কাছে যেতেই ওর নিষ্পন্ন চোঁট দুটোর মধ্যে থেকে কে যেম গর্জে উঠল, ‘কার’্যা প্রত্যাক !’ অসম্ভব কর্কশ ওর গলাটা শোনা। তবে কি এসবই সত্যি ?”

“হ্যা বাছা !”

“হায় রে !” বলে অমানুষিক চিৎকার করে ও পড়ে গেল বিছানার ওপর, নিখর, অচঞ্চল। মামা তাড়াতাড়ি আজলা-ভরতি জল দিতে লাগলেন ওর মুখে-চোখে। ঋণিক বাদে চোখ মেলেই আবার সভয়ে ও চোখ বুঁজল। আমাকে যোগীর কাছে, রেখে উনি ডাক্তার ডাকতে গেলেন। কের ও তাকাল, শৃঙ্গদৃষ্টিতে ; বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর কপালে কালিমা ঘনিয়ে এল ; অব্যক্ত ভীতি ফুটে উঠল দুই চোখে। আমার হাত ধরে নীরস গলায় ও ধীরে ধীরে প্রস্থ করল।

“আচ্ছা, সত্যিই আমি-...আমি কি-...একাজ করেছি ? কেন এমন করলাম ? কে বলল ?”—আমি চুপ করেই রইলাম।

“কই, তুমি উত্তর দিলে না ? বল, বল না, একথা কি সত্যি ?”

“হ্যা, সত্যি।”

গভীর স্তব্ধতা নেমে এল চারি দিকে। মুক নয়নে পরস্পরের পানে আমরা তাকিয়ে রইলাম, নিশ্চাপ মূর্তির মত। মিনিট পনেরো প্রায় এই ভাবেই কাটল। এমন সময় ডাক্তার এলেন।

“বাব, তোমায় বেশ ভাবুক, দার্শনিক গোছের দেখতে লাগছে হে”, উনি রসিকতা করলেন।

স্বপ্নোপিতের মত ছানোয়া তাকিয়ে রইল। পরে বলল, “ঠাটা না ডাক্তারবাবু ; আর সময় নেই। সবই এখন পরিকার বুঝতে পারছি।”

খানিক দম নিয়ে ও বলে চলল, “উঃ, এমন নিরপরাধ প্রাণ হরণ করবার আগেই কেন আমার মৃত্যু হল না ?”

হুঁহাতে মুখ ঢেকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার আর কর্ণেল পাশের ঘরে চলে গেলেন। নিজেরই অজ্ঞাতে ওর পাশে বসে ওর চুলগুলি সযত্নে বিস্তৃত করতে লাগলাম আমি। এই অসহ্য যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। ও আমার হাত সন্নিবেশ দিল।

“জান না আমি কে ? আমি যে ভাড়াহস্তা।” বিকৃত গলায়



## স্বাস্থ্য কল্পনা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্তে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সন্তানগণের দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপরিখ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ধোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিবা নিজের ধান্দায় ছুটেতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্নিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুর্কহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়ই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় কামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও হুঁচিস্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকুণ্ড বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার,

গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং স্বাস্থ্য কল্পনা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা কবে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে ঘরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ জুম্বা, তাই কজনই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলা? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিভী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্তে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটি ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মধ্যেই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ আছে। ভিটামিন ‘এ’ শরীরের বাড়ের জন্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্তে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন ‘এ’ স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন ‘ডি’ ও দেওয়া হয়। ভিটামিন ‘ডি’ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন ‘ডি’ দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদা শীলকরা টিনে খাঁটি ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

ও টেবিলে উঠল।—দারুণ ব্যথায় আমি বুঝে পড়ছিলাম ; কিন্তু না, এসময়ে ওকে প্রবেশ দেওয়াই আমার কর্তব্য। ওকে স্বরণ করাতে চেষ্টা করলাম, “আমরা করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান।”

“হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে—তুমি আমার ভালবাসতে, তাই না? মার মুখে যেন শুনেছি সে-কথা। এখনো ভালবাস?”

“আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমার ভালবাসি। ভগবান কি আমাদের নিকে মুখ তুলে চাইবেন না?”

“আমেন!” বলে ও আমার হাতটা তুলে নিল। বলল, “ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার অটুট।” ডাক্তার ফিরে এলেন।

“বুঝলে হে খদ্দর, দিতে-মনে এখন যত পার বিশ্বাস নাও।”

ওকে ও বাধা দিল, “মিসিয় শান্তি, আমি একদম সেরে উঠছি। রীতি-মাসিক বিচার শুরু হোক। আমার বিচারের দিন কবে খার্ব হয়েছে?”

“আগামী বাইশে।”

“আজ...হল...?”

“বিশ তারিখ।”

“পরশু দিন তবে?”

“হঁ।”

“বেশ। আমি প্রস্তুত।”

ডাক্তার চলে গেলে পাক্সা চার ঘণ্টা ও দিব্যি শান্তিতে ঘুমিয়ে নিল।

২১শে জানুয়ারী—আজ সন্ধ্যাবেলা ফাদার রোশেল ওকে দেখতে এলেন। সেট জন্‌এর চতুদশ অধ্যায়টি পড়ে উনি হাঁটু গেড়ে বসলেন; আমরাও বসলাম ওঁর দেখাদেখি। শুরু হল প্রার্থনা: আমাদের পাপ তিনি যেন হরণ করেন, রোগীকে করেন যেন কুপা।

“ভগবান, তুমি,” উনি ভক্তি-বিনয় কণ্ঠে বলে চললেন, “তুমি ত চাও না পাপীদের মৃত্যু হয়। তুমি চাও, তারা অমৃতপুত্র হোন, পুনরুৎপাদ করুক তাদের আত্মাকে; প্রভু, ক্ষমা কর তোমার দাসদাসকে; ওর অন্তঃকরণে জেগেছে আকৃতি,—প্রেমময়, ক্ষমা কর, কুপা কর।”

নীচবে আমরা অশ্রু বিসর্জন করছিলাম। পাদরী উঠে দাঁড়ালে ছানোয়া তাঁকে অমুরোধ করল নতমুখে, “পিতা, আশীর্বাদ করুন।”

ওর মাথায় হাত রেখে মিসিয় রোশেল বললেন, “বিপদের মুহূর্তে প্রথম প্রেমিক যেন তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন, আর তাঁর নামের মাঝেই তুমি যেন খুঁজে পাস শ্রেষ্ঠ আল্পর।”

আজ জমিদার তাঁর মাকে আত্মোপাস্ত ঘটনাটি বলল। ওর কাহিনী শুরু হতে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ঘর থেকে,—কঁতেন হাত ধরে আমায় বসালেন; অতি বিয়গ্ন নয়নে জমিদার আমার দিকে তাকাল; তার পর ওর মাকে বলল, “মা, ও চলে যাক; যে কাহিনী তোমায় বলছি, তা দুঃখের, বড় দুঃখের; ওর শোনা উচিত হবে না।”

তবু ওর মা আমায় যেতে দিলেন না।

“না ছানোয়া, ও থাক; বেচারী তোকে যে প্রাণাধিক ভালবাসে। ওর কপালে এত দুঃখও ছিল।”

“হঁ, এ-সব শোনার পর প্রেম-টেম করুণের মত উবে যাবে। তা

ছাড়া আমার ওপর ওর ধারণাই বা কেমন হবে?” স্নানমুখে ও স্বগতোক্তি করল।

তার পর শুরু হল ওর কাহিনী: “অল্প কথায় বলছি, যা ঘটছিল।—জ্ঞানেও কয়েককে দেখে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম আর গান্ধীও,” ছানোয়া সসঙ্কোচে বলল, “ওকে ভালবাসত। গান্ধীকে বহু বার সাবধান করে দিয়েছি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছি, আমার খুসীমত চলতে নির্দেশ দিয়েছি। সে-কথা কোন দিন ও কানেও তোলে নি। আর জ্ঞানেও ওকেই বেশী ভালবাসত আমার চেয়ে। আমার ব্যবহার ওর মত মধুর নয়; আমায় কেমন যেন ভয় করেই চলত জ্ঞানে। আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব ওকে বহু বার করেছি; ও আমায় চায় নি! আমি তখন যেন অস্ত্র মামুষ,—আমি আর আমাতে ছিলাম না;—এক দিন ফুটফুটে চাঁদিনী রাতে...দেখলাম, ওরা হুঁজুন বেড়াচ্ছে বাগানের সুরকি-ঢালা পথে।...এই অবস্থিই আমার মনে আছে। আর কিছু স্মরণে আসছে না। হায় রে কপাল! কেন এর আগেই মরলাম না!”

হঁ হাতে মুখ ঢেকে ও প্রাণ-কাড়া কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওর মা-ও কাঁদছিলেন। আমি উঠে গেলাম, আমার হাতে তুলে নিলাম ছানোয়ার হাত। জানি না কেন এ রকম—পোষা কুকুর যেমন মনিবের মন খারাপ হলে তাঁর হাত চেটে দেয়—সেই রকম ব্যবহার আমি করছিলাম। স্পষ্ট অমৃভব করতে পারছিলাম ঘটনাবর্তের খারা, তবু কিছু গ্রাস করবার শক্তি আমার ছিল না। সবই চলছিল যেন স্বপ্নের ঘোরে। আমায় দেখে, আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে ছানোয়া আঁতকে উঠল; আমার মাথায় হাত রেখে বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, “বেচারী! কি কষ্টটাই না দিলাম!”

তার পর আমার দিকে ওর মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, “মা, এই দেখ, শেষ পর্যন্ত একেও কি মেরে ফেলব না কি? কি চেহারা করেছে এই ক’দিনে দেখ ত?”

আমায় ও সন্মুখে অমুরোধ করল, “যাও মার্গবিরি, লক্ষ্মীটি, যবে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।”

শিশুর মত, বিনা বাকাব্যয়ে আমি ওর আদেশ মেনে নিলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, পথ যেন শেষ হবে না। ঘরে গিয়ে থপ করে বসে পড়লাম একটি চেয়ারে। কতরূপ আতঙ্ক ছিলাম জানি না, হঠাৎ দারুণ ভাবে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। চেয়ে দেখি, সামনের জানলাটা খোলা,—বাইরে তুষার পড়ছে। জানলা এঁটে দিলাম। চেয়ারে ফিরে যাবার সময় জুশটার দিকে চোখ পড়ল; নতজানু হয়ে বসলাম আমার দিব্য-সাধীর চরণতলে। মনে নেই কি মিনতি জানালাম, কিন্তু প্রেমের ঈশ্বর, অন্তর্ধামী—তিনিই আমায় বল দিলেন। বুক-ভরা সাধনা নিয়ে উঠে দাঁড়লাম। অন্ধরে পেলাম প্রথম শান্তি। নীচে দেখা হল, মিসিয়াকে আর ছানোয়ার সাথে। আমার হাত ধরে কর্ণেল অভিবাচন জানালেন। ছানোয়া খুবই বুঝে পড়েছে। আমার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই ওর মুখে প্রসন্ন ভাব দেখা দিল। ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

২৩শে জানুয়ারী—আজ মামলার দায় বার হবে। ওখানে

আমি বাই নি; বাবার সামর্থ নেই। গাড়ীতে চড়ে ছানোয়া আদালতে গেল; সঙ্গে ডাক্তার, কর্ণেল আর আমার বাবা। আশেপাশে অজস্র পুলিশ-অফিসার। দিব্যি শাস্ত্র ভাবে ও গাড়ীতে বসে ছিল। ভগবান, ওর মঙ্গল কর!

সন্ধ্যা।—বিকেল চারটের ওরা ফিরেছে। কর্ণেলের অমুরোখে প্রেহরীয়া ছানোয়াকে নিয়ে এসেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের কাছ থেকে ও বিদায় নেবে বলে। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম; স্বৎসন্দন স্তব্ধপ্রায়। ছানোয়া ধীর পায়ে এগিয়ে এল, হাসবার চেষ্টা করে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

“পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড!” উদাস ভাবে ও জানাল।

আমি কথা খুঁজে পেলাম না। পনেরো বছর! আত্মীয়-বন্ধুহীন অবস্থায় দিন কাটান! এ যে যুহুর সামিল। ঘটনার পর ত ওর স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙেই গেছে!

“না গো, ছানোয়া, এদণ্ড যে বড় নিরম!”

“কু:! আমার একমাত্র দণ্ড যুহুরা ছাড়া আর কিছু নয়; রক্তের বদলে রক্ত!”—ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দেখে আমি ওর হাত ধরলাম,

“চল ছানোয়া, প্রার্থনা করি গে।”—ওকে নিয়ে গেলাম প্রাসাদের উপাসনালয়ে, যেখানে ধর্মা দিয়েছিলেন ওর মা। বেদীর ওপর বরাভয়-মুদ্রায় হাতবাড়ান যীশুর ছবিতে লেখা, “এস আমার কাছে, তোমরা, যাঁরা কর্মকান্ত, পর্যুদন্ত, এস, আমি লাগব করব তোমাদের হৃদয়-ভার।”

সত্যিই-বুকে আজ আমাদের যে গুরুভার, তা ব্যথ বেড়ান অসম্ভব! হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর মায়ের পাশে; উনি থপ করে ওর হাত চেপে ধরলেন। মুখে আমাদের ভাষা নেই; প্রার্থনা করছিলাম অন্তরের অন্তর থেকে। ছানোয়া দাঁড়িয়ে পড়লো। নীচু গলায় অহুমতি চাইল, “না, বাই এবার?”

চট করে উনি টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন, চেপে ধরলেন ওকে আকুল আগ্রহে। “না না। আমি দেব না, আমার একমাত্র সন্তানকে এভাবে আমি হত্যা করতে দেব না!” উনি গর্জে উঠলেন। ভীত দৃষ্টিতে উনি কিছু খুঁজতে লাগলেন মনে হল। ওঁর কাঁপে ছানোয়া আলতো ভাবে একটা হাত রাখল।

“মাত্র পনেরোটা ত বছর; দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ভগবানকে সর্বদা স্মরণে রেখ মা।”—বীরে বীরে মার আলোষ থেকে ও নিজেকে মুক্ত করে নিল, সন্ধ্যাতে উনি বেদীর সামনে বসে পড়লেন।

ও খুঁকে পড়ে বলল, “মা-মণি, বিদায় দিবি না?”

ওর গলা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে উনি কান্ডাতে লাগলেন। সহস্র চুপনে ওকে অস্থির করে তুললেন।

“ভগবানের ইচ্ছাটী পূর্ণ হোক,” উনি প্রার্থনা করলেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। ভূমিদাব ঘূরে দাঁড়াল আমার দিকে, “আদিত্য মার্গরিং, বিদায়!”

ডাগর চোখ দু’টি তুলে ও প্রশ্ন করল, “নিত্য তোমার প্রার্থনার ক্ষণে বিশেষগামী এই ভাইয়ের কথা স্মরণ করে করুণা-ভিক্ষা করবে ত?”

“হ্যাঁ,” আমি জবাব দিলাম। ওর মার প্রসঙ্গ তুলে জানতে

চাইল, “ওঁর নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সাহায্য তুমি—ওঁকে মাঝে মাঝে দেখে যাবে ত?”

“হ্যাঁ।”

আবার ও আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

“যে-ভালবাসা তোমার কাছে পেয়েছি, তার ঋণ ভগবান শোধ করবেন।”—বলে ও বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে হল ছুটে বাই ওর পেছন পেছন কিন্তু দেহে আর তিলমাত্র শক্তি না থাকায় বসে রইলাম শূন্য-হৃদয়ে। চারি দিকে ঘন অন্ধকার জড় হয়ে এল। আরু নিবে গেল আমার জীবনের সব আলো। অন্ধকারে ছোট ছেলেদের ছেড়ে দিলে তারা যেমন করে, আমিও তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বসলাম ওর মার অশ্রু-সিক্ত সান্নিধ্যে। ভগবান, সাহায্য কর ভগবান! এই দুর্বার আঁধারে পথ দেখাও!

১০ই এপ্রিল, ১৮৬১।—বহু কাল হল দিনপঞ্জী লেখা হয় নি।

কঠিন অশ্রু থেকে উঠেছি। অসম্ভব জর তার প্রলাপে ভুগলাম। বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানই রক্ষা করলেন এ যাত্রা। চোখ খুলে যেদিন সূর্য দেখলাম, যেদিন দেখলাম আকাশের নীলিমা আর বাবা-মার আশাবিত্ত মুখ, ভগবানকে সেদিন ধন্যবাদ জানালাম। “আমায় তুমি সর্বদাই ঘিরে রেখেছ নিবিড় করুণায়!”—আগেকার জীবন আমার কাছে আজ যন্ত্রের মতই অস্পষ্ট, অবাস্তব। সপ্তাহ দুয়েক হল সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছি। তার আগেকার কথা বা স্মরণে আছে, বলছি।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মনে হল আমার ঘরে এক দল লোক, যেন ফিস-ফিস করে কি আলোচনা করছে। চোখ বুজে ছিলাম; এই আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, দুই হাতে মুখ ঢেকে কে যেন আমার বিছানার কাছে বসে কাঁদছে। চোখ আমার বন্ধ হয়ে গেল; বাদামী ঢেউখেলান চুল দেখে চিন্তে পারলাম,—কাপ্তেন লফেড্র। প্রথম দেখা হওয়া অবধি আমার ও ভালোবেসেছে প্রাণ-মন ঢেলে—প্রতিদানে আমি ওকে কি দিলাম? দিলাম শুধু বুদ্ধির ব্যথা। ওর প্রতি কেমন যেন সহানুভূতিতে আবার অন্তর ভরে উঠল। আমার যুহুর দেবী-ই, তার আগে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আমার তুলের জঙ্ক। এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল। আরো কিছু দিন আগে যদি এ-ভাবে আসত, যদি রাজী হতাম ওর প্রস্তাবে? ওর মাথায় আমি হাত রাখলাম।

“লুই আমার ক্ষমা করবে?”

বড় দুর্বল লাগল নিজেকে,—অতি কষ্টে বার হল এই চাংটে কথা। উত্তরে ও তুলে নিল আমার হাত, তার ওপর নেমে এল ওর চোঁট। চোখ ওর জলে ভরে উঠল।

“লুই, আমি ত যাচ্ছি; তুমি রইলে; বাবা-মার দেখা-শোনা কোর,—ওঁদের নিজের আত্মীয় ভেবে দেখা-শোনা কোর, যেমন?”

মনে কেমন ধারণা! এস, যুহুরা আমার সমীপবর্তী।

“যেচারা বাবা-মা! এই বয়সে ওঁদের স্বস্তি করার আর কেউ নেই। ওঁরা আমায় এত স্নেহ করেন,—আমার অবর্তমানে না জানি কত কষ্টই না হবে ওঁদের!”

ও নীরবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে,—দুই চোখে দাক্ষ

ব্যথার ছাপ, সজোর ও ধরে বইল আমার হাত। ক্লান্ত চোখ দুটি বন্ধ করে ফেললাম। কে আমার বুকে জড়িয়ে ধরল।

“মা-মণি!”

“বাবা!...”

তার পর আর মনে নেই। তার তিন দিন বাদে জ্ঞান ফিরল। বেশ দুর্বল লাগছিল। আমার ইচ্ছামুখায় আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি সেদিকে উঠছি দেখে মার মুখে হাসি ধরে না; আগের লালিমা ফিরে পেতে এখনও অনেক দেরী। আজ সকালে আমার জড়িয়ে ধরে তিনি আনন্দে, দুঃখে কঁদে ফেললেন।

“মার্গা, এ কি চেহারা হল তোর!”

তেরেস ওঁকে ধমক দিতে গিয়ে নিজেও কঁদে সারা। “মাদাম”, ও বলল, “এভাবে ওর ঘরে বসে তুমি কীদু দেখে ও কি নিজেকে সামলাতে পারবে? ডাক্তারবাবু না হাস্যরস বার বলছেন, ও বাতে উত্তেজিত না হয়; সেদিকে লক্ষ্য রাখতে?”

মা হাসার চেষ্টা করলেন। তেরেসের মুখ একবার খুলে খামে না সহজে।

“কেন ওর ফ্যাকাসে গাল দুটো কি খারাপ লাগছে নাকি? বরং খাসা লাগছে; এ কথার অন্তত আর একজন আছে যে সায় দেবে, যখন এখানে আসবে। এমন ভাবে ওকে উত্থাপ্ত কোর না মাদাম; এতে ওর মন খারাপ হয় না? কান্টেন সাহেব আশুক না একবার,—আজ্ঞার করা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে একচোট।”

বাবা এসে আমার বিছানায় বসে আমার আদর করলেন। তেরেস চলে গেল; মার থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি বাদ সাধলাম; আমি জোর করে ওঁকে বিদায় করতে পাঠিয়ে দিলাম; বাবাও আমার সমর্থন করলেন ভাগ্যিস; নহত উনি কি যেতেন? বাবা তখন কথা পাড়লেন, “মা-মণি এবার তুই সেদিকে উঠবি; ভগবান সত্যি আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয়।”

“হ্যাঁ বাবা!”

খানিক বাদে স্বাভাবিক গলায় উনি বললেন, “জানিস মা, লুই তোকে দেখতে এসেছে?”

“হ্যাঁ বাবা; ওকে যখন বিকানের ঘোরে দেখলাম, তখন আমার মনে কেমন যেন ধারণা হয়েছিল আমার মৃত্যু অবশ্যবাবী।”

সবাই তাই ভেবেছিল মা; পারীতে খুঁড়িমার ওখানে তোর অবস্থার কথা শুনে লুই বেচারী পড়িমরি করে ছুটে এসেছে।”

দীর্ঘ নীরবতার পর উনি বললেন, “কি একটা কাজে ও পারী গিয়েছে; দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।”

“আচ্ছা বাবা, কীতলের খবর কি?”

“বিশেষ সুরিধের নয়; মাঝে মাঝে ওঁর মাথার গুণ্ডগোল দেখা বাচ্ছে।”

“আর?”

“হুনোরা? মারা গিয়েছে; আত্মহত্যা করেছে।”

“হায় ভগবান!” আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। শুনলাম, উন্নত অবস্থায় ও একদিন এই অসহ্য জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছে। ভগবান, ওর আত্মা যেন শান্তি পায় তোমার আশ্রয়ে। এখান থেকে বহুদূর তুলার কাছাকাছি, কবরখানার বাইরে ওকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমি, আমিও ত চেয়েছিলাম ওকে অনুসরণ করতে।

২০শে এপ্রিল। কাল আমার বৈঠকখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; নিজেই নেমে যাচ্ছিলাম; কিন্তু কয়েক খাপ নেমেই বসে পড়তে হল। বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, “গাড়া খুকি, আমি তোকে নিয়ে যাবো; এখনো তুই বড় দুর্বল মা!”

আমায় উনি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বৈঠকখানার সোফার উপর। মা এক গ্রাস সুরা এনে দিলেন। বাবা আমার কাছেই বসলেন; ওঁর কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম; আমার অন্তরের পর থেকে ওঁর কপালে দেখা দিয়েছে অজস্র রেখা।— আমি অমুযোগ করলাম, “বাবা, আমার অন্তরের সময় তোমাদের খুব ভুগিয়েছি বুঝি?”

“হ্যাঁ মা, খুবই কষ্টে দিন কেটেছে আমাদের,” কাঁপা গলায় উনি জবাব দিলেন দুই হাতে আমার চেপে ধরে।

“তোমাদের ছেড়ে যেতে পারলাম কই? ভগবান আমার মনে করিয়ে দিলেন যে তোমাদের প্রতি আমার যে কতব্য তা পালিত না হওয়া অবধি আমি নিজেকে তাঁর চরণাশ্রয়ের যোগ্য করতে পারব না।”

বাবা আমার কোলের কাছে নিয়ে চুপ করে বসে বইলেন।

২১শে এপ্রিল।—কাল বিকেলে লুই এসেছে; বাবা আর আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম, দরজা খুলে গেল, আর আদালত কিছু বলবার আগেই ও এসে ঢুকল।

সান্দরে ওর হাত বাবা চেপে ধরলেন নিজের মূঠায়।

“হ্যাঁ বোমার মত কোথা থেকে এসে জুটল লুই?”

ও আমার কাছে এল; ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, “স্বাগত লুই!”

আমি এত বোকা আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছি দেখে ও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাকে ডাকতে গেলেন বাবা। লুই আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে সরু সরু আঙুলগুলোর ওপর স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

“কি রক্তহীন তোমার চেহারা হয়ে গেছে মার্গারিৎ!” আমার দিকে ঝুঁকে ও অশ্রুট কষ্টে বলল, “বনফুল, তোমার ওপর দিয়ে যে বিরাট বড় বয়ে গেল!”

ও আমার এত কাছে এগিয়ে এল যে ওর ঠোঁট আমার কপালে অমুভব করতে পারছিলাম; হ্যাঁ ও সোজা হয়ে উঠে গাড়াল, সরে গেল চিম্নীর দিকে। ওকে বেশ বিচলিত লাগল; ওর চোখ কালো হয়ে উঠল। যখন ও উত্তেজিত হয়, তখন দেখেছি ওর চোখে ওই রকম কেমন একটা অন্ধকার ভাব ঘনিয়ে আসে। মাকে নিয়ে বাবা এসে ঢুকলেন। মা লুইকে জড়িয়ে ধরলেন; অবিরল জলধারা ওঁর চোখে।

“ওর চেহারা কত বদলে গিয়েছে, না রে লুই?”

“হ্যাঁ, কিন্তু বসন্তকাল এলেই স্বাস্থ্যে আস্তে আগের স্বাস্থ্য ফিরে আসবে।”

“সত্যি না কি রে?”

“বাঃ, একথা ত সবাই জানে!” বলে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

“কি ভাবছ, সন্তাহ খানেকের মধ্যেই লুই আর আমি ওকে খাড়া করিয়ে দেব, কি বলিস লুই?”—বাবা ঠাটা করার চেষ্টা করলেও

দেখলাম ঠর চোখের কোণ চক্চক করছে। লুই এবার কিছু দিন থাকবে। সন্ধ্যাটা বেশ লাগছিল। লুই আর বাবা চিমনির দুই কোণে বসেছিলেন। বাবার হাতে হাত দিয়ে আমি সোকার শুয়েছিলাম। কাছেই বসে মা সেলাই করছিলেন। রাত দশটা বাজতে বাবা সবাইকে শুতে যেতে বললেন। আমি উঠলাম।

“উঁহ, তুই নিজে সিঁড়ি দিয়ে উঠবি কি করে?”—মা আপত্তি জানালেন।

“দেখ না,” আমি হাসলাম, “নামার সময় বাবার হাতে ভর দিয়ে কেমন অনায়াসে এলাম বল ত?”

“না না,” বাবা বাধা দিলেন, “অসম্ভব, নামার চেয়ে ওটা অনেক কঠিন।”

একটু চেষ্টাই করি না কেন? আমি বঁকে বসলাম। দশ ধাপ গিয়েই দম নেবার অস্বাভাবিক বসে পড়লাম, বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, “কি যে ছেলেমানুষী করছিস, শরীর এতে খাবাপ হবে।”

“একদম না।” আমি হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুবই দুর্বল লাগছিল; ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ল।

“এই ত লুই! ও-ই তোকে উপরে নিয়ে যাবে মা!”

“না বাবা,” আমি আপত্তি জানালাম।

“হা হা,” উনি উত্তর দিলেন, “ভয় নেই, ও তোকে ফেলে দেবে না, ওর গায়ে কি জোর জানিস?”

তার আগেই লুই আমার তুলে ধরেছে। আমার চুপি চুপি ও বলল, “মাখাটা আমার কাঁধে রাখ দেখি।”

ওর গলমটা যেন অস্বাভাবিক শোনাৎ; বড় নিস্তেজ লাগছিল, ওর কথাই শুনলাম; কি অবসর যে লাগছে। চোখ খুলে দেখি মা বসে আমার হাতে জল দিচ্ছেন আর তেরেস আমার জামা-কাপড় খুলে দিচ্ছে।

“এই ত জ্ঞান ফিরে এসেছে,” ও চেঁচিয়ে উঠল।

উঠতে চেষ্টা করতেই তেরেস বাধা দিল।

“আবার কি করবি রে? যা ঘোলাটা খাওয়ারি এখনি!”

ওর কথা জানতেই হল। আমার একটা গরম ডেসি গাউনে ঢেকে দিয়ে ও বলল, “বাই ম’সিয়াকে ডেকে আনি:—উনি কোথায় গেলেন মাদাম, জানেন?”

“ওই ত বাগানে কে যেন পায়চারী করছে,” বাদাম গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম।

“ও ত কাপ্তেন সাহেব,” হেসে উত্তর দিল তেরেস।—খানিক পরেই বাবা এলেন।

“দেখছিস ত মার্গরিৎ, কি দুর্বল হয়ে পড়েছিস?”

“হ্যাঁ বাবা, কিন্তু সকালে কেমন দিবা তোমার হাত ধরে নেমে গেলাম; ভেবেছিলাম নিজেই বুঝি উঠতে পারব।”

জানলা দিয়ে চেয়ে উনি বললেন, “ওই ত শারীর মত লুই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তুই অজান হয়ে গেছিস দেখে বা ভয়টা পেয়েছিল; বেচারা। ও তোকে কত যে ভালবাসে মা!” বলে উনি আমার আদর করলেন।

“কিছু চাই না কি মার্গো?”

“না বাবা ঘুমিয়ে পড়গে, মাকেও নিয়ে যাও; দিন-রাত তোমাদের কি যত্নাই যে দিচ্ছি!”

আবার আমার আদর করে উনি চলে গেলেন।

২২শে এপ্রিল।—বাগানে মা আর আমি বসেছিলাম। দুই দেখা বাচ্ছিল বাব’ আর লুইকে। ঠরা ঘোড়ার চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন; বাবা ঠর নিজের ঘোড়ায়, লুই আমারটার। বেশ কিছু দিন হল অন্ত্যারলিকের পিঠে চড়িনি বলে ও একটু বুনো হয়ে উঠেছে। তাই লুই ওকে একটু তালিম দিতে নিয়ে গেছে, আমি সেরে উঠলেই যাতে অন্ত্যারলিককে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি। ওরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

“লুই এবার বেশ কিছু দিন থাকবে এখানে,” মা জানালেন, “চার পাঁচ মাসের ছুটিতে এসেছে। ও বাড়ীতে এলে সব-কিছুর রূপ কেমন বদলে যায়, কেমন যেন একটা ক্ষুতির আঘাত এসে পড়ে! আর এই সময় তোর ক্ষুতির একান্ত দরকার।”

“ছেলেটা বড় ভাল।”

মনে এল গত বছর ওর প্রস্তাব আমি যখন প্রত্যাখ্যান করি,—বেচারা আমার একটা কথা পূর্বস্তু বলল না; সরল ব্যবহার দিয়ে, আমুদে মেজাজ দিয়ে ও আমার একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে সেই অতীতের অপরাধ; মার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম, দারুণ কান্না পেতে লাগল। মা-বাবার বাসনা আমি লুইকে বিয়ে করি। আমার ত’ মনে হয় ওদের সুখী করাই আমার কর্তব্য। বড়ই দুর্ভাবহার করেছি ওদের সঙ্গে, ভগবান আমার বাঁচিয়ে দিলেন এ ব্যাটা, যাতে আমি নিজের কামনা

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



• কল্লো প্রস্তুত  
• ফ্রীমে সেকা  
• মোসিনে প্যাক  
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, চর্চা  
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী  
কলিকাতা - ২৯



বাসনাগুলো দাবিয়ে রেখে তাঁদের ইচ্ছামত চলতে পারি, আর এই ভাবে তাঁর আশ্রয়ের যোগ্য হয়ে উঠি, বাতে করে আমার একগুঁয়েমির জন্ত পরিতাপ করতে পারি। ওঁরা আমার সেই দুর্বাবতারের কোন উল্লেখ যুহুতের তরেও করেন না; তবু সে কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওঁরা এত ভালবাসেন আমায়, আমার উচিত তাঁদের কোন দাবী অপূর্ণ না রাখা। লুইকে বরাবর আমি একটু বিশেষ চোখেই দেখেছি, আর ওকে যদি বিয়ে করি তবে ভগবান আমায় শিখিয়ে দেবেন কি ভাবে যথার্থই ওকে ভালবাসতে হবে। তিনিই আমার ভরসা।

২৮শে এপ্রিল।—লুই আমাকে আন্তরিক ভালবাসে। ওকে কথা দিয়েছি, ওর জীবনসঙ্গিনী হব আমি। গত কাল সন্ধ্যায় আমি সোফার ওয়েছিলাম, দরজার দিকে পিছন ফিরে। কার পায়ে র শব্দ শুনলাম; লুই! আমার পাশে ও বসল! চিন্তাকুল ওর দৃষ্টি। আমার দিকে বখন ও চাইল, মনে হল আমার গহনতম হৃদয়ে ও বেন কিছু খুঁজছে! হৃৎকেন্দ্র চূর্ণ করে রইলাম। বাইরের জগতের শুদ্ধতা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের অন্তর। ও আমার হাত ধরল; জানি ও কি বলবে। বলল ও তাই।

“মার্গরিৎ, অহর্নিশি তোমায় আমি স্মরণ করি, আমার জীবন তোমারই হাতে, আমায় আর ফিরিয়ে দিও না মার্গরিৎ, আমার জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হতে দিও না; তোমার একটি কথার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে আমার সন্তা; তবু তুমি রাজী হবে না?”

ওর গলা কাঁপছে, কাঁপছে ওর হাত দুটো। অসম্ভব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ওর মুখ,—আকুল আবেগে ও চেয়ে রইল আমার দিকে। সম্বরণে আমার হাত রাখলাম ওর পিঠে; ওর স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে অকপট ভালবাসার দীপ্তি।

“হ্যাঁ লুই, তোমায় আমি বরণ করে নেব সাগ্রহে।”—ওর সমস্ত রক্ত যেন ছলকে উঠল সারা মুখে। আমার অতি নিকটে ও গিয়ে এল, তপ্ত দু’টি ওষ্ঠ নেমে এল আমার গুষ্ঠে, বহুকণ নিবিড় প্রেমে আমরা মগ্ন রইলাম।

“মার্গরিৎ, তোমায় আমি সারা সন্তা দিয়ে ভালবাসি।”—বলে আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে নিল। ওর প্রশস্ত বৃক্কে আমার মাথা রেখে অপূর্ণ এক স্রবের মাঝে নিঃশ্বাস করে দিলাম। মনে পড়ে, এমন আনন্দ পেয়েছিলাম আর এক দিন। বখন অনেক দিন আগে এক চাবানীর খোকা জলে পড়ে গিয়েছিল, আর আমি তুবে বাজিলাম ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে—এমন সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবা আমায় বৃক্কে টেনে নিয়েছিলেন সবল দু’টি হাতে। ঘরের কোন কিছুই চোখে পড়ছিল না; বাইরে, গাছের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো ছলছিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা কাটিয়ে দিলাম ওই ভাবে। তার পর ওর দিকে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল উজ্জ্বল দু’টি চোখ; ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ওর কপালে চুশন দিয়ে প্রণয় করলাম, “লুই, সত্যি কি তুমি আমার চাও?”

আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল; উত্তরে অনুভব করলাম আরো নিবিড় হয়ে উঠল ওর আলো।

“কিন্তু আমি কি তোমায় স্ত্রী করতে পারব? সেদিনের মার্গরিৎের কঙ্কাল কণা না মাত্র আজ কেঁচে আছে, লুই?”

শীর্ণ আমার হাত দুটো দেখে এক বিলিক করণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে।

“কঙ্কাল থেকেই আবার মার্গরিৎকে আমরা গড়ে তুলব; সেই হবে আমাদের সাধনা।”

বাবা এলেন; উনি কিছু বলার আগেই লুই আমার হাত নিজের হাতে রেখে উঠে দাঁড়াল, বলল, “বাবা আমরা দু’জনে বাগ্‌দস্ত; আপনায় আশীর্বাদ চাই।”

বাবা এগিয়ে এলেন।

“মা, ভগবান তোদের বক্ষা করুন, তোকে, তোর ঈঙ্গিত সঙ্গীকে!” বলে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। “আজ সত্যি বড় আনন্দের দিন।”

“সত্যি তুমি স্ত্রী হয়েছ বাবা?”

“হ্যাঁ মা, হ্যাঁ।”

উনি ছুটে গেলেন মাকে ডেকে আনতে। তিনিও এসে আমার জড়িয়ে ধরলেন, “মার্গো, এ আজ কি শুনলাম মা? সত্যি?”

“হ্যাঁ মা!”

“যাক, ভগবান এত দিনে আমার প্রার্থনা শুনলেন।”

ওরা বড় সুখী আজ; আমিও সুখী; এত আনন্দ পাব কোন দিন ভাবিনি। ভগবানের ইচ্ছাই আমাদের নিয়ে চলুক পথ দেখিয়ে। লুই জানলা টপকে নেমে গেল বাগানে; সেখানে পায়চারী করতে করতে ও ধরাল একটা সিগার।

“তুই স্ত্রী হয়েছিস মার্গরিৎ?”

“হ্যাঁ বাবা।” আমি হাসলাম।

“বেশ মা, বড় স্বস্তি পেলাম; তুই দিন দিন যা শুকিয়ে যাচ্ছিলি, বড় ভাবনায় পড়েছিলাম; এখন তোব সামনে কত কিছু করবার আছে দেখছিস ত’? সেই সব কর্তব্যের ডাকে, তাদেরই আশায় তুই এবার সেরে উঠবি দেখিস। ও আর তুই—তোদের দু’জনােকে একই রকম ভাবে গড়েছিলেন ভগবান। তুমি কি বল আরিয়েৎ?”

“হ্যাঁ গো, সে-কথা আজ আর নতুন করে কি বলি? চল, ওদের আপন মনে কথাবার্তা বলবার সময় দিতে হবে; আমরা উঠি।”

“তাই ত, লুই বোধ হয় এতক্ষণ মনে মনে আমাদের খুণপাত করছে।” উঠে দাঁড়িয়ে বাবা ঠাটা করলেন। “তোদের এখন কত কি বলার আছে, তাই না মা-মণি?”

আমায় আলিঙ্গন করে মা আর বাবা বেরিয়ে গেলেন। সোফায় আমি শুয়ে পড়লাম; চেয়ে দেখতে লাগলাম লুই বাগানে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঋনিক বাদে, ঘরে কারো গলা শোনা যাচ্ছে না দেখে, ও মুখ তুলে তাকাল, তার পর ঘরে কেউ নেই দেখে, সিগারটা ও ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল। পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে চললাম; ও আমার এত ভালও বাসে! ঋনিক চূর্ণ করে থেকে ও জিজ্ঞাসা করল।

“আচ্ছা, কবে তা হলে ঠিক হল?”

“কি?”

“বাঃ, আমাদের—” ও লাল হয়ে উঠল।

“ওহো; তা বেদিন তুমি ঠিক করবে।”

“আমি জ চাই এখনি হোক,” ও অধীর গলায় জানাল, “আচ্ছা, আগামী ১৩ই মে করলে কেমন হয়?”

# মার্গো

CMC-12 BEN

জ্ঞানের  
সময়  
মার্গো সোপ



ব্যবহার করতে ভুলবেন না

সুস্বাদু-সুন্দর মার্গো সোপের শুভ ফেনরাশি প্রতিটি লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে মালিন্য দূর করে এবং দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তি এনে দেয়। পরিবারের সকলের ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ এই সাবান। কোমল স্বকের পক্ষেও নিরাপদ।

প্রস্তুতকারক  
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ  
কলিকাতা - ২৯

“বেশ!”

“আরো দুই সপ্তাহ বাকী; উঃ, এতগুলো দিন! জান, করে যে তোমার আমার মত করে পাব,—ভাবতেও ভাল লাগছে!”

“যে লগ্নে তোমার আমি কথা দিয়েছি তখন থেকেই ত’ আমি তোমার, একান্ত তোমার, লুই।” আমি উত্তর দিলাম।

ও বড় খুশী হল এ কথায়।

“জানো মার্গো, আমি ঠিক করেছি তোমার নিয়ে সোজা দক্ষিণ দেশে চলে যাবো; এখানের এই কনকনে উত্তরে হাওয়ার আওতা থেকে বহু দূরে উষ্ণ কোন প্রদেশে; সেখানে আমার জীবন-প্রস্থান ফিরে পাবে তার পূর্ব-লাবণ্য!”

ওর মধুর কথা শুনে আমার চোখ সজল হয়ে উঠল। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে অল্পতেই বিচলিত হই আজ-কাল। ওর শিশুর মত স্নানর কপালের এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে।

“কি ভাবছ বলত?” ও হাসল।

“ভাবছি যে তোমার রূপ, তোমার মহত্ব আমার প্রকৃতির সঙ্গে কি খাপ খানে?”

তু’ কৌটা জল পড়ল ওর হাতে। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে আমার হৃদয় আজ ভরপুর; আমার মাথা ওর বুকে, ওর মুখ আমার কপালে। জীবনের তরী আজ বন্দর খুঁজে পেয়েছে!

এই যে।—গিয়েছিলাম ‘ওর’ মাকে দেখতে; ওঁর মাথার অবস্থা খুবই খারাপ; এক দিক দিয়ে এ ভালোই হল! তা নয়ত এত বাতনা সহ্য করা ওঁর পক্ষে দায় হত। কর্ণেল ওঁর কাছেই আছেন। আমার দেখে কঁতেস চিনতে পারলেন; এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন।

“কি তোঁর চেহারা করেছিস মা!”—এত দিন, বাদে ওঁর গলা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম। বড় কান্না পেল।

“তোঁর কি অসুখ করেছিল?”

“হ্যাঁ।”

“দ্যনোয়া তোঁর এই চেহারা দেখে যে কি কষ্টই পাবে; ও অল্প দিনের মধ্যে বাইরে গিয়েছে; কি একটা কাজে ও গিয়েছে...কোথায় গিয়েছে?...ওহো! মনে পড়েছে...তুল’তে! কি নাম-যশতীন জায়গায় যে গেল! কে জানে বাপু, নামটা শুনেলেই গা রি রি করে; ওই বকমই। দ্যনোয়া বাইরে যাওয়া অবধি এমন ভীত হয়ে উঠেছি। গান্ড’ মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায়। সারা রাত এমন সব দুঃস্বপ্ন দেখি যে তারস্বরে চেঁচাই ভয় পেয়ে,—তাই শুনে ও ছুটে আসে।”

ওঁর এই ধরনের এলো-মেলা কথা শুনে বড় কষ্ট হল। এমন সময় কর্ণেল দেকে এলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি আমার অভিবাধন জানালেন। “কি দিদি, এখন শরীর কেমন?” কঁতেসকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন না; বসে বসে কি যেন ভাবতে লাগলেন; হঠাৎ আমার দিকে বসলেন, “কি মা, তোঁর মুখের হাসি একদম মিলিয়ে গেছে; ব্যাপার কি? তোকে এত গোমড়া দেখছি কেন?”

হাসার ভাগ করে বললাম, “কই কিছু ত হয় নি!”

“কিন্তু তোঁর সেই প্রাণোজ্জ্বল ভাব আর নেই; ওহো, আমিই ত

তার কারণ...ভাবিস না মা, ওর ফিরে আসার সময় হল; কই আমি ওর মা হয়েও তোঁর মত মুখ ভার করে বসে নেই দিন-রাত?”

বাবার জন্তে উঠে দাঁড়লাম; উনি বিদায়-আলিঙ্গন দিলেন অভ্যাসমত। নীচে কর্ণেলের সঙ্গে করমর্দন করার সময় উনি বলে উঠলেন, “কিন্তু মার্গরিৎ, নীগগির তোঁর বিয়ে? সত্যি না কি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”—ওঁর মুখে এ-প্রশ্ন শুনে খুব লজ্জায় পড়লাম;

তাই মুখ নামিয়ে ছিলাম; উনি আমার চিবুক তুলে ধরে জানতে চাইলেন, “কান্টেন লফেড-এর সাথে, তাই না?”—কটক অবধি উনি আমার পৌঁছে দিতে এলেন; বেশ চিন্তামগ্ন লাগল ওঁকে; স্বপ্নোপ্তিতের মত বললেন, “তুই কি একা এসেছিস মা?”

“না, বাইরে লুই আমার জন্ত অপেক্ষা করছে।”

আমরা বেরিয়ে আসতেই লুই এগিয়ে এল; করমর্দনের পর ওঁদের কথা শুক হল। আর পাশে এসে লুই জিজ্ঞাসা করল, “তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়নি?”

“না; কিন্তু এখানে খানিক বসে বাই না কেন?”

লুই ভাবল আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে; একটা ওক গাছের ছায়ায় বসা গেল। কর্ণেল আমার কাছেই বসলেন; বললেন, “এখনো তুই বড় দুর্বল দেখেছি।”

লুই আনাল যে আমার খুব অসুখ হয়েছিল।

“হ্যাঁ তা ত জানি।”

“এবার দেখবেন আন্তে আন্তে ও কেমন সেরে ওঠে।” বলে লুই হাসল। অদম্য ওর আশা। ও আমার একান্তই ভালবাসে! আমি যেন ওর প্রেমের যোগা হতে পারি, ভগবান!

কর্ণেল বিশেষ কিছু বলছিলেন না; লুই তা লক্ষ্য করে নি। যিত হাশ্বে ও আমার দিকে চেয়েছিল—আমাদের অদূরেই যে সুখ-পারাবার, তার স্বপ্নে ও একান্ত। একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়লাম; বাবার সময় হল। কর্ণেল বেশ আবেগপূর্ণ ভাবে আমার বিদায় দিলেন।

“মা আমার, তুই আমাদের যে সাহায্য করেছিস, তার ভক্ত ভগবান তাঁর আশীর্বে তোকে ধন্য করুন, মা!”

তারপর লুইয়ের সাথে করমর্দনের সময় বললেন, “ম’সিয়্য ওকে সুখী কর; জীবনসঙ্গিনীরূপে থাকে তুমি পেয়েছ সে যে কত হলভ তা যদি জানতে! তুমি ওকে ভালবাস, বেশ বুঝছি; তার থেকেই বুঝছি ছেলে হিসাবে তুমি কি রকম। জীবনে তোমাদের সাথে আর দেখা হবে কি না জানি না; তবু এ কথা জেনে রাখ যে বূড়ো এক সৈনিকের শুভেচ্ছা চিরকাল তোমাদের দু’জনকে আগলে রাখবে।”

বলেই চলে গেলেন। আমরা বাড়ী ফিরলাম। বেশ রাত হয়েছে; বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

“এই ত’, এসে গেছে!” উনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

“মা-মণি, ক্লান্ত লাগছে না ত’?”

আদলফ আলো নিয়ে এল।

“তোকে মা বেশ অবসন্ন লাগছে।” বাবা বলে চললেন।

লুই অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। আমি হাসলাম দেখে ওঁরা খানিক নিশ্চিন্ত হলেন।

“তোমাদের চোখে আমি ত আজ-কাল সর্বদাই অবসন্ন হয়ে আছি!” আমি বললাম।

লুই আর বাবা সত্যি আশস্ত হলেন। বাইরের ঘর থেকে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। পেছন পেছন এল লুই।

“ওনহু?” ও ডাকল। আমি ধামতেই ও আমার জড়িয়ে ঘরে কপালে একে দিল স্নেহচূষন। আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পোবাক বদলে ফেসলাম; খেতে যাব। ক্রুশের সামনে বসে ভগবানকে স্মরণ করলাম। আমি সবে কাঁড়িয়েছি এমন সময় লুই দরজার টোকা দিল।

“চলে এস না!”

“আসব?”

“বেশ ত? আসবে না কেন?”—দরজা খুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমার গোপন করবার মত আমার কি-ই বা আছে?” ও হাসল। ওকে বসিয়ে দিয়ে ওর পাশে আমি বসলাম। বুক আমার টনটন করছে অপূর্ণ আনন্দে: প্রার্থনা করছিলাম, লুইয়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী বেন হই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর সারা মুখ তৃপ্তিতে উজ্জ্বল।

“কি ভাবছ গো?”

“কি ভাবছি জান লুই, ভাবছি তোমার ভালবাসার কথা।” বলে ওর হাতে হাত রাখলাম।

“প্রিয়তমা!” ও ডাকল, পকেট থেকে বার করল একটা ছোট বাস; তার মধ্যে চমৎকার একটা আংটি; সেটা আমার আঙুলে ও পরিয়ে দিল; মাপে সামান্য বড় ঠেকল বেন।

“তাতে কি পড়বার ভয় নেই!” আমি বললাম।

কালো বেশমের মত স্নানর এক গাছা চুল দেখিয়ে ও প্রশ্ন করল, “বল’ত কার চুল?”

“তোমার মার?”

“উঁহ, তোমার!” ও হেসে বলল, “কই কবে নিয়েছ, জানি না ত?”

“জানবে কি? তোমার অন্তরের সময় নিয়েছি।”

“লুই, আমার সঙ্গে চল না; পুণ্যময়ী মেরীর কাছে প্রার্থনা করা যাক।”

ও উঠে এল; বৌতে গিয়ে ক্রুশের তলায় হুঁজনে বসলাম হাত ধরাধরি করে। নির্বাক শ্রদ্ধায় ভগবানের কাছে মেলে দিলাম আমাদের হৃদয়; আমবা বা চাই, তা তিনি দেবেন। আমরা উঠতেই দীর্ঘ আল্লাহে ও আমায় ধরে রাখল। জানলার কাছে তন্নর ভাবে খানিক কাটিয়ে আমরা খাবার ঘরে গেলাম।

১১ই মে। মার আয়োজনের অন্ত নেই। উনি বাবা, কেউই আমার কুটোটি নাড়তে দেবেন না। গিয়েছিলাম নদীর ধারে, লুইয়ের সঙ্গে। একটা গাছতলায় গিয়ে বসলাম; পাশেই, বাসের ওপর লুই চিং হয়ে শুয়ে পড়ল।

“কবে যে আমরা এক হব, দিন রাত এই ভাবনাই আমার মাথায় ঘুরছে,” বলেই ও সলজ্জ হাসি হাসল।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, “কেন লুই, কাল বাদে পরন্ত দিন না?”

“হ্যা, কিন্তু...” আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, “আচ্ছা, দিনটা পেছিয়ে দিলে হয় না?”

“না গো, দোহাই তোমার; তুমি যা বল আমি সবই করতে রাজী আছি; এমন কথা আর মুখে এন না লম্বাটি!”

ও আমার হস্ত চূষন করল।

এমন সময় পাশের ঝোপটা নড়ে উঠল। দেখি, শ্রীমতী গোসরেল সঙ্গে একজন ভদ্রলোক,—অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। লুই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। গোসরেল খিলখিল করে হাসতে লাগল।

“বড় খারাপ সময়ে এসে পড়লাম, না কান্তেন সাহেব?” তারপর আমার বলল, “তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম; তুই শুনলার বেরিয়ে গেছিল; অসভ্যের মত হাসতে হাসতে নীচু গলায় ও বলে ফেলল, ‘জানতাম কি ছাই কার সাথে কোথায় গিয়েছিল; তা হলে আর তোদের বাগড়া দিতে আসব কেন?’

লুই ওর চাবুকটা বাসের উপর এলোপাথাড়ি মারতে লাগল অন্তরমন্ব ভাবে; ওর অর্ধেক ভাব দেখে গোসরেল আমার হাত ধরে সহানুভূতি জানাল, “কি বদলে গেছিল তুই? একি চেহারা হয়েছে?”

ওর সঙ্গীর নাম ম’সিয়্য ভালীন—এই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ও কানে কানে বলল, “বিরিট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; বাপের ব্যবসা আছে; টাকা-কড়িতে পাকা ইহুদী।”

তার পর সাদা গলায় জিজ্ঞাসা করল, “শরীর খারাপ হয়েছিল বুঝি?”

“হ্যা।”

“ও, তাই বল; কিছুই ত জানতাম না। পারী গিয়েছিলাম। তুই কখনো পারী যাননি, না রে?”

“একবার গিয়েছি।”

“শুনলেন ত ম’সিয়্য ভালীন? বেচারী জীবনে একবারের বৌ পারী যাননি।”

অমরিক হাসি হেসে ভদ্রলোক অভিধান জানিয়ে আমার বললেন, “মাদমোয়াজেল আবার যদি কখনো পারী যান, বা কিছু সেখানে দেখার আছে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখানোর ভার আমি নিলাম।”

হঠাৎ বহু কঠোর সাড়া পেলাম; আমাদের দিকেই বেন এগিয়ে আসছে।

“ওই ত।” গোসরেল চেঁচিয়ে উঠল, “ওরা আসছে; সিল্ভী, এই যে আমরা এখানে।”

তিন জন মহিলা আর দুই ভদ্রলোক হাজির হলেন।

“এই দেখ,” একটি মহিলাকে ও ডাকল, “এইটি আমার গায়ের বন্ধু।”

তার পর আমার বলল, “আর এরা আমার পারীসিদ্দান বন্ধু: শ্রীমতী ব্রুতেভ, শ্রীমতী মারিউ, মাদাম কারসা।”

তারপর ভদ্রলোক দুজনের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। এত সৌরগোল আমার সইছিল না; দারুণ হাঁপিয়ে উঠলাম।

“কাল আমরা সমুদ্রের ধারে একটি প্রেস্তার ট্রিপে যাচ্ছি রে মার্গারিৎ; তুই আসবি ত?”

“না,” আমি জবাব দিলাম।

“কেন, এমন সরাসরি হঠাৎ ‘না’ বলছিস কেন রে? চল চল, তোকে যেতেই হবে; রাজী ত?”

লুই আমার হয়ে জবাব দিল এবার, “ও অল্পতেই আজকাল বড় কান্ড হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় না যাওয়াটাই কাম্য।”

“বেশ আপনি ওর হয়ে চলুন তবে,” ওকে ধরে বলল গোস্বেরল।

“না মানমোহনজেল, আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হবে না; যাক করবেন।”

“বেশ, বেশ, কান্টন সাহেব, আপনার রাগ এখনো পড়ে নি দেখছি! তবুও আপনাকে অনুরোধ করছি, যদি আসেন, বড় সুখী হবে; আসবেন ত? না! খজ একবোখা মাছ বাপু!”

আমাদের সঙ্গে কর্মদলের পর ওরা চলে গেল; দূর থেকে ও দস্তানা-পরা হাত নেড়ে আমায় বিদায় জানাল।

১২ই মে।—আজ সন্ধ্যাবেলায় জানলার ধারে বসে ছিলাম সোফার ওপর; লুই এল। আমার পাশে বসে আমায় এক হাতে জড়িয়ে ধরল; আমি ওর কাঁধে মাথা রাখলাম। ওর পাশে বসে বড় আনন্দ। এই একটি হৃদয় কত যে আন্তরিকতা আর প্রেমে ভরা, আমি জানি। আরো জানি যে জীবনে সব বাধা-বিপত্তির হাত থেকেই ও আমায় আড়াল করে রাখবে। ওর কপোল আমার কপালে, ওর হাত আমার হাতে, আমার মাথা ওর কাঁধের ওপর; আমরা নীরবে এই মুহূর্তটি উপভোগ করছিলাম। কাল আমাদের দুটি হৃদয় এক হবে। দুই বার ও আমায় চুমু দিল সম্ভরণে।

লুই যেতেই বাবা এলেন: লুই কোথায় জানতে চাইলেন।

“ওই ত,” আমি দেখালাম। লুই পাঁচচারী করছে। ধূমপানরত। “এইমাত্র ও ত এখানেই ছিল।”

“বল মা, তুই সুখী হবি ত?”

ওকে আমি দুই হাতে চেপে ধরে বললাম, “হ্যাঁ বাবা।”

উনি তৃপ্ত হলেন।

“লুই তোকে নীস-এ নিয়ে যেতে চাইছে।”

“হ্যাঁ, আমাকেও বলেছে।”

“তোকে ছেড়ে থাক! বড় কঠিন হবে মা!”

“বাবা, তোমরা যেন যাবে না আমাদের সঙ্গে, তুমি আর মা?” আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আমরা পরে যাব মা! এই ঠাণ্ডা দেশ থেকে তুই যত তড়াতাড়ি যাস ততই ভাল; দক্ষিণ দেশের হাওয়া পেলেই দেখবি কেমন সেবে উঠিস। বড় জোর এক মাস কি দুই মাস বাসেই আমরা গিয়ে জুটব। বাবার আগে এখানকার সব কিছু বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে ত?”

১৪ই মে।—গত কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের পরিবার সম্পন্ন হয়েছে। পুত্র ঠাকুর যখন ওর হাত আমার হাতে দিলেন, আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি যেন আদর্শ স্ত্রী হতে পারি। গীর্জা

থেকে যখন বের হলাম, আমাদের পথে মুঠো মুঠো ফুল ছড়ান হল। ইহাৎ একটা গান আমার মনে পড়ে গেল; কোথায় যেন পড়েছিলাম:

“নবোঢ়া রূপসী বে-পথে যাবে,

ফুলে ফুলে দাঁও সে-পথে ছেয়ে;

পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,

রূপসী নবোঢ়া এ পথে যাবে!”

গানের শেষটা বড় কল্পণ:

“পথে পথে ওঠে শোক-ক্রন্দন,

মৃত্যু রূপসী বে-পথে যাবে;

পথে পথে শোক, অশ্রু-অর্থ,

রূপসী মৃত্যু বে-পথে যাবে!”

আমারো কি এই অবস্থা হবে? ভগবান জানেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সব করেন।

বাবা আর মা বাড়ীর সামনেই আমাদের বরণ করে নিলেন।

চারি দিকে দাক্ষণ ভীড়; বয়স্করা উচ্চ কণ্ঠে আশীষ জানাচ্ছেন।

এঁরা সবাই আমায় অতি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করে আসছেন।

লুইয়ের পুত্ৰবালী উদার চেহারা দেখে সবাই বড় সুখী হলেন।

বাবা আমায় আলিঙ্গন জানালেন, লুইকেও।

মা দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ওঁর চোখে জল; আনন্দাশ্রু। লুই অতি সুখী আশ্র; বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাকে জড়িয়ে ধরল ও।

“বাবা, তোর হাতে আমাদের একমাত্র সন্তানকে সঁপে দিলাম।”

উনি বললেন, “জানি তুই ওকে কত ভালবাসিস, আব ও তোর ঘরে গিয়ে আনন্দেই থাকবে। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।”

তেরেস আনন্দের আতিশয্যে আমার গলা আঁকড়ে রইল, “বা দিদি, সুখী হ!”

তারপর বলল, “কিন্তু মাগাম, স্বাস্থ্যটার দিকে একটু নজর দিস, ব্যথি বাছা!”

রাতিয়ে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন পুত্রঠাকুর, সপরিবারে মেঘর মশাই, সপরিবারে ডাক্তারবাবু, মাদাম গোস্বেরল ও তাঁর ঘরে। নব দম্পতীর স্বাস্থ্য-কামনায় পানপর্ব শুরু হল। লুইয়ের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। শ্রীমতী গোস্বেরল আমায় উত্থাপ্ত করে তুলল,—এ কথা ওকে আমি আগে জানাইনি কেন,—এই বলে।

“তুই ভারী দুষ্টু; এই ত গত পরত দিন দেখা হল; কানে কানে একবার বলে দিতে কি আপত্তি ছিল?”

[ ক্রমশ: ]

অনুবাদক—পৃথ্বীশ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ছাত্রদের প্রতি বেত্র-ব্যবহার সম্পর্কে বিভাসাগর

আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি বাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। বালকদের শিক্ষাদান কার্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অন্তর্জনক; ইহাতে শাস্তিপ্ৰাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কাবলে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

( ১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৫ )



# এক মুঠো আকাশ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

সিনেমায় তেমন ভীড় ছিল না। কাজের দিন, তিনটের সময় বেশী লোক আশা করা যায় না। তবু ট্রাম-রাস্তার ওপর আর বাজারের কাছে বলে সামনে দিয়ে লোক চলাচলের বিরাম নেই। ছেলেটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে, সিনেমা হলের বাইরে আঁকা লাভময়ী নায়িকা, তার বিচিত্র ভঙ্গিমা। সিগারেটে জোর টান দিয়ে অনভ্যস্ত হাতের চার আঙ্গুলে ঢেক রাখার চেষ্টা করে। একমুখ পান, বয়স বেশী নয়, ছাত্র হলে ম্যাট্রিক দিতে এখনও দেয়ী আছে।

না দেখে পেছু হাঁটতে গিয়ে কার সঙ্গে খান্কা লাগে। ভদ্রলোক তিড়িবিড়িয়ে ওঠেন, ভারী ভেঁপো তো, বয়সের মান-সন্মান নেই, বাবা-কাকার গায়ে সিগারেটের ছাঁকা দিচ্ছ?

ছেলেটা খতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি—

—ছি, ছি, আবার এ নিয়ে কথা, গলা টিপলে দুধ বেরোয়। বাপ-মার পরস্রা ধ্বংস করছ? দেখছেন মশাই আজ-কালকার ছোঁড়াগুলোকে? গোল্লায় গেছে। লেখাপড়ার বালাই নেই, বিড়ি-সিগারেট, সিনেমা, শুধু এই হচ্ছে।

দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে যায়, সকলেই ভদ্রলোকের পক্ষে, আজ-কালকার ছেলেদের অর্বাচীনতা সম্বন্ধে সুখর হয়ে ওঠেন।

—আপনার বরাত ভালো যে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়নি।

—জিজ্ঞেস করে দেখুন না, স্তনবেন হয়তো বাড়ীতে ছবেলা হাঁড়ী চড়ে না।

—কি খোঁকা, ইটুল-টিটুল নেই বুঝ? এখানে কি করা হচ্ছে?

ছেলেটা উত্তর খুঁজে পায় না, সিগারেটের ছাঁকা লাগানোর অনিচ্ছাকৃত অপরাধে যে এ ধরনের অসহায় অবস্থায় পড়তে হবে তা সে কল্পনাও করেনি।

—বেশ করছে সিগারেট খাচ্ছে আপনাদের কি? একজন ছেলেটার কাছে এগিয়ে আসে।

এইটুকু হৃদয়ের ছেলে—

—এত দরদ তো এক বাটি দুধ খাওয়ার না, সে যুরোদ নেই, শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি বুকনি। সিগারেট খেয়ে তো আপনাদের পরস্রা ওড়ায়নি। এস তো খোঁকা আমার সঙ্গে।

ছেলেটা যন্ত্রচালিতের মত এই অপরিচিতের সঙ্গে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসে।

—সিনেমা দেখবে?

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়, আমার কাছে পরস্রা নেই—

—আমি দেখাব, চল।

সামনের দিকে ছুটে সিটে পাশাপাশি বসে তারা ছবি দেখে। আধুনিক বাংলা ছবি, ছোটদের জন্তে নয়।

—কি রকম লাগছে?

—ভাল, ছেলেটা আন্তে উত্তর দেয়।

ছবি শেষ হলে তারা বেরিয়ে আসে। পরমকাল, সন্ধ্যা তখনও নামেনি।

—খুব ভাল লাগল, ছবি দেখতে আমি ভীষণ ভালবাসি।

—এই সিনেমায় যে বই ইচ্ছে তুমি দেখতে পার, এখানে আমার পরস্রা লাগে না। ছেলেটার চোখ দুটো নেচে ওঠে, তাহলে খুব মজা হয়, আপনার সংগে কোথায় দেখা হবে?

—এখানে কিছা ওই গলির মধ্যে চান্নের দোকান আছে, অনন্ত কেবিন, ওইখানে।

—আপনার নাম তো জানি না?

—কেউনা।

দিন দুই পরের কথা। অনন্ত কেবিনের এক কোণে বসে কেউ চা খাচ্ছে, এ তার আন্তকের অভ্যাস নয়। চা খায়, কাজ করে, নিজের মনে ভাবে, কখনও গল্প করে। কেবিনের মাটিক 'আন্তদা' সদাশিব মাহুয়, পরস্রা বাকী পড়লে কিছু বলেন না, একসময় চুকিয়ে দিলেই হ'ল। এ কেবিনে সব ধরনের লোক আসে, কলেজের ছাত্র, চাকুরে, বেকার, ব্যবসায়ীর থেকে শুরু করে জুয়াড়ী, এমন কি সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা পর্যন্ত। আসে না শুধু মেয়েরা, বোধ হয় আলাদা ব্যবস্থা নেই বলে।

কেউর নিত্যসঙ্গী প্রভাত। সে সাহিত্যিক, কাগজ-কলম নিয়ে বসে খস-খস করে লিখে যায় ফরমাশ মত গল্প, প্রবন্ধ উপভাস। কয়েক কাপ চা আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট তার সাহিত্যের প্রেরণা যোগায়। আজও প্রভাত বসে লিখছিল।

কেউ জিজ্ঞেস করে, কি লিখচিস?

প্রভাত মুখ না তুলে উত্তর দেয়, একটা বড় গল্প, কড়া হয়েছে, তোকে পড়ে শোনাব।

—প্রেমের?

—দূর দূর, ওসব প্যানপ্যানে জিনিষ আজকাল চলে না, একখানা বিদেশী গল্পের বাংলা রূপ দিলাম, কোন শালাকে ধরতে হবে না যে চুরি করেছি।

প্রভাত বক বক করে একটু বেশী, শুনে শুনে কেউর অভ্যাস হয়ে গেছে, অর্ধেক কথায় মন দেয় না।

কেবিনের বাইরে ভোট নিয়ে কারা ঝগড়া করছিল, দু'দলের মধ্যে বচসা আর কি। কেউ বসে তাই খানিকটা শোনে। 'আন্তদা' বিড়ি বিড়ি করেন, ছোঁড়াগুলো আর ঝগড়া করার জায়গা পেলে না, মরতে আমারই দোকানের সামনে এসে জুটল।

হয়তো আরো কিছু বলতেন, যদি না ছেলেটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত।

—কি চাই?

—কেষ্টদা' আছেন?

আন্তদা' উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট হাত নেড়ে ডাকে, এই যে, এদিকে। ছেলেটি কেষ্টর সহানুভূতির দিকে তাকিয়ে হাসে, কাছে গিয়ে বসে পড়ে।

—আমি ভেবেছিলাম কাল তুমি আসবে।

—ইচ্ছল ছিল যে।

—তুমি স্থলে পড়?

—হ্যাঁ, বিজ্ঞানভবনে।

—বটে, কোন ক্লাশে?

—থার্ড ক্লাশ।

—কি খাবে বল? চপ আনতে বলি?

ছেলেটির উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট কেবিনের ছোঁড়া চাকরকে হুক দিয়ে বলে, ওরে নিতাই, দুটো চপ দিয়ে যা।

ছোট রেকাবীতে চপ আসে, সংগে খানিকটা কাঁচা পেঁয়াজ। ছেলেটি প্রাণ ভরে খায়, গল্প করে।

—মা নেই, মাথা গেছে আমার ছোটবেলার।

—বাবা?

—বাবা আছেন, মকঃ বলে কাজ করেন ওষুধ বিকীর।

—কোলকাতায় কোথায় থাকে?

—মামার বাড়ীতে।

—স্থলে যেতে ভাল লাগে না?

—না, ইরিজী, অল্প মাথায় ঢোকে না যে।

প্রভাত কাগজপত্র শুকিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে, আমি চলি রে কেই, যেতে হবে।

কেষ্ট ছেলেটির কাছে সরে আসে, কি করতে ভাল লাগে?

একটু চুপ করে থেকে ছেলেটি হঠাৎ উত্তর দেয়, বেড়াতে।

নিজের ইচ্ছামত বেখানে খুশী।

—চিড়িয়াখানা, বাছুর, এসব দেখেছো?

—দেখেছি ছোটবেলার, খুব বেশী মনে নেই।

—কাল এই সময় এসো, তোমার ঘুরিয়ে আনব।

—সত্যি, ছেলেটা উৎসাহিত হয়, খুব মজা হবে তাহলে—

কেষ্ট প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে, নাও।

ছেলেটা চার দিক দেখে নেয়, আন্তে আন্তে জিজ্ঞেস করে, খাবো?

—খাও, এখানে কেউ কিছু বলবে না।

ছেলেটা কেষ্টর সংগে সিগারেট ধরায়।

—তোমার নাম কি?

—মা আমার নাম দিয়েছিলেন শ্রামল।

কেষ্ট শ্রামলকে নিয়ে চিড়িয়াখানার ঘুরে বেড়ায়। পাখীর খাঁচা, বানরের ঘর, ওরাও ওটা—

—ঠিক হান্সবের মত, না কেষ্টদা'?

—আমরা তো ওই ছিলাম।

—দেখুন কি বকম সিগারেট খাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ অল্প সিগারেট ছুঁড়ে দিয়েছিলো, ওরাও ওটা বিখ্য মোজ করে টাকতে থাকে।

এ দিকে তাকিয়ে থেকেই শ্রামল বলে, আপনায় সিগারেটগুলো একটু অল্প বকম না?

—বেশী কড়া।

—একটা খেলেই আরেকটা খেতে ইচ্ছে করে।

কেষ্ট হাসে, সিগারেট চাই তো পরিষ্কার করে বললেই পার।

হু'লনে সিগারেট ধরায়।

নতুন সিংহ এসেছে, হকার ছেড়ে পায়চারী করছে, শ্রামল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

—একেই বলে পশুরাজ, কি সুন্দর চেহারা।

—চল বেঞ্চটার একটু বসি। শ্রামল কেষ্টর পাশে গিয়ে বসে।

—মাইনের খাতা আনতে বলেছিলাম, এনেছো?

—এই যে, শ্রামল খাতা এগিয়ে দেয়।

কেষ্ট চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, তিন মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি।

—না।

—কেন, বাড়ীতে টাকা দেয়নি?

—দিয়েছিলো, খরচা হয়ে গেছে।

কেষ্ট একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, ক্লাশে নাম ডাকে?

—না, কেটে দিয়েছে।

শ্রামলের গলা ভারী হয়ে আসে, তাইতো স্থলে বাই না।

কেষ্ট ডান হাতটা শ্রামলের কাঁধের ওপর রাখে, তাতে কি হয়েছে, আমি সব ঠিক করে দেবো। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, যা জিজ্ঞেস করব বলবে আমায়?

—কি?

—কত দিন সিগারেট খাচ্ছে?

—এক বছর।

—কে শেখালো?

—ঝুনো নারকোল।

—সে আবার কে?

—রামচন্দ্র, আমাদের ক্লাশের ছেলে, মাষ্টার মশাইরা ডাকেন ঝুনো নারকোল বলে, তিন বছর একই ক্লাশে আছে কি না।

কেষ্ট কথা চাপা দিয়ে বলে, চল আজ ওটা বাক।

গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে কতখানি পথ চলে এসেছে, শ্রামলের খেয়াল ছিল না, কালীঘাটের কাছে এসে হঠাৎ চৌচিরে ওঠে, আর, এ যে অনেক দূর এসে গেছি কেষ্টদা', এ তো কালীঘাটের মন্দির।

—আর হাঁটতে হবে না। এই বলে কেষ্ট পকেট থেকে চিকরী বার করে শ্রামলের হাতে দেয়, চুলটা সামনের দিকে পেতি পেড়ে জাঁচড়ে নাও, আমি এখুনি আসছি।

নীচু গলায় বলে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি আমার ছোট ভাই।

শ্রামলকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেষ্ট মোড়ের তিন তলা সাদা বাড়ীর ভিতর চলে যায়। প্রথমটা বুঝতে না পারলেও শ্রামল কেষ্টর কথামতই কাজ করে। বাড়ীর দোরগোড়ার ঝাড়িরে এদিক ওদিক তাকায়, রাস্তার কত বকম লোক, গ্যাসের আলোয়

নীচে আলুকাবলীওয়ালা, ঘোড়ের চাঁদের দোকানে গলা-ভাঙ্গা রেডিওর গান। ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে বিরক্তি ধরে যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে সদর দরজা খুলে কেউ ডাক দেয়, গ্রামল এদিকে আসে। গ্রামল এগিয়ে আসে, তাকে দেখিয়ে কেউ বোঝাতে শুরু করে, এর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। আমার ছোট ভাই গ্রামল, কি কষ্টে যে লেখাপড়া করছে, বই কেনবার পরগনা জোটে না, তার উপরে দু' মাসের মাইনে বাকী, আমার অবস্থা আপনি তো জানেন-ই।

কর্তার হাতে গ্রামলের মাইনের খাতা। নেড়ে-চেড়ে দেখে বলেন, বুঝতেই তো পারছি কিন্তু কি করব বল, সকাল থেকে লোক আসছে, কত জনকে সাহায্য করব।

কেউ ভেঙ্গে পড়ে বলে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আমি এক মাসের মাইনে সাত টাকা দিয়ে দিছি।

—আব তিন টাকা, ছোটো বই-এর দাম। আপনাকে আর খালাতন করব না।

—না না, ঐ সাত টাকা। আর আসবে না, মনে রেখো।

কেউ জিত কেটে কর্তার পারের দুলো নেয়, আজ্ঞে না, আপনি গরীবের মা-বাপ, তাই খুব বিপদে পড়লে ছুটে আসি। সবাই যে, হুখীর কথা বোঝে না।

টাকা নিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। গ্রামল চলতে চলতে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আবার আমার খুলে পাঠাতে চান?

উত্তর না পেয়ে বলে, আমি কিন্তু খুলে যাবো না।

—ইচ্ছে না করে যেও না।

পানওয়ালা দোকানে ঝাড়িয়ে নোট ভাঙ্গিয়ে কেউ সাড়ে তিন টাকা গ্রামলের হাতে দিয়ে বলে, এটা তোমার।

—টাকা নিয়ে আমি কি করব?

—বা ইচ্ছে তাই করবে, এর জন্য কাউকে হিসেব দিতে হবে না।

বাড়ীর কাছে এসে গ্রামল কেউব কাছে থেকে বিদায় নেয়, কান্ট-ধরে বলে, কাল আসব।

দরজা খোলা ছিল। কেউ ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে উঠে যায়। নীচে কারা এসেছে, আলাপ করার প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে ঢুক জামা খুলে পেরেক টাঙ্গিয়ে রাখে। পা না ঘুয়েই বিছানায় বসে পড়ে।

একটু পরে ভাটখি গ্রামা ওপরে আসে।

—কাকু, তোমার খাবার নিয়ে আসি?

—নিয়ে আস।

—হুমি নীচে আসবে না?

—নীচে, কেন?

—অনেকে এসেছে মাঝার বাড়ী থেকে।

—না, আমি যাবো না। পারিস তো খাবার নিয়ে আস।

গ্রামার বয়স দশ কি বারো হবে, চুলের মত কালো রং, ভীষণ কৌকড়া চুল, এতটুকু শ্রী নেই চেগায়।

# বহুমুদ্র

## আরোগ্য হয়

প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমুদ্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক গাংঘাতিক

রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুঃস্বপ্নরোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাংঘাতিক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকে ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গীণ অবস্থায় কারবাস্কল, ফোঁড়া, চোখে হানি পড়া এবং অজ্ঞান জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন য়ুনানি মতে দুর্লভ ভেষজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার ক’রে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অধিক সেরে গেছে বলে মনে হবে। পাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জন্ত লিখুন। ৫০টি বটিকার এক শিশির দাম ৬৬০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাশুল ফ্রী। নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

কেউর কথাযত সে খাবার ওপরে নিয়ে আসে, আজ পদের  
যাহল্য ছিল। কেউ খেতে বসে যায়—নে, ভুইও খা।

—আমি খেয়েছি।

—তা কি হয়েছে, নে যাঁচটা খেয়ে ফেল।

কেউ হঠাৎ বলে, ভুই নীচে যা, আমি এঁটো বাগন সব গুছিয়ে  
রাখবো।

শ্রাম! কথা বলে না, চূপ করে বসে থাকে।

—বসে রইলি যে, যা।

—নীচে আমার ভাল লাগে না।

কেউ ভাল করে শ্রামার খুঁটা দেখে নিয়ে বলে, কেন কি  
হয়েছে রে?

শ্রামার চোখে জল ভরে আসে! কেউ খাওয়া ফেলে তাকে  
কাছে টেনে নেয়, বোকা মেয়ে কীভাবে আছে কখনও!

শ্রামা ফুঁপিয়ে ওঠে, মামার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা আমায় কিরকম  
ঠাটা করে, বলে তোমার নাম শ্রামা নয়, কালী। জিত বার করে কাঁড়  
করিয়ে দিলেই সাক্ষ্য, মা-কালী।

কালার তার কথা আটকে যায়।

—বড়দেব কাউকে বলে দিসনি কেন?

—বাবাকে বলেছিলাম।

—কি বললে?

—বললে, ঠিকই তো বলেছে, এত বাগের কি আছে, কাক  
বলনি এই ঢের।

কথা বলতে বলতে শ্রামা হাট-হাট করে কঁদে ফেলে, তাই শুনে  
ওরা কি রকম হাসছিলো।

কেউ শ্রামার মাথার হাত বুলিয়ে দেয়, অনেকক্ষণ কঁদে শ্রামা  
শান্ত হয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। নীচে থেকে ছোটদে,  
দলের গলা শোনা যায়, মা কালী গেল কোথায়, মা কালী?

সিঁড়ি দিয়ে সবাই ওপরে উঠে আসে, শ্রামা কেউকে জড়িয়ে ধরে।

ছেলের দল কেউকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, দরজার বাইরে থেকে  
শান্ত গলায় ডাকে, শ্রামা খেলবি আর।

কেউর কণ্ঠস্বর শ্রামা মাথা নেড়ে জানায় সে যাবে না।

—আয় না, আয় না, বলে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যে এক জন  
শ্রামার হাত ধরে টানে। বাগে কেউর ঘোঁটা কাঁপছিল, সজোরে  
চড় মারে ছেসেটাব গাঙ্গে। জানোয়ার, বেরও এবান থেকে।

মার খেয়ে ছেসেটা মাটিতে পড়ে যায়, গালে হাত রেখে ভরে  
ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ভক্তরা কলরব করতে করতে নীচে  
নেমে গেছে, ও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

শ্রামা হতভম্ব হয়ে যায়, কেউকে এতখানি রাগতে সে আগে  
দেখেনি। বিছানার কোণে গিয়ে বসে। কেউ বা হাত দিয়ে  
চোখ দুটো চেপে ধরে।

নীচে ছেসেটার কান্না শোনা যাচ্ছে, অন্ধদের নালিশ, দাদার  
গর্জন।

একটু বাদে উঠান থেকে দাদার চিংকার শোনা যায়,  
কোথায় গেল মুখপুড়ী, শ্রামা, শ্রামা—যেবর ভেতর থেকে চেঁচিয়ে  
কেউ উত্তর দেয়, ও এখন যাবে না।

—আসবে না মানে? আমি ডাকছি আসবে না? আলবাৎ  
আসবে।

—যাবে না।

—এত বড় আশ্বর্ষা, আমার কথা অমান্য করা, এই সব শিখছে  
তোমার কাছে। কেউ আরও গলা চড়িয়ে বলে, বেশ করছে।

—আমার শতর বাড়ীর লোকের গায়ে তুমি হাত দিয়েছ  
কোন সাহসে?

—একশো বার দেব, ছোটলোকমি করলে।

দাদার আর বৈষ্য থাকে না। সিঁড়ির উপর কয়েক ধাপ  
উঠে পড়েন, ছোট লোক? তুমি নিজের ছোট লোক, ক' অন্ধর  
গোমাস, ভাগবণ্ড, লোক্যার।

সাইআপ, কেউ থমকে ওঠে, বাজ্ঞে বকো না।

—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

—তোমার বাড়ী, নিজের পয়সায় করেছে, কেরাণী আবার  
বাড়ী করবেন। পৈত্রিক বাড়ীতে তোমার যত ভাগ আছে  
আমারও তত ভাগ।

—আচ্ছা, দেখা যাবে। শ্রামা ঢলে আর।

—ও এখন যাবে না।

—ও নিজের মুখে বলুক।

—আমি বলছি ও যাবে না।

—আচ্ছা দেখছি, পুলিশ ডেকে নামিয়ে আনবো। তোমার  
ওস্তাদি বার করছি। কেউ আর কথা বলে না, দরজা বন্ধ করে  
শুয়ে পড়ে। শ্রামা কাঁদছিল, এতক্ষণে কেউর খেয়াল হয়, কাঁদলে  
গলা টিপে দেব, শুয়ে পড় এখনে।

ভোর রাতে বৌদি এসে দরজা ঠেলে, ঠাকুরপো?

কেউ দরজা খুলে দেয়, বৌদি ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে  
তাকিয়ে অমুমতি চায়, শ্রামাকে নিয়ে যাই।

—যাও। কেউ শুকনো গলায় উত্তর দেয়।

একটু থেমে বৌদি কৈফিয়তের সুরে বলে, তোমাদের  
ভাইয়ে ভাইয়ে যা মেজাজ, আমি তো ভয়ে মরি। বিশেষ  
করে তোমার দাদা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে, মার  
পেটের ভাই, তাকে বলছে কি না—

কেউ বাগা দেয়, আমার এখনও বুম কাটেনি বৌদি! তুমি বরং  
মেয়েটাকে নিয়ে যাও, দেখো, আবার মাংসের কোর না।

কথা শুনে বৌদি তো অবাক, কি যে বল, নিজের মেয়ে—

—থাক থাক, ঢের বক্তৃতা শুনেছি। এখন নীচে যাও।

শ্রামা বিছানা থেকে উঠে চোখ রগড়াচ্ছিল, বৌদি আর কথা না  
বলে তার হাত ধরে নেমে যায়। কেউ আবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে  
পড়ে, কিন্তু আর ঘুম আসে না।

পরদিন সকালে কেউ চা খেতে এলো অনন্ত কেবিনে অল্প দিনের  
চেয়েও দেবীতে। আশুবা' জিজ্ঞেস করলো—আজ এত দেবীতে যে?

—আর বলবেন না কাল আবার রগড়া—

—কি, দাদার সঙ্গে?

কেউ ব্যাজার মুখে উত্তর দেয়—আর কার সঙ্গে, আশুবা' হাসেন—  
এ আর নতুন কি, রাজাই তো লেগে আছে।

—আর ভাল লাগে না। তাবছি এবার আলাদা হয়ে যাব।

—সে তো তিন বছর থেকে ভাবছে।

—আমার আর কি। ওরাই বুঝবে। একতলা তো আমি ব্যবহারই করি না। উপরের একখানা ঘরে পড়ে থাকি। বাড়ী ভাগ হ'লে নিচের একখানা ঘর আমার দিতে হবে। ভখন কি করে থাকবে শুনি রাবণের গুণি নিয়ে?

আন্তরা মাথা নাড়েন, এতই যদি তোমার সুবিধে একটা উকিল আর একটা রাজমিস্ত্রী ডেকে—

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—হয় না 'আন্তরা' এত সহজে কিছু হয় না। ঐ যে গ্রামা—দাদার কালো মেয়েটা—ওকে বাড়ীতে কেউ হুঁচোখে দেখতে পারে না, বাড়ী ভাগ করলে আমার কাছে যেতে দেবে না। কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে।

আন্তরা' চুপ করে যান, চোঁচিয়ে বলেন, ওরে কেষ্ট বাবুকে চা ফুটি দিয়ে যা।

কেষ্ট খবরের কাগজ নিয়ে ওপর ওপর চোখ বোলায়। বিশেষ কোন খবর নেই—মামুলী কথা।

আন্তরা' বললেন—বাই ইলেকসনের তোড়জোড় চলছে যে।

—দেখছি তো! একটু খেমে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কারা দাঁড়িয়েছে?

—চার জন। তিন জন তিন পার্টির থেকে আর এক জন ইনডিপেন্ডেন্ট।

—তিনি কে?

—রাঘব বোয়াল।

—শুনছিলাম বটে রাঘব বোয়াল দাঁড়িয়েছে।

আন্তরা' চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—ওর চর'রা এসেছিল। পাড়ার ছেলের চায়, ওর হয়ে খাটবার জন্তে।

—কি রকম দেবে খোবে?

—পরমা আছে সাধ্যমত কোরবে নিশ্চয়। আমি তোমার নাম দিয়ে দিয়েছি।

কেষ্ট আড়মোড়া ভাঙ্গে,—রাবো একবার বিকেলের দিকে, দেখি আমার সংস পটে কি না।

ববু বাবুজের বাড়ী পাড়াতেই। মোড়ের মাধার তিনতলা বিকট বাড়ী, হুঁপানা গাড়ী, তকমা আঁটা দারবান। গেটের হুঁপান্নায় ইংরাজী বড় হরকে লেখা আছে, আর, বি। তাই পাড়ার লোকে নাম দিয়েছে, রাঘব বোয়াল।

আজ আর কেষ্টকে দারবানের কাছে কৈফিয়ত দিতে হল না। সেলাম হুঁকতে হুঁকতে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। সেখানেও আপ্যায়নের ক্রটি নেই। রাঘব বোয়ালের তিন জন ছেলে চা সিগারেট সুগিয়ে যাচ্ছে, আসর জুড়ে বসে আছে পাড়ার মার্কামারা ছেলেরা সুদী, বীরেন, ভোদা আখ তাদের সাক্ষোপাজ। এই ঘরে তারা জুড়ো হয়েছিল দাঙ্গার সময়—৪৬ সালে। তার পর এই আবার তাদের ডাক পড়েছে।

সিগাড়া-মিষ্টি-চা পরিবেশনের পর রাঘব বোয়াল তাঁর বক্তব্য জানানেন—আপনারা সকলেই জানেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় এই উপনির্কীচনে দাঁড়াইনি। পাড়ার সকলের বিশেষ অহুয়োখে নিজের কর্তব্য পালনের জন্ত দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার তো

কোন বল নেই। বল আপনারা, আপনারা যদি ভরসা দেন তবেই নির্ভয়ে এ কাজে এগুতে পারি।

আধ ঘণ্টা ধরে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন রাঘব বোয়াল। পরের জন্ত কতখানি আত্মত্যাগ কারছেন তারই মহিমা প্রচাব। অনেকে বাহবা দিল, অনেকে টুকরো মতামত প্রকাশ করলো, কিন্তু সকলেই একবাক্যে সায় দিল, তাঁকে সাহায্য করবে বলে।

জয়ধ্বনি করে সবাই চলে গেলেও কেষ্ট দাঁড়িয়েছিল রাঘব বোয়ালের সঙ্গে একান্তে পরামর্শ করার জন্তে।

—কেষ্ট, তোমার ওপরই আমার সবচেয়ে ভরসা। দাঙ্গার সময় এপাড়া তো তুমিই বাঁচিয়েছিলে, কেষ্টকে অশ্রুযুক্ত করেন রাঘব বোয়াল।

—এত যে লোক জুটিয়েছেন, কাজের বেলা দেখবেন সব চু-চু।

—তা আর জানিনে, কিন্তু কি করব? এসব ব্যাপারে সকলকেই খুসী রাখতে হয়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া এর চেয়ে সোজা।

কেষ্ট মুখে খানিকটা ডালমুট ফেলে বসে, একটা ভীপ দরকার হবে।

—তা তো হবেই, আমার কারখানা থেকে আনিয়ে দেবো।

—ডাইভার দরকার নেই, আমিই চালাব, শুধু পেট্রলের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

—ওই মোড়ের পেট্রোল পাম্প আমার এ্যাকাউন্ট আছে, কুপন দিলেই ওরা পেট্রোল দেবে।

—কি ভাবে আমি কাজ করতে চাই ক'দিনের মধ্যেই আপনাকে আনিয়ে দেবো। আপনি আমাদের পাড়া থেকে দাঁড়িয়েছেন, আপনাকে স্বেচ্ছাতে না পাবলে আমাদেরই লজ্জা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আজ থেকে সব ভার আমরা নিলাম।

রাঘব বোয়াল বিনয়ে ভেঙ্গে পড়েন, আমি তো আগেই বলেছি ভাই, তোমাদের বসই আমার বল। আমাকে ভালবাসে বলেই তোমরা এসেছ।

—যে ক'জন কাজের লোক এপাড়ায় আছে, সকলেই আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে সাবধান, অনেকে খাপ্পা দিয়ে টাকা খসাবার চেষ্টা করবে। তাদের কথার কান দেবেন না।

পরদিন অনন্ত কেবিনে কেষ্ট এসে দেখে, গ্রামল বসে আছে।

—কি রে, এ ক'দিন আসিসনি কেন?

গ্রামলের চোখে-মুখে কেমন যেন লজ্জার ভাব, বলে, গ্রামনি—

কেষ্ট বসে পড়ে কাগজপত্র বার করতে করতে হাঁক দেয়, ওরে হুঁকাপ চা আর মামলেট দিয়ে যা। খাবার আসতে দেবী হয়। কেষ্ট একমনে কি যেন লেখে। গ্রামল চুপ করে বসে থাকে, দেখে, অজ্ঞ দিকে হুঁ-একজন ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়ে তর্ক করছেন। দোরগোড়ায় আন্তরা' ক্যাশ বাজের কাছে বসে ঢোলেন। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা ভিথিরী মেয়ে পরমা চাইছে।

কেষ্ট হঠাৎ মুখ তুলে বলে, জানি তুই এতদিন আসিসনি কেন, ভাবছিলি সেদিন টাকাটা নেওয়া উচিত হয়েছে কি না, তাই না?

ঘরা পড়ে গিয়ে গ্রামলের মুখ শুকিয়ে যায়।

—টাকা কি করলি?



শ্রামল সপকোচে বলে, পকেটে আছে।

—বুঝ গাথা, তুই কোন কথের নোস।

এর মধ্যে খাবার দিয়ে গিয়েছিল, শ্রামল কথার কোন উত্তর না দিয়ে বেতে শুরু করে।

আমি কোন কথা হয় না। খায় আর খণ্টা বসে থাকার পর কেউ জিজ্ঞেস করবে, মাইনের খাতা এনেছিল?

জানেন না? বেড়ে সাই দেয়।

—খাবার?

জানেন না? ভয়ে মুখ ফুলে তাকায়।

—কি কথের কি মেরুটি, খাবার?

—চলুন।

শ্রামল মাইনের খাতা বেরিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করে নিয়ে এসে, জায়া বনেরী জিজ্ঞাসা করে, আমার বই বোলাবোলা না থাকলেও অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু সবকিছু মশাই-এর সঙ্গে কিছুতে কেউ কথার পেয়ে ওঠে না।

—বলছি তো, আমি একটা পরমাণু দেব না।

কেউ কখন মুখে বলে, সে আপনার যা ইচ্ছে। তবে আমরা গরীব মানুষ, ভাইটা ম্যাট্রিক পাশ করলেও কোথাও একটা কাজ চুকিয়ে দিতে পারি, দেখুন মাইনের খাতা, জাশের রিপোর্ট, হুমাসের মাইনে দিতে পারিনি।

—মিথো চেষ্টা করছ বাবু, এক দিন ছিল যখন এ বাড়ীতে হাজার হাজার কাগজালী বিনায় করা হয়েছে, আজ সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।

—বড় অভাবে পড়ে ছুটে এসেছি, কিছু না হোক এক মাসের মাইনে নাত টাকা—

—সাতটা পরমাণু দেবারও আমার ক্ষমতা নেই।

বাস্তায় বেরিয়ে চলতে চলতে শ্রামল হঠাৎ বলে, আমার কি বকম লজ্জা করে।

—কিসের?

—এ ভাবে পরমাণু চাইতে।

—কি এমন মানো লোক যে লজ্জার মাথা কাটা গেল?

শ্রামল উত্তর দেয় না, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কেউ পকেট থেকে একটা কাগজ বাব করে। ইংরাজী টাইপকরা, নীচে কয়েক জনের সই রয়েছে, শ্রামলের হাতে কাগজটা দিয়ে বলে, ঐ কোণের লাল বাড়ীটার বা, মাইনের খাতা, এই কাগজ, সব কিছু দেখাবি। আশ, কিছু দেয় কি না।

শ্রামল আপত্তি করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে লাল বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেউর দেওয়া চিঠিটা পড়ে। সব শব্দের মানে না জানলেও ভাবার্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাতে লেখা আছে, এ ছেলেটি আমাদের পরিচিত, অনাথ কিন্তু মেধাবী। আপনারা একে সাহায্য করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। নীচে কয়েক জনের নাম সই করা।

বাবু বাড়ী ছিলেন না, গিন্নী-মা বাগানখ থেকে বেরিয়ে আসেন— কি চাই খোকা?

কথা বলতে গিয়ে শ্রামলের গলা আটকে যায়, কিছু বলতে পারে

না। হাতের কাগজগুলো বাড়িয়ে দেয়,—আচ্চা কি দরকার, মুখেই বল না।

—ইহুসে হুমাসের মাইনে দেওয়া হয়নি। শ্রামল খেমে যায়, হঠাৎ বলে ফেল, আমরা বড় গরীব। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, কিছুতেই খামাতে পারে না।

গিন্নী-মা চোপের জল দেখে সিঁদিলিক হয়ে পড়েন, জাটা কাঁদতে কেন, মেথা-পড়া শিশু মিছেই এক দিন বোজগার কাগজে, মাস কাগজের সময় হাতে বেশী টাকা নেই, এখন টাটকা মিষ্টি নিয়ে যাও।

জাশ থেকে টাকা দুই দিকে দিকে ছিটকেন, কোন দিকে পড়।

বার্ট জাশ।

—শ্রামল বই এর দরকার থাকলে হোল। আমার ছেলেরা সব কলকলে পড়ে, ইহুসের বই অনেক আছে। এক দিন সকালবেলা দিকে এসে গল্পের সঙ্গে মাল্যপ করে নিয়ে বেও।

শ্রামল তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে। ঘরে কেউ দাঁড়িয়েছিল, শ্রামলের কাছে এগিয়ে আসে, কি হল?

শ্রামল ছোট্ট এক টাকার নোট কেউর দিকে এগিয়ে দেয়। কেউ হাসে, শ্রামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ—এই তো শিশু গেছিস, তোর এক টাকা, আমার এক টাকা।

শ্রামল স্থান হাঙ্গে, হাতের নোটটার দিকে তাকায়, এই তার প্রথম বোজগার।

শ্রামলের বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হ'ল। কেউর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা বাড়ীতে নোতেনি, পথে পথে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে, পকেট থেকে টাকা বা'র করে বার বার দেখছে।

বৈঠকখানায় তত্তাপোষের ওপর শশধর বাবু চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি রে ফিরতে এত রাত হ'ল?

শ্রামল চমকে ওঠে, বাবাকে এমন দিনে সে আশা করেনি। মাসের শেষের দিকে কলকাতায় বড় একটা উনি আসেন না। তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কখন এলে?

—বিকেলের গাড়ীতে, শরীফটা ভাল নেই।

—তোর ফিরতে এত রাত হয় কেন?

—একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, কোচিং ক্লাশে গিয়েছিলাম। শশধর বাবু উঠে বসেন, ইহুসের পরে বেতে হয় বুঝি?

—হ্যাঁ, উঁচু ক্লাশে একটু বেশী পড়তে হয়।

—কোচিং ক্লাশে আবার কী লাগবে তো?

শ্রামল ধতমত খেয়ে বলে, না পরমাণু লাগবে না, কেউনা আমাদের এমনি পড়ান।

কথা শেষ হয় না, শ্রামলের মামা জগৎ বাবু ঘরে ঢুকলেন।

—এইতো শ্রামল এসে গেছে, তুমি মিছামিছি এতক্ষণ ভাবছিলে! জগৎ বাবু তত্তাপোষের ওপর বসে পড়েন। ভদ্রলোক বেঁটে, নেমাপাতি ভুঁড়ি, সগদাগরী অফিসের বড়বাবু। সন্ধ্যাবেলা পান করা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস, আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নেমা যৌকেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি, তোর বাবা যে ভেবে ম'ল!

শ্রামলের হয়ে শশধর বাবু উত্তর দেন, কোচিং ক্লাশে পড়তে গিয়েছিল।

—ওরে বাবা, ইস্কুলের ক্লাশ, তায় ওপর কোচিং ক্লাশ, বিজ্ঞের জাহাজ হবি নাকি?

শ্রামল উত্তর দেয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে সন্ধ্যার পর মায়ার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই, উনি অনর্গল বকে যান।

—খবরদার বেশী লেখাপড়া করিসনি; তাহলে অফিসের ক্লাক কি বেয়াবা ছাড়া আর কিছু হতে পারবি না।

কথা কীর বেশ জড়িয়ে আসে, আরও জোর দিয়ে বলেন, আমার বাবা ভীষণ লেখাপড়া করেছিল, বল কি হ'ল, না ইস্কুল মাষ্টার। যাঁট টাকার বেশী মাইনে এক পরমা বাড়লো না। তার পর মনে কর তোর বাবা এই শশধরনা, মাজার কোক গ্যাজুয়েট তো, কি হ'ল? না অমুখের কানভাসার।

শ্রামল এ অসুখ চাপা দেবার চেষ্টা করে, মামা, আমি বাট, যুখ হাত পা ধুয়ে নিই—

—দাঁড়া, বা বলছি শোন, আমি আরও কম লেখাপড়া করেছি, কোন বকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে দিলাম, বাহোক তাই বড়বাবু হতে পেরেছি। তুই যদি আরও কম পড়িস তাহলে একদম বড় অফিসার হয়ে যাবি। কেউ আটকাতে পারবে না।

ভেতর থেকে মাসীমা ঠাক দিলেন, এস সবাই, খাবার দেওয়া হয়েছে। শ্রামল এই সুযোগই খুঁজছিল—মাই মাসীমা, বল সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শ্রামলকে বাড়ী পৌঁছে রাঘব বোয়ালের বাড়ী আসতে কেঁঠর অনেক দেয়ী হয়ে গেল, তাঁর বড় ছেলে বললে, বাবা আপনার জেয়েই এতক্ষণ বসেছিলেন, এই মাত্র খেতে ওপরে গেছেন।

—আসতে দেয়ী হয়ে গেল, বড় কামেলার কাজ বুঝতেই তো পারছেন, আমি বরং কাল আসব।

—আপনি বসুন, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

কেঁঠকে বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না, রাঘব বোয়াল নিজেই নেমে এলেন।

—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

—না, এই এসেছি। আপনাকেই এত রাতে বিরক্ত করলাম।

—মোটাই নয়, মোটেই নয়। রাঘব বোয়াল ঘন ঘন মাথা নাড়েন। তার পর, কি খবর বল?

—আমি মল ঠিক করেছি, আমাদের ভোটের লিষ্ট দেবেন, আমরা নিজেরা গিয়ে আলাপ করে আসব। বিশেষ করে বাস্তবলোতে, ভোট তো এখানেই বেশী পাওয়া যাবে।

—তুমি ঠিক বলেছ, বাবা অবস্থাপন্ন, তাঁদের ধরবার আমার লোক আছে। বস্তিগুলো যদি তুমি লোণাক্ত করতে পার, তাহলে অনেকটা কাজ এগুবে।

বেষ্ট বিজ্ঞের মত হাসে, তাই ত বলছি। এদের চাত করা শক্ত নয়। ভাই ভাই বলে পিঠে চাত দিয়ে বোকাতে হবে, দু-একদিন ভাল-মন্দ খাওয়াতে হবে, এর বেশী কিছু নয়। তাছাড়া এখন ছোটখাট ক্লাবগুলোতে চাত করতে হবে, এদের কিছু টাল দিলেই আপনার মিক চলে আসবে।

—সে তো চিতেই হবে। চাইতেনই কিছু বই দেওয়া, ফুটবল ক্লাবে আসি, ব্যাডমিটন ক্লাবে রাতে আলোদেওয়া—

কেঁঠ বাধা দেয়, ব্যাস ব্যাস। এ করলে আর দেখতে হবে না। দেখি ক'টা ভোট অল্প বাজর পড়ে। কয়েকটা জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে তো।

—সে তোমরা যা ভাল বোঝ—

—আমি সব পাড়াতেই ব্যবস্থা করে রাখছি, সেই পাড়ার লোক দিয়েই সভা ডাকাব। তারা নিজেরা এসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। আপনি গিয়ে ছ'চারটে গরম গরম কথা বলবেন—

রাঘব বোয়াল উৎসাহিত হন, এ তোমার খুব ভাল বুদ্ধি হয়েছে, একবার বক্তৃতা দিতে উঠলে আর আমাকে পার কে, প্রথমেই সরকারের নামে নিষেধ করতে হবে, দেশে কি রকম দুর্নীতি রয়েছে, কালো বাজারীদের অত্যাচার, পুলিশভুলুম। এ সব বিষয়ে খুব শক্ত শক্ত কথা আমার মুখস্থ আছে।

কেঁঠ সায় দিয়ে বলে, আপনার বক্তৃতা কে না শুনেছে, যেমন ভাষা তেমন বলবার ভঙ্গি, এ ইলেকশানে আপনার জয় নিশ্চিত।



‘মাতার যত্নপায় ভুগিভেছেন’  
একবার চক্ষু পরীক্ষা করার না কেন?

**ক্যালকাটা অপটিক্যাল**  
কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.

ফোন ৪-৫৫-১৭১৭

৪৫, আনন্দের স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

গলাটা একটু নামিয়ে বলে, কিছু টাকার দরকার, ছোঁড়া-  
গুলোকে হাতে রাখা চাই তো।

—কত দেবো, বেশী টাকা তো নেই, একশ' টাকার হবে?

—অত কি হবে, টাকা পঞ্চাশ হলেই আপাতত চল।

বাঘব বোয়াল পকেট থেকে টাকা বার করে দেন, কেউ  
পাঁচখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

জীপ-এ করে কেউ হবে বেড়াই, সকাল থেকে বাড়ি। গাড়ীতে  
ভেল কুরিয়ে আসলে পাড়ায় ফেরে, আর সহ্য রাতে বাড়ীতে  
পোবার জন্তে। ক'দিনের অবিশ্রান্ত কান্ড।

বাঘব বোয়াল বলেন, কেউ কান্ডের লোক বটে, এই ক'দিনে  
চার দিক গরম করে তুলেছে।

বন্ধু প্রভাত বলে, কেউটা চিপকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ  
তাড়ালো।

অনন্ত কেবিনের আন্তর' বলেন, বাক, কেউর দোঁলতে পাড়ার  
ক্লাবগুলো আবার চেগে উঠল। কেউ কোন কথা বলে না, নিজের  
মনে কাজ করে বার। রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় জনকয়েক  
চাঁৎকার করতে করতে চলেছে,—ভোট ফর রঘু ব্যানার্জী। সেই  
সঙ্গে কত বকমের শ্লোগান বা কেউই ঠিক করে দিয়েছে অগ্নি পার্টির  
নকল করে। যে পাড়া থেকে যে দলই বেরোক, বাঘব বোয়ালের  
বাড়ীর সামনে গলা ফাটিয়ে চাঁৎকার করে বার।

পাড়ার পাড়ার পোষ্টার লাগান হয়েছে, নানা ভাষায়,  
নানা রং-এ। অগ্নি প্রাণীদের পোষ্টারের ওপর কেউ ইচ্ছে করে  
নিজেদের গুলো লাগিয়ে দিয়েছে। সে নিয়ে কত জায়গায় ঝগড়া  
হয়।

—কে মশাই রঘু বাঁড়ুজো, জীবনে নাম শুনিনি—

—শুনবেন কি করে, অন্ধকূপের মধ্যে বসে আছেন।

—কি করেছেন তিনি?

—কি করেন নি? কেউ নির্দিকার ভাবে ফিরিস্তি দিয়ে  
বার বাঘব বোয়ালের গুণের।

—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রনৈতিক  
আন্দোলন হয়েছে মার ট্রাম ভাড়া স'গ্রাম অবধি সব ব্যাপারই  
তিনি নিজে চালিয়েছেন, কিন্তু নাম প্রকাশ করেন নি।

কেউর দল পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় বাঘব বোয়াল কত বড়  
একজন নীরব কর্মী।

এই মধ্যে একদিন দুপুরবেলা চৌরঙ্গীর সিনেমার সামনে  
দাঁড়িয়ে কেউ ভাবছিল চুকবে কি না, এমন সময় একটি মেয়ে এনে  
কাছে দাঁড়ায়, বলে, আমার একটা কথা শুনবেন?

অগ্রমনক হয়ে কেউ জিজ্ঞেস করে, কি?

—আমার ছোট ভাই-এর বড় অসুখ, মর-মর। এই দেখুন  
ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, অসুখ কেনার পরস্য নেই।

কেউ হাসে। মেয়েটি করণ চোখে তাকায়, টাকা চাই না, এই  
অসুখ কটা কিনে-দিন।

কেউ খুব আস্তে মন্তব্য করে, এখনও কাঁচা।

মেয়েটি তখনও ঘ্যান-ঘ্যান করে, তিন দিন থেকে চেষ্টা  
করছি, এই এক শিশি অসুখ একজন কিনে দিয়েছিলেন, বড়ী,  
মিস্টার, কিছুই দিতে পারিনি। ডাক্তার বলেছে আজ ওসুখ না  
পড়লে—

কেউ হঠাৎ বলে, বেশ, আমি তোমাদের বাড়ী যাব, যদি দেখি  
তোমার ভাই-এর সতি অসুখ, আমি টাকা দেব।

—অত দূরে কি যেতে পারবেন? টালীগঞ্জ, রেফিইজি বস্তীতে  
থাকি।

—ঠিক আছে, ঠিকানা দাও।

মেয়েটি ঠিকানা বলে, কেউ নোট-বুক লিখে নেয়, জিজ্ঞেস করে,  
তোমার নাম?

—গৌরী।

সন্ধ্যার আগেই বেঠ হাজির হয় টালীগঞ্জের উদ্বাস্ত বস্তিতে।  
গাড়ী থেকে নামতে দেখে তাকে ভ্রমিয়ার বাড়ীর পাকা দালান পার  
করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিতরের বস্তিতে। খবর পেয়ে গৌরী  
এগিয়ে এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়।

—এই নোংরা জায়গায় আপনাব বসে হবে কেনেই আসতে  
বারণ করেছিলাম।

কেউ উত্তর দেয় না, গৌরীর সঙ্গে ছোট কুঁসুরীর সামনে এসে  
দাঁড়ায়। মাটির ঘর, ওপরে টিনের চালারঘরের এক কোণে নোংরা  
বিছানায় একটা ছেলে শুয়ে আছে, প্রায় নিশ্চীর্ণ।

গৌরী ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলে, ওই আমার ভাই।

কেউ স্তম্ভিত হয়ে যায়, ক'দিন ভুগছে?

—প্রায় এক মাস।

—দেখি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন?

গৌরী এগিয়ে দেয়, তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেঠ বলে,  
আমার সঙ্গে একজনকে দাও, এখনি ওসুখ কিনে পাঠিয়ে দেব।

—চলুন, আমিই যাব।

—এর কাছে কে থাকবে?

—ভগবান।

—কেউ আর কথা বলে না। গৌরী বলে, গাড়ীতে বাবার  
দরকার নেই, ডাক্তারখানা পাশেই আছে।

কেউ গৌরীর কথা মত ডাক্তারখানার দিকে যায়, পথে শুধু  
জিজ্ঞেস করে, তোমার আর কে আছে?

—ওই ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। গৌরীর চোখ হল-হল  
করে ওঠে।

—কেন?

—পাকিস্তান থেকে কলকাতা আসবার পথেই সকলকে  
হারিয়েছি।

ওসুখ কিনে কেউ গৌরীর হাতে দেয়, বলে, আমার ঠিকানা রেখে  
দাও, যদি দরকার হয় চিঠি লিখ।

—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, গৌরী কেউকে প্রশ্নাম  
করে।

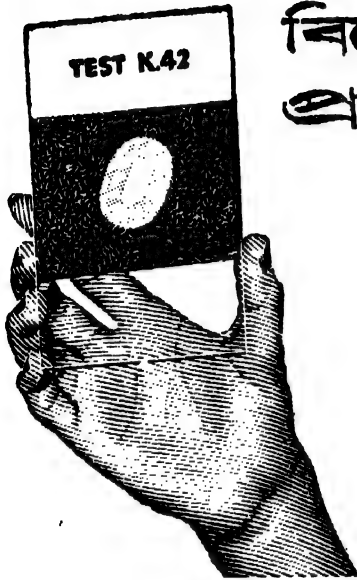
কেউ জিপ-এ উঠে ঠাট দেয়।

# দেখুন!

দস্তক্কর নিবারণে

বিশেষ

প্রতিরোধক!



## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দস্তক্করী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে খুসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিট-গন্ধী সুলীতল আস্বাদ!



লক্ষ্য করুন, ক্যাপট  
ধরবার কত সুবিধে।

৩৫ ৭৭৬ A

জেনি মানাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী



# বিবেকানন্দ ১ স্টোড ৫

সুমণি মিত্র

৪৪

এবার প্রশ্ন কোরি স্বামিজীর হোয়ে,—  
'ঈশ্বর' বোলতে কি বোঝে বোলতো হে ?  
ভেবে তাকো কাকে তুমি বলে ভগবান ?  
কি কি গুণ তাঁর মাঝে করো সন্ধান ?  
তোমার আদর্শের সীমাটা কোথায় ?  
কল্পনা পাখি মেলে কতো দূর যায় ?  
তোমার আদর্শকে বতোই ছাড়াও,  
ঈশ্বর-বোধটাকে বতোই বাড়াও,  
দেখবে যে অবতার তাকেও ছাড়ান,  
তোমার চেতনা তাঁর পায় না নাগাল ।

কল্পনা সন্ধান পায় না ধীরে  
কেন পূজো কোরবে না বোলতো তাঁদের ?  
চাইছো বা' তার চেয়ে বেশি যদি পাও,  
কেন তাঁকে মানবে না উত্তর দাও ?  
দেবতার গুণ যদি মানুষেই থাকে  
কেন তুমি ঈশ্বর বোলবে না তাঁকে ?

"Take one of these Messengers of Light ;  
Compare his character  
With the highest ideal of God  
You ever formed  
And you will find  
'That your God falls low  
And that character rises.  
You cannot even form of God

A higher ideal  
Than what  
The actually embodied  
Have practically realized,  
And laid before us  
As an example.  
  
Is it wrong, therefore  
To worship these as God ?  
Is it a sin  
To fall at the feet of these man-Gods,  
And worship them  
As the only Divine Beings in the world ?  
If they are really...higher  
'Than all my conception of God,  
What harm  
'That they should be worshipped ?

Not only is there no harm,  
But  
It is the only possible  
And positive way of worship."

৪৫

ভাবলে আমাকে কেউ জিগেস কোরো না,  
ঐশ্বর্যমুখের পূর্ণপ্রকৃতি কি না ।  
স্বামিজী যে বোলেছেন তা আমিও জানি,  
তবু যেন সার দিতে সাহস পাইনি ।  
স্বামিজী তো পৃথিবীকে বোলেছেন ভূতো,  
সে-কথাটা আমরা কি মেনেছি তবুও ?

১। "জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের অগ্রদূত যারা—তাদের যে-কোনো একজনের চরিত্রের সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার সর্বোচ্চ ধারণার তুলনা কোরে তাকো । দেখবে—তোমার কল্পিত ঈশ্বর ঐ চরিত্রের তুলনায় অনেকাংশে হীন ; দেখবে—অবতাবের, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র তোমার ধারণার অনেক উর্দ্ধে ।

আদর্শের সাকার বিগ্রহস্বরূপ এই সব মানুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কোরে তাঁদের মহৎ জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ধোরে গ্যাছেন, আমরা তার চেয়ে ঈশ্বরের উচ্চতর ধারণা কোরতে কখনোই সক্ষম নই ।

তাই যদি হয়, তবে জিগেস কোরি, এই সব মানুষকে ভগবানবোধে পূজো করা কি অত্যাচার নাকি ? এই সব নর-দেবতাদের জীচরণ লুণ্ঠিত হোয়ে, পৃথিবীতে এঁদের ভগবানের একমাত্র সাকার বিগ্রহস্বরূপ মনে কোরে পূজো করাটা কি পাপ ? যদি তাঁরা সত্যিই আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত ধারণার চেয়ে আরো বড়ো হন, তবে তাঁদের পূজো কোরতে দোষ কি ?

দোষের তো নই, বরং সাক্ষাৎ ঈশ্বরোপাসনা একমাত্র এই ভাবেই সম্ভব ।"—Christ, the Messenger.



স্বামিজীতো বহুকথা বোলেছেন জানি,  
আমরা কি স্বামিজীর সবকথা মানি ?  
স্বামিজীর কথাগুলো আমাদের তাই  
বেবাক্ কোপ্চে যাওয়া চলনাকো ভাই।

ঠাকুর 'ব্রহ্ম' কিনা আমরা কি বুঝি ?  
আমরা কি সব ছেড়ে 'ব্রহ্ম'কে খুঁজি ?  
'ব্রহ্ম' যে কাকে বলে তাই বা কে জানি ?  
নিজে যেটা বুঝিনাকো কি কোরে তা মানি ?

ঠাকুরের দৃষ্টিতে স্বামিজীর ঘর  
'সপ্ত-ঋষির লোকে', কিংবা সে 'নর'।  
ঠাকুরের কথা যদি মেনে নিতে চাই  
আমাদেরও অন্ততঃ ঋষি হওয়া চাই।  
না-বুঝে পনের কথা যেই মেনে নিচ্,  
স্বামিজীর মতে তারা মহা নাস্তিক।

\* \* \*  
"A man may believe  
In all the churches in the world,  
He may carry in his head  
All the sacred books ever written,  
He may baptise himself  
In all the rivers of the earth,  
Still,  
If he has no perception of God,  
I would class him  
With the rankest atheist."৩

৪৬

ঠাকুর ও স্বামিজীকে বুঝে নিতে তাই  
আমাদের জড়ত্ব আগে যাওয়া চাই।

আমাদের জড়ত্ব কেটে বাবে যেই,  
ঠাঁদের দেবত্বটা বুঝবো তবেই।  
ইহু কি দেবে বলো সিংহের মান ?  
হাতীই বুঝতে পারে সিংহের দাম।

\* \* \*  
"It is the strong  
That understands strength,  
It is the elephant  
That understands the lion,  
Not the rat.  
How can we understand Jesus  
Until we are his equals ?  
It is all in the dream  
To feed five thousand  
With two loaves,  
Or to feed two with five loaves ;  
Neither is real  
And neither affects the other.  
Only grandeur appreciates grandeur,  
Only God realizes God."৪

\* \* \*  
আমরা মানুষ হোলে, জেনো নিশ্চয়  
ঠাকুর-স্বামিজী তার বেশি কিছু নয়।

৪৭

বেশকথা, ও না হয় বুঝলাম তাই,  
এবার এ-প্রশ্নের সমাধান চাই,—  
ধরো ষাঁরা অবতার মর্মে আসেন,  
মানুষের মতো ষাঁরা কীদেন হাসেন,  
ঠাঁদের দেবত্বটা যদিও বিরাট,  
তবুও মানুষবোধে ভাখাটা কি পাণ ?  
নরের অপূর্ণতা মেনেছেন বিনি  
তিনি কি মানুষ নন ? দেবতাই তিনি ?

\* \* \*

২। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামিজী প্রসঙ্গে বোলতেন,—  
"দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সম্বন্ধী ; আমি দেখেছি সে 'অখণ্ডের ঘরে'র  
চারভনের একজন এবং 'সপ্তর্ষির' একজন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ( ৫ম ভাগ, পৃ: ১২৭ )

আবার এও বোলতেন—"জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ  
নামে যে দুই ঋষি মূর্তি পরিগ্রহ কোরে জগতের কল্যাণের জন্তে  
তপস্তা কোরেছিলেন, নরেন সেই নরঋষির অবতার।"

—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (পূর্বকাণ্ড, পৃ: ৫৮-৫৯)

৩। "এমন লোক থাকতে পারে যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতেই  
বিশ্বাসী, দুনিয়ার সমস্ত শাস্ত্র সে মাথায় বোয়ে বেড়াক্, পৃথিবীর  
সমস্ত নদীর জলে সে নিজেকে অভিষিক্ত কোরুক্, তাসত্ত্বেও যদি  
তার ঈশ্বর-উপলব্ধি না থাকে, আমি তাকে চূড়ান্ত নাস্তিক বোলে  
মনে কোরবো।"—Soul, God and Religion.

(complete works, vol I, page 323)

৪। "শক্তিমানই শক্তি কি, তা বুঝতে পারে। হাতীই  
সিংহকে বোঝে, ইহু নয়। আমরা যতদিন না ষাঁদের সমকক্ষ  
হোচ্ছি, ততদিন আমরা ষাঁটকে কেমন কোরে বুঝবো বলো ?  
দু'খানা পাউকটিতে পাঁচ হাজার লোক খাওয়ানো, কিংবা পাঁচখানা  
পাউকটিতে দু'জন লোক খাওয়ানো—এ দুই-ই মায়ায় রাজ্যে।  
এদের মধ্যে কোনোটাই সত্য নয়, সুতরাং এ-দুটোর কোনোটাই  
অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্বই কেবল মহত্বের কদম বোঝে,  
ভগবানই শুধু ভগবানকে উপলব্ধি কোরতে পারেন।"—Inspired  
Talks ( পৃষ্ঠা—১৮৫ )

আমরা মানুষ হোলে, অবতারদের  
মানুষ ভাবেতে তথা নরকো দোষের ।  
তবে যদি 'নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্ম'তে ভাই  
এ জীবনে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা পাই,  
সেদিন মানুষভাব থাকবেনা আর ;  
তার আগে এটাই থাকা দরকার ।  
দরকার বলা ভুল, থাকতে হবেই ;  
এ-ব্যাপারে মানুষের দুটো পথ নেই ।

"Whenever we try to think of God  
As He is  
In His absolute perfection,  
We invariably meet  
With the most miserable failure ;  
Because  
As long as we are men,  
We cannot conceive Him  
As anything higher than man.  
The time will come  
When we shall transcend our human nature,  
And know Him as He is ;  
But as long as we are men  
We must worship Him  
In man and as a man."\*

গাধাদের ভগবান, খুব সম্ভব,  
আকারেতে আর একটা বড়ো গর্ভ ।  
তাই বোলে গাধাদের দিচ্ছি না দোষ ।  
মোষদের ভগবান প্রকাণ্ড মোষ ।  
পোনামাছ ঈশ্বর চুনো-পুটিদের ;  
ঠাকুর ও স্বামিজীরা—এঁরা আমাদের ।

"If, for instance,  
The buffaloes want to worship God,  
They will,  
In keeping with their own nature,  
See Him as a huge buffalo ;

\* । "যখনই আমরা ভগবানকে নিষ্ঠূর্ণ পূর্ণরূপ বোলে ভাবতে  
বাই, তখনই আমরা মর্যাদাসিক ভাবে ব্যর্থ হই ; কারণ বতদিন  
আমরা মানুষ, ততদিন তাঁকে মানুষের চেয়ে বড়ো বোলে কিছুতেই  
ভাবতে পারবো না । অবশ্য এমন দিন আসবে, যখন আমরা  
মহুষ্য প্রকৃতি অতিক্রম কোরে তাঁর স্বরূপবোধে সমর্থ হবে ; কিন্তু  
বতদিন মানুষ থাকবো, ততদিন মানুষের ভেতর এবং মানুষবোধেই  
তাঁকে পূজা কোরতে হবে ।"—Bhakti-Yoga. ( পৃষ্ঠা—৩০ )

If a fish wants to worship God,  
It will have to form  
An idea of Him  
As a big fish ;  
And man has to think of Him  
As man."\*

81

ভক্ত একথা শুনে বড়ো ভয় পান,  
ঐ বুঝি ভগবান ছোটো হোয়ে যান ।  
এ-ভয়টা অমূলক, নেই কোনো দাম ;  
ভক্তি যে কতো কম—এ তারই প্রমাণ ।  
দেবতার এতটুকু অপূর্ণতার  
কোচিকোচি ভক্তই শুধু যাবড়ার !  
এই সব ভক্তেরা অবতারদের  
দেবতার আবির্ভাব চেকেছে তাঁদের ।  
তাঁদের মানুষ-ভাব, সাধকের সেই  
অন্তর্ভূত ইতিহাস নেই ।

গৌপীজনবল্লভ কোন্ সাধনার  
পার্শ্বসারথী হন—সে কথা কোথায় ?  
আচার্য শঙ্কর—তাঁরও ঠিক তাই,  
তিনি যে মানুষ তার কি প্রমাণ পাই ?  
দিবিলয়ের ঐ কাহিনীতে তাঁর  
লৌকিক চেহারাটা খুঁজে পাওয়া তার ।  
সাধক বীণুরও দেখি সাধনার সেই  
লৌকিক চেষ্টার ইতিহাস নেই ।  
ষাশবছর থেকে তিরিশ বছর  
কিভাবে কাটান তার নেইকো খবর ! ৭

নিকট ভক্তই সদা সাধনান,  
ঐ বুঝি অবতার ছোটো হোয়ে যান ।  
তাই তারা দেবতাকে ভীক প্রদায়  
সভয়ে শিকেষ তুলে রেখে দিতে চায় ।

৬ । "যদি, মোষদের ইচ্ছে হোলো ভগবানকে পূজা  
কোরতে—তাদের স্বভাব অনুযায়ী তারা ভগবানকে একটা বিরাট  
মোষ হিসেবেই দেখবে : একটা মাছ ঈশ্বরের আরাধনা কোরতে  
চাইলে, ঈশ্বরকে তাকে একটা প্রকাণ্ড মাছ বোলেই চিন্তা কোরতে  
হবে ; আর মানুষকেও ভগবানকে মানুষ বোলেই ভাবতে হবে ।"

—Bhakti-Yoga ( পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫ )

৭ । অবতারদের জীবন-ইতিহাস পোড়লে তথা বায়, সিদ্ধিলাভ  
করার পর তাঁদের যে অদ্বৃত্ত শক্তি প্রকাশিত হোয়েছিলো—সেইকথাই  
সবিস্তারে আলোচনা করা হোয়েছে । পূর্বসংস্কারজন্যে সন্ত

ভক্তিশাস্ত্র মতে ঐশ্বর্যের ভয়  
পরিণত ভক্তির পরিচয় নয়।  
ভক্তির প্রথমে যে ঐশ্বর্যের  
অদ্ভুত মোহ থাকে কাঁচা ভক্তের,  
ভক্তিটা পাকা হোলে তাকে সে তখন,  
ভক্তিপথের ওটা মহা দুঃখন।  
চতুর্ভুজের মোহ থাকেনাকো আর,  
ছুটো হাত ছুটো পাই ভালো লাগে তার।  
ভক্তির শেষ কথা ছোটো কোরে তথা,  
অনৈর্ঘ্যভাবে কাছে কাছে রাখা।

উৎপাটিত কন্যার জন্মে সাধনকালে তাঁরা যে অপূর্ণ অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হোয়েছিলেন—মানুষতাবের সেই দিকটা নিয়ে কেউই বিশেষ আলোচনা করেননি। মনে হয়, মানুষ-তাবের আলোচনা কোরলে পাছে তাঁরা ছোটো হোয়ে যান, পাছে নিজের কিংবা পাঠকের ভক্তির হানি হয়—এই ভয়েই তাঁরা অবতারদের মানুষভাবটি চেপে রেখে কেবল দেবতাবের আলোচনাই কোরে গ্যাছেন। ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ঐশ্বর্যের দুর্গলতা তথা যায়। ভক্তির প্রথম অবস্থাতে ভক্ত কখনো তাঁদের ঐশ্বর্য রহিত কোরে চিন্তা কোরতে পারেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণার্থে বিশেষ বিশেষ শক্তি সঞ্চয়ের জন্মে যে অনেক সময়ে উৎকট তপস্যায় নিযুক্ত হোয়েছিলেন—একথা পুঁথিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সাধনকালে তাঁর অন্তর্ভূক্তের বিশেষ কোনো বিবরণই পাওয়া যায় না।

ভগবান বুদ্ধের জীবনকাহিনীতে তাঁর সংসার-বৈরাগ্য এক ধর্ষচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁর সাধনার ইতিহাস ততদূর পাই না। তবে অন্তান্ত অবতারদের যেমন কিছুই পাওয়া যায়না, সে হিসেবে বুদ্ধের সাধক জীবনের একটা আভাব পাওয়া যায়। কিন্তু তাও রূপকের সাহায্যে তা' বর্ণিত হোয়েছে বোলে বর্ণাধভাবে তার সত্যতা সন্দেহ করা কঠিন।

আচাৰ্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনীই দেখি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে।

বাইবেলে ভগবান যীশুর সাধন-ইতিহাসের প্রায় কোনো কথাই নেই। তাঁর বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত হ'একটা ঘটনা মাত্র লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে। তারপর তাঁকে পাই আবার তিরিশ বছর বয়সে, যখন তিনি 'জনে'র কাছে অভিষেক গ্রহণ কোরে বিজয় মরুমুখিতে গিয়ে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁর অন্তর্ভূক্তের একটা কথা মাত্র রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হোয়েছে। তিনি যখন ঐ মরুমুখিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তপস্তা কোরছিলেন, তখন এক 'শয়তান' তাঁকে এসে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিফল হয়। তারপর মাত্র তিন বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। অতএব বারোবছর থেকে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত তিনি কি ভাবে কাটান, বাইবেলে তার কোনো বিবরণ নেই।

খ্রীষ্টের ইতিহাসে বোধ হয় সর্বপ্রথম স্বামী সারদানন্দজীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানুষতাবের আলোচনা কোরে গ্যাছেন এবং বতদূর সম্ভব তাঁর সুদীর্ঘ সাধক-জীবনের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গ্যাছেন।

ঐশ্বর্যে যত বেশি হবে অম্লরাগ  
ঐশ্বর্যের প্রতি আসবে বিরাগ।  
ব্রজের গোপীরা কি হে কৃষ্ণকে কেউ  
ভগবান বুদ্ধিতে দেখেছে তুলেও ?  
ভক্তির চরমেতে থেমে যার স্বপ্ন,  
তখন 'ব্রহ্ম' নয়, 'প্রাণবল্লভ'।  
কিংবা বশোদা, যিনি স্বচক্ষে তাঁর  
দিব্যবিভূতি সব দেখেছেন যার,  
তিনিও কি বিশ্বয়-বিমোহিত চোখে  
জগৎকারণ বোলে দেখেছেন তাঁকে ?  
কৃষ্ণ বতাই হোন জগৎপালক,  
বশোদার কাছে তিনি দুল্ল বালক।  
আসলে ও-সব জ্ঞান ভক্তের মনে  
বিভীষিকা এনে ছায়, ভালোবাসা কমে।  
পরিণত ভক্তির লক্ষণই এই,  
দেবতাকে কাছে টানে মানুষ-বোধেই।

৪৯

আপাততঃ আমাদেরই প্রয়োজনে ভাই  
ঠাকুরকে মানুষের আসনে বসাই।  
স্বামিজীকে ধরা যাক 'সিমলে'র ছেলে,  
তার পর তথা বাক্ কি বস্তু মেলে।  
মনে হয় আমাদের দেবতা হওয়ার  
দুর্গম রাস্তাটা তাতে দোজা হয়।

আমাদের মতো যদি না ভাবি ওঁদের,  
সত্যলাভের ঐ চেষ্টা তাঁদের  
মনে হবে অসত্য, নেই কোনো দাম,  
নিত্যপূর্ণ ধারা—এ তাঁদের ভাণ।  
অনৈর্ঘ্যভাবে দেখি যদি তাঁকে,  
আত্মজয়ের ঐ সংগ্রামটাকে  
'দেবতার লীলা' বোলে ভাববোনা আর,  
চেষ্টাটা বুঝা ভেবে ছাড়বো না হাল,  
দেবতা হওয়ার ঐ দুর্গম পথে  
আমরাও একদিন যাবো পা বাড়াত্তে।

তাদের মানুষ ভেবে নগ্ন যে লাভ,  
সেটা হোলো আমাদের সচেষ্ট ভাব।  
তাই আমি স্বামিজীর সব কিছুতেই  
দেবতার আবরণ দিতে রাজী নই।  
তাহোলে যে বুঝবো না চেষ্টার দাম,  
বুঝবো না কেন তাঁর এত সংগ্রাম।  
আমরাও চেষ্টাকে বুঝা ভেবে ঠিক  
হাল ছেড়ে দিন দিন হবো তামসিক।

৫০

তাই বোলে বোলছিনা অবতারদের  
আলোচনা করে শুধু মানুষ-ভাবের,  
দেবত্ব ভুলে গিয়ে সর্বক্ষণ  
ভাববে মানুষ ছাড়া আর কিছু নন।  
কিংবা বোলিই যদি ক্ষতি নেই তাতে,  
আমাদেরই দেবত্ব বাধা দেবে তাকে।

ভেবেছো কি আমরাও নিতান্ত rat ?  
Lion এর ছিটে-কোঁটা আমাদের নেই ?  
ঠাকুর-স্বামিজী তাই মানুষ হোলেও  
তার চেয়ে বড়ো হোতে কোনো বাধা নেই।

\* \* \*

"What is the proof  
Of Christs and Buddhas of the world ?  
That you and I feel like them.  
That is how you and I understand  
That they were true.

Our prophet-soul  
Is the proof of their prophet-soul,  
Your God-head  
Is the proof of god himself.  
If you are not a prophet  
'There never has been  
Anything true of God.  
If you are not God  
There never was any God,  
And never will be." ৮

[ ক্রমশঃ ]

৮ "জগতে খৃষ্ট এবং বুদ্ধদের প্রমাণ কি ? না, তুমি-আমিও  
সেইরকম অনুভব কোরে থাকি ; তাইতেই তুমি ও আমি তাঁদের  
সত্যতা স্বয়ংস্ব কোরতে পারি। আমাদের ঐশ্বরিক আত্মাই তাঁদের  
ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। তোমার ঈশ্বরত্বই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রমাণ।  
তুমি যদি নিজেকে ভগবান না হও তাহোলে কোনো ঈশ্বর নেই,  
কখনো হবেনও না।"

—Practical Vedanta ( পৃষ্ঠা ২১ )

### নারী ও পুরুষের পরমায়ুর প্রশ্ন

পৃথিবীর সকল দেশে না হোক, অনেক দেশেই দেখা গেছে এ  
যাবৎ—পুরুষের চেয়ে নারীরা বেঁচে থাকে একটু দীর্ঘদিন।  
বিলেতে নারী ও পুরুষের পরমায়ুর তুলনামূলক বিচারেও এই  
সত্যটি ধরা পড়েছে বিশেষ ভাবে। কিন্তু প্রশ্ন—এর স্বার্থ কারণ  
কি ? নারীদের আয়ু পুরুষদের অপেক্ষা বেশী হয় কেন ? প্রশ্নটি  
নিয়ে গবেষণাও বিলেতী চিকিৎসা দেহ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কম নয়।  
তারা তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন—নারীদের গড়পড়তা আয়ু যেখানে  
৭১-৫ বছর, পুরুষদের সে ক্ষেত্রে ৬৫-৮ বছর। তাঁদের নিশ্চিত  
ধারণা—যৌনগত কারণ এবং দৈহিক কাঠামোর কোথাও কোন ইতর-  
বিশেষ দ্রুপই এমনটি হয়ে থাকে বা হওয়া সম্ভব।

নারী ও পুরুষের পরমায়ু পার্থক্যের প্রশ্নটির যীমাংসার জন্তে  
বিলেতী জীববিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ শুধু মানুষের নয়—আরও  
প্রায় পঞ্চাশ রকমের প্রাণীকে চোখের উপর রেখে শেষ অবধি  
পরীক্ষা করেছেন। তাতে তাঁরা এইটাই দেখেছেন—পুরুষজাতীয়  
প্রাণীগুলোর চেয়ে স্ত্রীজাতীয় প্রাণীগুলো বাঁচে অপেক্ষাকৃত  
বেশী দিন। মনুষ্য-জগতে নারী এবং পুরুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও  
চিন্তাধারার তারতম্যে যে পরমায়ুর তারতম্য হয়—উক্ত শ্রেণীর  
গবেষকগণের তা' স্বীকার করেন না। পরন্তু এইটি বার বারই  
তাঁরা জোর দিয়ে বলেন—দেহের আভ্যন্তরীণ গঠনগত কোন  
পার্থক্যই পরমায়ুর উল্লিখিত রূপ। পার্থক্যের জন্ত দায়ী অর্থাৎ এই  
একটি মৌলিক কারণেই সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা  
বাঁচবার সুযোগ পায় কিংবা বেঁচে থাকে অধিক দিন।



## সামাজিক পটভূমিকা ও খেলাধুলা

মানুষ মহাভারতের যুগ থেকে বর্তমান কালের যান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত খেলাধুলার রীতি প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। তবে সামাজিক পটভূমিকা অনুসারে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেটাকে আমরা এক কথায় যুগোপযোগী বলে থাকি।

মহাভারতের যুগে ধনু ও তুণীর ধারণ। মল্লযুদ্ধ। বাণী, হনুমান, সুরাঘর প্রভৃতি মল্লযুদ্ধরূপেই খ্যাত হয়েছিলেন।...

ঐতিহাসিক যুগে আমরা সন্ধান পেয়েছি বড় বীরের। বাংলার প্রতাপ শৌর্যবীর্যে ছিলেন অতুলনীয়।

প্রাচীন কালে বিজ্ঞাপীঠে বায়াম চর্চার প্রচলন ছিল। গ্রামীন ভারতের আখড়া স্থাপনের কথা নিশ্চয়ই আমরা বিস্মিত হই নি। যার চিহ্ন আজও হাটগাটে পুরী অঞ্চলে দেখা যায়। বিজয়া দশমী, নাগপঞ্চমী, বসন্তপঞ্চমী ও অন্ধাঙ্গ উৎসব-মুখর দিনে পরীক্ষা চলতো। রাজ-রাজড়া কুস্তী করতেন আর পালোয়ান পুষতেন। এই কুস্তির রেওয়াজ আজও উত্তর বিভাগ প্রদেশে প্রচলিত আছে।

এর পর এলো পরাবীনতার যুগ। সূচক বৃষ্টিপ শাসক সম্প্রদায় শক্তি বিনষ্ট করার দিকে লক্ষ্যপাত করে, নানা আইনের বেড়াভালে জাতীয় সহিতিকে ধ্বংস করে ক্রোধে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

এর পর এলো দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

স্বদেশী যুগে স্বদেশীয় বীর শতীদ। শক্তি সঞ্চয়ের জ্ঞান গুপ্ত সমিতি গঠন। লাঠি পেলা, ছুরি খেলা, কুস্তি প্রভৃতির প্রচলন হোল নিজেদের বাঁচার সাধনা।

অসাধারণ মনোবল ও অসীম শক্তির দ্বারা ভারত আবার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের বাণী—

‘শরীরমাংসং খলু ধর্মসাধনম্’

জাতি গঠনের মূল মন্ত্র। সমস্ত মালিঙ্গ দৃঢ়হস্তে মোচন করে আজ জাতিকে অগ্রসর হতে হবে।

এবার প্রশ্ন আমাদের সামাজিক পটভূমিকা।

যুগ-সন্ধিক্ষণে দৈনন্দিন জীবন-যাপন যেখানে দুর্কিবিহীন হয়ে উঠেছে সেখানে খেলাধুলার কথা চিন্তা করা মানে বিলাস। এ কথাই আজকের দিনে প্রতিটি অভিভাবক বলেন।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে অভিভাবকরা খেলাধুলাকে অজ্ঞার বলে ভাবতেন। তাঁরা, জানতেন, শুধু লেখাপড়া করে ভাল চাকরী পাওয়ার কথা। স্বপ্নের বিষয়, বর্তমান অভিভাবকরা ছেলেদের খেলাধুলা করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলেন না। তাঁরা বুঝেছেন, খেলাধুলার প্রয়োজন আছে। খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতিগঠনের প্রয়াস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলে নানান বিষয়ে সম্ভাবনাকর ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে সেই সমস্ত

পদ্ধতির যদি প্রচলন করা যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে খেলাধুলার ভারতের স্থান শীর্ষে হবে বলে আশা করা যায়। ভারতের ছেলেমেয়েরা সুষ্টম সবল শরীর নিয়ে তাদের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজে ক্রীড়ানুশীলনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ভাবে রাখতে হবে। শারীরিক যোগাভা ও প্রতিভা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন দিকে উৎসাহ দিতে হবে।

বর্তমান স্কুল-কলেজগুলির কথাই আলোচনা করা যাক। বাধ্যতামূলক ভাবে খেলাধুলার ব্যবস্থা কোন কোন স্কুলে দেখা গেলেও ফলতঃ দেখা যায় যে খেলাধুলা করার মত মাঠের একান্ত অভাব। মিশনারী স্কুল, এংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলিতে কিছু কিছু সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এগুলি দেশের একমাত্র আশা বা ভরসা হুল নয়।...

সহরের স্কুলগুলিতে খেলাধুলার কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে খেলাধুলা করার মাঠ আছে কিন্তু স্কুলের তহবিলে খেলাধুলা খাতে খরচ করার মত সঙ্গতি নাই। কোন কোন উৎসাহী তরুণ শিক্ষক এ দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, স্কুলের মাঠে কোনরকমে একটি ফুটবল বা ভলি খেলার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তা অত্যন্ত মুষ্টিমেয় স্কুলে।

মেয়েদের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মেয়েদের খেলাধুলাকে এখনও আমাদের দেশে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখাবো যে, মেয়েদের স্থান ছেলেদের অপেক্ষা কোন অংশে কম হতে পারে না। আজকের যে মেয়েটি বালিকা, সেই মেয়েটি কালকের মা। এই ভয়স্বাস্থ্য, অশিক্ষিত মায়ের কাছ থেকে সুস্থ, সবল মেধাবী সন্তান আশা করা বুধা।

প্রাচীন যুগে মেয়েদের শক্তির আধাররূপে কল্পনা করা হতো। তাই আজকের যুগে মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দেখা জাতীয় জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি।

আমাদের দেশের খেলাধুলার একমাত্র কয়েকটি বেসরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান সধন। কিন্তু এগুলির আর্থিক সম্ভতি অত্যন্ত সঙ্গীন। একমাত্র সভ্যদের চাঁদার উপর সঞ্চল করে বেঁচে আছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলির সংগে আমাদের দেশের তুলনা করলে দেখা যাবে প্রচুর প্রভেদ।

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ‘পাবলিক স্কুলে’ খেলা মাঠে, আধুনিক পদ্ধতিতে বায়াম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার কথা সর্বোপরে বলতে হয়।



ক্রীড়াবিদদের মূলমন্ত্র অনুশীলন। যে যত অনুশীলন করে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় তত বেশী।

খেলাধুলার যে এক সুন্দর ধারা সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত আছে তা প্রতিটি দেশের পক্ষে অনুসরণীয়।

শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সোভিয়েট প্রতিটি মানব-শিশুতে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। শিশু গর্ভে আসার সংগে সংগে মাকে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে সুস্থ, সবল সন্তান। জন্মভূমিকে আমরা 'মা' রূপে কল্পনা করি। সোভিয়েট সে কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এক বছরের শিশু থেকে ব্যায়াম করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। নানান অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে নানান গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে পাইওনিয়র প্রাসাদ ও পেরেক্টস কমিটি সংশ্লিষ্ট আছে। মনস্তত্ত্ব বিভাগের বিচক্ষণ অধ্যাপকেরা শিশু পালন বিষয়ে নানান মতামত দিয়ে থাকেন।

রাশিয়ার কিগুরগার্ডেনে স্কুল সাধারণ স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় কারখানা এমন কি প্রতি ইউনিয়নে শরীর ভাল রাখার জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই সমস্ত শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে সোভিয়েট সরকার। শারীরিক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা সমান ভাবে এগিয়ে চলেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় কালের চাপে যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ অনুশীলন করার সময় পান না দিবা ভাগে, তাঁরা আলো জালিয়ে রাত্রে দিকে অনুশীলন করেন। শুধু অনুশীলন নয়, সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমন্বিত।

কিছুকাল ধরে দেখা দিয়েছে যে ভারতবর্ষের খেলা-ধুলার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের দিকে নেমে গেছে। বিশেষতঃ কলকাতার আশে-পাশের অঞ্চলগুলি থেকে তরুণ কুশলী খেলোয়াড়দের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কলকাতা মাঠে ফুটবল মরশুম, হকি মরশুমে নানান প্রদেশ থেকে, খেলোয়াড়রা আইনের বেড়ালাল টপকে

আসছে। কলকাতার ক্লাবগুলিরও এ দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই। তাঁরা মোটেই খেলোয়াড় তৈয়ারী করার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয়।

কলকাতার আশে-পাশের অঞ্চলে খুঁজলে অনেক ভাল খেলোয়াড় এর সন্ধান পাওয়া যাবে। শুধু সে সমস্ত খেলোয়াড়রা সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারতের ক্রীড়ামান অবনতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী করা যায় পশ্চিম-মণ্ডলীকে। তাঁরা কোন সুস্বত্ব পরিকল্পনা না নিয়ে ক্রীড়ামানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেন না। কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়ে চালিয়ে যাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শরীর গঠন ও নির্মল আনন্দ ছাড়া আজকের দিনে খেলা-ধুলার আরও একটি উপযোগিতা অধিকতর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সেটা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা স্বীকার করে নিয়েছেন খেলা-ধুলার মাধ্যমে সৌহার্দ বৃদ্ধির পথ।

খেলাধুলার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের অসংখ্য দেশগুলি দ্রুত ভাবে এগিয়ে চলেছে। তার প্রধান কারণ সজীব ও সতেজ স্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা যে কোন দেশের খেলোয়াড় অপেক্ষা দুর্বল। তাই সর্বপ্রথম নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যের দিকে।

আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সৌহার্দে খেলা-ধুলার গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিখিল-ভারত ক্রীড়া-পরিষদ গঠিত হয়েছে। রাজকুমারী অমৃত কাউন্সিলের ক্রীড়া শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়া-শিক্ষক ও কোচ আনার ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে স্পোর্টস বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়। উৎকর্ষতা লাভের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা দান ছাড়াও চাই রাষ্ট্রের আয়ুর্ক্য, দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সদিচ্ছা।

## এই বন-শীর্ষ নদী

রবীন চৌধুরী

এই বন-শীর্ষ নদী ঝাউতীর ধরে চলে যায়  
অন্ধকার করা কোন হিজল-তলায়।

যেখানে পাখর জল-তটে  
সার সার হিজলেরা ওঠে,  
সাত তলা জ্যোৎস্নার সমুদ্র-তলে  
অসংখ্য গগুজ জলে :  
ক্ষুটিক মাঠের সেই মাণিকের বন  
পেতে যদি মন।

মন যেতে চায়—  
মন-পবনের দাঁড়ে  
তার তীরে  
তারার চুম্বক হয়ে জলে যেতে চায়  
কখনো কখনো কখনো কখনো।

পেল নাক' মন  
গগুজ বিদীর্ণ সে গজমোতি বন।

মন যদি যেতে সেই দেশে  
অরণ্যের গন্ধ ধরে সন্ধ্যার মৌমাছি বেশে  
নক্ষত্র দীপের তল মধুসিক্ত মৌচাকের তার  
অপরোহে আসে যেথা

সোনারজ পাখরের সার  
আর যার মেঘাচ্ছন্ন জল-কল্যাণ  
দানব হাওয়ার ডাকে সচকিত অকথ্য কথন,  
অতিক্রান্ত সাম্রাজ্য হতে অবশ্য অবধি  
হয়ে যায় হীরকের নদী।  
অরণ্যের গন্ধ ধরে সন্ধ্যার মৌমাছি বেশে  
যদি মন—যদি মন যেতে সেই দেশে।



## সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে

— এতে দৈনন্দিনের ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।

• যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্তে স্বাস্থ্যবান লোক মাঝেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই স্বরূপে তাজা ভাব এনে দেয়



## ছোটদের আসর



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কলকাতা শহরের এক এক রাস্তা চোখে দূর পড়ে এক এক রূপ নিয়ে—কোথাও নানা বিচিত্র সাইনবোর্ড একটার পর একটা। নানা ধরণের দোকান—কোনো বাড়ীর সদর দরজাই দেখা যায় না, কোন দিক দিয়ে ওপরে ওঠে লোকে কে জানে! বাইরের ঘর কিংবা বৈঠকখানার পাটাই নেই কোনো ট্রামরাস্তার বাড়ীতে। প্রত্যেক বাড়ীর নীচের তলটি দোকান। মনোহারী, ফাউন্টেন পেনের, ব্রেকর, চায়ের, কাপড়ের, মুরার, বইয়ের, জুতোর, ঘড়ির, সোডা-লেমনেড সরবতের, কিংবা চায়ের।

কোনো রাস্তার প্রেস আর ডাক্তারখানা আর কবিরাজখানা, আর হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান। কোথাও লুপ্তি, টুপি, চুড়ি, মোরালাবাদ কানীর জিনিসপত্র ছড়ানো!

কোনো রাস্তায় খালি দাঁত আর চশমা পাশাপাশি। কোথাও সারি সারি গয়নার দোকান। আয়নালাগানো দেওয়ালে হাজার বাতির আলো ঠিকরে পড়ে পথচলতি লোকের চোখে দীপা লাগায়।

মাঝে মাঝে পার্কের বেসিং, পুকুরের টলটলে জল।

বড় বড়ো রাস্তাগুলোয় একচেটিয়া মাড়োয়ারী বাড়ী। আকাশ-হোঁয়া শ্রীহীন, বোমা পড়ার যুগে বেতুলো খালি হয়ে গেছিলো মালিকের দস্ত চূর্ণ করে।

সেদিনের কথা শুনেছে মীরা। ভাবতে পারে না। ভাবতে পারে

না। এই বিকানীরী জয়পুরিয়া প্রাসাদগুলোর অসংখ্য ঘর কোনোদিন খালি ছিল। ভাবতে পারে না কলকাতার রাস্তা সত্যে থেকেই অন্ধকার। সেদিন এরোপ্লেন থেকে বোম্বার উপায় ছিল না কোথায় কলকাতা। তবু সেই অন্ধকার কলকাতার বুকের ওপর জাপানী বোমা পড়েছিলো। 'হাতিবাগানের' বাজারের টিনগুলো চৌচির হয়ে ফেটে গিয়েছিলো। সমস্ত পাড়াটা ধ্বংসের কঁপে উঠেছিলো অতি সাধারণ সামান্য বোমায়।

আবার কোনো দিন যুদ্ধ লাগতে পারে। আবার কোনো দিন কলকাতার উজ্জল আকাশ কালো অন্ধকারে ঢেকে যেতে পারে। কিংবা এ পৃথিবীর ওপরের অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমায় পুরোন পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে নতুন পৃথিবী জন্মাতে পারে। কি পারে আর কি পারে না, সে কথা ভেবে মীরার মাথা খারাপ করার দরকার নেই যদিও।

চায়ের নেমস্তম্ভ এসেছে লেডি ব্যানার্জীর বাড়ী থেকে। আজ বিকেলে বেতে হবে। ফোনে জানিয়েছে—চা খেতে এসো। শুধু এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে পেট্রোল পুড়িয়ে খাওয়ার কোনো মানে হয়? অনেকে এ কথা ভাববে। চা খেয়ে এখানে—মানে অনেক গভীর।

মাত্র এক কাপ চাই নয়। মীরা দেপেছে তাদের এ বাড়ীতে টি পাট ব'লে যে জিনিস হয়, লনের ওপর চার-চারখানা চেয়ারের মাথায় রঙীন ছাতা দিয়ে যে আয়োজন হয়, তা যে কোনো মেয়ের বিয়ের খাওয়ার সমান।

লেডি ব্যানার্জীর বাড়ীর ফটক থেকে করিডোর পর্যন্ত মোরাম-বিছানো পথে গাড়ী চলে যেন জলের ওপর নৌকো ভেসে যাওয়া।

সকলে ড্রয়িং-রুমে বসেছিলো, মীরা ছেলেমানুষ, তেতেরে চুক পড়েছিলো উঁকি মারতে মারতে।

তখন লেডি ব্যানার্জীর সাজ হচ্ছিলো, মেম-ডেসার মুখে রং চুল কলপ দিয়ে ক্র এঁকে দিচ্ছিলো। লেডি ব্যানার্জীর নাতনী বি-এ পড়ছে, কিন্তু দিদিমার বয়স দেখাচ্ছে পর্যটন।

সত্যি, দেখতে ভালোই লাগে।

লেডি ব্যানার্জী বললে, এসো। মীরা!

ডাকটাও কেমন মিষ্টি।

ত্রিশ বছর ধরে কি করে লেডি ব্যানার্জীকে ঠিক এক রকম দেখতে লাগে, সবাই ভেবে অবাক হয়।

কথায় যেন মায়ামাখানো। ধনী হোক, গরীব হোক—প্রত্যেককে ডেকে ডেকে কুশল-প্রশ্ন করা লেডি ব্যানার্জীর মাধুর্য।

গরীব অবস্থা বেশী কেউ এ আসরে আসতে পারেনি। সাহিত্যিক আর শিল্পী কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে।

এ বাড়ীর ঐশ্বর্যের কাছে মীরাদের বাড়ী স্নান। একেবারে কিছুই নয়। হয়ত কোনো রাজার বাড়ীর সঙ্গে এ বাড়ী মেলে। মার্কস মোজেকের মেঝে। তাও দেখা যায় না, সবই দামী কার্পেটে ঢাকা। দশ জন বাবুচি আর দশ জন বাঁধনী বাঁধন মিলে আজকের চায়ের নেমস্তম্ভর খাবার তৈরী করেছে। খাবারের



ত্রিপ্রভাতকিরণ বসু

পাহাড়। তোমার কাছে যেই খালা আসছে, তুলে নাও চামচ দিয়ে বত খুঁসি।

কোথায় হ্যাংলা আর প্যাংলা? তারা বোধ হয় এখানে লোভ গমলাতে না পেরে খেয়ে মরেই যেত।

বাক্সের মতন খাওয়া এখানে চলবে না। দেখাতে হবে তুমি কত কম খেতে পারো।

ওদের অনেক জিনিস ফেলা যাবে। হয়ত কোনো ভিখারীর ছলে-মেয়েরা তখন কিছু পেতে পারে। ফটকের একেবারে বাইরে। রাজা বাবু জয় হোক ব'লে বারা চোঁচাচ্ছে।

অটালিকায় প্রচুর খাবার আর বাইরে প্রচুর অভাব—এ প্রাচুর্য্য বাপ হয় এক ভারতবর্ষে। এ কথা ভেবে মীরার দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এ কথা মনে হ'লে আর খেতে ইচ্ছে করে না। এর পরে ঠুঁতুবাঁধা ঘরে গান হল, বাজনা হল, নাচ হল। কিন্তু গরীব হিন্দুস্থানের কথা একবার মনে হলে, আর ত কিছুই ভালো লাগে না। ও ভাবতে লাগলো একদিন মাত্র না খাইয়ে এট লেডি বানান্ধী যদি কয়েক জন শিল্পী আর সাহিত্যিককে বাঁচার পথে সাহায্য করত।

মন ভার ক'রে মুখ ভার ক'রে মীরা ফিরে এলো। বাড়ীতে এসে দেখে, কত দিন পরে মাসীমা মেসোমশাই এসেছে। মাসীমা মানে মামণির নিজের বোন। মেসোমশাই প্রোফেসর। ব্যারিষ্টার ভায়রাভাইয়ের কাছে নিতান্ত কাজে না পড়লে আসে না।

আজ পরকার। সন্ধ্যা থেকে এসে বসে আছে। কোন ক'বে এলে এ বিভ্রাট ঘটত না।

চোখের বসে কি সব কথাবার্তা হল। কালকে সবাইকে যেতে হবে ওদের নতুন বাড়ীতে। লোক ভিউ বাড়ীতে।

নতুন বাড়ীটি লোকের কাছে। নতুন করা নয়, নতুন কেনা। দু'বে লোকের নীল জল, সামনে ফুলের বাগান, তিনখানা ঘরের একতলা ছোট্ট বাড়ীটি কী চমৎকার সকালের আলো হাওয়ায়।

পূর্বাতে মৌ-ভিউ, দার্জিলিং এ ছিল ভিউ দেখেছে, এবার দেখলে লোক-ভিউ। ভায়মণ্ডহারবারে কি বিভার-ভিউ হবে? কিন্তু রাতে এ বাড়ীর অজ্ঞা রূপ। সেই গল্পই ও শুনলো। পাশের ঘরে চোর ঢুকে একালের ঘালের আলমারী—যা নাকি আগুনে পোড়ে না, চাবি কেউ খুলতে পারে না, সেই আলমারী এসিডে গলিয়ে গয়নার বাস্র আর যা কিছু ছিল সর্বস্ব নিয়ে গেছে। এরা শব্দ শুনে জেগে উঠে গিয়ে দেখে, পাক্সা-মা-সাঁট বৃশকোট পরা ভদ্রলোকের ছেলেরা সব—বিভলবারের আওয়াজ করলো, বোমা ছুঁড়লো—হাওয়া হয়ে গেল।

খানায় সিগারেট হল, পুলিশ এলো। কোন কিনারা হল না। সেই চোরদের মতনই দেখতে ভদ্রলোকের ছেলেরা সিগারেট টানতে টানতে এসে প্রোফেসরকে জানিয়ে গেল—বারা চুরি করেছে তাদের মুকুট নাকি বিরাট বিরাট বড়লোকেরা। এরা একটু তথির তদারক করতে পারে। কিন্তু এখন গলা শুকিয়ে গেছে মাসীমা, দশ কাপ চা ক'রে দিন।

চা খেতে তারা প্রায়ই আসতে লাগলো। কোনো দিন সবৎ চায়।

দামী দামী ফুলপাছগুলো কে উপড়ে নিয় যায়। ঢিল ছুঁড়ে

মার্শীর কাচ ভাঙে। সারা রাত ধূপদাপ আওয়াজে একতলা বাড়ীতে ঘুম হয় না। তাই প্রোফেসর রাখলো একটা ফক্স-টেরিয়ার।

দিন কতক আওয়াজ বন্ধ হল। উপদ্রব বন্ধ হল।

কিন্তু রক্ষাকালী পুজোর চাঁদ চাইতে এসে কি কায়দায় যে তুন্দাস্ত ফক্স টেরিয়ারটাকে মস্ত খেলের মধ্যে ওরা পুরে নিয়ে গেল, ওরাই জানে।

বেলায় এলো সেই ছেলের দল। বগলে দশটা টাকা পেলে এনে দিতে পারে কুকুরটাকে।

খসলো দশ টাকা। মুখবন্ধ খলেতে ফিরে এলো ফক্স-টেরিয়ার। ব্যারিষ্টার পরামর্শ দিলে, বাড়ীটা বিক্রি ক'রে পাটোভাড়া দিয়ে ফিরে যাও। সেখানে পাড়ার লোক সজাগ, এখানে পাড়ার লোক কামেলায় যায় না। তা ছাড়া কত দূরে দূরে সব আছে।

আজ মীরা শুনলো, কলকাতায় বাড়ালী ছেলেরা, লেখাপড়া জানা ছেলেরা খুব ছোরা চালাতে শিখেছে, মদ পেয়ে মাতলামী করতে শিখেছে, অনেক জায়গায় পথে-ঘাটে মেয়েদের চলা বিপদ, নিজের জাতের ভাইয়েদের সামনে দিয়ে।

মীরার একথা বিশ্বাস হয় না। গুণ্ডা মানেই ত' ছোট লোক, ছোট জাত, মুখখু।

ভদ্রলোক কখনো গুণ্ডা হয়? বগু হ'তে পারে। কয়েক জন ভদ্র পরিবারের ছেলের ইয়ার্কিতে একজনকে নতুন বাড়ী বেচে পালিয়ে যেতে হবে?

কিন্তু তাঁর মেসোমশাইকে শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়। মাঝে থেকে এক উকীল বন্ধু বাড়ী বেচার সময় ছু'পক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এমন গোলাখাগ বাধিয়ে দিলো যে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে বেচার প্রোফেসরের অনেক কষ্টট হল। কী কাণ্ড সব!

বিচিত্র মহানগরী। এখানে থাকতে গেলে মারতে হবে হয় টাকার জোরে, নয় বুদ্ধির জোরে।

ভালোমানুষ গোবেচারাদের জন্তে কি এ শহর নয়?

তাই ওর প্রশ্ন শাস্ত হল ক'দিন সালানপুর এসে। পৃথিবীর মধ্যে এমন নিষ্কল দেশও আছে?

ছোট্ট একটা ষ্টেশন। তার পাশে ছোট্ট একটা খানা। বাস-চলার সর্ব্ব একটা রাস্তা। তার ধারে খান তিন-চার বাড়ী। তার পর মাঠের পর মাঠ, পলাশবন, শালবন, মহুয়াবন।

দূরে দূরে গ্রাম। দিনের বেলাতেই ঘুমন্ত। সাড়া নেই, শব্দ নেই। পথে লোক নেই একটিও।

শুধু শঙ্খচিল ডেকে ওঠে, মুনিয়াপাখী টেলিগ্রাফের তারে তারে লাকিয়ে যায়। আকাশে সাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে। দূরে দূরে কলিয়ারীর চিমনি আর কপিকল দেখা যাচ্ছে। কয়লা-বোকাই ইঞ্জিন শাফ্টিং করছে ঠেঁশানে।

রাস্তাটা প'ড়ে আছে ত প'ড়েই আছে। ক্যাবিনের দোতলার বারান্দার ধারে একটা লোক ব'সে আছে ত' বসেই আছে।

একদিকে আসানসোল, একদিকে কুলটি, একদিকে মাইথন, আর একদিকে চিত্তরঞ্জন। যেখানে লোকচলাচলের আর কাজের নাকি বিরামনেই, অথচ এগুলির এত কাছে, নিঃশব্দ অলস পাণ্ডব-বর্জিত সালানপুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতন অন্ধকার।

চাষের জমি, ফসলের জমি বিশেষ নেই, এখানে কিছুই পাও

যায় না, জল নেই, আলো নেই, শুধু বাতাস আছে নির্ঝল আর পাহাড়ী—পুরুষ। সব কাজে চ'লে যায় কলিয়াবী আর কারখানায় মেয়েবাও কিছু কিছু বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কেন্দ্রস্থলটি স্থির হ'য়ে প্রতীক্ষা করে বছরের পর বছর, কবে সেখানে উৎসাহের উত্তমের চকলতার সাড়া আসবে।

যতই বা হোক, তবু মীরার প্রাণ জাগে, এমন গ্রামও ভারতবর্ষে আছে যেখানে উদ্দীপনা ব'লে কিছু নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে এ গ্রাম একই ভাবে আছে, একটুও উন্নতি হয় নি। না স্কুল দিয়ে, না দোকান দিয়ে, না ডাকঘর দিয়ে।

এ সব কথা শুনেও মীরার ভালো লাগলো শাস্ত্র ছবিটি দেখে। দিগন্তলীন মাঠের ওপর উদার আকাশ নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়, শাস্ত্রি আসছে, মনে শাস্ত্রি আসছে—বে শাস্ত্রি পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে।

কলকাতা থেকে আনা খাবার আর তরী-তরকারীর ব্যবস্থা হয় ঠাকুরের হাতে রান্নাঘরে—কল্যাণ-কুটারের টালিঢাকা ছোট বারান্দা থেকে পঞ্চকোট পাহাড়ের ঢেউ দেখা যায়, ছাদের ওপর উঠলে দশ-পনেরো মাইল মাঠ ঘাট বন গ্রাম চোখের সামনে ধরা পড়ে। ভ্রমিং ক্রমের ভদ্রতা মেনী সভ্যতার স্থান এখানে নেই, ইচ্ছে হয়, ছোটো মাঠের ওপর দিয়ে—বে মাঠ ক্রমশঃ নীচে নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে, বে মাঠ সমতল বাংলার মতন একঘেয়ে নয়।

মাঝে মাঝে নদ্বরে পড়ে রাস্তায় স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের—লেডি ব্যানার্জীদের চেয়ে সৌন্দর্য্য বাদের বেশী। কোনো মেম-ডেলার যদি তাদের সাজাত, তাহলে তারা পরীষ মতন হ'য়ে উঠত। চুলগুলোকে কি রকম ঘুরিয়ে কানের পাশে খোঁপা করেছে, তাতে গুঞ্জেছে সাদা-লাল ফুল,—কলকাতার প্রাইটকের শুকনো ফুল নয়—ছুটে চলেছে যেন বনের হরিণের মতন, হাসছে যেন বর্ণার কলধ্বনি।

এরাই ত এখানকার শোভা। মোটা খাওয়া-পরায় এত স্নানন্দ ওরা কোথা থেকে পায়?

রাত হয় সালানপুরে, অজস্র কলিয়াবীতে আলো জলে ওঠে দীপাধিতার মতন, মাইথন আলোর মালা পরে হাসে।

ঐ মাইথনে যাবার জন্তেই ওদের এখানে আসা। মাম্মি স্বপ্ন দেখেছে, কল্যাণেশ্বরীর পূজো দিতে হবে। কালো আকাশে অসংখ্য তারা, বে তারা কলকাতার ধোঁয়াভরা আকাশে দেখা যায় না। সব তারা নিবে যায়। শুকতারা জাগে।

ওদের এয়ার-কন্ডিশনড মোটরকারে দীয়ারিং হুইলে ফাষ্ট গীয়ার, নিউট্রাল, সেকেন্ড গীয়ার হ'য়ে টপ গীয়ার ঠেলে দেওয়া হয়, গাড়ী বড়ের মতন এগিয়ে চলে, অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে শানাই বেস্তে ওঠে ছোট বোতার যন্ত্রে,—গাড়ী ত নয়, যেন বাড়ী চলেছে পীচালা রাস্তার ওপর দিয়ে, সাঁওতাল-পন্নীর পাশ দিয়ে, পল্লদীঘির ধার দিয়ে, দেশুয়া হল্ট পার হ'য়ে লাকুরাজুড়ি পিছনে ফেলে নেমে যায়, ক্রমশঃ নেমে যায় বরাকর নদীর দিকে গড়গড়িয়ে, আবার ওঠে পাহাড়ের বুক-ঢেয়া রাস্তায় কোয়ার্টার্স হুপাশে ফেলে,—মাইথন বাঁধ নদীর বুক থেকে বিশতলা সমান উঁচু, তার ও-ধারে পাহাড়ের চূড়া বুক বোপের মতন জাগিয়ে অর্ধে অতল জল, ময়দানবের মতন যন্ত্রদানব কি কাজ এখানে করেছে!

ছোট একটুখানি জায়গা জুড়ে ছোট একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম চারিধারে দোকান-পসার, লোকালয়।

মীরার মাম্মি বলতে লাগলো, সন্ন্যাসী আজ নেই, যেদিন তিনি ছিলেন, আমি এসেছি ালনা নদী পার হয়ে কাঁটা-বিছানো পাহাড়ী-পথে। সেদিন সন্ন্যাসীর আশ্রমের চারিধারে বত ফল-ফুলের বাগান, কুয়ার জল কি মিষ্টি, আর চারিধারে কি নিবিড় বন!

আশ্রমের জানলার লোহার গরাদের কাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া যেত এক পাহাড়ের উঁচু শিখর, ডিনামাইট দিয়ে বা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই পাহাড়ের জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে আসত রাত্রে। সন্ন্যাসী ছাড়া চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কেউ ছিল না। কোথায় গেল সেই বন, আর কোথায় গেল সেই আশ্রম। ও পর থেকে ফিরে ওরা মন্দিরের দিকে নেমে এলো।

মাম্মি বললে, এই মন্দিরে বিকেল তিনটের পর আর জনমানব থাকত না, পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ীতে সব গ্রামের দিকে শহরের দিকে ফিরে যেত। তারপরেই ছিল বাঘের ভয়, নিঃশব্দ পথে ছিল ডাকাতের ভয়।

আজ এখানে দেখো, দিনের বেলাতেই ইলেকট্রিক আলোয় সাজানো দোকান ঘর, মনে হয়, যেন কালীঘাটে এলাম। ধর্ম্মশালায় সারা রাত হৈ হৈ করছে বাঁটা হাজারিবাগ থেকে যারা এসেছে, বাণীগঞ্জের লোকের ফিরে যাবার তাড়া নেই, বাস দাঁড়িয়ে থাকবে।

দেবী আজ সকল ভয় দূর করেছেন, কিন্তু সেদিনের সেই জনহীন নদীকুলের বনপথের মন্দিরের অবাধ গাড়ীঘর কোথায় গেল? এ তো মেলার ঠাকুর দেখতে এলাম!

মীরা বলে, যতই বলো মাম্মি, সেদিন এলে ভয় করত। গরুর গাড়ীতে ফিরে যেতে হত বেল তিনটের আগে, থমথম করত চারিদিক, আজ কোনো ভয় নেই, তাড়া নেই, নদীতে স্নান করে শিচুড়ি খেয়ে অনেক রাত ক'রে ফেরা হবে।

নদীর ধারে গাছের তলায় উন্নয়ন পেতে ঠাকুর রান্নার ব্যবস্থা করলো। নদীতে পাথরে আছড়ানো বর্ণার মুখে ব্যারিষ্টার বায়চৌধুরী মিসেস বায়চৌধুরী মীরাকে নিয়ে প্রাণ ভরে স্নান সারলো। উঠতে ইচ্ছে করে না।

হুজনে যখন গরদের কাপড় আর শাড়ী প'রে পূজোর জিনিস নিয়ে তৈরী হল, তখন হাইকোর্টের অ্যাটর্ন্য উকিল আর মক্কেলরা কেউ কেউ সে দৃশ্য দেখে অবাক—সাহেব মানুষের এত হিন্দুয়ানী!

অনেক লোক মন্দির-প্রাঙ্গণে, বাইরের অঙ্গনে কালো কালো পাঠা সারি-সারি রাখা—একটার বলি দেখে আর একটার আর্তনার আর স্পষ্ট চোখের জল মীরাকে চকল ক'রে তুললো, সে ছোট বাইরে বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে, যেখানে বর্ণার অশ্রাস্ত কলকলধ্বনি, আর ব্রীজের ওপারে মাইথনের বাড়ীঘর বিক্মিক করছে।

মীরা ভাবে, খাওয়ার জন্তে পৃথিবীতে অজস্র জীবজন্তু পাখী-পক্ষী হত্যা করা হচ্ছে প্রতিদিনই, সে হয়ত আরো নিষ্ঠুর ভাবে জবাই করা, মানে ত টুটিটা আখানা কেটে ছেড়ে দেওয়া—কিন্তু মাঝের কাছে মার সন্তানদের ঠকাঠক কাঁপুনির মধ্যে এই বলিদান, কচি কালো পাঠাদের এই অকালমৃত্যু এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারা যায় না!

অ্যাটিম বোমের বাতাসে ভেসে যাওয়া রেগুকাণ দিয়ে, বিভিন্ন খাতে ভেজাল দিয়ে, মানুষকে বঞ্চিত করে উপবাসের মুখে ঠেলে



ওয়ার নিত্য-নতুন পৈশাচিক যড়যন্ত্র দিয়ে এর চেয়ে অনেক বেশী পাকা করা হচ্ছে পৃথিবীতে। জননী বেন শক্তি সেন সেই পি নিশ্চিহ্ন করবার।

বড়ো মন্দিরের বাইরে যেখানে চরণপদ্ম আছে ছোট মন্দিরে, যানে কিশোরী কন্ধ্যা একদিন শাঁখারীর কাছে শাঁখা কিনে পনপুরের নেওঘরিয়া পিতার কাছে দাম নিতে বলেছিলো—  
গাণেশ্বরীর সেই পুরানো কাহিনী মায়ের স্থান, মায়ের খান—  
ইধনে অরণ করতে করতে প্রার্থনা করতে লাগলো মৌরা—শক্তিময়ি,  
ক্তি দাও। [ক্রমশঃ।

## আমার দেখা সুনির্মল বসু শ্রীবিনায়ক সেন

সুনির্মল বসুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তাও নেই, বন্ধুত্বও নেই, একদিনের সানাত্ত কিছুক্ষণের জ্ঞাত ছাড়া। ওঁর সঙ্গে জীবনে আত্মীয় কোন দাবীও করতে পারিনে। তবু যে ওঁর সম্বন্ধে লিখতে চাইছি, তাই কারণ ওঁর সঙ্গে আমার একটি আজন্মের সম্বন্ধ। সম্বন্ধ লেখকের ও পাঠকের। তিনিই বখন লেখক, তখন আমি পাঠক।

সুনির্মল বসুর আমি আমার নিত্যন্ত ছেলেবেলা থেকে এক গতে কি ওঁর সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই দেখে আসছি। সেটা হবে ১১১১—২০ সাল, আমার বয়স ১১। ষ-দশ, বাংলার শিশু সাময়িকের বাজ্যে তখন সন্দেশ-এর সাম্রাজ্য গৃহে। যদিও শিশু-সাময়িকই তখন এমন কিছু ছিল না, এক হল ‘সন্দেশ’ আর ছিল ‘শিশু’, ‘প্রকৃতি’ বোধ হয় তার আগেই গিয়েছিল। শিশুও গেছে কিংবা যায় যায়। দু’-একখানা ছুটকো বোনো শিশু এখানে সেখানে বন্ধু-বান্ধবের বাসায় ছাড়া ও কাগজ গাষি নিজে কাউকে রাখতে দেখিনি। ছেলেবেলা মামুষ হয়েছিলাম। আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে রাখতো সন্দেশ, আর এই একটি মাত্র সন্দেশ দিয়েই আমরা পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে সাহিত্য উপভোগের জের মেটাতুম। তখনও শিশুচিন্তকে পীকার করবার মত বা তাকে সাহিত্যের আনন্দ দেবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।

সেই সময় বড়দের পত্র-পত্রিকা প্রবাসীর কি করে দয়া হলো, তারা ওঁদের কাগজে ছেলেদের পাততাড়ি বলে শিশুদের জ্ঞাত রাখত। পাতা জুড়লেন। কাজেই আমরা দু’টো সম্পদ হাতে পাইলাম এক সন্দেশ আর এক প্রবাসী। সন্দেশের রায়-পরিবারের রায় সবারই দান অনবদ্য গল্প, কবিতা, ছড়া প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনী, বাঁধা আমাদের বখন একেবারে মাতিয়ে রেখেছে, তার উপরে প্রবাসীর ছেলেদের পাততাড়ি আমাদের কাছে হলো যি ভোজনের উপরেও চাটনী-বিশেষ। সেই প্রবাসীর ছেলেদের পাততাড়ির পৃষ্ঠার একদিন সুনির্মল বসুর ছড়ার কবিতা হালুয়, “চন্দ্র ভায়ার পদ্মা পার।” চন্দ্র একদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখলে যে সে সাতরে পদ্মা নদী পার হয়ে যাচ্ছে, বন্ধু-বান্ধব তার তীরে পাড়িয়ে বলছে, “ওরে চন্দ্র, বাসনি বাসনি, ডুবে বাবি, তুই আর।” চন্দ্র কিন্তু কিছুতেই ওনছে না, তখন তার মজা

লেগে গেছে—পদ্মা পার সে হবেই। এমন সময় মা এসে হাত ধরেছেন ওর, ওকে ঘুম থেকে তোলবার জ্ঞাত—

..... ধরল তাহার হাত কে ?

“ওরে বাবা কুমীর বলে ওঠেন চন্দ্র আঁতকে—তার পরেই—

..... জেগে দেখেন লজ্জায় পার হয়েছেন পদ্মা নদী তুলে তুলে শযায়।

এইটেই সুনির্মল বসুর প্রথম প্রকাশিত লেখা, উনি নিজেই তা’ বলেছেন ওঁর সম্প্রতি প্রকাশিত “জীবন-খাতার কয়েক পাতা”র। ওঁর বয়স তখন কত ছিল তা’ আমরা জানতুম না, আর তা’ জানবার প্রয়োজনও তখন কিছুই বোধ করিনি, আমরা ওঁকে পুরোধদত্তব সাহিত্যসেবক বলেই ধরে নিয়েছিলুম। জীবন-খাতার পাতা থেকে জেনেছি, তিনি তখনও ছিলেন স্কুলের ছাত্র। এ ছেলেদের পাততাড়িতেই ওঁর আর একটি ছড়ার কবিতা পাই—

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং সবে সবে বাও না,

চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না ?

যাড়ে যদি পড়ি তবে প্রাণ হবে অস্ত।

পথ মাঝে পড়ে যবে ছিরকুটে দস্ত।

জান নাকি বলেছিল মহাকবি মাইকেল,

যেও না যেও না সেথা যেথা চলে সাইকেল ? ইত্যাদি

সুকুমার রায়ের ছড়া কুমড়ো গটাশ, ভয় পেও না, বাবাগাড়ের রাজার তখন আমাদের থানা ভরপুর, সুনির্মল বসুর পেয়ে যেন আরও কিছু পেলুম। সুনির্মল বসুর বেশী কিছু তখনও প্রকাশিত হয়নি। কবি মানসের কবিতা তো প্রকাশিত হয়ই নি। আরও পরে গাট ওঁর কবিত্বপূর্ণ কবিতা সন্দেশের পৃষ্ঠায়। সুনির্মল বসু সম্বন্ধে আমার সেই সময়ের মনোভাব কিছু দিন পূর্বে বাংলার শিশু সাময়িক নামে একটি রচনায় উল্লেখ করেছিলুম (যুগান্তর নভেম্বর ২০,—১৯৫৫) তারই সেই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি।—

“সুনির্মল বসুর সেই সময়েই হাত-খড়ি সাহিত্য জীবন আরম্ভ করেছেন মাত্র। ওর লেখা এবং ওর আঁকা ছবি দেখতে পাই সন্দেশের শেষ দিকে। ১৯২৪-২৫ সালে সুকুমার বাবু মারা যান। তার কিছুদিন পরেই ওদের সব দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে যায়। সেই সময়েই মালিক অধাবিন্দু বিশ্বাস কিছুদিন সন্দেশ চালিয়েছিলেন বোধ করি বা ২৬, ২৭, ২৮ সন, তার পরেই তা বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। সেই সময় সুনির্মল বসুর কবিতা প্রায়ই সন্দেশে বেরোতো আর ওঁর নিজের কবিতার ছবিও প্রায়ই উনি নিজেই আঁকতেন। ওঁর রসের কবিতা, খেলালী কবিতা ও ছড়া ছাড়াও উনি প্রায়ই নিছক কবি মনোবৃত্তির কবিতা লিখতেন বিশেষ মাস বা বিশেষ ঋতু নিয়ে। বর্ষার কবিতা ছিল—

—আবার স্রু স্রু স্রু বাদল বরা গান

চৈত্রের কবিতা ছিল—

—চৈতী হাওয়া বইতে স্রু অনেক দিনের পর

শরতের কবিতা ছিল—

—ভোর হলো রে দোর খোল রে ভাই

এমন ভোরে ঘুম পড়ে ছাই—ইত্যাদি।

প্রায়ের ছেলে ছিলুম আমি, ঋতু পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক



সৌন্দর্য্য উপভোগ আমার রক্তে রক্তে। বেশ মনে পড়ে বর্ষার সময়  
ঝম ঝম বৃষ্টি পড়তো। আর প্রান্তার জল একটা নালা বেয়ে হুড় হুড়  
করে নেবে আসতো আমাদের বাসার সামনের একটা ডোবায়ে।  
স্থল ছুটি থাকলে আমাদের বাইরের ঘরে একাকী বসে পড়তুম  
সুনির্ম্মল বহুর 'আবার শুরু যুক যুক', আর কাব্যের ছন্দে ছন্দে  
বুকটা টন টন করে উঠত সেই ছেলেবেলা।

সুনির্ম্মল বহু যদিও ছড়াকার বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ কিন্তু  
আমলে ছিল ওর ভিতরে একটি সুন্দর কবি, একটি সত্যিকারের  
কবি, বার বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ছোট ছোট কবিতায়।  
ওঁর সাঁওতালপল্লী, সাঁওতাল পরিবেশ, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে  
যে সব কবিতা আছে তা বাঁবাই পড়েছেন তাঁরাই জানেন। মাস বা  
আধু কবিতা তো আগেই উল্লেখ করেছি। 'মাস-পয়লার' চেহারা  
তখনও খুব ছোট, সেই ছোট মাস পয়লার 'অতনী' বলে ওঁর একটি  
ছোট কবিতা মনে পড়ে। সেই দিন মুখেছিলুম উনি কত বড় কবি।  
কবিতাটি ছিল বোধ হয় ষাট-বশ পংক্তি, তার পাঁচটি পংক্তি মাত্র  
আজ মনে আছে কিন্তু তাঁর কবিতাটি বিচারে তাই যথেষ্ট—

—অতনী কুটেছে বন-কোণায়,

খোঁজ রাখে তার কোন জনায়।

... ..

হুঁলে হুঁলে যারা নিরালাতে

... ..

তার পর একদিন কবি এসে বললে,—

“ওরে ও অতনী মোছ আঁপি,

আমি কবি তোর খোঁজ রাখি।”

সম্প্রতি উঠে বাবার পর সুনির্ম্মল বহুকে আমি দেখি শিশু  
ভট্টাচার্য্যর মাস-পয়লার সঙ্গে। ছোট ও বড় মাস পয়লার উনি  
অনেক কবিতা, ছড়া ও ছোটদের নাটক লিখেছিলেন। নাটক মনে  
পড়ে 'কিপটে ঠাকুরা', কবিতা 'অতনী' ও সাঁওতালরা, ছড়া  
'সামিগ্রাণা' 'অটল বাবু পটল তোলা', 'কথক ঠাকুর মশায়ের দাড়ি  
নাড়া দেখে রাম ছাগলের কথা মনে পড়া', 'কাছার বাঁধা নেটে ইঁদুর',  
'ভুলাল পালের ছেলে ভুলাল সদাই তাহার ভুলটি, কালনা  
যেতে বললে তারে হাজির হবে কুলটি', 'শেঠজীকে কুকুরে তাড়া  
করা'—

—প্রবাদ জানে তুমি আমি কুতাতো আর তা' জানে না।

রাত্রিতে রিক্সা করে ঠানঠানের কাছে বাড়ী ফিরতে, রিক্সাওয়ালা বাবুকে  
একেবারে নৈহাটিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করা—

ঠানঠানয়ার ঠান ঠানিয়ে, রিক্সাওয়ালা আমায় নিয়ে চলতেছিল

হনু হনিয়ে।

শীতের রাত, গায়ের কাপড়টা একটু ভাল করে জড়িয়ে আরাম করে  
বসেছি, একটু ঘুমের ও চুল এসেছে, তার পর কতক্ষণ কেটে গেছে টের  
পাইনি হঠাৎ দেখি যে, একি! গঙ্গার ধারে সব বড় বড় চোঙ পূব  
আকাশে সৃষ্টি উঁকি মারছে, কি ব্যাপার। হাঁ হাঁ করে রিক্সাওয়ালাকে  
থামাতেই সে বললে—কম্বর ছয়া ভুল ছয়া কুছ কাল রাতমে আঁফি  
পিয়া। কাজেই—

শীতের রাতে শীত করে পৌছাব ভাই কই বাটতে,

তা না হয়ে একেবারে পৌছে গেলুম নৈহাটিতে।

মাস পয়লার যুগেই নিজের কৈশোর কাটিয়ে উঠেছি, তার পর  
১৯৩০ সালে জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে যেতে হয়েছে, তাই  
সেই সময়ের পর থেকে সুনির্ম্মল বহুর কার্য্যকলাপের সঙ্গে আর  
বিশেষ সংযোগের অবকাশ ঘটেনি, তবু স্মরণ যে একেবারে শেষ হয়ে  
যায়নি বিদেশে থেকেও বার বার তা টের পেয়েছি। অধুনা প্রকাশিত  
শিশু সাহিত্য পরিষদের 'ছড়ার ছবিও' আমার হাতে এসেছে। জীবন  
চক্রের ও একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এ যেন  
ভাগ্যের খেলা, সুনির্ম্মল বহু স্মরণে আমাকে একদিন লিখতে হবে  
বলে সে আমাকে যেন আগে থেকেই প্রস্তুত করছিল। ঐ ছড়ার  
ছবিতে ওঁর সে অবদান—

দাহর মাথায় টাক ছিল

সেই টাকে তেল মাখছিল

বা

ইকিয়ে দিয়ে টাঙ্গি কাল

আসছিল এক খ্যাক-শিয়াল

এ সব ছড়া তো মনে হয় বাংলায় চিরদিনের ছড়ার ভেতরেই  
কালে স্থান পাবে।

১৯৪০ সালে একবার কলকাতা যাই, তখন একদিন বর্তমান  
বহুশ্রী বায়োম্পোপ ঘরের কাছাকাছি জায়গায় রসারোডের উপরে  
ছোট এক রেস্টোরাঁতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় সুনির্ম্মল বহু এক  
বন্ধুকে নিয়ে সেখানে এলেন, এবং আর কোন টেবলে জায়গা না  
থাকতে ওঁরা দু'জনে আমারই দুপারে বসলেন। বসেই বহু হাত  
এগিয়ে দিলেন আর সুনির্ম্মল বহু দেখতে লাগলেন তা'। কেউ হাত  
দেখতে থাকলেই, যদি পরসাদ দিতে না হয়, নিজের ভবিষ্যৎটাও একটু  
হাতড়ে দেখতে চাওয়া মানুষের এক চিরন্তন দুর্ব্বলতা। কাজেই  
আমিও সেই মুহূর্ত্তে ভিড়ে পড়েছিলুম ওঁদের দলে। কথা হতে পারে  
যে উনিই যে সুনির্ম্মল বহু আমি তা' জানলুম কি করে তা' হলে  
বলব বহু ক্ষেত্রে বহু অবস্থায় ওঁর ছবি আমার দেখা ছিল। অনেক  
দিন ধরে সম্প্রতি আমার রচনা শিশু সাময়িক প্রকাশিত হবার  
পর উনি আমার কয়েকটি ভুল শুধরে কাগজে পত্র দেন।  
সেই ব্যাপারকে অবলম্বন করে, ওঁর সঙ্গে আমার দু'খানি পত্র  
বিনিময় হয়। তাতে ঐ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ায় উনি  
আমাকে লেখেন যে, হাঁ, এক সময় ওঁর হাত দেখা চর্চায় বোঁক  
হয়েছিল।

ওঁর সঙ্গে সেই কয়েক মিনিটের মাত্র দেখা, আর কখনো দেখা  
হয়নি। তবু এই অপরিচয়ের বন্ধক সম্বন্ধে ওঁর নানা লেখা ও নানা  
বিবৃতির মধ্য দিয়ে ওঁর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব বার বার আমাকে  
অভিভূত করেছে তা' ওঁর মধুর বিনয়। জীবন-খাতার ভূমিকায় উনি  
বলেছেন—

“আমার আত্মকথা পড়ে কার কি উপকার হবে জানি না।  
কোন দিনই ভাবি নাই আমার আত্ম-চরিত্র লিখতে হবে, কোন দিন  
ইচ্ছাও ছিল না বরং আপত্তিই ছিল বরাবর।”

তারপর তিনি ত অপকর্ম্মের লাভালাভের দায়িত্ব দিয়েছেন  
প্রকাশককে যিনি তাঁকে তাড়না দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। প্রায়  
পনেরো বৎসর আগে উনি একটি কবিতা দিয়েছিলেন বাংলার  
কয়েকটি তরুণ তরুণী সাহিত্যিকদের, ওঁরা বাংলার বর্তমান ও বিগত

কবির কবিতার কয়েকটি সংকলন প্রকাশ করতে চেয়েছিল। এই কবিতাটি হয়তো বাংলার যথেষ্ট পাঠকের চোখে এখনও পড়েনি, তাই তা' এখানে সম্পূর্ণ ভুলে দিলাম :—

ছোট কবিতা

আমার কাছে চাইলে তুমি ছোট কবিতা,  
না যদি দিই, কেমন করে ভুলবে ভবি তা'।  
না-ছোড়-বান্দা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছি,  
এই জীবনের চলার পথে নিত্য হেরেছি।  
তোমরা যখন দাবী কর লেখার বিষয়ে  
তখন ভাবি এমন দাবী থাকবে কি সয়ে,  
কাব্যসম্রাট এলেন কবে গোপন-চারিণী,  
কবে আমি কবি হ'লাম বুঝতে পারিনি'।  
তোমরা সবাই য'বে কবি করলে আমাকে,  
বলে অনেক ভাল হতো রামা-আমাকে।  
এখন কগম ধরেছিলাম খোশাল খুশিতে,  
কে জানতো সকল জনে পারব বুঝতে ?  
স্বীকার করুক নাহি করুক স্বজন জ্ঞাতিতে,  
বে কবে' হোক গোছে গেছি খানিক খ্যাতিতে।  
একটা বড় লাভ হয়েছে দেখছি খতিয়ে,  
জ্ঞানবিশারদ প্রসন্ন আজ আমার প্রতি তে।

বাংলার পাইরে থেকেও ঔর 'জীবন-খাতা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা করবার উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গত নভেম্বর মাসে একবার কলকাতা যাই, সেই সময় একদিন ঔর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত বেরিয়ে অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় অর্ধেক রাত্তা থেকে ফিরে আসি। সেদিন সন্ধ্যা কাগজের স্তম্ভ থেকে জানলাম উনি পরলোকে। আর কখনো ঔকে আর আমার দেখা হবে না। এত শীঘ্র যে উনি চলে যাবেন এই কথাটা ভাবতেই পারিনি। আর ভাববই বা কি করে, কী-ই বা এমন ব্যস হইছিল ঔর, মাত্র ছাপ্রান্ন ত'। আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যেন একজন ছেলে-বেলার গুরুস্থানীয় বন্ধু হারালুম। বাংলার অনেক কিশোর-কিশোরীর মতই ছেলেবেলা থেকেই ঔকে ভালবেসেছি। আজও ঔর কথা ভাবলে নিজেকে শুধু সেদিনের আমার ভেতরেই দেখতে পাই, আমার কাছে স্মৃতিস্বল বস্তু এই-ই পরিচয়।

## একে পাঁচ পাঁচে এক

[ হাসি ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেনের রূপকথা ]

এক যে ছিলো মটরশুঁটি।

এক মানে অল্প এক জন নয়, কারণ আসলে তারা ছিলো পাঁচ জন। এক হ'লো গিয়ে খোশাটা, আর পাঁচ হ'লো ভিতরের মটরশুঁটি। খোশাটাও সবুজ, তারাও সবুজ, আর তাই তারা

ভাবতো সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি সবুজ—ভাবটা অসম্ভবও ছিলো না। খোশাটা বাড়লো, বাড়লো তারাও—গোলগোল পাঁচ জন একসাথে পাশাপাশি ব'সে। বাইরে যখন রোদ থাকে, খোশাটা তখন গরম হয়; বৃষ্টি পড়লে খোশাটা পরিষ্কার পাতলা হ'য়ে আসে। রোদ-মাখানো দিনহুপুরেও ভালো, ঘটখুটে শিশুতি রাতেও ভালো; দিনে-দিনে তারা পাঁচ জন বড়ো হয়, আর যতোই বড়ো হয় ততোই তাদের ভাবনা ধরে, কিছু একটা করতে হবে তো, নইলে পৃথিবীতে জন্ম হ'লো কেন ?

'এখানেই চিরকাল ব'সে থাকবো নাকি আমরা ?' সকলের মনের ভাবনা একদিন যুগ ফুটে প্রকাশ করলে এক জন। ব'সে থাকতে থাকতে শব্দ হ'য়ে গেলেই গেছি। বাইরে না জানি কতো কী হ'চ্ছে, একটু-একটু যেন টেবু পাচ্ছি ভিতরে ব'সে।'

মাস কেটে গেলো। হলদে হ'য়ে এলো তারা, হলদে হ'য়ে এলো তাদের পাতলা আবরণ।

'সমস্ত পৃথিবী হলদে হ'য়ে যাচ্ছে', একে অঙ্কে ফিশ-ফিশ ক'রে বললে তারা; আর এমন কথা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভবও ছিলো না।

আচমকা খোশায় পড়লো একটান! কে যেন খোশাটা ছিঁড়ে নিলে, কার হাতের ভিতর দিয়ে যেন চ'লে গেলো, টুপ ক'রে পড়লো গিয়ে একটা জামার পকেটে, সেখানে আরো অনেক খোশার টোলেটি ভিড়।

'এখন আমাদের খুববে'—একথা ভাবতেই খুব ফুটি হ'লো তাদের মনে—এতো দিন তো এরই হুন্স পথ চেয়ে আর কাল গুলে ব'সে ছিলো তারা।

পাঁচ জনের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোটো, সে বললে, 'দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে দূবে যায়।'

যে ছিলো সবচেয়ে বড়ো, সে কেবল বললে, 'যা হবার তাই হবে।'

তার পর আচমকা শব্দ ক'রে ফাটলো খোশা, পাঁচ জনে তারা গড়িয়ে বেরিয়ে এলো বোনের বলমসানিতে, এসে দেখলো ছোট্ট নরম একটি হাতে তারা শুয়ে—ছোট্টো একটি ছেলে তাদের হাতের মুঠোয় ধ'রে আছে।

'বাঃ, কী মজা !' ছেলেটি ব'লে উঠলো। 'এগুলো দিয়ে আমার গুলতির চমৎকার গুলী হবে।' এই কথা ব'লে এক জনকে সে গুলতির ছিলায় উপর রাখলো, তার পর কান পর্যন্ত টেনে দিলে ছুঁড়ে।

'চললুম আমি এই বিরাট পৃথিবীতে উড়ে। তাকো, আমাকে ধরতে পারো কি না !' এই ব'লে সে চ'লে গেলো।

আরেক জন বললে, 'একবারে ঠিক স্থানের বুকের মধ্যে গিয়ে লাগবো। ঠিক আমার মনের মতো জায়গা'—ব'লে সে হাওয়া হ'য়ে গেলো।

'যেখানেই গিয়ে পড়িনে কেন, খুব এক চোট ঘুমিয়ে নেবো প্রথমে, তার পর গড়াবো মনের সুখে,'—বললে এর পরেই হু'জন। গড়ালো বটে তারা, খুব ক'রে গড়িয়ে নিলে ছিলে লাগাবার আগেই, কিন্তু ছেলেটি তাদের ভুলে নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারলে। যেতে-যেতে তারা বললে, 'আমরা বাবো সবচেয়ে দূবে।'

'যা হবার তাই হবে,'—বললে শেষের জন। গুলতি থেকে

বেয়িয়ে সে ছুটলো, ছুটে গিয়ে লাগলো একটা কুঁড়েঘরের জানলার কপাটে।

এদিকে হয়েছে কী, সেই কপাটে ছিলো একটা ফুটো, আর সেই ফুটো নরম কাদা আর ঘাস দিয়ে আটকানো। এতো জোরে ছুটে এসে সে একেবারে আটকে গেলো সেখানটায়—নড়াচড়া একেবারে ‘নট কিঞ্চে’ হ’য়ে গেলো—না পারে নড়তে, না পারে চড়তে। তবু কিন্তু একটুও ঘাবড়ালে না সে, মনে-মনে আবার বললে, ‘বা হবার তা-ই হবে।’

ঘরের ভিতরে থাকে এক কাঠকুড়ুনি। ভয়ানক গরীব। বনে ঘুরে-ঘুরে সে কাঠ কুড়ায়, শুকনো পাতা কুড়ায়; লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজে, কুরো থেকে জল তোলো। শরীরে তার শক্তি অনেক, কাজও সে সারা দিনই করে, কিন্তু তবু তার দুঃখ দূর হয় না। ঘরে তার আপন বলতে আছে কেবল ছোটো, একরকম এক মেয়ে; অল্পশে ভুগে-ভুগে তার একেবারে মরণদশা। পুরো এক বছর সে মড়ার মতো অসাড় বিছানায় শুয়ে আছে—এখন তার এমন অবস্থা যেন সে বাঁচবেও না মরবেও না, কেবলি ভোগাবে মাকে।

কাঠকুড়ুনি মনে-মনে ভাবে,—‘ও বুঝি চললো ওর ছোট বোনটিরই কাছে। হুটি মাত্র মেয়ে ছিলো আমার, তাদের ষাওয়া-নো-পরানো কম কষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই একজনের ব্যবস্থা করলেন, টেনে নিলেন তাঁর কোলে। আরেক জনকে আমি তো চাই আমার কাছেই রাখতে, কিন্তু ওরা দু’বোন বুঝি আর আলাদা থাকবে না।’

কিন্তু, কই, তবু তো মরলো না মেয়ে,—তেনি মরো-মরো হ’য়েই শুয়ে থাকলো বিছানায়, নিজেও ভুগতে থাকলো, মাকেও ভোগালো কেবল।

সমস্ত দিন সে চুপ ক’রে নিঃশ্বাসের মতো বিছানায় শুয়ে থাকে—আর তার মা ঘোরে বাইরে-বাইরে, কাঠ কুড়ায়, পাতা কুড়ায়, জল তোলে, বাসন মাজে। তখন শীত শেষ হ’য়ে বসন্ত এসেছে; ভোরবেলায় তার মা ষণন কাজে বেয়িয়ে যায়, রোদের সোনালি রঙ জানলা দিয়ে চোকো হ’য়ে মেঝেতে এসে পড়ে: মেয়েটি চুপ ক’রে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘জানলার কপাটে ঐ ছোট, সবুজ ওটা কী, মা? ঐ যে, হাওয়ার নড়ছে?’

মা জানলার ধারে এগিয়ে এসে দেখলো। ‘আরে তাই তো! কী অবাক কাণ্ড! ছোটো একটা মটরশুঁটি যে, এখানেই শিকড় গজিয়েছে দেখছি, পাতাও গজিয়েছে দু’একটা। এই ফাটলের মধ্যে কী ক’রে ও এলো? এই তো তোমার ছোটো বাগান, মিঠুয়া ব’সে-ব’সে তাকিয়ে থাকো।’ ব’লে মা মিঠুয়ার বিছানা জানলার আরো কাছে টেনে আনলো। মা কাজে বেয়িয়ে যায় তার পর, আর মিঠুয়া শুয়ে শুয়ে থাকে, মটরশুঁটিটা কেমন স্বন্দর বেড়ে উঠছে আস্তে-আস্তে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মিঠুয়া বললে, ‘মা-মণি, আমার কেবলি মনে হ’চ্ছে আমি ভালো হ’য়ে উঠবো। আজকের রোদটা বড়ো স্বন্দর লাগলো। আর, দেখেছো ঐ মটরশুঁটির কাণ্ড—কী চমৎকার বাড়ছে। আমিও অমনি হবো, মা, আমিও সেরে উঠে বাইরে বেড়াবো এই সোনালি রোদ্দুরে।’

‘তা-ই যেন হয়, মিঠু, তা-ই যেন হয়।’

মুখে মা ও-কথা বললো বটে, কিন্তু মনে-মনে সে জানে যে তার মিঠুমণি আর বাঁচবে না। তবু সে কপাটের সঙ্গে একটা কাঠি বেঁধে দিলে; বাড়ন্ত মটরশুঁটি লতানো সবুজ ডগা কাঠিটুকু বেয়ে উঠতে পারবে। ও যেন হাওয়ার দাপটে ছিঁড়ে না পড়ে—ওকে দেখেই তো মিঠুমণি বাঁচবার কথা ভাবতে শিখেছে।

কী আশ্চর্য! মটরশুঁটির সেই ছোটো সবুজ লতা সত্যি-সত্যি কাঠি বেয়ে উঠলো, উঠলো উপরে, বাড়লো আস্তে-আস্তে, বাড়লো নতুন শ্রাণের আনন্দে; রোজই সে একটু-একটু ক’রে বাড়ছে।

‘আরে, ফুলও যে ফুটেছে একটা!’ কাঠকুড়ুনি হঠাৎ একদিন বলে উঠলো। তখন থেকে তার মনে আশা হ’লো, মিঠুয়া হয়তো সত্যি-সত্যি ভালো হ’য়ে উঠবে। ক’দিন থেকে মিঠুয়া বেশ ভালোই আছে তো! দিব্বি কথাবার্তা বলে, আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি। কাল একবার উঠেও বসেছিলো, ব’সে-ব’সে তার ছোটো বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, সে বাগানে একটিমাত্র ছোটো চারা গাছ, এই সবুজ মটরশুঁটি লতা।

কয়েক দিন পরেই মিঠুয়া দম্প্রমতো এক ঘণ্টা উঠে ব’সে রইলো। বড়ো ভালো লাগলো তার রোদে পিঠ দিয়ে ব’সে থাকতে। জানলার ফুটেছে মটরশুঁটির ফিকে-বেগুনি ফুল।

মিঠুয়া মুখ বাড়িয়ে কচিকচি নরম পাতাগুলোকে চুষে খেলো। দিনটা তার মনে হলো যেন উৎসবের রঙে ছোঁপানো।

মা আর খুশি চাপতে না পেয়ে ব’লে উঠলো, ‘স্বর্গের দেবতাই এই মটরশুঁটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে, তিনিই ফুটিয়েছেন এই ফুল, যাতে তুই খুশি হোস, আর তোর খুশিতে যাতে আমিও খুশি হই—ব’লে সে হাসলো বেগুনি ফুলের দিয়ে তাকিয়ে, যেন সে-ফুল স্বর্গের ঠানো দেবদূত।

‘কিন্তু আর চার জন? তাদের খবর কী?—তবে শোনো। যে বিপুল পৃথিবীতে উড়ে চলে গিয়ে বলেছিলো, ‘তাপো আমাকে ধরতে পারো কিনা!’ সে গিয়ে পড়লো এক বাড়ির ছাতে, সেখানে পায়দাদের দানা শুকোতে দেওয়া হয়েছিলো, পড়বি তো পড় তারই মধ্যে। তার পর আর কি—পায়দার পেটে। যে দু’জন কুড়েমি ক’রে ঘূমোতে চেয়েছিলো, তাদের কবুতরেই খেয়ে ফেললো—তবু তো বা-হোক একটা কাজে লাগলো। কিন্তু তার পরের জন, যে চেয়েছিলো সূর্যের বুক গিয়ে লাগতে, -সে পড়লো গিয়ে এক নোংরা নরদমায়। অনেক দিন সে শুয়ে রইলো সেই নোংরা জলে, আর কেবলি ফুলতে থাকলো। আর, মনে মনে বললো, ‘কী স্বন্দর মোটা হচ্ছি আমি। শেষটার একদিন ফেটেই যাবো—কিন্তু মটরশুঁটির পক্ষে তো ফেটে বাওয়াটাই সবচেয়ে গৌরবের। পাঁচ জনের মধ্যে আমিই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ।’ শুনে নরদমা বললে, ‘ঠিক কথা।’

এদিকে কুঁড়ে ঘরের জানলার তখন মিঠুয়া ঝাঁড়িয়ে, চোখে তার অপরাপ আলো, গালে স্বাস্থ্যের উপচে-পড়া লালিমা। পাতলা দু হাত দিয়ে মটরশুঁটির ফুলকে আদর করছে সে; আর বলছে, ‘দেবতার অনেক দয়া যে, তুই ফুটেছিলি।’

‘শ্রেষ্ঠ মটরশুঁটি, তুমি যে আমারই!’ নরদমা বললে।

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## আমাদের ৬৫০০ লোকের প্রচেষ্টা...



## শুধু আপনাদেরই জন্যে

হিন্দুস্থান লিভারি আদর্শ যে ৬৫০০ লোকি কাজ করছি তাদের প্রত্যেকের সামনেই একটি আদর্শ রয়েছে। একথা ঠিকই যে আমরা সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, বনস্পতি ইত্যাদি তৈরি করি, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। আমরা সদাসর্বদা সচেতন যেন এই সমস্ত জিনিষের গুণাগুণের কোন তারতম্য কখনও না ঘটে—আমরা যেন ভারতবর্ষের অসংখ্য পরিবারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি। আমরা চাই আপনারা আমাদের জানুন, বিশ্বাস করুন এবং আমাদের তৈরি জিনিষপত্র ব্যবহার করুন। এই আমাদের আদর্শ।

প্রায় আশি বছর ধরে আমরা আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে এসেছি। উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা করেছি নিত্য নতুন প্রচেষ্টা। আমাদের মার্কেট রিসার্চ বিভাগের কাজই হোল, আপনার পছন্দ অপছন্দ, মতামত ও বিশ্বাস আপনার দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস চাহিদা ইত্যাদির সঙ্গে যোগ রাখা এবং এই জগতের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে আমাদের উৎপাদন বিভাগ

অগ্রসর হয়। আমাদের কোম্পানি কন্ট্রোল বিভাগ আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষের ওপর (কাঁচা মাল অবস্থা থেকে তৈরি হওয়া পর্যন্ত) কঠিন পরীক্ষা চালান এবং নিঃসন্দেহ হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিষ বাজারে ছাড়া হয় না। আমাদের ডালডা এ্যান্ডভাইসারি সার্ভিস এবং ওয়াশিং ইনফরমেশন সার্ভিস এই জিনিষগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আপনাকে মূল্যবান উপদেশ দেন।

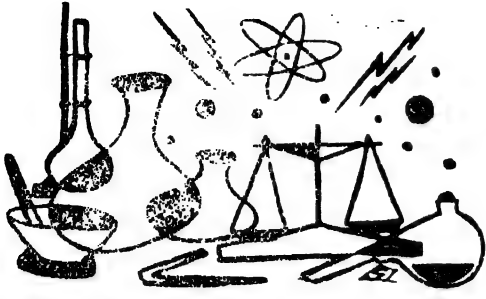
এই জিনিষগুলি কি? সানলাইট সাবান...লাইফবর...লাস...রেক্সোনা...গিবস্ এস, আর, টুথপেস্ট...ডালডা বনস্পতি সবই আপনার জানাশুনা নাম—আপনার দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সঙ্গী। আপনার প্রত্যেকদিন ঘর গেরস্থানীর কাজে আমাদের জিনিষগুলিই বেছে নিয়েছেন এ আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি যে বিশ্বাস আমরা অর্জন করেছি সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের এবং তা আমরা করতে পারি একমাত্র আপনাদের প্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়ে—আপনাদের অর্থাৎ ক্ষেত্রদের স্বার্থরক্ষা করে।

দশের সেবার



হিন্দুস্থান লিভার

# বিজ্ঞানবার্তা



## পক্ষধর মিশ্র

নটিলাস একাদিক্রমে প্রায় ৬৬ দিন ভ্রমণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নৌবিজ্ঞানের পরমাণু-শক্তি চালিত সাবমেরিন নটিলাসের কথা পাঠকদের কাছে আমি আগেই পরিবেশন করেছি সে এবার ৬৬ দিন একাদিক্রমে সমুদ্রতলে বিচরণ করে জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষের দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করলো। এর আগে মানুষের সৃষ্ট কোন যন্ত্রনাই একাদিক্রমে ৬৬ দিন চলবার ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারে নি। নটিলাসের সাফল্য, আগামী ভবিষ্যতে পরমাণুশক্তি চালিত যন্ত্রন-সমূহের অসাধারণ উন্নতির এক মহা সম্ভাবনাপূর্ণ উদাহরণ স্থাপন করলো।

গভীর সমুদ্রে জলের চাপ এবং অজ্ঞাত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে একাদিক্রমে প্রায় ১৬০০ ঘণ্টা অবস্থান করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। ইউরেনিয়াম জ্বালানী ভর্তি করা হয়েছিল মাত্র একবার, এবং এই ১৬০০ ঘণ্টার দীর্ঘ জ্বালানীর খুব সামান্য অংশই খরচ হয়েছিল। ১৬০০ ঘণ্টা চলবার জন্য ইউরেনিয়াম জ্বালানীর পরিবর্তে তেল ব্যবহার করা হলে এ সাবমেরিনটিতে লাগতো ১৬ লক্ষ গ্যালন তেল—যা বেল-লাইনের উপর দিয়ে বহন করতে প্রায় ১ মাইল লম্বা স্থান ছুড়ে তৈলবাধী ট্যাঙ্ক সাজাতে হতো! নটিলাস কিন্তু তার ভ্রমণে খুব কম পরিমাণ জ্বালানী খরচ করেছে, এখনও মজুদ জ্বালানীর সাহায্যে আরও বহু হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করতে পারে। যাত্রা তার শুরু হয়েছিল নিউ লন্ডনের সাবমেরিন ঘাঁটি থেকে, তারপর কেপ হর্ন, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তলভাগকে পরিভ্রমণ করে নিউ লন্ডনেই ফিরে এসে আবার ব্যাপকভাবে সে উত্তরমেরু পরিভ্রমণে যাত্রা করে। নটিলাসের পরমাণু-শক্তি-চালিত ইঞ্জিনটি ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের বিজ্ঞানবুদ্ধ পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছিলেন। সমুদ্রতলেও তাঁরা এর কার্যকলাপের উপর নজর রেখে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্থল-কসঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ছোট ছোট শিল্প ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগারে সাধারণ কাজকর্মের জন্য ‘অ্যাটমিকস ইন্টারন্যাশনাল’ এক ধরনের ছোট ছোট স্বল্পমূল্যের ‘রি-অ্যাক্টার’ নির্মাণ করেছেন। ‘পরীক্ষাগারের রি-অ্যাক্টার’ নামক এই সরঞ্জামটি মাত্র ৮ ফুট লম্বা এবং এর ব্যাসও ৮ ফুট। অতিরিক্ত কোন সংযোজন না করেও এটি যে কোন স্থলবাড়ী অথবা পরীক্ষাগারে স্থাপন করা চলে। সম্পূর্ণ নির্মাণ করে কার্যকরী অবস্থায় একে বসিয়ে দিতে খরচ পড়ে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা এবং সময় লাগে ৬ মাস।

নির্মাণকর্তারা আশা করেন, এই রি-অ্যাক্টারের সহায়তায় ছোট ছোট পরীক্ষাগারে শিল্পবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত নানাপ্রকার পরীক্ষা সহজে করা যাবে। এই সরল রি-অ্যাক্টারটি সাধারণ মানুষেরও পরমাণু শক্তি বিষয়ক নানা প্রশ্নের কোতুল মতো সাহায্য করবে। পাঠকেরা হয়তো স্থুলের জন্য এই অ্যাটমিক রি-অ্যাক্টারের ব্যবহারের কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। খুবই স্বাভাবিক, আমাদের দেশে স্থুলের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে অ্যাটমিক রি-অ্যাক্টার ক্রয় করার চিন্তা অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু অনেক সম্পদশালী এবং ক্ষমতাশালী দেশের কর্তৃপক্ষই পরমাণু শক্তির যুগে প্রতিটি মানুষকে এই শক্তির রহস্যের সঙ্গে হাতে-কলমে পরীক্ষানলক ভাবে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। স্মরণ্য মনে হয়, বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে এবং পরীক্ষাগারে এই সহজগতীয় অ্যাটমিক রি-অ্যাক্টারটি যথেষ্ট সমাদর পাবে।

রি-অ্যাক্টারটির অন্তর্দেশে তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিদ্যুৎবলের জন্য একটি গোলাকার ইম্পাতের আধারে প্রায় ৪ গ্যালন জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিশোধিত ইউরানিয়াম সালফেট রাখা থাকে। মরিচাবহীন ইম্পাতের এই গোলাকার আধারটি প্রায় ৬ ইঞ্চি মোটা সীসার পাত দিয়ে আবৃত করে জলে ভরা একটা আট ফুট চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই আট ফুট চৌবাচ্চাটাই মোটামুটি বাইরের আবরণ, তাই স্থান খুবই কম লাগে। রি-অ্যাক্টারটি মাত্র একজন লোকের পক্ষেই চালান সম্ভব। অ্যাটমিক ইন্টারন্যাশনালের যন্ত্রবিভাগের বিক্রয়-অধিকর্তা ডাঃ মাটিনের মতে, এই ছোট রি-অ্যাক্টারটির আবিষ্কার শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

\* \* \* \*

আপনারা বর্ধকালে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য বেণ কোট ব্যবহার করেন। সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার ফোর্ট বেলওয়ের সৈন্য বিভাগের যন্ত্রবিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে এক বকম নতুন ধরনের রসায়ন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে বেণ কোট এবং বৃষ্টিনিরোধ বস্ত্রাদির জীবনী শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, এই রসায়ন দ্রব্য তাদের জীব, বাতির বস্তা, বর্ধতি, ইত্যাদি নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে বৃষ্টি, উত্তাপ এবং আর্দ্রতা থেকে বহুকাল রক্ষা করবে। গবেষণাগারে দেখা গিয়েছে, বাতির বস্তা সাধারণ ভাবে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং আর্দ্র স্থানে ব্যবহার করলে মাত্র তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই পচে ছিঁড়ে যায়, ছত্রক নিবারক কোন রসায়ন দ্রব্য ব্যবহার করলে প্রায় ১ বছর এগুলি নষ্ট হয় না কিন্তু জলনিরোধ নবাবিকৃত এই রসায়ন দ্রব্য এদের জীবনী শক্তি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই বস্ত্রটি ব্যবহার করার আরেকটি সুবিধা আছে, ছত্রক নিবারক রসায়ন দ্রব্যাদির পরিমাণ অনেক কম দিলেও কাজ চলে যায়, ফলে খরচ অনেক কম পড়ে। খরচের কথাই কেবল মাত্র চিন্তা করলে চলবে কেন, ছত্রক নিবারক রসায়ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে আমাদের মৌলিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। আমরা অত্যন্ত মূল্যবান মৌলিক পদার্থ, কোন দিন আমাদের সরবরাহ কম হওয়ার জন্য জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে এর ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ঘটতে পারে, তাই এর ব্যয় যতো কম হয় ততই মঙ্গল। যাই হোক, গত মহাযুদ্ধে এবং কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্য বাহিনীতে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার বাতির বস্তা ব্যবহৃত হয়েছে। স্মরণ্য নবাবিকৃত রাসায়নিক



দ্রব্যটির সাহায্যে কেবলমাত্র বালির বস্তার জীবনকাল কয়েক গুণ বাড়িয়েই সৈন্যবাহিনী কতো টাকার সাশ্রয় ঘটাবে পারবে, তা অনুমান করে দেখুন! এর পর তাঁর ইত্যাদি অসংখ্য দ্রব্য তো আছেই।

\* \* \*

জলের তলায় অবতরণ করার নৌবিভাগীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন একজন ইংরাজ ডুবুরী। এর নাম মিঃ জি, ও, উকে, ইনি উদ্ধারকারী ব্রিটিশ জাহাজ 'রিক্সেম' থেকে নরওয়ের সমুদ্রের একটি খাড়ির মধ্যে ১০৬০ ফুট অবতরণ করে এই রেকর্ড স্থাপন করেছেন। জলের তলাকার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সাধারণতঃ যে সব পর্যবেক্ষণ কক্ষ ব্যবহার করা হয় তারই সাহায্যে মিঃ উকে সমুদ্র-তলদেশে ১০৬০ ফুট অবতরণ করেছিলেন। আরও সাত জন ডুবুরী এই একই ভাবে প্রায় ১৬৫ ফুট তলায় পৌঁছান।

রিক্সেম জাহাজ থেকে প্রচারিত সংবাদ মারফৎ জানা গিয়েছে, এই অবতরণের সময় পর্যবেক্ষণ কক্ষের তলদেশের এবং মধ্যের ভূটি আলো ডুবুরীকে পথ দেখাতে সাহায্য করেছিল। মিঃ উকের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, অবতরণের সময় কক্ষমধ্যে তিনি কোন অসুবিধাই অনুভব করেননি। সিলিগুড়ের সাহায্যে অস্ত্রাঙ্কন সরবরাহও ঠিক থাকার নিঃশাস-প্রশ্বাসেরও কোন অসুবিধা হয় নি। সমুদ্রের তলদেশে বড় বড় পাথর ছাড়ঃ আর কিছুই ছিল না, এমন কি কোন মাছের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় নি। মিঃ উকে জলমধ্যে ১০৬০ ফুট তলায় প্রায় ১ ঘণ্টা অবস্থান করেছিলেন। জলের গভীরের আলোক-ওজ্জ্বল্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

### রোনাল্ড রস

ম্যালেরিয়ার জীবাণু কি ভাবে দেহমধ্যে প্রবেশ করে তার আবিষ্কার এবং এই রোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করার কৃশপ্রদ গবেষণার জন্য শ্রাব রোনাল্ড রস চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ১১০২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ম্যালেরিয়া রোগের কারণাকারণের গবেষণা ভারতবর্ষে পরিচালিত হয়েছিল, এবং শ্রাব রোনাল্ডের রক্তের মধ্যেও প্রবাহিত হতো ভারতীয় রক্তের একটি ক্ষণধারা। তাই এই বিরাট কৃতিত্বের অংশ ভারতবর্ষ দাবী করতে পারে।

ঠিক একশ' বছর আগে ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে রোনাল্ড রস কুমায়ুন পাহাড়ে আলমোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল,—নাম জেনারেল সার কেম্পবেল রস। তাঁর বাবা স্বচ—মা ইংরেজ। শোনা যায়, তাঁরা তিন পুরুষে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান,—কোন সময় ভারতীয় রক্ত বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে তাঁদের পরিবারে প্রবেশ করেছিল। বাল্যশিক্ষার জন্য রসকে লণ্ডনে পাঠান হয় এবং পরে তিনি সেন্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৪ সালে এম. আর. সি. এস ডিপ্লোমা লাভ করে তিনি কিছুদিন লণ্ডন ও নিউইয়র্কের মধ্যে এক জাহাজে চিকিৎসকের কাজ করেন এবং পরে ম্যাজাক মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করে বন্দী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের পরীক্ষার সপ্তদশ স্থান অধিকার করে রোনাল্ড রস এর

মিলিটারী বিভাগে চাকরী পান এবং কিছুদিন পরে ছুটি নিয়ে লণ্ডনে গিয়ে বিবাহ করেন। এই সময়েই তিনি লণ্ডনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রেন-এর নিকট জীবাণুবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষালাভ করেন এবং ভারতে ফিরেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে ম্যালেরিয়া রোগের উপর। ১৮৮০ সালে রোগীর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট অথবা পরজীবী বীজাণু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এই বীজাণু কি ভাবে রোগীর দেহের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় সে বিষয়ে কোন কিছুই তখন পর্যাপ্ত জানা যায় নি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাটিট ম্যানসনই রসের মাথায় চুকিয়ে দিয়েছিলেন, মশার কামড়ে হয়তো ম্যালেরিয়া হতে পারে। রস ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাই মশা নিয়ে পড়লেন। মশা যদি রোগ ছড়িয়ে বেড়ায় তাহলে মশার মধ্যেও নিশ্চয়ই রোগের প্যারাসাইট পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষে নানা প্রকার মশা ধরে তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন। মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড় দিত আর তিনি সফ্র ছুঁঁ দিয়ে সেই মশার পাকস্থলী বার করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করতেন। যাই হোক, এত ভাবে নানা প্রকার মশার উপর পরীক্ষা চালিয়ে ১৮৯৭ সালের ২০শে আগষ্ট রোনাল্ড রস সেকেন্ডাবাদের হাসপাতালে এনোফিলিস মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট আবিষ্কার করলেন। এর পর এত গবেষণা তিনি সম্পূর্ণ করেন কলকাতায়। সৈন্যবিভাগের চিকিৎসকের চাকরী, বার বার বদলীর জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ রসকে ভোগ করতে হয়েছে,—গবেষণায় যাচ্ছে যথেষ্ট বিষ কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত না হয়ে অদম্য উৎসাহে তাঁর পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে গেছেন। ম্যানসন এ বিষয়ে রসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন,—তাঁরই হস্তক্ষেপে বিলাতের কর্তারা সম্মত হন এবং রস কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতার একটি গবেষণাগারে গবেষণা করার সুযোগ পান।

এর পর রসকে পাঠান হয় আসামে কালাজের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। ১৮৯১ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ কর রস লিভারপুলের স্থলে ট্রপিকাল মেডিসিনের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে লিভারপুল পরিত্যাগ করে তিনি কিংস কলেজ হাসপাতালের নিরক্ষীয় অঞ্চলের রোগের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সরকারের পরামর্শমতো ছিলেন এবং ১৯১৮ সাল থেকে লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। রসকে সম্মানিত করবার জন্য ১৯২১ সালে রস ইনষ্টিটিউট এ্যাণ্ড হাসপিটাল ট্রপিকাল ডিসিস পুটনেতে স্থাপন করা হয় এবং ঐ স্থানেই ১৯৩২ সালে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে সার রোনাল্ড রস পরলোক গমন করেন।

রোনাল্ড রস ১৯০২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯১১ সালে তাঁকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়ার কারণ এবং এর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের উপায় নির্ধারণ করেই সন্তুষ্ট হন নি; ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে প্রচারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি এক জন সুসেখকও ছিলেন, আত্মজীবনী এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়াও তিনি কাবিতা ও কাল্পনিক রচনার কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন।

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

সারদা দেবীর উপদেশ ছিল কেউ যেন হজুক পড়ে কিছু না

করে। কেন না, ভজুক খেমে গেলে সবই খেমে যায়।

যে যা চালাতে পারবে তার সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত। জপের সময়ের কোন বিধি-নিষেধ নাই বটে, কিন্তু সকাল-সন্ধ্যাট জপের প্রকৃষ্ট সময়। সব সময়ে আর জপ-ধ্যান ক'টা লোকে করতে পারে? কাজেই ধ্যান-জপ শুরু করলেই যে কাজকর্ম ছাড়তে হবে, তা নয়। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজে লেগে থাকা ভাল। মনের স্বভাবই হচ্ছে যে, তাকে আলগা রাখলে পাগলা হয়, ও যত রকম গোল বাধায়। এই জন্মই তো নরেন নিকাম কর্মের পত্তন করেছিল। নিকাম কর্মে মন পবিত্র হয়।

জপ-ধ্যানে একটা নিয়মিত অভ্যাসের প্রতি মা খুব জোর দিতেন। তিনি বলতেন, নিয়মিত অভ্যাস, সময়ের স্থিরতা, ও নিষ্ঠা ছাড়া কিছুতে উন্নতি করা যায় না। কাজেই জপ-ধ্যানেও নিয়মানুবর্তিতা আবশ্যক, প্রথম প্রথম একটু মুশ্কিল হতে পারে কিন্তু একটা অভ্যাস গড়ে উঠলে সবই সহজ হয়। একদিনও যেন বাদ না পড়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। বাদ দেওয়া ভাল নয়। তাতে একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে বাধা পায়। সারদা দেবীর এসব উপদেশ যে শুধু ভক্তদের জন্য ছিল, তা নয়। তিনি নিজের জীবনেও পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ম ও শৃঙ্খলার বশবর্তী ছিলেন।

সাধক-জীবনে আগ্রহকে তিনি প্রাধান্য দিতেন বেশী। বলতেন, আগ্রহ না থাকলে যেমন কিছুই হতে চায় না। তেমনি আগ্রহের জোর থাকলে শত বাধাবিঘ্নও পথ আটকাতে পারে না। একটা উপায় হয়েই যায়। এই জন্মেই তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ বা ইচ্ছা দেখলে স্রলোকের অন্তর্নিহিত কালকে পর্যাপ্ত বাধা বলে মনে করতেন না।

সারদা দেবীর জীবনে আগ্রহের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি বলতেন, মনে

বিধা না থাকলে তুচ্ছ-অতুচ্ছ কিছু করে না। শরীরের কোন অংশ তুচ্ছ, আর কোন অংশই বা অতুচ্ছ?

সাধনপথে যদি ভক্তের তেমন আকর্ষণ হত, তবে লৌকিক আচার-বিচারকে তিনি কখনোই রাখা বলে মনে করতেন না। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে সাধন-ভজন সম্বন্ধে এক একজনের প্রতি তাঁর এক এক উপদেশ ছিল। কাককে তিনি বেশী জপ-তপ করতে একেবারেই নিষেধ করতেন। বলতেন, “১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করো, আর খুব আনন্দে খেঁকো। বাকী যা করবার তা আমিই করে দেবো।” কাককে বলতেন, বেশী করে পূজা-আর্চা করতে। আর কাককে বলতেন, খুব বেশী করে জপ করতে আর কাককে করতে বলতেন শ্যান।

কোন ভক্ত তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য চাইতে এসে ব্যবস্থা পেতো বিয়ে করে সংসারী হবার। আবার কখনো বা বিবাহেচ্ছু ভক্তকে তিনি নিরস্ত করে বলতেন, “সংসারপথ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই তোমার প্রয়োজন। সংসারে তোমার কল্যাণ হবে না।” কাজেই সে পেতো ব্রহ্মচর্য। তর্ক দিয়ে তাঁকে ধামিয়ে দেওয়ার বড় একটা উপায় থাকতো না। কোন একটা যুক্তি নিয়েই তিনি ভক্তদের কল্যাণ-পথে চালনা করতেন। কাজেই অপরের কুট যুক্তি-তর্ক তাঁর কাছে পরাজয় মানতো। মূলতঃকে যেন কেউ না ভোলে, ভাবপ্রবণতায় কেউ না ঝোঁকে, এ বিষয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ভক্তদের অনেকেই বাহু অস্থান নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসতো কিন্তু সারদা দেবী তার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না।

ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, মা তাঁর সম্ভানদের পেটের সম্বলিত্তি বুঝেই খেতে দেন। কাককে ঝাল, কাককে ঝোল, কাককে অম্বল আবার ঝোল দেন খেতে। সারদা মায়ের ব্যবস্থাও তাঁর সম্ভানদের প্রতি ঠিক তাই ছিল। তাঁর উপদেশ বিভিন্ন ভক্তের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের হ'ত বলে তাদের কাছে পরস্পর-বিরোধী মনে হত বটে, কিন্তু মা যে আধার বিবেচনা করে উপদেশ দিতেন, তা তারা বুঝতো না বলেই তা তাদের মনে আসতো। তাঁর কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর উপদেশ থাকতো—সকলের যেন ধর্মপথে মতি থাকে, ভগবানে শ্রবণ-মনন থাকে। ভগবানকে পেতে হ'লে তাঁকে আকুল হয়ে ডাকা চাই। যে ভক্তরা প্রকৃত অধিকারী নয়, তাদের তিনি মাত্র ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করার বিধি দিতেন। বলতেন, “বেশ নিষ্ঠা করে ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করো আর খেয়ে দেয়ে আনন্দে খেঁকো, যা করবার আমিই করবো।”

নিরুৎসাহবাহী তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি কি করে বলবেন, তোমরা বললেও করতে পারবে না? কাজেই সত্য সত্যি তিনি নিজে তাদের জন্য জপ করতেন। তিনি জানতেন, ক্রমে ঐ ১০৮ বার বেলেই রুচি এসে তাদের অন্তরে ভক্তিরস জেগে উঠতে পারে। তারা প্রকৃত সাধনের অধিকারী হ'তেও পারে।

সারদা দেবী অনাসক্ত কোমলস্বভাবা পরহুঃখকাতরা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কোমলতা মধুরতার আশ্রয়ে কাকের সাধনের অঙ্গহানি হতে পারতো না। ভক্তরা জানতেন, মা তাদের জন্য জপ করেন। তারা তাই তাঁকে প্রেম করতো ‘মা—তুমিই যদি আমাদের জন্য জপ কর, আমাদের আর কি দরকার?’ তিনি বলতেন, ‘মাত্র ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপবে, তাও যদি না পার, তবে তোমাদেরই বাবে।’

জপের মূল্য তিনি খুবই দিতেন। কিন্তু হজুক পড়ে প্রথম

প্রথম খুব বেশী করে স্নান করে, পরে যাতে না ছেড়ে-ছুড়ে দেয়, তাই তিনি প্রথম দিকে কাককেই বেশী করে জপ করার বিধি দিতেন না। নিজে তিনি লক্ষ অবধি জপ করতেন। পনেরো-কুড়ি হাজার জপ না করলে, যে কিছু হয় না। আনন্দ বা শান্তি টের পাওয়া যায় না, এ তিনি অনেক ভক্তকেই বলতেন। মৌখিক জপের কোন ফল নেই, অন্তর দিয়ে মন-প্রাণ টেলে জপ দিয়ে ভগবানকে আহ্বান জানাতে হয়, তবেই মনের ময়লা কাটে, আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়। কালে প্রেম ভক্তি সব আসে। একথাই তিনি সবাইকে বোঝাতেন।

সারদা দেবীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা যে কতটা হয়েছিল, তা বোঝা যেতো যখন ঠাকুরের পণ্ডিত-ভক্তদের ভটল অধ্যাত্ম প্রেমের তিনি মীমাংসাস্বচক জবাব দিতেন। বিদূষী ইংরেজ মহিলা নিবেদিতা বলতেন ‘মায়ের নিকট যত কঠিন প্রশ্নই উপাধিত করা হউক না কেন, তাঁহাকে কখনই ভীত হইতে বা ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই।’

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ এ-বিষয়ে বলেন, ‘আমি যখন ছোট ছিলাম, মাকে বড়ই ভালবাসতুম, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতুম। চোমরা চোমরা পণ্ডিতেরা যখন এসে মাকে কি সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে থাকতেন আমার বুকের ভিতর টিপ টিপ করতো। আর আমার খুব রাগও হতে থাকতো। কেন রে বাপু! স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দজী

এঁরা সব বড় বড় পণ্ডিত থাকতে এত সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন মা বেচারীকে কেন?’

দেখতুম, মা কিন্তু বেশ নির্ভীক ভাবেই তাদের যেন কি সব জবাব দিয়ে দিতেন; আর প্রশ্নকর্তাদের মুখ বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠতো। বুঝতে পারতুম, তাঁরা তাঁদের মনের মত জবাব পেয়ে বেশ খুসী হয়েছেন। তখন আমার বুকের খড়কড়ানী যেন কমতো, আর আমি হাঁক ছেড়ে বাঁচতুম। মার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও দশগুণ বেড়ে যেতো, আনন্দে গর্কে বুকেটা যেন ফুলে উঠতো।

ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারে সারদা দেবীর অন্তরদর্শিতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেতো। যার ফলে ভক্তরা তাঁকে ভবিষ্যৎদষ্টা হিসেবে গুজো করতো। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাই তাঁকে অনেক ভক্তের হৃদয়ে দেবীর আসন দিয়েছিল। একবার একটি ভক্ত সারদা দেবীকে দর্শন-অস্ত্রে কাঠফাটা রোদের মধ্যে হুপুরবেলা বাড়ী যেতে চাইলে তিনি তাকে হুপুরটা বিশ্রাম করে বিকেলে যেতে বলেন। হুপুরে গেলে কোন কষ্ট হবে না বলে সেই ভক্তটি যাবার জন্য গীড়াগীড়ি করে। মা তাকে বললেন, ‘মানা করছি বাছা, যেও না। বুড়ি আসবে আর ভিজে যাবে।’ প্রথর সূর্য্যকিরণের দিকে আসল দেখিয়ে ভক্তটি হাসতে হাসতে চলে গেল। অর্থাৎ ‘মা তুমি আমার ভূলাছ এত রোদ্দুরে কখনো বুড়ি আসে?’

## মনের কথা

‘এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?’

‘আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলাস’ দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কুচিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।’

# মুখার্জী জুয়েলাস

দিনি সোনার গহনা নির্মাতা ও রত্ন-কারুজি  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



কিছু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ এমন মেঘ করে বৃষ্টি এল যে ভক্তটি ভিজতে ভিজতে নৌড়িয়ে এক চণ্ডাল-বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। তখন সে ইচ্ছাময়ীর লীলা বুঝতে পেরে তাঁর স্নেহ-উপবোধ অগ্রাহ্য করে চাঁকাবিতা কবার জন্ত অমৃতপ্ত হল।

একবার এক ভক্তকে মা কবজপ পদ্ধতি শিখাতে চান। সময়ের অত্যন্ত স্বল্পতা অথচ সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বললো, 'মা, তবে কি এবার আমার আর কবজপ শেখা হবে না?' মা বললেন, 'তা কেন? তুমি বরাবর সুরেনের কাছে শিখে নিও।' সে বললো, 'মা, সুরেন থাকে বাঁচিতে আর আমি যাচ্ছি চটগ্রামে। তার সঙ্গে দেখাই বা কি করে হবে? আমার এবার আর কবজপ শেখা হল না।'

মা বললেন 'হ'বে হ'বে হ'বে। হয়ে যাবে।' মার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিলেও ভক্তটি নিরাশ হয়েই ফেরেছিল, তার বুরি আর শেখা হলই না। কিন্তু আশ্চর্য্য ভাবে চটগ্রামের পথে স্ত্রীমারই সুরেনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল এবং সুরেন তাকে যত্ন করে কবজপ শিখিয়ে দিল।

এক ভক্ত মার কাছে দীক্ষা নিতে এল। মা তাকে দীক্ষা দেবার পর সে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্বৃত্ত হল মা এই বলে নিরস্ত করলেন যে তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে দক্ষিণা নেন না। ভক্তটি বাবে বাবে তাঁকে বোঝালো, 'মা আমি তো সন্ন্যাসী নই, গৃহী। আমার কাছ থেকে দক্ষিণা নিতে তোমার আপত্তি কেন?' কিন্তু সারদা দেবীর এই একই কথা 'বলেছি তো। সন্ন্যাসীর দক্ষিণা নিতে নেই।' ভক্তের বিষয় ঘুচলো না। মা কেন বাবে বাবে এই কথা বলছেন? কিছুদিন পর কিন্তু দেখা গেল সে সন্ন্যাস নিয়েছে।

অনেক সময় সারদা দেবী ভক্তদের মনের কথা টের পেয়ে তাদের অভিলাষ পূর্ণ করতেন। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মায়ের ভক্তরা সুযোগ সুবিধা পেলেই মায়ের সেবা করে। তাই দেখে একটি ভক্তের মনে হুঁপে হল 'আমার জীবনে কিছুই করা হ'ল না। কত ভক্তরা মায়ের সেবা করে ধন্ত হয়, আমার অদৃষ্টে তাও ঘটলো না।' মার সম্মুখে ঝাঁড়িয়েই সে এই কথা ভাবছিল। এমন সময় মা তাকে আদেশ করলেন, 'বাবা এসেছ যখন ভাঁড়ার থেকে ঐ ভারী আটার হাড়ীটা বের করে আন তো?' তার পর সেই হাড়ী থেকে আন্দাজ করে আটা বের করে দিয়ে তাতে পরিমাণ মত জল দিয়ে বললেন, 'এবার বেশ করে এটা একটু মেশে দাও তো?'

এর পর দক্ষ্যার সময় ভক্তটি যখন আবার মার দর্শন নিতে এ'ল, তিনি তাকে বললেন, 'পা'টা বড় কনকন করছে, একটু টিপে দাও তো বাবা।' ভক্তটি সারা দিনে মাকে সাহায্য ও সেবার এরকম অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে যেন নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলো, আর তার স্পষ্টই মনে হ'ল মা সাক্ষাৎ অন্তর্ধ্যামী। তার অন্তরের হুঁপে জানতে পেরেই এভাবে কৃপা করেছেন।

একবার কয়েকটি ভক্ত মার দর্শন নিতে এসে ব্যক্তি হওয়াতে মার আশ্রমেই বাজিতে থাকা স্থির করলো। তারা আশ্রমের সদর ঘরের বারান্দায় বাজিবেলা শুয়েছিল। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙতে তাদের একজনের মনে হ'ল 'আহা এই নিশা-উষার সন্ধিক্ষণে মা যদি এসে একবার দর্শন দিতেন!' অপর একজন বলে উঠলো মা তো থাকেন অন্যত্র মহলে, তা আর কি করে সম্ভব হতে পারে?' ভক্তটি মনের

আবেগে গান গেয়ে উঠলো 'ওঠ গো কঙ্কণাময়ি, খোল গো কুটারদ্বার!'

গানটি শেষ না হতেই দেখা গেল বাইরের দরজাটি খুলে সত্য সত্যই কঙ্কণাময়ী মা এসে ঝাঁড়িয়েছেন! পুলকিত বিম্বিত ভক্তরা কুতাজলিবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটি ভক্ত সাধু নাগ মশাইর জীবনী পড়েছিল। তাতে সে জানতে পারে, মা নাকি একবার সাধু নাগ মশাইকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এটুকু জেনে তার মনেও তীব্র ইচ্ছা হ'ল 'মা যদি আমাদের জননী হ'ন, তবে আমাদের কেন তিনি খাইয়ে দেবেন না? মুখ ফুটে সে মাকে কিছুই জানালো না। সত্য সত্যই একদিন মা তাকেও নিজ হাতে খাইয়ে ধন্ত করলেন। ভক্তটির আনন্দের আর সীমা রইল না।

কখনো কখনো ভক্তরা মাকে দেবার জন্ত বী মিলি সন্দেশ নিয়ে আসতো। অথচ মার কাছে এত ভক্তের ভীড় যে, নিজহাতে তাঁকে তা নিবেদন করা হ'ত না। আশ্রমের ভক্তদের হাতে দিয়ে আসতে হ'ত। ফিরবার পথে তাদের মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতি থাকতো, কষ্ট করে আনা জিনিষ মার সেবার লাগবে কিনা, তারা যে মার জন্ত এনেছিল তা মা আদৌ জানতে পাবেন কি না?

তাদের সঙ্গে পুনরায় যখনই মার দেখা হ'ত তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁ বাবা, সন্দেশ, বী তোমরাই এনেছিলে তা?' কখনো বা তাদের সম্মুখে একটি সন্দেশ হাতে নিয়ে বলতেন, 'এই দেখ গো আমার জন্ত যে সন্দেশ এনেছিলে, আমি তা খাচ্ছি।' শিষ্যদের আনন্দের আর অবধি থাকতো না।

একবার কয়েকটি ভক্ত রাজ্যার চলাতে চলাতে সাদা স্থলপদ্মের গাছ দেখতে পেয়ে স্থির করলো ১০৮টি পদ্ম সংগ্রহ করে মার পায়ে অঞ্জলি দেবে। সেই জন্ত তারা ঐ খেতপদ্ম সংগ্রহ করতে থাকে। এমন সময় কে একজন ছুটে ছুটে এসে বললো, 'সাদাপদ্ম ছিঁড়ে না।' মা বলে পাঠিয়েছেন দেবীপূজার খেতপদ্ম লাগে না।' অথচ আশ্রম সেখান থেকে বহুদূর। ভক্তদের বিষয়ের অন্ত থাকে না। মা কি করে জানলেন?

আরেক বার একটি ভক্ত এসেছিল মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে। দীক্ষান্তে সে মায়ের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললো 'এখান থেকে বেলুড় মঠ দর্শন করে বাড়ী যাবো ভাবছি মা। অমৃত্যু দিন।'

মা তৎক্ষণাৎ তাকে বললেন, 'এবার না হয় সোজা বাড়ীতে চলে বাও বাছা, অস্ত্র বার বেলুড়-মঠ যেয়ো।'

'মা, এতদূরে এসেও যদি বেলুড়-মঠ না দেখে ফিরে যাই, তবে আর হয় তো কখনো এ সুযোগ নাও পেতে পারি।'

'তাহোক বাবা! এবার তুমি বেলুড়মঠ না'ই গেলো। সোজা বাড়ী গিয়ে বাবা মার সেবা কর।'

মায়ের আদেশ অমাত্র্য করত না পেয়ে ভক্তটি অগত্যা বাড়ী ফিরেই গেল। কিন্তু বাড়ী এসেই দেখতে গেল, নিজ পিতা মৃত্যুশয্যায়। সে অবাক হয়ে বেলুড় দর্শনে যেতে মার বারংবার নিষেধাবাদী স্মরণ করলো। কয়েক দিনের মধ্যেই তার পিতার মৃত্যু হল। মায়ের নিষেধাবাদী না শুনেলো হয়তো তার পিতার সাথে তা' শেষ সাক্ষাৎ আর হত না।

যোগীনমা মায়ের স্ত্রী-ভক্ত। তাকে একদিন মা প্রশ্ন করলেন 'হ্যা গো! তুমি কি শুকনো বেলপাতা দিয়ে পূজা কর?'

যোগীনমা তো প্রশ্ন শুনে অবাক! বললেন, 'তা করি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

শুধু যে অন্তর্দর্শিতা, তাই নয়। মা নিজস্বই বলতেন, 'কিছুদিন তো এমন হ'ল, মনের মধ্যে যা উঠতো সত্যি সত্যিই তা উপস্থিত হতো। তা এখন ভালই হ'ক, আর মন্দই হোক। ভাবি, এইটি খাবো বা এইটি হোক, ভগবান যেন তখন তখনই তা যুটিয়ে দিতেন।'

রাধুর তখন খুব অসুস্থ। কোয়ালপাড়া একটা জুহুলে জায়গা। ভাবলুম, যে জঙ্গল, কোন দিন না বাঘ ভালুক বের হয়ে পড়ে। ভক্তরা আশ্বাস দিল, কোয়ালপাড়ার মত জঙ্গলে বাঘ ভালুক কখনো আসেওনি, আসতে পারেও না। আমার ভয় অমূলক। কিন্তু ২১ দিনের মধ্যেই শোনা গেল একটি গরীব বুড়ীকে নাকি ভালুকে মেরে ফেলেছে।

রাধুর অসুস্থের সময়ই আরো একবার। অসুস্থ বাড়াবাড়ি চলছে, সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। চার দিক ধমধমে নিঃশব্দ। একটুও শব্দ সহ হয় না রাধুর। বসে ভাবছি এই কিছুদিন ধরে দুটো কাক এসে কতই বিরক্ত করতো 'কা' 'কা' করে শব্দ করে। কিন্তু আর তাদের শব্দ কিছু শুনি না। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে কাক দুটি 'কা' 'কা' করে ডেকে উঠে জানিয়ে দিল 'এই তো মা আমরা রয়েছে এখানেই, কোথাও যাইনি। শুধু তোমার রাধুর ভয়েই চুপ করে রয়েছি। সাড়া দিচ্ছি না। আমি তো অবাক!'

একবার এক পশলা বুড়ির পর সবাই দাওয়ায় বসে। মন হ'ল আর্হা! শিহড়ের সেই পাগলটা কত কাল আসে না। বন্ধপাগল বটে, কিন্তু গানগুলি গায় বেশ। বলতেই এক ভক্ত বলে উঠলো 'এত রাত করে আবার তার নাম কেন কর? ধর, সে যদি এখুনি এই রাতে এসে পড়ে?' রাত্রি তখন দশটা। এক ভক্ত বলে উঠলো 'না! না! এই বাদলে এত রাত্তিরে নদী পেরিয়ে পাগলের আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।' অথচ কথা শেষ হতে না হতেই পাগল সত্যি এসে হাজির। ব'লে 'সাততরে পার হয়ে এলুম।'

একবার নাকি মার খুব অসুস্থ করেছিল। বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। চলাচল করতেই কষ্টবোধ হ'ত। একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'শরীরের যে অবস্থা একগাছা মোটা দেখে লাঠি পেলে ভর দিয়ে চলতাম। মুখে বলেননি কাককেই কিছু। সত্যি সত্যি পরদিন তার ঘরের দরজার একটি কোণে ভর করে চলার মত একগাছা মোটা লাঠি দেখা গেল। লাঠিটি যে কে এনে রেখেছে খবর করে জানা গেল না। এতে মা নিজেই বিস্মিত না হয়ে পারেননি। ভাবলেন ঠাকুরেরই লীলা। [ক্রমশঃ।

## বেদবতীর উপাখ্যান

### অগ্নিমা° মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মবৈবর্ত প্রাণে তুলসীর উপাখ্যানে উল্লিখিত শিবভক্ত ঐরাজসাবর্ণি স্বর্ধাশাপে লক্ষ্মীভট্ট হইয়া দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। শিব ঋষ্ট হইয়া স্বর্ধ্যনিধনে উত্তত হইলেন। তখন নারায়ণ আসিয়া অনেক অমুনয়-বিনয় এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা শিবকে

নিরস্ত করিলেন। তখন মহাদেব নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন যে, কুরুশে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত রাজসাবর্ণি পুনরায় লক্ষ্মীলাভ করিবে। উত্তরে নারায়ণ বলিলেন যে, রাজসাবর্ণির বৃষধ্বজ নামে একটি পুত্র হইবে, তাহার পর বৃষধ্বজ জন্মলাভ করিবে। বৃষধ্বজের দুই পুত্র হইবে—ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কন্তার লক্ষ্মীর অংশে জন্ম হইবে এবং তখন শাপযুক্ত হইবে।

বধাকালে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্মীদেবীর ইচ্ছায় সেই দুই ভাতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বরদান তপস্তা করিয়াছিল। সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীদেবী বরদান করেন। লক্ষ্মীদেবীর ধরে তাঁহার রাজ্যলাভ করিয়া ধনে-পুত্রে সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠেন। কুশধ্বজের পত্নী মালাবতী অতিশয় পতিব্রতা ও ধর্মশীলা রমণী ছিলেন। মালাবতীর গর্ভে কমলার অংশে বেদবতী নামে একটি কন্তা জন্মগ্রহণ করিল।

পরম আশ্চর্যের বিষয় যে, বেদবতী ভূমিষ্ঠ হইয়াই দ্রুত ব্রহ্মার আরাধনা করিতে বনে চলিয়া গেল। সজ্ঞাত কন্তার এই ভাব দর্শন করিয়া প্রতীবাসী সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার কন্ডাকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কন্ডা কাহারও কথা না শুনিয়া ঘুরিতে পবিত্র পুষ্করে গিয়া বিধাতার চরণপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিল। এইরূপ তপস্যায় বহুকাল অতিবাহিত হইল। কন্তার তনু ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, কাকন বর্ণে কালিমা দেখা দিল এবং ইতিমধ্যে কন্তার যৌবন আসিয়া উপস্থিত হইল। তথাপি কন্ডা অবচল অটুট থাকিয়া উপবাসে কঠোর তপস্যায় নিমগ্না রইলেন। এইরূপ কঠোরতা দেখিয়া ব্রহ্মার আসন টলিল। বিধাতা তুষ্ট হইয়া দৈববাণীর দ্বারা বেদবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কন্তে তোমার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ কর। তুমি যাহা চাহ তাহা দিব।' দৈববাণী শুনিয়া বেদবতী কহিলেন—'হে পদ্মাসন, যিনি এই জগতের নাথ, যিনি এই সুরমহান বিশ্বের আধার, তিনি যেন আমার পতি হ'ন, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা।' বেদবতীর কথা শুনিয়া দৈববাণী কহিল—'হে কন্ডা, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপস্বী ধীর পাদপদ্ম নিয়ত অন্তরে ধরিয়া আছে, তাঁহাকে তুমি এক্ষণে কী প্রকারে লাভিবে? আমি তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বরদান করিতেছি যে, জন্মান্তরে তুমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিবে।

দৈববাণীর কথা শুনিয়া বেদবতী ক্ষুব্ধ চিত্তে দ্রুত গন্ধমাদন পর্ব্বতে চলিলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অনশনে কৃষ্ণের চরণকমল হৃদয়মাঝে ধারণ করিয়া দিবস রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কন্ডা বেদবতী সদা-সর্ব্বদাই এক মনপ্রাণ লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, জগৎজীবন যেন তাহার নারীরূপে তাহাকে গ্রহণ করেন। এইরূপে বেদবতী যখন ধানে নিমগ্না সহসা সেই স্থানে দুরাশ্বা রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণকে দেখিয়া বেদবতী তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাঙ্গি সংকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অরণ্যের ফলমূল বহুপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া অস্ত্রাঙ্গিকে পরিভূষিত করিলেন। অতঃপর সেই স্থানে বিশ্রাম লইবার অবকাশে কন্তার মোহনরূপ দর্শন করিয়া পাণ্ডুপতির অন্তরে কামবহি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। দুরাশ্বা মিষ্টভাবে বেদবতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হে বিনোদিনী, তুমি কাহার কন্ডা? কাহার স্ত্রী? কেনই বা



একাকিনী এই নিষ্ঠুর পর্বতে বহিষ্কৃত ? তে বিধুযুগি, তুমি কেন গৃহত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ ? তোমার দারুণ এই তপস্যা ত্যাগ করিয়া আমার গৃহে চল। আমি ত্রিলোক-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর। এই পৃথিবীর মধ্যে তুমিই হবে আমার একমাত্র প্রিয়তমা। আমার অগ্ন্যস্ত্র রাণীগণ হবে তোমার সেবিকা মাত্র।' এই বলিয়া রাবণ মোহবশে উদ্ভাসিত হ্রাস বেদবতীকে আকর্ষণ করিতে বাইল। হুরাচার এই মন্ত ভাব সেনিয়া বেদবতী ক্রোধে বেতসপত্রের দ্বারা কম্পিত হইতে লাগিলেন। রাবণকে সম্বোধন করিয়া দুই চক্ষুতে ক্রোধায়ি প্রছালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শোন্ শোন্, নবায়ম রাবণ, সরলা নারীর প্রতি তোমার এই অত্যাচারের ফল তুমি অবিলম্বে পাইবি। ওরে পামর ! অতিথিরূপে আসিলি, তোকে যে আমার অভ্যর্থনা করিলাম, তাঁহার কি এই ফল ? ওরে হুরাচার, সাবধান ! আমার নিকটে একটি পদক্ষেপেও আর অগ্রসর হইবি না।' এই বলিয়া বেদবতী সর্বোদর লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া এক অদ্ভুত তেজোবৃন্ত ভঙ্গিতে ধাঁড়াইয়া রহিলেন। বস্ত্রাব ভীষণ মুষ্টি দর্শন করিয়া রাবণ অনঙ্গ অবল হইয়া রহিল। বেদবতী পুনরায় সর্বোদর কঠিতে লাগিলেন, 'তুমি যে পামর, আমি দিব্যানিশি মন-প্রাণ হরির উপর সমর্পণ করিয়া আছি। তাঁহাকে পতিরূপে লভিবার আশায় অহিনিশি তাঁহার চিন্তা করিতেছি। তুমি যেমন আমার পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিস, সেই হেতু তুমি সবংশে নিধন হইবি। তোমার বংশ আর কেহ রহিবে না এবং মরিয়া তুমি যমালয়ে বাইবি।' এই বলিয়া বেদবতী অতি ক্রুদ্ধমনে গঙ্গাবক্ষে জীবন ত্যাগ করিলেন। পাপমতি রাবণ স্বচক্ষে এই সকল দর্শন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

কমলার অংশে জন্ম কহা বেদবতী জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ করিয়া শাপবশে পুনরায় ক্রমা লাভ করিলেন রাবণ নিধনের জন্ত ; জনকরাজার গৃহে সীতা নাম ধরিয়া বেদবতী আসিলেন। পূর্বকৃত পুণ্যবলে কহা ভগবান রত্নপতিক পতিরূপে লাভ করিলেন। জাতিস্মার সত্য অস্তরে সমস্ত জানিলেন এবং পূর্বকার যত দুঃখ সকলই ভুলিয়া গেলেন। এই ভাবে জন্মান্তরে দেববাণী প্রদত্ত বরে বেদবতীর কঠোর তপস্যার বলে জগৎপতি, বিশ্বের আধার শাস্ত্রশীল, সুরচিত শ্রীরামের পত্নীরূপে পূলকে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

## উদ্বোধন

### শ্রীঅরুণা ঘোষ

অস্তাচলগামী বর্ষ ভূবে গেল অতীতের অন্তল গহবরে,  
বলে গেলো, নবীনের করো আবাহন তোমাদের ঘরে।  
সাক্ষাৎ বরণডালা মেহ আর ক্ষমা দিয়ে বাঁধ রাখী হাতে,  
মিলনের মন্ত্র আজি গ্রহণ করিবে সবে নূতন প্রভাতে।  
চেয়ে দেখি হায়, দিগন্ত রক্তিম করি সে তো চলে যায়,  
স্মৃতির প্রেক্ষাপটে কথময় দিন তার লিখে রেখে যায়।  
মৌনতার দিয়ে গেল নীরব সাধনা করে গেল দান,  
এ বিরাট বিধে তার যতটুকু ছিল করিবার দান !  
নূতন সাধনা দিয়ে নূতন বরবে মোরা উদ্বোধন,  
তিন্দা, ধৈর্য, গ্রানি ভুলে করি আজ সবে মিলে

মিলনের নূতন বোধন।

## বাতিঘর

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

বারি দেবী

সুমিতা সকালে একবার করে আসে, বাবার পুজোর ঘরে,  
কয়েক মিনিট নীরবে বসে থাকে তাঁর পাশে।

তারপর সারাদিন আর দেখা পাওয়া যায় না তার। সময় যে তার দিদিমার হাতে তৈরী ছকে বাঁধা। সকালে আসে গীটারের মাষ্টার,—তারপর কলেজ,—ফিরে এসে মুখে-হাতে জল দিতে না দিতে ; আসে শিয়ানো অথবা নাচের মাষ্টার। সন্ধ্যায় পড়া তৈরী।

সব শেষ করে রাতে একবার আসে, পিতার লাইব্রেরী-কক্ষে। তিনি তখন হয়তো নিবিষ্ট থাকেন—উপনিষদের মাঝে ! একবার মুখ তুলে কন্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করেন সোমনাথ—প্রশান্ত হান্তের সঙ্গে দিনান্তের বিদায় জানান।

সুমিতা হয়তো আশা করে থাকে, বাবা, কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করবেন, আর অভিযোগ জানাবেন—

—কৈ, সারা দিন তোমাকে তো একবারও পেলাম না মা !

যেমন পূর্বে বলতেন।

কিন্তু সে-সব কিছু হয় না। সোমনাথের ভাবলেশহীন পাখরের মত মুখে কোনো অভিমান বা দুঃখের রেখাপাত পর্যন্ত নেই। যেন তাঁর চাইবার আর কিছু নেই, মনে ওঠে না কোনো প্রশ্নের তরঙ্গ। তরঙ্গায়িত তটভূমি ফেলে রেখে, কোন ভাবদাগে, গভীর অন্তরে যেন বিরাজ করছেন তিনি।

সুমিতা এত বোঝে না ! প্রাণে যেন কিসের বেদনা অগ্নুভব করে। সহপাঠিনী দু'-একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখেছে সে ওরা কেমন ভাই-বোনেরা মিলে কত গল্প করে, কত হৈ হুল্লোড়ে মাতামাতি করে। ঝগড়া-মারামারিও আছে। মা-বাবার কাছে কত আদর পায়। আদার করে তাঁদের কাছে ! ওদের বাড়ীগুলো যেন সজীব প্রাণচাক্ষুসে ভরপুর থাকে !

—কিন্তু তার বেলা কেন এর ব্যতিক্রম ঘটলো ? সে যেন দিদিমার হাতের কলর-পুতুল একটা ! যে দিকে তিনি চালাচ্ছেন সে দিকে চলতে হচ্ছে তাকে। নিজের মন বলে কোনো দ্রব্য তার থাকতে নেই ? কিন্তু সত্যি তো না নয় ! মন যে তার চায়, ঐ রম্য মত দ্রবস্তপণা করতে। গীতার মত প্রাণখোলা হাসি হাসতে আর শিখার মত কথায় কথায় ভাই-বোনেরের সঙ্গে ঝগড়া করতে ; চোঁচামেচি করে বাড়ীখানা গুলজার করতে !

তা তো হবার নয় ! দিদিমা তাঁর আয়ারিটোজেন্ট, চলন-বলনকে সর্দিয়া অমুকরণ করতে বলেন তাকে। কেমন করে সভ্য সমাজে চলতে হবে, দাঁত চেপে মিতি গলায় কথা বলতে হবে, চোঁচের কোণে লেগে থাকবে একটু হাসি, শব্দ হবে না একেবারেই ; ওটা অসভ্যতা !

দিদিমার শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগারে যেন বন্দিনী সে! বাইরে যেমন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্য অন্তরে তেমনই যেন কিসের অভাব নিয়ত দংশন করে ওকে! কিসের বেদনা ওকে যেন সর্বদা সঙ্কুচিতা ত্রিযমাণা করে রাখে! মরুভূমির মাঝে ও থাকে ওরেশিষ! কয়লাখনির নিকষ-কালো আধারের মাঝেই যেমন মেলে অত্যাশ্চর্য হীরকের সন্ধান, রক্ত গিরিগহ্বরে ঝরণার কুল-কুল ধ্বনি,—তেমনই স্মিতার জীবনেও আছে স্নান।

সোমনাথের পরম বন্ধু মহিম হালদার, একজন উঁচু দরের ষ্ট্রিবেডোর—তীরই একমাত্র পুত্র স্নান হালদার। জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি, এখন পরমার্থের সন্ধানে গোপীদাস মহারাজের শিষ্য গ্রহণ করে কয়েক বছর হল বৃন্দাবন-বাস করছেন।

বাড়ীতে আছেন তাঁর স্ত্রী। ছোট ভাই অসীম হালদার, আর পুত্র স্নান হালদার। অসীমের ওপর আর বিশ্বাসী কর্তৃপক্ষীদের ওপর ব্যবসা পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি অস্বাভাবিক সংসার তাগ করেছেন।

অসীম এখনও অবিবাহিত, তবে খুব চতুর ও হিসেবী। দাদার চেয়ে বয়স অনেক ছোট হলেও ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে তার বেশী যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

স্নানমের তেইশ, চব্বিশ বছর বয়স হলেও মনে হয় এখনও সে নাবালকত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মা ও কাকার অত্যধিক আদর-যত্নে তার শিশুসুলভ ভাব আজও রয়ে গেছে। পুষ্ক-চেহারায় যেন একটি সুকোমল মেয়েলী ছাপ, ঘর স্থির কিছুটা বা লাজুক প্রকৃতির। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সে, ফাইন্সাল পরীক্ষার আর কয়েক মাস মাত্র বাকী।

পিতার ইচ্ছায় ডাক্তারী লাইনে গেলেও সাহিত্যের প্রতি তার অসামান্য অনুরাগ। আধুনিক তরুণ কবিদের মধ্যে যে কয়েক জন বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, স্নান হালদার তাঁদেরই অন্যতম।

“পূর্বরাগ” নাম নিয়ে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি প্রচুর সমাদরের মাঝে প্রথম সংস্করণের ধাপ পেরিয়ে এখন দ্বিতীয়ে চলছে। ছোট গল্পও তার মাঝে মাঝে হুঁচকি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লালকুঠিতে বাতায়ত চলছে তার সেই বারো বছর বয়স থেকে!

স্মিতা তখন বছর সাতকের। এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা।

বাবার সঙ্গে প্রথম বৈদিক গিয়েছিলো সে লালকুঠিতে, স্মিতার মা আদর করে কোলে বসিয়েছিলেন, কত কি খেতে দিয়েছিলেন, কি চমৎকার দেখতে ছিলো ঐ ঠিক ঐ পটুয়াদের গড়া দুর্গা প্রতিমার মত! গোলাপী ব্রক পরেছিলো স্মিতা, সোনালী এক-মাথা কোঁকড়ানো চুলে বাঁধা গোলাপী রিবনের বো। ওর হাত ধরে বাগানে নিয়ে গিয়ে কত ফুল দিয়েছিলো! খরগোশ আর কত রকমের পাখী দেখিয়েছিলো। আসবার সময় কত চকোলেট বিকুট দিয়েছিলো স্মিতা। আর একখানা চমৎকার বিলিতি ছবির বই। সে বইটা আজও বন্ধ করে রেখেছে স্নান।

বছর চারেক পরের কথা। বড় মনে কষ্ট হয়েছিলো ওর, যেদিন লালকুঠিতে গিয়ে আর দেখতে পেলো না মিতার মাকে!

পড়ার ঘরে চেয়ারে চূপ করে বসেছিলো মিতা। স্নানমকে দেখে হুঁহাতে মুখ চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো! স্নানমও কেঁদে ফেলেছিলো! তারপর স্মিতার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলো,—কেঁদো না মিতা! মা যে ভগবানের কাছে গেছেন।

—স্মিতা জলভরা চোখ দুটো খুলে বলেছিলো,—মার জন্তে বড় যে মন কেমন করছে দামী দা! কেমন করে আমি একলা থাকবো? বাবা যে দিনরাত্তির বই নিয়ে থাকেন, আমি কার সঙ্গে কথা কইবো?

—স্নানম ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলো,—আমি রোজ তোমার কাছে আসবো মিতা! তোমার সঙ্গে গল্প করবো! তোমার কাছে থাকবো, তাহলে তোমার ভালো লাগবে তো?

হুঁহাতে ওর গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখে, চোখ বুঁজেছিলো মিতা! চাপা দীর্ঘশ্বাসে ছোট বুকটা ফুলে ফুলে উঠেছিলো!

তারপর থেকে রোজ আসতো স্নানম। কলেজ থেকে ফিরে, সোজা চলে আসতো স্মিতাদের বাড়ী। গল্প বলে, কবিতা শুনিতে ওকে ডুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো।

বেশ ছিলো ওরা দু'জন। বছর দুইয়ে পরেই এ বাড়ীতে এলেন স্মিতার দিদিমা, মামা, আর ছোট মাসী! তখন রোজ আসতে কেমন লজ্জা করতো স্নানমের। ক্রমে ষাওয়া-আসাটা কম হতে হতে এখন সপ্তাহে দু'দিনে সীমিত হয়েছে।

ঐ দুটো তিন দিনই যেন স্মিতার জীবনে নিয়ে আসে অমৃত-প্রবাহ! তার নিয়মের অকোপাল্যে বাঁধা নীরস প্রাণলতিকার মূলে ঐ সঞ্জীবনী ষাটুকুই একমাত্র সখল! হতাশার কুহেলিকার মাঝে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু!

এক বছর কেটে গেছে সোমনাথ বাড়ীতে ফেরবার পর। তাঁকে আবার স্মৃতির পথে যাত্রা করতে হবে। সেদিন সকালে একখানি বিরাট বৃষ্টিকার এসে দাঁড়ালো লালকুঠির গাড়ী বারান্দার তলায়। গাড়ীর মালিক জানালেন,—তিনি সোমনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

বেয়ারা জানালো সোমনাথকে,—তিনি আগন্তুককে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে আসতে বললেন।

দামী বিলাতী পোষাকে সুসজ্জিত, অতি সুদর্শন একজন যুবক এলেন সোমনাথের ঘরে, সান্গগলস্ দ্বারা চোখ দুটি তাঁর আবৃত।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে বললেন তিনি—আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না? আমার নাম অসীম হালদার। মহিম হালদার আমার দাদা।

—সোমনাথ মুহূর্ত্তে জবাব দিলেন—বহুদিন পরে তোমাকে দেখছি কি না, সেজন্য প্রথমে চিনতে পারিনি—বোসো—না! না! এখানে নয়, ঐ চেয়ারটাতে বোসো!—হ্যাঁ, বিলেত থেকে ফিরলে কবে? দাদার খবর পেয়েছো তো?

—চেয়ারে বসলো না অসীম,—পা মুড়ে আড়ষ্ট ভাবে কার্পেটের ওপরই বসে পড়লো। পকেট থেকে একখানি চিঠি

বার করে বললো, বিলেত থেকে প্রায় তিন বছর হল ফিরেছি। তার পর থেকেই বিবাহসম্পত্তি সব কিছু আমাকেই দেখাশোনা করতে হচ্ছে কি না। দাদা তো বেশী ভাগ সময় এখন বুন্দাবনেই বাস করছেন। এই চিঠি দাদা আমার লিখেছেন সেই জন্তই এলাম আপনার কাছে। চিঠিখানি সোমনাথের হাতে দিলো অসীম।

—চিঠিখানি লিখেছেন মহিম হালদার—“সোমনাথ ত্রিবেদীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করো আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুনামের সঙ্গে স্মিতার পরিণয় কার্য এবারে সুসম্পন্ন করা হোক, এই আমার অভিপ্রায়। সুনাম ডাক্তারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে, সেজন্য বিলম্ব আর কাজ কি? বত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ব্যবস্থা করা হোক উভয় পক্ষের।”

সোমনাথ চিঠিখানি পড়ে মূহু হস্তের সঙ্গে জবাব দেন—আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ; ওসব ব্যাপার ঠিক বুঝি না, মহিমকে লিখে দাও, সে এসে যা করবার করে নেবে।

অসীম একটু ভেবে বললো, আমি একবার দেখতে পারি, আপনার মেয়েটিকে?

—অবশ্যই।

বাইরে অপেক্ষমান বেয়ারাকে বললেন, স্মিতাকে ডেকে দেবার জন্ত। পিতার আহ্বানে ঘরে এসে, একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে থমকে দাঁড়ালো স্মিতা। সঙ্কচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমাকে ডেকেছো বাবা?

—হ্যাঁ মা! ইনি সুনামের কাকা অসীম, আর এইটি আমার কক্সা স্মিতা। ওঁকে প্রণাম করো মিঠা?

স্মিতা হেঁট হয়ে পায়ের ধূলা নিতে বায়, বাধা দিয়ে অসীম হাত ধরে বসায় ওকে নিজের পাশে।

বিচক্ষণ সমালোচকের দৃষ্টিপাত দ্বারা স্মিতার সর্বত্র লেহন করে, রাগ দিলো অসীম—চমৎকার! সুনামের উপযুক্ত হবে। লেখাপড়া, গান-বাজনা, কিছু কিছু জানা আছে তো?

—হ্যাঁ! ওর দিদিমার ব্যবস্থার সবই চলছে। সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজে বি. এ. পড়ছে।

—কক্সাকে আদেশ করলেন সোমনাথ, অসীমের জন্তে চা আনতে।

খানিক বাদেই মায়া দেবী নিজে এলেন, নানাবিধ সুখাতপূর্ণ রূপের রেকাবী হাতে নিয়ে—পেছনে বেয়ারার হাতে ধ্যায়িত চায়ের কাপ। ছোট টিপসটিতে সব সাজিয়ে দিয়ে, পরমাত্মীয়র মত বললেন—চেয়ারটাতে উঠে বসো বাবা, একটু মিষ্টিখুশ করতে হবে। সোমনাথ পরিচয় করিয়ে দিলেন উভয়কে। অসীম হেঁট হয়ে মায়া দেবীর পদধূলি গ্রহণ করলো। বাবার সময় মায়া দেবী অসীমকে বিশেষ অমরোষ জানালেন,—তুমি মাঝে মাঝে এলে বড়ই সুখী হবো বাবা! সুনাম তো আমাদের ঘরের ছেলে, তার কাকা তুমি, তুমিও আমাদের পরম আপন জন।

আবার নতুন যে সবকটা গড়ে তোলবার আয়োজন হচ্ছে, তার জন্তে তো এখন তোমাকেই আনাগোণা করতে হবে।

মনে মনে স্থির করলেন,—এত দিনে বোধ কবি মেয়েটার

কয়েক দিন পরে—

একটি নাইট ক্লাবের পৃথক কক্ষে, কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে পানপাত্র হাতে বসেছিলো অসীম। মনে তার আলোড়ম জাগিয়েছে, স্মিতার রূপ আর তার পিতার সম্পত্তি। একাধারে লক্ষী-স্ববস্তী প্রাপ্তি যোগ ঘটলো সুনামের বরাত্রে। একচুকে পাত্রটি নিঃশেষ করে সঙ্গে টেবিলের ওপর রেখে, আপন মনে জড়িত স্বরে বলে অসীম—না! না! এ হতে পারে না, এ হতে আমি দেব না। বন্ধু নীরেন ওর কথায় হো-হো, করে হেসে ওঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—

—কি হতে দেবে না বাবা? আবার বুঝি নতুন কিছুর সন্ধান মিলেছে? আর তাকে লুটে নেবার মতলব ভাঁজছো মনে মনে?

অসীম সামলে নেয় নিজে—বলে,—না! না! ও একটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

নীরেন অসীমের হাতে মূহু চাপ দিয়ে বলে—কই হে তোমার উর্বরীটির দর্শন তো এখনও মিললো না? ব্যাপার কি হে?

অসীম হাতঘড়িটি দেখলো, রাতি সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

মনটা একটু চঞ্চল হল বৈ কি? শুকতারার আসবার কথা ছিলো, ঠিক আটটার সময়! মিনিট পাঁচেক পরেই সকলকার অর্ধেক প্রতীক্ষার অবসান ঘটালেন চিত্রতারকা শুকতারা দেবী রঙ্গভূমে আবির্ভূতা হয়ে।

মিষ্টি হাসি ঠোটে মাখিয়ে অসীমকে বললো—একটু দেয়া করে ফেলেছি না? সেক্ষণ্য আমি হুঃখিত, বিশ্বাস করো, বেকতে বাছি, এমন সময় এলেন হীরালাল ক্ষেত্রি।

তার বইতে হিরোইনের পাট আমি করছি কি-না সেক্ষণ্য—বুঝতেই পারছো, বিজ্ঞানেশ্বর ব্যাপারে—বিরূপভরা কণ্ঠে বলে অসীম—

হ্যাঁ! সেটা কিছু অন্যায় হয় নি তোমার পক্ষে। সত্যিই, ধনকুবেরের সান্নিধ্যের চেয়ে এখানকার প্রয়োজন মোটেই লোভনীয় নয় শুকতারায়!

তবুও একেবারে ভুলে না গিয়ে মনে করে যে এসেছো, দর্শনার্থী ক'জন যে হতো মিছেন বহুক্ষণ ধরে, তুমি না এলে খেসারতটা আমাকেই দিতে হত? মানে খাতবিল পঞ্চাশ-ষাট চুকিয়ে আবার অন্ত কোনো ক্ষুণ্ণির পেছনে হুঁ-পাঁচশো খসিয়ে তবে ওরা আমাকে রেহাই দিতো। ওরা আজ আমার গেট কি না। যা হোক তুমি খুব বাঁচালে আমাকে—

—তাই নাকি মিঃ হালদার? তবে তো সে টাকাটা আজ আমারই প্রাপ্য, কি বলে? হেসে লুটিয়ে পড়লো শুকতারায় অসীমের বুকের ওপর।

চারিদিকে হো, হো, হি! হি! হাসির তুফান বইলো, বয়রা ছুটোছুটি করলো, ডিসের পব ডিস এলো পর পর, বোতল এলো, খালি হলো।

অসীমের পকেট থেকে ঝরঝরিয়ে টাকার বৃষ্টি পড়লো, বয়রা বার বার সেলাম হুকলো।

রাতি বারোটার শুকতারাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার পথ, —হাল্যাবান যুক্তোর তিন নব বোধে ক্যাসানে গাঁথা, ...বুক



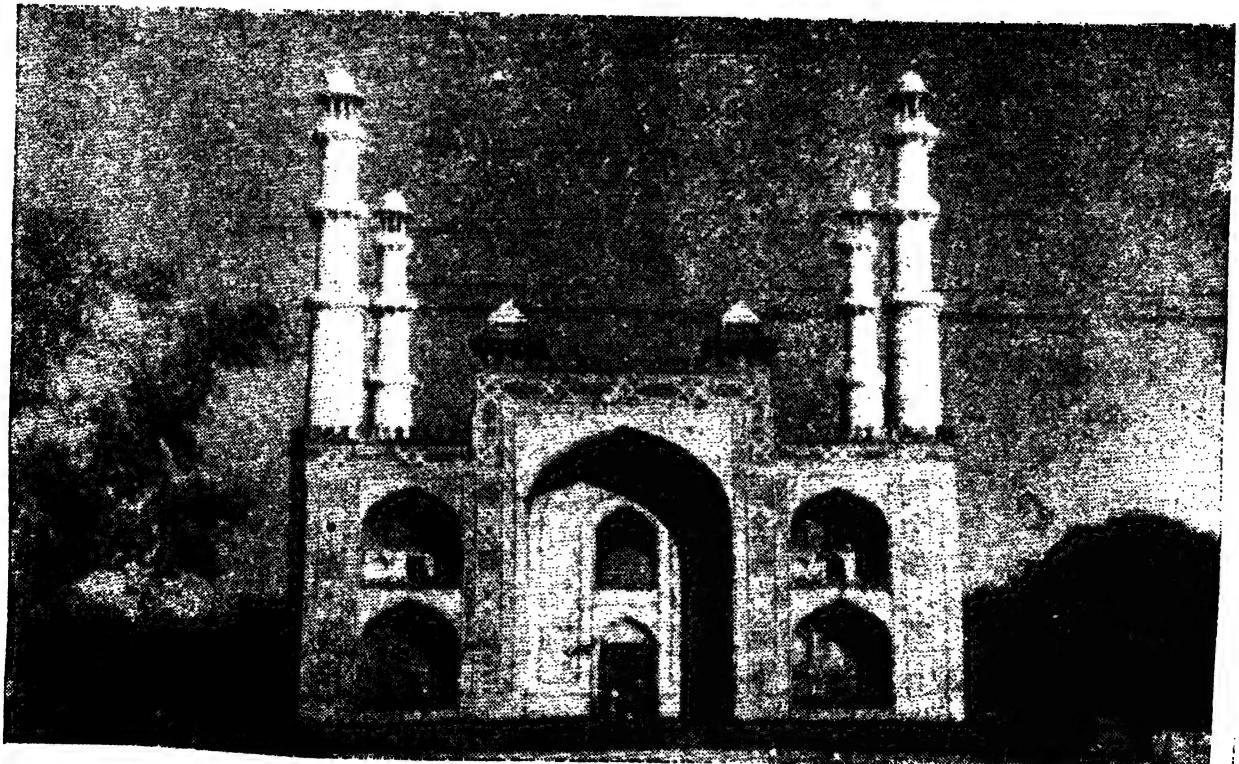
କାଳୀମନ୍ଦିର ( ନିଉ ଦିଲ୍ଲୀ )

— ଶାମାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ



ସିକାନ୍ଦ୍ରା ଫଟକ ( ଆଗ୍ରା )

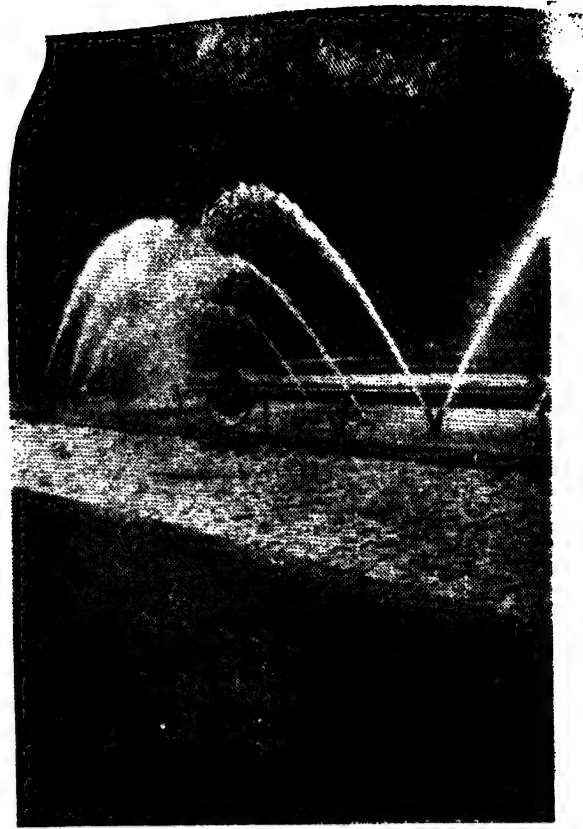
— ଅହମ୍ମଦ୍ ନାସିରୁଲ୍ ହକିମ୍





দীপমণি

—মিসেস অদিতি রায়



বৃন্দাবন গার্ডেন (মাইসোর)

—রমা রায়

মাছধরা

—ভাবা মুখোপাধ্যায়







—শীতা সরকার



—শুধীন দত্ত

## চাঁদের হাট



।তানব,

—বাঘুরী চট্টোপাধ্যায়



—নৌহার দত্ত



পকেট থেকে বার করে, অসীম পরিয়ে দিলো শুকতারার সুজোল কর্তে।

তারপর এ-পথে, ও-পথে, হুসলো গাড়ী। বারোটোর কাঁটা ছটোর ঘরে পৌঁছোলো, শুকতারাকে তার ক্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলো অসীম।

বিজ্ঞানায় শোবার পর, একি বিড়ম্বনা! ঘুমের বংশ যেন পালিয়েছে আজ ওর চোখে ছেড়ে। চোখে আর মনে যেন কে লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে, তাই দুটোই আজ পালা দিয়ে আলিয়ে মারছে।

কি করা যায়? ও রত্ন সুদামের হতে পারে না, ও একমাত্র আশাবই জ্ঞান। কিন্তু কোন্ উপায়ে? হলে, বলে, কোঁশলে, সর্বস্বপণ করে, জীবন দিয়ে। অন্তর্জগতের প্রবল উত্তেজনার অস্থির ভাবে ঘরঘর পায়চারী করতে থাকে অসীম। মনে চলতে থাকে ষড়যন্ত্রের জালবোনা, শীকার ধরার অব্যর্থ শর সন্ধান। —কিন্তু কোনটাই মনে ধরে না। ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঘড়িতে রাত্রি চারটে বাজলো, উত্তেজনার প্রকোপ কমে এসেছে। মাথা ঘুরছে, দেহ-মন অবসর। টলসায়মান দেহখানি ধীরে ধীরে শয্যায় এলিয়ে দেয় অসীম, তজ্জাভাবে চোখ দুটো ভারি বোধ হচ্ছে।

—হঠাৎ মস্তিষ্কের বিমূঢ় অন্ধকারে, একটি চমৎকার বুদ্ধির বিজলী খেলে গেলো। ঠিক! ঠিক! এ কথা তো এতক্ষণ

মনে জাগেনি, সুদাম তো ডাক্তারী পাশ করেছে, দানার ইচ্ছা ছিলো বিলেতে পাঠিয়ে ওকে কোনো বিষয়ের স্পেশালিষ্ট তৈরী করবার।

তখন সেই বাধা দিয়ে বলেছিলো,—না দাদা! সুদামকে অত দূরে পাঠিয়ে কাজ নেই, এখানে বসে ডাক্তারীও করবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা দেখবে।

—কিন্তু আজ সেই ভুলটা তো সংশোধন করে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়! কালই দাদাকে চিঠিতে জানানাবে, তাঁর কথাই ঠিক, সুদামের উন্নতির কথা ভাবলে, তার বিদেশে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ। ওকে চোখের আড়াল করতে পারলে সুমিতাকে দখল করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

সুদাম কি সন্দেহ করবে তাকে? নাঃ! কিছুতেই না! বয়সে সে 'মাত্র বছর চারেকের ছোট হলেও, বুদ্ধিতে সে এখনও বালক মাত্র। ওর নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে সে বাধ্য।

নিজের চমৎকার পরিকল্পনার খুসির আমেজে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে অসীমের! পরম তৃপ্তিভরে পাশ বালিশটাকে টেনে নেয় কাছে।

আঁখি-প্রোঃস্ত্র নেমে আসে শান্তিপূর্ণ নিদ্রার জড়িয়া।

[ ক্রমশঃ।

## বঙ্গাঙ্গ-বিদ্যায়

### ক্রীতপাপুরী দেবী

কি যেন অজানা সুরে অন্তরের অন্তঃপুরে  
ধনিয়া উঠিছে এক করুণ বেদনা ;  
নিত্য বার বাওয়া-আসা অন্তরে বেঁধেছে বাসা  
বুঝি তার পদধ্বনি আর শুনিব না।  
স্বক হবে কোণ রবে চিরতরে সে কী তবে  
আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক কাজে।  
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ভরে রব না কী তার তরে  
অথ-হুঃখময় স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে।  
বাংলার নববর্ষ জাতীয় জীবনে হর্ষ  
বুঝি আর আনিবে না প্রথম বৈশাখ।  
'শকাব্দ'র কলরবে এরে ভুলে যেতে হবে,  
ভুলে যেতে হবে রুজ—দেবতার ডাক।  
মাথার পিঙ্গল জট অতিবৃদ্ধ মহাবট  
মহাতপস্বীর মত শান্ত মৌন-মুখে,  
কাঁড়ারে গ্রামের প্রান্তে মধ্যাহ্ন-দিনে একান্তে  
চির বিদায়ের ছবি একে লবে বৃকে।  
মোর মাতা মাতামহী তাঁদের প্রণিতামহী  
কল্যাণ কামনা লয়ে নব-বর্ষ দিনে,  
কত শত যুগ ধরে গভীর ভক্তি ভরে  
পূজা দিয়ে গেছে হোখা শুচি-শুদ্ধ মনে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গাজন-সন্ন্যাসী গানে  
মুখরিত হইয়াছে স্বক দ্বিপ্রহর ;  
ভুলে যাবে গ্রামবাঙ্গী উৎসব দিনের বাঁশী,  
সেই মেলা হাসিখেলা, সেই অবসর।  
সেই নব-বৈশাখের কাল-বৈশাখীর জের  
আজও সাক্ষ্য হয়ে আছে নদীর ওপারে ;  
ভেঙেছে বটের গুঁড়ি তাজিয়া অসংখ্য খুরি  
গ্রাম্য উৎসব দিনে নব বৎসরে।  
আলি কি হইবে লুপ্ত এই মোর বঙ্গ-অঙ্গ  
এরে ভুলে যেতে হবে নবীনীর চাপে ?  
বৈশাখের সে পুণ্যাহ—নববর্ষ সমারোহ  
বিশুদ্ধ হইয়া যাবে হৃদয়ের তাপে ?  
ভাবিতে বেদনা বাজে অন্তর কলর-মাঝে  
চির-প্রতীক্ষিত মোর পহেলা বৈশাখ—  
এক যায় আর আসে প্রকৃতি নিয়ম বশে  
তবু নাহি ভোলা বার পুরাতন ডাক।  
হে বিদায়ী বৈশাখ, তোমার মজল শাঁখ  
বাঁজুক রক্তের করে অন্তরীক তলে ;  
আমার বঙ্গাঙ্গখানি সে চির তোমারি জানি  
অন্তরের মণিহর্যে তব দীপ জলে !



## পোশাক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান

প্রথম মানুষ উপলব্ধ ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের দেহকে আবৃত করার আবশ্যকতা অনুভব করলো। প্রথমে গাছের ছালপাতা, পশুর চামড়া প্রভৃতি দিয়েই এ দীর্ঘ সম্পন্ন হতো। তারপর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর উপযোগী পোশাক আবিষ্কৃত হতে লাগলো, যাতে এই সকল পোশাক শীত-গ্রীষ্ম জল-বৌদ্ধ থেকে শরীরকে রক্ষা করে আরামদায়ক হয়।

মানুষের শরীর একটি তাপ-উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। অব্যবহৃত অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে শরীর প্রায় একই তাপ বহন করে। দেহের উপরিভাগে ও হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি প্রান্তভাগে উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহের পরিমাণ ও বেগ এবং নির্গত ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীরের চামড়া ঠাণ্ডা হওয়া—এই সব প্রক্রিয়াতেই প্রধানতঃ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের তাপ সাধারণ আরাম অবস্থার বেশী বিঃ বাক্য হলে আমরা বলি, গরম কিংবা ঠাণ্ডা লাগছে। অত্যধিক গরম অনুভূত হলে শরীর দুর্বল লাগে। যে কাজ করতে এরূপ অবস্থা হয় সে কাজে অনিচ্ছা হয়। অত্যধিক শীত লাগলে শরীর কাঁপে এবং শক্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থার পূর্ব পরিশ্রম করে শরীর গরম করার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিবেশের সঙ্গে তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহের আরাম উৎপাদন ব্যতীত ও পোশাক ব্যবহারে আরও অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—যেমন, সামান্য আঘাত থেকে রক্ষা, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রীতি পালন, অস্ত্রের শোভা-বর্ধন, সৌখিনতা, প্রত্যারণার হৃদয়বল প্রভৃতি। তৈরীর সময় পোশাকের দাম, স্বাস্থ্য, ওজন, নমনীয়তা ধোয়ার সুবিধা এবং উপাদানের সহজ-প্রাপ্তি সবক্ষে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সব দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞান-সম্মত হয়েও ক্রটি-বিরুদ্ধ হলে পোশাক অগ্রাহ্য হয়। কোন পোশাক মনোনয়নের পূর্বে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করা দরকার—যেমন আবহাওয়ার ঠাণ্ডা কিংবা উত্তপ্ত করার ক্ষমতা, দেহের স্বাস্থ্য বা তাপ উৎপাদনের সামর্থ্য, নির্দিষ্ট পরিবেশে কতকগুলি অবস্থান এবং এই সব অবস্থায় পোশাকটির কার্যকারিতা।

শরীর থেকে সব সময়ই তাপ বাইরে নির্গত হওয়া দরকার। কারণ, অত্যধিক তাপ জমা হলে শরীর ক্লান্ত হবে, এমন কি, রাসায়নিক ভাবে তাপাহত হওয়াও অসম্ভব নয়। শরীর থেকে তাপ অপসারিত হবার অনেক উপায় আছে। ঠাণ্ডা পরিবেশে শরীরের তাপ হারানো হয়। এমন কি, বৌদ্ধোন্মূল গরম দিনেও দেহের

তাপ বাইরে নির্গত হতে বাধা পায় না। কিন্তু আবহাওয়া অত্যধিক উত্তপ্ত হলে দেহের তাপের বিকিরণ ব্যাহত হয়। দেহের অত্যধিক তাপ দূরীভূত হবার আর একটি উপায় হলো, ঘাম বাষ্পীভূত হওয়া। যখন অত্যন্ত উপায়ে শরীর থেকে যথেষ্ট তাপ নির্গত হয় না, তখন এই প্রথাই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ।

খানিকটা জল উত্তপ্ত করে উষ্ণতা এক ডিগ্রি কারেনহিট উঠাতে বতটা তাপের দরকার, তার চেয়ে সহশ্রুণ বেশী তাপ শরীর থেকে শোষিত হবে একই পরিমাণ ঘাম বাষ্পীভবনে। শরীরে নিকটস্থ বায়ুর চলাচল হলেই বাষ্পীভবনের হার অনেক বেশী হয়। যে পোশাক পরলে বায়ুর চলাচল ব্যাহত হয়, সেরূপ পোশাক শরীরকে স্নান রাখবার পক্ষে উপযোগী নয়। চামড়ার উপর বায়ুর জলীয় বাষ্পের চাপের পরিমাণ দিয়েই ঘামের বাষ্পীভবনের হার প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। বায়ুর চাপ যত কম হবে, বাষ্পীভবন তত দ্রুত হবে। এমন কি, ঐচ্ছিক প্রধান দেশের আর্দ্র বায়ুর চাপেরও দৃষ্টান্ত জোরে দেহের ঘাম বাষ্পীভূত হতে পারে। আবহাওয়া যথেষ্ট শুকনো হলে কিংবা তাপ কম হলে প্রতিবেশের চাপ এত কম হতে পারে যে, ঘামের বাষ্পীভবনের হার প্রতিবেশের চাপের চেয়ে ৩০।৪০ গুণ বেশী হতে পারে। এই ক্ষেত্রে শীতকালে সন্ধ্যাসন্ধ্যে পোশাকে এত ঠাণ্ডা লাগে। আবহাওয়ার তাপ কম হলে আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং দেহের চামড়া খুব শুকনো রাখা দরকার।

শীতের সময় চামড়ার নিকটস্থ বায়ুর চলাচল কম হলেই আরামদায়ক হয়। বায়ু একটি উৎকৃষ্ট অন্তরক। কাজেই যে পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে নিশ্চল বায়ুর স্তর থাকে, সে পোশাকও অন্তরক হয়; অর্থাৎ সেরূপ পোশাক পরলে শীতকালে গরম লাগে। গরম পোশাক মানে এই নয় যে, পোশাক থেকে তাপ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। এইরূপ পোশাক পরলে শরীর থেকে তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধা পায়। এই কারণে, শরীর উত্তপ্ত থাকে। নিশ্চল বায়ুর স্তর যত মোটা হবে পোশাকের অন্তরগতও তত বেশী হবে। প্রায় সকল শুকনো বস্তুর পক্ষেই এগুণ প্রযোজ্য। শুকনো তুলার বস্ত্র পশমী বস্ত্রের তুলনায় গরম হয়, যদি উভয় বস্ত্রের বুনানি ও বস্ত্র এক হয়। কিন্তু তুলার বস্ত্র ধোয়ালে পাতলা হয়ে চূড়তা এবং গরম করার ক্ষমতা কমে যায়। অপর পক্ষে, পশমের বস্ত্র ধোয়ালে আরও ঘন হয়, কাজেই গরম করার গুণ বজায় থাকে। তুলা কিংবা সিন্থের চেয়ে পশম অনেক আলগা ভাবে বোনা যায়। আলগা বুনানির ক্ষেত্রে পশমী বস্ত্রে যে সব রক্তের উদ্ভব হয় তাতে বায়ু থাকতে পারে। অল্প জাতীয় পোশাকের চেয়ে পশমী পোশাকে ঘাম শোষিত এবং বাষ্পীভূত হয় অনেক দ্রুত। এই সব

কারণে অল্প জাতীয় বস্ত্রের চেয়ে পশমী বস্ত্র পরলে শীতকালে গরম লাগে। অপর পক্ষে, গ্রীষ্মকালে শরীরের তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে বার করে দেওয়া যায়, ততঃ শরীরের পক্ষে আরামদায়ক। যে সব কারণে তুলা কিংবা সিল্কের পোশাক শীতকালে ব্যবহারের অমুপযোগী, সে সব কারণেই এ সব বস্ত্র পশমী কাপড়ের চেয়ে গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। পশমী পোশাকের চেয়ে এ সব বস্ত্র থেকে শরীরের ঘাম অনেক তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয়।

সাধারণতঃ পোশাক শরীরের তাপ বাইরে অপসারিত হতে এবং বাইরের তাপ শরীরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। উজ্জ্বল ও হালকা রঙের আবরণ বাইরের তাপ প্রতিফলিত করে। কালো রঙের দ্রব্য তাপ শোষণ করে। রোদে থাকলে মাখার কালো চুল গরম হয়ে যায় এবং মাখার খুলিকে বাইরের তাপ থেকে অনেকটা রক্ষা করে। শরীরের কালো রং কিংবা কালো পোশাক বাইরের তাপ শোষণ করে নেয় বলেই তাপ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না। তাপ শোষণ করবার ক্ষমতা কালো রঙের সব চেয়ে বেশী; অপর পক্ষে সাদা রঙের সব চেয়ে কম, কালোর প্রায় অর্ধেক। কালো রঙের তাপ শোষণ ক্ষমতা যদি ১০০ ধরা যায়, তাহলে অমুপাতে অজ্ঞাত রঙের পরিমাণ নিম্নলিখিত সংখ্যায় নির্দেশ করা যেতে পারে।

কালো	১০০
গাঢ় নীল, পাটল, সবুজ	৮৫।১০
ছাই, ধাতব	৮৫।১০
ধাকি, লাল, অ্যালুমিনিয়াম,	
অমুজ্জ্বল পাটল ও নীল	৭০।৭৫
খড়, পনীর প্রভৃতির স্নায় হালকা	৫০।৫৫
সাদা	৪০।৫০

সাদা ও হালকা রঙের পোশাক অধিক তাপ প্রতিফলিত করে গরম কম হয় বলেই গ্রীষ্মকালে পরিধানের উপযোগী। অপর পক্ষে কালো এবং গাঢ় রঙের পোশাক অত্যধিক তাপ শোষণ করে গরম হয়, সেজন্যে শীতকালে ব্যবহারের পক্ষে আরামদায়ক। প্রথম রোদে উত্তপ্ত আবহাওয়ার ঢিলে সাদা পোশাকই সবচেয়ে উপযোগী। টুপির বাইরে কোন গাঢ় রং না হয়ে সাদা হলে, টুপির নীচে মাখার নিকটস্থ বায়ুর তাপ অমুপাতে প্রায় কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহিট কম হতে পারে।

পোশাক এরূপ ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, যেন শীতবস্ত্র পরিধান করলে চামড়ার নিকটস্থ বায়ুর চলাচল কম হয়। কিন্তু তাগলেও নিশ্চিহ্ন পোশাক পরা উচিত নয়, যাতে শরীরের নিকটস্থ বায়ু চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পোশাক পরলে ঘাম হলে শুকাবে না, ভিতরের বস্ত্র ঘামে ভিজে যাবে, বস্ত্রের অন্তরণতাও কমে যাবে এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

যে দেশে স্বর্ষ্যের ভেজ প্রথম, বায়ু শুকনো এবং আবহাওয়ার তাপ সাধারণতঃই শরীরের চেয়ে বেশী, সেখানে ঘামের বাষ্পীভবনই শরীর ঠাণ্ডা হবার একমাত্র উপায়। বায়ু শুকনো হওয়াতে জলীয় বাষ্পের চাপ কম থাকে, কাজেই ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীর ঠাণ্ডা হবার খুব সুবিধা হয়। মকড়মিতে বেহুইনেরা নিজেরদের দেহকে স্বর্ষ্যের তাপ ও বড় থেকে রক্ষা করবার জন্যে হালকা রঙের মোটা আলখালা পরে। শরীরের খুব কম অংশই উন্মুক্ত থাকে। এই পোশাক সমূহ বাস্প ঘেরিয়ে বাবার উপযুক্ত ছিদ্র থাকে। এরূপ পোশাকের যত্ন

## প্রাণতোষ ঘটক রচিত

### বাসক সজ্জিকা

“একখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের ‘বাসকসজ্জিকা’। লেখক যদিও উপভাস রচনা করেই পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত হয়েছেন, তবু এই সঙ্কলন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃত-পক্ষে ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পের ভাষা বেশ স্নদয়গ্রাহী ও ব্যঙ্গনাময়। এবং সুন্দরসের পরিবেশন-পরিমিতির ফলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পর্যায়ের পৌছেছে।”—আনন্দবাজার পত্রিকা। মাত্র এগু বোব প্রকাশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

### মুক্তাভাস

“There is no false idealisation, no cheap dip into smutty episodes. The work shows some planning and purpose. For it is a frank exposure of a private way of life that has no justification for its continuance and the writer has wisely left the tale to be wound up by a remorseless nemesis.” —Amritabazar Patrika. প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### \* রত্নমালা \*

“এখানি সমার্থাভিধান। ইংরেজীতে বলা হয় Synonym-এর অভিধান। বাংলা ভাষায় এ রকম অভিধান আর নেই। বীদেব লেখা অভিধান তাদের পক্ষে এ জাতীয় একখানি সিনোনিমের অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দচয়নে বড়ই সুবিধা। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেও খুবই প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। প্রাণতোষ সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা বহু অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের বই বেঁচে অনেক পরিশ্রম করে শব্দগুলি সংকলন করেছেন। এ বইয়ের যথাযোগ্য আদর অবশ্যই হবে।”—যুগান্তর। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি: কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

### আকাশ-পাতাল

“Those who will probe deep into the antiquities of Calcutta will come across many such episodes. It is with unique delicacy, singular honesty and charming simplicity that the noted author presents in an original way an old episode—a tragic one.” —Amritabazar Patrika গত কয়েক বছরে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রায় চার হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি: কলিকাতা-৭। মূল্য ১ম পাঁচ টাকা ও ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা।

### কলকাতার পঞ্চমাট

“আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিষ্ময়প্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রন্থনও করেছেন অপরূপ শিরকুশলতার সঙ্গে।”—আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি: কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।



আলোকনেই যথেষ্ট বায়ু চলাচল হয়, কাজেই শরীর থেকে দ্রুত বাষ্পীভবনে কোন বাধা থাকে না।

শীতকালে হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও খুবই অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু শরীরের এই সব প্রান্তভাগে অতিরিক্ত গরম পোশাক চাপিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায় না। অত্যধিক ঠাণ্ডার দেহের উত্তাপের অপচয় যাতে না হয়, সে কারণে প্রান্ত-ভাগে রক্ত চলাচল অনেক কমে যায়। এ অবস্থায় শরীরের ভিতর থেকে প্রান্তভাগে খুব কম তাপই পরিবাহিত হয়। দেহের ভিতর থেকেই হাত-পা গরম করবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশ্রম করে শরীরের উত্তাপ বাড়ালে যথেষ্ট রক্ত চলাচল হয়ে হাত-পা গরম হবে। প্রায় সব অবস্থাতেই মাথা উত্তপ্ত থাকবার মত যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ হয়। সাধারণতঃ মানুষ ভ্রম বশতঃ মনে করে যে, মাথা ও মুখ উত্তপ্ত থাকতে এদের আর কোন আবরণের দরকার নেই। কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়ার দরুন এদেরই ঢাকা দরকার। বস্ত্রতঃ শীত-কালে ঠাণ্ডা হাত-পার চেয়ে উষ্ণ মাথা থেকেই অধিকতর তাপ নির্গত হয়। শিবদ্রাণ অপসারিত করলে পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

যুদ্ধের সময় নানা দেশে বিভিন্ন আবহাওয়ায় সৈন্য পাঠাবার সময় পোশাক পরিকল্পনা সত্ত্বেও অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়, প্রতিবেশ অনুযায়ী বস্ত্র তৈরীর জন্তে। কেবল পরিকল্পনা নয়, বিভিন্ন প্রতিবেশে যাতে বস্ত্র লোকসান না হয় সে সত্ত্বেও উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। পশমী মোজার সঙ্কটন নিবারণ করবার উপায় আবিষ্কার করতে পারলেও অনেক টাকা বাঁচানো যায়।

আঙুন, নানাপ্রকার গ্যাস প্রভৃতি থেকে রক্ষা করবার জন্তেও নানাপ্রকার পোশাক তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পোশাকের পরিকল্পনা যত বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা বাবে, মানুষের জীবন-যাত্রা তত আরামদায়ক হবে।

—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন।

## চাকরি রদবদলের সমস্যা

বর্তমান সমাজ-কাঠামোতে একটি কোন চাকরি জুটতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। বেকার-সমস্যা সর্বত্র দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় নতুন করে আর একটি চাকরি মিলবে, সাধারণ ক্ষেত্রে এই আশা সূর্যপরাহত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—যে চাকরিটি পাওয়া গেল, সর্বাবস্থায় তাতেই কি সুখী থাকতে হবে শেষ অবধি?

চাকরি-জীবীর ক্ষেত্রে এইটি সত্যই একটি জটিল সমস্যা যখন অপর কোন নতুন চাকরি পাওয়ার প্রশ্ন উঠে। কত যুবকের কর্তৃত্বজীবনেই এক-দুইবার এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। সহজ কথায় সমস্যাটি হ'ল—যে চাকরিতে রয়েছি, তা আদৌ ছাড়ব কি না এবং একই সঙ্গে যে চাকরির সন্ধান এসেছে সেটি গ্রহণ নিরাপদ ও সম্ভব হবে কিনা। প্রথম দফা চাকরি খুঁজে পাওয়ার চেয়ে চাকরির এই রদবদলের প্রশ্নটি নিশ্চয়ই কম কঠিন নহে। কেন না, পুরানো কাজ ছেড়ে একটি নতুন কাজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত, সমস্ত জীবন-ব্যাপী এর পরিণাম ভুগতে হবে, ভালই হোক, আর মন্দই হোক।

বলা হয়—যে, জীবনে দারিদ্র্য বেথানে কম রয়েছে কিংবা বয়স তখনও খুব বেশী হয়ে যায় নি, সেক্ষেত্রে সব বকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই লাগতে পারে—একটা চাকরি ছেড়েও নতুন চাকরির খুঁকি

লওয়া যায় অনেকটা সাহস করেই। আর এ ধরনের খুঁকি নেবার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ যদি যুবপ্রাণে না দেখা গেল, তবে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব? অবশ্য জীবনের প্রারম্ভেই সাংসারিক দায় ও দায়িত্ব যদি খুব বেশীরকম জড়িয়ে পড়তে হয়, বর্তমানকে ছেড়ে যখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরীক্ষার চিন্তাই সম্ভব নহে—সেই অবস্থায় চাকরি রদবদলের প্রশ্ন নেহাৎ অবাস্তব। এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি যে কাজে আছেন, আঁকড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, নতুন সে হতই রত্নী হোক, 'লোভনীর হোক—দুঃখের হলেও তাঁর কাছে সেইটি বৃষ্টি পরিতাজ্য।

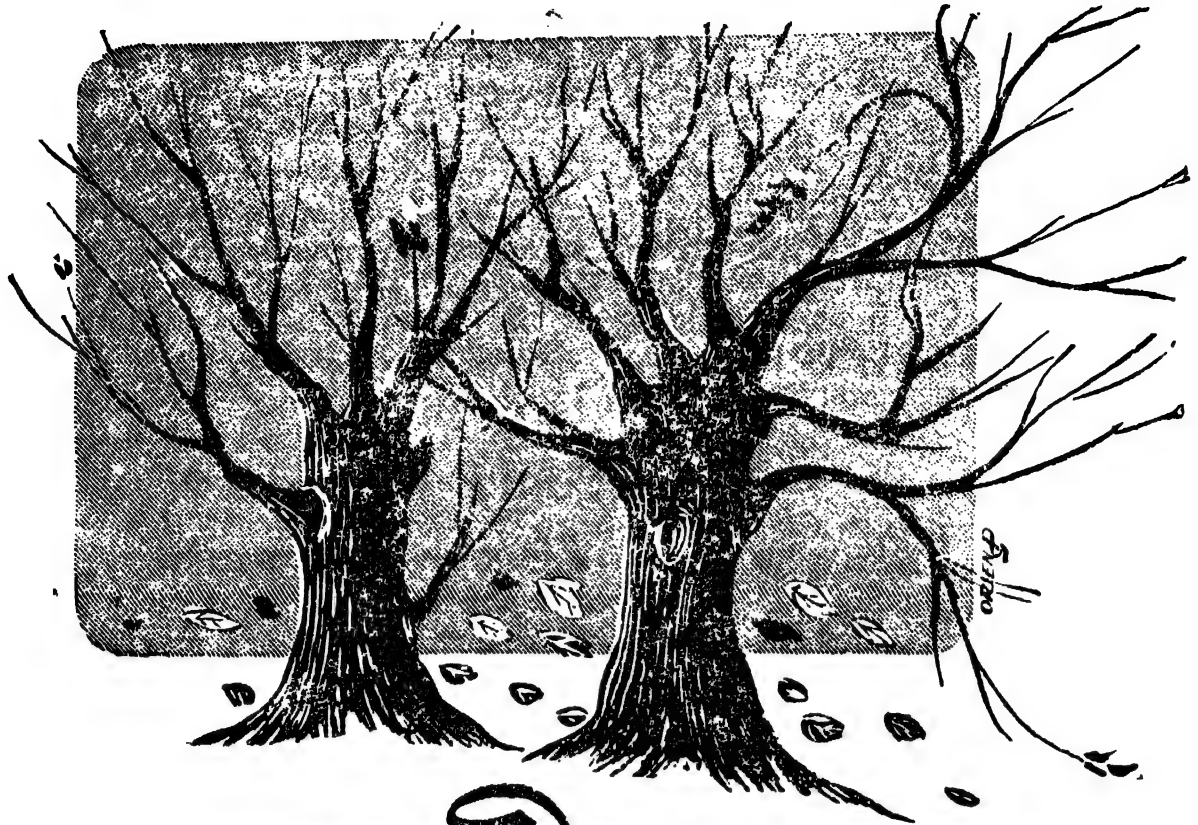
অনেক ক্ষেত্রেই জীবনে দুইটি সন্ধিক্ষণ এসে দেখা দেয়—যে সময় প্রত্যাশিত উন্নতির ঋতিরে নতুন কোন কর্তৃক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া অত্যাশঙ্কক হয়ে উঠে। একটি সন্ধিক্ষণ হচ্ছে—বয়স যখন কম থাকে এবং মনে থাকে নিজকে এবং পরিবারবর্গকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ়তা। দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ—যখন কর্তৃজীবন প্রায় শেষ হয়ে আসছে এবং পরিবারেরও নিশ্চিত উন্নতির হয়েছে বাবস্থা। এইটি বয়স জোর দিয়ে বলা যায়—আধিক দায়িত্ব যদি খুব বেশী না রইল এবং বয়সও না পার হয়ে গেল যৌবনের কোঠা, সেই ক্ষেত্রে একটি কাজ ছেড়ে ভাল হবে মনে করলে নতুন কোন কাজের খুঁকি নিতে আপত্তি নেই। চাকরির এই রদবদলের মুহূর্তে নিম্নোক্ত তিনটি জরুরী প্ত্র মনে রাখা বোধ হয় সমীচীন হবে:

(১) চাকরির লাইন পান্টনি কিংবা নতুন কাজ গ্রহণের প্রশ্ন যখনই আসবে, কাজে যাবার পূর্বেই অবসর সময়ে জেনে নিতে হবে কোন স্তরে কাজটা আসলে কি এবং কতটা উন্নতির সেখানে সম্ভাবনা। অর্থাৎ একটি কাজে ইন্তফা দিয়ে অপর কাজেই যাবার মুহূর্তে সন্দেহ ও দ্বিধার যেন খুব বেশী অবকাশ না থাকে, সেইটিরই এখানে দাবী।

(২) মনের পূর্বোক্ত প্রস্তুতি ছাড়াও আলোচ্য অবস্থায় আর একটি জিনিসের প্রয়োজন আছে। নতুন যে চাকরির সন্ধান করা হচ্ছে সেইটি পাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে হাতের কাজটি ছেড়ে দেওয়া মোটেই সম্ভব হবে না।

(৩) এখনকার কাজের ক্ষেত্রে যিনি 'বসু' বা উপরিওরাল, সুযোগ খুঁজে তাঁকে নতুন চাকরিতে যাবার বিষয় বলা অনেকক্ষেত্রে ভাল। কারণ সেক্ষেত্রে কর্তৃপ্রার্থীর উজোগীপণায় তিনি সুখী হবেন এবং তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়ক হিসেবে তিনি তাকে যেছায়া তুলে দিবেন একটি উপযুক্ত সুপারিশ পত্র।

অবশ্য একটি কথা থেকে যায় এর ভিতর—যে কাজ এখন রয়েছে সেইটি যদি মনোমত হয় এবং উন্নতির সুযোগ ও সম্ভাবনাও থেকে থাকে সেখানে, সেইক্ষেত্রে চাকরি রদবদলের প্রশ্ন উঠে না। যে যে কাজে সক্ষম কিংবা যে কাজের উপযোগী সে-কাজটি জুটে না যাওয়া পর্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরাফেরা করতেই হবে। একবার উপযুক্ত কাজ হাতে এসে গেলেই এবং কাজের অবস্থা-ব্যবস্থা ও মাস মাহীনা যদি অনুরূপ হলো, তা হ'লেই আর ততখানি ভাবনা নেই। মোটের উপর, চাকরির রদবদলটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে জীবনে উন্নতির প্রশ্ন এবং মনের মত ও যোগ্যতা অনুরূপ কাজ পাওয়া। অপর দিকে রদবদলের প্রশ্ন যখনই সামনে এসে পড়াবে, তখন চাই—স্থির চিন্তা চিন্তা ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং খুঁকি নেবার মতো শক্ত মনোবল।



# বেচারা....

লতাপাতা শূণ্য বৃক্ষ যেমন দেখিতে ভাল লাগে না,  
বিবাহের ব্যাপারেও তেমনি কষ্টা যতই  
গুণবতী, স্বাস্থ্যবতী ও ফরসা রংয়ের হউক না কেন  
কেশের অপ্রাচুর্যে কপালের প্রসারতা দেখিয়া যাহারা  
কষ্টা দেখিতে আসেন, একবার দেখিয়া আর  
পুনরায় কথাবার্তা উত্থাপন করেন না।

কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়—  
কে, এম, পি, (K.M.P.) মার্ক খাঁটি নারিকেল তৈল  
যাহারা একবার গৃহে প্রচলন করিয়াছেন তাহারা  
একরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েন নাই।



## কে, এম, পি

মার্ক

### খাঁটি নারিকেল তৈল

এখন

১ পাঃ ২ পাঃ ৫ পাঃ সুদৃশ্য  
ছাপান টিনে সম্ভ্রান্ত ডিলারের  
নিকট পাওয়া যাইবে।

## পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্

১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রট,

কলিকাতা-৭ : Phone : 34-3414



### বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য

পিছুকে তোরভূমি ফেলে-আসা নদীর মতো অস্পষ্ট অতীতকে কবে যে মন থেকে প্রাণ মুছে ফেলে বসেছিলাম। নিজেই জানি না। দেশ ছেড়ে কোলকাতার মোহানায় এসে আশ্রয় নিয়েছি; স্বাভাবিক প্রায় শেষ। তবে মনটা নাকি প্লেট নয় যে সব কিছু সময়ের জল বুলুনিতে ধুয়ে-ধুছে সাফ হয়ে যাবে, তাই যতোই কেন জীবনের লড়াই, বাস্তবতার ঝড়ে বিক্ষিপ্ত থাকি না,—মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ানো মুহূর্তে, চোখের সামনে স্মৃতির রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে—দেশ গ্রাম; শৈশব থেকে পনরটা সবুজ সতেজ ভোরে মতো বছর। মনে পড়েছে পটুয়াখালি, আঙ্গারিয়া নদী। ক্ষণিক যদিও। তার পরই জলপ্রপাতের টানের আগুতার মধ্যে আসা কুটোর মতো ঝামেলা, ঝঙ্কাট, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, রুজি-রোজগার, সংসারের ঘূর্ণি কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অতীত রোমহর্ষনের বিলাস। তুলিয়ে দিয়েছে অনবসরের অন্তরে। হয়তো এমন ভাবে আর কখনো সে সব দিনের তার পাত্র-পাত্রী নিয়ে—কাল্পনিক পুনরভিনয় চাকুরি দেখার সময় পেতাম না এ জীবনে। কখনোও না। যদি না পূর্বর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতো হাওড়া স্টেশনের বাস্তবতার অপরিচ্ছন্ন স্রটলয়।

কতো দিন হ'য়ে গেলো; আজ থেকে পনরটা বছরের মাইলপোষ্ট গুলে গুলে উজান বেয়ে গেলে দেখতে পাই—আর পাঁচজন পূর্ববঙ্গের ছেলের মতো বরিশালের পটুয়াখালি হুল থেকে ম্যাট্রিকের বেড়া ডিলিয়ে কোলকাতায় এসেছি উচ্চশিক্ষার আশায়। দেশে জমি-জমা—চাষ-বাস, সুপরি-নারকেলের ব্যবসার ওপর জ্যাঠা মশাইয়ের কবিরাজী। নির্বিশ্ব-নিশ্চিন্ত। মাসের প্রথম সপ্তাহেই বরাদ্দ টাকা এসে যায়। না এলে কোলকাতায় ব্যবসা-করা দেশের লোকের গদী থেকে ইচ্ছে মতো হাওলাত।

আর যেদিন এলো! হু-একজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রেস্তোরাঁয় প্রাণভরে আহার-নির্ধাত করুণী। এখন মনে করলে চোখে জল টল-টল ক'রে এসে পড়া সে সব সোনালী দিন ভালো লাগে, খারাপও। এ সব দিন যে কখনো আসবেই নয়, এমন অবস্থা যে থাকতে পারে তাই ভাবা যায়নি কখনো। আমার বাবা ছিলেন না জানতেই পারিনি কোনো দিন, এমন জ্যাঠামশাই ছিলেন। অপূত্রক তিনি। বুক দিয়ে শুধু বিশ্ব-সম্পত্তিই রক্ষা করেন নি। আমাদের ভালোবেসেছেম সিন্দুরা সত্যকম হলো! উনিশশো বিয়ানিশ সাল থেকে সাতচল্লিশ

সাল পর্যন্ত নাকি কুগ্রহের দৃষ্টি ছিলো ভারতের ওপর। বৃদ্ধ হুর্ভিস বজ্রা, মহামারী মড়ক আর দাদার ছাবখার করেছে সে দৃষ্টি—আমাদের বেলার কিন্তু তা নয়, বিয়ানিশ সাল থেকে চিরকাল,—চিরকাল দুর্দিন। মানুষ তো তাঁ বোঝে না!

বৃদ্ধের হিড়িকেই বলতে হবে তেতাল্লিশ সালে আরো শিক্ষার আশা ত্যাগ ক'রে এক সওদাগরী দপ্তরে চাকরি পেয়ে ভেবেছিলাম প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হাতের মুঠোর। কিন্তু জলে-ডোবা অবস্থায় ষড়কুটোর মতো চাকরিকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তখন কে জানতো! প্রথম খান্কা জ্যাঠা মশাইয়ের হঠাৎ স্বত্বসম্পন্ন বন্ধ হওয়া। দাবিদারী কি জিনিস বুঝলাম।

তবু হয়তো চলে যেতো যা হোক ক'রে। হ'লো দেশভাগ, আর তার কিছুদিন পরেই সর্বনাশা পঞ্চাশের বরিশাল হত্যাকাণ্ড।

কয়েক দিনের লোহার পদা ভেদ ক'রে কোনো খবর আসে না বরিশালের বাইরে। দৈনিক কাগজে ছিটকে বেরিয়ে আসা খবরে নিজের গ্রামের হত্যাকাণ্ডের হুং-বাব পড়ি। চেনা-শোনা পাড়ার লোকের হত্যার সংবাদে শিউরে শিউরে উঠি। সব বুঝি যায়। গেলোও। অবস্থা দেখে নিজের মৃত্যুকামনাই প্রেরণ মনে হলো। মা জ্যাঠাইমা, ভাই-বোনেদের এ রকম দেখতে হবে জীবদ্দশায়? লজ্জার অপমানে পরিজ্ঞাপ উপায় হীনতার দিশেহারা হ'য়ে গেলাম। তবু শেরালদা স্টেশনের আশ্রয়প্রার্থীদের দীন জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন ভীড় থেকে ওদের চিনে বার করতে হলো একদিন। বুকফাটা কান্না শুনে হ'লো, আর হতাশ হয়ে দেখতে হ'লো—ক'দিনেই আমরা পথের ভিখিরী ছাড়া কিছু নই। সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে শুধু মাত্র প্রাণ নিয়ে একবস্ত্রে ওরা পালিয়ে এসেছে।

চাকরিটুকু সম্বল। থাকি মেসে। বুক ফেটে গেলেও প্রথম কয়েক মাস ওদের ধুলিয়া ক্যাম্পে রাখতেই হ'লো সরকারী আশ্রয়ে। তার পর থেকে ভাণ্ডার নজে অবিশ্রাম আপোহীন সংগ্রাম।—আজো চলছে।

একে হুং-হুর্দশায় মানুষের সংগ্রাম-শক্তি বেড়ে যায়, তার ওপর পূর্ববঙ্গের আমরা প্রাকৃতিক নানান বিরূপতার সঙ্গে শান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্তেই বোধ হয় কিছুটা সহজাত সহন আর সংগ্রাম-শক্তির অধিকারী। তাই বাঁচালো। ঘীরে ঘীরে ভাইয়ের চাকরি হওয়ার পর কোলকাতায় বাসা করতে পারলাম একটা মাথা গাঁজার মতো। ওদিকে বেশ কিছুদিন এতদারসন হাউসে থাকা দিয়ে দিয়ে কোরগরের কাছে একটু জমি সাহায্য পেলাম। কিছু স্বপণও। প্রাণপণ ক'রে একটা টিনের চালাওলা তিন ঘরের কুঁড়ে খাড়া করেছি আজ।

অকিসে স্বপ্নের পাহাড়। তাতেও শেষ হয় না। এমাসে এটা করি তো ওমাসে ওটা। কোনো মাসে ক্রো, কোনো মাসে বা দরজা-জানলার রঙ। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত কোলকাতার অকিস বজায়। কিন্তু স্বভাব কোথায় বাবে!

এ সবে মধ্যও সাপের মুখে খানকা ব্যাঙের পোকা ধ'বে খাওয়ার মতো, এই অবস্থাতেও বিয়ে করে বসেছি লক্ষী ছেলের মতো। বিয়ে না, সর্বনাশ ক'রেছি বলাই ভালো বোধ হয়। সর্ব দিক থেকে নিরুপায়িততার নাগপাশের বেড়ে নিজেকে বেঁধেছি আটপেঁপে।

আগেকার দিন ভাবার সময় কই? কোথায় মনে পড়ানোর মতো মন?

কেনো দিন কখনো এমন ক'রে মনে পড়ত না, যদি না পূর্ণর সঙ্গে ঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতো হাওড়া ট্রেনের চিড়িয়াখানার জন্তদের মতো পঁজরে পঁজরে ক'রে ভাগ ক'রে রাঁধা আশ্রয়প্রার্থীদের দীন-জীর্ণ নপরিচ্ছন্ন জটলায়।

আমি ওদিকে চাইতাম না। সে দৃষ্টে বৃকে মোচড় দিতো নার চোখ কেটে জল আসতে চাইতো ব'লে প্রায় চোখ-কান ঝুঁক ক'রে হাওড়া শেরালদা ট্রেনের দলা পাকানো পাকানো নারায় চরম দূর্দশাগ্রস্ত জটলা পার হ'য়ে যেতাম! কোন দিনও চাইতাম না।

শনিবারের বারবেলায় আর এক চরম থাকা ছিলো কপালে। গাইতেই হ'লো। কামেলা কি এক রকম? রেলের মাসিক টিকিটটা ভুলে এসে ফেরার সময় টিকেট কেনার জন্তে থার্ড ক্লাশ টিকেট-জানলার কাছে যদি না ঝাঁড়াতে হ'তো, তা হ'লে লেখাই হ'তো না এ কাহিনী আর আমার মনেও পড়তো না পুরোন ফেরার দিন। হয়তো ভবিষ্যৎ। তা না হ'লে এই সমস্ত কার্যকারণ সংঘটিত হবেই বা কেন?

বেশ কিছু গরচা মনে ক'রে যুখে-চোখে যথাসম্ভব বিরক্তির পোঁচ নাগিয়ে ঝাঁড়িয়েছিলাম টিকেট কাটতে চাওয়া জনতার আঁকাবাঁকা গাইখুন-লাইনে।

—মেগো নিমাই না?

কী বেন ভাবছিলাম অন্তমনস্ক হ'য়ে। হয়তো ক্রোর পাড় সাগাবার কথা। চমকে উঠলাম। দমকা হাওয়ায় বইয়ের অনেকগুলো পাতা উটে গোড়ার দিকে চলে বাওয়ার মতো এক ডাকে ফিরে গেলাম বৌবন-প্রভাতের সোনালী সবুজ দিনে।

—নিমাই না! তাই ক', ঠিক চিন্হি!

অতি পরিচিত গলা। একটু হকচকানি, বিষ্ময়, তারপরই ঠাৎ পরিচয়ের বিদ্যায় চমকে উঠতে দেখলাম আমার যুখে, বানসিক দৃষ্টিতে।

—আরে, পূর্ণ?

কী আশ্চর্য! পটুয়াখালির বিখ্যাত ধনী নিতাই সাহার নাতি। প্রায়-রাজা জীবন সাহার আত্ময়ে হুলাল আমার বালাবন্ধু প্রিন্স পূর্ণ গাহাকে দেখছি? ঠিক তো? আমার দোষ ছিলো না। কেনা সহজ নয়। প্রায়ের সব থেকে সৌখিন—প্রায়-রাজপুত্র—পূর্ণ?

জীর্ণ মলিন বস্ত্রে অপরিচ্ছন্ন জিরঞ্জিরে স্বাস্থ্যের—পূর্ণ একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে ঝাঁড়িয়ে টিকেট কাটতে চাওয়াদের কাছে ভিক্ষে করছিলো এক যুহুর্ন্ত আগের দেখেছি। চিনতে পারিনি। পারার কথাও নয়। নিজেই পরিচয় দিলো আর লজ্জিত হ'লো না পূর্ণ।

—হ রে, সেই পূর্ণ! তোর আর দোষ কি? চেনে পায়র মতো আঁহ কী কিছু? সত্য! ভূইও বদলাইছো, সহজে চেনে পায়র নয়!

—এ কি অবস্থা তোর? কী কইরগা এ্যাম্ হইলো রে পূর্ণ? আমরা পূর্ববঙ্গের দেশের লোকের কাছে দেশের ভাষা বলি। না বললে, বাক-বিজ্ঞাপন পাত্র, তিরস্কৃত হই। আমার এ প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিলো না বুঝলাম।

আমার চোখ-যুখের অবস্থা দেখে পূর্ণ নিজেই নিজের কথা বলার ব্রত বৈধী হ'য়ে গিছলো ওরি মধ্যে। নিচুতে ওড়া-উড়া জাহাজ

থেকে দেখা ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, শহর গ্রামের মতো সমস্ত দেশের জীবনটা এক লহমায় চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যায় গতিতে তার সমস্ত দৃশ্যপট নিয়ে স'রে স'রে চলে গেলো—।

পাঠশালা থেকে স্থল।

আজারিয়া নদীতে ওদের নৌকয় দুপূর্ব-বিকেল কবা থেকে, পূর্ণর বিয়ের পর অন্তর্গা বৌদি, আমি আর পূর্ণর দীর্ঘ দুপূর্ব ওদের বাড়ির পেছন দিকের পূর্ণর পড়ার ঘরে কাটানো পর্যন্ত—

সম্পদ আর আনন্দানুভূতি মাছুর চেপে বেখে স্তম্ভ পায় না বোধ হয়। অন্তত দেখানো চাই। তার ওপর এখনকার হিসেবে বাংলা-কালেই বিয়ে হওয়ার কি না জানি না, পূর্ণ তার স্ত্রীকে ভালোবাসার প্রদর্শনী, আদর সোহাগের সাক্ষী রাখতো আমাকে। দেখিয়ে দেখিয়ে আদর ক'রে আমাকেই লজ্জায় ফেলতো। প্রথম প্রথম লজ্জায় লাস হ'য়ে আপত্তি করতো অন্তর্গা বৌদি; স'রে স'রে যেতো—। শেষে নিরুপায় হ'য়েই ঘরে বাসা করা চড়ুই পাখির মতো আমাকে লজ্জা অশ্রয়োজনীয় মনে ক'রে পূর্ণর কাঁধে মাথা রেখে আদর খেতো চেখে চেখে, আর সলজ্জ তৃপ্তির হাসিতে উছলে উঠতো।—এক লহমায় সমস্ত ভেসে ভেসে, ফুটে ফুটে উঠলো শ্রুতি থেকে মানসিক চোখে, জলছবির মতো—।

—কী সর্বনাশ হইলো তাই তাস্, ভাগ হইয়া! আমাগো দেশ গায়ে আমরা বিদেশী?

পশ্চিমবঙ্গ হোমিও স্টেট ফ্যাকালটির ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট,  
বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ইন্সটিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট,  
আন্তাত্য হোমিও কলেজের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রিন্সিপাল  
ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, এইচ-এম-বি প্রণীত

## কয়েকখানি অতুলনীয় পুস্তক

(৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত)

### ১। শিশুরোগ চিকিৎসা। পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ ৬০ পৃঃ—৫৫০

উদরাময়, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, কলেরা প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রাদির পীড়া—ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—জ্বা, হাম, বসন্ত, ডিফথেরিয়া, তপিকফ, ক্রিমি, মেনিনজাইটিস, চক্ষুরোগ প্রভৃতি সাধারণ পীড়া—জ্বাতি, রিকটস্ ম্যারাসম্যাস্ প্রভৃতি শিশুদের বিশিষ্ট পীড়াসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ও চিকিৎসা অতি স্পষ্টর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা দ্বারা উক্ত প্রশংসিত।

### ২। কলেরা, হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ১৮২ পৃঃ—২৫০

### ৩। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ— ৩৯৪ পৃঃ—৩৫০

Late Dr. Sarat Chandra Ghose M.D., M.R.S.L (Lond.)

"You have dealt with the diseases of females and their Homœopathic treatment in a masterly way; the symptomatic indications of remedies are simply wonderful. Your book bears the stamp of being written by one who is a thorough master of the subjects dealt with...."

প্রকাশক—গুপ্তাকার হোমিও হল, ১২৮১, বোম্বাইয়ার স্ট্রীট, কলি:

চমক ভাঙ্গলো পূর্বর আত্মকাহিনীর ভূমিকায়।

একটা শালা কাগজে কলমের আঁচড়ে দেশভাগ স্বীকৃত হ'লো। সেই আঁচড় যে হাজার হাজার মানুষের ফুসফুস ছুটোকে হুভাগ করে দেয়ার আঁচড় হ'লো তা কেউ ভেবে দেখেনি বৃহত্তর স্বার্থের মোহ আর মহিমায়।

—নানান বিপদ-আপদ, ক্ষয়-ক্ষতি, অপমান লাঞ্ছনা সহ কইর'গাও পৈতৃক মুখিমানার দোকান্দা আঁকড়াইয়া পইড়'গা ছিলাম পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত। বাবার জ্ঞানাত্তো? ঠাকুরদার অতো সম্পত্তি কপূর্বের মতো উড়াইয়া দিলেন মদ আর মাইয়া মাহুয়ে! তেজামতি কাগবার গাংলো। গ্রামে দোকান, তাও ছাইড'গা আইথে হইলো। দাদার প্রাণত্যাগ যাইতো, কোনোক্রমে পলাই বাচা—। বাবা কিছু আয়ন নাই, তাঁর রক্ষিতার বাড়িতে দাদার বলি হইলেন।

কিছু না হইলেও লোকান, বাড়ি, জমি, বাগান, পুথির লইয়াও ছাব পর্যন্তও বড়লোকই ছিলাম বে! আর আইজ জাখছো? ভিখারী! পূর্ব চোখ ছল-তল ক'রে উঠলো।

সত্যিই! আশ্চর্য! কয়েক বছর আগের দেখা এক প্রায়-রাজপুত্রকে আজ ছেলের হাত ধ'রে প্রকৃতই ভিক্ষে করতে দেখেও যতোটা আঘাত পাবার কথা, যেন পেলাম না। গা সওয়া হ'য়ে গেছে সব। কোনো পরিবর্তনই পরিবর্তন নয়। আশ্চর্য হই না কিছুতেই। সবই সম্ভব—স্বাভাবিক। সমস্ত।

—হ, তোর বাবার নাম নিহত লোকের লিঙ্কিতে উঠছিলো, দেখছিলাম। তোগো কতো খোঁজ করছি; হমিশ পাই নাই। কোথায় ছিল ক'দেশি?

পূর্ণ আমার পথের সকলের জানা—চরম হৃদ'শা আর লাঞ্ছনা'র কথা শোনালো এক নিঃশ্বাসে।

—জাবে নিঃশ্বাস রক্ত অবস্থার উড়িয়ায়। সেখানে কী আমরা থাকতে পারি ভাই? কষ্টের অবধি ছিলো না। মা আর তোর বৌঠানের চেহারা দেখবি চল না! কইয়া নিলেও চেন্বে পারবি না।

—তার পর?

—তার পর আর কি। ভারসাম হৃদ'শা আর কতো হইতে পারে। বাগলা জাশে বায়ুই। এখানে হয়তো একটা ব্যবসা-টাবসা খাড়া করতে পারমু স্বঃবাগ পাইলে। তাই ফিরতি একটা দলে গা ভাসাইয়া দিয়া শিলালদার বদলে হাওড়া ট্রেনের নবকভোগ করতে লাগছি। এবার তোর খবর ক'; তোগো সকলে—

বললাম সমস্ত।

—বাঃ! তুই তো কাজ গুছাইয়া লইছো। বিয়াও করছো? বাঃ! দে না ভাই একটা জমি, কিছু বাড়ি আর ব্যবসার লোনের ব্যবস্থা কইর'গা। তোর তো সব চেনা-জানা। আর তো কিছু হইব না। লাখা-পড়াগও তখন পুরা করলাম না।

পূর্ণ হুঃখ করলো।

—আয়, ওরা সব ঐ ঘোড়াটার মধ্যে সংসার পাতছে।

না গেলেই ভালো করতাম। পুরোন সমস্ত ছবি ওলটপালট হ'য়ে গেলো—সমস্ত রক্তন ছবি। অন্নপূর্ণা বৌদি আর পূর্ণর মার চেহারা! সমস্তই চরম দারিদ্র বাহুগ্রস্ত। কেন গেলাম?

নোংরা, হুগুং আর অবাধ্যকর জটলার প্রায় ওপর দিয়ে যেতে

যেতে থমকে ঝাঁড়ালাম। পূর্ণ এগিয়ে গিয়ে ওর মাকে বলছিলো—দূর থেকে দেখলাম। একটা জীর্ণ শতছিন্ন বস্ত্রাবৃত্তা কণ্ঠা মহিলা তাই শুনে এদিকে চেয়েই এমন ভীষণ ভর পেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে বসলেন মাথার কাপড় টেনে। কলে তাঁর অনেকখানি ছেঁড়া ভ্রামার ফাঁক দিয়ে পিঠটা অবনত হ'লো, আর কাপড়ের ছেঁড়া গর্ত নিয়ে নোংরাগট খোঁপাটা বেরিয়ে পড়ল। বলা ছিলো বলেই চিনতে তুল হ'লো না।

অন্নপূর্ণা বৌদি! একি দেখছি?

পূর্ণর মা বেহা'র বাইরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। মন্দভাগ্য হুঃখ-হৃদ'শার কথা। পুরোন জড়োয়া ঝিকি-ঝিকি দিনের সঙ্গে তুলনা ক'রে ক'রে, কেঁদে কেঁদে ব'লে গেলেন। মাথা নিচু ক'রে শুনলাম। শেষে অনেক আশীর্বাদ ক'রে পূর্ণর মতোই কিছু ব্যবস্থা বন্দোবস্তের কথা বললেন।

দু-তিন বার পেড়াপেড়ি করেও অন্নপূর্ণা বৌদিকে জানতে পারলো না পূর্ণ।

—সর শরীফটা খাবাপ কইরেছে! আইচ্ছা, পরে তাকা করিস।

পূর্ণ কৈফিয়ৎ তৈরী ক'রে দিলো। জানতাম উনি সহজে আসবেন না। ব্যাপারটা উপলব্ধি ক'রে, যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিক্রিয়া দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্তে উদ্বাদ হ'য়ে উঠলাম যেন। আমরা দৈনিক যাত্রীরা, একটা ট্রেন ফসকে পনের মিনিট দেরী হওয়া'কে রাজস্ব বাওরার সামিল মনে ক'রে থাকি।

ট্রেনটা ফসকাতে চাইলাম না। সোমবার সকালে এসে আবার দেখা করব ব'লে—পকেট টিপে ধ'রে দৌড় দিলাম আর পাঁচ জন ডেলিপাসেজারের মতোই।

ট্রেন চাডলো। আর মুহুর ধারে পুরোন দিনের বুট্টি এসে গেলো, মনের য'থা লোকজন, রেলপথ, বাইরের বিচিত্র প্রকৃতি সমস্তকে ঝাপসা ক'রে দিয়ে। অনেক—অনেক দিন পরে দেশের প্রতিটি দিনের দৃশ্যের পুনরভিনয় হতে থাকলো একের পর এক। স্মৃতি সমস্ত দিনগুলোর ওপর দিয়ে ধীর লঘুপায়ে হেঁটে এলো।

অনেক পুরোন দিন। জ্যাঠামশাই তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। একদিন ডাক এলো নিতাই সাহার কাছ থেকে। অগাধ সম্পত্তির মালিক—দশটা গায়েব সব সেবা ধনী নিতাই সাহা। মুখিমানা, মদের দোকানের ওপর বন্ধকী ভেজারতি করবার একা জ্যাঠামশাই নন। ওর পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম পঞ্চায়েৎ।

গ্রামের সমস্ত তিন মাথাওলাদের ডাক দিয়েছে মুহুর্ নিতাই সাহা।

চরিতা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আখশোয়া অবস্থার নিতাই সাহা প্রথমত পূর্ণ আর একজন কর্মচারীকে মাথার কাছের বিরাট সিন্দুকটা খুলতে বললেন। হুঃ যেন ছারিকেনের কল ঘুরিয়ে জোয়াশে আলোর সৃষ্টি করল। সিন্দুক ভর্তি সোনা রূপো জড়োয়ার গয়না। নিতাই সাহার নির্দেশে কর্মচারীটি কোন গ্রামের কার কী গয়না কতো টাকায় বাঁধা আছে ঘোষণা ক'রে গেলো তালিকা দেখে দেখে। সমস্ত হিসেব দাখিল ক'রে নিতাই সাহা বলল—আপনার গেরামের মাথারা জানেন আমার গোলা উড়নচণ্ডী মাতাল। আমার দিন ফুরাইয়া আইছে। চক্ষু বোজলেই ও সমস্ত ঘুরাইয়া উড়াইয়া



সকলকে পথে বসাইবে। সংসারতা ভাইসা যাতে না যায় তার জন্তই আপনাপনো হিসাব কইরগা সমস্ত সম্পত্তি আর পূর্ণের জিন্মা কইরগা দিলাম। জাখফেন ঠাকুরমশায়! জাখফেন আপনাপন।

তারপরও বুড়ো বেঁচেছিলো কিছুদিন। বড় ইচ্ছে পূর্বর বিয়ে দেখার। নাতবোয়ের মুখ দেখে মরার শেষ বাসনা। সে সব দিনগুলো জুলবে না কোনদিন। ঘর আলো করা বৌ নিয়ে পূর্ণ স্ত্রীমার ঘাটে নামল আমাদের সঙ্গে। অন্নপূর্ণা বৌদি। সত্যিই অন্নপূর্ণা। চোখ জলজল, পূর্ণ কি খুশি—কী খুশি! সত্যিই পূর্ণ সে সেদিন।

পূর্ণর ভাই ছিলো না। কেমন করে জানি না অন্নপূর্ণা বৌদি দুদিনেই আমাকে নিজের ঠাকুরপো করে নিলেন। ঠর শ্বেহ ভালোবাসা আর আমার ভক্তি ভালোবাসা একাকার। একটা দিনও ওদের বাড়ি না গিয়ে থাকার উপায় নেই। কোন ছপুর্বেই ওদের পেছনের ঘরে আমার অনুপস্থিতি ক্ষমা করা হতো না। স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কটা বাদ সব চেয়ে আমার ঘনিষ্ঠ ছিলো অন্নপূর্ণা বৌদি পূর্ণর পর। চলে আসার সময় সে কি বিবাদ-কল্পন দৃশ্য! মাঝে মাঝে আসফা তো ঠাকুরপো? চিঠি দেবা? আমাকে আর একবার ভালো করে দেখার জন্তে ঝাপসা চোখ মুছে ফেললো, না লুকিয়েই।

শেখ দেখা সে বার পূজার সময়। দাঙ্গার আগের বছর। তারপর 'পঞ্চাশের' আগষ্ট মাস থেকে একটা বিবাহট কাঁক। কোনো খবর নেই। আমরা সবাই দুঃখ-দুর্দশার ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছি, ক্রমবর্ধমান গতির নিরবচ্ছিন্ন পাক। কিন্তু আজ এতো দিন পরে কেন ওদের এমন দেখলাম? কেন সুদিনের শেষ দেখাটাই অক্ষয় হয়ে থাকলো না? মানসিক ক্রেশ আর কতো চরমে যাবে কে জানে? কাঁকটাট ভালো ছিলো। অলীক স্বপ্নের মতো চাই না মনে করতে ফেল-আসা শ্রামের ভাবলে চোখে জল আসা—দিনগুলো। বাড়িতে এসে সমস্ত বললাম। স্ত্রী উৎসাহ না দেখালেও, মা, জ্যাঠাইমা সবাই বললেন,—যতো কষ্টই হউক, আগে! লইয়া আয়। পূর্ণতো অকর্ণ্যা না, একটা কিছুতে লাইজ্যা যাইবে। তারপর নিজেরো ব্যবস্থা কইরগা নিবে। আঃ! রাজার পোলার এই দুর্দশা? কী কইরগা দেখু রে? একেবারে ঐ উদ্বেগ নিয়ে না হ'লেও, সোমবার সকাল সকাল যাত্রা করলাম ওদের জন্তে কিছু একটা করার সংকল্প দিয়ে।

অন্নপূর্ণা বৌদির সামনে গিয়ে তাকে আবার অপ্রস্তুত করতে

ইচ্ছে করল না। ছেলের হাত ধরে ভিক্ষে চাওয়া পূর্বর খোঁজে টিকেট-জানলার কাছেই গেলাম সোজা। পূর্ণ নেই। অপরাধ ভেনেও যেতে হ'লো ওদের লোহার বেড়া ঘেঁষা জায়গাটার দিকে। সেখানেও নেই। ঠিক কাঁকা নয়, অল্প একটা নতুন সংসার। এ কী রকম হ'লো?

ভুল—? কখ'গোনোই নয়!—

একটু ভেবে একজন মাতব্বর গোছের লোককে জিজ্ঞেস করলাম,—পরশু বে পূর্ণ বাবুয়া এখানে ছিলো, কোথায় গেলো বলতে পারেন? ঠিক ঐ জায়গাটায় ছিলো ওরা!

—পূর্ণ বাবু তো? জানি। কাইল তো চইলগা গ্যালেন তারা হঠাৎ। কী জানি দাদা, অর স্ত্রীর হঠাৎ কী হইলো! কেপিয়া গ্যালেন! কান্নাকাডি ঝগড়া কইরা উনিই যাঁতে বাইধ্য করলেন! ওরা নাকি খুব বড়লোক ছিলেন। এহ্ন পরশু নাকি ওনাগো গেরামের কার লগে দেখা হইছে, আর পূর্ণ বাবু সাহায্য চাইছেন! কী কান্না বোডার—“ওই মুখ ক্যান দেখাইলা তুমি? ক্যান চাইলা? গলায় দড়ি দিয়ু—তমো মুখ দেখায়ু না ওনাগো! বেশ ছিলাম আমরা চেনা লোকের চক্ষুর আড়ালে। নিমাই ঠাকুরপোই কেমন? মেগো হীন অবস্থা লইয়া মজা করতে আইছে নাকি?” কী কান্না, কী কহু মশায়! ছাড়লো না গায় পরশু; সেই উড়িয়ায়ই ফিরগা যাওয়াইলো ওনাগো। গরমেটের একজন অফিসার কাল সকালে আইখেই বৌদি নিজের দেখা কইরগা ফিরগা বাবার কথা কইলেন। বিকালে চইলগা গ্যালেন ওরা মন তারি কইরগা! পূর্ণবাবুর অবস্থাটা যদি দেখতেন,—

আমি আর শুনছিলাম না। জল টলটলো লাল চোখ আর তিরস্কার-মুখর অন্নপূর্ণা বৌদির মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

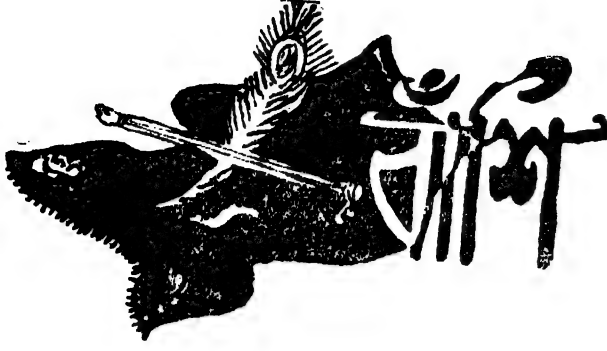
ভালোই করেছে। ঠিকই করেছে অন্নপূর্ণা বৌদি। যতোই পথে বসুক, মনের দিক দিয়ে ভিগিরী হয়নি সে। ধনীর পুঙ্খ আত্মসম্মান বোধ, উচ্চমন্ত্রতা আর দহ বজায় রেখে লজ্জা বাঁচিয়েছে সে। পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লেও ছোটখাটো মেয়েটা সকলের মাথা ছাড়িয়ে সোজা দাড়িয়ে আছে।—

একটা নিখাস চেপে, ট্রেনে ছড়ানো খাঁচার আটকে থাকা দুর্গন্ধ, অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দীন-নোংরা উদ্বাস্তুদের জটিলার মধ্যে দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুক্ষণ আগে আসা—সময়টা পায় করে দিতে থাকলাম উদ্বেগহীন ভাবে।

### মোটর চুরি এড়াতে হলে

মহানগরীগুলোতে অনেক সময় মোটর গাড়ী চুরির সংবাদ শুনে তো পাওয়া যায়। কিন্তু ডাইভার বা মোটরচালক যদি আরও একটু সতর্ক থাকেন, তবে গাড়ী চুরি হয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। গাড়ী ছেড়ে বাবার সময় দেখতে হবে ভাল রকম—স্টায়ারিং ও গাড়ীর দরজা যেন চাবি-আঁটা হয় মজবুত ভাবে। মোটর-চোররা নানা রকম ফিকির খুঁজে থাকে, সহজে নিজের উদ্দেশ্যটি কি ভাবে হাঁসিল হয়। কিন্তু গাড়ীর ইঞ্জিনটি যদি কোন অবস্থাতেই হুকুমতকারীরা চালাতে না পারলো, তবে আর ভয় কিসের? গ্যারেজে যখন গাড়ী থাকবে, তখনও দেখতে হবে গাড়ীর প্রবেশ-দ্বারটি যেন শক্ত তালার সাহায্যে বন্ধ থাকে। অপর দিকে দরজা কুলুপাবদ্ধ করা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে বিশেষ কতকগুলো কলা-কৌশল।

অপ্রস্তুত মোটরের সন্ধান পেতে যাতে সহায়তা হয়, সেইজন্তেও ডাইভার বা মোটরচালককে কয়েকটি কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। একটি পকেটবুকে আগেভাগে লিখে রাখতে হবে সবচেয়ে গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ইঞ্জিনের নম্বর ইত্যাদি। গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন বইটি অবশ্য রাখতে হবে বাড়ীতেই কোন নিরাপদ স্থানে। গাড়ী যখন যেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, পুলিশের দৃষ্টির ভেতর সেইটি থাকা ভাল। বিশেষ কবে, বিদেশ-বিভূই-এ যদি যাওয়া হ'ল—গাড়ী কোথায় রাখা চলে, এ ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণের দাবীই আগে উঠে। মোটর চুরি এড়াবার এ সকল নানা উপায়ের কথাই চিন্তা করা যায় কিংবা চিন্তা করা সমীচীন।



শ্রীঅবিনাশ সাহা

হাটকোট গ্রামের ছুটি চলেছে। বিচারপতি নিবারণ বাবু সন্ধ্যার পর দক্ষিণ-খোলা ঝুল-বারান্দায় বসে খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলুচ্ছি:সন। সহসা নাতনী লীলা কোথেকে ঘেন ছুটেতে ছুটেতে কাছে এসে বাগনা পরে, একটা গল্প বল না দাছ? খার্ড ক্লাসে পড়ে লীলা। বড় বাবো ব্যেস—ফুটফুটে চেহারা। নিবারণ বাবু ওর কোন আদ্যেই না বলতে পারেন না। তবু এ ক্ষেত্রে স্নেহ-মিশ্রিত কঠেই বলে দেন, এখন অনেক কাজ রয়েছে দিদিভাই, শোবার সময় বলবো'খন।

লীলার প্রাইভেট মাষ্টার আজ পড়াতে আসেন নি। তা ছাড়া ওরও স্কুল ছুটি। কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারে না। দাঁহুর কাছে গল্প শুনেই বাস্তব হয়ে ওঠে। নিবারণ বাবুর প্রতিবাদে পাণ্টা প্রতিবাদ জানান, না, কাগজ পড়া তোমার এখন হবে না। একুশি বলতে হবে।

নিবারণ বাবু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বিষয় প্রকাশ করেন, একুশি।

হ্যাঁ, একুশি! পাশের ঘর থেকে সেনটু ছুটে এসে লীলাকে সমর্থন করে।

চির-আদরের নাতিন-নাতনী। নিবারণ বাবু আর না বলতে পারেন না। সহজেই বাজী হয়ে যান, বেশ, ভাল হয়ে তাহলে বস হ'জনে, আবস্ত করি।

সেনটু লীলা নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে চূপচাপ হু'খানি চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। নিবারণ বাবু আবস্ত করেন: খার্ড ক্লাসে প্রামোশন পেয়েছি সেবার। নতুন বই-খাতা কেনা হয়ে গেছে। সবস্বতী পূজোর পর পড়াশুনোও নিয়মিত আরম্ভ হয়েছে। জয়দেব আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হয়। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। এত দেবীতে ও ভর্তি হচ্ছে দেখে আমরা কিছুটা হতবাকই হই। ভাবি, হয়তো বকাটে ছেলে, পড়াশুনো করতে চায় না, বাপ-মা ধরে-বঁধে ভর্তি করে দিচ্ছেন। কিন্তু সেই দিনই কোর্ষ পিরিয়ডে আমাদের ভুল ভেঙে যায়। হেড মাষ্টার মশায়, ইংরেজির ক্লাস নিতে এসে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় মহেন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন, মহেন, আজ থেকে তোমার একজন প্রতিদ্বন্দী বাড়লো। শুনেছ বোধ হয়, জয়দেব নামে তোমাদের ক্লাসে খুব একটি ভাল ছেলে ভর্তি হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বেচারি মহেন্দ্র! হেড মাষ্টার মশায়ের নিকট থেকে জয়দেবের গুণগণা শুনে বোধ হয় ঘাবড়ে যায়। বিগলিত কঠেই শুণায়, উনি কবে থেকে ক্লাসে আসছেন স্যার?

হেড মাষ্টার মশায়ের ওঠে কিঞ্চি হাসি দেখা দিলেও—গাভীৰ সহকারেই উত্তর দেন, বতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই আসছে। তবে বড় গরীব বেচারা, সব দিক গুছাতে হয়তো কিছুটা সময় নেবে।

স্কুল সেদিনের মতো স্বাধীনতা ছুটি হয়ে যায়। আমরা সকলেই জয়দেব সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরি।

শনিবারের ছাটবার। ছোট বড় নানা ধরনের নৌকায় করে ভিন গাঁয়ের মানুষ গঙ্গের হাটে আসে। জয়দেব একম একটি হাটুয়ে নৌকায় করেই হস্তা খানেকের মধ্যে এসে বোর্ডিং-এ হাজির হয়। শনিবার বলে আমাদের স্কুল ছুটি হবে কোর্ষ পিরিয়ড হয়ে যাবার পর। কিন্তু সংবাদটা আমরা পাই সেকেন্ড পিরিয়ডেই। আমাদের ক্লাসের মাখন গোপ একটা বই আনতে বোর্ডিং-এ গিয়েছিল, সেই এসে সংবাদটা দেয়। জয়দেবকে দেখবার জন্য আমরা সকলেই হাঁপিয়ে উঠি।

স্কুল স্বাস্থ্যময় ছুটি হয়ে যায়। বোর্ডিং স্কুলের সলগ্নই। আমরা জন সাতেক তাড়াতাড়ি বোর্ডিং-এ এসে হাজির হই। যদিও আমরা কেউ বোর্ডিং-এ থাকি না, তবু ছুটির পর প্রতি শনিবারেই আমরা মাখনের ঘরে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে থাকি। সেদিনও সকলে মিলে ওর ঘরটিতে এসেই বসি। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করি, আমাদের বয়সীই অপরচিত একটি ছেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরের পাশে বেঞ্চের ওপর একাকী বসে আছে। অল্পমানে বুকে নিই, উনিই জয়দেব বিশ্বাস আমাদের নতুন বন্ধু। অবশ্য মাখন আমাদের অল্পমানের সঙ্গে সঙ্গে ওকে জয়দেব বলে সনাক্ত করে।

বলিষ্ঠ চেহারা জয়দেবের। দূর থেকে দেখে আমাদের সকলের চেয়ে ওকে কিছুটা চেঙাই মনে হয়। গায়ের রং রীতিমত কালো। কবচ স্কুলের মত ছোট ছোট কবে ছাঁটা মাথা ভর্তি কক চুল। গায়ে ঢোলা-ছাতা আধময়লা গেকরা রংয়ের পাঞ্জাবি। যারা বোর্ডিং-এ থাকে তাদের জামা-কাপড় রাখবার জন্য প্রত্যেকেই হয় একটি স্টেকেশ না হয় একটি ট্রাক আছে। এ ছাড়া লেপ, তোসক, মশারি, বালিস সহ পুংাপুরি বিছানা তো আছেই। কিন্তু জয়দেবের সঙ্গে সে রকম কিছু দেখা যায় না। ছোট একটা বোচকা মাত্র বেঞ্চের নীচে রয়েছে। সকলে মিলে জটলা করি, জয়দেব আজকে হয়তো সীট ঠিক করতে এসেছে, সমস্ত প্রিন্সিপাল সহ আর একদিন আসবে। কিন্তু কেউ ছুটে গিয়ে সঠিক কিছু জিগ্যাস করতে ভরসা পায় না। কেন না সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব বড় কড়া লোক। বিনা আস্থানে তাঁর ঘরের কাছে যাওয়া নিষেধ।

আমাদের জটলা আর বেশী দূর এগোয় না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুল থেকে ফিরে আসেন। জয়দেব বেঞ্চ থেকে উঠে ওর পায়ে ধুলো মাখায় নিতেই উনি ওকে সঙ্গে করে সোজা মাখনের ঘরে এসে ঢোকেন। আমরা খতমত খেয়ে সকলে মিলে উটে "তালুট" করে ঠাড়াই।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব এক দিকে কড়া লোক হলেও আর এক দিকে বেশ রসিক ছিলেন। ঘরে ঢুকেই আমাদের কাউকে কিছু না বলে মাখনকে সম্বোধন করেন মাখন, আজ থেকে যদি তোমার গতি হয়। জয়দেব তোমার ঘরেই থাকবে।

ওর ইজিটটা মাখন চট করে বুঝতে না পারলেও আমরা বুকে যুহ যুহ হাসতে থাকি। কারণ আমাদের চেয়ে হ' ক্লাস ওপরে



এক কথায় পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। তাই জয়দেব যখন নিজের চৌকিটি বেড়েপুঁছে কাঁথাখানা বিছাতে বাচ্ছিল তখন ও বাধা দেয়। বন্ধুজনের দরদ দিয়েই বলে, দেশ গাঁয়ে যা করেন—করেন, এখানে ওরকম করলে টিকতে পারবেন না। দেখছেন না নদীর ধারে বোড়ি, ঠাণ্ডাতেই মারা যাবেন।

মাথনের কথা শুনে জয়দেবের হাসি পায়। এঁরা বলছেন কি! বোড়ি তো নদী থেকে 'বু' অনেকটা দূরে। পাকা বাড়ি। ওরা যে চালা ঘরে—বলতে গেলে এক রকম নদীর ওপরেই বাস করে! বাড়ি থেকে নেমেই তো, গাং-এর ঘাট। জয়দেব ঈষৎ হেসেই উত্তর করে, আপনাকে দগ্ধবাদ; কিন্তু আমার এতটুকু অসুবিধে হবে না।

কিন্তু মাখন খামে না। দূঢ় থেকেই পুনরায় অন্বেষণ করে, না না, আপনাকে আমি কিছুতেই 'অতো' কষ্ট করতে দেবো না। শুনলেন না, মাষ্টার মশায় বলে গেলেন, আপনাকে ধরেই আমার ক্লাস-বৈতরণী তরতে হবে! আপনার অসুখ-বিসুখ করলে যে আমারই ক্ষতি হবে। আজকের মতো এই 'ব্যাগটা' দিয়ে কাটিয়ে দিন। কালকে আমার আর একটা মশারি ধুয়ে আসছে। কাল থেকে আর কোন অসুবিধেই থাকছে না।

জয়দেব তরতো এবারও আপত্তি জানাতেই যাচ্ছিল। কিন্তু মহেন বাধা দেয়, সেই ভাল জয়দেব বাবু, বিদেশে বিভূঁইয়ে বাড়াবাড়ি না কবাই উচিত। মাখন আমাদের মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, ওর কাছে লজ্জার কিছু নেই।

সুশান্ত এতক্ষণ পর্যন্ত দম ধরে ছিল। এবার সুযোগ বুঝে মহেনকে সমর্থন করে, জয়দেব বাবু, এ নিয়ে আর আপনি মিছিমিছি কথা বাড়াবেন না। আর মহেন, জয়দেব বাবু যখন মৌন আছেন তখন শাস্ত্রবাক্যই প্রয়োজ্য—মৌনঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ, এখন আমাদের পেট-সকটের কি ব্যবস্থা হয়েছে তাই বল।

সুশান্ত বেশ রসিকতা জানতো। আমরা সকলেই ওর কথায় হো-হো করে হাসতে থাকি। এমন কি নবাগত জয়দেবও না হেসে পারে না।

এবার আমিই ওর কথায় সাহায্য দিই। হেসে হেসেই বলি, ব্যবস্থার যা কিছু তা তো চৌকির নীচেই রয়েছে, টেনে বার কর না।

আর কোন কথা নেই। আমার সমর্থন পেয়ে এক লমহায় সুশান্ত মাখনের চৌকির নীচ থেকে বড় বড় দুটো টিনের কোটো টেনে বার করে। মুগ্ধ খুগ্ধেই একটার ভেতর থেকে ভুর-ভুর করে বেরতে থাকে—যি আর নলেন গুড়ের স্মিষ্ট গন্ধ। আর একটার ভেতরে রয়েছে টাটকা ভাজা কচকচে মুড়ী। আজকের হাটুরে নৌকায় বাড়ি থেকে এসেছে। সপ্তাহের জলখাবার মাখনের। মুড়ীর টিনটা রেখে সুশান্ত অপরটার ভেতরে হাত গলিয়ে দেয়। কি মজা, আজ শুধু মোয়া মুড়কী নাড়ু-বড়িই আসেনি! এ কোটোটার ভেতরে যে গ্রানুিনিয়ামের আরো একটা কোটো রয়েছে। সুশান্ত সেটাকে টেনে বার করে ঢাকনা খুলে ফেলে। নজর পড়তেই আমরা সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। সবভাজা, ক্ষীরের পুলি আর পাটিদাপটা রয়েছে একগাদা। প্রত্যেকের ভাগে নেহাৎ কম পড়বে না। সুশান্ত তো ওরই ভেতরে একটা মুখে পুরে উচ্ছ্বাসে ফেটে

পড়ে। আমি বাধা দিই, এই রান্ধস, আর খাসনে বলছি। একটা কম দেওয়া হবে তোকে।

চিবোতে চিবোতে জড়িত কণ্ঠে সুশান্ত বলে, সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন তো চলুক, বলতে বলতে আরো একটা সবভাজা মুখের গহ্বরে ফেলে দেয়।

বেগতিক দেখে মহেন পাশ থেকে কোটোটা নিজের জিয়ার টেনে নেয়।

মাখন এতে এতটুকু মন খারাপ করছে না। বরং উৎসাহে মেতে ওঠে। মহেনকে লক্ষ্য করে বলে, মহেন আজ আর কিছু রাখতে হবে না। আমাদের নতুন বন্ধুর শুভাগমন উপলক্ষে আজ পুরো ভোজ্যই হবে। এই হরি—হরি—মহেনকে নিরস্ত করে বোড়ি-এর চাকর হরির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে মাখন।

হরি চির-স্নানগত মাখনের। ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে।

মাখন ওকে ডাইনিং রুম থেকে বড় দেখে একটা থালা ও চাব পাঁচটা গ্লাস আনতে লুকুম করে।

হরি ছুটে যাচ্ছিল। মহেন বাধা দেয়, একটা নয় দু'টো থালা। কেন না, সুশান্তটা যা গাঙুল, এক সঙ্গে খেতে হলে জয়দেব বাবু কিছুতেই সুবিধে করতে পারবেন না। ঠেকে আলাদা দেওয়াই ভাল।

প্রস্তাবটা যুক্তিসহ হলেও মাখন রাজী হয় না। বলে, না, প্রথম দিনেই আমি ঠেকে ভিন্ন করে দিতে পারবো না। সুশান্তকে শাস্ত্রোক্তা করবার ভার আমি তোকেই দিলাম।

হরি যথারীতি চলে যায় এবং থালা গ্লাস নিয়ে ফিরে আসে। মহেন নিজের হাতে পিঠেগুলো সাজাতে থাকে। জয়দেবকে তাড়া দেয় মাখন।

জয়দেব আড়ষ্টতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সত্যি, খিদেও প্রচণ্ড পেয়েছে। কখন সেই কাক-পক্ষী না ডাকতে দু'টি ফেনভাত খেয়ে নৌকায় উঠেছে। লজ্জায় সকলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে না পারলেও ধীরে ধীরে পেটটা বেশ ভরেই ওঠে। প্রথমে পিঠে; পরে মুড়ী, মোয়া, মুড়কী ও নলেন নারকেলি গুড়। এক সঙ্গে এতগুলো উপাদেয় খাবার জীবনে খুব কমদিনই ছুটেছে ওর।

ঘণ্টাখানেক চলে আমাদের খাওয়া দাওয়া হাসিঠাট্টা। বিকেল চারটের কাছাকাছি, সকলেই উঠে পড়ি। কেন না, সন্ধ্যা ছটার মধ্যে আমাদের সকলকেই আবার কমনরুমে সাক্ষ্য সম্মিলনীতে যেতে হবে। প্রতি শনিবারেই বসে সভা। দুর্গদাস বাবু হেড মাষ্টার হয়ে আসার পর থেকেই এই রীতি চলেছে। পুঁথিগত বিষয় সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নৈতিক এবং ব্যবহারিক মান উন্নয়ন করাই ওঁর উদ্দেশ্য। সভার প্রারম্ভে পাঠ হবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দুর্গদাস বসু স্বয়ং কিংবা পণ্ডিত মশায় পাঠ করে শোনাবেন প্রত্যাহ এক একটি অধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও করে যাবেন। পাঠান্তে আমাদের সকলকে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে হবে বিশ্বরূপ বর্ণনের শ্লোকটি। আমাদের মধ্য হতেই প্রথমে একজন সুর করে আবৃত্তি করবে, পরে আমরা সকলে তাকে ঠিক নামতা পড়ার মতো করে অনুসরণ করবো। গীতা পাঠ শুনতে আমরা তেমন

উৎসাহ বোধ করতাম না। কিন্তু সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে আমাদের খুব ভাল লাগতো। তার চেয়েও আমাদের বেশী আনন্দ হতো নিজের লেখা ছড়া, কবিতা, গল্প ও ধাঁধা শুনতে ও শোনাতে। সর্বশেষে কীর্তনের মধ্য দিয়ে আসরের পরিসমাপ্তি হতো।

সেদিনের আসরে জয়দেব ছিল নতুন সভা। আমাদের আসতে কিছুটা দেরীই হয়ে যায়। গীতা পাঠ শেষ হয়ে গেছে। আবৃত্তি আরম্ভ হবে, আমরা তিন-চারজন এসে আসরে বসলাম। মনে হলো দুর্গাদাস বহু কিস্তি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কেন না, তিনি কণ্ঠের ভাবে নিয়ম এবং সময় মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্রটি যা হয়ে গেছে তা নিয়ে তখন আর কিছু করার ছিল না। আমরা আবৃত্তিতে কণ্ঠ মেলাতেই তৎপর হই। হঠাৎ চোখ পড়ে জয়দেবের ওপর। দেখি, ধ্যানো বুদ্ধের মতো চোখ বুজে বসে আছে ও। পরম বিষয় বোধ হয় আমাদের। ওর ভাবভঙ্গীতে ক্রমশঃ হাসি চোখে রাখাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। অজ্ঞাত মাষ্টার মশায়দের অবস্থাও বোধ হয় আমাদের মতোই। শুধু দুর্গাদাস বাবুর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছেন না।

আবৃত্তি সমাপ্তি হয়ে যায়। এবার কীর্তনের পালা। আমাদের সভা-গায়ক কেন্দারনাথ নিয়মিত খোলে চাটি মারে। প্রতিদিনের মতো জয়ধ্বনি দিয়ে গানও শুরু করে সে। কিন্তু জয়দেব যেন খুশী হতে পারে না। নিয়মই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে ওর তরফ থেকে। হুঁ চার কলি শোনবার পর শেষটায় আর ধৈর্য রাখতে পারে না। কেন্দারের নিকট থেকে খোলটি টেনে নিয়ে নিজেই বাজাতে থাকে। সঙ্গে প্রাণখোলা নামগান। একাই যেন একশ'। কীর্তন শেষ হবার পর দুর্গাদাস বাবু ভূয়সী প্রশংসা করেন ওর।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে থাকে। আমরা গল্প, কবিতা, ছড়া, খেলায় উৎসাহ পেলেও জয়দেব ওর কাছে ঘেঁষে না। এ সবে চোখে কীর্তন আর গীতা শুনতেই ওর অমুরাগ বেশী। দুর্গাদাস বাবুর তাড়ায়—মাঝে মাঝে কিছু কিছু লিখতে বাধ্য হয় বটে, তবে আমরা তার মর্মার্থ কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না। গীতার শ্লোককে কেন্দ্র করেই যেন কি সব বড় বড় ন্যায় নীতির কথা।

বোড়ি-এর রীতি রাত এগারোটার মধ্যে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়া। পড়া তৈরী হোক আর না-ই হোক মাখন তাই শুয়ে পড়ে। এগারোটো কেন পারলে ও দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু সুপারিন্টেন্ডের ভয়ে কোন রকমে হুঁচোখের পাতাকে টেনে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু জয়দেবের ব্যাপার আলাদা। নিয়মমাসিক বাতি নিবিয়ে বিছানা নেয় বটে, কিন্তু ঘুমোয় না। জোড়-আসন হয়ে বিছানার ওপর চোখ বুজে বসে ঘটখানেকের ওপর বিড় বিড় করে কি সব যেন আঙড়াতে থাকে। হয়তো কোন ঠাকুর দেবতার নামই হবে। কেন না, থেকে থেকে হাত ভুলে প্রণাম করতেও দেখা যায়। তার পর বালিশের ওপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরো কি সব লিখে শুয়ে পড়ে।

মাখন প্রথম দিন কয়েক কিছুই বুঝতে পারে না। কেন না, শোবার সঙ্গে সঙ্গে ও অচেতন। কিন্তু পরে একদিন ঘুম না আসায় হতবাক হয় ও। বেচারি কি দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি!

তার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই জেগে থেকে ওর পাগলামি দেখতে থাকে। অনেক দিন ভাবে, ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ সবের মানে কি। কিন্তু বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আর বলা হয় না। বিকেলে উভয়ে বেড়াতে বার হয়। সন্ধ্যোগ বুকে কথায় কথায় খোলাখুলিই প্রশ্ন করে মাখন।

উত্তরে জয়দেব ঈষৎ হেসে বলে, আত্মতুষ্টি করি।

বিস্মিত মাখন উত্তর শুনে অধিকতর বিষয় বোধ করে। বলে কি জয়দেব! ওর কি মাথা খারাপ হলো! নীচু ক্লাসের ছাত্র, মনের আনন্দে খাবে, ঘুমোবে, খেলা করবে, পড়বে। এ সব বুড়োটে-পনা কেন!...

কিন্তু জয়দেব থামে না। উপদেশের সুরেই বলতে থাকে, আমার কাছে ধ্যান করবার মন্ত্র লেখা আছে। অভ্যাস করে দেখবেন, মনের জোর পাবেন—মা সরস্বতীর কৃপা হবে।

মনের জোর আর আত্মতুষ্টির মানে না বুঝলেও মা সরস্বতীর কৃপা হবে শুনে মাখন উৎসাহ বোধ করে। ভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠেই অমুরাগ করে, দেবেন তো! তা হলে আমাকে মন্ত্রটা লিখে, চেষ্টা করে দেখবো।

জয়দেবের ওষ্ঠে মুহূর্ত হাসি দেখা দেয়। মাখনকে আশ্বাস দিতে দিতে বেশ উৎফুল্লের সঙ্গেই উভয়ে বোড়ি-এ ফিরে আসে।

দিন কয়েক অতিবাহিত হয়, মাখন বোধ হয় সত্যি সত্যি জয়দেবের মন্ত্র-শিষ্য হয়ে পড়ে। কেন না, শোবার আগে সেও প্রায় ঘটখানেক বিছানায় ওপর বসে ধ্যান শুরু করেছে। জয়দেবের মতোই চোখ বুজে বিড় বিড় করে মন্ত্র আঙড়াতে থাকে। কিন্তু কই, কৃষ্ণদর্শন তো ওং হয় না! চোখের সামনে যে ভেসে ওঠে কেবল গুজ্জের খেলা-বুলোর ছায়াছবি! মন্ত্র না ছাই, বত সব বাজে গুল! মনে মনে বিরক্তি বোধ করে মাখন। ভাবে জয়দেবকে বেশ দু'কথা শুনিবে দেবে কিন্তু পারে না। মা সরস্বতীর কথা মনে হতেই ভয় হয়। ভক্তিভরেই আবার লেগে থাকে। এবার পাশ করতে না পারলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যে একত্রে পড়তে হবে। মাখন উঠে পড়ে লাগে।

ফল বোধ হয় কিছুটা ফলে। ধ্যানে জয়দেবের মতো কৃষ্ণদর্শন না হলেও অবিরত অভ্যাসের ফলে মানসিক চাক্ষু্য কমে আসে মাখনের। এখন এককালীন ঘটখানেক বসে পড়তে পারে ও।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জগ্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯



বিগত বাৎসরিক পরীক্ষায় অল্প আর ইংরাজী বাদে আর সব বিষয়েই পাশ করেছে। লেগে থাকলে বাৎসরিক পরীক্ষায় আশা আছে। শিক্ষকগণ মাখনের আশাতীত উন্নতিতে খুশী হয়। মাখন নিজেকে।

বাৎসরিক পরীক্ষায় জয়দেব অঙ্কে একশ'র ভেতরে একশ' পেলেও মহেনকে পরাস্ত করতে পারে না। প্রথম স্থান মহেনই অধিকার করে। জয়দেবের এতে কোন ক্রক্ষেপ নেই। কৃষ্ণের যেমন ইচ্ছে তাই হোক। কিন্তু মাখন এ পরাজয় সহজে স্বীকার করতে রাজী নয়। জয়দেব যে রকম মেধাবী তাতে ওরই প্রথম স্থান অধিকার করা উচিত। কথাটা স্পষ্টই ও জয়দেবকে জানায়। উত্তরে জয়দেব শুধু হাসে। উদাস ভাবেই মন্তব্য বয়ে, প্রভুর যদি ইচ্ছে হয় হবে। ব্যস্ত হবার কি আছে!

দিন দিন জয়দেবের ওপর শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলেও উত্তর শুনে খুশী হয় না মাখন।—একথায় প্রতিবাদ করতেই ইচ্ছে করে ওর। কি সব সময় শুধু প্রভু আর প্রভু! মনের ভক্তি মনে থাক, তাই বলে মানুষ প্রতিযোগিতা করবে না নাকি!...কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাখনের মুখ দিয়ে কিছুই বেরায় না।

শ্রাবণ মাস। গরমের ছুটির পর মাত্র দিন কয়েক হল স্কুল খুলেছে। এখনো বস্ত্রের জল সম্পূর্ণ নামেনি। ধলেশ্বরীর ক্ষীত জল এখনো বোর্ডিং পুকুরের কানায় কানায়। নৌকো ছাড়া কোথাও বার হবার উপায় নেই। খেলা, বেড়ানো সবই এক রকম বন্ধ আমাদের। ঘরে বসে ক্যারাম পিটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। সব সময়েই নিজেদের বন্দী মনে হতে থাকে। কিন্তু করার কিছু নেই। জয়দেব বাড়ি থেকে ফেরে স্কুল খোলারও কয়েক দিন পরে। এবার ওকে আরো গভীর মনে হয়। বোধ হয় মাস ছ' সাত হবে চুল ছাঁটেনি। বাবরি চুল ষাড় বেয়ে অনেকটা নেমেছে। মাখন বলে, ইদানিং নাকি ও প্রায় অধিকাংশ রাত্রেই ঘুমায় না। বোর্ডিং নিস্তব্ধ হলে একাকী উঠে চুপচাপ পুকুরের ঘাটলার ওপর গিয়ে বসে থাকে। কৃষ্ণের বাঁশির সুর নাকি ওকে পাগল করে। পুকুর পাড়ের কদম গাছ থেকেই নাকি ভেসে আসে সুমিষ্ট সুরলহরী।

কাহিনী শুনে তো আমরা অবাক। বলে কি মাখন! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি—তাও কি না পুকুরের ঐ কদম গাছ থেকে। সব বুজুকি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে জয়দেব তো পাগল হয়েছেই শেখটার মাখনও না খেপে যায়। টিপ্পনী কেটে আমিই মন্তব্য করি, বাঁশি না ছাই, বাঁচির টিকিট কাটতে হবে।

কিন্তু মাখন তাতেও দমে না। ভাবাবেগেই উত্তর করে, না রে, প্রথম প্রথম আমরাও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু শেখটার আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি নিজের কানে শুনেছি বাঁশির সুর। প্রতি ভুলপক্ষেই বাজে।

বলিস কি রে। মহেন বিশ্বয় প্রকাশ করে।

মাখন বলে, হ্যাঁ, শুধু বাঁশিই নয়। জয়দেব বলে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ওর নাকি প্রত্যক্ষ কথা হয়েছে। ও দেখেছে তাঁর ভূবন ভুলানো রূপ।

ভারি মজা তো, আচ্ছা দেখা যাবে একদিন, মহেন আর আমি সেদিনের মতো আলোচনা রেখে উঠে পড়ি।

সেদিন স্বলন পূর্ণিমা। সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি

পড়ছিল। আমাদের স্কুল এক নাগাড়ে তিন দিন ছুটি। বোর্ডিং-এর অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ি গেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবও অনুপস্থিত। তবে জয়দেব নিঃসঙ্গ নয়। মাখন বাড়ি যায়নি। জয়দেবকে আজও ভাল করে বাজিয়ে দেখবে। আজ নাকি শ্রীকৃষ্ণ ওকে পূর্ণ দর্শন দেবেন। ওর হাতের ভোগ খাবেন।

জয়দেবের আজ সারা দিন উপবাস। কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। মনে খুশীর হাওয়া বইছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বার দর্শনের জন্য যুগ যুগ আরাধনা করে আসছে আজ ও তাঁর পূর্ণ দর্শন পাবে। ঐ কুসুমিত কদম তরুতলে এসে দাঁড়াবেন নটবর শ্যাম। হাতে থাকবে মোহন বাঁশি গলায় তুলসীর মালা ভালে কনক কিরীট। প্রভু নিজের মুখে খেতে চেয়েছেন। কিন্তু কি আছে ওর যে তাই দিয়ে ভোগ সাজাবে। বিনা শূভোর মালা গাঁথে জয়দেব বাগান থেকে মালতী ফুল তুলে। বাজার থেকে আনে সাধ্যমতো ফল, মিষ্টি, ছানা, মাখন।

সন্ধ্যায় মেঘের আবরণ চিরে চন্দ্রোদয় হয়। জয়দেব উপকরণ সাজিয়ে রেখে ধ্যানে বসে। প্রভুর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জলটুকুও মুখে দেওয়া চলবে না। কিন্তু সে তো গভীর রাত্রে। বোর্ডিং-এ যদি লোক থাকতো কীর্তন করা চলতো। না না, না থেকেই বরং ভাল হয়েছে। ওরা পেছনে লাগতো। হৃদয় জুড়েই তো প্রভুর নৃপুর বাজছে। বাহ্যিক কীর্তনের আর দরকার কি!...জয়দেব ধ্যান-গভীর হয়েই চুপচাপ বসে থাকে। আজ আর বিছানায় ওপরে নয়। মেঝের ওপরে—গুদামনে।

রাত্রির মধ্য প্রহর। নিস্তব্ধ বোর্ডিং। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। জয়দেবের চোখে ঘুম নেই। 'মাখন থেয়ে' দেয়ে বিছানা নিয়েছে বটে, কিন্তু ঘুমায় নি! আজ জয়দেবের সঙ্গে ওও কৃষ্ণদর্শন করবে। জয়দেবের মতোই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। সহসা কদম গাছের পাতা নড়ে ওঠে। জয়দেব ধ্যানে ছিল হকচকিয়ে নড়ে ওঠে। নিমেষে ভেসে আসে সুরেলা বাঁশির সুর। জয়দেব আর স্থির থাকতে পারে না। নৈবেদ্য হাতে দোর খুলে ঘাটলার দিকে রওনা হয়। বাহ্যিক হয়তো কোন চেতনাই নেই। মুখে অশ্রুস্রব প্রভু দেখা দাও—প্রভু দেখা দাও...।

জয়দেব বেরিয়ে যায়, মাখনও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে ওকে অনুসরণ করে। চুপি চুপি গিয়ে ঘাটলার একপাশে বসে। জয়দেবের কোন ক্রক্ষেপই নেই। বোর্ডিং-এরও কেউ জেগে নেই। বাঁশি একটানা বেজে চলেছে।

বাঁশি বাজছে। জয়দেব কান পেতে তা শুনছে। যেন শ্রীমতীই যমুনার কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ জয়দেব যেন আমাদের জয়দেব নয়। ভাব পাগল এক আত্মভোলা।

বেজে বেজে বাঁশি ধোমে যায় এক সময়। জয়দেব নৈবেদ্যের খালা হাতে কদম গাছের দিকে ছুটতে থাকে। বর্ষার ভিজে মাটি। বৃষ্টিরও কামাই নেই। পুকুর পাড় রীতিমতো পিচ্ছিল। পা হড়কে যে কোন মুহূর্তে জলে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভাবপাগল জয়দেবের সেদিকে কোন হ'স নেই। চলেছে তো চলেছেই। মাখনেরও আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই। যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়েই ও লক্ষ্য রাখছে। এমন সময় দৈববাণীর মতো সহসা ভেসে আসে প্রভুর কণ্ঠস্বর, "উতলা হোস নে নৈবেদ্য কদম তলে রেখে চোখ বোজ। বধাসময়ে দর্শন পাবি।"

জয়দেব অমুগত ভক্তের মতো তাই করে। ভয়ে মাখনের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। লুকিয়ে এসেছে, ওকি প্রভুর তেজঃ-পুঞ্জ জ্যোতির নামনে চোখ খুলতে পারবে। গীতায়ুর্বর্ণিত বিশ্বরূপের সেই ভয়াল মূর্তি অবিরত ভেসে ওঠে। মাখনও জয়দেবের মতোই চোখ বোজে।

ভক্তবাগ্মী ভগবান। ভক্তের দেওয়া নৈবেদ্য খুশী মনেই গ্রহণ করবেন। হয়তো কদম গাছ থেকে নেমেই আসছিলেন উনি। সহসা কদম-লাম শব্দ হতে থাকে। মাখন চোখ খুলে দেখে ইষ্টক বর্ণণ শুরু হয়েছে। আর তা আসছে পার্শ্ববর্তী আমগাছ থেকে। জয়দেবও হয়তো চোখ খুলেছিল। প্রভুর প্রতি অনাচার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ও ভূতলে লুটিয়ে পড়ে। প্রভুর পক্ষেও আর বৈশীকণ কদম গাছে টিকে থাকা সম্ভবপর হয় না। ইষ্টকের ঘায়ে লাগিয়ে পড়তেই বাধ্য হন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের আম গাছ থেকে আরো দু'টি ছায়ামূর্তি লাগিয়ে পড়ে। মাখন সহসা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কদম গাছ থেকে লাগিয়ে পড়লেন উনি তো স্বয়ং প্রভুই। ঐ তো পীতবাস পরনে, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া চূড়া, হাতে মোহন বাঁশি! কিন্তু ও পাশও দু'জন কে? তেড়ে এসে প্রভুর হাত চেপে ধরলে! ওরা কি কংশের চর?...

মাখনকে আর বৈশীকণ হাবুডু খেতে হয় না। ছায়ামূর্তি দু'জন দু'পাশ থেকে প্রভুকে চেপে টানতে টানতে মাখনের কাছে এনে হাজির করে। প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও মাখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ছায়ামূর্তি দু'টি কাছে আসতেই বিষয়ে ফেটে পড়ে। ও মা, এ যে দেখছি মহেন আর স্রশাস্ত। আর ও তো প্রভু নয়; বাত্রার দলের সেই বরাটে সন্তোষটা। আগে মনে ছিল না, পাণ্ডিটা তো সত্যি খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারে। জয়দেবকে তা হলে এই হতচ্ছাড়াই পাগল করেছে। ক্রোধে এক বুঁধি তুলে কপে ওঠে মাখন। মহেন স্রশাস্তও জোরসে কয়েক বা বসিয়ে দেয়। সন্তোষ হাতে পায় ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে। জীবনে আর কখনো এমুখো হবে না।

ওদিকে জয়দেবকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওরা সকলেই সন্তোষকে ছেড়ে জয়দেবের কাছে ছুটে আসে। বেচারী, সারা দিনের ক্লান্তিতে মুছার চলে পড়েছে। পুকুর থেকে জাঁজলা করে জল এনে তাড়াতাড়ি ওর মাথায় দিতে থাকে। তিন জনে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ছাড়া পেয়ে সন্তোষ নৈবেদ্যের থালা নিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়দেবের জ্ঞান ফিরে আসে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে অশ্রুট স্বরে আওড়াতে থাকে, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ নয়াময়।

সেই থেকে জয়দেবের পাগলামি আরো বেড়ে যায়। মাখন

অনেক করে বুঝতে চেষ্টা করে। সন্তোষের দুঃখীর কথা আগাগোড়া ওকে বলে। কিন্তু ও কিছুতেই বোঝে না। তার পরেও অনেক রাত্রে পুকুর ঘাটে গিয়েছে। বাঁশি শুনবার জন্য আকুল হয়ে কঁদেছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বুক চাপড়িয়েছে। আমরাও ওর জন্য চেষ্টার ক্রট করিনি। হাসি ঠাটা করে, ভয় দেখিয়ে, আমোদ প্রমোদের কথা বলে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন ওমুখেই ওর রোগ উপশম হয়নি। বাৎসরিক পরীক্ষা এসে পড়ে, আমরা আর ধৈর্য রাখতে পারি না। যে বার পড়ায় মন দিই। জয়দেব বেন দিন দিন ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে। ভাল করে খায় না, ঘুমায় না, পড়াশুনো করে না। কথাটা হেড মাষ্টার মশায়ের কানে দেওয়াই হয়তো আমাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু কি জানি কেন, আমরা কেউ তা দিইনি। বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগের দিন সহসা দেখা যায় জয়দেবের সীট খালি। চারদিক থেকে খোজাখুঁজি চলে চলে কিন্তু কোন পাতাই পাওয়া যায় না।

প্রায় বছর তিনেক কথা। আমরা সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবো। হঠাৎ একদিন হেড মাষ্টার মশায় নবীন এক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে আমাদের ক্লাসে ঢোকেন। মহেনকে লক্ষ্য করেই জিজ্ঞেস করেন, মহেন, একে চিনতে পারছো?

মাথায় গেঞ্জী পাগড়ি বাঁধা, পরনে আলখাল্লা, প্রতিভাদীপ্ত মুখাবয়ব। মহেন কেন আমরা কেউ ওকে চিনতে পারি না। অবশেষে উনিই হাসতে হাসতে মস্তব্য করেন, ভূতপূর্ব তোমাদের সহপাঠী জয়দেব বিশ্বাস। অধুনা কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

স্বামীজির পরিচয় শুনে আমরা সকলেই মুহূ মুহূ হাসতে থাকি। উনিও আমাদের মতোই হাসতে থাকেন।

নিবারণ বাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটানা বলে চলেছেন। সেন্ট লীলা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছিল, একটুও বাধা দেয় নি। এবার সেন্ট চোক গিলে প্রশ্ন করে, সকালে যিনি এসেছিলেন তিনিই কি দাছ?

হ্যাঁ দাছতাই, তিনিই আমাদের ভূতপূর্ব সহপাঠী জয়দেব বিশ্বাস। অধুনা ভারতের এক দিকপাল পণ্ডিত, নিবারণ বাবু উত্তর করেন।

উনি কেন এসেছিলেন দাছ?

উনি এখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে চান। বার আদর্শ হবে, অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা।

তুমি কি বললে?

বললেম, এ কাজে আমার মত আছে। আমি যথাসাধ্য সহায়তা করবো।

সেন্ট লীলা দু'জনেই বোধ হয় খুব খুশী হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি হিংসা ভুলে যায়, তা হলে কি সুখেই না মানুষ থাকতে পারে!

## সাহিত্য কি?

“সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক,—এর কল্যাণ করার শক্তি সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যরসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত! এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দুষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নুতন সম্বন্ধে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।”—শব্দচন্দ্র



## গাজন গান শ্রীজয়দেব রায়

ব্রাহ্মদেশের ধর্মীকূলের পূজা পূর্বে বৌদ্ধদের অমুঠান ছিল, বৃগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহাই এখন বুদ্ধোশিবের গাজনে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ধর্মীকূলের পূজারী ছিল নিয়ন্ত্রণের ভোম বা বাগদৌরা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা গুত হইয়া হিন্দু দেবতাদের মধ্যে স্থান পাওয়ার পর এখন উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই গাজনের বুদ্ধোশিবের পূজা করে; কিন্তু গাজনে বাহারা মাতিয়া উঠে তাহারা নিয় বর্ণেরই লোক।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধর্মরাজ শিবের পূজার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে রহিয়া গিয়াছে। গাজনের ভক্তদের ঐ সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে হয়। দৈহিক নির্ধাতন বা আনুষ্ঠানিক তাহাদের তপস্শারই অঙ্গীভূত। বৌদ্ধধর্মে জাত-বিচার বা সম্প্রদায় নাই, ধর্মপূজার মধ্যেও জাতিভেদ বা সম্প্রদায় ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নীচজাতের ভক্তদের একত্র মেলামেশার কোন বাধা নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতির গাজন-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আহার-বিহারে কোন বাধ-বিচার নাই।

চর্চার বৃগে গুরুবন্দই প্রাধান্য লাভ করে, তাহার পর হইতে বাঙলা দেশের গানে গুরুবন্দনা চিরচরিত প্রধায় ঝাঁড়াইয়া যায়। নদীয়ার গাজন-উৎসবের এই প্রকার একটি গুরুবন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল—

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেবা  
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।

বাহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি  
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ।

(আহা) অন্ধের সোচন গুরু, ভক্ত-বাহা কল্লতরু  
ভক্তজন্য প্রতি গুরু দয়া।

শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বন্দি  
আর বন্দি মা মহামায়া।

গুরু গোদাঁই কর দয়া দেহ যোরে পদছায়া  
ও রাঙা চরণ বিনে গতি নাই।

অস্তিম কালে বমদন্তে লয়ে যায়,  
সেবক বলিয়া প্রভু রেখো রাঙা পাঁয়।

গাজন-গানের বৈচিত্র্যের জন্ত নানা আখ্যায়িকার সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, লাউসেনের ধর্মপূজা, শিবের নৌকাবিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পল্লী-কবিরা তাঁহাদের মনোমত নানা নূতন নূতন আখ্যায়িকা গাজন-গানে প্রতি বৎসর সংযোজন করিয়া চলিতেছেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের গল্প বামাষণে আছে, গাজন-গানে তাহার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়—

ব্রহ্মার কোমণ্ডলে আছেন গঙ্গানারায়ণী রূপ তথ্যে।

ধ্যান করিলেন মুনিগণে শিব দিলেন তা কয়ে।

ধ্যান করিয়া দেখিলেন যত মুনিগণে।

স্বর্ঘবংশে জন্মিবে ভগীরথ গঙ্গা আনিবে সেই জনে।

\* \* \*

ব্রহ্মার আদেশে করিয়া গমন আইলেন শিবের পাশ।

শিবের নিকটে করিলেন স্তব বৎসর হাজার দশ।

তুমি হরিহর সকলের আর তোমা বিনা আর কে।

তুমি না সহিলে সকলি মজিবে বাস্তুকি হইবে শেষ।

আসন করিয়া বসিলেন শিব ঘোড় করি দুই হাত।

শিবের মস্তকে ঢালিলেন গঙ্গা মুচ্ছিত হলেন ভোলানাথ।

শিবের আঁটনে তাঁহার মাখায় জল ঢালিবার সময়ে এই শ্রেণীর গান গাওয়া হয়। ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিলে তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন শিব। এসময়ে তাঁহার মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিতে ঢালিতে সেই কথাই স্মরণ করা হয়।

গাজনের ব্রত গ্রহণের সময়ে ভক্তরা তামার অঙ্গুরীযুক্ত একটি পৈতা গলায় পরে, তাহার নাম 'উত্তরী'। অঙ্গুরীযুক্ত করা হয়, বৌদ্ধযুগে বিন্মত ভিক্ষুরত গ্রহণের শেষ চিহ্নরূপে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই সময়ে জল-শুদ্ধি, ক্ষীর-শুদ্ধি, উত্তরী-শুদ্ধি, অঙ্গুরী-শুদ্ধি, প্রভৃতি কয়েকটি আনুষ্ঠানিক গান গাওয়া হয়। যেমন—

মন করি ধৃতি মোয়া, পবন করি কাছা,

সেই কাছা পরে পূজি সন্ন্যাস দেবতা।

সেই কাছা পরে করি শিবের স্মরণ।

যত কিছু পাপ মোদের হরে ততক্ষণ।

কহেন তো সৎগুরু মহেশের বরে।

উত্তরী শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে।

লাউসেন ছিলেন ধর্মমঙ্গলের আদর্শ বীর, ধর্ম ঠাকুরের বরপুত্র।  
গাজনের পটনির্মাণের গানে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—

ভারত ভুবনে এলেন দেবী পঞ্চানন।  
লাউসেনের বাড়ি ঠাকুর দিলেন দরশন।  
দরশন দিলেন ঠাকুর লাউসেনের বাড়ি।  
বসিতে দিলেন রাজা কুশানখানি।  
পাণ্ডা অর্ঘ্য নিয়ে রাজা কহে স্তববাণী।  
কি কারণে আগমন আজ্ঞা হোক শুনি।  
শিব বলেন জান করেন উপোস খোঁষাতি।  
সিংহাসন আনি দেহ পূজার অমুমতি।

লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গলার আদর্শ বীর চরিত্র। ধর্মরাজের ধর্ম রাজা স্থাপনের জন্য তাঁহার জন্ম।

রউপুর জেলায় যোগী সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে শিবের গাজন গান একটি বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাথ যোগীদের সাধন-ভজনের রীতিনীতির সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের শৈবভক্তদের মিল আছে। অমুমান করা হয়, তাতারা ঐ সম্প্রদায়েরই উত্তর সাধক। এই অঞ্চলের গাজন গান হইতে দুর্গার শাখা পবার সাধের একটি গান উদ্ধৃত করা হইল—

আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।  
তোমার জাতের কথা কইলে লাগিবে বগড়া।  
ভানুর আইসে, স্বপ্নর আইসে বণ-পরশুম তাকে।  
হাতে শাঙ্কা নাই জান গোমাই নজ্জা পাছু তাতে।  
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।  
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব।  
কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলাক পালিব।

উত্তর বঙ্গের গাজন গান ও পূর্ববঙ্গের নীলের গান সমশ্রেণীর। এই প্রকার শাখা পবানোর গান, শিব-দুর্গার বিবাহ, নারদের ঘটকালি প্রভৃতি নীলের গানেরও বিষয়বস্তু।

গাজন উৎসবের ছয়টি অঙ্গ—ভক্তনির্বাহন, ক্ষোরী ও সংঘম, ঘটস্থাপন ও হবিষা, মহা হবিষা, উপবাস উৎসব ও লীলাবতী পূজা এবং চড়ক।

গাজন উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৭শে চৈত্র। ঐদিন ভক্তরা সম্মাস্ত্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজগোত্র পরিত্যাগপূর্বক শিবগোত্রে প্রবেশ করে। ঐতিহাসিক যুগের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পুনরভিনয় হয় এই ভাবেই। ঐ দিনই তাহার মহাহবিষ্য পালন করে।

সংক্রান্তির গাজন নৃত্যের আসরও একটি বিরাট অনুষ্ঠান, সারা-রাত্রি ধরিয়া ঐ দিন ভক্তেরা শিবের আঁটনের চারিপাশে গান গাতিয়া নৃত্য করে। এই নৃত্যোৎসবের সঙ্গে রীতিমত সামরিক উদ্দীপনা বিজড়িত—এ বেশ মুগ্ধেরই মহড়া। এককালে এই সকল ভক্তদেরই পূর্বপুরুষগণ রণভাণ্ডে মাতিয়াছিল, তাহাদের বাহুবলেই বহু ভূমায় বহু ধনসম্পদ স্বেচ্ছাকৃত হইয়াছে, বহু দরিদ্রের শেষ সখল লুণ্ঠিত হইয়াছে; আজ তাহাদের সেই প্রতাপ না থাকিলেও, তাহাদের রক্তে রক্তে রহিয়াছে রণোদ্দীপনা।

নৃত্যের পূর্বে ‘ধারপরিষ্কার’ ও ‘খাটুনি’ নামক দুইটি অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়—

পূর্বে পূর্ণমণি স্মৃতিভায়া হায়,  
তিন বরণ রাঙা, তানু ভাস্কর,  
তাঁর চরণ সেবি কোন পদ পাই,  
নেই যাব যমপুরী ধর্মপুরী ঠাই।  
ধর্ম অধিকারী, কর্ম অধিকারী;

সাধুলিবে ভাই

পূর্ব দুয়ার খাটুনি হ’ল পুষ্পজল পাট।

চড়ক পূজার সময়ে ভক্তরা নানাপ্রকার দৈহিক নির্ধাতন খেজার পরিগ্রহ করে। কুমীরের পূজা, ফলস্ত অঙ্গারের উপর নৃত্য, কাঁটা বা ছুরির উপর বাঁপ দেওয়া, বাণ ফোঁড়া, অশ্বশানে বারানো ও হাঙ্গরা বা ভুতের পূজা, বেত্রাঘাতের নির্ধাতন, খেজুরের কাঁটার উপর শয়ন প্রভৃতি এই সূত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। এইগুলি সবই অনাধ-প্রভাব সঞ্চিত।

অনুষ্ঠানের পরিশেষে ভক্তেরা শিবের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে—

ভাঙব চারি দুয়ারের কবাট,  
দেখব এবার শিবের পাদচরণ।  
দশেতে করিল পূজা দশগিরি রাবণ,  
লোহার গুণে সেবা করে সেই পঞ্চানন।  
দেবদেবন মহাদেবন গলার উদ্দেশে পৈতা কাঁধে  
চুতঃ দুয়ার মুক্ত হ’ল দেখ পঞ্চানন।

গাজনের সময়ে পল্লীর নিমন্ত্রণ দেবতাগণও পূজা লাভ করেন।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা  
খুবই আশা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়াকিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার  
জ্ঞা লিখুন

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লি°

শো-রুম :—৮/২, এসম্প্যান্ডেড ইস্ট, কলিকাতা - ১

প্রত্যেক পর্যায়ে নিজস্ব গ্রাম্যদেবতা আছেন। অনাধি আমল হইতে এই ভাবে তাঁহারা গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষমূলে কিংবা অন্ত কোন নির্দিষ্ট স্থলে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কোথাও তাঁহাদের নাম বনদুর্গা, কোথাও বা বুড়োশিব।

বটগাছের পূজাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গৌড়বঙ্গের প্রাচীনতম কবি গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে আছে—

ঋষি কুশাম বটদ্রুম বৈষ্ণবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।

পারমর্য্যুপপাতাং কাসরশিঃসৈব তে রক্ষ।

এ ছাড়া গাছের সময়ে নানাপ্রকার ধনু বা কেশন পূজার প্রচলন ছিল এবং এখনও অনেক স্থানে আছে তবে তাহার দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তর হইতেছে।

## রেকর্ড-পরিচয়

“হিজ মাষ্টার ভয়েস” ও “কলহিয়া”র এবার চারখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে :

### হিজ মাষ্টার ভয়েস

N 82741—শ্রীমতী সূচিত্রা মিত্র “মরি লো মরি আমার” ও “আমি যে আর সইতে পারি নে”—রবীন্দ্র-গীতির অল্পতম শ্রেষ্ঠ অর্থা।

N 82742—“একটুকু ছাঁওয়া লাগে” এবং “আমার সঙ্গে এসে কে”—গেয়েছেন রবীন্দ্র-গীতি সাধিকা শ্রীমতী কবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

### কলহিয়া

GE 24838—কুমারী গায়ত্রী বসুর দরদী কণ্ঠে “সে কোন বনের হরিণ” ও “গোপন কথাটি রবে না গোপনে” ভাব ব্যক্তনায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

GE 24839—শ্রীমতী গীতা ঘটক রেকর্ড-জগতে নবাগতা হলেও সঙ্গীত-প্রিয়দের পরিচিতা। বিশ্বকবির “হৃৎজনে দেখা হল যমুযামিনীতে” ও “সখী বহে গেল বেলা”—গান দু’খানির ডালি নিয়ে শিল্পী রেকর্ড জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন—ভাব ও সুর মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর কণ্ঠে।

## আমার কথা (২৮)

### গৌরীকেশদার ভট্টাচার্য

আধুনিক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বাংলা এবং হিন্দী কি উচ্চ, কর্তন, জামাসঙ্গীত, পল্লীগীতি কিংবা জাতীয় সঙ্গীত আবার কাওয়ালি, গীত, নাত, গজল, ভজন, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি—সব রকম গানে সমান পারদর্শী, গীতি-রসিকদের দ্বিধা গায়ক গৌরীকেশদার ভট্টাচার্য ১৯১৬ সালে চটগ্রামের পরাইকোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ ৮অর্ণাচরণ ভট্টাচার্য। মাত্র

দশ মাস বয়সেই গৌরীকেশদারকে কানীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বালক বয়স হতে বারানসীর পবিত্র আবহাওয়ার তাঁর সঙ্গীত-সাধনা শুরু হয়। কানীর বিখ্যাত ক্রপদ গাইয়ে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কলকাতার আসেন এবং রক্তেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতে থাকেন।

কানীর সেন্ট্রাল কানী ইনস্টিটিউশন এবং কলকাতার ধর্মদাস মডেল স্কুল এবং সামরিক ইনস্টিটিউশনে তিনি লেখাপড়া করেন। যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন মাত্র সতের বছর বয়সে রেডিওতে গান করবার সুযোগ পান এবং ১৯৩৬ সালে কুড়ি বছর বয়সে কলকাতা রেডিওতে নিয়মিত শিল্পী হিসাবে কাজ শুরু করেন।

রেডিওতে গাওয়া গান ক্লাসে বসে ছাত্রবৃন্দের অমুরোধে গাইবার সময় ধরা পড়ে তিনি বিজ্ঞালয়ে হতে বহিষ্কৃত হন, তদবধি অনন্তচিত্তে সঙ্গীতের সাধনার নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রথম গান রেকর্ড করান,—১৯৩৭ সালে তা ‘হিন্দুস্থান’ রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং অচিরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার পর রিগাল, কলহিয়া এবং ‘হিজমাষ্টার ভয়েস’ রেকর্ডেও তিনি বাংলা হিন্দি এবং উর্দু বহু প্রকারের গান দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন।

রেডিও এবং রেকর্ড ব্যতীত চলচ্চিত্রে তিনি বহু গান নেপথ্য থেকে গেয়েছেন, নিজে পদ্য আবৃত্তিও হয়েও গেয়েছেন, বহু গানের সুর দিয়েছেন, সুরপরিচালকের কাজও করেছেন—‘হাপি ক্লাব’ নামক চিত্রে তিনি প্রথম নেপথ্য সঙ্গীত করেন। পরে ‘চন্দ্রশেখর’ ‘মরণের পরে’ ‘আবর্তন’, ‘নিমাই সন্ন্যাস’ প্রভৃতি ছবিতেও গান করেন। ‘এই আমার জীবন’ ‘শাখা সিঁদূর’ ‘মোচাকে ঢিল’, ‘মহাসম্পদ’ ‘নন্দারাবীর সঙ্গ’ ‘এক আউরং’ প্রভৃতি চিত্রে সহকারী সঙ্গীত পরিচালকের কাজ এবং নেপথ্য সঙ্গীত দুই কাজই তিনি করেন। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি ‘পরশ পাথর’ চিত্রে কাজ করেন।

বর্তমানে রেকর্ড এবং চলচ্চিত্রের সংস্পর্শ একরকম ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীতকে তিনি সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এখনও রেডিও এবং বড় বড় জলসায় গান করেন বটে, তবে আধুনিক গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই বেশি গেয়ে থাকেন। তিনি একজন দক্ষ সঙ্গীত শিক্ষক। বাগী বিজাবীধি, সুর বিজাবীধি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত শিক্ষকের কাজ করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে বহু গুণী গায়ক বেরিয়েছেন।

নিরতিমান অনলস কর্মী গৌরীকেশদার সামরিক বিভাগে ইলেকট্রিকাল এবং মেকানিকাল বিভাগে ভালো চাকরীতে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। বিদ্যায় ও যন্ত্রপাতির কাজে তাঁর দক্ষতা থাকলেও মন বসত না, ফলে তিন বছর কাজ করবার পর ফের তিনি পাগিয়ে এলেন সঙ্গীতের আসরে এবং বা তাঁর নিজের মনের মতো কাজ সেই গীত সাধনাতেই ভুবে গেলেন। আজিও চলছে তাঁর অত্যন্ত সাধনা। তিনি কখনও আত্মপ্রচার চাননি, চেয়েছেন গান-প্রাণ ঢেলে গান গাইতে, আর তাতেই পরকেও দিয়েছেন, নিজের পেয়েছেন পরম তৃপ্তি—বা প্রকৃত গুণী শিল্পীর ধর্ম।





প্রগতি ঘোষ লাক্স টয়লেট  
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন  
“এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা  
প্রমাণ করে।”

প্রগতি ঘোষ গুণী শিল্পী এবং হস্তশিল্পী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের তাঁকে ভাল লাগার জন্তে তাঁর ত্বকের লাভাণ্ড অনেকখানি দায়ী। সেইজন্তে তিনি সবচেয়ে মোলায়েম ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তাঁর ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। লাক্স টয়লেট সাবানের অগন্ধ স্নেহের মত ফেগার রাশি আপনার সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লা ক্স ট য় লে ট সা বা ন  
চি ত্র - তা র কা দে র সৌ ন্দ র্য সা বা ন

# আন্তর্জাতিক



## ঐগোপালচন্দ্র নিয়োগী

### জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন—

জর্ডানের রাজা হোসেন গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৫৭) সমগ্র জর্ডানে সামরিক আইন, আশ্রমের রাজপথ হইতে বিক্ষোভকারীদিগকে অপসারিত করিবার জন্য দিন-রাত্রি-বাপী কারফিউ জারী করিয়াছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খালিদির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিম হাসেনকে নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসের (১৯৫৭) তিন সপ্তাহব্যাপী যে সফল ঘটনার ক্রম পরিণতিতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহা জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন প্রয়োগের প্রথম ফল। ২৫শে এপ্রিল জর্ডান বেতারে রাজা হোসেনের বেকর্ড-করা যে বিবৃতি প্রচার করা হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, “আমি আমার সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছি।” তিনি যে জনগণের কিরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছেন, তাহা আশ্রমে দিন-রাত্রি-বাপী কারফিউ জারী হইতেই বুঝিতে পারা যায়। জর্ডানের রাজা যদি সত্যি জনগণের সমর্থন লাভ করিতেন তাহা হইলে কারফিউ জারীর কোন প্রয়োজন হইত না। সৈন্যবাহিনীর সমর্থন যে তিনি পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমর্থন পাওয়ার পূর্বে জর্ডান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবু মুওয়্যাকে তিনি পদচ্যুত করেন এবং ১৭ জন সামরিক অফিসার এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবুলসির ১১ জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। জেনারেল মুওয়্যাকে পদচ্যুত করার পর মেজর জেনারেল আলি হিয়ারীকে জর্ডান বাহিনীর চীক অব ষ্টাফ নিযুক্ত করা হয়। রাজা হোসেন ৬০ জন সামরিক অফিসারকে বৈরতাত্ত্বিক ভাবে পদচ্যুত করায়, উহার প্রতিবাদে মেজর জেনারেল আলি হিয়ারীও পদত্যাগ করেন। সামরিক অফিসারদের মধ্যে যে-সকল আরব ফিলিস্তানী ছিল এই ভাবে তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া রাজা হোসেন তাহাদের স্থানে অল্পগত বেদুইন অফিসার নিযুক্ত করায় সৈন্য বাহিনীর সমর্থন পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

আশ্রমের রাজপথগুলিতে গত ২৪শে এপ্রিল যে মার্কিন বিবোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, রাজা হোসেনের বিবৃতিতে তাহার জন্য আন্তর্জাতিক কম্মানিষ্মমকে দায়ী করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক কম্মানিষ্মমের অজুহাতে বাহা খুদী তাহাই যে করিতে পারা যায়

জর্ডানের ঘটনাবলী তাহার আর এক দফা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিবৃতিতে তাঁহার ক্ষিচ্ছে চক্রান্ত করার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, কয়েক জন অফিসারের দেশত্যাগই উহার প্রমাণ। জর্ডানের সঙ্কটকে রাজা হোসেন সম্পূর্ণ রূপে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জর্ডানের ব্যাপারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ করা হইবে না। কিন্তু জর্ডানবাসীদের অধুষ্ঠের ইহা এক পরিহাস যে, আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের স্বার্থেই রাজা হোসেন জর্ডানে এই সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনকে নিয়োগ করিয়াছেন নিজের সিংহাসন রক্ষার প্রয়োজনে। বিবৃতিতে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে জর্ডানের বাহির হইতে নির্দেশ গ্রহণের অভিযোগও উপস্থিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অভিযোগ জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত অক্টোবর মাসের (১৯৫৬) সাধারণ নির্বাচনে জনগণ বাহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহার বিদেশ হইতে নির্দেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বাহিরের নির্দেশ বলিতে রাজা হোসেন বুটেন বা মার্কিন প্রুস্তরাষ্ট্রের নির্দেশকে বুঝান নাই, বুঝাইয়াছেন রাশিয়ার নির্দেশকে। রাশিয়া আরব রাষ্ট্রগুলিতে অমুপ্রবেশ করিতে চেষ্টার ক্রটি অবশ্যই করিতেছে না। কিন্তু কার্যতঃ রাশিয়া কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রাশিয়া কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা নিরোধের জন্যই আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন। জর্ডানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবুলসী আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন ও সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়াছেন। ইহার উপর তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সন্ধি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। রাজা হোসেন উহাকেই জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহার অত্যাচরণের সুরোপে পণ্ডিত করিয়াছেন।

জর্ডানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহা আসলে রাজা হোসেনের সিংহাসন সঙ্কট। তাঁহার সিংহাসন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জর্ডানের রাজসিংহাসনের রক্ষক বুটেনের অর্থ সাহায্য, বুটেন জেনারেল গ্রাব পাশা কর্তৃক গঠিত সৈন্য বাহিনী অর্থাৎ আরব লিজিয়ন এবং বেদুইনদের আত্মগত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে অকস লইয়া ট্রান্স জর্ডান রাজ্য গঠিত হয় তাহা ছিল ৪ লক্ষ বেদুইন অধুষিত। বুটেন আমীর আবদুল্লাকে এই ট্রান্স জর্ডান অঞ্চলের অধিপতি করেন এবং বেদুইনরাও তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লয়। সম্পূর্ণরূপে বুটেনের অর্থে আরব লিজিয়ন গঠিত হয় এবং বুটেন জেনারেল গ্রাব

পাশার হাতেই ছিল প্রকৃত পক্ষে এই নূতন রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা। ব্রিটিশ অর্থের উপরেই এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। বেহুইনদের রাজনৈতিক চেতনা বলিয়া কিছু নাই, গণতন্ত্রের দ্বারা তাহারা ধার্য না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাবধারার মধ্যে বদ্ধিত বলিয়া আর্মীর আবদুল্লাহর প্রতি তাহাদের আনুগত্য একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই ভাবে রাজা আবদুল্লাহর রাজ্য শাসন বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছিল। অতঃপর ১৯৪৮ সালে আরম্ভ হইল আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একমাত্র ট্রান্স জর্ডানের আরব লিজিয়নই বিজয় গৌরব অর্জন করিতে এবং জর্ডান নদীর অপর পারশ্বে নয় লক্ষ আরব ফেলিস্তানী অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। এই অঞ্চল ট্রান্স জর্ডানের অঙ্গভূত হওয়ার উদ্যোগ নূতন নামকরণ হইল জর্ডান। এই যে নয় লক্ষ ফেলিস্তানী আরব জর্ডানের নাগরিক হইল ইহারা সকলেই রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন এবং গণতন্ত্রের সমর্থক। জর্ডান রাজ্য সিংহাসনের সঙ্কটের সূচনা এই সময় হইতেই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

রাজা আবদুল্লাহ একজন ফেলিস্তানী আরবের হাতেই ১৯৫১ সালে নিহত হন। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তালাল সিংহাসনের আরোহণ করেন। কিন্তু জেনারেল গ্রাব পাশার সহিত ছিল তাঁহার মনোমালিঙ্গ। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই পুত্র হোসেনের অমূল্যে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইল। এই তরুণ যুবক রাজা হোসেনই গ্রাব পাশাকে ১৯৫৬ সালে বরণান্ত করেন। তাহার দুই বৎসর পূর্বে ১৯৫৪ সালে তাঁহাকে বরণান্ত কবিতার কথাবার্তা স্থির হইয়াছিল। তরুণ রাজা হোসেন প্রথমে বুটেনের একান্ত অমুগত মিত্রই ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে তিনি যখন প্যারীতে গিয়াছিলেন সেই সময় প্যারীস্থিত তাঁহার সামরিক এ্যাটাচি আবুহুওয়ায়ের প্রভাবে পতিত হন। আবুহুওয়ায় গোড়া জাতীয়তাবাদী, জর্ডান হইতে ব্রিটিশ প্রভাব নিষ্কিষ্ণ করিতে তিনি বহুপরিকর; প্যারীর হোটেল বুটলে তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে রাজা হোসেন জেনারেল গ্রাব পাশাকে বরণান্ত করার সিদ্ধান্ত করেন। আরব লিজিয়নের সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ হইতে তাঁহাকে অপসারণের কাহিনী এখানে উল্লেখ করা নিম্নয়োজন। বাগদাদ চুক্তির বিরুদ্ধে জর্ডানে প্রবল বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা এবং আরব লিজিয়নের উপর হইতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অপসারণের দাবীকে উপলক্ষ করিয়া ১৯৫৬ সালের ২রা মার্চ রাজা হোসেন ব্রিটিশ জেনারেল জন গ্রাব ওরফে গ্রাব পাশাকে পদচ্যুত করেন এবং জেনারেল আলি আবুহুওয়ায় তাঁহার স্থানে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

জেনারেল আবুহুওয়ায় মিশর ও সিরিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী। ব্রিটিশের সাহায্য বর্জন করিলে ইহা ছাড়া জর্ডানের স্থায়িত্বের আর কোন পথ নাই। রাজা হোসেনের কাছে ইহা খুব ভাল লাগে নাই। তাঁহার ভাগ্যে মিশরের রাজার অবস্থা ঘটবার আশঙ্কা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ভাড়াবা ইরাকের রাজার সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ারই পছন্দ করেন। কিন্তু ঘটনার গতি তাঁহার সিংহাসন বিপন্নহওয়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫৬) জর্ডানে বেসাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে ইজ-জর্ডান দাঙ্গা বাতিলের পক্ষপাতীরাই

সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনের পর মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের সৈন্য বাহিনীর জন্ত দৌধ কমান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। রাজা হোসেন একান্ত অনিচ্ছা সবে ইজ-জর্ডান সন্ধি বাতিল করিতে বাধ্য হন। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৬) একদল সিরিয় সৈন্য জর্ডানের মাফরাক সহরে মোতায়েন হয়। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসী জর্ডান বাহিনীর এক অংশের সমর্থন লাভ করেন। এই অবস্থায় রাজা হোসেন যে তাঁহার সিংহাসন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন ইহা খুব স্বাভাবিক।

সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্ত রাজা হোসেন কি কি পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। লগুন হইতে প্রেরিত ৩রা এপ্রিলের (১৯৫৬) এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাজা হোসেন মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট কোয়টলীর নিকট যে গোপন পত্র দেন তাহা হইতেই সঙ্কটের উদ্ভব হয়। ঐ পত্রে তিনি মিঃ মুলেমান নবুলসীর প্রধান মন্ত্রিগে গঠিত জর্ডান গবর্নমেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের গুরুতর অপব্যবহার করার অভিযোগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের কি গুরুতর অপব্যবহার করা হইয়াছে তাহা কিছুই ঐ সংবাদে প্রকাশ নাই। কিন্তু সংবাদে ইহাও বলা হয় যে, যে কোন যুহুর্ন্তে নিরাপদ স্থানে চলিয়া বাইবার জন্ত রাজা হোসেন নিজের প্রাইভেট বিমান প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তিনি নাকি তাঁহার নয় বৎসরবয়স্ক ভ্রাতার অমূল্যে সিংহাসন ত্যাগ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু বামপন্থীরা প্রজাতান্ত্রিক গবর্নমেন্ট দাবী করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ২রা এপ্রিল নবুলসী সন্ত্রাসভা সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যিনি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই নিশ্চিত ছিলেন না সেই রাজা হোসেন জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিরূপে তাহা রহস্যাবৃতই রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে সৌদী আরবের রাজা সৌদ ওয়াশিঙন হইতে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাভর্তন করিয়াছেন, যে মাসের প্রথম ভাগে তাঁহার আখ্যান পরিদর্শনের কথাও ছিল। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডস আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের বেসাতী ফেরি কবিতার জন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বাহির হইয়াছেন। এইগুলি যে রাজা হোসেনের অমূল্যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইরাকের নিকট তিনি তিনি কোন সাহায্য চাহিয়াছিলেন কি না তাহা অবশ্য কিছুই জানা যায় না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে আরব রাষ্ট্রগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে, রাজা হোসেন কয়েক মাস পূর্বে হইতেই এই বুলি কপচাইতে ছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ ফরেস্টল (Forrestal) লেবাননের বেইরুটে আসিয়া নোঙ্গর ফেলে। এই জাহাজটি পৃথিবীর বিমানবাহী জাহাজগুলির মধ্যে বৃহত্তম। জর্ডানের সঙ্কট এবং মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ 'ফরেস্টল'র বেইরুটে উপস্থিতি একেবারেই কাকতালীয় ভায়েব মত, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বিমানবাহী জাহাজের উপস্থিতির ফলে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন গ্রহণ সম্পর্কে লেবানন গবর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত লেবানন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

অনুসূচ পরিবেশের সুযোগেই রাজা হোসেন প্রথম আশাত হানেন নবুলসী মন্ত্রিসভার উপর। আশ্মান হইতে প্রেরিত ১৪ই এপ্রিলের (১৯৫৭) সংবাদে অবগত বলা হইয়াছে যে, চারি দিন পূর্বে রাজার অনুবোধে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুলেমান নবুলসী পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজাই যে মিঃ নবুলসীকে পদচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজা হোসেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আবদুল হালিম নিম্নরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে নির্দেশ দেন। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, ডাঃ হোসেন ফখরি খালিদিকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দেওয়া হয়। তিনি ১৫ই এপ্রিল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন। রাজার সহিত আপোষের ভিত্তিতে এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রূপে উহাতে স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতেও সমস্তার সত্যিকার কোন সমাধান হয় নাই এবং রাজা হোসেন তাঁহার সিংহাসন সঙ্কটমুক্ত হইয়াছে, ইহাও মনে করিতে পারেন নাই। গত ২১শে এপ্রিল মিঃ নবুলসী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি একজন কন্সটিটিউশনাল বিরাগী। তিনি বলেন, “আমি আমার নিজের মত করিয়া কন্সটিটিউশনের সহিত সংগ্রাম করিতে চাই, আইসেনহাওয়ারের পছন্দ নহে।”

আশ্মানে সোভিয়েট দূতাবাস থাকিলে তিনি কন্সটিটিউশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন কিরূপে, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নবুলসী বলেন “আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, অজ্ঞাত কূটনৈতিক মিশন আমাদের ঘরোয়া, ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে;” ইতিপূর্বে রাজাকে হত্যা করার এক বড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার এবং অতঃপর আরব লিগিয়নের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়ার এবং রাজা হোসেন কর্তৃক তাগাদমন করার এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই বিদ্রোহকে উপলক্ষ করিয়াই সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ আবুদুওয়ারকে এবং আরও কয়েকজন সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। মেজর জেনারেল আলি হিয়াবীকে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরে তিনিও পদত্যাগ করেন। ঐ সময় ইরাকী সেনাবাহিনীর জর্ডানে প্রবেশের সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাগদাদের সরকারী মহল হইতে ইরাকী ফৌজের জর্ডানে প্রবেশের সংবাদ অস্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে উহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

মে: জে: আলি হিবরা পদত্যাগ করিয়া দামাস্কাসে চলিয়া যান এবং সেখানে এক বিবৃতিতে বলেন, “জর্ডান বড়যন্ত্রের ব্যাপারে কয়েকজন বিশেষী কূটনীতিবিদের হাত রহিয়াছে। তাঁহাদের অভিসন্ধি হইতেছে, রাজার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী বড়যন্ত্র করিয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ করিতে চান।” বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, “সাম্রাজ্যবাদীদের রথচক্রে জর্ডানকে বাঁধা দিতে চায় এইরূপ গবর্ণমেন্ট গঠনের চেষ্টা করা হইলে জনগণ যদি তাহার বিরোধিতা করে, তাহা হইলে সৈন্যবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে কি না, তাহা নির্ধারণের দায়িত্ব আমার উপর স্তম্ভ করা হইয়াছিল।” তাহার এই বিবৃতি ও বহু সংখ্যক সামরিক অফিসারকে অপসারিত করা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে, সৈন্যবাহিনীতে রাজার একান্ত অনুগত অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ইহার পর রাজা হোসেন ২৫শে এপ্রিল জর্ডানে সামরিক আইন ও আশ্মানে দিনরাতব্যাপী

কারকিউ জারী করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দিনেই ভূমধ্য-সাগরস্থ মার্কিন যুক্ত নৌবহর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে মহড়া দিতে আরম্ভ করে। ইহাকে কাকতালীয় ভাষা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। জর্ডানের এই সঙ্কটে রাজা হোসেন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য চাহেন কি না, তাহা জানিবার জন্ত মার্কিন গবর্ণমেন্ট জর্ডানস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ প্রদান করেন। রাজা হোসেন দলনিরপেক্ষ রাজনীতিক ইব্রাহিম হাসেনকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে রাজার নির্দেশ অনুসারেই চলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসীকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে রাজা হোসেনের জয়লাভ যে একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। এই জয়লাভের মধ্যে জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের জয়লাভও সূচিত হইতেছে।

### মিশরের সুয়েজ-পরিবর্তন—

সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইয়াছে এবং সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচলও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সুয়েজ খাল সমস্তার কোন সমাধান এখনও হয় নাই। সম্প্রতি মিশর সুয়েজ খাল পরিচালন সম্পর্কে এক স্মারক-লিপি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের নিকট পেশ করা করিয়াছে। গত ২৪শে এপ্রিল (১৯৫৭) কায়রো রেডিও হইতেও এই স্মারক-লিপির বিবরণ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই স্মারক-লিপিতে বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৮ সালের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই মিশরের নীতি এবং মিশর গবর্ণমেন্ট উহা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদও মিশর মানিয়া চলিতেছে। এই সাধারণ প্রতিশ্রুতি ব্যতীত সুয়েজ খাল পরিচালন সম্পর্কে মিশর যে পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে তাহাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন।

মিশর এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, আলাপ-আলোচনা কিংবা সালিশী ব্যতীত ১২ মাসের মধ্যে মিশর খালের মাস্তুল শতকরা এক ভাগের বেশী বৃদ্ধি করিবে না। কিন্তু এই ১২ মাস প্রথম বার মাস, না যে কোন বার মাস তাহা স্পষ্ট কারয়া কিছুই বলা হয় নাই। এই অস্পষ্টতা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। উন্নয়ন তহবিলের জন্ত খালের রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবার প্রতিশ্রুতিও মিশর দিয়াছে এবং ইহাও জানাইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিবর্তনও মিশর কার্যকরী করিবে। খালের মাস্তুল হইতে মোট যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা ৫ ভাগ মিশর তাহার রয়্যালটি বাবদ রাখিবে। ইতিপূর্বে ব্যবহৃত ছিল যে, খরচ খরচা বাদ দিবার পূর্বে খালের মাস্তুল হইতে মোট যে আয় হইত তাহার শতকরা ৭ ভাগ মিশর রয়্যালটি বাবদ পাইবে। সে তুলনায় মোট রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ যে অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। খাল পরিচালন ব্যাপারে কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে কি না, তাহাও একটি বড় প্রশ্ন। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দুই ব্যাপারে অভিযোগ উপস্থিত হইলে যে ভাবে উহার

মীমাংসা করা হইবে সেসম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছে। প্রথমতঃ সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের মীমাংসা যদি সম্ভাবজনক না হয়, তবে উহার মীমাংসার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটিতে অভিযোগকারী দেশের এবং খাল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি তো থাকিবেনই, তাছাড়া উভয় পক্ষ কর্তৃক মনোনীত আরও দুইজন সালিশীও থাকিবেন। এই দুইজন সালিশী মনোনয়ন সম্পর্কে যদি কোন মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা হইবে। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ মানিতে মিশর বাধ্য থাকিবে। পক্ষটি এমন যে মীমাংসা হওয়া বহু সময় সাপেক্ষ হইবে। ইহাতেও উভয় পক্ষের সম্ভাবজনক কোন মীমাংসা হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

মিশরের এই স্মারকলিপিকে আন্তর্জাতিক দলিল হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রেজিস্ট্রি করা হইবে। ইতিপূর্বে বহু আন্তর্জাতিক দলিলের ভাগ্যে বাহা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে সুয়েজ সম্পর্কে মিশরের পরিকল্পনাকে আন্তর্জাতিক দলিলরূপে গণ্য করার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রশ্ন বাদ নিলেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গত অক্টোবর মাসে সুয়েজ খাল সম্পর্কে যে ছয়টি নীতি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে মিশরের উক্ত পরিকল্পনা তদনুযায়ী হয় নাই। মিশরও ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, উক্ত ছয়টি নীতি আঞ্চলিক ভাবে স্বীকৃত হয় নাই, তবে উহার মূলনীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সুয়েজ খাল-এ কোনও দেশের রাজনীতির সহিত জড়িত করা চলিবে না, এই নীতি মিশরের পরিকল্পনায় নাই। ইসরাইলী জাহাজ সম্পর্কে মিশর যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করিবে, একথা মিশর গোপন রাখে নাই। তবে মিশর এই পর্যন্ত করিতে পারে যে, ইসরাইলের জন্য পণ্য লইয়া অন্ত দেশের যে সকল জাহাজ বাইবে মিশর সেগুলিকে আটক করিবে না। মিশর সুয়েজ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে তাহা পশ্চিমী শক্তিবর্গের পছন্দ হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

### জারি মিশনের ব্যর্থতার গুঁতো—

নিরাপত্তা পরিষদের ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৭) প্রস্তাব অনুযায়ী মিঃ গানার জারি ভারত ও পাকিস্তান গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া গত ৩০শে এপ্রিল তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কান্দীর প্রশ্ন মীমাংসার কোন পন্থা বাহির করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। মিঃ জারি ব্যর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতকে বার্ষিক এক প্রচণ্ড গুঁতো দিতেও তিনি ছাড়েন নাই। তিনি তাঁহার রিপোর্টে কান্দীর কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্টের প্রস্তাব ১৯৪১ সালের এই জাহুয়ারী প্রস্তাব সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই উক্ত দুইটি প্রস্তাব বাণ্যকর বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি এবং কান্দীরের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করিবার কথা আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গণভোট পরিচালক সম্পর্কে। মিঃ জারি তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান গবর্নমেন্ট মনে করেন যে, তাঁহারা সরল বিশ্বাসে উক্ত প্রস্তাবের সর্ব

কার্য্যকরী করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত বাহা বলিয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কথা এই যে, ১৯৪৮ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানী ফৌজ কান্দীর হইতে অপসারণ করা হয় নাই এবং আফ্রান কান্দীর বাহিনীও ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই। কাজেই প্রস্তাবের অস্তিত্ব অংশ কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না। ১৯৪১ সালের এই জাহুয়ারী প্রস্তাবও কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়তঃ ভারতের কথা এই যে, ভারত গবর্নমেন্ট ১৯৪৮ সালের ১লা জাহুয়ারী আক্রমণের যে অভিযোগ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন নিরাপত্তা পরিষদ সে সম্পর্কে নীরব। মিঃ জারি তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কান্দীর কমিশনের প্রথম প্রস্তাবের প্রথম অংশ কার্য্যকরী করা হইয়াছে কি না তাহা নির্ধারণের জন্য তিনি সালিশ নিযুক্তের প্রস্তাব উপাধন করেন। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায়, পাকিস্তান অনেক বিধা-বান্ধব পর নীতিগত ভাবে সালিশের প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ভারত প্রশ্নগুলি সালিশীর যোগ্য বলিয়া মনে করে না।

মিঃ জারি সালিশের প্রস্তাব কোন সময় উপস্থিত করিয়াছিলেন রিপোর্ট তাহা কিছুই জানা যায় না। উক্ত প্রস্তাব ভারত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পাকিস্তান নীতিগত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে কি না সে সম্পর্কেও রিপোর্ট নীরব। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ জারি পাক গবর্নমেন্টের সহিতই সর্বশেষ আলোচনা করেন। কতগুলি তথ্য নির্ধারণের জন্য সালিশের প্রস্তাব করিয়া তিনি আক্রান্ত ভারত এবং আক্রমণকারী পাকিস্তান উভয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কান্দীর সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন ইহা যে তদনুযায়ী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! দ্বিতীয়তঃ মিঃ জারি কৌশলপূর্ণ উপায়ে তাঁহার বার্ষিকতার দায়িত্ব ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সালিশ নিয়োগ সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব পাকিস্তান গ্রহণ করায় এবং ভারত গ্রহণ না করাতাই যে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন তাঁহার রিপোর্ট হইতে বিষবাসী মনে এই ধারণাই জন্মিবে। ইহা দ্বারা তিনি পাকিস্তানের হাতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নূতন অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান এইবার বলিবে যে, ভারত শুধু গণভোট গ্রহণেরই বিরোধী নয়, সালিশীরও বিরোধী। পাকিস্তান যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে ক্রটি করিবে না তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। মিঃ জারি তাঁহার রিপোর্টে আরও বলিয়াছেন যে, সমস্তগুলির মোটামুটি মীমাংসার জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষই তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রস্তাবগুলি কি তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণভোট সম্পর্কে এবং উহার ফলে যে-সকল সমস্যা দেখা দিবে তাহার সমাধানের জন্যও নাকি তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রিপোর্টে প্রস্তাবগুলির কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

মিঃ জারি তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, সমগ্র কান্দীর প্রশ্নের সহিত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রপনৈতিক প্রশ্ন সমূহ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সম্পর্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি উদ্বেগ অনুভব করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন



নাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা কাহাবও অজ্ঞাত নয়। গত ১০ বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরের কতক অংশ পাকিস্তান বে-আইনী ভাবে দখল করিয়া রহিয়াছে, ই অংশে সৈন্যদা-পা- বন্ধিত করিয়াছে এবং তাহার শাসনতন্ত্রে সমগ্র কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সাময়িক দিক চট্রিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তরাংশের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। পাকিস্তান মার্কিন সাময়িক সাহায্য পাওয়ার এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তান সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তির সমস্ত। পাকিস্তান সাময়িক সাহায্য পাইতেছে। এইগুলিই যে পরিবর্তনশীল অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ জারি: নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহার বার্ষিকতার রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদ কি করে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকে মনে করেন বহনওয়েলথ সম্মেলনের পূর্বে জারি: রিপোর্ট সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হইবে না।

### বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বৈঠকের আশা :—

আন্তর্জাতিক আকাশ যে আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল মেঘে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া যে নবওয়ে, ডেনমার্ক এবং নাটোর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে তাহা গত চৈত্র মাসের (১৩৬৩) মাসিক বহুমতীতে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ বারমুড়া সম্মেলনের পর হইতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের এই তীব্রতা সত্ত্বেও কুনোতিবিদগণ বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের প্রধানদের আর একটি সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস করিতে হইলে যে বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের একত্র মিলিত হওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি এমন কি কি ঘটনা ঘটয়াছে যাহাতে সম্ভাব্য কালের মধ্যে আরও বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা সঘন্য ধাণা খোঁসণ চলে যাওয়া পাবে তাহা খবরটি বিবেচনার বিষয়। নিউ ইয়র্ক হইতে ২১শে এপ্রিলের (১৯৫৭) সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্বাতী সন্থার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা ১৯৪৫ সালের পর সর্বাপেক্ষা আশাশ্রয়। মস্কোর রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরূপ সে-সময়ে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদানের ক্ষতই প্রে: আইসেনহাওয়ার মন্তব্যস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেকে মনে করেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর চতু:শক্তি সম্মেলন সঘন্যে মার্কিন গবর্নমেন্টের মতের পরিবর্তন হইতে পারে। তাহাড়া পশ্চিমী শক্তির্ণের মগ্যাদা লইয়া বাড়বাড়ি না করিয়া সুবেজ সমস্তা সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গ আলোচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়াই মনে হয়। গত ২০শে এপ্রিল (১৯৫৭) মিঃ ডালেস বলিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ, তাৎকালিক রাষ্ট্রগুলির প্রতি ব্যবহার এবং জাতিগতিকে ঐক্যবদ্ধ করণ সম্পর্কে রাশিয়া কি করিতে প্রস্তুত তাহাবই উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে নূতন সম্মেলন আহ্বান করা নির্ভর করিতেছে। যদিও মিঃ ডালেস এইরূপ সম্মেলন আহ্বান

সম্পর্কে সর্ব আশ্রয় করিয়াছেন, যদিও এই ধরনের সর্ব রাশিয়া রাজ্য হইবে না, তথাপি ইহা বুঝা বাইতেছে যে, বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের প্রধানদের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা একেবারে অলৌকিক কল্পনা নয়।

বুটিন প্রধান মন্ত্রী মিঃ মাকমিলনের নিকট রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিনের ব্যক্তিগত পত্রও বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয়ের প্রধানদের মধ্যে সম্মেলন সম্পর্কে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এই পত্রে রুশ প্রধান মন্ত্রী বুটিন প্রধান মন্ত্রীকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মার্কিন গবর্নমেন্টের সত্বিত আলোচনা না করিয়া মিঃ মাকমিলন এই পত্রের উত্তর অবগত হিবেন না। মার্কিন গবর্নমেন্ট এবং ফরাসী গবর্নমেন্ট সমর্থন করিলেই তিনি রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বুটিন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন চাহে না, তেমনি বুটিনও চায় না যে, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার একমাত্র বিকল্প বৃহৎ চতু:শক্তির মধ্যে আলোচনা। কি রাশিয়া কি পশ্চিমী শক্তিবর্গ সকলেই ইহা বুঝিতে পারিতেছে যে, এই পরমাণু অস্ত্রের যুগে হয় এক সঙ্গে বাস করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, না হয় একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

লণ্ডনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিম জাতিগত বনে উত্তর আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলন হইয়া গেল। শক্তিশালী হইয়া রাশিয়ার সত্বিত আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যেই উত্তর আটলান্টিক চুক্তি করা হইয়াছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত বার্ষিক হইয়াছে। রাশিয়াও পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হইয়াছে। উত্তর আটলান্টিক চুক্তির উত্তর রাশিয়া ওয়ারশ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। পশ্চিম জাতিগত নাটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঐক্যবদ্ধ জাতিগত গঠনের আশা সর্ব পর্বত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর পক্ষে চলিতেছে অস্ত্রসম্ভার প্রবল প্রতিযোগিতা। চলিতেছে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পরিণামও যে ভয়াবহ সে-বিষয়ে সকলেই একমত। সম্প্রতি বুটিনও হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে উত্তেজিত হইয়াছে। ক্রিষ্টমাস বোপে বুটিন সর্বপ্রথম তাহার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। সম্প্রতি রাশিয়াও অনেকগুলি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। নাটোর বৈঠকের শেষে গত ৩রা মে (১৯৫৭) ঘেচুডাস্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহাতে বলা হইয়াছে আটলান্টিক মৈত্রীর বিচ্ছেদ কোন আক্রমণ হইলে তাহার সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাহাতে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা অবগত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র পাইবার ব্যবস্থা। সর্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র যে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তর পক্ষেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত হইলেই যে পরমাণু যুদ্ধ অবগত হইবে, ইহা অবগত মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই আশঙ্কা যেমন উপেক্ষার বিষয় নহে, তেমনি উহার পরিণামে ব্যাপক ধ্বংস অনিবার্য।

## সবাই ডামেন -

শীল করা প্যাকেটে  
পাওয়া যায় ব'লে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
নির্ভেজাল ও একেবারে  
খাঁটি থাকে

প্রতি প্যাকেট  
**ব্রুক বণ্ড চায়ে**  
অনেক বেশী কাপ  
ভালো চা  
তৈরী করা যায়

বাজারে  
**ব্রুক বণ্ড**  
চায়েরই কাঁচিতি  
সব চেয়ে বেশী



এই জন্যই অন্য  
যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে

# ব্রুক বণ্ড

# চা

বেশী লোকে খান !



## ১৩৬৩-৬৪ সালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

* কবিতা *		বৃষ্টি, বৃষ্টি! ৫।	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কাব্যবিতান ১০৭	প্রমথনাথ বিদ্যী ও চাঁদাপদ	ব্যালেরিনা ৩৭	সুধীরঞ্জন মুখো:	ডি, এম, লাইব্রেরী
দশমী ১৭	মুখোঃ সম্পাদিত বেঙ্গল পাবলিশার্স	ভুবন সোম ২।	বনফুল	" "
দৃশ্যস্তিক ২৭	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সিগনেট	ভৃগুভাতক ৫৭	হারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	মিত্র ও ঘোষ
দুঃখের দর্পণে ১৭	মৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত এম, সি, সরকার	মধুমাধবী ৩৭	সুশীল রায়	সত্যভক্ত চাঁইডেরী
মনোগন্ধা ২৭	বাম বসু গ্রন্থ-জগৎ	মণিমালা ২৭	লীলা মজুমদার	এসিয়া পাবলিশিং
সাগর থেকে ফেরা ৩৭	বটবুদ্ধ দে ক্যাল: পাবলিশার্স	যত্ন ও শ্রীমতী ৩৭	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি, এম, লাইব্রেরী
পুনির্বাচিত কবিতা ৪।	প্রমোদ মিত্র ইণ্ডিয়ান অ্যাসোস:	লালবাঈ ৫৭	রমাপদ চৌধুরী	" "
হেমন্তের দিন ১।	মোহিতলাল মজুমদার	শেষ পাণ্ডুলিপি ৩।	বৃদ্ধদেব বসু	এম, সি, সরকার
	বাক্সলক্ষী দেবী অভ্যাস	সুজাতা ২।	সুবোধ ঘোষ	ক্যাল: পাবলিশার্স
* উপন্যাস *			* গল্পগ্রন্থ *	
অতিক্রান্ত ৩।	আশাপূর্ণা দেবী জিওফ্র লাইব্রেরী	আপন প্রিয় ৩৭	রমাপদ চৌধুরী	ত্রিবেণী প্রকাশন
অমুগাগিণী ২৭	নরেন্দ্রনাথ মিত্র বেঙ্গল পাবলিশার্স	কড়ির বাঁশি ৩৭	সন্তোষকুমার ঘোষ	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
অস্তরঙ্গ ২।	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সিগনেট	গল্প পঞ্চাশৎ ৮৭	বিভূতিভূষণ বন্দ্যো:	মিত্র ও ঘোষ
ইন্দ্রাণ্ডের স্বাক্ষর ১০৭	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ওরিয়েন্ট বুক কোং	গল্প-সংগ্রহ ৩।	নারায়ণ গঙ্গো:	" "
খেলাঘর ৪৭	প্রাণতোষ ঘটক সাহিত্য ভবন	" " ৪৭	প্রবোধকুমার সাঙ্কাল	" "
গড় জীবন ৮৭	অমিয়ভূষণ মজুমদার নাভানা	চকচকী ২৭	সত্যনাথ ভাট্টা	বেঙ্গল পাবলিশার্স
জলা মাঠের কসল ৩।	ললিতভূষণ দাশগুপ্ত নিরীক্ষা	জীবন-জীবন ২৭	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো:	সাহিত্য ভবন
জন্মেছি এই দেশে ৪৭	গজেন্দ্রকুমার মিত্র মিত্র ও ঘোষ	ভাল বেতাল ২।	বিভূতিভূষণ মুখো:	নবভারত
তিতাস একটি নদীর নাম ৬৭	অষ্টমত মল্লবর্ণণ পুথিঘর	নিরস গল্প-সংকলন ৩।	প্রমথনাথ বিদ্যী	ওরিয়েন্ট বুক কোং
তিন তরঙ্গ ৪৭	প্রতিভা বসু নাভানা	নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩৭	পরশুরাম	এম, সি, সরকার
দম্পতি ৩।	প্রভাত দেবসরকার ক্যালকাটা বুক ক্লাব	পলাশের নেসা ৩৭	সুবোধ ঘোষ	ত্রিবেণী প্রকাশন
দেওয়াল ৪।	বিমল কর ডি, এম, লাইব্রেরী	প্রেমের গল্প ১।	বিশ্ব মুখোঃ সম্পাদিত	রীডার্স' কন'রা
খুলোমাটি ৬৭	ননী ভৌমিক বেঙ্গল পাবলিশার্স	বাসক-সজ্জিকা ৪৭	প্রাণতোষ ঘটক	মিত্র এণ্ড ঘোষ
নয়ান বো ৫৭	বিভূতিভূষণ মুখোঃ মিত্র ও ঘোষ	ময়ূরী ২৭	বিমল কর	বাসন্তী বুক ট্রল
নাগমতী ৪।	প্রফুল্ল রায় " "	রূপালী রেখা ৩।	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	আভেনিউ
নীলাঙ্গন ৪৭	সরোজ রায়চৌধুরী বেঙ্গল পাবলিশার্স	জ্যেষ্ঠ গল্প ৫।	ত্রৈলোক্যনাথ মুখো:	মিত্র ও ঘোষ
পুতুলের খেলা ২।	সমরেশ বসু ডি, এম, লাইব্রেরী	" " ৪৭	পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য	গুরুদাস
প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান ২৭	মানিক বন্দ্যোঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স	" " ৪।	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	বিহার সাহিত্য ভবন
বহ্নি-পতঙ্গ ৩।	শরদিন্দু বন্দ্যোঃ গুরুদাস	বঠ ঝড় ২৭	সমরেশ বসু	নিওলিট
বালির প্রাসাদ ৪৭	পুলকেশ দে-সরকার নবভারতী	সপ্তপদী ১৫।	প্রমোদ মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোস:
বিচারক ২।	ভারীশঙ্কর বন্দ্যোঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স	সরস গল্প ৪৭	আশাপূর্ণা দেবী	কথায়ত ভবন
বেগমবাহার লেন ৪৭	বারীন্দ্রনাথ দাশ বেঙ্গল পাবলিশার্স	পুনির্বাচিত গল্প ৪৭	মানিক বন্দ্যো:	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোস:
		" " ৪৭	শিবরাম চক্রবর্তী	" "

**\* রম্যরচনা \***

আড্ডা ২৬	গোপাল হালদার	বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রিয়ানী ২৬	মৌলানা খান খান	সত্যভদ্র লাইব্রেরি
বসন্ত কেবিন ২১	নীলকণ্ঠ	ষ্ট্যাণ্ডার্ড
মনে এল ৪৬	ধর্জিপ্রসাদ মুখো:	নিউ এক্স
সপ্তপঞ্চ ৩১	পরিমল গোস্বামী	মিত্র ও ঘোষ

**\* নাটক \***

আরোগ্য নিকেতন ১১	তারাকর বন্দ্যো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
একটি নায়ক ১১	দিলীপ রায়	প্রতীতি প্রকাশনী
এবাও মানুষ ২৬	সন্তোষ সেন	ডি এম
মৃতবাস্তব ২৬	ধনঞ্জয় বৈরাগী	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
পরিণীতা ১১	দেবনারায়ণ গুপ্ত	এম সি সরকার
শেষলগ্ন ২৬	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স

**\* ভ্রমণ-কাহিনী \***

এলেম নতুন দেশে ৩৬	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	সিগনেট
কামাল পরদেশী ৪১	বিমল ঘোষ	মিত্রালয়
জল ভাঙায় ৩১	সৈয়দ মুক্তাবা আলী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ছুরিয়া দেখছি ৫৬	কলাগী প্রামাণিক	ওরিয়েন্ট বুক কোং
দেবভাঙ্গা হিমালয় (২য় খণ্ড) ১১	প্রবোধকুমার সান্যাল	বেঙ্গল পাবলিশার্স
পথ চলি ৩৬	মনোজ বসু	"
মহা সোভিয়েট ৩১	মৈত্রেয়ী দেবী	বিচিত্রা
লাফা বাতী ২১	মোহনলাল গঙ্গো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাহেব বিবির দেশে ৬৬	নরেন্দ্র দেব	ডি, এম

**\* সাহিত্য ও সংস্কৃতি \***

অ্যারিস্টটলের পয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব ৬১	সাধনকুমার ভট্টাচার্য	বেঙ্গল পাবলিশার্স
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৩৬	অসিত বন্দ্যো:	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসি:
কণ্ঠস্বর ৩৬	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি এম
কাব্য-কৌতুক ৫৬	বিসুপদ ভট্টাচার্য	প্রগতিশীল পাবলিশার্স
কি লিখি ৩১	যোগেশচন্দ্র রায়, বিভািনিধি	ওরিয়েন্ট বুক কোং

বাংলা ছন্দ ৩৬	সুধীভূষণ ভট্টাচার্য	এম সি সরকার
বাংলার জাগরণ ৩৬	কাজী আবদুল ওহুদ	বিশ্বভারতী
বাংলার পত্রসাহিত্য ৪৬	সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	ক্যালকাটা বুক ক্লাব

বাংলার জী-আচার ১১	ত্ৰীহিন্দ্রা দেবী চৌধুরাণী	বিশ্বভারতী
বাংলা সাহিত্য ও মানব-স্বাধীনতা ৩১	গোপাল হালদার	ডি এম
বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা ১০১	ভোলানাথ ঘোষ	এস ব্যানার্জি
বাংলা সাহিত্য পরিচয় ২১	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	গ্রন্থ জগৎ
রবীন্দ্রনাটক-প্রসঙ্গ ২৬	জীবনকুমার শর্মা	সাহিত্য ভবন
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন ২১	প্রবাসজীবন চৌধুরী	এ মুখার্জি
রবীন্দ্র-মানস ৩১	ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার	ইণ্ডিয়ান
শক্তি পদাবলী ও শক্তি-সাধনা ৫৬	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	ডি এম

**সংস্কৃত সাহিত্যের**

ভূমিকা ৫৬	অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	এ মুখার্জি
সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৬	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ডি এম
সাহিত্য বিচিত্র ৪৬	রবীন্দ্রনাথ রায়	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
বিশেষ ও সংস্কৃতি ২১	বুদ্ধদেব বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স

**\* জীবনী \***

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ২৬	নির্মলকুমারী মল্লানবিশ	ডি এম
ক'সির রাণী ৫৬	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	নিউ এক্স
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৪র্থ খণ্ড) ৫৬	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	সিগনেট
প্রেমাবতার শ্রীগোবিন্দ ৬৬	গৌরগোপাল বিজ্ঞানবিনোদ কলি:	পুস্তকালয়
বুদ্ধদেব ১১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
বুদ্ধ-প্রসঙ্গ ১০	মহেশচন্দ্র ঘোষ	"
জল্ল কবীর ৫৬	উপেন্দ্রকুমার দাস	বৈদ্যনাথ বুক কোং
ভারতের সাংস্কৃতিক ৫৬	শঙ্করনাথ রায়	হাইটস সিটিং
মীরাবাই ৪১	গোমাকেশ ভট্টাচার্য	প্রবাসক
মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন ৩৬	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	দাশগুপ্ত প্রকাশন
রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড) ১০৬	প্রভাতকুমার মুখো:	বিশ্বভারতী
রূপকার নন্দলাল ২১	শান্তিদেব ঘোষ	গ্রন্থ জগৎ
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ ১০১	গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	মহাভারত

সম্ম ৪১	সরলাবালা সরকার	বেঙ্গল পাবলিশার্স
---------	----------------	-------------------

**\* স্মৃতিকথা \***

আত্মস্মৃতি (২য় ভাগ) ৫৬	সত্যনাথ দাস	ডি এম লাইব্রেরী
আত্মমান-বন্দী ১১	অনন্ত ভট্টাচার্য	মিত্রালয়
কৈশোর-স্মৃতি ৪৬	তারাকর বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
তখন আমি জেলে ৬৬	বিজ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসি:
বিদ্রোহী জীবনের স্মৃতি ১২৬	বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়	"
বন্ধন নায়ক ছিলাম ৫৬	বীরাভ ভট্টাচার্য	"

**\* শিকার-কাহিনী \***

আমার শিকার-স্মৃতি ২৬	বিশ্বকান্ত সেন	বিশ্ব সাহিত্য ভবন
ঠাকুরাণীর বাঘ ২৬	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী	দ্বিজেন্দ্র পাবলিশার্স
বনের পর্বত ৩৬	প্রমদারঞ্জন রায়	সিগনেট

**\* ইতিহাস \***

ইতিহাসের দ্বারা ২৬	অমিত সেন	কালনাথ বুক এন্ডেজি
পৃথিবীর ইতিহাস ৮৬	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকুমার মৈত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ১০	ডঃ মহেশচন্দ্র মজুমদার	বিশ্বভারতী
বিশেষীকৃত চোখে প্রাচীন ভারত ৫০	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বিজ্ঞানসম্ম লাইব্রেরি
ভূমিকা ৩৬	প্রিয়তোষ মৈত্রের	গ্রন্থ জগৎ

\* সঙ্গীত \*

\* শিশু-সাহিত্য \*

স্বপ্নের গান ২৬	সলিল চৌধুরী	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
লাগানের গতিপথ ২৬	চিরায় চট্টোপাধ্যায়	ডি এম লাইব্রেরী
লাগান গীতকার ৩০	রাজেশ্বর মিত্র	মিত্রালয়
সীত ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড) ৭১	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান ১৬	নীলব্রতন বন্দ্যোপাধ্যায়	হস্তশিল্পী
বঙ্গাগর ৩০	হিমালয় রায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত	ডি এম লাইব্রেরী
ব্রহ্মবিশ্বাস (খণ্ড ৪৭ - ৩৬; ৪৮ - ৪৯; ৪৯ - ৫০; ৫০ - ৫১; ৫১ - ৫২)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

ঘনাদার গল্প ২৬০	প্রমোদ মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
ছবিছড়ার দেশে ৭৬	বিদ্যনাথ দে	সম্পাদিত
ছুটির আকাশ ১৬০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ইন্টলাইট
ছোটদের ছোটগল্প ১১০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতী লাইব্রেরি
ছোটদের জ্যেষ্ঠগল্প ২৬	তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	অভ্যুদয়
" ২৬	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	"
" ২৬	রবীন্দ্রলাল রায়	"
" ২৬	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	"
" ২৬	শিবরাম চক্রবর্তী	"
" ২৬	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	"
" ২৬	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	"

ব্রহ্মবিশ্বাস (৫১ - ৫২)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৫৩ - ৫৪)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৫৫ - ৫৬)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৫৭ - ৫৮)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৫৯ - ৬০)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

\* ধর্ম ও দর্শন \*

ব্রহ্মবিশ্বাস (৬১ - ৬২)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৬৩ - ৬৪)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৬৫ - ৬৬)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৬৭ - ৬৮)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ব্রহ্মবিশ্বাস (৬৯ - ৭০)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

\* শিল্প-কথা \*

আধুনিক আলোকচিত্র ৬	পরিমল গোস্বামী	বিশ্বভারতী
আলোকচিত্র ২১	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	সারস্বত লাইব্রেরি
আলোকচিত্র ১১	রবীন্দ্র মজুমদার	গ্রন্থ জগৎ
আলোকচিত্র ১৫	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
আলোকচিত্র ১৬	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স

তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

আলোকচিত্র ১৭	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
আলোকচিত্র ১৮	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
আলোকচিত্র ১৯	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
আলোকচিত্র ২০	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
আলোকচিত্র ২১	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স

তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

\* গল্প-সাহিত্য \*

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
সাহিত্যিক ৬৬	প্রাণতোষ ঘটক	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
কলকাতার পথঘাট ৩৬	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কবির দেখ (২ খণ্ড) ১১০	হীরেন্দ্রনাথ বসু	"
কাচ ও কাচশিল্প ১৬	হীরেন্দ্রনাথ বসু	"
নেহরু ও পররাষ্ট্রনীতি ৫৬	অনাদিনাথ পাল	ওরিয়েন্ট বুক কোং
বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ ২১০	শ্রীকুমার রায়	সিগনেট
বাংলাদেশের প্রাচীনগার ৮৬	বুদ্ধময় ভট্টাচার্য	গ্রন্থ জগৎ
বাংলায় ভূমিব্যবস্থা ১০	বৃন্দেন্দ্র ভট্টাচার্য	বিশ্বভারতী
বিবাহ-তত্ত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ২৬	ভক্তি সেন	দিগন্ত পাবলিশার্স
মনোবিজ্ঞান ৮৬	ইন্দ্রভূষণ মজুমদার	আন্তর্জাতিক বুক ষ্টল
মল্লভূমিতে ভারতের স্থান ৪১০	সমর বসু	ডি এম
বঙ্গদেশ ও সভ্যতা ১০	শ্রীমদারপ্রসন্ন রায়	বিশ্বভারতী
বাণিজ্যবিজ্ঞানের কথা ১০	ডাঃ পূর্ণেন্দ্রকুমার বসু	"
রাষ্ট্রনীতি ২৬	বিশ্বনাথ পাল	যুগযাত্রী প্রকাশক
সমীক্ষা ৫৬	বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য	মিত্র ও ঘোষ

অন্য ১ম পণ	অন্য ১ম পণ	অন্য ১ম পণ
(আপটন সিনক্রোমার) ৪১০	জ্যোতিষ বেদজ্ঞ	মিত্রালয়
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ	চাকপমা বসু	মিত্র ও ঘোষ
(টিমাস হার্ডি) ৫১০	চাকপমা বসু	মিত্র ও ঘোষ
ক্রিকেট খেলার অ-আ-ক-থ	পরীক্ষিত	আর্ট অ্যান্ড ক্রেটার্স
(ডেনড্রাডগ্যান) ৪৬	পরীক্ষিত	আর্ট অ্যান্ড ক্রেটার্স
নীল পাখি (মেটরোলিক) ১৬	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	বিজ্ঞানীয় লাইব্রেরী
বিবাহিত প্রেম (মারি টোপস) ৪৬	কল্পনা রায়	আর্ট অ্যান্ড ক্রেটার্স
মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে (শিবনাথ শাস্ত্রী) ৩১০	মায়ার রায়	রাইটার্স সিক্রেট
মা ও ছেলে (রমা বোল্ট) ৫৬	মায়ার রায়	রাইটার্স সিক্রেট
রোমান ইলিডে ২১০	ভবানী মুখোপাধ্যায়	গ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
স্পাটিকাস (হাওয়ার্ড ফার্স্ট) ৫৬	ভবানী মুখোপাধ্যায়	গ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
হিরোসিমার মেয়ে (আর কোম) ৪১০	ভবানী মুখোপাধ্যায়	গ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
হে বিদেশী জুল ৫৬	ভবানী মুখোপাধ্যায়	গ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব

\* গল্প-সাহিত্য \*

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
---------------	--------------------	-----------------

\* গল্প-সাহিত্য \*

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
---------------	--------------------	-----------------

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
---------------	--------------------	-----------------

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
---------------	--------------------	-----------------

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
---------------	--------------------	-----------------

আধুনিক শিক্ষণ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
---------------	--------------------	-----------------





ডিটামিন যুগ

কোলে

বিষ্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়

কোলে

কোলে বিষ্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



বিষ্কুট

পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

রাগণ  
মেরী  
পেটিটব্যুরো  
নাইস  
কলেজ

ডেন্টা  
ক্রা  
কয়েন  
স্পোর্ট  
জিঞ্জারনাট  
হাউসহোল্ড  
সল্‌টী

কাফেনয়ের  
চকোলেটক্রীম  
বেবীক্রীম  
সণ্ট ক্র্যাকার  
প্রভৃতি  
আরও অনেক রকম

# রঙ্গপট



## বাঙলা ছবি ও ১৩৬৩

১৩৬৩ সালে মোট বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে ঊনপঞ্চাশখানি। সেইগুলির উপর চোখ বোলালে যা দেখা বা পাওয়া যায় তাহাই একটি সার মর্ম উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি।

(১) চিরকুমার সন্ধ্যা (১ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীত সন্তোষ সেনগুপ্ত, আলোকচিত্র বিপ্লব চক্রবর্তী, সম্পাদনা গোবর্দ্ধন অধিকারী, শিল্প সৌরেন সেনের তত্ত্বাবধানে পুলিন ঘোষ ও গোপী সেন, শব্দ গ্রামফোনের ঘোষ, পরিচালনা দেবকীকুমার। রূপায়ণে অমিত্র, জহর, নীতীশ, উত্তম, প্রশান্ত, জীবন, তুলসী চক্র, জহর, অমিত্র, পঞ্চানন, ভারতী, শোভা, তপতী, বসুনা, অনিতা, অপর্ণা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা। (২) পরাধীন (৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও নায়কগণ ডট্টাচার্য, সঙ্গায়ন নায়কগণ গঙ্গো, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প অনিল পাল, গান প্রব বসু, শব্দ 'বাগী দত্ত, পরিচালনা মধু বসু। রূপায়ণে অমিত্র, ছবি, জহর, নির্মল, বীবেন, আদিত্য, বেচু, প্রীতি, শৈলেন, বাগী বাবু, হেম গুপ্ত, গ্রামল, অলক, সজল, মলিনা, চন্দ্রা, শোভা, সন্ধ্যায়াগী, কাবেরী, সাবিত্রী, বেধা মল্লিক, সন্ধ্যা, আশা, মনোহরা, শান্তা, বিজ্ঞা, গীতা, বুলবুল। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, আরুনা, ছবি। (৩) একটি রাত্রি (মূল নাম ভীষ্মপল্লী) (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বরফুল, চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত অম্বুপম ঘটক, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা বৈজনাথ চট্টো, শিল্প সুরধী খাঁ, শব্দ 'জগন্নাথ চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা চিত্ত বসু। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, জীবন, গুরুদাস, অম্বুপ, শুভেন, ভ্রাম, জহর, তুলসী চক্র, হরিধন, হুয়া, শিবকালী, পঞ্চানন, ছবি, মলিনা, চন্দ্রা, যেনকা। সুরচিহ্ন, সবিতা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে—সন্ধ্যা। (৪) মহাকবি গিরিশচন্দ্র (১ সপ্তাহ) কাহিনী—মধু বসু ও দেবনায়াগ প্রস্তুত সংলাপ দেবনায়াগ, অতি: সংলাপ বিদায়ক ভট্টা, সঙ্গীত অনিল বাগচী, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শিল্প কান্তিক বসু, গান মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও গ্রামল গুপ্ত, শব্দ বাগী দত্ত, পরিচালনা মধু বসু, নামভূমিকায় পাহাড়ী সাহায়া। রূপায়ণে অমিত্র,

নীতীশ, অসিত, মোহন, গুরুদাস, উৎপল, মিহির, সন্তোষ, জহর অজিতপ্রকাশ, অম্বুপ, সবিতাভ্রত, গঙ্গাপদ, দেবেন, ভূপেন, বলী: অবিনাশ, আদিত্য, বিপিন, সৌরী, শ্রীপতি, পঞ্চানন, চন্দ্রশেখ: শিবকালী, তপ্তেন্দ্র, হেম গুপ্ত, প্রীতি, সজল, মলিনা, পদ্মা সন্ধ্যায়াগী, ভারতী, শোভা, তপতী, যেনকা, পূর্ণিমা, সন্ধ্যা চন্দ্রা। নেপথ্য কণ্ঠে—ধনঞ্জয়, মৃণাল, উৎপলা, গীতা, ছবি অম্বুজী। (৫) অসমাপ্ত (৭ সপ্তাহ) কাহিনী বিদায়ক ভট্ট সঙ্গীত অম্বুপম, অনিল, নটিকেন্দ্রা, দুর্গা, ডা: ভূপেন, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, নৃত্য শ্রীমতী প্রিয়ম হাজারিকা। নৃত্য নেতৃত্ব উদয়শঙ্কর, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প কান্তিক বসু, শব্দ গো দাস ও বাগী দত্ত, গান গৌরীপ্রসন্ন, গ্রামল, জীবন বসু, পুলক বিদায়ক ও হরিচরণ, পরিচালনা রতন চট্টো। রূপায়ণে ছবি, জহর: ধীরাজ, পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, অসিত, দীপক, গুরুদাস প্রবীর, ভ্রাম, জহর, অম্বুপ, তুলসী চক্র, সন্তোষ, হুয়া, বেচু, শান্তি প্রীতি, নৃপতি, অমর বসু ও বিশ্বাস, ধীরাজ, বিভু, মলিনা: সন্ধ্যায়াগী, মধু, কাবেরী, রেণুকা, বাগী গাঙ্গুলী, জহরী, প্রীতিধারা চন্দ্রা, অম্বুজী। নেপথ্য বস্তুে আল্লারাখা, শান্তাপ্রসাদ, কেবামতুল্ল রাধাকান্ত, নিখিল, সাগিককীন, বালসারা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সতীনাথ, বিনয় অধিকারী, মৃণাল অপারেশন, মট্ট, ডা: ভূপেন, লতা, সন্ধ্যা, প্রতিমা, আলপনা কৃষ্ণা, বাঁশবী, বাসন্তী। (৬) শঙ্করনায়াগ বাঙ্ক (৬ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টা, সঙ্গীত অম্বুপম ঘটক, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সৌরেন সেন, শব্দ জগন্নাথ চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা নীরেন লাতিড়ী: রূপায়ণে ছবি, উত্তম, বসন্ত, মিহির, সবিতাভ্রত, অম্বুপ, আশীষ মুখো: ডা: হরেন, দেবেন, ছায়া, কাবেরী, অম্বুজা, নীলিমা। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা। (৭) গ্রামলী (১০ সপ্তাহ) কাহিনী নিরুপমা দেবী: সঙ্গী ও কালিদাস সেন, সম্পাদনা অধেন্দ্র চট্টো, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ ইরানী ও সত্যেন চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন ও ভূষণ, আলোকচিত্র ও পরিচালনা অন্তর কর। রূপায়ণে অমিত্র, উত্তম, আশীষ মুখো: অম্বুপ, সন্তোষ, হরিধন, তুলসী চক্র, শিবকালী, ডা: হরেন, অমর বিশ্বাস, গগেন, গ্রামল চক্র ও মলিনা, কাবেরী, অম্বুজা, শশিকা: অপর্ণা, বাগীবালা, বাজলন্দী, আশা, করালী, বেলারানী, সন্ধ্যা: আরতি ও কালিদাস সেন। (৮) ত্রিধামা (৮ সপ্তাহ) কাহিনী সুরোধ ঘোষ, সঙ্গীত নটিকেন্দ্রা ঘোষ, আলোকচিত্র বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ: বতীন দত্ত, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালক অগ্রদূত। রূপায়ণে ছবি কহর, কমল, নীতীশ, উত্তম, দীপক, মিহির, জীবন, শুভেন: হরিধন, ডা: হরেন, চন্দ্রশেখর, গৌর সী, চন্দ্রা, ছায়া, শোভা, সুরিতা: অম্বুজা, কেতকী, নেপথ্য বস্তুে আলী শাকবর। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সন্ধ্যা, ছবি। (৯) আশা (৭ সপ্তাহ) কাহিনী রাধালচন্দ্র, সংলাপ সঞ্জয়কান্ত, আলোকচিত্র জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সম্পাদনা তুলসী দত্ত, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, গান জ্ঞানপ্রকাশ ও গ্রামল গুপ্ত, শব্দ সত্যেন চট্টো, পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য: রূপায়ণে জহর, কমল, আশীষ, প্রশান্ত, পূর্ণেন্দ্র, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ, তুলসী চক্র, হুয়া, আশু, সীতল, পঞ্চানন, বেচু, নৃপতি, ডা: হরেন, শৈলেন, খগেন, কানন, পদ্মা, মণিকা, তপ্তি, সন্ধ্যা:

রা। নেপথ্য কণ্ঠে প্রব্রুত, কানন, আলপনা। (১০) মায়লায়  
ল (৪ সপ্তাহ) কাহিনী শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য শৈলজ্ঞানন্দ, সঙ্গীত  
বীন চট্টা, আলোকচিত্র বিত্ত চক্রবর্তী, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প  
নৃত্যিক বসু, শব্দ নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ, ভূপেন ঘোষ, গান  
প্রব বসু, পরিচালনা পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে ছবি, জহর,  
অসিত, প্রেমাস্ত, ভাসু, তুলসী, পঞ্চানন, শিবকালী, বীরাজ, শৈলেন,  
সুখ, সুধেন, বিত্ত, অসিতকুমার, দেবানীষ, মলিনা, সাবিত্রী, রেণুকা,  
বাণী গাঙ্গুলী, সুনীপ্তা, চিত্রা, মীরা। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্রামল,  
সন্ধ্যা, আলপনা। (১১) চলচল (৩ সপ্তাহ কিং ২৪ দফে দৈনিক  
সেছিল) কাহিনী আন্তোভোব মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নির্মল ভট্টাচার্য,  
আলোকচিত্র অনিল বন্দ্যো ও অজয় মিত্র, সম্পাদনা হুলাল দত্ত,  
শিল্প বটু সেন, গান অনিল ভট্টা ও শিবদাস বন্দ্যো, শব্দ গৌর  
দাস ও সন্তোম চট্টা। পরিচালনা অসিত সেন। রূপায়ণে পাভাড়ী,  
অসিত, নির্মল, প্রভাত, জহর, সমরকুমার, অনিল, খগেন রায়,  
চন্দ্রা, অরুণভা, তপতী, সুনী ও বাহু সন্ধ্যাট পি, সি, সরকার।  
নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্রামল, তরুণ, মৃণাল। (১২) পাপ ও  
পাপী (৫ সপ্তাহ) কাহিনী মুবারি সেন, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক ও  
সুধাস্ত দাসগুপ্ত, আলোকচিত্র বিমল মুখো, সম্পাদনা গোবর্ধন  
অধিকারী, শিল্প গৌর পোদ্দার, শব্দ দুর্গাদাস মিত্র, গান প্রব বসু,  
পরিচালনা বিজ্ঞ সেন। রূপায়ণে পাভাড়ী, নীতীশ, বিকাশ,  
অসিত, অজিত, আশীষ, নির্মল বগাক, শিশির মিত্র, মুবারি,  
হরিধন, পঞ্চানন, নৃপতি, ডাঃ হরেন, বেচু, বীরাজ, মঞ্জু, অমৃতা,  
সবিতা, শ্রামলী, মণিকা ঘোষ, জয়ন্তী। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত,  
সুপ্রীতি, গায়ত্রী, টেরা। (১৩) মানবন্ধ (৪ সপ্তাহ) কাহিনী  
মনোহর ভট্টাচার্য, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র বিজয় দে,  
সম্পাদনা রমেশ ঘোষী, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, চিত্রনাট্য  
সংলাপ ও গান প্রব বসু, পরিচালনা সত্যীশ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে  
ছবি, বীরাজ, পাভাড়ী, কমল, নির্মল, ভাসু, তুলসী চক্র, হরিধন,  
নৃপতি, বেচু, প্রীতি, খগেন, ছবি, সবিতা, বসুনা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী,  
কেতকী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (১৪) একদিন  
রাতে (১১ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা শঙ্কু মিত্র ও অমিত মৈত্র,  
সঙ্গীত সলিল চৌধুরী, আলোকচিত্র রাধু কর্মকার, সম্পাদনা মায়েকার  
ও বসন্ত সুলে, শিল্প আচরেকার, শব্দ আলাউদ্দীন, গান সলিল  
চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র, প্রযোজক ও প্রযোজনাংশে রাজকপূর। রূপায়ণে  
ছবি, পাভাড়ী, প্রদীপ, গঙ্গাপদ, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী,  
নেমো, নন্দাবু, ইকতিকার, বিক্রম কাপূর, মণি চট্টা, কুমার রাধ  
সুমিত্রা, স্মৃতি, সুলোচনা, ডেইজি এবং জীমতী নার্সিস।  
নেপথ্য কণ্ঠে মাল্লা, লতা, সন্ধ্যা। (১৫) রাজপথ  
(৪ সপ্তাহ) কাহিনী-উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সংলাপ উপেন্দ্রনাথ,  
সুমনাথ ঘোষ, সঙ্গীত—শৈলেন্দ্র দত্তগুপ্ত ও রায়, আলোকচিত্র  
বিত্ততি দাস, সম্পাদনা সুদীপ্ত পাল, শব্দ ক্ষেত্র ভট্টাচার্য,  
শিল্প ঈশ্বরপ্রসাদ, গান শৈলেন্দ্র রায়, পরিচালনা গুণময় বন্দ্যো।  
রূপায়ণে অমীক্ষ, ছবি, জহর, বীরাজ, নীতীশ, বসন্ত, অসিত, বীরেন,  
নবগোপাল, শিশির, গুরুদাস, অমর মল্লিক, সন্তোষ, তুলসী, জহর,  
অজিত, নবদীপ, নৃপতি, হুয়া, কৃষ্ণধন, বীরাজ, প্রীতি, বিজয়কান্তিক,  
ডাঃ হরেন, সুধেন, মনোগোপাল, আলোক, মিষ্ট, সত্যব্রত, সুপ্রিয়,

মলিনা, চন্দ্রা, সুপ্রভা, পদ্মা, মেনকা, অমৃতা, শোভা, ভারতী, শিপ্রা,  
বসুনা, প্রমীলা, স্বাগতা, সুনীপ্তা, মণিকা ঘোষ, নিভাননী, চিত্রা,  
শান্তা, মীরা, মনোরমা। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, ধনঞ্জয়, শ্রামল, তরুণ  
সন্ধ্যা, আলপনা, প্রতিমা, রমা। (১৬) সূর্যমুখী (মূল নাম  
প্রভাতসূর্য) (৮ সপ্তাহ) কাহিনী গজেন মিত্র, অতি : সংলাপ  
পাঁচুগোপাল মুখো, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সঙ্গীত তেজস্ব মুখো,  
সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শব্দ সন্তোম চট্টা, শিল্প গৌর পোদ্দার,  
গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা বিকাশ রায়। রূপায়ণে ছবি, পাভাড়ী,  
বিকাশ, অতি, জীবন, মিহির, ভাসু, তুলসী চক্র, হুয়া, পঞ্চানন,  
খগেন, দেবেন, সৌরীন মুহাঙ্কর, সমরকুমার, চন্দ্রা, সন্ধ্যাবাণী মঞ্জু,  
ভারতী, অপর্ণা, বাণী গাঙ্গুলী, হুলা, বেবা, আশা, সন্ধ্যা, রিজু।  
(১৭) ছায়া সঙ্গিনী (৩ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান গৌরীপ্রসন্ন,  
সঙ্গীত কালিদাস সেন ও বীরেন রায়, সম্পাদনা প্রব মুখো, শিল্প (নাম  
নেই), শব্দ নৃপেন পাল, আলোকচিত্র ও পরিচালনা—বিত্তপতি  
ঘোষ। রূপায়ণে ছবি, জহর, বসন্ত, বীরাজ, শান্তি, বাবুয়া, মলিনা,  
চন্দ্রা, মঞ্জু, শোভা, অমৃতা, অপর্ণা, নিভাননী, আশা, তারা, শান্তা।  
নেপথ্য কণ্ঠে আলপনা, উৎপলা। (১৮) সাধক রামপ্রসাদ  
(৮ সপ্তাহ) কাহিনী গৌরীপ্রসাদ বসু, সঙ্গীত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়,  
আলোকচিত্র দিব্যানু ঘোষ, সম্পাদনা নানা বসু, শিল্প ত্রতীন ঠাকুর,  
শব্দ পরিতোষ বসু, গান রামপ্রসাদ, পরিচালনা বংশী আশ। নাম  
হুমিকায় গুরুদাস। রূপায়ণে ছবি জহর, বীরাজ, মতেন্দ্র, নীতীশ,  
অজিত, রবীন, অতি, প্রশান্ত, শিশির মিত্র (প্রযোজক), সমীর,  
তুলসী, জহর, নবদীপ, নৃপতি, পশুপতি, বাবুয়া, মলিনা, সুনন্দা,  
পদ্মা, শিখা, অপর্ণা, সুরাজী, কল্পনা, গৌরী। নেপথ্য কণ্ঠে  
ধনঞ্জয়। (১৯) গোবিন্দ দাস (৪ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই  
ভট্টাচার্য, আলোকচিত্র জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত কমল  
দাশগুপ্ত, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ চট্টা, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী  
দত্ত, রঞ্জিত দত্ত, স্ববি বন্দ্যো, গান গোবিন্দ দাস, পরিচালনা—প্রফুল্ল  
চক্রবর্তী। রূপায়ণে ছবি, পাভাড়ী, কানু, নীতীশ, বসন্ত, সত্য, ভাসু,  
জহর, অজিত, গৌর সী, নৃপতি, বেচু, প্রীতি, হুম্মথ, সমীর লাহিড়ী, মঞ্জু,  
সাবিত্রী, সবিতা, অপর্ণা, করাজী, মীরা, পূরনী। নেপথ্য কণ্ঠে  
ধনঞ্জয়, প্রতিমা। (২০) মদনমোহন (৬ সপ্তাহ) কাহিনী  
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত প্রফুল্ল ভট্টা ও পরেশ ধর, আলোকচিত্র রমেন পাল,  
(বিশেষ দৃষ্ট প্রবোধ দাস) সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টা, শব্দ পরিতোষ বসু,  
শিল্প অন্তরক বসু, গান সুবল দত্ত, সন্তোষ সেন, স্বপ্নী নন্দী, পরিচালনা  
অমল বসু। রূপায়ণে ছবি, পাভাড়ী, নীতীশ, অজিত, তেজেন, মিহির,  
গঙ্গাপদ, অমৃপ, বেচু, পঞ্চানন, বীরাজ, মনোগোপাল, মলিনা, সবিতা,  
নমিতা, শ্রামলী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্রামল, পাঙ্গালাল, বিনয়  
অধিকারী, মৃণাল, প্রতিমা, গাংতী, বাসুদে, ডলি। (২১) পূত্রবধু  
(৮ সপ্তাহ) কাহিনী সলিল সেনগুপ্ত, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সঙ্গীত  
রাজেন সরকার, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সুবীর বর্মা,  
শব্দজগন্নাথ চট্টা, নৃত্য বিনয় ঘোষ, গান গৌরীপ্রসন্ন।  
পরিচালনা—চিত্ত বসু। রূপায়ণে ছবি, উত্তম, আশীষ  
মুখো, স্তোভন, জীবন, অমৃপ, পঞ্চানন, শান্তি, মৃণাল,  
উজ্জল, ছবি, বিত্ত, চন্দ্রা, মালী, সবিতা, মীরা। নেপথ্য কণ্ঠে  
মাল্লা ও সন্ধ্যা। (২২) অপরাধিত (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বিজুভূষণ,

সঙ্গীত ববিশঙ্কর, আলোকচিত্র সূত্রত মিত্র, সম্পাদনা তুলসী দত্ত, শিল্প বণী চন্দ্রগুপ্ত, শব্দ দুর্গাদাস মিত্র, পরিচালনা সত্যজিৎ রায়। রূপায়ণে কাম্বু, সুরণ, পিনাকী, কালী, রমণীরঞ্জন, চাক্রপ্রকাশ, প্রবোধ গাঙ্গুলী, হেমন্ত, কাঙ্গীচরণ, মণি, লালচাঁদ, পঞ্চানন, অনিল মুখো, হরেন্দ্রকুমার, অজয়, ভাগ্যহু পাণ্ডে, করুণা, রাণীবালা, শান্তি ওপ্তা, সুনীপ্তা, মীনাঙ্গী, বেবা। (২০) যক্ষ (২ সপ্তাহ) কাহিনী ও প্রযোজনা—অমিতা দেবী, সঙ্গীত রবীন চট্টো, আলোকচিত্র যতীন দাস, সম্পাদনা বমেশ যোগী, শিল্প বটু সেন, শব্দ শচীন চক্রবর্তী, গান প্রণব রায়, পরিচালনা সত্যীশ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, রবীন, অসিত, সন্তোষ, শিশির বটব্যাল, নরেশ, ধীরাজ, যতীন, মলিনা, চন্দ্রা, অমিতা, শিখা, মনোহরা, শান্তা, সন্ধ্যা, অঞ্জলি। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, সতীনাথ, তরুণ, যজ্ঞেন চৌধুরী, প্রমুখ ও সন্ধ্যা। (২৪) দানের মর্যাদা (১ সপ্তাহ) কাহিনী প্রভাবতী দেবী, সঙ্গীত, পরিবর্ধন ও সংলাপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আলোকচিত্র সুরেশ দাস, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক, রবীন্দ্র সঙ্গীত যজ্ঞেন চৌধুরী, সম্পাদনা বৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প অনিল পাল, গান প্রণব রায়, চাক্র মুখো ও অরুণ ভট্টা, পরিচালনা সুনীল মজুমদার। রূপায়ণে ছবি, কাম্বু, রবীন, অসিত, বীরেন, মিহির, জীবন, বীরেশ্বর, অমর মল্লিক, ভানু, নৃপতি, ডাঃ হরেন, তারাকুমার, প্রীতি, ছায়া, সাবিত্রী, আরতি, নমিতা, গুপ্তা, নিভাননী, রেখা মল্লিক, শান্তা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, অপরেশ, উৎপলা, আলপনা, সুনন্দা মজুমদার। (২৫) মা (৫ সপ্তাহ) কাহিনী অলকা মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র জি. কে. মেহতা, সঙ্গীত নির্মল ভট্টা (সহায়তায় বালসারা) সম্পাদনা হরিদাস মহলানবিশ, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ মণি বসু, গান অনিল ভট্টা মুখোপাধ্যায় প্রভাত মিত্র, পরিচালনা প্রভাত মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে অসিত, শিশির বটব্যাল, পার্ণা, চন্দ্রা, অরুণভী, সাবিত্রী, বিনতা, আশা, বেবা, ললিতা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সুরেন্দ্রা, উৎপলা, অরুণভী। (২৬) নাগর দোলা (২ সপ্তাহ) কাহিনী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত অরুণম ঘটক, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদক বৈষ্ণনাথ চট্টো, শিল্প রবীন চট্টো, শব্দ শ্রামসুন্দর ও সুনীল সরকার, গান শান্তি ও পরিমল ভট্ট, সংলাপ ও পরিচালনা অমলেন্দু বসু। রূপায়ণে নীতীশ, রবীন, সত্য, অরুণ, জহর, তুলসী চক্র, নববীপ, ছায়া, শীতল, পঞ্চানন, রাধারমণ, নারায়ণ, ছবি, পদ্মা, প্রণতি, সবিতা, বিনতা, মেনকা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, মিটু, সন্ধ্যা, আলপনা। (২৭) শুভলগ্ন (৩ সপ্তাহ) কাহিনী লিলি দেবী, সংলাপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত বীরেন্দ্রকিশোর (গৌরীপুর) আলোকচিত্র জি. কে. মেহতা, সম্পাদনা শ্রাম দাস ও শিব ভট্টা, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, গান প্রণব রায় ও শ্রামল গুপ্ত, পরিচালনা মধু বসু। রূপায়ণে নীতীশ, নির্মল, বীরেন, নবকুমার, গুরুদাস, উৎপল, অজিতপ্রকাশ, অমর মল্লিক, তুলসী লাহিড়ী ডাঃ হরেন, নৃপতি, প্রীতি, নরেশ, ধীরাজ, ছবি ঘোষাল, নরেন, মলিনা, ছায়া, শোভা, প্রণতি, তপতী, গুপ্তা বুলবুল, বিভা। (২৮) টাকা-আনা-পাই (৮ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা জ্যোতির্ষয় রায়, সঙ্গীত সত্যজিৎ মজুমদার আলোকচিত্র সুরেন্দ্র ঘোষ, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টো, শিল্প বটু সেন, শব্দ

শচীন চক্রবর্তী, গান জ্যোতির্ষয় রায় ও কল্যাণ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, রবীন, বিকাশ, উৎপল, জীবন, ভানু, জহর, অনিল, শৈলেন প্রেমশোষ, বাবুয়া, অরুণভী, তপতী, বিনতা, বাণী গাঙ্গুলী, অলকা, গীতা, নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ, সন্ধ্যা, বিনতা (২১) শিল্পী (৭ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টাচার্য, আলোকচিত্র রামানন্দ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত রবীন চট্টো, নৃত্য অনাদিপ্রসাদ, সম্পাদনা কালী রাই, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ সত্যেন চট্টো, গান প্রণব রায় পরিচালনা অরুণগামী। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, অসিত, কালী, ভূপেন, ডাঃ হরেন, পঞ্চানন, গোকুল, সমরকুমার, মলিনা, সচিত্রা, শোভা, শিখা, গীতা ও শিল্পী রবীন মৈত্র। (৩০) ধূলার ধরণী (২ সপ্তাহ) কাহিনী প্রভাবতী দেবী, সঙ্গীত, সংলাপ বিধায়ক ভট্টা, সঙ্গীত মানবেন্দ্র মুখো, আলোকচিত্র—সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প গৌর পোদ্দার, শব্দ গৌর দাস, গান গৌরীপ্রসন্ন ও শ্রামল গুপ্ত, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন। রূপায়ণে ধীরাজ, পাহাড়ী, বিকাশ, অসিত, অজিত, প্রেমশোষ, তরুণ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, শীতল, হরিমোহন, ধীরাজ, প্রীতি, অমূল্য, সন্ধ্যারাণী, শোভা, সবিতা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, বড্ডা, নমিতা দত্ত। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা। (৩১) সিঁথির সিঁছুর (৪ সপ্তাহ) কাহিনী বিজয় গুপ্ত, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সঙ্গীত কালিদাস সেন, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ গৌর দাস, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, কমল, অসিত, বীরেন, অরুণ, রাজা, বীরেশ্বর, সন্তোষ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, হরিধন, বেচু, ধীরাজ, কবি দাশগুপ্ত, মলয়, অমূল্য, সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, তপতী, মীলি, রেণুকা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, অমূল্য ও রবার্ট কামিংহাম (হলিউট)। নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ শ্রামল, সন্ধ্যা, প্রীতিমা। (৩২) চোর (৭ সপ্তাহ) কাহিনী মণি সিংহ, পরিবর্ধন প্রবোধ সান্যাল, আলোকচিত্র অমূল্য মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত রবীন চট্টো, সম্পাদনা হরিদাস মহলানবিশ, শিল্প সৌরেন সেন, শব্দ শ্রামসুন্দর ও সুনীল সরকার, নৃত্য বালকৃষ্ণ, গান প্রণব রায়, পরিচালনা কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে বিকাশ, জীবন, প্রেমশোষ, দিলীপ, সত্য, শিশির বটব্যাল, তুলসী, জহর, রঞ্জিত, প্রীতি, বেচু, মণি, ছবি, সুরেন, গুম, সন্ধ্যারাণী, চন্দ্রা, ইরা, গীতা, চিত্রা, আশা, মনোহরা। (৩৩) আমার বোঁ (৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা ঋগেন বসু, আলোকচিত্র দিব্যেন্দু ঘোষ, সঙ্গীত অরুণ সরকার ও বিনয় চট্টো, সম্পাদনা সুরকুমার মুখো, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প নিশীথ সেন, গান গৌরীপ্রসন্ন ও সন্তোষ সেন। রূপায়ণে ধীরাজ, কমল, বিকাশ, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, ভয়া, হরিধন, পতুপতি, মৃতাঞ্জয়, সচিত্রা, রেণুকা, সুনন্দা, মিত্রা, আরতি দাস, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, অমলা, শান্তা, কলিন অলিভার। (৩৪) নবজন্ম (৭ সপ্তাহ) কাহিনী আশাপূর্ণা দেবী, সঙ্গীত নটিকেশ্বর ঘোষ, আলোকচিত্র বিত্ত চক্রবর্তী, অতি: চিত্রায়ণে জি. কে. মেহতা, বিভাপতি ঘোষ ও বিমল মুখো: সম্পাদনা গৌবর্ধন অধিকারী, শিল্প সৌরেন সেনের তত্ত্বাবধানে পুলিন ঘোষ ও গোপী সেন, শব্দ শ্রামসুন্দর ঘোষ, অতি: গান গৌরী প্রসন্ন, পরিচালনা দেবকীকুমার। রূপায়ণে জহর, উত্তম, অজিত, ভূপেন, শিশির বটব্যাল, তুলসী লাহিড়ী, গোকুল, বিজু, বাবুয়া,

তিলক, অরুণভা, সাবিত্রী, সবিতা, মিতা, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী, আশা, মনোবদা। নেপথ্য যন্ত্রে অঙ্গলী আকবর। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, উত্তম, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, ছবি। (৩৫) কাবলিওয়াল (১৩ সপ্তাহ) কাহিনী রবীন্দ্রনাথ, অতি: সংলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঙ্গীত বিশিষ্ট, রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশিষ্ট চৌধুরী, নৃত্য মাধবী চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা সুবোধ রায়, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ মণি বসু ও অরুণ চট্টোপাধ্যায়, গান রবীন্দ্রনাথ, পরিচালনা জগদীশ সিংহ। প্রদর্শনাংশে ছবি বিশ্বাস ও টিকু ঠাকুর। রূপায়ণে রাধামোহন, কালী, জীবন, অতুল, কৃষ্ণধন, জহর, ধীরাজ, পাণ্ডিত্য, নৃপতি, প্রীতি, মঞ্জু, শ্রাবণী, করালী, আশা, নেপথ্য কণ্ঠে দেবদাসী বনিতা, মালবিকা ও সুলতা। (৩৬) ভারজিৎ (৫ সপ্তাহ) কাহিনী প্রেমেন্দ্র মিত্র, চিত্রনাট্য ও সংলাপ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধ রায়, সঙ্গীত রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র বিভূতি চক্রবর্তী, সম্পাদক হুলাল দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ ইয়াসী, গান প্রবোধ রায়, পরিচালনা মাহু সেন। রূপায়ণে পাণ্ডিত্য, কমল, উত্তম, বসন্ত, বীরেন, জীবন, সন্তোষ, জয়নারায়ণ, অরুণ, তুলসী চক্র, নৃপতি, ছায়া, ধীরাজ, বাবুয়া, মলিনা, অনিতা, স্বাগতা, সজ্জা। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, আমল, এ. কানন, প্রমুখ, সন্ধ্যা গায়ত্রী। (৩৭) মধুমালতী (৪ সপ্তাহ) কাহিনী প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রযোজনা বমুনা বড়ুয়া, পরিবর্তন ও সংলাপ নিতাই ভট্টাচার্য, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র সুরেন্দ্র ঘোষ, সম্পাদনা রাসবিহারী সিংহ, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ ইয়াসী ও শিশির চট্টোপাধ্যায়, গান প্রবোধ রায়, পরিচালনা নীলাচল চৌধুরী। রূপায়ণে জহর, নীলীশ, অতি, বসন্ত, অমর মল্লিক, শিশির মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র, ভাস্কর, নৃপতি, প্রীতি, ধীরাজ, ইয়াসী, কাবেরী, নমিতা। নেপথ্য কণ্ঠে এ. কানন, প্রমুখ ও সন্ধ্যা। (৩৮) শেষ পরিচয় (৬ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান কবি বিমল ঘোষ, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ শিশির চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সুনীল মজুমদার। রূপায়ণে ছবি, পাণ্ডিত্য, কামল, বিকাশ, বসন্ত, প্রেমাস্ত, জীবন, ভাস্কর, জহর, নৃপতি, ভয়া, প্রীতি, কৃষ্ণধন, বেচু, চন্দ্রশেখর, শৈলেন, তাবাকুয়ার, ছায়া, সাবিত্রী, তপতী, মিত্রা, অপর্ণা, নমিতা, নিভাননী, স্বরূপ, শান্তা ও বিশিষ্ট গুপ্ত। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত ও লতা। (৩৯) বড়দিদি (৭ সপ্তাহ) কাহিনী শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বিধায়ক, সঙ্গীত অনিল বাগচী, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ বাণী দত্ত, গান আমল গুপ্ত, আলোকচিত্র ও পরিচালনা অজয় কল। রূপায়ণে ছবি, ধীরাজ, পাণ্ডিত্য, উত্তম প্রশান্ত, অরুণ, জীবন, তুলসী, নৃপতি, শিবকালী, প্রীতি, শীতল, খগেন, অসিত, আমল, সজল, ছায়া, সন্ধ্যারাগী, মঞ্জু, তপতী, দীপ্তি, মেনকা, মণিকা ঘোষ, সন্ধ্যা, শান্তা, রূপা। (৪০) ঘুম (৫ সপ্তাহ) কাহিনী মণি বর্মা, সঙ্গীত শচীন গুপ্ত, আলোকচিত্র বিভূতি চক্রবর্তী, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ আমরেন্দ্র ঘোষ, গান পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা শ্রীতারশঙ্করের উপদেশনায় অরুণী। রূপায়ণে ছবি, জহর, অসিত, প্রবীর, দীপক, ভাস্কর, সন্তোষ, অমর বিশ্বাস, জ্যোতির্ষ্ময়, ম্যালকম, ধীরাজ, বাবুয়া, সন্ধ্যারাগী, মঞ্জু, শোভা, সবিতা, বেণুকা, রাজলক্ষী, আশা। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা, আলপনা। (৪১) বড়মা (৪ সপ্তাহ) কাহিনী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ,

আলোকচিত্র বিত্ত চক্রবর্তী, সঙ্গীত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ রঞ্জিত দত্ত, গান প্রবোধ রায়, পরিচালনা নীলেন লাহিড়ী। রূপায়ণে ছবি, জহর, নীলীশ, বিকাশ, ভাস্কর, জহর, কৃষ্ণধন, প্রীতি, ধীরাজ, গোবিন্দ, বিজু, তিলক, সরস্ব, সন্ধ্যারাগী, দীপ্তি, জ্ঞানদা, রমা, শান্তা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, হীরাবাসী, ও লতা। (৪২) সিঁদুর (৫ সপ্তাহ) কাহিনী কবেন রায়, চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সম্পাদনা বৈজনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, গান কবি বিমল ঘোষ, পরিচালনা সুধীর মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে পাণ্ডিত্য, কমল, বিকাশ, রবীন্দ্র, প্রেমাস্ত, জীবন, অমর মল্লিক, তুলসী চক্র, নৃপতি, বাণীবাবু শীতল, শৈলেন, সন্ধ্যারাগী, মঞ্জু, মানসী, রেবা, রাজলক্ষী, আশা, চিত্রা, অমলা। নেপথ্য কণ্ঠে—আমল, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (৪৩) উদ্ধা, কাহিনী—নীহার গুপ্ত, আলোকচিত্র—জি. কে. মেহতা, সঙ্গীত—সুধীন দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিল্প—বটু সেন ও শিব ভৌমিক, শব্দ—সুনীল সরকার, গান—গৌরীপ্রসন্ন ও কামল ঘোষ, পরিচালনা—নরেশচন্দ্র। প্রদর্শনাংশে—সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপায়ণে—কমল, বীরেন্দ্র, বীরেন, জীবন, অনিল, অরুণ, তুলসী লাহিড়ী, জহর, ডাঃ হরেন, দেবেন, রাধারমণ, শৈলেন, সুনন্দা, সবিতা, বমুনা, জহরী, সন্ধ্যা নৃত্যে লীনলীজ। নেপথ্য যন্ত্রে ইমরাত হোসেন ও বিলাহেৎ হোসেন। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা, আলপনা, গায়ত্রী। (৪৪) রাজ শেখ (৩ সপ্তাহ) কাহিনী মাণিক গুহরায়, সঙ্গীত আলি আকবর, সম্পাদনা শিব ভট্টাচার্য, শব্দ ইয়াসী, শিল্প গৌর গোদাবর, নৃত্য বিনয় ঘোষ, গান আমল গুপ্ত ও বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, আলোকচিত্র ও পরিচালনা সন্তোষ গুহরায়। রূপায়ণে পাণ্ডিত্য, সন্ধ্যা, অসিত, কালী, সত্য, অরুণ, জহর, শীতল, ছবি, দেবদাসী, পদ্মা, সন্ধ্যারাগী, বাণী গাঙ্গুলী, বেণুকা, আমল, রাজলক্ষী, রমা, অমলা, বিজু। নৃত্যে মায়া ও সীমা। নেপথ্য যন্ত্রে নিখিল, সাত্তিকদীন, আশীষ, বালসারা, শিশিরকণা। নেপথ্য কণ্ঠে সত্যনাথ, মানবেন্দ্র, আলপনা। (৪৫) একতারা কাহিনী প্রতিভা বসু, সঙ্গীত অরুণম ঘটক, আলোকচিত্র দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গাদাস মিত্র, গান ও পরিচালনা হীরেন বসু। রূপায়ণে ছবি, কামল, প্রবীর, সন্তোষ, কৃষ্ণচন্দ্র, ভাস্কর, তুলসী চক্র, হরিধন, নৃপতি, রঞ্জিত, বেচু, আমল, মলিনা, পদ্মা, সাবিত্রী, সবিতা, মেনকা, রাজলক্ষী, আশা, সীমা, বৃন্দাবন। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, আমল, পাণ্ডাল, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, প্রতিমা, গায়ত্রী, ছবি, আলপনা, নীলমা, কৃষ্ণ, রাধারাগী। (৪৬) অমর সাগর (১ সপ্তাহ) কাহিনী বিনয় চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র নির্মল দে, সংলাপ নটবর, সঙ্গীত পঙ্কজ, তিমির, রাইচাঁদ, অপদেশ, সম্পাদনা হরিদাস মহলানবিশ, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ (নাম নেই) পরিচালনা নীতীন বসু। নাম ভূমিকায় যুগের। রূপায়ণে পাণ্ডিত্য, হাফসজী ট্যাগুন, কাপুর, পদ্মা, আখতার জাহান, অমূলীয়া, রমা। (৪৭) তাপসী কাহিনী মণি বর্মা, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র বামানন্দ সেনগুপ্ত, সম্পাদনা বৈজনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প সুবোধ দাস ও মনন গুপ্ত, শব্দ নৃপেন পাল ও দেবেন ঘোষ, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা চিত্ত বসু। রূপায়ণে অরুণ, ছবি, জহর, পাণ্ডিত্য, কমল,



অসিত, অজিত, দীপক, বীৰেন, শিশির বটব্যাল, শুভেন, অম্বুপ, পরিমল, পঞ্চানন, নৃপতি, প্রীতি, বেচু, শান্তি, বিদু, মলিনা, চন্দ্রা, সন্ধ্যারাগী, সবিতা, বনানী, বেণুকা, বেবা, আশা, করালী, রূপা, গীতা। নেপথ্য কণ্ঠে শচীন, আলপনা, গায়ত্রী, প্রতিমা। (৪৮) পঞ্চতপা কাহিনী আন্তঃসম্মুখোপাধায়, সঙ্গীত নির্মল ভট্টাচার্য ও বাসসারী, আলোকচিত্র অক্ষয় মিত্র, সম্পাদনা তরুণ দত্ত, শিল্প এস, রামচন্দ্র, শব্দ বাণী দত্ত, গান গ্রামফোন গুপ্ত, পরিচালনা অসিত সেন। রূপায়ণে পাভাটী, কমলা, অসিত, প্রশান্ত, পারিজাত, অমৃত, মৃণাল, চন্দ্রা, পদ্মা, অরুণভা, তপ্পা, সীতা ও বিভাস সোম। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা। (৪৯) জাঁদারে আলো কাহিনী শরৎচন্দ্র, অতি সংলাপ সজ্জনকান্ত, সঙ্গীত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্র ক্রিকে মহতা, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শব্দ দেবেশ ঘোষ, শিল্প সন্তোম রায়চৌধুরী, গান গ্রামফোন গুপ্ত, পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য। রূপায়ণে বিকাশ, বনস্ব, জীবন, অমর মলিক, ভাবু, তুলসী চক্ৰ, অজিত হুয়া, পদ্মা, শুমির, যমুন, নীলিমা। নেপথ্য কণ্ঠে মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা।

এ বছর যে সব নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে— জাতীয় মুখোপাধায়, অমৃত দাশগুপ্ত, পরিমল সেন, দ্বিজু ভাওয়াল, অরণ ঘোষাল, পিনাকী সেনগুপ্ত, শ্রীমান্ত ভিলক, শ্রীমান্ত গুপ্ত, চাক্র প্রকাশ ঘোষ, রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অক্ষয় মিত্র, সুবোধ গাঙ্গুলী, শ্রীমান্ত পার্থ, স্বরূপ মুখোপাধায়, শত্ৰু চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসাক, মলয় বিশ্বাস, উজ্জলকুমার, টিকু ঠাকুর, শুভা সেন, অলকা সেন, গীতা দে, মানসী চট্টোপাধ্যায়, সজ্জাতা দেবী, শ্রাবণী চৌধুরী, সীতা সেনগুপ্ত, কুমারী ললিতা, জ্ঞানদা কাকোতি, মীরা রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যে সকল কৃতী শিল্পীদের বেশ কিছুদিন বাদে বাঙলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত, বাধামোহন ভট্টাচার্য, অতি ভট্টাচার্য, বিপিন গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিপিন মুখোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, দিলীপ চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত, অরিনাশ দাস, সমরকুমার, মনোগোপাল, তাসকুমার ভাট্টা, রাজ্জা মুখোপাধ্যায়, মালকম, জ্যোতির্ষকুমার, প্রেমতোষ রায়, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, মাল্য সিংহ, বনানী চৌধুরী, স্মৃতিপ্রদা বিশ্বাস, মণিকা গাঙ্গুলী, অনিতা গুহ, বিনতা রায়, অরুণি মজুমদার, শিখারাগী বাগ, পূর্ণিমা দেবী, অমিতা দেবী, ছন্দা দেবী, মণিকা ঘোষ, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

এ বছর যারা নতুন পরিচালকরূপে এ জগতে প্রবেশ করলেন তাঁদের নাম—শত্ৰু মিত্র ও অজিত মৈত্র, অমিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিভাপতি ঘোষ, অগ্রণী, সন্তোষ গুহরায় ও অমলেন্দু বসু।

অভিনয়শিল্পী স্ত্রীপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সিধু গাঙ্গুলী, আত বসু, সঙ্গীত পরিচালক অম্বুপম ঘটক এবং পরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি এ বছর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাপ্তাহিক স্থায়িত্বের দিক দিয়ে এ বছর প্রথম স্থান লাভ করেছে কাবলিওয়ালা ১৩ সপ্তাহ, দ্বিতীয়—একদিন রাত্রে ১১ সপ্তাহ এবং তৃতীয়—শ্রামলী ১০ সপ্তাহ।

পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবি উপহার দিয়েছেন যশু বসু, তিন বসু ও নীরেন লাহিড়ী (প্রত্যেকে তিনখানি করে)।

মোট ছবিগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী ছবিতে যারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ত্রিজন জন হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস (২৫) খানি, পাভাটী সাত্তাল, (২১ খানি) ও তুলসী চক্রবর্তী (১৯ খানি) এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে মলিনা দেবী (১৬ খানি) সন্ধ্যারাগী ও সবিতা চট্টো (১৩ খানি) এবং চন্দ্রাবতী, পদ্মা দেবী ও আশা দেবী (১১ খানি)।

এ বছর পর্দার বৃক্ক বারেকের তরে দেখা দিলেন যাত্ৰাসজ্জাট পি-সি সরকার, বিখ্যাত শিল্পী রথীন মৈত্র, হলিউডের রবার্ট ক্যানিং হ্যাম ও আলোকচিত্রী বিভাস সোমকে।

এইবার আমরা এ বছরের ছবিগুলির নামোল্লেখ করে চিহ্ন দ্বারা তাঁদের শ্রেণী নির্ণয় করার চেষ্টা করে এই আলোচনা শেষ করি।

১। চিরকুমার সভা * * *	২৫। মা * *
২। পরাধীন * * *	২৬। নাগরদোলা * * *
৩। একটি রাত * * *	২৭। শুভলগ্ন * * *
৪। মহাকবি গিরিশচন্দ্র * * *	২৮। টাকা-আনা-পাই *
৫। অসমাপ্ত * *	২৯। শিল্পী * *
৬। শঙ্করনাথায়ণ ব্যংগ * * *	৩০। দুলাল ধরনী * * *
৭। গ্রামলী *	৩১। সিঁথির সিঁড়ির * * *
৮। দ্বিধা * *	৩২। চোর *
৯। আশা * *	৩৩। আমার দৌ * * *
১০। মামলার ফল * *	৩৪। নবজন্ম * *
১১। চলাচল *	৩৫। কাবলিওয়ালা *
১২। পাপ ও পাপী * * *	৩৬। হারজিৎ * * *
১৩। মানবন্ধা * * *	৩৭। মধ্যমালতী * * *
১৪। রাঙ্গপথ * *	৩৮। শেষ পরিচয় *
১৫। একদিন রাত্রে *	৩৯। বড়দিদি * *
১৬। স্বর্ঘমুখী * *	৪০। ঘুম * * *
১৭। ছায়া সঙ্গিনী * * *	৪১। বড় মা * * *
১৮। সাধক রামপ্রসাদ * *	৪২। সিঁড়ির * *
১৯। গোবিন্দদাস * * *	৪৩। উদ্ধা * *
২০। মরনমোহন * * *	৪৪। বাত্রি শেষে * * *
২১। পুত্রবধু * *	৪৫। একতারা * * *
২২। অপরাধিত * *	৪৬। অমর সাংগল * * *
২৩। ফল * * *	৪৭। তাপসী * *
২৪। দানের মর্দাদা * *	৪৮। জাঁদারে আলো *

৪৯। পঞ্চতপা \*

### চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী সেন শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

বিষয়কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী সপ্তাহ চলছে। এ সপ্তাহে শিল্পীদের যোগাযোগ করা একটা দুর্লভ ব্যাপার! কিন্তু এদিকে মাসিক বহুসভার চলচ্চিত্র সম্পর্কে মতামত লিপবার জন্ত তাগিদ পাচ্ছি, কপি না দিলেই নয়। তাই এবারে ঠিক করলুম দক্ষিণ-কলকাতার কোন শিল্পীর কাছে না গিয়ে মধ্য কলকাতায় যে ক'জন শিল্পী থাকেন, তাঁদের সন্ধান করবো।

বর্তমান কালে অভিজ্ঞত ও শিক্ষিত পরিবারের যে কয়জন নৃত্যপট্যায়নী অভিনেত্রী রূপালী পদ্মায় দেখা যায় তাদের মধ্যে শ্রীমতী জয়লী সেন অগ্রতম। সাম্প্রতিক কালে মঞ্চ ও পদ্মায় বখেটে প্যাণ্ডিলাভ করেছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উদ্ধা' ছবিতে 'মাকিনের' ভূমিকায় অভিনয় করে ইনি সুনাম তো অর্জন করেছেনই, প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী বলেও সর্বত্র সমাদর লাভ করেছেন। এরই ভেতর একদিন সকালে শ্রীমতী জয়লীর গৃহাভিযুখে বাজা করলুম। আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। শ্রীমতী সেনের বাড়ী খুঁজে পেতে একটু দেরী হয়ে গেল। ছুটির দিন ভেবেছিলুম হয়তো শ্রীমতী সেনকে বাড়ীতে পাবো না। বাক, সরাসরি শ্রীমতী জয়লীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম, উপরে উঠতেই সামনে দেখি শ্রীমতী জয়লী সাদাসিধে পোষাকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার উদ্দেশ্যের কথা বলতেই একটু হেসে তাঁদের ডয়িং রুমে নিয়ে আমাকে বসালেন। তাঁর বসবার ঘরটিতে ঢুকেই মনে হ'লো সত্যিকারের শিল্পীর ঘর। চার দিকেই দেখতে পেলাম সাক্ষান, সব কিছু সুরুচির পবিচায়ক।

প্রাথমিক পরিচয় আদান-প্রদানের পরেই শুরু হলো আমাদের আলাপ আলোচনা। শ্রীমতী জয়লী বলতে থাকেন, ১৯৫৩ সালের 'আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ' ছবিতে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। শ্রীবিজ্ঞান সেন এ ছবিখানি পরিচালনা করেন। তারপর অনেক ছবিতে ও বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে আসছি। যখন যে-ভূমিকায় অভিনয় করেছি সে-ভূমিকাতেই আনন্দ পেয়েছি। তবে বিশেষ ভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'কাঞ্চী' ছবিতে ডালিয়ার ভূমিকায় এবং নরেশ ি. পরিচালিত 'উদ্ধা' ছবিতে মাকিনের অংশে অভিনয় করে তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর।

চলচ্চিত্র জগতে আপনার যোগদানের কারণ কি এবং এ লাইনে আসতে প্রথম প্রেরণা আপনি কি ভাবে পান, জিজ্ঞেস করলুম আমি। শ্রীমতী জয়লী সেন স্পষ্ট ভাষায় উত্তর করলেন, ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ও নৃত্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। শুধু তাই নয়, শিশুকাল থেকে আমার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে অভিনয় করবো, বড় হ'বো। ছোটবেলা গ্রামোফোনে গান হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি নাচতুম। আমার এই আগ্রহ দেখে আমার মা আমাকে একটি গ্রামোফোন কিনে দিয়েছিলেন। চলচ্চিত্র ও মঞ্চে যোগদান করতে আমার মা আমাকে উৎসাহিত করেন। তিনি নাচ, গান ও অভিনয় ভালবাসেন। মায়ের উৎসাহ ও আগ্রহেই আমি এ-সাইনে এসেছি, এ কথাটি বলতে আমার কোনই বিধা নেই। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আমার সামাজিক কি পারিবারিক জীবনে কোনই পরিবর্তন আসেনি, এটুকু স্পষ্ট ভাবেই আমি বলতে পারি।

দৈনন্দিন কন্ঠস্থচীর কথা জিজ্ঞেস করলে শ্রীমতী জয়লী বললেন, মধ্যস্থিত ভ্রমণের মেয়েদের জীবন যে ভাবে কাটে আমার বেলোতেও তার ব্যতিক্রম নাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে শিক্ষণীয় যে সকল পুঁথিপুস্তক আছে তা পাঠ করি, তার পর নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করি। ব্যায়ামের শেষে চা করে আমি সকলকে পরিবেশন করি ও বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের সঙ্গে একত্র বসে চা-খাবার খাই। চায়ের পর শেষ হলে যেদিন স্ন্যাটিং থাকে না সেদিন

বান্নাবান্নায় সাহায্য করি। দুপুর বেলা বই পড়ি। বিকেলে নাচ শিখতে বাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সংসারের কাজে সাহায্য করে থাকি। রাত্রিতে আবার পড়াশুনো করি। বাড়ীর মোহরা যে সকল কাজ করে আমিও সেগুলো করে থাকি প্রায় প্রত্যহই। পুঁথি-পুস্তক পড়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক গল্পের বই পড়তেই আমার ভাল লাগে। খেলাধুলোর মধ্যে বাডমিন্টন খেলতে আমি ভালবাসি, তবে ফুটবল খেলা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। পত্র-পত্রিকার মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্র সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি আমি নিয়মিত পাঠ করে থাকি। কবিতা লেখা আমার অভ্যাস আছে এবং মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে উঠা কিছু প্রকাশিতও হ'য়েছে।

গোবাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো সাদাসিধে ধরণের পোষাকই আমার পছন্দ। আমি নিজে সাদা পোষাকই পছন্দ করি।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, প্রশ্ন করলুম আমি।

শ্রীমতী জয়লী সেন স্পষ্ট গলায় বললেন, চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে সূচোয়ারা, সুরুঠ, অভিনয়-দক্ষতা, নাচগান ইত্যাদি জানা একান্ত প্রয়োজন। এর সাথে চাই উত্তম বাচনভঙ্গী। আর ভাল ছবি করতে হ'লে চাই ভাল গল্প বা কাহিনী, সঙ্গ পরিচালক এবং তার সঙ্গে টিম ওয়ার্কটিও ভাল হওয়া চাই। আমার মতে শিক্ষামূলক ছবি তৈরী করতে হবে, যাতে সত্যিকারের সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি?



শ্রীমতী জয়লী সেন

শ্রীমতী জয়ন্তী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন নিশ্চয়ই। বোধ হয় এর চাইতে বড় প্রয়োজন শিল্পীদের আর থাকতে পারে না। চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী বিশেষ করে অভিনেতা ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের আরও অধিক সংখ্যায় যোগদান করা উচিত। ভদ্র ও শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা এ লাইনে এসে এ শিল্পের আরও উন্নতি হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলতে চাই—বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রের ক্ষমতা অপরিমিত। এর চাইতে শিকার মাধ্যম ও প্রভাব আজ কালের দিনে আর কিছুতে তেমন বেধা যায় না। সরকার গ্রন্থিক দৃষ্টি দিয়েছেন বা নিচ্ছেন। পুণ্যপুত্রি ভাবে সরকারী সাহায্য পেলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। অবশ্য এ কাহ্ন চলতে থাকা নেই, আজ-কাল যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে সে চমৎকার সবই ভাল। দিন দিন আরও ভাল ছবি তৈরী হবে।

এ ভাবে আমার আশোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছুলো। দেখলুম শ্রীমতী জয়ন্তীর এ শিল্পের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও শেখবার আগ্রহ প্রচুর। সত্যিকারের শিল্পীর যে সাধ নাই সেই সাধনাই করে চলেছেন তিনি। বয়সে নবীন হলেও এর চেষ্টা, উত্তম ও নিষ্ঠা সত্যি প্রশংসনীয়। আমাদের আশোচনার মাধ্যমে

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা এ শিল্পের প্রতি।

এ বারে আমি আমার শেষ প্রেরণা শ্রীমতী জয়ন্তীর কাছে তুলে ধরলুম—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চান?

শ্রীমতী জয়ন্তী বলে চলেন, পূর্ব-বাঙ্গালার ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে আমাদের শৈল্পিক বাড়ী কিন্তু ঢাকা সহরেই আমরা বাস করতুম। আমার বাবা ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। ঢাকা কমকলেগে বাজিকা বিভাগে আমি পড়তুম এবং সেখান থেকেই আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিই। তার পর ১৯৫০ নাগাদ দাঙ্গার সময় আমরা কলকাতায় চলে আসি এক রকম রিক্ত হস্তে বলতে পারেন। ১৯৫২ সালে আমি রেডিওতে যোগ দিই এবং অভিনয় করি। ঢাকায় থাকতেই আমি নাট শিখি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিই। ঢাকাতে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করে শুভম অর্জন করেছিলুম প্রচুর। ১৯৫৩ সালে চলচ্চিত্রে যোগ দিই এবং যথেষ্ট যোগ দিই ১৯৫৪ সালে। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, তবে শিল্পী আমি, শিল্পের ভিত্তরে আত্মনিয়োগ করে সকলকে আনন্দ দিতে চাই। সত্যিকারের শিল্পী-জীবন যাপনই আমার একমাত্র কাম্য।

## কোনো এক বর্ষার রাত্রে

### অরুণাচল বসু

এখন হয়তো নেতচে কোথাও মরণ্য :

এই বর্ষার ধারা স্বর্গরে

কোনো পাহাড়ের বাঁকা নির্ঝরে

নেমেছে বজ্রা, কলরোলে তাঁর

রাত্রির কানে সঙ্গীত বোনে ছলছল সুর ;

বনের চরণে দিগন্তময় বেজেছে নুপুর।

ভেজা-পাখি ভাগে কঠিন রাত্রি,

চকিত হরিণী হয়বাণ হ'লো ; শিকারী বাঘের

চোখে ঠিকরায় কোথাও আশ্রন ;

মোঁচাকে চূপ ভীকু গুন্ডন,

সাপের খোপবে বেদে ; জলধারা তাড়া করে বায়,

কোথাও ময়ূরী পেখম তুলেছে ঝড়ের হাওয়ার,

অরণ্য দোলে, দোলে স্তম্ভ দেশ

স্বপ্নের কেশ এলানো হুঁচোখে বন-কন্ডার—

ভিক্ষে-হাওরা বেয়ে হৃদয় আমার

উড়ন্ত তাই,

বৃকে বর্ষার আরণ্য স্বর :

পৃথিবীতে আজ জায় কিছু নাই, আর কিছু নাই

## আপনার বাড়ীর জন্যে সুন্দর একটি ন্যাশনাল-একো রেডিও কিনুন

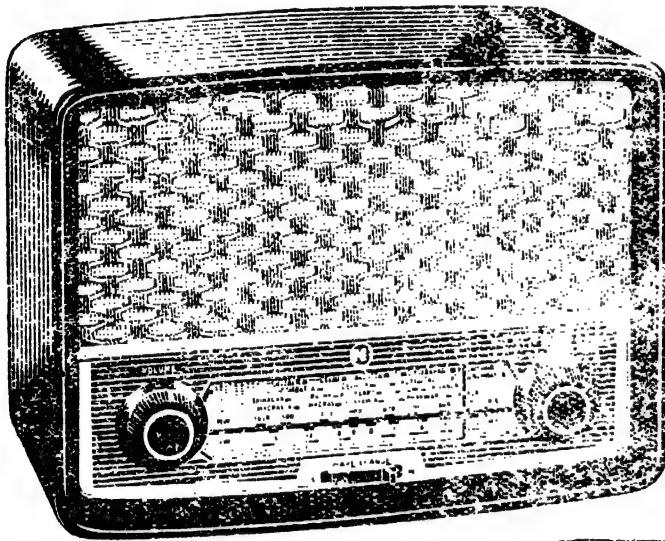
দেশের ঘরে ঘরে ন্যাশনাল-একো রেডিও গান-বাজনা ও  
আনন্দের ঢেউ এনে দিচ্ছে—আপনিও একটি ন্যাশনাল-  
একো রেডিও রেখে এই আনন্দের আসরে বোগ দিন।  
১৯৫ টাকা থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত পছন্দসই দারো  
রকমের মডেল আছে।

ন্যাশনাল-একো রেডিও

মনসুনা ইজ.ড.

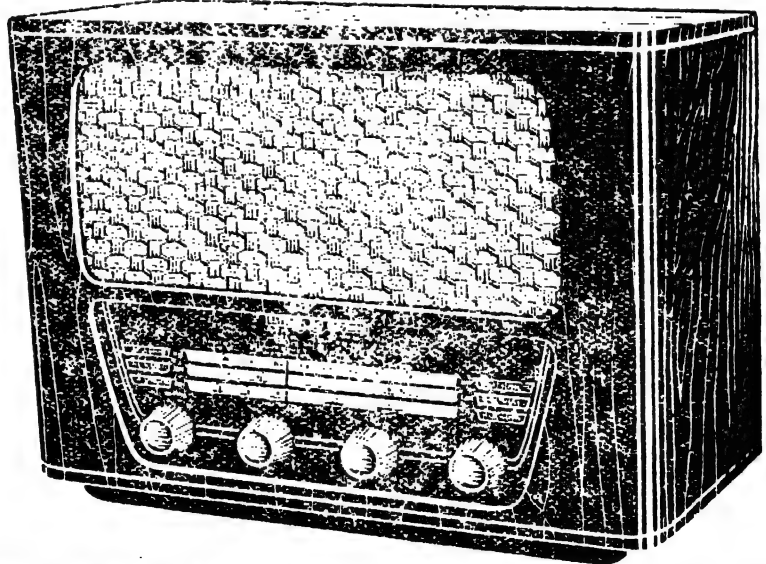


আজই ন্যাশনাল-একো কিন্তাকে বিনা খরচায়  
বাড়িতে পৌঁছে বসুন। এখানে সব নীট দাম  
দেওয়া হলো—এর ওপর স্থানীয় কর লাগবে।



মডেল ২৪৫ : ৫ ভল্ট, এসি/ডিসি  
সেট। ৫ ভল্টের ড্রাই ব্যাটারী  
সেট। সময় ভেবেভ দরী যায়।  
দাম ১৯৫ টাকা

মডেল ২৭০/১ :—‘নিউ কুমার’  
৫ ভল্ট, ৩ ব্যাণ্ড...পরিবর্তনযোগ্য  
টোন-কন্ট্রোল, বড় টিউনিং স্কেল,  
বড় ক্যাবিনেট। মডেল এ-২৭০/১  
এসি; মডেল ইউ-২৭০/১ এসি বা  
ডিসি। দাম ৩০০ টাকা।



(R&A) জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - বাঙ্গালোর - দিল্লী



## হিন্দী—চলবে না

“সরকারী ভাবে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা না হইলেও বেসরকারী সূত্রে রিপোর্টের সুপারিশের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা অভ্যাস ইঙ্গিত পাওয়া গাইতেছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কমিশন ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষারূপে চালু করার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু কমিশনের দুই জন সদস্য—ডাঃ পি সুরদায়ণ এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সুপারিশের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজীকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পরও ভারতের সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা উচিত। ভারতীয় সংবিধানে অবশ্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার নির্দেশ ছিল—কিন্তু ডাঃ সুরদায়ণ এবং ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, প্রয়োজন হইলে সংবিধানের সংশোধন করিয়াও ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে রাখা আবশ্যক। স্বেচ্ছা করিয়া হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার বিরুদ্ধে শুধু দক্ষিণ-ভারতই নহে, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানেও প্রবল বিক্ষোভ করিয়াছে। এই বিক্ষোভকে উপেক্ষা করিয়া কমিশনের সুপারিশ চালু করিবার চেষ্টা করিলে তিক্ততা ও বিভেদই বাড়িবে—এ সমস্ত ভারত সরকারের এখনো সময় থাকিতে উপলব্ধি করা উচিত।”

—দৈনিক বসুমতী।

## সীমান্ত-সমস্যা

“সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানী দুর্বৃত্তদের হামলা একরূপ হামেসা-সংঘটিত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এমন দিন খুব কমই যায়—যে দিন খবরের কাগজ খুলিলে কোথাও না কোথাও দুই-একটা দস্যুত্বের সংবাদ চোখে না পড়ে। ১৩ই মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত পাকিস্তানী হামলার যে বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই ধরনের হইলেও নিছক একটা বৈশিষ্ট্য বহন করে। রাজসাহী হইতে আগত একদল পাকিস্তানী ডাকাত মালদহ জেলার পরগণ্ড গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঐ গ্রামেরই জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দেয়। উক্ত গৃহস্থটি ডাকাতদলকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইলে ডাকাতদল পলায়ন করে এবং পরদিন সকালে অপর আর এক গ্রামের গাছতলার দল্লানলের দুইজন লোক ধরা পড়ে, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন গুলীর আঘাতে আহত এবং অল্পদিন তাহার গুলিবারত। তাহাদের

স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায়, গ্রামের লোকদের সহিত ডাকাতদলের যোগাযোগ ছিল এবং কৌতুকপ্রদ আরও যে কথাটি জানা যায় তাহা হইল এই যে, আহত ডাকাতটি নাকি একজন এল এম এফ ডাক্তার। অবাক কাণ্ড! একপাল লোকের মধ্যে গুলী লাগবি তো লাগ তাক করিয়া ডাক্তারের পায়ে! সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেড়ে শালাকে ধর—উপকথায় এই প্রবাদবাক্য এ ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। এ কথা বলিতেই হইবে যে, পুলিশ দল এক্ষেত্রে বেড়ে এক আসামী পাকড়াইয়াছে। সামাজিক পদ-মর্যাদার বসে ডাকাত নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য হইবার জন্ত দাবী জানাইবে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা

## মিথ্যা জেহাদ

“আল্লামা মাদরিককে লইয়া আবার গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত ‘কাশ্মীর অভিযানের’ তারিখ ক্রমাগত বদলাইয়া উহা স্থগিত রাখিতেছেন দেখিয়া তাঁহারই দলেব লোকেরা তাঁহাকে দল হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লামার অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি নূতন স্বৈচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া নূতন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে শিয়ালকোটের নিকটে তিনি সম্প্রতি তাঁহার “শিবির” স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই যুদ্ধবিবর্তি রেখা অতিক্রম করিয়া “সৈন্যে” কাশ্মীরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসী এবং স্বধর্মাবলম্বীরা তাঁহার এই পবিত্র জেহাদের মূল্য বুঝিল না। তাঁহার “শিবিরের” পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকেরা একদিন একযোগে আসিয়া আল্লামার “শিবির” ভাঙ্গিয়া তচনচ করিয়া দিয়াছে। অবশ্য আল্লামার ভক্তেরা নাকি আবার “শিবির” রচনা করিয়াছে এবং জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচার করিবেন কি না সে প্রশ্ন পৃথক। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কাশ্মীর অভিযানের মত পবিত্র কার্যে আল্লামার দেশবাসীরা ও সমধর্মীরা সাহায্য না করিয়া বাধা দিতেছে কেন? পাকিস্তানের অনেক নেতাই তো কাশ্মীর দখলের জন্ত মাঝে মাঝে “জেহাদ” ঘোষণা করেন। কেবল আল্লামার বেলায় ইহাতে দোষ কেন? স্বয়ং আল্লামা এ বিষয়ে কি বলেন?”

—যুগান্তর

## সতর্কতার প্রয়োজন

“গত সপ্তাহে বেলডাঙ্গায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বোমা তৈরীর যন্ত্রপাতি, ঢাকা মুসলীম লীগের বসিদ বই, দীর্ঘায়তন পাকিস্তানী পতাকা, উত্তেজনামূলক প্রচারপত্র, কাশ্মীর এবং মুর্শিদাবাদ এক সঙ্গে আক্রমণ করবার সিদ্ধান্তমূলক পত্র বেলডাঙ্গা পুলিশ আধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। এসম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে, পুলিশ সম্মেলনভাঙ্গন যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তারা সবাই জামিনে মুক্ত আছেন। জামিনদারদের মধ্যে বীরা আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিধান-সভার সদস্যও আছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদটি যেভাবে পরিবেশিত হওয়া উচিত ছিল তা মোটেই হয়নি, কলে স্বভাবতই এই ঘটনাটির গুরুত্ব অনেক পরিমাণে লুপ্ত হয়ে গেছে। বিগত নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে এই রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।



গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে গোষ্ঠী গঠন করার অধিকার আছে বলেই নির্বাচনের আগে আর সাময়িক কালে পুলিশের কড়া নজর থাকা সত্ত্বেও এই সব রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ কোথাও বাধা পায় নি। এই অবকাশেই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ধীরে ধীরে একটি চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল, আর এই চক্রান্ত বিরাট আর ব্যাপক আকার নিতে বেশী দেরী হয়নি। আমরা এ ঘটনার বহু আগেই সীমান্তবর্তী এ জেলায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম। সৌভাগ্যের কথা, নির্বাচনের কয়েক মাস বাসেই আমাদের বক্তব্য যে মোটেই ভিত্তিহীন আর অমূলক ছিল না তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরো জানিতে পেরেছি যে, বেলডাঙ্গায় অবিকৃত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের পেছনে আরো এমন অনেকের পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে যারা এই জেলার সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করছেন। “চাঁদা দেবেন কেন, মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য” এই প্রচার-পুস্তিকা ছড়িয়ে জেলার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে। যে সমস্ত রসিদ বই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে, সেই রসিদ বইয়ের নূর ধরে আরো অনেক অপপ্রচারকারী আর বড়সন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করা যায়, অথচ স্থানীয় পুলিশ বিভাগ এ সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ নীরব আছেন!” —জনমত (বহরমর)

### তীত সপ্তাহ উপলক্ষে

“গত ৫ই মে হইতে ভারতব্যাণী তীত সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সপ্তাহ গালনের উদ্দেশ্য হইতেছে তীত-জাত বস্ত্রের বিক্রয় তথা অধিক পরিমাণ ব্যবহারের প্রতি জন-সাধারণের মনকে আকৃষ্ট করা। তীত বস্ত্রের ব্যবহার বুদ্ধির জ্ঞান সরকারী প্রচেষ্টা আছে সত্য, কিন্তু জন-সাধারণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ইহার প্রসার লাভ সম্ভব নহে। জন-সাধারণ অধিক পরিমাণে তীত-জাত বস্ত্র ব্যবহার করিলে বহু বেকার এই শিল্পকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে, অর্থ উপার্জনে সক্ষম হইবে এবং দেশের সম্পদ বুদ্ধির সহায়ক হইবে। বর্তমান জেলার তীত, জাত বস্ত্রের গাতি আছে, জেলার বাহিরে বাজার আছে, চাহিদাও যথেষ্ট আছে। বর্তমানে যে ভাবে ইহা পরিচালিত হইতেছে তাহা এই শিল্পকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে বলিয়া মনে করি। একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে শিল্পচাভুর্ধ্য সমন্বিত বস্ত্রবয়ন দ্বারা ক্রেতা আকর্ষণ করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সমবায়ের ভিত্তিতেই করিতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সমবায় পদ্ধতি যেন তীত-শিল্পীদের স্বাধীন সমিতিতে পরিণত না হয়।” —বর্তমান বাণী।

### লুণ্ঠন কেন?

“অল্পের কাড়াল, বস্ত্রের কাড়াল, শিক্ষার কাড়াল, স্বাস্থ্যের কাড়াল ভারতকে আজ যে দ্বন্দ্বয় বিধারক অবস্থায় দিন কাটাইতে হইতেছে, তা রাজ্য সরকার হইতে মোটা মোটা তনুখা, ধান বাহন, প্রাসাদোপম বাসগৃহ ইত্যাদি যাহারা উপভোগের সুবিধা পাইয়াছেন, তাহারা লুণ্ঠন অনুভব করিতে পারিবেন না। এই ভারতকে হঠাৎ আমেরিকার মত সর্ব সম্পদের সম্পন্ন করিবার খেয়ালে এক পঞ্চবার্ষিক লুণ্ঠন ক্রিয়ার সহায়তা যাহারা করেন, তাহারা যে কোন জাতীয় অতিমানব তাহা এ দেশের কেহ চেনে না। আজ ইংরাজ রাজত্বের পরাধীনতাকে

এই স্বাধীনতা অপেক্ষা আরামদায়ক বলিয়া মনে করিতেছে। আজ দেশে যুদ্ধ নাই তবুও এই ধনরত্ন সংগ্রহের প্রবৃত্তি কেন? গোমস্তা-তীরে পতিত নরকপালের মত ভারতের তথা ভারতবাসীর “অপহৃদ্য কিং ভবিষ্যতি” ভাবিয়া দিশেচারা হইতে হয়।” —ভদ্রীপুর সবাদ।

### প্রাথমিক শিক্ষক

“পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের প্রাথমিক শিক্ষকগণ দারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছেন। বহু স্থানে বহু শিক্ষক নাকি নিয়মিত ভাবে বেতন পাইতেছেন না—বেতন পাইতে অথবা বহু বিলম্ব হইতেছে। ইহার সঠিক কারণ যে কি তাহা বুঝা যায় না। দুর্ভাগ্য ভায়া বারদ যে টাকা শিক্ষকগণ পাইয়া থাকেন, অনেক স্থানে তাহার কিছু অংশ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাইয়াছেন বাকী অংশ এখনো তাঁহারা পান নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃই উন্নয়ন হইতেছে। একেই তো প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণ স্বল্প বেতন পান—তাহার দ্বারা সংসারের সমস্ত প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয় না। তাহার উপর আবার যদি তাহা পাইতে অথবা বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে তাহারা যে কিরূপ অনুরোধ পড়েন, তাহা সহজেই অনুমেয়।” —ভাগীমথী (কালনা)।

### কংগ্রেস

“আজ কোথায় কংগ্রেস আর কোথায় দেশের মানুষ! মানুষ হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ায় কংগ্রেস আজ কেবল অর্থের উপর বনিয়াদ গড়িতেছে এবং ধনীদেব রূপা ও করণার উপর নির্ভর করিয়া চালিত হইতেছে। কংগ্রেস-নেতার সহিত জনগণের পরিচয় নাই এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণের কোন গবরাগবর তাঁহারা করেন না বা রাখিবার প্রয়োজন করেন না। কারণ হুত এই যে তাহা রাখিয়া কোন লাভ নাই, এইজন্য তাহাদের করিবার কিছু নাই। দুর্নীতি, দুষ, অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহারা কি করিতে পারেন ইহাই আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। দরিদ্র দেশ ও নানা অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিফলিত দেশে দারিদ্র্য অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। এই অবস্থায় সরকারী জাঁক জমক ও আড়ম্বর আরও বাড়িতেছে। লীনেহক তাঁহারা পাত্র সরকারী জাঁকজমক আড়ম্বর, মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের লাল উদ্দীপনা চাপরাশী প্রভৃতির বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেসের জন সংযোগের অভাব এবং জনগণের সহিত অস্ত্রের মাধ্যমে চাঁড়া চষক না থাকায় দেশে ধনী কংগ্রেস ও দরিদ্র জনসাধারণ এই দুইটি দল দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমান কংগ্রেস পরিচালকগণ এই মতঃ কার্যটি নির্ধারণ সহিত করিতেছেন এবং অগ্রগত রাজনৈতিক দল তাহার সুযোগ লইয়া মানুষের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহা কংগ্রেসের পক্ষে অতি অশুভ এবং দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। লীনেহক তাঁহারা সরকারী সহকারীদের সংঘত হইবার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহারা প্রয়োজন স্বীকার করা যায় না, কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসের দুষ্টিভঙ্গি ও ইহা প্রদানদের ক্ষমতা কবায়ত্তের মোহ দূর না হইলে সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। লীনেহক প্রত্যেকেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেও যদি মিথ্যা বাস্তব আড়ম্বর ও জাঁক জমক বন্ধ না হয় তবে তাহারা ফল ভোগ করিতে হইবে। টাকা একটা বিরাট শক্তি, ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু কেবল টাকার উপর ভরসা করিয়া ও তাহার দৃষ্টি দিয়া চলিলে ভয়াবহ

হইতে দেবী হয় না। তাহার কারণ এই যে, অবাচিত ও নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থ দান অতি অল্প লোকই করিয়া থাকে। স্বার্থ-প্রণোদিত দানের মধ্যমা গিতে প্রতিষ্ঠান যে দিন করুণ হইয়া বাইবে সেদিন আফশোসের আর সীমা থাকিবে না। ক্রীনেহরু বাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে তিনি পারেন কি না তাহা আমরা জানি না কিন্তু কর্তাগণ ইহা যদি মানিয়া চলিতেন তবে ভাল ছাড়া মন্দ হইত না। আশু নেতার আত্মবিলেপণ করিলে বৃষ্টিতে পারিতেন যে দেশ অপেক্ষা নেতার উর্দ্ধে উঠিয়াছেন এবং দেশকে তাঁহার নীচে টানিয়া নামাইতেছেন। —ক্রিশ্রোতা (জলপাইগুড়ি)

### মিথ্যার বাঁধ

“বাঁধের পরিবর্তন করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তা নিরোধ বিভাগ, বাঁধ নির্মাণ করিয়াছেন ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত বিভাগ। ইহাদের কাছারও যেম বাঁধের ব্যাপারে দায়িত্ব নাই। “বাঁধের পরিকল্পনা আমাদের নয়” এই কথা বলিয়া পূর্ত বিভাগ পাশ কাটাওয়া যান, আর বাঁধ বাঁধের পরিকল্পনা করিয়াছে, “বাঁধ আমরা করি নাই” বলিয়া তাঁহারাও পাশ কাটাওয়া বাইতে চান। স্বরণ করা বাইতে পারে যে, গত দুই মাসের বস্তার পর এই দুই ডিপার্টমেন্ট পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা এখন দেখিতেছি, জলের থাকায় বাঁধ না টিকিলে গ্রামবাসীসহ আগরতলার লোকের কপালে অনেক দুর্দশা রহিয়াছে। বালু মাটি দিয়া বাঁধ নির্মাণ করিয়া বক্তা প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টাকে মোটেই সমর্থন করা যায় না। যে রাজ্যে পাথর পাওয়া যায় না সেখানে কয়েক মাইল লম্বা একটা বিরাট বাঁধ নির্মাণের সাহস কি ভাবে করা হয়, তাহাই ভাবিয়া পাওয়া যায় না! বাঁধ নির্মাণ যদি প্রকৃতই ভরসা হইয়া পড়িয়াছিল তবে আরও অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াই ভাল ভাবে বাঁধ নির্মাণ করা বিধেয় ছিল। তাহা হইলে সতের লক্ষ টাকাও একটা সংকার্ষ্য ব্যয় হইয়াছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। সাধারণ বৃত্তিতে ইহাট মনে হয় যে, ভগ্ন বাঁধের জলশ্রোত অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টার জল সহরের উপর এক াটু পরিমাণ জল অনেক ভাল ছিল। বাঁধটি যদি প্রকৃতই জনসাধারণের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে তবে ইহাকে সময় থাকিতে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই কর্তব্য। ইহাতে অল্প অর্থকতির আশঙ্কা আছে। খয়রাতি সাহায্যের তুলনায় এই অর্থকতি নিশ্চয়ই অনেক অল্প হইবে। সাধু সাবধান!” —সেবক (আগরতলা)।

### জেলা-পাঠাগার

“জেলা-পাঠাগার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। দুইটি জেলা-পাঠাগারের অল্পতম মেদিনীপুর সহরের পাঠাগারের জন্য চেষ্টা বহু পূর্বে হইতেই হইতেছে, সরকারী অর্থও বহুদিন বিতর্কিত ব্যাঙ্কে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে কিন্তু ঘোড়ার পূর্বে চাবুক আসিয়াছে মাত্র—একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছেন, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য একখানি বড় মোটরভ্যানও ক্রয় করা হইয়াছে। তমলুকে অল্পতম জেলা-পাঠাগারটির জন্য এখন ত্রিভল

গ্রহের টোপোথন উৎসব হইতে বাইতেছে, এখানে তখন রাজনারায়ণ স্মৃতি-পাঠাগার বনাম জেলা-পাঠাগার কর্তৃপক্ষ বাদামুবাদে বৃথা সময় ব্যয় করিতেছেন। কাহার দাবী স্বায়স্বত্ত্ব সে প্রশ্ন হইয়া আমরা এখন আলোচনা করিতেছি না—আমরা শুধু এটুকু বলিতে চাই যে, জনস্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া পাঠাগার-ভবনটি সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।” —মেদিনীপুর হিতৈষী।

### আর কত দেবী

“সংসার এবং গ্রামাঞ্চল সমুদ্রে ধান-চাউল ও শাকসব্জীর মূল্য প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা করা গিয়াছিল ধান-চালের মূল্য কিছু হ্রাস পাইবে—বিক্রয় হইল না। শুধু মাত্র সংসারই নহে। গ্রামাঞ্চল সমুদ্রে হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে বহু স্থানেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে এবং অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হইয়া উঠিলে আশ্চর্যের কিছু নাই। ইতিপূর্বে আমরা সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং তদ্রূপে চাউল সরবরাহের দোকানের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিয়াছিলাম। সম্প্রতি ফালাকাটা অঞ্চলে নিদাকণ খাদ্যসমস্তা দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অবিলম্বে যদি সরকারী কৃষকসংস্থার প্রকাশ না ঘটে তাহা হইলে বাস্তবিকই অবস্থা আরও বেশী নিশ্চয় হইয়া উঠিবে। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। টেক্সিলিফেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।”

—বার্তা (জলপাইগুড়ি)।

### শোক-সংবাদ

#### জগদীশ গুপ্ত

সুসংগঠিত কবি জগদীশ গুপ্ত গত ২২ বৈশাখ কিছু কাল যোগাযোগহীন ৭১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করছেন। জীবনের একটি সুদীর্ঘ অংশ সাহিত্যসেবায় ইনি অতিবাহিত করে বাংলা সাহিত্যকে নানা ভাবে গৌরবান্বিত করে গেছেন। সাহিত্য ও আন্তরিকতা ছিল তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা বহু উপন্যাস গল্পগুচ্ছের মধ্যে বর্তি ও বিবর্তি, শ্রীমতী, অসামু, সিদ্ধার্থ স্মৃতি, মেঘাবৃত অশ্বিনী, মল্লিক ও মল্লিকা, লঘুগন্ধ, দয়ানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মাসিক বসুমতীর সঙ্গেও এর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল।

#### ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী

যাত্রা নামা ঐতিহাসিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গত ২১এ বৈশাখ ৬৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ছাত্রজীবন এর চিরকাল গৌরবে ভাস্বর ছিল। ইনি ১৯৫০ খৃঃ নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ইতিহাস-কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগেরও প্রধান অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

### সম্পাদক—ত্ৰিপ্রাণতোষ ঘটক

১৯৯৯ সালে “বসুমতী” পত্রিকার “বসুমতী” ইতিহাসকথা চতুর্থখণ্ডের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## গিনিগোল্ড জুয়েলারি শ্বেশালি



মৌলিকতায়  
নির্ভরতায়  
আধুনিকতায়

## এম.বি. সরকার এণ্ড সন্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ **জুয়েলার্স** গ্রাম-টিলিয়াটেস

১৬৭/সি ১৬৭/সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকতা ১২

ব্রাঞ্চ - বালি গঙ্গা-২০০/২/পি রাসবিহারী এডিনিউ. কলিকতা-২১

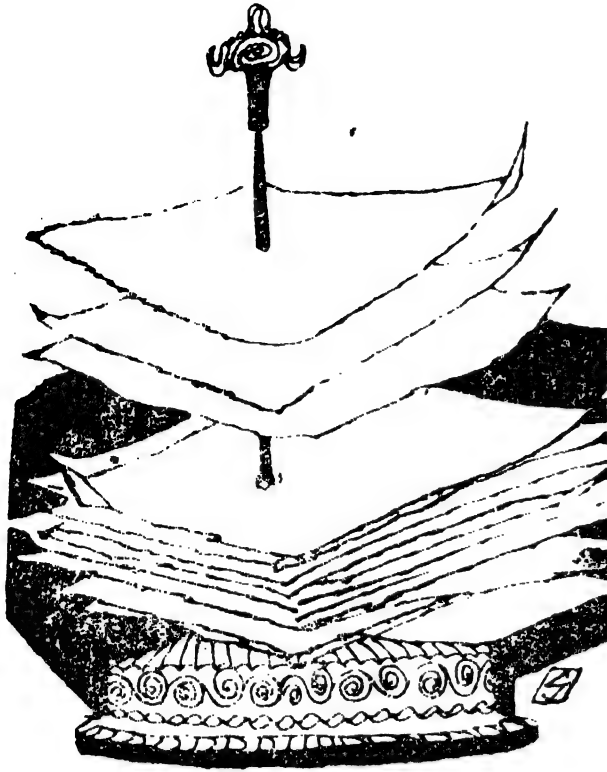
শ্রোতৃমণ্ডলের পুরাতন চিকিৎসা

১২৪.১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকতা ১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

নতুন ব্রান্ড শ্রোতৃমণ্ডল - ডায়মন্ডপুর. ফোন: ডায়মন্ডপুর-১৫৮

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



তরুণ দম্পতি প্রতিভা

পৌষ সংখ্যার পত্রিকায় তরুণ দম্পতি সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনাদের লেখা মন্তব্যটি উপস্থাপনের প্রথমে সত্যি বড় সন্মত লাগল। বুকলাম, কোথাও থেকে নষ্ট ছোঁগাড় করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিখ্যাত মনীষী শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত বলছিলেন যে, বইটি নিশ্চয়ই অতি দুস্তাপ্য গ্রন্থের অন্তর্গত। শ্রীমদ্রবিন্দ ১৮১৩ সাল নাগাদ যখন ভারতে প্রচ্যাবর্তন করেন সেই সময় বোম্বাইয়ে একটি পত্রিকায় 'বক্সিমন্ড' শীর্ষক ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ লেখেন। পুস্তকাকারে সেটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক থেকে তরুণ দম্পতি একটি মন্তব্য আপনাকে পাঠালাম: এত বড় কথা শ্রীমদ্রবিন্দ তরুণ দম্পতি সঙ্কে লিখেছিলেন, —ভাগ যদি বোঝেন, এটির সম্ভাবনার কারণে পাবেন:—“অসাধারণ এক তরুণের প্রতিভা নিয়ে জন্মালেন তরুণ দম্পতি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভাষার উপর দিয়েই সে প্রতিভার অর্থ্য অপব্যয় করে অকালে তিনি অল্প বয়সেই মারা গেলেন। তিনিও লিখেছিলেন গ্রীক ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে তিনি খুবই চমৎকার লিখতেন, কিন্তু ফরাসীতেও তাঁর কম দক্ষতা ছিল না। তাঁর লেখা ফরাসী নভেল ওই দেশের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে পড়ত, আর তাঁর লেখা অপর ফরাসী সঙ্গীত তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মনে উদ্দীপনা জাগাত। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রচুর পড়া-শোনার বিষয়ে যেমন এচটা অসাধারণ ছিল, এঁদের জীবন ব্যাপার সম্বন্ধেও ছিল তাই। যাকে বলে মস্ত বহুরের মাহু, এঁরা ছিলেন ঠিক তাই,—যা কিছু করতেন সবই বেশি বেশি মাত্রায়। এঁরা শিখেছেনও যত বেশি, লিখেছেনও তত বেশি...” [শ্রীমদ্রবিন্দ 'বক্সিমন্ড' পুস্তক থেকে]—পুস্তকলেখক যুগোপাধায়। শ্রীমদ্রবিন্দ

## চার জন প্রসঙ্গে

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত ফাল্গুন (১৩৬৩) সংখ্যার পত্রিকায় “চার জন” শীর্ষ্যে মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণ দিঃ সম্পর্কে কয়েকটি ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। প্রথমত, লুইসী মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে: “ডাঃ সিংহের পরিচরনা অল্পবয়সী ১১৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো লুইসী মানসিক হাসপাতাল।” আপনাদের অবগতির জ্ঞানে জানাট, লুইসী মানসিক হাসপাতাল ১১৫০ সালের বহুপূর্বেই ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু-র প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসাবে ১১৪৭-৪১ সালে লুইসী হাসপাতালে নিয়মিত বাওগার আমায় সুযোগ হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, তিনি এই হাসপাতালের ‘অধিকর্তা’ বলে বর্ণিত হয়েছেন। ‘অধিকর্তা’ কথাটি বিশেষ পরিষ্কার নয়, উনি ওখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ওখানকার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। পরবর্তী সংখ্যায় এই ভুলগুলি সংশোধিত হলে সুখী হবো। এ জাতীয় প্রকার বাওগার পাঠকদের বিভ্রান্ত কবে।—মায়াদেব। ৪ সুবাবলী এড্ডি, কলিকাতা-১৭।

## পত্রিকা সমালোচনা

সুদীর্ঘ কাল ধরে আমি মাসিক বসুমতীর পত্রিকা। তবে কি জানি কেন, গত কয়েক বছর ধরে বসুমতী যেন আমার কাছে অতুলনীয় বলে প্রতিভাত হচ্ছে। আরও তো অসংখ্য পত্র-পত্রিকা আছে কিন্তু বসুমতীর নাগাল ধরতেও তাদের অনেক দেয়। আপনাদের ঠিকই বলেছেন—রাঁচী থেকে কড়াচাঁ, রাণী থেকে কেদারী সকল দরবারেই বসুমতীর সমান গতিবিধি, এক এক সংখ্যায় সাত আটখানি উপস্থাপন বসুমতী উপহার দিয়েছেন। কত অজানা অচেনা ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে তুলে এনে তাঁদের প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে তাঁদের করেছেন আলাদা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুমতী ধরতে গেলে প্রতি মাসে পাঁচটি ছটি করে নতুন নতুন লেখক উপহার দিয়ে আসছে। আপনাদের খালি একটি অল্পবয়সী কবি, সেই দিকে কৃপা করে দুইজন কবলে বাড়িতাই হই। তার কারণ, সে কাগজে বর্তমানে বসুমতী ছাপা হচ্ছে তা মোটেই লাভ করে না স্থায়িত্ব। কিছুকাল গত হলেই তা বিবর্ণ হয়ে যায়।

শ্রীমতী শান্তা বসুর রচনা আমার বেশ লাগছে, বেশ একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে। আন্তরিকতার পকতপা ও বারীন্দ্রনাথের চায়না-টাউনও আনন্দ দিচ্ছে।

আপনার সম্পাদনা বাউলার তথ্য ভারতের সম্পাদক মহলের একটি বিশ্বকর উদাহরণ বলে গণ্য হবে। ইতি সুপ্রিয়া ঘোষাল, জামসেদপুর।

অনেক দিন ধরে আমি মাসিক বসুমতী পড়ে আসছি, লক্ষ্য করছি যে, এখন পাঠক-সাধারণও পত্রিকা সম্পর্কে মত প্রকাশ করছেন। সেই দেখে আপনাকে পত্রিকা সম্পর্কে আমার মত জানানোর সাহস সংগ্রহ করছি।

বসুমতীর প্রত্যেকটি বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণ কৃতিত্বের সঙ্গেই সম্পাদিত হচ্ছে, একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। অচিন্ত্যকুমারের পরমপুঙ্খ শ্রীশ্রীমদ্রবীন্দ্র শীর্ষকাল ধরে পাঠকচিত্তে জুগিয়ে গেছে অধ্যাত্ম ভাবের প্রাবল্য। একটি নিবেদন শৈশবজ্ঞানস্ব স্বন্ধে: যখন ইচ্ছে তিনি লেখেন, যখন ইচ্ছে তিনি বন্ধ করেন (অন্ততঃ সাধারণ পাঠক-হিসাবে বা দেখতে পাচ্ছি) এর অর্থ কি? তাঁর লেখা

মানের বখাৰ্খই আসে ভালো লাগে, কিন্তু আমাদের সেই স্তবিক "ভাল-লাগা"কে নিয়ে শৈলসজ্জানন্দ আজ যে ছেঁকে-খসে গছেন, এর কোন ব্যক্তিগত অর্থই আমার জানা নেই।

মনোজ বসু যতশয়ের রচনায় অনেকেই তৃপ্তিলাভ করবেন। শব্দবলে লেখা হচ্ছে শাস্তা বসু ও পৃথ্বী মুখোপাধ্যায়ের।

দয়া করে জানাবেন কি উদয়ভানু ও নীলকণ্ঠের প্রকৃত নামটি ?

বসুমতীর একটি বিশেষত্ব বড়ই আনন্দ দেয় সেটি হচ্ছে যে, মমতীতে যত বকম বিভাগ আছে এত বকম বিভাগ বোধ হয় অজ্ঞান পত্রিকাতেই নেই। সমাজের সকল স্তরেই আপনারা লাভ রেছেন অকুণ্ঠ সমাদর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকেই মমতীর মধ্যে খুঁজে পাবেন তাঁদের নিজেদের মনের গোপ্যক।

চারজন, বঙ্গপট, সাহিত্য-পরিচয় নাট্যগান-বাঁজনা, কেনাকাটা, গাধা, ইত্যাদি ইত্যাদি আরও যে সকল বিভাগ আছে, প্রত্যেকটিই খট পরিমাণে স্বয়ংগামী এবং তান্ময়পূর্ণ।—শান্তিনন্দ মুখোপাধ্যায় ও বিনতা রায়, এলাহাবাদ।

সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি পরিবেশনে আপনি সতিাই অতুলনীয়। রাসদ্য ভাননী খুব ভালো লাগছে বঙ্গবাস আপনাকে। অশোক ঘোষ। ১১, মনজিলাড়ী ট্রাট, কলকাতা ৬।

কালের গতি অতিক্রম করে যাচ্ছে, সমুদ্রের উচ্ছলিত ঢেউ এর গর্ভে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই তার অপূর্ণ সৌন্দর্য, সৃষ্টিকর্তার পরম কাঙ্ক্ষণ্য অতীত সুন্দর, তেমনি "মাসিক বসুমতী" দিনের পর আমাদের সামনে-সামনে দিচ্ছে এক যৌবন-সৌন্দর্যময়ীর কল্যাণ রূপ। তায় পাতায় ভরে যাচ্ছে প্রজন্মকন্দের প্রবন্ধ, গল্প, উপজ্ঞান জ্ঞান। প্রকৃতির মাঝে নত করি ও নূর হতে জানাই প্রণাম সকল লক্ষ্যকাঙ্ক্ষীকে, আর সম্পাদককে জানাই আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম।

"তানমী" উপজ্ঞান খুব ভালো লাগছে। বাসীপ্রনাথ দাশের গায়না টান" এক অভিনব ধরনের লেখা, "পঞ্চতপা" ও "অন্ত ও তাহ" এর লেখককে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাবেন, "অন্ত ও তাহ" পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে হয় লেখক যেন সব মন টেঁড়িও তার পাশে গোরাবুরি করেন। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ আরও বেশী করে প্রকাশ করলে ভালো হয়। মাসিক বসুমতীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি—শ্রীমদন সরকার। শিভুষণ ঘোষ লেন। মাহেশ, জৌহরপুর।

গ্রহণ করুন আপনি আমাদের "উভ নববর্ষের" আন্তরিক কামনা ও অভিনন্দন এবং আপনার মধ্য দিয়ে সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আমাদের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমরা আপনার জগৎ প্রচারিত পত্রিকা "মাসিক বসুমতীর" নিয়মিত পাঠিকা, এর প্রতিটি গল্প, উপজ্ঞান, প্রবন্ধ, পত্রপুস্তক, আমাদের খুব ভাল লাগে, এর অস্তিত্ব অক্ষরণ "চার জন"। এই চার জনের মধ্য দিয়ে বানরা জানতে পাই দেশের কত জানী-গুণীদের জীবনী-চিত্র। আমরা এই চার জনে দেশের কোন বিহীন মস্তিষ্ক ও জীবনী দেখতে চাই। অনেক দিন "মাসিক বসুমতীর" পাতায় আপনার কোন লেখা দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমরা এর দীর্ঘজীবন কামনা করি ও দিনে দিনে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক মাসিক বসুমতী। চিন্তা ঘোষ ও গায়ত্রী দত্ত। শিভুষণ ঘোষ লেন, মাহেশ।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Kindly receive Rs 15/- as subscription of "Masik Basumati." Pritikona Sengupta C/o Santilal Sengupta, Manager, Surma valley Sand Mills. Cachar.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বারদ ১৫ টাকা পাঠান। বসুমতী পত্রিকা উন্নতি কামনা করি, মহাশয়ের দাশপুত্র P. O. Titabar, Assam.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পানরো টাকা পাঠাইলাম। Madhuri Mookherjee, 41/19 Hauzkhari Enclave, New Delhi-16.

১৩৬৪ সালের চাঁদা পাঠাইলাম। Renu Dasgupta 3/17/331 H. Mal Dahia Varanasi Cantt.

Sending Rs 7.50 for the subscription from Baisakh to Aswin. Parbati Sen, 111A/304 Ashoknagar. U. P.

মাসিক বসুমতীর শুভ দায়াসিক মূল্য পাঠাইলাম। শ্রীমতী প্রভাবতী মুখোপাধ্যায় C/o Professor N. N. Mookherjee 6220 Rakalgunj Road. Agra, U. P.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের (বৈশাখ-চৈত্র ১৩৬৪) চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ দায়া অফিসে পাঠাবেন। শ্রীমতী মমতা বকশী। C/o Dr. B. K. Bakshi Forest Research Institute Dehra Dun,

আমি ৪০৫১১ (M) নং গ্রাহিকা। আজ আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। শ্রীমতী ইবা ঘোষ। পোঃ মাহেশগঞ্জ, (এস, পি) দুমকা।

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য স্বগ্রহণ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাবেন। কৃষ্ণ সান্ন্যাল। প্রাঃ নং M 41229 C/o, Sri R. K. Sannyal, Executive Engineer Hydro Electric Dvn. Gorakhpur.

সামনের বছরের চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। শান্তি বসু। 36 Havelock Rd. Lucknow U. P.

বার্ষাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। কান্তন ১৩৬৩ হইতে প্রাপ্ত ১৩৬৪ পর্যন্ত। মঞ্জরী সেনগুপ্ত। C/o. Sree B. Sen Gupta, A. C. Station. Jodhpur, Rajasthan

Sending herewith my Annual subscription for Monthly Basumati Magazine. Sm. Hiran Kumari Mittra, 49, Leader Road, Allahabad.

A sum of Rs. 15/- only is remitted herewith on a/c full payment of Annual subscription of Masik Basumati. Please acknowledge receipt and send the M. Basumati regularly.—Bela Paul. C/o G. G. Paul. Accountant in B. N. Assam Rifles, Imphal, Manipur State.

Remitted herewith Rupees Seven and annas eight only as half yearly subscription of Masik Basumati. Please enlist my name.—Manashi Sinha, Mor Hospital, Nawalgarh, Rajasthan,



# পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ অবতার নন্দ—মহুযের জনকসংসারণ প্রকাশ, মানবতার প্রথম প্রতীক। সে-মানব অতি মানব নয়, প্রাকৃতচিহ্নকারী অলৌকিক-কর্ম। পুরুষ নয়, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সকাতর বৈরাগী নয়—এই ধরণীর ধুলোট-উৎসবে ধূলি-লিপ্ত-বাস মাছুষের পাশে-দাঁড়ানো মাছুষ—দুঃখ-শোকে অবিচলিত, কঠোর স্রষ্টি, নিন্দা-আঘাতে আত্মক, প্রেমে দীপ্ত পতিপূর্ণ মাছুষ রবীন্দ্রনাথ। 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'-এ অমল হোম কবির সেই পতিচাই দিয়েছেন। আর পতিচয় দিয়েছেন তাঁর অপূর্ণ দেশাশ্রবোদয় সর্বত্র প্রকাশের—জাতিয়ান-মোলাবগ ইত্যাকার প্রতীকাদে তাঁর নাটক, ভাগ উপলক্ষে। কবির তিনখানি অপ্রকাশিত প্রতিটিপত্র বহু চিঠিপত্র ও তথ্যসংগ্রহ প্রভৃ। দাম : টাকা ২-৭৫।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

Stories from Modern Bengal

## কাব্য-সঞ্চয়ন

## BROKEN BREAD

ছন্দ-সরসভীর বঙ্গের সত্যেন্দ্রনাথ বাঙাল প্রিয় কবি। তাঁর প্রায় সমুদয় কাব্যগোষ্ঠের বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দলিতাংশ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের নামকরণ রবীন্দ্রনাথের। সমুদ্রিক অষ্টম সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দাম : পাঁচ টাকা।

Translated into English by Mrs. LILA RAY with an introduction by Dr. Daniel H. H. Ingalls, Chairman, Department of Sanskrit and Indian studies, Harvard University, U.S.A. and Editor, Harvard Oriental series Price Rs. 7-00

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সুবোধ ঘোষ	বুদ্ধদেব বসু
পথের দাবী ( উপন্যাস ) ৬-০০	খির বিজুরী ৩-০০	শেষ পাণ্ডুলিপি ( উপন্যাস ) ৩-২৫
পরিণীতা ( নাটক ) ১-৫০	জতুগৃহ ৩-৫০ ফসিল ২-৫০	বারোগাসের ছড়া (কবিতা) ৩-০০
পরশুরাম	গজোত্রী ( উপন্যাস ) ৪-০০	শুরেন্দ্রনাথ মিত্র
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩-০০	বিমল মিত্র	অদৃশ্য ইঙ্গিত ( উপন্যাস ) ৪-০০
গড্ডালিকা ২-৫০	অন্তরূপ ( উপন্যাস ) ৫-৫০	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কজ্জলী ২-৫০ গল্প-কল্প ২-৫০	মৃত্যুহীন প্রাণ ( উপন্যাস ) ১-৫০	জঙ্গলে ( উপন্যাস ) ৩-০০
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২-৫০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও
ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প ৩-০০	টনসিল ( নাটক ) ১-৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
রাজশেখর বসু	গণশার বিয়ে ( .. ) ১-৫০	বিসর্গিল ( উপন্যাস ) ৩-০০
মহাভারত ১০-০০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	হুমায়ুন কবির
রামায়ণ ৬-৫০	প্রাগৈতিহাসিক ২-৫০	সাথী ( কবিতা ) ১-৫০
চলন্তিকা ( অভিধান ) ৬-৫০	দীপক চৌধুরী	অপ্সাধ ( কবিতা ) ২-০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	কুমারী কল্যা ( উপন্যাস ) ৫-০০	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত
সাহিত্যে সঙ্কট ২-০০	শঙ্কবিষ ( উপন্যাস ) ৫-৫০	দুরান্তিক ( কবিতা ) ২-০০
কামিনী-কাঞ্চন ৩-০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	হরপ্রসাদ মিত্র
পথে প্রবাসে ৩-৫০	এই মতভূমি ( উপন্যাস ) ৩-৫০	তিমিরাভিসার ( কবিতা ) ১-৫০
অসমাপিকা ( উপন্যাস ) ৩-০০	সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত	বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
	কথাশুদ্ধ ( গল্প সংকলন ) ৭-০০	আধুনিক বাংলা কবিতা ( সংকলন ) ৫-৫০







## মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

### কথামৃত

#### গুরু কি ?

“যিনি তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিয়াছিলেন।

যিনি এই সংসার-মায়ায় পায়ে লইয়া যান, যিনি কৃপা করিয়া সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা ‘সমিৎপাণি’ হইয়া গুরুর আশ্রমে গমন করিত। গুরু অধিকারী বলিয়া বুঝিলে তাহাকে নীক্ষিত করিয়া বেদপাঠ করাইতেন।

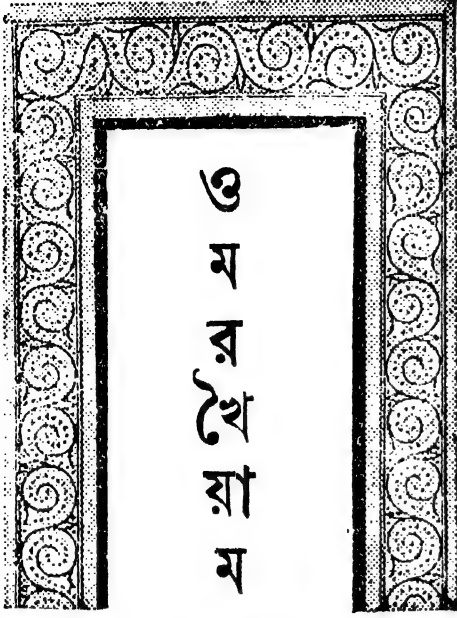
শাস্ত্রে বলে, বাঁহারা অধীতবেদবেদান্ত, বাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, বাঁহারা অপরকে অভয়ের পায়ে লইয়া বাইতে সমর্থ, তাঁহারা ই যথার্থ গুরু ; তাঁহাদের পাইলেই নীক্ষিত হইবে—“নাত্র কার্যবিচারণা।” এখন উহা কেমন দাঁড়াইয়াছে জান ?—“অন্ধেনৈব নীযমানা যথাক্কাঃ।”

আত্মা কেবল অপর আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। সারা জীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব,

আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিজ্ঞানে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যের সময়—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবনযাপন করিবার সময়—কেন এত ন্যূনতা লক্ষিত হয়, তাহার কারণ গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মার শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু বলে ; এবং যে ব্যক্তির আত্মার শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর বাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুরুষ্ট থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টিই বিद्यমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়।”

—স্বামী বিবেকানন্দ



(অপ্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম

হুজনাতেই সহিছি সাকী নিয়তির ক্রভঙ্গি চের  
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।  
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়ালা যতক্ষণ  
সেই ত প্রব সত্য, সখি, পথ দেখাবে সেই মোদের।

শরাব আনো! বন্ধু আমার খুনীর তুফান দেয় যে দেশ।  
স্বপ্ন-চপল ভাগ্যলক্ষী জাগল জাগো ঘুম বিভোল।  
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদসম ব্যস্ত পায়,  
যৌবনের এই বহি নিবে খোঁজে নদীর শীতল কোল।

মন পিও আর ফতি কঃ আমার সত্য আইন এই!  
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই।  
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইনু, 'দিব কি যৌতুক?'  
কইল বধু, 'খুশী থাকো, তার বড় যৌতুক সে নেই।'

মসজিদের অধোপা আমি, গির্জার আমি শত্রু প্রায়  
ওগো প্রহ, কোন মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?  
সংশয়ান্না সাধু কিংবা দৃগ্য নগর-নারার তুল  
নাই স্বর্গের আশা আমায়, শাস্তি নাহি এই ধরায়।

নৃত্য-পর্য কাণ্ডাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর  
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের প'র—  
হেথায় পায়ে দ'লো না কেউ—এই যে সবুজ ভূগের ভিড়  
হয়ত কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।

হৃদয় যাদের অমন প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,  
মসজিদ মন্দির গির্জা, যথা করুক অর্ঘ্য দান—  
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হ'য়ে তাদের নাম,  
স্বর্গের লাভ ও নরক ভীতির উদ্দেশে তারা মুক্তপ্রাণ।

কায়কোবাদের সিংহাসন আর কায়কাউদের রাজমুকুট,  
তুসের রাজ্য, একছিটে এই মদের কাছে সব যে বুট!  
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্বব  
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক জনে শ্বাস অফুট।

দোষ দেয় আর ভৎসে সবাই আমার পাপের নাম নিয়া  
আমার দেবী-প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া  
মরতে যদি হয় গো আমায় শরাব-পানের মজলিশে  
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শরাব আর প্রিয়া।

'রজব শাবান পবিত্র মাস' বলে গোঁড়া মুসলমান,  
'সাবধান, এই হু'মাস ভাই কেউ করো না শরাব পান'  
খোদা এবং তাঁর রশ্মলের 'রজব' 'শাবান' এই হু'মাস  
পান পিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ 'রমজান'?

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থবাস এ পৃথীতল—  
রাত্রি দিবার চিত্রলেখা চন্দ্রাতপ আধার-উজল।  
বসল হাজার জামশেদ ঐ উৎসবেরই আজিনায়  
লাল বাহরাম এই আসনে ব'সে হ'ল বেদখল।

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙীন গুল  
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজল।  
পান ক'রে নে, সময় ভীষণ অবিস্থানী, শত্রু যোর,  
হয়ত এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজকের তুল।

এই সে প্রমোদ-ভবন যথায় জলুসা ছিল বাহরামের,  
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম ক'রে ঘুমায় শের!  
চির-জীবন করল শিকার রাজ-শিকারী যে বাহরাম,  
মৃত্যুশিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হয়ে আখের।

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল অশ্রুজল ঝরে  
না পেলো আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভ'রে।  
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,  
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল—কে জানে হয় কার তরে



শুক্লাবর আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার  
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শরাব চলুক আজ দেদার  
এক পেয়ালি শরাব যদি পান কর ভাই অশ্রু দিন,  
তু' পেয়ালি পান কর আজ বারের বাদসা জুম্মা বার ।

এই মদিরা হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,  
কতু এ হয় প্রাণী, কতু তরু তা, ফুল-সুবাস ।  
ভেবো না কেউ সুরার সাথে সুরার সারও যায় উবে,  
রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্তি ইহার হয় না নাশ ।

যার পরে তোর আস্থা পভীর, এই যে বৃকের বন্ধু তোর,  
মাজিত জ্ঞান চক্ষু নিয়ে দেখ এই তোর শত্রু ঘোর ।  
বন্ধু বেছে নিস নে রে তোর অমাজিতের ভিড় থেকে,  
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তরহীন অন্তরঙ্গতার এ দোর ।

রে নির্বোধ ! এ টাঁচে-ঢালা মাটির ধরা শূন্য সব,  
রং-বেরং-এর খিলান করা এই যে আকাশ-অবাস্তব ।  
এই যে মোদের আসা-যাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,  
একটি নিশাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুম্ভের এ টব ।

হুরী বলে থ কলে কিছু—একটি হুরী, মদ খানিক,  
ঘাস-বিছানো বর্ণাভীরে, অল্পবয়েস বৈতালিক—  
এই যদি পাস স্বর্গ নামক পুরানো সেই নরকটায়,  
চাসনে যেতে স্বর্গ ইহাই স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক ।

হাতে নিয়ে পান-পিয়াল নামাজ পড়ার মাতুর খান—  
দেখতে পেলাম ভাঁটিখানার পথ ধরে শেখসাহেব যান  
কইলু দেখে, 'ব্যাপার কি এ, এ পথে যে শেখ সাহেব ।'  
কইলেন পীর, 'ফকিরার এ ছনিয়া, কর শরাব পান ।'

বুলবুল এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান,  
দেখল হাসিখুশী ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান ।  
আনন্দে সে উঠল গাহি, 'মিটিয়ে নে সাধ এই 'লা,  
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ !'

খৈয়াম ! তোর দিন ছ'য়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা—  
আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা ।  
তাম্বুওয়াল মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,  
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চলে ; কোথায় সে যায় অ-জানা ।

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,  
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন ।  
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটল হয়,  
ঘণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ ।

ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান—  
'শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস, মতপায়ীর নেইকো ত্রাণ ।'  
সত্য কথাই ! যে আঙুরে নষ্ট করে ধর্মমত,  
সবার উচিত—নিঙড়ে গুরে করে উহার রক্তপান !

রহস্য শোন্ সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,  
গুরে মানব ! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে ।  
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেবতা, দানব, স্বর্গদূত,  
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে ।

শ্রষ্টা যদি মত নিত মোর—আসতাম না প্রণামেও,  
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও ।  
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সন্মূলে  
যাওয়া-আমা জন্ম আমার ; সেও শূন্য, শূন্য এও !

এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশী করতে চাও—  
মুসলিম খ্রীষ্টান ইহুদী, সবার যশো-পাখা গাও ।  
এস্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার  
তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও ।

কুগ্রহ মোর ! বলতে পারিস, করেছি তোর ক্ষতি কোন্ ?  
সত্যি বলিস, মোর পরে তুই বিরূপ এত কি কারণ ।  
একটু মদের তরে এত উজ্জ্বলিত তোবামোদ,  
একটুকুরো রুটির তরে, ভিক্ষা করাস অন্নক্ষণ ।

খামুখা কথার বিষ খাসনে, মুসড়ে ঘাসনে নিরাশায়,  
ফেরেব-বাজিবি এই ছনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ছায় ।  
আথেরে ত দেখলি রে তুই, বিশ্ব ফাঁকা ফকিরার,  
তুইও মায়ার পুতুল যখন—ভয় ভাবনা যাক চুলায় ।

ভাগ্যদেবি ! তোমার যত লীলা খেলায় সুপ্রকাশ  
অত্যাচারী উপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস ।  
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত ভালোকে দাও দুঃখ শোক,  
বাহাতুরে ধরল শেষে ? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস ?

। ক্রমশঃ ।

# “রাষ্ট্রভাষা হিন্দী—অচল”—উইলিয়াম কেরী

[ বাঙলা দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বক্কে হিন্দী ভাষা জোর-জুগুমের মাধ্যমে যাঁরা চাপাতে চান, তাঁরা যে ভুল পথে অগ্রসর হয়েছেন, সেই কথা বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা বিভিন্ন আন্দোলন এবং প্রতিবাদের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছে। তথাপি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের জন্য এক বিখ্যাত বিদেশী মনীষীর উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি—যাঁর নাম উইলিয়াম কেরী (১৭৬১—১৭৯৩)। মনীষী কেরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের এবং শিক্ষাদানের কাজ চালাতে। উইলিয়াম কেরী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলে গেছেন বহু পূর্বে—হিন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা হিসাবে ধার্য হ'তে পারে না। —সম্পাদক ]

“Bengal, as the seat of the British Government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be treated as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit the ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with the Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers and people in the lowest stations are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain.” \* \* \*

“Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the South, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgor to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. **This idea is very far from correct**; for though it is admitted that persons may be found in every part of India who speak that language yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north west of Bengal which may be called Hindoosthan proper, as the French in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other,...

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita that any of the other languages of India ;.....four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita, words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to the copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant language of the east."

( বঙ্গানুবাদ )

## বাঙালী জাতির পরিচয়

“বাঙ্গালায় ভারতস্থিত বৃটিশ সরকারের শাসন-কেন্দ্র রাজধানী অবস্থিত : বাঙ্গালা প্রাচ্যের সহিত অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। এজন্য বাঙ্গালা দেশকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া কর্তব্য। উহার ভূমি উর্বর, লোকসংখ্যা যথেষ্ট। যে-সকল দেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালার বন্দরে যান, তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালার অধিবাসীদের যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ বাঞ্ছনীয়। যে কোন বিষয়ে লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় মহান আনন্দ লাভ করা যায়। বাঙ্গালা দেশের যে-সকল অধিবাসী ইউরোপীয়দের সহিত কথাবার্তা কহিতে পারেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সাহিত্যিক ও বাণিজ্যিক-বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং পরস্পরের সুবিধাজনক ভাবে ও সন্তোষের সহিত কথাবার্তা কহিতে পটু। বাঙ্গালা দেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নস্তরের লোকরাও প্রায়ই স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ সরবরাহ করিতে পারে, যাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন লোকদের নিকট আদরণীয়।”

## বাংলা ভাষার গুরুত্ব

“শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বেই বাংলা আজ একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। সমুদ্রের দিক হইতে প্রাচ্যভূমিতে এই ভাষার সঙ্গে অপর কোন ভাষার বোধ করি তুলনাই হয় না। বঙ্গোপসাগর হইতে পার্বত্য ভূটান পর্যন্ত, রামগড় সীমান্ত হইতে আরাকান-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কোটি কোটি অধিবাসীর মাতৃভাষা হইতেছে বাংলা।

কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা—হিন্দুস্থানী কিছু জানা থাকিলেই ভারতের যে কোন এলাকায় যাইয়া কাজ সারিয়া আসা যায়। এইটি কিন্তু মোটেই ঠিক নহে। অবশ্য ইহা স্বীকৃত যে, ভারতের সকল অঞ্চলেই কিছু না কিছু হিন্দুস্থানী জানা লোক পাওয়া যায়। আবার, হিন্দুস্থানী আদৌ বুঝে না, —এমন বহু অঞ্চল এবং বহু অধিবাসী ভারতেই রহিয়াছে। সোজা কথায়, সাধারণ লোক সাধারণতঃ আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে—অপর কোন ভাষার জ্ঞান তাহাদের ভিতর কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষা বরং ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সংস্কৃতের কাছাকাছি। বাংলা শব্দসমষ্টির পাঁচ ভাগের চার ভাগই সংস্কৃত বলা যাইতে পারে। এই ভাষায় এত সহজে ও এত সুন্দরভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর, প্রাচ্যের আর কোন ভাষায় বুঝি এমনটি হয় না।”

॥ মাসিক বন্ধুঘট বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ববাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# স্মৃতিচিহ্ন

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

২

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি,

এবং তারপর বঙ্গা—এর ভাবার্থ ইংরেজীতে দেখা,

শিশিরকুমার ভাট্টার এ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব এবং মনোহর। যারা ইংরেজী কবিতা পড়াতেন তাঁরাও যদি ক্লাসে এসে বার বার শুধু কবিতা এই ভাবে আবৃত্তি করতেন, কবিতার ছন্দ এবং শব্দব্যাকার আমাদের কান বার বার স্পর্শিত করতেন, তা হলে ইংরেজী কাব্য গোড়া থেকেই হয়তো সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু পড়াবার রীতি তা নয়। রীতি হচ্ছে ক্লাসে এসেই কবিতার প্রথম লাইন পড়ে তার ব্যাখ্যা শোনানো। ৪৫ মিনিটে হয় তো ৬ লাইন পড়া হয়। অংশ জুড়ে জুড়ে বহুদিন ধরে নোট চেহারা পরিচয়, সামগ্রিক রূপ তাতে ধরা পড়ে না, সে সামগ্রিক রূপ অনেকগুলি অংশের যোগফলে তৈরি হয় না।

শিশিরকুমার ইংরেজী পাঠের নোট লিখতেন, যতদূর মনে পড়ে নোট বইতে তাঁর নাম ঢাকা হত না। সেন-বাবু ছিলেন তার প্রকাশক। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে পাশাপাশি কয়েকটি প্রকাশক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বভাবতই প্রতিযোগিতা ছিল। একদিন এক ইংরেজী প্যাম্ফলেট নিয়ে বিজ্ঞাপনের কলেজের ছাত্র মহলে খুব হৈচৈ শুরু হ'ল। এই প্যাম্ফলেটের লেখক ছিলেন জে-এল ব্যানার্জি। তিনিও ছিলেন অল্প প্রকাশকের নোট লেখক। তিনি সেন-বাবুর প্রকাশিত ইংরেজী নোটের ভুল দেখিয়ে সেই ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। শিশিরকুমারের মধ্যকার ক্ষুব্ধ হওয়াতে আমরা স্তব্ধমাণ। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। পাণ্ডা প্যাম্ফলেট বেরোল। শিশিরকুমার দেখালেন (ইংরেজী-পণ্ডিতদের প্রচুর প্রমাণ সহ) যে তাঁর শব্দ প্রয়োগে কোথায়ও ভুল হয়নি, জে-এল ব্যানার্জিই ভুল করেছেন। তখন আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা বড় যুদ্ধে আমরা জিতে গেলাম। একটি মাত্র 'ভুল' প্রয়োগের কথা মনে আছে। জে-এল ব্যানার্জি বলেছিলেন sweet-scented flower

ভুল প্রয়োগ, হবে sweet-smelling flower. শিশিরকুমার প্রমাণ সহ দেখিয়েছিলেন sweet-scented flower অতি নিভুল ইংরেজী, ইংরেজ সমর্থিত ইংরেজী।

পি-বাবু চেহারা ছিলেন প্রায় ইউরোপীয়। শাদা চুল, গৌর কাস্তি, গালে গোলাপী আভা। শাদা সুট প'রে এলে বেশ দেখাত। পড়াতেন ঠিক সাহেবী ধরনেই। ল্যান্ডবের 'ইমেজিনারি কন্ভারসেশনস' পড়াতেন তিনি। বৃজলাল নাগ পড়াতেন শেক্সপীয়ারের নাটক। চেহারা কিছু কীর্ণ ছিলেন, চোখা নাক, হৃষ দেহ। তিনি ছিলেন গোড়া শেক্সপীয়ার ভক্ত। অল্পভঙ্গি সহ অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে। একদিন চাদরে মাথা ঢেকে ম্যাকবেথের উইচ সেজে চেষ্টানাট চিবোলেন শব্দ ক'রে (অর্থাৎ যেন উইচ ি বাজে)। টাকাকার ভেরিটির উপর তিনি মহা খাপ্পা ছিলেন। ভেরিটির নোটসহ মুদ্রিত এডিশনগুলিই আমরা পড়তাম। তিনি মাঝে মাঝে ভেরিটির ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর মতভেদ জানিয়ে বিতর্কপূর্ণ সুরে বলতেন, "ভেরিটি নয় যেন বেড়িটি!—শেক্সপীয়ারের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে।"

ডাক্তার বিমলাচরণ ঘোষ (বি, সি, ঘোষ নামে প্রসিদ্ধ) পড়াতেন ইংরেজী 'ডিক্শনারি' নামক একখানি বই। এই বইখানার কথা আমি প্রথম কিস্তিতে উল্লেখ করেছি পিপড়ে-দর্শন সম্পর্কে। এর লেখক আর, এ, গ্রেগরি। এরকম রোমাঞ্চকর বই আমি আর পড়িনি। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে নিরলোভ এবং নিরহঙ্কারে মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সেবা ক'রে গেছেন তাঁর কাহিনী। এমন চমৎকার ভাষায় লেখা, বিজ্ঞানীদের জীবনের রোমাঞ্চকর আত্মত্যাগের ঘটনাগুলি এমন অদ্ভুতভাবে সংকলিত এবং বিস্তৃত যে পড়তে বসলে মন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। অধ্যাপক বি, সি, ঘোষ এক একটি কাহিনী পড়তে পড়তে নিজেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। তিনি ছিলাম খুব সংযতবাক মধুর ভাবী এবং নিরহঙ্কার, আর বইতে ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-দর্শনের কথা। তাই তাঁর ক্লাসে ব'সে কখনো মনে হ'ত যেন কোনো দার্শনিকের বক্তৃতা শুনিছি, কখনো মনে হ'ত বিজ্ঞানের ক্লাসে বিজ্ঞান পড়ছি।

আর-কে-ভি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন।

তার মতো বসিক ব্যক্তি অধ্যাপকদের মধ্যে আর দেখিনি। বিজ্ঞানাগরের আমলের লোক। তার কাছে ছাত্ররা একেবারে দ্বাধীন। তিনি নিজেই সবাইকে খুব প্রেরণা দিতেন, নিজে খুব গভীর থেকেও আর সবাইকে হাসাতেন। একদিন ক্লাসে চুকে দেখি রোল-কল আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আমার নম্বরটি পার হয়ে গেছে। আমি এসে আর-কে-ভি'র সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম ডেন্সের সামনে খুঁকে। উদ্দেশ্য—সবার রোল নম্বর ডাকা শেষ হয়ে গেলে আমারটিতে 'প্রোজেক্ট' লিখিয়ে নেব। ডাকা শেষ হল, আর-কে-ভিকে আমার নম্বরটি বললাম। তিনি আমার মুখের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মাথাটি আমার প্রায় মুখের কাছে এগিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ির পাশে বাড়ি না এক গলিতে বাড়ি?" এ প্রশ্নের ইঙ্গিত এই যে আমি নিশ্চয় অন্তের প্রসঙ্গ দিচ্ছি, কিন্তু বার জন্ত আমি এতটা কষ্ট স্বীকার করছি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি ভাবে গড়ে উঠেছে, পাশাপাশি বাড়ি থাকার দরুন, না এক গলিতে বাড়ি হওয়ার দরুন।—অর্থাৎ বন্ধুত্বটা খুব গভীর না শুধু মুখের আলাপ। আমি বললাম, "না সার, ওটা আমার নিজেরই নম্বর।"

একদিন ক্লাসের মধ্যে থেকে কে একজন খুব গভীর ভাবে ব'লে উঠল, "সার, এই বুড়ো বয়সে আর পারি না।" এর উত্তরে আর-কে-ভি অমান বদনে বললেন, "বিয়েটা হয়ে যাক আর কি, তারপর সব ছেড়ে দিও।" আর এক দিন একজন জিজ্ঞাসা করল, "লিখতে এত ভুল হয়, কি করি বলুন তো, সার?" আর-কে-ভি বললেন, "তবে একটি গল্প শোন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে একটা ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নিভুল লেখা শেখা বার কি করে?' তার উত্তরে বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলেছিলেন, খুব সহজ একটি উপায় আছে, সেটি অনুসরণ করলে কখনো ভুল হবে না।' ছেলেটি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'বলুন সে কি উপায়, আমি পরীক্ষা করে দেখব।' বিজ্ঞানাগর মহাশয় বললেন, 'কখনো লিখো না'।"

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এই গভীর অর্থপূর্ণ উপদেশটি আর কোথায়ও প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না, তবে আর-কে-ভি বলেছিলেন কথাটি তিনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

কলেজের নতুন হাউসে এলাম ১৯১৮তে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর চার তলা বাড়ি, বাড়ির নম্বর ১৭। টাটকা নতুন বাড়িতে বেশ একটা তৃপ্তি। এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই ডেঙ্গু জ্বর সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হল পৃথিবী জুড়ে, তার নাম হল war-fever বা যুদ্ধ-জ্বর। সেই জবে আক্রান্ত হলাম আমি। অত্যন্ত কষ্টদায়ক জ্বর, সমস্ত গায়ে হাত পায়ে তীব্র বহুণা, পাশ ফিরতে লোকের সাহায্য দরকার হয় এমন অবস্থা। আমি অসহায় ভাবে পড়ে ছটকট করছি চারতলার ঘরে শুয়ে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা একই সঙ্গে ট্রাজিক এবং কামিক। আমার সেই অত্যন্ত অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিকেলের দিকে প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল, অন্তত চার তলার ঘরে তার কাঁকানি খুব জোরেই চলছিল। এমন অবস্থায় কি ভাবে যে কি ঘটে গেল, আমি তার জন্ত মোটেই দায়ী নই, কিন্তু যখন কিঞ্চিৎ সবিৎ ধরে এলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, হাউসের বাইরে

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। আশ্চর্য্যের সহজাত প্রেরণা থেকে এ কার্য করেছি এবং চারতলা থেকে আর সবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ঘটে এসেছি, দুরন্তেই পারি নি যে আমি অসুস্থ, আমি বহুণায় অত্যন্ত কাতর, পাশ ফিরতে পারি না, বিজ্ঞানায় উঠে বসতে পারি না। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। নিচে নামতে এক মিনিটের বেশি লাগেনি, অথচ উঠতে হল সমস্ত শক্তি ব্যয় করে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'বে এবং অনেক সাহায্যে।

দেহ আর মনের সম্পর্ক বিষয়ে অল্প জানা ছিল। কিন্তু মন বিশেষ সময়ে দেহের সর্বময় কর্তৃত্ব নিতে পারে এবং আপন গরজে একটি অসমর্থ দেহকে শূন্য দেহের মতো চালনা করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পড়েছি, তিনি একবার বিড়ল কামাডু অসুস্থ যখন ভোগ করছিলেন, এমন সময় তিনি মনকে বোঝালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তিকে বিড়ে কামড়িয়েছে, তাতে তার কষ্ট হবে কেন? এই ভাবে সত্যিই তিনি দংশন বেদনাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন। সত্যীনাথ সম্পর্কে পড়েছি, অনেক সত্যী দাহযন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সবই চিত্ত-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। কিন্তু আমার ঘটনাটিতে সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নেই। আমার মন আপন গরজে এবং আপন বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা না করে, বেতাল যেমন মুহূর্তের জন্যে ক'রে তাকে ভীষিত ক'রে তোলে, যেমনি ভাবে একটি অপটু দেহকে সাময়িক ভাবে পটু ক'রে নিয়েছিল। তার যত্না ভুলিয়ে দিলে কার্যাদ্বার ক'রে নিয়েছিল এবং প্রয়োজন শেষ হতেই যথাপূর্ব। তবু মনকে ধজবাদ জানিয়েছি এতজ্ঞ।

নতুন হাউসে কয়েকটি চরিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে। তরিণদাস সাকালোর কথা আগেই বলেছি। পূর্ববর্তী ট্রেজারিয়ার চরিত্র স্মরণীয় চাটোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন দ্বিত্ববাদী। তার বইয়ের শেলফ পরিচ্ছন্ন, একখানি বই নেই। টেবিলের ডায়েরি একখানি মাত্র পাতা, উপরে আয়না, চিকনি এবং একটা ক্লারিফিকেনের বাস। দেখে খুবই অভিনব মনে হয়েছিল। খুব একটা জোবালা ব্যক্তিও সম্পন্ন চেহারা। কলেজের এক নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন, কোচ করেছিলেন শিশিরকুমার। একদিন বিকেলে তৈ তৈ কাণ্ড। দোস্তলাব কয়েকজন ছাত্র সূর্যাস্তের বিকাশ প্রক্ষেপের কাছে অভিযোগ করলেন, "সূর্যাস্ত বাবু ক্লারিফিকেনেট বাজাচ্ছেন, এতে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে, আমরা পড়তে পারছি না।"

বেলা তখন সাড়ে চারটে। অপরাহ্নের ডাক পড়ল। দেখলাম তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন, অপরাহ্নের চেহারা আদৌ



বাড়ির পাশে বাড়ি, না এক গলিতে বাড়ি ?



নয়। তাঁকে ছাত্রদের অশ্রুবিধের কথা বলা হয়। তিনি সব শুনে ক্রিষ্টের দিকে খুব একটা দৃষ্ট ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, “এঁরা বললেন অশ্রুবিধ হচ্ছে, আর আপনি সে কথা শুনলেন? এখন বেলা সাড়ে চারটে, এটা পড়বার সময় নয়, খেলার সময়। এখন যদি এঁরা বলেন ‘আমরা পড়ছি’ আর আপনি এঁদের প্রশ্রয় দেন, তা হলে অপরাধ হবে আপনার। এ সময়ে পড়ে এঁরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক’বেছেন, এই পাপ কাজে আপনি এঁদের প্রশ্রয় দেবেন না, দিলে এঁদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, এবং তার জন্ত দায়ী হবেন আপনি। এঁদের ব’লে দিন, ঘরে ব’সে থাকার সময় এটি নয়, এখন কেউ পড়ে না।”

খুব ঘোরেব সঙ্গে কথাগুলো ব’লে অপরাধী অভিজাত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে গেলেন। বিচারক স্তম্ভিত। তাঁর বলবার কিছুই ছিল না। সুধাংশুর প্রত্যেকটি কথা সত্যি! ছেলেরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক’বে পড়ছে এটি সত্যিই ধরাযায়। খেলাব সময় পড়বে কেন? বিকেলে ঘরে বন্ধ থাকবে কেন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুধাংশুর ঘরে ক্লারিওনেট বেজে উঠল।

সুধাংশুর সব কথাই যুক্তিসঙ্গত, শুধু তাঁর লজ্জিক একটি ক্রটি ছিল। তিনি নিজেই সাড়ে চারটের ঘরে ব’সে স্বাস্থ্য নষ্ট করছিলেন।

এঁর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল, বেশ মধুর চরিত্র এবং একটি যোগাযোগও আবিস্কার হয়েছিল—ইনি বনফুলের ভগিনীপতি।

ক্ষিতীশচন্দ্র সর্বাধিকারী আর এক চিন্তাকর্ষক চরিত্র। মেদিনীপুরের ডাক্তার শচীন্দ্র সর্বাধিকারীর পুত্র, আই-এস-সির ছাত্র। ক্ষিতীশ অল্প দিনের মধ্যেই অভ্যুত্থান ও আমাকে একেবারে প্রিয়তম বন্ধু বানিয়ে ফেলল। এরকম ছদ্ম প্রাণোচ্ছল ছেলে হঠাৎলে আর ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তার বিবাহহীন জন্মোড় প্রকৃতি, পাঠে অমনোযোগিতা-প্রসূত অস্বস্তিকে ভেঙে চূরে একাকার ক’রে দিত। এর মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগত তার রুচির পরিচ্ছন্নতা। তার বক্তৃতা কাব্য না হলেও তার প্রত্যেকটি বাণ্য ছিল রসাত্মক। একদিন খিয়েটার থেকে ফিরতে তার একটা রাত হয়েছিল, সে আগে হঠাৎলে জানিয়ে যেতে পারেনি, সেজন্ত গোট বন্ধ ক’রে দেওয়া হয়েছিল। অগত্যা ক্ষিতীশকে গোট টপকিয়ে ভিতরে আসতে হল, কিন্তু পরা প’ড়ে গেল। গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু ক্ষিতীশ পরদিন এই উপলক্ষে একটি গল্প ক’বে বলল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে গাড়িয়ে—“প্রথম হঠাৎলে ছিল, সেই হঠাৎলের গোট টপকিয়ে ত্রিকণ ভিতরে লাকিয়ে পড়লেন। হঠাৎলে আয়ান ঘোষ বাস করতেন সপরিবারে, কক্ষের খঁরে ফেলে বললেন, ‘তোয়াট ডুইউ মীন?’ ইত্যাদি ক’রে দীর্ঘ এক কাহিনী, খুবই উপভোগ্য হয়েছিল এটি।

খাবার ঘরেও ক্ষিতীশ নিষ্ক্রিয় থাকত না। হঠাৎলের চেহারা যেমন ঝকঝকে তকতকে, তেমনি তার খাবার ঘরের বাসনপত্র। ভারী কাঁসার থালা বাটি গেলাস, সব নতুন। সব মিলিয়ে বেশ তৃপ্তিকর। একসঙ্গে অনেকে খেতে বসতাম। সংখ্যা মনে নেই। পকাশ ষাট কিংবা বেশি। ক্ষিতীশ আমি প্রায় একসঙ্গে পাশাপাশি বসতাম। মণি মুখুজে ক্ষিতীশের সহপাঠী, সেও বসত আমাদের সঙ্গে। সপ্তাহে একদিন মাংস হত। সকালের ও বিকেলের খাবার

ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। খাকা ও খাওয়া মিলিয়ে ১৮ টাকা মাসে বাঁধা যেত।

মাংস হত দু’রকম, পেরোজুক্ত ও পেরোজহীন—নাম বধাক্রমে আমিষ ও নিরামিষ মাংস। মাছ বা মাংস, অথবা ডাল, পৃথক বাটিতে পরিবেশন করা হ’ত। একদিন মাংস পরিবেশন করা হ’ল। ঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা ক’রে নিচ্ছিল—আমিষ চাই কি নিরামিষ চাই। ক্ষিতীশের কাছে এলে সে এমন অনমনস্ক হয়ে গেল যে সে যেন আর এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছেই না কিছু, যা হোক একটা দিলেই হল—এই রকম ভাবটা। অথচ সবই সে লক্ষ্য করেছে, জানে তাকে পেরোজুক্ত মাংস দেওয়া হয়েছে। দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাটিয়ক খালায় ঢেলে একটু মুখে দিয়েই ঠাকুরকে ডেকে বলল “আমিষ মাংস দিয়েছ আমাকে—ছি। ছি। এ আমি খাই না,” ব’লে সে সবটা মাংস ও খোল ঠেলে ঠেলে খালায় একপাশে সন্দিয় দিল। ঠাকুর মহা অপরাধীর মতো নিরামিষ মাংস একবাটি রেখে গেল খালায় পাশে। ক্ষিতীশ তখন সে মাংস ও খালাতে ঢেলে নিয়ে ছুটিতে মিশিয়ে ভোজন সমাধা করল।

আরও এক দিনের ঘটনা। পরিষ্কৃতি চিড়িমাছ রান্না হয়েছিল। ক্ষিতীশ মাছটি মুখে দিয়েই মাটিতে ফেলে দিয়ে চোঁচাতে লাগল, “ঠাকুর, পচা চিড়িটা আমাকে দিলে?” ঠাকুর দেখল কথাটি মিথ্যা নয়, মাছ মাটিতে প’ড়ে আছে। সে তখন আর এক বাটি থেকে নতুন একটা মাছ ও খোল ক্ষিতীশের পাতে ঢেলে দিল। ক্ষিতীশ তখন ফেলে দেওয়া মাছটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। হুটুপি বৃদ্ধির অস্ত্র নেই। একদিন মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ দূরে দরজার দিকে চেয়ে সন্নিয় ব’লে উঠল “আরে! স্নে, আর বানার্জি খাবার ঘরে!” পাশে মণি মুখুজে বসেছিল, সবাই দরজার দিকে তাকাতেই ক্ষিতীশ মণির বাটি থেকে তার মাছের খণ্ডটি তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। পরে একদিন ক্ষিতীশেরই কৌশলে ক্ষিতীশকে জব্দ করতে চেয়েছিল মণি, কিন্তু পারেনি। “আরে, শিশির ডাহাড়ি এসেছেন খাবার ঘরে। বলতেই ক্ষিতীশ নিজের মাছের বাটিটি ডান হাতে ঢেকে বলল, “কোথায়?” ক্ষিতীশই কি কেপমারী কৌশলের প্রথম উদ্ভাবক?

আরও কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা বলি। বলাইচাঁদ (বনফুল) তখন সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজের খার্ড ইয়ারে পড়ে। ক্ষিতীশও মেডিক্যাল কলেজে পড়ত একই সঙ্গে, কিন্তু ওদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমার কাছে বলাই সম্পর্কে অনেক কথা শুনে ক্ষিতীশের প্রবল আগ্রহ হয় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। সেটি অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারত, কিন্তু ক্ষিতীশের পথ আলাদা। সে তখনই আমাকে বলল, ভাই, বনফুলের কোনো একটা কবিতা জোগাড় ক’রে দিতে পার? সেটি সম্ভবত ১৯২০ সাল। সে সময়ে তার অনেক কবিতা নানা কাগজে বেিয়েছে, একটি জোগাড় ক’রে দেওয়া গেল। ক্ষিতীশ সেই দিনই বলাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। সে ঐ কবিতার যেকোনো একটি স্মরণ লাগিয়ে বলাইয়ের পিছনের একটি আসনে ব’সে আপন মনে গাইতে লাগল। এইটিই আলাপের প্রথম সূত্রপাত।

ক্ষিতীশ বর্তমানে মেদিনীপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার এবং বহু

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আরম্ভের সঙ্গে শেষ দিকের অবস্থা এই একটি যোগসূত্রে আছে, দীর্ঘকালের দূরত্বে বসে সেটি অম্লসরণ করা আমার সাধ্য নয়।

এই হট্টেলে দেখা হল রাজেন সেনের সঙ্গে। ১৯১১ সালের বিজয়ী মোহনবাগান দলের যে ফোটোগ্রাফ ক্লাস সেভেনে পড়তে নানা কাগজে দেখেছিলাম, তার মধ্যেকার প্রত্যেকের চেহারা মনে গাঁথা ছিল। তারপর কোন সালে মনে নেই বিজয় ভাণ্ডারী খেলা আমি দেখেছিলাম। আমার ১৯১১ সালের সেই বোম্বাকর বিজয়-স্মৃতিতে শ্রদ্ধার, গর্বের এবং বিশ্বাসের আসনে এঁরা সবাই ছিলেন উজ্জ্বল। সেই ফোটোগ্রাফ থেকে যেন রাজেন সেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন সামনে। আর তারই সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ছি, এক হট্টেলে বাস করছি! এ ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

রাজেন সেনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। আমি সেই বেঁটে লোকটির লোটার মত শক্ত পেশী দেখে অবাক হতাম, এবং তিনি আমার হাড়ের উপরকার চামড়ার আবরণ দেখে অবাক হতেন। খুব মিষ্টভাষী ছিলেন এবং খুব মর্যাদাপ্রিয় ছিলেন। এক দিন আরও অবাক হলাম দেখে, শ্রীশিরকুমার ভাট্টা তাঁকে রাজেনদা বলে ডাকতেন। পড়াবার সময় অবশ্য শ্রীশিরকুমারই নাগা হতেন ক্লাসের মধ্যে। বিজ্ঞাসাগর কলেজের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় ক্রীগোষ্ঠ পাল তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। তিনি হট্টেলে থাকতেন না। তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল। কলেজের কোনো খেলাই কখনো দেখতে যাইনি, শুধু খেলোয়াড় দেখেই খুশি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাওয়া প্রায় নিয়মিত ছিল। অতুলানন্দর সঙ্গে একত্র যাওয়া হত বেশি। অবশ্য এই সময় আমার আবার ম্যালেরিয়ার বড়ই কষ্ট দিতে থাকে, সেজন্য মাঝে মাঝে শুয়ে থাকতে হত। আমাদের ভ্রমণ-সীমা এ সময় গোলদীঘির বেশি বিস্তৃত ছিল না। এখানে এলে নানা চিন্তাকর্ষক জিনিসে মানসিক হাওয়া পথিবর্তন ঘটত সহজে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে সভা প্রায় লেগেই থাকত। সেখানে সার আন্ততোষ চৌধুরী অথবা সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক বার সভাপতির পদে দেখেছি। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর অনেক কৌতুককর প্রোগ্রাম এখানে দেখেছি। কলেজ দ্বারারে খোলা জায়গায় সভা প্রায় লেগেই থাকত। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা খুব আকর্ষক ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রোতার মর্মে গঁথে দিতে পারতেন। তখন মাইক্রোফোন লাউড-স্পীকার ছিল না, কিন্তু তখনকার বক্তার এসব দরকার হত না। শ্রোতার সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল সব সময়। ইনষ্টিটিউটে বত চিন্তাকর্ষক বক্তৃতাই হোক, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু ভিড়ে হটগোল হতে দেখি নি।

বিপিন পালের গলা ছিল খুব জোরাগো। তিনি কোনো কথাই ফুত বলতেন না, প্রত্যেকটি কথা প্রয়োজন বোধে একবারের বেশি বলতেন। সব দিকে ঘুরে ঘুরে সব দিকের শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন একই কথা। এ রকম বক্তৃতা আর কাউকে দিতে দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলা কলেজ দ্বারারে উমেশচন্দ্র বিহার্য্য মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। হিন্দুর শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন যুক্তি দিয়ে।

কিন্তু সে ব্যাখ্যা সাধারণ শ্রোতার মনঃপুত হত না, সভায় ভীষণ প্রতিবাদ উঠত। অতুলানন্দ ও আমি তাঁর ব্যাখ্যার নতুন যে খুব স্বল্প হয়েছিল। তাঁকে কলেজ দ্বারারে দেখলেই শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতাম। রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ তিনি এমন মুগ্ধ করতেন যে তাঁর সংগৃহীত সংস্করণগুলির যে-কোনো পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন পঠীর নম্বর এবং শ্লোকের নম্বর সমেত। লম্বা লাড়ি চুল, প্রায় সবটাই পাকা, বেঁটে মায়াব, গায়ে গেকুরা রঙের টিলে লম্বা জামা, গেকুরা রঙের খুঁটি।

এক দিন সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শুনি, তিনি কোনো একটি শ্লোকের লৌকিক ব্যাখ্যা করছিলেন, শ্লোকটি এখন আর মনে নেই। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে হিংস্র প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল, এবং তাঁর গায়ে কে যেন টিল ছুড়তে লাগল। বিপজ্জনক অবস্থা, কেউ কেউ মারবে বলে এগিয়ে এলো। অতুলানন্দ ও আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে, এবং তাঁকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এলাম জনতার মাঝখানে থেকে।

উমেশচন্দ্র আমাদের ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে, এবং কত গল্প করলেন। গল্প করতে করতে বই খুলছিলেন মাঝে মাঝে আমাদের দেখাবার জন্য। কয়েকটি আলমারির বোকাই বই। আলমারিরও অদ্ভুত সব নাম ছিল। একটির নাম মনে পড়ে—‘নৈমিষারণ্য’। নামগুলি আলমারির গায়ে লেখা। তাঁর কোনো পুত্র তখন আমেরিকার ছিলেন, তাঁর ফোটো দেখালেন—এই রকম মনে পড়ে।

পাখানা হট্টেলে থাকতে আক্রমণের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম, কলকাতার হট্টেলে এসে উমেশচন্দ্র বিহার্য্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। উভ্যত্রই ‘হীরা’ সেই একই আমরা দুজন—অতুলানন্দ ও আমি। সৌভাগ্যের বিষয়, এর পর থেকে আর এক দিনও অজ্ঞ কাউকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে হয় নি, কেন না পরবর্তী ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে আমরা শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আসছি।

কাছাকাছি সময়ে (১৯১৮ কি ১৯১৯ মনে পড়ছে না) বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা শুনসাম টিকিট কিনে। জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্টোগ্রাফের ক্রিয়া দেখালেন অন্ধকার দেয়ালে একটি আলোর



ক্ষিতীশ হট্টেলের গোট টপকাচ্ছে।

গোলক প্রতিফলিত করে। গাছ উদ্ভেদক খাড়ে কি ভাবে সাড়া দেয় এক বিষ দিলে কি রকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাঁর ছবি দেখা গেল এর সাহায্যে। সোজানুজি দেখবার উপায় নেই, গাছের উদ্ভেদনা বা নিষ্ক্রিয়তা এক লাখ গুণ বর্ধিত করে একটি বলের মতো আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে দেখানো। এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র নিজের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বলেছিলেন সেদিন। পদার্থবিদ্যা এবং বিশেষ করে বেতার বিজ্ঞানে তাঁর দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন মনে আছে। 'my galena receiver' কথাটি বার বার বলেছিলেন, এখনও কানে বাজছে। জগদীশচন্দ্রকে দেখে সেদিন শ্রুত হয়েছিলাম। বক্তৃতা শেষে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপও করেছিলাম। এই সময় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, শেখর সংস্করণ তাঁর নাম। একই সঙ্গে পুরনো সংস্করণের কাব্য গ্রন্থসমূহ—(বৌবনবধ, প্রেম, কল্পনা, যাত্রা প্রভৃতি নামে বিভক্ত) ও কণিকা (পকেট এডিশন) ও গজ গ্রন্থ—চাবি পূজা, লোক সাহিত্য প্রভৃতি পথে দু'আনা করে বিক্রি হত—আমি অনেক কিনেছিলাম, এখনও কিছু আছে।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার বসন্তে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। দেখলাম সবাই প্রকাশে বই খুলে নকল করছে। এই ব্যাপারটি আমার মনঃস্থলীয় দৃষ্টিতে খুব চমকপ্রদ বোধ হয়েছিল। পরীক্ষার নকল এতকাল ছিল একটি বিভীষিকা। কল্পনার বাইরে ছিল। পাবনা শহরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি নিস্তব্ধ ঘরে। কোথায়ও কারো মুখে একটি শব্দ নেই। পরীক্ষা একটি পবিত্র এবং নির্ভীক ব্যাপার বলে মনে হয়েছে এ জন্য। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও পাবনা শহরে দিয়েছি, সেও প্রত্যাশার মতো। তাই এ পরীক্ষার প্রথমত মনে আশা লাগল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সে আশাত কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হল না। পরদিন থেকে আমিও পাশের খোলা বইয়ের দিকে চাইলাম।

তখনাম পরীক্ষার খাতা দেখা হয় না, অতএব টাকা না টাকা সমান। পরীক্ষাটা লোক দেখানো। উদ্বেগ গোড়ায় ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কারণ পরীক্ষার নামে কিছু পড়া পড়বে ছেলেরা, এবং উত্তর লেখা অভ্যাস করবে। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা এত যে এই উদ্বেগে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। আজকের দিনে এর পরিবর্তন হয়েছে সম্ভবত, কিন্তু তখন শুনেছি বিভাগাগর কলেজের এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরীক্ষায় টাকা এখানে 'বার্ণ-রাইট' বিবেচিত হত। অধ্যাপকেরা বাধা দিতেন না।

কীরোর গুপ্ত দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন; অতি সদাশয় ব্যক্তি, শিশুর মতো সরল, ছেলেরা খুব ভালবাসতেন। মেট্রিকুলেশনের ক্লাস হচ্ছিল, এমন সময় পাশের মেট্রিকুলিটান স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক ছাত্র এক সঙ্গে চিংকার করে ক্লাস থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে। রোজ হয় এ রকম। তখন সে চিংকার সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি কীরোর গুপ্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে হেসে বলছেন আহা, এতক্ষণের কষ্ট শক্তি এক সঙ্গে মুক্তি পেল। তিনি পড়ানো কুলে এই চিংকার উপভোগ

করতে লাগলেন চোখ বুজে—মুখে মুহু হাসি। একটা পরীক্ষার দিন তিনি গার্ড হিসেবে এলেন এবং এসে চেয়ারখানা উল্টো করে ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসলেন। বতর্কণ পরীক্ষা হ'ল, ততক্ষণ তিনি একখানা খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। নকলে বাধা দেবেন না কেনেই তিনি বিপরীতমুখী হয়েছিলেন গোড়া থেকে। বুঝলাম টাকা এখানে একটি বনেদি অভ্যাস।

ম্যালেরিয়ার জ্বর নিয়মিত ক্লাসে বাওয়া হয়নি, নিয়মিত পড়ার উৎসাহও পাইনি, ধারাবাহিকতার মধ্যে বার বার ছেদ পড়েছে। শেষে এমন হল যে টেষ্ট পরীক্ষাই দেওয়া হল না। পরীক্ষা দিলেই পাস, অর্থাৎ বসাই হল না। আশা ছিল ফাইনাল পরীক্ষার আগে যদি ভাল থাকি তবে এরই মধ্যে বেশি পড়ে এতদিনের ক্ষতিপূরণ করে নেব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। হঠাৎলের একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি কুইনিন ও অজ্ঞাত দু'একটি সহযোগী ঔষধের বড়ি ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক, তাতে আর বন্ধ হল না। অবশেষে গেলাম হারিসন বোডে চাকরিতে সাম্রাজ্যের কাছে। তিনি অতুলানন্দের পরিচিত ছিলেন। তিনি কুইনিন দিলেন, কিন্তু বড়ি নয়, মিক্‌শায়। এই মিক্‌শায়ে ক্রম ফল হল, কিন্তু নিয়মিত চালানো সম্ভব হল না। বাল্যকাল থেকে ডি স্কপ্তের ঔষধ, এডওয়ার্ডস টনিক খেয়ে খেয়ে তিনটা ঔষধ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই এক শিশির আঁটি মাত্রাও শেষ করলাম না। জ্বর আবার দেখা দিল এবং মাঝে মাঝে বাড়তে লাগল। তখন হয়তো আবার দু'তিন মাত্রা খেয়ে তাকে দমিয়ে রাখতাম।

অতুলানন্দ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কবিরাজ গণনাথ পেনকে আশ্রয় করল, নানা মগজপুষ্টিকর ঔষধ খেতে লাগল, মাথায় তেল মালিশ করতে লাগল, আর পড়তে লাগল! সেটমুবেরির প্রকাণ্ড 'লিটারেচর' খানা প্রায় মুগ্ধ করে ফেলল। তার এক হাত মাথায় কবিরাজ তেল মালিশে বাস্তব, অজ্ঞ হাতে বই। আমার দু'খানা হাতই পীড়ের উপর। কোনো বইই পরীক্ষার আগে পড়ে শেষ করা গেল না। অতুলানন্দ সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেল। অর্থাৎ বসন্তকু কম পড়লে সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেতে পারত, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে সে ঠকে গেল, আর আমার মাত্রা প্রয়োজনীয় কম পড়ার ধাপ পর্যন্তও উঠল না বলে আমার পাস করাটাই হল না।

পর বছর ইংরেজী ছটি পেপার ছেড়ে দিয়ে তিনটি পেপার নিলাম। এবারও স্বাস্থ্য প্রতিকূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা হাতা হওয়াতে পার হয়ে বাওয়ায় কোনো অসুবিধে হয়নি। পরীক্ষা হয়েছিল সায়েন্স কলেজে। ১১১১-এর দ্বারভাঙ্গার বাড়ির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ১১২০-র অভিজ্ঞতা মিলল না। এবারের কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে স্তম্ভিত! পরীক্ষার হল, না বাজার। যার যেমন খুশি স্বাধীন ভাবে আলাপ আলোচনা করে লিখেছে। ইনভিভিটেররা পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিলেন। বিভাগাগর কলেজের কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এই কাণ্ড দেখে ছাত্রপুত্রের ক্রিয়া বদ্ধ হয়ে যেত।

আমার খুব তাড়াতাড়ি লেখা অভ্যাস। ম্যাট্রিকুলেশনে কিংবা ইন্টারমিডিয়েটে প্রত্যেকটি পেপার—কোনোটি আধ ঘণ্টা কোনোটি পরমাত্রা মিনিটে শেষ। এক ঘণ্টার আগে হলে থেকে বেরিয়ে বাওয়া যায় না—সেজন্য বড়ই অসুবিধে হত। আমি

ঘেটু বৃষি, শুধু সেইটুকুই লিখি এবং তার পরিমাণ সব সময়ই কম।

বি-এ পরীক্ষাতেও আমাদের লেগা শেষ করে থাকতে দেখে শুধু পাশের বন্ধুরা নয়, পাঁচ ছ জনের দুরত্বেরও অনেকে জোড় হাত করে "দাদা ছ-নম্বরটা একটু"—কিংবা "চার নম্বরের পয়েন্টগুলো যদি একটু সংক্ষেপে লিখে জানান"—। সাইকোলজিক্স পরীক্ষার দিন এটি সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। দূরের বন্ধুদের লিপে জানাতে হল, ইনভিজিলেটর তা ব্যয়ে নিয়ে পৌছে দিয়ে এলেন। কখনো বললেন নিচে ফেলে দিন। নিচে ফেলে দিলে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন।

পরীক্ষার এই কমিক দিকটি কলকাতার অভিজ্ঞতাত্তেই আমার কাছে প্রকট হয়। এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। পরীক্ষার যে রীতি তাতে এই টোকার ব্যাপারটাও অনিবার্য। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি আমি, এবং ব্যঙ্গ গল্পও লিখেছি একটি। গল্পটির নাম 'বাতিল পরীক্ষার কাহিনী'—প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল বছর দশেক আগে। গল্পটি "মারকে লেঙ্গে" বইতে স্থান পেয়েছে।

১৯১৯ সালে আমার সঙ্গে পাংশা-কালিকাপুরের যতীন্দ্রনাথ বাগচীর কক্স স্রীমতী জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়। অভিনবক-নির্দিষ্ট বিবাহ। বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে পণ বা কোনো রকম দান গ্রহণ করা হয় নি—বিবাহের ব্যবসায় খরচ বাবা বহন করেছিলেন।

এই বছরে আমি প্রথম ক্যামেরা কিনি। ক্যামেরা সম্পর্কে আমার মনে একটা অতি প্রবল আকর্ষণ ছিল বাল্যকাল থেকে। প্রথম ফোটোগ্রাফ দেখি বাবার। তাঁর অনেক ফোটোগ্রাফ। আমিও ক্লাস-টুতে পড়তে প্রধান ফোটো তোলাই। সেটি ক্লাসের ছেলে ও এক জন টাচারের সঙ্গে গ্রুপ ফোটো। কত দিন ধরে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—জলছবি পরেই এমন বিষয় আর কিছুতে অনুভব করিনি। ফোটোগ্রাফের রহস্যের কথা ভেবে ভেবে কুস্কিনারা পাইনি। যখনই স্বযোগ পেয়েছি ফোটো তুলিয়েছি, কিন্তু কি করে ছবি ওঠে তার রহস্য ভেদ করার উপায় কি? হাই স্কুলে পড়তে, ১৯১২তেই সম্ভবত, একখানা ছোট ক্যাটালগ আনাই কলকাতার হাউটন বুচারের কাছ থেকে। বইখানি ৫ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি হবে, মোটা কাগজে বাঁধানো। তাতে ছোট ক্যামেরার বিজ্ঞাপন ছিল। নানা আকারের ছবির জন্ত নানা আকারের মিনিয়চার ক্যামেরা। ক্যামেরার ছবির পাশে পাশে সেই ক্যামেরার তোলা ছবিও একটি করে ছাপা ছিল—কি আকারের ছবি ওঠে তার ধারণা কমানোর জন্ত। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে ক্যামেরা—তার নাম 'Ticca Watch Camera' (টিকা পকেটঘড়ি ক্যামেরা) দেখতে পকেটঘড়ির মতো, তার ছবির আকার ডাকটিকিটের আকার।

এই বইখানা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। অনেক বছর ধরে তাকে বন্ধা করেছিলাম। তার এক একটি পৃষ্ঠা চোখের সামনে ধরে মনে মনে ক্যামেরা বাছাই করেছি, কোনটি আমার কেনা উচিত মনে মনে হিসেব করেছি, কিন্তু ফোটো তোলা শিখিয়ে দেবার মতো তখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বড় একটি ফিল্ড ক্যামেরা প্রথম স্পর্শ করি দার্জিলিঙে, ১৯১৩ সালে। আমার সেই প্রথম দার্জিলিঙ দেখার চোখেই বড় ক্যামেরায়

কি করে ফোকাস করা হয় তা দেখার স্বযোগ পেলাম। যেখানে উঠেছিলাম, সেখানে কোনো এক ভদ্রলোকের একটি ক্যামেরা ছিল, তিনি সেটিকে বাইরে ট্রাইপাডে ঠাঁড় করিয়ে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে নিকটবর্তী একটি অতিকায় গোলাপ ফুলকে ফোকাস করে দেখছিলেন। তাঁকে আমার অন্তরের বাসনার কথা জানাতেই তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে ফোকাস করার কৌশল দেখালেন। দার্জিলিঙের প্রকাণ্ড একটি গোলাপ ফুলের ছবি দেখলাম ফোকাসিং স্ক্রিনের উপর। উন্টো ছবি, ফুলের উঁচু মাথা নিচু দিকে। ঘষা কাচের উপর সবুজ পাতার সঙ্গে গোলাপফুলের রং কি অদ্ভুত স্নায়ব যে দেখাচ্ছিল! একটি অনাবিকৃত রহস্য-রাজ্যের এই প্রথম স্বাদ। জীবন ধন্য হল।

১৯১৭ সালে যখন ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের কলেজ মেসে থাকি, সে সময় জানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আমার সহপাঠী। জানেন্দ্রনাথ পরে ছোটদের জন্ত কবিতা গল্প ইত্যাদি লিখে খ্যাত হয়েছিলেন। এঁর ফোটো তোলানোর শখ ছিল বেশ। তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কাছাকাছি কোনো গলির মধ্যে এম দত্ত ফোটোগ্রাফারের দোকানে। এম দত্তের কোনো ইন্ডিও ছিল না, বাইরের আলোতে তুলতেন। জানেন্দ্রনাথের চুল ছিল কাঁকড়া এবং টেটে খেলানো। তাঁর শখ হয়েছিল সাহেবী পোষাকে ছবি তোলাবেন। সেজন্ত তিনি কলার নেকটাই এ একটি কোট কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। দোকানে গিয়ে সেজে নিলেন এবং বাড়ি পূর্ব ফোটো তোলানেন। পুরো ছবি হল না, ধুতির সঙ্গে কোট কলার নেকটাই আর চলবে কি করে। (মাস্তাজে চলে, ছবিতে দেখেছি)।

তাঁর তোলা হলে চললেন, আপনিও কলার টাই পরে নিন। প্রস্তাবটি মনোহর। সাহেব সাজা গেল ধার করা পোষাকে। ফোটো তোলার পর এম দত্ত (মনোমোহন দত্ত) কে বললাম প্লেনে কি করে ছবি ওঠে দেখিয়ে দিন। মনোমোহন বাবু খুব অমায়িক লোক ছিলেন, আমাকে ডার্করুমে নিয়ে গেলেন এবং ডেভেলপ করা দেখালেন। তখন প্যানক্রোমেটিজম-এর জন্ম হয় নি, তখন সাধারণ প্লেনে ছবি তোলা হত, এবং সব প্লেনই কড়া লাল আলোতে নিরাপদে ডেভেলপ করা চলত।

জীবনে এই প্রথম প্লেনে ডেভেলপ করা দেখলাম। প্রত্যেকটি



নকলে বাঁধা দেবেন না কেনেই তিনি বিপরীতমুখী হয়েছিলেন গোড়া থেকে।

ধাপ খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখলাম। ডেভেলপিং, ফিল্মিং ও তার পরে জলে অনেকক্ষণ ধোয়া। ডার্করুমের কাজ দেখা যাবে এই আশায় মনোমোহন দত্তের কাছে আমি নিজে অনেক বার ছবি তুলিয়েছি এবং বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছি ছবি তোলাতে। এই উপলক্ষে অনেক বার ঢোকা হল ডার্করুমে। তখন পাইরো-সোডা ডেভেলপিং খুব চলত। এতে প্রেট ডেভেলপ করলে কারো চেহারার যে ছাপ উঠত, তার ঝাঁয়ের লাইন অর্থাৎ চোপ কান নাক ও মুখের লাইন প্রেটে গভীর দাগ কেটে যেত। তখন পি-ও-পি (প্রিণ্টিং আউট পেপার) ও ডেভেলপিং আউট পেপার বা ব্রোমাইড পেপার— দুই-ই চলত, ক্রেতার পছন্দ যেটি। অনেকের ধারণা ছিল ব্রোমাইড কাগজে ছবি বেশি দিন স্থায়ী হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পি-ও-পি প্রিণ্টই দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্য ব্রোমাইড প্রিণ্ট-এ সেপিয়া করলে তা প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

বাই হোক, মনোমোহন দত্তের সম্পর্কে এসে আমার ক্যামেরার আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে গেল, এবং তাঁরই সাহায্যে ১৯১১ সালে হস্পিটাল স্ট্রীটের গোপীনাথ দত্তের দোকান থেকে একটি কোয়ার্টার প্রেট ক্যামেরা কিনলাম। সেকেন্ড হাণ্ড ক্যামেরা ট্রাইপড সহ, দাম দিলাম ৪৫ টাকা। ফিল্ম ও প্রেট ক্যামেরা, তিন খানা ব্লাইড ছিল। ক্যামেরার ছিল অলডিস র‍্যাপিড রেজিস্ট্রেশনিয়ার (সংক্ষেপে আর-আর) ৭-৭ লেন্স ও ধাতুনির্মিত শাটার। এ ক্যামেরায় রোল ফিল্ম ও প্রেট দুই-ই চলত।

ডাক ক্রমের কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও ক্যামেরায় আলোর তারতম্য হিসেব ক'রে এক্সপোজার দেওয়া দু-এক দিন মাত্র শিখলেই হয় না। কিন্তু উৎসাহ এমনই অদম্য ছিল যে অবিরাম ভুলের পথে গিয়েও দমিনি কখনো। ক্যামেরা কিনে নিয়েই দেশে গিয়েছিলাম, তাই দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। 'ট্রয়াল অ্যান্ড এরর' নীতিতে চলা ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। বাথগেট থেকে প্রেট কেমিক্যাল ইত্যাদি রেল-পাসেলে আনিতে নিতাম। তখন অধৈর্য ছিল বেশি, তাই অর্ডার দেবার তৃতীয় দিনেই সব পাওয়া যেত বলে এখানে অর্ডার দিলাম, যদিও দাম অনেক বেশি পড়ত।

নিজ হাতে ছবি তুলছি এবং এত সহজে ছবি উঠছে এই ব্যাপারটি আমাকে অতি মাত্রায় উৎসাহিত ক'রে তুলল। দিন রাত প্রায় কোটো তোলাতেই মত্তে রইলাম। কয়েকটি বিশেষ বাধা আলোয় অতি চমৎকার ফোটে উঠত। সেই বিশেষ আলোয় এক্সপোজার আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিলাম। ফোটে সব সময়েই বোদে ভাল হত, ছায়াতে তোলার এক্সপোজার তখনও সঠিক খুঁজে পাইনি। ছায়াতে বেশি বা কম হত। প্রেট ছিল তখন কম দ্রুত। সবই ইলেক্ট্রিক প্রেট। দু'রকম পাওয়া যেত, অর্ডিনারি ও স্পেশাল র‍্যাপিড। এই স্পেশাল র‍্যাপিডেই তুলতাম। সংক্ষেপে এর মাম ছিল এস-আর। কোডাক রোল ফিল্মও তুলতাম। বাবোজ ওয়েলকামের 'ট্যাবলয়েড' মার্ক কেমিক্যাল বেশি ব্যবহার করতাম। প্রেট ও কাগজ দুই-য়েতেই 'আমিডল' ব্যবহার করতাম।

পি-ও-পি কাগজও অনেক ব্যবহার করেছি। দিনের আলোয় ছাপা, একটু একটু খুলে দেখা যেত কতদূর এগোচ্ছে। তার পর গোল্ড ক্লোরাইড সলিউশনে 'টোন' করে হাইপোতে দিতে হত। ছাপার পরেই হাইপোতে দেওয়া চলত সেলফ-টোনিং পেপারে।

সব চেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার এই কাগজটি। হুঃখের বিষয় এ কাগজ এখন আর পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানসাগর হাট্টেলে থাকতে এ ক্যামেরায় বন্ধুদের ছবি তুলে দিয়েছি। ঘরেই অনেক সময় ডেভেলপ করতাম; কখনো দিনের বেলায় দরজা জানালা বন্ধ ক'রে লেপের ভিতর বসে, কখনো একটা হাঁড়ির মুখে লাল কাগজ জড়িয়ে, উপরে একটি ফুটো ক'রে, ভিতরে মোমবাতি জ্বলে সেই আলোয়। যে কোনো ঘরকে ফোটোগ্রাফিক ডার্করুমে পরিণত করতাম প্রায় জোর ক'রে।

একদিন ইচ্ছে হল হাট্টেলের একখানা ছবি তুলব। তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির থেকে হাট্টেলের ভাল ছবি তোলা সম্ভব ছিল। হু-তিনজনে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। বললাম এখান থেকে আমাদের হাট্টেলের একখানি ছবি তুলতে চাই। কিন্তু বাঁদের কাছে চাইলাম তাঁরা হয় তো অনুমতি দেবার অধিকারী নন, তাই তাঁদের মনে সন্দেশ ঢুকল, ভাবলেন সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, বললেন, না সে কি ক'রে হয় ইত্যাদি। অবস্থা সুবিধে জনক নয় দেখে আমি তর্করত বন্ধুদের দিকে পিছন ফিরে একখানা ফোটে তুলে নিলাম, কাউকে জানতে দিলাম না।

ছবিখানা অতি সুন্দর হয়েছিল। তার অনেক কপি করতে হয়েছিল তখন। আমার কাছে নেই সে ছবি, যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের কারো কাছে থাকতেও পারে।

ছুটি নতুন আকর্ষণের মাঝখানের সংকীর্ণ খাতের ভিতর দিয়ে চলা, সেজন্তই পাঠ্যের বোঝা কিছু কমিয়ে নিতে হয়েছিল—যাকে বলে jettison করা, তাই। ১৯২০ সালে পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলাম সাহেবগঞ্জে, বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের কাছে। আগে থাকতেই আমাদের আয়োজন পাকা ছিল, আমরা ওখান থেকে সক্রিয়গণি মনিরাগাঘাট কাটিহার পার্বতীপুরের পথে দার্জিলিং রওনা হয়ে গেলাম।

সাত বছর পরে আবার দার্জিলিং!

সঙ্গে ছিল সাহেবগঞ্জের গৌর মজুমদার আর সম্ভবত ইন্দু মুখার্জি, মনে করতে পারছি না ঠিক। গ্রীষ্মকালে বাংলা বা বিহারে ব'সে দার্জিলিঙের শীত করনা করা হুঃসাধ্য। প্রবোধকে এক রকম জোর ক'রেই শীতের পোষাক সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের গাড়িতে উপরে উঠতে উত্তাপের তারতম্য গাড়ির মধ্যে ব'সে অনেক সময় বোঝা যায় না, বিশেষ ক'রে আগে যদি এক বা একাধিক দিন ট্রেনে কাটিয়ে আসা যায়। ক্লান্ত অবস্থায় শীত কিছু কম লাগে। তাই কাসিয়ং ছেড়ে বত উপরে উঠছি, তত প্রবোধ জিজ্ঞাসা করছে শীত কোথায়!

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল ঘুম। দার্জিলিঙের আগের ষ্টেশন এটি, এবং দার্জিলিঙ থেকে এক হাজার ফুট বেশি উঁচু। তাই সব সময়েই এখানে দার্জিলিঙ থেকে শীত একটু বেশি বোধ হয়। প্রবোধচন্দ্র অমৃত্যু করছিল আমার কথায় এত সব ভারী জামা ব'য়ে আনার জ্ঞান। ঘুম ষ্টেশনে নেমেও মনে হচ্ছিল শীত কিছুই নেই। কিন্তু হু-চার পা হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে গেল যাতে আমাদের হাড়শুষ্ক কাপিয়ে তুলল। সে এক অতি বিস্তীর্ণ রকমের কড়া ঠাণ্ডা। আমি প্রবোধকে



প্রশ্ন করলাম, কেমন বোধ হচ্ছে? প্রবেশ ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল আঃ কি আরাম!

এখানে উঠলাম গোরের ভগ্নিশীপতির বাড়ীতে। খুব কাঁকা জায়গায় বাড়িটি—সর্বদা জোর ঠাণ্ডা হাওয়া, বাইরে এসেই। আমার এবারের আসার অতিরিক্ত আকর্ষণ হচ্ছে নতুন কেনা ক্যামেরাটি। দার্জিলিংয়ের স্বপ্নের মতো কোমল এবং স্পর্শাতীত সূক্ষ্ম রূপটি ক্যামেরায় ধরবে। এ রূপটিকে কোমল বলছি অস্ত্র অর্থে। দার্জিলিং আমার কাছে একটি বিশেষ শহর নয়। যেখান থেকে তরাইয়ের জঙ্গল শুরু হল সেইখান থেকে আরম্ভ করে আলোছায়ায় সঙ্গে, অবণা ও খোলা পাহাড়ের সঙ্গে, লুকাচুরি খেলতে খেলতে রেজগাড়ি যতদূর এসে শেষ হয়েছে ততখানি পথ ও তার সঙ্গে তুষার-ঢাকা কাকনজম্বা মিলিয়ে বতটা হয় ততটা। তা আমার কাছে কখনো স্পর্শযোগ্য বোধ হয় নি, একটা অদ্ভুত আবহাওয়ায় ধ্যানরূপেই তা আমার চেতনার মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। নীহারিকা-পুঞ্জের মতো একটি অধরা রূপ, তাই কোমল।

আমার ধারণা ছিল, এ রূপের কিছু অদ্ভুত ক্যামেরায় ধরা পড়বে। কিন্তু পড়ল না। প্রথমত সে আমার প্রথম চেষ্টা, দ্বিতীয়ত ক্যামেরায় শক্তিশীল তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক্সপোজার দিয়েছি, উৎকৃষ্ট ছবি হয়েছে, কিন্তু সে শুধুই পাথর, শুধুই আউটলাইন। সমস্ত আলোছায়া, কুম্বাসা ও মেঘে গড়া অভিনবত্বের আবেগময় অদ্ভুত ক্যামেরায় ছবিতে ওঠেনি।

১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ। সম্ভবত সেটি জুলাই মাস। আমহাট্টা স্ট্রীটে যেখানে কুস্তলীনের এইচ বোসের বাড়ি, তার পাশ দিয়ে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট। সেইখানে একটি মেস ছিল, তার পরিচালক ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে তিনিও তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। এই মেসের সন্ধান আমাকে কে দিয়েছিল তা আর এখন মনে পড়ে না, তবে এ মেসের পরিবেশটি বেশ ভালই লেগেছিল, যদিও বেশি দিন এখানে আমি থাকিনি। থাকিনি তার কারণ কিছুদিনের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল এবং এই আন্দোলনে আমার স্বাস্থ্যও বোকাগেল।

একদিন ঠায় থিয়েটারে সভা। চিত্তব্রজ দাশ সভাপতি এবং গান্ধীজী বক্তা। বিজ্ঞপ্তি পড়ে ঠায় থিয়েটারে গিয়ে আসন দখল করেছিলাম। চিত্তব্রজ দাশ আসতে দেরি করছেন, গান্ধীজির তো কোনো খবরই নেই, আমরা অধীর হয়ে উঠছি, এমন সময় সভার উত্তোক্তারা একটি নতুন জিনিষ করলেন। তাঁরা ছাত্রসমাজ থেকে একজনকে সভাপতি করে দিলেন। এই ছাত্র শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেসে 'ভাবে'র অভিব্যক্তি' অনুশীলনে বিশেষ মনোযোগী, আমি তাঁর নানা মুখভঙ্গির ফোটোগ্রাফ তুলে দিচ্ছি। থিয়েটার করার তাঁর পটু আছে শুনেছি, অতএব মঞ্চতীতি বা টেক্সটরাইট তাঁর স্বভাবতই ছিল না। তিনি ঠায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বীররসে আহ্বান জানালেন—তোমরা সব বেরিয়ে এসো স্কুল কলেজ ছেড়ে। তাঁর বক্তৃতা চলা

অবস্থায় চিত্তব্রজ দাশ এসে পৌঁছিলেন সভায়। গান্ধীজির তখনও কোনো খবর নেই। দর্শকদের প্রধান উদ্বেগ গান্ধীজিকে দেখা। অবশেষে 'ঐ এসেছেন—ঐ এসেছেন' রূপ উত্তেজক ধনিটি শ্রোতৃর মতো প্রবাহিত হয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের খলে, তার ভারে তিনি হয়ে পড়েছেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, তাঁর খলয় রয়েছে বাঙালী মহিলাদের অলঙ্কারের দান। মহিলাদের এক সভায় তিনি এতরূপ বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য কামনায় সবাই নিজ নিজ অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন গান্ধীজির হাতে। গান্ধীজি মঞ্চে প্রবেশমাত্র তাঁর মুখে স্পটলাইট নিক্ষেপ করা হ'ল নাটকীয় ভঙ্গিতে। সব মিলে বেশ একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্য। হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। যেন সত্যি সত্যি একটি নাটকের দৃশ্য।

আমি পাশের বন্ধুকে চূপে চূপে বলছি—'আসলে গান্ধীজী বাংলাদেশে এসে ডাকাতি করে গেলেন।' অবশ্য এই জাতীয় ডাকাতিতে গান্ধীজি ছিলেন গুস্তাদ। পরে শুনেছি গয়না প'রে গান্ধীজির সভায় মেয়েদের অনেকেই যেতে দিতেন না।

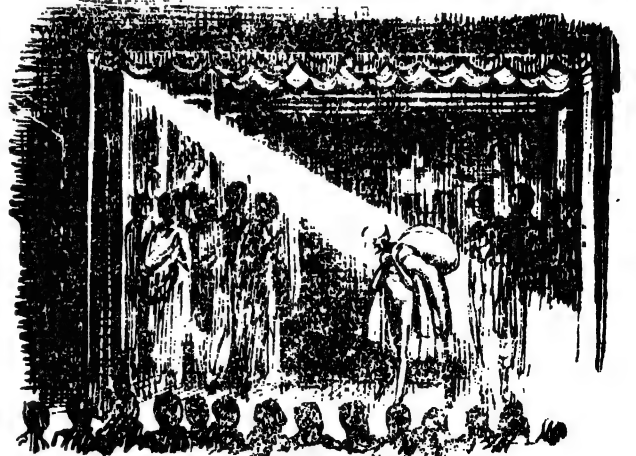
ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেসে সাহিত্যিকদের আনাগোনা ছিল। 'উপাসনা' সম্পাদনা করতেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। উপাসনার কাজ এই মেসেই অনেকটা চলত। এখানকার বাসিন্দা আর দু'জন, প্রবোধ মজুমদার ও চারুচন্দ্র সরকার বর্তমানে প্রতিষ্ঠা কর্তৃক করেছেন। প্রবোধ মজুমদার শুভযাত্রী নাটকের লেখক, ও চারু বাবু ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক।

এই মেস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃব্য কম নয়। আমি অধিকাংশ সময় নরসিং লেন নরেন্দ্র সেন স্কয়ার হয়ে যেতাম। ইংরেজী 'এ গ্রুপ'-এ ভর্তি হয়েছিলাম। তখনকার দিনের একখানা খাতা আবিষ্কার করেছি কিছুদিন হল, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। (আমার বোল নম্বর ছিল ১০৪, সেকশন-টু, ১৯২০।)

প্রোক্সেসর এন, চ্যাটার্জি—ল্যাজুয়েজ

• এম, ঘোষ —অ্যারিস্টোকেনিস (দি ক্লাউডস)

• এইচ, মৈত্র —ওয়ার্ডসওয়ার্থ



গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের খলে।

- প্রফেসর এন, চ্যাটার্জি—ল্যান্ডমাস্ট্র  
 " পি. সি. ঘোষ —চসার  
 " স্ক্রিমজার —শেফার্ডার  
 " জে, জি ব্যানার্জি—স্পেশাল পীরিয়ড অফ পোয়েটি  
 " এস. রায় —লিটারেচর অ্যাংলো-স্মারন পীরিয়ড  
 " টিফেন —সিলেকটেড পীরিয়ড অফ প্রোস  
 ( এসেজ অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম )  
 " কে বি রায় —গিবন  
 " এস. সেন —প্রোস পীরিয়ড ( ফিকশন )  
 " জে, ঘোষ —লিটারেচর—রেস্টোরেশন পীরিয়ড  
 " আর, পি মুখার্জী—মিলটন

এম ঘোষ—মনোমোহন ঘোষ ( অরবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ), তখন  
 বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, মাধব খুব হাফা শাফা চুল, হাওয়ার সর্বদা

উড়ছে, কণ্ঠস্বর নিম্নেজ, খুব কাছে না বসলে সব কথা ভাল শোনা  
 যেত না। স্ক্রিমজার ছিলেন ক্রীণদেহ, দেখে রুগ্ন ব'লে বোধ হত।  
 টিফেন ছিলেন খুব স্বাস্থ্যবান, এবং দীর্ঘ। তিনি যত্ন ক'রে নোট  
 লিখিয়ে দিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খুব উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন,  
 শুধু বক্তৃতা দিয়েই সমৃদ্ধ থাকতেন না, প্রত্যেককে পড়া জিজ্ঞাসা  
 করতেন ঠিক স্কুলের শিক্ষকের মতো। কারো কঁাকি দেবার উপায়  
 ছিল না। তখনকার দিনের এই অধ্যাপকদের প্রায় সবার চেহারা  
 আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে সুরহাস রায় সুদর্শন যুবক  
 ছিলেন, শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও সম্ভবত তখন পঁচিশ ছাব্বিশ  
 বছরের যুবক এবং গৌরাঙ্গ। কটনে দুটি নাম একসঙ্গে আছে,  
 জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরহাস রায়।—গত ডিসেম্বর ১৯৫৬,  
 এ'রা দু'জন একদিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করেছেন।

[ ক্রমশঃ ।

## রাজধানীর পথে-পথে

উমা দেবী

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট  
 ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের সর্ব আকাশের  
 চাপা বাতাসের  
 ঢিলে কঁকায় ঢুকে পড়েছে চপলমতি  
 —এক প্রজাপতি !  
 তার হলুদ পাখাতে এখনো হয়তো কোনো  
 নীলপদ্মের মধু মাখানো !  
 কাশ্মীরের সুনীল হ্রদের তরঙ্গ-তরঙ্গে  
 স্বর্ণাভ রৌদ্রের স্নানায়িত রঙ্গ  
 সেও হয়তো কাঁপিয়েছে পাখা—অগাধ স্নেহে  
 হয়তো বা ভাল হ্রদের তীরে কোনো পুঞ্জিত শাখার বুকে !  
 তার পর ভেসে এসেছে নিশীথের অসহ অন্ধকারের তুলনা  
 ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের গলিতে  
 —অতর্কিতে  
 একটি সুরভি স্বপ্নের মত !  
 কিংবা হয়তো  
 শহরের দুঃস্বপ্ন-আত্মর কোনো শহরতলীতে  
 অকস্মাৎ বেজে ওঠা ঈশ্বর-সঙ্গীতে  
 মধুর কণ্ঠের মত !  
 সে কেমন ক'রে এল এই সর্ব একমুখো বাস্তব মাঝ দিয়ে ?  
 স্বপ্ন পরিসরের এক বহুপ্রায় জানলায় কঁক দিয়ে—  
 অনেক লোকচক্ষুর পাহারা এড়িয়ে  
 অনেক মাঠ-ঘাট পেরিয়ে !  
 ভাবছিলাম মনে মনে কেমন ক'রে একে পথ বুঝিয়ে দিই

জানিয়ে দিই সেই উজ্জল নীলাকাশের স্মৃতি !—  
 হায়—হায় রে চপলমতি !  
 হঠাৎ সে বসল এসে মামলার নথি-ভরা টেবিলের উপরে  
 যেন রহস্য ভরে  
 অল্প অল্প পাখা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে  
 বলতে লাগল ইঁপিয়ে ইঁপিয়ে—  
 এত দিনে পেলাম খুঁজে পথ—  
 পূর্ণ মনোরথ—  
 সেই কাশ্মীরের ভাল হ্রদের সুরভি বাতাসে  
 ভর দিয়ে ভেসে এলাম কলকাতার মুক্তাকাশে  
 এই এটর্নো আগিসের পরীব্রাজ্যের দেশে  
 অবশেষে  
 সেখানে রোপ্যমুদ্রার চাকে  
 নির্বিপাকে  
 স্মরিত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে স্বর্ণের বিন্দু  
 প্রথম উদয় আভা অঙ্গে নিয়ে গলে যাচ্ছে তরলায়িত ইন্দু  
 স্নায়ের ধমনীব্রাজ্যের পদ্মবাগ—আরক্ত তরল  
 আর নয়ন উত্তানের শুভ মুক্তাফল  
 এয় ধূলায় অদৃষ্টের অপার রহস্যে স্পন্দিত  
 অনিশ্চয়ের আকস্মিকতায় অভিনন্দিত  
 আর কিরে যেতে চাই না সেই পুরানো ঐশ্বর্ষে  
 মিঠে-বাওরা ফাটল-ধরা পুরানো ধরণের সৌন্দর্যে  
 চুকিয়ে দিয়ে এলাম সকল দেনা—  
 তাকিয়ে দেখি প্রজাপতির ভঙ্গিটা কিছু চেনা-চেনা !

# ববীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

৮খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চানন ও তরীয় পিতৃব্য শুকদেব জাহাজে সববাহকারের ব্যবসাতে অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপুরে বাস করিবার সময় প্রতিবেশী ধীবরদিগে শ্রেণীর দ্বারা যে ভ্রাম্যণ বলিয়া 'ঠাকুর' আখ্যায় তাঁহার পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই 'ঠাকুর' আখ্যাতেরই ইংরাজ বণিক ও ক্যান্টনমিগের নিকটও পরিচিত হইলেন। তাঁহারাও ইহাদিগকে 'ঠাকুর' বলিয়াই ডাকিতেন। অর্ডার দেওয়া, বিল করা, সমস্তই 'ঠাকুর' নামেই হইত। এইরূপে পঞ্চানন ও শুকদেব উভয়েই 'ঠাকুর' উপাধিই প্রচলিত হইয়া গেল। তৎপূর্বে তাঁহাদের শাখায় 'চক্রবর্তী' উপাধি প্রচলিত ছিল। সরকারী কাগজপত্রে এবং সুপ্রিম বিচারালয়ের মকদ্দমার নথিতে এই 'ঠাকুর'-এর নানাবিধ রূপ দেখা যায়। ঐহাওয়া ইংরাজিতে ঠাকুর স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা তখন লিখিতেন Thakoor. শুকদেব-তনয় কৃষ্ণচরণ ও কৃষ্ণচরণের পৌত্র রামবতনের স্বাক্ষরে এবং জয়রাম-মৃত দর্পনারায়ণের স্বাক্ষরে এবং রামসন্তোষ বা সন্তোষরামের পুত্র বাহ্যারামের স্বাক্ষরে Tagoor দেখিতে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণের পৌত্র ও হরিমোহনের পুত্র উমানন্দনের স্বাক্ষরে Thaquare দেখা যায়। দর্পনারায়ণ ও তাঁহার অগ্রজ নীলমণির পুত্রদের ও রামবতনের পুত্রদের সময়ে Tagore স্বাক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার পর সকল শাখাতেই ইংরাজী স্বাক্ষরে Tagore রূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ঐহাওয়ানাথ চিবিদিনি Tagore লিখিতেন এবং তাঁহার সমকালবর্তী সকল শাখায় সকলেই তাঁহাদের উপাধির এইরূপ ইংরাজি বানান করিতেন। মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর লিখিয়াছেন যে "ঠাকুরের ইহা বিস্তৃত ইংরাজি রূপ না হইলেও এই বানানই লিখিতে হইবে নতুবা অনেক দলিলপত্রে গোল হইবে।" এই সময় হইতেই যে সকল ভ্রাম্যণ-পরিবারের ঠাকুর উপাধি ছিল যেমন পাথুরিয়াঘাটা দমাহাটা স্ট্রীটের (অধুনা মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড) ঠাকুর বংশ অথচ পীগালী নন ইহাই জানাইবার জন্য তাঁহাদের নিজেদের উপাধি লিখিতেন Thakur এই বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকায় মহর্ষি তাঁহাকে সখা বলিতেন এবং মহর্ষি-পরিবারে তিনি 'সখাবাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি অফিসকুমার, এম, এ ; বি, এল চিবিদিনি Thakur স্বাক্ষর করিতেন, তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডারে তাঁহাদের নামের এইরূপ উপাধির বানান ইংরাজিতে ছাপা হইয়াছে।

আমরা সুপুঙ্খ শতাব্দীর শেষপাদে শুকদেব বংশীয় চৌবর্গানের রামবতন ঠাকুরের একখণ্ড ভূমি সম্পত্তি ক্রয়ের কোবালায় রামবতন ঠাকুর চক্রবর্তী নাম দেখিতে পাই এবং তাহা হইতে

অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, পিতৃব্য শুকদেবের উপাধি ভ্রাতৃপুত্র পঞ্চাননেরও উপাধি ছিল। পঞ্চানন ও শুকদেব তাঁহাদের ব্যবসাতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদি গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাদের আবাস নির্মাণ করিলেন। পঞ্চানন তাঁহার পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম বা রামসন্তোষ এবং শুকদেব তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচরণকে কোম্পানীর অফিসে কর্ম করিবার উপযোগী কিছু কিছু ইংরাজি শিক্ষা দিলেন। তাহার কলে জয়রাম ও রামসন্তোষ কলিকাতার আমীন নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা নৃত্যদ্বটি ও গোবিন্দপুর জরিপ করেন। পলাশীযুদ্ধের পরে যখন শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ মুন্সীকে (পরে রাজা) কোম্পানী জায়গীর দিয়াছিল তখন এই আমীন ঠাকুরদের জরীপের নির্দিষ্ট সীমাহিসাবের উহা প্রদত্ত হয় ! শুকদেব ও পঞ্চাননের মৃত্যুর পর জয়রাম ও রামসন্তোষ কৃষ্ণচরণের বহিষ্ঠ পৃথক হইয়া জানবাজারে ও তালতলায় নিজেদের আবাস নির্মাণ করেন। বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহাদের এই বাড়ি আমীন ঠাকুরদের ভিটা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যশোহর বারপাড়ায় তাঁহাদের যে বাস ছিল তাহাকে লোকে তখন আমীন ঠাকুরদের ভিটা বলিত। জয়রাম পরে ধনসম্পত্তি (অধুনা ধর্মতলা) আবাস ও বাগানবাড়ি নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করেন এবং এইখানেই শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ, শিবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তখন সমারোহে দোল-দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন। জানবাজারে, তালতলায় তাঁহার যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল তাহার অধিকাংশ পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো উভয় বংশীয় ঠাকুরদের অধিকারে এখনো আছে। তালতলায় বাজার ও হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার তাহাদের অঙ্গতম। জয়রামের বাড়ী ও বাগান এক্ষণে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অন্তর্গত। যখন সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন জয়রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নবাব ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, বাহাব কিয়দংশ জয়রামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশীয়েরা পাইয়াছিলেন দেখা যায়।

জয়রামের আনন্দিরাম, নীলমণিরাম, দর্পনারায়ণ ওরফে মুকুন্দরাম ও গোবিন্দরাম নামে চার পুত্র ও সিন্ধেশ্বরী নামে এক কন্যা হয়। জয়রাম সিন্ধেশ্বরী সহিত যশোহরের গোলোকচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ দিয়া জানবাজারের ভূমিখণ্ডে একাংশে তাঁহাদের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করাইয়া ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি দিয়া তাঁহাদের কলিকাতায় বসবাস করাইয়াছিলেন। আনন্দিরাম কয়েকটি কন্যাচারের জন্য পিতা কর্তৃক ভ্রাতৃপুত্র হওয়ার পিতৃগৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া নৃত্যদ্বটির পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বাস করেন। এখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীটের যে অংশে প্রসিদ্ধ

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন বৈষ্ণবত্বের বাড়ি, পূর্বে তাহাকে আনন্দিরাম ঠাকুরের রাজ্য বলিত। জ্বরামের জীবদ্দশায় আনন্দিরামের মৃত্যু হয়। আনন্দিরামের পরিবারবর্গ কিন্তু ধনসামগ্রীর বাড়িতে থাকিয়া যান। জ্বরামের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরাম এবং শুকদেবের পুত্র কৃষ্ণচরণ উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কনট্রাক্ট পাঠিয়াছিলেন। যখন বর্তমান উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুত্রের অনেক ভূমি গৃহীত হয় তখন আদিগঙ্গাভীরব বাগভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষ্ণচরণ চৌবাগানে অনেক ভূমি সংগ্রহ করিয়া আবাসবাটী নির্মাণ করেন। ইহার কতকংশ (৩৪, ৩৪।১, ৩৫নং মুন্সারাম বাবু ষ্ট্রীট) এখনো এই বংশীয় শ্রীমান সুনীতিকুমার ঠাকুর, এম-এ; এল-এল, বি; এডভোকেট ও তাঁহার ভ্রাতাদের অধিকারে আছে। ধর্মতলা হইতে গড়ের মাঠের অনেক অংশ কোর্ট উইলিয়াম পর্ষদ ধনসামগ্রীর বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন কোম্পানীর কেন্দ্র ছিল বর্তমান বড় ডাকঘরের স্থানে। ধনসামগ্রীর বাড়ি গৃহীত হইবার পর নীলমণি এবং ভ্রাতা দর্পনারায়ণ সপরিবারে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করেন। তখন আনন্দিরামের পরিবারবর্গ ও গোবিন্দরামের বিধবা স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী ইহাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় আবাস-বাড়ি এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের জন্য ঠাকুরবাড়ি নির্মিত হয় এবং গঙ্গাভীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট যেখানে মর্ষি দেবেন্দ্র বোডের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে শিবমন্দির এখনো বর্তমান। নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায় কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দিরামের বংশীয় রাধাবল্লভ জ্বরাম বংশীয়দের বিরুদ্ধে সম্পত্তি পাঠবার জন্য যে মোকদ্দমা করেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরোহিত বিতবল্লভ ভট্টাচার্য বলেন যে, নীলমণি ও দর্পনারায়ণকে তিনি দেখিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে নীলমণি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভূমিফরেষ দলিলও ইহার পরিপোষক। দেখা যায় ১৭৬১ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ পর্যন্ত যে সকল সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে তাহা নীলমণির নামেই হইয়াছে। তাহার পরে ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৩ পর্যন্ত দর্পনারায়ণের নামে এবং ১৭৯৩ হইতে ১৮১৬ পর্যন্ত গোপীমোহন ও লাডলিমোহন উভয় নামে ক্রীত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যিনি যখন পরিবারের কর্তা, তখন তাঁহার নামেই সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে। ১৭৮৪ সালে নীলমণি ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়া সম্পত্তিতে তাঁহার অংশের মূল্য নগদ লক্ষ টাকা এবং শ্রীশ্রীসম্মাজনান্দনশিলা লইয়া জোড়াসাঁকোয় আসিয়া বাস করেন ও জোড়াসাঁকোর বাড়ি নির্মিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথম স্ত্রীর পুত্রদের জ্যেষ্ঠ গোপীমোহন ও দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্রদের জ্যেষ্ঠ লাডলিমোহন এই উভয় নামে সকল যৌথ সম্পত্তি খরিদ হইয়াছিল। গোপীমোহনের অগ্রজ বাধামোহন ও অম্বুজ কৃষ্ণমোহন বৈষ্ণবমত্ৰ ত্যাগ করায় বৈষ্ণব দর্পনারায়ণ তাঁহাদের তাজাপুত্র করেন। তাঁহার পঞ্চম পুত্র প্যারীমোহন মৃক ও ববির থাকায় তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার অবশিষ্ট চার পুত্রকে দিয়াছিলেন, বাচার মধ্যে গোপীমোহন ও হরিমোহন তাঁহার প্রথম স্ত্রী তারিণী দেবীর গর্ভজাত ও লাডলিমোহন ও মোহনমোহন তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী বরনমণি দেবীর গর্ভজাত।

গোপীমোহনের বংশে তৎপ্রপৌত্র মহারাজা প্রমোদকুমার, হরিমোহনের বংশে স্বরশ্মী শ্রীমান দক্ষিণমোহন, লাডলিমোহনের বংশে রথীন্দ্রনাথ, এম. বি এবং মোহনমোহনের বংশে মহারাজা প্রমোদনাথ সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিত।

নীলমণি জোড়াসাঁকোয় আসিয়া বাস করিবার পর ১৭৯১ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তিনি উড়িষ্যায় কিছুদিন আদালতের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, যে সময় তিনি তমলুকে দেবী বর্গভীমা মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দেন। সে সময় তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবসায়ও ছিল। পরে ২৪ পরগণা আদালতের সেরেন্দাদার হইয়াছিলেন। তিনি চেন্নোটিয়ার বোম্বাল বংশের কন্যা ললিতা দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পিতৃনাম ও বাসগ্রামের নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। নীলমণির তিন পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ ও এক কন্যা কমলমণি। কমলমণির সহিত কালাঘাটের হরিশঙ্কর হালদারের বিবাহ দিয়া স্বগৃহে গৃহজামাতা রাখিয়াছিলেন। নীলমণির পুত্রদের সকলেই স্বতন্ত্র ব্যবসায় ছিল। তাহার উপর রামমণি কলিকাতা পুলিশ অফিসে প্রধান বাঙালী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৭৫১ খৃঃ। রামবল্লভ কটক আদালতের একজন কর্মচারী ছিলেন ও পরে কটকের জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু। ইনি বশোহরের স্বসমাজে মজুমদার বংশে বিবাহ করেন। ইহার একমাত্র পুত্র বহুনাথের শৈশবে মৃত্যু হয়। ইহার দুই কন্যা জ্যেষ্ঠা হরমুন্দরী বা বিনোদিনী ও কনিষ্ঠা গৌরী। গৌরীর স্বামী সনাতন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহাদের কোনো সন্তান হয় নাই। জ্যেষ্ঠা হরমুন্দরীর সহিত বীরনগরের পেলাবাম বা হলধর মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। হরমুন্দরীর তিন পুত্র চৈতন্যচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কালাচাঁদ ও একমাত্র কন্যা আনন্দময়ী। দ্বারকানাথ তাঁহার বাড়ির দক্ষিণে একটি বাড়ি খরিদ করিয়া বসবাসার্থ হরমুন্দরীকে তাহা প্রদান করেন। দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার ইরোরোপ যাত্রায় ভাগিনের নবীনচন্দ্র সঙ্গী হন।

নীলমণির দ্বিতীয় পুত্র রামমণির পত্নী দক্ষিণডিহি শুকদেব রায়চৌধুরী বংশীয় রামকান্ত রায়চৌধুরীর কন্যা মেনকা দেবী। ইহাই গর্ভে কন্যা জাহ্নবী, পুত্র রাধানাথ, কন্যা রাসবিলাসী ও পুত্র দ্বারকানাথের জন্ম। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৮মাস বয়ঃক্রমকালে দ্বারকানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। রামমণি দ্বিতীয়পক্ষে বশোহর জগন্নাথপুরে শুকদেব রায়চৌধুরী-বংশীয় দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। দুর্গামণির গর্ভে রামমণির রমানাথ নামে (পরে মহারাজা) এক পুত্র এবং দ্রবময়ী নামে এক কন্যা হয়। রামমণি তাঁহার সর্বজ্যেষ্ঠা সন্তান জাহ্নবী দেবীর সহিত কানীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া গৃহে রাখেন। দ্বারকানাথ ইহার বাসের জন্য সিন্ধুলিয়ায় একটি বাড়ি করিয়া দেন। এখন ইহাদের বংশাভাব। রামমণির তৃতীয় সন্তান রাসবিলাসী দেবী। ইহার সহিত চন্দ্রনগর বিবিরতাট নিবাসী ভদ্রানীন্দন ফরাসী সরকারের দেওয়ান রামমুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভোলানাথের বিবাহ হয়। ভোলানাথ গৃহজামাতা থাকেন ও পরে দণ্ডাধ্ব গ্রহণ করেন। ইহার দুই পুত্র মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন। চন্দ্রমোহন চিরকুমার ছিলেন ও বাড়লার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট বেজিষ্টার অফ রাসিওয়েলস্।

বধন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন প্রথা পরীক্ষার জন্ত Justice of the Peace পদের সৃষ্টি হয়, তখন প্রথম উক্ত পদে নিযুক্ত হন মাতুল দ্বারকানাথ ও ভাগিনেশ্বর মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন। মদনমোহন মাতুলপ্রদত্ত এক ষণ্ড ভূমি মাতুলালয়ের দক্ষিণে পাইয়া ষোপার্জনে আরো করেকঞ্চণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিয়া তত্পরি নিজের আবাস ভবন নির্মাণ করেন। যে বাড়ির তাঁহার বাড়ি নির্মিত হয় তাহা তাঁহার নামে মদন চট্টোপাধ্যায় লেন আখ্যা পাইয়াছে। Justice of the Peace রূপে তখন মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন বেতন পাঠিতেন। মদনমোহনের বর্তমান বংশধরেরা দক্ষিণ কলিকাতা ও চন্দ্রনগর নিবাসী।

রামমণি তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা প্রথমীর কোরগরে এক জমিদারের ভাগিনেশ্বর নবকুমার (নবকান্ত) চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিয়া ষথারীতি তাঁহাকে গৃহজামাতা করিয়া লন। তাঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা ও তাঁহাদের বংশ বর্তমান।

রামমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ১৭১০ খৃঃ জন্ম। তিনি কটকে পিতৃব্য রামবল্লভের সহকারীরূপে কার্য করিয়াছিলেন এবং বধন দর্পনাবধনের পুত্র গোপীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্ধকুমার কলিকাতার Commercial Bank প্রতিষ্ঠা করেন তখন রাধানাথ হিসাব বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে ইংরাজিতে কৃতবিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮৩০ খৃঃ তিনি পিতার জীবদশায় পরলোক গমন করেন। রাধানাথ দক্ষিণভিহি শুকদেব বংশীয় রূপবান বারচৌধুরীর কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার কন্যা উমাসুন্দরী ও দুই পুত্র মথুরানাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। উমা ও ব্রজেন্দ্রের বংশাভাব। মথুরানাথের দুই পুত্র জীনাথ ও শৈলেন্দ্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের বংশে একটি মাত্র বালক বর্তমান। দ্বারকানাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন কর্তৃক পাঁচ বৎসর বয়সে দত্তকপুত্র গৃহীত হন। এই রামলোচনও ব্যবসায় দ্বারা ষোপার্জনে অনেক সম্পত্তি করিয়াছিলেন। সংগীত-চর্চায় তাঁহার অমুবাগ ছিল। তিনি রামকান্ত বারচৌধুরীর কন্যা অলকাকে বিবাহ করেন। অলকা দেবীর একটি কন্যা হয় কিন্তু শৈশবেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ার তাহার পর দ্বারকানাথকে রামলোচন দত্তক গ্রহণ করেন। এই অলকা রামমণি-পত্নী মেনকার অগ্রজ্ঞা এবং মহর্ষিদেবের আশ্রয়িত্রে যে পিতামহীর উল্লেখ আছে ইনিই তিনি। ১৮০৭ খৃঃ রামলোচনের বধন মৃত্যু হয় তখন দ্বারকানাথের বয়স ১২/১৩ বৎসর।

দ্বারকানাথের জনক রামমণির দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র অর্থাৎ দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাতা মহারাজা রমানাথ দ্বারকানাথ অপেক্ষা ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ ও তাঁহার ১৮০০ খৃঃ জন্ম। রমানাথ আলিপুর কালেক্টরেটে কর্মচারীরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে ইউনিয়ান ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। প্রেসমুকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Reformer সংবাদপত্রের এবং “অমুবাদিকা” নামক বাংলা সংবাদপত্রের ইনি সহঃ সম্পাদক ছিলেন। কাউন্সিলের সভ্য হইয়া কাউন্সিলে ও সংবাদপত্রে জনগণের হিতার্থে বক্তৃতা করায় ও লেখার লোকে তাঁহাকে রায়ত-বন্ধু বলিত। রমানাথের স্ত্রী দক্ষিণভিহি নিবাসী শুকদেব বংশীয় তারারীচাঁদ বারচৌধুরীর কন্যা জগদম্বা। রমানাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেনেটের সভ্যরূপে সেবা করিয়াছেন ও রামমোহন

রায় বিলাত বাইবার পর হিন্দু রমানাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজেরও একজন অধিকারী বহু বৎসর কার্য করিয়াছিলেন। তৎকালীন কলিকাতার বেকোনো সভা সমিতিতে বক্তা বা সভাপতিরূপে তাঁহার সংশ্রব থাকিত। একজন Justice of the Peace রূপেও তিনি যথেষ্ট মিউনিসিপ্যাল কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃঃ অগ্রজ দ্বারকানাথকে পৈতৃক ভবনের স্বীয় অংশ বিক্রয় করিয়া তৎলব্ধ অর্থ ও ষোপার্জিত অর্থে কয়লাহাটার রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে (অধুনা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট) একটি সুবৃহৎ আবাস ভবন নির্মাণ করিয়া তথায় সন্তোদরা প্রথমীর সহিত সপরিবারে বাস করেন। রমানাথের তিন পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র, মনীন্দ্র ও দুই কন্যা ব্রজসুন্দরী ও শ্যামসুন্দরী। মহেন্দ্র ও মনীন্দ্রের শৈশবে মৃত্যু। ব্রজসুন্দরীর সহিত ক্ষেত্রমোহন ষুধোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। শ্যামসুন্দরীর বংশাভাব, ব্রজসুন্দরীর বংশ এখনো বর্তমান, লেখক মাতুল হইতে সেই বংশ সম্ভূত। নৃপেন্দ্রনাথের ১৮২৩ খৃঃ জন্ম। তিনি রামমোহনের বিজ্ঞানলয়ে ও পরে হিন্দু কলেজে মহর্ষির সহপাঠী ছিলেন ও জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ইউনিয়ান ব্যাংকে মহর্ষির সহিত পিতার সহকারীরূপে কর্ম করেন। মহর্ষি তাঁহাকে চিরদিন স্নেহ করিতেন ও তত্ত্বাবধিনী সভা প্রতিষ্ঠাকালে নৃপেন্দ্র তাহার অবৈতনিক সম্পাদক ১৮৩১ খৃঃ নিযুক্ত হন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৪খৃঃ মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পিতার জীবদশায় তাঁহার মৃত্যু। ১৮৭৭খৃঃ রমানাথের মৃত্যুর পরে কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার মর্মমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে।

রামলোচন মৃত্যুকালে যে চরমপত্র করিয়াছিলেন তাহা ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ ৩২২-২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে বাহাতে তাঁহার মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ কী কী পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত চরমপত্র বা উইল এইরূপ :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণঃ

লক্ষ্মীজনার্দন শরণঃ

প্রাণাধিক শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর চিরজীবেষু,

জিহ্বিতং শ্রীরামলোচন ঠাকুর উইলপত্রমিদং কার্যকর আগ্রে আমি শারীরিক পীড়িত ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধেই তুমি আমার পুত্র একারণ আপন জ্ঞানপূর্বক ও স্বেচ্ছাধীন এই উইল করিতেছি। আমার পৈতৃক দৌলত নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ও জায়গা ও বাড়ী ও এসবাস পোষাক তামা পিতৃগ কাঁসা রূপা ও সোনার বাসনদিগর সেওয়ার গহনা পৈতৃক যে কিছু আছে ইহার তিন অংশের এক অংশ আমি পাইব দুই অংশ ভায়ারা পাইবেন পৈতৃক ও আমার দত্ত সোনা রূপার গহনার অংশ ইহঁদের না, বাহার যে চিহ্নিত আছে সে তাহারই থাকিবেক। আর সংসারের খরচ ও ধর্মতলার বাটাদিগর বানানোতে যবলগজায় আমার নিজটাকা বিখাতা বোকড় ভায়াদিগের স্থানে আমার পাওনা আছে এবং অল্প অল্প লোকের স্থানেও যে পাওনা আছে আমার দেনা নাই এই সকল পাওনা ও পৈতৃক হিত্তা ও আমার সোপাঙ্কিত দৌলত অসানা রূপার বাসন ও এসবাস পোষাক ও জেলা বশোহরের মোতালক পরগণে বিবাহিমপুর

\* এক্ষণে রমানাথের বংশধরেরা বালিগঞ্জ নিবাসী।



জমিদারিও শহর কলিকাতার মধ্যের খরিদা জায়গা ও গায়রহ সেওয়ার রতন বিধবার দক্ষণ বাড়ি আমার খোপাঙ্কিত ও পৈতৃক হিত্রা যে কিছু সব তোমাকে দিলাম রতন বিধবার দক্ষণ বাড়ি খরিদ কবিরী তৎকালীন তোমার মাতাকে দিয়াছি এবং সন ১২১৩ সালে তোমার মাতার পুণ্যক্রিয়া অর্থে আমি তুই হইয়া দিকা ১০০০০ দশ হাজার টাকা দিয়াছি, এ টাকা এবং রতন বিধবার দক্ষণ বাড়ি ইহার সহিত তোমার একাকা নাই, ইহার দান বিতরণ এক্তার তোমার মাতার। এখনো তুমি নাবালক, এ কারণ এই জমিদারি ও গায়রহ যে কিছু বিষয় তোমাকে দিলাম, ইহার কর্তব্যার্থ্য যাবত আমি বর্তমান থাকিব তাবত আমিই করিব আমার অবর্তমানে যাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবত পরগণাদিগের এ সকল বিষয়ের কর্তব্যার্থ্য ও সহী-দস্তখত ও বন্দোবস্ত ও হুকুম-হাকাম সকলই তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্ত বয়স হইলে জমিদারিদিগের আপন নামে হজুর লেখাইয়া এবং আপন এক্তারে আনিয়া জমিদারি ও সংসারের কর্তব্যার্থ্য ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ও গায়রহ তোমার মাতার অনুমতি ও পরামর্শে তুমি করিবে এবং যাবত তোমার মাতা বর্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার খুনাফা ও গায়রহ যে কিছু আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট যেমন আমি রাখিতাম, তুমিও সেই মতো রাখিবা। আমি ও তোমার মাতা যাবত বর্তমান ও বর্তমানা থাকিব ও থাকিবেন তাবত আদায়দিগের পুণ্যক্রিয়া আদি যে কিছু খরচপত্র এই দৌলত হইতে পাইব। আমার খোপাঙ্কিত জায়গার কবালা ও বরনামা ও গায়রহ আমার স্থানে ছিল নিতাইমতো তোমাকে দিলাম পৈতৃক জায়গা ও বাটাদিগের কবালা ও পাট্টা ও গায়রহ কসিজ রামমণি বাবুর স্থানে আছে জায়গা হিত্রা চিহ্নিত মতো বুঝিয়া লইব। এতদর্থে উইলপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৪ সাল বারো পৌষ মাস তাম্রিখ ২২শে অগ্রহায়ণ—ইশাদি

ঐরামমুল্লার শর্তনঃ	ঐদুর্গাপ্রসাদ শর্তনঃ	ঐজগদীশ শর্তনঃ
সাং—	সাং পালপাড়া	সাং চেলোটিয়া
	জেলা নদীয়া	জেলা যশোর
জায় জায়গা খোপাঙ্কিত		পৈতৃক
জমিদারি পরগণে বিরাহিমপুর মোতালকে		নিজবাটা ১
জেলা যশোর	১	ধর্মতলা বাটা ১
শহর কলিকাতার মধ্য		বড়বাজারের
ডোম পিদ্দো সাহেবের দঃ জায়গা	১—১/৪	বটতলার বাটা
		জানবাজারের
বামনদেব বাইতির দঃ জায়গা	১—৩	হাড়িটোলার জায়গা ১
কৃষ্ণরায় কবিরাজের দঃ জায়গা	১—১০	ডোমটোলার জায়গা ১
তিলক বসাকের দঃ জায়গা	১—১১	মাছের দঃ জায়গা ১
শহর মুখোপাধ্যায়ের দঃ বাটা	১—১১	কলিঙ্গা ব্রহ্মচারীর
		দঃ জায়গা ১
রামকিশোর মিত্রীর দঃ জায়গা	১—১/২	পরগণে মাগুরা
		মৌজে ফতেপুর
রামনিধি সাহার দঃ বাটা	১—১	ব্রহ্মোত্তর জমি ১
রতন বিধবার দঃ বাটা—এটি		মৌজে কপিলেশ্বর
তোমার মাতাকে দিয়াছি	১—১/৪	ব্রহ্মোত্তর জমি ১
	৩/৪/১১	১

উক্ত গ্রন্থে লিখিত যে জনক রামমণি ও পিতৃব্য রামবল্লভ বর্তমান থাকিলেও মাত্র ৪ বৎসরের বয়ঃক্রান্ত সহোদর রাধানাথ তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। জনক ও পিতৃব্য উভয়েই রামগোচনের নিকট খণ্ডী থাকায় সম্পত্তির মালিক দ্বারকানাথের সহিত বৈবয়িক বিষয়ে তাঁহাদের অভিভাবক মনোনয়নে আইনগত বাধা ছিল।

[ ক্রমশঃ ।

### দেশের কাজের মূল সূত্র

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভাব গ্রহণ করিয়া দেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিকা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নুতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান বাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হই তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং বাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিবি উদ্ভাবিত কর! এ কর্তব্য খ্যাতির আশা করিও না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কুতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিধান স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃত তপস্বী—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার দাওন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

\* \* \* \*

দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই :—

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদের বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাধা, ব্যুৎসঙ্গতা, Organization। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যুৎসঙ্গ নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মূঢ়ালক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সম্বল ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলবয়ের সর্বত্র গিয়া পৌছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অগ্র জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

—রবীন্দ্রনাথ।

(পাবনা প্রাদেশিক সন্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা—

বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ ফাল্গুন)

# বিশ্ববন্ধু

## কবি সূকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

“সং সঙ্গ শরণম্”

শ্রীমতী ১০৮ অর্ণবস্বামী গুরুজী মহারাজ সমীপে—

শত শত সেলাম পূর্বক নিবেদন,

পরমারাধ্য বাবাজী, আপনার আকস্মিক অধঃপতনে আমি বড়ই মর্মান্তত হইলাম। ইতোমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনি সন্তান অবলম্বন করিয়াছেন, তখন মানস পটে এই চিত্তাই সমুপস্থিত হইয়াছিল যে ইহা সাময়িক মন্ততা মাত্র কিন্তু অধুনা উপলব্ধি করিতেছি, আমার ভ্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহাই অসুস্থিত হইতেছে যে কাহারও সমুদ্রপার আপনি এই পথবর্তী হইয়াছেন। অতএব আমার ভিজ্ঞান এই যে, বৃদ্ধ পিতা এবং অসুস্থ মাতার প্রতি ঐত্বিক কর্তব্য সকল পদাঘাতে দ্রুতীভূত করিয়া কোন নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহ-মার্গ সাধনা করিতেছেন? এ ক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, অচিরে এই সং সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, আপনার এই অস্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া স্বীয় কর্তব্য করণে প্রবৃত্ত হউন। আপনার পিতামাকুরের নির্দেশ মত আপনার কলিকাতায় আসিয়া থাকাই আমার অভিপ্রায়। এ স্থানেও সং সঙ্গের অনটন হইবে না উপরন্তু আমার মত অসন্তের সহিত দুই চারিটা বন্ধোপকথনের সুবিধাও মিলিবে, অবগত ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে। যদি এ আশা নিতান্তই অকল্পিত, তথাপি চিন্তা করিতে দোষ কী? আমার দুইখানি পত্রে যে-সকল আবেগময় গোপন কথা লিখিলাম তাহার উত্তরের আশা বিসর্জন দিয়াছি, কিন্তু এ পত্রের বিস্তৃত উত্তর না পাইলে ইহাই আমার শেষ চিঠি জানিবেন। ইতি দাসানুদাস, সেবক—শ্রীসূকান্ত।

[ এই সময়ে গ্রামে ফিরে ‘ত্রিদিব’ নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করে সূকান্তকে একটি দার্শনিক (!) অর্থাৎ রাজনীতিবর্জিত কবিতা লিখে পাঠাতে ফরমায়েস দিই। তারপর এই চিঠি : অব ]

20 Narkeldanga Main Road,  
3. 3. 43.

প্রিয়বরেষু,

অরুণ! তোর কাছ থেকে এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। তার কারণ বিবৃত করছি। প্রথমত: চিঠিটা নৈহাটি, দোলাংপুর, ডোলাংবাটা, পাজিয়া এই চার জায়গায় fountain Pen, Pencil এবং কলমে লেখা বলে এতো বিচিত্র! দ্বিতীয়ত সমস্ত চিঠিটার একজন কেজো লোকের যন্ততার সাড়া পাওয়া গেলো। তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রকাশিততা।

চিঠির উত্তর দিতে তোকে নিবেদন করেছিলাম, তবুও তোর চিঠি পেয়ে আশাবিহীন হয়ে, পড়ে দেখলাম চিঠিটা নেহাৎ নৈর্ঘাতিক অর্থাৎ official। যদিও সংশ্লিষ্ট সন্থকে একটা কৈফিয়ৎ আছে, তবুও সেটা গৌণ মুখ্য হচ্ছে ‘ত্রিদিব’। এজ্ঞে আমি হুঃখিত হইনি, বরং কৌতুক অনুভব করেছি। অবিশিষ্ট খামখানাই এজ্ঞে দায়ী।

‘ত্রিদিব’ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার আশা গভীর হ’লো যশোহরের সংকীর্ণতা থেকে সারা বাংলা দেশেই এর পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ দেখে। পত্রিকাটি নতুন লেখক ও শিল্পীদের প্রাণ-রসে পরিপুষ্ট ও পরিপক হ’য়ে একদিন সারা বাংলার মুখা মেটানোর জ্ঞে পরিবেশিত হবে—সূচনা দেখে এ অনুমান করা সম্ভবত আমার অদূরদর্শিতায় পর্ববসিত হবে না।

তুই যে আমার আন্তরিকতার দিন-দিন সন্নিধান হচ্ছিস, ক্রমশঃ তার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ ও প্রমাণ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হ’লে দেখাবো। তুই কবে আসছিস এইটা জানবার জ্ঞে উৎসুক আছি। আর এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে জরুরী। তুই বোধ হয় কোনো কার্য-বাপদেশে এখানে আসছিস, তার কারণ তুই অধুনা কাজের লোক হয়ে পড়েছিস, কিন্তু আমি চাই বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে তুই আসবি।

তোর সন্তানক দিদি আর কাকীমার সন্থকে রীতিমত কৌতূহল দেখা দিয়েছে। আর কিছু পরিচয় পেলাম তোর সূক্ষ্ম বর্ণনার, তাঁরা যে সাহিত্য-বসিক তার নমুনা পাওয়া গেলো পঠনস্পৃহা থেকে।

তোদের (খুড়ি) আমাদের ‘ত্রিদিব’ সন্থকে একটা বড় সত্য অনুভব করছি যে, আমরা এই পাণ হুঃখ কষ্ট আকীর্ণ ধরণীর নগণ্য লোক কর্মদোষে ত্রিদিবের দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সং লাভের গুণ্যে হয়তো পাণ দ্ধান হ’বে, এবং তখন এক সংখ্যার দর্শনলাভও হবে।

তুই লিখেছিস, “অভাবে স্বভাব নষ্ট” (স্বভাব নষ্ট হাওয়া সন্থেও নিজের সন্থকে একটা সত্যি কথা বলেছিস দেখে তুণ্ড হলাম।) সত্যিই তোর স্বভাবের এতদূর অধঃপতন-হয়েছে যে, হুটো বাজে লেখা তুলে দিয়ে, স্বচ্ছন্দে নিজের স্বীকারোক্তি ক’রে নিশ্চিন্ত হ’লি? ভালো!

আর একটা গুরুতর কথা, তুই নিজের না সম্পাদক হ’য়ে কোন এক স্থানীয় বন্থকে সম্পাদক করেছিস কেনো? হোর চেয়ে যোগ্য লোক ডোলাংবাটা তথা সারা দেশেরে আছে না কী? এটা একটা আশা ভংগের কথা।

কবিতা পাঠাচ্ছি। ‘আদ্বিক’ বলে যে কবিতাটা লিখেছিলাম সেটা দিতে পারলেই ভালো হ’তো। কিন্তু সেটা এখন পাচ্ছি না,

পেলে পরে পাঠাবো, এখন অল্প একটা লেখা (দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক) পাঠালুম। বইয়ের লিষ্টও পাঠালুম, তবে সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত পরে পাঠাবো। চিঠির উত্তরের পরিবর্তে তোকে পেতে চাই। তোদের সকলের কুশল কামনা করি। ইতি—স্বকান্ত।

আরো একটু—চিঠিখানা ৩রা মার্চ লেখা হ'লেও পোষ্ট অফিসে পরসী নিয়ে গিয়েও নানা কারণে বিতাড়িত হ'য়েছিলাম দিনকয়েক। তা ছাড়া সুনলাম, দুই নাকি আবার সফরে বেরিয়েছিল, তাই মনে হ'চ্ছে পত্রপাঠ চিঠিটা পাঠাতে না পারলেও, বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর কবিতা যেটা পাঠালুম, সেটা প্রধানত অতিরিক্ত সংজ্ঞাবোধ ব'লেই আমার মতে (বোধ হয় তোর মতেও) অত্যন্ত খারাপ, সেজন্য তুঃখ করিসনি, সবুরে মেওরা ফলবে। তুই আজকাল ছবিটিবি আঁকছিস আশা করি, কবিতা বোধ হয় খুব ভালো লিখছিস।—স্বকান্ত।

Swadhinata

৪E Dacres Lane, Calcutta

২৪, ৫, ৪৬

প্রিয় বসন্ত,

তোর আবেগের কারণটা ঠিক বুঝলাম না, কেমন যেন হৈয়ালী। হৈয়ালীকে ব্যঙ্গ ক'রবো না সহানুভূতি জানাবো তাও বুঝি না। আমি খুলনা বাওয়ার সুযোগ হারিয়েছি এক মুহূর্তের লজ্জায়। কমবেশ নুপেন চক্রবর্তী নিয়ে বাওয়ার প্রস্তাব ক'রেছিলেন, আমি হঠাৎ 'না' বলে ফেলেছিলাম। বাই হোক, তুই তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর চিঠির খলি এখুনি যাড়ে ক'রে বেরবো। কাটুন ভালো হ'লে পাঠাস। ভূপেনের লেখা মন্দ হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকায় এবারও তোর আর আমার লেখা প্রকাশিত হয়নি। যেতে পারবুম না ব'লে তুঃখ করিস নি। —স্বকান্ত

স্বামী অরুণাচল মহারাজ সমীপে—

বাবাজী!

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়েছেন! আপনার "নাম-চিহ্ন" নকল করা হয় নাই। ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের আঁকা; নাম-চিহ্ন অনেকটা আপনার শ্রায় হইলেও, স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ডায়ালেকটিক্যাল আদালতের কি ভয় দেখাইতেছেন? ব্যাপারটি মেটাফিসিক্স কি না তাই বুঝিতে পারেন নাই।

দুর্বিনীত : স্বকান্ত শর্মা

অহিন-নকুল তথ্য

স্বাধীনতা 'কিশোর-সভা'র সম্পাদক তখন স্বকান্ত। মাঝে মাঝে আমি তাতে গল্প-কবিতা চিত্রণ করতাম। প্রতি ছবির একটি কোণায় রীতি মাসিক আমার নামের আঙকরটি (অ) স্বাক্ষরিত থাকতো। কিন্তু একবার সপ্তাহ দুই বাইরে গিয়ে থাকতে হওয়ার ওর দপ্তরে আর আমার ছবি অবশিষ্ট ছিলো না। কিন্তু সেখানে বসেই অবাধ হয়ে দেখলাম অবিকল আমার ঐ 'অ' নাম-চিহ্নিত একটি ছবি পরের রবিবারে বেশ বখা নিয়মেই বেরিয়ে এলো। বুঝতে বাকি রইলো না ব্যাপারটা স্বকান্ত এবং আমাদের অন্ততম এক শিল্পী অন্তরঙ্গের যথ্য ষড়যন্ত্রেই সংঘটিত হ'য়েছে!—সুবিখ্যাত

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রথম অঙ্কের সঙ্গে আমার নাম মেলে না; কিন্তু ঐ 'অহিনকুল' কথাটির মধ্য দিয়েই একাধারে উভয়ের নামের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই ঘটনার ফলে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াটুকু নিয়ে সরস কৌতুক করা গেছে। মুখোপাধ্যায়ের একটি আর্ট-প্রেট 'বঙ্গমতী'র গত সংখ্যাতেই প্রকাশিত হ'য়েছে।

ডায়ালেকটিক্যাল আদালত

স্বকান্তর জীবনে ভালোবাসার একটি চমৎকার ইতিবৃত্ত আছে। অবশ্য সে প্রণয় ছিলো নিতান্তই কিশোরমূলভ—প্রায় একক জনমাবেগের বলা চলে। ইংরেজীতে 'ডায়ালেকটিক' শব্দের অর্থে যন্ত্রের সঙ্গে 'বিকাশ' জড়িত। কিন্তু বাংলায় দ্বন্দ্ব অর্থে কলহও বোঝায়।—ও এবং ওর সেই পাত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কটি ছিলো বিরোধ-সংকুল ওর ছড়ায়-ভাষায় বেশ একটু 'মিঠে-কড়া'। আমি তাই তাকে নাম দিয়েছিলাম 'ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশন'—এবং ওতে আমাতে কিছু নিয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর হ'লেই ব্যাপারটি ওই 'ডায়ালেকটিক্যাল আদালতে' উপস্থিত করবার ভয় দেখাতুম। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছিলো বলা বাহুল্য।

মেটাফিজিক্স তত্ত্ব

আমাদের এলাকায় প্রায়ই রাস্তার বেকলে এক বড়ো মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তো। তিনি চুলদাড়ি ছাঁটছেন না। নাকের ডগায় ভাঙা চশমা। গলাবন্ধ পুরানো কোট। ময়লা কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা। পায়ে অতি পুরানো কেডস। কিন্তু বড়ো ভাল মানুষ তিনি। ঘোবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে সম্মানবাদী আন্দোলনে আর বিবাহও করা হ'য়ে ওঠেনি। প্রায় শিশুর মতো সরল আর পণ্ডিত মানুষ, একটু দার্শনিক প্রকৃতিই লোকও বলা চলে। আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন তিনি। আর দেখা হ'লেই তাঁর ভাষায় 'মেটাফিজিক্স এ্যাণ্ড মিউসিক্স'-এ তাঁর গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্যটি ঘটীর পর ঘটী বুঝিয়ে যেতেন। আমরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধাই করতাম। অবশ্য পিছনে যে একটু হাস্যহাসিও করতুম না তাও নয়। স্বকান্ত তাঁর প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছে এখানে। (অ, ব)।

20 Narkeldanga Main Road

Calcutta, 15. 2. 43.

প্রীতিভাষনে—

আমি কিছুদিন আগে একটা বিপুল বগু চিঠিতে অজস্র বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম—নেহাং চিঠি লেখার জরুরি। সেখানা হস্তগত হ'য়েছে শুনে নির্ভয় হ'লাম। ও চিঠির উত্তর না-পাওয়া আমাকে বিচলিত করেনি, যেহেতু ঐ চিঠিটার উত্তর দেবার মতো মূল্য ছিলো না। আমার খবর আমি এক কথার জানাছি—পরিবর্তনহীন ভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয় ক'রছি। তোরা একটা "পত্রিকা" বার করেছিস। ভালো কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, হাতের লেখা পত্রিকা বার করার মতো মনের অপরিপক্বতা তোরা আজো আছে? কথাটা নীরস হ'লেও একথা আমি বলবোই যে, এই ধরনের "খইভাষার" এই দুদিনে কাগজ ও সময় নষ্ট করা

ছাড়া আর কিছুই হবে না। নিজের সবকিছু তোর সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব হ'চ্ছে, নিজেকে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্তি ক'রে তোলা এবং সেই ক্ষেত্রে পত্রপাঠ ক'রকাতার এসে বাবার সাহায্য নেওয়া। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ অথবা বাবার নিবেদনের মত তিলক ও অনাবগতক বলে মনে হ'তে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি। কথাটার তাৎপর্য আমি মর্মে মর্মে অনুভব ক'রছি—এক বখাসাধ্য সে সবকিছু চেষ্টা ও আয়োজন ক'রছি। অতএব আমার কথাটা ভালো ক'রে ভেবে দেখবার ক্ষেত্রে অস্বস্তি জন্মানা। আশা করি, যা এক ভাই-বোন-সহ তুই ভালো আছিস, তোর প্রীতি-প্রাপ্তরা ভালো আছে, চিঠির উত্তর চাই না।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য\*

[ \* অর্থাৎ ভালোভাবে স্কুলের পড়াগুলো না করার ফলে একবার ম্যাট্রিকে ফেল করবার পর আবার তারই ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টার মত আছে। এ-চিঠিটিও উপরোক্ত হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গেই লেখা। ]—অ, ব ]

10 Rowdon Street  
Calcutta

বন্ধু-বৎসল্যে,

.....  
.....

সুকান্ত

২৭/৬/৪৬

[ সুকান্ত তখন অসুস্থ হ'রে উপরোক্ত ঠিকানায় কমিউনিষ্ট

পার্টির 'বেড-এড' কিওর হোমে' আছে। নানা কাজের ভাড়া দীর্ঘদিন ওকে দেখতে যেতে পারিনি। তার পর হঠাৎ উপরের কার্ডের চিঠিটি আমার হাতে পৌঁছোলো। বলা বাহুল্য, ওই 'বন্ধু-বৎসল্যে' কথাটি এক বাকি চিঠিটার শুধু ডায়ালেক্ট—বন্ধু প্রতি আমার এই অকর্তব্যের প্রতি স্মরণ এবং চূড়ান্ত এক কটাক্ষ নিহিত আছে। অ, ব ]

কলকাতা

১০/১/৪৫

অরুণ,

তোমার খবর কি? এক মাস তোর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অবিশিষ্ট দেখা-সাক্ষাৎ করাটা তোর কাছে অধুনা অবাস্তব। আমি কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে বার দুই তিন বেলেঘাটার গেছি তোর খোঁজে। বাই হোক, তোর খবরের ক্ষেত্রে আমি কি রকম উৎসুক তা রিপ্লাই কার্ড দেখেই আশা করি আন্দাজ করতে পারবি, এর পর যেন আর উত্তর দিতে দেরি করিসনি। অসুখ বিস্ময় করেনি তো? কেন না, আমি ইতিমধ্যে আর একবার অসুখে প'ড়েছিলাম। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার লজ্জা আমার হৃদয় ও অবহেলার সীমা নেই, বদ্বিচ তোড়জোড় ক'রছি খুব। তাই উত্তর দিতে অবহেলা ক'রে আর হৃদয় বাড়াই নি। ক'লকাতায় কবে কিরবি? বাড়ির লজ্জা সব কে কেমন আছে জানাস।\*

—সুকান্ত

\* শ্রীঅরুণাচল বসুর সৌজন্যে।

## বাংলা ভাষা ও ভারতের ঐক্য

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালী যে বঙ্গভাষার চর্চার মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গ-সাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত, তবে আজকে হয়ত তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিন্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিষের জীবনধর্ম আছে, তাকে হাঁচ ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হ'লে সে বন্ধা হয়।.....

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃ-ভাষার ক্রোড়ে আমাদের লগ্ন, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।.....

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে, তখনই অস্ত্র দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতার প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়।

( সত্যপতির অভিভাবণ, ১৩৩০ )—রবীন্দ্রনাথ

# সোবিয়তের দেশেদেশে

মনোজ বসু

২৫

এখন আর লেখা হচ্ছে না নিয়ম মতো। বিরক্তি লাগে।

লেখক মানুষ—সাধ ছিল, এখানে বঁারা লেখেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকটা দিন মিলেমিশে হৈ-ঠৈ করব। কিন্তু এত দিনের মধ্যে বোঁগা-বোঁগা হল না। হতাশ হয়ে পড়ছি। যে দলের মধ্যে এসেছি, জন দুই-তিন ছাড়া সাহিত্যের কোন তোয়াক্কা রাখেন না কেউ। বাংলা সাহিত্যের তো নয়-ই। পিকিনে স্যানিসিমভের সঙ্গে খাতির জমেছিল—এখানে এসে শুনি, ভদ্রলোক গকি ইনষ্টিটুট অব ওয়াল্ড লিটারেচার নামক মস্ত বড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, রীতিমত গুজনদার মানুষ। মস্তব্য এত বোঁরা-বোঁরা করছি, একই জায়গার থেকে তবু কিন্তু দেখা হল না একটাবার। কত জনকে বললাম, বটেই তো, বটেই তো বলে প্রবল ঘাড় নাড়ে, দু-কদম যেতে না যেতে তুলে মেরে দেয়।

দেশে ফিরবার সময় হয়ে এলো। খুব বেশি তো আর এক হস্তা। সত্যি তো ঘর-বাড়ি বিক্রিয়ে দিয়ে আসি নি। ক'জনের দস্তুরমতো গৃহপীড়া দেখা দিয়েছে—শয়নে, স্বপনে, বিচরণে বাড়ির কথা। চিঠি লেখা বিধম বেড়েছে, ভোকসের লোক নাজেহাল হচ্ছে খাম-টিকিটের জোগান দিতে দিতে।

বোঁরা-বোঁরা চলছে ঠিক নিয়ম মতো। আজ সকালে নিয়ে চলল মিউজিক একজিবিসনে—বার আসল নাম সোবিয়ত মিউজিয়াম অব আর্চস্। ১৯১১ অব্দে স্থাপনা।

লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতি—যেমন সর্বত্র দেখে আসছি। ১৯১৭ অব্দে বিপ্লব হ'ল—সেই বিপ্লবসৈনিকদের টুপি, ব্যাজ ও পিন্ডল। ভারি সম্মানের বস্তু এগুলো। আর দেখুন পতাকা। কাচের আড়ালে সাঁটা রয়েছে বিবর্ণ নিশ্চল, এক দিন এই পতাকা উড়িয়ে তারা জারের শীত-প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণের ছবি—ফোটো তুলে রাখেন কেউ, শিল্পী বড় ভুলি আর কল্পনার একেছে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সর্বহারার গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করলেন, তখনকার ফোটো ও কাগজপত্রে। অর্ডার অব দি রেড ব্যানার—লাল পতাকার নামে সৈনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—তার নমুনা রেখে দিয়েছে এখানে।

১৯১৮ অব্দে চারিদিক দিয়ে শত্রু রাষ্ট্র ঘিরে ফেলেছিল—তখনকার নানা পোষ্টার ও ছবি। ব্রিটিশ, আমেরিকা জার্মান সীমান্তে সেনা মোতায়েত করল, বিধম অত্যাচার, দেশের ভিতরেও গুণ্ডাগোল কাঁপিয়ে তুলেছে শত্রুরা, ঘরে-বাইরে লড়াই। তার হয়েক ছবি ও কাগজপত্র। ব্রিটিশ আমেরিকা জার্মান জাপান ও ফ্রান্সের বন্দুক মেশিনগান টুপি তেলমেট ইত্যাদি কেড়েকুড়ে নিয়েছিল সেই সময়, তার কিছু কিছু আছে। আবার এই তবুফের কামান, মাইন গেবিলাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ফেলার যন্ত্র, হাতে

তৈরি পেটাই মেশিনগান। সেকালের হাতলওয়াল বর্শা। জাপানি টুপি কেড়ে নিয়ে তাই মাথায় চাপিয়ে জাপানি সেজে পড়েছে গেরিলারা; বিদেশির হামলা কুখেছে। সেই সব টুপি দেখতে পাচ্ছি।

এক লাল সৈন্তের হাতের চামড়া তুলে নিল যেহেতু সে দলের কথা কীস করে না। সেই সৈন্তের নামধাম বাবতীর কাহিনী। কশাক টুপি, হাতবোঁমা, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ। শহীদজনের মূর্তি অনেকগুলি। একটা ব্রিটিশ সাবমেরিন এরা ছুঁয়ে দিয়েছিল, তার মডেল রেখে দিয়েছে। জলতল থেকে পরে ঐ সাবমেরিন তুলে তার মধ্যে বড়ঘন্টার দলিলপত্র পাওয়া যায়।

১৯১১ অব্দের তোলা সোবিয়ত বীর সেনাদের ছবি। তাদের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। প্রোপাগান্ডার ট্রেন ও জাহাজ বেঞ্চল দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র। গণমাছুষদের রাজনীতির পাঠ দিতে হবে। গণ্যমাছু নেতারা বেরিয়ে পড়েছেন গাঁয়ে গাঁয়ে। সেই সব ট্রেন ও জাহাজের মডেল।

লড়াই ছেড়ে সংগঠন এবারে। পর পর তিনটে পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার রূপদান হল। কত ঝাল কেটেছে, বাঁধ বেঁধেছে, জলধারা, বইয়ে দিয়েছে উত্তর মরুতে, তেল-ইস্পাতের গোপন ভাণ্ডার পাতাল খুঁড়ে খন করে ফেলেছে। ছবিতে ছবিতে তাকিয়ে দেখুন কী কাণ্ড করেছে তোমাম দেশটা জুড়ে। লড়াইয়ের সরঞ্জামও বানাচ্ছে কীকে কীকে। ছোটো পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে বানান চারশ রপ্তারী, নানান বকমের বন্দুক মেশিনগান হাউইটজার।

দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধ। নাজি ক্যাসি ও জাপান হামলা দিয়েছে রাশিয়ার উপর। আমেরিকা ও ফ্রান্সের অস্ত্র পাওয়া গেল তাদের হাতে। নিউইয়র্ক টাইমসে টুয়ানোর বিবৃতি; তারা জিতবে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব আমরা।...অসংখ্য পোষ্টার সে আমলের। এক দুর্গে সৈন্তেরা আটকা পড়েছে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে কে-একজন লিখে গেছে দেয়ালের উপর : আত্মদান করলাম, কিন্তু দুর্গ ছাড়িনি; তারিখ—২০ জুলাই, ১৯৪১। একটুকরা টিন রেখেছে এক পাশে—গুলিতে গুলিতে শতচ্ছিন্ন।

কেড় মাসে রাশিরা খতম—এই গুদের হিসাব। হিসাব উল্টে গেল—জার্মানিই হটেছে। স্ট্যালিন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

গাইড বলে যাচ্ছে ইংরেজি। ছবি ও ভিনিবপত্রে ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়ে যাচ্ছে। বোমাক্ক রূপকথার মতো শুনে যাচ্ছি। জার্মানদের হাতিয়ার পত্র কেড়ে নিয়ে তাড়া করেছে তাদের। নীপার নদী পার হচ্ছে সৈন্তদল—তার এক বিরাট মডেল। নিবীহ লাঠির মধ্যে বন্দুক-বিভলভার। ছুরির মধ্যে মাইক। পিন্ডল পেলিলের মধ্যে। গুপ্তচরেরা এই সমস্ত নিয়ে দেশের মধ্যে ঘুরত।



১৯৪৫ অব্দে পুরোপুরি জয়। জর্মানির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙেচুরে পালাচ্ছে বালিন যুদ্ধে—তার স্রব্ধ মডেল।

রাইখষ্টাগের চূড়ায় যে পতাকা—এরা উড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা পরম যত্নে এনে রেখেছে। সমস্ত শহর জ্বলছে, তার ছবি। রাইখষ্টাগের মডেল। নানা অঞ্চলের সৈন্তেরা রাইখের এখানে ওখানে বা খুশি লিখেছিল, তার ছাপ রেখে দিয়েছে। জাপানেরও হার হল, গাদা গাদা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছে।

সোবিয়েত হুনিয়া শাস্তি চায়। দেয়াল জোড়া ম্যাপের উপর আলো বসানো—বিশাল দেশের বাবতীয় সম্পদের পরিচয় এই ম্যাপে। দেশের মানুষ সকলে মিলে স্তম্ভে শাস্তিতে এই বিপুল সম্পদ ভোগ করতে চায়। রণজয়ের পর দেশ থেকে কত উপহারের পাঁহাড় জমেছে। স্তম্ভীকৃত পতাকা—বা সমস্ত জয় করে এসেছে, আর নিজেদের যা ছিল।

কত লোক মিউজিয়াম দেখতে এসেছে—মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়ো আর ইউনিফর্ম আঁটা সৈন্য। দেখে দেখে এলাম—গাইডেরা বকবক করে বুঝিয়ে চলেছে—এদের এই মহা ইতিহাস আপনার চোখের উপর ভাসবে। কত সংগ্রাম, কত বীরত্ব, কত আত্মত্যাগ! বেদনার উদ্বেল সমুদ্র পার হয়ে বোয়োজ্বল কূল পেয়েছে।

বিজয়োৎসব। পরাজিত পতাকাগুলো এদেশ সে দেশ থেকে বয়ে এনে প্রথমটা মুশোলিয়ামের সামনে রেখে দিল। লেনিন বীর ভিতর শাস্ত ভাবে ঘুমিয়ে আছেন। দেশের সমস্ত উল্লাস ঐ স্মৃতি-মন্দিরের পাদপীঠে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রেখেছে। সমস্ত সাজানো গোছানো। সর্বশেষ হঠাৎ দেখি, খুদ হিটলারের বিশাল পতাকা আর ব্যান্ডের গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাকের উপর কিছা দেয়ালের গায়ে জায়গা হয়নি। গাইডের কঠিন সহসা গভীর হয়ে উঠল, কথার আঙনের আলা। আমরা শাস্তি চাই; কেউ যদি পিছনে লাগতে আসে, তার মাথা এমনি করে ধূলয় লুটবে।

চেকোভস্কি স্মরণকার। জানীশ্বরীরা খুব জানেন, সাধারণের কথা বলতে পারব না। রাশিয়ায় কিন্তু এই নামে স্মৃতি পড়ে। মস্কো শহরের বৃক্ক মস্ত বড় স্মৃতি, ঐ নামে পার্ক। মনোরম এক হল বানিয়েছে—চেকোভস্কি কনসার্ট হল। সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বসলাম। নাচের আসর; অত বড় হল মানুষের গমগম করছে।

রাশিয়ার রকমারি লোকনৃত্য। চোখে না দেখে নাচের কি মজা পাবেন? আহা-ওহো করেও লাভ নেই। আর কি হবে—নাম কটা নিয়ে নিন শুধু।

বার্ক নাচ—গ্রাম্য পোষাকে একগালা মেয়ে নাচছে। ডান হাতে নীল কমাল, বাঁ হাতে বার্ক-শাখা। লাল গাউনে হুটো পা ঢেকে গেছে, ঢেকে অনেকখানি ঠোঁজের উপর ছড়িয়ে আছে। হলদে কমাল মাথায়। ধীরে ধীরে চলল। ঘুরছে, পা দেখা যায় তো—মনে হল ঠেংই পাক দিচ্ছে মেয়েগুলোকে ঘিরে। নাচ নয়—কাঠের ঐ ঠোঁজের উপর ভেসে ভেসে বেড়ানো। বত সব ধূলুমার নাচ দেখার পশ্চিমে—আজকের নাচ ভারি মোলোয়েম। গানের সুরগুলোও বড় স্নিগ্ধ।

নাচের পর নাচ চলছে। কিতো নাচ। তিন ঘোড়ার নাচ

—ঘোড়ার তলিতে নাচে তিনটে করে ছেলে। উত্তর-রাশিয়ার অতি প্রাচীন এক লোকনৃত্য। চৌকো নৃত্য—চারটে করে মেয়ে একসঙ্গে নাচে। মস্কো অঞ্চলের এক পুরানো নাচের সুর। ডান গাউনের উপর মাঝির নাচ। এক মেয়ের প্রথমগাথা ও নাচ। কসাক মেয়েদের নাচ—নাচের তাবৎ দর্শকদের সম্বন্ধনা জানাচ্ছে, বাজনারদের অবধি। নাগর দোলার নাচ। হাসিহাজার নাচ। এক পালা নাচ, নাম হল 'আমরা খালহসী'—কালো পাখরের বড় আঁটি আঙুলে পরে হাত বাকিয়ে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন রাজহসী, কালো পাখর হল হাঁসের চোখ; আহা, সরোবরে ভেসে বেড়ায় হসীর দল। রঙের খেলা—নাচে আর সাজ-পোশাকে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে; বারবার হাততালি পড়ে, ঘুবে কিরে নাচতে হয়। রাশিয়ার পুরানো বাজনা—কত রকম তারের বজ্র, লেখাজোখা নেই। লোকনৃত্যের বাজনা। সোবিয়েত যুবনৃত্য ও গান—একবার ছবার দেখে লোকের তৃপ্তি হয় না, বারবার করতে হয়।

পরদিন—১ নভেম্বর। রেড স্কোয়ার দিয়ে বত বার বাই, লোলুপ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি মুসোলিয়ামের দিকে। ভিতরে গিয়ে দেখব, লেনিন—ষ্ট্যালিনের কাছ: গিয়ে দাঁড়াব। এত দিন যেতে দিত না, উৎসব ব্যাপারে ভিতরে বড়চড় করা হচ্ছে, এমনি যেন শুনেছিলাম। উৎসব অস্ত্রে আজ দোর খুলে দিয়েছে। চলেছি সেখানে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড আয়তনের খেত কুসুমস্তবক নিয়ে চলেছি।

রেডস্কোয়ার আর রেভলুসান স্কোয়ারের মাঝখানটার ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য মানুষ। মুসোলিয়ামের সামনে থেকে লাইনের শুরু—রেডস্কোয়ার শেষ হয়ে ঐতিহাসিক মিউজিয়াম ছাড়িয়ে রেভলুসান স্কোয়ারের বহুদূর অবধি চলে গেছে। বাচ্চা-বুড়ো মেয়েপুরুষ সব রকম তার মধ্যে। বারো মাস তিরিশ দিন এই ব্যাপার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চুকতে দেয়, কিউয়ের লেজ একটুকু খাটো হয় না তার ভিতর। মাথার দিক দিয়ে লাইনবন্দি ঢুকে যাচ্ছে, পিছন দিকে নতুন নতুন মানুষ জুটেছে এসে। আমরাও আসছি রেডক্ল্যান-স্কোয়ার হয়ে ঐ পিছন দিকে। আরে সর্বনাশ! আগে যারা দাঁড়িয়ে গেছে তাদেরই শেষ হতে আজকের পাঁচটায় তো কুলাবে না।

না, বিশেষ অতিথি বলে আলাদা বন্দোবস্ত আমাদের জন্ত। উর্কি পরা কয়েকটা সৈন্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল কিউয়ের পাশ দিয়ে মুসোলিয়ামের দরজার দিকে। কুসুমস্তবক জন আষ্টক মিলে কাঁধে বয়ে চলেছেন। লিও আগে আগে ছুটেছে ফোটো তুলতে তুলতে।

হুয়ারে অদূরে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। ঠিক বারোটা—পাহারা বদল হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা বদল। হুঁজন করে সৈন্য বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত্রি সীত-গ্রীষ্ম-বরফ সর্বক্ষণ আছে তারা। এতটুকু নড়াচড়া নেই—অবিচল, পাখর-খোলা স্মৃতির মতো। তিনজন বন্দুকধারী ক্রেমলিনের ভিতর দিক থেকে আসছে খটখট জুতোর আওয়াজ তুলে পাখর-বাঁধানো রেড—স্কোয়ারের উপর। তারা এসে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। হুঁজন উঠল গিয়ে

দরজার উপর ; আগের দু-জন নেমে এসে আবার তিন জন হল। মাচ' করে তিন জনে আবার ক্রেমলিনে ঢুকে পড়ল।

ফুল ভিতরে নিতে দেয় না, দরজার কাছে রাখে। ভিতরে চললাম। লাল মাৰ্বেলে গড়া চৌকো ধরনের বাড়ি—বাইরে থেকে ছোট মনে হয়। পরলা দিনটা খুব খারাপ লাগছিল, এমনি সামান্য এক জায়গায় লেনিন-ষ্ট্যালিনকে রেখেছে! আজকে ভিতরে এসে দেখছি, ছোট ব্যাপার নয়। বিরাট ক্রেমলিনের পাশে বলেই আরও ছোট দেখায়। চমৎকার পালিশ করা, হাত ঠেকালে পিছলে যায়। মাটির অনেক তলেও ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে ক্রমশ গর্ভগৃহে ঢুকে পড়লাম। সৈন্তের পাহারা ভিতরেও। সন্তর্পণে সবাই পা ফেলে ফেলে যাচ্ছি। নিশ্চয় জুতোর শব্দ হচ্ছে না এতটুকু। শাস্ত্র ধ্যান-সমাহিত পরিবেশ। অবশেষে এসে পৌছলাম সমাগিগৃহে।

লেনিন ও ষ্ট্যালিন বসেছেন পাশাপাশি। কাচোঘরা জায়গাটুকু। কে বলবে মৃত্যু, কঠিন সংগ্রাম ও কঠোর ক্রান্তিতে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। লেনিনের বাম দিকে ষ্ট্যালিন। লেনিনের গায়ে কালো রঙের কোট। ষ্ট্যালিনের পুরানো মিলিটারি পোশাক। ছবিতে যা দেখেন, অবিকল সেই চেহারা। অদৃশ্য কোথা থেকে সহসা একটু আলো পড়েছে মুখের উপর—যেমন ধারা জ্যোতি ঘেরা থাকে মহা-পুরুষের মুখমণ্ডলে। ছোট ষাট মানুষটি লেনিন—হাত একটু বেন বিবর্ণ হয়েছে এই তিরিশ বছরে। ষ্ট্যালিনের কাঁচায় পাকায় মেশানো গৌণ-চুল। বারবার মুখে তাকাচ্ছি—যুগান্ত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। দুই দেহের তিন দিক প্রদক্ষিণ করে আবার উঁচুতে উঠে একটু ঝাঁক ঘুরে চলেছি। পা টিপে টিপে চলা—যুগ ভেঙে যায় যদি দৈবাৎ। গভীর শান্তিতে ঘুমোতে লাগলেন এঁরা—নিশ্চয় শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে এলাম।

শেষ নয়। আরও আছে, আর একটু এগিয়ে যাব। খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলাম। উপরে উঠে যাচ্ছি, ক্রেমলিনের দেয়ালের দিকে। একটু বাগান। তার পরে শহীদেব কবরভূমি। বিপ্লবের বলি। রীডের লেখা 'টেন ডেজ ডাট শক্ ড ওয়ার্ল্ড' (Ten Days that Shook The World) বইয়ে অলঙ্কার বর্ণন' আছে। সারা রাত্রি ধরে মাটি খুঁড়ে গর্ত বানান। শহরের নান, জায়গা থেকে নিঃশব্দ অন্ধকারে শব এনে জমা করেছে। তার পর শব সাজান খালি মাটির উপর। এক বার সাজানো হয়ে গেল তো দেহগুলোর উপর দিয়ে আর এক দফা সাজাচ্ছে। তার উপরে আবার। পাইকারি কবর—নাম ধাম জানা নেই। শুধু এই পুণ্যদেহ, মহৎ ব্রত প্রাণ দিয়েছেন। কবর এমনি ছোটো—লম্বালম্বি অনেকটা জায়গা নিয়ে—মাবে একটুখানি কাঁক। মস্কো শহরের

সব চেয়ে পবিত্র জায়গা—মরবার পর এই জায়গায় একটুকু ঠাই পাবার সন্ত সকলের ভারি লোভ। মার্কিন লেখক রীডেরও কবর এখানে। আরও পাঁচ জন বড় বড় নেতার—তাদের আবক্ষ মূর্তি কবরের উপর।

জায়গা নেই, একটু জায়গা নেই আর ওখানে। অনেক বলে গেলেন, মৃত্যুর পরে দেহ যেন দাহ করা হয় ; সেই ছাই খানিকটা এখানে ক্রেমলিনের দেয়ালের ভিতর চুকিয়ে রাখা হবে। অনেক আছে এমন—দেয়ালের উপর পাখরের কলকে নাম লেখা। মার্কিন গার্লিংও ছাই এখানে।

মস্কোর ভারতীয় অ্যাম্বাসি দাওয়াত পাঠিয়েছেন আমাদের সকলকে। দেশে তো ফিরেছেন, তার আগে স্মৃতি করে খাওয়া যাক এক সঙ্গে। বর্ধমান, রায়নার শ্রবীন্দ্রনাথ বোসকে জানেন আপমারা—সেই যে ছেলেটি অ্যাম্বাসিতে ঢাকরি করে। বয়সে তরুণ, ভারি হুম্মর ছেলে। বেলাবেলি আসতে বলে দিয়েছি তাকে। হুজুনে বেকব। ওদের গাড়িতে নয়—পায়ে হাঁটব বস্ত্র-তজ্জ, ট্রায়ে চরে বেড়াব, মেট্রোয় চড়ব। মস্কো শহর চবে বেড়াব'। তার পর বধা সময়ে অ্যাম্বাসিতে জুটে খানাপিনা করে করে সকলের সঙ্গে বাসায় ফিরব। বোস অনেক দিন আছে মস্কোয় তার সঙ্গে পথ হারাবার ভয় নেই। আমাদেরই পুরোপুরি আপন লোক সে।

এই যে শুনি ইম্পাতের পদ্যায় ঘেরা চতুর্দিক। দুটো চায়টে জায়গা দেখিয়ে দেয় নিজের খুশি মতো। বিদেশির দিকে কড়া নজর। চলাচলের ব্যাপারে একটু হেরফের হলে কাঁক করে টুটি টিপে কলসেন্টন-ব্যাঙ্কে নিয়ে ভুলবে।

বোস একগাল হেসে বলে, তাই দেখুন। সারা বিকেল তো চক্কোর দিচ্ছি। নজর তুলে দেখল না একটিবার কেউ।

যে তিন-চার ঘোরা-ঘুরি হয়েছে। ট্রায়ে চেপে যাচ্ছি—কোন তর্রাট দিয়ে কোথায় চলেছি, বোস বোধ হয় কিছু কিছু বলতে পারে। এবারে মালুম হল, নজর আছে বই কি! সবগুলো নজরই বোধ হয় আমাদের দিকে। বাদের মুখোমুখি বসেছি, তারা সোজা তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লে নজর নামিয়ে নেয়, ক্ষণপরে আবার তাকায়। উটো দিকে বাদের মুখ, ষাড় ঝাঁকিয়ে লুকিয়ে চুকিয়ে দেখে তারা। এ তো বড় মুশকিল! সামনে তো এই ব্যাপার—পিঠের উপরটাও দৃষ্টির শূলে খোঁচাখুঁচি করছে, অজ্ঞমানে বুঝতে পারি।

বোস বলে, রূপ দেখছে আমাদের। কালো দেখতে পায় না বড় একটা—দেখছে, আর হিংসের অলঙ্কার মনে মনে।

[ ক্রমশঃ।

### জনসাধারণের সাহিত্য

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অবিকার যে কেবল জ্ঞানোদগিরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তত্ত্বময় ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ বেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া

ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। (সাহিত্য-স্মৃতি—বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ আশ্বিন)

—রবীন্দ্রনাথ



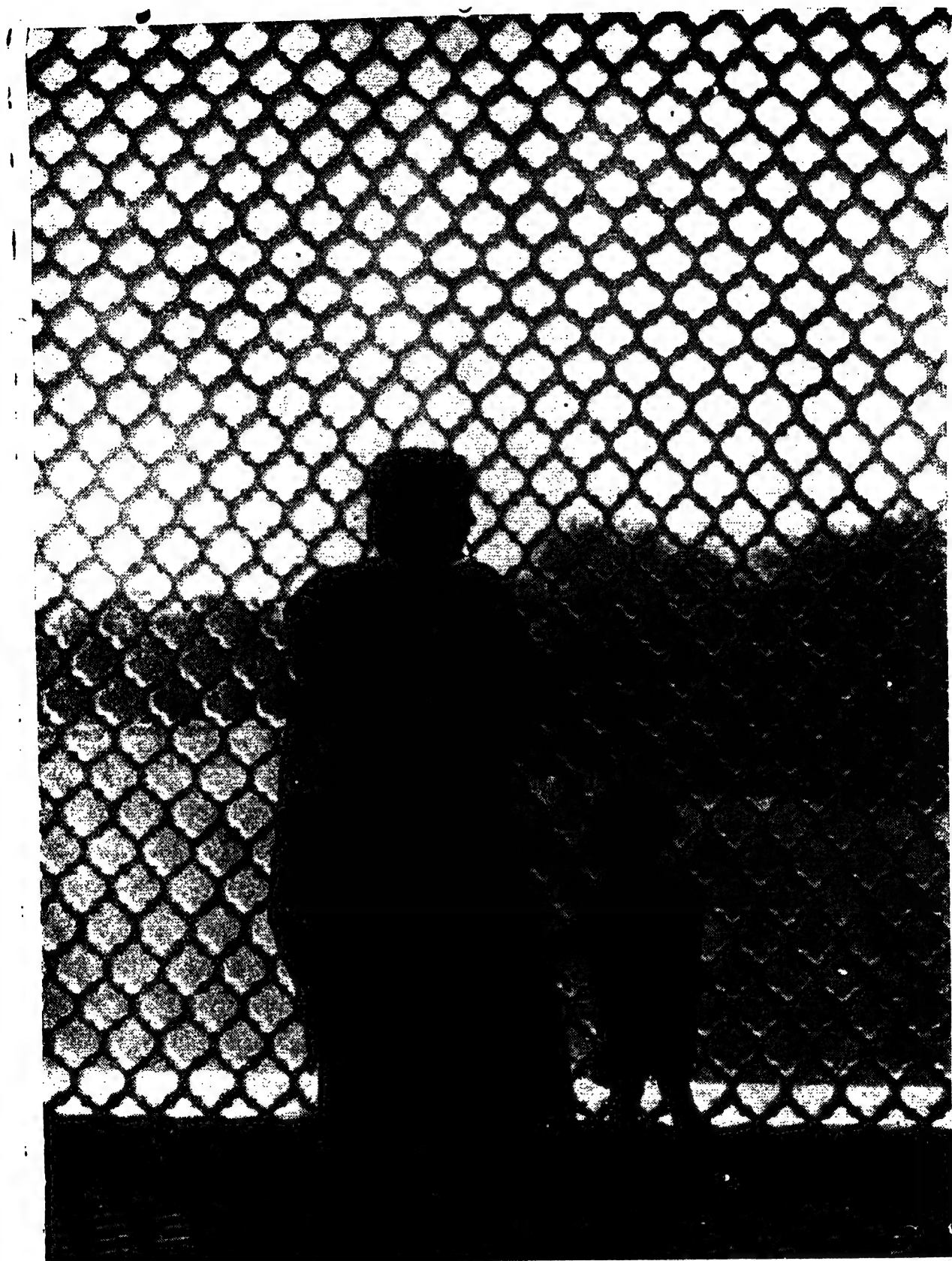
[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে  
নাম ধাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না ]

বিড়লা মন্দির ( দিল্লী )  
—মুশীল হালদার



যাত্রা হ'ল গুরু  
—রখান রায়





বন্দিনী

—পরিতোষ দিত্ত





মৃত্তিকার বন্ধন

—রায়কিঙ্কর সিং





চাঁদী

—সুকুমার দাস

### তনয়-তনয়া



—সুনীল বসু

—অমরেশ দাস



# চারুজেন

## ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

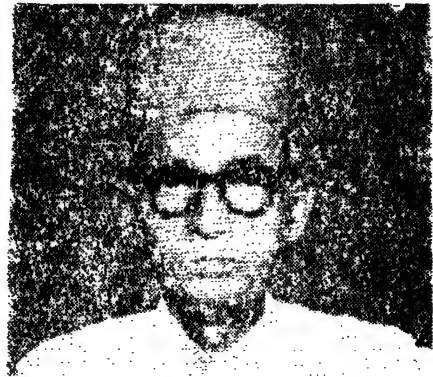
[ পরিচালক, নব নাট্য মহাবিহার, নাট্য ]

১৩০০ সালের ২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মবড়া গ্রামে (পোঃ—দক্ষিণগ্রাম) মাতুলালয়ে সাতকড়িবাবু জন্মগ্রহণ করেন। সাতকড়িবাবুর মাতামহ ছিলেন বীরভূমের প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ। সাতকড়িবাবুর পিতা ৮হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বীরভূমের রাতমা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে উচ্চ ইংরাজী বিজ্ঞালয়ে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকতা করিতেন। পরে রামপুরহাট ফৌজদারী আদালতে মোক্তারি করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সাতকড়িবাবুর মাতার নাম বিশেষ্বরী দেবী। সাতকড়িবাবুর পিতৃকুলে বৈবাহ্যিক প্রবল প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার পিতামহ ৮রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুত্র হরিপ্রসন্নকে চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় সংসার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্বামী মোক্ষদানন্দ) কালীতে দণ্ডী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন এবং রামপুরহাটের সন্নিকটস্থ তারাপীঠে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তারাপীঠের ভৈরব বামা ক্যাপা তাঁহার শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে রামপুরহাট হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সাতকড়িবাবু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই সময় হইতেই ইংরাজী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষায়ই সাতকড়িবাবুর সমান ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। স্কুলে বার্ড ক্লাসে (বর্তমানের Class VIII) পড়িবার সময় পিতার নির্দেশে সাতকড়িবাবু সমগ্র গীতা এবং অমরকোষের একের তিন অংশ কণ্ঠস্থ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত 'অনাস' প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সাতকড়িবাবু সংস্কৃত কলেজ হইতে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাতকড়িবাবু যখন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত 'অনাস' পড়েন তখন ইংরাজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া ইংরাজীর অধ্যাপক ৮গ্রামচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ইংরাজীতে 'অনাস' লইবার জন্য বার বার বলেন। সাতকড়িবাবুর পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্র সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হউক। পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দিবার জন্যই সাতকড়িবাবু সংস্কৃতই পড়িতে থাকেন। 'অনাস' পড়িবার সময় সাতকড়িবাবু পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ৮সীতানাথ কাব্যরত্নের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সাতকড়িবাবু এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তার আশুতোষ সাতকড়িবাবুকে সিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

সেই সময় হইতেই ছাত্রেরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পাণিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়া বাইত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় চার বৎসর সাতকড়িবাবু তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহিত সাতকড়িবাবুর পরিচয় হয়। তাঁহারই নির্দেশে সাতকড়িবাবু নাগার্জুনীর মাদ্যমিক দর্শনের উপর তিব্বতী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষার সাহায্যে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। ডক্টর দাশগুপ্তের নিকট সাতকড়িবাবু পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের নিকট সাতকড়িবাবু ত্রায়শাস্ত্র পাঠ করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সাতকড়িবাবু ছয়টি আত্মিক্য দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন আলোচনা করেন। পরে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ ও বৌদ্ধ ত্রায়ের উপর নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় 'সংস্কৃত সাহিত্য পত্রিকা' 'আধ্যাদর্শণ' Calcutta Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ফলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে সাতকড়িবাবুর ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি সংস্কৃত বিভাগের রীডার, প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ অধ্যাপক হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় 'বিহার গভর্ণমেণ্ট তাহাদের বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালিভাষার



সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে নালন্দা রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে (বর্তমান নাম,—নব নালন্দা মহাবিহার) গড়িয়া তুলিবার জন্য সাতকড়িবাবুকে অনুরোধ করেন। সাতকড়িবাবুর স্বাস্থ্য ভাল বাইতেছিল না, তাহা হইলেও বিহার গভর্ণমেন্টের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন না। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর রূপে তিনি নূতন ভাবে কার্যে যোগদান করিলেন। সেই পদেই তিনি বর্তমানে অধিষ্ঠিত আছেন।

সাতকড়িবাবু বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় আন্তোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু খ্যাতিমান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্তে বসিয়া সাতকড়িবাবু অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইহাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন।

সাতকড়িবাবু কয়েকখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'The Buddhist Philosophy of Universal Flux' (1935 C. U.), 'The Jain Philosophy of Non-Absolutism' (ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শাস্ত্রপ্রসাদ জৈন লেকচার সিরিজ, 1946), প্রমাণদীপিকা (হেমচন্দ্র)—A critic of Organ of knowledge (in collaboration with Dr. Tatia এবং 'The Absolutists position in Logic—এই কয়খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের History of Philosophy, Eastern and Western গ্ৰন্থের 'Philosophy of Sankhyayoga' নামক প্রবন্ধও সাতকড়িবাবুর রচিত।

সাতকড়িবাবু সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে পারেন এবং সংস্কৃত কবিতা রচনায় ও তাঁহার নৈপুণ্য আছে। ১৯১২ খ্রষ্টাব্দে দিল্লীদ্বারের উৎসব উপলক্ষে রানপুরঘাটে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি স্বরচিত অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। \*কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতার উপর সংস্কৃত ভাষায় তিনি বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বহুবার সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

সাতকড়িবাবুর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার খ্যাতিমান ছাত্রবৃন্দ। গবেষণায় সাক্ষ্যের পথের নির্দেশ দানে সাতকড়িবাবুর তুলনা ভারতবর্ষে নাই।

## শ্রীশ্রীর চট্টোপাধ্যায়

[ প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ী ]

সত্যতা, অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠা থাকলে লোক সাধারণ অবস্থা থেকে কি করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বিখ্যাত চা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শ্রীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশ্রীর চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আজ ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছেন। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীদের কাছে শ্রীরবাবু আদর্শমূল এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে এর সত্যতা, কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অনুপ্রেরণার বস্তু হয়ে থাকবে। লক্ষীর কুপা লাভ করলেও শ্রীরবাবু অতীতের দিনগুলি বিস্মৃত হন নাই। তাই তাঁর চরিত্রের

মধ্যে ফুটে উঠেছে অপূর্ণ মাধুর্য। অতীত দিনের কথাগুলো বলতে বলতে শ্রীরবাবুর চোখ সজল হয়ে উঠলো দেখলুম। অমায়িক, নিরহঙ্কার, সদালাপী এ মানুষটিকে দেখে সত্যিই ভাল লাগলো। পৃথিবীতে ধনবান হলে লোকে সাধারণতই একটু গর্ব অনুভব করে এবং অতীত দিনের কথা সহজেই বিস্মৃত হয়, শ্রীরবাবুকে দেখলুম এদিকে সম্পূর্ণ পৃথক। দেব, দ্বিজ ও নারায়ণে ভক্তি তাঁর চরিত্রের মধ্যে অপূর্ণ কয়েকটি গুণ দেখতে পেলুম, আর দেখতে পেলুম তাঁর ভেতর অপূর্ণ কর্মনিষ্ঠা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন করভারে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী আজ নিষ্পেষিত। এই অজায় করভারের প্রতিবাদে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ হরতাল আহ্বান করেছেন ৩০শে মে বৃহস্পতিবার। তাই এ দিনটিই আমি বেছে নিলুম কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৯ ঘটিকার শ্রীরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। গিয়ে শ্রীরবাবুর অনুসন্ধান করতেই তিনি নীচে নেমে এলেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলুম। শ্রীরবাবু বলতে থাকেন। "অজ্ঞাত জন বাঙ্গালীর মত আমি ও চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি পারিবারিক বিপর্যয়ে। কিন্তু যেদিন চাকুরী ত্যাগ করতে বাধ্য হই সেদিন আমার স্বপ্ন ছিল মাত্র কয়েকটি টাকা। সেদিন আমি কোথাও কোন আলোকের সন্ধান পাইনি।"

১৯১১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ব্যবসায়ী শ্রীরবাবুর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় এই কলিকাতা মহানগরীতেই। তাঁদের আদিবাস ২৪ পরগনা জেলার হালিসহরে। পিতা ডাঃ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরবাবুর লেখাপড়া আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম গৃহ-শিক্ষকের কাছে, বাড়ীতে কিছুকাল লেখাপড়ার পর তিনি কলকাতা টাউন স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পড়া শেষ করেই তাঁকে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার বামার লরী এণ্ড কোম্পানীতে চা বিভাগে unpaid apprentice হিসেবে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই হয় তাঁর কর্মজীবনের সূর্য এবং কিছুকালের মধ্যেই তিনি এই বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। এই বিভাগটি বামার লরী এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান টি কোম্পানী' বলে সে সময় পরিচিত ছিল। উহার অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

১৯৩৬ সালে উক্ত কোম্পানী থেকে শ্রীরবাবুকে বিদায় নিতে হয়। কোন লোকের প্রভাবে পড়ে বামার লরীর কর্তৃপক্ষ শ্রীরবাবুকে কর্মত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত লোকটি ছিলেন শ্রীরবাবুর আত্মীয়। চাকুরী বাবার পর শ্রীরবাবুকে কিছুদিন অন্তর্বিশেষ মধ্যে কাটাতে হয়। তারপর বামার লরীর এক সাহেবের চেষ্টাতেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় ক্যারেট মোর এণ্ড কোম্পানীর under Broker নিযুক্ত হন। আগার ব্রোকার নিযুক্ত হওয়ার পরেই উক্ত কোম্পানী তাঁকে কমিশন প্রদান আরম্ভ করেন। এর পর থেকেই শ্রীরবাবু ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকেন।

এর পর লাগলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময় ক্যারেটমোর এণ্ড কোম্পানীর সব সাহেবই বিলেত চলে যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখে চারের ব্যবসার সমস্তদিক শেখবার সুযোগ এসে গেল এ সময়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এ সুযোগ গ্রহণ করতে এতটুকু বিলম্ব করলেন না।

তিনি কর্মী মানুষ। কাজ বখন তাঁর ঘারে এসে উপস্থিত হলো, তিনি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে Tea market-এর সব গুচতত্ত্ব আরও করে নিলেন নিজের কর্তৃদক্ষতায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ঐচট্টোপাধ্যায়ের জীবনে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। এ সময় কোম্পানীর বড় সাহেব অবসর গ্রহণ করলেন। যিনি নতুন বড় সাহেব হ'য়ে এলেন তিনি ঐচট্টোপাধ্যায়ের কমিশনের হার কমিয়ে দিলেন। এই কমিশন হ্রাস করার প্রতিবাদে স্বধীর বাবু Resign করলেন। এ সময় থেকেই ঐচট্টোপাধ্যায় শুরু করলেন স্বাধীন ভাবে চা ব্যবসা অর্থাৎ চাঁয়ের দালানী এবং বামার লরীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। ক্রমে তিনি নিজ কর্তৃদক্ষতায়, সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে এবং তদানীন্তন ইণ্ডিয়ান টি মার্কেটস্ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মি: জি. এ. বেনার প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড ব্রোকার হিসেবে প্রবেশ করেন। রেজিষ্টার্ড ব্রোকার হলেন বটে কিন্তু স্বধীরবাবুর পথ সুগম হ'লো না। এখানেও নানা বাধা-বিষয়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হ'তে হলো। সে সময় চাঁয়ের বাজারে কোন বাঙ্গালী ব্রোকারকে সাহায্য ক'রবার জন্ত কেউ প্রস্তুত হ'লো না। কেন না, তখন পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী 'Registered Broker' হিসেবে সুপরিচিত ছিল না। ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের চাঁয়ের বাজার একচেটিয়া ছিল। তাই স্বধীর বাবুকে সংগ্রাম করতে হ'য়েছে এদিক দিয়েও। এ সময়ে পি. সি. চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীর প্রিপারেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বাগানের চা দিয়ে স্বধীর বাবুকে সাহায্য করেন এবং এ বাগানের চা সংগ্রহ করেই তিনি প্রথম 'কাটালগ' প্রকাশ করেন। এর পর থেকেই ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি বাগান স্বধীর বাবুকে তাঁদের ব্রোকার নিযুক্ত করলেন ঐচট্টোপাধ্যায়ের কর্তৃদক্ষতার পরিচয় পেয়ে। ২০ বৎসর কাল চাঁয়ের বাজারে স্বধীর বাবু অভিজ্ঞতা ধাকা সম্বন্ধে তাঁর চা Testing সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তার প্রধান কারণ, সাহেবরা কেবল তাদের ভেতরেই টেক্সট Monopoly করে রেখেছিল। ঐচট্টোপাধ্যায়কে উহা শেখবার সুযোগ প্রদান করে নাই। এ সম্পর্কে স্বধীরবাবু 'নিজেই বলছেন, "চাঁয়ের Testing সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন চা ব্যবসায়ীই সফলতা লাভ করতে পারেন না। এক্ষত ১৯৪৭ সালের ৫ই মে আমাকে লণ্ডন যেতে হলো এবং লণ্ডন থেকে একজন Tea Testing সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে আসতে হলো। এ ভ্রমলোকের নাম মি: ভি. এন. সিনক্রয়ার। স্বধীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী মি: সিনক্রয়ারকে প্রথম ডিরেক্টর করে নিয়ে আসেন। এবং স্বধীরবাবুও চা Testing-এ একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সততা, অধ্যবসায় ও কর্তৃদক্ষতার গুণে আজ চা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এস, চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী অগ্রতম শ্রেষ্ঠ চা ব্যবসায়ী বলে সুপরিচিত। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এ প্রতিষ্ঠানটি আজ গর্বের বস্তু। ১৯৫২ সালে কোম্পানীর সুনাম ও কর্তৃদক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে বামার লরী এণ্ড কোম্পানী তাঁদের হু'খানা চা বাগানের চা বিক্রয়ের ভার স্বধীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। তারপর স্বধীরবাবু ১৯৫৫ সালে পুনরায় বিলোত বান এবং ক্রমে আসেন কয়েকটি ইউরোপীয়ান কোম্পানীর চা বাগানের



স্বধীর চট্টোপাধ্যায়

চা বিক্রয় করবার ভার নিয়ে। বর্তমানে স্বধীর বাবু ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত এবং চা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বধীরবাবু জীবনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনে তাঁকে বহু সংগ্রাম করতে হ'য়েছে; তাঁর বাবা-মা ছেলে বেলাতেই মারা যান। বড় ভ'বার একটা উদগ্র কামনা ছেলেবেলা থেকেই ছিল এবং সেই ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌছাবার জন্তে তিনি নিরলস ভাবে কষ্ট করে গেছেন। জীবনের চলার পথে কোন বাধা বিষয়ই তাঁকে কষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাই এ কষ্টযোগী আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হ'য়েছেন। বহু বাঙ্গালী তাঁর প্রতিষ্ঠানে কার্য করে তাদের পরিবার পালন করছে। ঐচট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি বাঙ্গালীকে সাহায্য করবার জন্ত সর্বদাই উন্মুখ!

বহুবার বিলোত গেলেও ব্যক্তিগত জীবনে স্বধীর বাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর কলকাতার বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ সেবা হয় এবং প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার তিনি নিয়মিত ভাবে কালীঘাটে কালীমায়ের দর্শন করে দানদান করেন।

ঐচট্টোপাধ্যায় বহু সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্য করেন।

আজও তিনি নিরলস ভাবে কষ্ট করে চলেছেন। বিভিন্ন চা বাগানের মালিকদের কি ভাবে বাগানের চা উন্নততর করা সম্ভব তৎসম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইউরোপীয়ান কোম্পানীর মালিকেরাও চা বাগানের মালিকদের চাঁয়ের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছেন।

ঐচট্টোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা দেশের মুখোজ্জ্বল কনন, এই প্রার্থনাই আমরা ভগবানকে জানাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[উড়িষ্যা-নিবাসী বিশিষ্ট আইনজীবী]

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যে স্বল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী তদানীন্তন বৃহত্তর বঙ্গের অগ্রতম অংশ উড়িষ্যায় নিজ কর্তৃক্ষেত্র গঠন ও উহার ভবিষ্যৎ রূপায়ণে সাহায্য করেন,

এ্যাডভোকেট শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ তথ্যে অগ্রতম। তাঁহার কণ্ঠস্বরবনের প্রথমভাগেই (১৯১১ সালে) বৃহত্তর-বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া “বিহার-উড়িষ্যা” পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হইল— উড়িষ্যাভাষাভাষীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৃত্তি প্রভৃতি পরিবর্তনের জন্ত একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হওয়া এবং উহার নবগঠনে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মধ্যে যে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও মিলনাত্মক সৌহার্দ্য দৃঢ়তর হওয়া উচিত ইহা তিনি খুবই অমুভব করিতেন। তাই যখন ১৯৩৭ সালে পৃথক “উড়িষ্যা-প্রদেশ” সৃষ্ট হয়, তখন উপেন্দ্রনাথ সানন্দে উহা গ্রহণ করেন।

১৮৭১ খ্রষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার শিকড়া-কুলীন গ্রামে ৮জানকীনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাসনপুত্র বেণুড় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার স্নাত্তিভাতা ছিলেন। ম্যালেরিয়া আয়ুষিত স্বগ্রাম হইতে ছয় বৎসর বয়সে তিনি আঁড়িয়াদহে আসেন এবং স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ ৩য় শ্রেণী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া রিপণ ‘ল’ কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় তিনি Executive Service পরীক্ষা দিবার মানসে জনৈক ইংরাজ-শাসকের নিকট অন্বেষণের সার্টিফিকেট প্রার্থী হন। নানারূপ অছিলায় প্রত্যাখ্যান হইলে তিনি কটকের শাসক ত্রায় কে, জি, ওস্তের জামাতা সিভিলিয়ান বি, সি, সেনের নিকট হইতে উক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। তথাপি বাংলা সরকারের তৎকালীন আচার্য-সেক্রেটারী (হোম) মি: টিমেনসন (পরে বিহারের লার্ডসাহেব) তাঁহাকে পরীক্ষার লিখিত অমুমতি দেন নাই। পরে অমুমতিতে জানা যায় যে, দেশীয় সিভিলিয়ান প্রদত্ত সার্টিফিকেট উপেন্দ্রনাথের পক্ষে ‘অপর্যাপ্ত’ স্বরূপ হইয়াছে। সরকারী চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি তখন আইনের শেষ-পরীক্ষা দিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হন এবং পরবৎসর সম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল পরে ভাগ্যান্বেষণে তিনি কটক সহরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। সেখানে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তাঁহার স্বত্তর বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীহেমচন্দ্র দে সরকারের ‘জুনিয়র’ হিসাবে

বালেশ্বরে উপস্থিত হন এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করিতে থাকেন।

এইস্থানে তিনি বহু মামলা পরিচালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমজীবনে দুইটি বিখ্যাত মামলায় তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করেন এবং তজ্জন্ত ইংরাজ শাসকদের বিরাগভাজন হন।

প্রথমটিতে, চিত্তপ্রিয় ও ‘বাঘ স্বতীনের’ অগ্রতম সঙ্গীদ্য বড়োবাড় নদীর নিকট চাষখণ্ড গ্রামে ধৃত নীরেন (১৯) ও মনোরঞ্জন (১৮) মামলায় সরকারী দ্রুটি উপেক্ষা করিয়া ট্রাইবুনালে জাতীয়তাবাদী উপেন্দ্রনাথ আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। উহার চেয়ারম্যান ম্যাককারসন ও কাউন্সেল মানফ সাহেবদ্বয় তাঁহার উপস্থাপিত বক্তব্যের উচ্চ-প্রশংসা করেন কিন্তু বিপ্লবীদের সদস্ত বলিয়া দুইটি বালকের কাসীর দণ্ড বোধ না হওয়ার ব্যথা আজও উপেন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অমুভব করেন। উক্ত মামলায় কলিকাতার ব্যারিষ্টার (কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব মেয়র) স্বর্গীয় নিশীথ সেন (শ্রদ্ধেয়া কবি কামিনী রায় মহোদয়ার অমুজ) পরে যোগদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়টিতে, উপেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠার রাজা এবং ইংরাজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্মী (বর্তমানে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী) ডা: হরেকৃষ্ণ মহাতাবের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাঁহাকে সম্মানে মুক্ত করিতে সক্ষম হন।

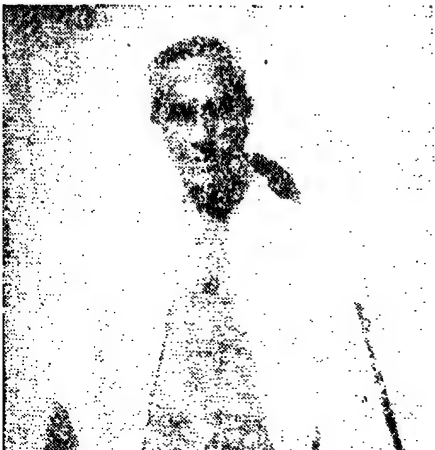
পাটনা হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন ফজল আলী সাহেব (বর্তমানে আসামের গভর্ণর) নিম্ন-আদালতের কয়েকটি মামলায় উপেন্দ্রনাথের উপস্থাপিত বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কর্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ উপেন্দ্রনাথকে মিথিল-উড়িষ্যা আইনজীবী সম্মেলনে সভাপতি পদে বৃত্ত করা হয় এবং উহাতে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ সরকারী ও বেসরকারী মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। গত ১৯৫৩ সালে তাঁহার আইন ব্যবসায়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হিসাবে উড়িষ্যার আইনজীবীরা স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালন করেন।

আইনব্যবসায়ে প্রভুত বিত্ত অর্জন করা সত্ত্বেও সরলপ্রাণ উপেন্দ্রনাথ সাধারণ জীবনধাপনে অভ্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহার গোপনদানে বহু গরীব ছাত্র আজও বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। দৃঢ়চেতা, সঙ্কল্পনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ উপেন্দ্রনাথ মনে করেন যে অগাধ ভগবৎবিশ্বাস ও একাগ্র-সাধনা মানবজীবনে উন্নতির মূল সোপান। তাঁহার অমায়িক ও সুমধুর ব্যবহারে সাধারণ লোক মুগ্ধ। নানাকর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও স্বগ্রামের কথা তাঁহার মনে সর্বাঙ্গাগ্রস্ত রহিয়াছে এবং বৎসরে কয়েক বার সেখানে আসিয়া থাকেন।

### শ্রীশুকমলকান্তি ঘোষ

[ জনপ্রিয় সংবাদপত্রসেবী ]



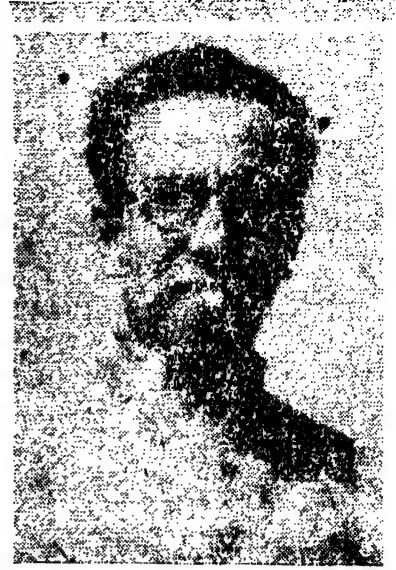
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

কার যশ হরণ করে জেলাটির নাম বশোহর হয়েছিল জানি না, তবে বশোহরের রক্ত বৃকে নিয়ে বাঙলার অসংখ্য সন্তান নিজেদের করে তুলেছিলেন বঙ্গবী; তার সাক্ষী দেবে ইতিহাস। বশোহরের কোন এক গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের এক বধু ছিলেন; নাম ছিল বীর অমৃতময়ী। এই অমৃতময়ীর নামানুসারে গ্রামটির নাম বদলে রাখা হ’ল অমৃতবাড়ার। অমৃতবাড়ারের ঘোষবংশে দেখা



দিলেন বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, গোলাপ, প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গ। এখান থেকেই প্রকাশিত হল অমৃতবাজার পত্রিকা। স্বনামধন্য সংবাদপত্র। সে আজ অনেক দিন আগের কথা।

হেমন্তকুমারের পৌত্র সুকমলকান্তি। ১৯১২ খ্রষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁর জন্ম। বছর দশ বায়ো ষখন বয়স ঠিক এই সময়ে ইনি এঁর বাবা পাইমলকান্তি ঘোষকে হারালেন চিরদিনের জন্তে। টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে থাকেন সুকমল। এখান থেকে পাশ করেন বি, এ। এর পর আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন সুকমল। ছেড়েও দিলেন। সংবাদপত্রের পরিবেশে ছেলেবেলা থেকে গড়ে উঠেছেন সুকমল। তাই ছেলেবেলা থেকেই অমৃতের করেছেন এরই হাতছানি প্রতিটি মুহূর্তে। ছেড়ে দিলেন আইন পড়া। অর্থনীতিতে এম-এ পড়তে পড়তে সেখানেও মধ্যপথে হ'ল ইতি। কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রথমে অমৃতবাজারের ক্যানভাসারের কর্তার গ্রহণ করলেন সুকমল। সেখানে তিনি ক্যানভাসার, অমৃতবাজারের স্বাধিকারী গোষ্ঠীর কেউ নন ঠিক এই মনোভাবটি নিয়েই কাজে মন দিয়েছিলেন সুকমল। সেই জন্তেই নিখুঁতভাবে সমস্ত কার্যটি আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। বেদিন প্রথম কর্মজগতে পা বাড়ালেন সেদিন অর্থনৈতিক আত্মবিশ্বাস ও অমৃতপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় যুগান্তকান্তি ঘোষ ও তাঁর ছোটিকাকা শ্রদ্ধের সাংবাদিক শ্রীভূষারকান্তি ঘোষের কাছ থেকে। সুকমলের জীবনের যাত্রাপথে এঁদের অনুপ্রেরণা এক অতি মূল্যবান পাথর। দেখতে দেখতে হল যুগান্তের প্রতিষ্ঠা, প্রথম দিন থেকে আজ অবধি যুগান্তরকে সর্বাঙ্গীণে ইনি করে চলেছেন সেবা। আজ দীর্ঘ দশ বছর ধরে ইনি পত্রিকা সিন্ডিকেট নামক প্রতিষ্ঠানটির সেবার মগ্ন। সম্ভ্রান্ত-নৃত্য-নাটক আকাদেমির নৃত্যনাট্য শাখার কর্মসমিতির ইনি একজন সভ্য। কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংহতির সাধারণ অধিবেশনে সুকমল ছিলেন প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৫৫)। সেখানে এঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—‘ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ‘সংবাদপত্র পরিচালনা’ প্রসঙ্গে ইনি প্রথমগ্রেড রেটটি লাভের সঙ্গেও ইনি রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। যুগান্তের প্রথম দিনটি স্মরণে বলেন কেন অমৃতবাজারের ছেলে হয়ে আমি যুগান্তের এত গভীরভাবে প্রবেশ করলুম জানো বলে যে ঘটনা তিনি বিবৃত করলেন তা এই প্রথম যখন যুগান্তর জন্ম নিল তখন তাকে লালন-পালন করতে বাঁবা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেদিন প্রত্যেকেই ছিলেন তরুণ। নতুন নতুন স্বপ্ন সেদিন তাঁদের চোখে, আশা ও আনন্দে ভরপুর তাঁদের স্বপ্ন, উদ্দীপনার পরিপূর্ণ তাঁদের অন্তর, তারুণ্যের এই অভাবনীয় সমাবেশ থেকে দু'বে সবে থাকতে পারলেন না সুকমল। নিজেকে



সুকমলকান্তি ঘোষ

মিশিয়ে দিলেন এর স্রোতে। সর্বাঙ্গকরণে অগ্রগমনের প্রেরণা লাগলেন তুবারকান্তি ঘোষ। শ্রীঘোষের মতে আজকে ভারতে যে পরিমাণে জনবৃদ্ধি হচ্ছে সেই স্রোতের সর্বাঙ্গবাহক কপতে পারছেন না আজকের ব্যবসাজগত।

সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেও সুকমলকান্তির মন ভরপুর জাপানের শ্রুতিতে। এশীয় সৌন্দর্যবোধের উদাহরণ জাপান, বঙ্গভূমির সঙ্গে জাপান ভূমির মিল নানা জায়গায়। তাদের জুতো খোলায়, মাড়র বিছিয়ে শোয়ায়, মন্দিরে অর্থহীন ‘বৌপাশুদা ছোঁড়ায় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান। জাপানে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিখতে হয় সংবাদপত্র মুদ্রণ ও পরিচালনা কি করে হয়? সেখানে দীপশলাকা কখনও পরসা দিয়ে কিনতে হয় না, যে কোন জায়গায় তা পাওয়া যায় বিনামূল্যে। ছোট বস্ত, অথচ কি অপূর্ণ শিল্পকার্য তাঁর গায়ে, রঙ ও রেখার অভিনব রূপায়ণ স্রুদ্র দেখে ঘোষণা করে চলেছে ও কাকুরার দেশে সেই নাম-না-জানা শিল্পীদের কৃতিত্ব। জাপানের বৃক্ক বত রঙ্গমঞ্চ, চিত্রগৃহ, পান্থশালা, নাইট ক্লাব শোভা পাচ্ছে—সংখ্যার দিক দিয়ে তার কাছে পৃথিবীর সেরা রূপপুরী প্যারীও পরাজিত।

জাপানকে কর্মক্ষেত্রে বেছে নিয়েছিলেন দুজন বিরাট বাঙালী। সেই মহান সন্তানদের মধ্যে আজ একজন যুগান্তর আনন্দময় বন্ধে নিত্যমগ্ন আর একজন কোথায় সব আজ সারা বিশ্বেরই দ্বিজাত। আজও জাপান তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে চলেছে। তাঁদের প্রতি তাদের গভীর অনুবাস্ত্র পরিচালনা! সেই দু'জন আর কেউই নন—তাঁরা হচ্ছেন বন্দিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও উৎসর্গিত জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।



# রাজাম্ব রাজাম্ব



উদয়ভাসু

রৌদ্রদন্ত বৈশাখের দীর্ঘদিন এখন শেষের দিকে।

তবুও এখনও ভুবন্ত সূর্য্যরশ্মির তজ্জ্বলী এসে স্পর্শ করছে মুক্তধার পাকীর ভেতরে, রাজকুমারীর ঠিক কপালটিতে। যেন এক মৃত মানুষের শান্ত কপাল। বিদ্যাবাসিনী মেঘ-মলুকে চোখ মেলে বসে আছেন নির্জীব পাষণের মত। দীর্ঘ আঁখি, কালো তারা দুটি যেন কৃষ্ণবর্ণ হীরার মত জল-জল করছে সূর্য্য-আলোয়। মিহি আর সূক্ষ্ম ভূকর আশে-পাশে ঢাকা-ঢাকা কেশজুহু কাঁপছে। চৌধুরীগৃহ থেকে ফেরার পথে হুঁজনের একজনও কথা বলেন না একটিও। পরিচারিকাও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, জমিদারগীর মুখে আশান্তের ব্যর্থতা দেখে। পাকী এগিয়ে চলেছে মগ্নর গতিতে। হুঁপাশের মাট-ঘাট পিছিয়ে পড়ছে। দিন-শেষের সোনালী রৌদ্র গাছের শাখাজাল ভেদ করে রাজকুমারীর চোখে এসে পড়ছে বার বার, রাজকুমারী তাই চোখ বন্ধ করলেন। যেন সূর্য্যে পড়লেন স্নান চোখে।

গড়-মান্দারগীর পথ-প্রান্তর বড়ই দুর্গম। ঝটখটে দিবালোকেই পথিকজন দল বেঁধে পথ চলে। একা ক'কেও দেখা যায় না। উপলব্ধিও আকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথের দুই ধারে শান্তিশব্দহীন চৌধুরীভক্তি উঁকি দেয় বনাঞ্চল থেকে। শুধু তাই নয়, হিশ্র জানোয়ারের উৎপাত কে এড়ায়? মারণ-উচাটন মস্তের গুঞ্জন শোনা যায়; সিঁদাই উপাসনা করছে জীর্ণবের বৃকে। হোমের আগুন জ্বলছে কোথায়, যেন আলোয়ার মত। পথপ্রান্তে তৃণবায় তাড়ির আড্ডা বসেছে। নেশার আনন্দে উৎফুল্ল বর্ণার মত অট্টহাসি হাসছে এখন থেকেই। পাকীবাহকদের পদশব্দে ভয়-পাওয়া শিয়াল লেজ উঁচিয়ে ছোট্টাছুটি করছে। আবছারায় দেখা যায়, ওদের নীলাভ চোখের কুটিলতা। স্পষ্ট হাসি যেন দস্তুরের তীক্ষ্ণদন্ডে।

এক দমকা হাওয়ার চোখ চাইলেন যেন বিদ্যাবাসিনী। খানিক দেখে দেখে বললেন,—ব্রাহ্মণ, পাকীর দুয়ারটা বন্ধ কর। সমুখে রাজি, ভুলে যাও কেন?

পরিচারিকা ভয়ানক চোখ ফিরিয়ে বললে,—রাস্তির নয় রাজকুমারি, যেন কালরাস্তির!

একটা সম্ভার খাস ফেলে বিদ্যাবাসিনী বলেন,—তা বাই হোক। জ্যোতিঃশাস্ত্র ঠিক আমার জানা নাই, ভবিষ্যৎ বলতে পারি না।

—আমি কিছু কিছু জানি।

পরিচারিকা বললে ভয়হীন কণ্ঠে। বললে,—চৌধুরী-গিন্নী সহজে কেহাই দেওয়ার পাত্রী নয় বৌ, তা তুমি দেখে নিও।

বরুটা যেন ধক-ধক করতে থাকে রাজকুমারীর। পাকীর

দেওয়ালগায়ে গা এলিয়ে বসেছিলেন বিদ্যাবাসিনী, ধীরে ধীরে উঠালেন উর্দ্ধদেহ। পরিচারিকার একটি হাত ধরলেন নিজের হাতে। আবার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যত্নকণ্ঠে,—এখন কি উপায় ব্রাহ্মণ? কি করি, কোথায় বাই?

যশোদা ফিসফিসিয়ে বললে,—দেখে নিও বৌ, চৌধুরী-গিন্নী ঠিক নবাবের কোতোয়ালে জানিয়ে দেবে। মাগীর চোখে আমি পতিহিংসার (প্রতিহিংসা) চাউনি দেখেছি।

পাকীর মধ্যে এখন প্রায় অন্ধকার। দার কন্ধ। বাহকরা এগিয়ে চলেছে হনহনিয়ে। সঙ্গে ক'জন পাইক আছে। একজন মশালটি আছে। আঁধার আরও ঘনীভূত হওয়ার পর মশাল জ্বলে তখন।

তরুর দল ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। কচুবনের আড়ালে আড়ালে ব'সে আছে উবু হয়ে। মুখে আর দেহে কালো ভূশো মেখেছে। ওং পেতে ব'সে আছে, যদি মিলে যায় এক-আধ জন সজ্জিহীন মানুষ।

এক চলমান জনপিণ্ড আসছে, তাই দেখে আর দেখা দেয় না কেউ। দলে ভারী, সেই ভয়ে। পাকীর বাহকরা, পাইক, মশালটি, জোড়া জোড়া অশ্ব চোখের লোভার্ত দৃষ্টি আছড়ে আছড়ে পড়ে পাকীতে। কে যায়? কোথায় যায় এমন অবেলার? নজাকাটা পর্দায় ঢাকা পাকীর অভ্যন্তরে অবশ্যই নারী আছেন কেউ। কোন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা! কুমারী কিংবা সধবা যদি হন, নানা অলঙ্কারে নিশ্চয়ই তিনি সুসজ্জিত। ফসকে-বাওয়া শিকার হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, চোর আর ঠেঙ্গাড়ের দল মুখ লুকালো কচুবনের আড়ালে।

—আমি তো কোন উপায় দেখি না বৌ!

পরিচারিকা অনেকক্ষণ পরে কথা বললে যেন আপনার মনে। বললে,—আমি তো দশ দিক অন্ধকার দেখছি।

—আমিও তাই যশোদা! বিদ্যাবাসিনী ক্রীণ কণ্ঠে বলেন—বন্ধ! পাওয়া কঠিন।

চৌধুরীগৃহিণী প্রথমে কেঁদেছিলেন, ককিয়েছিলেন। মেয়ের দুঃখে অধীর হয়ে বুক-কপাল চাপড়েছিলেন। বিদ্যাবাসিনীর পায়ে মাথাও খুঁড়েছিলেন। আনন্দকুমারীর নিরুদ্ধদের সঠিক কারণ শেষ পর্যন্ত জানতে না পাওয়ার পর শাসানির সুরে কথা বলেছিলেন। দশমহাবিজ্ঞার মত একেক বার এক এক মূর্তি ধরেছিলেন যেন। শেষে সাক্ষাৎ জানিয়ে দিয়েছেন,—আনন্দকে না পাওয়া যায় ক্ষতি নেই, জমিদার কেঁটরামের স্ত্রী গুমথুন হবে! আমার লোক-লম্বরের অভাব নেই, অর্থকলও সামান্য নয়। আমি নবাবের এজলাসে নালিশ পেশ করবো!

বিক্যবাসিনী প্রায় কম্পিতদেহে চৌধুরীগৃহ ত্যাগ কর'রে উঠে এসেছেন। কীপতে কীপতে পাকীতে উঠে সংজাহীনের মত ব'সে পড়েছেন। চৌধুরাগীর ক্রোধের সুর কানে বাজে বন-স্তম্ভন। বাধিনীর মত তাঁর রূপ বেন, মনে পড়লেও ভয় হয়।

—চল' বো, সাতগাঁয়ে ফিরে বাই আমরা।

পরিচারিকা খানিক ভাবনার পর বললে অল্পবোধের সুরে।

মাথা দোলালেন রাজকুমারী। জাঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললেন,—না তা হয় না যশোদা! আমি আর সাতগাঁয়ে ফিরবো না কোন দিন। জমিদারের সুরের বাধা হই কেন আর।

—এখানেই থাকবে তবে? মান্দারণে থাকতে সাহস হয় না আমার। পরিচারিকার ভরাত' কঠ ফিস-ফিস করে পাকীর অন্তরে। বলে,—চৌধুরীগিরী সহজে নিস্তার দেবে না জেনো।

—মান্দারণ ত্যাগ করলেই কি পরিজ্ঞাপ পাওয়া যাবে, আমার তা মনে হয় না। বিক্যবাসিনী বললেন সন্দ্বিদ্ধকণ্ঠে। কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন,—এক চন্দ্রকান্ত ইচ্ছা করলে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি এখন কোথায় কে জানে।

এক বলক তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটলো মুখে। হেসে হেসে যশোদা বললে,—চন্দ্রকান্ত আমাদের রক্ষা করবে! তেমন আশা আমি করি না। আনন্দকে হারিয়ে আর কি তিনি ফিরে তাকাবেন?

কথা বলতে বলতে পরিচারিকা পাকীর দ্বার ঈষৎ সরিয়ে বাইরে চোখ মেললো। দিনের শুভতা ঘুচে গেছে কখন। কালো আকাশে ক'টা তারা জল-জল করছে। বিব-বিব বাতাস বইছে। নারকেল গাছের পাতার আড়াল থেকে চাঁদের সোনালী উঁকি দেয়। উজানের নৌকার মত পাকী এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। ওয়ের পথটুকু পেরিয়ে যেতে পারলে, ভগ্নদেউলে পৌঁছতে পারলে যেন স্বস্তি পাওয়া যায়। বিক্যবাসিনী বললেন,—ব্রাহ্মণি, আর কত দূর?

ইতি-উত্তি দেখলো যশোদা। ঘনান্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে দিয়ে বললে,—যেদিক তাকাই সেদিকেই আঁধার। পথ কি চেনা যায় বো!

বিক্যবাসিনী বললেন,—আকাশে কি মেঘ ভ'মেছে?

পরিচারিকা উদ্ভীকাক্ষে চোখ তুললো। দেখে দেখে বললে,—উঁহ, আকাশে মেঘ কোথায়! জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে।

চোপের তারা স্থির হয়ে থাকে রাজকুমারীর। সাগ্রহে তিনি কি লক্ষ্য করছেন কে জানে। বললেন,—পথের ধারে এত আলো কেন নাচানাচি করছে? ভূত-প্রেত নয় তো?

যশোদা বললে,—তুমি আর হাসিও না বো! আলো নয়, শিরালের চোখ জলছে অন্ধকারে। পাকী চলার শব্দ পেয়ে হয়তো ভয় পেয়েছে!

একেক জোড়া হলুদ-রঙ চোখ, আলোকবিন্দুর মত সত্যিই বেন নেচে নেচে উঠছে। জলন্ত ক্ষুধার তাড়নায় শিকারের সন্ধান করছে। গেরস্থের মোরগ যদি মিলে যায় একটা। কিবা একটি ঘুমন্ত শিশু!

—চন্দ্রকান্তকে চাই, নচেৎ রক্ষা নাই আর। কেমন বেন আতঙ্কের সঙ্গে বললেন রাজকুমারী। এক-বুক শ্বাস টেনে নিয়ে বললেন,—তাকে আমাদের পক্ষে রাখতে হবে। সালিশী মানতে হবে। তাঁকে এখনই আমাদের চাই।

—এই রাতের বেলায় আশ্রয়কে কোথায় পাবে তুমি? পরিচারিকার কথাই বিষয়। চোখে জিজ্ঞাসার চাঁউনি।

বিক্যবাসিনী বললেন,—তুমি দয়া করলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বৈশাখ-রাত্রির ঝিরঝিরে হাওয়া চলেছে। গাছের পাতার মর্মর ভেসে আসছে। শুষ্কপত্র উড়ছে বাতাসের সঙ্গে। পাকীর মুক্ত দ্বার, রাজকুমারীর ঘর্ষাজ্ঞ কপালে হাওয়ার স্পর্শ লাগে। তিনি আবার কথা বললেন,—মিথ্যা দোষারোপ কে মেনে নেয়! চুরি করলে একজন আর তার শাস্তিভোগ করবো আমরা?

—আমি কি করতে পারি বো? আমার দয়ার প্রত্যাশা কেন তাই শুনি? পরিচারিকার ভীতি-কাতর কণ্ঠ কৈপে কৈপে কথা বলে। বললে,—আমরা গরীব-গরবা, আমাদের আবার দয়া কোথা থেকে আসবে!

অল্প হাসলেন রাজকুমারী। শুষ্ক হাসি হেসে বললেন,—তুমি যদি কষ্ট কর', তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

—কি করতে হবে তাই বল'?

—আমাকে জমিদার-বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে তুই বা এই পাকীতে। বিক্যবাসিনী ফিস ফিস কথা বললেন, পরিচারিকার কানের কাছে স্থূপ এগিয়ে বললেন,—পাকীবাহারাদের পাঁচ দশ কড়ি বকশিস দিলেই—

কথা শেষ হয় না। যশোদা বললে,—তিনি যদি আমাব কথায় না আসে?

হঠাৎ এক রাশ জোয়ালো বাতাস দাঁপাদাঁপি করতে করতে মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে ছুটলো। সামুদ্রিক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের মত হাওয়ার ঢেউ উঠলো। গাছের শাখা কঁচাকঁচাচ শব্দ তুললো। নির্জ্ঞান প্রান্তর ধ'রে পাকীও ছুটেছে অহুঙ্কল বাতাসের ঘায়ে। মশালটির হাতের নতশুনী অগ্নিশিখা কাদের যেন প্রণাম করতে থাকে। মশালের আলো চ'লেছে সর্বাপ্রাণে। বাঁশের লাঠি হুকতে হুকতে পাইক-পেয়াদা চলেছে মশালটির পেছনে। তারপর পাকী চলেছে। পাকীর শেষে আরও ক'জন পাইক।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন রাজকুমারী। কত শত চিন্তায় ভুবে ছিলেন বেন। নিজের কোমল বক্ষে হাত রাখলেন ক্ষণেক, স্পর্শে অনুভব করলেন হৃদয়ধ্বনি। ঘন ঘন বেজে চলেছে। শ্বাসের কষ্ট হয় বিক্যবাসিনীর। কি এক অস্বস্তির জ্বালায় থেকে থেকে অর্ধদৃষ্টি প্রকাশ পায়। কেমন বেন কষ্টের সঙ্গে কথা বললেন রাজকুমারী। অক্ষুট সুরে বললেন,—আমার নাম লয়ে বললে অমাত্য করবেন না।

—সোনা-দানা আছে কিছু কাছে?

পরিচারিকা প্রশ্ন করলে বেন ডাকাতনীর মত। চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকলো। জ্যোৎস্নার আলোয় তার চোখের কালো তারা বেন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

—আছে, অনামিকায় একটা অজুরী আছে। মুক্তাবসানো।

—হাত-ছাড়া করতে পারবে খুশী মনে?

—কেন? কি প্রয়োজনে?

—পাইক আর বেহারাদের দিতে হবে। নগদানগদি কিছু দিলেই কাজ হবে। কানা-কড়িতে ওদের মন উঠবে না।

—তা বটে। তোমার কথাই ঠিক।

কথা বলতে বলতে রাজকুমারী অনামিকার আঙটি খুললেন। বশোদার হাতে দিয়ে তার মুঠি বন্ধ ক'রে দিলেন। বললেন—আমাদের দেউলে পাকী পৌছেছে, তুমি যা বলার ওদের বল'। আমি ঘরে বাই।

—একা থাকতে তোমার ভয় হবে না বো? তুমিও চল না?

—পাকীতে একেই স্থানান্তর। আমি ঘরে ফিরি, একা থাকার ভয় পাই না আমি। একাই তো আছি। খানিক খেয়ে আবার বিদ্যাবাসিনী বলেন,—দেখো, বিফল যাত্রা না হয়।

জমিদারগৃহের তোরণ-ফটক পেরিয়ে পাকী ততক্ষণে প্রবেশ-দ্বারের কাছে। পাকী নামাতেই বিজুতের শিপার মত এক পলকের মধ্যে রাজকুমারী প্রায় ছুট দিয়ে চ'লে গেলেন যেন। বশোদা শুধু নামলো না। ব'লে থাকলো যেমনকার তেমনি। বললে,—চৌধুরী-গিন্নীর একটা হুকুম আছে। তামিল করতে হবে আমাকে।

পাকীরা শুধালো,—কি হুকুম?

বশোদা গম্ভীর স্বরে কথা বলে। কেমন যেন মৃদুগণ্যের চণ্ডে। বললে,—আসমান দীঘির ঐ তীরে পাকী নিয়ে যেতে হবে, চৌধুরী-গিন্নীর হু'টো গোপন কথা জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

—আমাদের গিন্নীমার হুকুম?

—ঐ গো ঐ। আনন্দকুমারীর সন্ধানে যাবো।

আর কিছু বলতে হয় না। আবার পাকী উঠলো আর চললো নতুন উজ্জমে। গায়ের ঘাম মোছার ফুরসৎ পায় না বাহকরা।

অন্ধরের এক চোরা গুলগুলি থেকে রাজকুমারী এক চোখে দেখলেন, পাকীপানা আবার চললো। আর দেখলেন প্রাঙ্গণ-প্রান্তরে জ্যোৎস্না ধৈ-ধৈ করছে। গাছের শীর্ষে শীর্ষে সোনার প্রলেপ। আকাশ থেকে যেন বুটো বুটো জ্যোৎস্না বরছে। চাঁদের ভঙ্গ পড়ছে সোনালী চিকণ তুলে।

কক্ষধ্বাসে সোপান-শ্রেণীতে উঠলেন বিদ্যাবাসিনী। ঘনকালো অন্ধকার, শুধুমাত্র পরিচয়ের ভরসায় নির্ভয়ে চললেন যেন। নিজের কক্ষে কোন রকমে পৌঁছানো, ততঃপর আর কোন ভয় নাই। ঘরের ভেতর থেকে অর্গল তুলে দিয়ে থাকলেই যথেষ্ট। রাজকুমারীও তাই ক'রলেন। উর্দ্ধ দেহের বস্ত্র আলগা করলেন। কক্ষলগ্ন দালান থেকে আমোদরকে দেখা যায়। নদীতে চোখ রেখে দাঁড়ালেন বিদ্যাবাসিনী। মুক্ত বাতাস আসছে নদীর বুক থেকে। আলাহর ঠাণ্ডা বাতাস।

সোনার চাদর বিছানো নদীতে। চাঁদের আকর্ষণে কিছু যেন উচ্ছ্বসিত। লক্ষ লক্ষ বাহ মেলছে আকাশের দিকে। যৌবনের জোয়ার এসেছে যেন আমোদরের। তাই ডাকাডাকি করছে আকাশের চাঁদকে। জোয়ারের মত নদীর জল কেঁপে উঠেছে আজ। পূর্ণিমা বত নিকটে আসবে, ততই না কি উচ্ছ্বাস উদ্যম হ'তে থাকবে। কুলকুল শব্দ গর্জনের মত শোনাবে দূর থেকে। কাল-বোশেখীর বড়-জলে ফীতকার হয়েছে যেন আমোদর। দূরে কাছে কোথায় হয়তো অশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে আজকাল।

যুঁই ফুলের গন্ধ আনে হাওয়া। আসমান দীঘির তীরে অজস্র যুঁই ফুটেছে সাদা বাতাসের চুবন স্পর্শে। কতকাল আগের এক যমুরাত মনের কোণে স্মৃতির রেখা তুললো। অচেনা অজানা

অনাগত সেই রাজিটার ভীষণ ভয় পেয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন নাবাণিকা কিশোরী বিদ্যাবাসিনী। বাসর-রাতের হাসিঠাট্টা সমঝাতে পারেননি তখন। কুলনারীদের পরিহাস বুঝবেন তেমন দক্ষতা নেই। অস্ত্রের হাতের খেলার পুতুলের মত রাজকুমারী নিজেকে যেন বিকিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ে, বাসরশয্যায় যুঁই আর বেলফুলের ছড়াছড়ি। ঘরের কোণের অলস দীপশিখাটির মত সারা রাত জাগতে পারলেন না রাজকুমারী। ভোর-রাতে ঘুমে ডুবে গেলেন। যুঁইয়ের গন্ধ রাজকুমারীর অঙ্গ থেকে যেতে কত কাল সময় লাগে।

কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়ালেন বিদ্যাবাসিনী। মুখে-পায়ে জল দিলেন। আর এক পাত্র গড়ালেন। পান করলেন আকণ্ঠ। তারপর চকমকি য'বে দীপ ধরালেন। আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকল কিছু চোখে পড়লো। প্রথমে দেখলেন, তুলট কাগজের রাশি, মসীপাত্র, লেখনীদণ্ড। চন্দ্রকান্তর দেওয়া সেই জ্বরাজীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথিখানি। মহাকাব্যের মূল লেখা আছে ঐ পুঁথিতে। একান্তই হুশ্রীপা ও হুমু'ল্য।

পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে থেকে থেকে। ভয়ে আর ভাবনায় বুক কাঁপছে। অসম্ভব কাঁটা বিঁধছে যেন বুক। পালাতে বসলেন বিদ্যাবাসিনী! অবসন্নতায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় দেহ এলিয়ে দিয়ে। চিন্তা-অবিরত জ্বালায় তাও যেন পারলেন না।

চৌধুরীকুমারী কোথায় এখন কে জানে! রাজকুমারীর চোখে ভরাবহ দৃষ্ট ভাসতে থাকে। অত্যাচার আর উৎপীড়নের ছবি। আনন্দকুমারী এখন বিদেশীর কবলে। তার খেয়াল-খুশী চরিতার্থের সামগ্রী। চোবাই আর লুঠের মাল।

গঙ্গা-দীর এক কিনারায়, এক ভাঙ্গা ঘাটে ম্যালেরির তরী নৌর বৈধেছে। তীরের একেবারে কাছাকাছি নয়, কিছু দূরে। হিংস্র জানোয়ারের ভয়। বিশেষতঃ বাঘের ভয়। ক্ষুধার জ্বালায় কত গহিনরাতে তীরলগ্ন নৌকার বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। ঘুমন্ত যাত্রী আর মাঝিদের হু'-একজনের ঘাড় কামড়ে ধ'রে নিয়ে অদৃষ্ট হয়ে যায় অন্ধকারে। ভোরের আলো ফুটলে দেখা যায়, রক্তধারা পথ সৃষ্টি ক'রেছে।

তাই আগভোগেই সাবধান হয় ম্যালেরি। বজরা আর তীরে ভিড়ায় না। তীরের জঙ্গল থেকে গর্জন শোনা যায় বাঘের। কেউয়ের আত্ননাদ ভাসে গঙ্গার ওপরে। ম্যালেরির তেলেকী সিপাইরা বন্দুক ধ'রে বসে আছে বজরার ছাদে। বাঘ আবার সাঁতারাতে পারে না কি! গভীর জল সাঁতারে নৌকা আক্রমণ করে অতর্কিতে। শিকার ধ'রে নিয়ে সাঁতারে পাশায়। জল থেকে ডাকায় ওঠে, মুখে থাকে আঘমরা মান্নব।

বাঘের গর্জনে ভীত আনন্দকুমারী। ম্যালেরিকে জড়িয়ে ধ'রে আছে সম্মোহে। ম্যালেরি তো হেসেই খুন কৃষ্ণকুমার ভয় পাওয়া দেখে। নদীর এক প্রান্তে হাসির প্রতিফলি ভাসিয়ে অটহাসি হাসছে ম্যালেরি। তার হাসির চাকল্যে বজরা হলে হলে উঠছে।

## লোকমাগ্ন তিলকের সঙ্গে বন্ধের এক হোটেলের এক সকালে

জগে উঠি। সেটা মনে হয়েছে এক সৌভাগ্যের সকাল, সত্যিকারের সুপ্রভাত! হোটেলটা অবশ্য কারণ নয়, সাধারণ মাঝারি হোটেল; বন্ধে শহরের জন্তও সৌভাগ্য নয়। শেঠ নই, বন্ধে শহর অর্ধপূর্ণ আকর্ষণে কখনো টানেনি। ঐ অঞ্চলে পুণাই মনকে বেশী নাড়া দিয়েছে। এই যুগের মারাঠিদের কন্ঠের সাধনা পুণাকেই ঘিরে ঘন হয়ে গড়ে উঠেছে। রাণাডে, গোখলে, তিলক পুণাই লোক। আর লোকমাগ্ন তিলকের অস্তিত্ব হয়ে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে আমরা এই হোটেলের এসে উঠছি। আমরা বন্ধে পৌছি আগের দিন দুপুরে। তিলক আসেন রাত্রে। পরের দিন সকালে তিলক বাবা ও মাকে (এবার মাও সঙ্গে ছিলেন) অভিবাধন জানাতে আমাদের ঘরে আসেন। আমি তিলককে প্রণাম করি। সুপ্রভাত নয় কি?

হোটেলটি বিশেষ করে মারাঠিদের নাম 'সর্দার-গৃহ'। মারাঠি অবস্থাপন্ন ঝাঁরা—অর্থাৎ জমিজমা ঝাঁদের আছে তাঁদের বোধ হয় গৌরবে সর্দার বলে। এই রকম অভিহিতাদের জন্তই যে প্রাধান্য: এই হোটেল, নামেই বোধ হয় তা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। বন্ধে শহরের সম্পদে মারাঠিদের ভাগ খুব বেশী দেখিনি। সেটা ভোগ করেন পার্শীরা, খোজা সম্প্রদায় ও গুজরাটীরা। বন্ধে হলোও বৃত্তিতে এঁরা সব বণিক। মারাঠিরা মনোবৃত্তিতেও বণিক নন। কাজে-কন্ঠে বন্ধে শহরে মারাঠিরা ঝাঁর থাকেন, সাধারণ ভাবেই তাঁরা প্রায় থাকেন। এমন কি, দেশপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী এম, আর জয়কাবের বন্ধের বাড়ীতেও বিভবের আতিশয্য দেখিনি। ঝাঁদের বন্ধে শহরে আসতে হয় মাঝে মাঝে তাঁরা অনেকে সস্ত্রীক 'সর্দার গৃহে'ই ওঠেন। এটা অনেকটা পারিবারিক হোটেলের মত। কিন্তু এর আসল আভিজাত্য তিলক এখানে ওঠেন বলে।

তিলক বাবাকে নিয়ে সকালেই এক আলোচনায় বসলেন। তিলকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার আছেন—আরও অনেকে। আলোচনার জরুরী প্রয়োজন ছিল। সময়টা ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনো থামেনি, তবে থামবার মুখে। তিলক সদলে ভাঙ্গের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই সময়েই বিলাত যাবেন স্থির করেছেন। সেই দলে আছেন—নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার, দাদাসাহেব গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ খাপাদে, বলবন্ত গঙ্গাধর তিলক নিজের ও বিপিনচন্দ্র পাল। বাহিরের দিক থেকে প্রয়োজন—ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁর "Indian Unrest" বইয়ে তিলকের রাষ্ট্র-জীবনকে যে হয় করতে চেষ্টা করেছেন তার বিরুদ্ধে চিরলের নামে বিলাতে মানহানির মামলা রুজু করা। এটা নিতান্তই বাহিরের প্রয়োজন। আমার মত বৃদ্ধকের মনে হয়েছিল, তুচ্ছও বটে। বিদেশী শত্রুপক্ষের নিন্দা সব সময়েই দেশসেবকের অঙ্গের ভূষণ। তার জন্ত দেশের এতগুলি মাথার মণিকে নিয়ে লড়াইয়ের বিপদের মাঝে সমুদ্রপাড়ি দেবার কি এমন প্রয়োজন? কিন্তু এসময়েই বিলাত যাওয়ার আসল প্রয়োজন দেশের জন্ত—তিলকের নিজের জন্ত বা তাঁর দলের জন্তও নয়।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা; একটু খুলে বললে বোধ হয় ভাল বোঝা যাবে। ১৯১৪ সালের দুনিয়া-ভোর লড়াইয়ে ইংরেজের অবস্থা এক সময় বেশ সঙ্কট হয়ে উঠে। তখন তাঁরা ভারতের সম্পূর্ণ আশ্রয়শাসনের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সফল হ'তে পারে, আর আস্তে আস্তে এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে যে তাঁরা সহায়ও

## বিচিত্র-ভ্রমণ

জ্ঞানাজ্ঞান পাল

হ'তে পারেন—এমন কথা এক রকম স্পষ্ট করেই বলেন। মার্কিনপন্থি উডরো উইলসনের চোদ্দ দফার বিখ্যাত বাণী প্রায় এই সময়েই প্রচারিত হয়। তাতেও আমাদের মত পরাধীন জাতিদের অনেক আশার কথা শোনান হয়। যুদ্ধটা পুরোপুরি থামার আগেই ভারতের আশ্রয়শাসন সম্বন্ধে পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি যদি ইংরেজের কাছ থেকে আদায় করা যায়, তারই জন্ত তিলক সহকর্মীদের নিয়ে বিপদের মাঝেও বিলাত যাওয়ার সংকল্প করেছেন।

তিলককে ইংরেজ বোঝেনি—তিলকের চরিত্রচিত্র আঁকবার সময় বিপিনচন্দ্র একথা বলেছেন। কথাটা হয়ত ঠিকই। আমাদের সময়ে দেখেছি—ইংরেজ এদেশের লোককে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। এক ভাগ, ঝাঁদের ঝাঁর তাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয় বা হ'তে পারে; আর এক ভাগ, ঝাঁর তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইংরেজের স্বার্থের সহায় তিলক কখনো হ'তে পারেননি। তাই তিলককে এত অপবাদে তাঁরা ভূষিত করেছে। তিলককে ইংরেজ বুঝতে না পারলেও তিলক কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি ভালই বুঝেছিলেন। তিনি জানতেন, যুদ্ধের চাপে ইংরেজের মুখে যে সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, যুদ্ধ থেমে গেলে—আর ইংরেজ যদি তখন জরুরি কোঠাতে থাকে—তা আর বাস্তবে পরিণত হবে না। সেন্সু যুদ্ধ থামবার আগেই একটা ফয়সালায় চেষ্টা করা দরকার।

কিন্তু কেবল বিলাতে গেলেও হবে না। ইংলও ও আমেরিকা তখন, কতকটা এখানেরই মত প্রায় একজোটে ঝাঁর। আমেরিকার কাউকে পাঠান যায় না? সে আলোচনাই তিলক, বিপিনচন্দ্র ও কেলকার করছিলেন, একসঙ্গে হয়েই সকালবেলা 'সর্দার-গৃহে'র এক ঘরে বসে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন বিপিনচন্দ্র তাঁর ঘরের দিকে; ডাকলেন আমাকে। আমাদের প্রায় পিছন পিছন দেখি একটা নতুন টাইপরাইটার যন্ত্রও এলো আমাদের ঘরে; সঙ্গে বাবে ব'লে সবে কেনা হয়েছে। আমায় বললেন—মেসিজে বসো, একটা চিঠি লিখতে হবে। চিন্তায় গভীর মুখ। চিঠিটা বাবে তিলকের নামে—রবীন্দ্রনাথের কাছে। যে চিঠিটা বিপিনচন্দ্র বলে গেলেন ও আমায় টাইপ করতে হলো, তার মর্মটা এই—“রবীন্দ্রনাথ যদি আমেরিকায় এখন যান, রাজনীতিক কোন দলের পক্ষে নয়, রাজনীতিক কোনো কাজেও প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। ভারতের সাধনা তাঁর বাণীতেই এ যুগে সব চেয়ে বেশী মূর্ত হয়েছে। সেই সাধনার কথা যদি মার্কিনের সমাজের কাছে তিনি নতুন করে বলেন ও সারা দুনিয়ায় যদি সেটা প্রচারিত হয়, তা ভারতের আশ্রয়শাসনের সম্ভাবনা বা যুদ্ধের গতিতে জগে উঠেছে তা অনেকটা শক্তি পেতে পারে। নেবেন কি তিনি এ ভার?” তাঁর পাখের ও খরচের জন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও তিলক করলেন। বন্ধের একজন ধনী পার্শী তিলকের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। নাম তাঁর এস, আর, বোমানজি। এই চিঠি ও এই টাকা নগদ রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার ভার তিলক দিলেন তাঁর উপর। তিলকের নির্দেশ এই চিঠি ও টাকা নিয়ে বোমানজি যেন সেই রাতেই কলিকাতা রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ তিলককে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু রাজনীতিক



উদ্দেশ্য পেছনে রেখে রাজনীতিক কাজের জন্য সাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে তিনি আমেরিকা যেতে রাজী হলেন না।

ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে এসময় রবীন্দ্রনাথ থাকিণে গেলে ভাল হয়, এক কল্পনা আমার মনে হয়েছে, বিপিনচন্দ্রের তিলকের নয়। একটু ভাবলে মনে হবে এটা কল্পনাই। আর কল্পনা বাঙ্গালীর সহজাত, মাথাটির নয়। স্বদেশীয় নতুন প্রবাহ বীরা বাংলায় ও ভারতে এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রদূত। স্বদেশপ্রেমের বান আমাদের জীবনের মরা গাঙ এসেছিল ১১০৫-৬ সালে, সত্য; কিন্তু সে বান ১১১৬-১৭ সালে অনেকখানি নেমে গেছে। ইংরেজের নির্যম নিপেষণে ও আমাদের অজ্ঞাত্য সে স্রোত তখন প্রায় কষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলক প্রমুখের নতুন রাজনীতির সম্বন্ধ অনেকটা ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ ভাবেও যে এরকম কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবেন না, এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু তা সাধারণ তিলকের এই চিঠি ও এত টাকা অবলীকৃত্যে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানোর মধ্যে যে মহত্ত্ব দেখা যায় তা স্ববীয়। তখনকার দিনে রাজনীতিতে বড় অঙ্কের টাকা এখনকার মত সহজে আসত না। রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করলে ও তা দিয়ে ভারতের সাধনা বাস্তবে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেলেও তিলকের নাম তার সঙ্গে যুক্ত হত না। তিলকের এই চিঠি ও টাকার কথা সম্পূর্ণ অজানা থাকবে সাধারণের এই ছিল নির্দেশ। ভারতের এই সর্বজনমাগ্ন লোকনায়ক পদ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ সম্বন্ধে এমনই নিষ্পৃহ ছিলেন। মনে হয়, এ যেন কোন অনাসক্ত সাধু জীবনের এক কাহিনী। অথচ তিলক সাধুসন্তদের মত কুহুমদান করে এ অনাগ্নিক অজ্ঞান করেছিলেন, তুমি। দেশসেবা কেবল তিলককে নয়, তাঁর সহকর্মী অনেককেও এভাবে সহজ ত্যাগী হতে শিক্ষা দিয়েছিল। সত্য দেশসেবার নাকি এরকমই হয়। কিন্তু তাই যদি হয় ত দেশের সেবার আমরা এখন এত লোভাতুর ও প্রতিষ্ঠাপ্রিয় হয়ে উঠছি কি করে?

তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের বোঝাইয়ের মহিলা-সমাজ এক অভিনব নবন। গুরুগাটী এক বাণিজ্যপতির বাড়ীর সংগ্রহ উজানে এই অমৃত্যুনের আয়োজন হয়। এই সভায় সব মহিলা তিলক, কেলকার, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ তার জন ও আমি ছাড়া। এরকম মহিলাদের সভা আগে দেখিনি। সভায় বেশী বক্তৃতাচি হয়েছিল বলে মনে নেই। পাণী, গুরুগাটী, যারাটি মহিলাদের শ্রদ্ধার দান হিসাবে একটা বড় টাকার খেলে লোকমাত্র তিলকের হাতে দেবার জন্যই এই সভার আয়োজন। সভার বীরা এসেছিলেন তাঁরা পরীষের ঘরের ঘরে বা বৌ একথা বলব না—ধনীগৃহেই প্রায় সব পুত্ৰী বা কন্যা, শিক্ষিতা ও বটেই, স্কলারও। কাউকে নতুন ভালবাসলে মেয়েদের সৌন্দর্য নাকি বেড়ে যায়। গোবিন্দবাস তাঁর এক বিখ্যাত কবিতার রাগারূপের গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে রাগা নবমুখবাগিনী এ কথা বলেছেন। আমরাও মনে হয়েছিল দেশের প্রতি নব অমুখ্যে এই সব মহিলাদের রূপ এক নতুন শোভাতে খুলে গিয়েছিল। মহিলে এত স্মরণ তাঁদের লেগেছিল কি করে? সভা অল্প পরে ভাঙল। তিলক ও তাঁর সহকর্মীরা উঠে পাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব ঘরে পরম আত্মীয়কে বিদায়ের সুখ

স্বপ্নেরা যেমন ঘেরে, সে-রকম ঘিরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন বেরবার বাস্তব দিকে। মুখিল হ'ল আমার। যুবক বটে, কিন্তু এমন পৌকর সংগ্রহ করতে পারলাম না নিজে মনে, যাতে এই মহিলা-বাহ ভেদ করে তিলক-বিপিনচন্দ্রের কাছে এগিয়ে যাই। বাস্তবে গিয়ে তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন বা কোন তরুণীকে পাঠাবেন আমার স্থানে ভাবতে লজ্জা হ'ল। কিন্তু এগুই কি করে? বাবার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজ করি; চোখে-মুখে পুত্রত্বের ছাপ বোধ হয় তখন কিছু কুটে উঠেছিল। একটু পরে মাতৃ-সমা এক মহিলা ইঙ্গিতে ডেকে সঙ্গে করে দ্রুত বাস্তবে নিয়ে এলেন আমাকে। তাঁর মুখে মেহ ও কৌতুক-মেশানো চাপা হাসি, এত দিন পরেও চোখের উপর ভেসে উঠেছে।

বসেতে তিলক থাকতে আসেন নি, বিপিনচন্দ্রও নন। বসে থেকে যাবেন তাঁরা মাল্লাজে, মাল্লাজ থেকে কলকাতা, সেখানে উঠাবেন বিলাতের জাহাজে এই ব্যবস্থা। সবাই একসঙ্গে বসে ছাড়লুম। মাঝে বেলগাঁওতে এক অপরাহ্নে আসতে হ'ল। একটা ভাড়া মন্দিরের সামনে বড় ময়নানে সভার আয়োজন হয়েছে। আমরা যাদের অশিক্ষিত বলি তাদেরই বিরাট জনতা। শিক্ষিত স্থানীয় বীরা নিশ্চয় তাঁরা সভাতে ছিলেন, কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে তাঁরা কেবল মিশে নয় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। সংখ্যার পার্থক্যে এটা হয়নি, হয়েছিল সভার যে চেহারাটা কুটে উঠেছিল তাতে। বক্তা তিলক একা; আর তিলকের দৃষ্টি, ভাষা, ভঙ্গী সব নিবদ্ধ ছিল এই অশিক্ষিত জনতার উপর। আমি মাথাটি বুলি না, কিন্তু তিলকের দেশপ্রেমের ব্যাখ্যানেয় সম্মোহন শক্তি জনতার মুগ্ধত্ববিতে দেখতে পেলাম। জনতার মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার মনে হচ্ছিল, দেশত্যাগিত বক্তা ও শোভা যেন এক হয়ে গেছেন।

সবাই তিলকের সঙ্গে বিলাত যাউবেন না, কিন্তু বসে ছেড়ে ম'দ্রাজগামী রেলের যখন ট্রি তখন মস্ত এক দল। যেন অনেক বরষাত্রী একটা বড় বিয়েতে যাচ্ছি। দ্রুতগামী মেল ট্রেনে উঠেছিলাম কি না মনে নেই, কিন্তু সারা রাত অনেক ট্রেনে গাড়ী ধোঁমাছিল। এক একটা ট্রেনে ট্রেন থামে, আর জনতার ভয়মুখনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাটেকরমটা। তিলকের বিলাত যাওয়ার সম্বন্ধটা যেন জনপ্রিয় কোন রাষ্ট্রনায়কের বিজয় অভিযান। সম্বন্ধনার উৎসাহে সেরকমই মনে হয়। এই উজ্জ্বল জনতার মধ্যেও যে একটা বড় সংগঠন ছিল বুঝলাম যখন দেখলাম, প্রতি জনতার মুখের হাতে একটা করে টাকার খসি—গ্রামবাসীর সংগৃহীত দান তিলককে দেবার জন্য। তিলকের কামরায় তাঁরা টাকার খলি, ফল, ফুল, মিষ্টি রেখে যাচ্ছেন। যে কামরায় রাখছেন সে কামরায় তিলক কিন্তু নেই। একটা বেঞ্চিতে ওপাশ ফিরে একজন ববীরান মারাঠি শুয়ে আছেন—সামনে তাঁর ফুলের পাগড়। বাস্তব জগৎ তিনি তিলকের পদে অভিযুক্ত হয়েছেন। জনতা তিলকের এই শায়িত প্রতিনিধিকে তিলক ভেনে প্রদ্বার অর্থাৎ রেখে যাচ্ছে। এ না! হলে সারা রাত তিলককে এরকম ভ্রমে যেতে হয়; তিলকের ভগ্নবাহ্যে তাঁর অমুরক্তরা এ হতে দিতে পারেন না।

মাল্লাজে পৌঁছলাম। তিলক ও তাঁর দলের আমরা সকলে জীবন্ত বৈশাখের অতিথি। ভুবন-বিখ্যাত এই মহিলার জীবনগতি

সোজা বা সহজপথে চলেনি। ধরত্ৰোতা নদী যেমন নিজে পথ কেটে বহু-কুটিল ভাবে সাগরে গিয়ে মেশে, প্রতিভাশালিনী এই নারীর জীবনও তেমন নানা বাধা-বিঘ্ন বড়-বড়ার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছিল। আমরা এবার মাস্তাজে যখন, তখন তাঁকে দেখি এখন বয়সসী—বোধ হয় সত্তরের কাছে। কিন্তু অমর্য উৎসাহ ও কর্তব্যশক্তি। ১১১৭ সালে কংগ্রেসের অধিনেত্রীর পদে তিনি বৃত্তা হ'ন। তার আগেই বোধ হয়, ১১১৪ সালে ভারতীয় হোমরুল লীগ সংগঠন করেন। তাঁর তত্ত্ববিজ্ঞা সমিতি বা Theosophical Society'র মত হোমরুল লীগের শাখাও ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাতেও হয়, কিন্তু মনে হয় বাংলাতে তেমন প্রাণ পায়নি। বসে অঞ্চলেও হয়; আর তার সমস্ত ভার তিলক ও তাঁর দলের উপর দেওয়া হয়। শ্রীমতী বেনাশঙ্কর কোনও কর্তব্য থাকে না। শ্রীমতী বেনাশঙ্কর সাংসারিক জ্ঞানও যে প্রশর ছিল, এ থেকে বুঝতে পারি। তিলকের নেতৃত্বে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বা মধ্য, অস্ত্র কাঁবো দ্বারা তা সম্ভব ছিল না।

রাজনীতিক পরিস্থিতিটা ১১১৪ সালে কি রকম ছিল মনের সামনে তার ছবিটা তুলে ধরা থাক। ১১১৪-র আগেই বাহিরের প্রকাশে স্বাধীনতার আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাজ্রাবে, মাস্তাজে—নির্বাসন বা দৌর্ব কারাবাসের পর ফিরে এসে নেতারা দেখলেন তাঁদের কাজের ক্ষেত্র সব বিপদাশ্রয় হয়ে গেছে। যুবকেরা অনেকে প্রাণ দিয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে বাহিরে কাজ করার অবস্থাটা যেন আর নেই। ১১১৪-র বিশ্ববুদ্ধে সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা বা স্বাধীনতার বন্ধনের বেদনা কিছু বেশী প্রবেশেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও নতুন জোরে মাথা চাপা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। অন্ধকার রাতে ঘন মেঘের আকাশে বিদ্রোহের বলকের মত বাংলায় মহারাষ্ট্রে, পাজ্রাবে ও মাস্তাজে দেশপ্রেমিক যুবকদের আত্মবলিদানে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে নিবে যায়নি, তলায় চলে গিয়েছে মাত্র, তা জানিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থাতেই শ্রীমতী বেনাশঙ্কর তাঁর হোমরুল আন্দোলন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তখন উচ্ছ্বাসে যাই মনে হোক না কেন, এখন বলতে পারি, এ আন্দোলন এ দেশে তেমন শিকড় গজায়নি। ছুঁটো কারণ তার মনে হয়েছে। এক, এর পিছনে সর্বদ্বন্দ্বী সম্পূর্ণ মুক্তি বা স্বাধীনতার আদর্শ ছিল না, যা বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতার আন্দোলনের পিছনে ছিল। দ্বিতীয়, এ আন্দোলন ইংরেজের সঙ্গে থেকে, ইংরেজের কোন ক্ষতি না করে, আইনের মধ্যে চলে, নিজেকে বাঁচিয়ে এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করত। বাংলা এবং মহারাষ্ট্রও নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য বেলী রচনা করতে গিয়েছিল।

তিলক ত নেই, বিপিনচন্দ্রও নিছক ভাববিলাসী ছিলেন না। গভীর মননশীলতার তাঁদের মন সদা-জাগ্রত ছিল। যে বিপিনচন্দ্র ১১০২-৭ সালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করেন, ও সব নদী যেমন সাগরে মেশে, দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা তেমন এই সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বাধেশিকতার মধ্যেই তাদের সত্য সার্থকতা খুঁজে পাবে, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তিনিই ১১১১-১২ সালে নিরকুশ সংকীর্ণ জাতীয়তা অপেক্ষা ভারতের পক্ষে ইংলও, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে

সমান পদ ও প্রতিষ্ঠার এক বৃহত্তর রাষ্ট্র-সংঘ গঠনের চেষ্টা যে প্রেরণকর—এ কথা বলতে আরম্ভ করেন। স্বপ্রতিষ্ঠিত ভারতের সঙ্গে ইংলওর এরূপ নতুন সংঘ গড়ে উঠতে পারলেই আমাদের ও ইংরেজের মধ্যে যে মণ্ডাস্তিক বিরোধ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল, তারও একটা মীমাংসা হ'তে পারে—একথাও তিনি বলেন। যেমন স্বদেশীর প্রথম যুগে তেমন এখানেও লোকমাত্র তিলকের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মনের একটা গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়। আর এই উদারতর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার প্রসারে শ্রীমতী বেনাশঙ্কর হোমরুল আন্দোলন সহায় হ'তে পারে। এ ভাবেই মনে হয়েছে, শ্রীমতী বেনাশঙ্কর সঙ্গে তাঁদের এক নতুন দৃঢ়তা ও সহযোগিতা গড়ে উঠে।

মাস্তাজে শ্রীমতী বেনাশঙ্কর থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আশ্রমে—আড়িয়ায়ে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান ও বহুতর অট্টালিকার সমৃদ্ধ এই আশ্রম। হোমরুল আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে এর কর্তব্যব্যস্ততা অনেক বেড়ে গিয়েছে। একটা বাড়ীর দোতলার মা ও আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সাবাদিন ও রাত্রে বড় অংশ যায় বাবার নানা সভা, অস্থান ও অভিনন্দনাদির ব্যস্ততায়। বোধ হয় যে দিন সকালে মাস্তাজে পৌছি সেদিনই রাত্রে আড়িয়ায়ের আশ্রমে তাঁদের প্রকাণ্ড বট-গাছের তলায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে এক সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা হয়। গাছের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার ঝোলান হয়েছে অপূর্ণিত ছোট ছোট আলো, নানা রংয়ের। আর প্রায় দু'হাজার লোক আমরা ার তলায় খেতে বসেছি। পরিবেশন হচ্ছে নিঃশব্দে, কলের চাউতেও বেশী শৃঙ্খলায়। এ-হেন এক মায়াপুরী তৈরী হয়েছে। এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য পরিবেশে এত বড় ভোজসভার আয়োজন এর আগে বা পরে দেখিনি।

কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে (শ্রীমতী বেনাশঙ্কর ১১১৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে নেত্রীত্ব করেন,) হোমরুল আন্দোলনের কর্তী হিসাবে মাস্তাজের বিশিষ্ট নাগরিক সকলকেই শ্রীমতী বেনাশঙ্কর এই ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। এত বড় নেতৃ-সম্মেলন দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে, এক সঙ্গে খাওয়া সাধারণের ভাগ্যে প্রায় কখনো ঘটে না।

মাংসটি মেয়েরা বাহিরের কাজেও কত ক্ষিপ্ত ও দক্ষ, তার এক পরিচয় আড়িয়ায়ে পাই। মার দেখাশুনার ভার ছিল একটি মারাঠি বধুর উপর। লোকমাত্র তিলকের একজন অন্তরঙ্গ সহকর্মীর তিনি পুত্রবধূ। তিনি ও তাঁর স্বামী দু'জনেই এখানকার কোন শিক্ষারতনের কর্মী, হ'জনেই উচ্চশিক্ষিত। মার ইচ্ছা, মাস্তাজে বা দেখার আছে সব দেখেন। এই বৌটি মার জন্য পরদিন সকালে এক মোটরের ব্যবস্থা করেছেন। গাড়ী সকালেই আসার কথা; দেয়ী হচ্ছে অন্ন। মা হয়ত একটু ব্যস্তও হয়েছেন। তাই না দেখে বৌটি তরতরিয়ে নেমে গিয়ে গেটের কাছে যে সাইকেল ছিল পাকা চড়িয়ে মত তাতে চড়ে আশ্রমের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মোটর নিয়ে এলেন তখনই সঙ্গে করে। উপরের বারান্দা থেকে মা দেখে ত অবাক! শ্রোটা বাঙ্গালী গৃহিণীর যে ধরণের বীর লক্ষ্যায় নতযুগী বৌ দেখে অভ্যাস, এ তার একেবারে উল্টো। তবে মার এরকম বৌও ভাল লেগেছিল নিশ্চয়। কলিকাতায় অনেক বার এ গল্প

করেছিলেন। বোটি কাজের, মাকে নিয়ে সারাদিন শহর ঘুরতে পারেন, এত সময় নেই। মোটরের চালক সব চেনেন, তাঁরই উপর ভর দেওয়া হ'ল মাকে সব দেখাতে। আমি মার সঙ্গে।

মাকে শহর দেখিয়ে ছপরে বাবার এক বিশেষ মাদ্রাজী বন্ধুর বাড়ীতে আমরা গাব। সকালেই শহরের বিভিন্ন অংশে একাধিক সভাতে তিলক ও বাগাকে যেতে হবে শ্রীমতী বৈশাখের সঙ্গে—বিদায় অভিনন্দন নাগরিকেরা দেবেন তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের। সময়ের যে হিসাব শ্রীমতী বৈশাখ করেছিলেন তা আর রাখা সম্ভব হয় নি, সাধাবণের উৎসাহের আতিশয্যে। এদিকে ছপুর ত প্রায় হয়। তাঁদের এক সভায় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। সভা সবে ভেঙেছে। শ্রীমতী বৈশাখ তাঁর প্রকাণ্ড বোলসরহেস গাড়ীতে তিলক ও বিপিনচন্দ্রকে নিয়ে উঠলেন। এই নামী গাড়ী শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী যমুনালাস দ্বারকানাথ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। আরও ২৩টি সভায় তখনো তাঁদের যেতে বাকী। আমরা কি তাঁদের সঙ্গেই ঘুরবো? বাবাকে জিজ্ঞাসা করি কি করে? ভিড় ঠেলে ত এগুলাম তাঁদের গাড়ীর সামনে। গাড়ী ইতিমধ্যে অল্প অল্প চলতে আরম্ভ করেছে। পাদানিতে উঠে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম—কি করব মা ও আমরা। শ্রীমতী বৈশাখের চোখ তখন পড়েছে আমার উপর। তাঁর গাড়ীতে তাঁর অতিথিদের বিরক্ত করছে এক যুবক! অমনি তাঁর মুখ থেকে বেরুলো নেমে যাও, নেমে যাও এখনি। ইংরেজীতে অবগত তিনি বলেন, আর তাঁর স্বাভাবিক জোরে বসীতে। আমার অভিমানে তাতে যেন আরও বেশী লেগেছিল। নেমে আমি গেলাম তখনি। বাবা বললেন, ‘আমাদের সঙ্গে চলো।’ শ্রীমতী বৈশাখ অবগত বোঝেননি আমি বিপিনচন্দ্রের পুত্র। তাঁদের জরিপাড় মাদ্রাজী চান। কিনেছি ইতিমধ্যে; তাঁদের মত ঝুলিয়ে দিয়েছি গায়ে; পায়ে মাদ্রাজী চটি; রংও তাঁদের মত। স্তবরাং শ্রীমতী বৈশাখের চোখে আমি মাদ্রাজী এক যুবক। কিন্তু হই না কেন তা? কোন যুবকের প্রাণে কি এমন করে আঘাত দিতে হয়—মনের ব্যথার ভাবলাম। আর ভাবলাম, তিলক কি বাংলার কোন নেতা কি কোন যুবককে এভাবে বলতে পারতেন?

সেদিন বিকালে এক সভা ছিল। বহুটা মনে আছে এক মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে। মাদ্রাজের জনতা বিপিনচন্দ্রের পরিচিত। তিলক ও বিপিনচন্দ্র এসভায় বক্তৃতা করেন। সভার পরে সে রায়েই আমরা কলম্বোর দিকে রওয়ানা হ'ব, কথা। আমি ভেবেছিলাম সোজা বোধ হয় ট্রেনেই যেতে হবে। এরকম বড় সভায় বাবা আমার সন্ধে একটু ব্যস্ত হ'তেন মধ্যে মধ্যে দেখেছি—হারিয়ে যাবো ব'লে নয়, হয়ত পিছিয়ে থাকব এই ভয়ে। সেজন্ত ডাঃ আক্কেলের উপর ভর দেন, তিনি যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখেন। ডাঃ আক্কেল শ্রীমতী বৈশাখের শিষ্য ও বনিষ্ঠ সহকর্মী। দক্ষিণগামী ট্রেনের তখনো কিছু দেরী ছিল। তিলক প্রমুখের গাড়ীর সঙ্গে দেখি যে গাড়ীতে ডাঃ আক্কেল আমায় নিয়ে উঠলেন, সে গাড়ীও চুকল ফের আড়িয়াবে, থামলো শ্রীমতী বৈশাখের বাড়ীর নীচে। দোতলায় উঠলাম—বসবার বড় ঘর—আলমারী, টেবিল আর বই কাগজপত্র ভরা, কিন্তু অগোছালো নয়। শ্রীমতী বৈশাখ এসেই ক'থানা চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন—বিলাতে তাঁর অমুসলিম

ও পরিচিত বন্ধুদের; তাঁরা যেন তিলককে সাহায্য করেন বহুটা সম্ভব। এই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তিলকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যুরোপে অনেক আগেই পৌঁছিয়েছে। কিন্তু নবজাগ্রত ভারতের তিনিই যে অবিসম্বাদী নেতা, শিক্ষিত ইংরেজ সমাজের কাছে এটা ভাল কবে জানান দরকার। চিরলের ‘Indian Unrest’ বইয়ের অপপ্রচারে বিলাতে তিলকের নেতৃত্বের যে ক্ষতি হয়েছে তার প্রতীকার করা একারণেই প্রয়োজন। শ্রীমতী বৈশাখ দ্রুত চিঠিগুলি লিখে চললেন—নিজের হাতেই। আর শ্রীমতী জিনরাজদাস অতিথিদের চা পরিবেশন করতে লাগলেন। তিলককে চা দিলেন শ্রীমতী বৈশাখের নিজের সোনার পেয়ালায়; অস্ত্রেরা ও আমিও চা পেলাম রূপোর পেয়ালায়। কপালের লিখন ছিল, সকালে বাঁধ কটু ভাষণ শোনা, সন্ধ্যায় তাঁরই ঘরে তাঁর দেওয়া চায়ে অভ্যর্থিত হওয়া। হুঁটার কোনোটাই আমি অবগত প্রকৃত তেতু নই।

তিলকের এই সমাদর সাধারণ প্রীতি বা আতিথ্যের অঙ্গ বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল বোঝা হবে। এঁদের মধ্যে দীর্ঘদিনের স্বাভাবিক কোন প্রীতি ছিল বলে জানি না। তিলক প্রমুখের ১১০-৫৬ সালের রাজনীতি শ্রীমতী বৈশাখের কোনো সমর্থন পায়নি। বিপিনচন্দ্রের ঐ সময়ের রাজনীতিক চিন্তাকে তিনি ‘প্রতিভার বিকৃতি’ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু ১১১৩-১৪ সালে শ্রীমতী বৈশাখ দেখলেন, দেশে এক নতুন শক্তি জেগেছে। এটা যে কত বড় শক্তি, তা তিলক প্রভৃতিও বোধ হয় বোঝেন নি, এমনই আশ্চর্য-ভোলা ছিলেন তাঁরা। বাংলায় এ শক্তি সংহত পৃষ্ঠপুত্র হয়নি, দিকে দিকে এর প্রকাশ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মাত্র। মহারাষ্ট্রের যে সংহতি তিলকের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল, তা বিদেশীর শক্তিকে কেবল আঘাত করার জন্তই। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে বা পাঞ্জাবে স্বদেশীযুগের সাধারণ মৃতপ্রাণ জাতির প্রাণে যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল, আমাদের দেশে ইংতহাস এখনো তার হিসাব কষেনি। এর সম্ভাবনা যে কত বড়! শ্রীমতী বৈশাখের চোখেই বোধ হয় তা প্রথম ধরা পড়ে।

হোমরুল আন্দোলন তিনি আরম্ভ করেন ১১১৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে তিলক প্রভৃতিকে ফের টেনে আনেন ১১১৫ সালে। মুসলমান নেতৃত্বের সঙ্গেও একটা যক্ষার চেষ্টা হ'ল এসময়। এভাবে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে শ্রীমতী বৈশাখ এমন একটা সংহতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, যা রাজনীতিক সকল শক্তি এই নতুন নেতৃত্বের হাতে আসে শ্রীমতী বৈশাখই আমাদের রাজনীতিক জীবনে বোধ হয় প্রথম যিনি নেত্রী কামনা করেন, শুধু তাই নয়, একনায়কত্বও চান কিন্তু তিলকের নেতৃত্ব স্বতঃ গড়ে উঠেছে সাধারণের মধ্যে গত চল্লিশ বছরের উপর একনিষ্ঠ দেশ-সেবায়। সেই নেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হ'তে চান শ্রীমতী বৈশাখ প্রথম থেকেই তারই প্রকাশ আমরা দেখি এবারে তিলকের সমাদরে। ১১১৭-১৮ সালে লড়াইয়ের গতিতে ভারতের আত্মশাসন লাভের সম্ভাবনা জেগে উঠে, আগেই বলেছি। ইংরেজের সঙ্গে তার জন্ত যে রকম প্রয়োজ্য তার তার একমাত্র লোকমাত্র তিলকের উপরেই দেওয়া যায়; শ্রীমতী বৈশাখ এটা জানতেন। তিলকের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁর তা এত উৎসুক্য। শ্রীমতী বৈশাখের জীবনীতে আছে, তাঁর ছুটু আ ছিল তিনি ভারতে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠা দেখে যাবেন। আর এ

যদি এবারে সম্ভব হয় ত তিলকের সঙ্গে তাঁর নামও আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অক্ষয় মর্যাদা লাভ করবে।

ক্রীমতী বৈশাখের গৃহ থেকে সোজা যাই আমরা এগমোর ট্রেনে ; সেতুবন্ধ রামেশ্বরের গাড়ী এখান থেকেই ছাড়ে। এদিকের অনেক ট্রেনে করিডব আছে, বাংলা অঞ্চলে তা দেখিনি। ধুমুফোটি ভারতের ও ট্রেনের শেষ সীমা। এখান থেকে এক ফেরী জাহাজে সমুদ্রের জল পেরিয়ে সিংহলের ভূমিতে পা দিলাম। এদিকের রেললাইন একটু ছোট। কিন্তু সুন্দর ট্রেন, করিডরও। রাত্রি গেলাম সন্ধ্যা খাবার ঘরে। অবশ্য পুরো বিলাতী খানা—সাধারণ হিন্দুর নিষিদ্ধ ভোজ্য-সম্ভারই বেশী। বাবা ত একেবারে এসব তখন খান না,—মা কখনো খান না। আমাদেরও সংস্কারে আটকাছিল এ খানার সব রকম খেতে। কিন্তু আটকালো না দেখলাম শ্রদ্ধেয় খাপাদে'র। বরসে, বিজ্ঞান, ব্যবহারে তিনি আমাদের নম্র ত ছিলেনই, বর্ষে বা ব্রাহ্মণ্যেও ছিলেন উপরে। তাঁকে দেখে বুঝলাম আমাদের খাড়াখাড়ের সঙ্কার কত বাহিরের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ভবভূতির উত্তরচরিতে আছে, রামচন্দ্রের সময়ে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মান-ভোজের আয়োজন হয়েছিল আশ্রমের স্তম্ভপুষ্ঠ গো-বৎসের বলিদানে।

কলম্বো পৌছলাম পরদিন ভোরে। তিলক প্রভৃতি উঠলেন তিলকের এক অনুবক্ত ভক্তের বৃহৎ 'বাংলো' বাড়ীতে। বাবার সঙ্গে আমরা উঠলাম বাগার এক সিঁচলী বন্ধুর বাড়ীতে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে বিলাতে তাঁর পরিচয়। নাম তাঁর ডবলিউ এ ডি সিলভা, খুব বড় ধনী, একটা প্রকাণ্ড রবারের ক্ষেত বা প্লানটেশনের মালিক। মস্ত বাড়ী, নতুন করেছেন, চার দিকে খুব বড় বাগান। আর সব খুব সুন্দর করে সাজান। বাড়ীর ঘরের পর্দা প্রভৃতিও দামী সিল্কের। একটা বাড়ীর মধ্যে এত ঐশ্বর্য এর আগে দেখিনি। খাপাদে' এ বাড়ীতে এক সকালে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে এক মজার মন্তব্য করেন ; বলেন—“এ বাড়ী দেখতে ভাল, থাকতে ভাল নয় ; এত সাজান গোছান ও ঐশ্বর্যের মধ্যে কি মানুষ আরাম পায় ?” আরাম কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম, বিভবের প্রাচুর্যের জন্ত অবশ্য নয়, বাড়ীর যিনি মালিক তাঁর ব্যবহারে। তাঁর নিজের ছেলপুলে নেই, স্বামী স্ত্রী দু'জনে। এক আশ্রমের ছেলেকে পালন করেন। তাঁর নামকরণ করেছেন আমাদের দেশীয় নাম—বোধ হয় সুশাস্ত। বাড়ীরও নাম রেখেছেন “শ্রাবস্তী।” সিংহল পতঙ্গীজ ও ওলন্দাজদের অধীনে অনেক দিন ছিল। তারা খালি দেশই দখল করেনি, সাধারণের পোষাক, পরিচ্ছদ, নাম, ধর্ম সব বদলে দিয়েছিল।

নাম সব দি'ফনসেকা, দি'সিলভা, ফার্মানসেজ প্রভৃতি। সাধারণ মেয়েদের পোষাকও কতকটা আমাদের দেশের দো-আঁশলা গরীব মেয়েদের মত বাগরা ও জ্যাকেট বা ব্লাউস। আমরা বাবার আগেই সিংহলে নতুন জাতীয়তার আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়েছিল। দেখলুম, শিক্ষিত সিংহলীরা তাঁদের পূর্বতন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপনে উৎসুক হয়েছেন। নিজের দেহ মেয়েদের নাম আর বিদেশীর অনুকরণে রাখছেন না, বড় ঘরের মেয়েরা শাড়ী পরতে আরম্ভ করেছেন। পরাধীনতার যে নির্ধম চেহারা সিংহলে দেখেছিলাম আমাদের দেশেও তা দেখিনি। আমাদের দেশ বিদেশী নিয়েছে, সম্পদ সব তাদেরই করায়ত্ত করেছে, মর্যাদায় আমাদের খাটো করতেও চেষ্টার জট করে না। কিন্তু এত দুর্ভাগ্যও আমাদের মনকে কখনো তাদের দাসত্বের শিকলে বাঁধতে পারেনি। বাদের জন্ত এটা সম্ভব হয় নি, তাঁরা আমাদের চিরকালের শ্রম্য—সিংহলে ১৯১৮ সালে বার বার একথা মনে হয়েছে।

কলম্বো থেকে তিলক-বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বিলাতের জাহাজে উঠবেন। কিন্তু লড়াইয়ের সময় ছাড়পত্র চাই। ছাড়পত্র দেওয়া না দেওয়া সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ছাড়পত্র আর পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা আগে থেকে নিশ্চয় হচ্ছিল ; এখানে এসেও বিলাতে অনেক তার গেল, এল। সকলে এখানে বসে বইলেন আশায় আশায় বোধ হয় দশ-এগার দিন। শেষ পর্যন্ত ছাড়পত্র আর এল না। ইংরেজ সরকার নিরীহ ক'মন ভারতবাসীকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তাঁদের দেশেও যেতে অনুমতি দিতে পারলেন না। তিলক প্রভৃতির এত চেষ্টা, এত শ্রম, সাধারণের সংগৃহীত অর্থের এই খরচ আপাততঃ সব বুঝা গেল। এর পরে যুদ্ধ থেমে গেলে আঁরা বিলাত গেলেন বটে। কিন্তু যে সম্ভাবনা ও যে পরিস্থিতি যুদ্ধের গতিতে জেগে উঠেছিল, যুদ্ধ প্রায় হঠাৎ থামায় আর ইংরেজ ও তার মিত্রবর্গ জয়ী হওয়ার সে সম্ভাবনা একেবারে মিলিয়ে গেল। ভারতের আত্মশাসনের আশা, মনে হলো, আপাততঃ বোধ হয় নিবে গেল। এটা বলছি ১৯১৮ সালের কথা। আর একটা বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেল। কিন্তু ভাবি, এটা যদি প্রায় ত্রিশ বছর আরও আগে হ'ত, তা'হলে কি আমরা স্বাধীনতার এই রূপই পেতাম ? তখনও কি দেশ ভাগ হ'ত, একো'র নামে এক-নায়ককেই আশ্রয় করতাম, দেশের কৃষি ও শিল্প সম্পদ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের দারিদ্র্যও কি বাড়িয়ে তুলতাম ? কি জানি !

## শুভ-দিনে মাসিক বন্ধুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধ করা যেন এক দুর্ভাগ্য বোঝা বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, মেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায় আপনি 'মাসিক বন্ধুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বন্ধুমতী'। এই উপহারের জন্ত সুদৃঢ় আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে থুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বন্ধুমতী। কলিকাতা।

# শ্রীশিক্ষার আদর্শ

শ্রীহরিহর শেঠ

দীর্ঘ দিনের পর আজ এই বিজ্ঞানমন্দিরের একটি আনন্দ অমুঠানে সক্রিয় ভাবে একটু যোগদানের সুযোগ পেয়ে সুখ ও দুঃখের কত স্মৃতিই না মনে উদয় হচ্ছে। ধারা আমাদের আজকের এই সম্মানের আসনে স্থান দিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁদের আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাভাব জানাই। তাঁদের এই ব্যবস্থা সাধু-ইচ্ছা-প্রণোদিত, তাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও, মনে হয় আমাদের এই কার্যের জ্ঞান নির্বাচনটা হয়ত তাঁদের একটু হিদাবে বাকি হইয়াছে।

কালের বিবর্তনে, হয়ত শিক্ষা-সংস্কৃতির একজন দীন সেবক হিসাবেই আমি আজ এই পদ গ্রহণের জ্ঞান নিমন্ত্রিত, আর এই শিক্ষামন্দিরের অগতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা আমার প্রশ্রয় সহায় বহুবর নারায়ণ বাবু প্রবান বলে বিশেষিত হলেও আজ এখানে একজন অতিথি। আর শুধু তাহাই বা বলি কেন, পৌরপ্রধান-রূপে তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে এই যে প্রতিষ্ঠান, এবং হয়ত বা যিনি ইহার নিয়ন্ত্রণের মালিক, আজ সেখানে তিনি অতিথি।

কয় দিন পূর্বে প্রচেষ্টা প্রশানা শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া যেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ কর্তে গিয়েছিলেন, ২৩শে মার্চ অমুঠানের দিন ধায়া হয়েছে শুনেই তাঁকে সেদিন যা বলেছিলাম—যাধীন ভারতের পূণ্যভূমে আজ এই একটি চিহ্নিত স্থানে ঝাড়িয়ে যে কথা প্রথমেই মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা এখানে উল্লেখ না করে পারাচ না। ঠিক দুই শত বৎসর পূর্বে ১৭৫৭ সালের ২৩শে মার্চ পরাধীন চল্লিশনগরের ঠিক এই স্থানেই ব্রিটিশ-ভাগ্যসম্মার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ফরাসী ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ দুই শত বৎসরে কতই না পারবর্তন ঘটেছে। আজ এখানে ইংরাজ নাই ফরাসী নাই। উভয় অধিত্যয় রাজশক্তির আজ ভারতে বিশেষণ ঘটেছে। আমাদের মধ্যেও কত দিকে কত পরিবর্তন না ঘটেছে। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা প্রসঙ্গেই বলি, একটা দিন ছিল যখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা সমাজে নিষিদ্ধ বিবরণ ছিল। তখন লেখাপড়া শিক্ষা নর্তকী ও পতিতাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আজ আমাদের মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রেও যেমন দ্রুত অগ্রগমনের পথে অগ্রসর হতে চলেছে, কি বাস্তবক্ষেত্রে কি সমাজের বিবিধ স্তরেও তাঁহাদের আসন ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে। মনে হয় বুঝি বা অল্প সকল বিষয়ের তুলনায় সমাজে নারী-প্রগতি বা নারী জাগরণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

একত্রিংশ বৎসর পূর্বে যখন এই শিক্ষামন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, সে দিন কত সাংবাদিক কত সংশয়ে না আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। আরম্ভ হয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে, অক্ষর পরিচয়ের পর দুই-একখানা বই পড়া শেষ করেছে একশ মেয়েদের নিয়ে তার বিবাহযোগ্য বয়সের মধ্যে এমন শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হবে যাতে সে উত্তর জীবনে স্মৃতি, স্মৃতিশীল, স্মৃতিগীনা হয়ে কাটাতে পারে। পাঠ্যবিষয়, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, অল্প কোন প্রতিষ্ঠানের অমুকরণে তাহা করা হয় নাই। তখনও বালিকাদের বিবাহের বয়স অনেকটা কৈশোর সীমার মধ্যে

নিবদ্ধ ছিল। স্মৃতির স্বলবিশেষে বিবাহিতা বালিকা, বালবিধবা প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থাও তাহার মধ্যে ছিল। বিশেষ সাক্ষ্য লাভ না হইলেও, পরে পুরজীর্ণের শিক্ষার আয়োজনও করা হইয়াছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্ত বাহা কিছু আবশ্যক তাহার সমস্ত থাকা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া মেয়েরা ম্যাট্রিক পাশ করে এ উদ্দেশ্যও ছিল না। কালক্রমে প্রথমকার মেয়েরা যখন শিক্ষা-মন্দিরের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পড়া শেষ করিল, তাহাদের আগ্রহ ও সহবাসীরা অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তখন শ্রীযুক্ত পি. কে. রায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞানসম্মার পরিদর্শনে আইসেন। তাহারা আবশ্যকীয় সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলে, তখনকার ম্যাট্রিক শ্রেণীর ছাত্রীরা তাহাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল, বাহাতে আগামী পরীক্ষাতেই তাহারা উপস্থিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জ্ঞান। সে তারিখটি ২০ কি ২১শে ডিসেম্বর। তাহা মেয়েদের অনুরোধ শুনিয়াছিলেন, বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা অমুমতি দিয়াছিলেন। সে বার পরীক্ষা দিয়াছিল তিনটি ছাত্রী, তন্মধ্যে শ্রীমতী ইন্দু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির পর বাহাতে ছাত্রীরা কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারে, সে বিষয় চেষ্টার কোন ক্রটি করা না হইলেও, যত দিন পর্যন্ত বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে ছিল, ইহার সকল বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছিল। তৎপরে সরকারের হস্তে অর্পণের পর কয়েক বৎসর কতকটা পূর্বের ব্যবস্থাদি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা হইলেও, পরে ঠিক কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার কোন সংবাদ জানি না। প্রথম হইতে এখানে ছাত্রীদের দক্ষিণার হার ১১, ১১.০ ও ২২ টাকা মাত্র ছিল এবং অবৈতনিক বা অর্ধবৈতনিকের কোন স্থান নির্ধারিত ছিল না। সরকারের হস্তে অর্পণের সময় তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে বেতনের হার দশ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হইবে না স্থির হয়। কিন্তু নয় বৎসর না বাইতেই তাহা দ্বিগুণ বা ততোধিক বর্দ্ধিত করিয়া অল্প সকল সরকারী বিদ্যালয়ের সহিত সমান করা হয়। পাঠ্যাদি বিষয়ও এক্ষণে সাধারণ শিক্ষালয়ের সহিত সমান হওয়াই সম্ভব। যদি ইহা হইয়া থাকে তাহাই স্বাভাবিক। এজ্ঞ শিক্ষামন্দিরের বর্তমান পরিচালনার দোষারোপ করিবার বা বলিবার কিছু নাই।

অল্প সকল দিক বিবেচনা করিলে উন্নতিও কিছু যে না হইয়াছে তাহা নহে। প্রথম প্রথম উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাইতে সময় সময় বিশেষ অনুরোধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা একজন প্রশানা শিক্ষয়িত্রী ও তাহার অধীনে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্তা এম-এ, বি-এ শিক্ষিকা নিয়োজিতা আছেন। আর একটি আমাদের আনন্দের কথা, শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতিরেকেও সঙ্গীত, রন্ধন, কাট-ছাঁট, হাতের কাজ প্রভৃতি যে সব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিছু দিন বাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রবর্তন করায় এখানকার বৈশিষ্ট্যের অনুকূলেই হইয়াছে। আরও একটি আনন্দের কথা, সরকারী প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে multipurposec স্থলে পরিণত করা হইতেছে। বর্তমান বিভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম



প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের এই উচ্চ ইংরাজী স্কুলটিকেই বোধ হয় এই বিভাগে সর্বপ্রথম Higher Secondary School-এ পরিণত করে সরকার ইতার মর্যাদা বন্ধা করিয়াছেন। ইতা দ্বারা এখানে বিবিধ বিষয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্রীরা অধিকন্তর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই অল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবগতই এখানকার সাধারণের নিকট যত্ববানাহ। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হওয়া স্বাভাবিক—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের পর ১৯৫৬ সালে ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থলে ২২ হাজার হইয়াছে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৮৫৮৮ স্থলে ১৫৫৬ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে আজ প্রায় সর্বত্র কি স্থল কি কলেজে ছেলে-মেয়েদের স্থানান্তরে শিক্ষা বিষয়ে যে অগ্রগতি ভোগ করিতে হইতেছে সে দিকে কর্তৃপক্ষের যে উপযুক্ত দৃষ্টি আছে তাহার পরিচয়ও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই চন্দননগরেই এখন প্রথম এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় তখন সাধারণের নিকট কি ভাবে ইতা গৃহীত হইবে, আশাব্যবহা ছাত্রী পাওয়া যাইবে কি না, এই সব মনে হইয়াছিল, আর আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই নগরেই চাণ্ডি এং হুগলী চুঁচুড়ায় হিন্দি মেয়েদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বত্রই সকল শ্রেণী ছাত্রীতে পূর্ণ। বলা বাহুল্য, এই সব কথা বিদ্যালয়ই স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অগ্রবিদ্যার কথা স্বতাই বর্তমানে এখানে প্রায় একটি সাধারণ প্রসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা মনে আসে। সরকারী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত নবগঠিত কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাবলি বাওয়ার ফলে স্থানীয় দরদীদের হস্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর উন্নতি দেখিবার আশা অনেক করিয়াছিলেন। আশাততঃ তাঁহাদের নিরাশ হইতে হইয়াছে। এতাবৎ তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। শুনা যায় এখন পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া মত সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক সাহায্য না পাওয়াই তাহার কারণ। ইগ যদি সত্য হয় তবে খুবই দুঃখের কথা। অত্যাগ কোন কোন বিদ্যালয়েও এই শিক্ষামন্দিরে বহুদিন হইতে যে কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর স্থান পূর্ণ রহিয়াছে তাহার কারণও তাই। সম্প্রতি এই অভাব পূরণের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনা যায়।

আজ এই যে ছাত্রীদের কৃত সৃষ্টিশীলতার প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইল, এই সব বিষয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং বিবিধ প্রশংসা হ'তে বহু পদকাদি লাভ হইয়াছিল। সে সময় পাঠ্যের সঙ্গে ছাত্রীদের হাতের কাজ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি দেখিয়া সমাগত মনীষীদের মধ্যে কবিত্বক রবীন্দ্রনাথ, জামাশ্রম যুগোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, কবি কামিনী রায়, শ্রব বহুনাথ প্রভৃতি কতই না আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সেসব কথা মনে হ'লে আজও আনন্দে হৃদয়টা ভরে উঠে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁদের, বাকের চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই শিক্ষামন্দিরটি গড়ে উঠাছিল, বিশেষ ভাবে তদানীন্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী স্বর্গত

নীহারিকা মল্লিক ও কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র যুগোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁদের উদ্দেশ্য আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কালের নিয়মে আর এই পরিবর্তনের যুগে কতই না পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সে যুগের মানুষ, ঠিক যুগের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারি না। আর সেই জন্যই বহু বায়ে আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের সংসার-শিষ্টাচার করে কনভেন্ট প্রভৃতিতে দেওয়ার সার্থকতা ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের মেয়েদের আমাদের সমাজ সমসার উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তখন ক্রাশে পড়াশুনা আরম্ভের পূর্বে এবং পরে নিত্য নিয়মিত দেবীর বন্দনা কবান হইত। মেয়েদের মনে দীন দরিদ্রদের সেবার্ত্তি স্মৃতিত করিবার জন্য ক্রীতদাসপূর্ণা পূজার দিন মেয়েদের স্বহস্তে বন্ধন ও পরিবেশন দ্বারা দরিদ্র নারায়ণদের ভোজন করান হইত। বাৎসরিক পেলা-ধুলা প্রতিযোগিতার সময় খেলার সঙ্গে গৃহস্থালী কোন কোন কাজকর্মের প্রতিযোগিতাও হইত।

সময়ের গতিকে আজ আমি শিক্ষামন্দির হ'তে কিছু দূরে গিয়ে পড়েছি। বয়সের বর্ধে আজ বিশ্বাস আমার উপর তার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও, সময় সময় কত কথাই না মনে পড়ে। এই শিক্ষামন্দিরের কল্যাণেই আজও স্থানীয় ও নিকটবর্তী বহু পরিবারে আমার জ্ঞান দ্বার উন্মুক্ত। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে আজও তাদের শ্রদ্ধা আমাকে অভিভূত করে। শৈশব ও কৈশোরে মানুষ যে আদর্শের মধ্যে থাকে পরবর্তী জীবনে তাব প্রভাব থাকিয়াই যায়। আমার বেশ মনে আছে, শিক্ষামন্দির গভর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণের যখন কথা উঠে, তখন তদানীন্তন কংগ্রেস-ভারতের গভর্ণর এবং হুগলীর স্থল সমুহের ইন্সপেক্টর মহোদয় ইতার আদর্শ ক্ষুদ্র হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার কিছুটা ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমাদেরও যে সে সংশয় ছিল না তাহা নহে। তবে সেই সঙ্গে সরকারী কর্তৃক পরিচালনাদি অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইবে এ বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির সম্ভিত পাঠ্যাদি বিষয় ন্যায়সম্মত অনুসরণ করিতেই হইবে। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, সেখানে আদর্শ বলিয়া স্বহস্ত কিছু আছে কি না জানি না। বালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আদর্শ থাকা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই মনে করি। এসকল বিষয় নির্ভর করে ইংরাজী শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের উপর। আমার বিশ্বাস, এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের সে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব নাই।

বহু অবাস্তব কথার আপনাদের মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট করিলাম। আমি প্রথমেই বলেছি, আমাকে এই আসন দেওয়ার জন্য একটু হিসাবের বাতির হয়েছে। এছাড়া বিশেষজ্ঞের উপর এই কার্যাবলীর অর্পিত হলে অনেক সময়ে উপযোগী প্রয়োজনোপযোগী উপদেশাবলী শুনার আপনাদের সুযোগ হ'ত। আমার এই ভাষণে কি সুশীল, কি শিক্ষয়িত্রী কি ছাত্রীকে কেহই ভূঁপ্ত পোহেন- তা মনে করি না। সত্য পরিচালকের কাছ থেকে এই সব পূণ্যভঙ্গ কথা বা ইতিহাস শুনার মত কেউ আগ্রহান্বিত থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার পক্ষে আমার এই সব ব্যক্তিগত স্মৃতি কথা

এমন একটি অস্থানে মনে না এসে পারে না। পরিণেবে শ্রীভগবান সমীপে, বড় আদরের বড় বড় সৃষ্ট এই শিক্ষা-মন্দিরটির ও আমাদের পরম শ্রদ্ধার ছাত্রবৃন্দের সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করি। আর শিক্ষিকা-মণ্ডলী এখানে সকল সুবিধার মধ্যে একটি সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে প্রফুল্ল মনে তাঁদের কর্তব্য পালনে সক্ষম হন, সেই কামনা করে আমার কথা শেষ করি। আর স্নেহেরা, সংসারে তোমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক। মাত্র একটি কথা মনে রাখতে বলি—ইতিহাস, বিজ্ঞান, জুগোসাদি অধ্যয়নের দ্বারা সেই সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ

হইলেও শিক্ষার প্রাথমিক বা মূল উদ্দেশ্য মনুষ্য লাভ করা, মানুষ হওয়া। মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃসমীপে মাত্র এই প্রার্থনাই জানাইয়াছিলেন—“মা, আমাকে মানুষ কর।” মনুষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাব্য। তোমাদের সাধনাও তাই হওয়া সর্বোপরে প্রার্থনীয়। আমি মনে করি, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে ব্যবধান বিশেষ নাই। \*

\* ২৩শে মার্চ ১১৫৭ কুম্ভাবিনী নারী শিক্ষামন্দিরের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

## পলাতকা শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী.

রূপে বড়ে বসে বর্ণোজল তোমার নিখিল,  
বাঙলা ত প্লাবনে ভাসা অবিকল্পিত দুঃখের মিছিল।  
বর্ষণ ঘনঘটা বড়-ঝড়ায়—  
নাট বা এবারে তুমি গেলে বাঙলায় ?

ভাসে পূর্বদ্বীপী জামগ্রাম ডাঙী জলপুৰ,  
কালনা কাটোয়া কান্দী বনগ্রাম ভরপুর।  
ক্রুদ্ধ বক্রেশ্বর, ধৈর্যে এলো দামোদর,  
জলজী কোপাই কংশবতী খরতর ;  
রূপনারায়ণ-কুলে গর্জে লক্ষ ফণা—  
বুহিত বস্তার শত শুণ্ডের তাড়না।

নবদ্বীপ 'সমুদ্র' পানিত্রাসে ত্রাস,  
নলহাটা তমলুক বেহালায় আশ-পাশ  
জল খেয়ে হাঁসকাঁস।

এ সময়ে কোলকাতায় বাস,  
হে লাবণ্য, শোনায়ে যে রিক্ত উপহাস।

বস্তা বাজায়ছে তার ছন্দুভি নাকাড়া,  
রাঙা মাটির পথ, রাঙা জলে গ্রামছাড়া।  
হায় যে ধানের শীষ ! সবুজ ইসারা,  
সোনালী কামনা আর রূপালী তুষারা।

গ্রামছাড়া, ঘরছাড়া !  
রায়মঙ্গল মাথাভাড়া মাতলা বেদিশ,  
নৌলু মনুষ্যাকী মধুমতীর হৃদিশ ?  
আখিরের ভরা গাঙে মথিত বেদন,  
বাঙলায় যাবে কি সেখা ঢেউ তোলে অনন্ত বোদন

মত্ত প্রবাহধারা ভাগীরথী, চূর্ণি—  
মাত্রে হুর্জর অজয় জলধারা ঘূর্ণি।  
তাতাধি অধি জলে জগবান্দ্য,  
বিষ্ণুপুরে বীরভূমে হৃদিকম্প।  
ন'দে শান্তিপুর ভাসে ভাসিছে খাগড়া,  
বান্ধেই থেকে যাবে জরির নাগরা !

তার চেয়ে যাও আজমীর,  
ময়ূর-মধুর পুষ্করের তীর—  
চন্দনার খজনার নৃত্যে ভরপুর।  
হয়ন'লহরী ব'বে খেমে বহুদূর।  
দিশান্তে দিগন্তরাঙা, রাঙা থির নীর ;  
তারাগড়ে, সাবিত্রী পাহাড়ে নামে নীলীথ তিমির।  
নীলনয়না "আবু"র বোবন-চকল, সবুজের বলমল ;  
নয়নাভিরাম সে শৈলধাম,—সেখা যাবে তুরি ?  
বনহরিণীর ডাকে উচ্চকিত যে অরণ্য-ভূমি।  
সে কোন হারানো পথ "থর" মরু প্রসারিত কোলে,  
নিষ্কুম নিশ্চিতি রাত্রে মহাশূন্তে সপ্তবিরা দোলে।  
সে নিঃসঙ্গ নীরবতা দস্তুর ভয়াল ;  
আদিগন্ত বালুর আসনে ধ্যানমগ্ন মহাকাল।

তাই যাও, পড়ে থাক নিরন্তর দুঃখের মিছিল ;  
নদী নালা খন্দখানা খাল বিল ঝিল।

বিষ্ণুপুর, কোলকাতা ন'দে শান্তিপুর, সে ত বহুদূর !  
শাল সেগুন জাকল,  
কুল পলাশ বকুল,  
সব প'রে জলের খাগরা।  
বাঙলায় গিয়ে কি হ'বে—  
ভিজে যাবে জরির নাগরা।

# কল্যা-বিল্যাস

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

## অষ্টম সর্গ

গায়নদের চেয়ে হেমকারেরা আরো বড় চোর ; চৌধা-  
কলায় তাঁরা যোগীবিশেষ । বিস্তীর্ণ তাঁদের ধ্যান ।  
চুর ঐশ্বর্যশালী হয়েও তাঁরা জগতে খেলা দেখিয়ে বেড়ান  
স্বাভাবিক । ১

সোনা, ... খন-রাজ্যের যেটি সাব-পদার্থ, যেটি সম্পদে ভূষণ,  
বিপদে রক্ষা, যেটিকে বলা যেতে পারে পরম তেজঃ,—সেই  
মানকেও নিত্য চুরি করেন এই পাণেরা । ২

নিত্য-মুগ্ধ চণ্ডালেরা যেমন হঠাৎ স্পর্শ ক'রেই নষ্টশ্রী করে  
স্নান ব্রাহ্মণকে, তেমনি হেমকারেরাও স্পর্শমাত্রই ক্ষান্ত করে  
ফলেন স্ববর্ণকে । ৩

মহা কষ্টপাথরে ধীরে ধীরে সোনা কষতে কষতে সোনার  
গিটিকে কমিয়ে দেখানো ধানের একটি কলাবিজা, বিক্রয়কালে  
বন্ধুরে কষ্টপাথরে সেই সোনার উগ্রতা দেখিয়ে লাভের কড়ি  
দানোও তাঁদেরি আর একটি কলাবিজা । ৪

লোক-ব্যবহার ভেদে তাঁদের পাষণ এঁদের পাঁচ প্রকারের ।

- কোনো পাষণ জল টানে,
- কোনো পাষণকে ওষু দিয়ে ঘামানো হয়,
- কোনো পাষণ মোম দিয়ে জমানো,
- কোনো পাষণ বালুকা-প্রায়,
- কোনো পাষণ গরম । ৫

এঁদের "মুখা" অর্থাৎ "মুচি" ছয় প্রকারের । যে বি-ভাঁজ  
মুচিটিতে রৌপ্যাদি ও ঔষধের পাক হয়, তাকে বলে "বিপুট ।"  
যেটিতে সোনা ফাটিয়ে গালানো হয়, তাকে বলে "ফোট-বিপাক ।"

একটির নাম "স্ববর্ণ-রস-পায়িনী ।"

যেটিতে সোনার রঙ বাদামী করা হয় সেটির নাম "স্বতাত্ত কলা ।"

এবং আর এক রকমের মুচি আছে যেটি কেবল সীসে, কপূর  
ও কাচের চূর্ণ গ্রহণ-বিষয়েই মজবুৎ । ৬

সোনা-তৌলীর বাটখারা এঁদের ঘোলা রকমের ।

- ( ১ ) কোনোটি "বক্র-মুখী,"
- ( ২ ) কোনোটি বিষম-পুট ;
- ( ৩ ) কোনোটি "স্ববিরতল" অর্থাৎ তলা ছেঁদা ;
- ( ৪ ) কোনোটিতে পারদ রাখা থাকে ;

( ৫ ) কোনোটি পলপলে ;

( ৬ ) কোনোটির পাখনা দুটি কাঠের ;

( ৭ ) কোনোটি গ্রন্থিমতী ;

( ৮ ) কোনোটিতে লাগানো থাকে মোম ;

( ৯ ) কোনোটিতে তাগা জড়ানো ;

( ১০ ) কোনোটির মুখ ঝোঁকা ;

( ১১ ) কোনোটি বাতাসে ঘোরে ;

( ১২ ) কোনোটি সক্র ;

( ১৩ ) কোনোটি ভারী ;

( ১৪ ) জোরে বাতাস করলেও কোনোটি আবার আঁকড়ে থাকে

সোনার গুঁড়ো ;

( ১৫ ) কোনোটির ভিতর কীট পোরা থাকে ; ৭

( ১৬ ) কোনোটিতে আবার কীট থাকে না । ৮

এই হেমকারদের "ফুংকার"-ও আবার ছ' রকমের ।

( ১ ) ধীর ;

( ২ ) সাবগ ;

( ৩ ) মধ্যস্থির ;

( ৪ ) স-শব্দ ;

( ৫ ) পাতী ;

( ৬ ) শীকর-কারী । ৯

এঁদের "বহি" ছ' রকমের ।

( ১ ) আসা-বলয়ী ;

( ২ ) ধুমল ;

( ৩ ) বিফোটা ;

( ৪ ) ডিমে আঁচের ;

( ৫ ) ফুলিঙ্গী ;

( ৬ ) পূর্বস্থত তাশ্রুর্ণের আঙন । ১০

এঁদের প্রচেষ্টা দ্বাদশ প্রকারের ।

( ১ ) এঁরা প্রসন্ন করবেনই ;

( ২ ) কথার বৈচিত্র্যের এঁদের অন্ত নেই ;

( ৩ ) কত্থন যোগ থাকতেই হবে ;

( ৪ ) কাপড় ধরে টানটানি করবেনই ;

( ৫ ) দিনের বেলায় অর্ক-নিরীক্ষণ করবেনই ;

- (৬) হোঃ হোঃ করে হাসা চাই;  
 (৭) বোস্তার মত খাওয়া করবেনই;  
 (৮) তামাসা দেখতে ছুটবেনই;  
 (৯) বার বার স্বপ্নদের সঙ্গে বিবাদ করবেন;  
 (১০) জলের ঘড়া ভাঙবেন;  
 (১১) থেকে থেকে বাইরে দৌড়বেন।

(১২) কাঁচা ঘুঁটের জালে বসিয়ে, লবণ ও ক্ষারের অম্ললেপ দিতে দিতে হাতের কাজটির উপর নকল গিন্ট ধরাবেনই। ১১-১৩

এঁদের চুখটিকে যদি মাটিতে ফেলে রাখা হয়, তাহলেও দেখবে, সাধারণ লোহার পাত্র থেকেও এঁদের বাটখারাগুলো সেদিকে যেন মুখিয়ে দৌড়ছে, দ্রুত হয়েও মুতুর্হু অসুপূর্ণ হয়ে উঠছে তারা। বাটখারাগুলো মোমে সেঁটে যায়, সরিয়ে দেয় নিগুচ সোনার কথা। তারপরে পুরণের সময় আনন্দে কিরে আসে সোনা চুরি করতে...সংগ্রহ। ১৪-১৫

বৎসগণ,—অত্যন্ত কলঙ্ক অবস্থাতেও পারার “পাতন” এঁরা জানেন। পাষণ কথা...এঁদের কাছে এক নিত্য সজ্জ ব্যাপার। সদৃশ ও মিথি অলঙ্কার গড়বার সময় কেমন করে সেটিকে বদলাতে হয়, হাড়া করতে হয়, তার প্রসার দেখাতে হয়, সে বিভ্রান্ত এঁরা পারদর্শী। সোনাটি হাতিয়ে নিয়ে অদ্ভুত হওয়ায় এঁরা পটু। তারপরে এক মাথা করে ফিরে দেবার কড়ার করেন। পানি চড়াতে এঁরা লক্ষ। সময় নিয়ে নিয়ে সময় নষ্ট করতে এঁরা সিদ্ধ। কতিপূরণ, পালাটানাবী...বিলক্ষণ জানেন। অনেক রকমের সংযোগ, অনেক রকমের দাচ এঁদের আয়ত্ত্যবোধে। এই একাদশটি কলাবিজ্ঞাকে ছোট করে বলা হয় “যুক্তি”।

এবং এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা হচ্ছে—

সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশিতে অস্তর্ধান। ১৬-১৭

বিচারের ফলে হৃদয় পাওয়া যায় এই চতুঃশ্লী কলাবিজ্ঞার। এ ছাড়া হেমকারদের অস্ত্র যে সব গুট কলানৈপুণ্য রয়েছে, হাজারচক্ষু ইন্দ্রদেবও সেগুলির হৃদয় জানেন না। ২০

বৎসগণ, মেক-পাহাড়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়? তিনি এখন অতিদূরে সরে রয়েছেন! মনুষ্য-ভূমি পরিত্যাগ করে, এই ঘোর চোর হেমকারদের ভয়ে দূরে চলে গেছেন। কোনো ভুল নেই। ২১

পুরাকালে একদল মুখিক...স্বর্ণশৈলের শত শত সন্ধিস্থলে কোটি কোটি গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে সম্পূর্ণভাবে ঝাঁঝা করে ফেলেছিল তাঁর শিখরগুলোকে। বিরাট মুখিকবাহিনী। এমন ভাবে তারা নথ দিয়ে কুরতে থাকে মেককে যে, সহসা শিখিল হয়ে যায় তাঁর মূল। তিনি অচল হয়ে পড়েন।

এত ভাল-ভাল সোনার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে উপরে তুলতে থাকে মুখিক-নথর, যে ক্রমশঃ বেজার উচু হয়ে ওঠেন সুরেক। উদ্ভত স্বর্ণ-ধূলায় হলুদ হয়ে যায় দিগন্ত।

অমরের দল স্বর্ণ থেকে আর্ন্তনয়নে দেখতে পান...শিখরগুলি অক্ষয়িত হয়ে গেছে। সোনার পাহাড়ের তটদেশে হাঁ করে রয়েছে বিরাট বিরাট গর্ত! কলান্ত উপস্থিত হচ্ছে না তো!! তাঁরা বিশেষ ভয় পেয়ে ওঠেন।

অগস্ত্য ঋষি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন দেবতাদের। তিনি তাঁদের কাছে সমস্ত কথা নিবেদন করে শেষে বললেন—

“দেবাসুরের সংগ্রামে যে ব্রহ্মর নশাচরদের আপনারা নিহত করেছিলেন, তাঁরাই অধুনা ঐ মুখিক-রূপ ধারণ করে ভ্রমগ্রহণ করেছেন এবং আরম্ভ করে দিয়েছেন মেক-নিপাত। তারা আপনাদের পুনর্বা। মুনিদের আশ্রমভঙ্গও তাঁরা করেছেন।”

অগস্ত্যমুনির নিবেদন শুনে দেবতারা আর কালবিলম্ব করলেন না, ধূম দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিলেন গর্তগুলিকে। পূর্বেই অভিযানে দক্ষ হয়ে গিয়েছিল মহা-মুখিকের দল। এবার তারা ছাই হয়ে গেল। ২২-২৮

সেই মুখিকবাহিনীই এই সুর্য্যকারেরা; পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন ধরাধামে। জন্মভ্যাস তাঁরা ভুলতে পারেন নি। তাই রাজিদিন কেবল কুরে কুরে বার করেই চলেছেন...কাকলচূর্ণ। ২৯

সেই হেতুই বলছি, যখন পৃথীপতিদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে রাজ্য চালনা, তখন যেন তাঁরা বিধ-মারক ও চোর-ডাকাতিদের মধ্যে একমাত্র সুর্য্যকারকেই নিগ্রহ করেন...সর্বধা ও নিত্য। ৩০

ইতি সুর্য্যকারোৎপত্তিনাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

### নবম সর্গ

এই সমুদ্রমঞ্চলা পৃথিবীতে, বৎসগণ, প্রতারকেরা...যে মায়াজাল বিস্তার করে রেখেছেন, খেটি বিশাল। দীবরেরা এই ভাবেই জাল ফেলে ডাঙায় তোলে নষ্টবুদ্ধি মন্ত্রদের। ১।

যে প্রাণ মানুষের পরম ধন, সর্বস্ব; খেটির ক্ষত্রে মানুষের এত আশ্রয়, এত প্রচেষ্টা; সেই প্রাণ নিত্য বাদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে, তাঁরা বৈজ্ঞ। তাঁদের চিনে রাখা উচিত সকলের।

বিরহের মত তাঁরা দুঃসহ।

যতক্ষণ না দেহ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ধূর্ত বৈজ্ঞগণ ঔষধ প্রদান করবেনই।

ধীয়ের তপ্তদিনের মত তাঁরা উগ্র।

তৃষ্ণার অস্ত্র নেই তাঁদের।

শোষণ করে সর্বস্ব।

ঔষধের নিত্য পরিবর্তন-মূলে, এবং স্ব-বিজ্ঞার গবেষণা মূলে প্রথমে তাঁরা সহস্র সহস্র নরহত্যা করেন, পশ্চাতে সিদ্ধ হন বৈজ্ঞ-রূপে। ২-৪।

গণংকারদেরও বৎসগণ চিনে রেখো। কেউ যদি কিছু প্রাণ নিয়ে এল, দেখবে, গণকঠাকুর তখনই ঘিরে ঘিরে রাশি-ক্রুর বিজ্ঞাস নিয়ে বসবেন, হরেক রকমের সুখের বিকৃতি দেখাবেন, নাটক করবেন গ্রহ-চিন্তার এবং তারপরে বহু পরে যদি কিছু বলতে চান, তাহলে তাঁর সেই ভাষণ হবে যৎকিঞ্চিৎ।

চন্দ্রের সঙ্গে বিশাখার মিলন হচ্ছে গগনে, গগছেন বসে গণংকার। কিন্তু লম্পট সর্পদের নিয়ে ঘরে যে চমৎকার খেলায় মেতেছেন ঘবী, সে গণনা তাঁর আসে না। ৫-৬।

এক দল ছোটোদল আছেন, ধীরা প্রথম ভীষনে হন উড়ন-চণ্ডী, গুড়ান পোড়ান সর্বস্ব। তার পরে তিনি হয়ে ওঠেন সোনার কাডাল। বিনাশ করতে থাকেন সেই সব রসিক-প্রবরাদব, ধীদের ঘড়া ভক্তি-ভক্তি ধন। তাঁরা চিত্রকর। তুলিবাকীতে তাঁরা ওস্তাদ। ৭

এক দল আছেন, ধীরা ধাতুবাদী। তাঁরা বলে বেড়ান—

“হেঃ হেঃ, আমার এই শতবেদীটি, এই সহস্রবেদীটি, সিদ্ধ। রসও বেরিয়েছে।” তাঁরা ঠক্। কী চেহারা তাঁদের! নগ্ন, মলিন, কৃষ্ণ, কৃশ। ৮

আর এক প্রকার ধূর্ত আছেন। তিনি রাসায়নিক। জবাজীর্ণ। ভাষার ঘটের সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে তাঁর মুণ্ডের। এক-মাথা-টাক-বাবুদের টাক সমান কেশোৎপাদনের কথা শুনিয়া। অতিক্রমী তাঁরা। সব সময়েই তাঁদের ছুরাশা বন্ধক দেওয়া থাকে শব্দ-রমণীদের নয়নতারার আচ্ছাদনী সূচিয়ার। বেলপাতা পুড়িয়ে হোম করতে করতে ধূমাক্ত হন অবশেষে। ১-১০

বংসগণ, ভ্রগতে দলে দলে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বহু ধূর্ত-বহু। সংসারী মানুষ তাঁদের কাছে দৌড়, দিচ্ছিরি লাভে। আর সেই বহু-...মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ভাগিয়ে রেখে খেলা দেখান, বলেন—“বহু করলে যদি আকাশ কুসুম পাওয়া যায়, তাহলে খেচরী বিজা বলে বিজাঘর তৈরি। অন্যায়সেই লাভ করা বেতে পারে।”

“আজ বশীকরণ যারা জানেন, তাঁরা তো বলেই থাকেন...মশার হাড়ফলের মধ্যেও নানান সিদ্ধি রয়েছে।” “আরে আরে এত ভাবনা কিসের মহাশয়,—কালো ঘোড়ার নেদি আলিয়ে অজ্ঞান করে নিন, সেই অজ্ঞান চোখে লাগান...ইজের ভবন দেখবেন গগনে।” তাহলে কথাটি কান পেতে না হয় শুনলেন; ব্যাঙের চর্বি ব্যবহার করেন।

মানুষের পক্ষে অসংসারিত ৪৫৪ কী কথা। ইত্যাদি ভাবলে উত্তেজিত ক’রে নিরীহ মানুষদের তাঁরা পাঠান নবকে। ১১-১৩

এমন এক দল প্রতারক আছেন, যারা কুলবধূদের তুলিয়ে ভালিয়ে গৃহস্থাগিনী কবান্তে পারেন। পথে পথে নারীদের রক্ষা-দান করা তাঁদের অভ্যাস। অথচ রত্নতন্ত্র ও কামতন্ত্র মূলক মূল মন্ত্র তাঁদের অস্ত্রাস্ত্র। ১৪

এই সব ফেরিওয়ালার গুরুরা প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত নন। কনিক

মিলনের মোহ ছড়িয়ে আত্মসাৎ করেন সবল যুগদের অর্ধসম্পদ, এমন কি পত্নীও। তাঁরা ব্যাধের মত। ১৫

“আহা, আপনার হাতের ধনেরখাটি! শুধু বিপুল নয়, বিপুলতরা! কিন্তু আপনার স্বামীটির...হৃদয় বড় ঝেল; এই হেন বচন ছাড়েন ধূর্ত-শ্রেষ্ঠ, আর ধীরে ধীরে টিপতে থাকেন কুলবধূদের কমল-কোমল পাণি। ১৬

বুড়ো আঙুলটিকে জলের মধ্যে ডোবান কজা, আর দেখতে থাকেন...জনভ্রম! কিন্তু আসল চোরটিকে তিনি দেখতে পান না। ইন্দ্রজালের এমনই মোহ। ১৭

মস্তুর নেই, স্তম্বর নেই, ছোট্ট একটি ধূপ আলিয়েই চাকরদের বশ কবে ফেলেন ধূর্তেরা, আবোলতাবল বকেন, মনিবদের মাথার টাটি মেঝে মজার চালান পান-ভোজন। ১৮

“নাগার্জুনের লেখা এই যুক্তিটি ধূপে জড়িয়ে কোণীনের মধ্যে রাখুন। চুরি করতে এসেই মূর্খা হবে চোর।” ইতি আশাস দেন ধূর্ত, আর আঙুনে পড়ে পরের ধন। ১৯

এই কূট ধূপ-কর্তাদের, বংসগণ, চিনে রেখো। তোমরা গল্প শুনেছ তো বকীপুত্র আর চোরের?...বাতে প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল...দারিদ্র্য এবং রাজভঙ্গ? ২০

“বশিকটি মহাধনী। পুত্রটিকে তিনি আবার পুত্রবৎ দত্তক নিয়েছেন। বুঝেছে, পুত্রটি আবার আমার অধীন।”...ইত্যাদি কথার খই ফোটে ধূর্তের মুখে, আর ধীরে ভোগে আসে কজার অর্থ। ২১

বংসগণ, এট বে সব প্রতারক ধূর্তদের কথা বলা হল তাঁদের নিয়োগ করেন শত্রুর।

সাক্ষাতিক তাঁদের ভাষা;

তাঁরা মর্গ-জ্ঞ,

তাঁরা স্বদর-চোর।

মিথ্যা-বধির বা ঘোষা সাজা তাঁদের কাছে,...খেচা। ২২

[ ক্রমশঃ।

## নালন্দা

আহমদ নওয়াজ

পূবাকালের শিক্ষাগারের এই নালন্দা শীঠস্থান,  
এই নালন্দায় গীত হলো বিশ্ববোড়া সাম্যগান।  
ছাত্র এসেন নানান দেশের বধা, কাশ্মীর পেশাবার,  
চীন, জাপান, কোরিয়া, জাভা, তিব্বত এবং সুমাত্রার।  
তাহার সাথে ছাত্র এসেন মঙ্গোলিয়ার বোখারার  
সাল, কালো, পীত ও হলুদ মিশিয়ে হলো একাকার।  
ব্রাহ্মণ আর বুদ্ধযুগের কৃষ্টি এবং শিক্ষাসার,  
এইখানে হয় প্রচারিত প্রচেষ্টাতে পাল রাজ্যের।  
জ্ঞানের খনি এই নালন্দা শিক্ষার্থীর পূর্ণা মঠ,  
উদারতার আবাস-ভূমি যুক্ত এবং অকপট।

অধিতীয় এই নালন্দার জ্ঞানমার্গের ভাড়াবা,  
আজও বাজে কর্ণ মাঝে, স্বর্ণযুগের সেই সাধাব।

সাংখ্য বৈশেষিক ও জায়ের দর্শন আর তত্ত্ব পাঠ,  
এই নালন্দায় বসিয়েছিল স্বর্ণযুগের স্বর্ণ-হাট।  
তাহার সাথে নিত্য ছিল বেদ ও উপনিষদ-বাণী,  
যাহার মাঝে লুক্কায়িত সত্য আছে চিরস্থনী।  
যোগ দর্শন শিক্ষার আশায় এসেন হয়েন সাং চিনের,  
শিলাভট্টের কাছে পেচলেন শিক্ষা গুচ্ছ-তত্ত্ব চের।  
তখন ছিলেন শিলাভট্ট নালন্দাতে চান্দ সেলার,  
মহাজানী সাধক পুন্ড, বঙ্গদেশের বড়সার।  
এই নালন্দায় দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাসু পাঠক দল,  
জ্ঞান সাধনার লাভ করেছেন, মহাজ্ঞানের মহাফল।



# অঘোর প্রকাশ

( স্বগায়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আর্তবন্ধু

১৮১৪ সালের মাঘোৎসবের পর রাজগৃহ যাত্রা করা হইল। এবারও পথে পথে গান ও মার কথা বলা হইল।

বিভাগলের জন্ত ও পরিবারের জন্ত শ্রম নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। মার্চ মাসে শ্রদ্ধের দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নির্মলার সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিনয়ভূষণের বিবাহ হয়। এ বিবাহে তোমাকে অনেক খাটিতে হইয়াছিল। গোপাল বাবুরা তোমার বাটীতেই ছিলেন। তার পর লক্ষ্মী নগরীতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা সরলা সহিত শ্রদ্ধের দীন বাবু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেখানেও তুমি গমন করিয়াছিলে। তুমি সেখানে বরযাত্রী ও কন্যাবাত্রী উভয়ই হইয়াছিলে। সেখানকার একটি ঘটনা মনে আছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিল ভক্তলোক একটু মুঞ্চিলে পড়িয়াছিলেন। কারণ, সকল ব্রাহ্মের সঙ্গে তিনি আহার করিতে পারিবেন না। তুমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলে, এবং আশ্বাস দিয়া তাঁহার ভিন্নস্থানে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে। তিনি একথা এখনও ভুলেন নাই।

ইহার পর তোমার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর বিবাহ উপস্থিত হইল। বিবাহের জন্ত আমরা চেষ্টা করি নাই, কারণ চেষ্টা করা তোমার ও আমার উভয়েরই বিশ্বাস-বিরুদ্ধ ছিল। বিধাতা আপনি এ সম্বন্ধ মিলাইয়া দিলেন। কন্যা সরোজিনীকে তুমি বৈরাগিনী করিয়া গঠন করিয়াছিলে। বেশভূষা সাত্ত্বসজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি যথার্থই নিজের অলঙ্কার বলিয়া জানিতেন। বরপক্ষের অভিভাবকগণের সঙ্গে কথাবার্তা হইবার সময় শ্রদ্ধের প্রতাপ বাবু মহাশয়ের পত্নী কস্তার ছবি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। একা তাঁহার ছবি তুলাইলে পাছে তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়, তাই সে সময়ে তোমার, আমার, সুবোধের ও সরোজিনীর ছবি তোলা হইল। ভাগ্যে সেদিন তোমার ছবি তোলা হইল, নতুবা তোমার একখানি ছবিও আমার কাছে থাকিত না। দেহে থাকিতে দায়ে পড়িয়া সেই একবার মাত্র কালীর ছবি লইতে দিয়াছিলে। ছবি তো তোলা হইবে, কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষসজ্জা করিয়া যাওয়া হয় নাই। ফটোগ্রাফার বলিলেন, দাদা কাপড়ে ছবি ভাস উঠিবে না, তাই আমার গেকরা পায়ে দিয়া সকলে ছবি তুলিলে। এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছবি তুলিয়াছিলে বলিয়া, বিশেষতঃ কন্যাকে সাজাও নাই বলিয়া, তুমি বন্ধুজনের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছিলে।

বরকন্যা পরম্পরকে পছন্দ করিলেন, তার পর বিবাহের আয়োজন হইল। একই বেলিতে বসিয়া শ্রদ্ধের অমৃত বাবু ও ভাই শিবনাথ বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর কস্তার শব্দ-খাত্তরী নিকট হইতে

সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে তাঁহার পুত্রবধু পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের সুখের সীমা রহিল না।

কস্তার বিবাহের পর তুমি তোমার সেবার কার্যে আরও প্রাণ-মন ঢালিয়া দিলে। বিভাগলের ও পরিবারের নিহমিত কাজ ব্যতীত দরিদ্র ও বিপন্নের সেবা করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে। হৃৎ-দারিদ্র্য রোগ-শোক দেখিলে তুমি আর স্থির থাকিতে পারিতে না। এক এক সময়ে আহার নিত্রার অবসর থাকিত না, তবু নিজে খাটিতে ও সকলকে উৎসাহিত করিতে অত্যাশ্রয় কর নাই। বতই শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল, ততই যেন তোমার নিষ্কাম সেবা ও নিঃশেষ ভাব বাড়িতে লাগিল। একটা কোন বস্ততে প্রেম আশ্রয় না থাকিলে বা হয়, তাই তোমারই হইতে লাগিল। এদেশে নারীভাবনে যে সেবা নাই তা নয়। কিন্তু তাতা প্রায়ই স্বামী ও পরিবারের সীমার মধ্যেই বন্ধ থাকে। তুমি যতই আশ্রিত প্রাচীর ভাঙ্গিতে লাগিলে, ততই পরের জন্ত ভাবিবার ও খাটিবার শক্তি বাড়িতে লাগিল। তোমার কাছে এ সময় যেমন বড় মানুষের বাটা, তেমনি দুঃখিনী বিধবার পর্ণকুটীর। সংবাদ পাইলেই হৃৎ দূর করিবার জন্ত দৌড়িতে। শেষে যখন এই সেবার কাজ অনেক বাড়িয়া চলিল, আমার কাছে সব সময় জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইতে না। কত দিন আমার অজান্তেই কত রোগীর সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রাত্রি দুইটার সময় আমার শয্যার পার্শ্বে কাঁড়াইয়া বলিল, “আমি যাই।” চক্ষু খুলিয়া দেখি, তুমি আপনায় মোটা সজ্জা গজ্জিত। আমি বলিলাম, “এই শীতকালের রাত্রিতে কোথায় যাইবে?” তুমি—“বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র বড়ই পীড়িত, দেখিতে যাইব।” ব্রাহ্মণীর আর কেহই নাই, একমাত্র পুত্র এক এ পাশ করিয়াছিল; সেই পুত্র স্নায় রোগে এখন তখন, বায় বায়। সন্ধ্যার সময় তুমি সেবা করিতে গিয়াছিলে। চিকিৎসার্থে পরেশ বাবুকে ডাকাইয়াছিলে। আমি এ সব কিছুই জানিতাম না। আমি নিদ্রিত হওয়ার পর, রাত্রি দশটার সময় বাটা আসিয়া আহার এবং শয়ন করিয়াছিলে। তার পর এই আমাকে প্রথম জাগাইলে। আমি—“এত রাত্রে কেন যাইবে? প্রাতঃকালে যাইও।” তুমি—“বলিয়া আসিয়াছি, ডাকিলেই যাইব। অবস্থা মন্দ না হইলে ডাকিতে আসিত না।” আমি—“ঘরের গাড়ী আছে, প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতেই যাও।” তুমি—“ঘোড়া পরিশ্রম করিয়াছে, কোচোয়াম নিত্রা যাইতেছে, গাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। ততক্ষণে হাটিয়া রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারিব।” আমি—“তবে যাও।” অমুমতি পাইবামাত্র তুমি অল্পশেষে সেই ঘোর নিশাকালে পদব্রজে রোগীর সেবার চলিয়া গেলে। সঙ্গে রোগীর বাটার চাকর, তার হাতে লঠন। শেষ রাত্রি ৪টার সময় রোগীর দেহান্ত হয়। শব গঙ্গাতীরে পাঠান, বহনের জন্ত ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করা। এসব তোমাকেই করিতে হইল। বিধুরা মাতার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তুমি তাঁহাকে স্নান করাইলে, শয্যা প্রস্তুত করাইয়া দিলে, একটু

সবত পান করাইয়া বাটা আসিলে। তখন বেলা ১টা, বিজ্ঞানস্নেহ বাইবার সময় নিকটবর্তী। উপাসনা করিয়া, একটু দুধ খাইয়া বিজ্ঞানস্নেহ চলিয়া গেল। আহারের সময় পাইলেন না।

একদিন বিজ্ঞানস্নেহ কাজ করিতেছে, এমন সময় তোমার পুত্রসম স্নেহভাজন ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া সংবাদ দিলেন, নিকটেই একজন অসহায় নারী প্রসবের পর কষ্ট হইয়া কষ্ট পাঠিতেছেন, সাহায্য প্রয়োজন। কামাখ্যানাথের সঙ্গে তোমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল যে, এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তিনি তোমার সংবাদ দিবেন ও সেবার জন্ত লইয়া বাইবেন। প্রিয় কামাখ্যানাথ নিজেই লিখিতেছেন, “একদিন একটি ছাত্র মেডিকেল স্কুলে আমার বলিল যে এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ধনীর কোন আত্মীয় রোগে ভয়ানক কষ্ট পাঠিতেছেন। স্ত্রীলোকটির এক মাস কি দেড় মাসের একটি শিশু কষ্ট আছে, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার কোনও লোক নাই, এবং পথ্যাদি কিনিবারও কোন সম্ভল নাই। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহ তাঁহার সংবাদ লন নাই। ছাত্রটির মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। দুঃখনিবারণের কি উপায় হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি গিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাথিনী নারীর ভগ্ন কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই মলমূত্র-বিশিষ্ট কতকগুলি নেকড়া, বাহা গৃহের এক ধারে জড় করা ছিল, তাহা লইয়া কাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমি ভোঁ অবাঁক হইয়া গেলাম। তিনি যতক্ষণ নেকড়াগুলি কাচিতে লাগিলেন, আমি গৃহ পরিষ্কারে জন্ত খাঁটা লইয়া খাঁট দিতে লাগিলাম। তিনি চাকরের মধ্যে নেকড়াগুলি কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া আমার হাত হইতে খাঁটা লইয়া গৃহের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।” গৃহটি অপরিষ্কার, এক দিকে কয়লার গুঁড়া, অত্র দিকে আবর্জনা। বাবুটি কয়লার ব্যবসা করিতেন, তখন নিঃশব্দ। প্রস্তুতি সন্তান লইয়া কয়লার মধ্যে পড়িয়া আছেন। দেখিয়া মাত্র আপন গৃহে সংবাদ পাঠাইয়া দিলে। যেখন হইতে পরিষ্কার বস্ত্র, শয্যা, উপাধান চাহিয়া পাঠাইল। যখন তুমি সম্মানজনী হস্তে লইয়া গৃহ পরিষ্কারে নিযুক্ত হইলে, বাবুটি আসিয়া আপত্তি করিলেন। তুমি বলিলে, “এ হাত থাকিয়া কি হইবে?” সত্য সত্যই দেবি, তোমার হস্ত সেবার জন্তই আসিয়াছিল। তুমিও তাহা বুঝিয়াছিলে। অল্পক্ষণ মধ্যে গৃহ পরিষ্কার হইল, শয্যা প্রস্তুত হইল, মাতা ও শিশুর বস্ত্র পরিবর্তন করা হইল। একখানি খাটে শায়িত। হইয়া সেই নারী বলিলেন, “মা তুমি প্রাণ দান করিলে।” গৃহে গিয়া দুধ সাগু প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলে, ও কামাখ্যানাথকে প্রতিদিন আসিয়া চিকিৎসা করিবার ভার দিলে। সুপরিষ্কৃত সন্তানটি যখন মাতার কোলে দিলে, তখন মাতা যে হাসি হাসিলেন, তাহাই তোমার পুরস্কার। বহু দিন ইনি অসুস্থ ছিলেন, প্রতিদিন দেখিতে বাইতে।

একটি বালিকা পূর্বে তোমার বিজ্ঞানস্নেহে পড়িতেন। তিনি এখন বিবাহিতা। সম্প্রতি একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বিজ্ঞানস্নেহ যি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। সে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল যে, ঐ কস্তার পিতামাতা তীর্থে গিয়াছেন। বাটীতে কেবল কস্তার স্বামী আছেন। এদিকে কস্তাটির শ্রুতিকান্ড হইয়াছে। গৃহে দ্বিতীয়া

নারী নাই যে সেবা করেন। শুনিয়া মাত্র তুমি সেবা করিতে গমন করিলে। শ্রুতিকান্ডের দুর্দশা দেখিয়া তোমার বড় কষ্ট হইল। তুমি সেই দুর্গন্ধময় স্থান পরিষ্কৃত করিলে, প্রস্তুতি ও সন্তান বাহাতে আরামে থাকেন, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলে। কস্তার স্বামী দেখিয়া অবাঁক হইলেন। গৃহ পরিষ্কার করা, সন্তান পরিষ্কার করা, শয্যা প্রস্তুত করা এ সকল কার্য যেন সুহৃৎমধ্যে হইয়া গেল। ডাক্তার ডাকাইল। যন্ত্রের সহিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সেদিন তুমি অনেক রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। তুমি অনেক বস্ত্র করিতে লাগিলে, কিন্তু রোগ অতি কঠিন হইয়া পাড়াইল। প্রতিদিন তোমার কত বার বাইতে হইত, ঠিক নাই। এত সেবা করিলে, তবু কস্তা তিন চারি দিনের বেশী জীবিত রহিলেন না। শেষ সময়ে আমিও উপস্থিত ছিলাম। রোগের যন্ত্রণার অস্থির হইয়া কস্তা বলিলেন, “মা, আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।”

তুমি বলিলে, “এখন ভগবানকে শ্রদ্ধা কর।” আহা! বালিকা তিনি, ভগবানের বিষয় কি জানেন! স্নিহাসিলেন, “কাহাকে ডাকিব? কি বলিব?” তুমি বলিলে, “দয়াময় হরি, দয়াময় হরি, এই নাম কর।” সেই নাম করিতে করিতে কস্তা সন্ধ্যার পর দেহভাগ করিলেন। তখন তুমি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলে, এখন ইহার সঙ্গতির জন্ত বাহা প্রয়োজন তাহা করা হউক। তার পর গঙ্গাতীরের স্রাব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া গৃহে ফিরিলে।

—বাবু মুনসেফ। তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তানের ডবল নিউমোনিয়া হইল। পুত্রের জননী তখন পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তিনি সেবা করিতে অক্ষম। বন্ধুরা তোমাকে সংবাদ দিলেন। আমি তখন বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছি। কিন্তু আমার অল্পমতির জন্য অপেক্ষা করা তখন সম্ভব নয়, তাই আমাকে না বলিয়াই বাইতে প্রস্তুত হইলে। ইত্যবসরে আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমি তোমার সঙ্গে মুনসেফ বাবুর বাটীতে গেলাম। সন্তান একটি ছোট বয়ে রহিয়াছে, দেখিবারাত্র তুমি বলিলে, ইহাকে বড় দালানে লইয়া বাইতে হইবে। তাহাই হইল। বাজার হইতে লানল আনা হইলে, আপন বাটা হইতে ভাজা তিবি চূর্ণ করাইয়া আনা হইল। পুসটিশ দিতে লাগিলে। বেলা নয়টা কি দশটার সময় বসিলে, বেলা দুইটা বাজিয়া গেল তবুও তুমি একাঙ্গনে সন্তান কোলে লইয়া সেবা করিতে লাগিলে। তারপর কস্তা মৃত্যুর এবং বিজ্ঞানস্নেহের শিক্ষিত্রী ফিরিয়া আসিলে তোমার আশ্রয় জন্ত ছুটি হইল। বাটা আসিয়া আহার করিয়া আবার পূর্বের মত সেবার নিযুক্ত হইল। সন্তানের মাতা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অবাঁক হইয়া তোমার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বাবুদের সঙ্গে আমিও অনেক বার দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে হইল যেন তুমি আপনার সন্তান কোলে লইয়া বসিয়া আছ। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া তোমার স্বামীর জন্ত আমি একটু চিন্তিত হইতেছিলাম। কিন্তু হাং, সন্ধ্যার পূর্বেই তোমার কোল ছাড়া করিয়া এক পিতামাতাকে কাঁদাইয়া সন্তান পলায়ন করিলেন। জননী যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, তুমি সাবুনা দিয়া বলিলে, “অধিক কাঁদিলে গর্ভস্থ শিশুর অকলাপ হইবে, এখন ভগবানের শরণাগত হও।” ইহার পর হইতে সেই জননী গাড়ী করিয়া তোমার নিকট উপদেশ ও সন্তানার জন্ত বাস্তব হইয়া আসিলেন।

তিনি যেন ঐ দিন হইতে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত হইয়া গেলেন।

এদিকে এইরূপ সেবা করিতে, আবার মাসিক আয়ের টাকা পরার্থে এত ব্যয় করিতে যে অনেক সময় নিজের বস্ত্র ক্রয় করিবার সম্ভাবিত থাকিত না। অতি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকের বাড়ী সেবা করিতেই বা কিকপে বাইবে, এই সম্বন্ধে অনেক বার পড়িতে হইয়াছে। তোমার মৈনিকে একদিন লেখা আছে, “আজ রাত্রিতে —র ভাইর পেটের খুব পীড়া থাকায় ১২টা রাত্রিতে ডাকিতে আইসে। তখন গেসাম না। ১১টায় আবার ডাকিতে আইসে। তখন আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। খুব হেঁড়া একখানি বস্ত্র পরিয়াছিলাম। সেইখানি পরিয়াই তাহাদের চাকরের সহিত তাহাদের বাটাতে গেলাম। খুব ভাল ঐশ্বর্যদর্শন হইল। যুয়ু’ সম্মানকে একাকী লইয়া বসিয়া রহিলাম। ৮টার সময় চক্ষের সামনে আস্তে আস্তে শিশু চিহ্নিত হইল। পরদিন বেলা ১টার সময় বাটা আসিয়া একাকী উপাসনা করিলাম। বড় মিষ্ট উপাসনা হইল। প্রার্থনা,—মা, সর্বদা নিত্যতা অমূল্য করিতে শিখাও।

কখনও কখনও কেহ কেহ মনে করিতেন, দেখাইবার জন্ত তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান কর। কিন্তু তাহা নয়। সেই যে প্রথম ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই হইতে কখনও ভাল বস্ত্র ভাল অলঙ্কার পরিধান কর নাই। আর তা ছাড়া, কাহারও অভাব জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাত্ নিজের বা কিছু থাকিত এমন কি আমার ও সম্মানদের বা কিছু থাকিত, সবই অকাতরে দান করিতে। কাজেই কিছু থাকিত না। আমি তোমার কিছু অলঙ্কার করিয়া দিই নাই। পিত্রালয়ের যে ক’খানি গহনা ছিল, তাও সব বিক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলে। একবার একজন লোক বেনারসী সাড়ী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। আমার ভাতৃশ্রী বসন্ত বলিলেন, “কাকীমা, একখানি সাড়ী কেন না? নিজে না পর, সর্বোজিনীকে একখানা ক্রয় করিয়া দেও।” তুমি সকল বস্ত্রগুলি দেখিলে, কিন্তু সকলগুলিই কিরাইয়া দিলে। বসন্ত জিদ করিতে লাগিলেন, উত্তরে তুমি বলিলে, “একখানা কিনিলে তো হবে না, আমার দশটি মেয়ে, দশখানা কিনিতে হয়।” সত্য সত্যই পরিবারের সব মেয়েদের তোমার আপনায় কষ্টা মনে করিতে, তাই অসম্মতি নিবন্ধন আপনায় কষ্টাদেরও বসন্ত ভরণ করিয়া দিতে পার নাই। পূর্বে বখন পবের কষ্টাদের আপনায় করিতে শিক্ষা কর নাই, তখন উৎসবের সময় নুতন বস্ত্র আনিতে, এবং আপনায় সম্মানদিগকে পরাইয়া স্থপী হইতে। কিন্তু বখন আপনাকে ভুলিয়া পবের মঙ্গলে নিযুক্ত হইলে, তখন উৎসবের সময় সকলের বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন না বলিয়া নিজের সম্মানগুলিকেও বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইতে। মেয়েদেরই ভাল বস্ত্র নাই, তখন তোমার আর কোথা হইতে হইবে? তুমি তাই বেহারের হুস্বিনীদের মত “হুটিয়া” বস্ত্র বস্ত্র করিয়া পরিধান করিতে, এবং বড় মাংসের মেয়েদের সঙ্গেও তাহাটী পরিয়া দেখা করিতে বাইতে। সেই মোটা, বং করা, মাংসখানে সেলাই করা দীর্ঘ বস্ত্র পরিয়া একদিন একজন শিক্ষিতা রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে। তিনি বিলাতফেরতদের ঘরের মেয়ে। বস্ত্র দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—“এ বস্ত্র কোথায় পাইলেন?” তুমি দমিবার মেয়ে

নও, অমনি বলিয়া উঠিলে, “কেন? পরিবে? বল তো ক্রয় করিয়া দিতে পারি। অমুক জায়গায় পাওয়া যায়।”

এই বৎসরের আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। শ্রদ্ধের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। এখান হইতে ডাকগাড়ীতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবেন। ডাকগাড়ী সকাল ৭টার আইসে। তুমি স্বীকার করিলে, সকালে ৬টার সময় আহাৰ প্রস্তুত করিয়া দিবে। তিনি আনন্দিত হইলেন। আহাৰ হইবে, উপাসনা হইবে না, ইহা তোমার প্রাণে সহিল না। লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলে, “৬টার আহাৰ, তবে উপাসনা কখন হইবে?” শ্রদ্ধের মহাশয় বলিলেন, “অন্ত সকালে কেহ কি আসিতে পারিবেন?” তুমি বলিলে, “আপনি বলিলেই সকলেই আসিবেন,” যেন তুমিই সকলের কর্তা। হইলও তাহাই। প্রায় সকল বাটার স্ত্রী-পুরুষেরা ৫টার সময় তোমার দেবালয়ে উপস্থিত। গরম জল প্রস্তুত হইল; শ্রদ্ধের মহাশয় ৫টার পূর্বে স্নান করিলেন। শ্রদ্ধোদয়ের পূর্বে উপাসনাগৃহ পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, উষা উপাসনা কখনই করেন নাই; তোমার চেষ্টায় তাহাও হইল। ৬টার সময় আহাৰ করিলেন, ও ৬টার সময় যাত্রা করিলেন।

এই বৎসর গান্ধীপুত্র গিয়া গৃহোৎসব করা হইবে এই স্থির হইয়াছিল। গান্ধীপুত্রের উকীল ভাই নিত্যগোপাল বায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তোমরা প্রস্তুত হইলে। ছোট বড় সব বাড়ীই নারী। আমি ও ব্রজগোপাল তোমাদের সেবার্থে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা আরা উপস্থিত হইলাম। সেগানকার ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল না। তুমি অম্মা উৎসাহে সব মেয়েদের সঙ্গে লইয়া হাঁটুয়াই চলিতে লাগিলে। পথ অন্ধকারে আবৃত হওয়ার একটু শরদানে চলিতে হইল। অল্প রাত্রি হইতে না হইতে সকলে গঙ্গাগোপাল বাবুর বাটাতে উপস্থিত হইলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী অনেক আদর ও যত্ন করিলেন। সেই রাতেই তোমরা ক্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্রের বাটাতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকেও সঙ্গিনী করিলে। পরদিন অতি প্রত্যুষে উপাসনা ও আহাৰ করিয়া আরা হইতে গান্ধীপুত্র যাত্রা হইল। তাত্ত্বিগাট হইতে দুখানি নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া গান্ধীপুত্র পৌছিলাম। ভাই নিত্যগোপালের কতই যত্ন। খুব বড় বাড়ী, খুব বড় মন, তোমাদের আদরের সীমা রহিল না। ২৩শে রবিবার সন্ধ্যার উপাসনা ব্রজগোপাল করিলেন। সোমবারে পণ্ডহারি বাবার দর্শনার্থে গমন। তিনি পূর্বদিন বাহির হইয়াছিলেন। তোমরা তাঁহার কুটীরের সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া অনেক কথা কহিলে। তাহার পর গৃহে ফিরিলে। ২৫শে তাঁবুর মধ্যে ভাই নিত্যগোপাল উপাসনা করিলেন। বড়ই ভাল লাগিল। পরদিন কর্ণওয়ালিস সাহেবের সমাধি দর্শন করিয়া তার পর নিত্য বাবুর পড়ার পিত্রালয়ে বেড়াইতে গেলে। সেদিন তুমি খান ধুতি পরিয়াছিলে। ভগিনীর ইচ্ছা যে সধবার মত পাড়ওয়াল কাপড় পরিধান করিয়া যাও। তুমি বলিলে যে তাহা হইলে বাওয়াই হইবে না। অবশেষে তোমার কথাই রহিল। বিধবার বেশে গেলে, কিন্তু ভগিনীর বাটার সকলেই তোমাকে আদর করিলেন। তুমি বলিলে, বস্ত্রে কি সধবা বিধবা হয়? তোমায় খানের ধুতি পরিলে বেশ দেখাইত।

## যটুত্রিশ পরিচ্ছেদ

চিরয় যোগ বৃদ্ধি

১৮১৪ সালে তোমার বিজ্ঞানস্নেহ ছাত্রীসংখ্যা আরো বাড়িল ; কায়েই খাটুনিও বাড়িল ; তার উপর বিপ্লবের সেবার জন্ত কত আহ্বান আসিতে লাগিল, তাহাও পূর্বে বলিয়াছি। এ সকলের মাধ্যম্য থাকিয়াও সেই চিরবাহিত খন চিরয় যোগের জন্ত মন পড়িয়া থাকিত। মায়াশূন্য আসক্তিশূন্য হইয়া কিরূপে মার কাজ করিবে, তারই জন্ত সর্বদাই ব্যাকুল থাকিতে। মার কাজের খাতিরে তোমাকে অনেক সময় আমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইত ; আমি মফঃস্বলে গেলে আর তো সঙ্গে বাইতে পারিতে না। তাই আনন্দের সহিত সংগ্রাম আরও বনীভূত হইয়া আসিল, চিরয় যোগের পিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একদিন বলিতে, “আমার ভালবাসা শেখা এখনও হয় নাই।” আপনাতঃ প্রতি নির্ভর কখনই করিতে না ; আপনাতঃ গুণ কখনই দেখিতে না, তাই তোমার দৈনিক তোমার নিত্য নব নব কান্তর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। একদিন লিখিয়াছি, “এখনও ভালবাসা শিখি নাই। দয়াময়ী মা, তোমার ভালবাসা শিখাও। আমার ভাল রক্ত, ভাল মাংস, হাড়ের শক্তি, সকলই দিয়া সংসারের সেবা করিলাম, ভালবাসিলাম। কিন্তু তাহার ফল এখনও দেখি শূন্য। এখন কাল রক্ত, পচা মাংস, দুর্বল হাড় কয়খানা দিয়া শেষ কয়টা দিন বাহা করিব, তাহা যেন তুমি গ্রাহ্য কর, ও তোমার ছেলেমেয়েরা গ্রাহ্য করেন, এই ভিক্ষা। আত্মি রাগ হয় নাই।” তোমার এই লেখা হইতে মনে হয়, তুমি যেন আভাস পাইতেছিলে, যে শরীর দিয়া মাথের সেবা করিবার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আর তাই চিরয় যোগের জন্ত এত লালায়িত হইতেছিলে।

এই বৎসর একবার আমি পাটনা জেলার অন্তর্গত মিরচাইগঞ্জ নামক স্থানে গিয়াছিলাম। তখন তুমি পত্রে লিখিয়াছিলে, “কায়ের শ্রোত খুব বাড়িয়া চলিতেছে, এই সঙ্গে ক্রমও বাড়িতেছে, ভয় পাইও না। মা আমাদের প্রাণ আরও প্রশস্ত করুন। শরীর তফাৎ হইলেও যে যোগ কমে না, বরং পরলোকচিন্তা সহজ হয়, তবু আমার পাগল মন কেন শরীর ভালবাসে, কি জানি? অবশ্যই কোন অভিপ্রায় আছে, বুঝি! তা না হ’লে কেন কণিকের জন্ত আমাকে এত কেল দেয়। পরে আর তো সে ভাব থাকে না ; মন খুব ভাল হয়, যোগ নিকট হয়। আজ ৪টার সময় এই কথাই মনকে ব্যাকুল করিতেছিল। কে যেন বলিল, এক সময় এইরূপ শরীর আর থাকিবে না। সেই চিন্তায় মনকে কি করিল, আত্মার যোগের জন্ত প্রাণ যেন পাগল হইল। সে যোগ এখনও হয় নাই, বাহাতে শরীর দেখিলে যেমন স্তম্ভ হয় শরীর না দেখিলেও তেমনি হইবে। আজ কাল সেই যোগের জন্ত খুব চেষ্টা করিতেছি। তোমাকে নিকটে উপস্থিত দেখিলে সকল বিষয় বলিব। এখন মায়ের কৃপাকে শুভক্সণে ধরিতে পারিলেই হয়। কত কথা আর লিখিব, শেষ তো নাই। যোগ বাড়ুক, মা তাই করুন ; কারণ এ লেখাও তো আর থাকিবে না। মন চ’লে বাড়ুক, সকল কথা বলে আনুক, এই ভাল। তুমি আর এখন মিরচাইগঞ্জে নও, এই যে আমার পাশে সত্যই আমি অগ্রভব করিতেছি। মা, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, সেই যোগ লাও।”

এই সময় কোনও শ্রদ্ধেয়া ভগিনীকে লিখিয়াছিলে, “কয় দিন নেওয়ার খগোলের ভাই-বোন সহ খুব ভাল কাটাইলাম। কাল এখানে আসিয়াছি। আর শেষ কটা দিন নিশ্চয় থাকিবেন না। একবার আগুনটা খুব ভাল ক’রে ছেলে দিন। আর যে বিলম্ব হয় না ; কবে কি হইবে? খুব ধুমধাম লাগান না। দিন বে গেল। মা এবার চরিত্র ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। কে তাহার সেই সাধ পূর্ণ করিবে? মাতা ও পৃথিবী ও ভক্তগণ আমাদের উপর বড় বেশী আশা করিয়াছেন। এবার শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় একই কথা বলিলেন যে, এইখানেই সেই দল হইবে, যে দলের ছাত্রায় লোকে শাস্তি পাইবে। দিদি, এ কথা শুনিলে ভয় হয়, কিন্তু মাও ছাড়িতেছেন না। আর এক কথা শুনিলাম যে নারীর ধর্ম না হইলে ধর্ম থাকিবে না। তবে উঠুন, আর বিলম্ব করিবেন না। আমরাই যদি প্রতিবন্ধক তবে আর দেবী করা উচিত নয়।”

আর একবার আমি মফঃস্বলে গেলে আমাকে লিখিয়াছিলে, “শিখু! তুমি এবার আশ্চর্যরূপে নিকটে বাস করিতেছ। এই পূর্ণ নিকটে দেখিতে পাইলে আমার আর কিছু বলিবার নাই। মন খুব ভাল। কাজ বেশ করিতে পারিতেছি। লিখে আর এখন কথা শেষ হয় না। চিরয় কথাই ভাল। এখন তুমি জলে আমি স্থলে। — মা ভক্তিকে বলিয়াছেন, স্ত্রবোধের বাবা, মা যখন একজ্ঞ যান, কেমন বেশ দেখায়, যেন ভাই-বোনের মত। যাকে যে ভালবাসে, তার সকলই তার ভাল লাগে।” যোগেই এ প্রফুল্লতা হয়। দুঃখের বিষয় এ চিরয় যোগ সর্বক্ষণ থাকে না। দুর্বল মানুষ, জড় শরীর না পাইলে তাহার মন ওঠে না। জড়ের ভুলিয়া থাকিতে চায়। তুমিও তো মানুষ ছিলে, তোমারও ঐ দশা হইত। যোগে বঞ্চিত হইলে তোমার কি কষ্ট হইত, নির্যাকৃত পত্র পড়িলে বুঝা যায়। এখন ৪টা বাজিয়া ১৫ মিনিট, এই স্থল হইতে আসিলাম। সভার জন্ত প্রস্তুত হইতেছি। আজ একটি গুরুভার মাধ্যম লইতে বাইতেছি। কি হইবে জানি না। ফল মায়ের হাতে। তুমি এ সময় প্রার্থনা করিও ; মা আত্মীকর্ষন করুন। কাঁল গাড়ী যখন বাড়ী মুখে ফিরিল, অমনি চক্ষু দিয়া অনেকখানি জল পড়িল। আর বাধা দিলাম না। ফাটকের বাহিরে আসিতে আসিতে পরলোকের ছবিখানি মা হাতে লইয়া দেখা দিলেন, আর সেই ছবি দেখিতে দেখিতে সমস্ত পথ বেশ এলাম। কাল সমস্ত সময় আর আজ এ পর্যন্ত সেই ছবিখানি আমার সামনে যেন ঝাঁড়াইয়া বহিয়াছে। বেশ দিন কাটিল। আশা করি তোমারও তাই। আর আমার শরীরের জন্ত ব্যাকুলতা নাই। এখন মর্শনে পৌছিয়াছি। এখন প্রাণ মর্শনের জন্ত ব্যাকুল হয়, এইতো এবার বুঝিতেছি।

একবার আমি গঙ্গাতীরে সুন্দর শোভাময় স্থানে একটি বাগানতে ছিলাম। ইচ্ছা হইল, তুমিও আসিয়া সে শোভা দর্শন কর। তোমাকে লিখিলাম। উত্তরে তুমি লিখিলে, “চিরমুক্ত! এবার বেশ আছি। কোনও রূপে মন উল্লাস নয়। এ কাজ আমার পবিত্রাণের জন্ত। এই কয় দিনে শরীরের আসক্তি বিষয়ে অনেক উপকার দেখিতেছি। মার কৃপায় আশা কবি মুক্ত হইব। এমন মন আর কখনও ছিল কি না মনে নাই। যে নির্ভর করে, তার এইরূপই হয়। আমি গেলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাইতে হয়।

তাঁই ভাবিতেছি, দেখি কি হয়। যদি বাই সন্ধ্যার সময়।  
আহারাদির কোন যোগাড় করিও না। বাওয়ার ঠিক নাই। যদি  
বাই, আহার করিয়া বাইব। আশা করি, মার কোলে তুমি ভাল  
আছ। এবার তুমি বড় নিকট। তবে বিদায়।" পাহাড়ে  
উঠিতে উঠিতে যদি একটা বিকৃত সমতল ভূমি পাওয়া যায়, তাহা  
হইলে মনে হয়, বুঝি এই শেষ, বুঝি আর উঠিতে হইবে না। যোগ-  
রাজ্যের সেইরূপ এক ভূমিতে তুমি এই সময় উঠিয়াছিলে; সুতরাং  
তোমার দুঃখ নাই। তখন তুমি প্রিয়জনকে নিকটেই দেখিতেছিলে,  
আর কাঁদিলে কেন? কিন্তু অনন্তের রাজ্যে তো কাহারও কখনও  
নিস্তার নাই। "হইল না" একথা বলিতেই হইবে, নইলে অনন্ত  
উন্নতি একটা কথার কথা মাত্র, যখন ঈশ্বর যোগভূমিতে লইয়া  
বাইতেছেন, তখনও কত তর্ক, কত আশঙ্কা। মন কখনও কত  
ভোলপাড় হইত তাহা এই পথে বুঝা যায়। "কাল গাড়ীতে  
আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, অশ্রু পিকুর সেবা করিতে কে  
দিতেছে না? আমার হাত পা কে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন?  
উত্তর আসিল, 'মাসিক এই হুকুম দিয়াছেন।' কোথাও কেহ নাই,  
অথচ এই শব্দ আসিল, 'অমনি মাথা হেঁট করিয়া 'বস' বলিলাম।  
সুখে আসিয়া অনেক বার স্মরণ হইল। স্মরণের বেড়ার ভিতর তুমি  
খুব উজ্জল ভাবে ছিলে। সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিয়া একবার চুপ  
করিয়া একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল। নিজের বিছানায় চুপ করিয়া  
শয়ন করিলাম, এবং তোমাকে খুব নিকটে দেখিয়া দূরত্ব যেন  
ভুলিয়া গেলাম। অনেক আলাপ করিলাম। ঐ বাহা গাড়ীতে  
হইয়াছিল তাহা তোমার কাছে বলিলাম, ও আরো বলিলাম, আমার  
যে তোমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এইরূপে অনেক  
আলাপে খুব আরাম পেলাম। কিন্তু তোমার নতুন স্থানে হয় তো  
কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি ভাবিয়া মনটা আবার একটু কেমন করিল;  
কিন্তু আমার ইচ্ছা তো কিছু নয় এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম।  
পিকু। এইরূপে আমার যে তপস্যা হইতেছে, মনে হয় তাহা কিছু  
কম নয়। এতেই আমার জীবনকে লইয়া বাইতেছে।"

আর একবারের পত্র এই, "কাল বেরূপ দেখিলাম তাহাতে আশা  
বাড়িল। যেমন কাপড় পরিলাম, অমনি যেন কর্তব্যের ভিতর  
পড়িলাম আর আসক্তি মায়া কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় তুমি  
বুঝিতে পারিলে। যেমন করিয়া তুমি আমার মায়া পশ্চাতে ফেলিয়া  
অগ্রসর হও, তেমনি করিয়া তোমার মায়া ভুলিয়া আমি অগ্রসর  
হইতে কাল পারিয়াছিলাম। আশা হইতেছে যে আমিও মাহাত্ম্য  
হইতে পারিব। আর কি বলিব। আমার মন স্তবী। আমার  
আর কি স্তব। মার এবং তোমার ইচ্ছা পালনই আমার স্তব।  
তবে এখন বিদায়।"

২০শে অক্টোবর তোমাকে আমার সঙ্গে মফঃস্বলে চলিতে  
বলিলাম। কর্তব্যের জন্ত এবারও তুমি বাইতে পারিলে না।  
আমার মনে হইল, তবে একাকীই বাইতে হইবে। শুদিকে তুমি  
লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ, "আমাকে সঙ্গে বাইতে অনুরোধ করায়  
আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও বাইব না বলিলাম। কারণ, আমার স্তবের জন্ত  
অনেক কর্তব্য নষ্ট হয়, অতএব কি করিয়া বাইব? গেলাম না বটে,  
কিন্তু মন আমার তাঁহারই সহিত চলিয়া গেল। আমি বেশ  
বুঝিলাম আমার মনও গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেলে উপরে

আসিয়া আজকার ডায়েরী লিখিলাম। প্রায় ১১ ঘণ্টা আমি  
জাগিয়া থাকি। এ সময়ের মধ্যে বোধ হয় সর্বশুদ্ধ দুই কি তিন  
ঘণ্টা অঃ প্রঃ আমার মনে থাকেন না। আজ বড়ই মনটা কেমন  
করিতেছে, কি জানি। মা, তুমি তাঁহাকে কোলে কর।"

১১ই নভেম্বর লিখিয়াছ, "কাল সন্ধ্যার সময় উপাসনার ঘরে  
একাকী বসিয়া পরলোকের কথা ভাবিতেছিলাম। তুমি অবশ্যই  
ছিলে। মনে হইল যেন তুমি অনেক দূর দেশে গিয়া পড়িয়াছ।  
তাহাই সত্য। কারণ নিকটে থাকিলে সংবাদ পেতাম।  
নিজ দেশে গেলে আর তো কাগজে সংবাদ আসিবে না। তখন তার  
ভিন্ন আর সংবাদের উপায় থাকিবে না। তারটা পরিচয় চাই।  
ব্রহ্মরূপ তার সাক না করিলে সংবাদ দেওয়া বড় কঠিন। সেই  
তার কিসে পরিচয় রাখি এই কথাই আজ উঠিল। এই ভাবেই  
উপাসনা হইল। ইচ্ছা করিতেছে, জিজ্ঞাসা করি কবে আসিবে।  
কিন্তু করিব না, কেন না সে দেশে গেলে তো আর ঐরূপ কথা  
ব্যবহার হইবে না। যাক্ আর না, বিদায়। তোমার অঘোর।"

১২ই ডিসেম্বর লিখিয়াছ, "আজ স্বামী মহাশয় বাহিরে গেলেন।  
৪টার সময় আমি আবার শয়ন করিয়া ঘরের দিকে চেয়ে দেখি সব  
খালি। সহজেই মনে হইল, মাহাত্ম্য নাই। একে তো মৃত বলি না,  
বলি অল্পপস্থিত। মৃতকে তবে আর মৃত বলিব না, অল্পপস্থিত  
বলিব। উপাসনায় গেলাম। যোগ যে বাড়িতেছে বেশ বুঝিতে  
পারিলাম। প্রার্থনা ছিল, আত্মা দূরে গেলে যেন অল্পপস্থিত বলি,  
আত্মা মার নিকট গেলেও যেন অল্পপস্থিত বলিতে পারি।  
মা তাই আজ ভিক্ষা যে, অদর্শনে যেন বলিতে পারি, অল্পপস্থিতের  
দর্শন দাও।"

## সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### পতাকা বহনের শক্তি

অনেক দিন পরে সন্ধ্যাতে শুনিলাম, "তোমার পতাকা ধারে দাও,  
তারে বহিবারে দাও শক্তি।" ১৮১৫ সালে তোমাকে নারীজাতির  
সম্মানের পতাকা অনেক বিবোধ ও বিসম্মদের মধ্যে বহন করিতে  
হইয়াছিল, এবং দেখিলাম সত্য সত্যই তুমি সে পতাকা বহনের  
জন্ত বলও লাভ করিয়াছিলে। শুধু এই পতাকাই নয়, এই বৎসরের  
মধ্যে তোমাকে শোকের ক্রসও বহন করিতে হইয়াছিল।

১৮১৪ সাল হইতেই তুমি মাঝে মাঝে পরলোকগত গুরুপ্রসাদ  
সেন মহাশয়ের বাটীতে বাটতে। এইরূপে তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা  
স্থাপিত হইতেছিল। তুমি তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদে যখন তোমার  
সেই বেহারের সাদী পরিয়া বাইতে, তোমায় বেশ দেখিতে লাগিত।  
প্রথম প্রথম উহারা কেহ তোমার সঙ্গে দেখা করিতে তোমার  
বাড়ী আসিতেন না। কিন্তু তুমি তাহাতে কিছুই দ্বিধিত হইতে  
না। কারণ তুমি সাংসারিক ভ্রমস্থায় চলিতে না, বা অহঙ্কারমূলক  
আত্মসম্মানবোধেরও ধার ধারিতে না। পরে যখন উহাদের  
বাড়ীর মহিলারা তোমার পরিবারকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন,  
ও যখন তোমার বিজ্ঞানস্নেহ সম্প্রদায় মাঘোৎসবের সময় tableau  
vivant (টাবলো অভিনয়) পরিবার কথা হইল, তখন উহারাও  
খন খন তোমার বাড়ীতে বাতায়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে  
উহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া গেল।



এত বড় একটি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে সক্ষম করিলে, কিন্তু তোমার নিজের তো সব জানা ছিল না যে, কি করিয়া কাকে রাজাইতে হইবে ও শিখাইতে হইবে। পরলোকগত গুরুপ্রসাদ শন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু তোমার প্রধান সহায় হইলেন। শখান, সাজান, সব সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে তোমাদের টুংসাহ বাড়িতে লাগিল। বাহারা শিখিতে লাগিল তাহাদেরও খুব উৎসাহ হইল। দেখা গেল, সাজসজ্জা, গান ও আবৃত্তি অতি সুন্দর হইবে। অবশেষে অভিনয় দেখাইবার দিন আসিল। সে দিন তোমাদের কি ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ, কতই আনন্দ! তুমি আনন্দ নয়, ইহার সঙ্গে কিছু কিছু মানসিক উত্তেজনাও ছিল, কারণ এক শ্রেণীর লোকে ইহা পছন্দ করিতেছিলেন না। তাঁহারা তোমার উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিলেন না; এ সব করা বাঙালীয় নয় বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে “বন্ধে মাতরম্” সঙ্গীত গান করা হইল। তারপর স্বর্ণমুকুটধারিতা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা পদ্মাসনা লক্ষ্মী পদ্মবনে দেখা দিলেন। নেপথ্যে লক্ষ্মীর স্তব গান হইতে লাগিল। ইহার পর আবৃত্তি; তারপর আবার খেতপদ্মবনে খেতবস্ত্রপরিহিতা বীণা-গুপ্তকহস্তে সরস্বতী দেখা দিলেন, ওদিকে নেপথ্যে সরস্বতীর স্তুতিগান হইতে লাগিল। তারপর আবৃত্তি; তারপর ব্যাঙ্গ ও সর্পনয় বনে লুপ্তিত অঞ্চলে উর্দ্ধনেত্র বোড়করে ধ্রুব দেখা দিলেন। নেপথ্যে সঙ্গীত হইতে লাগিল, “বিজন কাননে মুনীতি তনয় কীদে কোথা হরি বলে, দু নয়নে ধারা বয়।” তারপর ফুলের বাগানে আসিয়া ছুটি বোন, প্রকৃতির রচয়িতা কে? এই প্রশ্ন বিস্ময়েব সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল। তারপর বৃক্ষমূলে পাশবন্ধ রাজকুমার প্রহ্লাদ উর্দ্ধমুখে নভোজাহ্ন হইয়া দেখা দিলেন। নেপথ্যে প্রহ্লাদের উক্তিযুক্ত সঙ্গীত হইতে লাগিল। তারপর সঙ্গীত, “There is a happy land, far far away.” তারপর কমণ্ডলু রত্নাকমলা গৈরিক ও ভটা চিহ্নিত “ধর্ম”, উর্দ্ধনয়না কুন্তলা পুষ্পমুকুটধারিণী “ভক্তি”, ও ক্রেড়ে পুষ্পকধারিণী বাম হস্তে গন্তবীর্ণা চিস্তানিমগ্না “বিজ্ঞা” দর্শন দিলেন। তার পর ক্রমশঃ অভিমানিনী বালিকার আবৃত্তি, বিচিত্র দেশে ছয় স্বর্ভূব আবির্ভাব ও এক বালিকার অপর বালিকাকে মাধুনা প্রদান, এ সকল হইয়া গেল। সর্বশেষে সঙ্গীত হইল, “না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।”

এই দিন সকলে ব্রাহ্মিকা সমাজ ছিল। সেখানে তোমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল। তার পর সাবানিন তোমরা ট্যাবলোর জুগ খাটলে। বাহিরের অনেকে তো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেনই, অবশেষে তোমার স্বমণ্ডলীভুক্ত এক ভাই বলিলেন, তোমার সকল কাজেই বাড়াবাড়ি ও তোমার আচরণ বাজারের জীলোকের সঙ্গে তুলনীয়। সেদিন তুমি রাতিতে আসিয়া আমার বন্ধে মাথা রাখিয়া অনেক ক্রন্দন করিলে। আমরা উভয়ে প্রার্থনা করিলাম, তার পর মনের ভার চলিয়া গেল।

শ্রদ্ধের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সে বার বিদেশ হইতে প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। উৎসবের দিনই তাঁর বাকিপুর ট্রেন দিয়া মেল ট্রেনে চলিয়া বাইবার কথা। তুমি তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। বিকাল ৩ টার ট্রেনে সদলবলে দানাপুরে উপস্থিত হইলে। সেখান হইতে একখানি গাড়ী মেল ট্রেনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে তোমরা সকলে বাকিপুর পর্যন্ত আসিবে, এই বন্দোবস্ত করা গেল। মেল ট্রেন দানাপুর ট্রেনে আসিবামাত্র সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধের মহাশয়কে সেই গাড়ীখানিতে লইয়া আসিলেন। তাঁহার গলায় পুষ্পমালা দেওয়া হইল, পুষ্প ও সুগন্ধ বৃষ্টি করা হইল, অভ্যর্থনাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করা হইল। পরে প্রার্থনা হইল। বাকিপুর ট্রেনে গাড়ীখানি কাটিয়া দেওয়া হইল। শ্রদ্ধের মহাশয়কে লইয়া মেল ট্রেন চলিয়া গেল, আমরাও ট্রেন হইতে উপাসনা-মন্দিরে আসিলাম।

এই যে আমরা শ্রদ্ধের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে গেলাম, ইহাতে অনেকে মন্দ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, উৎসবের দিনে মানুষকে বড় করা কেন? মানুষকে, বিশেষতঃ যে ব্রহ্মসন্তান বিদেশ হইতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে, আদর করিলে যে উৎসব করা হয়, একথা ভক্তিশ্রী ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিলম্বে বুঝিবে। যাহা হউক, এবার বেশ গুণধামের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ট্যাবলো অভিনয়ের পরের দিন (২৭শে জাম্বুয়ারী) আমাদের দুজনের আধ্যাত্মিক বিবাহোৎসবও হইয়া গেল।

এ বৎসর তোমার জন্ম নিম্মা ও সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে অপেক্ষা করিতেছিল। এই সকল ব্যাপারের পরই রাত্ৰিগৃহে বাত্মা হইল। পথে একখানি গাড়ী উর্দ্ধিষ্টা গিয়া কয়েক জন আঘাত প্রাপ্ত হন, তাই প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আর যাওয়া হইবে না। কিন্তু বাওয়া তা হইলই, অস্ত্রাঘাত বারের মত এবারও মেয়েরা পথে পথে সঙ্গীর্ভন করিতে করিতে গেলেন। ইহার জুগ চিরপ্রচলিত বা নিম্মা তা হইল। তার পর বাকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া স্থলের প্রাইজ দিবার সময়, মেয়েরা কোথায় বসিবে, কি ভাবে প্রাইজ আনিতে বাইবে, ও পর্দা হইবে কি না, এ সব বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হইল। মাঝে মাঝে তোমাকে একটু উত্তেজিতও দেখিতেছিলাম।

বাগ হউক, এ সব ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, তার পর তোমার বিজ্ঞান্যের কাষ, পরিবারের কাষ, ও পরসেবার কাষ আবার নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু এ বৎসর তোমার শরীর বড়ই ভাঙ্গিতে লাগিল। তুমি বলিতে, “ভাঙ্গা শরীর আর বসাইয়া রাখিয়া কি হইবে?” একদিনও বসাইয়া রাখিতে চাহিতে না, একদিনও নিয়মিত কাষগুলি ছাড়িতে চাহিতে না। এই ভাবে কাষ করিতেছ, এমন সময় মার্চ মাসে আর একটি ঘটনা ঘটিল। সন্ন্যাসীচরণ রায় নামক একটি যুবক আসামে চা-বাগানে কাষ করিতেন। তাঁর নামে মিথ্যা চুরির মোকদ্দমা লাগান হওয়াতে তিনি হঠাৎ ভীত হইয়া চা-বাগান হইতে পালাইয়া দানাপুরে চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার নামে ওয়ারান্ট আসে, ধৃত হইয়া তিনি এখানকার জেলে প্রেরিত হন। তুমি জেলে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। তাঁহার মুখে সমুদয় বৃহত্তম গুনিয়া তোমার বিশ্বাস হইল যে তিনি নির্দোষ। তখন হইতেই তুমি তাঁর মুক্তির জুগ উত্তাপী হইয়া পড়িলে। তুমি তাঁর জুগ এত ব্যস্ত হইলে যে মানুষ আপন সন্তানের জুগও এত হয়

কি না সন্দেহ। তাঁর জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলে। যখন তাঁহাকে কয়েদ অবস্থায় আসাম লইয়া বাওয়া হইল, তখন ব্রজগোপালকে তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলে। ব্রজগোপাল নওগাঁতে গিয়া উকীল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটতে উঠিলেন। তিনি অনেক বস্ত্র ও সাহায্য করিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসীচরণ দণ্ডযুক্ত হইলেন। বতদিন না তাঁহার মুক্তি হইল, তুমি প্রতিদিন তাঁর জন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে। প্রথমে নিম্নতর বিচারালয়ে তাঁর ক্ষেপ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। যখন এ সংবাদ তারযোগে এখানে পৌঁছিল তখন বাগানে উপাসনা হইতেছিল। তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা কখনই ভুলিব না। পরে যখন আবার তারযোগে মুক্তি সংবাদ আসিল, তখন তোমার আনন্দ আর ধরে না। সন্ন্যাসীচরণ এই পুত্রে তোমার চিরদিনের আপনার হইয়া গেলেন। সুবোধের জ্ঞান তিনিও যেন তোমার এক পুত্র হইয়াছেন।

এদিকে তোমার পরিবার বাড়িতে লাগিল। আর কিছু বাড়িল না। বাহার বাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা সে মাসের মধ্যেই দিতে, বাজারে খণ করিতে না। এ অবস্থার সংসার চলে কিরূপে? একবার অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া মেয়েদের কাছ হইতে তাহাদের হাত খরচের টাকা হইতে ধার লইয়াছিল। সে টাকাও তুমি নিজেই তাঁহাদের দিয়াছিলে, কিন্তু সেই নিজের প্রদত্ত টাকা ধার লইয়াও তোমার মনে পরে অত্যন্ত অমৃত্যপের যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। একবার মাত্র এরূপ করিয়াছিল, আর কখনই কর নাই। এ বৎসর তোমার বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। একদিন তুমি লিখিয়াছ, “আমি যেন এই পরিবারের জন্ত ভাবি না। আমার সকল ভার তুমি লও। আমার ভাই যেন আমার এই পরিবারের জন্ত ভাবিতেছেন। আজ আমার পরিবারে একটা পরিস্রাও ছিল না। সকালে একটি ভগিনী পুরান কাগজ বিক্রয় করিয়া ১১/০ আনি দিলেন। বৈকালে আবার একটি কস্তার বাবা ১১/০ টাকা নিজে আনিয়া দিলেন। তিন জোড়া বস্ত্রের ও অত্যন্ত খরচের বড় নরকার হইয়াছিল। এ ১২১/০ দান পাইয়া ধন্তবাদ করিলাম মাকে। এইরূপে এই বৎসর মা নিজে আমার সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন।” এ তো নূতন কথা নয়। মাশ্বের বৃত্তিতে বাহা বুঝা যায় না, বিশ্বাসী তাহা সরল বিশ্বাসে বুঝেন। যখন পরিবার বাড়িতে লাগিল, আমি একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তুমি বলিলে, “তাহাও কি হয়? মেয়ে আসিলে ফিরাইয়া দিব কিরূপে?” আমি আর কিছু বলিতাম না। তোমার বিশ্বাসকে অত্যাশ্রয় মাত্র করিতাম। কিন্তু তোমার সহকারিত্বীগণ অনেক সময় পারিয়া উঠিতেন না। একদিন তুমি লিখিয়াছ, “আজকাল অত্যন্ত সাংসারিক অভাব। কর্তব্যকারিণীরা অনেকে বকেন। সব হাসিয়া উড়াই, কখনও চুপ করিয়া থাকি। আশ্চর্য্য, একদিন কিছুই ছিল না। এরূপ বকুনি ও হাসির পর একজন কর্তব্যকারিণী নীচে হইতে হাসিতে হাসিতে ৫টা দানের টাকা পাইয়া লইয়া আসিলেন। ঐ টাকা পাইবার সে দিন কোন কথা ছিল না। ঐ টাকা দেখিয়া মাকে ধন্তবাদ দিলাম। পরিবারে বিশ্বাস বাড়িল।”

২৩শে আগষ্ট রাত্রিতে তোমার কস্তা সরোজিনীর একটি পুত্র সন্তান হইল। এই প্রথম পৌত্র; তাহার জন্মের সুখখানি তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কস্তার সেবা করিতে গিয়া তুমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া বাইতেছিল।

এই বৎসর আসানসোলে একজন নারীর প্রতি অত্যাচার হয়। তুমি সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলে না। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলে। অবশেষে ছোটলাট-পত্নীকেও পত্র লিখিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলে। লেডী ইন্সপেক্টর মনোযোগী হওয়ার অত্যাচারীর ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল।

এই বৎসর হইতে তোমার বাটতে একটি অমুঠান প্রবর্তন করিলে। তোমার অবর্তমানে তোমার পরিবারের কস্তারা এখনও ইহা পালন করিয়া থাকেন। ভ্রাতৃত্বভিত্তিকার দিন সব ভাইসের ডাকিলে। ভাইসের নামের প্রথম অক্ষর এক এক খানি ক্রমালের কোণে লেখা হইল। একদিকে ভাইসেরা সমাদর লাভ করিবার জন্ত বসিলেন, অপর দিকে ভগিনীরা সমাদর করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। ভগিনীদের পক্ষ হইতে একটি ছোট মেয়ে সকলকে কোঁটা দিলেন। সন্মত হইল, তুমি প্রার্থনা করিলে। তার পর সকলকে জলযোগ করান ও নামাক্রান্ত ক্রমাল উপহার দেওয়া হইল। এ অমুঠানটি আমার অতি স্মরণ লাগিয়াছিল। এখনও বাঁকিপুরস্থ মণ্ডলীর এটি একটি বিশেষ প্রিয় অমুঠান।

নবেম্বর মাসে তোমার স্বাস্থ্য আবার তগ্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু কাষ কিছুই কমাইল না। এই সংগ্রামের মধ্যে তোমার জন্ত ভগবান আর একটি গুরু ভার ক্রম পাঠাইলেন। তাহা বহন করিতে গিয়া তুমি তোমার বিশ্বাসের শক্তির পরিচয় অশ্রুচরুণে দান করিলে। ডিসেম্বর মাসে তোমার আদরের পৌত্র পীড়িত হইল। কস্তা সরোজিনী কখনও এত শক্ত সেবা করেন নাই, কাষেই তোমার পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল। বন্ধুরা ব্যস্ত হইলেন, ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে উদ্ভাটন বাবু জাগিতে আসিতেন। তাঁহার পত্নীও আসিতেন, ও শিশুকে স্তম্ভহৃৎ দান করিতেন। রোগ বাড়িয়া চলিল, ইহার মধ্যে মাস শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, অর্থের গুরুতর টানাটানি পড়িয়া গেল। রোজ ৪।৫ টাকা ব্যয় হইতেছিল, আয়ের অল্প কোনও পথ ছিল না। ২৩শে ডিসেম্বর আমার অত্যন্ত চিন্তা হইল। তুমি প্রায়ই খোকার কাছে উপরের ঘরে থাকিতে। সেদিন সকাল বেলা একটু অবকাশ পাইয়া ভাঁড়ার দেখিতে গেলাম। সেখানে তোমাতে আমাতে যে কথাবার্তা হইল, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আমি—এত খরচ হইতেছে, এখন তোমার অর্থের সম্বল কিরূপ?  
তুমি—আছে। (পাছে চিন্তিত হই, তাই অভাব থাকিলেও আমাকে জানাইতে না।)

আমি—ও আমি বুঝি না। আজ তোমার হাতে কত আছে?  
তুমি (একটু হাসিয়া)—এক টাকা।

আমি—কি বলিলে? ৪।৫ টাকা নিত্য ব্যয়, আর আজ সকালে তোমার হাতে এক টাকা মাত্র?

তুমি আমার বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলে—ভাবিও না, হইয়া  
বে।

আমি—আমি বুঝিতে পারি না, তুমি কিরূপে স্থির আছ।

এই বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইলাম, ও চিন্তাকুল হইয়া  
হান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় বড়  
জ্বর কেহ ডাকিস “বাবুজী, বাবুজী।” বাহিরে গিয়া দেখি একজন  
ষ্ট-পিঘন মণিঅর্ডার লইয়া আসিয়াছে। অল্পসন্ধান করিয়া  
নিলাম, পরিবারের তিনটি মেয়ের জন্ম কোন অপরিচিত বন্ধু খরচ  
হইয়াছেন। তাহাদের জন্ম আর কখনই খরচ আসে নাই, পূর্বেও  
হ, পরেও নহে। যেদিন বিশেষ অভাব সেই দিনই ৩০টি টাকা  
দিয়া উপস্থিত। টাকা লইয়া তোমার হাতে দিলাম। তুমি  
ন বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কি বলিলে তাহা কি তোমার মনে  
হইছে? তোমার না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কেমনে ভুলিব?  
মি এইমাত্র বলিলে, “দেখলে?” বিশ্বাসের জ্বর হইল, আমি হার  
নিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমারও অবিশ্বাস ও সঙ্কোচ দূর  
হইল।

২৪শে ও ২৫শে খোকার রোগ খুব বাড়িল। ঘরেই খুটোৎসব  
হইতে লাগিল। ২৫শে খোকাকে ফেলিয়া উপাসনার গৃহে আসিতে  
দিলে না। ২৬শে উপাসনা উপরের ঘরেই হইল। তুমি  
খোকাকে কোলে করিয়া উপাসনা করিলে। ২১শে এই প্রার্থনা  
দিলে, আমরা যেন শিশুর রোগের মধ্যে সকলেই ক্রুশ বহন করিতে  
পারি। তুমিও এখন বুঝিলে, খোকা থাকিতে আসে নাই। বেশ

প্রভৃতি হইতে লাগিল। আমাদের জ্ঞান আসিলেন, খুব চিকিৎসা  
চলিতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। ৪ঠা জানুয়ারী  
(১৮১৬) অমর যাত্রী অমর ধামে চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে ১লা  
জানুয়ারী পরেশের বাটাতে নববর্ষের উপাসনা হইয়াছিল। সেদিন  
বন্দোবস্ত করিয়া তুমিও গিয়াছিলে।

এই জানুয়ারী অনেক বড় বড় গোলাপ ফুলে খোকাকে  
সাজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোলাপ ফুলের মধ্যে খোকার  
স্থখখানিও একটি গোলাপের মত দেখাইতেছিল। অনেক দিন  
পূর্বে বলিয়াছিলাম, তোমাকে শ্রাদ্ধ দেখাইব। তোমার খোকা  
আগুন পুড়িবে, তুমি তাই দেখিতে চাহিলে। গাড়ী করিয়া তুমি  
যাটে গেলে। যখন দাহকার্য্য হইতেছিল, তাহার মধ্যে তুমি  
একবার বলিয়াছিলে, “স্ববোধ, অত নির্ভর কেন হও?”

এইরূপে ১৮১৫ সাল চলিয়া গেল। তোমার জন্ম এ বৎসরটা  
অর্পিত ক্রস ক্রমশঃ ভারী হইতেছিল। তুমি তাহা নিরাপত্তিতে  
বহনও করিতেছিলে। বাহিরের জীবনে এই ক্রস, অন্তরের  
জীবনেও দেহের সঙ্গে সংগ্রাম, ও আমার সঙ্গে মিলনের জন্ম  
আপনাকে বলিদান, এ সকল অন্তরকে শাস্ত করিতেছিল। তুমি  
সে সকলকে কেমন করিয়া “মায়ের হাতের বেদনার দান” বলিয়া  
গ্রহণ করিতেছিলে, কেমন করিয়া “জীবনে মৃত্যু বহন” করিয়া  
মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আদর করিতে পারিয়াছিলে, তাহা ক্রমশঃ  
বলিতেছি।

[ ক্রমশঃ ।

## এক্সপ্রেস

### ষ্টীফেন স্পেণ্ডার

চারটে বাজার পরে ষ্টেশনের কাছে সিগন্যালটার  
পাখা নামে, বাঁশি বাজে, কানে ভালো লেগে যায় ;  
বিকট আওয়াজ ক’রে কালো তেল-চুকচুক পিষ্টল  
নড়ে ওঠে, ওঠে নামে, তালে তালে ঘোরে চাকা বন্-বন্ ;  
ষ্টেশন ছাড়িয়ে ধীরে ঐক-বৈকে এক্সপ্রেস যায়  
ধোঁয়া তার শূন্যের তরলিত মেঘ হয়ে আকাশ ছাপায়।  
কত সব বাড়ি-ঘর দুই পাশে ছুট-ছুট লৌড়ায়  
কারখানা, বাতিঘর, কবরখানার ডিং নড়ে যায়।

অনেক দূরের দেশে দিগন্ত মাঠ আর দীর্ঘজল,  
পাহাড়ের হাতছানি, নীলাকাশ, আর ঘন বনভল ;  
উধাও গতির স্রোতে তারটানা খুঁটিগুলো পর পর  
উড়ে চলে—সীমাহীন যাত্রার নেই কোনো অবসর।

রাত এলে দীপ জ্বলে ছুটে চলে দূর দূর বন্দর-নগর,  
বুকে তার কুঠুগোতে স্তব্ধ চিঠির খবর,  
কসকরাসের আলো ঐ দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের চুড়ায়।  
পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন ধূমকেতু হবার নেশায়

পাড়ি দেয় নৈশ রাত, লৌহবস্ত্র গুম-গুম ধ্বনি,  
এমন সঙ্গীত, আহা, মৌমাছি কি পাখিদের কাছেও শুনি।

অনুবাদক—দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়।



পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জানি না। ভীতিতে কি বিশ্বাসে সোরাণাটি আমার হুকুম বর্ণে বর্ণে তামিল করেছিলো। মতঙ্গল লয়েল ঘরে ছিলো জন্তকণ দেয়ালের দিকে ফিরে মুখ টেকে নিঃশব্দে পড়েছিলো। দৌড়াগা গুরু, শুধু আমান মধু—কারণ একটু এদিক-ওদিক হলে ওকে যে দী করতাম তা আমিই জানি! লয়েল চলে গেলে ওকে বললাম, “আজ হুপুই দেবদূতের আবার আবির্ভাব হবে—তীয় সঙ্গে কাঁচি থাকবে, তাই দিয়ে তুমি আমাদের হুঁজনের দাড়ি তালো করে কামিয়ে দেবে।” আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম সোরাণাটি জাতে নাশিত।

—“দেবদূতেরও দাড়ি থাকে নাকি?”

—“নিশ্চয়ই। তুমি আমাদের কামিয়ে দিলে আমরা এই প্রাসাদের ছান ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবো। সোজা গিয়ে নামবো সেন্টমার্ক স্কোয়ারে—সেখান থেকে জার্মানী চলে যাবো—”

সোরাণাটি চূপচাপ শুনলো—কোনো কথাই কইলে না। খেতে বসেও নিঃশব্দে খেয়ে নিলে। আমার মন তখন এত উত্তেজিত, সত্যমুক্তির আশায় এত বিভোর যে, খাওয়া তো দূরে, ছুটি এত দুই চোখের পাতা অবধি এক করিনি।

ঠিক সময়টিতে দেবদূতের আবির্ভাব হলো। দেওয়ালের গর্ভটির মুখে যেই ফাদার বালবিকে দেখা গেল সেই মুহূর্তেই সোরাণাটি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালো। বালবি নেমে পড়ে দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

—“আপনার কাজ এবার শেষ হলো ফাদার বালবি! এখন শুরু হবে আমার কাজ—”

বালবি আমাকে একজোড়া কাঁচি আর আমার সেই বিখ্যাত হাতিয়ার লোহার রডটি ফিরিয়ে দিলেন। আমার কথা মত সোরাণাটি আমাদের হুঁজনকেই বেশ সন্দেহ ভাবে চেঁছে-ছুলে দিলে। আমি বালবিকে বললাম, সোরাণাটির কাছে অপেক্ষা করতে ইতিমধ্যে আমি একবার সমস্ত জায়গাটা পরীক্ষা করে আসবো। দেওয়ালের গর্ভটা একটু ছোটো হোলও কোনো মতে দেহটাকে গলিয়ে নিয়ে সোজা নামলাম বালবির ঘরে। সেখানে ওর সহবন্দী কাউন্ট এ্যাসকুইনি শুয়ে আছেন দেখলাম। সুপুরুষ, বৃদ্ধ ভয়লোক। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এর পর আমার মতলবটা কি? আমি বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন না ওর মতে আমি শুধু উত্তেজনার বশে খামখেয়ালে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিছি। উনি রাজী নন আমার সঙ্গে পালাতে। তবে আমার মঙ্গলের জন্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন ঠিকই। ওঁর ধারণা, ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে হুঁখানা ডানা না গজালে মাটিতে নামা সম্ভব হতে পারে না—আমার ব্যাখ্যা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

ফিরে এলাম আমার সেলে। তারপর ঘুরো চারটি ঘণ্টা ধরে যত কবল, চাদর, ওয়াড়, বিছানাঢাকা, টেবলক্লথ ছিলো সব সফ সফ লম্বা ফালির মত করে কাটলাম—সেইগুলো জুড়ে একশো গজ লম্বা দড়ির মত করলাম। তারপর কোর্ট, সার্ট, মোজা এগুলো একটা ছোটো প্যাঁকেটের মত করে বেঁধে নিলাম। এসব কাজ হোলে সেই গর্ভটা দিয়ে তিন জনে আবার এসে কাউন্ট এ্যাসকুইনির সেলে নামলাম। সেখানে ঘটা দুই ঘরে ছাদেতে আর একটা বড় গর্ভ করলাম—কিন্তু সেই গর্ভের ভিতর দিয়ে দেখি, বাইরে জ্যোৎস্নায় আলোর বান ডাকছে—এমন রাতে সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে দলে দলে সবাই বেড়ায়—অতএব এই সময় ‘লেডস্’-এর ছাতে ছুটো ছায়ামূর্তি সবার মনেই সন্দেহ জাগাবে। অপেক্ষা করতে হোলো।

কাউন্ট এ্যাসকুইনির কাছে ব্রিল সেকুইন (ইতালীয় মুদ্রা) খাব চাইলাম—জার্মানীতে নিরাপদে পৌঁছবামাত্রই ফেরৎ পাঠাবো, এমন প্রতিশ্রুতিও দিলাম। কিন্তু কুপণ বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী নয়—আমিও ছাড়বার পাত্র নই। শেষে অনেক চোখের জলে মাত্র দুটি সেকুইন দিতে রাজী হলেন—তাই-ই সই।

ফাদার বালবির চরিত্রটির পরিচয় এইবার পেতে শুরু করলাম। ইন্দ্রিয়ে প্রায় বার দশক আমাকে শোনালেন যে, আমার কথার ঠিক নেই। আমি যে সব প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি বলেছিলাম সেকথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি শুধু ভাঁওতা দিয়েছি। আগে জানলে উনি আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হতেন না। ওঁর সঙ্গে কাউন্ট যোগ দিলেন—অবাচিত উপদেশ আমার এই অদূরদর্শিতায়—ব্যাপার দেখে সোরাণাটি এতক্ষণে মুখ খোলবার সাহস পেল। হাউ হাউ করে কেঁদে আমার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইলে ওকে মুক্তি দেবার জন্তে! ছাদের কার্ণিশ বেয়ে ঐ পিছল পথে ওর যাওয়া একেবারেই অসম্ভব—নীচের ঝালের জলে পড়ে ওর মৃত্যুও নাকি অবধারিত—আমি যেন দয়া করে ওকে সঙ্গে না নিই। নির্ঝোঁধটা বৃষ্ণত্তেও পারল না ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমিও কত নিশ্চিন্ত কত খুসী হোয়েছি। কাউন্টের কাছ থেকে কালি কলম আর কাগজ নিয়ে একটা চিঠি লিখে সোরাণাটিকে দিলাম সেক্রেটারীকে দেবার জন্তে—চিঠিটা অনেকটা এই রকম ছিলো—

আমাদের মালিক বাজ্যের বিচার বিভাগীয় অধিকর্তারা একজন দৌরীকে কারারুদ্ধ করবার জন্ত তাঁদের সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করেন। কিন্তু সেই বন্দীকে যদি সাময়িক মুক্তিও না দেওয়া হয়, সেও তাঁর সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করে মুক্ত হতে। তাঁদের অধিকার নীতিতে—তাঁর অধিকার প্রকৃতিতে। তাঁরা বন্দী করার সময় তাঁর সম্মতি চাননি—তাঁরও মুক্তি নেবার সময় তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন নেই।

জ্যাক্স ক্যাসানোভা, যে এই চিঠিটা লিখেছে, জন্মের সমস্ত তিক্ততা দিয়ে, সে জানে তার আবার হরত বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে—সে ক্ষেত্রে সে বিচারকদের মন্তব্যের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছে যে, তখন যেন তার ভাগ্যে এর চেয়ে বেশী দ্রবত্ব না ঘটানো হয়। তার সেলের ভিতরে খাবতীর জিনিষপত্র সোরাধাটিকে দিয়ে বাচ্ছে—সুধু বইগুলি কাউন্ট গ্রাসকুইনিকে।

মধ্যরাত্রির এক ঘণ্টা আগে বিনা প্রার্থীপে, কাউন্ট গ্রাসকুইনির সেলে লিখিত—৩১শে অক্টোবর ১৭৫৬।

চাঁদ ঢলে পড়েছে—আর সেই বানডাকা জ্যোৎস্নার রাশি নেই। যাত্রার সময় হোলো। অর্ধেকটা দড়ি বালবির একটা কাঁখে আর ঠর প্যাকেটটাতে বাঁধা হোলো। আমার নিজেও তাই। তারপর মাথার টুঙ্গী এঁটে হুঁজুনাই সেই ক্ষুদ্র ছিন্নপথে বেরিয়ে পড়লাম।

\* \* \* \* \*

আমি প্রথম, আমার পিছনে বালবি। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম, হাতের বড়টা দিয়ে সীসের পাতের খাঁজে খাঁজে ভর দিয়ে বালবিকে টানতে টানতে। তিনি ডান হাতে আমার কোমর-বন্ধনীটা সজোরে চেপে ছিলেন। আমার নিজের বোঝা, তার উপর লাগাম-পরানো ঘোড়ার মত ঠেকে টানছি খন কুয়াশায় পিচ্ছিল সীসের পাতের কার্নিশ দিয়ে—সে যা অবস্থা! হঠাৎ বালবি আমাকে খামতে বললেন হ্যাঁচকা টান মেরে। ঠর প্যাকেট থেকে কি একটা পড়ে গেছে বোঝাবার জন্তে। ইচ্ছা হোলো এক লাথিতে খালের জলে ফেলে দিই লোকটাকে—কোনো মতে নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, দড়িগুলো ঠিক থাকলেই হোলো, এখন হারানোর জন্তে দুঃখ করে লাভ নেই—খামলেই মৃত্যু। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বালবি আবার এগোতে শুরু করলেন। খানিকটা গিয়ে ছাদের চূড়ায় উঁচু চিম্পির মত দেখে হুঁজনে পাশাপাশি বললাম—মাত্র দু'শো ফিট দূরে দেখা যাচ্ছে 'দোজ'-এর প্রাশাদচূড়া। পৃথিবীর কোনো সম্রাটই বোধ হয় এর চেয়ে স্মরণ্যতর প্রাসাদের কল্পনা করতে পারে না। এখানে আবার বালবি বেচারার টুঙ্গীটা গেল হাওয়ার উড়ে। বেচারার আরও মূলড়ে পড়লো। ছাদের ঐ জায়গাটাকেই বালবিকে বসিয়ে রেখে আমি খুঁজতে গেলাম, যদি নামবার কোন পথ পাওয়া যায়। সিঁড়ির দরজা, জানলা কিংবা স্বাইলাইট যাতে আমি দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত ধরে নামবার চেষ্টা করতে পারি। চার্চ'পেরিয়ে নামবার জন্ত চার্চের ছাদের দিকে নজরে পড়লো—কিন্তু সেটা এত খাড়াই যে ওখানে নামতে হ'লে সলিলনমাধি অবগুণ্ণাবী। আরগাটা দেখে বুঝলাম, আমরা বন্দিশালা থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি ছাদ বেয়ে বেয়ে—এটা সম্ভবতঃ 'দোজ'ের প্রাসাদেরই অংশ। হরত ভোবের আলোয় কোনো দরজা চোখে পড়তে পারে। কারণ, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, যদি প্রাসাদের কোনো ভূতোর নজরও পড়ি সে তৎক্ষণাতঃ আমাকে পালিয়ে যাবার স্তবোগই করে দেবে—যত বড় দাগী আসামীই হই না কেন। বিচারকের হাতে তুলে দেবে না—বিচার-বিভাগ সবার কাছেই এমন উৎকর্ষ ভীতিপ্রদ আর ঘৃণ্য ছিলো। প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু ছাদের নীচেই একটা জানলা হঠাৎ চোখে পড়লো। মরিয়া হয়ে ছাদের উপর থেকে বৃকে ধেঁটে ঘবে ঘবে বীরে বীরে নামতে চেষ্টা করলাম। শেষে কাছাকাছি পৌঁছে বৃকে পড়ে দেখলাম, ছোটো ছোটো কান

দিয়ে তৈরী জাকরীকাটা জানলা—তার ওধারে ঘরের মত মনে হোলো। কাচগুলো সহজেই সরানো যেত কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থা এমন যে, মনে হোলো এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। নিরাশায় মন ভরে গেল—দীর্ঘ সময়ের উদ্বেজনা, পরিশ্রম, ক্লান্তি, অনাহার আর তীব্র মানসিক উত্তেজনা আমার মনের সহজ ভাবটুকু সম্পূর্ণ গ্রাস করছিলো। অতি সামান্য সহজ-সাধ্য কাজও আমাকে ভয়-নিরাশায় ভরে তুললো। এমন সময় সেট মার্কের বাড়িতে ঢা ঢা করে রাত্রি বাবোটা বাজলো—মধ্যরাত্রির সূচনা। ঐ বাড়ির শব্দ হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে আশা, আর নির্ভর আশ্বাসের চেতনা জাগিয়ে দিলো। কি এক শক্তিতে ফিরে পেলাম বিশ্বাস, আর দৃঢ়তা। নতুন উত্তমে হাতের বড়টা দিয়ে একটা কাচ ভেঙে ফেললাম। তার পর পনেরো মিনিট ধরে কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে একে একে জাকরীর সব কয়টা কাচই ভেঙে ফেললাম—উদ্বেজনায় খেয়ালই ছিল না যে বাঁ হাতটা কখন কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ফিরে এলাম আমার সঙ্গী ফাদার বালবির কাছে। হার যে কপাল! 'হার জন্তে করে মরি সেই বলে চোর'—আমাকে দেখিয়ে বালবি কুসিততম ভাবায় আমাকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন, এতক্ষণ একলা বসিয়ে রাখার জন্তে। ঠিক করেছিলেন যে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার কারাগৃহে ফিরে যাবেন। আর ভেবেছিলেন যে আমি খালের জলেই ডুবে মরেছি।

"তাই বুঝি আমাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে ঐ ভাবায় আনন্দ প্রকাশ করলেন? এখন চলুন এতক্ষণ কি করেছি দেখাও।"

হুঁজনে মিলে ফিরে এলাম সেই ছাদের উপর জাকরীকাটা জানলার ধারে। পরামর্শ করতে লাগলাম কি করে ভিতরে নামা যায়। একজনের পক্ষে খুবই সহজ, অল্প জন দড়িটা না হয় ধরবে—কিন্তু সে নামবে কি করে? এটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বালবি বলে উঠলেন,—"আমাকে আগে নামিয়ে দিন তো। তারপর আপনি কেমন করে নামবেন সে কথা চিন্তা করার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

স্বার্থপর ঘৃণ্য পশুটার কথায় মনে হোলো, দিই লোহার বড়টা ওর বৃকে বিঁধে। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে, তার বসন্ত গুরই কাঁখে বেঁধে ওকে নামিয়ে দিলাম। দড়িটা টেনে তুলে মেপে দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ ফিট নীচে ঘরের মেঝে। এখন আমি কি করে নামবো? জাকরীর পাতলা ফ্রেমে দড়ি বাঁধলেও অত ভর সহ্যে না, ভেঙে পড়বে। ছাদের সীমার টালির উপর ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলাম, মনে মনে একটা উপায় খুঁজতে খুঁজতে। ঘুরতে ঘুরতে অপর প্রান্তে গিয়ে দেখি, এক কোণে একটা বড় টবভর্তি চূণ, বালি, জল মালা রয়েছে, পাশে খুরপি আর একটা মস্ত লম্বা মই পড়ে রয়েছে। মইটা দেখেই উল্লসিত। দড়ি দিয়ে একদিকের প্রথম খাপটা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম সেটা জানলার কাছে। জানলা দিয়ে গলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণে কিন্তু একটু গিয়েই সেটা আটকে গেল। তখন আমি বেশ করে দড়িটা দিয়ে মইটা জোর করে বাঁধলাম, তারপর সেটা ভঙ্গ বেরোবার নালীর পাইপের উপর ঝুলতে লাগলো। কারণ মাত্র একটুখানি জানলার ভিতর ঢুকেছে, বেশীর ভাগ ভরটা বাইরের দিকে—কোনোদিক



উপুড় হোয়ে শুয়ে বুক ঘষে ঘষে জলের মার্কেল পাথরের পাইপটা ধরলাম, তারপর সেটা ধরে পিছলে পিছলে খানিকটা নেমে এসে মইটার শেষ দিকটা ধরতে পারলাম। শেষটা ধরে ঠেলে খানিকটা ছোঁয় হয়। প্রাণপণে ঠেলে আরও একটু চুক গেল মইটা। তখন আর বাইরে ঝুলতে লাগলো না। বোঝার ভাগ ভারটাই ভিতরের দিকে ঝুঁকে গেল। কিন্তু ঐ জোরে ঠেলার দক্ষণ আমি পিছলে গেলাম—চালু সীসের পাতের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে—দুটো হাঁটু আর হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম—নিশ্চিত যত্নের দিকে এগোচ্ছি জেনেও মনের উপস্থিত বুদ্ধি হাবাইনি। সমস্ত শক্তি দিয়ে মরিয়ার মত চেষ্টা করতে করতে সামলে নিলাম নিজেকে। উঠে এসে জলের পাইপটার পাশাপাশি চিং হোয়ে শুয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম স্বাভাবিক পবিত্রতার ক্রান্তিতে। সমস্ত হাত-পায়ে ঝিল ধরে আসছিলো। শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে চূপচাপ পড়ে রইলাম। উপার নেই—কি নিরাশ্রয় হুঃসহ যুহুত! ক্রমে ক্রমে হাত-পায়ে লাড় কিরে এলো। সহজ হলো নিঃশ্বাস। উঠে পড়ে মইটার বাকীটুকুও ঠেলে দিলাম—তারপর রডটার সাহায্যে সীসার পাতের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে জানলাটার কাছে গেলাম। মইটা ভিতরে লগানবি হোয়ে আটকে ছিলো—এবার সহজেই সেটাকে নীচে নামাতে পারলাম—নীচে বালবি সেটা ধরে ফেললেন। আমি ওপর থেকে জামা-কাপড়ের প্যাকেট, দড়ির বাগুস সব নীচে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে নেমে পড়লাম। তার পর মইটাও নীচে নামিয়ে নিলাম। কারণ, উপরে আমাদের পালানোর কোনো চিন্তাই লরেন্সের সঙ্গানী দৃষ্টির সামনে রাখতে চাইনি। নীচে অন্ধকার ঘরটার আমর হুঃসহ হাত ধরাধরি করে ঘরের অবস্থানটা ঠিক করে নিতে লাগলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি, লোহার খিল লাগানো কিন্তু তালাবন্ধ নয়। খুলে বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, আর একটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি, মাঝখানে মস্ত টেবিল চার ধারে চেয়ার সাজানো। ঘরের একটা জানসা খুলে বাইরেটা দেখলাম—নিশ্চয় কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। অগত্যা নতুন কোনো প্রচেষ্টার আশা ছেড়ে দড়ির বাগুসটা মাথার দিয়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম লম্বা হোয়ে—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এলো দুটি চোখে, তখন আর কোনো চিন্তার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। পরে মুক্তি ছুটেবে না মরতে হবে সব চিন্তাই তখন সমান।

বোধ হয় পুরা সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। ফানার বালবি চেঁচিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙলেন। পাঁচটা বাজে—এখন এই অবস্থার আমার চোখে ঘুম আসে কি করে? উনি তো ভাবতেও পারছেন না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিলো—এই বিশ্রামের পর আবার আমার স্নায়ুগুলো সচল হোলো।

—“এটা তো জেলখানা নয়। এখানে নিশ্চয়ই কোনো বেকবার পথ পাৰো।”

হুঃসহ দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা গ্যালারি পেরিয়ে ছোটো পাথরের সিঁড়ি। নেমে এসে আর একটা গ্যালারি, আরও একটা সিঁড়ি পেরিয়ে মস্ত একটা হলে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এর দরজা কিছুতেই খোলা সম্ভব হোলো না। মুক্তির মুখে এসে তখন আমার মরিয়া অবস্থা। ঠিক করলাম লোহার রডটা দিয়ে ওপরের

খোপটাতে একটা গর্ত করবো। তার ভিতর দিয়ে গলে বেরোবো। তখনি শুরু করলাম গর্ত করা। ফাথ ঘণ্টার চেষ্টায় বেশ বড় গর্ত করা গেল। কিন্তু এমন বিস্তীর্ণ রকম গর্ত হোলো যে গলে যাওয়া বিপদজনক। চারিদিকে বর্ষার মত খোঁচা-খোঁচা অসমান ভাঙ্গা গর্ত। তার উপর মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে। বালবিকে প্রথমে উল্লভে ধরে পরে গোড়ালী ধরে কোনমতে পার করলাম। কিন্তু আমার ভাঙ্গা তো আমিই। কোনো মতে মাথা আর কাঁধটা গলিয়ে বালবিকে বললাম টানতে—বদি খোঁচা লেগে দেহটা টুকরো টুকরো হোয়ে যায় তাহলেও যেন থাকে না। এই ভাবে অবশেষে নামলাম—সর্বোচ্চ যত্ন নিয়ে আর পিছন থেকে উক থেকে দর-দর ধারায় রক্তের স্রোত বইয়ে।

এবার দৌড়ে গিয়ে আর একটা সিঁড়ি নেমে একেবারে প্রাসাদের প্রধান সোপানের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেই বিরাট দরজা ভেদ করা আমার লোহার রডটির সাধ্য ছিল না। কিন্তু তার স্তম্ভ অস্থির বা চকল না হোয়ে শাস্ত ভাবে বসে পড়লাম দরজার সামনে। বালবিকে বললাম আমার যতদূর সাধ্য করেছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা। আজ প্রাসাদের ঝাড়ুদারও আসবে কি না সন্দেহ। কারণ আজ তো ছুটির দিন। যদিই কেউ এসে দরজা খোলে তখনি ছুটে পালার চেষ্টা করবো, অস্ত্রধার মরে গেলেও এখান থেকে নড়ছি না।

বালবি তো রেগেই আছেন। আমাকে উদ্ভাদ, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি যথেষ্ট গালাগাল দিতে শুরু করলেন। বালবিকে চাষার মত দেখতে হলে কি হবে—বেশভুষা ওঁর ঠিকই ছিলো, কোনো পরিচয় তো করতে হয়নি। আর আমার অবস্থা তো দেখলে লোকের ভয় হবে—সর্বোচ্চ রক্তমাখা, সারাগাণের চামড়া ছেঁড়ে ছাল উঠে গেছে। সমস্ত জামাকাপড় টুকরো টুকরো হোয়ে ফালির মত ঝুলছে, মোজাটা, গুয়েষ্টকোট, শাটগুলো শতছিন্ন অবস্থায়, আর বোঝবার মতও নেই। উকর গভীর ক্ষত থেকে ঝঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে।

আমি ক্রমাগত দিয়ে যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে একটা ব্যাগুজ ঝাংলাম, উপরি উপরি গোটা দুয়েক শাট প্যাকেট থেকে বের করে পরে ফেলে সবার উপরে লেশ দেওয়া শাটটা পরলাম। নতুন একজোড়া মোজা পরে যতগুলো ক্রমাগত ইত্যাদি পকেটে ভরা সম্ভব ভরে নিয়ে বাকীগুলো এক কোণে কেলে দিলাম। হাত দিয়ে চুলগুলোকে যথাসম্ভব বিজ্ঞপ্ত করার চেষ্টা করতে করতে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাল্লা দুটো খুলে দিলাম। খুলতেই নীচের উঠানে বাবা ছিলো তাদের হুঃ—একজনের চোখ পড়লো আমার দিকে—পড়টা অবগু বিচিহ্ন নয়। সে তখন প্রাসাদ-রক্ষকে খবর দিতে ছুটলো। ভালমাহু বৃষ্টি হয়ত ভাবলেন, ভুল করে আগের রাত্রে কাউকে চািবন্ধ করে ফেলেছেন—তাড়াতাড়ি চািবির গোছা নিয়ে হাজির হোলেন। আমি ওদের ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছিলাম—সিঁড়ির ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে। আমি বালবিকে আমার পাশ বেঁধে দাঁড়াতে বললাম—লোহার রড হাতে নিয়ে দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম—ওরা দরজা খুলেই পালাবো আর যদি বাধা দেয় তবে এই লোহার রড...

বৃদ্ধ বেচারি আমার চেহারা দেখে বজ্রহস্তের মত দাঁড়িয়ে



# লক্ষ্মীবিলাস

কেন্দ্র

এম. এল. বসু স্যুগু কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

রইলো... আমি দৃকপাতও না করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম—ঠিক পিছনে বাসবি। কিন্তু গতি দ্রুত করলেও পালাছি যে সে বকম ভাব ফুটে দিইনি চলার ভিত্তিতে। সোজা প্রাসাদের প্রধান ফটক পেরিয়ে সামনের ছোটো পার্ক পেরিয়ে জলের কিনারায় রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই যে গণ্ডোলাটা পেলাম তাইতেই চড়ে বসে বললাম “আমি খুব শীগগির ফুসিনা পৌছাতে চাই আর একজন মাঝি বরং ডেকে নাও”—

বলা বাত্বেল, আমার সঙ্গে সেই মুহূর্তে বলবিও উঠে পড়েছিলো গণ্ডোলাতে। গণ্ডোলাটা একটু এগোলে আমি মাঝিকে ডেকে বললাম যে—“আমি মত বললেছি, আমি মেসুতার যেতে চাই”—

—“তাড়া ঠিকমত পেলে আপনাদের ইংলণ্ডও পৌছে দিতে পারি জুজুর!” মাঝিটা হেসে বললে।

খালটাকে এত অপূর্ণ সুলার আগে কখনও মনে হয়নি—বিশেষ করে এত নিষ্কল যে আর একটা নৌকাও দেখা বাচ্ছে না... কি নিশ্চিন্ত তৃপ্তি! ভোমের নরম আলোয় আর মিষ্টি বাতাসে দেহমন জুড়িয়ে গেল। মাঝি দুটিও খুব দ্রুত বাইছিলো। সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের নবককুণ্ড থেকে আবার উদার আকাশের তলায় মুক্তি পেয়ে আনন্দে, ঈশ্বরের করুণায় মুগ্ধ হোয়ে আমার দুই চোখ জলে ভরে এলো... আবেগে উত্তেজনার আমি সত্যিই কঁদে ফেললাম। এতকণে আমার সঙ্গী, আমার কর্তব্যপরায়ণ বন্ধুর কর্তব্যবোধ ফিরে এলো—তিনি এসে আমি কাঁদছি ভেবে কর্তব্যবোধে সাধনা দিতে শুরু করলেন। এই মৃত্যুর হাসা ছাড়া আর উপায় রইলো না।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথের যাত্রায় বিচিত্র, তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অবশেষে ১৭৫৭ সালের ৫ই জানুয়ারী প্যারিসে পৌঁছলাম। পুরানো বন্ধুরা সাদরে আমাকে কাছে টেনে নিলে। প্যারিস—গৌরবময়ী প্যারিস বেন আমার পালিকা মা—অপরিচয়ের সঙ্কোচ আর আতঙ্ক কিছুই নেই এখানে। আর আমার জন্মভূমি ভেনিস? সেখানে বাবার পথ তো এখনকার মত নিজের হাতেই বন্ধ করে এসেছি।

মনে মনে ঠিক করলাম—আচাৰ্য্যব্যবহারে সংঘম আর দ্রুততা কিরিয়ে জানবো—আবার আমাকে ফিরে পেতে হবে যশ, মান, সম্মান আর প্রতিপত্তি... পিছতম বন্ধু, অভিভাবক ম্যাসিয়ে ব্রাগাঙ্গী মাসিক হাজার ফ্রাউন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার জন্ম—তাই স্বচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটিছিলো এখন শুধু বৈধা ধরে আরও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে....

আমার প্রথম কর্তব্য ঠিক করেছিলাম ভেনিসের রাজসূতের সঙ্গে দেখা করা। কাবণ, এখানে রাজসভায় তাঁর অনীম প্রতিপত্তির কথা আমি জানতাম। আর তাঁকে বতব্বর টিনি, তাইতে তাঁর অনুগ্রহ পাবো বলেই ভরসা করি।

আমার পালিয়ে আসার গল্প আমি প্রতিটি সালেতে করতাম। একদিন একটা চিঠি লিখে নিজেই সেটা সঙ্গে করে প্যালেস ব্যারক্টে গিয়ে দিয়ে এলাম। পরদিন বেলা আটটার সময় একটা চিঠি পেলাম—সেই দিনই আমাকে ওখানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল তাইতে।

ম্যাসিয়ে জ বার্গাস আমাকে অত্যন্ত সৌজন্মের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন—আমার পালানোর বিবরণও শুনেছেন বলে জানালেন। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে আমার পালানোর সমস্ত ইতিহাসটাই আমি তাঁকে লিখে দেবো। উঠে আসার সময় উনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে হাতে একটা একশো লুই-এর নোট হস্তে দিলেন। সেটা অবশ্য পোষাকের আলমারীটা ভর্রভাবে ভর্তি করতেই খরচ হোয়ে গেল। বাই হোক, এক সন্তানের নথ্যেই তাঁকে আমি পুরো বিবরণটা লিখে পাঠিয়ে দিলাম—সেই সঙ্গে জানালাম, ওটায় যতগুলি ইচ্ছে সংখ্যায় উনি ছাপাতে পারেন আর বিলি করতে পারেন। আর অনুমোদন জানালাম, এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও দিতে যাদের দ্বারা আমার কিছু উপকার হোতে পারে।

সপ্তাহ তিনেক পর উনি আমাকে বললেন যে, আমার সবক্ষে উনি ভেনিসের রাজসূত ম্যাসিয়ে এরিংসো'র সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজসূত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমার উপর তাঁর কিছুমাত্র ফ্রোণ বা বিরক্তি নেই... তবে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী নন। কারণ, কোনো বকম গোলমালের ভিতর উনি নিজেই জড়াতে চান না। আর রাজ্যের শাসন-পরিষদের কাছে পাছে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় সে সব হাস্যামোদ উনি পছন্দ করেন না। ম্যাসিয়ে বার্গাস আরও জানালেন যে, আমার গল্প তিনি মার্কুয়িস জ পম্পাহ্যর, ম্যাসিয়ে জ বুলোন ইত্যাদি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে করেছেন। তাঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে গেলে তাঁরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন সন্দেহ নাই। এখন তাঁদের সঙ্গে থেকে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ আমার হাতে। আরও বললেন যে, রাজকোষে যাতে কিছু অর্থ আসে সে বিষয়ে কিছু নতুন ব্যবস্থা বা উপায়ের উদ্ভাবনা যদি করতে পারি, তবে আমার ভবিষ্যৎ স্বর্ণোজ্জ্বল। তবে যেন কোনো বকম জটিলতার মধ্যেই না বাই।

ম্যাসিয়ে জ বুলোন-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বৃদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত সৌম্যমুষ্টি—প্রথম দর্শনেই মনে শ্রদ্ধা জাগে। অনেক বিষয়ে আলোচনার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—“একটা ব্যাপার আছে—সে বিষয়ে আপনাদের কি বক্তব্য বলতে পারেন—অবশ্য পরে লিখেও জানাতে পারেন। ব্যাপারটা হোলো ম্যাসিয়ে প্যারিস ছাড়াগিরি তাঁর সাময়িক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্তে বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা চান। এই টাকাটা আমাদের তুলে দিতে হবে রাজকোষে ইন্তক্ষপ না করেই।”

—“আমার কিন্তু একটা প্র্যান আছে, যাতে করে রাজাকে—”

—“কত খরচ হবে তাতে?”

—“কিছুমাত্র নয়—কেবল টাকাকলি সংগ্রহ করার যা খরচ—”

—“আপনি কি ঠিক করেছেন আমি জানি—”

—“আশ্চর্য্য। কি করে জানলেন আপনি? আমি তো কাউকেই বলিনি—”

—“বেশ তো। কাল এসে আমাদের সঙ্গে রাজে খাবেন, ম্যাসিয়ে ছাড়াগিরি সঙ্গেও এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো।”

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে আপন মনেই চিন্তা করতে লাগলাম, ভাগ্যের কি অদ্ভুত খেলা। রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে কেনেই বলে

বসলাম এত টাকা আমি জোগাড় করে দেবো—বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করে যে কোথা থেকে বা কেমন করে দিতে পারবো। অথচ ওই পাকা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন দেখাবার জন্তে যে আমার কথা উনি আগেই ধরতে পেরেছেন। এখন উপায়? আমি ভাবলাম, প্রথমেই আমাকে যে করেই হোক আঁচ করে নিতে হবে দ্ব্যভাগি আর উনি কি ভেবে রেখেছেন, যদি নেহাৎই না পারি তবে এমন রহস্যপূর্ণ হাসি মুখে টেনে নিঃশব্দে বসে থাকবো যাতে মনে হবে এ সবই তো আমার জানা ব্যাপার।

বথাসময়ে মাসিয়ে দ্ব্যভাগির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম। আরও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন—আর কথাবার্তা যতদূর সম্ভব একঘেয়ে ক্লাস্তিকর হয়ে উঠেছিলো। খাওয়ার পর মাসিয়ে দ্ব্যভাগি অশ্রদ্ধা অভ্যাগতের কাছ থেকে কিছুক্ষণের অবসর প্রার্থনা করে আমাকে আর মাসিয়ে ব্যালোনকে অস্ত্র একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করালেন। তারপর উঠে গিয়ে একটা বই হাতে করে নিয়ে এসে প্রথম পাতাটি খুলে একটু হেসে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—“মাসিয়ে ক্যাসানোভা, এই দেখুন আপনার প্র্যানট”

প্রথম পাতাটিতে দেখলাম লেখা আছে—নব্বইটি টিকিটের লটারী মাসে একবার করে টিকিট বিক্রী হবে—আর প্রত্যেকটি বাবে পাঁচপান্নার বেশী টিকিট উঠবে না।—“স্বীকার করছি মহাশয়, আমি ঠিক এই জিনিষই ভেবেছিলাম”

সেদিন বাকী রাতটা কাটলো, কি ভাবে লটারীর সব ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। আর নেহাৎ অহঙ্কার করে বলছি না আমি যে সব সংশোধনী অথবা নতুন কোনো পদ্ধতির প্রস্তাব আনলাম প্রত্যেকটিই সকলের মতে রীতিমত মূল্যবান বলে গৃহীত হলো—সবার মনেই আমার সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটা উঁচু ধারণাই গড়ে উঠেছিলো। তার বিশদ বিবরণ না দিলেও শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, হিসাব পত্র আর গণনার বথার্থ নির্ভুল ভাবে বিচার করার জন্ত এক জন নামকরা বিশেষজ্ঞ ডাকা হলো। আর তিনি এসে আমার প্রত্যেকটি প্রস্তাব এবং হিসাব নির্ভুল বলে স্বীকার করলেন।

মাসিয়ে ও বার্গস আমার সঙ্গে মাদাম জ পম্পাহুয়-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদাম ঠিক চিনতে পারলেন, আমাকে পাঁচ বছর আগে দেখেছিলেন—তবে তখন এই যে, আমার মুখে কয়সী ভাষা শুনে তখন তাঁর ভারী মজা লাগতো, কিন্তু এখন আমার নির্ভুল পরিষ্কার উচ্চারণে উনি আশ্চর্য। বাই হোক, লটারীতে মাদাম পম্পাহুয়-এর বল উৎসাহ দেখালেন। লটারীর প্র্যানট হলো—প্রতি মাসে পাঁচটি করে জিতবার সংখ্যা থাকবে অর্থাৎ পাঁচপান্না টিকিট জিতবে—আর যদি ছয়টা হয় তাহলে আরও ভালো—ছয়ের সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেয়া হবে। অতএব রাজ্য প্রতি মাসে একশো হাজার ফ্রাউন লাভ করতে পারবেন।

লটারীর ছয়টি অফিসের ভার আমার উপর দেওয়া হলো। আর লটারীর লাভ থেকে বছরে চার হাজার ফ্রাঙ্ক আমার আয় নির্দিষ্ট করা হলো। প্রধান অফিস কর্মসর্তার এ খোলা হয়েছিলো, তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর আমার চেয়ে অনেক বেশী

আয় নির্দিষ্ট করা হলো। কিন্তু তার জন্ত আমি একটুও হিংসা করিনি। কারণ, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গেই দ্ব্যভাগি তাঁর বাড়ীতে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আর আমি জানতাম, আসলে এই সমস্ত লটারীর প্র্যানট তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত।

এইবার আমার বুদ্ধির খেলা শুরু হলো। আমি আমার পাঁচটা অফিসই বছরে দু’হাজার ফ্রাঙ্কে ভাড়া দিয়ে দিলাম। আর ক সেট দেনিসে এই অফিসটি বথাসময় সৌখীন মূল্যবান আর সুন্দর জিনিষে সাজলাম। এক জন কর্মচারীও রাখলাম—সুন্দর প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত একটি ইতালীয় যুবক।

জনসাধারণকে আমার অফিসের দিকেই আকর্ষণ করবার জন্তে আমি ছাপানো কাগজ বিলি করতে লাগলাম। তাতে লেখা ছিলো, আমার সঠ-করা টিকিট যদি জেতে তাহলে চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই জেতার টাকা পাওয়া যাবে। সহজেই আমার অফিসের ভাঁড় বাড়তেই লাগলো। প্রথম বারেই আমার অফিস থেকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক-এর টিকিট বিক্রী হলো তার থেকে—জিতবার পুরস্কার-স্বরূপ দিতে হলো আঠারো হাজার ফ্রাঙ্ক। ক্রমে ক্রমে আমার অফিসটা রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আমার ইতালীয় কর্মচারীটিও ভাগ্য কিরিয়ে নেবার সন্ধান পেলে।

এই সময় ভেনিসের একটি অভিজাত-বংশীয় যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো। ওর নাম কাউন্ট জ তিরেস্তা।

এক দিন তিরেস্তা আমাকে জানালে যে, পোপের এক জন বিধবা ভ্রাতৃপুত্রবধু মাদাম লাম্বার্তিনী সঙ্গ আমার আলাপ করিয়ে দেবে। নামটা শুনে কৌতূহল জাগলো, রাজী হয়ে গেলাম। তিরেস্তার সঙ্গে গেলাম—কিন্তু কোথায়ই বা পোপ আর কোথায়ই বা তার আত্মীয়! পরিচয় হলো উগ্র বিলাসিনী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির একটি মহিলার সঙ্গে আর তার বান্ধবীর সঙ্গে। আর সেই বান্ধবীটি অপরূপ সুন্দরী কিশোরী বোনঝির সঙ্গে। কিশোরীটির নাম মাদামময়সেল থেরেসা জ লা মিউর।

কিছুক্ষণ অর্থহীন আলাপের পর মাদাম লাম্বার্তিনী এক রকম তাসের জুয়া-খেলার প্রস্তাব করলেন। আমি রাজী হলাম না কিছুতেই—একটু এগিয়ে এসে মাদামের কিশোরী বোনঝিকে আশ্বিনের ধারে একটি বসবার জায়গায় বসতে অমুরোধ জানিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। ওঁদের জানালাম, তাস খেলার চেয়ে গল্প করে কাটানোই আমার ভালো লাগবে। মাদাম লাম্বার্তিনী হাগতে হাসতে বললেন,—“গল্প তো করবেন—কিন্তু কোন বিষয়ে কথা বলবেন? ও তো মোটে এক মাস হলো কনভেন্ট থেকে বেরিয়েছে?”

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, এমন মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে একটুও খারাপ লাগবে না। ওঁরা তাস খেলতে লাগলেন—আর আমি মেয়েটির সঙ্গে নানা চমকপ্রদ বিষয়ে আলাপ জমালাম। বলতে বিধা নেই—ওর মনোরঞ্জে একটুও বিলম্ব ঘটেনি আমার। সন্ত গণ্ডীর বাইরে মুক্তি পাওয়া কাঁচা মন—নানারকম সরস আলোচনার ওর কৌতূহল আর আগ্রহ স্বাভাবিক।

যে সব প্রসঙ্গের আলোচনা ওর অপরিণত বয়সের কাছে অপরাধ বলে গণ্য করা হতো, সেই সব প্রসঙ্গের আলোচনার ওর কিশোর মনের লজ্জা আর আগ্রহের ছাপ ওর মুখে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠতে

লাগলো। এক সময় ও উঠে গিয়ে ওর মাসীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মাসী হাতের তাসটায় হারলেন। বোনঝিকেই অপয়া, ভেবে বললেন,—“হুই মেরে পালা এখন থেকে—তুই-ই নিশ্চয়ই অপয়া, তাই এবার হারলাম। আর তাছাড়া ঐ ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রেখে চলে এলি যে! লোকে কি বলবে? একটু শিক্ষা সভ্যতা জানে না?”

মেয়েটি হাসতে হাসতে ফিরে এলো আমার পাশে। তার পর কিশ-কিশ করে বললে,—“যদি আমার মাসী জানতেন যে আপনি আমার সঙ্গে কি সব বিষয়ে গল্প করছেন—তাহলে কিন্তু চলে যাবার জন্তে দোষ দিতেন না—”

—“সত্যিই ভারী অজ্ঞার হোয়েছে। এর জন্তে আমার অমৃতপু হওয়া উচিত। আচ্ছা তাহলে আমি বরং চলে যাই—কিছু মনে করবে না তো?”

—“আপনি যদি চলে যান তাহলে মাসী ভাববেন আমি একটা আস্ত বোকা, তাই আপনি বিরক্ত হোয়ে চলে গেলেন—”

—“তাহলে তোমার ইচ্ছা যে আমি থাকি।”

—“আপনি যেতে পাবেন না—”

ফিরে এলাম। তবে সে রাতে বিদায় নেবার আগে জেনে গেলাম ওই লাবণ্যময়ী কিশোরীর অঙ্গের গভীর প্রেমের রেখা একে দিয়েছি—আর আমার অমুবাগের চিহ্ন রেখে গেলাম ওর হৃৎ প্রসারিত কর-পলকে অল্পশ উক চুখনে...

তিন চার দিন পর মাদামময়সেল জু লা মিউর-এর কাছ থেকে আমার অফিসে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে ও জানিয়েছে—“মোটামুটি এই কথা—” আমার মাসী ধনী কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী, বিলাসিনী আর হুনার্তি-পরায়ণা। আমাকে পর্দানশীন করতে না পেয়ে শুধু ঘটকের মুখের প্রশংসায় মুগ্ধ হোয়ে ডানকার্কেবের এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বিবাহের ঠিক করেছেন। তাকে আমিও যত চিনি মাসীও ততই চেনেম। আপনাকে আজ আমি বলতে চাই যে যদি সেদিন রাতের আলাপ-আলোচনার আমাকে ঘৃণা না করে থাকেন তবে আমি আপনার ধর্মপত্নী হোতে চাই। হ্যাঁ, আমার বেহ-মন আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করতে চাই—পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক সমেত—আমার মৃত্যু মায়ের যৌতুক। তাছাড়া মাসীর মৃত্যুর পরও অত টাকা আমিই পাবো।

চিঠিতে উত্তর দেবেন না। কার হাতে পড়বে জানি না। পাঁচ দিন পর মাদাম লাবণ্যময়ীর বাড়ীতে এসে মুখেই জানাবেন। পাঁচটি দিন সময় রইলো আপনার ভাববার। যদি আমাকে আপনার উপযুক্ত না মনে করেন তবে একটি অমুরোধ রাখবেন—আমার কাছে আর আসবেন না...আমার সঙ্গে কোথাও দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাবেন...তাইতে আমারও ভালো সহজ হবে। আমার জীবনে একমাত্র সখ শুধু আপনার পাশে...

চিঠিখানি পড়ে ব্যথিত হলাম। চিঠির প্রতিটি লাইনে সত্যতা, সম্মান আর সরল মনের সহজ সত্য ফুটে উঠেছে...সত্যিই শ্রদ্ধা হোলো মেয়েটির উপর। কিন্তু ওই বিবাহের কথাতেই আমি পিছিয়ে এলাম। আমার মনে বিবাহের বা বিবাহিত জীবনের প্রতি কোনো রকম আসক্তি ছিল না আমি স্পষ্টই দেখতে পেতাম যে বিবাহিত জীবনের মশল স্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্তে নয়।

তাকে আমি শুধু দুঃখই দেবো—যে আমার কাছে করবে আশ্রয় নিবেন।

চার দিন পর মাদাম লাবণ্যময়ীর বাড়ীতে ওর সঙ্গে দেখা হোলো—সুন্দর সাজে অপকৃপ সুন্দরী দেখাছিল ওকে। ওর মাসীর সামনেই আমি প্রস্তাব করলাম, ২৮শে মার্চ সকলকে দামিএন-এব কাসী দেখবার জন্তে আমি নিয়ে যাবো। সমস্ত প্যারিস দেখবার জন্য উন্মুখ সেই নইর মৃত্যুদণ্ড। আমি একটা খুব ভালো জানলা ভাড়া করে এলাম। যেখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখা যাবে। ফিরে এসে জু লা মিউর এর সঙ্গে নিভুতে বসে গল্প করতে লাগলাম... আর আলাপের মধ্যে এক দুর্বল মুহূর্তে ভাসা-ভাসা ভাবে বিবাহে সম্মতিও জানিয়ে দিলাম।

কাসীর দিন সবাইকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম। জানলাটা বিশেষ বড় ছিলো না—তাই প্রথম সারিতে মহিলারা আর তাঁদের পিছনে আমি তিরেস্তা দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই অমাহুযিক হত্যাকাণ্ড আমি দেখতে পারিনি—সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। হুই কান প্রাণপণে চেপে রাখা সত্ত্বেও সেই হতভাগ্যের মর্মান্বশী তীব্র করণ আর্ন্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। ডেরিএন সখকে সকলেই জানতো—লোকটা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির আর ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী ছিলো। রাজাকে হত্যা করে স্বর্ণলভের আশা করতে গিয়েই বেচারার এই ফল হোলো। অবশ্য রাজার গায়ে সামান্য একটু আঁচড় কাটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি...কিন্তু শাস্তিটা হোলো হত্যা করার শাস্তিরই সামিল। সীন নদীর ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে গড়ানো চাকায় বেঁধে দেওয়া হোলো হতভাগ্যের দেহটা। চাকায় সমস্ত শরীরটা পিষে গেল আর চারটে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সমস্ত দেহটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হোয়ে টুকরো টুকরো করে ছিটকে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য্য প্যারিসের মহিলারা! এই দৃশ্যবিদ্যার ক দুর্ভাগ্যের এতটুকুও বিচলিত করলো না!

এই ঘটনার পরই মাদামময়সেল জু লা মিউর তার মাসীর সঙ্গে লা ভিলেং এ বেড়াতে গেল আমাকেও একবার যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে। দিন তিনেক পর আমি দু'-একদিন কাটাতে বসে গেলাম। ডানকার্কেবের সেই ধনী ব্যবসায়ীরও আসার কথা ছিলো। কিন্তু আমি থাকা অবধি তিনি এসে পৌছলেন না। আমি তাঁকে দেখবার জন্য আর একবার গেলাম লা ভিলেং এ। মাদামময়সেল জু লা মিউরকে ধনী অতিথির সম্মানে মূল্যবান উজ্জ্বল পোষাকে সুন্দর করে সাজতে দেখলাম—ডানকার্কেবের ব্যবসায়ীটিও দেখতে সুন্দর আকর্ষণীয়। তাঁকে আরও একদিন বেশী থাকবার জন্য অমুরোধ জানালেন মেয়েটির মাসী। জু লা মিউরও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে।

পরে যখন মাসী বোনঝিকে একান্ত ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হবু স্বামীর সখকে কি ঠিক করলি বল?” বোনঝি তখন উত্তর দিলে,—“লক্ষ্মীটি মাসী, এখনকার মত আমাকে রেহাই দাও। কাল ঐ ভদ্রলোকের পাশে আমাকে বসিও আর কথা বলিও, তাহলেই দেখতে পাবে আমার রূপ ওর সহ হোলো আমার কথাবার্তা ওর অঙ্গ হোয়ে উঠবে। যখন দেখবেন আমি একেবারে একটা নিরেট বোকা তখন হয়ত আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন না”—

সে রাতে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাস খেলে আমরা সবাই যে যাব



ঘরে শুতে গেলাম। মিনিট পনেরো পরেই আমার দরজা খুলে গেল—  
চুকলো এসে আমার কিশোরী প্রিয়া—কিন্তু প্রতিদিনকার মত শিথিল  
রাত্রি বাস ওর পরনে নেই, সাক্ষ্য পোষাকে সুসজ্জিতা।

—“বলো তুমি...এই বিয়েতে কি আমাকে রাজী হতে হবে?”

—“ঐ ভুল্ললোকটিকে পছন্দ হয় তোমার?”

—“অপছন্দ হয় না”

—“তবে রাজী হও”।

—“বেশ—তবে বিদায়। এই মুহূর্ত থেকে প্রেমের যত্না হোক,  
জেগে থাক শুধু বন্ধুত্বের প্রীতি”—

—“আজই রাত্রি থেকে কেন? বন্ধুত্বের সুর হোক কাল থেকে।  
আজ রাতে তুমি আমার প্রেমসীই থাকো।”

—“না, তা’ হয় না, মরে গেলেও তা’ হোতে দেবো না। আমি  
যদি অন্তের দ্বী হই আমাকে তারই বোণ্য হোতে হবে। কে জানে  
ভবিষ্যতে হয়ত তার পাশে থেকেই সুখ পাবো। আমাকে ছেড়ে দাও  
—আমাকে আর ধরে রেখো না—যেতে দাও—তুমি তো জানো  
আমি তোমাকে ভালবাসি”—

—“তবে যাবার আগে একটি চুখন দিয়ে যাও”

—“না।”

—“কিন্তু তোমার চোখে জল! তুমি কঁাদছো?”

—“না-না-না, ভগবানের দোহাই এবার আমার যেতে দাও”।

—“না, তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে সারা রাত কেঁদে কাটাবে! কি  
করবো ভাবতে পারছি না—শোনো, কেঁদো না তুমি, থাকো আমার  
কাছে, আমিই তোমাকে বিয়ে করবো”—

—“না—আর এখন তাইতে আমি রাজী হতে পারি না”—

এই বলে প্রবল চেষ্টায় আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে  
নিরে ও ছুটে চলে গেল।

পবনিন রাত্রে আহাবের সময় অবধি আমি রইলাম। গত রাত্রে  
অশ্রুশোচনার, লজ্জায়, ক্ষোভে এক মুহূর্তের জন্য ঘুমতে পারিনি।  
সারা দিন অশ্রুতর ভাণ করে নির্জনে চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম।  
সারাক্ষণের মধ্যে জা লা মিউর এর সঙ্গে একটি বার দেখাও হোলো না,  
একটি কথাও বলতে পেলাম না। রাত্রে খাবার টেবিলে মাদাময়াসল  
ওর বিয়ের কথা প্রকাশ করলে...দিন আঠেকের মধ্যেই বিয়ে হবে,  
তারপরই ও ডানকার্ক চলে যাবে। আজ বুঝতে পারি সেদিন আর  
দেখা না করে ও ঠিকই করেছিলো।

কিন্তু সে সময় আমি যেন ওকে হারিয়ে পাগলের মত হোয়ে  
উঠেছিলাম...অশ্রুশোচনার আমার বুক জলে বাজিল। প্যারিসে  
ফিরে এসে ওকে এক দীর্ঘ উচ্ছ্বাস আর আবেগ ভরা চিঠি লিখলাম।  
উত্তর এলো অমরোথ জানিয়ে, আর কখনো যেন ওকে চিঠি না লিখি।  
মনে হোলো তবে ও নিশ্চয়ই ডানকার্কের ওই ব্যবসায়ীর প্রেমই  
পড়েছে—মনে হতেই ইচ্ছা হোলো ঐ ব্যবসায়ীটিকে খুন  
করতে ও যেন দস্যুর মত লুটে নিতে এসেছে আমার এক প্রথম  
সম্পদ।

ঠিক করলাম ওর বাড়ীতে যাবো...ওকে গিয়ে জানাবো ওর

ভাবী পত্নীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা। তারপরও যদি ও নিরস্ত  
না হয় তাহলে ওকে বন্দুকে আহ্বান জানাবো। মনে মনে ঠিক  
করে দুটি শিশুল হাতে নিয়ে সত্যিই ওর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।  
কিন্তু তখন ও ঘুমাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম—আধ ঘণ্টা পর ও  
ঘরে এসে চুকলো একটা ডেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে চুকে আমাকে  
দেখেই দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত  
আহ্বান জানালো। ওর এই আন্তরিকতার আমার ভিতরের উন্মত্ত  
পণ্ডটা অভিভূত হোয়ে পড়লো। সব কোভ, আলা শান্ত হোয়ে  
জুড়িয়ে গেলো। আমি বাঁচলাম।...

এর কিছু দিন পর আমি জেনেভাতে চলে এলাম। সেখানে  
এসে যে হোটেলটাতে উঠলাম তার নাম হোটেল দা বার্লাস। মনে  
আছে সেদিন তারিখটা ছিলো ২০শে আগস্ট ১৭৬০। ঘরের মধ্যে  
এক সময় অলস ভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়লো  
জানলার কাচের উপর কি যেন লেখা রয়েছে...উৎসুক হোয়ে কাছে  
যেতেই দেখি, হীরার অগ্রভাগ কেটে কেটে লেখা—

“তুমিও ভুলে যাবে হেনরিয়েটাকে”

আমার মাথার চুলগুলো অবধি খাড়া হোয়ে হোয়ে উঠলো একটা  
অসহ্য শিহরণে—এক ঝাপটায় সরে গেল বিন্মুতির যবনিকা—  
হেনরিয়েটার স্মৃতি আমার সমস্ত মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মনে  
পড়লো সুদীর্ঘ তেরটি বছর আগেকার সেই দিনটি যেদিন হেনরিয়েট  
ঐ কথাগুলি লিখে রেখে গিয়েছিলো। এই ঘরেই আমরা দুজনে  
কাটিয়েছিলাম উজ্জল মধুর ক’টি দিন। হেনরিয়েটার লক্ষ লক্ষ  
স্মৃতি আমার সমস্ত অমুভূতি সমস্ত স্বপ্ন জুড়ে ফুটে উঠলো...মানস  
নয়নে জেগে উঠলো হেনরিয়েটার তেজোময়ী; দীপ্তময়ী মধুর মুখখানি  
—মনের সবটুকু মাধুরী দিয়ে যাকে একদিন ভালোবেসেছিলাম আজ  
সে কোথায়? তারপর থেকে আর দেখিনি তাকে। কোথাও  
তিনি তার কথা। আজও তাকে আমি ভালবাসি—মনের  
অবচেতনে এত আবেগ এত নিবিড় অমুভূতি আজও ওর জন্তে  
লুকিয়েছিলো। কিন্তু কি যেন হারিয়েছি আজকের আমি সেদিনের  
আমির কাছ থেকে। হয়তো সেই গভীর আদর্শবাদ। কিন্তু মনে  
হয় আজও ওর স্মৃতি আমাকে যেন অনেক দিনের হারানো কি  
ফিরিয়ে দিলে। যদি একটুও জানতাম কোথায় গেলে ওর সন্ধান  
পাবো, তবে সেই মুহূর্তেই সেখানে চলে যেতাম ওর খোঁজে।  
মানতাম না কোনো বাধা—কোনতাম না ওর সেই কাতর মিনতি  
ভরা নিবেদ।

সেই দিন রাত্রে মাসিয়ে ভিলার্স-শ্রীহর সঙ্গে গেলাম জলটোয়ারের  
কাছে। আমার জীবনে এও এক স্মরণীয় দিন। আমরা যখন  
পৌছিলাম তখন তিনি সরে টেবিল ছেড়ে উঠলেন—তার চার পাশে  
যিরে আছেন বিখ্যাত লর্ড আর লেডীরা।

আমাকে যথারীতি ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোলো।

[ ক্রমশঃ।

অমুবাদিকা—শান্তা বসু।

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুত্বের উল্লেখ করবেন ]

# শ্রীমতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

“কারণ জ্ঞানতাম যে তোমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে গেছে।”

“আর তাতেই তোর কর্তব্য শেষ হয়ে গেল?”

রাত দুটার সময় শুতে গেলাম সবাব স্নানমতি নিয়ে। বড় ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের জন্ম আমার ঘরটা সাজান হয়েছিল; পাশের ঘরের দোরটায় খুলে দেওয়া হয়েছে, ওখানে হবে আমার বুদ্ধোদার। আমার কত দিনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভরা অতি-পরিচিত ঘরটার চেহারা আজ বদলে গেছে; ক্রুশটা শুধু বখাস্থানে আছে। বহুক্ষণ তার সামনে বসে বইলাম।

আজ সকালে উঠতে বেশ দেরী হল। লুই এসে ঘরে ঢুকলো, “কি, ঘুম ভাঙল?” বিফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি দেখে ও হেসে বলল, “ওগো বঁধু, তুমি ভুলে গেলে নাকি গত রজনীর কথা?”

‘ওগো বঁধু’ কথাটার কি আলো ছিল জানি না, চকিতে চেয়ে দেখি সামনেই ‘আমার স্বামী’। বড় অপরূপ ওর চেহারা; আমার হুই কাঁধে হাত রেখে ও স্নিকমুখে চেয়ে ছিল। অসীম প্রেমে ভরা ওর চোখ আজ স্নেহময়; ধবধবে সাদা দাঁতগুলো উঁকি দিচ্ছে সরল হাসিতে উজল ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে; ওর ডেউখেলানো চুলে সোনা আর পার্ণার চমক। ওর গলা জড়িয়ে ধরে আমি ওর ঠোঁটের ওপর রাখলাম আমার ঠোঁট। ও বসে পড়ল আমার পাশে, আমি ওর বুকে বুখ লুকলাম, আমার কপাল থেকে ও চুলগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল; ওর কাছাকাছি আরও নিবিড় হয়ে বসলাম, তাকালাম ওর দিকে সহাস্ত, সানন্দ, নির্ভরশীল দৃষ্টিতে। ও আমার স্বামী, বন্ধু! ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম আমার এত সহৃদয়, প্রেমাত্মক, অমুগত স্বামীর হাতে অর্পণ করার দরুণ। এক সঙ্গে গিয়ে ক্রুশের সামনে আমরা প্রার্থনা করলাম। ও নীচে গেল; আমি-খানিক বাদে যখন নামছি সিঁড়ি দিয়ে, ও দেখি আবার ওপরে আসছে।

‘কি হল?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘কিছু না, আমার ঘড়িটা ভুলে এসেছি,’ বলে টুক করে আমার জড়িয়ে ধরল।

ঘরে গিয়ে ও দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখল। চার-তলার ঘর থেকে তেরেস নামছিল।

“এই যে দিদি, ঘুম ভেঙেছে?” ও আজাদে-ডগমগ করে উঠল, “এই ত! কেমন সুন্দর চতুষ্রয়ের মত স্মৃতিভরা চেহারা হয়েছে তোর। এখনো! আজ ফাঁকাশে ভাব যদিও আছে। কেমন দিদি, আগেই বলিনি এবার শীগগির তুই সেরে উঠবি?”

আমি হাসলাম। লুই ঘর থেকে বেরিয়ে এল, “কি বলছ, ও তেরেস?”

“কাস্তেন সাহেব, বলছিলাম যে মাদমোয়াজেল আপনার রাজদে যেতে না যেতেই ওর গালের গোলাপগুলো আবার ফুটেছে।”

লুই হেসে বাধা দিল, “না তেরেস ও আর এখন মাদমোয়াজেল নয়।”

“তাই ত! আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে!” বলে ও কপাল চাপড়াতে লাগল, “এবার থেকে ত ওকে মাদাম ডাকতে হবে। থুকীদির বে হয়ে গেছে, ভাবতেও কেমন লাগে। না, আমার ভীমরতি ধরেছে।”

লুই হাসল। আমরা খাবার ঘরে গেলাম। বাবা ‘কেমন আছিস?’ বলে আমার চুমা দিলেন। মা যুহু যুহু হাসছিলেন; টেবিলের ওপর একটা চিঠি আর বাজের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

“আমার লিখ?”

“হ্যাঁ মার্গো, তোর ঠাকুমা পাঠিয়েছেন,” মা জানালেন।

নানা রকম দামী পাখরের কাজ-করা সুন্দর দুটি সোনার ব্রেসলেট ছিল বাজের মধ্যে।

“আমাকে কি এত সুন্দর গয়নায় মানাবে?”

“দেখাই যাক না, পর ত,” বলল লুই।

“উহ, আগে ওর চিঠিটা পড়া যাক।”

চিঠিটা আস্তরিক স্নেহে উজ্জল। আমাদের বিয়ের যৌতুক-স্বরূপ গয়না পাঠিয়েছেন ঠাকুমা, আর লিখেছেন পারী গিয়ে ওঁকে আমরা যেন দেখে আসি একবার।

ও আর আমি বেড়াতে গেলাম। একটা চেরিগাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসা গেল। আমার কোলে মাথা রেখে লুই শুয়ে পড়ল।

একটু সন্ধ্যার সুরে ওকে বললাম, “লুই, তোমার মায়ের কথা বল না?”

ও চুপ করে আছে দেখে ভাবলাম বুঝি এ প্রশ্ন ওর মনঃপুত হয়নি।

“লুই বাগ করলে?”

আমায় আদর করে ও বলল, “কি যে বলছ, বাগ করব, তোমার ওপর? কেন বল ত? ভাবছিলাম মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে আমার প্রাণাধিকাকে দেখে কি তৃপ্তিই না পেতেন! হয়ত উনি অদৃষ্ট লোক থেকে আমাদের দেখতেন, আমাদের ওপর বয়ে পড়ছে ওর আশীষধারা।”

“ওর ছবি তোমার কাছে আছে?”

“এখানে নেই; বাড়ী গিয়ে তোমায় দেখাব। আমার সঙ্গে আছে কয়েক গুছি চুল।” বলে ওর ঘড়ির চেনে লাগান একটি খুলে ছুই গুছি চুল দেখাল।

“তুমার শুভ্র গুহিটি আমার মায়ের; কটা চুলগুলো আমার বাবার।”

“তোমার মার গায়ের রং বুঝি এত স্নান ছিল?”

“হ্যাঁ, ওঁকে অতি অপূর্ণ দেখতে ছিল; আমার দেখলে অবশ্য উলটো ধারণাই হবে, ও হেসে বলল।”

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম।

“বাবার সঙ্গে ওঁর মিলন হয় অতি অল্প বয়সে, তবে তোমার মত এত কম বয়সে নয়।”

১৭ই মে। কাল আমরা চলে যাব। আজ সবই তাই ধুমধাম করছে। লুই আর বাবা দেখাতে চাইছিলেন ওঁদের স্মৃতিতে ভাটা পড়েনি, কিন্তু বেশ বোকা যাচ্ছিল বাবা খামকা এই অপচেষ্টা করছেন। মা আর আমি সেলাই করছিলাম। থেকে থেকে আমার দিকে চেয়ে উনি গোপনে চোখ মুছছিলেন। মার কত যে কষ্ট হচ্ছে! তা সত্ত্বেও উনি জোর করে আমাদের পাঠাচ্ছেন—আমার শরীরের কথা ভেবে।

“তোমার বা স্বাস্থ্যের অবস্থা; অবিলম্বে চেঞ্জ যাওয়া দরকার। সঙ্গে তোমার স্বামী থাকবে, আমার ভাবনার কি-ই বা কারণ আছে?”—আমার উনি উম্মাহ দিচ্ছিলেন এই বলে।

বাবাও বললেন যে, অল্পদিন বাদেই মা আর উনি আমাদের সঙ্গে নীসে মিলিত হবেন। আমার চোখের জল দেখলে পাচ্ছে ওঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন, তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাচ্ছিলাম। আমরা বিকেল ছটার একপ্রসেসে রওনা হব।

আমার ঘরে গিয়ে একা বসে কাঁদছিলাম; এই বাড়ী ছেড়ে, বাবা-মাকে ছেড়ে এক মাসও আমার পক্ষে কোথাও থাকা অসম্ভব। তেরেস এল।

“সে কি খুঁদুদি, কাঁদছিস কেন? কাপ্তেন সাহেব দেখলে কি ভাববে বল ত? তোমার এই অবস্থা দেখলে ওর কত কষ্ট হবে বল দেখি? ও বউ! স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবি, এতে কাঁদবার কি পেলি!”

জল এনে ও আমার চোখ-মুখ ভাল করে ধুয়ে দিল। ও ঠিকই বলেছে। লুই বেচারী আমার এত বিচলিত দেখলে কোন প্রাণে বাবার ব্যবস্থা করবে? মা এসে আমার দেখে কেঁদে ফেললেন। তারপর আমার স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। দশটা অবধি আমার কাছে উনি রইলেন। লুই এলে হাত ধরে ওকে পাশে বসালেন।

“বাবা,” ওকে মা বললেন, “তোমার হাতে এই দুধের বাছাকে সাঁপে দিয়েছি,—জানি যে তুই ওকে স্নেহে রাখবি; লুই, ওকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবি ত? দেখছিস ত এখনও ও নাবালিকা, তা ছাড়া কত দুর্বল!”

“হ্যাঁ মা,” ও প্রতিশ্রুতি দিল। মিনিট পনেরো আলোচনার পর মা উঠলেন।

১১শে মে। পারী।—কাল বিকেলে বুটানী ছেড়ে এসেছি; রাত দুপুরে এখানে পৌঁছেছি। মা আর বাবাকে বিদায় জানাতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে পারিনি; ওঁরা টেশন অবধি এসেছিলেন।

## সমুজ্জ্বল মুখশ্রী

নিয়মিত “বোরোলীন”  
ব্যবহারে আপনার  
তনুশ্রী দিন দিন উজ্জ্বল  
ও কমনীয় হয়ে উঠবে।  
মুখশ্রীর কোমলতা  
ও সজীবতা বজায় থাকবে  
এর প্রাণ পর্শী স্নিগ্ধ সুবাস  
আপনার মনে আবেগময়  
অনুভূতি এনে দেবে।

পরিবেশক:- জি, দত্ত, এণ্ড কোং  
১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



**বোরোলীন**

উচ্চাঙ্গের ফেসক্রীম

সকল টেসনার্শ ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

আমার সঙ্গে বৃকে ধরে শত চুমায় বাবা অভিমুক্ত করলেন।  
বাবার কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি অঝোরে কাঁদলাম।

কাঁপা গলায় উনি বললেন, “যা মা, আর কাঁদিস না,—বড় কষ্ট লাগছে আমার।” তারপর হাসার চেষ্টা করে বললেন—

“তা ছাড়া তরুণ-তরুণীর সংসারে আমাদের মত বুড়ো হাব্‌ড়ার কি-ই বা দরকার বল ত?”—মা লুইকে আশীর্বাদ করলেন।

“ওকে দেখিস কিন্তু বাবা,” মার অমুরোধ ভেসে এল। বাবার হাত ধরে আমাদের কামরা অবধি ও এল। আবার আলিঙ্গন-আশীর্বাদের পালা শুরু হতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

বতরুণ পারলাম চোখ ভরে চেয়ে রইলাম মা-বাবার দিকে; আমাদের গ্রামের দিকে চোখ পড়ল। মিলিয়ে বাবার পূর্বকণ অবধি আমি সমস্ত অমুভূতি দিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম আমাদের গ্রামের শোভা। বৃকের কাছটা খালি খালি লাগল। আমার স্বামীর দিকে তাকালাম! ওর স্রজ আজ সব কিছু ছেড়ে এলাম, বাবা, মা, দেশ, অতীত। ওর স্বচ্ছ স্নেহ-কোমল চোখের দিকে চেয়ে আমার মধ্যে জেগে উঠল ক্ষীণ এক আশার শিখা, স্রবময় এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন! ওর কাঁধে ভর দিয়ে, হাতে হাত বেধে নীরবে কাঁদতে লাগলাম। ও আমায় ওর রেহছাড়ায় ঘিরে ধরল। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলাম; মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

“তোমার বড় বিরক্ত করছি, না গো?” ওকে প্রশ্ন করলাম।

“আমায়? বিরক্ত করছ?” ও হেসে জিজ্ঞাসা করল,  
“আমি কিছুতে বিরক্ত হই? বল মার্গারিৎ?”

গাড়ীর আলো জলে উঠল। আমাদের কামরায় দেখি আরো এক জন বয়স্ক ভ্রমলোক আছেন; বেশ মন দিয়ে উনি আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। বড় অবস্খি লাগল; উনি নিশ্চয় আমার কাঁদতে দেখেছেন; লুইকে চোখের ইশারায় প্রশ্ন করলাম ভ্রমলোককে ও প্রশ্নমেই দেখেছিল কি না। ও সম্মতিসূচক হাসি হাসল, আর আমায় আগের মত ভাবেই বসতে বাধ্য করল। তার পর আস্তে আস্তে আমরা গল্প-গুজবে মেতে উঠলাম। একটু নীরবতার স্রবোগ নিয়ে ভ্রমলোক কথা পাড়লেন।

“মশাইয়ের কি পারী বাওয়া হচ্ছে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, দু-এক দিনের জন্ত; কয়েক মাস আমরা গিয়ে দক্ষিণদেশে কাটাতে ইচ্ছে আছে।”

“আমিও পারী যাচ্ছি; ডাক্তারী করি: নাম আমার ডা: লাক্স; আপনাদের কোন উপকার করতে পারলে কৃতার্থ হব; আপনার ত দেখছি সামরিক বিভাগের চাকরি।”

“আজ্ঞে, আমি ইচ্ছা দ্বাবিশ অখারোবী বাহিনীর কান্তন লক্‌ব্র।”—লুই নিজের পরিচয় দিল।

“মাদামের কি শরীর খারাপ লাগছে?” সৌজন্তের সঙ্গে ভ্রমলোক জানতে চাইলেন।

“সম্প্রতি উনি অসুখ থেকে উঠেছেন।” লুই উত্তর দিল।

উদ্বিগ্ন নয়নে লুই আমার দিকে তাকাল; ভ্রমলোকের প্রশ্নে ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে কি না।

“না গো না, আমি আজ খাসা আছি।”

ও আশ্বস্ত হল।

আমরা লুভ হোটেলে উঠেছি। এখন ভোর ছটা। বাড়ীতে আমি ববাবরই সকাল সকাল উঠতাম। সে অভ্যাস এখনো ছাড়িনি। গ্রামের কথা, বাবার কথা, মার কথা মনে পড়তেই চোখ আমার জলে ভরে ওঠে। তবু আমি স্তব্ধ, বড়ই স্তব্ধ। লুই এখনো ঘুমচ্ছে। আমি চাই না ও দেখুক আমি কাঁদছি। মনে হচ্ছে কত দিন হল আমি চলে এসেছি; এই ত সবে গতকাল আমরা বাড়ী থেকে রওনা হলাম। আজ ঠাকুমার ওখানে যাব। উনি বোধ হয় জানেন না আমাদের আসার কথা, আমাদের পেলে কি খুসীটাই হবেন উনি! বড় জোর দু দিন কি তিন দিন আমরা এখানে থাকবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুই দক্ষিণ দেশে পৌঁছুতে চায়। আজ আমি ভগিনী ভেরোনিকের দেওয়া ক্রুশটির সামনে প্রার্থনা করলাম। ওটি সর্বদাই আমার গলায় থাকে। বেচারি! কত অল্প বয়সেই না মারা গেলেন। ওঁর জীবনের ছাব্বিশটা বছর খতিয়ে দেখলে দুঃখের পূঁজিই বেশী দেখা যাবে। আজ উনি শান্তিলোকের অধিবাসী Requiescat in pace! লুইয়ের ঘুম ভাঙল।

“কি গো, বড় দেবী হয়ে গেল না?” বলে ও আমার জড়িয়ে ধরল। এবার লেখা খামাই। সারা দিনের জল্পনা-কল্পনা ও এখন সেরে রাখতে চায়।

আমরা ঠাকুমার ওখানে গিয়েছিলাম। আমরা এসেছি, চাকরের মুখে শুনে উনি সোজা বাইরের দরজায় গিয়ে হাজির।

“আর রে আর বাছারা!” আনন্দে ওঁর গলা ভারী হয়ে উঠল। আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম, উনি আমাদের হাত ধরে বলে চললেন—

“কি গদা-দিদি, তোরা স্তব্ধ হয়েছিস ত? হ্যাঁ: আমাকে যেমন প্রশ্ন! কিন্তু তোরা এমন রক্তহীন চেহারা কেন রে দিদি? খুব ভুগলি বুঝি? বাছা আমার! বাবা-মার সব খবর কি? ভাল ত?”

লুইকে বসিয়ে আমায় নিয়ে গেলেন সোফার কাছে, “নে দিদি, একটু জিরিয়ে নে; খুব কাহিল হয়ে পড়েছিস, তাই না?”

“না ঠাকুমা, এইটুকুতেই কাহিল হব? এখন আমার বল কিরে এসেছে, শরীরের অবসাদ কেটে গেছে।”

লুইয়ের দিকে কিরে উনি প্রশ্ন করলেন, “তাই নাকি রে লুই? বেশ, তা হলে আজ আমার এখানে খেয়ে দেখাতে হবে কেমন শরীর সেরেছে। কোনও গুজব শুনছি নে বাপু! আমার কথা শুনতেই হবে।

ওর পায়ান উপহারের জন্ত ধন্যবাদ জানাতে গেলাম; উনি থামিয়ে দিলেন আমায়।—“ও সব কিছু আমি শুনতে নারাজ। দুই জনে আজ এখানে খেয়ে বাও, তবেই ব্রেসলেটের দাম উঠে যাবে।”—ওঁর কথায় রাজী হতেই হল। আমাদের ছেলেবেলার কত গল্পই যে করলেন।

“জানতাম, তোরা একদিন না একদিন মিলিত হবি! বুঝলি দিদি, প্রথম দর্শনেই তোদের প্রেম হয়, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। ওর জন্মদিনে সে বার ওর সাত বছর পূর্ণ হল। তোর তখন বছর দুয়েক বয়েস। ছোটদের জন্ত একটা ‘বল’ নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল। দুই থেকে বারো বছর বয়েসের মানা ছেলে-পিলেতে

ঘর ভরতি। লুইয়ের হাতে ছোট একটা মালা,—ওর হৃদয়-রাশীর গলায় পরিয়ে দেবে। কত রূপের, কত বর্ণের থুঁকিই যে ওর সামনে দিয়ে আনাগোনা করল : কিন্তু মহারাজের মন কিছুতেই ভুল না। সেই সময় তোকে কোলে নিয়ে তোর মা ঘরে ঢুকলেন। সেই তোরদেব প্রথম দেখা। সাদা-পোষাকে আবলুসের মত চুলে আর কুচ-কুচে কালো বড় বড় চোখে কি রূপই সেদিন খুলেছিল তোর! ওর আর তর সইল না; সটান গিয়ে তোর মাথায় মালাটা দিয়েই এক চুম্ব। কি হাসির রোল যে উঠল দিদি! ছোঁড়ার মা ত কীভাবে কি হাসবে ভেবে সারা। তার পর তোকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইল ওর মা,—তুই তার ছেলের বউ হবি কিনা। খুব গম্ভীর গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে তুই জবাব দিয়েছিলি—“হঁ।”—ওর মা অতি মহামুভব প্রাণোচ্ছল মেয়ে ছিল; বেচারী আজ তোদের দেখে কি তৃপ্তিটাই না পেত।—বলে ঠাকুমা চোখ মুছলেন। লুই আমার হাতে চাপ দিল; আমাদের চোখাচোখি হল।

২৩শে অক্টোবর, ১৮৬১। ছয় মাস হয়ে গেল আমার নীসে সংসার পেতেছি। সমুদ্রের ধারে ছোট এই শহরটি বড় ভাল লাগে। কত দিন যে আমার খাতার কিছু লেখা হয় নি; সময় পাই না একদম। ওর ভ্রুকুম, বতরুণ সম্ভব খোলা হাওয়ায় থাকতে হবে; আর সন্ধ্যাবেলা ত প্রায়ই আটটার আগে ঘুমতে হয়। এত তাড়াতাড়ি যে ঘুমিয়ে পড়ি, এর থেকেই বুঝছি যে সেয়ে উঠছি। ভ্রমধালাগরের বেলাভূমিতে হুঁজনে যখন তখন ঘরতে বাই। সূর্যের আলোয় নীল সাগরের বৃকে অজস্র রঙের বাহার দেখে চোখ ঝলসে ওঠে। রাতের খাওয়া প্রায়ই ছাতের ওপর হয়। সেখান থেকে জ্যোৎস্না রাতের সমুদ্র যে কী অপূর্ব লাগে! হুঁজনে হুঁজনে নতুন করে পাই এই অসীম রূপের পাখারে। কখনো কখনো এ-ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ি; সবল হুঁটি হাতে ও অকলীলাক্রমে আমার বৃকে তুলে নেয়, শুইয়ে দেয় গিয়ে বিছানায়; এত যে চেষ্টা করি জেগে থাকতে, তবু পারি না। ও বলে, এতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না; আমার ওজন নাকি ওর কাঁধের পেগীটার চেয়েও কম! আমার লুই যে কত ভাল তা কি করে বলি? ওকে ভালবেসে, ওর জীবনসাথী হয়ে নিজেকে আমি ধন্য মনেছি।

মা কিংবা বাবার পাতা নেই এ অবধি, ওঁরা চিঠি অবশ্য বোঝাই লেখেন। এবার লিখেছেন আসছে মাসের আগে আসতে পারবেন না; এত আশা করেছিলাম যে আগষ্ট মাসের আগেই ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

লুইকে মাঝে মাঝে পারী বেতে হয়; ওখানেই ওর রেজিমেন্ট আছে এখন। বড় জোর দুই দিনের বেলী ও বাইরে কাটায় না। গতকাল সকালে ও পারী গিয়েছে; আজ বিকেলে এসে পৌঁছবে লিখেছে। বারণ করেছে গতবারের মত ষ্টেশনে যেন না বাই ওকে আনতে। ওর ধারণা, এত অল্পই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়বো। তবে, বাগানের দরজা অবধি গিয়ে ওর জন্ত অপেক্ষা করতে পারি, এ অমুমতি ও দিয়েছে! ওকে একটা কথা বলতে হবে,—এমন কথা যে তাবতেই প্রতিবার আমি আশায়, আনন্দে শিউরে উঠছি! ভগবান, অসীম তোমার করুণা!

ছটা বাজল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই লুই এসে পড়বে।

এবার খাতা বন্ধ করি, বাগানে গিয়ে ওর জন্ত অপেক্ষা করব।

২৪শে অক্টোবর।—কাল লুইকে কথটা বলেছি। রাতে খাবার পর আমরা ছাতেই ছিলাম। পারীতে কি দেখল, কি করল—সবকিছু সবিস্তারে বলছিল ও। খানিক চুপ করে থাকার পর ওর বৃকে মুখ রেখে বললাম—

“লুই, আমার মনে হয়...” রাজ্যের সজ্জা এসে জড় হল আমার সর্বাঙ্গে, “মনে হয় যে শীগগির আমাদের ঘরে নতুন এক অতিথি আসছে।”

উল্লসিত ওর ওষ্ঠের সঙ্গে আমার ওষ্ঠ এক হয়ে গেল। কাল থেকে আমার চোখে জগতের রূপ পালাটে গেছে, আমার স্মৃতি মনে হল বিশ্বপ্রকৃতি আজ সুখী। আমার জানলার পাশে গোলাপ গাছের ওপর থেকে পাখীরা মধুর কি এক বাণী নিয়ে আসে আমাদের জন্ত; ওদের চঞ্চল চোখ যেন আমারই স্মৃতির প্রতিচ্ছবি। ফুল ফুটে উঠেছে অপূর্ব প্রাচুর্য নিয়ে; সমুদ্রের ধারে যখন বসি আর টেউগুলো এসে লুটিয়ে পড়ে আমার পায়ের তলার, মনে হয় ওরা বন্দনা গাইছে নবগতের। ভগবান, তোমাকে আমার প্রণতি জানাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই বসে রইলাম লুইয়ের পাশে, চেয়ে রইলাম ওর ঘুমন্ত মুখের পানে; ওকে আমি বড় ভালবাসি; আমার স্বামী, আমার সম্ভানের পিতা! দশ মাসও হয়নি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তোমার প্রস্তাব। তা সত্ত্বেও তুমি আমার ভালবেসেছ বন্ধু, বড়ই অকৃতজ্ঞ, বড়ই নির্ভর আমি। কিন্তু না, আজ, লুই, প্রিয়, তোমার আমি প্রাণাধিক ভালবাসি; মনে পড়ে তোমার মুখে প্রথম যখন একথা শুনি চেরি-বাগানে! ওর কপালে আলতো লাগে চুম্ব দিয়ে আমি জানলা খুলে দিলাম। প্রাণোচ্ছল আলোর প্রোতে ঘর ভরে গেল। সূর্যের প্রোচ্ছল মুখখানি হেসে যেন আমার বলছে, “সুপ্রভাত।” পাখীদের মুখেও সেই কথার প্রতিধ্বনি, “সুপ্রভাত।” আনন্দের আবেগে আমার ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠি। গোলাপ তুলতে গিয়ে যুঁহু করে তাদের জানালাম এ-সুখবর। শিশিরভেজা ফুলগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলাম মেরী-মায়ের বেদিমূলে; আমাদের আশার অকপট অঞ্জলি ওঁর চরণে কি পৌঁছবে না? কতকণ জানি না, চেয়ে রইলাম ওঁর অক্লান্ত নবজাত যৌবন দিকে; এই দেবশিশুর মত স্নানর হোক আমার সম্ভান। আকুল প্রাণে প্রার্থনা করলাম যৌবন কাছে। তার পর মেরীকে স্মরণ করে বললাম, “তৈ জননি! আমাদের ঈশ্বরের জননি, আমার বল দাও, আমার সম্ভানকে পরম প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি যেন গড়ে তুলতে পারি আদর্শ মানুষ-রূপে!”

২৫শে অক্টোবর। কাল আমরা ছাতের পাশে হলঘরটায় বসে ছিলাম। একটা কৌচের ওপরে বসে লুই আর আমি আমাদের সম্ভান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। আমি বললাম, “লুই, তোমার মত ও সৈন্ত বিভাগে কাজ করবে, না?”

“যদি ওর মায়ের আপত্তি না থাকে,” ও হেসে বলল।

“আমার ত একান্ত ইচ্ছে যে ও হুবহু তোমার মত হোক; লোকের দ্বিতীয় লুই লফেল বলে ওকে অভিহিত করুক। তোমারি রেজিমেন্টে ও বোগ দেবে,—বাগের অধীনে কাজ করবে। আর আমি দাবিশ অথারাই বিভাগের আমার স্থানী ও পূর্ব সম্বন্ধে সন্নির্গ করবে



বেড়াব। তার পর ও যখন একুশ বছরে পা দেবে, তোমার বদলে ও হবে ক্যাপ্টেন, আর তুমি, তুমি হবে মার্শাল।”

“সমস্ত কবাসী সৈন্যবিভাগের মার্শাল, না?”

“নিশ্চয়ই! তোমার কি সাহসের অভাব?—তখন তুমিই ওকে অন্তর্গত দেখবে। ওর প্রথম বিজয় যেদিন ঘোষিত হবে, সেদিন সবাই অবাক হয়ে তাকাবে ওর দিকে, “কে এই তরুণ যোদ্ধা!” লোকে তখন বুক ফুলিয়ে উত্তর দেবে, “মার্শাল লফেড্র-এর ছেলে?” আর আমি মনে মনে বলব, “আমাদের সন্তান!”

২৬শে অক্টোবর। কাল লুই আর আমি বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খানিক এদিক ওদিক ঘোরবার পর আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম; অলিভ গাছের ছায়ায় গজিয়েছে অজস্র নরম ‘মস’। বুনা গোলাপের বেড়া দেওয়া ছোট এই কুটিরগানি প্রকৃতি যেন আমাদের জন্তু তৈরী করেছিলেন। তার গোপনতম কোণে গিয়ে আমি বসলাম, আর চিরদিনের অভ্যাসমত লুই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা রেখে। আমার দিকে নীরবে চেয়ে ও নাড়াচাড়া করছিল আমার গলার লকেটটা; এই লকেটের মধ্যে আমি ওর ছবি বেঁধে দিয়েছি।

“শুনছ? বড় ঘন পাচ্ছে।”

ওর দিকে তাকালাম; কি অপরূপ দেখতে! আমার সাদা মসলিনের পোষাকের ওপর ওর কটা রঙের চুলগুলো চমৎকার লাগছে। ওর ঝাঁপে হাতে লকেটটা রয়েছে, ডান হাতটা আলতো ভাবে নামানো মাটির ওপর।

ও হঠাৎ চোখ খুলে আমায় জিজ্ঞাসা করল, “কি এত ভাবছ গো?”

“আমাদের সন্তান যেন তার বাপের রূপ পায়, লুই।”

“আমায় যদি অতই সুন্দর দেখতে তবে তার দাম টাই, একটা—” ও হেসে বলা মাত্র আমি নীচু হলাম; ও সাগ্রহে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

“মার্গারিৎ, মার্গো, তোমায় বড় ভালবাসি!”

হঠাৎ মনে হল কে যেন ঝোপের ওদিকে রয়েছে, লুই ঘাড় কিরিসেই দেখল, একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। লুই উঠে দাঁড়াল চট করে।

“ভিয়ার! তুই এখানে কি করে এলি রে?” সানন্দে ও চেঁচিয়ে উঠল।

“আমার ভ্রমণের নেশার কথা জানিস্ ত? আর এখানেই দিন কাটাচ্ছি কেন জানিস? তোকে আর তোর বউকে দেখব বলে।” আগন্তুক উত্তর দিয়ে আমায় অভিবাদন জানাল।

“এখানে দিন কাটাচ্ছিস কি রে? এত দিন এখানে আছি, তোর সঙ্গে দেখা হয়নি ত?”

“সে কথা থাক, তোদের দুটিতে এত চমৎকার ‘ভাবলো’র সৃষ্টি করেছিলি রে। চুপি চুপি ক্যানভাসের বুক এঁকে নিলাম। আমার ওপর সেরস্ব রাগ করলি না ত, লুই?”

“চটব কেন রে? তোর হাজার খুন মাফ করলাম; ক্যানভাসের ওপর ছবি হয়ে টিকে থাকার বদলে পুকুবাঁলি একটা কাজ দিল বটে!”

আমার দিকে ঘুরে ও বলল, “মাদাম, আমায় মাফ করবেন ত?”

“বিলক্ষণ ম’সিয়া, অবশ্য এতে মাফ করার কিছুই দেখি না!” আমি জবাব দিলাম।

“ধন্যবাদ মাদাম, আপনি দেখুচ্ছি সাক্ষাৎ করণাময়ী!”

“কিছু তোর ছবিটা লুকোলি কোথায় ভিয়ার?” লুই প্রশ্ন করল।

“উহ, এখন দেখাচ্ছি না; শেষ আঁচড় দেওয়ার পর দেখাব; এখন খালি কাঠামোটা দাঁড় করিয়েছি।”

“তবে চল, আমাদের ওখানেই এ-বেলার পাট চুকিয়ে নিবি।”

“আমি ত একুশি রাজী, কিন্তু মাদাম কি আমার মত ভবঘুরেকে বাড়ী ঢুকতে দেবেন?”

“নে নে, ও-সব পারিসিয়ান নকুতো এখানে অচল,” লুই ধমক দিল হেসে। আমিও যোগ দিলাম, “বুঝলেন ম’সিয়া, লুইয়ের যত বন্ধু আছেন, প্রত্যেকেই আমাদের বন্ধু,—তঁারা প্রত্যেকেই যে-কোন মুহূর্তে আমাদের বাড়ী আগতে পারেন; কাজেই কোন ওজর খাটবে না মশাই!”

বাড়ীর পথ ধরলাম আমরা।

“তুই বিয়ে করলি লফেড্র, আমাকে জানাস নি ত?”

“হ, বহুকাল তোর সঙ্গে দেখাও হয় নি, তোকে লেখাও হয় নি, গেল মে মাসে আমাদের বিয়ে হল।”

“আর আমায় একটা লাইন পর্যন্ত লিখে পাঠালি না হতভাগা! দেখলেন ত মাদাম, কেমন বন্ধু?” আমায় ও সাক্ষী মানল। তার পর কিছু গভীর কিছু পরিহাসের সুরে ও বলে চলল, “থাক বাপু, তোকে আর বেশী উত্থাপ্ত করব না। কারণ বিয়ের পর, বিশেষতঃ মাদামের মত রূপে গুণে তিলোত্তমার হাতে পড়লে, লোকে আর সবই ভুলে যায়।”

লুই ওর বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল।

“ম’সিয়া ভিয়ার, তুই বড় একটা সত্যি কথা বলে ফেললি; জীবনে আমি এত সখ আশা করিনি!”—কাঁপা গলায় লুই বলল। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এল; ওর বন্ধু সহানুভূতির সুরে জানাল।

“জানি লফেড্র, জানি; তোর এই সুরের যে আমি কত বড় সমভোগী, তা, তা তুই জানিস না।” লুইয়ের হাত ও ধরল।

খাবার পর লুই ম’সিয়া ভিয়ারকে গান গাইতে বলল। “জান মার্গারিৎ, খোদ সারিও-র মত ওর গলা।” আমিও অমরোষ করাত ম’সিয়া ভিয়ার গিয়ে পিয়ানোয় বসল। জানলার কাছে একটা কেদারায় গিয়ে বসল লুই। ওর পাশেই একটা গদীতে বসলাম আমি, ওর কোলে মাথা রেখে। ভিয়ারের প্রথম কয়েকটি সঙ্গত শুনেই কেমন একটা অস্পষ্ট স্মৃতি চকিতে জেগে উঠল। জানা একটা সুর, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না কি! ও হো, এইবার মনে পড়েছে।

“নবোঢ়া রূপসী যে পথে যাবে,

ফুলে ফুলে দাঁও সেপথে ছেয়ে;

পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,

রূপসী নবোঢ়া এপথে যাবে!”

এ যে জাস্মায়ার সেই করুণ গান। আমাদের বিয়ের দিন হঠাৎ যে গানটা আমার মনে পড়েছিল। হুই হু’বার একই গান এভাবে

আমার কানে ধ্বনিত হল,—এ কি কিছুই ইঙ্গিত? ওই ত! শেবটুকু ও গাইছে, সুলক্ষী এষোক্তীকে কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে :—

“পথে পথে ওঠে শোক-ক্রন্দন  
মৃত্যু রূপসী যে এ পথে যাবে ;  
পথে পথে শোক, অশ্রু-অর্ধ,  
রূপসী মৃত্যু যে যাবে এ পথে !”

আমার বুক বাথার টমটম করতে লাগল। সজোরে লুইয়ের হাত চেপে ধরলাম। ও সুলক্ষী, ভগবান; আমি, আমিও সুলক্ষী! আর কোল ভুড়ে যে আসছে! ওকে বৃকের ভূখ খাইয়ে কি জীবনের পথে দীক্ষিত করে যেতে পারবো না আমি? দয়াময়, এমন যেন কখনো না হয়; না দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়—আমাদের বাসনা যেন তোমার কাজের অন্তরায় না হয়!

মসিয়্য ভিন্নার উঠল।

“দল্লবাদ,” লুই বলল, “তোমার গলাটা খাসা চাঁচা-ছোলা রেখেছিস দেখছি; কিন্তু অজ্ঞ কিছু এবার শোনা: সুলক্ষী সেই গেরো মেয়ের কাহিনীটা?”

“হ্যাঁ! ওটা জ্বলে গেছি, জাসম্মার এই গানটা মনে ছিল এখন যেটা গাইলাম।” ও এগিয়ে এল, অক্ষুটস্থরে আমি ওকে দল্লবাদ দিয়েই একটু খোলা চাঁওয়া খাবার অজুহাতে গিয়ে হাজির হলান ছাতে। না, না, লুইয়ের সামনে কিছুতেই এ-বাথার যুখ খুলব না। একটু পায়েচাষী করে বেশ শাস্তি পেলাম। জানলা-গুলো বন্ধ করে দেওয়া হল, আলো এল। রাত আটটার সময় মসিয়্য ভিন্নার উঠল। রোজ আসবে,—কথা দিয়ে গেল।

২৭শে অক্টোবর।—কাল রাতে এগারটার সময় ডায়েরী লিখছিলাম, ভয় হচ্ছিল লুই বুঝি বকুনি দেয় এখনো জেগে আছি

বলে। ও নীচে গিয়ে আফিসের কি হিসেব মেলাচ্ছে। তাজ বহুস্ব ভগবানকে ডাকলাম, যেন আমাদের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। কয়েক মিনিট বাদেই লুই এল।

“এ কি এখনো লিখছ! না গো, এ ভাবে শরীর খারাপ কোর না লম্বাটি।”—তারপর আমার আদর করতে করতে বলল, “কি সুলক্ষর যে লাগছে তোমায়।”

আমি হাসলাম।

“কি গো, হল?” ও অধীর হয়ে উঠল।

“এই হয়ে এল।” আমি জানালাম। তারপর খাতা বন্ধ করে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা লুই, তুমি আমায় সত্যি ভালবাস?”

“হ্যাঁ গো, হ্যাঁ,” ও বলল।

“আমিও তোমায় বড় ভালবাসি লুই, একথা তুমি বিশ্বাস কর?” আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল, শত চেষ্টায়ও তা টাকতে পারলাম না।

“কেন তুমি একথা বলে আমায় কষ্ট দিচ্ছ?”

“আচ্ছা, অতীতের জন্ত তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?”

“ক্ষমা? কিসের জন্ত?” বলেই ও আমায় বুক চেপে ধরল।

তারপর আমায় ক্রুশের সামনে প্রার্থনা করলাম অভ্যাস মত।

২৮শে নভেম্বর।—মা-বাবার চিঠি পেয়েছি, ঠুঁরা ১ তারিখে আসছেন। এতদিন বাদে ওঁদের দেখব,—দিন যেন কাটেছে না। ওঁদের জন্ত ঘর গোছাতেই সারা দিন কাটিয়ে দিলাম, দু’জনের হুঁটি ঘর।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ :—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

## ফড়িঙ ও বিঁঝি

(কৌটু থেকে)

এই জগতের কাব্য কতু ধ্বংস হবার নয় ;  
সকল পাখী মুবড়ে বখন থাকে তপন-তাপে,  
গাছের ছায়ায় লুকায় হবে একটা গুমোট তাপে,  
লতার বেড়ায় বাস-ছাটানো মাঠে ফড়িঙ-চর  
গ্রীষ্মকালের বাড়ায় শোভা গেয়ে সুনিশ্চয়।  
আমোদ কতু মিটেবে না তার, শাস্ত হ’লে বাপে  
খুব আরামে ভঙলীগাছের সুলক্ষর ঝোপ-ঝাপে ;  
(এমনি ক’রে জগৎ সে যে করছে মধুময়।)  
এই জগতের কাব্য কতু ক্ষান্ত হবে না যে !  
শীতের বিজন সন্ধ্যাবেলা শান্ত নীরব ধরা,  
বিঁঝি তখন গরম ঠাইয়েব আঙতাতে গান গায়।  
আম্বভোলা মানুষ তখন ঘুমের অন্ধকারে,  
ভাববে, ফড়িঙ গাইছে বুঝি এমন আকুল-করা !  
গাইছে বুঝি অদূরে কোন উচ্চ পাহাড়-চূড়ায়।  
অনুবাদ : শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।



[পূর্ব-প্রকাশিতঃ পৃষ্ঠা ২০]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কিন্তু তাই বাইরে থেকে এসে বসে নেমেছে।

বাড়িতে এসে একটি চূপ-চাপ, কোনো কাজ নেই, বাড়ির মোড়ে ঘেঁষে ঘেঁষে ঘুরে। পথে লোক-চলাচল নেই। ছোট্ট ট্যাঙ্কি কি কিছুর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বেলিডা বাড়িতে পানির বাড়িতে। আর শোনা যাচ্ছে মেয়েদের আশ্রয় কলকোলাহল।

তেমনি এক বুড়ির দিন শুণ্ডবোলা হঠাৎ বেশি, একটি ট্যাঙ্কি এসে থামলো বাড়ির সামনে।

মিনিট দুটো পরে চোখের সামনে আবির্ভূত হলো 'দিলীপদা'। বললো, "কতটা টাকা আছে তোমার কাছে? ট্যাঙ্কির ড্রাইভার মিটিয়ে দিও।"

আমি লবাক হয়ে তাকালুম দিলীপের দিকে। সে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো, "মনে ছিলো না যে পকেটে টাকা নেই। ব্যস্তিতে ভুলে যেতাম তোলা। ভাবলাম কোথায় বাই। তোমার বাড়িটা পথে পড়লো এখনেই এসে নামলাম।"

চাকরের নাম দিয়ে নীচটা নিচে নামিয়ে দিলাম। ট্যাঙ্কি চলে গেল।

"আজ বেয়োস মি?" দিলীপ বিজ্ঞেস করলো।

"এই বুড়িতে কোথায় বেরো?"

"আমি কিন্তু এমন বুড়িতে বাড়িতে এসে বাস করে পানি না।" দিলীপ উত্তর দিলো।

আমি চূপ করে বইলাম। দিলীপ একটি অশ্রুতে কলকো আমার কিছু বসাব, চূপ করে আহি দেখে একটি পকেট জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় গিয়েছিলান জানিস?"

আমি চোপ ভুলে তাকালুম।

"বেবা জৌড়ির হাট্টলে।"

"ওরা দেখা করতে দিলো বেবার সঙ্গে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভিত্তিটার লিষ্ট নাম না থাকলে তো দেখা করতে দেয় না।"

"সে প্রশ্ন ভুলনি, কারণ, সে হাট্টলে ছিল না।"

"ও"—বলে আমি মনে মনে একটি সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

দিলীপ বোধ হয় বুঝলো। হাসলো একটুখানি। বললো, "বেবাকে হাট্টলে না পেয়ে আমি গেলুম সুবিমল ভট্টাচার্য বাড়ি। সেখানেই বেবার সঙ্গে দেখা হলো। এতক্ষণ ওদের

ওখানেই আড্ডা দিচ্ছিলুম। খেলামও সেখানেই। মলিকা বাসা রান্না বসে।"

আমার যুগে কি তা' ফুটে উঠেছিলো না জানি! দিলীপ আমার কথায় তাকালো আমার দিকে। তার পর আস্তে আস্তে বললো, "তোমার অতো ভাবনা কিদের? তোমার উদ্ভাসিত প্রশংসা করে হেসেছি সেখানে। সুবিমল, বেবা মলিক, সবাইকেই বুঝিয়ে এসেছি তোমার মতো ছেলে আর হয় না।"

আমি শুধু কোনো উত্তর দিলাম না। দিলীপই বোধ হয় এবার একটি অসোয়াস্তি বোধ করলো। আস্তে আস্তে বললো, "তুমি বোধ হয় জানিস না, কেন আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম?"

আমি চোপ ভুলে তাকালুম।

দিলীপ বলে গেল, "আজ দু'দিনের দিন ধরে শুধু ভাবছি কি করে এক জনকে ভোলা যায়। চেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে হৈ-চৈ করে কিছুই হোলো না। তার কথা বার বার আবার বোঁ করে মনে পড়লো। অতেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটিতে গিয়ে দেখি, তাদের সঙ্গে মদ্য মনে হচ্ছেই, আর মনে হচ্ছে যেন এ ভাবে মন চেয়ে বোঁ অপমান করছি তাকে, যাকে চোঁ করছি ভুলে যাওয়ায়। সুতরাং এখন মনে হচ্ছে, এমন একজন সামান্য চেনা কারো সঙ্গে একটি বোঁ চেনা করে নেওয়ার চোঁ করা যাক, যাকে অনেক চোঁ করে ও আমার কাছে অসামান্য করে তোলা যাবে না। কারণ, সে আরেক জনের কাছে এই মধ্যে অসামান্য হয়ে আছে,— একটি ভাবতেই তোমার কথা মনে পড়লো, বেবার কথা মনে পড়লো, সুতরাং বেবা' বোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।"

কী আবোল-তাবোল বকছে দিলীপদা! জিজ্ঞেস করলাম, "কি লাভ হবে এতে?"

"বিশেষ কিছুই না, দিলীপদা" উত্তর দিলো, "শুধু একটি সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ।"

"মানে?"

"বেবা কাল আমায় একটি সিনেমা দেখাচ্ছে।"

"ও, তা'হলে," আমি বললাম, "তুমি, সুবিমল, মলিকা, বেবা সবাই মিলে কাল সিনেমার যাচ্ছে?"

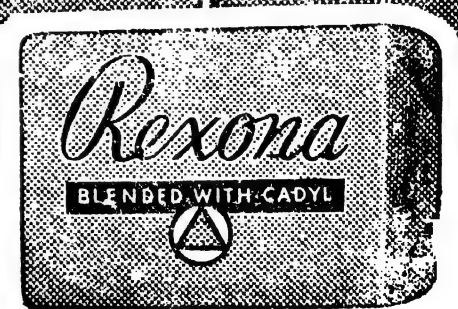
ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেঙ্সোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেঙ্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের  
জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

“সুবিমল আর মল্লিকা বাচ্ছে না,” দিলীপ স্নান হাসি হাসলো, “তুখু আমি আর বেবা বাচ্ছি।”

বাইরে বসবস করে আরেক পশলা বৃষ্টি নামলো। দমকা হাওয়া জানলাদরজায় বা দিয়ে গেল, তোলপাড় করে তুললো জানলার পর্দা, সামনের টেবিলে একটি বইয়ের পাতাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো, আর এলোমেলো হয়ে গেল দিলীপদা’র মাথার চুলগুলো। সামনের বাড়ির ছাতের ওপারে কালো কালো মেঘ ছড়ছড় করে উঠলো।

“বেশ তো, দেখে এসো,” আমি হেসে বললাম, “বেবাকে তো চেনো না, ওর পাশে বসে সিনেমা দেখার মতো যন্ত্রণা আর নেই। প্রত্যেকটি কথা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রত্যেকটি ঘটনা কেন হোলো, কি ভাবে হোলো, তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে, ও হেসে উঠলে কানে আঙুল চাপা দিতে হবে, ও চোখের জল ফেলতে শুরু করলে নিজের ক্রমাল এগিয়ে দিতে হবে। একদিন ঘুরে এসো ওর সঙ্গে। আর যেতে চাইবে না।”

দিলীপ একটু স্নান হেসে চুপ করে রইলো। তারপর বলল, “সে-ও ভালো। একদিন বাবো, দু’দিন বাবো, তিন দিনের দিন আর যেতে চাইবো না, মনেও কোনো আক্ষেপ থাকবে না। অনেক দিন আগে একবার একজনের সঙ্গে যে বসবস হয়েছিলো সে বসবসটি না হলেই হোলো।”

হঠাৎ যেন মনে হোলো দিলীপদা’র উপর অভিযোগ করছি এত কক্ষ হয়ে। খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, “কার কথা বলছো? জেনী ওয়াড?”

দিলীপ চুপ করে রইলো।

মস্তুর হয়ে এলো বাইরের বৃষ্টি। নিস্তেজ হয়ে এলো বাবলো হাওয়া। বাবান্দার অকিডের পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে টুপ-টুপ করে।

“আচ্ছা, দিলীপদা’, তুমি আমার কাছে ওদের অনেকের গল্পই করেছো, কিন্তু জেনীর গল্প করো নি কোনো দিন,” আমি বললাম।

তখনো চুপ করে রইলো দিলীপদা’।

তারপর আবার যখন ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হোলো আরেক পশলা আর গুরু-গুরু মেঘ ডেকে উঠলো আবার, দিলীপ বললো আন্তে আন্তে, “আজ জেনীর গল্প করার মতোই দিন। শোন তা হলে। কিন্তু তার আগে চা চাই। হইন্ডি হলে আরো ভালো হোতো, কিন্তু তোদের সব মধ্যবিত্ত ব্যাপার, ওসব তোলে থাকিস না। এই বাঙালী জাতটার যে কবে উন্নতি হবে কে জানে! বাক, চাই সই। দু’ কাপ চা দিতে বলে দে’। আর কাউকে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দে’। খুচরো নেই তোর কাছে? কেন, ওই, ট্যান্সির ভাড়া দিতে পাঁচটা টাকা দিলি তোর চাকরকে? ডাক তাকে, ডেকে তিন চার প্যাকেট গোল্ডস্মোক এনে দিতে বলে দে’। তোদের এসব মধ্যবিত্ত পাড়ার পানওয়ালাদের কাছে তো টিন পাওয়া বাবে না।”

দু’ কাপ চা এলো। তার পর তিন প্যাকেট গোল্ডস্মোকও এলো।

বাইরে ঝির-ঝির বৃষ্টি—কিন্তু বাবলো হাওয়ার সে বসবস দাপট

আর নেই। এ বাড়ি ও বাড়ির জানলার জানলার কি বসবস যেন একটু করুণ তার সাড়া।

রিকশ ঝুং-ঝুং করে গেল বাস্তা দিয়ে। স্তিমিত হয়ে এলো পাশের বাড়ির রেডিও। ও-বাড়ির মেয়েদের হাসির সাড়াও আর পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আড্ডা সেরে এবার হেসেলে গিয়ে চুকেছে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দিলীপ একটি সিগারেট ধরালো। জিজ্ঞেস করলো, “জেনি?”

আমি চুপচাপ একটি সিগারেট ধরলাম।

“বেবার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করিস নি তো?” দিলীপ ঘোঁড়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো।

উত্তরে একটু হেসে আমিও একমুগ ঘোঁড়া ছাড়লাম।

দিলীপ চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর বললো, “আচ্ছা, শোন তা’হলে। আজ না বললে হয় তো আর কোনো দিন বলা হয়ে উঠবে না।”

আহ-কিম্-এর লিগু বেল্টিক ষ্ট্রীটের এক পাশে। ছোটো সাজানো-গুছানো দোকান, কাউন্টারের পেছনে কাচের আলমারিতে নানারকম স্টেগাউন টাঙানো। কাউন্টারের পেছনে একটি চীনে মেয়ে বসে।

একটি ময়লা গরম স্টুট বগলে নিয়ে একদিন সেখানে উঠে এলো দিলীপ। স্টুট ডাই ক্রীল করতে দিলো, দর নিয়ে নিখল তর্ক করলো, রসিদ নিজের নাম-ঠিকানা সই করলো, তারপর রসিদ নিয়ে চলে গেল।

কিছু দিন পর গিয়ে সেই স্টুট ফেরত নিয়ে এলো। তারপর একদিন একটি সিকের হাওয়াইআন শাট ধুতে দিলো। পরের বার নিয়ে গেল একটি রেয়নের স্টুট।

সেই দিনে, রসিদ নিয়ে, ঘটনাক্রমে এখানে সেখানে কাটিয়ে হঠাৎ খেয়াল হোলো যে তার সিগারেট-লাইটারটি ভুলে সেই স্টুটের পকেটে রয়ে গেছে। দামী লাইটার। একজনের কাছে উপহার পাওয়া।

তাই তৎক্ষণি ছুটলো সেই লগুতে, যদি স্টুটটা এখনো কারখানায় চলে গিয়ে না থাকে, তা’ হলে লাইটারটি ফেরত পাবে, এই প্রত্যাশায়।

রুকেই সেই চীনে মেয়েটি তাকে দেখে একটু হাসলো। সেইটুকু হাসিতেই বুঁজে এলো তার চোখ দু’টো।

দিলীপ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে লাইটারটি বার করে দিলো।

সে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে বেরিয়ে এলো। প্যাকেট বার করে একটি সিগারেট ঠোঁটের কোণে সন্নিবিষ্ট করলো। তারপর লাইটারটি ধরালো।

চকমকি থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে সলতেটি ধরে উঠতেই দিলীপ একটু অবাক হয়ে আগুনের শিখার দিকে তাকালো। কী যেন ভাবলো। তারপর চলে গেল।

দিন পাঁচছয় পরে দিলীপ লগুতে ফিরে এলো তার রেয়নের স্টুট ডেলিভারি নিতে কিন্তু রসিদ ফিরিয়ে স্টুট ডেলিভারি নিয়েই সে চলে গেল না। পাড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো।



“ইয়েস, এনিথিং এলস্,” জিজ্ঞেস করলো সেই মেয়েটি।

“হ্যাঁ, বলছি,” দিলীপ বললো, “আমি যখন লাইটাবটি কোর্টের পকেটে রেখেছিলাম তখন তা’তে তেল ছিলো না। যখন আমি লাইটাবটি তোমার কাছে থেকে পেলাম তখন দেখি, ওটাতে তেল ভরে দেওয়া হয়েছে।”

মেয়েটি একটু হাসলো। হেসে বললো, “তা’তে কি হয়েছে?”

“বিশেষ কিছু না,” দিলীপ উত্তর দিলো, “শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে জিনিসটা ঝলে না, তোমার কাজ কি সেটি ঝলবার ব্যবস্থা করে দেওয়া?”

মেয়েটি হেসে ফেললো। আনমনেই কি রকম বেন নিচু হয়ে গেল তার মাথা। আশ্বে আশ্বে উত্তর দিলো, “কি আমার কাজ সেটা আজো ঠিক জানি না। তবে কি আমার কাজ নয় সেটা বলতে পারি।”

“বেশ, তাই বলা, শুনি,” দিলীপ বললো।

“লগ্নিতে কাজ করা আমার পেশা নয়,” মেয়েটি উত্তর দিলো, “আমি চোরগির একটি দোকানে সেলস্-এসিস্ট্যান্ট ছিলাম। এই দোকানে কাজ করে আমার বোন। ওর এখন অসুখ। আর আমারও হাতে কাজ নেই। তাই যে ক’দিন সে আসতে না পারে সেই কদিন আমি এখানে বসছি।”

“দোকানের মালিককে যে দেখিনি একদিনও?”

“এ সময়টা সে থাকে না।”

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, “তোমার বন্ধুরা তোমায় কি বলে ডাকে?”

“জেনী,” মেয়েটি হাসলো, “আমার নাম জেনী ওয়াড।”

“তোমার বোন সেরে উঠতে আর ক’দিন বাকী?”

জেনী তার নরম চোখ দুটো রাখলো দিলীপের চোখের উপর। আশ্বে আশ্বে বললো, “আমার মালিকের আসবার সময় হয়েছে।”

“তাই নাকি? আচ্ছা, বাই বাই,” বলে দিলীপ কেটে পড়লো।

দিন কয়েক পর দিলীপ আবার গিয়ে উপস্থিত হোলো—এবার তার নিজের স্টু নিয়ে নয়। কারণ, অতো স্টু তার ছিলো না। এবার সে নিয়ে গেল তার এক বন্ধুর স্টু।

জেনী রসিক লিখতে লিখতে হেসে ফেললো। বললো, “এভাবে নিজের পরসায় পরের স্টু কাটিয়ে দিতে সুরু করলে দু’দিনে দেউলে হয়ে যাবে। পয়সা যদি ওড়াতেই চাও তো অনেক রাস্তা আছে।”

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, “ওটা যে আমার স্টু নয় তুমি কি কবে জানলে?”

“আমার এক জোড়া চোপ আছে মিষ্টার,” উত্তর দিলো মেয়েটি।

“আমার বন্ধুরা আমায় দিলীপ বলে ডাকে,” দিলীপ বললো।

লগ্নি গাল’স তাদের কাঠমারদের দিলীপ বলে ডাকে না।”

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, “তোমার বোন এখানে বসতে আরম্ভ করবে কবে থেকে?”

“কাল থেকে,” হেসে উত্তর দিলো মেয়েটি, “আজ এখানে আমার শেষ দিন।”

“জাট্‌স্ ফাইন, তুমি অফ-ডিউটি কখন থেকে?”

“টার্টে থেকে। তখন মালিক নিজেকে এসে বসবে।”

“ফাইন। শোনো,” দিলীপ বললো, “দেখ, আজকে ছ’টার শোভে

আমি লাইট হাউসের দুটো টিকিট করেছি। একটি আমার কাছে আছে। আরেকটি আমি ভুল করে ওই কোর্টের পকেটে রেখেছি।”

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কি আশা করো? পরের সপ্তায় যখন স্টুটা নিতে আসবে তখন টিকিটখানি ফিরিয়ে দেবো?”

“না,” দিলীপ উত্তর দিলো, “আমি আশা করি লগ্নি গাল’ তার অস্থায়ী চাকরির শেষ দিন কাঠমারের জিনিস ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেই ব্যবহার করবে।” বলে দিলীপ আর উত্তরের জন্যে দাঁড়ালো না।

গট গট করে হেটে বেরিয়ে হলো লগ্নি থেকে। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। সোজা চলে গেল তার নিজের কাজে।

সন্ধ্যার পর লাইট হাউসে ঢুক দিলীপ দেখে, ঠিক পাশের সীটে বসে আছে জেনী ওয়াড।

সে দিন সিনেমায় দিলীপের পাশে বসে এটা-কি ওটা-কি জিজ্ঞেস করলো না, ঘটনা ও সংলাপ বুঝিয়ে দিতে বললো না, হল ফাটিয়ে হাসলো না বা নাহক-নাহিকার হুং মেখে চোখে ক্রমাল চাপা দিলো না রেবা চৌধুরির মতো। শুধু চুপচাপ বসে সিনেমা দেখলো।

সিনেমা শেষ হতে জেনীদের পেলে দিলীপেরা বা বলে, দিলীপ তাই বললো। বললো, “চলো কোথাও বসে খেয়ে নিই।”

জেনী সেদিন রাজী হোলো না। বললো, “আজ নয় আরেক দিন।”

“এর পর দেখা হবে কোথায়?” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী বললো, “পরশ্ব তিনটের সময় এখানেই। সেদিন সিনেমা আমি দেখাবো।”

জেনীকে ট্রামে ভুলে দেওয়ার আগে শুধু একবার দিলীপ বললো, “জেনী, এখন তুমি লগ্নি গাল’ মণ্ড, আমিও কাঠমার নই, স্মরণ্য এখন থেকে আমায় দিলীপ বলে ডাকতে পারো।”

“আচ্ছা,” বলে হেসে জেনী ট্রামে উঠে পড়লো।

দিন দুয়েক পর আবার জেনীর সঙ্গে সিনেমায় দেখা হোলো। জেনী সে দিন কিছু বললে না।

তিন-চার দিন পর দিলীপ আবার গেল সেই লগ্নিতে। বোধ হয় ভেবেছিলেন এবার জেনীর বোনকে একবার দেখবে। কিন্তু গিয়ে দেখলো, কাউন্টারের পেছনে জেনীই বসে আছে।

কি ব্যাপার?

না, লগ্নির মাসিক আহ-কিম জেনীর বোন মিনিকে বলেছে,— তোমার শরীর এখনো ঠিক সেরে ওঠেনি, তুমি এক মাস বিশ্রাম নাও। মাইনেও পুরোই পাবে। আর জেনীর হাতেও তো চাকরি নেই। এই এক মাস সেও কাজ করুক এখানে। তারপর দেখা যাবে।

“খুব উদার মালিক দেখছি,” দিলীপ বললো।

“হ্যাঁ, ও আমায় খুব ভালোবাসে।” জেনী হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

“তাই নাকি,” বলে দিলীপ চোখ তুলে জেনীর দিকে তাকালো।

বোধ হয় ক্যাশে পাও হয়ে গিয়েছিলো দিলীপের মুখ, তাই জেনী মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলো।

দিলীপ একটু তাকিয়ে দেখলো জেনীকে, তারপর কোনো কথা না বলে পেতন ফিরে দরজার দিকে হেঁটে চললো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা পড়তেই জেনীর ডাক শুনলো পেছন থেকে, “যেও না দিলীপ, শোনো।”

“কি,” দিলীপ মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

“এখানে এসো।”

দিলীপ ফিরে গেল কাউন্টারের কাছে।

“আহ-কিম আমার কেন ভালোবাসে সেটা শুনে যাও,” জেনী বললো।

“কেন কি হবে?” শুকনো গলায় দিলীপ বললো।

“শোনোই না। আহ-কিমের সঙ্গে আমার বোন মিনির বিয়ে হবে। আমি মিনির দিদি! তাই আহ-কিম আমাকেও ভালোবাসে। কেনন ভালো আহ-কিম—তাই না,” বলে জেনী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

হঠাৎ জেনী লক্ষ্য করলো যে, দিলীপ তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে খেয়াল হলো যে তার চোখ দু’টি ঝাপসা।

জেনী মুখ নিচু করলো তাড়াতাড়ি।

দিলীপ আস্তে আস্তে বললো, “জেনী, তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছি।”

“আজ নয় দিলীপ! আজ কোনো একদিন—”

“না, এক্ষুণি।”

“এখানে নয় দিলীপ! এটা দোকান। আজ কোথাও—”

“না, এখানেই।”

“মালিক এখনই এসে পড়বে দিলীপ!”

“মালিক তো আহ-কিম? সে যে মেয়েকে বিয়ে করবে, সেই মেয়ের দিদিকে তার দোকানের কাষ্টমার কি বলবে না! বলবে ইজ নান্ অফ হিজ বিজনেস্।”

“ওর কাষ্টমারেরা যদি দোকানের ভিতর এরকম পাগলামি করতে শুরু করে তাহলে দু’দিনেই ব্যবসা উঠে যাবে।”

“ও যাকে বিয়ে করছে তার যদি ততগুলো দিদি থাকে যতোগুলো কাষ্টমার আছে—তার দোকানের তাহলে দু’দিনে হু-হু করে ব্যবসা কেঁপে যাবে।”

“তুমি ব্যবসার কি বোঝো দিলীপ! এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবসা ঠাঁড় করতে পারলে না।”

“এবার আমার চার মাস সময় দাও জেনী! দেখবে, কি রকম ঠাঁড়িয়ে গেছে আমার ব্যবসা।”

“চার মাস কেন?”

“চারটা আমার লাকি নম্বর।”

“আমার লাকি নম্বর বিস্ত পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ।”

“দেখ, জেনী, এসব আজ-বাজে কথা বলে আমার আসল বক্তব্য থেকে তুমি আমার বিচ্যুত করছো।”

“বেশ তো, কি বলছিলে বলো।”

তখন দিলীপ একটু ভাবলো। ভেবে মুখ লাল করে একটা যান্ত্রিকত খবর জানালো। তারপর পাঁচটা প্রাণ করলো জেনীকে। জেনীও একটু কান লাল করে উত্তর দিলো—হ্যাঁ! তারপর দিলীপ একটা সজ্ঞা ঘোষণা করলো।

জেনী আস্তে আস্তে বললো, “সেটা এখন নয়। আরো কিছুদিন বাক। তোমার বোজগার বাড়ুক। আমিও একটা চাকরি খুঁজে-পেতে নিই।”

“তখন হবে তো,” খুব উৎকুল হয়ে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী ঘাড় নাড়লো হাসিমুখে। দিলীপ খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। সন্ধ্যাগুলো জেনীর সঙ্গে কাটাতে কাটাতে কলকাতাকে স্বর্গ মনে হোলো দিলীপের।

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, “জানো, আমার মা ইংরেজ।”

“উনি কি মারা গেছেন?” জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

“কেন বলো তো?” দিলীপ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো জেনীর দিকে।

“তোমার দেখে মনে হয়,” জেনী উত্তর দিয়েছিলো, “তোমার মা নেই। তবে আমার ভুলও হতে পারে।”

দিলীপ একটু চুপ করে থেকে বলেছিলো, “না, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মা নেই।”

“উনি যখন মারা যান তুমি খুব ছোটো ছিলে বৃদ্ধি?” দিলীপের পিঠে হাত রেখে জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

“উনি মারা যান নি। বেঁচেই আছেন।”

“তা’হলে?” অবাক হয়েছিলো জেনী।

“আমি যখন বেশ ছোটো, তখন উনি বাবাকে ছেড়ে চলে যান। বাবা আর বিয়ে করেন নি। আমি আবার হাতে মাহুস হয়েছি।”

জেনী সেদিন আর কিছু বলতে পারেনি, শুধু চোখ ছলছলিয়ে দিলীপের হাতখানি চেপে রেখেছিলো নিজের নরম মুঠোর মধ্যে। আর সে দিনই যতোটুকু দিবা ছিলো জেনী ওয়াশের মধ্যে, সবটুকুই কেটে গেল। হোক না ওরা দু’জনে দুটো আলাদা জাত—দিলীপের গো জেনীকে দরকার তার জীবনে। সুতরাং কী আস-যায়!

জেনী খবরটা প্রথম ভাগলো তার বোন মিনির কাছে। মিনি অনেকক্ষণ জেনীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, “দেখ, সে বিদেশী। যা করবে খুব ভেবে-চিন্তে করবে।”

“আমি বা স্থির করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তেই স্থির করেছি,” জেনী উত্তর দিলো।

ওরা কথা বলে কম, তর্ক করে না, যা বলবার দু’চার কথায় বলে, যা বুঝবার দু’চার কথায় বুঝে নেয়।

মিনি বুঝে নিলো, জেনী দিলীপকে ভালোবাসে, এবং তাবেই বিশ্বাস করবে। এর আর এদিক-ওদিক হবার নয়।

তখন মিনি তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে বললো, “তুমি যদি স্ত্রী হও, আমিও খুব স্ত্রী হবো।”

তারপর বললো, “জানো, আহ-কিমকে যখন বিয়ে করবো স্থির করলাম, তখন তোমার কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। এর মধ্যে আমারও বিশ্বাস ঠিক হয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে লাগলো না কোনো ছেলেকে। আমি আহ-কিমের বাড়ি চলে গেলে তুমি একা থাকবে কি করে? অনেক রাত্তিরে তোমার কথু হের কেঁদেছি, তবে লজ্জায় তোমার বলিনি। আজ যে আমার কী ভালো লাগছে, সে বলে বোঝাতে পারবো না।”

শুনেন জেনী একটু হাসলো।

তারপর মিনি জিজ্ঞেস করলো, “বুড়ো ক’টা গুনলেও কিছু মনে করবে না।” স্নং-চাং না হয় মাথা ঘামাবে না, কিন্তু চিয়েন-চাং?”

চিয়েন-চাংকে নিয়ে একটু অন্তর্বিণে ছিলো।

বুড়ো ওয়াঙ ভীতনে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে, যে কোনো কিছুই অত্যন্ত সহজ ভাবে নেওয়াই তার অভ্যাস।

শুনেন বললে, “এ আর নতুন কথা কি? আমাদের দেশে কতো ক্ষাভ এসেছে, আমাদের মধ্যে বিয়ে করে আমাদের মধ্যে মিশে গেছে। এমন কি ওই উলুদীরা, যারা অতীত দেশে নিজেদের পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে, আমাদের বেশে তাদেরও আমরা হজম করে ফেলেছি। এখানেও তাই হয়েছে, কতো কিনটাল মিশে গেছে আমাদের মধ্যে, আমাদের মেয়েরা চলে গেছে ফিরিস্কীদের মধ্যে। আস্তে আস্তে বাঙালীদের মধ্যেও যাবে। যে দেশে যা, তাই হয়ে থাকতে হবে বই কি। বাঙালীর যদি তেমন যুরোধ থাকে হজম করে ফেলুক আমাদের, যদি নিজেদের উপর বিশ্বাস না থাকে, আসাশা সম্প্রদায় হয়ে থাকুক। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।”

জেনী সেদিন খুশি হয়ে বাপকে একটি নতুন বাগা বেঁধে বাঁধ্যালো।

জেনীর ভাই স্নং-চাংও এমন কিছু বিরপত্তা প্রকাশ করলো না। যদিও তার মনের প্রসার বুড়ো ওয়াঙের মতো নয়, তবু ঠিক সেই সময় সে প্রেম করছিলো এক ফিরিস্কী ললনার সঙ্গে। স্তব্ধতা বিয়ের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার দোষ বিরোধী। অন্তত নীতিগত ভাবে।—কারণ জেনী ওয়াঙের পছন্দ করা ছেলেটি বাঙালী শুনে তার ভালো লাগেনি। বললে,—কী এসব বাঙালীরা, বড় বৌ ক’টা বলে, সবথেকে ছেলে বাগা করে, তরকারীতে মিশ্রি দেয়, ইত্যাদি।

কিন্তু যখন শুনলে দিলীপের মা ইংরেজ, তখন সে আর আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না। বাই হোক, দিলীপ হাফ-ইংরেজ তো—যেমন হাফ-ইংরেজ স্নং-চাংএর প্রণয়িনী বোম্বী।

বোম্বীর ঝং ময়লা, তবু তার পূর্ণশুরু ইংরেজ, সে নাচতে জানে, ভালো ইংরেজি বলতে জানে। কোথায় লাগে তার কাছে চায়না টাউনের মধ্যবিত্ত চীনে মেয়েরা, যারা শুধু কাঠের খড়ম পরে খুট খুট করে চলতে জানে, গালাগাল দিয়ে ঝগড়া করতে জানে, যাদের গায়ে বাগাঘরের গন্ধ। হ্যাঁ, দু-চারজন বাগ বটে কনভেণ্টে, এবং ওরা অতীত চীনে মেয়েদের চাইতে একটু বেশী স্মার্ট, কিন্তু এগুলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে লাগে না। ইদানীং কেউ তো কনভেণ্টেও মেয়ে পাঠাতে চাইছে না। চীনেদের নিজেদের স্বপ্ন হয়েছে। ছেলেরা মেয়েরা সবাই আজ-কাল সেখানে যায়। সবই শেখে, শুধু যেটুকু থাকলে ফিরিস্কী মেয়েদের মতো আকর্ষণময় হয়ে ওঠা যায়, সেটুকু শেখে না।

স্তব্ধতা বুড়ো ওয়াঙ তার বিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। সে কিয়টো তাকায়নি নিজেদের সমাজের মেয়েদের দিকে। তার বন্ধুবান্ধব বান্ধবী সবই ফিরিস্কী, নয় উলুদী নয় আম’নী আর কিছু ফিরিস্কী বনে বাওয়া ভারতীয়। স্নং-চাংএর পোষকের ছোট সাম্প্রতিকতম আমেরিকান—প্যাট কোমরের অনেক নিচে, সফ্র খুঁটা গোড়ালি থেকে আট ইঞ্চি উপরে। কোটে একটি

মোটো বোতাম, কাঁধ অতিকায় রকম চওড়া, কোমর অত্যন্ত চোলা। চুলের সাধনেটা এ্যালবাট। পায়ে রংগার মোজা, গলার খমকালো টাই, মুখে কাণ্ড-বয় ইংরেজি।

স্তব্ধতা দিলীপের খমনীতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজ-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে জেনে সে চট করে দিলীপকে পছন্দ করে বসলো। বললো, “একদিন এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। সে আমাদের ডিনার ষ্ট্যাণ্ড করুক, হুইস্কি ষ্ট্যাণ্ড করুক, তার পর দেখা যাবে তাকে আমরা পছন্দ করি কি করি না।”

এত সহজে সে মিনি ওয়াঙের ভাবী স্বামী আত-কিমকেও অনুমোদন করেনি। কারণ আত-কিমের ইংরেজি খুব পরিষ্কার নয়, সে স্বামা-কাপড়ে খুব কেতাহরস্ত নয়, তার চেহারা খুব স্মার্ট নয়, সে একজন সাধারণ দোকানদার—আর তার দাদা বেটিক স্ট্রীটের একজন সাধারণ জুতোওয়ালা, সে নিজের হাতে কাষ্টমারদের পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়, যে দোকানের ভিতর হাফপ্যাট আর গেজি গায়ে দিয়ে বসে থাকে। তার বৌদিকে তো দেখা গেছে, বছর বছর পুত্র সন্তান প্রসব করতে আর বাগাঘরে বসে শূণ্যের চর্বিতে তরকারি রাখতে।

বুড়ো বাবা না। বললে চটে গিয়ে বলে, এদের কথা শোনো, পুত্র সন্তান মেয়েরা প্রসব করবে না তো কে করবে? বছর বছর না করবে তো শতাব্দীতে একটি করে করবে? আমাদের মায়েগা করেনি? আমাদের ঠাকুরমায়েগা করেনি? ওরা কি আমাদের চাইতে কোনো অংশে খারাপ ছিলো?

স্তব্ধতা মিনির বর হিসেবে আত-কিমকে বুড়ো ওয়াঙ আর অতীত আতীত-রক্তনের পছন্দ করে ফেললেও স্নং-চাং কোনো দিন তাকে অনুমোদন করতে পারেনি।

বয়ং এবার যখন দেখলো, জেনী ওয়াঙ এমন একজনকে পছন্দ করেছে যার শরীরে আছে ইংরেজ-রক্ত, তখন জেনীকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান মনে হলো মিনির চাইতে।

স্নং-চাং সোজাসজি বললে, “হুইস্কি জল মিশিয়েই খাও, আর সোডা মিশিয়েই খাও, হুইস্কি সে ভাইস্কি।”

কিন্তু বুড়ো ভাই চিয়েন-চাং চুপ করে বসলো।

“তুমি কিছু বলছো না যে দাট-কো,” মিনি জিজ্ঞেস করলো।

জানলার আলপেতে পাইপ খুট-খুট করে ছাইটা কেড়ে ফেলে তন্দ্রাস উত্তর দিলো চিয়েন চাং, “ইণ্ডিয়ান, এঃ? তা মন্দ নয়, তবে ইণ্ডিয়ানদের চেনো না। তার রক্তে ইংরেজ-রক্তই থাক আর জাপানী রক্তই থাক ইণ্ডিয়ানরা চিরকালই ইণ্ডিয়ান।—তবে শুধু ইণ্ডিয়ান বলেই আমি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না, যেহেতু, এরা প্রায় আমাদের মতো সভ্যজাত, শুধু আমাদের মতো বাগা জানে না।—আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের মধ্যেই যখন ভালো ছেলে আছে, তখন আর এই অচেনা ইণ্ডিয়ানকে কেন?”

“আমাদের মধ্যেই ভালো ছেলে? তুমি কার কথা বলছো?” জিজ্ঞেস করলো বুড়ো ওয়াঙ।

“কেন? কেং চেং-শিঃ? সে কি বোগ্য নয়?” বললো চিয়েন-চাং।

[ক্রমশঃ।



পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৯

মড়াইয়ের কাজে এখন পর্যন্ত বিয় ঘটনি কোথাও।

সেমন এসছিল তেমনি চলেছে। ঘোষ-চাকলাদারাই এখনকার একমাত্র কন্সট্রাক্টর নয়। ছোটবড় আরো আছে, ছোটবড় কাজ নিয়ে আছে। একজনের বিপর্যয়ে আর একজনের শ্রমদিনের সম্ভাবনা। 'তব প্রতিকূল আঘর্ষের ছায়া পড়ে একটা'। অনাগত উৎকর্ষাব মত কিছু একটা হুযোগ যেন থিতুয়ে আছে। শুরু থেকেই ঘোষ-চাকলাদারকে সকলে স্বতন্ত্র চোখে দেখে এসেছে বলেই হয়ত এরকম লাগছে।

বাগা বা নরেন বাবুর দৃষ্টিভঙ্গি দেখে সাহুনা মুখে যাই বলুক, মেজাজ ঠাণ্ডা হতে ভিতরে ভিতরে একটু দমে গেল সেও। যাই হোক না কেন সূচনা শুভ নয় তো বটেই।

অনধিত এক জীবনের অধ্যায়ও তার পর শুনল একদিন। নরেনই বলেছে। যেভাবে বলে সচরাচর সেভাবে নয়। একজনের শোনার দরদ তারও ভেতরটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সেদিন। সাহুনা তুম্ব হয়ে শুনেছে।

শেষ হতে নরেন নিজেই যেন থমকে গেল একটু। সারাক্ষণ সাহুনা ওরই দিকে চেয়েছিল বটে, ওরই কথা শুনছিল। কিন্তু তার কথার বুনটে দেখছিল যাকে সে অস্ত্র মাহুয। দেখছিল, চিম ইঞ্জিনিয়ারের খোলস থেকে যাকে উল্ঘাটন করে দেখাল, তাকে। হালকা হেসে নরেন বলল, কি হল, কেঁদে টেদে ফেলবে না কি?

নিজের স্তব্ধতায় নিজেই একটু লজ্জা পেল সাহুনা। বলল, না, বড় দুঃখের জীবন তো ভয়ালোকের।

—তুংগের বলেই তো এমন একটা নিখুঁত জিনিস গড়ে উঠছে, নরেন ঠাটা করল আবারও, ওর ভেতরটা যত বলবে, লোকে ততো বেশি আলোর আশ্বাস পাবে, মল কি?

—হান, আপনি ভারী নিষ্ঠুর।

অন্তমমন্থের মত নরেন ভাবল কি। পরে বলল, নিষ্ঠুর নয়, ওর জীবন থেকে নীলা গেছে ভালই হয়েছে কিন্তু একেবারে গেছে কি না ভেবেই ভয় হয় মাঝে মাঝে।

সাহুনার জিজ্ঞাসা চোপে চোপে রেখে বাকিটুকুও না বলে পারল না।—মাহুযটাকে যত শক্ত দেখো ততো শক্ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই

মেয়ে সামনাসামনি এলে আবারও পারে ওর জীবনের সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, ওর এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু তচনচ করে ফেলতে।

শোনা যাত্র মুখভাব, বদলাতে লাগল, সাহুনার। একজন গেলেও সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে না সে কথা মনে হল না। ওলটপালট হয়ে যাওয়া এবং নিষ্ঠায় ছেদ পড়ার সঙ্গে ডায়ের কাজে ব্যাঘাত ঘটান সম্ভাবনাটা এক করে দেখল কি না সেই জানে। মেয়েটার আবার সামনাসামনি আসার প্রসঙ্গ কল্পনা করে সমস্ত মুখে কঠিন ছায়া পড়ল একটা।

রথবীর ঘোষের ব্যাপারটা স্বগিত আছে এখনও। কতকাল থাকবে তারও ঠিক নেই। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসেনি এখনো কিছু। কেন আসেনি তাও অনুমান করতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। ঘোষ-চাকলাদার নিশ্চেষ্ট বসে নেই।

এ ব্যাপারের ফলে কাজের ধারা একটু বদলেছে বাদল গাঙ্গুলির। দিনের মধ্যে দু'তিন বার মড়াইয়ে নামে। সন্ধানী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সব। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে। বিশ্বাসের শাস্তিভঙ্গ হয়েছে একবার। ঘোষ-চাকলাদারকে সম্পূর্ণ কক্কর আর যাই কক্কর, ভিতরে চির খেয়ে গেছে একটা।

ফলে সাহুনার সঙ্গেও আজকাল দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

সাহুনার উদ্বেগ হয় সামনে গিয়ে দুটো কথা বলে। গাছতলায় সেই লাকের পর্ব মনে পড়তে রাগিয়ে ওঠে নিজেই। রাগের মাথায় কি যাচ্ছেতাই না বলেছিল। বড়সাহেবের প্রতি পাগল সর্দারের সেই অভিযোগ মুছে গেছে মন থেকে, ভুতুবাবুর কথাগুলোও। একটা মেয়ের কাছ থেকে অস্তবড় যা খেয়েও মেয়েদের ওপর ভয়লোক বীতশ্রু হবেন না তো কি! সব শুনে ওর নিজেরই রাগ ধরে গিয়েছিল মেয়ে জাতটার ওপর।

সামনাসামনি পড়ে গেলে নমস্কার বিনিময় হয় বড় জোর। ইচ্ছে থাকলেও কাছে বঁয়ে না সাহুনা। পারেও না।

কাগজ সাহুনাও বদলেছে।

মাসির বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝকঝকি করে যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল, সে বদলেছে। একটু একটু করে বদলেছে। দশ জনের চোখে নিজেকে দেখে বদলেছে। সেই হাসি খুশি আছে, সেই কোঁতুল প্রাচুর্যও আছে, কিন্তু ভরা জোয়ারের মধ্যে চেতনার রাশটাও তেমনি সমাগ আজকাল। ওভারসিয়ারের মেয়ে সেটাই একমাত্র পরিচয় নয় এখন। স্ব-মহিমায় স্বতন্ত্র, স্বয়ংবিকশিত। নিজের পরিপূর্ণতার রহস্য নিজে জানে। ওই যে অস্তবড় চিক ইঞ্জিনিয়ার মড়াইয়ের, যা খাওয়া পোড় খাওয়া মাহুয—দেখলেও যে না দেখার ভান করে কত সময়, কাজের কীকে কীকে তারও বিমনা দৃষ্টি উধাও হয়ে আসতে দেখেছে ওর কাছ পর্যন্ত।

অস্তরকমের যোগাযোগ ঘটল একটা সেদিন।

বিকলে মেন কোয়ারটার্সে-এর দিকে ছিল সাহুনা। বড় বড় কোঁটার জল পড়তে লাগল হঠাৎ। অসময়ের জল। অস্তমন ছিল, থমকে কাঁড়াল। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে দিল ছুট।

অবুঝের সব ক'টা কোয়ারটার্সই চেনা। একটার খুব কাছে নয় আর একটা। চকিতে ভেবে নিয়ে যে দিকে এগলো, একা

**স্বাই  
ড্যানেন -**

দামের তুলনায়  
**ব্রুক বণ্ড চায়ে**  
অনেক বেশী কাপ  
ভালো চা পাবেন

শীলকরা প্যাকেটে  
পাওয়া যায় বঁলে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
নির্ভেজাল ও একেবারে  
খাঁটি থাকে

বোজ  
২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
লোকে কেনেন



**এই জন্যই  
অন্য যে কোন  
মার্ক চায়ের চেয়ে**

**ব্রুক বণ্ড  
চা**

**বেশী লোকে খান !**





কোনদিন যাবে সেখানে ভাবে নি। ভুললোক তো আর বাড়ি নেই এখন, শুধু নিধু আছে...।

কিন্তু জলটা চেপে এলো যেন। সতী ভিত্তে ভেবেছিল তাব পেকে বেশিই ভিজে গেল। একেবারে বাড়ির গায়ে এসে সেট চেতনার দাশে টান পড়ল আবার। না, যাবে না। আগে হলে ভাবত না, সবাসপি ক'র পড়ত। এখন মন চাইছে বলেই যাবে না। তাছাড়া ভিক্টোর একেবারে কম নয় হুগই বা নিধু...।

বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছাঁতের আলসেস মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কি যাচ্ছে তাই জল রে বাবা। কতকণে ছাড়বে ঠিক কি! ভুললোক যদি এসেই পড়েন এর মধ্যে! অস্বস্তিতে আকাশ বিশ্লেষণ করতে লাগল সাহুনা।

ওদিকে মাথার ওপর জানালা খুলে যে লোকটা গঙ্গা বাড়িয়েছে সে স্বপ্ন নিধুরাম।

—দিদিমণি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ। এসো এসো ভিতরে এসো!

চমকে উঠেছিল সাহুনা। পরে নিঃশব্দ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা তোমাদের বাড়ি না কি নিধু?

বতবচনে প্রীত হন নিধুরাম। দ্রষ্ট কর্তে জবাব দিলে, হাঁ দিদিমণি, আমাদের বাড়ি, আমার আস বাবু। কিন্তু তুমি ভিজে যাচ্ছ যে, ছুটতে ভিতরে চলে এসো না।

এভাবে গা বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু পা যেন আটকে আছে এখন মাটির সঙ্গে। বলল, ভিতরে যাব...তোমার বাবু রাগ করবে না হে?

নিধু অবাক।—বিজ্ঞিতে ভিজছ বাগ কেন করবে? আর বাবুতো এখন আপিস ঠাণ্ডাচ্ছে—

ভিতরে প্রবেশ করে সাহুনা শাড়ির আঁচলে হাতখুঁত মুছে ফেলল। কটাক্ষে নিধুকে দেখে নিল একবার। দিদিমণি আসার আনন্দই তার চোখে মুখে। যে দিদিমণিকে স্কুলে চেনে, স্কুলে জানে আর স্কুলে ভালোবাসে।

—দাঁড়াও, একটা তোয়ালে এনে দিই তোমাকে।

—না না, তোয়ালে কিছু দরকার নেই, সাহুনা শশব্যস্তে থামালো তাকে, এই তো একটুখানি ভিজেছি মোটে।

কতটা ভিজেছে নিধু তাই দেখে নিল একবার। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সাহুনা স্কোড়কে ভিতরের দিকে উঁকি দিল। নিধু বলল, সব ঘুরে ঘুরে দেখো না দিদিমণি, আমি তো আছি, ভয় কি।

সাহুনা মাথা নাড়ল। আশঙ্ক হন যেন। কিন্তু এগোবার আগেই সাগ্রহে আর একটা প্রস্তাব করে বলল নিধুরাম। নিজের যা কিছু অস্ত্রের চোখ দিয়ে আত্মদান করে নেওয়ার বৃত্তিটা শাশ্বত। দিদিমণির মত এমন সমজদার আর পাবে কোথায়। সবিনয়ে বলল, আগে আমার ঘরখানা দেখে যাও, হ্যাঁ? বাবুর ঘর থেকে আমার ঘর চের ভালো, দেখবে এসো, কাউকে দেখাইনে।

সানন্দে আগে তারই ঘর দেখতে চলল সাহুনা। সত্যিই দেখার মত ঘর। নিধুর নিজস্বতা আছে একটা। যেখানে যা কিছু পছন্দসই সবই ঘরে এনে পুরেছে। চৌকি, হাতলভাঙ্গা

চেয়ার, খবরের কাগজচাকা কেরোসিনকাঠের টেবিল। টেবিলে বাজার জিনিস। রঙের টাইমপীস, ফাটা আয়না, রোঁয়া ওঠা বুকশে দামী চিকুণী, শস্তা ফাউটেন পেন, কালি, চকচকে আশপট একটা, দামী তেলের শিশি, দুটো একটা শূণ্য ফাইল পর্যন্ত। আলনায় আত্মময়লা কাপড় জামা আর ছোঁড়া টাকিশ তোয়ালে, নিচে হুঁতিন জোড়া পুরানো জুতো। সামনেই দেয়ালে মহাদেবের ছবি আর তার পাশেই স্তম্ভবসনা নারীমূর্তির বিস্মৃতি ক্যালেন্ডার।

—বাঃ সুন্দর। সাহুনা হেসেই ফেলল, এত সব তুমি কোথায় পেসে?

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়ল নিধুরাম। জবাব দিল, পাবে আবার কোথায়, এ সব তো তারই। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না তবু। একটু সতর্ক করে রাখা ভালো। বলল, আমার ঘরে এত সব আছে তুমি যেন বাবুকে কখনো বোলো না দিদিমণি।

সাহুনা মাথা নেড়ে আশঙ্ক করল তাকে, কখনোই বলবে না। খুশি হয়ে নিধুরাম নিচু গলায় বলল আবার, তোমাকে তাহলে বলি দিদিমণি, বাবুর তো কিছু মনে থাকে না, যখন যা ভালো কিছু নিয়ে আসে কিছুদিন গেলেই সেটা আমার হয়ে যায়। যদি কখনো খোঁজ পড়ে বলি খুঁজে দোর'খন—বাস, তারপর আর মনে থাকে না, কি-করে থাকবে, সারাক্ষণ তো মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ড্যাম্ ঘুরছে।

দিদিমণিকে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কিছু বোধ হয় খেয়াল হল নিধুরামের। অতঃপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে মনোভাবটুকু জ্ঞাপন করল, তার সার কথা, দিদিমণি ভাবছে চুরি, চুরি নয়, চুরি কেন হতে যাবে! এমনিই নেই সে, তেমন বেশি দাঁড় পড়লে চুপি চুপি তো আবার ফিরিয়েই দেয়। আর তাছাড়া সে তো আর বিয়ে-খাওয়া কিছু করেনি, ঘর-সংসারও নেই—এ সব তো এখানেই থাকবে বরাবর, কোথায় আর যাবে।

কোনরকমে হাসি দমন করে তার কথায় সাহ দিতে দিতে বাইরে এলো সাহুনা। নিধু বলল, বাবুর আসার সময় হয়ে গেল, আমি চট করে চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

নিধুর পাল্লায় পড়ে এভাবে এখানে এসে পড়ার অস্বস্তি অনেকটা কেটেছিল। গৃহস্থামীর প্রত্যাখ্যান সম্ভাবনার সঙ্কোচ বাড়তে লাগল আবার। বাইরে অঝোরে জল পড়ছে তেমনি। ওর সঙ্গে আড়ি করে নেমেছে যেন। এত জলে কেউ বেরোয় না এই যা ভরসা। একটু দরে এলে ও নিজেই আগে পালাবে এখান থেকে।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নিধুর মনিবের ঘরে উঁকি দিল সাহুনা। অবিস্মৃত আগোছালো ঘরের ছিঁরি দেখে ওর হাসি পেয়ে গেল। যেটার যেখানে খুশি পড়ে আছে। সব ছাড়িয়ে চোখ গেল ঘরের কোণে টেবিলটার দিকে। টেবিলের দামী ফোটাষ্ট্যাণ্ডের ওপর।

এরই কথা শুনেছিল নরেন বাবুর মুখে। ফোটাখানার কথাও শুনেছিল। পায়ে পায়ে এগলো সাহুনা। কাছে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। বকবকে চকচকে চেহারা। স্ত্রী। সৌন্দর্য বশবাস। সুপরিষ্কৃত অভিজাত্য।

এই তাহলে নীলা। সামান্যসামান্য এঁলে যে এখনো পারে সব ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব তখনই করে ফেলতে।  
চেয়ে চেয়ে দেখছে সাহনা।

—পারে বোধ হয়। নইলে এ ছবি এখনো এখানে কেন। হাতে তুলে নিল ছবিখানা। কাছে দূরে এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আবার। আয়নার চোখ পড়েনি, নইলে দেখত ওর এই দেখাটার মধ্যে প্রীতি ছিল না খুব।

নিধুর সাদা পেয়ে ফোটা মথাস্থানে রেখে দিল আবার। নিধু চুপি চুপি পরিচয় করিয়ে দিল, উটি নীলা দিদিমণি, বাবুর সঙ্গে খুব ইয়ে ছিল একসময়, কি রকম সব গুণগোল হয়ে গেল, নইলে বাবুর তখন ফুঁটি ছিল কত!

সাহনা জানে সবই। কিন্তু জাম্বুক বা না জাম্বুক নিধুর মুখে কিছু শুনে তাও ঘা বিড়খনা। বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরে বসল সে। নিধুর ভ্রমলোক হওয়ার সরঞ্জাম-সংগ্রহে বিশেষ একটা অভিল্যম অপরূপ থেকে গেছে বলেই নীলা দিদিমণির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। গোপনে বাসনাটা ব্যক্ত করে ফেলল সাহনার কাছে। কাউকে যদি না বলে তো একটা কথা বলি দিদিমণি, ঠা?।

কোনরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সাহনা আবার কিছু শোনবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত নেই তাই খালাস তার দিকে।

—আমাকে জমনি কপোব পাগে বাঁধানো ছবি লেবে একটা দিদিমণি? টেবিলে রাখতুম—

নিবেদন শুনে দুই চক্ষু প্রথম বিস্ময়িত হয়ে উঠল সাহনার। উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে স্বিচ বসে থাকে দায় হলে তার পর। এই নিয়ে ওর সামনে বসে হাসাটাও বিসদৃশ। আবেদন পেশ করে ফেলেই নিধুও লক্ষ্যায় অধোবদন। দিদিমণি অত হাসবে জানলে বলত না।

সাহনা বলল, আমার কাছে তো নেই, পেলে দেবখন। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্তই জিজ্ঞাসা করল, তোমার চা হয়ে গেল?

—না, সবই জল গরম হল, এবারে খাবারটা আগে তৈরী করব, তুমি বোসো।

মনে মনে নিধুও একটু আড়াল হবার ফিকির খুঁজছিল হস্ত। ব্যস্ত হয়ে তাই বাস্তবের দিকে চলে গেল।

কিন্তু দিদিমণির মত একজনকে চুপচাপ বসিয়ে রেখে কতক্ষণ আর ভালো লাগবে। তার ওপর একটা প্রানও এসে গেছে মাধায়। এবারের প্রস্তাবে নিশ্চয় খুশি হবে। সেই টিফিন ক্যাবিনার বদলানোর ব্যাপারটা নিধু জীবনে ভুলবে না। বাবু অবাক হয়ে কেমন চেটেপুটে খেয়েছিল এবং পরে জেনে ফেলে আরো কত অবাক হয়েছিল সে সব ফিরিস্তি দিদিমণির কাছে অনেক দিন আগেই বলা হয়ে গেছে।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে কাঁড়াল আবার। —দিদিমণি, নতুন খাবার কিছু তৈরী করে দেবে? দাদাবাবু খেয়ে ভারি খুশি হবে সেবারের মত—

ঝোঁকের মাধায় এখানে এভাবে এসে আটকে পড়ার অবস্থিতি ক্রমেই বাড়ছিল সাহনার। তুচ্ছ কুঁচকে জলের বহর দেখছিল। ওকে জ্বল করার ভগ্নেই যেন সব কিছু। বায় কথা ভেবে এত সঙ্কোচ, এর ওপর তাকে খুশি করার এই প্রস্তাব শুনে প্রায়

রেগেই গেল। বঙ্গল, যোজ কছ তুমিই করোগে বাও, আমি এখন পারব না—তোমাদের ছাতাটাতা আছে কিছু?

ঠাং এই বিরাগের স্বরটা কানে বাজতে থতমত পেয়ে গেল নিধু। মাথা নাড়ল, নেই—। ফিরে গেল।

ছাতা থাকলেই বা এ জলে যেত কি করে! শাদা মনে এসেছিল লোকটা, এভাবে না বললেই হত। ভাল সাহনা। নেমন্তন্ন করে তো আর ডেকে আনেনি, বরং এসেছে বলে খুশিতে আঁটখানা হয়েছে। উসখুস করতে লাগল...নীলার মত মোটর হাঁকারনি কখনো, বরনার মত এম, এ পড়েনি—কিন্তু এই একটি জায়গায় তার হাত পড়লে তখন কিছু করে তুলতে পারে, সে আত্ম পুরোপুরি আছে। আর এটুকু পারার আকর্ষণও কম নয় ওর কাছে।

উঠল। পায়ে পায়ে নিধুর বন্ধনশালার দরজায় এসে কাঁড়াল। কাগজে ভড়ানো বড় একটা পাউকটি আর গোটা কতক ডিম সামনে রেখে গম্ভীর মুখে নিধু পেছাজ কুঁচোতে বসেছে।

—কি খাবার কছ নিধু?

জবাব না দিয়ে নিধু ডিম-পাউকটিও দিকে একবার তাকালো শুধু। বড় সাহেবের আপনায় লোক প্রায়, তারও একটা মানমর্ষাণ আছে। নেহাত দিদিমণি বলেই তুলেছিল আর এমন অগ্ররোধ করেছিল।

সাহনা আবার জিজ্ঞাসা করল, আপিস থেকে এসে এই ওকনো ডিমকটি খাবে তোমার বাবু?

নিধু সাফ জবাব দিল, খিদের পেট চুঁই চুঁই করে তখন খাবে না তো কি।

জবাব শুনে বিমর্ষ হল সাহনা। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করল।—জল ছাড়ার তো কোন লক্ষণ নেই, তোমার বাবু আসবে কি করে?

—আঁটা-পুরুফ আছে, বিষ্টির জল ভেতরে সেগায় না, ঠিক আসবে।

দুচার মুহূর্ত ঘরের ভেতরটা দেখে নিল চুপচাপ। তেমনি হালকা করেই বলল আবার, তোমার আছে তো দেখছি শুধু ডিম আর কুটি এ দিয়ে আবার নতুন কি করতে চাইছিলে তুমি?

জবাব না দিয়ে নিধু ঘরের কোণে তবকারির ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

সাহনা হাসল একটু।—আচ্ছা সবো, দেখি কি করতে পারি।

এতক্ষণে নিধুর ফুঁটি যেন ঘিরে এলো আবার। একগাল হেসে, তবকারির ঝুড়িটা টেনে আনলো। অজ্ঞাত সরঞ্জাম হাতের কাছে শুছিয়ে দিতে লাগল। চৌকাঠের ওপর বসে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তারপর।

নিধু অবসিক নয়! তার মনে হল, দু'খানি যোগ্য হাতের তংপর ছোঁয়া পেয়ে কিমন্ত বাস্তবঘটনাই যেন নড়েড়ে জেগে উঠেছে। তবকারি শেষ, আদা-পেঁয়াজের রস সহযোগে সেক আনুব কাটিয়ে শেষ, এবারে ডিম আর কুটি একসঙ্গে করে ভেজে নামাচ্ছে। কথাবার্তা খেমে গেছে নিধুবামের, সব কটিরই স্তম্ভাণে রসনা দিল।

বাইবে খটাখট কড়া নাড়ার শব্দ।

নিধু ছুটল। হাত খেমে গেল সাহনাও।

গৃহস্থামীর পদার্পণ ঘটেছে। কলকথা ওয়াটার প্রাণ খুলে নিধুর

হাতে দিল। ভিজে জুতো বদলে ঘরে ঢুকল। তোয়ালে দিয়ে আধভেজা হাতমুখ মুছে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল খানিকক্ষণ। নিধু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

খানিকবাদে আপিসের বেণডুয়া বদলে এবং হাতমুখ ধোয়া শেষ করে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসল। বলল, খুব ভালো করে চা কর—।

এই প্রতীক্ষায় ভিন্ন নিধুরাম। নির্দেশ শোনার আগেই রান্নাঘরে এসে হাজির। সাধুনা গুছিয়ে রেখেছে সব। একটি কথাও না বলে তার হাতে তুলে দিল। খেয়াল করে ওর মুখের দিকে তাকালে নিধুরামও ভড়কে যেত হয়ত। কিন্তু তার চোখ অগ্রনিক। নিধুদের জন্তু কতটা আছে না আছে দেখে নিয়ে খাবার হাতে দ্রুত প্রস্থান করল আবার।

রোজকার মতই খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে মনিব। খাবারের ডিশে হাত বাড়াল। তার পিঠে তফাতটা বুঝতে পারল যেন। কাগজ কোলে নামিয়ে ভালো করে দেখল চেয়ে। তার পর অবাক হয়ে তাকালো নিধুর দিকে। কিছু অরণ চল বোধ হয়।

নিধু প্রস্থানোত্তর।

ডাকল, এই শোন তো—

প্রত্যাবর্তন।

—এ খাবার দুই তৈরী করেছিস না কেউ পাঠিয়েছে?

নিধু জবাব দিল, এ বিজ্ঞিতে আবার পাঠাবে কেমন করে, ঘরে বসেই তৈরী করছে দিদিমণি।

—দিদিমণি!

অরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল নিধু, সেই ওভারসিয়ার দিদিমণি—সেই সেবারে রান্নায় যার সঙ্গে পোলাও-কালিয়া বদল হয়ে গেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে জঙ্গল নিরুজ্জ্বল, আমি ঘরে নিয়ে এলাম—আসতে কি চায়, বলে তোমার বাবু বাগ করবে না তো?

চায়ের সরঞ্জাম হাতে সাধুনা সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। তেপায়ার ওপর রাখল ঠিক করে। বলল, অত জেরার কি আছে, খেতে ভালো না লাগে সরিয়ে বেখে দিন। নিধু মামলেট আর পাউরুটি নিয়ে আসুক, চিবোন বসে বসে।

বাক্য শুনে নিধু হতভম্ব। বাইরে জলের দরুন ঘরে আলো কম মনে হচ্ছিল। আলোটা জ্বলে দিল। মনিবের মুখে বাগের চিহ্নমাত্র না দেখে আশ্চর্য। উটে হাসির মতই দেখল যেন। তক্ষুনি রান্না ঘরের কথাটা মনে পড়ে গেল তারও। তাড়াতাড়ি সেদিকেই চলল সে।

—বহুনা। বন্ধ দরজা জানালার কোনো এক কীক দিয়ে আলোর বেখা যদি এসেই পড়ে, সেটা উপলব্ধি না করে উপায় নেই। চাক বা না চাক ভালো লাগার আভাস লাগল মুখে।

এ বকম পরিবেশে সাধুনার একমাত্র সোজা রাস্তা সহজ হওয়া। এই সহজ হওয়ার দায়েরই সরাসরি ঘরে এসে ঢোকা। বলল, হ্যাঁ, বসবে, বাড়িতে গুদিকে বাবা কত ভাবছে।

জানাল দিয়ে বাইরের জলবায়ু আকাশ নিরীক্ষণ করে বাদল গাঙ্গুলি হাল্কা জবাব দিল, তাহলে বাড়ি যান।

বিশ্রিত নেত্র তাকালো সাধুনা, এই বুদ্ধিতে বাব কি করে?

—তাহলে বহুনা।

সাধুনা সকৌতুকে দেখল আবারও। পরে বলল আমার নাম সাধুনা। আমাকে আপনি বহুনা বলতে হবে না।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলে হাসল একটু।—নাম জানি।

—সকলেই জানে।

অর্থাৎ সকলেই যখন জানে, তার জানাটাও এমন কিছু নয়। এই নিশ্চয় অভিব্যক্তির পিছনে আশ্বাস কতটুকু বুঝতে দিতে রাজি নয় সাধুনা। বলল, কতক্ষণে যে ঘরবে এ ছাইয়ের জল কে জানে, সেই কখন থেকে আটকে আছি।

নরেনবাবু হলে এই অকালবর্ষণের সুবিবেচনার কথা বলে খাবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। আচাররত মাছুষটা সে দিক দিয়েও গেল না। ক্ষুদ্র প্রশ্ন করল, আজ এদিকে রাউণ্ড ছিল বুঝি?

আবারও সেই একই কথার টোপ ফেলল সাধুনা।—ছিলই তো, আপনার ডিন-কটি চিবুনো বরাত্রে নেই বলেই ছিল বোধ হয়। ওই নিধুর জন্তু, নইলে কবে এতক্ষণে ভিজেই বাড়ি চলে যেতাম।

এবারও স্মৃতিটা ছেড়ে দিয়ে গেল বাদল গাঙ্গুলি। মুহূর্তে পেয়ালায় চা ঢেলে নিয়ে আবার আহারে মনঃসংযোগ করল।

জানালার কাছে গিয়ে একবার আকাশটা দেখে এলো সাধুনা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। ভুরুগুলে কুঞ্জন বেখা মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, আগের থেকে শুকনো দেখাচ্ছে ভয়লোককে। মড়াইয়ের বিগত গোলযোগের দরুন বোধ হয়। কিন্তু শুকনো হলেও সঙ্কল্পের কাঠি আছে তাতে। আর আছে প্রায় রক্ত স্রাবজ্ঞাবোধ। ভেবেছিল এই নিয়ে কথাবার্তা হবে, মড়াইয়ের ভালোমনা মিশে আছে তারও মনের সঙ্গে জানিয়ে দেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভয়ানক গায়েপড়া শোনাবে। এরকম নির্দোষ অত্যাচার সাধুনাও অভ্যস্ত নয় আজকাল।

—কি হল, বসতে আপত্তি আছে না কি? চায়ের পেয়ালার বেখে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলল আবার। আপনি বা তুমি দুইই এড়িয়ে গেল।

সাধুনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। ঘরের মধ্যে বসবার দ্বিতীয় জায়গা শয্যা বিছানো খাটখানা। খাটের পাশেই টেবিল। টেবিলের ওপর নীলার কোটো। ফোটোর মধ্যে মেয়েটা যেন একেবারে মুখোমুখি হাসছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাণ্টা জবাবেই যেন সাধুনা ঈষৎ দ্রুতসহকারে দেখতে লাগল তাকে। তার এই দেখাটা অনুসরণ করে অল্প লোকটির নীরব চাকল্য না তাকিয়েও যেন উপলব্ধি করতে পারল সে।

বাদল গাঙ্গুলির দুচোখ ওর দিকেই সংবদ্ধ। ভিতরে একটা নাড়াচাড়া পড়ল হঠাৎ। গুরুগভীর পদমর্ষাদার আবরণ সরিয়ে অনেকদিনের আহত মাছুষটাই জেগে উঠল যেন। নিছক কৌতুহলে ভিতরের একটা দুর্বল ক্ষত কেউ উটে পাণ্টে দেখতে থাকলে যেমন লাগে তেমনি লাগছে। অস্বস্তিকর বহুনাশায়ক।

হঠাৎ বেদম হাসি পেয়ে গেল সাধুনার। হাসতে হাসতে খাটের কোণ ঘেঁষে বসে পড়ল এবার। মাছুষটার চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠছে দেখেও হাসি ধামে না। কিংবা হয়ত ইচ্ছে করেই ধামতে দিল না সেটা।

—এত হাসির কি হল? নীরস, ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

সাহসনার সামলে নিতে সময় লাগল তবু। শাড়ির আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে বলল, শুনেলে আপনি বেগে না যান। আপনার নিধুরও ভারি সখ এরকম একথানা বকবক ফোটো ওর টেবিলে রাখে, আমাকে বলছিল যদি একটা যোগাড় টোগাড় করে দিতে পারি।

হাসির কারণ শুনে অন্তঃস্তরের একটা ছায়াভয় মুহূর্তে অপসৃত হয়ে গেল যেন। আপসের নিঃশ্বাস। ইচ্ছে না থাকলেও যেখানে সহজ হওয়া যায়, সহজ হতে হয়, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে মেয়েটার ছুড়ি নেই বোধ হয়। যত্ন যত্ন হাসতে লাগল বাদল গাঙ্গুলি। বলল, তা তুমি ঠাচ্ছে করলে এর থেকে অনেক ভালো ফোটোই তো নিখুঁত পেতে পারো, বকছিল যখন দিয়েই দাও একথানা।

বলল সাহসনা। বুকেও দুর্ভোগাতার ভান করতে হল তাকে।  
—আমি কোথেকে দেব?

—তোমার নিজের ফোটোই একথানা দিয়ে দিতে পারো...।

চকিত কটাক্ষে সাহসনা তাকালো একবার তার দিকে। অপরিণত অজ্ঞতার চোঁট ইট্টে জ্বাল নিল, আমার ফোটোই নেই—। কি মনে পড়তে আর এক বলল হাসল আবার। মুণোমুখি জাঁকিয়ে বসল।—জানেন, নাসিমা একবার তো আমার সাক্ষিয়ে শুঁছিরে

ফোটো তোলানোর সব ঠিকঠাক করলে। ফোটোগ্রাফারের সামনে যেই গিয়ে দাঁড়ানো, অমনি ভদ্রলোক সেই কালো ঘোমটা মাথায় দিয়ে যা শুরু করে দিলে—সোজা হোন, বেকে দাঁড়ান, মুখ তুলুন, মুখ নাবান, গভীর হোন, ওয়ান—টু—হাসুন—। আমার আগেই হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর যেই না বলা হাসুন, আমি তেঁসে একাকার—কালো ঘোমটা সরিয়ে ভদ্রলোক এমন চেয়ে রইল—আমার হাসি আর থামলই না, একেবারে দে ছুট!

নিজের অজ্ঞাতেই ভালো লাগছে বাদল গাঙ্গুলির। কল থুলে দিলে যেমন বরফরিয়ে জল পড়ে, এ মেয়েও হাসির উৎসে নাড়া পড়লে তেমনি বরফরিয়ে হাসি বসে।

—তোমার স্বন্দরী কেমন আছে?

আর একদিন আর এক জায়গায় এই একই প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিল বিলক্ষণ মনে আছে। আচ্ছ বলেই আচ্ছ আবারও জিজ্ঞাসা করল।

সাহসনা যথার্থই লজ্জা পেল এবার। তবু বলল, ওর ওপর আপনার খুব টান দেখছি।

—বে টানা টানিয়েছিলে, টান হবে না?

আরক্ত হয়ে উঠল সাহসনা।—আমি কি জানতুম আপনি চিৎ ইঞ্জিনিয়ার এখানকার?

—কিন্তু—

কিছুটা নিরস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বায়ী নিকৃষ্ট সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোন সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোনদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০, -*ইঞ্জিন-কন্ট্রোল* -গ্রাম-গিনিয়াট

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৮, রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা-১২

—জানলে কি করতে ?

—আলুট টালুট করতুন বোধ হয়।

গোক ছুটে যেতে যেতালো ছমড়ি খেয়ে পড়েছিল, দুগুটা মনে পড়ে গেল বাবল গাঙ্গুলির। সে কথা বলে লজ্জা না দিয়ে বলল, কিন্তু তার পরেও তো অনেক বার দেখা হয়েছে, পরোয়া কর নি তো ?

অস্মান বললে উঠো জবাব দিল এবার। আমি পরোয়া করতে বাব কেন, আমি আপনাব চাকরি করি ?

বাবল গাঙ্গুলি হাসছে।

ঘরের আলোয় বাইরের দিকটা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ। অধাবসায়ী ছাত্রের দুঃস্থ কোন আঁকের ফল মিলে গেলে যেমন হয় তেমনি একটা তৃপ্তির আশ্বাসন নিয়ে সাহসনা উঠে জানালার ধারে গিয়ে জল খেমেছে কি না দেখল। জিব কামড়ে বলল, এই বা জল কখন ছেড়ে গেছে, বাবা দেব'খন, আমি চলি—।

ঘাড় ফিরিয়ে বাবল গাঙ্গুলি তাকালো বাইরের দিকে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। বলল, নিধুকে ডেকে দিই, সে সঙ্গে থাক।

অকুট হেসে উঠল সাহসনা, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিষিরাম সর্দার—নিধুকে ডাকতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব।

লম্ব চরণে ঘব থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।...বাবল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। বাগ্নিচেরা বিছাৎ বলকে বিবরাজ্যীদের সাজা পেয়ে চম্পৎ সচেতন হল ঘেন। এ বিস্থতি চায় নি, চায়ও না। চোখ দুটো আবার শুকনো খরখরে হয়ে উঠতে লাগল আগের মতই।

কিন্তু তবু ঘরের আলোটা এখন নিঃশব্দ লাগছে কেমন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার থেকে সাহসনা বেরিয়ে এসে বিজয়িনীর মতই। অস্ত্রতৃষ্ণিতে ভরপুর। কাউকে বঙ্গা বাবে না, নরেন বাবুকেও না।...বলতে পারলে কিন্তু বেশ হত। কলের মানুষ না কি। কলের মানুষের কলকবজাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখে আসতে পারে বোধ হয় হচ্ছে করলে।

কিন্তু মেন কোয়ার্টারস-এর বাধানো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সমস্ত নারীবিক্রম ঠাণ্ডা। কোয়ার্টার থেকে পচিশ-তিনিশ গজ দূরে রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রণবীর ঘোষ কথা বলছে নিধুর সঙ্গে। মড়াইয়ের সোসাইটি বলতে মেন কোয়ার্টারস্। দেখা এখানে সকলের সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু জলঝরা রাস্তায় লোকজন নেই আজ, এখানে এ সময়ে নিধুর সঙ্গে কথা বলটা শুধুই বোগাযোগ নয় নিশ্চয়। সেই বাদনা উৎসবের পর এই ক'মাসের মধ্যে লোকটাকে আর সামনাসামনি দেখে নি সাহসনা।

মুহুর্তে কর্তব্য স্থির করে নিল। সোজা নিধুর সামনে এসে খম্কে দাঁড়িয়ে অহুশাসনের সুরে বলল, তুমি এখানে আর ওদিকে ডেকে সাধা এতক্ষণ। আমাকে পৌছে দেবে চলো।

কিন্তু নিধুর মনে রয়েছে অস্ত্র চিন্তা। বলে উঠল, এই বাঃ, তুমি চলে এলে দিদিমণি, তোমার খাবার যে বাগ্নাঘরে ঢাকা পড়ে থাকল! আমি অপেক্ষে করে করে ভাবছিলাম—

—তুমি আসবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করবে? যথার্থ বেগে উঠল সাহসনা।

নিধু হকচকিয়ে গেল। সাহসনা ক্রম্প ককক বা না ককক, রণবীর ঘোষ নিজেকে থেকেই অমায়িক হেসে বলল, আপনাব যাবার তাড়ার বেচারীর দরদটুকু মাঠে মাঠে গেল, খবর সব ভালো তো ?

জবাব না দিয়ে সাহসনা পলকের জ্ঞান শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। সেই হাসি ভিজানো বকবকে মুখ আর চকচকে চোখ। বিগত গোলযোগের আঁচ লেগেছে কোথাও মনে হয় না, একটুও বদলায়নি।

পা বাড়াবার আগেই দ্বিতীয় দফা বাক-নিঃসরণ হল রণবীর ঘোষের।—সেই দু'মাপ আগে আমার গো-ডাউন দেখতে যাবেন বলেছিলেন, এতদিনের মধ্যে কই একবারও গেলেন না তো ?

—আপনাব গো-ডাউন এখনো আছে না কি ?

বলবে ভাবে নি, বলতে চায়ও নি। মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে গেল চম্পৎ। সচকিত হয়ে ডাকল, নিধু এসো—।

—সামনে বসে আসি দিদিমণি—।

—বলতে হবে না এসো তুমি! ঝাঁকিয়ে উঠে সাহসনা হনহন করে এগিয়ে গেল।

রমণী বিরাগে অনভাস্ত নিধুরাম শশবাস্তে শ্বশুরগ করল তাকে। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। দিদিমণি এ রকম বলল বলে নয়, নিজের হাতে সব করে না খেয়ে চলল বলে। বেচারীর দোষ নেই। জিজ্ঞাসা করতে এসেও মনিবের ঘরের আবহাওয়া দেখে রসভঙ্গ করতে মন সরেনি। বাবু অমন হাসিমুখ দেখেই অনেককাল।

সামনের বাক না পেরেনো পর্যন্ত সাহসনা আর এদিক ওদিক চাইতেও পারছে না। না তাকিয়েও পিছনে রণবীর ঘোষের দুই চোখ উপলব্ধি করতে পারছিল। নিধু পাশে আসতে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে না তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ?

নিধু বাঃ ফিরিয়ে দেখল একবার। বলল, দাঁড়িয়ে এদিকপানে চেয়ে আছে—। বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা করবেন না তো উনি।

সাহসনা বলল, দেখা করবেন না তো তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এত কি কথা হচ্ছিল ?

যেন সেই মনিব নিধুর। জবাবদিহি শুনে আরো রেগে গেল। নিধুর বক্তব্য, দেখা করার জ্ঞান লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ঠিক করেছে অত যাতে আজ আর দেখা করবে না, আর একদিন আসবে।

—অপেক্ষা করছিল তো তুমি তোমার বাবুকে এসে খবর দাওনি কেন ?

তাই বা কি করে হবে নিধু। লোকটা যে নিষেধ করল, সাহেব দিদিমণির সঙ্গে গর করছে যখন আজ আর বিরক্ত করে কাজ নেই, বাড়িতে কখন কি রকম ফুরসৎ থাকে সাহেবের, তাই জেনে নিচ্ছিল।

নিধুর আত্মসমর্থনে কিছুমাত্র খুশি না হয়ে নিজের মনে গজ-গজ করতে করতে এগলো সাহসনা।

নিধু মিথ্যে বলে নি খুব। তা বলে নির্জলা সত্যিও বলে নি একবারে। দিদিমণির মেজাজ দেখে চেপে গেল। নইলে কথা উঠতে আরো অনেক কথাই বলে ফেলেছে সে। দিদিমণির কথা। যত বড় সাহেবই হও, দিদিমণির সামনে সব জল। প্রকারান্তরে



এ কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে বণবীর ঘোষকে। তাব পর দিদিমণির রান্নার প্রশংসাও করেছে বটকি। আর তাই যখন করল, সেবাবের সেই 'টিপিনকার' বদলে দেওয়ার মন্তব্য খবরটাই বা না বলে পারে কি করে!

কিন্তু সাধনার মন থেকে বণবীর গোধ মুছে গেল একটু বাদেই। তার আগের অন্যাটুটুকুই জুড়ে বসল আবার।...নরেন বাবু মিথ্যে বলেনি শোধ হয়। আসলে ওই নেয়েটাকে তুলতে পারেনি বলেই একটা শোকের অহঙ্কার চোপের সামনে সর্বদা জ্বিয়ে রাখতে চায় মানুষটা। নইলে শু ছবিটা ওভাবে ওখানে থাকত না। থাকুক, সাধনার আপত্তি নেই। কিন্তু ইনকো এক নারী-বিসে জলছে বলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একজন তার দ্বানি ছড়িয়ে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে কালো করে দেখবে, সেখানেই বস আপত্তি! ওতে যেন তাদের সকলের অপমান থেকে থেকে কেবলি মনে হতে লাগল, একটা কাজের মত কাজ হয়েছে আজ। ওপর ওপর দেখতে গেলে কিছুই নয়, কি আর এমন বলে এসেছে? কিন্তু মনের কারিগরী অস্ত্র রাস্তায়। ও যেন জানে, বলাটাই সব নয়। বলে হোক, না বলে হোক, লোকটার ওই কালোর শোক কিছুক্ষণের জন্য অস্ত্রত বৃষ্টিয়ে এসেছে।

নিধুকে আগেই বিবায় দিসছে। বাড়ি ঢুকে দেখে, বাবা চিন্তিত মুখে ঘর বার করছেন। দেখেই বলে উঠলেন, বড় কল দেখে বেরোস না, না কি—?

অপ্রস্তুত হয়েও জবাব দিল, জল এসে গেল তার আমি কি করব?

বিবস বদলে শবনী বাবু কাছে এসে হাত দিয়ে তার গা মাখা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, ভিজছে কি না।

—কেন, ভিজছে?

শবনী বাবু হেসে বললেন, না, খুব বাতাসবী—সেই থেকে ভাবছি আমি, ছিল কোথায় তুই?

—তোমার তো কাজ না থাকলেই ভাবা, গোসল, এদিকের ব্যবস্থা দেখে আসি আগে।

সবে এলো সাধনা। ব্যবস্থার জ্ঞান নয়, ছিল কোথায় এতক্ষণ সেটাই এড়াতে চায়। কিন্তু কেন?

এই কেনটাই ভালো লাগছে না কেন জানি। নিজের পরিবর্তন জানে, উপলব্ধি করে। আগে হলে বাবার সামনে জাঁকিয়ে বসত, বলত সব। আজ বলতে পারল না। পারল না, কারণ, জমটা হঠাৎ এসেছে বটে, কিন্তু বাবল গাজুলির বাড়িতে ওর বাওয়াটা আকস্মিক কিছু নয়। জলের স্বযোগে ভিতরের একটা আগ্রহ ওকে টেনে পাঠিয়েছে।

তিন চার দিন পরে বাড়ি ঢুকেই নরেন হৈ চৈ করে উঠল প্রায়, তোমার ব্যাপারখানা কি বলতো! অমন একটা আড্ডেঙ্কার করে এলে অথচ আমাকে বলই নি কিছু?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে যেন এক বলক রক্ত নেমে এলো সাধনার। কাজের অছিলায় উঠে গিয়ে একটু বাদে ফিরে এলো আবার।—কি হয়েছে বুঝলাম না।

—বুঝলে না? সেদিনের জলে কোথায় আটকে পড়েছিলে?

—ও, এই কথা। সে আবার বলার মত কি?

বলার মত কি! জবাব শুনে নরেন আরো অবাক। যেন নির্বিরণী বলছে, স্ববীর মত কি।

বথাসম্ভব নিস্পত্ততা বজায় রেখে সাধনা শাদাসিধে ভাবেই খিজ্রাসা করল, কার কাছে শুনলেন?

—নিধুরাম দি গোট।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর কথা তুলেই গিয়েছিল। এবারে বাগও হল বেশ। ঠেস দিয়ে বলল, নিধুরামের সঙ্গে খুব ভাব বৃদ্ধি আপনার?

—খুব। নিধু হল আমার দশ বছরের সাগরেন।

—কান কুড়কুড় শোনে? হেসে উঠল। ঠাট্টা করতে পেরে নয়, প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য।

আড্ডেঙ্কারের কথাটা চাপা পড়ে গেল ঠিকই। এর পরেও ও কিছু বলল না দেখেই নরেন তুলল না কথা। মনে একটা খিজ্রাসার আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। ব্যতিক্রমটুকুই উপলব্ধি করল শুধু। কিছুদিন ধরেই করেছে। কথার কঁাকে কঁাকে ওকে লক্ষ্য করল অনেকবার।...উজ্জলতা নয়, সম্প্রতি শ্বির জোয়ারটা ওর ভিতরে এসে থেমে আছে যেন।

ডামের সকলেই ব্যস্ত ইদানীং। আর একটা বছর ঘুরে আসছে। কাজের গতি লক্ষ্যেব নিশানায় পৌছয়নি। নতুন বছরের ছক কাটা হচ্ছে। সন্ধ্যায় মিটিং বসছে বোকাই। আরো জেংজন, আরো সাজসজ্জাম, আরো তৎপরতা বাড়ানোর জল্পনা-কল্পনা।

শবনী বাবুর বাড়ি ফিরতে বাত হগ প্রায়ই। নরেনেরও ক'দিনের মধ্যে দেখা নেই। আগে এ শবনের বাড়তি অবকাশে সাধনা নিজেকে আগে বেশি করে বাইরে ছড়িয়ে দিত। কিন্তু পরপর কটা দিন বাড়ি বাসেই কাটছে একরকম। বাইরের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর অশান্ত তাগিদে ছেদ পড়েছে। বেশ লাগছে এই ভরা ভরা অলস মুহূর্তগুলো।

—দিদিয়া!

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সাধনার। ভিতরের দাওয়ায় বসে বাইরের আলোর রংবদল দেখছিল চূপচাপ। উঠবে, আলো জ্বালবে, সন্ধ্যা দেখাবে। আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে অনতিদূরে কোথায় চাপা গলার অতিপরিচিত ফিস ফিস ডাক শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সহসা প্রেতের ডাক শুনল যেন।

—ই দিদিয়া!

সাধনার সারা অঙ্গ হিম স্রোত বইছে একটা। নড়া চড়ার ক্ষমতা নেই। আকুল হয়ে বলতে চাইল, কোথায় যে, কোথায় তুই? ব্যাকুল নেত্র এদিক ওদিক তাকাতে লাগল শুধু।

—দিদিয়া!

এক বটকার উঠে দাঁড়াল এবার। স্বল্পবীর ঘরের দিক থেকে আসছে অস্ফুট কণ্ঠস্বর। এগিয়ে গেল। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে ঠাঁড়িয়ে গেল তারপর। গোয়াল ঘরের দেয়াল ঘেসে অন্ধকারে অবহা যুতির মত ঠাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদমণি।

অক্ষুট হস্তধ্বনি।—আমাকে চেনতে পারিস লাই দিদিয়া?

সান্দনা সামলে নিয়েছে খানিকটা, মুহূ গলায় ডাকল, আয়।

—উবাসীর বাবু কুখা?

—নেই, আয়। হাত ধরে তাকে ভিতরের দাওয়ার নিয়ে এসে আলো ফেলে দিল। তারপর আর মুখে কথা সরল না একটাও।

চাঁদমণি কিন্তু হাসছে! যেমন হাসতো আগে তেমন নয়, তবু হাসছে। সান্দনার আশাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তুকে একটোবার দেখতে আলাম, আরো অনেক সোন্দরপানা দেখতে লাগছে তুকে।

সোন্দাশুস্ত্রি সান্দনা তাকাতো পারছে না। মড়াইয়ে চাঁদমণি বলে মেয়ে ছিল একটা পাগল সর্দারের। অনেকদিন পর্যন্ত তার মূর্তি আর তার কথা সকলেরই মনে হয়েছে। অস্বস্ত সান্দনার তো হয়েছে। কিন্তু সব সম্বন্ধে প্রেমের প্রত্যাভর্তন যেমন কাম্য নয় তেমনি বিস্ময় এক অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে উঠল যেন।...কালোর ওপর আলংগা কালো ছাপ পড়েছে আর একটা, চলচলে প্রাচুর্যে শুকনো টান ধরেছে, যে কালো চোখ কারণে অকারণে জ্বলতে দেখেছে কতবার তার নিচে যেন কালো দীঘির ছায়া। চকচকে মুখে পঙ্কজ-নিধাতনের কৃষ্ণতা, আর...আর...মেয়েটা একলা নয় এখন, ওর দিকে তাকালেই সেই অনাগত সম্ভাবনাটা চোখে পড়ে।

চাঁদমণি দাওয়ার ওপরে বলল।

সান্দনা ঝাঁড়িয়ে তেমনি। কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠছে না। কেন এলো মেয়েটা। এলো যদি, এমন লুকিয়ে তার কাছেই এলো কেন! অক্ষুট প্রসঙ্গ করল, এতদিন ছিল কোথায় তুই?

—ছেলাম? হাসিতে ঝাঁতগুলি আগের মত বকবকিয়ে উঠল না আর।...ছেলাম...কত লজা জায়গায় ছেলাম।

—তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সান্দনাও বলল আস্তে আস্তে।

সভয়ে চাঁদমণি ফিরে তাকালো তার দিকে। বলল, উ দেখলে তো ভুঁয়ে পুঁতে ফেলাবে।

—বল করবে, হঠাৎ রাগে দপ করে উঠল সান্দনা, আঁশ বাঁটি দিয়ে কুটেবে তোকে, আমি খবর পাঠাচ্ছি তাকে।

চাঁদমণি অনেকক্ষণ শুধু চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হাসল আবার। সেই হাসি দেখে গা আবারও জ্বলে গেল সান্দনার, মরার হাসি যোগ বায়নি এখনো। কিন্তু পর মুহূর্তে হকচকিয়ে কাঁঠ হয়ে গেল একেবারে। সহসা উবুড় হয়ে তার হুঁপা জাঁকড়ে ধরে মাথা গুঁজে পড়ে রইল চাঁদমণি। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, সর্বাস্থ অবশ সান্দনার। আর এক পাহাড় প্রমাণ জমাট বেদনা যেন কঁদে কঁদে তার পায়ের ওপর গলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

নীরব, নিষ্পন্দ পুতুলের মত বসে আছে সান্দনা। কিন্তু ওই কান্নার স্পর্শে চোখ দুটো তারও ভিত্তে উঠছে বারবার।

নিজেই উঠল চাঁদমণি। শাস্ত হয়ে আঁচলে করে চোখ মুখ মুছে নিল অনেকক্ষণ ধরে। আবারও হাসল তার পর। বলল, দিদিয়ার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই দেখা করতে সাহস করেনি। দিদিয়ার ও ক্ষতি করতে চেয়েছে কতবার, তবু। ও চলে যাচ্ছে, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, আর কোন দিন দেখা হবে না কারও সঙ্গে,

কিন্তু সকলকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে খুব—সকলকে আর কি করে দেখবে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু বাবাকে দেখবে একবার, দেখে চলে যাবে।

—কোথায় বাবি? কার সঙ্গে যাবে, সে প্রশ্ন আর মুখে এলো না।

কে জানে কোথায় যাবে। কে জানে কতদূর নিয়ে যাবে তাকে। বাবাকে একবার দেখা হলেই যেখানে হোক যাবে, আশ্রয় ক'দিন ধরে চেষ্টা করছে তাকে লুকিয়ে দেখতে, কিন্তু মড়াইয়ে তো আর যেতে পারে না, গাঁয়ের দিকে গেলেও সকলে চিনে ফেলবে। দিদিয়া কি তার বাবাকে দেখেছে? ক'দিন দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

আবার উক হয়ে উঠছে সান্দনা। সেই নির্মম বিচারের মহড়া চোখে ভাসতে উঠল। কি না হতে পারত। নিজের জীবনের প্রতি ক্রক্ষেপ না করে যে লোকটা এতবড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করল তার বাবাকে, তার প্রসঙ্গ আভাসেও জিজ্ঞাসা করল না একবার। সান্দনা নীরস কণ্ঠে বলে উঠল, নিজের দেশ ছেড়ে সকলকে ছেড়ে ওই জমাদার লোকটাই বেশি হল যখন, তখন আবার দরদ কিসের এত?

—কোন জমাদার? বাহাদুর? হঠাৎ চাঁদমণির দুই চোখ জ্বলন্ত অজ্ঞাবহের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। যেমন মড়াইয়ে জ্বলত আগে। চেয়ে রইল সান্দনার দিকে। শুধু ওকে নয়, ওর ভিতর দিয়ে সকলের ধারণাটাই উপলব্ধি করে নিতে চাইল বোধহয়। তার পর আস্তে আস্তে নিবে গেল আবার। শাস্ত হল। ঠাণ্ডা জ্বাব দিল, বাহাদুর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপৃষ্ঠের মত একটা ঝাঁকুনি খেল সান্দনা। বাহাদুর নয়! বাহাদুর না হলে আর যে কে সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হল না তার।

চাঁদমণি জানাল, সেই থেকে কলকাতায় ঘোষ বাবুর আড়তে কাজ করতে বাহাদুর। ঘোষ বাবু অনেক টাকা দিয়েছে তাকে, আরো দেবে। টাকার লোভে বাহাদুর ওকে দেশে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে, এলছে বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে করবে না চাঁদমণি জানে, কেউ করে না...কিন্তু যেতেই যখন হবে কোথাও, ভয়-ভর নেই আর, ওর সঙ্গেই যাবে।

মুখ তুলে সান্দনা চাইতেও পারছে না আর। নির্বাক, বিমূঢ়, অধোবদন। প্রলোভনের এ আশ্বাস চাঁদমণির কাছে কত অমোঘ সেটা মর্মে মর্মে বুঝেছে বলেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চাঁদমণি উঠে দাঁড়াল একসময়। বলল, বাবার আগে পারলে দিদিয়ার সঙ্গে আর একবার দেখা করে যাবে।

তবু একটি কথাও বলতে পারল না সান্দনা। মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায় যাচ্ছে এখন ও, কোথায় থাকবে।

—দিদিয়া—

ডাক শুনে এবার চমকে তাকালো ওর দিকে। কিছু একটা বলবে চাঁদমণি, স্থির নেত্রে দেখেছে তাকে, চোখ দুটো চকচক করছে প্রায় আগের মতই।

হঠাৎ অক্ষুট কণ্ঠে একটু হেসে উঠল চাঁদমণি। বলল, দিদিয়া, আশুন তুকে আরো ঢের ঢের সোন্দর দেখতে লাগছে। তু টুকচি সামলে চলিস, বাকলি?

শিহনের গোক-ঢোকা সৰু পথ দিয়ে নিজস্ব হয়ে গেল।

সান্দনা স্থাপুর মত বসে আছে তেমনি। কতক্ষণ ঠিক নেই। আজ বুকেতে পারছে, অনেক কিছুই বুকেতে পারছে। কেন মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন ওকে দেখে অগ্নিদৃষ্টিতে ভষ্ম করে ফেলতে চাইছিল চাঁদমণি, বুকেতে পারছে। বুকেতে পারছে, কেন আদিম ঈর্ষায় বাদন উৎসবে ওই মেয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিল ওকে। আর বুকেতে পারছে, শাল মতয়ার ধারে কোন প্রতীক্ষায় স্থিতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রণবীর ঘোষ।

কিন্তু আজ ওর কাছেই এলো কেন চাঁদমণি? এলো কোন বিশ্বাসে? সহানুভূতির জন্তে নয়, নালিশ জানাতেও নয়। শুধু ওর বাবাকে দেখার ইচ্ছেয় এসে থাকলে তাকে দেখেই ফিরে যেত। এতবড় মর্ঘসাতী বেদনা নিয়ে ওর কাছে আসত না। এসেছে শুধু এই জন্ত, এসেছে শুধু এই শেষের কথাটি বলে যেতে। এসেছে, নারীমান্দলালুপ এক পুরুষ দানবের সন্ধ্যা ওকে সচেতন করে দিয়ে যেতে।

মড়াইয়ের বাতাস পর্বত হুঃসহ, বিধাস্ত হয়ে উঠল যেন। কিছু ভালো লাগছে না, কিছু না। কাউকে বলবে কিছু? কি বলবে? এক এক করে তিন চার দিন কেটে গেল।

অবীর আগ্রহ। হুক হুক প্রতীক্ষা, চাঁদমণি আবার একদিন আসবে বলে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে এক মুহূর্তের শুষ্ক বেকতে পারে না। নরেন বা তার বাবা সেই সময় বাড়ি থাকলেও অবীর হয়ে ওঠে।

অস্থিহতা বাড়ে। ছপুর তেতে সোকা মড়াইয়ে নেমে এলো সেদিন। পাগল সর্দারের দেখা পেল না। প্রায়ই কামাই করে আজ-কাল। কিন্তু সেদিন আরো একটা লোককে দেখল না সান্দনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাছে দূরে সর্বত্র খুঁজল। হোপুন। অক্লান্ত নির্মম যান্ত্রিক আঘাতে শক্ত কঠিন পাথুরে মাটির বুকে শুধু ক্ষতচিহ্ন আঁকে যে।

ফিরে চলল আগ্রহ। কোনো উদ্বেগ নিয়ে আসেনি পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অষ্টপ্রহরের বাতনার সঙ্গে একটা ভীতিও মিশে আছে কেমন।

বাড়িতেই পাওয়া গেল সর্দারকে। মাটির ঘরের মেঝের বসে পাঁতার নলে তামাক খাচ্ছে। অপুর হোপুনও চূপচাপ বসে।

—আই বে দিদিয়া, আর আর! মহা খুশি হয়ে পাগল সর্দার তামাক পাওয়া বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে একটা মোড়া টেনে বসতে দিল তাকে।—বসু দিদিয়া, আজ সোমকাল হতে তুকে ভাবতে ছেলায়, অনেকদিন দেখি লাই।

দ্বিতীয় লোকটার উপস্থিতি বরাবরই অস্বস্তির কারণ সান্দনার। ও যে এসেছে সেটা যেন টেরই পায় নি লোকটা। তবু পাগল সর্দারের খুশির আপ্যায়নে ভিতরের একটা দুর্ভর বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল অনেক। মোড়াটা তার কাছে টেনে বসে অন্তরঙ্গ ক্রটি করে বলল, বাড়ি বসে থাকলে দেখবে কি করে, কাজে বাঙনি কেন আজ?

—শরীলটা আবার দেল না, স্বর আসল ভাবলাম—।

—তোমার তো রোজই স্বর আসছে আজকাল। স্বর এলে কেউ খালি গায়ে বসে থাকে? কপালে পিঠে হাত দিয়ে তার গা পরীক্ষা করল সান্দনা।—কোথায় স্বর, পা তো ঠাণ্ডা পাথর! তুমি বড় শুধু শুধু কামাই কর আজকাল।

ওর হাতের এই স্পর্শ আর অমূল্যসন সমস্ত বুক গিয়ে অমূল্য করে নিল সর্দার। তারপর হেসে তাকালো হোপুনের দিক, বলল, উকেও স্বর লেগেছে, আমা সঙতে দু'দিন কামাই দেল—স্বরপালা মৃন্টিটো দেলে লে দিদিয়া।

সত্যিই এবার না তাকিয়ে পারল না সান্দনা, আর হেসেও ফেলল। ওর ভিতরকার ঠাণ্ডার আঁচ দশ হাত দূর থেকেও উপলব্ধি করা যায়। মুখ তুলে হোপুন হুঃসহের দিকেই তাকালো। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় আগের মতই, কোন তারতম্য নেই।...একদিন শুধু অন্তরকম দেখেছিল। চাঁদমণির সঙ্গে সেই পাহাড়ের নির্জনে—।

পাগল সর্দার কি বলে চলছে ঠিক যেন কানে যাচ্ছে না, তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সান্দনা। ক'টা মাসে সর্দারের বয়েস যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কালো মুখে নিশ্চিন্ত ভরা নেমেছে একটা।...পাগল সর্দার বড়িয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদমণির খবর কিছু পেল সর্দার? এক মুহূর্ত। সর্দারের স্থবিরতা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল বৃষ্টি। কীর্ণহ্রাতি চোখের কোটরে লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যাধের তুর পরিচাপ চিকচিকিয়ে উঠল। সময় লাগল সামলে নিতে। অবসাদাচ্ছন্ন, মহা জবাব দিল তারপর, উ আফুসীর লাম তু আর এখনে লিস না দিদিয়া—।

নাম আর নেয়নি সান্দনা। বা বোঝবার ওটুকুতেই বুঝে নিয়েছে। বাইরের দিকে চোখ পড়তে বাস্তব হয়ে উঠল। বিকেলের খালো কমে আসছে। চাঁদমণি যদি আসে—। এসে যদি ফিরে যায়! আর বসতে পারল না এক মুহূর্তও। ভিতর থেকে কিছু যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

কিন্তু দিন যায়, চাঁদমণি এলো না।

হোপুন আর পাগল সর্দারের ক্ষতি কিছুতে আর বড় করে দেখতে পারছে না সান্দনা। রাগ হয় ওর বাবার ওপর, কেন এতদিন বিয়ে দেয় নি। রাগ হয় হোপুনের ওপর, কেন জোর করেই বিয়ে করেনি এতদিন। নির্দারুণ ভয়ে নিজের বাবার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে পারেনি মেয়েটা। শুধু ওকে বিশ্বাস করেছে, ওর কাছে এসেছে। আশ্চর্য। কিন্তু আবার এলে বসে তবে, তার বাবাকে দেখে কাজ নেই চাঁদমণি, তুই পালা শিগগীর, যেখানে হোক পালা। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, এতবড় পৃথিবীতে কোথাও আর আশ্রয় নেই—। বীভৎস শকুনির ছায়া নেমেছে ওর জীবনে।

ঘরকর করে ওঠে সান্দনার বুকের ভিতরটা। কাঁপুনি ধরে সর্দার। দিনে অস্বস্তি। রাতে ঘুম নেই। সেই পা-ভেজানো কান্নার স্পর্শ ভুলতে পারছে না কিছুতে, চোখের কোণে এসে জমছে। মন বলছে চাঁদমণি আর আসবে না। যে জন্তে এসেছিল বলে গেছে। তবু সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উজলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার গাঁড়তর হতে নিজের অজ্ঞাতে অনাচে কান্না চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক একবার। কোথায় বৃষ্টি কালো মেঘের কালো ছায়া পড়ে একটা। উৎকর্ণ। কখন বৃষ্টি ভীতজন্তু ফিস ফিস ডাক কানে আসে চাঁদমণির, দিদিয়া! ই-দিদিয়া—! [ ক্রমশঃ।

# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

অনন্ত কেবিনে বেঠর জুড়ে সকলে বসেছিল। ওকে ফিরতে দেখেই চীৎকার করে ওঠে—কেঠনা', সারা দিন কোথায় ছিলে, এদিকে যে সর্পনাশ হয়ে গেছে!

—কি হয়েছে?

—আজকের মিটিং-এ একেবারে লোক হয়নি, রাঘব বোয়াল বেগে অস্থির। আজই তোমাকে দেখা করতে বলেছে।

কেঠ বিরক্ত হয়, কেন, সোজা হ'ল না কেন?

—আহা, ওর কাছেই যে 'হুমান মার্কা'দের মিটিং ছিল, শানারা এমন বজ্জাত, মিটিং-এর পর চা পাওয়াবে বলে সবাইকে টেনে নিয়ে গেল।

আবও বিরক্ত হয়ে কেঠ বলে, তোরা কোন কক্ষের নোস, ওদের মাইকের তারটাও তো কেটে দিতে পারতিস?

—তুমি নেই, সাহস হল না।

—হা, এখন ছালাতন করিস না, রাঘব বোয়ালকে বলে দে আমার শরীর খারাপ, কাল দেখা করব।

সবাই চলে গেলে এক কোণে কেঠ চুপ করে বসে থাকে। 'আত্তা' এক বার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ এত চুপচাপ কেন?

—শরীরটা ভাল নেই আত্তা'।

অনেকক্ষণ বাদে প্রভাত এল, একটা পত্রিকা কেঠর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেখ, এবারের ইস্তা কেমন হয়েছে!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঠ নেড়ে-চেড়ে দেখে বলে, ভাল।

—কভারের ছবিটা দেখ, এরকম টাটকা মেয়ের ছবি দেখেছিস? এ বই-ষ্টল-এ পড়তে পাবে না, একেবারে হট কেক।

কেঠ উত্তর দেয় না, জানে প্রভাত এখনও বক-বক করবে।

—সুচীপত্র বার কর, সব কটা লেগা আনা। গোপেশ রায়, বীণা চ্যাটার্জী, 'ক থ গ,' সৌমেন তালুকদার সব আমি। কিন্তু পড়ে দেখ, এক বারও বুঝতে পারছি না যে একজনই সব লিখেছে।

—বাহাদুর বটে!

—লেখকদের একটি পয়সা দিতে হবে না, এ না হলে আজকালকার দিনে কাগজ চলে?

প্রভাত একটু চুপ করে থেকে কেঠর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে রে, এত গম্ভীর কেন?

কেঠ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দুনিয়াটা বড় গোলমালে।

পবদিন সকালে কেঠ এল রাঘব বোয়ালের খাড়া: আগে থেকেই সেখানে মিটিং চলছিল। কেঠকে দেখে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, ছি, ছি, আর বোল না। লজ্জাব এক শেষ! বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাঠে একটা লোক নেই! আর নাকের ডগায় হুমান

মার্কারে কি ভীড়, ঘন ঘন জয়ধ্বনি, এত অপমান আর আমার জীবনে হয়নি।

কেঠ কথা চাপা দেয়, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাই বা গোলমাল। সামনের মিটিং-এ নিশ্চয় এর শোধ তুলব। পরন্তু তে কোণ পার্কে আমাদের মিটিং-এ দেখবেন কি কাণ্ড হয়।

রাঘব বোয়ালকে আশস্ত করে কেঠ তার দলবল নিয়ে বসল পরামর্শ করতে। পুলিশ বললে, কেঠনা', বলে তো এলে পরন্তু দিন তে কোণ পার্কে মিটিং করবে, কিন্তু সেদিন হুমান মার্কারেও যে এখানে মিটিং আছে।

—জানি, ওরা সময় দিয়েছে পাঁচটা, আমরা চারটে থেকে ষাঠর অষ্ট দিকটা দখল করে বসব। বত লোক আসবে, দেখবি স্ফু-স্ফু করে আমাদের দিকে চলে আসবে। ওদের মিটিং কিছুতেই জমবে না।

যে কথা সেই কাজ। রাতারাতি কেঠর দল তে কোণ পার্ক রাঘব বোয়ালের পোষ্টারে ছেয়ে দিল। দুপুর থেকে মাইকে সিনেমার গান বাজতে লাগল, দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে ওঠে।

কেঠ বলে, দেখতে হবে না, মাঠ ভরে যাবে। বেকার, ভ্যাগাবণ্ড আর হুল-কলেজ-পালান ছাত্রের সংখ্যা কি কম নাকি? এমন তে কোণ পার্ক তিনখানা ভরে যাবে।

পুলিশ বলে, কিন্তু সাবধান, ওদের দলও ছেড়ে কথা কইবে না, শেষ অবস্থ মারামারি হতে পারে।

—আমি তো তাই চাই, আমরা তৈরী হয়ে এসেছি। ওরা তো আঁটবাঁট বেঁপে আসবে না, খুব একচোট হয়ে যাবে।

রাঘব বোয়াল বক্তৃতা দিতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। এত লোকের সামনে তিনি আগে কখনও বলেন নি। কেঠর দলের লোক মাইকে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল, সংগে সংগে ঘন ঘন করতালি, শাঁখ, বাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। রাঘব বোয়াল ছালাময়ী ভাবায় বক্তৃতা শুরু করলেন। চললও কিছুক্ষণ, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। হুমান মার্কারে অনেক এসে পড়ে চীৎকার চোঁচা-মচি করে বক্তৃতা থামিয়ে দিতে চায়। কেঠর দলও তৎপর হয়ে ওঠে। বচসা শুরু হয়ে গেল, দাঙ্গা হবার উপক্রম, কয়েক মিনিটের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেঠর দল সোড়ার বোতল ছুঁড়তে থাকে, বেশ কয়েক জন জখম হল। রাঘব বোয়াল এক স্তম্ভোৎসবে বক্তৃতা থামিয়ে গাড়ী চড়ে পালিয়ে গেলেন। দাঙ্গার জের চলল অনেকক্ষণ। হুমান মার্কারে দল প্রথমটায় মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আরও লোকজন নিয়ে ফিরে এসেছিল। ঠিক সময় পুলিশ এসে না পড়লে রক্তারক্তি কম হত না। হাতের কাছে যাদের পেল, পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। মাজে



প্রগতি ঘোষ লাক্স টয়লেট  
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন  
“এর শুদ্ধতা এই এর বিশুদ্ধতা  
প্রমাণ করে।”

প্রগতি ঘোষ শ্রদ্ধা শিরি এবং হৃদয়ী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের তাঁকে  
ভাল লাগার জন্য তাঁর স্বকের লাভাও অনেকখানি দায়ী। সেইজন্মে তিনি সব-  
চেয়ে মেলায়েন ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুধু বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের  
সাহায্যে তাঁর স্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে স্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ  
স্বের মত ফোয়ার রাশি আপনার সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লা ক্স ট য় লে ট সা বা ন  
চি ত্র - তা ব কা দে র সৌ ন্দ র্য সা বা ন



হ'জন ছাড়া কেউর দলের সকলেই পুলিশ আসার আগেই পালিয়েছিল।

কেউরা ফিরলে উৎকণ্ঠিত রাঘব বোয়াল জিজ্ঞেস করলেন, কি হল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না! মারামারি কেন?

কেউ জবাব দিলে, হিংসে, হিংসে, তা ছাড়া আর কি! ওদের মিটিং-এ লোক হয় নি, তাই ইচ্ছে করে গোলমাল বাধাল।

—সোডার বোতল ছুঁড়ছিল কারা?

—ওরাই তৈরী হয়ে এসেছিল, ভাগ্যিস আমাদের বিশেষ কিছু লাগেনি। নিরীহ জনতার উপর অত্যাচার!

রাঘব বোয়াল বলেন, বাই বল, এত ভীড় হবে আমি আশা করি নি।

—বলেছি তো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আপনার জয় অনিবার্য।

ক'দিনই শ্রামল এসে ফিরে গেছে, কেউর সংগে দেখা হয় নি। অবশ্য আজ-কাল অনন্ত কেবিনে একলা বসে থাকতে তার খারাপ লাগে না। আশুদা', প্রভাত, পুলিশ অনেকের সংগেই আলাপ হয়ে গেছে। আশুদা' বলেন, অত 'কেউদা' 'কেউদা' করে ছটকট কর কেন? বসে চা খাও না। একবার যে এখানে চা খেয়েছে, সে ঘুরে-ফিরে ঠিক এখানে আসবেই।

প্রভাত খেট ধরে, তা আর বলতে, আশুদা'র চা না খেলে আমি তো লেখার ইম্প্রেশনই পাই না।

শ্রামল জিজ্ঞেস করে, এখানে এত গোলমালের মধ্যে কি করে লেখেন?

প্রভাত হাসে, আমার এগানে-সেখানের বাছ-বিচার নেই। যেখানে বসিয়ে দেবে, লিখে যাব। এই দেখ না, একটা উপস্থাপনা লিখছি। মাত্র তিন দিনে এতখানি লেখা হয়ে গেছে আর খুব হলে সাত দিন, তিনশ' পাতার মোটা বই।

—বই-এর কি নাম?

—মধুবালা।

—সিনেমার মধুবালা?

প্রভাত হাসে, বিজ্ঞের হাসি, তার সংগে কোন সম্বন্ধ নেই, শুধু ঐ নামটা দিয়েছি। এখন থেকে বই-এর অর্ডার আসছে।

একটু চুপ করে থেকে শ্রামল জিজ্ঞেস করে, আপনি ভিটেটিকিট বই লেখেন নি?

—অনেক, তবে নিজের নামে নয়। নাম খারাপ হয়ে যায় কিনা, তাই 'অবধূত' ছদ্মনামে লিখি।

শ্রামল বিস্মিত হয়, আপনিই অবধূত?

প্রভাতের উত্তর দেবার আগেই কেউ এসে পড়ে, এই যে শ্রামল, ক'দিনই স্তোর সংগে দেখা হচ্ছে না, কি খবর?

প্রভাত বলে, তোরা গিয়ে ওদিকটার বোস কেউ, আমি ততক্ষণ আরও হু'চাপটার লিখে নিই।

শ্রামল উঠে এসে কেউর পাশে বসে পড়ে, কেউ জিজ্ঞেস করে, চেগারায় বেশ ওটক এসেছে দেখছি, ভালো মাহুস ভাবটা কেটে গেছে, ভাল।

শ্রামল আগের মত লজ্জা না পেয়ে বলে, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব কেউদা'।

—খুব বড়লোক হয়েছিস বুঝি?

—এক দিনে প্রায় দশ টাকা পেয়েছি।

—বাঃ বাঃ, বাহাদুর তো!

শ্রামল উৎসাহিত হয়, প্রথম দিন যে লাভ বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে পুরোন বই নিয়ে এসেছি। বিক্রী করে চার কি সাড়ে চার টাকা পাব।

—বাড়ীতে কেউ কিছু জানতে পেরেছে?

—না।

কেউ ব্যাগ থেকে একটা চাদর খাতা বার করে শ্রামলের দিকে এগিয়ে দেয়।

—সবস্বতী-পূজা আসছে, খাতা নিয়ে চাদা তুলে বেড়াবার চেষ্টা করলে দিনে চার পাঁচ টাকা ঠিক উঠবে। দুপুরের দিকে বাবি, যে সময় ঘেরেরা থাকে।

শ্রামল ঘাড় নেড়ে কেউর হাত থেকে খাতা নেয়, এ যে অনাধ-বান্দব সমিতির চাদর খাতা।

—তাই তো দিলাম, এদের পূজা খুব নামকরা, চাদা চাইবার অশ্রুবিধে হবে না। কিন্তু সাবধান! ওদেরই দলের কারো কাছে গিয়ে হাজির হোস না।

শ্রামল হেসে উত্তর দেয়, সে আমি ম্যানেজ করে নেব।

আজ কেউর ঘুম ভেঙ্গে যায় অল্প দিনের চাইতে অনেক আগে। রাত্তায় ধরানো উল্লুনের ঘোঁরায ঘর ভরে গেছে। বিরক্ত হয়ে কেউ নীচে নেমে এসে কলতলায় মুখ ধুয়ে নেয়, ডাকে, শ্রামা চা দিয়ে যা। কেউকে এত আগে উঠতে দেখে বিস্মিতা শ্রামা জিজ্ঞেস করে, এত সকালে উঠে পড়েছ, কোথাও যাবে বুঝি? কেউ তাকে ভেজিয়ে বলে, কোথাও যাবে বুঝি? ঘরময় যে ঘোঁরা, সকাল বেলা জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়ারও সময় হয় না?

—“মা, তাইতো। আমি একেবারে ভুলে গেছি কাকু, ছি ছি!

কেউ ধামিয়ে দিয়ে বলে, যা, চট করে এক কাপ চা নিয়ে আয়, আমার বেরতে হবে।

কেউ ওপরে উঠে গিয়ে জামা-কাপড় পরে। জুতো-জোড়া বড় মরলা হয়েছিল, বসে পালিশ করে নেয়। একটু পরে শ্রামা চা নিয়ে আসে, সংগে গরম তেলোভাজা। কেউ খেতে খেতে বলে, বাঃ বেশ গরম তো, নে দুটো খেয়ে জাখ।

তার কথামত শ্রামা একটা বেগুনি নিল্ল মুখে দেয়, উঃ, ভীষণ গরম!

শ্রামা মুখ থেকে বার করে উঃ-আঃ করতে থাকে। কেউ হেসে কলে।

হঠাৎ শ্রামা জিজ্ঞেস করে, কাকু, তুমি বিয়ে করবে না?

কেউ বিস্মিত হয়, এখরখের প্রশ্ন সে আগে শ্রামার কাছে শোনেনি, জিজ্ঞেস করে, বিয়ে কেন?

—বাঃ, সবাই তো বিয়ে করে।

কেউ হাসে, এ নিয়ে কথা হচ্ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, কালকে।

—কে বলছিল?

—বিভূতি বাবুরা এসেছিলেন যে—

—কোন বিভূতি বাবু, ঐ হলদে বাড়ীর ভাড়াটেবা?

—হ্যাঁ, শীলাদি'র সংগে তোমার বিয়ের জন্তে ।

—কি কথা হ'ল ?

—বাবা বললেন তোমার সংগে কথা বলতে ।

কেষ্ট সিগারেট ধরায়, যাক, তোর বাবার তাহলে এত দিনে বৃষ্টি হয়েছে ।

বাগ হাতে নিয়ে কেষ্ট সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, শ্যামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাস করে, কাকু, তোমার একটা চিঠি এসেছিল পেয়েছ ?

—কই না !

—আমি যে তোমার ফোটার পকেটে রেখেছিলাম ।

—দিয়ে যা :

শ্যামা ছুট গিয়ে কেষ্টের হাতে চিঠি দিয়ে আসে । চিঠিটা খুলতে খুলতে কেষ্ট রাস্তায় বেদর, গৌরীর চিঠি ।

“প্রিয়পুত্র,

আপনি যেদিন আমার অনেক উপকার করিয়াছেন । আমার ভাই একটু ভাল আছে । আরও পাঁচ টাকার ওষুধ কিনিতে হইবে, আপনি যদি দয়া করিয়া এই কয়টি টাকা দেন তাহা বড় উপকার হয় । আমি সকাল নগ্ন হইতে প্রায় দু'-তিন ঘণ্টা ধর্ম্মভার ঘোড়ে থাকি । দয়া করিয়া হস্তবাক্ষ আশ্বিনে । ভগবান আপনার মঙ্গল করুন । ইতি

প্রণতা গৌরী ।”

চিঠি পড়ে কেষ্ট পকেট থেকে টাকা বার করে দেখে কত আছে ।

কেষ্ট যখন এসপ্লানেডে এসে জীপ ধামালো তখন প্রায় এগারোটা বাজে । অকিন যাবার ভীড় চলে গেছে তবু গাড়ী চলার বিরাম নেই । কেষ্ট গাড়ী পাক করে চার দিকে তাকায়, কিন্তু গৌরীকে দেখতে পায় না । অশ্রুমনস্ক হয়ে দেখাছিল বইএর ষ্টলে কত লোকের ভীড় হয়েছে, রিফিউজিদের লোকাল জিনিষ বিক্রী হচ্ছে । কতক্ষণ কেটে গেছে খেরাল চিস না । গৌরীর ডাকে চমক ভালে ।

—আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন ?

—না, বেশীক্ষণ না । ভাই কেমন আছে ?

—আগের চেয়ে একটু ভাল, ওষুধে কাজ দিয়েছে, কিন্তু বোগীর পথ্যি দিতে পাচ্ছি কই ।

—ডাক্তার কি খেতে বসেছে ?

—সব দামী দামী খাবার, কল, দুধ, ছানা ।

কেষ্ট কি বলবে ভেবে পায় না ।

—এখন আসছি, বলে গৌরী হঠাৎ এগিয়ে যায় রাস্তার মধ্যে । কেষ্ট দেখে পুলিশের হাত দেখানোর জন্তে অনেকগুলো গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে । গৌরী সেখানে গিয়ে ভিক্ষে চায় । কেষ্ট সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে । ময়লা শাড়ী, তেলের অভাবে চুলে জট পড়েছে, কি বলছে শোনা যায় না, চোখে করুণ প্রার্থনা । ব্যগ্র হাতে গাড়ীর দরজা ঝাঁকতে ধরছে, ড্রাইভারের ধমকে আবার হাতটা সরিয়ে নেয় । হয়ত কোন গাড়ীর কাছ কিছু পাবার আশায় আগ্রহ ভরে ছুটে যায়, পরসী পেসে দাতার উদ্দেশে শুভ কামনা জানায়, না পেলে নিরাশ হয় ।

পুলিশের বাঁকিতে গাড়ীগুলো আবার চলতে আরম্ভ করে, গৌরী কেষ্টের কাছে ফিরে আসে ।

—কত পেলে ?

গৌরী ক্লান্ত স্বরে বলে, ছ' আনা । একটু খেমে বলে, একটা টাকাও পুরো হল না । কেউ যে শুনতে চায় না । কেষ্ট স্নান হাসে, শুনলেও এরা দেয় না ।

কেষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দেয়,—এই নাও, তোমার ভাইকে ভাল পথ্যি দিও ।

টাকা নিতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল আসে, বলে আপনি দেবতা !

কেষ্ট শব্দ করে হেসে ওঠে, দেবতাই বটে, ওই যে আবার খেমেছে, দেখ যদি আর কোন দেবতা পাও ।

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই কেষ্ট গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায় ।

কেষ্ট বরাবরই গাড়ী জোরে চালায়, আজও ভীড়ের মধ্যে দিয়ে হর্ব্বাক্রিয়ে বেশ জোরেই গাড়ী চালাচ্ছিল কিন্তু মন তার গাড়ীর দিকে ছিল না । ভাবছিল গৌরীর কথা কতখানি সত্য, মাহুকের ওপর কি গভীর বিশ্বাস, আর ভুলতে পারছিল না একটা কথা, ‘আপনি দেবতা ।’

এক জায়গায় ভীড় দেখে গাড়ী থানিতে বাধ্য হল । সকলে ধর ধর করে চলেছে । কেষ্টের আসার নিমিটখানেক আগে কোন ফোর্ড গাড়ী একটা দশ বার বছরের পাড়ায় ছেলেকে চাপা দিয়ে

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**

**আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”**



প্রতি প্যাকেট  
২৪ টি  
বড় আকারের

- কল্লে প্রস্তুত
- ঈসিমে সেকা
- মেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

**আপনার স্বাস্থ্য, চাপ্তি**

**ও সঞ্চয়, রক্ষা করিতে**

**আর্য বেকারি অ্যান্ড কন্ফেকশনারী**

**কলিকাতা - ২৯**

চলে গেছে। কেউকে তারা অস্বস্তি করে, আপনার গাড়ী করে ছেলোটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দিন।

কেউ বলে, ওকে বরং ট্যাক্সী করে নিয়ে বান, আমি ততক্ষণ ফোর্ড গাড়ীটা ধরতে পারি কি না দেখি।

কেউ জোরে গাড়ী চালিয়ে দেয়, সুনতে পায় পেছু থেকে বলছে সবাই, নীল রং, বড় ফোর্ড, মেয়ে চালাচ্ছে।

রাস্তা বেশ চওড়া, জোরে চালাবার অস্ববিধে হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'বে ফোর্ড গাড়ীটা দেখা যায়, কেউ একসি-লেটারে আরও চাপা দেয়। ফোর্ড গাড়ীটাও বেশ জোরে চলেছে। অনেক বৈকে চুর, প্রায় বালীগঞ্জের কাছে এসে গাড়ীটা বড় দোতলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়। কেউ তার পেছনে গাড়ী থামিয়ে লাকির নেমে পড়ে। গাড়ীর সামনের সিটে চালকের পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। পিছনে দু'তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর এক প্রোট ভ্রলোক। কেউ কাছে এসে কর্কশ গলায় জিজ্ঞাস করে, আপনারা কি মানুষ, একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে এলেন?

প্রোট ভ্রলোকটি গাড়ী থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন, ঠিক পালিয়ে আসিনি।

—নয় ত কি, শবীরে এতটুকু দখানায় নেই?

ভ্রলোক আমতা-আমতা করেন, নতুন ডাইভার বুঝলেন কি না—

কেউ যেন বলে, ডাইভার তো গাড়ী চালাচ্ছিল না, ওর ওপর দৌর দিচ্ছেন কেন? গাড়ী তো উনি চালাচ্ছিলেন।

কেউ ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি এবার কথা বলে, যে ছেলেটি চাপা পড়েছে সে কে?

—আমার শালা।

—খুব বেশী লেগেছে?

—সরল কি বাঁচল, তা দেখবার আপনার সময় কোথায়?

—মিথো এক কথা বলছেন, আমরা তো দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, সবাই ফেপে মারতে এল দেখেই তো—

—কপাবে না, বিশ্বাস সবে ঘন নীলমণি ছেলে। থাক্ গে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে, এখন দেখা থাক্।

প্রোট ভ্রলোক তাকে থামিয়ে কথা বলেন, ছেলেটির চিকিৎসার জন্তে বত টাকা লাগে, আমরা দেবো। এ নিয়ে আর থানা-পুলিশ করবেন না। এত বড় বাড়ীর বো, বুঝলেন কি না—

কেউ শাস্ত গলায় বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। দেখি, আমার শান্তডাকে যদি রাজী করতে পারি। এখন আমার টাকা পকাশ দিন, আবার হাসপাতালেই যাই, কখন কি লাগে বলা তো যায় না।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। মেয়েটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভ্রলোক কেউ হাতে ওঁজো দেন। বুঝতেই পারছি আপনার মনের অবস্থা কিন্তু বিশ্বাস করুন, ছেলেটি অমন করে ছুটে এসে না পড়লে গাড়ীতে থাকা লাগতো না।

কেউ টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে, যদি বেঁচে যায়, আপনার চিকিৎসার টাকাটা দিলেই হবে, কিন্তু মরে গেলে জানি না আমার শান্তডা আপনার ছেড়ে দেবেন কি না।

আর কোন কথা না বলে কেউ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে আসে। চিন্তিত মুখে ভ্রলোক সবাইকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে বান। কটকে দরওয়ান বসেছিল, তার সামনে গাড়ী থামিয়ে কেউ এক টাকা বখশিস দেয়, দরওয়ান সেলাম করে।

—এ বুড়ো বাবু কে?

—বাড়ীর মালিক।

—এ মেয়েটি?

—মাইজী।

—অত ছোট?

—নয়া মাইজী।

—ও, দ্বিতীয় পক্ষ? কেউ ব্যাংক হাসে।

ফেরবার পথে কেউ আবার ঘটনাস্থলে আসে। খবর নিয়ে জানতে পারে, ঐ ছেলেটি নোড়ের মিষ্টিওয়ালার দোকানে কাজ করে।

—ধরতে পারলেন নাকি?

কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কই, পেছু-পেছু কত দু'ব দৌড়লাম, কোথায় যে বৈকে গেল!

পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, ধরতে পারলে গাড়ীর দফা রক্ষা করতাম।

কেউ সার দেয়, আশিও কি ছাড়তাম নাকি? পরে মিষ্টিওয়ালাকে বলে, আমি এসে খবর নিয়ে হাব, ছেলেটি কেমন থাকে।

নতুন বাংলা মাস পড়ে গেছে, এতই মধ্যে পত্রিকা বার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রেসের গোলমালে হয়ে ওঠেনি। তাই সকাল থেকেই প্রভাত সম্পাদকের সংগে উঠে-পড়ে লেগেছে, পত্রিকা কাগজে যুড়ে তার ওপর নাম-ঠিকানা লিখছে। গ্রাহকদের সংখ্যা বেশী না হলেও, সময় মত বই না পেলে চাদা দেওয়া বন্ধ করে। সম্পাদক বলে, গ্রাহক তো নয় সব, খাদক। পত্রিকার দেবী সেই শালাদের মেজাজ গরম। কড়া কড়া চিঠি পাঠাবে।

প্রভাত কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, পরশা দিয়েছে, করবেন না? আমরা যখন টাকা দিয়ে লেখা নিই, তখন কি আর ছেড়ে কথা কই? লেখককে বেঁধে ফেলে গল্প লেখাই না?

—এবারের গোট আপ কেমন লাগছে?

—ওপরের ছবিটা তেমন জোর হয় নি।

সম্পাদক মুখ ব্যাকায় হস্তভাগা জীবনটার জন্তে। কেউ তার ছবি ছাপিয়েছে কখনও! আমি তার নাম করিয়ে দিলাম আর শালা এখন আমার কাছেই টাকা চায়।

প্রভাত বিম্বিত হয়, বল কি, জীবনও টাকা চায়?

—নয় তো আমি কুমারেশের ছবি নিই! ও ত বন্ধ ক্যামেরায় ছবি তোলে।

—যাকগে-পত্রিকার মুখ তো এঁটে দেওয়া হয়েছে, ষ্টলে দাঁড়িয়ে বাবুদের আর পাতা ওলটাবার উপায় নেই। ও ঠিক কেটে বাবে।

এ-হেন নামকরা পত্রিকার আফিস। উত্তর-কলকাতার অনেক গলি-পুঞ্জির মধ্যে একটি ছোট কামরায়, বার সন্ধান শুধু ডাকবোগেই পাওয়া সম্ভব। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা কালিগড়া কাঠের টেবিল, আর দু'খানা নড়বড়ে চেয়ার। তাই সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক মাটিতে মাটির বিড়িয়ে কাজে ব্যস্ত।

প্রভাত আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, এবারের গল্পটা তেমন শ্রবিণের হয় নি।

—সুফটা ভালই ছিল, শেষের দিকটা ম্লিয়ে গেছে।

—কি করব, একেবারে সময় পাই না। চিঠি পত্রের জবাব দেব, প্রবন্ধ লিখব তার পর অনুবাদ করব। এদিকে গল্প উপভাস সব বিচুড়ী পাকিয়ে যায়। সম্পাদক উৎসাহ দেয়, তুমি তো সব্যসাচী হে, তুমি ছাড়া কি এ কাগজ চলতো?

কাজ শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল, প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে আসছিল, সম্পাদক বলে, বেলাগামীর সংগে ইন্টারভিউটা ভুলে যেও না।

—সে তো সোমবার দিন।

—একটা ভাল ছবি ঠেকে দিয়ে সই করিয়ে নিও, আমাদের জন্তে বিশেষ ভাবে তোলাটা লিখে দিতে হবে।

প্রভাত সায় দিয়ে বলে, সে সব আমি ঠিক করে নেব। প্রঙ্গ উত্তরও আমার সব লেখা হয়ে গেছে, ঠেকে শুধু একবার শোনাতে হবে। একটু থেমে বলে, বানীগঞ্জে বাড়ী, ট্যাক্সী করে যাব, ভাড়াটা দিয়ে দিও।

—বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সী চেপো, এখান থেকে নয়।

—সে আর বলে দিতে হবে না।

হাসতে হাসতে প্রভাত বেড়িয়ে আসে।

রাঘব বোয়ালের বড় গাড়ী এনে দাঁড়াল অনন্ত কেবিনের দরজায়। আন্ত বাব হস্তান্তর হয়ে নেমে এলেন, কাউকে খুঁজছেন তার?

রাঘব বোয়ালের ছেলে পেছনের সিট থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কেউ বাব কোথায় জানেন?

—দিন-দুই এদিকে আসেনি।

—তাকেই যে দরকার—

আন্ত বাব টাকে হাত বোলান, এসে বস পাঠিয়ে দেবো।

আপনাকে বলে যাচ্ছি, ছেলেরা দারী আসবে সব আমাদেব বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন, বাবা সকলের সংগে কথা বলতে চান।

—নিশ্চয়, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আন্ত বাব মুখ বাড়িয়ে হাঁক দেন, ভোঁদা, নরেশ, বা শীগগিরি যা, বাডুস্কে মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাঘব বোয়ালের ছেলে চলে যায়। আন্ত বাব দোকানে উঠে এসে বিড়-বিড় করেন, কেউকে নিয়ে এই জালা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে।

ভোঁদা বলে, এ আর নতুন কি, তবু তো কেউদা' এবার একটু বেশী মন দিয়েছে।

—তোমরা আর দেবী কোর না বাপু, যাও।

—আর তো সাত দিন, রাঘব বোয়ালের পরসায় ক'দিন নবাবী করে নিই। তার পর আর কে পুঁছছ, আপনিই কি আর দোকানে চকতে দেবেন?

আন্তদা' দোকান কান দেন না। কোণের টেবিলে শ্রামল বসে ছিল, সে দিকে এগিয়ে যান। তোমার কেউদা'র কোন খবর জান নাকি শ্রামল?

—না, ক'দিনই ধরতে পারছি না, তাই তো এখানে বসে আছি।

—কিছু খাবে নাকি?

—থেকেছি। একটু থেমে বলে, আন্তদা', আপনাকে কিন্তু চালা দিতে হবে।

—কিসের চালা?

—সরস্বতী-পুজোর।

—ওরে বাবা! তোমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত কুড়ি জন হ'ল। যা সরস্বতী আমার ইস্কুল থেকে কাঁটা মেরে তাড়িয়েছিলেন, তবু তাঁর পুজোর সময় চালা দিতে হবে, কি আদ্য দেখ!

—সে আমি শুনব না আন্তদা', আপনার নামে এক টাকার রসিদ কেটে রেখেছি, এই দেখুন—বলে সত্যিই রসিদ বার করে আন্তদা'র হাতে দেয়।

—তবে আর চাইছ কেন? এক টাকার পেয়ে দাম দিও না। তাহলেই আমার চালা দেওয়া হয়ে যাবে, কি বল?

—তাতে আমি রাজী আছি। নিতাই, পাউকটি আর ভিন্ন দিয়ে বা।

যর প্রায় কাঁকা ছিল, তাই আন্তদা' বসে বসে শ্রামলের সংগে গল্প করেন। বিশেষ করে নিজের জীবনের কথা, কত কষ্ট করে দোকান করেছেন, কত রকমের কাজ করেছেন, তারই বিবরণ। কথা হয়তো অনেকক্ষণ চলতো, যদি না কেউ এসে পড়ে হাঁক দিত।

—কি খবর আন্তদা', দু'দিন আপনার পাতা পাই নি যে?

—তাই বটে, চোর এসে বুড়ীকে বলছে, তুমি তো আমার ছুঁতে পারলে না।

—কেন, কি হল?

—কি আবার হোল, রাঘব বোয়াল যে লোক পাঠিয়ে পাগল করে মারছে।

কেউ বিরক্ত হয়, ও জালাতন করে মারলে, রাঘব বোয়াল আর রাঘব বোয়াল। আমার যেন মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছে। সব সময় হাজিরা দিতে হবে, যত সব—

—আহা, মাথা গরম করছ কেন?

শ্রামল এতক্ষণে কথা বলে, কেউদা', আপনার সংগে যে কথাই হচ্ছে না!

—কি করবো বল, কত দিক সামলাবো?

—আমার চালা দিতে হবে কেউদা'—

—চালা, কিসের?

আন্তদা' টিপ্পনী কাটেন, সরস্বতী-পুজোর বিজ্ঞের দৌড় তো তোমার আমারই মত কিন্তু চালা দিতে হবে।

শ্রামল আবদারের সুরে বলে, বাঃ সবাই চালা না দিলে ভাল করে পুজো হবে কি হবে?

কেউর বেশ মজা লাগে, জিজ্ঞেস করে, কাদের পুজো?

—অনাথ-বান্দব সমিতির। এই দেখুন আন্তদা', প্রভাতদা', সবাইএর কাছে চালা নিয়েছি, আপনাকে এক টাকা দিতেই হবে।

কেউ পকেট থেকে এক টাকা বার করে ওর হাতে দেয়, ঐ নে, থাক থাক, রসিদ পরে দিয়ে দিস, আমি চলি—

শ্রামল বাধা দেয়, না কেউদা', আমাদেব সমিতিতে সে হবার জো নেই। টাকা নিলেই রসিদ দিতে হবে।

—তবে লাও।

শ্রামল খন-বস করে বসিঙ্গ লিখে দেয়। কেউ একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ দুটো জল-জল করে ওঠে।

কেউ চলে যাবার পর শ্রামল অনন্ত কৈবিন থেকে বেরিয়ে সোজা পার্কে এসে হাজির হল। ওদের বিজ্ঞানবনের কাছেই এই পার্ক, দু'মিনিটের রাস্তা। স্কুলপালানো ছেলের ছোটখাট আঙা এখানে গোলই বসে। আজ অল্প এখনও কেউ আসেনি। বারটা বেগে গেছে কালো করে বোদ। পার্কের এক কোণে ঘরের বাইরে গাছতলায় খাটিয়া পেতে মাসী শুয়ে আছে। অল্প দিকে সাধারণের বিজ্ঞানের জ্ঞান যে শাণ্ডাধান, মাথা ঢাকা, ছোট বগটি রয়েছে সেখানে হুঁতন ফিরিওয়াল পাশে মাল বেগে নিমুছে। শ্রামল রাজকায় মত পুর্নিকের পেয়ারা গাছটার তলায় গিয়ে বসে। খুব আস্তে হাওয়া বইছে, চায়ের বসলে বেশ অগ্রাম লাগে। শ্রামল চিং হয়ে শুয়ে দেখছিল গাছের উঁচু ডালে ছোট ছোট পেয়ারা হয়েছে, হুঁতনটে পাখী কিসিমিত করে কগড়া লাগিয়েছে।

—এই বীরব, বুমুচ্ছিস? রেলিঙ টপকে মদন পার্কের ভেতর এসে শ্রামলকে ঠেলা দেয়।

শ্রামল ঠিক বুমুচ্ছিস, তজ্জার ভাব এসেছিল, উঠে বসে বলে, দু'ব গালা, বেশ অগ্রাম লাগছিল, তুই নষ্ট করে দিল।

—দিব্যা নৌক করে শুয়ে আছিস, তোর আর কি? আমাদের শালা এক মিনিটের কাক নেই। একবার বাইরে যেতে চাইলে মাঠাবরা কটমট করে তাকায়। তেমনি সব ভালো মানুষ ছেলে জুটেছে, বলে, কি বে সিগারেট খেতে যাবি?

শ্রামল জাসে, বেশ হয়েছে, তুই তো আর ক্লাশ রাজ কাকি দিতে পারবি না, যা রাগী দাদা, বেত মাংবে।

মদন মুখটা গম্ভীর করে বলে, সেই তো জালা! একটা সিগারেট দাও, এখনি ক্লাশে কিবতে হবে।

শ্রামল সিগারেট বাব করে মদনের হাতে দেয়, নিজের ধরায়।

—এ সময় এলি যে, টিকিনের তো দেবী আছে।

—এক পিরিয়াড আগেই ছেলের উঠানে জড় করেছে, হেড মাষ্টার কি বজুতা দেবে।

আমি সেই শ্রমোণে এই দুটো নিয়ে পালিয়ে এলাম।

মদন পকেট থেকে দুটো 'ইন্ট্রুমেন্ট বক্স' বাব করে শ্রামলের সামনে রাখে।

—একবারে নতুন যে—

—নিগে কেউ পুরোন নেয়?

—কার?

—কে জানে, আমাদেরই ক্লাশের।

শ্রামল বাক্স দুটো নেড়ে-চেড়ে বলে, আজই বেড়ে দেবো।

—হুঁ-একটা দোকান যাচিয়ে নিসু—

—তুই আর আমার শেখাস না।

মদন একমুখ ঘোঁরা ছেড়ে বলে, তোর ছোটদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি না?

—দেবো তো বলেছি। কেউনা এখন খুব বাস্তব, যোববার ভোট হয়ে থাক, তার পর একদিন—

সিগারেট শেষ হয়ে আসে, মদন জোরে টান দেয়, পালাই, দেবী হলে ধরা পড়ে যাব।

—তাহলে কখন দেখা হবে?

মদন কি যেন ভেঙে নেয়, একটা ছবি দেখবি?

—কোথায়?

—বীথিকায়, 'চিচি কাক' খুব ভাল হয়েছে।

—আলিবাবার গল্প?

—না, না, এ শুধু খিস্তি ভরা।

—কে আছে?

—বেলাবাণী।

—মাইবী! আমি তাহলে গেটের কাছে থাকব। ছ'টার সময়।

—ঠিক আছে। সম্মতি জানিয়ে মদন আবার রেলিঙ টপকে পার্কের বাইরে চলে যায়। একদিন কেউ একেবারেই ফুরসৎ পায়নি। সামনের রবিবার ভোট দেবার দিন, এই মধ্যে সব কিছু ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চতুর্দিকে লোক পাঠিয়েছে, প্রত্যেক সেটারের কাছে নিজের অফিস খোলা ব্যবস্থা করেছে, রাখব বোয়ালকে বলে তার বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকগুলো গাড়ী আনিচ্ছে, প্রয়োজন মত বুঁজে খুঁজে ছেলে বোয়াল করে এনেছে, যারা বিভিন্ন সেটারের ভার নিয়ে সেই দিন কাজ চালাতে পারবে। এর মধ্যে কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া হয়েছে অনেক আগে। বিশেষ করে পুলিন, সে তো বলেই গেল, চললাম আমি, ইমুমান মার্কাদের দলে। দেখব কোন শালা রাখব বোয়ালকে হেতায়।

কেউ চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, কাজ করবার ভাঙে সবাইকে এখানে আনানো হয়েছে। গুলতানী করবার জ্ঞান নয়।

পুলিন কেউকে ভয় করে। তাই মুখে ওপর জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এসে অল্পদের কাছে বলেছিল, কেউনা ফুটানো দেখালি? রাখব বোয়ালের পরসায় লবাবী করছে আর আমরা দুটো পরসায় চাইলেই খিচিয়ে ওঠে। চেনে না আমার, পুলিন মণ্ডল যে-সে ছোকরা নয়, এর শোধ আমি ঠিক তুলব।

এ নিয়ে দলের মধ্যে অনেক কথা উঠছিল। এমন কি, রাখব বোয়াল বলেছিলেন, কেউ, এ সময় ঝগড়াখাটি করা ভাল নয়, পুলিনকে ফিরিয়ে আন, নয় ত বল আমি নিজেকে ডেকে আনছি।

কেউ এতে সায় দেয়নি, কোন দরকার নেই ওকে ডাকবার। ও সব ছেলেকে শাস্তি করতে আমি জানি। [ ক্রমশঃ ]

### কালীমূর্তির ব্যাখ্যা

জগজ্জননী—কালী প্রকৃতি বা কালীও বলা হয়। একটি নারী-মূর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তার অর্থ, মায়ার আধরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আধরণে আবৃত করে জগজ্জননী-রূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টি-প্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ-মূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব বা ব্রহ্ম, মায়াবৃত হয়ে শবরূপ।—স্বামী বিবেকানন্দ।



# তমসী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

ডাক্তার বাবু বলছিলেন, নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর, কী তার উত্তর। এত দুঃখেও হাসি পায় হেনার। নিজের মনকে কি আজও তার জানতে বাকী আছে? সে যে কত লোভী, কত অব্যব, তার আকাঙ্ক্ষার যে শেষ নেই! তাই আপনার অন্তরকে শুধু চোখ রাঙিয়ে এসেছে এত দিন। তার অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে এতটুকু প্রশ্রয় দেয়নি। আজ মনে হচ্ছে, সাংলোভ যেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর যোগ হয় নিজেকে সে ধরে বাথতে পারবে না।

জেল-গেটের পেটা ঘন্টার ছুটো বেঞ্চে গেল। পাশের বিছানায় মোনার মা অযোগ্যে ঘুচ্ছে। সে-ও তো দীর্ঘ রাত্রির সেই প্রথম প্রহর থেকে একটুখানি ঘুমের জন্তে চেষ্টার ক্রটি করেনি? কিন্তু ঘুম আসেনি। নিম্নলিখিত চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠছে একখানা মুখ আর তার দুটি ক্রমাগত চকু—স্নেহে ককণায় ভাঙব, আগ্রহে, অল্পব্যাগে প্রদীপ্ত। ঐ মানুষটা কি রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি নয়? কাগান্দী অপরাধীর উপর মানুষের যে সহজাত ঘৃণা, স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, সে সব কি বিধাতা তাকে একেবারেই দেননি? তিনি তো ভানেন, প্রকৃত আদালতের বিচারে সে ভয়ঙ্কর অভিযোগে দণ্ডিত, জীবনের যে পথ ধরে এইখানে এসে সে পীড়াল, সে পথ পঙ্কিল, কলুষময়। তার সর্বস্ব জ্ঞানো সেই মসী-চিহ্ন কি ঠিক ঐ উদার আয়ত চোখ দুটিতে একবারও ধরা পড়ল না? সভ্য সমাজ থাকে আবর্জনার মত আত্মকুঁড়ে টেনে কেলে দিল, তিনি তাকে হুঁ হাত ধরে তুলে নিলেন, জড়াতে চাইলেন একান্ত করে, নিবিড় করে নিজের শুদ্ধ পবিত্র জীবনের সঙ্গে। প্রসন্ন-সবল হাতো সব দ্বিধা, সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তুমি বা আছে, সেই তোমার পরিচয়; তার বেশী আর কিছু জানতে চাই না।

কিন্তু তিনি জানতে না চাইলেও সে তো না জানিয়ে পারে না? তিনি ভুলতে চাইলেও সে তো ভোলাতে পারে না! নিজেকে তার প্রকাশ না করে উপায় নেই। হেনার ইচ্ছা হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে নিজেকে তাঁর পায়ে তলার লুটিয়ে দেয়, সেই পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বলে, হে আমার দেবতা, তুমি থাকে ভালবেসেছ, সে আমি নই, সে আমার এক কল্পনা-রঙীন মিথ্যা রূপ। তোমার ঐ কল্পনাময় অন্তরের মাধুরী মিলিয়ে তার জন্ম। সে তোমার সৃষ্টি, আমার বিধাতার সৃষ্টি নয়। হে আমার প্রিয়, তোমার কাছে বা পোলাম, সে যে কত বড় পাওয়া, তা কেবল আমিই জানি। কিন্তু এ

কথা কেমন করে ভুলি, তার একটা কথাও আমার পাওনা নয়? সে শুধু কীকি দিয়ে ভুলিয়ে নেওয়া। আমাকে তুমি ভেনে নাও। আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে পরিশূর্ণ আমি, তাকে তোমার সামনে তুলে ধরতে দাও। তাকে যখন দেখবে হয়তো মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, ঘৃণায় ভরে উঠবে তোমার ঐ দেবচকু। বুক ভেঙ্গে গেলেও সে তুংখ আমি সইতে পারবো। কিন্তু মিথ্যা আমি, নকল আমি দিয়ে একটা দিনের তবেও তোমাকে ঠিকিয়েছি, সে যত্নগা আমার সইবে না।

প্রবল উত্তেজনায় হেনা বিছানার উপর উঠে বসল। বার বার মাথা নেড়ে বসতে লাগল, একথা তাঁকে জানাতেই হবে। তিনি শুনতে না চাইলেও অকপটে অসহ্যে মেলে ধরতে হবে তার গ্লানিময় রূপ, খুলে দিতে হবে জীবনের যেটা অন্ধকার কক্ষ, বার মথ্যে জুপাকার হয়ে আছে পাপ অপরাধ আর কলঙ্কের বোঝা।

গভীর ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে এল। ধীরে ধীরে আবার শব্দাপ্রান্তে এলিয়ে পড়ল হেনা। পশ্চিম আকাশের কোন প্রান্ত থেকে এক টুকরা চাঁদ তার একটুখানি ক্ষীণ জ্যোৎস্না পাঠিয়ে দিয়েছিল খোলা জানালার পথে। সেই অপরিষ্কৃত আলোর চেয়ে দেখল আপনাকে। কেমন যেন মায়া হল নিজের উপর। বহিষ্ঠ জীবনের উপর এক রহস্যময় মমতা। মুহূর্ত পূর্বে যে কঠোর সংকল্প দিয়ে নিজের মনকে সে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিল, তার গ্রাস্থি যেন শিথিল হয়ে এল। মনে হল, থাক না ঢাকা। জীবনের যে দিনগুলো চোখের আড়ালে পড়ে আছে, থাক না তার উপরে বিশ্বাসের আবরণ। কী কাজ তাকে খুলে দিয়ে? কুয়াশার স্নিগ্ধ মায়া যদি মোহ রচনা করে থাকে কারো মনে, সূর্যের রক্ত আলোর তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে কী লাভ? সে তো ইচ্ছা করে, ছল করে কাউকে ভোলায়নি? তবু যদি কেউ ভুলে থাকে, সে ভুল নাই বা ভাঙল? তার অনাগত জীবনের সম্পদ হয়ে থাক সেই ভুলের ফসল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, পূর্বদিকের জানালা দিয়ে খানিকটা বোধ এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। ষড়মড় করে উঠে পড়তেই চোখে পড়ল পাশের খাটে বসে মোনার মা তার দিকে চেয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, আজ তুমি হেরে গেছ, দিদিমাণি! আমি তোমার আগে উঠেছি।

হেনা লজ্জিত হয়ে বলল, আমাকে তাকনি কেন?

—আহা ; বড় ঘুঘুছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করলাম না। শরীর ভালো আছে তো ?

—হ্যাঁ গো :—কথায় কথায় এমন শরীর খারাপ করে না আমার।

বিছানা থেকে নেমে চার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, সব তো বুঝলাম। আমাকেও ডাকনি, নিজেও বসে আছ গণেশ ঠাকুরের মত। এদিকে গোছগোছ সব পড়ে আছে। আজ আবার বাইরের হাসপাতালে যেতে হবে, মনে আছে তো ?

—আর পারি না মা ! এখানেই তো বেশ চিকিৎসা হচ্ছে। এতেই যা হয়, হবে। এই বুড়ো হাড় আর টানাটানি সয়না।

—সয় না বললে হবে কেন ?

—খুব হবে। তুমি ডাক্তার বাবুকে একটু বুঝিয়ে বল। তাহলেই স্তনবেন। একটু খেমে উদাস হয়ে বলল, তোমাদের ছুঁজনের হাতে যদি না সাধে, এ রোগ স্বপ্নে গিয়েও সাধবে না।

তোমাদের ছুঁজনের হাতে ! হেনার বুকের মধ্যে একটা অত্যন্ত কোমল জায়গায় যেন হাত পড়ল। বাথার টনটন করে উঠল সমস্ত বুকখানা। আর কোনো কথা না বলে কাপড়জামা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কলতলার দিকে।

দৃগতঃ স্নহ হয়ে উঠলেও যন্ত্রাঙ্গীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের ভাবনা সহজে বোটে না। উপসর্গ সব বন্ধ হয়ে গেছে। ওজন লাগিয়ে উঠছে ধাপে ধাপে। তবু ডাক্তারের হাত থেকে তার ছুটি নেই। তখনো মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে হবে রক্তনরশির কবলে। আবার তোলা হবে আলোকচিত্র। সেই হাড়পাঁজরাগুলো আলোর সামনে তুলে ধরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখবেন বিশেষজ্ঞ কোথায়, কোন কোণে লুকিয়ে আছে সেই সর্বনাশা স্নহেহ বন্দুতগুলো। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের উপর যনিয়ে উঠবে পাণ্ডুর ছায়া। তীব্র উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান বোগীর আত্মীয়ের দিকে মুখ তুলে বলবেন,—‘নাঃ, আর একটা কোর্স নিতে হবে।’ তার পর প্যাড টেনে নিয়ে লিখবেন প্রোগনিকশন আর তার সঙ্গে আর এক দফা রাজসিক খাজতালিকার পুনরুক্তি।

বুড়ীর এখন সেই পর্যায়। বিশেষজ্ঞের নির্দেশে অ্যান্থ্রাক্স চড়ে আজও তাই ছুটতে হল বাইরের হাসপাতালে। তাকে রওনা করে দিয়ে হেনার হাতে কোনো কাজ ছিল না। শরীর কাল থেকেই ক্লান্ত। তার উপরে মন ভরে আছে গভীর অবসাদে। চুপ করে পড়েছিল বিছানায়।

ডাক্তার দেখা ; ডাক্তার দেখা ; এবার হল তো ? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল কমলা, ও মা, এমন অসময়ে শুয়ে !

হেনা একটু পাশের দিকে সরে গিয়ে বলল, কী করবো, কাজকর্ম নেই ; তাই শুয়ে পড়লাম। বোস্ না। কী বললেন ডাক্তার বাবু ?

কমলা তার কোলের কাছটিতে বসে পড়ে বলল, কী ভীষণ ভয় হয়েছিল, জানো দিদি ? কত কী হয়তো জিজ্ঞেস করবেন। কেমন করে কী উত্তর দেবো ! সে সব কিছু না। খালি বললেন, কী কষ্ট হয়, বলো। আমি বললাম, গাঁটগুলোর ব্যথা। বাস্। তার পর হাতটা দেখলেন, চোখের কোণটা একটু টেনে দেখলেন। বললেন, এক দিন বল নি কেন ? রোগ কখনো পুবে রাখতে আছে ? স্নহীলা মাসীমাকে বললেন, কম্পাউন্টার বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রক্ত নিতে হবে। বাবার সময় আর একবার ফিরলেন আমার দিকে, কিছু ভয় নেই ; গোটা কয়েক ইন্জেকশন দিলেই সেরে যাবে।— এমন মিষ্টি করে বললেন কথাগুলো ! মনে হচ্ছে, অসুখ আমার আত্মক ভালো হয়ে গেছে।

হেনা হঠাৎ প্রশ্ন করল, মাসীমা কি কয়ছে রে ?

—কেন ?

—কাজ আছে।

—ওর কাছে এখন আবার কী কাজ ?

—বিকালের দিকে একবার আফিসে নিয়ে যেতে বলবো।

—আফিসে ! খিল-খিল করে হেসে উঠল কমলা ; চাকরি চাকরি পেলে নাকি কিছু ? সেই যে কী নাম বাবুটির ? ক’দিন সেজেগেজে ঘোরাঘুরি করলেন। তার দপ্তরে বৃষ্টি ?

এবার, হেনাও হেসে ফেলল। তার পর হঠাৎ গভীর হয়ে বলল, না, ঠাটা নয় ; জেলের সাহেবের কাছে যেতে হবে এক বার।

কমলা বিস্মিত হল, জেলের সাহেবের কাছে !

—হ্যাঁ। এবার বোধ হয় সত্যিই তোকে ছেড়ে চললাম, কমলা ! বলে ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

কমলা চমকে উঠল, ছেড়ে চলে ? কোথায় ?

—কোথায় আবার ? আর কোনো জেলে। অবিশিষ্ট ওরা যদি রাজী হন।

কমলা নিঃশ্বাস চেপে যেন আপন মনে বলল, বুঝছি। আশ্চর্য ! ঐ মানুষের কাছ থেকেও পালাতে হয় ?

—না রে ; পালাচ্ছি নিজের কাছ থেকে। নিজের ওপরে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

কমলা কণকাল তার শুদ্ধ গভীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন ঐ বলেছিলাম, আজও সেই কথাই বলবো। তুমি তুল করছ দিদি।

—কী করবো, বল, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল হেনা, বিবাতা ঠকে অত বড় দুটো চোখ দিয়েও যখন দেখনি, আমাকে তার সুযোগ নিতে বলিস !

—না। ওর চোখ ফোটাবার জন্যে নিজেকেই শুধু ছোট করে ছেঁয়ে করে দাঁড় করাতে বলি তার সামনে !

—তোরাই ভুল হল, কমলা। নিজেকে আমি ছোটও করিনি, হেরও করিনি, শুধু দেখাতে চেয়েছি নিজের বোটা সত্যিকারের রূপ।

—হ্যাঁ ; অত্যন্ত খাঁটি লোকানদার যেমন তার খন্দেরকে সাবধান করে দেয়, জিনিষটা দেখে-শুনে নেবেন, স্তর। ঠকবেন না যেন।

কমলার এই শ্লেষ-তিস্ত স্বর এবার তীব্র হয়ে উঠল, এক বার ভেবে দেখেছ, এমন করে কোথায় টেনে নামাচ্ছ নিজেকে, আর সেই সঙ্গে ঐ উল্লার সবল মানুষটাকে ; বার চোখের দিকে এক বার তাকালে নিজেকে শুধু নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

—ইচ্ছে করে তো তাই দে না ? কে মানা করছে ? মুখ টিপে হাসল হেনা।

—সে কথা তো আগেই বলেছি। আমি যদি তুমি হোতাম, তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে যেতাম না। না, ঠাটার কথা নয়, দিদি ! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বিতার বুদ্ধিতে মানে আরো অনেক বড়। তবু মুখ ছোট বোনের একটা কথা হেসে উড়িয়ে



যুকের দুই ছাড়া নোর  
সমস্যা থেকে  
আমায় মুক্তি দিয়েছে

# নেস্টাম

যব, গম প্রভৃতি শস্যচূর্ণের সংমিশ্রণে  
তৈরী আদর্শ শিশু-খাদ্য। নেস্টাম  
শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের পক্ষে  
অপরিহার্য উপাদানগুলো  
যথাপরিমাণে যুগিয়ে স্বাভাবিক-  
ভাবে তাকে পুষ্ট করে।

- রান্না করতে হয় না
- সহজেই মিশে
- পরিপাক যন্ত্র  
সবল করে



নেস্টাম দিয়ে পিঠে, কেক প্রভৃতি নানা উপাদেয়  
খাদ্য তৈরী করা যায়।

বিনামূল্যে পুষ্তিকার জ্ঞান লিখুন :

নেসেল্‌স্ প্রডাক্টস্ ( ইণ্ডিয়া ) লি

পোঃ অঃ বক্স ৩৯৬, কলিকাতা • পোঃ অঃ বক্স ৩১৫, বোম্বে,

পোঃ অঃ বক্স ১৮০, মাদ্রাজ

দিও না। এটা তোমার কেনা-বেচার হাট নয়। এখানে যে চোখ বুজে নিতে পারে, সেই পায়; আর যে হিসাবের খাতা খুলে বসে, সে ঠকে। কেন, নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছ না? তুমি তো ওর কিছুই জানতে চাওনি, খুঁজতে চাওনি কোথায় লুকিয়ে আছে ওর ঠিকুজিকুজীর কদ। চোখ বুজেই তো নিয়েছ। তাই সমস্ত বুক ভরে আছে। ওর বেলাতেও তাই...

বলি, খুব তো লোকচোর বাড়ী হচ্ছে, এদিকে যে কম্পাউণ্ডার বাবু সেই কখনো এসে বসে আছে হুঁচ হাতে করে, বলতে বলতে সুনীলা জমাদারনী একেবারে 'মার'-মুষ্টিতে দোরগোড়ায় এসে হানা দিল। কমলা দাঁতে জিত কেটে ভাড়াভাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে, বাই মাসীমা। বললই বেরিয়ে গেল।

কমলার এই শেষের কথাগুলোর হেনার মনটা প্রথমে আবিষ্ট করে এল। কিন্তু সে আবেশ কাটিয়ে উঠতেও বেশীক্ষণ লাগল না। কথার মোহ বড় মারাত্মক জিনিষ। মাহুয়ের সঙ্গে এত বড় প্রতারণা বোধ হয় আর কেউ করে না। সত্যকে ভুলিয়ে দিতে, প্রকৃত বস্তুর উপর থেকে দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করতে তার জোড়া নেই। হয়তো এই সব বড় বড় কথার কাঁদে পড়ে কমলাও আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ভুলে গেছে, একদিন সেও পাবেনি। ওর সেই প্রথম কি-এর পরামর্শ যদি সেদিন শুনত, সময়ের কাছে লুকিয়ে রাখত জীবনের সেই চরমতম অভিশাপ, আজ তাহলে স্বামি-পুত্র নিয়ে পরম সুখে ঘর সসার করত। আপনার কাছে যে পরিচয়ই থাক, লোকে বলত সত্যী-সাক্ষী স্বামি-সোহাগিনী। সভ্য সমাজের পুণ্যবতীরা ওর পতিভাগ্যকে ঈর্ষা করত। ভবিষ্যৎ জীবনের সে উজ্জল আকর্ষণ তবু ওকে নীরব থাকতে দিল না। তার কারণটা হয়তো ভেবে দেখেনি কমলা। কিন্তু কারণ অস্তি সহজ—ওরা যে ভালবেসেছিল বড় বিচিত্র বস্তু এই ভালবাসা। সে অনেক হুঁখ সইতে পারে, অনেক আঘাত বইতে পারে, শুধু মিথ্যার সঙ্গে তার বিরোধ, প্রবন্ধনার সঙ্গে তার আপোষ চলে না।

কটকের কাছে দড়ি-বাঁধা ঘটাটা জোরে জোরে বাজতে লাগল। নিশ্চয়ই তোমরা-তোমরা কেউ। হয় জেলের, কিংবা কোনো ভিজিটর, নয়তো স্বয়ং বড় সাহেব। কিন্তু আজ তো বড় সাহেবের ফাইল নয়। অগ্নিদে অক্ষণে ফিমেল ওয়ার্ডে সুপারের আবির্ভাব বড় রকম অবতন না হলে ঘটে না। হঠাৎ জমাদারণীর স্তূতি-কৃত্যে সমস্ত ওয়ার্ড কেঁপে উঠল—একটি আটেনশন। সুনীলার সেই পেটেন্ট মিলিটারী কমাণ্ড। এই কমাণ্ড দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে জমাদারণী তিনটা স্বরগ্রাম ব্যবহার করে থাকে। জেলের সাহেব এলে উদার, কোনো ভিজিটর বখন আসেন, মুদার, আর বড় সাহেবের বেলায় তার। হেনার সন্দেহ হল, এটা সেই সর্বোচ্চ পুরস্কার। ওয়ার্ডে, ওয়ার্ডকম্পে বা কাছে-দূরে কোথাও থাকলে এখন তাকে অস্ত্র সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে হত। আবার বসে পড়তে হত, সুনীলা বখন হাঁক দিত, আজবর। প্রথম জেলে আসবার পর জমাদার এবং জমাদারণীর মুখে এই বিচিত্র বুলি প্রত্যেক দিন শুনেও হেনা ধরতে পারেনি কথাগুলো কী এবং ভাষাটা কোন্ দেশের। তার পর একবার পিকিটি না প্রেসেশন, কী একটা ব্যাপারে জন কতক স্বদেশী মেয়ের জেল হয়ে গেল। তাদেরই একজন ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল,

কথাটা হচ্ছে, স্কোয়াড, অ্যাটেনশন (Squad, Attention!) আরও বলেছিল, এটা নাকি হালে আহদানী। আগেকার দিনের বুলি ছিল—সরকার, সেলাম! এই মেয়েটির কাছেই প্রথম শুনেতে পায় হেনা, 'বন্দে মাতরম'-এর মত এই কুখ্যাত শব্দের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বহু দিনের বহু লালিনার নিলম্বিত ইতিহাস। সে এক দিন গেছে, বখন এই 'সরকার সেলাম' আদায় করতে গিয়ে সরকারের কত বেটন হুঁ খণ্ড হয়ে গেছে, কত লাঠির সঙ্গে উঠে এসেছে—তাজা মাংস, বুটের ঠোঁটের খেয়ে ভেঙ্গেছে কত পাঞ্জার হাড়। তবু বেয়াদা 'স্বদেশী'কে শাস্তি করা যায় নি। তার পর হঠাৎ এক দিন সরকার হাল ছেড়ে দিলেন এবং রাতারাতি 'সরকার সেলাম'-এর জায়গায় দেখা দিল এই স্কোয়াড, অ্যাটেনশন। সব দিক দক্ষা হল। শুধু মুন্সিলে পড়ল, জেলের বত জমাদার আর জমাদারণীর দল। কটমট বিদেশী ভাষার ঐ বিদ্যুৎ কথাগুলো নানা মুখে নানা বিচিত্র আকার নিয়ে কয়েকদেব কৌতুক যোগাতে লাগল।

হেনার কানে গেল, অনেকগুলো ছুতোর লক্ষ নেবু গাছের ঝোপ পার হয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। ভাড়াভাড়ি উঠে দাঁড়াতেই সুপার সাহেব সদলবলে সামনে এসে পড়লেন। তাকে দেখিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, এটি কে? কী করছে এখানে?

জেলের সাহেব বললেন, ওই এখানকার টি-বি কেসটা দেখাশুনা করে।

—I see; পা কাঁক করে, মধ্যাহ্ন সামনের দিকে বাড়িয়ে ছোট সফ লাঠিখানা ছুতোর উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন সুপার। বাই দি বাই, That old woman is not coming back. মিডিল সার্জেন্টকে বলে আমি ওখানেই ওর একটা বেড-এর ব্যবস্থা করেছি। Let this Hospital be closed down. এখানে কাউকে রাখবার দরকার নেই। জেলের দিকে ফিরে ইঙ্গিতে হেনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, Give her some hard work to do.

দলবল নিয়ে ফিরে চললেন বড় সাহেব। বাবার পথে নেবু গাছগুলোর দিকে লাঠি উঠিয়ে বললেন, Looks more like a bower than a lime orchard. এসব কুঞ্জটুঞ্জ এখানে না থাকাই ভালো। বলে বাঁকা দৃষ্টিতে একবার তাকালেন দেবতোষের মুখের দিকে।

হু-এক জায়গায় রাউণ্ড সেরে আপিসে বাবার পর এই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে এলেন সুপার সাহেব। বললেন, লুক হিয়ার, জেলের, ফিমেল ওয়ার্ড দৃষ্টান্তে আমাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ওখানে যারা থাকে তারা কেউ সত্যী-সাক্ষী নয়। সেইজন্তে ওদের দৈহিক স্বাস্থ্যের চাহিতে নৈতিক স্বাস্থ্যটাই বেশী লক্ষ্য করা দরকার। ওরা নিজেরা ভালো হোক না হোক বয়ে গেল, কিন্তু আমাদের যে-সব ষ্টাফ ওদের সঙ্গবে আসে, তারা না বিগড়ে যায়, সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে, আপনাদের কী মনে হয়?

তালুকদার অস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লেন। কিন্তু তার পরেও মনিবকে উত্তরের অপেক্ষা করতে দেখে বললেন, নজর সব দিকেই রাখতে হয়। ওদের ভালো-মন্দটাও বাদ দেওয়া চলে না।

—You are right তবে আমার ষ্টাফের স্বাধীনতা আমি বেশী দেখি। আমার মনে হয়, সম্প্রতি সে বিষয়ে চিন্তিত হবার

কারণ ঘটছে। Don't you think so? ভালুকদার বললেন, আমি তো সে রকম কিছু জানি না। সুপার বিষয় প্রকাশ করলেন, বলেন কি। কাষ্ট এস, এ, এস, আর ঐ মেয়েটাকে জড়িয়ে কোনো কথাই কি আপনার কানে আসেনি?

—তা কিছু কিছু এসেছে। ঐ সব ব্যাপার নিয়ে বারো মাথা ঘামার, কান ভারী করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। দেখতে পাচ্ছি, সেদিকে তাদের জট হয়নি।

—Oh, no, no, আপনি ভুল করছেন। বিশেষ ভাবে কারো কাছ থেকে আমি কিছু শুনিনি। তবে ওদের মধ্যে যে বেশ খানিকটা undesirable ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে, বাকি বলে romantic relations সে কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়। The Doctor must be a fool. ও হয়তো ঐ মেয়েটাকে একটা হিরোয়িন টিরোয়িন ঠাউরে বসে আছে। I admit she has charms and she appears to be respectable; but after all she is a criminal!

জেলের সাহেব আর কোনো উত্তর করলেন না। মনে পড়ল, উদারপন্থী এবং অতি আধুনিক বলে তাঁর এই মনিবটির প্রসিদ্ধি আছে। সামাজিক জীবনে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের স্বাধীন মেলামেশার তিনি পক্ষপাতী, এবং সে বিষয়ে জাতি, বর্ণ বা অন্ত সব কৃত্রিম বাধা স্বীকার করেন না। তাঁর নিজের মেয়ে সম্বন্ধেও নানা রকম অপ্রীতিকর জনশ্রুতি আছে। তিনি সে সব গ্রাহ্য করেন না, বরং মেয়ে এবং তার পুত্র-বন্ধুদের খানিকটা প্রেমই দিয়ে থাকেন। এ-হেন ব্যক্তিও যে আজকের এই ব্যাপারে বিচলিত হয়ে উঠেছেন সেটা হঠাৎ বিস্ময় মনে হলো কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তার কারণ, After all she is a criminal.

এই পাঁচিলঘেরা জায়গাটুকু হুনিয়া থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, সর্বপ্রকারে বিভিন্ন। এখানকার বারা বাসিন্দা, তাদের সঙ্গে বাইরের মানুষের মিল শুধু আকৃতির, শুধু দেহের কাঠামোয়। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় কোন ইস্কুলপাঠ্য কেতাবে একদিন যুগ্ম করেছিলেন ইংরেজ কবির লেখা কটা লাইন Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage... যিনি উচ্ছ্বাস ভরে এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তিনি কোনোদিন জেল-কেবল করেদায় সাক্ষাৎ পাননি। যদি পেতেন, তাহলে বুঝতেন, অত বড় মিথ্যা কথা আর নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়-প্রভেদ যদি কেউ ঘটাতে পারে, সে হচ্ছে ঐ stone walls আর Iron bars এ দুটো বস্তু ভেদ করবার মত দৃষ্টি আর পর্যন্ত কারো চোখে দেখা দেয়নি, হয়তো কোনো কালেই দেবে না।

জেলরকে নিঃশব্দে পাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়-সাহেব মনে মনে আশঙ্কিত হলেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আপনি ভেবে দেখুন, এসব scandal আমাদের বন্ধ করতেই হবে। আপাততঃ ওখানকার হাসপাতালটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। যদি আরো কিছু, এমন কি drastic কিছু করবার দরকার হয়, তাও করতে হবে। আচ্ছা ঐ ঘোষণাকে—

টেলিফোনের উপর টেলিফোন বেজে উঠল। সাহেব রিসিভার তুলে নিলেন। সেই স্বরোগে জেলরও বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে।

নিজের ঘরে এসে দেখলেন, বিশাল টেবিল জুড়ে জমে উঠেছে খাতা-পত্রের পাহাড়। পাশের একটা চেয়ারে বসে আছেন দেবতোর। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন না হলে এ সময়ে ডাক্তারের আসবার কথা নয়। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে এক বার মাত্র দৃষ্টি-পাত করে বললেন ভালুকদার, কী হে, তোমার আবার কি দরকার পড়ল? সেই কলেরা কগীটা বুঝি পটল তুলবার আয়োজন করাছ; সদর হাসপাতালে পাঠাতে চাও? হবে না, গার্ড একেবারে নেই, মরতে হয় তো তোমার হাতেই মরুক।

—না, না। পটল তুলবে কোন হুঃখে? সে তো দিবি চালা হয়ে উঠছে।

—তবে কী? আবার একটা কুঠি কিংবা চিকেন পক্স ছুটিয়েছ? ওসব তোমার ঐ হাসপাতালের এক কোণে রেখে দাও। cell দিতে পারবো না। সব পাগোল-ভর্তি।

—এসব ব্যাপার নিয়ে আসিনি, দাদা! এসেছি নিজের কাজে। বলে, একখানা টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। ভালুকদার হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে বললেন, কী এটা?

—পড়লেই বুঝতে পারবেন।

খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্বান হেসে বললেন জেলের সাহেব, বুঝছি। কলেরা নয়, কুঠও নয়। তার চেয়েও মারাত্মক কিছু।

ডাক্তার কোনো জবাব দিলেন না। উঠে পাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি চলি। আপনার মক্কেলরা সব সার বেঁধে পাঁড়িয়ে আছে। আমারও অনেক কাজ বাকী।

জেলের সাহেব হঠাৎ অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার চলতে শুরু করতেই প্রমত্ত করলেন, একটা কথা জিজ্ঞাস্য করবো। তোমার এই ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে কি আজকের ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক আছে?

—না, দাদা! ছুটির কথা ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম। কাল রাতিরে মন স্থির করে ফেললাম। আজ সকাল থেকেই ওটা পকেটে করে ঘুরছি।

একটু পাঁড়িয়ে চেয়ারের পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, অ্যান্টিকেশন তো দিলাম। এখন কত দিন বুলিয়ে রাখবেন, কে জানে? এটা পাঠানো হবে, যজ্ঞ হবে, লোক পাওয়া বাবে কি না, শেলও সে কবে আসবে—অন্ততঃ হাসপাতালের খাঙ্কা। তবে আপনি যদি একবার কত্তাকে বুঝিয়ে বলেন, জর্ডারের অপেক্ষা না করেই হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন। ডাক্তার সেন তো রইলেন। দরকার হলে 'পুলিশ হাসপাতালের মল্লিক এসে ক'দিন ঠাণ্ডা দিয়ে যেতে রাজী আছে। এক বার বলে দেখুন না?

ভালুকদার খানিকক্ষণ ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি নিশ্চিত থাকো। তোমাকে আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবো।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্থব্ধ হয়ে পাঁড়িয়ে থেকে বীরে বীরে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশবুকের বোঝা নিয়ে বাস্তব ভাবে হুকে পড়লেন হেড ক্লার্ক।



# ওহর আধারে

— সিন্ধু —

তীর্থ সেবে আবার পরিচিত পরিবেশে ফিরে আসবার পর তীর্থচরণগুলোর কথা শ্রবণ করলে কেমন যেন বিষম লাগে। হাসি পায়, বিশ্বাস করতেও সঙ্কোচ হয়, কবুল করা তো দূরের কথা। সত্যি কি এমন অকারণে ভাববিভোর হয়েছিলাম?— এমন নির্দোষের মতো কি সত্যি অবিশ্বাসিত ঈশ্বরের কাছে পূজা নিবেদন করেছিলাম? অশিক্ষিত অমাজিত এক পাণ্ডাই বা কেমন করে অত সহজে অতঙ্কুর টাকা ঠিকিয়ে নিতে পারল? ঐ সব যুক্তিহীন অবাস্তব কিয়দস্তীগুলোই বা বিনা প্রতিবাদে বৈধ্য ধরে শুনে কি করে? তীর্থে তো এই আমিই গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আমি কি ঐ আমি?।

যাত্রীবা কিন্তু বিশ্বাস করে যে, তীর্থে গেলে যাত্রীর জন্মান্তর হয়। আজকের এই বস্ত্রবানী যুগে জন্মান্তর শব্দটায় চট করে বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু তীর্থে গেলে সংশয়প্রবণ সংস্কারমুক্ত যাত্রীর মধ্যেও যে একটা ভাবান্তর আসে তা অনস্বীকার্য। আর মৌলিক অবস্থার সঙ্গে এই ভাবান্তরের প্রকৃতিগত প্রভেদ অকস্মাৎ এমনই প্রবলরূপে প্রকট হয়ে ওঠে যে, আলাঙ্কারিক অর্থে অন্ধত জন্মান্তর শব্দটা ব্যবহার করলে আদৌ অত্যাক্তি হয় না। এখন পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ জগৎ ছেড়ে অপব এক চেতনা-সর্বস্ব সন্তাপ্রাহ অস্তর্জগতে প্রবেশ করা। পূর্বের যুক্তি এখানে অযৌক্তিক, পূর্বের সংশয় হান্তকর, পূর্বের বিশ্বাস ছেলেবেলা। এখানে সর্বদা দুইয়ে দুইয়ে চাব হয় না। ধোঁয়া দেখেই পর্বত বহিমান অম্মান করলে অনেক সময় ভুল হয়। অথচ ঐ জগতেরও নিজস্ব যুক্তি আছে, বিশ্বাস তো আছেই আর তাছাড়া আছে যোগ-বিরোগ গ্রায-অগ্রায সব কিছু। ঐ জগতের পরিপ্রেক্ষিতে যে ঐ সব কিছুই আবার সমান যুক্তিসঙ্গত, অপব জগৎ থেকে ক্ষণকালের জন্ত নিছক ভ্রমণ-মানসে এসেও তা অস্বীকার করা অসম্ভব।

এখন ঐ দুই জগতের মধ্যে কোনটা অধিকতর সত্য এবং কোনটা অপেক্ষাকৃত মিথ্যা, তা নিয়ে দলীয় দার্শনিকদের কখনো যুক্তি-প্রতিযুক্তির অভাব হয় নি। বিপদ শুধু আমাদের মতো অদার্শনিক ইতরজ্ঞানদের—কেবল তর্কে যাদের জিজ্ঞাসা মেটে না—যারা জীবনটুকু কাটাবার জগে একটা শাণমিঠা সহজ ভাব চায়। দেহ আমাদের একটিটি, সামাজিক চৌহদ্দিতে জীবন সেও একবচন, মনও সর্বত্রগামী নয়,—একোদর পৃথক-গ্রীবা হয়ে যুগপৎ দুই জীবনেরই স্বাদ গ্রহণ করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বিপদ হয় যখন ঐ আমাদেরই একজন ইন্দ্রিয়সর্বস্ব বাহ-জগতে লালিত-পালিত বর্জিত হয়ে, ঐ পরিচিত জগৎটিকেই একমাত্র জগৎ বলে বিশ্বাস করবার পরমুহূর্তের অনবধানে অকস্মাৎ অপব অস্তর্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করে, তার কেবল বিপরীত নয় বিরোধী যুক্তি, বিশ্বাস, গ্রায ইত্যাদিকে আর কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না তখন। একক জীবনটাই যেন

তখন বিধাবিভক্ত হয়ে একাধি অপরাধের সঙ্গে মরণ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। চেতনসত্তা অপেক্ষা ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত, অতএব বতক্ষণ সজ্ঞান থাকি, ততক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়পক্ষই সমর্থন করি। কিন্তু সর্বক্ষণ সজ্ঞান থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় একটু রাস্তা হলেই চেতনসত্তা তখন তার অধিকার বিস্তার করতে থাকে—মুহূর্তমধ্যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। এই

আত্মকলহে নিরপেক্ষতার অবকাশ নেই এবং অবশস্তাবাক্রমে একবার মুহূর্তের জন্ত পক্ষ-নির্বাচনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেই অচিরকালের মধ্যে ঐ কলহের প্রতিক্রিয়া নিগূহীতের বাহীর্জীবনে পরিমুট হতে শুরু করে, ব্যক্তির জীবন তখন একটা বিলম্বিত যন্ত্রণা; অজস্র কোষের সমন্বয় নয় সংগ্রামক্ষেত্র। তখন কখনো মনে হয়, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো? নেচে এই আবছায়া কতকগুলো ধারণাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যেন? আবার কখনো ঘৃণা হয় যে ইন্দ্রিয় কি চিরকালই এমন মাঝে মাঝে অংগতনে টেনে নেবে?—নিজের উপর কি কখনোই একটু অধিকার জন্মাবে না? জীবনের তখন কোন দিশা নেই, গাত নেই, সিদ্ধান্ত নেই, উদ্বেগ নেই,—একটা অচলায়তন মৃত কাঠের গুঁড় নদীর পাকে পাকে ভেসে চলেছে, কখনো মন্দিরের ঘাটে ঠেকে, কখনো শ্মশানের ঘাটে।

আমি চতুরতর যাত্রী, অনেক বড়ো শঠ। উপযোক্ত গতিপথের শেষ প্রান্তে পৌছবার অনেক আগেই আমি অনেক মিছা কথা বলে অনেক অছিলা করে আবার নিজেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি পরিচিত পুরানো জগতে। ঐ প্রত্যাবর্তন হয়তো চিরস্থায়ী হবে না কিন্তু ইতিমধ্যে দুই জগতের অভিজ্ঞতার বাহাহুগী দেখিয়ে কিছু বাহবা লোটা যায়।

আমি হয়তো নিজেকে বতটা মনে করি আসলে ততটা চতুর নই। সেই ভাবান্তরিত জগতের গ্রায ও যুক্তির ধারা ঐ জগতের পাঠকের কাছে বিবৃত করার পিছনে আমার বাহবা লোটোর অভিসন্ধিটা হয়তো একান্তই আপাত। সেই জগতের কথা আমি ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবো না। সেই জগতের যুক্তি আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি নি হয়তো বুঝতে পারবোও না। আমার সত্তা তবু একবার তার উৎসের সন্ধান পেয়েছে এবং ক্রমাগতই সেই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। সেই ভাবান্তরের কথা বার বার নিজের কাছে বলে, লিপে বার বার চোখের সামনে ধরে নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমি হয়তো যাচাই করে দেখছি সেই ভাবান্তরিত অস্তিত্বের ভিত্তি;—সেই ভিত্তি সত্য কি কাল্পনিক, পরিহারযোগ্য কি অপরিহার্য, তাক্য কিথা কামা। চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্বে এ হয়তো একটু আত্ম-সান্তনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মতো ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কার্ণ-কারণ সূত্রও অনেক জটিল, জট। অপরিচয়ের দক্ষণ এই জট মুক্ত করা অধিকতর দুঃসাধ্য।

প্রসঙ্গ-কথায় আমরা অনেক দূর বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ঐ যাত্রীরা যাকে বলে জন্মান্তর,—নামান্তরে যাকে ভাবান্তর বলে আমরা রফা করেছি। ঐ ভাবান্তরের প্রকৃতিটা এইবার বোঝা দরকার। কিন্তু এইটে বোঝানো বড় শক্ত। কেন না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অমুদ্রুতিগুলো প্রকাশ করবার জগেই যে ভাষার সৃষ্টি

সে ভাবায় অতীন্দ্র অমুভূতি ও যুক্তির কথা ব্যক্ত করা সহজ নয়। তবু পাঠকের সহানুভূতির উপর নির্ভব করে ছুঁটো-চারটে উদাহরণে এই ভাবান্তরিত অবস্থার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যায়।

কামাখ্যাবাসের দ্বিতীয় দিন হুঁ টাকার একটা লালচে নোট হাতে ডালির দোকানের সামনে ঝাঁড়িয়েছিলাম। হুঁ টাকার ডালিতে পুঁজা দেব, দোকানদারকে হুঁ টাকার ডালি দেবার কথা বলে অপেক্ষা করছি। অল্প হুঁ-চার জন ঋষিদ্ধার বিদায়ের পর আমার পালা আসবে। হঠাৎ সন্দেশ হল, হাতের নোটটা হুঁ টাকারই তো? এক টাকার নোট বা এমনি এক টুকরো কাগজ নয়! নোটের লালচে রঙটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম,—কিন্তু নিজের চোখে কিছতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হুঁ টাকার ডালি নিয়ে এই নোটটা এগিয়ে ধরলে দোকানদার যদি হেসে ওঠে হঠাৎ? হাসিটার বেশ যেন ইতিমধ্যেই বুকের ভিতরে দূর-দূর করে কাঁপছিল। ভয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ। এমন সময় আমার পালা আসতে নিজেকে ত্রুটি করে বললাম, দু'ব আঙ্গুবি এসব কি ভেবে মরছি! তারপরে সেই নোট দিয়ে হুঁ টাকার ডালি নিয়ে মন্দিরের দিকে চলে এলাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলাম না। ওই অহেতুক ভয়টার কথা ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। খুব সবলচিত্ত বলতে বা বোঝায় তা আমি কোন দিনই নই, কিন্তু চোখের সামনে অলজ্ঞাস্ত কোন একটা বিষয় সম্পর্কে এর আগে কখনো তো এমন সশয়কাত? হইনি! এর পর মন্দিরে বাবার পথে আন্তে আন্তে নতুন জগতের নতুন যুক্তিধারা আমার দৃষ্টিগোচর হল। স্পষ্ট যেন বুঝতে পারলাম যে, ভয়টা আসলে অমূলক বা অহেতুক ছিল না। এব আগে কখনই পয়সা দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনেছি তখনই সেই পয়সার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লোভ যুক্ত হয়ে পয়সা পূর্ণমূল্য পেয়েছে। বয়স্কাকে কফিতে আপ্যায়িত করে যখন তার দাম দিয়েছি তখনও সেই দামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাম। কিন্তু আজকের এই ডালির হুঁ টাকার সঙ্গে তো আমার প্রজ্ঞা যুক্ত হয়নি, বিশ্বাসও অভ্যস্ত সংশয়ের তলায় তলিয়ে গেছে। অতএব আজকের এই হুঁ টাকাকে যদি এক টাকা বলে প্রতীতি হয়ে থাকে, এমনি এক টুকরো কাগজ বলে আশঙ্কা হয়ে থাকে, তার প্রতীতি সেই আশঙ্কা তো অহেতুক নয়, অমূলকও নয়। আর এই যুক্তিকেই সেদিন আমার খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

অভ্যস্ত পরিচিত জগতের সীমা ছাড়িয়ে চেতনাময় অন্তর্জগতে পদাৰ্পণ করলে এমনি মানসিক বিপর্যয় ঘটে এবং এই বিপর্যয় কেবল মানসিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, চিরাচরিত ঐতিক অভ্যাসগুলোও নিমেষমধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যেমন, আমার চিরকালের নাগরিক অভ্যাস হচ্ছে বেলা আটটার নিম্নাভ্যাস; তার পরে পর পর হুঁ পেয়লা চা পানের পর সাড়ে আটটার শয্যাভাগ। অথচ কামাখ্যায় আসবার প্রথম দিন যদিও ঘুমোতে ঘুমোতে বাত্মি প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল, তবুও দ্বিতীয় দিন আমার ঘুম ভাঙলো প্রত্যবে ঠিক চারটে। মাত্র দেড় ঘণ্টার বিশ্রাম, তবুও দেহ সম্পূর্ণ ক্লান্তিহীন, মন অবসাদমুক্ত। তার পরেও নিম্নাভ্যাসে প্রথমেই চায়ের কথা মনে পড়ল না, মনে হোল আজ পুজো দিতে হবে, বান করা প্রয়োজন।

এমন ব্যতিক্রম অথচ বিনা বিষয়ে সব করে গেলাম, যেন এই করেই অভ্যস্ত।

তা ছাড়া কেবলই কি নৈতিক এবং মানসিক বিপর্যয়?—এত কালের যে শিক্ষা-সংস্কার, বীতি-নীতি সেসবই বা চোখের নিমেষে কোথায় ভেসে নিকৃষ্টি হয়ে যায়? নগরের রাস্তায় যেই আমি নিজেকে জগতের কেন্দ্র অনুমান করে ভুলেও কখনো গীবা সোজা করি না—সহজ ওঠে সিগারেট ধারণ করি না—সেই আমিই কি না চক্ষুস্কায় মাথা খেয়ে অবিস্মিত ঈশ্বরের কাছে নির্বোধ মূঢ় গ্রাম্য পুণ্যকামীর মতো এক কোঁটা কদমাক্ত দ্বিত জল কপালে ঠেকিয়ে ডালি হাতে পাক্তি বেঁধে পুজো দিতে গেলাম?

কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যস্তর ভাগটা অত্যন্ত অন্ধকার। মন্দিরে প্রবেশ করে সোজা হুঁপা গিয়েই বা দিকের অন্ধকারে সিঁড়ি নেমে গেছে। একোণ ও-কোণে দেয়ালের গর্তে হুঁটো-একটা প্রদীপ স্থিরভাবে জ্বলছে। কিন্তু সে-আলোর মন্দিরের আকৃতি তো দূরের কথা পার্শ্ববর্তী যাত্রীর মুখও দেখা যায় না। সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে ডালি হাতে নিয়গামী সিঁড়ির ধাপে পাক্তি বেঁধে ঝাঁড়িয়ে আছি,—পালা আসলে পুজো দেব। অন্ধকারটার বিস্তার যে কতদূর পর্যন্ত তা বুঝবার উপায় নেই। যাত্রীদের উচ্চাশ্বাসে সে-যেন সজীব হয়ে উঠেছে। বার বার এ-পাশ ও-পাশ ফিরছে মাথা কুটছে যেন নিজের অন্ধকার থেকে যুক্তি চায়! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আন্তে আন্তে অপ্রতিযোগ্যরূপে ঐ অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। এত কাল ধরে অস্তিম স্রুথের মুহূর্তে সেই অনিদেও শক্তি প্রতিবাব বাদ সেখেছে, জয়ের গুণস্বা। হিসাবে দিচ্ছে পরাজয়ের গ্রানি, সাফল্যের পর এনেছে ব্যর্থতার অবসাদ—সেই শক্তিই যেন কামাখ্যা-মন্দিরের অন্ধকারের রূপ পরিগ্রহ করে আজ সামনে এসে ঝাঁড়িয়েছে, আলিঙ্গন করতে উত্তত হয়েছে। অনেক কাল পরে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবোধা বিষয় যেন প্রায় বুঝতে পারছিলাম; এত কাল বা বুঝে এসেছি তার সব যেন নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছিল।

নিজের উপর আর নির্ভব ছিল না। অচল্যতন সজীব অন্ধকারের হাতে আত্মসমর্পণ করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। যেন চেতনা থেকে অবচেতনের স্তরে, সান্ত থেকে অনন্তে, প্রবাহ থেকে সাগরে। ঝানিকটা নেমেই স্বল্প-পরিসর একটু জায়গা। একটা যুত-প্রদীপ জ্বলছে, পূজারীরা বসে আছে, যাত্রীরা একের পর এক পূজা নিবেদন করে নির্গমনের অন্ধকার পথে নিকৃদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। পূজা গ্রহণের জন্ত কোন বিগ্রহ নেই, শুধু সিন্দুর-চর্চিত দুটি টোপরাকৃতি ষাটব আবরণ শক্তির প্রতিভূ স্বরূপ দাঁড় করান। সত্যি দেহের যোনিদেশ পড়েছিল বলে কামাখ্যাপীঠের যুগলময়ী থাতি। পূজা নিবেদনের পর পাণ্ডা যখন সেই আবরণের দেহ থেকে সিন্দুর নিয়ে কপালে টিপ পরিয়ে দিল তখন মুহূর্তের জন্ত একবার চুর্ভর বাসনা হল আবরণ সরিয়ে অভ্যস্তরের সত্য প্রত্যক্ষ করবার। কিন্তু সেইটে নিয়ম-বিকৃত। তাছাড়া হয়তো খাসকরকারী অন্ধকারের দরুণ, হয়তো অল্প কোন কারণে ঐ দুই অল্পসন্ধিসা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহ-মন যেন কেমন অবশ হয়ে এল। অকস্মৎ যেন একটা দুর্দমনীয় আভ্যন্তরীণ আকর্ষণে সাধের বাস্তবিক বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে এল। হঠাৎ

মনে হল, একটা অতল গভীর কুপের অন্ধকারে অপ্রতিরোধ্যরূপে তলিয়ে বাছি। পুত্র। সাজ হলেও সেই বাতব আবরণ দু'টির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মূর্তিবৎ ঠাঁড়িয়ে বইলাম। প্রাণীপের আলোর আবরণ দু'টি চকচক করছিল। একটু ঠাঁড়াতে না ঠাঁড়াতেই অকস্মাৎ আবার মনে হল, আবরণ দু'টি বৃষ্টি বতঃই উন্মোচিত হয়ে যাবে।

হয়তো হ'ত, হয়তো হ'ত না। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে না দিয়ে পাগু আমাকে হাতে ধরে টেনে মন্দির-প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে আনল তাড়াতাড়ি। বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে আমার 'ঘোর' লেগেছে কি না, আমি প্রকোষ্ঠকে এড়িয়ে নির্বোধের মতো একবার হাসলাম, বার মানে হাঁও হতে পারে নাও হতে পারে। আমার বারণা, আমি সে দিন সত্য জবাবই দিয়েছিলাম।

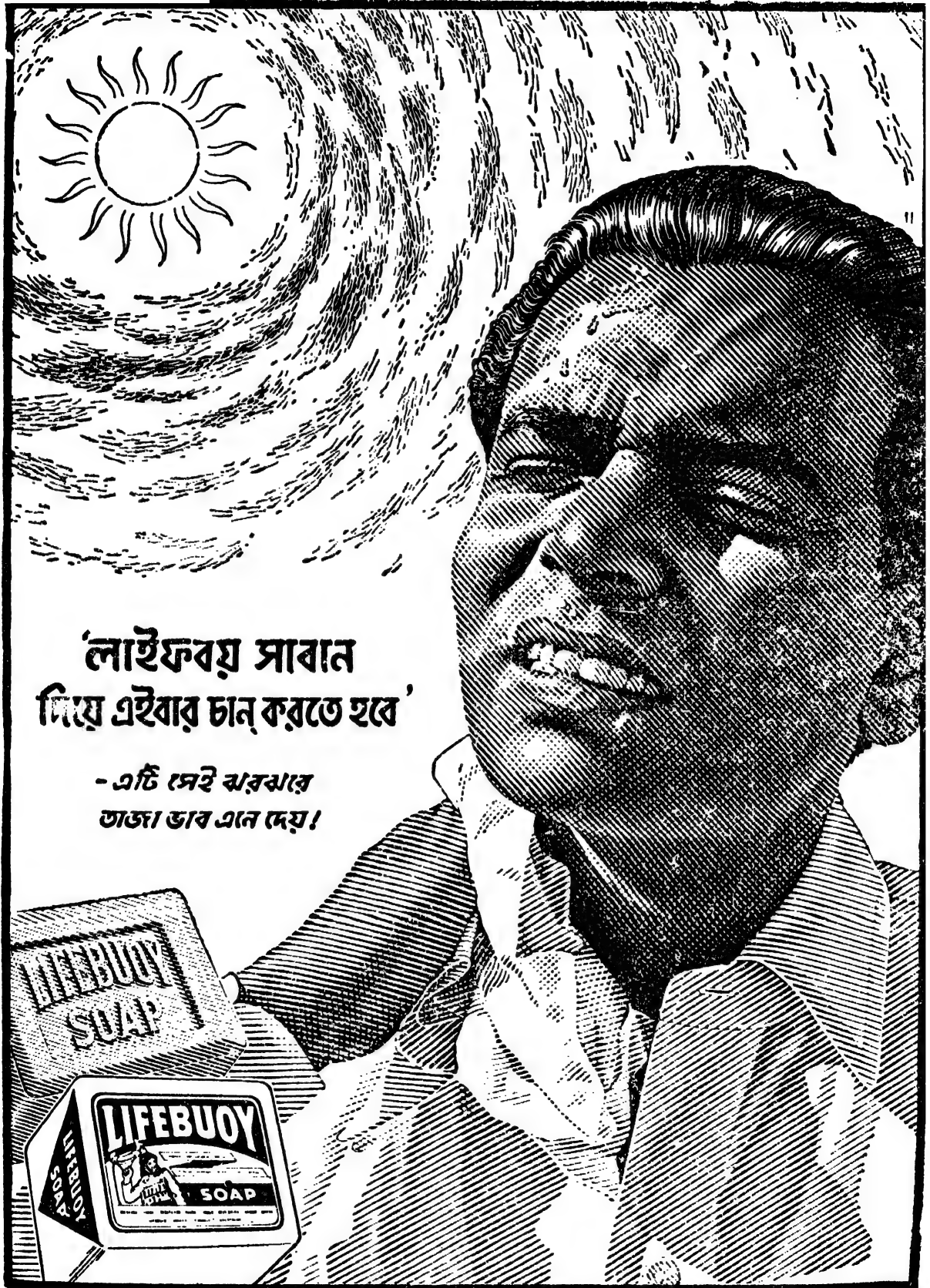
ভাবান্তরিত অবস্থার নিজের মধ্যে, নিজের সত্তার নিজেকে হারিয়ে ফেলবার এই শেখোক্ত লক্ষণটি কিন্তু একমাত্র কামাখ্যারই বৈশিষ্ট্য। ভারত-ভারতের খুব সামান্য অংশই আমার পরিক্রমের সুরোগ হয়েছিল কিন্তু এর আগে কখনই কোথায়ও গিয়ে তীর্থ-চেষ্টনার পরিপ্লুত হয়েছি তখনই অনুভব করেছি, যেন ব্যক্তিগত সঙ্গীর্ষতার কূল ছাপিয়ে এই ব্যক্তি-মণ্ডক আমিই অসীম ভূমায় পরিব্যাপ্ত। পুরীতে কালীতে হরিদ্বারে তুঙ্গনাথে সর্বত্রই এক দীক্ষা পেয়েছি যে, নিজের থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে না দিলে, বা বিকল্পে এই যে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক আমি—এই আমার মৃত্যু না ঘট পর্যন্ত মুক্তি নেই, শান্তি নেই। কিন্তু কামাখ্যার কথা এর ব্যতিক্রম, কামাখ্যার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর, প্রায় বিপরীত। ভক্তকে কামাখ্যা বহির্ভূতের ভূমায় ছড়িয়ে দেয় না, অন্তর্ভুক্তের গভীরতায় মিশ্রিত করে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় বা রিপূর সঙ্গে কামাখ্যার কোন বিরোধ নেই। কামাখ্যার বিচারে ব্যক্তি-চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য ইন্দ্রিয় এবং রিপুই মুক্তির সোপানস্বরূপ। ব্যক্তির সামাজিক সত্তা, সাংস্কৃতিক সত্তা, ভৌগোলিক সত্তা, ঐতিহাসিক সত্তা, এমন কি ধার্মিক সত্তারও অন্তরালে যে নিগূঢ় সত্তা—ইন্দ্রিয়ও রিপু উপেক্ষা বা উচ্ছেদ করে নয়, সে সব অতিক্রম করে সেই সত্তার আশ্রয় গ্রহণেই ব্যক্তির মুক্তি, সেই সত্তার নিরাক্ষিত ব্যক্তির সিদ্ধি।

প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায় মুখ্যত দুই সাধন পদ্ধতিতে সাধনা করে আসছেন—শৈব এবং শাক্ত। এই দুই সাধন পদ্ধতির রীতি-নীতি আচার-উপচার সব কিছু শুধু বিভিন্ন নয়, প্রায় পরস্পর-বিরোধী। অথচ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ জৈন ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের যেমন যুগে যুগে সংঘর্ষ বেধেছে তেমন কোন বৈরিভাব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কালেই দেখা যায়নি। ছুঁটো বেন সমান্তরাল রেখা,—দু'ধ বজায় রেখে যে বার পথে চলেছে ; হয়তো অনন্তে গিয়ে মিশবে বলেই। কিন্তু অল্প কোন গূঢ়তর যুক্তির অনুপস্থিতিতে এমন অবস্থা ইতিহাসের যুক্তি-বিরুদ্ধ যে, ছুঁটো পরস্পর-বিরোধী সাধন-ধারা একই দেশে একই সঙ্গে একে অপরের উপর সামান্যতম প্রভাব বিস্তার না করে সমান জনপ্রিয় থাকবে। এমন অবস্থার সত্যতা অনুসীকার, এমন অবস্থার যুক্তি কি? যুগান্তিযুগ ধরে যে-সব রাজী কালী গেছে বা কামাখ্যার এসেছে, তাঁরা কিন্তু এই যুক্তি খুঁজে বিভ্রান্ত হয়নি কোন দিন—হয়তো সে

যুক্তি তাঁরা আপন আপন সত্তার কান পেতে শুনে থাকবে। কিন্তু এই যুক্তির আভাস আত্ম-কাল পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদেরও নজরে পড়ছে, এই বোধি-গ্রাহ যুক্তি অস্বীকার করা তাদের পক্ষেও প্রতিদিনই অধিকতর শক্ত হয়ে উঠছে। স্বাধীন ভাবে কিন্তু সর্বশেষ প্রাচ্যের অনুরূপ ব্যক্তি-চরিত্রের বেসংজ্ঞা জ্ঞান মনস্তত্ত্ববিদ সি, জি, যুড গ্রন্থিত করেছেন তার গ্রন্থসংগ্ৰহ কোন প্রতিবাদ আত্ম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় গুণী ব্যক্তির সবারই আত্ম নিঃসংশয়ে একথা স্বীকার করেন যে, জীবনকে দেখবার মূলতঃ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের আছে। একটির নাম ওঁরা স্থির করেছেন 'একট্রোভার্ট,' অর্থাৎ বহির্মুখী, —আমরা আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বাকে বলি শৈব। অপরটির পশ্চিমী নাম 'ইনট্রোভার্ট,' অর্থাৎ অন্তর্মুখী,—ভারতীয়রা বাকে এত কাল শাক্ত বলে এসেছে। দু'টো সমান্তরাল রেখা—যেন গঙ্গা আর যমুনা—যে বার পথে বয়ে চলেছে ; অন্তে সেই অসীম অপার সমুদ্র—সেখানে সবাই এক।

দারিদ্র্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলে এবং প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ নয়—তরুণের যুগের অনুকূলতায়—শৈব সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক অজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই ধারার সঙ্গে একটা ব্যবহারিক পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। মাঝে মাঝে শাক্ত আকর্ষণও আমরা সবাই আমাদের সত্তার অনুভব করে থাকি ; কিন্তু সেই শক্তির আভাসই এত ভয়ঙ্কর যে তাকে একটা শক্তি বলে স্বীকার করে জয় করবার সাহস এবং বিশ্বাস দুই চার জন ক্ষণভঙ্গা পুরুষ ভিন্ন বড় বর্তে না। সেই আকর্ষণ যখন আমাদের দ্বারে এসে পৌঁছায় আমরা তখন আর্থিক অনটন, কর্মরাস্তি, যৌন-অভ্যুপ্তি, রাজনৈতিক অসন্তোষ ইত্যাদি মূল এবং সমাধানযোগ্য কতকগুলো সমস্যার বালুতে উৎপন্ন হয় মতো মাথা লুকিয়ে সেই শক্তিকে অস্বীকার করি, তার আকর্ষণ বিপথগামী করি। কিন্তু কামাখ্যার মন্দিরে শক্তিমানতার প্রকোষ্ঠে যখন সেই আকর্ষণ টেনে ধরে তখন আর পালাবার কোন পথ থাকে না। তখন আমাদের 'ঘোর' লাগে। সেদিন সেই ভূতল গর্ভের অন্ধকার কুঠরীতে আর কিছুকণ ঠাঁড়িয়ে থাকলে পরিণাম কী হত তা অনুমান করাও অসম্ভব। পাগু ঠাকুরের সন্তবৎ : 'তা জানা ছিল,—হাত ধরে টেনে তিনি আমাকে সেই সজীব অন্ধকারের সূদূর আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে বাইরে নিয়ে এলেন।

মূল-মন্দির থেকে উঠে নাট-মন্দিরে যাবার পথে একই ছাঁদের তলায় ছোট একটি ঘর আছে। ঘরটি পাণ্ডাদের বিশ্রাম স্থানস্বরূপ। ঘরের চতুর্দিককার দেয়ালে হেলানো, শোয়ানো ঠাঁড় করানো অবস্থায় কচিসৌন্দর্য কমলীয়তা এবং বাস্তবতা বস্তিত অভ্যস্ত কিছুতুকিমাকার মূর্তি বিকল্প হয়ে আছে। পাণ্ডাকথিত অর্থোজিক কিংবদন্তীর সূত্রে প্রত্যেকটি মূর্তিই পৌরাণিক যুগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। একটা মূর্তি কেবল অর্ধাচীন,—ঘটিত এবং বর্ষা বয়স নিরূপণ করবার কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই,—মূর্তিটি কোচবিহারের রাজা গুরুদেবের। যেত পাথরে খোদিত ভাবলেশহীন মূর্তিটি ঘরের এক কোণে নিঃসঙ্গ ঠাঁড়িয়ে আছে। এমন ব্যক্তিহীন নিরপেক্ষ মূর্তি যে প্রথম নজরে চোখেই পড়ে না ; অথচ সেই নিরপেক্ষতা এমনই তীক্ষ্ণ অলক্ষ্যে মনে একটা অনপন্যে দাগ কেটে যায়। চিহ্নটা ক্রমে ক্রমে মতো বাড়তে থাকে, অনুকণ কুটতে থাকে কাঁটার মতো।



**‘ଲାଇଫବୁୟ ସାବାନ  
ମିଶ୍ରେ ଏହିପରି ଚାନ୍ କରନ୍ତେ ଥାନ୍’**

**- ଏଠି ମୋହି ଧରନ୍ତେ  
ତାଜା ଡାବ ଏନେ ଦେୟ !**

**LIFEBUOY  
SOAP**

**LIFEBUOY  
ANTISEPTIC  
SOAP**



ঘরের মেঝেতে নানান আকৃতির চোলকজাতীয় একরাশ বাতবস্ত্র ছড়ানো। আমাকে টেনে এনে খাস ফেলবার সময় না গিয়েই পাণ্ডাঠাকুর চর্চিত চর্চণের মতো বলতে শুরু করলেন যে, এই সব বাতবস্ত্র প্রতি অব্যবহার রাত্রিতে বাজানো হয়,—মা তখন এই বাতের তালে তালে আপন প্রকোষ্ঠে নগ্ন-নৃত্য করেন। প্রতি অব্যবহার রাত্রিতেই এই নৃত্যাহুষ্ঠান হয়।

“আপনি কখনো দেখেছেন মার নৃত্যাহুষ্ঠান? মা কি দেখধারণ করেই নৃত্য করেন?”

“হি, মার নগ্ননৃত্য কি সম্ভাব্য দেখতে আছে? সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই!” রক্তবর্ণ নিমীলিত চক্ষু প্রদর্শিত করে ভৎসনা করতে গিয়েই পাণ্ডাঠাকুর যুহু হেসে এই ঔদ্ধত্য মার্কনা করলেন। “তাছাড়া সেই নৃত্য দেখবার ক্ষমতাই বা মানুষের কোথায়? ছলে বলে নানান কৌশল করে নানান সুখোস পরে সইয়ে সইয়ে মা মাঝে মাঝে সামান্য একটু আভাসে সাক্ষ্য দেন, তাতেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে বাই। স্বরূপে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করলে যে পাপের হয়ে বাব, মহারাজ তুলসীজের মতো। সেই বীভৎস সৌন্দর্য দেখবার ক্ষমতা রক্তমাংসের মানুষের নেই।”

প্রতিভূ সমীপে অবস্থান করে পূজোষ্টকু নিবেদন করতেই যে ‘ঘোর’ লেগেছিল তার বেশ তখনো পূর্বোপরি কাটেনি, অতএব অক্ষমতার ভয়ে ভীত হবার দায় আমার ছিল না। আমি ভাবছিলাম, মা স্বয়ং যদি নগ্ননৃত্যে সজ্জিত না হন তবে আমার পক্ষে তা দেখা কেন অবৈধ হবে? কিন্তু প্রেরণা মনে মনে শত বার মাড়াচাড়া করেও, একবার উচ্চারণ করতে আমারই কেমন সঙ্কোচ লাগছিল, চেতনার উপরিস্থরের বিক্ষোভ সত্ত্বেও, অন্তরালে যেন অস্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম এই আলঙ্কারিক নগ্ননৃত্যের ঐক্যিক নিগূঢ় অর্থ।

ইতিমধ্যে পাণ্ডাঠাকুর একটির পর একটি মূর্তির সামনে গাঁড়িয়ে রীতি-অনুযায়ী সেই সেই মূর্তির সংগে সংযুক্ত কিম্বদন্তীগুলো এই পাণ্ডার পাপমোচনার্থে বিবৃত করে যাচ্ছিলেন। তারতের প্রতি তীর্থেই কিম্বদন্তী দিয়ে গড়া না হলেও কিম্বদন্তী দিয়ে ঘেরা, কামাখ্যা-তীর্থেও এর ব্যতিক্রম নয়। এই গল্পকথগুলো এক অতি অদ্ভুত জিনিষ। এগুলোর কাহিনী কৌতুকলোকপক নয়, বাস্তবতা শ্রোতার সমবেদনা আকর্ষণ করে না, কচির বালাই নেই, সৌন্দর্যের লেশমূল্য, সম্ভাব্য অসম্ভাব্যতারও দায়যুক্ত—অথচ এগুলোই যুগের পর যুগ ধরে প্রতিদিন শত সহস্র বার একঘেয়ে বৈচিত্রহীন কণ্ঠে বিবৃত হচ্ছে; বিশ্বাস করে বা না করে লক্ষ লক্ষ বাকী এই সব গাঁজাখুরি গল্পই শুনেছে সশ্রদ্ধচিত্তে। এই গল্পগুলোর উৎসের কথা ভাববার চেষ্টা করলে বিষয় লাগে। গৃহ বা বিকৃতমস্তিষ্ক কোন মানুষের পক্ষেই এমন গল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস হয় না; অথচ উদ্ভাবিত না হলে এগুলো এল কোথা থেকে?

আগেই বসেছি যে, তীর্থস্থানে—বিশেষতঃ কামাখ্যা-পীঠের মতো নির্বিষ্ট তীর্থে পদার্পণ করলে আমাদের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিতের চেতনা কতকগুলো অস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমাদেরও একটা চেতনা ব্যতীত ছিল পারিপার্শ্বের আলো শব্দবৃত্ত থেকে কতটা জ্ঞান আবার কিরে এসেছে ও আসছে তার হিসেব কবতে।

অপর চেতনা কিছুক্ষণ আগেকার সেই অন্ধকার অভিজ্ঞতার বাহ্যিক সঙ্গপণে ঢুব দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল যে, সেই অভিজ্ঞতা সত্য কি সংস্কার? তৃতীয় চেতনা আবার এই অভিনব জগতের সঙ্গে আমার পুরাতন নাগরিক জগতের তুলনামূলক বিচারে তন্তু ছিল। এই সব এবং আরও অজস্র ফুট-অফুট চেতনার টানা-পোড়নে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তা ছাড়া পাণ্ডাকথিত এই ধরণের কিম্বদন্তী কাহিনী আমার অনেক শোনা আছে—সেদিকে কর্পণাত নিশ্চয়োজ্ঞন। কিন্তু হঠাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চেতনা অত্যন্ত ক্রীণ অস্থিভূতিতে যেন স্পষ্ট আত্মনাদ করতে শুরু করল। অকস্মৎ আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই সব গাঁজাখুরি গল্পকথার মধ্যেই আমরা অজস্র পরম সত্য চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। কবে কোন বিষ্মিত যুগে এক অসীম শক্তিশালী ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলস্বরূপ, এক পরম সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। সাধারণের সেই সত্য বুঝবার সাহস নেই, সাধনা নেই,—সেই সত্য উপেক্ষা করতে গেলে শ্রদ্ধা এসে বাধা দেয়;—তখন যুগের পর যুগ ধরে চলল সেই নিষ্ঠুর সত্যের চতুর্দিকে শব্দবাহুর মতো গল্পকথার প্রলেপ-মার্কনা। ক্ষণজন্মার সাধনার ফল আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিতরণযোগ্য করবার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। ক্রমে ঐতিহ্যের আবরণে সত্যের নিষ্ঠুরতা ঢাকা পড়ল। আজও যে সব সম্মিত বাকী এই ঐতিহ্যধারা অনুসরণ করে তীর্থে আসে, তারা হয়তো আপন আপন অজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই সাধনার ফলে অমর হয়ে যায়। আমরা যারা বাচাই না করে কোন জিনিষে বিশ্বাস করি না, আমাদের কাছে সেই সত্য চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনির্দেশ্য এক স্ত্রী ধরে কেন প্রতিশ্রুতি আসছিল যে, ঠিক সাধনা নয়, একটু চেষ্টা করলেই সে সত্য নিজে থেকেই বুঝতে পাবব। অথচ তখনই আবার মনে পড়ছিল, তিন দিনের মধ্যেই সেরস্তার বাঁশ নীল পড়বে। যদিও মনে-প্রাণে সর্বক্ষণই বুঝতে পারছিলাম যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে আছি। অমন বিস্ময়কর অসহায়তা আজ সত্য বা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে নিজের কাছেও কেমন যেন বাধ-বাধ লাগে।

বিনা বিরতিতে কিম্বদন্তী কথা বলতে বলতে পাণ্ডাঠাকুর একটির পর একটি মূর্তি অতিক্রম করে অবশেষে পূর্বোক্ত মহারাজা তুলসীজের মূর্তির সামনে এসে গাঁড়ালেন। মূর্তিটা তখনও তেমনি বিমূর্তের মতো গাঁড়িয়ে আছে,—তার নিরপেক্ষতার সাংসারিক ব্যঞ্জনা তখনো আমার সম্ভাব্য-চেতনা স্পর্শ করে নি। কিন্তু তবু মূর্তিটার সামনে এসে গাঁড়াতেই আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিক্ষোভ যেন হুহুতেরে স্তম্ভ নীখর হয়ে গেল।—প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারলাম না, কান পেতে খাস কক্ষ করে শুধু শুনলাম, মহারাজার করুণার্জ বীভৎস কাহিনী।

তুলসীজ ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা। কেবল পদাধিকারেই নয়, শৌর্ধে-বীর্ধে চেহারায়-চরিত্রে চলনে-বলনে অমন যৌল আনা মহারাজা ইতিপূর্বে কখনো কোচবিহার রাজ্যের রাজ্যসন অধিকৃত করেন নি। মহারাজা ছিলেন একক এক অনন্ত।

কিন্তু ওই পর্বন্ত; মহারাজা তুলসীজ বা তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে পাণ্ডাঠাকুর আর কিছু বলেন না, হয়তো আর বিশেষ জ্ঞানেনও না। এই আংশিক পরিচয়ে শ্রোতার ঐতিহাসিক তৃষ্ণা সম্ভবত অনেকাংশে



অভূত থাকে, কিন্তু ঐতিহাসিক তুফান অপেক্ষাও হয়তো মহত্বের তুফান আছে, যার পক্ষে ঐ আংশিক পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। সুনতে সুনতে আমার তো অন্তত মনে হ'ল যে, ঐ রাজা গুরুদ্বজের সঙ্গে নিজের যেন কোথায় একটা অজানী আত্মীয়তা আছে। ঠিক আমারই মতো, প্রত্যেকের মতো, গুরুদ্বজও একক এবং অনন্ত!

সিংহাসনে আরোহণ করেই মহারাজা গুরুদ্বজ মনঃসন্নিবেশ করলেন রাজ্যজয়ের দিকে। একে একে আশে-পাশের ছোট-বড়ো সব রাজ্য গুরুদ্বজের বগুতা স্বীকার করলো। সিংহাসন অধিকারের অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে এই প্রাগ-জ্যোতিষপুর প্রদেশও মহারাজার বশীভূত হল। কিন্তু রাজ্যজয়ের এই উদ্দাননা বেশি দিন স্থায়ী হয় না; তার প্রধান কারণ, নিজ জন্মভূমি থেকে কখনো অধিক দিন দূরে প্রবাসী থাকা সহ্য না মহারাজা গুরুদ্বজের। কারণে অকাবণে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতেন; কখনো কোন রাজ্য সম্পূর্ণ বগুতা স্বীকার করবার আগেই, আবার কখনো শত্রুকে পুরোপুরি দমন না করেই। অবশেষে একবার যে এলেন, তার পরে আর নতুন কোন অভিযানে যাবার নাম করলেন না।

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমার আবারও যেন মনে হ'ল, অনেকটা ঠিক আমারই মতো। গুরুদ্বজের সুযোগ আমার ছিল না সত্য, কিন্তু প্রথম যৌবনের নব উদ্দাননায় প্রেম, স্বাদেশিকতা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবাদ, সাম্যবাদ লোকহিতৈষণা কত শত রাজ্য-জয়ের সে কি অদম্য উৎসাহ! এক এক বার এক এক পথে যাই, কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে আসি; সাফল্য অসাফল্যের প্রতি স্নেহপূর্ণ করবারও কৌতূহলটুকু আর অবশিষ্ট থাকে না। যেন কোন একটা অনির্দেশ্য নোড়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধা আছি; দূরে ভেসে যাবার আগেই যা আবার কুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি বাহই যেন রাজা বা বোদ্ধা বা পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনয়ের পর সাজগজা খুলে আবার যেই আমি ঠিক সেই আমি। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তগন আবার আপন আবাসে আর্তনাদ করতে করতে প্রত্যাগমন।

রাজ্যজয় পূর্ণ সমাধা হতেই মহারাজা গুরুদ্বজের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটল। এখন তিনি সুবিশাল কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা,—পূর্বের সংঘম গেল বিলাসের শ্রোতে ভেসে, ব্যভিচারের সংঘাতে চারিত্রিক দৃঢ়তা হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। নর্তকীর নৃপুং নিকণে অস্ত্রের স্বনবননা স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রজাদের

সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখবার আর সময় হয় না; রাজ্য থেকে শান্তি নির্বাসিত হল, শৃঙ্খলা বিদায় নিল। যে অপরিমিত বেগে রাজ্য গুরুদ্বজ এককালে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতেন এখন তার চাইতেও বিপুল বেগে ভেসে চললেন ব্যভিচারের পঙ্কিল শ্রোতে।

অর্থাৎ ঠিক যেমনটি ঘটবার। জীবনের সহজাত ব্যর্থতার আর্তনাদ চাপতে হবে, ব্যভিচারের পাশবিক কোলাহলে। পরাজয়ের ক্ষত ঢাকতে হবে কতকগুলো অপাত স্বয়ংসৃষ্ট ক্ষত সর্বদা নিজের চোখের সামনে গরে রেখে নিজেকে শিউরে দিয়ে। এক কালের সে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা কত কল্পনা কত উচ্চাভিলাষ,—হঠাৎ একদিন রাত প্রভাতে দেখা গেল সব ভিত্তিহীন, রাজ্যের শেষে রঙিন অলৌকিক স্বপ্নও সব শেষ। জানা গেল যে আসলে কোন দিনই কোথায়ও বাচ্ছিলাম না, কোন দিন কোথায়ও যাবার কোন উপায়ই নেই। যেই 'আমি'কে কেন্দ্র করে এত সব, সেই আমিও নিকষ কালো শূন্যতার মধ্যে একটি নিছক শূন্য। কোন পরিচয় নেই, কোন স্বাক্ষর নেই, কোন নাম পর্যন্ত নেই! ভরাডুবির পর অকূল পাথার সমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্বুদের মতো ভাসছি,—কেটে গেলেই সব শেষ! এমন শূন্যতা স্বীকার করবার সাহস নেই, উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য ভেঙে গেছে, অতিক্রম করবার সামর্থ্যের অভাব, সাধনা নেই বলে। অতএব অগত্যা পলায়ন,—যে দিকে চোখ যায় না সে দিকে চোখ না চায়। অতএব অগত্যা যসনা লাঞ্চিত করে জীবনের তিক্ততা বিস্তরণ।

কিন্তু রাজত্ব করা তো জল থেকে ডাঙায় উঠে দাঁড়ান নয়, যে জল আর স্পর্শ না করে আপন পথে বয়ে যাবে! রাজ্যের বিশ্বাস্যতার সুযোগে পার্শ্ববর্তী জনৈক পরাক্রমী রাজা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করলেন। একটি বিন্দু রক্তপাতও হল না, প্রজা সৈন্তসামন্ত সবাই প্রস্তুত ছিল, প্রথম সুযোগেই সবাই আত্মসমর্পণ করল। শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে মহারাজা গুরুদ্বজ আপন রাজ্য থেকে পালিয়ে এলেন। পালিয়ে এলেন এই কামাখ্যায়ই পার্শ্বত্যাগরণে।

যেমন আমি আজ এসেছি, কিম্বা উদ্দানের মতো অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বায়ে বায়ে গেছি ভারতের বিভিন্ন তীরে। ঘৃণা ক্ষুদ্র পাশবিক জীবনের পাশ থেকে মুক্তি পাবার মূঢ় বার্ষ প্রয়াসে, কিন্তু মহারাজা গুরুদ্বজকে যিনি রাজ্যত্যাগে বাধ্য করলেন সেই পরাক্রমীর নামই বা কী, রাজ্যই বা তার ছিল কোথায়, সে সম্পর্কে পাণ্ডাঠাকুর সম্পূর্ণ



মাথার বক্সমায় ডুগিভেদে  
একবার চক্ষু পরীক্ষা করার না কেন?

**ক্যালকাটা অপটিক্যাল**  
কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড  
প্রতিষ্ঠা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.

দীর্ঘ—যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। অজ্ঞানের অবকাশে আগন্তকের পক্ষে আগ্রানীকে চেনা সহজতর হয়। অজ্ঞাত আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পাবলাম যে এই আগ্রানী আমার অপরিচিত নয়; আমারই সম্ভার অংশ সহজাত বিরোধী,—পরাজয়ের স্লেমে যে জয়ন্তিলক জ্যৈষ্ঠ মাক্ষর্যের উপর আনে বার্ষিকতার কালো ভাষা, মাল্লকে যে স্নাত্ত করে রাখে চিরকাল ক্রমেই চির-চকস চির-অস্থির বিরোধী, যোগীকে কে ভোগী করে—ভোগীকে যোগী। এর দম্বা নেই, কমা নেই, নীতি নেই, ভাষাময় বোধটুকুও নেই। কোন দিন কারো কাছে এ শক্তি ধরা দেয়নি, ভাষার একে ধরতে বাওয়া বাতুলতা।

সেই অবশেষে স্বরূপ আমবা আজ কল্পনাও করতে পারি না। জনবসতিপূর্ণা খাঁদনসঙ্গ সেই ঘচাণে রাজ্যহার্য যথারীতা গুরুত্ব নিঃশব্দ পানিয়ে বেড়াতে লাগলেন। জীবন ধারণের সামাজিকত্ব অসুবিধাটুকু যার সঙ্কট না, কিন্নিই এখন গাণেশের মন্ডর এড়িয়ে গণ্ডারের ধূলি ঝাঁকিয়ে দিই একটি অসংখ্য ধারণে পাবেন তো ক্ষুণ্ণবৃত্তি করেন। মন্ডর মিনের পর সিন চলে উপাশ। কোন দিন বা বাঘের কুলাবিশিষ্ট গোমাংসে শিক্তগন্ধা হয়। এমন সময় একদিন অনাহারে কুশ অনিবার্য রাস্তা বার্ষিক্যর কুশ মহারাজা গুরুত্ব হতচেতন হয়ে একটা পাতের ভঙ্গার গুয়ে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঝোপে ঝাড়ে অন্ধকার দানা বেঁধে উঠছে—রাত্রির আগ্রয় খুঁজবার সময় অতিক্রান্ত প্রায়। দিনের নিবীড় জীব সব মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে; একটু পরেই ত্রিশ্রুত শ্রাপকের ক্ষুণ্ণ চোখ অন্ধকারে অল অল করে উঠবে, আকাশ কীদর শব্দ শবকের নিদ্রার আর্তনাদে। কিন্তু মহারাজা গুরুত্বের আব তরু পাবার মতো শক্তিত্বকুও অবশিষ্ট ছিল না। ঘুরে বা পাশ কাটিয়ে বা মগা দিয়ে পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে; গুরুত্বের দীর্ঘ শাসটুকুও না ছেড়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন নিয়তির হাতে। মুহূর্তমগো রাস্তা মহারাজার সমস্ত বাইরের চেতনা লুপ্ত হ'ল। অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহর হলে দিবা জ্যোতিতে মা আবিস্কৃতা হলেন মহারাজার সামনে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে তিনি একদৃষ্ট চেয়ে বইলেন মায়ের মুখের দিকে। আন্তে আন্তে দেখে শক্তি সঞ্চার হতে থাকল; রাত্রির শেষ প্রহরে একটা মন্দির গড়ে দেবেন বলে প্রণাম করবার পর শক্তিমাতা অন্তর্হিতা হলেন। মহারাজ গুরুত্বের দেখে তখন আর রাস্তার কণাটুকুও অবশিষ্ট নেই,—তমুহূর্তে তিনি রাজ্যভিত্তিতে অগ্রসর হলেন। তিন দিন তিন রাত্রি এতদিক্রমে হেঁটে আপন রাজ্যে এসে পৌঁছলেন—মায়ের কুপায় সাত দিনের মধ্যে আবার সিংহাসনে আরোহণের পরেই প্রতিক্রিয়ায় মায়ের মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন।

সেদিনের সেই কামাখ্যা-তীর্থে অভিজ্ঞতা লিখতে স্মৃক করবার সময়েই সংশয়ের অন্ত ছিল না, সংকোচে এখন কলম ভক্ত হয়ে আসছে। কলমের ভাষা নিত্যভূই বিজ্ঞানের ভাষা। ইন্দ্রিয়ের সব কথাও সর্বদা তার মুখে জোগায় না। আর চেতনার একেবারে প্রান্তদেশে পৌঁছে ব্যক্তির মানসিক আবেগ বন্ধন বিস্কোভের প্রায়সো সম্পূর্ণ নীতির হয়ে যায়—যুক্তি-অযুক্তি শালা-কালো সরল-জটিল সব বন্ধন একাকার, বন্ধন জগতের সমস্ত পরম্পর-বিরোধী ভাব একটি এক তানে আকাশ-বাতাস নৈশব্দে মুখরিত করে তুলেছে তখনকার সেই আনন্দ সেই আবিষ্কার কথা কলমের একস্তরে উচ্চারণ করা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা

তাদের ব্যবতীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি মুহূর্তে এসে ভীড় করে ঝাঁড়িয়েছে। এক কাল ধরে—এক এক কালেরও আগে অনন্তকাল ধরে বা কিছু দেখেছি তুনেছি ভেবেছি, কত কিছু আশা-আদর্শ হতাশা-শোক প্রাপ্তি-বন্ধনা সব এসে জড়ো হয়েছে এই একটি অনন্ত মুহূর্তে। একটি একটি করে স্মৃতি খুলে বয়নশিল্পের কাঠিগরী দিকটা হয়তো বোঝানো যায় কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণিত হয় না। স্মৃতি যেনে এগলে অনন্ত কাল পরেও অনন্ত মুহূর্তে সমান স্মৃতি থাকবে। মাল্লের ভাষা মাল্লের চাটতেও চূর্ণল। ঐক্যতানের প্রতিটি তান বিচ্ছিন্ন করে তবেই ভাষার প্রথিত করা যায় কিন্তু সেই বিবরণ লত যার পাঠ করলেও ঐক্যতানের স্বরূপ তা থেকে স্পষ্টতম হয় কি?

কিন্তু এরচরার সম্ভাষা পাঠকমাত্রকেই যদি আন্তিক বলে ধরে নেবার কোন অসুবিধে না থাকতো তবে উপলোভ্য দিলাপোক্তির কোন প্রয়োজনই ঘটত না। শক্তিমাতা আবিস্কৃতা হলেন, বয় দিলেন এবং প্রণামী দিলেন,—বিধানীর কাছে এসব কথার কোন অবিদ্যাত অভিনব নেই। কেন না, মা যে দুর্গতি-মালিনী সে-কথা তাদের কাছে স্বতঃপ্রসূ—এই সহজ কথার নিগূঢ় গুহ্য উপলব্ধিতে তাদের ঐতিহ্যলব্ধ ক্ষমতা। ঐতিহ্যলব্ধ হয়ে সেক্ষমতা আমি হারিয়েছি অনেক দিন, তবুও সেদিনের সেই সাময়িক অপ্রকৃতিস্থতার পাণ্ডার কথা তখনতে এবং হয়তো বুঝতে আমার কণামাত্রও অসুবিধে হয়নি। দিবাভ্যোতিতে মা আবিস্কৃতা হলেন এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে মহারাজা একদৃষ্ট চেয়ে বইলেন মায়ের মুখের দিকে—একধার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আমি সেদিন এমন নিঃশব্দে বুঝেছিলাম যে, সমতলে নেমে এসেও অযৌক্তিক বলে তা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই, কিন্তু যে সত্যের যুক্তি কেবল অমুহূর্তপ্রায় তা অনস্বীকার্য হলেও ভাষায় তাকে কি করে গাঁথব? কল্পক সেসম্ভা বোঝাবো কেমন করে?

কিন্তু কেমন হয়, কোন একটা বিদ্যর নিয়ে অনবরত ভাবনা চলতে থাকলে তখন সজীব নির্জীব সব কিছুর সঙ্গেই সেই বিদ্যের অবিলম্বে সম্পর্ক আবিস্কৃত হতে থাকে, তখন সব সঙ্গীতেরই ঐ এক সুর, সব সাহিত্যেরই ঐ এক ব্যঞ্জনা। কিংবা হয়তো ঐ ব্যঞ্জনার সাহিত্যই তখন চোখে পড়ে, ঐ সুরই কেবল কানে বাজে। কামাখ্যা থেকে প্রত্যাগমনের পরেও ঐ অবিদ্যাত অভিজ্ঞতার বাস্তব ভিত্তি যে কী হতে পারে মুহূর্তের স্তম্ভ সে-চিন্তা থেকে বেহাই ছিল না। আর যেন অনেকটা দৈবযোগেই ঠিক এই সময়ে পি, ডব্লু, মার্টিন রচিত এক্সপেরিমেন্ট ইন ভেপুট গ্রন্থখানা হাতে এসে গেল—যদিও কোন কালেই আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিলাম না। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী অধ্যয়নের যোগ-সাধন করে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেবার ক্ষমতা স্বীকার না করলেও বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে সেই পরিসরের অভাব। তবে গ্রন্থখানা একবার উটে দেখলেই উৎসাহী পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, অশিক্ষিত অমার্জিত সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তুরা বৃগাতিবৃগ ধরে শক্তিমাতা বলে যার পায়ে পূজা নিবেদন করে এসেছে আজকের পশ্চিমী বিদগ্ধজনেরা অনেক দ্বারে মাথা ঠুকে অবশেষে পথ হাতড়ে হাতড়ে সেই চরণেরই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। যদিও তার স্বরূপ এখনো বোঝেনি, তবুও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে পূর্ণমাত্রায়। কেউ তাকে 'আনকনশাস' বলে ডাকেন, কেউ বলেন ক্লাক ম্যাডোনা, কেউ বা শ্রেয় লিভিং মৌখ।

সবাই স্বীকার করেন যে, এই শক্তি বীভৎস এবং এই শক্তি দুর্বল—মানুষ যে-কোন মানুষ সব মানুষ এই শক্তিরই দাস মাত্র। প্রত্যেক মানুষের এ-শক্তি চার দিকে একবার নহন মেলে চার। তার সামাজিক বন্ধন—সামাজিক রীতি-নীতি বোধ সমেত—খসিত হয়ে বার সেই মূর্তিতে। এই শক্তি ফকিরকে যেমন ক্ষণকাল মধ্যে রাজা করে দেয় তেমনি রাজাকে করে দেয় ফকির; দুর্বলকে এ বলশালী করে বলমানকে করে পশু। এই শক্তির এক দ্রুতগতিতে মানুষ পশুর স্তরে নেমে আসে; এই শক্তি ব্যতিরেকে মানুষ মাত্রেরই পশু। ঠাণ্ডা আসণ্ড আবিষ্কার করেছেন যে সাহস না থাকলে বা কমতার অভাব ঘটলে, অর্থাৎ আমরা থাকে সাধনার অপ্রতুলতা বলে এসেছি এত কাল তা নিয়ে এই শক্তির সম্মুখীন হবার দুর্ভাগ্য যদি কোন দুর্বল মন মানুষের হয়, তবে সে পাগল হয়ে যেতে বাধ্য,— সামাজিক দীক্ষা অনুযায়ী আনন্দাত্মিক অর্থে মৃত্যু তার হবেই। শেলফেস, পলি, শিকটটিক তখন যে, হ্যাললন্ট, ট্রাইডেকে স্থান ছেড়ে দিয়ে বিলার নেবে। অপূর্ণ পক্ষে যদি তার সাহস থাকে সাধনা থাকে তবে এই শক্তিকে অধিগত করে সে অসীম শক্তির অধিকারী হবে।— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কেমন একদিন চরেছিলেন সদর ট্রাটর এক অতি পুণ্য প্রভাতে। কিন্তু কামাখ্যা সেদিন এসব কোন যুক্তিই আমার জানা ছিল না; সেদিন আমার পুঁজি ছিল শুধু সত্যতাত্ত্বিক অবিদ্যার আর সঙ্গ সাক্ষাৎ অপ্রকৃতিস্বত্ব। সেই সাময়িক অপ্রকৃতিস্বত্বই সুযোগে আমি সেদিন নিঃসংশয় চিত্তে উপলব্ধি করেছিলাম যে, মহারাজা গুরুদেব আপন অনাত্মগঠিত্য হার কাছ থেকে যে শক্তি লাভ করেছিলেন বলে পাণ্ডা ঠাকুর বললেন—যে শক্তির বলে স্বাধীন্য আবার মহারাজার কবলগত হল—সেই শক্তির অস্তিত্ব যুক্তি-প্রতিষ্ঠা না হলেও স্বতঃসিদ্ধ।

এখন নিঃসঙ্গ হোঁ কবলগত হল, মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়াও না হয় বন্ধিত হল কিন্তু যেই শক্তির আধীক্যে সব হল তার পূর্ণ পরিচয় তো জানা হল না! সেই বালক সেই ঐশ্বর্য সেই পরিভ্রম সেই পারিভ্রম,—কিন্তু তবু কোন কিছুই যেন আর পূর্ণতার মতো সত্য নয়, সত্য নয়, সুবিশুদ্ধ নয়, সুস্বচ্ছ নয়। বাইরে যেই মহারাজা ঠিক সেই মহারাজা, একটু তারতম্য ঘটেনি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেকে কেমন প্রোতাপ্ত বলে মনে হয় মহারাজা গুরুদেবের,—যেন কোন কিছুই সঙ্গেই আর আন্তিক কোন যোগাযোগ নেই; সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, সব কিছু দূরে আয়ত্তের বাইরে আগ্রহের বাইরে চলে গেছে। মহারাজা গুরুদেবের মনে হয় যে নিজ রাজত্বই তিনি নির্বাসিত। এমন নিঃসঙ্গতা যে সম্ভব তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি কোন দিন। এক এক সময় হয় হয় বৃষ্টি অপ্রকৃতিস্ব হয়ে যাচ্ছেন, এক এক সময় বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল, একেবারে অর্ধশত শতাব্দীর বলে মনে হয় নিজেকে; কিন্তু তবু সত্যের অন্তস্তলে নিবাত নিরুপ প্রদীপ-নির্গতি মতো একটা উজ্জ্বল দল্লোষ সদা-জাগ্রত!—ইতিমধ্যে কামাখ্যা পাণ্ডার নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দির থেকে মায়ের নানান মতিমা-কথা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল। মা বাক্তিতের বাক্য পূর্ণ করেন, দুর্গতের গতি করেন,— কামাখ্যা-মন্দিরে মা সদা-জাগ্রত, এ কথাও রাজার কানে পৌঁছল। মহারাজা একবার ভাবলেন যে মায়ের কাছ থেকে শান্তি মেপে নেবেন কিন্তু রাজকীয় দত্ত বাদ সাধল। কবায়ত্ত সহজ

সমাধানের পথটি কল্প থাকার মিথল নিরুদ্ধিই যোগে মহারাজা বিভ্রম হুঁসতে থাকলেন। জীবন যে গীতিকাব্যের একটা পঠিত পৃষ্ঠক নয় গুরুদেব তা জানতেন; তাই অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে বখন অনাহার ক্রিষ্টে দেহে দিনের পর দিন অভিশপ্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন তাতে কষ্ট হয়েছে কিন্তু এমন খাসকল্প হয়নি, আজ আর কোন ভোগান্তরই অস্বাচ্ছন্দ্য নেই—স্পৃহাও আছে—আজ শুধু মহারাজা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান, স্পৃহা অতিক্রম করে অনেক অনেক গভীরের অন্ধকারে আজ তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। বাইরের কেউ কিছু জানতে পারে না, বুঝতে পারে না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহারাজা একেক বার পাগল হয়ে যাবেন জেবে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। আতঙ্কের আর অন্ধ কোন কারণ নেই, শুধু মা দেখেই পাগল হয়ে যাবেন, না জেনেই বিদায় নেবেন।

শক্তি এবার স্পষ্টতই নিয়তির বেধে আকর্ষণ করছেন এবং প্রজ্ঞাকল্যাণে স্ত্রী-সন্তোষে বা গার্হস্থ্যধর্মে মনোনিবেশ করে মহারাজার পক্ষে আর সে-আকর্ষণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সম্ভব হবেই বা কী করে!—জগদ্বাস্তব ধরে মূলদেশে জলসিঞ্জন করে বেই বৃক্ষ শিতকে মহীকূহে পরিণত করেছি সেই নিয়তি আমাদের স্পষ্ট বলেই তো আমাদের দাস নয়। যত কাল অন্ধ ছিলাম, নাবালক ছিলাম, তত কাল কোন দায়িত্ব ছিল না, শক্তির কথার উঠেছি বসেছি—শক্তিকে কীকি দিয়ে নিষ্পত্তি নিজেকেও ভুলেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু জীবনের রূপ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার আজ চোখ খুলে গেছে—আর সেই পূর্বকার বাধা-বাধকতা নেই কিন্তু নিয়তির নির্মম পথ আজ চোখের সামনে প্রসারিত। নির্ভীক নিরীহ নীতি-বৈষ্ণব ক্ষুদ্র সামাজিক জীবনে আর প্রোতাপ্তমনের পথ নেই—এখন হয় মৃত্যু, নয় মৃত্যু।

এমন সময় রাজার কানে সংবাদ পৌঁছল যে, মা প্রতি অমাবস্তার রাতে কামাখ্যার ভূগর্ভস্থ মন্দির-প্রকোষ্ঠে নৃত্য করেন। সংবাদ শুনে মহারাজা মরীয়া হয়ে উঠলেন, কামাখ্যা পাণ্ডাও রাজার তোড়জোড় তৎক্ষণাত্ শুরু হয়ে গেল। রাজ-পরিবারের পাণ্ডা অনেক বার স্থির করেও রাজার সামনে কোন ক্রমেই নিরস্ত হবার অনুবোধটুকু উচ্চারণ করতে পারলেন না। সবাই যেন জানতো কী ঘটবে, সবাই যেন জানতো যে, যা ঘটবে তা অপ্রতিরোধ্য। অবশেষে অমাবস্তা রাত্রির পূর্বেই মন্দির-প্রকোষ্ঠের দরজায় ছোট একটি ছিদ্র করে রাখা হল এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে মহারাজা গুরুদেব সেই ছিদ্রে চোখ রেখে পীড়ালেন। রাত্রি ক্রমে গভীরতর হতে লাগল—কাড়া-নাঁকাড়া বেজে উঠল মন্দিরের বাইরে—কামাখ্যা পাণ্ডা ধরধর কাঁপতে থাকল। ছিদ্রপথে রাজার চোখের আর পাণ্ডা পড়ে না। অকস্মাৎ বাজ ধেমে গেল, কামাখ্যা পাণ্ডা স্থির হয়ে পীড়াল, ব্রহ্মপুত্র শুক। চুটে গিয়ে সবাই দেখল, মহারাজা গুরুদেব তখনো ছিদ্রপথে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে নীথর পীড়িয়ে আছেন। মহারাজা পাবান-মূর্তি হয়ে গেছেন। এই সেই মহারাজা ঠিক সেই অবস্থায়। একেও প্রণাম করতে হয়।

মহারাজার নিরপেক্ষ মূর্তি নিমেষে তাকিয়ে রইল। নতজানু হয়ে পাণ্ডা ঠাকুর সেই মূর্তিকে প্রণাম করলেন, আমিও তার অনুসরণ করলাম। কেন না, অন্তত এ কথায় বিশ্বাস করতে আমার আর সন্দেহ নেই যে, তাঁর এলে রাজ্যের জয়ান্তর হয়। সাময়িক হলেও কামাখ্যা তাঁর আমাদেরও হয়তো জয়ান্তর হয়েছিল।



### ত্রিনির্মল চট্টোপাধ্যায়

পায়রা ওড়ান বন্ধিমের নেশা। অনেকে অনেক কিছু করে ;

মদ খায়, মেয়েমানুষ পোষে, গাঁজা, গুলি, আফিম অনেক রকম বিষ তিলে তিলে গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠার প্রয়াস পায়। ও-সব দিক থেকে বন্ধিম একেবারে নির্ভেজাল, সাদা আর খাঁটি। শুধু বেলা ন'টার পর সকালের চাঁ শেষ করে ছাদে উঠে আসে বন্ধিম। ছাদের এক দিকে কাঠের তৈরী সার সার ছোট ছোট খোপ, সেই সব খোপের ছোট ছোট দরজা তখনও বন্ধ। আগের দিন সন্ধ্যায় বন্ধিম প্রত্যেকটা খোপের প্রত্যেকটা দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে যায়। দোরবন্ধ খোপগুলোর ভেতর থেকে সম্বন্ধে ধনি ওঠে,—“বন্ধ-বন্ধ, বন্ধ-বন্ধ, বন্ধ-বন্ধ-বন্ধ।” কান পাতে বন্ধিম, কান পেতে থাকে, ছুই কান দিয়ে যেন পান করে পায়রাদের কোরাসু সঙ্গীত। অদ্ভুত ডাক এই পায়রাদের, চোখ বুজে খানিকক্ষণ শুনে যেন ঝিমুনি আসে, ঢুল আসে, ঘুম পায়। এত দিন ধরে ত শুনেছে বন্ধিম এই ডাক, সেই ছোটবেলা থেকে, বাবার হাত ধরে বধন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসে কৌতূহলী মন নিয়ে এই ডাক শুনে, তখন থেকেই ত এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মদ কোনো দিন খায়নি বন্ধিম, পরনারী, বারনারীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি সে, গাঁজা-বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া মস্তিষ্কে কোনো দিন আলোড়ন তোলেনি তার, স্তব্রাং ও সমস্তর মর্ম বোঝে না সে ; তবু আন্দাজ করে বন্ধিম—এই যে ‘বন্ধ-বন্ধ’ ‘বন্ধ-বন্ধ’ শুনে শুনে আবেশে ছুই চোখ সহজে বুজে আসা—এ বোধ হয় সেই সমস্ত ধোঁয়াটে তরল আর মাংসল নেশার আমেজের মতই। নিশ্চিত জানে না সে, কিন্তু একদিন এই ডাক না শুনেই যেন মনে হয় কি যেন হারিয়েছি, কি যেন পেলাম না, কিসের থেকে যেন বঞ্চিত হলাম।

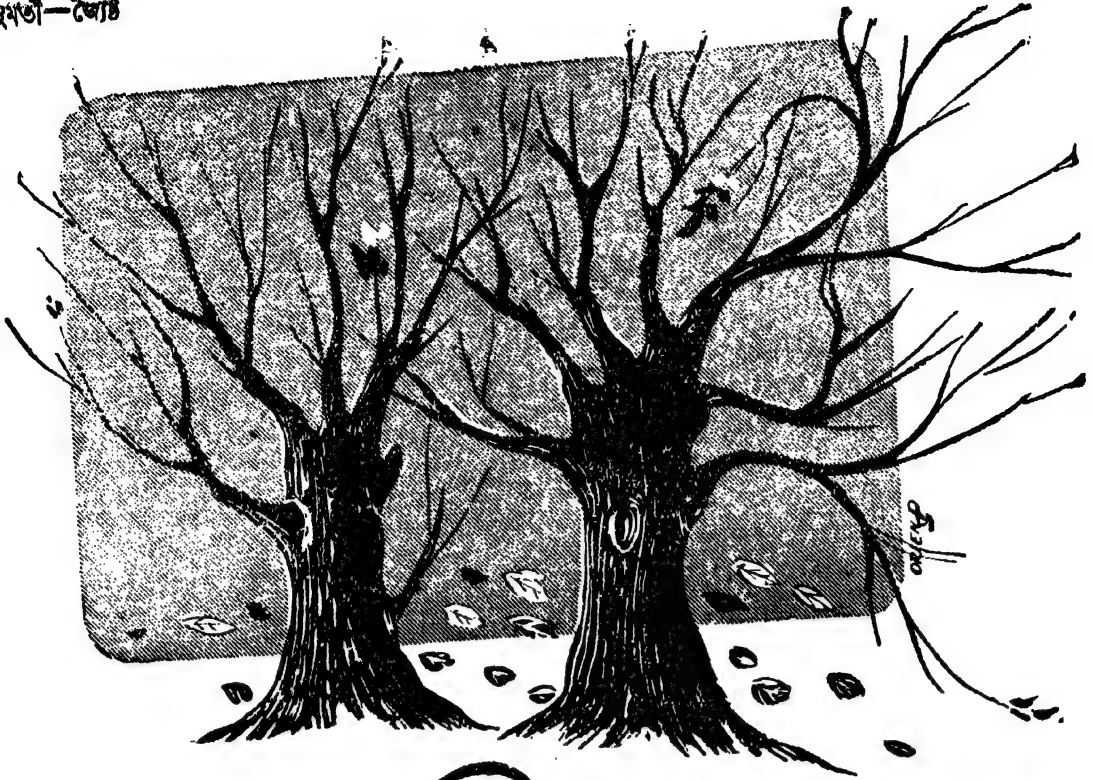
এক এক করে খোপের দরজাগুলো খুলে দেয় বন্ধিম। এক একটা দোর খোলে আর ঝটপট ঝটপট করে একজোড়া পায়রা ছাদজোড়া সোনারঙা সকালের রক্তুরে বেরিয়ে আসে। উড়ে উড়ে বন্ধিমের ঘাড়ে মাথায় বসে পায়রাগুলো—ভারী ভাল লাগে বন্ধিমের, একটুও অবস্থি বোধ হয় না। একে একে সব খোপের

দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলে বন্ধিম হালে কেনা, পোষ মা-মানা পায়রাগুলোর পাখনার বাঁধনগুলো পরীক্ষা করে, পাখনা উলটে দুটি আঙ্গা আজুলে বাঁধনগুলো পায়রার মেজাজ মাকিক চিলে বা কড়া করে দেয়। ইতিমধ্যে পোষমানা, পুরোনো পায়রাগুলোর কেউ কেউ আলসেস উঠে বা কাণিসে নেমে যৌবন-গরিভা ষোড়শীর মত সামনে বুক ঠেসে ঈষৎ ঢুলে ঢুলে চলে আর বন্ধিমের বাপ-দাদার আমলের নোণায় ধরা পুরোনো বাড়ির বরেপড়া পলস্তারা বালি-সুরকি খুঁটে খুঁটে খায়। কেউ কেউ উঠে যায় একটা বাঁশের মাথার দিকে চৌকাল করে চার খুঁটির ওপর জালবেছান ‘বোম্বে’।

অনেক রকম পায়রা আছে বন্ধিমের। দেশী-বিদেশী সুল্লর-কুংসিত। গোলা, কেলে গোলা, গলা ফোলা, মুখশী থেকে শুক করে লক্কা, সিরাজ, তোমা, গিরবাজ, টারবিন, মাকরিণ পর্যন্ত। একজোড়া পায়রার দাম যে দেড়শ-দু'শ টাকা পর্যন্ত দিতে হয় বন্ধিমকে, তা কি জানে রাগু? না সে জানে যে কঁটিদার লক্কার সঙ্গে পায়রা-জগতে অপারাজ্জের কেলে গোলাব মিশ্রণের ফলে এমন এক নতুন জাতের সৃষ্টি হয়, যা অনায়াসে বন্ধিম বুক ফুলিয়ে সবাইকে ডেকে দেখাতে পারে। কিছুই জানে না রাগু। তার ধারণা, বছর বছর আগনি আপনি বেড়ে যায় বন্ধিমের পায়রাদের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে, যে নিয়মে খেতে না পাওয়া মানুষের ঘরে বছর বছর ডিম ছাড়ান কই মাছের মত হাড় জিরুজিরে, বুক ডিগড়িগে বাচ্চার সংখ্যা বেড়ে যায়। এই পায়রাদের পেছনে বন্ধিমের যে কত পবিত্রত্ব, কত অধ্যবসায়, কত খরচ—তার কিছুই ধারণা নেই রাগুর। কত সাধনার পর, কত শিক্ষকতার পর যে একটা পায়রা শীঘ্রের প্রকার-ভেদ ধরতে পারে, বুঝতে পারে আর সেই অমুযায়ী নিজেকে ফুলের মালার মত কিংবা যোগ চিহ্নের মত অথবা আরো নানান কাককাধ্যের মত আকাশে উড়ন্ত পায়রার দলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে, খাপ খাইয়ে নিয়ে সেই নয়ন মনোহর দৃশ্যের অন্তর্গত হয়ে যেতে শেখে, তা কখনও করতে পারে না রাগু। তাই সে ঠাট্টা করে বন্ধিমকে, বিজ্ঞপ করে, ঠেস দিয়ে দিয়ে বন্ধিমের আচরণের নিন্দা করে।

হাসি পায় বন্ধিমের, করুণাও হয়। কি দেখেছে রাগু? কতটুকু দেখেছে? গরীব ঘরের মেয়ে রাগু, রূপের দৌলতে এই আদি কলকাতার অভিজাত পরিবারে ঠাই হয়েছে তার। আজ না হয় পরশা নেই বন্ধিমের, না হয় তিন বিঘের ওপর জায়গাজোড়া নানান মহল বাড়িখানা আজ ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে, খসে গেছে পলস্তারা, কঙ্কালের দাঁত ছিরকুটি হাসির মত না হয় বাড়িখানাও ইটের দাঁত বের করে হাসছে, না হয় আজ বাড়ির ভেতরের বড় বড় মাঠগুলো আর উঠোনগুলো ধোঁবাদের আর গোয়ালাদের ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বন্ধিম কাপড় শুকানোর আর গরু-মোষের খাটাল করবার জঙ্গ। তাই বলে কলমধ্যাদা বাবে কোথায় বন্ধিমের? বাপ-দাদার আমলের ‘রাজা’ উপাধিটা কি এতই সম্ভা আর সহজলভ্য যে, আজ দু'টিখানি ভাতের অভাব হয়েছে বলেই বন্ধিম তার ‘রাজা’ উপাধি, এত দিনকার বংশমধ্যাদা তার পায়রা ওড়ানোর নেশা, সব কিছু ছেলেমানুষের খেলনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাল আমলের ডাক্তার-মোক্তার মধ্যবিত্তদের মত চাকরী খুঁজতে বেরবে? আর চাকরী করবে কি করে বন্ধিম? সে কি পড়েছে, না পাস করেছে?

তবু ত আর কোনো নেশা নেই বন্ধিমের, ছোটবেলাতেও ত



## বেচারা....

লতাপাতা শূণ্য বৃক্ষ যেমন দেখিতে ভাল লাগে না,  
বিবাহের ব্যাপারেও তেমনি কষ্টা যতই  
গুণবতী, স্বাস্থ্যবতী ও ফরসা রংয়ের হউক না কেন  
কেশের অপ্রাচুর্যে কপালের প্রসারতা দেখিয়া যাহারা  
কষ্টা দেখিতে আসেন, একবার দেখিয়া আর  
পুনরায় কথাবার্তা উত্থাপন করেন না।

কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়—  
কে, এম, পি, (K.M.P.) মার্কী খাঁটি নারিকেল তৈল  
যাহারা একবার গৃহে প্রচলন করিয়াছেন তাহারা  
এরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েন নাই।



কে, এম, পি  
মার্কী

খাঁটি নারিকেল তৈল  
এখন

১ পাঃ ২ পাঃ ৫ পাঃ সুদৃশ্য  
ছাপান টিনে সম্ভ্রান্ত ডিলারের  
নিকট পাওয়া যাইবে।

পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্

১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট,  
কলিকাতা-৭ : Phone : 34-3414



সে দেখেছে তার বাবার বড়মামুদী চাল। শুনেছে ডিকাটারে ডিকাটারে ঠোকাঠুকির মিষ্টি-মধুর শব্দ। সেই গ্যাসের উজ্জল আলোর রঙীন পানীয়ের বসন্ত, চিংপুর থেকে আনা মুনিয়া বাঈয়ের চুমকী-বসানো ঘাগরা ওড়ান নাচ, পিলুর ওপর হুঁকার মধুর সুর-বিস্তার, —“আয়ে না সাগ্নন বা...” সে সব ত কিছুই দেখল না, জানল না, শুনল না রাগু! আজ শুধু সামান্য কটা পায়রা দেখেই রাগুর এত রাগ! না হয় সে একটা না দুটো পাসই করেছে, না হয় রূপ আছে তার—রূপ ত এ বাড়ির বউ হয়ে আসার ব্যাপারে এক অতি আবশ্যকীয় যোগ্যতা—তাই বলে সে বন্ধিমের পিতা-পিতামহর আমল থেকে চলে আসা পায়রা ওড়ান নেশাকে, এক কথায় তার কণ্ঠের ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দিতে চাইবে তার প্রজাপতির পাখনার মত ঠোঁটের সামান্য হাসির হাওয়ায়?

আর পায়রা ওড়ানোর নেশাই বা বন্ধিমের কি এমন বেশী? তার ঠাকুরদানার গল্প শুনেছে সে ছোটবেলা তার বাবার মুখে। সে কথা ভাবলে মনে হয় তার নিজের নেশা—শুধু আজ-কালকার লোকের মত মদের বদলে চায়ের নেশার সমান। সেই পুরোনো আমলে পাঁচশ-সাতশ-হাজার টাকার একজোড়া পায়রা কিনতেন ঠাকুরদা! ভাবলে শরীরে শিহরণ লাগে বন্ধিমের। আর সেই পায়রার লড়াই আর বেস! একশ একশ পায়রা উঠত হুঁদিক থেকে হুঁদলের, লড়াই চলত হুঁদিকা তিন ঘণ্টা ধরে। কোন দিকের কত পায়রা দলছাড়া হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল, তার হিসেব নিকেশ করে নিশ্চিন্তি হত জয়-পরাজয়ের। আর বেস যোগদানকারী সকলের পায়রা একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হত গয়া, কাশী, মথুরা বা বৃন্দাবন থেকে, যার পায়রা আগে কলকাতায় এসে পৌঁছত তিনি জিতেন বেসে। অনেক বার বিজয় মুকুট লাভ করেছেন বন্ধিমর ঠাকুরদা! এমনি ধারা লড়াই-এ আর দৌড়বাজীতে। কিন্তু সে সব দিন আজ কোথায়? আজ আর লোকে পায়রার সম্মান দেয় না, মধ্যাংগ বোঝে না। রোজ সকালে যখন সে হাতের ছোট লাঠিটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর জিভের তলার মধ্যমা আর তর্জনী দিয়ে বিচিত্র শব্দে শীঘ্র দেয় আর সেই শীঘ্রের শব্দ অল্পসরণ করে বোম থেকে ডানা মেলে দিয়ে পায়রার ঝাঁক মেয়েদের সূচের কাজের মত আকাশের এক অংশে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে তোলে, তখন দূরের দূরের বাড়ির ছাদের সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কিন্তু বন্ধিম জানে, ওরা যতই অবাক হোক না কেন, আসলে মনে মনে ওরা সবাই বন্ধিমকে অবহেলা করে, বন্ধিমের কথা উঠলেই নাক সিঁটকে বলে—এ পায়রা-ওড়ান লোকটা। ওদের ওপর রাগ হয় বন্ধিমের, কিন্তু আবার সামলে নেয় রাগ। ওদের দোষ কি? নিজের বউ যেখানে ঠোট বাকার, নাক সিঁটকায় কথায় কথায়, সেখানে অল্প লোক যে দুয়ে দেবে, ধুলো ছুঁড়বে, হাততালি বাজাবে পেছনে, তা আর বিচিত্র কি?

বিদ্রূপ করুক রাগু কিছু এসে-যায় না বন্ধিমের। পাস-করা মেয়ে রাগু, এবার ওকে আনাই ভুল হয়েছে। আসল কথা, শেষ বয়সে আজকালকার কড়া আলোর চোখ ধাঁসিয়ে গিয়েছিল বন্ধিমের বাবার, ভেবেছিলেন কোনো আধুনিকাকে ঘরে তুলে আজকালকার সঙ্গে পালা দেবেন। ছেলে বন্ধিমকে বিয়ে দিলেন তিনি গরীবের মেয়ে রাগুর সঙ্গে, যে আসলে আজকালকার এই হুনকো যুগেরই

প্রতিনিধি। দিয়ে ত মরলেন তিনি, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলার খেয়ে-বাওয়া বড়মামুদী ভেঙ্গে পড়ল শব্দে। পাত-দায়রা একযোগে সবকিছু গ্রাস করল, রইল শুধু এই সাবেক বাপ-দাদার আমলের দৈত্যাকার বাড়িখানা। আর এই এত বড় বাড়িখানা আগল হৃৎকের ১৩ জেগে রইল বন্ধিম। এখানে, এবাড়িতে মন বদল না রাগুর। সে ঘরের মধ্যে থেকেও পর হয়ে রইল, দূর হয়ে রইল।

কিন্তু মন কি করে বসাতে হয় জানে বন্ধিম। এ পরিবারের পূর্বপুরুষের হাত অনেক নারীরক্তে রঞ্জিত। সেই রক্ত বংশ-পরম্পরায় বন্ধিমের দেহেও প্রবাহিত। রাগু তার কাছে একটা বড় পায়রা ছাড়া আর কিছু নয়। পায়রা কি করে গোব মানাতে হয়, তা জানে বন্ধিম।

বিয়ের পরের প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে বন্ধিমের। সকালের পায়রা ওড়ানর অনুষ্ঠান তখনো শেষ হয়নি, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছিল রাগু, সুখের আলোর অবগাহন স্নান করে উজ্জল একঝাঁক উড়ন্ত পায়রা দেখে বুঝি তারও ভাল লেগেছিল। একটুখানি প্রশংসমান দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে, তারপর শুমিয়েছিল,—“কি, চান-খাওয়া করবে না আজ?”

চোখ নামিয়েছিল বন্ধিম, রাগুক দেখে বিস্মিত হয়েছিল একটু, তারপর আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে জিভের নীচে হর্জনী আব বৃদ্ধাস্থলি দিয়ে দীর্ঘ বিলম্বিত করে একবার শীঘ্র মিল সে। বৃদ্ধাকারে উড়ন্ত পায়রাগুলো হঠাৎ বৃত্ত ভেঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ল বোমের ওপর। রাগুর দিকে ফিরেছিল বন্ধিম,—“ছাদে উঠেছ যে?”

রাগুর মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিয়েছিল,—উঠেছি ত কি হয়েছে? নিজের বাড়ির ছাদেও উঠতে পারব না?”

—“না। পারবে না।” চমকে উঠেছিল বন্ধিম,—“আমাদের কণ্ঠের বউদের অত বেলেলাপণা চলবে না! বুঝেছ? বাও।” সিঁড়ির দিকে জুঙ্গলী নির্দেশ করল বন্ধিম।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল রাগু, সিঁড়িতে পা দিয়ে এদিকে ফিরে বলেছিল,—“বেলা বারটা বে বেজে গেল! খাওয়া দাওয়া করবে না?”

—“খাবার কথা।” গর্জন করে উঠেছিল বন্ধিম,—“বা—ও।”

হুড়মুড় করে নেমে গিয়েছিল রাগু।

সেদিনের কথা মনে আছে বন্ধিমের। রাগুরও। তারপর আর কোনো দিন ছাদে ওঠেনি সে।

সারাদিন ত ছাদেই থাকে বন্ধিম। নীচে নামে খুব কম—শুধু খাওয়া আর শোয়ার সময়। বাড়ির বাইরে যায়ই না বলতে গেলে। শুধু মাসের শেষে যোশা আর গোয়ালদেব কাছ থেকে ভাড়ার টাকা আদায় করতে বাইরে যায় সে। নীচেকার অন্ধকার ঘরে সারাদিন প্রায় একাই কাটাতে হয় রাগুকে। প্রথম প্রথম কি ভয়ই না করত রাগুর! বাবা ম্যাট্রিক পাস করিয়েও দিয়ে দিলেন রাজবংশের এই মূর্খ রাজপুত্রটির সঙ্গে। যদিও অবস্থা তখন দৃষ্টিকটু রকমের পড়ন্ত এদের, তবুও বাবা বলেছিলেন,—“মরহাতীর দায় লাখ টাকা।” সে গরব না খািলেও এখনও ওরা সাতটা উকিলকে এক হাটে কিনে আর হাটে বেচতে পারে। বাবার হিসাবে গোলমাল হয়েছিল, তিনি তার যৌবনের চোখ

দিয়ে এতদূর যে বমারম্ বমারম্ দেখেছিলেন, আসলে বুড়ো বরষেও তার বেশ কাটেনি।

বিয়ে হল আর গোটা পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে কপাট বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিল। বই পড়া বারণ এ বাড়ির বউ-এর, বারণ বাইরে বেকনো, দিনের বেলা ছাদে ওঠাও। খন্তর বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত ছ'চারজন পরগাছা বাল-বিধবা আত্মীয়গণ যা ছিলেন, খন্তর চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেল সারাল বুকের সন্ধানে। বিংবা বন্ধুই তাদের ত্যাগাল। তারপর একা, একেবারে একা! ভূতের মত বাড়িটা তার সমস্ত অন্ধকার, নিস্কলতা আর ক্ষীণতম শব্দের বীভৎসতম প্রতিধ্বনি নিয়ে যেন বুকের উপর চেপে বসল রাণুর, যেন হ'হাতে গলা টিপে ধরে তার দম বন্ধ করে দিতে চাইল।

এই নিঃশব্দতা নিঃসঙ্গতা আর নিস্পন্দতাকে এড়ানোর জন্যই রাণু ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিল। ছোট ছোট খুপরী খুপরী ঘর, ঘরের মধ্যে চাপ-চাপ আদিম অন্ধকারের বাস। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই যেন 'খাড়মোড়া ভেসে দৌড়ে গিলে খেতে আসে, পায়ের সামান্যতম শব্দ বিরাটতম রবে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। এমনি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘবতে ঘবতে একদিন বিকাশ দা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই কে যেন হাত ধরেছিল তার। আর্জকণ্ঠে টেতিয়ে টেতিয়ে গিয়েছিল সে, তখনই বিকাশ কথা বলল,—“চপ! আমি আমি, রাণু!”

অবাক হয়ে গিয়েছিল রাণু,—“তুমি...তুমি কি করে এলে বিকাশ দা'?”

—“এলাম।” জাবড়া অন্ধকারেও বিকাশের মুখের হাসিটি দেখা গিয়েছিল,—“জানতাম ত এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছে তোমার। চুপি চুপি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে, লুকিয়ে ছিলাম এই ঘরের মধ্যে।”

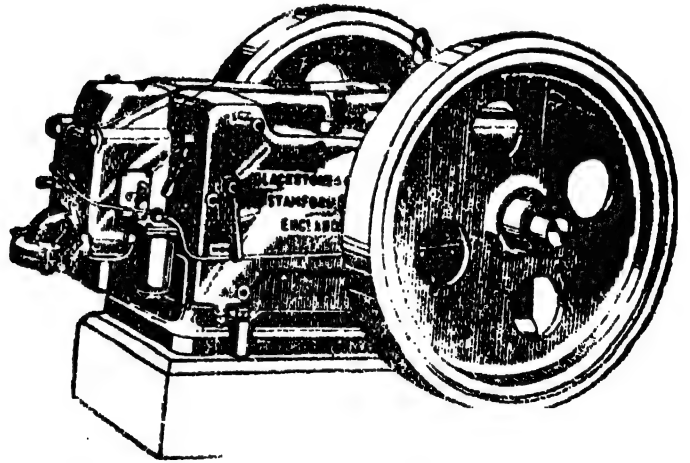
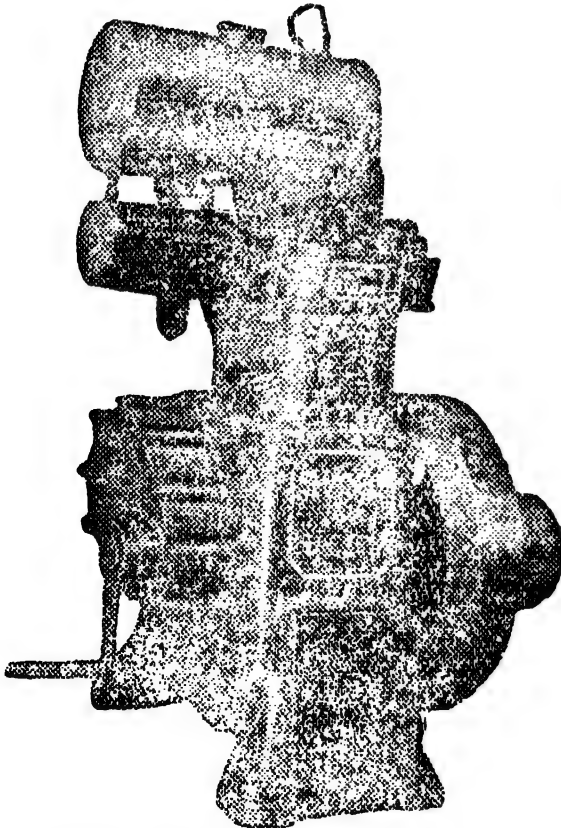
ভীষণ ভয় পেয়েছিল রাণু, হাত দিয়ে ওর বুকে ছোট একটা ঠেলা দিয়ে বলেছিল,—“তুমি চলে যাও বিকাশ দা'! চলে যাও এখান থেকে।”

রাণুর হ' কাঁধের ওপর হ' হাত রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল বিকাশ রাণুকে, তারপর শুবিয়েছিল,—“তাড়িয়ে দিচ্ছ রাণু?”

—“না, না বিকাশ দা'! তাড়িয়ে দিচ্ছি না তোমাকে আমি”—রাণু বলল,—“তবু যাও তুমি।”

—“আচ্ছা। বাই—” বিকাশ এগিয়ে গিয়েছিল ছ'পা, তারপর ফিরে বলেছিল,—“আবার কিন্তু আসব রাণু!”

বিকাশ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুকের টিপটিপানি থামেনি রাণুর। কিছুটা পূজক, কিছুটা আতঙ্ক হুইয়ের সম্মিশ্রণে এক অনাস্বাদিতপূর্ণ শিহরণ বার বার পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হাতারাত করে। বিকাশকে ভালবাসত রাণু, হ্যাঁ, এখনও বাসে। কারণ, বিয়ের পরে ঘেঁকারে মেয়েরা এক কালের



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটীর শিল্প ও কৃষিকাষা দেশের অন্ন ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিটোর, ব্লাকষ্টোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিটোর পাম্পিং মেট, আন্ডস্ ডিজেল ইঞ্জিন আন্ডস্ পাম্পিং মেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এড্রেস :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রীট, বিত্তল কলিকাতা—১

ফোন ৪—২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিন ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবসায় সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

প্রিয়জনকে ভুলে গিয়ে চোখের জলের নাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের দাগকেও মুছে ফেলে নতুন সংসার, নতুন মাহুখের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ভবত মিলে যেতে পারে—তার কিছুই ত পায়নি রাণু! তার সংসার বসতে ত এই ভাঙ্গা, অন্ধকার, ঘরে ঘরে চামটিকে আর মাকড়সার বাসা, মাকড়সার আমলের জনশূন্য, মনশূন্য বাড়ি আর সামী বসতে ত ঐ বোকা, মূর্থ, এককালীন সম্ভ্রান্ততার অহংকারে ভগ্নমগ্ন বঙ্কিম, যে আত্মোচ্ছাদে বসে ঐষ দিয়ে পায়রা ওড়ায় আর বউকে অন্ধকার ঘরের অন্ধকারতম কোণায় আটকে রেখে বাঁশের ঐতিহ্য বহন করে চলে! কি করে সে ভুলবে বিকাশ দাঁকে, মুছে ফেলবে মন থেকে নিশিচ্ছে—যে বিকাশ দাঁ এক দিন তার শিক্ষায়, বুদ্ধিতে, কথায়, চিন্তায় উজ্জ্বল একটা নক্ষত্রের মত অহরহ চোখের সামনে, মনের আকাশে জেগে থাকত?

তবু এমনি ভাবে বিকাশ দেখা না দিলেও পারত। বিষের সময় দেখা হয়নি বিকাশের সঙ্গে। কারণ, সে তখন গভর্ণমেন্ট ষ্টাইপেন্ড নিয়ে পড়তে গিয়েছিল বিদেশে। দেখা যখন হয় নি—না হয় দেখা নাই হত কোনো দিন। অনুপস্থিত বিকাশ দাঁর উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্তি মনের বেদীতে বসিয়ে ভক্তির চন্দনে, শ্রদ্ধার পুষ্পে সাজিয়ে চিরকাল পূজা করে এক দিন নিঃশব্দে এই ভূতুড়ে বাড়িতে নিশ্পন্দে মরে যেতে পারত সে! কেন এল বিকাশ দাঁ আবার? আর যদি বা এল, কেন এমনি ভাবে এক দিন বলে বসল হাতের মধ্যে হাত নিয়ে,—“তুমি আমার সঙ্গে চল রাণু! নতুন চাকরী হচ্ছে আমার, পাজাবে পোষ্টিং হচ্ছে, কেউ জানবে না! কেন এমনি ভাবে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে? আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমাকে ভালবাস। এই কি সব চেয়ে বড় কথা নয়?”

সেদিনও রাণু কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল,—“তুমি যাও বিকাশ দাঁ! তুমি যাও!”

একটু হেসে বিকাশ বলে গিয়েছিল,—“বাচ্ছি! কিন্তু আবার আসব।”

এ কি লোভ দেখিয়ে গেল বিকাশ? আলো, বাতাস, ফুল, পাখী, গান, হাসি, প্রেম, ভালবাসা—যার কিছু পেল না রাণু, অথচ বা কিছু পাওয়ার জন্তে তার তদী মনটা আঁকুপাকু করছে, বা কিছুই অভাবে তার জীবনে মৃত্যু নেমে আসছে তড়িৎগতি, সব কিছুই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে! পৃথিবীটা আবার কড়া নেড়ে বাচ্ছে বন্ধ দোরের বাইরে থেকে—দোর খোলো, দোর খোলো! কি করে এখন রাণু?

আজকে এই সময় বিকাশ এল কেন? বেলা যখন প্রায় একটা বাজে, পায়রা ওড়ান শেষ করে বঙ্কিমের নীচে নামার সময় হয়ে গেছে যখন, তখন বিকাশ না এলেই বুঝি ছিল ভাল! আর এল যদি, এমন জুতো মচমচিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এসে না ঢুকলেও ত পারত সে? বিকাশ ত জানে, বঙ্কিম নেমে এসে যদি দেখে বিকাশকে, মাথায় খুন চেপে বাবে তার!

আর তাই ত ঘটল। বিকাশকে যখন ঠেলে দিচ্ছে রাণু দোরের বাইরে, বলছে—“তুমি চলে যাও বিকাশ দাঁ! এখুনি! ওর নামার সময় হয়ে গেছে ছাদ থেকে!” ঠিক তখনই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল

বঙ্কিম আর দোরের দাঁড়ান বিকাশকে দেখেই দপ করে <sup>আঁ</sup>জেরে উঠল তার চোখ দুটো!

বিকাশও দেখেছে বঙ্কিমকে। একটুখানি কাঁঠহাসি হেসে বিকাশ বলল,—“এই যে বঙ্কিম বাবু, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ, নামই শোনা ছিল শুধু! আমি রাণুর পিসতুতো ভাই, আপনার ঘরের বিষের সময় ফরেনে ছিলাম। আচ্ছা, চলি আজ। বেলা হয়ে গেল। আবার দেখা হবে। চলি রাণু, কেমন?” জুতো বাজিয়ে বেরিয়ে গেল বিকাশ। কপাটের ওপাশে দাঁড়ান রাণু জমে যেন হিম হয়ে গেল!

ঘরে ঢুকল বঙ্কিম। সংকুচিত দুই ভ্রূতে সন্দেহের ঘোর কুটিল ছায়া। একটুখানি দেখল রাণুকে বঙ্কিম, তার পর প্রশ্ন করল,—“ও কে?”

ভাষার পথে যেন হেঁচট খেল রাণু,—“আমার.....আমার পিসতুতো ভাই।”

—“দেখাচ্ছি, আজ তোমার কোন্ গোঁকুলের পিসতুতো ভাই!” হাতে হাত ঘষে কথা ক’টা উচ্চারণ করল বঙ্কিম, তার পর হাত বাড়িয়ে তাকে ওপর থেকে লম্বা আর সক্ষ একটা লোহার রড টেনে নিল সে।

—“তুমি...তুমি...মারবে আমাকে?” শীংকারধ্বনির মত কথা ক’টা বেরিয়ে এল রাণুর মুখ থেকে।

—“না!” ব্যঙ্গ রণধ্বনিতে উঠল বঙ্কিমের স্বর,—“পূজা করব।”

তার পর স্তব্ধ হল মার। লোহার রড দিয়ে এলোপাখাড়ী পিটোতে স্তব্ধ করল বঙ্কিম—পিঠে, ঘাড়, কপালে, বাহুতে, মাথায়। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বঙ্কিমের হাতের লম্বা সক্ষ আর শক্ত লোহার রড রাণুর দেহে তাণ্ডব নৃত্য করে চলল। কপাল কেটে গেল রাণুর, রক্ত পড়িয়ে নেমে চোখের দৃষ্টি-রাপসা করে দিল তার, মাথা ফেটে রক্তে চুল আঠা হয়ে গেল।

শেষে এক সময় ক্রান্ত আর পরিশ্রান্ত হয়েই যেন থামল বঙ্কিম, রেহাই দিল রাণুকে। প্রচণ্ড বেগে ঘরের পালঙ্কের ওপর ঠেলে দিল তাকে। বলল,—“আবার যদি দেখি কোনো দিন ঘরের মধ্যে নাগর নিয়ে কেলি করতে, দু’খানা করে ফেলব একেবারে!” বেরিয়ে গেল বঙ্কিম, মনে তার আত্মপ্রসাদ; পোষ কি করে মানাতে হয় জানে সে!

পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে কঁদল রাণু, কঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে। জোরে কেঁদে কি করবে রাণু? যত জোরেই কাঁদুক সে, সে কারা! এই কবর-ভূমির বাইরে যে আলো বাতাস, জীবন, আনন্দ, প্রেম-ভালবাসা ভরা পৃথিবী, সে পৃথিবীতে ত কোনো দিন পৌঁছুবে না!

কতক্ষণ যে কেঁদেছিল রাণু, তা জানা নেই তার। চমকে উঠল চুলে এক শিথল কোমল-স্পর্শ পেয়ে। চমকে তাকিয়ে দেখল বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে কখন মাথার কাছে, বলছে,—“আমি জানতাম রাণু, এমনি হবে, তাই আবার এলাম।”

দ্রবন্ত অশ্রুভার লুকোবার জন্তই মুখ লুকোলো রাণু। এমনি সময় না এলেই কি চলত না বিকাশের? হাতে পায়ে পিঠে বগন প্রহার জনিত কালো কালো দাগ, রক্তে যখন সে প্রায় নেমে উঠেছে:

সর্বদা তার বিপ্রলক্ষ্য জীবনের গভীর বন্ধনার স্পষ্ট চিহ্ন, তখন  
বন্ধুর বাদ নিয়ে, আশা নিয়ে, প্রতিশ্রুতি নিয়ে, এমনি ভাবে  
মাথার কাছে এসে না দাঁড়ালেই কি পারত না বিকাশ ?

পরের দিনে সকালে ছাদে বসে পায়রা ওড়াচ্ছিল বন্ধিম।  
গোলা, কেলে গোলা, গলাফোলা, মুখখী, হোমা, সিরাজু, গিরবাজু,  
টারবিন, জ্যাকবিন, গ্রাবার নানান ধরনের পায়রার বিচিত্র পক্ষ-  
বিলাস আকাশের বৃকে ! কিন্তু আজ পায়রা ওড়াতে মন  
নেই বন্ধিমের। সব-সব পায়রা থেকেও যেন কোন একটা  
গরিমে গেছে চিরন্তনে ; সব চেয়ে ভাল আর দামী আর সুন্দর  
পায়রাটাই যেন উড়ে গেছে বন্ধিমের, উড়ে গেছে চিরকালের জন্ত,

ডানা মেলে দিয়েছে অবশ্যে, কোনো দিনও যেন আসার আশা নেই  
তার।

পুরোনো দিন হলে হয়ত গুণ্ডা জেলিয়ে দিয়ে খুঁজে বার করত  
ওদেরকে বন্ধিম, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে একেবারে শেষ করে  
দিয়ে নিঃশব্দে পুঁতে ফেলত এই অন্ধকার বাড়ির মেঝের গভীর গর্ত  
করে। কিন্তু আজ আর তা করার শক্তি নেই তার, ক্ষমতা নেই,  
সাধ্যও নেই। আজ শুধু তাকে এই সব চেয়ে বড় পায়রা তারানোর  
হৃৎস্পষ্টকে বৃকে পুষে রেখে চুপ করে পায়রা পোষ মানাতে হবে ;  
সকালের রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দিয়ে দিয়ে আর ছোট  
লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়রা ওড়ান ছাড়া আর কিছুই করার নেই  
বন্ধিমের।

## বৃষ্টি বারে

রেখা দত্ত

বৃষ্টি বারে বৃষ্টি বারে  
ঝিম ঝিম ঝিম সারাক্ষণ। কল্লঘরে  
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার  
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।

নিঃশ্বাস স্পন্দন শূন্য স্তব্ধ দশ দিশি,  
নিঃস্পন্দ-প্রদীপ মনে জেগে সারা নিশি  
ভাবি বসে বসে—  
ভেঙে-চূরে টুকুরো-হয়ে যারা গেছে থমে  
এ জীবন হতে  
বদি পারি কোনো মতে  
তাদের স্মৃতির স্নান বেশ  
এই রাতে করে সমাবেশ  
জোড়া দেব।

শত চেষ্টা শেষে  
তন্দ্রাবিজড়িত চোখে বার্ষ ভাবাবেশে  
একটু জোড়ানো হলে পিছে চেয়ে দেখি  
পুনঃ সব গেছে ভেঙে !

মৃচ-মেকি সে কি  
লক্ষ চিন্তা আসে-যায় তারি কঁাক দিয়ে  
ঠাং তুমিও এসে উঁকি মারো প্রিয়ে।  
মনে ভাবি, বলে কেলি এই শুভক্ষণে, রাশি রাশি  
নির্জন প্রহরে, 'ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি !'

'ভালবাসি' বলবার সব চেষ্টা বুধা—

আগে জানি নি তা !

কা'রা এসে

কণ্ট চোখে ধরে অট্টহেসে !

সে কি লাজ ?

সে কি ওই মার্জিত সমাজ

আর পিছে ফেলে-আসা যত নর-নারী ?

না না শুধু তারা নয় প্রেমের ভিখারী,  
তা ছাড়া অনেকে  
আরো, ঢোনা-জানা নেই তাই থেকে থেকে  
বলা না-বলার দ্বন্দ্ব  
ধামা ও চলার ছন্দ  
চোখ খুলতেই  
দেখি তুমি নেই !  
বৃষ্টি-ঘোরা কদমাক্ত পথে  
বিদ্যুৎ-চকিত রণে  
চলে গেছ যেন কত দূরে !  
শ্রান্ত আমি ক্লান্ত পায়ে মিথো ধূবে ধূবে  
বার্ষ মনে এত শূন্য ঘরে ফিরে আসি।

'ভালবাসি'—

ভালবাসি বলা শব্দ বড় !  
লজ্জা ভয়ে দেহ-মন অতি জড়সড়,  
বুক ফাটে তবু ভালবাসি বলা দায়।

নব নব বার্ষি-দিন আসে চলে যায়  
বৃষ্টি বারে  
অনাদি অনন্ত কাল ধরে  
তার মাঝে অন্ধকারে হুত করে নেমে আসে ঝড়,  
হিয়া কাঁপে থরথর  
অশ্রু বারে, ঝিকিমিকি সিক্ত গণ্ড জলে তপ্ত আঁখি;  
মৃত্যুশ্রাব্য অন্ধকার ভেদ কবে তবু চেয়ে থাকি  
প্রিয়ে,

হয়তো আসবে তুমি প্রভাতের রাঙা আভা নিয়ে।

বৃষ্টি বারে বৃষ্টি বারে

ঝিম ঝিম ঝিম সারাক্ষণ। কল্লঘরে

একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার

আপন আঁচলে ঢেকে নিল এসংসার।



### শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

একখানা বই থেকে নকল করার নাম চুরি। অনেকগুলো বই থেকে নকল করার নাম গবেষণা। বছর পাঁচেক আগের কথা বলছি। অনেক বই খেঁটে, অনেক মেহনত করে, ঘামের গন্ধ-বমুনা বইয়েও যখন হুঁ লাইন লিখতে পারলাম না, গুরু তখন ডেকে বললেন “বৎস, ও সব তোমার ধারা হবে না, এ লাইন থেকে কেটে পড়।”

কিন্তু গবেষণা করতেই হবে আমাকে। ডিগ্রীটা না পাই নেহাৎ একটা ডিপ্লোমা ত চাই-ই।

শ’পাঁচেক প্রশ্ন সক্ষম করে, দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্র অভিযুগে বণনা দিলাম। এবার আর বই থেকে নকল নয়। মুখোমুখি প্রশ্ন করে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে প্র্যাক্টিক্যাল গবেষণা।

জায়গাটার নাম নিলোখেরি। দিল্লী থেকে আশী মাইল দূরে। কুরুক্ষেত্রের কাছেই। বাসনা ছিল ধর্মক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি যাবার।

নিলোখেরিতে বহু দিন ছিলাম। বহু নবজীবনে সাধে পরিচয়ও ঘটেছিল। কিন্তু একটি দিনের ছবি আমার মনে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে, আমার মনে হয়, জীবনের শেষ মুহূর্তেও সে চিত্র মুছেবে না।

প্রশ্নের তাড়া নিয়ে প্রতিদিন ঘরে ঘরে ঘুরতাম। সাথে থাকতেন স্থানীয় কবি বন্ধু—আমার দোভাষী।

নিলোখেরির প্রায় সবাই মূলতান প্রত্যাগত শরণার্থী। মূলতানের গ্রামের চানী-সংক্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার।

সেদিন গরমটা একটু বেশীই পড়েছিল। সমস্ত দিন কাজে মনোযোগ দিতে পারি নি। দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য দিগন্তে আবার ছড়িয়ে পাটে বসছিলেন। আমার কবি বন্ধু নানকের মহিমা আবৃত্তি করতে করতে এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার বেশী দেরী ছিল না। সাথে সাথী প্রদীপ নিয়ে চলল। চারিদিকে বাতি নেই। বড় রাস্তাগুলোতে তখনও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলি নি।

রাস্তার বাঁকে বাঁকে দুর্বল ছেলেরা খেলাধুলোর মত্ত ছিল। হস্পিট্যাল এরিয়া ছাড়িয়ে টেশনের দিকে পড়লাম। গ্রামের বধূরা যবে ঘরে প্রদীপ জ্বালছিল। আমার মনে ভেসে উঠল বালায় নিভৃত পল্লীর বিম্বতপ্রায় দৃশ্য। তুলসীমাকে প্রদীপ-শিখারত গলবস্ত্র বঙ্গ পল্লীবালার সে চিত্র সহস্র মাইল দূরে কে শিখিয়ে দিল?

ভারতের গ্রামকে তখনও আমার চেমা ছিল বাকী। আমার

কবি বন্ধু যশোবন্ত বলল, “এই যে এসে পড়েছি।” কুটীরের সামনে একটা গরু-বাধা। মাটির কলসী ভরা জল। পাশে বন্ধুকে গেলাস।

যশোবন্ত ভিতরে গিয়ে গৃহকর্তাকে ভেদে জানল। এখানকার সব ঘরেই ওর সমান বাতায়। সবাই ওকে ‘গুরুপ্রিয়’ বলেই ডাকে। যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর নাম গোবিন্দরাম।

গোবিন্দ মূলতানের অধিবাসী। পাঞ্জাবী ভাষায় মূলতানী দেহাতীর টান আছে। লম্বা-চওড়া চেহারা। মুখখানা রক্তাভ। মাথায় পাগড়ী। পরনে ছিন্ন শালওয়ার। আমাদের সহস্র কুর্পিস করে দাঁড়াল। খাটিয়াতে বসলাম।

আমার সহস্র প্রশ্নে আমি নিজেই দ্বিধাবোধ করছিলাম। হঠাৎ লোকটা আমাদের ফেলে লাফ দিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমার উদ্বেগ দেখে যশোবন্ত অভয় দিলেন, “বাবড়াবেন না, ও এখনি আসছে।”

বন্ধুকে গ্রাস ভর্তি ফেনিল ছুঁ নিয়ে গোবিন্দরাম হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো।

যশোবন্ত আমার কানে কানে বলল, “হুঁটুকু চোখ-কান বুজে খেয়ে ফেলুন।” এই ওর আতিথেয়তা। না খেলে ওকে শক্ত, বেইজ্জতি করা হবে।

যশোবন্তের আদেশ শিরোধার্য করলাম। কাঁচা ফেনিল ছুঁয়ে চুষুক দিলাম। তা ছাড়া লোকটার আন্তরিকতাও আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রশ্নবাশি শেষ করে উঠছি, এমন সময়ে মিনতির সুরে গোবিন্দ বলল, “তুমি দিল্লী থেকে আসছো? তাই না?”

বললাম, “হঁ—

“তাহলে রাজার সাথে রোজই দেখা হয়?”

বললাম, “কোন রাজা?”

“কেন? আমাদের মুখিয়া যে বলত রাজা দিল্লীতেই থাকে। তাকে দেখোনি কোনো দিন?”

বললাম, “ও হরি! তুমি জানো না গোবিন্দ, সে রাজা ত কবে এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে! এখন ত তোমার আমার, আমাদের সবার রাজ। যাকে খুশী গদীতে বসাত।”

যশোবন্ত দাড়ির কাঁকে হেসে বলল, “বল ত চাচা তোমার ভ্রাতৃও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। সবাই পক্ষায়েতে রায় দিলেও দিল্লীর গদীতে তুমিও বসতে পারো।”

বুদ্ধ বলল, “তামাসা করিস নি। তুই খাম, জ্যাঠা কোথাকার। জানিসটা কি শুনি? ইংরেজ রাজা ত চলে গেছে। তার গদীটা ত আর খালি নেই। বলি, নতুন রাজাও ত দিল্লীতেই থাকে?”

“ঠিক কথা। ঠিক কথা। তাকে কি কিছু বলতে হবে? বল ত গোবিন্দ—”

আমার হুঁখানি হাত ধরে মিনতির সুরে সজল চোখে বুদ্ধ বলল, “তুমি বলবে বাবুজী? বল তুমি বাদশাকে বলবে?”

আমি বললাম, “তোমার সমস্যাটা তো বল আগে।”

—“আমার বিজয়া।” বলেই বুদ্ধ অশ্রু সংবরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল।



কর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে আমি যশোবন্তের মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর অবস্থাও সুবিধের নয়। চোখ দুটো বাম্প-সজল।

আমি বললাম, “কি হয়েছে গোবিন্দ? বল, তোমার বিজয়ার কি হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই দিল্লীতে খবর দেব। গোবিন্দ!”

—“জী!”

—“কোথায় তোমার বিজয়া?”

—“বাবুজী, পেটের দায়ে তাকে বিক্রী করে দিয়েছি। ভগবান আমাকে কেন তার আগে পতন করে দিলেন না? আমার বিজয়া—”

বলেই বুদ্ধ হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল। তার অশ্রু সংবরণের কোন পথই আমার জানা ছিল না।

বসে বসে না দেখা বিজয়ার চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করলাম। তরুণী যুবতী, তরী, সরল। বহু বিজয়ার চিত্র আমার চোখে ভেসে উঠল।

কিন্তু কে বিজয়া? মাতা? কন্যা? বঙ্গবন্দী? কেমন করে জিজ্ঞাসা করি?

বুদ্ধ বলল, “মাত্র একশ টাকার জুজু পাখি হরিয়ার আমার বিজয়াকে কিনে নিয়েছে। বিশ্বাস কর বাবুজী, ছ’ মাস যেরে রাজ একবেলা খেয়ে পাঁচ কুড়ি টাকা জমিয়ে যখন হরির কাছে গেলুম বিজয়াকে ফিরিয়ে আনতে বেটা পাজী বলে কি না একশো কি হে? কমসে কম পাঁচশো টাকা ফেলে বিজয়াকে ফেরত নেবার কথা পাড়ো। বেইমান। কাম্বাক্ত, বেটার পায়ে ধরে বললাম, আমার বিজয়া কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেড়ে দাও হরি! বিধাতা তোমার মজল করবেন। মুলোর মতন লম্বা দাঁতগুলো বার করে বেটা বললে, “নিজের খাবার বন্দোবস্ত আগে কর চাচা! বিজয়ার চিন্তায় তোমার কাজ নেই।”

বাবুজী, বিজয়াকে আমি মুখ দেখাতে পারি না। সে দিন কাছে গেলাম আদর করতে। মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখলাম বড় বড় চোখ দুটো তার জলে ভরে গেছে। চলে আসার পথে পিছনে ফিরে দেখি, একাগ্র নয়নে বিজয়া আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে বললাম, দুটো দিন সব্ব কর বিজয়া। তাকে আমি ফিরিয়ে নেবই।

চারি দিক ঘুরে ঘুরে দিন-রাত মজুরী খেটে আরও দু’কুড়ি টাকা জোগাড় করে হরির কাছে গেলাম। হরির পায়ে টাকা কটা দিয়ে বললাম, “হরি ভাই, তুই বড়লোক। দু’কুড়ি টাকা বেশী দিচ্ছি। বিজয়াকে ছেড়ে দে।” হরি তাকে ছেড়ে দিল না।

আমি তখন বললাম, “হরি, তোমার ক্ষেতে কত লোক খাটে। আমি তোমার জমিতে পুরো ছ’ মাস গতর খেটে দেব। তুই আমার

বিজয়াকে ছেড়ে দে। এখানে থাকলে ও আর বাঁচবে না। বাবুজী, বেটা শয়তান শুধু দুচকি হাসলো।”

বিজয়াকে অনেক খুঁজতে দেখতে পেলাম না। সত্যি বলছি, বাবুজী, বিজয়াকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, “তাই যদি হবে, তবে ওকে বিক্রী করতে গেলে কেন? তখন এ সব কথা খেয়াল হয় নি?”

গোবিন্দরাম বলল, “বিশ্বাস কর বাবুজী, একটা কানাকড়ি পকেটে ছিল না। তাতে কোন দুঃখ ছিল না। যে বিধাতা এ পেট দিয়েছেন, দুঃখ সহ্য করার শক্তিও তিনি কম দেন নি। আমার চিন্তা ছিল জয়া বিজয়াকে বাঁচানো। ওদের আমি খাবার জোগাতে পারছিলাম না। এই একশ টাকার এক পাই আমি নিজের জুজু খরচ করিনি। জয়াকে খাইয়ে বাঁচিয়েছি। বাবুজী, তুমি রাজা হবে। দিল্লীতে খবরটা দিয়ে তুমি আমার বিজয়াকে ছাড়িয়ে দাও।”

আমার পা দুটো জড়িয়ে বুদ্ধ হাপুস নয়নে অশ্রুর গঙ্গা-বয়না বইয়ে দিল।

অত্যন্ত দ্বিধার সাথে বললাম, “তোমার জয়া তো তোমার সাথে আছে। তাকে বহু করছ তো?”

“জয়ার কি হয়েছে জানি না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কেবল বোধ হয় বিজয়ার কথাই ভাবে। তুমি চল না বাবুজী! ভিতরে একবার চলো। দেখবে তাকে।”

কত কষ্ট করে মুলতান থেকে পায়ে খেঁটে ওদের নিয়ে বেঁচে এসেছি, সে দুঃখের কথা বিধাতা ছাড়া কেউ জানেন না। ঘর বাড়ী সম্পত্তি কিছুই তো আনতে পারিনি সাথে। আমার দরিদ্র জীবনে জয়া বিজয়া ছাড়া আর কেউ নেই। চলো না, দেখবে জয়াকে।

অনেকক্ষণ থেকেই মনটা আনচান করছিল। বৃদ্ধের সাথে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দু’একটা লাঙ্গল ছাড়া ঘরে বিশেষ কিছুই দেখলাম না। আমাকে টানতে টানতে একটা বলদের সামনে নিয়ে খাড়া করল। এক হাতে বলদটার গলার হাত বুলিয়ে অন্য হাতে তার মুখে খড় দিয়ে আদর করে বুদ্ধ বলল, “বাবুজী, এই হল জয়া। বিজয়াকে যদি দেখতে। সে আরও লম্বা। আরও ফর্সা। তার শিং দুটো সোনালী রঙের। জয়া বিজয়া দুজনে মিলে পাখর থেকে সোনা ফলায়।” বলদটার গলা জড়িয়ে বুদ্ধ বলল, “দিল্লীতে গিয়েই বাবুজী বিজয়াকে ছাড়িয়ে দেবেন। শুনহিস জয়া? জয়া কেমন করে তোমার দিকে তাকাচ্ছে দেখো বাবুজী, দেখো।”

গবেষণার ডিগ্রী আজও পাইনি। দুঃখ নেই তাতে। আমার ভারতবর্ষকে আমি চিনতে শিখেছি। আমি তাতেই খুশী।

[ মাসিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



স্মরণি মিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

(দুগা প্রয়োজন ও ঊনবিংশ শতাব্দী)

১

“বহুনি মে ব্যতীতানি জ্ঞানানি তব চার্জুন !  
তাগ্ৰহং বেদ সর্গাণি ন তং বেথ পরস্তপ ।  
অজ্ঞাহপি সন্নবায়াদ্বা ভূতানমীষরোহপি সন্ ।  
প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ।  
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভাবত !  
অভূতানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃষ্টাম্যহম ।  
পরিত্রাণায় সাধুনং বিনাশায় চ দ্রুততাম্ ।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥” ১  
\* \* \*  
“নরধ্বংসি দুর্দশো হরিনারায়ণো হুহম্ ।  
কালে লোকমিমং প্রাপ্তো নরনারায়ণাবুযো ॥” ২  
\* \* \*

১। “শ্রীভগবান বোলেন—‘হে পরস্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হয়েছে ! আমি সেসব জানি ; কিন্তু তুমি তা’ জানো না ( ভুলে গিয়েছো ) আমার সেই ত্রিগুণাত্মিক শক্তিকে আশ্রয় কোরে স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি দেহধারণ কোরি ।

হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্রানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন কোরি । সাধুদের রক্ষা, পাপীদের দ্রুততিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্তে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।—”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( ৪র্থ অধ্যায় ) ।

২। “হে অর্জুন, তুমি দুর্দশ নর, আমি নারায়ণ হরি । আমার সেই ‘নর-নারায়ণ’ ঋষি, কালক্রমে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হোয়েছি ।”  
—মহাভারত ( উদযোগ পর্ব )

এখানে প্রশ্ন তোলে মন,—  
নিত্যযুক্ত আত্মা ঐ ‘নর-নারায়ণ’  
আবার এলেন কেন  
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেবে,  
যখন এ-দেশে  
প্রচণ্ড প্রতিভারা তুলেছিলেন ঝড় ।  
মহর্ষি, কেশব সেন, বিজ্ঞানাগর  
যখন কর্ণধার বাংলাদেশের,  
তবু কেন সেই যুগে ফের  
এলেন দুর্দশ নর, ঋষি নারায়ণ ?  
ঠাকুর-স্বামিজী এই যুগে আত্মা  
কি জন্তে এলেন ?

২

আমরা সেদিন  
মদ ও মাংসের ঝাঁজে  
একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন !  
দুর্জন ইংরিজী-আনা অচেতন সমাজের বৃকে  
ঝাঁকে-ঝাঁকে বোসেছিলো  
শহুনির মতো ঝুঁকে ঝুঁকে !  
বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিক্ষিত সমাজ  
পরামুদ্রণ মোহে সব চেয়ে আগে,  
সবচেয়ে অন্তরানবদনে,  
সবচেয়ে অসংবতভাবে  
ঘাড় গুঁজে পোড়েছিলো ঐ  
বহিষ্কৃত বিদেশীর জাস্তব জীবনের পাঁকে !

বহুকাল ধোরে  
খাঁটি ইংরিজী বুলি বোলে  
মাতলামি কোরেছিলো প্রচণ্ড প্রলাপে !  
সেদিনের সাহিত্যে সে দুঃস্বপ্নের কথা লেখা আছে,—  
“I read English, write English  
Talk English, speechify in English,  
Think in English, Dream in English.” ৩  
\* \* \*

“পূর্বাকালে ভূতে পেতো  
মদ-মাংসে পেয়েছে এ-কালে”...  
মাতলামি কোরে কিন্তু  
‘নিমোটাদ’ ঠিক কথা বলে । ৪

৩। “আমি ইংরিজী পোড়ি, ইংরিজী লিখি, ইংরিজীতে কথা বোলি, ইংরিজীতে বক্তৃতা দি’, ইংরিজীতে চিন্তা কোরি এবং ইংরিজীতে স্বপ্ন দেখি ।”—সববার একাদেশী ।

৪। সে-যুগে মদ না খেলে সমাজে কেউ শিক্ষিত বোলে স্বীকৃত হোতোনা । স্বনামধন্য রামগোপাল বোষের ভাগ্নে গ্র্যাডুয়েট হোয়েছিলো কিন্তু মদ খেতোনা । ঘোষমশাই অত্যন্ত দুঃখিত হোয়ে বোলেছিলেন,—“তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার কোরি কি কোরে ?”

৩

আর ও-দিকে মিশনারীগণ  
তাগ বুঝে 'হিন্দু'কে অন্ধকার থেকে  
টেনে-হিঁচড়ে আনেন আলোকে।  
রান্নাকরণে আর আত্মবিস্মরণে  
[কি বাঙ্গালী যতো গাণাধের মতো  
'ন দুটো পাড়া কোরে মন দিয়ে শোনে,—  
'তোমাদের দেব-দেবী, আচার-বিচার  
পৈশাচিক, অনন্ত নরক ;

Crystallized immorality  
And Hinduism  
Are something.

বীণ আছে ভয় নেই,  
পাপীদের পরিভ্রাতা তিনি,  
তাঁর পায়ে পড়ো,  
আর  
'বাইবেল' বুকে চেপে  
প্রাণপণে অমৃত্যু করে।\*

বিজয়ী জাতির গুণে অভিভূত বিজিত জাতের  
তবল মনের পাশা উর্বর জমিতে  
এইভাবে শ্বেতাচাৰ্যগণ  
ধর্ম-বিশ্বব্ধের বিষ মুঠো মুঠো ছড়াতে থাকেন !  
সেদিনের শিক্ষিত সমাজ  
পাত্রীদের কথাতাই ওঠে-বসে-নাচে,  
'পৈশাচিক হিন্দুধর্ম' ফেলে পত্রপাঠ  
পৃষ্ঠানু হোয়ে তবে বাঁচে !

৪

আরও একটা দল ছিলো  
'ডিরোজিও' জাতে, ৬  
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে  
অসম্ভব মদ খেয়ে মাতো !

৫। "ফটিকাকারে ঘনীভূত অপবিত্রতা আর হিন্দুধর্ম একই জিনিষ।"

৬। সেকালে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা কোলকাতা সহরে যে সমাজ-বিপ্লব সুরু কোরেছিলো, তার জনক হোলেন আর্থাইউরোপী ও আধা-ভারতীয় এই তরুণ প্রাতিভাশালী শিক্ষক 'ডিরোজিও'। 'ডিরোজিও' বর্ষাৰ্থই ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন এবং ফরাসী-বিপ্লব-সাগর মন্থন কোরে ভারতের জন্ত শুধু অমৃতই আনেননি, গরলও এনেছিলেন। 'The Fakir of Janghira' নামক কাব্যগ্রন্থটি তাঁর ভারত-প্রেমের একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। 'ডিরোজিও' মাত্র ২০ বছর জীবিত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সেই এই দৃঢ়দয় প্রাতিভাবান অধ্যাপক হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে এই নতুন

নিজেদের ধর্মবাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে  
লজ্জা ঢাকেনা এরা আর কোনোটোতে।  
ফরাসীবিপ্লব-বিস পেট ভোরে খেয়ে  
ঘে-ডালেতে থাকে এরা সেই ডাল কাটে  
সম্প্রদায়ের ভীষণ আকার  
কুমীর আনবে বোলে  
একমনে কোষে থাল কাটে !

সমাজ-বিপ্লব সুরু করেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিলো—'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বতোভাবে উপভোগ কোরতে হবে।' এতে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহায়ে সত্যামুসন্ধানের একটা স্পষ্ট ভোগেছিলো, সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুকে যাচাই কোরে নেবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে যেভারেশু কুসুমোহন ব্যানার্জী, দক্ষিণারজন মুখোপাধ্যায় এবং ভারতের Demosthenis স্বনামগুণ শ্রীরামগোপাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় স্বেচ্ছাচারী ছাত্রেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা সুরু কোরে দিলে : নিরীক্ষা মাংস খাওয়া, প্রকাজে সুরাপান করা—এইসব সংস্কারের কাজ বোলে বিবেচিত হোতে লাগলো। হিন্দুধর্মের সবকিছুকেই কুসংস্কার বোলে ধোরে নিয়ে মত্তপানকেই কুসংস্কারভঞ্জনর একমাত্র উপায় মনে কোরে এরা মদ্রিগ-শ্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো : শুধু হিন্দুধর্মকেই নয়, সর্গাঙ্গীন স্বাধীনতা উপভোগ কোরতে গিয়ে শেষপর্যন্ত এরা কোনো ধর্মকেই গ্রহণ কোরতে পাতেনি। এদের ঠট্কারিতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সে-যুগের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কাছেই অসহ্য হোয়ে উঠেছিলো। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের এই পৈশাচিক আচার-ব্যবহার দেখে রাজা রামমোহন অত্যন্ত বিচলিত হোয়েছিলেন। আজীবন 'অন্ধবিশ্বাস'ের বিরুদ্ধে যিনি দ্ব্যস্তর যুদ্ধ ধোয়েছিলেন, সেই বুদ্ধিবাদী রামমোহন শেষজীবনে হিন্দুকলেজের এই যুক্তিবাদী ছাত্রদের স্বেচ্ছাচার আর 'অন্ধবিশ্বাস' দেখে কীতিমতো শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন,—

"In his younger years, his mind had been deeply struck with the evils of believing too much, and against that he directed all his energies; but in his later days, he began to feel, that there was as much, if not greater danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent youngmen, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education had learnt to reject their own faith without substituting any other, these he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality."

—Biography of Pija Ram Mohan Roy, London.

৫

আর.

ওদের কি দোষ ?

শতাব্দী-সঞ্চিত ঐ কুসংস্কারে কানা  
সেদিনের মরুচে-পড়া হিন্দুধর্ম তার  
দুর্বল গুজন নিয়ে বেদ-বেদান্ত থেকে  
পিছলে এসে পোড়েছিলো  
রান্নাঘরে 'ভাতের হাড়িতে' !

ধর্মের রক্ষক যারা, হিন্দুধর্মটাকে  
জী-আচার-দেশাচারে আটপে-পৃষ্ঠে বেঁধে,  
'জ্ঞান-মার্গ', 'ভক্তি-মার্গ', 'যোগ-মার্গ' থেকে  
'ছুৎ-মার্গ' গোড়ে শ্রেক খাবি খাচ্ছিলো !  
এই ঘোর 'বামাতন্ত্রে' মূলমন্ত্র হোলো—  
'আমায় ছুঁয়োনা কেউ, ছুঁলে জ্ঞাত যায় !'  
পাগলাগারদটাকে 'ব্রহ্মলোক' ভেবে,  
দুই কিংবা ততোধিক উপপত্তী রেখে  
অপবিত্র ছনিকাকে তুচ্ছ রাখায় !

৬

এমন সময়

উন্নত বলিষ্ঠ ঋজু রামমোহনের

'বেদান্তের' বক্তাব্যাসে

সেদিনের তস্ত্রাতুর জ্ঞাত

প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে চোখ তুলে চায় ।

৭। সে-কালের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর মতামত প্রবিধান-  
যোগ্য—“আমাদের কি আর ধর্ম ? আমাদের 'ছুৎ-মার্গ', খালি  
'আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা ।' যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলো  
আজ দু'হাজার বছর খালি বিচার কোরছে, ডান হাতে খাবো,  
কি বাঁহাতে, ডান দিক থেকে জল নেবো, কি বাঁদিক থেকে—তাদের  
অধোগতি হবে না তো কার হবে ?...কোঁর টাকা খরচ কোরে  
কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলে আর পড়তে । এই ঠাকুর  
কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর  
আঁটকুড়ির বেটাদের গুটির পিণ্ডি কোরছেন—এদিকে জ্যাস্ত ঠাকুর  
অন্ন বিনা, বিজা বিনা মরে যাচ্ছে । ভোগের সময় ব্রাহ্মণের জাতের  
স্পর্শ দোষ নেই—ভোগ সাক্ষ হোলোই স্বান...সাধু সন্ন্যাসী, আর  
ব্রাহ্মণ বদ্ধ্যাস দেশটা উৎসর্গে দিয়েছে । দেখি দেখি চুরি বদ্ধ্যাসি—  
এরা আবার ধর্মের প্রচারক ! পরসো নেবে, সর্বশাস্ত্র কোরবে আবার  
বলে—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কার তো ভারি—‘আলুতে  
বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহোলে কতকণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে  
যাবে ?’ ‘১৪ বার হাতে মাটি না কোরলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়,  
কি ২৪ পুরুষ’—এই সকল দুর্বল প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোরছেন  
আজ ২ হাজার বছর ধোরে । এদিকে  $\frac{1}{4}$  of the people are  
starving”

পত্রাবলী ( ১ম ভাগ, পৃ: ১৫৬ ও ৪৫৬ ) ।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে

'মাস'মান', 'কেদী'-কেদরি যতো ৮

প্রবল বেদান্ত-যুদ্ধে

একে একে হোলেন আঁহত ।

ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ঐ

জড়পিণ্ডবৎ স্থাপু হিন্দু জাতটাকে,

একাই একশো তোয়ে রাজা একটানে

পঙ্কশয্যা থেকে তাকে

ঝাঁটি ধোরে বার কোরে আনে !

৭

যুগের সারথি তুমি 'ভারত-পথিক',

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা তুমিই ।

অসীম দৃঢ়তা নিয়ে বুকে

হৃদয় ও বুদ্ধিকে জাগ্রত বেগে

যুগের দৃঢ়তা আর অক্ষতা যতো

বিদূরিত কোরে গ্যাছো তুমি ।

'সত্যদাহ' প্রথাটাকে দাহ কোরে তুমি ১

৮। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন  
এবং লুপ্তপ্রায় উপনিষদ প্রচার এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে  
আন্দোলন আরম্ভ করেন । কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই নয়,  
মিশনারী প্রচারিত অসার মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি লেগনী ধারণ  
করেন । কলে প্রাচীন-পন্থী হিন্দুসমাজ এবং খৃষ্টান মিশনারী—  
দু'পক্ষই বিশেষ ভাবে বিচলিত হন । ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম  
আডাম নামে একজন খৃষ্টান মিশনারী খৃষ্টীয় ত্রিভুবাদ পরিত্যাগ  
করে রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন । এই ব্যাপার নিয়ে  
মিশনারী মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো । দিগ্বিদিক  
জ্ঞানশূন্য হোয়ে মাস'মান, কেদী প্রভৃতি জীবানপুত্রের মিশনারীরা  
বেদান্তদর্শনকে আক্রমণ কোরলেন । রামমোহন দৃঢ়চিত্তে তাঁদের  
আধৌক্তিক মতামতগুলো একে একে খণ্ডন কোরতে লাগলেন ।  
এই বিখ্যাত বেদান্ত-যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা । একটিকে  
হিন্দুদের শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার, আর একদিকে মিশনারীদের  
আক্রমণ,—দু'য়েরই বিরুদ্ধে রামমোহনকে একাই দৃঢ়চিত্তে এবং  
ধীরভাবে সংগ্রাম কোরতে হয়েছিলো ।

৯। 'সত্যদাহ' প্রথা ব্রিটিশ সরকার রদ করিল । এ ব্যাপারে  
স্বামিজীর মতামত প্রবিধানযোগ্য ।

"The great Hindu reformer, Raja Rammohan Roy, was a wonderful example of unselfish work. He devoted his whole life to helping India. It was he who stopped the burning of widows. It is usually believed that this reform was due entirely to the English ; but it was Raja Ram Mohan Roy who started the agitation against the custom and succeeded in obtaining the support of the Government in suppressing

‘জাতিভেদ’, ‘শ্রেণীভেদ’ ভেঙ্গে  
অমিতবিক্রমে  
নোংরা সমাজটাকে  
একা হাতে সাফ কোরে গ্যাছে।  
‘খি’ আর নিষেধের দড়া-দড়ি ছিঁড়ে  
‘সাপানি’ পার হোয়ে  
টাকে সচল কোরেছে।

স্বাধীনতা তো ঠিকই বোলেছেন,—  
“One of the great causes  
Of India’s misery and downfall  
Has been  
That she narrowed herself,  
Went into her shell  
As the Oyster does,

it. Until he began the movement, the English  
had done nothing.”—Inspired Talks ( Comp.  
works. Vol VII 84 ) প্রবরন বানার্জীও এতে সায় দিয়েছেন,  
“Without him the law could never have been  
passed.”

And refused to give her Jewels  
And her treasures  
To the other races of mankind,  
Refused to give life-giving truths  
To thirsting nations  
Outside the Aryanfold

That has been the one great cause,  
That we did not go out,  
That we did not compare notes with  
other nations,—

That has been the one great cause  
Of our downfall,  
And every one of you knows  
That that little stir,  
The little life that you see in India  
Begins from the day  
When Raja Ram Mohan Roy  
Broke through the walls of that  
exclusiveness.

## সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি

সক্রিয় রেগেনোফিল সংযুক্ত

বিশ্রাস্তকর সবুজ কলিনসটুথপেস্ট

- \* দাঁত পরিষ্কার ও ঝকঝকে করে
- \* মাড়ি সুস্থ রাখে
- \* দন্তক্ষয়ী জীবাণু তাড়ায়
- \* মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

জেফ্রি ম্যানাস  
এণ্ড কোম্পানী  
প্রাইভেট লিমিটেড

GK 3027



ফেনার জন্যেই  
‘কলিনস’-এর বিশেষত্ব!



Since that day,  
History in India  
Has taken another turn,  
And now  
It is growing with accelerated motion." ১০.

\* \* \*  
তুমি যা' কোরেছো রাজা,  
তার তুলনায়  
যা' করোনি—সেটা কিছু নয়।  
গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি এনে,  
জাতীয় শিক্ষাটাকে বিজ্ঞানে টেনে,  
আমাদের স্বর্ণ আয়ুটোতে  
সাম্প্রতিক রোমাঞ্চ তুলেছো !

হিন্দু ও মুসলিম—দু'য়েরই যখন  
ঐক্যের শিখিলতা ঘটেছে চরম,  
তোমার ঐক্যবোধে তার  
মধুর মিলন-সেহু গড়েছো তুমিই,  
সমবায় ধর্মের সত্যতা কোরেছো প্রচার।

অসংখ্য হিন্দু-ভাতটাকে  
বেদান্তে চুবিয়ে তুমি  
ঘ'ষে-মোড় তার  
লুপ্ত শোভা কোরেছো উদ্ধার। ১১

১০। "ভারতের পতন এবং দুঃখ দারিদ্র্যের অন্ততম প্রধান কারণ—ভারত নিজের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধিত কোরেছিলো, শাস্ত্রের মতো দরজার খিল দিয়ে বোনেছিলো, আর ছাড়া অজ্ঞান সত্যপিপাসু জাতের কাছে নিজের রক্তভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেনি। আমাদের পতনের অন্ততম প্রধান কারণ, আমরা বিদেশে গিয়ে অজ্ঞান জ্ঞানির সঙ্গে আমাদের তুলনা কোরে দেখিনি, আর আপনারা সবাই জানেন, যেদিন থেকে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্গীতের বেড়া ভাঙলেন, সেই দিন থেকেই—অজ্ঞান ভারতের সর্বত্র যে একটু প্রাণ-স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হচ্ছে—তার সূত্র।"

—Lectures From Colombo to Almora  
(Page—244)

১১। রামমোহন প্রসঙ্গে স্বামিজী সিন্ধার নিবেদিতাকে বোলেছিলেন—তার বাণীর প্রধান সুর হচ্ছে তিনটে,—

"...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu.

In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohan Roy had mapped out."

—Notes of some wanderings  
with the Swami Vivekananda

by

Sister Nivedita

সাতচর্চ দূরে থাক,  
সেদিনের হিন্দুর দল  
তেড়ে কামড়াতো এসে  
অবিশ্রান্ত কোরেছে চিংকার ! ১২

তুমি নির্ধাত  
John the Baptist,  
"...The voice of one  
Crying in the wilderness,  
Make straight  
The way of the Lord..."

ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে  
কেন বোলে না খুলে তুমি,—  
"...There standeth one among you,  
Whom Ye know not ;  
He it is,  
Who coming after me  
Is preferred before me,..." ১৩

\* \* \*  
তা-সে-বাই-হোক,  
শতাব্দীর ব্যবধান  
আমাদের আজ  
একথাটা চুকেছে মাথায়—  
অবতার আসার আগেই  
দাক্ষণ দীপ্তি নিয়ে  
কাঁটা হাতে আসে অগ্রদূত !

[ ক্রমশঃ ।

১২। প্রাচীন হিন্দুসমাজ সম্ভবিত্বকে পুড়িয়ে মারবার শুযোগ তারিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ করলেন। তার বাধাকাঙ্ক্ষের দল এইবার তাঁর মূর্তিপূজা অস্বীকার এবং বেদান্ত আলোচনাকে প্রতিবাদ কোরতে লাগলেন। এই বাধামুখাদের মধ্যে দেশপ্রেম কতোখানি ছিলো জানি না, তবে কুকচি এবং ইর্ষার পরিমাণ নিতান্ত কম ছিলো না।

১৩। বাইবেলে 'St. John'এ খৃষ্টের অগ্রদূত 'John the Baptist' এর কথা লেখা আছে। জুয়েরা তাঁকে তাদের শাস্ত্রোক্ত অবতার ভেবে যখন প্রশ্ন কোরেছিলো,—“Who art thou ?” তখন John উত্তর দিয়েছিলেন,—“I am not ‘the Christ.’ —“What then ?...what sayest thou of thyself ?”

তার উত্তরে John বোলেছিলেন—“I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord...But there standeth one among you, whom Ye know not ; He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.”

# হে উদ্দাম পশ্চিম বাতাস

( পি, বি, শেলীর 'Ode to the West Wind' কবিতার অনুবাদ )

( ১ )

হে উদ্দাম পশ্চিম বাতাস, তুমি মর্ত্তমান শরতের শ্বাস,  
তোমার অদৃশ্য উপস্থিতি থেকে মৃত পত্রদল  
বিতাড়ি ঐক্সজালিকের থেকে যেমন ভূতেরা উদ্ধ্বাস।

গীতাভ কৃষ্ণ, মলিন, এবং অরতপ্ত ও পাটল,  
মহামারী-বিলিত সংখ্যাহীন তারা ; আর তুমি,  
তাদের সাথ্য করো অন্ধকার শীতের শস্যার মহাবল !

সপক্ষ বীজেরা, শুয়ে আঁকড়িয়ে ঠাণ্ডা নিম্নভূমি,  
প্রতিটি শবের মত কবরে আবদ্ধ হয়ে থাকে, যতক্ষণ  
তোমার বাসন্তী নীল ভয়ী না বাজায় নিজে চুমি'

সিঁড়া তার স্বপ্নময় পৃথিবীতে, করে সম্পূরণ  
( মধুর কোরকগুলি মেঘের মতন নিয়ে চরিয়ে হাওয়ার )  
জীবন্ত রঙ ও গন্ধে সমতল, পর্বত গহন :

হে উদ্দাম-সত্তা, সর্বদেশে তুমি যাও ;  
ধ্বংসকারী এবং রক্ষক তুমি, শোনো, শুনে যাও !

( ২ )

তোমারই প্রবাহে ঢালু, শক্ত আকাশের সঞ্চালনে,  
খণ্ড-ছিন্ন মেঘপুঞ্জ, পৃথিবীর বিকীর্ণ পাতার মত করে,  
আকাশ ও সমুদ্রের থেকে, যেন গ্রন্থিল শাখার আন্দোলনে।

বুড়ি ও বজ্রের ওরা দেবদূত ; প্রসারিত থাকে ধরে-ধরে  
যে তোমার বাসবীর তরঙ্গ, সুনীল বৃকে তার,  
যেমন উজ্জ্বল কেশ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মাথার উপরে।

ভয়াবহ প্রচণ্ডার, এমন কি দিগন্ত-রেখার  
অস্পষ্ট প্রান্তের থেকে মধ্য-আকাশের উচ্চমান  
আসন্ন বড়ের কেশরাশ। তুমি শোকগীতি তার।  
বে-বর্ষ যুগ্ম, তার এই রাত্রি প্রত্যাশার বার লগ্নমান  
বিশাল সমাধি-শীর্ষে গড়বে গম্বুজ তার, তাও  
করবে খিলান সব তোমার বাস্পীয়শক্তি হয়ে একতান,  
তারই নীরব শূন্য থেকে কৃষ্ণবুড়ি, বহি আর কবকাও  
ঝরে বাবে ; ওগো তুমি শোনো, শুনে যাও !

( ৩ )

তুমিই জাগালে গ্রীষ্ম-স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা  
নীল ভূমধ্যসাগর, সে যেখানে থাকতো শান্তিত,  
তাকে ঘুমপাড়াতে কুণ্ডলীকৃত ফটিক প্রোভেরা,  
'বেরী' উপসাগরে আশ্রয়শিলা-নির্মিত দীপের সন্নিহিত,  
এবং দেখতো ঘূমে প্রাচীন প্রাসাদ হর্যাবলী  
তরঙ্গের তীব্রতার দিনে আন্দোলিত,  
সুনীল শৈবালে, ফুলে আচ্ছন্ন সকলই  
কী সন্দেহ, অম্লভূতি মূর্ছাহত সে চিত্র চিত্রণে !  
তোমার পথের জন্তে আটলান্টিক সমতায় বলী,

জলেবাও নিজেদের দীর্ণ করে, আবর্তের গঠে, বত নিচে  
সমুদ্র-শৈবাল আর কদমাস্ত বন, তবে তাও  
সাগরের নীরস পাতায়, তারা জানে কী যে

তোমার গর্জন, আর সহসাই ভরে পাণ্ড গো-ও,  
কাঁপে, আর নিজেদের নষ্ট করে : ওগো শুনে যাও !

( ৪ )

আমি হলে মৃত পত্র, তুমি টেনে নিতে ;  
দ্রুতগামী মেঘ হয়ে তোমার সাথেই যদি হতাম উদ্ভটন ;  
অথবা একক ঢেউ, কেঁপে উঠে তোমার শক্তিতে,

পেতাম কিছুটা অংশ ক্ষমতার প্রভাবের, অল্পই স্বাধীন  
তোমার অপেক্ষা, হে দুর্দমনীয় ! এমন কি যদি  
হতাম শৈশবকালে আমি বা ছিলাম, আর আমি অর্বাচীন,

হতাম তোমার সঙ্গী ভ্রমণের—আকাশ পরিধি ;  
এবং তখন যদি তোমার আকাশগতি অতিক্রমণ  
করার কচিং স্বপ্ন মনে হতো, বিরত হতাম সে অবধি

এ-প্রচেষ্টা থেকে যা তোমার সঙ্গে প্রার্থনার তীব্র প্রয়োজন।  
ওগো তুমি নাও আমাকে তরঙ্গ, পাতা, অথবা মেঘের মত !  
জীবনের কাঁটারনে পড়ি আমি ! দেহে হয় শোণিত স্রবণ !

সময়ের গুরুভাবে মূহুরিত এবং আনত  
তোমারই মতন একজন : দুর্দম এবং দ্রুত, এবং উদ্ভট।

( ৫ )

আমাকে তোমার বীণা করে নাও, এমন কি বনের মতন ;  
কী বা হবে তারই মত করে যদি আমার পাতারা বৃষ্ণ-বৃষ্ণ !  
উচ্চকিত তোমার বিপুল তান-লগ্ন-সংস্থলন

উভয়ের থেকে নেবে, গভীর শায়দ কোনো সুর,  
বা দুঃখেও মনোহা। হও তুমি হে সত্তা ভীষণ,  
আমার জীবন। আর তুমি হও উদ্ভেক আমার স্নানুর !

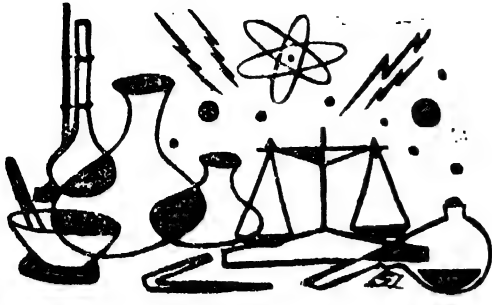
আমার নিঃশ্বাস চিহ্নাগুলি বিধে করো বিসর্জন  
বিকীর্ণ পাতার মত নূতন জগৎকে দিতে গতি !  
আর এই কবিতার এ-মন্ত্বেই করো সমর্পণ

অসম্পূর্ণ চুল্লীর থেকে যেন ভয়, ফুলিঙ্গ-সংহতি,  
আমার বাক্যের রাশি, মানুষ্যের মাঝে, গুচ্ছময় !  
আমার গুণের থেকে অজ্ঞাত পৃথিবীর প্রতি

ভবিষ্যৎগীর শব্দ বাজাও ! হে বায়ু বরাভয়,  
শীত যদি আসে তবে বসন্ত কি বহু দূরে রয় ?

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

# বিজ্ঞানবার্তা



পক্ষধর মিশ্র

**বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং**—কথার্টা আপনার কাছে নতুন মনে হতে পারে। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার সাহায্যে

আশা করা যায়, মানুষ অপর ভবিষ্যতে তার খাদ্যসম্ভার সমাধান ঘটাতে পারবে। পৃথিবীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার দেখে চিন্তাবিদরা শঙ্কিত হয়ে উঠছেন,—এর সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদনের একটা সমতা রক্ষা না করতে পারলে পৃথিবীতে নেবে আসবে এক অবশ্যজাবী বিপদ।

বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি ভাবে মানুষকে সাহায্য করবে? উদ্ভিদ-জগতই আমাদের খাদ্যের অপরিখ্যাপ্ত উৎস, আমাদের দেহের জন্ত প্রয়োজনীয় সব রকম খাদ্যসম্ভারই সর্বপ্রকার উদ্ভিদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে আমরা উদ্ভিদ-জগত থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হবো। সব রকম উদ্ভিদ আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কারণ তাদের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ইত্যাদির সঙ্গে আরও বহুপ্রকার বস্তু একত্রে ভাবে মিশে রয়েছে—যা মানবদেহের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। যে বস্তুটি আমাদের পরিপাক শক্তির সঙ্গে শক্ততা করছে আলাদা ভাবে হয়তো তা মানুষের জন্ত কোন কাজে লাগতে পারে। কিন্তু মজাটা দেখুন,—এক সঙ্গে মিশে থাকার জন্ত দুটি বস্তুকেই আমাদের পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। আশা করা যায়, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে এদের পৃথক করে কাজে লাগান যাবে। ধান অথবা তুলোর এতো আদর কেন? তার কারণ অতি সহজেই এদের উদ্ভিদের অজ্ঞাত অংশ থেকে পৃথক করে কাজে লাগান যায়। ঘাসের মধ্যে প্রচুর খাদ্যগুণ থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত পদার্থের উপস্থিতির জন্ত এর খাদ্যমূল্য খুবই কম, গম বা তুলোর মতো এর প্রয়োজনীয় অংশটিকে পৃথক করে নেওয়া যায় না; তাই এর পরিমাণ অপরিখ্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ একে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না। ঘাসের থেকে খাদ্যশক্তি মানুষ জন্ত ভাবে সংগ্রহ করে। গরু ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণী ঘাস খায়, ঘাসের খাদ্যাংশ তাদের দেহে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে জমা হয় প্রোটিনরূপে, সেই প্রোটিন মানুষ খাদ্য হিসাবে কাজে লাগায়। প্রাণীর দুধের এবং মাংসের মধ্যে দিয়ে মানুষ আবাদ পায় ঐ খাদ্যশক্তির। অনেক বিজ্ঞানীর মতেই উদ্ভিদদেহের খাদ্যমূল্যের এই রূপান্তর অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করা সম্ভব হলে মানুষ ব্যবহার করতে পারতো তার মাত্র শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ প্রাণিদেহের মধ্যে

দিয়ে ফেরত পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা তাই বলছেন, কেবলমাত্র উদ্ভিদ থেকে এই প্রোটিনকে সোজা বার করে নেওয়া সম্ভব হলে পৃথিবীতে অবস্থিত অপরিখ্যাপ্ত উদ্ভিদের কল্যাণে মানুষ তার খাদ্যসম্ভার কিছুটা সমাধান করতে পারবে। পৃথিবীর ভূখণ্ডের নিম্নোক্ত অঞ্চলে যে পরিমাণ ঘাস ও অজ্ঞাত গুল্মাদি জমায়, সেখানকার পশুর খাদ্যের পরও তার এক বৃহৎ অংশ হয় নষ্ট। বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে আশা করা যায়, এই উদ্ভিদ সমূহ থেকে মানুষ তার ভবিষ্যতের খাদ্য খুঁজে বার করবে।

\* \* \* \* \*

বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসারের অগ্রতম প্রধান উদ্যোক্তা হলেন রথামস্টেড এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশনে বিজ্ঞানী পিরা সাহেব। তাঁর মতে বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের কোন একটা নতুন শাখা নয়। জীববৈজ্ঞানিক, জৈববৈজ্ঞানিক প্রচলিত জ্ঞান ও ধারণার সঙ্গে উৎপাদন-শিল্প বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কলাকৌশলের মিশ্রণ ঘটিয়েই এর উৎপত্তি হয়েছে। তেল, রবার এবং ষ্টার্চ প্রস্তুত প্রণালীকেও মোটাটুটি এই শ্রেণীর মধ্যেই ফেলা যায়। গাছের পাতা থেকে প্রোটিন পৃথক করার চেষ্টা গত কয়েক বছর ধরেই রথামস্টেড গবেষণাগারে চলছে, ফলাফলও মোটের উপর শুভ। সেখানে তাঁরা যে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছেন তার সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ অংশশক্তি খরচ করে ২ টন প্রোটিন মিশ্রিত রস গাছের পাতা থেকে নিষ্কাশন করা সম্ভব। প্রথমে প্রোটিন সমন্বিত রস নিষ্কাশন করা হয়। মোটাটুটিভাবে পাতার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ প্রোটিন রসের সঙ্গে বার হয়ে আসে। তারপর ঐ ঠাণ্ডা তরল পদার্থটিকে কোঅ্যাগুলেশন যন্ত্রে প্রবেশ করান হয়। উপর দিয়ে নিচের দিকে নামে ঐ তরল পদার্থ এবং নিচের থেকে উপরের দিকে পাঠান হয় গরম বাষ্প। গরমে ঐ তরল পদার্থের মধ্যে প্রোটিন যায় জমে বন হয়ে। এখানে কেবল ছেকে নিলেই জমাট প্রোটিনকে পরিত্যাগ করে তরল পদার্থের সঙ্গে অজ্ঞাত বস্তু বার হয়ে যাবে। এই হোল উদ্ভিদ-জগতের প্রোটিন পৃথক করার মূল বক্তব্য,—এ ছাড়া অজ্ঞাত যান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক জটিলতার কথা এখানে আর আলোচনা করা হোল না। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে প্রোটিন ছাড়াও আর একটি বস্তু আমরা পাব,—রস নিষ্কাশন করার পরে পাতার যে শুষ্ক অংশ পড়ে থাকবে, আলানী হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট বেশী। বিশেষ করে আমাদের দেশে আলানী হিসাবে ঐ বস্তুটি যথেষ্ট সমাদৃত হবে।

বিজ্ঞানী পুটনামের, 'ভবিষ্যৎ কালের শক্তি' নামক পুস্তকে আমরা কয়েকটি চমৎকার তথ্যের সন্ধান পাই। সেই বইটিতে তিনি ১৮৬০ সালে সারা জগতে আলানী ব্যবহারের বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তখন আলানী ব্যবহারে ভারতবর্ষ যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল এবং ব্যবহৃত আলানীর প্রধান অংশ অধিকার করে থাকতো বনের কাঠকুটো আর শুকনো গাছপালা। আজকের দিনেও সম্ভব হলে ঠিক এই ভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই শুকনো গাছপালা আলানী হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে পুটনাম দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন, এর দ্বারা কয়লার অপচয় হয় বোধ, আলানী পরিবহনের সমস্যা মেটে এবং কৃষিক্ষেত্রের শুকনো জঞ্জালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষকদের কিছু আর্থিক লাভ হয়। সারা জগতেই

যখনই অবস্থা, তখন ভারতবর্ষের কথাটা একবার চিন্তা করে দেখুন—পাতা আর ঘাস থেকে তৈরী হবে প্রোটিন, সেই প্রোটিন ভারতবর্ষকে খাদ্য জোগাবে। এই শিল্পে আবর্জনারূপে উদ্ভিদদের যে শুকনো অংশ থাকবে পড়ে তা দেবে জালানী। কেবল সাত্রয়ের কথাই নয়, জালানী হিসাবে এই শুকনো উদ্ভিদ-দেহের মূল্য খুবই বেশী।

### উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ

১৮৬২ সালের ২রা জুলাই ইংল্যান্ডে, কাম্বারল্যান্ডের ওয়েষ্টওয়ার্ডে, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ-এর জন্ম হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাকে সিস্টার-সায়ারের একটি গ্রামার স্কুলে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর তিনি কিংস উইলিয়াম কলেজে ভর্তি হন এবং এখানেই গণিত-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বর্ধিত অনুরাগ জন্মায়। ১৮৮১ সালে, ১৯ বছর বয়সে ব্র্যাগ কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং গণিত-বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ লাভ করেন। ট্রিনিটি কলেজে তিনি তৃতীয় রাংলাংয়ের সম্মান পেয়েছিলেন, এবং এখানেই পদার্থবিজ্ঞান বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. জে. টমসনের বহুতা শুনবার সৌভাগ্য তাঁর হয়।

১৮৮৫ সালে সূদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ব্র্যাগের ডাক হলো। বয়স তখন তাঁর মাত্র তেইশ বছর, তিনি অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও গণিত বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান পেলেন। ১৮৮৬ সালে ব্র্যাগ এ পদে যোগদান করেন, এবং তাঁর প্রথম জীবনের গবেষণা আরম্ভ হয় ঐ অস্ট্রেলিয়াতেই। জীবনের প্রায় তেইশ বছর সময় তিনি ঐ দক্ষিণ-অস্ট্রেলিয়াতেই অতিবাহিত করেন; এখানে তিনি তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা করেছিলেন। গবেষণার ফলাফল অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। ১৯০৬ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন।

আবার ইংল্যান্ড। ১৯০৮ সালে তিনি ক্রিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পেগিস অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহ্বান এলো। এই পদ গ্রহণ তিনি করলেন বাট,

কিন্তু সময়-বিজ্ঞানের নানাপ্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য নোবিভাগের কাজে ১৯১১ সালের আগে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সরকারকে আবিষ্কার এবং গবেষণা বোর্ডের এজেন্সি সমস্ত হিসাবে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে বিজ্ঞানী ব্র্যাগ রয়েল ইনস্টিটিউশন অফ গ্রেট ব্রিটেনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। পৃথিবী-বিখ্যাত ডেভীফার্মাডে গবেষণাগারের দায়িত্ব এবার তাঁর হাতে আসে এবং তাঁরই পরিচালনায় পদার্থের খুঁটাল অথবা ক্ষুদ্রিকের বিষয়ের গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম নতুন করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

আপন প্রতিভাবলে এই বিজ্ঞানী সারা জীবনে অত্যন্ত সম্মান লাভ করে গেছেন। এক্ষ-রে, বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পদার্থের ক্ষুদ্রিকের কাঠামোর পরিচয় এবং তার মধ্যে পরমাণু সন্নিবেশের অবস্থিতি নির্ণয়ের গবেষণায় বিরট অবদানের জন্য ১৯১৫ সালে বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ, তার পুত্র উইলিয়াম হরল্ড ব্র্যাগের সঙ্গে একযোগে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানী ব্র্যাগ ১৯২০ সালে তার উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় ১৬টি ব্রিটিশ এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে নিজেদের সম্মানিত করেন। তার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ ১৯৩৫ সালে রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই পদ তিনি অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৮-১৯২৯ সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বিজ্ঞানী তার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগের বিজ্ঞান নিবন্ধ রচনার প্রতিও বর্ধিত উৎসাহ ছিল। বিজ্ঞান গবেষণা-পরিষদ, বিদ্যোৎসাহ সমিতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কয়েকটি বহুতা দিয়েছিলেন। বহুতাগুলির বিজ্ঞান সাহিত্য হিসাবে মূল্য খুবই বেশী। তার হেনরী ব্র্যাগের রচিত কয়েকটি পুস্তক এবং তাদের প্রকাশের বছর দেওয়া হলো। The world of sound (1920), the Universe of light (1933), Concerning the nature of Thing (1925)।

“যে পথ কঠিন, সে পথ কণ্টক-সম্বল, সেট পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারন্ত্রে এগনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্রধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ে না, দূর্যোগের বস্তুচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ-সমক্ষে অপমানিত করিয়ে না। বাধার সৃষ্টাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অতি বিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ে না। যখন বিধাতার বড় আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে।”

—রবীন্দ্রনাথ

# শ র ৭ - স্মৃতি র টুকিটাকি

[ পূর্ণপ্রকাশিতের পৰ ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বৰ্ধাকাল। শেষ শ্রাবণের এক মেঘ-মেঘুর দিন। পূর্বপ্রান্তিতে প্রায় সারাক্ষণই বৃষ্টি হোয়ে গেছে, কখনো ঝম-ঝম, কখনো বা ঝির-ঝির। আশু সকাল থেকে বর্ষণ থেমে গেছে বটে, কিন্তু কোদালে-মেঘ ভরা সারা আকাশটা গম্ভীরভাবে ধারণ কোরে আছে। তা সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের একটাবারের জন্তেও উঁকি দিতে পারেন নি। সারাদিনটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্নানাহার সেরে, বেশ জুত কোরেই শুয়ে পড়লুম। মনে করলুম, আজকের এই বাদলা দিনে ভাল কোরে এক চোট ঘুম দোবো। সকলকে বলে রাখলুম—“বেলা তিনটের আগে আমাকে কেউ ডুলো না। জীবনে অনেক বর্ধাকাল আসবে, কিন্তু আজকের দিনের মত, জুত কোরে ঘুমোবার মত দিন হয় ত কখনো না-ও আসতে পারে।”

ঘুম কিন্তু এলো না। মনের মধ্যে আমার প্রাণের এইরূপ কতদিনের বর্ধার ছবি ফুটে উঠে, মনকে কেবলি সেইদিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। ইট কাঠ পাথরের তৈরী সহরের আবদ্ধ গুদাম-ঘরের মধ্যে বস্তার মত পোড়ে থেকে, প্রাণের সেই অপক্লপ বর্ধা-সৌন্দর্য কেমন কোরে বোঝা যাবে! সে মাধুর্য ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। ভাষায় তা ব্যক্ত করতে যাওয়া বাতুলতা। মাঠের ধারে বাড়ী। চিল কোঠার জানালায় বোসে, এই বকম শ্রাবণ বর্ধার রূপ দেখা! জীবনে সে দৃশ্য ভোলবার নয়। সমস্ত পৃথিবী ছায়াঘন আঁধারে ছেয়ে আসচে, মাঠ-ঘাট-বাড়ী-ঘর-দুয়ার, কানন-প্রান্তর—সবের ওপর যেন মহাপ্রলয় নেবে আসচে। সারা আকাশব্যাপী নিশ্চল কালো মেঘের সঞ্চার, যেন কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষণের প্রতীক্ষায় থম-থমে ভাব ধোরে আছে। সেই সব দৃশ্য, সেই সব ছবিই মনের ওপর ফুটে উঠে, মনকে চকস কোরে তুলতে লাগলো, ঘুম কিছুতেই হোল না। স্মরণ উঠে পড়লুম।

কোন একটা কাগজের লেখার জন্তে জোর তাগিদ ছিল; ভাবলুম ওইটে লিখলে হয়, কিন্তু লেখার দিকে কিছুতেই মন বসাতে পারলুম না। অনেকের মত, আমি যখন তখন লিখতে পারতুম না। লেখার ভাবে মন যখন কানায়-কানায় ভরে উঠতো, তা তখন ভোর বেলাই হোক, দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যাই হোক, রাত্রিই হোক বা গভীর রাত্রিই হোক, সেই সময়টিতেই আমি লিখতে পারতুম ও লিখতে বসতুম। স্মরণ ধারা-শ্রাবণের সেই বর্ষণহীন আঁধার মধ্যাহ্নে লেখার দিকে মন গেল না। কি করা যায়। কোথায়ই বা যাওয়া যায়? এমন দিনটা ঘরের মধ্যে নিষ্কর্মার মত কাটাতেও মন সরচে না। স্মরণ ছাড়াটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু যাই কোথায়? ‘মোস্তার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত’। চললুম শরৎচন্দ্রের ওখানে। আমিও যেমন নিষ্কর্মা, তিনিও তরুণ, তাই হুঁজনে মেলে ভাল।

শরৎচন্দ্র ওপর থেকে বোধ হয় আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই নেবে এলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—“আমার দেখতে পেয়ে বোধ হয় নেবে এলেন, দাদা?” শরৎচন্দ্র বললেন—“না। তোমার

ত দেখতে পাই নি, এমনই নেবে এলাম। আজকের weather কি বকম বদলত দেখছো।”

“Weather বদলত নয় দাদা, মনটাই আমি। এই শহরে টক্সিন-কারখানায় থেকে বদলত হোয়ে পাড়িয়েছে। বয়সকালে আর স্থান-বিশেষে এই weatherই মনের মধ্যে কান এক স্তম্ভের স্বপ্নলোকের অন্ধকারময়ী মায়া বুলিয়ে দিয়ে যেত; নয় কি, বলুন।”

শরৎচন্দ্র কিছু বললেন না, তার বদলে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি—‘য কবে যাই?’

“সেখানে এখন আর যাব না।”

“যেয়ো না। অত বড়লোকের বাড়ী যাওয়া ভাল নয়। যাও কেন?”

“বড়লোক বলে যাই না। যাই—আন্তরিক ভালবাসার টানে। তাঁদের ধনদৌলত, টাকা পয়সা আমাকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যায় না; আমার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক প্রীতি-ভালবাসা আর প্রত্যাশাই তাঁদের ওখানে আমাকে আকর্ষণ করে। হৃদয়ের বদলে হৃদয় না দিলে যে পাপ হবে, দাদা! বলুন হ্যাঁ কি না।”

কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছু বললেন না, চুপ কোরে রইলেন। তাঁর এই নীরবতা আমার কথার সমর্থনই জানিয়ে দিল।

শরৎচন্দ্র ইমানী ধনীদেব সংস্রব এড়িয়ে যেতে চাইতেন, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না, বিশেষত যেখানে ধনের অহমিকা থাকতো, সেখানে ত নয়ই। কারো ধনদৌলত বা টাকা-কড়ি কখনই তাঁর ওপর মোহ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অবশ্য কৈশোর বয়সের অপরিণত বয়সে তিনি অনেক ধনার সঙ্গে মিশতেন, অনেক ধনীগৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। ভাগলপুরের মজুমদার বাড়ী ও স্বর্গত নফর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ধনবান গৃহস্থ ছিলেন। ওখানকার বড় জমিদার ‘লাল’ পরিবার ও মজুমদারের মহাদেব সাহু প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর খুব ভাব-সাব ছিলো ও তাঁদের গৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। মিষ্টার এস, লাল, মিষ্টার টি, লাল প্রভৃতি তখনকার নাম-করা ধনী। মিঃ টি, লালের (তিলকধারী লাল) সম্পত্তি কোলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। মিস্ গিবনস্ নারী এক ইউরোপীয় মহিলার মাধ্যমে মিঃ টি, লালের সঙ্গে এককালে আমার আলাপ ও ভাব-সাব হোয়েছিল। মিস্ গিবনস্ মিষ্টার টি, লালের কোলকাতায় গৃহ-সম্পত্তি দেখা-শোনা করতেন। তিনি কখনো কোলকাতায় কখনো ভাগলপুরে থাকতেন। মিস্ গিবনস্ মাঝে-মাঝেই ভাগলপুরের ‘দাঁ’ এনে আমাকে উপহারস্বরূপ দিতেন। তাঁর কাছ থেকেই ‘লাল’-পরিবারের ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যের কথা শুনতাম। পরবর্তীকালে শুনেছি, এঁদের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রেরও যাতায়াত ছিল। মহাদেব সাহুও অর্থশালী লোক ছিলেন। খুব সম্ভব এঁদেরই কাফকে নিয়ে ‘শ্রীকান্তের’ ‘কুমার সাহেব’ চরিত্র অঙ্কিত। আমার কিশোর বয়সে এক সময় আমি ভাগলপুরের



সুন্দর দেব মুখোপাধ্যায়ের গৃহে কিছুদিনের ভ্রম ছিল। সুন্দর দেব বাবু ও সুন্দর দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা অরুণা দেবীর পিতা। তিনি সে সময় তখনকার সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ওখানকার নফর ভট্ট মহাশয়ও ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত সর্জক। এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ভাব-ভালবাসা ছিল। সেজন্য ওখানে থাকা কালে আমিও কয়েকবার নফর ভট্ট মহাশয়ের গৃহে গিয়েছি। বোধ হয়, আমার বয়স তখন বোল-সাতেরো, সে সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ঐ হিসাবে হবে—কুড়ি-একুশ। ভাগলপুরে তাঁর যে সাহিত্য আসর ছিল তার সঙ্গে নফর ভট্ট মহাশয়ের পুত্র শ্রীবিভূতি ভট্ট মহাশয়ের ভালরকম যোগ ছিল। ঐ সূত্রেই ভট্ট পরিবারের গৃহে তাঁর খুবই বাতায়ানত ছিল।

ঐ সাহিত্য আসরের আমলেই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির' কুস্তলীন পুস্তকবের প্রথম স্থানের অধিকারী হোয়ে সে বছর সাহিত্য-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সময় আমি কানীতে ছিলাম। তখন সাহিত্যের 'স'-ও জানতাম না। কিন্তু, গল্পটা পড়ে মুগ্ধ হোসে যাই। আমার কানীর অন্ততম বন্ধু, বর্তমানে 'শান্তিনিকেতন'ের শ্রীকৃষ্ণমোহন সেনকে গল্পটার কথা বলি ও তাঁকে পড়তে দিই। তিনিও পড়ে চমৎকৃত হন। গল্প লেখককে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। গল্পের শেষে লেখকের নাম ছিল—শ্রীশ্রবন্ধনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙ্গালী টোলা, ভাগলপুর, কিংবা T. N. Jubilee College, ভাগলপুর; আমার ঠিক স্মরণ হয় না। প্রায় ৬০ বছর আগেকার কথা, স্মরণে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। এই সূত্রে আরও একটা কথা বলে রাখি। 'শরৎস্মৃতির টুকিটাকী—' প্রায় সমাপ্তির পথে এল। এতে আমার লিখিত কোন বিষয়ের বা বিষয়বস্তুর কেউ যদি কোন প্রতিবাদ করেন, আমার দিক থেকে সে প্রতিবাদের কোন উত্তরের আশা যেন তিনি না করেন। আমার সে নীরবতার কারণ হবে—প্রতিবাদকে তাচ্ছল্য বা অবহেলা নয়, আমার অক্ষমতা।

যাই হোক, পরে যখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার মেলা-মেশা ভাব-সাব হয়, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, 'মন্দির' গল্পটা তিনি কে-নামীতে দিয়েছিলেন কেন? তার উত্তরে বলেছিলেন—“নিজের লেখার ওপর তখন মোটেই বিশ্বাস ছিল না। তাই আশা করতে পারি নি যে ওটা অন্ততঃ লাঠি প্রাইজেরও যোগ্য বিবেচিত হবে কি না। আর সেই না-হওয়ার বাখাটা সরাসরি সোজা বুকে এসে বাতে না লাগে, স্বপ্নেরকে হোয়ে বাতে আঘাতে আসে, তাই স্বপ্নেরের নামেই দিয়েছিলাম।”

কানীতে 'মন্দির' গল্পটা দেখবার ও পড়বার পরই আমি ওখান থেকে ভাগলপুর যাই বা যেতে বাধ্য হই। সে-ও শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে উল্লিখিত সাধু-সন্ন্যাসীর ব্যাপারের মত। তবে শ্রীকান্তের সাধু ছিল নকল, গিণ্ডি করা টিন, আর আমার হোল খাঁটা চোনে-পাত সোনা, পবিত্র ও স্বর্গীয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান। জগদ্ধিখ্যাত কানীর শ্রীমং ভাস্কর্য্যমন্ডল স্বামিজী কিছুদিন আগে 'দেহ রক্ষা' করেছেন তাঁর সেই পবিত্র ও মহান আসনে অধিষ্ঠিত তখন তাঁরই প্রধান চেলা—শ্রীমং মৈথিলানন্দ স্বামিজী। এক পুণ্যপ্রভাতে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম।

সেই প্রথম দর্শনের দিনে, কি হোল জানি না। জানি না—আমার মত অতি সাধারণ এক কিশোরের মনের সঙ্গে আর এক সর্বলোক-পূজিত, পুণ্যজ্যোতির্ধর মহান পুরুষের মনের সঙ্গে সেদিন কিসের একটা অদৃশ আকর্ষণের সৃষ্টি হয়ে গেল। এবং যার ফলে তাঁর কাছে আমি প্রায় প্রত্যাহই একটি বারের ভ্রম না গিয়ে পারতুম না এবং তিনিও আমাকে একটি দিনও না বাইয়ে ছাড়তেন না। পরলোকগত ভাস্করানন্দ স্বামিজীর উলঙ্গ মর্মর মূর্তি ও তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির স্থান দেখবার জন্তে অনেক সাহেব-মেম আসতেন। ইংরাজীতে স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী, ও তাঁর বহু অল্পবাকী উদ্ভাবনীয় ভক্ত্য নাম-ঠিকানা সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তক থাকতো, আমি তা সকলকে এক একখানা দিতাম ও তাঁদের কথা প্রশ্ন আশ্রয়ী বুজিয়ে নিয়ে, আমার বোল বহুরী বিস্তার জোরে কোনও রকমে সে সবার উত্তর দিতুম।

স্বামিজীর অনেক বড় বড় বাঙ্গালী শিষ্য ছিলেন। কচিং কখনো তাঁদের চিঠি লেখবার দরকার হোলে, আমাকে দিয়েই তা লেখাতেন। মৈথিলানন্দজীর মৈথিল ভাষা ছাড়া, বাংলা ত দূরের কথা, ভাল হিন্দীও জানতেন না; আর আমি বাংলা ছাড়া আর কিছু তেমন জানতুম না! আমাদের দু'জনের মধ্যে যখন কথা হোত, তখন তিনি যদি যেতেন পূবে, ত আমি যেতুম—পশ্চিমে। কিছ—দু'জনেরই গতি ঘুরে এসে এক জায়গায় যেত মিলে; অর্থাৎ বুঝতে পারতুমই কিছু আটকাতো না।

ভাগলপুরে সুন্দরদেব বাবুর এক কস্তার মারাত্মক অস্ত্রধ করেছিল। স্বামিজী আমাকে ভাগলপুরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন; বলে দিলেন—কোন চিন্তা নেই, মেয়ে সেয়ে যাবে। ঠিক তাই হোল। আমি যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর কল্যাণ আবেগা হোতেন। ভাগলপুরে থাকাকালীন, শ্রীযুক্ত নফর ভট্ট মহাশয়ের বাড়ীতেও আমি যেতুম। শরৎচন্দ্রও ঐ সময়ে আসতেন। ভট্ট-পরিবার ও গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যে সম্পর্ক গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তখনকার ধনীদেব মনোভাবের অনেক প্রভেদ দেখা দাঁড়ায়। প্রভেদ যে কি এই এবং কোথায়, তা না বললেও বুঝতে আটকায় না। বর্তমান কালের প্রভেদটুকুর জগেই শরৎচন্দ্র ইনানীর ধনীদেব সংস্রব এড়িয়ে যেতে চাইতেন এবং আমাদেরও সেই উপদেশ দিতেন।

উপদেশ ছলে তুটো কথা তিনি আমাকে শুনিয়ে দাঁড়ই বলতেন। একটা হচ্ছে, 'শতং বদ, মা লিখ।' আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—'তর্ক কোরো না।' একশ্রেণীর লোকদের তর্ক কববার স্পৃহা এত উদ্দাম যে, সহস্র যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ সত্ত্বেও, তাঁরা পেছু হটতে চান না। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে I. C. S. বা —বিশেষতঃ এ দেশীয় I. C. S.রা একবার যদি ভুলক্রমে বলে ফেলতেন যে 'সূর্য পশ্চিমে উদয় হয়', সে কথা আর তিনি কিছুতেই ওলটাতেন না। সূর্যোদয়ের কালে যদি তাঁকে 'ভাতে-নাতে' দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, সূর্য পূবেই উঠে, তবু তিনি তা স্বীকার করতেন না, বলতেন—'আজ হয়ত পূবে উঠে, কিন্তু সূর্য পশ্চিমেই ওঠে যোজ।' স্মরণ্য এ ত তর্ক নয়, এ হোল গোঁ। অতএব তর্ক কিছুতেই করবে না। উটে অনায়াসক একটা মনোবাখা নিয়ে তোমার ফিরে আসতে হবে।" শরৎচন্দ্রের এই কথাটা যে খুবই সত্যি তা আমার বহু বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতাপূর্ণ সুদীর্ঘ সামাজিক ও

সাংসারিক জীবনে বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি। কতকটা এই জন্মেই লিখতে বাধ্য হয়েছি যে—‘আমার লিখিত শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই টুকটাকির অংশবিশেষের ভবিষ্যতে কোন প্রতিবাদের উত্তর দিতে আমি একান্তই অক্ষম, আমার কাছ থেকে কেউ তা আশা করবেন না।’

আমাকে ‘অভিনন্দন’ দেবার প্রায় চার মাস পরে আমার ‘৩১শে ভাদ্র’—অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জন্মদিন এসে পড়লো। এবার ‘অল ইণ্ডিয়া রেডিও’র কোলকাতা শাখার কর্মকর্তারা, তাঁদের ১নং গাস্‌টিন্‌ রোসের বাড়ীতে ‘শরৎ-শব্দরী’ নামে তাঁর জন্ম-বার্ষিকী উৎসব আয়োজন করেন। তখন কে জানতো যে এই উৎসবই তাঁর শেষ জন্মদিন উৎসব! এ দিনের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে সবিস্তারে লিপ্যায়।

পূর্বেই আমি বলেছি যে, এ দিনের উৎসবে, বেতার কর্মপক্ষ আমাকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং ৩১শে ভাদ্রের সকালে, শরৎচন্দ্র আমাকে খবর পাঠালেন যে, আমি যেন সন্ধ্যার পূর্বে তাঁর ওখানে যাই; সেখান থেকে একসঙ্গে রেডিও অফিসে যাব। তাই হোল। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমি শরৎচন্দ্রের বাড়ী গেলাম ও সেখান থেকে তাঁর গাড়ীতে ১নং গাস্‌টিন্‌ রোসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায়ও ছিলেন। পথে, চৌরঙ্গী থেকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শিল্পী শ্রীযুক্ত দে’কেও আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে, গণ্ডা ভর্তি করা হোল,—একথা পূর্বে লিখেছি।

‘কোলকাতা বেতার’ স্ট্রিক্স মুক থেকেই, তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন এখানে আমাদের আনন্দের বান বয়েছে। বেতার যমুনার কুলে-কুলে নেপেনের (নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার) মধুর বাঁশীর স্বর সর্বদাই ভেসে বেড়াতো। রাইটচান বড়ল, বজ্রিত বাজ, প্রফুল্লবালা—এঁরা প্রথম যুগের রেডিওর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ‘বেডিও’র এই সময়কার ষ্টেশন-ডিবেটর ছিলেন—মিষ্টার ষ্টেপলটন। সম্ভবতঃ তিনি জাতিতে Scotch ছিলেন। শরৎচন্দ্র Irish ও Scotchদের খুব পছন্দ করতেন। বেতার অফিসে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন, উপলক্ষে তাঁর সম্বর্ধনা ব্যাপারে Mr. Steppleton-য়ের আগ্রহপূর্ণ সমর্থন, সম্মতি ব্যবস্থাপনা ছিল।

এই Steppleton সাহেবই একদিন বলেন যে, মহারাজ-কুমার প্রজ্ঞাৎকুমার ঠাকুর ‘বেডিও’তে আমার ‘জমা-খরচ’ের অভিনয় শুনে, একবার আমাকে দেখবার জন্য খুব উদগ্রীব হয়েছেন। আমি মহারাজকুমারের বাসনা পরিতৃপ্তিত জন্ত, তাঁর বি. টি. বোডহু ‘Emerald Bower’-য়ে একদিন যাব বলে স্থির করেছিলুম; কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাকে সমক দিয়ে যেতে নিষেধ করেন। সুতরাং যাই নি।

‘জমা-খরচ’ প্রশংসার সঙ্গিত বেতারে উপযূর্ণাধি কয়েক রাত ধরেই অভিনীত হয়েছিল। বোধে থেকে প্রকাশিত ‘Indian Radio Times’ নামক পাক্ষিক পত্রে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় এর প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছায় ও আদেশে, তাঁর ‘কাটিং’গুলি আমি সবুজ রেখে দিতাম।

বছর তিন-চার আগে ‘বেতার-জগৎ’-য়ের জুনিয়া খ্যার বেতারের প্রথম অভিনীত গাটক সম্বন্ধে নৃপেন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন—‘অসম্ভব বাবুর ‘জমা-খরচ’ সর্বপ্রথম বেতারে অভিনীত হয় এবং আমিই ছিলাম—তাঁর ‘অধিকারী’... ইত্যাদি।’ কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই আর একজন... বা’ক, এ সমস্ত নিক আমায় ব্যক্তিগত কথা এ ক্ষেত্রে না লেখাই ভাল। বলছিলাম, তাই বলি—

সন্ধ্যার পরই আমরা রেডিও অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। কোলকাতার বহু গণ্য-মান্য লোক। বহু সাহিত্যিক ও কবি সেদিনকার অস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের উৎসব সম্বন্ধে, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪—তারিখের ‘বেতার জগৎ’-এ যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। তা’এখানে উদ্ধৃত কোরে দেওয়া হোল।

#### আমাদের কথা

##### শরৎ-শব্দরী—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। শুক্রবারের সন্ধ্যা অস্থানে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ‘শরৎ-শব্দরী’র অধিবেশন অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। এই অধিবেশনে নাটোরের মহারাজা কাশিমবাজারের মহারাজ, রায়বাহাদুর জলধর সেন, রায়বাহাদুর এন, কে, সেন, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, কাজি নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অসম্ভব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে অস্থানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন অতি সংক্ষেপে ও কৃতান্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায়। স্বয়ং শরৎচন্দ্র ও সমাগত সুধী ব্যক্তিরা খুবই খুশী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র রচিত ‘সত্য’ গল্পের নাট্যরূপ ও অভিনয়-দর্শনে। ছোটদের বৈঠকের পক্ষ থেকে কুমারী গীতিকা সবকার কর্তৃক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়েছিল।

#### গান

মন্দিরেতে আনন পেতে

বেথেছি মোরা তব পূজার লাগি।

সুখা পরশে এই নব বরষে

ধন্য মানি তব স্বকৃণা লাগি।

বাণীর দেউলে তুমি আনিলে যে স্বর।

মধু-মুরছনে সারা দেশ ভরপুর।

পেয়েছে ভাষা প্রাণে জেগেছে আশা

পূতান চিত আঁজি উঠিছে জাগি।

অনেক দয়েছ তব তোমার কাছে।

কাঁড়াল পরাও আরো আরো হে যাচ,

সবার সনে আছি সবার মনে

সবার সাথে স্বখ-দুখ ভাগি।

[ ক্রমশঃ ।

## এ দুটির তুলনা নেই



নিম টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজা আর স্নানে  
মার্গো সোপ ব্যবহার নিত্য প্রয়োজনীয়। নিম  
টুথ পেষ্ট আর মার্গো সোপ দুটি জিনিসেই নিমের  
বিষাপহারক, জীবাণুনাশক ও নির্মলকর গুণ  
আছে। এ দুটি জিনিসই উপকারী ও প্রীতিপদ।

নিমের গুণসমন্বিত জিনিস ব্যবহার করা  
মানেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।

### নিম টুথ পেষ্ট



### মার্গো সোপ

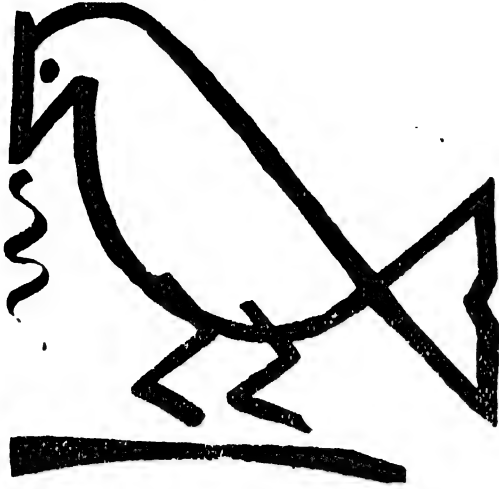


চিঠি লিখলে বিনামূল্যে  
“প্রসাধনী” পুস্তিকা  
প্রাপ্ত হইবে।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ  
কলিকাতা-২৯

## ছোটদের আসর



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রাণটির নাম পাহাড়তলী। ছোট পাহাড়, সবুজ ঘাসে ঢাকা,

একছুটে একেবারে ওপরে উঠে যাওয়া যায়, চূড়ার ওপর বটগাছের তলায়—যেখানে উঠে অনেক দূর পর্যন্ত—দশ মাইল ত হবেই—মাঠ ঘাট বন নদীর পড়ে—নদীর পড়ে ভেমারি, বেদুয়া আর সালানপুরের সাদা সাদা বাড়ীগুলো পর্যন্ত—সেই পাহাড়ের নীচে শাল পলাশ শিবুল গাছের ছায়ার পাহাড়তলী গ্রাম—সামুড়ি পোষ্ট অফিস। বনবিড়ি, বনজোয়ারি, আঙ্গুশা কলিয়ারী ওপরের বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। একটা পাহাড়ী নদী গেছে, বাড়া-বাড়া পাখে সাঁকো সৃষ্টি করেছে। এই ছোট বিবিকিরে নদীর জন্তে রেল লাইনের ব্রিজ দিতে হয়েছে। হঠাৎ বর্ষায় এ যে ফুলে-কঁপে ওঠে, নিম্নে আসে দূরের পাহাড় থেকে গঙ্গার মতন লাল জল। হুঁধারে মাঠ ছাপিয়ে নদী বয়ে যায়।

পাহাড়ের ধারে ধারে গরু চরছে। রাখাল ছেলে বেণু বাজায়, বাদের নিয়ে কত কবিতা, কত গান তৈরী হয়েছে। এখন প্রায় ছপুৰ—রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে—

মধ্য দিনে যবে গান

বন্ধ করে পাখী,

হে রাখাল, বেণু তব

বাজাও একাকী কী মিষ্টি স্বর।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে মীরা তুলেছিলো।

রবীন্দ্র জয়ন্তী। কলকাতা শহর হোলপাড় হায় বায় - রবীন্দ্র জয়ন্তী পুজোর মতন। ছেলে বড়ো মেয়েরা—আবালবৃদ্ধবনিতা যেন পাগল হয়ে ওঠে, মাতাল হয়ে ওঠে—রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসবে। কয়েকটি জায়গায় সে গেছে, আরো কত জায়গায় কথা এনেছে—দূর দূর গ্রামে গ্রামে, কত নদীর এপারে ওপারে কত ঠেঙের ধারে, কত গঞ্জের ঘাটে—রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কত বিচার—রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়ে নৃত্য-সংগীতে কত শিল্পীর প্রয়োজন—কত সভাপতি, কত প্রধান অতিথি, কত সুন্দর সুন্দর নিমন্ত্রণ পত্রে কীব্যময় ভাষা—সেই পৌরোহিত্যটা কিন্তু সবচেয়েই পৌরোহিত্য বরবে—অসামান্য কবির জন্তে কী অসাধারণ উদ্গারনা—পুরীতে থাকতেও কিছুই টের পায়নি। সেখানে সমুদ্র শুধু গজ্জন করে, সমস্ত দিন সমস্ত রাত অশ্রাস্ত। সমুদ্রকে বান দিয়ে কোনো চিন্তা কোনো কল্পনা মনে আসতে পায় না।

আরে, মীরার মন কোথায় চলে গেছে! পাহাড়তলী গ্রামের দিকে চেয়ে বটগাছের গুঁড়ির ওপর বসে সে ভাবছে—রবীন্দ্র জয়ন্তীর কথা দেশে, দেশে, ভাবছে পুরীর সমুদ্রের কথা, তাত বৈশবের নিত্যসঙ্গী যে ছিল! এদিকে ড্যাডিকে না বলে যে সে পাইলট ইঞ্জিনে চড়ে এত দূর চলে এসেছে, ড্যাডির ভাবনা হওয়া আশ্চর্য নয়। যদিও বাসনা তাকে দেখেছে, সে কি মনে করে বলবে? শাণ্ডিৎ ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে ও যখন ড্রাইভারকে বললে—এ ইঞ্জিন কোথায় যাবে? ড্রাইভার বললে—কয়লা আনতে,—ও বললে কখন কিরবে? সে বললে হুঁকটার মধ্যে। তখন ত' ও ইঞ্জিনে উঠে পড়লো।

বাজালী যুবক, সাদা পোষাক তার কালীতে কালো হয়ে গেছে, এত শব্দ স্মার্টপরা মেয়েকে ইঞ্জিনের তেল-ময়লার মধ্যে দাঁড়াতে দেবে; ব্যস্ত হয়ে গেল—বসলে, কোথায় বসতে দিই আপনাকে? সবই যে কালীমাখা! তখন মীরা হেসে বললে, আমি দাঁড়িয়েই বাব। আপনি কি করে গাড়ী চালান দেখি।

এত সহজ ইঞ্জিন চালানো? একটা ঢাকা মতন জিনিস ঘুরিয়ে দিলেই গাড়ী চলবে? একটা তাবের মতন জিনিস টানলেই এমন সিটি দেবে যে কানে তাল লাগে বায়? এ তো মীরাও পারে। কিন্তু সিমেন্টের চুল্লী থেকে গণগণে কয়লার আঁচ, এ কতোকণ সহ্য করা যায়? আর ডানদিকের ছোট্ট কোকরে চোপ রেখে গাড়ী

চালানো সেই পথে, যে পথে গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে মানুষের দল চলেছে, লাইনটাই যেন বাস্তব!—এ কি সহজ নাকি? আর এই তো লাইন, কেউ কোনো যত্নই নেয় না। এর ওপর দিয়ে কি করে এত কয়লা নিয়ে এতগুলো মালগাড়ী চলে? কোনোদিন তো উটে পড়ে না! ইঞ্জিন থামে, যেখানে লাইনের ধারে কয়লা সাজানো আছে সাইডিং। মাঠের মধ্যে ম্যানেকজারের কোয়ার্টার, জানলার ম্যানেকজারের বোর্ড মেঝে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে; কী নির্জন চারি ধার, কুলী আর কামিনরা যখন তাদের ধাড়ার

# রত্নবেদী

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

যাক বাবে, তখন এখানে কে আছে? রাতে যখন চার দিক অন্ধকার, তখন এখানে কে আছে? ডাকাত পড়ে তো কে বাচাবে? এ যেন নির্বাসন! এ যেন বনবাস! তাই তো ও পাহাড়তলী সাইজিং এ নেমে পড়ে পাহাড় গিয়ে উঠেছিলো, রূপনারায়ণপুরের কেবল কাঁচা, চিত্তরঞ্জন কারখানার আলো যেখান থেকে সন্ধাবেলা প্রদীপমালা মতন দেখা যায়। যেমন দেখা যায় সালায়পুর থেকে কুলটির আঁঠু হার, মাইথনের আলোর সাতনরী।

কলকাতার বড় ঘরের এই ছোট্ট মেয়েটিকে সামলাতে গিয়ে বাঙালী ছোকরা ডাউভার ধর্মমত খেয়ে গেছিলো, অনেক উঁচু থেকে নীচে নামিয়ে দেবার সময়ে বলেছিলো, দেখবেন, পাশের রঙটা ধরবেন। 'হাতটা ধরবেন' বলতে পারেনি, কারণ ওর হাতময় কালী, সীতারামপুরে বাঁধতে গিয়ে সাবান মেখে স্নান করতে হবে। বাঙালী সামনেই ইঞ্জিন খেমেছিলো, মালগাড়ীগুলো রাস্তা পার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মীরা ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে একটা বাক্সকে ছবি আঁকা টকির বাক্স নিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ওর হাতে দিলো, বললে, আপনার ছেলে-মেয়েকে দেবেন।

সে স্নান হেসে বললে—আমার ছেলে-মেয়ে নেই।

স্ত্রী কো আছেন?

তা-ও নেই।

তাহলে আপনি গাবেন। আপনি কি টকি ভালোবাসেন মা? ইঞ্জিন চালাতে চালাতে কি আপনার হৃ-একটা টকি মুখে দিতে ইচ্ছে করে না?

কিছু এর তো অনেক দাম! কেন মিছে নষ্ট করছেন?

অনেক দাম? আমারও অনেক আছে—এ কথা মীরা বলতে পারলো না, বললে, আপনার হাতে যে ঘড়িটা আছে, ওটারও তো অনেক দাম বলেই আমি জানি।

এ কথাটা বললে এটি বোঝাতো যে, তোমাকেও আমি তুচ্ছ মনে করি না, যে-তুমি খুব দামী ঘড়িই কিনে পরতে পারো।

কী চণ্ডা নতুন রাস্তা আসছে, লক্ষ লক্ষ একর থানক্ষেতের ওপর দিয়ে আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন জুড়ে দেবার জন্তে। নিষ্পন্ন নিষ্পন্ন থান সালায়পুরের বুকের ওপর দিয়ে রাক্ষস তৈরী হচ্ছে দেশ বিদেশের পণ্যবাহী আর যাত্রীবাহী গাড়ীর কোলাহল সমস্ত আলস্য চূর্ণ করতে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিচার কেন্দ্রবিন্দুতে যে অচলায়তন, তার মাটির পাঁচিল ভেঙে আসছে ইম্প্যাক্তের জগবাত্রা। তবু কবি বলেছেন—রক্তকরবী খেতকরবী ফুটেবে মাঠের প্রান্তে, সিঁদুর ইলেকট্রিকের তার যেখান দিয়ে কলকাতা গেছে।

কলকাতা—!

বাগিগঞ্জের এফ আবুদ্দী প্রতিযোগিতা—

দাদখানি চাল

মুন্সুরির ডাল

চিনিপাতা দৈ।

ছুটো পাকা বেল

সরিষার তেল

ডিম-ভরা কৈ।

বাজারে এই আনতে গিয়ে মুখস্থ করতে করতে ছেলেটি পথে ঘড়ি ওড়ানো ইত্যাদি দেখে সব ভুলে যাবে—দোকানে গিয়ে বলবে—

দাদখানি বেল,

মুন্সুরির তেল

সরিষার কৈ।

চিনিপাতা চাল

ছুটো পাকা ডাল

ডিম-ভরা দৈ।

মীরা এখানে নাম দিলো—

মোলোর নীচে যার বয়স, সেই যোগ দিতে পারে। ও বললে— ডাড্ডি, ভারী মজার কবিতাটা! বাংলা কবিতায় এত মজাও ছিল— তোমরা যখন ছোট ছিলে!

ডাড্ডি বললে—ওটা ইংরেজী কবিতা থেকে বেমানুম নেওয়া— স্বীকার করা হয় নি। ইংরেজী কবিতাটার নাম হচ্ছে Going on an errand.

ডাড্ডির কাছে এত পবনও থাকে। মীরা বলে, ডাড্ডি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আশী বছর বেঁচে ছিলেন—আপ ওদের লেখকরা?

ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর টেনিসন বা দীর্ঘজীবী! নইলে কীটস ত্রিশ বছর, শেলি ত্রিশ বছর, বায়রণ ছত্রিশ বছর, লুই ব্রিভেনসন চুয়াল্লিশ বছর, শেক্সপীয়ার বাঁচান্ন বছর। আমাদের দেশে পঞ্চমহাসদেব, মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র সেন সাতচল্লিশ, দেশবন্ধু, আশুতোষ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিয়াল্লিশ, স্বামী বিবেকানন্দ উনচল্লিশ, নটা ভায়াস এম-এ হরিনাথ দে বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। শঙ্করাচার্য বত্রিশ আর আলেকজান্ডার দি গ্রেট আটশ বছরে মারা যান। কত অল্প বয়সে তাঁরা কত কাজ ক'রে গেছেন! আর মাত্র উনিশ বছরের বালক সিগাজদোয়া ইংরেজের হাতে মারা গেল, ঐ বয়সেই কত কুর্কী, কত সাহসের পরিচয় সে দিয়ে গেছে!

আবুদ্দী প্রতিযোগিতায় প্রথম হল মীরা। পদক নিয়ে বাড়ী এলো। বড়োলোকের ক্লাব নথ, সম্ভার পাতলা মেডেল দিয়েছে তারা—নেহাংই তারা মাঝী!

মীরার মন ধাবাপ।

মীরার মাম্মি বললে সম্মানটাই বড়ো। ভিনিসটা নয়। তুমি কি জানো ভিক্টোরিয়া ক্রশ দোনার নয়, বপোর নয়, নিতামুই ব্রোঞ্জের, তবু তার সম্মান দোনার চেয়ে বেশী।

কি ক'রে হল?

১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ানরা পাকায় অনেক কামান ফেলে। ইংরেজ সৈন্যরা নিয়ে আসে। জাঁদবেল জেনারালরা কত কি পুনরায় পেলে, মহারানী ভিক্টোরিয়া বললে সেই সব অখ্যাত সৈনিকরা কি পারে, যারা কত সাহসের পরিচয় দিয়েছে যারা না থাকলে যুদ্ধ জয়ই হত না? তখন স্থির হল ঐ ব্রোঞ্জের কামানগুলো ভেঙে ক্রুশটিকে তৈরী করা হবে, রাণীর নামে নাম হবে ভিক্টোরিয়া ক্রুশ—তারাই পাবে যাদের তাগের আর সাহসের তুলনা নেই। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে পাঞ্জাবের খোন্দার বাঁ ভি-সি পেয়েছিলো! ভি-সি পেয়ে রাণীর সঙ্গে সে ডিনার খেতে বসতে পেয়েছিলো! সে ত ব্রোঞ্জের। তবু তো তোমার পদকে থানিকটা রূপো আছে।

কারাটার থেকে মাম্মির দাদা এসেছে, তাকে মামাবাবু নয়, আকল বলতে হবে। সাহেব মাস্তুর। সাঁওতালদের মধ্যে থাকেন,



সব সময়ে পাঞ্জামা পরে। ধুতি পরতে পারেন না। লুঙ্গি পরাটা কিন্তু পছন্দ করেন না।

আঙ্কল এনেছে গৌলাপ কামাটারের বাগান থেকে—মাষ রোজ, ডামাস্ক রোজ, উড রোজ—যাকে কাঠগৌলাপ বলে, আর ওয়াইল্ড রোজ, বুনো গৌলাপ।

গৌলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল আঙ্কলের কাছে। পুষ্পেরণকে pollen বলে। এমন যে শুক্লর গৌলাপ ফুল তাতে নাকি মধু মোটে নেই। কত বনের ফুলে মধু থাকে, আর ছুনিয়ার সেরা ফুলে মধু নেই! মৌমাছিয়া পুষ্পেরণ থেকেই খুসি হয়।

কাঠাটার মীরা দেখেনি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বাঙামাটির দেশে গৌলাপের বাগান, কত রং-বেরঙের গৌলাপ সারে সারে ফুটে আছে, গৌলাপ বাগান আলো করে নাসারি চলে গেছে বিঘার পর বিঘা, কয়েক একর দূরে পাহাড়ের চূড়া, খাটুছে কালো পাথরের চেহারা সাঁওতাল তার সাঁওতালী মেয়েরা—কামাটার।

যেমন টাইবার নদীর তীরে রোম ভাষতে ভালো লাগে, তেমনি, সাঁওতাল পরগণায় কামাটার ভাষতে ভালো লাগে বালিগঞ্জের রেনি পার্ক থেকে।

আঙ্কলের একটা ফিল্ম ক্যামেরা আছে,, তাতে নড়া-ছবি তোলা যায়। একদিন সেই ছবি তোলার ব্যবস্থা হল।

বটানিক্যাল গার্ডেনে ঝিলের ধারে রাস্তা হল, খাওয়া হল, পরিবেশন হল, বিরাট বটগাছের মাঝখানে যেখানে আসল গুঁড়িটা ম'রে গেছে, বংশের গাছগুলো একদিন যারা খুরি হ'য়ে নেমেছিলো, আজ বাইরেটা পাহাড়ের মতন করে সাজিয়ে রেখেছে, সেই খোলা কাঁকা জায়গায় ওরা গিয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়ালো গঙ্গার ধারে যেখানে সীমার চ'লে যাচ্ছে ঢেউ তুলে, গঙ্গা ব'য়ে যাচ্ছে গঙ্গাসাগরের দিকে, আর সমস্ত ফিল্মটা ডেভালাপ হ'য়ে প্রিন্ট হ'য়ে যখন এলো, তখন সাদা পর্দার গায়ে ফুটে উঠলো সেই একটি দিনের কাণ্ড কারখানা চলচ্চিত্রে। আশ্চর্য মনে হয়!

ড্যাডি অল্প লোককেও আশ্চর্য্য করবার ব্যবস্থা করে দিলে আঙ্কুরে মেয়ের খাতিরে। এলো নতুন ক্যামেরা, এলো প্রোজেক্টর, এলো স্ক্রীন। শিখে নিতেও দেবী হল না।

কিন্তু দেখবে কারা? কোথায় সেই উৎসব ছেলে-মেয়ের দল? এ বাড়ীতে যে সব ছোটরা আসে, তারা তো বড়োদের মতন নাক সিঁটকেই আছে। কোনো কিছুতে অবাক হওয়া তাদের বাহন। তাদের বলতেই হবে, এ আর এমন কী! ও তো ভারী! কিন্তু এই বাংলাদেশেই—এই কলকাতা সহরেই এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ছেলেমেয়েদের মা-বাপ-পিসিমা-দিদিমারাও আছে, যাঁরা অবাক হয়ে যাবে নিজেদের চলা-ফেরার ছবি পর্দার বুকে ফুটে উঠছে দেখে। তারা তো ধন্য হ'য়ে যাবে।

তাদের পাঁবে কোথায় মীরা? সেই সরল প্রশ্নের উদ্ভাস এখানে কি করে দেখা যাবে এই সাহেবী কায়দার বাড়ীতে?

বাগবাজারের বাড়ীতে সে দেখেছে, একদিন একটা ঝি বগড়া করছে, তাকে ঝি বলে ডাকা হয়েছে বলে, আর তাকে তুই বলা হয়েছে।

সে কিনা কমলার মা, তাকে সবাই তুমি বলে, আর এ বাড়ীতে—ঝি, তুই?

কাজ করবুনি, এখনি আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, তুমি যে, আমিও সে। বাসন মাজি বলে কি ছোটনোক হয়ে গেছ?

কোমরে হাত দিয়ে ছোটলোকের এত চোখরাজনী?

আর তাকেই শেষটা সাধ্যসাধনা করে রাখা হল, পাঁচমাস, এ মাসে যেতে নেই, বাগ কোরো না।

ফুড়িটাকা মাইনে দুবেলা হাতীর খোঁরাক, তবু এ খোসামোদ করতে হবে?

ওদের বাঁধুনী বলেছিলো—কাম ছেড়ে দিমু।

অগত্যা অল্প লোক আনা হয়েছিলো। তখন সে বল যানু না।

মেয়েছেলের কী কাণ্ড!

ঝিও তো তাই করলো, মাঘ মাস পড়তে যেই নতুন চাকর-এলো, তাকে বললে, তুমি আমার চাকরীটা খেতে এলে? এক ছেলে নিয়ে ঘর করো, তোমার কি প্রাণে ভয় নেই?

তখন একজন গিন্নী বললে বাঁটা মেয়ে বিদেশ কর মুখপড়িকে। লোক দেখলেই যেন কেঁচো, অল্প সময়ে কালকেউটে। দূর হ, ঢের ঝি মিলবে তোমর মতন। ঝি তখন কান্না জুড়ে দিলো নেচে-কুঁদে। আমাকে মেয়েছে—বাঁটা মেয়েছে। যেই যেই নাচ।

এ বাড়ীতে ও সব কুরুক্ষেত্র দক্ষবজ্র চলবে না।

রায়মতন বলে লোকটা একদিন মীরাকে বলেছিলো—চা যদি জুড়িয়ে গিয়ে থাকে, হিটারে গরম করে নাও, আমি আবার চা করতে পারব না—ড্যাডি শুনতে পেয়ে তক্ষণি হিসাব করে টাকা দিয়ে বললে—এই দণ্ডে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। মনিবের সঙ্গে কথা বলতে শেখোনি?

সে বলেছিলো—হজুর, কসুর হয়ে গেছে

একটি কথা নয়। বাইরে সোজা চলে যাও।

ড্যাডি বলে—পা আর মাথা এক হয় না। জুতো সোনার হ'লেও পায়ে থাকে। অশিক্ষিত ছোট ছাত কি করে সম্মান পাবে শিক্ষিত বড়ো জাতের সঙ্গে? কোনো বর্ণশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কখনো বলেননি যে এমন হ'তে পারে।

আবার ঢাকুরিয়া লোক। যতই গরম পড়ুক কলকাতার সম্ভার পর দক্ষিণ থেকে যে হাওয়া আসে লেকের জলের ওপর দিয়ে—হ হ হ, প্রাণ তা জুড়িয়ে দেবে। ওদিকে থাক না—১১০—১১১—১১২ ডিগ্রী।

মাম্মি জর্জেট শাড়ী নিয়ে বাসের ওপর শুয়ে পড়লো। মীয়ার শিক্ষক নরম দুর্কাদলের ছোঁয়া গেলে। মাম্মি বললে—এইজ্ঞেই পশ্চিমের গরম দেশের লোক সন্ধ্যা হলে কোথায় জল খুঁজে বেড়ায়। একটা ডোবার ধারে গেলেও মাঠের গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।

ওদিকে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে গল্প শুনছে। কার কাছে? সেই লেখক—ছড়াতে-পড়াতে যাবু লেখা।

আচ্ছা, আপনার বয়স কত? একজন ভাবিকি গোছের লোক প্রশ্ন করে—যার মাথার চুল সাদা, খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গৌফ সাদা, কানের ওপর গোছা-গোছা চুল সাদা।

কেন বলুন ত?—লেখকের প্রশ্ন।

আমার বয়স পঞ্চাশও নয়, জরার সাদা চিহ্ন আমার সারা গায়ে। আপনার বয়সও নিশ্চয় এর চেয়ে কম নয়—লেখাই ত পড়ছি আজ

ত্রিশ-পঁচাত্তর বছর—অথচ চুল দিবা কাঁচা, মুখখানাও কচি, গলার দরও ছোট—মামুষের মতন কোমল। কি ক'রে এমন হয়?

হয় মনের জন্তে। মনে কোনো প্যাচ ঢুকতে না দিলেই চেহারার কোমলতা থাকে। মনটাকে রাখতে হয় কৈশোরের দিনে। পৃথিবী দেখে অবাক হ'ত হবে।

তাই বুঝি এখনো হয়? তা কি ক'রে সম্ভব হবে? আর আপনি ঘুরিয়ে দিতে চান, আমার মনে প্যাচ আছে তাই চেহারা পাকিয়ে গেছে।

—তা নই। এরকম চোয়াড়ে হ'রে যাবেন কেন? আর গায়ে প'ড়ে বগড়াই বা করতে যাবেন কেন? বসুন তো এই ছেলেদের নিয়ে। করুন ত গল্প।

হ্যাঁ, আমার যেন আর কাজ নেই! আমি তো আপনার মতন নিকামাই নই?

এও তো একটা কাজ—ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেওয়া। বসুন এদের নিয়ে।

ছেলেরা মেয়েরা তখন আপত্তি জুড়েছে, না না, আপনি বলুন—কি হল সেই টুনটুনি পাখী? রাজাও তাকে পেটের মধ্যে পুরে ফেলেছে। তারপর কি হল?

রাজা একটা ঢেঁকুর ভুলেছে—হেউ, আর টুনটুনি পাখী পেট থেকে বেরিয়ে ফুড়ুক ক'রে উড়ে গেল!

যারা শুনছিলো, তারা হৈ-হৈ ক'রে উঠলো—বললে তারপর? তারপর?

শিশুমন যে হারিয়ে ফেলেছে, সে আর কাঁড়ালো না, ব'লে গেল যত সব গাঙ্গা। পেটের মধ্যে পাখী গেলে কখনো ঢেঁকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে? পারে উড়ে যেতে? এ কি সার্কাসের লাল মাছ যে জলের সঙ্গে গিলে ফেলে আবার কুলকুচো ক'রে একটি একটি জ্যান্ত বার ক'রে দেবে? এ হল টুনটুনি পাখী, বাকি আশু গোলা যায় না!

হৃদয়ের সবুজ জল হাওয়ায় কাঁপছে, কাঁপছে বিজলী বাতির রেখা হাজার টেউএর সঙ্গে। আসছে বড়, যাচ্ছে টেন। চানচুর ভাঙা চা—না বাদাম—ঘুম আসে। মনে পড়ে যায়—পুরীতে ফেলে এসেছে 'রাজার ছেলে' কি জানি কার লেখা, প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে গেছে, রাজার ছেলে প্রশান্ত, তার বন্ধু অধীর—দুহনে দেশে দেশে ঘুরে কত কী কাণ্ড! কিছুতে ভুলতে পারা যায় না গল্পটা।

তাদের বাড়ীতে আসে কোথাকার কুমার বাহাদুর, সেও ছোট বেলায় পড়েছে রাজার ছেলে বলে, আমার ভীষন একেবারে বদলে গেছে রাজার ছেলে প'ড়ে। ষ্টেট বন্ধন গভর্ণমেন্ট নিয়ে নিলে তখন তাই আমার একটুও কষ্ট হল না। আগে থেকেই আমি প্রাসাদ ছেড়ে আমার দোতলা বাড়ীতে চ'লে এসেছি, আর কাপড়ের কল হু-হুটো ক'রে ফেলেছি।

সবুজ ঘাসের বিছানায় দক্ষিণে হাওয়ায় রাজার ছেলের পালাঙ্কের মলমলের বিছানার কথা মনে হয়। নটীর সময়ে ড্যাডি গাড়ী নিয়ে এসে ডাকাডাকি করে, এ কি অসভ্যের মতন ঘাসের ওপর শোয়া? চার ধারে লোকজন ঘোরা-ফেরা করছে। তোমাদের কি সবই অদ্ভুত?

বড্ডো ক্লান্ত লাগছিলো, মামুঁ মিললো।

চিরদিন কখনো সমান যায় না বলে একটা কথা আছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলেও একটা কথা আছে। আকাশে মেঘ নেই, অথচ বাজ পড়লো।

মীরা সেই রকম একটা কথা শুনলো।

মামুঁর ছেলে হবে।

মানে মীরার একটা ভাই আসছে।

ভাই হওয়া তো আনন্দেরই। কোন বোনের না আনন্দ হয় ভাই হ'লে?

কিন্তু এখানে আর একটা জিনিস ভাবতে হবে। এদের ছেলে হয়নি ব'লেই না মীরাকে এনেছে? ছেলে হয়নি ব'লেই না এখানকার সমস্ত ঐর্ষ্যা মীরার? ধন-দৌলত, বাড়ীঘর সা?

সত্যি যদি নিজের ভাই হ'ত, না হয় তার সঙ্গে সমান সমান ভাগ হ'ত, তাতে দুঃখ ছিল না। কিন্তু মীরা তো সত্যি এ বাড়ীর কেউই নয়?

এদের নিজের ছেলে কিংবা মেয়ে এলে মীরার কোনো দরকারই হবে না।

তাকে হয়তো কিরে যেতে হবে তার গরীব বাপের দুঃখের সংসারে, নয়ত রাস্তার ফুটপাথে হাত-পাতা ভিখারীদের দলে।

যে ভবিষ্যৎ তার স্থির হ'য়ে গেছলো—সেই ভবিষ্যৎ হ'য়ে গেল অনিশ্চিত।

ড্যাডির মুখ গম্ভীর।

মামুঁর মুখ আরো গম্ভীর।

নবদীপ থেকে কাঁধি পিসিমা এসে বললেন—নাথনি কি ভয় পেয়ে গেলি?

মীরার চোখে এবার জল এসে গেল—যে জল বাধা মানল না, ঝরে পড়ল ঝর-ঝর-ঝর। অসহায় মেয়েটিকে চিবিয়ে খাওয়ার জন্তে যেন নিষ্ঠুর পৃথিবী অপেক্ষা করছে রূপকথার রাক্ষসীর মতন। সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন বনবন-বনবন আওয়াজ! ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে ভয়ে আঁংকে ওঠে। আকাশে হাজার হাজার শকুনি!

আজ মীরার বাড়ীতে গেলে হয়ত আশ্রয় হবে না। সংসার সংসার অভাবের তাড়নায় আরো হয়ত ভরস্বর হ'য়ে উঠেছে। হাংলা প্যাংলারই হয়ত দুবেলা পেট ভ'রে ভাত জুটছে না।

বড়ে হ'য়ে গেছে মীরা মাধার। এবার তার বিয়ের ভাবনা। যে সমুদ্র তার ভালোবাসার জিনিস ছিল—তাও আজ ভালো লাগছে না। মাখার ওপরের ছাদ উড়ে গেছে। পারের তলা থেকে মাটি স'রে গেছে।

মীরার নিজেরই মনে হল, আসলে মীরা বিধাতার খেলার গুতুল!

যেন ঘুম ভেঙে গেল দুঃখপ্ন দেখে।

ফুলের বন মিলিয়ে গিয়ে মক্কাভূমির বালি উড়ছে—সাহারা মক্কাভূমি—সারা ইয়োরোপের চেয়ে বড়ো। ওয়েসিস,—মরুতানের ধারে ধারে ডাকাত দল থাকে, লুঠ করে পথিকের সর্বস্ব, যে মরীচিকা দেখে দেখে ছুটে ছুটে ক্ষুধার তৃষ্ণায় ক্লাস্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত গলগলে বালির ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে প্রাণ হারালো। ঘরে তার খবর গেল না, সাহারা মক্কাভূমির বালি তাকে চাপা দিলো।

মেরুদণ্ডের ভেতর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। সে কি চলেছে কুমেরু পাহাড়ের দিকে মাইলের পর মাইল, বরফ পাব হ'য়ে মেরুর দেশের হরিণ পর্য্যন্ত যেখানে যায় না, সাপা ভালুক আসে না। গাছ নেই, ঘাস নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পথ নেই, ঘাট নেই, গ্রাম নেই, বর নেই, আকাশে পাখী নেই, মাটিতে মানুষ নেই— শুধু হুর্ভেজ কুয়াসা, সাপা বরফ আর কনকনে ঠাণ্ডা। ঝাট নেই, পানীয় নেই, বল নেই, ভরসা নেই, আশা নেই, সাহস নেই, শুধু আছে ভয় আর ক্লান্তি। দিগন্তবিহীন দক্ষিণ মেরু, আড়ষ্ট পা যেখানে চলে না, ভারী বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না।

এদের বাড়িতে উৎসব। আত্মীয়-স্বজনের নিত্য আনাগোনা।

কত কামনার কত ভরসার ছেলে আসছে নিঃসন্তান রায়চৌধুরী পরিবারে—লক্ষ লক্ষ টাকা বানের ব্যাঙ্কে—ভোগ করবার লোক খুঁজছিলো যারা।

হাঘরের মেয়ে মীরার উড়ে এসে জুড় বসে কেউই পছন্দ করছিলো না। সবাই আজ গমন খুঁসি পায়! মেয়ের সর্বনাশের সম্ভাবনায়।

সালামপুরের সাঁওতাল মেয়ের মতন খোঁপায় ফুল গুঁজে, ক'সে কোমর বেঁধে ও যদি চলে যেতে পারত কয়লা-বনির কাজে প্রজাপতির মতন নাচতে নাচতে, আর ফিরে আসতে পারত গান গেয়ে গেয়ে— তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে, তেমনি প্রাণের উজ্জলতায়! ভাবনা-বিহীন সাঁওতাল মেয়ে!

শাস্ত্রাচ নেপেছে-শুনেছে বংশোদ্ভূত, সে কত আদরে ছিল, কলকাতার মেয়ে। আজ সব হারিয়ে দশটা-পাঁচটা চাকরী করছে লক্ষ পুরুষের ভিড়ে, ট্রামে-বাসে ঝাঁড়িয়ে গিয়ে। মীরার অবস্থা অত বিস্তে নেই। [ক্রমশঃ।

## স্বর্গজয়ের বিড়ম্বনা

(একটি দিনেমার রূপকথা)

### হাল ক্রিস্টিয়ান এ্যাণ্ডারসন

অনেক, অনেক দিন আগে ছিলো এক দেশ। সেদেশের রাজ্য ছিলো দানোর মতো লোভ। তাঁর রাজ্য ছিলো বেশ বড়ো, কিন্তু তাতে তাঁর মন উঠতো না। তিনি চাইতেন যে, তিনিই সাগর পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট হবেন। আর, সেই উদ্দেশ্যেই, রাজ্যমশাই সৈন্যসামন্ত লোক-লগ্নর তীব্রধনুক বশ ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবছরই দেশ জয় করতে বেরোতেন। তাঁর শিবির পড়তো যেখানে, সেখানেই তাঁর ফৌজ সব-কিছু ধ্বংস করতো, তাদের নিষ্ঠুর, লোভে-বিকানো, শিরা-জাঁকা খাণ্ডা থেকে কিছুই রেহাই পেতো না। যে দেশ জয় করতে যেতেন, সেই দেশের শতাব্দ্যমূল মাঠের উপর দিয়ে সেই রাজ্য তাঁর পট্টন চালিয়ে নিয়ে যেতেন, আর তাদের পায়ের চাপে সব ফসল, সোনালি ফসল, নষ্ট হ'য়ে যেতো। তার দক্ষিণ দেশের লোকদের অনেক কাল ধরে না খেয়ে থাকতে হ'তো। রাজ্যমশাই যে দেশ জয় করতেন, সে-দেশের কেবল যে ফসলই নষ্ট করতেন, তা নয়—দেশের উপর দিয়ে যাবার সময় সব গরিব লোকদের কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। এই সব ঘরবাড়ির আগুন হ'হ ক'রে আকাশ পর্য্যন্ত উঠতো, আর আশে-পাশের সব গাছপালা আগুনের আঁচে ঝলসে যেতো, পুড়ে যেতো। খিঁদে পেলে

কেউ যে ফসল খেয়ে থাকবে, তারও কোনো উপায় থাকবে না। সবাই বাতে না খেয়ে মরে সেই জন্তাই এই ছিলো। নিদ্রা ফন্দি! ছোটো-ছোটো ছেলেরা কোলে ক'রে পাণ্ডন-লাগা বাড়ি থেকে সব মেয়েপুরুষ এসে আশ্রয় নিতো সেই সন্ধ্যা ঝলসানো গাছতলায়। বর্ষার দিনে প্রবল বৃষ্টির জলে, আর শীতকালের ঠাণ্ডা, কনকনে, পঁজরায়-ছুরি-চালানো হাওয়ায়, অনাচারে, অনিচ্ছায়, ভয়ে তাদের যে কী অবস্থা হ'তো, তা বলনা! করতে গেলেই শরীর শিউরে উঠতে চায়। লড়াইয়ের গল্প প'ড়ে আমরা মোটেই বুঝতে পারিনে, যে-দেশ হারলো, সে-দেশের উপর দিয়ে হৃদশার রখের চাকা কী ভাবে গড়িয়ে যায়!

রাজ্যমশাই তাঁর ফৌজ নিয়ে যাবার সময় অনেক বার ঐ সব কল্লণ, বুক-ফাটা, দুঃখে মলিন দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু অজ্ঞ সবাই সে-সব দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেও তাঁর খুবই ভালো লাগতো ও সব দেখতে। রাজ্যমশাই দেখতেন, তাঁর চোখের সন্মুখ দেশের সব লোক ঘরছাড়া হয়ে শীতে বা বর্ষায় না-খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে ও মারা যাচ্ছে, সবুজ গাছের গায়ে ক'রে ঠিকই করছেন, অজ্ঞায় কিছু করছেন না। রাজ্যের পরাক্রম আর সৈন্যবল ছিলো অনেক, কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-জয়ের ফল কেবল হ'তো এই রকম ধ্বংস আর দাচল্য দুর্ভিক্ষ।

দিনের পর দিন যায়, রাজ্যমশাইয়ের ক্ষমতা কেবল বেড়েই চলে। একের পর এক সকল দেশ আসতে থাকলো তাঁর দখলে। তাঁর নাম শুনেলে আশে-পাশের দেশের লোকেরা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতো, ছেলেরা ভূমি করলে মায়েরা তাদের ভয় দেখাতেন তাঁর কথা ব'লে। এমন কি, যে-সব ডানপিটে ছেলেরা তাদের মা-বাবার কথা শুনতো না, তারা পর্যন্ত ভয়ে শিরশিগিরি কাঁপতো তাঁর নাম শুনেলে।

সে সব দেশ রাজ্যমশাই দখল করতেন, সে সব দেশ থেকে অজ্ঞা ধনসম্পত্তি তিনি লুণ্ঠরাজ্য ক'রে নিয়ে আসতেন। এর দক্ষিণ তাঁর রাজধানীর সম্পদ ক্রমশই বেড়ে চললো। পৃথিবীতে অতো সমৃদ্ধ নগরী তখন আর কোনোখানে ছিলো না। রাজ্যমশাই যতটাই তাঁর অধীন সব দেশ থেকে অজ্ঞা টাকা-পয়সা পেতে লাগলেন, ততটাই সে-সব দিয়ে রাজধানীতে অনেক ভালো-ভালো মন্দির, বাস্তা, বাগান, প্রাসাদ প্রভৃতি তৈরি করতে লাগলেন। রাজধানীর লোকেরা দেখতো, তাদের দেশের সম্পদ আর ঐখন্দি দিন-দিন কেবলি বেড়ে যাচ্ছে, আর তাই দেখে তারা সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো : 'ও! খুব শক্তিশালী রাজ্য তো!' তারা যখন এমন ভাবে ঐ দুর্ভাগ্য রাজ্যের ক্ষমতার প্রশংসা করতো, তখন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো না যে, অজ্ঞ সব অধীন দেশের লোকদের কী রকম হৃদশার বিনিময়ে তাদের দেশ ঐ-রকম ক্ষমতার ক'রে সাজানো হ'চ্ছে।

আর রাজ্যমশাইও তাঁর অটল সোনা রূপো হীরা-জহরত চুপি-পাড়া দেখে ভাবতেন, 'সত্যিই তো, আমার তো তবে সাংঘাতিক ক্ষমতা! কিন্তু আমার আরো চাই, আরো বাড়তে হবে আমার ঐখন্দি, পৃথিবীর সকলের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ধনী আমার হ'তে হবে।' এই ভেবে আন্তে-আন্তে পৃথিবীর সকল বাজাকে তিনি হারিয়ে দিলেন, আর তাদের সমস্ত ধনবস্তু নিজের রাজ্যে ব'য়ে আনালেন। অধীন দেশের রাজারা হ'লো তাঁর সামন্তের মতো;

প্রতি বর্ষেই তাঁরা তাঁর জন্ম ধনদৌলত নিয়ে আসতো। রাজ্য-মশাই উঁচু সোনার সিঁড়াসনে বসে থাকতেন, তাঁর গর্ভিত মাথায় রত্নমল কতো চুনি-পান্না-বসানো সোনার মুকুট, আর সেই সব পরাজিত বাহু বা ঠাট্টা গেড়ে তাঁকে অভিবাাদন করতো।

একদিন রাজ্যমশাইয়ের খুব শগ হ'লো যে, দেশে-দেশে, ঘরে-ঘরে তাঁর নিজের পাখরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। যেই তিনি লকুম দিলেন, যেমনি অল্পশ শিল্পী তাঁর মূর্তি গড়তে শুরু ক'বে দিলে। এক মাসের মধ্যেই জাহাঙ্গীর-জাহাঙ্গীর খেতপাখরের মূর্তি তৈরি হ'য়ে গেলো। রাস্তার ধারে, বাগানের মধ্যে, বড়ো-বড়ো প্রাসাদের ভিতরে তাঁর মূর্তি বসানো হ'তে লাগলো। তারপর একদিন রাজ্যমশাই তাঁর কতকটি পাখরের মূর্তি একটি বড়ো গাড়িতে শোখাই ক'বে নিয়ে বেরোলেন। উদ্ভ্রাণ, ঐ মূর্তিগুলো কেবল সা বড়ো-বড়ো কেউলের মধ্যে বসাবেন। দেউলে গিয়ে রাজ্যমশাই পুরুতদের বললেন : 'আমি চাই যে, সব মন্দিরেই আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আর এ-ও আমি চাই যে, দেবতার পূজার সঙ্গে সঙ্গে আমারও যেন পূজা হয়।'

পুরুতরা সকলে করছোড়ে বললেন : 'সম্রাট! আমরা স্বীকার করি যে, আপনার ক্ষমতার কোনো সীমা নেই, সাধ্য আপনার সীমাহীন! কিন্তু একথা তো ঠিক যে, স্বর্গের দেবতারা আপনার চেয়ে ঢের বেশি শক্তি পান। আমরা আপনার আদেশ পাশন করতে ভয় পাইছি, কারণ, তা-হ'লে দেবতারা আমাদের শাস্তি দেবেন। সুতরাং সম্রাট! আমাদের কোনো ক্রটি না নিয়ে এই দুকুই ছেঁজর হাত থেকে আমাদের বেরাই দিন।'

পুরুতদের সেই উত্তর শুনে রাজ্যমশাই বললেন : 'বেশ, আমি স্বর্গের দেবতাদেরও পরাস্ত করবো। দেবতাদের জয় করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন।'

স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তাই রাজ্যমশাইয়ের নির্দেশ অনুসারে খুব ভোড়োড় গুরু হ'য়ে গেলে চার দিকে। উদ্ধত রাজার অহঙ্কার প্রস্তুত হ'তে লাগলো তুমুল যুদ্ধের জন্য। তখনো উড়োজাহাজ বেরোয়নি, তাই তাঁর লকুম-মতো অল্প টাকা খরচ ক'রে একটা প্রকাণ্ড জাহাজ তৈরি হ'লো; সেই জাহাজের উপর সাজানো হ'লো জাহাঙ্গীর-জাহাঙ্গীর তীরন্দাজ চাল-তলোয়ার বর্শা-বল্লম; আর ঠিক হ'লো, রাজ্যমশাই তাঁর পুটন নিয়ে সেই জাহাজের মধ্যেই থাকবেন। তারপর প্রায় দশ জাহাজ ঈগল বেঁধে দেয়া হ'লো সেই জাহাজের সঙ্গে, কারণ, জাহাজটার তো ওড়া চাই!

নির্দিষ্ট দিনে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, ঈগল-পাখীরা সেই জাহাজটা নিয়ে আকাশে উড়লো! ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে স'রে যেতে লাগলো জাহাজটা; বানিক পরেই পৃথিবীর সব জিনিশ দেখাতে লাগলো পুতুলের দেশের মতো ছোটো-ছোটো; তারপর উড়তে-উড়তে জাহাজটা এতো উপরে উঠলো যে; সেখান থেকে পৃথিবীর কিছুই আর দেখা গেলো না।

জাহাজটা যখন নীল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠলো, রাজ্যমশাই চার পাশে দেবদূতদের চলাফেরা করতে দেখলেন। তাদের দেখেই রাজ্যমশাই লকুম দিলেন তাঁর ছুঁড়তে। জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর ধুক থেকে অনর্গল রাশি-রাশি তাঁর ছোঁড়া হ'তে লাগলো, কিন্তু রাজা অবাক হ'য়ে দেখলেন যে, একটাও দেবদূতদের গায়ে লাগছে না, বরং

সেই সব তাঁর কেমন ক'রে যেন ফিরে এসে তাঁরই সৈন্যদের গায়ে লাগছে, আর তারা এক-এক ক'রে মরছে। বেগতিক দেখে নিজেই একটা ধুক তুলে নিলেন হাতে, খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য স্থির করলেন, তারপর ছুঁড়লেন এক দেবদূতের দিকে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তাঁরটা দেবদূতের গায়ে লাগলো, কিন্তু তবু সে মরলো না। কেবল তাঁর গা থেকে ছুঁকোটা রক্ত পড়লো জাহাজের উপর, আর সেই ছুঁকোটা রক্ত পড়তেই মনে হ'লো, কেউ যেন সেই জাহাজটার উপর জাহাঙ্গীর মণ বোকা চাপিয়ে দিলো। তাঁর দক্ষণ ঈগলেরা আর জাহাজের ভার বইতে পারলো না। ভারের চোটে তাদের ডানা ভেঙে গেলো, আর হু-হু ক'রে জাহাজটা শূন্য থেকে মাটিতে পড়তে লাগলো।

অতো উঁচু থেকে পড়তেও তো সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যে রাজ্যমশাইয়ের হৃদয়া কিন্তু কিছু কম হ'লো না। তাওয়া উখাল-পাখাল হ'য়ে উঠলো যেন চঠাং, নাগরদোলায় মতো পাক খেতে লাগলো জাহাজটা, টলতে লাগলো চরকিবান্ধির মতো, রাজার মাথার উপরে হাওয়ায় বৌ-বৌ ক'রে আওয়াজ হ'তে থাকলো, তাঁর অনেক সৈন্যকে বড়ে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেলো, তা কেউ বুঝতেও পারলো না; আর কতগুলো বড়ো-বড়ো সন্মুস্তের কাঁকড়ার মতো কী সব জানোয়ার লশ-লশ ক'রে উড়ে এসে রাজ্যমশাইকে আর তাঁর সৈন্যদের কামড়ে একবারে বজ্রাস্ত ক'রে দিল।

তারপর,—রাজ্যমশাইয়ের বরাত জোরে, কি দেবতাদের কাছে তাঁর আরো শাস্তি তোলা ছিলো ব'লেই কি না জানিনে,—জাহাজটা এসে পড়লো ভলে। ব'দ মাটিতে বা পাগাড়ের উপরে পড়তো, তবে জাহাজটা তো চূরমার হ'য়ে যেতোই, রাজ্যমশাইও তা-হ'লে গুঁড়ো হ'য়ে যেতেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর স্বর্গের রাজা হওয়া বেরিয়ে যেতো। এতো শাস্তি পেয়েও রাজ্যমশাই দমতেন না; অতবিস্তৃত শরীর বাড়ি ফিরে এলেন : ঠিক ক'রলেন, যে-কন্ঠে হোক, স্বর্গ জয় করা তাঁর চাই-ই। বৈজ্ঞানের চিকিৎসা যখন তাঁর আহত শরীর সেবে গেলো, তখন তিনি ফের দেবতাদের সঙ্গে লড়াইয়ের উত্তাগ করতে লাগলেন।

এবারে একটা উড়োজাহাজের জায়গায় তৈরি হ'লো একশো উড়োজাহাজ। আর সেই সব উড়োজাহাজ আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য কতো যে ঈগল পোরা হ'লো, তাঁর আর কোনো লেখাজোখা নেই। হুড়াইয়ের জন্ত অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি হ'লো প্রচুর। পৃথিবীর সব দেশ থেকে তাঁর জন্য সৈন্যসামন্ত এলো। যুদ্ধের জন্য রাজ্যমশাই এতো বিরাট আয়োজন করেছিলেন যে, পৃথিবীতে ভাজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে অতো সৈন্য ও অতো রশদ জোগাড় করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি।

সৈন্তেরা সব জাহাজে উঠেছে,—তখনো জাহাজ ছাড়তে কিছুক্ষণ দেরি আছে, চার দিকে ভয়ানক শোরগোল আর ব্যস্ততা। যুদ্ধের বাজনা বাজছে তুমুল আওয়াজে,—এমন সময়ে স্বর্গের দেবতারা একক'ক বড়ো-বড়ো মশা রাজ্যমশাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রবার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মশাগুলি যেমনি বিব যে, তাদের কামড়ে সাপের চোবলের মতো ঝুপা হয়, আর ম'হুয পাগলের মতো অস্থির হ'য়ে চার দিকে ছুঁটাছুটি করতে থাকে। রাজ্যমশাই

কেবল জাহাজে উঠতে যাবেন, এমন সময় সেই মশার ঝাঁক এসে তাঁকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলো।

রাজা খাপ থেকে রূপোলি তলোয়ার বার করে মশাদের মারবার জন্য এদিক-ওদিক চালাতে লাগলেন, কিন্তু একটি মশাও মরলো না। ওদিকে রাজা মশাইয়ের সারা শরীর মশার কামড়ে ভীষণ জ্বালা করতে লাগলো। পাগলের মতো নাচতে থাকলেন রাজা, কিন্তু তবু মশারা তাঁকে বেহাই দিলো না। তখন রাজা হুকুম দিলেন : ‘তাড়াতাড়ি আমাকে একটা মশাবি দিয়ে ঢেকে দাও, আর মশাদের উপর তীর ছোঁড়ো।’

তীর হুকুম শুনে সৈন্যরা সব হো-হো করে হেসে উঠলো। তারা ভাবলো, ‘মশা মারতে আবার তীর ছুঁড়বো কি! রাজামশাই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন।’ কয়েক জন অবজ্ঞা ত্যাগ করে ছুটে গিয়ে কোপে একটা মশাবি নিয়ে এসে রাজামশাইকে ঢেকে দিলে, কিন্তু তবু কোনখান দিয়ে একটা মশা মশাবির ভিতরে তাঁকে এমনি ভাবে কামড়ালো যে, জ্বলনির চোটে মশাবি ছেড়ে তিনি পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তীর সৈন্যসামন্তরা এই কাণ্ড দেখে ভাবতে লাগলো, ও রকম হু-চার ঝাঁক মশা যদি দেবতারা তাদের দিকে পাঠিয়ে দেয় তো মহা মুশকিল হবে: সেইজন্য তারা সবাই বৈকে বসলো, তারা যুদ্ধে যাবে না। তবু যদি রাজামশাই বেশি গীড়াগীড়ি করেন তো তারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। রাজাও তাঁর সব সৈন্য ও দেশের লোকের সামনে সামান্য কয়েকটি মশার কাছে লজ্জার এমনি লক্ষিত আর অপ্ৰতিভা-হ’লেন যে, ভুলেও ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো দিন স্বর্গজয়ের দুর্বাসনা প্রকাশ করেন নি।

অনুবাদক : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## রাশিয়ার রূপকথা

( বয়স তার সাত )

শ্রীচিন্তরঞ্জন দেব

তারা দুই ভাই। একজন ধনী, আরেক জন গরীব। ধনীর আছে তাকী ঘোড়া, গরীবের আছে মাদী ঘোড়া। এক দিন তারা বেড়াতে বেরল। নিজ নিজ বাহনে চড়ে দুই ভাই পাশাপাশি চলল। চলতে চলতে রাত হল। একটা গাছের তলায় তারা রাত কাটাল।

ধনী লোকটির ঘোড়া ছাড়া গাড়িও ছিল সঙ্গে। গাড়িতে করে তার খাবার-দাবার আর বিছানাপত্র গিয়েছিল।

রাত্রিবেলা গরীব লোকটির মাদী ঘোড়ার একটি বাচ্চা হল। বাচ্চাটি গড়িয়ে গড়িয়ে ধনীর গাড়ির তলায় এসে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা ধনী গরীবকে ডেকে বলল, দেখেছো হে, আমার গাড়িটা কি সুন্দর বাচ্চা দিয়েছে!

গরীব ধনীর কথায় অবাক হয়ে বলল, ‘সে কি কথা, গাড়ি আবার বাচ্চা দেবে কি করে? বাচ্চা দিয়েছে আমার মাদী ঘোড়া।’

ধনী একথায় আপত্তি জানিয়ে বলল, ‘বাচ্চা যদি তোমার মাদীর হবে, তাহলে সে আমার গাড়ির নীচে আসবে কেন?’

এমনি করে কথা-কাটাকাটি করতে করতে তারা আদালতের আশ্রয় নিল।

ধনী হুস দিয়ে উকিল হাকিমের মুখ বন্ধ করল। গরীবের সম্বল বইল শুধু সত্যি কথা। ব্যাপারটা আদালত থেকে রাজা কাছে গেল।

রাজা তাদের দু’জনকে ডেকে চারটি প্রশ্ন দিলেন—  
এক—সব চাইতে শক্তিশালী কে, আর সব চাইতে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে?

দুই—সবার চাইতে স্নেহ কার বেশি?

তিন—সব চেয়ে নরম জিনিস কি?

চার—সবার চাইতে মানুষের প্রিয় কি?

প্রশ্নগুলি বলে রাজা তাদের তিন দিনের সময় দিলেন। চতুর্থ দিন সকাল বেলাই তারা যেন উত্তর যুগে নিয়ে রাজদরবারে হাজির থাক।

ধনী লোকটি চতুর। তার মনে পড়ল একজন চেনাশোনা লোককে। সে তখনই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন চারটির উত্তর জানতে চাইল। তার কাছে গেল, সেও খুব চালাক লোক। চটপট সে উত্তর বলে যেতে লাগল।

এক—সবচেয়ে শক্তিশালী আমার পাটকিলে রঙের ঘোড়া। তার গায়ে চাবুক ছুঁইয়েছে কি সে বাতাসের আগে ছুটতে শুরু করবে।

দুই—স্নেহ মানে স্নেহপদার্থ, মানে চর্বি। এ জাখো না আমার হুঁ বহুরের শূণ্যের বাচ্চাটার গায়ে কত চর্বি। ওটা এমনি মোটা যে, চার পায়ের উপর শরীরের ভর রেখে কাঁড়াতাই পারে না।

তিন—পালকের বিছানার চাইতে নরম আর কিছু আছে বলে ত জানিনে।

চার—আমার নাতি ইভানুস্কার চাইতে প্রিয় আর কি থাকতে পারে? জাখোই না, কি সুন্দর সে দেখতে—যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে রাজার কাছে হাজির হবার আয়োজন করতে লাগল।

এদিকে গরীব লোকটি ঘরের এক কোণায় বসে কাঁদতে লাগল। রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তার যে প্রশ্ন নেবেন রাজামশাই। সে যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে কোথায় দাঁড়াবে তার সাত বছরের মা-হারী মেয়ে!

মেয়ে তাকে দেখে ফেলল হঠাৎ। বলল সে বাবাকে, ‘এমন কাঁদছ কেন বাবা?’

গরীব বাবা বলল, ‘মা, রাজা আমাকে চারটি প্রশ্ন দিয়েছেন। সেগুলির উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি নে।’

মেয়ে বলল, ‘বলো না আমাকে, রাজা কি প্রশ্ন দিয়েছে?’

বাবা বলল, একে একে চারটি প্রশ্নের কথা, তার সাত বছরের মেরেকে।

মেয়ে প্রশ্ন শুনে বলল, ‘এ তো খুব সহজ প্রশ্ন বাবা! আমিই এগুলির উত্তর তোমাকে বলে দিচ্ছি, শোনো—’

এক—সবচেয়ে বলশালী হচ্ছে বাতাস, বাতাসের চাইতে তাড়াতাড়ি আর কেউ ছুটতে পারে না।

দুই—সব চেয়ে স্নেহ বেশি হচ্ছে পৃথিবীর। যত জীবজন্তু, গাছপালা—প্রাণী সবাইকেই পৃথিবী অপার স্নেহে পালন করছে, খাইয়ে পরিয়ে বাড়িয়ে তুলছে।



—সব চেয়ে নরম হচ্ছে মানুষের বাহ। মানুষ শত নরম  
পথারি দিয়ে মাথার নীচে বাহুখানি বিছিয়ে দিলে আরাম বোধ করে।

চারি—সবার চাইতে প্রিয় মানুষের ঘুম। হুং-হাতনা বোগ-  
শোক সব কিছুই শান্তি হয় ঘুম এখন হুঁচোখ ভরে আসে। এমন  
দরনীক্কু মাংসের আর কিছু নেই।

চতুর্থ দিন আবার দুই ভাই একসঙ্গে হয়ে এসে হাজির হল রাজ-  
দরবারে। প্রথম ধনীকে প্রশ্নের উত্তর শুধালেন। ধনীর  
উত্তর শুনে রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে বইলেন। তারপর গরীবকে  
শুধালেন। গরীব এক একে প্রশ্ন চারটির উত্তর দিলে পর রাজা  
বললেন, “এই উত্তরগুলি কি তুমি নিজে নিজেই তৈরি করেছ—  
না, আর কারও সাহায্য নিয়েছ?”

গরীব লোক কখনও মিথ্যে কথা বলেনি। এবারও সে সত্যি  
কথাই বলল। বলল—“আমার সাত বছরের মেয়ের কাছ থেকে  
প্রশ্নগুলির উত্তর জেনে নিয়েছি।”

রাজা শুনে অবাক হয়ে বললেন, “তোমার এত ছোটো মেয়ের এত  
বুদ্ধি তাহলে এক কাজ করো তো, এই নিয়ে যাও আমার কিছু  
বেশমের সূতো, এ দিয়ে তোমার মেয়ে যেন আমাকে একটি স্মরণ  
তোয়ালে তৈরি করে দেয়।”

গরীব লোকটি রাজার দেওয়া বেশমের সূতো নিয়ে বাড়ি এসে  
এক কোণায় বসে বইল বিহীন মনে।

মেয়ে এসে বাবাকে বলল, “কেন এমন মুখ কালো করে বসে  
আছ বাবা? বাবা তখন খুলে সব কথা বলল।

মেয়ে বাবার কথা শুনে বলল, “এর ভেত্রে তুমি অত আবার  
ভাবছ? এই বলে সে তখনই ঝাঁটার ভিতর থেকে কাঠের টুকরোটা  
খুলে নিয়ে বাবার হাতে দিয়ে বলল, “বাও, এতুনি রাজার কাছে, গিয়ে  
তাকে বলো যে এই কাঠের টুকরোটা দিয়ে উনি যেন একটা তাঁতের  
মাকু তৈরি করিয়ে দেন আমাকে। ওর ভালো কাঠমিস্ত্রি আছে।”

গরীব লোকটির হাতে রাজা কাঠের টুকরো পেয়ে ভাবতে  
লাগলেন সেই ছোট মেয়ের কথা, যার বয়স মোটে সাত।

পরক্ষণেই দেহশো দেড়শো হাঁসের ডিম নিয়ে এসে লোকটির হাতে  
দিয়ে রাজা বললেন, “এগুলো নিয়ে তোমার মেয়েকে দাও আর বলো—  
কালকের মধ্যে আমাকে যেন দেড়শো হাঁসের বাচ্চা পাঠিয়ে দেয়।”

গরীব লোকটি রাজার দেওয়া দেড়শো ডিম নিয়ে এসে বাড়িতে  
এক কোণায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। আজ তাকে অস্ত্রাভ  
দিনের চাইতেও চিন্তাকুল দেখাছিল।

তার মেয়ে এসে তাকে ‘বাবা’ বলে ডাকতেই সে হাউ হাউ করে  
কঁদে উঠে বলল—“হায় যে আমার পোড়াকপালী মেয়ে, এবার রাজা  
যে বিপদে ফেলেছে তার থেকে আর বাঁচতে পারবি নে।”

মেয়ে বাবার মুখে রাজার ছকুম শুনে আর রাজার দেওয়া  
ডিমগুলি নিল। ডিমগুলি দিয়ে সে তখনই নানারকমের খাবার  
তৈরি করতে লাগল।

তার পর বাবাকে বলল, “বাও বাবা রাজার কাছে, গিয়ে বলো,  
হাঁসের বাচ্চাগুলির শুভ্র আঙ্গিকেই যেন জমিতে চাষ দিয়ে নীবার  
বোনে, আগ্রকের মধ্যেই সেই নীবারগুলির কচি ডগা তুলতে হবে—  
আর সেগুলি খেয়ে বাচ্চাগুলি বাঁচবে। বাও, এখনই গিয়ে রাজাকে  
বলো।”

রাজা গরীব লোকটির কথা শুনে বলল, “তোমার মেয়ের যদি এত  
বুদ্ধি, তাহলে তাকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও কাল খুব সকালবেলা আমার  
কাছে। কিন্তু একটা কথা—সে যেন পারে হেঁটে না আসে, সে যেন  
ষোড়ায়ও না চড়ে আর তার পরনে যেন কিছু না থাকে, তাই  
বলে সে যেন স্ত্রাটো হয়ে না আসে। আর মনে রেখো—সে যেন  
আমার জন্য কোনো উপহার না আনে—তাই বলে একেবারে খালি  
হাত যেন তার না থাকে।”

রাজার এই অদ্ভুত সব ইচ্ছে শুনে গরীব লোকটি হতাশ হয়ে  
পড়ল। বাড়িতে গিয়ে পা দিতেই মেয়ে এসে তার মুখ  
থেকে সকল কথা কেড়ে নিয়ে বাবাকে সাহস দিয়ে বলল,  
কিছু ভয় নেই বাবা। শিকারীদের কাছে যাও, আর আমার জন্য  
একটা জাম্বা খরগোস আর একটা তিতির কিনে নিয়ে এসো।

পরের দিন মেয়ে ঘুম থেকে উঠেই পরনের পোষাক খুলে ফেলল।  
একটা মাছ-ধরার জাল দিয়ে শরীরটা ঢাকল। তিতিবটাকে হাতে  
নিল আর খরগোসটার পিঠে চড়ে বলল। খরগোসটা ছুটে চলল  
রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়ির ফটকেই রাজার সঙ্গে দেখা হল। সেই গরীব লোকের  
সাত বছরের মেয়ে। মেয়ে মাথা হুড়িয়ে রাজাকে অভিবাदन  
করল। তার পর বলল, “এই নিন আপনার উপহার”,  
বলে তিতিরটাকে ছেড়ে দিল।

রাজা পাখিটার নিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু ধরতে পারলেন না।  
পাখিটা শী করে আকাশে উড়ে গেল।

রাজা এতে বিব্রত না হয়ে বললেন, “সাবাস মেয়ে। ঠিক  
ঠিক যেমনটি বলেছিলাম, তেমনটি তুমি করলে, সাবাস।

রাজা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বললেন, “আজ্ঞা,  
তোমার বাবা-তো বড় গরীব, তুমি আমার বলতে পারো,  
তোমাদের খাওয়া-পরাই ব্যবস্থা কি করে হয়?”

সাত বছরের ছোট মেয়ে রাজার প্রশ্ন শুনে এতটুকু  
বিচলিত হল না। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল। “আমার  
বাবার আবার ভাবনা কিসের। শুকনো ডাডায় তিনি মাছ  
ধরতে পারেন। মাছ ধরবার জন্য কখনও তাঁকে নদীতে  
যেতে হয় না, ভালও বাইতে হয় না। ডাড়া থেকেই বাবা এত বেশি  
মাছ ধরেন যে আমি সে সব মাছ আমার জামার আঙিনে পুরে বাড়ি  
নিয়ে আসি। সেই মাছ দিয়ে আমি খুব সুখরোচক স্নান তৈরি  
করি। আমি পাই। বাবা ধান। আপনি যদি একবার খান,  
তাহলে তার কথা জীবনে ভুলবেন না।”

রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, “ওয়ে অবোথ, বোকা  
মেয়ে, কী সব তুই বলছিস? মাছ কি কখনও ডাডায় থাকে? মাছ  
যে জলের জীব, সে কথা কে না জানে?”

সাত বছরের মেয়ে তখন গলার জোরে টেঁচিয়ে বলল, “ওগো  
বুদ্ধিমান রাজা, কাঠের গাড়ির পেটে আবার কোথায় রক্তমাংসের  
ষোড়ার বাচ্চা জন্মায়? মাদী ঘোড়ার পেটেই যে বাচ্চা থাকতে পারে,  
সে কথা কে না জানে?”

রাজা এবার সাত বছরের মেয়ের কাছে জন্ম হলেন।  
গরীব লোকটিকে ডেকে তিনি তার ঘোড়ার বাচ্চাটা কিরিয়ে  
দিলেন।



নীলকণ্ঠ

বাইশ

মেয়ে-পুরুষ। মেল আর ফিল্ম বলে বোম্বাইয়ের ফিল্মবাজ্যে আলাদা আলাদা শ্রেণী নেই। কে যে মেল আর কে ফিল্ম; জামা-কাপড়, হাবভাব, বৃত্তি অথবা প্রবৃত্তি কিছু দিয়েই তা ঠাহর করার হিম্মতের দরকার। মেল আর ফিল্ম নেই; তার বদলে আছে ব্র্যাক মেল। যেমন নাকি হগসাহেবের বাজার; বহু বাবুর বাজার; চীৎপুতের নতুন বাজার; বৈঠকখানার বাজার,— এ সব সনাতন কলকাতাতেই আজও টিকে আছে। বোম্বাইয়ের ফিল্ম রাজ্যে এরা প্রাগৈতিহাসিক হয়েছে বহুদিন। তার পরিবর্তে একমাত্র যে বাজার আলো করে আছে দশ দিক,—তার নাম কালো বাজার। ব্র্যাক মেল আর ব্র্যাক মার্কেট। প্রথমটা চালু আছে বহুদিন, দ্বিতীয়টির গোড়াপত্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে। ব্র্যাক এণ্ড হোয়াইটে বোম্বাইয়ের ফিল্মবাজ্যের ব্রু-প্রিন্টের নকল লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ শূন্য মস্তিষ্কে অসম্ভব। কারণ বোম্বাই ছবিগুলোর মুখ কেবলমাত্র ব্র্যাক নয়। তার আসল রং ব্রু-ব্র্যাক। সোসাইটি ব্রুদের তীর্থস্থান ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বাইয়ের ফিল্মবাজ্যে তাই শুধু ভারতে আর কি হয়, বোম্বাইয়ের ছাড়া ভারতে থাকে ফিল্মী ইণ্ডিয়ান বেআইনী মদ এবং তার সঙ্গে নিষিদ্ধ আমোদ, কোনটারই অভাব নেই; ব্র্যাক মার্কেটের কুপায়, ব্র্যাকমেলের কুতিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে ভারতবর্ষের মাটিতে বিধবৃকের যে মার্কিনী চারা পুঁতে গেল কোটি কোটি এ্যামেরিকান ডলার তা ভারতবর্ষের অন্তর্গত জায়গায় এখনও চারার আকারে থাকলে কি হবে? বেচারী বোম্বাই। বিশ্বের চারা বোম্বাইয়ের ফিল্মী ছনিয়ার কুলে কুলে লতার পলবে এখন চার শ' বিধে সুপরিণক।

এই ফিল্মী ইণ্ডিয়ান সব চেয়ে বড় ফিল্ম ম্যাগাজিনে নের শিখণ্ডির আড়াল থেকে ব্র্যাক মেলের তীর ছুঁড়ে সাঁজা জীবন, বাড়ী করে, গাড়ী করে তারপর সেই কাগজেই ঘোষণা করা যে, যে প্রমাণ করতে পারবে যে সম্পাদক ব্র্যাকমেলের তাকে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে!—এমন বৃকের সাঁজা বোম্বাইয়ের ফিল্মবাজ্যেই সম্ভব। শোনা যায় আমাদের এখানে বহুকাল আগে এক প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক পত্রের দায়িত্বরত কলমে প্রত্যাহ গালাগাল করতেন একটি ছোট প্রতিষ্ঠানকে। তারপর সেই প্রতিষ্ঠানটি এই প্রবীণ সাংবাদিকের কলম দ্বারা উদ্বেগে কিছু টাকা দিয়ে যায় গোপনে! তারপর আবার এর দিন প্রচণ্ড গালাগালি কাগজে প্রকাশিত হতে গৌড়ে আসে প্রতিষ্ঠানের লোক। কি ব্যাপার? কিছু না! সাংবাদিক বলেন: টাকা নিতে পারি অভাবে; কিন্তু তার জন্য সাংবাদিক আদর্শ বিসর্জন দিতে পারি না ত! বুঝুন একবার! এটা আদর্শ না ছুরাবোগ্য অর্শ?—কে বলবে!

বোম্বাইয়ের ফিল্মবাজ্যে বারা পদার্পণ করেছে একবার তাদের নরক-দর্শন হয়ে গেছে জীবদশাতেই। যুধিষ্ঠির যেমন সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, তেমন সশরীরে নরকে যেতে হলে বোম্বাইয়ের ফিল্ম ষ্টুডিওতে যেতে হবে আপনাকে। ইংরেজ যেমন আমাদের ক্রীশান করেছে, মাড়ভাষা ভুলিয়েছে, স্বদেশ ও সংস্কৃতি করিয়েছে বিস্মৃত, তেমনই বোম্বাই ফিল্ম ভারতের জমিতে পয়সা করছে জারজ মার্কিন সংস্কৃতি। চটল পায়ে তালি পড়ান সুরকে সঙ্গীত বলে। হাওয়ারাইয়ান অথবা বৃশ সাটি। তার সঙ্গে ট্রাউজার আর পায়ে শ্লিপার। না জন্তু না মানুষের এই পোষাককে একমাত্র পরিষেব বলে। রাস্তায়, পার্কে, প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে, ট্যান্ডিতে পুরুষ এবং নারীতে মিলে জড়াজড়ি করাকে প্রণয় বলে। না শুদ্ধ ইংল্যান্ড, না বিস্মৃত রাষ্ট্রভাষা; দুয়ের অভাবে এ্যামেরিকান ব্র্যাককেই একমাত্র হিউম্যান ল্যান্ডস্কেপ বলে চালাবার সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠান বোম্বাই ছবির। আর সেই বোম্বাইটে ছবি যে রেটে প্রদর্শন করছে কালচারের কলকাতাকে তাকে স্বাধীন ভারত রসাতলে যেতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করার থাকবে না প্রয়োজন। কলকাতাও আজ সংস্কৃতি বলতে বুঝে সিনেমা। পাঠ্য বলতে সিনেমার কাগজ। এ্যাটম আর হাইড্রোজেন। হুয়ান্সিয়ার অস্ত্রের বিক্রেতা শাস্তির স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহের অনেক আগে নিমূল করা দরকার এই জাতীয় ছবি। এবং এই বজ্রাতীত ফিল্ম পত্রিকাগুলিকে। এখানেই সার্বজনীন ছক্কতির হুয়ান্সিয়ার সব চেয়ে জোরালো অবস্থিতি। সেবাসদনে সন্তান ঠিক সময়ে প্রসব না হলে ডাক্তারগণ পর্যন্ত আজকাল সন্দেহ করে যে সেই দীর্ঘস্থিতির কোনও প্রাকৃতিক কারণ নয়। হয়ত নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার আগেই; মাড়গর্ভে থাকতে থাকতে ইহাতে পেয়েছে কোনও সিনেমার কাগজ; হয়ত সেই কাগজে ছাপা জনপ্রিয়তম লেখকের সার্থকতম সাহিত্য সৃষ্টি, 'বখা-সংবাদ' পড়তে পড়তে বিস্মৃত হয়েছে সময়ে জন্ম নিতে! সিনেমা' ভুলিয়েছে বাপ-মায়ের নাম; আর সিনেমার কাগজ ভোলাচ্ছে মহুয়া-জন্ম!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই বোম্বাই হাওয়া ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। বেলগাপনা; বেআইনিকপনা; বেআইনিকপনার অভিশাপটুকু বলা তুলেছে বোম্বাই মার্কা ছবিতেই প্রথম।



২৫,০০০ মাইল চলা মানে গোটা পৃথিবীটাকে একবার ঘুরে আসার চাইতেও বেশী! জীবনের এই হৃদয় পথে যে পা বাড়াচ্ছে ত'র প্রচুর কর্মশক্তি চাই—সেই শক্তি যোগাবে বনস্পতির রান্না খাবার, যা দিয়ে রান্নায় পয়সার ও সাশ্রয় হয়।

## ২৫,০০০ মাইল পাড়ি দিতে হবে!

বনস্পতি বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি যোগায়

আপনার খোঁকাবানু রোজ যদি এক মাইল ক'রেও হাঁটে তাহলে সারা জীবনে তাকে ২৫,০০০ মাইলের ওপর হাঁটতে হবে। যাতে সে জীবনের পথে ভালোভাবে পা বাড়াতে পারে, এগিয়ে যাবার শক্তি পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার ভার আপনার।

খাল থেকে কর্মশক্তি

কর্মশক্তি আসে খাল থেকে, বিশেষ ক'রে মেহ-প্রধান খাল—শক্তি যোগাতে যার জুড়ি নেই। শক্তি যোগানো ছাড়াও মেহপদার্থ ভিটামিন এ ও ডি হজম করতে ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াইে সাহায্য করে। বাড়ীর সবার স্বাস্থ্যেই যাতে মেহজাতীয় উপাদান থাকে তার জন্তে

গিন্নীরা বনস্পতি দিয়ে রান্না করেন—বনস্পতি পুষ্টিকর ও পয়সার সাশ্রয় করে।

আপনি নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখুন

নিজে পরখ করলেই বুঝবেন, বনস্পতি আপনার বাড়ীর কত বড় বন্ধু? আজ থেকেই বাড়ীর রান্নাবান্না বনস্পতি দিয়ে করুন। দেখবেন, বাড়ীর সবাই খেয়ে কেমন খুশি হয়, আর খাঁটি উদ্ভিজ্জ মেহের বান্ধারে পয়সার কত সাশ্রয়, কত ভুগ্নির সঙ্গে সবাইকে খাওয়ানো যায়। এও মনে রাখবেন, প্রতি আউন্স বনস্পতি ৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট স্বাস্থ্যকর 'এ' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

# বনস্পতি

## বাড়ীর গিন্নীদের পরমবন্ধু!



সেই 'অ'-এ অজগর আসছে তেড়ে! 'বিড়কি'-বরজা দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে যার সম্ভরণ প্রবেশ সতর্ক হবার কোনও সুযোগই দেয় নি তাকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর মানসিক বিকৃতির দ্বন্দ্ব কলা দিয়ে পুবেছি আমরা; তাই উক্তকথা এই অজগরের প্রতীক আমরাই। আন্তে আন্তে এই ফিল্মের দূষিত হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সমস্ত স্তরে; এর নাগালের বাইরে আছে আজও বারী তারা সংখ্যায় নগণ্য। সত্যকারের মাইনটিটি মুসলমান-ক্রীশ্চান অথবা পাসিরা নয় হিন্দুস্থানে। স্বাধীন ভারতবর্ষে তারাই সত্যকারের একমাত্র মাইনটিটি বারী স্বাধীন চিন্তা করবার এখনও রেখেছে স্পর্শ। কলকাতার বাতপথে হোলির দিনে unholy উৎসব প্রত্যক্ষ করবার অভিজ্ঞতা এখনও আমাদের মন থেকে যুছে যায়নি। খবরের কাগজে এখনও পর্বন্ত প্রতাহ আমাদের পড়তে হচ্ছে: 'প্রম্পত্ত কঠিন হওগর ছাত্রদের একযোগে পরীক্ষাকেন্দ্রে ত্যাগ!' আমরা এ খবরও সেই সঙ্গে বাধি যে বেলা তিনটের স্থলে থাকে বত ছিলে-তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে কোনও নতুন ছবির ম্যাটিনি শো-তে! এবং একথাও ত মিথ্যা নয় যে পাড়ার পাড়ার পুঙ্খ উপলক্ষে জলসার নামে আমরা লাউউস্পীকার যোগে যার জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য হই তার সঙ্গে আর বাধাই বত ক্ষণস্থায় যোগ থাকে পূজার সঙ্গে বা কোনও শুভ, স্নহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সংযোগ থাকতেই পারে না; আর? আর বাড়ীতে পারিবারিক সম্বন্ধ বাব-মায়ের সঙ্গে ছেলেময়ের কোথায় এসে ঠাড়িয়েছে সে কথার উল্লেখ না থাকাই বোধ করি বাঞ্ছনীয়! কিন্তু একদিনে হয়নি এসব; একটু-একটু করে হয়েছে। এবং শিথিল হয়ে আসা; যুগধরা সমাজের সেই আগাপাশতলার সঙ্গেই শেষ থাকে দিচ্ছে এই সব বোম্বারের আসল এবং অস্ত্র বোম্বারের নকল বোম্বাই মার্কী ছবি।

বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কথঞ্চিৎ নাম হলেই বোম্বাই পাড়ি দিচ্ছে। বদনাম হলে বাধ্য হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্স-যুগের যারা এবং যারা পরবর্তী হজুগের কুশার বড় পরিচালক, কি সুরকার, অথবা আলোক চিত্রকর; অভিনেতা-ত্রী ত বটেই বস্তু যাবার জন্ত বাস্তব। না। ব্যস্ত নয়; জলের জন্ত চাতক যেমন; তুর্কার্ত। বাংলা ছবিতে নাম হয়; হিন্দী ছবিতে বদনাম। কিন্তু বাংলা ছবিতে টাকা হয় না; হিন্দী ছবিতে টাকা হয়। এই যুক্তিতে কেউ কেউ বলতে চান, বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি টাকার জন্ত বোম্বাই যান তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? পারে। ইরুয়েবাই ডুবন্ত জাহাজ পরিচ্যাগ করে প্রথম; মামুংবরা নয়। কিন্তু এরা সেই মুখের চেয়েও অধম; কারণ মুখেরা ডুবন্ত জাহাজ পরিচ্যাগ করে মাত্র; আর বাংলা ছবির কুশীলব এবং কলাকুশলীরা শুধু বাংলা দেশ ত্যাগ করেই বেতাই দেয় না। ভাগ করে থাকে; আবার বাংলা ছবির হাল ফিরে গেলেই; অথবা বোম্বাইতে বখেটবও অতিরিক্ত নাজেহাস হলে এই পোড়া বক্সেই প্রত্যাবর্তন করতে না হয় লজ্জিত; না করে দ্বিধা। শুধু সেকারণেও নয়। টাকা,—মস্ত বড় প্রযোজনীর বস্তু। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য ক্ষুণ্ণ করেও নয়। একটা তুলনা দিলেই সহজ হবে বক্তব্য। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবারের বেটন কাপ বিজয়ী; তাতে বাঙালীর

গৌরব কোথায়? একজন-আধজন মাত্র বাঙালী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলেছেন। ফুটবলেও তাই। দেশ বিদেশের খেলার খেলোয়াড় নিয়ে এসে শুধু ইষ্টবেঙ্গল নয়; ইষ্টবেঙ্গল, মোহাবাগান, এবং ঠক বাহুতে গাঁ উজাড়।—কে নয়? এতে বাঙালী খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে কোথায়? আমরা একসময়ে ক্রিকেটে রাজ ট্রফি জিততাম সাতজন সাহেব খেলোয়াড় সহস্র করে এগার জনের মধ্যে। তাতে রাজি ট্রফি জিততাম বটে কিন্তু ধীরে ধীরে নামে ট্রফি সেই অবিদ্যমান রঞ্জি হাসতেন নিশ্চয়ই; যে হাসি খালে কান্নারই আবেক রূপ।

বাংলা দেশের ছবি আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তার জন্ত বাদে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সর্বাধিক সেই সব ব্যক্তিত্ব যদি কেবলমাত্র টাকার জন্ত সবাই বোম্বাই চলে যান তাতে স্বদেশ ও সংস্কৃতি তাদের অকৃতজ্ঞ বলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা দায়ী করতে পারে বৈ কি! টাকার প্রয়োজন সর্বকালের আছে। ছায়াছবি-বর্মীর যে থাকবে তাতে আর বাই থাক দোষের কিছু নেই। কিন্তু টাকার জন্ত লোকে চুরি করবে, এতে যেমন না আছে আইনের, না বিবেকের সম্মতি, তেমনি শুধু মাত্র-টাকার জন্ত নিজের দেশের প্রগতি বাহ্যত হবে জেনেও প্রবাসে পাড়ি দেওয়ায় আইনের না থাকে মনুষ্যত্ববোধের বিশেষ আপত্তি থাকতে বাধ্য। এ ছাড়াও আপত্তির আরও কারণ আছে। আরও অকটা যুক্ত আছে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে। বোম্বাইতে ছবির পৃথিবী টাকার; কেবলমাত্র টাকাগই। টাকা ছাড়া আর কোনও রকম আদর্শের এতটুকু বাংলাই থাকলেও আমরা বাঙালীর বোম্বাই ফিল্মে যোগদান করায় আপত্তির পরিবর্তে জানাতাম অভিনন্দন। কিন্তু বোম্বাইকে জানি; অনেক বেশি জানি বোম্বাই ছবির প্রযোজকদের। শুধু তা-ও নয়। বোম্বাই প্রযোজকদের; কুশীলবদের; কলাকুশলীদের মনোবৃত্তির চেহারাটা দেখতে পাই খোলাচোখেই চিকিৎসকদের এক্স-রে চোখের চেয়ে অনেক অন্তঃপুর পর্যন্ত। সে মনোবৃত্তি বাঙালী দিগন্তে বিকৃত। বোম্বাই বলে নয়; সমস্ত অবাঙালীরই জাতকোষ বাঙালীর বিরুদ্ধে; পূজ্যভূত আকারে বোম্বাইয়ের ফিল্ম ঈউওতেও সজ্জাত। বাঙালীকে দিয়ে ছাড়া সেকাজ আর কাউকে দিয়ে অসম্ভব, সেই কাজেই কেবলমাত্র বাঙালীকে ডাকে। কাজ ফুরোলেই বিদায় দাও। বোম্বাইয়ের ফিল্মরাষ্ট্রে যে ক'জন বাঙালী ধোপে ঝেঁপেছেন, অনেক আছড়েও তাঁদের দফা দফা দফা করা যায় নি বলেই তাঁরা বোম্বায়ে বসতখানি বাঙালী তার চেয়ে অনেক বেশি অবাঙালী হতে বাধ্য হয়ে তবে টিকেছেন। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না। উচ্ছল ব্যতিক্রম আছে এবং থাকবে। কিন্তু ব্যতিক্রম ত'নিয়মেই প্রমাণ সূচিত করে মাত্র।

বোম্বাই ছবিগুলোর বঙ্গবিদ্বেষের পেছনে যা কাজ করে তা-ও ওই টাকা। টাকা অনেক বেশি যোজ্ঞগতের মহিমায় বোম্বাই শিল্পী এবং কুশলীরা বাঙালীর চেয়ে নিজের অনেক বড় মনে করে। না মনে করে উপায় কি! শুণের চেয়ে ভাগ্যের; বিজ্ঞার চেয়ে অর্থের; ব্রাহ্মণের চেয়ে বণিকের প্রতিপত্তি বিশ্বসমাজ জুড়েই যেখানে বেশি সেখানে অশিক্ষিত ছবিগুলোর যে টাকার উপায়ে বণিকিৎস গরম হবে এতে অবাক হবার এমন কি আছে? আশ্চর্যের পৃথিবীতে যারা সভ্যতার অঙ্গে শিল্পের বিজ্ঞানের চিন্তার অঙ্গার পরাবার স্পর্শ

তারা নয়। বড় জাত বলে গণ্য আজ তারাষ্ট, চরম সভ্যতার দ্বারা মৃত প্রতীক; তাদের হাতে আছে হাইড্রোজেন বার এ্যাটম বোমা। এই যেখানে শতাব্দীর সভ্যতারের রূপ, এই শতাব্দীতে সভ্যতার অভিশাপ বারা, চলচ্চিত্রকর্মী—পেটে বার্মা মারলে তাদের 'ক' বেরায় না, তারা যে গুলীকে ট্রেসপাসার জ্ঞান করবে, তত আঘাত বতাই বিচলিত বোধ করি শূন্যস্থান পৃথিবীতে অর্ধেক লগাণে সমর্থ সেই সব শয়তানরা নিজেদের হৃদয়ে এতই অবিচলিত থাকবে। তাদের অলোয়তনে তাই যা দিতে হবে। সুস্থ, বৃত্ত, প্রগতির যা; অজ্ঞ ও প্রত্যহ; প্রতিমুহুর্তে দিয়ে যেতে হবে সঞ্জোর আঘাত।

মাসিক বহুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত অজ্ঞ ও প্রত্যহর কান্ একটি কিস্তিতে আমার মনে নেই, আমার একটি মন্তব্যে বিচলিত হয়ে বহুমতীর কোনও অনুরাগী পাঠক! এক পত্রাবাত করেন সম্পাদককে। সেই পত্রটি আমি দেখেছি। আমার যে মন্তব্য তিনি আপত্তিকর বলে জানিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করেও তার পুনরাবৃত্তি করার থেকে বিরত রইলাম। বিরত রইলাম কারণ নৈতিকভাবে পুনর্বার তিনি আঘাত পেতে পারেন। কাউকে ব্যক্তিগত আঘাত করা আমার 'অজ্ঞ ও প্রত্যহ' রচনার উদ্দেশ্য নয়, তার পরিবর্তে সকলকে ঘুম থেকে জাগানোই আমার লক্ষ্য; আমার একমাত্র করণীয়।

আমার মন্তব্যটির টীকাটিপ্সনি সহযোগে স্তব্ধিত ব্যাখ্যা যদি হয় যায় তাহলে মোক্ষা মান্নে দাঁড়াতে তার এই যে, আমি বলতে চেষ্টাছিলাম মাত্র এইটুকু : অজ্ঞ ও প্রত্যহে বাদের কথা আমি বলছি তারা 'ত' এতে কর্তৃপাত করবে না কোনও দিন, কারণ চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী; কিন্তু তাদের বাদ দিলাম বারা অজ্ঞ ও প্রত্যহ রচনা পুনরায় এদের হৃদয়জনক অবদান প্রত্যক্ষ করছেন, সেই শ্রমের কানেও কিছু তুলে লাভ নেই বোধ হয়। কারণ দর্শকদেরও; বাংলা হিন্দি ছবির দর্শকদেরও আপাততঃ মুকুর্ধির বলে মনে করা; যেনে নেওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। মুকু এবং ববির যা হলে বাংলা ছবি বা হিন্দি ছবি শুধু নয়, বত হুঙ্কতি আজ গণিতমরকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা হতে পারত না।

নিম্নলিখিত বিকৃত মনোবৃত্তির রসদ বারা দিনের পর দিন উপস্থিত করছে রূপালী পদার তিনটে-ছটা ন-টায় বুক ফুলিয়ে, তারা কাদের ভাসায় একত্র করছে? দর্শকরা এক আশঙ্কন নয়, লক্ষ লক্ষ দর্শক লক্ষ্যভ্রষ্ট বলেই আজ বোম্বাই মার্কো বাংলা ও হিন্দি ছবির জয়-জয়কার। জানি। পৃথিবীতে বিকৃত বই এবং ছবি বহু বিকৃত, তার কারণ একদল লোক সব যুগে থাকবেই বারা এর বাঁধা ধর্মের। কিন্তু তাদের কঠি যদি এত সোচ্চার হয় যে সেই স্বপ্নের কঠরর থেকে যায় চিরকালের মত অশ্রুত, তাহলে তার পারিধি কেবল মাত্র ছবিওলাদের ওপর বর্তায় না; বারা ছবি দেখে নিয়মিত তারাও এর অজ্ঞ কিছুটা দায়ী হতে বাধ্য। মাসিক বহুমতীর অনুরাগী সেই নিয়মিত পাঠক! এর জবাব দিন।

এক প্রতিবাদের অভাবেই যে পথের পাঁচালীর পথে এখনও

বোম্বাই মার্কো বাংলা-হিন্দি ছবির জয়যাত্রা অব্যাহত, একথা অস্বীকার করে লাভ কার? অজ্ঞ হলে কি সভ্যই প্রেমের বন্ধ থাকে? অনেকে মনে করেন প্রতিবাদ করে লাভ কি? কে শুনেবে? লাভ আছে। অজ্ঞাদের প্রতিবাদ না করা আরেক গুরুতর অজ্ঞায়। অজ্ঞাদের ক্ষমা আছে; কিন্তু প্রতিবাদ না করার যে অজ্ঞায়—সে হল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। হুঁচকারজনও যদি এর প্রতিবাদ করে; যদি প্রতিজ্ঞা করে এ জাতীয় ছবি তারা দেখবে না; বা অজ্ঞদের দেখায় বাধা দেবে তাতেও টনক নড়বে। তাতেও চৈতন্যের সঞ্চার হবে অহল্যার পাখাণে।

ধবরকাগজের কথা তুলে লাভ নেই। স্ববাদপত্র আজ বিজ্ঞাপনের পায়ে বিকৃত। সেই কারণে স্বাধীন মতামত স্ববাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রায়শঃই বিকৃত। সেখানে রুচিহীন ছবির বিকৃতি মুখ খোলবার আগেই বিজ্ঞাপনের সজ্জতে কাগজলোয় মুখবন্ধ। তাই সমালোচনার অপেক্ষার না থেকে মুদ্রিতের দর্শক বারা বর্ধাই ভালো ছবি দেখতে চান। তাঁরাই প্রথম প্রতিবাদের পথিকৃৎ হন! তাঁদের সেই প্রতিবাদের ধ্বনি বতই ক্ষীণ হক আজ, এই ক্ষীণ প্রতিবাদের ধ্বনি যেদিন কঠ থেকে কঠে প্রতিধ্বনি করে কিরবে, সেদিন ঘুরবে বাংলা ছবির মোড়। তার আগে নয়। সেই আগামী কালকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যই অজ্ঞ ও প্রত্যহর অজ্ঞ কোনও সার্থকতার লেখকের আত্মতৃপ্তি নেই।

প্রতিবাদের অভাব নাহলে ছবির প্রযোজক একথা বলতে চেষ্টা করেই সাহস করত না যে যে ছবিই পরসা দেবে সেই ছবিই শুধু ছবি। এবং নোয়া, আসার, অপদার্য ছবিতে যখন পরসা বেশি, তখন বেশি করে সেই ছবিই আমরা তৈরী করব। বাংলা ছবির দর্শকদের পক্ষে প্রযোজকদের এ মন্তব্য অপমান, অসম্মানজনক। কিন্তু এর পুরোটা না হক, খানিকটা যে সভ্য, কোনও দর্শকই কি তা অস্বীকার করতে পারবেন? আমার মন্তব্যে বিকৃত, মাসিক বহুমতীর অনুরাগী সেই পাঠক! কি পারবেন! না। পারবেন না। পারবেন না বলেই, তাঁকেও আহ্বান জানাচ্ছি যে খারাপ ছবি, খারাপ বই-এর বহু বিকৃতির বিকৃতি সক্রিয় প্রতিবাদ সংগ্রামে অবতীর্ণ। তিনি এক! না দেখলে, এক! না পড়লেই শুধু কাজ হবে, এমন নয়, আরও পাঁচজনকে নিয়ে দাঁড়াতে হবে এর বিকৃতি। আর পাঁচজনকে দিয়েও বলাতে হবে : বাজে ছবি দেখানো বন্ধ কর। শুধু কালেভদ্রে; পার্কে, হলে, বড়তা মধ্যে বললেই হবে না। অজ্ঞ ও প্রত্যহ বোম্বাই বসতে হবে : বাজে ছবি দেখানো বন্ধ কর। বাজে ছবি দেখা দর্শকরা সেদিন বন্ধ করবে, বাজে ছবি দেখানো মাত্র সেদিনই বন্ধ হবে। সেদিন আমার মত, বহুমতীর সেই অনুরাগী পাঠক! আরও নিশ্চয় এ বিশ্বাস আছে, সেদিন আর দূরে নয়। পথের পাঁচালী এখনও একটি। সেদিন একটির পর একটি, একটি মশালের আগুন থেকে ধলে উঠবে আরেকটি মশাল। পথের পাঁচালীর অনেক আগে বাঁশের কেলা; পথের পাঁচালীর পর অপরাধিত; চলাচল, পকতপা, কাবুলিওরালা এক টাকা-আনা-পাই কি তারই প্রমাণ নয়?

[ ক্রমশঃ ]



# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ছোটবেলা থেকে মা'র কতকগুলি অলৌকিক দর্শনের কথাও জানা যায়। তাঁর কোন কষ্টকর কাজ বা অস্ববিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই অলৌকিক ভাবে তিনি সাহায্য পেতেন। কিন্তু সে সাহায্য কি করে হ'ত, কে যে করতো, তার কোন নিরূপণ হ'ত না। রহস্যাবৃত থাকতো।

ছোট অবস্থা থেকেই মা সাংসারিক কাজে নিজের মাকে সাহায্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ আমরা শুনেছি। গন্ধরাজ্য দল-বাস কাটতে তাঁকে পুকুরে গলাঙ্গলে ডুবতে হত। বাস কেটে তুলে আনতে ঐ বয়সে তাঁর যথেষ্টই পরিশ্রম ও কষ্ট হত। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তাঁরই বয়সী ছোট একটি মেয়ে বাসগুলি কেটে কেটে তাঁর হাতে তুলে দিতো আর তিনি বেশ সহজেই সেগুলি ঘাটে তুলে রাখতেন। তাঁর কাজ যেন অর্ধেক হাঙ্কা হয়ে যেতো। কে যে মেয়েটি তাঁকে এমনি অভাবনীয় ভাবে সাহায্য করতো, তার আর কোন খবর পাওয়া যেতো না।

মা যখন প্রথম জীবনে কামারপুকুরে থাকতেন, ভোর রাতের দিকেই তাঁকে খিড়কীর দরজা দিয়ে স্বান করে আসতে হত। একা-একা এভাবে পুকুরে গিয়ে স্বান করতে তাঁর রীতিমতো ভয়-ভয় করতো। পরদিন থেকেই দেখতে পেলেন কোথা থেকে আটটি জীলোক তাঁর স্বানের ঠিক সমরটাতেই তাঁদের খিড়কীর স্রুখ দিয়ে তাঁরই-সাথে সাথে চলতো। আগে চার জন পিছে চার জন এ ভাবে তারা মাকে মগো রেখেই পুকুর পর্যান্ত যেতো। আবার স্বানান্তে কলসী কাঁধে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতো। এরকম আশ্চর্য্য ভাবে সঙ্গী পেয়ে মার আর স্বানে যাওয়া-আসার কোন ভয় থাকতো না। অথচ এই সঙ্গিনীরা যে কে, তার কোন পরিচয় আর পাওয়া যায় নি।

দক্ষিণেশ্বর যাবার পথে হুয়ে বেহ'স হয়ে যখন মা রাস্তায় এক

চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখনো কালো মত একটি স্ত্রী এসে তাঁর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে আরাম করে দিচ্ছিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল 'আমি তোমার বেহ'স হই।' পরদিন ঘুম থেকে উঠে সত্যিই মা দেখেন সেই মেয়েটিও নেই, তাঁর অসুখও আর নেই।

আবার চলা শুরু করলেন ক্রান্ত দেহে—পা চলে না। তবুও ঐ পথে কোন বানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। কাজেই চলে লাগলেন ধীরে ধীরে হেঁটেই। হঠাৎ দেখা গেল তাঁরই দিকে একটি পাকী আসছে। এমন অভাবনীয় ব্যাপার বড় একটা হয় না। মা ভাবলেন, কালকের রাতে দেখা সেই কালো মেয়েটিই নিশ্চয় এ পাকীর ব্যবস্থা করেছে, নইলে এখানে আর পাকী আসবে কোথেকে! এমনি ধরণের ঘটনা মা'র জীবনে অনেক বারই ঘটেছে। কিন্তু এ নিয়ে তিনি কোন দিন বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি।

সারদা দেবী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কাজে ও ব্যবহারে সেবাপরায়ণতা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো। অন্তরটিও তাঁর অতি শৈশব হ'তে কোমল ও দুঃখকাতর ছিল। দুভিক্ষের সময় একবার তাঁদের বাড়ীতে গরীব দুঃখীদের খিচুড়ী খাওয়ানো হয়েছিলো। মাত্র বছর ছয়েক তখন তাঁর বয়স। তিনি সকলের খাওয়া দেখতেন। গরম গরম খিচুড়ী পাতে নিয়ে সুখার্ণব দরিদ্ররা যখন খেতে বসতো তিনি দৌড়ে গিয়ে পাখা নিয়ে তাদের গরম খিচুড়ী ঠাণ্ডা করে দিতেন। ভাবতেন আহা! কত ক্ষিদে পেয়েছে! গরম খিচুড়ী ঠাণ্ডা না করে দিলে খাবে কি করে? ছয় বৎসর বয়সের এই ছোট ঘটনা থেকে তাঁর কোমল ও পরদুঃখকাতর অন্তরের পরিচয় পাওয়া যেতো।

সারদা দেবীর বিচার-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা ঠাকুর নিজেও করতেন। তিনি বলতেন, ও যদি এমন না হ'ত, তবে আমার সিদ্ধির পথে অন্তরায় হ'ত। একবার নাকি পানিহাটির উৎসবে ঠাকুরকে ভক্তদের সাথে যেতে হয়েছিল। সেই কালে ধর্ম্মাৎসব ছাড়া সামাজিক জীবনে বড় একটা বৈচিত্র্য ছিল না। কাজেই ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন তিনিও যেতে চান কি না?

প্রশ্নের বকম দেখে সারদা দেবী বুঝতে পারলেন তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়। কেন না, ঠাকুর তো তাঁকে সঙ্গে বাবার জগ্ন তৈরী হ'তে বলেননি, তিনি যেতে চান কি না এ প্রশ্নমাত্র করেছেন। ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হত, সারদা দেবীকে সঙ্গে নেবেন তবে ঐ ধরণের প্রশ্ন কখনোই আসতো না। সাথে বাবার আদেশ বা আহ্বান জানাতেন। অল্পবয়সে সখও যে না ছিল তাও নয়। কিন্তু বুদ্ধি করে নিজেকে দমন করলেন তিনি। গেলেন না।

ঠাকুর কিন্তু পরে বলেছিলেন 'সারদা না গিয়ে খুব বুদ্ধিমতীর পরিচয় দিয়েছে নইলে লোকে বলতো হংস-হংসী এসেছে।'

আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যখন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিরাও গুরু নিতে আসতেন, ভক্তরা বিব্রত বোধ করত। একদিন একটি ভক্ত এসে মা'র উপদেশ চাইলেন দাতব্য উদযালয় তো গরীবদের জগ্ন, ধনীরা ও যে গুরু নিতে আসে কি করবে?

মা বললেন, গরীবদের জগ্নই দাতব্য চিকিৎসালয়, তা কেনেও যে ধনীরা গুরু চাইতে পারে, যে পণ্যস্ত্র অনটন না ঘটবে দিয়েই যেও। কেন না, কেনেও গীরা ভিক্ষা চান তাঁরা যে দান ও কৃপারই পাও।

মাড়োয়ারী ভক্তটি যখন ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিতে এসে

প্রত্যাহ্বিত হয়ে মার কাছে ঐ অর্ধ গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব করেছিল, তখন টাকাটা যুক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতেও ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও নিরলোভতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়ে।

সারদা মার তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁকে শিখিয়েছিল সংস্কারমুক্ত হ'তে। আর ঐ মারের দেওয়ালগুলিকে তিনি ভাঙতে পেরেছিলেন বলেই মুক্তির দালালের সন্ধান পেয়েছিলেন। সংস্কারের দেওয়ালগুলি হতো মানুষকে ধিক্ক করে, কোন আলোর সন্ধান পেতে দেয় না।

ভক্তরা সীমাবদ্ধতার সুযোগ পেয়ে কাল-অকালের বাছ-বাছাই করলে তিনি বলতেন 'কালের কাছে (মৃত্যু) যখন কাল বা অকাল নেই, তখন পূণ্য কাজে কেন কাল অকালকে টানবে? সংস্কারের সুযোগ কখনো বারে বারে আসে না।' ভক্তদের কত জটিল সংস্কার-জনক সমস্যা যে তিনি বুদ্ধি দিয়ে সরল সহজ মীমাংসা করে দিতেন তার ঠিক নেই। তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের সংস্পর্শে যে কেউ আসতো তারই সংস্কারের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়তো। সকলকে তিনি নির্ভীক হতে উপদেশ দিতেন। সত্যতঃ আশ্রয় করে নিলোঁতি হতে পারলেই ভয় জয় করা যায়, এই ছিল তাঁর মত।

কত দেশ-দেশান্তর থেকে বিদেশী ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা তাঁর

কাছে তাঁদের শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করতে আসতেন। সারদা দেবীকে কখনোই ভয় পেতে দেখা যায়নি। দিবি হাসিমুখে তাঁদের তিনি অভ্যর্থনা করতেন। ভাবার জন্তও কোন দিন তাঁর আটকায় নি, নিজের অন্তর দিয়েই তাদের অন্তরের ভাষা তিনি বুঝে নিতেন।

নিন্দা-স্তুতিও তাঁর কাছে সমান ছিল। কোনটা বরণ করতেও তিনি যেমন এগিয়ে যেতেন না আবার অন্যটা ভেজেন করতেও তেমনি শিহিয়ে যেতেন না। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা নিগূহীত হয়েও তিনি যেমন অচঞ্চল থাকতেন, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানী ভক্তদের দ্বারা দেবীজ্ঞানে গুপ্তিত হয়েও ঠিক তেমনিই অবিচলিত থাকতেন। সবই ছিল তাঁর চোখে ঠাকুরের লীলা। নিজের প্রাণ্য বলে কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না।

তাঁর মধ্যে ভগবৎশক্তির প্রকাশ অল্পভব করেই তাঁর সম্মুখে যেতে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ঠাকুরের সম্ভানদের শরীর ভক্তি-শ্রদ্ধার আবেগে ধরধর করে কাঁপতো। দুর্গাপূজার সময় ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে দেবীভাবে অর্চনা করতেন। অন্তান্ত বহু স্ত্রী-পুরুষ ভক্তরা যাকে চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করতেন। ১০৮টি বস্ত্রপত্র দিয়ে তাঁকে অর্চনা করে তাঁকে 'দেবীরূপে সম্মুখে রেখেই চণ্ডীপাঠ করতেন।

## মনের কথা

"এমন শুল্লর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিগি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-অলঙ্কার  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



কত যে অগণিত ভক্ত সারদা দেবীর চরণ-পূজা করতো তার কোন সীমাসংখ্যা ছিল না। নারায়ণী কাত্যায়নী জানে কেহ বা সর্ব সন্মুখই তাঁকে পূজা করতো। আর শুধু কি তাই? ভক্তরা যে তাঁর প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধা কি ক'রে তাঁকে নিবেদন করবে, তা প্রকাশের যেন উপায় খুঁজে পেতো না। তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে নিজেরাই ঘোড়ায় বদলে গাড়ী টেনে নিয়ে যেতো। কেউ বা তাঁর চলায় পথটি ফুলে ফুলে ঢেকে দিত। এরকম দেবভক্ত সন্মান শ্রদ্ধা পেয়েও কিন্তু সারদা দেবীকে এক দিনের তরে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। এমন ভাবে তিনি এসব শ্রদ্ধা নিবেদন গ্রহণ করতেন যেন খ্রীষ্টীয়াকুবকেই ভক্তরা সন্মান দেখাচ্ছে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। কোন চিত্তবৈকল্য এ জন্যই তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না।

দূব-দূবাস্তব থেকে যে ভাবে মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে, তাঁর শিবায় গ্রহণ করে আনুগত্য স্বীকার করেছে, তা দেখে মনে হয় যেন পাহাড়, পর্বত ও পথের দুর্লভ্য বাধা অতিক্রম করে নানা নদ-নদী বুঝি এসে সমুদ্রের বৃক আশ্রয় খুঁজছে।

‘সু’ ও ‘কু’ বলে তাঁর কাছে কিছু ছিল না। বিপথগামীদের প্রতিও তাঁর অনন্ত ককণা ছিল। কিন্তু তাই বলে কাকুর কোন অভ্যাসকে কোন দিনই প্রেরণ দেননি তিনি। তাঁর সং ও পূণ্য আদর্শে এসে অসংখ্য সং হয়েছে, ডাকাতরা পর্যন্ত সাধু হয়েছে। তিনি ছিলেন পরমশয়ি। তাঁর সম্পর্কে সব যেন সোনা হয়ে যেতো। অবিখ্যাসী বিন্যাস জন্মাতো, পুণ্যবানের পুণ্যজ্ঞানাকাজ্ঞা শতগুণে বৃদ্ধি পেতো। এ সারদা দেবীর কথা বর্ণনা করা সাধারণ মনুষ্যসাধ্য নয়।

স্বর্গীয় গিরিশ ঘোষ বামকৃষ্ণভক্ত ছিলেন। সারদা দেবীকে তিনি শুধু ঠাকুরের বিবাহিতা ধর্মপত্নী ছাড়া অন্য কোন স্বতন্ত্র প্রাণান্ত দিতে রাজী ছিলেন না। কয়েক জন ভক্তের সঙ্গে একবার তিনি জয়রামবাটী যান। যেখানে তিনি মাকে প্রথম দর্শন করেন। মাকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। তাঁর এরকম ভাবান্তর দেখে ভক্তরা তাঁকে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন ‘মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ তো, স্বপ্নে তিনিই আমার দর্শন দিয়েছেন কি না?’

সারদা দেবীকে প্রশ্ন করে ভক্তরা জানতে পারে যে, তিনি স্বপ্নে গিরিশ ঘোষকে সন্তাই দর্শন দিয়েছেন। গিরিশ বাবু একথা শুনে ভক্তদের কাছে তাঁর দীর্ঘকাল আগে দেখা স্বপ্নবৃত্তান্তটি বর্ণনা করেন।

উনিশ বৎসর বয়সে না কি তাঁর এক বার কঠিন অসুখ করে। প্রাণের কোন আশা ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণার তিনি হটকট করতেন। সে সময় এক দিন তিনি স্বপ্নে এক অপূর্ণ জ্যোতির্ধরী দেবীমূর্তি দর্শন করেন। তিনি তাঁকে সন্নেহে বলেন, ‘গিরিশ, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তা ভেবো না তুমি সেয়ে যাবে।’ এই বলে পুরীর জগন্নাথের প্রসাদের মত তাঁকে কিছু খেতে দেন। সেই খেয়ে পরদিন থেকেই তিনি সেয়ে উঠতে থাকেন। সেই সময় তিনি সারদা দেবীকে দেখা দূবে থাকুক তাঁর কোন ছবিও দেখেন নি, তাই চিনতে পারেন নি। ভেবেছিলেন অতি লৈশবে তাঁর মা যারা গিয়েছেন, তিনিই বুঝি সন্তানের কষ্ট লাঘব করার জন্য স্বপ্নে এ ব্যবস্থা দিয়েছেন। এত দিন পর আজ সারদা দেবীকে চাকুর দর্শন করে স্বপ্নমুখী মূর্তির সঙ্গে তাঁর অপূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভক্তিত

হয়েছেন। ইনিই যে তিনি এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র না সেই থেকে গিরিশচন্দ্র মায়ের পদাশ্রিত ভক্ত; ঠাকুর ও সাহসী দেবীতে অভিন্ন জ্ঞানসম্পন্ন।

সারদা দেবীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যেমন ফুলের মত নরম ছিলেন, তেমনি প্রয়োজনে বাজর ত কঠিনও হতে পারতেন। লক্ষ্মীলতার নহৃতায় ও শিখরায় তিনি ছিলেন পল্লীমুখ। আবার তেজস্বিতায় দৃঢ়তায় ও সংসার ছিলেন রাজপুত্র রমণী। একাধারে এই কুণ্ডলবৎ মৃদু ও বজ্রদুর্ভাব খুব কম নারীতেই দেখা যায়।

জয়রামবাটীতে প্রাচীর বাঘের উৎপাত শোনা যেতো। ঠাকুর বখন সেখানে যেতেন প্রয়োজনেও রাত্রিতে একা বেঁচে হাতে সাহস পেতেন না। কিন্তু সারদা দেবী লুঠন হাতে দরজা খুলে বাইরে এসে ঠাকুরকে ডাকতেন ‘কৈ গো? আমি দাঁড়িয়েছি, তুমি এসো। তোমার ভয় নাই। তোমার কিছুই হবে না। বাঘে খায় তো আমাকেই খাবে।’ এসব কথা শুনে কি মনে হয়, মা আমাদের পল্লীর মেয়ে! অবলা সরলা ভয়চকিতা গ্রাম্যবধূ?

প্রথম বখন ঠাকুরের মাথা খাঁচা হওয়ার সংবাদ পেয়ে মা দক্ষিণেশ্বরে আসেন, দলচ্যুত হয়ে পিছিয়ে পড়ায় ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। কিন্তু কী অপূর্ণ বৃদ্ধিমত্তা ও অসীম সাহসে তিনি পিতৃসম্বোধন করে দস্যুর আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন, সে এক বিস্ময়! ডাকাতের মন ভিলে গিয়েছিল। দস্যুরা তো ভীত আতর্জনাদ শুনতেই চির অভ্যস্ত। তাতে তাদের মন ভেঙে না বরং সে আতর্জনাদ উপেক্ষা করেই তারা তাদের লুঠন ও হত্যাবৃত্তি চরিতার্থ করে। তাই-ই তাদের পেশা। কিন্তু সারদা দেবীর মধুর কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন দস্যুকে তার বৃত্তি ভুলিয়ে দিল। তার অন্তর যেন আমূল সংশ্লিষ্ট হ’লো বাৎসল্যরসে। সারদা দেবীকে সন্তান জ্ঞানে মাতৃজ্ঞানে নিরাপদে রক্ষা করে স্বামীর কাছে পৌঁছে দেওয়াকেই পরম কর্তব্য মনে করলো সে।

কামারপুকুর থাকা কালে এক উদ্ভাদ ভক্ত একবার মাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল। আত্মরক্ষার্থে তিনি প্রথমে পালাতে গিয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু বখন পাগলের সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠলেন না, তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে তার বৃক চেপে ধরে তাকে ক্রমাগত চড় মারতে মারতে নিজের হাত লাল করে ফেলেন। আর পাগল হাঁকতে থাকে। আধুনিক যুগের প্রগতিসম্পন্ন মেয়েদের দ্বারা এ রকম অপূর্ণ সাহসে আত্মরক্ষা সম্ভব কি?

সারদা দেবীর মধ্যে ‘অনন্তসাধারণ এতগুলি মহৎ গুণের সমঞ্জস ছিল, বা মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না। তাঁকে বুঝতে হ’লে শুধু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে চলে না। সেই একশ বছর আগের সামাজিক জীবন বাপন, সমাজে নারীর স্থান, বিচার করে দেখতে হয়।

জাতিভেদের বজ্রদুর্ভেদ্যাল ভিজিয়ে সেদিনে কাকুর চলাচলের কোন বাধা ছিল না। সামান্য চ্যুতি-বিচ্যুতিতেই জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত একঘরে হয়ে থাকতে হ’ত মানুষকে। সারদা দেবী কিন্তু সমাজের এই সব দাবী অপেক্ষা মানুষে মানুষে যে অন্তরের দাবী, তাকেই প্রাণান্ত দিতেন বেশী। নির্ভয়ে তিনি তাঁর সংস্কারমুক্ত

মন দিয়ে সমাজ চলাচল করেছেন সমাজের ক্রকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিষ্টিন, ভগিনী দেবমাতা, সারা ওলি বুল প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে তিনি যেকোনো অন্তর্ভুক্ত ভাবে মিশতেন, একত্র খেতেন, একত্র শুতেন, তাঁদের একেবারে নিতান্ত আপন ভাবে গ্রহণ করতেন, তাঁতে তাঁর বলিষ্ঠ মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত।

সারদা দেবী ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা ও গুণগাহিনী। এই ভিনদেশীয়া, ভিন্নজাতীয়া, সমাজচোখে অস্পৃশ্য নারীদের সাথে তাঁর এই অন্তরঙ্গতা থেকে বোঝা যায় তিনি কি রকম নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। নারীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন রূপটিকেই তিনি যেন স্বাধীন জ্ঞানিয়েছিলেন এই বিদেশীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রেম ও প্রীতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

সারদা দেবী প্রাচীন যুগের ভারতীয়া নারী। নারীর লক্ষ্মীশীলতা ও আত্মর তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সে শুধু নারীর স্নিগ্ধতা ও কোমলতা বজায় রাখার জন্য। কোন কল্যাণকর জাগরণে তিনি নারীর এই লক্ষ্মীশীলতা বা আত্মকে প্রতিবন্ধক হ'তে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশ-কালের প্রয়োজন বিচারে তিনি বিশেষ উদারমতাবলম্বিনী ছিলেন। তাঁর সংস্কারমুগ্ধ উন্নত ধরনের পরিচয় পেয়ে ভগিনী নিবেদিতা অনেক সময় বলতেন 'মা যে পুরাতন যুগের শেষ কিংবা নতুন যুগের সূত্র, তা বুঝবার কোন উপায় নেই।'

শ্রীশিক্ষার প্রসার ও প্রচারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। তিনি বলতেন, 'বিজ্ঞান অবিজ্ঞা দূর হয়। একটি মেয়ে লেখাপড়া শিখলে দেশজনের উপকার হবে, এ কি কম কথা?' নিবেদিতা বিজ্ঞান পরিচালনা ব্যাপারে সে জুড়ি তাঁর অফুসন্ত উৎসাহ। গোঁড়াযুগের মানুষেরা ইচ্ছলে মেয়ে পাঠাতে বাজী হ'ত না। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা করা যে কত প্রয়োজন মা তাদের তা বুঝতেন। অথচ সেই সময়টায় মেয়েরাই মেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজী লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা ও ভাগ্যহীন হ'ত, এই ছিল তাঁদের ধারণা। অথচ সারদা দেবীকে দেখি নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের জন্য কি ব্যস্ততা!

গৃহশিক্ষয়িত্রী হয়ে মেয়েরা উপার্জন করবে, এ ভাবনকার দিনে বড়ই লক্ষ্যার বিষয় ছিল। মেয়েরা বিজ্ঞানদান করে আত্মসম্মানের পথ করবে, সারদা দেবীর চোখে তা একেবারেই দোষের বলে মনে হ'ত না। হাসপাতালে নার্স হবার শিক্ষা নিতেও তিনি মেয়েদের উৎসাহ দিতেন। 'সেবাব্রতই যে সেরা ভ্রত আর ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কাজ। একজন শিখে নিলে, কত লোকের উপকার হবে।' ঘোর অবরোধ-প্রথার যুগে মানুষ হয়েও নারী জাগরণে যে তিনি কিরূপ উৎসাহী ছিলেন, তা তাঁর ঐ ধরনের মন্তব্য শুনেলেই বোঝা যায়। নারীজগৎ যে শুধু বিবাহ, গৃহকর্ম ও সম্মানোৎপাদনেরই জন্য, এটা তাঁর অন্তর

মানতো না। সেবাসেবা বা জীবসেবার জন্য যদি মেয়েরা বিবাহে অনিচ্ছুক হ'ত, তাদের তিনি খুশী-মনে আশীর্বাদ করতেন। সংঘম শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র গঠন ও জীবসেবার আকাঙ্ক্ষা সকলের প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত, এই ছিল তাঁর মত।

লেখাপড়া শিখবার সারদা দেবীর নিজেরও খুব আগ্রহ ছিল কিন্তু সুযোগ-সুবিধা করে উঠতে পারেন নি বিশেষ। কাজেই মেয়েরা যাতে সেই সুযোগ-সুবিধা পায়, তাঁর জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি বই পড়তে চেষ্টা করতেন, ঠাকুরের ভায়ে সন্ধ্যা তাঁর বই কেড়ে নিয়ে বাপা দিত। ভাতুশত্রী লক্ষ্মী যেতো পাঠশালায় পড়তে। তাঁর কাছেই তিনি চুপি চুপি একটু একটু পড়া জেনে নিতেন।

কামাবণ্ডুর স্বত্তরবাড়ী। সেখানে শত কাজে ও শত চক্ষুর সম্মুখে সুবিধা করে উঠতে পারেন নি কিছু বিশেষ শিখবার, কিন্তু সেজন্য উৎসাহ হারান নি। দক্ষিণেশ্বরে এসে মুখুন্ডো-বাড়ীর একটি মেয়ের কাছে তিনি মাঝে মাঝে পড়া জেনে নিতেন। সে মেয়েটি প্রায়ই স্নান করতে এসে মাকে সাহায্য করত। এমনি করেই তিনি বামায়ণ, মহাভারত দিব্যি পড়তে শিখেছিলেন। লেখার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা কষ্টকর ছিল বলে লিখতে বিশেষ শেখেন নি।

ঐ সময়টায় বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরও লেখাপড়ার বিশেষ আগ্রহ দেখা দেতো না। মার সেই দিনে এরকম জ্ঞানসম্পন্নতা দেখে অচাই লাগে। উত্তর-জীবনে নিবেদিতা স্কুলের মেয়েদের কাছে মাঝে মাঝে হুঁচকারি ইংরাজী কথাও শুনতে চাইতেন তিনি।

'আমরা এখন বাড়ী যাবো'—এর ইংরাজী কি? 'বাড়ী গিয়ে কি খাবে?' ইংরাজীও কি বলবে? এসবের উত্তর শুনে বড় খুসী হতেন তিনি। বড়দারী ভক্তদের তিনি বলতেন, 'ও-দেশ থেকে সাহেব-সুন্দরো কত আসবে, ভাল কবে কথা বলতে হবে। কাজেই তোমরা একটু ভাল করে ইংরাজী-টিংরাজী শিখে নিও বাপু।' এর থেকে মনে হয় না কি যে, তাঁর দূরদর্শিতা অসামান্য ছিল?



ফোন ৩৪-৫০০২

সবকিছু সম্মত  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাস  
কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স (KLS)

১৬৭ বি, বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সারদা দেবীকে পুঁথিগত বিজ্ঞান ভণ্ডাকথিত শিক্ষিতা বলা না চললেও, ধর্মজগতের স্ফুটান্ধ্র প্রেরণ ও জটিল সমস্যার কি সরল, সহজ ও সুন্দর মীমাংসাই না তিনি নিতে পারতেন! বা নাকি জিজ্ঞাসার মস্তিষ্কে কোন বস্তু আলোড়ন আন্দোলন না ঘটবে সরাসরি তাঁদের অন্তর স্পর্শ করতো। ধর্মবাক্যে বিচরণ করেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও দেশের আভ্যন্তরিক সর্ববিধ উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতন সবক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অবহিত থাকতেন।

আবার ধর্মবাক্য গ্রহণ হলেও সেবারতই তাঁর মহান ব্রত ছিল। জনকলাপ কাজে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ ও প্রেরণা। আশ্রমবাসী ভক্তরা তাঁকে প্রশ্ন করতেন, 'মা, সব ছেড়ে ছুড় বাব ভক্ত এখানে এলুম, তাতেই যে বড় বিষ হচ্ছে! এত সব কাজ-কর্ম নিয়ে লিপ্ত থাকলে সাধন-ভজন যে তত্তে চাপ না!'।

তিনি বলতেন, 'যাত্রা-এন কি আর কেউ বসে সাধন-ভজন করতে পারে বাবা! না মন বসাতেই পারে? নিঃস্বার্থ সেবাই ভগবান লাভে সহায়তা করতে পারে। নিজাম কণ্ঠে পূর্বজন্মের কর্মফলের একমাত্র পথ। কাজ সমুখে এলে সেবাজ্ঞানে করে যেও। সেবাকে ধর্মপথে বিষ মনে করা বড় ভুল।'।

সাধারণ সংসারীর মত জীবন-ব্যাপন করেও কি ভাবে ভগবৎসুখী হওয়া যায়, সারদা দেবী নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন। সাধারণ সংসারী জীবনের বজ্রাটের মধ্য দিয়েও তাঁর অন্তরে অস্তঃসলিল ফল্গুবাণের মত ভগবৎ-ভক্তির একটা ধারা যেন সর্বদাই নীরবে বয়ে যেতো। তার থেকে তিনি যে অন্তরে শান্তি পেতেন তা তাঁর সংসারের শত তাপ তুষেও নষ্ট করতে পারতো না। তিনি তাই সর্বদা পাংগক তাঁর পরীক্ষিত শান্তির পথে চালাতে চাইতেন। অন্তরের ভক্তিশ্রোত সর্বদা বইলে কোন পাপ বা ময়লা তিষ্ঠাত পারে না। আবার ভক্তিশ্রদ্ধাহীন অন্তরে দিবা-রাত্রি অপতপ করলেও বুঝি যায়। [ক্রমশঃ।]

## বৌদ্ধ ত্রিশরণ

আশা রায়

“বুদ্ধ সর্বং গচ্ছামি। ধর্ম সর্বং গচ্ছামি। সত্ত্বং সর্বং গচ্ছামি।” বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্ত্ব ইহাদের অতুলনীয় পুত পবিত্রতার জন্ত ত্রিব্রহ্ম বলিয়া বিদিত এবং সেহেতু বৌদ্ধদিগের নিকট ভগবতের মধ্যে ইহা মহত্তম বৈভব। এই ত্রিবিধই ত্রিশরণ। কোনও বৌদ্ধ যখন এই ত্রিশরণ গ্রহণ করেন তখন ইহাদের প্রতি তাহার জীবনধারা ও চিন্তাবৃত্তির প্রেরণারূপে অপরিণীম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় আস্থা সতিত আত্মসমর্পণ করেন। এই সরল ভাব-ব্যবহা-রিত আত্মসমর্পণ করেন তিনিই বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশের প্রত্যেকেই একরূপ প্রথম বাক্যস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উচ্চারণ করিতে শেখে এবং ইহা তিন বার আবৃত্তি করিয়া শরণ গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত যে কোনও অমুষ্ঠানের প্রায়স্তে ইহাদের শরণ গ্রহণ করিয়া তবে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই ত্রিশরণ শুনিতে মন্ত্র উচ্চারণের জায় হইলেও বাস্তবিক ইহা মন্ত্র নহে এবং পূণ্যার্থে আবৃত্তিও নহে।

বুদ্ধ বলিতে সেই পরমোত্তম পথ নির্দেশককেই বুঝায়। গাঠন্য মহান আদর্শকেই বুঝায়। যিনি জীবের দুঃখে জীবকে ধর্ম, অরা, মৃত্যু, ব্যাধি, বিপদ ইত্যে মুক্তি পাইবার পথের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মুক্তিপথের সন্ধান ও পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভের প্রতীকই বুদ্ধ।

রাজার কুমার রাজপ্রাসাদের নিশ্চিত সুখ ও বলাস হইতে পরিপূর্ণ ঘোবনে মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে একদিন যিনি রাজপুত্রের সকলে সুস্থতির জোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, সে সময় গভীর রাত্রে প্রাসাদ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল তাহার অসীম স্নেহমীল পিতা, আর অপার মমতাময়ী বিমাতা, অগুরু রূপলাবণ্যযুক্তা প্রেমময়ী পত্নী, সন্তোষিত স্নেহময় পুত্র—বিদায়ের ক্ষণে কুমারের চক্ষু ক্ষণিকের জন্ত সজল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁর দৃঢ় সংকল্প দুর্বলতাকে প্রেরণ দিল না। নগরী পার হইয়া বিখ্যাত সারথি অশ্বমুখী চক্রকে বিদায় দিলেন।

যিনি নিয়ত অমুচর, ভৃত্যবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন তিনি চলিলেন একা সগায়হীন সম্বলহীন বপদকহীন। রাজকীয় আদর্শের মতর্গ রাজহুত্র নাই আত্মপ নিবৃত্ত করিতে। বানারোহণ বিনা যিনি পথ চলা কি জানিতেন না, তিনি চলিলেন পদব্রজে, বিচিত্র সুরকব পাছকা বে পর যুগলকে কণ্টক ও কঙ্কর হইতে রক্ষা করিত সে পদ নগ্ন ও বিকৃত। মণিরত্নভরণ ও স্বর্ণসুত্রে বস্ত্র যে অঙ্গের কাস্তি বর্ধন করিত সে অনিন্দ্যাসুন্দর অঙ্গে ধারণ করিলেন আশান পরিত্যক্ত ভিখারীর চাবর। মস্তক কেশগুচ্ছ বাহা একদিন সযত্নে নানা গন্ধতৈলে, গন্ধবান্ধিতে সিক্তিত ও সজ্জিত হইত তাহা ছেদন করিলেন। স্বর্ণধালায় পরিবেষ্টিত রাজভোগে যিনি অভাস্ত, মুক্তিকার ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষার ফল হইল আহার। দুগ্ধ-মৈত্রি কোমল পালক শবার পরিবর্তে কণ্টকাকীর্ণ কঠিন বৃক্ষতরু হইল বিশ্রামের স্থান।

নিজের তাঁহার কোনও হুঃখ ছিল না, অপার স্নেহময় পিতার সদা সতর্ক দৃষ্টিতে তিনি আত্ম সুরক্ষালিত, পৃথিবীতে যাত্রা কিছু সুখ বলিয়া কামা সকলই তাঁহার ছিল, কোনও কিছুর অভাব বা অভাবের সম্ভাবনাও ছিল না। মানুষের দুঃখে এই মহান আত্ম-ত্যাগের তুলনা ও আদর্শ বৃষ্টি ধরাতে আর নাই।

তিনি বিশাল বিশ্বের বিশ্বয়। জীবের দুঃখমুক্তির জন্ত রাজার হুলাস গোতমী-নয়ন-পুত্তলি ভিখারী জীবনের ব্রত ধারণ করিয়া অসীম ক্লেশ অসাধারণ অগাধসায় ও অপরিণীম চেষ্টায় এই জীবন-বিজ্ঞানী জীবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করিলেন।

সেই মহত্তম পারত্রিক শিক্ষকের আদর্শের শরণই বুদ্ধ বন্দনার অর্থ। বুদ্ধ ব্যক্তিরিশেষের পূজা নহে। কারণ তিনি নির্লিপ প্রাপ্ত হইয়া অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পূজা করা বা তাঁর নিকট প্রার্থনার কোনই অর্থ হয় না। এই শরণ গ্রহণের অর্থ সেই সন্মা-সম্বোধির মহান আদর্শকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং এই শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে আছে তাঁর মহান আদর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী চলিবার জন্ত আত্মশক্তিকে উত্তীর্ণ করার সঙ্কল্প।

যখন তাঁর করুণা বিগলিত প্রশান্ত মূর্তির সমুখে নভোছা হইয়া কুতাবলিপুটে মুদিত নেত্রে প্রণাম জানাই, তখন তাঁর ধ্যান-নির্মীলিত সম্মিত মুখটি অন্তরের অন্তস্তলে যতই মুদ্রিত হইয়া যায়। এ



জগৎকে সকল ক্ষেত্রে, সকল দিনের সকল কক্ষে, জীবনের স্রুখে সমৃদ্ধির দুঃখে—দীর্ঘনিশ্বাসে ঘুমে দিয়ায় এই মহান আদর্শের প্রতীক আমাদের স্বার্থ পথে চালিত করিবার প্রেরণা যোগাড়—তাই বার বার আবৃত্তি করি—“এক সরণ গচ্ছামি।”

ষষ্ঠ, দ্বিতীয় শরণ হইল মুক্তির পথ। যে পথের সন্ধানে তিনি তৎকালীন পাণ্ডিত্যগির নিকট গভীর মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিলেন, তৎসন্ধান করিলেন নানা শাস্ত্র লইয়া, এতদ্ব্যতীত বরণ করিলেন বিত্ত। গুরু, আলোচনা করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে কিন্তু কেহই তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে বা পথের সন্ধান দিতে পারিলেন না। দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইতে চলিল।

তারপর তাঁর চলিল অদ্ভুত কৃচ্ছসাধন, লোকালয়ের বাহিরে হিংস্র ঋণদেবল গভীর অরণ্যে তিনি তপস্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহা! পর্য্যায়ক্রমে হ্রাস পাইয়া হইল দিনান্তে একটি মাত্র শতকণা, শরীর হইল অস্থিচর্ম্মসার। তারপর স্নানান্তে এক মিনি নদীতীরে ভূপতিত হইলেন, উপানশক্তি রহিত হইয়া কৃচ্ছ সাধনের অসারতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া শরীরের দ্রুত বল ও পুষ্টির আশায় পরিমিত ভিক্ষায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদর্শনে তাঁর পঞ্চাশ হস্তাশ ও বিরক্ত হইলেন। সর্কাপেক্ষা যে সময় তাঁহার সাগাষের ছিল প্রয়োজন সেই সময়ই তাঁহারা তাঁহাকে করিলেন বজ্রন। কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল, তিনি বিচলিত হইলেন না। নৈরঞ্জন নদীর তীরে একটি বোধিবৃক্ষ মূলে তিনি সাধনের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিলেন এবং এক বৈশাখী পূর্ণিমা

তিথিতে সেই বৃক্ষতলে স্বায়ত্ত সাধনার দ্বারা লক্ষ্যে পৌছিবার চূড়ান্ত সঙ্কল্পে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন—দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ নিশ্চল স্থির হইল, মুখ অপূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, সেই জ্যোতি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারার সাত্ত্ব মিলিত হইয়া সমস্ত জগৎ প্রাণিত করিল, তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করিলেন সমুদ্র হইলেন। জন্ম, জরা, মরণ রহস্তের ঘন বনিকা ভেদ করিলেন। আবিষ্কার করিলেন মানবের দুঃখমুক্তির উপায়, আবিষ্কার করিলেন দুঃখের কারণ। তিনি বলিলেন, তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল কারণ। বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া স্রুখ-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনই দুঃখের অন্তর্নিহিত সত্য। পতঙ্গ বেরূপ অগ্নিতে ধাবিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় মানুষও বাসনারূপ অগ্নিতে জরপাই ধাবিত হয়; মুঢ় মানব বুদ্ধিতে পারে না বাসনাই মোহ এবং এই মোহই অবিজ্ঞা; ইহাতে আবদ্ধ হইয়া মানুষ একেব পুর এক নানাবিধ তৃষ্ণার আবর্তনে পতিত হইয়া বাসনা ছেড়ু কিয়ার প্রতিক্রিয়া জনিত পরিণামে নদী শোভের অবিরাম গতির মত জন্ম-মৃত্যুর কাল-চক্রে আবর্তিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। তিনি দুঃখের হেতু ও তাঁহার প্রভাব নিরোধের উপায় ‘চতুর্থাংশসত্য’ আবিষ্কার করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন—মানবের মনই তৃষ্ণার উৎস, সকল রকম দুঃখের হেতু তৃষ্ণা মন হইতেই উদ্ভূত। তাই ষষ্ঠ শরণের প্রথম বাক্যই হইল—“মনো পূর্য্য গমা ধম্মা মনো সেট্টা মনোময়া।” মনকে জানাই প্রধান ও প্রথম কর্তব্য, মনকে বাসনাহীন পবিত্র না করিতে পারিলে মানবের মুক্তি নাই এবং প্রত্যেক মানুষের স্বীয়



উৎসবের দিনে



ক. হোড়ের

মুবাচিত  
প্রমাধীন সাক্ষ্য

ক. হোড় এণ্ড কোং

কলিকাতা-১৪

অন্তরের মধ্যেই মনকে নির্মল পবিত্র করার শক্তি আছে; মনের অন্তর্নিহিত সে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিতে পারিলেই মানবের সে ক্ষমতা স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত হয় এবং মোহ বা অবিজ্ঞা দ্বারা দ্বীর্ণ অপসারিত হইয়া বাসনাহীন হয় এবং অনাবিল আনন্দের পথে লইয়া যায়।

এই মনকে পবিত্র ও মুক্ত করিবার জন্য যে উপদেশ যে বাণী তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহাই ধর্ম। যে পথ যে উপায় সেই চিন্তাশীল মন-বিজ্ঞানী আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন তাহাই স্মৃতি লইয়া অমূল্যলব্ধির উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করি—“সজ্জা সর্বং গচ্ছামি।”

সজ্জা, তৃতীয় শরণ, আজ মানবের চতুঃপার্শ্ব নানা সজ্জের নাম তুলিয়া থাকি এবং কথটি শুনিতে এত অভ্যস্ত যে মনে হয় ইহা অত্যন্ত মামুলী; কিন্তু সজ্জা সৃষ্টি ভগবান বুকেরই পরিচয়। তিনিই ভিক্ষুসজ্জা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সমদৃষ্টি ভক্তিতে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ঐকান্তিক অভিনিবেশ, পৃথক ও ক্ষুদ্রকে একীভূত করিয়া বৃহত্তর শক্তির সঞ্জন ও প্রয়োগ। তিনি তাঁর নির্দেশিত পথের অনুগামীদের জাতিপথের বিভেদ ভাঙ্গিয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্রিত করিলেন, এবং মহান ধর্মের ধারার ঐতিহ্য ও পরম্পরা ধারাবাহিক ভাবে সজ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে সজ্জাগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সজ্জা সৃষ্টির মূলে তাঁর অসামান্যমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ আমাদের চমৎকৃত করিয়া দেয়।

মানবের জন্মলব্ধ জাতিগত উচ্চনীচ ভেদগ্রস্ত সমাজের আত্মঘাতী রীতির বিরুদ্ধে যে নিতৌক মতবাদ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, সমাজের এ ঘোর অজ্ঞারের প্রতিবাদে বাঙ্গা বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া যে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আজও তাহা প্রয়োজন গ্রহণ গিয়াছে, সমাজের এ গর্জিত ঘানির উচ্ছ্বসকে যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সার্বিক দ্বন্দ্ববৎসর পূর্বে চিন্তা করিয়াছিলেন সেই সর্ব-অকুশল দমন-কুশলী মনোযীর অভূতপূর্ব তীক্ষ্ণ—দী ও প্রাণতায় অভিভূত হইতে হয়, বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হইতে হয়।

বিষমপ্রেমিক মহামানব কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তাঁর দরদী মন নারীকেও বিশিষ্ট স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, মুক্তি পথের দুয়ার তিনি মানুষ মাত্র সকলেরই সমভাবে সর্বদা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; তাই তাঁর স্নেহময়ী বিমাতা গৌতমী তাঁর নিকট হইতে ভিক্ষুণীসজ্জা প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার হৃদয়ে কোনও ভেদ-বৈষম্যের স্থান ছিল না। রাজমতিয়া হইতে দীনা দাসী সতী সাধনী বমণী হইতে বারবনিতা পর্যন্ত ভিক্ষুণীসজ্জা প্রবেশের সমান অধিকার তিনি দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুণী জীবন বাগনের ও নির্বাপন প্রাপ্তির অধিকার সকলেরই সমান।

সংসার-তাপে তাপিত নানা দুঃখে সজ্জীবিত ভিক্ষুণীগণ ভগবান বুকের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া সংসারের অসারতা ও দুঃখ বেটনী অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং যে শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন আনন্দে আত্মগার হইয়া তাহারা যে গাথাগুলির ভাব উচ্ছ্বসিত অভিযুক্তি করিয়াছিলেন তাহাই ‘খেরীগাথা’। ইহা পাঠে আধ্যাত্মিকতায় তাহারা কত উন্নত হইয়াছিলেন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। খেরী গাথার স্থান পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, জগতের আদি কাব্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যে ইহা বৈরাগ্য, আত্মচেতনা ও প্রজ্ঞার জন্ম একটি বিশিষ্ট স্থান প্রদর্শন করিয়া আছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ও নানা ভাষায় ইহা অনুদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, ধর্ম দর্শন সাধনা ও শাস্ত্রচর্চায় গুরুত্ব ও স্ত্রীর সমান অধিকার ছিল। ভিক্ষুণীগণের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং ধর্ম দেসনা করিতে ও তর্কবিচারে পারদর্শিনী ও নিপুণা ছিলেন। নারীর অধিকার ও উচ্চ মর্যাদা দানের এইরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই। তাঁর করুণা বিগলিত মনের বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য অপার করুণা শরণ করিয়া মুক্ত হই, সেই মহাকাব্যিকের প্রতি অক্ষয় ভক্তিতে হৃদয় আগ্রত হইয়া যায়, শির স্বতঃই নত হইয়া আসে।

সজ্জা বন্ধনার অর্থ—ভগবান বুকের উন্নতমনা সত্যদর্শী অতি মানবীয় অনুগমনকারীরা যাহারা তাঁর বাণী অনুসরণ করিয়া পরমোত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন বা তাঁর অনুবর্তী যাহারা তাঁর নির্দেশিত পথে চলিতেছেন, তাহাদের পূনঃ অনুসরণ করার সংকল্প। বাস্তবিক তাহাদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপদেশ ও উৎসাহ যতনানি সহায়তা। যতনানি প্রেরণা যোগান, এমন চাক্ষুস ভাবে সহজ ও সুন্দর ভাবে অস্ত্র লাভের সম্ভাবনা হয় না।

সমাজ-বিজ্ঞানী সমাজের কঠিন নিগড় ভঙ্গ করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যে সাম্যবাদের সজ্জা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা প্রভাব, সুশৃঙ্খলতা, আমাদের জীবনে সদাই নূতন আশা নূতন আলোক নূতন চেতনা আনয়ন করে। তাই আবৃত্তি করি—“সজ্জা সর্বং গচ্ছামি।”

“সমগ্র বিশ্বচরাচর সুখী হউক।”

## বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

সাহিত্যিকের ডায়েরীর মাঝে ওদের পারিবারিক বিশেষ ঘটনাগুলো ঠিক মত পাওয়া যায় না।

—মানে যে বকমটি গেলে আমার উপস্থাস্থানির মাল-মশলা যোগাড় হবে, ঠিক সেই বকমটির বখন অভাব ঘটে, তখন, কলম ধামিয়ে মাঝে মাঝে, আমাকে ছুটে বেতে হয়, আলিপুর বেলভেরিয়া ঘোড়ে—বাস্তব ভবনে।

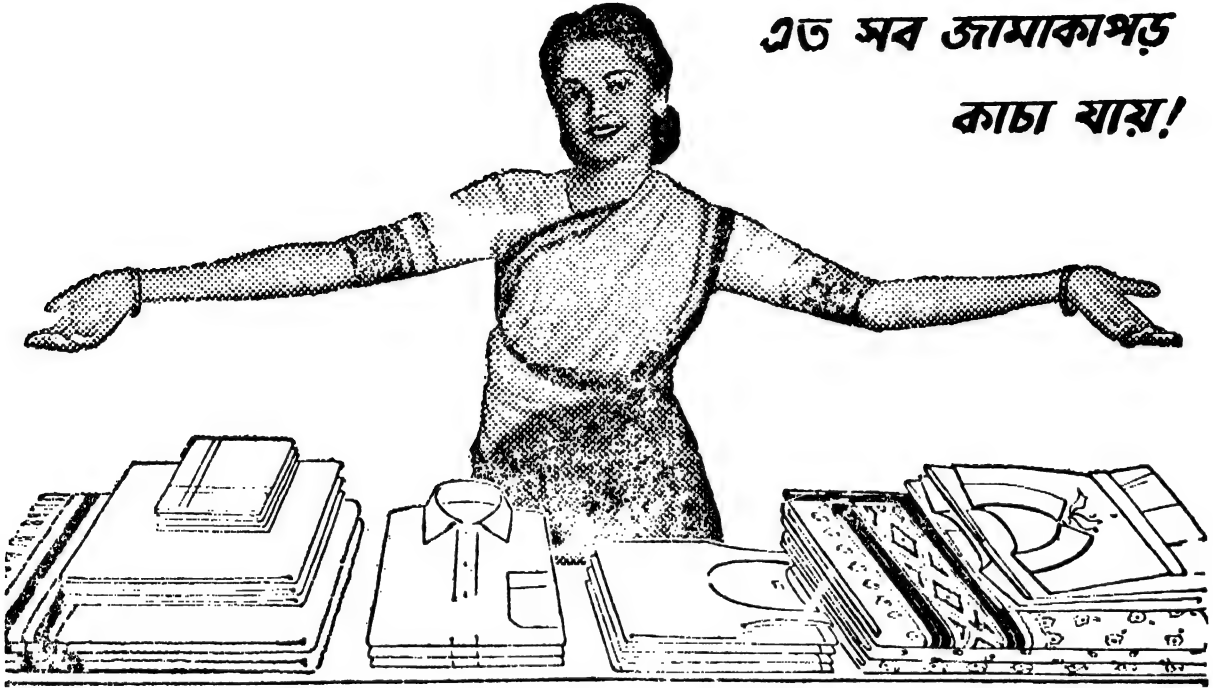
এমনি একদিন সন্ধ্যায় তাঁর ড্রিংক্রমে বসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিলো আমাদের। আমি জানতে চেয়েছিলাম,—

সোমনাথ বাবুর মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস নেবার কারণটা কি? শুধু কি স্ত্রীবিয়োগই এর মূলকারণ? না আর কিছু?

জবাব দিলেন মিঃ বাবু। এ ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে গেলে,—পকাশ বছর আগেকার ঘটনাগুলো স্মরণে হবে আপনাকে। আমারও প্রথম প্রথম ভীষণ গোলমেলে লাগতো এদের ফ্যামিলিটাকে! বখন ঐ লালকুঠিতে স্মৃতিটা নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছিলো। তিন বছর সে কোথাও বেরোয়নি, ঐ প্রকাণ্ড বাড়িতে ওপর

# দেখুন! মাত্র অর্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড়  
কাচা যায়!

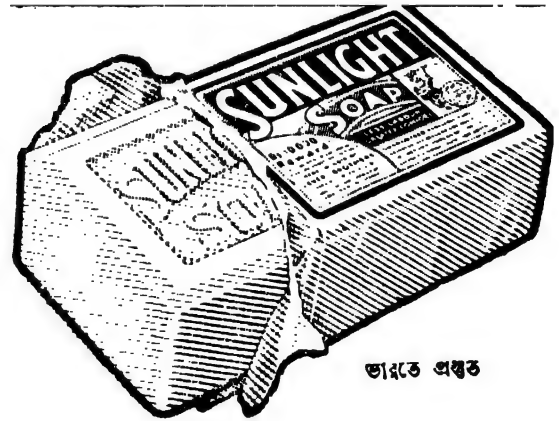


**সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !**

ফেনার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়শীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অর্ধেকটি সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেনার দরুণই প্রতিটি  
ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যকর সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড়  
বিনা আছাড় পড়িয়া হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

**সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে**

তলার একলাই থাকতো। অনিল অবশ্য নিচের তলার ছিলো, তার জীও ছিলো, তবে তাদের ভীষনধারা ছিলো অল্প বকমের—তারাও তখন, নিঃশব্দে ভুলের মাশুল দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় তার একমাত্র সঙ্গী ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে বাগানে ওদের অর্কিড হাউসের ভেতরে স্মৃতিতা ডেকে নিয়ে যেতো আমাকে। কথা বেশী বলতো না, চুপ করে বসে যেন কি ভাবতো।

একদিন সে আমাকে বলেছিলো—জানো দাদা, বংশের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞায়ে প্রারম্ভিত না কি পরবর্তীদের করতে হয়।

আমি হেসে বলেছিলাম,—তা কখনও হয়? একজনের পাণের দণ্ড আবেক জন ভোগ করবে কেন?—

—হায়! এই দেখ না আমি প্রারম্ভিত করছি। চমকে উঠেছিলাম,—

তুমি কি বলছো মিটা?

—ঠিকই বলছি ভাই! এই যে অর্কিড হাউসটা দেখছো এ ভারি অদ্ভুত!

মাঝে মাঝে গুড়-গুড় শব্দ হয় এর তলার, ঘরটা কঁপে ওঠে। গাছপালাগুলো যেন শিরশির দিসদিস করে কথা কয়, আর মনে হয় মাটির অনেক তলায় কার চাপা কান্না যেন গুমবে ওঠে।

আমি একদিন ভাবি ভয় পেয়ে ছুটে বেরছি অর্কিড হাউস থেকে, আমাদের বুড়ো মালী বামভজন সিং বললো,—খুকি দিদি, কি হয়েছে, ভয় লেগেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ রাম সিং! ঘরটা যেন কাঁপছে, যেন কি রকম আওয়াজ!

বামভজন সিং ফোকুসা নাড়ি বার করে হাসে—। আমার হাত ধরে বাগানে পাথরের বেদিটার ওপর বসিয়ে বললো, ভাব সব অনেক কাল ধরে ঘটছে দিদিমণি, ওতে ভয় পেয়ো না। আমি যখন এ বাড়ীতে এসেছি, তখন তোমার বাবা জন্মায়নি।

তোমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে কত খেলা করেছি, কি দিল ছিলো ছোটো বাবুর,—আতা,—কেন যে অমন বেকাঁস কাজটা করতে গেলেন? জীবনটাই চলে গেলো!

—কৌচাচর খুঁটে চোখ মুছলে মুছতে সে বলে গেলো কত কথা! তুমি শুনবে দাদা? তাহলে ডাকি ওকে!

স্মৃতিতা ডাকে, অর্কিড হাউসের ভেতর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়ায় বামভজন সিং।

লতাপাতার ছাটিনির কঁকে কঁকে স্নান চাঁদের আলো এসে পড়ছিলো, ওর খপখপে শালা চুল-দাড়ির ওপর। ওর সামনে খুঁকে পড়া জরাজীর্ণাক্ষত দেহখানি কালো আলোয়ানে ঢেকে সে বললো আমাদের সামনে, সোয়ারার জলের পাশে।

খুক খুক করে কাশতে কাশতে বললো,—কি খুক দিদি, বুড়োটাকে ডাকলে কেন বলো?

স্মৃতিতা বললো,—সেই সেদিন, এই অর্কিড হাউসটার কথা, আমাদের পূর্ব পুরুষদের বাগার বা বলেছিলে তুমি আমাকে, সেই কথাগুলো আজ আবার বলে না, ভজন দাদা!

—সব কথা কি মনে আছে দিদিমণি? বরস কি কম হলো? ছোটোবাবু আর আমি এক বয়সী ছিলাম কি না—এ বাড়ীতে এসেছি সে কি আজকের কথা? তখন তোমার দাদা বছর বারো-তেরো বয়সের আর আমারও ঐ বকমই হবে!

আমার বাবা ছিলেন এখানকার দরওয়ানদের সর্দার। মন্তব্য পালোয়ান ছিলেন আমার কাপ-কাকা। ঐ যে দেখা লতাপাতার কুজবন, আগে ওখানে ছিলো পালোয়ানদের আখড়া!

কত কুস্তিগীর আসতো,—তোমার বাবার ঠাকুরদাদা রামনাথ ত্রিবেদী ছিলেন তখনকার দিনের একজন দেশমাত্র লোক!

বাঙালী ব্যবসায়ী তখন এদেশে খুবই কম। ঐর ছিলো, তিনি, লোহা, সিমেন্ট, নানা বকমের ব্যবসা। হিন্দীর বরপুত্র ছিলেন তিনি! যেন, জেনে, এ বাড়ী তখন গমগম করতো।

নিকট আর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, দাস, দাসী, সরকার, আমলা, অতিথি, অভ্যাগতের লালকুঠি সর্বদা পরিপূর্ণ। তার ওপর বারো মাসে, তের পার্শ্ব। অতিথি-ফকির কখনও বিমুখ হতো না। সবাই বলতো, সাক্ষাৎ মহেশ্বর আর অল্পপূর্ণা এ বাড়ীর কর্তাবাবু আর গিন্নীমা!

রামজীর কুণার কর্তাবাবু তখন মহালের পর মহাল খরিদ করছেন। কোম্পানীর সঙ্গেও খুব খাতির ছিলো, কত সায়েব স্ত্রী, লাট, বিবিরি আসতো এ বাড়ীতে। কত বাড়লঠান অগতো! আতসবাজি পুড়তো। ডিল্লি, লাহোর, বোম্বাই থেকে আসতো নাচওয়ালা।

—তারপর গভর্ণমেন্ট যখন কর্তাবাবুকে রাজাবাহাদুর খেতাব দিলেন, তখন এ বাড়ীতে এক মাস ধরে পরব চলেছিলো।

গরীব দুঃখীর জন্তে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন বাণীমা, মেঠাই মোণ্ডার আমাদের অর্কিড ধরে গিয়েছিলো। বাড়ীর সব লোকজন গিনি, মোহর, পুরোনো কাম্বোয়ী দরওয়ান সব মোহরমালা বখাশব পেয়েছিলো। সে এক দিন গেছে।

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিলো বামভজন সিং। চোখ বুজে খানিকটা চুপ করে থাকে, বুঝি বা তার মনের পর্দায় কুটে ওঠে হারানো অতীতের জমকালে, দিনের ছবিগুলো।

দুইহাতে চোখ মুছে আবার আরম্ভ করে বামভজন সিং! তোমার ঠাকুরদাদা কুমার সাহেব ইন্সনাথ কিন্তু তাঁর বাপ-মার মত হলেন না।

তখনকার দিনে বড়লোকের ছেলের সর্বনাশ করবার জন্তে চারিদিকে মোসাহেবের দল ঘুরণ করতো; এমনি একটি খাদ্য দল সর্বনাশ করলো আমার কুমার সাহেবের।

ছেলেকে শোধরাবার জন্তে রাজাবাবু—লক্ষী প্রতিমার মত বোঁ ধরে নিয়ে এলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ঐ দুইব্রহ্মের হাত থেকে ছোট বাবু রেহাই পেলেন না!

তোমার ঠাকুমা বোরাণী কমলা দেবী আহা কি সতীলক্ষ্মী ছিলেন গো! বলছি সে কথা পরে! তোমার বাগ যখন জন্মালেন—এই তো সেদিনের কথা, রাজবংশের কুলপ্রদীপ যেদিন ছলে উঠলো জাঁড়ু ঘরে আবার রাজবাড়ীতে আমাদের অজ্ঞাদের পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো।

সকলে ভেবেছিলো এবারে কুমার সাহেব ঘরযুথো হবেন, কিন্তু হায়, হল তার বিপরীত!

খোকাবাবু যখন বছরখানেকের তখন রাজা বাবু একদিন হঠাৎ বোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একদিন বেহঁস হয়ে পড়লেন! কত

ডাক্তার কুমার, জীবনটা ফিরলো বটে, কিন্তু পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে বিছানায় রইলেন।

এইবারে এলো ত্রিবেদী বাড়ীর চরম সর্বনাশের দিন।

কুমার সায়েব, বাড়ীতেই তাঁর কুসঙ্গীদের নিয়ে জঁকিয়ে বসলেন। দিনরাত গান-বাঁজনা! মদের ঢেউ খেলতে লাগলো ঐ হলঘরে।

নিতি নতুন মেয়েমানুষ যোগাড় করে আনতো মোসাহেবের দল! কত ভদ্র ঘরের মেয়ের ইচ্ছত নষ্ট করেছে ওরা, পাপের শ্রোত বইতে লাগলো লাল কুঠিতে!

আগা বিছানায় শুয়ে, চোখের জল মুছতেন আমার দেবতা! রাণীমা, বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে দিনরাত থাকতেন রাজা বাবুর বিছানার পাশে, আর ঐ ঠাকুর ঘরটিতে।

সোনারগাঁও খোকা বাবুকে কোলে নিয়ে চোখের জল ফেলে অন্দরে একা দিন কাটাতেন বৌরাণী! দু'তিন বছরের মধ্যে সেনার দায়ে, লাটের ক্রিতি না দিতে পারায়, পর পর অনেকগুলি মহাল নিলামে বিক্রি হয়ে গেলো।

কুমার সায়েবের তখনও হুঁস হলো না,—হুঁস হল আরো, আরো কয়েক মাস পরে—

সুক্লহরে সুনছিলাম আমার, সেই রাজ-পরিবারের ধ্বংসের ইতিহাস। চাঁদের আলো পাতার ক্ষাফি দিয়ে সুরু সুরু রূপোব জালির মত ছড়িয়ে পড়েছিলো, রামভঞ্জন সিংএর সর্দাঙ্গ সাদা চুল-নাড়িগুলো চক্ চক্ করে উঠছিলো। কৌচকানো কালো মুখখানা যেন মনে হচ্ছিলো, মহেঞ্জদাদার ভগ্নস্থপ থেকে আবিস্কৃত একখানি প্রাগৈতিহাসিক মুখ। পাশে ফোয়ারার জলের কির-কির শব্দ মাঝে মাঝে দু'একটা পাখীর ডানা বাপ্টানোর আওয়াজ অর্কিড হাউসের নীরবতাকে যেন কেমন অলৌকিক রহস্যপূর্ণ করে তুলেছিলো।

বুড়ো বসে বসে বোশ তব্ব ঝিমোচ্ছিলো।

স্মৃতি ডাকলো, ভজনদা! ও ভজনদা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চমকে ওঠে ভজন সিং। কে? ছোট বাবু?

না, না, ঐ দেখ, বয়সটা কি কম হল দিদি! সেই করে এসেছিলাম এ বাড়ীতে।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন?—সেই নেপালী মেয়েটার কথা না?

—ফুহুয়ার ভেতর থেকে দোক্তাপাতা বার করে হাতে দলে ধৈনি প্রস্তুত করে মুখে ফেলে দিলো ভজন সিং। তার পর আবার বলতে আরম্ভ করলো—

এক দিন একটা ভারি খুপসুরং নেপালী মেয়েকে চুরি করে এনে ইয়ারের দল ঐ এক তলার কোণের ঘরটার তালাবন্ধ করে রেখেছিলো।

রায়ে যখন মেয়েটাকে বার করবার জন্যে তালা খুললেন কুমার সাহেব,—তাকে দেখে অঁ তাকে উঠে চিংকার করে পিছিয়ে এলেন—

মেয়েটা টানাপাখার সঙ্গে পরনের কাপড় বেঁধে তাতে গলার কাঁস লাগিয়ে বুলছে।

চুপ! চুপ! বাড়ীভিত্ত সকলকার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। রাতরাতি এই গাছঘরের তলার গর্ত খুঁজে লাশ পুতে ফেলে দুর্কোষাস বুন দেওয়া হল। বাইরের হাঙ্গামা কিছু হল না বটে, তবে কুমার সায়েবের মনটা যেন গেলো একেবারে বদলে। মদ মেয়েমানুষ সব বন্ধ হল, ইয়ার-বক্সীদের বিলাস দিলেন। বার-বাড়ি ফেলে অন্দরে বাস করতে লাগলেন।

সর্বক্ষণ যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকতেন তিনি। ল্যাগো গাড়ী করে সন্ধ্যা-সকাল গঙ্গার ধারে যদি একটু হাওয়া খেতে বেরুতেন, মনে হত ছোট ছোট অলম্বলে চোখওয়ালা দু'চার জন নেপালী যেন ওঁর আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছে। ওঁর দিকে চেয়ে যেন কি সব বলাবলি করছে। ছোট কাগজের টুকরো এক দিন দলা পাকিয়ে ওঁর গাড়ীতে কে ছুঁড়ে মারলো।—তাতে লেখা ছিলো, ইচ্ছতের বদলে ইচ্ছত—জ্ঞানের বদলে জ্ঞান দিতে হবে।

এর পর ছোট বাবু আর বেরুতেন না বাড়ী থেকে, একটা বিষম ভ্রাস যেন ওঁকে ভ্রাস করতে লাগলো। ঘুমের ঘোরে কি সব বিড় বিড় করে বকেন

চিংকার করে ওঠেন,—ঐ এলো,—ঐ খুন করলে, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

বৌরাণী ভয় পেয়ে, রাণীমাকে বললেন সব কথা। রাণীমা ভাবলেন বোধ হয় ছেলের মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে।

বড় বড় ডাক্তার এলো!—তারা পরীক্ষা করে কোনো বাধির লক্ষণ খুঁজে পেলেন না!

স্বাস্থ্য গোলমাল! ক্ষুর্তি আনোদের দরকার, এ ঘরটা বদল করে অল্প ঘরে শোবার ব্যবস্থা করা উচিত! মানে পরিবেশটা কিছু অদল-বদল করলে মনটার পরিবর্তন হতে পারে!

অনেক দিন পরে আবার ইয়ার বক্সীরা এলো, বাগানের দিকে একতলার ঐ কোণের ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হল।

স্বরার পায়ে চুমুক দিয়ে মনের ভ্রাসভাব যেন অনেকটা কমে এসেছে।

মন প্রাণ খুলে ফুঁট করলেন ছোটাবু!

অনেক দিন বাদে শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন!

পরদিন সকালে ছোটাবাবুর খানসামার চিংকার শুনে বাড়ীর সকলে ছুটে গেলো ছোটাবাবুর ঘরে।

বন্ধুদের নেশার ঘোর ছুটে যায়, সকলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, একসাথে সকলে চৈচিয়ে ওঠে—

—গালচের ওপর চিং হয়ে পড়ে আছেন কুমার সাহেব! লাল বেশমী কমাল দিয়ে শক্ত করে মুখ তার কাঁস দিয়ে বাঁধা! বুকে বসানো একটা চককে ভোজালী।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিংস সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯



—গালচের ওপর গড়িয়ে পড়া বস্ত্রগুলো চাপ বেঁধে কালো হয়ে গেছে। বিক্ষারিত চোখ থেকে আতঙ্ক যেন ঠিকরে পড়ছে।

—হত্যাকারীর সন্ধান মিললো না। সম্মানিত ঘরের ছেলের লাশ কাটা ছেঁড়া হলো না।

রাশি রাশি ফুল ঢেকে দেওয়া হল কুমার বাহাদুরের দেহটাকে।

মা অল্পপূর্ণা একবার নয়নের মণির মাথাটি নিষেধ কোলে তুলে নিয়ে বসেছিলেন। দুচোখে গড়িয়ে পড়ছিলো গঙ্গা-যমুনার ধারা। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অফুট স্বরে কি আশীর্বাদ করছিলেন, পরমেশ্বরের কাছে শ্রেষ্টের হুলালের আত্মার শাস্তি ভিক্ষা চাইছিলেন!

—রাজাবাহাদুরের অকস্ম দেহটা বহন করে নিয়ে এলো হুঁজন ভৃত্য। তাঁর শীর্ণ হাতখানি পুত্রের মাথায় রেখে ডাকলেন, আমার মা কমলা কই? তাঁকে আর আমার পাড়াভাইকে ডেকে আনো তো। তোমার বাবাকে কোলে করে নিয়ে এলাম আমি।

—কিন্তু বৌরাণীর দেখা কোথাও পাওয়া গেলো না। অনেক বোজাখুঁজির পর ঠাকুরঘরে পাওয়া গেলো তাঁকে। কিন্তু তখন দেহে তাঁর প্রাণ ছিলো না। বিষ খেয়ে সকল জালা জুড়িয়েছেন সতীলক্ষ্মী মা আমার।

মহাসমারোহে জাঁকজমকের সঙ্গে বিদায় নিলেন বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ। কুলরমণীরা মায়েব পায়ে সিঁদুর ঢেলে দিয়ে সেই সিঁদুর মুঠো মুঠো তুলে নিতে লাগলেন নিজেরদের কৌটায়। ঝৈ, বাতাসা, টাকা, সিকি, গিনি, মোহর ওঁদের যাত্রাপথের হুঁধারে ছড়ানো হলো রাশি রাশি। লালকুঠির আলো নিবে গেলো।

নীরব হল রামভঞ্জন সিং।

তার কোটিরগত চোখ দুটো দিয়ে অনর্গল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিলো, কৌটার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলতে লাগলো।

রাজাবাবু এ থাক্কা সামলাতে পারলেন না, হুঁমাসের মাথায় তিনিও স্বর্গে চলে গেলেন। এই বিশাল পুরীতে রইলেন একা রাণীমা, এই পাঁচছরের শিশু তোমার বাবাকে বুক করে।

—আত্মীয়-স্বজন সকলে চলে গেলো বাড়ী ছেড়ে। হুঁ-একটি পরগণা তখনও যা ছিলো, রাণীমা বিক্রি করে দিলেন।

সরকার আমলা সকলকে বিদায় দিলেন! খালি পুরোনো বিধাসী লোক আমরা কয়েক জন রইলাম।

খোকা বাবু ক্রমে বড় হতে লাগলো। তাঁকে তিনি বাড়ী থেকে একবারেই বেরুতে দিতেন না; বাড়ীতেই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

খোকা বাবুর মামা ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁকে রাণীমা বাড়ীতে রাখলেন, যাতে ছোটবেলা থেকে খোকা বাবুর সংশ্লিষ্ট হয়।

নিষেধ তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, তার সঙ্গে খোকা বাবুকও পালন করাতেন।

মাছ মাংস এ বাড়ীতে তখন নিষিদ্ধ ছিলো। খোকা বাবুর যখন আঠারো বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে দিলেন রাণীমা। কারণ তাঁর শরীর খুব খারাপ হচ্ছিলো,—সে-জন্তে তড়াতাড়ি নাতির বিয়ে দিলেন।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় টায়ে গ্রহণ লেগেছে, রাণীমা সারা দিন উপোস থেকে সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। পল্লীর জোয়ার এসেছে তখন, কোমর পর্যন্ত ছিলো তাঁর

জলে ডোবানো, সেই অবস্থায় সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিলো। সঙ্গে পুরোনো ঝি ছিলো, তার চিংকায়ে সকলে ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে ঘাটের ওপর শোয়ালো, কিন্তু জীবন তাঁর তখন দেহ ছেড়ে চলে গেছে। ‘পূণ্যবতী জননীকে আমার, মা গঙ্গা স্বয়ং কোলে তুলে নিয়েছেন।’

মিঃ বাবুর কথার মাঝে ছেদ টানতে হলো। কারণ জরুরী প্রয়োজনে বাইরে এক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর কাছে—তাঁকে সেক্ষণ উঠে যেতে হল।

মিসেস বাবু সেখানে বসে উল বুনছিলেন। আমার দিকে চেয়ে হাতমুখে বললেন,—এখনও যে একটু বাকি আছে ভাই, সেটুকু আমিও বলতে পারি আপনাকে। তবে ঠিক মত স্মরণ ভাষায় হয়তো পারবো না।

—আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসে বললাম—তা হলে বাকিটুকু আপনার কাঁছেই শুনি ভাই,—যেমন ভাবেই বলুন না কেন, ভালো আমার লাগবেই—একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

—আমি তখন খুব ছোট, সেক্ষণ সব ঘটনা ঠিক মনে নেই—তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি বছর দশেকের মধ্যে।

সোমনাথ বাবুর ঠাকুমা মারা যাওয়াতে তিনি মনে যেন বড় বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ ছোটবেলা থেকে সঙ্গী সাথী কেউ ছিলো না তাঁর। ঐ ঠাকুমা আর মামাই ছিলেন তাঁর মা, বাপ, ভাই বন্ধু সবই।—তিনি বড় একটা কাকর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। প্রফেসরি করতেন আর বাকী সময়টা লাইব্রেরীতে পড়াশোনায় কাটাতেন। তাঁর মামা চলে গেলেন কাশীতে। মাঝে মাঝে, হুঁচাব জন সাধু সন্ন্যাসী দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আনাগোণা করতেন তাঁর কাছে। গোপীদাস মহারাজ তাঁদের অগ্রতম। সূদামেব বাবা মহিম হালদার ছিলেন তাঁরই শিষ্য।

স্মৃতিভার যখন বছর এগারো বয়স সেই সময় তাঁর মা দ্বিতীয় সস্তা প্রসব করে মারা গেলেন। ছেলেটিও রইলো না।

এইবারে সোমনাথ বাবুর মনে দেখা দিলো পূর্ণ বৈরাগ্য।

এই প্রচেলিকাময় জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করবার জ্ঞান তিনি ছাড়লেন প্রফেসরি।

দিন-রাত ঐ লাইব্রেরি ঘরের কপাট বন্ধ করে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

হুঁ-বছর পরে এলেন গোপীদাস মহারাজ। কয়েক দিন তিনি বাস করলেন ঐ রুদ্ধকক্ষে। তাঁর কাছেই বোধ হয় সোমনাথ বাবু জীবনের কিছু মানে খুঁজে পেলেন।

বাস্তব ভাবে একদিন তাঁর শব্দশ্রবণে গিয়ে হাজির হলেন।

শত চেষ্টাতেও ঠাঁকে ঘরের বার করা সম্ভব হয়নি, তাঁকে হঠাৎ আসতে দেখে সকলে অবাক বনে গিয়েছিলেন।

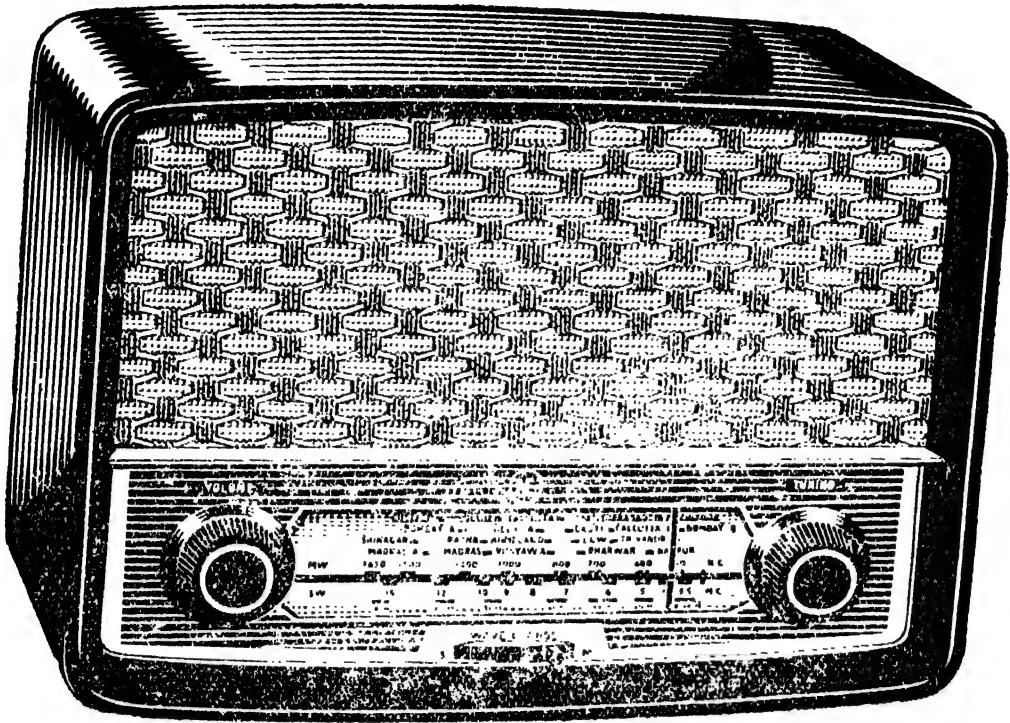
—তিনি, হুঁচাব কথায় স্বশ্রম্যতাকে বললেন।


—তীর্থ ভ্রমণে যাবেন, বাড়ীতে স্মৃতিতাকে দেখবার শোনার তো কেউ নেই, যদি ওঁরা গিয়ে তাঁর লালকুঠিতে বাস করেন। এবং সমস্ত তার গ্রহণ করেন—তবে তিনি তীর্থে গমন করবেন আগামী কল্যাই।

তাঁর নির্দেশ মতই কাজ করলেন তাঁর স্বশ্রম্যতা। আর তাঁর তীর্থে গমন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণের এই মোটামুটি ইতিহাস আমার জানা আছে।

[ ক্রমশঃ। ]

দামের তুলনায় সেরা রেডিও !



**ন্যাশনাল-একো**   
মডেল ২৪১ মাত্র ১৯৫ টাকা

- ★ এই শ্রেণীর রেডিওর মধ্যে একমাত্র এতেই ১৯, ২৫, ৩১, ৪১, ৪৯, ৬০ ও ৮০-৯০ মিটার পাবেন
- ★ মস্ত বড় স্পীকার
- ★ সুবহুৎ ও সুদৃশ্য ব্যাকলাইট কেবিনেট
- ★ এসি, ডিসি অথবা ড্রাই ব্যাটারীতে চলে



আজই ন্যাশনাল-একো বিক্রেতাকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—খরচ লাগবে না !  
এখানে নিট দাম দেওয়া হল ; স্থানীয় কর আলাদা।

জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ,  
কলিকাতা — বোম্বাই — মাদ্রাজ — বাঙ্গালোর — দিল্লী



## বিজ্ঞাপন

আজকাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কত একমেরই যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কত প্রকার দেশহিতৈষিতা তাহাতে যে প্রকটিত থাকে, কত প্রকার মনোমোহিনী ভাষা তাহাতে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অন্ত নাই। ক্রেতারূপ মৎস্য ধরিবার জন্ত, সংবাদপত্ররূপ সরোবরে কত বিজ্ঞাপনদাতা, কত একম চার ফেলিয়া ছিপ পাতিয়া বসিয়া আছে। এই পুকুরে মাছ ধরিবার জন্ত পুকুরের মালিককে কিছু কিছু টাকা দিতে হয়। যে বসন্তুলি ছত্রধরূপ ছিপ ফেলিবে তাহাকে তত অধিক জমা দিতে হয়। অধিক ছিপ ফেলিলে যে মাছ অধিক ধরা যায় তাহা নহে। বিজ্ঞাপনের ভারাক্রম মালমসলা দিয়া চার ও টোপ তৈয়ার করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তির ভাষা-চারের এমনি খোসবু যে, তাহার চার ফেলিতে ফেলিতে ভ্রাস্ত মৎস্যগণ স্রগন্ধে আমোদিত হইয়া পালে পালে আসিয়া টোপ গিলিয়া দেলে এবং শেষে বড়ই পস্তাইতে থাকে।

সংসারে বিজ্ঞাপনটা যে কেবল সংবাদপত্রেই দেওয়া হয় তাহা নহে। আমার সময় সময় বোধ হয়, সংসারে যেন কোন না কোন আকারে সর্বত্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে, সংসারে যেন কেহই একটা না একটা বিজ্ঞাপন খাড়া না করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চাহে না। যেন চতুর্দিকে “আমার দেখ, দেখ গো!” “আমার দেখ গো” এইরূপ বলিয়া সকলেই চীৎকার করিতেছে। যেন আমাকে অজ্ঞ লোকে না দেখিলে, অজ্ঞ লোকে আমার নাম না শুনিলে, আমার জীবন বুঝা যাইল—যেন সংসারে জীবনের একমাত্র এবং কেবলমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে প্রচার করা, আপনার নাম অস্ত্রের কণ্ঠে নিনাদিত করা, আপনার কীর্তিকলাপ অস্ত্রের কণ্ঠে ঘোদিত করা। এইরূপ আত্ম-ঘোষণাতে যে নীচতা আছে, তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টি করিতে চাহে না।

প্রায় সকল মানুষই যেন বিজ্ঞাপন দিবার জন্ত, আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্ত ব্যাকুল। কেহ বহি লিখিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি কবি, কেহ বড়তা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, আমি স্বদেশপ্রেমী, কেহ কথোপকথনে বা নিজের রচনাতে নানা প্রকার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতেছেন, আমি পণ্ডিত, কেহ বা গাড়ি-ঘোড়া ইকাইয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি ধনী, কেহ বা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া স্তুপীকৃত ইটকরাশি দ্বারা বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি লক্ষপতি। কেহ বা বিভিন্ন বেশে সাজিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন,—“আমি সাজিয়া আছি, তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে একবার দেখ গো।”

কেহ বা সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন দিতেছে। যেন প্রতি পদবিক্ষেপে প্রতি কটাক্ষে বলিতেছে, “ওগো আমাকে দেখো গো, আমি দেখিতে বড় সুন্দর। তোমরা আমার ভাল করিয়া না দেখিলে আমি প্রাণে বাঁচি না।”

সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি অনেকে এক একটা ভেঁপুধরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেখানে যাহা কহেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে একবার জয়ধ্বনি করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন না দিয়া তাঁহার শাস্তি লাভ করিতে পারেন না। সভ্যতার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপনে আড়ম্বর, চটক ও নিলজ্জতা দিন দিন বাড়িতেছে।

আমি যে একটা মস্ত লোক, আমার রচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থ যে একটা অপূর্ণ পদার্থ, আমার দোকানের জিনিস যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দেখুন এই কথা, সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া লজ্জান মাথা খাইয়া, বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়া, কত লোকে অমানবদনে কুকারিয়া বলিতেছে। সভ্য ইংলণ্ড ও সভ্য আমেরিকাতে এই জুয়াচুরি অধিক পরিমাণে বিকশিত হইতেছে। ভারত অজ্ঞ বিলাতের নিকট সভ্যতা লিখিতেছে, স্বতরাং বিলাতের সভ্যতার জুয়াচুরিটুকুও বেশ লিখিতেছে।

গুণের পথ দিয়া চলিয়া যান, বিবিধ বর্ণে, বিবিধ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। একটি ছাতাওয়ালার দোকানের বাহিরে লোহিত কাষ্ঠ লেখা রহিয়াছে, দেখিবেন—“যদি ছাতা কিনিয়া না ঠিকাত চান তাহা হইলে এই দোকানে ছাতা ক্রয় করুন।” ঐ দোকানের পাশেই আর একটি ছাতার দোকান রহিয়াছে, তাহার বাহিরে নীল কাষ্ঠকলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—“যদি আপনি স্বর্ণাৰ্ণ ভাল ছাতা চান, তাহা হইলে সতর্ক হইবেন, তাহা কেবল আমার দোকানে পাইবেন।” প্রায় সকল খুদিরই দোকানে এই বিজ্ঞাপন দেখিবেন—“একবার আমার দোকানের চা খাইলে আর কোনও দোকানের চা ক্রটিবে না।” কি নিলজ্জ মিথ্যাবাদিতা! একটা ভটি প্রকাণ্ড চা’র দোকানে লজ্জা ও সত্য জলাঞ্জলি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন—“আমরা ডিউক, মার্কুইস বড় ওয়রাও লোককে যে চা দিয়া থাকি, সেই চা ১০ টাকা পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় করিয়া থাকি।” কি ভয়ানক প্রতারণা! বিলাতে বিজ্ঞাপনে অদ্বুত টাকা খরচ করা হয়। বিলাতের প্রধান দৈনিকপত্র ‘টাইমস’র বাট স্তম্ভ বিজ্ঞাপনে পূর্ণ। এমন অনেক দোকানদার আছে বাহার ইংলণ্ডের প্রত্যেক সংবাদপত্রে, প্রত্যেক রেপোর্টে, টেলিগ্রামে, প্রত্যেক সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে।\* এই বিজ্ঞাপন-সমুদ্র

কত জুয়াচোর হান্সর ডুব দিয়া বহিয়াছে তাহা বলা যায় না। অসতর্ক পার্ক পাইলেই তাহারা তাহাদিগকে টপ করিয়া গিলিয়া ফেলে।

এইরূপ জুয়াচোর হান্সর এ দেশের বিজ্ঞাপকদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—ক্রমেই অধিক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন ব্যক্তি-বিশেষকে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কাহারও নাম করিতে চাহি না। অনেক বিজ্ঞাপক আক্ষেপ করিয়া বলেন যে “কোন কাগজেই এখন বিজ্ঞাপনে আর বড় কাজ হয় না।” কেমন করিয়া হইবে? এত লোক মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে যে, ক্রেতাগণের বিজ্ঞাপন মাত্রেরই উপর একটা ঘোর অবিশ্বাস পাড়াইয়াছে। কেহ বিজ্ঞাপন দেখিয়া পরস্পর পাঠাইয়া বহি পায না, কেহ বহি পাইয়া দেখে, তাহা ছাই পাঁশ, অস্পষ্ট ঘৃণিত শব্দাবলি, কেহ ঔষধ কিনিয়া দেখে তাহা—ডোবার রংকরা পানি। বার্য্য কোন জন্মে ডাক্তারি শিখে নাই, তারাত্তর নতুন ঔষধ আবিষ্কার করিতেছে এবং তাহা সর্ববিধ রোগের অব্যর্থ অমোঘ ঔষধ বলিয়া, অসঙ্কুচিত চিত্তে বিজ্ঞাপন-ভেরী দ্বারা ঘোষণা করিতেছে। কাজে কাজেই বাহারা সত্য বিজ্ঞাপন দিতেছেন, জুয়াচোরদিগের জন্ত, তাহাদিগের বিজ্ঞাপনে আর তত কাজ হইতেছে না। এই সকল জুয়াচোরদিগের বাহাতে দমন হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য।

সংসারে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন দিয়া লোক অর্থ উপার্জন করে। মহানগরীর রাজস্ব বারাদ্ধনা বা নিজের দেহরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহা দ্বারা পথিকগণকে নরকে আকর্ষণ করিবার জন্ত কতই চেষ্টা করে। ইংরাজি-সাহিত্য শিক্ষিত পাঠকগণের মিলটনের Areopagiticaতে কে বারাদ্ধনার কতকটা এবধিখ বর্ণনা স্বরণ হইবে। ইহারা বিজ্ঞাপনে কি বলিতেছে? “এস পাঠক, তুমি আমাকে পরস্পর দাও, আমি তোমার নিকট আমার সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্ম বিক্রয় করিতেছি।” ঘৃণিততম—নীচতম এই সকল বিজ্ঞাপন। কত ঘৃণিততম, নীচতম এই সকল বিজ্ঞাপন। কত ঘৃণিততম, নীচতম এই সকল পাণ্ডীয়দিগের জীবন! কিন্তু স্ববাদপত্রে বাহারা বারাদ্ধনাগণের কটাক্ষবৎ মিথ্যাচরিত্রকে ভাষার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ উপার্জন করে, তাহাদিগের জীবন কি বারাদ্ধনাগণের জীবনের তুল্য ঘৃণিত নহে? প্রেলোভন, প্রতারণা, ঘৃণিত বিজ্ঞাপন, উভয়েরই অন্ত—অন্তের অর্থ অবৈধরূপে গ্রহণ করা, উভয়েরই উদ্দেশ্য—নরকে উভয়েরই বাসস্থান।

আমরা আর অসং বিজ্ঞাপনের আলোচনা করিতে পারিতেছি না। এখন সাধু বিজ্ঞাপনের আলোচনা করা উচিত। সংসারে যে বাহা করিতেছে, যে বাহা বলিতেছে, যে বাহা লিখিতেছে, তাহাতেই কোনও না কোন প্রকারে সত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে। বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক, আবিষ্কৃত সত্যের বিজ্ঞাপন মাত্র। ভাল ভাল কবিতা, এফ প্রকার সঙ্গীতময় সত্যের বিজ্ঞাপন। আর মধুর পবিত্র সঙ্গীত—স্বর্গরাজ্যের বিজ্ঞাপন। আর ধর্ম্মকার্য্য, পরোপকার, দয়া প্রেম—পবিত্র আত্মার অস্তিত্বের বিজ্ঞাপন। অজ্ঞান অধাধারে লোকে দিশাহারা হইয়া পৃথিবীতে ফিরিতেছে। জ্ঞানী মহাজন বাহারা, তাহারা উন্নতির ঠিক পথ কোন দিকে তাহা দেখাইবার জন্ত, সময়ের রাজস্বের বড় বড় অঙ্ককে লিখিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দিতেছেন, পুস্তকের খুটিতে “সাইন বোর্ড”

## প্রাণতোষ ঘটক রচিত

### মুক্তাভাস

“There is no false idealisation, no cheap dip into smutty episodes. The work shows some planning and purpose. For it is a frank exposure of a private way of life that has no justification for its continuance and the writer has wisely left the tale to be wound up by a remorseless nemesis.” —Amritabazar Patrika. প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### কলেকাতার পঞ্চমা

“খালোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিষয়তন্ত্রায় ঘটনাবলী আতরণ করেছেন এবং তা গ্রন্থনও করেছেন অপর শিরকুশলতার সঙ্গে।”—আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা ৭ মূল্য তিন টাকা।

### বাসক সজ্জিকা

“এখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের ‘বাসকসজ্জিকা’। লেখক যদিও উপন্যাস রচনা ক’রেই পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত হয়েছেন, তবু এই সংকলন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃত-পক্ষে ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধান্ত। তাঁর গল্পের ভাষা বেশ ছদ্মগ্রাহী ও বাজানাময়। এবং সৃষ্টির পরিবেশন-পরিমিতির ফলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পর্যায়, পৌছেছে।”—আনন্দবাজার পত্রিকা। মাত্র এণ্ড ঘোষ প্রকাশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

### \* রত্নমালা \*

“এখানি সমার্থাভিধান। ইংরেজীতে বলা হয় Synonym-এর অভিধান। বাংলা ভাষায় এ রকম অভিধান আর নেই। বাদের লেখা অভ্যাস তাদের পক্ষে এ জাতীয় একখানি সিনোনিমের অভিধান হাতের কাছে থাকলে শকচয়নে বড়ই সুবিধা। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষেও খুবই প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। প্রাণতোষ সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা বহু অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের বই বেঁটে অনেক পরিশ্রম করে শব্দগুলি সংকলন করেছেন। এ বইয়ের যথাযোগ্য আদর অবশ্যই হবে।”—স্বগাস্তর। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

### আকাশ-পাতাল

“Those who will probe deep into the antiquities of Calcutta will come across many such episodes. It is with unique delicacy, singular honesty and charming simplicity that the noted author presents in an original way an old episode—a tragic one.” —Amritabazar Patrika গত কয়েক বছরে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রায় চার হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য ১ম পাঁচ টাকা ও ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা।

টাকাইয়া দিয়াছেন। স্বর্ণপ্রচারক বাহারা, স্বর্ণ বা স্বর্ণরাজ্যের পক্ষ কোন দিকে, তাহা নির্দেশ করিবার জন্য দেশে দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

আর দেখুন, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং কত স্থানে, কত রকমে, কত বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে নীল কাগজের উপর, হীরকের অক্ষরে, প্রতি রাত্রিতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? আপনারা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, সমুদায় আকাশে, হীরক অক্ষরে কে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন? এই বিজ্ঞাপন কি প্রকাশ করিতেছে? অমৃত-বৃন্দ ভগৎ—অনন্ত ব্যাপ্তি, জ্যোতির্ময়তা, সুনিয়ম—মধুর মহীতান্ বিধবাপী অতীর সঙ্গীত। বলিহারি এই বিজ্ঞাপনের! আকাশে কেন, ভগতে যে দিকে চান, সে দিকেই বিজ্ঞাপন—সমুদায় সৃষ্টি বিজ্ঞাপন—দলদক্ষরে অসংখ্য অসীম, অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য দিবানিশি প্রচার করিতেছে!

—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

## জনপ্রিয়তার যাচাই

সুনাম বা জনপ্রিয়তা এমনি বিনিস—যা ঘরের মনোগারী আয়নার দ্বারা পড়ে না, এর পরিচয় বা পরিমাপের জন্তে তাকাত্তে হয় সমাজ-দর্পণের দিকে। প্রতিবেশীরা আমায় সম্পর্কে কি ভাবছেন, বান্ধব সঙ্গে দৈনন্দিন কান্স-কাণবার বা চসাকো, তাঁরা সত্যি আমায় পছন্দ করেন কি না এবং করলেও কতখানি—এইখানেই তো জনপ্রিয়তার যাচাই।

সাধারণতঃ আমরা নিজেকে কেহই ছোট করে দেখতে চাইনে—নিজের কোন ক্রটি বা অক্ষমতা নিয়ে থেকে সহসা মেনে নেওয়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় নয়। পরন্তু এইটুকু ভাবতে আমরা তেমন ঝিঝি করি না—প্রত্যেকেই আমরা মোটামুটি নিখুঁত, আমাদের মান ও মর্যাদা সামান্য কোথায়? আমাদের বেশীর ভাগেরই ক্ষেত্রে এইটি আত্ম-প্রবন্ধনা না হলেও, আত্মসম্বলি ছাড়া কিছুই নয়। সুনাম বা জনপ্রিয়তা যাচাই করতে চাইলে এই মাপকাঠি ধরে নিয়ে থাকলে নিতান্ত ভুল করা হবে।

মানুষ মানুষকে কখন ভালোবাসে, কেন ভালোবাসে? অথবা স্থায়ী সুনাম বা জনপ্রিয়তা নির্ভর করে কিসের উপর? প্রথম কথাই বস্তুতঃ সম্ভব ভালো মানুষ হতে হবে; আশাবাদী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, সাহসী, কণ্ঠতপস্বী ও দরদী মানুষ না হলে নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা—অহংকার বা মাদকতা, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব বা সঙ্কীর্ণতা এই শ্রেণীর বদভ্যাসে পেয়ে বসলে কখনই চলবে না। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধিকারে বসই কেন না বড় হওয়া গেল, ভাবতে হবে নিজেকে সাধারণেরই এক জন—নিতান্ত আলাদা কিছু নয়। বৈবয়িক আচরণে সত্যতা ও সারল্য, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ভাব যেন অটুট থাকে—এইদিকেও নজর রাখতে হবে সব সময় কড়া।

এ তো গেল একদিকের ব্যাপার—অপর দিকে, নিজে নিজে বড় না ভাবলেও মনে প্রতীকৃতি রাখতে হবে—আমি কখনই পেছনে পড়ে থাকবো না, নিজেকে হেয় বা হীন প্রতিপন্ন করবো না কোন অবস্থাতেই। অহংকারের প্রয় না তুললেও ব্যক্তিগত ও অগ্রগামিতা চাই সকল ভালো কাজে—সকল প্রয়োজনের মুহূর্তে। এইভাবে একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ জীবনযাত্রার পথ বেছে নিলে সুনাম বা জনপ্রিয়তা এসে ছুঁবে আপনি—এর যাচাইএর জন্তে এতটুকু আর ভাবতে হবে না।

## ভারতে ম্যাংগানিজ উৎপাদন

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ম্যাংগানিজ একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় প্রথম শ্রেণীর ধাতু হিসাবে গণ্য। লৌহ ও ইস্পাত মজবুদ করতে, এনামেল ব্লক ও ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী ব্যাপারে, রসায়ন-শিল্প ও কাচ-শিল্পের ক্ষেত্রে এই খনিজ পদার্থের ব্যবহার আজ খুবই ব্যাপক।

লৌহ, কয়লা, ফ্রোমিয়াম, অল্ড ও থোরিয়ামের দ্বারা ম্যাংগানিজেরও সত্যি প্রচুর ধোঁগান রয়েছে ভারতে। বলতে কি, সেদিন পর্যন্তও ম্যাংগানিজ উৎপাদনে এই দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এক্ষণে উৎপাদনের দিক হ'তে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ। ভারতের মধ্যে আবার মধ্যপ্রদেশেই এই খনিজ পদার্থ বা ধাতুর উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। তার পরই নাম করতে হয় মাদ্রাজ রাজ্যের। বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মহাশূর প্রভৃতি রাজ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়। অন্য দিক বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে ভারতের ম্যাংগানিজ উৎপাদনের স্থান দ্বিতীয়।

ভারতের খনিসম্ভার সাংপ্রতিক একটি হিসাব—ভারতে ম্যাংগানিজ পিণ্ড আছে প্রায় ১১ কোটি ২০ লক্ষ টন। তন্মধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই রয়েছে প্রায় ১০ কোটি টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড। ভারতে যে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়, তা'সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ ম্যাংগানিজ বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে ভারতের খনিসম্ভ হ'তে ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫০৮ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড উত্তোলন করা হয়। ১৯৫৪ সালে উত্তোলন করা হয় ১৪ লক্ষ ১০ হাজার ৬৮ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড। ভারত থেকে ১৯৫৫ সালে যে ম্যাংগানিজ পিণ্ড রপ্তানী হয়, উহার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের ২০ লক্ষ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড উত্তোলন নির্ধারিত আছে। এই পরিকল্পনায় রপ্তানীর যে বরাদ্দ স্থিরীকৃত হয়েছে, উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন। এই রপ্তানী খাতে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আসছে, ইহা বলাই বাহুল্য।



# গিনিগোল্ড জুয়েলারি শ্বেশালিষ্ট



মৌলিকতায়  
নির্ভরতায়  
আধুনিকতায়

## এম.বি. সরকার এও সন্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ *জুয়েলার্স* গ্রাম-ট্রিলিয়াটস

১৬৭/জি ১৬৭/জি ১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

ব্রাঞ্চ- বালি গঙ্গা-২০০/২/পি রাসবিহারী এডিনিউ. কলিকাতা-২১

স্মারকমের পুরাতন চিয়ানা  
১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

'নতুন ব্রাঞ্চ শো রুম - ডায়মেন্ডপুর' ফোন: ডায়মেন্ডপুর-৮

# খেলাধুলা

কলকাতা মাঠে খেলাধুলা একটু মন্থর গতিতে চলেছে। কারণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ৰুখ কবলে পড়েছেন অনেকে। এ অধীনও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

দীর্ঘ দিন সংবাদে উপর কোন আলোচনা হয়নি, তাই এবারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

এবারে এবলি প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলায় বোম্বাই দল বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাই ইতিপূর্বে আট বার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। ফাইনালে এবার বোম্বাই দল সার্ভিসেস দলকে এক ইনিংস ও ৩৮ বাণে পরাজিত করেছে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত ধার নিয়ে দেওয়া হল।

সার্ভিসেস—১ম ইনিংস ১৭১ (গাদকারী ৫৩, কঙ্কর ৫০, এস, ওয়াই বেগে ২১, উল্লিগড় ৬৫ বাণে ৪, বিলে ২৩ বাণে ৩ ও গার্ড ২৩ বাণে ২ উইকেট)

বোম্বাই—১ম ইনিংস—৩৫১ (৭উই: ডিক্লেয়ার্ড) ওয়াইকে বিলে ১৬২, তামান ৬৬, মন্ত্রী ৬২, কামাধ ৩৮, জগদীশন ৫১ বাণে ৩ উই: সুরেন্দ্রনাথ ৫০ বাণে ২ ও দানী ৪৭ বাণে ২ উইকেট লাভ করেন।

সার্ভিসেস—২য় ইনিংস—১৫০ (গাদকারী ৪০, দানী ৩৬ গণেশন ২৭, পাঞ্জবী ৫৭ বাণে ৫, উল্লিগড় ৫৭ বাণে ৫ ও হারদিকার ১ বাণে ১ উইকেট)

(বোম্বাই এক ইনিংস ও ৩৮ বাণে বিজয়ী)

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবারে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে রেল দল। রেল দল সমেত ভারতের প্রায় সকল রাজ্য ঋষি:শ্রুতিভিত্তম অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ঋষি:বিশ্বর, বিশ্ববিজয়ী হকি খেলার মন আজ নিয়ন্ত্রণ।

ভারতীয় রেল দল ও বোম্বাইএর মধ্যে যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে কিছুটা উন্নত ধরনের খেলা দেখাব সৌভাগ্য দর্শকবৃন্দের হয়েছিল বলা যায়। তীব্র উত্তেজনা এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলাটি নিষ্পত্তি হয় ২—১ গোলে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রেল দলের ইহাই দ্বিতীয় সাফল্য। ১১৩০ সালে রেল দল প্রথম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

মোহনবাগান দল অপরাধিতের জয়ন্তিলক পরে এবারও হকি লীগের চ্যাম্পিয়ান সিপ লাভ করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, মোহনবাগান দল উপর্যুপরি তিন বার অপরাধিত থেকে হকি লীগের চ্যাম্পিয়ান অর্জন সত্যি মোহনবাগানের খেলাধুলার ইতিহাসে ক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর এবার রাণার্স' হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

এবার নিয়ে মোহনবাগান দল ৬বার লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন

১।

এবারে বাইটন কাপ লাভ করেছে ইষ্টবেঙ্গল দল। ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। দীর্ঘদিন পরে কলকাতার দুইটি দল বাইটন কাপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার খেলার মাঠে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শক্তিশালী ফুটবল দল হিসাবে এত দিন ইষ্টবেঙ্গল দলের পরিচয় ছিল। ক্রমে ক্রমে সে সীমারেখা অতিক্রম করে ইষ্টবেঙ্গল দল গ্র্যাণ্ডেলিটাস স্পোর্টিংসে শীর্ষস্থানীয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবছরই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সর্বপ্রথম বাইটন কাপ লাভ করলো। এবছর বাইটন কাপের খেলায় মোট ৩০টি দল অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বাংলার বাইরের দল ছিল আটটি। শক্তিশালী দল হিসাবে একমাত্র উত্তর প্রদেশ ছাড়া, টাটা স্পোর্টিংস, পাঞ্জাব, সার্ভিসেস প্রমুখ শক্তিশালী দলগুলি এবারের বাইটন কাপের খেলার যোগদান করেনি। বাইটন কাপের প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি তিনবার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মোহনবাগান দল লীগের খেলায় মহামেডান দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। বাই হোক, বাইটন কাপের সংগে সংগে হকি খেলার উপর যবনিকা পড়ল।

কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছু দিন। লীগ পাঞ্জাব রাডে রাজস্থান দল ১৪টি দলের মধ্যে এখন অপরাধিতের সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মরুতমের প্রথম চ্যারিটি খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে ইষ্টবেঙ্গল দলের পরাজয় যেমন মহামেডান দলকে লীগ বিজয়ের পথ কিছুটা প্রশস্ত করে দিয়েছে, অপর পক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দল বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধে কোণঠাসা করে রাখলেও শেষ পর্ধ্যন্ত মহামেডান দলের কাছে ১—০ গোলে পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই দিন মহামেডান দলের অধিনায়ক সালাম ও ইষ্টবেঙ্গল দলের নবাগত খেলোয়াড় রাম-বাহাদুরের ক্রীড়ানৈপুণ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, আট, এক, কর্তৃপক্ষ ইনফ্লুয়েঞ্জার দোহাই দিয়ে খেলা বন্ধ রাখেন। ঠিক এই প্রকার অভূতান্তে খেলাধুলা বন্ধ রাখা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এর পিছনে নাকি কোন দুর্ভাগ্য আচ্ছ বলে শোনা যাচ্ছে। জানি না, এর কতটুকু সত্য এবং মিথ্যা।

এবারের প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হাওড়া ইউনিয়ন দল মোটামুটি খেলছেন। সূচনা ভাল হলেও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায় তেমন ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখা যায়নি। অতীতের খ্যাতিমান দল তার পূর্ব-সুনায অম্বারী খেলুক, এটাই ক্রীড়ামৌলীরা আশা করেন।



## গ্রন্থকার ও পাঠক

গ্রন্থকার ও পাঠকে সম্বন্ধ কি? এতদুত্তরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে আমাদের প্রথমেই গ্রন্থকার ও পাঠক শব্দের অর্থ বর্ণিত হইবে। গ্রন্থকার শব্দের অর্থ 'যিনি গ্রন্থন করেন'। গ্রন্থকার কি গ্রন্থন করেন? এতদুত্তরে বলা যায় যে, তিনি শব্দসমূহ গ্রন্থন করেন। মাসী যেরূপ মালা গ্রন্থন করে, গ্রন্থকারও সেইরূপ শব্দসমূহ গ্রন্থন করেন। শব্দসমূহ চিন্তার প্রতীক বা বাহন। যে শব্দে মনের কোন চিন্তা প্রকাশ করে না, সেই শব্দ অর্থহীন। গ্রন্থকার শব্দসমূহ গ্রন্থিত করিয়া বস্তুতঃ চিন্তাসমূহই গ্রন্থিত করিয়া থাকেন। আর পাঠক শব্দের অর্থ 'যিনি পাঠ করেন'। পাঠ করার অর্থ কি? ইহার অর্থ শুধু কতকগুলি অক্ষর দর্শন বা উচ্চারণ করা নয়। পাঠ করার প্রকৃতার্থ অর্থবোধ সহ অর্থসমূহের দর্শন কিংবা উচ্চারণ, বা অর্থবোধসহ অক্ষর সমূহের যুগপৎ দর্শন ও উচ্চারণ। অর্থবোধই পাঠক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। যে পাঠে অর্থবোধ নাই, সে পাঠ পাঠই নয়, উহা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ বা কতকগুলি অক্ষরের দর্শন মাত্র। অর্থবোধের অর্থ—পাঠক কর্তৃক গ্রন্থকার-লিখিত ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা, গ্রন্থকারের মনোগত ভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা তাঁহার চিন্তাবাণী চিন্তা করা। এইরূপে গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ দুইটি সঙ্গীর পরস্পর সম্বন্ধরূপে প্রতিলিপ্য হয়, গ্রন্থকার যেন কিছু বলিতেছেন, আর পাঠক যেন তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তখন তাহাদের সম্বন্ধ বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধরূপে বর্ণিত হইতে পারে। আর গ্রন্থকার যখন কোন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তখন গ্রন্থকার হন উপদেষ্টা, আর পাঠক হন উপদীষ্ট, সেইজন্য আমরা তাহাদের তৎকালীন সম্বন্ধ গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ-রূপে অভিহিত করিতে পারি। পাঠক যদি কোন গ্রন্থ বর্ণিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে গ্রন্থকারের ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি গ্রন্থকারের উক্তি সম্যক বর্ণিতে পারিবেন। নতুবা তিনি গ্রন্থকারের লেখার ভিত্তিার্থ করিয়া ফেলিবেন। সেইজন্য কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বর্ণিতে হইবে, পশ্চাৎ উহার উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করা যাইতে পারে, নতুবা পাঠক ঐ গ্রন্থের অপব্যাখ্যা করিয়া ফেলিবেন, তাহাতে তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন।

আমরা ইতিপূর্বে গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ দুইটি সঙ্গীর সম্বন্ধরূপে প্রতিলিপ্য করিয়াছি। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে সকলে চিন্তাকর্ষকরূপে তাহাদের বক্তব্য বলিতে পারেন না। কেহ হয়ত

সবস ভাষার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন, আবার কেহ হয়ত নীরস কিংবা ভটিল ভাষার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন। সেইরূপ কোন গ্রন্থকারের ভাষা হয়ত সবস, সবল ও সতেজ হয়, আবার কোন গ্রন্থকারের ভাষা হয়ত নীরস ও ভটিল হয়, ইহা গ্রন্থকারের স্বীয় ভাব প্রকাশের ভঙ্গির উপর নির্ভর করে; ভাষার সবসতা কিংবা নীরসতা আবার বিষয়ের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কোন গভীর তত্ত্বের বিষয়ে লিখিতে হইলে ভাষা সাধারণতঃ গভীর ও ভটিল হইয়া পড়ে, আবার নাটক, উপহাস প্রভৃতি তরল ভাবের গ্রন্থ লিখিতে ভাষা সাধারণতঃ সবস হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া গভীর তত্ত্বপূর্ণ লেখার ভাষা যে সবস হইতে পারে না, এমন কোন নিয়ম নাই। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ শঙ্করাচার্য-বিরচিত চণ্ডিকা-স্তোত্রের উল্লেখ করিতে পারি। এই স্তোত্র গভীর তত্ত্ব-প্রকাশক, অথচ ইহার ভাষা বেশ সবল ও সবস। এ সম্পর্কে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মোটের উপর, একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত লেখার ভাষা গভীর ও ভটিল হয়। ইহার প্রমাণ আমরা দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে পাইয়া থাকি। ঐ গ্রন্থ সমূহ নানা যুক্তিভালে বিস্তীর্ণ, আর ঐ যুক্তিভাল দুইতর শব্দে গঠিত। সাধারণ লোক ঐ সকল যুক্তিভাল ভেদ করিয়া সার গ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ লোক যেরূপ তরল মস্তিষ্ক, সে ঐরূপ তরল ভাবাপন্ন নাটক কিংবা উপহাস পড়িয়াই আমোদ পাইয়া থাকে। এই হেতুতে দর্শন, বিজ্ঞান, বাস্তবনীতি, ধর্ম ও গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থকারদের পাঠকের সংখ্যা খুব কম থাকে। পক্ষান্তরে, কাব্য, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থকারদের পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। যে বাহা হোক, পাঠকবর্গের সংখ্যাধিকা দ্বারা গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উৎকর্ষাপকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, Like will draw like. (সমান সমানেই মিলন হয়)। এই নিয়মামুসারে পাঠক যে প্রকৃতির, সে সেই প্রকৃতির গ্রন্থকারের প্রতি আকর্ষণ হয়, আর গ্রন্থকার যে প্রকৃতির, সে সেই প্রকৃতির পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করে।

গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া আ-  
হয়, গ্রন্থকার যেন দাতা, আর পাঠক যেন গ্রহী-  
পাঠককে চিন্তাবাণী দান করেন, আর পাঠক  
করেন, কিন্তু সকল গ্রন্থকার যুখে চিন্তাবাণী দা-

পারেন না। কোন গ্রন্থকার হয়ত ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে শায়িত থাকেন, আবার কোন গ্রন্থকার হয়ত দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে লাহিত হইলেন। কোন গ্রন্থকার হয়ত জীবদ্দশাতেই প্রভূত বশঃ, প্রতিগতি ও অর্থ লাভ করেন, আবার কাহারও ভাগ্যে হয়ত মৃত্যুর পর ঐ সকল বা উহাদের একতন জুটে বা জুটে না! বাহারা ইংরেজী সাহিত্যের সচিত্র পরিচিত আছেন, তাহারা জানেন ‘কবিজীবনী’ (‘Lives of Poets’) লেখক ডাক্তার জন্সন (Dr. Johnson) ও অমর কবি মিল্টন (Milton) জীবদ্দশায় কিরূপ অর্থকষ্ট পাইয়াছিলেন। বশঃ ও প্রতিগতি এই উভয় গ্রন্থকারই জীবদ্দশায় যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে অর্থাভাবে বড় কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালী ভাষার অমর কবি মাইকেলের জীবনও গ্রন্থকারদের দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগের দৃষ্টান্তস্থল নহে কি? কবির মাইকেল জীবনে যে কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া সুবিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন তাহার (মাইকেলের) মৃৎপলকে রচিত স্ব স্ব কবিতায় খেদ করিয়া লিখিয়াছেন,—

‘‘হায়, মা ভারতি, চিরদিন তোমার  
কেন এ কুখ্যাতি হবে?  
যে জন সেবিবে ও পদধূলি  
সেই সে দরিদ্র হবে।’’ (হেমচন্দ্র)  
‘‘কিংবা কটকিত হায়! যে বিধি কবিল  
গোলাপ কমল;  
সে বিধি পাষণ মনে দহিতে সুকবিগণে  
কবিত্ব-ধন্যতঃ নিল দারিদ্র্য-অনল।’’  
(নবীন সেন।)

ইংরেজীতে এই ভাবে একটি গাথা আছে, তাহা এই,—Most wretched men are craddled into poetry wrong, what they learn by suffering they teach in song. অর্থাৎ ভাগ্যহীন লোকেরাই ভুল বশতঃ কবিতার চর্চা করিয়া থাকে আর তাহারা দুঃখ-কষ্টে বাহা শিখে, তাহাই তাহারা সঙ্গীতাকারে শিক্ষা দিয়া যায়। এই উক্তি কেবল কবিদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। মোটের উপর, বাহারা ভারতীয় সেবা করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেন, তাহাদিগকেই অনেক দুঃখ-কষ্ট, নানা বাধা-বিপত্তি ভোগ করিতে হয়। গ্রন্থকারগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যের উপাসক, তাই তাহাদিগকেও অনেক সময় দুঃখ-দৈন্ত ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ইহা নিয়ম নয় যে, গ্রন্থকার মাত্রই দুঃখ-কষ্ট পাইবে। গ্রন্থ প্রণয়ন ও দুঃখপ্রাপ্তির সঙ্গে এমন কোন নিত্যসম্বন্ধ নাই যে, একটির বিস্তারিত অপরটিকে সূচিত করে। গ্রন্থকার যে জীবদ্দশায়ই প্রভূত ধনসম্পত্তি ও বশেষ অবিকারী হইতে পারেন, তাহার বসন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত বশঃ, সম্মান ও অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ বিজ্ঞানগর মহাশয়ও ‘গীতার বনবাস’, ‘শকুন্তলা’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত বশঃ, মন ও অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সসার সুখ-দুঃখ ভাগ্যবশত। ইহাতে গ্রন্থকার

চর্চা করেন, তাহারা পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রতি যেন একটু উদাসীন থাকেন। এই হেতু ঐ সকল জিনিষ তাহাদের ভাগ্যে যেন একটু কমই জুটে। তবে অদৃষ্টে সুখ থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিয়াও সুখ হইতে পারে,—গ্রন্থকারও সুখী হইতে পারেন। এখানে প্রশ্ন এই যে, গ্রন্থকার যদি নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও পাঠকে তাহার চিন্তাশক্তি উপহার দিয়া বাইতে পারেন, তবে পাঠকের গ্রন্থকারের প্রতি কোন কর্তব্য আছে কি? ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, গ্রন্থকার যেমন পাঠকে চিন্তাশক্তি দান করেন, পাঠকও তেমন গ্রন্থকারকে গ্রন্থের মূল্যস্বরূপে অর্থদান করেন, সকল পাঠকই মূল্য দিয়া গ্রন্থ ক্রয় করিলে বহু লোকে বিনামূল্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারে কোন একখানা গ্রন্থ থাকিলে বহু পাঠক সেই গ্রন্থাধ্যয়নে উপকৃত হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থাগারে পাঠকগণকে কিছু কিছু টাকা দিতে হয়, তাহা গ্রন্থকারের চিন্তাশক্তির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ চিন্তা বা ভাব দানের সঙ্গে অর্থদানের তুলনাই হইতে পারে না, তাহাধিক ঐ সামান্ত অর্থদানের। এতদ্ব্যতীত কোন কোন গ্রন্থাগারে পাঠকগণ বিনা খরচেই গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে পারেন, যেমন কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ও অগাধ গ্রন্থাগারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠক গ্রন্থকারকে তাহার চিন্তাশক্তির বিনিময়ে কি দিতে পারেন? তিনি দিতে পারেন তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। পাঠক যদি গ্রন্থকারের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কিছুমাত্র উপকৃত হন, তবেই গ্রন্থকার নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। মোটের উপর, গ্রন্থকারের দান সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাই পাঠক গ্রন্থকারের নিকট চিরদিন ঋণীতা বা ঋণী থাকেন, আর গ্রন্থকার পাঠকের নিকট চিরদিন দাতাই থাকেন।

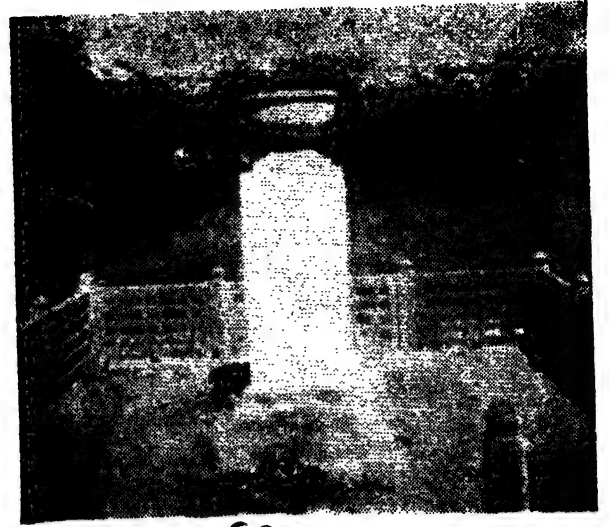
সকল গ্রন্থই পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিতে পারে না, আবার সকল গ্রন্থ এমন সমাদরও লাভ করে না। কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ কেবল সাময়িক ভাবে সমাদর লাভ করে, পরে হয়ত উহা অনাদৃত হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ চিরদিনই সমাদরপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের গ্রন্থ স্বদেশে সমাদরপ্রাপ্ত হয়ই, এমন কি বিদেশেও সমাদর লাভ করে। এ সকল গ্রন্থকার বাস্তবিকই ভাগ্যবান। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল, কালিদাস, দান্টে, নিউটন, শেক্সপীয়ার ও মিল্টন প্রভৃতি বাস্তবিকই ভাগ্যবান গ্রন্থকার। এ সকল গ্রন্থকার দেশ-কালের অতীত,—তাহারা সর্বদেশে সর্বকালেই পূজিত হইবেন।

পাঠকের উপর গ্রন্থকারের একটি স্থায়ী প্রভাব আছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়। এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রাম্যক। কারণ গ্রন্থকার একটিমাত্র কথা দ্বারা পাঠকের মনে, এরূপ গভীর ভাবের সঞ্চার করিতে পারেন, বাহা বাস্তবজীবন স্থায়ী হইতে পারে। গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ যদি গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায়, তবে গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া লাভ কি? আমরা গ্রন্থাধ্যয়ন কবি, উহা হইতে কোন স্থায়ী কলা লাভ করিবার জন্ত,—যেমন আমাদের চিত্র গঠনের জন্ত, অথবা এমন কোন জ্ঞানলাভের জন্ত, বাহা চিরতরে জীবনপথে আমাদের সাহায্য করিবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থই যে আমাদের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া বাইতে পারে, এমন কথা নয়, তবে এ কথাও অস্বীকার করা বাইতে



... এ সালের প্রচুদপট ...

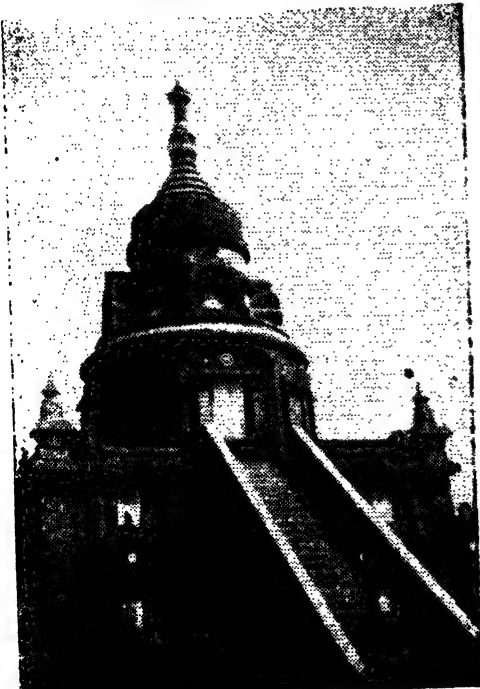
এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি আমামেয়ের আলোকচিত্র স্থাপিত  
করেছে। চিত্রটি কীরামকির সিংহ প্রতীক। ]



গান্ধী-হত্যাহল ( দিল্লী ) —কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়

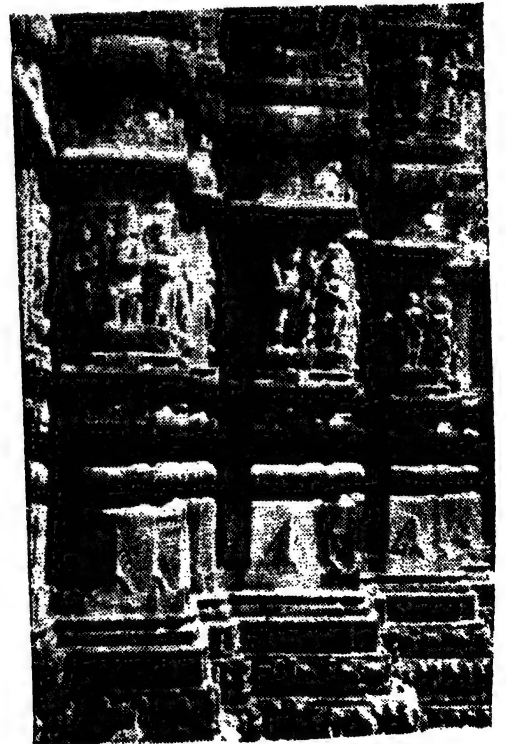
বুদ্ধগয়া ( বিড়লা মন্দির ) দিল্লী

—এস. এন. সরকার

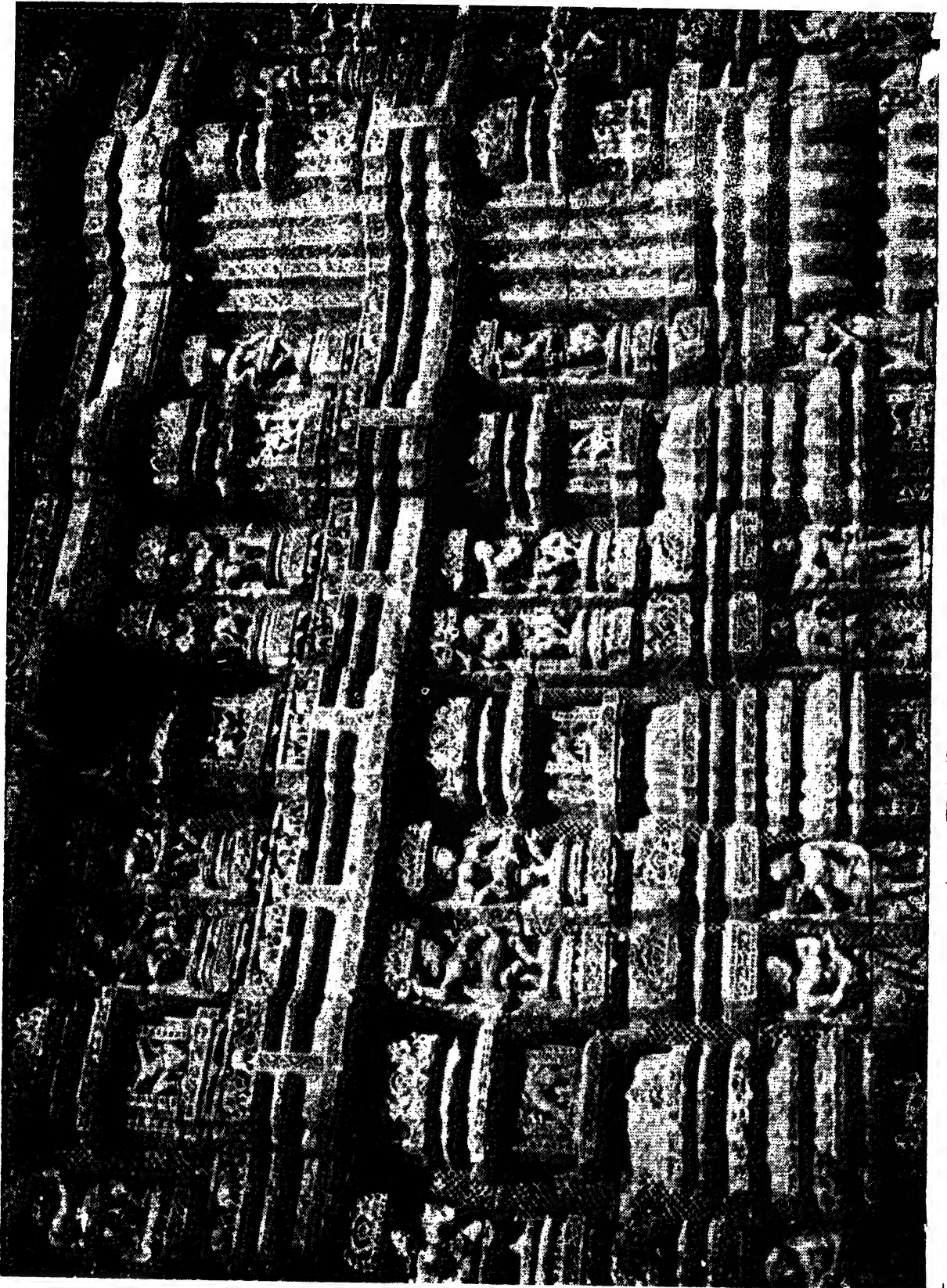


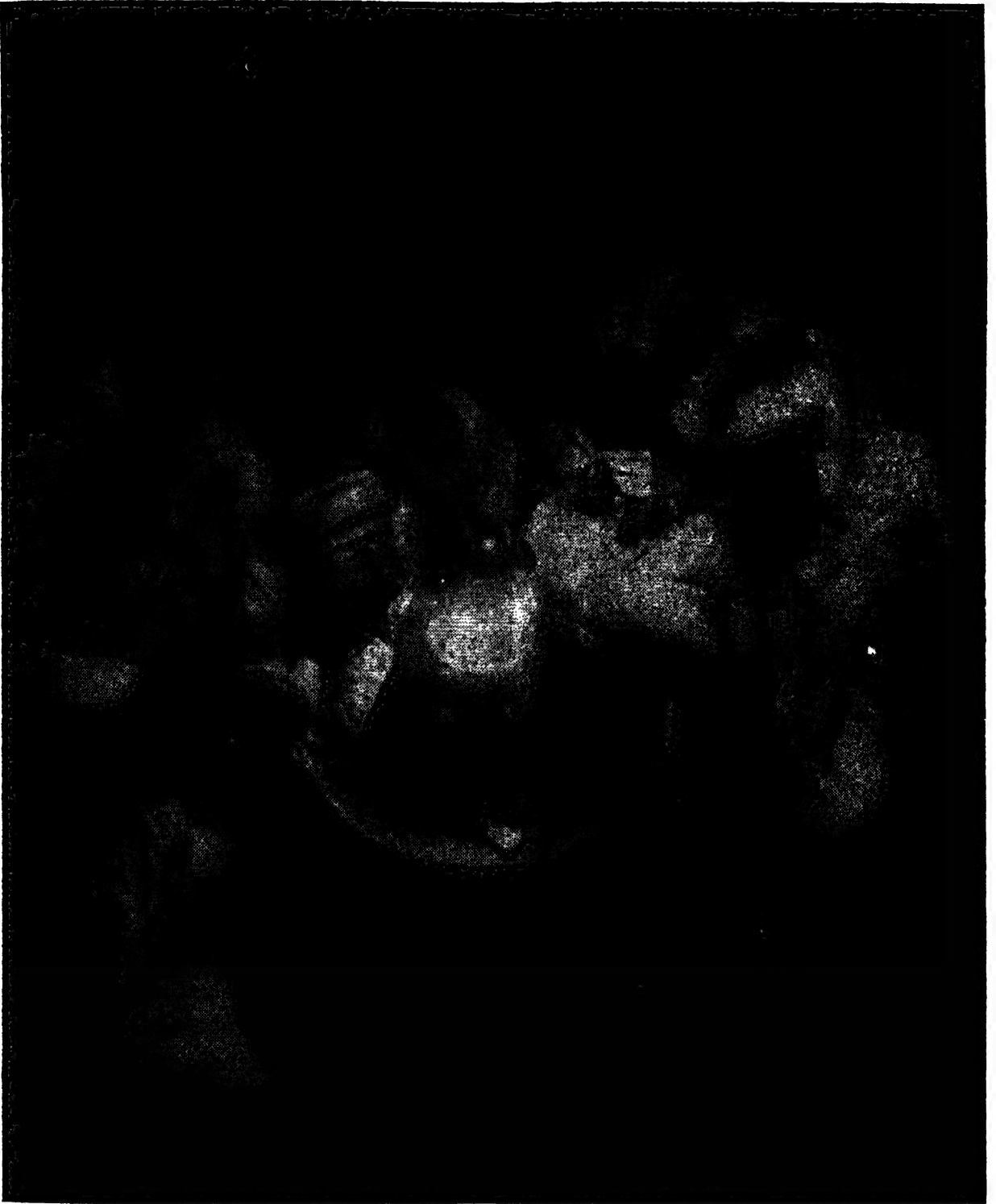
জগদীশ মন্দিরগাত্র ( উদয়পুর )

—বতীন্দ্রনাথ পাল









সাজঘর

—মীরেন অধিকারী

ঘরকরা  
—বর্ণজিৎ সোম



তাজোর মন্দির

—রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



পারা যায় না যে, প্রত্যেক গ্রন্থকারই পাঠকের মনের উপর একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যান। বাহ্য পাঠকের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি, যখন আমরা সময়োপযুক্ত করিবার জন্য কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, তখনও গ্রন্থকার আমাদের মনের উপর অস্বল্পে একটি প্রভাব বিস্তার করিয়া যান।

পক্ষান্তরে, কেবল গ্রন্থকারেরই যে পাঠকের উপর প্রভাব থাকে এমন নয়, পাঠকেরও গ্রন্থকারের উপর অল্পবিস্তর প্রভাব আছে। গ্রন্থকার যদি পাঠকে সন্মুখিত করিতে পারেন, তবে পাঠক সর্বত্র গ্রন্থকারের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, পাঠক যদি গ্রন্থকারের গ্রন্থে তেমন উপাদেশ কিছু না পান, অথবা গ্রন্থকারের গ্রন্থ যদি কুভাবে কিংবা কুচরিত্র কলুষিত হয়, অথবা তাহার গ্রন্থ যদি নানা লোকে ঘৃণিত হয়, তাহা হইলে সুদী পাঠক ঐকমুপ গ্রন্থকারের বশঃ না গাহিয়া ঘূর্ণাময় করিয়া থাকে। লোকেরই বা লোকে কি? সাধু লোকের প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকে, আর কুলোকের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে। প্রশংসা ও নিন্দা সকলেরই আয়ত্তাধীন। সংক্ষেপে চলিলে লোকে প্রশংসা করে, আর অসংক্ষেপে চলিলে লোকে নিন্দা করে। সেইরূপ যে গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থমধ্যে সৌন্দর্য্য, চরিত্র ও ধর্ম্মের ছবি কুটাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই জনসমাজে বশঃ লাভ করেন; আর যে গ্রন্থকার গ্রন্থের মধ্যে পাণ্ডার ছবি চিত্রিত করিয়া লোকের মন কলুষিত করেন, তিনি স্তনী সমাজের নিন্দাভাজন হন। ঐরূপ গ্রন্থকার দেশের কটকবৃক্ষ, প্রভাব আছে।—শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

কারণ তিনি গ্রন্থ প্রণয়নের উচ্চাশ্রয় (সমাজের মঙ্গল) বিশ্বস্ত হইয়া জনসমাজকে কুপথে চালিত করেন।

এরূপ গ্রন্থকার অনেক সময় কেবল সমাজের কৃতি অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন। সমাজের কৃতি অনুযায়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তিনি হয়ত খুব লাভবান হন,—বাজারে তাহার গুস্তকের হয়ত খুব কাটতি হয় কিন্তু কাটতি হইলে কি হইবে? ঐরূপ গ্রন্থের আদর বেশী দিন থাকে না। কারণ এক্ষণকারের গ্রন্থ সমাজের সাময়িক কৃতি অনুযায়ী ভাবে লিখিত হয় বলিয়া সমাজের কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহারও আদর কমিয়া যায়। বৎস, পাঁচকড়ি দের ডিটেকটিভ উপভাস সকল। পক্ষান্তরে, যে সকল গ্রন্থকার সমাজের কৃতির সাংশোধন করিয়া সমাজকে সংক্ষেপে চালিত করিতে পারে, তাহার বাস্তবিকই দেশহিতৈষী। এরূপ গ্রন্থকার সমাজের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যান। ইতিহাসে তাহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত থাকে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পাঠকের সন্মোচনা দ্বারা তৎকর্তৃক গ্রন্থকারের গুণকীর্তন বা নিন্দাবাদ দ্বারা গ্রন্থকারের বা লেখার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না; কিন্তু পাঠক কর্তৃক গ্রন্থকারের গুণগতি বা নিন্দাবাদ যে গ্রন্থকারের সন্মায় বা ঘূর্ণাময় অনেকটা বর্ধিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই হিসাবেই বলিতেছি যে, গ্রন্থকারের যেকোন পাঠকের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব আছে, পাঠকেরও গ্রন্থকারের উপর সেইরূপ অল্পবিস্তর প্রভাব আছে।—শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হরপ্রসাদ রচনাবলী

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজের অগ্রতম কর্ণধার ছিলেন সুলেখক, চিন্তাশীল মনোবী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আলোচ্য গ্রন্থটি শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র রচনার সংগ্রহের প্রথম খণ্ড। ইংরাজী এবং বাঙলায় তিনি অসংখ্য সাহিত্যসৃষ্টি করেন, যেগুলি এত কাল ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল নানা পত্র-পত্রিকায়। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত থাকায় এই সব মূল্যবান রচনা পাঠের সৌভাগ্য হয় নি আমাদের পাঠক-সমাজের। হরপ্রসাদের সাহিত্য অনুলসারূপ বিভিন্ন কারণে। কারণ, তিনি যেমন পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কুসংস্কারে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি, তেমনই তাঁর রচনামালাও নানা গুণের অধিকারী হ'লেও সেই সনাতননী ধাঁচে বচিত হয় নি। হরপ্রসাদ একদা তাঁর সাহিত্য-সেবার মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করেছিলেন, ইংরাজী-লিখার প্রসার যেন দেশকে উজ্জ্বল না ভাসাতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-প্রতিভা বহুবলী। তাঁর ভাবের আর ভাবার তত্ত্ব অদুরন্ত। প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ আরতনের বিপুল এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথম সস্তারের আভ্যোপাস্ত সম্পাদকের কৃতিত্ব বহন করছে। এই মহাগ্রন্থের বস্ত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। প্রতি খণ্ড মূল্য এগারো এবং পনেরো টাকা। ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী। ৬৪এ, বর্ধমান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

সে যুগের বাঙালী লেখকদের অধিকাংশই বাঙলা ও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সমান দক্ষ ছিলেন। ঠিক এই ধরনের জ্ঞানী ও গুণীদের প্রথম সারির মধ্যে স্থান দেওয়া যায় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে। তখন বাঙালীর গৌরবময় যুগ, বাঙলা দেশের নামে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদ্বার মাথা নোয়াতো। এই যুগের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ জন শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ "মেন আই হাভ সোন" এত কাল বাদে প্রথম বাঙলা ভাষার অনূদিত হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় এদেশের ও বিদেশের বহু বিখ্যাত মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে লাভ করেন স্বীয় প্রতিভার বলে। তিনি এমনই একজন বিশেষ মানুষ ছিলেন যে তাঁর প্রতিও আবৃত্তি হয়েছেন তদানীন্তন মহাপুরুষরা। আজকের যুগ কুটীর যুগ। আসলের যুগ অতীত হয়েছে এখন। আজকের বিভাস্ত তরুণ-তরুণী ও চপলমতি কিশোর-কিশোরীদের কাছে এই বইখানি এক অমূল্য সম্পদ হওয়া উচিত। বাঙলার গৌরবময় যুগের সাত জন জন্মর বাঙালীর এই জীবন-কালেখা থেকে বর্তমানের মানুষ অনেক কিছু শিক্ষালাভ করবে। আশোচ্য জীবনের মধ্যে বিভাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, আনন্দমোহন, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ডাঃ মহেন্দ্রলাল এবং দ্বারকানাথ বিজাভরণের কাহিনী স্থান পেয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য্য কন্যা মারা রায় এই গ্রন্থের যোগ্য্য অধ্বাব্য করেছেন। বইটির ছাপা, বঁধাই ও প্রচ্ছদপট যথাযোগ্য্য হয়েছে।

রাইটার' সিগ্ণিফিকেট। ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১৩।  
মূল্য তিন টাকা আট আনা।

### গ্রন্থবার্তা

বিদেশের সেবা সেবা গ্রন্থগুলির সারাংশ সংকলিত করে 'গ্রন্থবার্তা' নাম দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে পৃথিবীর সাহিত্য কোন পথে তার গতি পরিচালিত কবছে, সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এর থেকে জন্মাতে পারে। বিভিন্ন লেখক-লেখিকা সম্বন্ধেও যথাযোগ্য আলোচনা এখানে পরিবেশিত হয়েছে। সংকলকের চ্যেনশক্তি প্রশংসার যোগ্য। তাঁর সংকলক একেত্রিক নয়। বহুভূমিনী। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব আত্মজীবনী সবল বিষয়ক রচনাই সংকলক সীলভজ্ঞ এখানে সমান কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করে গেছেন। রচনার উৎকর্ষতা স্থানে স্থানে পার্শ্বচিহ্নকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। এ সবের গ্রন্থ নিশ্চয়ই পাঠকমহলে সাড়া জাগাবে, এ আশা আমরা রাখি, এই প্রসঙ্গে সংকলকের প্রকৃত নাম প্রকাশের কোঁহল আমরা চেপে রাখতে পারছি না। তাঁর নাম শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ভারতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১০ বি কলেজ রোড শান্তি লাইব্রেরী থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম চার টাকা মাত্র।

### উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

বাঙালী জাতি ও তার সাহিত্য উভয়েরই একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল আজ থেকে দেড়শ বছর আগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর উদ্যোগে। যে শতাব্দী বাঙলার শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি নব জাগরণ জীবনবোধ নতুন ভাবে গড়ে দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী বহন সব চোপ মেলে প্রত্যঙ্গ করছে পৃথিবীর আলো ঠিক সেই সময়ই বাঙালীর জীবনবোধ এক নতুন চেতনার রূপ নিচ্ছে, তার স্বরণ সব থেকে বেশী রূপ নিয়েছিল তৎকালীন সাহিত্যে। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন যেমন পরিশ্রম সাপেক্ষ তেমনই প্রশংসার যোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে সেই সংক্যাটি সম্পাদন করেছেন। বাঙালীর মানসিক জীবনের এই ইতিকথার যত প্রশংসা হয় ততই ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গল। কারণ অতীতের প্রতি বিশ্বাস আজকের দিনে এক বৈশিষ্ট্যের আকার ধারণ করেছে। এই গ্রন্থটির আমরা বড়ল প্রচার কামনা করি। ১৩ হা-হিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা মাত্র।

### মেরুপথের বাত্মী দল

বাঙলার কিশোরদের জগতে আশু রোমাঞ্চ বা শিহরণ সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি খুব সাড়া তুলেছে। কিন্তু সেগুলি নিতান্তই অসারভাষ্য ভরা। শ্রীপরিমল গোস্বামীর এই গ্রন্থখানি তারই ব্যতিক্রম সানন্দে ঘোষণা করছে। ভবিষ্যতের নাগরিকদের জীবন ভরা যে তৃষ্ণার প্রয়োজন লেখক তা সম্যক উপলব্ধি করেছেন, কৈশোরে মানুষের অমুসন্ধানের স্পৃহার হয় প্রথম উদ্বোধ, ভবিষ্যতে তাই তাকে টেনে নিয়ে যায় সমৃদ্ধির সিংহধারে। কিশোর মনে অদ্বৈতের বীজ বপন করেছেন লেখক এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে। সত্যিকারের শিহরণ

মানুষের মনকে গঠন পথে সহায়তা করে প্রদত্ত। লেখক এখানে তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পেরেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ রাইটার' সিগ্ণিফিকেট প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীমুখী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা মাত্র।

### নেহরু ও পররাষ্ট্র নীতি

একথা আজ অস্বীকার করার উপায় কোন মতেই নেই যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আচার্য জওহরলাল নেহরুর মত ব্যক্তিত্ববান পুরুষ সারা পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় জন নেই। আজকের সমগ্রা-সমুদ্র পৃথিবীতে, যেখানে সর্বত্র হতাশা, লোভ আর বিনষ্টির সুস্পষ্ট হাতছানি সেই বোকাবোকা বিখের বৃকে নেহরুজীর একটি মস্তব্য বখেই মূল্য বহন করে। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিকায় নেহরুজীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব আজ একটি সম্পদ-বিশেষ। ভারতবর্ষ আজ লাভ করেছে স্বাধীনতা, প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর স্বয়ং তার পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সহ অভিজ্ঞ, সহযোগিতা ও সহমুভূতি সম্বল করে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রভাব আজ বিশ্বের বৃকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন শান্তির মৃতমম উপাসক শ্রীনেহরু। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। লেখক—শ্রীঅনাদিনাথ পাল, ১ শ্রীমাচরণ দে ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপ্রফুল্লদ-কুমার প্রামাণিক। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

### মাটিঘেঁষা মানুষ

বাঙলার কথাসিদ্ধজগতে একটি আলোকোজ্জ্বল আসনের অধিকারী স্বামী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত একটি কাহিনীর সম্পূর্ণতার পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন কৃতী সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। মাসিক বঙ্গমতীর পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থের কিয়দংশের সঙ্গে পরিচিত। নিগীড়িত মানবাত্মার জন্তে ক্রন্দনে, জীবনের নবতর চেতনার সন্ধানে, অন্তরের মূল সত্যের বখোচিত উদ্ঘাটিত গুহাটি আকর্ষণীয়। নারী-জীবনের বিচিত্র স্পন্দন ও ভ্রমুভূতি সার্থক রূপায়ণ লেখনী দ্বারা এই মধ্যাদা বৃদ্ধি করে। ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ডি, এম, লাইব্রেরী থেকে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

### নাজান্স ও তার বন্ধুদের অভিযান

কল দেশের সাহিত্য এত কাল বলতে গেলে বাঙলা দেশের শিশুদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু এবারে সে বাঙালী ছোট-ছোট পাঠক-পাঠিকার সাথেও পাতাতে চাইছে মিতালি, দুটি দেশের সাহিত্য পদস্পর্শ পরস্পরকে ভরিয়ে তুলতে চাইছে আন্তরিক শুভ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। শিশুদের জন্তে এই গ্রন্থটি মূল রচনা করেছেন নিকোলাই নসোব। রাশিয়ার সাহিত্য ক্ষেত্রে এই উনপঞ্চাশ বছরের সাহিত্যিকের প্রবল প্রভাব বহুর অভিমত মত ভাবে করতে সমর্থ হয়েছে তাঁর রচনা। সহজ, প্রাচল ও ছন্দোময় ভাষায় বাদের জন্তে লেখা তাদের অন্তরের বেক্সহুলে অধিকার করবে এর বক্তব্য। মনোহর ভঙ্গীতে লেখা এর কাহিনী সর্বত্রই দেবে



পরিভূক্ত। অম্বাবাদক শ্রীজয়কুমার (মূল রূপ থেকে) ও কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হয়েছেন বলা যায়। ১৩-এ খ্যাতলা ট্রিটস ইন্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী থেকে শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা মাত্র।

### রক্তরাগ

সুসাহিত্যিক শ্রীদেবশ দাশের 'রক্তরাগ' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। দেবশ দাশ ইতঃপূর্বে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়ে বাঙালার সাহিত্যকে ক্রমাগত পুষ্ট করে এসেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটিও যথেষ্ট মূল্য বহন করে। সাময়িক পটভূমিকায় এর কাহিনীর সারমর্ম হয়েছে রচিত। সাময়িক জীবন সম্বন্ধে বর্তমান দিনে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আলোকপাত করার সর্বশেষ প্রয়োজন। সাময়িক জীবনেও যে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার জোয়ার চলে, লেখনী দ্বারা তার প্রকাশ দেবশ বাবুর সুনিপুণ কৃতিত্বেরই ঘোষণা করে। একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি অর্চ্য রাষ্ট্রপতি-প্রসাদের স্বাক্ষরসহ বাঙলায় লেখা ভূমিকাটি গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বুদ্ধি করেছে। ১৩ হারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম চার টাকা মাত্র।

### ননীগোপালের বিয়ে

নীলকণ্ঠ বিরচিত "ননীগোপালের বিয়ে" দীর্ঘদিন বাদে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ হাসির উপজ্ঞানের অভাব দূর করবে। মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয় লেখক নীলকণ্ঠের প্রথম আকর্ষক আত্মপ্রকাশ মাসিক বহুমতীর পাতাতেই "চিত্র ও বিচিত্র" মারফৎ। বর্তমানে তাঁর আরেকটি ধারাবাহিক রচনা মাসিক বহুমতীতেই চলছে: অদ্ভুত ও প্রত্যহ। ননীগোপালের বিয়ে শেষ বা ব্যঙ্গমুখী ব্যাঙ্গাত্মক বই নয়। নির্মল হাসির, পরিচ্ছন্ন কৌতুক, কথার চেয়ে বেশী সিঁচুয়েশ্যাত্মক; ওডহাউস-টাইপের হাসির উপজ্ঞাস। হাসার এবং ভালোবাসার যুগলং আদি ও অনাদি রসের যুগল গঙ্গা-বহুনার হাবুদু খেতে কান্নারই আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকাশক: সাহিত্য ভবন। দাম: দু'টাকা বারো আনা।

### মধ্যবিভ

দেশের মধ্যে বিরাট অংশ জুড়ে আছেন মধ্যবিভ সম্প্রদায়। দেশ ও দেশ বলতে তারাই। কিন্তু তারাই আজ সহিসুতার মূর্তি প্রতীক। অভাব আর অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী, অস্বাচ্ছন্দ্যই বেন তাদের যাত্রাপথ-প্রদর্শক। এদের হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতির কোন মূল্যই তথাকথিতদের কাছে পাওয়া যায় না। সে সব জায়গার দেওয়াল এত মোটা যে এদের আবেদনে ব্যর্থতা বরণ করেই ফিরে আসে। অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করে সেই সত্যই এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন বনফুল। যমুনা, কুঙ্গর, ললিতা, নকুল, সহদেব, শিবাজী, পরিতোষ প্রতিটি চরিত্র যথেষ্ট মূল্য বহন করে। ১৩ হারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দু'টাকা মাত্র।

### অঘটন আলো ঘটে

তথাকথিত বিজ্ঞান আজ বত প্রসারই লাভ করুক, বত অসম্ভবই সম্ভব হোক, তার কুণার ভারতের সনাতন যুগ থেকে যে অলৌকিকত্ব

কালে কালে বহমান হয়ে এসেছে, তার মহিমার কাছে বিজ্ঞানের গরিমার কোন স্থানই নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বিরাট শক্তি জগতকে তার প্রতিবুদ্ধির যাত্রাপথে পরিচালিত করছে সে রহস্য বিজ্ঞান ধরতে পারে না বলেই তার উপর নিজের মহিমাকে সে তুলে ধরতে চায় কিন্তু সেখানেও সে পরাজিত। লোকচক্ষে কখন অগোচরে যে অলৌকিকতার মহিমা প্রভাব বিস্তার করে ফেলে তা বোধ হয় বুঝেও বোঝা যায় না। এই সত্যকে কেন্দ্র করে 'অঘটন আলো ঘটে'র কাহিনী রচিত। কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে সেই ঐশ্বরিক অলৌকিকতার অস্তিত্ব স্বীকার করে সেই উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছেন লেখক। বর্ণনার অপরূপ ভঙ্গী, লেখনীর সজীবতা পাঠকচক্ষে প্রভূত আনন্দ দেবে। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দিলীপকুমার যে যুক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে করে তাঁর নৈসর্গিক প্রতিভার পরিচয় আরও গভীর ভাবে ফুটে ওঠে। ১৩ হারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে চার টাকা।

### প্রাণ-গঙ্গা

বাংলা ও কাব্যধর্মের সমন্বয় প্রাণ-গঙ্গা শুলেখক অবিনাশ সাহার একখানি সার্থক উপজ্ঞাস বলা চলে। বৃহৎ উপজ্ঞাসের যে সকল গুণ থাকে উচিত এই বইটিতে তা সবই আছে। পটভূমিকা পূর্ববাঙলার গ্রাম নদী বন। নিশির পাগলকরা বাঁশের বাঁশী ঘরে থাকতে দেখে না ময়নাকে। মুগোমুখি বসে ছাঁজনে, চুরি-করা খাবার খায় আর ননের আনন্দে গান গায়, দৌড়ঝাঁপ দেয় মাঠময়। একজন অন্তর্যম্মকে পাতার মুকুট পরিয়ে দেয়। ময়নার খোঁপায় ওঠে কাশফুল। ছোটবেলার খেল'র সাথে জীবনসাথী হয়ে পাশে এসে কাঁড়ায় একদিন। লেখকের ভাষা, বর্ণনা এবং চরিত্রসৃষ্টি বেশ হৃদয়গ্রাহী। বইখানি সকল পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। প্রকাশ মহল। ৬ বক্স চাটাজুড়ী ট্রাট। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

### চীন থেকে ভারত

পৃথিবীর বহু দেশ থেকে পর্ধ্যটক এসেছেন এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। হিউয়েন চোয়াং এসেছিলেন চীন থেকে ভারতে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সুপণ্ডিত ববীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হিউয়েন চোয়াং এর লিখিত বিবরণীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করায় তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এই অতিগাঢ় চৈনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথিবীর অজ্ঞাত ভাষায় ইতিপূর্বেই অনূদিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে এই প্রথম ভাষান্তর হয়েছে বাঙলায়। হিউয়েন চোয়াং ধর্মদক্ষানী ছিলেন, ভারতে বৌদ্ধযুগের কীটিকলাপ দেখে তিনি বিস্ময়ে স্তব্ব হয়েছেন বারে বারে। চীনা পর্ধ্যটকের সেই কষ্টকর তীর্থ পরিক্রমায় বৌদ্ধতত্ত্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টা সফলগত। হিউয়েন চোয়াং ইতিহাসের তত্ত্ব ভান্নাতে কোথাও কোথাও ভুল করলেও, তাঁর বিবরণে পর্ধ্যটকের সহিযুক্ত, আত্ম-অধঃসায় পরিস্ফুট। এই বিবরণ আমাদের কাছে সত্যি এক মূল্যবান দলিলস্বরূপ। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ প্রথম শ্রেণীর। শিল্পী হৈমন্তী সেনের আঁকা প্রচ্ছদচিত্র অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩, গ্রামাচরণ .স. ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

# শ্রীতে রাঘবেন্দ্রশূন্য

শ্রী অজয়েন্দ্রনারায়ণ রায়

আমার দিদিমা অর্থাৎ রাঘবেন্দ্রশূন্যর ত্রিবেদীর মাকে আমরা ডাকতাম পদ্মা নামে। একদিন গল্পছলে জিজ্ঞেস করলাম—পদ্মা! আমার বড় মামার ছেলেবেলা থেকে কী খুব বুদ্ধি ছিল? তখন থেকে কী মামার পড়ায় খুব মন ছিল?

—বখন পাঁচ বছর বয়স রাঘবের, হাতে খড়ি মিলায়। তখন তার কথা জাম হয়ে মুখ থেকে বার হয়নি। কাণ্ড জাল করে পরতে দেখেনি। তখন তার বাবারা বললেন—আর এক বছর যাক, তার পদ পড়া বরাবো। ছ' বছর বয়সে তার বাবা তাকে পড়াতে আরম্ভ করতেন। ঠিক দু'দিনেই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ করলে। আশ্চর্য্য হয়ে রাঘবের বাবা বললেন—এ ছেলে আশিষ্য। আগে জগো সব শেষ করে এসেছে। তখন খুশী দেখে কে আমাদের!

বাড়ীতে তখন এই একটা ছেলে রাম। তার তখন খুব আদর। বাবা ছেসে পড়িয়ে এসে বলতেন—ও ছেলেকে ত আর আমরা পড়াতে পারি না। ও ছেলে জিজ্ঞেস করছে—“ম” কে “মো” বলছেন। মরণ এর উচ্চারণ মোরণ। মরণ বলবো কেন বুঝিয়ে বলুন!! কী উত্তর দেবো ভেবে পাই না। অন্নদা পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পেলো না ছেলে।

তখন তার বাবারা তর্কি ক'রে দিলেন রাজা নরেন্দ্রনাথগণ ইষ্টুলে। অন্নদা পণ্ডিতের হাত দিয়ে বলে দিলেন এর উপর নম্বর রাখবেন।

সাত-আট বছর যখন রাঘবের, তখন ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। দেশের স্বাধীনতার লজ্জা যে সব বীর প্রাণ দিয়েছেন, তাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের কথা বলতেন। রাম তখন যেন গিলে খেতো। রাম তার বাবা উঠতে চাইলে উঠতে দিতো না। বলতো—আরও বলুন! তার বাবা কখন কখন জিজ্ঞেস ক'রে বুঝে নিতেন ছেলের মনে আছে কিনা। খুশী হতেন ছেলের বলা শুনে।

আমরা কোন কোন দিন গিয়ে দেখতাম, রাঘবের বাবার ছেলে পড়ান। সে যেন একটা কী ভদ্রী! হাত নড়ছে বাবার জোরে জোরে। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বেরছে। ছেলের চোখে লস। আমরাও শুনে শুনে অস্থির হয়ে উঠতাম। ছেলে জ্বর-গায়ে ইষ্টুল এসে কাঁপছে। অন্নদা পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন—তুমি জ্বর-গায়ে কেন রাম? উত্তর এলো ও এখনি ছেড়ে বাবে পণ্ডিত মশায়। তখনই ধরে এনে আমাদের দিয়ে গেলেন। আমি বললাম—রাম জ্বর-গায়ে ইষ্টুল যায়? তখন রাম যা বললে শুনে হেসে বাচিলে। ঠিক যেন বুড়ো—আমি নতুন বাটির ঘাস কাটবো না কি? একটু জ্বরে শুয়ে থাকবো কেন? হাজার বাবারা বললেও শোনে না, ইষ্টুল বাবেই।

খুব জ্বর বয়সে রাম আঁক কষতো খুব ভাল। পদ্মা জিজ্ঞেস ক'রলেন—হা রে। আঁকের সঙ্গে আর একটা কী পড়া হয়? বললো জ্যামিতি। এই জ্যামিতিতে পণ্ডিত দিকেও হারিয়ে দিতো।

পণ্ডিতবা এসে বাবুদের কাছে গল্প করতেন। রাম জানতে পারলে পণ্ডিতদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ব'সতো—আমার বিজ্ঞাত আপনাদের কাছেই। এই বকম শুদ্ধ কথা শুনে তার বাবারা হেসে খুন।

রাঘবের বাবা জ্যোতিষী বিজ্ঞার বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঠিক সন্ধ্যা লাগলেই মাহুরের উপর ব'সে বুঝাতে লাগতেন। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে—এ দেখ চাঁদ্রাপথ। এই উত্তর দিকে আছে ঐ নক্ষত্র। এই এখানে সন্ধ্যা তারা উঠে। আর সব মনে পড়ছে না ভাই। যা দেখিয়ে দিতেন একটা যদি ভুল হ'তো রাঘবের। সেই দেখে তার বাবার খুশী কতো।

কখন কখন ছেলের বাবা শিক্ষা দিতেন—কখন চুরি ক'রে ভাল চষে, পাশ করবাব চেষ্টা করবে না। মন দিয়ে পড়বে। পড়ার সময় কখন কাঁকি দেবে না, তাহলে নিজেই কাঁকি পড়বে। এ সব কথা রাম মনোযোগ দিয়ে শুনতো।

একদিন রাঘবের বাবা ছেলেকে সকালের দিকে খেলা করতে দেখে ভাবলেন—এবার ছেলের সব শেষ। এতো মনে করলাম কতো ভাল হবে!! দুঃখ ক'রে ছেলেকে বললেন—এই সময় কী খেলার রাম? আমি তোমার উপর অনেক ভরসা ক'রেছিলাম। রাম কাঁড়িয়ে থাকলো চুপটি ক'রে। মুখে কোন কথা নাই। তখনই রাম বাবার পায়ে উপর পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো, বাবা! আপনি পরীক্ষা নিয়ে দেখুন পড়া শেষ ক'র গিয়েছি কি না। তখনই বাবা পরীক্ষা নিয়ে জানলেন, ছেলে সত্যি পড়া ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে। তখন ত'ৎ বাবা খুশী হ'য়ে ন বছরের ছেলের কাছে নিজে ক্ষমা চাইলেন। আর যাবে কোথা! রাম বাবার পায়ে উপর প'ড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো—আর ব'লে চ'ললো বাবা! আপনি ক্ষমা কথা তুলিয়ে নেন। কী করেন, বাবাকে তখন রামকে কোলে তুলে নিয়ে ব'লতে হলো—তুলিয়ে নিলাম বাবা! সেই কথা এসে বলল রাঘবের বাবা আর হাসেন। এতো কম বয়সে ছেলের এমন বুড়ামি কথা কখনো শুনেছো!

আর কিছুদিন পরে মেকেন্সি সাহেব এলেন মেমো ইষ্টুলে পরীক্ষা নিতে। তিনি এসে ক্লাসে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কোন উত্তর পান না। তখন রামকে প্রশ্ন করলেন—গজাম কোথা বল ত খোঁকা? রাম উত্তর দিলো—মাদ্রাজ প্রদেশের একটা জেলা। তার প্রধান সহরের নাম কী?—বহরমপুর। তখন প্রশ্ন ক'রলেন সাহেব তোমাদের এই বহরমপুর আর ঐ বহরমপুর তফাৎ কী? তখন রাম বললে—আমাদের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর আর ওটা মাদ্রাজে। সাহেব খুশী হ'য়ে রাঘবের পিঠে হাত বুলতে লাগলেন। বার বার প্রশংসা করে বললেন—তোমার মত একটা ছেলেও আমার চোখে পড়েনি। তুমি খুব মন দিয়ে পড়বে খোঁকা! সারা ভায়তের মধ্যে একজন হবে।

রামকে দেখে মনে হ'তো আলা-ভুলো। তার কাছার ঠিক নাই। কিন্তু তার বই-দপ্তর ঠিক স্থানে থাকতো, একটু যদি নড়চড় থাকে।

## স্বাস্থ্য কথন...

এখন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল বখন লোকে ঘি খাবার জন্তে খার করতেনও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই ঘি খাবার কোন কথাও নয়। তখন সপ্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপরিখ্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। হুথের সাথ খোলে মেটাবার কথা তখন ভেঁটতোই না।

এখন দিনকাল বদলেছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথার দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিবা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্নিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি হুহুহু কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার ভুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটখাটুনি ও হুশিষ্টাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার,

HVM. 293A-X52 BG

গিরীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। হুতরাং ঋণ? কথা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা মোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজিতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে মোজা একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে হুত্রে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কখনেই বা মোজা আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিভী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্তে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাটি ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিত মনে ডালডা বনম্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাটি গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমাণ ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্তে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাটি ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদা শীলকরা টিনে খাটি ও তাজা পাবেন। এই সব কারণেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনম্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

কেউ হাত দিয়ে এবার ওধারে রাখলে রকে নাই। কেঁদে আকুল। কেউ যদি ছোটো চারটে পরসী দিতো রামকে, আমার কাছে রেখে দিতো। হিসাব তার ঠিক ঠিক রাখতো। হু পরসী তা থেকে খরচ ক'লে অনেক বলে ছেলেকে বুঝাতে হ'তো।

মামার খেলার কোন সখ ছিল কি না পদ্ম-মা? জিজ্ঞেস করতেই বললেন—ছেলেদের মত দৌড়াদৌড়ি ক'রতে কখন পারতো না। ব'সে ব'সে মাটিতে দাগ কেটে—বাঘবন্দী না হয় ছজ্জা পজা খেলতো। বাবা বা বলতেন—ও সব খেলা ভাল নয় ছেলের। আমাকে দিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রতেন। বললে শুনতো না রাম। এই শুনে তার বা নিজে একদিন বললেন। সেই থেকে বাঘবন্দী খেলা করতে আমি জীবনে দেখিনি। তোমরা বড় হয়ে ত দেখেছা তাস খেলতে তোমাদের মায়ের সাথে, জিতলে কী খুশী! যেন ছেলেমানুষ! এ তো তোমাদের নিজের চোখে দেখা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রাম প্রথম হয়ে পাশ ক'রলো। সে কী মুখ তখন বাড়ীতে। ছেলের বাবা ও ছোট-বাবা অনেক ভুল্ললোক ও রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নুতন বাড়ীতে এনে খাওয়ালেন। রাজা এসেই ছেলেকে ভাল করে দেখে বললেন—বাবুসাহেব! তোমার এই ছেলেটি আমার ভক্ত রাখিবে। এর বিয়ে দেবো ইন্দুর সঙ্গে। রাজার ছোট কন্যা নাম ইন্দুপ্রভা। ছেলের বাবা বললেন—এ তো আমার ভাগ্যের কথা। এতো বড় মুক্কার আর কোথায় পাবে?

আমাদের বাড়ীর সামনে যে ফুলবাগান আছে, এটা ক'রেছে আমার ছেলে রাম আর তার ছোট-বাবা উপেন্দ্র বাবু। দু'জনে বসে কত পরামর্শ। তার ছোট-বাবা ত বলতো রামের পরামর্শ নিয়েই ত বাগান তুলেছি। কেও জল দেবার না থাকলে ছোট বালতি করে সে নিজেই ছোট হাতে জল তুলেছে! কখন বলেছে ছোট-বাবা, এবার কামিনী গাছ ছাঁটতে হবে। তখন দেখেছি সত্যি এত দিন কাটা উচিত ছিল।

পদ্ম-মা! মামা বাত-দিনই পড়তেন? না জীবজন্তু নিয়ে কখন কখন থাকতেন? হেসে পদ্ম-মা তখন আরম্ভ করলেন—রাম বাড়ীতে ঢুকলে, ছোটো রাজহাঁস বাড়ীতে ছিল ডাকতে লাগলো। যেন তারা কতো রামের বন্ধু। সকলকে পায়ে কামড়ে ধরতো। কেবল তার সঙ্গে খেলা করতো। ছোটো ভাত হাতে করে কেবল দিতো। আমরা নবাবের সময় শিবা ভোগ দিতে গেলে রাম পিছু পিছু সঙ্গে যেতো, হাঁ করে চেয়ে দেখতো কখন শিবা-মা এসে থাকে। তখন জিজ্ঞেস করতো বুড়ার মত—শেয়ালকে তোমরা শিবা-মা বলতেন? কী উত্তর দেবো ভেবে পেতাম না। হাসির কথা বলি শোন—একটা কুকুরের নাম দিয়েছিল রাম কালটা। নিজে হুণ না খেয়ে সেই কালটাকে খাওয়াতো। তার মুখে চুমো খেতো রাম। দেখে তার বাবারা দুঃখ ক'রে বলতেন—হাঁ রাম! তোমার ঐ কুকুরটা কী ভাই? নিত্য গিয়ে রামকে রেখে আসতো ইকুলে আবার নিয়ে আসবার সময়ও কালটার ঠিক জানা ছিল। কী ঘাণের! রাম শিকার দিয়ে বলতো—কালটা

কখন ভাত খাবি না হেঁসেলে ঢুকে। নিত্য স্নান করে এসে ভাত খাবে, বেশ। শুনতো ও রামের কথা। একদিনও হেঁসেলে মারেনি। নিত্য স্নান ক'রে এসে ভাত খেতো। সেই কালটা মলে কী রামের দুঃখ! দুদিন ছেলে ভাত ছুঁলো না, ইকুলে গেল না। তার পর রাম বললে—আমি আর জীবনে কুকুর পুষবো না। সেই থেকে কিন্তু কুকুর আর পোষেনি রাম।

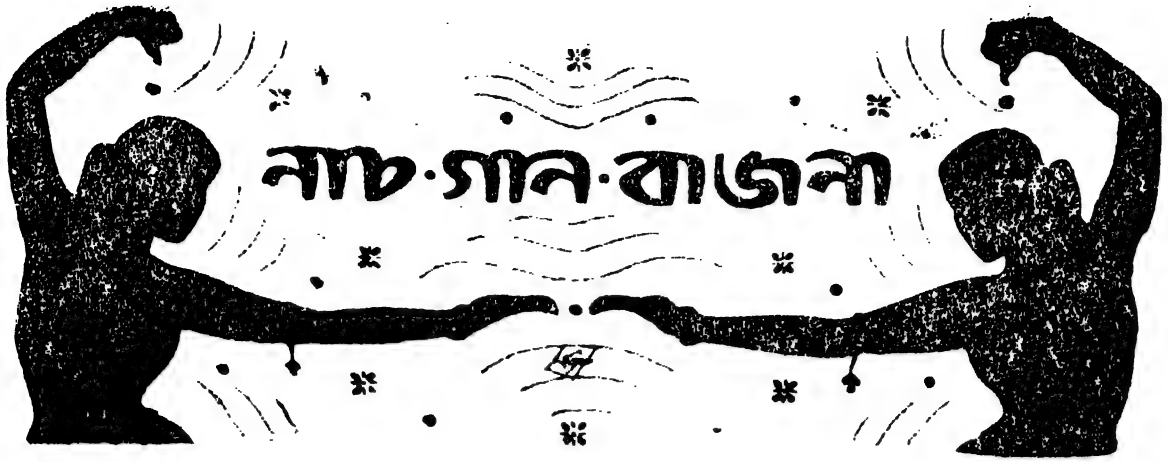
বাড়ীতে ইংরাজী কয়েক দিন পড়িয়ে কান্দীর ইকুলে ভর্তি ক'রে দিলেন রামকে। তার বাবারা হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে বললেন—ছেলেকে দিয়ে গেলাম একটু দেখবেন। সে বার রাম ভাল ইংরাজী জানতো না বলে দ্বিতীয় হলো, তখন আমাদের নতুন বাড়ীতে মরা কান্না—ছেলে বলল, এবার দেখবেন, আমি কখন আর সেকেও হবে না।

তার পর থেকেই পড়া কেমন জিনিষ দেখিয়ে দিলো রাম। দিন নাই রাত নাই পড়া। ভালুকের বাজি হচ্ছে, কতো ছেলে হাজির সদর আউনেতে। তখন রাম পাঠে নিরত। বাবারা থিয়েটারের বিহাসার্সাল দিচ্চেন। ঘর-বাড়ী গুম-গুম করছে বাজনার আওয়াজে, ছেলের খেয়াল নাই, ঘরে ব'সে কেবল পড়া। সেদিন বাবাদের থিয়েটার, ছোট-বাবা ছেলেকে নিমন্ত্রণ করলো রামকে; তবে রাম সেখানে উপস্থিত হলো। একদিন তার বাবা গিয়ে দেখেন কী বই পড়ছে ছেলে। দেখে অবাক! যত সব কঠিন বই সাহেবদের। তখন থেকে রাম আর দ্বিতীয় হয় নি। সে বরাবর প্রথম হয়ে উঠে।

রাজা আর থাকতে না পেরে নিজের ছোট মেয়ে ইন্দুপ্রভার সঙ্গে বিয়ে দিলেন রামের। বৌমা এসেই দেখলো আর এক রাজকন্তে মারা গেল। তিনি মরবার সময় বলে গেলেন—আমি একজনকে দিয়ে গেলাম। তখন রামের বয়স চোদ্দ বছর। হেডমাষ্টার বলেছিলেন—এবার ছেলের মাথা খাওয়া গেল আর পড়া হবে, না ছাই হবে। প্রথম শ্রেণীতে উঠে রামের চক্ষু স্থির! তার বাবা মারা গেলেন। তিনি শুধু বাবা নন তার, বন্ধু তার; খুব আপনার জন তার, খেলার সাথী! রাম একেবারে ভেঙে পড়লো। পড়া ছেড়ে দিয়ে কিম হয়ে ব'সলো। তখন কতো বোঝায় তার ছোট-বাবা উপেন্দ্র বাবু ছেলে কি বোঝে! তখন উপেন্দ্র বাবু ছেলের মাথায় হাত বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—দেখ বাবা! তোমার বাবা ব'লে গেছে। তুমি ভাল হয়ে পাশ করবে, মানুষ হবে। সে কথা মনে আছে ত আজ স্বর্ণ থেকে তিনি সব দেখছেন। তুমি না পড়লে ত্রির্দীর্ঘ কাঁদবেন। তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁকে কষ্ট দেবে!! তখন রাম যেন ঘুম থেকে উঠলো। সব জড়তা ঝেড়ে আবার পড়তে আরম্ভ করলো সেই আগেকার দিনের মত। সে বার পরীক্ষা দিয়ে সব চেয়ে ভাল হলো। বৃত্তি পেলো সকলের চেয়ে বেশী।

রামের চোখে জল। সেই দেখে বাড়ী শুদ্ধ সকলে কেঁদে উঠলো। হয় তো মনে পড়েছে বাবার কথা! [ ক্রমশঃ





## রাগসঙ্গীতে সময়

### শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতের সঙ্গে সময়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্পীগণ সচেতন। তাহা সঙ্গীত-শাস্ত্র গ্রন্থগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। 'সঙ্গীত' শব্দে এক্ষেত্রে আমরা কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতই উল্লেখ করিব। শিল্পীরা উপলব্ধিই শাস্ত্রকার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কাজেই এই উপলব্ধির মূলে কোন বাস্তব তত্ত্ব নিহিত আছে কি না তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কোন ওস্তাদ গায়ক অথবা বাদককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "প্রাতঃকালে কেন বেড়াগ বাগ গোয়া হয় না বা যায় না—অথবা সায়াংকালে বা কেন ভৈরো? গোয়া হয় না?" তাহার উত্তরে তিনি হয়তো বলিবেন—(১) "শাস্ত্রের বিধান নাই," অথবা (২) "শাস্ত্রের বিধান আছে, আমরা মানিয়া চলি, কারণ বলিতে পারি না"—অথবা (৩) "তাদৃশ পৌড়াপীড়ি করিলে হয়তো বলিবেন (৪) "ও সব শাস্ত্রেরই আপনারা বুঝবেন না।" কোন কোন ওস্তাদকে আমি বলিতে নিয়াছি—"কেন গোয়া বাইবে না, নিশ্চয়ই যায়। আমি ওসব শাস্ত্রের বিধান মানি না।" কলিকাতার কোন বিশিষ্ট (রাগ) সঙ্গীতজ্ঞ আবার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কেন গোয়া বাইবে না? যায়। প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছিলেন, তাই ওই সকল কাল্পনিক নিয়মে সঙ্গীতকে শৃঙ্খলিত করিয়া গিয়াছেন। সায়াংকালে কেন ভৈরো? গোয়া বাইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।"

বুঝিলাম যে প্রকৃত ৮কল্পন বক্ষ্যোপাধ্যায়ের মতই তাহার মত। খাটি ভাবিয়া দেখিবার মত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, একই ক্রি প্রভাতকালে 'ভৈরো' রাগে তাঁহার যে কৃতিত্ব দেখ ইতে পারিবেন, ঐকালে তাহা কেন যে পারিবেন না; অথবা রাগ আশাহুরুপ অথবা অধিক মনোরঞ্জন হইবে না—তাহারই বা কি কারণ থাকিতে পারে? অথচ শাস্ত্রকারগণের মতও উপেক্ষণীয় নহে। বাহা হউক, মনোরঞ্জনই যদি রাগের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা বলিব যে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হওয়া সম্ভব। শাস্ত্রেও নিয়মের তিক্রম উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। নারদ-সংহিতায় আছে—"ব্রহ্মো নৃপাজ্জয়া কালদোষো ন বিজ্ঞতে।" নাঃ সঃ অর্থাৎ ব্রহ্মো ব্রহ্মো এবং রাজার আজ্ঞার কালদোষ থাকে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন সময়েই যে কোন রাগ গোয়া অথবা বাজানো যাইবে। এই লক্ষ্যই বোধ হয় নিয়মাত্মক গায়ক বাদক অসময়ে কোন রাগ গাহিতে বা বাজাইতে হইলে শ্রোতৃগণের মধ্য হইতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সেই রাগ গাহিবার বা বাজাইবার অনুৰোধ করিতে বলেন। তাহাতে দোষ খণ্ডিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। সঙ্গীত-মকরন্দে নারদ অসময়ে কোন রাগ গোওয়াকে কৃত্তিকর (পাপ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"এবং কালবিধি জ্ঞাতা গায়েৎ যঃ স সুখী ভবেৎ।

রাগা বেল্যে প্রগাণেন রাগাণাং ত্রিসংকো ভবেৎ।

যঃ শৃণোতি স দরিত্রী স্বায়ুর্নশতি সর্গা। সঃ যঃ

এইরূপ কালবিধি জানিয়া যিনি গান করেন তিনি সুখী হন। নির্দেশিত ব্যতীত অন্য সময়ে কোন রাগ গাহিলে রাগগুলি ত্রিসংক্রমণ হয়, এবং বাঁহারা শ্রোতা তাঁহাদের আনন্দ নষ্ট হয়। এরূপ একটা অভিপ্রেত ভয় নারদ কেন দেখাইলেন তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সঙ্গীতনির্ণয় রচয়িতার মতে দেশভেদে কালনিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে।

"এবং বহুবিধাচার্য্যগণ-কাল সমীকৃতঃ।

যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিজ্ঞস্তথাচার্যঃ। সঃ নিঃ

পণ্ডিতগণের দ্বারা এইরূপ বহুবিধ গানের সময় বর্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞব্যক্তির যে দেশে গীতের যে রীতি তাহাই পালন করা উচিত।

রাগতরঙ্গিণীরা লোচন বা (হারভাঙ্গা) এ বিষয়ে তাঁহার উপলব্ধি—বাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। তাঁহার মূল তথ্য আমরা পরে আলোচনা করিব। গায়ন-বাদনের কালনিয়মের ব্যতিক্রমের উল্লেখে তিনি বলিয়াছেন :—

দশদণ্ডং পংক্যং রাত্রৌ সর্বথাং গানমীরিতম্।

রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্জয়া কালদোষো ন বিজ্ঞতে। যঃ তঃ

দ্বিতীয় চরণটি নারদ-সংহিতায়—ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। লোচনের মতে দশ দণ্ড রাত্রি অতীত হইলে যে কোন রাগ অথবা গান গোয়া বাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য খুব সম্ভব ইহাই হইবে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র মতানুসারে শুক্রই সঙ্গীতকারী গ্রহ এবং রাত্রি দশ দণ্ড হইতে শুক্রের অধিকৃত সময় অর্থাৎ তৎকালে শুক্রের প্রভাব বলবতী হয় এবং যে কোন রাগই গোয়া অথবা বাজানো গায়ক-বাদকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় এবং আশাহুরুপ মনোরঞ্জনকও হয়।



অথবা ইহাও সম্ভব যে, এষ্ট সময়ে নৈশ-নিশ্চিন্ততা সঙ্গীতচর্চার বিশেষ সঙ্গায়ক।

কতকগুলি শব্দের (নাদ) সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্বর রচনার দ্বারা শোভনবনের একটি বিশেষ ভাবকে জাগাইয়া তোলাই শিল্পীর কাম্য। নানাবিধ ও অভিনব শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে শোভাচিত্রকে অভিজ্ঞত করাই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে সময়ের সাহায্য প্রয়োজন—এ কথাই বা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? কারণ, প্রভাত কালের মনোভাব ও সাংসকালের মনোভাব একরূপ হয় না—ইহাতেও পারে না। সারারাত্রি ব্যাপী বিশ্রামের শেষে প্রভাতে মনে যে শান্ত, উদার গভীর ভাব বিবাজ্য করে, কর্কশাঙ্গ দিব্যদানে ঠিক সেইরূপ মনোভাব থাকা সম্ভব নহে।

সকলেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, রাগসঙ্গীতের শব্দরচনার রাগ যেন কিছু বলিতে চায়। এইরূপ একটি গুণ্ণভাব স্বর-রচনার নিহিত থাকে। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই মানবে মানবে, মানবে মানবীতে, মানবে প্রকৃতিতে—একটি চিরন্তন যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য শব্দের সাহায্যে তাহারই মনোভাব মানব-মনে জাগাইয়া তোলা। এইরূপ দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকটি স্বরের মৌড়েই কোন্ এক অজ্ঞাত জনমের স্মৃতি গেল মনকে আলোড়িত করিয়া দেয় তাতাকে স্থান ও কালে (Time and Space) সীমার বাহিরে কোন্ এক অজ্ঞাত অপময় জগতের আভাস দেয়।

রাগসঙ্গীত ব্যবহারের সময়, ঋতু ইত্যাদির নিয়ম যে নিত্যজুই ভিত্তিহীন তাহা আমরা স্বীকার করি না। বসন্তকালে 'দেশ' অথবা মল্লার গাছিল কি ভাল লাগে না? লাগে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে গাছিল মন যেরূপ বিবল, বিহ্বল হয়, তেমনিটি বোধ হয় অল্প প্রকৃতে হয় না। কারণ শিল্পীর নিজেরই আদল ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে বিলম্ব হয়। শাস্ত্রকারগণ শিল্পীর অভিজ্ঞ উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ সম্ভবতঃ এষ্ট যে, পরবর্তী কালের শিল্পীগণের কলাকৌশল সহজেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে এবং রাগাভিযাক্ত উৎসাহের সহস্রাধ্য হয়। সাংসকালে ভৈরবী গাছিল যে ভাল লাগে না তাহা নহে, কিন্তু রাগ যে মনোভাবটি জাগাইয়া তুলিতে চাহে সেই প্রচেষ্টা বোধ হয় সন্ধ্যাক সফল হয় না। স্রবাক্রান্ত স্রমিষ্ট কঠোরের সাহায্যে গাছিলে অথবা দীর্ঘ অভ্যাসের অভিজ্ঞতায় বাজাইলে যে কোন রাগই যে কোন সময়ে মনোরঞ্জক করা সম্ভব। কিন্তু রাগের, 'আজ্ঞাহিনী'টি খুব সম্ভবতঃ রাগের বল হ্রাস হয় না। ভাল লাগাই যদি মাত্র কাম্য হয়—তাহা হইলে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন স্রগায়ক-বানকের পক্ষে অতি অল্পই থাকে। কিন্তু রাগ যে নিজের আত্মকথা শুনাইয়া মনোরঞ্জন করিতে চাহে—তাহাতে অসময়ের প্রয়োজন—একথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? অর্থাৎ যে কোন সময়েই যে কোন রাগ কুশল শিল্পীর পরিচালনার মনোরঞ্জক হইতে পারে কিন্তু পূর্ণভাবেই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

উপস্থিত ভাষ্যেও বলিয়াছেন, 'ইস শাস্ত্র নিয়মকা' আশ্রয় ইতনা হী সমর্থনা চাহিয়ে কি নিয়মিত রাগ নিয়মিত সময় পর আপনা আপনা প্রভাব অধিক সম্ভাব্যপ্রদ বীতি সে ব্যক্ত করতে

হৈ।" এই শাস্ত্র-নিয়মের তাৎপৰ্য্য এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, নিয়মিত সময়ে গাছিলে অথবা বাজাইলে রাগ আপনা হইতেই সম্ভাব্যজনক ভাবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। অল্প সময়ে রাগের স্রষ্ট প্রকাশের জন্য শিল্পীগণকে কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

পক্ষান্তরে, রাগ গাহিবার যে সময় নির্দেশিত হইয়াছে তাহা মানিয়া চলিতে গেলেও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, রাত্রিকালেই অধিকাংশ সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা হয়, সময়ের নিয়ম মানিয়া চলিলে অল্প সময়ের রাগগুলির আলোচনা ও চর্চা সম্ভব হয় না। বাহারা আসরে গান গাহিয়া বোজগার করেন, তাঁহাদেরও অল্পকক্ষ হইয়া রাগ গাহিতে হয় বলিয়া রাগের সময়-নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না। হয়তো অপরাহ্নে আসর বসিলে 'মালকৌশ' বাহা তৃতীয় প্রের রাগে গাহিবার সময় নির্দেশিত হইয়াছে, গাহিতে অসুযোগ করা হইল। শিল্পীর পক্ষে সে অসুযোগ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। কারণ জনপ্রিয়তা তাঁহার বাৎসারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য শাস্ত্রকর্তাগণ বিশেষ চিন্তা করিয়া রাজাজ্যের নিয়ম প্রজ্ঞন করা যাইবে বলিয়া নিয়ম কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন। রাজাজ্যের কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই—অর্থাৎ তাহা না করিলে না গাইয়া মরিতে হইবে।

রাগসঙ্গীতে সময়ের যে বিধি-নিয়ম বদ্ধ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি কিসের উপরে রচিত, সে বিষয়ে রাগতত্ত্বগণের রচয়িতা লোচন পণ্ডিত এমন একটি তথ্য আমাদের দিয়াছেন তাহার জন্য সঙ্গীত-জগৎ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাহা এই—

"বধাকালে সমারকঃ গীতং ভবতি রত্নকম্"

অন্তঃ স্বরস্বনিয়মাৎ রাগেহপি নিয়মঃ স্কৃতঃ । রাঃ তঃ

বর্ণাসময়ে—অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশিত সময়ে আশ্রয় করিলে গীত অদিশ মনোরঞ্জক হয়—কারণ স্বরের ব্যবহারের নিয়মাত্মসারেই রাগ গাহিবার সময় নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, কোন রাগে যে স্বরগুলি (বাদী, সবাদী, বিবাদী, অসুবাদী) ব্যবহৃত হয় তাহাদের অল্প অর্থাৎ অল্প ব্যবহার এবং বহুস্বরের অর্থাৎ বহুল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া সেই রাগ গাহিবার সময় স্থির করা হইয়াছে। পণ্ডিতের (লোচন) বলিবার উদ্দেশ্য খুব সম্ভবতঃ এই যে, সব সময়েই সব স্বরের বহুল ব্যবহার ভাল লাগে না ও আশানুরূপ মনোরঞ্জকও হয় না। দিন ও রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ স্বরের ব্যবহার অত্যন্ত দ্বন্দ্বগ্রস্ত হয় এবং সেই স্বরগুলির ব্যবহারে তখন সেই রাগ আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। রসাত্ত্বভব হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসের অভিব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে রচনা করিয়া রাগরূপ স্রষ্ট করা হইয়াছে দেখা যায় এবং সেই অল্প রাগ প্রকাশের সময়ে একটি ভাবের অথবা রসের অল্পভূতি শিল্পী এবং শোভা উভয়েরই মনকে আচ্ছন্ন করে। কাজেই এই রস বা ভাবানুভূতির শাস্ত্রিক ক্ষুরণ উপযুক্ত সময়ের উপরে নির্ভরশীল মনে করান তাহা অধৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

এখন ঋতু বা উৎসব, স্বরের ব্যবহারের অল্প ও বহুল অবলম্বনে কি প্রকারে রাগ গাহিবার সময় ধার্য করা হইয়াছে। মধ্যযজ্ঞ (সা) দেশী সঙ্গীতে সর্বাধিকারিতই প্রবল থাকে—এই অল্প সময়ের সহিত

তাহার বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। স্বরসম্প্রদকে দুই সমান অংশে ভাগ করিলে পূর্বাঙ্গ সা, রে, গা মা ও উত্তরাঙ্গ পা, ধা, নি, সা এইরূপ দুইটি সমান চতুঃস্বরিক অবয়ব হয়। ইহাতে পঞ্চমের কার্যও সাধারণতঃ ষড়্জের মতই দেখা যায়। তথাপি অজ্ঞাত স্বরের যোগে পঞ্চম ও নানাপ্রকার বৈচিত্র উৎপাদক হয়। সাধারণ নিয়মে কোন রাগের বাদীস্বরকেই বহুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে—অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক বার গাওয়া হয়। কিন্তু কুশল ও অভিজ্ঞ শিল্পী রাগের প্রত্যেক স্বরকেই সমভাবে মণ্ডল (বাড়াইয়া) করিয়া থাকেন—তাহাতে রাগরূপের কোনরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না—উপরন্তু আবির্ভাব তিরোভাবাদি নানাবিধ বৈচিত্রাদায়ক নিয়মের সৃষ্টি ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা মালকোশ রাগ লইতেছি। এই রাগে সর্বসম্মত ‘মধ্যম’ বাদী ও ষড়্জ সখাদী। কিন্তু গুণী শিল্পী সা, গা, মা, ধা, নি প্রত্যেক স্বরের উপরেই জ্ঞাস করিয়া অভিনব কৌশলে রাগরূপ ফুটাইয়া তোলেন, এবং মধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। তবে ইহা সম্ভব যে, রাগের মুখ্য অঙ্গ বাদীস্বরকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়া থাকে। এই অঙ্গ বাদীস্বরের সহিত সময়ের অথবা সময়ের প্রভাব অনুসারে বাদীস্বরের নির্বাচন নিত্যকাল অসঙ্গত না হইতেও পারে। শাস্ত্রের নির্দেশে বাদীস্বর ব্যতীত রাগের অজ্ঞাত মুখ্য স্বরগুলিকেও ক্ষণকালের জন্য বাদীত্ব দেওয়া হয় তাহাকে ‘পর্যায়ামল’ বলে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে অংশত বা বাদীত্ব দেওয়া হয়।

ষড়্জ শুদ্ধ মধ্যম ও পঞ্চম (পৃথিবীর) সর্বসঙ্গীতেই সমবাবধানে অবস্থিত এই স্বরগুলি নিজেরা খুব বেশী বৈচিত্রাদায়ক না হইলেও সঙ্গতান্ত্র অজ্ঞাত স্বরের সঙ্গতিতে বিবিধ অম্পদ, রক্তিদায়ক রচনাঃ সহায়তা করে অবশিষ্ট স্বরগুলি অর্থাৎ রে, গা, ধা, নি, উচ্চ-নীচতায় (pitch) এ পরিবর্তনশীল বলিয়া মার্গদর্শক স্বর নামে অভিহিত হয়। এই মার্গদর্শক স্বরগুলির উচ্চ-নীচতাব পরিবর্তন সময়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত রাগগুলির স্বর রচনা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন স্বর একটি বিশেষ সময়ে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়। যেমন প্রাতঃকালে, যখন মন-ভাব শান্ত গম্ভীর, ধীর থাকে তখন ঋষভ ও ধৈবতের ব্যবহার সেই ভাবস্বরূপে বিশেষ সহায়তা করে এবং যে সকল রাগে এই দুইটি স্বর প্রবল থাকে তাহাই প্রাতঃকালে গাওয়া হয়। অথবা দিবসের প্রথম ভাগের রাগগুলিতে ঋষভ ধৈবত প্রবল এবং গান্ধার নিবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাখা হয়। ঠিক তদ্রূপ রাত্রির প্রথম প্রহরের রাগে গান্ধার নিবাদ প্রবল ও ঋষভ, ধৈবত অপেক্ষাকৃত দুর্বল লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত যেখানে ধৈবত প্রবল, ক্রিয়ৎপরিমাণে নিবাদের বাহুল্য এবং যেখানে ঋষভ প্রবল সেখানে কিঞ্চিৎ গান্ধারের বাহুল্য স্বতঃ হইতেই আসিয়া পড়ে। প্রশান্ত গান্ধারীর জন্ম ঋষভের প্রয়োজন হয় বলিয়া শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগগুলিতে গান্ধার ও নিবাদ বহুল থাকিলেও ঋষভের বিশিষ্ট ব্যবহার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ শুদ্ধ মধ্যম দিবসের প্রথম ভাগে ও তীব্র মধ্যম সায়ংকালে অধিক ব্যবহৃত হয় দেখা যায়। দিবসের দ্বিতীয় ভাগ আসন্ন হইতেই কিছু তীব্র মধ্যমের ব্যবহার ও রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইতেই শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার রক্তিদায়ক হয়।

রাগসঙ্গীতে রে, গা, ধা, নি এই স্বর চতুষ্টয়ের উচ্চ-নীচতাব পরিবর্তন—সময়ের পরিবর্তনের সহিত একটি রহস্যজনক সম্বন্ধে

আবদ্ধ। যেমন ঠিক বিপ্রহরে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত বৃন্দাবনী সায়ং গাওয়া হয়। সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিতে আরম্ভ করিলে খুব নীচু কোমল গান্ধারে পীলু আরম্ভ হয়। বিপ্রহরে গান্ধার পরিত্যক্ত ছিল। পীলুর পরেই আরও একটু উচ্চকোমল গান্ধারে ভীমপল্লী, ধানেলী পটদীপ ইত্যাদি গাওয়া হয়। ইহার ঠিক পরেই আরও একটু উচ্চকোমল গান্ধারে মূলতানী—তখন সূর্য্যদেবের ডগমগ লাল মূর্ত্তি। সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতেই শুদ্ধগান্ধার লইয়া পুরবী আসিয়া অত্যন্ত উদাস ভাবে কর্মরাজ দিবসের অবসান ঘোষণা করিল। বীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল—কোমল ঋষভের উচ্চতা আর একটু বাড়াইয়া এবং তীব্রমধ্যমকে প্রবল করিয়া একটি গম্ভীর মধুর অঞ্চল যেন বেদনামুক্ত মনোভাব লইয়া পুরিয়া কিছুক্ষণের জন্য আসন গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যার আভাস রাত্রির নিম্নতরায় বিলীন হইতে লাগিল ও শুদ্ধ ঋষভ ও গান্ধার লইয়া ইমন অথবা কল্যাণের আবির্ভাব হইল।

এই রূপেই রাগ গাহিবার নিয়ম স্বরের ব্যবহারের নিয়মের উপরে নির্ভর করে দেখা যায়। দিবারাত্রির যে কোন সময়েই গাওয়া হউক না কেন—ভীমপল্লী অথবা ধানেলীতে কোমল গান্ধার ঠিক উপযুক্ত উচ্চতায় লাগাইতে পারিলে নিশ্চয়ই অপরাহ্নের আভাস দিবে। “দাহুর্গা ব্লাই রে বদরিয়া” যে কোন ঋতুতেই গাওয়া হউক না কেন, যদি গান্ধার ঠিক লাগানো হয় তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বর্ষাঋতুর আভাসে ও আমেজে মনকে আচ্ছন্ন করিবে।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই আভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার  
জ্ঞান লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লঃ

শো-রুম :—৮/২, এসপ্ল্যান্ডে ইস্ট, কলিকাতা - ১

সুচবাং স্বরগুলি (রে, গা, ধা, নি) নিজেরাই সময় স্রাশক। শাস্ত্রকারগণ মাত্র শিল্পীর উপলব্ধির অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কল্পদ্রুমার প্রণেতা (আপা তুলনী) ৬পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পরামর্শে তাঁহার পুস্তকে 'বাগতরঙ্গিনীর' বাগ গাতিবার সময় তালিকা সমন্বিত শ্লোকগুলি সকলন করিয়াছেন। উহার কিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রাতিসমে মে গাইয়ে ভৈরব প্রথম সুরাগ।  
ললিত ভৈরবী রামকলি গুণকলি অম্বরগ।

\* \* \* \* \*

সোলসহস্র অরু অটসৌ বাগ-বাগিনী জান  
বৃন্দাবন হরি-রাসমে গোপিনি কিয়ে তৈ গান।  
দেশ দেশকে ভেদ মে ভিন্ন ভিন্ন তৈ নাম  
মারগ ব্রহ্মাদি ক কহে দেশী দশহঁ ধাম। রা, ত:

## রেকর্ড-পরিচয়

এবার "হিজ মাষ্টার ভয়েস" ও "কলসিয়া" রেকর্ডে যে গানগুলি বেরিয়েছে, তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

### হিজ মাষ্টার ভয়েস

N 82745—শ্রীমতী উৎপলা সেনের কণ্ঠে হু'খানি আধুনিক গান "রয়েছে ছড়ায়ে" ও "কথা দিয়েছিলো হায়"—প্রতিভাময়ী শিল্পীর সার্বক রূপায়ণ সকলকে তৃপ্তি দেবে।

N 82746—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "বাতের আকাশ তারার" ও "পথ চেয়ে শুধু মোর" হু'খানি আধুনিক গান—গান হু'খানি ভাব, ভাষা ও অনবদ্য পরিবেশনা গুণে সকলের মনে স্থায়ী আসন পাবে।

N 82747—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম রেকর্ড এবারের বাংলা গান হু'টি। "একটি কথা শোন" ও "নতুন কিছু বলা শুনি"—ভাষা, স্বর ও তার পরিবেশনায় নতুনত্বের দাবী রাখে।

N 82748—মৃণাল চক্রবর্তী গেয়েছেন "খোলা জানালার ধারে" ও "মৃণাল বাহুলতা ঘেরিয়া"—গান হু'খানিতে স্বরও দিয়েছেন তিনি—এক কথায় চমৎকার।

### কলসিয়া

GE 24842—খনজয় ভট্টাচার্যের মধু কণ্ঠে বিশেষত্ব পূর্ণ হু'খানি গান "এই ঝির ঝির ঝির বাতাসে" এবং "গান গেয়ে ফিরে গেছি"—অপূর্ব রসস্থিতি করেছে।

GE 24843—শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় হৃদয়প্রধান হু'খানি গান গেয়েছেন "নামটি যে তার কেউ জানে না" এবং "এই রাত নিঃস্বপ্ন"—নতুন রসধারায় ভুবিয়ে রাখে।

GE 24841—শ্রীমতী সচিত্রা সেন গেয়েছেন "বাঁশী কি গুণ জানে গো" ও "তোরা বলিসু নে আর আমার কথা।" পল্লীগীতি হু'খানি নবগণতা শিল্পীর কণ্ঠে দীপ্ত মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

## আমার কথা (২৯)

### শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ

আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে কলকাতার আকাশবাণী যখন প্রথম আলো দর্শন করে, সেই সময় তাকে স্নেহময়ী গাত্রীর মত বকে তুলে নিয়েছিলেন স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। গাত্রীর স্নেহে বকে জড়িয়ে ধরে তিলে তিলে তার কপালে পরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণতার জয়তিসক। নৃপেন্দ্রনাথের অল্পজ ডাক্তার জীবনীন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁর এক ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে স্বনামধন্য গায়িকা ভারতী বসু ও সুপ্রীতি ঘোষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আভ্যন্তরীণ দিনে উল্লেখযোগ্য। শক্তিময়ী কণ্ঠশিল্পীদের দরবারে সুপ্রীতি ঘোষের যে একটি বিশেষ আসন সংরক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিয়ালদহ অঞ্চলে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগাষ্ট সুপ্রীতির জন্ম। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আন্তর্জাতিক কলেজে ভর্তি হন। সেখানে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী অবধি পড়ে শিক্ষা-জগৎ থেকে গ্রহণ করেন বিদ্যায়, পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন সঙ্গীতের আলোময় বাজার উন্নতিসাধনে।

বাড়ীতে সঙ্গীতের প্রভাব বরাবরই ছিল, নৃপেন্দ্রনাথের কাছে সমাগম হত অনেক স্বনামধন্য গুণী গায়কের, বসত গানের বৈঠক, নাদগম্ভীর কণ্ঠ গমগম করত বাড়ী। বাড়ীর সর্বত্র মিশে যেত স্ববে-তানে-লয়ে। এই সময় গানের ক্ষেত্রে নিজের প্রপ্রসিদ্ধা অগ্রজার কাছেও অনেক সাহায্য পান সুপ্রীতি। সুপ্রীতির গান শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাসন্তী বিজ্ঞাপীথি এঁকে গ্রহণ করে নেন ছাত্রীহিসাবে। কীর্তন, ভাটিয়ালি, আধুনিক, পল্লীগীতি, ভজন, খেয়াল, ঝুঁড়ি প্রভৃতি সবকিছু পাঠ নিতে থাকেন সুপ্রীতি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে বেতার কেন্দ্রের সম্পাদক আসেন



সুপ্রীতি ঘোষ

সুপ্রীতি। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অজয় ভট্টাচার্যের 'আবার আমি আসব গো এই পথে' ও 'আজও কি যমুনা তীরে' গান দুটি শৈলেশ দত্তগুপ্তের শিক্ষাধীনে সেনোলায় রেকর্ড করেন সুপ্রীতি। এই তাঁর প্রথম রেকর্ড। ১৯৩৫ থেকে ৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনী ও নাগর সঙ্গীত সম্মিলনীতে প্রত্যেক বার প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যন্ত যে কোন একটি আসন সুপ্রীতির জন্তে থাকতই, এর কখনও ব্যতিক্রম হত না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীতি প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেন (চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে এবং কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া), কবিগুরু তখনও জীবিত, প্রচুর সম্ভ্রম আশীর্বাদে সেদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন শিল্পী। রবীন্দ্র সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেছেন অনাদি দস্তিদার ও নীহারবিন্দু সেনের কাছে, তা ছাড়া শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজা মজুমদারের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষায়ও গ্রহণ করেছেন আশ্বাদ। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দেই চলচ্চিত্রে আগমন সূচিত হয় সুপ্রীতির জীবনে। অভয়ের বিষে ছবিতে প্রথম কণ্ঠদান করেন সুপ্রীতি। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন শচীন দেববর্মণ, এ ছবিতে শচীন বাবুর সহকারী ছিলেন আজকের দিনের আর একজন প্রখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। আজ অবধি প্রায় আশীখানি ছবিতে গান গেয়েছেন শ্রীমতী ঘোষ। হারাহুবিবহির্ভূত অজ্ঞাত গানের রেকর্ড সংখ্যাও এঁর প্রায় বাটমানি, সর্বসাক্ষ্যে এঁর গাওয়া আত্মমুগ্ধিক ছশোখানি গান রেকর্ডে গবে রাখা হয়েছে। বেঙ্গল মোশান

পিকচার্স দ্যাসোসিয়েশন এঁকে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য-শিল্পীর সম্মানে বিভূষিতা করেন। ভারতের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রে এবং দক্ষিণ-ভারত ব্যতীত ভারতের নানা স্থান (ত্রিপুরা জম্মু পর্যন্ত) থেকে গান গাইবার জন্তে আহ্বান এসেছে সুপ্রীতির হুয়ারে, একবার নয়, দু'বার নয় বহু বার। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে বেতারে বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুপ্রীতি, সেদিনকার অনুষ্ঠানে সুপ্রীতির সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও জগন্নাথ মিত্র। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর বেতারে মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন রাজাজী রাজভবনে সুপ্রীতির গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বর্ষেই সমাদরের সঙ্গে সম্মানিতা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

বাহ্য্য বর্জিত ও সরল জীবন বাপনই সুপ্রীতির বাস্তব। ফুলের প্রতি এঁর অসম্ভব আকর্ষণ। ভ্রমণেও পেয়ে থাকেন অপার আনন্দ।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন সুপ্রীতি। শ্রীঘোষ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন গেজেটেড অফিসার। সুপ্রীতি একটি কন্যা (চৈতী)র জননী।

জ্যৈষ্ঠের শেষাংশে। পথে পথে শুধু গ্রীষ্মের প্রখরতার বাণী। বাতাসে বাতাসে হলাহলের তপ্ত নিঃশ্বাস, প্রতি মুহূর্তেই উত্তাপ লাভ করছে ব্যাপকতা। আর বসি চলে না, আসব হয় ওটোতে, পা বাড়াতে হয় গৃহের উদ্দেশে।

### প্রাপিক্চাএর জগৎ



# বহুবর্তী

সোশোক কুমার  
বাণা রায়  
কিশোর কুমার • শ্যামা

সত্যেন বোস • হেমন্ত কুমার

ভাতৃপ্রেমের অপকূপ আদর্শে গড়া  
চিত্তগ্রাহী কাহিনীর সার্থক  
চিত্ররূপ ইদানীং কালের সমস্ত  
ছবিকেই চ্যালেঞ্জ করবে

★  
হিন্দ • দর্পণা  
ইন্দিরা • ইণ্টালী  
গ্রেস • ভবানী

চিত্রপুরী • পি.সন • অলোকা  
(খাদিরপুর) (মেটিয়াবুজ) (শিবপুর)  
পারিজাত • যোগমায়া • চম্পা  
(শালকিয়া) (হাওড়া) (বারাকপুর)  
শ্রীকৃষ্ণ • শ্রীলক্ষ্মী • নৈহাতি সিনেমা  
(জগদল) (কোচড়াপাড়া) (নৈহাতি)  
শ্রীভূগা • গৌরী • জয়ন্তী  
(চন্দ্রনগর) (উত্তরপাড়া) (বিহার)  
বিভা • কৈরী  
(বেলুরিয়া) (হুগড়া)

## রাজায়-রাজায়

[ ২০৮ পৃষ্ঠার পর ]

জানলা থেকে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়েছে বজ্রার মধ্যে। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে নৌকার আশ-পাশে আছড়ে পড়ছে। কলকলিয়ে হাসছে যেন রাতের গঙ্গা। বেমিকে দু'চোখ যায় শুধু জল আর জল। অন্ধকারে নদীর অস্ত্র তার বেন অস্তিত্ব হারিয়েছে।

মরণপথের বাতীর মত চৌধুরাণীর মুখখানি কক্ষ আর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় ম্যালোট। ভয় পেয়েছে, তাই হয়তো থেকে থেকে কঁপে উঠছে দেহলতা। ম্যালোটের বাতবন্ধনে বাঁধা তবু।

—সাহেব, আমার বড় ভয় করছে!

ক্ষণ কণ্টে কথা বললে আনন্দকুমারী। সেতারে যেন এক অতি করুণ সুর বাজলো।

চিবুক তুলে ধরলো ম্যালোট। চৌধুরাণীর ভীক মুখ দেখতে দেখতে আবার হেসে ফেললো। বললে—ভয় নাই।

আনন্দকুমারী বললে,—বজ্রার এখানে থাকবে না। আমার ভয় করবে।

—ভয় নাই। ম্যালোট আবার বললে হাসতে হাসতে। বজ্রার ভেতরে এক কোণে কি দেখিয়ে বললে,—ভয় কেন? বন্ধু আছে হামাদের।

কে কার কথা শোনে! আবার বাঘের গর্জন শোনা যায়। ফেট ডাকছে অবিরাম। বজ্র ভক্তদের বুকে কম্পন লেগে গেছে। শিয়ালের পাল ছুটছে বাঘের ভয়ে। দূরে কোথায় ঢাক নিউছে কারা। বাঘ বেরিয়েছে, তাই জানিয়ে দেওয়া হয়। গেরুকে সাবধান করা হয়।

—বজ্রার দড়ি খুলতে বস সাহেব! দোহাই।

আসন্ন সূর্যকে এড়ানোর জগুই যেন কথাগুলি বললে আনন্দকুমারী। ভয়ে তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। ঠকঠকিয়ে কঁপে উঠেছে। হাত দু'টি বেন বরফঠাণ্ডা।

বজ্রার এক প্রান্তে তোলা উদ্ভূত জলছে রাত্রি আগুনের আভা ছড়িয়ে। সাহেবের রাত্রি চেপেছে। সিপাইরা রাত্রির কাজে লেগেছে। হুধের পাত্রের দুধ ফুটে টগবগিয়ে। খাঁটি গোহৃদ্ধর অগন্ধ বইছে হাওয়ায়। দুধ নামলেই সজী সিক্ত হবে। তারপর মাছ ভাজার পাল। একটা ভেটকী মাছ কিনেছে ম্যালোট, হাট-বাজার থেকে। এক কুড়ি আশ কিনেছে।

গঙ্গার বুকে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে। চৌধুরাণীর আলুলায়িত কক্ষ কেশের রাশি উড়ছে। চুলে চিকণী পড়ে না কত দিন। এক কোঁটা ভেলও নয়। আনন্দকুমারীর এলোচল তাই যেন কালো রঙ হারিয়ে সোনালী হয়ে উঠেছে। তার মাথায় পর পর কয়েকটা চুম্বা খায় ম্যালোট। আরও কাছে টেনে নেয় তাকে। বলে,—কোথায় বাবে বজ্রা?

ম্যালোট মাঝে মাঝে দেনী ভাষায় কথা বলে। স্পষ্ট বাড়লা ভাষা বলে। ম্যালোট ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী আর স্পেনের ভাষা জানে! কথা বাড়লা ভাষাও দিনে দিনে রপ্ত করছে। শুনে শুনে

শিখছে। যেটা জানে সেটা আওড়ায় যখন তখন। ল্যাটিন আর ইংরাজীর সঙ্গে বাড়লা ভাষার যোগসূত্র খোঁজে মনে মনে।

আনন্দকুমারী বললে,—এখানে থাকবো না আমি। কিছুতেই নয়। আরও এগিয়ে চল'।

ম্যালোট মিষ্টি হেসে বললে,—পটু'গীজ পাইরেটদের ভয় আছে। ক্যানলে লুকিয়ে আছে ওরা। বজ্রা দেখলেই হামাদের এ্যাটাক করবে। তখন আমরা মারা যাবো। বাঘ একা এ্যাটাক করে, পাইরেট আসবে দল বেঁধে।

শিউরে শিউরে উঠলো চৌধুরাণীর শুক চোখের তারা। মুখে তার কথা ফুটলো না। ম্যালোটের মুণপানে তাকিয়ে থাকলো ভীক পাখীর মত।

ম্যালোট আবার হেসে হেসে বললে,—পটু'গীজরা হামাদের মারবে না ধরবে না। আনন্দকুমারীকে ওরা ছাড়বে না। কিড'নাপ, করবে।

চৌধুরাণীর ভয়ানক চোখ বন্ধ হয়ে যায় সহসা। নিজের মুখখানি সে ম্যালোটের বুকে চেপে ধরে। সাদা মলমলের পাতলা সাট ম্যালোটের গায়ে। জিনের সাদা পায়জামা। সার্টের বোতাম খোলা। ম্যালোটের বুকে রূপার চেনে বাঁধা ছোট লকেট। সোনার ক্রশ, যিশুর কাঠামো। চাঁদের আলোয় সেই স্মৃতিচিহ্ন চিকমিক করছে।

মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি কথা বলে চৌধুরাণী। বললে,—সাহেব, তুমিও তাই ক'রেছো। ইংরাজের সঙ্গে পটু'গীজের তফাৎ কোথায়?

এক বলক লজ্জা নামলো ম্যালোটের শুভলাল মুখে। সজ্জায় বললে,—বাট আই লাভ ইউ। আমি টোমাকে ভালবাসি। আই ওয়াণ্ট ইউ। আমি টোমাকে চাই।

নিশ্চুপ থেমে থাকলো আনন্দকুমারী। কতক্ষণ কে জানে! ম্যালোটের বুকে কান পেতে শুনলো যেন তার অন্তরের কথা। ভালবাসার কথা শুনে মনে মনে কি যেন ভাবতে থাকলো। যা বস্তুকু পেয়েছে, তার হিসাব করতে থাকলো যেন। কত কি দিয়েছে ম্যালোট। ক'দিন আহার জুগিয়েছে। পরনের বস্ত্র দিয়েছে ক'খানা। কত ভাল ভাল কথা শুনিয়েছে। বাঁজনা শুনিয়েছে। কার্য আওড়েছে। চৌধুরাণী একে সময়ে বুঝেছে, শুধু ভোগ দখলের স্বখে নয়, ম্যালোট যেন তাকে পেয়ে এক স্বর্গস্বখ হাতে পেয়েছে—যাতে দেওয়া আর নেওয়ার পাখিব আনন্দের লেশমাত্র নেই। দেশে থাকতে অনেক কুঁড়ি আর ফুল দেখেছে ম্যালোট, সাজানো কাননে বীথিতে ফুটে উঠতে দেখেছে। কিন্তু কোথায় এক বিদেশ-বিভূ'ইয়ে একটি বনফুল দেখতে পেয়ে অবহেলা করতে পারলো না যেন। তাই তুলে নিয়ে রেখেছে বৃকের প'রে।

—আমার শেষ পর্যন্ত কিপ্তি হবে সাহেব?

চৌধুরাণী কথা বললে হঠাৎ। হিসাব কষে কি বুঝলো কে জানে, পরিণাম জানতে চাইলো কেমন ভাড়া মনে। চোখ তুলে তাকালো। চোখে যেন নেশার ঘোর। বললে,—ঘরে-বাইরে কোথাও যে আর আমার ঠাই মিলবে না। মরণ ছাড়া আর গতি কি! কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যালোটের লোমশ বুকে। তারপর আবার বললে,—আমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে তো?



—নো, নো। নেভার।

কথায় আন্তরিকতা মাখিয়ে বললে ম্যাগেট। শিখিল বাহ-  
বাধন কঠিন ক'রলো। চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়ে বললে,—আমি  
টোমাকে ছাড়বো না। নেভার ইন মাই লাইফ।

—সত্যি কথা? পুরুষকে বিশ্বাস নাই। চন্দ্রকান্ত আমাকে  
বিপদে ফেলে পালিয়ে যায়।

—হাঁ, সত্য কথা। মেঘীর নামে বলছি। কালীর নামে  
বলছি! মাদার গডেশ্ কালী।

—তোমার কে আছে?

—কেউ নাই আমার। ফাদার ছিলেন, সেও মারা গেল।

—বোঁ নেই? জ্বী নেই?

—না। টুমি আমার জ্বী।

—দেশ কোথায়?

—ইংল্যান্ডে।

সব কিছু যেন জানা হয়ে গেছে চৌধুরাণীর। আবার শুরু  
নীরব হয়। চূপচাপ থাকে। মস্তুর খাস ফেলে একেকটা।  
বজ্রার আনাচে-কানাচে জলের ঢেউ আছড়ানোর শব্দ স্পষ্ট হয়ে  
ওঠে। চৌধুরাণীর উদ্ভক্ত কেশরাশিতে হাতের কোমল পরশ বুলায়  
ম্যাগেট।

—আমার মা আছে। বাবা আছেন।

অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর আবার কথা বললে আনন্দকুমারী।  
ম্যাগেট সহানুভূতির সঙ্গে বলে,—হামি জানি।

চাঁদের ছায়া খেলছে নদীর জলে, সোজাশ্রজি। ছায়াপথ  
সৃষ্টি হয়েছে যেন। জলের স্রোতে দিকিধিকি কাঁপছে। ঐ সোনালী  
ঝিলিমিলিতে চোখ রেখে কথা বলছে ম্যাগেট।

—মাকে দেখতে ইচ্ছা হয়। কেমন আছে কে জানে?

চৌধুরাণী কেমন যেন কষ্টকাতর স্বরে  
কথা বলছে। বৈরাগী ভঙ্গীতে। বললে,—  
বাবা হেথায় নাই, স্মৃত্যুটি গোবিন্দপুরে  
গেছেন।

এবার নীরব হয় ম্যাগেট। সে কেবল  
শুনে যায় চৌধুরাণীর কথা। তার যেন  
কোন কিছু বক্তব্য নেই।

—আমার বজ্রায় গয়না ছিল আমার  
গায়ের। তোমার সিপাই আর মাঝিরা,  
সাহেব সেসব লুটেপুটে নিয়েছে। খানিক  
থেমে আবার বললে চৌধুরাণী,—বা গেছে  
তা থাক। আমি আর ফেরৎ চাই না।  
মায়ের সিলুকে আমার আরও অনেক গয়না-  
অলঙ্কার আছে।

ম্যাগেটের মুখে কথা নেই। সাঁটে-  
আঙিনে কপালের ঘাম যুছলো একবার।  
চাঁদের ঝিলিমিলি থেকে চোখ ফিরিয়ে  
নিজের বুক চোখ নৈমালো। চৌধুরাণী  
মুখ উঁচিয়ে বললে,—কোথায় নিয়ে চললে  
আমাকে?

—টওয়ার্ডস স্মৃত্যুটি-গোবিন্দপুর। ম্যাগেট বললে কেমন যেন  
গভীর স্বরে। বললে,—আই উইল গোটু মাই ওয়ার্কিং সেটার।

হঠাৎ যেন দুলে উঠলো বজ্রাখানা। জলের ঢেউয়ে টলমলিয়ে  
উঠলো। ম্যাগেট দেখলো আরও একখানি বজ্রা কাছাকাছি  
এগিয়ে এসেছে। আসছে এই দিকেই, তীরের কাছে। হয়তো  
নোঙর বাঁধবে।

ম্যাগেটের চোখে সভর চাঁউনি। চোর, চুরি ক'রেছে, তাই  
তার ভয় পাওয়া। হয়তো বামাল সমেত গ্রেপ্তার করতে আসছে  
কারা। ম্যাগেট দেখে নের বন্দুকটা কোথায়!

মাঝি-সদার মুখে হাঁকো খ'রে কথা বলে পরিহাসের স্বরে।  
বললে,—সাহেব, বজ্রাখানা দেখো একবার। চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

ম্যাগেটের লক্ষ্য চলন্ত বজ্রার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সাংগ্রহে দেখে  
বজ্রার গতিবিধি; অনেক মাঝি-মাল্লা বজ্রার দুই মুখে।  
বজ্রার ঘরে সারি সারি গবাক্ষ। ছাদে দোতল ভিছানা-তাকিয়া।  
মশাল জ্বলছে ছাদের মাথায়, স্মুটক বাঁশের শীর্ষে। সেই আলোর  
দেখা যায় নৌকাগাত্রে নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র। বজ্রাখানি  
ব্যাঘ্রযুধী।

আর যেন স্থির থাকতে পারে না ম্যাগেট। বাহপাশ আলগা  
হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

বজ্রা এখনও দোতল্যমান। জলের স্বাভাবিক ধারা যেন হঠাৎ  
ব্রাহত হয়েছে। চৌধুরাণীও মাঝি-সদারের কথা শুনে চোখ ফিরিয়ে  
দেখছে। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আনন্দকুমারীর হাত  
ধরে তাকে বসিয়ে ম্যাগেট ঘরের বাইরে যায় মাথা নামিয়ে। চুরি  
করেছে ম্যাগেট, তাই হয়তো ভয় হয়েছে।

চোখের যেন পলক পড়ে না। চৌধুরাণীর লক্ষ্য ধরা পড়ে ঐ


ফোন : ৩৪-৪৯০২

G.V

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার ; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিনি ভবন** সৃজন কুমারী  
সিঁগিকার ও স্বর্ণশিল্পী

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২



ব্রাঞ্চ ৪-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

( রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল )

বজ্রার বাত্মীরা সকলেই দেশীয়। দেখে যেন আশ্বাস পায় মনে। পট্টীগীজ কিশা ইংরাজদের কোন' জাতীয়-চিহ্ন দেখা যায় না, তাই নিশ্চিন্ত হয়। চৌধুরাণীর সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতায় বিদেশীদের রূপ বিস্তী আকৃতি ধরেছে। চৌর-ডাকাত ছাড়া আর কোন মানুষ নেই যেন বিদেশীদের মধ্যে। মনুষ্য বলতে কিছু নেই—আছে শুধু লোভ আর লালসা! অপহরণের প্রবল তৃষ্ণার কাতরতা।

—সুতাহুটি-গোবিন্দপুরের বজরা। ঐ তল্লাট থেকে আসছে। মাঝি-সর্দার দেখে দেখে চিনতে পারে। বজ্রার গঠন, আকৃতি আর বাত্মীদের দেখতে দেখতে কথা বললে অটুট আত্মবিশ্বাসের মূরে।

—ফ্রেণ্ড অর, ফো! নিজেই যেন প্রব্র করলে ম্যালটে। বললে, —শত্রু না মিত্র?

মাঝি-সর্দার বললে,—জানি না সায়েব, তবে মনে হয় আমাদেরই মত রাতটুকু কাবার করতে নোঙর ফেলছে।

কথা কানে যায় আর বুকের মধ্যে যেন গুমরে গুমরে ওঠে। আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। 'সুতাহুটি-গোবিন্দপুরের বজরা' এই কথাটি শোনামাত্র তার শোণিতধারায় কেমন এক উত্তেজনা নাচানাচি করতে থাকে। ম্যালটে'র পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক-চোখে তাকিয়ে আছে। নিম্পলক চোখে দেখছে সূত্রজিত বজরাখানি আর তার বাত্মীদের। বজ্রার ছাদে মশাল জলছে কম্পমান শিখায়। গজাবন্ধের মুক্ত হাওয়ায় মশালের আলো ধব-ধব কাঁপছে। বজ্রার ছাদে শুভ্রশস্যায় কে যেন ব'সে আছেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। বন্দুকধারী সিপাইরা চলাফেরা করছে মাঝে মাঝে। চাঁদের অকুপণ আলোয় বন্দুক স্পষ্ট দেখা যায়।

—ডার্লিং, ভয় পাইও না।

ডান হাতে চৌধুরাণীর কোমর জড়িয়ে ধরলো ম্যালটে। বুকের কাছে টেনে নিলো তাকে।

—ওরা কারা? ভয়ে ভয়ে শুধালো আনন্দকুমারী।

ম্যালটে বললে,—ওরা বাঙ্গালী।

কথা শুনে কোথায় খুনী হবে তা নয়, চৌধুরাণী আরও যেন আশঙ্কিত হয়ে উঠলো। কেন কে জানে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালটে'র বুকে মুখ লুকালো।

মাঝি-সর্দার আবার কথা বললে,—সায়েব, ওরা জানে না বাঘ বেয়িয়েছে। তাঁবে নামছে সব দলে দলে। জানিয়ে দিয়ে আসি, যদি অমুমতি দাও।

আনন্দকুমারী তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে,—হাঁ বাও মাঝি-সর্দার! বাঘের খবরে পড়ে মানুষ মরবে জানিয়ে দিয়ে এসো। এক মুহূর্ত থেমে আবার বললে,—আর খোঁজ নাও, বজ্রার মালিক কে? কোন্ দিকের বাত্মী?

ম্যালটে'র কথা থেমে যায় চৌধুরাণীর দৃষ্ট কণ্ঠ শুনে। বাহপাশে যেন এক বাঘিনী, ফুঁসে উঠলো।

চোখ ফিরিয়ে নেয় ম্যালটে। চাঁদের জল-ছায়া দেখে আবার। জলে সোনালী ঝিলিমিলি খেলছে। গজাব অঙ্গ তাঁর নজরে পড়ে না, যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

মাঝি-সর্দার জলে নামলো। এক-ইটু জল। ম্যালটে মনে মনে তাকে বাধা দিতে চাইলেও মুখ ফুটে বলতে পারলো না কিছু।

চাঁদের আলোয় দেখলো, সর্দার-মাঝি উদ্ধ্বাসে এগিয়ে চলেছে। তাঁরে উঠছে না বাঘের ভয়ে, হাঁটুভর্তি জলের পাখে চলেছে।

বাঘ গর্জে উঠলো আবার, অসেক দূরে কোথায়। হাজারে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফেউয়ের ডাক শুক হয় সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যালটে যেন কেমন নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। চৌধুরাণীকে ছেড়ে চলে আসে; ব'সে পড়ে নিজের জায়গায় ফিরে। ডিকপটারটা টেনে নেয় নিজের কাছে। নেশা যেন ভূবার কাতর হয়েছে। কণ্ঠ প্রায় শুকিয়ে গেছে।

এত আদর বড়ো মন উঠছে না আনন্দকুমারীর! বজ্রার ঘরে তার মন বসছে না, বাইরে ছুটে চলেছে বাবে বাবে। কে কোথায় এলো গেল নজর সেই দিকে যেন। খাঁচার বন্দী পাখী যেমন দেখে আকাশ-বিস্তার।

যতই হোক, ম্যালটে একা। সিপাই আর মাঝি-মাস্তারা তাঁর তাঁবের লোক, তবুও যেন নিজেকে তাঁর বড় বৈশী একা মনে হয়। কাছে রয়েছে চৌধুরাণী, তবুও। কত কি মনে হয় ম্যালটে'র। হৃদিতার ছায়া ফোটে তাঁর টিকালো মুখে। পানপাত্র মুখে তুললো ম্যালটে। ঝট হইলি এক পাত্রে—বা কখনও না কি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। বরং অমুবাগিনী প্রেয়সীর মত আনন্দ দান করে।

—চৌধুরাণী! হঠাৎ কি মনে হ'তে ম্যালটে ডাক পাড়লো সিন্ধুকণ্ঠে।

আনন্দকুমারী সাড়া দেয় না। যেদিকে তাঁর চোখ সেদিকেই চেয়ে থাকে। ডাক যেন কানে যায় না তাঁর। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আবার ডাকলো ম্যালটে,—ডিরারেট ডার্লিং!

তবুও সাড়া দিলো না আনন্দকুমারী। পৃথিবীর অঙ্গ এক আশ্চর্য দেখছে যেন সে। কর্ণেশ্রিয় নেই। চৌধুরাণী যেন মূক আর বধির।

ম্যালটে'র মনের আশার আলো যেন নিবু নিবু হয়। অবজ্ঞার আবাত লাগে তাঁর। পানপাত্র মুখে তুলে আবার। এক চুমুকে শেষ হয়ে যায় পাত্র। গজাব বুকে চাঁদের ঝিলিমিলি দেখতে থাকে ম্যালটে। তাঁর কপাল আর ভুরুতে কুঞ্জন দেখা দেয় কেন কে জানে! শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আছে হয়তো। ব্যাকুল প্রতীকার দাঁড়িয়ে আছে চৌধুরাণী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে বহু বিচিত্র বজরাখানি আর তাঁর বাত্মীদের। সুতাহুটি-গোবিন্দপুরের নাম হ'টি তাঁর পরিচিত। চৌধুরী মশাই বছরে বেশ কয়েক বার মান্দারণ থেকে বাত্মা করেন সুতাহুটির উদ্দেশ্যে ব্যবসার প্রয়োজনে। গোবিন্দপুরের কোলে গজাব তাঁরে আছে বুড়োশিবের বাজার-হাট। সেই হাটে মাল বিকান্তে বান চৌধুরী, সওদাগ করেন। নাম হ'টি শুনে জমিদার-বন্দিনী বিজ্ঞাবাসিনীর মুখখানি মনের পটে ভেসে ওঠে। তাঁর পিত্রালয় ঐ দেশে। আনন্দকুমারী ভাবলো, এখন রাজকুমারীর সঙ্গে আর কোন পার্থক্য নেই তাঁর। তিনি গৃহে বন্দিনী, চৌধুরাণীও বজ্রার বন্দিনী।

চাঁদের আলোয় দেখা যায় মাঝি-সর্দার জলপথে এগিয়ে চলেছে। আনন্দকুমারীর দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে।

ম্যালেট প্রেমিক মানুষ, কিন্তু তার চোখে যেন এখন কুটিল চাঁউনি ফুটে আছে। চাঁদের বিলিমিলি থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখছে চৌধুরাণীর আপাদমস্তক। কেমন যেন নিরাশ হওয়ার পর চাপা আক্রোশে জ্বলছে ম্যালেট। এক পাত্র নিঃশেষ হওয়ার পর আরেক পাত্র হাতে তুলেছে।

বাব ডাকছে ঘন ঘন। ফেউ ডাকছে। কিন্তু চৌধুরাণীর যেন কান নেই! ভয় নেই। বজরা আর দেশী বাড়ী দেখে মনে মনে কি আঁচতে থাকে কে জানে! লাল অধর দংশন করে দাঁতে। চোখের পাতা পড়ে না। পাবাণ-মূর্তির মত অবিলম্ব দাঁড়িয়ে থাকে।

তোলা-উম্মন জ্বলছে। সাহেব আর বিবির রান্না চেপেছে রাতের। মাছ ভাজার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। খাঁটি সরষের তেলের উগ্র গন্ধ।

—চোখ দেখবে না কি মিষ্টার? হুঁ-চারখানা দিই খাও। মদের মুখে মন্দ লাগবে না।

একজন সিপাই কথা বললে ম্যালেটের সামনে এসে। একখানা রেকাবী নামিয়ে দিয়ে গেল।

ম্যালেট হাঁ না কিছুই বললে না। একবার শুধু উনাস চোখে দেখলো সিপাইকে। সম্মতি বা অসম্মতির জন্ত আর দাঁড়ালো না সিপাই, উম্মনধারে চলে গেল।

—চৌধুরাণী, কাম হিয়ার। হামার নিকটে আইস।

ম্যালেট কথা বললে পানিক বাদে। রেকাবী তুলে ধরলো আনন্দকুমারীর দিকে।

মুক আর বধির যেন সে। কানে তোলে না কথা। মুখে অবজ্ঞা ফুটিয়ে থাকলো।

—চৌধুরাণী।

বাতের মতই সহসা গর্জন করলো ম্যালেট। বজরার মাঝি আর সিপাইরা পর্যন্ত চমকে উঠলো ম্যালেটের গলা শুনে।

আনন্দকুমারী মুখ ফিরাতে এককণ্ঠে। অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বললে—কি? আবার?

—কাম হিয়ার। ম্যালেট কাঁসালো সুরে বললে। ধমক দেওয়ার সুরে।

—কি চাই আবার? চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে বজরা ছলিয়ে ম্যালেটের কাছে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

রেকাবী আবার উঁচিয়ে ধ'রলো ম্যালেট। বললে, —টুমি খাও।

এ পাশে ও পাশে মাথা ছলিয়ে অসম্মতি জানালো আনন্দকুমারী। মুখে বিরাগ আর বিতৃষ্ণা ফুটলো। সঙ্গে সঙ্গে রেকাবীখানা জানলা থেকে ছুঁড়ে নদীর জলে ফেলে দেয় ম্যালেট।

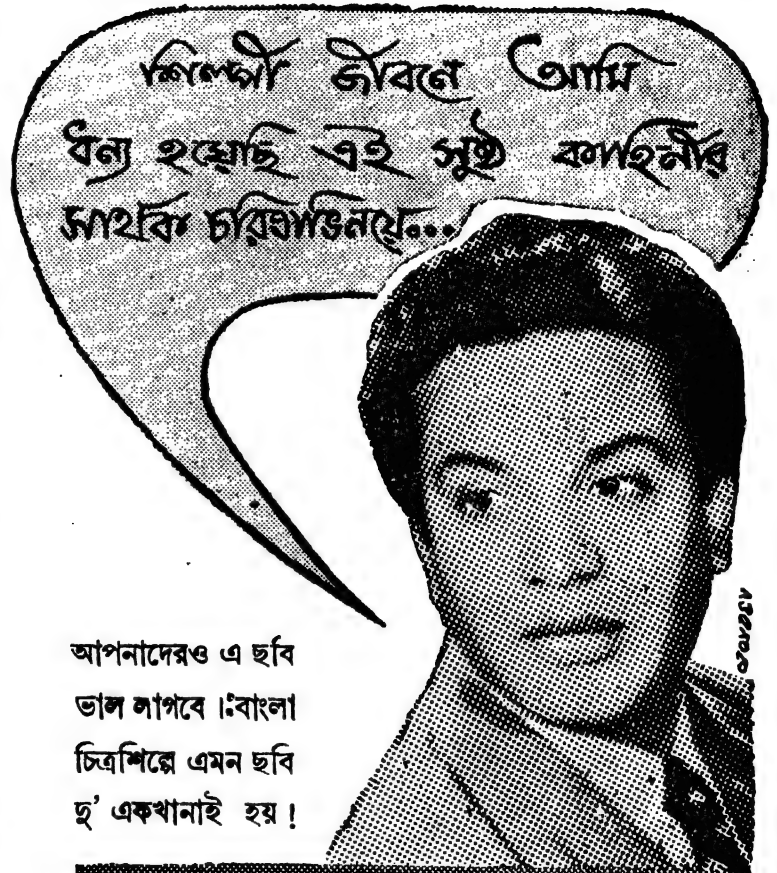
চৌধুরাণী ভীতা হয়ে ওঠে ম্যালেটের মুখভাব দেখে আর উচ্চকণ্ঠ শুনে। হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে ঠকঠকিয়ে।

—ছদ্মরূপী, কেউ কোন কথা কাঁস করলে না। মাঝি সর্দার দরজার বাইরে থেকে কথা বললে। বললে,—বজরার মালিকের নাম বললে না।

—কোথা থেকে আসছে তাও বললে না?

চৌধুরাণী প্রশ্ন করলে গভীর সুরে। চোখ বাঁকিয়ে দেখলো বাঁকা চোখে।

—হাঁ তা ব'লেছে। আমাদের অনুমান মিথ্যা নয়, সত্যতাই গোবিন্দপুর থেকে আসছে।



আপনাদেরও এ ছবি ভাল লাগবে। বাংলা চিত্রশিল্পে এমন ছবি হুঁ একখানাই হয়!

# তাপের ঘর

অভিনয়ে-সাবিত্রী-সবিতা-রবীন-চন্দ্রাবতী-জাহর  
পরিচালনা-মঙ্গল চক্রবর্তী সঙ্গীত-হেমন্ত কুমার

সগোরবে প্রদর্শিত হইতেছে!

## রাধা • প্রণ • প্রাচী

—কোথায় বাবে ?

—বাবে হুজুরগী গড়-মান্দারগে ।

মাঝির কথা শুনে একটা কেমন যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললো চৌধুরাগী । মুখে হঠাৎ এক বলক হাসি ফুটিয়ে ব'সে পড়লো ম্যালোটের কাছাকাছি । গা ঘেঁষে ব'সলো । হেসে হেসে বললে,— সায়েবের রাগ তো দেখছি খুব ! আমার যে ভয় করে রাগ দেখলে ।

ম্যালোট জলের বুক লম্বান ঝিলিমিলি দেখছে তো দেখছেই । চৌধুরাগীর দিকে আর যেন কখনও ফিরে তাকাবে না । রাগ না অভিমানের গাভীরা তার চোখে-মুখে । দ্বিতীয় পাত্র মুখে তুলেছে ম্যালোট । পান করেছে কয়েক চুমুক । হুইঙ্কির সজোর লাগি খেয়েও যেন কেমন স্থির হয়ে আছে ।

গড়-মান্দারগ ! চৌধুরাগীর মুখের হাসি কৃত্রিম । মনে মনে কি যেন আঁচতে থাকে সে । নকল হাসি হেসে আর একটু ঘেঁষে বসে । তার কোমলদেহ অসুস্থত্ব করে উঠতা । ম্যালোটের রাগের গরম হয়তো । চোখে-মুখে হাসি মাঝিয়ে ম্যালোটের হাত থেকে পাত্র কেড়ে নেয় আনন্দকুমারী । টলমল করছে সোনা-রঙের হুইঙ্কি । নিজের হাতে ম্যালোটের মুখের কাছে এগিয়ে ধরে চৌধুরাগী । কি কারণে কে যেন হঠাৎ যেন অদ্ভুত লাভময়ী তার দেখায় । নিজের মুখ তুলে ধরে ম্যালোটের মুখের কাছে ।

বাইরে জোৎস্না আর অন্ধকারে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে । কে কাঁকে হারাতে পারে । সিপাই আর মাঝিরা কি এক দৃষ্ট

দেখতে পায় বজ্রার ভেতরে । কি লজ্জাহীনা ঐ বেনের মেয়ে ! তারা চোখ কিরিয়ে নেয় অস্ত দিকে ।

সুখাপানের লোভে ম্যালোট আবার হাসলো মুখের গাভীরা ছুটিয়ে । নেশার প্রথম উগ্রতায় কেমন যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ।

কতক্ষণ অতীত হয়ে যায়, কথা বলার অবকাশ পায় না চৌধুরাগী । যখন মুক্তি পায় তখন বলে,—খুশী হয়েছো সায়েব ?

মাথা তুলিয়ে ম্যালোট বলে নেতিবাচক ইঙ্গিত করে । মিষ্টি হাসি ম্যালোটের মুখে ।

আবার মুখ তুলে ধ'রলো আনন্দকুমারী । কি এক আবেশে চোখ হুঁটি বন্ধ করলো । ম্যালোটের হাতের বলিষ্ঠ আঙুল ক'টা চৌধুরাগীর পিঠে যেন কামড়ে ধরে । কত কোমলদেহ, তবুও এতটুকু আপত্তি জানায় না আনন্দকুমারী ।

বাঘের গর্জন ভেসে আসে অনেক দূর থেকে । খেয়াল নেই কারও । হুইঙ্কির নেশায় যেন বিভোর হয়ে আছে ম্যালোট ।

নিজেকে মুক্ত করে আনন্দকুমারী । বলে,—ছেড়ে দাও এখন । সিপাইরা সব ঘোরাফেরা করছে যে !

কিস-কিন কথা, তবু অমান্ত করতে পারে না ম্যালোট । চৌধুরাগীকে ছেড়ে পানের পাত্র মুখে তুললো খুশী মনে ।

এক রাশ হেসে আনন্দকুমারী বললে,—দেখি, আকাশের চাঁদ এখন কোথায় । কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে । লম্বা পা ফেলে ফেলে তিন কদমে ঘরের বাইরে চলে গেল । আকাশের এদিক সেদিক দেখতে থাকলো ।

মাঝি আর সিপাইরা সারাদিনের ক্লাস্তিতে এখন শান্ত হয়ে আছে । এখানে সেখানে ব'সে আছে দলে দলে । খোসগল্প করছে ।

হঠাৎ কি এক শব্দে চমকে উঠলো সকলে । এমন কি ম্যালোট পর্যন্ত : তার হাত থেকে পানপাত্র খ'সে পড়লো । মাঝিদের দলে হৈ হৈ পড়লো । সিপাইরা ছোট্টাছুটি করতে থাকে ।

ঘরের বাইরে এসে এখার ওখার তাকিয়ে ম্যালোট দেখলো, আনন্দকুমারী নেই । অতর্কিতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে সে । হুঁজন মাঝিও ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে । কোথায় গেল সায়েবের বিবি ! ম্যালোটও কিন্তু হয়ে উঠলো ।

জল আর জল । সাঁতরে চলেছে হুঁজন মাঝি, যদি একবার ভেসে ওঠে । দেখা যায় দেহের কোন অংশ । আনন্দকুমারীর শাড়ির আঁচল কিবা তার মাথার কালো কেশ ।

চৌধুরাগী ডুব-সাঁতারে এগিয়ে যায় ছুটন্ত সাপের মত ; বেদিকে বজরাখানা ঝাঁড়িয়ে আছে সেই দিকে সাঁতারায় । স্ততাহুটি-গোবিন্দপুর থেকে গড়-মান্দারগের দিকে বাবে-বজরা, তবে আর দ্বিধা কেন ?

ম্যালোটের ঝট্ট চাউনি আহত হয় নদীর জলে । চৌধুরাগীর চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও ; ম্যালোটের তর্জনে সিপাই আর মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ।

চৌধুরাগীর ডুব-সাঁতার কারও চোখে পড়ে না । চাঁদের আলোর একবার শুধু তার একখানি শুভ্র হাত ভেসে উঠতে দেখা যায় । জলের আবর্তে আবার কোথায় হারিয়ে যায় চৌধুরাগী । চাঁদের ছায়া খেলছে জলে । সোনালী ঝিলিমিলি নয়, জলের হাসি যেন !

[ ক্রমশঃ ]



**ROY COUSIN & CO.**  
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.  
OFFICIAL AGENTS FOR  
**OMEGA & TISSOT WATCHES**  
SOLE AGENTS FOR  
**COVENTRY WATCHES**



ভিটামিন যুগ্ম



যাঁরা ওদের চিঁচরি করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিটুট

কোলে বিটুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর স্বাদু সন্মদ

খিন-এরাকট

গেরী

পেটিটবুরো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্ টী

মার্শেলক্রীম

কাফেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।



# রঙ্গপট



খেলা ভাঙার খেলা

শ্রীযুক্ত অমর বচনার অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে বহুমূল্য বহুরাজি দিয়ে পরবর্তী কালে এত যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। খেলা ভাঙার খেলা তারই একটি সংযোজন মাত্র। সামাজিক ছবি। একটি নারীকে কেন্দ্র করে আর একটি নারী ও একটি পুরুষের গল্প। স্মিটার-মন্দন বিনয় বাল্যকালে খেলার ছলে একদিন সন্নিহিত শুকতারার সঙ্গে করে ফেলেছিল মালা বনল। যাত্রাদলের গীত-শিল্পকেব মেয়ে শুকতার। বহুকাল পরে শহরবাসী বিনয়ের সঙ্গে যখন অর্পিতাব বিয়ের ঠিক, সেই সময়ে ঘটনাটিকে শুকতারার কথা তার কানে ওঠে। সে জানতে পারে, শুকতারার সঙ্গে এক বৃদ্ধ দোজবরের বিবাহের ঠিক হওয়ায় সে ভয়ে নিকৃষ্টি এবং অনৈশ্বর্য ধারণা, সে বর্তমানে বিনয়েরই আশ্রিত। এর পরেই ঘটনাপ্রবাহে অভিনেত্রী মেঘনা দেবীর সঙ্গে হয় বিনয়ের পরিচয়। জানা যায় মেঘনাই শুকতার। বিনয়ের জীবনের স্রোত যায় ঘুরে। শুকতারাকে নতুন করে পাঁচার জন্তে সে পাগল হয়ে ওঠে। শুকতারার...বাণ দেয়। সে বিনয়ের বংশমর্ষাদার দিকে দৃষ্টি রেখে বিবাহবন্ধন থেকে নিজেকে সরে যায় এবং নিজেকে থেকে অর্পিতার সঙ্গে বিনয়ের বিষয়ে দিয়ে নিজের যথাসর্বস্ব অর্পিতার নামে লিখে দিয়ে সে গ্রহণ করে বিবাহ।

এই হল কাহিনীর সংক্ষেপিত রূপ। প্রত্যেক ছবিতেই দর্শকদের সাময়িক আনন্দ দেবার জন্তে কিছু হাস্যরসের অবতারণা করতে হয়। কাহিনীটির মধ্যে থেকেই অংশবিশেষ বেছে নেওয়া হয় হাস্যরসের জন্তে। এ ছবিতে সাময়িক পত্রের কার্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে হাস্যরসের কেন্দ্ররূপে এবং কেন্দ্রবিন্দুরূপে দেখানো হয়েছে বিভাগীয় সম্পাদক-বৃন্দকে। এই মনোবৃত্তি যেমনই জঘন্য তেমনই লক্ষ্যাকর। জনগণের অন্তরের বাণী একত্রীভূত করে ধারা হাজারের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, মানুষে মানুষে যোগসূত্রের মিলন-সেতু ধারা, সেই সাময়িক-পত্রসেবীদের প্রতি এই চরিত্রবিগহিত ব্যঙ্গ শুধু অজায় নয়, অপরাধও। সাময়িকপত্র-সেবীদের বাঙালার এই সব পরিচালকের দল যে চোখে ইচ্ছে দেখুন, তাদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় অধীকার করতে চান কখন, তবে এই সত্য চিরদিনই বেঁচে থাকবে যে সুড়ি ও মিছরিব দর কখনও এক হয় না। যে যা সে

তা। শত ব্যঙ্গ ও বিদ্রোপে সে আসন টলানো যায় না। ছবির প্রথম থেকেই পরিচালনা ক্রটিপূর্ণ। নৌকো থেকে শুকতারার নামল যে ছেলটিকে নিয়ে, সেই ছেলটি কোথায় গেল? বিভূর সঙ্গ মেয়েটিকে দেখতে মানায় কি? পরিচালকের চোখ তো আছে! বিনয়ের প্রভাব যখন শুকতারার অন্তর স্পর্শ করেছে তখনও তার পরিধানে পিঠ-কাঠা জামার মত আপত্তিজনক বেশভূষা কেন? ঠেঁশনে শুকতারাকে পৌছাতে বিনয় এল আর যে অর্পিতাকে নিজের যথাসর্বস্ব সে নিয়ে এলো, তাকে ঠেঁশনে দেখা গেল না কেন? অর্পিতার মা হৃদয়হীনা হতে পারেন তবে তার বাবা তো স্নেহশীল বলেই দেখে এসেছি। তিনিই বা নিকৃষ্টি মেয়ের খোঁজ করলেন না কেন? চির গ্রহণের কাজে স্ত্রীর বস্তু প্রশংসাই। অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকায় সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অসাধারণ অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। স্মিত্রা দেবী মনে ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় খুব একটা রেখাপাত করে না। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণকুমার ও চন্দ্রা দেবীর অভিনয় প্রাণ স্পর্শ করে। নবাগতা স্মালা চট্টোপাধ্যায়কে ভালো লাগবে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। এ ছাড়া কমল মিত্র, মোহন ঘোষাল, (ছবির প্রচার বিভাগ বড় চমৎকার ব্যবহার করেছেন এই শিল্পীটির সঙ্গে) পদ্মা দেবী, অপরূপা দেবী, বিভূ ও গীতা স্ম-অভিনয়ই করেছেন। এঁরা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে আছেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবরায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লতা, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, মম্বথ মুখোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রী। সবচেয়ে ছবিবহু ও বিরক্তিকর অভিনয় করেছেন সবিতা চট্টোপাধ্যায়।

## নতুন প্রভাত

বিশ্বনাথ বায়ের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবার তাঁর লেখনীর সঙ্গেও পরিচিত হলেন দর্শক-সাধারণ। এক অভিনয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিকাশ বায় বচনা করেছেন এর কাহিনী। কতকগুলি রোগীকে কেন্দ্র করে এক ডাক্তার ও তার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের গল্প। আছে জনসেবার স্মরণ প্রচার, তারই সাথে জুড়ে আছে প্রেম, সংঘাত, মিলন, বিদ্রোহ। রোগীর অন্তরের অন্তর্ভুক্তি, ভাব ও তার ব্যক্তিপ্রকাশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বিকাশ বায়। রোগীর কুসংসারতার প্রতি তার সমবেদনা এখানে সুপরিষ্কৃত। বাঙলা ছবির কাহিনীর মধ্যে গতানুগতিকতা ভেদ করে নতুন নতুন পথের যে নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে, সেই নব বার্তাবাহীদের মধ্যে নতুন প্রভাতেও স্থান হবে নিরুপিত। ডাক্তার অনিল ঘোষের চিকিৎসাশ্রমে দেখা যাচ্ছে তরেন মাষ্টারকে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষনে শুধুমাত্র আশার আলোর যে কুসংসার নিয়ে পাগল, অন্ধরূপে, বো-পাগলা লোক অথচ স্ত্রীর সাধারণ ঠাট্টাকে যে গভীর ভাবে গ্রহণ করে, রমাকে, সীতাকে, ডাক্তারের অন্তরে যে মেলাতে চায় অন্তর, আনন্দকে, প্রাণপ্রাচুর্যের ভরা একটি কিশোর বালক সব কিছুর উপর যে বলতে চায় যে ছুনিয়ায় টাকার উপরেও আছে, অনেক কিছু আছে স্নেহ-মায়া-মমতা-হাসি-গান-কবিতা। পাখির শোক দুঃখ জয়ের মৃত্যু প্রতিমূর্তি তার জনক-জননীকে। সোমেশ্বরকে, সবদিক দিয়ে একটি কুতী ছেলে একটি অসম্ভব ঘা খেয়ে যে ভাবে

তিলে তিলে এগিয়ে যায় ক্ষয়ের দিকে, তারই যেন ব্যক্তিরূপ। ডাক্তার ব্যানার্জীকে, হাত্তরসিক ও হৃদয়বান এক চিকিৎসককে, সীতাকে, ডাক্তারশিষ্য রমেশের প্রেমসী অথচ সীতা চায় ডাক্তারকে, পরে ডাক্তারই তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে উদ্ধার করে তার ভুল ভেঙে দেয়, ডাক্তার চায় রমাকে, রমা চায় সোমেশ্বরকে, পায়ও। ডাক্তার নিয়গ্র থেকে যায় জীবসেবার মহান তপস্ৱী। ছবিতে ডাঃ ব্যানার্জীকে দিয়ে ঐ রকম হাত্তরসের অবতারণা করে চরিত্রটির মর্যাদা ফুটিয়ে তুলে মনে হয়। স্নায়ুতমের গুরুকে প্রেম নিবেদন কি রকম যেন বিসদৃশ লাগে! অরুণ ও আশার মধ্যে কি ভুল বোঝাবুঝিই লাভ করল চিত্রকারি? ছবির আরম্ভ ও শেষ অপূর্ব ভাবগভীর পরিবেশে সূচিত হয়েছে। অনিল স্তপ্তের চিত্র গ্রহণ চমৎকার অভিনয়ে ছোট একটি চরিত্রে অপূর্ব সংবেদনশীল ও সংযত অভিনয় করে গেছেন ছবি শ্রেষ্ঠ ও অপর্ণা দেবী। পুত্রবিদ্বেষের বেদনা মর্মে মর্মে বাজছে অথচ সমস্ত দুঃখ তাঁর পায়ে নিবেদন করার সেই দৃঢ়তা, অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এঁরা। অত্যন্ত গাভীরপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়। আসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি ও কান্না তিনি একাধারে গেলে পরিবেশন করে। ক্রসওয়ার্ডের সমস্যায় হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, আবার দরিদ্র শিক্ষকের ততোধিক দরিদ্র পরিবারবর্গের অসহায় কাতর অবস্থার উল্লেখে সকলের চক্ষু সজল করে তুলেছেন। অনেক দিন বাদে দেখা দিয়ে প্রাণমাতানো অভিনয় করে গেছেন নীরেন

ভট্টাচার্য। ছবির নায়ক না হলেও ছবির প্রাণ তিনি। নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের চরিত্রটি। অল্প সুরোগে যথেষ্ট পরিমাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাস্তবের অসামান্য অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পাঠাঙ্গী সাজাল, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সন্ধ্যারাণী, তপতী ঘোষের অভিনয়ও অন্তর স্পর্শ করে। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতা চক্রবর্তী, শুভা দাস, সীতা সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা দেবী ও মায়া ভট্টাচার্য।

ক্ষুধা

বিশ্বরূপার নবতম নাট্য 'ক্ষুধা'। সমস্তাসকুল বাস্পাঙ্কর আজকের পৃথিবীতে জীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আজ প্রতীয়মান হয়ে উঠছে এক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, ক্ষুধা আরতন থেকে আজ তা বিশালত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। পেটের ক্ষুধা থেকে যে প্রেরণ উদ্ভব, তার পরিণতি গিয়ে ঈর্ষা-হিংসা-বৈরাগ্য-ক্ষুধায়। বিধায়ক ভট্টাচার্য এই নাটকে একটি সূক্ষ্ম ও জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। বর্তমান যুগের সমস্যাগোষ্ঠী নাটক হিসাবে ক্ষুধার নাট্য-মূল্য যথেষ্ট। নাটকটি অপূর্ণ লাভ করেছে শ্রদ্ধেয় নটশেখর নরেশচন্দ্রের সুপরিচালনায়। নরেশচন্দ্রের সূক্ষ্ম স্পর্শ প্রভাবে এক বিশিষ্টতা লাভে সমর্থ হয়েছে এই নাটকখানি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে রক্তের টান অর্ধের মাপদণ্ডেরও উপরে, সেই বক্তব্যই প্রচার করা হয়েছে। অধ্যাপক চরিত্রটি অপূর্ব। সন্দেশ দিয়ে মোড়া চাবুক

পৃথিবীটা কি কেবল টাকার পেছনেই ঘুরছে?  
স্নেহ, মায়া, মমতা বলতে কি আর কিছুই নেই!!



বসুন্ধরী : বীণা : ও শহরতলীর  
অন্ত্য চিত্রগৃহে  
(নীততাপ নিয়ন্ত্রিত)

ব্যবহার করা হয়েছে এই চরিত্রে। আজ ইনকো আভিজাত্যের তাসের ঘর জাঁকড়ে থাকার চেয়ে বৈচে থাকার যে বিরাট আত্মনায়ণের ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে সেই পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটির আবেদন সকলকে আকর্ষণ করুক, এই কামনা করি। অভিনয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কাম্বু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া বসন্ত চৌধুরী, তরুণকুমার, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, সন্তোষ সিংহ, নবদীপ হালদার, মণি শ্রীমানী, জয়ন্তী সেন, সুব্রতা সেন প্রভৃতিও সুঅভিনয় করেছেন। শাস্তি গুপ্তা ও তপতী ঘোষ দরদ দিয়ে নিজেদের চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

চিত্রামোদীদেব কাছে অশোককুমারের সুযোগ্য অমুজ কিশোরকুমারের নাম আর অজানা নেই। বোম্বাইয়ে আজ ঝাঁঝ বাঙালি মুখ উজ্জ্বল করছেন, নিঃসংশয়ে তাঁদের মধ্যে কিশোরের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রতিভাবান অভিনেতা কিশোরকুমার এবারে বাঙলায় একটি ছবি প্রযোজনা করবেন। পরিচালনা করবেন

কাহিনীকার কমল মজুমদার। ছবিটির নাম লুকোচুরি। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন হেমন্তকুমার। রূপায়ণে থাকছেন কিশোর নিজে এবং অমুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা সিনহা, কমলা মুখোপাধ্যায়, সতী, সীতা, পূর্বী ও রাজলক্ষ্মী (বড়)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়ের আগামী অবদান কাঁচামিঠে। শুধুর ঘোষ ঘোরাচ্ছেন ক্যামেরার হাতল। অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, ববীন মজুমদার, অমুপকুমার, জীবন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদীপ হালদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, বিনতা রায়, নীলিমা দাস, গুলা দাস প্রভৃতি। 'পথে হল দেবী' ছবিটি সম্পূর্ণ রঙীন প্রথম বাঙলা ছবি। রূপায়ণে উত্তম-সুচিত্রা সহযোগে থাকছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাত্তাল, অমুপকুমার, মিশির ভট্টাচার্য, জহর রায়, শ্যাম লাহা, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, ভারতী দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল প্রমুখ কৃতী শিল্পীগণ। কাহিনীটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত লেখিকা প্রতিভা বসু। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করে মা লক্ষ্মী ছবিটি পরিচালনা করেছেন হরি ভঞ্জ। রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, বীরাজ ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিশির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, গঙ্গাধর বসু, মলিনা দেবী, সন্ধ্যাবাণী, জয়ন্তী সেন ও শিখা বাগ প্রভৃতি।

## মানবদেহের অভ্যন্তরে

বাউরে থেকে মানুষের দেহ কাঠামোটি নিশ্চয়ই যথেষ্ট স্তম্ভ্যমূলক। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রাঙ্গ ও উপাদান রয়েছে সে সকলের খবর আমাদের ক'জনাই বা জানা? স্তন্যে আশ্চর্য্য ঠেকবে—মানবশরীরে যে স্তন্যের অংশ রয়েছে, তার গড়পড়তা পরিমাণ প্রায় ১০ গ্যালন। 'কাট' বা চরিকাজাতীয় উপাদান যা রয়েছে, ওতে সাবানের প্রায় সাতটি 'বার' তৈরী সম্ভবপর। 'কার্বন' গড়পড়তা বা আছে, কমপক্ষে ১ হাজার লেড পেন্সিল তৈরী করা চলতে পারে তা' দিয়ে। দেহের অন্তঃস্থ 'কসফরাস' এর পরিমাণও এত বেশী যে, ওতে দুই সহস্রাধিক দে'লসাই তৈরী সম্ভব।

এইট হ'ল উপাদানের পরিমাণের দিক থেকে একটি বৃক্কবায় মতো হিসেব। সংখ্যার দিক থেকে হিসেব স্তন্যে আরও অবাক হয়ে বাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। মনুষ্য-শরীরের একটি অপরিহার্য উপাদান রক্ত—একথা সকলেই জানা। কিন্তু ক'জনাই জানা আছে—নরদেহে অল্পিস্তেন আহরণ উপযোগী যে লাল রক্তকণিকা রয়েছে, উহার সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি? এগুলোকে যদি কোন সমতলক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে ওয়া প্রায় ৩০ শত বর্গগজ স্থান জুড়ে ফেলবে। মেরুদণ্ড ও হাড়ের কাঠামোর উপরই মানবদেহ ঝাঁড়িয়ে—কিন্তু ছোট-বড় হাড়ের সংখ্যা কি একটি দুটি? শৈশবাবস্থায় এক একটি দেহ-কাঠামোতে হাড় থাকে অন্ততঃ ২৭০টি। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো হাড় আপনি

জুড়ে যায় এবং এর ফলে সংখ্যা স্বভাবতঃই কিছুটা কমে আসে। তদুপরি অবশ্য প্রায় ২০৬টি হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে প্রতিটি মনুষ্য-শরীরে। হাড়গুলো একে অপর থেকে ঠিক আলানো আলানো নয়—দড়ির মত একটি জিনিস, যাকে বলা হয় সংযোজক তন্তু এই দিয়ে এদের একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত।

এখন মানুষের স্নায়ু-স্পন্দনের সংখ্যাটা একবার তলিয়ে দেখা যাক। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে স্পন্দন হয় ৭০।৭২ বার এবং এই হিসেবে একটি মানুষ যদি ৭২ বছর বৈচে থাকতে পারতো, তবে কম পক্ষে তার স্নায়ু-স্পন্দন হবে ২১০ কোটি বার। অপর দিকে এই স্পন্দনের ক্রিকে মানুষের শিরা-উপশিরায় যে রক্ত সঞ্চালিত হবে, তার পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি পাইন্ট। মানুষের মাথায় কত সংখ্যক চুল আছে, এর সঠিক হিসেব কখনই প্রায় হয় না। একটি হিসেবে অবশ্য দাবী করা হয়েছে—মাথার চুল এক লক্ষ ২০ হাজার থেকে এক লক্ষ ৪০ হাজারের মধ্যে। মানুষের নখ কতটা করে বাড়়ে, ষতিয়ে দেখা হয়েছে সেইটোও। আঙ্গুলের নখ বৃদ্ধি পায় বছরে দেড় ইঞ্চি করে এবং এর অর্থই হচ্ছে একজন মানুষের জীবনে হাতের নখ যদি কখনই কণ্ঠিত না হ'ল, তবে সেই নখ বেড়ে হবে ৭ ফুট ১ ইঞ্চি। এমনি করে আরও কত হিসেব বা গবেষণাই চলতে পারে মানব দেহের যন্ত্রপাতি নিয়ে, বা' অবহিত হয়ে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

## পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা কেন ?

“এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৪৬’২ এবং আই-এসসি পরীক্ষায় শতকরা ৪১’৩ জন পাশ করিয়াছে। অর্থাৎ পাশের অপেক্ষা ফেলের সংখ্যা অধিক। এরূপ হবার কারণ কি? এতগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা একটি বৎসর নষ্ট হইল, তাহাদের অভিভাবকদের এত অর্থনগু গেল কেন? এই বৎসর প্রাপ্তপত্র যে কঠিন হইয়াছে, এরূপ অভিযোগ ছাত্রেরাও করে নাই। শোনা যায় যে, ইংরেজীর জন্য এত অধিক সংখ্যক ছাত্র ফেল করিয়াছে। অধিকাংশ পরীক্ষকের মত এই যে, ছাত্রেরা ইংরেজী ভাল করিয়া বোঝে না এবং ইংরেজী ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু কলেজে প্রায় সব বিষয়ই ইংরেজীতে পড়ান হয় এবং অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজীতে উত্তর লেখে। ফলে ক্লাসে কি পড়ান হয়, তাহাও তাহারা বোঝে না এবং কি উত্তর লিখিতেছে তাহাও তাহারা জানে না। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ছাত্রেরা ফেল করিয়া চলিয়াছে। এ সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার মান উন্নত না করিলে কলেজের শিক্ষার মান উন্নত হইতে পারে না এবং পাশের হারও বাড়িতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, স্কুলে ছাত্রেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করিয়াছে, হঠাৎ কলেজে আসিয়া ইংরেজীতে পড়া তাহাদের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে অনেকটা সফল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## আবহ সংবাদ

“কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। ভারতের আবহাওয়া অফিসগুলির কর্মপদ্ধতি এবং বস্ত্রোপকরণের মধ্যে আধুনিকতম সৌষ্ঠবের অভাব নাই তো? উন্নত দেশগুলিতে আবহ বিভাগ দেশের কৃষির প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীলতা বহন করে। আবহ বিভাগের প্রচারিত তথ্যের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া সেই সব দেশে কৃষিকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, আবহ বিভাগের সহযোগিতায় কৃষিকার্য সূষ্ঠতর ভাবে পরিচালিত হইবার সুযোগ পায়। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য এবং শিল্পগত উদ্যোগের সহিত আবহ বিভাগের সংগৃহীত, অনুরূপ ও প্রচারিত তথ্যের অন্তর্গত সম্পর্ক আছে। আবহবিদ বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতিগত বেসব তথ্য প্রচার করেন, তাহাই শ্রমণে রাখিয়া দেশের নৌ-চলাচল, বিমান চলাচল এবং জাহাজের সমুদ্রযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুনিয়ামিত, ১৯৪২ সালের অক্টোবরে সমুদ্রের যে জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুর ভয়াবহ ভাবে প্রাণিত হইয়াছিল, সেই জলোচ্ছ্বাসের আসন্নতার ইঙ্গিত এবং সতর্কতাব নোটিশ যথাসময়ে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। যথাসময়ে সেই ‘পূর্বাভাস’ প্রচারিত হইলে অনেক মাহুসের প্রাণ বাঁচিত। আবহ বৈজ্ঞানিকদিগের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই অভিযোগ করা যায় না যে, আবহ বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং আবহ পর্যবেক্ষণাগারগুলির উন্নতি সাধনের গুরুত্ব স্বয়ং দেশের সরকার সচেতন নহেন। কিন্তু সচেতনতা সত্ত্বেও একেত্রে বিশেষ কোন উন্নয়নের উদ্যোগ হইয়াছে কি না জানি



না। আবহাওয়া অফিসগুলির কাজ সেই পুরাতন গতানুগতিক পদ্ধতিতেই চলিতেছে কি? আবহ বিজ্ঞানের আধুনিকতম রীতিনীতি ও পদ্ধতি-সমূহ ভারতের আবহ বিভাগের কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে কি? প্রশ্নটি এই কারণে উপস্থাপন করিতে হইতেছে যে, পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়নে অগ্রসর ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথোচিত সূষ্ঠ আবহ তথ্যের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্ব লইয়া দেখা দিচ্চে। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

## বাস্তুহারা সমস্যা

“অজ্ঞ শনিবার অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া উদ্বাস্ত পুনর্বাসতির প্রশ্নটি আর একবার আত্মস্থ বাঁচাইয়া দেখিবেন এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসতি মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না তথ্যের উপস্থিত থাকিবেন, এ সংবাদে সবাই প্রীত হইবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম কংগ্রেসের সরকারী ও বেসরকারী মহল একত্র মিলিত হইতেছেন। সুতরাং সবাই এই আশাই করিবেন যে, আলোচ্য সম্মেলনে যে সব সুর্চিস্থিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহা একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিবে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত পুনর্বাসতি সমস্যাটির সার্বিক ও সন্তোষজনক সমাধান আজ পর্যন্ত হইতে পারে নাই, ইহা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বাস্তবিকই বিশেষ উদ্বেগজনক। বলাই বাহুল্য, আজ পর্যন্ত এই খাতে অর্থও ব্যয় হইয়াছে প্রচুর, প্রয়াস প্রচেষ্টাও কম হয় নাই, কিন্তু উদ্বাস্তদের বৃহত্তর অংশকেই এখনো স্থিতিশীল গৃহে পণ্ডিত করা যায় নাই বা সমাজজীবনের পক্ষে উপযোগী করিয়াও তোলা যায় নাই। এই কাজ কি ভাবে দ্বারপ্রাপ্ত ও সূষ্ঠরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, আলোচ্য সম্মেলনে আশা করি সে স্বত্বকে বাস্তবতাসম্মত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। আসলে নির্দিষ্ট বাসস্থান, অল্পকূল আবেষ্টনী ও স্বাবলম্বী হওয়ার মতো জীবিকা, এই তিন দিকের সমীকরণের উপরই পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসতির সফলতা নির্ভর করে। ক্যাম্পে রাখিয়া খরবারি সাহায্যের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা, অথবা পরিকল্পনামূলক ভাবে বাংলার বাহিরে পাঠানোর দ্বারা যে জটিলতাই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সকলেরই অভিজ্ঞতা। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সার্বিক ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের পথ বাতির করুন, ইহাই আমরা আন্তরিক ভাবে কামনা করি।”

—যুগান্তর।

## ডাকঘরের দুঃবস্থা

# বহুমুখ

## আরোগ্য হয়

প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমুত্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকে। ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গীণ অবস্থায় কারবাসুল, ফোড়া, চোখে ছানি পড়া এবং অস্বাভাবিক জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন য়ুনানি মতে দুর্লভ ভেষজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অধিক সেয়ে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জ্ঞাত লিখুন। ৫০টি বটিকার এক শিশির দাম ৬৫০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাশুল ফ্রী। নির ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোষ্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

“ইদানীং পোষ্ট অফিসগুলিতে ডাকের চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামাদি বিলির কার্যে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। এই তমলুক সহরেই দেখি, আজকের টেলিগ্রাম কাল পৌছিতেছে, চিঠিপত্র বেলা ১২টার পূর্বে পাওয়া ভাগ্যের কথা, সময়ে সময়ে তাহা পাঠিতে বিকাল ৪টা ৫টাও হইয়া যায়। তাহাতেও আবার রামের চিঠি শ্রামের কাছে এবং শ্রামের চিঠি যত্ন নিকট যাওয়াও বিচিত্র নহে। সহরেই যদি এই অনিয়ম চলে তবে মফঃস্বলের দুঃবস্থা সহজেই অনুমেয়।” পোষ্টঃ:ই বুঝা যায় ডাক বিভাগে আর সে আগের নিয়মামূল্যবর্তিতা বা কশ্মিনীতা নাই। সেদিন যুগান্তরেও দেখা গেল যে কলিকাতার বিখ্যাত জেনারেল পোষ্ট অফিসেও কশ্মশৈথিল্য চুকিয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে খোঁজ লইলে জানা যায় তাঁহাদের যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী নাই। নূতন নূতন যাহাদের কাজে লাগানো হইয়াছে তাহাদেরও যথোপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা বা কশ্মনিষ্ঠার অভাব রহিয়াছে। ফলে চিঠি বাছাই ইত্যাদিতে বিলম্ব হয়। তারপর কতাবও অসুখ-বিসুখ হইলে ত আর কথাই নাই। দুই জনের কাজ এক জনকে করিতে হয়, তখন অসুবিধা চরমে উঠে, এবং জনসাধারণও তাহার জ্ঞাত ফলভোগ করে। সরকার দিন দিন পোষ্ট অফিসের সংখ্যা বাড়াইয়া বাড়াইয়া লইতে চান। কিন্তু কাক্ষেব মান বাড়ানো দূরে থাক অসুস্ততঃ পূর্বমান বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি কোথায়? এই সব বিশৃঙ্খলার জ্ঞাত কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নহেন। সরকার খাম, টিকিট, রেভেন্যু প্রভৃতি সব বিষয়েই দর বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত কাজ না দেওয়ার জ্ঞাত মানুষের যে অসুবিধা ও ক্ষতি হয় তাহার কৈফিয়ৎ কি?”

—প্রদীপ (তমলুক)।

## পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

“কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৯১৭-১৮র বাজেট রাজ্যের পরিকল্পনা বাবদে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পাঠবার কথা কিন্তু বাস্তবে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে, ইহার ফলে আরও ৪ কোটির ঘাটতি পড়িবে। পশ্চিম-বাংলাবাসীর উপর মোট ৮।০ কোটি টাকার মত নুতন কর চাপিবে। কারণ ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যথাযোগ্য গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে রাজ্যের দাবী পেশ করেন নাই। বরং জনগণকে অধিকতর কুণ্ড সাধনের মাফুলী উপদেশ দিয়া নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষকে ত্যাগের জ্ঞাত প্রস্তুত হইতে ও সারা দেশের পাতিরে পশ্চিম বাংলার স্বার্থত্যাগ করার জ্ঞাত প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিয়া ডাঃ রায় কেন্দ্রের নিকট বাংলার দাবীকে দুর্বল করিয়াছেন। সারা পশ্চিম বাংলাকে যিনি এই সে দিনও বিহারভুক্ত করার অর্পণে করিয়াছেন তাহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। জনগণকে আজ পশ্চিম বাংলার চরম খাতিসঙ্কটের দ্বারে বসিয়া দেখী যনিক শ্রেণীর শ্রেণীদল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোন প্রকারে আপাত মধুর ব্যবস্থার আড়ালে জনগণকে অধিকতর নিপীড়নের পথ পাইলে ইহার তাহা গ্রহণে কুণীত হইবে না।”

—বীরভূম।



## অদ্ভুত মনোবৃত্তি

## কুম্ভাচারীর বদান্ধতা

“রঘুনাথগঞ্জ ষ্টেজ কমিটির গচ্ছিত প্রায় দুই হাজার টাকা প্রস্তাবিত জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতাল ফণ্ডে দান করা সম্পর্কে স্থানীয় মহকুমা শাসকের এক প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গত ২রা জুন উক্ত ষ্টেজ কমিটির এক সভা ন্যাকোজি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা তিনিয়া বিম্বিত হইলাম যে, ষ্টেজ কমিটির কতিপয় সদস্যের আপত্তির জন্য মহকুমা শাসক মহাশয় শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হন। মহকুমা শাসক উক্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সভাপতির আসন হইতে বখারোতি কোন প্রস্তাব পেশ করা হইলে ইহা সেই কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার নজির ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তন্মধ্যে উক্ত ষ্টেজ কমিটির সম্পাদক মহাশয় অন্যতম এবং তিনি এই শহরের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। এ সম্বন্ধে অল্প আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই ষ্টেজ কমিটির সক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় ১২/১৩ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন মহকুমা শাসক শ্রীমাজিঙ্গুর রহমানের উদ্যোগে এই ষ্টেজ কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁহারই উদ্যোগে প্রায় ৩০০০ হাজার টাকা টাঙ্গা সংগৃহীত হয়। এই টাকার অধিকাংশই জোগান দেন এই মহকুমার পল্লীবাসীগণ। এই টাকা প্রথমে স্থানীয় ডাকঘরে জমা না রাখিয়া কুমা বাধা হয় তপশীলভুক্ত নহে এমন একটি স্থানীয় ব্যাঙ্কে। পরে এই ব্যাঙ্কটি ফেল হইলে কমিটির প্রায় ছয় শত টাকা খোঁয়া যায়। বাহা হউক, ইহার মধ্যে কিছু পাবে খরচ করিয়া কয়েক কার্গা জমি খরিদ করা হয় এবং বাকী টাকা দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থানীয় ডাকঘরে আমানত পড়িয়া থাকে। কমিটি আশ্রয় পূর্ণাঙ্গ গচ্ছিত টাকা সন্ধানের কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই বা ইহাদের কোন কর্মোত্তমের লক্ষণও দেখা যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ষ্টেজ কমিটির যে টাকা দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন কাঙ্খে লাগান সম্ভব হয় নাই বা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করার কোন সম্ভব কারণ নাই সে টাকাটা যদি আপাতত হাসপাতাল ফণ্ডে দেওয়া হইত তাহা হইলে এই শহর তথা এই মহকুমার একটি বড় অভাব দূর হইত। জনগণের অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়িত হইলেই তাহার সার্থকতা, অনন্ত কাল ব্যাঙ্কে আমানত রাখায় ইহার কোন সার্থকতা নাই।”

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

## দুর্গাপুরের দুর্গতি

“দুর্গাপুরের লোহার কারখানার পত্তনের জন্য বহুব্যক্তির জমি ও ভিটা হারাইতে হইয়াছে। এখনও তাহাদের জন্য সরকার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের অনুরোধ, সরকার ঐ সমস্ত লোকের মধ্য হইতে কারখানার জন্য উপযুক্ত লোককে, অল্প বাইরের লোক লইবার পূর্বে; যেন কাজ পাইবার, প্রথম সুযোগ দেন। তাহা হইলে ঐ সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং স্থানীয় বেকার সমস্যারও কিছু সমাধান হইবে।”

—আসানসোল তিঠেতরী।

“দুর্দান্ত জমিদার যেমন প্রজার রক্ত-নিড়ানো টাকায় খলি ভর্তি করিয়া দুই-এক টাকা বখশিস ছুড়িয়া প্রজাবাংল্য দেখায় কুম্ভাচারীর ট্যান্ড প্রস্তাবের পরিবর্তন সেই রকমের। মধ্যবিত্ত ও গরীবের কাঁধের বোঝা ঠিকই রহিল। আমরা আগেই বলিয়াছিলাম, ট্যান্ড প্রস্তাবের নড়চড় বিশেষ হইবে না, পোষ্টকার্ডের দাম ঠিক রাখিলে এনভেলোপের দাম বাড়িলে। হইয়াছেও তাহাই। ইনল্যাণ্ড এনভেলোপের মূল্য ১৫ নয়া পইসা হইয়াছে—পুরানো ৮ পয়সারও বেশী। রেল যাত্রীভাড়া প্রথম ১৫ মাইল পর্যন্ত বাড়িলে না, অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা সহরে যাত্রীদের কাজেকর্মে ট্রেনে যাতায়াত করিতে হয় তাহাদের বেশীর ভাগই এই সুবিধা পাইবে না। ইনকাম-ট্যান্ড তিন হাজার টাকায়ই ঠিক রহিল, তবে ছেলেমেয়ে থাকিলে ৩০০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা পর্যন্ত আরকর হইতে বাদ যাইবে। কুম্ভাচারী চা ও কফির উপর বন্ধিত শুক প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং নতুন কোম্পানীওয়ালাদের পাঁচ বৎসরের জন্য সম্পত্তিকর হইতে রেহাই দিয়াছেন—ইহাতে উপরতলার লোকদের লাভ হইবে। মোটামুটি ৭৮ কোটি টাকা ট্যান্ড হইতে মাত্র ৫ কোটি টাকা ট্যান্ড কমাইতে কুম্ভাচারী রাজী হইয়াছেন। কংগ্রেসী এম-পিদের হৈচৈও বন্ধ হইয়াছে, জহরলাল এক ধমকে তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, প্রান পাচাইবার জন্য ট্যান্ডের সীম-বোলার চালানো বন্ধ হইবেই না, বরং বাহাতে বেশী ট্যান্ড দিয়া দেশের লোক হাড়ে হাড়ে বুকিতে পারে যে, প্রান চলিতেছে তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে। অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করিয়া, নবাবী চাল একটু কমাইয়া যে অনেক টাকা বাঁচানো যায়, দু'এক টাকা ট্যান্ড কমিলেও যে গরীবেরা একটু সোয়াস্তি পায় তাহা বুঝিবার ইচ্ছা পর্যন্ত তাঁহার নাই।”

—যুগবাণী।

## শুধু অবহেলা

“স্থানীয় সহরের অব্যবহৃত রাস্তাগুলি সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে স্থানীয় পৌরসভার পরিচালক-মণ্ডলী বিভিন্ন স্থানে খোঁয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সহরের জনসাধারণ ভাবিয়াছিল যে তাঁহারা বুকি শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কার্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা জনগণকে হতাশ করিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে যে খোঁয়াগুলি পড়িয়া আছে সেগুলি লইয়া সহরের অপরিণতবুদ্ধি বালকেরা বালক-স্বস্ত চাপলো ইষ্টক নিক্ষেপ ক্রীড়ায় আনন্দ অনুভব করিতেছে। এই ভাবে খোঁয়াগুলির অপব্যয় ঘটাইবার যে কি কারণ তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর! আশা করি, পৌরসভার কর্তৃপক্ষ আন্তরাস্তাগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া অথবা অপচয় নিবারণ করিতে মনোযোগী হইবেন।

—ভাগীরথী, (কালনা)।

## সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৩৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, “বন্ধুমতী বোটারী মেশিনে” শ্রীভারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



মূলী রূপ

চৈতন্য বসুমতীতে শ্রীযুত শ্রীযুক্ত অশোক সিংহের 'সংশোধনের' 'সংশোধন' করেছেন।

অশোক বাবু 'মূলী' লিখেছেন, আর শ্রীযুক্ত বাবু বলছেন লেখা উচিত 'মূলী' ('মূল'তে উকার হ'জনাট দীর্ঘ দিয়েছেন কিন্তু সেটা ছাপার ভুলও হতে পারে। কারণ pour-এর ou-এর মত moulin-র ou দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব—এটা অবগু এখানে অবাস্তব)। শ্রীযুক্ত বাবু ফরাসী ভাষার অধ্যাপক, তাই একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন অশোক বাবু মূলী লিখেছেন কেন? তাঁর মনে মনে ভয় ছিল (এবং সেটা কিছু অসঙ্গত নয়) মূলী লিখলে বাঙালী ভাষার রীতি অনুযায়ী লোক পড়বে, 'মূলী' যে বাক্য আমরা 'কল্লা', 'বল্লা' স্থলে 'ক-ননা' 'ব-ননা' পড়ি অর্থাৎ ব ফলা থাকার দক্ষণ তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিগুণ করি। এই কারণেই অনেকে রমী (Romain) লেখেন 'রমী' না লিখে; যদি ও ফরাসীতে Romain (রোমবাসী, কিংবা সাহিত্যিক Romain) এবং Roman (উপন্যাস) দুইই আছে, এবং প্রকৃত পক্ষে একটা হবে রমী এবং অজ্ঞাটা রমী। কিন্তু ঐ দ্বিগুণ উচ্চারণের ভয়ে বহু গুলী রমী (বলী) লিখছেন—রমী বলী না লিখে। Moulin-কে বরঞ্চ মূলী উচ্চারণ করা ভালো, কিন্তু (মূলী থেকে) মূলগী উচ্চারণ করলে আসল উচ্চারণ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাই।

Henri-এর বেলাও অশোক বাবু ভয় ছিল আঁরি লিখলে বাঙালী 'আঁ'টাকে তার ভাষার উচ্চারণের পদ্ধতি অনুযায়ী বড় বেকী দীর্ঘ করে ফেলবে এবং ফরাসীতে ঐ জায়গাটার 'en'-টি অতিশয় হ্রস্ব, আর 'le'-এর 'e'-র মত (ফরাসীতে যে 'a' হরকের

হ বাক্য উচ্চারণ—হ্রস্ব দীর্ঘ নয়, সে তো আছেই—একটা যুথ-গহবরের সামনের দ্বিতীয়টা শিছনের এবং Henri শব্দের enটা শিছনের অনুনাসিক a)। অবগু অশোক বাবু চিন্তা করলে ভালো করতেন যে 'আঁরি' লিখলে বাঙালী তার ভাষার প্রথা অনুযায়ী উচ্চারণ করে বসবে ঔরি (যেমন 'কলি' হয় 'কোলি', 'বলি' হয় 'বোলি') এবং সেটা ফরাসীর আসল উচ্চারণ থেকে এত দূরে চলে যাবে যে তার চেয়ে 'আঁরি' ভালো।

কাজেই এসব (শ্রীযুক্ত বাবুর অভিমত অনুযায়ী) 'ভুল' নয়, উনিশ-বিংশের তফাৎ। কারণ, তিনি নিচ্ছেই চরম সত্যটি বলে দিয়েছেন—'সব ফরাসী শব্দের যথার্থ উচ্চারণ বাঙলায় লেখা সম্ভব নয়।' 'তীব্র' বেলাও তাই হয়েছে। 'tam'-এর am এত হ্রস্ব, একেবারে Henri-র 'en'-এর মত যে অশোক বাবু এখানে তাঁ (ব ফলা ও আকার) দিয়েছেন। আর শ্রীযুক্ত বাবুর 'তীব্র' বাঙালার উচ্চারিত হয়ে যাবে 'তীব্র'!—খামবা একটা ফালতো 'ব' এসে যাবে। (উভয়েই 'ব' দিয়েছেন হ্রস্ব; শুধু কি 'ব' দীর্ঘ হবে না?)

কিন্তু R-এর উচ্চারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু যা বলেছেন সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ ধোঁকা আছে। 'ওরা R উচ্চারণ হবে গলার ভেতর থেকে, জিত থেকে নয়'—তা হলে প্রশ্ন—জিত কেটে ফেললে কি ফরাসী R তখনো বলা যাবে? আর বাঙালী গলা বন্ধ করে দিলে কি সে শুদ্ধ জিতে জোরে বাঙালী R বলতে পারবে। কিংক, 'আ' এক 'রা' দুটোই তো 'গলা থেকে' বেরয়—তফাৎ তবে কোথায়?

অপরক, দক্ষিণ ফ্রান্সের লোক আমাদের 'র'-র মতই R উচ্চারণ করে—তবে আমাদের মত অতখানি 'ট্রিল' করে না। প্যারিসের লোক কি ভাবে করে? 'জিত থেকে নয়' 'গলার ভিতর থেকে' বলাই যদি মুশকিল আসান হয়ে যেত তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

সর্বশেষে বক্তব্য, 'ল্যে'-তে 'একার' ও 'ব' ফলায় সম্বন্ধে বাঙালী কি উচ্চারণ করতে কি যে করবে, তার ঠিক নেই; কারণ বাঙলাতে এ সময়র থাকলেও আমাদের চোখে পড়ে নি।

—গৈয়দ মুজতবা আলী

স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত

গত মাঘ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে "স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত" প্রবন্ধটিতে শ্রীনিতিযোগোপাল রায় মহাশয় যে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—তদ্ব্যতীত এক স্থানে বলেছেন—"বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকলেই অনেকাংশে শ্রীকৃষ্ণের বিপরীতধর্মী অর্থাৎ antithesis, স্বামীজী এই বিপরীত ভাব বিদূরিত করিয়া একটা সমন্বয় (Synthesis) আনিলেন।"—কথাটা সমর্থনযোগ্য নয়। বরং শ্রীকৃষ্ণ-পরবর্তী বুদ্ধ শংকর চৈতন্য প্রভৃতি অবতার প্রতিম মতাপেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন ভাব—বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্য, শংকরে জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম যেন পূর্ণ মতিমায় প্রকট হোয়েছিল বস্তুতঃ, এঁরা সবাই ছিলেন সমন্বয়ধর্মী। প্রকৃত ধর্মের আদর্শই এই সমন্বয়। ধর্মই সকল যুগে সকল ভাব-সংঘাত বা বিপরীত্যকে (antithesis) একাদর্শে সমন্বিত করে। শ্রীকৃষ্ণ-শংকর-শ্রীচৈতন্য

এই সময়ের আদর্শ রূপায়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে এই সময়ই মহাসময়ই পরিপূর্ণ। তাই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে “অবতার-বরিষ্ঠাধ” বলে ঘোষণা করেছেন। লেখক অজ্ঞাত শ্রীবুদ্ধ শংকর ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যে নেতিবাদের (negativism) কথা বলেছেন এটাও ঠিক বলা চলে না। এঁরা কেউই নেতিবাদের প্রচারক ছিলেন না। বরং এঁরা সবাই ছিলেন ইতি-বাদেরই প্রচারক। শ্রীবুদ্ধের নির্বাণ-বাদ, শংকরের ব্রহ্মবাদ, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ মূলতঃ একই প্রচারণা—একই মহা হওয়ার বাণী।

গীতার্থ শ্রীকৃষ্ণ যে “ব্রহ্মনির্বাণ”র কথা বলেছেন—উহাই শ্রীবুদ্ধের নির্বাণ, শংকরের ব্রহ্ম, ও শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ দর্শন। শ্রীবুদ্ধের নির্বাণ বস্তুতঃ নাস্তিবাচক (annihilation) নয়। শংকরের মায়াবাদও নিছক ভ্রান্তি (illusion) বা অধ্যাস (projection) নয়। উহা ব্রহ্মবাদেরই অভিব্যক্তি রূপে সংস্থাপন মাত্র। শ্রীচৈতন্যের বৈকুণ্ঠধর্মও নেতিবাদমূলক নয় বরং ইতিবাদ-মূলক। কারণ বৈকুণ্ঠের বৈরাগ্যের আদর্শই কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম কখনও নেতিবাদের সমর্থক নয়। বৈরাগ্যের তাৎপর্য রাগ-বিহীনতা। প্রবৃত্তির রাগরঞ্জন রঞ্জিত না হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। উহা কখনই (negativism) নয়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, শ্রীবুদ্ধ শংকর ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহা-পুরুষগণের সৌন্দর্যবাসনের পরে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা এই নেতিবাদ প্রচারিত হয়। যার ফলে বুদ্ধের নির্বাণ, শংকরের মায়্য, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি একটা বিরাট বিকৃতি এনে দিল জনসাধারণের মনে ও মগজে। ধর্মের নামে, প্রেমভক্তির নামে কৌবত, জড়ভাষ্য হুঁব গেল সাধা বেশ। ইতিবাদের পরিবর্তে নেতিবাদই হোয়ে উঠল প্রবল। এ জন্ত দায়ী শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য-অনুগামী অগণিত শিষ্য বা ভক্তের দল। এ সম্বন্ধে লেখক রায় মহাশয় নতুন কিছু আনাতে সক্ষম হবেন। শ্রীহিরণ্যর মুন্সী, পোঃ জগতাই।

### কিনতে চাই

১৩৬২ সালের বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মাসিক বসুমতী।—দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ নং লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড। কলিকাতা ৬।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা চাই।—সমীর দে। ২৭ সি বিডন রো। কলিকাতা ৬।

১৩৬২ সালের বৈশাখ ও ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা চাই।—অনিমা সেন। ৭৭, নতুন চট্ট। বাঁকুড়া।

১৩৬৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা চাই।—আশরাফ সিদ্দিকী। ৩৭, দেওয়ান বাজার রোড। ঢাকা। পাকিস্তান।

১৩৫৫ সালের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, পৌষ, এবং চৈত্র। ১৩৫৬র ফাল্গুন, ১৩৫৮র ফাল্গুন, এবং ১৩৫৯এর আষাঢ় এবং ফাল্গুন।—সন্তোষ পাল। Chengmari Tea Estate, Dalcheng P. O.

### বেচেতে চাই

১৩৫৭ সাল থেকে ১৩৬২ সাল পর্যন্ত পত্রিকার পুরা সেট। মূল্য বৎসকঃ ৬০০ ছয়, নয় এবং বারো টাকা। এক সঙ্গে লইলে ছয়

টাকা দাম কম হইবে। ননীলাল দত্ত। ৬০, কৈবর্ত পাড়া লেন। শালিখা। হাওড়া।

১৩৬০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র ছাড়া সবগুলি সংখ্যা। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক টাকা। ভিঃ পিঃতে পাঠানো যাবে। গোপালচন্দ্র পাল। গাজিপুর। হাওড়া।

১৩৪৭ হইতে ১৩৬১ সাল পর্যন্ত পত্রিকা বেচেতে চাই। পুন্পলতা বানার্জী। ৪৬ চিন্তামণি দে রোড। হাওড়া।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমার প্রিয় পত্রিকার জন্ত এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। অল্পগ্রহ পূর্বক বৈশাখ সংখ্যা সম্বর পাঠাইবেন। ইতি—মায়্যা দেবী। Garganda Tea Estate, Ramjhora (Dooars).

Remitting Rs 15/- only being the amount of yearly subscription for the year 1364 B. S. please send the paper regularly and oblige.—Nilima Bose. C/o, B. M. Bose. Asst. Manager, Halmari T. E.

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—Sm. Rajlakeshmi Kar. 8, Goode Road. Darjeeling.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া বৈশাখ মাস হইতে উপরিউক্ত ঠিকানায় বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—বাণী রায়। 35/B, Nizamuddin West, New Delhi—13.

Rs 15/- being the subscription of M. Basumati for the current year is remitted herewith. I shall be glad if you would enlist my name for this year also and arrange to send the subsequent copy of the 'Basumati' at an early date.—Lila Lahiri. Coal Survey Station. Bilaspur P. O. M. P.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হওয়ার জন্ত ছয় মাসের চাঁদা ডাকে পাঠাইলাম। পত্রিকা সম্বর পাঠাইবেন।—রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়। C/o, Ramranjan Mukherjee. Dept of Ins. Govt of India. Simla Hills.

আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা হিসাবে ছয় মাসের বসুমতীর জন্ত অগ্রিম সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীশকুন্তলাকুমারী দেবী। Po. Jiaganj, Murshidabad.

১৫ টাকা পাঠালাম। ১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর জন্ত। অবিলম্বে পত্রিকা পাঠাবেন।—Devrani Choudhuri, 26, Wakdewadi Poona 5.

Being subscription for the year commencing 1st Baisakh to 31st Chaitra. Please start issuing the magazine regularly.—Mrs. Gita Banerjee, 15/95, Civil Lines. Kanpur.

বসুমতীর জন্ত ৭১০ টাকা পাঠাইলাম। নানা কারণে দেবী হইয়া গেল। আশা করি বই সম্বর পাইব।—স্মিতা দাশগুপ্তা। Quinton Road, Shillong (Assam).

জাতীয় সংগ্রামের অগ্রিকথা কাহিনী  
॥ মণি বাগচির ॥

## মিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

॥ বহু চিত্র ও মানচিত্র পরিশোভিত ॥

দাম পাঁচ টাকা

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : কলিকাতা-১২

.....

‘অক্ষপূজা’ ও ‘কক্ষহার’ প্রণেতা  
শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গৃহাগতা

১৯৫৬ সনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অন্তরায় (উপন্যাস)

প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়,

১১৪১২ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬

আমেরিকার বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও  
বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি ড্রাম ১১০ ও ১০ আনা, পাইকারীগণকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ও ব্যবহার্য সমগ্র গ্রন্থ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। ব্যবহার্য পীড়া, মায়বিক দৌর্বল্য, অক্ষা, অনিদ্রা, অন্ন, অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যবহার্য জটিল রোগের চিকিৎসা বিচক্ষণতার সহিত করা হয়। মক্ষঃস্বল রোগীদিগকে ডাকযোগে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—  
ডাঃ কে, সি, দে এল-এম-এফ, এইচ-এম-বি (গোড মেডেলিট),  
ভূতপূর্ব হাউস ফিজিসিয়ান ক্যাম্বেল হাসপাতাল ও কলিকাতা  
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক।  
অনুগ্রহ করিয়া অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

স্থানিয়ান হোমিও হল ১৮৫, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬(৫)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণ প্রশংসিত—

নিজে নিজে ইংরেজী লিখিবার—বলিবার—শিখিবার সর্বজন-  
সুপরিচিত—স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত  
একমাত্র চূড়ান্ত গ্রন্থ

## রাজভাষা

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীসঙ্গতভাবে পরিবর্তিত—পরিবর্তিত।

বাংলা-ইংরেজী সংস্করণ—১১০ টাকা

হিন্দি-ইংরেজী সংস্করণ—১১ উর্দু-ইংরেজী সংস্করণ—১১

● ● নতুন বেরোল ● ●

উপন্যাস

পথের প্রিয়া

২১

আঁধারের আলো

২১

সুখীন দত্ত

পরিচয়

১১০

নব জীবন

৩১

বিজয় ভট্টাচার্য

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শিশু-সাহিত্য

প্রেমের ঠাকুর ত্রিচৈতন্য ১১০

গল্প গাথা

১১

স্বপনকুমার

চিত্তরঞ্জন স্মর

(কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত)

মোহন লাইব্রেরী—৩৫এ, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্যের

ঐতিহাসিক ভিটা...৩১০

বাঁকের মুখে (২য় সং) ২১০

স্বামীীর স্বর্ণ (৩য় সং) ২১

ভ্রমরী ২১০

বন্দীর বান্ধবী (২য় সং) ২১০ মিস্ত্রির মেয়ে (২য় সং) ২১০

দস্যুর পশ্চাতে (২য় সং) ১১০

কাঁটাফুল ২১

বুড়ীর বটতলার ডাকাতি ১১০ ছন্দে শকুন্তলা ৩১

নারী কি শুধু স্বামীর ? ১১

সাহিত্য-কোণ, ৪৪/সি বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক পুস্তক

ডাঃ জে, এম, মিত্র প্রণীত

মডার্ন

## কম্পারেটিভ মেট্রিরিয়া মেডিকা

গৃহস্থ, শিক্ষার্থী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পক্ষে বিশেষ  
উপযোগী। সকল সম্ভাস্ত পুস্তকালয় ও হোমিও ফার্মাসীতে  
পাওয়া যায়। মূল্য ১২১। ডাঃ মাঃ ২১।

মডার্ন হোমিওপ্যাথিক কলেজ

২১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্ববিমোহন কথাসাহিত্যের সেই অক্ষরস্ত রসোল্লাস নিম্নরিত্বী—রূপ—  
রস—ঐর্ষ্যা—প্রথম-বৈচিত্র্যের ঐক্যজালিক প্রভাবসম্পন্ন স্পর্শমণি—

## তারব্য রজনী

একাধিক সহস্র রজনীর প্রমোদ-লহরী।

অনুবাদ-সাহিত্যে অমর-কীর্তি—বহুশ্রমীলায় সর্বজনপ্রমোদন বাহুবল—

চিরপ্রিয় প্রবোধ উপন্যাসিক দীনেশকুমার রায় অনুদিত।

চিত্রের পর চিত্রে বায়বোপ প্রদর্শিত—সুবর্ণিত চিত্র-এলবাসে সৌন্দর্য-  
জ্যোৎস্না উজ্জলিত—অল্পপম রূপসজ্জায় সুশোভিত রাজাধিরাজ সংস্করণ।

মূল্য ১০১ টাকা।



১. হাট-বাজার

২. হাট-বাজার

৩. হাট-বাজার

৪. হাট-বাজার







# মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—আশাঢ়, ১৩৬৪ ]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

সকল উপাসনার সার এই—সুদৃষ্টিত হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, বোঁগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই ষষ্ঠার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তকমাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

যিনি শিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্মানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্মানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ষাঁহার ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দাস; অতএব এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি, তোমাদিগকে সুদৃষ্টিত হইতে হইবে এক যে কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়,

যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম। এই সংকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব বহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিবাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্তি দেখতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে।

গেকর্য কাপড় ভোগের জন্ত নহে, মহাকাধের নিশান—কারমনোবাক্যে ‘জগদ্ধিতায়’ দিতে হইবে। পড়িয়াছ, ‘মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব’, আমি বলি, ‘দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব’,—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্ত নবকে বাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

# সংস্কৃতি ও বাঙালী

ঐন্দ্রব্রত সেন

আমাদের ব্যবহারিক সভ্যতা একটা দ্বিমুখী প্রবৃত্তি ধরা পড়ে।

এক দিকে মস্তকের স্বাক্ষর—আর, অন্য দিকে ক্ষুদ্রতার নিকট আত্মসমর্পণ। ১৪ আলোচনা অন্তে বিন্দুসমাজ একথা; মেনে নিয়েছেন যে, আমাদের সভ্যতাবের মধ্যে নিরন্তর এই দু'ধারার দ্বন্দ্ব চলছে। প্রতীচীর কোন এক মনোবীর ভাষায় The world is the vale of soul-making,—অর্থাৎ, নানা বিরোধের মধ্য দিয়ে মানুষের সকল প্রয়াসের আসল লক্ষ্য নিজের পূর্ণতম বিকাশের দিকে সে বিকাশের ভাবী স্বরূপ নিয়ে অনিশ্চিত সম্ভাব্য কোন লাভ নেই। সময়ের ধাবা বয়ে চলেছে; তারই বুক চলেছে বিবর্তনের খেলা; এই বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নিজেকে বৃহত্তর জীবনের রূপে রূপায়িত করবার জন্য নানা কৰ্ম ও চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে মানুষ। সে নিজের ভেতরকার অ-প্রয়োজনীয়ের সংস্কার করে চলেছে,—যা একান্ত প্রয়োজনীয় তাকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে। এমনি করে সভ্যতাবের সংস্কার করতে গিয়ে যা কিছু গ'ড়ে উঠেছে, তারই নাম 'সংস্কৃতি'। প্রকৃতির খেলা লক্ষ্য করলে এটা বেশ বোঝা যায় যে, পরিবর্তন ছাড়া সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্ভব নয়। বাইরের জগৎ বহু ভাবে একথা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সেখানে একটা বিপুল চলমান শক্তির প্রকাশ চলছে চিরকাল। প্রকৃতি তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষকে এসে পৌঁছেছে। এই চলা এখানেই শেষ হবার নয়। কিন্তু এই অবিচল চলার লক্ষ্য একটা সার্থক অভিব্যক্তির দিকে।

মানুষের মন প্রকৃতিরই অংশস্বরূপ—তাই তাকে বলি অন্তঃপ্রকৃতি (Internal Nature)। সেই ভেতরের রাজ্যও বিবর্তনের খেলা থেকে অব্যাহতি পায়নি। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেই মনোরাষ্ট্রও গ'ড়ে উঠেছে নানা সভ্যতা ক্রটি ও সংস্কৃতিবোধ। রূপান্তরের মূল অর্থ হ'ল ভাঙা-গড়ার লীলা। এই লীলার আনন্দে মানুষ যোগ দিয়েছে স্বৈচ্ছায় ও সানন্দে। বাক্যে সে গড়েছে, তাকেই আবার ভেঙে চূরমার করেছে। কিন্তু, কেন এই খেলা? উত্তরে বলব,—একটা সার্থক বিকাশের প্রয়োজনে। তাই, প্রকৃত সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে প্রগতির কোন বিরোধ ত' নেই-ই,—বরঞ্চ, তারা অতি নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ।

বহুযুগী ঘটনার আবর্তে পড়েও যে স্বরূপটি গ'ড়ে ওঠে তারই নাম স্বাতন্ত্র্য। নানা ভেদের মধ্যেও একটি অভেদ রূপ গ'ড়ে ওঠে সেখানে। ব্যক্তিগত জীবনে তার নাম 'চরিত্র',—আর সমষ্টিগত জীবনে তাই-ই 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত হয়।

এছাড়া, আরও একটা দিক আছে। রাষ্ট্রনীতি পড়ে আমরা জেনেছি যে, কি অপরিণত অবস্থা থেকে এবং কত উপান-পতনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ বর্তমান জীবনের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে! এই চলমান ধারাবাহিক জীবন-বাগের মূল নায়ক মানুষ নিজেই। যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে নিছক বাহ্যিক (Mechanical) হ'য়ে ছিল, —মানুষের জীবনে তাই একান্ত ভাবে আন্তরিক স্বাধীনতা লাভ করল।

সভ্যতা চলল এগিয়ে; সংগে সংগে বিভিন্ন দেশ ও সমাজ-জীবন গ'ড়ে উঠল। এমনি করেই দেখা দিল নানা রাষ্ট্র ও জাতির একটা প্রবহমান ধারা। তারা বিভিন্ন,—কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। ভূগোলের চতুঃসীমায় তারা ধীরে ধীরে বাঁধা পড়ল। বাতাস আর মাটি বদলের সংগে সংগে ভেতরের বৈচিত্র্যও ফুটে উঠল। কারণ, মাটির রসেই মনের রস প্রবর্তিত হয়। যাই হোক, ক্রমশঃ এই বিভিন্নতা উৎকট প্রাণান্ত লাভ করল। ফলে, মানুষ তার মূল ঐক্যের (Common Heritage) কথাও বিস্মৃত হয়ে গেল। অসংগতঃ, একথা বলে রাখি যে, এ ভুলের মাশুল আদায় শুরু হ'য়ে গিয়েছে;—তারই প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্ব জুড়ে সংঘটিত, মানুষের স্বকৃত আত্মঘাতী সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যে।

বস্তুতঃ, অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ—কোনটাই সম্ভব নয়। কালের বিবর্তনের সংগে সংগে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে দেখা গেল, যে রসধারা বহু জনমানসে ছুড়িয়েছিল—তা নানা প্রদেশের সীমায় আবদ্ধ হ'য়ে স্বতন্ত্র ও বিশেষ হ'য়ে উঠল। ছোট ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ হবার ফলে প্রত্যেক জাতি তাদের নিজস্বের সংস্কৃতিকে আপন খুসীমত গ'ড়ে তোলবার দিকে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হোল। নানা সংস্কৃতির এই মহাতীর্থযাত্রায় 'বঙ্গসংস্কৃতি' নামে একটা বিশিষ্ট ভাবধারা গ'ড়ে উঠল। এই বাঙালী জাতি ও তার সংস্কৃতির আদি পরিচয়টি কি? ঐতিহাসিকের ভাষায়—'গংগা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিশোধিত, সাগর-পর্বতস্থিত রাঢ়-পুণ্ড-কংগ-সমতট এই চতুর্জনপদসম্বন্ধ বাংলা দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিভিন্ন রক্ত ও সাংস্কৃতিক ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে—এবং একে একে ধীরে ধীরে কোথায় কে কি ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব মনে রাখে নাই। সম্রাণ চিন্তের ও ক্রিয়াজীল মননের রচিত কোনও ইতিহাসে তাহার হিসাব নাই একথা সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহ গঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই।' (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ষ,—শ্রীনিহাররঞ্জন রায়)। কালের প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে এ মাটিতে একটা স্বতন্ত্র জনসমাজ তার স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সেই সমষ্টিপ্রাণের গতি আজও সামনের দিকে নিয়ন্ত-প্রসারিত। ইতিহাসের পাতায় একথা বহু বার লেখা হয়ে গেয়েছে যে, অন্ত যে কোন জাতির জায় বাঙালীর সংস্কৃতির মানস-দুর্গে বহু বার আঘাত লেগেছে। তাতে সামাজিক, জীবনের বন্ধনগুলো চকল হ'য়ে উঠেছে। অনেক কিছু পুরানো নিশ্চিহ্ন হয়েছে,—আর তারই ভগ্নস্থূপের উপর নতুনতর জীবনের সৌধ গ'ড়ে উঠেছে। হুঃখ ও বিরূপতাকে বাঙালী এড়িয়ে যেতে চায়নি। তার জীবনধর্মে এমন একটা দুর্দমনীয় বীর্ঘ আছে, যার প্রেরণায় সে হুঃসহকে করেছে সহনীয়, প্রতিকূলকে করেছে অনুকূল। নানা হুঃখ ও সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাত বাঙালীকে সত্যের প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে।

আমার মনে হয় যে, বাঙ্গালীর মানস গঠনটি একটু স্বতন্ত্র ও অপূর্ণ। তার মনোধর্ম একান্ত ভাবে নমনীয়, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে এই নমনীয়তার মধ্যেই বাঙ্গালীচিন্তের এমন একটি দৃঢ়তা গড়ে উঠেছিল, যা আপন বৈশিষ্ট্য প্রোক্ষল। এখন এই নমনীয়তার কথাই বলি। ইতিহাসের আবর্তকে এই “গংগা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত-রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমভূত” প্রদেশে বার বার নতুন জন, ধর্ম ও সংস্কৃতির আঘাত লেগেছে,—আজও লাগছে। কিন্তু সেই চরিত্রে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা তার অন্তরের স্বাভাবিকভাবে কালের আবর্তন-প্রবাহে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। তখন মনে হয়েছে, বুদ্ধি বা বাঙ্গালী গেল—তার চর্যা ও সংস্কৃতির বিলোপ ঘটলো। কিন্তু তা হবার নয়। এ জাতি তার অন্তরস্থিত দুর্জয় শক্তি ও অনমনীয় সাহসের বলে কিছু কালের মধ্যে নবতর উৎসাহে সবার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এটি একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য যে, চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সংগ্রামী মনোবৃত্তির প্রবলতর প্রকাশ ঘটেছে এক এক জন মহামানবের আবির্ভাবে, সমাজ ও ব্যক্তির জীবন পরস্পর-নির্ভরশীল, এটি আধুনিক সমাজদর্শনের একটি বহু ঘোষিত সত্য। এ সত্যটি বাঙ্গালীর জীবনেও বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনি নবজাগরণের যুগে অসংখ্য মহাপ্রাণ আবির্ভূত হয়েছেন জাতির জীবনে; তারা এই দুর্দশাগ্রস্ত, বিপর্যস্ত, মৃতপ্রায় সমাজকে আত্মহীন জানিয়েছেন নতুনতর জীবন-চর্যার পুনরুত্থান উৎসাহে, তখন জাতির মগ্নচেতন (Subliminal Consciousness) থেকে তার জন্ম-জন্মান্তরের ঐতিহ্য, তার সুদীর্ঘ অতীত, একই সংগে, একই প্রেরণায় তড়িৎ-শিখার মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বহু বার এই নবজাগরণের শব্দধ্বনি শুনেছি বাঙ্গালী দেশে। জাতির চিন্তাকাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কত মহামানব; তাঁদের কর্ম-জীবনে, স্বপ্নে-মননে, একটা লুপ্তপ্রায় জনমানবের আত্ম-পরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী ঘোষিত হয়েছে। সে ঘটনাবলীর তারিখ সমন্বিত বিচারের ভার রইলো ঐতিহাসিকের উপর। এ ধরনের যুগের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Human Cycle নামক পুস্তকে বলেছেন—

“Then there arrives a period when the gulf between the convention and the truth becomes intolerable and the men of intellectual power arise...who rejecting robustly or fiercely or with the calm light of reason symbol and type and convention strike at the walls of the prison-house

and seek by the individual reason, moral sense or emotional desire the truth that society has lost or buried in its whited sepulchres. It is then that the individualistic age of religion and thought and society is created; the Age of Revolt, Age of Reason, Progress, Freedom has begun.” (P. 13).

ব্যক্তিজীবনের চরম প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালীর আত্মজীবন জাতীয়তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো; তারই সঙ্গে বাঙ্গালী বিশ্ব-ভাতৃব্দের মধ্যে দীক্ষালাভ করল। এই সময়ের প্রতিফলন দেখতে পাই উনিশ শতকের বাঙ্গালী মহাপুরুষদের জীবনে ও বাণীতে। এই সব মহামানবের আবির্ভাবও নিতান্ত আকস্মিক নয়। এর পেছনে রয়েছে কার্য-কারণ নিয়মের অলঙ্ঘনীয় শাসন। জাতির বহুকালের সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জাতির অসংখ্যপ্রাণ যে সাধনা করে, তারই বলিষ্ঠ একীভূত রূপায়ণ ঘটে এক একটা বিশেষ মানুষের মধ্যে। জাতির বহুকালের অপ্রকাশিত বেদনা প্রকাশিত হয় নানা মহামানবের জীবনে। একথা অস্বাভাবিক যে কোন জাতির দ্বায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও সত্য। বৃহৎ জন্মলাভের জন্ম বৃহত্তম বেদনার প্রয়োজন। আজ-কাল অনেকে আক্ষেপ করে বলে থাকেন যে, কই,—বাঙ্গালী দেশে এত দলের মধ্যেও এমন কোন নেতা আছেন কি, যিনি এই বিপর্যস্ত জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট কল্যাণময় ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন? তার উত্তরে আমি বলব যে, এই দুর্দশা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ জাতির মনে আজ কোনও বেদনাবোধ নেই। ইংরেজ-শাসিত ভারতে এবং আরও একটু পেছিয়ে বলা যায়, মুসলমান-শাসিত দেশে মানুষের মনে যে স্মৃতিক বেদনা ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, তারই ফলে অগণ্য মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। জাতি এখন অচেতন হয়ে থাকে, তখন তার আত্মহুতির মানস-হর্গে আঘাত লাগে; সে আঘাত স্বতঃপ্রসূত হয়, আবির্ভাবের বিরূপিতাও তত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এটি ঐতিহাসিক সত্য, আজ নানা দলীয় চাপে পড়ে বাঙ্গালী খুঁজে পাচ্ছে না কোন সুযোগ্য নেতাকে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয় যে, এ জাতির অহুস্কান করবার তাগিদও বুদ্ধি নিষ্কিছু হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থার আমাদের সকলকেই সেই নবজাগরণের কাজে অগ্রসর হতে হবে; কেন না, এ হ'ল জাতীয় দায়িত্ব। এই বেদনাবোধ জাগ্রত করবার একমাত্র উপায় হ'ল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

“একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের ‘সঙ্গীতের মূল আদর্শ’টাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলো স্বাধীন! এ সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলীভের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলাতী সুর নয়।”

“ইরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি সে আপনার মধ্যে প্রধানতঃ আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে জাতিমর্যাদাই প্রকাশ করে।”

—রবীন্দ্রনাথ

# তীর্থগোষ্ঠীর ভাষা-সমস্বয়

## শ্রীআদিত্যপ্রভনন্দ কাব্যতীর্থ

বহু ঐতিহাসিকের মতে আৰ্যগণের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য-এশিয়া, সেখানে বংশবৃদ্ধি ও স্বল্প-পরিশ্রমে জীবনোপায়ের অন্তর্বিধার জন্ত তাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণে সুরজলা ভল্গা, ডন, দানিউব, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস্, সিঙ্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী-বিশেষে শস্ত-আমল ইত্যাদি দেশসমূহ ও তুরস্ক, ইরান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহে গিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সেই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পৈতৃক বাসভূমিতে তাহাদের যে মাতৃভাষা ছিল, বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ায়, ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। তাহাদের নব নব রূপে যদিও তাহাদিগকে পরস্পরের জ্ঞাত্তি বলিয়াও চিনিতে পাওয়া গেল না—তবুও শূন্য, গভীর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষাবিদগণের দৃষ্টিকে তাহারা বঞ্চিত করিতে পারিল না। তাই আজ ভাষাবিদগণ তাহাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষের একত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তাহারা বর্তমান ইংরাজী ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষার জনক ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয় প্রধান ভাষাগুলির উৎপত্তির উৎস সংস্কৃতের, আবার আরবি, পার্শী প্রভৃতিরও কি কি সাদৃশ্য আছে—তাহার কিছু কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন।

নিম্নে ইংরাজীর কতকগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের সহিত সংস্কৃতের কতকগুলি শব্দ ও ধাতুর কি কি সাদৃশ্য আছে—তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

Webster এর অভিধানে ইহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বিশেষ্য ও ক্রিয়া, সেই প্রাচীন যুগে একরূপই ছিল—কালক্রমে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছে। ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, আরবি প্রভৃতি ভাষার মূল ধাতু ও শব্দের সহিত সংস্কৃতের এই সাদৃশ্য বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান ক্রমে নিখোঁজ হইবার আশা করা যাইতে পারে।

গম্ ও কৃ ধাতুর ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলির মূলের ২৪টি দৃষ্টান্ত ওয়েবস্টার হইতে প্রদর্শিত হইল।

### ক্রিয়া

### বিশেষ্য প্রভৃতি

সংস্কৃত	ইংরাজী	সংস্কৃত ও বাংলা	ইংরাজী
গম্ }	Go	পিতর, পিতৃ	Father
গাও }		মাতর, মাতৃ	Mother
	Saxon-gan	ভ্রাতর, ভ্রাতৃ	Brother
	German-gehen	ত্রি ( তিন )	Three
	Dun-gaer	ষষ্ ( ছয় )	Six
	Swedish-ga	অষ্টন্ ( আট )	Eight
	Dutch-gaan	নবন্ ( নয় )	Nine
	Busqwe-gan	তে ( তাহারা )	They
ডু ( কুণ্ড ) কৃ	Do	পূর্ব	Prior
কৃ ( করা )	Saxon-Don	অগ্র, আগে	Ago
	Dutch-Doen	ফল	Fruit
	German-Thun		
	Russian-Deya (Dayw)		

### ক্রিয়া

### ক্রিয়া

সংস্কৃত	ইংরাজী	সংস্কৃত	ইংরাজী
অর্চ, অর্হ	Worship	অদ }	Eat
অর্জ	Earn	অশ }	
অট	Wonder	লিহ	Lick
জট, কট	Clot	নিস্	Kiss
কট	Rob	নীড় }	Sleep
মদ, মদি	Mad,	বস্ }	
	Become Mad	পা }	Protect
অভ্, ইত্	Endeavour	পৃ }	
পনচ্	Stop	পল্ }	
উয়ী	Praise	হু }	Be
পুয়ী }	Weave	বিদ্ }	
পুড্ }	Purify	জন্	Born
সেব,	Serve	বিব্	Sew
জীব	Live	প্রীচ্	Please
শল্	Fall	ষিল্	Sweat
বম্	Vomit	শম্	Calm
ক্ৰশ্, ক্ৰন্দ্ }	Cry	দম্	Tame
মেঘ	Meet	তৃব্, (become)	Thirsty
চিব্	Wear	কৃথ্, কৃড্ }	Kill
মাস্ত }	Measure	দনভ	Deceive
মা }		ইব্	Wish
মজ্ }		মৃগ্	Seek
বধ্,	Bind	ভাজ্	Devide
কিং	Cure	কট্, চুট্ }	Cut
শান্ }	Sharpen	কৃৎ, কুট্ }	Mix
শিঙ,		মৃদ, মিশ্র	

## EXTEMPORARY SONG.

### I

I sigh for Albion's distant shore,  
Its valleys green,—its mountains high ;—  
Tho' friends, relations I have none  
In that far clime,—yet oh ! I sigh  
To cross the vast Atlantic wave  
For glory or a nameless grave !

### II

My father, mother, sister all  
Do love me and I love them too,  
Yet oft the tear-drops rush and fall  
From my sad eyes like winter's dew.  
And oh ! I sigh for Albion's strand  
As if she were my native land !

KIDDERPORE, 1841.

—Madhusudan Dutt.





## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১

২৬ মে ১৮৯১

ও

প্রিয়বরেণ্য,

কলিকাতা

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিত্যায় জ্ঞাত আমাকে ঠাণ্ড কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে—প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে—ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে কঁাকি দিয়া বসেন। দার্জিলিঙেও যদি এখানকার অনুরূপ বর্ষার প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ইঙ্গা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনার শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে—সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি—এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে—জোর করিয়া মনটাকে সংগ্ৰহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়—কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরানিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হোক তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কল্পনায়ের মত—পার্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয় হইয়া উঠিবে—কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে—এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬ আপনার

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৮৯১

ও

শিলাইদহ,

কুমারখালি

E. B. S. Ry.

প্রিয়বরেণ্য,

দার্জিলিঙের ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে দার্জিলিঙ ছাড়া

আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেদ্রুপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে, এখন বোধ করি নদীনির্ধর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে—আপনার কি শিখরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নায়েন ত এই পদ্মা নদীর পথটা কি অসুদূর করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে নদী জলে এবং পৃথিবী শস্তে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু 'জানালা' আছে কি করিতে? আপনার বাইসিক্ল চলিবার মত একটা পথ পড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম—সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনারদের সেই অর্দ্ধশ্রুত গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াছে আপনারদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়। ১৩০৬

আপনার  
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৪ জুন ১৮৯১

ও

শিলাইদহ

কুমারখালি

১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেণ্য—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। জ্ঞাতিনিষ্ঠার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া বথাসম্ভব দূরে থাকি; কিন্তু সংসারকে কঁাকি দেওয়া চলে না; প্রেমদাসের একটা গানে আছে :—

বুধা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—

ভোগ বিনা নাহি মিটনা।

বুধা শোক করিয়া কোন ফল হয় না—বাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার বো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পথ সুখ এই যে, বন্ধুদের সম্মুখে স্বয়ং নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কৃষ্ণে ২০টি বেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ কুণ্ডিত কীটকে দিব্যাজি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—বশ বাগো জন লোক অহর্নিশ তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—লবঙ্গ স্নান-আহার নিষা পরিভ্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আনাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হইতে প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে যোঝাই এত আছে যে কাং করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটি পাউলে এদিককার কথা শ্রবণ করিবেন।

আমার চাপ-বাসের কাঁড়ও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলি দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মাস্তাজি সফলান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। বিজ্ঞপ্তিলাবায় সোমবারে সন্ধ্যায় আমার শত্ৰুপক্ষ পরীক্ষণ করিতে আসিবেন।

যাপনাতা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার  
শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
৪  
১৭ সেপ্টেম্বর [ ১৯০০ ]

ও

শিলাইদহ  
কুমারখালি  
নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চূপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওলটাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছটকট করছি, কিন্তু তারা দু'য়ে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন। কাউকে রেহা করবেন না—যে হতভাগ্য surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নিম্নম চিন্তে তাদের পুরাতন ঘর দুয়ার তর্কানলে জালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সৈন্ত-সম্প্রদায় গেঁথে ষে-রকম বাহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ান ক্রিষ্টমাস করতে পারবেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব—আপনি কি করলেন তা বোঝাবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ করতে হবে না, কেবল টাইমস পত্রে ইংরেজের যুদ্ধ থেকে বাহবা শোনবামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বলবে, আমরা বড় কম লোক নই; অন্য কাগজে বলবে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার করছি;—এদিকে আপনার জন্যে কারো সিকি পরসার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আনবেন তখন আপনি আমাদের;—

চাষের বেলা আপনি একা, লাঠির বেলা আমরা সবাই; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে সম্পন্ন, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিকড়িগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি—আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দৌলুমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকছি। বলা বাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী করচিনে, এবং কোন দেশের ত্রাশতাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যান্ড বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুংসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ণ স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিজ্ঞাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে বোল আনা কুড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মন্ত বাধা হয়েছে এই যে, বত পেঙ্গিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী কবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ কবার চালানটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্ছে—অতএব মৃত ব্যাঙ্কে তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর মশের কোন জাবব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তাঁর ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিমরে টানবার জন্যে চেষ্টা করুচে—কিন্তু আমি নড়চিনে। স্বহিরা যখন পুরুত-শিখরে তপশ্যা করুতে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল—কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দার্জিলিংগের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বাগুতে শারদজীর শুভ শুভ সমাগম প্রতীক্ষা করছি। বোধ করি, মন পাছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গদানে প্রতিশ্রুত আছেন, ক'ম্বারে হোক, উড়িয়ায় হোক, ত্রিবাঙ্করে হোক, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিত্রের একটা অধ্যায়ের মধ্যে কঁাকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত করবেন না—সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাখের সঞ্চয় ক'রে রাখছি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করচেন—বেলাও হয়েছে। অতএব স্বপ্নকালের জন্যে মার্জনা করবেন—আমার অধিক দেৱী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চরন প্রকাশ প্ররুত ছিল মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উত্তম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি আমি ছবি আঁকছি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখতে ব'সে গেছে শুনে বোধ হয় কম আশ্চর্য্য হবে না। তার এতই দ্রবস্থা হয়েছে! বেচারাকে শেষ কালে কবিতা লেখালে! ওয়ার খায়েমের বাঙ্গলা পড়ানুবাদ করচে। দুই-একটা নমুনা দেখলে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝতে পারবেন:—

মৃৎ তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্ণমুখ-আশে  
ধাকিসু মুক্তির তরে অন্ধ কাণাংসে।  
সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিসু পাওনা,  
ছাড়ি না নগদ আমি বাহা হাতে আসে।

এই সমস্ত কবিতায় সোফেন মুখের ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্ জারি করেছে—সুদ চায় না, লাভ চায় না, বা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়—আমি এ ব্যবসাসে শেষার কিনতে প্রস্তুত নই।

আপনার শালকজ্ঞা আখ্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করছেন—পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুশীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি, আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষার অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অস্তিত্বের ইংরেজী চর্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্তে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্তে পুরীর জমিটি ঠিকিয়ে রাখতে পারব বলে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েছে। কর্তা আমাকে লিখেছেন, পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েছে। জোর যার মুলুক তার যদি সত্য হয় তাহলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাকতে থাকতেই বাড়ী আরম্ভ করে দিতে পারতেন তাহলে ও লোকটা দাবী করতে পারত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্ছে—মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলা-দরজাগুলো হুদুড়ি ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। এই বড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটির ভাব এনেছে—সেই কর্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব করতে পারবেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে—তার পরে আবার যেদিন একটু বাদলা হয়, বা শরতের হৌজ গুঁঠ, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটি নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শাসিগুলো বন্ধ ক'রে বসে আছি—বরষার শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছে।

প্রব্রাতার দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা করেন তাহলে আর্থ্যার শরণাগত হবেন—তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তাহলে আমার কোন নালিশ থাকবে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুকরো খবরটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পবন উপাদেয়, এটুকু মনে রাখবেন। কে কি বলছে, কি লিখছে, কি হচ্ছে সমস্ত আভ্যোপাস্ত জানবার জন্তে সতৃপ্ত হ'য়ে আছি। ইতি ১লা আশ্বিন [ ১৯৬৭ ]

আপনার  
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫  
[ অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০০ ]  
বন্ধু,

সীতার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কথ্য আপনাকে আশ্রয় কবিতা আছে, আপনাকে অতি নীরব সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতৃপুত্র সাংসারিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি—এার আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই

নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই—শরীর অবসর। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি; এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি, দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিয় কয়েকটি হইতে পারে :—পোষ্টমাস্টার, কক্কাল, নিলীখে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্যের সহায়তার জন্ত তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্বেই বলিয়াছি—আপনি বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুদ্র মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি, সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন  
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬  
২০ নভেম্বর ১৯০০

ও কলিকাতা

বন্ধু,

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বন্ধ থাকতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্বে এখানে যখন আসতুম তোমাদের ওখানেই সর্ব প্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রান্তেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল—তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুণন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আসতুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করছি। এক এক সময় সাংসারিক নানা বন্ধাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্লিষ্ট হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্তব্যের গৌরব পুনর্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি—সাংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চার করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্তও আমার সাংসার-বন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতার তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন

এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব—তিনি খুব খুশি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমন উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্তে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তর্জমার জন্তে ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিস্তেজ শক্তির প্রতীক বিশ্বাসহীন। সেই জন্তে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারিনি। সে এখন আমার কাব্যনির্করনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি—তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্বাসিত করে বইটাকে সর্বসদাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা গেছে—এখনো দুই এক জায়গায় একটু আধটু কটক লুকিয়ে আছে—সে আর পারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে “নৈবেদ্য” বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্ধ্যাতীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-স্বপ্নের কেন্দ্রস্থলে যিনি এবং নিশ্চল ভাবে বিরাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণু পরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল—তাঁর কাছে নির্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্ছি। সে দিনগুলিকে যদি কর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অসম্ভব তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীত্রই এগুলো ছাপতে দেব—বোধ হয় তুমি ইংলণ্ডে থাকতে থাকতেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কণ্ঠ-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জনে দেবদেবের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজবে কি না জানি নে—এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শাস্তি সেখানে কি রকম শোনাবে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুশি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাক্তনা সহ করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুষ্কর হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি—শিলাইদহের নীড়টির জন্তে প্রাণ কাঁদে। এই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার  
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ডিসেম্বর [ ১১০০ ]

ও

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পক্ষ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া দ্রুতপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জন

নাটকের অভিনয় হইবে; আমি বহুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুবোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাবনপুত্রীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। স্বত পাত্র তোমার ধবর আমাকে পাঠাইবে—তন্ন তন্ন বিবরণের জন্ত আমি ক্ষুধাতুর—কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ে না। তোমার কীতিকাহিনীর মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুই খণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্বাসিত করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্যকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উত্তম হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বক্তৃথানি টানিয়া লইলে দ্রোণদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুষ্টিল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এখানে তোমাদের দ্বি—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকায়ীয়া আছে।

গভর্ণমেন্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্ত আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক, তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিদিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না, বাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভাব আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাই না—তুমি বাহাকে খুশি দিয়ে।

বিসর্জন নাটকের রিহাসাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ ডিসেম্বর ১১০০ ]

তোমার  
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[ ডিসেম্বরের শেষ ১১০০ ]

বা জাহ্নুয়ারীর প্রথম ১১০১ ]

ও

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিস্ম-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাহার “প্রকৃতি” নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অজ্ঞ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না। কিছু দিন যোগভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্ত এক বহুতা লিখিতে হইল—তাহার পরে ভারতীয় জন্ত “চিরকুমার সত্য” লিখিতে হইল—তাহার পরে

সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জন নাটকের জগৎজয়ের বিহার্সাল দেওয়া গেল—  
আমাকে রূপান্তরিত নাটকে হইয়াছিল—সমস্ত বক্তৃতাতে বিব্রত  
ছিলাম।

বিসর্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সপ্তাহ  
পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে—  
আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার  
হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই  
করিয়া লইতে চান—নিরুৎসাহ জনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত  
হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া  
থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন  
পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার  
জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া  
লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্তন  
করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় লইব  
বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন শীতের দিনে পদ্মা তাহার  
তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ্র ফরাস বিছাইয়া অপেক্ষা  
করিতেছে—ফসু করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে  
বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ—বড়দাদার এই খাতার কোন নকল নাই।

১

জাহ্নবীর ১১০১

ও

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্মসমাধা সম্বন্ধে  
যাযাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না।  
সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম  
সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে  
স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে।  
তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুভাঃ সেই কার্য্য সমাধার ব্যয়  
আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন  
রাখিয়া কিরিয়ো না—আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছে—আমার এই চিঠি  
যখন পৌছিতে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ  
করিয়া উঠিয়াছে। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার  
প্রদত্ত নূতন জ্ঞান-লাকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপরূপ  
উজ্জলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

১০

মে ১১০১

ও

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি  
লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে—আমি যে লিখি নাই

তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে  
বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি—কোন রকমে  
মনের অবসাদ কাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ার মন দিতে চাই—কিন্তু  
কমলি নেই ছোড়া।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জিলিঙে  
আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের  
স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার  
সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ  
মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই  
বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না; তুমি বিলাতে, লোকেন তর্কবচ,  
মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলার, নাটোর নীলগিরিতে।  
আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার  
উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যাদ্বন্দ্বান এখনো কি প্রস্তুত  
কর নাই বাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্ত  
বিকীর্ণ করতে পার? নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিয়ো।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত  
হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ  
ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ  
করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর  
দায়িত্ব স্বন্ধে লইতে তুমি সফল বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু  
তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি বাহাকে ভাল মনে করিয়া  
বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া  
কাঁড়াইতে পারে—মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না।  
বর্তমানে তুমি বাহাকে বোগ্য এক ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে  
যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত হইবেন  
না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে  
পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার  
সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান  
করিয়াছেন। কতক বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে  
হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা  
পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজ্ঞানকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে।  
শুনিলাম, তিনি অল্পপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের কোল  
ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন—তাঁহার মাছের কোল এখনও  
ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ—মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে  
বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন—  
তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান  
ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন,  
বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই  
নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দিষ্ট সময় বাধির  
দিতে হয়, তাহাও চলিতে পারিবে।



১১

ও

২১ মে ১৯০১

শিলাইদহ

২১শে মে

১৯০১

বন্ধ,

অনেক দিন থেকে তোমার চিঠি জন্তে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুশি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্তে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করিনে।

পৃথিবীকে সর্বত্র চিম্টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমেতে পীড়ন করে আসছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেবার চিম্টি কাট আর বিধ খাওয়াও—ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিম্টি দণ্ড বিধান কর্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্তে প্রস্তুত হোয়ো। অনর্থক ভারতবর্ষের বন্ধুদের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট করোনা। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫-৬ বৎসর সেখানে থেকেতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সন্ধান কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দাঁড় ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বল্পে ও নিশ্চিত চিন্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোঁচা করে লিখো।

লোকের যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আমার ভারি ইচ্ছা করছে আমবা জন দুইতিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘটা দুই তিনের জন্তে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকের সঙ্গে লগুনে গিয়েছিলুম—তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা—আমি দুদিন থেকেই নিত্যন্ত যিকার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছ বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করছি দেখা হবে। হয়ত কোন দিন তোমার দরজার ঠক্কাক শব্দে যা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাদ্যে আমি মন

নিতে পারি নি—অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

৪ জুন [ ১৯০১ ]

১২  
বন্ধ,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নতুন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অজ্ঞ আমি তাহার অকর্ণভামণ্ডিত পদ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্ত আমার লম্বাকরণ উদ্ভূত হইয়া আছে—বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক! নব্য ভারতের প্রথম স্বাধিকরণে জ্ঞানের আলোকশিখায় নতুন হোমায়ি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারবার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্বী শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাধিয়া দিতে পারি তবে আমিও কী দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।

বেলায় বিবাহের আর ১০/১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক আঁলিয়া দিয়াছ। অনেক বন্ধুদের মধ্যে পড়িয়াছিলাম—আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন শ্রবণ করিয়া ধনী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—২১শে জ্যৈষ্ঠ। [ ১৮০৮ ]\*

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

## আষাঢ়ের মেঘকে

শ্রীপ্রজ্ঞেশকুমার রায়

স্বাগত হে সুন্দর আষাঢ়ের মেঘ!

স্বাগত হে মস্তুর আষাঢ়ের মেঘ!

দগ্ধ চোখে মোহাঙ্গন দাও, এঁকে দাও—

অসকার পথে নাও, সঙ্গে করে নাও।

স্বাগত হে ঘননীল আষাঢ়ের মেঘ!

দাও আশা, দাও ভাবা, দাও প্রাণাবেগ।

দূর করো নিদাঘের দাহ হৃৎসহ,—

দাও অঙ্গ, দাও গীতি, ওগো বারিবহ!

বন্ধ ভরে দাও কেরা-কদম্বের ড্রাগ—

কল্পনারে দাও পাখা, মূর্তে দাও প্রাণ।



# স্মৃতিচিত্রণ



পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

৩

ফুকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটের মেসেই প্রথম কালি নক্সকল ইসলামকে দেখলাম। যুবক নক্সকল, প্রাণোচ্ছলতার ভেঙে পড়ছেন, তাঁর কল্পনার হাউই তখন আকাশচুম্বী। কবিতা আবৃত্তি করলেন। বল বীর, বল উন্নত মম শিব! উদ্দীপনা আগার ভীক মনে। গালভানির মতো তিনি যেন, যে যুবশক্তি মৃত ব্যাঙের মতো পড়ে আছে, তার মধ্যে বিদ্যাস্তরঙ্গ চালনা করতে এসেছেন তাঁর বিদ্যাজ্ঞান বস্ত্র নিয়ে।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। আবৃত্তির পর তিনি কীর্তন গান গাইলেন একথানা। তাঁর কণ্ঠের উচ্চগ্রাম মেস-যর অতিক্রম করে আমহাট্ট ষ্ট্রীটের বাড়িঘরগুলোকে গাফা মারতে লাগল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম দুজনের দিকে।

কবিশেষণ কালিদাস রায় আসতেন লেখার ফাইল নিয়ে, বাইরে থেকে। তিনি উপাসনা কাগজে মাসিকপত্র সমালোচনা করতেন, তাঁর মত এ কাগজে একটি পৃথক বিভাগ ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সহকারী সম্পাদক। আরও একজন সহকারী—কিরণকুমার রায়। ১৯২০ সালে কিরণ খার্ড ইয়ারে পড়ত ইংরেজীতে অনার্স সহ।

কিরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তখন থেকেই, আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে। কিরণচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অধিকাংশ বিষয়েই নিজস্ব মত প্রকাশ করা, এবং সে মতটি একটি মাত্র ইংরেজী শব্দ—trash! অনেক কিছুই কিরণের কাছে ট্রাশ। মনে মনে জানতাম ঠিকই বলছে, কিন্তু অত অল্প বয়সে এ রকম মত প্রকাশ করবে কেন সে, এর পরিণাম কি, ভেবে ভয় হত। শেষ পর্যন্ত আশঙ্কিত পরিণামই ঘটেছে, সে সব পরে বলা বাবে।

একটি কবিতা লিখেছিলাম, সসঙ্কোচে সেটি কবিশেষণের হাতে দিলাম। তিনি সেটি উপাসনাতে ছেপেছিলেন। কবিতা যে কেন লিখেছিলাম জানি না, ওটি হয়তো বাঙালীত্বের বৈশিষ্ট্য। কবিতা ছিল মনে মনে, নীরব এবং অদৃশ্য। নীরব কবিকে সংসারে কবি বলে স্বীকার করা হয় না। অবশ্য কবিরূপে তারা স্বীকৃতি না পেলেও স্বপ্নের ভিতর দিয়ে অসংখ্য গান গাইত। পত্রিকাকে কবিতার

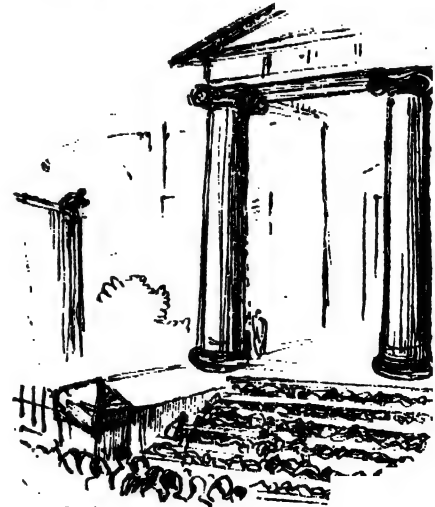
কাব্যে এ বাৎসরিক যুদ্ধ হয়েছে এবং কাব্যকে জনপ্রিয় করেছে তার সবাই নীরব কবি।

“একাকী গায়কের নহে তো গান  
গাহিতে হবে দুইজনে  
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা  
আর একজন গাবে মনে।”

এর ব্যতিক্রম একমাত্র সমবেত সঙ্গীতে, যেখানে, ‘গাহিবে দশজনে খুলিয়া গলা, কেহই গাহিবে না মনে।’

উপাসনায় এ সময় আমার একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়, (মাঘ ১৩২৭)। প্রবন্ধের নাম ‘আমাদের চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা।’—প্রবন্ধটি আজ থেকে ৩৭ বছর আগের লেখা। তবু হয় তো আজকে আমার কিছু চিহ্ন ওর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এ প্রবন্ধে লিখছি—

“কোনো একটি বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা ভাষা আশ্রয় লই, কিংবা রেখার ও বর্ণের তাহা ফুটাইয়া তুলি। চোখে যেটুকু দেখি শুধু সেইটুকুই যদি প্রকাশ করি তাহা হইলে সে প্রকা



বিষয়বস্তুর পিকো

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে রূপটুকু চোখের নিকট অব্যক্ত অথচ স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্ত সেটুকুর প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমরা সহ্যই হইতে পারি না। এখন কথা উঠিয়াছে চিত্রশিল্পে আমরা প্রকৃতিগন্য হইব কি কল্পনাপন্থী হইব; বাহ্য চোখে দেখিতে পাই কেবল তাহাই আঁকিব না করনার রং কসাইয়া তাহাকে ভিন্ন পথে ঢালাইব। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—সমস্তটি মোটেই জটিল নহে। চিত্রশিল্পে প্রকৃতিকে অনুসরণ করার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আমাদের অঙ্কিত চিত্র একটি বাস্তব চিত্র তো হইবেই তাহা ছাড়াও কিছু বেশি চাইবে। বস্তু বিত্ত অস্বাভাবিক শুধু দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা যখন মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে চাই তখন আমরা তাহার বিত্তবৃত্ততা বজায় রাখিতে পারি না; সঙ্গে কিছু বাহ্য কিছু অব্যক্ত এবং কিছু অলঙ্কার বোগ করিয়াই থাকি।—চোখে দেখা রূপের বর্ণনা বেশি করিতে হয় না, কারণ চোখে আমরা সামান্য অংশই দেখিতে পাই; কিন্তু অন্তরের চোখে বাহ্য দেখি তাহা অতি বৃহৎ। তাই শব্দচিত্রেই হউক, বর্ণ বা রেখাচিত্রেই হউক, করনার রূপ যত বেশি দিতে পারিব ততই সেগুলি বেশি সুন্দর হইবে।”

চিত্রশিল্প নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে লিখি। আজ বুঝতে পারি যে অর্ধে একথা লিখেছিলাম আমার মনের মধ্যে সে অর্ধের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সে কথা পরে বলছি।

বিভূতিভূষণ ভট্ট আসতেন এই মেসে। তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলে দিয়েছিলাম, আজও মনে আছে সে ছবিখানার কথা। আরও একখানি ছবি তুলেছিলাম যার কপি থাকলে আজ তার বড়ই আদর হত। সিনেট হাউসের সিঁড়িতে ছাত্ররা শুয়ে আছে, ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না কাউকে। প্রবেশ করতে হলে তাদের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমি আমার কোয়ার্টার গ্রেট ক্যামেরাটি নিয়ে পাণের একটি ফটকের উপরে উঠে ছবি তুলেছিলাম। আশুতোষ বিলজি তখন ছিল না। ফোটোগ্রাফখানা নির্ভুল এক্সপোজারে চমৎকার হয়েছিল।

এই মেসে থাকতে আর একটি কৌতুকর ঘটনা ঘটে। আমি একদিন একখানা ছবি আঁকি। ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মৃতিকে আশ্রয় করে আঁকা। একখানা প্রোফিল ফোটোগ্রাফ থেকে কপাল ও নাকমুখের রেখাটি নিয়ে সেই রেখাটি শালা রেখে বাকী অংশ সব কালো করে দেওয়া। মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারে মুখের ঐ অংশে শুধু আলো পড়েছে। যেন অন্ধকার ভেদ করে কবি জ্যোতির্গয়ের দিকে মাথা তুলেছেন। ভাবটি তাঁর কবিতা থেকেই নেওয়া।

কবি জানেন্দ্রনাথ রায় তখন প্রভাতী নামক ছোট একখানা মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে পত্রিকার আমার একটি রচনাও ছাপা হয়েছিল, কি এখন আর মনে নেই। এই পত্রিকার জানেন্দ্রনাথের ত্রিভুজ অফ সাইন্স কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়। তিনি এই মেসে আসতেন। যে দিন ছবিখানা আঁকি তার পরদিন তিনি এসেছিলেন। তিনি ছবিখানা দেখে বললেন ওখানা প্রভাতীতে ছাপবেন! মোটা কাগজে আঁকা ছবি, জড়িয়ে মোটা বোর্ডের সিলিঙারে ঢুকিয়ে তাঁকে দিয়ে দিলাম। তখন বেলা নটা

কি দশটা। আধঘণ্টা পরে জাটীয়াবু হস্তান্তর হয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে এবং এসে প্রায় কঁদে ফেলেন আর কি। তিনি দোস্তামুজি কিছুতেই বলতে চান না, শেষে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত ভাবে বললেন যবে গিয়ে দেখি, প্যাকিংএর চোড়াটা হাতে আছে, ভিতরে ছবি নেই, চোড়া থেকে পথে কোথায় পড়ে গেছে। শেষে আমিই তাঁকে অনেক সাধুনা দিয়ে বিদায় করলাম।

বেলা বারোটা আশ্রয় সময়ে খাবার ঘরে কয়েকজন ‘সহোদর’-এর কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করছিলাম। শক্তিপদ নামক এক বন্ধু বললেন মেসের চাকর এক ওড়িয়ার দোকান থেকে তাঁর জল পান কিনে এনেছে, সেই পান জড়ানো আছে রবি ঠাকুরের একখানা ছবি দিয়ে। খাওয়া শেষে দেখি—ঘটনা সত্য। পানের রং মাখা সেই কাগজখানার আমারই ছবি। তবে পান উল্টো পিঠে জড়ানো ছিল, তাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। ছবিখানা দুমড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনেক কৌশলে তাকে চেপে চেপে ঠিক করে তার উপর আবার তুলি বুলিয়ে ঠিক করে ফেললাম।

কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল, এবং সে ছবি অবশেষে সবাই দেখলেন। যেন জীবন্ত কবি একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে সম্প্রতি কোনোরকমে বেঁচে ফিরে এসেছেন। কিরণকুমার বলল, ও ছবি উপাসনায় ছাপা হবে। নানা কারণে ছবির দাম বেড়ে গিয়েছিল। উপাসনাতোই অবশেষে সে ছবি ছাপা হল পৃথক প্লেটে, ছবির নিচে ক্যাপশন রইল ‘সমস্ত তিমির ভেদ করি দেখিতে হইবে উদ্ভাস’ শির— এক-পূর্ণ জ্যোতির্গয়ে অনন্ত ভুবনে।’

জানবাবু একদিন বিম্মিত হয়ে দেখে গেলেন সে ছবি এবং পুনরায় অনুতাপ করে চলে গেলেন।

কিন্তু এ ছবির কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এ ছবির যে কি নাম তা রবীন্দ্রনাথই একদিন কঁাস করে দিয়েছিলেন।

এই মেসে থাকতে এক বিশিষ্ট বন্ধুর জন্ত কনে দেখার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। বাইরে থেকে হঠাৎ গিয়ে কোনো মেয়েকে দেখে পছন্দ হল বা পছন্দ হল না বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার মতে গৌণভাবে জেনে শুনে শুধু বিয়ের কথা পাকা করতেই বাওয়া ভাল। এ বিষয়ে আমার এমন একটি মনোভাব আছে যাকে দুর্বলতা নাম দেওয়া যেতে পারে হয় তো, কিন্তু আজও এ দুর্বলতা আমার কাটেনি। বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দ দুটি কথা প্রায় কেনা-বেচার ভাষায় পরিণত হয়েছে, ওতে মেয়েদের অপমান করা হয় এই আমার ধারণা। বাই হোক, তবু আমাকে বেতে হল নানা কারণে। যেতে হল সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত। সঙ্গে কিরণকুমার, সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং আরও একজন কে ছিলেন মনে নেই। দুটি বোন একত্র সঙ্গে এসে বসল, সম্ভাবিত খন্দেরদের কাছে। দুজনে একসঙ্গে বসে সেতারে একই গৎ বাজাল। কত খাতির পেলাম। কলকাতা ফিরে এসে অভিযানের নেতা বললেন বড় মেয়েটির সম্পর্কে মত দিতে হবে। ফুলমার্ক ১০০। দশটি ভাগে ভাগ করা হল মেয়েটিকে। চুল ১০, মুখ ১০, চোখ ১০, দেহ-সৌষ্ঠব ১০, কণ্ঠস্বর ১০, ইত্যাদি। আমরা দ্বারা দ্বারা দেখেছি সবাইই পৃথকভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে হবে মার্ক-দিয়ে। আমার হাতে মোট মার্ক উঠেছিল ৮০। কিন্তু অন্তের মার্ক কম দিলেন, ভোটের জোর হল তাঁদের। তাঁরা যে কেন কম দিলেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেস ছেড়ে গেলাম দেশে। স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপের দিকে। এর উপর দেশে ব্যাপক ভাবে মহামারী দেখা দিল। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই চলে গেলাম ভাগলপুরে ১৯২১ সালে। প্রবোধ ছিল সেখানে, তার সাহায্যে আগেই বাড়ি ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন সর্বত্র ভেঙে পড়ছে। খুব একটা উত্তেজনার ভাব। আমাদের স্বাস্থ্য কোনো দিনই কোনো আন্দোলনের উপযুক্ত ছিল না, সেজন্য আমি এ বিষয়ে হিলাম অনেকখানি উদাসীন। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির 'চরকায় স্বরাজ' প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন মত প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত আমার বুদ্ধিবাদী মনে খুব সাড়া দিয়েছিল।

আমার বোন সরলা তখন ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী উর্মিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত নারীকর্মশালার নামক শিক্ষায়তনে। বাড়িটি ছিল রূপচাঁপ মুখুজে স্ট্রীটে। এখানে ইংরেজী, হিন্দি, অঙ্ক ও চরকায় সূতো কাটা শেখানো হত। সূত্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে মুখার্জী) ও চারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে রাহচৌধুরী) এখানে ছাত্রী ছিলেন। ভাগলপুর থেকে দেশে ফেরার পথে আমরা সবাই মিলে একবেলার জন্ত এখানে এসে উঠলাম। আসবার সময় সরলা কর্মশালার এক চরকা আমাদের কাছে বিক্রি করল। এই সম্পূর্ণ স্বদেশী জিনিসটি বাড়ি পর্বন্ত পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে একটি বিদেশী জিনিস গান্ধীর ভিতর থেকে চুরি হয়ে গেল।

চুরি হল আমার ক্যামেরাটি। একটি আটাশে কেস্-এ ক্যামেরা ও অনেকগুলো চিঠি ছিল, সবসুদ্ধ গেল। বিজ্ঞাসাগর হঠাৎ থাকতে রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। অকারণে চিঠি। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তখন কিছু ভেবেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে প্রশংসা জানিয়েছিলাম। কি লিখেছিলাম ঠিক মনে পড়ে না এবং সে-চিঠির কোনো উত্তর আমি আদৌ আশা করি নি এবং উত্তর পাওয়া যে আদৌ সম্ভব তাও কল্পনা করি নি, অথচ লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই তার এক উত্তর এলো, খামে-লেখা মাত্র তিন লাইন। চিঠিখানা মুগ্ধ আছে।

কল্যাণীয়েবু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, বাংলা দেশ থেকে আজ পর্বন্ত আমি কোনো সাহায্য বা সহায়তা পাই নি। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৮ সালে লেখা, কিন্তু তারিখটি আমার মনে নেই। এই চিঠিখানাও ক্যামেরার সঙ্গে চুরি হয়ে গেল। চিঠিখানিতে একটি বেদনার স্বর আছে। চিঠি লেখার মুহূর্তে মনে হয় তো কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। কবি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তেন সাময়িক ভাবে। তারই কিছু ছায়া পড়েছে এ চিঠিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার সামান্য একখানা চিঠির উত্তরে তিনি আমার প্রতি অনেকখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, এ আমার কাছে একেবারে কল্পনাতীত ছিল। এতে কবির মানসিক ঔদার্যের একটি পরিচয় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল, যা আমি ভুলতে পারি নি কখনো।

এ চিঠিখানা হারিয়ে বাওয়াতে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল।

মূল্যবান জিনিসগুলো হারিয়ে শুধু চরকা নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম। চরকা আমিও কেটেছিলাম, শুধু মেয়েদের দেখাতে যে ও-কাজটা ছেলেরাই ভাল পারে। আধ সের পরিমাণ সূতো আমার হাতে বেরিয়েছিল। সে সূতো কোনো তাঁত পর্বন্ত পৌঁছয় নি। পৌঁছতে হলে সম্ভবত আমাকে কলকাতা আসতে হত কিংবা ১৯২১ সালের ঘটনা। এর ২৬ বছর পরে যে স্বাধীনতা এলো, তারই কি সেটি প্রথম স্মরণাত ?

আক্ষরিক অর্থে চরকা কেটেছিলাম কয়েক বছর পরে, উত্তম্নে পাঠাবার আগে। যাই হোক, বাড়িতে চূপচাপ বসে থাকতে থাকতে মানসিক অর্থৈর্ষ বাড়তে লাগল। পড়াশোনা হোক বা অন্য কোনো বিজ্ঞা হোক, তার সাহায্যে উপার্জন করতে হবে, এ চিন্তা মনে এলেও ভাল লাগত না। অন্তত এ সময়ে বা এর পরেও অনেক দিন এদিক দিয়ে কিছু ভাবি নি। একটা দারিদ্রহীন অলসপন্থিতা, যার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ক্রমে নবগঠিত বিশ্বভারতীর দিকে আকর্ষণটা বেশি বোধ করতে লাগলাম। সেখানে থেকে, চিত্তাঙ্কন শিখব, এই ভাবে চিঠি লিখে সব আয়োজন পাকা করে ফেললাম, সম্ভবত টাকাও আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বগুনা হবার আগে একখানা চিঠি পেলাম নৈহাটি রেল পুলিশের কাছ থেকে। আমার ব্যাগটি সেখানে জমা আছে, পুলিশে সেটি কুড়িয়ে পেয়েছে রেলের ধারে। শান্তিনিকেতনে যাবার পথে সেটি উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম নৈহাটি রেল পুলিশের ঘর থেকে। তার ভিতরে কিছুই ছিল না। পরে হঠাৎ খেয়াল হল পুলিশ জানল কি করে যে ওটি আমার ব্যাগ! নিশ্চয় ওর ভিতরের চিঠি থেকে। কিন্তু আমি যখন ব্যাগ পেয়েছি তখন তাতে একখানিও চিঠি ছিল না। অপ্রয়োজনীয় বোধে চিঠিগুলো সব ফেলে দিয়ে থাকবে, কিন্তু কেন? শুধু একটি ভাড়া কেস্ সংগ্রহের জন্ত আমার তাক পড়ল, অথচ বা আমার কাছে যথার্থরূপে মূল্যবান তা ফেলে দেওয়া হল। পরে এ সব উল্লেখ করে রেল পুলিশকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে, কিন্তু তার কোনো জবাবই পাইনি।

শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছিলাম সন্ধ্যাবেলা। আশ্রয় পেলাম লাইব্রেরি ঘরের দোতলার আরও অনেকের সঙ্গে। এখানকার খোলা আবহাওয়ার এবং নতুন পরিবেশে স্বাস্থ্যলাভ করব এই রকম একটা আশা জাগল মনে। কিন্তু ঘটল বিপরীত। ভোরবেলা



সাহেবগঞ্জে কনে দেখা

ঠাণ্ডা জলে স্থান ক'রে সর্দিকাসি আরম্ভ হয়ে গেল এবং শুধু আলুর তরকারি আর ডাল খেয়ে পাকস্থলীর হুঁশা ঘটল। চেহারা ঠাণ্ডাল বন্দারোগীর মতো, এবং সপ্তাহে দু'তিন দিন অন্তত হাসপাতালের বিশেষ পথ্য খেতে লাগলাম ডাক্তারের ব্যবস্থার। মাঝে-মাঝে কাসি এত বেশি হতে লাগল যে নিজেরই সঙ্কট হ'ত কারো সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে।

আমি যে যবে ছিলাম সেখানে আজকের শ্রমবীরদের মধ্যে আমার নিকটতম শস্যায় রাত কাটাতেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও জিন্নানিল চন্দ। দু'জনেই আজ কথাশিল্পীরূপে প্রসিদ্ধ। তখনও তাই ছিলেন। ক্রমাগত কথা ব'লে আসব জমিয়ে রাখতেন। কথাশিল্পী আজ অবশ্য বিশেষ অর্থে। একজনের প্রকাশ কাগজে কলমে, আর একজনের প্রকাশ রাষ্ট্রীয় আসবে। আর ছিলেন অনাদি দস্তিদার ও শিল্পী হরিণন্দ রায়।

শান্তিনিকেতনে বাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক। দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্সের খেলা ও অজ্ঞাত আত্মবাস্তবিক ছোটখাটো সব খেলা। এই আসবে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। এক বাতুর আর এক বাতুরের সামনে ব'সে আছেন! সমস্ত পরিবেশটি বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছিল! ইলিউশন বাক্সের খেলা আরম্ভ হবার আগে বাত্মটি সম্ভাব্য মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।

এই খেলাটির একটু বর্ণনা আবশ্যিক। এটি বড় একটি কাঠের বাস। গণপতি চক্রবর্তীর ছুখানা হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা হ'ল। ছুখানা পাও কবে বাঁধা হ'ল। তার পর তাঁকে একটি খলেতে পুরে, খেলের মুখ বেঁধে সেই বাক্সে পোরা হল। তার পর সেই বাত্মটি দড়ি দিয়ে চারদিক থেকে বাঁধা হল এবং তালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। তার পর সামনে একটি কালো পর্দা বলিয়ে দিতে না দিতে বাতুরের ছুখানা হাত পর্দা ভেদ ক'রে বেরিয়ে খটা বাজাতে লাগল। হাত ছুখানা স'রে গেল, পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হল, দেখা গেল বাত্ম আগের মতোই বন্ধ আছে। তার পর বাক্সের উপরে তবলা রাখা হল এবং পর্দা খুলিয়ে দেওয়া হল। ব'লে দেওয়া হল বীর যে তাল স্তনতে ইচ্ছে, আদেশ করুন। কেউ বললেন চোতাল, কেউ বললেন ধামার। পর পর দুটি তালই তবলার বাজল। পর্দা স'রে গেল, বাত্ম পূর্ববৎ। আবার পর্দায় ঢেকে দেওয়া হল, এবারে বাতুর নিজের বেরিয়ে এলেন পর্দার আড়াল থেকে। বলা হল আপনারা কেউ কোনো চিহ্ন লাগিয়ে দিন এঁর গায়ের। কেউ আঁটি পরিয়ে দিল, কেউ চশমা পরিয়ে দিল। বাতুর পর্দার আড়ালে বাবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল এবং দর্শকদের মধ্যে থেকে উৎসাহীরা গিয়ে দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাক্সের ঢাকনা তুলে মুখ বাঁধা খলেটি বাইরে তুলে আনলেন। সেটি খুলে দেখা গেল বাতুর দর্শকদের দেওয়া চশমা ও আঁটি পরা অবস্থায় এবং পূর্ববৎ পিছমোড়া ও পা-বাঁধা অবস্থায় খেলের মধ্যে রয়েছেন।

তখনকার দিনে এই খেলাটির খুব প্রসিদ্ধি ছিল। এর পর ট্রেজে আমি অজাবধি কারো ম্যাজিকই দেখিনি। অতএব এ দেখার উপভোগ্য স্মৃতিটি আজও আছে।

প্রথমনাথ বিন্দীর সঙ্গে তখন কিছু দূরত্ব ছিল, কাহাকাছি

ছিলেন তাঁর ভাই, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বিন্দী, বর্তমানে রাজসাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরের পি. এ, তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে গুণানকার ভূগোলের সঙ্গে বখাসাধ্য পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমনাথের সঙ্গে দূরত্ব ছিল অথচ পরে তাঁর খুব কাছে এলাম, এগারো বারো বছর পরে। এরকম ঘটনা আরও একজনের সম্পর্কে ঘটেছে। বিভাসাগর কলেজে একই সঙ্গে একই সেকশনে দুটি বছর পড়েছি শ্রবদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কিন্তু পরে বখন পনেরো বছর অন্তে তাঁর সঙ্গে দেখা হল, তখন নতুন ক'রে পরিচয় হল এবং বন্ধুত্ব গাঢ় হল। আমরা পূর্বে পরস্পর কাউকে দেখেছি মনে পড়ল না।

শান্তিনিকেতনে কিঞ্চিৎ দূরত্ব প্রায় সবার সঙ্গেই ছিল এবং প্রধানত তা স্বাস্থ্যের জন্ত। সৈয়দ মুজতবা আলী (তখন ছিলেন মুজতাবা) ও অনিলকুমার চন্দ্র অবিরাম কথা বলতে পারতেন ব'লে, এবং তাঁদের সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি রাত কাটাতে হত ব'লে, আক্ষরিক অর্থে তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচে গিয়েছিল। আলী হিন্দি এবং উর্দু ক্রত লিখতে পারতেন। সোজা দিক থেকে এবং বিপরীত দিক থেকে। আমার একখানা খাতায় তাঁর হাতে আমার নাম ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি এবং উর্দুতে সোজা এবং উল্টো ক'রে লেখা, এখনও রয়ে গেছে।

কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ক্লাসগুলো নিতেন তার কোনোটিই বাদ দিইনি। গুণানে গিয়ে একদিন বিকেলের দিকে তাঁর কাছে গেলাম; তিনি একা ছিলেন সেই মুহূর্তে। আমার পরিচয় দিলাম। তিনি খুব খুশি হলেন যে আমি এখানে কলাভবনে ভর্তি হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আলাপে সকল সঙ্কট কেটে গেল। এই আমার প্রথম কথা বলা তাঁর সঙ্গে। তিনি এমন আশ্চর্য সহানুভূতি এবং স্নেহের সঙ্গে কথা বললেন যাতে শুধু সঙ্কট কাটা নয়, কিঞ্চিৎ সাহসীও হয়ে উঠলাম এবং আমার আঁকা উপাসনার প্রকাশিত সেই ছবিখানি, (বা আমি চারদরের নিচে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম) তাঁকে দেখলাম।

মনে হল ছবিখানা দেখে তাঁর যেন কিঞ্চিৎ ক্রকুঞ্চ ঘটল। তিনি তার উপরে চোখ বুলিয়েই সেখানা আমাকে ধরৎ দিলেন এবং কয়েক সেকেন্ড চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলেন, তুমি যে ছবি এঁকেছ তার প্রধান লক্ষ্য আমার চেহারা, অর্থাৎ ছবিতে কতখানি আমার চেহারার সঙ্গে মেলাতে পার, এবং তার পর নিচে একটি নাম বসিয়ে দিয়েছ। একে আমি ছবি বলব না। কবিতার যে কথা দিয়ে ছবির ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছ সেই ভাবটা যদি তোমাকে প্রেরণা দিত তা হলে চেহারার সঙ্গে ছবি মেলাবার ইচ্ছেটা অবাস্তব হত। তোমার উচিত ছিল কল্পনার আশ্রয় নেওয়া, ফোটোগ্রাফের আশ্রয় নয়। ছবির যেটি মূল প্রেরণা সেটি হচ্ছে একটি ইমোশন। সেই ইমোশনের সঙ্গে যদি আমাকেই এক ক'রে দেখার কথা মনে হয়ে থাকে তা হলে তোমার ছবির চেহারা অল্প রকম হত। তোমার সকল চেষ্টা এ ছবিতে শেষ হয়েছে চেহারা মেলাবার কাজে। তাই এটি তুমি বা দেখাতে চেয়েছ তা হয় নি। হয়েছে স্পাইলাইট ফোলা একখানি ফোটোগ্রাফ। তার অর্থ এই যে ক্যামেরার ঠিক এই রকম একখানা ছবি তৈরি করা কঠিন হত না।



আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা'হলে আপনার চোখের সঙ্গে মেলাবার কোনো ব্যবহারই ছিল না ?

না।—যদি দৈবাৎ মিলত, ক্ষতি হত না, কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে মেলাবার জন্ত আঁফলে তা ক্রিয়েশন হয় না।

কথাটা স্বয়ংস্বয় করতে লাগলাম। আমি উপাসনা কাগজের প্রবন্ধে আর্টের যে অর্থ বোঝাতে চেয়েছি—তা কি আমার মনে সুবধানি ধরা পড়েনি? স্পষ্টই বোঝা গেল পড়েনি। বা লিখেছি, বাস্তবকে আশ্রয় ক'রে কল্পনার বিস্তারের কথা, আমার মনে তার একটি সীমাবদ্ধ অর্থমাত্র প্রকাশিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার আত্মগোঁড় ধূলিসাৎ হল। তিনি আমার মনে আর্টের এমন একটি ব্যাখ্যা স্পষ্ট ক'রে তুললেন যা আমার রচনার কল্পিত হয়নি। তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে আর্ট সম্পর্কে বলেছিলেন এবং আমার কাছে তখন তা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়েছিল। কথাগুলো আমাকে অনেক চিন্তা ক'রে আত্মস্থ করতে হয়েছিল, কারণ আর্ট সম্পর্কে এ রকম বৈপ্রবিক ধারণা আমার ছিল না। আর্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে পেলাম প্রথম নীকা, এটি একটি স্বর্ণময়ী ঘটনা। এর পর বিচিরা মাসিকে (চৈত্র ১৩৩৮, ১১৩১) 'আর্টের অর্থ' নামক যে প্রবন্ধটি লিখি তা সে দিন রবীন্দ্রনাথ আমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। এই প্রবন্ধে আর্টের অর্থের (অর্থাৎ আমার পাওয়া নতুন অর্থের) পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পকেই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। কারণ ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে চিত্রশিল্পী হয়েছেন। অতএব আমার এই কার্যটিকে সম্ভবত গুরু-মারা বিজ্ঞা বলা চলে।

নবাগত আমাকে রবীন্দ্রনাথ এমন অদ্ভুত সহায়ত্বের সঙ্গে এত কথা বললেন, এ আমার কাছে তখন আশাতীত বোধ হয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, মনে হয়েছিল এতটা যেন আমার প্রাণ্য নয়, যেন তাঁর দ্ব্যবসায় সময়ের ও সম্ভবত্বের উপর আমি মুঢ়তা বশতঃ অত্যাচার করলাম। রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছের দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস না হলে এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে বহু বিচিত্র দায়িত্ব এক সঙ্গে পালন ক'রে যেতে পারেন একথা আমার পক্ষে বাইরে থেকে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল, বিশেষ ক'রে যখন তিনি ক্লাসে ব'সে পড়াচ্ছেন বা কারো সঙ্গে কৌতুক করছেন, তখন একথা কখনো মনে আসেনি যে তিনি হয় তো তার পাঁচমিনিট আগে কোনো বৃহৎ বাস্তবনৈতিক বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান চিন্তা করছিলেন।

মন্ত্রদানের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নন্দলাল এখানে আছেন এটি আমাদের সৌভাগ্য। বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হও, তা হলেই বুঝতে পারবে তিনি কত বড় আর্টিষ্ট, ক্লাইভ বেলের আর্ট এটরানা পড়, তা হলে তোমার উপকার হবে।

একদিন শেখার 'হিমু টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি' নামক কবিতাটি পড়ালেন। ইংরেজী কবিতা তিনি বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা তাকে বলা যায় না, এক কাব্যের সমান্তরাল যেন আর এক কাব্য রচনা। পড়াতে পড়াতে ইউরোপের ফুলের কথা উঠল। বললেন অনেকের ধারণা আমাদের দেশেই ফুলের শোভা বেশি, কিন্তু তা ঠিক নয়। ইউরোপে তিনি ফুলের যে শোভা দেখেছেন—বিশীর্ণ

ক্ষেত্র জুড়ে তা অপূর্ণ সুন্দর, সে শোভা আমরা এদেশে ব'সে কল্পনা করতে পারি না।

বাংলা ভাষায় ইংরেজী কাব্যের স্বাদ অনুভব করা এবং তা রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে, এ অভিজ্ঞতা নতুন, তাই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। লক্ষ্য করতাম, নবাগত বিদেশী ছাত্ররা অস্বস্তি বোধ করতেন বাংলা বুঝতে না পেরে, কিন্তু কবির সে দিকে খেয়াল নেই। কিংবা খেয়াল ছিল বলেই বাংলার বোঝাতেন। কারণ তাঁরা কবির কাছে পড়বেন বলেই এসেছেন, অতএব বাংলা শেখার জন্ত উঠে পড়ে লাগতেন, এবং শিখতে ফেলতেন খুব দ্রুত। আমি তো একজনকে বাঙালী মনে ক'রে আলাপ করছিলাম, তাব পর তখনলাম ছাত্রটি সিংহলী। একজন সিংহলী ছাত্র আমার কাছেও আসতেন বাংলা শিখতে।

জাপানী এক যুবক পণ্ডিত এসেছিলেন, নামটি মনে নেই। তাঁর কাছে শুনেছিলাম তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে ইউরোপে যাবেন। ভাড়া ভাড়া ইংরেজীতে কথা বলতেন। দুচার দিনের মধ্যেই বাঙালী রীতি কিছু শিখে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব কথা মনে রাখতে পারতেন না। খাবার ঘরে আমরা পাশাপাশি খাছিলাম। এমন সময় তাঁর নতুন পরিচিত একজন সেখানে আসতেই ভাতের খালা থেকে হাত তুলে দু'হাত জোড় ক'রে তাঁকে নমস্কার জানালেন। আমি খুব সহজ ভাষায় একটি একটি কথা পৃথক ভাবে উচ্চারণ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক যেমন একটি ছোট ছেলেকে বোঝায় তেমনি ক'রে; বললাম খাবার সময় এ কাজ করতে নেই, ওটা আমাদের রীতি নয়, আমরা সবাই এখানকার বাসিন্দা, তাই সকালে হোক বা যখন হোক আমাদের যখন প্রথম দেখা হবে তখন নমস্কার জানাব, কিন্তু সেটি কখনো খেতে খেতে নয়। তিনি আমার কথা বুঝলেন এবং বললেন ইয়েস ইয়েস। কিন্তু কি পরিমাণ বুঝলেন, সেটি আমি বুঝলাম কয়েক মুহূর্ত পরেই। তাঁর আর একজন নব পরিচিত ছাত্র খাবার ঘরে আসতেই নিষিদ্ধ সকল প্রক্রিয়াগুলিই পুনরাবৃত্তি হল। অর্থাৎ বুঝ থেকে ডান হাত বেরিয়ে বাঁ হাতের সঙ্গে যুক্ত হল তবু 'নমস্কার' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

পাতে ডাল ও আলুর ভরকারী ছিল। প্রথমত তিনি শুধু



রবীন্দ্রনাথের 'নাইট স্কুল'

ভাত খাচ্ছিলেন, একটু একটু ডালও খাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে একটুকরো আলু বুখে দিয়ে ভেরি হট ভেরি হট (ভেলি হং ভেলি হং) বলতে বলতে উঠে পড়লেন। চেয়ে দেখি নাক ও চোখ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। সেদিন আর তাঁর খাওয়া হল না। আমিও কম ঝাল খাই, এবং আমার মতোও সেটি কম ঝালই ছিল।

খাবার ঘটা বাজলে খালা-বাটি নিয়ে ছোট্ট একটি কমিক দিক আছে। ব্যাপারটি আমার কাছে খুব মজার মনে হত। ঘটা বাজার সঙ্গে খাবার জন্ত ছুটে আসার অভ্যাস তৈরি ক'রে দেওয়ার পরীক্ষা কুকুরকে নিয়েই বেশি হয়েছে। মানুষের জন্তও এটি দরকার কাজের সুবিধার জন্ত।

সেপ্টেম্বর (১৯২১) মাসের ত্রিবেলা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলেন জাপানী কবিতা পড়বার জন্ত। ডিটস লঠনের আলোয় ব'লে পড়াতেন ছাত্তর খোলা হাওয়ার। আমরা মোট দশ বারো জনের বেশি নয় তাঁকে ঘিরে ব'লে যেতাম। জাপানী 'হাইকাই' নামক 'লিরিক এপিগ্রাম' কবিকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। কবিতাগুলি এক লাইন, দু' লাইন, তিন লাইন বা চার লাইনের। তিনি এই জাতীয় কবিতা প'ড়ে এমনই বিমগ্ন হয়েছিলেন যে তাঁর সে বিষয় তিনি আমাদের মনে বতরুণ না সঞ্চারিত করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর তৃপ্তি নেই। এ রকম উচ্ছ্বাসিত অনাবিল প্রশংসার হেতু হাইকাই কবিতাগুলির গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া বাবে। অল্প কথা, অনাড়ম্বর প্রকাশ, কিন্তু এক একটি কবিতার ইঙ্গিত হঠাৎ এমন গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনকে প্রবল ভাবে থাকা মেরে যায়। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বীজমন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন এই কবিতার স্রষ্টা নিতান্তই কৌতূহল থেকে, হঠাৎ কৌতূহল, উদ্বেগমূলক নয়, একটি benevolent curiosity কিন্তু তারপর তুলির ছোঁয়া (কবিতা তুলিতেই লেখা) লাগা মাত্র তা profundity of sympathy-তে অর্থাৎ সেই কৌতূহল একটি অতি গভীর সংবেদনে রূপান্তরিত।

যেমন, একটি এক লাইনের হাইকাই—'প্রান্ত বাহক চেরি ফুল দেখতে পায় না।'

কবি বললেন, দেখ মানুষের দুঃখ বেদনার মূলে না পৌঁছলে এমন ক'রে এ কথাটি বলা যেত না। এ দৃষ্টান্তটি হচ্ছে vital comprehension of human suffering-এর।

আর একটি কবিতা—'বায়ের কাছে একটি পাইন'—ইটারনিটির পথের মাইলষ্টোনের মতো। প্রাণের অমুভূতির vision আছে এতে। আর একটি কবিতা—

They spread their beauty  
and we watch them—  
and the flowers turn and  
fade—and—

এইটুকু মাত্র। কত বড় সঙ্কেত বেধে গেল, ইঙ্গিতের শেষ হ'লনা কোথায়ও। মন চিরদিন নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করবে 'এক'এর পরে কি। আশ্চর্য সংহত শক্তি।

আর একটি অদ্ভুত সুন্দর কবিতা, এটি one of the most beautiful—

The world of dew is  
alas ! a world of dew  
and none-the-less—

এখানেও ইঙ্গিত চিরদিনের। খানিকটা পেসিমিস্টিক, এবং এপিকিউরিয়ানিস্দের ভাব। এই world of dew এর মানে হচ্ছে অনিত্য জগৎ।

চমকপ্রদ সুন্দর এই সব কাব্য-বীজমন্ত্র। কবি একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। কথাটি জাপানী জনসাধারণের সৌন্দর্য ও রসবোধের সম্পর্কে। তিনি বললেন এই হাইকাই কবিতা এমন রিফাইনড এবং এর রস এত ঘনীভূত যে হঠাৎ মনে হবে অল্প সংখ্যক লোকই এর গম্যগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় বিশ্বাস যে জাপানী জনসাধারণ এর ভোক্তা! তুলির এক টানে যে সব ছবি আঁকা হয় সে সম্পর্কেও তাই। একটা জাতি যে এমন রুচিসম্পন্ন হতে পারে তা তিনি আগে ভাবতে পারেননি।

কথায় কথায় জাপানী মেয়েদের কথা উঠল একদিন। তিনি গাঁটধরে শরণ করলেন তাঁর বিদায় মুহূর্তের কথা। সে সময় মেয়েরা এমন কেঁদেছিল যে তা মনকে 'স্পর্শ' না ক'রে পারেনি। একজন বিদেশী অতিথির প্রতি তাদের এই মমত্ব বোধ কবির কাছে সুন্দর লেগেছিল।

এই নাইট মূলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তারও দেখা মিলত। একদিনের একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। ছাতে ক্লাস বসত একটিমাত্র ডিটস লঠনের আলোয়। আমি বসন্তাঃ কবির ডান হাতের কাছে, একখানি খাতা নিয়ে, কিছু নোট নিতাম। হাইকাই সম্পর্কে এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম তা সেদিনের একখানি মাত্র পাতার লেখা নোট থেকে। অসংখ্য অনেক কথা বা আর একখাতার লেখা ছিল, তা হারিয়ে গেছে।

লঠনের আলো বেশি দূরে যেত না, কবির কণ্ঠও একদিন কিছু ক্ষীণ ছিল। তাঁর ইচ্ছে আনরা সবাই তাঁর খুব কাছে বসি। লঠনটা থাকত ছোট্ট একটা টুলের উপর। কাছেই বসেছিলাম সবাই, কিন্তু আমাদের মধ্যেকার একজন ছাত্র কবির লক্ষ্য এড়াতে পারলেন না। তিনি বেশ একটু দূরে অঙ্ককারে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পড়তে পড়তে কবি একবার মাত্র চোখ তুলে বললেন, "অসিত, ঘুমোনার তো আরও ভাল জায়গা ছিল।"

এই শ্লোকের লক্ষ্যবস্ত্ত হচ্ছেন শিল্পশিক্ষক অসিতকুমার হালদার। এর পর তাঁকে এগিয়ে আসতেই হ'ল।

অরবিন্দমোহন বসু একদিন তাঁর জারমানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বছর দশেক বিদেশে থেকে তাঁর বাংলা উচ্চারণে টান ব'রেছিল। আনন্ডুজ সাহেব একদিন আমাদের সবাইকে ডেকে গান্ধীজির অসহযোগ নীতি সম্পর্কে কিছু বললেন। তিনি তখন সজ তাঁর কাছ থেকে ফিরেছেন।

সন্তোষ মজুমদার একদিন রাতে আমাদের ঘরে ব'লে তাঁর জীবনের পূর্বকথা কিছু শোনালেন। তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের আলাপেই তাঁর বেশ একটা সরল মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। এমন নিরহঙ্কার

মনখোলা লোক স্বরসী। তিনি বললেন সজ্ঞাসবাদ তাঁকে ভীষণ আকর্ষণ করছিল। তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবেন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন, এমন সময় গুরুদেবের আদেশ এলো আমেরিকায় যেতে হবে। সেখানে না গেলে এতদিন তাঁকে আশ্রয়ানে থাকতে হত।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী আর এক মধুর চরিত্র। দুই কালের ব্যবধানেও সেই অল্পকালের পরিচয়, অস্পষ্ট, তবু মনের একটি কোণে চিহ্ন এঁকে গেছে। ভাল লেগেছিল, শুধু এই স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। তাঁর মোচার অগ্রের মতো একটুখানি শ্রান্তশীর্ণ যেন অনেকদিনের অব্যবহৃত স্বরণ বেকর্ডখানার উপর আজ নীডলএর কাজ করছে।

আশ্রমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন ঋষি বাস করতেন। আত্মভোলা, ঋষিভুল শুক এবং ক্ষীণ। পাখী ও কাঠবিড়ালিদের সঙ্গে তাঁর ভাব। দর্শনশাস্ত্র অমূল্যবোধে বিরাম নেই। অমূল্যবোধে ক্রান্তি বোধ হল, কিছু রিক্রেশন দরকার, কিছু খেলা দরকার। দর্শন অমূল্যবোধে ছেড়ে খেলার মাতলেন। কি সাংঘাতিক খেলা! শুনে চমকে উঠতে হয়। সেটি উচ্চ গণিতের খেলা। পড়াশোনার ক্রান্তি কাটাতে অঙ্ক কবা! এ শুধু বিজ্ঞানশাস্ত্রের পক্ষেই সম্ভব। শুধু তাই নয়, শাস্ত্র অমূল্যবোধে কোথায়ও এসে ব্যাখ্যা আটকে গেল, ব্যাখ্যা দরকার। তখনই আপন রিকশ'খানায় চেপে হাকা করে কগাছা রেশমী দাড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছুটলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। এমন মানুষ আর দ্বিতীয় দেখলাম না। বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পর্কে দেশে বহুশ্রম আলোচনা হয়নি কেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা হয়নি আজও। তাঁর পরিচয় বাংলাদেশে প্রচার হওয়ার প্রয়োজন আছে।

জগদানন্দ রায়, ক্রিতিমোহন সেন এঁদের পরিচয় পেলাম ঋণশোধ নাটকে। সে নাটকের কথা ভোলবার নয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। 'সারা নিশি ছিলেম শুয়ে,' 'কেন যে মন ভোলে' 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, যে রয় মনে,' 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে' ইত্যাদি।

আচার্য নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি খুব সহজ ও সরল ছিল, তিনি নিজে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং অল্পাস্বকর্ম। কি ভাবে আঁকলে আরও ভাল হবে, তা আঁকা ছবির উপর বা পাশে দ্বিতীয়বার এঁকে দেগিয়ে দিতেন। তাঁর হাতের পেন্সিলে আঁকা ছবি আমার কাছে হ'একখানা এখনও আছে। আমার আঁকার পাশে তাঁর আঁকা।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকেই বর্ষার হু'একটি গান খুব শুনে পেতাম যেখানে-সেখানে। কঠে বা এসবাজে বাজছে। একটি—'আমার দিন ফুরালো, ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,' অথবা 'বাদল মেঘে মাদল বাজে'। 'ও গো আমার শ্রাবণ মেঘের খেরা তরীর মাঝি' গানটিও তখন খুব গাওয়া হচ্ছিল। এই সব গানের সঙ্গে এমন একটি বেদনার গভীরতা ছিল যা আমার মনকে অত্যন্ত উত্তলা করে তুলত। মনে সব সময় ঐ সব কথা ও সুর গুল্লবণ করে ফিরত। কিছু ভাল লাগত না। এক এক সময় মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠত। বিকেলের দিকে একা বেরিয়ে যেতাম বহু দূরে, নির্জন কোনো স্থানে। কখনো রেলের ধারে গিয়ে বসতাম। রেলের হু'ধারে ফিকে গৈরিক মাটির পাহাড় যেন। হু'ধারের

উঁচু দেয়ালের মাঝখানে দিয়ে রেল চলে গেছে। ১৯১৩ সালে এই পথে সাহেবগঞ্জ যেতে যে আনন্দশিহরণ অমূল্যবোধ করেছিলাম তাই যেন আবার ফিরে আসত মনে। কখনো চলে যেতাম কোপাই নদীর ধারে—বহু দূরে। দিগন্তব্যাপী সেই বিস্তীর্ণ বালু ভূমিতে আমার কোথায়ও আর আড়াল নেই, সমস্ত উন্মুক্ত পরিমণ্ডল যেন আমার নিশ্বাসের সঙ্গে এসে যুক্তে মিশছে। শান্তিনিকেতনের আবেষ্টনেই কেমন যেন একটা বেদনার সুর। উৎসব চলছে, প্রাণোচ্ছলতার শেষ নেই, কিন্তু তবু আমি তার মাঝখানে একা। বাইরে বেরিয়ে এসে উদ্বেগহীন ভাবে হু'চার মাইল হাঁটার পর মন শান্ত হত অনেক সময়।

বীরভূমের নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে বেশ একটা অভিনবতা আছে, আমার খুব ভাল লাগত। আশৈশব যে প্রকৃতির কোলে মানুষ, বীরভূমের প্রকৃতি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই আমার চোখে তা ছবির মতো লাগত। এ দৃশ্য প্রকৃতিই চিত্রণময়ী। সবুজ এখানে অনেক কম। এক একটা উঁচু ভূমিতে তাল গাছের ভিড়—অল্পপ্র তাল গাছ। এর বেশ একটা চরিত্র আছে। পূর্ববাংলার নদী বাদ দিলে বাকী দৃশ্য চরিত্রহীন। ঝোপঝাড় ঢাকা সমতল মাঠের পুনরাবৃত্তি, বড় একঘেরে। যেন গ্রাম্যতা-দোষে হুট। অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু নদী পূর্ব বাংলার দৃশ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কিছু বলিষ্ঠতা থাকে। নিতান্ত দরকার। বীরভূমের নামে ও দৃশ্যে সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে; তদুপরি কিছু কক্ষতাও আছে। সব মিলিয়ে চিত্তাকর্ষক। এই সব গানের আনন্দ-বেদনার সুরের সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র-সুরভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধুর স্মৃতিটি মনের আঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

শান্তিনিকেতনে বর্ষা কেটে গিয়ে এলো শরৎ। 'ঋণশোধ' নাটকের রিহাসালে সমবেত কঠে 'আজ আমাদের ছুটি' অথবা 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা' ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমার মনের উপরকার বোঝাটাও নেমে গেল। শরৎকালের সঙ্গে পল্লী-বাংলার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ এবং সে এক মধুর ঘনিষ্ঠতা। এই কালের সঙ্গে, একই সঙ্গে বাংলা দেশের বহু আনন্দময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তার উপর আবার শরতের সমস্ত অন্তরাঙ্গাতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গানে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। বর্ষার বেদনাভরা ভাণটি সুহৃৎ কেটে গেল, এলো ঋণশোধের পালা। সামনে ছুটির আনন্দ। ঋণশোধ নাটকের প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

অভিনয়ের আগের দিন। সর্বত্র বেশ একটা ঢাকঢাক। বিকেলের দিকে আমি একটি খুব কৌতুককর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। লাইব্রেরি ঘরের সামনের দিকে শালবীথির পারে কোনো একটা স্থানে



বীরভূমের প্রকৃতি

ষ্ট্রেজ সম্পর্কে কি আলোচনা করতে করতে কবি এগিয়ে চলেছেন। চোখে-মুখে বেশ একটা উদ্বেগের ছায়া। আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম বাইরে থেকে আসা দু-তিন জন ভ্রমলোক দ্রুত সে দিকে আসছেন। কবির সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভাবে তাঁদের সম্মুখীন হলেন। তাঁরা পর পর কবিকে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বলা বাহুল্য, কবি খুবই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। এক জন আগন্তুক ব'লে উঠলেন, আমরা আপনাকে দেখতে এলাম।

কবি ইতিমধ্যেই আত্মোদ্ধারের পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি মুখে আরও ব্যস্ততা ফুটিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন

এবং ভ্রমলোকদের বলতে লাগলেন বেশ, আপনারা দেখুন সব ঘুরে—

তার পর হঠাৎ বাঁ-পাশে মুখ ঘুরিয়ে রথী, রথী ব'লে ডাকতে ডাকতে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রথীজন্যথকে দেখা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে এত দূরে যে কবির কণ্ঠ তত দূরে পৌঁছবার কথা নয় এবং তিনি যত দ্রুতই পা চালান রথীজন্যথকে ধরে ফেলাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ভিন্ন তখন আর কোনো উপায়ও ছিল না। রথীজন্যথ ব্যক্তিগত ভাবে হয় তো তাঁর পিতাকে অনেক সংকটের হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকবেন, কিন্তু সে দিন নিজ চোখে দেখলাম রথীকৃত্ত নামক একটি অ্যাবট্রাঙ্কী পুত্রসন্ত। কবি পিতাকে আশ্চর্যকর ভাৱে বাঁচিয়ে দিল। [ক্রমশঃ।

## এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

“মার্কিং যন্ত্রের সব কিছুই অদ্ভুত”—পৃথিবীর সর্বোচ্চ অট্টালিকা নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখে বিদেশী দর্শক মাত্রই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই কথাটি বলে থাকেন।

মালুয়ের হাতে-গড়া এই বিস্ময়কর আকাশচোঁয়া বাড়ীটি ১৪১০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। নিউইয়র্কের অভিজাত পল্লী ফিফথ্, এতিনিউ ও থার্টিকোর্থ স্ট্রীটের মধ্যে প্রায় দুই একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটি গড়ে তুলতে যে পরিমাণ মাল-মশলা ও অর্থব্যয় হয়েছে তার অঙ্ক শুনে অনেকেরই হয়ত মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু মার্কিং যন্ত্রকে সব কিছুই সম্ভব।

নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্থপতি উইলিয়াম এফ ল্যাথ সর্বপ্রথম এই আকাশচোঁয়া বাড়ীটির পরিকল্পনা করেন এবং তিনিই দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে বাড়ীটির নক্সা তৈরী করে দেন। তারপর মুখ্যবাস্তুরকার মিঃ শ্রীভ ও মিঃ হারমান্ নক্সাটিকে পনেরো বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তবে বাড়ীটি তৈরী করতে অনুমতি দেন।

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাস থেকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হয়। বাড়ীটি গড়ে তুলতে ৬০,০০০ টন ইস্পাত, ১০,০০০০ ইট ও ৩০.১৪৩৬০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। এ ছাড়া চূণ, সুরকী, পাথর, সিমেন্ট খরচ হয়েছিল হাজার টন। কে তার হিসেব রাখে! ১৯৩১ সালের মে মাসে বাড়ীটি তৈরী শেষ হয়।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ ৬৪০০ জানলা, ৩২০০ মাইল টেলিফোন-টেলিগ্রাফের তার, ৫০ মাইল প্রাচীর পাইপ ও ২১৫৮০০০ বর্গ ফিট মেঝে আছে। তিনশো পরিচারিকা সর্বদা বাড়ীটিকে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন করে রাখে এবং নীচে থেকে উপর-তলা পর্যন্ত সিঁড়ির সংখ্যা ১৮৬০টি। বাড়ীটির বিভিন্ন দোকান ও অফিসে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৮০০০। এদের ওঠা-নামার জন্য ৭৪টি লিফট আছে। তাছাড়া কয়েকটি এক্সপ্রেস লিফটও আছে। এগুলির সাহায্যে দেড় মিনিটেরও কম সময়ে একেবারে উপর-তলায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

তার থেকে সহরের দৃশ্য দেখার জন্য ৮৬ তলায় একটি অবজারভেশন প্ল্যাটফর্ম আছে। এখান থেকে চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ-মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণা দিলে জনসাধারণ এখানে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক সহরের দৃশ্য দেখতে পারেন। টিকিটের হার মাথা-পিছু ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে ছয় টাকার মত। প্রতি বছর ৫০০,০০০ দর্শক এই অবজারভেশন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্কের দৃশ্য দেখার জন্য এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ বেড়াতে আসেন। এদের কাছ থেকে দর্শনী বাবদ কর্তৃপক্ষের বছরে ৩২৫০০০ টাকা আয় হয়। স্মার উইনষ্টন চার্চিল কার্ডিনাল ইউজিনিও প্যাসিলি (ভ্যাটিকানের পোপ), ডিউক অব উইগসর ও ডাক্তার আলবার্ট আইনষ্টাইন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরাও এখানে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক সহরের দৃশ্য দেখে গেছেন।

আমেরিকার বিশিষ্ট বাস্তব-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন— ভবিষ্যতে আণবিক অথবা হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে বাড়ীখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে এর আয়ুষ্কাল এক হাজার বছরেরও বেশী। মার্কিং ধনকুবের মিঃ হেনরী ক্রাউন এই বিস্ময়কর আকাশ-চোঁয়া বাড়ীটির মালিক।





## শ্রীনিরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

[ 'সুশান্ত সা' প্রকাশিত হবার পর বন্ধুবান্ধব অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তার পর কি হল? বলেছিলাম—সে খবর এখনও পাইনি। এক দিন আমার স্বনামধন্য বন্ধু ৷বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'সুশান্ত সা'র পরের খবরটা দশ জনকে জানিয়ে দিলে ভালই হয়। সন্ধান করবার অগ্রপ্ৰেরণা পেলাম। যতটুকু যা জেনেছি 'নীলশাড়ী' উপন্যাসে লেখা হয়েছে। 'নীলশাড়ী' উপন্যাসে দেখা যায়—'সুশান্ত সা'র পৌত্র বিকাশ এখন থেকে ডাক্তারী পাশ করে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য জ্বর ও শিশুপুত্রকে এদেশে রেখে বিলেত রওনা হয়ে গেল, আর ফিরল না। বিলেতে তার জীবনটা কোথা দিয়ে কি ভাবে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় ঝড়িয়েছিল' সেইটাই 'সিন্ধুপারে' উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। বিকাশই সুদীর্ঘ চিঠি লিখে তার আদরের ছোটবোন 'নীলশাড়ী'র বুলাকে অকপটে সব দিচ্ছে জানিয়ে।

—লেখক]

### বিকাশের চিঠি

প্রথম পর্ক  
এক

সেট জন হোটেল।  
সলিহল : ইংলণ্ড।

কল্যাণীয়াসু আমার স্নেহের বোন বুলো—

তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি সে কথা বলাই বাহুল্য। তুমি যে এত দিন পরে মনে করে আমাকে চিঠি লিখেছ সেইটেই আমার মনের দিক দিয়ে তোমার চিঠির সব চেয়ে বড় কথা। দাদার চিঠি কচিং কখনও পাই। তোমার চিঠি বহুদিনের মধ্যে পেয়েছি বলে মনে হয় না।

চিঠিতে যা জানতে চেয়েছো তার জবাব আমি দেবো। কিন্তু এক কথার জবাবটি সর্বাসঙ্গী হতে না। তাই তোমার চিঠি পেয়ে অনেক দিন ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত আমার কাজ থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে আমার বাড়ী এবং সাক্ষারী ছেড়ে নিরবিচ্ছিন্ন উপরোক্ত হোটেলটিতে এসে বাস করছি তোমাকে চিঠি লেখার জন্য। এই দূর বিদেশে ডাক্তারি করি—বিশেষ কর্তব্যবস্তু আমার জীবন। তাই সব ছেড়ে এরকম পালিয়ে না এলে তোমাকে এ চিঠি লেখা হত না।

অথচ এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজনও হয়েছে। আমার একমাত্র পুত্র বরুণকুমার বিশেষ সাকল্যের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে, খুলনার কাছাকাছি এক গ্রাম্য কলেজে অধ্যাপকের কাজ করে—এ খবরটা অবশ্য আমি আগেই শুনেছিলাম। এখন তুমি লিখেছ, সে এদেশে এসে অন্তর্কোড বা ক্যামব্রিজে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে, তার আঙ্গা উচিত কি না সেই বিষয় তুমি আমার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছ। লিখেছ "প্রায় চার বছর হতে চলল সে এম. এ. পাশ করেছে, কিন্তু এত দিন কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হয়নি। আমিও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ প্রস্তাবে কোনও দিনই জোর দিই নি। কেন না, বরুণের চরিত্রে এমনই একটা স্বাভাবিক

মাধুর্য আছে যে আমার কোনও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বভাবতঃ মেনে নিয়েই সে যেন তৃপ্তি পায়, তার বিরুদ্ধে ঠাঁড়িয়ে স্বস্তি পায় না মনে। তাই জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছা চালিয়ে তার চরিত্রের এই স্বাভাবিক মাধুর্যটুকু আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি। আজ যখন সে স্পষ্ট ভাবে বিলেত যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জানিয়েছে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি কেন সে এত দিন বিবাহ করতে রাজী হয় নি। বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে বিলেত যেতে তার মন সার দেয়নি কখনও এবং বিলেত যাওয়ার ইচ্ছাটি বরাবরই সে মনে পোষণ করে এসেছে। আজ এখন আমি কি বলি—মহা সমস্তার পড়েছি। এ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত জানিয়ারো।" কিন্তু এ প্রস্তাবের মীমাংসা করার দায়িত্বও এখন আমার নয়। সে দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা আমি অনেক দিন হারিয়েছি। সে বিষয় মীমাংসা করার দায়িত্ব ত' এখন সম্পূর্ণ তোমারই। বুকের দিক দিয়ে, জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সে দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি তুমি পেয়েছ আমি জানি। জীবনের নানা রকম খাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তুমি উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে গিয়েছ। আজ তুমি মাধবপুরের রাণীর আগনে সুরপ্রতিষ্ঠিত—নিজেরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চরিত্রের মহিমায়। বরুণকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ তুমিই ত দেখিয়ে দেবে।

বরুণকুমার অবশ্য আমার পুত্র কিন্তু সেইটেই তার সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। ছেলেবেলায়ই সে বাপকে হারিয়েছে, মাকেও হারিয়েছে। তোমাকে আশ্রয় করেই সে বড় হয়ে উঠেছে—তোমারই আদর্শে সজীবিত হয়ে। তার মনের গতির সঠিক খবর তোমার চাইতে কেউ ত বেশী জানে না। শুধু তাই নয়, আমাদের বংশের একমাত্র পুত্র বরুণকুমার, মাধবপুরের অত বড় জমিদারীর উত্তরাধিকারী সে। এ সব খবরের তাৎপর্য তোমার চাইতে বেশী কে বোঝে? বিশেষতঃ আমাদের সকলের মাথার উপর দাদা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর মতন লোক জগতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। তাঁকেও সব দিক বিবেচনা করে দেখতে বলা।

এক কথার তোমার প্রস্তাব উত্তর দেওয়া এইখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও সব কথা বলা হল না। আমার মনে হয়,



যে প্রায় তুমি তুলেছ সেই দিক দিয়ে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, বরুণকুমারের জীবনের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করবার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে আমার জীবনটাও সর্বদিক দিয়ে সর্বোত্তম ভাবে তোমার দেখে নেওয়া উচিত। তা হলেই তোমার এ দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতার আর কোনও কুটি থাকবে না। তুমি লিখেছ, “বরুণের বিলেত যাওয়ার দাদার বিশেষ মত নেই, দাদার ইচ্ছে বরুণকে আইন পাশ করিয়ে হাইকোর্টের উকিল করেন। কিন্তু বরুণের তা মোটেই ইচ্ছে নয়। বরুণের বিলেত যাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে তার হারিস-বাগ্নার বাপকে আবার খুঁজে পাওয়ার প্রবল বাসনা যে মর্মে মর্মে লুকিয়ে আছে—সেটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।” সে দিক দিয়েও আমার এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন। যদি তাকে বিলেত পাঠাও, এ চিঠি পড়ে বাপকে খুঁজে বার করার পথ তার সহজই হবে। রবিন চশমা আড়াল দিয়ে সে আমাকে দেখবে—আমি তা একেবারেই চাই না। তা ছাড়া এদিক দিয়ে আরও একটা বড় কথা আছে। পিতার জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ত পুত্র। সে অভিজ্ঞতাকে অন্ধকারে ঢেকে রেখে তার থেকে পুত্রকে বঞ্চিত করা, আমার মতে শুধু অজ্ঞান নয়—পাপ। বাপের অভিজ্ঞতার আলোতে পুত্র জীবনের পথ খুঁজে পাবে সেইটেই জীবনযাত্রার স্বপ্ন। পুত্রের প্রতি, আমার জীবনে আমি অন্ততঃ সেইটুকু কর্তব্য করে যেতে চাই। তাই পালিয়ে এলাম কথ্যবাস্ত জীবনের আবহাওয়া ছেড়ে ঘনতরু-ঘেরা নিরিবিলা এই হোটেলটিতে।

দাদার অমতের কারণ বোঝা ত মোটেই কঠিন নয়। অমত ত হবেই। তাইকে হারিয়েছেন। বংশের একমাত্র দুর্গালকে হারাতে আর রাজী নন। শুধু দাদার দিক দিয়ে কেন, তোমারও মনের দিক দিয়ে সে ভয় যে নেই—এমন কথা জোর করে বলতে পারি কৈ? আমি জানি, আমি তোমাদের সকলেই নিন্দাতান্ত্রন এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। আঠশষ নিজেই সংসার ও সমাজ সমস্ত ভুলে সাধী প্রেমদা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে বিনা অপরাধে অনায়াসে বঞ্জন করে যে লোক দুই বিদেশে গিয়ে নতুন জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তার স্বপক্ষে যুক্তির দিক দিয়ে কোনও কথা খুঁজে পাওয়া যায় না—সেটা আমি বুঝি। বিশেষতঃ যখন সেই সাধী স্ত্রী অথবা মানসিক উৎপীড়ন ও নির্যাস অপমানে ধীরে ধীরে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয় তখন তাকে কেউই ক্ষমা করে না, পাষাণ বলেই অভিহিত করে—সেটুকুও আমি জানি। অথচ এই দিক দিয়ে সারাজীবন আমি আমার প্রাণের কোণে একটা বেদনা বহন করে নিয়ে চলেছি—সে কথাটা ত কেউ জানে না। এই দুই বিদেশে জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ মাঝে মাঝে সোনালী সূর্যের অরুণ আলোর দিকে চেয়ে কিংবা গভীর রাত্রে হৃদয় বাতাসে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সেই বেদনার চমকে উঠে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে একটু স্থিতি পাওয়ার চেষ্টা করেছি—সে কথাও কেবল আমারই জানা। অনেক খুঁজেছি। কিন্তু এ বেদনার প্রলেপ আমি আজও খুঁজে পাইনি। কখনও বা ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে একখানা চিঠি লিখি। মনে হয়েছে শুধু তোমারই মনে হয়ত বা এই ব্যাটিকুর সাড়া একটু পেতেও পারি। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেছে, লেখার অনুপ্রেরণা পাইনি।

এমন সময় তোমার পাঠানো ‘স্বশাস্ত সা’র আত্মজীবনী হাতে এলো। প্রাণ-মন দিয়ে দিন-রাত বসে বইখানি পড়লাম। শেষ করে বারে বারে পুঙ্জনীয় পিতামহের চরণে প্রণাম করে বলেছি “হে পিতামহ! তোমার জীবনে ক্ষত্রের তীব্র লীলার তুমি পুণ্যলোক। তোমাকে প্রণাম করে যত্ন হই।” একটু যেন সান্তনাও পেলাম অন্তরের নিভৃত বেদনায়।

কেন জানি না, ‘স্বশাস্ত সা’ পড়ে আবার তোমাকে বিস্তারিত একখানা চিঠিতে আমার জীবনের কাহিনী জানিয়ে দেবার বাসনা মনে জেগেছিল। স্মৃতির আদি লীলার অনুপ্রেরণা স্বশাস্তর ভাঙ্গা বুকে এসে লেগেছিল—তাই তিনি অতবড় গ্রন্থ লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে অনুপ্রেরণা পেলাম না। মনের বাসনা মনেই গেল রয়ে। কিংবা হয়ত তখনও আমার জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হয় নি—তাই বোধ হয় অনুপ্রেরণা জাগে নি মনে। অথবা চিঠি লেখার প্রয়োজনের দিক দিয়ে তখনও বিশেষ কোনও তাগিদ পাইনি মনে। কিন্তু আজ আমার জীবনের কাহিনী শেষ হয়েছে, তাই বোধ হয় তোমার চিঠি পেয়ে চিঠিরই প্রয়োজনে মনে প্রবল অনুপ্রেরণা জেগেছে। আজ সময় হয়েছে—আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী তোমাকে জানাবার।

ভুল বুঝো না। আমি বিচারপ্রার্থী নই। বিচারে নিরপরাধী প্রমাণিত হওয়ার বাসনায় এ চিঠি লিখছি না। পুঙ্জনীয় পিতামহ ‘স্বশাস্ত সা’ মনুষ্য-সমাজের আদালতে অবিচার পেয়ে তাঁরই বড় আদরের গল্প কাহে স্মৃতিচার চেয়েছিলেন। আমার বিচারের ভার বইল ভবিষ্যতের গর্ভে তোলা।

## দুই

প্রথম যেদিন ইংলণ্ডে এলাম—তখন আমার তরুণ যৌবন। আজ মনে হচ্ছে, সে যেন কতকাল আগেকার আর এক জন্মের কথা। আজ আমি প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে বার্দ্ধক্যের সীমানায় পা দিয়েছি। তখন বিস্তৃত হবে না নিশ্চয় যে, আজ আমার মাথায় আর একটিও কঁচা চুল নেই। তবে একমাথা চুল আজও—টাক পড়েনি। সেই ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলে—সেই রকমই মাথার একপাশে সোঁথি কেটে চুলগুলোকে পিছন দিকে টেনে জাঁচড়ে দি। ছেলেবেলায় তোমরা সকলেই আমাকে সুপুরুষ বলতে—আমার স্পষ্ট মনে আছে। আজ এদেশে এ বয়সেও সবাই আমাকে সুপুরুষই বলে—এ কথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে। তবে ছেলে বয়সে চোখে চশমা ছিল না—এখন সব সময়ই চোখে চশমা—বিনা চশমায় দেখতে পাই না বললেও চলে। গায়ের রং তোমাদের দেশের মাপকাঠিতে আজও ফর্সা বরং এ দেশের জল-হাওয়ার একটা লালচে আভার আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ দেশের লোকের পাশে আমি কালো। কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, আমার এই রং এরা ত ঘণা করেই না, বরং কেউ কেউ হিংসাও করে—আমার গায়ের রং পেলে তারা যেন বেঁচে যায়। ইচ্ছে করে রোদে পুড়িয়ে গায়ের রংকে ঘন লাল করে তোলার জন্য এদের তরুণ-তরুণীর মধ্যে কারো কারো কি সাধনা। অথচ তোমাদের দেশে রোদ ঝাঁচিয়ে, নানারকম ক্রীম মেখে কালো রংকে একটু উজ্জ্বল করে তোলার দিকে তরুণদের অনেকেরই চেষ্টার ক্রটি নেই।

বা পায়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—এইটাই বোবনের একটি বিশেষত্ব। তা কি এদেশে কি ওদেশে। বোধ হয় জীবনে প্রগতির দরজা খোলা রাখার ভগবানের এ এক কৌশল। বার্তিক্যের কথা অবশ্য সত্যত্ব। বার্তিক্যে মন অবশ্য হয়ে আসে। তখন নিজের মনের মধ্যে নিজেরই একটা ঠাই তৈরী করে নেয়—নিশ্চল বিশ্বাসের আশায়।

\* \* \* \*

বাই হোক, নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যাবেলা লণ্ডন সহরে এসে প্রথম পদাৰ্পণ করেছিলাম—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। এসে পৌঁছবার কথা ছিল রাত ৮টায়, কিন্তু এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। তার একটু কারণও ছিল। ফ্রান্স থেকে ইংলিশ উপসাগর জাহাজে পাড়ি দিয়ে ফোকটোনে এসে দেখলাম যে, লণ্ডন নিয়ে বাওয়ার জন্ত আমাদের ট্রেন প্র্যাটফর্থে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে আমার আশৈশব বন্ধু চন্দ্রনাথও ছিল। প্র্যাটফোর্থে রেল-কর্মচারী আমাদের দু'জনকে দু'টি কামরায় দিল তুলে।

কিন্তু তখন আমাদের দু'জনাই বা মনের অবস্থা, কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়; চন্দ্রনাথের কামরায় জায়গা ছিল, তাই আমি রেল-কর্মচারীর আদেশ অমান্য করে চন্দ্রনাথের কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম।

চন্দ্রনাথকে তোমার নিশ্চয় মনে আছে? ছেলেবেলায় সে অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে গিয়েছে আমার সঙ্গে গল্প করার জন্ত—দেখেছ তাকে নিশ্চয়ই। দোহারী গড়ন, স্নেহশীল চেহারা—গায়ের বর্ণ গোঁয়। মাথায় কালো চুল—মাঝখান দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পোষাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতার ভিত্তর দিয়ে সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথায়-বার্তায় ব্যবহারে ধরণে-ধরণে একটা মার্জিত বিশিষ্টতার আভাস সেই বয়সেই পেয়েছিলাম—সেটাই আমাকে বিশেষ ভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার—কথা বলে অত আনন্দ আমার অল্প বন্ধু-বান্ধবদের আর কারো কাছে পাই নি। কোনও কথা বলতে না বলতে তার নিগূঢ় মর্মটি ঠিক বুঝে নেয় এবং উত্তরে ঠিক সাড়া দেয় মনে। এই দূর বিদেশে ক্রমে তার মনের সঙ্গে আমার পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছিল—সে কথা ক্রমে বলব। চন্দ্রনাথ এখন কোথায়, কেমন আছে জানি না। অনেক দিন তার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়েছি এবং সেটা আমার জীবনের ক্ষতির পর্যায়েই তোলা আছে। তখনেছিলাম, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে সে বিশিষ্ট নামজাদা অধ্যাপক হয়েছিল—সেই পর্য্যন্ত।

ফোকটোন ষ্টেশনে কেন যে আমরা দু'জন দু'জনকে ছাড়তে পারি নি—তারও একটু ইতিহাস আছে। সেইটুকু বলি। বথে থেকে জাহাজ ছাড়ল বেলা ৩টে আন্বাঙ্ক। জাহাজ ছাড়ার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলাম। জাহাজ চলায় গাঢ় নীল জলের ডেউগুলি ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনায়—একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিলাম। আজকেও স্পষ্ট মনে আছে—ডেউগুলির ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে সে-সময়টা আমি আমার মনের বা হোক একটা অবলম্বন বেন খুঁজে নিতে চেয়েছিলাম—ক্রমে মনটা এতই আকুল হয়ে উঠেছিল। জাহাজ ক্রমে দূরে চলেছে, আরও দূরে আরও—আমার দেশ, আমার বা কিছু মনের আশ্রয়

সমস্ত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে—আমি বেন আর সইতে পারছিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। দূর দিগন্তে মাঝে মাঝে তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল আমার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল—সেই তোমাদের কাছে শেষ বিদায়ের সময় যেমন দেখেছিলাম—সেই তোমার ব্যাখ্যাতরা সহজ দুটো চোখ, সেই সুধার ছল ছল চোখ দু'টির সলজ্জ কাতর চাহনি। কিন্তু হায় রে, তার মধ্যে মনের কোনও অবলম্বন পাওয়া ত দূরের কথা, মনটা আরও বেন পাগল হয়ে দিশাহারা হয়ে উঠল। বিরাট সমুদ্রের বিশাল ডেউগুলি ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—শুধু কানে বাজতে লাগল সমুদ্রের একটা প্রবল গর্জন, বেন আমরাই মনের আর্ন্তনাদের তীব্র প্রতিধ্বনি! আমি যে হারিয়ে গেলাম, আমি যে হারিয়ে গেলাম—এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমার দেশের মাটির সঙ্গে আমার যোগসূত্রটি গেল ছিঁড়ে। কোনও রকমে টলতে টলতে নিজের কেবিনে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম—সে রাতে আর কিছু খাই নি।

১৭।১৮ দিন জাহাজে ছিলাম—এই হারিয়ে যাওয়া মনোভাবটা আমার ত বায়ইনি বরং উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তার উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খালি জল জল আর জল—জল দেখে দেখে আমার ক্রমে বেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আমার দেশের মাটির কথা ছেড়েই দিচ্ছি—এই পৃথিবীর বুকের একটু মাটি কোথায়ও দেখতে পেলে আমি বেন হাঁক ছেড়ে বাঁচি। সে যে কি মনোব অবস্থা বুলা, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। ধর্মীর মাটির সঙ্গে আমাদের গহন মনের যে কি নিগূঢ় যোগ—সেটা মাটির উপর সব সময় দাঁড়িয়ে তোমরা টের পাও না।

বাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের মার্শেলস-এ নেমে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম—কিন্তু হারিয়ে যাওয়া দিশাহারা মনোভাবটি তখনও গেল না আমার। মাটিতে পা দিয়েছি, কিন্তু এ মাটি ত আমার মাটি নয়। এর সঙ্গে আমার প্রাণের কোথাও কোনও যোগ নেই। এ মাটির রস টেনে নিয়ে সজীবিত হয়ে ওঠার শক্তি পেলাম না। তাই নীরস মনের নিদারুণ অবসানে চন্দ্রনাথকে অমন করে আঁকড়ে ধরেছিলাম—একদমও তাকে ছাড়তে রাজী নই—কতকটা বেন মুহূর্ত বোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তিমজ্বলের মত। তাই ফোকটোনের রেল-কর্মচারীর কথা মনি নি।

নভেম্বর মাসের যে সন্ধ্যায় লণ্ডন সহরে এসে প্রথম পদাৰ্পণ করেছিলাম—সে সন্ধ্যাটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে। কেন, ক্রমে সেটা বুঝতে পারবে। আমরা দু'জন ট্রেনের কামরায় উঠে বসার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন দিল ছেড়ে। একটু অবাক ছিলাম। আমার হিসেব মত ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় দু'ঘণ্টা বাকী। চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে শুধোলাম, “একি হল! এরই মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল যে?”

চন্দ্রনাথ বললে, “কি জানি, তোমার হিসেবে ভুল ছিল বোধ হয়।” কিন্তু মন সে কথায় সায় দিল না। কেন না, আমার যাত্রাপথের প্রত্যেক পদক্ষেপটি জাহাজ এবং ট্রেনের বই দেখে আমার—ইংরেজীতে বাকে বলে ‘Travelling Agents’—তার লিখে ঠিক করে দিয়েছিল। পকেট থেকে সেই কাগজখানি বার করে দেখলাম—আমার ত ভুল হয়নি।

ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বেরছিল। হঠাৎ শুধাল, “তোমাকে প্রথম অনেক পিছনের একটা কামরার বসিয়েছিল না?”

বললাম, “হ্যাঁ”।

বললে, “ঠিক হয়েছে। ট্রেনটা দুই ভাগে ছিল। প্রথম অংশটি ছেড়ে দিয়েছে, শেষের অংশটি তোমার হিসেব মত প্রায় ঘটা দুয়েক পরেই ছাড়বে। তাই তোমাকে সেই দিকে উঠিয়েছিল।”

কাচ-আঁটা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—কথাটা ঠিক। আমাদের কামরার পিছনে মাত্র আর একখানি গাড়ী রয়েছে। আমার মাথার বেন বজ্রাঘাত হ'ল। তারও কারণ বলি।

সুরেশ ঘোষ বলে আমার এক বন্ধু ছিল—নাম শুনেছ, তাকে দেখনি কখনও। নাম শুনেছ তার কারণ, এটা নিশ্চয়ই শুনেছিলে যে বিলেত যাত্রা করার আগে তাকেই আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং আমার থাকার জন্ত একটা ঘর ঠিক করে রাখতে। সে আমি রওয়ানা হবার বহরখানেক আগে থেকে, বিলেতে এসে ব্যাবিষ্টারী পড়ছিল। তাকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছবার সময় দিয়েছিলাম রাত ৮।১টা। কিন্তু আগের ট্রেনে উঠে বসেছি—হিসেব মত লগুনে পৌছতে ৬।১টার বেশী হয় না।

চন্দ্রনাথকে সব কথা খুলে বলে শুধোলাম “কি হবে?”

চন্দ্রনাথ বলল “কি আর হবে? যা হয় একটা করে নেওয়া যাবে। নেহাৎ নিকপায় হই ত ষ্টেশনেই বসে থাকব, যতক্ষণ না সুরেশ আসে।”

চুপ করে রইলাম। আসল মনের কথাটি চন্দ্রনাথকে বলতে লজ্জা হ'ল। এই দূর অচেনা বিদেশে, যেখানে কোনও দিক দিয়েই মনের একটুকু অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছি না, সুরেশই যেন আমার মনের একমাত্র আশ্রয়। আমি যে ইতিমধ্যে কতবার সুরেশ ঘোষের মুখখানি মনে করে, পরমাশ্রয় ভাবে তাকেই মনে মনে আঁকড়ে ধরেছিলাম, চন্দ্রনাথ ত তা জানে না। যদিও তোমাকে জানাতে এখন আর কোনও বাধা নাই যে দেশে থাকতে সুরেশকে কোনও দিনই আমি বিশেষ পছন্দ করিনি—তার সঙ্গে মনের মিল আমার হয়নি কখনও। সব সময়ই মনে হয়েছে—মনটা তার অন্ধকারে গলিপথে চলতেই ভালবাসে—আলোর সোজা রাস্তা সে যেন চলে এড়িয়ে।

যাই হোক, চন্দ্রনাথের কথা শুনে ষ্টেশনেই সুরেশের জন্ত অপেক্ষা করব—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে করে নিয়ে থানিকটা স্থিতি পেলাম। ক্রমে ট্রেন এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। প্র্যাটফর্ম পা দিয়ে মনে হল—এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু আমরা দু'জনেই যেন খালি বাস্তব, আর সবই যেন স্বপ্ন।

চন্দ্রনাথ শুধাল “কি করবে?”

বললাম “সুরেশের জন্ত অপেক্ষা করা যাক। কোথাও গিয়ে বসা যায় না?”

চন্দ্রনাথ বলল “কিন্তু এই ঠাণ্ডায় দু'ঘণ্টার ওপর বসে থাকলে ত মরে যাবে।”

সত্যই অসম্ভব শীত। এরকম শীত জীবনে কখনও দেখিনি।

গায়ে গরম স্মাট, তার উপর ওভারকোট, মাথার টুপি—তবুও বেন হাড়ের ভিতর থেকে শীত কঁপে কঁপে উঠছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

চন্দ্রনাথ বলল “তোমার জন্ত সুরেশ ২২নং ক্রমওয়েল রোডে ইণ্ডিয়া হাউসে জায়গা ঠিক করে রেখেছে না?”

বললাম “ঠিক করেছে বলে ত লেখে নি। প্রথমটা এসে সেইখানেই দু'একদিন থাকবার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবে—এই রকম একটা কি চিঠিতে লিখেছিল। সে চিঠি ত আমার টেলিগ্রাম করবার আগেই পেয়েছিলাম।”

চন্দ্রনাথ একটু ভেবে বলল, “চল, এক কাজ করা যাক। ট্যাক্সি করে চল বাই ইণ্ডিয়া হাউসে। সেটা ত আমাদেরই মতন ভারতবর্ষের ছেলেদের প্রথম এসে ওঠার জন্তই তৈরী হয়েছে। জায়গা পেয়ে যাবো।”

বললাম “কিন্তু সুরেশের সঙ্গে দেখা হবে কি করে?”

চন্দ্রনাথ বলল “এসে তোমাকে না পেলে ইণ্ডিয়া হাউসে কাল সকালে সে নিশ্চয়ই খবর নেবে।”

সত্যই ঐ শীতে ষ্টেশনে আর দাঁড়ান সম্ভব হচ্ছে না। অথচ কোথায় যে গিয়ে একটু গরমে অপেক্ষা করব—তাও জানি না। নিজের ইচ্ছাশক্তির জোর তখন আমার একেবারেই নেই। চন্দ্রনাথের কথায় সার দিয়ে বললাম “তাই চল।” মনে মনে ভেবে নিলাম ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে, একটা আস্তানা ঠিক করে—ট্যাক্সি করে না হয় ফিরে আবার ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসব, সুরেশের সঙ্গে দেখা করতে।

জিনিষ-পত্র নিয়ে চললাম ট্যাক্সি করে দু'জনে—ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে দিলাম—২২ নং ক্রমওয়েল রোড। লগুন সহরের বৃকের উপর দিয়ে চলল আমাদের ট্যাক্সি—সেই লগুন সহর, যার কত কথা ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। কাচ-আঁটা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—রাস্তার অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন অথচ সেই অন্ধকারের বুকে হাজার আলো জলছে চারিদিকে। মনে হল—এ যেন একটা সহস্রচক্ষু বিরাট দৈত্য, হাঁ করে ক্রমেই আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে তার বিশাল উদরে।

চন্দ্রনাথকে শুধোলাম “তোমার থাকার জায়গা তুমি কিছু ঠিক করে আসনি কেন?”

বলল “জান ত আমার আসা হঠাৎ ঠিক হল। আমারও তেমন জানাশোনা কেউ এদেশে নেই। মেজদা তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছেন—এই ইণ্ডিয়া হাউসেই আমার জন্ত ঘর ঠিক করে রাখতে। তিনি কিছু করেছেন কিনা জানি না।”

বললাম “চল, ইণ্ডিয়া হাউসে গেলেই বা হয় বোঝা যাবে।”

কিন্তু রাস্তা যেন আর ফুরায় না। ট্যাক্সি লেছে ত চলইছে। মন তখন কোনও রকম একটা আশ্রয় পাওয়ার জন্ত পাগলের মতন ছুটেছে। ট্যাক্সি তার সঙ্গে ‘পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে কেন?’

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—২২নং ক্রমওয়েল রোডের সামনে। ফুটপাথের উপরেই বাড়ী—কয়েক বাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ফুটপাথ থেকে—দুধারে রেলিং দেওয়া। দুজনে উঠে গিয়ে সদর দরজার বাঁকা দিলাঘ। একটি মহিলা দরজাটি ঝঁক খুলে দু'বার করে জিজ্ঞাসা করলে “কাঁকে চাই?”

বললাম “আমরা সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছি।—এখানে থাকার জায়গা হবে কি না?”

দরজা খুলে মহিলাটি বললে—“ভিতরে আসুন।”

ভিতরে গিয়ে পাঁড়ালাম একটি অপ্রশস্ত বারান্দা মতন জায়গায়—দু’পাশে ঘর, সামনে একটু দূরে সোজা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। মহিলাটি সেখানে পাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“কি নাম?”

আমাদের নাম বললাম। বললে, “একটু অপেক্ষা করুন—আমি খবর নিচ্ছি।” এই বলে পাশের একটি ঘরে ঢল গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে, “মি: চৌধুরী কার নাম?” আমি বললাম “আমার।” বললে “আপনার জন্ত ঘর আছে কিন্তু (চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে) “আপনার জন্ত কোনও স্থান ত নেই! কোনও খবর ত আপনার পাইনি আমরা।” তাড়াতাড়ি বললাম—“ঐ একটা ঘরেই হুঁজনে কোনও রকমে ব্যবস্থা করে নেব। আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে বা হয় করব।”

মহিলাটি একটু হেসে বললে, “তা হয় না। একজনারই খালি বিছানা—হুঁজনের ব্যবস্থা হবে না।”

চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম। সে তখন আমার কোটের হাতটা জোর করে চেপে ধরেছে। চুপি চুপি বললে, “আমাকে ছেড়োনা কিন্তু।” বুঝলাম তারও মনের অবস্থা আসলে আমার চাইতে বিশেষ কিছু ভাল নয়।

বললাম “আমরা দুজনে যে একসঙ্গে থাকতে চাই। বললে, “তাহলে অন্তত চেষ্টা করুন।”

তখন চন্দ্রনাথ বলল “অন্ত কোথায় দুজনে অন্তত: আজ রাতটার মতন জায়গা পেতে পারি বলে দিতে পারেন?”

বললে “হ্যাঁ। তিন জায়গার নাম ও ঠিকানা আপনারা লিখে দিচ্ছি। কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন—নিশ্চয়ই।”

এই বলে আবার পাশের ঘরে গেল চলে। একটু পরেই একটি কাগজে তিনটি ঠিকানা লিখে বাইরে এলো। চন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। আমাকে বললে “চল।” আমি যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত চন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। দু’পা এগিয়ে চন্দ্রনাথ হঠাৎ ফিরে মহিলাটিকে বললে, “অনেক ধন্যবাদ।”

মহিলাটি হেসে একটু মাথা দোলাল, মুখেও কি যেন একটা বলস—ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদিও বিশেষ করে লিখে এসেছিলাম যে এদেশে কথায় কথায় ধন্যবাদ দিতে হয়। তবুও আমি ধন্যবাদ দিতে ভুলেই গেলাম।

\* \* \*

আবার চলল আমাদের ট্যাক্সি লগুন সহরের বুকের উপর এদিক ওদিক নানা রাস্তা দিয়ে। কখনও অতিরিক্ত আলোতে উজ্জ্বল প্রশস্ত রাস্তা—দু’দিকে বড় বড় অটালিকা। কখনও বা অপ্রশস্ত রাস্তা—দু’দিকে ঠিক একই ধরনের ছোট ছোট বাড়ী। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে রাস্তার পাশে পাঁড়ান ক্ষীণ আলোতে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সবই যেন অবাস্তব, অস্পষ্ট। অনেক ঘুরে ঘুরে ক্রমে আমাদের ট্যাক্সি এসে পাঁড়াল—গাওয়ার স্ট্রীটে, সেক্সপীয়ার হাটে। এইটেই মহিলাটির দেওয়া প্রথম ঠিকানা।

গাওয়ার স্ট্রীটে সেক্সপীয়ার হাট লগুন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের

বিশেষ পরিচিত স্থান, কিন্তু আমরা হুঁজনে এর বিষয়ে কিছুই জানতাম না। লগুনে ভারতীয় ছাত্রদের মেলামেশার এটি একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল—এক কথায় বাকে বলে ক্লাব। কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্রদের থাকবারও ব্যবস্থা ছিল এখানে। ভারতীয় খাজ অর্থাৎ ভাল ভাত রুটি চাপাটি মাংসের কারী ইত্যাদি এখানে বেশ সম্ভার খেতে পাওয়া যেত এবং অনেক দূর দূর থেকে ভারতীয় ছাত্ররা মাঝে মাঝে এখানে ভারতীয় খাজ খেতে এসে জুটত এবং পরে আমিও হয়েছিলাম তাদের মধ্যে একজন। স্থানটিকে আমি যে কোনও দিনই বিশেষ পছন্দ করেছি, এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু কখনও কখনও ভারতীয় খাজের লোভ আমাকে টেনে নিয়ে যেত সেখানে।

সেক্সপীয়ার হাটের বাড়ীখানি লগুনের অল্প অল্প সাধারণ বাড়ীগুলির চেয়ে একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। একতলা বাংলা ধরণের বাড়ী—ছাটটি টালির না কাঠের ঠিক মনে নেই। সামনেই বেশ বড় ছড়ান কাচ আঁটা বসবার ঘর—রাস্তা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। আমি ট্যাক্সি থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার দিকে বড় সদর দরজাটি সম্পূর্ণ খোলা।

আমার মনের উত্তাপ তখন খুব কম মাত্রায়ই ছিল। কিন্তু বা দেখছিলাম তাতে আমার মনের মাত্রা প্রায় শূন্যতে গিয়ে নামল। এক ঘর ছড়ান বিদেশী পোষাক পরা ভারতীয় ছাত্র—কেউ বা বসে গল্প করছে, কেউ বা একটু বৈকিয়ে পাঁড়ানো, চেয়ারের উপর তুলে দিয়েছে পা। চুলগুলি প্রায় সকলেরই পিছন দিকে টেনে আঁচড়ানো—কারও মুখে পাইপ, কারও হোটে সিগারেট একটু বৈকিয়ে লাগানো। হো-হো হাসি ও তাদের মুখের বাঁকা-বাঁকা বিদেশী কথাবার্তা—ঘর ভরা আমাদের ঘোঁরাই কুণ্ডলী পাকিয়ে বাইরে যেটুকু কানে এলো—কেমন যেন বিকৃত মনে হল।

চন্দ্রনাথকে বললাম “আমি আর নামব না। তুমি নেমে খবর নাও।”

চন্দ্রনাথ “আচ্ছা” বলে নেমে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ গাড়ীতে বসে রইলাম—কিছু দূরে ঘরের মধ্যে ভারতীয়দের গতি-বিধি ধরণ ধারণ চোখের সামনে সিনেমার ছবির মত ভাসতে লাগল—সেই দিকেই রইলাম চেয়ে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাইরে থেকে এসে আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুক যাচ্ছে; কেউ কেউ বা বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু বেশীর ভাগই একা নয়—বগলে জড়ান পাশে চলেছে মেম সাহেব।

চন্দ্রনাথ ফিরে এল। এসে বাইরে পাঁড়িয়ে পকেট থেকে কাগজ বার করে ট্যাক্সি-ডাইভারকে কি একটা বলে দিল—কাচ আঁটা ভিতর থেকে ঠিক তনতে পোলায় না। বুঝলাম—পরের ঠিকানা।

ভিতরে উঠে এসে বলল “বাবা! বাঁচা গেল।” শুধোলাম “কি হল?”

বললে “আরে কেউ ভাল করে কথাই বলতে চায় না। এ বলে—ও দিকে যান। ও বলে—ঐ দিকে খবর নাও। সকলের চোখেই কেমন যেন তাচ্ছিল্য ভরা বাঁকা চাহানি।”

শুধোলাম “শেষ পর্যন্ত জায়গা আছে কি না খবরই পেল না?”

বললে—“যে যেমসাহেবের হাতে সব ব্যবস্থা করার ভার—

তিনি এখন নেই। তবে শুনলাম নাকি জায়গা নেই। থাকলেও থাকতাম না ওখানে।”

ট্যান্ডি চলেছে। শুখোলাম “কোথায় বাচ্ছি এখন?” বললে “বেভফোর্ড স্ট্রীটে। লিঙ্কলন হল হোটেল।”

জায়গা ওখানে না পাওয়াতে মনে মনে আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

\* \* \* \*

ক্রমে ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—লিঙ্কলন হল হোটেলের সামনে। খানিকটা ২২নং ক্রমওয়েল রোডের মতনই বাড়ীখানি—ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে, ছ’পাশে রেলিং দেওয়া। বাইরের দিকে জানালা দরজা সবই বন্ধ—ভিতরে যে মানুষ আছে বোঝা যায় না। ছ’জনে নেমে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে সদর দরজায় খাক্সা দিলাম। সদর দরজার পাশেই পিভলের উপর কালো হরফে বড় বড় করে লেখা—লিঙ্কলন হল হোটেল। বাড়ীর নম্বরটাও চোখে পড়ল—২৭।

একটি ক্ষীণাকীর্ণ দীর্ঘ মহিলা এসে দরজা খুলে আমাদের দিকে চাইলেন।

চন্দ্রনাথ বলল, “এখানে কি আমাদের থাকবার স্থান হবে? আমরা ছ’জনে একসঙ্গে থাকতে চাই।”

বললে “ভিতরে আসুন।” ভিতরে চুকলাম—সেই ক্রমওয়েল রোডের বাঁচাই বাড়ীটা তৈরী—অর্থাৎ লম্বা অপ্রশস্ত বারান্দা মতন একটা জায়গা, ছ’পাশে ঘর এবং কিছু দূরে সামনে দোতলার উঠার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। পরে অবগু দেখেছিলাম—বেশীর ভাগ লণ্ডনের সাধারণ বসবাসের বাড়ীগুলিই এই রকম।

মহিলাটি বললেন “হ্যাঁ—দোতলার ছ’জনের থাকবার মতন একটা ঘর আছে। চলুন দেখবেন।”

কথাটা শুনেই একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক ছাপিয়ে বেরুল, আমি নিজে টের পাওয়ার আগেই। চন্দ্রনাথ একটু যেন হেসে আমার মুখের দিকে চাইল। [ ক্রমশঃ।

### বিলেতে ধূমপানের বহর

ধূমপান অর্থাৎ সিগার-সিগারেট খাওয়ার বহর বুটেনে বেড়েই চলেছে দিন দিন। সেখানকার অনেক ধূমপায়ী ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছে এবং গবেষণায় প্রমাণিতও হয়েছে যে, ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারজনিত ক্ষতের সম্পর্ক খুব নিবিড়। কিন্তু তাই বলে ধূমপানের মাত্রা বা হার কমে যায়নি সেখানে এতটুকু, পরস্তু সংখ্যাতন্ত্র নিয়ে দেখা গেছে—এইটি ক্রমেই বাড়তির দিকে।

১৯৫৪-৫৫ সাল অর্থাৎ বছর তিন আগেকার একটি সরকারী হিসেব। বিলেতের শুক ও আবগারী বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্টেই জানা গেছে, টুবাকো (তামাক) থেকে আলোচ্য বর্ষের জাম্বুয়ারী মাসে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তার পরিমাণ ৬৫ কোটি পাউণ্ড। এর পূর্ববর্তী বছরটিতে অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালে এই খাতেই সংগৃহীত রাজস্ব অপেক্ষা উক্ত রাজস্ব ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। বুটেনে ধূমপানের বহর বাড়ছে বই যে কমছে না, এই থেকে এর একটি সহজ অনুমান চলে।

শুধু বুটেনেই কেন, পৃথিবীর মোটামুটি প্রায় সকল দেশেই ধূমপানের মাত্রা তথা ধূমপায়ীর সংখ্যা আগে থেকে বেড়েছে, অন্ততঃ কমেনি কোথাও। তবে বুটেনে নারীদের ভেতরও এই অভ্যাসের প্রচলন অনেক দেশের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। অবগু রাষ্ট্রীয় সরকারের দিক থেকে এতে প্রত্যক্ষ কিছু ক্ষতি বা লোকসান নেই। পক্ষান্তরে বরং বলা চলে—এইটি তাঁদের আয়ের একটি মন্ত বড় সূত্র এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র। ধূমপানের বহর বা মাত্রা যতই বাড়বে, রাজস্ব বৃদ্ধিও হবে সেই অনুপাতেই।



# চারুজনা

## শ্রীনেত্রনাথ সেন

[ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং  
বর্তমানে ঐ কলেজের ইমারিটাস প্রফেসর ]

অধ্যাপক শ্রীনেত্রনাথ সেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত বিনাইদহ মহকুমার বাহগাম নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগৃহ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী স্থানীয় বন্য জমিদারের প্রতিষ্ঠিত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত নলডাঙ্গা ভূষণ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। পরে তিনি যশোহর জেলা স্কুল হইতে প্রতিযোগিতা সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রীসেন রসায়নশাস্ত্র ও ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত বিষয়ক পক্ষে যশোহর জেলার ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া শীতলাসুন্দরী বহু স্মরণপদক লাভ করেন। ইহার পর শ্রীসেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৪ সালে তথা হইতে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এস. সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে রায়বাহাদুর শ্রীনাথ পাল স্মরণপদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ স্নাতকপত্র এবং রায়বাহাদুর অমৃতনাথ মিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর তিনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস. সি ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী লাভের পর তিনি তাঁর রাসবিহারী ঘোষ স্নাতকোত্তর বৃত্তি পাইয়া বিজ্ঞান কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় ১৯১৭ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দুই বৎসরকাল গবেষণা কার্য করেন।

১৯১৯-এর শেষভাগেই তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয়। এই সময় শ্রীসেন মেসার্স আর. জি. হচিসন কোম্পানীতে তাঁহাদের প্রধান রাসায়নিকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুনামের সহিত কার্য করিবার পর তৎকালীন দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানসাহী শ্রমপতিগোষ্ঠী টাটা কর্তৃপক্ষের গুণগ্রাহী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জে. এন. টাটা কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চতর বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে শ্রীসেন ধাতুবিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্ত ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীর বরুইন রয়াল স্কুল অব মাইন্স এ যোগদান করেন। দুই বৎসর পর তিনি এ. আর. এস. এম ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এক বৎসর শ্রীসেন মিডলসবরো সহরে অবস্থিত ডারমান লভ এণ্ড কোম্পানীর ওকলাম ব্রিটানীয়া আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসএ কাজ করেন এবং ১৯২৫ সালের শেষভাগে ভারত সরকারের ষ্টোয়র্ক বিভাগের ইন্সপেকটরের অধীনে একজন

ক্লাশ ওয়ান অফিসাররূপে যোগদান করেন। এই পদে তিনি অল্প দিন অধিষ্ঠিত থাকিলেও সেই অল্পকালের মধ্যেই তিনি ষ্টোয়র্ক বিভাগের মেটালোগ্রাফি ল্যাবরেটরীতে একটি নতুন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং রেলওয়ে সংক্রান্ত ধাতুদ্রব্যাদির অকাল ভগ্নপ্রবণতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। ইহার পর ১৯২৭ সালে শ্রীসেন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ধাতু এবং রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজের খনিবিজ্ঞান বিভাগের ভারও কিছুকালের জন্ত ইহার উপর জ্ঞাত হয়। পরে অবজ্ঞা ধানবান্দে ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিবপুর কলেজের ঐ বিভাগটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সালে শ্রীসেন ধাতুবিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং ধাতব শিল্প (Metallurgical Industries) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করিবার জন্ত গ্রেট ব্রিটেন এবং জার্মানী প্রেবিত হন এবং আট মাস ঐ দুই দেশে অবস্থান করিয়া জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন



শ্রীনেত্রনাথ সেন

রিয়। ক্রীসেন গ্রেটব্রুটন এবং জার্মানিতে অজিত জ্ঞান এবং ভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধাতুবিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং ভূবিজ্ঞান একটি ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রিয়। শিবপুরের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ব্রেকট পেশ করেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মনোপ্রাণে কলেজের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি কামনা করিতেন। তিনি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া ক্রীসেনকে সেই পরিকল্পনাটি লইয়া সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে উপস্থিত হইবার উপদেশ দেন।

সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পরিকল্পনা অনুমোদন করায় ১৯৩৯ সালে ধাতুবিজ্ঞান ৩ বৎসরের বি. মেট. ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হয়। পরে ১৯৪৫ সালে অবশ্য এই কোর্স ৪ বৎসরের কোর্সে পরিণত হয় এবং ইহাতে উত্তীর্ণ তরুণেরা মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি. ই. ডিগ্রী লাভ করিয়া থাকেন। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ক্রীসেন ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই বাংলা সরকার উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্টে অনতিবিলম্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্পাদনা এবং উন্নতিসাধন করিবার সুপারিশ করা হয়। সরকার সেই সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ক্রীসেনের উপর সেই সকল সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, ভর্তি হইবার যোগ্যতার পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম-কানূনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার্থ পেশ করিবার নির্দেশ দেন। সেই সকল নিয়ম-কানুন ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুন সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়, কিন্তু সিণ্ডিকেট প্রথম এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ম-কানুনগুলিকে পশ্চাত্তাত্ত ১৯৪৫ সালের ২২শে অক্টোবর (with retrospective effect) হইতেই চালু করিবার নির্দেশ দেন। ক্রীসেনের নির্ভর বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি ঐ সকল নিয়ম-কানূনের মধ্যে সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শিবপুরের অধ্যক্ষতার সংগে সংগে তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এয়ার ক্রাফটের অধীনস্থ টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেন। ভারতীয় এয়ারকোর্সের ফ্লাইট মেকানিক্সদিগের ট্রেনিং-এর ব্যাপারেও ক্রীসেনের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, তিনি বাংলা ও বিহারের খনিবিজ্ঞান বিষয়ক আডভান্সারী বোর্ড, প্রীডার্স সার্ভে এগজামিনেশন বোর্ড এবং স্কুল ফাইন্সাল এগজামিনেশন (বিজ্ঞান বিভাগ) বোর্ডের কর্মসচিব (Secretary) হিসাবে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছেন। ক্রীসেন স্বদেশ ও বিদেশে যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সংগে গুণঃপ্রসূত ভাবে জড়িত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর এখনও আছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে। আমরা তাঁহার কর্মজীবনের ব্যাপকতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি মাত্র। ১৯২৪ সালে ক্রীসেন গ্রেটব্রুটন এবং আয়ারল্যান্ডের “ইনস্টিটিউট অব কেমিস্ট্রি” অ্যাসোসিয়েটে এবং ১৯৩৭ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপের সম্মান অর্জন করেন। ইহা ছাড়া তিনি ভারতীয় ‘Chemical Society’র ফেলো লগুনের ইনস্টিটিউশন অব মাইনিং এণ্ড মেটালজিক্যাল অ্যাসোসিয়েটেড সভ্য

ছিলেন (১৯৩৪—৪৯)। তিনি ১৯৪১ হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রিওসজিফ্যাল মাইনিং এণ্ড মেটালজিক্যাল ইনস্টিটিউশনের সভ্য ছিলেন। ১৯৪৫ সাল হইতে ইনি ভারতের “ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং” নাম প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদে বৃত্ত আছেন। ইনি “ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স” নামক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলের অগ্রতম সদস্য। তিনি সর্বভারতীয় কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন ও সর্বভারতীয় বোর্ড অব টেকনিক্যাল স্টাডিজ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড মেটালজি প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরীক্ষা গ্রহণ কমিটি এবং ক্যালকাতা টেকনিক্যাল স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তিনি কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটির ডীন মনোনীত হন এবং সিণ্ডিকেটের সভ্য হিসাবে কাজ করেন। সিণ্ডিকেটের সভ্য থাকা কালে তিনি ইহার ওয়ার্কস কমিটি, স্কুল কমিটি এবং ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি এক বৎসরের জ্ঞান ভূবিজ্ঞান শিক্ষা বোর্ডের এবং কয়েক বৎসরের জ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হন। তিনি বেঙ্গল ট্যানিং (Tanning) ইনস্টিটিউট ও ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজির গভর্নিং বডির মেম্বর এবং কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন সায়েন্স-এর সদস্য ছিলেন।

ক্রীসেনের মৌলিক গবেষণামূলক কাজ খুব বেশী নাই। তবে তাঁহার যে দুইটি মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লগুনের কোয়িক্যাল সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্টে স্থান লাভ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে কানীধামে বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি “Struntum of Metals” এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উত্তোক্তাদের নিকট ধাতুবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের স্নাতক শাখা হিসাবে গণ্য করিবার আবেদন জানান। ইহার ফলে ধাতু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানকে যুক্তভাবে একটি “সেক্সনাল সাবজেক্ট” রূপে গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালে তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি যে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে এমারিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি শিবপুর কলেজের দ্বিতীয় ভারতীয় এবং প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ।

### অধ্যক্ষ ত্রীচিন্তামণি কর

[ সরকারী চাকর ও কাক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও  
বিখ্যাত চিত্র ও প্রস্তরশিল্পী ]

ব্রহ্মগর্ভা ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের রক্ষিণী আলোকিত করেছে বিশ্বের আকাশ তার দিকপাল সন্তানগণের কল্যাণে। দীর্ঘ দিন বিদেশে কালাতিপাত করেও নিজের দেশীয় স্বাভাব্য বীর্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন উপরন্তু নিজের ভাবধারায় অপরকে করেছে অনুপ্রাণিত, সেই বরণীয় সন্তানগণের সঙ্গে অনারাসে উল্লস

করা যেতে পারে সরকারী চাক ও কার মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ চিত্র ও প্রস্তরশিল্পী বাউলার গৌরব শ্রীচিন্তামণি করের নাম।

শিল্পের দিকে অগ্রবাহ্য তাঁর জীবনের উষ্মালয় থেকে। পড়াশুনায় মন না বসলেই পিতৃদেব শিল্পী শ্রীভূপতিনাথ কর অঙ্কনের দিকে অগ্রপ্রাণিত করতেন। বাবার কাছে পেয়েছেন অপরিমিত উৎসাহ। তা ছাড়া মৃৎশিল্পীদের কার্ণাট সহায়তা করতেন সেই সময় থেকেই। এমনই করেই শিল্প-লক্ষ্যের অমোঘ আহ্বান বরণ করে নেন চিন্তামণি। ১১৩০ খৃষ্টাব্দে গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অরিয়েন্টাল আর্টস-এ যোগদান করেন। নিজের কৃতিত্বে ও মেধায় সেখানে উচ্চ ক্লাসেই স্থান পান। এখানে মোট তেরো মাস ছাত্র হিসাবে ছিলেন। ভারতীয় ধারায় চিত্রাঙ্কনে এঁকে সেদিন শিক্ষা দিতেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীকৃষ্ণনাথ মজুমদার। কাঠ ও প্রস্তর খোদাই করা স্বত্বকে পাঠ নিলেন উড়িষ্যার প্রকৃষ্ট মৃৎশিল্পী গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে থেকে। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও হয়েছেন উত্তীর্ণ। বিপণ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন আই-এ। আত্মনিয়োগ করলেন বাণিজ্যিক শিল্প সাধনায়। তারপর টাকোতে সরকারী উচ্চ বিভাগে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ, সেখান থেকে তিনি বদলী হলেন সিউড়ীর বীরভূম জেলা বিভাগে ও নিজের মনোমত বিভাগটি পেলেন। অঙ্গন শিক্ষক হলেন চিন্তামণি কর। ইতিমধ্যে চিন্তামণির শিল্পীখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। রঙ ও রেখার আঁচে ফোটাতে থাকেন অন্তরের ভাব ও ভাষা, নীরল পাথরের মধ্যে আনেন লালিত্য, লাবণ্য, দীপ্তি। শিল্পপ্রাণ মহারাজা প্রচোতকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্যাক্সোডেমী অফ কাইন আর্টস-এর প্রদর্শনী থেকে সাড়ে চার শ' টাকার এঁর একখানি ছবি কিনে নিয়ে গেলেন ত্রিপুরার পরলোকগত বিতোংসাহী মহারাজা বাহাদুর। তারপর লণ্ডন যাত্রা। সেখানেও প্রভূত সমাদর পেল এঁর অঙ্কিত ছবিগুলি। স্ট্রীট মাধ্যমে স্ট্রীট পেলেন সম্মান। লণ্ডন থেকে এলেন প্যারীতে, এখানে তাঁর প্রতিটি মূহূর্ত কেটেছে শ্রম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে, অপরিমিত নিষ্ঠায় তিনি দিনের পর দিন যে পরিমাণ পরিশ্রম করে গেছেন তারই সমষ্টি দেখা দিয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাক্ষরূপে, সেখানে সকালে নটা থেকে বায়েটা স্যাক্সোডেমী জালা' গ্রীন্দ গ্রন্থিঘেরে ঘাটির কাজ শিখেছেন, দুটো থেকে পাঁচটা প্রস্তর খোদাই শিখেছেন বরণীয় শিল্পী ভিক্টর জোভানেল্লীর ষ্টুডিওতে, ছটা থেকে সাতটা অধ্যয়ন করেছেন ইন্সটিটিউট অফ আর্ট স্যাণ্ড আরকোলজিতে, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছেন রাত আটটা থেকে দশটা অবধি। এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী। যুদ্ধের মরণ-দামামা বাজার সংসদেই ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯৪২ খৃঃ এ দিল্লীতে গিয়ে একটি ষ্টুডিও খুললেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দিল্লী পলিটেকনিক আর্টস সেকশানে ভাস্কর্য শেখাবার ভার পেলেন (১৯৪৩)। ১৯৪৪-৪৫ খৃঃ অঙ্কনে ও ভাস্কর্যে ওয়ানম্যান শো'র অর্জন করলেন প্রভূত প্রসিদ্ধি। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে আবার লণ্ডন যাত্রা। সেখানেও নির্মাণ করলেন একটি ষ্টুডিও। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল ব্রিটিশ স্কালপচারাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হলেন। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে ইনিই এই প্রতিষ্ঠানের

প্রথম ও আজ পর্যন্ত একমাত্র সভ্য। ১৯৪৮-এর অলিম্পিকে স্পোর্ট-ইন-আর্ট'এর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভাস্কর্য বিভাগে জ্যেষ্ঠ গ্রেট ব্রুটেনের পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক ও ডিপ্লোমা পান। রয়্যাল স্যাক্সোডেমীর প্রদর্শনীগুলিতে ইনি একজন নিয়মিত প্রদর্শক ছিলেন (১৯৪১-৪৬)। লণ্ডনের একটি শিল্প সংরক্ষণ শালার পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পী চিন্তামণি কর (১৯৫০-৫৩)। লণ্ডনে চার বার ও প্যারীতে দু'বার ইনি 'ওয়ান-ম্যান-শো' করে এসেছেন। লণ্ডন ও প্যারী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে বহু ব্যক্তিগত ও সাধারণ সংগ্রহশালায় শোভা পাচ্ছে এঁর শিল্প সৃষ্টিগুলি। ক্লাসিকাল ইণ্ডিয়ান স্কালপচার' ও 'ইণ্ডিয়ান মডার্ন স্কালপচার' নামক দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেও সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৩ ও ৫৪ খৃষ্টাব্দে তিন মাসের জুড়ে দু'বার ভারতে ফিরে আসেন। এই সময়ে শ্রীজি, ডি, বিড়লার ইচ্ছাক্রমে রাষ্ট্রপতি রাভেন্দ্রপ্রসাদের একটি এগারো ফুট ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি নির্মাণের ভার নেন। ১৯৫৫ খৃঃ সেটিকে আট মাসে সম্পূর্ণ করেন। ভারতের প্রধান হিসাব পরীক্ষকের আবাসের সামনে দেওয়ালে ন'টি "৬-৪" বাস রিলিফ স্কালপচার প্যানেলের নির্মাণ ভার গ্রহণ করলেন ভারত সরকারের কাছে থেকে। এই উপলক্ষে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে একেবারে প্রত্যাবর্তন করলেন ও সেই বছরই অগষ্ট মাসে সরকারী ও চাকরাক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন চিন্তামণি কর।

দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, ভারতীয় ভাবধারায় শিল্প সৃষ্টি করে সেখানে অর্জন করেছেন প্রভূত যশ, ইনি বলেন যে আমাদের প্রাচীন শিল্প সেখানে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের প্রাচীন শিল্প স্বত্বকে তারা রীতিমত চর্চা করে। স্বাদীনদেশে শিল্পের বতটা অগ্রগমন হওয়া দরকার অধ্যক্ষ করের মতে ভারতে তা মোটেই হচ্ছে



শ্রীচিন্তামণি কর

না। ভবিষ্যৎ শিল্পীদের প্রতি আপনাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ কি, জিজ্ঞাসা করায় অধ্যক্ষ কদের কাছ থেকে উত্তর আসে যে নতুন শিল্পীদের নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকতে হবে অথবা তাই বলে পুরাকালকে আমি নকল করতে বলি না— তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নতুন যুগেরই ছবি থাকবে তবে তা দেখেই যেন বোঝা যায় যে শিল্পী কোন দেশান্তর্গত। এইভাবে ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রত্যেক শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য। জীবনে বহু শিল্প সাধকের সম্পর্কে নিবিড়ভাবে এসেছেন অধ্যক্ষ কর বাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ফিতিল্লুনাথ, প্রেমিক, জুভেনেলি প্রমুখ এঁর শিক্ষকবর্গের ও তৎসহ ব্রাহ্মদী, ভেনিসিট, এপটাইন প্রমুখ স্বনামধন্য শিল্প সাধকদের নাম।

ভারতের বিশেষ করে বাঙালার গৌরব অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের দ্বারা সারা বিশ্বে আরও পরিচাপ্ত হোক, বিশ্ববাসীকে ভারতীয় শিল্প বোধে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্বজন মানসে ভারতের শিল্প নতুন চেতনার সঞ্চার করুক, এই কামনাটি করি।

### শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

[ প্রখ্যাত কবি ও 'যুগান্তর'-সম্পাদক ]

শ্রীমল শোভন বাঙালার পবন কোমল মুক্তিকায় পুষ্ট হয়েছেন বাঙালার অন্যান্য কবি সন্তান, সেই পুষ্টিকে বিকাশের পথে সহায়তা করেছে বাঙালার অন্দরমহলের রূপ রস-মাধুরীর অবর্ণনীয় বৈচিত্র্য। এই রূপসাগরে অবগাহন করে কবিকুল তাই থেকে আহরণ করেন অমৃত, সেই অমৃত তাঁরা পরিবেশন করেন ঘরে ঘরে কাব্যের মাধ্যমে। বাঙালার ঠিক এই রকমই এক শোভা স্রবমায় ভরা



শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক ও স্রুকাবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমাস্তর্গত ছয়গাঁও গ্রামে। নদীতীরে মাছুলালয়ে। পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত, পরম বিজ্ঞানসাহী। মায়ের কাছে প্রথম পাঠগ্রহণ। তারপর পাঠশালায় প্রবেশ। এদিকে গ্রাম্য প্রকৃতি বিশেষ করে গৃহ সন্নিগটস্থ নদী ছেলেবেলা থেকে হাতছানি দেয় বিবেকানন্দকে। নদীর গতিবেগ অভিভূত করে তোলে বালককে, তার উত্তাল উদ্যমতার মধ্যে মনে মনে বালক নিজেকে দেয় মিশিয়ে, ভবিষ্যৎ-জীবনের কবি বিবেকানন্দের কবিতার মধ্যে বা তাঁর নিজের জীবনেও যে অশ্রান্ত গতিবেগ ধরা পড়ে তার উৎসই হচ্ছে এই নদী-তট। গ্রামের মহিলাদের রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনান বিবেকানন্দ। পাঠশালায় পর মধ্য ইংরাজী বিজ্ঞানয় তারপর রুদ্রগড় উচ্চ ইংরাজী বিজ্ঞানলয়ে অধ্যয়ন। লেখা আরম্ভ হয়েছে তার আগেই। বিজ্ঞানলয় থেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের হ'লে তাতে গল্প-প্রবন্ধ কবিতা এই তিন বিভাগেই দেখা দিলেন বিবেকানন্দ। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের অনুকরণে একদিন রচনা করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ কাব্য। ১১২১ খৃষ্টাব্দ এল। বাঙালার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বৎসর। পরাধীন দেশের নেতারা সম্ভবদ্ব হয়ে উঠেছেন, দেশের মুক্তি আন্দোলনে উদ্বোধিত করছেন সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সূদূর পল্লীগ্রামেও সে ডাক পৌঁছোল, ফলে বিবেকানন্দের অধ্যয়ন ব্যাহত হ'ল কিছুকালের জন্তে। এরপর একবার কলকাতায় ঘুরে যান বিবেকানন্দ। এখানে এসে দৈনিক বসুমতী ও অমৃতবাগীর পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হন ও গ্রাহক হয়ে যান। কবিতা রচনা তখন পুরোদমে চলছে। প্রথম কবিতা বেরোল 'উদ্বোধন'এ দ্বিতীয় 'মাসিক বসুমতী'তে। মাসিক বসুমতী তখন সবে চোপ মেলে চেয়েছে। পূজনীয় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে মাসিক বসুমতী ধীরে ধীরে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবার রাস্তা খুঁজছে। মাসিক বসুমতীর সঙ্গে এই যে সংযোগ স্থাপিত হ'ল বিবেকানন্দের তা আজও অক্ষুণ্ণ। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দের জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুলি এখানেই প্রকাশিত হয়েছে, তা ছাড়া তখন একরকম নিয়মিত ভাবেই এখানে কবিতা পরিবেশন করতেন বিবেকানন্দ। এদিকে বাঙলা ও সংস্কৃতে 'লেটার' নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিবেকানন্দ। ছাত্রজীবন বরাবরই গৌরবমণ্ডিত ছিল। কলেজে পড়ার ইচ্ছা থাকাতা স্বাভাবিকই। কিন্তু কোন কারণে কলেজে পড়া আর হয়ে উঠল না, কর্মজীবনের অমোঘ আহ্বান সরিয়ে রাখতে পারলেন না—কিন্তু অধ্যয়ন তাঁর শেষ হ'ল না, তার বিরাম নেই, পৃথিবীর বিখ্যাত সাহিত্যগ্রন্থগুলি বিখ্যাত সন্তানদের জীবনকাহিনীগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে তলিয়ে গেলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কলেজে পাঠগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইনি যখন চুঁচুড়ায় পদার্পণ করেন, সেই সময়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে এঁর হয় পরিচয়। নজরুলের সঙ্গে এঁর পরবর্তী জীবনের গভীর সৌহার্দ্য অনেকেরই সুবিদিত। উদীয়মান কবিকে নজরুল আখ্যা দিলেন 'মর্নিং ষ্টার'।

বিবেকানন্দের কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়।



আনন্দবাজারও তখন শিশুস্রাজ। নির্ভীক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের চেষ্টায় ও মাখনলাল সেনের সমর্থনে একজন অবৈতনিক শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করলেন বিবেকানন্দ (১৯২৫ খৃঃ)। অনেক দিন পরে প্রথম পারিশ্রমিক লাভ করলেন পঁচিশ টাকা। তার পর মেথার ও নিষ্ঠার এবং সত্যতার বারো বছরের মধ্যে তিনি সহ-সম্পাদকের পদে সমাসীন হলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি ও বিপ্লবের গ্রন্থগুলি ব্যাপক ভাবে সংগ্রহ করতে লাগলেন। সম্পাদকীয় রচনায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক রচনাদির প্রথম প্রবর্তন ইনিই করলেন। দীর্ঘাকার প্রবন্ধগুলিই ধীরে ধীরে আজ রবিবাসরীয় বিভাগরূপে পরিণত হয়েছে। আনন্দবাজারের দোল সংখ্যা ও পূজা সংখ্যার সম্পাদনভার ইনি একাধিক বার গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 'যুগান্তর'এর প্রতিষ্ঠা হ'ল। বিবেকানন্দ যোগদান করলেন যুগান্তরে। সমস্ত পরিকল্পনাটি তাঁর সৃষ্টি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে ইনি সম্পাদনভার গ্রহণ করলেন, আজও তিনি পৌরবের সঙ্গে এই পদে সমাসীন। প্রথম জীবনে বিদ্রোহমূলক কবিতা লেখার জন্তে গোয়েন্দা বিভাগের কুনজরেও থাকতে হয়েছিল আর পনেরো-বোলা বছর। শতাব্দীর সঙ্গীত, বিপ্লবী নায়িকা ও জীবনমৃত্যু গ্রন্থত্রয় তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহনকারী। তা ছাড়া জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, কণ-জার্মান সংগ্রাম, সোভিয়েট মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি শীর্ষক গ্রন্থগুলিতে তাঁর বিখ রাজনীতি তথা সমরনীতি সম্বন্ধে দক্ষতা ঘরা পড়েছে।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং ১৯৫৫ থেকে ইনি পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সঙ্ঘার সভাপতি। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ পান কিন্তু তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে হেলসিংকি বাজা করেন ও সেই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। ঐ বছরেই এপ্রিল মাসে বার্মায় অনুষ্ঠিত নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ঐ বছরের শেষার্ধ্বে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সমাজ সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে দেখা দায় এঁকে। ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংস্থা বর্তমানে বিশ্বের সংবাদ জগৎ নিয়ে গবেষণায় মত্ত। এঁদের বাৎসরিক সম্মেলনে আমষ্টার্ডামে যুগান্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেন বিবেকানন্দ (১৯৫৭ খৃঃ)।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সাংবাদিকতার স্থান কোথায়? আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিবেকানন্দ উত্তর দেন—কলকৌশলের দিকে তারা অনেক উন্নত মনোবাব ক্ষেত্রে ভারত বিশেষতঃ বাঙ্গালার কাছে তাদের স্থান অনেক নীচে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এই দ্বিবিধ জীবন বহুকাল একযোগে বাপন করে এসেছেন কবি সাংবাদিক বিবেকানন্দ। আমার প্রশ্ন এই যে দুয়ের মধ্যে সংযোগ কতখানি? উত্তর আসে অচ্ছেদ্য। সাহিত্যে রীতিমত দক্ষতা না থাকলে সাংবাদিকতার সাফল্যলাভ করা যায় না। ইতিহাসে দেখুন যারা সার্থকনামা সম্পাদক তাঁরাই কৃতী সাহিত্যসেবী। তাই সাংবাদিকতার মধ্যেও তাঁদের সেই পরম মোহনীয় শিল্পীমনই বার বার ঘরা দেয় এবং যেখানে তা দেয় না সেইখানেই তাঁদের ব্যর্থতা।

## ডক্টর শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক]

জীবনের প্রতিষ্ঠাশিখরে যারা আরোহণ করেছেন ইতিহাসের সোপানমালাকে আশ্রয় করে, ইতিহাসের মাধুর্যময় আলোকের স্বর্ণাধারায় যারা নিজেদের স্নাত করেছেন সর্বতোভাবে, ইতিহাসের বহুমূল্য কোষাগার থেকে মহার্ঘ বস্তু আহরণ করে সেইগুলি দিয়ে যারা ভরিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থী ছাত্রদের ও শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদের, সেই বরণীয় ঐতিহাসিককুলে ডক্টর অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও যে একটি বিশেষ আসন আছে সংরক্ষিত, এ অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসচর্চা, সাংবাদিকতা ও শিক্ষাদান এই তিন বিরাট ব্রতের মধ্যে অনিলচন্দ্রের জীবন ও জীবনীর পরিপূর্ণ বিকাশ।

নোয়াখালীর একটি স্থুলের শিক্ষক ৮ম শ্রেণির অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অনিলচন্দ্র নোয়াখালীতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই অগাষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বালিগাঁও গ্রামে ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের আদিবাস। আরিয়ল গ্রামের (ঢাকা জেলা) স্বর্ণময়ী হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন অনিলচন্দ্র। নোয়াখালীর অরুণচন্দ্র হাই স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবন অনিলচন্দ্রের ওজ্জ্বল্যে ভরপুর, কেবলমাত্র সর্বাঙ্গীন সার্থকতা, সাফল্য, বিজয়ের আশ্বাদ।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফেণী কলেজ থেকে আই-এ পাশ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হলেন প্রথম জন। সরকারী বৃত্তি সহ পেলেন বক্সিমচন্দ্র পত্রিক ও ডিজেন্ডাল বৃত্তি। প্রেসিডেন্সী



শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অনিলচন্দ্র (১৯৩০)। এবারেও সরকারী বৃত্তিলাভ। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথমজন হয়ে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার নিয়ে এম, এ, পরীক্ষাতেও হলেন উত্তীর্ণ। মারাঠার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে মৌর্যট মেডেল ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্মারকশিপি লাভ (১৯৪০-৪২)। আসাম ও ব্রহ্মদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে গবেষণা করে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দর্শনশাস্ত্রে ‘ডক্টরেট’ লাভ করেন। এ ছাড়াও যথা মারাঠার ইতিহাস, রাজপুত ইতিহাস, আসাম ও ব্রহ্মের ইতিহাস, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও আফগান সমস্তার ইতিহাস, ভারতের শাসনতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়সমূহ অবলম্বন করে গবেষণার মধ্যে অনিলচন্দ্র অতিবাহিত করেছেন জীবনের অনেকগুলি দিন।

সিটি কলেজ ও জয়পুরিয়া কলেজে কয়েক বৎসর ইতিহাসের পাঠ দিয়েছেন। ত্রিপুরা জেলার ক্রীকাইল কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন এক বছর। বর্তমানে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষরূপে ইনি সমাসীন (১৯৫০ থেকে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইতিহাসের অধ্যাপকের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন বছর তিনেক।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত হয়েছে এঁর দ্বারা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, ফ্যাকাল্টি ও বহু কমিটির ও কয়েকটি স্কুল-কলেজের পরিচালক সমিতির ইনি সভ্য। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক স্নানবিড়। আজীবন সভারূপে কোষাধ্যক্ষরূপে, শাখা সভাপতিরূপে, ঐ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯৫৫) সভাপতি সমিতির সম্পাদকরূপে নানা ভাবে ঐ কংগ্রেসকে সেবা করেছেন অনিলচন্দ্র। বর্তমানে ইনি কার্ণাটক সমিতির সভ্য ও ঐ কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট ভারত ইতিহাস প্রকাশনী সমিতির সম্পাদক। ভারতীয় সরকারের ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের ইনি একজন সভ্য। প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ অনিলচন্দ্র রচনা করেছেন তাদের মধ্যে পেলোয়া প্রথম মাধব রাও, রাজপুত ঠাডিস, রাজপুত ঠেটুস্‌ য্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইষ্টার্ন ফ্রান্সিসের অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, য়ানেক্রেনান অফ বর্মা, ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল ডকুমেন্টস (৩ খণ্ড) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সহযোগিতায় এঁর লেখা ভারতীয় ইতিহাস ক্রশ ভাষায় রূপলাভ করেছে। এ ছাড়াও ইতিহাস বিষয়ক বাঙলা ভাষায় ইনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনিলচন্দ্রের ইতিহাসে অনুরক্তি একারই নয়। এঁর তিন ভাইও ইতিহাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁর তরুণ পুত্র অমলেন্দুর নামও অনেকের কাছে অজানা নয়। অমলেন্দুর

ছাত্রজীবনও যশঃসৌভে ভরপুর। প্রবেশিকার দ্বিতীয়, আই-এতে প্রথম, অনার্স সহ বি, এতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে তিনিও যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বর্তমানে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিয়ল কলেজের ছাত্র।

অনেক কৃতী শিক্ষাদাতার সংস্পর্শে এসেছেন অনিলচন্দ্র। তাঁদের মধ্যে কে, জ্যাকবেরিয়া, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্মৃতি আজও অনিলচন্দ্রের হৃদয়ে অমলিন। ইংরাজী ভাষাতেও প্রফুল্ল বোম্ব, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (দমদম মতিঝিল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) শিক্ষাদান পদ্ধতিও অনিলচন্দ্রের অন্তরে স্পর্শ করে। জিজ্ঞেস করেছিলুম যে দীর্ঘ দিন শিক্ষাজগতে অতিবাহিত করে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন—এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন যে পনেরো বছর আগেও যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সহযোগিতা এ জগতে ছিল আজ তা যেন লোপ পেতে বসেছে। অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্রকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব কি জিজ্ঞাসা করি—উত্তর এল—অধ্যক্ষকে ছাত্রদের মনের মধ্যে সর্বাঙ্গে ধারণা আনতে হবে যে তিনিও একজন শিক্ষক তবেই তাদের সঙ্গে অন্তরের সংযোগ গড়ে উঠবে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা আসবে তাদের তরফ থেকে। অধ্যক্ষ যদি শুধুমাত্র অফিসাররূপেই তাদের সামনে প্রতীভাত হন তবে কিছুতেই তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে এও ঠিক, অধ্যক্ষকে শুধুমাত্র শিক্ষক হয়ে থাকলেই চলে না, কলেজের নানা বিভাগ নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়। এই বিষয়ে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষা-জগতের আজকের দিনের একজন বিরাট পুরুষ উক্তি করেছেন “দি প্রিন্সিপালস্‌ আর সিটি অফ ভগক্যানোস্‌।” অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত জিজ্ঞাসা করায় অনিলচন্দ্র বলেন যে—এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে আপোচনার দ্বারা পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান হওয়া খুবই বঞ্জনীয়—কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জন্তে সকলের সঙ্গে তা হওয়া অসম্ভব। সেই জন্তে স্বরসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যেখানে সেখানেই অধ্যক্ষের সঙ্গে তাদের নিবিড় সংযোগের পরিপূর্ণ সুযোগ। ঐতিহাসিক অনিলচন্দ্রকে প্রশ্ন করি—আজকের দিনে সারা ভারতবর্ষে ইতিহাসজগতের স্তম্ভরূপে আপনি কোন্ কোন্ ঐতিহাসিকের নাম করতে চান? অনিলচন্দ্রের অভিগতে আজকের দিনের ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথম তিনজন হলেন ডাঃ ত্রায় বহুনাথ সরকার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এ বিষয়ে সবিশেষ লক্ষণীয় যে যে তিনজনের নাম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে অনিলচন্দ্র উল্লেখ করলেন, তাঁরা তিনজনেই বাঙালী, বাঙলাদেশের ছেলে। রত্নপ্রসূ বঙ্গজননীর কীর্তমান সন্তান।

“যে পথেই হ’ক, আর যে ভাবেই হ’ক, দেশ বিভাগ  
রহিত হতেই হবে; ঐক্যসাধন করতেই হবে  
এবং ঐক্যলাভ হবেই।”

—শ্রী অরবিন্দ

# রাজা রাজা

উদয়ভানু

মুন্স্কৃত্যের মত এঁকেবঁকে সাঁতরে চলেছে অদৃশ্য  
আনন্দকুমারী।

অফুরন্ত জ্যোৎস্নার আলোয় কখনও দেখা যায় তার শুভ হুঁখানি  
হাত, কখনও মাথার কৃষ্ণকেশ, কখনও শাড়ীর আঁচল বা তার  
বস্ত্রপ্রান্ত। স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে ম্যাালেটে দেখতে পায় ঝাপসা চোখে,  
তার প্রিয়সঙ্গিনী জলে ভেসে চলেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বন্ধুত্বটা  
হাতে তুলে নিয়েছে কখন, কিন্তু হাত আর উঠলো না যেন।  
একটা বুক-জসা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাালেটে। সাঁটার বোতাম খুলে  
তপ্ত বুকখানা উন্মুক্ত করলো। চোখের দৃষ্টির দোষ না তুল দেখছে  
নিজেই সে বোঝে না। চোখে হাত কচলায়। মাঝির দল চিত্রাঙ্গিতের  
মত ঝাঁড়িয়ে আছে। হকুম পাওয়া মাত্র তারা জলে ঝাঁপ দেবে কিন্তু  
ম্যাালেটের মুখে কোন কথা নেই, ভ্রত্বাক যেন। খাঁচা থেকে পানী  
পালিয়েছে, চলে গেছে হাতের নাগালের বাইরে। শূন্য বজরাক্ষের  
দিকে একবার বার্ষ দৃষ্টিতে দেখলো ম্যাালেটে। তারপর ধীরে ধীরে  
ঘরে ঢুকে বঁসে পড়লো নিজের জায়গায়। ডিকেটারটা হাতে  
তুলে নিয়ে নিশ্চুপ বঁসে থাকলো কতক্ষণ।

ঘরের খাটো দরজায় দেখা দেয় মাঝি-সর্দার। নিম্নকণ্ঠে বললে,  
—হুজুর, গোলা-বারুদ আর এতগুলো বন্ধু থাকতে শিকার পালিয়ে  
যাবে চোখে ধুলো দিয়ে?

ম্যাালেটে নিষ্কণ্ঠে। অভিমানে যেন শুরু হয়ে আছে। চোখের  
পলক পড়ছে না। মুখে নিরাশার কালোছায়া ফুটেছে। তবুও  
অক্ষুট ক্রীণ হাসলো ম্যাালেটে। ডিকেটার মুখে তুলে ঢকঢকিয়ে  
পান করলো খানিকটা, তৃষ্ণ মিটাতে। ক্রোধ আর উত্তেজনার তার  
কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। মাঝির কথা যেন কানে গুঁথে না। ম্যাালেটে  
হয়তো জানে, ভালবাসার তব্বে জোর-জুলুম অচল। শক্তির প্রয়োগে  
দেহ যদিও কারও পাওয়া যায়, ভালবাসার খনি মনটা পাওয়া যায়  
না। সাহেবের আশার আলো যেন চিরদিনের মত নিবে গেছে।  
প্রেমের কণ্ঠহার ছিঁড়ে গেল অতর্কিতে।

মাঝি-সর্দার দেখতে পায় তার মনিব পান করছে অতি-মাত্রায়।  
এই অসংযমের পরিণাম তার জ্ঞাননা নয়। দেখতে দেখতে  
এখনই জ্ঞান হারাবে, আর বসতে বা ঝাঁড়াতে পারবে না! জ্ঞান  
কিরতে কিরতে হয়তো আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে।

—হুজুর এত খাবেন না উপরি-উপরি।

মাঝি-সর্দার যেন আর থাকতে পারে না, দেখতে পারে না  
চোখে। কথাগুলি বলে একান্ত আপন জনের মত।

কি এক আক্রোশে ডিকেটার নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো

ম্যাালেটে। টলটল পদক্ষেপে ঘরের ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে  
হঠাৎ হেসে উঠলো সশব্দে। কি যেন খুঁজতে থাকে হাসতে হাসতে।  
আনন্দকুমারীর পরনের বস্ত্র আর সাজসজ্জার উপকরণ জলে ছুঁড়ে  
ফেলতে থাকে। মাঝির দল এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অবাক মানে।

—সাহেবের মাথাটা বিগড়ে গেছে না কি? মস্তব্য! কাটলো  
একজন মাঝি।

আরেকজন বললে,—মনে দাগা পেয়েছে, হবেও বা তাই।

কিছুই রাখলো না ম্যাালেটে। স্মৃতির চিহ্নগুলি একে একে জলে  
ভাসিয়ে দিয়ে আবার বসলো নিজের জায়গায়। বাস্তবজ্ঞান পদাঘাতে  
একপাশে সরিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রটা একবার বন্ধার তুলে কক্ষিয়ে  
উঠেছে রাজির নৈশব্দ ভেঙে।

—এক গেছে আর এক আসবে। মাঝি-সর্দার সান্ত্বনা দেওয়ার  
সুরে কথা বললে সাহেবকে শুনিবে। বললে,—রাড়ের দেশে  
যেমেমাহুয়ের অভাব হবে না। অমন সুন্দরী ঢের ঢের মিলবে।

নদীর জলে, লম্বমান চন্দ্রালোকছায়ায় দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে।  
ডিকেটারটা আবার তুলে নিয়েছে কখন। নদীর জলকল্লোলে  
বজরা হুলে হুলে উঠছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে ম্যাালেটে। রাগের  
আবেগে তার উন্নতবক্ষ আরও যেন ক্ষীত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।  
সর্দার-মাঝির সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই চোখের ইশারায় ডাকলো!

বজরার কক্ষে তৈলদীপ জ্বলছে এককোণে। সাহেবের নীলাভ-  
চোখের আফ্রান দেখতে পেয়ে কক্ষমধ্যে ঢুকলো মাঝি।

ম্যাালেটে মুহূ হাসির সঙ্গে বললে,—বজরা চালাও।

—কোথায় যাবে সাহেব এই মাঝরাতে? মাঝি যেন কিঞ্চিৎ  
বিষয়ের সঙ্গে কথা বললো। বললে,—পটু গীজদের হাতে পড়লে কেউ  
বাঁচতে পারবে না। খালের ধারে লুকিয়ে থাকে তারা।

—ভয় নাই কিছু! কেমন যেন অশ্বস্তির সঙ্গে বললে ম্যাালেটে।  
বললে,—হামাদের বন্ধু আছে। ভয় কেন? নোভর খুলটে বল'।

অগত্যা মাঝি-সর্দার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষুব্ধমনে। এত  
সাধের বিল্যম আর কপালে সহ হয় ন। সাগাদিন হাল টেনে  
টেনে মাঝির দল ক্রান্ত হয়ে আছে। তোলা-উঠুন ছেলে ভাত  
তরকারী চাপিয়েছে। সাহেবের জন্ম রান্না চোপেছে।

হাওয়া যেন বিষ ছড়িয়ে দেয় শরীরে। তাই আর এখানে থাকতে  
চায় না ম্যাালেটে। যেন শ্বাস বোধ হ'তে থাকে অপমানে আর  
অভিমনে। রাজি কত ব্রিঙ্কশাস্ত, তবুও উত্তেজনার কপাল খেমে  
উঠছে। পরাজয় মানতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঠকতে রাজী নয়  
ম্যাালেটে।

সাঁতারে পাকাপোক্ত চৌধুরাণী। কতদিন পাড়ার সঙ্গিনীদের

( or speedily )".

[ ୧୩୦ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ]



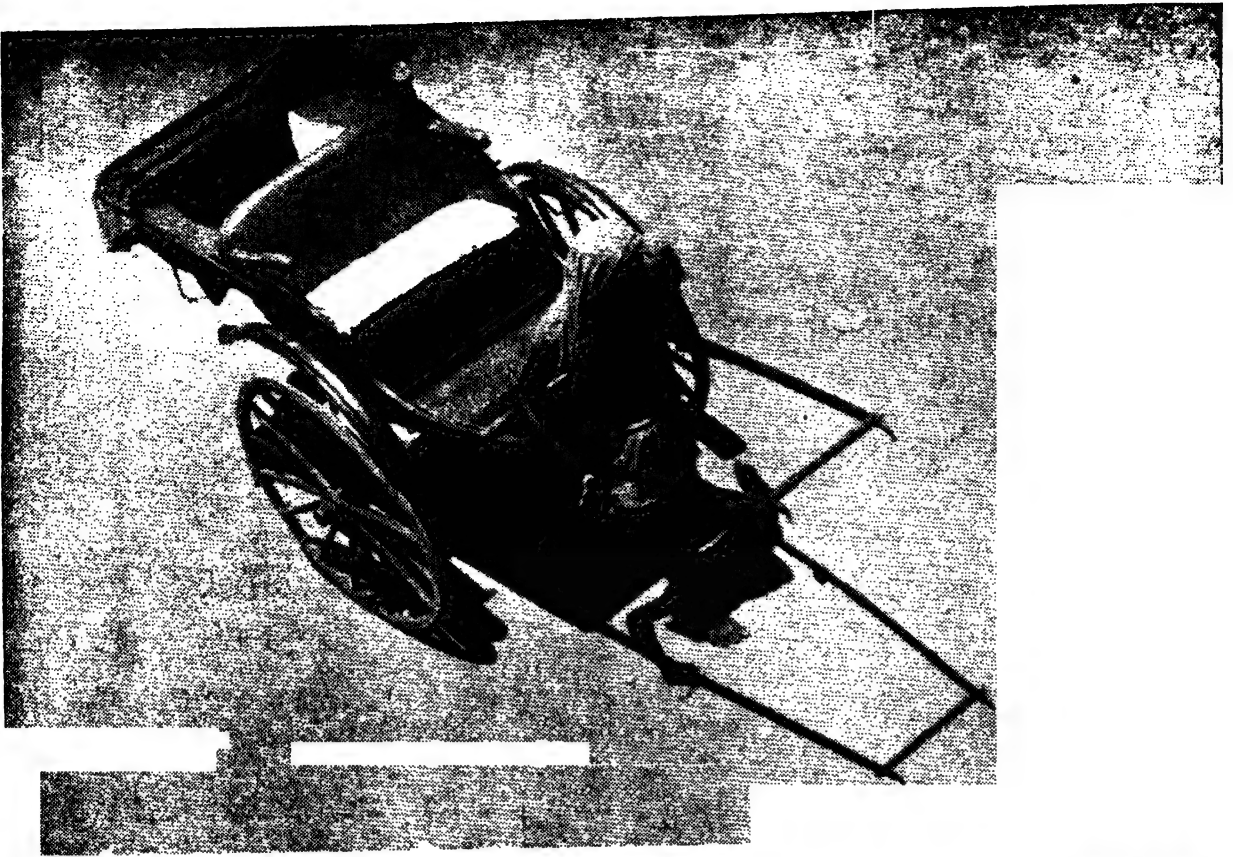
ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ধাম ও  
বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]

প্রতীক্ষা  
—রবীন রায়



নর্তকী  
—রতন দাশগুপ্ত





রিক্সাওয়ালা

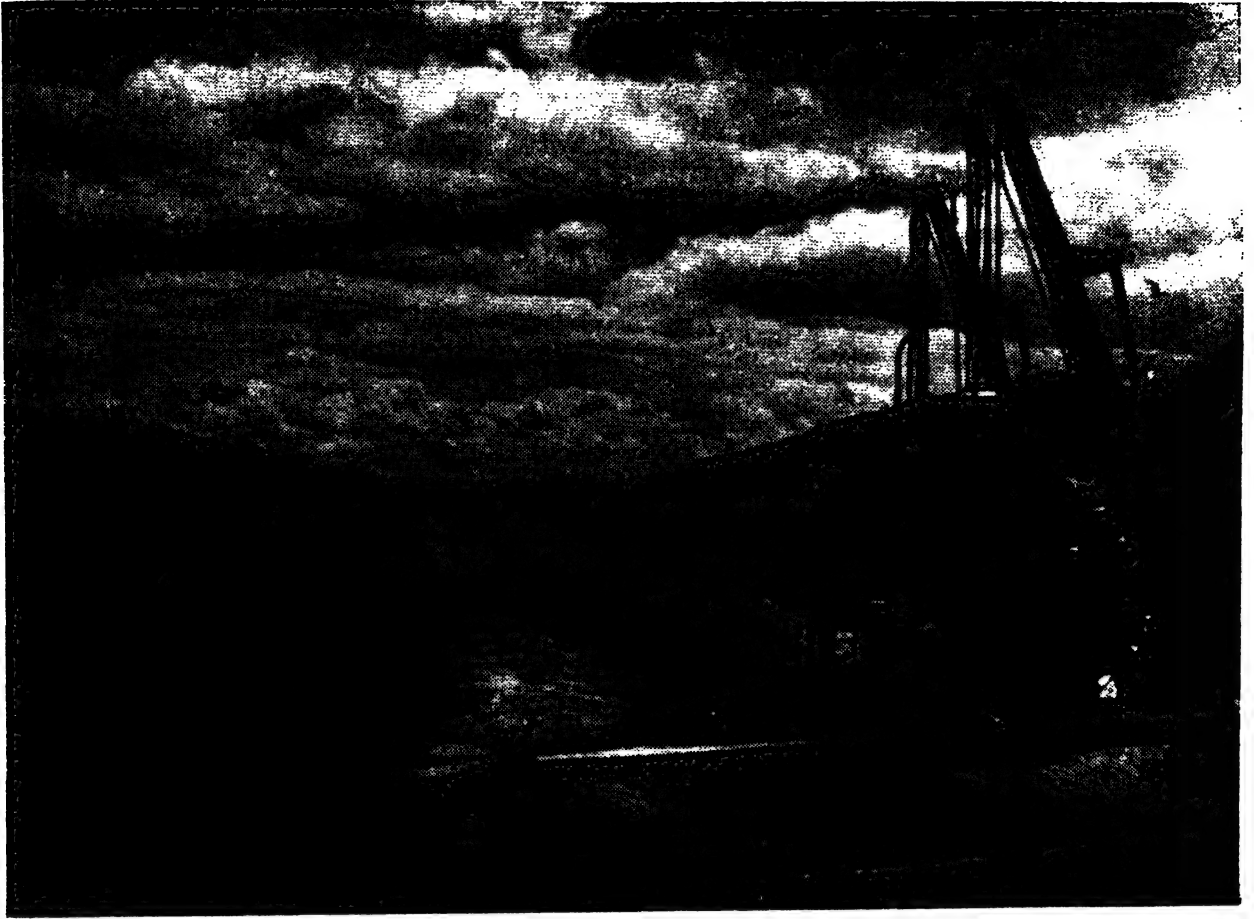
—বিবেকজ্যোতি মিত্র

সাবীহারা

—এন. কে. মিত্র







জলসা

—হাদুদী চট্টোপাধ্যায়



স্মৃতি

—সোপাল ঘোষ



হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুস্তকার  
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা ঘট তৈরীর খাল দেদার ।  
দ্বিধা দৃষ্টি দিয়ে এ সব যেই দেখলাম, কইল মন,  
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপদাদার ।

আমার সাধী সাকী জানে মানুষ আমি কোন জাতের,  
চাবি আছে তার ঝাঁচলে আমার বকের সুখ দুখের ।  
যেমন মেজাজ মিইয়ে আসে গেলাস ভ'রে দেয় সে মদ  
এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেবলোকের ।

মউজ চলুক ! লেখার যা তা লিখল ভাপ্যে কালকে তোর  
ভুলেও কেহ পুছল না কি থাকতে পারে তোর ওজর !  
ভদ্রতারও অমুমতি কেউ নিল না, অমনি ব্যস  
ঠিকঠাক সব হয়ে গেল ভুগবি কেমন জীবন-ভোর !

সুরার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শরাব তার ভিত্তর,  
দেহ তাহার বাঁশরী আর তেজ যেন সেই বাঁশীর স্বর ।  
খৈয়াম ! তুই জানিস কি এই মাটির মানুষ  
কোন জিনিস ?  
খেয়াল-খুশীর ফানুস এ ভাই, ভিতরে তার প্রদীপ কর ।

আমি চাহি—শ্রষ্টা আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর  
আকাশ ভুবন এই এখনই, এই সে আমার আঁখির পর ।  
সেই সাথে চাই সৃষ্টিখাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,  
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর ।

তোমার দয়ার পিয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর,  
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর ।  
তোমার মদে মস্ত কর, আমার 'আমি'র পাই সীমা,  
হুঃখে যেন শির না ছুখায়, হে ছুখ-হরণ অতঃপর ।

ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় হয়ত নরকেই জ্বলি,  
তাহার বহ্নি-মহোৎসবে হয়ত হবি অঞ্জলি ।  
খোদায় দয়া শিক্ষাতে যাস সেই সে তুই, কি হুঃসাহস !  
তুই শিক্ষাবার কে, তাঁহারে শিক্ষাতে যাস কি বলি ?

দোঁহাই ! ঘৃণায় ফিরিয়ে না মুখ  
দেখে শরাব-খোর গৌয়ার,  
যদিও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার ।  
শরাব পিত্ত, কারণ শরাব পান কর আর না-ই কর,  
ভাপ্যে ধার্য থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর ।



( অপ্রকাশিত )

কাজী নজরুল ইসলাম

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গ্লানির পাক হানে,  
বলবে বড়যন্ত্রকারী রোস যদি পোরস্থানে ।  
'খিজির' হও আর 'ইলিয়াস' হও ;  
সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়  
জানতে চাস নে কারেও তুই আর তোরেও  
কেহ না জানে ।

শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকী, হেথায় এলাম ফের ।  
তোঁবা ক'রেও পাইনে রেহাই হাত হ'তে  
ভাই এই পাপের ।  
'নূহ' আর তাঁর প্লাবন-কথা গুনিয়ে নাকো আর, সাকী,  
তার চেয়ে মদ-প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বকের ।

যেমন পাবি মণ ছই মদ—যেখানে হোক যদিই পা'স  
অমনি পানোন্নত ওরে, সে মদশ্রোতে ডুবে যাস !  
যেমন খাওয়া অমনি হ'বি আমার মত মুক্ত প্রাণ,  
ভেসে যাবে রাশ-ভারি তোর ঋষির মত দাড়ি রাশ ।

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অটেল লাল শরাব  
গেহুঁর রুটি, গরম গরম মটন চপ ও এই কাবাব,  
আর লালারুখ প্রিয়া আমার কুটীর-শয়ন-সঙ্গিনী,  
কোথায় লাগে শাহান শাহের দৌলত ঐ বে-হিসাব ।

এই নেহারি-নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,  
একটু পরেই ঠিকরে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার।  
মহা দাও নিজ মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট,  
দ্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি তোমার অভিনয় লীলার।

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,  
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।  
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ  
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।

পানোপ্ত বারান্নায় দেখে সে এক শেখজী কন—  
'ছুরাচার আর সুরার কর দাসীপণা সর্বখন।'  
'আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি', কয় বারনারী,  
'কিন্তু শেখজী, তুমি কি তাই,  
তোমায় দেখে কয় যা মন' ?

চূর্ণ ক'রে তোমায় আমায় গড়বে কুঁজো কুম্ভকার,  
ওগো প্রিয়া ! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-  
খিড়কি-দ্বার—

পাত্রে ব্যথার শাস্তি ঢালো—এই সোরাহির লাল সুরা,  
এক পেয়ালা তুমি পিও, আমায় দিও পেয়ালা আর।

রূপ-মাদুরীর মাথায় তোমার য'দিন পারলো প্রিয়া,  
তোমার প্রেমিক বঁধুর ব্যথা হরণ কর প্রেম দিয়া।

রূপ-লাবণীর সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,  
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

মৃত্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিষ্ঠুর করে  
বেঁচে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ঐ তোর তরে।  
হেথায় কিছু যোগাড় ক'রে নে রে,  
হোথায় কেউ সে নাই,  
তাদের তরে—শৃংগ হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে।

আঁধার অন্তরীক্ষে বুন যখন রূপার পা'ড় প্রভাত  
পাখীর বিলাপ ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ ?  
তারা যেন দেখতে বলে উজ্জল প্রাতের আশিতে—  
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত।

আমার কাছে শোন উপদেশ—কাউকে কভু বলিস নে  
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিস নে।  
হৃৎ-ব্যথায় টলিস নে তুই, খুঁজিস নে তার প্রতিষেধ,  
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উচু রাখ, চলিস নে।

নাস্তিক আর কাকের বলি তোমরা লয়ে আমার নাম  
কুংসা গ্রানির পঙ্খিল শ্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।  
অস্বীকার তা করব না যা ভুল ক'বে যাই, কিন্তু ভাই,  
কুংসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম ?

### মুক্তির সাধনা

.....“বন্দীদশা শুধু তো কারাগারের মধ্যে নয়। মানুষের  
অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো  
কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষের সেই সামাজিক কারাগারকে  
আমরা বণ্ডে বণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি  
পাবো কি করে ? যারা মুক্তি দেয়, তারাই তো মুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম,  
চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর  
স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন, কোথায়  
আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে বঁারা  
মুক্তিসাধনার তাপস, তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে,  
যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোট হয়ে ছিল,  
তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা  
ঘেবেচি, তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।”

—ববীন্দ্রনাথ

# রবীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

৮খণ্ডেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতামহ দ্বারকানাথ

১২০১ সালে ১৭১৪ খৃঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম। নরেন্দ্রপুর বংশোদ্ভূত নিবাসী রামতনু রায়চৌধুরীর কন্যা দিগম্বরী দেবীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্র: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র ( ৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু ), গিরীন্দ্রনাথ ( ৩৫ বৎসরে মৃত্যু ), ভূপেন্দ্র ( ১৩ বৎসরে মৃত্যু ) ও নগেন্দ্রনাথ ( নিঃসন্তান, ২১ বৎসরে মৃত্যু )। ১৭৮৪ খৃঃ নীলমণি তদীয় অমুজ্ঞ দর্পনারায়ণের সহিত পাথুরেঘাটা দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের প্রাচীন বাস্তু হইতে পৃথক হইয়া জোড়াসাঁকোর ( পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ) বাস্তু পত্তন করিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে সমারোহে দুর্গোৎসব, গ্রামা, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতীপূজার প্রবর্তন করেন এবং গৃহদেবতা লীলী৮লক্ষ্মীজনার্দন জিউর প্রতিষ্ঠা করেন। যে শালগ্রাম শিলা আজিও অবনীন্দ্রনাথের গৃহে পুজিত হইতেছেন। জোড়াসাঁকোর ( পরে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ) এই বাড়ীকে পারিবারিক চলতি কথায় ‘বড়বাড়ী’ বলা হয় এবং পার্শ্বস্থ যে বাড়ীতে দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বাস করিতেন ও বাহা ৫ সংখ্যক ভবন, সম্প্রতি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, বাহা দ্বারকানাথ নির্মাণ করান ও বাহা তাঁহার বৈঠকখানা বাড়ী ছিল, তাহাকে চলতি ব্যবহারে আত্মীয়রা ‘বৈঠকখানা বাড়ী’ বলিয়া অভিহিত করিতেন। মহর্ষি ও তাঁহার ভাতা গিরীন্দ্র-পরিবারে একুশ একাত্তা ছিল যে স্বপ্নপ্রাণে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ভাতে বধা সত্য হেম মাতে বধা বীর  
গুণজ্যোতি হরে বধা মনের তিমির  
নব শোভা ধরে বধা সোম আর রবি  
সেই দেব-নিকेतন আলা করে কবি।

ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা ছাড়াও অপর ব্যাখ্যাটিতে পাই সহোদর ভোক্তা, হেমেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রের নামের হিত ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের নিকेतনের উল্লেখের সহিত পিতৃব্য পুত্র গুণেন্দ্রেরও নামোল্লেখ।

দ্বারকানাথ স্বীয় বুদ্ধিবলে কর্তৃত্ববলে প্রবেশ করিয়া, ব্যাংক রিচালনার ও বহুবিধ ব্যবসায়ের প্রভূত ধনশালী হন ও তৎকালীন লিকাতার একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান নাগরিক ছিলেন। তৃতীয়া বাঙলা ও জর্জরিত স্থিতির নিকট তিনি আরবী ও ফারসী বা শিক্ষা করেন এবং চিৎপুর বোডে শেরবোরের স্কুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য রামলোচন কর্তৃক দত্তক হীত হইয়াছিলেন এবং অল্পবয়সেই তাঁহার ‘পিতৃবিরেক’ সহ

যুগপুত্র রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দ্বারকানাথ লবণ-এজেন্টের দেওয়ান ও পরে কাষ্টমসের ঐ পদে নিযুক্ত হন। সতীদাহ প্রথা রহিত করিবার আন্দোলনে তিনি রামমোহনকে সর্গান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ১৮৩৪ সালে তিনি উপরোক্ত সরকারী দেওয়ানের পদ ত্যাগ করেন ও Carr Tagore & Co প্রতিষ্ঠা করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লার খনি, রামনগরে চি’নর কল ও শিলাইদহে ও বঙ্গদেশের অপর কয়েক স্থানে অপর কয়েকটি ফ্যাকটরি পরিচালনা করেন। তদ্ব্যতীত কয়েকটিতে তাঁহার স্থলানুভবী হন তাঁহার বৈমাত্রেয় অমুজ্ঞ রমনাথ ঠাকুর ( পরে মহারাজা )। দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাংকেরও অন্ততম ডিরেক্টর ছিলেন ও উক্ত পদে ইচ্ছা দিয়া পরবর্তী দশ বৎসর জন-আন্দোলনে নিকট নিয়োজিত রাখেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়, সুবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে, ব্রাহ্ম যাত্ৰার বিরোধিতায় দ্বারকানাথের অবদান সামান্য নহে। তাঁহার বেলগাছিয়ার উজানে তৎকালীন জ্ঞানীগণদের তিনি প্রায়ই সম্বন্ধন করিতেন। এই উজান পরে মহর্ষি Carr Tagore Co. উঠিয়া বাগ্ম্যতে বিক্রয় করিয়া দেন পাটকপাড়ার রাজাকে, বাহা এখনো তাঁহাদের বংশধরদের অধিকারে আছে। দ্বারকানাথ প্রথম ভারতীয় Justice of the Peace ও পরে এই পদ তাঁহার ছুই ভাগিনের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের প্রাপ্ত হন। দ্বারকানাথ ছুই বার বিলাত গিয়াছিলেন ও তথায় নানা প্রতিষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দান করায় ও দেশে অবস্থানকালে বেকর নানা উৎসবদির অনুষ্ঠান করিতেন সেসকল তথায়ও উৎসবদির অনুষ্ঠান করায় তাঁহাকে সে দেশের অভিজাত সমাজ ‘প্রিন্স’ বা যুবরাজ বলিতেন। তিনি মহিমাষিত মর্ধানায় সে দেশে অবস্থান করিতেন ও তদ্রূপ রাজা রাণী, ডিউকগণ ও তাঁহাদের পরিবারবৃন্দ প্রভৃতির সহিত এবং ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে অবস্থানকালে তথাকারও রাজা, রাণীদের সহিত একত্রে আহ্বানাদিতে প্রায়ই মিলিত হইতেন। তাঁহার ছুইবার ইয়োরাপ যাত্রায় একবার তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও একবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভাগিনের চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ প্রথম বার বিলাত যান ১৮৪২এর জানুয়ারিতে ও দ্বিতীয়বার বা শেষবার ১৮৪৫এর মার্চে এবং তথায় বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিবার পর ১৮৪৬এর এলা অগাষ্ট ইংল্যান্ডেই দেহরক্ষা



### পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২৪০ সালের ফাল্গুন মাসে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে যশোহরের (পরে খুলনা জেলার) অন্তর্গত দক্ষিণডিহি গ্রামের রামনারায়ণ রায়-চৌধুরীর কন্যা শাকন্তরী ণী সারদা দেবীকে দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। সারদা দেবীর ১২৩২ সালে জন্ম ও ১২৮১ সালে লোকান্তর ঘটে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ৮অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১১৩ পৃষ্ঠায় আছে যে মহর্ষি তাঁহার পত্নীবিয়োগ সত্বে উল্লেখ করেন তাঁহার বিবাহকালে নববধূর বয়স ছয় বৎসর ছিল। অল্প বয়সে পরিণয় হইলেও বয়স সত্বে কিছু ভুল আছে। আমরা মহর্ষিদেবের শিশুত্বোত্তো ভগিনী কালীদাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার ভ্রাতৃত্বাধীনা তাঁহার সমবয়সী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বিবাহ মহর্ষির বিবাহের এক বৎসর পরে হয়, তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর। বিবাহ পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মাতামহ রামমণি ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া মহর্ষির সহিত এক বাড়িতে বাস করিতেন। স্মৃতরাং কবি-জননীর বিবাহকালীন বয়স ছিল আট, মহর্ষির তখন সতের।

আমাদের প্রপিতামহ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের খরচের খাতাও ইহাও পোষকতা করে। তাঁহার সত্বে উল্লেখ 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' আছে। মদনমোহন তাঁহার মেজ পিসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বারো বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মদনমোহন নিজের উপার্জনের যে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখা যায় লৌকিকতা হিসাবে মাতাঠাকুরাণী দেবেন্দ্রের বধুকে আশীর্বাদেব যৌতুক দেন ২৪এ ফাল্গুন ১২৪০ ইং ১৮৩৪ ও পরে ৫ই আশ্বিন ১২৪৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ দেবেন্দ্রের বধূ সাধের লজ্জা মিঠাই প্রস্তুত হয়।

মহর্ষির প্রথম সন্তান কন্যার জন্ম ১৮৩৮ পুঃ (অকালে মৃত), প্রথম পুত্র দার্শনিক ও কবি ষ্টিজেন্দ্রনাথ জন্ম বুধবার ২৭এ চৈত্র ১২৪৬ ইং ৮ই এপ্রিল ১৮৪০, দ্বিতীয় পুত্র প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান লেখক সত্যেন্দ্রনাথ জন্ম ১৮৪২, তৃতীয় পুত্র ব্যায়ামবীর হেমেন্দ্রনাথ, তৎপরে জন্মগ্রহণ করেন অজ্ঞাত পুত্রকষ্টাগণ বীরেন্দ্র, সৌদামিনী, সংগীত ও সাহিত্যশিল্পী জ্যোতির্জেন্দ্রনাথ, অরুণমারী, পুণোজ (অকালে মৃত), শরৎকুমারী, সাহিত্যসম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ (চিরকুমার), অষ্টমপুত্র রবীন্দ্রনাথ ও বুধেন্দ্রনাথ (অকালে মৃত)।

উপরোক্ত অরুণমারী দেবীর সহিত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের অনুষ্ঠানের একটি ইংরাজি অহুবাদ চাল'স্ ডিকেনস্ সম্পাদিত "All The Year Round" পত্রিকায় ৫ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক জগদলনিবাসী ঠাকুর বংশের আত্মীয় ও শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পিতামহ রাখালদাস হালদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাই এই পরিবারে প্রথম ব্রাহ্মমতে বিবাহ। মহর্ষি ইতিপূর্বেই আনন্দচন্দ্র বোসাবাণীশ প্রমুখ চারিজন ব্রাহ্মকে কাশীতে পাঠাইয়া

আচার্যপদে বৃত্ত হন। মহর্ষি উপাসনায় বেদগান অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। সমাজে দেশীয় সংগীত-যন্ত্রের সহিত উপাসনাকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর গান হইত। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণান্তে মহর্ষি প্রত্যুষে সপরিবারে শয্যা ত্যাগ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পটবস্ত্রপরিহিত হইয়া দালানে একত্র হইতেন। মহর্ষি সঙ্গীত বেদীতে বাসন্তেন এবং পুরুষেরা এক পার্শ্বে ও মহিলারা অপর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। দৈনিক উপাসনায় মহর্ষির বৈদিকমন্ত্র প্রধান অবলম্বন ছিল। তৎপরে ব্রহ্মসংগীত গীত হইত। ব্রহ্ম সংগীত রচনা তিনি নিজে তো করিতেনই, ষ্টিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথও রচনা করিতেন। পূর্বে প্রাচীনপন্থী ভারতীয় সংগীতবিদেরা হারমোনিয়ামকে সুনজরে দেখিতেন না। মহর্ষির নির্দেশে ষ্টিজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সংগীতে হারমোনিয়ামের সঙ্গত প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ সফলকাম হন। পরে প্রথম ভারতীয় উত্তর অক্ষ মিউজিক সংগীতনায়ক রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাড়লা গানে হারমোনিয়াম (তখন হারমনি স্ট্রট বলা হইত) যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচার লাভ করে ও সাধারণে প্রচলিত হয়।

ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষায় গায়ত্রী মন্ত্র একমুখে জপ ও ধ্যান-ধারণার সাহায্যে সাধনা করিতে মহর্ষি উপদেশ দিতেন। তাঁহার গায়ত্রীতে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা আজীবন ছিল। পশ্চবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্মের বীজ চতুষ্টয়ও আবিস্কৃত হয় ও তদ্বারা দীক্ষাপ্রথা চলিল। 'ব্রহ্মঃ সন্তো দক্ষিণঃ বুধঃ তেন মাং পাহি নিত্যং' মন্ত্র লইয়া প্রার্থনাস্বরূপ পাঠিত হইতে লাগিল ও সব শেষে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইত।

উপাসকের মমত্ববোধই তাহার রক্ষাকবচ। বিশ্বজননী জগৎ-মঙ্গলকারণে বতই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, আমার তিনি ভিন্ন কেহ নাই।

দদাসি হুঃখম্ যদি কালী নিত্যম্,

তাজামি নাহং তব পাদপদ্মম্।

সস্তাড়িতাশ্চৈচ্ছিবো জনতা,

অকং জনতা হি সমাপ্রেরস্তি।

—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ভগবৎবিশ্বাস ছাড়াও মহর্ষির চারিত্রিক অসংখ্য গুণের মধ্যে একটির উল্লেখ এখানে করিতেছি—বাহাতে তাঁহার বিরাট হৃদয়ের ও মানসিক শক্তির পরিচয় মিলিবে। যদিও এ-ঘটনা অনেকেরই বিদিত তথাপি লিখিলাম। প্রভূত ধনশালী পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর জানা যায় যে তাঁহার শেষ জীবনে বিদেশে অবস্থান করার দেশে ব্যবসায়িক আয়-আদায়ের চেষ্টা না হওয়ায় বহু টাকা ঋণ হয় ও তাহা শোধের পরিবর্তে অনেকে মহর্ষিকে সম্পত্তি বেনামী করিতে বলেন কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর মতো মহর্ষি তাহা না করিয়া পাওনাদারদের বলেন যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহারা পরিচালনাবীনে লইয়া বিক্রয় করা প্রয়োজন হইলে তাহা করিয়া মহর্ষিকে যেন পিতৃঋণমুক্ত করেন। তাঁহার এই মহাত্মবৃত্তার পাওনাদারেরা মুগ্ধ হইয়া তাহা না করিয়া কিয়দংশ বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়া ও কিস্তিবন্দীতে ঋণ শোধ করিতে বলেন ও ধীরে ধীরে ঋণ শোধ হইয়া যায়।

১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত একটা যুগসন্ধি। বাঙলাদেশে সমাজে এবং সাহিত্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৫৪ সালে লর্ড ড্যালহাউসির প্রস্তাবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা (Lieutenant Governor) নিযুক্ত হইলেন। ইহাকে ছোটলাট এবং গভর্ণার জেনারেলকে সেই সময় হইতে বড়লাট বলা হইত। সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাঙলার প্রথম ছোটলাট। ইহার পূর্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা সংক্রান্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্য গভর্ণর-জেনারেলের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব বিভাগে সম্পাদিত হইত, একজন ডেপুটি গভর্ণর তাঁহার উপদেশ মতো তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেন। ড্যালহাউসি দেখিলেন সর্ববিধ কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে না। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের শৃঙ্খলা ও সর্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা অল্প-অবসর বড়লাটের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এ বিষয়ে সমস্ত অবস্থা বিশদভাবে জানাইলেন। ফলে ১৮৫৩ সালে চার্টার রিনিউএর সময় তাঁহার প্রস্তাবিত ছোটলাট নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল ও স্থির হইল যে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে নিজের দায়িত্বে কার্য করিতে পারিবেন, কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় বড়লাটের অনুমোদন-সাপেক্ষ রহিল।

সমাজ-বিধবার মৃত্যু নিবারণের জন্য রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের আশ্রয় চেষ্টায় ১৮২১ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক আইন করিয়া সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। ইহার প্রায় ২০।২২ বর্ষ পরে বিধবার দুঃখময় জীবন দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিশেষ ব্যক্তি করে। তিনি বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ও ইহার সিদ্ধতা শাস্ত্রীয় বচনে প্রমাণ করিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কয়েকজন দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গোঁড়া সমাজের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সরকার বিধবা বিবাহ আইন প্রচারে ঘোষণা করিলেন যে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ করিলে সে বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব স্বামীর সম্পত্তিতে কোনোরূপ দাবীদাওয়া থাকিবে না। ১৮৫৬ সালে Hindu Widow Remarriage Act আইন প্রচারিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত দ্বিতীয় সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে কোনোরূপ আইন করা সরকার আবশ্যক বোধ করিলেন না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় তাহা আপনা হইতে রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রস্তত হয় এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের (পরে কাউন্সিলার), বাহাদের তখন নাম ছিল Justice of the Peace, শহরের সীমান্তগত ভূসম্পত্তির উপরে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইবার ও সেই অর্থ স্বাধীন ভাবে ব্যয় করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি, ডেনেজ, বিদ্যুৎ পানীয় জল ও আলোক প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য ছোটলাটের কর্তৃত্বাধীনে রহিল এবং ১৮৫৬ সালে কতিপয় আইনের দ্বারা তিন জন বৈতনিক কমিশনার ও একজন চেয়ারম্যান লইয়া একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয়।

তাঁহাদের কর্পোরেশন আখ্যা দিয়া তাঁহাদের হস্তে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সকল টাকা ও নগর সংক্রান্ত সর্ববিধ কার্যের ভার সরকার হস্তান্তরিত করেন। ১৮৫১ সালে কলিকাতায় খোলা নদমার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের দ্বারা ড্রেন প্রস্তুত আরম্ভ হয় ও তাহা সম্পূর্ণ করিতে ১৬ বৎসর লাগে। বহুবর্ষ পরে নিরাপদে লোক চলাচলের জন্য পাদপথ বা ফুটপাথ নির্মিত হয় এবং ইহারও ব্যবস্থার সূত্রপাত এই সময়েই।

১৮৬০ সালে বাঙলাদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাবিজ্রোহ ঘটায় নীল সম্বন্ধে সর্ববিধে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য এক কমিশন বসে ও ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী আইনের দ্বারা নীলকরদের সংযত করিবার চেষ্টা হয়। চারীপ্রজার অবস্থার উন্নতির জন্য উপদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত চারীপ্রজার অধিকারপত্র বা Charter ঘোষিত হয় ও ভদ্রমুখারী কার্য শুরু হইল। এই প্রজাবিদ্ভবিধি জমিদারের অনেক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। এই বৎসরেই দেশের জনসাধারণের জন্য নিয়মিত শিক্ষার বিস্তারের ভার সরকার হাতে লইলেন। এই সম্বন্ধে ডেসপ্যাটকে শিক্ষা বিষয়ে অধিকারপত্র বা চার্টার বলা হইত। এই ডেসপ্যাট অনুসারে সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে নিয়মিত প্রাইমারি শিক্ষার জন্য নবম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং বঙ্গভাষা শিক্ষার্থীর জন্য ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা ও পরীক্ষান্তে অভিজ্ঞানপত্র বা সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার অল্পদিন পরেই উচ্চ প্রাইমারি বা মাইনার পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শিক্ষাব্যবস্থার শৃঙ্খলার জন্য স্থলভ মূল্যে ডাকটিকিটের ও পোষ্টকার্ডের প্রচলন আরম্ভ। ইহার পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ডাকখরচা সরকারে জমা দিলে চিঠিপত্র সরকারী ডাকে প্রেরিত হইত। এখন নিয়ম হইল যে বিলাতের দ্বার একই মূল্যের ডাকটিকিটে ভারতে সর্বত্র পত্রাদি প্রেরিত হইবে। প্রেরিত প্রবোয় ওজনের উপরে ডাকটিকিটের মূল্যের তারতম্যের ব্যবস্থা হইল। দূরত্ব তখন আর গণ্যের মধ্যে থাকিল না। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদারদের উপর ডাক-খাজনা (Cess) বসান হইল।

১৮৬০ সালে সকল ভারতীয় প্রজাকে একই দণ্ডবিধির অধীন করিবার জন্য অপরাধের শ্রেণীবিভাগ ও দণ্ডের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইন (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ হইল। একদিকে দণ্ডবিধির দ্বারা যেমন প্রজার শাস্তিবিধান হইল, অন্যদিকে তেমন ভারতীয় প্রজাকে সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত করিবার জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়ার অনুমতানুসারে ১৮৬১ সালে ভারত-নক্ষত্র (Star of India) অর্ডারের উপাধির সৃষ্টি হইল। মহারানী রাজ্যভার গ্রহণের পর এই ভাবে দুইটির দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা করিলেন এবং পরে ভারতীয়রা উপরোক্ত অর্ডারের ও অন্যান্য পুরাতন ব্রিটিশ অর্ডারের উপাধিতে ও আরো পরে পুরাতন নাইট ব্যাচিলার উপাধি-ভ্রঞ্জে বিভূষিত হইতে লাগিলেন। আর বংশানুক্রমিক নাইট বা ব্যারোনেট উপাধি প্রথম লাভ করিলেন বোম্বাইয়ের এক দানবীর কোটিপতি ব্যবসায়ী বাহা অনেক পরে আরো একজন বোম্বাইয়েরই কোটিপতি ব্যবসায়ী লাভ করেন।

প্রাদেশিক স্থানীয় কার্য সুনির্বাহের জন্য ও প্রতি প্রদেশের উপযোগী স্বতন্ত্র আইন-পরিষদ গঠন করিবার ব্যবস্থার ফলে প্রথম

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৮ই জামুয়ারি ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনকে উক্ত সভার সভ্য মনোনীত করা হয়। উপরোক্ত ঠাকুর অফ ইণ্ডিয়া অর্ডারের Companion শ্রেণীর উপাধিতে বাহারা প্রথম ভূষিত হইয়াছিলেন প্রসন্নকুমার ও রাজা বাধাকান্ত দেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাধাকান্ত পরে উক্ত অর্ডারের নাইট কমান্ডার শ্রেণীতে প্রথম ভারতবাসী উন্নীত হন।

কলিকাতার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত পানীয় জলের অভাব দিন দিন বাড়িতেছিল। পুষ্করিণী ও খারাপ কূপের অস্বাস্থ্যকর জল সাধারণ লোকে পানাদি সকল কার্যেই ব্যবহার করিত; বিশেষাণী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া নিখালাদির দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া এক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দ্বারকানাথের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এই ব্যবস্থা ই ছিল। কলিকাতা সহরে শোবিত জল (Filtered water) বাহাতে সহজপ্রাপ্য হয় তাহার জন্য ১৮৬১ সালে আলোচন আরম্ভ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ১৮৬৩ সালে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ার কানীপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গা হইতে নলদ্বারা কলিকাতার জল আনা হবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে ইহাতে আপত্তি হইল। তাঁহারা বলেন যে কলিকাতার সন্নিকটস্থ প্রদেশের জল পরীক্ষায় অত্যন্ত দোষী দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্যারাকপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরস্থ কোনো স্থান হইতে জল লওয়া উচিত হইবে না। তখন ব্যারাকপুরের এক ক্রোশ উত্তরে পলতায় গঙ্গাজল সঞ্চয় করিয়া শোষণ করিবার জন্য কয়েকটি শোষণ পুষ্করিণী (Filters and Reservoirs) প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেইস্থান হইতে পাইপের দ্বারা কলিকাতার জল সরবরাহের প্রস্তাব হয়। এই পলতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিমকূলে পলতা ঘাট, গোষ্ঠি গ্রামের অন্তর্গত। খ্রীষ্টোত্তমদেবের ভ্রমণকালীন এইস্থানে অবস্থান জন্ম এই স্থানটি গৌরহাট প্রাচীন আখ্যা পায়। অপভ্রংশে গোষ্ঠি বলিয়া পরিচিত। ইহার সন্নিকটে টাপদানীতে (একশ্রেণী বৈদ্যুতিক রেল ষ্টেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার) ভাগীরথীতীরে একটি স্নানের ঘাট আছে। তাহা তারকেশ্বর তীর্থযাত্রীদের নিকট নিমাইতীর্থের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তথায় স্নানার্থ বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এই ঘাটের উত্তরে কিয়দূরে আশ্রকানন ঘেরা একটি সুন্দর বাগান-বাড়ী ১১০২ সাল অবধি ছিল। ইহাকে পলতার বাগান বলিত, এক্ষণে ডালহাউসি ও রায়লাস্ জুট মিলে রূপান্তরিত। ইহা পূর্বে ঠাকুর-বাবুদের গোষ্ঠি বা পলতার বাগান বলিয়া তাঁহাদের পরিবারে উল্লিখিত হইত। 'মহাবির আত্মজীবনীতে' এখানে ২১৩ বার নবগঠিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উত্তান-মিলনের প্রসঙ্গে বাগানবাড়ীটি উল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' যে তাঁহার খুড়তুতোভাই খোলাপ্রাণ হাতোজ্জল সৌখীন 'গুণানন্দ' (অবনীন্দ্র-জনক গুণেন্দ্রনাথ) উল্লেখ আছে, তাঁহার অকাল মৃত্যু (১৮৮১) তাঁহার এই সাথের বাগানে হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালে ছোটলাট পলতা হইতে পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ১৮৬৬ সালে কলিকাতার অন্তর্গত বাড়ীর দ্বার দেবেন্দ্র-পরিবারবর্গ তাঁহাদের

বাড়ীর দোতলায় ও তেতলায় কলের জলের ব্যবহারে আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। তাই গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার কলের জলে যৌত নাগরিক কবি। পল্লীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচায় যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা পরবর্তী-কালের ও তাহা তাঁহার ঘোষাভিত। এই নদী-মাড়ক দেশে নৌকাভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত অন্তঃসঙ্গতা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। পরবর্তীকালে উৎপিত শরৎকালে চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নব্য সাহিত্যিকদের পক্ষে গ্রাম্যজীবন হইতে ঘনিষ্ঠভাবে অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরচনার উপাদান আহরণ করা গ্রামের লোক বলিয়া সহজ হইয়াছে।

১৮৪৩ সাল হইতে যে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চরমনা-করনা চলিতেছিল, ১৮৫৭ সালে তাহা কার্যে পরিণত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও বহুনাথ বসু এনট্রাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও বহুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন, বাহা সর্জনবিদিত। পরে কবি হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল আইন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া একজন উকিল ও অপর জন অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ভারতীয়দের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ও রাষ্ট্রীয় কর্মনিয়োগের প্রসারবুদ্ধিকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা তৎকালীন বিলাতী পার্লামেন্ট হইতেও কিছু কিছু করা হইত। ভারতকে কেবল অর্ধশোষণের স্বরূপে ব্যবহার করিতে তখনকার কয়েক জন ইংরাজপ্রধানের অভিপ্রায়ে বাধিত। তাঁহারা বলিতেন, ভারতীয়দের জ্ঞান ও জাগতিক ব্যবহারের সুশৃঙ্খলা যদি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাহা ঘোরতর লজ্জার কথা। এই কারণে ১৮৫৩ সালের চার্টার রিনিউএর সময় স্থির হইয়াছিল যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যিক। এই চার্টারেই ব্যবস্থা হয় যে, ভারতীয়েরা বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভারতের বিচার বিভাগে ও প্রাদেশিক শাসন বিভাগে ইংরাজ কর্মচারীদের সহিত সমভাবে নিযুক্ত হইবেন। এই সময়েই ইন্ডোলি অর্থাৎ আইনের কর্তৃমণ্ডলী ভারতীয়দের বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার ঘোষণা করেন। ফলে প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার হইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র পরীক্ষায় ১৮৪১ সালে বৃত্তি পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া বৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বিলাত বান ও ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রেভাঃ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া পুনরায় বিলাত বান। তথায় তিনি আইন ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করেন ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বিলাতে 'বৈঠকখানা' নামীয় নিজের বাড়ীতে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাস করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষে হিন্দু মতে বিবাহিত। পত্নী বালাসুন্দরী দেবী ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র প্রমুদকুমার অকালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম ভারতীয়দ্বয় রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগরের দেওয়ান রামলাচন ঘোষের পুত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ১৮৬০ সালে বিলাত যাত্রা করেন ও

তথ্য জ্ঞানেন্দ্রমোহনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সত্যেন্দ্র ১৮১৭ সালে ব্রুন্ডি পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে দুই বৎসর ইয়োরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৮৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানরূপে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মাইকেল মধুসূদন তখন বিলাতে। তিনি নিরুলিখিত চতুর্দশশব্দী কবিতায় সত্যেন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। বাঙলা কবিতায় সনেটের প্রবর্তন এবং সনেটের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অভিনন্দন উভয়ই মধুসূদনের অবিনশ্বর কীর্তি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
সুরপুরে সশরীরে শূরকূলপতি  
অর্জুন, স্বকাজ বধা সাধি পুণ্যবলে  
ফিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমতি  
বাও শ্রুখে কিরি এবে ভারত মণ্ডলে,

মনোজ্ঞান আশালতা তব ফলবতী!—  
ধন্য ভাগ্য, হে শূভগ, তব ভবতলে!—  
তত্ত্বক্ষেণে গর্তে তোরা ধরিলে যে সত্য,  
তিতিবেন বিনি, বৎস নয়নের জলে  
(মেহাসার!) হবে রঞ্জে বায়ুরূপ ধরি  
জনবব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্ত্বরে  
এ তোমার কীর্তিবর্তা। বাও দ্রুতে, তব,  
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!  
অদৃশ রক্ষার্শে সঙ্গে বাবেন সুলক্ষ্মী  
বঙ্গলক্ষ্মী। বাও, কবি আলীর্বাদ করে।—

মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াও নির্দিষ্ট  
বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলেন।

[ ক্রমশঃ।

## জ্বর

কৃষ্ণ ধর

কালি সারা রাত ভীষণ জ্বরে আমার শরীর পুড়েছে,  
উত্তাপে আমার দেহ অবশ, হৃদয় মৌমাছির মতো  
নেশায় বৃন্দ। সারা রাত ধরে জ্বরের মৌচাকের  
কোষে কোষে কারা যেন বেদনার মধু রেখে গেছে,  
আর আমি সে ব্যথায় বার বার শিউরে উঠছি।  
জানালার ধারে বাতাবী লেবুর গাছে বোঁবনবতী  
নারীর স্তনের মতো দুটো লেবু সারারাত  
জ্যোৎস্নায় খেলছে। আমি যন্তোবার তাকিয়েছি  
হাওয়া এসে পাতার আড়াল দিয়ে তার লজ্জা  
দিয়েছে ঢেকে। দূরে কুচ্চুড়ার ডালে  
খলো খলো আঙনের ফুলকি। আমি আর  
তাকাতে পারি না। আমার কেমন জানি ভয় করে।  
এই ডাক-বাংলোয় একা একা ভীষণ জ্বরে  
ধুঁকে ধুঁকে কেমন জানি ভীত চকিত হ'য়ে গেছি,  
শর-বেঁধা হরিণের মতো।

ভোর তখনও হয়নি। ঝিঝ ঝিঝ হাওয়া  
শিরীষ গাছে ঝুঁঝ বাজিয়ে চলে গেল।  
বরফ-গলা পাহাড়ী নদীর স্রোতের মতো ঠাণ্ডা  
এক ঝলক হাওয়া এসে আমার জানালার দাঁড়াল।  
আমার উত্তাপ গেল কমে। আমি চোখ বুজলাম।  
সারারাত্রি জ্বরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এবার  
যেন আমার হৃদয় মৌমাছির মতো ঘুমিয়ে পড়ল।  
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার মনে হল:  
নিচে ঢালু জমি পেরিয়ে সেই সবুজ উপত্যকার  
মতো জায়গাটির উজ্জ্বল জলে পা ডুবিয়ে যেন  
আমি গিয়ে বসেছি। আমার পাশে এসে  
বসল কমলালেবুর মতো মুখ সেই খাসিয়া  
মেয়েটি বাকে আমি কোথায় দেখেছি  
এখন আর মনে পড়ছে না।

আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না,  
কমলালেবুর মতো মুখ এই মেয়েটাকে।  
ভূটায় দানার মতো তার ছোট গোল গোল  
পাঁতের পাটি; কী আশ্চর্য ভঙ্গিতে ও হাসছিল  
আর আমার সারা গায়ে দিচ্ছিল উজ্জ্বল জল।  
আমি ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন  
বিহ্বল হয়ে গেলাম।  
ও এতো কাছ, তবু ছুঁতে পারি না।  
মনে হয় ও হেসে একটা খুশির বর্ণার মতো  
ঢলে পড়ল আমার গায়। দমকা হাওয়া  
আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।  
আমি সন্ধ্যের মতো ওর দিকে তাকাই,  
ও ব্যাধিনীর মতো চোখের শায়কে আমাকে  
বিধে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।  
উজ্জ্বল জলে কতোক্ষণ এমনি স্থান করেছি  
মনে নেই। জলের কঁোটা গায়ে পড়তেই  
আমার ঘুম ভাঙ্গল।  
ভোরের দিকে জোর এক পশলা বৃষ্টি।  
তার কঁোটাগুলো গোল মুক্তোর মতো দানা  
বঁেধে আছে বাতাবী লেবু ছোটোর গায়।  
এখুনি নাহারকাটির আকাশে সূর্য উঠবে।  
আর শিরীষগাছের পাতায় আটকানো ভোর  
বেলাকার বৃষ্টির কঁোটায় এই নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দের  
জগৎ প্রতিবিম্বিত হবে।  
আর আমি দক্ষিণ নায়কের মতো,  
আমার তাপদণ্ড হৃদয় নিয়ে,  
এই শব্দ গন্ধ আর চেতনার জগৎকে  
ভালবাসবো নতুন করে, নারীর প্রেমে, বোঁবনের জাহতে  
আর কুচ্চুড়ার লাল নিমন্ত্রণে।

# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২৬

শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে—কেউ বিষ্ট কেউ নই—কিঞ্চিৎ বোগাযোগ আছে আমার। শিকিনের শান্তি-সম্মেলনে খানিকটা তড়পে এসেছিলাম। মস্কোর শান্তি-অফিসে এই সুবাদে চুঁয়ে এলে কেমন হয়? ইচ্ছা মাত্রই গাড়িতে পুবে পলকের মধ্যে তথ্য হাজির করে দিল। সঙ্গে কৃষ্ণবামী—আমার শিকিনের সহবাত্রী, সিনেমার মানুষ। শান্তির করে বসালেন ঠুঁরা! প্রশ্ন : শান্তির কাজ কর কেমন ধারা চলছে ভারতে? এবং উত্তর নিজেরাই দিচ্ছে : নেহরুর দেশ, বিশ্ব শান্তির আদর্শ তোমাদের—আন্দোলন খুব জোরদার নিশ্চয় ওখানে। আমরা জোরে জোরে বাড় নাড়ি : হাঁ হাঁ—অত্র সম্ভেহ নাশ্টি।

পলিতকেশা এক বুদ্ধা ঠাইর করে করে দেখছেন। ক্রীণ দৃষ্টি নিয়ে লোকে যেমন পুঁথি পড়ে। হঠাৎ উঠে গিয়ে তাকের উপর থেকে লম্বা-চওড়া এক বই নামিয়ে ফসফস করে অনেকগুলো পাঠা উন্টালেন। তার পরে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বোস—

ব্যাপার জানি। বইটার চেহারার মালুম হয়েছে—শিকিন শান্তি সম্মেলনের বুলেটিন। চার ভাষার আছে—ওটা হল রুশ। আমার কাছে আছে ইংরেজি। আর বানিয়েছে চীনা স্প্যানিশে। অধ্যক্ষ ও তুলে দিয়েছিল সেই আসরে। ছবি নিয়েছিল বক্তৃতার সময়—ঐ কেতাবে ছবি সহ বক্তৃতা ছাপা হয়ে আছে। ছবি তো সব বক্তারই রয়েছে—দুশ দেখুন তা হলে বুড়োমানুষের আঁহা-মরি প্রাণকান্ত চেহারা নয় যে এক নজরে ছবি দেখে অমনি হিয়ার দাগ কেটে রয়েছে। অথচ বই খুঁজে খুঁজে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাম বাতলে তবে ছাড়লেন।

শরীর বেজুত লাগছে, দুপুর থেকে তরে পড়ে আছি। হীরেন মুখুজে মশায় বললেন, সে হয় না, সাহিত্য নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া তারা তো বাবোই। হিন্দির ব্যাপার বখন, যে ক'জন বাঙালি আছি সকলেরই বাওরা উচিত।

হিন্দি সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকাশ গুপ্ত বলছেন—ভোক্সের ডাকে এসেছি, ভোক্স হল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ভারত সোবিয়তের জানাশোনা ও ভালবাসা আরও বনিষ্ট হবে এই আশায় ডেকে এনে এত শান্তির বস্ত্র ও খরচপত্র করছেন, এসেছি বখন যাব যেটুকু বিত্তে, জাহির করে যেতে হবে। আমাদের আছে কাল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধ—আমার ও হীরেন মুখুজে মশায়ের। এবং ক্রীমতী মদন বলবেন পাক্কাবি রূপকথা সম্বন্ধে। প্রকাশ গুপ্ত হলেন এলাহাবাদ য়ানিভার্সিটির অধ্যাপক। মাস্টার মানুষ, বলার অভ্যাসতো থাকবেই—কিন্তু পরমার্শ্ব ব্যাপার, ডিগ্রি এবং চাকরি প্রাপ্তির পরেও পড়াশুনা ভ্রমলোক রীতিমতো বজায় রেখেছেন।

তা নিয়ে লাভ হল অনেক, সত্যি বলছি। আনাড়ি মানুষ অনেক কিছু শিখে নিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। রুশ শ্রোতারাত শতকণ্ঠে তারিফ করলেন। আমাদের নিয়ে প্রথম এই গুণী-জ্ঞানীর আসর। ক্রীশ্ণ দলের বোল আনা মান রেখেছেন।

পরের সকালে রেডিও অফিসে আমাদের ক'জনকে ডেকেছে। সোবিয়তে এত দিন ঘোরাঘুরি হল, কেমন লাগল বলে যান এইবার। মুখের কথা রেকর্ড করে নিচ্ছে, সময় মতো পরে শোনাবে। প্রশ্ন করছেন বিনয়, আমরা জবাব দিচ্ছি। তার পরে কিছু আলোচনা সকলে মিলে। আমার আবার আলাদা একটু কাজ—গল্প রেকর্ড করা। বিনয় চারটে গল্প পছন্দ করে দিয়েছেন, সেগুলো পড়তে হবে। আজকে বন্ধর হয় হোক, বা বাকি থাকে কাল-পরন্তু দেখা যাবে।

বাইশ-চব্বিশ বছরের এক তরুণীকে দেখছি, কাজে নিমগ্ন। আড়চোখে চায় এক একবার, মিটিমিটি হাসে। বিনয় পরিচয় করিয়ে দেন : ভালা ইসোরবোভা—রেডিও বাংলা বিভাগের মেয়ে, থাঙ্গা বাংলা শিখেছে।

ভালা রাডা হয়ে ওঠে লজ্জায় : না না, বাংলা আমি কিছু জানি না।

লাজুক ভাব থাঙ্গা লাগে ওদেশের মেয়ের মুখে। খুনসুটি করি, নানা কথা বিজ্ঞাসা করি বাংলায়—কেমন জবাব দেয় দেখি। বাড়ি নিচু কপে দুটো-একটা কথা বলে, আর হাসে। আর বলে, বাংলা আমি একেবারে জানি না।

বরিস কাপুস্কিন—সুশ্রী এক যুবা রেডিওর ঐ বাংলা বিভাগে অনুবাদের কাজ করে। ভালা বাংলা হরফে নাম লিখল আমার থাতায়, বরিসও লিখল। গল্পে গল্পে আমাদের থিয়েটার-জগতের মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা উঠল। সে আমলে ভারতীয় গণনাট্যের এক প্রধান গুণী বিনয় ; আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন দলের-সভাপতি। মস্কোয় বেড়ানোর সময় এক সাহেব ছেলে হঠাৎ এসে তাঁকে বলল। আপনাকে দাছ ডাকিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বিনয়কে শুধাই, কে ছেলেটি খবর রাখেন কিছু? আছে সে এখন মস্কোয়।

বরিস বলে, আমি তো সেই।

অবিকার রীতিমতো। দেশে গিয়ে বলা যাবে, মহর্ষির নাতিকে দেখেছি।

ভালাকে বললাম, আমার বাংলা দেশের পাড়ারগায়ে লাজুক মেয়ে দেখে থাকি। অবিকল তোমারই মতো।

ভালা চুপি চুপি বলে, আপনি দাদা, আমি বোন আপনার।

ভাই পেয়েছি ণাত্যককে, বোনও এই পেয়ে গেলাম। দেশে



ফেরবার ১টা দিন আগে। আমার শিষ্ট শাস্ত লক্ষ্য বোনই বটে।  
 ঐ এক সকাল বেলা দেখে এলাম, অসীম পরিচয় হল। মফোর  
 তাকে আঁচ পাই নি। আর কোনদিন দেখব না জীবনে। কিন্তু  
 স্মৃতিবাসিনী তার কল্পনাত হাশিভরা মুখ নিয়ে চিরকাল আমার  
 আপনজন হয়ে উঠল।

ভারত এসে উপস্থিত। জুজ করে গাড়ি ছুটিয়ে এসেছে মফোর  
 বাসপথে। সেটা তো দেখিনি বটে, কিন্তু ছোটো-তিনটে সিঁড়ি ধুপধাপ  
 একসঙ্গে উপকানো দেখে বকম বোকা যায়। এসে অবধি চোঁটা করছি,  
 নিত গাড়ীর ভিতর বসে ছোটো স্মৃতি-স্মৃতির কথা কইব, সেই স্মৃতি ব্রত  
 সমাগত। যুনিয়ান অব রাইটার নামে জোরালো সমিতি—  
 মফোর লেখকদল এখানে মোলাকাতের জন্ম বসে আছেন। চলুন,  
 চলুন—

কী মুশকিল, আগে একটু খবরখবর দেব। ওঁ ছুঁড়ি তোর  
 বিষয়, একেমন কথা?

আগে খেঁচেই নাকি ব্যবস্থা, কাজকেই খবর দেবার কথা।  
 কিন্তু যার উপরে তার ইচ্ছা-ইচ্ছা।

একতলা বাড়ি, মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। লেখক মশায়রা গাড়ি  
 চেপে আসছেন, গাড়িতে বসেছেন। পঁচিশ-ত্রিশটা গাড়ি সর্বক্ষণ  
 উঠানে। সমিতির কতগুলো ঘর আর কত বকমের বিভাগ, গণে  
 পারবেন না।

এক ঘরে নিয়ে গেল। কথা টেবিল ঘিরে বসেছি—আমাদের  
 তরফের এবং ঐ তরফের। অনেক লেখক পলিতকেশ অশীতিপর  
 এফজন রবীন্দ্রনাথের কথা হুসনে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলেন,  
 বিপ্লবের ধনু তখনো কাটেনি। নানান অভাব-অসুবিধা, বাবার  
 দাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু মুশকিল কাটিয়ে উঠবার  
 প্রায়শ চেষ্টা চলছে। রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে শহরতলীর এক  
 বাড়ি। লোকজনের ঝামেলা কম, নিরিবিলাি আছেন।

সেই লেখক বসতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতায়  
 অমুবাদ হয়েছিল এমনকি, আমরা তাঁর নাম জানতাম, লেখাও  
 পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনেরজন লেখক মোটামুটি  
 বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রান্তসঙ্গে। বাববার দেখছি তাঁকে,  
 দেখে দেখে আঁচ মেটে না। মনে হল প্রফেট। তাঁর মুখ দাড়ি  
 পোশাক সব মিলিয়ে অপক্লপ মনে হচ্ছিল। গুরুত্বের কথা বলছেন।  
 সব চেয়ে আশ্চর্য সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু ঘণ্টা ঘরে চলল।  
 আমাদের ভয় হচ্ছে, ক্রান্ত হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মফো  
 তখন বড় একটা গ্রামের মতো। এই বৃহৎ দেশের এইটুকু রাজধানী  
 —তিনি কিন্তু হতাশ হননি। মফোর লোকের খুব প্রশংসা করতেন।  
 লেখিনগ্রাডে বাবার কথা, কিন্তু শরীরের জন্ম ঘটে উঠল না।

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বুদ্ধ বলতে বলতে হেসে  
 উঠলেন। কেমন করে বটে গেছে, গিটার পাদরিক লুকিয়ে রেখেছি  
 ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোশাক দেখে ভেবেছে ঐ  
 বকম। বিপ্লবের বেশ আছে তখনো, পাদরিপুস্তকের উপর লোকের  
 রাগ। বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা কিরিয়ে  
 আনার চেষ্টা ছিল তারা। একদিন হামলা দিয়ে এসে পড়ল।  
 আমরা বোঝাই, মস্ত বড় কবি—ভারত থেকে এসেছেন, মহামান্ন  
 অতিথি। তখন বলে, দেখতে দাও আমাদের ভাল করে। টেগোর

উপরের বারাণ্ডায় এলেন। সকাল বেলা, বোলে চারিদিক ভরে গেছে,  
 তারি মধ্যে ঐ স্মৃতি সৌম্য দীর্ঘ দেহ এসে দাঁড়ালেন। মুক্ত জনতার  
 জয়ধ্বনি উঠল। তখন আমার ঐ এক উপসর্গ—বোজ এসে ভিড়  
 করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারাণ্ডার বেরিয়ে আসেন, দেখে  
 পরিতৃপ্ত হয়ে মানুষ ফিরে যায়।

‘রাশিয়ায় চিঠির’ কথা তুললাম আমি। সেই আশা সার্থক  
 হয়েছিল। কী আশ্চর্য স্মৃতির ভাবে এই দেশ ও আপনাদের কথা  
 লিখে গেছেন! বইটার ইংরেজি অমুবাদ হয়েছিল, কিন্তু ওনতে পাই  
 বিলাতে প্রচার বন্ধ। আপনাদের রাশিয়ান অমুবাদ নেই?

তাঁরা প্রায় আকাশ থেকে পড়েন: না—নেই তো সে বইয়ের  
 অমুবাদ। পড়ি নি আমরা।

আমার কাছে আছে এক কপি। আমার নিজের কয়েকটা  
 বই আপনাদের জন্ম এনেছি, সেই সঙ্গে ওটাও দিয়ে যাব।

নিশ্চয় দেবেন। আমরা অমুবাদ করে নেবো।

কাগজে দেখছি, ‘রাশিয়ায় চিঠির’ দশ অমুবাদ হয়েছে।  
 আমার সেই কপি থেকে হয়েছে কি না জামিনে।

এইবার সেই লোকের নিজের কথা: ১৯২০ অব্দে কাবুল  
 গিয়েছিলাম কুটনৈতিক কাজে। ভারতীয় কাগজ পড়তাম।  
 বৃটশের সঙ্গে খুব লড়াই তখন তোমরা। সেই সময় পেশোয়ার  
 বাবার খুব চোঁটা করেছিলাম। আমি ফরাসি বস্ত্রতাম। আমার  
 বলেছিল, ভাইসরয়ের অফিস বতর্দিন সিমলায় আছে, তোমাদের  
 যেতে দেবে না। আমি বলেছিলাম, আর কদিন থাকতে পারে,  
 তাই দেখ। চলে গেলে তার পরে যাব। হয়েছেও তাই—  
 তারা চলে গেছে। কিন্তু আমি বড় বড়ো হয়ে পড়েছি, আর  
 কোথাও বাবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে ভারত ঘুরি এখন।  
 ভারতকে খুঁজে বেড়াই নানা বইয়ের মধ্যে। ভাবার অসুবিধা।  
 ভারতের অনেক—অনেক বইয়ের বর্জমা হওয়া দরকার।

সব্ব একটা বই বেরিয়েছে—‘ভারত ও পাকিস্তানের ছোট গল্প’।  
 বইটা নেড়েচেড়ে দেখি। একজনকে বলি, স্মৃতিটা পড় তো, কার  
 কার গল্প নিয়েছে তনি। যশপালের আছে গোটা চারপাঁচ,  
 কৃষ্ণচাঁদ, মুলুকারাজ তাঁদের সব আছে। অজানা নামও অনেক।  
 আমাদের বাংলাদেশের শুধু একজন—ভাবানী ভট্টাচার্য। তিনি  
 বাংলায় লেখেন না, থাকেনও না বাংলা দেশে।

কী মশায়রা, বাংলার উপরে বিতৃষ্ণ কেন? বাংলা ছোট গল্প  
 ভূবনের যে কোন দেশের সঙ্গে টেকব দিতে পারে। তার একটারও  
 ইই হল না?

আমাদের আর খাড়া ছিলেন, তাঁরাও ধী-ধী করে সার দিয়ে গেলেন।

ওঁরা লজ্জিত হয়েছেন। বলেন, জানতে পারিনে, খবর-বাদ  
 পাইনে তেমন কিছু। আপনাদের তরফ থেকেও সাহায্য পাইনি  
 এ তাবৎ। বরঞ্চ এমনও মনে হয়েছে, টেগোরের অত বড় সাহিত্যের  
 খাড়া কি একেবারে শুকিয়ে গেল?

বাগ্গালি লেখকদের কিঞ্চিৎ উত্তোষী হতে বলি। আমাদের  
 প্রচার নেই। দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে। আপনাদের সাগনার ঘন  
 সব্ব দেশের ক’টা মানুষের মধ্যে আটক থাকবে কেন? বাঁইরে  
 ছড়িয়ে দিন। বসে ও নিদ্রার দিকে নজর তুলে দেখুন না একটু।  
 সামান্য দখল নিয়ে কত জনে কী ঢাকই না বাজাচ্ছেন! [ ক্রমশ:।



বুদ্ধের পানপূজা : অমরাবতী

ভারতীয় ভাস্কর্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভারতের ইতিহাসের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ভাস্কর্য ইতিহাসের মাধ্যমে ক্রমানুসারে ভারতের রাজনৈতিক উপাদান-পতন কাহিনী, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বস্তির গতি ও প্রকৃতি এবং জনচেতনতার ক্রম বিবর্তন ও আশা-নিরাশার চিত্রাবলী সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত।

ভাস্কর্য শিল্প জাতীয় চিত্র-বিকাশের প্রকাশ। ভারতীয় ভাস্কর্য-ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আদর্শের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ শিল্প-বিচারের মাপকাঠিতে ভাবতশিল্পকে বিচার না করিয়া বহির্দেহের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তি, সভ্যতার ও আধ্যাত্মিক সভ্য প্রকাশে সার্থক হইয়াছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বহির্দেহের মাধ্যমে অন্তর্দেহের সত্য ও সার্থক রূপ প্রকাশই ভারতশিল্পের আদর্শ।

পাঞ্জাবে হারাণা, সিন্ধুপ্রদেশে মহেঞ্জোদাড়ো ও উত্তর-ভারতের অজান্ত স্থানে ভারতের সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের বয়স আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর। প্রাপ্ত নিদর্শনাদির মধ্যে মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত খাতুনিসিত নৃত্যরতা নারী ও শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট নাসাগ্রদৃষ্টি যুক্ত আবক্ষ পুরুষ-মূর্তি এবং হারাণার যুগবিহীন প্রস্তর-নির্মিত মূর্তির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক-আর্য শিল্পের এই সকল নিদর্শন হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে ভাস্কর্য শিল্পের স্তর ও মান বিশেষ উন্নত ধরনের ছিল এবং বহুদিনের চেষ্টা ও সাধনার ফলে ধীরে ধীরে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল নিদর্শন ব্যতীত উপরোক্ত স্থান সমূহে যে অসংখ্য বিভিন্ন আকারের ফলক (শীল) ও পোড়ামাটির জীমূর্তি সকল পাওয়া

গিয়াছে, তদ্বারা তদানীন্তন সামাজিক ও ধর্মিক স্ফূর্তির আচার-ব্যবহারের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

আর্যগণ ভারতে বৈদিক সভ্যতার পত্তন করেন এবং সম্ভবতঃ তাহার ১৫০০ খৃঃ-পূর্বাব্দে মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। যাযাবর আর্যদিগের আক্রমণ ও সিদ্ধুদীর গতি পরিবর্তনের ফলে ভারতের সুসভ্য অনার্য সভ্যতার কেন্দ্র সকল ধীরে ধীরে নান হইয়া পড়ে। দুর্ভিক্ষ, সংগ্রাম ও ক্ষিপ্তগতি বিশিষ্ট ইহাদের জন্য (অশ্ব ব্যবহার করার দক্ষতা) আর্যগণ সুসভ্য ও শাস্ত্র জ্ঞাবিভগণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন।

সমসাময়িক ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ, চতুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি আর্যদিগের দান কিন্তু পরবর্তী হিন্দুসভ্যতা বাস্তব জীবনে ও ভাবজগতে আর্য-অনার্য চিন্তাধারার মিশ্রণের ফল। পুনর্জন্মবাদ, প্রতিমাপূজা, ভক্তিবাদ, যোগসাধনা প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যাদি পুরাপুরি অনার্য সভ্যতার দান।

ক্রমশঃ আর্য-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে যোগটি পৃথক পৃথক রাজ্য গড়িয়া ওঠে এবং ৩২০ খৃঃ-পূর্বাব্দ পর্যন্ত এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ চলিতে থাকে। মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে (৩২০ খৃঃ-পূঃ) প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ এক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম মৌর্যরাজ অশোকের কাল হইতে রাজধর্মরূপে পরিগণিত হইয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

মৌর্য এবং ইহার পরবর্তী স্রষ্টা ও কাব্যযুগে (১৮৫-২১ খৃঃ পূঃ) যে সকল ভাস্কর্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, বুদ্ধমূর্তির অন্তর্গত তত্ত্বাধা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হইতেছে যে, তৃপ্ততা বা তৃষ্ণাকে এবং উহার পরিবর্তক ইচ্ছাশক্তি সৌন্দর্যবিলাস ও

পার্বি ভোগলাসকে নিবারণ করা। ইহার ফলে দেহকান্তিময় শিল্পকলা সাধনা ও বর্জিত হয়।

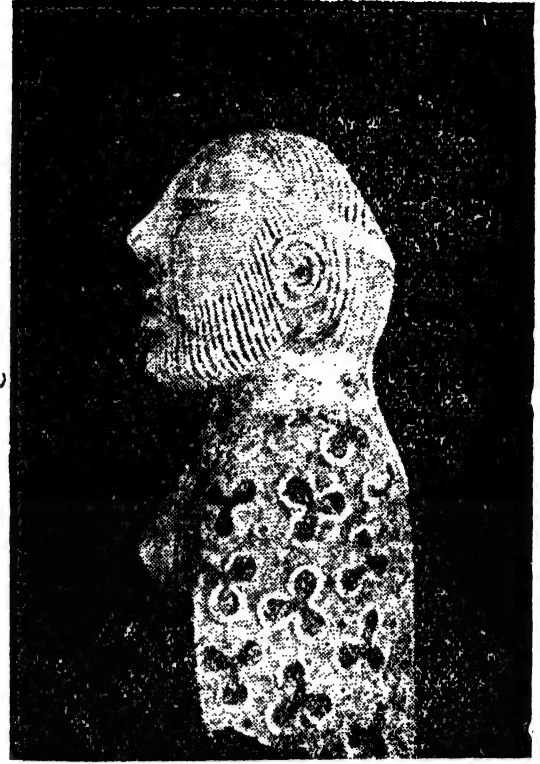
ভারতে আৰ্য্যাবিকার কাল হইতে মৌর্য্যশক্তির বিকাশকাল পর্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৫১৬ খৃঃপূর্বাব্দে পারস্য-সম্রাট দরায়ুসের এবং ৩২৬ খৃঃপূঃ গ্রীক-সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকাশ ও বিবর্তনদ্বারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও ধর্মবিকাশের প্রভাব ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করিয়া নতুন নতুন রূপে রূপায়িত হইতে সাহায্য করে।

মৌর্য্যযুগের ভাস্কর্য্যধারার যে সকল নিদর্শন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহদাকার বক্ষ-বক্ষী এবং পশুমূর্তিগুলি প্রধান। দিনারগঞ্জে প্রাপ্ত বক্ষীমূর্তির সহজ দৈহিক লীলায়িত ভঙ্গি, সুললিত ছন্দ এবং সরল সজীবতা ও সারনাথের সিংহমূর্তির নিখুঁত গঠন, ফৌজ শিরা-উপশিরা ও পেনীসমূহ, কেশর বিভাসের আলাংকারিক হস্তবাহুগত ভাব প্রকাশে পরিস্ফুট। এই সকল মূর্তির সজীবতা, বাস্তবতা ও সূচিক্রম মনোহরতা মৌর্য্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অজ্ঞাত বক্ষ-বক্ষী ও পশুমূর্তি (যেমন বেমনগরের বক্ষী, পাটনার বক্ষ, লৌরীয়নন্দন গড়ের সিংহমূর্তি ইত্যাদি) আকারে বিরাট হইলেও স্থূল, গতি ও প্রাণহীন। মৌর্য্য-শৈলীশিল্প প্রকাশ মধ্যে এই দুইটি ধারা সচেতনই অনুসরণ করা যায়।

পারস্য ও গ্রীস দেশীয় শিল্পধারার প্রভাব মৌর্য্যশিল্পকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে একথা সত্য, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যধারা অবাচ্ছত গতি ও ছন্দের উপরেই মৌর্য্যশিল্পের মূল ভিত্তি।

মৌর্য্য-পরবর্তী যুগে স্তম্ভ ও কাথ সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রাশ্চাণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে। স্তম্ভ ও কাথ রাজগণের উদারতার জ্ঞাত বৌদ্ধ-শিল্পশ্রোত অবাচ্ছত ভাবে প্রবাহিত থাকে। সাঁচী, ভারুত, বুদ্ধগয়া, উদয়গিরি খণ্ডগিরি ও দক্ষিণ-ভারতে ডেরী নামক স্থানে এই যুগের শিল্প নিদর্শনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের শিল্পধারা মৌর্য্যযুগের ধারার গতি ও প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। মৌর্য্যযুগের স্থায় এ যুগের শিল্পে সে সজীবতা ও সরল ছন্দের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত অবিকাশ শিল্প নিদর্শন পরিপ্রেক্ষিতে রচনার অভাবে গভীরত্বহীনতা, কাল ও স্থানের অসঙ্গতি, ভাবলেশহীন মুখাকৃতি ও ছন্দহীনতার দোষে দুই কিন্তু জীবজন্তু, বৃক্ষসত্তা ফল-ফুল প্রভৃতির শিল্পরূপ আদিম সৌন্দর্য্য, সজীবতা ও সারল্যের জ্ঞাত থাকে। ভারুত ও সাঁচীর বৈদিকাগারে ফোদিত জাতক-কাহিনীগুলির মধ্যে ছদ্মস্ত, অলম্বুজা, মহাকপি, শূন্য, জেতবন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ যুগে বুদ্ধমূর্তি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা (যেমন ছত্র, ত্রিভুজ, সিংহাসন, পাহুকা, ধর্মচক্র ইত্যাদি) রূপায়িত। দৌছন ও মিথুনমূর্তির প্রচলন স্তম্ভ-কাথ শিল্পে বিবিধ ভাবে প্রকাশিত।

পৃষ্ঠাব্দে স্তম্ভ হইতে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা যায়। মগধের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে কুষাণ ও দক্ষিণে অন্ধ বা সাতবাহন সাম্রাজ্য প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম করে।



শ্রদ্ধামুক্ত মূর্তির ভগ্নাবশেষ : মহেঞ্জোদাড়ো

কুষাণগণ মূলতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের এক দুর্দ্বর্ষ বাণাবর সম্প্রদায়। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর হইয়া বসেন। কুষাণরাজদিগের মধ্যে দুইটি কবিরাজ নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



অশোকস্তম্ভের বৃক্ষমূর্তি : বামপুরোয়া

সম্রাট কশিকের সময় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে। হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া গভীর দক্ষিণ বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ হীনযান হইয়া গড়িত হইল। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট কশিক জালালাবাদে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বান করেন এবং উক্ত সভায় মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম পুনরায় নবশক্তি ও প্রেরণা লাভ করে। শিল্পের দিক দিয়া মহাযান মতবাদ প্রবর্তন এক নবযুগের সূচক। কারণ, হীনযান মতে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মহাযানীদের মধ্যে বিভিন্নরূপে বুদ্ধের মূর্তির নানা ভাবে প্রকাশ করিয়া এক গভীর ঐশ্বর্য দেখা যায় এবং সেই কারণে গাঙ্কার ভাবে এ যুগে বুদ্ধের মূর্তির ব্যাপক প্রকাশ ঘটয়া থাকে।

এ যুগের শিল্পকলাগুলির মধ্যে পশ্চিমে গাঙ্কার, মধ্যভাগে মথুরা এবং দক্ষিণে অমরাবতী শিল্পের উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের কাণাণ্যায় তৈয়ারী করার মত অসংখ্য যুগে উপরোক্ত শিল্পকলাসমূহ অসংখ্য বিভিন্ন বর্ণ ও সম্ভাব্যের দেব-দেবীর ও অজ্ঞাত মূর্তি তৈয়ারী হয়।

প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পেশোয়ার জিন্দা গাঙ্কার অঞ্চল নামে খ্যাত ছিল। সূর্য অস্তিত কাল হইতে এই অঞ্চলটি ভারত, পারস্য ও গ্রীক সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র। ইহার ফলে এই অঞ্চলে যে ফিরিকী শিল্প গড়িয়া ওঠে তাহা গাঙ্কার শিল্প নামে খ্যাত। গাঙ্কার শিল্প সম্ভবতঃ ২য় খৃঃ-পূঃ কাল হইতে আরম্ভ হয় এবং প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীক ও রোমান শৈলী শিল্পের আদর্শ ও ভারতীয় ভাবধারার অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির

মূর্তি এই অঞ্চলে তৈয়ারী হয়। বহির্দেশের নিখুঁত প্রকাশ চোঁটার আঘিকা বশতঃ ভারতের ধ্যানমগ্ন অন্তর্মুখী ব্যক্তির গাঙ্কার শিল্পে আদৌ বিকশিত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে গাঙ্কারেই প্রথম বুদ্ধমূর্তির সূচনা হয়, কিন্তু এ কথা সত্য নহে। মথুরা ও গাঙ্কারে একই সময় বুদ্ধমূর্তি আত্মপ্রকাশ করে।

গাঙ্কারের জায় মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া এ যুগে যে শিল্পবেষ্টিত গড়িয়া ওঠে তাহা মথুরা শিল্প নামে খ্যাত। মথুরা কেন্দ্রের তৈয়ারী অসংখ্য লাল পাথরের বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। দেব-দেবীর মূর্তিগুলি গাঙ্কারের মূর্তির মত নাটকীয় ভাবের (অনিকো) তরঙ্গ না চলেই ও ভাবধারার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নহে। দেব-দেবীর মূর্তি ব্যতীত সামাজিক জীবন সকল জীবনের আচ্ছন্ন গতি ও লাভময় ভাবের প্রকাশ সার্বিক ও সম্পূর্ণ। লত কুশান সাম্রাজ্যের প্রভাবান্বিত প্রতিচ্ছবি সকল এ যুগের বিশেষ দান।

দক্ষিণ-ভারতের তুঙ্গা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অমরাবতীর শিল্প সম্রাট ভারত-শিল্পের অমরাবতী। সাল মার্কেল পাথরের তৈয়ারী অমরাবতী ও নাগার্জুনী কোত্তার স্থাপের গায়ে ফোঁসিত যে সকল মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিক যান অনুযায়ী মথুরা ও গাঙ্কার শিল্প হইতে উন্নত ধর্মের এবং মোহিনী শক্তি ও রাগান্বিত ভাবের প্রভাবে স্পষ্ট। অমরাবতী ও নাগার্জুনী কোত্তার স্তম্ভগুলি অপরূপ সযস মোহিনী শক্তির লাভময় প্রকাশ। এই অঞ্চলের প্রথম যুগের শিল্প ভেঙ্গী শিল্প নামে পরিচিত এবং ইহা সাঁচী ও ভারতের সমসাময়িক।

চতুর্থ খৃষ্টাব্দে প্রায় (৩২০ খৃঃ) মগধ গুপ্তাব্দ-বংশের অভ্যুদয় এক অরবীর ঘটনা। গুপ্তযুগে ধর্ম, সাহিত্য, চাক্ষুশ, বিজ্ঞান ও সমাজ-জীবনের যে সকল উন্নতি ও বিকাশ ঘটে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য। চীন, ইন্দো-চীন, ভারত ও পূর্ব উপদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ সকল স্থাপিত হয় এবং ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদির আদান-প্রদান দ্বারা এক মিলিত জাতীয় মনোভাব ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ গুপ্তযুগে এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র পরিগণিত হয়।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা শুরু হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রোত তখনও অব্যাহত। সে কারণ এই যুগে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-শিল্পের প্রচার ঘটে।

যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ ও বৌদ্ধ নীতিমার্গ একত্র ছিল, তখন সাধকগণের মধ্যে বাহ্যিক নিয়মদিকারী, তাহারাই কেবল ধর্মত্বকার ভূমিকাধনের দৃষ্টি শিল্পের আশ্রয় কইত। ব্যাধি ও গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সময়ের বিশেষ সহায়তা করে এবং এই ভক্তিস্রোত সাকার ধ্যান ও পূজাকে সাধক সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাইয়া উচ্চ শিল্পের অভ্যুদয় সাধন করে। এ যুগের শিল্পই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিভিন্ন যুগে শিল্পে যে সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা গুপ্তযুগের ভক্তিস্রোতের প্রাবল্যে, ধ্যানের গভীর রসে ও বৈরাগ্যভাব এবং সংযমের স্থিতির বন্ধন-ডোরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ মানব-জীবনের মধ্য দিয়া দেহাত্মিক ভাব প্রকাশ চোঁটার এই যুগের শিল্পীরা সার্বিক হন।



গৌতমবুদ্ধ : গাঙ্কার

# অঘোর প্রকাশ

( স্বর্গীরা দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

“তোমার হাতের বেদনার দান”

তোমাকে নিজে মীমাংসা করিয়া অনেক সময় কাঁচ করিতে হইত। কাঁচ করিতে হইলেই তো তুলও হইয়া থাকে। তুলও হইতে লাগিল। জ্ঞানের ভারতময় ছিল বলিয়া তোমাকে আমাকে একটু অমিলও হইতে লাগিল। তখন মনে হইত, দু’জনার মধ্যে এক জনার আশ্রয় একেবারে চলিয়া গেলে তবে সামঞ্জস্য হইবে। তোমার ২১শে মে ১৮১৫ তারিখের দৈনিক ইহার প্রমাণ। “আজ সকাল হইতে মনটা বড় চিন্তাযুক্ত। এই প্রশ্ন হইতেছিল, আমি কি খাটপ হইয়া গিয়াছি? আজ কয় সপ্তাহ হইতে মনে বড় বড় চলিতেছে। আজ তাই এই কথা মনে হইল। দরাময়ী মা উপাসনার বস্ত্রা দিলেন, তোমাকে ১০ বৎসর বয়সের সময় যে ধন দিয়াছিলেন, সেই ধন হারাইয়াছি। আমিও হারাইয়া চির অধীন থাকিবে বলিয়াছিলে,— এখন তুমি স্বাধীন হইয়া সকল কাঁচ কর। মত হইয়াছে তোমার, বিচার কর তুমি, এই জ্ঞান এত বড় বহিতেছে।” বুকিলাম কারণ! প্রার্থনা আজ এই হইল, ‘আমিও ধুঁচায় আমাকে ঘিরিয়াছে। না আমাকে আমিও হাতে বাঁচাও, আবার আমাকে অধীন কর। মনে বড় বিচার উঠিতেছে। সপ্তাহি যেন সকল বিষয়ে বিচার আসে, আর মন স্বাশ্রয় হয়।’ ৩০শে মে লিখিয়াছি, “আমার মনে বড়ই বড় চলিতেছে; কিছুই পরিষ্কার হইতেছে না। আমি কি কাটারও যথেষ্ট বাধা হইতেছি? কেন আমার মন এমন ব্যাকুল? চিন্তা এত প্রাণ যেন শরীরে সঞ্চার হইতে পারিতেছে না। কি করি মা, বল।”

তোমার ও যে অবস্থা আমারও তাই হইয়াছিল। আমার ডায়েরী দেখ। “ঘোরীর সঙ্গে এত অমিল হয় কেন? আমিও বাঁচ নাহি বলিয়া। মনে কেন এত অশান্তি হয়? ইহার কারণ কি বুঝিতে পারি না। সেই বুঝিবার ক্ষমতা দাও। ঘোরীর সঙ্গে বৈরাগ্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। একেবারে সমুদয় অর্পণ করিতে না পারিলে নির্বাণ হয় না। নির্বাণ না হইলে মিলন কিরূপে হইবে? যেন সর্দশ দিতে পারি। সন্ধ্যার সময় মিলনের বিষয় অনেক কথা হইল। শরীরের মিলন তো আমি চাই না। তাহা সহজ। আশ্রয় মিলন দাও।” দু’জনার একই মত, একই সুর, একই অভাব। ভালবাসা ছিল, মিলন ছিল, কিন্তু কি যেন একটা অভাব যেন এক বাঁজনা বাঁজিতেছে না, একটু একটু বোঝা হইতেছে, বেতাল বাঁজিতেছে। লোকে বলিত, খুব মিলন ইহাদের মধ্যে। আমি যখন বিহটা রাজকাঁচ্যে চলিলাম, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলে। এত নিকটে, কিন্তু মাঝখানে যেন এক একটা পাথর রহিয়া গেল।

তোমরা ১লা জুনের দৈনিকে লেখা আছে, “কাল সন্ধ্যার সময় উভয়ে মিলন বিষয়ে অনেক কথা হইল। আজ সকালে ৩১০ টার সময় উপাসনা হইল। খুব ভাল উপাসনা, প্রার্থনা মিলন বিষয়ে।

আশ্রয় মিলন বাহাতে হয় সেই পথ দেখাইয়া দেও।” আমার ডায়েরীও তাই বলিতেছে, “অতি মিষ্ট উপাসনা। বিপু বর্তমান অথচ এমন ভাল উপাসনা। আমার প্রার্থনা, ঘোরীর সঙ্গে মিল অতীবশতক। ইহাতে যদি জ্ঞান তুলিয়া বাইতে হয়, প্রেম লুকাইতে যদি হয়, তাহাও করা আবশ্যক। মা! তুমি আমার সকল কাঁচিয়া লও।”

কুস কুস বিষয়ে দু’জনে মতভেদ হওয়াতেই বড় কষ্ট পাইতাম। তখন তুমি স্বাধীন ভাবে কাঁচ করিতে আরম্ভ করিয়াছ; স্বাধীন ভাবে কাঁচ করিতে গেলে মতভেদ অনিবার্য। কিন্তু তখন একপ হইলে দুই জনেরই মনে বড় তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সত্য সত্যই মনে হয়, এই সময়ে আমাদের মতটা আমিও বিবীন হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমরা হইতে পারি নাই। পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে হইলে আমিও বিবীন হইয়া আর পথ নাই।

জুলাই মাসে মসৌড়ি গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দু’জন লেণ ভাল ছিলাম। দু’জনে একত্র মিলিয়া সাদাক্ত কোনও কাঁচ করিতে পারিলেও কেমন পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেখানে গিয়া দেখিলাম। মসৌড়ির আমবাগানে দু’জনে একত্রে গেলাম। একত্রে আঁচ পাড়িলাম। আমি বলিলাম, “তুমি গাছ চড়িতে পার?” তুমি বলিলে, “হা পারি। কিন্তু কিছু মন্দ নয় তো?” আমি বলিলাম, “না; চড়।” তার পর তুমি গাছে চড়িলে। আমার বড় আনন্দ হইল।

এইরূপে কখনও মতভেদের হওয়া বন্ধ, কখনও বা এবড় কাঁচ করিয়া আনন্দ, এই ভাবে এই বৎসর চলিতে লাগিল। দু’জনের মধ্যে কষ্টের কয়েকটা স্থানী বাঁধনও ছিল। তোমার জ্ঞানের অল্পতাবশত: তুমি সব সময় মনের প্রশ্নে থাকিতে। যদি আমি কখনও কোনও বন্ধুর সঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ করিয়া শুকি হইতাম, জমনি তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চট্টি বাইতে ও বলিতে, “তু’জনের বিজ্ঞা সমান না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নয়।” আমি যদি কাটারও সচিত্র আলাপে বা প্রসঙ্গে অনেক সময় কাটাইতাম, ও যদি তোমার মনে হইত যে, তোমার প্রাণ সময় বা মনোযোগ আমি অপব্যয় দিতেছি, তাহাতে তোমার মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হইত। একবার পূজাব হইতে আগত একটা ধর্মপ্রাণ ভাইকে (মঙ্গল দেওজীকে) পাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন অনেক সময় কাটাইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি অসুখী হইয়াছিলে। শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগের সংগ্রামও তোমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, আমার শরীরের প্রতি তোমার কিছুটা টান না থাকে; তাই প্রস্তাব করিলাম যে, একেবারে পরস্পরের শরীরে সঞ্চার করিব না। তুমি ইহাতে অসুখী হইয়াছিলে। যখনই মনে করিতে যে, আমার শরীরের জন্ত তোমার মতটা টান আছে, তোমার শরীরের জন্ত আমার মতটা নাই, তখন তোমার মনে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।



এ সকল সংগ্রাম অন্তরেই থাকিত; এ সকলের জন্ত বাহিরের কোনও কাজে বাধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ সকলের জন্ত তোমার ভয় শরীর আরও ভয় হইয়া বাইতে লাগিল। লোকে আমাকে কত মন্দ বলিতে লাগিল যে আমি তোমাকে অতিরিক্ত খাটাইয়া তোমার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু তুমি কোনও কাজ ছাড়িতে চাহিতে না। কারণ, যতক্ষণ মায়ের সেবার জন্ত উৎসাহ প্রদানিত থাকিত ততক্ষণ এ সকল সংগ্রাম মনকে অধিকার করিতে পাঠিত না। যখনই বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিতেন, কিংবা তোমাকে পরসেবার জন্ত অন্তরে বাড়ীতে বাইতে হইত, তখনই তোমার মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইত।

এ বৎসর তোমার সর্দাপেক্ষা অধিক যত্নের দিন গিয়াছে ৪১। আগষ্ট। এই দিনের দৈনিকে লিখিয়াছি, “মা, আমি জানিতাম, আমার কখনও পরীক্ষায় ধরিবে না, সুখ ভিন্ন দুঃখ কখনও আমাকে ছুঁইবে না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, মায়ের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আমাকে পরীক্ষায় ঘিরেছে। আমি ভয় পাইব না। চিরদিন এ পরীক্ষা থাকিবে না। আশীর্বাদ কর, তোমার হাতের পরীক্ষা বাগা আমার মঙ্গলের জন্ত এসেছে, আমি যেন আদর করিতে পারি। আমাকে দৈর্ঘ্য দাও, আশীর্বাদ কর। আজ বিবাহের, সকালের উপাসনা দায়ব বাড়ীতে ছিল। বিকালবেলা প্রায় ৩টার সময় স্বামীর সঙ্গে বাটা ফিরিয়া আসিলাম। একটু বিশ্রামের পর ভাল কথা বলিতে বলিলাম। আজ কয়দিন কয়মাস, বিশেষ আজ সকাল হইতে মনটা যেন কেমন করিতেছিল। আজ ৩:৪ বার তাগ স্বামীরকে জানাইয়াছি। এবারও তাই জানাইয়া ভাল কথা বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, ‘পরের বিচার করা উচিত নয়’ আমি অন্তরে বিচার না করিয়া এই পরিবার কেমন করিয়া চালাইতে পারি, তাগ জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক কথা হইল। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আমার উপাসনা, জীবন, কি নীচ হইয়াছে?’ উত্তর—‘বুঝিতে পারি না; কিন্তু দোড়ে বাইতে চাহিতেছি, কিন্তু বাধা পাঠিতেছি। আমার আর তোমার সহিত চলে না দেখিতেছি।’ এই কথা শুনিয়া আমার যে কি অবস্থা হইল ঈশ্বর ভিন্ন নিশ্চয় কেহ তাগ বুঝিতে পারিবে না। একটু পরে ক্ষমা চাহিলাম। স্বামী হাসিয়া বলিলেন, ‘কোনও দোষ তো মনে হয় না।’ বড়ই যতন হইতে লাগিল। একটু পরে আবার বলিলাম, ‘আমি কি তোমার প্রেমের পথের বাধা হইতেছি?’ উত্তর—‘একটু বই কি?’ তখন মাথাটা যেন গরিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। উভয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে বলিলাম, ‘তুমি সমাজে বাও।’ তিনি গেলেন, আমি গেলাম না। আজ যে কথাটা স্বামীর মুখে শুনিলাম, এই ভাবটি আজ কয়মাস হইতে একটু বুঝিতেছিলাম। বাহাই হউক, আজ আমার কি ভয়ানক ঘন পরীক্ষা! আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর একত্র বাস। বাঁহার সঙ্গে চলি বসিয়া মা, বাপ, ভাই, বোন, দেশ, আহা, পরিচ্ছদ, পৃথিবীর সকল বিষয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি, আজ সেই মুখে আমার এই অবনতির কথা শুনিয়া মনে হয় সেই সময় একটু জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম। আর তো কোনও উপায় নাই। সকল দুঃখের কথা বাঁহার নিকট বলিয়া শান্তি পাইতাম, তাঁহার মুখে যখন এই কথা শুনিলাম, তখন সেই অগতির গতির নিকট গিয়া এক ঘটা

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলাম। বুঝিলাম, তিনি বলেন নাই; মা আমার শাসন করিলেন। এখন রাত্রি ১১টা, আজ ঘুম নাই। মন ব্রহ্মে বাস করিতেছে। তবে বিছানায় বাই।

৬ই আগষ্ট তারিখে ‘মুনের’ নামক গ্রাম হইতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, ‘মাতৃকন্ডা, মায়ের ভালবাসা লইয়া ভবের হাটে, মেলার গোলমালে স্বর্গীয় প্রেম দ্বারা সামান্য মোটা জিনিষ ক্রয় করিয়া আসিতেছ। তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর আসিবে না। স্বর্গের প্রেম দ্বারা আমার শরীরও মন ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু আত্মা কিনিতে পার নাই। আত্মা তবে কিরূপে ক্রয় করা যাইবে? তাহার একমাত্র উপায়,—ব্রহ্মকে লাভ কর, আমার চিরস্থায়ী আত্মাকে লাভ করিবে। এতদিন যে আত্মা ক্রয় করা হয় নাই সে দোষ তোমার নয়, আমারই দোষ। পূর্বেই যদি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে এ বয়সে তোমার এত ক্লেশ হইত না। বাহা হউক, এখনও অনেক প্রেম অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা শূন্য পূরককে লাভ করা অশর্য্য নয়। এস, তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি। অনেক সময় বাহাতে তাঁহাকে স্মরণ হয় এমন কথা বলিব। তাঁহারই কথায়, তাঁহারই সেবায়, দিবানিশি ভুলে থাকি। ‘মুনের’ এ বিষয়ে খুব সহায়। নির্জন মন্দির মসজিদ সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবে বাড়ী গেলে এইরূপ ভাব মনে উদয় হইবে! এখানকার মনের অবস্থা খুব ভাল। ভগবান তোমাকে এই সুখ শীঘ্রই দান করুন, এই আমার দুই হৃদয়ের ও সন্ধার প্রার্থনা। তোমার উপর অনেক নির্ভর করিতেছে।’ তুমি উত্তরে লিখিলে, ‘ব্রহ্মপুত্র, তোমার আশীর্বাদপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আপনাকে বহু মনে করিলাম। কারণ আমি অল্পবয়স্ক। তোমার আশীর্বাদ পূর্ণ হউক, মাকে আমি পাই, তোমার আত্মাকে ক্রয় করি, মা শীঘ্র এই করুন। কারণ, আমার যে আর কোন কাজ হবে না যদি তোমার আত্মাকে ক্রয় করিতে না পারি। আমার জন্ত সৎসা প্রার্থনা করিও। আশা করি তুমি মার কোলে ভাসি আছ। তোমার মন ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। দুঃখ হয়, আমি অনেক সময় তোমার এই স্তনের ব্যাঘাত হই, নিজের স্বার্থের জন্ত। মা আশীর্বাদ করুন, আমার এই বোগ যেন না থাকে। কেমন করিয়া গৃহে ব্রহ্মকে রাখি, তুমি বাহির হইতে আসিয়া গৃহে ব্রহ্মদর্শন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পার, এ বিষয়েও কিছু বলিও। আমার শরীর মন ভাল; আর সব ভাল। এখন আমি জীবব্রহ্ম বেষ্টিত হইয়া এই দুঃকলম লিখিলাম। আমার চারিদিকে ষণান বেষ্ট। তাহাতে আমার মায়ের আদরের ২৫টি ছোট জীবন-ধন, মধ্যে আমি। বাগা করি প্রতিদিন তাহা সত্য হউক; ব্রহ্মে নিয়োজিত হউক।

ইহার পর তোমার শরীর ধরাপ হইতে লাগিল। তখন পত্রে লিখিয়াছিলাম, ‘তোমার সুখ হইলই আমার সুখ। মা চিন্ময় বোগে যুক্ত করুন, আর কিছু চাই না। আমার জন্ত ভাবিও না। বতদিন থাকিবার ও কাঁচ করিবার দরকার ততদিন আমি নিশ্চয় এদেশে থাকিব। আর সকলে ভাল। মন বেশ আছে। সর্বদাই তোমার নিকট থাকি। অনেক আলাপ করি, সুখী হই। কষ্ট নাই। মা অতি নিকটে সর্বদা থাকেন।’

আর একদিন লিখিলে, ‘যখন কাঁচ আসে তখন যেন কোথা

হইতে বলও আসে। আমি আশ্চর্য্য হই যে আমি কেমন করিয়া এত পারি। আমার জন্ত প্রার্থনা করিও, আরও তোমার উপযুক্ত হইয়া যেন মরিতে পারি। তোমার সহিত এমন একটা বোগ হইয়াছে, সে যোগে এমন একটা শ্রমণ আছে, বাহা কোন সময় মনকে পরিত্যাগ করে না। অশীর্বাদ কর, ত্রুষ্ণের সহিত সেইরূপ বোগ হউক। ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা লও। তোমার স্তম্ভ পত্রখানি পাইয়া ভাবিলাম, একদিন আর আমার জন্ত এ পত্রও আসিবে না। বেশ মন প্রস্তুত।” আর একদিন লিখিয়াছ, “এখন শয়ান অবস্থাতেই তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, শরীর না থাকায় মনের কি অবস্থা হয়, যখন শরীর আর আমার নিকট আসিবে না তখন কি অবস্থা হইবে। শরীরে বা কত মিষ্টতা, আত্মাতেই বা কত মিষ্টতা তাই অনুভব করিতেছিলাম। আত্মাকে শরীরের মত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম; সেই সুখ অনুভব করিতেছিলাম। একটা না থাকিলে আর একটার জন্ত মনটা বড় টানে, তাই ভাবছিলাম। তারপর তুমি এখন কি করিতেছ তাই ভাবিলাম।” ২২শে আগষ্ট লিখিয়াছ, “বেশ হইয়াছে। শরীরটা অসুস্থ বলিয়া তোমার সহিত এত বেশী থাকিতে পারিতেছি; শরীর ভাল থাকিলে এ সুখটা আর হইত না। শয়ন করিয়া তোমার বিষয় কতই ভাবি। মা খুব ভালবাসেন বলিয়া চারটি দেওয়ালযুক্ত স্থানেও এ অবসর দিয়াছেন। তুমি গঙ্গার কুলে বসিয়া কত সুখী হইতেছ, আমি পাছে বঞ্চিত হই, তাই আমাকেও শয়ান অবস্থায় রাখিয়া খুব সুখী করিতেছেন। চিন্তা ফেলে উঠিতে ভাল লাগে না। আজ ৮টার সময় তোমার পত্র পাইলাম। একবার মন প্রাণ চাহিতেছিল, জমনি ধমক দিতেই চূপ করিল। তুমি সুখে দিন কাটাইতেছ, এতে আমার মন কত সুখী ও কত নিশ্চিন্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ক’ এই জ্ঞান। তোমার ধন হইলেই আমার ঐশ্বর্য্য বাড়িবে। সত্য না? আমার মন ভাল। অনেক সহিয়া আসিয়াছে। এবার কি আমি বাইবার সময় যুগ ভার করিয়াছি? বোধ হয় না। এইরূপে তো হইবে? আমার ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি লও।” আর একদিন লিখিয়াছ, “পিকু, আমার জন্ত ভাবিও না। আমি ভাল আছি। এই দেশে থাকিয়াই পরলোক যে বিরূপ হইবে তাহার পূর্বাভাস পাইতেছি। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তবে আজ বিদায়।” ২১শে আগষ্ট লিখিয়াছিল, “স্কুলে আদিবার সময় তোমার মিষ্ট সত্যমাখা পত্রখানি পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর ও মন ভাল। শ্রমণের বেড়া পূর্বাগম্ভা কিছু ঘন হইয়া আসিয়াছে। আমার দুর্ব্বলতার জন্ত তুমি প্রার্থনা করিও। শেষ নিঃশ্বাস যেন মার নামে ফেলিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর।” আর একদিন লিখিয়াছ, “আশীর্বাদ কর, চিরকাল যেন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া সঙ্গে চলিতে পারি। তোমার সহিত চলিতে চলিতে যদি এই লোক ছাড়িতে হয়, আমার স্বর্গ হইবে। ১০ বৎসর বয়সে যে ব্রত মান্জননী অজ্ঞানিতরূপে আমাকে দিয়াছিলেন, সে ব্রত যেন আমার উদ্ঘাপন হয়। পিকু, তুমি অবশ্যই জান, আমি আর কোন আশা রাখি না। একটা লোক আপনাকে হারাইয়া কেমন করিয়া অন্তের সহিত মার নামে মিশিতে পারে, এই আমার কাজ। মা কবে সেদিন দেবেন! তাহারই জন্ত এত বহন করা। যখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, তখন শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে

হয় যেন আর চলে না। আবার যিনি চিরদিন আশা দেন তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া আমি বল পাই। বাকু, তুমি যে এত সুখে দিন কাটাইতেছ, শুনে বড়ই সুখ হইতেছে। তোমার সুখে আমার সুখ। মা বুঝি চান না যে তোমার শারীরিক সুখ হয়, তোমার সঙ্গে আমার শারীরিক সখ্য থাকে, তাই হয়তো এইরূপ ঘটনা করিতেছেন। এক ঘটনার পথে থাকিয়াও তুমি আমার শারীরিক কোন অবস্থা বুঝিতেছ না। মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে, চিন্ময় যোগের জন্ত। একটা কিছু না হইলে মন শান্ত হইতেছে না। কাল ৫টা হইতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত তোমাকে দেখিবার জন্ত বড়ই প্রাণ কেমন করিতেছিল, কেন তা জানি না। পত্র পাইলে বুঝিলাম, ঐ সময় তুমিও আমাকে শ্রমণ করিতেছিলে। অজ্ঞানিত রূপে দু’টি আত্মা দু’টি আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাই ওরূপ হইতেছিল বুঝি।”

দেবি, আমার জন্ত তোমার মুখাপেক্ষা চিরকালই ছিল, এখনও আছে। আমার সঙ্গে চলিবার আকাংক্ষা বড়ই প্রবল ছিল। সত্য সত্যই আমার সঙ্গে চলিবার জন্ত দৌড়তে। প্রথম জীবনে অনেক কাল বুধা গিয়াছে বলিয়া শেষ জীবনে এত দৌড়িতে হইত। ১০ বৎসরের সময় হইতে এই মিলন ব্রত লইয়াছিল, একদিনও সে ব্রত ভঙ্গ কর নাই। আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। ক্ষণেকের জন্ত উদ্বেগ ভুলিলে মিলন ভাঙিত, আবার স্বর্গের সুধাপান করিয়া আপনাব ব্রত রক্ষা করিতে। শরীরের বোগ পূর্বেই কমিয়াছিল, এখন শান্ত মনে তাহার স্থানে আত্মার যোগ স্থাপন করিতে লাগিল।

২৪শে অক্টোবর লিখিয়াছ, “কাল তুমি গাড়ীতে কি বিষয় ভাবিলে, এবং ওখানে গিয়াই বা কি বিষয় ভাবিলে, শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি সমস্ত গাড়ী তোমার অনাসক্তির কথাই ভাবিলাম। বাটা আসিয়া শয়ন করিয়া ঐ কথা ভাবিলাম। যদি তোমার শরীর ছাড়িয়া এ দেশে থাকিতে হয়, কি ভাবে কিরূপে থাকিব তাই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেলাম।”

৬ই নভেম্বর তোমার শরীর বড়ই ভাঙিয়া পড়িল। তোমাকে লইয়া দানাপুরে আসিলাম। তার পর দিন মকসুদপুরের গঙ্গাতীরের বটীর বাগানে দুই জনা উপাসনা করিলাম। অবশ্যই তোমার মনে আছে। কেমন বিড়্টি শূণ্য উপাসনা, চক্ষের ভলের সঙ্গে কেবলমাত্র স্বরপঙ্ক্তি উচ্চারণ করা; এ উপাসনা তোমারও খুব ভাল লাগিল। এমন উপাসনা কখনও শুন নাই। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সঙ্গে সদালাপ। ৮ই নভেম্বর আর ৯ইয়া আবার উপাসনায় গেলে। বিড়্টিশূণ্য উপাসনা হইয়াছিল, তুমিও খুব সুখী হইয়াছিলে।

সরোজিনীর খোঁকা তোমার কাছে পরলোক আরও উজ্জল করিয়া দিয়া গেলেন। তোমার দৈনিকে লেখা আছে, “অজ্ঞ প্রিয় খোঁকার শেষ উপাসনা হইল। প্রার্থনা হইল, শিশু আমার গুরু হইয়াছেন। পরলোকের নিকট করিয়া দিয়া গেলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে স্থায়ী সখ্য হয় নাই তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার নিকট স্বামী হইলাম।” আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিল, “খোঁকা যেমন শূর্য্য দেখিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, আমার তো সেরূপ তোমাকে দেখে হয় না।

সেইরূপ বাহাতে হয়, তাই কর।" সরোজিনীকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময় প্রার্থনা করিলে, "মা তুমি সহ্যের ছেলে হয়ে কোলে উঠে যাও। চন্দ্র খোঁকা কে যেন আমরা সর্বদা দেখিতে পাই।"

## উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### আপন আলয় যুগে

১৮১৬ সালের মাঘাৎসবের জন্ত ক্রুরূপে প্রস্তুত হইতেছিল, তাতা তোমার ২২শে জামুয়ারীর দৈনিক পড়িলে বুদ্ধিতে পাওয়া যায়। তুমি জিজ্ঞাসাছ, "এই বোনের নিকট পাপ স্বীকার না করিলে, তাঁহার এক বৎসরের অপরাধ ক্ষমা না করিলে, উৎসবে মা দেখা দিবেন না। কিন্তু ছোট বড় সকলের নিকট পাপের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা বড় বঠম, তাই বল ভিক্ষা করিলাম। উপাসনা হইতে উঠিয়া সকলকে পায় ধরিয়া ক্ষমা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল।" উৎসবের জন্ত প্রস্তুত হইতেছ, এমন সময় সন্ধ্যা পড়িলে যে কোনও প্রতিক্ষেপ বশতঃ পাগোলের ভাইবোনেরা উৎসবে আসিতে পারিবেন না। তুমি জিজ্ঞাসাছ, "পাগোল ছাড়িয়া উৎসব করিতে কি কেশ, তুমি জান। বাহার প্রতিবন্ধকতা তাদের অমুতাপ দেও।" ২৩শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব? স্থান—সমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণ। এবার হাতে পয়সা ছিল না, তাই সকালের উপাসনার পর তুমি ভিক্ষা করিলে। দুটি ছোট ছোট মেয়ে আর নিজে তুমি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত হইয়া উৎসব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া একটি প্রার্থনা করিলে। স্বয়ংসম্পন্ন প্রার্থনা। এমন প্রার্থনা আর তোমার যুগে শুনিয়াছি কি না সন্দেহ। এমন রূপ ২৩ বার দেখিয়াছি মাত্র। ভিক্ষুণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সুতরাং তোমার সেই বেশ অতি সুন্দর মনে হইতে লাগিল। শরীরের রূপ তো বিশেষ কিছু ছিল না, স্বর্ণের ভাব তোমার হস্তকে পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ভাব তখন ফুটিয়া পড়িতেছিল, সুন্দর ব্রহ্মরূপে তুমি নিমগ্ন হইয়াছিলে। নারী যদি এই রূপ লইয়া সর্বত্র বিচরণ করেন, পৃথিবীতে আর পাপ ভিত্তিতে পারে না। হাতে ভিক্ষার কুণ্ডল সেইরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। কেহ বা সিঁদা, কেহ বা পয়সা দান করিলেন। উপাসনার পর প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে আমাদের ডাকিয়া হাতে সোনার বালা দেখাইলেন। যখন তুমি অলঙ্কার ও কেশভ্যাগ করিয়া সন্ধ্যাসিনী হও, তার পর একদিন আমি বলিয়াছিলাম, "সকলই তো হইল, এখন আবার কেশ রাখ।" তুমি বলিয়াছিলে, "আর কেশ বড় করিতে পারিব না, বড় ভার বোধ হয়।" আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, "তবে অলঙ্কার পর।" তুমি তখন বলিয়াছিলে, "আচ্ছা, একদিন পরিব।" আজ উপযুক্ত সময়ে, ভিগারিণী বেশধারণের আব্যবহিত পরে তোমার সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে। ভিক্ষা প্রস্তুত হইল, আনন্দে সকলে আহার করিলেন। তারপর তোমার শেষ আনন্দবাজার করিলে। দোকানগুলি বেশ চলিল। নিয়ম করিয়াছিলে যে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য নির্দিষ্ট থাকিবে; পরস্পর কেনা-বেচা কবিবে কিন্তু মূল্য চাহিতে পারিবে না। পান ও সরবৎ বেচিয়া অনেক লাভ হইয়াছিল, তাহা হইতে সব খরচ কুলাইয়া যা কিছু ভূস-ভাঙ্গি হইয়াছিল তারও শোধ হইল। ২৭শে জামুয়ারী আশ্বিন বিবাহের উৎসব। এই দিনে রাজগৃহে তোমার আর আমার আশ্বার বিবাহ হইয়াছিল। বাৎসরিক

বাণীর মনের মানুষদের সঙ্গে একত্রে করিব, তাই খগোল গেলে। সমস্ত রাত্রি ভাল কথাবার্তার কাটিয়া গেল।

ইহার পর রাজগৃহ যাত্রা হইল। তুমি বলিলে "রাজীর স্বথের জন্ত প্রাণ, মন, অর্থ সব যেন দিতে পারি, পক্ষান্তে থাকিয়া। রাজগৃহে গিয়া দুই প্রহরে বেড়াইতে বাইতে। রাত্রিতে একাকী ব্রহ্মকুণ্ডে স্থান তোমার বড়ই ভাল লাগিল। পরে আমিও গিয়া স্থান করিলাম। যেন এই শেষ স্থান; সেই নিখল জল, পূর্ণিমার পর চতুর্থীর চন্দ্রের কিরণ বিস্তৃত জলে পড়িয়াছে; পাহাড় নীরব; এমন স্থানে মানুষের বাক-বিসম্বাদ হইতে বিদায় লইয়া ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইয়া শীতকালের রাতে স্থান,—ইহা সম্ভোগের বিষয়। তাই তুমি জিজ্ঞাসাছিলে, "উপযুক্ত ভালবাসায় নিম্মন সম্ভোগ।" সেই জলেই তুমি প্রার্থনা করিলে, "বাঁহা দ্বারা তোমাকে পাঠিয়াছি, কিছু কিছু শিখিয়াছি, তাঁকে যেন ভক্তি করিতে পারি।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধায় অমৃত বাবু মহাশয় সকালের উপাসনা তোমাকেই করিতে বসিলেন। তুমি অপ্রস্তুত, তবুও ভয় নাধা পাতিয়া গেলেন। তুমি অধিকার গাইয়া আবার আমাদের সবসঙ্গে এক এক স্বরূপে আরাধনা করিতে বসিলে। আমরা তিন জন তিন স্বরূপে আরাধনা করিলাম, বাকি সকল স্বরূপ তুমিই করিলে। খুব ভাল হইল।

রাজগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সঙ্গে একবার বিহটা গিয়াছিল। বিহটা হইতে শরীর ও মন ভাল করিয়া ফিরিলে। তোমার দৈনিকে জিজ্ঞাসাছ, "আজ বিহটা হইতে আসিলাম। দুইবার উপাসনা আজও হইয়াছে। খুব ভাল হইল। শাড়ী গুত্রের কাছে অনেক দুঃপ করিলেন,—আমি তাঁর কিছু করিতে পারি না। তাঁহার ধর্মও এক প্রতিবন্ধক। আমি পারি না বলিয়া স্বামীর একটু ক্রেশ হয়।" তবু তুমি তাঁহার সকল আবদার সহ্য করিতে। অস্ত্র যাইতে চাহিলে তুমি বাধা দিলে ও বলিতে, "হাঙার হউক, আমাদের মত মায়ের আর বেহ করিতে পারিবে না।" তোমার অন্তর্ধানের পর তিনি এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ৩৪ বার উপাসনা হইল। আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তুমি সামাজিক-উপাসনা গৃহেই করিলে। ২০ জন ছোট-বড় মেয়ে যোগ দিলেন। খুব ভাল উপাসনা। যোগীর শব্দার পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিলে যোগীর বিশেষ সেবা করা হয়। এ সেবায় যেন কেহ ব্যস্ত না হয়।

এই সময়ে তোমাকে যেমন নিয়মিত গুরুতর শ্রম করিতে হইতেছিল, তেমনি মানসিক অনেক সংগ্রামও বহন করিতে হইতেছিল। সে কথা আগামী পরিচ্ছেদে বলিব। আমার মনে হয়, তোমার শরীর এ সময়ে এত অসুস্থ হইয়া গিয়াছিল যে, এত শ্রম ও এত সংগ্রাম বহন তার পক্ষে অসম্ভব। অস্ত্রের সংগ্রাম সহিবাস জন্তও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বাহিরের কার্যভার বহনের জন্তও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। তোমার স্বাস্থ্য ইহার পূর্বেই ভিতরে ভিতরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মার্চ মাসে বোল্টন সাহেব চীফ সেক্রেটারী হইয়া কলিকাতায় বাইতেছিলেন। বাইবার পূর্বে তোমার প্রিয় মেয়েদের বিদ্যালয় দেখিতে আসিলেন। এক ঘণ্টা বহিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পরীক্ষা

করিলেন। মিঃ ডি. এন্ড মল্লিক ছিলেন, আমিও ছিলাম, এক কোণে তুমিও তোমার অপূর্ণ গোয়ালিনীর সাড়ী পরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। সাহেব আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন না; তোমার কাছে গিয়া বলিলেন, “বিভাগলয় দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিলাতে এবং ভারতবর্ষে এ সকল কাৰ কুমারী কিংবা বিধবারাই করিয়া থাকেন। স্বামী পুত্র লইয়া এত কাৰ হাতে লইয়াছেন, এমন আর দেখিতে পাই না।” তুমি বলিলে, মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া আপনি যে আমাদের এই সামান্য বিভাগলয় পরীক্ষার জন্য এত সম্মান দিলেন ও সন্তুষ্ট হইলেন, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।” এই কথা বলিয়াই এক প্রণাম করিলে। সেই পাদরী সাহেবের শেক-স্বাণ করার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলে বলিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিলে; সাহেবও নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

৮ই মার্চ মেয়েদের স্কুলের প্রাইজ হইল। সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বাহাদের চরিত্র খুব ভাল নয়, তাঁহারাও আসিয়াছিলেন, এই জন্য অনেকে চটিলেন। একটি বালিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেও অনেকের আপত্তি। তুমি কিন্তু ইহাতে দমিলে না। তুমি লিখিলে, “বতই বকুন কাজ কিন্তু ছাড়িব না, এই প্রতিজ্ঞা।” এই দুই ব্যাপারে তোমাকে যে পরিশ্রম করিতে হইল, তাহাতে শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল।

৩১শে মার্চের দিনকে লিখিয়াছ, “আজ স্কুল কমিটিতে কথা হইল, গবর্ণমেন্টকে বলা হইবে স্কুল হাতে লইতে। আজ গাড়ীর খরচের জন্য গবর্ণমেন্ট (special grant) ১৬৮ টাকা দিলেন। স্কুল বন্ধন আবদ্ধ করিয়াছিলাম তখন লিষ্টে ৫টি মেয়ে। কেবল প্রার্থনা ভরসা ছিল। আজ সেই প্রার্থনার ফলে স্কুলে প্রায় ৪০টি মেয়ে। অপরিচিত বাবুরা আসিয়া কার্যভার লইয়াছেন; আমাদের অবসর দিতে চান; টাকা অনেক; এখন স্কুল ধনী। এ সকলই প্রার্থনার ফল। তাই বলি, মা আমার আরও প্রার্থনাশীল কর, আরও বিশ্বাসী কর। এই ভিক্ষা চাই, পরিবারকেও বিশ্বাসী কর।”

৫ই এপ্রিল ১৮৯৬ আমাদের প্রিয় ব্রজগোপাল সংসার ত্যাগ ও প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিলেন। তোমার উপাসনা-পুঁহে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। তুমি ও আমি আশীর্বাদ করিলাম।

২০শে এপ্রিল কথার কথায় জীমান্ সুবোধচন্দ্রের বিবাহের কথা উঠিল। তুমি বলিলে, বিলাতে বাইবার পূর্বে যদি সুবোধ বিবাহ করিতে চাহেন, তাহা হইলে বারণ করিবে। কি আশ্চর্য! কোথাও কিছু নাই, টাকার সঙ্গতি নাই, অথচ মনে মনে তুমি ঠিক করিয়াছ, সুবোধ বিলাত বাইবে। বিশ্বাসী লোক আশ্চর্য্যমানে বানায় ঘর! দেখি, তোমার সে সাধও পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল জীযুক্ত উমাচরণ সেনের কন্ডার কলোরা হইল। সকলে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। তুমিও সেবা করিতে লাগিলে। একদিকে উমাচরণ বাবুর কন্ডার পীড়া, অন্যদিকে তাই বিহারীলাল ঘোষের কন্ডা হেমের সহিত মিঃ ডি. এন্ড মল্লিকের বিবাহ স্থির হইল। এ কন্ডার বিবাহের তার তুমিই গ্রহণ করিয়াছিলে। ১৫ই মে কন্ডার আইবুড়াভাত ও বরও কন্ডার দীক্ষা সম্পন্ন হইল। তার পরদিন বিবাহ। সেদিন সন্ধ্যার সময় ময়রা আসিয়া বলিল, তাহার পীড়া হইয়াছে, সে লুচি প্রস্তুত করিতে

পারিবে না। তখন অল্প বন্দোবস্ত করার সময় নাই। আমার ত্রিদিনের মস্তুর কাছ মজ্জা চাট্টিলাম। যতী বলিলেন, “ভাবিও না, আমড়াট কবিব।” উপস্থিত মেয়েদের সাধা-সাধনা করিলে; কিন্তু বিবাহ-সভা ত্যাগ করিয়া কে ছুট ভাজিতে আগুনের নিকট দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকে? অবশেষে কি করিবে, ভৃত্যকে উদ্বুদ্ধ প্রস্তুত করিতে বলিলে, এবং নিজেই ভাজিতে আরম্ভ করিলে। দুই শত লোকের জন্য লুচি প্রস্তুত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমার উৎসাহ অদম্য। বিবাহ শেষ হইতে না হইতে লুচি প্রস্তুত হইল, কেহ জানিতেও পারিল না যেমন, কোথা হইতে অথবা কে প্রস্তুত করিল।

রেজিষ্ট্রেশন শেষ হইতে না হইতে একটু কষ্টের ব্যাপার ঘটিল। সে বিষয় তোমার দৈনিক হইতে উদ্ভূত কবিতা দিতেছি। “ভাঙ্গার বাবুর বাটীতে আজ (১৬ই মে) তেমের বিবাহ। মেয়েদের আমাদের জন্য সাহেব জানাতার হাতে সিন্দুর দিয়া কন্যাকে পরাতে বাওয়া হয়। প্রদ্বৈ—বাবু—বাবুর উদ্ভেজনায় অধীর হইয়া নারীদের অপমাননূচক বসক দিয়া জানাতাকে বাহিরে দিয়া গান। বলেন, সিন্দুর পরান কুসংস্কার। আমার শান্তি-দেব হইল। আমি রাগ করিলাম, কারণ আমার জীবনে নারীকে নিরুস্থানে স্থান দিবার জন্য প্রাণপণ। বলিলাম, আপনারা আমার সিন্দুরের মত অনেক কুসংস্কার করিলেন। এই ঘটনায় বুকিলাম, এখনও নারীর স্থানের অনেক দেরী। এই বিষয়—বাবুকে বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মন গরম ছিল বলিয়া স্বামীর বারণ করিলেন; আর বলা হইল না।” সেদিনকার কথা আশ্রিত আমার মনে জাগিতেছে। এখন সভায় সকল কথা বলিবে বলিয়া আমার অহুমতি চাছিলে, তখন তোমার মুখ লাল এবং উত্তেজিত। যদি তুমি সভায় কিছু বলিতে, তাহা হইলে তার ফস ভাল হইত না। তাই আমি বলিলাম, ‘গোলা ধা ডালো’, আর তুমি সেই তপ্তগোলা হস্তম করিয়া ফেলিলে। তখন কথা উঠিল বৌ-ভাত কবে হইবে। বিবাহের পরদিনই বৌ-ভাত হইলে উপযুক্ত পরিপরিশ্রমে তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, আমি তাই আপত্তি করিলাম। তুমি বলিলে, বিলম্ব করিলে মল্লিক সাহেবের অনেক খরচ বাড়িবে। পরদিনই করা উচিত। আপনাকে হারাইয়া পরের মঙ্গলে জীবন দেওয়া তোমার পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছিল। তোমারই জয় হইল, সিন্দু হইল পরদিন বৌ-ভাত হইবে।

বিবাহ-রাত্রির সকল ব্যাপারের বর্ণনা এখনও স্মরণ নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহ্বানের পর তুমি জানিতে পারিলে যে, উমাচরণ বাবু কিংবা তাহার স্ত্রী বিবাহে আসেন নাই। তৎক্ষণাৎ খালাস খাওয়া সন্মুখিত করিয়া তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলে। কিন্তু গাড়ী পাঠান হয় নাই বলিয়া তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং খাড়া দি ফেরত পাঠাইলেন ও পত্র লিখিলেন, বতক্ষণ এ অপমানের পূর্ণ কৈফিয়ৎ না পান, বিবাহের সামগ্রী লইবেন না! কোন বাটীতে গাড়ী পাঠান হয় নাই, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ ছিল না। বাহা হউক, রাত্রি ১১টার সময় তোমাকে লইয়া হাঁটিয়া নিজ বাটীতে চলিলাম। পশ্চিমধ্যে উমাচরণ বাবুর বাটী; তখনও তাহার শয়ন করেন নাই। দেখিবামাত্র তুমি বলিয়া উঠিলে, “দাঁড়াও, আমি একটা মজা করিয়া

আসি।" এই বলিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়া উমাচরণ বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলে। অপমানের কোনও কথা উল্লেখ করিলে না। পীড়িত কণ্ঠের জন্ত রাগি জাগরণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে। তিনি বলিলেন, "আজ তো আর কোনও বন্দোবস্ত নাই, খোকার মাতা ও আমি রাতি ভাগরণ করিব। যাবা তুমি দিন রাতি জাগরণের জন্ত আসিতেন, তাঁরা আজ সকলেই বিবাহে গিয়াছেন। যদি তুমি বঁটা পত্র কেহ থাকিতেন, তাতা হইলে সহজ হইত।" তুমি—"আমাকে কীকাস করিয়া তুমি বঁটা সেবা করিতে দিন।" তিনি—"আপনাকে পাঠিলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" তুমি বলিলে, "খোকার মাকে শয়ন করিতে বলুন, কণ্ঠের নিকট আমি জাগিতেছি।" রাতিতে আসিয়া আমাকে গুতে বাঠিতে বলিলে। তুমি পূর্ণা পাত্রেই দোণীর শয্যাপার্শ্বে সেবা করিতে বলিলে। সারা দিনের এত পরিশ্রমের পরও সে রাতিতে দুইটার পূর্বে বাটা গিয়া শয়ন করিতে পারিলে না।

১৭ই মে বৌভাত হইল। তোমার দৈনিকে লেগা আছে, "আজ কেমেব বাটিতে সকলের নিদ্রাশ্রম! আমি, হেম, জামাতা, প্রকাশ এক গাড়ীতে বাইরেছিলাম। জামাতা গত রজনীর কথা তুলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছে। আগে সকল তব জানিলে আমি সিদ্ধ দিতাম। আজ দিব।" আমি বলিলাম, "আর দিতে হইবে না; কারণ কাল মেঘেরে আনন্দ বর্ধনের জন্ত বলিয়াছিলাম। আমি নিজে প্রায় ৩০ বৎসর সিদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছি, বিপদা সাঙ্গিয়া থাকি। এ অবস্থায় যখন আমাকে কুসংস্কারাপন্ন মনে করা হইল, তখন আমি আর সে বিষয়ে আলোচনা করিব না। কিন্তু নারীর অপমানের জন্ত এখনও আমার মন অপমানিত। যদি একজন ইউরোপীয়ান নারী হইতেন, তবে কখনও এ ব্যবস্থা হইত না। যাক।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে মল্লিক সাহেবের বাগ্মালায় উপস্থিত হইলে। মেঘেরা পূর্বেই গিয়াছিলেন। কথা ছিল, ১১টার উপাসনা আরম্ভ হইবে ও ১১টার আহার হইবে। বাবুরা সন্দেশ করিতেছিলেন যে, ইহা হইয়া উঠিবে কি না। তুমি কিন্তু নির্ভর। ৮টা উঠুন জালিলে, একেবারে ৮ স্থানে বাগ্মা আন্ত হইল। সকাল ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে সমুদয় বাগ্মা প্রস্তুত করিয়া উপাসনা বসিবামাত্র তুমি যোগ দিলে। ১১টার কিঞ্চিৎ পরেই গরম পোলাও সকলের পাতে পড়িল। পরাধামে তোমার এই শেষ রন্ধন, এই শেষ বৌভাত খাওয়ান হইয়া গেল।

এই পরিশ্রমের পর তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তোমাকে লইয়া খগোল যাত্রা করিলাম। সেখানে কেবল উপাসনা ও ভাল কথা হইবে, বিশুদ্ধ বায়ুতে তোমার শরীর সুস্থ হইবে, এই আশা। Canalএর ধারে একটি বাগ্মালায় অবস্থিত করিতে লাগিলে। সকালে সন্ধ্যায় বেড়ান হইত, যখন অবকাশ হইত ভাল কথা বলিতে। ২১শে ও ২২শে মে বক্সী বাবুর ও খেলাত বাবুর বাটিতে উপাসনা করিয়া ২৩শে বাঁকিপুরে কিরিলে। ২৪শে মে বাঁকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাসরিক হইল। ২৫শে মে মোকামার ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে। আর দেখে খগোল ও মোকামায় যাবেনা হইল না। এবারকার সাক্ষাৎ কিছু বাস্তবাবে পরিচয় দিয়াছিল। যখন কেহ অনেক

দূরদেশে যাত্রার উদ্ভাগ করে, তখনকার দেখা-সাক্ষাৎ ব্যস্ততারই পরিচয় দেয়।

## চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুছায়ায় উপত্যকা

খোকা যেন তোমার জীবনের উপর পরলোকের ছায়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৬ সালের যে কয়েক মাস তুমি দেখে ছিলে, দেহের সহিত সংগ্রাম করিতে করিয়াছিলে, তাহা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। শরীর তোমাকে মুক্তি দিবার পূর্বে আর একবার যেন শেষ দেখা দিয়া গেল; আর একবার তোমার দৃষ্টির সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার রচনা করিল।

১৫ই জানুয়ারী আমায় সঙ্গে তুমি নাসরীগঞ্জে গিয়াছিলে। সে সময়ে দেখিয়াছিলাম, একত্র অবস্থান সম্বন্ধে শরীরের অধিকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আমার দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, "আজি বাগ্মা-উপাসনা খুব ভাল হইল। নির্কাশ এখনও লাভ হয় নাই। শরীরের অভাব এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের ভোগের জন্ত এখনও মন থাকিল হয়। কেন তাহা হইবে? "রী" নামে অধোগত ডাকিলাম, বড় মিষ্ট লাগিল। পবিত্র ভাব বন্ধা বিস্ময়ে "রী" সাহায্য করিলেন।" ১১শে ফেব্রুয়ারী তুমি আমার সঙ্গে ফুতুয়া গেল। সে-দিনকার দৈনিকে এইরূপ লিখিয়াছিলে— "আজও ২ বার উপাসনা চলিতেছে। প্রার্থনা আরও দর্শন উজ্জ্বল কর। তোমার সন্তানকে দেখি, তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি, এই সংসারেই তুমি দেখা দেও।" ঐ দিন সন্ধ্যায় সময় তোমাকে লইয়া বেড়াইতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হইল। অনেক সময় নির্জন পাইলে এতরূপ বেড়াইতে ভালবাসিতে ও অনেক কথা বলিতে ও শুনিতে। তোমার কোন দোষ থাকিলে তাহাও তখন বলিতাম। তাই দৈনিকে লিখিয়াছি, "শরীরে এখনও সন্দেহ আছে। এ শেষ গেল যামিনী স্থখী হন।"

ইহার পর ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমি এই ব্রত লইয়াছিলাম, যে কোনও কারণেই তোমার শরীর স্পর্শ করিব না। তাহাতেও যদি ভাসবাসা থাকে তবেই বুঝিব যে স্থায়ী ভাসবাসা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে তোমার শরীর এমন ভগ্ন হইয়াছে যে এখন এ ব্রত রক্ষা করা কঠিন হইবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তোমার পেটে একটা ব্যথা হইল। সে দিনের বিষয় তোমার দৈনিকে লিখিয়াছি, "আজ পেটে বড় বেদনা উঠিয়াছিল। স্বামীর সন্তানদের ডাকিয়া সাহায্য করিতে বসিলেন, তাহা নিলাম না। কারণ সংসারে স্ত্রীতে দুঃখে একজননের সাহায্যই নেব বলেছিলাম। তাই যদি ভগবান মানা করিলেন তবে তিনি ছাড়া আর কাহারও সাহায্য নেব না। ১১টা পর্যন্ত যন্ত্রণার পর নিদ্রা আসিল। আমার পড়িবার ভয়ে স্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন না।" কেহ যদি আমার দৈনিক পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, সচেতন হইয়াও সে রাতিতে আমি অচেতন পাথরের মত পড়িয়াছিলাম। যে ব্রত লইয়াছিলাম, যদি তোমার সেবা ও আদর করিতাম, তাহা হইলে সে ব্রত ভাঙ্গিয়া বাইত। স্পর্শ করিব না অথচ নিকটে থাকিব, আমার কপালে সেই সাধন পড়িয়াছিল। তুমিও ক্ষুব্ধ হইলে, আমিও নিরাশ্রয়ের মত চারিদিকে



পূর্বেরই বলিয়াছি, ২৭শে মে আমি বিহারে বাই, ও ২৯শে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তোমার একটু খর হইয়াছে। আসিবার পরেই ছোট উপাসনা হইল। ছোট হইল বটে, কিন্তু তোমার মিত্র লাগিল। দিনের বেলায় বিশ্রাম করিলে, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বে আর স্থির থাকিতে পারিলে না। সেবাই তোমার নিকট বিশ্রাম বোধ হইত। সন্ধ্যার পর করুণার মাতার সঙ্গে দেখা করিলে। শ্রীযান্ শ্রীশচন্দ্রের মেয়ে পাঁড়িত, তাহাকে দেখিয়া আসিলে। অসুস্থ শরীরেও আপনার নিত্যকৰ্ম করিয়া মৃত্যুশয্যা শয়ন করিলে। রাত্রে বেশ খর ফুটিল। ৩০শে মে প্রাতঃকালে খর গায়ে নীচের ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। ষাটি বিশ্রামের অন্ত প্রার্থনা করিলে। সেই দিন বুঝিলাম তোমার মহাপ্রয়াণ অন্তিম নিকটে। আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তুমি আমি বোম্বাই বেড়াইতে যাইব, স্থির ছিল; পাথের সঙ্গ্রহ হইয়াছিল; বোম্বাই সহরে একটি ছোট বাড়ীও ঠিক হইয়াছিল, ছুটিও পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিবাহত্যাগ বিধান ভিন্ন প্রকার।

১লা জুন তোমার বড় ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ঐ ঘোড়া বিভাগের জন্ত ক্রয় করিয়াছিলে। নিজের অর্থে ঘোড়া কিনিয়া তিন বৎসর ধরিয়া জ্বলের গাড়ী চালাইলে। তোমার রোগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমার বাহিরে কাষে বাওয়া হইল না। ২রা জুন রাত্রিতে একাকী সেবা করিলাম। আমারও শরীর অপটু; দুই বার পড়িয়া গেলাম। মোকামা হইতে কত্মা নুসারকে আনান হইল।

৩রা জুন ৬ট প্রহরে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে পায়ের আঙ্গুলে বাতের ব্যথা মত ব্যথা হইয়াছিল। তারপর ঐ ব্যথা বুক পর্যন্ত আসিয়া শ্বাস বন্ধ হইতে আরম্ভ হইল। সকলে বলিতে লাগিল Endocarditis হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নাকি ফুলিয়াছিল। নিঃশ্বাস ফেলিতে মাঝে মাঝে এত কষ্ট বোধ হইতেছিল যে প্রত্যেক আক্রমণে আমাদের মনে হইতেছিল বৃষ্টি ঐকবার প্রাণ যায়। দুই প্রহরের পর একবার প্রবল প্রকোপ হওয়াতে তুমিও মনে করিলে, এই শেষ। দেহভ্যাগে পাছে কাহারও ক্ষতি হয়, এই ভয়ে সেই কষ্টের সময়ও আমার পানে তাকাইয়া বলিলে, “নস্কর হিসাবে গোল, আর কোথাও গোল নাই,—বসু।” সংসারের হিসাবপত্রের বিষয়ে এই শেষ কথা বলিলে। পরে যখন উঁহাদের বিল আসিস হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বুরিলাম, তোমার কথাটি ঠিক। বিলের হিসাব কাটিতে হইল। “বসু” কথাটির কত অর্থ! পৃথিবীর দেনা-পাওনা ফুগাইল। আর টাকা-কড়ির হিসাব রাখিতে হইবে না, এই শেষ হইল।

প্রথম হঠাৎই বন্ধুর সাহায্য করিতে লাগিলেন, রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। অ্যুস্কট উমাচরণ সেন মহাশয় প্রধান ভার লইলেন। সেই বিবাহের রাত্রিতে তোমার ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দুজনা পুরুষ ও একজন নারী দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ধনীরাও এত বহু পান কি না সন্দেহ। পোড়ার সময় কত লীলা হইল, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছিল। উমাচরণ বাবু সঙ্গ তোমার বিশেষ সখ্য হইয়াছিল। তাঁহার গোপাগুলি পোড়ার ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। নিঃশ্বাস বন্ধ হইলে তোমাকে ধরিয়া উঠাইতে হইতেছিল। পরিচারিকাগণ একবার কাছান্তরে অস্ত্র ঘরে গিয়াছেন, এমন সময় নিঃশ্বাস বন্ধের ফিট উপস্থিত। তুমি “উঠাও, উঠাও” বলিতে লাগিলে। তুমি নারী, উমাচরণ বাবু একমাত্র পুরুষ গৃহে। কিরূপে ধরিয়া উঠাইবেন, ইত্যন্তঃ কবিত্তেছিলেন। তুমি তখনই তাঁহার সঙ্কট বৃত্তিতে পারিলে, এবং বলিলে, “এইরূপে কি সেবা করিবেন? আপনি যে আমার বাবা!” যেমন বলা, তেমনি তিনি ধরিয়া উঠাইলেন। কি আশ্চর্য! এমন যত্নপার সময়ও প্রভাত্যপন্নমতি হইল না। যা বলিলে কাছোচ্চার হয়, তাহাই বলিলে।

৫ই জুন রোগ পরীক্ষার জন্ত ডাক্তার শূর্য বাবুকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন, “বিউম্যাটিজম ‘ব দি হাট।’” কাহার চিকিৎসা হইবে এ কথা উঠিলে জুমি পরেশের উপর ভার দিলে; আমিও তোমার মতে মত দিলাম। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিতে লাগিলেন। তুমি দৃঢ়ভাবে বলিলে, “যদি বাঁচিতে হয় দাদার হাতে বাঁচিব, যদি মরিতে হয় দাদার হাতে মরিব।” চিকিৎসকের হাতে কিরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেল।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক স্থির করিয়াছিল। যখন একবার স্থির হইল, যখন একবার “ডাক্তার ভাই” বলিয়া স্বীকার করিলে, বিশ্বাসীর মত শেষ পর্যন্ত অটল রহিলে। একবারও চিকিৎসার প্রণালী কিংবা ঔষধ অস্বীকার কর নাই। ধর্মনিষ্ঠ চিকিৎসক যখন ধর্মপরায়ণ হইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন তখন তাহার অপূর্ণ শ্রী হয়। তুমি পরেশের মধ্যে এই ধর্মভাবের অবতারণা বৃত্তিতে পারিতে, তাই তাঁহার প্রতি এত অটল ভক্তি। স্মরণ্য তাঁহারই চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

জুন মাসের গরম, তার উপর আমাদের বাড়ীর উপরের একহারা ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দিকে তোমার হৃৎরোগ, কাষেই তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে লাগিল। পরেশ তোমাকে তাঁহার বাতলায় লইয়া বাইতে চাহিলেন। এই প্রস্তাবে তোমার সম্মতি হইল না। আপনার বাটার স্মৃতি তোমার ধর্মজীবনের সঙ্গে জড়িত, সহসা সে স্থান ছাড়িতে চাহিলে না। যদি মরিতে হয় তাহা হইলে আপনার গৃহে দেহভ্যাগ করাই ভাল, এই তোমার মনের ভাব।

তোমার আসন্ন তিরোভাব তুমি বৃত্তিতে পারিতেছিলে, নহিলে ৭ই জুন রাত্রি দুই প্রহরে কেন বলিলে, “সব গোপন কছেন, আমি কিছু ভাল নাই।” সহরের লোকেরা তোমার পীড়ার কথা জানিলেন। ৯ই জুন গুরুপ্রসাদ বাবু ও লোকনাথ বাবু তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ১০ই জুন রোগ খুব বাড়িল। পরেশ সমস্ত রাত্রি জাগিলেন। রোগের লক্ষণ দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে বসিয়া বলিতেছিলেন, “যদি এবার উদ্ধার হন, অকস্মাৎ হইয়া থাকিতে হইবে।” তোমার কানে একটু আওরাজ গিয়াছিল; তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, “দাদা কি বলিতেছেন?” অগত্যা আমি বলিলাম; শুনিয়া তুমি বলিলে, “তবে বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক কি?” তোমার চক্ষে ক্ষীণ ও সেবা এক হইয়াছিল। পলু হইয়া পড়িয়া থাকা তোমার চক্ষে অসম্ভব মনে হইত।

১১ই জুনের ভোরবেলা পরেশ তোমার কষ্ট দেখিয়া আবার তাঁহার গৃহে লইয়া বাইবার অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে এইবার তুমি পরাস্ত হইলে। যখন বাইতেই হইল তখন অসার গৃহানুরাগ রাখিয়া ফল কি? তুমি স্বীকার করিলে। তোমার সম্মতি পাইবামাত্র আমি গৃহান্তরে পরেশকে বলিতে বাইতেছিলাম, এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া বলিলে, “বোস, বোস, তোমার মত কি?” এমন যত্নপার সময়ও আমার মত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলে না। অতি প্রভাবে পালকী করিয়া তোমাকে পরেশের বাটিতে লইয়া গেলাম সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মল্লিক ছিলেন, অজ্ঞাত বন্ধুবাও ছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু তাঁহার বাটাও দিতে চাহিয়াছিলেন। পরেশের বাটিতে সর্বোৎকৃষ্ট পশ্চিমের ঘরে তোমার স্থান হইল। নূতন নূতন সেবা উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার নিঃবাটিতে সেবকদিগের আহার হইত, আর তাঁহারা পালা করিঃ দিবানিশি তোমার সেবার নিযুক্ত থাকিতেন।

১১ই সমস্ত দিন ভালই গেল। রোগের কষ্ট ছিল না ছটকটানি, বৃকের ব্যথা, পিটের ব্যথা কিছুই ছিল না। এত নিঃ হইল যে সেবকদিগের অধিক ক্লেশ হইল না। আমিও নিদ্রা বাইতে পারিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইয়া তোমার শয্যাপা

বসিয়া উপাসনা করিলাম। অলক্ষণস্থায়ী উপাসনা; বাহ্যতে তোমার কষ্ট না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল, তুমিও শান্ত ছিলে। ১২ই জুনও তুমি বিশ্বাসের জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলে। রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল, অব ১০২ পর্যন্ত উঠিয়াছিল, শেষ রাত্রে ছটকট করিয়াছিল। অপরাহ্ন বন্ধ ডাক্তার নৃত্যগোপাল বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা মন্দ নয়।

১৩ই জুন প্রাতে তোমার শয্যার পার্শ্বে উপাসনা করিলাম, তুমি আবার বিশ্বাসের জ্ঞান প্রার্থনা করিলে। সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ সুল্লর সিং সেবার্থী হইয়া তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; তুমি আমাকে ডাকিলে ও বলিলে, “যদি তাঁহাকে সেবা করিতে না দেও, তাঁহার ক্রেশ হইবে। একটা কিছু কর।” তোমার রোগের ক্রেশ ভুলিয়া গেলে; সুল্লর সিংহের ক্রেশ না হয় এই চিন্তা প্রবল হইল। শুশ্রূষার জ্ঞান আর অধিক লোকের প্রয়োজন ছিল না, তাই তাঁহাকে বেদনা আনিতে মিঠাপুর পাঠাইলাম। শ্রীমান্ শ্রীশঙ্করের সন্তানের আর ছাড়িতেছে না; আমাকে ডাকিয়া বলিলে, “আমাদের উপরের ঘর তাকে ছাড়িয়া দাও।” ইহার পূর্বেই তাঁহার আমাদের উপরের ঘরে আসিয়াছেন, শুনিয়া অভ্যস্ত সুখী হইলে। যেন দ্রব হইতে একটা মহা বোঝা নামিয়া গেল। শেষরাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি পাইল। আমার পক্ষে ঐখ্য রক্ষা করা কঠিন হইতে লাগিল। কত চক্ষের জল পড়িল।

১৩ই জুন রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় তুমি বলিলে, “মায়ের কাছে যাব, আর দেবী কহতে পারছি না। সুবোধ, অসত্য পথে যেও না। তোমাদের জন্ত কিছু রেখে গেলাম না; এই সত্য নিও। আমার জন্ত কেঁদে না। দেখ আমি কাঁদছি না। সেদিন চোখ জল এদেছিল বলে এ কয় দিন দেবী হ’ল।”

১৪ই রবিবার আবার উপাসনায় যোগ দিলে, কিন্তু আজ যন্ত্রণা তোমায় শান্ত থাকিতে দিল না। প্রার্থনা যেমন তেমনই করিলে। যতই তোমার কষ্ট বাড়িতে লাগিল, ততই যেন আমার কাঁটার মুকুট বড় বড় কাঁটায়ুক্ত হইয়া বিদ্ধ হইতে লাগিল; যেন আর সহ করা যায় না। রবিবার সমাজের উপাসনা করিতে যাইতে হইবে; তোমার নিকট অনুমতি চাহিলাম, তুমি বিদায় দিলে, খাব বলিলে, “অবশ্যই যাইবে” শুধু আমাকে নয়, মোকামার দিকিকেও সমাজে যাইতে বলিলে। বলিলে, “যদি আপনি সমাজে না যান তাহা হইলে আপনার হাতে ঔষধ পাইব না।”

১৫ই জুন তোমার যাত্রার দিন। ঐ দিনের প্রভাত হইবার পূর্বে (রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময়) তুমি বলিলে, বক্সী বাবু! কে তুমি, সুবোধ? জিজ্ঞাসা কর বক্সী বাবুকে, ৪টার গাড়ী চলে গেছে? আমার অসুখ আর সারবে না। আমি তো কোথাও যাব না। কোথায় যাব? সংসার আমার যত্নের জিনিস। ও মেনার বাবা (বক্সী বাবু) ও শুকুমারীর বাবা (খেলাত বাবু), তোমরা নহি স্নততে হো কি চার বজেকে গাড়িতে যাব। কে তুমি? মণি? ১৫ই প্রভাতে যখন ভাই খেলাতচন্দ্র আসিলেন, তাঁহার আগমনের কথা বলিলামাত্র তুমি বলিলে, “কেন? আমি তো এই যাত্রা খগোলে গিয়াছিলাম। এই তো দেখা করিয়া আসিলাম।”

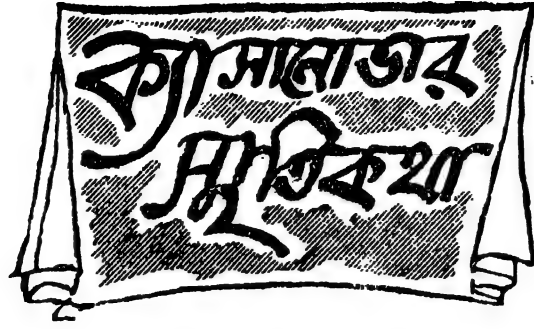
বেলা ৭টার সময় উপাসনা করিতে তোমার শয্যার পার্শ্বে সকলে একত্রিত হইলেন। তুমি তোমাকে ঘূরাইয়া দিতে বলিলে, বাহ্যতে সকলকে দেখিতে পাও। তোমার ইচ্ছামত তোমাকে শোয়ান হইল। তুমি পৃথিবীতে শেষ প্রার্থনা করিলে, “যেন বিশ্বাসের শেষ পরিচয় দিয়া বাইতে পারি।” প্রার্থনা ছোট, কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবে বলিলে। সকালেই নাড়ী ক্ষীণ দেখিয়া মনে সন্দেহ হইতেছিল। তখন সকালে আফিস হইত। আফিসে বাইবার পূর্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, তুমি বলিলে আচ্ছা। আমার চক্ষু জল দেখিয়া তুমি বলিলে, “কাঁদছ?” এই এক কথায় অনেক কথা বলা হইল। বিয়োগ তো কিছু নয়; তুমি আমার কাছে কাছেই থাকিবে; ইচ্ছা হইলেই দেখিতে পাইব, তবে কাঁদিব কেন? আমিও তোমার কথা শুনিলাম; চক্ষের জল পুঁছিয়া ফেলিলাম, ও রাজকাৰ্য্য করিতে গেলাম।

দুই প্রহরের পূর্বেই তুমি সকলকে আহ্বান করিয়া আসিতে বলিলে। লতু ও পাঁড়েরাইন ও আর সকলকে ডাকাইয়া আনিলাম। সুসারকে ডাকিয়া তাঁহার ক্রোড়ে নিজ মস্তক রাখিলে, যেন আপনার সকল ভার তাঁহাকে অর্পণ করিলে। সুসারও তোমার অর্পিত ভার আজীবন বহন করিয়া গেলেন। ভাই পরেশ বাবুরে বোগী দেখিতে গিয়াছিলেন; প্রায় একটার সময় বাড়ী আসিয়াই প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেমন আছেন?” তখন বোধ হয় তোমার শেষ বাতনা উপস্থিত হইয়াছে; তবু তুমি বলিলে, “এখন বলিব না, আহ্বান করিয়া আসুন, তারপর বলিব।” কি অপরের দিকে দৃষ্টি! ১১টার সময় আমি ঔষধ দিলাম, তুমি পান করিলে। তারপরই ডাক্তার স্বর্ধ্য বাবু আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “ঔষধ দেওয়া বুঝা।” কেহ নাম করে না দেখিয়া আমিই মাতৃস্বোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; আর সকলে যোগ দিলেন। মনে হইল তুমিও যোগ দিতেছিলে। যেন ওষ্ঠ নড়িতেছিল। ২-১২ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলে।

উত্তর-পশ্চিমের কুঠরীতে তোমার দেহ রাখা হইল। চতুর্দিকে আমরা বসিয়া উপাসনা করিলাম। সুবোধ ও সুসারও প্রার্থনা করিলেন। তারপর তোমার দেহের ফটো লওয়া হইল। তোমার দেহ নয়াটোলা বাড়ীতে আনয়ন করা গেল। পল্লীর বত দরিদ্র লোক (অধিকাংশই জীলোক) তোমার দেহকে ঘিরিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। উপাসনার ঘরের কাছে নামাইয়া আবার প্রার্থন করা হইল। তারপর ৪টার সময় দেহ তীব্র করা হইল। সঙ্গে অনেক ভক্তলোক গিয়াছিলেন। সুসার ও লতুও গিয়াছিলেন। তোমার শেষশয্যা প্রস্তুত হইল। তোমার এই পুরাতন বন্ধু ও সেবক তোমার দেহের শেষকাৰ্য্য করিল। তোমার জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া অর্চনা করিলাম। রাত্রি ১টার সময় আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পৃথিবীর জীবন এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু তোমার অমর আত্মা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় নহে। এখান হইতে যে প্রেম, নিঃস্বার্থ ভাল ও পরহিতকামনা অর্জন করিয়াছিলে, অমরধানে তাহা বড়ই প্রয়োজন, তাই তুমি সে সকলে সুসজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলে।

সমাপ্ত



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

—“ম্যাসিমে জ ভলন্তের আর আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন—গত বিশ বছর ধরে আমি আপনার শিষ্য গ্রহণ করেছি। আজ শুক্ল চাক্ষুশ দর্শনে, তাঁকে প্রজ্ঞাবলি নিবেদন করতে পেরে আমি ধন্য”—

—“এই শিষ্যত্বের পরমাণু আরও বিশ বছর স্থায়ী হোক—আশা করি, তারপর আমার গুরুদক্ষিণাটা থেকে বঞ্চিত হবো না—”

—“সর্গীভূতঃকরণে সম্মত—অবশ্য যদি তত দিন আমার জন্তে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন”—

আমাদের এই ভলন্তেরীয় বাকচ্যুতীতে সকলেই হেসে উঠলেন। আমি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত ছিলাম না। কারণ ভলন্তেরীর সঙ্গে এই ধরনের আলাপই আমি আশা করছিলাম। ভলন্তেরীর আমাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যখন ভেনিসের লোক তখন কাউন্ট আলগারোত্তিকে চিনি কি না?

—“সাত বছর আগে যখন পাদুয়াতে ছিলাম চিনতাম। আর ঠিক ঠিক একটি জিনিষ আমাকে মুগ্ধ করেছিলো—সেটি তোলা আপনার প্রতি ঠিক অসীম শ্রদ্ধা”—

—“আমাকে বড় বাড়াচ্ছেন—উনি যে সকলের শ্রদ্ধেয় সেটা নিশ্চয়ই বিশেষ একজনের প্রতি ঠিক শ্রদ্ধা আর প্রশংসার জন্ত নয়।”

—“ঠিক শুই কারণেই উনি নাম করেছেন। নিউটনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রশংসা আর প্রশংসা করেই উনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।”

—“আচ্ছা ইতালীয়রা ঠিক রচনাশৈলী পছন্দ করে?”

—“না, কারণ বিভিন্ন ভাষার রচনাশৈলীর প্রভাব আর আধিক্য ঠিক রচনায় পূর্ণ।”

—“কিন্তু ইতালীয় সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের ভাব আর প্রকাশভঙ্গী তে অভাব দেখি না—”

—“হ্যাঁ আমাদের সাহিত্যকে ওইতেই নষ্ট করেছে। যেমন ফরাসী ভাষার মধ্যেও ইতালী আর জার্মান সাহিত্যের প্রভাব আর তাদের রচনাশৈলীর অনুকরণ খুব বেশী দেখি, এমন কি ম্যাসিমে জ ভলন্তেরীরও যদি এমন ভাবে লেখেন তাহলেও সেটা উপভোগ্য হবে না একটুও—”

—“ঠিকই বলেছেন। সাহিত্যের সব চেয়ে বড় জিনিষ হোলো ভাষার পবিত্রতা। আচ্ছা জানতে পারি কি, কোন ধরনের সাহিত্যে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন?”

—“বিশেষ কোনটিতেই নয়। কিন্তু আমি প্রচুর পড়ি আ ভ্রমণ করি মানুষের চরিত্রের স্বরূপ জানতে আর ব্যুত।

—“হ্যাঁ এ ভাবেও শেখা যায়—তবে বইএর প্রয়োজন সবার বেশী। অবশ্য সবচেয়ে সহজ উপায় হোলো ইতিহাসের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়।”

—“ঠিক, যদি অবশ্য ইতিহাস মিথ্যা না বলে, তাছাড়া ইতিহাসে থাকে বিবজিকর একঘেয়েমি, রসপিপাসু চিত্তকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই—অথচ বাষাবরের মত দেশ থেকে বিদেশে...পথ থেকে বিপথে চলতে চলতেই তো দেখা যায় বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্রের লীলা বয়ে যায়...”

—“আপনি বুদ্ধি কবিতার অনুরাগী?...?”

—“শুধু অনুরাগ? কবিতায় আমার সত্যার বিলোপ...”

—“আপনি কি অনেক সনেট লিখেছেন?”

—“গোটা বারো সনেট প্রকৃত রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করি, আর হাজার দুই তিন শুধু লিখেছি আর পরমুহূর্তে ভুলেছি—”

—“আপনাদের অর্থাৎ ইতালীয়দের সনেটের উপর একটা দারুণ ঝোক দেখা যায়...তবুও সনেটের ঐ নির্দিষ্ট লাইনের অনুশাসনের বন্ধনেও কবিতাগুলি যেন অথবা বিলম্বিত হয়ে চলতে থাকে। আমাদের ভাষার দোষেই বোধ হয় একটাও ভালো সনেট আমাদের ভাষায় নেই—”

—“ভাষার দোষ ছাড়াও ফরাসী সাহিত্যিক প্রতিভাও বেশ কিছুটা দারী। কারণ তাঁদের ধারণা, ভাবধারার বিস্তৃতিই কাব্যের গতি ব্যাহত করে তাকে নিশ্চল করে তোলে...”

—“আপনি কি তা মনে করেন না?”

—“মাফ করবেন, আমার মতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হোলো ভাবধারার নির্বাচন। কবিতার রস-সৌন্দর্য নির্ভর করে কোন ভাব বা কোন চিন্তার আধারে তার প্রকাশ তারই ভিতর...”

—“আপনার সবচেয়ে প্রিয় ইতালীয় কবি কে?”

—“আরিয়োস্ত। আমি যে তাঁকে আর সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসি, একথা বলতে পারি না—কারণ একমাত্র উনিই আমার প্রিয় কবি...ঐর সামনে আর সব কবিই নান, নিম্ন। বছর পনেরো আগে ঐর সম্বন্ধে আপনার লেখা পড়ে আমি ভবিষ্যদবাণী করেছিলাম যে আপনি যখন ঐর সমস্ত লেখা পড়বেন তখন আপনি বাধ্য হবেন আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে বদলাতে...”

—“হ্যাঁ, আমি তখন অল্পবয়সী ছিলাম, আপনাদের ভাষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও ছিলো ভাসা-ভাসা। তখন অল্পদের যথেষ্ট প্রভাব আমার উপর পড়ে। আর তাইতেই অনুপ্রাণিত হয়ে

আমি যে সমালোচনা লিখি...সেটা সে সময় আমার লেখা বলে মনে করলেও আসলে সেটা ছিলো তাদেরই কথার আর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। এখন কিন্তু আপনার আবিষ্কৃত আমারও প্রিয় কবি—

—“আঃ, মাসিয়ে ভলতেয়ার হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম আপনার কথায়! কিন্তু এবার কৃপা করে আপনার ঐ সব রচনাগুলি বাতিল করে দিন না—যাতে অতবড় একটা প্রতিভাকে শুধু উপহাস আর বিদ্রূপ করে গেছেন—”

—“কোনো চিন্তা নেই, তারা সব একদমই হয়েছে। এবার আমার একটা আবৃত্তি শুনুন, তাহলেই বুঝবেন...”

এই বলে ভলতেয়ার চতুর্দশ আর পঞ্চবিংশ সর্গ থেকে দুটি স্তব্ধ অংশ আবৃত্তি করে গেলেন, একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে... শেষ হোতে না হোতে আমি উদ্ভূসিত হয়ে চীৎকার করে উঠলাম এই বলে যে, সারা ইতালীর এই অনবদ্য আবৃত্তি শোনা উচিত ছিলো। প্রশংসাপ্রিয় ভলতেয়ার খুশী তোয়ে ওঁর রচিত কয়েকটি অংশের অনুবাদ আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন পরদিন।

ভলতেয়ারের ভাতুপুত্রী মাদাম দেনিস উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কাকা কবির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পঙ্ক্তি কয়টি আবৃত্তি করেছেন কি না।

—“হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বলা যায়, শ্রেষ্ঠতম বলা যায় না...”

—“আপনার মতে কোন পঙ্ক্তিগুলি শ্রেষ্ঠতম?”...ভলতেয়ারের প্রশ্ন।

—“রয়োবিশ পদ্যের শেষ পঙ্ক্তিগুলি। যেখানে ষ্ট্রীম বর্ণনা করছেন কেমন করে ‘বাস্‌গ্যা’ পাগল তোয়ে গেল...স্রষ্টার আদিম থেকে আজও এই অনন্ত পঙ্ক্তিগুলির ভুলনীয় কিছু রচিত হয়নি।”

—“মাসিয়ে ক্যামারাত্তা, এটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন কি?” মাদাম দেনিসের জল্পনা।

করলাম আবৃত্তি। বহন শেষ হোসো দেসি আমার চোখেই লল টলমল করছে...অবশ্যই কল্পনায় বেগ সুরুসকেই সামলাতে হচ্ছে... ভলতেয়ার ছুটে এসে আমার গলা ভড়িয়ে ধরলেন উদ্ভূসিত আবেগে।

—“আশ্চর্য্য! রোস্‌গার এই সঙ্গীতকে যোগ্য তার প্রাপ্য স্থান দেয় না!” মাদামের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর।

—“বোম কখনও একে ত্যাগিলা করেনি...”ভলতেয়ার বললেন। “দশম লিও গোড়াতেই তাদের বাতিল করে দিতেন বারাই এই রচনার বিপক সমালোচনা করতে যেত। তাছাড়া রীতিমত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হুসন সম্মানিত ব্যক্তি আবিষ্কৃত সর্বদা আগলে রাখতেন। তাঁদের সাহায্য আর আশ্রয় না পেলে ওঁকে অনেক নিগ্রহ সহ করতে হোত।...”

এইবার উপস্থিত কোনো ভুলসৌকের প্রস্তাবে ওঁর বাড়ীতে একটা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের কথা উঠলো। ভলতেয়ার আমাকে তাইতে অংশ গ্রহণ করতে অহুবেগ করলেন, জানালেন, তাহলে তিনি নিজের অংশ গ্রহণ করবেন। আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানালাম, কারণ পরদিনই আমি চলে যাচ্ছি। ভলতেয়ার আমার পরদিন চলে যাবার কথায় কানই দিলেন না—

—“আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন না আমার কথা শুনে এসেছিলেন?”

—“বলতে নিশ্চয়ই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হোসো আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে...”

—“তাহলে অন্তত: আরও তিন দিন থাকুন। প্রতিদিন আমার কাছে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো...আহারপর্কের সঙ্গে সঙ্গে চলেবে আমাদের আলাপ-আলোচনা...”

অস্বীকার করতে পারলান না, সবাইকে উভেচা জানিয়ে বাঁজের মত বিদায় নিলাম।

পরদিন সকালে ভলতেয়ারের সঙ্গে আহারপর্কের সময়, ভলতেয়ার তেনিসের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বার বার কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু ঐ প্রশ্ন উত্থাপনে আমার একান্ত অনিচ্ছা দেখে আর প্রশ্ন করলেন না। আমার হাত ধরে বাগানে বেড়াবার জন্তে উঠে এলেন। বাগানের এক প্রান্ত দিয়ে যেন নদী বয়ে চলেছে। নানা ধরণের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমরা শেষে বাড়ীতে এলাম। ওঁর সঙ্গে ওঁর শোবার ঘর অবধি আমি গেলাম। ভলতেয়ার মাথার পরচূলাটা খুলে টুপী মাথায় দিলেন। সহজেই ঠাণ্ডা লাগতো বলে উনি কখনও মাথা খালি রাখতেন না। একটা দেওয়াল খুলে ফেললেন—দেখলাম, তার ভিতর প্রায় শ'খানেক মোটা মোটা কাগজপত্রের দিক্কা।

—“ওসবগুলো কি জানেন? প্রায় হাজার পঞ্চাশেক চিঠি। ওগুলোর প্রত্যেকটার উত্তর কিন্তু আমি দিয়েছি”—

—“আপনার উত্তরগুলোর প্রতিলিপি রেখেছেন তো?”

—“আমার কণ্ঠচরীর উপরই ওসব রাখার ভার দেওয়া আছে।”

—“আমি যথেষ্ট প্রকাশক আর পুস্তক-বিক্রেতাকে জানি, যারা ওই অমূল্য সম্পদ পেলে যোগ্য দক্ষিণা দিতে এগুই প্রস্তুত—”

—“হ্যাঁ, কিন্তু ওঁদের থেকে সাবধান! যদি আপনি কোনো বই বা রচনা প্রকাশ করতে চান—আর বিশেষ করে আপনি যদি অখ্যাতনামা হন, তাহলেই সর্বনাশ! দেখবেন, তখন সব প্রকাশকেরাই ডাকাতের চেষ্টেও ভয় পাবে।”

—“যত দিন না বাক্কো পা দিচ্ছি তত দিন ওই সব ভয়মহোদয়দের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।”

—“তাহলে ওরাই হবে আপনার বাক্কোর চাবুক।”

তারপর আমরা আবার সালোতে ফিরে এলাম। সেখানে প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে ভলতেয়ারের আশ্চর্য্য নিপুণ বাগবৈদ্য আর উপেষণালিনী প্রতিভার পরিচয় সমস্ত শ্রোতাদেরই মুগ্ধ করে রাখলো—যদিও তার সঙ্গে ছিলো তাঁর অভাবজাত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি যা কাউকেই পরোয়া করতো না। কিন্তু ওর মিষ্টি হাসির আড়ালে সব ভয়, আর বিদ্রূপ ঢাকা পড়ে যেতো।

ভলতেয়ারের বাড়ীতে ছিলো সবার অব্যবহৃত ঘর। তেমন আহার্য্যের পরিবেশনেও ছিলো উদার মুক্তহস্তের পরিচয়। তখন ওঁর বয়স হবে ছেয়টি বছর আর বাৎসরিক আয় একশো বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। জনবব ছিলো, ভলতেয়ার ওর প্রকাশকদের ঠিকিয়ে নিজে ধনী হয়েছেন—কিন্তু আমলে তার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটতো। প্রকাশকরাই তাঁকে ঠাকাতো। অল্প তার ক্ষয় দায়ী ওর খ্যাতির মোহ। খ্যাতির প্রতি দুর্বলতা ওকে এমন পোষ বসেছিলো যে,



উনি অনেক সময় প্রকাশকদের শুধু এই সর্ভেই বই দিতেন যে, সেগুলি ছাপা হবে আর ভালোভাবে চালু করা হবে। মাত্র তিন দিন ঠর সারিখে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার মধ্যেও ঠর এই উপহার পরিচয় আমি পেয়েছি। 'প্রিন্সেস জ ব্র্যাখিলন' বলে একটি অপূর্ব উপন্যাস উনি ওই ভাবে প্রকাশককে দিয়ে দেন। বইখানি মাত্র তিন দিনের মধ্যে শেষ করেছিলেন।

রাত্রে আহারের সময় মাদাম বেনিস ছিলেন। ভলন্তেরার অনুপস্থিতি। কিন্তু ঠর অনুপস্থিতির সব ক্ষুণ্ণ উনি একাই হরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ঠরও মার্জিত রুচি, সাধারণ জ্ঞান আর সৌন্দর্যবোধের কিছু অভাব ছিল না। ম্যাসিয়ে জ ভলন্তেরার বেশ দেবীতে কিরলেন, হাতে একখানা চিঠি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি মার্কু'ইস আলবার্গাতিকে চিনি কি না। আমি বললাম, পরিচয় না থাকলেও নামে চিনি।"

—"তিনি আমাকে 'গলদোনি'র কয়েকটি নাটক, কিছু সসেজ আর একটি রচনার অনুবাদ উপহার পাঠিয়েছেন, আর বলে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—"

—"নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি আসবেন না, অত বোকা তিনি নন।"

—"মানে? আমার সঙ্গে দেখা করাটা বোকামির লক্ষণ? আপনি এই বলতে চান?"

—"না, আমি শুধু বলতে চাই যে, এতে করে কত বড় বুকি যে তাঁকে নিতে হবে, সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান তাঁর আছে। কারণ যদিই আসেন, তবে সেই মুহূর্তেই আপনি টের পেয়ে যাবেন তাঁর বুদ্ধির দৌড় কতখানি—আর আপনারও ধারণা ভেঙে যাবে"

—"আচ্ছা, গলদোনি 'ডিউক অফ পাবমা'র কবি বলে জাহির করেন কেন?"

—"বোধ হয় প্রমাণ করতে যে আর পাঁচজনের মত তাঁরও চরিত্রে একটা দুর্বল দিক আছে।"

"উনি তো নিজেকে একজন ব্যাপ্তিষ্টারও বলেন—আসলে কোনোটাই নন। কয়েকটি বেশ ভালো মিলনাস্তক নাটক অবশ্য তিনি লিখেছেন, আর কিছু না। সমাজেও বিশেষ নাম করতে পারেন নি..."

—"আমি শুনেছি ঠর অবস্থা ভালো নয়, উনি নাকি ভেনিস ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন খিয়েটারের ম্যানেজারদের চোখে... সেখানে ঠর নাটকগুলি অভিনীত হয় কিনা..."

—"একবার ঠকে একটা বৃত্তি দেবার কথা ওঠে। কিন্তু আবার সেটা চাপা পড়ে যায়। কারণ, সবাই আশঙ্কা করেন যে, একটা অনির্দিষ্ট আয় হোলে হয়ত আর উনি লিখতে চাইবেন না..."

—"হুম্। হোমারকেও একবার বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়া হয়। পাছে অন্ধমাত্রের বৃত্তি চেয়ে বসে বসে..."

সেদিনটা ঠর সারিখে উজ্জল আর স্নরগীর হয়েই রইলো। পরদিনও অমনি উজ্জল একটি দিনের প্রত্যাশায় পেলাম ভলন্তেরার কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেদিন সেই বিরাট প্রতিভাকে দেখলাম তাঁর নিরুৎসাহ মানসিক অবস্থায়। জানি না, কোন অজ্ঞাত কারণে সেদিন ঠর মেজাজ যেমন খিটখিটে, কলহপ্রিয়, কথাবার্তা ত তেমনি তিক্ত আর দ্বেষ-বিক্ষেপে ভরা। যদিও জানতেন সেদিন আমার বিদায়ের দিন, তা সত্ত্বেও আমাকে দেখে তিক্ত হাসি

হেসে বললেন—"মার্গিনের বইটা উপহারের জো দিয়েছেন হয়তো ভালো মনেই। কিন্তু তার জন্তে ধন্যবাদ দিতে আমি অক্ষম। কারণ পুরো চারটি ঘণ্টা আমার ওর পিছনে নষ্ট হয়েছে।"

আমি প্রাণপণে নিজেকে সংবত রেখে উত্তর দিলাম, হয়ত আজ ভালো না লাগলেও একদিন আমার মতের সঙ্গে মিল হোতে পারে। সামান্য কথায় উঠলো তাঁর ঝড়। কথায় কথায় আমি স্রেবিল'কে আমার শিক্ষক বলে অভিহিত করতে ভলন্তেরার জিজ্ঞাসা করলেন, —"স্রেবিল! জানতে পারি কি, কোন্ সুবাদে তাঁকে শিক্ষক বলছেন আপনার?"

—"তিনি আমাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন হু'টি বছর ধরে—আর তারই রুতজ্জতাস্বরূপ আমি তাঁর একটি রচনা ইতালীয় 'আলেক্সান্দ্রাইন' ছন্দে অনুবাদ করেছিলাম—আর আমিই প্রথম ইতালীয় বার ঐ ছন্দে রচনার সাহস ছিলো..."

—"প্রথম! মাফ করবেন, প্রথম হবার সম্মান ছুটেছিলো আমার বন্ধু পিয়ের মার্ভেল্লীরই বরাতে..."

—"হুম্। আপনার কথার প্রতিবাদ করতে হোলো বলে..."

—"কিন্তু তাঁর রচনা আমার কাছে আছে। বোলোনাতে ছাপা হয়েছিলো..."

—"হ্যাঁ, কিন্তু 'আলেক্সান্দ্রাইন' ছন্দে লেখা নয়। তাঁর কবিতাগুলির চোদ্দটি করে চরণ, আর একটি পুঞ্জিৎ একটি ত্রীলাঙ্গ, এই ভাবে পর পর চরণগুলির রচনাও তিনি করেন নি। অতঃ, তিনি নিজে ভেবেছিলেন যে, তিনি ওই ছন্দেই লিখছেন, তাই ঠর ভূমিকা পড়ে আমি হাসি চাপতে পারি নি। সস্তবতঃ আপনি সেটা পড়েন নি..."

—"পড়ি নি! কি বলছেন আপনি? ভূমিকা পড়াটাই আমার নেশা। তাতে তো তিনি জোর করেছে লিখেছেন..."

—"হ্যাঁ, সেটাই তো মজার ব্যাপার...আপনাদের কাব্যজগতিতে কখনো বারোটি চরণ আর কখনও তেরটি চরণ ব্যবহার হয়। অথচ মার্ভেল্লী সবই চোদ্দ চরণের। অতএব হয় তিনি কাল্পনা, নয় তাঁর ছন্দজ্ঞান খুবই কম।"

—"আপনি বুরি আমাদের কবিতার ছন্দের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন কঠোর ভাবে অনুসরণ করেন?"

—"হ্যাঁ, বত কঠিনই হোক না কেন?"

—"আচ্ছা স্রেবিল'র রচনার যে অনুবাদ করেছেন তার কোনো অংশ কি আবৃত্তি করে শোনাতে পারেন? অবশ্য যদি আপনার অনুবিধা না হয়। কারণ আমার খুব ইচ্ছা আপনার অনুবাদ আর ছন্দ শুনতে..."

আমি দশ বছর আগে স্রেবিল'র কাছে যে অংশটি আবৃত্তি করেছিলাম সেই অংশটিরই পুনরাবৃত্তি করলাম। এতক্ষণে ভলন্তেরার মুখে খুশীর আলোর আভাস দেখা দিল। শেষ হতে নিজেও ঠর স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন—সেটি তখনও ছাপা হয়নি...কিন্তু অপূর্ব, অনবদ্য সেই রচনা। যদি সেই খুশীর বেশটুকু রেখেই সেদিন বিদায় নিতাম তবে সব দিক থেকেই ভালো হতো। কিন্তু কেন যে আবার 'হোরেস'এর লেখার সমালোচনার মধ্যে নিজেকে জড়ালাম জানি না! সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ আর তাঁর ঝড়ে খুশীর সেই মুহূর্ত আলোটুকুও নিবে গেলো। দুটি

প্রতিপক্ষের মধ্যে শুধু যুক্তিতর্কের আর বিতর্কের বড় বইতে লাগলো। এলো নিতান্ত অব্যাহিত প্রসঙ্গ সব...দেশ, শাসনতন্ত্র স্বাধীনতা সব কিছুই...

—“আপনি কি ভাবেন তেনিসে আপনারা স্বাধীন জীবন বাপন করেন?”—ভলন্তেরার কূট প্রশ্ন।

—“একটি অভিজ্ঞত শাসনতন্ত্রের অধীনে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করা যায় ততটা করি বৈ কি। বলছি না যে আমরা ইংরেজদের মত স্বাধীন—তবুও বলবো আমরা তৃপ্ত, আমরা খুশী...”

—“এমন কি যখন ‘লেডস্’এ বন্দী ছিলেন তখনও...” বিক্মিকিয়ে উঠলো শাবিত বিরূপ।

—“আমার কারাবাস একটা বড় ধর্মের ফল আমি জানি...কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি আমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমার এ কথাও মনে হয়, কোনো রকম বিচারের ব্যবস্থা না করেই শাসনকর্তারা আমাকে বন্দী করে উচিত কাজই করেছিলেন...”

—“কিন্তু আপনি তো পালিয়েছিলেন?”

—“শাসনতন্ত্রও যেমন তার অধিকার নিয়ে আছে, আমিও তেমনি আমার অধিকার খাটিয়েছি...”

—“সত্যি! কিন্তু তাতে তো তেনিসে কেউই স্বাধীন হতে পারে না?”

—“হয়ত নয়। কিন্তু নিজেকে স্বাধীন ডাবলেই তো স্বাধীন হওয়া যায়...”

—“আপনার একধার আমার কোনো আস্থা নেই। অভিজ্ঞ! সম্প্রদায়, এমন কি শাসন বিভাগের অধিকর্তারও তো আপনাদের দেশে স্বাধীন নন। কারণ তাঁরাও তো অল্পমতিপত্র ছাড়া কোথাও ভ্রমণ করতে অধি পারেন না—”

—“ঠিক, কিন্তু এটাও তো তাঁদেরই গড়া আইনের অশুশাসনে তাঁরা স্বেচ্ছাশ্রমী...”

—“ভালো কথা, দুনিয়ার সব জায়গাতেই জনসাধারণকে নিজেদের আইন গড়বার সুবিধা দেওয়া হোক...”

সাহিত্য পুস্তক বহুক্ষণ চাপা পড়ে গেছে। এই কূট তর্কের জালে ক্লান্ত হোয়ে দুহুনেই চূপ করে রইলাম। তারপর ভলন্তেরার বিশ্রাম নেবার জগে উঠে গেলে আমি চলে এলাম অশান্ত, বিকৃত মন নিয়ে। নিজের উপরই বিরক্ত হোয়ে উঠলাম কেন এই বিখ্যাত সাহিত্যিক, অসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, বিরাট প্রতিভাকে যুক্তিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রে নামালাম। অবশ্য সারা মন জুড়ে একটা ভীত বিদ্বেষের দাহ অনিবার্য ভাবে জ্বলছিলো, তাই পুরো দশটি বছর ধরে ভলন্তেরার প্রতিটি লেখার নির্ধর্ম সমালোচনা করেছি। অবশ্য আজ তার জগ্ন আমি অমৃতপ্ত। কিন্তু পরে সেই সব লেখা বাতিল করতে গিয়ে বার বার পড়ে দেখেছি—অনেক জায়গায় অনেক বিষয়ে আমার সমালোচনার কোনো ক্রটিই দেখতে পাইনি। তবুও বলবো, আমার আরও সংবত হওয়া উচিত ছিলো।

সারা রাত বসে লিখে রাখলাম আমাদের কথোপকথন—যা সব জড়ো করলে একটা বিরাট গ্রন্থ হোতে পারতো। কিন্তু আত্মশ্রুতির

পাতায় তার হ’-একটি টুকরোই রেখে দিলাম। পর দিনই বাত্ম করলাম দক্ষিণের পক্ষে...

## নবম পরিচ্ছেদ

যুগে যুগে নীস জেনোয়া হোয়ে এলাম ফোরেন্সে। এখানে এসে ছোট্টো একটা স্পট ভাড়া করলাম। জায়গাটি বড় সুন্দর বেছে নিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে একটা গাড়ী কিনে কোচম্যান আর সহিসও রাখলাম হু’জন। তার পর আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সেরে নিতে দেবী হোলো না। এক দিন অপেরা দেখতে গেলাম। এমন জায়গায় আমার আসন নিয়েছিলাম যেখান থেকে প্রত্যেকটি অভিনেত্রীকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কে জানতো সেখানে আমার জগ্ন এমন বিষয় অপেক্ষা করে রয়েছে।

শ্রেষ্ঠ গায়িকাটি যেট রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, অমনি আমারও সর্বোচ্চ রোমাঞ্চের শিহরণ...এ তো টেরেসা...সেই টেরেসা যাকে কতো... কতো দিন আগে পেয়েছিলাম। আর পেয়েই হারিয়েছিলাম। সে কী আশ্চর্য! ১৭৪৪ সালে ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়...আর কি অভিনব সেই পরিচয়! কিশোরীর আত্মপরিচয় কিশোরের বেশে। সঙ্গীদেবও ছন্দপরিচয় ম্ল আর সহোদরের রূপে। কিন্তু বেলিনোর ছন্দবেশের আড়ালে কিশোরীর কমনীয়তা আমার দৃষ্টিকে কঁকি দিতে পারেনি। আর ওর সঙ্গ পরিচয়ের রহস্যভরা অবগুণ্ঠনখানি তুলে ধরতে গিয়ে আমাদের হৃদয় বিনিময়েও কোনো কঁক ছিল না। আর যৌবনের সেই প্রথম সন্ধিক্ষণে আমাদের অভিনব প্রথম পরিণয়েই সমাপ্তি লাভ করতো...সেই শপথই তো আমরা নিয়েছিলাম নির্জন বিশ্বল মুহূর্তগুলিতে...কিন্তু কোঁতুকময়ী ভাগ্যদেবীর পরিহাসে আমি হলাম পিসারোতে বন্দী আর প্রতীকারতা টেরেসা পেলো ডিউক অফ কাস্ত্রোপিনানোর আশ্রয় তাঁর রঙ্গমঞ্চের গায়িকা হোয়ে...

তার পর হু’জনের মাঝখানে সুদীর্ঘ সতেরোটি বছরের ব্যবধান। স্মৃতির কোন মণিকোঠায় কন্ডবরে বন্দী দিনগুলি ছাড়া পেয়ে ছুটে এলো বৃষ্টি...মনে পড়লো টেরেসার শেষ চিঠিখানির উত্তর আজও দেওয়া হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, এই সুদীর্ঘ সতেরোটি বছর ওকে কি কোথাও স্পর্শ করেনি? তেমনি সতেজ, তেমনি কমনীয় তেমনি লাভণ্যে ঢলঢল অপকণ্ঠ দেহকান্তি...আর তেমনি মাধুর্যে পূর্ণ বিকশিত।

গানের শেষের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো টেরেসার আমার দিকে। স্পষ্ট দেখলাম, হু’টি আঁগিতারায় জলে উঠলো পরিচয়ের ছাতি। গানটি শেষ হওয়া অবধি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আমার দিকে। এক বারও দৃষ্টি ফেরালো না...মঞ্চ ছেড়ে বাবার সময় হাতের পাখাখানি নিয়ে চকিত ইশারায় জামিয়ে গেল আহ্বান।

আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম...বক্ষস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর। রঙ্গমঞ্চের পিছনে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আমার টেরেসা। অগিয়ে গেলাম। যুথোযুথি দাঁড়ালাম হু’জনে...নিঃশব্দে সম্মোহিতের মতো। জানি না ক’টি মুহূর্ত কাটলো। শেষে আন্তে আন্তে ওর হাতখানি ধরে আমি বৃকের উপর চেপে ধরলাম।

—“কিছু শুনেতে পাচ্ছো? বৃকের ত্রিতরায় কি হচ্ছে, পাচ্ছো তার আভাস?”

—“প্রথম বেই তোমাকে দেখলাম, মনে হোলো এখনি বুঝি মূর্ছিত হোয়ে পড়বো। হুঁত্যা আজই রাতে আমার আবার অস্ত্র আরগায় নিমন্ত্রণ...কিন্তু আজ তো সারা রাত হুঁটি চোখের পাঁতায় ঘুম নাযবে না...তাদের জায়গা তুমি যে আগেই অধিকার করে বসে আছো। কাল ভোরবেলা এসো আমার কাছে, বলো আসবে? কোথায় থাকো তুমি? এখানে কি নাম তোমার? কত দিন এসেছো? কত দিন থাকবে আর? বিয়ে কোরেছো? ওঃ ওঃ, সময় হোয়ে আসছে...ছাই-এর নিমন্ত্রণ...ঈশ্বর ওরা ডাকতে আসছে বুঝি? বিদায়...বিদায়...কাল কিন্তু মনে...”

মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর...স্বস্ত হোয়ে গেল অজ্ঞান প্রাণের কড়। প্রকৃতির হোতে কিছু সময় লাগলো বৈ কি। ফিরে এলাম নিজের আসনে। এতক্ষণ খেয়াল হোলো ওর নাম-ধাম কোনো পগিচরই তো নেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ যে জানালে কিন্তু ঠিকানা কোথায়?

আমার পাশেই বসেছিলেন একটি সুবেশ তরুণ...আমি মৃদুস্বরে তাকেই প্রশ্ন করলাম ঐ গায়িকা-অভিনেত্রীটির পরিচয় যদি বলতে পারেন?

—“আপনি বুঝি ফোরেখে নবাগত?” তিনি প্রশ্ন করলেন।

—“সবেমাত্র এসেছি বলতে পারেন—”

—“ওঃ, তবে আপনার অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে। তাহলে শুধু ওই ভদ্রমহিলার আর আমার নাম একই; কারণ উনি আমার জ্ঞী। আর এই অধমের নাম হোলো সিরিজো পালেসি”—

আমি অভিযান জানালাম, কিন্তু কোথায় থাকেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হোলো না—আমার ভাব্যতা স্বয়ংক্রিয় তাহলে সম্ভব জাগতে পারে, টেরেসা তাহলে এই সুন্দর তরুণটিকে বিয়ে করেছে? আর আশ্চর্য্য, সবাইকে ছেড়ে আমিও ঠিক ঐকই প্রশ্ন করলাম!

অপেরা দেখে ফিরে আসবার সময় ওখানকারই একটি পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মাত্র দশ মাস হোলো টেরেসার বিয়ে হয়েছে। আর ওর স্বামী বেচারা বেকার শুধু নয় বিওহীনও বটে; তবে টেরেসার অর্থসম্পদ দু'জনার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু অর্থসম্পদ নয়, মানমর্যাদাও কিছু কম নেই টেরেসার।

উবার আসো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাল্দির হোলান আমার ঘোবনের উবালোকে, যে প্রথম মাঝুয়ার বস্তুর পবন বুলিয়েছিল আমার মনে; তারই দরজায়! এক জন বৃদ্ধা পরিচারিক! এসে দরজা খুলে অভিযান জানিরে বললে, আমিই মাসিয়ে ক্যাসানোভা কি না, কারণ তাঁরই অপেক্ষায় কর্তী রয়েছেন।

বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই টেরেসার তরুণ স্বামীটি বেসিয়ে এলেন, পরনে ডেসি: গাউন, মাথায় রাজির টুপী। আমাকে স্বাগত জানিরে বিনয়ের সঙ্গে আগন গ্রহণ করতে অহরোধ করলেন। জানালেন ওর জ্ঞী এখন আসবেন, তার পর আমার দিকে এক দৃষ্ট চেয়ে বললেন,—“কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনিই নিশ্চয়ই কাল আমার জ্ঞীর নাম জানতে চেয়েছিলেন।”

—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি বহুদিন ওকে দেখিনি, আর ওর বিয়ে হোয়ে গেছে তাও জানতাম না। আমার সৌভাগ্য যে, ওর স্বামীর কাছেই আমি কাল প্রশ্ন করেছিলাম।

আমাদের দু'জনার বন্ধুত্বের বন্ধনে আপনাকেও জড়াতে পারলে যত হবো...অবশ্য আপনার সম্মতি থাকলে...”

টেরেসা এসে ঢুকলো। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে হুঁটি প্রণয়ীর মতই আমরা উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে পরস্পরকে বন্দী করলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র...টেরেসা ওর স্বামীকে বসতে বলে দুই হাতে আমাকে টানতে টানতে সোফার উপর ওর পাশে নিয়ে বসালো...তার পর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো...আমারও চোখ অশ্রুসজল—

প্রথম উচ্ছ্বাসের বেগ একটু কমে এলে দু'জনাই চোখ গিয়ে পড়লো বেচারী স্বামীটির উপর...আমাদের খেয়ালই ছিল না ওর উপস্থিতি...আর বেচারার হতভম্ব, মুগ্ধি দেখে দু'জনাই হেসে উঠলাম এক সঙ্গে। কিন্তু টেরেসা জানতো, ওই পোষমানা বেচারী জীবটিকে কেমন করে মানিয়ে নিতে হয়—

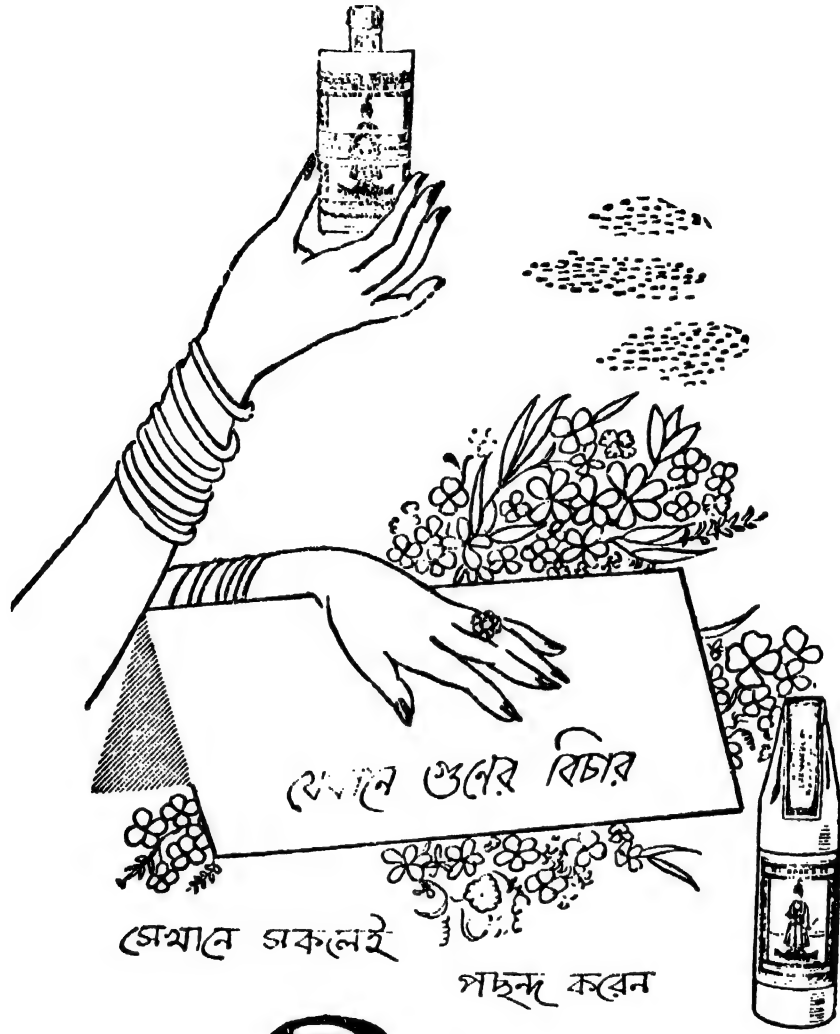
—“ও হো: পালেসি! ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে, এই যে ভদ্রলোকটিকে সামনে দেখেছো ইনি আমার বাবার মতো...বরং বাবার চেয়েও বেশী বলতে পারি। অভিভাবকের মত, বন্ধুর মত, রক্ষাকর্তার মত ইনি যে আমার কত উপকার করেছেন তুমি জানো না...আমি সবকিছুই জন্মেই এঁর কাছে ঋণী, উঃ কি আনন্দের দিন আজ...দীর্ঘ দশটি বছর এই মুহূর্তটির প্রত্যাশায় ছিলাম।”

বাবার সঙ্গে তুলনা দেওয়ার সে বেচারার চোখ হুঁটি গোল গোল হয়ে উঠলো...কারণ টেরেসা যদিও আজ নিখুঁত সৌন্দর্য্য আর অটুট ঘোবনকে এতটুকু ম্লান হোতে দেখনি তাহলেও মাত্র দু'বছরের ছোটো আমার চেয়ে। তবু হাল ধরেই চললাম—

—“ঠিকই বলেছে, আপনার টেরেসা শুধু আমার মেয়েই নয়, সহোদরার প্রীতি বন্ধুর ভালোবাসা সবই ওর কাছে পেয়েছি। ও সাধারণ মেয়ে নয়, ও একটি অমূল্য সম্পদ...তার উপর আপনার জ্ঞী...এইটুকু এক নিঃশ্বাসে বলেই আমি টেরেসার দিকে ফিরে বললাম—‘রিপ্ত তোমার শেষ চিঠিটার উত্তর আমি আজও দিইনি কারণ...’

—“আমি জানি তুমি ‘লেডম’ এ বন্দী ছিলে। ভিয়েনায় থাকতে তোমার পালিয়ে আসার আশ্চর্য্য গল্প শুনেছিলাম। তার পর প্যারিসে আর হলান্ডও তোমার খবর পেয়েছি। মাত্র সম্প্রতি আমি তোমার কোনো খোঁজ পাইনি কোনো স্মরণও পাইনি, সেখান থেকে খোঁজ পাবো। গত দশটি বছর কেমন করে কেটেছে সেই সব গল্প তোমার কাছে করবো...তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। যাই বলো এখন কিন্তু আমি সুখী। আমার প্রিয়তম পালেসি, ওকে আমি ভালোবাসি, পালেসিও আমাকে ভালোবাসে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার আশা আছে তুমি যেমন আমার বন্ধু তেমনি এক দিন পালেসিরও বন্ধু হোয়ে উঠবে...”

এই কথায় আমি উঠে গিয়ে পালেসিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলাম। আর বেচারী পালেসি—জ্ঞীর পিতৃসম, ভ্রাতৃসম বন্ধুসম সম্ভবতঃ প্রণয়ীসম এই নবপরিচিতকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা বুঝে ওয়া বাস্তবিকই ওর পক্ষে দুর্ভাগ ছিলো। ওর দুর্দশা দেখে আমাদেরই হাসি চেপে রাখা দায় হোয়েছিলো। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ঠাঁড়িয়ে থেকে অতি কষ্টে স্বাভাবিক হবার



নী

কেশ তৈল

এম. এল. বসু স্যুও কোং প্রাইভেট লি:  
নন্দীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

চেষ্টা করে আমাকে ওদের সঙ্গে এক পিয়লা চকোলেট খাবার জুড় অমুরোষ জনালো—আর পরকণ্ঠে ভিতর চলে গেল তার ব্যবস্থা করতে... যদিও আমার বিশ্বাস, নিজেকে একটু সামলে নিতেই গেল।

আমরা একা হোটেটে টেরেসা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার বৃকে কাঁপিয়ে পড়লো। দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মনের উদ্ভাসিত আবেগে বলে উঠলো—

—“প্রিয় আমার, প্রিয়তম আমার...জীবনের প্রথম প্রেমের স্বপ্ন আমার...আমাকে বৃকে টেনে নাও...আরও আরও নিবিড় করে এতটুকু যেন ঝাঁক না থাকে। আমি কি ভুলতে পারি? জন্মে প্রথম প্রেমের স্পন্দন তো তুমি জাগিয়েছিলে...কৈশোরের স্বপ্নভরা রজনী মাথাকে তো তুমিই রূপ দিয়েছিলে...আজ একটি সুহৃদের জন্তে ফিরে পেতে দাও সেই ফেনে-আসার স্বপ্ন স্বপ্নগুলির একটি কথা। কাল থেকে সহোদরার প্রীতি নিয়ে সবার সামনে তোমার স্নেহের দাবীট বারবার...কিন্তু সে কাল, আজ নয়। আজ শুধু তুমি থাকো আমার সেই চিরকিশোর প্রিয়তম...”

না, না বন্ধনা আমি করিনি...আমি ভালোবাসি আমার স্বামীকে, সত্যিই ভালোবাসি। তাকে আমি বন্ধনা করিনি... করবো না। কিন্তু তোমার স্বপ্ন যে শুধু শুধুতেই চলে...আমার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন। তারপর...তারপর তুলে যাবো সব—শুধু মনে রাখবো আমি বিবাহিতা...আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অক্ষয় বন্ধন। ও কি?...তোমার মুখ অত স্নান কেন?”

—“সেদিন আমি বন্ধী ছিলাম...সেই সন্তেরা বছর আগে... তাই মুক্ত বিহঙ্গকে ধরে রাখিনি। আর আজ আমি যখন মুক্ত তখন দেখি বন-বিতঙ্গী হোয়েছে স্বচ্ছাবন্দিনী...অনেক মেরী হোয়েছে আমার। কিন্তু আজ তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ...বলো আমাকে তোমার কি ইচ্ছা? তোমার স্বামীর কাছে পূর্বকথার কোনো উল্লেখই যেন না করি তাই না?”

—“তাই-ই। পালেসি আমার পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সকলেই যা জানে তা’ ছাড়া যেনেপলসেই আমি মাত্র দশ বছরে এসে অর্ধ, সম্পদ, খ্যাতি অর্জন করি। এ বন্ধনা নির্দোষ নয় কি? বলো, কার কতটুকু ক্ষতি হবে এটুকু ছলনায়? অথচ এক জনের জীবনে এ-বে অনেকখানি। সবাই জানে আমার বয়স চব্বিশ—আমি তাই-ই বলেছি। বলো তো আমাকে কি অনেক বেশী বয়স দেখায় তার চেয়ে?”

—“একটুও না—যদিও আমি জানি তোমার বত্টি বছর বয়স।”

—“একথা আমাদের মধ্যেই থাক্। কিন্তু ঠিক করে বলো আমাকে চব্বিশের মত দেখায় কি?”

—“তার চেয়ে আরও অনেক কম দেখায়।”

—“আচ্ছা, ক্যাসানোভা এবার বলো তোমার কথা। তোমার টাকার দরকার আছে? এক দিন তুমি যা দিয়েছিলে আজ তা কিরিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আমার হোয়েছে...ঠা সুদৃঢ়। আমার হাজার পঞ্চাশেক টাকা আছে আর প্রায় সমান দামের হীরে আছে...একটুও সন্ডাচ করো না—সীপগির বলো, চকোলেট আদার সময় হোয়ে এলো যে...”

আমি উত্তরে শুধু আর এক বার ওকে আমার বাহুডোরে বন্দী করতে বাচ্ছিলাম এমন সময় চকোলেট এসে পড়লো। ওর স্বামী প্রথমে, আর পিছনে পরিচারিকার হাতে রূপার ট্রেতে তিনটি পেয়ালো। খেতে খেতে আমরা তিন জনেই নানা রকম গল্প করতে লাগলাম। পালেসি এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দ আর সপ্রতিভ। কৌতুকভরা স্বরে পালেসি বললে, ভোঁরবেলা ঘুম থেকে উঠেই যে আগলুকের সঙ্গে দেখা সেই কাল রাত্রে যিয়েটারে ওরই কাছে ওর স্ত্রীর পরিচয় চেয়েছিলো। তাই ও আশ্চর্য হোয়ে গিয়েছিলো খুবই। কিন্তু ওর ভ্রম মন আর সংবত ব্যবহার ইঙ্গিতেও প্রমাণ তুললে না, কবে, কখন, কোথায় কেমন করে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

পালেসির বয়স তেইশ বছর মাত্র...কিন্তু অপকৃপ ওর লালিত্য আর অতি শোভন ওর কেশবিন্যাস...বা পুরুষের গাফে সৌন্দর্য্যটা একটু মাত্রাছাড়াই বলতে হবে। আর ওর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর চঞ্চল আত্মপ্রিয় স্বভাবের জুড় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে ভালো লাগলো...ভারী ভালো লাগলো।

প্রায় দশটা নাগাদ একে একে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের আগমন শুরু হোলো গ্রিহার্শালের জন্তে। আমি লক্ষ্য করলাম টেরেসার সহজ সুন্দর ব্যবহার প্রত্যেকের সঙ্গে...অথচ স্বাভাবিক মধ্যে।

হুঁজ অভিনেত্রী শেষ অবশি থেকে গেলেন। টেরেসার কাছে তাঁদের আহ্বারের নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে না কতিসেলি নামে অভিনেত্রীটি আশ্চর্য্য সুন্দরী...কিন্তু তখন আমার সমস্ত মন টেরেসাতে আচ্ছন্ন। আর কারো দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার মত অবস্থাই ছিল না আমার।

আহ্বারের শেষে এক জন মঠবাসী এসে উপস্থিত হোলেন আমাদের আসরে। ওর নাম আবেগাম। ওকে আমি চিন্তাম রোমে থাকতে। উনিও আমাকে দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন। ওর কাছ থেকে পুরানো বন্ধুদের সব খবর ওয়াত লাগলাম...কিন্তু হঠাৎ আমার সমস্ত মনটা চমকে উঠলো একটি ছেলেকে দেখে। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাাদ জানিয়ে এগিয়ে এরে টেরেসাকে চুম্বন করলো। একমাত্র আমিই ছেলেটির কাছে অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য্য আমি একাই হইনি। টেরেসা তখন ওকে আমার সামনে এনে বললে।

—“এটি আমার ভাই।”

টেরেসার ভাই! অথচ আমার জীবন্ত প্রতিদ্বন্দ্বি...এতটুকু পার্শ্ব্য নেই...কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ছাড়া। তখন বুঝলাম, তখন জানলাম ওকে...প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার এর চেয়ে চরম আর কি হতে পারে?

আমার মনে হোলো আমাদের হুঁজনার প্রথম পরিচয়ের এতগুলি সাক্ষী টেরেসা না রাখলেই ভালো করতো। আমি বত বার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম তত বারই ও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। আর সেই কিশোরটি এমন একাগ্র তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো যে টেরেসা ওকে কি বলছে তা ওর কানেও গেল না। আর বরঞ্চ সবাই এক বার আমার মুখে আর এক বার ঐ কিশোরটির মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। যে কোনো লোক মাথায় এক কোঁটা বুদ্ধি থাকলেই ঘরে বেলেচে পারবে কিশোরটির বাপ মায়ের পরিচয়।



কথাবার্তা ওর অতি মার্জিত আর সব চেয়ে বড় কথা হোলো ও কথা কইতে জানে। তাছাড়া কি শোভন ভদ্র ব্যবহার! ওর মা বললে সঙ্গীত ওর একমাত্র সঙ্গী।

—“তুমি ওর ‘হার্পসিকর্ট’ বাজনা শুনো...সত্যিই শোনবার মত। যদিও ও আমার চেয়ে আট বছরের ছোটো তবুও অনেক ভালো বাজায় আমার চেয়ে।”

সত্যি কঠিন সমস্তার হাত এড়িয়ে যেতে মেয়েরা যত সহজে পারে পুরুষরা কিছুতেই পারে না।

সবাই বিদায় নেবার পর ঘরে টেরেসাকে একলা দেখে অভিনন্দন জানালাম, অমন সুকুমার দর্শন সহোদরের জন্তে।

—“ও তো তোমারই...আর আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। মনে আছে ডিউক অফ ক্যাম্পোপিনানোর কথা? তিনিই ওকে মাহুষ করেছেন। মনে পড়ছে তোমার ‘প্রিমিনি’ থেকে যিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে? ছেলে জন্মাবার পরই ওকে সোরোন্টাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নয়টি বছর ও সেখানে ছিলো। ডিউক ওকে সিজার ফিলিপ ল্যান্টি এই নামে দীক্ষিত করেন। ও বরাবরই আমাকে বড় বোনের মতই জানে। কিন্তু আমার হৃদয়ে একটি আশার ক্ষীণ আলো। আমি নিবতে দিইনি...আমাদের আবার দেখা হবে আবার মিলবে। তুমি আর আমি...আর তখন তুমি তোমার সম্ভানকে স্বীকার করে তার জননীকে দেবে সহধর্মিণীর সম্মান।”

—“কিন্তু এখন তো তুমিটো সে পক্ষ বন্ধ করেছে। টেরেসা?”

—“হার বে, আমরা দুইগা ছাড়া কি বলি? ডিউকের মৃত্যুর পর যখন আমি নেপলসে আসি তখনও আমি বিতবান। আর তোমার ছেলেও বিশ হাজার টাকার মালিক। আমার আর পালেনির যদি কোনো সম্ভান না হয় তবে আমার বা কিছু সবই ওর—”

আমাকে টেরেসা ওর শোবার ঘরে নিয়ে গেল। আগমারী

খুলে দেখালে হীরা মুক্তা আরও নানা মূল্যবান রত্ন, তাছাড়া প্রচুর রূপার বাসন।

—“সিজারিনোকে আমার দাও টেরেসা—ওকে আমি দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।”

—“না, না, না, অল্প কিছু বলো, আর কিছু চাও, আমার ছেলেকে নিয়ে নিও না। জানো, ভয়ে আমি কোনো দিন ওকে ভালো করে চুমা খাইনি। আচ্ছা বলো তো ভেনিসের লোক কি মনে করবে যদি জাখে ক্যাসানোভা আবার কিশোর হোয়ে ফিরে এসেছে...”

—“তুমি কি ভেনিসে যাবে ঠিক করেছে?”

—“হ্যাঁ, আর তুমি?”

—“বোধ তার পরে নেপলস।”

আমার জীবনে এক চরম সুখের দিন। আমার সিজারিনো... হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিলো সে আপন স্বভাবকে...শুধু সম্ভানস্নেহে নয়। ওর দুঃখমীভরা স্বভাবে, ওর সবল কৌতুকের উচ্চ মধুর হাসিতে—ওর এক বলক দখিণ-হাওয়ার মত উজ্জল প্রাণের খুশীতে...ও যে কী মায়া ছড়ালো জানি না।

ওর ‘হার্পসিকর্ট’ বাজিয়ে মজার গান শোনানো কখনও ভুলবো না—ঘরগত জ্বাকের হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবার যোগাড়। আর টেরেসার দৃষ্টি শুধু আমার দিকে এক বার আর সিজারের দিকে এক বার...কি ভাবাভরা তন্ময় দৃষ্টি। অথচ ওরই মধ্যে দেখছি ঘনিষ্ঠহোয়া বসে পালেসিকে মিষ্টি করে আদর করে বলছে—“বাসের সবচেয়ে ভালোবাসি তাদের সামিগ্যের চেয়ে স্বর্গসুখও বড় নন্দ...”

বিচিত্ররূপিণী। কিন্তু ওর ছলনার ব্যথা আমি বুঝি।

[ক্রমশঃ।

—অনুবাদিকা শান্তা বসু।

## গতকাল : আজ

অর্ণব সেন

গতকাল ভোরে ছিল বৃষ্টির আকাশ  
রূপালী বস্ত্রায় মতো বৃষ্টিগয়া দিন  
প্রাত্যহিক মন ছিল নেশায় রঙিন  
আহা, জল লেগে কাল কি সবুজ হয়েছিল বাস।  
কাল বুঝি জলে ভিজে তুমি ছিলে কিছুটা রক্তিম  
ভিজে চুল, ভিজে মন, শ্রোবাটি বক্ষিম,  
কি কথা কালকে ছিল এখন বলো না  
কাল তো বললে না।

আজকে সকাল এলো অন্ধকার চোখের মতন  
আকাশে পাখিরা নেই চূপচাপ বেন ঝাউবনে,  
ঘুম নেই, ঘুম নেই, সাগরিকা মনে  
কি পাবে এখানে এই—এই ঝাউবনে?  
তোমার অবুঝ চোখে বা ছিল গহনে  
বলো তা আমার আজ চূপি চূপি এই ঝাউবনে;  
কি কথা বলবে বলো এইখানে চোখ মেলে বাসে  
বিগত ভোরের স্বপ্ন এখন কি স্নান হয়ে আসে?

# কপা-বিলাস

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

যে-সব বাসান্দাদের মুচকি হাসিতে চাঁট খরে, যে সব গণিকায়া পুষাপাঠে মন দিয়েছেন, এবং যে-সব শ্রমণারা বুদ্ধ, তাঁরা কুলস্ত্রীদের ধন ও শীল চরণ করেই...চরেন। ২৩

এক দল ধূর্ত রয়েছেন, যাদের কাজ জড়ভরত নায়ক ধরে বেড়ানো। তাঁদের বর্ণা,—

“বিধবাটি তরুণী হে; সম্পত্তিও বিস্তর। আপনাব মতই একটি দিবা প্রেমিক তাঁর প্রাণের কামনা।”

ততঃপর ধূর্ত ভক্ষণ করেন তাঁর সর্বস্ব। ২৪

এক দল ধূর্ত রয়েছেন তাঁরা কাফিলী। প্রত্যহ বেতন নিয়ে কাজ করেন। কর্মে বিশ্ব-খটানোই তাঁদের বিলাস। তাঁদের বলে— “কাল-চোর।” ২৫

এক দল ডাকসাইটে জোড়োর আছেন, যাদের ব্যবসায় ক্ষেত্র হচ্ছে বিদেশ। তাঁরা পাশা পাতেন, নানান রকমের গণনা করেন, তার পরেই দেখান স্মনিপুণ হাত সাফাই। ২৬

এক দল ধূর্ত আছেন, তাঁদের প্রাণুর্ভাব হয় ভোজনের মাগুই। মদ, পাশা, বেগা...এই পথেই বহু ব্যয় ঘটিয়েছেন। তাঁদের বলা হয় “গৃহচোর।” সাধারণতঃ তাঁর বন্ধুজন গৃহদাস। ২৭

আর বৎসগণ, জেনে যেথো—যিনি বলে বেড়ান—

“শাস্ত্রগুলো কৃত্রিম, অসত্য; কেউ কি কখনো সাক্ষাৎ পরলোক দেখেছে?”

তিনি একটি শঙ্কাস্থল নিরঙ্কুশ মন্তঃমাতঙ্গ। ২৮

আর এক দল মানুষ আছেন, তাঁদের নাম “লাভচোর।” এঁরা মহাপণ্ডিত। সন্ধ্যানে ফেরেন সেই সব মানুষদের, যাদের বেশী লাভের লোভটি অত্যধিক। অসহ্য লাভের লোভ দেখিয়ে, তাঁদের দিয়ে স্বর্ণ করান; আর তার পরেই চুরি করেন স্বর্ণ-ধন। ২৯

“স্বাধ-চোর” নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁদের আখ্যা হচ্ছে ‘ভট্ট।’ তাঁরা জম-ধন-ঘন-মন। সর্বদাই সর্ব-ভুত। বিচার-গৃহ-সমুদ্রের মাঝখানে বাড়বাগির মত জ্বলেন। ৩০

“সুখ-চোর” নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁরা সুহৃৎ। ঐশ্বর্য-পদের তাঁরা ভ্রমর; বিপদের দুঃসহ বাতাস বইসেই তাঁরা মুখ উগটিয়ে বসে থাকেন। লক্ষ্মীর লতাই কেবল তাঁদের আহ্বান জানান। ৩১

“কর্ণ-চোর”—নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। এক লাখ হাসির কথা আওড়ে কর্ণ-সুখ বিধান করেন তাঁরা। এখন সব

কাজের কথা ফলিবে বসেন, যার সবটুকুই অপূর্ণ, করনাত্তেও যার ধারণা করা অসম্ভব। ৩২

“স্থিতি-চোর”—নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। চতুর তাঁদের বচন। দোষগুলোরও গুণ গেয়ে তাঁরা শ্রদ্ধা উৎপাদন করে ফেলেন দোষগুলোর প্রতি। সে এক অভিনব সৃষ্টি! আচারের বালাই তাঁদের নেই। ৩৩

“গুণ-চোর” নামীয় আর এক দল পবন ধূর্ত আছেন। বিপুল যত্ন-সহকারে তাঁরা পরের গুণগুলিকে ঢেকে ফেলে, নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রচার করেন নিজের গুণ, সম্মোহিত করে ফেলেন মূঢ়দের সবল হৃদয়। ৩৪

আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁদের বলা হয় “বৃত্তি-চোর।” প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে তাঁদের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অল্প কেষ্ট প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছে দেখলেই হিংসের তাঁরা ফেটে পড়েন। পরের ভালো তাঁদের নয় না। খলতার বৈচিত্র্য দেখিয়ে তাঁরা অল্পত উপায়ে তাঁদের নাশ করেন। ৩৫

আর এক দল ধূর্ত আছেন, শয় দম বা ভক্তির বালাই তাঁদের নেই; অথচ তাঁরা দেখান, যেন কতই না তাঁরা পালন করছেন তাঁর ব্রত। প্রতিপক্ষের জোরেই তাঁরা হঠিয়ে দেন সাধু-সজ্জনদের। তাঁদের বলা হয় “কীর্তি-চোর।” ৩৬

“দেশ-চোর” নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁদের মুখে অহরহঃ শুনতে পাওয়া যায় দেশ-দেশান্তরের রম্যাত্তিরমা বর্ণনা;—

“ওঃ, সেখানে মশায়, কী ভোগ-বিলাস!

উঃ, কী না ঘটছে সেখানে!”

কথায় ভুলিয়ে তাঁরা পশুর মতন বিদেশে চালান করেন দেশের মানুষদের। ৩৭

এমন ধূর্তও আছেন, যারা হাসি-খুসীর ভিতর দিয়ে অথবা অনেক রকমের সৌখিন পাণ্ডিত্য দেখিয়ে অথবা নর-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, পরের ঘাড়ো দিন কাটিয়ে দেন আনন্দে। তাঁরা “অকৃত্যব্যাপার চোর।” ৩৮

আর আছেন “বিটে”র দল। নিজেদের বহু বৈভব তাঁরা খেয়ে ওড়ান। তারপর পরের বৈভব কী করে কমাতে হয়, ওড়াতে হয়, ক্ষয় করতে হয়, সেই ব্যবসায়ে তাঁরা দীক্ষালাভ করেন। হৃদয় তাঁদের মুখে লেগে থাকে বেগাগৃহের স্ততি। তাঁরা চিত্তনীর পদার্থ। ৩৯

আর এক দল ধূর্ত আছেন, তাঁরা নিঃস্পাহ-নিয়োগী। অতি-  
তুচ্ছতার আড়ম্বর দেখিয়ে তাঁরা বিত্ত গ্রহণ করেন না ; আগ ভাগেই  
অধিকার কেন্দ্রে বসেন। এঁরা নিয়ম-সলিলের মাছ। সর্বথা  
পরিহার্য। ৪০

কিরিওয়ালারা পাপ। ঘরে ঘরে তাঁরা পণ্য নিয়ে বেড়ান।  
হাতে ক'রে বা দেন, তা কেবল ঠুনকো কাচ। ৪১

যাঁরা ছন্দামুখ্যতা, খানায় ফেলে দিলেও যাঁরা সাধুবাদ করতে  
ছাড়েন না, বংসগণ, জেনে রেখো, তাঁরা মধুর বিষবৎ ; অন্তরে প্রবেশ  
করে হরণ করেন সর্বদা। ৪২

আর রাজদাসেরা ধূর্ত। তাঁরা বিজনে সেবকদের ডেকে নিয়ে  
বলেন—

“বাজা আপনাদের উপর প্রসন্ন, আপনাদের গুণগান  
করছিলেন।” তারপরেই লোঠেন। ৪৩

“মহাশয়, স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিয়েছেন লক্ষ্মী দেবী। পদ্ম ফুল  
তাঁর হাতে। দেখলেম, দেবী প্রবেশ করলেন আপনার গৃহে।”

“মহাশয়, মাসাবধি আমি উপবাস করেছি। তুষ্ঠা হয়ে  
লক্ষ্মী দেবী আদর করে আমায় বললেন—‘খা রে আমার ভক্তের কাছে  
বা, সেই তোকে সব দেবে।’” ইত্যাদি স্বপ্নতত্ত্বে ভুলিয়ে সরল  
মামুষদের গৃহে গৃহে, কত ধূর্তই না নেচে বেড়ান! ৪৪

রাজধানীতে বিপ্লব বেধেছে বা নগরোদয় যন্ত্র হচ্ছে বা  
বিবাহোৎসবে ভিড়ে ভিড় :...শব্দ হলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে যান  
বহুবর্ণী ধূর্তের দল। একটাই নায় তাঁদের উদ্দেশ্য ;...লুট করে  
হাওয়া-হওয়া। ৪৫

কতকগুলি বিশেষ প্রকারের মামুষ আছেন। বংসগণ, তাঁদের  
...সাবধান !—

(১) বন্ধুবান্ধবের মনের আসব বসেছে, অথচ দেখবে, তাঁরা  
মত্ত স্পর্শ করছেন না।

(২) রাত ভাগীর দল।

(৩) ভাবে বিভোর হবার দল।

(৪) সেবার পোভে যেন তাঁরা মুখ বাড়িয়েই আছেন ; কিছু  
না-কিছু করবার লগ্নে যেন সদাপ্রস্তুত।

(৫) তাঁরা কথা বললে উত্তর দেন না ; যদিই বা দিলেন অস্পষ্ট  
শোনায় তাঁদের গদগদ গুঞ্জন।

(৬) চক্ষুসজ্জাধীন দল।

(৭) তাঁরা উচ্ছ্বাসে কণে কণে ঘন ঘন কাঁপেন এঁরা  
সকলেই চোর। ৪৬-৪৭

আর সাবধান তাঁদের, যাঁরা—

(১) প্রার্থনা করেন পরিতোষের প্রার্থনা ;

(২) ঘন ঘন ভোলেন সগর্ভ গর্জন ; এবং—

(৩) যাঁরা ঘোর অপলাপকারী। এঁরা পাপ। শঙ্কর এঁরা  
মন্দির। ৪৮

চোখের সামনে থেকেও চোখের আড়ালের কাজগুলি বিনি  
করেন ;

যাঁর কাছে করা-না-করা, সত্যি-মিথ্যা সব সমান ;

ব'লেও বিনি বলেন, ‘না এমন কিছু তো আমি বলি নাই’ ;

ব্যবহার যাঁর নিষিকার ;

পুরুষদের মধ্যে তিনি পরম ভয়-স্থান। ৪৯

মিন্মিনে নকল মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব নিয়ে, মেয়েলি-চটে কথা কইতে  
কইতে, মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আলাপ করতে করতে, স্ত্রী-বন্ধুদের  
মধ্যে যাঁরা যশের মত ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সাক্ষ্য কামদেব, ...কিন্তু  
গৃহে ধূর্ত। ৫০

এমন মামুষও দেখতে পাবে, ...সর্বদাই যাঁর মাথাটি নীচু, দৃষ্টিটি  
নীচু ; বৈভব থাকলেও দাঁত ময়লা, কাপড় ময়লা ; বসে বসে  
ভাঁড়ারঘরের হিসাবপত্র লিখছেনই তো লিখছেন। ভেবে জাখ তো  
বংসগণ, এমন মামুষা ভাঁড়ারঘরের ইন্দুর কি না ? ৫১

মে মামুষ খ্রীত-বেজার ভবনে গৃহদাস হয়ে সারাটি দিন কাটান,  
অথচ নিজের ঘরের কথায় পক্ষমুখ, ...সেহেন মামুষটিকে চিনে রেখো।  
তিনি চর। সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করাই বিদেয়। ৫২

নিশ্চিনীয় কান্ড, বহু দণ্ডার কান্ড...গাতোও বিনি বেবাক ঠাকান ;  
জীপিকা-নাশের ভয় দেখিয়ে বিনি ব্যবস্থা করেন নিজের  
ভোজনের ;

তাঁর কথা আর বোলো না। তাঁর দমায় রাশিচক্রও স্থির হয়ে  
যায়। ৫৩

বা কিছু গোপনীয় সমস্তই ভালো ক'রে দেখে নিয়ে এবং অতি  
সহজে তার সমস্ত রহস্য জেনে নিয়ে, সেই মূঢ়কেই ধূর্ত আবার শিলে  
কোটেন। ৫৪

রাজবিক্রম কোনো দ্রব্য, বা জালমুদ্রা, বা কুট দলিলাদি বা অন্য  
কিছু ঘরে ফেলে দিয়ে ধূর্ত সরে পড়েন অন্তর অলক্ষ্যে। তার ফল  
ফলে। ধনীবা নিপাত যায়। ৫৫

মামুষ ক্ষুদ্রই হোক বা ক্ষীণই হোক...যদি একবার সে ধনের  
আশ্বাস পায়, বা ...যদি তার অর্থাগম হয়, তাহলে দেখবে,  
তার হাতে যেন আপনা হতেই উদয় হয়েছে অস্ত্র বিধ বা পাশ।  
তিনি ঘম হয়ে ওঠেন। ৫৬

লজ্জা যে নায়কের ঘন, অথবা বিনি কুলীন, অথবা যাঁর শুভতা  
শীল ও মর্যাদা, বহু সম্মানিত প্রায়ই দেখা যায়, সগর্ভ নারীদের  
সহায়তায় তাঁকে মেয়েমানুষ বানিয়ে ফেলছেন ধূর্তরা। ৫৭

আকছার দেখা যায়, ...স্বামীরা প্রবাসে গেছেন,—আর ধূর্তরা  
লুটছেন মুখা বন্দুদের, ...যেকী প্রণয়-রঙ্গের নিরম মুদ্রা দেখিয়ে, অথবা  
না দেখিয়ে। ৫৮

জনবত্তল স্থানে ধূর্তেরা অঙ্গে অভিবণ চড়িয়ে, ভয়বেশে, হেলাভয়ে  
ঘুরে বেড়ান, এবং অচঞ্চল-হস্তে হরণ করেন সকলের ঘন। কেউ  
যদি দেখে ফেলেন, তখন হাঙ্গা, কলধায়...লাভ। ৫৯

ধূর্ত দেখাওয়ে স্থান, সাড়ম্বরে ঘর জাঁকিয়ে বসেন। বিশ্বাস  
ক'রে লোকে তাঁর হাতে গচ্ছিত রেখে যায় লক্ষ লক্ষ টাকা। ফীত  
হয়ে ওঠেন ধূর্ত, পূর্ণ হয় তাঁর গৃহ, পূর্ণ হয় কুন্ত। তারপর বছর  
ঘুরে না ঘুরেই, ধূর্ত দেন পিটান। ৬০

আবার কোথাও দেখবে, এই ধূর্তগণ শত্রুদত্ত রাজপুত্রের সঙ্গে  
বসে গেছেন। কী তাঁদের পরিকার পরিচ্ছন্ন মিহিন ধৃতি !  
স্বর্ণালঙ্কারের কী ঘনঘটা অঙ্গে ! সম্রাটের লোকজন এসে দাঁড়াচ্ছে,  
আর তিনি পূজা কুড়োচ্ছেন ঘরে ঘরে। ৬১

ধর, কোথাও উৎসর্গ-করা দেশবৃত্ত বা পুণ্যভাগল ছাড়া রয়েছে।  
ধূর্তেরা কি করবেন জানো ? সেগুলোকে বিক্রী করে দেবেন।

আর এমনও ঘূর্ণি আছেন বঁরা সেগুলোকে কিনবেন, হুখে পচবেন,  
আনন্দে লাগবেন। অর্ধ লাভ হয়েছে তো! ৬২

মহাশয়-ব্যক্তির ঐশ্বর্য যে ধূর্ত কুন্ত ঘণায় পরিত্যাগ করে চলে  
বান, বিস্তৃত হলো সেই ধূর্তকেই...মাছুবে দিয়ে বায় বিস্ত, সভয়ে  
সম্বন্ধে। ৬৩

মিশার ভূর্জনাথ লেখাপড়া ক'রে দিয়ে ধূর্ত গুছিয়ে কেলেন  
রাশি রাশি পণ্য। তারপরে তিনিও বেরলেন দেশে-বিদেশে,  
আর ধনিকরাও তলিয়ে গেলেন হাজারে হাজারে। ৬৪

বিদেশে যখন বাস করেন, তখন প্রচার করে দেন, গয়া-গঙ্গা  
ইত্যাদি ভীষণাঙ্কর তিনি চলেছেন। মৃতবন্ধুদের নামে পূজো  
দিতে তৈজসপত্র, অর্ধ ইত্যাদি হাতে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত  
হয়ে বান মূঢ়ের। এবং ধূর্ত সেগুলিকে গ্রহণ করেন। ৬৫

কোথাও লেখবে পণ্য-বর্মণী স্থলের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন  
বৃক্ষদের, আর চুরি করছেন তাঁদের গায়ের মহামূল্য পোষাক।  
তাঁরই হাতে আবার দেখবে, অচল রূপেরা গুঁজে দিয়ে ঠকিয়ে  
নিশিপালন করে গেলেন ধূর্ত। ৬৬

কোথাও দেখবে, বোবা বা কালা কোনো বণিককে মালখানার পুরে  
যেখে, ধূর্ত লহমার সরিয়ে ফেললেন তাঁর বহুমূল্য আদর্শ মাল। ৬৭।

কিঞ্চিং পরিচয়,  
কিঞ্চিং প্রগল্ভতা,

কিঞ্চিং কল্লনা,

কিঞ্চিং কলহ,

কিঞ্চিং মামলা—

এইগুলিকেই শাকী করে বিখ্যস্ত করেন সর্বজ্ঞ ধান্নাবাজ। ৬৮।

মেকো বড়লোক তিনি সাজেন;

পেটে পুঁথির বিজ্ঞে, অথচ বচনে বরান জ্ঞান;

বানানোয় তিনি বীর;

চপল একটি চতুর্মুখ।

এই হোলো ধূর্তের প্রকাশ। ৬৯

অজ-প্রভাসগুলোকে কাঁপাতে কাঁপাতে সঙ্কেতে তিনি সকলকে  
জানিয়ে দেন...এখন যে বার ঘরে বিদায় হও। তার পরেই  
মহাধূর্তটি হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছাচারী, দিগন্তরে অন্তর্ধান হন...মজা  
লুট। ৭০

গুণজনদের সামনেও অবোধে ধূর্ত বলে বান "একশ বছরের পুরোনো  
একটি মাত্র আমলকী খেয়ে ত্রীপদন্ত থেকে আমি এসেছি। আমার  
অবশ্য হচ্ছে শুভ-স্মৃতি।" ৭১

বংশগণ, হোমাদের কাছে সংক্ষেপে আজ আমি বর্ণনা করলুম  
চৌব্বিটি মায়। কে জানে, লাখ লাখ কত রয়েছে ধান্না-মহারাজদের  
মায়। ৭২

ইতি কলাবিসায়ে নানা-ধূর্ত-বর্ণনঃ নাম নবমঃ সর্গঃ।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

## পালুতে মাদার

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য

কণ্টকময় লতাগুল্মের চূড়ে  
কে ভুমি উঠেছে ফুটে?  
প্রভাত-অরুণ বর্ণ তোমার সুরে,  
ধূলার ধরণী রূপটৈবতব লুটে;  
তোমাতে চিনেছি পালতে মাদার অয়ি!  
দিব্যাকনা, রূপসী-মহিমময়ী!

ভুমি স্বরগের পারিজাত মন্দার,  
ধূলার ধবায় কেন আভাসার তব?  
নন্দনরাণী শচীর কণ্ঠহার,  
কা'র অভিশাপে কণ্টকযোনি জড়?  
মম মালক ধস্ত করেছ ভুমি,  
ধস্ত ধরার সমীর তোমাতে চুমি'।

শাখার শিখরে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটি'  
বস্ত্রাধরা, বস্ত্রাঙ্গিনী বালা,  
কোকনদরুচি দল দিয়ে ভরি মুঠি  
ফান্তনে আজি রিক্ত করিছ ডালা  
সারাদিন কেন তরুতলে বাও বরি!  
উত্তলা হ'য়েছ কা'র কথা 'সরি' 'সরি'!

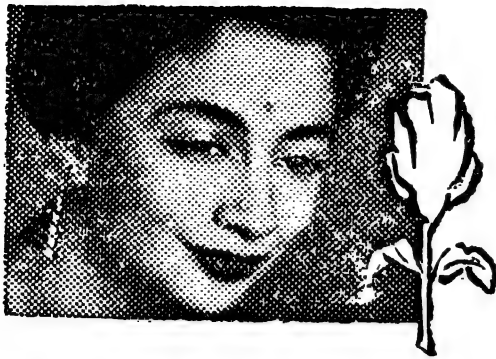
অজের বিলাপে ভরি গেছে ত্রিভুবন,  
অমৃত করেছে বিবের বৃষ্টি হায়!  
রাজাধিরাজের হরিয়া বৃকের ধন,  
কোন বেদনায় অন্তর তব ছায়?  
যে ভূমে পড়েছে লুটায় ইন্দুযতী,  
এসেছ কি তা'র জুড়াতে স্বয়ং সতি!

কণ্টকময় আছিল শয়নতল,  
মরমী অমরী ছাড়ি এলে অমরায়,  
দুপের বহ্নিদহনে দীপ্ত দল  
আজ্ঞও তেরি রাঙা 'সরি সেই বেদনায়।  
অয়ি পারিজাত, অয়ি মন্দার মোর,  
ইন্দু-মরণে অপরাধ কিবা তোর?

কুটিল নিয়তি করেছে কুটিল লীলা,  
ভুমি দরদীয়া স্বরগ তেয়াগি এলে;  
কণ্টক পরে কুচ্ছদাধনলীলা,  
কুকুমবাভা দলগুলি দিলে মেলে।  
দুখের এ ভুমি, কঠিন ধরণী তল,  
এ নহে তোমার যোগ্য আবাস স্থল।

অয়ি পারিজাত, অয়ি মন্দারবালা!

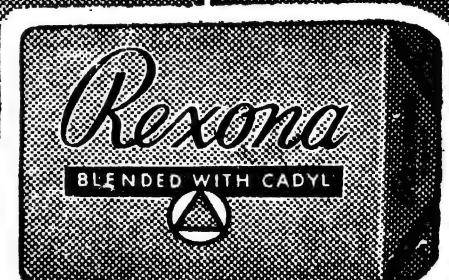
মম কণ্ঠের লহ সঙ্গীতমালা।



ফুলের মত...  
আপনার লাবণ্য রেঙ্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেঙ্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের  
জগৎ তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



প্রকমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেঙ্সোনা প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 148-X62-BQ





## পথ ত পথ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১০

কনুটের ঘোষ-চাকলাদার যেমনটি আশা করেছিল, তেমনটি হল না।

ক্রমশ ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হতে থাকল তারা। রণবীর ঘোষ না হোক দ্বিজেন চাকলাদার বটেই। সপ্তাহে দু'তিনবার পালা করে হেড আপিসে আনাগোনা করছে। আশাস পাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সেটা খুব জোঁরালো লাগছে না এখন। চড়া মাস্তুলে এমন নিশ্চিন্ত আশাস সর্বত্র মেলে। হেড আপিস থেকে লেখালেখি চলছে। এখান থেকেও জবাব যাচ্ছে। এই মাঝুলি আপিসি-চালের রীতি জানে।

নিরুপায় বিকোভ আর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। এ ছাড়া পথও নেই আর। ইচ্ছে করলেই একটা সোঁরগোল ফেলতে পারে তারা, হেস্তনেস্ত করতে পারে। কিন্তু তাতে করে বে জালে জড়িয়েছে, সেটা আরো জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যা খেতে অভ্যস্ত নয় বলেই প্রথমে গর্জে উঠেছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল একটু। অনবধানে ওই যা সূর্যবাসী হতে পারে। কারণ সন্ধ্যের দায়ে কনুটটির বাতিল করাটাই শেষ অস্ত্র নয় চীক ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। অগুট চালে তাকে খাঁটাতে গেলে যে ব্যবস্থার এগোতে পারে সে, তার রাস্তা সোজাশুজি গারদের দিকে।

অবশ্য এ ধরনের ভাবনা শুধু দ্বিজেন চাকলাদারেরই। রণবীর ঘোষ অত ভাবে না। ভেজালের দায় তারও জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার যাত্নও জানা আছে। তা ছাড়া গো-ডাউনে এখনো আর ভেজাল নিরে বসে নেই সে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৌকস হলে গো-ডাউনে পাহারা বসাতো সর্বাত্মে। তবু চূপ করে আছে সে-ও। কারণ, ব্লকের সেই ফটলটাতো এখনো ধাঁ করেই আছে তেমনি। চালে ভুল হলে ওটা যা গ্রাস করেছে, তার থেকে অনেক বেশি উগরে দিতে পারে।

গো-ডাউনে বাসুর পাহাড়, পাথর-কুঁটির পাহাড় আর সিমেন্ট বস্তার পাহাড়গুলো যেন নিশ্চল অনাকরের বোঝা বইছে একটা। বিরাট অপচয়ের সম্ভাবনার স্তর। বোঝা নিঃশাস ছাড়ছে যেন। সর্বত্র পরিত্যক্ত শূন্য অমুভূতি একটা। করতংপর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। রণবীর ঘোষ সেখানে এসে পাড়ায় একসময়। দুর্জয় ক্রোধে দেহের প্রতি রক্ত ভরাট হতে থাকে।

চিঠি পড়ছে। কলকাতার আড়ত থেকে চিঠি। নতুন বাবতা কিছু নেই। হেড আপিসের প্রীতিবদ্ধ শুভামুখ্যারীদের নির্দেশ, চীক ইঞ্জিনিয়ার নরম না হলে তদবীর তদারক করে বিশেষ সুরবিধে হচ্ছে না। অতএব, ইত্যাদি।

অকুট কটুক্তি করে বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। তেলতেলে মুখে লাগতে আভা। দ্বিজেন চাকলাদারও চিঠি পড়ে ভুক কৌটকালো। চিঠিখানা আবার ছুঁড়ে ফেল দিল তার সামনে।

পাইপ মুখে রণবীর ঘোষ অনেকটা ঘেন নিজের মনেই বলল, চীক ইঞ্জিনিয়ারকে নরম করার পরামর্শ দিয়েছে।

ধিরক্ত মুখে দ্বিজেন চাকলাদার জবাব দিল, তা তো দিয়েছে, কিন্তু লোকটা যে নিরেট পাথর একখানা, তাকে নরম করবেন কি করে?

ঠিক কানে গেল না ঘোষ হয়। অথবা শুনেও শুনল না। ঘোষ ভাবছে কিছু। আর পাইপ টানছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, কিন্তু সেরকম চেষ্টাও তো করিনি।

লোকটার এ ধরনের ভাব-ব্যতিক্রম চেনে দ্বিজেন চাকলাদার। মগজের নতুন কিছু মতলব এসেছে বা আসছে। ও মগজের প্রতি আস্থাও প্রচুর। অবশ্য যদি সেটা নারী-বিবর্জিত পথে চলে। মুশকিল আসানের জাপ পেল যেন।

নিজের অজান্তে চিঠিটা দুই হাতের চেটোয় ভালগোল পাکیয়ে ফেলেছে রণবীর ঘোষ। ভালগোল পাکیয়ে চলেছে আরো। অস্ত্র-ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। সামনে দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি আটকে আছে স্থাপুর মত। চোখ পড়ল। নিশানা করল। ছুঁড়ে মারল ঠক করে। ঢ্যাপ করে শব্দ হল একটা। টিকটিকিটা মাটিতে পড়ল। গান্ধ লাগেনি, আচমকা আক্রান্ত হয়ে খাবা ফসকেছে। সেই এক কথাই বলল আবার রণবীর ঘোষ, সেরকম চেষ্টাও তো করিনি আমরা তাকে নরম করার, করেছি?

জবাবের প্রত্যাশায় নয়। নিজের মনেই পর্যালোচনা করেছে কিছু। ভুল হয়েছে বই কি। সুপারিশ করতে গিয়েও উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছিল। নতুন হয়নি বরং একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এসেছে। গোড়ায় গোড়ায় হত না এমন ভুল। ভিতরের দস্ত বিনয়ের আঁচে তরল করে নিতে পারত যখন তখন। মর্খাদার শিখরে বসে ডায়ের ওই অল্পবয়সী ওপরজাটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মান না দিয়ে ভুল করেছে। নইলে কল্‌ফিকির জানে বই কি। পাথর নরম করারও কল্‌ফিকির জানে।

এবারে মনভিজানো আবেদন নয় আর। নিরভিমান সমর্পণ। সেও লক্ষ্যস্থলে নয় সরাসরি। মাটি চুঁইয়ে শিকড়ে পৌছানো মত এই সমর্পণের ধারাও চীক ইঞ্জিনিয়ারের দরবারে পেশ করছেন চৌধুরী বাবু। বলল, কাসির আসামীও নিজের হয়ে দু'টো কথা বলতে পার, আমরা কি তাও পাব না?

বিরত বোধ করল নরেন চৌধুরী। মাসের পর মাস এরকম নিরুপায় কেটে বাবে ভাবেনি। উতলা ভাবটা একেবারে যায়। তবু। স্বচ্ছ জলের নিচে খানিকটা পঙ্কিলতা জমে থাকার মত এ অনাবিল কর্মশ্রোতের তলার তলায় একটা গোলযোগের আশঙ্ক্য বিতিয়ে আছে সেই থেকে। কখন বুঝি ঘুলিয়ে ওঠে। কিন্তু তা বদলে ক'মাসের এই শাস্ত প্রতীক্ষা আর তারপর এই নতি স্বীকার।

এতটা আশা করেনি নরেন চৌধুরী। আশা করেনি বলে আবেদনও যথাস্থানে পৌঁছল।

সময় অনেক ভোলায়। কোন রকম বাধা না পেয়ে চি

ইঞ্জিনিয়ারের সেই রুচতা গেছে। তা'ছাড়া মেজাজও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আজকাল। জবাব নিল, কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো ?

নরেন বলল, কি বলতে চায় শুনতে বাধা কি। গোড়ার দিকে লোকটা উপকারই করেছিল। এ ব্যাপারে শাস্তিও যথেষ্ট হয়েছে—এরপর কিছু করা সম্ভব হলে করবে, নয় তো সেটাই বুঝিয়ে বলে দেবে।...কার ভিতরে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, দেখই না কি বলে।

বাদল গাঙ্গুলি আপত্তি করেনি আর। দিনস্থির করে মরেন রণবীর যোথেকে জানিয়ে দিল।

তুনে মনে মনে আর একদফা কটুক্টি বর্ষণ করল রণবীর যোগ নিজের উদ্দেশে। স্থূল দস্তুর বেশে মিথোই এই ক'টা মাস এভাবে নষ্ট। যেখানে মাটি তেতে আছে সেখানে জল না ঢেলে ছুটল কি না ঠাণ্ডা হেড আপিসকে আরো ঠাণ্ডা করতে !

দিনে দিনে খুশির মাত্রা বাড়ছে নরেন চৌধুরীর। নিষ্পেষিত ভিতরে কোথায় যেন অনেকদিন ধরে একটা খুশির আলো জ্বলে বসে আছে সে। মনের আনাচে কানাচে সর্বত্র খুশির বলক। বাদে শুধু সেই খুশি প্রদীপের নিচটুকু। সেখানে কি যেন এক আলো-আঁধারি সংশয়।

কিন্তু মানুষটাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ভাবনশূন্য উজ্জলতার ভরপুর। বৈদিকে তাকালে সশয় সেদিকে তাকিও না। ঠিক সময়ে ঠিক লগটির প্রতীক্ষা করে শুধু।

গোড়ায় গোড়ায় কি মড়াই ভালো লেগেছিল এত ? কারো হাওয়ায় প্রজ্ঞাপতির মত এমন পাখা মেলছে মন ? কি জ্ঞানি। কিন্তু এখন ভালো লাগার মাত্রাটা প্রায় হ্রাস হয়ে ওঠে এক একদিন। মড়াইয়ের ওধারে ধূসর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যখন সূর্য ওঠে তখন থেকে শুরু হয় ভালো লাগা। বেসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়াইয়ে জল বাঁধার কর্মস্রোতে মিশে থাকে সেই ভর-ভরতি ভালো লাগার উদ্দীপনা। বিকেলে যখন গলানো সূর্যের রঙ আটকে থাকে পাহাড়ী মেঘের ফাটলে ফাটলে, ওর ভালো লাগার সঙ্গে তখনকার সেই রঙটাও ভারী মেলে যেন। তারপর ভালো লাগে মড়াইয়ের আকাশ আর মড়াইয়ের বাতাস আর মড়াইয়ের সমাহিত পাহাড় আর মড়াইয়ের তমস্বিনী রাত্রি।

যে লগের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা, তার আভাস এখন মনোগোচর খানিকটা। অন্তত সেই রকমই ধারণা। চোখের সামনে একজনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে একটুখানি। করেছেও। প্রথম উপসন্ধি করেছে পাগল সর্দারের বাদনা উৎসবের নেমস্তম্ভ রাখতে গিয়ে। তারপর ফেরার পথে পাহাড়ের ওপর সেই পাথরটায় বসে। তারপর অনেকদিন। চেতনার আলোর হুঠাৎ থমকে যাওয়ার মত সেই পরিবর্তন। তারপর থেকে একটু যেন ব্যবধান বাড়ছে, একটু যেন আড়ালে রাখছে, একটু যেন আগলে রাখছে। নরেন বোঝে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। নিজেকে দেখছে দেখুক। ওই দেখাটাই লগের সূচনা।

—কি ব্যাপার! দিক-বিদিক ভুলে অমন হন্ হন্ করে চলেছেন কোথায় ?

সামনের বড় পাথরটার আড়ালে ঝরণা একটা শুকনো গাছের ডাল দিয়ে পাহাড়ের দেয়াল থেকে পাহাড়ী ফুল-চয়নের চেষ্টা করছিল। পাথরটার পাশ কাটিয়ে নরেন আর লাকায়নি বলেই দেখতে পারিনি।

ঝরণা হেসে উঠল খিলখিল করে। হাতের শুকনো ডাল ফেল এগিয়ে এলো। সোনালি ফেমের পুরু লেঙ্গের ওধারে দুই শাদাটে চোখে কোঁতুক উপছে তুলে বলল, দিলাম তো বাধা ? চলেছেন কোথায় এভাবে ?

ঝরণার হাসি আর সঙ্গলভ কোঁতুক নরেন চৌধুরীর ভালো লাগেনি প্রথম থেকেই। অনেক দিন দেখা হয়েছে, অনেক দিন হাল্কা আলপন করেছে। ঝরণা কথা বলেছে অনর্গল আর হেসেছে অজ্ঞপ্ত। কিন্তু নরেনের মনে হয়েছে মেয়েটা কোথায় যেন ঠিক স্তম্ভ নয় খুব। সেই অসুস্থতা ক্ষয় করার চেষ্টা তার এই হাসি-খুশিতে আর চলেন-বলেন। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত নয় বলেই খানিক বাদে উজাড় করা শূন্যপাত্রের মতই রিক্ত দেখায় ওকে।

জবাব এড়িয়ে নরেন ঠাটা করল, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ফুল চুরি করছেন, দেখব কি করে ?

—হায় রে কপাল ! ঝরণা বড়-সড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা, বান কোথায় যাচ্ছেন, এর পরে এত বড় রাস্তাটাই হয় ত গা-ঢাকা দিয়েছে মনে হবে।

বা বললে খুশি হবে জানে, এর পর তাই বলল নরেন।—আপনি আছেন, এতটা না-ও মনে হতে পারে।

ঝরঝরিয়ে হেসে উঠল ঝরণা। নরেন জানতো হাসবে। এমনি হাসতে-হাসতে হঠাৎ এক সময় সব হাসি যেন ছুরিয়ে যাবে মেয়েটার। পুরু লেঙ্গের ভিতর দিয়ে দেউলে হাসির আভাষ তবু চিক-চিক করবে চোখের কোণ ছুটো। সচকিত হয়ে সোজা প্রশ্নান করবে তার পর।

হাসির মধ্যেই ঝরণা ভেবে নিল বোধ হয় কিছু। জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই যাচ্ছেন কোথায় ?

—অবনীবাবুর কাছে। নরেন গম্ভীর মুখেই জবাব দিল।

ঝরণা বলল, তাহলে অ্যাডাল্ট-টান ককন, মেন-কোয়ার্টারস্ এর রাস্তা ধরে আবার নাক বরাবর হেঁটে বান সোজা—আমি গেট-হাউসের দিকে দেখে এসেছি তাঁকে।

নরেন বেকায়দায় পড়ে গেল। উৎফুল্ল মুখে ঝরণা বলল, সাথে বল কেঁটাছুব ছাড়া সবাই মেয়ে, যাচ্ছেন তো মড়াইকন্ডা দর্শনে—বেচারী অবনীবাবুকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন ? বান, আর আটকাবো না আপনাকে।

জবাবে নরেনও গোটাঁকতক গিল্লনী কাটতে পারত। কিন্তু পাঁচটা রসিকতার আঁচ পেলেই চকচকিয়ে উঠবে আশান। তা ছাড়া অবনীবাবুর বাড়ি না থাকার প্রসঙ্গেও গোপন দুর্বলতার একটু ছা পড়েছে। স্কেনারেল কোয়ার্টারের দিকে ওর পা বাড়ানোর সময়ের সঙ্গে অবনীবাবুর বাড়ি থাকার সময়টা প্রায়ই মিলছে না আজকাল। মিলছে কি মিলছে না আগে একবারও মনে হত না। এখন হয়।

শাদাসিঁথে আমন্ত্রণ জানানো, আপনাই বা এমন কি কাজ, চলুন না একসঙ্গে বাই গল্প করতে করতে।

খুব আগ্রহ ঝরণার।—কিছু কাজ নেই আমার, কিন্তু সত্যি

বলছেন! আসব সঙ্গে! চলুন তাহলে, সাহসীকে একদিন

বলেছিলাম, বাব। সানন্দে কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল  
আবার। বলল, থাক গে, মিছিমিছি, আপনি যান—

যেভাবে বলল, শাদা অর্থ বাবার ইচ্ছে বোল আনা, কিন্তু  
উপর পড়া হয়ে গিয়ে কারো আনন্দবিনোদনে আবার বাধ্যত  
ঘটাই কেন। নরেন বিব্রত এবং বিরক্ত হল মনে মনে। আচ্ছা  
ছেলেমানুষ তো আপনি! যাবেন তো চলুন—

উজ্জল হেসে বরণা বলে উঠল, আমায় কেউ ছেলেমানুষ  
বললেই মা তাকে সন্দেহ না খাইয়ে ছাড়ে না। উৎফুল্ল নিঃশ্বাস  
ফেলল একটা, বলছেন যখন, যাই চলুন।

জেনারেল কোয়ার্টারসএব রাস্তা ধরে পাশাপাশি চলল তারা।  
ছোট মড়াইয়ে নিতান্ত ঘরবন্দী হয়ে না থাকলে সকলেই সকলের  
ইাড়ির খবর রাখে। অন্তত এই মা মেয়েকে চিনতে বাকি নেই  
কারো। ভিতরে ভিতরে অবিরাম একটা টাগ অব ওয়ার চলছে  
যেন মা-মেয়েতে। মা চান টেনে রাখতে, মেয়ে চায় ছিটকে বেরিয়ে  
আসতে। মায়ের টেনে রাখাটাও যেমন বিশদৃশ, বিপরীত যৌকে  
মেয়ের বেরিয়ে আসার সঙ্গ্রগলভ আশিষ্যও তেমনি অশোভন মনে  
হয় অনেকের চোখেই। চলতে চলতে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আপনি  
তাহলে এ বছরটা উপ করছেন?

—উপ করছি মানে?

—এ বছর এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন না?

—ও, তাই বলুন। কি করে দেব, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে  
দিনকে দিন দেখছেন না? শরীর আগে না পরীক্ষা আগে?  
হাসতে লাগল, মায়ের কাছে শোনেননি এসব কথা?

বেগতিক দেখে নরেন চুপ। শুধু পরিহাস নয়, পুঞ্জীভূত  
খানিকটা ক্ষোভের মুক্তি। সব জেনেও বিস্মিত হল মনে মনে।  
ব্যাপি মায়ের না মেয়ের!

অবনীবাবু বাড়িতে পা দিয়েই আরো যেন বোবা হয়ে পেল সে।  
বাইয়ের ঘরে বসে অবনীবাবু পড়ছেন কি। নীরব বিষয়ে নরেন  
তাকালো বরণার নিকে। চশমার ওধারে থেকে চাপা হাসি উপ-  
পড়ছে।

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। বরণা বলল, আমাকে  
আপনি চেনেন না বোধ হয়, তু আপনায় বাড়ি চড়াও করেচি,  
আপনায় মেয়ে চেনে অবশ্য—

—আমিও চিনি, অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ওরে সাহসী,  
দেখে যা কে এসেছেন—

একটু আগে ছোকরা চাকর সন্দরীকে নিয়ে ফিরেছে। সাহসী  
তার তত্ত্বাবধান করছিল। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে যেমন  
ছিল তেমনি বেরিয়ে এলো।

অতি অন্তরঙ্গ জনের মত বরণা একেবারে জড়িয়ে ধরল তাকে।  
—কেমন? ভাবো নি তো? বলেছিলাম না আসব—এসে  
গেলাম। এখন খুশি হয়েছে কি হওনি তুমিই জানো।

বাবার সামনে নরেনবাবু সামনে এই আচমকা উজ্জ্বল সাহসী  
হকচকিয়ে গেল প্রায়। যে ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো শক্ত।  
ভিতরে এনে দাওয়ায় মাহুর পেতে বসালো তাকে। নিজেও বসল।  
ভাবেনি তো বটেই। খুশি হয়েছে কি হয়নি তাও জানে না।

বরণা দু'টার মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করল তাকে। কি ক'ছি

এসময় বাড়ি বসে?

তার চোখে চোখ রেখেই হাক্সা হেসে সাহসী জবাব দিল,  
গোয়ালঘরে ছিলাম।

—গোয়ালঘর! চশমার ওধারে দুই চোখ বড় বড় দেখালো  
বরণার। যেখানে গোক থাকে? তোমার আছে? সাগ্রহে একেবারে  
উঠে কাঁড়াল সে, চলো তো দেখি।

এবারে বিষয়ের পালা সাহসীর। হাত ধরেই টেনে আবার  
বসালো তাকে। আচ্ছা দেখবেন'খন পরে, বসুন। আসার সঙ্গে  
সঙ্গে ওখানে আপনাকে নিয়ে ঢোকালে বাবার কাছে বকুনি খেয়ে  
মরতে হবে।

আগ্রহটুকু এভাবে অগ্রাহ হতে বরণা বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।  
বাবাকে বৃষ্টি ভর্য করে খুব?

সাহসী হেসে মাথা নাড়ল, খু-উ-ব। পাশের ঘরের দিকে  
তাকালো একবার। কানে গেলে দু'জনেই হেসে উঠবে।

চশমার ওধারে বরণার চোখে হাসির ছটা কমে আসছে। দেখছে  
চেয়ে চেয়ে।—সেই কবে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, আর আজ।  
সেই যে সাঁওতালদের কি উৎসব দেখতে গিয়েছিলে তোমরা—বনের  
ধারে নদীর পায়ে দেখা হল মনে নেই?

সাহসী জবাব দিল না। মনে আছে। আর তার পরেও  
বরণা ওকে না দেখুক, ও দেখেছে। বরণীর ঘোষের জিপে চড়ে  
হাওয়া খেতে দেখেছে আরো অনেকবার, ভূতুপাবুর দোকানের কোণে  
তেমনি বঁধাখঁড়ি বসে গল্পগুজব করতে দেখেছে কলকাতার সেই  
প্রাইভেট কলেজের মাষ্টারের সঙ্গে—ওর মা যাকে বোকা ভাবে, অথচ  
বোকা নয়। বরণার মতে আসলে ভালো বলেই বোকা দেখায়  
যাকে।

থেকে থেকে বরণা তেমনি নিরীক্ষণ করছে তাকে। কিছু একটা  
নির্ণয় করার মতই।—সেই তখন যা দেখেছিলাম তার থেকে আরো  
যে ঢের সুন্দর লাগছে এখন তোমাকে। অস্টুট হাত্তে বরণা  
একেবারে গায়ের কাছে বঁধে বসল তার।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না সাহসী। দিন কতক  
আগে চাঁদমণিও এই কথাই বলেছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত তার  
চোপের নাবীমূলভ প্রশংসাই সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এ যেন ঠিক  
তা নয়। খানিকটা যেন পুরুষ চোখে বাচাইয়ের দৃষ্টি। বিশ্লেষণ  
করে দেখা। সরে বসতে পারলে একটু সরে বসত সাহসী।

বরণা কথা শুরু করল আবার। নানান কথা। অবাস্তব  
কথা। কতদিন ভেবেছে আসবে, কি রকম বিচ্ছিন্নি লাগে  
এক এক সময়, কি করে সময় কাটায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির—  
মায়ের কত বক্তৃতা তার জন্ম, ইত্যাদি।

একবারও শুনেছে না সাহসী। এই কীকে দেখে নিচ্ছে সেও।  
সঙ্গোপনে যা দেখতে চাইছে। চাঁদমণির মুখে যা দেখেছিল  
যে পুরুষ-নির্ধাতন দেখেছিল। এরকম কোঁতুল নিজেই কাছেই  
বিড়ম্বনা। লজ্জাকর। তবু কোঁতুল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাঁদমণি হতছাড়াটা প্রাধান-পটু  
নয় এমন।

—হী করে দেখছি কি?

নড়ে চড়ে বসে সাধুনা তেমনি জবাব দিল, দেখছি কোথায়, শুনছি তো—আপনি এ সময় এলেন কোথেকে ?

জবাব না দিয়ে ঝরণা হঠাৎ সামনের দিকে খুঁকে হাঁক দিল, নরেন বাবু, ও নরেন বাবু !

নরেন এসে দাঁড়াতে বলল, ওখানে ক'ছেন কি এখানে বসুন। সরে বসে মাহুবে জায়গা করে দিল। সাধুনা জিজ্ঞাসা করছে এসময় কোথেকে এলাম, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল কি করে। বলব নাকি ?

সাধুনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে। মাহুবে যোগাশন হয়ে নরেন হাক্কা জবাব দিতে বাচ্ছিল কি। কিন্তু তার আগেই আবার এক বলক "হেসে ঝরণা বলল, জানো, নিয়ে আসতে কি চায় আমাকে, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়ে তবে এসেছি।

আবার সেই শাদাটে উচ্ছলতা ঝরণার চোখে মুখে। নরেন বলল, এ রকম সত্যবাদিনীর দেখা পেলে যুগিষ্ঠির মহারাজ হয়ত একেবারে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তুলতেন।

মুখে বিবস ছায়া ফেলে ঝরণা তাকালো তার দিকে। বলল, কলকাতায় দাদার বাড়ির চাকরটার নাম যে যুগিষ্ঠির !

সাধুনা স্তব্ধ এবার হাসল অনেকক্ষণ ধরে। সেই প্রথম দিন তার মায়ের সঙ্গে দেখে ভালো লেগেছিল। আর এই এখন লাগল। মাঝখানের যতকিছু সব মুছে গেলে আরো ভালো লাগত।

আতিথেয়তার কথাও স্মরণ হল একক্ষণে। ওঠার উপক্রম করতে ঝরণা বাধা দিল, ও কি, বাচ্ছ কোথায় ?

—আপনাকে চা করে দিই একটু।

—বোসো ! ধমকে উঠল প্রায়। তারপরেই মনে পড়ল বোধ হয় কিছু। বলল, চা খেতে যাব কেন, তোমার বাবা খা প্রশংসা শুনি, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব একদিন, দেখো।

ঈশ্বর বিষয়ে সাধুনা নরেনের দিকে তাকালো একবার। কিন্তু নরেনও যথার্থই কোন দিন একে বলনি কিছু। সেই জিজ্ঞাসা করল, প্রশংসাটা কার কাছে শুনলেন ?

—লোকের অভাব ! এই মড়াইসুদ্ধ লোক তো ওর ভক্ত, মেয়েটা বাচ্ছ জানে—। বাচ্ছ জানে কি না সেটাই যেন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। পরে বলল, এর মধ্যে সেরা ভক্ত দু'জন।

নরেন জিজ্ঞাসা নেত্রে চেয়ে রইল। সাধুনা আশঙ্কায় ছুঁ ছুঁ।

ঝরণা বলল, একজন ভুতুবাবু আর একজন নিধুরাম।

নরেন হেসে উঠল। সাধুনাও হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ঝরণা বলে গেল ভুতুবাবু মা-লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান, নতুন কোন মেয়ে চা খেতে গেলে আগে মা-লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনতে হবে তবে চা পাবে। আর ওদিকে নিধু বলে, এমন রান্নার রান্না, খেয়ে তার গুরুগম্ভীর বাবু স্তব্ধ কাবু।

হাসিভরা দুই চোখ জ্বলতে করে নরেনের মুখের ওপর বুলিয়ে নিল একপ্রহর। কিন্তু নরেন খেয়াল করেনি। নিজের অগোচরে সাধুনার সঙ্গেই দৃষ্টি বিনিময় ঘটল তার। চকিতে অন্ধদিকে মুখ ফেরালো সাধুনা। বিরক্ত এবং আরক্ত।

ওদিক থেকে অবনীবাবু এসে দাঁড়ালেন সামনে। ঝরণা বলল, কেমন হাট বসিয়ে দিয়েছি আমরা দেখুন। তার পরেই সোজা উঠে

দাঁড়াল একেবারে।—আপনার সঙ্গে আলাপই হল না, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন—গল্প করতে করতে যাব।

—বেশ তো, বেশ তো।

—বেশ তো না, এখুনি যাব, রাত হয়ে গেল।

তাড়া খেয়ে অবনীবাবু জামা বদলাবার জন্য ঘরে গেলেন আবার। ঝরণার দু'চোখ যেন খলখলিয়ে হেসে উঠল নরেনের মুখের ওপর। তার অর্ধ শুধু প্রোঞ্জল নয়, অস্বস্তিকরও।

সাধুনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। না করলে অস্বাভাবিক লাগত না কিছু। করল বলেই বাবাকে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার পিছনে স্থলবসিকতার আভাস পেল। এতক্ষণের ভালো লাগাটুকুর ওপর যেন কালির ছিটে পড়ল একপ্রহর। বিরক্তিতে মুখ লাল হয়ে উঠল সাধুনার।

অবনীবাবুকে নিয়ে ঝরণা চলে গেল। আর যাবার আগে ওদের দুজনার মাঝে বেশ ঝানিকটা অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সহজতার তাগিদে নরেনের পকেট থেকে সিগারেট বেরুলো, দিয়াশলাই বেরুলো, হাতীর দাঁতের কানকাঠি বেরুলো, নাকস্থ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরুলো আর সবশেষে কর্ণ-পটহ তোরাজ-মুলভ গলা দিয়ে সেই পেটেট শব্দ বার হল গোটাকতক।

সাধুনা চেয়েছিল দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে তার বাবা আর ঝরণা বেরিয়ে গেল। মুখ না ফিরিয়ে ক্র-ভঙ্গি করে বলল, জ্বুত !

—আমি ? না ওই যে গেল ? নরেনের মুখে উৎকর্ষায় কাক্কার্কার।

সাধুনা হেসে ফেলে তাকালো তার দিকে। দুজনেই, নইলে ও আপনার সঙ্গে এসে জুটল কি করে ?

—বরাত। দীর্ঘনিঃশ্বাস।

—মেয়েটা, মাধার ছিট আছে।

—তা আছে। নরেন সায় দিল, ও এক ধরনের রোগ, বিষম রোগ।

শোনামাত্র আবার অন্ধদিকে চোখ ফেরালো সাধুনা। লাল হয়ে উঠছে, নিজেরই বুকে।

নরেন অস্বস্তিক। ঠিক তামাসা করে বলেনি। যেটুকু বলেছে তাও স্পষ্ট নয় খুব। কিন্তু ঝরণার রোগের স্বরূপ সাধুনাও যে যথার্থই উপলব্ধি করে বসে আছে, একবারও ভাবেনি।

মনে মনে কি জানি কেন আবার সেই অস্বস্তিকর খুঁশির স্পর্শ লাগল মনে। কিন্তু আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির দিকে এগুলা না। ঝরণা প্রসঙ্গ সরাসরি ধামাচাপা দিল।—যেতে দাও ওসব—সুখবর ছিল, মেয়েটার পাল্লায় পড়ে তোমার বাবাকে বলা হল না।

জিজ্ঞাসা নেত্রে তাকালো সাধুনা।

—চিকিৎসিনিয়ারের সঙ্গে যোগ-চাকলাদারের এবারে একটা ফরসলা হতে পারে বোধ হয়, ব্যবস্থা করে এলাম।

—কি ব্যবস্থা ? ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

ঝরণার ঘোষের আবেদন এবং বাদল গাঙ্গুলির কাছে সুপারিশের বৃত্তান্ত জানালো।

অকস্মাৎ দপ করে জলে উঠল যেন একমুঠা নিকুণ্ডাপ হাই।—কেন, কেন আপনি সর্দারি করে এ ব্যবস্থা করতে গেলেন ? কে

আপনাকে করতে বলেছিল? ডেকে ছুটো মিষ্টি কথা বলল, আর গলে জল হয়ে অমনি ছুটলেন সুপারিশ করতে?

নরেন হতভম্ব। এমন আর দেখেনি। কি হল?

উত্তেজনার অধর দংশন করে রইল সাধনা। নরেনের বিষয়ের শেষ নেই। কি ব্যাপার? পাছে কিছু গোলমাল হয়, সেই জন্তেই তো—

মেজাজ চড়লো আরো।—ওঃ, একটা লোক এতবড় কাজের মধ্যে গোলমাল করে তো একেবারে উন্টে দেবে সব—সেই ভয়েই গেলেন আপনারা! আর ওদিকে বুক ফুলিয়ে বা খুশি করে বেড়াবে সে। কতবড় পাকি ও লোকটা জানেন? পাগল সর্দারের ওই মেয়েটাকে পর্বস্ত একেবারে—

রাগে ক্ষোভে লজ্জায় শেষ করতে পারল না। অত্নদিকে বাড়ি গৌজ করে বসে রইল।

বিহ্বল বিষয়ে নরেনের মুখে কথা নেই আর। মড়াইয়ের বুক থেকে এক ভরাপ্রাণ কালো মেয়ের অন্তর্ধান হঠাৎ একটা স্থল রহস্যের পরমাঠে একেবারে চোখের সামনে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। সাধনা জানল কি করে? সর্দার বলেছে? মন বলেছে, না। ওদের বলাব রীতি এরকম নয়। বললে সরাসরি রণবীর ঘোষকেই বলত। আর সেই বলায় মড়াইয়ের পাঁজরে ত্রাসের কাঁপুনি জাগত।

রাগ কমে আসছে সাধনার। অস্বস্তি বাড়ছে। এ নীরবতা শুধু বিষমহত নয়। জিজ্ঞাসা-স্বত্বও। কিন্তু মানুষটার বিবেচনার প্রশংসা না করে পারল না। আত্মসেও কোন প্রশ্নের দ্বারা বিভ্রত করল না ওকে। বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করেই যেন উঠে চলে গেল এক সময়।

রাগ গেছে। উত্তেজনা কমেছে। পুরুষ সন্নিধানজনিত সঙ্কোচও নেই। চূপচাপ খানিক বসে থেকে বড় করে একটা নিঃশ্বাস কেঁসল সাধনা। কিন্তু খুব আরামের নয় যেন। তলার তলার একটা অজায় বোধ জাগছে। অকারণে এত কথা বলল, এত কথা শোনালো। ভুললোক যা করছে বা করতে গেছে সবটাই ভালোর জন্তে। তা ছাড়া ভিতরের এ সব ব্যাপার জানতও না। কিন্তু রাগের মাধ্যম কি বলতে কি না বলে বলল!

শুধু অহুতাপ নয়। একটুখানি আশঙ্কাও। ওর কথা শুনে সব আবার নাকচ করে দেবে না তো! জানাজানি হবে না তো কিছু? ডায়ের কাজে নতুন কিছু বিভ্রাট বাধবে না তো আবার? ছেলে-মানুষের জন্ত নিষ্পেষ উপরেই মর্যাদিক জুঁক হল সাধনা। তবে গোলযোগের আশঙ্কাটা থাকল না বেশিক্ষণ। নরেনবাবু না হয়ে আর কেউ হলে ভাবত...বাবল গাজুলি হলেও নিশ্চিত হতে পারত না।

স্বয়ং চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টারে এক নাটকীয় প্রহসন ঘটে গেল সেদিন।

যেদিন রণবীর ঘোষ এলো নিজের হয়ে সওয়াল করতে। ভেজালের ফটল জুড়তে।

নরেনকে সঙ্গে থাকতে বলেছিল বাবল গাজুলি। সময় মত

আসেনি সে। স্মরণও করিয়ে দেয়নি কিছু। তাই প্রতিদিনের মত সকালের বাউণ্ডের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। আর অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের প্রতীক্ষা করছিল। কি একটা কাজে তাঁরই আসার কথা।

নরেন চৌধুরী ভোলেনি। কিন্তু তার আগ্রহ ভিন্ন। ডায়ের স্বার্থে আপসের প্রয়াস। সে প্রয়োজনই আছেই। তবু...। রণবীর ঘোষকে ভালই জানত। ভালই জানে। তবু...। এক জনের ক্ষোভ আর বেদনা আর কখনো এমন করে স্পর্শ করেনি তাকে। তাই নিরুৎসাহ। আবার এরপর ও লোকটার সংশ্রবে আসতেও বিতৃষ্ণা। বা করেছে ভালোর জন্ত করেছে। ভালো ভেবে করেছে। এর পর যার দায়িত্ব সে বুঝুক।

কিন্তু মন বলেছে তারও উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। বাবল গাজুলির রাগ জানে। কি থেকে কি হয় আবার ঠিক কি। তা' ছাড়া নিজের মুখে থাকতে বলেছিল ওকে। ঘড়ি দেখল। বেশ দেরি হয়ে গেছে! তবু বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে রণবীর ঘোষ এসেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। হাতে অবিকল বইয়ের আকারের বোতাম-আঁটা চকচকে কালো লেদারকেস একটা। চামড়া মোড়ানো সোঁতাল বড় ডায়েরির মত। দ্বিভুজ চাকলাদারকে অদূরে জিপে বসিয়ে রেখে সহাস্তে সাড়া দিল, গুড মনিং স্যার, ভিতরে আসব?

আগিস সংক্রান্ত কাগজপত্র উন্টে দেখছিল বাবল গাজুলি। মুখ তুলে তাকালো। মনে পড়ল। আজই আসার কথা বটে। ঘড়ি দেখল। সন্তবত নরেনের আসার কথা ভেবেই।

—আমুন।

—নমস্কার, ভালো আছেন বেশ?

—হ্যাঁ, বহুন।

রণবীর ঘোষ বলল। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি সপ্রতিভ।—আপনি বরুজিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আজই আপনি আসবেন খেয়াল ছিল না, নরেন বাবুও আসার কথা ছিল, আসেন নি...

চূর্তাগাজনিত একটা বিরস ছায়া নামল ঘোষের মুখে। পরে হাসল অল্প একটু।—বরাত। বাক, আপনার শরণার্থী বাটেই, তবু আজ আমি কিন্তু কোন ব্যবসার তাগিদে আসিনি আপনার কাছে। বাবল গাজুলি নীরব, জিজ্ঞাসু।

কি ভাবে ব্যক্ত করবে মনের কথাটা রণবীর ঘোষ ঠিক করে উঠতে পারছে না যেন। স্বীকৃতির বাসনার সঙ্গে অনভ্যাসজনিত সঙ্কোচ মিশলে যেমন হয়। সলাজ হাসি। বলল, এসেছি এক বকম প্রাণের তাগিদে...বড় আকর্ষণ ভারী বিচিত্র ব্যাপার!

বলতে না পারলে কটু শোনাতো। বিরক্তির কারণ হত। কিন্তু রণবীর ঘোষ নিপুণ কথক।

অল্প দিকে গান্ধীধ্বের ব্যতিক্রম ঘটল না খুব। শুধু বিষয়ের আভাস একটু।—আপনি কি বলবেন বলুন।

—কত কি বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু কি যে বলি, ইট ইন্ড, অল্‌ সো ওয়াণ্ডারফুল। মুখের ভাব নয় শুধু, গলার স্বর পবিত্র বদলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাঁচের শাসির ভিতর দিয়ে দূরে মড়াইয়ের দিকে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। ফিরে এলো আবার।



বড় করে নিঃশাস ফেলল একটা। বসল চেয়ারে। হাসল একটু।

—আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ গাঙ্গুলি, কি যে হল সেদিন থেকে নিজেই বুঝতে পারছি না। এতবড় এক লোকসান, তার থেকেও বড় জিনিস, এতবড় একটা দুর্ভাগ্য কাঁধে চাপলে অনেক কিছুই করার কথা আমাদের—আর কিছু না হোক, বড়দরের একটা গোলমাল অন্তত পাকিয়ে তুলতে সক্ষম পারি। হেসে চোখে চোখ রাখল, আরো যত্ন, আরো শাশ্বতসিদ্ধি নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু মন বলছে, তার থেকে অনেক বড় পারা হবে সোভাসুজি আপনার কাছে এসে প্রাণ খুলে হার স্বীকার করা। এ লাভটুকুর কাছে এই লোকসান কিছুই নয়।

দস্ত নয়, প্রার্থীর দৈন্তও নয়, আহত মর্মান্বিত অভিভাব্যক্তি। চিক ইঞ্জিনিয়ারের ঋণ গাঙ্গুলি তরল হয়ে এলো। এরকম সমর্পণে বিব্রত বোধ করতে লাগল প্রায়।

ঘরে নরেন চৌধুরীর পদাধিপত্য। বাদল গাঙ্গুলি ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। ঘোব হুঁহাত তুলে নমস্কার জানালো। হেসে বলল, আপনি কিন্তু অনেক লেট।

ঠাণ্ডা চোখে নরেন একবার শুধু তাকালো। প্রতি-নমস্কার না, কিছু না। একটা চেয়ার টেনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে ধীরে স্তব্ধ সিগারেট ধরালো একটা। বন্ধুর দিকে না চেয়েই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, বেরোতে দেবি আছে না কি তোমার?

—না। তার অমন নিম্পৃহ হাবভাব দেখে বাদল গাঙ্গুলি অবাকই হল একটু। আর তেমনি বিম্বিত রণবীর ঘোব। প্রয়োজনে এর শরণাপন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু তাবলে এ লোকটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি কখনো। বরু কটাক্ষে দেখল দুই একবার। চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, যেন ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই কেউ।

আগের কথা প্রসঙ্গে এবারে বাদল গাঙ্গুলি সদয় কণ্ঠে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই মিঃ ঘোব, সিমেন্টের ব্যাপারে যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি—কিন্তু সত্যি এরকম করে যদি ভাবতে পারেন তাহলে তো আনন্দের কথা।

উৎফুল্ল মুখে ঘোব জবাব দিল, ভাবতে পারতুম না কখনো, এখন শিখেছি। আপনি শিখিয়েছেন। পরিবেশ যেন তারই আয়ত্তাধীন। —ওই ভেতালের অপকাণ্ডি যেই করে থাক, দারিদ্র্য বন্ধন সব আমার, দারীও আমিই বই কি।...আমি...আমার মত আরো পাঁচজন...। এতকাল সবাই পার পেয়ে আসছে তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে—পড়লে ব্যাঙের ছাতার মতই সব—

শেষ না করে অস্ট্রুট কণ্ঠে হেসে উঠল। চকিতে নরেনকে দেখে নিল আবার। তেমনি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে হালকা বিনয়ে বলল আবার, বাক কাজের সময় আর আপনাদের বিরক্ত করব না...।

হাতের লেদার কেসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, এটা দয়া করে রেখে দিন, অবসর মত খুলে দেখবেন একটু—

নিপুণ ক্রটিতে হুঁসাও খায়েল হন। আরো অনেকটাই

নরম হয়ে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। এবারে বিম্বিত হল। কেসটা উন্ট পাণ্টে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এতে কি আছে?

ও বোষ্ট্‌মি-বিশ্বয় খুব চেনে ঘোব। সন্ধ্যাট বিনয় হাসি। যেমনটি দরকার। বলল, ও কিছু নয়, আমার জবানবন্দি...।

—কিন্তু এ দেখে আমি কি করব?

—কিছু না, কিছু না—আপনাদের মনে দাগ ফেলতে পারে এমন কিছু নয়। শুধু আমার নিজের মনের সাক্ষ্য একটু...নইলে আপনাদের কাছে ওর আর কি দাম...এতবড় এক অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকার না করলে, বাক, সময় মত শুধু দেখে রাখবেন একটু—।

তৃতীয় লোকটির বেখান্না নীরবতা প্রায় অসাহ্য্যের কারণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করল ঘোব।

বাদল গাঙ্গুলি বলল, কিন্তু এখন আর এসব দেখে আমি কি করব?

অবিমিশ্র প্রশংসাভরা দুই চোখে ঘোব যেন সিন্ধু করল তাকে হুঁচকার মুহূর্ত।—উই আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! আপনি নিশ্চিত থাকুন, কিছু আপনাকে করতে হবে না। ওই সিমেন্টের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর পর যেদিন আপনি বলবেন সেদিনই আপনার সামনে ওই গুদাম ভরা সিমেন্ট আমি মড়াইয়ের জলে ঢালব। আগেই ঢালতুম, পাছে আপনার অবিশ্বাস হয় সেই জন্য অপেক্ষা করছি। হাসল। যদিও ওতে আর ভেজাল নেই এক কণাও, তবু যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বাদল গাঙ্গুলি বিব্রত আবারও। নরেনের দিক চোখ ফেরাল। চোখাচোখি হল বটে। কিন্তু তেমনি নিরুৎসুক। কোন আভাস নেই। একটু খেমে বলল, ও সিমেন্ট এখন যেমন আছে থাক, ভেবে দেখি

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহের অণুতে অণুতে আচমকা এক বিদ্যুৎ শিহরণ। সবেগে চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। দুই চোখে ভয়াবহ বিভীষিকা।

কথা বলতে বলতে বইয়ের আকারের লেদার কেসের বোতাম টেনে খুলেছে। তার ভিতরে রণবীর ঘোবের জবানবন্দি। খাতাপত্র নয় কিছু।

তিন তাড়া নোট। সব একশ' টাকার। তিরিশ হাজার... দেহের সব রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। নরেন চৌধুরীও বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই উঠে বসেছে। বিষয়ে তারও হুঁচোখ বিক্ষিপ্ত।

এত বিষয় খুব যেন অল্পকূল মনে হচ্ছে না রণবীর ঘোবের। আনাড়ীদের রকম সকল অস্বস্তিকর।

নির্বাক বিষ্ময় বিষয়ের ঘোর কাটল বাদল গাঙ্গুলির। লেদার কেস হাতে তাকালো নরেনের দিকে। নরেনের হুঁচোখও তার মুখের ওপরই সংবদ্ধ। বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে চেয়েই আছে। দেখছে। অন্তস্তল পর্বত দেখে নিচ্ছে যেন। সহসা তার এই দেখাটুকু উপলব্ধি করল নরেন চৌধুরী। আগের স্মরণশক্তি সেই করেছিল। আর এতক্ষণ তার বসে থাকটাও ও চোখে বিকৃত সন্দেহ জাগিয়েছে। এবারে এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল সেও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘোবের মুখোমুখি।

সে দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল বোধ হয় কিছু। কারণ নিজের অজ্ঞাতে ঘোষও উঠে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে নরেন বাদল গাঙ্গুলির হাত থেকে চামড়ার কেসটা নিল। নোটের তাড়া ক'টা দেখল। চামড়ার কেস থেকে খুলে নিল সেগুলি। খুব মোলায়েম গলায় বলল, আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য—যে অভিজ্ঞতায় টাকার ভেজালে ভেজাল সিমেন্ট খাটি হয়ে যায়, কেমন?

এমন পরিস্থিতি কল্পনা করেনি রণবীর ঘোষ। এ সাংক্ৰান্ত ব্যবস্থার পিছনে একটা অর্থই জানে। একটা অর্থই জেনে অভ্যস্ত। কিন্তু ঋদ্ধের যে এদিকে এত কাঁচা বোঝেনি। রণবীর ঘোষও না, যিজেন চাকলাদারও না।

আরো মুহূ আরো মোলায়েম ব্যঙ্গের মত শোনালো নরেনের কণ্ঠস্বর। এতকাল সবাই আপনারা পার পেয়ে আসছেন তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে, ও—?

বাদল গাঙ্গুলি নির্গত ঠাট্টা।

ঘোষ সামলে নিয়েছে কিছুটা। পরিস্থিতি উপলব্ধির ফলে বিনয়ের মুখোশ খসেছে। নগ্ন রক্ততীর ছাপ সেখানে।

নির্মম বিদ্রূপ-ছটায় নরেন যেন হাসছে।—কিন্তু কৈফিয়ৎ যারা তলব করে তাদের জ্ঞাত আলাদা। আপনার এ জবানবন্দী তারা নেবে না—মুখের ওপর ছুঁড়ে কেলে দেবে এমনি করে—আর এমনি করে—আর এমনি করে!

তিনবার তিন তাড়া নোট এবং চতুর্থবার চামড়ার কেস। হুঁহাতে মুখ বাঁচিয়ে ঘোষ একেবারে ঘরের বাইরে এসে পড়ল। জিপ থেকে ছুটে এলো যিজেন চাকলাদার। নিধু আড়ালে ছিল। আর আড়ালে থাকা সম্ভব হল না! ওদিকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন কখন।

চিত্তাঙ্গিত সকলে।

ঘোষ-চাকলাদারের জিপ চলে গেছে অনেকক্ষণ। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। নিধু আড়াল নিয়েছে আবার। ঘরের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে নরেন চৌধুরী।

আর বাদল গাঙ্গুলি? তার বাড়িতে, তার ঘরে, তার সামনে এরকমটা হবার কথা নয়। কিন্তু তারও সন্দেহ করার কথা নয় নরেন চৌধুরীকে। টাকা দেখে তাইতো করেছিল। আড়ে আড়ে দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে বিপরীতই দেখে এসেছে। এরকম আর দেখেনি কখনো। দেখবে ভাবেওনি।—রাগ চণ্ডাল? কিন্তু মনে হচ্ছিল জায়গা বিশেষে সন্দেহও।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে নরেনের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। সিগারেট খরাল। কিন্তু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না তবু। জানালায় ভিতর দিয়ে দূরে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে নিম্পশ্য মূর্তির মত। হুঁচকার শব্দক দেখল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করল। পরে নিজের সিগারেট টোটে খুলিয়ে অজ্ঞটা হাতে নিয়ে মুহূ একটা খোঁচা দিল তার কাঁধে।

এবারে নরেন চৌধুরী কিরে তাকালো। বাদল গাঙ্গুলি নীরবে অজ্ঞ সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল মুহূ মুহূ।

নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। হাত বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী তার হাত থেকে সিগারেট নিল। স্বচ্ছ, নির্মম।

ছোট মড়াইয়ে ঘটনাটা চাপা থাকল না।

অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ ছুঁচরজন সহকর্মীকে বললেন। মিসেস চ্যাটার্জী ফিস ফিস করলেন সমমর্মণীয় গিল্লিদের কাছে। বেশ খোলাখুলি ভাবেই কানাকানি শুরু হল একটা। বিশ্বয়-কটকিত নিধুবাম সেদিনই হুপুবে সবিস্তারিত পল্লবিত করতে বসল দ্বিধামিতির কাছে।—লরেন বাবু কাণ্ড সর্বশ্রেণে এখানে বলবে না তো কোথায় বলবে! এই বলে বেড়ানো স্বভাবের জন্ত ইদানীং সাস্তনা মোটেই সম্ভব ছিল না ওর ওপর। কিন্তু স্তনল যা, দুই চক্ষু বিক্ষারিত।

অবীর প্রতীক্ষা তারপর। কিন্তু লোকটার আর পাত্তা নেই পর পর ক'দিন। বাবার মুখেও শানামাটা ঘটনাটাই শুনেছে শুধু। রণবীর ঘোষ ঘুম দিতে এসেছিল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি নরেন চৌধুরী, ইত্যাদি। এই মেজাজ ঠিক রাখতে না পারার পিছনে আরো যে কারণ, সে শুধু সাধুনাই জানে। ভুললোককে সেদিন ওভাবে বলার জন্ত মনে মনে অনেক অমুতাপ করেছে। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটবে কে স্তানত। ভাবল, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করবে ভুললোকের দেখা নেই কেন ক'দিন ধরে। কিন্তু বলি বলি করেও হল না বলা। ছোকরা চাকরটাকে পাঠিয়ে খবর দেবে ভেবেছিল। তাও পরে উঠল না।

ওর এই আগ্রহটুকুই অদৃশ্য বাধার মত।

প্রথম দেখে নিজের চোখ ছটোকেই সহসা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সাস্তনা।

রণবীর ঘোষের জিপ উপরে উঠে গেল হস করে। একটা বড় পাখরে তাড়ায় পা ছড়িয়ে বসেছিল সাস্তনা।

ওকে কি দেখেছে? বোধ হয় না। দেখলে নীল চশমা ষাড় কেবতাই। তার পাশে বসে আর একজন। বিচিত্র একজন।

হোপুন...।

চড়াই-উৎরাইয়ের পথে এ এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। জিপে হোক, ট্রাকে হোক হরদয় নামভেঙে উঠতে দেখা যায় ওদেরও। বিশেষ করে উপরে ওঠার সময়। জায়গা থাকলে সরাসরি চেপে বসে তারা। সস্তোচের বালাই নেই কোনো, মাঝপথেও ডেকে থামায়, বাবু টুকচি তুলে লে না কেনে—

কিন্তু সাস্তনার চোখে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুন...জায় ঝাঁকুনি লাগার মতই অপ্রত্যাশিত।

হোপুনের স্বভাব বদলানো একটা কালো পাখরের রং বদলানোর মতই। ভাবা যায় না। লোকটার সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞাতে সাস্তনার তেমন একটা ছাপ পড়েছিল মনে। কিন্তু দিন কতক আগেও কেমন একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য করা ঠিক নয়, উপলব্ধি করা। পর পর হুঁ দিন।

প্রথম মড়াইয়ে। সেদিনও মাটি কাটছিল হোপুন। সহস্রের সঙ্গে, সহস্রের মতই। এরই মধ্যে তফাৎ কোথায়, সে শুধু সাধুনাই দূরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে অনেক দিন। সেদিনও করছিল। এদিক-ওদিক চেয়ে পাগল সদাঁরকে না দেখে ওর কাছেই খোঁজ

করতে এসেছিল তার পর।—সদাঁয়কে দেখি নে, সে কাছে আসে নি ?

কোদাল খেমে গিয়েছিল। মাটি কাটার কোঁকে আনত দেহ আস্তে আস্তে টান হয়েছিল। শ্রান্ত দেহপঙ্খের ভরাট করে বাতাস টেনেছিল হাপরের মত। তার পর জবাব না দিয়ে নিম্পলক চেয়েছিল তার দিকে। খতমত খেয়ে সাধুনা আবার জিজ্ঞাসা করেছে: সদাঁর ভালো আছে তো ?

এবারও মুখে জবাব দেয়নি কিছু, একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দূরের এক দিকে দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, ওই দিকে আছে সদাঁর। কিন্তু চোখের পাঁতা পড়ে নি একবারও, আত্মবিশ্বস্তের মত হাতটা আপনি উঠেছিল যেন।

তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে দু'দশ পা সরে বেঁচেছিল সাধুনা। সদাঁয়কে দরকার নেই কিছু। দেখেনি বলতে খোঁজ করেছিল। যেখানে আছে জানল, সেও কাছাকাছি নয়। হোপুন কাজ শুরু করেছিল আবার। কিন্তু একটু বাদেই মাটি কাটার সেই হিংস্র তন্ময়তায় ছেদ পড়তে দেখেছিল সাধুনা। একাদিকবার। তার পর সম্পূর্ণ। কোদাল-হাতে হোপুন চূপচাপ ঝাঁড়িয়ে দেখছিল ওকে। সেই প্রথম ব্যতিক্রম। সাধুনা অবাক। আর কখনো এমন হয় নি। ওর নির্বিকার নিম্পৃহতায় এতটুকু ফাটল দেখে নি কখনো। প্রথম ভেবেছিল কিছু বলতে চায় যদি। কিন্তু তা নয়। ওকে দেখার মধ্য দিয়ে দুই নিম্পলক কালো চোখ যেন কোন দূরে সমাহিত।

ইচ্ছে হচ্ছিল সামনে এসে ঝাঁড়ায় আবার। জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে কি না। ভরসা পায় নি। এই এক কালো মানুষের প্রতি সন্মমের শেষ নেই। দিনে দিনে সেটা বেড়েছে। পাগল: সদাঁয়কে আপন জন মনে করে। চাঁদমণির আকর্ষণও সেই প্রথম থেকেই। সেই সূবাদে এই লোকটার সঙ্গেও একটা সহজ সংযোগ অবাঞ্ছিত ছিল না। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে সহজ হতে পারল না কোন দিন। সেদিনও পায়ে পায়ে প্রস্থানই করেছিল।

কিন্তু ওর সেই নীরব আচরণ ভোলেনি।

দ্বিতীয়বারের ব্যতিক্রম এর কিছুদিন পরে। গুদরীর, অর্থাৎ সাধুনা গোকর অপরাহ্ন রোমন্থনের সেই নিরিবিলা পরিবেশে। ছোকরা চাকর সবে গরু ফরিয়ে নিয়ে গেছে। সাধুনাও উঠবে উঠবে করছিল। মড়াইয়ের ওধারে পাতাড়ের উপর ঠিক তেমনি একটা ধূসর মেঘের দিকে চোখ আটকে গিয়েছিল। পড়তি সূর্যের গলানো সোনার ঝাঁক জমাট কালোর বর্ণছটা।

বিষম চমক তারপর। বিশ তিরিশ হাত দূরে হোপুন। কাছের শেষে ঘরে চলেছিল সম্ভবত। ওকে দেখে ঝাঁড়িয়ে গেছে। কখন এসেছে, কখন ঝাঁড়িয়েছে সাধুনা লক্ষ্য করেনি। এ পাখও পাতাড়ের পরিয়ে গাঁয়ে বাওয়া চলে। তবু এ সাক্ষাৎ শুধুই যোগাযোগ মনে হয় না সাধুনায়। তাহলে? আর কোনদিন অন্তত চোখে পড়ত।

...তেমনি নিশ্চল, নিম্পলক চাউনি...তেমনি দূর বিশ্বস্তির পথে উগাও।

চূপচাপ থাকা বিড়ম্বনা। অসচ্ছন্দ্যের বোকা ঠেলে সাধুনা উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমায় কিছু বলবে হোপুন ?

হঠাৎ যেন আশ্চর্য হল মানুষটা। চোখ থেকে দূরের বোর কেটে

গেল। পাখাশ মুখে চেতনার সাড়া জাগল। সঙ্গে সঙ্গে রুঢ় কর্যোর ছাপ পড়ল একটা। সেই চিরচরিত নিম্পৃহতা নয়।

তারপর চলে গেল।

বিমূঢ় বিষয় কাটতে সময় লেগেছিল সেদিনও। পরে মনে হয়েছে, এ বিরূপতা হয়ত চাঁদমণির স্মৃতি বিজড়িত। চাঁদমণির রাগ ছিল সাধুনায় ওপর, ওটুকুই জানে। পরের খবর তো জানে না। জানানো সম্ভব নয়। হলে বলে দিত।

বিগত ওই দুদিনের ঘটনা মন থেকে মোছে নি। সদাঁয়ের কথা ভাবতে গেলে একটা বোবা শূন্যতার নিপীড়ন। চাঁদমণির কথা ভাবতে গেলে বুকের ভিতরে এক অব্যক্ত টনটনানি। কিন্তু হোপুনের কথা ভাবতে গেলে এক নিটোল স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতার পিছনে নারীর অপরাধ... তাই সঙ্কোচ, তাই ভয়ও একটু।

তবু এমন নয়, যা কোন অনাগত সংস্বের ছায়া ফেলে মনে। অথবা, বিভ্রমের মুগুরে অতর্কিত যা বসিয়ে দেয় একটা। কিন্তু আজ দিনে দুপুরে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে ওই জমাট বাধা কালো মূর্তি দেখে তাই হল যেন। সহসা স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। বিভ্রান্তি আর কেমন যেন অব্যস্তি। নীল-চশমার পাশে ওই কালো মূর্তি, নিষ্ঠুরতার পাশে কালো ত্রাসের মতই।

অতিকার্য গহ্বরের পাশ থেকে ডাম্পার মাটির স্তুপ বয়ে নিয়ে ঢেলে দিয়ে আসছে যেখানে দরকার। বুলডোজার ঠেলে ঠেলে সমান করে দিচ্ছে সে মাটি। আর মাটি কাটছে অর্ধ-কাটার। সাধুনা জনছিল, নতুন মডেলের বিশাল বিশাল হুঁতিনটে মাটিকাটা যন্ত্র এসেছে আরো। সে নাকি এক ভয়ানক ব্যাপার!

শোনামাত্র সবুর সঘনি আর।

অনেক দূরে একটিকে চলেছে সেই মাটিকাটা যন্ত্র। ভয়ানক ব্যাপারই বটে। হিংস্র গর্জনে সেই যন্ত্রদানবের অস্ত্র বিভীষিকা স্তরে স্তরে শুকনো কঠিন মাটি চেছে নিয়ে আসছে, খুলে নিয়ে আসছে অবলীলাক্রমে। মাটির বুক বুকে নিমেষের মধ্যে এক একটা গাড়ি হোঝাই করে ফেলেছে। নিঃশব্দ আর্তনাদে মাটির বাধন আলগা হয়ে খুলে আসছে। টাকের গহ্বরে মাটি পড়ছে না যেন ধরণী আপনাকে উজাড় করে অঞ্জলি দিচ্ছে অস্ত্রস্রাবের।

অদূরে এক জায়গায় বসে তন্ময় হয়ে দেখছে সাধুনা। স্তম্ভমুখর, স্তম্ভমুখর। দেখছে আর নিজের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। ধূবু অতীতের ওপারে। এর পাশাপাশি আর এক যুগের আর এক মানুষদের সেই চেষ্টার ছবি। বুড়ী ঠাকুরমার চোখের জলে সূর্য-ভেজানো, টোটকা পণ্ডিতদের মন্ত্রবাণে মেঘ জমানো, চাঁদী প্রতিবেশীদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ। সাধুনা ঝাপসা দেখছে সব কিছু। চোখের কোল টলমল।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ে গেল। অপ্রস্তুতের একশেষ। পাঁচ-সাত হাত দূরে ঝাঁড়িয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

—কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে ?

মুখ ঘুরিয়ে নিতে হল চট করে। বাহতে চোখ রগড়ে নিল তাড়াতাড়ি। তসে উঠে ঝাঁড়াল তারপর। হালকা জবাব দিল, আপনায় ওই যন্ত্রগুলির কেরামতি দেখছিলাম, বাবারে বাবা, এক একটা যেন মাটিগেলা রাক্ষস!

এদিকটায় এই যন্ত্রেরই কাজ দেখতে এসেছিল বাদল গাজুলিও। কিন্তু সেখানে এমন এক দৃশ্যও দেখবে ভাবেনি। তদারক সেরে ফিরে বাবে বাবে করেও না ঝাঁড়িয়ে পাবেনি। এমন বিস্মৃতি-বিশ্বিনী মূর্তি আর দেখেনি। এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। বরং বিপরীত এবং সচেতন মুখরতায় ভরপুর। ক্ষণপূর্বের দৃশ্যটা মনের কোথাও জমা হয়ে থাকল তবু।

পাশাপাশি আসছে। এভাবে এই লোকের সামনে ধরা পড়বে সাধুনা স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিছু একটা রোমাঞ্চকর সঙ্কোচ এড়ানোর তাগিদ। আর কেমন এক অকারণ খুশির বিড়ম্বনা। নিরুপায়, তাই বেপরোয়া। প্রায় প্রগলভা।

—ডাম্পারগুলোকে দেখাচ্ছে যেন শুকনো ডাঙায় মস্ত এক একটা কচ্ছপ। নতুন আর্থকাটারের মাথার ইঁদুরি হাতে মূর্তির মত বসে আছে ওই যে টর্গোমাথায় লোকটা—মুখখানা দেখলে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে কালের মত শুধু এই করে আসছে। কীকা মড়াইয়ে শাদা ব্লকগুলোকে উঁচু থেকে বেগেদের তাঁবুর মত মনে হয় অনেক সময়। আধ ড্যামের ওই ওদিকটায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে বস। হাতীর পিঠের মত লাগে দেখতে। অনর্গল উপমা আর অনর্গল হাসি সাধুনার।

সেদিন যেমন আজও তেমনি। মড়াইয়ের সর্বাধিনায়ক তো ওর কি। ও পরোয়া করে না। অন্তত দেখাতে চায় যে পরোয়া করে না। অস্বস্তিতে যেমে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। উঠলেই বা। বাইরে অটুট সহজ। দ্বিগুণ সহজ।

বাদল গাজুলি দেখছে। হালকা লাগছে। ভালো লাগছে। জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আমার বাড়ি থেকে ওভাবে চলে এলে যে?

ঠিক বুঝে উঠল না। কি ভাবে চলে এলাম?

—খাবার টাবার তৈরী করে খাওয়ালে, তারপর নিজে না খেয়ে চলে এলে—নিধু হুং খে করছিল।

হেসে উঠল সাধুনা।—আর নিধুর মনিব?

—নিধুর মনিবও।

আবার সেই খুশির বিড়ম্বনা। ফলে আবার সেই খুশির উচ্ছলতা। সাধুনা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আ'হা, মরে বাই মরে বাই, নিধুর হুং তার ওপর আবার নিধুর মনিবের হুং—একেবারে জোড়াকুমীর কান্না। আর একদিন গিয়ে বেঁধে দিয়ে আসব?

হাসছে বাদল গাজুলিও। নিজের অজান্তে হাসছে। বলল, দিলে তো ভালই, নিধুর রান্নার কথা মনে হলই গায়ে জ্বর আসে। তুমি এত ভালো বাঁধতে শিখলে কি করে?

গভীর মুখে সাধুনা জবাব দিল, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে প্লান করিয়ে, ড্রাফটস্ম্যান দিয়ে ছক আঁকিয়ে, ওভারসিয়ার দিয়ে সারভে করিয়ে, কন্ট্রোল দিয়ে— নিজের মুখরতায় নিজেই লজ্জা পেল একটু।

দিনে বার দুই অন্ততঃ মড়াইয়ে টহল দিতে দেখা যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। নিঃশব্দে আসে কখন, নীরবে পর্ষবেক্ষণ করে, সকলের মধ্য দিয়েই সকলের পাশ কাটিয়ে যায় আবার। কিন্তু আজ যারা দেখল বা দেখছে তারা তফাৎ কিছু উপলব্ধি করছে। গুমোট ছায়া পড়েনি কোন! বিশ্লেষণী গান্ধীধের দৃষ্ণ নেই।

মড়াইয়ের উপর থেকে দেখছে আর একজন। রণবীর ঘোষ। দিনের মধ্যে ক'বার তুর্ধগতিতে তার জিপ ওঠানামা করছে ঠিক নেই। অকারণে। ক্ষোভে আর আক্রোশে। লাহুনার ক্ষত মুখে ফেলার তাড়নার। দ্রুতগতির মাধ্যম বাঁচ করে থেমে গেল জিপটা। এত উঁচু থেকেও মড়াইয়ের গহবরে চোখে পড়েছে কিছু। দুই মূর্তি। একজনের শাড়ীর আভাষ।

খুঁকে পিছনের আসন থেকে বায়নাকুলার হাতে নিল। কি কাজে লাগে এটা এখানে? এখন না হোক, আগে লাগত। মড়াইয়ে নিজের এলাকায় বসে দৃষ্টিসান্নিধ্য পেত। যখন খুশি, যার খুশি। কালের কীকে কীকে চোখে উঠত ওটা। বোচ্চ বেড়ে নজরবন্দী করত কাউকে।

চোখ থেকে নীল চশমা নামল। বায়নাকুলার উঠল। ব্যবধান ঘুল। দৃষ্টি-বন্দী দুই মূর্তি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর সাধুনা। নারী আর পুরুষ আর প্রসন্নতা।

কঠিন চোখে পলক পড়ে না। যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর বিচ্ছিন্ন হল ওরা। বায়নাকুলারের আঙতা থেকে একজনকে ছাড়তে হয় এবার। অক্ষুট কটকটির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে জাহান্নমে পাঠালে। নারী প্রাচুর্য সামনে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

উঠে আসছে। কাছে আসছে। প্রায় হাতের কাছে যেন। তবু রণবীর ঘোষ জানে থুব কাছ নেয়। চোখ থেকে যন্ত্রটা সরালে কাছেই মোহ ভেঙে যাবে।

...থমকে ঝাঁড়াল। জিপটা দেখেছে এবং চিনেছে। নিরীক্ষণ করছে চোখ টান করে। চোখাচোখি হল বায়নাকুলারের ভিতর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত। যন্ত্রটা সরালে রণবীর ঘোষ। বেশ দূর এখনো।

এর পরে কি হবে জানা আছে। ওই বাঁক পেরোলে আবার দেখা যাবে উঠে আসছে। উঠে আসবে। তারপর সরাসরি চুকে পড়বে ওই দোকানে। ভুতুবাবুর দোকানে।

তার মত জিপে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। মড়াইয়ের মিস্টার ফুরিয়েছে তার। বোঝাপড়া হয়ে গেছে বিজ্ঞান চাকলাদারের সঙ্গে। এখানে তার এ চালচলন আর বরদাস্ত করতে রাজি নয় পার্টনার। স্পষ্ট জানিয়েছে। কলকাতার আড়ত নিয়ে থাকতে হবে তাকে। আর হেড অফিস থেকে এনকোয়ারির ব্যবস্থা করতে হবে। মড়াইয়ে শুধু বিজ্ঞান চাকলাদার থাকবে।

ঘাড় ফেরাল। দেখা যাচ্ছে। যা ভেবেছিল তাই। বিচলিত দৃষ্টি। ক্ষণিক দ্বিধা। তারপর ভুতুবাবুর দোকান।

রণবীর ঘোষের চকচকে মুখে হাসির আভাস। ভুতুবাবুর মালিকানা!

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। সেই জলের দিনে সন্ধ্যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সামনাসামনি পড়েছিল যখন, তারপর গাণ্ডাউন দেখতে আসার আশ্রয়ের জবাবে মেয়েটা যা বলেছিল ভোলেনি। তবু সেদিন অবাক বত হয়েছিল অপ্রসন্ন হয়নি তত। পরে হালকা আভাসে জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। কার বরাতে খুলছে? বাদল গাজুলি? নরেন চৌধুরী?

ভুতুবাবু এত জানে আর এটুকু জানে না। আধ হাত জিব কেটে সারা। কিন্তু সেদিনের সে মেজাজ গেছে রণবীর ঘোষের।

জিপ থেকে নামল। চলল ঘীর্ষ-সুস্থে।

দোকান জমে উঠছে ভূতুবাবু। পর্দা দিয়ে ক্যাবিন করেছে মেয়েদের জন্য। নিটোল পর্দা নয় মোটেই, দৃষ্টি চলে অনায়াসে। তাও আবার অর্ধেক গোটানো। ভূতুবাবুর গোল মাথার বুদ্ধি গোল নয়।

মেন কোয়ার্টার্স এর আর একটি মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল রবণা চ্যাটার্জী আর হাসি ছড়াচ্ছিল। আসলে হাফ-গোটানো পর্দার ওদিকে ছেলে কটার মুখের কারুকার্য উপভোগ করছিল। তারা চলে যেতে মুখে একটা বিষন্ন ক্রান্তির ছায়া পড়ছিল সবে। সান্ত্বনাকে দেখামাত্র কলকলিয়ে উঠল একেবারে। ভূতুবাবুর ফোলা গাল হাসি টসটেসে হয়ে উঠল চিরচরিত অভ্যর্থনায়।—আমুন মালম্মী আমুন, আমি ভাবছিলাম ভূতুর দোকান ভুলেই গেলেন।

রবণা হেসে উঠল আবার।—এ দিকে, সোজা এ দিকে চলে এসো মালম্মী!

এক বিপদ এড়াতে গিয়ে আর এক ক্যামাদ। কিন্তু রবণার অভ্যর্থনায় সাড়া দেবে কি ভূতুবাবুর কাছেই দাঁড়াতে ঠিক করার আগে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল আবার। নীল-চশমা হাতে দোলাতে দোলাতে রণবীর ঘোষ ভিতরে এসে দাঁড়াল।

সান্ত্বনা ঘাড় ফেরাল। দৃষ্টি-বিনিময়। নিষ্পন্দ কাঠ তারপরে। চিরনিপিত নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই চকিত সাড়া জাগল। সবিনয়ে ভূতুবাবু তার আসন ছেড়ে মাটিতে অবতরণ করল। কলহাস্তে রবণাও এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। কৌতুকছটা তার পার্শ্ববর্তিনী তৃতীয় মেয়েটির মুখেও। রবণা বলল, ভূতুবাবুরই ভাগ্য আজ, মালম্মীর পা পড়তে না পড়তে একেবারে কুবেরের আবির্ভাব!

ভূতুবাবু বিনয় বিগলিত। পলকের ভগ্ন রবণা থমকে গেল। সান্ত্বনাকে দেখল। রণবীর বোথকে দেখল। অজগরের অমোঘ আকর্ষণী আওতায় অসহায় পশুর অব্যক্ত ধড়ফড়ানি দেখল। নির্মম ঠেংলতায় সমস্ত ভিতরটা খল-খলিয়ে উঠল যেন। কিছু দেখার ধান্দলে শুকনো এক নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির আশ্বাসন। সান্ত্বনার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা, কি গো মড়াইকন্ডা একেবারে বোবা হয়ে গেল যে। অনেকদিন আগে এই ভয়লোক দুঃখ করছিলেন তুমি নাকি শুনজরে দেখো না—এসো আজ বোঝাপড়া করে ছাড়ব তোমার সঙ্গে। ভূতুবাবু, আমাদের চা দিন, আমুন মি: ঘোষ, ভূতুবাবুর লেডিজ ক্যাবিনেই চলে আমুন।

আহ্বান কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনার বিভ্রান্ত আচ্ছন্নতা কেটে গেল যেন। সবলে এক লোলুপ গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, না আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। ভূতুবাবুর দিকে এগিয়ে এলো একটু।—সর্দারের সঙ্গে দেখা হলে একবার আমাদের বাড়ি যেতে বলবেন তো, দরকার আছে—।

কোনদিকে না চেয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল। ভূতুবাবুর গোলচোখে গোলমেলে বিষয়। রণবীর ঘোষ নিজের অজান্তে ঘাড় কিরিয়েছে বাইরের দিকে। চাপা হাসিতে বলমলিয়ে উঠছে রবণার সমস্ত মুখ। মাহুঘটাকে দেখছে না, তার ইচ্ছটাকে দেখছে। দেখছে আর কৌতুকে উপছে উঠছে।—আমুন তাহলে, আমরাই আর একটু চা খাই, কি আর করা যাবে!

রণবীর ঘোষ সচকিত। ভূতুবাবুও। ছোকরা চাকরকে হাঁকডাক করে চায়ের অর্ডার দিল তাড়াতাড়ি।

হনহনিয়ে উপরে উঠছে সান্ত্বনা। বিকেলের মিষ্টি বাতাসে আরো বহুলোক উঠছে নামছে। কারো দিকে ক্রক্ষেপ নেই। অসহিষ্ণু কোভে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। যেন মেন কোয়ার্টার্স ছাড়িয়ে জেনারাল কোয়ার্টার্স এর দিকে পা বাড়িয়ে কিছুটা সুস্থ হল। বেজায় হাঁপিয়ে গেছে। বসলে হত একটু। কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর অকারণ তাগিদে বসা হল না।

পাগল সর্দারকে আসার ভক্ত বলে এলো ভূতুবাবুকে। কেন বলল? কে জানে কেন, শুধু কিছু একটা বলার জেঁই বলা। সঙ্গে সঙ্গে হোপনের কথাও মনে পড়ে। জিপে রণবীর ঘোষ আর তার পাশে সেই কালো পাথর মূর্তি। ভিতরে ভিতরে আবার জলে উঠল সান্ত্বনা। খুব তো জিপে করে পাশে বসে ঘুরিস, তোর চাঁদমণির খবর রাখিস? পাগল সর্দার এলে বলে দেবে, ওই লোকটার সঙ্গে যেন কক্ষনো না মেশে হোপুন। সেদিন জিপে ওদের হুঁজনকে পাশাপাশি দেখার বিষয় এবং অস্বস্তি ভুলতে পারবনি সান্ত্বনা।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন খুশি। বাবা আর নরেন-বাবুতে বসে গল্প করছে। সেই কটুক্তি শুনে গিয়েছিল ভয়লোক, আর এই এলো। অবনীবাবু ঐক্য বিরক্ত হয়ে বললেন, কোথায় থাকিস সমস্ত দিন? নরেন সেই কখন এসেছে আপিস থেকে, পর বোধ হয় গিদে পেয়ে গেছে, দেখ কি আছে।

কি আছে দেখার বললে সান্ত্বনা নরেনকে দেখতে লাগল। খুব চেনা মাহুঘের মধ্যে অচেনা কিছু দেখলে যেমন করে দেখে। চোখে মুখে কৌতুকাভাস।

নরেন অল্প অল্প পা দোলাচ্ছে আর হাসছে। গিদে পেয়েছে কি না দেখছ নাকি?

জবাব না দিয়ে হাসিমুখে ভিতরে চলে এলো সান্ত্বনা। গুমোট কেটেছে। হাকা লাগছে।

কিছুদিন হল হাকা লাগছে অবনীবাবুরও।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন তিনি। সান্ত্বনা জানে না। নরেনও কিছু আভাস পায়নি। সকলের অলক্ষ্যে সকলের অগোচরেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন অবনীবাবু। একলার জীবনে এক ধরনের দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছে তাঁর মধ্যে। সংস্কারের বীধন শিথিল হয়েছে অনেক। সামাজিক ক্রকুটির অর্থ গেছে কমে। মেয়ে সুখে থাকবে। ভালো থাকবে। এইটাই বড় কথা। আর সার কথা। নরেনই কথা পাড়বে হয়ত। সন্ধ্যাচে যদি না পারে, তিনিই বলবেন। এ ঘর থেকেই হাঁক দিলেন, আমি বেকলাম, বুঝলি?

বিকলে লম্বা একপ্রস্থ হাঁটা অভ্যেস তাঁর।

সান্ত্বনা হাতমুখ ধুয়ে দাঁড়ায় এসে সবে ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবার কথা কানে এলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন টের পেল। ভাল লাগল না। খারাপও লাগল না। মনে মনে উদ্বোধন হয়েছিল একদিন। নিধুর মুখে আর বাবার মুখে রণবীর ঘোষের নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা শোনার পর থেকেই। নিধু বলেছিল



তাড়া তাড়া নোট দিয়ে অমন গিটুনি জম্মতক দেখেনি। বাবা চিন্তিত হয়েছেন, কি ভাবে শোধ নিতে চেষ্টা করবে ওই কনট্রাক্টর ঠিক কি। সে চিন্তা সাধনাকেও স্পর্শ করেনি এমন নয়। যেমন মনে হয়েছে, তার জন্মেই এতটা হয়েছে। হঠাৎ আবার জিপে বর্ণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের মূর্তি শ্রবণ হতেই ভয়ের ছায়া নামল মুখে।

নরেন এসে দাঁড়াল। মোড়া টেনে দাওয়ার বসল, যেমন বসে। সহজাত হালকাভাবেই বসল, আমার খাবার তাড়া নেই কিছু, খেয়ে এসেছি।

সাধনা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে। বলল, নতুন নতুন লাগছে শুনতে।

—বে ভাবে তাকান, মনে হচ্ছে নতুন নতুন লাগছে দেখতেও।

—লাগচেই তো। আপনাব আবার এত রাগ জানতুম না।

কোন প্রসঙ্গে বলছে বুঝেই নরেন হাসতে লাগল তার দিকে চেয়ে। এ ছাড়া আমাব আর যা কিছু সব জেনে ফেলছে বোধ হয়?

নিরুপায় হয়ে হেসে ফেলল সাধনা, খুব ফট ফট করে কথা শোনাচ্ছেন যে—এ কদিন আসেন নি কেন?

অনেকবার স্থির করেছিল, দেখা হলে বলবে, সেদিন গুরুত্ব বজাটা তার অজ্ঞায় হয়েছে খুব। বলে উঠতে পারল না। কিন্তু যা বলল, নরেনের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছুলো বোধ হয়। নিম্প্রভ মুখে জবাব দিল, না এসে দেখছিলাম পেয়ারা পাঠাও কি না, আশা নেই দেখে শেষে চলে এলাম।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সাধনা। সেখানেই বসল। চেষ্টা করেও হালকা কথা কিছু মুখে ঝগালো না। বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে হল। ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ সুবিধের ঠেকছে না।

প্রসঙ্গ বদলে নরেনই জিজ্ঞাসা করে বলল আবার, মড়াইয়ে বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে খুব গল্প করছিলে দেখলাম—

প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ একেবারে ধতমত খেয়ে গেল সাধনা। সচকিত বর্ণাস্তব। নরেনের চোখ এড়ালো না কিছুই। চেয়েই আছে। হাসছে একটু একটু।

হালকা বিষয়ে সাধনা পাল্টা প্রশ্ন করল, ও মা, আপনি আবার কোথেকে দেখলেন?

—গা-ঢাকা দিয়ে তো আর ঘুরছিলে না, সব জায়গা থেকেই দেখা গেছে...তা কি কথা হল?

আবার লাগ হয়ে উঠছিল সাধনা, শেষের প্রশ্নটার আশ্রয় নিয়ে বাঁচল। ছদ্ম-গাভীয়ে বলল, কথা হল আমি খুব ভালো বাঁধি, আর নিখুঁত রান্নার কথা মনে হলে গায়ে একেবারে স্রব আসে। আচ্ছা কেমন আপনাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার—এত টাকা মাইনে পায়, দেখে শুনে একজন বাঁধুনি বাথলেই হয়।

শুধু টিপ্তানী নয়। নিজে এ বিস্তারিত পটু বলে করুণাও। নিখুঁত রান্নার বহর স্বচক্ষে দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন ঠাটা করল, তা পছন্দ মত বাঁধুনির খোঁজে যদি এ বাড়ির দিকেই চোখ দেয়, তাহলে?

—যেং, আপনি যাচ্ছেনই লোক। ত্রুটি সম্বন্ধে আরক্ত হয়ে উঠল। এ কথাই জবাবে এই ভদ্রলোক এরকম ঠাট্টাই করবে জেনেও বলা। তবু বিকেলে মড়াইয়ের অমুভূতিটুকু নিজের অজ্ঞাতে মিষ্টি আনন্দের মত যেন ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে আছে। সেই খুশিটুকুই প্রকাশ পেল আবারও। হাসি-খুশি মুখেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোককে সবাই এত ভয় করে কেন বলুন তো? ক’দিন তো কথা বলে দেখলাম, মেজাজপত্র দিব্যি ঠাণ্ডা।

নরেন চূপচাপ চেয়েছিল। মুচকি হেসে বলল, তোমাকে সে মেজাজ দেখাতে বাবে কেন?

—অন্ত লোককে? হালকা আগ্রহ।

—অন্ত লোককেও মেজাজ ঠিক দেখায় না, তবে কাজের বাইরে নিজের মনে একা থাকতে থাকতে এমন হয়েছে যে ভয়সা করে কেউ বড় বেঁবে না কাছে।

বলার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল কোথায়! নারীশুলভ একটুখানি বেদনার ছায়া পড়ল মুখে। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ভদ্রলোকের আপন বলতে আর কেউ কোথাও নেই, না?

আবার হাসতে লাগল নরেন চৌধুরী। নিঃশব্দ হাসি আর সকৌতুক নিরীক্ষণ। সাধনা বিব্রত বোধ করতে লাগল কেমন। বেশ খানিকক্ষণ চূপচাপ থেকে নরেন শাশাসিনে জবাব দিল, আছে, তেমন কেউই আছে, তবে ভদ্রলোক সেটা এখনো ঠিক জানে না বোধ হয়।

এক বলক রক্ত উঠ আসছে সাধনার মুখে। সেটা টের পেয়েই জিজ্ঞাসা বিশ্বাসের ভান করতে হল যথাসম্ভব। কিন্তু সেও আর কতক্ষণ। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে গা-জালানো হাসি।

উঠে চট করে রান্নাঘরে চলে গেল। সেদিকে চোখ বেখে নরেন এমনি হাসছে মুহ-মুহ।

সাধনার সামলে নিতে সময় লাগল বেশ একটু। ওই ভাবে না তাকালে আর ওই ভাবে না হাসলে সেও রাগ দেখাতে পারত বা যাহোক কিছু বলতে পারত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে করতেও হবে সে রকম কিছু বা বলতে হবে। কিন্তু আয়না ছাড়াও নিজের মুখের অবস্থা অনুমান করতে পারছে।

চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অশ্রুপূর্ণ ছোকরা চাকর উমুন ঘরিয়ে রেখে গেছে। বেশ শব্দ করে কেটলি ধুয়ে চায়ের জল চড়ালো। শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো তারপর। বিমূঢ় পরক্ষণে।

নরেন চৌধুরী চলে গেছে।

প্রথ পায়ের মেন কোয়ার্টারস-এর দিকে চলেছে নরেন চৌধুরী। অনেকটা নিরুদ্ধির মত। অল্প-অল্প হাসিটুকু মুখে লেগে আছে তেমনি...হাসি ঠিক নয়। তবু হাসি বই কি।

মূর্তির মত দাওয়ার বসে আছে সাধনা। রান্নাঘর কেটলির জল ফুটে উঠুন নিবছে, খেয়াল নেই। [ ক্রমশঃ ]

# তামসী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

যে তাকিয়টাকে আশ্রয় করে প্রতারণা করে হয়ে ছিলেন, এবার তারই উপর সটান শুয়ে পড়ে তালুকদার বললেন,

তার পর? কী বলতেন তোমার মাষ্টার মশাই?

দেবতোষ বসে ছিলেন পাশেই একটা ক্যাম্পচেয়ারে। উঠে পড়ে বললেন, দাঁড়ান, আপনার সিগারেট নিয়ে আসি।

—আর তোমার ঐ বনমালীকে বল আর এক কাপ চা দিতে। সত্যি, ও যে একজন গুস্তান চাকর, সেটা ওর চামচে নাড়া দেখলেই বোঝা যায়। গ্রালুসনটা বুঝলে না তো? ডাক্তার জিজ্ঞাস্য চোখে তাকালেন। তালুকদার বললেন, যখন হিন্দু হাঠিলে ছিলাম, আমাদের Ward Servant ছিল বশী। একটি নতুন ফার্ট ইয়ারের ছেলে বন্ধুণ কাছে তাকে চাকর বলে উল্লেখ করেছিল। বশী তো ভীষণ পাগল। সবকারী চাকরি করে; চাকর বললে বরদাস্ত করতে কেন? তাকে ঠাণ্ডা করলেন আমাদের মতীতোষ দা। ডেকে এনে বুললেন, ওবে মুখা, চাকর মানে চাকর নয়। ওটা সংস্কৃত কথা। চাং করোতি, ইতি চাকরঃ। তোর মত চা করে কে?

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললেন, গল্পটা বনমালীকে শোনাতে হবে, দেখছি।

—সে কাজও করো না। এখন ঘাড়ে চড়ে আছে। এর পরে মাথায় উঠবে। নাইনে নাও কত?

—যখন যা পারি। কোনো হিসেব-পত্তর নেই।

—ওকে আমি Kidnap করবো ঠিক করেছি।

—রক্ষে করুন, দাদা! তাহলে আমার চলে কেমন করে?

—ঐ লক্ষ্মীছাড়াটাই কি চিরকাল ঢালাবে নাকি? লক্ষ্মী একটা জোটাতে হবে না?

—কোনো দরকার নেই। এই বেশ আছে। বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আজ সকালেই দেবতোষের ছুটি মজুর হয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে তার এই শোবার ঘরেই আস্তানা নিয়েছেন তালুকদার। ঘটা দুই কোথা দিয়ে কেটে গেছে কেউ টের পাননি। আজকার বস্তা দেবতোষ। উনি শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা সন্ধিস্ত প্রেমের ভুবুনি নামিয়ে তার অন্তরের গহন থেকে সংগ্রহ করছিলেন যা কোনো দিন কেউ পাবনি। ডাক্তার সিগারেট নিয়ে ফিরে এলে তালুকদারও

তার পুরানো প্রেমে ফিরে গেলেন, এবার বল তোমার সেই পাগলা মাষ্টারের কাহিনী।

ডাক্তার তাঁর সেই ক্যাম্পচেয়ারটা আবার দখল করে বললেন, আমার ওপরে ওর একটু বিশেষ টান দিল, যদিও আমিই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী আলাতন করতাম। মাঝে মাঝে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, আমাদের সেই মহকুমা সহর থেকে অনেকখানি দূরে কোনো কাঁকা মাঠে, কিংবা নদীর ধারে। কত কী বলতেন। একটা কথা প্রায়ই শুনতাম তাঁর মুখে—এই যে দেখছিস মাঠ ঘাট গাছপালা নদীনালা, যাদের আমরা বলি বিশ্ব প্রকৃতি, মানুষও এর একটা অংশ। এদের মত সেও নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন, ঐ আকাশের রং যেমন বদলায়, কেন বদলায় কেউ জানে না, কেউ প্রশ্ন করে না, তেমনি মানুষেরও রং বদলায়, তার মন বদলায়। কিন্তু আমরা সে কথা মানতে চাই না। তর্কের বেলায় মানলেও কাজের বেলায় মানি না। জোর করে বলি, অমুকে এ রকম হতে পারে না তমুকে একথা বলতে পারে না। অথচ দুটোই এক, একই বিধাতার সৃষ্টি। দুয়ের মধ্যে একই লীলা একই বৈচিত্র্যের খেলা। কাল রাতে ঝড় উঠেছিল বলে, আজকের উদার হাসি তো বন্ধ থাকে না? তেমনি যে মানুষ কাল একজনের বৃকে ছুরি বসিয়েছিল, আজ সে আর একজনকে বৃকে জড়িয়ে ধরতে পারে। কালকার 'আমি'র সঙ্গে আজকার 'আমি'র অনেক তফাৎ। কালকের বিভৎস রূপ যদি সত্যি হয়, আজকের এই মোহন রূপও মিথ্যা নয়...গভীর আবেগের সঙ্গে এই সব কথা যখন বলতেন মাষ্টার মশাই, মনে হত, এ সব শুধু কথা নয়, তাঁর মনের কোনো প্রত্যক্ষ সত্য বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাকে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। তারপর আবার ভুলে যেতাম। অল্প সকলের মত আমিও বলতাম, পাগলা মাষ্টার! কিন্তু তার পাগলামির ভূত যে বরাবর আমার ঘাড়ে চেপে ছিল, বহুকাল পরে সেটা টের পেলাম, যখন এলাম আপনার এই জেলখানায়। দেখলাম খুনী, ডাকাত, পকেটমার, জোচোব, গুণ্ডা বলে যাদের চিরদিন ভয় করে এসেছি, ঘৃণা করেছি সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায়? তাবাও তো খুনী হলে হাসে, দুঃখ পেলে কাঁদে, উপকার করলে কৃতজ্ঞ হয়, ভালবাসলে সাড়া দেয়, অপমানে ক্রুদ্ধ হয়। আমার হাসপাতালের কালতু কটিক বাগদী একটা বাচ্চা

মেয়ের গলা টিপে মেরেছিল, এক ভরি একটা সোনার হারের জন্তে। সেদিন জমাদারের ছোট মেয়েটার ফোড়া অপারেশন দেখে কেঁদেই অস্থির। ছুটে গিয়ে কার কাছ থেকে একটা কমলা লেবু এনে গুঁজে দিল মেয়েটার হাতে। সেই মুহূর্তে যে চোখ দুটো তার দেপলাম, সে তো খুনীর চোখ নয়?

দেবতোষের কঠ দীর্ঘে দীর্ঘে মিলিয়ে গেল। তালুকদার কোনো সাড়া দিলেন না। কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার বললেন, ডাক্তার, আমার সে পাপা মাষ্টার আজ আর নেই। কিন্তু তার সেই চোখ দুটো আমার চোখের ওপর ভাসছে। সেই চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমি এই কয়েদীগুলোকে দেখতে চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে পড়ে, কাল রাতে সড় উঠেছিল বলে, আজকার উষার হাসি তো বন্ধ হয় না!

এবার তালুকদারের সাড়া পাওয়া গেল। চোখ বুজে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, But after all they are criminals. ডাক্তারের মুখে মুহূর্তসি ফুটে উঠল, criminal বৈ কি? জেল যখন এসেছে।

—Exactly বিজ্ঞানার উপর উঠে বসলেন তালুকদার, তার পর বললেন, জেলের বাইরে যে বিশাল দুনিয়া, যেখানে ঐটুকুই ওদের একমাত্র পরিচয়। জেল থেকে বেবিয়ে যখন যাবে, তখনও তারা কেবল মাত্র ex-convicts। কিন্তু সে কথা আজ তোমার মাথায় চুকবে না। তোমার কাঁধে ভর করে আছে পাগলা মাষ্টারের ভূত। চোখের দৃষ্টিই বনলে গেছে। তুমি দেখছ, তেনা মিত্র বলে যে সর্বনাশী এক দিন এক জনকে বিষ খাইয়েছিল, আজ আর এক জনের জন্তে সে বয়ে এনেছে মৃত্যু। কিন্তু ঐ বিষকন্ডা যেদিন এই পাঁচিলের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে, আর সারা সংসারের কাছে বিষদৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তখন যদি ওকে দেখতে পাও, ওর হাতের এই সুগার ভাঙটা তোমার নভে পড়বে তো, ভায়া?

—আজ আর এসব কথা কেন, দাদা? মুহূর্ত করুণ সুরে বললেন দেবতোষ। যে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, পাতা উলটে আবার যেখানে ফিরে গিয়ে কী লাভ?

—তুল করলে দেবতোষ। দার্শনিকরা বলেন, জীবনটা হচ্ছে বার বার পড়া উপকাস। তার কোনো অধ্যায়ই কোনো কালে শেষ হয় না। তা ছাড়া আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেটা 'যদি'র কথা। যে-তুমি আমার সামনে বসে বক্ বক্ করছ, তার কথা নয়।

—ও 'যদি'র কথা? তাহলে বলবো, আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই দিয়েছেন। যে-মাত্র এক বার অন্তের স্বাদ পেয়েছে, সে অমর। বিষ তাকে কোনো দিন স্পর্শ করবে না।

—স্বাচ্ছন্দ্য, ওসব রূপক ছেড়ে সাদা কথায় এসো। যখন দেখবে, ঐ একটা মানুষের জন্তে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন তোমার আত্মীয়-পরিজন, আর আমাদের ভ্রূ সমাজ তার দরজাটা বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দিলেন তোমার মুখের উপর, তখন?

দেবতোষ হেসে ফেললেন, জানতে চাইছেন, তখন কী করতাম? আর বাই-করি, ধারা মুখ ফেরালেন, তাঁদের মুখ দেখবার জন্তে ছটকট করতাম না, আর, যেদরজা বন্ধ হল তাও খোলবার জন্তে টানাটানি

করতাম না। কিন্তু ওসব যদি-টদি আজ একেবারেই অবাস্তব। ওগুলো আজ থাক।

বেশ রাত হয়েছিল। তালুকদার বিছানা থেকে নেমে লাঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন, তুমি তাহলে সত্যিই চললে ডাক্তার?

দেবতোষ মাথা নত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

—কোথায় যাবে ঠিক করলে?

ডাক্তার মাথা তুলে বললেন, ঠিক কিছুই করিনি। ভাবছি, কিছু দিন ঘুরবো।

হু'পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন তালুকদার। প্রশ্ন করলেন, স্বাচ্ছন্দ্য, ওর সম্বন্ধে কিছুই কোনো দিন জানতে চাওনি?

—জেনেছিলাম, যেটুকু আমার প্রয়োজন।

—কী সেটুকু?

—কোনোখানে ওর কোনো বাঁধন নেই।

—আমার মনে হয়, বাঁধন না থাকলেও হয়তো কোনো বাঁধা আছে, যা আমরা জানি না।

—জেনেও কিছু লাভ নেই দাদা! তার শেষ উত্তর পেয়ে গেছি।

—এই ছাখ; আমার আমাকে দর্শনশাস্ত্র আঙড়াতে হল। সংসারে শেষ বলে কিছু আছে কি?

ডাক্তারের কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

বড় বড় জেলের বড় জমানাদের একাধিক 'রাইটার' থাকে।

অনেকটা প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত। ফায়দী হলেও তারা লেখাপড়া

জানা মাতব্বর কয়েদী। কোন্‌ নম্বরে কত আসামী বন্ধ হবে;

কত গেল, কত এল; কোন কোন খাটনিতে লোক চাই, কোথায়

ছাঁটাই দরকার; নতুন যারা আসছে, তাদের 'কাম পাল' বা

কাজ বটন, এই সব এবং এ ছাড়া দৈনন্দিন কারা-পরিচালনার

আরো অনাংখা খুঁতিনাটি ব্যাপারে হিসাব পত্র রাখা এবং জমানাদারকে

সাহায্য করা ইচ্ছে তার রাইটারদের কাজ। তাদের হাতে ক্ষমতাও

প্রচুর। যারা খাটনি-বদল চায়, গম-পেয়া থেকে ফুলবাগান, 'চৌকা'

থেকে 'বাদু-বফা,' কিংবা 'রাস্তাচারি' (Road-repairing)

থেকে 'বাতি কমান' (Lamp-lighting) রাইটার বাবুর সুপারিশ

ছাড়া তাদের গতি নেই। সাধারণ কয়েদী থেকে 'পাহারা', কিংবা

'পাহারা' থেকে 'মেট' পদে যার প্রমোশন দরকার, তাহলেও প্রথমটা

গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঐ রাইটারের কাছে। কারা-শাসন-তন্ত্রে বড়

জমানাদের যে প্রতিষ্ঠা, তার অনেকখানি নির্ভর করে উপযুক্ত

রাইটারের উপর।

সুশীলা বড় জমানাদার নয়, জেনারাল ফাটকের জমানাদারী। তার

রাজ্যটা নেহাৎ ক্ষুদ্র, কাজকর্মও ক্ষুদ্রতর, তবু রাইটারের আকাজক্ষা

তার অনেক দিনের। মহাবল সিং-এর মত দু'-তিনটা না হোক,

অন্ততঃ একটি লেখাপড়া জানা অল্পগত মেয়ে তার পায়ের

কাছটিতে কবল বিছিয়ে বসবে, আর তার নির্দেশমত লিখে থাকে

অন্যকে 'ফাটা-দরজা' (ছোঁড়া জামাকাপড় ঘেরানতের কাজ)

থেকে ডালচাকি, তরুকে বাস-ছেঁড়া থেকে চালঝাড়া— এটুকু না

হলে তার মর্যাদা বন্ধ হয় না। কিন্তু এমনি কপাল, লেখাপড়া

জানে, এরকম কটা মেয়েই বা জেলে আসে? কাল-ভয়ে যদি বা

এসে পড়ে তার মনের কথাটা কেউ বোঝে না। হেনা যেদিন এল,

তাকে দেখে, তার চাল-চলন কথাবার্তা লক্ষ্য করে সুনীলার সেই লুপ্ত আশা আবার জেগে উঠল। মনে মনে স্থির করে ফেলল, একে আর কোনো কাজ করতে দেবে না; এর একমাত্র পদ হবে জমাদারগীর রাইটার। কিন্তু হেনাও তার অন্তরের কথাটা ধরতে পারল না। প্রস্তাবটা একরকম হেসেই উড়িয়ে দিল, আপনার এটুকু কাজ করতে আর ক'ক্ষণ লাগবে, মাসীমা? খাটনি বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওটা আমি দু'মিনিটে করে দেবো। সুনীলা ক্ষুব্ধ হল। কাজ তার চলে গেল ঠিকই। কিন্তু রাইটার তো হল না। যে ডাল ভাজে, বতাই লিখুক, তাকে কেউ রাইটার বলবে না।

কিছু দিন পরে ডাল-খাটনি থেকে হেনা চলে গেল টি-বি ওয়ার্ডে। তার পর বড় সাহেবের লকুমে, সে কাজ যখন তার বন্ধ হয়ে গেল, ওকে এবার কোথায় দেওয়া যায়, ভাবতে গিয়ে সুনীলার মনের কোণে হঠাৎ নতুন করে দেখা দিল সেই রাইটারের স্বপ্ন। হেনাকে ডেকে নিয়ে বলল, তোর আর খাটনি-যেবে যেতে হবে না। ক'টা দিন জিরিয়ে নে। তার পর আমার এই কাজটাজুলা একটু আধটু দেখা-শুন। করবি। আমি জেলের বাবুকে বলে সব ঠিকঠাক করে নেবো। হেনা এবার বুঝল সবই, কিন্তু সাব্ব দিতে পারল না। মনের চোখে ছুঁয়ে গেল একটুখানি ব্যথার স্পর্শ। বলল, সে হয় না মাসীমা! আগে যা করতাম, তাই করবো। জেলের বাবুকে এ নিয়ে আপনি আর কিছু বলতে পারেন না। সুনীলারও শেষ পর্যন্ত মনে হল, এর কথাটা ঠিক। এই সামান্য ব্যাপারে বড় সাহেব পর্যন্ত যখন মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন তার মত লোকের নাক গলানো উচিত হবে না। কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

অনেক দিন পরে আবার যখন গাঁতার পাশে গিয়ে বসল হেনা, তখন বাণীবালার টিউটি। দু'দিনটি মেয়ের সঙ্গে তার একটুখানি নীরব হাসির আদান-প্রদান অনেকের অলক্ষ্যে হলেও হেনার চোখ এড়াল না। অনভ্যাসের ফলে ওকে একটু ঘন ঘন হাত বদলাতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কণ্ঠে বেশ খানিকটা দরদ ঢেলে বসল বাণীবালার, তোমার যদি কষ্ট হয়, বেরে দাও না। বাকীটা ওরা কেউ করে দেবে।

হেনা সহজ সরেই বলল না, না। কষ্ট হবে কেন?

—তুমি 'না' বললে কি হয়, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। তাই ভাবছিলাম, ডাক্তার বাবুকে বলে তোমার খাটনিটা মাপ করিয়ে দেবো।

কয়েকটি মেয়ে গিল-গিল করে হেসে উঠল। কমলার কাজ ছিল না। সে বসেছিল দরজায় ঠেসান দিয়ে। হঠাৎ বলে উঠল, দরকার হলে সেটা ও নিজেই বলতে পারবে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

—তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি বাছা, বন্ধার দিয়ে উঠল বাণীবালার, তোমার এত জলুনি কিসের?

কমলা কী একটা উত্তর দিতে বাচ্ছিল। তার আগেই হেনার কণ্ঠে শোনা গেল চাপা ভংসনার স্বর—কমলা! আর কোনো কথা না বলে সে উঠে চলে গেল। ঘরের আবহাওয়াটা কেমন ধমধম করতে লাগল।

বেলা গড়িয়ে গেছে। সবাইই লক্ষ্য তাতাতাড়ি হাত চালিয়ে কাজটুকু সেরে ফেলা! এমন সময়ে দরজার বাইরে শোনা গেল

বাণীবালার গলা, এই যে নিস্তারিণী, কী খবর? নিস্তারিণীকে মেয়েরাও চেনে। ওর নাম ফালতু জমাদারগী। হাজতী-মেয়েদের যেদিন মামলার তারিখ থাকে, সেদিন ওর ডাক পড়ে তাদের কোটে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যাবেলা আবার পৌছে দেবার জন্তে। তাছাড়া কোনো মেয়ে যখন সদর হাসপাতালে যায় কিংবা চালান হয়ে যায় অস্ত্র জেলে, তখনও সঙ্গে যায় নিস্তারিণী।

বাণীবালার প্রশ্নের জবাবে বলল, এই তো, এলাম। একটা চিঠি আছে।

—চিঠি! কার চিঠি?

—হেনা কার নাম?

—ঐ তো হেনা। কোথেকে এস চিঠি?

—হাসপাতাল থেকে।

হেনার হাত দুটো হঠাৎ অচল হয়ে গেল। মাথা না তুলেও বুঝতে পারল, চার দিকে সবগুলো না হোক, অন্ততঃ কয়েকটা মুখ চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। বাণীবালার তাতা দিয়ে উঠল, নাও না চিঠিখানা। ডাক্তার বাবু দিয়েছে বুঝি?

—না, না। ডাক্তার বাবু নয়, বলল নিস্তারিণী: দিয়েছে ঐ বুড়ী, কি নাম যেন!

—মোনার মা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মোনার মা।

—ও, তুমি বুঝি এটাকে নিয়ে আছ?

—আর বল কেন, দিদি! এরকম একটা ঘান-ঘানে বুড়ী জন্মে কখনো দেখিনি।

হেনার যেন ঘাম দিয়ে স্বর ছেড়ে গেল। উঠে এসে চিঠিটা নিল নিস্তারিণীর হাত থেকে। চিঠি মানে ছেঁড়া এক টুকরা কাগজ। আঁকাবঁকা অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে লেখা। কোনো কলীকে দিয়ে লিখিয়েছে বোধ হয়। দু'টি মাত্র লাইন—‘দিদিমণি, ডাক্তার বাবুকে বলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে থাকলে আমি মরে যাবো।’ হেনার চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। এই যক্ষ্মাঘাথিগ্রস্ত বুড়ীটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার মনটা যে কখন জড়িয়ে পড়েছিল, এত দিন টের পায়নি। কিন্তু বুড়ী যে ওকে কতখানি ভালবাসে, শুধু ভালবাসে নয়, কতখানি ভয়সা করে, নির্ভর করে ওর উপর, তার পরিচয় অনেক বার পেয়েছে: তাই জেলের বাইরে গিয়েও সেই জেলেই আবার ফিরে আসবার জন্তে ছটফট করছে। সেখানকার নিয়মিত চিকিৎসা, সুদক্ষ নার্সদের সেবা-যত্ন সব ফেলে ডাক্তার বাবু আর দিদিমণির কাছেই তার প্রাণটা পড়ে আছে। ওখান থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো পথ চোখে পড়েনি। এক টুকরা কাগজ পাঠিয়ে শরণ নিয়েছে সেই দিদিমণির, যে তারই মত কিংবা তার চেয়েও অসহায়।

—ও মেয়ে, গিয়ে কী বলবো বুড়ীটাকে? নিস্তারিণীর ডাক শুনে হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে জেগে উঠল হেনা। নিস্তার বলল চল, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। খালি এক কথা—আমাকে দিদিমণির কাছে নিয়ে চল।

হেনা বলল, আমি তো ওকে চিঠি দিতে পারি না। আপনি বুঝিয়ে বলবেন, ওখানে থাকলেই শীগগির শীগগির ভাল হয়ে যাবে।

ভালো হলেই ওরা এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আর বলবেন, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে আমি ভীষণ রাগ করবো।

পরদিন বিকালবেলা। সুশীলার আসবার কথা চারটা সাড়ে চারটায়। এল প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। বৈকালিক খাওয়া দাওয়া সেরে হেনা একা-একা গেটের কাছটায় বেড়াচ্ছিল। সুশীলাকে দেখে বলল, আজ এত দেরি যে মাসীমা?

—মিটি-এ গিয়েছিলাম। সুশীলার চোখে-মুখে ঊত্তেজনার চিহ্ন।

—মিটি-এ! কোথায় মিটিং?

—জেলখানার বড় মাঠে।

—জেলখানায় পাবার মিটিং হয় নাকি?

—আমিও তো তাই জানতাম। জেলখানায় এ সব কাণ্ড আমার তিন কুলে কেউ শোনে নি, দেখা তো দূরের কথা। আজ দেখে এলাম নিজের চোখে।

হেনারও কৌতূহল বেড়ে গেল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, কিসের মিটিং মাসীমা?

সুশীলা বেন মনে মনে সেই দুগুটা প্রশ্ন করে বলল, আমাদের ডাক্তার বাবু চলে যাচ্ছেন, কয়েদীরা তাকে বিদায় দিয়ে গেল। একটু থেমে আবার বলল, মাঠভর্তি লোক। উনি বসে আছেন ঠিক সামনে। পাশে রয়েছেন জেলের বাবু। আর সব বাবুরাও রয়েছে। একে একে এসে মালা দিয়ে যাচ্ছে ওর গলায়, সেলাম করছে, কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সব দেখে এলাম। বাইশ বছর জেলখানায় আছি। কত বাবু দেখলাম। কত জেলের, ডাক্তার বদলি হয়েছে, ছুটি নিয়ে গেছে। বাবুরা মিলে অফিসে বসে চা-টা খাইয়েছে কাউকে কাউকে। কিন্তু এ বকম কয়েদীর মেলা কোনো দিন হয়নি।

হেনা আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু চেয়ে রইল যবে ঐ আমগাছটার দিকে।

সুশীলা আবার শুরু করল, কী স্পন্দন বস্তুত্যা দিলেন, এক বার যদি শুনতিস?

হেনা হাসল মুহূর্ত হাসি, হ্যাঁ, আমার আর কাজ কী! জেলের মাঠে বড়তা শুনতে যাই। কী বললেন?

—সে সব কি আমি ছাই বুঝি? কিন্তু ভারী ভালো লাগছিল। কয়েদীগুলোর কী কান্না! সন্তানের মতো এক কথা, এ বকম বাবু আর হবে না।

দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা বেজে উঠল। জমাদার আসছে সন্ধ্যাপ-এর উত্তোগ করতে। সুশীলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বহুদর্শী জমাদারগী ঠিকই বলেছে। জেলের কোনো অফিসার চলে যাচ্ছেন বদলি হয়ে, কিংবা ছুটি নিয়ে, আর কয়েদীরা দিচ্ছে তাকে বিদায় অভিনন্দন, এ বকম ঘটনা ছিল নিত্যশুভই অভাবনীয়। শাসক এবং শাসিতের যে সখ্য, তার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই। এক পক্ষ হুকুম করবে, আর এক পক্ষ তামিল করবে, তার বেশী আর কিছু নয়। কারো বেলায় কোনো ব্যতিক্রম যদি ঘটত, হুকুমের বর্ষ ভেদ করে দেখা দিত অন্তরের যোগসূত্র, কর্তৃপক্ষ বিচলিত হতেন। কয়েদীরা যাকে প্রীতির চক্ষে দেখে, তার উপরে পড়ত সরকারের সন্দেহ-চক্ষু। এক পক্ষের অমুদ্রাগ মানেই অন্য পক্ষের বিরাগ।

কয়েদী-মহলে জনপ্রিয় হওয়াটা কুতী এবং জবরদস্ত অফিসারের কাম্য নয়, চাকরির দিক দিয়েও নিরাপদ ছিল না। বন্দীরা সে কথা জানত। তাই প্রিয় ব্যক্তির প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধাপ্রীতি সেটা নীরবে জানিয়েই ক্ষান্ত হত। আধুনিক প্রকাশের সাহস করত না। দেবতোষকে নিয়ে হঠাৎ এক দারুণ হুঁসাহসের কাজ করে বলল এ জেলের কয়েদীরা। তাদের তরফ থেকে জনকয়েক প্রতিনিধি জেলের সাহেবের কাছে গিয়ে জানাল, তারা সবাই একত্র হয়ে ডাক্তার বাবুকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে চায়। দেবতোষের উপর সাধারণ বন্দীদের মনোভাব তালুকদারের অজানা ছিল না। এই ব্যাপারটাকে সাময়িক লজ্জুক বলে লঘু করে দেখলে ভুল করা হবে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই তিনি কয়েদীদের আবেদন সুপারের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর এই ডাক্তারটিকে উপলক্ষ করে জেলের ডিসিগিনে যে ভাটন রয়েছে, এটা তারই শোচনীয় পরিণতি। হঠাৎ মনে হল, এ প্রস্তাব একটা সোজাশুজি চ্যালেঞ্জ। তিনি এবং তাঁর শাসন নীতি যাকে অব্যাহতি মনে করে প্রকাশ্যত্বের সরিয়ে দিচ্ছেন, তাকেই তারা ঘটা করে দেবে ফেয়ারগয়েল! মেজর সাহেবের চৌকটের কোণে একটু জ্বর হাসি ফুটে উঠল। জেলের দিকে ফিরে বললেন, ঐ লীডারদের জানিয়ে দিন, ওদের চ্যালেঞ্জ আমি accept করলাম। ফেয়ারগয়েল হতে দেবো না। তার পর দেখি ওদের দৌড় কতদূর। তালুকদার মনিবের মনের কথাটা বুঝতে পেরে শাস্ত কঠে বললেন, তাতে জিং হবে ওদেরই।

—মানে? কক্ষ কঠে জানতে চাইলেন মেজর।

—আপনি যাকে মনে করছেন চ্যালেঞ্জ, সেইটাই তখন সব আক্রমণে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে পড়াবে। ওসব মিটিং বন্ধ হবে বটে, কিন্তু আমাদের মুখ রক্ষা হবে না।

সু:র কিঞ্চিৎ নরম হলেন। কিতুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাহলে ওদের ঐ ছেলেকেলাটা হতে দেওয়া, মানে ignore করা ই আপনাব ইচ্ছা? বেশ তাই করুন।

সুতরাং মিটিং হল। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েদীরা এসে সার বেঁচে বসে পড়ল ঘাসের উপর। তাদের সামনে এক লাইন চেয়ার দখল করলেন বাবুরা। মাঝখানটিতে বসলেন দেবতোষ, তার পাশেই সভাপতির আসনে বসলেন জেলের সাহেব। সমরোপযোগী ভাষণও একটা দিতে হল। বন্দীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ উঠে ছুঁচার কথা বলতে চেষ্টা করল তাদের অনভ্যন্ত কাঁচা ভাষায়। যা বলা হল, তার চেয়ে অনেক বেশী বইল না-বলা। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন দেবতোষ। বললেন, আমার বন্ধুদের মত আমি ঠিক জেলখানার লোক নই। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম; হঠাৎই আবার চলে যাচ্ছি। এই ক'টা দিন আমার চিরদিন মনে থাকবে।

জেলখানায় চাকরি পাবার কাহিনী উল্লেখ করে বললেন, কত ভয় হয়েছিল মনে মনে। বত না ভয় তার চেয়ে অনেক বেশী লজ্জা। লোকে বলবে জেলের ডাক্তার। হিঃ হিঃ! আজ বুঝতে পারছি, এখানে না এলে জীবনের একটা বড় দিক আমার কাছে অন্ধকার থেকে যেত। বাইরের হাসপাতালে ডাক্তারি করতে গিয়ে দেখেছি, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ। এখানে এসে দেখলাম ব্যাধিগ্রস্ত



মন। কিন্তু এদের ভালো করবার মত ওষুধ আমার জানা নেই। মানুষের হাত-পায়ে যখন আঘাত লাগে, সে ব্যথা আমরা সামিয়ে দিই, কিন্তু তার মনে যখন আঘাত লাগে, সেখানে যখন ক্ষত দেখা দেয়, আমাদের কিছুই করবার নেই। অথচ, কে না জানে, সেই আঘাত বা ক্ষত থেকেই জন্ম নেয় অপরাধের অঙ্কুর, বাক্যে আমরা বলি crime আমাদের শরীরের উত্তাপ যদি বেড়ে যায়, আমরা তাকে বলি জ্বর। সে হল দেহের একটা সাময়িক বিকার। তার চিকিৎসা আছে, প্রতিকার আছে, ব্যর্থ হলে সে বিকার চলে যায়। কঙ্গী আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কারণে মানুষের অন্তরের উত্তাপ যখন বেড়ে যায়, তার কর্মে আচরণে দেখা দেয় বিকৃতির লক্ষণ, আমরা তার নাম দিই অপরাধ। সেই অপরাধী অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত মানুষটাকে ধরে এনে আটকে রাখি জেলখানায়। তাকে সুস্থ করবার, নিরাময় করবার, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেবার কোনো বিধান তো আমাদের শাস্ত্রে নেই। সে ডাক্তারি আমি শিখিনি। শিখবার কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও জানি না। যদি থাকত, আমাদের এই থারোমিটার বা টেম্পেরেচার দিয়ে যেমন জ্বর মাপি, হৃদযন্ত্রের স্পন্দন কিংবা স্নায়ুস্নেহের শক্তি পরখ করি, তেমনি একটা কিছু যদি থাকত বা দিয়ে মাথা ব্যর্থ অপরাধীর মনের দাচ, তার স্নায়ু বা মস্তিষ্কের কৃৎস গতি, তাহলে বোধ হয় এত বড় পাঁচিল, এত সব সিঁপাই-শাট্রী, গুলী-বন্দুকের দরকার হত না। জেলের বদলে গড়ে উঠত আর এক রকমের নতুন হাসপাতাল। 'খুলে যেত মানব-সেবার আর একটা নতুন দ্বার।

বাবুদের লাইনে কেউ কেউ উসখুস শুরু করলেন। কারো কারো মুখে দেখা দিল চাপা হাসি। দেবতোষ সেটা লক্ষ্য করলেন। তারপর বসলেন, আমার পক্ষে এ-সব হয়তো অনধিকার চর্চা। জেলের আইন-কাহুন আমি পুরোপুরি জানি না। সমালোচনা করণ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু জানিয়ে যাচ্ছি আমার ক্ষমতা। তোমাদের জন্তে আমি কিছুই করতে পারিনি। তোমরা যারা আমাদের ভালোবেসেছিলে, তাদের কাছে স্বীকার করছি, সে ভালোবাসা পাবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই।

সুশীলা অত্যাশ্চর্য্য করেনি। ডাক্তারের বৈদ্যিক ভাগ কথা সেও যেমন বোঝেনি, কয়েদীরাও তেমনি বুঝতে পারেনি। তবু, এই হৃদ্যোধ্য কথাগুলো শুনতে শুনতেই তাদের চোখের জল সেদিন বাধা মানেনি। কথা বুঝতে বুদ্ধি লাগে, শিক্ষা লাগে। সেটা ওদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তার পেছনে যে সুখ সেটা বুঝতে লাগে দূর। সেখানটার বোধ হয় কোনো অভাব ছিল না।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, তবু একটা অর্ধহীন ক্ষীণ আশা হেনার মনের কোণে জড়িয়ে ছিল, যাবার আগে একবার তিনি আসবেন। সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও ছিল, যদি আসেন আর সেই উদ্দাস চোখ দুটো তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, হেনা আমি যাচ্ছি, কী বলবে সে? হয়তো সেই দৃষ্টির সামনে মাথাটা তার আপনাই মুইয়ে পড়বে। একটা বার চেয়ে দেখা হবে না, একটা কথাও বলা হবে না। বলবার বা শোনবার আর আছেই বা কী? তাই হয় তো আসেন নি। কিন্তু তার জন্তে না আনুন, আরো তো কত মেয়ে

আছে এই জেনানা-কাটকে, বাবা তাঁর কাছে কতরকমে খণী। কমলা আছে, বীণা আছে, বাবের চিকিৎসা সবই শুরু করেছিলেন, শেষ করে যেতে পারেননি। তাদের ব্যবস্থা অবশ্য তিনি করে গেছেন। নতুন ডাক্তার তাঁরই নির্দেশ মত ওষুধ ইনজেকশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তবু কি এক বার আসতে নেই? কী ক্ষতি হত যদি মিনিট করে করে জন্তে একটা বার এসে পাঁড়াতেন এই ওয়ার্ডের সামনে? আর মেয়েরা এসে একে একে জানিয়ে যেত তাদের প্রচণ্ড অন্তরের নিঃশব্দ প্রণাম। ক্ষতি হোক আর না হোক, তিনি আসেন নি। সুশীলার কাছেই খবর পেয়েছিল হেনা তিনি চলে গেছেন। কোথায়, তা সে জানে না। এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো প্রত্যাশিত। এতে অভিযোগ করবার, নালিশ জানাবার কী আছে? তবু তার মনে হল, বুকের একটা দিক কেমন দেন কাঁকা হয়ে গেছে। তার মধ্যে কিসের একটা বস্তু, খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান, খানিকটা বক্রতা! অর্ধহীন বেদনার চোখের কোণ দুটো ভিজে ওঠে। মনে হয় এক দিন কোথাও একটা অশ্রয় ছিল। আশ্রয় আর নেই। আশ্রয় সে নিতান্ত একা, একান্ত অসহায়।

এক সপ্তাহের উপর হল দেবতোষ চলে গেছেন। বুড়ী ফিরে আসেনি। নেবুতলার হাসপাতাল বন্ধ। জরাদারকে বসে-করে ক'দিন 'তল একটা সেল-এ থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে হেনা। নির্দিষ্ট খাটনি করে আর সুশীলার ফাই-ফরমাজ খেটে যেটুকু সময় বাঁচে, ঐ নির্জ্ঞান ছোট ঘরটোতেই সে ক'টিনে দেয়। সেল-এ আলোর ব্যবস্থা নেই। নিশি আসবার আগেই সেখানে নৈশ ভোজনের পাট দেয়ে নিতে হয়, এবং নৃধীকুর পাটে বসতে না বসতেই বন্ধ হয়ে যায় গরাদে-দেওয়া লৌহকপাট। সেখানে আলো একটা অনাবশ্যক বিলাস মাত্র। দুটো কবল বিহিরে নিতে ক'মিনিট সময় লাগে? হ'মিনিট? তার পর আলোর কী প্রয়োজন? লেখাপড়া? তৃতীয় কয়েদির সে অধিকার নেই। যদি বলেন, তবে লাইব্রেরীর আছে কিসের জন্তে? ওটা শুধু রবিবারের রিক্রিয়েশন। রবিবার ছাড়াও সে সুবিধা ওদের দেওয়া হয়, বহুতর ন'দিন, বাক্যে বল জেলহাউসে। সব কটাই কোনো না কোনো পর্বের দিন—তিনটি হিন্দু, তিনটি মুসলমান, তিনটি খৃষ্টান। সর্বধর্মে সমদৃষ্টি। অভিযোগের অবকাশ নেই কোনো তরফেই। ঐ ন'টা দিন খাটানির বদলে বই পড়ো কিংবা দশ-পঁচিশি খেলো। কিন্তু সব দিনের বেলায়। জেলের রাতগুলো শুধু ঘুমের জন্তে। কথা বলতে চাও, নিজের সঙ্গে বল। গান করতে চাও, তাও নীরবে। "Strict silence should be maintained at all times."—লেখা আছে জেল কোড-এ।

আইনে যার বিধান নেই, কিংবা তার মত অল্প সকলের জন্তে যে ব্যবস্থা হয়নি, এমন কিছুই হেনা কোনো দিন চায়নি, দিলেও প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ এত দিন পরে তার সে কঠোর নিয়ম শিথিল করতে হল। অনেক ভেবে, অনেক ইতস্ততঃ করে এক দিন সুশীলার দরবারে পেশ করল তার আরজি, আপনায় কাছে দুটো জিনিষ চাইতে এলাম, মাসীমা।

সুশীলা খোস মেজাজে ছিল। বলল, কী জিনিষ, একটা দড়ি আর একটা কলসী?

—তা আপনি দিতে পারবেন না। দিলেও লাভ নেই।  
একটা পুতুর চাই, তা না হলে ওগুলো কাজে লাগবে না।

—তবে কী তোমার কাজে লাগবে শুনি?

—একটা আলো আর একটা খাতা।

শুশীলার মুখ গভীর হল। হারিকেনের সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রতিটি লোকের জ্ঞান যে তেলের বরাদ্দ আছে, শীতকালে ছুঁচটাক আর গরমকালে দেড় ছটাক, তার বেলাতেও হিসাবের কড়াকড়ি। একটা ফাল্গুন আলো চাইতে হলে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে শুদামী-বাবুর সেরেস্তায়, এবং প্রচুর তৈলমর্দন করেও এক ছটাক তৈল সংগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এই সামান্য বিষয়ে হার স্বীকার করলে এত বড় জেলের জমাদারীর মান থাকে না। বিশেষ করে, যে কোনো দিন কিছু চায় না, সেয়ে দিতে গেলেও হাত গুটিয়ে নেয়; তার এই আদারটুকু না রাখতে পারলে মনই বা বর মান্নে কেমন করে? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে এক ফলক বিচার-শিখার মত হাসপাতালের লঠনটা শুশীলার চোখের উপর ভেসে উঠল, এবং তারি আলোর মুখের গাভীরটাও এক নিম্নে কেটে গেল। শুদ্ধিলোর স্তরে বলে উঠল, আলোর জন্তে ভাবনা কি? জমাদার এসে মনে করাস, হাসপাতালে যা বাতিটি পড়ে আছে, বের করে দেবো।

হেনা আশ্বস্ত হতে পারলো না। বলল, কিন্তু, ওটা যদি ঠাণ্ডা খেরত চান? হাসপাতাল তো বন্ধ হয়ে গেছে।

—আরে না, না। খেরত অমনি চাইলেই হল।

মুখে ভরসা দিল বটে। কিন্তু সে বিষয়ে উদ্বেগ শুশীলার মনেও কম ছিল না। তবু, আপাততঃ সমাধান একটা হয়ে গেল। গোল বাগল ঐ দু'নম্বরে। জেলস্থপার করেদী বিশেষে খাতা কিনবার অধুমতি দিতে পারেন। সরকারী খরচে নয়, করেদী বিশেষের পরগায়। হেনার তো কোনো টাকা-পয়সা জমা নেই। বাইরে থেকে একটা খাতা যদি তার কোনো আপনাতার জন জেল-গেটে দিয়ে যায়, তাতেও বাধা ছিল না। কিন্তু তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আইন বাঁচিয়ে প্রকাশ্য ভাবে আফিস-মারফৎ এই সামান্য কিনিষটাও শুশীলার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও শুধু খাতা কেন, আরো অনেক কিছু তার এই একান্ত স্নেহের পাত্রীটির হাতে দেবার জন্তে সে ব্যাকুল। হেনা তার 'আপনার জন' নয়, তার হেফাজতে রাখা একজন করেদী মাত্র। তার সঙ্গে এই বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা কর্তৃপক্ষ স্তনজরে দেখবেন না। বিশেষ করে বড় সাহেব এবং আরো ক'জন বাবু যে এই মেয়েটির উপর প্রসন্ন নন, সে কথা আজ আর কারো অজানা নেই। নিজের এই অসহায় অক্ষমতা অনুভব করে শুশীলার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। হেনার দিকে ফিরে অনেকটা যেন সান্ত্বনার সুরে বলল, খাতা দিয়ে কী করবি? বই-টাই আছে, তাই পড়।

এই সান্ত্বনার আড়ালে আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেনারও সঙ্কোচের অবশি ছিল না। তাই শুশীলার উত্তরে বেশ খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, তাই ভালো। বই-টাই বরং এনে দেবেন মাঝে মাঝে। খাতা এখন থাক। আলোটাই আমার বেশী দরকার ছিল।

খাতা উপলব্ধ করে এই ছলনাটুকু দু'জনের কারো কাছেই গোপন রইল না এবং হেনার অতিরিক্ত খুশির সুর আর এক জনের বুক গিয়ে বিঁধল। দুটো দিন সমস্ত কাজ-কর্ম চলা-ফেরার মধ্যে তার মনের একটা কোণ জুড়ে রইল একখানা কালো মেঘ। সে মেঘ নেমে গেল তৃতীয় দিন ভোর বেলা, যখন তার দু'হাত সখা চান্দরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা মোটা বাঁধানো খাতা এবং যদিকে তাকিয়ে হেনার মুখে ভেসে উঠল সত্যিকার খুশির আলো। পরক্ষণেই গভীর হয়ে বলল, এটা ভালো করেনি বাসীমা। ওয়া যদি জানতে পারে?

—হ্যাঁ, জানতে গেবে তো আমার সব করবে।

—তা ছাড়া, এতে জেলের ছাপ নেই, বড় সাহেবের সই নেই। তালাসি করতে এদেই তো কেড়ে নিয়ে যাবে। আমার শাস্তি হবে, সেজন্তে ভয় করি না, কিন্তু আপনাকেও পড়তে হবে কত কী কৈফিয়তের দায়ে। সে ভাবনা শুশীলার মনেও কম ছিল না। একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, এক সময়ে দিল খাতাখানা। লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কেরানীবাবুকে বলে করে যদি একটা সীল দিয়ে আনতে পারি, দেখবো।

ইস, এ'খাতা আমি দিলাম আর কি! ছেলেমানুষের মত মাখায় একটা খাঁকানি দিয়ে বলে উঠল হেনা। যদি আর ফিরিয়ে না দেয়। আশ্রুক না তালাসি। বলে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল খাতাখানা।

[ ক্রমশঃ ]

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন-

এই অগ্রিমুখ্য দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দ্বিবিহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে ঈড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকাৰ্য্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধ'রে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ত সন্মুখ আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম-ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রাপ্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



বিরের পর থেকে  
এ-পর্ষন্ত  
এঁকে ৭,৩০০ বার  
রাঁনা করতে  
হয়েছে

প্রত্যেক বুদ্ধিমত্তী গৃহিণীই জানেন,  
বনস্পতির রাঁনা খেতে স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি  
যোগায় অথচ এতে খরচা কম পড়ে।

ঘরকন্নায় ব্যস্ত বউ ও মায়াদের বনস্পতির প্রতি অমীম  
কৃতজ্ঞতা, কেননা বনস্পতির জন্যেই তাঁরা কম খরচায়  
পুষ্টিকর খাবার রাঁধতে পারেন।

বাড়ীর গিন্নীর দায়িত্ব কত—ভুবেলা রাঁনাবাঁনা, ঘরদোর পরিষ্কার  
রাঁনা, আবার ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো দেওয়া—সবই  
তাকে করতে হয়। সারাদিন এভাবে গেটেও সবাইকে হাসিমুখে  
আদর যত্ন করতে হলে তাঁর প্রচুর কর্মশক্তির দরকার।

প্রত্যেক গিন্নীরই পরম বন্ধু

বুদ্ধিমত্তী গিন্নীরা জানেন যে দৈনিক খাবার থেকেই তাঁরা বেশির  
ভাগ কর্মশক্তি পান। তাই তাঁরা প্রচুর পরিমাণে স্নেহপদার্থ  
দিয়ে ঘরের খাবার তৈরীর দিকে নজর রাখেন। কেননা

স্নেহপদার্থ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' হচ্ছেন সহায়তা করে, রোগপ্রতিরোধ  
ও অস্থি-বিসৃদ্ধি কাছে পেঁষতে দেয়না এবং সত্যিকার কর্মশক্তি  
যোগায়। গিন্নীরা অনেকই বনস্পতি দিয়ে রাঁনার পক্ষপাতী।  
তাঁরা জানেন, বনস্পতি খাটি ও পুষ্টিকর এবং এর প্রতি আউন্সে  
৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' রয়েছে। এতে খরচা  
কম। পয়সার সাশ্রয় হয় বলে অল্পাচ্ছন্ন স্বাস্থ্যপ্রদ ভিটামিন  
খাওয়ার সুযোগও পাওয়া যায়। এছাড়াও বনস্পতি গিন্নীদের  
পরমবন্ধু বলে পরিচিত—আর আপনও সেইভাবেই সবরকম  
রাঁনাবাঁনা এই বাঁটি ভর্তি স্নেহ ব্যবহার করেন।

বনস্পতি

গৃহিণীদের পরমবন্ধু



# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

আগে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত রবিবার। ভোর থেকে উঠে কেউই দল কাজ শুরু করেছে। আগের দিনের নির্দেশ মত হেলেগা এক এক সেটাবে জমা হয়। কেউ জীপে কবে-বুঝে বেড়ায়, কান্ট্রিক একটু কি না দেখে।

—তোমাদের এখানে পঁচিশ জন ছেলে এসেছে ?

এদের ঘোড়স নিচাই উত্তর দেয়, হুঁজুন ছাড়া আর সবাই এসেছে। ভোটার-লিষ্টের 'ইনচার্জ' কংক্রিট অটোমক, ও হুঁজুনকে নিয়ে এখানে বসবে।

—ভোটারদের বসিত করবে কারা ?

—সত্যেন আর বিত্ত, ভোটার 'স্লিপ' ওরাই হাতে ধরিয়ে দেবে।

—গাড়ী বিধানী লোকের হাতে দিও, ভোটার আনতে গিয়ে না লোক বেড়িয়ে আসে। দরকারী কথাই মথোই সত্যেন এক কোণ থেকে টেচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেউ দা', খাবার আসবে কখন, চা-সিগারেট তো আর পেট ভরবে না ?

—এই মথো কিসে পেরে গেল ? এখনও তো কোন কাজই করিসুনি।

—টফিনের আগেই কিন্তু খাবার আসা চাই, মাংস থাকবে তো ?

—ভুই কি বিরো-বাড়ী পেয়েছিস নাকি ? তবে লুচি আনুন মমের ভাল ব্যবস্থাই আছে।

ভোট দেবার জন্তে বারা মুখিয়ে ছিলেন, সেটার খুলতে না খুলতে হড়মুড় করে ভেতরে চলে যান। সে কিন্তু বেশীকণের জন্তে নয়, আস্তে আস্তে ভীড় পাতলা হয়ে আসে।

কেউ বলে—প্রথম চোটে শেখানো-পড়ানো লোকরা চলে গেছে। এখন আর নিজের গরজে কেউ আসবে না, সাধাসাধি করে আনতে হবে।

কেউ কথাই ঠিক। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটদাতার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সব সেটারেই প্রার্থীদের আফিসে ভোটদাতারা জমায়েৎ হয়ে চা, সিগারেট পান করেন। ভলেন্টারিয়ারা খাতির করে বলে, মনে রাখবেন শ্রাব, অল্প মাঝি বাজে—ভল্ললোক হেঁ হেঁ করে হাসেন, তা না হলে এই বোদ্ধেরে কষ্ট করে আসি ? দেখি এক গ্রাস ঠাণ্ডা সরবৎ—

তিনটি গ্রাস এক সঙ্গে এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পান, সিগারেট। ভল্ললোক সব ক'টির সন্ধানের করে উঠে ঝাঁড়ান। তাঁকে অল্পপ্রাণিত করার জন্তে ভলেন্টারিয়ারা সমবেত কণ্ঠে কানে তাল লাগিয়ে চিংকার করে, ভোট ফর রঘু ব্যানার্জী—

ভল্ললোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন, ডান হাত বাড়িয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, ফেরার ভাড়াটা দেড় টাকা।

—ভোট দিয়ে আসুন, আমাদের লোক গিয়ে ছেড়ে আসবে।

—কিরে এলে তখন তো আর চিনতে পারবেন না। ভাড়াটা

আগে থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল। অগত্যা নগর বিদায় করতে হয়। আরেক খিলি পান যুখে বিষে ভল্ললোক ভোট দেবার জন্তে এগিয়ে যান।

বেশ কয়েকটি সেটারে হুজুমান মার্কাদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেল রাঘব বোয়ালের দলের। জটিল ভোটদাতা রাঘব বোয়ালের আফিস থেকে চা সিগারেট ধরে আবার দুনি হুজুমান মার্কাদের ক্যাম্পে লুচি-সন্দেশ উড়িয়েছে। বাসু, আর রাঘব কোথা, তাকে কেন্দ্র করেই গোলমালের সূত্রপাত। ফলে অনেক নিবীড় ভোটদাতার জামা চিঁড়ল, মেয়েদের মধ্যে অনেক ভোট না দিয়ে বাড়ী চলে গেল, হুঁদলের অসম্মান জনক চিংকারে পাড়ার লোক দরজা-জানলা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

কেউর হেড আফিসে খবর আসে, ওদের এক সেটার থেকে ভোটার-লিষ্ট চুরি হয়ে গেছে। সংগে সংগে কেউ সেখানে ছুটে যায়।

—কি করে চুরি হ'ল ?

বিত্ত বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, আমরা কি করে জানব কেউদা', খানিক আগে পুলিশ এসেছিল—

কেউ রাগে ফেটে পড়ে, পুলিশ, ডাম্ রাঙ্কল। তাকে কে চুকতে দিলে ?

—তার যে এ মতলব, কি করে বুঝব ? এসে বলল বড্ড ভেটী পেয়েছে, এক গ্রাস জল খাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, হুজুমান মার্কারা জল দিচ্ছেন না বুঝি ? জিত কেটে বললে, ছি, ছি, কেউদার সংগে ঝগড়া হয়েছে বলে এ হুজুমানদের দলে যাব ?

—সবলে কি করে ?

—টাক্সী থেকে ক'জন লোক নামলেন, আমি বেরিয়ে নাথিয়ে আনতে গেছি, ইতিমধ্যে পুলিশ কখন বেরিয়ে গেল। আমি ফিরে এসে আর ভোটার-লিষ্ট খুঁজে পাই না।

কেউ ঠোট কামড়ায়, তোমরা যেমনি গাধা, পুলিশটা তেমনি শরতান !

সে সেটারে রাঘব বোয়ালের দল ভোটার-লিষ্টের অভাবে আর বিশেষ কাজ করতে পারে না। রাঘব বোয়াল মনঃক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, তখনই বলেছিলাম কেউ, পুলিশের সংগে ঝগড়া করা উচিত হয়নি।

রাঘব বোয়ালের কথা যে কতখানি সত্যি তা আরও বেশী করে প্রমাণ হল এক 'মিল এরিয়ার'। কেউ সেখানে নিশ্চিন্ত হয়েছিল অন্ততঃ শতকরা আশীটা ভোট রাঘব বোয়াল পাবেই। সেই জন্তেই সেদিকে আজ কেউ বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু পরিদর্শনে এসে সে অবাক হয়ে গেল !

যিগিন বলল, সর্বনাশ হয়েছে কেউদা'।

—কি ব্যাপার ?

—এখানে কেউ ভোটই দিতে পারছে না।

—মানে ?

—কোথা থেকে এক দল লোক এসে দাঁড়িয়ে গেছে ! পালায়ান চোরাগা, ভীড় করে আছে । ভোট দিতে বাচ্ছেও না, কাউকে যেতেও দিচ্ছে না ।

—এ আবার কি রসিকতা, পুলিশ কি করছে ?

—পুলিশ তো রয়েছে, ওরা বলছে, আমরা গ্রন্থিকার লোক, সবাই হুম্যানজীকে ভোট দেবো, নেতার জন্তে অপেক্ষা করছি ।

বিরক্ত হয়ে কেউ সেটারের দিকে এগিয়ে যায়, কথা মিথ্যে নয় । এক দল লম্বা-চওড়া লোক গेटের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অগ্নী মন্তব্যে ও অন্তর্য ব্যবহারে কেউ ত্রিসীমানায় বাচ্ছে না ।

এক সময় বিশিষ্ট চুপি-চুপি বলে, খবর পেলাম কেউ-না, এ-ও না কি পুলিশের কাজ ।

কেউ চোখ ফুলে তাকায় ।

—ও জানত এখানে আমরা সব চেয়ে বেশী ভোট পাব । তাই হুম্যান মার্কারের দলে গিয়ে এই কাণ্ডটি করিয়েছে ।

এব পর আর কেউকে দেখা যায় নি । শুধু সেই দিন নয়, তার পরদিনও । এর মধ্যে কত জন অনন্ত কেবিনে এসে কেউর গৌরব করেছে, নিক্রিকার আত্মদা' বলেছেন, তার খবর জানি না জাই ।

কিন্তু পুলিশের লোক এসে বখন তার সন্ধান করলে, তিনি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বলুন তো ?

—গুণামীর চার্জ ।

—কোথায় ?

—পুলিশ মণ্ডল নামে একটি ছেলে থাকে এই পাড়ায়, চেনেন বাণ হয় ?

—তিনি বই কি ।

তাকে ইলেকশানের দিন রাত্রিবেলা কারা গান্ডায় মেয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে ।

—কি সর্বনাশ !

আত্মদা' যদিও বিষয় প্রকাশ করলেন, কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝা গেল এ খবরটি তাঁর অজানা ছিল না ।

—যাদের সন্দেহ হয় বলে পুলিশ বাবু নাম দিয়েছেন, কেউ দাস তাঁদের মধ্যে এক জন । পুলিশ ইলেকটর বলে যেতেই আত্মদা বাবু দোকান থেকে বেরিয়ে কেউর বাড়ীর দিকে গেলেন ।

যথাসময়ে ট্যাকসী থেকে নেমে প্রভাত দরজার বেল টিপতেই, বেলারাগীর ঢাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ছায়ামুক থেকে আসছেন ?

—হ্যাঁ ।

—ভেতরে আসুন । দরজা বন্ধ করে প্রভাতকে ভেতরের বৈঠকখানার বসিয়ে দেয় । এ ঘর প্রভাতের অপরিচিত নয়, আগেও বেলারাগীর সংগে এইখানে এসে আলাপ করে গেছে । আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকলেও ঘরটি পরিষ্কার করে সাজান । প্রভাত কাগজপত্র বার করে নেড়ে চেড়ে দেখে । জানে, বেলারাগীর

নামতে বহারীতি আধ ঘণ্টা দেবী হবে । ইতিমধ্যে ঢাকরটি চা দিয়ে গেল ।

অল্প দিনের চেয়ে আজ বেলারাগী এতটু আগেরই নামে । একমুখ হেসে হাত তুলে নমস্কার করে বলে, আপনাকে অনেককণ বসিয়ে রেখেছি, সেজ্জ মাপ করবেন ।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে না না, আজ আপনি মোটেই বেশী সময় নেন নি । তার ওপর আপনার দুটো অতিথি সংকারে বেশ পটু ।

—সে আমার ভাগ্য ।

কিছুক্ষণ টুকরো আলোচনার পর প্রভাত আসল কথা পাড়ে, আপনি আমাদের আগের সংখ্যা দুটো পেয়েছেন নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ পেয়েছি ।

—বিশিষ্ট তারকারা প্রস্তোত্তর দিয়েছেন, দেখেছেন বোধ হয় ?

—বেশ সুন্দর হয়েছে, ওরা কি নিজেরাই—

—পাগল হয়েছেন, সব আমার লেখা । এবার আপনার নামে প্রস্তোত্তরগুলো যাবে ।

—লিখে এনেছেন, দেখি ?

প্রভাত কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দেয়, বেলারাগী ওপর ওপর চোখ বুজিয়ে বলে, প্রায়গুলি তো বেশ ইন্টারেস্টিং, আপনার কাগজের পাঠকরা দেখছি—প্রভাত হেসে বাধা দেয়, এ প্রায় সবই আমার, পাঠকরা কি আর এত বুদ্ধিমান ?

—তার মানে, ওরা কি কোন প্রশ্নই করে না ?

—করে, তবে আমরা তার কোন উত্তর দিই না । উপরে লেখা থাকে দেখবেন, আমাদের কাছে এত চিঠি এসেছে যে, সব ক'টির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ।

—এতগুলো নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—

—এ কি কম মেহনতের কাজ, এমন ঠিকানা দিতে হবে যাতে না কেউ পরে গোলমাল করে ।

বেলারাগী হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে, এটি বড় সুন্দর লিখেছেন, প্রশ্ন—আপনি মাথায় কি তেল মাগেন ? উত্তর—জবাকুসুম, মহাভূষণাঙ্গ, ক্যাষ্টর অয়েল মিশিয়ে তাতে তিন কৌটা ইডনিং ইন প্যারিস দিই ।

—কোন পাঠিকা এটি পরীক্ষা করে দেখলে কি হবে জানি না !

বেলারাগী হেসে বলে, আমার যে ববু চুল তা কি তারা খবর রাখে না ভাবেন ? প্রভাত কথার মোড় ফেরায়, নীচের দিকে মিষ্টি খাওয়ার প্রায়টি দেখুন, বেলারাগী পড়ে, প্রশ্ন—রসগোল্লা না সন্দেশ, কি খেতে ভালবাসেন ? উত্তর—পরীক্ষার খাতায় সন্দেশ, তবে কেউ পাঠালে রসগোল্লা পছন্দ করি । সত্যি কিন্তু প্রভাত বাবু আমি রসগোল্লা খেতে ভালবাসি ।

এ ধরনের প্রস্তোত্তর নিয়ে হাসাহাসি চলে । প্রভাত একসময় জিজ্ঞেস করে, আপনার যে প্রিডিউসার হবার কথা ছিল, কদুর এগুলো ?

—এখনও পাকাপাকি হয়নি ।

—হলে আমায় মনে রাখবেন কিন্তু ।

—সে আর বলতে হবে না, বই-তুললেই আপনাকে দিয়ে সিনেবির লেখাবো । নতুন কিছু লিখেছেন নাকি ?



—একটা বড় উপভাস।

—কি নাম?

—মধুবালা।

বেলাগাণী কপট বাগের ভাণ করে বলে, মধুবালায় জীবনী বেশী ইন্টারেস্টিং হ'ল বুঝি?

—কি মুন্সিঙ্গ, জীবনী কেন হবে! নাট্যিকার নাম মধুবালা। বুঝেন না, যাতে বই বিক্রী হয়।

—বেলাগাণী নাম দিলে তো বই বিক্রী হত না!

প্রভাত অপ্রতিভ হবার ছেলে মোটেই নয়, বলে আপনায় কি শুধু নামটাই দেব, পুরো জীবনী দিয়ে বই লিখব।

—আমাকে খুসী করার চেষ্টা করছেন বুঝি?

—বাঃ, ইংরাজীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনীর উপর কত সুন্দর সুন্দর বই আছে, আমাদের দেশেই বা তা হ'ল না কেন?

—পরে এক দিন আপনার সংগে এ নিয়ে আলোচনা করব।

—কবে বলুন?

—বললাম তো, এক দিন।

প্রভাত আর এ প্রসঙ্গের জের টানেন না। বলে, এক কপি ছবি দিন, এ মাসের কভারে দেব।

—সে আবার কি, দুটো ছবি তো পোষ্টে পাঠিয়েছি।

—পুরোন ছবি না, আপনার বিশেষ ভঙ্গিমায় তোলা।

প্রভাতের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বেলাগাণী হেসে বলে, আপনি ভারী দুষ্ট, শেষ পর্যন্ত না নিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

বেলাগাণী উঠে গিয়ে দেওয়ান থেকে ছবি বার করে প্রভাতের হাতে দেয়। ইংরাজী নাট্যিকার অঙ্কুরণে লোল কটাক্ষ ভরা, লম্বা ভঙ্গিমায় ছবি।

প্রভাত তারিফ করে বলে, বাঃ, বেশ সুন্দর উঠেছে তো! কে তুলেছে?

—কেন, পিনাকী। ওই তো আমার সব ছবি তোলে।

প্রভাত উঠতে উঠতে বলে, না এবারের পত্রিকা পাঁচশো কপি ছাপাতে হবে দেখছি। নমস্কার-বিনিময়ের পর প্রভাত যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন প্রায় এগারোটা বেজে গেছে।

আন্ত বাবু কেঁঠদের বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে ভেতর থেকে চীংকার করে তার দাদা জিজ্ঞেস করেন, কে কড়া নাড়ে?

—আমি আন্ত, অনন্ত কেবিন থেকে আসছি।

—কা'কে চাই?

—কেঁঠ বাড়ী আছে?

—নেই।

একটু চুপ করে থেকে আন্ত বাবু বলেন, বিশেষ দরকার আছে, দরজাটা একবার খুলুন না।

কেঁঠের দাদা একপাটি দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে উত্তর দেয়, আমি সব জানি। পুলিশে হুঁলিয়া দিয়েছে, কোথায় কা'কে খুন করে এসেছে।

—আহা খুন করবে কেন, সব পুলিশ মণ্ডলের বদমাইশি।

—আপনারাই কেঁঠের মাথাটা খেয়েছেন, একটা খুনকে নিয়ে বাড়ীতে বাস করা!

—তার দিকটা এক বার ভাবুন, বেচারী বিপদে পড়েছে।

এ সময় আমাদের সকলের উচিত—

—উচিত ঘটা, ও সব বাদরদের জেলে বাওঁড়াই ভাল। আমি পুলিশের সৌকদের সাফ সাফ বলে দিয়েছি, দু'দিন ওর পাতা নেই—

আন্ত বাবু বিড়-বিড় করে বলেন, জানি না ভাল করলেন কি না—

—ভাল-মন্দ আমাকে শেখাতে হবে না। বলে কেঁঠের দাদা দড়াম করে মুণের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

আন্ত বাবু ফিরে আসছিলেন, মোড়ের মাথায় কেঁঠের সংগে দেখা। দিবা টেরী কেটে হাসতে হাসতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসে, কি আন্তদা, এদিকে হঠাৎ?

—তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

—দাদা খুব ক্ষেপে আছে নিশ্চয়?

—ক্ষেপে মানে, পারলে আমাকেই বোপ হয় জেলে পাঠিয়ে দিতেন।

কেঁঠ তাড়িয়া ভরে বলে, ও একটা পাগল! আপনার দোকানে বাওয়া বাক, বড় ক্ষিপে পেয়েছে, চলতে চলতে আন্তদা' বলেন, থানা থেকে লোক এসেছিল।

—জানি।

—কি হবে?

—কি আবার হবে? একদিন ধরে নিয়ে যাবে, আপনারা গিয়ে জামিনে খালাস করে আনবেন।

—তার পর?

—কিছুই নয়, প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

—কিস্ত পুলিন?

—ও আর কারো সংগে শয়তানী করতে পারবে না, জন্মের মত শিকার হ'ল গেল।

োকানের কাছে এসে কেঁঠ মত বদলায়, চলুন অস্ত্র কোথাও বাই।

—কেন?

—আপনার দোকানে অনেক লোক, সবাই-এর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আর ভাল লাগছে না।

কেঁঠ আন্ত বাবুকে নিয়ে অস্ত্র বাস্তা ধরে। বড় বাস্তা পেরুতেই আন্ত বাবু বলেন, অস্ত্র কোন দোকানে যাবে! বরং আমার বাড়ী চল।

আন্ত বাবুর বাড়ী কাছেই, সেখানে পৌছতে দেরী হয় না। বাইরের বৈঠকখানায় কেঁঠকে বসিয়ে আন্ত বাবু ভিতরে চলে যান। কেঁঠ ডেকচেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়, আপনা হতেই চোখ বুজে আসে। আন্ত বাবু ফিরে এসে কেঁঠের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল কোথায় ছিলে?

—এক বছর বাড়ী।

—সারা দিন তোমায় দেখিনি?

—কগীর সেবা করতে গিয়েছিলাম।

—কোথায়?

—টালীগঞ্জ।

—কার অস্থল?

—গৌরীর ভাইএব।

—গৌরী কে ?

—আপনি চেনেন না। একটু হেসে বলে, ছেলেরা বাঁচবে না।

—কি হয়েছে ?

—বোধ হয় বন্দী।

—আহা ! একটু পরে বলেন, খাবার আনতে বড় দেরী করছে, তুমি বস, আমি নিয়ে আসি।

কেউ সত্যক নয়নে বলে, আশুলা, গরম চা।

খাবার আনতে বেশী দেরী হয় না, চা করতে আর নিমকি ভাজতে যেটুকু সময় লাগে, আশু বাবু ফিরে এসে দেখেন কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে মারা হ'ল, ছেলেকে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন, আমি দোকানে যাচ্ছি, কেউ উঠলে ভাল করে চা খাবার বাইরে দিস।

ঘুম থেকে উঠেই গ্রামল শোনে মামা চৌমাটি করছেন, তাঁর জামার পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট চুরি গেছে। গ্রামল চোখ বগড়াতে বগড়াতে সে ঘরে ঢোকে, কি হয়েছে মামা ?

জগৎ বাবু বাঁকের সাংগে বললে, ভূতের রাজত্ব, কাল রাত্রে আমার পকেটে পাঁচ টাকা ছিল, আজ একটা পরসী নেই। পাখা গজিয়ে উড়ে গেল নাকি ?

—এত আশ্চর্য্য কথা মাসীমা, সব জায়গা দেখা হয়েছে ?

মাসীমা বললেন, সব জায়গা তো খোঁজা হ'ল। ছোটলা' কাল অন্ধ কোথাও ফেলে আসনি তো ?

জগৎ বাবু আরও বেগে যান, তৌমাদের ওই এক কথা, কিছু তাবালে আমিই নিশ্চয় কোথাও ফেলে এসেছি। কেন, আমার কি মাথার ঠিক থাকে না, মাতাল হয়ে—?

গ্রামল জগৎ বাবু'র পক্ষ নিয়ে বলেন, এক কথা ঠিক মাসীমা, বাড়ীতে প্রায়ই এটা-ওটা চুরি যাচ্ছে। এই তো ক'দিন আগে বাবা ফুলের মাঠে দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে ছ' টাকা পেলাম না। নিশ্চয় কেউ আমার পকেট থেকে তুলে নিয়েছে।

—আগে বলিস নি তো ?

—বলে কি হবে ? মিছিমিছি গোলমালের সৃষ্টি, যে নিয়েছে সে তো ফেরৎ দেবে না ?

জগৎ বাবু জোর দিয়ে বলেন, আমি নিশ্চয় কবে বলছি, এসব ওই হতভাগা নটবরটার কাজ।

মাসীমা আস্তে আস্তে বলেন, নতুন লোক তো নয়, বেশ কিছু দিন কাজ করছে—

—ওরা সব পারে, আজ-কাল একটা বিখানী লোক পাবে না।

গ্রামলকে ডেকে বললেন, আমি দরকারী কাজে বেকছি, তুই ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সন্দেহ হলেই দিবি বেটাকে তাড়িয়ে।

জগৎ বাবু চলে গেলে মাসীমা বললেন, গ্রামল, কাজটা কি ঠিক হবে ? মিছিমিছি একটা লোককে সন্দেহ করা—

—মামা বখন বলে গেলেন, একবার ওর বাস-প্যাটারগুলো দেখা উচিত, নয়ত ফিরে এসে আমাদের ওপর চটে যাবেন।

গ্রামল বখন নাচে গিয়ে নটবরকে বাস-বিছানা খুলে দেখাতে বলে, সে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে যায়, বাবু এই কথা বলে গেলেন।

—আমি কি তবে মিথ্যে বলছি ! সাবু সাজতে হবে না, বাস খোল।

কথামত নটবর বাস খুলে দেয়। গ্রামল জিনিসপত্তর নেড়েচেড়ে দেখে, এ নতুন কাপড় কোথায় পেলে ?

—পূজোর সময় মাসীমা দিয়েছিলেন।

—মাথার তেল, সাবান, এসব কেন ?

—দেশে পাঠাব, গাঁয়েব লোক কাল যাবে।

—কেনবার টাকা পেলি কোথায় ?

নটবর বিরক্ত হয়ে বলে, আপনারা কি মাইনে দেন না ?

—এঃ, খুব যে মুখের উপর কথা বলতে শিখেছিস, পাড়া, বাবু আনুক বাড়ীতে।

জগৎ বাবু ফিরে আসার জন্তে আর অপেক্ষা করতে হয় না। নটবর সোজা মাসীমার কাছে গিয়ে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে ছুটি দিন যা !

মাসীমা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, বাবু আশুন।

আমি এ-বাড়ীতে কাজ করব না। এত দিন রয়েছে একটা জিনিষের এদিক-ওদিক হয়নি, আর আজ আমাকে এক কথায় চোর বললেন।

আর কিছু না বলে নটবর সেখান থেকে হুঁতন করে চলে যায়। মাসীমার কাছে সব শুনে গ্রামল বললে, তবে ও-বাটা নিশ্চয় চোর, এক কথায় যখন কাজ ছেড়ে পালান,—

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**

**আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"**



প্রতি প্যাকেট  
২৪ টি  
বড় আকারের

- কলো প্রস্তুত
- স্টীমে সঁকা
- হোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

**আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি**

**ও সর্বস্ব রক্ষা করিতে**

**আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী**

**কলিকতা - ২৯**

—কি জানি বাবা, লোকটা তো কখনও খারাপ ছিল না ?

—বুদ্ধি দেবার লোক জুটেছে বোঝ হয়।

গ্রামল আর কথা না বাড়িয়ে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মদনের পাড়ার আসতে তার বেশী সময় লাগে না, ট্রাম থেকে নেমে ছ' মিনিটের ঠাঁটা পথ। গলির মোড়ে ফুটপাথের ওপর বসে মদনরা আড্ডা মারছিল, গ্রামলকে দেখে হাঁক দেয়,—এই গ্রামল, এ দিকে—

গ্রামল ওদের মনো গিয়ে বসে, সকলেই প্রায় তার পরিচিত। এখানে এসে কত দিন সে আড্ডা মেঝে গেছে, মদন এর নাম দিয়েছে আড্ডা-সভা। নামকরণ যে খুবই সঙ্গত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিন তলা বাড়ীর নীচে বড় ফুটপাথ, তারই একাংশ আড্ডাসভার আসন বসে। এক তলায় রেশন আফিসের ওরাম বলে সাহায্যই ফুটপাথে ছ'তিনটে ঠেলা গাড়ী থাকে। প্রয়োজন মত ছেলেরা ঠেলাগাড়ীর মাটি ধোঁয়া অংশটার বসে, কেউ বা তার পাথের পাথরটায়, কখনও ফুটপাথেই কাগজ পেতে। সামনেই পানের দোকান। বড় বাড়ীর নীচে বলে অনেকক্ষণ ছায়া থাকে। প্রথম দিন এসে গ্রামল তারিফ করে বলেছিল, বাঃ বেশ খাসা ভায়গা! কাকর বাড়ী নয়, দোকান নয়, সবকাণী ফুটপাথ, যে কেউ এসে আড্ডা দিতে পারে, কারো কিছু বলার নেই।

মদন হেসে বলেছিল, শুধু এই, সামনের বাড়ীটা দেখেছিল? ছোট বারান্দা, ওখানে বা আছে—

—কি যে, কি? গ্রামল চারি দিকে তাকায়।

—চিড়িয়া।

—মাইরি?

—এক উকিল থাকে, তাঁর পাঁচ মেয়ে। বড় দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। সেজ মেয়েটির সংগে আমাদের মমুদা—

মমুদা গ্রামলের অচেনা নয়। মদনের সংগে অনেক বার দেখেছে, স্কুলর চেহারা। ফর্সা রং, টানা ভুরু, গানও বেশ ভাল করে, বিশেষ করে সিনেমার গান।

প্রথম দিন মদনের কথা শুনে গ্রামল খুব অবাক হয়েছিল। এ বিষয়ে আরও শোনার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গেছে। কত দিন দেখেছে মমুদা এই আড্ডা-সভায় বসে গান গায় আর মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গ্রামলের প্রথম প্রথম চোখ তুলে তাকাতো লজ্জা করত। পরে দেখেছিলো, মেয়েটি ডানাকাটা পরী কিছু নয়, সাধারণ মেয়েই। বয়স ছাড়া আর কিছু অকর্ষণীয় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মমুদা যে মেয়েটির জন্যে পাগল এ বিষয়ে কাকর সন্দেহ নেই। আজও সবাইকে বলছিল, আমার মনের কথা তোমরা বুঝবে না ভাই!

ভোলা উৎসাহ দিয়ে বলে, বা হোক হেস্ত-নেস্ত কিছু করে ফেলুন, মমুদা, আমরা আপনার পেছনে ঠিক আছি।

—এ সব ব্যাপারে গায়ের জোর চলে না যে ভাই!

—নন্দিতার বাবাকে একটা চিঠি লিখেই দেখুন না।

মমুদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, কোম লাভ নেই, হেমন্ত বাবু আমাকে ছ'চোখে দেখতে পারেন না। ওনাকেই বা দোষ দেব কি, পাত্র হিসেবে আমি সত্যিই তাঁর মেয়ের বোঁগ্য নই।

—কেন, অবোঁগ্য কিসের? ক'টা ছেলে আপনার মত গান করতে পারে?

মদন খেই ধরে, আর এমন বোমিও মার্কী চেহারাই বা কোথায় পাবে? ঠা বড় জামাইটি তো একটা হৌদস কুংকুং।

—আপনি তো অল্পের মত ভ্যাগাবণ্ড নন, ব্রীতিমত দশটা পাঁচটা অফিস করেন।

মমুদা উঠে পড়ে, কোণারি আবার আফিস, চলি ভাই।

ভোলা চুঁ করে হাত বাড়িয়ে দেয় সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে বান মমুদা।

মমুদা সিগারেট, বেশগাই দুটোই ওর হাতে দিয়ে সুর ভাঁততে ভাঁজতে বাড়ীর দিকে চলে যায়।

গ্রামল প্রথম কথা বলে, পাগলা!

ভোলা সিগারেট ধরিয়ে বলে, বাই বল বাঁটি প্রেমিক, ভেজাল নেই।

মদন হাই তোলে, আজ কিন্তু তেমন জমলো না। এমন ছুটির দিনে না মমুদার ছ'—একটা কড়া গান, না সামনের বাড়ীর নীল শাড়ী। গ্রামল জিজ্ঞেস করে, মদন, বেকবি নাকি?

—চল।

দু'জনে উঠে পড়ে। চলতে চলতে কেঁটার বিষয়ে আলোচনা হয়। মদন জিজ্ঞেস করে,—কেঁটার'কে খানায় ধরে নিয়ে গেল?

—সে তো, চলিশ খন্টার জন্তে, আন্তদা' গিয়ে জামিনে খালাস করে এনেছে।

—কাটে কেস হবে তো?

—হবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না। সেদিন যাদের সংগে ছিল বান্ধু, তারা সাক্ষী দেবে।

—আমার সংগে কবে আলাপ করিয়ে দিবি?

—সেই কথাই বলতে এলাম, তোকে নিয়ে টালীগঞ্জের বস্তীতে যেতে বলেছে।

—কেন, সেখানে কি হবে?

—কেঁটার' ব্যাপার কি বোঝা যায়, বলল কে এক জন মর-মর, হয়তো আশানে নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চয় কোন দাঁও মারবে।

মদন হঠাৎ বলে, সে দোকানদারটা আবার এসেছিল। ওকে টাকা না দিলে চলবে না, বলছে বাড়ীতে বলে দেবে।

গ্রামল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে মদনের হাতে দেয়।

—কোথায় পেলি?

—মামার পকেট থেকে।

—সাবাস, আজ না পেলে মুন্সিলে হত। চল, বুড়াকে আগে টাকাটা দিয়ে আসি।

[ ক্রমশঃ ]

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]

# দেখুন! অন্ধকণী সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!



সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা  
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।



# ব্যক্তিহে রামেন্দ্রচন্দ্র

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

২

এবার কলকাতায় পড়বার পালা। উপেন্দ্র বাবু—রামের ছোট বাবা বললেন—এ ছেলেকে ছেড়ে একা আমি থাকতে পারবো না। আমরা সপরিবারে গিয়ে রামকে পাশ করিয়ে তবে আনবো। স্নাতক পেয়ে রামের খবর রাখা ডেকে বললেন উপেন্দ্র বাবুকে, তোমাদের বিষয় দেখবে কে? তোমাদের খার আছে শোধ দেবে কে? তোমার বাওয়া হবে না। ছেলেকে ভর্তি ক'রে দিবে এসো—রাজার কথা বাবুদের কাছে বেদবাঁকা।

তখন রাজা হুঁখানা পাকী ক'রে দিয়ে সাইখিয়া পাঠিয়ে দিলেন। তখন কলকাতা বাওয়া সোজা ছিল না। যেতে হলে সাইখিয়া ছাড়া ট্রেন নাই। রামেন্দ্র বাবু উঠলেন গিয়ে কলকাতায়। যে ছেলে অল্প পাড়ারগী থেকে প্রথম হয়ে আসচে কলকাতায়, তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় ক'রে এলো ভাল ভাল ছাত্র। অবিনাশ বাবু বললেন—হা রে! তুই মফঃস্বলের ছেলে হয়ে আমাদের মুখে চূণ-কালি দিলি। জানকী বাবুও ঐ ধরনের ঠাটা করেন। উপেন্দ্র বাবুর এই সব কথা শুনে আনন্দ ধরে না। রাম খাঁক ধরলো আমি বিভাগাগরের আশীর্বাদ না নিয়ে কলেজে ভর্তি হবো না। তখন উপেন্দ্র বাবু বললেন—এ কথার উত্তর দিতে পারবো না। এ আমাদের বংশের ছেলেরই কথা। আমার সাথে একটু পরিচয় ছিল বটে, তবে হয় তো চিনতেই পারবেন না।

এক দিন বেলা আটটার সময় বিভাগাগরের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি নানা কাজে ব্যস্ত। ছেলে আর তার কাকাকে দেখেই চিনতে পারলেন। আমাকে কী চিনতে পেরেচেন? বলতেই উত্তর দিলেন—আমি ত আপনাদের মত জমিদার নই; এক বার দেখলে আমাদের ভুল হয় না। রামেন্দ্রের পরিচয় শুনে খুশী হয়ে না বিভাগাগরের। তিনি বললেন—আমার নিজেরই একরকম প্রতিষ্ঠা করা কান্দীর ইচ্ছা। জানো রাম? তোমার বাবা কাকার পরীক্ষা নিয়েছি আমি নিজে। তোমার দায়ের সাথে আমার পরিচয় ছিল। তোমাদের বাড়ী গিয়েছি। খেয়ে এসেছি। তোমার বাবা কাকার ব্রাহ্মণ ভোজন করতে জানেন। তোমাকে আশীর্বাদ করছি রাম, তুমি মায়া হও।

রাম তখন বিভাগাগরের পায়ে ধুলো নিয়ে ভাব-গদগদ ভাবে আশীর্বাদ চাইলে তখন বিভাগাগর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, মনে রাখবে কখনও শাসকের অধীনে কোন কাজ নেবে না। শুনে রামের মন ভরে উঠলো। যেন কে রামের আশ্রয় সাড়া দিলো। মনে হলো রামের, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ দেখে এলাম। খুব খুশী হয়ে বাড়ী এলো।

প্রথম কলেজে যেয়ে খুব ইংরাজি দর্শন পড়তে লাগলেন রাম বাবু। এতো পড়া তার কথা নাই। রাত দুটো বেজে গেছে খেয়াল নাই। তার বন্ধুরা এসে বলতেন—রাম, তুই নিজের পরীক্ষার পড়া পড়বি কখন? রাম উত্তর দিতেন—তা দিন কতক দেখে নিলেই হবে। তখন সহপাঠীর দল মনে করতেন—হবেও বা

তাই। রাম ত অসাধারণ বুদ্ধিমান। কিন্তু সে বার রাম দ্বিতীয় হয়ে গেল। অনেক দিন পূর্ব রামের মনে পড়লো বাবার কথা। তাঁর কাছে কী কথা বলেছিলেন তাও মনে পড়লো। তখন থেকে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞান পড়তে। তখন দর্শনশাস্ত্র আর খুলেও দেখেন না। প্রথম হয়ে সে বার পাশ করলেন। তাঁর কাগজ দেখে তাঁদের পরীক্ষক পেডলার সাহেব এতো খুশী হলেন বলার না। তিনি বলেছিলেন, আমি এ পর্য্যাপ্ত বৃত্ত রসায়নের কাগজ দেখেছি তার মধ্যে এইখানি out of the way the best.” কিছুক্ষণ পরে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিলেন out of the way the best. তিনিই বললেন রামকে—তুমি এম এ, ও প্রেমচাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

এম-এ পরীক্ষায়ও প্রথম হয়ে পাশ করলেন। তার পর প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দেবার সময় রাম বাবুর পড়া দেখে সকল ছেলেই হতবুদ্ধি। সমস্ত রাত কেটে বাজে, ঘুম নাই। সহপাঠীরা বলে—এতো পড়লে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে যে রাম। কে শোনে সে কথা—রাম বলে আমাকে অবিনাশের মত ছেলেদের সাথে পরীক্ষা দিতে হবে মনে রেখো। কিছুদিন পর দেখা গেল ছেলেদের কথাই ঠিক হলো। রাম বাবুর মাথার দোষ হলো। একটু পড়তে গেলেই অজ্ঞান হ'য়ে যান। ডাক্তাররা এসে বললেন তোমাকে এখন বিশ্রাম নিতে হ'বে। চার মাস শুয়ে থাকতে হলো রাম বাবুকে ঠিক পরীক্ষা দেবার আগেই। তখন তিনি বাড়ীতে লিখলেন—আমি এবার পরীক্ষা দিতে পারবো না। শুনেই খবর লিখে পাঠালেন—তুমি পাশ না করতে পারলেও পরীক্ষা দাও।

কী করেন? অগত্যা পরীক্ষা দিতে গেলেন। দুটো প্রশ্ন মাত্র লিখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন পরীক্ষা-গৃহেই। বলতে লাগলেন—আমি পাশ ক'রতে পারবো না। কেন খবরমশায় আমাকে জেদ ক'রে পাঠালেন। হুঃখে রাম বাবু বিছানার গা ঢালা দিলেন। প্রফেসর এসে জানিয়ে যান—অভরসা পাবার মত তুমি লেখনি। তুমি ওঠো কথা কও। ভাল লাগছে না সেকথা তাঁর; মনে করেন—আমাকে স্তোক দেবার জন্য বলচেন। পরে পেডলার সাহেব এসে যখন প্রকৃত সংবাদ দিলেন তখন রাম উঠে বসলেন। সাহেব বললেন—তোমার মত লেখা কখনও কোন ছেলের আজ পর্য্যাপ্ত চোখে পড়েনি আমার। তুমি যেটার উত্তর না দিয়েচি মনে করে লিখেচো সেটার উত্তর আরও চমৎকার হয়েছে। তুমি বাড়ীতে থবর দাও, আট হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েচো প্রেমচাঁদে প্রথম হ'য়ে পাশ করেচো।

তৎক্ষণাৎ রামেন্দ্র বাবু তাঁর করলেন বাড়ীতে—আমি ও অবিনাশ পাশ করেচি প্রথম হয়েই। দুজনেই বৃত্তি পেয়েচি আট হাজার ক'রে।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ইংরাজী জানতেন না। তাঁর কাছারিতে সামান্ত রকম ইংরাজী-জানা কর্মচারী একজন ছিলেন। তিনি প'ড়ে



বললেন—রাম কেস ক'রেচে। অবিনাশ পাশ করেচে। ওনেই রাজা মর্দাহত হলেন। কী ভুলই করেচি জামাইকে পরীক্ষা দেবার অহুমতি দিয়ে!

এমন সময় বসন্ত বাবু—রাম বাবুর পিসেমশায় কান্দী ইংরাজী ইকুল থেকে এসে উপস্থিত। তিনি তার না দেখেই বললেন—গাথাটাকে ডাকো ত', টেলিগ্রাম ক'রে কেও ফেলের খবর দেয়! তার পর বললেন—রাম অবিনাশ হু'জনেই পাশ করেচে। হু'জনেই আট হাজার টাকা ক'রে বৃত্তি পেয়েচে।

তখন রাজবাড়ীতে ধুম দেখে কে। জেমো-কান্দীতে এমন লোক ছিলেন না যিনি ঠাকুরদের প্রসাদ না পেয়েচেন।

প্রেমচাঁদ পরীক্ষার পর লিখেচেন আলেকজান্ডার পেডলার — চার জন ছেলে প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে হু'জন বৃত্তি পেয়ে প্রথম হয়েছে। তার মধ্যে রামেন্দ্রশুন্দর এমন শুল্কর রসায়ন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়েচে, এমন খাতা আর কোন ছাত্রের এ বাবৎ আমার চোখে পড়েনি।

পাশ করেই হু' বছর বেতন না নিয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাণীর কাজ করেছিলেন।

বি-এ পড়বার সময় রামেন্দ্রশুন্দরের পুত্রসন্তান হয়। বহু আত্মীয়-স্বজনে সর্বদা কোলে নিয়ে থাকতো ব'লে লজ্জার তিনি ছেলেকে নিতে পারতেন না। রাত্রে থাকতো পদ্মমার কাছে ছেলে, তখনও নেওয়া সম্ভব হত না রামেন্দ্রশুন্দরের। কিছু দিন পরেই ছেলে মারা গেল। তখন দুঃখ করতে দেখেছেন অনেকে। ছেলে হাত বাড়িয়ে কত সময় আসতে চেয়েছে।

আমার কাছে। আমি নিইনি কেবল লজ্জায়! আজ আমার সেই ছেলে হারিলাম। আর হয়তো আমার পুত্র সন্তান হবেও না। আশ্চর্য কথা ছিল রামেন্দ্রশুন্দরের। যে কথা বের হ'তো তাঁর মুখ থেকে তা' ঠিকই হ'তো। আর পুত্র সন্তান হয়নি তাঁর।

পাশ ও অবৈতনিক কাজ করার পরই হু'বছর গৃহকর্ম দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম দেখলেন কর্তাবাবার একটা উইল প্রভেট নেওয়া হয়নি। সম্পত্তির অনেক টাকা ধার। আরও অনেক কাজ গড়ে রয়েছে। নিজের ও খুঁড়তুতো ভাইয়া নাবালক সব একত্রে আছে। কয়েক জন রামেন্দ্রের বন্ধু বললেন—তোমার নিজের পাওনা টাকা এজমালি ধরে শুখাচো কেন? তখন তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন—চিনে রাখলাম আপনাদেরকে।

১২১৮ সাল, রামেন্দ্রের স্বপ্ন মারা গেলেন। শোকে মুহম্মান হয়ে বাড়ীতে কিছু দিন থাকলেন। অনেকে এসে বলতে লাগলেন—সব বোঝা ডু মি জ্ঞানী। তোমার মত ছেলে কখনও কীদে? তবুনিই উত্তর দিয়েচেন—আমার বোধ আছে ব'লেই ত কীদচি। কোন পণ্ড-পক্ষীকে কীদতে দেখেচো? আমি ত ছার রাম! জেত' কালের অবতারকে কীদতে শোনোনি। উইল মত কতক সম্পত্তি তিনকড়ি দেবীকে দিয়ে ব্রজশুন্দরের নির্দেশ মত দেবোত্তর করে দিলেন বিষয়। স্বপ্নপত্র শোধ দিলেন নিজের পরীক্ষার পাওনা টাকা হ'তেই।

ডাক প'ড়লো রামেন্দ্রশুন্দরের ভগিনীপতিদের তরফ হ'তে। চার ভগিনী আছে জেমো রাজবাড়ীতে। ভগিনীপতিরাও প্রায় তাঁর সমবয়স্ক। পিতৃহীন হয়ে বিভাগ করতে চান রামেন্দ্র বাবুকে সামনে রেখে।

## সমুজ্জ্বল মুখশ্রী

নিয়মিত "বোরোলীন"

ব্যবহারে আপনার  
তনুশ্রী দিন দিন উজ্জ্বল  
ও কমর্নীয় হয়ে উঠবে।  
মুখশ্রীর কোমলতা

ও সজীবতা বজায় থাকবে  
এর প্রান পর্শী স্নিগ্ধ সুবাস  
আপনার মনে আবেগময়  
অনুভূতি এনে দেবে।

পরিবেশক:- জি. দত্ত, এণ্ড কোং  
১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

সকল টিসনার্শ ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

রাজা রামেন্দ্রসুন্দরের কতো উপকারী ছিলেন ভেবে তিনি ভার গ্রহণ করলেন। দিন নাই রাত্রি নাই সর্বদা রামেন্দ্রসুন্দর তৎপর বিষয় কাজে। তাঁর কোমরে বড় বড় চাবি আয়রণ সেফের ও সিল্কের। রামেন্দ্র বাবু তখন বলতেন প্রায়ই, তোমাদেরই জন্তে আমাকে এই বোকা টানতে হচ্ছে। বিভাগের বিষয়ে ডাক পড়তেই রামেন্দ্রবাবু হাজির। খুব লক্ষ্য রাখেন যেন কোন বিষয়ে কায়ও একটু অন্যায় না হয়।

ঠাণ্ডা একদিন সেফ খুলে দেখেন, একটা ড্রহায়ে সোনার চাঁদির জিনিষ বোকাই। তখন ভগিনীপতিরা বললেন—রাম বাবু! দেখছো না আঙ্গ টুপি ভাগ হচ্ছে, এটা শেষ হ'তে দাও। ওটা আর এক দিন হলেই হ'বে। সেদিন সোনা-চাঁদি ভাগ করা হ'লো না।

কী করেন আবার আর এক দিন অসিতে হলো রামেন্দ্র বাবুকে সোনা-চাঁদির ভাগের জন্ত। এসে নেপেন, সোনা-চাঁদির জিনিষ নামমাত্র পড়ে রয়েছে। তখন বিজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ ফুল ভগিনীপতি বললেন—ব্যাপার কী রাম বাবু? রামেন্দ্রসুন্দর উত্তরে বললেন—তাই ত দেখছি ফুল হজুব। তখন অল্প ভগিনীপতিরা বললেন—রাম বাবুর কাছে চাবি আছে, আমরা কী চুরি করতে গিয়েছি? হাজার মানা করলেও বিজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ বললেন হাত্ত করে।—আমি কি বুঝি না রাম বাবু! আমার সাথে একটা তোমার ভগিনীর বিয়ে দিলেও আমার শরিকদের বাড়ীতে আর তিন বোনের বিয়ে দিয়েছে।

হাজার ঠাট্টা করে বললেও রামেন্দ্র বাবুর চৈতন্ত হলো। এতো ব'লে-কয়েও আর রামেন্দ্র বাবুকে চাবি নেওয়া করাতে পারেন নি। তাঁর সেই এক কথা—আমি নিজেকে কখন কীকি দিতে পারি না। রহস্যচ্ছলে ফুল হজুব বা ব'লেছেন, মিথ্যা না। আমিই দেখতে গেলে চুরি ক'রেছি।

তার পর দরখাস্ত ক'রলেন গভর্ণমেন্ট এডুকেশনাল বিভাগে একটা চাকরী করার জন্ত। মাহিনাও বেশী সংবাদ পেয়েছেন। ডিরেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিয়ে আর্থান পেয়েছেন ইন্টারভিউ-এর জন্ত। এমন সময় শিয়ন এসে হাত পেতে বকশিস চাইলো। অবাক হয়ে রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন—কেন? উত্তরে দারোয়ান বললো—গভর্ণমেন্টের ঘরে যেতে হ'লে দিতে হয়।

তখনই মনে পড়ে গেল বিভাসাগরের কথা। উঠে বললেন—সাহেবের ডাক পড়লে বলবে, তিনি আপনাদের দেওয়া কাজ নেবেন না। দারোয়ান তাকিয়ে দেখলো লোকটিকে। পাঁচছয় শত টাকার চাকরী ছেড়ে যায় সেই মানুষটিকে।

রামেন্দ্র বাবু প্রায়ই ব'লতেন—আমাদের শিক্ষা সেই দিনই সম্পূর্ণ হ'বে, যেদিন পরের জন্ত আমাদের প্রাণ কাঁদবে। আশ্চর্য্য ছেড়ে পরের জন্ত ভাবতে শিখবো।

এই ভাব দেখে হীরেন্দ্র বাবু ব'লেছিলেন—জাতির জীবনে আমরা সেই দিনই জরী হইব, যখন চরিত্র বলে রামেন্দ্রসুন্দরের মত হইতে আরম্ভ করিব।

রামেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানের উন্নতি দেখাতে চান নি, দর্শনশাস্ত্রের কিছু দেখিয়ে নায় নিতে চান নি, কেবল বেছে নিয়েছিলেন স্বদেশের উন্নতির কাজ। সেই জন্ত অধ্যাপক বোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখে গেছেন—হাজারখানা বই লিখে বা নাম হয় রামেন্দ্র বাবু সেই

কির্তিই রেখে গেছেন। রামেন্দ্র বাবুর কথার দোছোট ছিল—নিজের ভাল বা বুঝে কখনও অপরকে বোঝাতে বাবে না। সেই জন্ত অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখে গেছেন—রামেন্দ্র বাবুকে আমরা পেলাম বঙ্গবাতের মধ্যে। যখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন তখন যোগ-শয্যায়। বহু দিন ভাল ছিলেন আয়ত্ত করেই গেলেন। তিনি কোন শাস্ত্র হজুম না করে বলতেন না। কখন রামেন্দ্র বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে বুঝিয়ে দিতেন বাংলা ভাষায়। এমন কি, যখন পড়াতেন কলেজে তখন জ্ঞান থাকতো না। ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গেছে কে দেখে কে শোনে সে সব কথা। তখন পড়িয়েই চলতেন। ছেলেরাও শুনছে আগ্রহ করে।

তিনি প্রায়ই বলতেন—বদি পারি আমার মাতৃভাষাকেই তোলাবো। ঐ ভাষায় প্রথম আমি মা বলে ডেকেছি। দেখি বদি পারি আমার মাতৃভাষাকে বাহন করবো সব কিছু শিক্ষার।

একদিন হেসে বলতেন বিশ্বকবিকে—আমার দৌহিত্যদেরকে জিজ্ঞেস করলাম—জয়গোপাল, মণি! তোরা ভারতের চৌহদ্দি কি বল তো। তারা ঠাঁড়িয়ে রইলো নির্বাক। তখন জিজ্ঞেস করলাম ভারতের চতুঃসীমা বলতে পারো? তখনও মিরুত্তর। যখন বললাম—ভারতের বাউনডারি। তখন জলের মত মুগ্ধ বলে গেল। আঁশ-খঁটি দিয়ে কাটতে হয় না পণ্ডিত মশায়দিকে। ধীরে বুঝিয়ে না দিয়ে মুগ্ধ করান।

বিশ্বকবি গভীর গলায় বললেন—তা হলে রামেন্দ্রসুন্দর হাজারে হাজারে জন্মাতো হয়।

তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলে মুক দর্শক রামেন্দ্রসুন্দর। যেন কিছুই বোঝেন না জিবেদী মশায়। হাজার জিজ্ঞাসা করলেও তাঁর কাছে উত্তর পাওয়া যায় না।

কান্দী মহকুমার ভার নিয়ে আছেন তখন বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়। পূজার ছুটিতে রামেন্দ্র বাবু বাড়ী গিয়েই জানতে পারলেন, বাবা মহাশয় এখানে আছেন। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ-এর সঙ্গে রামেন্দ্র বাবু গেলেন ডি, এল, রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। অল্প বয়স হলেও তখন রামেন্দ্র বাবুর সব চুল পেকে গেছে। হৃবিরের ভাব এসেছে শরীরে। পরিচয় দিতেই চমকে উঠে বললেন—হবে না কেন ভিতরের জ্ঞানও যে পরিষ্কৃত হয়েছে। রামেন্দ্র বাবুকে পেয়ে ভাবাবেশ অনেক প্রশ্ন করলেন। রামেন্দ্র বাবুর উত্তর শুধু হাসি দিয়ে। কতো কথা জিজ্ঞেস করেন ডি, এল, রায়। সেই হাসি। ডি, এল, রায় তাঁর বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখেছেন তাই লিখলাম—এখন কান্দিতে থাকার মধ্যে আছেন হৃবির-প্রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয়। সেদিন অল্পগ্রহ করিয়া আমার এখানে আসিয়াছিলেন। আলাপ হইল। বহুদিন পর এক জন নামজাদা বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া নানা প্রশ্নগুলা তাঁর সহিত তর্ক করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভ গভীর মুগ্ধ হইতে বাক্যের পরিবর্তে অধিকাংশ সময়ে মুহূর্ত্ত অর্থাৎ—দশনকৌমুদীর স্মরণ মাত্র হইতে থাকিল। স্মরণ আমারও না মিটিল আশা'না পুরিল সাধ; তর্ক হইল না। অহো দম্ব অদৃষ্ট! বড় ধীর মানুষটি। কতকটা নির্বোধ-এর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইলেও বিভার একটা জাহাজ, তর্ক যখন করেন না বুঝিলাম বৈয়সিক। আমাকে যখন বাড়ী নিয়া গিয়া খাওয়ারাইলেন, অন্তঃস্থ বুঝিলাম উদারমনা মহাজন।

সে বার পুজোর ছুটিতে তাঁর বন্ধুরা দেখেন তাঁদের রাম বাবুকে বড় খুশী। অনেকে প্রশ্ন করলেন—আপনাকে বড় খুশী দেখাচ্ছে কেন? তখন রাম বাবু স্তব্ধ করলেন—আমার আকাঙ্ক্ষা এতো দিনে ফলবতী হতে চলেছে। কী আকাঙ্ক্ষা আপনার? জিজ্ঞাসা করতই প্রশ্ন স্বরে আরম্ভ করলেন বলতে—আমার বয়সবন্ধার আকাঙ্ক্ষা ছিল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাকে গড়া। আমাদের বাঙ্গালীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে গেলে চাই এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে গেলে আবার ফিরে আসবে ভাবধারা। সেই স্বর্ণমন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এর নাম দিয়েছে সাহিত্য পরিষৎ। যেখানে সমবেত হবেন ভারতের মনীষিগণ। তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন শুধু বাংলাকে নয়, ভারতকেও।

তখন ভাবগম্ভীর রামেন্দ্রসুন্দর ব'লে চলেছেন শুদ্ধ ভাষায়। জিজ্ঞেস করলেন উপেন্দ্র বাবু—কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপাল—তোমার দান কী আছে এতে?

হেসে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আমার এই জন্তে গর্ব যে এটা একটা মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠান বললেও চলে। মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য মহারাজা মনীষচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জমির উপর সাহিত্য পরিষদ মন্দির স্থাপিত। মুর্শিদাবাদের আর এক স্বনামধন্য মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের টাকাত্তে মন্দিরটির দ্বিতল গঠিত। আরও একটা কথা বলি মুর্শিদাবাদের শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের টাকাত্তে এই মন্দিরটি মর্মান্বিত হইবে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, আপনার এই অধম একজন মুর্শিদাবাদেরই অধিবাসী এর সম্পাদক। তখন হাসির রোল উঠিলো। আচ্ছা অধম লোক আপনি মুর্শিদাবাদের।

লালগোলা মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ যখন তাঁর নাতি বীরেন্দ্রনারায়ণকে সমর্পণ করে গেলেন রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে, ব'লে গেলেন মানুষ করবার জন্ত আপনার মত পণ্ডিতের হাতে দিয়ে গেলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর সানন্দচিত্তে সে ভাব নিলেন। বললেন আমারও যে নাতি পোকা। মহারাজ বললেন—বাসাটা একটু বড় করতে হবে, আমার লোকজনও আসতে পারে। রামেন্দ্র বাবু বললেন—আমি একজন গরীব শিক্ষক আমার এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। এখন আপনার মত বড় পাখী আসতে গেলে বড় খাঁচারও প্রয়োজন।

ইতস্ততঃ করে মহারাজা জানবার চেষ্টা করলেন—এর জন্ত কিছু কী দিতে হবে আপনাকে? তখন উচ্চ হাস্য শুনে পেলেন রামেন্দ্র বাবু। বললেন—আমাকে! আমার নাতির ভাব নেওয়ার জন্ত! তখন লজ্জিত হয়ে মহারাজা নিজের তুল বুঝতে পারলেন। মহারাজকে লজ্জা-নিবারণ জন্ত বললেন ত্রিবেদী মশায়—আমার কতকগুলো অভ্যাস খারাপ আছে। কখন কখন ভিক্ষের খুলি নিয়ে কাঁড়াবো আপনার কাছে। অবশ্য নিজের জন্ত নয়। শুনে মহারাজা গম্ভীর ভাবে বললেন—বুঝছি, দেশের কাজের জন্ত ভিক্ষের

খুলি হাতে আপনার মত লোক পাওয়া ত ভাগ্যের কথা মশায়। রামেন্দ্র বাবুর তখন খুশী ধরে না।

যখনই জানতে পেরেছেন মহারাজ, রামেন্দ্র বাবু চিন্তিত আছেন সাহিত্য পরিষদের ঘর তৈয়ারী নিয়ে, তখনই মুক্তহস্তে রামেন্দ্র বাবুর অভাব মোচন করেছেন। যখন শুনেছেন স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্ত রামেন্দ্র বাবু চিন্তা করছেন তখনই পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন স্থায়ী ভাণ্ডারে। যখন শুনেছেন রামেন্দ্র বাবু চিন্তা করছেন বিভাগাগর লাইব্রেরীর জন্ত। তখন মুক্তহস্তে সেই লাইব্রেরী দান করেছেন যত টাকাই লাগুক মহারাজার। এই ভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের ঋণ শোধ করবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন মহারাজ।

মহারাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার একটা ইতিহাস আছে। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদের অসুযোগী সাহিত্যিকদেরকে বললেন—আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে বলুন মহারাজাকে, আমাদের সাহিত্য পরিষৎ অভাবী দরিদ্র, আপনি কিছু সাহায্য করুন। দেখা যাক কী তিনি দেন।

তখনই সকলে একটা মিটিং করার স্থির করলেন। সহরের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সুখী একত্রিত হয়ে কলকাতার একটা বিরাট মিটিং-এ মহারাজা বাহাদুরকে অভিনন্দিত করলেন। এমন কী সেদিনের সুখীজনের চাপে সভামণ্ডপ ভেঙে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল। এমন সুখী সমাগম তখনকার কালে কেউ দেখতে পার নি। তাঁরা মহারাজকে মালা-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিলেন। দুর্বা দিয়ে দশের পক্ষ হতে আশীর্বাদ করা হলো।

মহারাজা তখন বললেন রামেন্দ্র বাবুকে দিয়ে—আমি স্থায়ী ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাই। অতর্কিতে এই কথা কানে বাওয়াতে সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর খুশী দেখে কে! খুশী ধূমে সভামণ্ডপ ভেঙে পড়ে আর কী! বহুকাষ্ট উত্তেজনা কমলে সুখী সজ্জনে ঔত্তাব করলেন, মহারাজকে বহন করে নিয়ে বাবার খোলা গাড়ীতে। মহারাজা কিন্তু সম্মত হলেন না—আপনাদের মত বিধান লোকেরা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবেন আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে, এমন সঙ আমি সাজতে পারবো না। মহারাজকে প্রায় বলতে শোনা যেতো টাকা থাকলে ত'হয় না মশায়। দান করিয়ে দেবার মত মন করে দেবার পাত্রও দরকার।

নিজের বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি বলতেন—রামেন্দ্র বাবু আপনাকে অনেক খরচ করিয়ে দেন। তখন বলতেন মহারাজা—আমার কলিজা যে দিয়ে রেখেছি রামেন্দ্র বাবুর কাছে। বীরেন্দ্রনারায়ণ একমাত্র নাতি যে মহারাজের, তেমন পাশ না করতে পারলেও বাঙলার মধ্যে একজন নামকরা সাহিত্যিক। রামেন্দ্রসুন্দরের সান্নিধ্য লাভেই তাঁর সাহিত্য সাধনায় আগ্রহ জন্মেছিল।

[ক্রমশঃ।

॥ মাসিক বঙ্গমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ববাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# শ র ৭ স্মৃতি র টু কি টা কি

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কৌলকাটা বেতায়ের সেদিনকার 'শরৎ-শরৎ' সভায় বাবা

উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা কোরে কিছু কিছু বক্তৃতা দান করেন। সকলেরই ভাবনা'খুব আন্তরিকতাপূর্ণ হয়েছিল। সকলের বলা শেষ হলে, শরৎচন্দ্র তাঁদের গল্পবার দিয়ে, অল্প কথায় কিছু বলেন। তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা শুধু তিনি বা বলেছিলেন তার মোটামুটি কথা এই যে, দীর্ঘজীবন বাইরে থেকে সাধারণতঃ দেখতে ভাল হ'লেও, সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে উত্তম কাম্য নয়। যদি স্বাস্থ্য, শাস্তি ও কর্মশক্তি অটুট থাকে; দেশ, সমাজ ও লোকসেবা করবার ক্ষমতা থাকে, কোনও দিকে কোনরূপ অশাস্তি না থাকে, তবেই দীর্ঘজীবন কাম্য। কিন্তু মানসিক অশাস্তি ও দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘজীবন—তখন দীর্ঘজীবনকে তিনি ভাগ্যের অভিসম্পাত বলেই মনে করেন। ব্যাধিপীড়িত হ'য়ে কর্মশক্তি হারিয়ে তিনি একদিনও বাঁচতে চান না...ইত্যাদি।

তারপর বেতার কর্তৃপক্ষ থেকে ফটাঁ তোলবার আয়োজন হয়। ফটাঁ তোলা হয়, একখানা শরৎচন্দ্রের আর একখানা সমবেত অভ্যাগতদের। এই দু'খানা ফটাঁ থেকে ব্লক করে, 'বেতার জগৎ'এ ছাপা হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের ফটাঁখানা বেশ ভাল হয় নি। গুলু ফটাঁখানাত সামনের ক'জনেরই ভাল উঠেছিল। একেবারে সামনে বসেছিলাম আমি এবং নাটোরের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, জলপাই সেন প্রভৃতি দু'চার জন। 'বেতার জগৎ'এর ছবিতে এই ক'জনেরই ভাল উঠেছিল। 'বেতার জগৎ'এ ছাপা এই ছবি দু'টি 'টুকিটাকি'র গত সংখ্যায় ছেপে দেবার জন্ত আমি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এ প্রেরিত ছবি থেকে ভাল ব্লক হবে না বলে আমার ছবি দু'খানা ফেরৎ পাঠানো হয়। 'টুকিটাকি' সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে। তাইতে এ ছবি দু'খানা যদি কোন রকমে দিতে পারা যায়, তার জন্ত চেষ্টা করবো।

পরদিন সকালে যখন শরৎচন্দ্রের কাছে গেলাম তখন তাঁর প্রথম কথা হোল—'আমার সব প্রান উন্টে গেল হে।' একখানা চেয়ারে বসে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। চেয়ে দেখবার উদ্দেশ্য, মুখভাব দেখে, তিনি কেমন আছেন সেইটে যোগ্যতার চেষ্টা। শরৎচন্দ্র বললেন—'কই, কিছু জিজ্ঞাসা করছ না যে?'

'কি জিজ্ঞাসা করবো?'

'এ যে বললুম, 'সব প্রান উন্টে গেল'—ওই বিষয়ে?'

'কোন প্রানটা উন্টে গেল, দাদা? আপনার 'প্রান'এর ত' সীমা নেই? কিসের প্রান?'

'আহা-হা! আসল জিনিসটা, যা এত দিন মনে-মনে ছোঁক এসেছি,—দেবানন্দপুরে বাড়ী কোরে তোমাতে আমাতে হ'জনে থাকবার ব্যবস্থাটা। ওটা আর হোরে উঠলো না। বড় জোরে জোরে বাবার তাগিদ আসছে। কালকের জন্মদিন উৎসবই আবার এ জীবনের শেষ জন্মদিন উৎসব হোয়ে গেল।'

আমি অপ্রসন্ন মনে একটু থমকের সুরে বললাম—'চুপ করুন ত', বাজ্ঞে কথা বলবেন না।'

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হোয়ে বললেন—'বাজ্ঞে কথা মোটেই নয়; দেখে নিয়ো।'

এর পর থেকেই ঘন-ঘন তাঁর শরীর খারাপ হোতে লাগলো। মনে মনে আমার একটু ভয় হোল, তাঁর মুখের কথাটাই সত্য হোয়ে দেখা দেবে না কি?

হঠাৎ জানা গেল, তিনি অতিমাত্রায় অসুস্থ হোয়ে পড়েছেন এবং শ্রীমুরেশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর কাছে আনিয়ে রেখেছেন। খুব আবহুকের সময় সুরেন বাবুকেই তিনি নিজের পাশে রাখেন। সুরেন বাবু শরৎচন্দ্রের শুধুই যে মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন, তা ত' নয়। তিনি ছিলেন তাঁর আবাল্যের সহচর, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য, তাঁর পরম বন্ধু। শরৎচন্দ্র সব কাজেই তাঁকে ডাকতেন, তাঁকে চাইতেন, তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য নিতেন।

তাঁর 'নারসিং হোম'এ বাবার কয়েক দিন আগে আমি তাঁকে দেখতে গেলুম। তখন তিনি নীচে একেবারেই নামেন না। সুরেন বাবু সর্বদাই তাঁর কাছে থাকেন। তখন শরৎচন্দ্র কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। ডাক্তারদের সেইরূপই নির্দেশ ছিল। তবে খুব দরকারী কাজের জন্তে কেউ যদি আসতেন ত' সুরেন বাবুর মাধ্যমে ওপর থেকে শরৎচন্দ্র সব বলে পাঠাতেন।

এরকম অবস্থায় আমিও যেতাম না। না গেলেও খবরটা আমি পেতাম। আমার যে ছেলেকে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাকে বে.জ. পাঠিয়ে খবরটা আনতুম। সেদিন সেই ছেলেটি বাড়ী না থাকায় ভাবলুম, আমিই গিয়ে সুরেন বাবুর কাছে থেকে খবরটা জেনে আসি। গেলাম। বরাবর যে গিয়েছি, একটা মধুর স্নিগ্ধ উজ্জল আনন্দময় আলোর মধ্যে গিয়ে ঝাঁড়িয়েছি, বসেছি, গল্প-গাছা করেছি। সেদিন যেন গিয়ে ঝাঁড়ালাম—একটা অন্ধকারভরা, আনন্দশূন্য, স্থানে। সেই ঘর, সেই দোর, সেই দালান, সেই সামনেরকার ছোট বাগান—কয়েক দিন আগে পর্যন্ত যে সবের মধ্যে ছিল একটা প্রাণপূর্ণ উৎসাহ ও মাধুর্যের স্পর্শ, একটা সাদা, একটা সুর,—আজ সেখানকার সেই সবের ভেতর যেন প্রাণহীনতার একটা নিষ্করণ হাওয়া বয়ে বাজে।

মনটা যেন কি রকম হোয়ে গেল!

বোয়াকের পৈঠায় উঠতে গিয়ে, ঝাঁড়ালুম। সেখানকার শুক বাতাস আমাকে যেন পেছনে ঠেলে ফিরিয়ে দিতে চাইলে। ফিরে বাই।

তাও পারলুম না! বোয়াকের ওপর উঠে কলিং-বেলটা টিপে ধরলুম। শব্দ শুনেই সুরেন বাবু নীচে নেমে এলেন ও সবাদ বা দিলেন তা মোটেই ভাল বলে মনে হোল না। সুরেন বাবু আমাকে নীচের ঘরে বসিয়ে আবার ওপরে শরৎচন্দ্রকে খবর দিতে গেলেন। একটু পরেই নেমে এসে বললেন—'শরৎ আসছে।'

আমি চমকে উঠলুম। বললুম—'আসছেন কি রকম? নীচে

নাহতে বারণ করুন। খবরদার, যেন নীচে না নামেন; বান আপনি।”

“না, সে তখনে না। আপনি এসেছেন শুনে, ও কিছুতেই না এসে পারবে না।”

“কিছুতেই তা হবে না; আমি চলে যাচ্ছি।” বলেই আমি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে চটি জুতোর শব্দ হতে লাগলো।

সুয়েন বাবু বললেন—“দেখলেন ত?”

কিছু আর বলবার পেলুম না।

অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শরৎচন্দ্র যেন নিজীবের মত ঘরের মধ্যে এসে তাঁর সেই নিত্য ব্যবহার্য আরাম কেদারাটার ওপর চলে পড়লেন। আমি তাঁকে খুব খানিকটা বকলুম। তিনি একটু চুপ কোরে থেকে বললেন—“তোমার হেঁসকে দিয়ে বলে দিয়েছিলুম, তোমাকে আসবার জন্তে। তাই, তুমি এসেছ শুনেই এলুম।”

“কেন এলেন? আসাটা মোটেই ভাল হয়নি।”

“আসি না ত। মোটেই আমি নীচে নামি না; সুয়েনকে জিজ্ঞেস করে দেখ।”

কি আর বলবো তাঁকে! বীর মনে অগাধ বন্ধুপ্রীতি, তাঁকে শারীরিক অসুস্থতার বীধান কখনো বেঁধে রাখা যায়? বীর যুধের কথাই হোল—‘মরতে ত এক দিন হবেই, তার জন্তে আর হুঃখ কি?’ তাকে সাবধানতার বেড়া দিয়ে কখনো আটকে রাখা যায় না।

মনে রাখতে হবে,—এ আর কেউ নয়—‘শ্রীকান্ত’।

ইন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য—‘শ্রীকান্ত’।

সুয়েন বাবু এখনো জীবিত আছেন, তাই এই দিনের কথাগুলো ছুঃখ লিখলাম; নতুবা লিখতুম না। \*

জীবিত অবস্থায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই দিনের দেখাই আমার শেষ দেখা। অবশ্য কল্লনার ছায়ামূর্তিতে আমি তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই দেখি। জীবনে অনেক আত্মীয়, অনেক হিতাশী, অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত এমন পরমাশ্রী, এমন পংম বন্ধু এমন পরম ভাষাশীকে যে অত্যন্ত অসময়ে এমন ভাবে হঠাৎ হারাতে হোল, এটা আমার চরম দুর্ভাগ্য।

দাঙ্গা গো! এমনি হঠাৎই যে তুমি পালিয়ে যাবে, তা কোন দিন স্বপ্নও ভাবিনি। বলেছিলে বটে যে, তোমার ছুটির বাণী শীগগিরই বেজে উঠবে, তাই কানী থেকে তাকাতাড়ি চলে এলে। তখন বুঝতে পারিনি যে তোমার যুধের সেই কথা এমনি মর্যাদিক ভাবেই সত্য হয়ে যাবে! কি কোরে যে তুমি সেটা জানতে পেরেছিলে, তা জানি না। এখন বুঝতে পারছি, তুমি যেমন কোরেই হোক ত জানত পেরেছিলেন। বাই হোক, ভবিতব্যতা যা তা হবেই। ভগবানের কাছে এখন এই প্রার্থনা করি, তুমি যেখান গেছ, শীগগিরই যেন সেখানে গিয়ে আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

\* ‘টুকটাকি’র এই সংখ্যাটা পূর্বেই লেখা হয়েছিল। সে সময় সুয়েন বাবু জীবিত ছিলেন ও কোলকাতার দক্ষিণাংশ ‘বেহালায়’ বাস করছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, কয়েক মাস পূর্বে তাঁর ভাণ্ডার-বিখাতা তাঁকেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে টেনে নিয়েছেন।

—লেখক।

‘শরৎ-স্মৃতির টুকটাকি’ পড়ে, কেউ-কেউ ‘রসাত্ন’ উপজ্ঞানানার বিষয়ে আরো-একটু বিশদ ভাবে জানতে চেয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ মত লিখছি যে, স্বর্গতঃ কেদারনাথ বাল্যোপাধ্যায় কানী থেকে ক্ষুদ্র-কলেবর একখানা মাসিক পত্রিকা বার করতেন অথবা তার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল—‘প্রবাস-জ্যোতি’। শরৎচন্দ্র এক বার কানী গেলে বাল্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে ঘরে বসেন, ‘প্রবাস-জ্যোতির’ জন্ত একটা উপজ্ঞাস তাঁকে লিখে দিতেই হবে। শরৎচন্দ্র কেদার বাবুর বার-বার অনুরোধ এড়াতে না পেরে, ‘বাড়ীর কর্তা’ নাম দিয়ে একটি উপজ্ঞাস কানেন ও তার প্রথম পরিচ্ছেদ লিখে কেদার বাবুকে দেন। ‘প্রবাস-জ্যোতিতে’ ঐ প্রথম পরিচ্ছেদটা ছাপা হয়। তার পর শরৎচন্দ্র কানী থেকে কোলকাতায় চলে আসেন এবং ‘প্রবাস-জ্যোতিতে’ ‘বাড়ীর কর্তা’ও বন্ধ হোয়ে যায়। এর বছরখানেক পরে, কানীর অন্ততম মাসিক ‘উত্তরা’র সম্পাদক, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের ‘রসচক্র’র কাছে প্রস্তাব করেন যে, রসচক্রের সদস্তগণের দ্বারা ঐ অসম্পূর্ণ উপজ্ঞাসটি সম্পূর্ণ করা হোক এবং সেটা গারাবাহিক ভাবে তাঁর ‘উত্তরা’তে প্রকাশিত হোক। সুরেশচন্দ্র এজন্তে আমাদের সকলকে খুবই ধরে বসলেন। আমরা শরৎচন্দ্রকে এবিষয়ে বলাতে তিনি সুরেশচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন স্থির হোল, বারোয়ারী উপজ্ঞাসের মত, আমরা আটদশ জন মিলে লিখে গল্পটার শেষ করবো। গল্পের গুট কি হবে তা সকলে একসঙ্গে মিলে ঠিক করতে পারবেন না, বা সে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে কেউ কোন আলোচনা বা পরামর্শ করতে পারবেন না। শরৎচন্দ্র লিখিত প্রথম পরিচ্ছেদের পর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে লেখবার ভার পড়ে আমার ওপর। কিন্তু আমার হাতে তখন মাসিঃ বহুমতীর জন্ত খুব জরুরী একটা লেখার কাজ থাকায়, শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লিখিয়ে নেবার প্রস্তাব করি। তাতে আমাকে বলা হয় যে, সে তার আপনাকেই নিতে হবে। সে সময় শৈলজ্ঞানন্দ কানীঘাট হালদারপাড়া রোডে, বটবুজ পালের একখানা বাড়িতে থাকতেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে এবিষয়ে বলাতে তিনি সম্মত হলেন ও দিন-দুইয়ের ভেতরই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লিখে দিলেন। কিন্তু তখনো আমার হাতের সেই কাজ শেষ না হওয়াতে, কবিশংকর কালিদাস রায়ের ব্যবস্থাপনার, স্বর্গতঃ জগদীশ গুপ্ত ওর তৃতীয় পরিচ্ছেদটা লেখেন। তার পর আনি লিখি, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। আমার পর শ্রীনরেন দেব লেখেন সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ ও শ্রীরাধাশ্রী দেবী লেখেন—নবম পরিচ্ছেদ। দশ হইতে চৌদ্দ পরিচ্ছেদ লিখিত হয়—সরোজকুমার রায়চৌধুরীর দ্বারা। পনের থেকে উনিশ পরিচ্ছেদ শ্রীমেনোজ বসু লেখা। তার পর বিশ্বপতি চৌধুরী লেখেন—বিংশ থেকে বাইশ পরিচ্ছেদ। তারাংশকর লেখেন—তেইশ, চব্বিশ ও পঁচিশ পরিচ্ছেদ। ছাব্বিশ থেকে আঠাশ পরিচ্ছেদ লেখেন—রাধিকাগুপ্তন গঙ্গোপাধ্যায়। সব শেষে ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ লিখে—উপজ্ঞাসখানি সমাপ্ত করেন। মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বইখানি শেষ হয়।

‘রসচক্র’ উপজ্ঞাস সম্পর্কে আর এক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের ‘রসচক্র সাহিত্য সভা’র একজন বিশিষ্ট সদস্ত—কুহুদচন্দ্র রায়চৌধুরী। বইখানায় তিনি কিছু না



লিখলেও, ওর প্রকাশ বাপারে তাঁর উৎসাহ, উত্তম ও সাহায্য খুব বেশী ছিল। তিনি আন্তর্জাতিক কলেজের একজন পুরাতন ও প্রবীণ অধ্যাপক ও এক সময়কার 'বঙ্গবাণী' মাসিকের (বা স্বর্গভঃ শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে, তাঁদের বাড়ী থেকেই বার তোত) কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক ও সমালোচক। শরৎচন্দ্রের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 'বঙ্গবাণী' কে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত পছন্দ করতেন ও তাতে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। তাঁর 'মহেশ' ও 'পথের দাবী' এই 'বঙ্গবাণী'তেই প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র যখন সামন্তাবেড় খাচ্ছিলেন, তখন 'বঙ্গবাণী'র জন্ত তাঁর লেখার কাপি আনতে কুমুদ বসু প্রতি মাসেই অন্তঃ পক্ষে একবার করেও সামন্তাবেড় যেতেন। শরৎচন্দ্র যেমন আমাকে 'আফি' ধরিয়ে গেছেন, তেমনি কুমুদ বাবুকেও পরবার জন্তে খুব চেষ্টা করেছিলেন। আফি পরার বিকল্পে কুমুদ বাবু বস্ত্ররক্ষা আপত্তি তুলেছিলেন, শরৎচন্দ্র তা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষকালে যখন কুমুদ বাবু বলেছিলেন যে, আফি বেলে প্রচুর ছুঁ খেতে হয়, তখন পরসা তাঁর নেই, তাতে শরৎচন্দ্র কুমুদ বাবুকেও বলেছিলেন যে, তাঁর একপাশা বটায়ের কাপি-রাইট তিনি কুমুদ বাবুর নামেও লিখে যেবেন, সেই পরসার তিনি ছুঁ খাবেন। কিন্তু এততেও শরৎচন্দ্র কুমুদ বাবুকে রাজী করতে পারেন নি। নৈসর্গিক জগতে উভয়ের মধ্যে সর্গজনবিদিত প্রণয় ও বন্ধুত্বের বাঁধন থাকলেও এবং শরৎচন্দ্র শক্তিতে ও শোভায় অতুলনীয় হলেও, এক্ষেত্রে কুমুদের নিকট তাঁর এই অনুরোধ কিছুতেই রক্ষিত হোল না। কুমুদ বাবুকে আমার মত তিনি আফি ধরাতে পারলেন না। পরে শরৎচন্দ্র আমাকে এ বিষয়ে বলেছিলেন—“কুমুদ আফি পরলে ভাল করতো; ওর ঐ মারাত্মক বকমের ডিম্পপেশিরার তাত থেকে ও বাঁচতো। ও রোগটার পক্ষে আফি একটা মগা ওষুধ। পশ্চিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রে আফিকে সুন্দরভাবে ব্যুত্রে ও ধরতে পারে নি, আফিদের ওপর ওপর মোটামুটি গুণাগুণ তারা বুঝেছে। ঋষিদের আয়ুর্বেদে এর সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে।” পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলোর স্বার্থার্থ্য আমি জানতে পারি। স্থলবিশেষে এই জিনিষটি বিষয় কাজ করে, আবার স্থলবিশেষে এ অমৃতের মত উপকার দান করে। আমাদের এদেশে ৬০-৬৫ বছর বয়সের সময় দৈনিক অল্প মাত্রায় খেলে, বৃদ্ধ বয়সের অনেকগুলো রোগের হাত থেকে এড়ানো যায় ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়।

স্বর্গভঃ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁর জন্মভূমি দক্ষিণেখরে আসেন, তখন আমিও দক্ষিণেখরে বাস করতাম। শরৎচন্দ্র সব্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বহু কথা হয়। আফি সব্বন্ধেও অনেক কথা হয়। তিনি নিজেও আফি ব্যবহার করতেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮০। তিনি বললেন—“আমি যে এ বয়সেও নীরোগ ও কর্মক্ষম আছি, সেটা আফি-য়ের দৌলতে। এই জগতেই আমাদের দেশে বৃদ্ধ বয়সে এই জিনিষটা প্রায় ঘরে ঘরেই প্রচলিত ছিল এবং সেই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নীরোগ ও কর্মী দেখে ৮০, ৯০, ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতেন। কিন্তু ইংরেজদের ডাক্তারীতে কিছুতেই আফি-য়ের স্বপক্ষে এই ধর্মের কথা স্বীকৃত হবে না।” আমি ইচ্ছা করেই আফি-য়ের বিরুদ্ধে অনেক পথ দিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করি। একদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে

হোল। তবে, শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন, কেদার বাবুও তাই বলতেন যে, ৬০ এর আগে আফি খাওয়া কর্তব্য নয় কিংবা খুব বেশী মাত্রায় ব্যবহার করাও ঠিক নয়। মোটের ওপর আয়ুর্বেদে বর্ণিত নিয়মে ও জিনিষ ব্যবহার করলে, অমৃতের ত্রায় ফল দিয়ে থাকে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, ডাক্তারেরা বাই বলুন না কেন। শরৎচন্দ্র নিত্য আফি ব্যবহার করতেন, তবুও অসময়ে মারা গেলেন। এর মন্ত একটা কারণ ছিল। তিনি শরীরের ওপর বেরূপ অনিয়ম অত্যাচার চিরকাল কোরে এসেছেন, তাতে তাঁর অকালমৃত্যু মোটেই আশ্চর্যের নয়। বৈচে থাকার ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র যৌক ছিল না। তিনি অনেক দিন আমার কাছে বলেছেন—“দেখ, এখন বৈচে থাকটা লোকসানের সাহিল। কি কোরে মরা বার বল দেখি?”

আমি বলতাম—“কেন দাদা, মরে লাভটা কি?”

“লাভই ত বেশি আনা। আবার নতুন জন্ম, আবার সেই মধুর ছেলেবেলা, ছেলেবেলা, আবার জীবনের সব চেয়ে মাধুর্যময় সময়—কিশোর বয়স, সেই কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ... আছা-হা! কী সুন্দর! কী চমৎকার!”—বলতে বলতে শরৎচন্দ্র যেন আত্মহারা হোয়ে যেতেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে হঠাৎ যেন শীকান্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতো, আর সেই সঙ্গে বায়োক্ষেপের ছবির মত পর্দার পর্দার হযত বা ফুটে উঠতো—ভাগলপুরের সেই গঙ্গা, গঙ্গার প্রবল প্রোতোবেগ ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথের ডিঙ্গি, বুনোবাউয়ের বন, মাছচুরি; তার সঙ্গে ফুটে উঠতো—তার অন্নদা দিদি, আর অন্নদা দিদির সেই নির্মম সাপুড়ে স্বামী। আরো কত কি! থাক, যা বলছিলুম—বলি।

‘বসচক্র’ উপন্যাস সব্বন্ধে এর আগে আমি বলেছি যে সমস্ত বইখানা পড়ে আমার নিজের তেমন ভালো লাগেনি। এ কথাই মানে এই নয় যে, বীরা বীরা আমরা এতে লিখেছি, সবার লেখা খারাপ হয়েছে। লেখা সকলেরই খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু প্রতি সব্বন্ধে পূর্বে সকলে মিলে যুক্তি-পরামর্শ না কোরে, অনির্দিষ্ট ভাবে অগ্রসর হওয়ায় ফলে যেমন হয়, তাই হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের লেখা অতি সুন্দর হয়েছে—এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে এবং হয়েছেও তাই। শরৎচন্দ্রও ‘বসচক্র’ সব্বন্ধে আমাকে বলেন—“বই ত বেশ ভালই হয়েছে, তোমাদের সবাইকে আমি এ জন্তে ধন্যবাদ দিচ্ছি; সবাইকে জানিয়ে।”

‘কিন্দ্র’ হবার পক্ষে ‘বসচক্র’ ভাল বই। যে বই শরৎচন্দ্র, নবরশচন্দ্র, তারশঙ্কর, শৈলজানন্দ প্রভৃতির লেখনীম্পর্শে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বটায়ের ছবি যে সকলেরই খুব প্রিয় ও আকর্ষণীয় হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইখানার ছবি করার জন্তে কোন কোন কিন্দ্র কোম্পানী থেকে প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু আমাদের সকলের ইচ্ছা, কোন ভাল এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যদি ‘বসচক্র’র ছবি করেন, তাঁদের আমরা আনন্দের সহিত উহা দিব। বইখানি বাজারে নিঃশেষপ্রায় হোলেও, এক-আধ কাপি আমাদের কাছে আছে; কোন প্রতিষ্ঠান কিন্দ্র কোম্পানী আমাদের কাছে এ জন্ত এসে আমরা তাঁদের বই দিতে পারব। ‘বসচক্র’র বহু পাঠক-পাঠিকা এর চিত্রাভিনয়ের ব্যবহার জন্ত আমাদের অনুরোধ জানিয়ে

আগছেন; এবং এটাও ঠিক যে 'বসন্ত' ফিরা হোলে, ফিরা প্রস্তুতকারীদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই লাভজনক হবে।

ফিরা কথার আর একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন সকালে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছি, কথার-কথার তিনি বললেন—“তোমার গল্পের ভেতর অনেকগুলোর বেশ ভাল ফিরা হোতে পারে, যদি গুট একটু-আধটু বাড়িয়ে দিতে পার।” আমি বললাম—“আমার বই ফিরা করার ক্ষেত্রে আমি কারো কাছে বাই নি, যাবও না। কোন প্রতিষ্ঠান যদি আমার কাছে এসে প্রস্তাব করেন, তা হলে আমি আনন্দের সঙ্গেই সে প্রস্তাবে রাজি হ'ব।” একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম—“প্রবেশ বড়ুরা তাঁর 'বুজি'র ছবি শেষ কোরে একদিন আমার কাছে এসে, আমার একখানা বই খুব আগ্রহ কোরে চেয়েছিলেন। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাকে রাজি হয়েছিলুম। কথা হয়েছিল, তিনি 'বুজি'র ছবি কোরে খুবই লাভ হোয়ে পড়েছেন। সেজন্য কিছুদিন তাহলে ইয়োয়োপ ঘুরে আসবেন; ফিরে এসেই আমার একখানা বই ফিরা তোলাবার ব্যবস্থা করবেন।”

“তোল না বোন?”

“তিনি বয়ে থেকে জাহাজে ওঠার ছ'চার দিন পরেই, এখানে তাঁর জীর্ণ হাং মৃত্যু হোল। পথে এই খবর পেয়েই তিনি ফিরে

এলেন। তারপর সব ওলোট-পালোট হোয়ে গেল; আমিও আর ও-সংকে কোন চেষ্টা করি নি।”

“আচ্ছা, তুমি রবীন্দ্রনাথকে তোমার কি কি বই পাঠিয়েছিলে?”

“পথের গুতি, 'বরনা ভাঙার', 'জী', 'মুক্তাবারি', 'জমা-খরচ' আর বোধ হয় 'বাঁধার উত্তর'।”

“কবির চিঠিখানা বড় কোরে বেখে দিয়ে; ওর দাম অনেক হে।”

রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তার মোটামুটি কথা এইরূপ ছিল:—“মনে করেছিলুম, আপনার বইগুলোতে একটু-একটু উঁকি দিয়েই ছুটি নেব, কিন্তু পড়া আরম্ভ কোরে, সব শেষ না কোরে পারি নি, তাতে আমার কাজের বিশেষ ক্ষতি হোয়েছে। লেখার আপনি ওস্তাদ। আপনার লেখা প্রত্যেক পথেই এল; চলে খুব সহজেই। \* \* \* করণকে অতি করণ করার ইচ্ছার, কোন কোন জায়গায় বং চড়িয়েছেন একটু বেশী; তা হোলেও তা ত্যাগ-বীকা অটাবদ্ধ হয়নি যে, তাতে আদ্যম পেলো। \* \* ইত্যাদি। আমার বইগুলোর ওপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাত্মক অভিমত দামের জন্তে সবচেয়ে বেশী খুশী হোয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রকৃত বড়ুর এইরূপই হয়। আমার সব বই পড়ে স্বর্গতঃ ডাক্তার সুনন্দ্রীমোহন দাস ছ'খানা দীর্ঘ পত্র লিখে আমার যে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং শ্রীমানপ্রসাদ, এন, সি, চ্যাটার্জি,



র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার ভাস্কর্য  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০, - হুগুন-কুমলী ষাণিকার-গ্রাম-গিনিয়াট

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৮, রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা-১২

— কিন্তু —

কিছুটা নিরাস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নহারা নিকৃষ্ট সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিরাচরিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোন সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোরদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং

চার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যে উচ্চ প্রশংসা করতেন, তাতে আমার অস্বাভাবিক অধিকাংশ বন্ধুরা ভেতর ভেতর একটা অস্বস্তির ভাব যে পোষণ করতেন সেটা আমি বুঝতে পারতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্র এতে খুবই আনন্দিত হ'তেন। তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু।

আজ তাঁকে হারিয়ে আমি যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই আমি একরকম সাহিত্য-আসর থেকে সবে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে প্রবল নেশার মত যে ভিন্মিয় স্বপ্নের আঁঠে-পৃষ্ঠে জড়িত হোয়ে গেছেলো, তার থেকে একেবারে মুক্ত হোতে পারিনি। সেই জন্তেই মাঝে মাঝে একটু-আটটু না লিখে পারিনি এবং সেই জন্তেই কতক স্মৃতিব্যক্তির বিশেষ অনুবোধ—‘শরৎ-স্মৃতির টুকি-টাকি’ লিখে বসেছিলাম। বসলেও আর আগের মত হয় না; মুক্তবেণী আর মুক্ত হয় না। তাই এখনকার লেখার মধ্যে থেকে যার—শব্দকে তুল, সহস্র ক্রটি, অসংখ্য অসতর্কতার ছাপ। এর জন্ত তাই গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রেখেছি। আজ আমার স্মৃতিকর্তা যে পথে আমার ঠেলে দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র জীবিত থাকলে আজ হু'জনে একসাথে বুক ফুলিয়ে, নির্ভয়ে, বিনা বাধায় সেই চির-মহান, চির-উজ্জ্বল পথে অগ্রসর হোতে পারতাম। বন্ধু অনেকেই ছিলেন, অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আজ নিজেদের সংসার-স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত; আমার মত লোকের বন্ধুত্ব তাঁদের কোন দিক দিয়ে কোনরূপ লাভ হবার আশা নেই। তাই আজ ঐ শ্রেণীর কোন বন্ধুর বাড়ী যদি যাই, তা তিনি মনে মনে অসন্তুষ্টই হ'ন। বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও হস্ত, কারকে দিয়ে বলে পাঠান যে তিনি বাড়ী নেই; কিংবা হু'মিনিটের জন্তে একবার এসে, ক্ষমারী কান্ডের অভিজ্ঞা দেখিয়ে, অতি ভয়ভীর সহিত চলে যান। স্মরণ্য কারো কাছে আর বাইও না, বাওয়া উচিতও না।

সাহিত্যক্ষেত্র হোতে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করেই একান্তে পড়ে আছি; বর্তমান সাহিত্যের কোন খবরই বড়

একটা রাশি না। শুনতে পাই, কেউ কেউ বলেন যে বর্তমানে কথাসাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে; আমার কেউ কেউ খুব অশ্রদ্ধার সঙ্গে ও-কথার বিপরীত বলে থাকেন। কিছুই বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে, সাহিত্যক্ষেত্র আজ বিভিন্ন দলে ভাগাভাগী। দল অবশ্য চিরকালই ছিল, কিন্তু ঠিক এভাবেই গৌড়া দলীয় ভাব ছিল না। একজনর উৎকৃষ্ট রচনা, অল্প দল কিছুতেই গ্রহণ করবে না, আমার খুব নিকৃষ্ট রচনাও সেই দলে আদরের সহিত গৃহীত হোয়ে তার প্রশংসা-প্রচারে তাঁরা আকাশ-বাতাস ঝাণিয়ে তুলবেন...এই ধরনের নানা কথা শুনতে পাই। কি ঠিক, কি বে-ঠিক তা বুঝতে পারি না, বোরবার আবশ্যক নেই বোলে, সে চেষ্টাও করি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাংলা-সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হোক; তাই দেখতে দেখতে, যে পথে পা পাড়িয়েছি সেই পথে যেন তাড়াতাড়ি যেতে পারি। পথের শেষে সেখানে শরৎচন্দ্র আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

দাদা গো! যেখানে তুমি গেছ, সেখানে বাবার জন্তে পা বাড়িয়ে আছি। শীগগিরই সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সেখানে আমার আমরা এমন সাহিত্যিক জোট বাঁধবো, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা থাকবে না, ঘেব থাকবে না, পরজীকাতরতা থাকবে না, যেখানে মিথ্যা অভিমান-অহঙ্কার থাকবে না, মুখে মধু মনে বিষ থাকবে না, অর্থের অহমিকা থাকবে না। সেখানে থাকবে সত্য, প্রীতি, সরলতা, জন্মে জন্মে প্রবৃত্তি বিনিময়, স্বর্গীয় প্রেমের আদান-প্রদান। সেখানে আমরা সত্যকার পবিত্র ও অনাবিল সাহিত্য-সাধনা কোরে, সেই মহা-সাহিত্যিকের প্রীতি ও করুণা যেন আমরা লাভ করতে সমর্থ হই, যা অনন্তকাল পর্যন্ত সেখানকার আকাশে-আকাশে, বাতাসে-বাতাসে, ফলে-ফুলে, ওরু-লতায়, পল্লবে-পাতায়, বনে-উপবনে, প্রান্তরে-কান্তারে চির-সঞ্চারিত হোয়ে সঞ্চারিত থাকবে। তাই আজ তোমার স্মৃতি-নৈবেদ্যের মধ্যে, তোমার অর্থ করবার সঙ্গে-সঙ্গে, সেই হৃদয়হার মালীকে, বিশ্ব-জ্ঞানেশ্বর রাজাধিরাজ, মহা-সাহিত্যিক ও কবিশ্রোষ্ঠের চরণে কোটি-কোটি প্রণাম আনিয়, তোমার স্মৃতির এই ‘টুকি-টাকি’তে সমাপ্তির রেখা টেনে দিলাম।

শেষ

## তুমি এসেছিলে

শ্রীমাধবী সেনগুপ্ত

আমার ঘরের কপাটে কে যেন টোকা দিয়ে গেল মুহু  
ধূপছায়া রাত যখন কেটেছে, উরাস হাওয়ার যখন মিশেছে  
ঝিরি ঝিরি আর বুক বুক বন-বিটপীর জ্ঞাপ,  
কে যেন তখন টোকা দিয়ে গেল আমার হৃদয়ে শুধু।  
আকাশ যখন অরণ্য-চুমায় হয়নিকো মোটে লাল—  
সাগর-বলাকা ওড়েন যখন মুক্ত-পক্ষ হয়ে,  
তটিনী যখন সাগরের কানে করেছিলো কিছু কথা,  
তখন কে যেন হৃদয়-বাহিরে রেখে গেল নীরবতা।

তস্মার মতো যখন জ্যোৎস্না বাইরে ছড়িয়ে ছিল,  
একটি জোনাকি যখন সেখানে বিজীর রবে মিশে,  
নিজ-ন-স্বাধ যখন আঁধারে পালক গুটায় নিল,  
আমার হৃদয়ে তখনই মধুর আওয়ার কুলিস কিসে?  
আবণ যখন অজ্ঞাত ছিল কামনার রাগিনীতে  
অনেক ইচ্ছা তোমাকে পাওয়ার না পাওয়ার সঙ্গীতে  
পূর্ণ যখন। তখন কে যেন মুহু গুন্ গুন্ গানে  
টোকা দিয়ে গেল আমার হৃদয়ে, ডাক দিয়ে গেল শুধু।

এই শিশুটির জন্য  
এক মুহূর্তও  
ভাবতে হয় না



কারণ সে

# ল্যাক্টোজেন

খেয়ে পুষ্ট



LG/৮/২১

সিলোন রেডিয়ো থেকে 'ল্যাক্টোজেন' হিন্দী  
প্রোগ্রামে বীণা রায়ের কথা শুন।

রবিবার...রাত্রি ৭টা-৪৫ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা এবং  
বৃহস্পতিবার...রাত্রি ৮টা-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি  
৮টা-৪৫ মিঃ।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

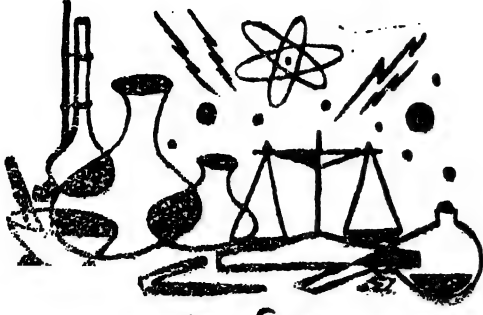
২১

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসলস প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

পোস্ট বক্স নং ৩৯০ কলিকাতা    পোস্ট বক্স নং ৩১৫ বোম্বে    পোস্ট বক্স নং ১৮০ মাদ্রাজ

# বিজ্ঞানবার্তা



পঞ্চমর মিশ্র

জীৱ বিয়েই কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠান চলে না, শিল্পের উন্নতির জন্য উপযুক্ত মাধ্যমেরও প্রয়োজন। শিল্পের উৎকর্ষতার, উন্নতির পথ নির্দেশ করবে মাধ্যম :—যদি চালাবে মাধ্যম, তাই উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রের সবচেয়ে বেশী। ছেলে ছবি আঁকতে ভালবাসে; আনন্দ হলে সে পথে-বাটে ঘুরে বেড়ায়, খুলী মতো খেঁচ করে। বাবা তাকে এক দিন জোর করে বস্ত্রপাতির কারখানায় চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। ছবি আঁকলে তো পেট ভরবে না—অতএব হাতুড়ী নাও। শিল্পী হিসাবে ছেলেটি হয়তো খুবই উন্নতি করতে পারতো—কারখানার মেহনতী কর্মী হিসাবে সে একেবারেই অচল। তবু তাকে দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে, ফলে লোকটির এবং তার সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান এই উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে। এক কথায় বৃহৎ অর্থে ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র দেশের। কেবলমাত্র কর্মী নয়, উচ্চপদস্থ অফিসার এবং পরিচালকমণ্ডলী নির্কীর্ণিত করার সময়ও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মানসিক পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ার সঙ্গে যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে আসছেন, তাঁর মনের মিল আছে কি না।

দেশ-বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্তমান কালে সাধারণ কর্মীদের এবং দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদের মানসিক পরীক্ষার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র মানসিক পরীক্ষা নয়, বীর অফিসারের দায়িত্ব নিতে যাবেন তাঁদের পৃথক ভাবে ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা উচিত। ঠিক কি ভাবে শিল্পের জ্ঞান প্রয়োজনীয় মাধ্যম সংগ্রহ এবং তৈরী করে নেওয়া যায়,—ইংলণ্ডের বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা পরিষদ তা নির্ণয় করতে উজ্জাগী হয়েছেন। শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মীর সঙ্গে উৎপাদনের হার একসূত্রে বাঁধা; তাই অজ্ঞাত শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করতেও পরিষদ এসেছেন এগিয়ে। গবেষণার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ‘জাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ইনডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি’ নামক প্রতিষ্ঠানের উপর। গবেষণার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিল্প ও বিজ্ঞান-গবেষণা পরিষদের কাছে তাঁরা আগামী তিন বছরের জন্য, বছরে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য পাবেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন আবহাওয়ার মাধ্যম নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে এবং নতুন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে, তা নির্ণয়কল্পেই প্রধানতঃ এই গবেষণা পরিচালিত করা হবে।

কিছার কোম্পানী আবিষ্কার করেছেন ‘সিগমামাইসিন’; ওয়াশিংটনে সম্মতি অ্যাণ্টিবায়োটিকের উপর যে আন্তর্জাতিক

আলোচনাচক্র বসেছিল, তাতে এই ঔষধটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। টেইসাইক্লিম এবং ওলিমানডোমাইসিন নামক দুটি অ্যাণ্টিবায়োটিকের সমন্বয়ে প্রস্তুত সিগমামাইসিন চিবিংসা-জগতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। আপনারা জানেন, বেশী অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হলে মানবদেহে অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্ভব হয়। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও এই ঔষধে সুফল পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন প্রাণিদেহ অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ সহ্য করতে পারে না,—একে এক রকম অ্যালার্জি বলা যেতে পারে। সিগমামাইসিন দেহের অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অ্যাণ্টিবায়োটিক ভীতি নিরাসন করতে সক্ষম, তাই চিকিৎসা-জগতে এই ঔষধের আবিষ্কারের গুরুত্ব খুবই বেশী।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, কোন রোগে, বিশেষ কোন ঔষধ একা নিরাসন ঘটাতে না পারলেও অনেক সময়েই অপর রক্ত কোম ঔষধের সহিত একযোগে ব্যবহার করায়, খুবই সুফল দেয়। অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের উপর আলোচনা এসলে নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ সিগমুণ্ড উইনটন, নবাবিকৃত সিগমামাইসিনের কার্যকারিতার প্রশংসা করে বলেন যে, চিকিৎসাক্ষেত্রে শতকরা ১৬ ভাগ রোগীই অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার হাত থেকে এই ঔষধ ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, কয়েকটি সাংঘাতিক যৌন রোগ এবং নিরক্ষীয় অঙ্কুর রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সিগমামাইসিন অত্যন্ত সফল দেয়। সোরিডার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ১৮১ জন রোগীর উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন; তাঁর মতে এই ঔষধের ব্যবহার অত্যন্ত নিরাপদ, সকলেই এই ঔষধ প্রয়োগ সহ্য করতে পারে এবং অনেক ঠেকাইলোকক্কাদ জাতীয় জীবাণুর আক্রমণে যেখানে অজ্ঞাত ঔষধ কার্যকরী হয় না, সেখানেও এর ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ। অজ্ঞাত চিকিৎসকদের বিবৃতি থেকে জানা যায়, দেহমধ্যস্থ বহুপ্রকার রোগ, ক্ষত প্রভৃতিতে এই মিশ্র ঔষধ বিশেষ সুফলদায়ক।

আবিষ্কার হলেন কিছার কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা, তাঁরা কি দাবী করছেন শুধু। তাঁদের মতে ‘সিগমামাইসিন’ এর জীবাণুনাশক এবং রোগনিরাসনকারী ক্ষমতার পরিধি সবচেয়ে বেশী। যে সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা নানা প্রকার অ্যাণ্টিবায়োটিকস ব্যবহার করেন, সেখানে নিরাপদে এই ঔষধ ব্যবহার করা চলবে। যে-সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ পেনিসিলিন ব্যবহার করেন, সেই সব রোগীর উপরেও সিগমামাইসিন ব্যবহার করা যাবে।

সম্মতি অল্পজিট ওয়াশিংটনের অ্যাণ্টিবায়োটিক বিষয়ের আলোচনাচক্রে সিগমামাইসিনের পরে আর একটি ঔষধ বিষয়েও চিকিৎসকেরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন। এই অ্যাণ্টিবায়োটিকটির নাম থিস্টোসিটিন,—এই ঔষধটি বিভিন্ন জীবাণুর বৃদ্ধি মন্দীভূত করে দিতে পারে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি স্কুলের বিজ্ঞানী ডাঃ রোমানস্কি এবং কলম্বিয়া জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ লিমসন এই নতুন ঔষধটি ১৬ জন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছেন। আলোচনাচক্রে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা এই



বিজ্ঞানীস্বরের পরীক্ষামূলক চিকিৎসার কলাকল বিচার বিশ্লেষণ করেন।

পি এ ১৩২ নামক আর একটি নবাবিকৃত আণ্টিবার্গোটিকের বিষয়েও বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন। অনেকের মতেই উদ্ভিদের প্যাথোজেনিক ফাঙ্গাল রোগ সমূহে পি এ ১৩২ খুবই কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে। মানবদেহের পক্ষে উত্তেজক হওয়ার জন্য মনে হয় মাছের রোগচিকিৎসায় এই বস্তুটি ব্যবহার করা যাবে না। আমেরিকান সায়েন্সাইড কোম্পানীর ১২ জন বিজ্ঞানী এক সঙ্গে ভারতবর্ষের মাটি থেকে প্রাপ্ত আর একটি নতুন আণ্টিবার্গোটিকের কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন আণ্টিবার্গোটিক জাতীয় ঔষধটির নাম 'নিউক্লিয়ারসিডিন'। বিজ্ঞানীরা জানান যে, এই ঔষধটি গ্রাম পঞ্চায়েতি এবং গ্রাম নেগেটিভ এই উভয় প্রকার জীবাণুর বিরুদ্ধেই কার্যকরী। তাঁরা মনে করেন, স্বাস্থ্যবোগের চিকিৎসায় নতুন আণ্টিবার্গোটিক নিউক্লিয়ারসিডিন বিশেষ কার্যকরী হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রিসটো-সিটিনেরও গ্রাম পঞ্চায়েতি জীবাণু এবং স্বাস্থ্য জীবাণু বিনাশের অসাধারণ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করা গেছে।

### অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর জীবনকাহিনী আজ আলোচনা করবো, মাত্র ২ বছর আগে ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ জার্মানিতে ব্যাভেরিয়ায় উলম অঞ্চলে একটি ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনে প্রথম দিকে শিক্ষক মহাশয়দের কাছে বোকা বলে পরিচিত হলেও অল্প বয়সেই তিনি কঠিন ক্যালকুলাস ও আনালিটিক্যাল জিওমেট্রি শেষ করে কেলেছিলেন। পরবর্তী জীবনের শিক্ষা সুইজারল্যান্ডে পাবার পর অবশেষে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি লাভ করেন। প্রথম কর্মজীবন তাঁর আরম্ভ হয় পেটেন্ট পরীক্ষকরূপে। এই সময়েই তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত আপেক্ষিকত্বের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন এবং চাকরী করতে ঢোকা মাত্র তিন বছর পরেই ১৯০৫ সালে এই তত্ত্বের উপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানী হিসাবে আইনষ্টাইনের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার, আপেক্ষিকত্বের সাধারণ মতবাদের উপর বিজ্ঞানী মহলে আলোচনা ও সমালোচনার অন্ত থাকে না। এই সময় আইনষ্টাইন নিজেকে বলেছিলেন,—“আমার এই মতবাদ যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে জার্মানীরা আমাকে জার্মানীর এক মহামানব বলবে এবং ফরান্সীরা বলবে আমি সমগ্র বিশ্বের নাগরিক, কিন্তু যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে জার্মানরা বলবে আমি ইহুদী এবং ফরান্সীরা বলবে আমি জার্মান।”

যাই হোক, অবিলম্বেই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে বিজ্ঞানীচর্চা অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি পেলেন, বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার মারফৎ তাঁর গবেষণা চললো এগিয়ে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞার তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁর আপেক্ষিকত্ব। এর মাধ্যমে তিনি পদার্থের পরিমাণ, আকর্ষণ, স্থান এবং কালের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই বিশ্বজগতের সর্বক্ষেত্রেই যে স্থান ও কালের বিরাট প্রভাব আছে, একথা তিনিই ঘোষণা করেন। আইনষ্টাইনই জানান যে, পদার্থের সঙ্গে শক্তির কোন প্রভেদ নেই,—পদার্থ হলো জমাটবাঁধা শক্তি। মাত্র আধ পাউণ্ড পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপান্তর করা যায়, তাহলে তার পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন টি, এন, টি-এর বিক্ষোভের সমান হবে। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন জানান, আলোর যে বেধা তারও পদার্থগত পরিমাণ আছে এবং আলোকও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আকর্ষণ করে। শেষ বয়সে বিজ্ঞানীচর্চা আর একটি যুগান্তকারী মতবাদ প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন,—এর নাম “নিউক্লিয়ারেড ফ্রিড থিওরি।” এই মতবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানী দেখতে চাইছিলেন তারা, গ্রহ, বিদ্যুৎ, আলো ইত্যাদি বিশ্বজগতের সবকিছুই একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। তাঁর এই সমস্ত গবেষণাই পরিচালিত হয়েছিল মস্তিষ্করূপ গবেষণাগারে—সম্মত ছিল মাত্র কাগজ আর পেন্সিল। কাগজ-পেন্সিলের মাধ্যমে যে সব তথ্য বিজ্ঞানীচর্চা বহুদিন আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—আজকের দিনে গবেষণাগারে তা পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সর্বকালের অল্পতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে পরিগণিত হলেও ১৯৩৩ সালে ইহুদী বিতাড়নের সময় বিজ্ঞানীচর্চা আইনষ্টাইনকে জার্মানী পরিত্যাগ করতে হয়। সামাজিক অর্থ সম্বল করে তিনি ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে ইংলণ্ডে আসেন এবং এখান থেকেই আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আত্মন পান। ১৯৩৩ সালে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং প্রিন্সটনস্থিত, “ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড ষ্টাডীস” আত্মজীবন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানীচর্চা আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমেরিকার প্রিন্সটনেই বসবাস করেছিলেন।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ছিলেন আপনভোল অস্বিভন্ন মানুষ। কোন কিছুতেই খেয়াল নেই,—মানের সাবান দিয়ে লাড়ি কামাতেন আর বেটের অভাবে কোমলে বাঁধা থাকতো একটা ছেঁড়া টাই। অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করতেন। ১৯০১ সালে তিনি সিগভা মরিক নামক এক জন বিজ্ঞান-কর্মীকে বিবাহ করেন, ১৯১৬ সালে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। ১৯১৭ সালেই তিনি তাঁর সম্পর্কে বোন এলসা আইনষ্টাইনকে বিবাহ করেন। এলসা মারা যান ১৯৩৬ সালে। বিজ্ঞানীচর্চার দুটি পুত্র, একজন অ্যালবার্ট জুনিয়র এবং অপর জন এডওয়ার্ড। উভয়েই তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান।

বিজ্ঞানীচর্চা আইনষ্টাইন যুগান্তকারী মহামানব। বর্তমান বিজ্ঞানকালকে তিনিই পরিচালিত করতেন; তাই একে বলা হয় আইনষ্টাইনের যুগ। সর্বকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিউটন আর আইনষ্টাইনকে শ্রেষ্ঠতম বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে পৃথিবী সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠতম অসাধারণ সন্তানকে হারিয়েছে।

# শ্রীমতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তত্ত্ব দত্ত

লুই পই-পই করে বারণ করল নিজে নিজে এসব যেন না করি; কিন্তু আমার নিরস্ত করা সম্ভব নয় দেখে নিজেই ও লেগে গেল আমার সঙ্গে। বাবা-মা আসছেন বলে ওকেও বড় উৎকল লাগল।

যদিয়া ভিয়ার এসেছিল; ওকে জানালাম যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মা-বাবা আসছেন।

“এমন মেয়ের মাকে দেখে বস্তু হব মাদাম! না জানি কত মহৎ ঠগ চরিত্র!” ও বলল।

“বা: ভিয়ার, নারী মহলে তুই কথার খই ফোটাতে ওস্তাদ দেখছি।” লুই ঠাটা করল।

“উহ! কথার কথা নয় লুই, আমার মনের কথাই বলছি ভাই, এতটুকু মিথ্যা নয়।”

সকলে খাওয়ার পর নিয়ম মত বেড়াতে গেলাম জাকো-গিল্লির ওখানে। আশী বছর ভ্রমহিলার বয়স; দেখা-শোনার কেউ নেই। আমার উনি বড় স্নেহ করেন আর আমি যেতেই অভ্যর্থনা জানান।

“পুণ্যবতী, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।” নানা কথাবার্তা হয় ওর সঙ্গে। প্রায়ই ওর স্বস্ত্রে ভাল কল, কিংবা ভাল মদ, নরত পেয়ালা খানেক স্থপ নিয়ে বাই। উনি একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছেন।

আজ ওর ওখানে যখন যাচ্ছি, লুই আর ভিয়ারের সঙ্গে দেখা। লুই হেসে প্রসন্ন করল।

“কাদের বাড়ীর বউ গো? একা সাত সকালে যাও কোথায়?”

“আমি জাকো-গিল্লির ওখানে যাচ্ছি লুই।”

“আমিও যাব, চল ভিয়ার।” বুড়ীর বাড়ীতে তিন জনেই গিয়ে হাজির হলাম। দু’জন ভ্রমলোককে বাড়ীতে আসতে দেখে ভ্রমহিলা দাক্ষণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমি তখন “জানালাম যে আমার স্বামী ও তাঁর বন্ধু এসেছেন, উনি লুইয়ের হাত ধরলেন।

“তাই বলি বাছ! তুমিই আমার বউমান, সোয়ামী? অসহায় এই বিধবাকে ও যেভাবে সেবা করছে, ভগবান সেন্সত ওকে পুরস্কৃত করবেন, এই বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধমূল।” সন্তোষে উনি লুইকে বললেন, “সৈন্ত বিভাগে কাজ কর? বেশ। আমার জোসেফও ওখানেই কাজ করত; বেচারী! আমার একমাত্র ছেলে! কিমিয়া থেকে আর ফিরল না। এই ওর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন আমার ঘর আলো করে আছে।” উনি ইশারায় দেখালেন দেওয়ালে ঝলনো একটা মিলিটারী পোষাক।

“ওর সাহস ছিল অসাধারণ।—ওর দেহ থেকে কি পাওয়া গিয়েছিল জান? মারী বোলনএর দেওয়া একটা লকেট আর আমার একটা চিঠি।” বুড়ী চোখ মুছলেন।

‘ও এখন মাদাম তুস্যা বুঝলে,—মারীর কথা বলছি। ক্যা মাসেনার ধনী হোটেলওয়ালাকে ও বিয়ে করল। জোসেফ, যে কি ভালই বাসত ওকে! যুদ্ধের শেষেই ওদের বিয়ে হবে ঠিক ছিল। মারী মেয়ে বড় ভাল; মাঝে মাঝে এখনো আমার দেখা-শোনা করে। ওর স্বামীকে ধরে ও আমার এই বাড়ীটা কিনে দিয়েছে। ঘরে ওর দুটি সন্তান: আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী। বেচারী জোসেফ!” বহুক্ষণ এ জাতীর গল্প চললো। আমরা চলে যখন আসছি, উনি লুইয়ের হাত ধরে বললেন, “আচ্ছা বাবা, ভগবান নাকি বিধবাদের প্রার্থনা শুনতে পান? তা যদি সত্যি হয়, যে ক’টা দিন বৈতে আছি আমি তোমার আর আমার বউমার মঙ্গল কামনায় বোজ তাঁকে অর্পণ করব।”

১ই নভেম্বর।—মা আর বাবা এসেছেন। লুই আর আমি দরজায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। পাঁচটা নাগাদ একটা ফিটন এসে থামল; আমরা দৌড়ে গেলাম। বাবাই প্রথমে আমাদের দেখতে পেলেন।

“এই যে মার্গরিৎ”, উনি টেচিয়ে উঠলেন, “বেশ দেখতে লাগছে ত তোকে!”

মা তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাকে আর লুইকে বুকে চেপে ধরলেন। আনন্দে দুই চোখে তাঁর অবিরল ধারাতো জল বরতে লাগল। বাবা যে কত বার আমার চুমা খেলেন!

“বাবা, কত কাল বাদে যে তোমাদের দেখছি!”

“এখানে ভাল লাগছে ত মার্গরিৎ?”

“হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল জায়গা।”

এই সব আলোচনার মধ্যে লুই এসে জুটল; “কি বড় বস্ত্র হচ্ছে তনি?” হেসে ও প্রসন্ন করল।

“বাবাকে বলছিলাম যে জায়গাটা বড় চমৎকার!”

ও চুপ করে থাকলেও ওর মুখের চোখ দুটি জল-জল করছিল।

“চল, ভেতরে যাওয়া থাক,” ও ডাকল, বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, মার্গরিৎ, আর বাইরে থাকা উচিত হবে না।”

মাকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম; সোফায় বসে আমার মুখ উনি দুই হাতে চেপে ধরলেন। মনে পড়ল, এভাবে একদিন আদর করতেন প্রুয়ার ভেনের কঁন্তেস। দু’কোঁটা জল নেমে এসে আমার চোখ দিয়ে; অশ্রুশোচনা? না, মোটেই না, কারণ মুখে আমার হাসি ছিল। মা আমার শিরশ্চূষন করলেন।

“মার্গো, ওকে তুই এখন ভালবাসিস ত?”

“হ্যাঁ মা!”

“জগতে সবার চেয়ে বেশী?”

“হ্যাঁ মা!”

মা হাসলেন; চেয়ে রইলেন আমার দিকে। চল মাগো, ভগবানকে আজ ধন্যবাদ জানাই তাঁর অসীম করুণার জন্য।

“হ্যাঁ মা, চল।”

বিশ্ব-ভারতের চরণ-তলে নতজাহ্নু হয়ে বসলাম আমরা।—তারপর যখন বৈঠকখানায় গেলাম, দেখলাম লুই একা বসে আছে আগুনের ধারে (আজকাল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে); পেছন থেকে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখতেই ও চমকে উঠল; আমার দিকে তাকাল; ওর কটা চুল আর প্রশস্ত কপাল আগুনের সামনে চক্চক করছিল; দুই চোখে ওর স্নেহের আশ্রয়। ওকে বুকে ধরে জানতে চাইলাম, “একা বসে যে? বাবা কই?”

“ওগরে, ওঁর ঘরে আছেন।”

উঠে দাঁড়িয়ে ও আমার ওর শূন্য স্থানে বসিয়ে দিয়ে বলল, “আগুনের ধারে একটু জিরিয়ে নাও গো; বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ!” আমার পাশেই ও বসল। আমরা কতক্ষণ যে ও-ভাবে কাটালাম জানি না, হঠাৎ দরজার টোকা পড়ল; ম’সিয়া ভিয়ার ঢুকল। ততলোক লজ্জিত হয়ে ভাড়াভাড়া চলে বাচ্ছিল।

“আর রে!” লুই হেসে ডাকল ওকে; তার পর যেমন ভাবে বসেছিল, সেই ভাবেই ও ভিয়ারকে হাত ধরে বসাল আমাদের কাছে।

ভিয়ার বলল যে, বাবা এসেছেন শুনে ও এসেছে তাঁর সাথে আলাপ করতে।

“কিন্তু লয়েজ, তোর কি শরীর খারাপ নাকি?”

“আমার? কোন দুঃখে? একটু আরাম করছি রে। জানলি, যখন ওর কোলে মাথা রেখে শুই আর ওর হাত দুটো ভেসে চলে আমার ওপর দিয়ে, তখন আমি বাদ্যশক্তি তারিয়ে কেলি যেন।”

এমন সময় বাবা এলেন। লুই চটপট উঠে ওঁকে একটা কেদারা এগিয়ে দিল। ওঁর সঙ্গে ভিয়ারের আলাপ করিয়ে দিলাম; মা না আসা অবধি বহু গল্পই হল। তার পর আমরা খেতে গেলাম।

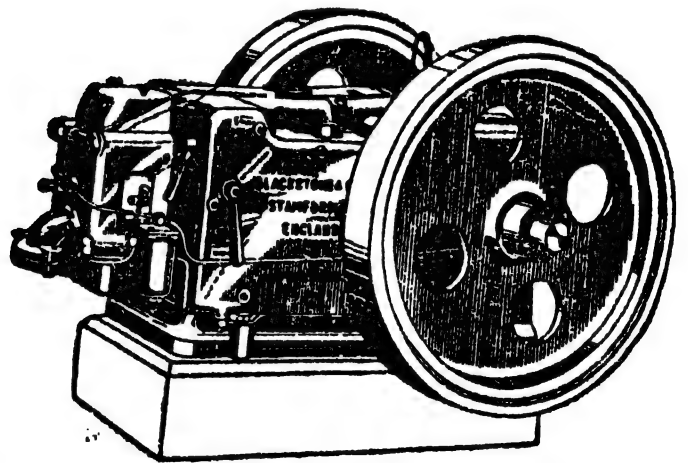
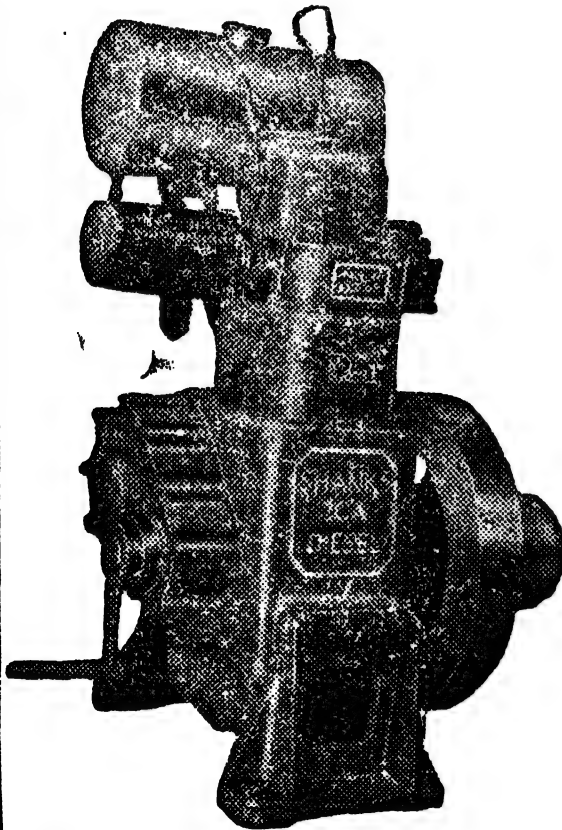
১৮ই নভেম্বর। আগামী পরশা ডিসেম্বর আমরা নীস থেকে চলে বাব। কিছু দিন পারীতে কাটিয়ে আমরা ফিরে বাব আমার জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত বুটানিতে। আমার ইচ্ছে, আমাদের সম্ভান ওখানেই ডুমিঠ হোক, লুইও তাই চায়। বৈঠকখানার চিমনির পাশে মা আর আমি এক দিন সন্ধ্যাবেলা বসেছিলাম। লুই আর বাবা বেরিয়েছেন। বুটানির গল্প হচ্ছিল। কীতলস কেমন আছেন, আমি জানতে চাইলাম।

“মাথার অবস্থা খুবই খারাপ।” মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

“ওর ভাই ওখানেই আছেন?”

“হ্যাঁ মিলিটারীর কাজ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বোনের দেখাশোনা করছেন তিনি।”

নানা স্মৃতি একের পর এক ফিরে আসছিল। হঠাৎ মা আমার প্রশ্ন করলেন, “মাগরিং, তুই এবার মা হচ্ছিস, তাই না?”—আমিও



অর চাই, প্রাণ চাই, কুটার শির ও কৃষিকার্য দেশের অন্ন ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিষ্টার, ক্রাকটোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিষ্টার পাম্পিং নেট, তাজস্ ডিজেল ইঞ্জিন তাজস্ পাম্পিং নেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :—

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, দিউল কলিকাতা-১

ফোন :—২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবসায় সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

ওঁর মত আড়ট গলায় উত্তর দিলাম, “হ্যাঁ মা!”—নীচব আশীর্বাদে উনি আমার বুক টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন, “কত মাস হল রে?”

“জানি না ত!”—তুনে মা হাসলেন।

“ওঁর প্রয়োজনীয় বা কিছু সব তৈরী রেখেছিস?”

আমি মাকে নিয়ে গেলাম আমাদের ঘরে। একে একে দেখলাম লুই আর আমি বা বা কিনেছিলাম ভাবী পুত্রের জন্ত। মা ডরার খুসে বলে উঠলেন, “এই ছোট বুট-জোড়া কি কাজে লাগবে রে? এই ভেলভেটের খুদে মিলিটারী টুপি, মিলিটারী শোষাক? এসব কি করেছিস মার্গারিৎ? হুঁ, এটা বরং দরকার লাগবে,” বলে এক প্যাকেট লিনেন বার করলেন, “কিন্তু এত অল্প কি হবে? বেশ আমিই ওঁর কাঁধা-কোলটের বন্দোবস্ত করব, তুই ভাবিস না।”

“হ্যাঁ মা,” আমি হাসলাম, “সেই ভাল, আমি ত এসবের কিছুই জানি না।”—এমন সময় নীচে বাবার আর লুইয়ের গলা শোনা গেল। সিঁড়িতে লুইয়ের সঙ্গে দেখা। মা ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে নেমে গেলেন। লুই আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল, “কি ব্যাপার গো?”

“উনি জানতে পেরেছেন যে আমাদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে। কি করে জানলেন বল ত?”

“এতে আর অবাক হবার কি আছে?” ও হাসল।

“ওহো তুমিই বুঝি বললে?”

“না গো!” বলে ও আমার নিয়ে গেল আমাদের ঘরের মধ্যে।

“লুই, মা বলছিলেন ফেরারী নাগাদ ও জন্মাবে, সত্যি?”

“হ্যাঁ গো, সবই ভগবানের মর্জি।”

“কিন্তু লুই—” একটু ধেমে আমি বললাম।

“ওসময় কিন্তু আমি বুটানিতে থাকতে চাই।”

জানি না আমার গলা কেঁপে উঠল কি না, কারণ জামমার সেই করুণ গানটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। চট করে লুই মুখ তুলেই আমার জড়িয়ে ধরল।

“এতে আর বলার কি আছে গো? তোমার মার চেয়ে ত এ সময়ে আর কেউ ভাল ভাবে তোমার শুদ্ধা করতে পারবে না।”

বাবার কানও মা কথাটা তুলেছেন বুঝলাম; বাবার সময় তিনি আমার মাথার হাত রেখে বললেন, “ভগবান তোদের রক্ষা করুন মা, তোকে, লুইকে, তোদের ভাবী সন্তানকে।”

খানিক বাদে লুই এল। বড় আনন্দে কেটে গেল সন্ধ্যাটা।

২০শে নভেম্বর।—আজ আমরা সবাই ম’সিয়্য ভিয়ারের ট্রাডিও দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের সেই ছবিটা ও দেখাল; এখনো শেষ হয়নি; তবু অতি অপরূপ লাগল। আমি এক কোণে বসে আছি লুইয়ের দিকে মুখ নামিয়ে, আর ও শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, আমার কোলে মাথা রেখে। এক হাতে ও ধরে আছে আমার বুকের লক্কেটা; ওঁর মুখে মুহু হাসি; আমার মুখ বেন একটু গভীর, তবু আশার মাধুর্যে মগ্ন। ছবিটার নাম দিয়েছে ‘প্রেমের স্বপ্ন’।—বাবার অত্যন্ত ভাল লাগল, মার ত কথাই নেই। লুইয়ের বড় গছন্দ হয়েছে ছবিটা, আমাদের। কাল সকালে ম’সিয়্য ভিয়ার পারী চলে যাবে। আজ আমাদের এখানেই ও খেল; বিদায় নিয়ে গেল।

২১শে নভেম্বর।—লুই আর আমি জাকো-গিরিকে বিদায় জানিয়ে এলাম। আমরা দেশে বাচ্ছি শুনে বড়ই দুঃখিত হলেন উনি। ওঁর ঘরে ঢুকে দেখি, একহারা চেহারার এক ভক্তমহিলা বসে; আমাদের অভিবাদন জানিয়ে উনি ছোটো চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ইনিই মাদাম তুস্তা, বনাম মারী বোলেন।

“মা, তুই কাল চলে বাবি?” অতি কাতর স্বরে বললেন জাকো-গিরি। “তোরা সুখী হ, এই প্রার্থনাই মার জাকে। তোদের জন্তে শিন-রাত করবে রে!”

ওঁর কাছ থেকে আগার সময় চুপি চুপি ছোটো গিনি দিয়ে এলাম ওঁর হাতে। মারী বোলেন আমাদের পৌছে দিলেন দরজা অবধি।

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬১। এখনো আমরা পারীতেই আছি, তবে পরশ দিন দেশে বাব। এক নাগাড়ে বেশী রাত্তা বাই, লুই তা চায় না, পাছে আমার কষ্ট হয়। সর্বদা ওঁর সতর্ক দৃষ্টি—কিসে আমার ভাল হয়। কাল ঠাকুমা আমাদের এখানে এসেছিলেন। প্রতিদিন বিকেলেই উনি আসেন, গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে বান আমাদের সঙ্গে; রোজ সকালে আমি বাই ওঁর ওখানে। আমার উনি বড় ভালবাসেন। কাল আমাদের সঙ্গে মা যেতে না পারায় উনি, লুই, আমি তিন জনই শুধু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা গিয়েছিলেন ওঁর বন্ধুর বাড়ী। বুলোত্রি বাগানে ঠাকুমা আমাদের হৃৎজনকে গাড়ী থেকে নামতে বললেন। ঘটনাক্রমে ওখানে হাঁটার পর লুই আমার গাড়ীতে উঠে ইঙ্গিত করল।

“কি গো, ক্লান্ত লাগছে না ত?” উৎকণ্ঠিত ভাবে ও জিজ্ঞাসা করল।

“কি যে বলিস,” ঠাকুমা ঠাটা করলেন, “আমি খুশুরে বুড়ী, দিনি তাক্সা আছি, আর ও কি না ক্লান্ত হয়ে পড়বে?”

“কিন্তু এ অবস্থায় ওঁর বেশী হাঁটাধাটি করা ভাল নয়,” ওঁর পেছন পেছন গাড়ীতে ঢুকে লুই বলল। ঠাকুমা কয়েক মিনিট কি ভাবলেন, তার পর আমার দিকে তাকালেন, “ওহো, এতক্ষণে আঁচ করেছি। তাই নাকি রে?”

আমি লজ্জার অধোবদন হয়ে বইলাম।

“এই ত তোঁর গাল দুটো কেমন টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে বাছা, আমার বাহাতুরে না পেলে কি এত দেরী লাগত বুঝতে!” বলে উনি আদর করলেন।

“ভাবতেও কেমন লাগে যে তুই আজ মা হতে চলি, আর আমি, আমি এখনো আইবুড় হয়ে গেলাম! বলি খুদে শয়তানটা আসছে কবে?”

“বোধ হয় ফেরারী মাসে, ঠাকুমা!”

“বার ত মোটে ক’দিন!” উনি উল্লাসে অধীর হয়ে উঠলেন “তাই বলি তোঁর এমন চেহারা হয়েছে কেন; বোল বহুরে বিঃ হওয়ার এই এক ঝামেলা বাপু; সন্তরোতে পা দিতে না দিঃ কোলে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। কিন্তু তুই আমার প্রণাম করিঃ না ত?”

ওঁর বাসনা পূর্ণ করলাম।

“অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে যে তোঁর ছোটোটা; দেখিস, আঃ মাখাটা খাস না বেন।”

বাড়ী না বাওয়া অবধি এই কথাই হচ্ছিল।

৩০শে ডিসেম্বর। বুটানি। দেশে ফিরে যে কী ভাল লাগছে! যে দিন পৌঁছলাম, বরফ পড়ছিল। একটা প্রকাণ্ড সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করছিলেন জ্যোৎস্নার রক্ত-আশীষ; চার দিক বলমল করছিল। ভাল পশমী কাপড়ে লুই আমার সারা গা সম্বন্ধে ঢেকে দিল; বাবা বললেন টুপিটা মুখ অবধি টেনে আনতে। আমাদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল; উঠে বসতেই ঘোঁ! দুটো টকাটক্ টকাটক্ করে দৌড় দিল। তেরেস বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের প্রতীক্ষায় ছিল। আমার দেখে কি ওর আদরের ঘটা, “এই ত দিদি, কিং এলি ঘরের মধ্যে ঘরে!”

লুই ওকে অভিবাধন জানাল; আমরা খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম; ওখানে শুকনো আঙুর-লতাব গনগনে আগুন সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। তেরেস আমার গরম জামা, জুতো খুলে নিল; ওগুলো তুষারে ভরে গিয়েছিল। মা ঠর ঘরে গেলেন। এত দিন বাদে সবাই বাড়ীতে জড় হয়েছি, ঠর মুখে হাসি ধরে না! লুই আর বাবা গেলেন পোষাক বদলাতে। আমার শুকনো জামা-কাপড় ধনে দিয়ে তেরেস আমার পা চিমনির ধারে তুলে দিল। ওকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম; ও বাধা দিল।

“তুই এসেছিস খুকুদি, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, দেখছিস না, তোর জন্তে ভেবে ভেবে আমি কত বুড়ো হয়ে গেছি? কিছু হোকে দেখে এখন মনে হচ্ছে দশ বছর আমার কমে গেছে

একদিনে; খুদে ম’সিয়া বে আসছেন, তাঁর উপযুক্ত দাই হবার মত শক্তি এখনো রাখি। তোবও আমি দাই ছিলাম না? তোর মায়েব? আর এবার তোর ছেলের দাই হব!”

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল ভাবের অমুভূতিতে। আমাদের ছেলে! আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চিন্তা আজ ওকে ঘিরে; লুইয়েরও সেই দশা। মা ওর জন্তে কাঁধা-কোলট তৈরী করছেন। লুই নীস্ গিয়েছে; সপ্তাহ খানেক ওখানে থাকতে হবে। অন্তত: দুই মাসের ছুটি নিয়ে ফিরবে। বড় সুন্দর ভাবে স্বীষ্টমাস কাটল। সকাল আটটার সীর্জাতে গিয়েছিলাম। সারা গ্রাম ওখানে ভেঙ্গে পড়েছিল। সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে, সবাই গায়ে পড়ে দু-দশটা ভাল কথা শোনাল। কৃহস্ততার নত হৃদয়ে আমি বললাম গিয়ে বেকীর সামনে। দোলনার শোয়ান নবজাত বঁশুকে প্রণাম করলাম। ভাবতে লাগলাম, আমার সমস্তানের কথা। মা, মেরী, আমার পথ দেখাত, আমার বল দাও, প্রাণে আমার শক্তি দাও, আমি যেন আদর্শ জননী হতে পারি। লুই ছিল আমার পাশে; ওর ভাবনা আর আমার ভাবনা একই খাতে বয়ে চলেছিল।

ম’সিয়া ভালপোরান আর তাঁর জী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। রুদ পুরুষসুলভ গাভীরে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। হেলেন আমার দেখে লজ্জার কথাই বলছিল না; ওর মাসের আড়াল আড়ালে ঘুরছিল; শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওর আগের



# সুনিপুণ স্বর্ণশিল্পী ও মনিকার গিনি ম্যানসন

জুয়েলাস

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনিম্যান” \* ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহ :

যদুবাবুর বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ, ফোন : ৪৬-১৪২৫



বাচালতা বেরতে দেবী হল না। ছোট পিরেরের দিকে হাত বাড়াতোই হুম করে ও চলে এস।

কাল গিয়েছিলাম কঁতেসকে দেখতে; সঙ্গে ছিল লুই। ও আমার বারণ করে দিল, যেন অনর্থক নিজেকে দুর্বল না করে ফেলি। একা গিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম। ছানোয়ার পুরনো ঢাকের হস্তবস্ত্র হয়ে ছুটে এস।

“মামজেলু আর্ভের।”—ও আমার বৈঠকখানার নিয়ে গেল। কঁতেস একটা সোফায় শুয়েছিলেন। চিনমীর খায়ে বসেছিলেন কর্ণেল। উনি কাগজ পড়ছিলেন; আমার প্রথমে দেখতেই পান নি। কিন্তু আমার দেখে কঁতেস ষড়মুদ্র করে ওঠাতে উনি ফিরে তাকালেন।

“ছানোয়া যেখানে আছে, সেই দেশ থেকে ও ফিরছে; বল যা, ছানোয়ার খবর কি?” কঁতেস ঘরে বসলেন; হেসে আমার হাত দুটো ধরলেন। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে না।—আচ্ছা, ওকি ওর ভাইকে খুন করেনি?” ফিস্ ফিস্ করে আমার উনি প্রশ্ন করলেন। কর্ণেল ওকে সোফায় শুইয়ে দিলেন। উনি হাসলেন। ওর কথা মত শুয়ে বইলেন। চুপি চুপি কর্ণেল আমার জানালেন যে দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

“এই ক’দিন আগে ত দেখে গিয়েছিলি ওকে; আর এখন দেখ, কি রোগা আর বুড়ী হয়ে গেছে এর মধ্যে।” কর্ণেল বললেন।

“হ্যা, তাই ত দেখছি।” ওকে দেখে আমার চোখে জল এল।

“তুই আনন্দে আছিস ত মা?” কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন।

“আজ্ঞে হ্যা।” ওর দিকে চোখ তুলে উত্তর দিলাম।

খানিক কথা-বার্তার পর উঠলাম, কঁতেস অভ্যাস মত আলিঙ্গন জানালেন। কর্ণেল গাড়ী অবধি এলেন, লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

“ম’সিয়্য, ও তোমার পেয়ে সুখী হয়েছে; ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই সর্বান্তঃকরণে। ওরই সুখী হওয়া সাজে।”

মাদমোয়াজেল গোসরেল আমাদের এখানে সেদিন এসেছিল। সঙ্গে ছিলেন আর একটি ভদ্রলোক। ছুটে এসে ও আমার জড়িয়ে ধরল; তার পর সঙ্গীর পরিচয় দিল, “ইনি হচ্ছেন ম’সিয়্য লাকোস্ত, মার্গরিৎ, আমার ভবিষ্যৎ স্বামী; দেখলি ত, তোর মত ঢাকাঢুকি আমার স্বভাব নয়!” বলে সে কি হাসি।

“বুলি, ব্যাঙ্কার! টাকার কুমীর!”

সহাত ম’সিয়্য লাকোস্তের দিকে আমি তাকাতে গোসরেল বলে চলল, “উনি আমার হাড়ে হাড়ে চিনেছেন; জানেন, ওকে আমি কত ভালবাসি আর সোনা-পানার প্রতি আমার টান কত। তাই না রিশার?”

হেসে উনি উত্তর দিলেন; “বস্ত্র ওরস্তাস, বলিহারি তোমার প্রথর বুদ্ধির।”

গোসরেল একটু গভীর ভাবে জানতে চাইল, “আচ্ছা মার্গরিৎ, তোর শরীর কি এখনও সারে নি? এসে দেখলাম তুই সোফায় শুয়ে আছিস।”

একটু বুদ্ধিলে পড়লাম, “নাঃ, ভালই ত আছি।”

“ম’সিয়্য লাকোস্ত কই? ওর নাম দিয়েছি কুঁক্ক সৈনিক।”

—নাস্-এ গিয়েছেন।”

“ওহো, ওর রেজিমেন্ট বুদ্ধি এখন ওখানে?”

“হ্যা।”

“মিলিটারীকে বিয়ে করার অন্ত্রবিধে কত দেখেছিলি ত?” বাড়ীতে অতি অল্প সময়ই ওরা কাটাতে পারে; তা ছাড়া যুদ্ধের সময় ত...”

“এখন ত’ আর যুদ্ধ নেই কোথাও, আর কোথাও লাগার সম্ভাবনাও ত’ দেখি না।” আমি উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলাম। তার পর গর্বের সুরে বললাম, “সৈনিকের কর্তব্যই ত হল দেশের বিপদে এগিয়ে যাওয়া; সব ধর্ষের ওপর তার ধর্ম হচ্ছে স্বদেশ-প্রেম।”

“দেখলে ত রিশার, কি ভাবে স্বামীকে পাখার আড়ালে ঢেকে রেখেছে! কবে ফিরছে ম’সিয়্য লাকোস্ত?”

“সপ্তাহ থাককের মধ্যেই। আন্দাজ দুই-তিন মাস ছুটি নিচ্ছে।”

“ওঃ, সুলতান পাশে বসে কাটাবার জন্ত? আশা করি বেচাবার ছুটি মঞ্জুর হোক।”

বাঁধার আগে গোসরেল ওর বিয়েতে বাঁধার জন্ত নেমস্তন্ন করে গেল, “আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বুলি মার্গরিৎ? আসা চাই-ই।”

“হ্যা, যদি যেতে পারি।”

“তার মানে: যদি স্বামী যেতে দেয়? বেশ, তোর স্বামীর নামেও চিঠি পাঠাব; একটু চেপে ধরলেই রাজী হয়ে যাবে, বুলি। তোর ঐ গোলাপী ওষ্ঠের একটা স্পর্শই ওকে কাত করতে যথেষ্ট।”

৮ই জানুয়ারী, ১৮৬২। নতুন বছর শুরু হয়েছে। লুই ফিরেছে আজ। পকেটে তিন মাসের ছুটির অমুমতি। কত দি-বাদে যেন ওকে দেখলাম। বাবা আমার নড়াচড়া করতে দেন নি তাই আপন মনে ঝাঁড়িয়েছিলাম বাইরের ঘরের দরজায়। বহু দূ-থেকে লুইকে দেখতে পেলাম,—ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তরত-বরে ও গিঁড়ি বেয়ে উঠে এল; আমি মুখ ঢাকলাম ওর বুক-বহুক্ষণ ওই ভাবে ছিলাম, এমন সময় বাবা এসে গেলেন।

“বাইশ বছরেই কি কেউ এমন প্রেমে পড়ে?” হেসে উঁ-বলাতে লুই ওর দিকে তাকিয়েই বড় অপ্রস্তুত হল। ওর স-করমর্দন করল; বাবা ওর কপালে এঁকে দিলেন স্নেহচুশন।

“বা বাব’, তোর ওপর তারি সন্তুষ্ট হয়েছি; ছুটি মঞ্জুর হল?”

“আজ্ঞে হ্যা, তিন মাসের ছুটি।”

বাবা বাইরে গেলেন; লুই চুকল আমাদের ঘরে, ময়-জামা-কাপড় বদলাতে; আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

“বুলে গো, আমাদের ওপরওয়ালা কর্ণেল লোকটি বড় ভাল-আমার দিকে সবে এসে ও বলল, “ওর কাছে ছুটি চাইতেই উ-কারণ জানতে চাইলেন। পারিবারিক ব্যাপারে ছুটির প্রয়ো-শোনামাত্র উনি তৎক্ষণি ব্যবস্থা করে দিলেন।”

ওকে মাদমোয়াজেল গোসরেলের নিমন্ত্রণের কথা জানাতে হাসল।

“তোমার পক্ষে ত’ তখন যাওয়া অসম্ভব: আমরা সেই অব-কাংগে তখন যে আমাদের ঘরে বাতি জলবার সময়, না গে-বলে আমার আকুল চুমায় ভরে দিল।

১১ই জানুয়ারী, ১৮৬২। পরত রাতে বড় খারাপ-দেখেছি। ষড়মুদ্র করে উঠে তাকিয়ে রইলাম আমার বা-

দিকে। চিমনির অস্পষ্ট আলো এসে ওর মুখে পড়েছে। কি প্রশান্তিতেই ও ঘুমিয়ে আছে! আমার চোখ থেকে দুই ফোটা জল ঝরে পড়ল; হায় ভগবান! সত্যি কি তবে আমার চলে যেতে হবে এই পৃথিবী থেকে? আমার সুখের প্রভাত সব হয়েছে শুষ্ক, আর এবই মধ্যে তলব আসবে? সন্তর্পণে স্পর্শ করলাম ওর কপাল, “কি গো, কি বলছ?” বলে ঘুমের ঘোরেই ও আমার বন্দী করল স্নেহাতুর বাহুপাশে। ওর বুকে বুক দিয়ে বহুক্ষণ জেগে রইলাম। উঃ, এ কি স্বপ্ন!

কাল রাতে লুইকে স্বপ্নটা বললাম। রাত তখন দশটা হবে; কাপড়-জামা বদলে জানলার কাছে অপেক্ষা করছিলাম লুইয়ের জন্য। বাইরে সব কিছু সারা ধবধব করছে স্নান জ্যোৎস্নায়। খানিক পরেই লুই এল। আমি উঠে দাঁড়িলাম; পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। গাছ থেকে এক এক করে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা, টুপ টুপ করে টোকা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের জানালার কাছে, প্রজাপতির মত তাক পাখায় কোথায় উড়াও হয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, “লুই, আবার বখন আসবে গাছে গাছে সবুজের জোয়ার, আমায় তখন আর তোমার পাশে পাবে না; আমি তখন নীতল ঘাসের তলায় চিরবিশ্রামে থাকবো ময়!”

“ভগবান, এ-ব্যথা কেন সইতে না হয়, প্রভু!” ওর মুখ দিয়ে কথা ক’টি বেরিয়ে এস। দারুণ আবেগে ও আমায় ঘিরে ধরল সমস্ত অঙ্গ দিয়ে। তার পর আমার গুনিয়ে একটু ঠাট্টার সুরেই বলল, “কি যে সব আক্ষেপ-বাক্যে চিন্তা তোমার! তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ডেলের মা হতে চলেছে—এই সব কথা বুঝি রাত-দিন ভাবছ? গেল সপ্তাহে আমি এখানে ছিলাম না, সেই অস্থগস্থিতির কঁাকে ছোট মাথাটি একেবারে স্থশ্চিন্তার আঁতুড়-ঘর কবে তুলেছ!”

“তুমি হয়ত ঠিকই বলছ লুই, কিন্তু কাল রাতে বা স্বপ্ন দেখেছি,—ভয়ে আমি আকুল হয়ে উঠেছি!”

“আচ্ছা বিশদ, আমাকে ডেকে তুললে না কেন? এই অবস্থার কখনও মনে ভয় পুবে রাখতে হয়?”

“তুমি এমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছিলে, ডাকতে মায়া হল। আমি তোমার গা ঘেঁসে শুলাম, তুমি আমার টেনে নিলে তোমার বুক, আদর করে কি কেন বললে; তাতেই আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম।”

“আচ্ছা, তোমার স্বপ্নটা শোনাই বাক”, চপল বাক্য ও বলল, “তোমার মত সাহসী মেয়ের মনে ভয় বখন ঢুকেছে, মনে হয় অতি ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছ স্বপ্নের ঘোরে?”

“স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একা শুয়ে আছি, এমন সময় কে যেন টোকা দিল পাশের জানলার; ঘুম ভেঙে আমি উঠতে পারছি না, এত অবসন্ন লাগল, এমন সময় যেন বাবার গলা শুনলাম, দরজা খুললাম, দেখি কেউ নেই। বাইরের ঘরে গেলাম, তোমার দেখতে পাবো ভেবে। দরজা খুলে ঢুকে দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ জানলার ধারে, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমি গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম তোমায়, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভেবে যেমন চোখ তুলেছি, দেখি, কই তোমার মুখ! মৃত্যু নিজে দাঁড়িয়ে আছে!—তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল।”

লুই আগা-গোড়া মন দিয়ে শুনল। শেষ হওয়ামাত্র হেসে বলে উঠল, “দেখ গো, ভাল করে চেয়ে দেখ এখন আমার, যমের মত লাগছে না কি!”

“ধেং!” আমি জবাব দিলাম। ওর অপূর্ব চেহারা, আশা আর স্নেহে ভরা চোখ, অসীম ভালবাসা ভরা হাসি আর আনন্দোচ্ছল মুখ দেখে আমার ভয় সব উবে গেল। আমি ওর মুখে মুখ রেখে আপন মনে বলে উঠলাম,—

“তোমার নয়ন উদিয়ে হেথায়

তারকা-সম,

তাহারি বশি উজলিবে প্রিয়

স্বপ্ন মম।”

ও হাসল, “মার্গরিৎ, আমার উদ্দেশ্যই বলছ না কি?” বলে আমার ওর বুক টেনে নিল। তার পর একটু গভীর গলায় বলল, “আচ্ছা, মার্গরিৎ, কোন প্রাণে তুমি ভাবতে পার যে আমাদের এই সন্ত সাক্ষানো সংসার থেকে ভগবান তোমায় সরিয়ে নেবেন? না মার্গরিৎ, একথা মনে রেখ যে ভগবান এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না!”

আমি চুপ করে রইলাম। কে জানে? ভগবান যা করেন তা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য, বাইরে থেকে সব সময় তা সহনীয় না হতেও পারে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ :—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



মাথার ব্যস্ততার ভুগিয়েছেন  
একবার চক্ষু পরীক্ষা করার না কেন?

ক্যালকাটা অপটিক্যাল  
কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ত্যাগের অভাবই সংসারে সকল অশান্তির মূল। সংসারীরা তা বোঝেনা। ভোগের পিছনে তৃপ্তার্জ হয়েই শুধু ছোটে। তাই পৃথিবীতে এত সংঘাত। ত্যাগের পথই যে শান্তির পথ, তা সারদা দেবী নিজ জীবনে অঙ্গণ করেই দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনকে আমরা উদাহরণ হিসাবে পেতে পারি। সব কিছু বিলিয়ে দিয়েই তিনি সব কিছু পেয়ে দেব-মানবী হতে পেরেছিলেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে লোকে বাই ভাবুক না কেন, তাঁকে হারাতে কিছুই হয়নি।

শারীরিক স্বাস্থ্য, বিশ্রাম, খাওয়া, চলা, বলা কিছুই যেন সারদা দেবীর নিজের জন্ত ছিল না। এমন কি, অবসর সময়ের চিন্তা-ভাবনাটুকুও অপরকে ঘিরে হ'ত। জগতের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল সর্বদা নিঃস্বার্থ হয়ে কর্মে ব্যাপ্ত থাকতে। কর্ম দিয়েই পূর্বস্বপ্নকৃত কর্মফলের ক্ষয় হয়। তিনি বলতেন, 'সর্বদা আত্মনোবানুদানী হও, তবেই প্রকৃত শান্তির পথ খুঁজে পাবে। মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। মানব-দেহকে ঈশ্বরের মন্দির ভেবে পবিত্র রাখতে চেষ্টা করা মানুষের পবিত্র ধর্ম। অন্তরেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে সে অন্তর অন্তর বা কলুষিত হলে চলে না। শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই।'।

এই নিঃস্বার্থ প্রেম ও সেবাত্রত গ্রহণ করতে গিয়ে সারদা দেবীকে যে কতখানি নিঃস্বার্থ হতে হয়েছিল, তার সম্যক ধারণা করাও আমাদের সাধারণ মানুষদের সম্ভব নয়। পরের সেবা আর পরোপকার দিয়েই সারদা দেবীর জীবন স্নক আর তাতেই তাঁর জীবনের অবসান। আত্ম-পরের কোন গত্তী আমরা সারদা দেবীর মধ্যে দেখতে পাই না। তাঁর সম্পর্কে বেই এসেছে, তাকেই তিনি অতি আপন ভাবে গ্রহণ করেছেন।

সারদা দেবীর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল অনলস কর্ম ও অসাধারণ ত্যাগে। ঠাকুরের অগণিত ভক্ত-সন্তানদের জন্ত এবং

পরবর্তী জীবনে তাঁর নিজেরও ভক্ত-সন্তানদের জন্ত দিব্যাত্মি কত যে পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'ত, তা সারদা দেবীর জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয়ও বীর আছে, তাঁর অজানা নেই। আর তাঁর ত্যাগের কাহিনীর বর্ণনা যদিও মনুষ্যসাধ্য নয়, তবু অত্যন্ত ছোট একটি ঘটনা থেকেই তাঁর সমস্ত জীবনের ত্যাগমাধুর্য ধরা পড়ে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন সারদা দেবী ঠাকুরের কাছে আসেন, ঠাকুরই তাঁর ইষ্টদেব, জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তাঁকে সেবা করা, যত করা, আপন হাতে বাগা করে কাছে বসিয়ে তাঁকে খাওয়ানোই তাঁর সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও তৃপ্তিকর কাজ ছিল। খেতে বসে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'লে খেতে পারতেন না। তাঁকে অভুক্ত থাকতে হ'ত। সারদা দেবী তাই কাছে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করে নানা কথায় ঠাকুরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াতেন। এইটাই ছিল তাঁর এক মাত্র সময়, যখন তিনি স্বামীর একান্ত সান্নিধ্য পেতেন। অপর সময় ভক্তরা তাঁকে এমন ঘিরে থাকতো যে, সারদা দেবী তাঁর দর্শনও পেতেন না।

এক দিন একটি জী-ভক্ত এসে সারদা দেবীকে বললেন, 'মা, আপনি ভাতের খালা দিন, ঠাকুরকে আমি খাওয়াবো।' এরকম ক্ষেত্রে একান্ত পতিত্বতা জীর অন্তরে কি ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক, তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। সারদা দেবীর এই একটি মাত্র তৃপ্তি-একটি মাত্র পরম আনন্দকর কাজ। কিন্তু জী-ভক্তটির আন্তরিক ইচ্ছাকে উপেক্ষা করতে তিনি পারলেন না। তুলে দিলেন ভাতের খালা তার হাতে।

সে সময় নারীরা কোন কাজের অছিল। ভিন্ন স্বামীর কাছে যেতে সক্ষম বোধ করতো। আর তাহাড়া সারদা দেবী ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল। জী-ভক্তটি ভাত নিয়ে চলে গেল ঠাকুরকে খাওয়াতে। তিনি বাসই রইলেন। বাছে বসে স্বামীর খাওয়াটুকু দেখতে পারলেন না। এর পর থেকে প্রতি দিনই ঐ জী-ভক্তটি ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। মুখ ফুটে সারদা দেবী নিজের দাঁই বা আকাখাটুকু জানাতে পারলেন না। অথচ কত কষ্টই না তাঁ হয়েছিল।

ক্রমে তো এমন হ'ল, যে পকাশ-বাট গল্পের ব্যবধানে থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস স্বামিদর্শনটুকু থেকেও তাঁকে বঞ্চিত থাকতে হ'ত। ঠাকুরের সমস্ত কাজই ভক্তরা করে দেয় কাজেই তাঁর আর ঠাকুরের কাছে যাবার সময় কোথায়? এ একটি অনুবক্তা জী, ভক্তিমতী ভক্তের পক্ষে কত বড় ত্যাগ, ও আমরা ধারণা করতেও পারি না।

দক্ষিণেশ্বরে কত নাচ-গান হয়, ঠাকুরের কত ভাবসমাধি হ' দুঃদুঃস্বপ্ন থেকে লোকেরা দেখতে আসে। সারদা দেবী সে দক্ষিণেশ্বরে থেকেও দেখতে পান না। তিনি তাই নহবৎখান বেড়ার মধ্যে একটা ফুটে করে তার মধ্যে দিয়েই চেষ্টা করেন দেখতে সাথে সাথে ভাবেন আহা! ভক্তরা কত ভাগ্য করে এসেছে। সময় তাঁর কাছে কাছে থাকে, তাঁর দর্শন ও স্পর্শ পায়। আ! যদি এমনি ভক্ত হয়ে জন্মাতুম এ ভাগ্য আমারও হতে পারতো!

আবার নিজের মনেই ভাবতেন, 'আমি কি আর তেমন পু করে জন্মেছি যে, এমন দেবদুর্ভাগ স্বামীর নিত্যদর্শন, নিত্যসান্নিধ্য পাবো আর তাঁকে নিত্য সেবা করে ধন্য হবো?'

সারদা দেবী যদি স্বামীর প্রতি নিজ পত্নীত্বের অধিকা!

বিন্দুমাত্রও দাবী জানাতেন, তবে কি সর্বোপায়ে তাঁর দাবী বিবেচিত হ'ত না? কিন্তু এক দিনের জ্ঞাপ্ত তাঁর কথাবার্তা বা ব্যবহারে তিনি তা প্রকাশ করেন নি। নিজেকে বলিয়ে দিতে যিনি এসেছেন, বুড়িয়ে নেবেন কেন?

সকলের মতে মত মিটিয়ে সকলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে থাকতে তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাগট তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। কাজেই ব্যক্তিগত ফোন হুঃখই কোন দিন তাঁকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। সর্ব অবস্থাকে মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

সাংসারিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলে তিনি বলতেন, হয়তো শিবপূজা করতে গিয়ে কাঁটাগুঁড় বেলপাতা দিয়েই মহাদেবের পূজা করেছিলুম, তার জ্ঞাপ্ত এ জন্মে এ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। বার জ্ঞাপ্ত তিনি কষ্ট পেতেন তার প্রতি কোন অভিমান ছিল না তাঁর। অপরের লোষ্ট্র দেখতে পেতেন না তিনি।

ঠাকুরের অবিভাবস্থায় অসংখ্য ভক্ত-পরিবৃত হয়ে থাকায়, সারদা দেবী ঠাকুরকে একান্ত ভাবে কখনই পাননি বটে, কিন্তু ঠাকুরের দেহাবসানের পর তিনি তাঁকে সর্বসময়ের জ্ঞাপ্ত পেতেন।

ঠাকুর যেন সত্যি সত্যি ঘর বদলে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যেখানে সারদা দেবী সর্বদাই তাঁর দর্শন, স্পর্শন, সান্নিধ্য, আদেশ, উপদেশ, ঠিক যেন দেহধারী স্বামীর মতই পেতেন। এমন কি, শোনা যায় ঠাকুর নাকি তাঁর কাছ থেকে আদ্যাকর করে, কখনো কখনো বিচুড়ী পর্য্যন্ত চেয়ে যেতেন।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর যা তাঁর প্রথম জীবন্ত দর্শন পান নিজ বৈধব্যবেশ ধারণকালে। ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, 'আমি আর কোথায় গেছি গো! এ-ঘর থেকে তো শুধু ও-ঘর।' বাস্তবিকই সারদা দেবীর এ অমুভূতি তাঁর দেহাবসান কাল পর্য্যন্ত ছিল। সেজ্ঞাপ্তই তিনি সর্ব লাল পাড়ের শাড়ী ও হাতে হু'গাছা বালা পরতেন। শোনা যায়, সধবার লক্ষণ হিসাবে মাথার পিছন দিকে সিঁদূরও ধারণ করতেন। শুধু তাই নয়, সেই থেকে স্বামীকে তিনি নিত্য ভোগ রান্না করে খাওয়াতেন। নিজ হাতে তাঁর ছবি সাজাতেন, ঘুম পাড়াতেন, জাগাতেন। সব কিছুতেই তিনি যেন ঠাকুরের জীবন্ত সান্নিধ্য পেতেন।

ঠাকুরকে যখন তিনি ভোগ নিবেদন করতেন, তার মধ্য দিয়েই দেখা যেতো তিনি ঠাকুরের উপস্থিতি বা সান্নিধ্য বহুটা অমুভব করতেন। 'কৈ গো! এসো, তোমার খাবার দিয়েছি।' কখনো

## মনের কথা

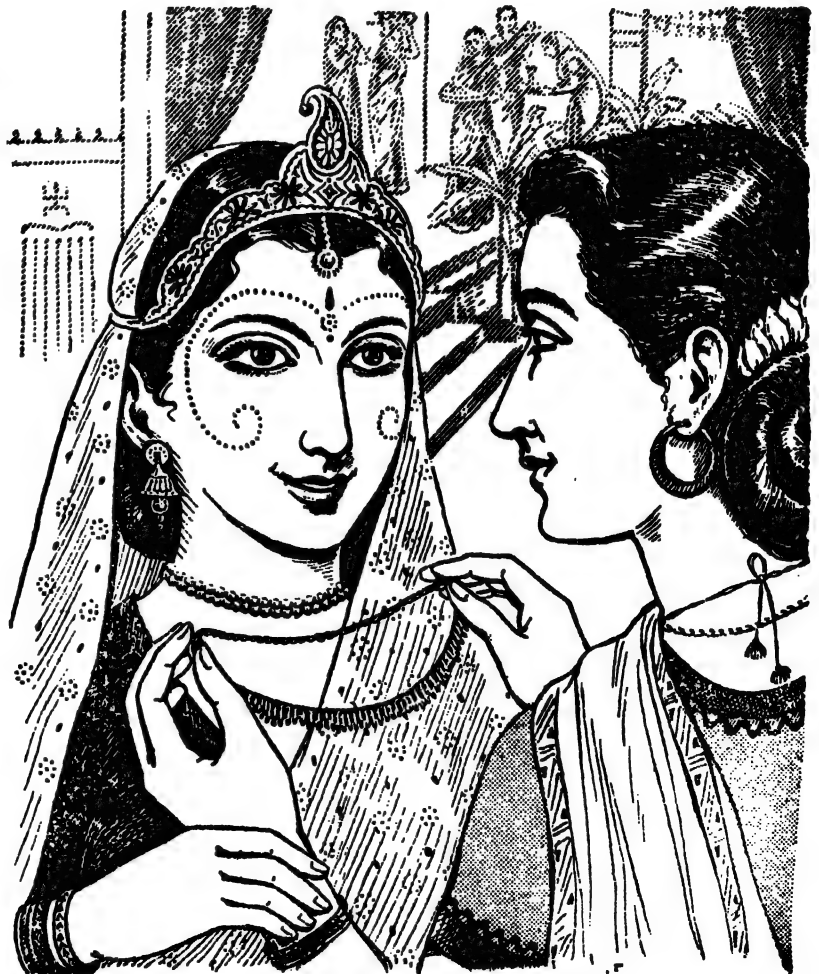
"এমন সুন্দর গহনা কোথায় পাবো?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিনি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-অলঙ্কার  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



বলতেন, 'আজ কিছ একটু তাড়াতাড়ি করে খেতে হবে, আমি কিছু জগন্নাথী-পূজা দেখতে বাবো।'

এরকম সহজ ভাবে আহ্বানে তিনি যে কোন পটের ঠাকুরকে ডাকতেন, তা মনে হ'ত না। জীবিতকালে স্বামীকে যে ভাবে আহ্বান করতেন, তাই-ই যেন অগণ করিয়ে দিত।

পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে নেওয়া ঠাকুরের ছবিকে তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়েছিলেন। জীবিতকালে ঠাকুরের জগন্নাথ দর্শন হয়নি। নিজেকে সেই জগন্নাথদেবকে একা কি করে দর্শন করবেন?

এক দিন দুপুরবেলা সারদা দেবী দেখতে পান ঠাকুর সারা বরষা পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। তা দেখে সারদা দেবী চমকে ওঠেন, 'এ কি! বিশ্রামের সময় যে! তুমি এখানে শোওনি?' ঠাকুরের ছবির কাছে এগিয়ে দেখেন, ছবি-ভক্তি লাল ডেরো পিণ্ডের সারি। কারণ বুঝতে তাঁর দেবী হয় না। একটি ভক্ত সেদিন ঠাকুরের আগুন ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল। হয়তো ফুল না বেছেই দিয়ে থাকবে!

সারদা দেবী ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করেই বুঝতে পারতেন ঠাকুর তা গ্রহণ করেছেন কি না। গ্রহণ না করলে তাঁর কি ব্যস্ততা! ঠাকুরের কাছে বসে কত অম্লনর বিনয়। তিনি জানতে পারতেন অপবিত্র বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন হয়েছে। গৃহস্থবাড়ীতে ঠাকুর অতুল থাকলে তাদের পাছে অকল্যাণ হয়, বুঝে তিনি অমুরোধ করে ঠাকুরকে একটু পায়ের খাওয়াতেন। নিজের পায়ের ছাড়া আর কিছু বুঝে দিতেন না। স্বামীর জন্ত ভোগ রাগ্না হয়েছে। তিনিই খেলেন না, সারদা দেবী কি করে খাবেন? কখনো যদি ঠাকুর না খেতেন তিনিও অতুল থাকতেন।

ঠাকুর তখনো জীবিত। কানীপুর বাগানে উত্থানশক্তি-রহিত অম্লহ। সারদা দেবী ছিলেন অজ্ঞ বয়সে। সেখান থেকে তিনি দেখতে পান, ঠাকুর নিজ ঘর থেকে বের হয়ে দৌড়ে কোথায় যেন গেলেন। বিস্মিত সারদা দেবী ঠাকুরের ঘরে এসে দেখতে পান সত্যি সত্যিই ঠাকুর বিছানায় নেই। তাই দেখে তিনি চমকিত হন। ঠাকুরকে পাশ ফিরিয়ে না দিলে নড়তে পারেন না। তিনি কোন মন্ত্রবলে অম্ল মানুষের মত দৌড়ে বাগানের দিকে গেলেন? এ কি করে বিশ্বাস করা যায়?

ঠাকুরকে পরে একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানতে পারেন, নরেন প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত বাগানে খেজুরের রস খেতে গিয়েছে, সেই খেজুর গাছের নীচে মস্ত একটা গোখরো লাগ দেখতে পেয়ে তিনি তাদের বাঁচাবার জন্ত এক দৌড়ে সাপটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলেন। সারদা দেবী ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই তাঁর স্মরণরীরে ফ্রিয়ার দর্শন করতেন, বা সাধারণ চক্ষুতে কেউ দেখতে পেত না। কাজেই দেহাবসানের পর তাঁর জীবন্ত সান্নিধ্য বা দর্শন পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর যখন সারদা দেবী কামারপুকুরে ছিলেন। এত দিনের অভ্যস্ত গঙ্গান্নানের অভাবে তাঁর বড় কষ্ট হত। এক দিন তাঁর গঙ্গান্নানের খুব ইচ্ছা হয়। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন ঠাকুর যেন পায়ে হেঁটে আসছেন, এবং তাঁর পিছনে পিছনে আসছে সব ভক্তরা। ঠাকুরের পায়ে কাছ জলের মস্ত মস্ত ডেউ।

সারদা দেবী ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘরের পাশের একটা গাছ থেকে মুঠা মুঠা ফুল তুলে সেই জলে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। তুলে গেলেন, এখানে গঙ্গা থাকার কথা নয়। সব যখন মিলিয়ে গেল তখন বুঝতে পারলেন ঠাকুর এভাবে তাঁকে অলৌকিক দর্শন দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে তাঁর জগন্নাথ গঙ্গার মতই পবিত্র। এখানে থেকে গঙ্গান্নান করতে না পারলে দুঃখের কোন কারণ নাই।

নীলাধর মুখার্জীর বাড়ীতে থাকা কালে আরো একবার মায় এরকম দর্শন হয়। তিনি দেখতে পান, ঠাকুর যেন গঙ্গায় নামলেন আর তাঁর দেহ যেন গ'লে গঙ্গার জলে মিশে গেল। সেই জল স্বামী বিবেকানন্দ নিজে হাতে ক'রে কোটি কোটি লোকের মাথার ছিটিয়ে দিয়ে 'জয় রামকৃষ্ণের জয়' বলতে লাগলেন। সেই থেকে অনেক দিন পর্যন্ত গঙ্গাকে আরো পবিত্র মনে করে সারদা দেবী গঙ্গায় নেমে স্নান করতে পারতেন না। উত্তরকালে তাঁর এই দর্শন যে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছিল, তা আমরা-সবাই জানি। সাধনলাভ স্মরণশীল সারদা দেবীর ছিল বলেই তিনি এ-ধরনের ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস পেতেন।

পরমহংসদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমরা অনেক কিছুই শুনেছি। যখন তখন একটু স্পর্শ করেই তিনি অনেক ভক্তদের মনের ইচ্ছার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত শক্তিশালী মানুষের জীবনে আমরা এ প্রয়োগ দেখেছি। সারদা দেবীরও শোনা যায় এ ধরনের বিভূতি প্রকাশের ক্ষমতা ছিল। যদিও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দুই শক্তিরই এতে অপচয় হয় জেনে বিশেষ কারণ ব্যতীত তিনি তা প্রয়োগ করতেন না। তবে প্রয়োজন বোধে তিনি তাঁর ভক্তদের মধ্যে কয়েক জনকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তা আমরা জানি।

ঠাকুরের শেষ জীবনে যে দুর্বোগ্য কষ্টকর ব্যাধি তাঁর দেহে আশ্রয় করেছিল, সেই সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা যে, যখন তখন অগণিত ভক্তদের পায়ের ভোগ ক্ষয় করতে গিয়ে নিজের মধ্যে তা টেনে নিয়েছিলেন বলেই তাঁর পবিত্র দেহে ঐ ব্যাধি আসা সম্ভব হয়েছিল। কপের একটা ফল থাকেই। কর্তব্যকারীকে যদি কেহ নিজ শক্তিতে ফলভোগ করতে না দেয়, তবে সে কর্তব্যফল কর্তব্যকারীকে আশ্রয় না করে নাশকারীতে বর্তায়। ঠাকুরের আয়ুষ্কাল কমাও ঐ বোগভোগের একমাত্র কারণই। নিজ শক্তি ক্ষয় করে ভক্তদের হুর্ভোগের অবসান করা।

একটিমাত্র ঘটনাকে আমরা এ বিশ্বাসের সমর্থনে দেখাতে পারি। কত ঘটনা যে আরো আছে তার তো যেন অঙ্কই নেই। মথুর বাবুর স্ত্রী যখন দুর্বোগ্য ব্যাধিতে যত্নশয্যায়, তখন তিনি এক দিন এসে ঠাকুরের পায়ে কৈদে পড়লেন। স্ত্রী না বাঁচলে তাঁর ভবিষ্যতী যায়। ঠাকুর একটু স্থির হয়ে ভাবলেন, তার পর বললেন, 'বাও, দেখ গিয়ে ভাল হয়ে গেছে।'

মথুর বাবু বাড়ী ফিরে সত্যি দেখেন, স্ত্রীর বোগের আশ্চর্য্য পরিবর্তন! তিনি ছুটে এলেন ঠাকুরের পায়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'বোগ আর কোথায় গেছে? (নিজেকে দেখিয়ে) এই দেখে টেনে এনেছি।'

মায়ের সুখেও এক বার স্বামী বিবেকানন্দের প্রেমের উত্তরে ঠিক এই ধরনের কথা শোনা গিয়েছিল। বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে এসে



প্রশ্ন করেছিলেন, 'মা, আমার ঠাকুরের সন্তান হয়েও কান্দীরের একটা ফকিরের অভিশাপ আমার উপর এমনি করে ফলে গেল, আর ঠাকুর আমাদের রক্ষা করতে পারলেন না?'

উত্তরে তিনি বলছিলেন, 'সে তো বাবা একই কথা! তোমার দেহেও বা, তাঁর দেহেও তাই-ই। ভক্তের প্রতি অবিচার নিজে গ্রহণ করলেই ভগবান ভক্তকে যুক্তি দিতে পারেন, নতুবা প্রাণকর্ষের ফল বা সাধুবাণ্য না ফলে বাবে কোথায়? ঠাকুর তো কিছু নষ্ট করতে আসেন নি? সব রক্ষা করতেই এসেছিলেন।'

অনেকে আবার খোলাখুলি সারদা দেবীকে প্রশ্নও করতো, 'মা, ঠাকুরের পবিত্র দেহে এত কষ্টকর ব্যাধি কেন?'

মা তাদের উত্তরে বলতেন, 'সকলের পাপ যে তিনি নিজের দেহে টেনে নিতেন। নইলে কি ও-সব দেহে ব্যাধি হয়?'

ভক্তদের কর্তৃক নিজে গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁদের মুক্ত করতেন, একথা মেনে নিলেও তাঁর দীর্ঘ রোগভোগের মধ্যে পৃথিবীর যে একটা মহাকল্যাণ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

জীবিতকালে আপন জীবনাদর্শ দিয়ে মরদেহে কি করে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব, তার তিনি অপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। আপন সাধন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, সর্বধর্ম-সম্মতই হিন্দুধর্মের আদর্শ। তার মধ্যে কিছু তাত্ত্ব্য প্রাচ্য নাই।

তা ছাড়া দীর্ঘ রোগভোগকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উন্মুখ-হৃদয় ভক্তদের তিনি একত্র হবার সুযোগ দিয়েছিলেন অপূর্ণ ভ্রাতৃ-বন্ধনের স্মৃতি বিনিময় গড়তে। আর শুধু তাই-ই নয়, অবশেষে বতী সারদা অবশেষে বৃষ্টিতে এক দিনের চাওরা একটি সন্তানের জায়গার এতগুলি সন্তানের জননী করে ও সেই সন্তানদের সম্মুখে তাঁর স্নেহময়ী কল্যাণময়ী জননীরূপটি উদ্ঘাটিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। [ক্রমশঃ।

## ভালো লাগা যুহুত

অম্লপূর্ণা গোস্বামী

ভালো লাগা যুহুত আমার

আনন্দ-বন যুহুত

বতঃকৃত

না হ'তে, গুণন না উঠতে,

স্বরের জাল বিস্তার না করতে,

ছিঁড়ে বার, টুকরো হ'য়ে সেতারের তার।

যশিল যুহুত আমার।

পাইনে কারও নিবিড় আলিঙ্গন

কণিক আলিঙ্গন

বিদারী সূর্যের রঙিন আলোর মত

শুধু ছুঁয়ে বার মন।

কী মধুর, কী পরম রূপ

ওরা চলে বার

এঁকে রেখে বার

রেখে দিয়ে বার

ভালোবাসার স্বপ্ন সম্ভার।

ভালো লাগা যুহুত আমার।

ওরা হাঁটে—

চিত্তরঞ্জন এভেনিউর ফুটপ্যাথে

কেউ বার বাসে, কেউ ঘরের মোটরে

ক্রমশঃ ওরা অপস্রম্যান,

লাল সূর্য অন্তর্যাম

বড় বড় সৌরগুলির মাথার ওপরে।

গোধূলি-অন্ধকার ঘনিষে আসে

চিত্তরঞ্জন এভেনিউর আকাশে

ঘন ছায়া ফেলে

মনের অন্তরে

আমি মুক, নিধর, অভিভূত—

জমাট বাঁধা বরফের মত

দাঁড়িয়ে থাকি আমার কেবিনের জানালার পাশে।

কতটুকু সময়ের সাক্ষাৎকার,

কী মধুর মুহূর্ত আমার।

জমাট বাঁধা বরফ কখন যেন গলতে শুরু করে,

চম্কে উঠি আমি রজনীগন্ধার সুবাসে

অন্তরঙ্গ পরশে

যে রজনীগন্ধা রয়েছে আমার টেবিলের পুষ্পাধারে।

প্রীতি ছোঁয়ানো উপহার

রজনীগন্ধার বাঁড়

সন্ধ্যা বাতাসে, মন্দির হয়ে আসে

মাধুর্যের উপচার

ভালো লাগা যুহুত আমার।

## বাতিশ্রব

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বিগাতি পামগাহ-ঘেরা জালির ওপর পুষ্পিত লতার ছাউনি  
ঢাকা, ছোট অকিড হাউসটির ভেতর খেঁচ পাথরের বেদিটার  
ওপর বসেছিলো সুমিতা আর সুদায়। সামনেই খেঁচপ্রস্তর নির্মিত  
হংস-মিথুনের চৌকি বেয়ে বর বর করে বয়ে পড়ছে কীর্ণ জলধারা।  
পাশের বোপে খেলা করছিলো একপাল খরগোশ।

শরতের মেঘযুক্ত সোনালী প্রভাত। ঘন-নীল আকাশে পেরা  
তুলোর বস্তার মত হালকা মেঘের দল আপন খুশিতে ছুটোছুটি  
করছিলো, ঐ খরগোশগুলোর মত।

সুদায় অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলো সেই দিকে। ওর  
হাতখানা ধরে কাঁকুনি দিতে দিতে বলে সুমিতা, অত অবাক চোখে  
কি দেখছেো দামীরা?'

যুহু দৃষ্টি তার ফিরে আসে সুমিতার মুখের ওপর।

—কি দেখছিলাম?—দেখছিলাম কি অকুরন্ত সৌন্দর্য হুড়ানো  
রয়েছে জগৎ জুড়ে। কোন অসীম সৌন্দর্যশালী শিরী যেন অনল্যে

বসে যুটো যুটো বিচিত্র সৌন্দর্যধারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ধরণীর বুকে, দিনের পর দিন। এ পেওয়ার বিরাম নেই, শেষও নেই।

বিশ্বর ভরে চোখ দু'টি বিক্ষারিত করে বলে স্মৃতিতা,—আচ্ছা দামীদা! তোমার মত স্মরণ করে এট পৃথিবীটাকে আমি কেন দেখতে পাট না? এ সৌন্দর্য্য বৃষ্টি সবার জন্মে নয়?

—হ্যাঁ মিতা। এ সবারই জন্ম।—তবে একে আতরণ কবে নিতে হয়। ষাত-প্রতিষাত, সুখ-দুঃখ, চাঁওরা-পাঁওরা সবার উক্কে এমন একটা সাম্য সৌন্দর্য্য বিরাজ করছে, থাকে হৃদয়ে বরণ করে নিলে আর কোনো ক্ষোভ থাকে না।

স্বপ্নালু ছুটি চোখ মেলে চাইলো স্নান স্মৃতিতার পানে। সে চোখে ছিলো না কোনো কামনার বহি। ছিলো প্রেম-মহুরাগের স্নিগ্ধ ছায়া। একটা মুহূ নিঃশ্বাস ফেলে বললো স্মৃতিতা—তোমার মত যদি মন আমিও পেতাম দামীদা!। অমনি খুশির আলোয় মনটাকে ভরিয়ে নিতে পারতাম তাহলে...

—তাহলে কি হত মিতা? কিসের অভাব তোমার মনে? কেন মানন্দ-সায়ের অবগাহন করতে সক্ষাচ তোমার মিতু?

—জানি না দামীদা!। কেন আমার এমন হয়! বেদনার্ত কণ্ঠে বলে স্মৃতিতা।

—ওর একখানি হাত নিজের যুটোর মধ্যে তুলে নেয় স্নান, অপর হাতে দেয় একখানি নীলস-এর কাগজ—বলে, পড়ো এটা—

—খুশির আলো বৃষ্টি এবারে লাগলো ওর চোখে-মুখে। হরিনীর মত চকস কাঙ্গাল-কালো চোখ দু'টি নাচিয়ে বললো—নতুন কবিতা? কবে লিখলে?

—পড়েই দেখো না,—হাতখানিতে মুহূ চাপ দিয়ে বলে স্নান।

—তুমি পড়ো দামীদা!। তোমার মুখে কবিতা শুনে যে আমার বড় ভালো লাগে। নিজে পড়লে অতটা ভালো লাগে না।

—তাই না কি? আমার গলায় যে এত মধু আছে তা তো আমার জানা ছিলো না, ভাগ্যিস তুমি বললে মিতা।

কৃত্রিম কোণের সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নেয় মিতা। মুখ কিরিয়ে বসে, অভিমানে বলে—থাক পড়তে তোমায় হবে না।

নিজেকে ভারি অপরাধী বোধ করে স্নান। ওর সামনে গিয়ে মাটিতে বিছানো কাঁকরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। স্মৃতিতা ব হাত দুটি ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—

—আমার ক্ষমা করো মিতা। পরিহাস করতে গিয়ে আঘাত করেছি তোমার মনে। দাও কবিতাটা আমি পড়ে শোনাই তোমাকে। কতদূর চলে যাবো—কত দিন শোনাতে পারবো না তোমার কবিতা। আমার সমস্ত কাব্যকুসুমগুলো সেখানে হয়তো কুঁড়িতেই বসে থাকবে। হুমি তো কাছ থাকবে না, কে কোটােবে তাদের।

—হায়! সাধনা দিতে গিয়ে নারীচরিত্র-অনভিজ্ঞ পুংসব তার প্রিয়তমার আসন্ন শ্রিয়-বিচ্ছেদ বেদনা—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার নিদারুণ বাক্যবাণ বিদ্ধ করে বসলো।

হুঁহাতে মুখ ঢেকে আকুল কান্নার ভেঙে পড়লো স্মৃতিতা। ক্রীণ তল্লসতানি তার কান্নার জোয়ারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

—কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় করণ চোখে তার পানে পানিক চেয়ে রইলো স্নান,—তার পরে হুঁহাতে টেনে নিলো তাকে নিজের টুকুর ওপর।

স্নেহে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—তুমি যদি অমন করে কাঁদো, তবে আমি সেই স্নদূর পথে কেমন করে যাবো মিতা? সত্যিই যে তোমাকে ফেলে যেতে মন আমার একেবারেই চাইছে না—কেবল বাবা, ভাব কাঁকার আদেশেই যেতে হচ্ছে। তুমি যদি এত কাতর হয়ে পড়ো, তবে থাক আমার বাওয়া।

স্মৃতিতা সামলে নেয় নিজে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে—না। না। দামীদা। তোমার উন্নতির পথে আমি কখনই বাধা হবো না। তুমি যাও।

—তার পর ছোর কবে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, মাত্র তিনটে বহর তো,—ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমিও ফিরে এসে দেখবে আমি কত কি শিখেছি,—তোমার পাশে দাঁড়াবো বোণাতা জন্ম করত হবে তো? বাবার সঙ্গে দেখা কবে বলছিলে না? যাও তুমি বাবার লাইএরী-ঘরে,—আমি এখানেই বইলাম। দেখা করি আবার এখানে এসো।

স্নান বিমর্ষ চিত্তে অর্কিড-হাউস থেকে বেবিয়ে যায়। স্মৃতিতা উচ্চকণ্ঠে ডাক দেয়—ভজনদা! ও-ভজনদা!

—বুড়ো মালী তার ঘর থেকে কালো-শাদায় কে-কাটা চাদরখানি মুড়ি দিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে—কি গো হুকুদিদি। বুড়োটাকে আবার কি দবকার পড়লো?

—বড় দরকার ভজনদা!। তোমার সাজিটা আর ছুঁচ মতোটা এক বার দাও না?

একমুখকোকলা হাসি হেসে বসে রামভজন সিং—ও, এই কথা? আনছি গো দিদি!

খপ-খপ কবে দ্রুত গমনে যায় ভজন সিং। এনে দেয় স্মৃতিতার বয়মহেসী দ্রব্য।

—সাজিতে রাশি রাশি ফুল তোলে স্মৃতিতা। একা পাবে না, মা'না। ও ওর সঙ্গে ছোটোছুটি করে ফুল তোলে।

‘লাল’, ‘বুঁই’, গন্ধরাজ, বরবী, আর তার সঙ্গে বিচিত্র বর্ণের মরুমী ফুলে সাজিটা ভবিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে অর্কিড-হাউসের ভেতর।

অশ্রু বর্ষা পরে সেখানে ফিরে এলো স্নান। স্মৃতিতাকে বসে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বললো,—সেই কখন থেকে একলা বসে আছ মিতু? ওঠো, এবারে ভেতবে যাও।

—বাঃ। কবিতাটা শোনাবে না?

—সত্যিই তো। দাও কাগজখানা।

—কাগজটা ওর হাতে দেয় স্মৃতিতা।

—গভীর ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে কবিতাটা পাঠ করে স্নান।

—“তোমার তরে রইলো আমার সকল আয়োজন,  
আমার সকল চাওয়া

স্বপ্ন ভরে পাওয়া।

রাত্রি-দিনের কাব্য আমায়—প্রেমে উজল মন!

তোমার তরে রইলো মিতা, সকল আয়োজন।

দূরের পথে, নিলেম সাথে তোমার মালাখানি,

বন্ধু তোমার গানের সুরে,

হৃদয় আমার নিলেম ভরে,

পাথের মোর রইলো সাথে তোমার প্রেমমণি।”

কবিতা পড়ার শেষে উঠে দাঁড়ালো মিতা! সাজির ওপরে চাণা-দেওয়া কলার পাতাটি সরিয়ে সত্ত-সমাপ্ত ফুলের মালা ছড়াটি বার করে পরিয়ে দেয় স্বদামের গলায়। মিষ্টি হাসির সঙ্গে বলে—কবিতার পুণ্যকার।

সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে মালাটি দেখে স্বদাম। তার পর নিবিড় অঙ্গাগতরে বাহুপাশে আবদ্ধ করে, অমিতাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। কম্পিত রক্তিম ওষ্ঠে এঁকে দেয় প্রথম চুম্বনবেশ। গভীর ভাবনাগরের অতলতলে, তলিয়ে যায় দু'টি প্রেমবিম্বিত তরুণ আঁখি। কেটে যায় কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

প্রাত্যহিক নিয়মরক্ষা করবার জ্ঞান সেদিনও রাতে এসেছিলো অমিতা পিতার কক্ষে। ধূপ, ধূনা, অগুরুর পবিত্র গন্ধে ঘরের বাতাস সুবাসিত! অমিতার বড় ভালো লাগে এ গন্ধটা! এ ঘরে এলে মনের গুণোট ভাবটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায়।

—তবুও বাবার কাছে সে বসে না। সন্ধ্যাচ ভরে, তখনই বসে,—পিতার শুচিশুদ্ধ সান্নিধ্য থেকে নিজেকে পৃথক রাখে। অল্প দিন সোমনাথ বিশেষ কথা বলেন না। কিন্তু সেদিন অমিতাকে নিজের পাশে বসতে আদেশ করলেন।

একটু বিষয় লাগে বৈ কি?

কত দিন যে মনটা তার লালসারিত হয়ে উঠেছে পিতার একটু স্নেহ-পবন পাবার জন্তে! ভাগ্যে তা মেলেনি এক দিনও। আনন্দের উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেমন টিপ-টিপ করতে থাকে।

সোমনাথ কন্ডার মাথায় ঘীরে ঘীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—মিছ মা! আমি স্থির করেছি কালই হরিদ্বার রওনা হবে।—বাসনা ছিলো, তোমাদের পরিণয়-কার্যটা সমাধা করে বাবো, কিন্তু সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছা অন্তরঙ্গ।

স্বদামের কিরতে বছর তিনেক বিলম্ব হবে, আমারও কিছুকাল নির্জীবনবাসের প্রয়োজন হয়েছে।

—তুমিও চলে যাবে বাবা?

মুহূর্তে কথা ক'টি বলে পিতার মুখপানে বিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকে অমিতা। ভাবলেশহীন পাথরে গড়া সে মুখে কোনো ভাবান্তরের বেখাপাত পর্যাপ্ত দেখা গেলো না। সোমনাথের দৃষ্টি অমিতার ওপর ছিলো না।

যদি তা থাকতো, তবে তাঁর নির্বিকার চিত্তসায়রে স্নেহের আলোড়ন হয়তো দেখা দিতো, অথবা সেই আশঙ্কাতাই তাঁর দৃষ্টি বইলো অমিতার পানে নিবদ্ধ।

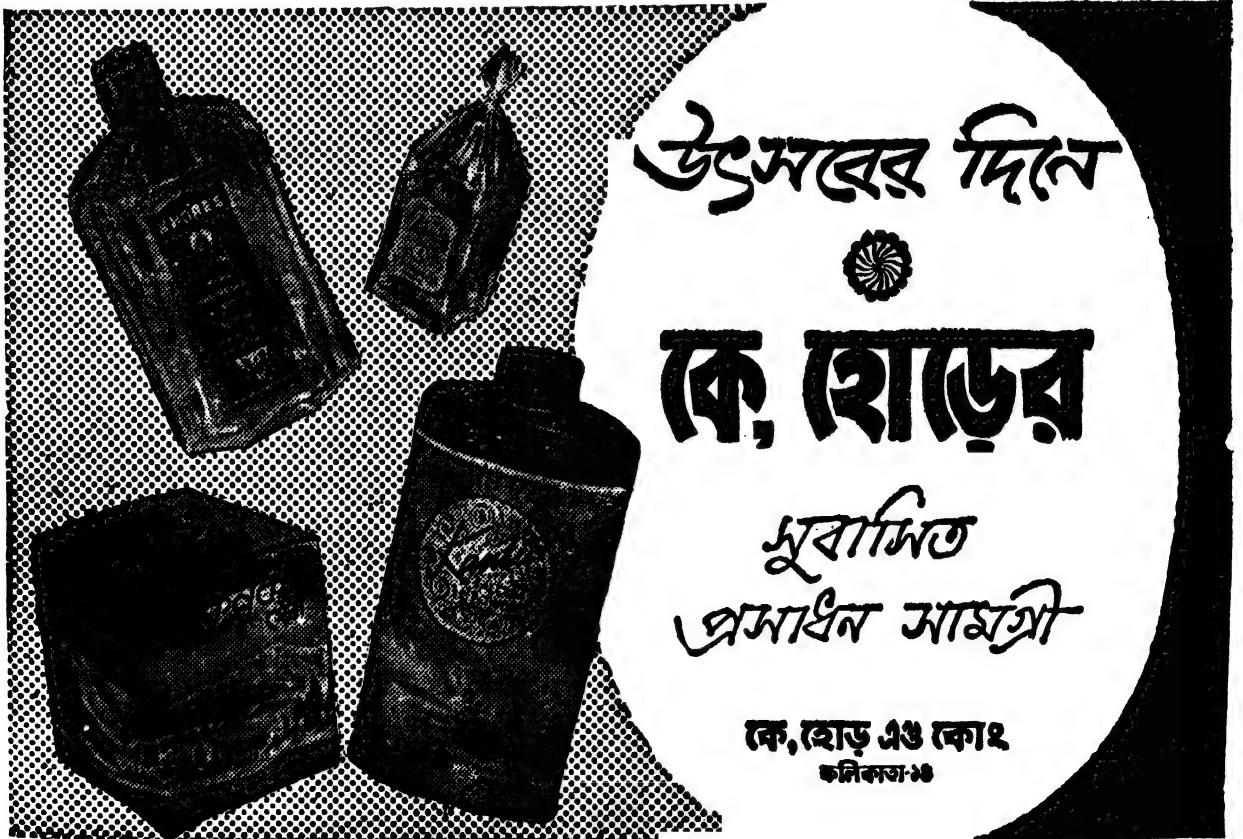
পাথরের চৌকির ওপর থেকে একখানি বই তুলে তিনি কন্ডার হাতে দিলেন।

অমিতা বইখানির পাতা উঠে নামটি পড়লো, শ্রীমন্তাপবত!

অম্ববাদ করেছেন, গোপীকাস মহারাজ। প্রথম পৃষ্ঠায় পিতার হস্তলিপি ছ'ছত্র।

“জীবনে যদি কখনও আসে অন্ধকার,

এর মাঝে কোবো আলোর অমুসন্ধান।” [ক্রমশঃ



**উৎসবের দিনে**

**কে. হাডের**

**মুবাচিত**

**প্রসাধন সামগ্রী**

**কে. হাড এণ্ড কোং**

কলিকতা-১৪

## সুদানের পথে

লীলা মজুমদার এম-এ,

“সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর ঘরি খুঁজিয়া।  
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।”

সেই দেশ হবে যে আফ্রিকা, যাকে কবিবর বলেছেন—

“রক্ত সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে  
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—  
বাংলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়  
রূপণ আলোর অন্তঃপুরে।”

মনের কোথাও আগেনি কোনও দিন। একে তো ঘরকুণো বাঙ্গালী ঘেরে—ফবির মিঠা মিঠা বুলি পড়তেই শুধু ভালবাসি—  
বাস্তব জীবনে মনে নিতে হবে তাই ভাবিওনি কোনও দিন সত্যি—  
কিন্তু আলোর রূপগতা দেখানে বেশী দেখানেই বাহির হ’তে এনে  
দেখাতে হয় আলোর প্রয়োজনীয়তা—তাই সুদূর সুদান হ’তে  
অমুরোধ গেল ভারত সরকারের নিকট কর্তৃক জন ইঞ্জিনিয়ারের  
জ্ঞান নূতন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশের ক্রয়োন্নতির পথে সাহায্য করে।  
ইংরাজদের বিদায় জানিয়ে আমন্ত্রণ করা হোল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের  
তাদেরই স্থানে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক ইঞ্জিনিয়ার চাকুরের সঙ্গে বিয়ে  
হোয়েছিল আমার এবং তার পর হ’তে গতানুগতিক ভাবেই মফঃস্বল  
সহরের এক জায়গা হ’তে আরেক জায়গায় ঘুরে বেরাচ্ছিলুম।  
হঠাৎ এলো সরকারের আমন্ত্রণ-পত্র। তবে যাবার নয় দরখাস্ত  
পেশ করবার। সুদান। নামটিও তখন ভাল কোরে পরিচিত  
হিস না। একে তো ম্যাট্রিকের পর ভূগোলের সাথে প্রায়  
সকল সম্পর্কই চূঁক গিয়েছিল—তার উপরে একে আফ্রিকা,  
ভায় আবার সুদান। মনেরও খুব বেশী দোষ নেই। বা হোক  
স্বামী তো দরখাস্ত কোরে দিলেন। ক’বে যে দিলেন বাস, তার  
পরে আর কোনও খবরধর নেই। কা কত পরিবেশনা—  
দিন চলে মাস এলো, মাসের পর মাসও চলে বাচ্ছে, এমনি  
ভাবেই এমনি সময়ে হঠাৎ এলো আবার ইস্টারভিউর জন্তে ডাক।  
তাড়াহুড়ো কোরে চল্লিশ কোলকাতাতে, সেখানে আসবে সুদান  
সরকারের প্রতিনিধিত্বরূপ হ’ল সুদানী উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

এলুম কোলকাতাতে—আকস্মিক আগমনের কারণ শুনে সবার  
কাছ হ’তেই প্রায় এলো বখারীতি প্রচুর আপত্তি, এসব দেখে শুনে  
আমিও গেলুম একদম যাবড়ে। ঘরকুণো ভাবটা কিছুটা হয়তো  
কমেছিল—কোলকাতার বাইরে থেকে একা কিছুটা সুদূরের  
শিরানীর সম্পর্কে এসে কিন্তু আবার সবার মাঝে এসে সবার  
সঙ্গে সব মিলিয়ে আমার মনও তুলে দিল বিদ্রোহ, কিন্তু মনের  
বিদ্রোহ মনেই রইলো।

ইস্টারভিউ সাঙ্গ কোরে তিনি যখন ফিরে এলেন, মনে  
হোল খুবী। এফট ফেরারা সঙ্গে কোরে বয়ে এনেছেন অর্থাৎ  
সব-কিছুই প্রায় ঠিক শুধু কনট্রাক্ট সাইট করা বাকী। বাড়ীর  
আবহাওয়া হোয়ে গেলো খুবখমে, কাকর অন্তরই সায় দিতে  
চাইছে না—অনেক কোরে একাই বোঝালেন সবাইকে—ইঞ্জিনিয়ার  
যে প্রয়োজন হোলে সবজাতও হোয়ে উঠতে পারেন, তার

প্রমাণ গেলুম হাতে-নাতে। সবাই হোলেন কিছু কিছু রাজী  
অথবা রাজী হ’তে বাধ্য হোলেন জানি না—অবশেষে অল্পমতি পাওয়া  
গেল সবাকার সুদূর সুদানের পথে পাড়ি দেবার।

দিন স্থির হোল ১১শে ডিসেম্বর ১৯৫৫—হোয়ে বাচ্ছে পৌষ মাস,  
আবার নূতন কোরে আপত্তি উঠলো বাড়ীতে—এটারও দেখলুম  
সুন্দর কোরেই ব্যবস্থা হোয়ে গেলো অর্থাৎ গিড়মাছুহানীর  
গুরুজনদের সম্ভাব্য বিধানের জন্তে তিন দিন আগে হতে বাড়ী  
কোরে থাকা—আমার অবস্থা অনেকটা যেন ‘বিদ্রোহের’ বিদ্রোহের  
মতন কোনও মতামত নেবার বাংলাই নেই—হু’ তরফে ঠিক কোরে  
বা বললেন করবার জ্ঞান তাই হোল আমার করণীয়, কিন্তু মন  
যেন কিছুতে মানছে না—উৎসাহও যে কাকর কাছ হ’তে পাইনি  
তা নয়—যখন পেরেছি তখন কিছুটা হয়তো উৎসাহিতও হোয়েছি—  
কিন্তু আবার যে কে সেই—যত দিন এগুতে লাগলো মন যেন ততই  
পিছোতে শুরু কললো—ইউরোপ বা অমেরিকা হোল কি হোত  
জানি না কিন্তু এ যে সুদান! নিগ্রোদের দেশ—বাদের কথা মনে  
হোলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে ছোট ছোট কুঁকড়ে বাওয়া  
চুল অনাবৃত অদীম কালো দেহ, শুধু গাছের পাতার আবরণ  
একটুমানি পরিধানে—হাতে বর্শা, মাথায় পাখীর পালক গৌড়া, মুখে  
মোহাঙ্গা মোহাঙ্গা গানের স্বর একটানে চালিয়ে নেচে নেচে চলে  
কিসের অভিযানে কে জানে! ও-সব দেশে মেয়ে আছে কি?  
আছে নিশ্চয়ই; তবে আমাদের চোখে সবই মনে হয় একই রকম—  
আবরণ কি ছেলে কি মেয়ে কাকর বিশেষ নেই। তাই হয়তো  
বৈষম্যটুকু মনে করতে সরমে বাধে। সভ্যদেশীয় কোনও মেয়ে কি  
নেই ও-সব দেশে! তারা কি পারে নিরাপদে পথ চলতে ওখানে?

উভট সব চিন্তা এসে জড়ো হচ্ছিল মনে। ভাবতেই পারছিলাম না,  
ওগাও এগিয়ে গেছে অনেকটাই সভ্যতার পথে। আলোর ছটা এসে  
গেছে ওদেরও দেহে মনে প্রাণে। তার জন্তই গভীর আগ্রহ নিয়ে  
এগিয়ে এসেছে ভারতের কাছে ক্রমবর্ধমান সভ্যতার দিকে এগিয়ে  
যাবার পথে সাহায্যের আশায়। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত সব কিছু  
উপযোগী অভরণই এসে যেতে পারে ওদের দেশে; মন যেন কিছুতেই  
মানতে চাইছিল না। তাই দাদা যখন ভরসা দিয়ে বললেন,  
ইংরেজরা যেখানে বছরের পর বছর থেকেছে সেখানে, সকলেই  
নিরাপদে অন্ততঃ নিশ্চিন্তই থাকতে পারবে—ইংরেজদের প্রতিক  
কত শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস আমাদের! এরকম জোরালো কথা শুনে  
যেন মনটা কিছুটা ঠাণ্ডা হোল।

এলো অবশেষে শরণীর ১১শে ডিসেম্বর। মাঝে মাঝে এমনি হয়,  
দিন ঘুম কি কোরে চলে যেতে থাকে টের পারারও অবসর থাকে না—  
আসছে আসছে কোরে সত্যি এসে গেলো যাবার দিনটি—ভোর  
হতেই সংসার মন ভাব হোয়েছিল—হু’-এক পল্লা বৃষ্টিও যে না  
হচ্ছিল তা নয়—কার উপরে অভিমান কোরে জানি না সবাইকে  
ছেড়ে কোন দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছি মনে কোরে মনটা কেঁদে  
কেঁদে উঠছিল—বিকেল এটার ছিল প্রেন ছাড়বার নির্দিষ্ট সময়।  
তার ভেতরে হঠাৎ খবর এলো এয়ার ইন্টার অফিস হ’তে  
বিকেল এটার পরিবর্তে প্রেন বেলা ২টার সময় দমদম বিমানযাত্রী  
ছেড়ে চলে যাবে বছের উদ্দেশ্যে—ওখানেই অপেক্ষা করছে ভারতীয়  
আন্তর্জাতিক বিমান আমাদের নিয়ে যাবার জন্তে। সুদানের পথে

আফ্রিকার প্রথম বন্দর কার্যরোতে ঘটাক্ষরেক সময় ছিল মাত্র বাকী। কোনও মতে নাওয়া-খাওয়া সেয়ে একদম বণ্ডনা হলুম সবাই মিলে দমদম বিমানবাঁটা অভিমুখে—কি যে তখন মনের অবস্থা শুধু অন্তর্দ্বারী জানতেন। গিয়ে দেখলুম, তখনও আছে কিছুটা সময় হাতে—কাঠমসু পরীক্ষা হবে বসন্তে—তবুও রক্ষে! আরও কিছুটা সময় তাহোলে থাকতে পারবো আত্মীয় পরিজনদের মাঝে বসে—চুপচাপ বসে আছি সবার সঙ্গে—হঠাৎ ঘোষিত হোল মাইকে, বন্ধ-বাত্তীদের বিমান অভিমুখে যাত্রা করবার জন্ত—আরও হুঁটি বাঙ্গালী পরিবার ও একজন ব্যাচেলর বাঙ্গালী ভ্রমলোকও ছিলেন স্রদানের পথে বাত্মী—মনের অবস্থা! আমাদের তিনটি মেয়ের একই রকম—মলিন মুখে সবার কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে চললুম বিমান সন্নিকটে—মনে হচ্ছিল আমাকে যেন সবার কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন স্রূর দেশে পৃথিবীর কোন অজানা প্রান্তে!

বন্ধে বাবার পথে ঘটানাক্ষরেক জন্তে নামতে হোয়েছিল নাগপুরে—ইচ্ছে হচ্ছিল থেকে যাই ওখানে, পরে জন্ত কোনও উপায়ে ফিরে যাবো কোলকাতার অভিমুখে কিন্তু কার্যতঃ করলুম না কিছুই, শুধু বীরে বীরে গিয়ে উঠলুম আবার স্বস্থানে—যেতে যেতে সন্ধ্যা বাড়িতে পরিণত হোল—জানালা দিয়ে বত বারই তাকাছি নীচে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছুই যেন আর নজরে পড়ছিল না। নদী নালা পূর্বত কত কি হয়তো পার হোয়ে বাচ্ছিলুম, দেখবার উপায় ছিল না কিছুই—শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে বইলাম—কিছুক্ষণ বাদে একটি গুজন শব্দ শুনে আশে-পাশে তাকিয়ে দেখি, সহবাত্মীরা নীচের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন—সবার দেখাদেখি আমিও ঝুঁকে পড়লুম নীচের দিকে—বা রে! এ যে আকাশকে নীচে দেখতে পাচ্ছি তার উজ্জল তারকারূপ সহ কিন্তু তা তো আর হোতে পারে না—এ তবে কি! এই কি তবে স্রশোভিতা আলোক-মালার সম্ভ্রতা বন্ধে নগরী? স্বামী গভীর মনোযোগ সহকারে ধবের কাগজ পড়ছিলেন—ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালুম, কোনও সৌন্দর্য্যই একা দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায় না—উনিও খুবই চমৎকৃত হোলেন দেখে—বাদের পেনে বাতায়ত অভ্যেস হোয়ে গেছে তাদের চোখে এ সৌন্দর্য্য হয় তো কিছুই নয়—কিন্তু আকাশপথে বিচরণ আমার এই প্রথম—তাই এই সৌন্দর্য্যটুকু যেন আমার চোখে অভিনব হোয়ে দেখা দিল—আর মনে হচ্ছিল আসবার আগে স্বামীর কল্পনার জালে বোনা নিত্য নূতন দেশের নূতন সৌন্দর্য্য সত্যিই বোধ হয় আমাকে চমৎকৃত কোরে দেবে—ঝুছিয়ে দেবে তৃপ্তির প্রাঙ্গে আমার সকল বেদনা, পেছনে ফেলা আসা আত্মীয় পরিজনদের জন্ত—বা হোক, কয়েকটি ঘুরপাকের পর পেন এসে তো শান্ত হোল বন্ধে বন্ধে—রাত তখন দশটা—এত রাতও কি সবগরম—কি বিরাট হৈ চৈ—আমাদের ছিল তাড়া—ভাল কোরে দেখবারও উপায় নেই, হুঁ ঘটীর ভেতরে আবার বণ্ডনা হ'তে হবে কারো অভিমুখে আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারজাশনাল সুপার কন্সটেলগানে।

বখারীতি কাঠমসু সারা হোল, সঙ্গে ছিল শুধু এক বড় স্ট্রকেশ ও ব্যাগ—আবশ্যকীয় সব কিছুই ছিল তাতে—বাকী আর সব কিছুই চালান কোরে দেওয়া হোয়েছিল জাহাজে পোর্টসুদান অভিমুখে। বা হোক, তার পরে সবার সঙ্গে বীরে বীরে চলতে লাগলুম মরদানের

দিকে, যেখানে বিরাটকার পেন কাড়িয়ে আছে, তার বিপুল বসু নিয়ে—এগোবো কি, ওর দিকেই শুধু ঘুরে ঘুরে চোখ বাচ্ছিল বত এগোচ্ছি ততই যেন উঁচু ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মামুষগুলোকে কত ছোটই না মনে হচ্ছিল—ওর সন্নিকটে বন্ধ-বিশাবদের দল বারা উঠেছিল ওর শিঠের ওপরে কলকজা সব পরীক্ষার জন্তে সবাই তখন বীরে বীরে নেমে আসছিল, সব কিছু আমাদের যেন আলাদিনের প্রদীপের দৈত্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, ওর মুখের ভেতরে গুরে কত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে হবে আমাদের। সত্যিই তো নিয়ে যাবে, না, পথের মাঝে ওর মুখ হ'তে কোনও হাঙ্গর বা তিমি মাছের মুখে ফেলে দেবে কে জানে? বা হোক, গিয়ে তো আশ্রয় নিলুম ওর ভেতরে, ভেতরেও দেখছি এলাহী ব্যাপার, আলোর আলোময় সব কিছুই, স্তম্ভ ও স্তম্ভজিত, বসবার ও শোবার উপযোগী স্তম্ভর আরামদায়ক আসন, বাত্মীদের সব রকম স্বস্থ স্রবিধে দেখবার জন্তে আছে স্রবেশা এয়ার হোটেস্, সব-কিছুই অভিনব মনে হয় প্রথম দর্শনে। খাবার পাট আগের পেনেই সারা হোয়েছিল, ওখানে শুধু ঘুমোবার পালা, কিন্তু ঘুম কোথায় তখন! শেষবারের মতন ভারতের শেষ বন্দরকে প্রাণভরে দেখে নেবার জন্ত হুঁচোখ খুলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বইলুম বাইরের দিকে—হঠাৎ দেখলুম আমাদের সামনে এসে উঠলো দুখানা সাক্ষাতিক আলো 'ধূমপান নিষেধ' ও 'বেন্ট বাঁধবার' সঙ্কেত জানিয়ে অর্ধাং পেন এখন ভূমি ছেড়ে শূন্যের পথে উড়বে, সত্যি তাহোলে চললুম ভারতভূমি ছেড়ে কত দিনের জন্তে কে জানে, মন যেন কিছুতেই সহজ ভাবে মানতে পারছিল না, তা বড় বেশী ভাবপ্রবণ বোধ হয় আমরা—বাঙ্গালী মেয়েরা তাই প্রতিপদেই পাই মন হ'তে বাধা, প্রতি পলে জাগে সংশয়—প্রতিস্বহুর্ন্তে আসে চোখে জল নিজ পরিজনদের ছেড়ে বাবার আশঙ্কায়—ভিন্ন দেশীর মেয়েরাও ছিল বাত্মী, তাদের কোনও ভাবান্তরই দেখা বাচ্ছিল না। আমাদের মতন অচ্যুত পেন যেই শব্দ কোরে ছুটোছুটি শুরু কোরে দিল ওড়বার জন্তে, আমাদের মনও যেন তোলপাড় শুরু কোরে দিল নেমে পড়বার জন্ত কিন্তু এ পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরোবার সাধ্য আর নেই, তখন শুধু এর চলার সাথে সমান তালে মনটাকে চালিয়ে যেতে হবে সমুদ্র পানে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন জানি না। ঘুম ভেঙ্গে দেখি সমস্ত কামরাটি স্রবুপ্তিতে-মগন, নীধর নীরব। চারিধার শুধু পেন চলছে হ হ শব্দ কোরে আরব সাগরের উপর দিয়ে। পেনের ইঞ্জিনের তলা হ'তে আগুনের বলক বেরোচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে আর নীচের দিকে তাকালে কিছুই দেখবার উপায় নেই, সমস্ত নীচটা মনে হচ্ছিল কুয়াশার ঢাকা—সময় দেখবার জন্তে ঘড়ির দিকে তাকালুম—ও কি। ঘড়ি চলছে তো? সংশয় জেগে উঠলো মনে—তাড়াতাড়ি কানের কাছে ধরলুম—বা। টিক্ টিক্ শব্দ কোরে চলছে তো সত্যি—কি ব্যাপার! আমার ঘড়িতে সাতটা হোয়ে গেলো—বাইরের দিকে তাকালুম আবার ভাল কোরে, কোথাও স্রমিয়ামার এতটুকুন বেশও দেখতে পাওয়া যায় কি না—কোথাও কিছু নেই শুধু কুয়াশাছুর অন্ধকারাছুর চারি ধার! হঠাৎ কানে এলো পাশের সারির বসবার আসন হ'তে কে যেন বলে উঠলেন—কি বোদি। বড় ধাঁধার পড়ে গেছেন, ঘড়ি আর প্রকৃতির চলার



বৈষম্য নিয়ে, না? চমকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সহযাত্রী ব্যাচলার ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক—ভারী শিশুকে, স্বীকার করতে হোল ম'নর ঘনক—ভরসা যদি কোনও সুরাহা মিলে—মুখিল আসান হোল সত্যি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল একদম ভুলে বসে আছি সে খোঁচাটুকুনও হজম করতে খেয়াল হোল—তখন হোল যে আমরা চলছি পশ্চিমের দিকে—পূর্ব গগনকে আলোকিত কোরে তবুই সূর্য্যদেব দেখা দেবেন পশ্চিম-এর পাশে, তাই প্রকৃতির আবহাওয়ার সঙ্গে ভারতের সমুদ্রের পাচ্ছিলুম না কোনও এক—দুশ্চর হোল অবসান, শান্ত হোল মন তখন।

ঘীরে ঘীরে সিনেটর গায়ে দেহ এলিয়ে ভাবতে লাগলুম কোলকাতার সকলকার কথা, সবাই কি বাছে না বাছে এখন—ওখানে নিশ্চয়ই সকলকার দৈনন্দিন জীবনের কাঁধাধারা শুক হয়ে গেছে—যে ঘণি হাওয়া তুলেছিলুম কয়েকটা দিনের জন্ত আত্মীয়-পরিজনদের কাছে, এখন তার অবসান হওয়ায় সবাই বীথে ঘীরে আবার ফিরে যাবেন নিজদের দৈনন্দিন জীবনের কৰ্ম্মধারার ভেতরে। তবু নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারা হোতে পারবেন না স্থস্থির—যত দিন না আগবে সুদান হ'তে আমাদের পৌঁছুবার খবর নিয়ে আসা জরুরী তার!

আমার ভাবনার স্রোতে ভেসে চলার কঁাকে সহযাত্রীরা সকলেই যে স্বপ্নের দেশ হ'তে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছিলেন টের পাইনি কিছুই—স্বামীর আহ্বানে চমকে উঠে দেখি, সত্যি সবাই যে প্রাতঃকৃত্য সারতে তৎপর হোয়ে উঠেছেন—আমার হয়নি কিছুই তখনও—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম না তো? বা হোক চোঁটা কোরে সবার কঁাকে এক বার আমিও সেরে এলুম—আমাব বাঙ্গালী সহযাত্রীরা খুবই ব্যস্ত দেখলুম শিশুদের ভদ্র হু কোরে তুলতে—প্রাতরাণ এসে আবার উপস্থিত হবে, তার আগেই প্রস্তুত হবার তোড়জোড় চলছে—বাচ্চারা সারা ঘর জুড়ে ছুটোছুটি করছিল, ওদেরই বা দোষ কি! ঘরের বাঁধনে কতক্ষণ আর স্থস্থির হোয়ে থাকি যায়—মাঝে মাঝে এয়ার হোটেস্ট্‌স্‌ মিষ্টি মিষ্টি কথাতে ভুলিয়ে মাসের কাছে এনে দিচ্ছিল—বেশ ভাল লাগছিল শিশুদের কল-কাকসোতে মুগরিত পরিবেশটি—স্বামীজ্ঞানিয়ার ধারে বসে প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলেন—হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন। 'দেখো, দেখো—কি সুন্দর! আমাদের কাকুনজ্যাকে হার মানায়।' সচকিত হোয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য আমি দেখলুম আমার জীবনে দ্বিতীয় বার সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ হবে কি না জানি না—চারি ধারে কুরাশার চিহ্নমাত্র নেই—সারা সকাল বোনে ঝলমল করছিল। পূরে দিগন্তের গায়ে চলে গেছে কত যে পাহাড়ের সারি, গণনা নেই তার।

'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে, শূন্যে আর ধরাতলে মস্ত বাঁধে ছন্দে আর মিলে, বনেরে করায় শ্রান শরতের বৌয়ের সোনালী'—পাহাড়ের চূড়া দেখবার উপায় নেই, সমস্ত চূড়া বরফাবৃত। তার উপরে সকালবেলাকার সূর্য্যের আলো পড়ে মনে হচ্ছিল যেন কত হীরা মুক্তা মাণিক্যের ছটা শূন্য দিগন্তের ইস্ত্রজাল ইস্ত্রমুহুরটা পাহাড়ের চূড়াতে এসে আমাদের সকলকে চমৎকৃত করে দিচ্ছিল। কখনও বা মনে হচ্ছিল পর্বতরাজ তার হীরকখচিত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মুকুট মাথায় দিয়ে সঙ্গোবনে পাড়িয়ে আছেন দিগন্তের গায়।

ভাব বেখানে গভীর, তাবা সেখানে হুক—যে সৌন্দর্য্য আমি

মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি, তার প্রকাশ করবার মতন ভাবা আমার নেই, যেটুকুও ছিল তাও যেন শুক হয়ে গিয়েছে ভাবের আত্মহারায়। কতক্ষণ যে এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছি আমরা তার হিসাব নিকেশ রাখিনি কোনও, খেয়াল হোল যখন বিমান-চালকের কাছ হ'তে খবর এলো কারোতে আবহাওয়া খারাপের দরুণ আমাদের প্লেন গতি পরিবর্তন কোরে যাচ্ছে বেকটের অভিমুখে, প্লেন চলছে আরবদেশের হাজার হাজার ফিট উপর দিয়ে, ঘটনাধানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো আমরা বেকট। বেকট! সৌন্দর্য্যের তালিকাতে যে বেকটের নাম শুনে এসেছিলুম এত দিন, সুন্দর বেশে যাচ্ছি তার জন্তেই কি পথে যেতে এত সৌন্দর্য্যের সমারোহ? সহরটি না জানি কত বিস্ময় মাখানো সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দেবে আমাদের চোখে, ভাবতেও পারি না তা।

বেকট সহরটি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পরিবেশেই যে অবস্থিত, নামবার আগেই পরিচয় পেলুম তার, একধারে তার সাগর অঙ্গধারে খিটখিট পাহাড়ের সারি, মাঝখানে বেকট বন্দর। প্লেন এসে পাঁড়ালে পর আমরা ঘীরে ঘীরে সবাই নেমে বিশ্রামাগারের দিকে চলতে লাগলুম, বিরাট আয়তন নিয়ে বিমানঘাঁটিটি অবস্থিত, শুধু বিরাটই নয়, সৌন্দর্য্যমণ্ডিতও বটে। চারি ধারে ফুলের সমারোহ। ফুলবাগানে গাছ আছে বোলে মনেই হয় না। শুধু মনে হয় ধরে ধরে যেন নানান রং-বেরংয়ের ফুল সাজানো। কালো বকবক্‌ গুঁতকে প্লেন পাঁড়াবার সমস্ত জায়গাটি। তার থেকে চলে গেছে তেমনি মন্থণ কালো পথ আমাদের বিশ্রামাগারের দিকে নিয়ে যাবার জন্ত। শুধু ঘর বললে ভুল হবে, বিরাট একটি বাড়ী, দোতলা কি তেতলা বোঝাবার উপায় নেই। পাহাড়ের বাড়ী কোথাও উঁচু কোথাও বা নিচু, শুধু আমরাই নই, আরো দু'টি প্লেনের বাড়ীও দেখলুম এসে রয়েছে ওখানে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীরা তাদের উজ্জল গারের রং ও বেশভূষা দিয়ে পরিবেশটাকে যেন আরও সুন্দর আরও উজ্জল কোরে তুলেছিল। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল বুঝি বা হলিউডের কোন এক বিলিতি ছবি দেখছি।

কারো পৌঁছুতে দুপুর হোয়ে যাবার সভাবনা বোলেই কি না জানি না—যাত্রীরা সবাই দেখলুম নিজের নিজের পাসপোর্ট জমা দিয়ে রিক্রেসমেন্ট ক্রমের দিকে অগ্রসর হোল, আমরাও চললুম সেই সঙ্গে, তারই বা কি সুন্দর পরিবেশ, উপরতলার চার ধার কাচ দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় একটি হলঘরে রয়েছে সাজানো চেয়ার টেবিলের সারি। টেবিলের উপরে কাচের পাত্র পূর্ণ কোরে রয়েছে জলের পরিবর্তে মোসাম্বির রস—ফলের চাইতে জলের নাম বেশী ওখানে—তাই তৃষ্ণা মেটাবার জন্তে রয়েছে রসের পাত্র—কিন্তু আমরা হলুম সুজলা সুজলা বাংলার অধিবাসী—জল চাই আমাদের প্রতি পদে—বাধ্য হোয়ে তাই চাইতে হোল—খাওয়ার ভাগিন আমাদের বিশেষ কাকুরই ছিল না—শুধু এটা ওটা নাড়াচাড়া কোরে কিছুক্ষণ কাচের মাধ্যমে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করলুম বসে বসে—ভারী ভাল লাগছিল পরিবেশটি।

আমার এক সহযাত্রীরা প্রস্তাব করলেন, সহরটি দেখতে গেলে কেমন হয়? সানন্দে সবাই রাজী হলুম এ প্রস্তাবে—কিন্তু কতক্ষণ আমাদের থাকতে হবে এখানে—বাইরে যাবার অল্পমতি হবে কি না, জানবার জন্তে বাওয়া হোল এয়ার ইন্ডিয়ার কাউন্সার। হুধের

# গিনিগোস্ত ডুয়েলারি শ্বেশালিস্ট



মৌলিকতায়  
নির্ভরতায়  
আধুনিকতায়

## এম.বি. সরকার এও সন্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ *জুয়েলার্স* গ্রাম-টিলিয়াক্টস

১৩৭/সি ১৬৭/সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকতা ১২

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এডিনিউ. কলিকতা-২১

স্বাক্ষরমের পুরাতন চিহ্নমা

১২৪.১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকতা ১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

নতুন ব্রাঞ্চ শো-রুম - ডায়মসেদপুর. ফোন: ডায়মসেদপুর-১৫৮

বিবরণ, অনুমোদন হোল না ওদের তরফ হ'তে। প্লেন কখন ছেড়ে চলে বাবে স্থিরতা নেই তার কোনও, কার্যবোঝার আবহাওয়া প্লেন চলবার উপযোগী হবার খবর এলেই আমাদের অভিযান শুরু হবে কার্যবোঝার অভিযুখে—কাজেই বিফল মনোরথ হোয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালুম সবাই—কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বকৃৎ তকতক্ কচ্ছে! বন্দরটি দেখিকে তাকাই সেদিকই যেন অপস্রুপ হোয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে—অবশ্য হোয়ে দেখছিলাম তাই আর মনে হচ্ছিল গতকালও এমনি সময়ে শ্রিয় পরিজনদের কত নিকটে ছিলাম আর আজ কত দূরে এক আন্তর্জাতিক পরিবেশের ভেতরে রয়েছি—এ রকম বটেই ভাবিওনি কোনও দিন। তাই মনে হয় সহস্র দিনের মাঝে এ দিনখানি হবে স্বতন্ত্র চিরন্তন।

কার্যবোঝা বাত্মা করলুম যখন, আমাদের ঘড়িতে ভারতের সময় অনুযায়ী দুপুর এসে গেছে—ধীরে ধীরে বেরুটকে দিগায় জানিয়ে আমরা গিয়ে বসলুম স্বস্থানে। প্লেন সশব্দে ভূমি ছেড়ে পাড়ি দিল সাগরের উপর দিয়ে আকাশপথে—দু'ঘণ্টার ভেতরেই কার্যবোঝা পৌঁছে বাবে—সাগরের ওপর দিয়েই যেতে হবে প্রায় সাধাটা রাস্তা—ধীরে ধীরে সাগর হ'তে কত উঁচুতে আমরা উঠে গেছি—নৌচের দিকে তাকালে চেটেরের যাত-প্রতিযাত আর দেখা বাচ্ছিল না—শুধু মনে হচ্ছিল নীচে—বহু নীচে সাধা ধবধবে বরফের টুকরো সারি সারি জমাট বেঁধে রয়েছে—অভিনিবেশ সহকারে তাকালে দেখা বাচ্ছিল ধীরে ধীরে সেগুলো আবার মিলিয়েও বাচ্ছিল—সাগরের কোনও প্রতাপই চোখে পড়ছিলনা, আমাদের আলাউদ্দিনের প্রদীপের নৈত্যের ভরাবহ শব্দ শুনে সাগরও যেন মনে হচ্ছিল শান্ত হোয়ে গেছে অনেক!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার নিজের চোখও যেন শান্ত হোয়ে আসছিল ধীরে ধীরে—ইচ্ছে হচ্ছিল কিছুক্ষণ জিটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বুজে বিশ্রাম নিই—কিন্তু সৌন্দর্য্যপিরানী মন তা যেনে নিতে বাজী হোল না—বদি কোনও নতুন সৌন্দর্য্য হ'তে বঞ্চিত হোয়ে বাই আবার? অগত্যা সঙ্গে কোরে নিয়ে আসা একখানা বাংলা বই খুলে বসলুম। কিছুটা সময় বই এর প্রতি, কিছুটা সময় আবার বাইরের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ চললো এই ভাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রথ দেখা ও কলা বেটা একসঙ্গে করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হোল না—কখন হ'তে বইটি আমার মনের ও চোখের সমগ্র একাগ্রতা টেনে নিয়েছে ওর দিকে, টেরও পাইনি তা; সামনের সারি হতে যখন বিমানচালকের বিমানের গতি, উচ্চতা ও কার্যবোঝাতে পৌঁছুবার সময় ইত্যাদি নিয়ে বিবরণ এলো হাতে—খেরাল হোল তখন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নাকি কার্যবোঝাতে পৌঁছে বাবো আমরা—তাড়াতাড়ি আবার নীচে তাকালুম কিন্তু তখন বাচ্ছিলুম আমরা মেঘের উপর দিয়ে, আশেপাশে নীচে সমগ্র মেঘ আর মেঘ—উপর দিকে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার নীল আকাশে—তার নীচে এখানে ওখানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই মেঘের ভেতর দিয়েই পথ কোরে নামবে আমাদের প্লেন—কার্যবোঝা যেন আপনাকে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই দেখা দেবে না বা নামতে দেবে না বিদেশীদের ওর বুক—মেঘের মধ্য দিয়ে বাচ্ছিলুম দেখে ভয়ও হচ্ছিল আবার পূর্ণক আগছিল। মনে মনে হচ্ছিল যেন কিরে

গেছি আমাদের সেই পূর্বেরকার যুগে—পাড়ি দিয়েছি পূর্ণক রথে কোরে মেঘের রাজ্যেতে—শুধু দুঃখ—সে যুগের পূর্ণক রথে হোত না কোনও দুর্ঘটনা, এ যুগে সেটা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাই মেঘের রাজ্য পার হোয়ে বতকণ না পৌঁছুবো আমাদের এ যুগের মিশরের মাটিতে, ভয়ও কাটিবে না মন হতে।

বা হোক, মানে মানে তো গিয়ে নামলুম কার্যবোঝাতে—আসবার আগে কত আলাপ আলোচনার কেন্দ্র ছিল এই কার্যবোঝা—কি দেখবো কি জানি না দেখবো। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এই কার্যবোঝা নগরীতে—প্রথমতঃ এয়ার পোর্টটি দেখেই মনটা গেল দমে। একটি আন্তর্জাতিক বিমানখাঁটি আরেকটু উন্নত ও সুশ্লী হওয়া অন্ততঃ উচিত ছিল মনে হয়, কিংবা বেরুটের স্মৃতিতে মনটা ভরপুর ছিল বোলেও বোধ হয় ওর পাশে আর কাউকে সে রকম পছন্দ হচ্ছিল না—কিন্তু আমার সঙ্গিনীদেরও দেখলুম তাই মত—মনের এই অবস্থায় কার্যবোঝা আর ভাল লাগছিল না বিমানখাঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে—বিমানখাঁটিটি তখন আবার সস্তার করা হচ্ছিল, তার জন্তেই যেন আরও গোলমালে ও অনুশ্রম লাগছিল সব কিছু আমাদের কাছে।

পাসপোর্ট, সহরে প্রবেশ করবার ও থাকবার অনুমতি-পত্র আদায় ইত্যাদির হাজ্জামার কেটে গেলো বেশ খানিকটা সময়। সব কিছু সেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, স্থানীয় সরকারের তরফ হ'তে একজন স্থানীয় ভ্রমলোক অপেক্ষা করছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত—স্থানীয় যখন তখন তো নিশ্চয়ই নিগ্রো কিন্তু নিগ্রোদের যে ছবি মনে আঁকা ছিল এ তো সে রকম মোটেও নয়। রং অবিশিষ্ট খুবই কালো, চুলও সব কুঁকড়ে কুঁকড়ে রয়েছে কিন্তু আর সব কিছু তো আমাদেরই মতন। পোষাকও দিব্যি বিলাতী ভাবাপন্ন, কথাবার্তাতেও ভারী ভয়। কার্যবোঝা এয়ার-পোর্ট দেখে মনটি দমে গিয়েছিল যেমনি, ভ্রমলোকের সাথে পরিচিত হোয়ে স্থানীয়দের সবক্ষে যে ভয় ভাবনা ছিল মনে তা কেটে বাওয়ার তেমনি আবার উৎসাহিত হোয়ে উঠলো। একটা দিন কার্যবোঝাতে থাকবার ও পরদিন সকালের প্লেনে খারটুমে যাত্রা করবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন, এখন শুধু হোটেলের দিকে বাবার অপেক্ষা—বেশ খুশীর একটি ছোঁয়া লাগলো মনে। কার্যবোঝা সহরটি ঘুরে দেখবার অবকাশ হোল দেখে সবাই বেশ প্রকুর মনেই চললুম বিমান কোম্পানীর গাড়ীতে কোরে হোটেল অভিব্রুখে।

কার্যবোঝাতে আমাদের যে হোটলে থাকবার ব্যবস্থা করা হোয়েছিল, সেটা বিমানখাঁটি হ'তে বেশ খানিকটা দূরে—শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল বোলে বাবার পথেই আমাদের শহরের বেশ খানিকটা দেখা হোয়ে গেলো—রাস্তাগুলো মস্ত চওড়া—মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ট্রামের লাইন এঁকে বেকে—তার দু'ধারে মোটর চালানার রাস্তা—ফুটপাথগুলো ভারী সুন্দর—সবুজ মধ্যমলের মতন সবুজ ঘাসে বিছানো, তার মাঝে মাঝে আবার ফুলের কেন্দ্রারী—ছোট ছোট নানা রংয়ের ফুল ফুটেছিল তাতে। যেতে যেতে পথে ফুলের সমাবেশ দেখতে পেলুম অনেক জায়গাতেই—পথিকের চোখে নয়নাভিরাম কোরে তুলবার ভারী সুন্দর প্রদর্শন—মিশর শুধু সুন্দর নয় সুরকি সম্পন্নও বটে—বাড়ীগুলোও বা কি সুন্দর, তেমনি তার রংয়ের সমাবেশ,

তেমনি গঠন-নৈপুণ্য—পাখরের তৈরী বাড়ীগুলো মনে হোল সব—হবে নাই বা কেন। পিরামিডের দেশ এই কার্যের—ঐর্ধ্য ও শিল্পকলার কেন্দ্রভূমি—তাই এর শিল্পচাতুর্য্যে মনপ্রাণ মুগ্ধ হোয়ে যাবে বেশী কথা কি আর। বিমানবাঁটিটিই শুধু দেখলুম এর ব্যতিক্রম, অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। হোটেল পৌঁছে কিন্তু আর তর সইছিল না—ভাবছিলুম শুধু বখন নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করবো, বিশেষতঃ আমার সহযাত্রিনীরা বাচ্চাদের সামলে নিয়ে চলতে বেশ কাহিল হোয়ে পড়েছিলেন—বখন ঘরে গেলুম সত্যি ভারী ঢাল লাগলো মনে—ঘরটিও ছিল ভারী সুন্দর—আরাম উপভোগ করার প্রয়োজনীয় সবকিছুই ছিল তাতে—কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ধ্যা স্নানের ঘরে খুব ভাল কোরে স্নানটা সেয়ে নিলুম আগে—ভারী আরাম ও তৃপ্তি লাগছিল মনে—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম স্বামী আবার প্রতীক্ষা কোরে বোসে আছেন উল্লসিত নির্মল ধারার শরীর ও মন স্তম্ভিত কোরে তুলবার জন্যে—তারপরে খোপদ্রব পোষাকে সজ্জিত হোয়ে নিলুম খাবার ঘরে খাবার ভাণ্ড—উনিও দেখলুম বেশ তাড়াতাড়ির সহিত কোরে এলেন স্নান—নিশ্চয়ই তাহোলে স্নানের তাগিদে। স্বামীর তৈরী হবার অবসরটুকুনে ফোন কোরে ডেনে নিলুম সহযাত্রী বাত্রিনীরা সবাই প্রস্তুত হোয়েছেন কিনা—বাচ্চাদের ঘরেই খাওয়ানো সাজ কোরে সবাই চলছিলেন খাবার উদ্দেশ্যে—সহযাত্রী দেওরটির ঘর হ'তে কিন্তু কোনও সাড়াই পেলুম না, হয় যে। খাবার ঘরেও গিয়েই অপেক্ষা করছে সকলকার জন্যে।

সত্যিই তাই—মস্ত বড় টেবিলের একটি আসন দখল কোরে খাবার ঘরের ম্যানেজারের সঙ্গে বেশ গল্প ভাসিয়ে তুলেছেন—আগে-পাশের টেবিলগুলো প্রায় খালিই ছিল—আমরাই বোধ হয় সর্বশেষ খাবার ঘরের অতিথি—মেহু এলো আমাদের কাছে অম্মোদনের জন্যে কিন্তু সারা তালিকা খুঁজেও পেলুম না আমাদের প্রিয় ভাত ও মাছের বোল—ইংলিশ হোটেল, তাই সবই প্রায় ইংলিশ খানা—ভাজা সেন্দ্র নরতো কাঁচা—খেতে হবে পাউরুটি সহকারে—কি কি আনবার জন্যে বলেছিলাম এখন আর মনে নেই, শুধু মনে আছে আমাদের তিনটি বাঙ্গালী মেয়ের আধপেটা খেয়েই ফিরে আনতে হোয়েছিল ঘরে।

ক্রি 'ক্রি'—দুঃখভানো চোখে রিসিভার তুলে ধরতেই শুনেতে পেলাম তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নেবার জন্যে জোর তাগাদা—ওরে বারো! এর মধ্যে চারটে বেজে গেলো! তাড়াতাড়ি ট ১ পড়লাম—বেতে হবে পিরামিড দর্শনে, তাই তাড়াতাড়ি সব কিছু সেয়ে দ্বিতীয় বার ক্রি ক্রি করবার আগে রওনা হোলুম নীচের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি, আমাদের গ্রুপের ভেতরে সিনিয়র ভ্রমলোক (মিডিয় সাহেব) ম্যানেজারকে মহাশয় বেখে হু'খানা ট্যাক্সি ঠিক করেছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে ট্যাক্সিচালকের কি কথা হোল জানি না—হু'খানা ট্যাক্সিই শেষে ঠিক হোল পিরামিড ও সমস্ত শহর ঘুরে দেখাবার জন্যে। দুর্গা দুর্গা স্রবণ কোরে রওনা হোলুম, একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিলুম—কে বুঝিয়ে দেবে সবকিছু দ্রষ্টব্যের ইতিবৃত্ত। আমাদের ডাইভারকে দিয়েও হয়তো হোতে পারতো সে কাজ কিন্তু আরবী ভাষা ওদের তখন যে ছিল আমাদের কাছে 'ইচির মিচির' ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু এখনও কি খুব রপ্ত করতে পেরেছি? মালী বা চাকরের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তো বুঝতে পারি তা বা তুকনো খটখটে ভাষা।

বা হোক, গাড়ী হু'খানা তো এগুতে লাগলো ধীরে ধীরে, যাতে সব কিছুই বেশ ভাল কোরে দেখতে দেখতে যেতে পারি—সবচাইতে বাড়ীগুলোই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। নীল নদের ধার দিয়ে এ রাস্তা চলে গেছে পিরামিডের দিকে। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছিল নানান বকম নাম না জানা শস্যের ক্ষেত—নীল নদের কল্যাণে শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ কার্যেরা শহর ছোট ছোট গাছগুলোকে হেলিয়ে ছলিয়ে বেশ সুন্দর মিঠে মিঠে হাওয়া বইছিল। বিকেলটিতে ডিসেম্বর হোলে কি হবে, ভারী আনন্দদায়ক মনে হচ্ছিল হাওয়াটি। এক দিকে প্রকৃতির অনবদ্য অবদান অপর দিকে মানুষের তৈরী অপূর্ণ শিল্পচাতুর্য্যের সমাবেশ—তারই ভেতর দিয়ে সবকিছু উপভোগ করতে করতে আমরা চলেছিলাম পৃথিবী বিখ্যাত পিরামিড দর্শনে।

পিরামিড নদীর এপারে নয়, ওপারে। তাই সেতু পার হোয়ে যেতে হোল ওপারে। দূর হ'তেই দেখা যাচ্ছিল মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐর্ধ্যের প্রতীক পিরামিডের সুউচ্চ শির—কি বিরাট তার আয়তন, যেমনি দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে, মাথা উঁচু কোরে দেখতে দেখতে ব্যাধা ধরে যায় যেন—দেখতেই থাকে পরিশ্রম হয় তৈরী হ'তে সেটা কত লক্ষ লোকের না জানি পরিশ্রম-সাপেক্ষ ছিল! কিন্তু কি এমন প্রয়োজনীয়তা ছিল এর? ফারাওদের খেয়াল চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু কি? বার জন্মেই হোক, আজ বিশ্বের দরবারে প্রধান আশ্চর্য্য সমূহের ভিতরে মিশরের পিরামিড একটি অস্বপ্নময় আশ্চর্য্য—কত দূর দূরান্তর হ'তে দর্শকের দল ছুটে আসে শ্রদ্ধাগ্রস্ত চিত্তে শুধু একটিবার দেখবার জন্যে—ঐতিহাসিকদের কথা তো ছেড়েই নিলুম—দিনের পর দিন তারা কাটিয়ে দিতে পারে এই পিরামিডের গবেষণার পিছনে—ভিতরে নাকি দেখবার আছে এর অনেক কিছুই কিন্তু কি কারণে যেন সম্ভব হোল না আমাদের পক্ষে—মনে মনে কিন্তু আমি খুশীই হোয়েছিলাম—মোটোও উৎসুক্য ছিল না মনে, তার চাইতে মনে হচ্ছিল নীল নদের ধারে বসে কার্যরোর দিকে তাকিয়ে থাকলে মনটা তৃপ্ত হোত বেশী—বিরাট পিরামিডের বিরাট সৌন্দর্য্য আমার মনে জাগাচ্ছিল শুধু এক প্রত্যাশিত বিষয়, আর কিছু নয়—সাধারণের চোখে হয়তো এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না, তাই এতদিনকার জল্পনা কল্পনার আধার পিরামিডের সৌন্দর্য্য ভাগ্যেতে পারেনি আমার মনে কোনও আনন্দ—শুধুই যেন ছিল শ্রদ্ধা ও বিষয়।

পিরামিডের কাছে বিদায় দিয়ে আমাদের চলা শুরু হোল এবার শহরের দিকে, তবে অল্প পথ দিয়ে যেতে যেতে একটি মস্ত বড় কোয়ারা নিয়ে ঘেরানো একটি জায়গাতে—আমাদের গাড়ী পাড়ালো—কোয়ারা তো নয়, যেন শুধুই লাল নীল নানান বর্ণের বাহারের হটা—চারদারে এরকম নানান বকমের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হোতে থাকায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল দূর হ'তে—আমরা সকলেই নেমে বেশ ভাল কোরে দেখলুম—গাড়ী হতে নেমে যেন কার্যরোর আরেক অভিনব সৃষ্টিও দেখতে পেলুম—বুলগেরিয়ার আগমনে কোলকাতা শহরের এক আলোকমালার সজ্জিত বেশ দেখে এসেছিলাম—মনে ভাসছিল সে ছবি—এখানেও দেখছি তেমনি নানা রং-বেরংয়ের আলোর সাজে সজ্জিত বেশ—তবে কি কার্যরোতেও সাজ সাজ রব সাড়া পড়ে গেছে তেমনি কোনও সম্মানিত অতিথির আগমন সম্ভাবনায়? পথপ্রদর্শক আমাদের সে ভুল ভেঙ্গে দিল—সমস্ত শহরটি প্রীতি রাস্তাই এমন আলোকমালার সজ্জিত বেশ ধারণ করে, বিশেষ তার কারণ নেই



কোনও—তবে দূর হতে যে সব দর্শকের দল ছুটে আসে কারবোর সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্য, তাদের চোখে নিজেকে আরও সুন্দর—আরো অভিনব কোরে তুলবার জন্তই হয়তো এই আলোর সমারোহে সমারূপ থাকে সুন্দরী কারবো নগরী।

গাড়ীতে উঠে ঠিক হোল আর নামা হবে না, শুধু গাড়ীতে কোরে ঘুরে ঘুরে দেখা হবে—তথ্য! হোটেলে যে ফিরে যাবার প্রস্তাব করনি ভাগি—কত রাস্তার উপর দিয়ে কত কি দেখতে দেখতে গেলুম। পথপ্রদর্শক সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছিল সবাকার নাম ধাম পরিচয় কিন্তু আমার মন ছিল না মোটেও তাতে—যা সুন্দর, যা মধুর—যা দেখে মনপ্রাণ হবে তৃপ্ত তার দিকেই শুধু আমার দৃষ্টি—কি হবে তার পেছনের নাম গোত্র বংশপরিচয় জেনে—একটি শহর কত সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হোতে পারে তাই শুধু দেখছিলাম হৃদয়ন ভরে। কিন্তু একটি প্রস্থ মানে মানে মনকে নাড়া দিয়ে উঠছিল, পারলুম না আর তাকে দাবিয়ে রাখতে—সকল শহরেই তো যেমনি থাকে নৃতনের অস্তিত্ব তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের অবস্থিতিও কিছু না কিছু থেকে যায়—এতদিনকার পুরোনো শহর, নিশ্চয়ই আছে এরও ছোট ছোট ঘিঞ্জিগলি ও বস্তির সারি কিন্তু কোথাও আমাদের চোখে পড়লো না তো সে সব! গাড়ীতে ছিলেন সঙ্গে স্বামী ও এক মজুমদার ভ্রমলোক পরিবার নিয়ে—কথাটা শুনে হেসেই উঠলেন, যেন কত তারির কথা এটা—এখানে নাকি কোনও কিছুই অসুন্দর বা চোখের পীড়াদায়ক হোয়ে থাকতে পারে না—নিতি নতুন সংস্করণ ও পরিবর্তনের ফলে এদের যা মলিন ও অসুন্দর ছিল—তাই নাকি হোয়েছে এখন সৌন্দর্যে রূপান্তরিত। মন মানতে চাইলো না তা—হোতেই পারে না তা—নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শক আমাদের কাছ হতে আড়াল কোরে রাখবার জন্ত নিয়ে যাবার নির্দেশ নেয়নি সে পথে আমাদের দেশের পথপ্রদর্শকও কি নিয়ে যেতো কোনও বিদেশী দর্শককে দেখাবার জন্ত চিংপুর বা বড়বাজারের কোনও রাস্তাতে? যা হোক, বেশী বাক্যব্যয় কোরে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে হোল না আর—চূপটি কোরে শুধুই দেখতে লাগলুম যা কিছু পড়ছে পথে যেতে যেতে।

হোটেলে যখন ফিরলুম, তখন খাবার সময় হোয়ে গেছে, অথচ তখনও চা খাওয়া হয় নি—খেয়ালই ছিল না একদম—ঠিক হোল চা খেয়ে, তার পর কিছুক্ষণ বসে না হয় রাতের খাওয়া হবে। চা খেতে খেতে বেশ গল্প-গুজবও চললো খানিকটা, হৃদয়ন সহবাসিনী চলে গেলেন ঘরে, বাচ্চাদের ব্যবস্থা করার জন্তে। আমরা রাস্তার ধারের লগিতে বসে দেখতে লাগলুম রাস্তার লোক চলাচল ও যানবাহনের আনাগোনা—কতক্ষণ বসেছিলাম এমনি ভাবে, খেয়াল ছিল না। সঙ্গিনীদের পুনরাগমনে সচেতন হোয়ে উঠলুম, ওখান হ'তেই খাবারের উদ্দেশ্যে চললুম। এবারে দেখলুম, খাবার-ঘর নানা অতিথির আগমনে সরগরম—মিষ্টি মিষ্টি বাজনা বাজছে একটু দূরে, এক কোণ হ'তে নানান বর্ণের ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে—সব টেবিলেতেই স্তোরালো আলোতে আলোকিত ঘরটি। সব কিছুই সমাবেশে বরখানা মায়াপুরী বোলে ভ্রম হচ্ছিল, যেন সব জায়গাতেই কি কারবোর জাঁকজমক ও আলোর সমারোহ। যা হোক, খাওয়া তো হোল একসঙ্গে, খাওয়ার চাইতে সত্যি বলতে কি পরিবেশেই আনন্দ পেলাম বেশী। কত রং-বেরংয়ের পোষাকে সজ্জিত হোয়ে

কত সুন্দর ও সুন্দরীরা আগছে-বাছে, হাতে-লাস্তে বরখানাকে আমোদিত করে তুলছে—কেউ কেউ শুধু 'ড্রিক' কোরেই চলে বাছে আবার বাইরে। 'ড্রিক' করাটা ওদের কাছে যেমন আমাদের কাছে জল পান করা, শুধু আমাদের টেবিলটি ছাড়া আর সর্বত্রই হাচ্ছিল প্রচুর এর সরবরাহ। দেখতে বেশ লাগছিল, সব কিছু মিলে কিন্তু বেশীক্ষণ বসবার জো নেই, কাল সকালেই আবার রওনা হতে হবে স্বদানের রাজধানী খারটুম অভিমুখে—তাই পরদিন ভোর এটাতে প্রাতরাশের ব্যবস্থার কথা বোলে আমরা যে বার ঘরে চললুম ওভরড্রি জানিয়ে।

আধো আলো আধো ছায়ার ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে বিমানঘাটি অভিমুখে—পথে যেতে আরেকটি হোটেল হতে গেলুম ইক্সেলের ছাত্রী কয়েকটি, ভারী সুন্দর দেখতে ও সঙ্গে তাদের একজন মিস্ট্রেস চলেছে খারটুমে। ছুটি উপলক্ষে প্রিয়-পরিজনদের কাছে, মিস্ট্রেস অবিশিষ্ট সঙ্গে যাচ্ছিল শুধু এয়ার-পোর্ট অবধি ওদের যাত্রাপথে বিদায় জানাবার জন্ত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে ভারী মিষ্টি কোরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, মেশবার জন্ত দু' পক্ষই আগ্রহশীল কিন্তু মাঝখানে রয়েছে ভাষার ব্যবধান—ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই মনের ভাব আদান-প্রদানের।

এয়ার-পোর্টে যথাসময়ে পৌঁছবার বেশ খানিকক্ষণ পরে আমাদের যাত্রা হোল স্ক্রু খারটুম অভিমুখে—এবারে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, মরুভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যেতে হবে। সে যে কি ভোগ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছি তা তার জন্তই বোধ হয় রেখেছে স্বদানের সীমারেখার বিশ্রামের জন্ত একটি বিমানঘাটি। ওরাদীহালকা তার নাম—শুধুমাত্র একটি ঘর, আশেপাশে তার আর নেই কোনও জনবসতির চিহ্ন। জানি না, এ দেশে কেউ বাস করে কি না! তার করলেও কি তাদের উপজীবিকা। শুধু বালি আর বালি—চারি দিকে ধু ধু করছে মরুভূমি, কোনও দিন এখানে বৃষ্টি হয় না, এই নাকি এই জায়গাটির বিশেষত্ব। সহজেই তা হোলে বুঝতে পারা যায়, জায়গাটির মাহাত্ম্য। তাই সবুজের অভিধান নেই এর ধারে-কাছে কোথাও। সমস্ত দেহ-মন যেন আকুল হোয়ে উঠছিল একটুখানি ঘরিত্রীর সবুজ গ্রামলিমা রূপ দেখবার জন্ত, কিন্তু কোথায় পাবো তা?

কিমাশ্রধ্যামতঃপরম্। ওরাদী হালকা পার হোয়ে যাবার কিছু পর হ'তেই স্বদানের জন্ত এক মাদুর্যমণ্ডিত মূর্তি—সাহারা প্রান্তরের কোনও প্রভাবই আর বিস্তার করতে পাবেনি তখন স্বদানের বুকে—উত্তর প্রান্তে যদি বা কিছু থেকে থাকে মধ্য বা দক্ষিণ প্রান্তে মোটেও নেই বলা চলে—নীল নদের আশীষবারি স্ক্রু সেখানে—এক পাশে নীল নদকে রেখে আমাদের প্লেন চলছিল খারটুমের দিকে—নীল নদের আশে-পাশে সর্বত্র সবুজের সমাবেশ—দেখে দেখে যেন আর চোখের তৃষ্ণা মেটে না—গ্রামল বাজলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমাদের সে দৃশ্য—সমস্ত মনপ্রাণ যেন উদ্ভূত হোয়ে উঠেছিল এ দৃশ্য দেখবার জন্ত। এত শীর্গার তো দূরের কথা, দেখতেই আর পাবো কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট আশঙ্কা জাগছিল মনে। ওরাদী হালকাকে দেখে তখন আবার শঙ্কা জাগলো মনে। আমাদের গন্তব্যস্থল কেমন হবে আবার কে জানে! মরুভূমির দেশে তো দেখছি কিছুই ঠিক নেই। এই ওকনো খটখটে ধু ধু করছে বালির দেশ, আবার কিছু দূরেই



শান্ত বিন্দু সর্বত্র স্তম্ভ ভূমি ! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম এক গ্রীক ভ্রমলোককে ( ব্যবসায় উপলক্ষে সূদানেই বসতি ) আমাদের জায়গাটির নাম কোবে কেমন হোতে পারে তার আভাওয়া ও পরিবেশ—উত্তর শুনে তো হতবাক্ আমি—সমগ্র সূদানের ভেতরে নাকি ওটি সব চাইতে মনোরম স্থান এবং সবুজের দেশ ( Green land of Sudan ) বলা হয় সূদানের ।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা গিয়ে পৌঁছলুম খারটুম বিমান-খাঁটিতে—সূদান সরকারের Chief Hydrologist ছিলেন একজন ভারতীয় Mr. Rajadaksha অবিজ্ঞি তিনি এখন আবার ফিরে গেছেন ভারতেই Mr Rajadaksha এবং সূদান সরকারের তরফ হ'তে আরেক জন সূদানী ভ্রমলোক উপস্থিত ছিলেন আমাদের রিসিভ করবার জন্তে । নেমেই একজন ভারতীয়কে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগলো মনটা—উনিও এত দিন বাদে একসঙ্গে বেশ কয়েক জন ভারতীয়কে দেখতে পেয়ে ভারী খুশী, উভয়েই খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাদের । তারপর বখারীতি নিয়ম কামূনের বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হোয়ে রওনা হোলুম অবশেষে ওদেরই আনীত গাড়ী কোরে আমাদের জন্তে নির্দিষ্ট হোটেলে অভিমুখে ।

খারটুমে নেমেই 'সূদানের পথে'র সমাপ্তির-বোঝা টেনে দেওয়া উচিত ছিল বোধ হয় কিন্তু আমাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থলে যাবার পূর্বে রাজধানীতে দু'টো দিনের অবস্থান কালের শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ কোরেই আমার এ যাত্রাপথের কাহিনীর যবনিকা টেনে দেবো আমি ।

পৌছবার পয়ের দিন সকালে স্বামী ও ব্যাচেলার ভ্রমলোক চক্রবর্তী ( মাসখানেক হোল অবিজ্ঞি ব্যাচেলার নাম ঘুচে গেছে ) বেরোলেম traveller's cheque ভাঙ্গাবার জন্তে ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে—Mr. Rajadaksha অথবা Indian Embassyর সাহায্য ইচ্ছে হোলেই নিতে পারতেন কিন্তু সামান্য এ কারণে তাদের সাহায্য আর চাইলেন না, যা হোক ওদের সঙ্গে আমিও চললুম এই সুযোগে খারটুমও একটু বেশ ঘোরা হোয়ে যাবে মনে কোরে । রাস্তা-ঘাট একেবারেই অপরিচিত শুধু নয়, ব্যাঙ্ক সহরের কোন দিকে অবস্থিত তারও কোনও নির্দেশ জানা নেই আমাদের । ট্যাক্সি নেবারও ভরসা নেই, যদি কোনও কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থেকে থাকে অথবা Cheque ভাঙ্গানো না যায় বুদ্ধিলে পড়তে হবে তাহোলে—হাতে নেই একটিও সূদানী মুদ্রা—বেতে হবে তাহোলে আবার সেই Embassy অথবা Mr. Rajadakshaর কাছে সাহায্য প্রত্যাশায় ।

তিন জনে হাঁটতে শুরু করলুম—যেতে যেতে পথের ধারে একটি বেশ বড় রকমের দোকানের সামনে দেখলুম হু'জন ভ্রমলোক ( গ্রীক বা ইজিপিসিয়ান ) কথা বলছেন ঙাঁড়িয়ে—National Bank of Egypt এর পথের নির্দেশটুকু একটু পাবার আশায় ওদের কাছে

গিয়ে জিজ্ঞেস করা হোল—প্রথমে চাইলেন বোঝাতে কিন্তু তারপরে আমাদের না জানার ভাষা বুঝতে পেরে কি না জানি না নিজেই বললেন তাদের ভেতর একজন আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্ত—পথ হ'তে একটি হেভি ট্যাক্সিও ডেকে নিলেন আমাদের কিছু বলবার অবসর না দিয়েই—গাড়ীতে যেতেও বেশ খানিকটা সময় লাগলো আমাদের ব্যাঙ্কে পৌঁছতে ।

Bankএ দেখলুম ভ্রমলোক বেশ পরিচিত সকলকার সঙ্গেই—ব্যবসায় উপলক্ষে বহুদিন ধরে বসবাস এখানে, এটুকু শুধু জেনেছিলাম ভ্রমলোকের সন্ধক্ষে—ব্যাঙ্কের কাজও সন্ধ্যার ভাবে সবকিছু সমাধান হোল ভ্রমলোকের সাহায্যে এবং বেশ অল্প সময়ের ভেতরেই—তারপর ব্যাঙ্ক হতে কোথায় আমরা যেতে চাই জানতে চাইলেন—আমাদের পরবর্তী যাবার জায়গা ছিল Indian liason Offices এর বাড়ীতে—কিন্তু ভ্রমলোকের অমূল্য সময় এ রকম কোরে নষ্ট করবার ইচ্ছে আমাদের ছিল না—তাই অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নিজেরাই যেতে পারবো এবারে জামালুম—কিন্তু Liason Offices এর বাড়ীতেও এই প্রথম আমাদের যাওয়া জেনে নিয়ে হয়তো বুঝতে পারলেন সে গণ্ডে আমাদের একেবারেই অপরিচিত । কিন্তু টাকা ছিল তখন আমাদের সঙ্গে, তাই আমরা ভরসা পাচ্ছিলুম যেতে যথেষ্ট—আমাদের সকল আপত্তি হাসিমুখে মেনে নিয়ে আবার চললেন আমাদের নিয়ে লিয়ানস অফিসারের বাড়ী অভিমুখে—ভ্রমলোকের অবাচিত এই রকম সাহায্যে ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা ভারী মোহিত হোয়ে গিয়েছিলাম—শুধু তাই নয়, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে নি নিজেই এবারে বিদায় চাইলেন এই বোলে, এ স্থানের ধারে কাছে ট্যাক্সি মোটেও মিলতে চায় না, তাই আমাদের প্রথম থেকে নিয়ে যাওয়া ও আসার গাড়ীটি কোরেই ফিরে যেতে চান উনি স্বস্থানে—কিন্তু তা কি কোরে হয় ট্যাক্সির সকল পাওনা যে আমাদেরই চুকিয়ে দেওয়া উচিত—ভ্রমলোক এ থেকেও নিরস্ত কোরে দিলেন আমার হু'জন সঙ্গীকে তার নীরব হাসি ও বিনীত আপত্তিতে, এ এমনি একটি ব্যাপার খুব বেশী জোরও করা চলে না এতে—বাধ্য হয়ে কাঙ্ক্ষ হোলেন সঙ্গী হু'জন, ট্যাক্সির ভাড়াটা কিছুই নয় কিন্তু এ উপলক্ষ্যে একজন বিদেশী ভ্রমলোকের যে উদারতা ও মধুর ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হোলুম আমরা চিরকাল তা থেকে যাবে আমাদের শ্রুতির মণিকোঠায় । কত ভাবনা চিন্তা ও কত সন্ধ্যা নিয়ে এসেছিলাম প্রবাসে—তাই ভ্রমলোককে নিয়ে যখন ট্যাক্সি দূর হ'তে দূরান্তরে মিলিয়ে যেতে লাগলো তখন শুধু কবিরের কথাগুলো কানে বাজছিল, "আছে আছে প্রেম ঘুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে । মিথ্যার ঘেরা ছোট কণাটির তুচ্ছ করিয়া দেখিলে ।" "প্রবাস কোথাও শহিরে, শহিরে জনমে জনমে মরণে । বাহা হই আমি তাই হয়ে রব সে গৌরবের চরণে ।"

... এ সন্ধ্যার প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দিলওয়ারা মন্দিরে যেত-প্রস্তবে খোদিত একটি স্তম্ভের আলোক-চিত্র মুদ্রিত হয়েছে । চিত্রটি শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় গৃহীত ।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফেং চেং-শিয়াংএর সঙ্গে ওয়াংদের আলাপ খুব বেশী দিনের নয়।

বড়র খানেক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা চিয়েং-চাং হঠাৎ এনে হাজির করেছিলো চেং-শিয়াংকে।

জেনী তখন রাগান্বিত। মিনি সবে মাত্র ফিরে এসেছে লণ্ডন থেকে। বড়ো ওয়াং একটি দীর্ঘ দিবানিদ্রা শেষ করে উঠেছে কিছুক্ষণ আগে।

ওয়াংদের পরিবার এমনি খুব সাদাসিধে। অবস্থা বৃদ্ধ হলও নিজেদের চলাফেরা আদব-কায়দায় সাধারণ চীনা পরিবারের সমস্ত প্রথাই বজায় রেখেছে। সম্প্রতি ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী শুলে লেখাপড়া শিখলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোনো ফিরিঙ্গীঘানা ঢোকেনি তাদের বাড়িতে।

কিন্তু বড়ো ছেলে চিয়েং-চাং বদলাতে শুরু করেছিলো সম্প্রতি। দেখা গেল, হলিউডের চবি দেখতে দেখতে তার ইংরেজি কথাবার্তা একটু আমেরিকান ঢঙের হয়ে যাচ্ছে, তার চীনে কথার মধ্যে অনেক আমেরিকান বাক্য, গলায় জমকালো টাই, কিংবা গায়ে উগ্র রঙীন হাওয়াইআন শাট।

এ সব বর্বরদের দেশে বসবাস করার কোনো মানেই হয় না, সে বলতে শুরু করলো, “দেশ বলতে আমেরিকা। ওদের দেশে কী ক্রীডম।”

“সেখানে গিয়ে থাকলেই পারো,” জেনী একদিন হেসে বলেছিলো।

“সুযোগ পেলেই চলে যাবো,” উত্তর দিয়েছিলো চিয়েন-চাং, “হয়তো সুযোগ পেয়েও যাবো শীগগিরই।”

জেনী অবাক হয়েছিলো। সে বলেছিলো হাল্কা ভাবে এবং তাতে চিয়েং-চাং এতটা গুরুত্ব আরোপ করবে ভাবতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিলো, “সত্যি সত্যি?”

চিয়েন-চাংএর হাসি দেখে বড়ো ওয়াংও একটু চিন্তিত হয়েছিলো। জিজ্ঞেস করেছিলো, “সুযোগ পাবে মানে? সুযোগের চেষ্টা করছো নাকি?”

ছেলে উত্তর দিলো, “চেষ্টা তো করছি বেশ কিছু দিন থেকে। এখন যোগাযোগ একটু হয়েছে। আমার এক বন্ধুর একজন

আমেরিকান বন্ধু আছে। সে এখানে কনসালটে চাকরি করে। তার বাবার মস্তো বড়ো ফার্ম নিউ ইয়র্কে। সে তার বাবাকে লিখেছে, আমার একটা ব্যবস্থা যদি করতে পারে। ওর বাবার চিঠি পেলেই পাসপোর্টের জন্তে এগ্রাই করবো। তিসা পেতে কোনো অসুবিধাই হবে না।”

বড়ো ওয়াং কোনো উত্তর দেয়নি।

মিনি শুধু তেমে বলেছিলো, “ওখানে গিয়ে একটি হলিউডের ঠাঁর বিয়ে করতে ভুলো না।”

“করবোই তো,” বলেছিলো চিয়েং-চাং, “আমাদের এখানকার মেয়েদের চাইতে ওরা অনেক ভালো। তোমরা না জানো কথা বলতে, না জানো চলাফেরা করতে, না জানো মিশতে। আর ওদের মেয়েদের দেখ! কী সহজ ভাবে নেয় জীবনটাকে। তোমরা জানা রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে। আর কিছু জানো না।”

“রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে যে জানে,” বড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছিলো, “সে মেয়ে সবই জানে।”

সে কথার উত্তর না দিয়ে চিয়েন চাং বলেছিলো, “জীবনে কিছু করতে চাও তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো, বাইরে চলে যাও, যে দেশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে সেখানে যাও।”

“আমাদের দেশও তো বড়ো হচ্ছে, সেখানে গেলেই হয়,” মিনি বলেছিলো।

চীনে তখন গৃহযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে, কায়ম হয়েছে নতুন সাম্যবাদ।

চিয়েনচাং হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো, “বড়ো হচ্ছে! সেই ধারণা নিয়েই থাকো।”

জেনী, মিনি আর বড়ো ওয়াং মর্গাহত হোলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

শুধু ছোটো ভাই সূং-চাং বললো, “তোমরা যে যেখানে যাবে যাও, আমি কলকাতা ছেড়ে নড়ছি না। আমার এখানেই বেশ ভালো লাগে।”

জেনী মিনি একটু হাসলো, কারণ সূং-চাংএর সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে ওয়েলসলির এবং ফিরিজী মেয়ের সঙ্গে। স্মৃতবাঃ কলকাতা শহরকে তার ইদানীং স্বর্গ বলেই মনে হচ্ছে।

মাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব

সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বনুন বা কাজকর্মই বনুন ধুলোময়লায় ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ঝরঝরে বোধ করবেন। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।



চিয়েন-চাং বললো, “আমার বন্ধুকে একদিন এখানে নিয়ে আসবো। আলাপ করিয়ে দেবো সবার সঙ্গে।”

“সেই আমেরিকান?” বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

“না, এ আমাদেরই লোক। এর নাম ফেং চেং-শিয়াং।”

“ফেং? কোন ফেং? ট্যাংবার?”

“না, না, এখানকার লোক সে নয়। সে আগে থাকতো নানকিং-এ। ব্যাং অফ চায়নার বড়ো চাকরি করতো। যুদ্ধের পর ও দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে আসে। সেখান থেকে এখন কলকাতায় চলে এসেছে। এখানে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করে।”

তুনে জেনী মিনি একটু গম্ভীর হোলো।

“ওদের অনেক পয়সা,” চিয়েন-চাং বলে চললো, “ওর স্বর্গীয় বাবা এককালে ব্যাংক অফ চায়নার ডিরেক্টর ছিলো। ওরা ক্যান্টনের ফেং।”

“ক্যান্টনের ফেং?” বুড়ো ওয়াং আন্তে আন্তে মাথা নাড়লো। দেশে না গেলেও, দেশের অনেক খবর সে রাখে। ক্যান্টনের ফেং-রা খুব অভিজাত বংশ।

“সে এখানে কি করতে এসেছে?” বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

“বললাম তো, ব্যবসা করতে এসেছে।”

“ব্যবসা ফরমোসায় বসে করলেই পারতো।”

“ওর ইচ্ছে হয়েছে, কলকাতায় এসেছে। তোমাদের অতো মাথাব্যথা কেন?” বিরক্ত হয়ে বললো চিয়েন-চাং।

“ওর সঙ্গে তোমার বন্ধু হোলো কি করে?”

“ও অফিসে একটা কোটেশান চাইতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভাব হোলো। সে আমার লাঞ্চে ডাকলো। সেখানে বন্ধু হোলো। তারপর ওর বাড়িতেও গেছি। ওর একটি বোন আছে। নাম টিং-লিং। খুব শিক্ষিত, কালচারড, একমপ্রিশড। স্মন্দর দেখতে।

“ও, এই ব্যাপার?” জেনী আর মিনি হাসলো।

কিন্তু বুড়ো ওয়াং আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, “চিয়েন, আমরা ওয়াং, খুব সাধারণ লোক। ওরা ফেং। ফেংদের সঙ্গে ওয়াংদের বন্ধুত্ব হয় না। আমি তো কোন দিনই তুনি, দেখিনি।”

“বেশ তো, এবার দেখবে,” চিয়েন-চাং উত্তর দিলো।

“আগে বা হয়নি, এখন কি তা হবে?”

“ওহ য়, এটা ডিমক্রেসির যুগ, আর ফেং চেং-শিয়াং পাকা ডিমক্র্যাট। ডিমক্রেসি ওর রক্তে রক্তে এমন ভাবে মিশে গেছে যে কমিউনিস্টদের দেশে সে কিছুতেই থাকতে রাজী হোলো না। ও বলে, ও বছরখানেক পরে আমেরিকা চলে যাবে। ওর বোন টিং-লিং তো আমেরিকায় বড়ো হয়েছে। কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছে। আবার চলে যাবে।”

জেনী আর মিনি আবার মুখ টিপে হাসলো।

বুড়ো ওয়াং আন্তে আন্তে বললো, “দেখ চিয়েন, তোমার এসব কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না। আমরা এদেশে থেকেছি, বড়ো হয়েছি, এখানে ঘর করেছি, খুব দরকার না পড়লে যাবের ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আমি ভালো মনে করি না। দেশের অবস্থা এখন খুব গোলমালে, তোমাকে সেখানেও যেতে বলছি না। তবে আমেরিকাও আমাদের নিজের দেশ নয়, তাই এখানে থাবার সংস্থান

থাকলে এসব ছেড়ে সেখানে যাও, তাই আমি চাই না। যদি যেতে হয় স্ত্র-চাং যাবে। তুমি বড়ো ছেলে। তুমি বাড়ীতে থাকবে। তোমাকে তোমার বোনদের বিয়ে দিতে হবে। আমি বড়ো হয়েছি। আমার দেশাশোনা করতে হবে। আর তোমাকে বিয়েও করতে হবে। ওয়াং বংশ টিকিয়ে রাখতে হবে। পূর্ব-পুরুষদের আত্মাদের পরিতুষ্টি রাখতে হবে।—

“বিয়ে?” চিয়েন-চাং হেসে উঠলো, “এখন? অসম্ভব। আমার পছন্দ হবে এরকম মেয়ে এদেশে নেই। ঠ্যা, একটা ছোটো যে দেখা যায় না, তবে ওরা ঠিক এদেশের বাসিন্দা নয়।—

জেনী আর মিনি হেসে ফেললো।

বুড়ো ওয়াং গম্ভীর হয়ে বলে গেল, “দেখ, তুমি যদি টিং-লিং-এর কথা ভেবে থাকো তো আমি বলবো তুমি একটি আহাম্মক। ফেং-এরা কোনো দিন ওয়াং-দের বিয়ে করে না। তার উপর টিং-লিং আমেরিকায় বড়ো হওয়া মেয়ে। তবে সে যদি সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, তাহলে আমি বলবো সেটা ভালো কাজ হবে না। তাহলে তুমি অশুখী হবে, আমি অশুখী হবো। তোমার ভাই-বোনের অশুখী হবে।”

“কেন?” লাল হয়ে জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাং।

বুড়ো ওয়াং উত্তর দিলো, “টিং-লিং তোমার বোনদের মতো রান্না করতে পারবে না, ওদের মতো খাটতে পারবে না, কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তার উপর তুনেছি, এসব বিদেশী বনে যাওয়া মেয়েরা বেশী ছেলে-মেয়ে হওয়া পছন্দ করে না। সেটা ওয়াং বংশের পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয় নয়। পূর্বপুরুষের আত্মারা তাতে অসন্তুষ্ট হবেন।”

চিয়েন চাং হাসতে লাগলো বুড়ো ওয়াং-এর কথা শুনে। বললো, “তোমরা তোমাদের পুরোনো ধারণা নিয়েই আছো। সময়টা যে বদলে যাচ্ছে, তোমাদের সে খেয়াল নেই?”

“সময়টা যে বদলে যাচ্ছে সে খেয়াল আমার খুবই আছে, কিন্তু কতগুলো জিনিস যে বদলায় না, চিরকাল বা চলে আসছে, ভবিষ্যতেও তাই চলতে থাকবে, সে খেয়াল নেই তোমার মতো অর্বাচিনের।”

“বেয়ন?” ভুরু কুঁচকালো চিয়েন-চাং।

“তুমি কি বলতে চাও,” বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো, “সময় বদলে যাচ্ছে বলে মেয়েরা আর রান্না করবে না? তুমি কি বলতে চাও মেয়েরা আর ছেলে-মেয়ের মা হবে না?”

“বুড়োদের সঙ্গে তর্ক করা বুঝা,” উত্তর দিলো চিয়েন-চাং, “আমাদের কথা তোমরা বুঝবে না, তোমাদের কথা আমরা বুঝবো না।”

বুড়ো ওয়াং আর কোনো কথা বললো না। আন্তে আন্তে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

মিনি বললো, “কেন তর্ক করে বাবার মনে কষ্ট দাও? চুপ চাপ শুনে গেলেই পারে।”

“উনি যদি নিজে ইচ্ছে করেই কষ্ট পান, আমি কি করতে পারি বলো?”

জেনী জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা দাই-কো, একটা কথা বলবে?”

“কি কথা?”

“তুমি কি টিং-লিং-এর প্রেমে পড়েছো?”

“না, ঠিক তা’ নয়,” চিয়েন-চাং উত্তর দিলো, “আমরা এমনি বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।”

“বেশ তো। কিন্তু, তুমি যদি কোনো দিন ওকে বিয়ে করতে চাও, সে কি রাজী হবে?”

চিয়েন-চাং একটু মাথা চুলকালো, তার পর বললো, “দেখ, ও যদি রাজী হয়ও বা, আমি রাজী হবো না। তার আগে আমার অনেক টাকা দরকার। আর সে টাকা এদেশে হবে না। তাই ঠিক করেছি আমেরিকা যাওয়া। ওয়াশিংটন যাবে। আর আমেরিকা হোলো ডিমফ্রেসি। আমার বাবা কি আর ওর বাবা কে, ওসব প্রশ্ন ওদেশে ওঠে না। আমার টাকা থাকলেই হোলো। তা হলেই আর বিয়ে করায় কোনো অসুবিধে হবে না।”

“ও,” মিনি আন্তরিক ভাবে বললো, “ও, তাহলে তোমার টাকার জন্তে বিয়ে করবে।”

“তোমাদের মন অত্যন্ত ছোটো,” চিয়েন-চাং চটে গিয়ে উত্তর দিলো, “সে কথা কে বলেছে? আমি কতকগুলো প্র্যাকটিক্যাল সুবিধে অসুবিধের কথা বললাম মাত্র।”

“থাক, থাক, আর চট্টাচট্ট করতে হবে না,” জেনী মাঝখানে পড়ে বললো।

“ওদের কাউকে তো তোমরা চোখেও দেখনি,” বললো চিয়েন-চাং, আগে ওদের নিয়ে আসি আমাদের বাড়ি, তারপর যা হোক একটা কিছু ধারণা করে নিও।”

“টিং-লিংকেও নিয়ে আসবে?” মিনি জিজ্ঞেস করলো।

“না, টিং-লিংকে নয়। আগে চেং-শিয়াংকে নিয়ে আসি। একটু বাওয়া-আসা অস্বস্ততা সূত্র হোক। তারপর টিং-লিংও আসবে।”

“কবে আনবে?”

“আনবো ইতিমধ্যে একদিন।”

“আগে থেকে বলে রেখো কিন্তু—”

কিন্তু আগে থেকে কিছু বলে রাখলো না ওয়াং চিয়েন-চাং।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা এনে হাজির করলো ফেং চেং-শিয়াংকে, মিনি তখন সবে কাজ থেকে ফিরেছে, হাত-মুখও ধোয়নি, মুখটা তার ঘামে চিক-চিক করছে।

জেনী রান্নাঘরে ব্যস্ত। তার কোমরে জড়ানো এপ্রনটি আঁধা-ময়লা।

বুড়ো ওয়াং জানলার ধারে বসে বাইরের পৃথিবীকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করছে।

এমন সময় চিয়েন-চাং এলো। সঙ্গে এলো চেং-শিয়াং।

প্রথম আলাপ করিয়ে দেওয়া হোলো বুড়ো ওয়াং-এর সঙ্গে।

কিন্তু চীন দেশ ছেড়ে এসে কাণ্ড-তাণ্ড করতে ভুলে গেছে ফেং চেং-শিয়াং। সে একটু নড় করে বললো, “গ্যাড টু মীট ইউ।”

বুড়ো ওয়াং প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলো, তার অতিথিকে “তুমি এসেছো বলে আমিও খুব খুশী হয়েছি। ফেং-বংশের এক যোগ্য ব্যক্তির আগমনে ওয়াং পরিবারের এই ক্ষুদ্র গৃহখানি বৃদ্ধ হোলো। ওই চেয়ারখানি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। তুমি সেখানে বসে আমাদের কৃতজ্ঞতা করো।”

বিশুদ্ধ চৈনিক আশ্রয়নে ফেং চেং-শিয়াং একটু বেশ অপ্রস্তুত হোলো। একটু ‘বাও’ করে চূপচাপ নির্দেশিত চেয়ারটিতে বসে পড়লো।

“তোমার ভাই-বোনদের ডাকো,” চিয়েন-চাংকে বললো বুড়ো ওয়াং, “ওরা এসে আমাদের সম্মানিত অতিথির পরিচর্যা করুক।”

বাগের অতিরিক্ত সৌজন্যে চিয়েন-চাং-এর শরীর জলে গেল। কিন্তু কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে জেনীকে ডেকে বললো, “জেনী, মিষ্টার ফেং এসেছেন—।”

জেনী তেমনিই বেরিয়ে এলো, এমন কি কোমরের এপ্রনখানিও না ছেড়েই। জেনীর পেছনে পেছনে এলো মিনি, তার সেই চিকচিক মুখ নিয়ে।

অল্প ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সূং-চাং। চিয়েন-চাং চেং-শিয়াং-এর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলো।

চেং-শিয়াং তার স্বভাবসুলভ পাশ্চাত্য সৌজন্য প্রকাশ করলো।

মিনির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো সে। শীর্ণ দেহের উপর কর্কশাস্ত দিনান্তের স্নান মুখখানি তার ভালো লাগলো না। সে চোখ ফিরিয়ে তাকালো জেনীর দিকে।

জেনীর দেহের গঠন খুব মজবুত, সূঠাম। উজ্জ্বল আঁচে লাল মুখখানি বেশ ঢলঢলে, করশা। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলো চেং-শিয়াং।

জেনী তাকিয়ে দেখলো চেং-শিয়াং-এর চোখের দিকে। দেখলো—সেই চোখ, যে চোখ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনের অভিজ্ঞত জমিদারেরা তাকিয়েছে কর্কশ সূঠাম কৃষক-যুবতীর দিকে।

জেনী একটু হাসলো। ছুরির ধার মিশিয়ে দিলো সেই হাসিতে। শুধু জেনী বুঝলো আর চেং-শিয়াং বুঝলো। আর কেউ লক্ষ্য করলো না।

এক মুহূর্তের জন্তে লাল হয়ে উঠলো চেং-শিয়াং-এর কান। সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে খুব সহজ ভাবে বললো, “চিয়েন-চাং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আশা করি আমরাও খুব বন্ধু হবো।”

“হ্যাঁ, আশা আমরাও করি,” জেনীও উত্তর দিলো খুব সহজ ভাবে।

“এখন একটু চা খাওয়া যাক,” বললো চিয়েন-চাং।

“হ্যাঁ, চা এখনই এসে যাবে,” জেনী বললো।

“শুধু চা, আর কিছু নয়,” বলে উঠলো চেং-শিয়াং, “আমার অল্প প্রস্তাব আছে।”

সবাই তাকালো তার দিকে।

“আজ চিয়েন-চাং আর তার ভাই-বোনেরা আমাদের অতিথি। আমরা আজ দিনার খাবো বাইরে কোথাও।”

সেদিন থেকে ফেং চেং-শিয়াং-এর গতিবিধি সূত্র হোলো ওয়াংদের বাড়িতে। সূং-চাং-এর সঙ্গেও খুব সখ্যতা হয়ে গেল। মিনিরও মনে হোলো লোকটা মন্দ নয়। শুধু জেনী পছন্দ করলো তার এই আশা-বাওয়া। তবে মুখে সে কিছুই বললো না। বরং খুবই ভদ্র ব্যবহার করতো চেং-শিয়াং-এর সঙ্গে।

কিছু দিন পর এক দিন টিং-লিংকেও নিয়ে এলো চেং-শিয়াং। প্রথমটা তার পোশাক-প্রসাধন বর্ণ-বারণ ভালো না লাগলোও



তার মিষ্টি ব্যবহারে বুড়ো ওয়াংও যেন গলতে শুরু করলো একটু একটু করে।

বললো, “যতোই আমেরিকায় থাকুক, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হোক, চীনা মেয়ে চীনা মেয়েই থাকবে। আমাদের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি এত প্রাচীন যে, এদের এসব নতুন ভাবধারা উপর উপরই থেকে যায়, মনের গভীরে ঢুকতে পারে না।”

জেনী মিনি ভাবলো, টিং-লিং নাই বা হোলো আমাদের মতন, আমাদের দাই-কো যদি তাকে বিয়ে করে সুখী হয়, আমরা মানা করতে বাবো কেন? তা’ ছাড়া দাই-কো আমেরিকা এখন বাবেই ঠিক করেছে, সেখানে গিয়ে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করার চাইতে টিং-লিংকে বিয়ে করা অনেক ভালো। আর বাই হোক, ওয়াংদের রক্তে বিদেশী রক্তের ভেজাল থাকবে না।”

জেনী, মিনি আর টিং-লিং তেমনটা অন্তরঙ্গ হতে পারলো না অতো বাওয়া শেষেও, তবে একটা সহজ সম্ভাব গড়ে উঠলো তাদের মধ্যে।

চেন্-শিয়াংকেও দেখা গেল, খুব ভদ্র ব্যবহারই করছে জেনীর সঙ্গে। তার সেই অস্বাভাবিক কামনা-দহন চাউনি সে ওই প্রথম দিনই দিবেছিলো,—তার পুনরাবৃত্তি আর কোনো দিনই হয় নি।

সুতরাং এরাও যেতে শুরু করলো টিং-লিং চেন্-শিয়াংদের সাহেব-পাড়ার দ্যাটে। চেন্-শিয়াং কয়েক বার পাটি দিবেছিলো তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আরেক পরণের দ্রুতলয় সমাজ-জীবনের পরিচয় লাভ করেছিলো জেনী আর মিনি। তা’ ছাড়া হুই পরিবারের ভাই-বোনেরা মিলে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতো, এখানে ওখানে সেখানে।

একবার মিনি নিয়ে এসেছিলো আহ-কিমকে, চিয়েন চাংএর আপত্তি শেষেও। কিন্তু চেন্-শিয়াংকে দেখে আহ-কিম গভীর হয়ে গেল।

আহ-কিমকে দেখে ভুরু কুঞ্চিত করলো চেন্-শিয়াং।

“ও কে?” চেন্-শিয়াং জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাংকে।

“আমার বোন যেখানে চাকরি করে, সেই ফার্মের মালিক,” বললো চিয়েন-চাং, তার পর একটু হেসে জুড়ে দিলো, “এবং ভারী স্বামী।”

তুনে চূপ করে রইলো চেন্-শিয়াং।

“এই লোকটি কে? আহ-কিম জিজ্ঞেস করেছিলো মনিকে।

“ওই যে টিং-লিং মেয়েটি, যাকে বিয়ে করবে আমাদের দাই-কো, তার বড়ো ভাই।”

তুনে আর কোনো কথা বললো না আহ-কিম। তার পর

সারাটা কণ আহ-কিম আর চেন্-শিয়াং কেউ কারো দিকে তাকালোও না, কথাও বললো না।

সবাই চলে যাওয়ার পর চিয়েন-চাং মনিকে বললো, “আমি আগেই বলেছিলাম আহ-কিমকে ডেকো না। ওকে চেন্-শিয়াংএর ভালো লাগবে না। এখন দেখলে তো?”

“কেন? কি হয়েছে?” জিজ্ঞেস করলো সুং-চাং।

“সবাই জানে আহ-কিম মাও-সে-তুং সমর্থক আর চেন্-শিয়াং দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে এসেছিলো। এরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

“এটা কলকাতা,” উত্তর দিলো মিনি, “এবং বাড়িটা আমাদের।”

“বাই হোক, যেদিন এখানে ফেরা আসবে সেদিন আহ-কিমকে ডেকো না।”

সেদিন থেকে মিনিও মেলামেশা বন্ধ করলো চেন্-শিয়াংএর সঙ্গে। ও একা এলে আসতোই না ওর সামনে। শুধু টিং-লিং এলে, বেরিয়ে এসে একটু গল্প করতো তার সঙ্গে পারিবারিক সৌজন্য-বজায় রাখবার জন্তে।

জেনীও ফেরার সঙ্গে বেরোনো বন্ধ করেছিলো। তবে চেন্-শিয়াং এলে এমনি বসে গল্প করতো, চা খাওয়াতো, ভাবতো, বাই হোক, টিং-লিংকে দাই-কো বিয়ে করবে, সুতরাং এটুকু না করলে কি করে চলে! আহ-কিমকে মিনি বিয়ে করবে, তাই সে চেন্-শিয়াংকে না হয় এড়িয়ে চলে। ওদের রাজনীতি নিয়ে ওরা থাকুক। আমার কি? সবাই যে বার মতন সুখী হলেই আমি খুশি।”

চেন্-শিয়াং সাধারণত চিয়েন-চাংএর সঙ্গে আসতো, কিংবা যে সময় চিয়েন-চাং বাড়ি থাকতো শুধু সে সময়ই আসতো।

একদিন এলো যখন চিয়েন-চাং বাড়ি নেই, সুং-চাংও নেই, মিনিও কেয়েনি তার লগি থেকে, বুড়ো ওয়াংও ভেতরে ঘুমাচ্ছে। জেনী একটু অবাক হোলো।

জেনীর বিষয় চেন্-শিয়াং অনুধাবন করলো। বললো, “জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলেই এ রকম সময় এসেছি।”

বললো, “জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলেই এ রকম সময় এসেছি।”

“শুধু আমার কাছে? কেন?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“একটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে।”

“আমার সঙ্গে? কি কথা?”

চেন্-শিয়াং তার সোনার বাঁধানো দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “জেনী, আমার বিয়ে করবে?” [ ক্রমশঃ।

## উত্তরণ

### শ্রীসাধনা সরকার

গোধূলির ছায়াশ্রান স্বপ্নভরা রাতে  
সকরণ মূলতানে গেয়েছি সে গান  
বিরহের প্রবলগুণে শুনিবে সে সুখ  
আকাশের বুকে যদি পেতে দাও কান।  
অকম্পিত নিশীথের শূন্য গৃহপানে  
গায় মোর স্নানগতি, কল-শব্দহীন

শিশিরের গুঞ্জরণে ছেয়ে আসে হায়  
সত্তার অস্তিম গান—বেদনায় ক্ষীণ।  
রাত্রির নদীজলে ভেসে যাক তবে  
বিরহের প্রহরের আকাশ-প্রদীপ  
বিস্মৃতির বনতলে নিঃশব্দ ভারে  
করে যাক রজনীর গন্ধভরা নীপ।

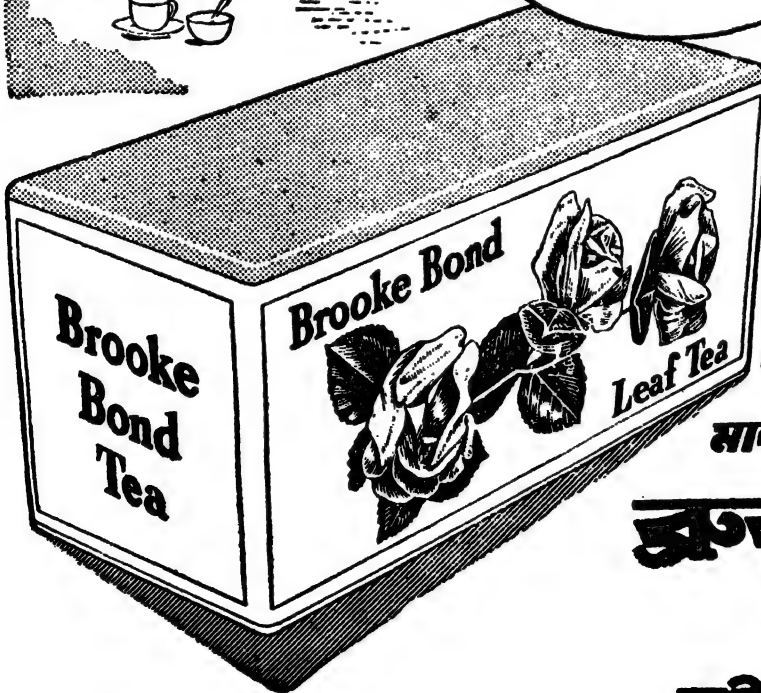


**সবাই  
ডানেন -**

লোকে রাজ  
স্নাড়ে পাঁচ কোটিরও  
বেশী কাপ  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
থিয়ে থাকেন

বাজারে  
**ব্রুক বণ্ড**  
চায়েরই কাঁচিতি  
সব চেয়ে বেশী

চটপট সরবরাহ  
করা হয় বলে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
একেবারে তজা থাকে

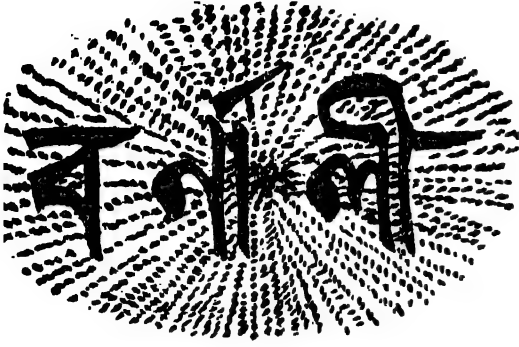


**এই জাতাই**

অন্য যে কোন  
মার্কী চায়ের চেয়ে

**ব্রুক বণ্ড  
চা**

বেশী লোকে খান !



মূলখা দাশগুপ্তা

পরীক্ষা শেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে ফলাফলের বে  
হুভাবনা আর অশান্তি ভোগ আরম্ভ হয়েছিলো, সে ভোগের  
শেষ হয়ে গেছে পাশের পবর পেয়ে। তা'র ওপর শুধু ভালো সখস্বই  
নয়, স্থির হয়ে গেছে বিয়ের দিন—মৌরীর মন নির্জন মাঠের একক  
সর্ষে ফুলটির মতো খুশীর বিস্ময়ের বাতাসে ভুলছিলো।

বর্তমানে ও ওর বসবার জায়গা করেছে বাড়ীর চিলেকোঠায়—  
যেখানে বসে দু'দিন আগেও কেবল পিট টান করে পরীক্ষার পড়া  
তৈরী করেছে। আজ আর টান হয়ে এমন একটানা পড়বার দরকার  
নেই। তাই সে আনিরে নিয়েছে একটা ক্যাশিসের ইজিচেয়ার।  
এতে গা ঢেলে বসে ও গল্প উপভোগ পড়ে—নয়তো তাকিয়ে থাকে  
আকাশের দিকে। ভাবে কত কি—বার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ  
নেই। ছোট বোন মঞ্জু অবশিষ্ট ওর এই আয়াস ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে  
তাতে ধনুকটান মেয়ে বলে, ইংরেজী সাহিত্যের মোটা মোটা বই  
যোগাড় করেছে, দেখ না কত! পড়বে তো নাই-ই আর পড়লেও  
ব্যব হবে ছাই। চলছে তো শুধু বসে বসে বিয়ের কথা ভাবা।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। একে বয়সটা স্বপ্ন দেখাও।  
তার উপর বিয়ে—মনটা কখনও ওর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসছে,  
কখন চাইছে গান গেয়ে উঠতে। সে দিন মৌরী ওর চিলেকোঠায়  
ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুজে গানই গাইছিলো—

‘দিনে দিনে কষ্টিন হলো কখন বুকের তল  
ভেবেছিলেম বরবে না আর আমার চোখের জল,  
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে

কান্না তখন থামে না যে—’

—‘এই দিদি, তুই এখন ও গান গাচ্ছিস যে?’

—‘কেন কি হয়েছে তাতে?’ জু কুঁচকে ছোট বোনের দিকে  
তাকাল মৌরী।

—‘বিয়ে ঠিক হয়ে বাবার পর কেউ ও গান গায়? আর যদি  
গায় তো তার বিয়ে শুকুণি ভেঙ্গে যায়।’

—‘গানটার অপরাধ?’

—‘হঠাৎ দেখা পথের মাঝে কান্না তখন থামে না যে—’ মা  
গো, কী ভীষণ গান! তোর বর এখন এ গান শুনলে বিয়ে ভেঙ্গে  
দেবে। পরে শুনলে সমস্ত জীবন তোর দিকে আড়নমনে তাকিয়ে  
থাকবে—আর পথে তুই পরিচিত, অপরিচিত বার দিকে বকুণি  
তাকাবি, তোর চোখে জল খুঁজবে। ‘কেটেছে একেলা বিবাহের  
বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে’ এছাড়া কনের মুখে গান মানায়?’

মৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বোনের কান্না চূলে কষে এক টান দিয়ে  
বলল,—‘বেশ তো ছিলাম আমরা ক’তাই-বোন। শেষকালে তোর  
মত একটা অতি কাজিল মেয়ে হবার কি প্রয়োজন ছিল?’

—‘আমি তোমাদের প্রয়োজনে নয়, জন্মেছি বিশ্বের প্রয়োজনে।  
গাগী, মৈত্রেয়ীর পর বন্ধা ভারত এই প্রথম আবার একটা কন্যাসন্তান  
উপহার দিয়েছেন মাতা ধরিত্রীকে। কিন্তু সে কথা তো বলে বিশ্বাস  
করান যাবে না, করে দেখাতে হবে।’

‘আচ্ছা বাপারটা কি?’ বৌদি এসে দাঁড়ালেন সামনে—‘তুমি  
সেই থেকে ছাদে বসে আছ, পান্ডা নেই—মঞ্জুকে তোমার ডাকতে  
পাঠালেন শিসিমা—তারও দেখা নেই। আজ সন্ধ্যায় বাস্তব জন্তে  
মেয়ে দেখতে যেতে হবে না?’

‘এমন একটা কথা ভুলে বসেছিলাম কমা নেই।’ মৌরী চুটল  
নীচে। এসে ঢুকল একেবারে ছোড়না বাস্তব ঘরে।—‘এই ছোড়না,  
ইটি, কাশি কমেছে তো? তোমার জন্তে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি, দেখা  
বেকবার মুখে আবার হ্যাঁচো দিয়ে বসো না।’

বাস্তবের অল্প-অল্পের সর্দি-কাশি নিয়ে বিছানায় শুয়ে বই  
পড়ছিল। হাত দিয়ে নিজের পাশটা দেখিয়ে বললো—‘শোন, বোস  
এখানে। কথা আছে।’

—‘সময় নেই। খুব চটপট সার।’ হাতে জড়িয়ে থোঁপা  
বাঁগতে বাঁধতে মৌরী গিয়ে বসল বাস্তবের খাটের উপর। ‘কি কথা,  
খুব ভালো করে দেখব এই তো?’

—‘ঠিক উল্টো! একেবারেই মানা করছি যেতে।’

—‘কেন?’ আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলো মৌরী।

—‘আচ্ছা’, হাতের বইটা বন্ধ করে উঠে বসল বাস্তব—‘এই যে  
তোরা এমন আয়োজন করে মাসী-পিসির সঙ্গে দল বেঁধে মেয়ে দেখতে  
গিয়ে বসিস, লজ্জা করে না তোদের? লেখাপড়া শিখেছিস,  
কচিবাধের গরু করিস, কিন্তু তোরা কি? নিজে তো বার চোদ্দ,  
নিবিকার চিতে গিয়ে বসলি সন্তার মাঝে। আবার চলছিস  
আরেক জনকে দেখতে!’

—‘মিথ্যা কথা। কক্ষণো সভায়-টায় বসিনি। আমি  
চা-খাবার সাজিয়ে ওঁদের ডেকেছি। সবাই এসে বসলে, সামনে  
উপস্থিত থেকে খাবার তদারক করেছি। কথা জিজ্ঞাসা করলে  
জবাব দিয়েছি, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তা মহিলা বা  
সদা-সর্বদা বাড়ী-ঘরে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় করে থাকেন। বিকার  
ঘটবে কেন?’

—‘তুই জানতিস নে দেখতে এসেছে তোকে?’

—‘এই কথা। ঐ সখস্ব নামটাতে তোমার আপত্তি? না,  
আমার অবশিষ্ট তেমন কোন সংস্কার নেই।’

—‘ঠাট্টা নয়, ও ভাবে পুতুলের মতো সাজিয়ে এনে দেখানোতে  
অসম্মান হয় মেয়েদের।’

—‘বেশ’, মৌরী যেন ভরু করবার জন্ত গুছিয়ে বসলো—‘তবে  
মানুষের বিয়ে হবে কি করে?’

—‘আসা-বাওয়ায়, আলাপে, পরিচয়ে।’

—‘বাঁচা গেল। একেবারে দেখাশোনা-বর্জিত নয়। তবে  
এমন দু’-এক ঘটনার দেখায় তোমাদের হচ্ছে না। আরো সময় চাই।  
তা বেশ, হলো আসা-বাওয়া, হলো আলাপ-পরিচয়। তারপর?’

—‘তারপর ভালো লাগলে বিয়ে।’

—‘না লাগলে?’

—‘হবে না।’

—‘অর্থাৎ কেটে পড়বে?’

মুখ-চোখের এমন ভঙ্গী করে কথাটা মৌরী বলল যে, বাস্তবের হেঁদে ফেলল। বললো—পরে কাটাকাটি হওয়ার চাইতে, আগে কেটে পড়া অনেক ভাল।

‘তোমাদের মেলামেশার বিষয়ে পরে আর কাটাকাটি হয় না—নিশ্চয়তা দিতে পারো?’

—‘না, তা অবশিষ্ট পারিনে।’

—‘পারলে একুশি হাতে হাত মিলাতাম। কিন্তু তা যখন নয়, তখন বেশী দেখার লাভটাকে—প্রয়োজনটাই বা কোথায়। তবু চললে বললে রূপে বৃদ্ধিতে দিনের পর দিন ভালো লাগিয়ে তোমাদের আকর্ষণ করতে হবে।’ রক্ষে করো, তার চাইতে এই আগার টের ভালো।’

‘এটা হুই পক্ষের কথাই হচ্ছে—ভালো লাগা-না-লাগাটা দুয়েরই।’

—‘আমাদের চলতি ব্যাপারটা কি একজনকে মতে, আর একজনকে গলায় দড়ি দিয়ে হয় না কি?’

—‘তোদের যে ভাবে দেখতে যায়, ছেলেদের কেউ সে ভাবে দেখতে গিয়ে বসে?’

—‘প্রয়োজন নেই। তোমাদের চেহারাটা নিতান্ত সাপ, ব্যাঙ জাতীয় না হলেই হলো। প্রয়োজন জান গুণ আর-বারের হিসেব দেখা—সেটা তো সামনে বসিয়ে দেখবার জিনিষ নয়, খোঁজ-খবরের। সে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় বৈ কি। বাছাই কি শুধু মেয়েই হয়? আমার বিশটা সখ্যক কি বাবা এক নাক কুঁচকে ভেঙ্গে দেননি?’

মঞ্জু এসে ঘরে ঢুকলো—‘না দিদি—তোকে নিয়ে পারা গেল না। ছাদ থেকে টেনে নামালাম, আবার এখানে এসে তুর্কে মেতেছিল? ছোট পিসিমা পর্যন্ত এসে গেছেন, আর আমরা এখনো তৈরীই হইনি। আজ বাবা রক্ষে রাখবেন না।’

মৌরী দৌড়ালো আনের ঘরে।

মেয়ে দেখে দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললে—‘ও বাবা, এ কি মানুষ না প্রতিমা যে দিদি?’

মৌরী মাথা নাড়ল। ‘হা বলেছিল। প্রতিমাই। কিন্তু মাটির নয়, প্রাণ আছে। এ মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করতে হবে ছোড়নার।’

বিপ্লবীক ভাতার গৃহে পিসিমাই কর্তা। তিনি নাকে চশমা এঁটে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখে সম্ভ্রষ্ট চিত্তে মন্তব্য করলেন, ‘হ্যাঁ, এ মেয়ে আমার বাস্তব কাছে লক্ষ্যের মতো মানাবে। ছোট পিসিমা তার মতামত সহজে বলে বসেন না। তিনি মনে করেন তাতেই গুরুত্ব বাড়ি।’

উদ্বিগ্ন মেয়ের মার মুখে দেখা দিল খুশীর কুতর্ভ হাসি। এলেন—আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আমার মেয়ের ভাগ্য। সাহস ছিল না আপনাদের ঘরে কথা তুলি। কিন্তু কর্তা বললেন, —‘কিছু চায় না গো, চায় শুধু নাত্র একটি সন্দরী মেয়ে। তা

ভগবান সব দিকে বাকিত করলেও মেয়ের রূপটুকু দিয়েছেন। তুমি চিঠি লিখে দাও মেয়ে দেখে যেতে। তারপর আমাদের বরাত।’

চকল মঞ্জু উঠে গিয়ে বসল মেয়েটির কাছে খোঁসে। চুপি চুপি বললো—‘বড় ভালো লেগেছে ভাই তোমাকে। একুশি ইচ্ছে করছে বাড়ী নিয়ে যেতে। জান, চীন দেশে নাকি কনে পছন্দ হলেই স্বতন্ত্র করে নিয়ে যাওয়ার রীতি। এ নিয়মটাই এখন আমার নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।’ আবার তফুশি মৌরীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—‘কিন্তু তোর বেলা নয়।’

বাড়ী কিরে হুঁবোন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। শাড়ী-কাপড়গুচ্ছ মেঝেতে বসে পড়ে বললো—‘না ছোড়না, পছন্দ হলো না।’

—‘আছে তো লিখিতে শ’বানেক। সব ক’টি বাড়ীর চা-মিষ্টি খস মা করে হবেও না।’

—‘না গো ছোড়না, এমন কত শ’কেন, লাখেও মিলবে না। খুঁব খুঁবী ফুলের মতো মাথা দেলাল মঞ্জু।

—‘একবারে এমন ভীষণ।’

—‘হ্যাঁ, মাথা ঘুরে যাবে চেহারা দেখলে! আমাদের তো গুঁই গিয়েছিল।’

বাস্তব গভীর ভাবে বললো—‘মেয়েটা যখন অল্প কোন মেয়ের রূপের প্রশংসা করে তখন বুঝতে হবে, সে মেয়ে যে বলছে ‘তার চাইতে অবশ্যই দেখতে খারাপ।’

মঞ্জু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো—‘হে মা কালী, তাই মন হয়। পাঁচ জোড়া পাঁঠা দেবো। একসঙ্গে এত রক্ত দেখে যদি ভয়ে কিংবা আনন্দাতিশয্যে দুর্জী যাও, চিন্তা নেই—খরে ডাক্তার জামাই আস’হ। আর তোমার চিকিৎসা দিয়ে ব্যবসায় বউনি করতে পারলে, খনবনে পসার তার আটকায় কে?’

উঠে দাঁড়িয়ে মৌরী হেসে বলল—‘খাই বাবাকে খবর বলে আসি গো।’ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জুও। দুবোনকে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাস্তব বললো—‘তোরা কি জোড়া-বাঁধা? এক জনের সঙ্গে আর একজন উঠে দাঁড়ালি? বোস না।’

হাসিতে ফেটে পড়ল হুঁবোন। ‘কি স্নানতে চাও বলো না? আজ্ঞা দাঁড়াও আসছি আমরা বাবার কাছে থেকে হয়ে।’

পরের দিন। বেলা তখন দশটা। বৌদি এলো ব্যস্ত পায়ে খবর নিয়ে—‘কী গগির বসবার ঘরে যাও বাস্তব। তোমাদের বড়না, বাবা কেউ বাড়ী নেই। একা ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি ছেলেটিকে।’

—‘ছেলেটি? কে সে ছেলে?’ ভিজ্ঞাসা করল বাস্তব।

চোখ-মুখ বোরালেন বৌদি। ‘কে, তা কি আমিই প্রথমে বুঝে উঠতে পারি। গা খুতে বাবার আগে গেছি বসবার ঘরটা একটু শুছিয়ে রেখে আসতে। ও মা, দেখি কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে। জানতে চাইলাম, কাকে চাই? এগিয়ে এসে বললো—‘লক্ষ্মী থেকে এসেছি। আমার নাম সন্দর্শন, কঙ্গকাতা আসতে হলো—বাবা বললেন একবার এখান হয়ে যেতে।’

লাফিয়ে উঠল মঞ্জু—‘তোর ভাবী বর দিদি! বাবা এবার ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে, হাট, লাংস মজবুদ কিনা দেখতে, মা গো—’ হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

বাস্তব্য হইতে উঠে দাঁড়ালো। আর মৌরী দাঁড়িয়ে রইল একটা বুক টিপ-টিপ নিয়ে।

বৌদি বললেন—‘আজই লক্ষ্যে চলে যাচ্ছে হাতের ট্রে। বলছে, বেশীক্ষণ বসতে পারবে না। তুমি চট করে তৈরী হয়ে নাও মৌরী! আমি বাচ্ছি পিসিমাকে খবরটা দিতে।’ বৌদি চলে গেলেন।

গায়ে পাঞ্জাবী চাপাতে চাপাতে বাস্তব বললো—‘আর কি, বাও। আবার সেক্ষেত্রে দাঁড়াও গিয়ে সা হয়ে।’

—‘আমাকে যেতে হবে কেন? আমার দেখতে এসেছে, এমন কথা তো বলেনি।’

আকাশের দিকে তাকালো মঞ্জু—‘দূর পাগল! তোকে দেখতে আসবে কেন? বাপ ছেলেকে আমাদের ঘরের আসবাব দেখতে পাঠিয়েছেন।’

—‘আসবাবই তো তোরা। বিক্রমে ঠোঁট বঁকালো বাস্তব। নিত্যদিন ঝাড়পোঁচ আর ঘসামাজার জৌলুস তুলে খরিকাবের চোখ ভোলাবার জন্য বসে থাকছিল।’

—‘এই ছোড়না, কথা বাড়িও না বলছি। শেষে পালাবার পথ পাবে না।’

—‘পালাবার পথ পাবে না।’

—‘হ্যাঁ পাবে না। জবাব দেবার মতো কথা মিলবে না।’

—‘এমনি সব ধারালো উত্তর রয়েছে। বেশ—রইল তোলা। দেখা যাবে কে কার হাতে বধ হয় আজ। আর দেহী করলে ভুল্লোকটির আমাদের ভুল্লতাবোধ সব্বক্ষে প্রথম দিনই একটা সন্দেহ এসে যাবে। আমি নীচে বাচ্ছি। তোরা তৈরী হয়ে আয়।’

এগিয়ে এল মৌরী। ‘দাঁড়াও ছোড়না, আমি তোমার সঙ্গেই আসছি।’

—‘এই ভাবে?’

—‘হ্যাঁ।’

মঞ্জু বলে উঠলো—‘কেন এ ভাবে যাবে না? এর ভেতরও বুঝি বার দু’তিনেক আরনায় দেখে নেরনি এই অগোছালো চেহারাও ওকে এখন বা সন্দেহ লাগছে, প্রমাণন করলে তার সিকিও লাগবে না।’

—‘তোকেও বেশ লাগছে। এ ভাবেই বারি, না সাজতে হবে?’

—‘তোর বর এসেছে, তুই সাজলি। আমি সাজবো! তোরা চাইতে চেহারাটা আমার ঢের ভালো—সে খেয়াল আছে? একটা সমস্তার সৃষ্টি হতে কতক্ষণ।’

—‘ওর সঙ্গে পারবিনে মৌরী। চল শীগগির।’ বাস্তব বোনদের নিয়ে ঢুকলো গিয়ে বসবার ঘরে।

সুদর্শন বসে বসে একটা বই-এর পাতা ওন্টাচ্ছিল। ওদের দেখে বই বেঁধে উঠে দাঁড়াল। বাস্তব নমস্কার জানিয়ে, একা বসিয়ে রাখবার জন্যে চাইল মাপ। তারপর হুবোনকে দিল পরিচয় করিয়ে। নমস্কার-বিনিময় করে আগুন গ্রহণ করল সবাই। গল্প শুরুতে লাগল বাস্তবর সঙ্গে সুদর্শনের। মৌরী বসে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আর মঞ্জু বসে রইল একটা অস্বাভাবিক গভীর মুখ করে। যে জিনিষে বত বেগ, তাকে

আটকাবার জন্যে প্রয়োজন হয় তত বেশী ওজনের চাপ। মঞ্জুকে দেখেও মনে হচ্ছিল ভীষণ একটা হাসির রেশের মুখ চেপে রাখছে ও ঐ রকম অস্বাভাবিক ওজনের গাভীরা দিয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—‘আপনাদের ওখানে মাছের দর কত?’

—‘মাছের দর!’ আশ্চর্য হয়ে চোখ তুলে সুদর্শন প্রথমে মঞ্জুর দিকে, তারপর মৌরীর দিকে তাকালো।

শুধু সুদর্শনই নয়, বিশ্বয়ে চোখ বড় করল বাস্তব, মৌরীও।

—‘হ্যাঁ মাছের দর।’ তেমনি গভীর মুখ মঞ্জুর।

মেডিকেল কলেজে পড়া ছেলে সুদর্শন সে-ও হকচকিয়ে গেল। সবিনয়ে বললো—‘মাছের দর বলতে পারবো না।’

—‘কেন?’ ভারী বিস্মিত মঞ্জু।

—‘আমি বাজার করিনে।’

—‘তবু?’

—‘হঠাৎ চাকর চলে গেলে কি করেন?’

হেসে ফেলল বাস্তব। ‘এ কি হচ্ছে মঞ্জু?’

—‘বাঃ বতই লেখাপড়া বন্ধক ঠেকা পক্ষের সঙ্গে যেয়েদের যেমন কিছু মেয়েলীকাজ জেনে রাখতেই হয়—ছেলেদেরও তেমনি কিছু জানা উচিত—নইলে সংসার অচল হয়ে ওঠার মতো বাহির অচল হয়ে ওঠে না।’

এবার হাসল সুদর্শন।—‘তেমন দিনে হোটলে খাব।’

পিসিমার ডাকে বেরিয়ে এসে বঁচল মৌরী। বৌদির দিকে তাকিয়ে বলল—‘কি দুর্দান্ত মেয়ে বে বাবা।’

—‘কেন কি করেছি আমি?’

—‘আর কি কি করবার ইচ্ছে ছিল আপনার?’

—‘বার জন্যে চুরি করি সেট বলে চোর।’ ছোড়নাটা সামনে কথা বলে চলেছে যেন ভুল্লোক ওকে দেখতে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। দিলাম কথার মোড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাবার ব্যস্ত করে—‘আমারই দোষ হ’ল?’

—‘না কিছু না।’ জান বৌদি, জিজ্ঞাসা করে কি না ‘মাছের দর কত?’

গালে হাত দিলেন বৌদি।

—‘তবে কি জিজ্ঞাসা করব? রবীন্দ্র সাহিত্য পড়েছেন? কবিতা কেমন লাগে? চিত্রতারকারের কে আপনার প্রিয়? আচ্ছা জুমিই বল বৌদি, তার চাইতে বাস্তবর দর প্রায়টা ভাল নয়?’

—‘খুব ভালো! কিন্তু পাত্র দেখলে কেমন, তাই বল এবার।’ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন বৌদি।

—‘অপূর্ণ। ভারী মিষ্টি দেখতে। ছোড়নার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন। মাথার চুলগুলি যে বাতাসে উড়ছিল তাই বা কি মিষ্টি। তুই এমন করে তাকাচ্ছিল কেন দিদি? একদিন তুই তোরা এক বছর বর দেখে এসে এক ডজন লিটি বলেছিলি, আমি শুনে রেখেছি।’

—‘ঐ যে পিসিমা বলেন, তোকে পুলিশ দিয়ে সামলাতে হবে, সত্যি তাই।’

—‘কে জানে, পিসিমাতার বাণী না জানি আমার জীবনের ডিবিয়াং বাণী!’ একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জু।

কিন্তু যে-ট্রেপে বাবার কথা ছিল সে-ট্রেপে সুদর্শনকে যেতে দিলেন





সুমিত্রা দেবী বলেন “লাক্স টয়লেট  
সাবানের শুভতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় দেয়।”

সুমিত্রা দেবী দুইবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক “বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী” নির্বাচিত হয়েছেন। এই তাঁর গুণের নিঃসন্দেহ প্রমাণ! কিন্তু তবুও শুধু প্রতিভা নয়, তাঁর আছে হৃকোমন সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যার জন্তে তিনি নানারকম চরিত্রে সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারেন।

এই লাবণ্য সুমিত্রা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেন বিশুদ্ধ এবং শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিয়ে। এই বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত মোলায়েম এবং সুগন্ধ ফেগার সাহায্যে আপনারও ত্বকের যত্ন নিন।



লা ক্স ট য় লে ট সা বা ন  
চি ত্র ভা র কা দে র সৌ ন্দ র্য সা বা ন।

সর্বদ্বীন সৌন্দর্যের জন্তে—  
বড় সাইজ কিনে খরচ বাঁচান।

LTS. 528-X52 BG

না মৌরীর বাবাই। বললেন—‘এমন ছোটোছুটি করে বাবার দরকার কি? একদিন দেখি করলে কি খুব অসুবিধে হবে?’

—‘তেমন নয়।’

—‘তবে আর কি। আজ এখানেই থেকে বাও।’

সন্ধ্যারাত্রে বেশ একটা জমাট আসর বসেছিল। কে যে কখন এক এক করে উঠে গেছে—মৌরী সন্ধ্যা করেনি। হঠাৎ খেয়াল হলো, মজু উঠে পাড়িয়েছে। আর ও চলে যাওয়া মানে সুদর্শন আরও একবারে একা পড়া। মজুর হাত চেপে ধরল মৌরী—‘তুই আমার কোথায় চললি?’

—‘হারাবয়ে। নদীতে নিঃসর হয়ে। নদীতে তোর তেতলার চিলকোঠায়।’

মজু বলল মৌরী—‘বাস বলছি।’

—‘এক পেছাটা গো সন্তান হাব?’ সুদর্শন মজুর দিকে চাইল।

—‘ফেল মারেন্তে। তা এ বাড়ীতে আপনার সন্তান আজ অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।’

মজু চলে গেল। সুদর্শন কমাল দিয়ে মুখ মুছল। যদি এমন ভারী কোচ না হয়ে বসবার স্থানটা হালকাজাতীয় কিছু হতো, তবে সে নিশ্চয়ই সেটা টেনে মৌরীর কাছে এগিয়ে আনত। একটু বুক বসে বললো—‘ভাবছি, বাবাকে গিয়ে মাথা ঠুকে একটা মস্ত প্রণাম করব।’

—‘কেন?’

—‘আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়, তাঁর নির্দোষে দুঃ হয়ে। কিন্তু আমাদের কি রকম লাগল জানতে চাইলেও আপনি তো নিশ্চয়ই মুখ খুলবেন না?’

চুপ করে রইল মৌরী।

—‘কি, বলবেন না তো?’

—‘এই সময়টুকুর ভেতর কি আর একজনকে চেনা যায়?’

—‘এইটুকু সময়! ভোর দশটা থেকে আটটা—পরিচয়ের আর চকিলাত ঘটা হয়ে গেল যে।’

তবু চুপ করে রইল মৌরী।

—‘আরো সময় চাই। বেশ! বর্তমানে যতটুকু গেছে, তাই বলুন না হয়?’

—‘পোষাক ভালো, চেহারা মন্দ নয়, হাইকম আলাপে দখল আছে।’

হেসে ফেললো সুদর্শন।—‘হাইকমের পাশের ঘরের সাক্ষাৎকার জট্টাই তবে আর সব জানা তোলা রইল।’

সুদর্শনের দৃষ্টি, তার কথা, গলার স্বর সব মিলিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে মৌরী। এবার ওটা ভালো কিন্তু যেই মৌরী উঠে পাড়িয়ে বললো ‘আসছি।’ অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাড়াল সুদর্শনও।

ওদের দুজনকে নিতৃত আলাপের সুযোগ দিতেই যে সবাই চলে গেলেন, এটা সুদর্শন ঠিকই বুঝেছিল। কিন্তু সুযোগটা সে কিছু নিয়ে ফেলল বেশীই। আচমকা কাছে টেনে আনল মৌরীকে। এত অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা মৌরীর কাছে যে, প্রথমে কিছু বুঝে উঠতেই পারলো না সে। তারপর সুদর্শন বধন ওকে ছেড়ে দিয়ে কের গিয়ে কোঁচে বসল, তখন হয় ও পাখর হয়ে গেছে, নয় গেছে

যরে। নইলে ছাড়া পেয়েও ও অমন স্থির দৃষ্টিতে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে পাড়িয়ে থাকবে কেন?

মৌরীর এ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ছিল না সুদর্শনের। সে ভেবেছিল, ছাড়া পাওয়া মাত্র ছুটে পালাবে মৌরী সন্ধ্যায়। এমন স্থির দৃষ্টিতে যে ওরই দিকে তাকিয়ে পাড়িয়ে থাকবে, বা কোন মেয়ে তা থাকতে পারে—এ পর্যন্ত সুদর্শনের জীবনে সে অভিজ্ঞতা হয়নি। অবশ্যটা হয়ে পাড়ালো উন্টো অর্থাৎ ওরই ছুটে পালাবার মতো। একেবারে এতটুকু হয়ে গেল সে। হাত জোড় করে কমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কি যেন বলতে বাচ্ছিল সে সময় প্রচুর হাতে পাবো, সেদিন আমি জিজ্ঞাসা করব কোথায় অপরাধ—আজ কমা চাইছি—

চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো মজু।—‘একি! হাত জোড় করে কি প্রার্থনা করছেন!’ সুদর্শনের হাতে চা দিয়ে মৌরীর দিকে তাকতে গিয়ে মজু দেখল, ওরই ভেতর কখন যেন সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

দীর্ঘ পায় একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলার চিলকোঠায় উঠে এসে ইমিচেয়ারটার উপর শুক হয়ে বসে রইল মৌরী। শুক হয়ে রইল ওর শরীরের সমস্ত রক্তকণিকা। অস্ত্র কোথাও এ অবস্থার ওরা শরীরময় মাতাল-মত্তা জুড়ে দেয়। কিন্তু যে শরীরে বাস করে, তাকে ওরা ভালো করেই চেনে। সেখানে মাতলামী করবে তেমন সাহস ওরা রাখে না।

কিন্তু সত্যি কি এতটা বিচলিত হবার মতো কারণ কিছু ঘটেছে?

কারণটা বাইরে খুঁজলে মিলবে না। অদেবগটা চালাতে হবে ভেতরের দিকে। মাটির সামান্য কম্পনেও বিশ্ব-সংসার কঁপে ওঠে, কারণ নাড়াটা দেয় সে বিশ্বের মূল ভিত্তি ধরে। সুদর্শনও নাড়াটা দিয়ে ফেলেছে মৌরীর চারিত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। একটা অতি উঁচু সুরে বাঁধা মন মৌরীর—প্রায় ক্যালিক মানের। সঙ্গীত-জগতের মতোই এমন মনেরও সমঝদার মেলা ভার। ওর সঙ্গে কাক বন্ধু গড়ে ওঠে না আর গড়ে উঠলেও ভাঙতে সময় লাগে না। বয়সখর্ষে ওদের কথা ওদের নতি যেদিকে গতি নেয়, মৌরী মুখ ফেরায় সে দিক থেকে। নতুন বিয়ে হয়ে আসা বান্ধবীদের নিয়ে কৌতুহলে কেউ মাত্রা ছাড়ালে মুখের প্রতিটি রেখার প্রকাশ করে বসে, এমন বিরাগ বা আত্মমর্গাদায় আঘাত করে। মনে মনে অপমানিত বোধ করে ওরা। বন্ধ হয়ে যায় বন্ধুদের মনের দরজা। এই একটি দরজাই ওদের মনের আছে। সেটা বন্ধ হলে আর কোন পথ পায় না মৌরী ভেতরে ঢোকবার। মন খারাপ করে এসে ঘরে বসে। শুনেতে পায় বন্ধুরা মন্তব্য করছে, অতি আনন্দোন্মাদিৎ মেয়ে ও। শুনে হাসি পায় মৌরীর। একটি রোম্যান্টিক মন পাওয়া জগতে যত দুর্লভ তার ভেতর একটিও বোধ হয় ওদের নেই। তাই অপপ্রয়োগে এমন নিঃসঙ্কোচ।

এমন মেয়ের মন পাওয়া কঠিন—সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বাড়ীর সবাই। তাই আগে থেকেই ওর মনটা তৈরী করে রাখার কাজে লেগে গিয়েছিলেন তাঁরা। পাত্রের বিভা-বুদ্ধি-ব্যস্তি-ঐশ্বর্যের বাণ এমন নিপুণতার সঙ্গে এক একটি করে নিক্ষেপ করে চলেছিলেন, যেন মৌরী মুখ ফেরাবার পথ না পায়। বধন ও-পক্ষ থেকে পছন্দ হবার খবর এলো, তখন সবাই মিলে এমন কাণ্ড জুড়ে

মিলেন, যেন অপ্রত্যাশিত নয়, অকল্পনীয় কিছু ঘটতে থাকে। স্বপ্ন দেখতে বা সাহস ছিল না তা চলেছে সত্য হতে।

ভয়ে ভয়ে এসে বোনকে জিজ্ঞাসা করেছিল মৌরী—‘কি করি বল ত?’

নিজের হৃচোখ বন্ধ করে দেখিয়ে দিল মঞ্জু—‘একবারে এমনি করে হৃচোখ স্টেটে বন্ধ করে বসে থাক।’

—‘চোখ বন্ধ করে বসে থাকব?’

—‘হাঁ। আর খুবই সেই শুভদৃষ্টির সময়ে। এর আগে নয়। সাক্ষ্যকারী মহারথীদের মানসপুত্রদের জন্ত বসে বসে মালা গাঁথছিল—মিস্বে? তোর ঘারা আপন স্বামী নির্বাচন জীবনেও হবে না। তাকে বিয়ে করতে হলে ধাঁদের নির্বাচনে করতে হবে, তাঁরা যখন এমন চাঁদ পাওয়া ভাব করছেন, তখন তুই চোখ বুজে বসে থাক।’

তাই থাকবে ঠিক করেছিল মৌরী। ছিলও তাই। সুদর্শন না এলে ও চোখ খুলত সত্যি শুভদৃষ্টির সময়েই। তাই যখন বৌদি এসে বললেন সুদর্শন এসেছে, তখন ওর বুকটা যে এমন টিপ টিপ শুরু করেছিল তার কারণটাও এই—যদি ভালো না লাগে! যদি মন বেকে বসে! কি দেখে বেকবে, কেন বেকবে, সবার কাছে যা তুচ্ছ মনে হবে বা কিছুই মনে হবে না তেমনি কারণে ওর মন কেন এমন বিমুগ্ধ হয়ে উঠবে, যে শত চেষ্টা করেও আর মুখ ফেরাতে পারবে না। নিজেও বলার মতো কোন কারণ হয়ত বের করে উঠতে পারবে না—কিন্তু—তা হলে কি হলো। যা হবার তা হয়ে গেছে। সুদর্শনকে ওর ভালো লাগেনি। ওর স্বপ্ন রুচিবোধে ওর স্বপ্ন মাথাবোধে হয়ত সে এর ভেতর বহু বার আঘাত করে ফেলেছে। কিন্তু আলাপে পরিচয়ে যখন ভালো লাগল সুদর্শনকে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মৌরী। রূপে সে কন্দর্প নয়। কিন্তু তার চেহারায় বা আছে তা রূপের চাইতেও মূল্যবান। একটা স্থির আত্মবিশ্বাস। এমন চেহারার ডাক্তার দরজায় এসে ঝাঁড়ালেই রোগী মনের বল ফিরে পায়। ডাক্তারের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন রোগীর মুখে গিয়ে পড়ে, তার বিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলে। মৌরী দেখল, কথা বলতে সুদর্শন জানে কিন্তু তবু সে সংযত-বাক। এই বাক-সংযম তার প্রকৃতিগত না অভ্যাসকে স্বভাবে ঝাঁড় করিয়েছে আপন ব্যবসার অঙ্গ হিসাবে, ও অবশিষ্ট তা বুঝে উঠতে পারেনি—তা যাই হোক, একটা মানুষকে ভালো লাগার পক্ষে এটা ওর কাছে একটা মস্ত গুণ। তাই অসাধ্য সাধন হয়ে গিয়েছিল। মৌরীর ভালো লাগে গিয়েছিল সুদর্শনকে। যত বার ওর দিকে তাকিয়ে সুদর্শন কথা বলেছে বা ফেলেছে এমন একটা অপরিচিত অমুভূতির স্রোত ওর শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে যে, মৌরী বিম্বিত না হয়ে পারেনি। কিন্তু সব কিছুর উপর নিজ হাতে যেন ছুরি চালিয়ে দিল সুদর্শন। পরিণতি লাভের জন্ত যে সম্পর্ক যতটুকু সময় চায়, যে ঘটনার জন্ত যতটুকু প্রস্তুতি কাল প্রয়োজন, সেটুকু দিতে অবসর না মানা—এ অস্বীকৃতি।

দিনটা অসহ্য গরম। পদ্বিমাণ যন্ত্রের পারদ ক’দিন ধরেই গিয়ে ঠেকেছে আট নয় ছাড়িয়ে। সন্ধ্যার দিকে যন্ত্রের পারদ নেমে এলেও গরমটা ধরে রাখে ইট, কাঠ, দেওয়াল। অল্প দিন বাতাস থাকে, আজ তা-ও নেই। একেবারে দমবন্ধ ভাব। দমবন্ধ হয়ে আসছিল মৌরীরও। যদিও কিছুক্ষণ আগে এর উল্টো। মনোভাবটিই কাজ করছিল ওর মনে—কিন্তু এখন মনে হ’তে লাগল কোথাও কিছু ভালো লাগার মত নেই। আকাশটা অতি বেশী নীল। তারাগুলো অতি বেশী জলজল। চাঁদটা যেমন কাছে, তেমনি বিজী রকমের বড়। বং ব্যবহারে সংযম নেই কোথাও। অতি কাঁচা শিল্পীর হাতের কাজ।

গলির ওপরের আমগাছটা তার গুঁড়িটি মাত্র গচ্ছিতে যেরূপ সমস্ত শরীরটা নিয়ে এসে ক’কে পড়েছে ওদের ছাদে। মঞ্জু বলে—‘ও ‘কাকু নয়’ হয়ে থাকতে চায় না। সেই গাছটা এখন কোঁপে উঠেছে বৈশাখী আমে। বং ধরা শুরু হ’লো বলে। সোভা হয়ে বসল মৌরী। আচ্ছা গাছগুলো যদি হঠাৎ হঠাৎ ভূঁইকোঁড় হয়ে বেরিয়ে এসে এক এক মাথা পাকাফল নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে ঝাঁড়াত? প্রকৃতি স্তম্ভলা, স্তম্ভলা হ’তেন ঠিকই কিন্তু তার শিল্পী নাম যুঁচত। পাতা খোলা, পাপড়ি মেলা, ফুল ফোটা, ফুলের ফল হয়ে ওঠা তার কাঁচা বর্ণে বং ধরা—এর একটা স্তরও সে জোর ক’রে এগুতে চায় না, এমন স্বপ্ন শিল্পীমুভূতি তার! ভালোবাসারও এমনি একটা ধাপে ধাপে পরিণতি আছে—সেও সময় চায় পাতা খোলায় পাপড়ি মেলায়। শিল্পিমনের অমুভূতিকাল ওতো সেটাই। শুধু ফলে লক্ষ্য তো লোভীর! কিন্তু তার শুভও তো সময় দিতে হয়। উপভোগ করতে না জানলেও অপেক্ষা করতে জানতে হয়। মৌরীর মনে হয়, অনেকটা রম্য পথ সুদর্শন ওকে হেঁচড়ে নিয়ে এল। পথ, সব কিছুতেই এই পথটাই তো সবচেয়ে মূল্যবান। পথের সাধনায় এক টুকরো হুড়ি ওঠে ভগবান হয়ে। নইলে ঘরে বসে যে পাথরের টুকরোটাকে মানুষ হুড়ি ব’লে ফেলে দেয়; চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, মরুপ্রান্তরের আগুনে ঢালা পথে পা ফেলে, হিমালয়ের বরফ ঠেলে—অনাহারে অর্দ্ধাহারে কত দুঃখের পথ অতিক্রম ক’রে—সে হুড়িকেই বুকে চেপে ধরে, মানুষ ভগবান বলে। পথের সাধনায় আপন অন্তরটাই হয়ে ওঠে তখন তাদের পবিত্রবেণী। চোখ বুজলে সেখানেই তারা ভগবানকে দেখতে পায়। কি ভগবানের ক্ষেত্রে কি ভালোবাসার ক্ষেত্রে, এ প্রশ্নটিটাই কি পুণ্য নয়? এই প্রশ্নটিটাই কি প্রেম নয়?

শুধু এই নয়, এই ঘটনার ভেতর দিয়ে মৌরী যেন সুদর্শনের চরিত্রের অনেক দূর পর্যন্ত দেখে নিল। একটি মেষকে কাছে টেনে নিয়ে তার চোঁট স্পর্শ করবার কাঁচা অবস্থা সে পায় হয়ে এসেছে। অভ্যস্ত—এতে অতি অভ্যস্ত সুদর্শন। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মৌরী। তারাতারা আকাশটাকে যদি টেনে নামানো সম্ভব হ’তো, তবে বুঝি সেটা দিয়েই মুখ ঢাকত মৌরী।

[ ক্রমশঃ।





সিরাজুল হক

তেজকালিমাধা হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ী ঢুকল অশোক। বেলা তখন প্রায় দুটো। দুঃসহ ক্ষুধা বারটার পর হতেই শুরু হয়; ক্ষুধা ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে পারে কিন্তু ক্ষত্রিরোজগারে নিহমামুখবিস্তীর্ণ চলে কৈ? নির্দিষ্ট সময়ে স্নান-আহার সব দিন হয় না। কোন দিন সাড়ে বাঘ, কোন দিন একটা-দেড়টা, আবার কাজের চাপে আটাইটা তিনটেও হয়ে যায় এক একদিন। আজ মেসিন ষ্টাট দেওয়া হয়েছিল সকাল ছ'টার। গাড়ী গাড়ী ধান আমদানী; বেলা দেড়টা পবন্তে মেসিনটার গোড়ানি যস্যস্যানি সমানে চলেছে। স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নগ্নর পাটনার মতিয়র রহমানের। মতিয়র পৌনে বারটার পর আর কিছুতেই মেসিন চালু রাখতে চায় না; এই নিয়ে অশোকের সঙ্গে প্রায়ই তার কথা-কাটাকাটি। মতিয়র বলে থাকে, টালবাহানা কেউ দ্ব্চোতে পারবে না রে! বাঙালীর এটি শেব বিধিলিপি। ধান আমদানী হবেই, তাই বলে সময়ে নাওয়া-খাওয়া না করে অসময়ে স্বাস্থ্যটা মাটি করবি? ভিটামিনের ডেক্সিসিয়েলী শতকরা নব্বই জনের। দুধ মাছ দেশ থেকে একরকম উঠে গেল। বি-এ চর্কি। সরবের তেলে শিরাগুল কাঁটার নির্ঘাস। চা-এ চামড়ার গুঁড়ো। ভেজাল আর ভেজাল; ভেজাল ছাড়া খাবার নাই, পানীয় নাই। মানুষ বাবে কি করে? পরমায়ু বাড়বে কিসে? অকালে ষাঁত ভাঙছে। চুল পাকছে। পাড়ায় পাড়ায় বন্দা, হাঁপানি। তার উপর বাবা এই হাসকিন মেসিন নিয়ে ধস্তাধস্তি; ধুলোগুঁড়ো হরদম নাক দিয়ে পেটে ঢুকছে, ফুসফুসে আঘাত হানছে। উঁহ, স্বাস্থ্যের দিকে খুবই খেয়াল রাখতে হবে, নইলে সবই বিকল। কল চালাবে কে?

মতিয়র অতিশয়োক্তি করে নাই। গত বছর অশোক পুরো ছ'বছর ভুগেছে। চিকিৎসার টাকাও কম খরচ হয়নি। কিন্তু তবুও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কাগুনগুলো সব সময় মেনে চলা যায়

না। যে পেশা পাঁচ জনের সহায়ত্বের উপর অনেকটা নির্ভর করে, যেটা একটা ব্যবসারই সামিল, সেখানে স্বাধীন কর্তৃত্ব চলেবে কি করে? অশোক একথাটা কিছুতেই পাটনার মতিয়র রহমানকে বোঝাতে পারে না। আর একটি ব্যক্তিও ভয়ানক অবুর। সে হল রমা। রমার অসন্তোষ বা অসুযোগটা শাড়ী-স্নো-পাড়িভারের বধারীতি সরবরাহের নয়। স্বামীকে অত্যন্ত বেধে সে মুখে আহার তুলতে পারে না অথচ অন্তঃসন্তা রমার গর্ভস্থ ভ্রূণ তাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই অশোকের বাড়ী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রমা প্রায় কঁদে ফেলল। অশোক কয়েক সেকেন্ড অপরাধীর মত ঝাঁড়িয়ে থেকে পরম প্রীতিভরে পত্নীর হাত ছ'খানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল—আজ থেকে তোমার কাছে আমি শপথ করছি রমা, আর কোনো দিন আমি এতো দেরী করব না। বারোটোর আগেই আমি চালু মেসিনও বন্ধ করে এসে নেড়ে-খেয়ে যাব, কেমন?

রমা উল্লাসে অক্ষ আঁচলে মুখে স্বামীর হাতখোঁওয়া জল, লাইকবর সাবান ও গায়ছা আনতে সেখান হতে চলে গেল। রমার গমন-পথে তাকিয়ে পরিশ্রান্ত অশোকের আজ অনেক কথাই মনে পড়ে বাচ্ছে পর পর। অনেক খোঁজ-খবর আর বাচাই করে বাবা যেদিন রমাকে ঘরের বউ করে নিয়ে এলেন, সেদিন বাবার সমবয়সীরা বলেছিলেন—ভায়া যে লক্ষী সরস্বতী দুটোকেই ঘরে এনে তুললে তে! যেমন ছেলে, তেননি বউ; এ একেবারে রাজঘোটক।

সত্যই রমা রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী। সেদিনের সেই লক্ষী সরস্বতীর আজ একি ছিবি! আজ কে বলবে এ সেই রমা? প্রতীমা বিস্ময়নের পর জল থেকে তুলে আনা খড়ের কাঠামোর মত রমার রম্য দেহ থেকে সব কিছু শিল্পসজ্জার অন্তর্হিত হয়ে রিক্ততায় হাঙ্গকার করছে। রমাকে দেখলে আজ আর চেনাই যায় না অথচ কি-ই বা এমন বয়স! ক'টা বছরই বা বিয়ে হয়েছে! দশ বছর আগে অশোক এম, এম ছাত্র, রমা বি, এস সির,। পূর্বরাগ বা রামায়ণের শ্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা একলা পরিণয়-ঘাটে এসে লাগেনি। অশোক জমিদারপুত্র, কোলকাতার পড়াশুনো করছিল। রমাও জমিদারকন্যা, কোলকাতার কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাবা। অশোক রমা কেউ কাউকে চিনতো না। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। ছেলেমেয়ের তত্ত্ববাস করে উভয় অভিভাবক একই ট্রেনের একই বগির বেঞ্চে পাশাপাশি বসে দেশে ফিরছিলেন, চার ঘণ্টার জার্নির ভিতর দু'জনের অভিভাবক আলাপনের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি এমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, চিরস্থায়ী রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করতে পাত্রপাত্রী চোখে দেখার পূর্বেই শুধু কানে শুনে এক রকম পাকা কথা দিয়ে দিয়েছিলেন।

বিয়ে হয়েছিল। অশোক এম, এ আর রমা বি, এস সি পাশ করে কলকাতার হোটেল ছেড়ে এসে দেশের বাড়ীতে দাম্পত্য জীবন শুরু করল। জমিদারী ছিল, আর বেশ কয়েক হাজার টাকা, পাকা বাড়ী, নায়েব-গোমস্তা-পায়দা-পাইক-চাকর-চাকরাণী, সবাব উপরে মাথার উপর বাবা। জীবনটা ছিল খুবই হালকা আর রঙীন, পাখা মেলে নীলাকাশে উড়ে চলবার মত।

ভূমিকম্প হল না বটে কিন্তু সব ভূমিসাৎ হয়ে গেল বৈ কি! বাচ্ছে, বাবে, বাবে না, এই করতে করতে এক দিন জমিদারী প্রথা

রহিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নায়েব, গোমস্তা, গ্যারদা, পাইক আপনা আপনি বরখাস্ত হল। বাবা গতায়ু হলেন। সিলুক খুলে দেখা গেল, সেটা সব সময় চাবি দেওয়া থাকলেও কাঁকা। অশোক ও রমার হাঙ্গা জীবন হঠাৎ দুর্ভিক্ষ হয়ে পড়ল। সেদিনের চক-মিলানো জমিদারবাড়ী, লতাপাতা সুশোভিত তোরণদ্বার, কাছারী-ঘর, নাট মন্দির সবই আছে কিন্তু তার প্রতি ইটে সমারোহের যে প্রতিধ্বনি তুলত, তা আজ গভীর বিষণ্ণতার মৌন, নিস্তরক, অপাংক্তেয়। দূর-দূরান্তের মহাল থেকে প্রজারা আসত। কাছারী-ঘরের মেঝে প্রজাদের আভূষিত প্রণিপাতের স্বাক্ষর আজও বহন করছে কিন্তু জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার পর প্রজাদের প্রণামাবনত মাথাগুলো বেন লৌহনির্মিত কুতুব-মিনারের মত আকাশ হুঁড়ে উন্নত শির হয়ে পড়ল। সেখান হতে জমিদার-বাড়ীটাকে আজ খুবই ক্ষুদ্র, খুবই করুণার স্থান বলে মনে হয়। এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে রমা এক এক সময় ইপিয়ে উঠে, ভয়ও করে তার। রমা অস্থবোগ করে—ওগো, তুমি তো বাইরে পাঁচটা লোকজন নিয়ে থাকো, আমি কি করে থাকি বল তো এই শূণ্য পুরীতে? হুপুরবেলায় তেতলার ঘরে শুতে গিয়ে গা আমার ছমছম করে। না বাপু, এখানে আমি থাকতে পারব না; এ নির্জন বাস তুলে দিয়ে অস্ত্র কোথাও বাই চলে।

অশোক বলে—জনতাকে আমরা যুগ-যুগান্তর ধরে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বলেই তো আজ নির্জনে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে হচ্ছে রমা! অজ্ঞতা, মূর্থতা, অজ্ঞায় ও শোষণের সুযোগ নিয়ে মানুষের

তরু সেলামই কুড়িয়েছি; তাই বলে কোলে ঠাই দিই নি তাদের। মানবদেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক আর সলাটদেশ আমাদের পদখুলিতে অপমানিত ও কলঙ্কিত হয়েছে রমা! নরকপী নাহায়ণের সেই অপমান, তিনি কি ক্ষমা করবেন আমাদের? তাঁর রক্তরোব থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই তো আজ নিঃস্বপনবাস করতে হবে এখানে। সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না আমাদের? তবে হ্যাঁ, তোমারই বা ভয় করার কি আছে? সেদিন চাঁদপুরের বোষ্টমী ঠাকুরপের কাছ থেকে যে মাহুলিখানা নিলে, সেটাতে কোন কাজ হচ্ছে না বুঝি? ভুত-প্রেত, ডান-ডাকিনী 'তো তোমার দেহের ত্রিগোমানার ভিড়বার কথা নয়, তবে বাড়ীটার চতুঃসীমা বন্ধ করতে হবে বৈ কি!

কথাটা শেষ করে অশোক নিজেই হেসে ফেলে। রমা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলে—তোমার সব কথাতেই 'জোক'। আমি কি মিথো বলছি? তুমি একদিন হুপুরবেলায় তেতলার ঘরে একা-একা শুয়ে দেখ না, ভয় করে কি না।

অশোক কণ্ঠস্বরে হঠাৎ গাঢ় প্রত্যায় এনে উত্তর দেয়—তুমি যা বলো তার এক বস্তিও মিথো নয় রমা, সে বিশ্বাস তোমার উপর আমার আছে। কথা হল এই যে, ভুত-প্রেতগুলো বড়ই বাবু আর আরামপ্রিয়। পাকা বাড়ী কাঁকা দেখলে আর কথা নেই। কোন সময় অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে জাঁকিয়ে বসে, দাপাদাপি করে দিন-হুপুরে। চর্যচোখে দেখতে পেলে তো কথাই ছিল না। লাগি-সেঁটা দিয়ে ঠাণ্ডিয়ে দূর করা যেত; তা যখন সম্ভব নয়, তখন

## বেশীর পিউরিটি বার্লি দেওয়া হয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

১) সন্তান প্রসবের পর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুগিয়ে মায়ের দুধ বাড়তে সাহায্য করে।

২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বার্লিশস্তের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।

৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শীল করা কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাঁটি ও টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

## পিউরিটি

ভারতে এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

বিনামূল্যে

“মায়াদের জানবার কথা”

পুষ্টিকাটির জন্য লিখুন :—অ্যাটল্যান্টিস (ইন্সট) লিমিটেড (ইংল্যান্ড-এ সংগঠিত)  
ডিপার্টমেন্ট, এক বি-পি-১, পো: বক্স ৬৬৪, কলিকাতা-১



PHY-1

PHY 272



বোষ্ট্রী ঠাকরণকে দিয়ে গোটা বাড়ীর চৌহদ্দিতে গাড়ী-চার মাছুলি পুঁতে দিলে কেমন হয়? তত্ত্বশক্তির মত আর শক্তি আছে? সব কুপোকাত হয়ে বাবে। তাই-ই করব রমা! এই শূণ্য পুরীতে একা যখন আমাদের থাকতে হবে তখন নিরাপদ পড়া হল বোষ্ট্রী ঠাকরণের তাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন মাছুলি ধারণ।

স্বামীর পরিহাস-উক্তিতে রমা মোটেই উৎসাহ বোধ করল না। বিমিত্র কণ্ঠে বলে—তুমি কি ভূত-শ্রেতে বিশ্বাস কর না?

করি। অশোক উত্তর দেয়—শ্রীমতী মনোব্রমা দেবী যদি সায়েলেক ছাত্রী হয়ে ভূত-শ্রেত বিশ্বাস করে, তা হলে তাতে অশোক বন্দোপাধ্যায়ের শোক করা মোটেই শোভা পায় না। করি, খুব করি।

রমা আর তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—‘হ্যাঁ গা’, যখন আমাদের জমিদারী ছিল, মহাল হতে প্রজারা আদিত থাকনা দিতে, নজর দিতে, বাবাকে প্রণাম করতে; গণগম করত কাছারী-ঘর। নায়েব, গোমস্তা, পায়ালা, পাটক, চাকর-চাকরাণী সবাই জমিদারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল এবাড়ী ছেড়ে। পুরোনো মনিব বলে কেউ তো থাকল না এক-আধ বছর এ বাড়ীতে?

আবার হাসালে রমা! অশোক প্রত্যুত্তর করে—নিমক খেলেই কি সকলের কাছ থেকে তার প্রতিদান পাওয়া যায় রমা? তা’ছাড়া মোটাকৈ মধু না থাকলে মোমাছির গুজনধ্বনি তো শোনা যায় না! এ তো স্বায়শাস্ত্র-সম্মত কথা।

রমা পূর্বকথার স্মরণে পুনরায় জিজ্ঞেস করে—‘হ্যাঁ গা, প্রজারা তোমার চিন্তে পাবে তো? রাস্তা-ঘাটে হঠাৎ দেখা হলে প্রণাম করে, পায়ের ধূলা নেয়? এত দিন তাদের জমিদার ছিলে বলে সন্মোচ-সমীহ করে? ‘বাবু’ বলে সম্বোধন করতে ভুলে যায় না তো তারা?

কী সব প্রশ্নাপ বকে যাচ্ছ রমা? অশোক রমাকে ধামিয়ে দিয়ে বলে—পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক বন্দোপাধ্যায়কে প্রজারা চিনতে পারবে না, এ কি বলছ তুমি? খুবই পারে। জমিদার-বাড়ীর জাতকর্ম থেকে শুরু করে জমিদার-নন্দনের জীবনের প্রতিটি বাপ আর তার অস্থানে অর্ধ-উপচার যে প্রজাদের ঘর থেকে এসেছে তারা চিনবে না তো চিনবে কে? তাদের সেদিনের খোকন বাবুর অন্তপ্রাশনে যে অননুষ্ঠি আমার কচি অধরোষ্ঠী স্পর্শ করেছিল, সে তো তাদেরই শ্রমজাত তুলকণায় তৈরী রমা? সোনার থালায় সজ্জিত অন্নভূষণের আড়ালে যাদের দান-হস্তের নীরব কল্যাণ কামনা ছিল, তারা কি ভুলতে পারে কখন? যে খোকন বাবুর উপনয়নে বিবাহের ভোজকাজে প্রজারাই স্তম্ভচিত্তে জুগিয়েছে পুকুরের মাছ, কলসী-ভরা দুধ, দই, ভাঁড়-ভর্তি শি, গামলা-ছাপানো ছানাবড়া-রসগোল্লা, বস্তাবন্দী চিড়ে-মুড়ি, সর্ক চাঙ্গ, সেই খোকন বাবুকে রাস্তাঘাটে দেখা হলে তারা পাশ কাটিয়ে চলে বাবে? রাজা-প্রজা সম্পর্কের চাইতে স্বদয়-রাজ্যের সম্পর্ক যে আরও বড় রমা! তুমি তো জান এম, এ পাশ করে বিয়ে হওয়ার পর বাবা যখন আমাকে জমিদারী দেখানোর কাজে তালিম দিতে লাগলেন, কাছারীতে বসে থাকতাম, প্রজারা মহাল থেকে এসে আভূষিত হয়ে

প্রণাম করত, পায়ের ধূলা নিতো; তাদের আনুগত্যান্বিত বৃত্তি আজও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। সেদিন নিজেই চরম পূজনীয় ও অভিজাত বলে মনে করেছি। আজও অভ্যাস বশত: প্রজারা অতীতের জমিদার বলে প্রণাম করলে, পায়ের ধূলা নিতে এসে কেমন বেন অপরাধী বলে মনে হয় রমা! মনে হয়, তারা পরিহাস করছে না তো? কী এমন স্মৃতি—সদাচার—সদগুষ্ঠান করেছে, যার জন্ত আজও তারা ভক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে ‘বাবু’ বলে সম্বোধন করবে? বিভামল্লির—হাসপাতাল—ধর্মশালা—চতুষ্পাঠী—প্রজাব হাড়ডাঙ্গা পরিভ্রমের অর্থেই এসব প্রতিষ্ঠান বাংলার জমিদাররা করেছেন রমা কিন্তু তবুও প্রজারা জমিদারের নামেই নালীপাঠ করে আসছে। বাসের অর্থে এই সব লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে তারা ভুলেও কোন দিন চিন্তা করে দেখেনি, এসবের প্রকৃত নির্মাণকারী ও প্রতিষ্ঠাতা কে? অপরকে প্রবঞ্চনা করে এরা অর্থ চতে চায়নি; যুগ যুগ ধরে শুধু দান করে গেছে নীরবে অগ্নির বন্ধনে। এমন এরা আত্মবিশ্বস্ত মতীয়ান মানুষ! কিন্তু তবুও বাংলার জমিদারকুল এত দিন কি কম নিখ্যাতন চালিয়েছে প্রজাদের উপর?

আমার বাবাও তাঁদেরই একজন ছিলেন। জমিদারের স্বদয়হীন শোষণ অত্যাচার অবিচারে প্রাণান্ত হয়ে যখনই তারা স্মৃতির পথ খুঁজেছে তখনই তাদেরকে দমন করতে কত হীন যড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে জমিদাররা, যার অলিখিত ইতিহাস আজ সীমাহীন, যুগায়তক। গুপ্ত ডাকাতিদল গঠন, অবাধ্য প্রজা শাস্তা করতে লাঠিয়াল পোষণ, গোপনে রাত্রির অন্ধকারে প্রজার ঘরে অগ্নিসংযোগ, জাল স্বাক্ষরটি তৈরী; চক্রবৃদ্ধি হারে স্তন, পরিশেষে অপের দ্বারে প্রজাকে বাপ-দাদার জিটমাটি থেকে চিবতরে উৎখাত। অকাল বিধবার মর্যাদাহানি করতেও এরা পিঁপড়া হয়নি সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে। সেই সব দুর্ভিক্ষ ও পানের দিবে বিবে বাংলার মাটি, বাংলার জল-বায়ু আকাশ-বাতাস সব বিবাক্ত নীল হয়ে গিয়েছিল। মানুষ-বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল লীগোবাসের দেশ। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয় রমা, জমিদারী প্রথা রক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রজাকুল সমস্ত গরল গলাধঃকরণ করে যেন নীলকণ্ঠ রূপ ধারণ করল! কোন বিচার তাদের দেখা গেল না; স্থির-শাস্ত সৌমভাব। জমিদারের পূর্বকৃত অপরাধ মুহূর্তের মধ্যে মরণে এলে তারা মারমুখো হল না; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে নিজের হাতে বিচারতাব নিল না। ক্রীতচত্বের দেশে ক্ষমাই ধর্ম-আদর্শ; প্রেমদান সেখানে শাস্ত রমা! কাজেই তোমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রজা প্রজাই আছে আজও। নাই জমিদার। জমিদারীহারা দল আজ প্রজার ঘাড়ে এক নতুন পোষাশ্রণী। কতকটা ভিখারীও বৈ কি?

অশোকের সব কথাগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত রমা সহিষ্ণুত্ব সহকারে শুনে যাচ্ছিল। প্রতিবাদ করে বলল—জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ার জমিদারশ্রেণী আজ ভিখারীর পর্যায়ে নেমে এসেছে। আমরাও কি তাই হবে?

—হ্যাঁ, রমা! অশোক বলে—আশ্চর্য্য হচ্ছে তুমি? ভিক্ষা সজা কি শুধু ঝোলা-মালা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘাট-এক করা?

মহুয্যকে খর্ব করবে, শ্রমদেবতাকে কঁকি দিয়ে অপরের অঙ্গে এত কাল যারা উদ্‌গুপ্তি করে আসছিল, আজ তা' হঠাৎ বন্ধ হয়ে বাওয়ায় মরাকাল্লা স্তব্ব করেছে। ক্ষতিপূরণ দাও, চাকরী দাও, জীবিকার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, কি খেয়ে বাঁচব, কি করে এত কালের মান-ইজ্জত বাঁচাব, এই ধরনের আরো কত আত্মমর্যাদা বিহীন আবেদন-নিবেদন। এ সব কি ভিক্ষারই সামিল নয় রমা? অক্ষমই অপরের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়, সক্ষম তো হয় না?

—আমিও তো একজন জমিদার-ঘরের মেয়ে, বউ। রমা বাথা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে—আমাদের জীবনের আজকের এই গ্রানি কি মুছে ফেলা যায় না?

—যায়। অশোক যেন অবচেতন অবস্থায় “যায়” এই শব্দটি উচ্চারণ করে মনের গভীরে কি একটা বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করছিল। পুনরাবৃত্তি করে বলে—যায়। ঐ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেই যায়। কিন্তু সে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে গ্রানি নাই, নাই হীনতাবোধ, মহুয্যকে খর্ব করার প্রয়াস; আছে দেবত্ব, আছে পরমার্থ লাভ। আড়াই হাজার বছর পূর্বে কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহ ধন ঐশ্বর্য্য শোষণ শাসন রাজস্বত্ব সর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করে মানব-জীবনকে গ্রানিযুক্ত করতে যে পথ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সেই সাধনাই আজ আমাদেরকে গ্রানি ও পাণযুক্ত করতে পারে রমা! ত্যাগ ও সাম্যের সেই মহিমাযুক্ত উদার অমুভূতি যদি আজ আমাদের থাকত, আসন্ন হিমালয় যদি তার আড়াই হাজার বছরের পুরানো আত্মার বাণী কান পেতে নতুন করে শুনত আজ, তাহলে রাজা-প্রজা স্বতন্ত্রকারী সব সম্পর্কের তিক্ততা অনিশ্চয়তা হতাশা নিরাশার অবসান ঘটত রমা!

রমা স্বামীর সুসজ্জত যুক্তি, নীতিবাক্য, উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা নিজের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দিয়ে বাচাই করে আকুলকণ্ঠে বলে—ইচ্ছাময় ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন!

## দুই

অশোক ও মতিয়ার পরস্পর সহপাঠী। গ্রাম্য পাঠশালা থেকে বি, এ, পর্য্যন্ত। অশোক আরও ছোটো বছর বেশী পড়ে এম, এ, ডিগ্রী নেয়। মতিয়ার বি, এ, পাশ করে চাকুরীতে ঢুকে প্রবাসবাসী হয়। দু'জনের গ্রামের ব্যবধান মাত্র এক মাইল। একই বাস্তা দিয়ে বই বগলে হাইস্কুলে পড়তে যেত। একটি খেলার মাঠেই হারজীবনে ফুটবল নিয়ে ছুটোছুটি করেছে। পুজো পার্বণে পরস্পর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হত। তা'হাড়া স্বামি জাম বনকুল বৈষ্ণব কতবেল প্রভৃতি পার্ববর্তী ঐশ্বর্য্য থেকে স'গ্রহ করে স্থল-কিরতি পথে যুগলক্কা সহযোগে ভ্রমণ করা এক রকম মনগুন্নি বিলাস ছিল। অশোকের মা দু'জনের বন্ধু দেখে পুলকিত হয়ে বলতেন—আমার অশোক ও মতি যেন জগাই-মাধাই।

মতিয়ার টিপ্পনী কেটে বলত—সে কি মাসীমা, আমি যে যুগ্মমানের ছেলে। অশোক জগাই হতে পারে, আমি কী করে নাগাই হতে পারি বলুন তো?

—কেন পারবি না? মাসীমা স্নেহসিক্ত হাসি হেসে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলতেন—তোর মা যদি আমার বোন হয় আর সেই সম্পর্কে আমি যদি তোর মাসীমা হলুম; তা হলে তুই মাধাই

হ'স না বোকা? হিসেব করে তাক। এই বুঝি লেখাপড়া শিখছ তোমরা?

—লেখাপড়া বলতে মাসীমা কী বুঝতেন তা জানা যায় নাই, তবে মাসীমার মাধাই সর্ব্বশেষ বি, এ, পাশ করে দেশে সরকারী চাকরী করতে করতে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক জেলা সূদূর চট্টগ্রামে ‘অপসন’ দিয়ে চলে যায়। কয়েক বছর সেখানে থাকার পর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে একটি অল্পত অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। স্থল সাব-ইন্সপেক্টরের পোষ্ট, সামাজিক সম্মানও আছে, বেকারপ্রাপ্তি যুগের মন্দ চাকরী নয়, ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলে কেন? কেউ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় মতিয়ার—পরগাছা আলোকলতার মত আর কত দিন শূন্য দোল খাওয়া যায় বোকা? শত চেষ্টা করেও পরের মাটিতে শিকড় গাড়ে পারলাম না। পরের রাষ্ট্রে চম্বার-টেবিলে বসে কলম চালানোর চেয়ে নিজের জন্মভূমিতে ধান ভেনে খাওয়া লাখ গুণের ইচ্ছত। তাই পালিয়ে এলাম চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে। ভাল করিনি বলছ?

প্রত্যুত্তর হয়—‘জননী জন্মভূমিঃ স্বর্গাদপি গরীমসী।’

মতিয়ার বলে—জন্মভূমির মহীমসী রূপের বল্লনা এর চাইতে আর বেশী কী হতে পারে বল? সেই দেশের বাপ-পিতাম'র বাস্তবীভে, শ্রাশান-গৌরবানের পুণ্যমাটির স্পর্শ থেকে যারা মানুষকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করে রাজনীতির দোহাই দিয়ে, তারা মানুষ; জগতের কোন ভাষার অভিধানে এমন কোন শব্দ নাই যা দিয়ে তাদেরকে অভিহিত করি।

অশোক যে কথাটি বল থাকে সেটাও মিথ্যা নয়—“Politics is the agitation of many for the gain of a few.” অতীতের বাট বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে কি এই কথাটাই প্রতিপন্ন হয় না মতি? তবে বুধা খেদ করছিল কেন? কার উপর দোষারোপ করবি বল?

মতিয়ার বিস্মিত কণ্ঠে বলে—কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন, আহা-বিহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি এক কথায় মানব-জীবনের স্তম্ভ ও স্তম্ভের বিকাশধারা যে নীতির সঙ্গে জড়িত, তা যদি সর্ব্বোপগম্যবদ্ধ হয়, তাহলে মানব-জীবনের কী সার্থকতা থাকতে পারে অশোক?

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জগ্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

অশোক এ বিষয়ে আর উপযুক্ত উত্তর না দিয়ে বলে—খাক্কে ও-সব কথা, ধান ভানতে শিবেব গান। মেসিনটা ক'দিন থেকে একটু ডিস-অর্ডার চলছে। কাল ধান ভানা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে কয়েকটা পার্টস খুলে দেখতে হবে কি হয়েছে কলটার।

বলতে গেলে পরিকল্পনাটা প্রধানতঃ মতিয়র রহমানেরই। বিদেশে চাকরী ছেড়ে চলে এসে মতিয়র এক রকম অধৈর্যে পড়ল। মাগসী-গণ্ডার দিন। মধ্যবিহীন সংসার, আজ শত অভাব অভিযোগ, সমস্তায় কষ্টকিত; তৃপ্তি বোগ্যতানুসারে কর্তব্যস্থান নাই। বিস্তর সাধ্যসাধনা, তবির তদারকের পর সরকারী বেসরকারী বা হোক একটা কিছু বোগাড় হলে তাকে বজায় রাখতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হীনমন্ত্রতার পরিচয় দিতে হয়। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর অশোকও ভরানক অন্ত্রবিধায় পড়ল; কিছু একটা না করলে দিন চলার দিন আর নাই। যুগটা স্পষ্ট পরিবর্তনের যুগ; অশোক মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করল এই বাস্তবতাকুঁহু। অশোক এম-এ। মতিয়র বি-এ। উভয়েরই শৈক্ষিক বোগ্যতা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বরাজনীতি নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, হুঁ-একটা সমস্তার সমাধানও বের করতে পারে অন্যায়সে তারা। আজ নিজেদের ভরণপোষণ জীবিকানির্ভারের উপায় নিয়ে গলদঘর্ম। স্বীম, ক্যাপিটাল, প্রেসিট এণ্ড লস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু ডিসকাসন, গবেষণা হয় কিন্তু কোনটাই সাব্যস্ত হয় না। অশোক অভিমত প্রকাশ করে—বাণিজ্যে বসতে লম্বীঃ। ব্যবসা-বাণিজ্য এই ধর কাপড়, মণিহারী কিম্বা মুনিখানার লোকান খুলে কেমন হয়?

মতিয়র গরবাজী। বলে—দারুণ ডিস-অর্ডার হতে হবে, নইলে মার্কেটে কমপিট করতে পারব না।

—আচ্ছা এ-সব বিজ্ঞানে তোমার যদি মত না হয় তা এলে কটেজ ইনভাস্ট্রি এই ধর হোসিয়ারী, উইভিং, কারপেনটারি, শিপিং।

—চলবে না। কঠোর বেন রাজ্যের প্রত্যয় জমা করে মতিয়র বলে—পূর্ববঙ্গের বাস্তবহারী এসে বেহ'স হয়ে হোসিয়ারী চালাচ্ছে।

—উইভিং?

—মাগে ট্রেনিং নিতে হবে। মাকু ঠেলাঠেলির ব্যাপার। পেন্সেল চাই, নইলে নুতো ছিঁড়বে।

—কারপেনটারি?

—পাড়াগাঁয়ের লোক কে কটা চেয়ার-টেবিলে বসে? দুয়ো-জানলা লাঙল-জোয়াল স্থানীয় মিষ্টিতে বা তৈরী করে তাই-ই কেনবার খন্দের থাকে না সব সময়।

—শিপিং?

—নেহাই—লোহা—হাভুড়ি—হাপর—চারটেকেই একসঙ্গে সামলাতে হবে। মতিয়র বলে—উছ' ও-সব পারবি না। আগুনের তাতে তাতে বলসিয়ে বাবি।

—এটা নয়, ওটা হবে না, তবে কচু করবি? অশোক কতকটা বিরক্তি হয়ে মন্তব্যটা করে।

মতিয়র চিন্তামগ্ন।

অশোক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে কতকটা আস্থার ভাব নিয়ে পুনরায় বলে—আচ্ছা, একটা এগ্রিকালচার ফার্ম করলে কেমন হয় বল দিকিন?

—এটা শ্রমিক অভ্যুত্থানের যুগ। মতিয়র বিজ্ঞোচিত মত

প্রকাশ করে—চাষবাসের কাজ হল অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। তা' ছাড়া নিজে কোদাল ফাউড়া লাগল জমিতে না চালাতে পারলে শুধু দিনমজুরদের উপর গুরোপরি নির্ভর করে ফার্ম চলবে না।

—বা হোক, এ বিষয়ে একটা কনক্লুসনে আসা চাই তো? অশোক বলে—না শুধু রিসার্চ আর স্বীম। বা হয় একটা ঠিক কর ভাই!

ঠিক যেটা হল, সেটা একটা হাসকিন মেসিন কিনে ধানভানা। মেসিনটার আদত দাম ও খরচ খরচা নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পড়ল। প্রতি মণ ধানের ভানাই বেট মোটামাটি আট আনা ফেললে দশ হাজার মণ ধান ভানতে হবে মেশিনের দাম ও আনুষঙ্গিক খরচ। টাকাটা তুলতে। তার পরে লাভালাভ। হিসাব কষে দেখতে গিয়ে অশোকের মাথা ঘুরে যায়। বস্ত্র—সরুনাশ, দশ—দশ হাজার মণ ধান ভানতে হবে রে? ক' বছর লাগবে তার ঠিক নাই!

আনুষঙ্গিকের উপর মতিয়রের অগাধ শ্রদ্ধা। শক্তিত হবার কি আছে? মেসিনটা তো হাটের পণ্যদ্রব্য আলু কচু পটল নয় যে, সময়ে কাজে না লাগলে পচে-খসে যাবে। হু' বছরের জাগরায় না হয় তিন বছর লাগবে দশ হাজার মণ ধান ভানতে, তার পরে তো প্রফিট আছেই। প্রতি মণে আট আনা।

ভবিষ্যৎ লাভের অঙ্কটা বিদ্যাতের ক্যালিকুল দিয়ে যার মতিয়র অশার আকাশে।

দেড় বছরের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দফা মেসিন বিগড়ে যে লোকসান হল তার পরিমাণ প্রায় বার তের শো টাকা। বেশ চলছে মেসিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মেকানিক এলো; তন্ন তন্ন করে দেখে কলকল্লা, বলল, ইনজেক্টর বিকল। সেটা যদি মেরামত হল যে মাস দুই পর 'গভর্নর'। 'গভর্নর' যদি সারাই হয় তো ক্যুয়েল পাম্প ক্যুয়েল পাম্প কেনো করে হুঁচার মাস চলার পর হঠাৎ বিকল হতে গড়ে পিস্টন। অশোক বললে—মেসিনারী মাত্রই রিপিরি তাছাড়া জীবনটাই বাস্তবিক হয়ে যাচ্ছে যে দিন দিন। এমনি ক' বছরদানবের পায়ে আমাদের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি বিসর্জন দিয়ে তা দাসামুদাসে পরিণত হবি? মনুষ্যত্বের প্রাণীও আত্মশক্তি-সম্পন্ন বস্তুদ্বারা কেবল করে আকাশ-মাটি-জল ডানা মেলে, চলে ফিরে সাঁতার কেটে চরে খুঁটে খায়। আর, আমরা মানুষ! হারিয়ে যে আমাদের সমগ্র সভা বস্তুদানবের কাছে। না—না—এ ভারতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী মতি; এ পেশা আমাদের ছাড়তেই হবে।

যুগবিষয়ে অশোকের কথাগুলো মতিয়র শুনে বাড়িল অশোকের মুখের পানে চেয়ে মতিয়রের মনে হল, হাজার হাজার বছর অতীতকালের গর্ভ হতে কে যেন একটি মানুষ এগিয়ে আসে মাটির পৃথিবীর দিকে। সমস্তাযুক্ত, শাস্ত, সৌম্যমূর্তি, হাতে তাঁকসলের স্বয়ম্যান। মতিয়র পরম শ্রদ্ধাপ্রসূত কণ্ঠে বলে—বেশ, তাঁ হল অশোক। কল আজ হতে চিরদিনের জন্য বন্ধ করলাম।

—হ্যাঁ, তাই করা ভাই! অশোক বলে—সব সমস্তার সমাধান করেছে যে মাটি সেই মাটিমায়ের কাছেই চলে কিংবাই মতি সেই অল্পপূর্ণা বস্তুদ্বার বৃকে।

—এগ্রিকালচার ফার্মের কথা বলছ?

—অশোক প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। মাটি মা—জমি—লাঙল—কদল।



ভিটামিন যুক্ত

কোলে  
K  
বিস্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর স্বাদু সম্মদ

খিনএরারকট

মেরী

পেটিটব্যুরো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রোমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্‌টী

যার্ভেলক্রোম

কাকেনয়ের

চকোলেটক্রোম

বেবীক্রোম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

# ম্যাগিফিক বাজেট



কি জন্মে যে ওর বাপ-মা ওর নাম দানী রেখেছিলেন, তা

আমার কল্পনারও অগোচর! যদি দানী নামের সঙ্গে দানের কোন নিকট-সম্বন্ধ থাকে, তাহলে নামটা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য ছিলো। বন্ধুত্বের পাতিরেও যে পরস্পর ব্যয় করতে কুণ্ঠিত, সে যে কাউকে খেছায় এক পরস্পর দান করবে, এটা অসম্ভব।

অফিসের মাসিক ছুটির সময় কত দিন ওকে চপ প্রভৃতি খাইয়েছি—ও অস্বাভাবিক খেয়েওছে কিন্তু একদিনও তার প্রত্যাশায় আমাকে বা অন্য কাউকে দানী খাওয়ায় নি। তাই যখন সে একদিন পরলা তারিখে ছুটির পর আমার তার সঙ্গে করে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো তখন কিছু অনুরোধী থাকা সত্ত্বেও কোতূহলই জন্মী হলো। হঠাৎ এই কোতূহলের খেসারত হিসাবে সারি রাত লীলার নিঃশব্দ বাক্যবাণ আমার সহ্য করতে হবে। কারণ তাকে নিয়ে আজ প্রথম শোতে সিনেমা বাবার কথা ছিলো।

“মিছামিছি বাস কম্পানীকে পরস্পর না দিয়ে পাদবানের আশ্রয় নিয়ে গল্প করতে করতে যাওয়াই ভালো, কি বলে?” দানী প্রস্তাব করলো। আমি মোটেই হাঁটতে পারি না কিন্তু আজ দানীর কোন কথাতেই না বললাম না। কিন্তু না বললেই ভাল হ’তো, কারণ, দানীর বাড়ী গেয়ো লোকের তথাকথিত “পোটাক পথ” মাত্র দু’রে এবং যখন আমরা তার বাড়ী পৌঁছালাম তখন আর আমাতে আমি নেই। রাস্তায় দানী শুধু তার স্ত্রীর কথাই বলতে লাগলো, কাজেই বলা বাহুল্য, তার অর্ধেক কথাও আমার কানে যায় নি। তবে যেটুকু গেল তাতে বুঝতে পারলাম যে, তার স্ত্রী বন্ধনে স্রোপদী, বিজ্ঞার লীলাবতী এবং সরলতার শিশু (অবশ্য দানীর মতে সরলতা মানে সাজসজ্জাবিরহুতা)। বিশ্বনিন্দুক দানীর মুখে প্রশংসা পাচ্ছে এ-হেন লোককে দেখবার ইচ্ছা আমার পঞ্চরাস্তিকে অনেক পরিমাণে লঘু করে আনলো।

যখন দানীর ঘরে পৌঁছালাম, তখন ঘরে ঘরে সাক্ষ্যপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে। কড়া নাড়তে দানীর স্ত্রী রাণী এসে দরজা খুলে দিলো। আমার মুখে শ্রান্তির চিহ্ন, দানী বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হলো আর বললো, “হেঁটে আসলে সাক্ষ্যভ্রমণও হয় আর পরস্পর বাঁচে। আর তোমরা বারা খুব কম হাঁটো তাদের খিদেও পায়।

রাণীর হাতের “শঙ্করপারা” খেলে তোমার মুখের রুচি ফিরে যাবে আর হাঁটোও নিরর্থক হয় নি মনে হবে।”

প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটতে বেশী সময় লাগলো না। কথাবার্তার রাণী বেশ চতুর বলেই মনে হোল; তবে তার সরলতা অর্থাৎ সাজসজ্জাহীনতা কতকটা খেছায় এবং কতকটা দানীর প্রয়োচনার, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা যখন কথা-বার্তায় মগ্ন তখন দানী ছোট ছোট কাগজের পুঁটলি করছিলো। তার স্ত্রীরও মুখের সঙ্গে হাত চলছিলো। প্রথমে আমি ওদিকে তত নজর দিইনি। মনে কেবলিলাম অল্প খরচে সময় কাটানোর এ এক নতুন ফিকির হবে। কিন্তু যখন দানী প্রত্যেক পুঁটলীর মধ্যে কিছু কিছু পরস্পর রাখতে লাগলো এবং কালী দিয়ে পুঁটলিগুলির উপরে কিছু লিখতে লাগলো তখন আমার কোতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। আমি দানীর হুঁতলা জ্ঞানতাম, লোকচর ঝাড়বার সুযোগ কখনও সে উপেক্ষা করতো না। তাই চূপ করেই রইলাম এই ভেবে যে, দানী আপনাই বলবে, কেন সে পুঁটলি বানাচ্ছে এবং তার উপযোগিতাই বা কি।

কিছুক্ষণ পরেই তার মুখ খুললো, “তুমি প্রায় আমার মতন মাইনে পাও এবং আমারই সঙ্গে চাকরীতে ঢুকেছো। যে রকম বাজে খরচ করো হাতে বোধ হয় কিছুই রাখতে পারো নি। অথচ দেখ আমি আর বছর পাঁচেকের মধ্যে একটা ছোট বাড়ী করবার মত পরস্পর জমিয়ে ফেলবো। এখন অবশ্য মজার আছে কিন্তু বুড়ো বয়সের জন্ত বা অসময়ের জন্ত সঞ্চয় না করলে পরে পস্তাবে।” গৌরচন্দ্রিকা সেরে দানী কিছুটা দম নিয়ে নিলো। বুঝলাম এবারে রহস্য প্রকাশ হবে। “আমাদের আর যখন সীমাবদ্ধ তখন ব্যয়ের অঙ্ক যাতে মাত্রা ছেড়ে না যায় বরঞ্চ উল্টে কিছু টাকা প্রতি মাসে আমাদের হাতে উত্তর থাকে তাই আমি অনেক দিন ধরে একটা উপায় অবলম্বন করেছি। কাগজের পুঁটলী করে এক একটা পুঁটলীতে এক একটা দরকারী খরচ বাবদ টাকা রেখে দি এবং সাধ্যমত সেই টাকার সেই খরচ চালাতে চেষ্টা করি। কোন খাতে বেশী খরচ হ’লে প্রায়ই অন্য কোন খাতের বাঁচা টাকার থেকে তা পূরণ হয়। যেমন ধর দাড়ি কামানোর পুঁটলীতে ১২ টাকা, ক্রি় পুঁটলীতে ৩ টাকা রাখি। এই রকম ভাবে সমস্ত খরচের জন্ত টাকা তুলে রেখেও আমার মাসে মাসে ৪০০ টাকা বাঁচে।

রাণী অবশ্য ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই চা এবং “শঙ্করপারা” এল এবং খিদে জন্মেই হোক বা দানীর সাহচর্যের গুণেই হোক, বেশ রুচির সঙ্গেই সেগুলোর সম্ব্যবহার করলাম। এই রকমে আরও কিছুক্ষণ কাটলো। তারপর আমি হুঁজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমার অবচেতন মনেও যে পরস্পর জমাবার গুটি বাসা বাঁধছিলো তার প্রমাণ পেলাম ঘরে গিয়ে। লীলা মুখ গুমোট করে দরজা খুলে দিলো। সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপ না করে বললাম, “বিকানের জলখাবারের জন্ত রসগোল্লা সিদ্ধাড়া প্রভৃতির দরকার কি? আজ দানীর বাড়ীতে “শঙ্করপারা” যা খেলাম সিদ্ধাড়া তার কাছে কোথায় লাগে! আসল কথা, খিদে পেলে যা খাও তাই মুখে অমৃত লাগে—আর কাউ হিসাবে পরস্পর বাঁচে। আমি মনে করছি, রাজ অফিস থেকে হেঁটেই বাড়ী



ফিরবো আর জলখাবার সিনেমা প্রভৃতি বাজে খরচগুলো বখালাধ্য কমিয়ে ফেলবো। এই করে দানীটা বেশ পরসা জমিয়ে ফেলেছে, আমরাই বা পারবো না কেন?

লীলা তবুও চুপ করে রইলো এবং নিঃশব্দে আমার জলখাবার নিয়ে এলো। আমি শুধু চা'র কাপটা নিয়ে বললাম, “আর কিছু আমি খাব না, দানীর বাড়ীতে খেয়েছি।” তার পর আমিও বিভিন্ন কাগজের পুঁটলীতে বিভিন্ন খরচের পরসা তুলে রাখলাম। দশ টাকা সিনেমা, হোটেল প্রভৃতির জন্যে আলাদা রাখলাম।

রাত-ভোর লীলা মুখ খুললো না, তবে সে কথা বলতে স্বভাবতই ভালবাসে; তাই সকালেই আমাদের মিটমাট হয়ে গেলো। অবশ্য একটু দুঃখের সঙ্গেই সে আমার পরসা জমানোর নৃতন ফিকিরে সহযোগিতা করতে সম্মত হলো। কারণ, সিনেমা দেখার সখ ওর বিলক্ষণ থাকার দক্ষণ সেই খাতে পরসা অপব্যয় রাখা হয়েছে বলে ওর অভিযোগ।

দিন কতক বেশ চললো। অফিসে দানী ছাড়া আমি বড় একটা কাজের সঙ্গে মিশি না, কাজেই হোটেলের বাজে খরচ হয় না। দানীও আমার বদলাতে পেরেছে দেখে খুব খুসী, একদিন গিয়ে দেখি, আমাদের পুরানো টাইপিষ্ট কেউ ছুটিতে গেছে এবং সেই জায়গায় এসেছে একটা চটপটে কেতাছরম্ব মেয়ে, নাম নলিনী, ক্রমশঃ আমাদের আলাপও হলো। দানী আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে সতর্ক করে দিলো, যেন আমি নলিনীর সঙ্গে বেশী দহরম মহরম না করি।

দুপুরবেলায় চা খাবার ছুটির সময় অবনী নলিনীকে বললো, “চলুন চা খেয়ে আসি।”

“আপনিও চলুন না” নলিনী আমাকে অনুরোধ করলো। দিন কতক বন্ধ করার পর পুরানো অভ্যাসটা মাথা চাড়া দেওয়াতেই

হোক, বা একজন মহিলার প্রথম অনুরোধ এড়াবার অক্ষমতাতেই হোক, আমিও ভিত্তে বেড়ালটির মত তাদের অনুরণন করলাম। খাওয়াটা চা দিয়ে শুরু হোলো বটে, তবে আনুসঙ্গিক আরও অনেক কিছু এলো এবং শেষ পর্যন্ত বিলটা টাকা পাঁচেক অবশি গেলো।

ইচ্ছা করেই হোক বা আমার দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, বিল শোধ করতে গিয়ে অবনীর মুখ চুপ হয়ে গেলো। “পাসটা আনতে ভুলে গেছি” কাতর মুখে সে বললো। অগত্যা আমাকেই বিলটা শোধ করতে হ'লো। অবনী অবশ্য বললো বটে, তোমাকে পরে দিয়ে দেবো, কিন্তু আমি জানি, সে আর দেবে না বা দিলেও আমি নোব না।

আমি শুকনো মনে (বাইরে কাঠ-হাসি বজায় রেখে) আবার কাজে কেবং গেলাম। এক হস্তার মেহনত এক ঘণ্টায় গেলো, বাড়ী ফিরে ভাললাম, স্ত্রীকে বঞ্চিত করে অপরকে (তা তিনি মহিলা-বন্ধুই হোন) হোটলে বা সিনেমায় নিয়ে যাওয়া অনুচিত। পরসা জমানো আমার দ্বারা হবে না। আমার প্রকৃতিই অন্তরূপ, তার চেয়ে খরচ করে দাম্পত্য-জীবন যাতে সুখে কাটাতে পারি, তার চেষ্টা করাই ভালো। লীলাকে বললাম, চল আজ “প্রকৃতিতে” একটা ভাল সিনেমা আছে দেখে আসি।

এক সস্তার মেঘ কেটে গিয়ে লীলার মুখে আবার স্বন্দুর দেখা দিলো। \*

অনুবাদিকা—অনুরাধা ভট্টাচার্য্য।

\* “সুগন্ধা” দানী-সংখ্যায় প্রকাশিত V. V. Bokil-এর একটি মারামি গল্পের ছায়াবলধনে।

## তমসো মা জ্যোতির্গময়

### তপতী মুখোপাধ্যায়

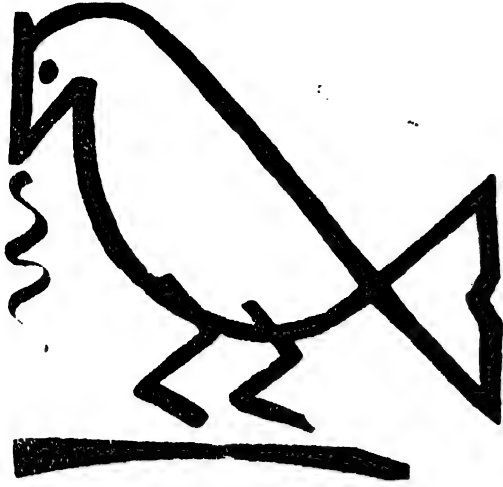
অস্তর-মাঝে চেনাকপিলী স্তম্ভমগনা জননী মোর,  
এত কশাঘাত মানব জীবনে তবু মোহ-যুম ভাগে না তোমার।

বাহিরের বত মোহ উপচার অস্তর-মাঝে চক্ৰ বচি,  
জয়ের বাঁধনে সহস্রপাক বাঁধিয়া রেখেছে কেমনে বাঁচি?  
সে উপকরণ নহে তো জননি আমাদেরই কোনও সৃষ্টিলালা,  
তোমারই সে কোন প্রিয় বহুর্ভূত মেলিয়াছে এই খেলার মেলা।  
তুমিই দিয়াছ খেলিবার তরে নবীন খেলনা হাতেতে তুলি।  
কঠোর পাঠেতে কেমনে আজিকে মন দিব মা গো তাহারে তুলি?  
একই স্বপ্নে কমল বস্ত্র বরাভর আর ণ্ডুগ সাথে,  
এক হাতে তুমি বিলাও মাধুরী শাসন তোমার অস্ত্র হাতে।

তোমারই দীক্ষা লাভি সে মন্ড্রে জাগাব তোমারে ও মনোরমা,  
চিন্তের জ্যেত সহস্রোপরি শিব সাথে হও পূর্ণতমা।  
সে মিলন হ'তে আগিবে অমৃত আনন্দরূপ রসের ধারা,  
স্নাত হব মা গো তাহারই ধারায় মোর ধরা হবে যথুকরা।

যে আসিলে ভরা কঠোর মিলন অসম্ভবা মা তোমাকে দেখি,  
হর্বল ভীক কোমল স্বপ্নে কেমনে তাহারে জাগিয়ে রাখি?  
কঠিন কারার প্রাচীরবন্ধা জননি, তুমি কি মুক্তি চাও?  
ক্ষমতা তোমার আমাতে দানিয়া আপনি শক্তি মুক্তি লও।  
স্বপ্নে আমার বত মালিন্য বেদনা আমাতে রক্তক্ষরা,  
তোমার পায়েতে জবারূপে ফোটে নাও তুলে নাও দুঃখহরা।  
অপূর্ণতারি অসম্পূর্ণ অর্থে তোমার কলুষ নাশি,  
চিন্তে আমার অনীত শক্তি দীক্ষার টীকা দাও মা আসি।

## ছোটদের আসর



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্কুলের রেহলতা দি' গর বলছিলো—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গরীবঘরের ছেলে। কষ্ট করে ঝড়ে-জলে-বোদ্ধুরে ইটিতে ইটিতে পাঠশালায় পড়তে যেতেন। একদিন—তখন গরম কাল, ছেলে এলো ঘেমে নেয়ে বাড়ীতে। তার বইয়ের তাড়ার সঙ্গে কার একটা পেন্সিল এসেছে—লক্ষ্য হ'ল ছেলের মা'র। মা বললে ছেলেকে—কার পেন্সিল রে? ছেলের খেয়াল হল, বললে, আমার পাশে যে বসে, তার। ভুলে চ'লে এসেছে। কাল ফেরৎ দৌব।

মা বললে, কাল নয়। আজই।

ছেলে বলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে—তার বাড়ী যে অনেক দূর। এখন বড়ো ক্লিষে পেয়েছে।

ছেলের ঠাকুমা বলে, আহা, বড়ো ক্লিষে পেয়েছে ছেলেটার। আজ খেতে বসুক। কাল পাঠশালা যাবার সময় পেন্সিল সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে বোমা!

ছেলের মা'র গলার স্বর গভীর।

কাল ব'লে কোনো কাজ হয় না মা! যা করবার আজই করতে হবে। ছেলে আজই দিয়ে আসুক। এসে থাকে।

ছেলেকে যেতে হল। এখনকার ছেলে হ'লে বলত, তার দাদার

সঙ্গে পথে দেখা হল, তার হাতে দিয়েছি। আরো কত কি কথা বানিয়ে বলতে পারত, না গিয়ে।

কিন্তু সে অস্ত্র ছেলে ত নয়! গুরুদাস বাঁড়ুঘো, যে গরীবের ছেলে থেকে হাইকোর্টের বড়ো উকীল থেকে বড়ো জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হ'তে পেরেছিলো।

আর একজন ঈশ্বরচন্দ্র। রেঁধে-বেড়ে সকলকে খাইয়ে পড়তে যার। আলোহীন ঘরে পড়া হয় না, বাইরে রকে ব'সে গ্যাসের আলোয় বই পড়ে। বাপের মোটে দশ টাকা মাইনে। সেই ছেলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর হ'য়ে দেশের একজন ইলেন। মাকে পাঠায় ছেলে, শীতের গরম কাপড়। মা নেয় দান ক'রে।

আরো অনেকের যে শীতের কাপড় নেই, অস্ত্র মা'ও নয়, বিভাসাগরের মা, নিজের গরম কাপড় গায়ে দিয়ে আরাম করে কি ক'রে?

শেষ অবধি ছেলে বলে, যার যার দরকার—সকলের নাম দাও, তাদের হয়ে যাবার পর বাকি যেখানা থাকবে, সেইখানা তোমার।

গরীবের ছেলে বিভাসাগর, গরীবের বন্ধু দয়ার সাগর হলো।

আর শুনেছিলাম আর একটি গরীব ছেলের কথা। সে ছেলেটি বিদেশী।

ছেলেটির সখ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনীখানা পড়ে। কিন্তু সে বইয়ের দাম অনেক। পরসী কোথায় পাবে যে সেই বই কিনবে?

গ্রামের এক বড়োলোকের লাইব্রেরীতে সেই বই আছে শুনেছে। তাকে গিয়ে ধরলো বইখানা পড়তে দেবার জন্তে। পড়বার জন্তে পেলো বইখানা।

পড়ে সে মন দিয়ে। পড়ে পড়ে আশ মেটে না। কত মস্ত লোক জর্জ ওয়াশিংটন, তার কথা বার বার পড়েও আবার পড়তে ইচ্ছে করে পাড়া থেকে।

ইতিমধ্যে একদিন ঝড় এলো, জল পড়লো। ছেলেটির ভাতাঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে দামী বইখানা শুধু ভিজ্ঞে গেল না, নষ্ট হ'য়ে গেল।

তখন ছেলেটি সেই বড়োলোকের কাছে গিয়ে বললে—আপনার বইয়ের অনেক দাম। বইটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি যে আবার কিনে দিতে পারব, এমন পরসী আমার নেই। আপনার জমির কাজে আমি খাটব, কোনো মজুরি না নিয়ে। যেদিন বইয়ের দাম উঠবে—সেদিন আমার ছুটি।

এমনি ক'রে খেটে খেটে সত্যি সত্যি সে বইয়ের দাম শোধ করলো।

আর সেই ছেলে—সেই গরীবের ছেলেটিই একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হল—জর্জ ওয়াশিংটন, যে প্রেসিডেন্ট। নাম তার আব্রাহাম লিঙ্কন।

দেশে দেশে যুগে যুগে গরীবের ছেলেরাই অসাধ্য সাধন করেছে।

সোনার ছিহ্নক মুখে দিয়ে বারা জন্মালো—তাদের মধ্যে থেকে বত লোক স্বরদায় হয়েছে তার চেয়ে বেশী লোক



প্রতিভাভাষ্করণ বসু

এসেছে সেই দল থেকে—জাঁতুড়ঘরে বাদের ছেঁড়া কাঁথাও জোটেনি।

কিন্তু এইটাই মস্ত সাধনা নয়। 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাকী' বলেও একটা কথা সে শুনেছে। গরীব যে, তার গুণেরও আদর হয় না।

গরীব সে দেখেছে। পথের ভিখারীদের মধ্যে নয়, তারাও খেতে পার। দেখেছে পুরীতে।

অন্ধর মাঠারের বাড়ী। মাঠারের বোঁ-এর শাড়ীটা এমন ছেঁড়া যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো যায় না। পিঠটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে। একটি ছেলে ঘরের মধ্যে একটানা কেঁদে যাচ্ছে। মা গো, ক্ষিদে পাচ্ছে।

সকাল থেকে মা নিজেও কিছু খায়নি, ছেলের মুখেও কিছু দিতে পারেনি। বাপ বেরিয়ে গেছে খাবারের চেষ্টায়। সে-ও ফেরেনি।

মীরার কাছে কতকগুলো কলা ছিল, কিনে নিয়ে যাচ্ছিলো। ৮।১ বছরের ছেলে কি আগ্রহ করে খেলো! ৮।১ বছরের ছেলে ক্ষিপের জন্তে কাঁদে, কি করণ সে দুঃ।

আর দেখেছিলো এক সাহেব-মেমকে। তারা ফিরিলী, রং যদিও সাহেবের মতন। স্বাধীনতার পর তাদের অবস্থা এমন খারাপ হল যে দিন চলে না।

সারা দিন কিছু না খেয়েও স্বামি-স্ত্রী বিকেলবেলা বাইরে চেরার টেনে দু'জনে মুখোমুখি বসত। সারা দিন তারা টাকার চেষ্টা করত। কোনো দিন ছুটত, বেশীর ভাগ দিনই ছুটত না।

কিন্তু বিকেলবেলা—পেটে কিছু না পড়লেও বাইরে চেরার টেনে মুখোমুখি বসে এক দিনের জন্তেও বাদ যেত না।

মীরা এক দিন তাদের কিছু ঝিঞ্জে দিয়ে এসেছিলো, তার বাচ্চা মেয়ের কাছে গল্প শুনেছিলো, সেই ঝিঞ্জে-ভাতে ভাত তারা তিন জনে খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলো।

তার পর তারা কোথায় চলে গেল! মেয়ের নাম বেবী। সে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। না খেতে পেয়ে তার চোখের কোল খসে গিয়ে কি বিস্তী দেখতে হয়েছিলো!

সেই বেবী স্বাধীনতার পর কোথায় গেল, সে কথা মীরার জানতে ইচ্ছে করে।

অত দারিদ্র্যের মধ্যেও বেবীর মনে একটু জাঁক ছিল যে সে সাহেবের মেয়ে, স্বাধীন দেশের মেয়ে—মীরার মতন পরাধীন নয়। যদিও তার মা ছিল ভারতবর্ষের গুঠান—ইংলণ্ডের মেয়ে নয়।

মীরার যখন স্বাধীন হয়ে গেল, তখন বেবীর আর তার মায়ের মনের ভাব কেমন বদলালো তার জানতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক।

অমন দারিদ্র্য তারা পার হ'ল কি করে, তাও জানার আগ্রহ জাগে।

কাঁধির পিসিমা ওর কথা ভাবছিলেন আর কেউ না ভাবুক।

উনি বললেন—চল, এই বেলা কাঁধী ঘুরে আসি। এখানে তো কেউ তোকে দেখছে না।

সত্যি, কেউ ওকে দেখছে না। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার ক্রটি অবশ্য হচ্ছে না। স্থুলে আসা-যাওয়াও হয়। কিন্তু কান্নার আর ওর কথা যেন মনে থাকে না। কিংবা মনে থাকে একটু বেশী

ক'রেই। ও যেন এক সমস্তা হয়ে উঠেছে। কি করা যায়, মেয়েটাকে নিয়ে, কি করা যায়?

ড্যাডির মুখ গম্ভীর। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়েছে। নানারকমের আসবাব ছাইয়ে-ছাইয়ে ভরে উঠেছে। কাচের আবরণের মধ্যে যে সোনালী চাকার সোনালী রথ ছুটেছে, তার মধ্যে ঘড়ি—চাকার চাকার টক্-টক্ করে ঘুরে যাচ্ছে কাঁটা, বেজে যাচ্ছে, একটা-দুটো-তিনটে, ছুটির দিনের বেলা গড়িয়ে যায়—ড্যাডির ভাবনা কমে না।

কোণের ঘড়ি থেকে খাঁচার দরজা খুলে কোকিল বেরিয়ে এসে ডাক দেয়, কুহ, কুহ, কুহ, কুহ, চারটে বাজলো জানায়—খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, জার্মান ঘড়ির লম্বা পেণ্ডুলাম তুলতে থাকে, চা, চিনি, দুধের ট্রে নিয়ে বয় আসে—মামমি ড্যাডি মীরাকে নিয়ে চা খায়, কান্নার মুখে কোনো কথা নেই।

হাসি নেই, ঠাট্টা নেই, কুশল-প্রশ্ন নেই। কত দিন পরে এ বাড়ীর বংশধর যদি আসে—মীরার আর কি দরকার?

শোবার ঘরে ড্যাডি বলে, থাক না, ও তার খেলার সাথী হয়ে থাকবে।

মামমি বলে—আবার কাজ করবে।

অনেকগুলো প্রেট পড়ার শব্দ হয় বাবুচিখানায়—ভাজলো বুঝি কতকগুলো ডিশ?

তাই মীরা যখন জানালো, কাঁধির পিসিমার সঙ্গে কাঁধী বাবে, কেউ প্রশ্নও করলো না, স্থুলের পড়ার কি হবে। ওরা দুজনেই যেন খুঁসি হল।

স'রে যাক্ দিন কতকের জন্তে সামনে থেকে মেয়েটা। কাঁধির পিসিমা ই ত এখন বোকা।

ছেলে আসছে সমস্ত বাড়ী দখল করতে। ঘর থেকে ঘরে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে।

সমাজের লোক দিনকতক জিগ্যাস করবে—কোথায় সেই মীরা, উজ্জল ভবিষ্যৎ বার ছিল, চেহারা, অভিনয়ে, বুদ্ধিতে প্রতিভায়?

কোথায় সেই লাভলি মেয়েটি, মিষ্টি বার হাসি, মিষ্টি বার চোখ দুটি, মিষ্টি বার মুখখানা?

খার্ড ক্লাস গাড়ী। গরীব আর মধ্যবিত্তঘরের মেয়েরা চলেছে। বেনারস এক্সপ্রেস ছাড়বার সময় কামরার কামরায় 'জয় বিশ্বনাথ' শোনা গেল।

যে বোঁটি জামতাড়ায় যাচ্ছে, তার বাপ-মা-ভাই কান্ডিতে কান্ডিতে চলে গেল। স্বামীর সঙ্গে চলেছে হাওয়া বদলাতে। অনেক দিন অন্তরে ভুগছে। স্বামী এখন অফিস থেকে টাকা ধার করে জীকে নিয়ে যাচ্ছে চোখে। সেই গল্প সে বলতে বলতে চললো। স্বামীর কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এলো। সামান্য মাইনে। দেনার ডুবে আছে, তবু জীকে বাঁচাতে চায়—এই কালো রোগা জীকে। চন্দননগরে গাড়ী থামতে এসে জিগ্যাস ক'রে গেল—কষ্ট হচ্ছে না তো?

কোনো কষ্ট নেই। তুমি উঠে পড়ো। গাড়ী ছেড়ে দেবে। তোমার অত খোঁজ নিতে হবে না। এ'রা আছেন।

আমরা আছি গো—মালা ঠক্ক' করতে করতে এক বুড়ি বললে ওয়ার থেকে। আর ২।১ দখব—বললে

তার ছেলে খেতে দেবে না। তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে কান্দী বাও। মাসে পাঁচ টাকা পাঠাব। সেই ছেলেকে মানুষ করেছে পরের বাড়ীতে বাঁধনীবৃত্তি ক'রে। ছেলের এখন দুশো টাকা মাইনে। মাকে আর দরকার নেই।

বৌমা গরীব হলেও বনেদী ঘরের মেয়ে। বলেছিলো—মায়ের জন্তে পৃথিবী দেখছ; সেই মাকে অপমান? সংসারে শান্তি থাকবে কি ক'রে? আমার ছেলেপুলে ভালো থাকবে কি ক'রে মায়ের চোখের জল পড়লে?

ছেলে বলেছিলো, এর নাম তুমি এম-এ পাশ? এখনো এত কুসংসার? মাকে তাড়িয়ে দিয়ে কত লোক মৃত্যু আছে।

বৌমা বলেছিলো—আমি বিশ্বাস করি না।

তবু সে আটকাতো পারেনি। ছেলে মুখ্য কি না। রাগ না চণ্ডাল তার।

গাড়ীতে কতকগুলি মেথরাণী উঠেছিলো। সকলের গা ঘেঁসে তারা বসতে চায়। বলে, আমরা কি পয়সা দিইনি? আমাদের কি বিনাটিকিস?

তারা খুঁহু ফেলছিলো। গাড়ী নোংরা করছিলো। আর বলছিলো—আমাদের যদি খেঁচা কবো—পুলিশ ডেকে দোব? নতুন আইন হয়েছে।

অন্ধকারে কখন বোটি জামতাড়ায় নেমে গেছে, মেথরাণীরা নেমে গেছে কোন্ ঠেগনে—মীরা কিছু টের পাযনি। সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মোগলসরাইয়ে গোলমালে সে জাগলো। ভোরবেলা মালবীর ব্রীজে বধন গাড়ী উঠেছে—প্রথম দেখা গেল নীল গঙ্গার দক্ষিণ কূলে—আখানা টাদের মতন অসংখ্য মন্দির-চুড়ার শহর—বেনারস। সবাই প্রশংসা করে, ও-ও করে—বাড়ী-বাড়ী-বাড়ী—মন্দির-মন্দির—মন্দির—বৃক্ষমৃ বৃক্ষমৃ করছে—একটি আওয়াজ নেই—সকালবেলায় শান্ত আকাশের নীচে প্রথম সোনালী রোদে লক্ষ লক্ষ লোকে ভরা, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো মহাতীর্থ—বারাণসী। কত পুণ্য, কত পাপ, কত বর্ষা, কত আয়ত্তি, কত স্মৃতি, কত কাহিনী ব্রীজ থেকে কতক্ষণ ধরে দেখা যাচ্ছে—কান্দী-কান্দী-কান্দী।

তার পর সূর্য হল সবুজ ফসলের ক্ষেত—বার কপি বেগুন কড়াইগুটি কোনো দিন ফুরায় না। হারিয়ে গেল কান্দী শহর, দূরে র'য়ে গেল পুণ্যতীর্থ। ক্যান্টনমেন্ট ঠেশন থেকে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে কপ, কপ, কপ, কপ। সাদা বোড়ার টাঙ্গা চড়ে কত বাগান কত বাজার কত দোকান কত মহলা পার হ'য়ে গৌধুলিয়া হয়ে দশাখমেথ পৌঁছলো তারা—বাঙালীটোলার চারতলা বাড়ীর ওপরের ঘরে পাখরের জানলায় ঝাঁড়িয়ে এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয়। ঘাটে ঘাটে মানুষ স্নান করছে, খালা ভরা ফুল নিয়ে পুজো দিতে যাচ্ছে, নৌকো চলেছে জলে, তীর্থযাত্রী চলেছে পথে—সংসার ছেড়ে কান্দীতে কেন শান্তি পেতে আসে লোকে—কতকটা যেন বুঝতে পারে মীরা। স্নান ক'রে বিশ্বনাথের মন্দিরের পথে ওরা চললো।

মোড়ের ওপরেই ধরে-ধরে খাবার সাজানো রয়েছে—হিঙের কচুরি ভাজা হচ্ছে, স্নগদে চারিদিক ভরে গেছে—তার সঙ্গে চেঁড়েশের তরকারী, সে নাকি অপূর্ণ! রয়েছে কাঁসার থালায়—চাপ চাপ সরুলা মালাই, কলকাতার এ জিনিস কে চোখে দেখতে পায়?

কিন্তু উপায় নেই। পুজোর আগে খাবার কথা মনে করাও পাপ। পাখর-বাঁধানো সড়ক গলি, ছপাশে পাখরের বাড়ী উঠে গেছে চারতলা পাঁচতলা—নীচে ছ'পাশে দিনেরবেলায় ইলেকট্রিক আলোয় সাজানো দোকান। কান্দীর কাঠের খেলনা, চক্চকে রঙে চোখে ধাঁধা লাগে, কান্দীর গরদ, বেনারসী চেলি, চোলি সাদা জরীর কাজ বিক্রমিক করে। কান্দীর স্তম্ভি জর্দা পান সুরা ধূপ স্নগদে পথ ভরে গেছে। কান্দীর জার্মান সিলভার পেতলের দোকান বৃক্ষমৃ বৃক্ষমৃ করছে—সঙ্গে সঙ্গে নাম লিখে দিচ্ছে। 'কান্দীর স্মৃতি' তলার মাটির পুতুলের দোকান, টিপের দোকান, দোকানের শেষ নেই, পথেরও শেষ নেই, বাজীরও শেষ নেই, সারা ভারতবর্ষের মেয়েপুরুষ বাড়ী, তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু বাছা জুড়ে আসছে। মানুষজন ছিটকে ছিটকে পড়ছে, গরু চলে যাচ্ছে গান্ধীর হয়ে চুঁ'য়ে, থাক্তা মেয়ে, তারপর কেবলই ফুলের দোকান, রাশি রাশি ফুল, সাদা .লাল হলুদে গৌলাপী, ফুলের পাহাড় যেন, তারপর ঢা ঢা ঘটধারনি ভারত-বিশ্বাত বিশ্বনাথ! ভারত-বিশ্বাত অন্নপূর্ণা! টাকার অবশি নেই, উৎসবের শেষ নেই, কান্দী আসা সার্থক।

সন্ধ্যায় কান্দীর ঘাটে ঘাটে বেদ উপনিষদ ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্তন, 'কথকতা' বামায়াণ পাঠ—সে আবহাওয়াই যেন আলাদা—সে আবহাওয়া সারা হিন্দুধানে কোথাও নেই, ফিরে যায় মন কত শতাব্দী আগে।

কান্দী মীরার সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিলো। মায়ের মতন। বন্ধুর মতন।

পথে পথে একলা সে ঘুরে বেড়ায়। কান্দীর শিসিয়া বলে দিয়েছিলেন, দশাখমেথ গৌধুলিয়ার কাছে কাছে থাকবে। গলি দিয়ে গলি দিয়ে কেদার হরিশ্চন্দ্র ঘাট পর্যন্ত যেতে পারো, গাড়ী-বোড়ার ভয় নেই, অন্ন কোনো ভয় নেই।

কিন্তু ও চলে গেছলো মানমন্দিরের খোঁজে গঙ্গার ধার দিয়ে অন্ন দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছলো, পথ চিনতে পারেনি। কান্দীর মধ্যে কান্দীর গুণ্ডার হাতে পড়েছিলো। তাদের হাতে ছিলো চক্চকে ছোরা। তারা চোঁচাতে বাধণ করেছিলো।

তবু ও চেষ্টা করেছিলো। গুর চাঁৎকার শুনে যে এলো তার চেহারায় পাংলা, রোগা। কিন্তু তাকে দেখেই গুণ্ডারা সেলাম ক'রে স'রে গেছলো।

আলাপ হয়েছিলো। তার নাম বাবা। বাঙালীটোলার বাঙালী তরুণ বাবাকে কান্দীর সব লোক মানে, সর্দার বলে স্বীকার করে।

তবে সঙ্গে থাকে বিভলভার। হাতবোমা সে অনায়াসে ছোঁড়ে। সাহসে অস্বীকার। তবু একটা খুনের ব্যাপারে পুলিশ তাকে খুঁজছিলো ভুল ক'রেই। বাবা নির্দোষ হলেও ভুব দিয়েছিলো সাত দিন। বাবাকে ধরবার জন্তে কী চেষ্টা চলছিলো। মীরা ভরে কাঁটা হয়েছিলো।

বাবা তার জীবনে ছাপ দিয়েছে। বাবাকে পুজো করা যায়। হু:সাহসী ছেলে বাবা!

বাবা একদিন ধরা পড়লো। সেদিন মীরা কেঁদেছিলো। ক'দিনের পরিচয়ে কোনো মানুষের জন্তে এমন কান্দা পায় সে জানত না।

কিন্তু বাবা ছাড়া শেলো। বাবার দলবল বোগীর সেবা, মণিকর্ণিকার শব নিয়ে বাঁওয়া আর হারানোকে খুঁজে আনবার জন্তে সব সময় তৈরী।

অহল্যাবাই ঘাটে বিকেল নেমেছে কাশীর গঙ্গার নীল জলে সোনালী আবির ছড়িয়ে। ওপারে শূন্য বাণুচর, জোয়ারের জনারের ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে গোলাপী আকাশের নীচে। বাবা বললো, মীরা, তুমি নাকি বড়লোকের ঘরে মানুষ হচ্ছিলে, এখন গরীব হ'রে বাবে ব'লে ভয় পাচ্ছ ?

কে বললে আপনাকে বাবালা ?

পিসিমার মুখে শুনলুম কিন্তু তুমি খাঁচার পাখী দেখেছ ?

কেন দেখব না ?

খাঁচার পাখী বখন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে যায়, সে কি কোনো ভাবনা ভাবে ? সে কি আর কিরে আসে কাঁকনি দানা, হলদে ছাতু কিংবা ভিক্রে ছোলার লোভে ? নিরাশদ আশ্রয়ে ? ডাকলেও সে ফেরে না। সে গাছে গাছে ঝড়ে জলে কাটিয়ে দেয়—বনে বনে উড়ে বেড়ায়। তার ভাবনা কে ভাবে ? ভগবান ! সেই পাখীর মতন মন নিয়ে তুমি পৃথিবীর মাটিতে বেরিয়ে এসো, তোমার জায়গা ঠিক করাই আছে। শাস্ত্র বঁরা লিখে গেছেন, তাঁরা বোকা ছিলেন না। তাঁরা কি তোমার-আমার মতন বুদ্ধ ?

নিশ্চয়ই না।

তাঁরা ভগবানের সন্ধকে সব জেনে তবে লিখেছেন। তোমার যদি দেখবার চোখ থাকে—তুমিও দেখতে পাবে, সমস্ত বিপদ সমস্ত অকল্যাণ থেকে মায়ের মতন কে আমাদের বাঁচাচ্ছেন প্রতিদিন প্রতিমুহুর্তে।

হৃদয় হুব গেল। ঘাটে ঘাটে বিহ্বাৎ আলো জলে উঠলো। জলে প্রদীপমালা ভাসলো। কত লোক স্নান করতে এলো সারা দিনের পর। জলে আলো কাঁপছে, ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, এমন সময়ে স্নান করলে শরীর ত নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ হয়, রাজের ঘুমটা হয় চমৎকার।

বাবা বললে, আমার গুরুদেবের কাছে গেলে অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। চলো কাল সকালে। সকালে নয়, খুব ভোরে।

তখনো কাশী শহর জাগেনি, ওরা নৌকায় চড়লো। পাথরে বাঁধানো ঘাট একের পর আর। নামগুলো কি মনে থাকে ? মীর-ঘাট অহল্যাবাই, দশাধমেধ, মনিকর্ণিকা, সিকিরা ঘাট, পঞ্চগঙ্গা, রামঘাট, গাইঘাট, গৌঘাট, রাজঘাট—তারপর ব্রীজের থামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে বরুণাঘাট, যেখানে ঝাঁড়ালে ওদিকে অসিঘাট পর্যন্ত দেখা যায় অর্দ্ধচন্দ্রের মতন বারাগঙ্গীর গঙ্গার কূল ব'লে। বৈশীমাধবের একটা ধরাজী কলকাতার মহুমন্টের মতন ঘোরানো সিঁড়ি আর বারান্দা নিয়ে জেগে আছে আকাশে মাথা তুলে। আরেকটা কবে পড়ে গেছে।

তিনতলার সমান সিঁড়ি ভাঙতে হয় বরুণাঘাটে। ওপরে আদিনাথের মন্দির দর্শন ক'রে ওরা বেরিয়ে এসে এক আশ্রম গেলে গঙ্গার তীরে।

তিনধানা কামরার একটি ছোট বাড়ী, নানা ফুল-কলের গাছ, লতাপাতার ঢাকা। সেখানে এক ভক্তলোক—সোনার চশমা চোখে, দাড়ি-গৌক কামানো শাস্ত্র মূর্তি—কাগজ পড়ছিলেন।

বাবা বললে—গুরুদেব, আপনার কাছে মীরাকে নিয়ে এলুম। এর বিশ্বাস হচ্ছে না ভগবান আছেন।

গুরুদেব বললেন, নাই বা হল। তুমি জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইছ কেন ?

বা রে, ভগবানে বিশ্বাস না করলে ও মনে জোর পাবে কেন ?

ভগবানে বিশ্বাস না করলেই মনে বেগী জোর পাওয়া যায়। আমি সংপথে আছি, আমার কোনো ক্ষতি হবে না, হ'তে পারে না, কেন না আমি কাকুর ক্ষতি করিনি, আমিই ভগবান—এই ধারণাটিই সব চেয়ে ভালো।

কথাটা মীরার খুব ভালো লাগলো।

গুরুদেব বললেন—তুমি পৃথিবীতে এসেছ একটি বিশেষ কাজে। সেইটি খুঁজে বার করো। প্রত্যেকেই এসেছে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে। সকলে বুঝতে পারে না, সকলে পথ পায় না। যে পায়, তার নাম হয় নেতাজী, তার নাম এভিশন। বারা পায়, তাদের নাম হয় বীসাস, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, নিউটন, র্যাফেল, রোমারোলী, রবীন্দ্রনাথ, মালবীন্দ্র, রক্ষসলায়। বারা তোমার মুখের অন্ন, পরায় কাপড়, রোগের ঔষধ তৈরী ক'রে দিচ্ছে, তারাও পথ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এঁদের সন্ধকে বলেছেন—ওরা কাজ করে। ওরা সার্থক।

বাড়ীর মধ্যে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ছলোড় তুলেছিলো। কত না ভড়া, কত না গান !—

শোন রে খুক

শোন রে খোকা

নাচ দেখাবে

শূর্ণপখা।

কুস্তকর্ণ

দিচ্ছে ঘুম।

ঘুম ভাঙাবার

লাগলো ঘুম।

চিত্রকূটের পাহাড় যেতাম অমাবস্ত্য রাত্তি  
লক্ষণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে।

নেবু ফুল নেবু ফুল নেবু-নেবু গন্ধ।

নেবু ফুল নেবু ফুল নও তুমি মন্দ।

ছোট খোকা পড়ে অ—আ।

শেখেনি সে কথা কওয়া ॥

বক্ বক্ বক্ বক্

রেল বাচ্ছে।

ঝিরঝিরে নদী,

গরু জল খাচ্ছে।

আওরাজ শুনে ভেতরে হুকে দেখে মীরা, এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা আভিনায় নেচে হৈ হৈ করছে। তারা কাউকে ভয় করে না।

পৃথিবীতে এদের কেউ ছিল না। এদের আদর করবার কেউ নেই। এরা পেয়েছে এখানে পরম আশ্রয়।

বাবালা'র মুখে মীরা শুনলো—এখানে থেকে বারা বড়ো হ'রে গেছে, তারা কামার, কুমোর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, টেলিকোন, ইলেক্ট্রিসিটি, কারখানা, স্থল, মায় বইবাধানোর কাজে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারা কাজ করে।



যখন তারা কাজ করতে লাগলো তখন দেশের জঙ্গ, মেজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, কত লোকের দৃষ্টি পড়লো এদিকে। সাহায্য আসতে লাগলো চারি ধার থেকে।

শুধু বাঙালী নয়, সব প্রদেশের লোকের কাছ থেকে সাহায্য এলো। এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন সব দেশের ছেলেমেয়ে আছে।

এখানে কিন্তু সকলকে বাংলা বলতে হয়, বাংলা পড়তে হয়, বাংলা শিখতে হয়—কারণ এ নিয়ে তো কোনো তর্ক নেই যে স্বাধীনতার বাংলা হিন্দুস্থানের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষা। সব চেয়ে সুন্দর।

কোনো বাড়ীতে কোনো উৎসব হ'লে মেয়েরা নিজের হাতে খাবার এনে এখানকার সকলকে খাইয়ে যায়।

নৈমিষ যার নীচে প্রকাণ্ড কারখানায়—মাছুষ গড়ার কারখানায়, যেখানে লেখা আছে—

অনাথ ছেলেদের কোলে নিবি

জননীরা আয় তোরা সব।

মাতৃহারা মা যদি না পায়,

তবে আজ কিসের উৎসব?

মীরা দেখলো—আর একটা ঘরে লেখা আছে সোনালী অক্ষরে—

আমাদের এ ঘরনী বড়ো ভালো লাগে

ভালোবাসা যদি থাকে ঘরে।

কত শান্তি আসে, প্রাণে কী আনন্দ লাগে

ভালোবাসা যদি থাকে ঘরে।

গুরুদেব বললেন, এখানে তুমি আজ খেয়ে যাবে মীরা!

ভাগ্যিস শিসিমাকে বলে এসেছিলো বেলা হ'তে পারে, নইলে তিনি কী ভাবতে পারেন!

চলো একটু বেড়িয়ে আসি, বলে উনি মীরাকে নিয়ে বন্ধুণার ভীর ধ'রে চললেন। টলটলে নীল জল, এদিকটা অনেক কাঁকা—মীরা বললো—বেশ ত জায়গাটা!

শিকারোল আরো ভালো লাগবে তোমার—সাহেবী প্যাটার্নের বাংলাগুলি বাগানের মাঝখানে। অস্ত দূর যেতে পারবে?

পারব।

ইতিমধ্যে কট করে গেল মীরার শ্রাণাল ছিঁড়ে। এক পাটি গেল। আরেক পাটি প'রে ত ইটা যায় না, ছোটোই হাতে নিলো।

পথের ধারে গাছের তলায় একটি মুচি বসেছিলো। একটা কাঁসিতে ধবে ছাতু আর ছোলার ছাতু মিশিয়ে বন্ধুণা নদীর জল দিয়ে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সে তার সকালের খাওয়া সেবে নিচ্ছে।

মীরা জুতোটা দেখাতে সে বললে—তুইয়ে পরসা লেগা মাইজী?

গুরুদেব বললেন—এক্টে পরসা।

হায় মীরায়ায়! বলে সে হাসলো। মজবুত ক'রে সেলাই ক'রে দিলে।

খানিক দূর গিয়ে মীরা বললে, দেখুন গুরুদেব, আমার কাছে যদি পরসা থাকত, ওকে আমি হু' আনা দিতুম।

আমিও তাই দোব। তোমার মন পরীক্ষা করবার জন্তে এমন করলুম। ব'ড়ো বধে মাছুষ হ'লে এমন বড়ো নজর হয়।

মুচি কিন্তু নিতেই চায় না, ভয় পেয়ে যায়, এ কি ঠাটা তার সঙ্গে!

গুরুদেব জোর ক'রে দেন—লেও ভাইয়া ব'লে। তার পর বলেন—মুচির মতন এত উপকারী অথচ এত ভদ্র বন্ধু আমাদের আর নেই। সব দেশেই মুচিরা কত ভালো। এই জন্তে ওদের পরসা দিয়ে যেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় এমন আর কাউকে দিয়ে হয় না। তোমার পায়ের জুতো হাতে ক'রে ওরা সারিয়ে দেবে, ওদের ছাড়া তোমাদের চলবে না, তবু ওদের সঙ্গে তোমরা দর করবে, আর বলবে চামার। ডেনমার্ক এক মুচির ছেলে হল হ্যান্স ফ্রিশিয়ান অ্যাগার্সন। লেখা-পড়া শিখলো না কিন্তু এত বড় শিশু-সাহিত্যিক হল যে সারা ইউরোপে তাকে নিয়ে মাতামাতি। আমাদের দেশে দেখো কোনো লেখা ভালো লেগেছে এ কথা ছেলেরাও জানায় না, তাদের অভিভাবকরাও না। বাংলাদেশের প্রথম শিশু মাসিক 'সখা' বার ক'রে বুক প্রমোচরণ সেন অভাবের মধ্যে রোগে ভুগে মারা গেলেন, যার নামে স্মৃতি-মন্দির হওয়া উচিত, তার নাম কেউ মনে করে না। আর হ্যান্স অ্যাগার্সন যখন লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলো, তখন হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের মিছিলে মনে হল বুঝি কোন দেশের রাজার শোভাযাত্রা চলেছে। শিশু-সাহিত্যের গঙ্গা-নদীকে যে ভগ্নীর্থ প্রমোচরণ সেন বাংলার মাটিতে নিয়ে এলো—তার হল বন্দা। চিকিৎসা হল না।

আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ব'সে মীরা খেলো। হুটু হুটু বাচ্চারা খাবার সময় একটুও গোল করলো না।

দুপুরে সব মন দিয়ে পড়াশুনো করলো। বড়োরা হাতের কাজে গেল। বিকেলে ছুটোছুটি খেলো। সন্ধ্যাবেলা গল্প।

প্যাঁচা কেন লক্ষ্মীর বাহন, এত জীবজন্তু থাকতে? গোলাভরা ধান ইঁহু নষ্ট করে, পেঁচা তাদের খায়। তাই পেঁচার মতন মুখ বান খোঁচা করলেও ছুঁধের মতন সাদা লক্ষ্মীপেঁচা যা লক্ষ্মীর আদরের বাহন।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির কোথায়? দাক্ষিণাত্যে কাবেরী নদীর তীরে। ৪১৮ বিঘা জমি, সাতটা পাঁচিল, প্রথম পাঁচিল ৩০০ ফুট লম্বা ২৫০ ফুট চওড়া। প্রবেশ-পথের ওপর যে পাথরের গোপুরম, তাই এখানকার তেরতলা বাড়ীর সমান উঁচু। মূর্তি নারায়ণের—সমুদ্রের ওপর অনন্তনাগে শয্যা—দশ হাত লম্বা নীল পাথরের তৈরী, পায়ের কাছে লক্ষ্মী। এত বিরাট মন্দির তৈরী করতে বাট বছর লেগেছিলো, সেই কারিগরই বা কি রকম?

হাসির গল্পও হল—এক ব্রাহ্মণের তিন জামাই ছিল, হু'জন পণ্ডিত, ছোটটি মূর্খ। একদিন অনেক পণ্ডিত লোক বাড়ীতে এসেছে, তাই ছোট জামাইকে তার দ্বী খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছে, কি বলতে কি ব'লে ফেলবে। সংস্কৃত কথাবার্তা হচ্ছিলো, অনেকক্ষণ ধ'রে ছোট জামাই শুনলো। অং বং শুনে মনে করলো বাংলা কথার সঙ্গে অমুখ্যার বোগ করলেই সংস্কৃত হয়। তাই সে ভেড়ে মেড়ে বেরিয়ে এসে বলে ফেললে—

অমুখ্যার দিলেং বদিং সমসকৃতং হয়,

তবে কেনং ছোট জামাই খাটের তলায় রয়?

ছেলেমেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

অন্ধকার গঙ্গার বৃকে নৌকো চলেছে। আকাশে অসংখ্য তারার

বেন আলপনা আঁকা রয়েছে অদৃশ্য বাহুরের হাতে। কুলে কুলে অসংখ্য বাড়ীতে কানী বেন আলোর দেওয়ালীর প্রদীপমালায় সাজানো। অদ্ভুত দৃশ্য!

সারা রাত ধরে এমনি চলতে ভালো লাগে। বেনিপার্কের সাজানো ড্রিং রুমের পুতুলজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে এ বেন আকাশের পাখীর উড়ে বাওয়া।

মারিদের সঙ্গে বাঘাদা'ও কাঁড় টানছে। খেচ্ছায়, আনন্দে। তাদের সঙ্গে এমন হিন্দী ভাষা বলছে যে, কে বলবে ও বাঙ্গালী!

আশ্রম ওর ভালো লেগেছে। কিন্তু তারাতারা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার মনে হ'তে লাগলো—ভালো লেগেছে, এ কথা এদেশে মুখ ফুটে বেন বলতে নেই।

আমরা উপভাস পড়ি দিনের পর দিন। হয়ত আগ্রহ ক'রেই পড়ি। কিন্তু কক্ষণো জানাই না, ভালো লাগছে, আমাদের ভালো লাগছে।

ভালো লাগাবার জন্তে যিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেন, তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রেই আমরা আনন্দ পাই, যেমন ট্রামে চড়ে অনেক দূর গিয়ে টিকিট কাঁকি দিয়ে নেমে পড়াকে আমরা বাহাহুরী মনে করি।

তাই হাল্ফ ক্রিস্টিয়ান অ্যাগাস্টন এ দেশে জন্মায় না। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র লেখককে আমরা প্রণাম করতে শিখি না। মীরা নিজের মনে বলে—আমাদের কি ক'রে ভালো হবে?

[ ক্রমশঃ ]

## আমাদের মনের মানুষ

দেবদত্তা রায়

### হাইকোট।

বিশেষ জরুরী মামলার শুনানী চলছে। বিচারাসনে গভীরমুখে বসে আছেন বিচারপতি, তাঁর দৃষ্টি টেবিলের 'পরে কাগজে লুপ্ত কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুই কান তাঁর উদগ্র আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে জেরার জবাব শুনবার জন্ত। জুরীরা বসে আছেন চিন্তিত গভীর মুখে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে তাঁরাও তাকিয়ে আছেন সেই দিকে, আর মনের পাতায় তুলে নিচ্ছেন এদের কথাবার্তার নিখুঁত রেকর্ড।

বাদীপক্ষের জেরা...

জেরা করছেন একজন দৃঢ়দেহী ঋজুস্বকু সস্ত্রাস্ত-দর্শন ভ্রমলোক। আদালতগৃহের সমস্ত লোক মধ্যে মধ্যে বিমিত্র নেত্রপাত করছেন তাঁর স্তূঠায় সৌম্য মুখমণ্ডলের পানে। তাঁর গভীর মুখভাসে, তাঁর ভাষণে, তাঁর দৃষ্টিপাতের মধ্যে কি বেন একটা ছিল, লোককে বা অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করে আনত তাঁর দিকে। সেদিন সেই আদালতের উপস্থিত জনতারও মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাঁর প্রতিটি কথাই প্রত্যেক ভক্তিতে ঝরে ঝরে পড়ছে সেই শক্তির আভিজাত্য।

এমন সময়ে আদালতের চাপরাশি এসে তাঁকে সেলাম করলে। জেরার বাধা পেয়ে ফিরে তাকিয়ে ঈষৎ বিরক্তিতে তিনি বললেন, 'কী!'

চাপরাশি সঙ্কুচিত ভাবে সমুদ্রমুখে একখানা টেলিগ্রাম তাঁর দিকে অগ্রসর করে দিলে।

টেলিগ্রামখানা পড়তে পড়তে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে মাত্র এক পলকের জন্ত।

পরমুহুর্তে টেলিগ্রামখানা মুড়ে পকেটে ফেলি তিনি আবার আরম্ভ করলেন জেরা, এবং নিজের প্রতিভা-প্রদীপ্ত বাগ্‌জাল বিস্তারের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে ফেললেন হারিয়ে।

আদালত শেষ হ'ল। সকলেই উঠবার উপক্রম করছে। বিচারকের কাছে গিয়ে কাঁড়ালেন অভিজাতদর্শন ব্যক্তিটি।

বিচারক সঙ্কট কণ্ঠে বললেন, "ভাল হয়েছে, চমৎকার হয়েছে আপনাব জেরা। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি, ওভাবে জেরা না করলে মামলাটার কিনারা করাই শক্ত হত। কাল তাহলে মিঃ—"

বাধা দিয়ে সেই স্বল্পভাবী ভ্রমলোক বললেন, "কাল আমি আসতে পারব না ইওর অনার, মামলাটা দুয়েক দিন মূলতরী রাখলে ভাল হয়।" বিচারকের হাতে তিনি তুলে দিলেন টেলিগ্রামখানা।

বিচারক স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল, "Your wife expired lest uight."

"আপনার স্ত্রী কাল রাত্রে মারা গেছেন।"

ইনি ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদও যাকে কর্তব্য কাজে এতটুকু বিচলিত করতে পারে না, অসীম ধৈর্যের আভিজাত্যসম্পন্ন ইনিই সেই আমার দেশের মনের মানুষ। এই অটল ধৈর্য ও বিপুল কল্পনিস্থার পতাকা উড়িয়ে তিনি গান্ধীজীর পাশে এসে ভারতের জাতীয়-সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে এনেছেন। চিন্তভরে আজকে আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

আজকের যুগে আমাদের যে চাই এমন অনেক অনেক সর্দার প্যাটেল... কর্তব্যে অবিচলিত, নিষ্ঠার দৃঢ়।

ব্যক্তিগত অমুভূতির উর্দ্ধলোকচারা।

আজকের কিশোরদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে ভাবীযুগের সেই "লৌহমানব।" তাঁদের স্মরণ করেই বহুমুখীর পাতায় তুলে ধরলুম তাঁর মহানু আদর্শ।

প্রণাম প্যাটেল !!

## সোনার পাখী

[ বিদেশী রূপকথা ]

### শ্রীচিন্তরঞ্জন বিশ্বাস

এক রাজার একটা সুন্দর বাগান ছিল। আর সেই বাগানের আপেল গাছে আপেল ধরত—সোনার আপেল। ঐ আপেল-গুলো পাকলে রোজই একবার করে গোণা হত। আপেল পাকার সময় হলোঁদা রোজই একটা করে আপেল কমে যেত—এটাই হল আশ্চর্যের বিষয়। রাজামশাই কিন্তু এ ব্যাপার শুনে রেগে আগুন হয়ে যেতেন। আপেল কমে যাবার কথা শুনেই যিনি মালীকে আদেশ দিলেন, যাতে সবসময় রাত ধরে আপেল গাছ পাহারা দেওয়া হয়। মালী তার

জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পাঠাল পাহারাধার হিসেবে। কিন্তু রাত প্রায় বারটা নাগাদ সে ঘুমিয়ে পড়ল গাছের নীচে। সকালবেলায় জেগে দেখে, গাছের আপেল একটা কমে গেছে। পরদিন মালী মেজপুত্রকে পাঠাল পাহারা দেবার জন্তে। কিন্তু এই একই ব্যাপার—মধ্যরাত্রে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে আপেলগুলো গুণে দেখে সে, আজও একটা কমেছে। তার পর মালীর কনিষ্ঠ পুত্রের পালা। সেও প্রস্তুত হয়ে ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের বেলায়ও এই একই ব্যাপার ঘটবে জেনে সে তাকে পাঠাতে রাজী হ'ল না। কিন্তু অবশেষে সে রাজী হ'ল। কনিষ্ঠ পুত্র প্রেরিত হল সোনার আপেল গাছট! পাহারা দেবার জন্তে। সমস্ত রাতের মধ্যে ওর এতটুকু ঘুম এল না। বখন বারটা হল, তখন সে বাতাসের মধ্যে একটা খস্ খস্ আওয়াজ শুনে পেল। তার পর একটা সোনার পাখী উড়ে এল এবং পরে বখন সে ঠোঁট দিয়ে আপেলের গা'টার কামড় দিয়েছে অমন মালী-পুত্র ছুড়ল তীর। তীরটা পাখীটার কোন ক্ষতি করতে পারল না। কেবল মাত্র পাখীর লেজ থেকে একটা সোনার পালক খসে পড়ল এবং তারপরেই সে উড়ে চলল—আকাশের পানে। সকাল হতে মালী সোনার পালকটা নিয়ে গিয়ে হাজির হল রাজার কাছে। রাজা ডাকলেন সভাসদবর্গকে। সকলেই পালকটা দেখে বললেন—এটা রাজ্যের যে কোন অমূল্য সম্পদের চেয়েও মূল্যবান। রাজা বললেন—একটা পালক দিয়ে আমার কিছুই হবে না। গোটা পাখীটাই চাই।

সোনার পাখীটাকে খুব সহজেই পাওয়া বাবে—এই ভেবে মালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর গিয়েই সে একটা ছোট বনের কাছে হাজির হল। এবং বনের পাশেই একটা খেঁকশিয়ালকে দেখতে পেল। তাই সে তৎক্ষণি তার ধনুক উঁচু করে ধরল খেঁকশিয়ালটাকে মারবার জন্তে। ব্যাপার দেখে খেঁকশিয়াল বলল—তুমি আমাকে মের না। তোমাকে আমি সাহায্য করব। তুমি কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছ তা আমি জানি। সোনার পাখী চাই ত তোমার? আজ সন্ধ্যায় তুমি একটা গায়ে পৌছবে। বখন তুমি ওখানে পৌছবে তখন হুঁটো পাহাশালা মুখোমুখি দেখতে পাবে। ওর মধ্যের একটা খুব সুন্দর দেখতে। আরামপ্রদও বটে। ওটাতে তুমি ঢুকবে না। রাত কাটাবার জন্তে ওর বিপরীত দিকের নোংরা পাহাশালায় থাকবে, বুঝলে ত?

কিন্তু সে ভাবল—আচ্ছা ব্যাপার ত! এই বুনি খেঁকশিয়াল ব্যাটা কি করে জানল এসব? তাই এবার সে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু বার্থ হল। তীর ওর গায়ে লাগল না। বনের মধ্যে পালিয়ে গেল খেঁকশিয়াল। তারপর মালী-পুত্র ধেঁটে চলল। খেঁকশিয়াল-কথিত গ্রামে সে পৌছল এবং ওখানেই ওর সন্ধ্যা হ'ল। হুঁটো পাহাশালাও সে দেখতে পেল। ওর মধ্যের একটাতে খুব নাচ, গান আর হলা হচ্ছে। এবং বিপরীত দিকেরটা নোংরা আর স্থির। কোন সাড়াশব্দ নেই ওর ভেতর থেকে। আমি নিশ্চয়ই খুব নির্কোষ প্রতিপন্ন হব—যদি এই নোংরা বাড়ীটাতে প্রবেশ করি, এই চমৎকার বাড়ীটা ছেড়ে। এই ভেবে সে ভাল পাহাশালাতেই প্রবেশ করল। ইচ্ছে মত পান-আহার সাবল। তারপর পাখীর কথা, এমন কি বাড়ীর কথাও সে ভুলে গেল।

অনেক দিন পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কোন খবর না পাওয়ার বেজ পুত্র

প্রেরিত হল—সোনার পাখীর খোঁজে এবারও এই এক ব্যাপার ঘটল। খেঁকশিয়ালের সাক্ষাৎ এবং পরামর্শ সে পেল। কিন্তু বখন সে এই দুই পাহাশালার নিকটবর্তী হল, তখন জানালা দিয়ে দেখল যে, বড়দা ওর মধ্যে বেশ মজা করছে। বড়দাও ভেতর থেকে মেজ ভাইকে দেখে ডেকে নিয়ে গেল। খেঁকশিয়ালের কথা ভুলে গেল। ওর মধ্যে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সেও বড়দার মত পাখী এবং বাড়ীর কথা ভুলে গেল।

তার পর আবার অনেক দিন কেটে গেল। মালীর কনিষ্ঠ পুত্র এবার সোনার পাখীটাকে খোঁজবার জন্তে প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু মালী পুত্রদের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হওয়ার অনেক দিন ধরে ওর কথায় কান দেয় নি। তা ছাড়া পথে অনেক বিপদ হতে পারে—যার জন্তে সে কনিষ্ঠ পুত্রকে ছাড়তে রাজী হয়নি। বাগা হোক, অবশেষে সে রাজী হল। বেরিয়ে পড়ল কনিষ্ঠ পুত্র। হুঁদাদার মত বনের কাছে যেতেই ওর সাথেও খেঁকশিয়ালের দেখা হল। এবং সেও পরামর্শ দিল একে। দাদাদের মত সে খেঁকশিয়ালের প্রশ্ন নাশের কোন চেষ্টা করল না বরং খেঁকশিয়ালের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হল। খেঁকশিয়ালও সন্তুষ্ট হয়ে বলল—তুমি আমার লেজের ওপর বস। তা হলেই খুব দ্রুত যেতে পারবে। সেও বলল এবং খেঁকশিয়াল এত জোরে দৌড়ুতে লাগল যে বাতাসের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এবং ওদের কানেও সে শব্দ বিধতে লাগল।

বখন তারা এই গ্রামে পৌছল, তখন মালী-পুত্র পাহাশালা হুঁটো দেখতে গেল। অল্প কোন দিকে দৃকপাত না করে সে নোংরা পাহাশালাটিতে ঢুকে পড়ল এবং রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিল। সকালবেলায় আবার সে খেঁকশিয়ালের সাক্ষাৎ পেল। এবং সে আবার পরামর্শ দিল। বলল—তুমি সোজা চলে বাবে—যতক্ষণ না একটা হুর্গে পৌছাও। ওর সামনেই তুমি দেখবে সৈন্সরা ঘুমুচ্ছে আর নাকে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। ও-সবে খেয়াল না করে সোজা হুর্গের মধ্যে চলে গেল একটা ঘরে পৌছবে—যেখানে সোনার পাখীটা রয়েছে—একটা কাঠের খাঁচার ভেতর। ওর পাশেই একটা সোনার খাঁচা রয়েছে। তুমি নোংরা কাঠের খাঁচা থেকে পাখীটা বের করে সোনার খাঁচার বাধবার চেষ্টা করো না।

খেঁকশিয়াল মেজ সোজা করল এবং মালী-পুত্র ওর ওপর চড়ে বলল এবং শোঁ-শোঁ শব্দ করে চলল।

অবশেষে হুর্গের কাছে গিয়ে সে খেঁকশিয়ালের কথা মত সব দৃশ্য দেখতে গেল। সোজা চলে গিয়ে সে হাজির হল যেখানে খাঁচার ভেতর সোনার পাখীটা রয়েছে। তার নীচেই রয়েছে সোনার খাঁচাটা। আর ওর মধ্যেই রয়েছে আগের হারান সোনার আপেল তিনটে। বা পাখী আগে চুরি করে এনেছিল রাজার বাগান থেকে। তখন সে ভাবল—আচ্ছা, এই নোংরা খাঁচা থেকে যদি সে পাখীটাকে বের করে আনে, তাহলে খুব মজার ব্যাপার হতে পারে। তারপর সে নোংরা কাঠের খাঁচার দরজা খুলে পাখীটাকে সোনার খাঁচার রাখল। কিন্তু পাখীটা এমন চীৎকার করে উঠল যে, সব সৈন্সরা জেগে গেল ঘুম থেকে। এবং ওরা মালী-পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল—রাজার কাছে কয়েদী হিসেবে। পরদিন সকালে ওর বিচারের জন্তে সভা বসল। সকলেই বললেন যত্নাণ্ডাজার কথা। তবে যদি সে সোনার বোড়া—যে বাতাসের দ্রুত দ্রুত

ছুটে পাবে, তাকে এনে দিতে পাবে, তাহলে মৃত্যুদণ্ড ত হবেই না বরং সোনার পাখীটা এমনিতেই পাবে।

আবার মালী-পুত্র রাজা স্তব্ধ করল। সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং খুব আশাহীনও হল। কিন্তু একটু পরেই খেঁকশিয়ালের সাথে দেখা।—আমার কথা না শুনে তোমার কি রকম অবস্থা হয়েছে দেখ। তবুও আমি বলব কি করে সোনার ঘোড়াটা তুমি পাবে। বলল খেঁকশিয়াল। সোজা গেলে তুমি একটা দুর্গ দেখতে পাবে। ওর মধ্যে সোজা চলে গেলে একটা আন্তাবল দেখবে—যেখানে সোনার ঘোড়াটা ঝাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশেই ঘোড়ার সহিস ঘুমিয়ে আছে এবং নাক ডাকাচ্ছে। আস্তে আস্তে চামড়ার জিন্টা তুমি নেবে—সোনারটা নয়।

আবার সে খেঁকশিয়ালের লেজের উপর বসল এবং শোঁ-শোঁ বেগে চলল। ঠিকমত গিয়ে সে দেখল—সহিস সোনার জিনের ওপর হাত দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু যখন সে ঘোড়ার দিকে তাকাল তখন ভাবল—এ ঘোড়ার পক্ষে চামড়ার জিন্টা খুব খারাপ দেখাবে। এবং খুব লজ্জার বিষয় হবে। এই ভেবে যখন সে সোনার জিন্টা নিল তখন—সহিস জেগে উঠে চীৎকার ছাড়ল—আর সমস্ত প্রহরীরা জেগে উঠল এবং ওকে কয়েকটি হিসেবে ধরে নিয়ে গেল—রাজার কাছে বিচারের জন্ত। রাজা বললেন—মৃত্যুদণ্ডই তোমাকে দেওয়া হবে—তবে তুমি যদি অমুক রাজ্যের সুলতানী রাজকন্যাকে এনে দিতে পার, তাহলে সোনার ঘোড়া এবং সোনার পাখীটা তোমার নিজের সম্পদ হিসেবে দেওয়া হবে।

তখন সে আবার চলাতে শুরু করল। এবং হঠাৎ খেঁকশিয়ালের সাথে দেখা হল। আমার কথা শোননি কেন? যদি তুমি শুনে তাহলে পাখী এবং ঘোড়া উভয়ই পেতে। যাক তবুও আমি তোমাকে পরামর্শ দেব। তুমি সোজা চলে গেলে সন্ধ্যাবেলায় একটা দুর্গে পৌঁছবে। ওর মধ্যে তুমি চুকে রাজকন্যার স্নানাগারের কাছে যাবে। রাত বারটার সময় রাজকন্যা স্নানাগারে যাবে। তখন তোমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হতেই তুমি ওকে প্রণাম করবে। রাজকন্যা তোমার সাথে আসতে চাইবে। কিন্তু তার আগেই ওর পিতা-মাতার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে যাবে। তুমি ওকে যেতে দেবে না।—বলল খেঁকশিয়াল। অতঃপর মালী-পুত্র খেঁকশিয়ালের লেজের ওপর বসল এবং সন্ধ্যা নাগাদ দুর্গের কাছে পৌঁছল। খেঁকশিয়ালের কথামত মালী-পুত্র রাজকন্যার স্নানাগারের কাছে ঝাঁড়িয়ে রইল এবং রাত বারটার সময় রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেল। এবং প্রণাম ঠিকল। রাজকন্যাও ওর কথাগুলোই ওর সাথে আসতে চাইল বটে, কিন্তু আসবার আগে পিতামাতার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইল। কারণ, ওর কোন বোজ-খবর না পেলে পিতা-মাতা কেঁদে আকুল হবেন। মালী-পুত্র মোটেই রাজী হল না। কিন্তু রাজকন্যা কীদমে কীদমে ওর পায়ের ওপর পড়ল। রাজকন্যার ব্যাপার দেখে সে ওর পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বস্তি দিল। কিন্তু যে মুহূর্তে রাজকন্যা ওর পিতার শরনকক্ষে হাজির হল, তখনই সমস্ত প্রহরী জেগে উঠল এবং বন্দী করে রাখল।

অতঃপর সে রাজার সম্মুখে নীত হল। রাজা নিকটবর্তী একটা পাহাড় দেখিয়ে বললেন—তুমি আট দিন ধরে এটা খুঁড়ে সমস্ত

ভূমিতে পরিণত করে ফেলতে পারলে রাজকন্যা পাবে এবং মৃত্যুদণ্ড হবে না।

পাহাড়টা সত্যিই খুব বড় ছিল। কি করে ও খুঁড়ে সবটা? সাত দিন ধরে খুঁড়ে দেখে পাহাড়ের খুব অগ্নাশটুকুও খুঁড়ে পারেনি সে। আর একদিন মাত্র বাকী। তাই সে মহা ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল। সাত দিনের দিন খেঁকশিয়াল এসে হাজির। এসেই বলল—যাও তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ। গিয়ে ঘুমোও। আমি সব কাজটা করে দিচ্ছি।

যখন সকালবেলায় মালী-পুত্র জেগে উঠল তখন দেখল যে, পাহাড়ের চিহ্নটা মাত্র নেই। তাই সে ভাড়াতাড়ি রাজাকে গিয়ে খবর দিল।

রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজকন্যাকে ওর হাতে দিলেন। খেঁকশিয়াল তখন বলল—আমরা এখন ঘোড়া পাখী সবই পাব। মালী-পুত্র বলল—কি করে পাব?

খেঁকশিয়াল বলল—তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে সব কাজ শীগগির সমাধা হয়ে যাবে। যখন তুমি রাজার কাছে যাবে তখন তোমার জিজ্ঞেস করবেন—কই রাজকন্যা কোথায়? তুমি বলবে—এইখানেই। তখন তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। আর সোনার ঘোড়াটা তোমায় দেবেন। তুমি ঘোড়ার চড়ে বসবে। আর ঐ স্থান পরিভ্রমণ করার আগে তুমি রাজাকে সন্তোষ জানাবে এবং অবশেষে রাজকন্যার সাথে করমর্দন করবে এবং করমর্দন করার সময়েই রাজকন্যার হাত ধরে ওকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে দেবে ছুট। যত জোরে পারবে তত জোরে পালিয়ে আসবে।

খেঁকশিয়ালের কথা মত রাজকন্যাকে নিয়ে আসা হল ছিনিয়ে। আবার সে বলল—তুমি যখন পাখীর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন আমি রাজকন্যাকে নিয়ে দুর্গের বাইরে থাকব। তুমি ঘোড়ার চড়া অবস্থায় রাজার সাথে কথা কইবে। যখন তিনি সোনার পাখীটা দেবেন—তখন তুমি ঘোড়ার চড়াবস্থায় পাখীটাকে হাতে নিয়ে দেখবে খাঁটি সোনার কি না। তারপর রাজা একটু অস্বস্তি হলেই পালিয়ে আসবে ঘোড়া আর পাখী নিয়ে।

সব কাজ খেঁকশিয়ালের কথা মত সমাধা হয়ে গেল। পাখী নিয়ে রাজকন্যাকে ঘোড়ার চড়িয়ে আবার ওরা চলাতে শুরু করল। খেঁকশিয়ালও চলল। একটু পরে খেঁকশিয়াল মালী-পুত্রের কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করে বলল—তুমি দয়া করে আমার পা এবং মাথা কেটে ফেল।

মালী-পুত্র কি এতে রাজী হবে? যে ওকে এত সাহায্য করেছে তাকে কি করে হত্যা করবে? তাই সে গরবাজি হল। খেঁকশিয়াল আবার পরামর্শ দিল। বলল—তুমি ছোটো কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। প্রথমতঃ, কাউকে কীদা থেকে মুক্ত করতে যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন নদীর পাড়ে বিশ্রাম করতে বসবে না। তা হলেই বিপদ। আরও বলল—হে, যুবক! আমার এই কথা ছোটো বক্ষ করতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তারপর সে বিদায় নিল।

তারপর মালী-পুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে সেই গ্রামের মধ্যে এসে পড়ল। যেখানে পাহাশালা দুটো বিপরীতস্থানী ছিল এবং তার দ্ব্যেষ্ঠ জাতীয় হয়ে গেছিল। ওখানে পৌঁছতেই খুব গোলমাল

শোনা গেল। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানল যে—দুটো লোককে কাঁসী দেওয়া হচ্ছে। নিকটে দেখে—সে ত একেবারে অবাক হয়ে গেল। কারণ ঐ লোক দুটো আর কেউ নয়—ওর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাধর। বারা এর মধ্যে দম্ভাতে পরিণত হয়েছিল। সে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, ওদের বাঁচাবার কি কোন পথ নেই?—না যতক্ষণ না ওরা সব টাকা-পয়সা ফেরৎ দিচ্ছে ততক্ষণ ছেড়ে দেওয়া হবে না।

সে ওদের সব টাকা মিটিয়ে দিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাধরকে মুক্ত করল। এবং তারা সবাই একসাথে দেশে ফিরে চলল।

যে স্থানটিতে অর্থাৎ বনের পাশে ওদের সাথে থেকশিয়ালের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পাশেই একটা নদী ছিল। ওখানে পৌঁছতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাধর বলে উঠল—নদীর ধারে কিছুক্ষণের জন্ত বিশ্রাম করে নেওয়া বাক এবং পান আহার সমাপ্ত করা হোক।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা থেকশিয়ালের কথা ভুলে গিয়ে বলল—হ্যাঁ, এখানেই বিশ্রাম করা হোক। এই বলে সে-ও নদীর ধারে গিয়ে বসল। সে যখন চুপচাপ বসে ছিল তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাধর পেছন দিক দিয়ে গিয়ে ওকে চাটদোলা করে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ওরা দু'ভাই রাজকন্তা, ঘোড়া আর পাখী নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে রাজাকে বলল—এই সমস্তই আমরা আমাদের নিজেদের শক্তি দ্বারা অর্জন করেছি।

খুব আনন্দের ধনি পড়ে গেল সমস্ত রাজ্যে। কিন্তু ঘোড়া আহার বন্ধ করল। পাখী আর গান করল না এবং রাজকন্তা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওদিকে ত ছোট ভাইকে ওরা নদীর ভেতরে ফেলে দিতে গেছে। ভাগ্যিস ওখানে বেনী জল ছিল না। কিন্তু ওর শরীরে ভীষণ আঘাত লেগেছিল। কয়েকটা হাড়ও ভেঙে গেছিল। নদীর তীরটা ভীষণ কদমাক্ত থাকায় সে বাঁচবার বা শুকনো জায়গায় ওঠবার কোন পথ পাচ্ছিল না। অতঃপর সেই থেকশিয়াল হাজির হল। এবং তার কথা না শোনার জন্তে খুব বকুনি দিল। কারণ তার কথা শুনে ত বিপদ হত না। সে থেকশিয়ালের লেজ ধরল। আর একটা ভাল জায়গায় নিয়ে তাকে সস্থ করে তুলল।

তার পর থেকশিয়াল বলল—যদি তোমার ভাইরা তোমাকে ঐ রাজ্যে দেখতে পায় তাহলে হত্যা করবে। তাই থেকশিয়ালের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রিষ্ট্র বেশে সে তার রাজ্যের রাজার কাছে গিয়ে হাজির হল। রাজপ্রাসাদে ওকে প্রবেশ করতে দেখেই ঘোড়া আহার শুরু করল। পাখী স্তম্ভুর স্বরে সংগীত শুরু করল। এবং ভাইদের চক্রান্তের কথা বলল। রাজাও—রাজকন্তাকে ওর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এবং ওদের দুজনকে খুব করে শাস্তি দিলেন। এবং রাজার মৃত্যুর পর সেই-ই রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হল।

অনেক দিন পরে মালীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ নতুন রাজা যেখানে থেকশিয়ালের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল—সেই বনের ধারে বেড়াতে গেল। পুরোন থেকশিয়ালের সাথে ওর আবার সাক্ষাৎ হল।

সে আবার ওকে তার মাথা এবং পা কেটে ফেলতে বলল। অবশেষে নতুন রাজা ওর কথা মত মাথা ও পা কেটে ফেলল, আর যুহুর্ডের মধ্যে সে থেকশিয়াল থেকে মানুষে পরিবর্তিত হল এবং ঐ রাজকন্তার ভ তারূপে পরিগণিত হল। বাক রাজকন্তা অনেক দিন আগে হারিয়েছিল।

## ইয়োরোপী টিপ

বাহুকর এ, সি, সরকার

কুঙ্গম-টিপ, কাজলের টিপ, চন্দন টিপও ভালো, সিন্দুর টিপ কপালে গৃহিণী ঘর মোর করে আলো। টিপ সন্নি দিয়ে বহু কাজ চলে, টিপ-টিপ পড়ে বৃষ্টি, বাসর-ঘরেতে নতুন বধূর টিপ-টিপ করে দৃষ্টি। টিপ-টিপ করে সন্ধ্যার তারা রজনীর অবসানে, টিপ-টিপ সাজে সেজে বড়বাবু হাওয়া খান ময়দানে। নস্তির টিপ নাকে পড়ে দাদা, বুদ্ধির জট খোলে, রেসের ঘোড়ার টিপ দিয়ে দিয়ে কারও বা পকেট ফোলে। কিন্তু রে দাদা, ইয়োরোপী টিপ কুণী বাধা তার সাথে, সাবধান হয়ে না চলো যদি বা ফল পাবে হাতে হাতে। উঠিতে বসিতে ঘরে ও বাইরে সবখানে টিপ ভাই, পার্কেতে গিয়ে বসবে একটু সেখানেও ছাড়া নাই। বেঞ্চের পরে বসবামাত্র হাত বাড়াবে মালী, উপড় হস্ত না করো যদি বা খেতে হবে গালাগালি। সিনেমায় যাবে? বেশ ভালো কথা টিকিট নাও না কিনে, গেট-কিপারকে টিপ দাও আগে তবে দেবে সিট চিনে। ইন্টারভালে 'টয়লেটে' যাবে সেখানেও টিপ চাই, স্ট্রট-টাই-পর মাথের রয়েছে কেমনে এড়াতে ভাই? ট্যান্ডিতে চেপে বেড়াবে সহরে, মিটারে উঠবে ভাড়া, 'সোফার সাহেব,' সে-ও টিপ চায় মিটারে পাওনা ছাড়া। হোটেলতে বাও সেখানেও টিপ টিপে ভরা এই দেশটা, টিপ এড়ানোর টিপ কিছু দাও, দেখি করে শেষ চেষ্টা। \*

\* গত বছর ইয়োরোপ সরকারালে স্বনামধন্য বাহুকর এ, সি, সরকার স্বরচিত এই কবিতাটি আমার কাছে পাঠান। প্রকাশের জন্ত কবিতাটিকে ফাইলে রেখে দেবার কয়েক দিন পরে খুলে দেখি সাদা কাগজ পড়ে আছে—লেখার চিহ্ন মাত্র নাই। ফেলে না দিয়ে কাগজটিকে ফাইলের মধ্যেই রেখে দিই। অল্প কিছু দিন পূর্বে ফাইল খুলে দেখলাম সাদা কাগজের বুক লেখা ফুটে উঠেছে। পাছে এ লেখা আবার ম্যাজিকের মত উড়ে যায়, সেই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। কবিতাটিতে বাহুকর এ, সি, সরকারের সৃষ্ট রসজ্ঞান ও কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।—সম্পাদক

“আগত যুগ, ভারতের তার স্বন্ধে লইয়া বঙ্গজননী  
উঠিতেছেন।”

ঐঅরবিন্দ



কামির  
মূলকারণ দূর  
করুন



সিরোলিন  
খান

নিরাপদ  
পারিবারিক  
ঔষধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি  
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কাশির মূলকারণ হুটে-  
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

# খেলা খেলা

কলকাতা মাঠে ফুটবল খেলা বেশ জমে উঠেছে এক রকম।

তবে এবারের খেলায় তেমন বিশেষ কোন উন্নতি ফুটবল-মানের দেখা যায়নি। মহামেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। গত বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহাবাগান লীগ পাল্লার দৌড়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে প্রায় অনেক দলই প্রথমার্ধের খেলা শেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়ান-সিপের পাল্লার ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে লীগের কিংকর্তা খেলায় মোহনবাগান দল তাদের শক্তির পরিচয় দিতে চেষ্টা করছে। মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দলের ফিরতি ম্যাচের খেলাটি ১—১ গোলে সম্মানসিদ্ধ হয়েছে। এ খেলায় মোহনবাগান দলের জয়লাভ করা সম্ভাবনাই অধিক ছিল।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের চ্যাবিটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল ১০ মিনিটের সময় একটি মাত্র গোল করে এবং ঐ গোলেই খেলাটির মীমাংসা হয়। প্রথম দশ মিনিট ইষ্টবেঙ্গল দল আবিপত্য বিস্তার করে থাকলেও মোহনবাগান দল আস্তে আস্তে খেলায় আবিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরয়ার্দের ব্যর্থতার দ্বারা গোল করা সম্ভব হয়নি।

রাজস্থান ও মহামেডান দলের খেলাটিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব পাওয়া যায়। রাজস্থান দল খেলা আরম্ভ হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে একটি গোল দেয়। আবার পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে মহামেডান দল গোলটি পরিশোধ করে। এর পর দু'দলই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালালেও কোন দলই গোল করতে সমর্থ হয়নি।

লীগের নিচের দিকের দলগুলির মধ্যে হাওড়া ইউনিয়ন, বালী প্রতিভা প্রমুখ দলগুলি তাদের শক্তি অনুযায়ী আশাহুরূপ খেলেছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

## ট্রেডিয়াম প্রসঙ্গে

ফুটবল মরসুমে কলকাতা দর্শককুলের দ্রবস্থার চরম অবস্থা দেখলেই ট্রেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। এ বিষয়ে নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি বছরেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাবাদিকরা আলোচনা করেছেন। সাময়িক ভাবে ট্রেডিয়ামের কথা উঠেই আবার সেটা চাপা পড়ে যায়।

সম্ভাব্যের পরলোকগত মহারাজা সর্বপ্রথম কলকাতার ট্রেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ইদানীং কালের বাদিন্য ও শিক্ষামন্ত্রী ভূপতিভূষণ মজুমদার মহাশয়ও ট্রেডিয়াম নির্মাণকল্পে বখেট উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু আজও তা পরিকল্পনার মধ্যেই রয়ে গেছে।

ট্রেডিয়াম নির্মাণের স্থান নির্বাচন একটি সমস্যা। কোন সময়ে ইডেন উদ্যানে ব্যাণ্ড ষ্ট্যান্ড, এলেনবোরো কোর্স, ইডেন উদ্যানের

কখনও ক্যালকাটা ফাউন্স পুলিশ ক্লাবের মাঠ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত পরিকল্পনা—পরিকল্পনাতেই রয়ে গেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট মাঠ সমেত শ্রাশানাল ক্রিকেট ক্লাবের সম্পত্তি পুলিশী ব্যবস্থায় দখল করার পর ট্রেডিয়াম নির্মাণের কিঞ্চিৎ আশা দেখা দিলেও কতখানি কার্যকরী হবে, তা সঠিক ভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কলকাতার ট্রেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ইডেন উদ্যানে ট্রেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে, পশ্চিম বাঙালার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ডিমাণ্ড গ্র্যাক্সন কমিটির কনভেনর জীবীরেন দেব কাছে যে চিঠি দেন, তাতে অনেক আশার আলো দেখা দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন। আমাদের ডাঃ রায় সত্যি কি এ বিষয়ে আগ্রহী? বিধান সভায় ইতিপূর্বে ট্রেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা হয়নি। ডাঃ রায় প্রতিবারই বলেছেন যে, সরকার ট্রেডিয়াম নির্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হ'ল না কেন? বতদূর মনে হয়, এ বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। কলকাতায় স্পোর্টস বিল পাশ হয়েছে। কিন্তু তার কাজ একটুও অগ্রসর হয়নি।

হ্যাঁ, ইডেন উদ্যান এ ভাবে দখল থানিকটা বিশ্বস্তের সৃষ্টি করেছে।

ইডেন উদ্যান ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠে কমোজিট ট্রেডিয়াম করা হলে কিন্তু আপত্তি আছে। কমোজিট ট্রেডিয়াম গঠিত হলে কি ফুটবল, কি ক্রিকেট কোনটির উপরই সুবিচার হবে না। ফুটবল মরসুমের পর দ্রুত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে যে সময়ের প্রয়োজন তা মোটেই হাতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বালুবিহীন ইডেন উদ্যানকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে প্রচুর সময় লাগবে।

ক্রিকেট মাঠে ফুটবল খেলা যায় কিন্তু ফুটবল মাঠে ক্রিকেট খেলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

একশ' বছরের ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠ বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানধিকারী ক্রিকেট মাঠকে ফুটবল মাঠে পরিণত করাও সম্ভব মনে হয় না। ট্রেডিয়াম না থাকলেও ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেন উদ্যানের বখেট সন্মায় আছে। দেশ-বিশেষের গুণী ও কৃতি খেলোয়াড়রা এই মাঠে খেলে গেছেন। তারা মাঠের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বিশ্বের ক্রিকেট দরবারে ইডেন উদ্যানের যে আভিজাত্য, তাকে ক্ষুণ্ণ করার কোন রকম বৌদ্ধিকতা নেই।

কলকাতার মাঠের অভাব নেই। ইডেন উদ্যানকে বাদ দিয়ে  
 \* \* \* \* \*  
 কলকাতার মাঠের অভাব নেই। ইডেন উদ্যানকে বাদ দিয়ে



ভাই না কি

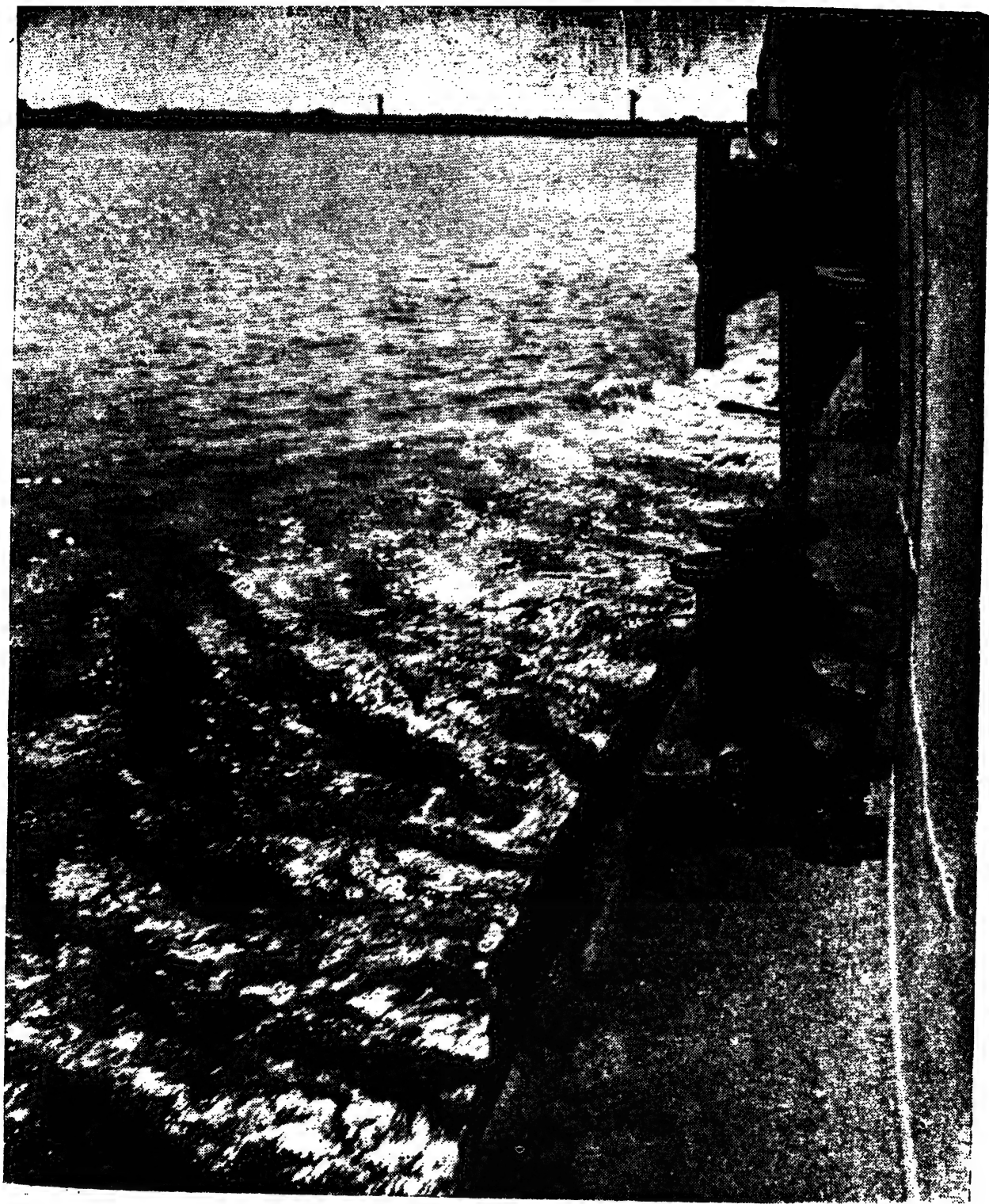
—বহন দানডণ্ড

আনোবচ্চি



বিজয়ে জিকারা

—কামাক্ষীকান্ত চট্টোপাধ্যায়



জলযান

—অৰ্জুনেশ্বৰ ভৌমিক





ভিপোর হাঁ

—চকল মিড

জগৎ কলকাতা মাঠে পৃথক ট্রেডিয়াম চাই। এবং সে ট্রেডিয়াম বেশ বড় আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### ক্রিকেট

বার্মিংহামের 'এজবাস্টন' মাঠে ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। মোনো রামধীনের মারাত্মক বোলিং এবং মিথ, ওয়েল, ওয়ালকট ও সেবাসের প্রশংসনীয় ব্যাটিং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয়লাভের পথকে স্তূর্ণম করে দিলেও শিটার মে, কলিন কাউডের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং এবং লক এবং লেকারের বোলিং শেষ পর্যন্ত খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—১৮৬ (রিচার্ডসন ৪৭, মে ৩০, টুম্যান নট আউট ২১, ইনসোল ২০ রামধীন ৪১ রাশে ৭ উই গিলক্রিষ্ট ৭৪ রাশে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—১ম ইনিংস—৪৭৪ (মিথ ১৬১, ওয়ালকট ১০, ওয়েল ৮১, জি, সেবাস ৫৩, আর কানহাই ৪২, ভার্ডাড ২৪, লেকার ১১১ রাশে ৪ উইঃ ষ্ট্যাথাম ১১৪ রাশে ৩ উইঃ টুম্যান ১১ রাশে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—৫৮৩ (উইঃ ডিক্সেঃ) যে নট আউট ২৮৫, কাউডে ১৫৪, ব্রোজ ৪২, রিচার্ডসন ৩৭, ইভাল ২১, রামধীন ১৭১ রাশে উইঃ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২য় ইনিংস—৭২ (৭ উইঃ) (ইভার্টন উইকম ৩৩; লক ৩১ রাশে ৩ উইঃ টুম্যান ৭ রাশে ২ উইঃ লেকার ১৩ রাশে ২ উইঃ)।

### [ অমীমাংসিত ]

লর্ডন মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৩৬ রাশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে পরাজিত করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এ পরাজয় কিস্তুম্যানদের ব্যর্থতা ও তারই সংগে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা বিশেষ করে চোখে পড়ে।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১৭ রাশে পিছিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ব্যাটিং শুরু করে এবং দিনের শেষে ৪৫ রাশ সংগ্রহ করল। এভারটন ও সেগান ছাড়া কেউই প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না। ২৬১ রাশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ার এক ইনিংস ও ৩৬ রাশে পরাজিত হল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—১ম ইনিংস—১২৭ (আর কানহাই ৩৪, মিথ ২৫, বেলী ৪৪ রাশে ৭ উইঃ টুম্যান ৩০ রাশে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৪২৪৪ (কাউডে ১৫২, ইভাল, ০'৮২, রিচার্ডসন ৭৬, টুম্যান নট আউট ৩৬, ব্রোজ ৩২, গিলক্রিষ্ট ১১৫ রাশে ৪ উইঃ ওয়েল ১১৪ রাশে ২ উইঃ সেবাস ২৮ রাশে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২য় ইনিংস—২৬১ (উইজ ১০, সেবাস ৬৬ নাইরন আসগার আলী ২৭, ওয়ালকট ২১, বেলী ৫৪ রাশে ৪ উইঃ ষ্ট্যাথাম ৭১ রাশে ৩ উইঃ টুম্যান ৭৩ রাশে ২ উইঃ)

[ ইংলণ্ড ১ ইনিংস ৩৬ রাশে বিজয়ী ]

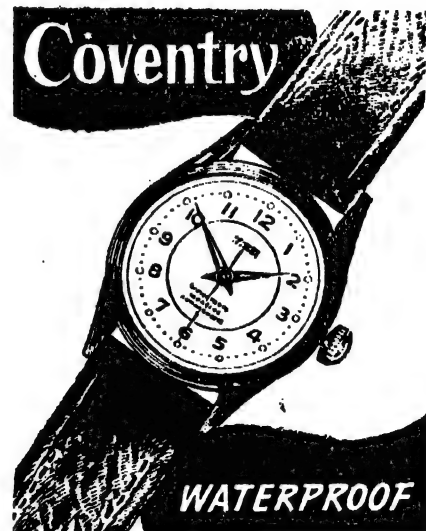
### টুকরো খবর

যেকারী পি, চক্রবর্তী বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটি খেলা পরিচালনা করার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এ সংবাদ চক্রবর্তীর নিজের পক্ষে ও কলিকাতা যেকারীজ এসোসিয়েশন তথা ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা।

ভারত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট, তথাপি ভারতের কাছ থেকে খেলা পরিচালনার জন্ত সাহায্য চাওয়া ভারতীয় যেকারীর যোগ্যতার পরিচায়ক। বহিরাগত যত দলই কলকাতায় সফর করে গেছেন, তাঁরা খেলার পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শ্রী চক্রবর্তীর এ সম্মানে প্রতিটি ভারতবাসী গৌরবাবিত।

ভারতের টেনিস পটীয়সী মিস রিতা জেতার একজন জার্মান শিরানো-বাদকের সঙ্গে গত ১৮ই এপ্রিল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেও রিতা টেনিস খেলার সম্পর্ক ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত করেছেন। ব্যাডেন ক্লাবের সভ্যা হিসাবে তিনি বিভিন্ন টেনিস খেলার অংশ গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, রিতার স্বামী রলফ জাল মুলার একজন শিরানো-বাদক হলেও তাঁরও টেনিসে স্নদের হাত আছে। দাম্পত্য জীবন স্নখের হোক, এই কামনাই করি।

ইংলণ্ডের কীর্তমান ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কমটন প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রে কমটন জনপ্রিয় খেলোয়াড়। একাধারে ফুটবল ও অপর দিকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে এতখানি গৌরব অর্জন কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি।



**ROY COUSIN & CO.**  
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1  
OFFICIAL AGENTS FOR  
**OMEGA & TISSOT WATCHES**  
SOLE AGENTS FOR  
**COVENTRY WATCHES**



## অথরের লিপষ্টিক

লিপষ্টিকের সূষ্ঠ প্রয়োগ আপনার সৌন্দর্য মহনীয় করে তুলবে, কিন্তু এর অপপ্রয়োগে তেমনি সৌন্দর্যের তানি হতে পারে। যদি আপনার স্বামী কিংবা পুরুষ-বন্ধু সাধারণ মানুষ হন, তাহলে তাঁদের কাছে লিপষ্টিক ব্যবহারের নিন্দা শুনে শুনে আপনাকে হতাশ মনে হবে, তাঁরা লিপষ্টিক আদৌ পছন্দ করেন না। কিন্তু তা সত্য নয়। সুন্দর এবং পরিষ্কার থাকলে যে কোন মানুষই উজ্জ্বল লাল অথর পছন্দ করেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঠিক হোটেল ওপর একটু লিপষ্টিক অত্যন্ত অথরের সংগে লাগানো আছে, আর কফি বা অল্প কিছু খেতে গিয়ে তাও অদৃষ্ট হয়ে গেছে। এমনি করে লিপষ্টিক ব্যবহারেই তাঁদের আপত্তি।

যদি লিপষ্টিক স্পন্দন করে ব্যবহার করতে না পারেন এবং যদি এর রং স্থায়ী না হয়, তাহলে এর ব্যবহার নিরর্থক। কিন্তু তা করবেন কী করে? আমরা সেই বিষয়েই এখন আলোচনা করব।

## লিপষ্টিকের সূষ্ঠ প্রয়োগের নিয়ম

অল্প সমস্ত প্রসাধনের কাজ সেবে লিপষ্টিক ব্যবহার করবেন। লিপষ্টিক ব্যবহার করবার আগে খুব সাবধানে মুখের সর্বত্র foundation make-up (এক প্রকার তরল প্রসাধন জব্য। পাউডার, ক্রিম, লিপষ্টিক বা অল্প কোন প্রসাধন জব্য ব্যবহারের পূর্বে এ বস্তু ব্যবহার করতে হয়) ব্যবহার করুন। বিশেষ করে চোঁটে লাগাবার উপর জোর দিন, যাতে ওখানকার স্বক ভাঁজা ভাঁজা না দেখায়। তারপর দেখতে হবে আপনার অথর খুব শুক কি না। এর জন্ত আপনি কমনীয় পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

এবার লিপষ্টিক ত্রাস দিয়ে লিপষ্টিকের ওপর ঘষুন এবং ওতে লিপষ্টিক ভরিয়ে নিন। চোঁটে দেবার সময় প্রয়োজন মত রং ভরে নেবেন ত্রাসে। সব সময় ত্রাস দিয়ে রং দেবেন। মোজামুজি ঠিক থেকে এমন ভাবে নেবেন না যাতে ঠিকটা ভেঙ্গে যায়।

আপনার স্বাভাবিক অথর-রেখা ধরে উপরের চোঁটটি আগে রং করুন। প্রথমে একদিকের কাজ শেষ করুন এবং পরে অপর দিক আরম্ভ করবেন, দেখবেন যাতে দুদিকেই সমান দেখায়। এবার নীচে আগুন এবং চোঁটের সীমারেখা ত্রাস দিয়ে অথবা একেবারে টিউব থেকে রং নিয়ে ভরিয়ে দিন। মুখের প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত রং দেবেন। ফলে যখন হাসবেন, তখন সমগ্র অথর অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাবে। প্রথম প্রথম ধীরে লিপষ্টিক ব্যবহার করেন এবং এমন কি ধীরে এ বিষয়ে পটু, তাঁরাও

মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলেন এবং অথরের ঠিক সীমারেখাটি নষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। একেবারে সেঁটে বাবার আগে যে ধারটা একটু নষ্ট হয়েছে, সেখান থেকে অপপ্রয়োজনীয় লিপষ্টিক উঠিয়ে ফেলুন এবং একটু শুঁড়ো পাউডার দিন। লিপষ্টিক দেবার পর ছুতিন মিনিট বসে থাকুন, যাতে রংটা বেশ বসে যায়; তার পর 'টিন্স' কাগজ দিয়ে জায়গাটা বেশ করে মুছে ফেলুন।

## যথার্থ অথর-রেখা

লিপষ্টিক দেবার পর নিজেকে খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করুন। নিজে নিজে কথা বলুন, হাসুন, নিজের চোঁট ছুঁতে দিয়ে একটা 'ও' তৈরী করুন। যদি আপনার মনে হয় কাজ এবং বিশ্রাম—সব সময়েই আপনাকে স্পন্দন দেখাচ্ছে এবং দেহের অত্যন্ত অংশের সাথে আপনার অথরের একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহলে জানবেন, যে অথরচিত্র আপনি তৈরী করেছেন তা যথার্থ। কিন্তু চোঁট ছুঁতে যদি খুব ছোট বা বড় দেখায়, কিংবা একটু ঝুলে পড়ে, তাহলে এর কতকগুলি প্রতিবেদক আছে।

যদি আপনার চোঁট আপনার মুখের তুলনার খুব ছোট এবং স্ক্র হয়, তাহলে আপনার স্বাভাবিক অথর-রেখার সমান্তরালে সমগ্র অথর-চিত্রটি বর্ধিত করুন। যদি তা খুব বড় হয়, তাহলে foundation make up আর পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক অথর-রেখা টানুন। এটা আগের মতই স্বাভাবিক রেখার সমান্তরালে থাকবে, কিন্তু একটু তির্যকের দিকে। যদি নিচের চোঁট একটু ঝুলে পড়ে, তাহলে অথর-চিত্র নিচের চোঁটের মাঝখান থেকে আরম্ভ করুন এবং ঝুলে পড়া লাইনগুলোর মাঝ দিয়ে একটু নতুন সোজা লাইন হৃদিকের সীমা পর্যন্ত নিয়ে যান।

আপনার লিপষ্টিক ত্রাস আর লিপষ্টিক একজন প্রসাধনশিল্পীর মত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করুন। আর ক্রমাগত অভ্যাসে আপনি সত্যিকার শিল্পীর মতই এর ব্যবহার করতে পারবেন।

—শ্রীস্বদেশ মোদী (লাক্‌মে)

## চলচ্চিত্রশিল্প ও বুটেন

বিশেষ ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা ছাড়া বুটেনের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি বা বুটেন চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন হতো। কতকগুলো ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানে বেশী রকম কড়াকড়ি হয়ে থাকে—এর মুখ্য লক্ষ্য বলতে কিছুটা মধ্যাঙ্গ আর বাকীটা বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়।

বুটেনী-বাণিজ্য থেকে বুটেনের এই শিল্পটিতে যে আর হতে

পারে, তার মোট পরিমাণ হবে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আর হয়ত সম্ভব—আমদানীকৃত ফিল্ম বাবদ ডলার ব্যয় বাঁচিয়ে।

বুটিশ ফিল্মশিল্পক্ষেত্রে সাহায্যের একটি সবচেয়ে বলিষ্ঠ পন্থা হচ্ছে 'কোটা' বা বরাদ্দ ব্যবস্থা। সেখানকার সিনেমা-ভবনগুলোতে দেশী ছবিগুলো কি পরিমাণ দেখাতে হবে—বৈধে দেওয়া আছে সেইটি। আলোচ্য ব্যবস্থাটির লক্ষ্য কিন্তু অধিক সংখ্যার বুটিশ ফিল্ম তৈরীর জন্তে উৎসাহ দেওয়া নয়, পরস্তু আগে থেকে তৈরী ছবিগুলো বাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত হ'তে পারে—তারই নিশ্চয়তা বিধান। ছবি নির্মাণের কাজ আরম্ভ থেকে ছবির মুক্তিলাভ পর্যন্ত সময় সাধারণতঃ প্রায় ১৮ মাস। এই ভিত্তিতে প্রতি বছরই নির্দীয়মান বা নির্দিষ্ট ছায়াছবিগুলোর বরাদ্দ নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভবপর।

বুটেনে ছায়াছবি সমূহের প্রদর্শন সম্পর্কে বাতে নিশ্চয়তা থাকে, এই উদ্দেশ্যে এক দিকে 'কোটা' বা বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু যেমন আছে, অপর দিকে নেশনাল ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ফিল্মগুলোর নির্মাণে সাহায্য করে চলেছেন। প্রতিটি ফিল্মই সে সাহায্য পাবে, এমন নির্দিষ্ট কোন কথা নেই। সাধারণতঃ সে সকল ক্ষেত্রেই অর্থ সাহায্য করা হয়, যেখানে প্রয়োজক বড় একটি ডিস্ট্রিবিউটার ফাংশনের কাছ থেকে আগে ভাগেই ছবি ডিস্ট্রিবিউশনের গ্যারান্টি আনতে পারেন। গ্যারান্টি দেওয়া থাকতে হ'বে এই মর্মে—ছবি নির্মাণ ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী বহন করতে প্রস্তুত থাকবেন, যে ক্ষেত্রে অবস্থায়। বাজার থেকে শেষ অবধি রাজস্ব যদি সেই পরিমাণে না উঠে এসে, তবে এই গ্যারান্টির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। ব্যয়ের অবশিষ্টাংশের শতকরা ৩০ ভাগের জন্ত প্রয়োজক বা ছবিনির্মাতা কোম্পানীই দায়ী থাকেন। অত্যাধিক একটা মোটা অংশ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনকেই বহন করতে হয়।

এভাবে নেশনাল ফিল্ম কর্পোরেশন অবশিষ্ট তেমন ক'জন প্রয়োজককেই অর্থ সাহায্য করতে পারতেন, বাইরের নৃত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ বাদেই পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন আইন ব্যবস্থা হচ্ছে—যাতে করে এই ধরনের কড়াকড়ি বিলুপ্ত ঘটবে।

হিসাব অনুসন্ধান করে দেখা গেছে—১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চার বছর কাল মধ্যে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ১৫২টি বুটিশ ফিল্ম বা ছায়াছবির নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেছে। এই ১৫২টি ফিল্মের মধ্যে ৬২টি ক্ষেত্রেই মুনাফা অর্জিত হয়েছে। উক্ত ছবিগুলো অবশিষ্ট একই সময়ে বুটিশ ফিল্ম প্রোডাকশন ফাণ্ড থেকেও সাহায্য পায়। ফিল্ম কর্পোরেশন যে সাহায্য যোগান, বুটিশ বাণিজ্য-বোর্ডের সরবরাহ-কৃত অগ্রিম অর্থই এইটির সূত্র। মোটের উপর বুটেনে চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে, একে আরও বড় করার লক্ষ্য থেকে সরকারী পর্যায়ে বহুবিধ চেষ্টা অবলম্বিত ও পন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে সেই থেকেই।

### এ দেশের তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্প শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের অত্যন্ত প্রধান কুটিরশিল্প। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাঁতশিল্পের

অবদান অসীকার করার উপায় নেই। ইতিহাসেই দেখা যায়—অতীত ভারত বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত, তাঁত-শিল্পজাত পণ্যের ব্যবসায় থেকে। ইংরেজ শাসনে পিষ্ট হয়ে এই শিল্প পিছিয়ে পড়েছিল বহুদূর—কিন্তু এক্ষেত্রে দেশ অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার এর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলেছে এবং এইটি নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত ছিল।

একটা জিনিস প্রথমেই লক্ষ্য করার—আম্রিকার ভারতেও অত্যন্ত যে কোন শিল্পের চেয়ে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা বেশী। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-সচিব ত্রীনিত্যানন্দ কামুনগোর মতে এই শিল্পের যারকতে দেশের ৩০ লক্ষাধিক ব্যক্তির কর্মসংস্থান হচ্ছে। অপর একটি হিসাবে জানা যায়—সমগ্র ভারতে ২১ লক্ষ তাঁতে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা হবে প্রায় ৮৭ লক্ষ। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কম হবে না এবং কর্মীর সংখ্যাও হবে প্রায় ৪ লক্ষ। বাংলায় যে সকল তাঁত চালু—সেগুলো তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উল্লিখিত ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজারই হচ্ছে ঠিকঠাক তাঁত, অবশিষ্টগুলো অর্ধস্বয়ংক্রিয় ও হস্তচালিত তাঁত।

সরকার থেকে দাবী করা হচ্ছে—তাঁতশিল্প দেশের বস্ত্র চাহিদার শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ মিটিয়ে থাকে। বস্ত্রকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বস্ত্র উৎপন্ন হয় ১৯৫৫ সালে ১৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ গজ এবং ১৯৫৬ সালে ১৫৪ কোটি ১০ লক্ষ গজ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ কোটি গজের উপর এবং তার মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা।

বিদেশী মুদ্রাও ভারত অর্জন করে চলেছে এই শিল্প নায়কত্ব ক্রমেই বেশী পরিমাণে। ১৯৫৬ সালে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত তাঁত বস্ত্রের পরিমাণ—৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার গজ। এতে ভারত ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার সমমূল্যের মুদ্রা অর্জন করেছে। ১৯৫৬ সালে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল—৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, সিংহল, মালয়, সুদান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় তাঁতবস্ত্র বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তন্মধ্যে সিংহলেই তাঁতবস্ত্র রপ্তানী হয় তুলনামূলক হারে সবচেয়ে বেশী। জাপানী, অস্ট্রেলিয়া, যুগোস্লাভিয়ার, পূর্ব-আফ্রিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রেও ভারতীয় তাঁতজাত পণ্যের দ্বারী বাজার পাওয়ার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমান যন্ত্রযুগে এই কুটিরশিল্পটি এখনও অবশিষ্ট সমস্তাযুক্ত হয়নি। এর সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে—পর্যাপ্ত শ্রুতি। সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। এদিকে জাতীয় সরকারের মনোযোগী দৃষ্টি পড়ে নি, সে কথা বলা চলে না। পরস্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্ত সরকারী সাহায্য বরাদ্দ হয়েছে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই শিল্পের উন্নয়নের দাবীতে পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গের জন্তও পরিকল্পনা কমিশন প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। উক্ত অর্থের সদ্যবহার যদি হয়, তবে এদেশে তাঁতশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি না হয়ে পারে না।



## নীলকণ্ঠ তেইশ

B. N. G. S.—এই ইংরাজি আভ্যকরে যুক্তিত যে সাংস্কৃতিক বাংলা বাক্য, তার পাঠ উদ্ধার করা শক্ত নয় অনেকের পক্ষেই। বিলাত না গিয়ে সাহেব। বিলাত ফেরত বাঙালীদের অনেকেরই মোসাহেবীর প্রবৃত্তি কেটে যায়। কেটে গিয়ে উদ্বোধন হয় স্বাধীন মনোবৃত্তির। বিলাত দেশটা যে মাটির, সোনা-রূপার নয়, এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে ডি, এল, রায়ের হাসির গানই বথেষ্ট নয়; তার জন্ম বিলাতের মাটিতে একবার পা দিতেই হয়। বিলাত না গিয়ে সাহেব বারা, তারা বিলাতের মাটিতে পৌঁছতে না পারার কারণেই কিন্তু ভয়ঙ্কর। এদের সবক্ষেই গল্প আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গাল-গপপো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিলাত গিয়ে এবং বিলাত না গিয়ে সাহেব, দু'দলই ছিল উগ্র মোসাহেব। ইংরাজি ধান, ইংরাজি জ্ঞান এমন কি ইংরাজিতে অজ্ঞান হতে পারলেও তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করত। মদ না খেলে এবং গোমাস ভক্ষণ না করলে তাদের ধারণা নয় শুধু; বহুমূল বিশ্বাস ছিল যে ভালো ইংরাজি বলা অসম্ভব। এইরকম দুজন ইংরাজ হতে বহুপরিচর বাঙালী হোটেলে গেছে গরুর মাংস খেয়ে সাহেব হ'তে। অনেক রাতে হোটেলে যাওয়ার গোমাস মেলেনি। মাংস নয় কেবলমাত্র, নাড়ি-ভুঁড়ি, হাড়, লেজ, শিং, কিসমু না মিলতে শেষ পর্যন্ত তারা খানিকটা গোবরের অর্ডার দিয়েছে। গোবরে শুধু পদ্মের নয়, গরুর এবং সেই কারণে ইংরাজির গন্ধ আছে যে!

এই বিলাত না গিয়ে সাহেবদের বদলে তাদের বংশধরেরা আজ টলিউডের তেতরে না ঢুকে ফিল্ম ষ্টাফ হয়েছেন। তারাই ভয়াবহ।

তারাই বিখ্যাত করেছে কলকাতার হাওয়া। এদের দেখতে পাবেন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কলকাতার তিন, চার পাঁচ রাস্তার ঘোড়ে সাজুভেলা, কফিহাউসে সিগারেটের আগুনে আলো করে বসে দশ দিক। যুখে দিখিঞ্জরীর হাসি: ছবিদা আজ যেতে বললে তাঁর কাছে; আনিস। বিমল রায়ের ছবিতে লোক খুঁজছিল, এ শর্ধাকে দেখবার পর লোক খোঁজার হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। দেবকী বোস বললেন বোখাই না যেতে, কি করব তাই ভাবছি। যে বলল সে উঠে যেতে না যেতে তার জায়গা নিল যে সে মস্তব্য করল: গুল। সেরেক গুল। আমি বলছি, ছবিদা ওকে দেখেই নি, দেখলে আমাকে অন্তত একবার জিজ্ঞেস করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ এক আধবার ছবিতে ভীড়ের দৃতে দাঁত বার করে হেসেছে। কেউ কথো বলেছে এক-আধটা। আধা, তিনপোরা মন্ত্রীদের মত এরা আধা, তিনপোরা একটর। এরাই হচ্ছে সাজুভেলাতে-এই ফিল্ম পাগলদের হিবা।

মন্ডের বললে যাতে মন্ডের মতই মজা সেট আমোদ, গায়ের বললে আজ সেই বহুব্রহ্মই নাম বাই হক তার আসল পরিচয়, সিনেমা। এরা সিনেমা ছাড়া দেখে না; সিনেমার কাগজ ছাড়া পড়ে না; ষ্টিভির আনাচ কানাচ ছাড়া ঘোরে না। এদের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, রূপালী পদা। যদি আট বেচে, কাবুলীর কাছে খার করে। তিনটে ছটা নটার রূপালী পদা এদের তেমনি করে টানে মদ যেমন করে মাতালকে, আফিং যেমন করে আফিংখোরকে। অভিনয় ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, বিভাবুদ্ধি অনাবশ্যক, শুধু একটা চাল, একটা চালের অপেক্ষা শুধু। এদের মধ্যে সবাই যে অভিনয়-পাগল কেবল, তা নয়। কেউ কেউ অবার টেকনিশিয়ান হতে চায়। সিনেমার টেকনিশিয়ান। ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিষ্ট, ফিল্ম এডিটর, নাহলে নিদেনপক্ষে পরিচালকের সহকারী। এদের সংখ্যা অল্প কম। বেশির ভাগেরই স্বপ্ন; দুর্গাদাস, অশোককুমার, ছবি শিখাস, পাঠাভী সান্তাল। এরা অবশ্য নিশীথ রাজির নীল স্বপ্ন। দিবাস্বপ্ন হচ্ছে সেট এক—উত্তমকুমার।

স্কুলের ছেলেপিলে বারা ম্যাটিনী শোতে স্কুল পালিয়ে কিউ দিচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের সামনে, তারা টাকাটা পাচ্ছে কোথায়? তারা বই বিক্রী করে, স্কুলের মাইনে না দিয়ে জোগাচ্ছে এই টাকা। তাদের উসকানি দিচ্ছে ফিল্মের কাগজ। মেয়েছেলের ছবি ছেপে, ফিল্মষ্টারের অলীক জীবনের আবিষ্কোপভাস রচনা করে অপটু হাতে ফিল্ম-পত্রিকাগুলি নিজেদের ভবিষ্যৎ গুজবাবার অনেক আগেই নষ্ট করছে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎজীয়েরা ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাবে না ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বিশ শতাব্দীর মধ্যপাদে আসতে না আসতেই কি করে এতদূর ক্লৌষ হয়ে গেল। আগামী কালের সেই প্রেমের উত্তর যুক্তিত রইল এখানে।

কিন্তু তীর এসেছে কি একদিক থেকে? না। তীর আসছে চতুর্দিক থেকে। বেদিক লক্ষ্য করবার কারণ পাওয়া যায়নি এখন তীর আসছে সেদিক থেকেই। স্কুল সেমিফাইন্সালের (স্কুল ফাইন্সালে এরা বসে বটে, কিন্তু ওঠে না আর, প্রতি বছরেই বসে একবার)। ছেলেরা জ্ঞানপাগী। তারা বোঝে তারা কি করছে। তাই তাদের জন্ম দুঃখ হলেও, দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু নতুন হুজুগ এসেছে রূপালী পদার বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছবি করার হুজুগ।



এর চেয়ে অভায়, এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু ঘটনা সম্ভব। এর চেয়ে বড় ঘটনা, দুর্ঘটনা অকল্পের। রূপালী পর্দার বাচ্চাদের আশ্চর্য অভিনয়কে টিকিট কেটে হাজারো হাততালিতে অভিনন্দিত করেই দর্শকদের কর্তব্য শেষ। কিন্তু রূপালী পর্দার অন্তরালে এই সব বাচ্চাদের জীবনে কি বিপ্লব ঘটে যায় এর ফলে আমরা কি কোনদিন তার খবর রাখি? রাখার প্রয়োজন মনে করি একবারও? না। করি না, কারণ তারা আমাদের কেউ নয়। কিন্তু 'করি না বলে' বেন ফুলে না রাই যে আমরা যে ঘরে বাস করছি তা-ও তাদের ঘর। বাচ্চাদের টেউ সেখানে এসে পৌঁছতেও দেখি নেই বেশি।

এই সব বাচ্চারা, কেউ ফুলে পড়ে, কাঁদার হাতেখড়ি হয়েছে হরত কেবল যাত্র। এদের পর্দার ওপর অভিনয় কখনও কখনও এত দূর বিশ্বকর প্রেক্ষিতার পরিচয়ে প্রদীপ্ত যে হতবাক হতে হয় আবালবৃদ্ধবনিতাকে। বালক অথবা বালিকা গুলী তাই বিশ্বাস করে যখন তখন আমরা স্বতঃই হার মানি, বলি : এমি গো বিশ্বয়। কিন্তু বিশ্বয় এর এক দিকে। অন্য দিক যে কত দূর বেদনার, ভয়ের, অথবা দুঃখের আমরা যদি জানতাম তাহলে শুধু তারিক করেই কান্ড নিষ্কাশ্য হতাম কি না প্রেক্ষাগৃহ থেকে বলা শক্ত। আগেকার যুগের রূপালী পর্দাতেও বালক-বালিকার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তারাও অভিজ্ঞত করেছেন অভিনয় পারঙ্গমতায়। কিন্তু সে ঘটনা কালেভদ্রে, নীল চাঁদে একবার, ইংরেজিতে বাক বলে once in a blue moon, ঘটত। তা নিয়ে মাথা ব্যথা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজ কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট 'হবিত'ও কুশীলবদের তালিকার অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আবির্ভাব অপ্রচুর নয়। সেই হচ্ছে ভয়ের কথা; ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সেই। হাতেখড়ি হবার আগেই বারা খড়ি মাথতে ব্যথা হয় সুখে তারা একদিন চূপ-কালি মাথতেও যে পেছপাও হবে না, সে এমন আর বেশি কথা কি?

এই সব বাচ্চাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করে দেখা যাক অন্তঃপর। এদের মধ্যে যে সব শুল-ভারকা আছে তাদেরই বর্তমান সবচেয়ে দূষিত এবং ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। এরা প্লে করে অভিনন্দিত হবার পর যখন ক্লাসে এসে আর সব ছেলেরের ঈর্ষার পাত্র হয়, তখন ঈর্ষার কারণটা কিন্তু রাতারাতি মহং হয়ে দাঁড়ায় না। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, পরিশ্রমকে ঈর্ষা করা এক বস্তু আর সিনেমাষ্টারকে ঈর্ষা করা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। অন্য সব বুদ্ধিপোষেরা তখনই পড়ার বই ফেলে ফিল্মের কাগজ মেলে ধরে। তখন থেকেই তাদের জীবনে আদর্শ হিসাবে মুদ্রিত হয়ে যায় বিজ্ঞাসাগরের নয়, পাহাড়ী সাজালের মুখ। কি হবে পড়াশুনো করে? সেই ত' লাল-বাবার মত কেবলগিগিরী করে সারা জীবন সংসারের বোকা হয়ে মুখ খুঁড়ে পড়ে মরা একদিন। তার চেয়ে পাট মুখ করা কত 'রোবাকের', কত আশার, কত আরাধনার।

তাদেরই একজনকে বিশ্বয়ে বিশ্বস্ত হয়ে তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। তার মুখে গল্প শোনে টলিউডে। কিছু সত্য, কিছু বানানো। কিছু অলীক, কিছু অলৌকিক। ঘুম চলে যায় চোখ থেকে, দিবাশ্রম দেখে জেগে জেগে। বার্ষিক পরীকার বদলে বছর ভোর 'পরী'-কল্পনার বিভোর বালক টিকিট না কেটে চড়ে বসে বোঝাই অথবা মাস্তাজ মেলে। ঘরা পড়ে মাঝপথে খবর কাগজের হেডলাইন হয়; মাথা ঘুরে যায় আমাদের।

আর যে বাচ্চাটি রাতারাতি ফিল্মষ্টার হয়, তার? তার অবস্থা আরও দুঃসহ। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে টুন্ডিওর গাড়ীতে করে একদিন সে বেবোর, ফিরে আসে দিগ্বিকর করে। মুহূর্তে বিচাণ হয়ে যায় ঘরের ডালভাত। বাপমাকে মনে হয় শক্ত। পরিবেশকে জঘন্য। সিনেমাকে সত্য মনে করে, জীবনকে সিনেমা। তারপর টাকা পায় যেদিন সেদিন থেকেই ধরাকে সরা মনে করে। তাইট টাকার সংসার চলছে বোঝে যেদিন, সেদিন থেকেই সংসার অলস হয়। সবাই বোকার এখন এই টাকা, হত বড় হবে তত টাকাও বড় অঙ্ক। বাচ্চা দামড়া হওয়া মাত্রই বাতিল হয় টলিউড থেকে। শুধু টলিউড নয়, সংসার থেকেই বাতিল হয়ে বাকী জীবন ধরাকে সরা দেখার পরিবর্তে সরাইধানার সিঁড়িতে বসে দেশী সং সেজে গড়াগড়ি যায় আজীবন। তাদের খবর খবরকাগজে ছাপা হয় না।

এছাড়াও তীর আসছে আরও একদিক থেকে। কাকে কাকে আসছে। এখন বাদের কথা বলছি, তারা বাচ্চা নয়, তারা বাচ্চার মা। মা-বোন-বউ-ঝি-এরাও সিনেমা বলতে প্রভাব মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গল্পের ভাষায় বাক বলে গিয়ে ignorant অর্থাৎ অজ্ঞান। সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে সর্বনাশে, সব চেয়ে সর্বনাশকর বিভ্রান্তি হল এই। হেঁসেলে মন টিকতে না আর মেয়েদের। মায়েরেরও না। অভাবে বারা আসছে তাদের


ফোন : ৩৪-৪৯০৭

Gv

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার ; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিনি ভবন** সুজন কুশলী  
মাসিকার ও অন্যান্য

১০২, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলি:-১২



গ্রাফ :—২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬  
(ব্রাহ্মা দোনেত্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

কথা নয়; স্বভাবে আসছে যারা তাদের সংখ্যাও কম কিসে? বিদ্যবীরা বেরিয়ে পড়েছেন টলিউডে। স্বামী কর্তৃক, স্ত্রী রক্তকলমে, ছেলেমেয়েরা বিরাট স্ট্রাট বাড়ীতে লিফট-ম্যানের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মাতুল হচ্ছে। বিদ্যবীরের কথা বাদ দিই; সব দেশে, সব কালেই সর্বযায়ের ম্যাডাম বোভারী আছে এবং থাকবে। ভয় তাদের নিয়ে নয়। ভয়, মধ্যবিত্ত ঘরের বউবাও মজেছে। বাধা মজেছিলেন কৃষ্ণের ঝাঁপী শুনে। এযুগের তরুণীরাও পাগল হয়েছে সিনমার ডাক শুনে; পাবলিসিটির সিটি শুনে। ঘর রাখা যাবে না আর। ঘরে ঘরে অভাব আছে ঠাঁ-করে। যেখানে নেই সেখানেও হাঘোরে স্বভাব টানছে মধ্যবিত্ত ঘরের বউদের রূপালী পর্দায় নারিকা সাপ্তাহে। পর্দানশীন ছিল যেয়েও একদিন। একরকম ছিলো তারা। আশ্রয় তারা! রূপালী পর্দানশীন হতে আরম্ভ করেছে। এখন আর এ যৌবন-উল্লসিত রোহিণী কে?

এর পরেও দিক আছে তার এসে বৈধার। এবার যাদের কথা বলছি তারা দ্বিধাদিক-জ্ঞানশূন্য। এরা, এই সব মেয়েরা টলিউডে জায়গা না পেয়ে এমের খিয়েটের দশটা টাকার জুত গিয়ে হাজির হচ্ছে যে কোনও দলের দরজায়। ঠেকছে; তার পর ঠেকছে। ডালহউসী স্কোয়ার জুড়ে সন্ধ্যার পর, অথবা শনিবার অফিস ছুটির পর অফিসের ঘরে বসেই রিহাসার্স দিচ্ছে। এ রিহাসার্স খিয়েটারের নয়; অভিনয়ের নাম করে এ হচ্ছে বজ্রাতির মহড়া। খিয়েটারে রিহাসার্স দেওয়াটা বড় কথা নয়, কে কাকে নিয়ে বাড়ী পৌছে দেবে জানবে তাই নিয়েই নাটক। ডালহউসী স্কোয়ারের অফিস-পাড়ার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এই পোষ্ট অফিস সীলারঙ্গ। এখন সেখানে আটকে না থেকে পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ওর বীজাণু। মহলা দেওয়া চলছেই সন্ধ্যা হতে না হতেই, কোথাও না কোথাও। দেখলে মনে হবে সংস্কৃতির অমুদ্রান আয়োজন করতে সারা দেশটাই বোধ হয় বাতারাতি জেগে উঠেছে। না। সংস্কৃতি চর্চা নয়;

চক্ৰতির দুর্গোৎসব এগুলি। বিকৃতির দোলযাত্রা। সার্বজনীন Rogueদের ছোঁয়াতে রোগের জীবন্ত ডিপো একেকটি।

আগে যে সব অভিনয় পাগলদের কথা লিখেছি তাদের জুড়ই কবির বক্তব্য: প্রেমের কাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে! এ প্রেম প্রেমিকের নয়, প্রেতারকের। তারা এই দুর্ভাগ্যব শ্রবোগ নিয়ে সাইনবোর্ড ঝোলায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়: ছায়াছবিতে অভিনয়ের জন্য তরুণ-তরুণী চাই। বিজ্ঞাপনে রাখব-ঝোলায় ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে চুনো-পুঁটি। ভয়েস টেষ্ট, ক্যামেরা টেষ্ট ইত্যাদির নাম করে দফার দফার দফারফা হয় চুনোপুঁটিরা। তরুণরা পায় নাকের বদলে নফণ! তরুণীদের যা যায় তার বদলে কিছু পেয়েই, কোন ক্ষতিপূরণেই, কোন কালে কোন মেয়েই ক্ষতি আর বাবার নয়। শুধু বাবার যারা তারা বাতারাতি সাইনবোর্ড পালাটে চলে গেছে আবার নতুন ঠিকানাঘর। পড়ে থাকে তারাই যারা ঘরেও নহে, পারেও নহে। সেই, যে জন আছে মাঝখানে।

### চবিশ

এ সব কথা যেতে দেওয়া যাক আপাতত। সমুদ্র মন্থনে শুধু গরল উদ্ধার করে লাভ নেই। বরং এই এক কথা, একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে অজ্ঞ ও প্রতাহ, বিরক্তির উল্লেখ হওয়া আশঙ্কের নয়। তার বদলে এখন পরিবেশন করা যাক চানচুর। এখন টাটকা আছে; এখনই করা যাক। চানচুর অথবা বুধনি দানা বাসি হলে আর কেউ খাবে না। এখন এতকণ যাদের কথা বলছি তারা সব কল্পনার যোগাক্রান্ত। যদিও টলিউড কল্পনার স্বর্গরাজ্য, তবু সেখানে কল্পনাভীত বাস্তব কাণ্ডও ঘটে বই কি কিছু কিছু। সেই রকম একটি বাস্তব চরিত্রের অবতারণা করা যাক অতঃপর। তার নাম দেওয়া যাক, কল্পনাভীত ভট্টাচার্য।

এর কথা বলছি সে সত্য সত্যই কল্পনাভীত এক অভিজ্ঞতা। টলিউডের কল্পনাভীত এখনও তাকে অতিক্রম করতে পারে

নি কেউ। যার কথা বলছি তার আসল নাম জানার জন্য কৌতুহলী হওয়ার এতটুকুও কারণ নেই। নিবন্ধক। কারণ, উত্তমকুমার ছবি চালায়; উত্তমকুমারকে চালায় উত্তম-মধ্যম-অধম চিত্র-পরিচালকরা। যার কথা বলছি সেই কল্পনাভীত চালায় পরিচালকদের। পরিচালকদের, কাহিনীকারদের, প্রযোজন হল প্রেক্ষাগৃহের মালিককে। মায় পাবলিশিটি অফিসারকে নির্দেশ দেয় লিখুন! পণ্ডিতমগ্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রশংসিত। পাবলিশিটি অফিসার যদি পণ্ডিতমগ্ন না লিখে, শুধু পণ্ডিত লেখে, তাহলে তাকে অকর্মণ্য মনে করে জবাব দেয়। পণ্ডিত শুনতে কত হালকা! আর পণ্ডিতমগ্ন? কত গভীর জ্ঞাতনা ব্যঙ্গক বাক্য।

কল্পনাভীত: যদি টলিউডের লোক না

ফোন ৩৪-৫০০২

সবকিছু সম্মত  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাস  
কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স KLS

১৬৭ বি. বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

হয়ে ইনসুরেন্সের লোক হত কি কারখানার মালিক হত, তাহলে তাকে নিয়ে তৈরী হত খবরকাগজের সম্পাদকীয়। চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক উৎসবে তার মুখ থেকে শুনি হত সবাই তার সেক্রেটারীর লেখা বক্তৃতা। হয়ত কালে মন্ত্রী হত সে। আবক মর্যব মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হত যুত্বাব পূর্বেই। রাস্তার নাম হত তার নামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারশিপ আকর্ষণীয় হত তার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ছাত্রাচিত্রের 'প্রবোধক হওয়ার ফলে এসব কিছুই জোটেনি কলনাতীতর কপালে। না জুটুক। সেখানে রাজনীতি পরিণত হয়েছে তবু অর্থ আর সামর্থ্য। জীবনযুদ্ধে জয়যুক্ত হতে বাধ্য হয় নি তার। সেই বা কম কি!

কম সে নয়, কলনাতীতর অতীত বারা জানে, তারা জানে। কত দুস্তর পথ পেরিয়ে, কত কৌশল, ঐর্ষ, বুদ্ধি এবং ভাগ্য ভরসা করে আজ সে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে, কলনাতীত রাজনৈতিক নেতা অথবা মার্চেন্ট নয় বলেই তা বাইরের লোকের কাছে বন্ধপুস্তক। আট টাকা মাইনের প্রোডাকশন বয় ছিল সে একদিন ষ্টুডিওতে। কাজ ছিল মেয়েদের গাড়ী করে আনা এবং বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। মেয়ে মানে—রক্তচক্ষু করা কোনও উর্বশী নয়; নয় কোনও ভারত বিখ্যাত ফিল্ম ষ্টার। মেয়ে মানে ক্রাউডসিনে মুখ দেখান মাংসের স্তূপ, সন্ধ্যা হলে বারা গলির মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টের তলায় ঝাঁড়ায়। মেয়ে নয়, স্ত্রীলোকের পারিভি। নারীর জীবন্ত ব্যঙ্গচিত্র।

সেইখানে আরম্ভ। সেইখানে শেষ নয়। মেয়েহলে তাকে পক্ষাঘাত করতে পারে নি। কর্মের অসম্মান করতে পারে নি লাইনচ্যুত। এই লাইনেই বড় হবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। নিঃসঙ্গ অস্থিত থেকে অর্থে সিদ্ধ হয়েছ কলনাতীত। সামর্থ্যে সিদ্ধার্থ। আজও সংগ্রামবিমুখ নয় সে। নারী, মজা অথবা আড্ডা ফেনটাতেই আজও মগ্নে নি দুশোমজার রাজ্য এই টেলিউডে। শিহন ফিরে তাকালে মনে পড়বে সেদিনকার কথা। পূর্ণ ধিরেটার থেকে টেলিফোন করেছেন স্বর্গত: সুবিখ্যাত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। কলনাতীত টেলিফোন ধরে জিজ্ঞেস করেছে: কে কথা বলছেন। অজয় ভট্টাচার্য রেগে বলেছেন; আমি অজয় ভট্টাচার্য; আপনি কে?

—আজ্ঞে, আমি শুধু ভট্টাচার্য,—জবাব দিয়েছে কলনাতীত। কলনাতীতর এই উত্তরে নীরব হয়েছেন গীতিকার। পরে বলেছেন; লোকটা করে থাকে।

এই পরিহাসবোধ আজও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি কলনাতীতকে। একজন ক্যামেরামানকে কলনাতীত অতি বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করায়, বেশ নড়েচড়ে বসে, প্রতিনিয়ম্ভার করতে করতে জিজ্ঞেস করেছে: প্রভু! আমার প্রতি আবার এত সম্মান কেন? করে খাচ্ছিলাম। এবারে বোধ হয় মারা পড়ব! কলনাতীত তক্ষুণি করেই বলে: ছিঃ! ছিঃ! কি যে বল? তোমরা টেকনিশিয়ানরা সামাজিক চীজ! বাঁচাতে না পারো, ডোবাতে পার যে কোনও ছবি। টেকনিশিয়ান দেখলে আমি ডাই। দূর থেকে নমস্কার করি। এমন কি কোনও গর্ভবতী গল্প যদি নজরে পড়ে তাকেও প্রশংসা করি সাষ্টাঙ্গে। ভগবতীজ্ঞানে নয়। যদি তার পেটের ভেতর কোনও টেকনিশিয়ান জুমিষ্ট হবার অপেক্ষার থেকে থাকে। কে জানে।

[ক্রমশঃ।

## প্রাণতোষ ঘটক রচিত

### মুক্তা ভাস্ম

"There is no false idealisation, no cheap dip into smutty episodes. The work shows some planning and purpose. For it is a frank exposure of a private way of life that has no justification for its continuance and the writer has wisely left the tale to be wound up by a remorseless nemesis." —Amritabazar Patrika. প্রকাশক বঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### কলকাতার পথঘাট

"আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিস্তৃতপ্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রহণও করেছেন অপূর্ণ শিরতুলাতর সঙ্গে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

### বাসক সজ্জিকা

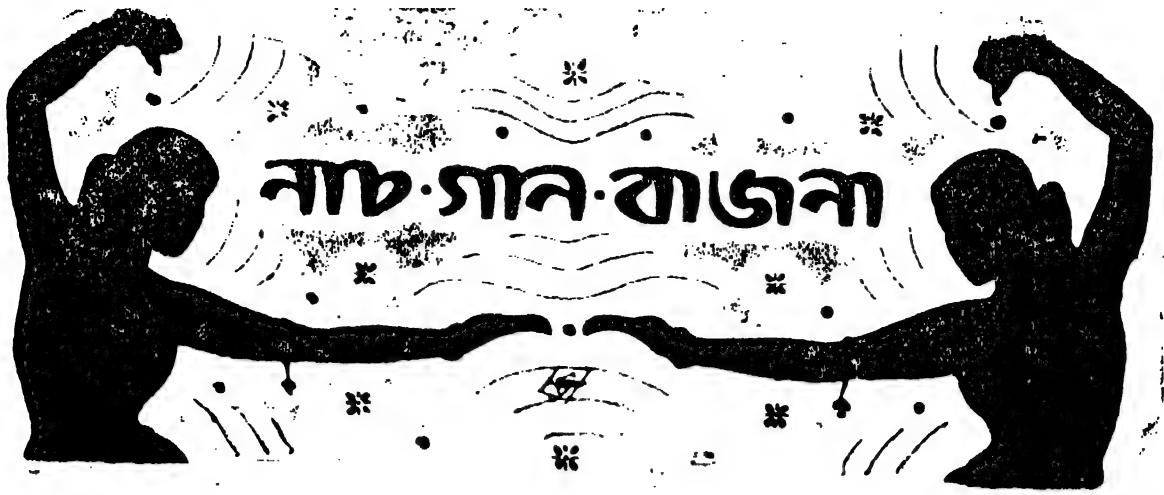
"একখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের 'বাসকসজ্জিকা'। লেখক যদিও উপন্যাস রচনা করেই পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত হয়েছেন, তবু এই সঙ্কলন থেকে স্পষ্টই বোকা যায় যে, তিনি প্রকৃত-পক্ষে ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পের ভাষা বেশ ছন্দযগ্রাহী ও ব্যঙ্গনাময়। এবং সূক্ষ্মরসের পরিবেশন-পরিমিতির ফলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। মিত্র এণ্ড কোম্পানি প্রকাশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

### \* রত্নমালা \*

"এখানি সমার্থাভিধান। ইংরেজীতে বলা হয় Synonym-এর অভিধান। বাংলা ভাষায় এ রকম অভিধান আর নেই। বাঁদের লেখা অভিধান তাদের পক্ষে এ জাতীয় একখানি সিনোনিমের অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দচয়নে বড়ই সুবিধা। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষেও খুবই প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। প্রাণতোষ সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা বহু অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের বই বেঁটে অনেক পরিশ্রম করে শব্দগুলি সংকলন করেছেন। এ বইয়ের যথাযোগ্য আদর অবশ্যই হবে।"—মুগাস্তর। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

### আকাশ-পাতাল

"Those who will probe deep into the antiquities of Calcutta will come across many such episodes. It is with unique delicacy, singular honesty and charming simplicity that the noted author presents in an original way an old episode—a tragic one." —Amritabazar Patrika। গত কয়েক বছরে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রায় চার হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। কলিকাতা-৭। মূল্য ১ম পাঁচ টাকা ও ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা



## জারি গান

শ্রীজয়দেব রায়.

জারি গান ও গাজীর গান, এক শ্রেণীর গোষ্ঠীসঙ্গীত।

জারি সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামী ধর্মসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, হিন্দু কবি ও গায়করা এ গানে অংশ গ্রহণ না করিলেও পল্লীবাসের মুসলমান গৃহস্থের সঙ্গে হিন্দু গৃহস্থাণ্ড জারি গানের রসগ্রাহী শ্রোতা। হজরত ইমাম হোসেন ও হাসানের কারবালা ট্রাজেডিকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গান রচিত হয়—

হানেক বলে, আর মোর কোলে জয়নাল বাছান;  
ওরে যে না পথে দিছিরে দুই ভাই জোড়ের ভাই এমাম হোছেন।  
সেই না পথে যাবো রে আমি, কবো আমার গোর কাকন।  
ভাই ভাই ব'লে ডাকছে হানেক আর কি প্রাণের ভাই আছে।  
যে বলের বল করলেম যে জয়নাল, সে বল ভেঙেছে;  
জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে বাই মরে।

সভাবতঃ জারি গানের সুর অতি কঠিন; কাহিনী-সূত্র জানা না থাকলেও কেবল সাত্র সুরের আবেদনেই চক্ষু অঙ্গসজ্জল হইয়া উঠে। 'জারি'র অর্থ ই যোদন।

মুন্সী মনসুর উদ্দীন বলিয়াছেন—

"জারি গান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় কল্পনাধীন গান। জারি গানের মত ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্র ভাবে অন্য কোন পদ্যগানে বুদ্ধ করা হয় নাই।"

জারি গানের সুর বেশ গভীর; উদ্দীপনাময় ও ভাবান্বিত শব্দগুলিই সাধারণতঃ এই গানে ব্যবহৃত হয়—

খোদা খোদা আল্লাহ কিরা দোস্ত মোহাম্মদ,  
অজুদে মজুদে সাই, দসে কিয়ামত।  
বিসমোলাতে বিস্ত হয় কিছ কারে দয়াময়;  
কোরাণ কর নামাজ বোজা, বেহেশ্ত বাবার বাজা সোজা,  
হজরতে কর নামাও বোকা কর এবাদত।

জারি গানের গীতিবীতিটি কীর্তনেরই অমূল্যসম্পদে রচিত। এই গানে রামায়ণ গানের দ্বায় একজন-মূলগায়নে পায় নৃপুং পরিয়া ও হাতে চামর বাজান করিয়া গান ধরে, বাকী সকলে কতকটা মাঠের ভঙ্গীতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরা ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাকে অমূল্য করে।

জারি গানের সুরটি মুসলমান চারী গৃহবাসীদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত। কবির গান ও পাঁচালী গানের দ্বায় জারি গানের মধ্যেও কয়েকটি তুচ্ছ ভাগ করা আছে—বন্দনা, মাসিয়া বা কথা, প্রভাতী ও খেউড়।—

বন্দনা—পরথম আল্লাহর নাম সার করলাম বল মুখেতে।

আর না হইব মানব জনম এষ্ট জনম গেলে।

(আবে ভাই রে) পরথম বন্দনা করি প্রভু নিবন্ধন।

বীহার কোণ্ডিতে পরমা এ তিন ভুবন।

তারপরে বন্দনা করি মবিজীর চরণ।

বীহার শিখারে পরমা এ তিন ভুবন।

আমি সব গ্লাবে বন্দনা করি সভাজনের পাও।

যার গৌলতে আজ এখন ছাতু চিড়া পাও।

সভা কইয়া বইছুন বত হিন্দু মুছলমান।

আপনাদের জন্যে আমার অথমের ছালাম।

কথা—আবে ও ভাই রে হোছেন,

কারবালাতে তুমি বাইও না।

কারবালাতে বেদীন আছে দীন তো মানে না।

কাকি জা কারবালায় নিয়া পানি দিবা না।

দোহার—যরি, হায় হায় হায়।

খেউড়—মূলগায়ক—আমার এই গানের বে করবেন হেলা।

কত শত দুঃখ পাইবেন শুতে বাবার বেলা।

দোহার—ওহো, ব্যাশ, ব্যাশ।

প্রভাতী—কি বিপ্রাহী পরিপ্রাহি বাপ রে ও বাপ মলম মলম।

কি তোমাসা সকল চায়া, ভেবেছিলো রাজা হলেম।

হাতে পলো, কাঁধে লাঠি, লোটে বত খটিবাটি।

মানা খারো, আল্লাহ জাতি, ভয়ে ভীক অবাঁক হলেম।

দেশের বত হিন্দু বত, তারা কি আর আছে ভত।

আমাদের দেখামাত্র মস্তর আর বাজায় সেলাম।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে কোন মুসলমান জারি-গায়ক উপরিউক্ত গানটি রচনা করিয়াছিলেন। প্রভাতী পর্বারে এই শ্রেণীর সময়োপযোগী ও আনুষ্ঠানিক গান গাওয়া হয়। কিন্তু জারি গানের আসল অংশ হইল মাসিয়া ও বর্ধধ্ব। মহরমের কক কাহিনী, পরগণার জীবনী, ইসলাম ধর্ম স্থাপনে কাকেরদের সঙ্গে বিভিন্ন লড়াই প্রভৃতি অবলম্বনেই এই প্রকার জারি গানের রচনা।

অনেক জারি গানের মধ্যে যাত্রা গানের জায় নাটকীয়তা ও সঙ্গাপণ রহিয়াছে। কাসেম ধর্মযুদ্ধে চলিতেছে, তাহার নব পরিণীতা পত্নী সাকিনা তাহাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সাকিনা—বিয়ের কালে যুদ্ধে যেতে গো, কেন আকিঞ্চন।  
হে, অনাধিনী ক'রে মোরে বিবাহ বাসরে,  
কোন প্রাণে প্রাণনাথ চলেছ সময়ে তে।

কাসেম—হো, মহাকর্তব্যের তরে ও-রে সাকিনা।  
চলেছি এ ঘোর সমরে কৈদ না, কৈদ না রে।

সাকিনা—যেও না, যেও না নাথ আমারে ছাড়িয়া।  
( যদি ) যুদ্ধে যেতে ছিল সাথ, কেন করিলে বিয়া হে...  
হে, উদয় অন্তে একই সাথে কে দেখেছে কুখ্যার?  
বিয়ার ঘরে স্ত্রী রেখে স্বামী যুদ্ধে যায় হে।

কাসেম—রণে যদি না যাই পিয়া হাসরের দিনে।  
ক্যানুনে দেখাব মুখ বাবাজীর সামনে হে।

সাকিনা—ধাও হে বীরেন্দ্র কাদে যাত্র মথিখানে।  
ভূবাও এজিদের নাম ভেঁড়া তরী জলে হে।

কাসেম—হুস্তো আবার দেখা হবে হাসরের দিনে  
বিরত বিচ্ছেদ জালায় নাই গো সেখানে হে।

সাকিনা—তুমি যেথা, দাসী তথা জেন গো নিশ্চয়।  
আসন্ন সৌম্যময় ঘোষাবে ধরায় হে।

সাকিনার অহুনে কাসেম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—“রণে কত দিনে প্রসন্নের দিনে আমি কি কৈফিয়ত দেবো?”

সাকিনা তখন কাসেমকে স-সমাদরে রণযাত্রার সাজাইয়া দিল। যেন নগভারতের উত্তরা-অভিমুখ্য পাণ্ডারই ইসলামী সংস্কার। ধারণ করণতর হইয়া উঠিয়াছে জারি গানে, যখন কাসেমের মৃত্যুতে সাকিনা আকুল স্বরে পতির রক্তাক্ত মৃতদেহে জড়াইয়া ধরিয়া বোদন করিয়া গাহিতে থাকে—

হা রে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস এস প্রাণ হৃদিবাসরে  
কে রঞ্জিল সোমার তমুগো খোন খোরাবি আবিরে ( হারে )।  
ব ধর গো পিয়া এসেছি প্রাণ পিণ্ডিমা  
বুকে বিনুছা বিষের চিত্ত দেখ লজরে  
অঘোর ঘোরে ঘুম দিল লো ( হা হা ) সাকিনা লো  
তোমার ঘরে ( হা রে )।

এস এস ওগো বর, যন্ত্র তোমার বাসর ঘর  
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।  
দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ গো—( আমি ) রক্তচেলি লই পরে।  
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি  
রক্তজবার শয্যাপাতি গার তিমিরে  
নিবিড়ে ঘুমাবে ধোঁহে গো ( উঠব ) বাসিবিয়ার হাসরে।

বলা বাহুল্য, সাকিনার অংশও পুরুষেরাই গায়, তবে এই অংশটি ককণতর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণতঃ বালকদের কণ্ঠেই তাহা আরোপ করা হয়। বঙ্গবধূ বেহুলার আকুল ক্রন্দনই যেন সাকিনার কণ্ঠে ধনিয়া উঠিয়াছে।

বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত জারি গানে বেহুলার উপাখ্যানও জড়িত আছে—

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচে না ভাই,  
ও মোর ছাবেরদিন কইছে তাই  
কোখায় যায়ে গানের যোগাড় পাই।  
আমার মনে বড় বাহুল্য ছিলো গায়ান গায়ে সাথ মিটাই।  
( আরে ) দুই হাতে দুই খপ্পরী বাজাই।  
আরে বয়্যতি সংকথা কও,  
বয়্যতি কও বেউলার কথা,  
কি হ'লো বয়্যতি বলো চাঁদ সভায়।

জারি গানের গায়কদলের নাম ‘বয়্যতি’।

জারির কথকশ্রুত গীতিরীতিটি বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমান কবিদের মধ্যেই সবিশেষ প্রচলিত আছে। চকিশ পরগণা জেলায় এক অখ্যাত জারি কবিগায়ক মহম্মদ গোলাম আকবর রচিত নিম্নের গানটিতে চাষের গুণকীর্তন করিয়াছেন—

সোনার মাঠ সোনার হাট সোনার শস্ত-প্রাণ।  
এ সোনা উদ্ধারে কত গেছে সোনার প্রাণ।  
আমরা গায়ের চাষী দল আমরা দেশের বল।  
নব যুগের বলরাম সব কাঁধে লব হল।  
নব যুদ্ধ হবে ভাই রে এ বাংলাদেশ মাঠে।  
বাজে মোদের রণবাণ বাজে বাংলাদেশ হাটে।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা  
ধুবই আভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়াকিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ ক'রে মূল্য-ভালিকার  
জ্ঞত লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এসপ্ল্যানেন্ড ইস্ট, কলিকাতা - ১



জারি গানের সুরে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, এ গান কতকটা আবৃত্তি-  
প্রবণ, রাগরাগিণীর আশ্রয়ে এ গান গীতও হয় না।

### গাজীর গান

গাজীর গানেরও মূল বিষয়বস্তু ইসলামী ধর্মপ্রচারকদের কাহিনী।  
ব্যাক্তিগতভাবে বড় গাজী খাঁ ও কুতুবদেবতা কালু রায়ের কাহিনীও  
দক্ষিণ-বঙ্গের গাজীর গানের আসরে গাওয়া হয়।

দক্ষিণ বায় ও বড় গাজী খাঁর যুদ্ধের কাহিনীতে গাজীরই সর্বনা  
জয়লাভ হয়—

তখন, বিষম রাগে গাজীর মূর্তি হৈল ভয়ঙ্কর ;  
যুদ্ধেতে চলিল গাজী হামের দোসর ।  
তখন মারামারি কাটাকাটি (চাকাইবা কে ?)  
চইল হানাহানি ;  
নবমুণ্ড মাছ হইল, কথির হইল পানি ।  
( গাজী উপায় করবা কি ? )

কিন্তু যে সকল গান আসরের বাহিরে গাওয়া হয় সেগুলিতে  
পশ্চিমবঙ্গের মুন্সিগ-আসান গানের ভায় গৃহস্থ সংসারের নানা কর্তব্য  
কর্মের ক্রিয়াক্রান্তি দেওয়া হয়। নিম্নের গাজী গানটি ইসলামী নীতি-  
কথার কীর্তন—

আল্লার তকুম ভাই সাব দুনিয়া ভরি ।  
ওরে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি ।  
বহুং বহুং পেগাম্বর দুনিয়াতে পয়দা হইল ।  
আল্লার কুদকতে মক্কায় মহম্মদ জমিল ।  
মহম্মদ মদিনা পরে বাদশা হয়েছিল ।  
বান্দার খয়রাফিরতে কোরাণ বানাইল ।  
কালামল্লা পড় ভাই রে গোছল করিয়া ।  
জুমা'র নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া ।

গাজীর গানের এই চারণ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিক  
বতীন্দ্রমোহন রায় বলিয়াছেন—

“পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এক সময়ে গাজীর গীতের প্রচলন ছিল। হিন্দু  
রাজ্যদিগের গুণগরিমা ধেরূপ চারণ ও ভাটমুখে দিগন্তব্যাপ্ত হইত  
সুবর্ণ গ্রামের মুসলমান অধিপতি প্রভৃতিদিগের সেই রূপ গীতি  
আকারে গৃহে গৃহে শুনার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।”

মুন্সিগ-আসানের গানের উপজীব্য সত্যপীরের কাহিনী। হিন্দু  
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতারা এই শ্রেণীর গান তত্ত্বিগ্রন্থত  
চিন্তে শুনিয়া থাকে—

মুন্সিগ-আসান কর দয়াল সত্যপীর ।  
কলিকাতায় খিদিরপুরে সত্যপীরের থান ।  
হিন্দু মুসলমান মিলে সিন্ধি করে দান ।  
হিন্দু ব'লে নাযায়ণ, খোজা ব'লে পীর  
জাতের বিচার নাই ক'রে খায় সিন্ধি ক্ষীর ।  
কুক যে সবাইকে চেনে, কুককে চেনে কে ?  
মরিয়া হইয়া তেনার নাম জপে যে ।  
যেই আশাটি ক'রে আপনি পীরকে দিচ্ছেন দান,  
সেই আশাটি পূরণ করেন সত্যনাযায়ণ ।

## আমার কথা ( ৩০ )

### প্রতাপনারায়ণ মিত্র

২৪ পরগণা জেলার মিত্র পাড়ার মিত্রবংশীয় স্বর্গীয়  
অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের পুত্র সুখ্যাত সঙ্গীতবিদ প্রতাপনারায়ণ মিত্র  
১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে ( ১১০৩ খৃঃ ) জন্মগ্রহণ করেন।  
অন্নদাপ্রসাদ স্বর্গীয় যুগারিমোহন গুপ্তের শিষ্য ছিলেন, ছেলেবেলা  
থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রতাপনারায়ণের আকর্ষণ হয় পরিলক্ষিত।  
বাবার কাছে ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র বসুর কাছে  
সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। আঠারো বছর স্বর্গীয় দুর্লভ ভট্টাচার্যের  
কাছে যুগ্ম শেখেন। এদিকে যথাসময়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং  
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পূর্ত বিভাগে প্রবেশ করেন ও আগামী  
বছর সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করবেন। ঐক্যদ, খেয়াস, টপ্পা,  
সেতার, তবলা, স্বরোদ প্রভৃতি বিষয়ে বাঁদের কাছে ইনি শিক্ষালাভ  
করেছেন তাঁদের মধ্যে যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কে. জি. ডেকনা, ছোট  
রামদাস মিশ্র, গোবিন্দচন্দ্র মিশ্র, বৃন্দা মিশ্র, ধীরেন বসু, কালী পাল,  
যুক্তাক আলী খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এলাহাবাদ  
বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনী থেকে পর পর দু'বছর  
( ১১৩৩-৩৪ ) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও ১১৩৪ খৃঃ নিখিল বঙ্গ  
সঙ্গীত প্রতিযোগিতাতেও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আন্তঃ-মহাবিদ্যালয় সঙ্গীত  
প্রতিযোগিতার, নিখিল ভারত ডাক ও তার বিভাগীয় সঙ্গীত  
প্রতিযোগিতার ও নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অত্যন্ত



প্রতাপনারায়ণ মিত্র

বিচারক ছিলেন প্রতাপনারায়ণ, শেষেরটির কার্যকরী সমিতিরও ইনি একজন সভ্য ছিলেন কিছু কাল। আকাশবাণীর ইনি একজন শিল্পী ও বিচারক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ধারণ সমিতিরও (সঙ্গীত বিভাগীয়) ইনি একজন সভ্য। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত আকাদেমীর একজন শিক্ষাদাতা। এ ছাড়া 'বহু ভট্ট', 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' প্রভৃতি ছায়াচিত্রেও ইনি মৃদঙ্গ বাজিয়েছেন নেপথ্য থেকে।

## রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

বর্তমান রেকর্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বয়ং রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় "নীলাচলে মহাপ্রভু" চিত্রের গানগুলি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিখানি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে।

কিন্তু তার আগে বলা দরকার, শ্রীমতী কণিকা দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) গাওয়া দু'খানি মীরাব ভজন "সখিরি মেরি নি'দ" এবং "গোবিন্দ কবছ" মিলে পিরা। কণিকা দেবীর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অমুরাগীদের কাছে তাঁর এই ভজন আরো ভালো লাগবে। রেকর্ড নম্বর—N 82122.

কুমারী পূর্ববী দত্তের গাওয়া "ওই গোদুলি বধূর সিঁথিতে" এবং "কে জাগে আজ শেষ প্রহরে" দু'খানি নতুন আধুনিক গান। —N 82749.

## কলহিয়া

গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দু'খানি চমৎকার আধুনিক গেয়েছেন—"কম বুঝ কম ক'ম" এবং "শাওন এল ওই।" দ্বিতীয় গানখানি কবি রতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা। —GE 24844.

## চিত্রগীতি

"নীলাচলে মহাপ্রভু" চিত্রের গান—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "জ্ঞান বিফল সাধু" এবং "জগন্নাথ জগদ্বন্ধু"—N 76056. শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"কি রূপ হৈছিল" এবং "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়"—GE 30364 দীর্ঘকাল মনে রাখবার মত গান।

গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"গ্রাম অভিসারে" এবং "বন্ধু, আমি আজি কালি করি"—GE 30365 আর চুটি অবিস্মরণীয় গান।

## যন্ত্রগীতি

বংশীধর রায় ও কার্তিকচন্দ্র ঘোষ "সি, আই, ডি" আর "চোরি চোরি" চিত্রের দুটি গানের সুর, বংশী ও কাঠঁতরঙ্গে বাজিয়েছেন চমৎকার।

## মালতীর ঘুম

জসীম উদ্দীন

গহন রাত্রি ঘুমায় মালতী নিবিড় শান্তি ভয়ে,  
শিথিল তাহার কবরী হইতে দু'-একটি চুল ওড়ে।  
পাতায় পাতায় টুব টুব টুব নীহারের ফিসফিস,  
সই সই সই কেন পাখী ডাকি' দোলায় নীরব দিশ।  
রাতের ফুলের গন্ধে মাতাল উতল শীতল বায়,  
বনের শাখায় আসে আর বায় মুহূর্ত নীরব পায়।  
দূর বনপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শত জোনাকীর পরী,  
কুটির তাহার প্রদক্ষিণ যে করে সাবাসাত ধরি।  
গহন আঁধারে ঘুমায় মালতী আহা মরি মরি মরি,  
সুখ-পদ্ম না নিশী-পদ্ম ও নিশীধী সরসী ভরি।  
কেশের আঁধারে কর্ণ-কুমুদে অলিছে কুমকো দুটি,  
দু-বাহু বিজলী ঘুমায় এখন বসন মেঘেরে লুটি।  
বন্ধের 'পরে দু'টি হাত মেলা, তাহাতে সোনার চুড়ি,  
অলিছে পূজার প্রদীপ যেন বা দেহ-মন্দির জুড়ি।  
মুহু নিশ্বাসে অলিছে দুইটি সুগল কমল বৃকে,  
যেন বা দুইটি স্বর্ণভক্ত উঠিয়াছে দেবলোকে।  
আকাশ মেলিয়া শত তারা আঁখি খেরাইছে ওই রূপ,  
পাতায় পাতায় কিস-কিস-কিস বহে'বার চূপ চূপ।



# বিত্তেকানন্দ শ্রোত্র

স্মরণি মিত্র

৯

যখন বাংলাদেশ শাস্ত্র-বিষয়,  
হঠাৎ বড়ের মতো এসে  
মৃত বেদ-আলোচনা  
জাগ্রত করেছে এ-দেশে।  
তাই বলে তুমি  
বেদের আবর্জনা করোনি গ্রহণ,  
রাধাকান্ত থা রা অমুখ্যায়ী  
বিকৃত ব্যাখ্যাসহ  
শাস্ত্রকে করোনি স্বীকার,  
কিংবা আবার  
ডিবোজ্ঞ-পন্থায়  
বর্জন করোনি কো বেদ,  
কল্যাণ-বুদ্ধিকে জাগ্রত কোরে  
দূর করে দিয়ে গ্যাছো  
বিশ্বাস ও যুক্তির ভেদ।  
তুমিই আবার  
শাস্ত্র ও সমাজকে এক বলে মেনে  
অভিনব ব্যাখ্যাস  
শাস্ত্রকে কোরেছো প্রচার।  
তুমিই প্রথম  
শাস্ত্র ও যুক্তির  
কোরে গ্যাছো রাধী-বন্ধন। ১

১। "I have often lamented that in our general researches into theological truth, we are subject to the conflict of so many obstacles.

কিন্তু বাই বলে,  
তবু তুমি অভ্যস্ত নও;  
নইলে কি হিন্দুনীতি অবহেলা কোরে  
খৃষ্টানী ধর্ম-নীতি  
বেমালাম কোলে তুলে নাও? ২

When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other. And when discouraged by this circumstance we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is alone to conduct us to the object of our pursuit. We often find that instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate an universal doubt incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other, but by a proper use of the lights furnished by both endeavour to improve our intellectual and mental faculties."

—Raja Ram Mohan Roy

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন অদ্বৈতবাদ প্রচার কোরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তিটা স্মৃষ্টি কোরে যেতে পারেননি। তিনি খৃষ্টান নীতিবাদকে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মিশ্রিত কোরে খৃষ্টান-ধর্ম-নীতির প্রাধান্য দিয়ে গ্যাছেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলে গ্যাছেন, খৃষ্টান-ধর্মের নীতিবাদ পৃথিবীর অস্তিত্ব ধর্মের নীতিবাদের চেয়ে নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে বেশী উপযোগী।—

—"The Doctrines of Christ are more conducive to moral principles and better adopted for the use of national beings than any other which have come to my knowledge." আবার অল্প বোলেছেন,—  
"The moral precepts of Jesus are something most extraordinary." আবার বোলেছেন,—  
"Genuine Christianity is more conducive to the moral, Social and Political Progress of a People than any other known creed." এই সব পড়ে-শুনে মনে হয়, রাজার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য-প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত কোরতে পারেন নি। তাছাড়া, তিনি খৃষ্টান-ধর্মের 'পাপবাদে' বিশ্বাস কোরতেন এবং খৃষ্টান-ধর্মের নীতি অমুখ্যায়ী মানসিক প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন বোধ কোরতেন। এই সব ক্ষেত্রে তিনি অদ্বৈত বেদান্তবাদী নন, কেন না বেদান্তে পাপবোধের কোনো স্থানই নেই।

## খানঃ কৃষা

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্তে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সন্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপচ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গুরুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথার দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিবা নিজের ধান্দায় ছুটেতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্নিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুষ্কর কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় খামেলা বেড়েছে খাটখাটুনি ও ছুচিস্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকুট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা গুৰু পস্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টির স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার,

গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং স্বাস্থ্য কৃষা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে ঘরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কড়নেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, বাকে আমরা বিলিতি বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্তে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটি ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ আছে। ভিটামিন ‘এ’ শরীরের বাড়ের জন্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্তে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন ‘এ’ স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন ‘ডি’ ও দেওয়া হয়। ভিটামিন ‘ডি’ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন ‘ডি’ দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদা শীলকরা টিনে খাঁটি ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

পরের পোষাকী জামা  
আমাদের জাতীয় জীবনে  
সবচে পবতে গেলে কেন ?  
বেদান্তকে ভিত্তি কোরে  
ধর্মমত গড়ো,  
যত পারো পাদ্রীদেব সাথে যুক্ত করো—  
সে তো বাহাদুরী,  
তাই বোলে তুমি  
ভিন্ন জাতের ফুলে কেন  
ছিন্ন জাতের মালা গাঁথো ?  
বিজাতীয় শিক্ষার পাঞ্জায় পড়ে  
আমাদের ভাষাটাকে কেন  
হঠাৎ শিকতে তুলে রাখো ?  
পশ্চিমী শিক্ষার প্রণালীটা প্রচলন কোরে  
দেশকে এগিয়ে গ্যাছো ঠিকই,  
তবু এটা ভেবে জাখো দিকি—  
ইংরাজী ভাষাতেই নিতে হবে তাকে ?  
হঠাৎ ছাড়তে হবে  
চিরায়ত্ত এই স্বাভাবিক দিশী ভাষাটাকে ?

কাটলেট খেতে হবে বোলে  
ছুরি-কাটা, ও-দু-টা কি চাই-ই ?  
খিদে কি মেটেনা তাতে  
আমি যদি শুধু হাতে  
বাঁবু হোয়ে বোসে সেটা খাই ?  
বরং নীচ মেটে তাতে,  
সহজেই পেটে ঢুকে যায় ।  
ছুরি-কাটা চামচের  
অভ্যাস না থাকতে  
পেটে যেতে দেবী হোয়ে যায় ।

\* \* \*  
সব কিছু নেবো তো বটেই,  
তবে সেটা হাতে তুলে  
স্বাভাবিক, চিবকেলে  
আমাদের দিশী, কারদার । ৩

১১

তারপর তুমি  
জ্ঞানের ভিত্তিটাতে  
সবাইকে কেন টেনে আনো ?  
কেন ফেলে দাও দেব-দেবী ?  
মুষ্টি-পুঞ্জের প্রতি  
তোমার এ বিবেচ কেন ?

'Idol worship,—  
Source of prejudice'ই শুধু ?  
আর কিছু পেলে নাকো খুঁজে ?  
ও কি শুধু '...Induces  
The violation of  
Every humane  
And social feeling,—  
And moral debasement  
Of a race...?'  
'Impure, absurd, puerile'ই শুধু ?  
'Prejudice' ছাড়া  
আর কিছু জায়নি প্রতীক ?

শ্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্তনরূপ যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগস্বীকারাদির কথা সত্য হইলেও, উহা যে তাঁহার অন্তরে পাশ্চাত্যভাবপ্রাধান্যের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমিত হয়। দিব্যপ্রতিভাসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদেরকে বারম্বার বলিয়াছিলেন,—'রাজা রামমোহন ইংরাজীভাষার প্রাধান্য স্বীকারপূর্বক বিজ্ঞানসমূহে উহার প্রচলন করার বিষয় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জ্ঞান উহাতে দেশটাকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ঐরূপ না করিয়া, যদি তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি বিজ্ঞা ও গ্রন্থবোধ্য চিন্তাসমূহ ঐ ভাষায় অনুদিত করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ পূর্বক বিজ্ঞানসমূহে পঠন পাঠন করাইতেন, তাহা হইলে অতি নীচ্রই দেশময় ঐ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমগ্র জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।'

স্বামিজীর ঐ কথা তখন বুঝিতে না পারিলেও এখন বুঝা যায় যে, 'যে প্রণালী অবলম্বনে দেশের লোক নতুন ভাব ও সত্যগ্রহণে বহুকাল অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজীভাষার প্রচলনে সেই প্রণালী এককালে দূরপরিহৃত হওয়ার দেশের জনসাধারণের ঐ সকল ভাব ও সত্যগ্রহণে অনর্থক অনেক বিলম্ব হইয়াছে ও হইতেছে।...পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া ভারতের জাতীয়তার স্বার্থ স্বরূপ নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সমর্থ হইয়াছিলেন।'

কিন্তু স্বামিজীর বেদান্তবাদে খৃষ্টান-ধর্মের নীতিবাদ মাথা গলায় নি; বরং তিনি অধৈর্যবাদের ওপরেই নীতিবাদের ভিত্তিটা সুদৃঢ় কোরে খৃষ্টান-নীতিবাদের ভিত্তিকে আক্রমণ কোরেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশি আত্মস্থ।

৩। স্বামী প্রজ্ঞানন্দে 'ভারতের সাধনা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামিজীর গুরুত্বই স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন,—'মহামানবী রাজা রামমোহন রায়কে দীর্ঘ সুস্থিতিময় ভারতে প্রথম জাগ্রত ব্যক্তি বলিয়া অনেকে নিদেশ করিয়া থাকেন—একথা অনেকাংশে সত্য হইলেও তিনিও যে আপনাকে ঐ পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। দেশে স্বাধীন চিন্তার



তাই যদি ভেবে থাকো রাজা,  
তুমিই কি কম 'প্রজুডিসড' ! ৪

১২

যদিও বোলেছো তুমি  
নিম্ন আধারদের  
প্রতীকের আছে প্রয়োজন,  
তবু তুমি মন থেকে  
প্রতীকোপাসনাটিকে  
কোনোদিন করোনি গ্রহণ।  
সবাইকে একমতে  
এক বাধা-ধরা পথে  
টেনে আনা সম্ভবপর ?  
তোমার ধাতে যা শুভ  
অপরের ধাতে সেটা  
হয়তো অকল্যাণকর।  
তুমি কি জানো না রাজা,  
বিচিত্রতাই হোল  
বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দন ?  
তবে তুমি শুনে রাখো  
শঙ্কর অম্মগামী  
স্বামিজীর স্বস্তি-বাচন।

৪। রামমোহন গ্রীক ও রোমক মূর্তিপূজার সঙ্গে হিন্দু মূর্তিপূজার তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে,

"Idolatry practised by the Greeks and Romans was certainly just as impure, absurd and puerile as that of the present Hindus; yet the former was by no means, so destructive of the comforts of life, or injurious to the texture of Society, as the latter."

—A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas.

মাতৃক্য উপনিষদের ভূমিকায় লিখেছেন,—

"Idol worship,—the source of prejudice and superstition and of total destruction of moral principles."

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখেছেন,—"Fatal system of Idolatry induces the violation of every humane and social feeling,—and moral debasement of a race who, I cannot help thinking, are capable of better things..."

তাই তিনি সদর্পে বোলেছেন,—"As Luther's design was to destroy Popery, the corruption of Christianity, by simply resuscitating genuine old Christianity as revealed in the New Testament, so his ( Ram Mohan Roy's ) mission was to destroy popular Pauranic Idolatry, the corruption of Hinduism, by resuscitating genuine old Hinduism as propounded in the ancient Vedas."

—The Brhmo Samaj, or Theism in India by Keshab Ch. Sen.

১৩

"...Different natures  
Require different methods,  
Your methods of coming to God  
May not be my method,  
Possibly  
It might hurt me,  
Such an idea as that  
There is but one way for everybody  
Is injurious,  
Meaningless,  
And entirely to be avoided.  
Woe unto the world  
When everyone  
Is of the same religious opinion  
And takes to the same path.  
Then  
All religions and all thoughts,  
Will be destroyed.  
Variety  
Is the very soul of life  
When it dies out entirely  
Creation will die.

...How can they preach of love  
Who cannot bear another man  
To follow  
A different path from their own ?  
If that is love,  
What is hatred ?" ৫

১৪

ধর্ম-জীবনে যারা নিম্ন আধার  
তাদের প্রতীক-পূজা কোরেছো স্বীকার। ৬

৫। "বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ কোরবে, সেটা হয়তো আমার পক্ষে খাটবে না, হয়তো তাতে আমার ক্ষতিই হোতে পারে। সকলকে এক পথে যেতে হবে—এ কথাই কোনো অর্থ নেই, বরং ক্ষতিকর; সুতরাং এই মতবাদকে সর্ব প্রকারে এড়িয়ে যেতে হবে। যদি কখনো পৃথিবীর সমস্ত লোক একধর্মমতাবলম্বী হোয়ে একটা নির্দিষ্ট পথে চলে, তবে সেটা হুঃখের বিষয় বোলতে হবে। তাহোলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে নষ্ট হোয়ে যাবে। ভেদই হোচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার মূল মন্ত্র। এই ভেদ যদি সম্পূর্ণ ভাবে চোলে যায়, তাহোলে সৃষ্টিই লোপ পাবে।

অন্ত লোক ভিন্ন পথ অনুসরণ কোরলে, যে তা' সন্ত কোরতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে কি কোরে! এই যদি প্রেম হয়, তবে বিবেচ্য ক'কে বলে?"

—Lectures From Colombo to Almora. (Page 33-34 )

৬। রাজা রামমোহনের মতে "অজ্ঞানীর মনস্থিতির নিগিড়ে বাহুপূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে।" পুরাণ সম্পর্কে তিনি বলেন,— "পুরাণাদি শাস্ত্র সর্বথা বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকারে রহিত

মূর্তি-পূজার প্রতি এই যে তোমার  
কৃপণ অমুগ্ধ—এও অবিচার।  
তুমি যে সত্য নও প্রমাণটা তারি,—  
শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যেক পূজারী।  
এমন বুকের পাটা বোলা আছে কার,  
যে তাঁকে বোলবে—তিনি ভুচ্ছ আধার?  
মূর্তিকে পূজা কোরে জাখোনি যে ছাই,  
তাই এত বুদ্ধির মিথ্যা বড়াই!  
মূর্তিকে ধোরে যদি ত্র্যম্বকে যেতে,  
তাহোলে কি একথাটা তুমি বোলে যেতে?  
তোমার এ-মতবাদে সত্যতা নেই,  
স্বামিজীর প্রতিবাদ সেই কারণেই।—

\*  
"It has become  
A trite saying,  
That idolatry is wrong,  
And every man  
Swallows it  
Without questioning.

I once thought so,  
And to pay penalty of that  
I had to learn my lesson  
Sitting at the feet of a man  
Who realised everything  
Through idols;  
I allude  
To Ramkrishna Paramahansa."

অতএব তোমার এই মতবাদটার  
ঠাকুরই তো জীবন্ত প্রতিবাদ তার।

"If  
Such Ramkrishna Paramahansas  
Are produced

করেন। পুরাণে অধিক এই যে, মনুষ্যিক লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার  
পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ  
সাধন বিনা জন্মক্লেপ করিবে কিংবা দুঃখ প্রবৃত্ত হইবে, অতএব  
নিরলম্বন হইতে ও দুঃখ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে  
মমুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মমুষ্যানির সর্বদা গ্রহ হয়, তবিশিষ্ট  
করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।" পুরাণের মূর্তিপূজাকে রাজা অশ্বাজীত  
বোলে বর্ণনা করেন নি বটে, কিন্তু তিনি পৌরানিক যুগের  
বিকাশটাকে স্বীকার করেন নি; তাই পুরাণ কথিত মূর্তিপূজাকে  
নিম্ন অধিকারীর যোগ্য বোলে তার একটা সঙ্কীর্ণ স্থান নির্দেশ কোরে  
গ্যাছেন মাত্র।

৭। "আজকাল এটা চলতি কথার ঠাঁড়িয়েছে, আর সকলেই  
বিনা আপত্তিতে এটা স্বীকার কোরে থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ।  
আমিও এক সময়ে এরকম ভাবতাম, আর তার শাস্তিস্বরূপ আমাকে  
এমন এক ব্যক্তির পদতলে বোসে শিক্ষালাভ কোরতে হোয়েছে,  
যিনি পুতুল-পূজা থেকেই সব কিছু পেয়েছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ  
পরমহংসদেবের কথা বোলছি।"

—My Plan of Campaign.

Through idol-worship,  
What will you have—  
The reformers creed  
Or  
Any number of idols?  
I want an answer  
Take  
A thousand idols more  
If you can produce  
Ramkrishna Paramahansas  
Through idol-worship,  
And  
May God speed you!  
Produce such noble natures  
By any means you can.

Yet idolatry is condemned!  
Why?  
Nobody knows.  
Because  
Some hundreds of years ago  
Some man of Jewish blood  
Happened to condemn it?  
That is,  
He happened to condemn  
Everybody else's idol  
Except his own.  
...If God  
Comes in the form of a dove,  
It is holy.  
But  
If he comes  
In the form of a Cow  
It is heathen superstition;  
Condemn it!  
That is  
How the world goes."

তোমাদের মতবাদটার  
সত্যতা থাকলেও  
স্বামিজীর তাই আফশোষ!

[ ক্রমশঃ। ]

৮। "যদি পুতুল-পূজা কোরে এইরকম রামকৃষ্ণ পরমহংসদের  
অভ্যাস হয়, তবে তোমরা কি চাও?—সংস্কারকদের ব্রাহ্মধর্ম, না  
পুতুল-পূজা? আমি এর একটা জবাব চাই। যদি পুতুল-পূজার  
দ্বারা এইরকম পরমহংসদের সৃষ্টি কোরতে পারো, তবে আরও  
হাজারটা পুতুলের পূজা করো। সিদ্ধিলাভ! তোমাদের সিদ্ধি দিন।  
যে কোনো উপায়েই হোক এই রকম মহাত্মাদের সৃষ্টি করো দেখি।  
তবুও লোকে মূর্তি-পূজাকে গাল দেয়। কেন? তা কেউই  
জানেনা। কারণ কয়েক হাজার বছর আগে জনৈক ব্রাহ্মী বংশের  
একটি লোক মূর্তি-পূজাকে নিন্দে কোরেছিলেন বোলে? অর্থাৎ  
তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দে  
কোরেছিলেন।...ঈশ্বর যদি একটা ঘৃণ্য পাখীর রূপ ধোরে আসেন,  
তাহোলে সেটি মহাপবিত্র, কিন্তু তিনি যদি গাভীর রূপ নিয়ে  
আসেন, তাহোলেই সেটা হিন্দেনদের কুসংস্কার। ওটা অধঃপাতে বাক।  
ছনিয়ার ভাবই এই।"

—My plan of Campaign.



## বাংলা সাহিত্যে নতুন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার এবং ভারত গভর্নমেন্ট সাহিত্য বিষয়ক নানা বহু পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য বাংলা গভর্নমেন্ট 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-এর আয়োজন করেছেন। দিল্লী থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ আকাদেমী পুরস্কার আছে। এতদ্ব্যতীত দিল্লী থেকে সর্বভারতীয় ভাষার শিশু-সাহিত্যের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পুরস্কারও দেওয়া হয়ে থাকে। এই সকল পুরস্কার সাহিত্যক্ষেত্রের পক্ষে সাহিত্যিকদের যে যেখান উৎসাহিত করছে সে সবক্ষেত্রেই অবকাশ নেই। কিন্তু তবুও এই সকল সাহিত্য-পুরস্কার সমগ্র দেশের পক্ষে যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এর নান্দতা সহজেই নজরে পড়ে। একমাত্র আমেরিকার বুক-ব্যাঙ্কোই বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্যের জন্য ৪০টি বড় বড় প্রাইজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত আছে আমেরিকার বিখ্যাত 'পুলিটজার' পুরস্কার। এই পুরস্কার প্রতি বৎসর সংবাদপত্র ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ১৫টি ক'রে দেওয়া হয়ে থাকে।

কয়েক দিন পূর্বে নববর্ষ উপলক্ষে দক্ষিণ-কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের অন্ততম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার একটি সাহিত্য আসরের ব্যবস্থা করেন। এটি এঁদের একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। কলিকাতার প্রবীণ ও নবীন প্রায় সকল সাহিত্যিকরাই এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও নিবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতাএসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় এই সাহিত্য-পুরস্কারের কথা উত্থাপন করে বলেন যে, ক্রান্তে সাহিত্যের জন্য ভূরি ভূরি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাংলা দেশে এইরূপ কোন ব্যবস্থার নিদর্শন দেখা যায় না। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় একজন অবাকানী ব্যবসায়ী প্রদত্ত 'নরসিং দাস প্রাইজ' নামক একটি হাজার টাকার পুরস্কার প্রতি বৎসর বাংলা-সাহিত্যের লেখকদের দিবে থাকেন। হুঃখের বিষয়, এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলা

দেশে নেই, যারা বাংলা-সাহিত্যের জন্য অল্পরূপ কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

বাস্তবিক পক্ষে কথাগুলি যে কতদূর সত্য তা আজ আমরা সকলেই অনুভব করতে সক্ষম। সকল বিষয়েই যে আমাদের গভর্নমেন্টের যুথাপেকী হয়ে থাকতে হবে তার কোন সন্দেহ কারণ দেখা যায় না। ইতিপূর্বে যে কতকগুলি আমেরিকার সাহিত্য-পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটিও গভর্নমেন্ট প্রদত্ত নয়—নোবেল প্রাইজের মধ্যেও তো সরকারের কোন দান নেই।

জানন্দের বিষয়, অন্নদাশঙ্করের এই আক্ষেপের পর, কলিকাতার দুইটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক, যারা এই আসরেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রতি বৎসর এক একজনে হু'হাজার টাকা ক'রে চার হাজার টাকার (শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাসের জন্য) চারটি সাহিত্য-পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। দুইটি পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বৃগান্তর' এবং অপর দুটি পুরস্কার দেন 'জানন্দ বাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান টাইমার্ড'। এই চারটি পুরস্কার ব্যতীত আরও দুটি পুরস্কার উক্ত সভাহলেই ঘোষিত হয়। একটি পাঁচ শত টাকার পুরস্কার প্রতি বৎসর শিশু-পত্রিকা 'মৌচাক'-এর তরফ থেকে শিশু-সাহিত্যের জন্য; অপরটি মাসিক পত্রিকা 'উন্টরথ'-এর তরফ থেকে, প্রতি বৎসর পূজার সময় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য পাঁচ শত টাকা।

বর্তমান বৎসরের প্রারম্ভে এই পুরস্কার ঘোষণা বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। আমরা আশা করি, এ থেকে আরও বহু সাহিত্য-পুরস্কারের উদ্ভব হবে এবং বহু প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠান এ সবক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হবেন।

বর্তমান বৎসরে যারা এই পুরস্কারগুলি ঘোষণা করেছেন, তাঁদের বখাবত্ব ভাবে এই পুরস্কারগুলি বিতরণের একটি গুরু দায়িত্ব আছে। পুরস্কারগুলি কোন কোন বিষয়ে হবে, কারা এর বিচারক হবেন, কি ধরণের নিয়ম-কানূনের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হবে, ইত্যাদি নানা বিষয় সন্দেহ জানবার জন্য আমরাও যেমন উদগ্রীব হয়ে আছি, তেমনি জনসাধারণেরও কৌতূহলের অবধি নেই। আশা করি, এ সবক্ষেত্রে একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা শীঘ্রই আমরা অবগত হব।

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## পুরনো বই

## কর্মযোগ

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলা সাহিত্যের যে একটি বিশেষ আগুন নিদ্রিষ্ট, এ কথা আজ নতুন করে বলবার নয়। বঙ্গ সাহিত্যের এই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা হঠাৎ গম্বিয়ে ওঠা নয়—আজকের দিনের তার আ-দিগন্ত খ্যাতির পিছনে আছে অনেক কালের সাধনার দীর্ঘ ইতিহাস। অতীতের অনেক সাহিত্য-পথবাত্রীর নিদাক্ষণ পরিশ্রম। পূর্বাচার্যদের অকৃত্রিম সাধনা। বাঙা সাহিত্যের অতীত দিনের রূপ, তার স্বরূপ-কৌশল, তার গঠন-চাতুর্ঘ্য যেমনই গৌরবময় তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। শুধনকার দিনের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের সম্বন্ধ বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। আলোচনার সঙ্গেই সমভাবে স্থান পেয়েছে লেখকদের মূল রচনার দীর্ঘ উদ্ভৃতি। প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কুলীনকুলসর্বধ্ব, নবাবু বিলাস, হতোম পাঁচার নকশা, গোড়ীর ব্যাকরণ, বোম্বেজু বিকাশ, তোতা ইতিহাস, বিজ্ঞানকল্পদ্রুম, নয়শো রূপেরা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আবার নতুন করে স্থায়িত্ব লাভ করুক, এই কামনা। সমগ্র গ্রন্থটিতে শ্রীনিখিল সেনের পরিভ্রমের ছাপ পাওয়া যায়, আমরা তাঁর সাক্ষ্য কামনা করি।—২ কলেজ স্কয়ার, কলকাতা—১২ থেকে এ, মুখার্জী স্ট্রাও কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীধর্মিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দাম ৮৫ টাকা মাত্র।

উনিশশো পাঁচ সালের বাঙলা দেশের রক্তরাঙা দিনগুলিতে বাঙালীর জীবনধারার যে মনোবীর্ষের প্রভাব বিশ্বের লাভ করেছিল তাঁদেরই অন্ততম মহাত্মা অখিনীকুমার দত্তকে স্মরণ করি প্রচার সঙ্গে। অখিনীকুমারের অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে ‘কর্মযোগ’ গ্রন্থটিই তাঁর শেষ রচনার স্বাক্ষর বহনকারী। আধ্যাত্মিক রচনার অখিনীকুমারের লেখনী শক্তিগর্ভা। বাত-প্রতিঘাতে ভরা হাজারো ঘটনার অতিবাহিত হয় আমাদের জীবন কিন্তু এই জৈব বাজার চরম উৎকর্ষতা মহামুক্তিতে। সেই মুক্তির চাবিকাটি নিহিত আছে নিষ্কাম কর্মযোগে। নিষ্কাম কর্মযোগ ছাড়া মুক্তির ‘নান্যঃ পন্থা’ বিজ্ঞতে অন্য়নায়’। গীতার আলোছায়ার এই গ্রন্থ পুষ্ট। জোবালো ব্যাখ্যা দ্বারা অখিনীকুমার তাঁর মহাবাদগুলিকে স্পষ্ট করেছেন। সংসারবাজার পরেই যে বিরাট জিজ্ঞাসা লুকিয়ে আছে সকলের মধ্যেই, তারই সমাধানের পথনির্দেশ পাওয়া বাবে এই গ্রন্থ। বঙ্গ সাহিত্য সংসদ, ১০ জামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীধর্মিয়রঞ্জন। দাম ২ টাকা মাত্র।

## পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

বহু গুণীজ্ঞানী-জনসঙ্গলাভ-গুণাঢ্য রসিক পুরুষ অমল হোম রবীন্দ্রনাথেরও সান্নিধ্যলাভ করেছেন নানা ভাবে, নিবিড় ভাবে সঙ্গ করেছেন তাঁর সঙ্গে। সে কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখার তিনি বর্ষাধিকারী। এই গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্র-চরিত্রের নানা দিক, কাহিনী, আলোচনা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। পরিচ্ছেদ-গুলির নাম থেকে পাঠকের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। নামগুলি বর্ণনা—এইরূপ—পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, কেবল রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানিগ্নানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি চিঠি ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রথম সংস্করণ স্বল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ার পরিবর্তিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ’ল। কবির কয়েকখানি মূল্যবান চিত্রও সংযোজিত হয়েছে এই সংস্করণে। ছাপা উচ্চাঙ্গের এবং সাজসজ্জা দেখে বিশ্বভারতীর প্রকাশিত গ্রন্থ বলে ভ্রম হয়। গ্রন্থখানি রবীন্দ্রভক্তদের বহু নূতনত্বের আশ্বাস দানে সুখী করবে। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৫০

## মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আগার সৌভাগ্য বাদের হয়েছে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁদের অন্ততমা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিকণ্ঠকে দেখলে দেখা যায় তিনি নানারূপেই প্রতীয়মান। এই গ্রন্থে কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে মূর্ত করে তুলেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। চিরবিদায়ের কয়েক বছর আগে কবিকণ্ঠ মংপুতে করেছিলেন পদার্থপণ। এই সময়েই লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে আরও নিবিড়ভাবে দেখার স্রবোগ পেয়েছেন। মংপুতে থাকাকালীন কবিকণ্ঠর দৈনন্দিন আচার ব্যবহার-সংলাপ এই গ্রন্থের উপজীব্য। কবিসত্তার মধ্যে যে একটি শাশ্বত মানব-সত্তারও বিশেষ স্থান ছিল সেই রূপটিকেই ফুটিয়ে

কাল নরম  
মসূন  
কেশের  
জন্ম



কেএমপি  
ব্র্যাণ্ড  
নারিকেল তৈল



পার্বিত্র হিন্দু অয়েল মিলস  
১ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-৭

ভুলতে মৈত্রের দেবী তৎপর। সুখের বিষয়, এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন। প্রতিটি বরীন্দ্রমুরাঙ্গী তথা সাহিত্যপ্রিয় পাঠক-পাঠিকার কাছে এই গ্রন্থের যোগ্য সমাদর হোক। ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা—৩ থেকে প্রজ্ঞা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীশ্রকমল ঘোষ। দাম হ' টাকা মাত্র।

### SNAKE BITE

সর্পাঘাতের ভীততা স্বক্কে কাউকেই নতুন করে বোঝাবার কিছু নেই। অতীতের পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত রীতিমত একটি আতঙ্কের আসন অধিকার করে আছে এই সর্প-দংশন। এই সর্প-দংশনের প্রতিকার কি ভাবে সম্ভব, তারই একটি সুবিস্তৃত আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থটিতে। সর্প-দংশন এবং তার চিকিৎসা স্বক্কে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য গ্রন্থটির শোভাবর্নন করেছে। বাঙালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের বধোপযুক্ত সমাদর ঘটুক, এই কামনা করি। লেখক ও প্রকাশক—শ্রী পি. ব্যানার্জী, মিহিভাম, (বিহার)। দাম—পাঁচ টাকা।

### স্বাধীনতার আবোল-তাবোল

দীর্ঘ দু'শো বছরের পরাধীনতা অতিক্রম করে ভারত লাভ করেছে স্বাধীনতার আশার। শত শত সন্তানের আশ্বাসসর্গ সফল হ'ল, লক্ষ লক্ষ মানবের পরাধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান সার্থক হ'ল, বিধাতার দরবারে মানুষের অন্তরের আবেদনও হ'ল ফলস্বতী কিন্তু এই স্বাধীনতা তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল না। নিখুঁত হ'ল ন' তার রূপ, অনেক কিছু অভাব রয়ে গেল সেই রূপায়ণে। স্বাধীনতা আসার সঙ্গে আর বাদেও আসার প্রয়োজন অথচ তারা এল না, সেই স্বক্কেই এখানে লেখকের আলোচনা। বাদের অভাবে স্বাধীনতা আজ নিজের মর্যাদা হারিয়েছে বহু পরিমাণে, সেই সংক্রান্ত আলোচনাই এ গ্রন্থের উপজীব্য। কোটি কোটি লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন বেখানে নিহিত সেখানে সেই সংক্রান্ত আলোচনাগুলো একটু গভীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতাকে আবোল-তাবোল আখ্যাটা না দিলেই যেন ভালো হত। তবুও গ্রন্থটি যথেষ্ট মূল্য বহন করে এবং যে অভাব লেখককে বিচলিত করেছে, সেই অভাব আজ ঘরে ঘরেই

বিস্তারিত। দেশের সত্যিকারের উন্নতিকল্পে লেখক বা আশা করেন তা সম্পূর্ণরূপে ফলস্বতী হোক, এই কামনাই করি। লেখক—সুনীলকুমার গুহ। পি ৫২১ রাঙ্গা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা-২১ থেকে লেখক নিজেই প্রকাশ করেছেন। দাম চার টাকা মাত্র।

### বনভূমি

বাঙালি সাহিত্যের অমূল্যসম্পদ পাঠক-পাঠিকার কাছে বিমল করার নাম আজ আর কারো অজানা নেই। জোরালো বক্তব্যের দ্বারা সংসাহিত্য সৃষ্টি করে বিমল কর আজ নিজের আসন দৃঢ় করে নিয়েছেন। সুদূর মধ্য প্রদেশের একটি ছোট বেলগুয়ে ষ্টেশনকে মুখ্যত কেন্দ্র করে বনভূমির পটভূমি রচিত। আগাগোড়া রচনাটি বিস্তৃত ভাষায় লেখা। সূর্যশঙ্কর-বনলতার চরিত্র সত্যিই প্রত্যেকটি পাঠকের মনে জাগায় করুণা। সমস্ত লাম্পটা, দুবাচার ছাড়াও সূর্যশঙ্করের মধ্যে আছে একটি সুন্দর মানবতা, সেইটাই মূর্ত হয়ে ওঠে এক-এক সময়ে। হেমন্ত বাবুর চরিত্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন বিমল কর। এই চরিত্রটি সত্যিকার ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। ১৭৭ এ আপার সাকুলার রোডস্থ জিবেলী প্রকাশন থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকানাইলাল সরকার। দাম তিন টাকা।

### সংকলিতা

অনেকগুলি নানা ধরনের কবিতার সঙ্কলন। বিভিন্ন বিদেশী কবির অনুবাদ-কবিতাও আছে কতগুলি। গ্রন্থকার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন নানা মাসিক সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকাদির মধ্যে যে রস ছড়িয়ে এসেছেন, এই গ্রন্থখানির মধ্যে কাব্যরসশিখার পাঠক তা একত্রে পেয়ে খুশি হবেন। অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই কবির ছন্দমাধুর্য্য ভাববৈচিত্র্য ও অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্যনীয়। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির নামকরণ করেছেন, শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৪ বক্সিং চার্টজো স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৪৮

## সে মেয়ে ছিল তো সবই

### হালডার লাক্সনেন

সে মেয়ে ছিল তো সবই—বা তোমার ভালবাসা আর অধেবার,  
বা কিছু পাওয়ার সঙ্গে ব্যাকুলতা, স্বপ্নদেখা তোমার মনের।  
তুমি তাকে শুনিয়েছ ছন্দ গান তোমার সকল মনীষার  
শিখিয়েছ হে স্বপ্ন, সব কিছু শ্রদ্ধা-সম্মানের।

আমি যে পেয়েছি খুঁজে তোমার মনের মণিকোঠার লুকানো  
সত্যের এবং দুর্দৃষ্টির কোরকগুলি ঠিক ;  
এ পার্থিব জীবনের এবং জ্যোতির  
বা কিছু সু-উচ্চতম—তাদেরই প্রতীক।

এক তাদেরই নিয়ে আমরা দু'জনে বেঁচেছিলাম নিষ্পাপ  
যে সত্যেরা—খণ্ড, ছিল পৃথিবীকে বাঁধে সমবায় ;  
ক্ষণজীবী আমোদের নাটকের থেকে  
আনন্দের পবিত্র-মধুর প্রত্যাবারে।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।



# রঙ্গপট



## তাসের ঘর

বিশ্ববিখ্যাত গঠন-শীলার পরিপূর্ণতা মনুষ্য সৃষ্টিতে ও তাদের বর্ণাধোগ্য স্থানে সংস্থাপনেই সেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বিকাশ। বাক্যে যেখানটিতে মানায় তাকে ঠিক সেইখানটিতেই তিনি বসিয়েছেন। কিন্তু মানুষের চিত্ত চিরদিনই অপূর্ণ। চাওয়ার নেশা তার ভাঙে না কোন দিন। সকল সময়েই সে ভাবে যে 'ওর জীবনযাত্রার মত আমারটি হলে ভাল হত'। ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়— পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারে যে পরমশিতার উপর কলম চালানো সূর্যতা ছাড়া কিছুই নয়। এই সত্যের ছায়া গ্রহণ করে অজয় ও বিনয় নামক দু'টি যুবককে কেন্দ্র করে রাসবিহারী লাল রচনা করেছেন 'তাসের ঘর'-এর কাহিনী। প্রথম জন বৈভব-বিমণ্ডিত, ধন্য বিনয়, দ্বিতীয় জন বিস্ত, নিঃস্ব, মৃত্যু-অভিলাষী। একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে দেখা হয়ে গেল দু'জনে, দু'জনের মধ্যে বিনিময় হ'ল পারস্পরিক জীবনযাত্রার। এর প্রধান সহায়ক হ'ল উভয়ের মধ্যে আকৃতির অদ্ভুত সৌন্দর্য্য অর্থাৎ অজয় হয়ে গেল



'পথে হ'ল দেবী' (প্রথম পূর্ণাঙ্গ পেতাকলারে তোলা বাঙলা ছবি)  
একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস ও স্রষ্ট্রা সেন

বিনয় ও বিনয় হয়ে গেল অজয়। তারপর নানা ঘটনার সমাবেশ হান্তরস পরিবেশন। শেষে বিনয়ের দ্বারাই উভয়ের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন। অজয়কে ভালবাসত দেবী, কিন্তু অজয় তার ডাকে সাড়া দেয় নি, তাকে মন দিল বিনয়, সুবহার বেলাতেও তাই— সে চেয়েছিল বিনয়কে কিন্তু বিনয় তাকে চায় নি, তাকে চাইল অজয়। কথা হচ্ছে যে, প্রথমেই প্রস্ন জাগে যে এই কাহিনী বাস্তবতার সমর্থন পায় কি না। বস্তুতঃ পক্ষে ঠিক হুবহু চেহারার মিল কি পাওয়া যায়, সৌন্দর্য্য থাকে? এককে দেখে অন্য বলে ভ্রমও হয় কিন্তু তাই বলে দিনের পর দিন একজন আরেকজন সেক্সে কাজ চালায় কি করে? তবে অজয় ও বিনয়ের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নিখুঁতভাবে ছবিতে ফুটে উঠেছে এবং কাহিনীর সাক্ষ্যতা হয়েছে অনেকখানি সহায়ক। হেমন্তকুমারের কঠো গাওয়া প্রখ্যাত কবি বিমল ঘোষের লেখা "শূন্যে ডানা মেলে, পাখীরা উড়ে গেলে, নিঝুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি।" গানটি একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অভিনয়ে দ্বৈত ভূমিকায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন উত্তমকুমার; এক সঙ্গে দু'টি বিভিন্ন ধরণের চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অথচ একটির মধ্যে আরেকটির ছাপ পড়ে নি। এইখানেই তাঁর সমধিক কৃতিত্ব। মিথুর কঙ্কণ-কাতর অসহায় চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-নৈপুণ্যে। আদর্শের পায়ে নিবেদিত প্রকাশের কর্তব্যনিষ্ঠ অথচ কোমল রূপটি দর্শকমনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় রবীন মজুমদারের অভিনয় দক্ষতার। দেবদানীর অভিব্যক্তিশীল অভিনয় ঠিক মুগ্ধ করা তোতা পাখীর উজ্জ্বল মত। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিটিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায় বেন তুল করে একটুখানি ভাল অভিনয় করে ফেলেছেন, তাঁর মত অভিনেত্রী যেটুকু ভাল অভিনয় করতে পারেন সেটুকুই আশার কথা। প্রার্থনা করি, তাঁর অভিনয়ের যেটুকু উন্নতির সূত্রপাত হ'ল তাসের ঘরে সেইটুকুই বেন ক্রমশঃ বীরে বীরে বর্ধিত আকারে পরিণত হয়। অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, ডাঃ হরেন, মাঃ তিলক, চন্দ্রা দেবী, অপর্ণা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় স্ব স্ব ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন নবাগতা শেকালী নামেক, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, মণি জীমানী, প্রেমতোষ রায় ও শ্যামসুন্দর খানার ও, সি জীঅনিল সরকার প্রভৃতি। তাসের ঘর ছবিটির মূল নাম ছিল 'বিনিময়'। নামটি বোধ হয় ঠিকই ছিল, কেন যে বদলানো হল বোঝা গেল না! ছবির একেবারে শেষের দিকটি কিন্তু পরিচালক সহজভাবে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। আর একটু সহজ করে ঐ জায়গাটি দেখালে ভালো হোত।

## নীলাচলে মহাপ্রভু

ছবির নামকরণেই বোঝা যায় যে, কাহিনীর পটভূমিকা বাঙলা নয়, দূর নীলাচল অর্থাৎ উৎকল এবং কাহিনীর নায়ক স্বয়ং মহাপ্রভু জীজীচৈতন্য। সোয়া চারশ বছর আগের কথা। যেদিন বর্ণবৈবহ্যে নীলাচল ভরপুর, ব্রাহ্মণদের আলোয় বেদিন ব্রাহ্মণের অন্ধ, অত্যাচারে গীড়নে শূন্য নীচ অত্যাচারের প্রাণ অতিষ্ঠ, সেই সময়ে সময়ের বাণী বহন করে

বাঙলা থেকে নীলাচলে পদার্পণ করলেন নবদীপচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর চরণপ্রান্তে সেদিন পরমানন্দে ঠাঁই পেল সর্বহারার দল। মহারাজা বর্ণক্ষেত্রে, মহামন্ত্রী চক্রান্ত করে মহারাজকে নিহত করে শূন্য সিংহাসনে নিজে বসতে চান। জীবন্ত জগন্নাথকে দেখে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে থাড়া হল দেবদাসী, যিনি মহামন্ত্রী দ্বারা নিয়োজিতা হয়েছিলেন গৌরীকে অস্ত্র উপায়ে পরিতুষ্ট করে লোক সমক্ষে তাঁকে হের করতে। তাঁর বার্ষতা দেখে মহামন্ত্রী তাঁকে যখন চরম দণ্ড দিতে উপস্থিত, সেই সময়ে নাটকীয় ভাবে মহারাজার আবির্ভাব ও সকল দুর্যোগের সমাপ্তি। মহারাজাও চৈতন্তের প্রতি অবিখ্যাসী রইলেন, শেষে রথযাত্রার দিন মহারাজ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করলেন চৈতন্তের চরণে। এর পর মহাপ্রভুর স্বদেশে আগমন, মাতা-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পুনর্বার নীলাচলে গমন ও অসীমের মধ্যে বিলীয়মান হওন। ভক্ত দর্শকের চিত্ত এ ছবি অধিকার করবে সন্দেহ নেই। সমগ্র উৎসববাসীর মহাপ্রভুকে বরণ করে নেওয়া বাঙালীর প্রাণে নতুন করে পথ চলার প্রেরণা জোগাবে। বিশ্বত অতীতকে বর্তমানের বৃক জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা সকল সময়ে প্রশংসার যোগ্য। পরিচালনায় খুঁৎ চোখে পড়ে প্রথমার্শে জগন্নাথের মন্দিরে চৈতন্ত অচৈতন্ত হয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত অবধি দেখা গেল মন্দিরের অভ্যন্তর একেবারে নির্জন অথচ তিনি পড়ার পরমুহূর্তেই যে গাঙ্গা-গাঙ্গা লোক বাধা দিতে এগিয়ে এল তারা কি দেওয়াল ভেদ করে এল? কুঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলুম কেউ মহাধ্বজলকার পর্বস্ত দিয়েছেন, ভেবে দেখুন এ কি সম্ভব? কুঠরোগীকে যখন নীরোগ করলেন গৌরী, সেই সংবাদ সার্বভৌমের কাছে পৌঁছল না কেন? চৈতন্তের যে শোভাযাত্রার সার্বভৌম পর্বস্ত অংশগ্রহণ করলেন সেই শোভাযাত্রার মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপীনাথ অম্বপস্থিত কেন? মহারাজা প্রতাপরুদ্রের মাথার মুকুট অমন মুসলমান নবাবদের মত কেন? মহামন্ত্রী বিজ্ঞানবীর দাড়ি দেখে তাঁকে নীলাচলবাসীর পরিবর্তে শিখ বলে মনে হয়। অভিনয়ে অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন নবাগত নট অসীমকুমার। সমগ্র চিত্রখানির গৌরব বহন করেছে তাঁর ভাবগভীর শান্ত সংবত সৃষ্ট অভিনয়। প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকচিত্ত বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গেলেন অসীমকুমার। তাঁর ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনা করি। যৎসামান্য আবির্ভাবে ঈশানকে জীবন্ত করে তুলেছেন কাছ বন্দ্যোপাধ্যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটবাস, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন ঘোষ, মলিনা দেবী, শিখা বাগ স্ব ভূমিকাগুলি সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'স্মৃতিজা দেবী' ও দীপ্তি রায় দুজনেই চরিত্র দুটির বর্ণনা রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, এঁদের অভিনয় পরিতৃপ্ত দেয়। বার্ষ হয়েছেন পদ্মা দেবী ও স্মৃতিজা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমদিক অভিনয়ে মহারাজীর পরিবর্তে মনোহারিনী বলে মনে হয়, রাজীর ব্যক্তিত্ব এতটুকু তার মধ্যে নেই, রাজার অসংখ্য অল্পগৃহীতারই একজন বলে তাঁকে মনে হয়। দ্বিতীয় অভিনয় সম্পূর্ণরূপে জড় ও আড়ট ও অভিব্যক্তিহীন। এখনও তাঁর রীতিমত সাধনার দরকার। কুচক্রীর রূপটি বীরাঙ্গ ভট্টাচার্যের মধ্যে ফুটে উঠছে এ কথা অস্বীকার করা

যায় না; তবে মাঝে মাঝে তাঁর সেই 'টেন-টেনে' কথা বলা দর্শকচিত্তে রীতিমত বিরক্ত উৎপাদন করে। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন হরিমোহন বসু, কৃষ্ণন মুখো, হরিশ্চন্দ্র মুখো, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টো, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, সমীর মজুমদার, পারিজাত বসু, প্রেমতোষ রায়, শৈলেন মুখো, শ্রীমান হিলক, জ্ঞানদা কাকোতি, আরতি দাশ, সুকৃতি সেনগুপ্ত ইত্যাদি।

### স্বরের পরশে

একটি থিয়েটারকে কেন্দ্র করে গল্প। স্বনামধন্য অভিনেতা পরেশ রায় মৃত্যুকালে তাঁর 'নাট্যশ্রী' থিয়েটারের ভার দিয়ে বান তাঁর মেয়ে মনোবাকে। ঘটনাচক্রে মনোবাকে মঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হয় ও পরে নাট্যকার কল্যাণ সেনের সঙ্গে নানা বিরোধের মধ্যে দিয়ে প্রেম গড়ে ওঠে শেষে সর্বস্ব ত্যাগ করে কল্যাণের জীবনে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। এই হ'ল গল্প। একটি দুর্বল গল্প ও নিরেশ পরিচালনা ছবিটিকে বার্ষ করে দিয়েছে। তালকানার মত পরিচালনার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কয়েকটি দেওয়া যাক। মন্ত্রশক্তির অভিনয়ে বাণীকে দিয়ে যে পরিচ্ছন্ন পরানো হয়েছে ও যে ভাবে নাট্যনো হয়েছে তাতে করে সন্দেহ হয় যে 'মন্ত্রশক্তি'র কাহিনীটি এঁদের জানা আছে কি না। 'স্বরের পরশ' নাটকটির মঞ্চাভিনয়ের বস্তুগুলি অংশ দেখানো হ'ল তা অস্বাভাবিক নয় কি? ছবিতে বস্তু খুঁটিনাটি দৃষ্ট দেখানো যার মঞ্চে তা কিছুতেই যায় না—কবির দণ্ডাজা থেকে মুক্তি পর্বস্ত খুব জোর তিনটি দৃষ্ট দেখানো যেতে পারে, তার বেশী কিছুতেই নয়। সাধারণতঃ একটি থিয়েটার সাড়ে ন'টা নাগাদ ভাঙে, তার সাজসজ্জাদি ধুলতে ও হাত-বুখ ধুয়ে পরিষ্কার হ'তে আরও অন্ততঃ মিনিট পনেরো সময় যায়, এখানেই পোনে দশটা; এ ছবির নায়ক তখনও যে কি করে দশটার ফ্রেনে বিদেশবাজার আশা রাখে সেইটেই ভাববার কথা। থিয়েটারটি দেখলুম 'প্রমীলা রাজা', অভিনীত নাটকটিতে পর্বস্ত।



প্রতিভা বসুর 'পথ হ'ল দেবী'র একটি দৃশ্যে উত্তম, সচিব্রা,

প্রচার—সুধীবেজ সাভাল

সব থেকে চোখে লাগে যে মুহূর্ণপখাত্রী পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেই সত্যের অন্ধান। যে সত্যকে বজায় রাখতে সহস্র বাধা সম্মুখীন হয়ে নিজে অভিনেত্রী হ'ল, সেই মনীষা মুহূর্তের আবেগে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ভিন্ন জীবন গ্রহণ করে বসল এবং রীতিমত সে সরে গেল মঞ্চজগত থেকে। এমনও হতে পারত যে মনীষা সরে গেল বটে তবে সে মৃত পিতার থিয়েটারটিকে চালু রেখে গেল কিন্তু এ ধারণার মৃত প্রতিবাদ কাহিনীর বক্তব্যই। আমরা দেখতে পেয়েছি যে মনীষাই থিয়েটারের প্রাণ। সে চলে গেলেই থিয়েটার নিশ্চিহ্ন। যা সবই বুঝতে পারলেন অথচ মেয়ে কোথায় যাচ্ছে একবার প্রশ্ন পর্বস্ত করলেন না। তিনি কি একজন জ্যোতিষী যে সব কিছু গণনার আগে থাকতে জেনেছিলেন? আদর্শবাদী সাহিত্যিককে এখানে যে ভাবে দেখানো হয়েছে ও যে সংলাপ তাঁকে দেওয়া হয়েছে এ জিনিষ প্রশ্ন তেবো বছর আগের 'উদয়ের পথে'রই একরকম অনুকরণ বললে ভুল হয় না। অভিনয়শে উত্তমকুমার ভাল অভিনয়ই করেছেন, ছবির প্রশ্ন মধ্যাংশে তাঁর আবির্ভাব আর ধরতে গেলে তাঁর আসার পর থেকেই যেন ছবিটি কিছুটা আকৃষ্ট করে দর্শক সাধারণকে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাতাল, নীতীশ মুখো, কালী বন্দ্যো, অমূলকুমার, জীবন বসু, সত্য বন্দ্যো, সঞ্জিল দত্ত, শ্রীমান বাবুয়া, অপর্ণা দেবী, যমুনা সিং প্রত্যেকেরই অভিনয় বখাষ চরিত্রাভিনয়ই হয়েছে; তবে মালা সিন্হা মনীষার কণ্ঠ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, দর্শককে মোটেই আকৃষ্ট করে না তাঁর কৃত্রিমতাপূর্ণ অভিনয়। অবশ্য স্থানে স্থানে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল হয়েছে স্বীকার করতেই হবে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে যে তিনি কার্যশীলকর্মের দিকেই অধিকমাত্রায় যত্নশীল। 'পুত্রবধূ'র মালা সিন্হার কাছে, আমরা এ জিনিষ আশা করি নি।

## রূপট প্রসঙ্গে

চলচ্চিত্র ও পঙ্কতপার মাধ্যমে দর্শক সাধারণ আন্তরিক মুখোপাধ্যায় ও অসিত সেনের প্রতিভার পেয়েছে আশ্বাদ। এঁদের আগামী অবদান 'জীবনতৃষ্ণা'। সঙ্গীত পরিচালনার ভার পেয়েছেন উত্তর ভূপেন হাজারিকা। রূপায়ণে দেখা যাবে পাহাড়ী সাতাল, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, সুনন্দা দেবী ও সুরিন্দ্রা সেনকে।...

### 'মুখোশে'র নিবেদন—

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

বহুজন প্রশংসিত সামাজিক নাটক

**ধূতরাষ্ট্র**

আগষ্ট মাসের প্রতি শনিবার

সন্ধ্যা—৬-৩০ মিঃ

**থিয়েটার সেন্টার**

৩১এ, চক্ৰবেড়িয়া রোড, সাউথ কলিকাতা—২৫

ফোন : ৪৭-৩৫৫৫

প্রবেশ মূল্য—৫০, ৩০, ২০, ১০

জয়সঙ্কর 'লৌহকপাট' বাঙলার বিনয়মহলে একটি আদৃত গ্রন্থ। এটি পরিচালনা করেছেন খ্যাতিমান পরিচালক তপন সিংহ। অভিনয়ে মালা সিন্হা সহ দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবর্গকে। ...তরুণ সাহিত্যিক অনিলবরণ ঘোষের 'বসন্তবাহার'কে চিত্ররূপ দিচ্ছেন অভিনেতা-পরিচালক বিকাশ রায়। সঙ্গীতে সমৃদ্ধ এই চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার পেয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবেন ভারতবর্ষে ও গুপ্তাদ বড় গোলাম আলী খাঁ, আমীর খাঁ, হীরাবাই বরদেকার, কণ্ঠে মহারাজ, সাগরিন্দী, শান্তাপ্রসাদ, মাসিক বর্মা, প্রমুখ বন্দ্যো, মানবেন্দ্র মুখো, এ কানন, সন্ধ্যা মুখো, কণিকা বন্দ্যো প্রভৃতি। পদার্থ দেখা যাবে পাহাড়ী সাতাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবন বসু, বিগত দিনের খ্যাতিমান অভিনেতা প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা দেবী, অপর্ণা দেবী, নবাগতা শ্রীমা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা দাস, মায়ী ভট্টাচার্য এবং যোশনকুমারী প্রমুখ শিল্পীদের। ...মণি ঘোষ ও সুরবি অমল দত্তের পরিচালনার চিত্রায়িত হচ্ছে কড়ি ও কোমল। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গীত পরিচালনার এই ছবিতে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, রবীন্দ্র মজুমদার, প্রবীরকুমার, জীবন বসু, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি চৌধুরী, ভারতী দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের। ...জনপ্রিয় তারকা উত্তমকুমার বর্তমানে প্রযোজক। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি 'হারানো সুর' যার কাহিনী রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও হেমন্তকুমার। অজয় করের পরিচালনায় এই ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাতাল, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দেবী, সুরিন্দ্রা সেন, কাজরী গুহ প্রভৃতি। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও উত্তমকুমার সাক্ষ্য লাভ করুন ও তাঁর দ্বারা চিত্রগ্রহণ আরও উপকৃত হোক, এই কামনাই করি।

## চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

### সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী সুরিন্দ্রা দেবী

শুধু বাংলা নয়, বাংলার বহির্জগতকেও একই সঙ্গে বিমুগ্ধ করেছেন সৌন্দর্যময়ী কুশলী অভিনেত্রী সুরিন্দ্রা দেবী। একটি যুগ মাত্র অতিবাহিত হয়েছে তিনি চিত্রজগতে এসেছেন কিন্তু অভিনয় প্রতিভা ও অভিনয়-দক্ষতার কী বিশিষ্ট ছাপই না রাখতে পারলেন এরই ভেতর! দক্ষশীল পরিবারে তাঁর জন্ম—দক্ষশীল পরিবেশেই তাঁর বালাক্যাবনের শিক্ষা ও দীক্ষা। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এ লাইনে আগবেন এ বোধ হয় কল্পনার বিষয়ও ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী সুরিন্দ্রার বিজ্ঞানী মন—চলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা—এ ছিল বলেই এ লাইনে আসতে তিনি বাধা পেলেন না। আর এসে বসন পড়লেন তখন দেখা গেল তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন সার্থক শিল্পী, বাংলার চলচ্চিত্র-জগত তাঁকে পেয়ে সত্যি লাভবান হয়েছে অনেকখানি।

শি মদেবী-মতামত জানতে গিয়ে বহু শিল্পীর সম্পর্কে এসেছি

এ বাৎ, নোতুন নোতুন অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি প্রচুর। শিল্প-চাতুর্য ও অভিনয়ে বীরা দর্শক সমাজের চিত্তবিনোদন করে থাকেন দিনের পর দিন, তাঁদের জীবন-বৈচিত্র্য, রূপালী পর্দার বাইরে দেখানে তাঁরা আমার আপনায়ই মত রক্তমাংসের মানুষ, সেই কাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করে আগছি কত কাল থেকেই। এবারে বাংলার অন্ততমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীও মতামত সংগ্রহ করে পরিবেশনের তাগিদ অনুভব করলুম প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

বাণীগঞ্জের কৈয়াতলা লেনের একটি প্রকাণ্ড ফ্লাট বাড়ী। শ্রীমতী কানন দেবী ও তাঁর স্বামী বন্ধুবর বনামমণ্ড পরিচালক শ্রীহরিন্দাস ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন আগে-ভাগেই সুমিত্রা দেবী এখানেই থাকেন। কলকাতার দাঙ্গা গ্রীষ্মের একটি দিনে ঘন্টাকত কলেবরে হাজির হলুম সেখানে। চার তলার ফ্লাটে বসানে শ্রীমতী সুমিত্রা থাকেন, ঐ স্থানে তাঁর ডইংরুমে আমাকে নিয়ে বসান হ'লো। চমৎকার ঘরখানি—চারদিকেই দেখতে পেলুম শিল্পীমনের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে। কবিতা রবীন্দ্রনাথের একখানি বৃহৎ আলোখা ঘরখানির শোভা বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি, পরিবেশকেও করে তুলেছে বেশ শিল্প শাস্ত্র ও সমাহিত। ভাবলুম, আলোচনার ক্ষেত্রে প্রশস্ত হ'য়ে আছে এইখানে আপনা থেকেই।

“১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স-এর হিন্দি ছবি ‘মেরি বহিন’ এবং বাংলা ছবি ‘সন্ধি’—এ দুখানি ছবিতে আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি। তারপর এক বছরের মধ্যে বহু ছবিতে এবং বহু বিশিষ্ট ভূমিকায় আমার অভিনয় চলে আসছে। ‘স্বামী’ ছবিতে সৌদামিনী ‘সাহেব বিবি গোলাম’ এ পটেশ্বরী বৌ ঠাকুরাণী এবং ‘জীথারে আলো’ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পেয়েছি তুগনাবল্ক ভাবে অনেক বেশী। এর বিশেষ কারণ জটিল চরিত্রে রূপশ্যেনেই সাধারণতঃ আমার আনন্দ। একটি ছুটি হিন্দি ছবিরও নাম করবো আমি যেমন ‘মশাল’ ও ‘ময়ূরপঙ্খ’ (বোম্বাইয়ের ছবি) যেগুলোতে অভিনয় করতে যেরে আমার তৃপ্তি বা আনন্দ কম হয়নি। এক্ষেত্রে সেই একই কারণ—অভিনয়ের ক্ষমতার মত কাহিনী ও চরিত্র খুঁজে পাওয়া। বলতে কি, যে চরিত্রের ভেতর সংঘাত রয়েছে অর্থাৎ বেদনা ও আনন্দ, আলো ও অঁধারের রয়েছে সমিশ্রণ, বিশেষতঃ যাতে থাকবে একটা বিদ্রোহের মনোভাব, সেখানেই যেন আমি মানানসই, স্বাভাবিক ও স্বন্দর। কাজেই সে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না, পরস্তু মনে আনন্দ ও তৃপ্তি পাই আমি প্রচুর।”

ঘরে ঘরে বললেন আমার শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী এ কথাগুলো আলোচনার সূত্রপাতেই। এর পর আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখলুম তাঁর কাছে, আমি শুনিছি, তিনি চললেন বলে।

একটি ছোট প্রশ্ন আমার—চলচ্চিত্র-জগতে আপনার যোগদানের কারণ কি?

—এ লাইনে কেন এলুম, সে কথা আজ আর বলে লাভ কি? তবে এটুকু বলতে পারি, চলচ্চিত্রে আমি যোগদান করবো, এ বাৎগা আমার কোন দিনই ছিল না। ঘরে নিন, নিছক ব্যক্তিগত কারণেই এ লাইনে এসে পড়েছি আমি। আমাদের Familyতে আমিই first এবং বোধ করি আমিই last. একটা কথা না বলে

পারবো না, হয়তো বা এইটিই আমাকে এ লাইনে আসতে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে, ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের উপর একটা সহজাত টান ছিল আমার। মনে পড়ছে, পূজোর সময় আমাদের বাড়িতে অভিনয় হ'তো প্রতি বারেই এবং সে অভিনয় আমার মনের উপর অলঙ্কিতে কী প্রভাব বিস্তার করতো! সিনেমা-জগতে আসবার কথা তখন মনে উঠে নি বটে কিন্তু অভিনয়ের একটা নেশা আমাকে যেন ক্রমেই পেয়ে বসে। স্থলে যখন পড়ছি তখনই অভিনয় করবার আমি সুরোগ পেলুম—এবং আর ছুই-একবার সাহায্যের জল্পে অভিনয় করেছি অবশ্য, সে সকল অভিনয় শুধু মেরেবাই করেছিল। Confidence ছিল মনে বরাবরই—অভিনয় করতে আমি পারবো, কখনই ব্যর্থ প্রমাণিত হবো না।

সামাজিক ও পারিবারিক প্রশ্নের কথা যদি তোলেন, তা হ'লে বলবো, শ্রীমতী সুমিত্রা বলতে থাকেন বেশ সহজ গলায়, ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর প্রথমটার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড সংঘাত এসেছিল আমার। বাড়ীর দিক থেকেই আপত্তি ও বাধা দেখা দিয়েছিল অত্যন্ত বড় হ'য়ে কিন্তু আমার মনে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি তখনও ছিল না, আজও নেই। সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকেও এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, কোথাও আমি অনাদৃত নই।

—সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মত্বটি কি এবং বিশেষ hobbyই বা কি আছে? ঘর ক'ঠে সুমিত্রা দেবী বলেন—বোম্বাইতে যখন থাকি, ভোরবেলাই উঠে পড়ি ঘুম থেকে, তারপর চা খেয়ে স্বান করতে বাই—স্নান শেষে চলে হয় তো আমার



সুমিত্রা দেবী



নাচ দেখা। ইন্ডিগোতে যেদিন কাজ থাকলো সেদিন সেখানে চলে বাই, আর যেদিন স্যাটিং থাকলো না সেদিন প্রায় সারাদিনই বাড়ীর কাজ-কর্ম দেখি। বিকেলের দিকে হয়তো বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম, ক্লাবে গেলুম খেলা-ধুলোও করলুম। রাত্তিতে বাড়ী ফিরে এসে কিছুক্ষণ চলে পড়াশুনো বা সংসারের কাজ-কর্ম দেখা। হবি বলতে, গার্ডেনিং, ট্রাভেলিং, ট্রাম্প জমান, রকমারি coin সংগ্রহ—এ কয়টি আমার আছে এবং এগুলো করে আমি আনন্দ পাই। যখন খেলি, টেবিল টেনিস খেলতেই আমার ভাল লাগে। swimming করি outing এর দিকেও আমার ঝোঁক কম নয়। আর একটি হবি আমার ছবি তোলা, ছবি তুলতে সত্যি আমার ভাল লাগে।

শ্রীমতী স্মিত্রার বলা তখনও শেষ হয়নি, বললেন তিনি—পড়া-শুনোর অভ্যাসটা এখনও রয়েছে কি না যদি বলতে হয়, বলবো—এটিও প্রায় আমার একটি হবি, কাজেই ছাড়তে পারিনি। এ অভ্যাসটি আজও। সাহিত্য ও Drama এ পেলেই আমি পড়ে থাকি। আধুনিক নামকরা সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের রচনা মোটামুটি ভালই লাগে আমার। বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে বাবার ও সৈয়দ মুক্ততাবা আলি সাহেবের লেখা আমার ভাল লাগে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। ‘মাসিক বহুমতী’ আমার বেশ ভাল লাগে। এর প্রধান কারণ এর ভেতরে ভাল ভাল গল্প ও অজ্ঞাত উৎকৃষ্ট রচনা থাকে যা পড়তে ঘরে মনের আনন্দ হয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ সবকিছু আপনার নিজস্ব মতামত কি ?

স্মিত্রা দেবী উত্তর করলেন স্পষ্ট ভাষায়—পোষাক-পরিচ্ছদ simple হওয়াই ভাল, তবে সেটা artistic হতে হবে। সোজা কথার সব কিছুই ভেতরই একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। ড্রেস বস্তা light colour এর উপর হবে, ততই বোধ করি ভাল।

এর পর চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনার আমরা ফিরে এলুম। এবারে আমার প্রশ্ন—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি গুণ না থাকলে নয় ?

সর্বপ্রথমেই বলতে হয়, চলচ্চিত্রে শিল্পী হিসেবে যোগ দিতে হলে আট সত্ত্বকে sense অবিশিষ্ট চাই। proportion বার ভেতর আছে, দক্ষশিল্পী তিনি হবেনই। বলা বাহুল্য, এ লাইনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য একরূপ অপরিহার্যরূপেই চাই ভাল চেহারা, সুকঠ, অভিনয়-প্রতিভা এবং সেই সঙ্গে general instinct.

ভাল ছবির ক্ষেত্রে কি চাই বা কি না হলেই নয়, জিজ্ঞেস করলে আমি না বলে পারবো না, শ্রীমতী স্মিত্রা জোর গলায় বলে চলেন, প্রথমেই চাই ভাল বই—অর্থাৎ ভাল গল্প বা কাহিনী। তার পরেই চাই treatment, ভাল টিম ওয়ার্ক ও নিখুঁত অভিনয়। সর্বোপরি থাকতে হবে পর্যাপ্ত finance যাতে production কখনই hamper না করে। এ সবগুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ছবি তৈরী করতে গেলে ছবি ভাল না হয়েই পারে না, এটুকু আমি বলবো।

খামতে যেয়েও স্মিত্রা দেবী দেখলুম খামলেন না। বললেন—আর একটি কথা আমি না বলে পারবো না, সে হ’লো শিল্পীদের

স্বাস্থ্য সম্পর্কে। স্বাস্থ্য যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই পরম সম্পদ সন্দেহ নেই কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পীদের পক্ষে এটি আরও কিছু বেশী। স্বাস্থ্য বেখানে ভেঙ্গে গেল, শিল্পীর সেখানেই মৃত্যু। বলতে কি, শিল্পীদের বেলায় স্বাস্থ্য জিনিষটা খুবই urgent অর্থাৎ এটা হুগেই যে, বাংলা দেশের মেয়েরা এদিকে ততটা খ্যান দেন না।

চলচ্চিত্রে বাঙালী—বিশেষ করে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি ?

শ্রীমতী স্মিত্রার কণ্ঠে দৃঢ় জবাব—শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ লাইনে আসতে বাধা কোথায় ? আমি তো দেখিনে। অজ্ঞাত বৃত্তির মত এইটিও একটি প্রাথমিক বৃত্তি বলেই আমার বিশ্বাস। চলচ্চিত্রে শিল্প হিসেবে উন্নীত করতে হলে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরই এ লাইনে চাই। বাঙালী ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এ লাইনে এদের আরও অধিক সংখ্যার আসা উচিত, এ কথাই আমি বলবো।

নিজের আয়ের প্রসঙ্গ তুলতে যেতে স্মিত্রা দেবী কোনরূপ জড়তা না রেখেই বললেন—১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স এ যখন আমি যোগ দিই, তখন আমার মাসমাইনে খার্য্য হয় আড়াইশো টাকা। অবশ্য এক মাস যেতে না যেতেই নিউ থিয়েটার্স-এর কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশ্পদ শ্রী বি, এন সরকার সেটা বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা করে দেন। শুধু তাই নয়, আমাকে বোনাসও দেওয়া হলো। এযাবৎ কোন ছবিতে বেশী পেয়েছি বা কোন ছবিতে কম—টিক খতিয়ে দেখি নি। তবে মনে হয়, বোম্বাইয়ের হিলি ছবি ‘গুরু ধুগুরু’ এবং বাংলা ছবি ‘পথের দাবী’তেই সব চাইতে বেশী টাকা পেয়েছি। সব চাইতে কম টাকা হয় তো শেষে থাকবো বাংলা ‘সকি’ ছবিতে—কম বলতে প্রায় ৩ হাজার টাকা।

এর পর আমি জানতে চাইলুম সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায় ? এ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব ধারণা বা মতামত কি ?

—চলচ্চিত্র একটি বিরাট শিল্প তো বটেই পরন্তু এটি একটি চমৎকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমাজ-জীবনের উপর এর প্রভাব অপরিণীম। এর মাধ্যমে সমাজকে উন্নত করা চলে বহুব্র বর্ধি। আমি তো বলবো এটি একটি Powerful medium of teaching.

প্রশ্নোত্তরের পালা প্রায় শেষ হ’য়ে এলো। এর ভেতর বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না—শ্রীমতী স্মিত্রা চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। দেখলুম, সিনেমা-জগৎ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি এ ক’বছরের ভেতর—চিন্তা করবারও অধিকার রাখেন বর্ধে, কি করে এ শিল্পের উৎকর্ষ সাধন হবে, এ লাইনের উন্নতি হবে। একদিন যদি আমরা স্মিত্রা দেবীকে শিল্পীর পর্ধ্যায় অতিক্রম করে প্রযোজিকা হিসেবে দেখি, বা দেখতে পাই, তবে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হবো না। বরং এ আশাই রাখতে পারি পরিবার যে, শিল্পী ও অভিনেত্রীরূপে তিনি যেমন স্বনামধন্য, প্রযোজিকার নয়া ভূমিকাতেও তেমনই হ’তে পারবেন সার্থক। শ্রীমতী স্মিত্রা বেঙ্গল ফিল্ম-জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কয়েক বারই, শ্রেষ্ঠা প্রযোজিকা-রূপেও আমরা তাঁকে দেখতে পাবো, এটি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত চাওয়া নয়।



# দেখুন!



দস্তাক্কর নিবারণে  
বিশেষ  
প্রতিরোধক!



## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দস্তাক্করী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিট-গন্ধী স্নানীতল আন্বাদ!



লক্ষ্য করুন, কাপটি  
ধরবার কত সুবিধে।

GK 4776 A

জেনি ম্যানার্স এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী

## রাজার-রাজার

[ ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর ]

ম্যাণেট ভালাগা জানিয়েছিল নরম সুরে, চৌধুরাণীর দেহটাকে আন্তরিক চেয়েছিল। এ খাঁচার অধিকারী যদি নরদানব হয়!

আনন্দকুমারী ভবিষ্যৎ জানতে চায় না। রাবণের হাতে যুগ্ম অপেক্ষা রামের হাতে মরণ না কি অনেক সুরের, অনেক আনন্দের।

বজ্রার অধিকারীও দেখতে পেরেছেন অপ্সরানিন্দিতা মন্ত-কন্ডাকে। ছাদের ফরাসে লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তবুও তিনি নিশ্চিন্ত বসেছিলেন, বিন্দুমাত্র বিম্বিত হনেন না।

একজন তাঁবেদার সেবার রত ছিল। দেহ মর্দন করার কাজে। পরসেবার দাস একজন কাছে ছিল। তাকেই ফিসফিসিয়ে বললেন, —হয়তো ভাগ্যবিড়ম্বিতা, আশ্রয়প্রার্থিনী। কি প্রার্থনা জানায় শুনা চাই।

জগমোহন লেঠেলের বুকে স্তম্ভ সিংহ আগলো যেন। বজ্রার ছাদ থেকে নৌকার তীরে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বসূহর্ষে বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনার অমুমানই বখাৰ্। দেখি কি বলে।

ভয়ে বুক দুধুরিয়ে ওঠে। আনন্দকুমারী ক'বার শিউরে শিউরে উঠলো। ক'হাত পিছিয়ে পাঁড়ালো।

জগমোহন বললে,—ঠাকরুণ, আপনি কে? এই ভয়েন স্থানে এমন অসময়ে?

অধর ধরধরিয়ে কঁপে ওঠে। ভিজ্জে চোখে অজ্ঞার আভাস দেখা যায়। আনন্দকুমারী সাবগুঠনে নতমুখী। নির্গজ্জতার আশ্র-প্রকাশ যেন না হয়। আনন্দ তীক্ষ্ণচক্ষুতকণ্ঠে বললে,—উদ্ধারপ্রার্থী আমি। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। একজন ইংরেজ আমাকে—

—আঁ। কৃত্রিম আঁতকে উঠলো জগমোহন। সহাস্তে। বললে—যব কোথায়? বেশ কোথায়? কি জাতের মেয়ে?

নতমাখা তোলে না চৌধুরাণী। গুঠনের আড়াল থেকে কথা বললে,—যব মান্দারণে। আমি একজন বণিককন্ডা। পিতার নাম পোগীমোহন চৌধুরী।

আনন্দের উজ্জ্বলে অটহাসি ধ'রলো জগমোহন। তীরের জঙ্গলে তার সজ্জার হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো। হাসতে হাসতে বললে—ঠাকরুণ, সিঁড়ি বেয়ে বজ্রার ওঠ, তার পর দেখা বাবে। খানিক খেমে আবার বললে,—আমরাও ঐ মান্দারণে চ'লেছি।

জগমোহন সোৎসাহে আগে আগে চললে। তার ছায়া ভয়ে ভয়ে অস্থসরণ করলো চৌধুরাণী। আশার আলো দেখলো যেন ভগ্নাহুর পর। তবুও এখনও ভয় ভয় করছে। বজ্রার উঠতে পা চলেছে না যেন। দেহ কীপছে ধরধরিয়ে।

—কুমারবাহাদুর আছেন বজ্রার। মাহুকের মধ্যে দেবতা তিনি। জগমোহন সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললো।

আনন্দকুমারী কথা বলে না আর। সে যা বলতে চায় তা যেন বলা হয়েছে। আশ্রয়কা পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে, আর কিছু বক্তব্য নেই। সহসা চোখে পড়লো বজ্রার ঘরে ভূগীকৃত অস্ত্রশস্ত্র। শেষ পর্যন্ত ডাকাতদলের হাতে বেছায় নিজে ধরা দিলো নী কি চৌধুরাণী!

সিক্তবাস, ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতের স্পর্শ লাগে। ভয়ের সঙ্কোচে পা দুটি কঁপে কঁপে ওঠে। ভবিষ্যৎ কেউ জানতে পারে না, কে জানে এখনও কত বিপদ বরণ করতে হবে!

জগমোহন আবার কথা বলে খুশীর হাসি হাসতে হাসতে। বললে,—ঠাকরুণ, তোমার কোন ভয় নাই। আমাদের কুমারবাহাদুর তোমাকে আশ্রয় দেবেন। এই বস্তুতথান (বস্ত্র) লিয়ে তুমি ভিজ্জে কাপড়টা ছেড়ে দাও। ভয় পাও কেন মিথ্যে মিথ্যে। ঘরের ভিতরে যাও, কেউ দেখায় নাই।

হলুদ রঙে ছোপানো একখানি নতুন কাপড় আনন্দকুমারীর হাতে দেয় জগমোহন। বজ্রার ঘরের দরজা দেখিয়ে দেয়।

কুমারবাহাদুর চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন জগমোহনকে। চুপি চুপি বললেন,—কাদের মেয়ে? কি বলতে চায়? অভিসন্ধি নাই তো কিছু?

এক ঝলক হেসে নেয় জগমোহন। হাসি চেপে বললে,—মান্দারণের এক বেণের মেয়ে। ইংরেজ ধ'রে নিয়ে কোথায় চলেছিল, মেয়েটা নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

প্রশংসার হাসি হাসলেন কানীশকর। বললে,—বেণের মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় তবে।

—হী হজুব! দেখে মনে হয় বেশ চালাকচতুর। জগমোহন হেসে হেসে বলে। বললে,—দুর্ভ ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়েছে যখন। মেয়েটি হজুব বাক বল আপনাদের পরমাম্বন্দরী।

কানীশকর বললেন,—খেতে পরতে দাও এখন। মান্দারণে ফিরতে চায় না কি?

—হী মান্দারণে ফিরতে চায়। জগমোহন ফিসফিস কথা বলে। ঘর আরও নামালেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিদ্বাবাসিনীকে জানে না কি? জমিদার কুকরামের নাম?

—তুধাই নাই হজুব এ সব কথা। বলেন তো বাই গিয়ে বলি।

মাথা দোললেন কানীশকর। বললেন,—না না এখন নয়। এই সকল কথা এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা সমীচীন হবে না। অহেতুক সন্দেহ করবে।

—তবে হজুব আমি ঝোপ বুকে কোপ মারবো। পরম আশ্রয়প্রদায়ের সঙ্গে বললে জগমোহন। বললে,—খাইয়ে দাইয়ে তারপর আমি শুধাবো।

বজ্রার জানলা থেকে চৌধুরাণী দেখতে পায়, ম্যাণেটের বজ্রা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলেছে। আনন্দকুমারীর বুকের ওপর থেকে যেন এক গুরুভার পাথর স'রে যাচ্ছে।

হাতের কর গুণতে গুণতে কথা বলছিলেন কুমারবাহাদুর। হয়তো গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন, জপ ধামালেন না।

—মা ঠাকরুণ!

বজ্রার দুয়োরে দেখা দেয় জগমোহন। একান্ত নিকটজনের মত ঘনিষ্ঠ সুরে ডাকে। বলে,—মিঠাই খেয়ে জল খাও এখন।

—হ্যাঁ তাই দাও। কুন্ডায় আমি কাতর। তোমাদের কত দয়া!

কৌশল্যের কথা আসে ঘর থেকে। চৌধুরাণী ঘরের এক কোণে আত্মগোপন ক'রেছে। মুখ দেখানোর মত যেন মুখ নেই। কত পাণ করেছে! ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দোষ হয়েছে তার। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর রক্ষা নেই। নিজের দেহটার প্রতি কেমন যেন বিরাগ হয় তার। এই দেহ নিয়ে খেলা ক'রেছে ম্যাগেট। হোঁয়াছুঁ'রি করেছে মনের আনন্দে। গঙ্গায় ডুব দিয়েছে আনন্দকুমারী, মনটা তবু কেন পবিত্র হয় না কে জানে?

মিঠাই আর জলের পাত্র এগিয়ে দেয় জগমোহন। বলে,—খেদে দেয়ে হুঁ দণ্ড জিরেন নাও। কুমারবাহাদুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন আর চিন্তা কি! ঘরের মেয়েকে ঘরে কিরিয়ে দেওয়া হবে।

—কুমারবাহাদুরকে আমার সহস্র প্রণাম জানাও। তিনিই আমার রক্ষাকর্তা।

চৌধুরাণীর কাঁপা কাঁপা সুরে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যথা। বুকভরা খাঁস টেনে আবার বললে,—তোমাদের মান্দারনে বাওয়ার কারণ কি? সেখানে কোথায় বাওয়া হবে?

জগমোহন মনে মনে খুশী হয়। শব্দহীন হাসি হাসে। বলে,—সে-কথা ঠাকরুণ পরে বলবো, তুমি এখন মিষ্টিজল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। কেমন যেন দুঃখের হাসি হাসলো চৌধুরাণী। অতীত ঘটনার ছবি দেখতে পার সে। কি দুর্ভিক্ষ সেই বৃহত্তলি। ম্যাগেটের দুঃসাহসের সমুচিত শাস্তি কে দেবে? ক্রোধের আতিশয্যে মথো মথো অধর দংশন করে আনন্দকুমারী।

নদীর তীরে চুল্লী জ্বলছে কয়েকটা। ভাতের হাঁড়ি চেপেছে মা'বুদের। কুমারবাহাদুরের রাতের আহার তৈরী হয়। মশালের আলো আর চুল্লীর আগুনে গঙ্গার তীরভূমির একাংশ আলোকিত হয়ে আছে।

—জগমোহন!

গভীর কণ্ঠের ডাক আসে বজ্রার ছাদ থেকে। কানীশকরের কণ্ঠ যেন গুরু-গভীর।

আনন্দকুমারী কান পাতেলো কথা শুনতে। বজ্রার অধিকারী কি বলেন কে জানে! ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। কুমারবাহাদুরকে এখনও চোখের সমুখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় নি। তিনি কেমন ধরণের মানুষ কে জানে!

—ডাকছেন কুমারবাহাদুর?

আহ্বান শুনে বাস্তব হয়ে ওঠে জগমোহন। সাড়া দেয় বজ্রার পাটাতনে দাঁড়িয়ে।

কানীশকর বললেন,—কাছে এসো, একটা গোপন কথা আছে।

চৌধুরাণী চমকে চমকে ওঠে। কুমারবাহাদুরের বক্তব্য কি, কেন ডাকাডাকি করছেন—ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে যেন। অজানা আশঙ্কায় আনন্দকুমারী ক্রমশঃ ব'সে থাকে। মিঠাই আর খাওয়া হয় না। মুখে ওঠে না। সজাগ কানে অপেক্ষা করতে হয়। কুমার কি আজ্ঞা করেন কে জানে?

জগমোহনকে কাছে পেয়ে কানীশকর কিসফিস কথা বললেন। বললেন,—পরজীকে সঙ্গে ল'য়ে বাওয়া অসম্ভব হবে না কি? লোকে যদি আমার চরিত্রে দোষ দেয়? কুখ্যা রটনা হবে না তো?

হো হো শব্দে হেসে উঠলো জগমোহন। বললে,—হজুর, লোকে আড়ালে রাজা-বাদশাকেও গালমন্দ করে, কারণ থাক আর না থাক। লোকের কথার মূল্য কি?

—তবে বণিককন্ডাকে ছাদে পাঠাও। আমি তার সহ ক'টা কথা কহি।

কানীশকরের মুখে অমূলক আশঙ্কা ফুটেছে। কথার সুর যেন রহস্যময়।

—সাবধানে কথা বলবেন হজুর! পারেন তো আমাদের রাজকুমারীর খোঁজটা একবার জানবেন।

জগমোহন কিসফিসিয়ে কথা বলে। বললে,—আমি তাকে পাঠাই।

—আর একটি কথা বলি। সর্দার-মাঝিকে শুধাও দেখি মান্দারণ আর কতদূর?

কুমারবাহাদুরের শেষের কথার যেন ঈষৎ অর্ধৈর্ষ্য প্রকাশ পায়। জিজ্ঞাস্য চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—হজুর আমিই বলি, রাতভোর বজ্রা চালিয়ে সেই ভোর নাগাদ পৌছানো যায়।

—তোমার অহুমান ঠিক?

—হ্যাঁ হজুর, বিশ্বাস করতে পারেন।

কথা বলতে বলতে জগমোহন বজ্রার ঘরে অদৃগ্ হয়। তার চলাফেরার বজ্রা শোনে ছলছে।

ঘরে তৈলদীপ জ্বলছে এক কোণে। চৌধুরাণী যেন ক্রমশঃ ব'সে আছে। কুমারবাহাদুরের বঠরর শুনে ভয় ভয় করে। আনন্দকুমারী সভয়ে বললে,—তোমাদের কুমারবাহাদুর কি বিরক্ত হয়েছেন আমার জন্ত?

জগমোহন সহাস্তে বললে,—কৈ নৈ। হজুর আপনাকে ডাকছেন। আলাপ করবেন।

ভিত্তিকম্পন আসে যেন। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ে। বক দুক দুক করে। মুখে কোন কথা আসে না। বিফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী।

—ভয় করছে না কি? বললে জগমোহন।

অন্ন হাসি ফুটলো আনন্দকুমারীর মুখে। বললে,—না ঠিক ভয় নয়, তবে ভয়ও বটে। তোমাদের কুমারবাহাদুর মানুষ কেমন তাই শুনি?

—মাটির মানুষ। আকাশের দেবতার সঙ্গে কোন তফাৎ নাই তাঁর।

—গড় মান্দারণে চলেছেন কি কাজে?

—হজুরের মুখেই শুনা যাবে। তাঁকে শুধাও কেন বা বলতে চাও।

—তা পারবো না। সাহস হয় না বে।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো চৌধুরাণী। হলুদ রঙে ছোপানো নৃত্যের পাতলা বস্ত্র তার পরিধানে। আঁচল টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে সজ্জার ছাদে ওঠে বীরে বীরে।

কিরে দেখলেন না কুমারবাহাদুর। জ্যোৎস্নাধবল আকাশ দেখেছেন তিনি। কাপড়ের খসখসানি শুনে বুঝলেন বেণের মেয়ে এসেছে। চৌধুরাণী কবাসের এক পাশে বসলো সন্তর্পণে।

জগমোহন বললে,—হুজুর, তিনি এসেছেন।

কথায় কর্ণপাত করলেন না কাশীশঙ্কর। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু কিরিরে একবার দেখলেন মাত্র। বললেন, তোমার নাম কি?

—আমার নাম আনন্দকুমারী।

—পিতার নাম কি? তিনি কি করেন?

—গৌপীমোহন চৌধুরী। বাণিজ্যকর্ম করেন।

আনন্দের পিতার নাম শুনে কুমারবাহাদুর খানিক শুক হয়ে থাকলেন। তারপর বললেন,—তঁার নাম আমি শুনেছি। গোবিন্দপুরের ইংরেজের কুঠীতে তিনি মাল-মসলা সরবরাহ করেন। আমি কুঠীর নামের তালিকায় তঁার নাম দেখেছি।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই দেখেছেন।

চৌধুরাণী এতক্ষণ সহজ স্বরে কথা বলে। তবুও যেন তার হাবে ভাবে ভয়ানকতা। কঠ কল্পমান।

—তবে তোমার এই দুর্ভোগ কেন? কুমারবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

চৌধুরাণী মাথা নত করে। বলে,—আমার দুর্ভাগ্য।

কাশীশঙ্কর বললেন,—মান্দারণে কত কালের বাস?

—শুনতে পাই তিন পুরুষের বসবাস আমাদের। বজ্রাঞ্চল পাকাতে পাকাতে কথা বলে আনন্দকুমারী।

হঠাৎ গাভীরা অবলম্বন করলেন কুমারবাহাদুর। নিশ্চুপ বসে থাকলেন কতক্ষণ। কি এক গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন হয়ে পড়লেন।

চৌধুরাণী আড় নয়নে দেখে একেবারে। কুমারবাহাদুরের অনিন্দ্য আকৃতি দেখতে দেখতে বিমিত্তা হয়। শৈবল বলিষ্ঠ দেহ—বেশন বর্ণ ভেদন গঠন। পুরাণে বর্ণিত রাজচিহ্ন যেন শরীরে।

একবার চারি চক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হয়। আবার চোখ নামিয়ে নেয় চৌধুরাণী। এক লক্ষ্যে দেখে নেয়, কুমারের মুগাবহবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন মূর্তিমান।

হঠাৎ আবার কথা বললেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—জমিদার কুমারামের নাম কি জানা আছে? কুমারামের গৃহ আছে মান্দারণে। যদিও কুমারাম নিজে সপ্তগ্রামে বাস করেন।

—হ্যাঁ আমি জানি। জমিদারপত্নী আমার বন্ধু। সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। তার নাম কি বিদ্যাবাসিনী?

সানন্দে বললেন কাশীশঙ্কর,—হ্যাঁ, নামটা ঠিক। ঐ তার নাম।

—বিদ্যাবাসিনী মাহুঘটার তুলনা হয় না। এত কঠোর, তবু তার মুখ থেকে হাসি মিলায় না। আনন্দকুমারী চোখ তুলে কথা বলতে যেন সাহসী হয় না। বলে,—বন্দিনী হয়ে আছে সে। আপনি কুমারামকে কি স্ত্রে জানেন? শুনতে পাই কুমারাম না কি অবিবেচক, অত্যাচারী।

নীরব হলেন কাশীশঙ্কর। মনে মনে প্রশ্ন হাসি হাসলেন। আকাশে চোখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন কতক্ষণ। তারপর বললেন,—কুমারাম আমার পরিচিত। বিখ্যা কথা শুন নাই।

কুমারাম একটা অমায়ু। বীরকণ্ঠে কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বর সপ্তমে উঠলো। কুমারবাহাদুর ডাকলেন,—জগমোহন!

নদীর বুক থেকে তীরের জঙ্গলে এই ডাকের প্রতিধ্বনি ভাসলো। জগমোহন আর সাড়া দেয় না, এসে হাজির হয় বজ্রা হুলিয়ে। বলে,—ডাকছেন হুজুর?

আরও কিহংস্ফণ নীরব থাকলেন কাশীশঙ্কর। কি যেন ভাবতে ভাবতে বললেন,—রাতের আহা! প্রকৃতির বিলম্ব কত জগমোহন?

—আর এক দণ্ড হুজুর। ভাত ফুটছে। মাংসটা আরও কিছুক্ষণ ফুটবে।

—সর্দার-মাঝি!

উচ্চস্বরে ডাকলেন কুমারবাহাদুর। আবার প্রতিধ্বনি ভাসলো তীরের জঙ্গলে।

বজ্রার শেষ প্রান্তে বসেছিল সর্দার। মাঝি আর মাল্লাদের দলপতি সে, তাই উচ্চাসনে বসে। সাড়া দেয়, বলে,—হাজির আছি।

—কোথায় তুমি? দেখতে পাই না কেন?

মুহূর্তের মধ্যে মাঝি-সর্দার এসে উপস্থিত হয়। তিনটে সেলাম হুঁকে বলে,—কিছু বলবেন কুমারবাহাদুর?

কাশীশঙ্কর কি যেন নিক্ষেপ করলেন অতর্কিতে। তৎক্ষণাৎ লুফে নেয় মাঝি-সর্দার। একটি শালুর থলি। এক থলি টাকা। নবাবের ট্যাকশালে তৈরী।

—এখনই মান্দারণে বাত্মা করবো। তোমরা তৈয়ার হও।

কেমন যেন হুকুমের স্বরে বললেন কুমারবাহাদুর। লাল ভেলভেটের তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসলেন। জগমোহন কাছেই ছিল। তার উদ্দেশ্যে বললেন,—চুপাচুপ টাকি কাঠ দণ্ড জগমোহন। মাংসটা যেন সুস্বাদু হয়।

গোবিন্দভোগ চালের ভাত আর কচি পাঁটার মাংস। আম আর ক্ষীর। বাত্মাসে এক মিশ্রিত স্বর্গন্ধের ভার। ভাত, মাংস আর ক্ষীর চেপেছে উম্মনে। মাটি খুঁড়ে চুন্নী বানানো হয়েছে।

কি এক গুপ্তমন্ত্রে যেন মাঝিরা ঢেঁকল হয়ে ওঠে। সর্দার-মাঝি কি এক মন্ত্র দেয় যেন তাদের কানে কানে আর দেখায় হাতের লাল শালুর থলি। মাঝিদের ব্যস্ততায় সাড়া পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। দোলনার মত তুলতে থাকে বজ্রা।

রাত্রি গভীর। গজার উত্তরপ্রান্তে চোখ মেলে মাঝি-সর্দার। বতস্বর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে সোনালী নদী—চক্রাকারে বেকে গেছে। নগদানগদি টাকার কাছে দৃঢ় কিছু নয়, কিছু নয়।

সর্দার মাঝি বললে,—জগমোহন, তোমার হাড়ি বড়ই বজ্রার তুলে নাও। বজ্রা ছাড়বে এখনই। নোঙর খোলা হবে এখনই।

বজ্রার ছাদে দুই ভোড়া চোখ বিষয় আর আনন্দে প্রায় শুক হয়ে আছে। আনন্দকুমারীর মুখখানি হঠাৎ যেন চোখে পড়ে। লাভণ্যে ঢল ঢল মুখশ্রী দেখতে দেখতে কুমারবাহাদুর যেন কিঞ্চিৎ বিমিত্ত হয়েছেন। দুই যুগল আঁখির দৃষ্টিমিলন আকাশের চাঁদ আর তারারা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।

[ ক্রমশঃ ]

## পুনর্বাসন না গ্রহণ ?

“কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় উৎখাতদের অত্যধিক ভীড় হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল রাজ্যের শিবিরে বা আশ্রমে পূর্ববঙ্গ হইতে নবায়িত উৎখাতদের গ্রহণ করা হইবে না এবং আর কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই এই উৎখাত সমস্তা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। বহু অর্থব্যয় হইয়াছে, বহু উৎখাত প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু আজও ইহার কোন স্মৃষ্টি সমাধান হইল না। একজন উৎখাতও যে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বাসন হইয়াছে, একথা বলা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, এসমস্তার সমাধান নাই। এই সমস্তা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই, বাঁহারা দেশ বিভাগে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কখন বলে ‘সন্তার তিন অবস্থা’। সন্তার স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া যে মূল্য দিতে হইতেছে তাহাতে নৈতিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়াই ভারত আজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বোধ হয় চিরদিনই খেয়াবত দিতে হইবে। এক এক সময় মনে হয়, জিন্নার দুই জাতিত্ব মানিয়া লইলেই ভাল হইত। তাহাতে বোধ হয় এতটা ক্ষতি হইত না। তবে সকল রকমেই যখন ভুল-ভ্রান্তি হইয়া গিয়াছে, তখন হাল ছাড়িলে চলিবে না। পুনর্বাসন করিতেই হইবে। সেই সঙ্গে উৎখাতদের মানসিক অবস্থার দিকেও নজর দিতে হইবে। যে কোন পরিবেশে জোর করিয়া ঠেলিয়া দেওয়াকে পুনর্বাসন বলে না।”

—দৈনিক বঙ্গমতী :

## খেলাভাঙ্গার খেলা

“কলিকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা উপলক্ষে যে লজ্জাজনক মারপিট ও গণ্ডগোল দেখা দেয়, তাহা শান্তিকামী সহরবাসী মাত্রকেই উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে একদা এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিত। বহুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া তথু অনভিপ্রেত নয়, ইহার পরিণামও আশঙ্কাজনক। কাজেই গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই বিষয়টি সযত্নে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া দরকার। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান প্রভৃতি সাম্প্রায়িক ও আকলিক নামাক্রান্ত ক্লাবের অস্তিত্ব থাকার ফলেই অনেক সময় অসুস্থ বেবারেবি ও পালাপালি দেখা দেয় এবং তাহা হইতেই শেষ পর্যন্ত অত্যাশাহীরা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং এই শ্রেণীর নামকরণ বজায় রাখা ঠিক কি না গভর্নমেন্ট সে সযত্নে চিন্তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নাম পরিবর্তনের দ্বারা কিছু সুফল হইতে পারে, কিন্তু আসল পরিবর্তন দরকার মনোবৃত্তির। খেলা সূহ মানসিকতার জিনিষ—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহা যেখানে হিংসা, আক্রোশ ও মারপিটে পূর্ববসিত হয়, সেখানে বৃষ্টিতে হইবে শিচ্ছে সেই সূহ মনোভাবটি নাই, বা খেলোয়াড়ী আদর্শরূপে সর্বদেয়ে স্বীকৃত। সেই মনোভাব কেবলমাত্র নামের অঙ্গবদলেই রূপান্তরিত হইবে কি ?”

—যুগান্তর।

## পুরুষ ও নারী—এক

“নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিক একই হারে সমান বেতন পাইবে না কেন, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জনৈক মহিলা



সদ্য অভিযোগ করিয়াছেন, দাঞ্জলিং ও জলপাইগুড়িতে শ্রমিকের যে বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুরুষ শ্রমিককে যে বেতন দেওয়া হয়, নারী শ্রমিককে সেই হারে বেতন দেওয়া হয় না। শ্রমমন্ত্রী শ্রী আবদুল সাত্তার উত্তরে বলেন যে, পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী শ্রমিক কাজ কম করে। তার পর পুরুষ শ্রমিক ও নারী শ্রমিককে যে সমান হারে বেতন দিতে হইবে, এমন কথাও ভারতীয় সংবিধানে পরিকার লেখা নেই। এইরূপ জবাব দিয়া মন্ত্রী শ্রী আবদুল সাত্তার বক্তৃত্ত: একটু বিপাকেই পড়িয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র রায় তখন রহস্যজালে বলেন যে, নারী ও পুরুষকে বিভিন্ন হারে বেতন দেওয়া ব্যবস্থা অন্ততঃ আমাদের আইন সভায় নাই। বিধান সভার সদস্য নারী ও পুরুষ সদস্যগণ সকলেই সমান হারে বেতন পাইয়া থাকেন। এখানে নারী ও পুরুষদের সমানাবিকার স্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানের বৈষম্যের কথা উল্লিখিত প্রশ্নে তোলা হইয়াছে, সেই বৈষম্য বক্তৃত্ত:ই আছে। সেখানে নারী ও পুরুষ শ্রমিক কেন সমান হারে বেতন পাইবে না ? এই প্রশ্ন কিন্তু বহিরাই গিয়াছে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## চরম নৃশংসতা

“ভারত গবর্নমেন্ট প্রচার করিতেছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে উৎখাত আগমন সম্প্রতি হ্রাস পাইয়াছে। এর আসল কারণ নৌচর সংবাদ হইতে বুঝা যাইবে। কমিশনগঞ্জের (কাছাড়) “যুগশক্তি” পত্রিকার ঢাকার প্রতিনিধি লিখিতেছেন—“ঢাকা, ১৫ই জুন। এক লক্ষ একষাট হাজার পরিবারের (প্রায় ৭ লক্ষ লোকের) বাস্তব্যাগের আবেদনপত্র ঢাকার ভারতীয় ভিসা অফিসে দাখিল করা আছে। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখন আর মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে চাহিতেছেন না। ইহাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আজ অসহায় বোধ করিতেছেন। ভারত সরকার ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারকে এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতে হইবে। অনেক হিন্দু বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় হাই কমিশন অফিস আবেদনপত্র পাঠাইয়াও কোন সাড়া পাইতেছেন না। ফলে তাহারা আজ মৃত্যুপথের যাত্রী। পূর্বের জায় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিলে প্রতি মাসে গড়ে ৩০,০০০ হাজার হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করিত। হিন্দুদের জমিজমা জবরদখল, বর্তমান জরিপের সময়ে হিন্দুর জমি মুসলমানের নামে রেকর্ড করা, হিন্দু



নারী অপহরণ, হিন্দুর বাড়ীতে ডাকাতি, হিন্দুর জমির ধান কাটরা নেওয়া, হিন্দুর মেয়েদের বলপূর্বক ছিনাইয়া নেওয়া প্রভৃতি কারণে হিন্দুগণ বাস্তব্যাগ করিতে উদ্যোগ হইয়া পড়িতেছেন। মাইনরিটি মিনিটর সীমানারজন ধর এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। হিন্দুরা মি: ধরকে আজ আর তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে না। ভারত সরকার ভারত বিভাগের পূর্বকালীন প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ত হইয়া মাইগ্রেশন ব্যাপারে নানারূপ কড়াকড়ি করিয়া পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াছেন। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে যে হিন্দু পরিবার ভারতের কোনও স্থানে গিয়া বসবাস করিতে চাহেন, সেই অঞ্চলের লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সার্টিফিকেট এই মর্মে নিতে হইতেছে যে, তিনি ভারতে গিয়া ভারত সরকারের “বোঝা” (Burden) হইবেন না। আর বাহারা ভারত সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন বলিয়া আবেদনপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আসি মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাইবে না। নেহরু গবর্ণমেন্টের এই নৃশংসতার তুলনায় অন্ধকূপ ও জালিওয়ানাবাগের ইত্যা নিতান্ত ছেলেখেলা মনে হইবে। ঐ দুই ঘটনা প্রবল উত্তেজনার মুখে ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ যে লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর সুপরিচালিত জীবন্ত সমাধি।

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

### অবহেলিত সহর

“প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের যে উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সার্থক রূপায়ণে বাংলার গ্রামের বখেট পুস্কৃত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সহরগুলিতে সেরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির কোনও চিহ্ন তো দেখা যায়ই না উপরন্তু আসানসোলার মত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পাঞ্চলীয় সহরটি ক্রমাগত জনবৃদ্ধির চাপে ও নিত্য নতুন ছোট বড় দোকান ও বাসগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অলিগলি হইতে সদর পর্যন্ত যিঙ্গি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। রাস্তাঘাট, কলের জল বাজার প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অপরিহার্য ব্যবস্থাগুলিকে এক একটি অব্যবহার্য দুষ্টাঙ্গুল বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত শিশুদের ও বড়দের জন্য অত্যাধিকারী পার্ক পাঠাগার প্রভৃতির কোনও অভাব নাই বলাই সমীচীন হইবে। আজকাল শিশুদের চতুর্ধ শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিষয়ের পুস্তকে গৃহ নির্মাণে স্থান নির্বাচন হইতে গৃহের শয়ন ঘর, পাকশালা, পায়খানা প্রত্যেকটি ঘর কতটা দূরে কোনদিকে কতটা আলো-বাতাস যুক্ত হইবে, ও রুটিজান, প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, পৌর প্রতিষ্ঠানের বাহারা গৃহ নির্মাণের নমুনা অনুমোদন করেন তাহাদের এ বিষয়ে কোনও জ্ঞান বা কর্তব্য আছে কি না? পূর্বের পুরাতন বাড়িগুলি তো বখেছ ভাবে উঠিয়াছে, তাহা লইয়া বলার কিছু নাই—কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেও এমন অনেক বাড়ী, বিরাট অটালিকা বা কুঠুরী তৈয়ারী হইয়াছে, বাহা দেখিয়া মনে হয় যে সহরের সৌন্দর্য অথবা সেই গৃহবাসীদের

স্বাস্থ্য কোনটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই এই সব প্রাণ অনুমোদিত হইয়াছে।”

—আসানসোল হিউমারি।

### রামরাজ্যের সুবিধা

“ভারত সরকার সম্প্রতি এক নির্দেশ জারী করিয়া সর্বস্বত্বের কলসার দাম টন-প্রতি দেড় টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি কালের মধ্যে এই লইয়া তিন বার কলসার মূল্য বৃদ্ধি করা হইল। ইতিপূর্বে গত বৎসর জুলাই মাসে টন-প্রতি তিন টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা, ইহার পর ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে টন-প্রতি তিন আনা বাড়ান হয়। বর্তমানের এই বৃদ্ধি তৃতীয়বারের বৃদ্ধি। সুতরাং ইহা বোঝার উপর শাকের আঁটি! আমাদের দেশে পণ্যমূল্য যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই তেমনি ইহারই অবশুজাবী পরিণতিতে আজ সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও টলটলায়মান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কার্যত: সরকার এমন সব ব্যবস্থা করিতেছেন, বাহাতে দেশের পুষ্টিপতি ও শিল্পপতিরাজ আজ এইভাবেই দেশকে হাবুডুবু খাওয়াইতেছে।”

—বীরভূম বার্তা।

### শোক-সংবাদ

#### চুণীবালা দেবী

গিরিশ-যুগের স্বনামধন্য অভিনেত্রী চুণীবালা দেবী গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। তার পর দীর্ঘকাল পর ১৯৫৪ খৃ: ‘পথের পাঁচালী’তে অভিনয়ের ভার গ্রহণ করেন ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগেও ইনি বহু ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। ‘পথের পাঁচালী’তে অভিনয় করে বিশেষ বহু দেশের প্রশংসা অর্জনে ইনি সমর্থ্য হন।

#### প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতার বৈদ্যমূল অন্ততম উৎসর্গিত প্রাণ বিপ্রবী নেতা প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে আষাঢ় ৬৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও জীবনের একটি বিরাট অংশ কারাগারে অতিবাহিত করেন। ইনি ঢাকা থেকে এম, এল, সি, নির্বাচিত হন এবং ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

#### নলিনীকান্ত সেন

ফরিদপুরের প্রবীণতম উকীল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গায়বাহাদুর নলিনীকান্ত সেন গত ২৩শে আষাঢ় ৮৭ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। আইনে এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত ছিল ও বহু জটিল মামলার সমস্ত সমাধানে নিজের স্বয়ং বুদ্ধির পরিচয় দেন। ইনি ফরিদপুরে সরকারী উকীলও নিযুক্ত হন ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পূর্বের মধ্যে ‘পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল ও স্যাডিসনাল কমিশনার শ্রীপ্রবন্ধু সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৯৬৪ বহুবাজার স্ট্রীট, “বহুমতী স্টোরী বেসিনে” প্রচারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’র গত জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সখায় প্রকাশিত জীবনীমূলক পালের ‘বিচিত্র ভ্রমণ’ শীর্ষক কৌতুহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য রচনাটির জন্য আপনারা ধন্যবাদার্থী। লেখক মহোদয় ২০১ পৃষ্ঠার বই অল্পক্ষেত্রে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন—তারই পরিপূরকস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে মতবাদ আমি উদ্ধারযোগ্য মনে করি। আলোচ্য ঘটনাটির সন আমার অজ্ঞাত, কিন্তু কবি ১৯২৪ সনে একটি রচনার এই ব্যাপারটিকে স্মরণ করেছেন, কৌতুহলী পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেটি উদ্ধৃত হ’ল: একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমাত্র তিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের মাগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ব’লে পাঠিয়েছিলেন আমাকে যুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন-কোঅপারেশন আন্দোলন হয়নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি যুরোপে যেতে পারব না। তিনি ব’লে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চার থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ—এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি।—আমি জানতুম, জনসাধারণ তিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তার পরে বোম্বাই সহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, ‘রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন—এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।’ আমি বৃদ্ধিতে পারলুম, তিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল—সেই অধিকার মহৎ অধিকার। (পশ্চিমবঙ্গীর ডায়ারি: ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪: বাকী)। লেখকের মতে ১১০৫-৬ সালে যে স্বদেশপ্রেমের বান এসেছিল ১৯১৬-১৭ সালে তা’ অনেকখানি নেমে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলক প্রথমে নতুন রাজনীতির সূচক ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি—এই মত প্রকাশে ভুল বুঝার অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের ‘স্বদেশ’ সঙ্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন—তার প্রমাণ অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রয়েছে। হয়ত কখনো তাঁকে একতারা ফেলে দিয়ে ভেরি নিতে হয়েছে, ছুটতে হয়েছে খর মধ্যাহ্নের তাপে জয়পরাভ্রমের আবেগের মধ্য দিয়ে—কিন্তু, সে তার স্বভাব সংগত নয়, তাঁরই কথায়: ‘বড়ের সময় কবিতারাকে দেখা যায় না ব’লে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরে কলোলে উদ্ভাস হলে স্বপ্নের বাণী স্পষ্ট ক’রে শোনা যায় না।’ কারণ ‘ভিমক্রেসির যুগে... কর্তব্যের ভাব্যবহতা’ এবং ‘প্রয়োজনের আসরের সর-গরমের মধ্যে’ ‘টাকার পক্ষে এ সময়টা সুরময়, কিন্তু বীণাকারের পক্ষে নয়।’ আমার মনে হয়, লেখকের কথায় ‘রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করলে ও তা দিয়ে ভারতের সাধনা বাহিরে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেলেও’ তাঁর স্বভাবস্বষ্টতার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেতাম না। এই পরিবেশে আজ তাত্‌কালিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে কবির ভূমিকায় নতুন মূল্যায়ন করাই সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তিলকের



সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্মৃতিতা ছিল, শ্রীঅমল হোম তার বিবরণ দিয়েছেন (দ্র: বলবন্ত গঙ্গাধর তিলক অমল হোম: বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাচীন-আধুনিক ১৩৬৩)। রবীন্দ্রনাথের ‘জ্যোতির্দীপা’ জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুরের তিলকের গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেন। পার্শ্ব বহু। রামময় রোড। কলিকাতা—২৫

#### ওমরের জন্মকাল

দৈনিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সভায় প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের ‘নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম’ নামে স্মৃতিচিত্র প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করলাম। আলি সাহেব এক জায়গায় লিখেছেন, ওমর খৈয়ামের জন্ম ও মৃত্যু-সন জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি ওমরের জন্ম ৪১০ হিজরাকে অর্থাৎ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে। ওমরের মৃত্যু-সনটি সঙ্কে পণ্ডিতদের মতভেদ দেখা যায়। সাধারণতঃ তাঁর মৃত্যু-সাল ৫১৭ হিজরাকে (১১২৬-২৮ খৃ:) এইরূপ প্রচারিত। কিন্তু পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন বলেন, ওমরের মৃত্যু ১১১৫-৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ১১৩৫ খৃষ্টাব্দের অবিকৃত নিকটবর্তী সময়ে ঘটে থাকবে। আর তিনি ওমরের তিন বন্ধুর যে গল্পটি বলেছিলেন তা নিছক গল্প—ইতিহাস নয়। এ বিষয়ে আমি তাঁকে অন্তরেষ্ট্র নন্দী লিখিত বঙ্গভাষার একমাত্র ওমরের জীবনী ‘ওমর খৈয়াম’ বইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—দীপঙ্কর নন্দী। কলিকাতা-৩৬

#### মূল্যবোধ

সৈয়দ মুজতবা আলীর সমালোচনা পড়লাম। আমি ‘মূল্য’ লিখেছিলাম তিনি সংশোধন করেছেন ‘মূল্য’ তাঁর মতে ‘মূল্য’

লিখলে বাঙালী পাঠকরা পড়বেন—‘মূল্য’।’ এবং তাহলে Roman আর Romain লিখতে হলে দুটোই কি একই বস্তু লিখতে হবে—‘রম’? আর Romanকে ‘রম’ লিখলে বাঙালী পাঠকরা ‘র’কে ‘রমা’-র ‘র’-র মত উচ্চারণ করতে পারেন যুক্ততবা আলী তা ভেবে দেখেছেন? ‘রোমা’ লিখতে কি আপত্তি? যুক্ততবা আলীর theory অনুযায়ী Matinকে লিখতে হবে, ‘মাতী’, Vilainকে ‘ভিলী’, Parfumকে ‘পারফী’, mainকে ‘মী’। যুক্ততবা আলী কি বলেন? তাই ত? তিনি বলেন যে ফরাসীতে Romain এবং Roman দুইই আছে—এক প্রকৃত পক্ষে একটা হবে রম্যা এবং অন্যটা রম’।’ তাঁর উক্তি এবং বুদ্ধি পরিকার নয়—anomolous, Henri সন্দেহ আমার বুদ্ধিকেই যেনে নিয়েছেন। Le সন্দেহ বলতে চাই আসল উচ্চারণ খেঁচে ‘ল্য’ অথবা ‘ল্যে’র দ্রুত মাগা সহজ কথা নয়। ‘একার’ ও ‘র’-কলার সম্বন্ধে কোন শব্দ যুক্ততবা আলীর চোখে পড়েনি। কেন, ‘জ্যেষ্ঠ’, কথাটি বাঙলা ভাষায় ‘হরিজনের’ মত? ফরাসীরা যে ইংরেজদের মত R উচ্চারণ করে না তা এখানে Kinder garten এর ভারতীয় শিশুরাও জানে। তাদের নামের R গুলো যখন ফরাসী শিক্ষকরা বিচিত্রভাবে উচ্চারণ করেন তখন তাঁরা বেশ কৌতুক বোধ করেন। ফরাসীরা যখন ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেন তখন তাঁরা যে ফরাসী তা বোঝা যায় বিশেষ করে R এবং T’র উচ্চারণ শুনে। যুক্ততবা আলী কি তা লক্ষ্য করেন নি? বিস্তৃত উচ্চারণের জন্ত কতগুলো বিশেষ গান, বিশেষ শব্দ ফরাসী শিক্ষকরা গোড়াতে শেখান বা articulation এর দিক দিয়ে চমৎকার। আসলে আলী নাহেব কখনও articulate করেন নি, করলে বাজে পরিহাস করতেন না। প্রথম বস্তু ফরাসী শিখি তখন আমাদের ফরাসী শিক্ষিকা বিশেষ করে R এবং U-এর উচ্চারণের প্রতি আমাদের ঘৃণা আবর্ষণ করতেন। ফরাসীতে ও-হুটির উচ্চারণ সবচেয়ে শক্ত। শুধু দক্ষিণ ফ্রান্স কেন, ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশের লোক এখানে আছেন; এমন কি প্যারিসেরও। সুইজারল্যান্ডেরও কিছু ফরাসী-ভাষাভাষী আছেন। তাঁদের উচ্চারণ বিভিন্ন ধরণের এবং কেউ কেউ Rকে বেশী Roll করে বলেন, আবার কেউ কম করে বলেন কিন্তু তাই বলে তাদের কেউই Rকে ইংরেজী R অথবা বাংলা ‘র’-এর মত উচ্চারণ করেন না। এত বড় একটা Contrast যুক্ততবা আলীর কানে ধরা পড়েনি—আশ্চর্যের বিষয়! শ্রীস্বদীপকান্ত গুপ্ত ( শ্রীস্বদীপকান্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় )।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বর্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইলাম। দেরী হওয়ার অভ্যস্ত হুঃখিত। বৈশাখ হইতে সকল সংখ্যা সম্বৎ পাঠাইবেন। শ্রীমতী হারা বহু। কার্ণ বোড কলিকাতা।

আপনাকে অজ্ঞ M. O. যোগে ৭।০ মাসিক বসুমতীর হুঃ মাসের সডাক টালা বাবদ পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বাসন্তী দেবী, Didwana.

The Monthly Basumati which please continue sending from the Baisak number—Mlv. B. U. Ahmed. Thaligram T. E. Assam.

মাসিক বসুমতীর দক্ষণ ছয় মাসের ৭। টালা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন, বাকী ছয় মাসের টালা তাম্র টালসে পাঠাইয়া দিব।—শোভনা ঘোষ। 146, Guajipara Jabbulpore, M. P.

অজ্ঞ ১৫ টাকা পাঠাইলাম আরও এক বৎসরের জন্ত। প্রাপ্তি সংবাদ জানাইবেন।—নমিতা দে, ধুবড়ি বাট। কাছাড়।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আগামী ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চ’মাসের সডাক মূল্য মোট ৭।০ পাঠাইতেছি। দয়া করিয়া ঐ সব সংখ্যার পত্রিকা নিচের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী অর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চতী ঘোষ বোড। কলিকাতা।

বাৎসরিক টালা বাবদ সডাক ৭।০ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।—শ্রীশান্তিসুখা মোদক। Goari Bazar, Nadia.

I am sending herewith Rs. 7'50 as half-yearly subscription for the "Monthly Basumati," Kindly send me "Monthly Basumati" 1364 B.S,—Nilima Bhan, Karol Bag, New Delhi.

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য স্বরূপ ১৫ টাকা পাঠালাম। বৈশাখ হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। Sm. Niharika Roy, Delhi.

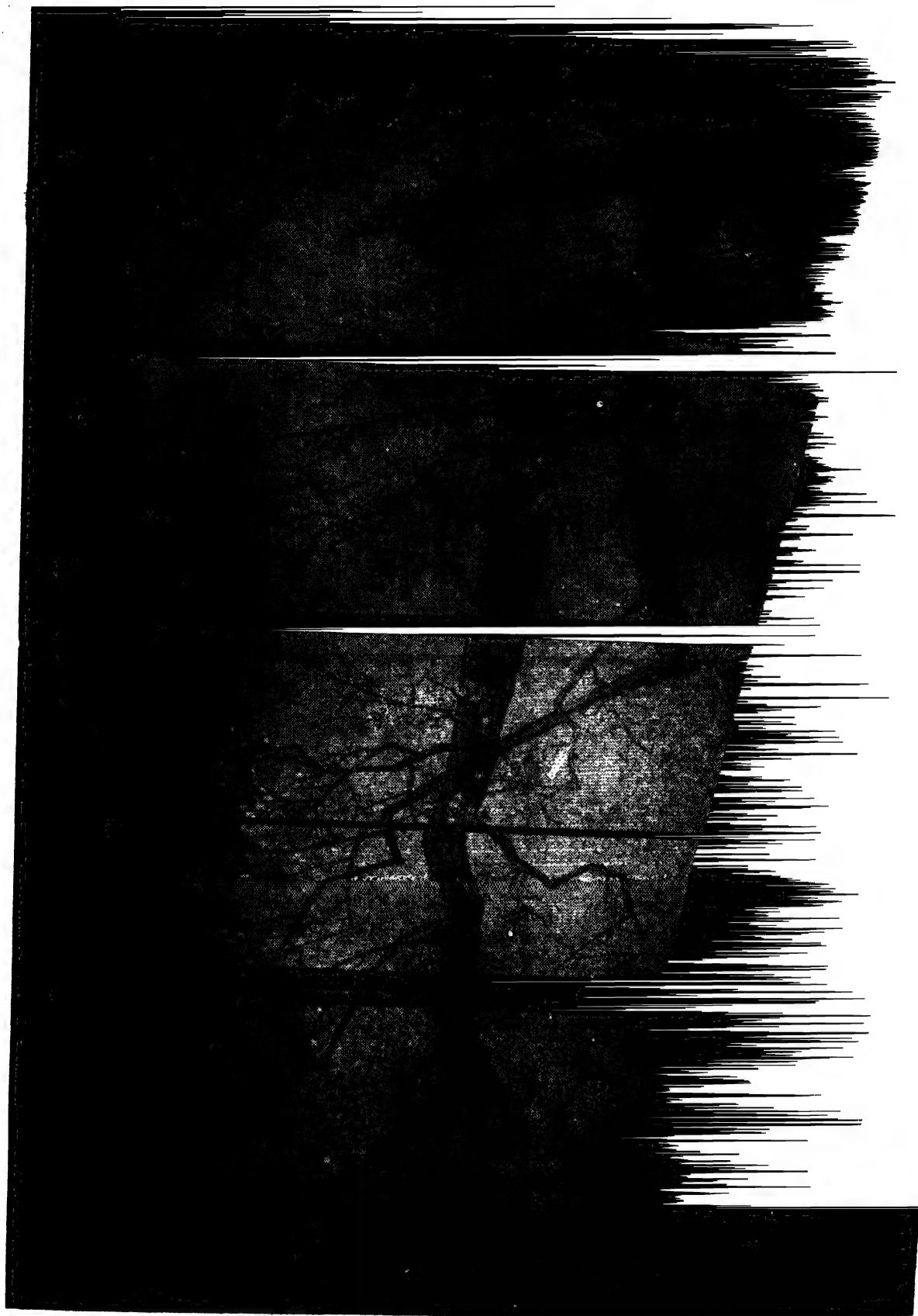
মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টালা পাঠাইলাম। এই বৎসর হইতে আমাকে পত্রিকার গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—রেশুকা মুখার্জী। Pratapgunj, Baroda.

বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের মাসিক বসুমতী আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রতিভা দেবী। 33 B Russa Road Cal—26.

আমি আপনাদের পুরানো গ্রাহক-হিলাম না, সেজন্য আমার কোনো গ্রাহক নম্বর নাই। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নতুন গ্রাহক সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া ‘মাসিক বসুমতী’ পাঠাইবেন। শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য। Haw Bagha, Jabbulpore.

মাসিক বসুমতী পত্রিকা রেজেষ্ট্রী ডাকবোলে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলে বাধিত হবো। রেজেষ্ট্রী খরচ সহ পত্রিকার ১ বর্ষসের টালা ২১ টাকা পাঠালাম।—শোভা মিত্র। Hill Colony, Dhanbad.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা তালিকাভুক্ত হ’তে ইচ্ছা করি। এই উদ্দেশ্যে ছ’মাসের অগ্রিম টালা বাবদ ৭।০ পাঠালাম। দয়া করে কান্ডন সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে প্রতি মাসের বসুমতী আমার লিখিত ঠিকানাতে পাঠাবেন এবং আমার নাম গ্রাহিকা তালিকাভুক্ত করে নেবেন।—গায়ত্রী দেবী। C/o, S. K. Bhattacharjee. Accountant Patna Electric Supply Co. Ltd, Mangles Road, Patna.









# মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—প্রাবণ, ১৩৬৪ ]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

## কথামৃত

মানব-সমাজ ক্রমাগত চারিটি বর্ষ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক বর্ষে দোষ-গুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সন্ধীর্ণতা রাজত্ব করে—তঁাহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকারক্ষার জন্ত চারি দিকে বেড়া দেওয়া থাকে—তঁাহারা ব্যতীত বিজ্ঞা শিক্ষার কাহারও অধিকার নাই, বিজ্ঞাদানেরও কাহারও অধিকার নাই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করিতে হয় বলিয়া পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

ক্ষত্রিয়শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অহংকারমণ্ডিত নহেন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। এর ভিতরে ভিতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত এই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হইতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হইবে। এ যুগের সুবিধা হইবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দ্যের বিস্তার হইবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হ্রস্ত সভ্যতার অবনতি ঘটিবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়িবে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে অথচ এদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু এ কি সম্ভবপর? প্রত্যুত, প্রথম তিনটির পালা শেষ হইয়াছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

আমাদের নিজস্বের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক যুক্তি ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহামহিমায় ও অপরাধের শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

# কোথায় চলেছি

নরেশ দাশগুপ্ত

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পর ভারতের ঈর্ষাংগ ব্যালান্স ছিল সন্তোষের শ' কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের ঐ অর্থই বোধ হয় আমাদের মাথা খাড়াপ করিয়া দিল। ধনীর অর্বাচীন পুত্রের জায় আকাশ-কুসুম গড়িতে লাগিলাম আমরা। দুই শত বৎসরের ঘাটতি বিশ বৎসরে পূরণ করিবার জ্ঞান বন্ধপরিবর্তন হইলাম। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপ আমেরিকা দুই শত বৎসরে যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই আমরা বিশ বৎসরে সম্পন্ন করিবার জ্ঞান পাগল হইলাম।

অর্থ পরের ঘরে, কল-কব্জা আমদানী করিতে হইবে পরদেশ হইতে।

ইহা সুবিদিত যে, লম্বী টাকা আদায় করিবার জ্ঞান মহাজনকেই খাতকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাপ্য আছে বলিয়াই পাওয়া যায় না। নালিশ করিয়া ডিগ্রী করিলেও কিস্তি-বন্দীর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দুই কিস্তি দিয়া চার কিস্তি খেলাপ করা বিবল তো নতই, বরং উচাই রীতি।

স্বতন্ত্র পরহস্তগত ধনের উপর নির্ভর করিতে হইলে আকাশেই সৌধ নির্মিত হয়, বাস্তব পৃথিবীতে ইমারত গঠন করা অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

অর্থ সমাগম হইলেও সময় মত যত্নপাতি পাওয়া যাইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে? বিদেশীর উহা দিবার আত্মবিক ইচ্ছা আছে কি না তাহাই বা নিশ্চিত করিয়া বলিবে কে? দিবার ইচ্ছা থাকিলেও নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের চাহিদা মিটাইয়া অপরকে দিবার মত কি পরিমাণ উৎসব থাকিবে, তাহাই বা ঠিক কি? উৎসব থাকিলেই বা সহজে দিবে কেন?

কারখানায় যদি তাহাদের স্বার্থ না থাকে, তবে অপরকে মাল-মসলা সরবরাহ করিয়া স্বাবলম্বী অথবা অতিরিক্ত শক্তিশালী করিয়া কি তাহারা আপন পায়ে কুঠার মাড়িবে? খাল কাটিয়া আপন আঙ্গিনায় কুমীর ঢুকাইবার দুর্বুদ্ধি ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশে কাহার আছে?

ভারতের ভূগর্ভস্থ রত্নের সন্ধান আমরা জানি, আর দুই শত বৎসর এখানে রাজত্ব করিয়া ইংরেজ জানে না, ইহা মনে করা বাতুলতা।

ভারতের মস্তিষ্কের যে অভাব নাই তাহার বহু প্রমাণ ইউরোপ আমেরিকা পাঠিয়াছে। ভারতের জনবলও তাহাদের অবদিত নহে। শান্তিতে বাস করিয়া কল-কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে পশ্চিম এমঃ দ্ব্ব-পশ্চিমকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, সে সম্বন্ধে দৃঢ় বিদেশীর কোন সংশয় থাকিবার কথা নহে।

কিন্তু দূর্বৃত্তির অভাবে ক্ষমতা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম এবং অনতিবিলম্বে অগাধ সলিলে নিমজ্জিত হইলাম।

বিদেশী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের চক্রান্তে পড়িয়া পঞ্চাশ কোটি টাকার পরিকল্পনার ব্যয় ক্রমশঃ ফীত হইয়া দেড় শত কোটিতে পৌঁছিল, তথাপি পরিকল্পনা যে ভিমিরে সেই ভিমিরে।

সারের কারখানা তৈয়ারী হইল, সারও প্রস্তুত হইল কিন্তু উহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য কৃষকের আজও হইল না।

নদীর বাঁধ হইল বহু। নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের উদ্দেশ্যে। খালের জলের মূল্য দিবার অর্থ নাই এদেশের লোকের। কোথাও অনাবৃষ্টিতে ফসল জন্মিল না, কোথাও প্লাবনে দেশ ডুবাইয়া দিল।

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল। জনসাধারণ উহার দ্বারা উপকৃত হইল না, হইল কল-কারখানার মালিক; বেকার হইল কিছু মজুর, উদ্যম হইল কিছু গৃহস্থ। কোথায় বিদ্যুৎ-চালিত কুটিরশিল্প? পরমা কোথায় যে কলের পাখার হাওয়া খাইয়া শ্রান্তি অপনয়ন করিবে পল্লীবাসী? কিংবা বিযুক্ত গ্যাস উৎপাদক কেরোসিনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া বিজলী বাতির আলোর আনন্দ উপভোগ করিবে?

সন্তোষের শত কোটির ঈর্ষাংগ ব্যালান্স এখন পাঁচ শত কোটিতে ঝাঁড়াইয়াছে, দিগন্ত এখনও বহু দূরে।

শাসকবর্গ আবেদন (!) করেন কোমরের কাপড় আরও আঁটিয়া পরিবার। কাপড় কোথায়, আঁটিয়া পরিবে? আঁটি হাত কাপড়ে কি দুই কাজ চলে? কোমরে বাঁধিতে হইলে কি লজ্জা নিবারণ করা যায়?

নেতাদের লজ্জার বালাই না থাকিলেও জনসাধারণ এখনও জৈলঙ্গ স্বামী হইতে পারে নাই।

কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়া দেশ বিভাগে রাজি হইয়া স্বাধীনতা ভিক্ষা পাইলাম, কুচক্রীর খেলা চলিতে থাকিল। শাস্তি যেন চিরতরে ভারত-মহাদাগরে নিমজ্জিত হইল। বিবাদ কামনা করি না, তবুও আত্মরক্ষা করিতে প্রাণান্ত।

বিদেশ হইতে যুদ্ধের যে সামগ্রী আসিতেছে বিপদের সময় উহা ক'রাকর হইবে কি না কে জানে। ইতিহাসে দেখা যায়, ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িবার সময় রণজিৎ সিংহের বিলাতী বন্দুক ফুটিল না। বীর কেশরীকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

দু'-দু'টি মহাসমরের অনলের মাঝখানে থাকিয়া কি করিয়া ক্ষুদ্র স্বইজারল্যান্ড নিরাপদে থাকিল তাহা কি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি? কতখানি তাহার সামরিক শক্তি, তাহার সন্ধান কি লইয়া থাকি?

আমার সময়সস্তার অগ্রভুল হইলে আবার আমি পরাধীন হইব, এই আশঙ্কার চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিলাম। চোখের উপর দেখিলাম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বেলজিয়াম আক্রান্ত হইতেই বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল; অতিদুর্বল সন্তোজাত মিশরের উপর চড়াও করিতেই ইংলণ্ডের তৈলমহশ্ব টাক ফাটাইয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল সোবিয়েৎ নেতা। তথাপি ভরসা পাই না।

ভারতের মত এত বড় দেশে, ইহার অগণিত অধিবাসীকে শত্রু করিয়া কোন নির্বোধ আপনায় চিরশত্রুকে সাহায্য করিবে? ভারতকে আক্রমণ করিয়া কোন অর্বাচীন আপনায় ঘরে বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করিয়া নিজের সর্বনাশ করিবে? আফগান অনেকেই করিয়া থাকে, কথা মত কাজ হয় ক'টা?

জাতির শক্তি তাহার গোলা-বাক্সের উপর ভরসা নির্ভর করে

না, যতটা করে তাহার জাতীয় সংহতির উপর। চল্লিশ কোটি অধ্যুষিত এই দেশকে আক্রমণ করিবে কোন মূর্খ তাহার আপন কবর খনন করিতে? যদি এই চল্লিশ কোটির মনের মিল থাকে। কিন্তু মনের কি সে মিল আছে?

১৯৪৭ সালে এই দেশবাসী নেহরুর হস্তে একটি শান্তিকামী সজ্জবদ্ধ জাতি অর্পণ করিয়াছিল। দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ-বিসংবাদ এইরূপ দাঁড়াইল যে, সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্ত একে অস্ত্রের মস্তক ফাটাইতে বিলুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না।

কুক্ষণে প্রদেশের নাম পরিবর্তন করিয়া রাজ্য রাখা হইয়াছিল! ইহারা যেন পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্য!

কেন এমন হইল, কে চিন্তা করে? বাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তাঁহারা কী মনে করেন কে জানে!

সংবিধান রচনার সময় একটি ধারা নিবদ্ধ হইয়াছিল, বাঁহা বলে ইচ্ছা করিলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন রাজ্য পনেরো বৎসর পরে ইউনিয়ন হইতে পৃথক হইয়া যাইতে পারিত। সংবিধান গৃহীত হইবার সময় ঐ ধারাটি বর্জন করা হয়।

সোবিয়েৎ রাশিয়ার সংবিধান দৃষ্টেই ঐ ধারা লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ ধারাটি সোবিয়েৎ সংবিধান হইতে বর্জন করিবার চিন্তা আজও তাঁহাদের মনে উদ্ভিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এবং এখন পর্যন্ত সোবিয়েতের কোন ইউনিট ঐ ক্ষমতার সুযোগ লইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

কোন আশঙ্কায় অথবা কোন উদ্দেশ্যে আমাদের গণপরিষদ ভারতের সংবিধান ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই ঐ ধারাটি বর্জন করিলেন? ভবিষ্যতে উহার সুযোগ লইয়া কেহ বাহির হইয়া যাইবে সন্দেহ করিয়া কি? অথবা কোন প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের দুর্বল ক্ষুদ্র অঞ্চলকে একসমুদ্রেট করিবার দুঃসঙ্কল্প বশত?

একত্র থাকিবার সুবিধা দ্রুতরূপে করিলে পৃথক হইয়া যাইবার কি আশঙ্কা থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর। কিন্তু যদি একত্র থাকিরা অন্তর্বিধা, পক্ষপাতিত্ব, অবহেলা অথবা নির্ধাতন ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথক হইয়া যাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিকই প্রবল হইয়া উঠে।

কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া, যতই সম্মানযোগ্য সে কাগজ হউক, কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন লোককে লইয়া ঘর করা যায়? নারায়ণ সাক্ষী করিয়া মন্ত্র পড়িয়া, এমন কি জাগ্রত দেবতা আইন আদালত সহায় করিয়াও ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামিস্বত্বকে একত্র ঘর করান সম্ভব নহে। হাজার বাধা সত্ত্বেও একদিন তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। ভারতের বর্তমান অবস্থা হইতে এরূপ আশঙ্কাই মনে জাগিয়া থাকে।

ইতিহাসের দোহাই পাড়িয়া বলা হয় যে, যখনই নিজেদের ভিতর বিবাদ করিয়া ভারত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখনই সে পরাবীন হইয়াছে। ইহা সত্য।

পক্ষান্তরে ইহাও মিথ্যা নহে যে, যত বার ভারতকে সহত করা হইয়াছে তত বারই সে অনতিবিলম্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৌর্য, পাঠান এবং মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যুগে যুগে কেন এইরূপ হইয়াছে? যত দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তি প্রবল রহিয়াছে মাত্র তত দিন পর্যন্তই ভারত সজ্জবদ্ধ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলেই সুযোগ বুঝিয়া সকলে কেন্দ্রের প্রাধান্ত অস্বীকার করিয়াছে।

রাজচক্রবর্তীদের বেলার বাহা সম্ভব হইয়াছে, নৃপতি বিহীন গণতন্ত্রে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি হইতে নির্বাচন করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা হইয়া থাকে। এই মন্ত্রিমণ্ডলীর উপরই রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্রিমণ্ডলী সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই নির্বাচিত হয়। ইহারা মাত্র তত দিন পর্যন্ত ইহাদের দলের আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, যত দিন তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থ ঠিকতররূপে ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু যদি ক্রমাগত এই সকল অঞ্চল কেন্দ্রের সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই অঞ্চলীয় মন্ত্রীর পক্ষে একাগ্রচিত্তে দলের তথা কেন্দ্রের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না। এই ভাবে দল দুর্বল হয়, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী তথা কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলে প্রদেশের সুবিধা মত সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা অনিবার্য হইয়া পড়ে। উহাতে অকৃতকার্য হইলে সংবিধান-বিরোধী চেষ্টা যে হইবে না, তাহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভারত আজ দুর্ভাগ্যক্রমে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে যদি কোন রাজ্যের কোন প্রতিনিধি সংবিধান পরিবর্তন করিয়া রাজ্যকে ইউনিয়ন হইতে বাহির হইবার অধিকার দানের আশ্রয় প্রকাশ করেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। এই মনোভাবের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীই দায়ী হইবেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রকাশ্যে অভিযোগ করিতে পারেন যে, বিশেষ বিশেষ রাজ্য কেন্দ্র হইতে সুবিচার পাইতেছে না, তাহা হইলে ঐ রাজ্যের অধিবাসীর মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহা কি বুঝিতে কষ্ট হয়?

যেখানে সব দিক দিয়া নিজের অসুবিধা, এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়া অপরের সঙ্গে ঘর করিতে হয়, সেখানে প্রণয় কত দিন থাকিতে পারে?

মাহুষের বুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈশী দিন আর তাহাকে বোকা বানাইয়া রাখা যাইবে না।

পৃথক হইলে কি বিপদ, তাহা বুঝাইতে গিয়া বলা হয় যে, প্রবল রাষ্ট্রের কাছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কোনই মূল্য নাই। এক কথার সত্যতা সন্দেহে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে বর্তমান কালে নারা পৃথিবী ছুটিয়া আসে তাহার সাহায্যের জন্য। যদিও মরদ অপেক্ষা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যই প্রবল। যুদ্ধ যদি বাধে, তাহা হইলেও বর্তমান শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র আক্রান্ত রাজ্য স্বাধীনতা তো হারায়ই না, বরং আক্রমণকারী বৃহৎ শক্তি অপেক্ষা বহু কম সময়ের মধ্যে সে তাহার অবস্থার পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধের পর পুনর্দলিত নিষ্পেষিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহাদের পুর্বাতন স্বাধীনতা ফিবিয়া পাইয়াছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে।

ভারতের অংশ সমূহের পক্ষে যে অন্তরূপ হইবে, তাহা অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে? আর একটি যুক্তি দেখান হইয়া থাকে যে, পৃথক হইয়া গেলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য।

কোন কোন অংশের পক্ষে এই প্রকার আশঙ্কা অমূলক না হইলেও সকল অংশের পক্ষে ইহা সত্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ করা যাউতে পারে। এই দুই রাজ্যই কৃষি, বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ; লোকবলও ইহাদের যথেষ্ট আছে। অধিকন্তু ইহারা উভয়ই সমুদ্র-উপকূলবর্তী। পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহৎ বন্দর বর্তমান, আর একটির স্থানেরও অভাব নাই। উড়িষ্যার কোন বন্দর না থাকিলেও স্থানের অভাব নাই। সুতরাং কৃষি-শিল্প এবং বাণিজ্য লইয়া ইহাদের পক্ষে সমৃদ্ধিশালী হইবার কোন বাধা আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

এই সকল বিবেচনা করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হইবার আবশ্যকতা যে কত অধিক, তাহা কি বলিবার প্রয়োজন আছে?

একত্রে থাকিতে হইলে পরস্পরের সুবিধা অসুবিধার উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। শুধু নিজের আঠার আনা দেখিলে চলিবে কেন?

ভারতের উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা হইয়াছে। আরও কিছু না বলিলে একটি থাকিয়া যায় বলিয়া ঐ প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

উন্নতির চিন্তার সময় আমাদের চক্ষু এবং মন উভয়ই পশ্চিম গোলাধারে নিবদ্ধ থাকে। দৃষ্টিশক্তি চিন্তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তুলিয়া যাই আমরা যে, আমাদের কৃষ্টি এবং আদর্শ স্বতন্ত্র এবং পৃথক।

প্রতীচী চার আরও ভাল খাজ, আরও সুন্দর বেশভূষা, আরও চাকচিক্যময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। প্রাচ্যের আদর্শ সাধারণ খাজ এবং সংযত বেশভূষা। পশ্চিম চার উর্ধ্বের আরও উর্ধ্ব উড়িতে; পূর্ব চাহে ঘরে বসিয়া তাহার অন্তরের চিন্তার প্রসার, যে পর্যন্ত উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া বঙ্গে বিলীন না হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য আদর্শের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি হইতেছে দুর্লভ, ঈর্ষা ঘেঁষ, বিবাদ ও পরস্পরহরণ এবং ব্যোমমার্গে দিগ্বিজয়ের অভিলাষে উদ্ধার মত অনিবার্য ধ্বংস, প্রাচ্যের আদর্শ মানুষকে পৌছাইয়া দেয় কল্যাণময়ের পরম শান্তিময় রাজ্যে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে উন্নতির আশায় আমরা উন্নত হইয়াছি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পৃথিবীময় সংস্কৃতির দূত প্রেরণ করিয়া আমাদের সনাতন কালচারের যে গর্ব প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, সে গর্ব আর কত দিন করিতে পারিব?

বিজাতীয় কৃষ্টির আবর্জনা আনিয়া ঘর ভর্তি করিয়া, নিজের দেশের সুন্দর বাহা কিছু সব ঢেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি। কৃষককে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিলের মজুর করিয়া বস্ত্র পুস্তর পথ্যায়ে ফেলিলাম, শাস্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিলাম; স্বজনশীল শিল্পী হইল অশ্রুকারী টেকনিসিয়ান, দার্শনিক প্রকৃত করিবে মাংগাঙ্গ।

কথিত আছে যে, ফারাডে যখন ইলেক্ট্রিসিটি আবিষ্কার করিয়া মনের আনন্দে বিভোর, তখন কোন মন্ত্রী তাঁহাকে বারম্বার প্রশ্ন করিতে থাকেন উহার দ্বারা কি কাজ হইবে। উহার উত্তরে বিরক্তির সহিত ঐ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, ‘অস্তুত পক্ষে উহার উপর তুমি ট্যাঙ্ক বসাইতে পারিবে’।

বৈজ্ঞানিকের কথা মিথ্যা হয় নাই। সত্যই মানুষ একদিন উহার উপর ট্যাঙ্ক বসাইল; কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন যে মনোবী তাঁহার অন্তরের আনন্দ কে বুঝিল?

সব জিনিষ অর্থের মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না। কৃষ্টি এমনই একটা জিনিষ, যাহা পৃথিবীর কোন মাপকাঠির নাগালের মধ্যে নহে।

ভারতের বৈশিষ্ট্যই তাহার কৃষ্টি; উহাই বোধ হয় তাহার দীর্ঘ জীবনের মূল কারণ। কত জাতি আসিল, কত গেল, ভারত আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। পশ্চিমের বিজ্ঞান আসিয়া ভাংয়ের জ্ঞানকে নির্ধাসিত করিলে কিসের জোরে ভারত বাঁচিবে? গুপ্তবীরেন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিয়া অথবা নটরাজের নৃত্য নাচিয়া কি তাহাকে রক্ষা করা যাইবে?

## লোকটি যাহাকে হত্যা করিয়াছিল

( Thomas Hardy লিখিত ‘The Man He Killed’ কবিতার অনুবাদ )

যদি তার সাথে দেখা হতো কোন পুরান অতিথিশালাতে,  
পিয়লা পিয়লা মদিরা উজাড় করিতাম বসে হৃৎকনাতো।  
পদাতিক-রূপে মুখোমুখি দৌঁছে দেখা হ’ল সমরঙ্গনে,  
দৌঁছে দৌঁহা প্রতি গুলী ছুঁড়ে দিমু, মারিছু তাহারে সেইখানে।  
সমরঙ্গনে বিপক্ষ দলে পাইছু তাহারে সমুখে—  
সে মোর শত্রু জানি নিশ্চয়, তাই তো মারিছু তাহাকে।  
হায়, মোর মন বুঝে না সঠিক শত্রু সে মোর কে বলে,  
আমারই মতন হয়তো সে-জন না ভেবে চুকেছে সেনাদলে।

পেটের তাড়নে বিক্রী করেছে যাহা কিছু ছিল স্বপ্ন;  
আমারই মতন ছিল সে বেকার, তাই তো চুকেছে সেনাদল।  
শান্তির কালে তার সাথে যদি মদের দোকানে দেখা হ’ত,  
টাকা-কড়ি কিছু দিতাম তাহারে, করাতাম খানাপিনা কত।  
যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ’ল ব’লে তারেই মারিছু গুলীতে,  
স্থান কাল-ভেদে একই মানুষের বিপরীত ভাব হিয়াতে।  
যুদ্ধ বড়ই অদ্ভুত বটে, যুদ্ধ বড়ই ভয়ঙ্কর—  
যুদ্ধ করেছে মানুষের প্রাণ নিষ্ঠুর, ক্রুর, ঘোরতর।

অনুবাদক—শ্রীতমালকৃষ্ণ নাথ।

# বিপ্লবী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৯৫৪ ইং অক্টোবর ৪ঠা জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় জাতিগণের হামবুর্গে অবস্থিত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের 'ইনভেস্টমেন্ট এডভাইজার টু জাতিগণ ফাইন্যান্সিয়ার' শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এক পত্র প্রকাশ করেন, তাহার শিরোনাম ছিল, 'এ্যাসেসজ ফ্রম হামবুর্গ' তাহার মর্ম ছিল, বিপ্লবী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৪৬ ইং অক্টোবর ১৮ই ডিসেম্বর হামবুর্গের একটা হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁহার দেহাবশেষ যেন মাতৃভূমির ধূলি-রাশির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

ডক্টর দাশগুপ্ত যে শেষ জীবনে দারুণ অর্থাভাবে মগ্ন হইয়া অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহারও সাক্ষিগুণ বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন।

আমরা যথাকালে এই বিপ্লবী-বীরের জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার সংবাদ পাই নাই। দারুণ অর্থাভাবের সংবাদও অবগত হই নাই, সুতরাং অকস্মাৎ উক্ত পত্র পাঠ করিয়া অবশ্যই হইলাম। তিনি ছিলেন আমাদের সহকর্মী, সহপাঠী, আমার স্বদেশবাসী এবং একই মত ও পথের পথিক। অর্থাভাবের সংবাদ পাইলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করা অসম্ভব হইত না। সুতরাং তাঁহার শোকে বন্ধ বিদীর্ণ হইল। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন স্বদেশী যুগে উদ্যম কর্মী, অগ্নিমন্ত্রের সাধক। পরে জাতিগোষ্ঠে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র ও যুবকগণের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সর্বকর্মচারীর সত্যবাক ছিলেন।

## পরিচিতি !

ত্রিপুরা জেলার জিনোদপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ চা—কৃষি ও শিল্পবিদ মহেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের চতুর্থ পুত্র ছিলেন তিনি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণও কৃত্তী বিদ্যার্থী এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার একটি ভাগিনেয়ী প্রখ্যাত। বিপ্লবী নারী-কর্মী শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সহ দীর্ঘকাল কারাকক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৮৮ অক্টোবর ১লা আগষ্ট জ্ঞানেন্দ্রের জন্ম হয়।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র স্বদেশী যুগের প্রারম্ভেই একজন বিপ্লবী উৎসাহী দেশকর্মীরূপে কুমিল্লা সহরে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি জিলা স্কুলে সর্বজন-প্রশংসিত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ অক্টোবর এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্স ভঙ্গের পর বাগ্ম্যবর বিপিনচন্দ্র পাল মধন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীউল্লাসকর দত্ত প্রমুখ একদল উগ্র দেশকর্মিসহ স্বদেশী প্রচার ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কুমিল্লার গমন করেন, বিপিনচন্দ্র প্রত্যাহ স্থানীয় দেশকর্মীগণ সহ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্রত্যাহ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে বিপিনচন্দ্রের দলের পুরোভাগে দেখা যাইত। তিন মাস পরে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রবর্তিত প্রথম বৎসরের এন্ট্রান্স এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সমতুল্য পঞ্চম মান ও সপ্তম মান পরীক্ষা গৃহীত হয়। তিনি পঞ্চম মান পরীক্ষা দিয়া কৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ বোম্বাইয়ের 'দি এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'

বিজ্ঞান শিক্ষায় ত্রুতী হন। কিন্তু ছয় মাস পরই তাঁহার উচ্চল প্রতিভার পরিচয় পাইয়া—জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (পরে ডক্টর) সাংগ্ৰহে তাঁহাকে কলেজ কোর্সে ভর্তি করিয়া লইলেন। এখানেই তাঁহার দীক্ষা হইল বৈজ্ঞানিক মন্ত্রে,—গুরু গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ দে এম-এ, বি-এস-সি।

## সোনার বাংলা

এক শুভ প্রভাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে আমরা আসিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার সুরঞ্জিত প্রাচীরপত্র সহর ঢাকিয়া গিয়াছে। পত্রটি ছিল এইরূপ :—

সোনার বাংলা !

৫০০০ লোক মরিতে প্রস্তুত, তোমরাও প্রস্তুত হও !

ভিতরে উন্মাদনী ভাবায় ছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিবোলগার, এবং মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার আহ্বান।

আমরা স্থূল বজ্জন করিয়া স্বদেশী প্রচারে বিভ্রত, তখনও মুক্তি-সংগ্রামের কথা ভাবি নাই, প্রাচীরপত্র পাঠে হৃদয়ে উৎসাহ-অনল প্রদীপ্ত হইল।

কয়েক মাস পরে দাশগুপ্তের নিকট অবগত হইলাম, তিনি তাঁহার দুই জন সহকর্মীসহ প্রাচীরপত্র একই রাতে চাঁদপুর, কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরের দেয়ালে দেয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্ততম সহকর্মী নরানন্দ্র লোধও পরে আমাকে এই তথ্য জ্ঞাপন করেন। প্রাচীরপত্র ছিল কলিকাতার আন্দোলন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

## বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার।

১৯০৬—১ পর্যন্ত দাশগুপ্ত ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ এবং ত্রিপুরা জেলার সহর ও বড় বড় গ্রামে তাঁহার গুরু মহেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নির্দেশে বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার করেন, স্বয়ং অধ্যাপক মহোদয় আমাদের চুট্টা, কালীকচ্ছ, বিজাকুট, ইত্যাহিমপুর প্রভৃতি গ্রামেও গমন করেন। স্থানে স্থানে অত্যাচারী কর্মীগণের মধ্যে হু-একটি বিলম্বারও বিতরণ করেন।

## জাতিগণী যাত্রা

১৯০৮ অক্টোবর মণিকতলায় বোমার বাগান আবিষ্কৃত হয়, তৎপরেই বিপ্লবী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী যুবকগণের অন্তরে জাগিয়া উঠে বোমা প্রস্তুতের এবং প্রয়োগের বিধান আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র উদ্বীপ্ত হইলেন জাতিগোষ্ঠে যাইয়া রসায়নশাস্ত্রের অনুশীলন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের বিদ্যা অর্জন করার হুনিবার আকাঙ্ক্ষায়। তিনি 'দি এসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইণ্ডিয়ানস্'এর সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার লগুন পর্যন্ত বাতায়নের



পাথের দিতে প্রস্তুত হইলেন। তৎপরে বঙ্গাঙ্গবর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে মাসিক পচিশ টাকা বৃত্তি দুই বৎসর পাওয়ার স্বীকৃতি পাঠিয়াই উৎসাহিত হইলেন এবং ধার-কল্প করিয়া ১১০১ অব্দের আগষ্ট মাস “গোলকুণ্ডা” জাহাজে চাপিয়া লণ্ডন চলিয়া গেলেন।

### বার্লিনে দাশগুপ্ত

বার্লিনে পৌছিয়া তিনি শীতের সেসনে ভর্তি হইতে পারিলেন না। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ভর্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। এ বিষয়ে দৃঢ় ভাবে আন্দোলন করিয়া অবশেষে ১১১০-এর গ্রীষ্ম সেসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন।

তাহারই আন্দোলনের ফলে জাতীয় বিদ্যালয় এবং সায়েন্স এসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট জাতিগণের সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ে ভর্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইল।

আমি এবং বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ( পরে ডক্টর এবং রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ ) ১১১০-এ বার্লিনে পৌছিয়া তাহার সাহায্য এবং সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলাম। সত্বরই লক্ষ্য করিলাম, তাহার টেবিলের উপরে ম্যাডাম ভিকাজীকামা সম্পাদিত—“বন্দে মাতরম্”, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—“ভলোয়ার” শ্রামাজী কৃষ্ণবর্মা “ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট” এবং অগ্ন্যাক্ত বহুবিশ বৈপ্লবিক ইস্তাহার ও পুস্তকাদি রহিয়াছে। সত্বরই আমাদের নামেও জীসাতারকর সংকলিত—“ভারত-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস” এবং কিছু সংখ্যক পত্রিকাদি আসিল। আমরা উপলব্ধি করিলাম, প্যারিস বার্লিনে লোকচক্ষের আড়ালে এক যোগসূত্র রহিয়াছে।

### অঙ্গসংগ্রহের বোঝা

দাশগুপ্ত এক দিন কথাছলে বলিলেন, তিনি কলিকাতায় জীপ্রভাসচন্দ্র দেবকে লিখিয়াছেন, জাতিগণ গভর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাসৈনিকগণের ব্যবস্থার প্রায় নূতন রাইফেল সম্ভা দরে বিদেশে চালান দেয়, তিনিও আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, তাহার দিতে প্রস্তুত কিন্তু ডেলিভারী জাতিগণেই নিতে হইবে। তার পর দেখাইলেন, একখানা পোষ্টকার্ডে মুদ্রিত রাইফেলের চিত্র।

প্রায় দুই মাস পরে আমার একজন জাতিগণ সহপাঠী বন্ধু হার আর্গান্ট মিটাগ আমার কক্ষে বসিয়া আমাকে জাতিগণ ভাষা শিক্ষাদান এবং ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণকালে সহসা দাশগুপ্ত হইতে আনিত “ইন্টার জাশনেল হিষ্টরী অব দি রিভোলিউশনারী একটিভিটি” নামক গ্রন্থের প্রথম অংশ খুলিয়া দেখিলেন। সহসা উক্ত চিত্র দেখিয়া কাঁপিয়া উঠেন। তিনি বলেন ইহা ত তাহাদের মিলিটারী রাইফেল, তাহার চিত্র আমার নিকটে কেন? নানা ভাবে কথা বলিয়াও আমি তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে পুস্তকের ভিতরে যে এই চিত্র ছিল তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু তাহার যুগ কাল হইল—এবং সম্ভাব্যে পুলিশ আসিয়া এ বিষয়ে বহুবিশ প্রশ্ন করিলেন; পরদিন দাশগুপ্তকেও পুলিশ প্রশ্ন করে কিন্তু তাহা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

তিনি কলিকাতায় পত্র দিইয়াছিলেন আন্দোলন সমিতির উত্তোপে দ্রোণ রোডে একটা লোহা-সঙ্করের ও সিমেন্টের দোকান খুলিতে।

তিনি জাতিগণী হইতে পাইপ পাঠাইবেন, তাহারই কতকগুলির মধ্যে থাকিবে রাইফেল, সিমেন্টের পিপার মধ্যে বুলেট, পিস্তল এবং রিভলবার। ব্যবসা চলিবে লোকসান দিয়া। কলিকাতা হইতে উত্তর গেল—“ব্যবস্থা করিতেছি”।

### হেগ আদালতে সাভারকরের বিচার

হেগ আদালতে জীসাতারকরের ইতিহাসখ্যাত বিচারের জন্ম প্যারিস ও বার্লিনে যে আন্দোলনের স্রষ্টা হয়, তাহাতে দাশগুপ্তের কৃতিত্বও কম ছিল না। তিনি রাইখসটাগের কতিপয় সদস্য ( সোসিয়েলিষ্ট এবং প্রোগ্রেসিভ পিপলস পার্টির সভ্য ) দ্বারা গভর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে আন্দোলন চালাইবার পরামর্শ দেন, অর্থ সংগ্রহেও তাহার শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা গর্ব অনুভব করি। যদিও উক্ত বিষয়ে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডক্টর চক্রবর্তী এবং আমার উৎসাহ অদম্য ছিল তথাপি তাহার বুদ্ধির প্রাখ্য আমাদিগকে বিম্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। এ বিষয়ে ১১৫২ ইং অব্দের ১২ই অক্টোবরের “যুগান্তর সাময়িকী”তে প্রকাশিত আমার সংকলিত “হেগ আদালতে সাভারকর ব্যাপার” শীর্ষক প্রবন্ধে সকল তথ্য বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

### বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব

১১১৩ অব্দের মার্চ মাসে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র “কলিত রসায়নে” ডক্টরেট উপাধি লাভ করিলেন। তার পরই তাহার অধ্যাপক ডক্টর উল্ফ্রাম অনুবোধপত্র লইয়া সুইজারল্যান্ডের বাসেলে গেলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ “রসে ব্রাণ্ড” ক্যামিকেলস প্রস্তুতকারক “হৌফম্যান ল্যা রসে” কোম্পানীর “উবারডিজেন” ফ্যাক্টরীতে গবেষক রাসায়নিক পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার পরই সুইজারল্যান্ড নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল, সুতরাং জাতিগণে অবস্থিত ফ্যাক্টরীতে বাসেলে হইতে প্রত্যহ যাতায়াত করার বিষয় ঘটিল, কারণ উত্তর দেশের মধ্যে রাইন নদীর উপরের সেতুপথ বন্ধ হইল, রেল-বাসও অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রহিল। এ জন্ত তিনি ছুটি পাইলেন।

### ভারত উদ্ধার উত্তোপে সহযোগিতা

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আগষ্ট মাসের ১৮ই তারিখে জাতিগণ পররাষ্ট্র দপ্তরে এক পত্র দিয়া ভারতে বিপ্লব বাধাইবার উত্তোপ করার জন্ত সাহায্য ও সহযোগিতা চাহিলেন কিন্তু উত্তর পাইলেন না। অপর একজন বিপ্লবী সি পদ্মনাভম পিলাই জুরিখে থাকিতেন, তিনি তথায় ‘প্রো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং “প্রো-ইণ্ডিয়ান” নামক মাসিক পত্রিকা জাতিগণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। আমরা তাহাকে জানিতাম, তাহার কার্যে প্রীত ছিলাম। তিনিও জ্ঞানেন্দ্রকে না জানাইয়া পররাষ্ট্র দপ্তরে এক পত্র লিখেন, কিন্তু উত্তর পান নাই।

৩রা সেপ্টেম্বর আমাদের অনুবোধে পররাষ্ট্র দপ্তর উক্ত দুই জনকেই আমরা বার্লিনে বিপ্লব সংঘটনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাদের সহরে অবস্থিত জাতিগণ কনসাল হইতে অর্থ লইয়া বার্লিনে চলিয়া আসিতে পত্র দেন। জ্ঞানেন্দ্র অর্থ না লইয়া নিজ ব্যয়েই এবং পিলাই অর্থ লইয়া বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত

হন। কিন্তু উভয়েই যদিও আমাদের বন্ধু ছিলেন, বার্লিনে পৌঁছিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের দরবার করিতে গেলেন, কেন পত্রের জরুরি মিলিল না ইত্যাদি। পরে ব্যারন ওপেনহাইমের অনুরোধে আমাদের সঙ্গেই যোগদান করিলেন।

### ডক্টর মুলার

দাশগুপ্ত ব্যারনকে অনুরোধ করেন, তাঁহার বন্ধু এবং আমার পরিচিত চীনভাষাবিদ ডক্টর মুলারকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাঁহাদের (পররাষ্ট্র দপ্তরের) এবং আমাদের দলের মধ্যে লিগেসন অফিসার ভাবে রক্ষা করার জ্ঞাত। এই সকল তথ্য ১৩৫১ অব্দের পূজা সংখ্যা “বসুমতীতে” আমার লিখিত “বার্লিনে ভারত উদ্ধার উত্তোগ” শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

মুলারের আগমন, তাঁহার বাটীতে আমাদের “ভারতবন্ধু জাৰ্গান সমিতি”র কার্যালয় স্থাপন, স্পাগো বিফোরক কারখানায় বিফোরক প্রস্তুত শিক্ষা ইত্যাদি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

দাশগুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়াই তাঁহার সর্ব বিষয়ে কর্তৃদৈন্য প্রদর্শন করিয়া ব্যারন ওপেনহাইম, ডক্টর মুলার প্রমুখ ব্যক্তিগণের এবং সমিতির প্রেসিডেন্ট—হামবুর্গ আমেরিকা স্ট্রিমার লাইনের জেনারেল ম্যানেজার ভারতবন্ধু এবং ইরাজ ফরাসীর যোরতর শত্রু হাজার আলবার্ট পলিনের প্রশংসাজ্ঞান হইলেন।

### হেলপোলাও যাত্রা

সিন্ধী পারসী ছাত্র বিপুল উৎসাহী এবং দুর্জয় সাহসী দাদা বানজী কেরসাম্প এবং দাশগুপ্ত উভয়েই ছিলেন সর্ব কার্যে ক’পাইয়া পড়ার জ্ঞাত উৎকর্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান দোষ ছিল—অত্যন্ত একজেন্দী এবং পরমত-অসহিষ্ণু, এ জ্ঞাত দলের সঙ্গে কার্য করার অল্পবোঙ্গী। কেরসাম্প হইতে দাশগুপ্ত অধিকতর জেন্দী ছিলেন, উভয়ে দাবী করিলেন তাঁহাদিগকে সামুদ্রিক মাইন প্রস্তুত শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। যদিও ৩রা সেপ্টেম্বর যে সব সর্ব আমরা ব্যারন ওপেনহাইমের নিকট দিয়াছিলাম, ইহাও তন্মধ্যে একটি ছিল, তথাপি লেডী অফিসার হাজার ফন ফিসার যখন ইহা কয়েক মাস মধ্যে আয়ত্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন, তখন আমরা এ বিষয়ে নীরব হই। সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ই তারিখ উক্ত দুই সহকর্মী এজ্ঞাত গীড়ানীড়ি আরম্ভ করিলেন, নানা প্রকারে বৃথাইয়া নিরস্ত করা যখন অসম্ভব হইল তখন ব্যারন ওপেনহাইম, ডক্টর মুলার ও ফিসার পরদিনই তাঁহাদিগকে হেলপোলাও যাত্রা করিবার সুযোগ দিলেন।

ফ্রিড্রিখস্টাডক ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিবার কালে চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর স্ককতাকর এবং আমি বলিলাম, বৃথা বাইতেছেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় দাশগুপ্ত সহাস্তে বলিলেন, “ভয় নেই, চার মাস মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ ও মিত্র শক্তির স্ট্রিমার ডুবিয়ে দিবে সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।”

তৃতীয় দিনেই হেলপোলাও হইতে ফোনে কেরসাম্প চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন—“ভাঃ করে দেখে শুনে মনে হল, শীঘ্র শিক্ষা লাভ

করা অসম্ভব। উক্ত গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং মেকানিক্সে সুপ্রচুর জ্ঞান না থাকলে মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং ফিরে বাবার অমুমতি চাই।” ব্যারন আপিসে নির্দেশ দিলেন হেলপোলাও ম্যারিন ট্যাকনিকেল ইনস্টিটিউটে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া হেলপোলাওর রোমানস্কর বর্ণনা দিলেন, তাহা সুবিস্তৃত, সুতরাং এস্থলে প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম।

### সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা

১১১৪ অব্দের ১লা অক্টোবর দুই জন সহকর্মী সহ আমি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করি, নবেম্বরের মধ্যভাগে আমার পত্নী নিবাসে বেয়ারণ হইতে লিখিত দাশগুপ্তের এক পত্রে অবগত হই, তিনি আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায় হাত দিয়াছেন এবং জেনোয়া বন্দর হইতে মাসপত্র প্রেরণ করার জ্ঞাত তথ্য বাইতেছেন।

“আমদানী-রপ্তানী” অর্থ অল্পশস্ত্র ভারত উপকূলে প্রেরণের চেষ্টা। ১১১৬ অব্দে সুইজ গভর্ণমেণ্টের শাসন পাইয়া তাঁহাকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে ঐ ব্যবসা চালাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চাহুদীও করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি সুইডেনের ষ্টকহলম চলিয়া যান। তার পর বিশেষ কিছু অবগত হই নাই।

১১১১ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার (বার্লিন হইতে লিখিত এক পত্র) পাইয়া অবগত হইলাম, তিনি এবং ডক্টর মুলার এক সঙ্গে ডক্টর জে. সি. দাশগুপ্ত এণ্ড কোং নামে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি হামবুর্গে যাইয়া একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন এবং কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানী ব্যবসা আরম্ভ করেন।

### দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে নেতাজীর সহযোগিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বখন বার্লিনে থাকিয়া চক্রশক্তির সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার উত্তোগ করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন বলিয়া ১৯৪৫ অব্দেই সংবাদ পাইয়াছিলাম কিন্তু তার পর আর কোনো সংবাদ পাই নাই। বিদেশে বেঘোরে অর্থীভাবে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি হামবুর্গের একটি হাসপাতালে দেহত্যাগ করিলেন, তার পূর্বে আমরা সংবাদ পাইলে প্রচুর না ইউক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিয়া যদি আরও একটু বছর তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম, তবে ভারত স্বাধীন হইয়াছে ইহা জানিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। ১৯০৫ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি যে কল্পনা করিয়াছিলেন, বাহার জ্ঞাত শক্তি অর্থ এবং আবক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা সার্বক মনে করিতেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শোনার বাংলা, তাঁহার গোমতী-তিতাস-মেঘনা-বিধৌত ত্রিপুরার বন্ধে জিনোদপুর গ্রামে বাইয়া জীবন ধন্য কবিত্তে পারিতেন। সংগ্রাম, স্বদেশ এবং বাঙ্গালা জাতির কল্যাণের জ্ঞাত যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল, তাহা আশিক ভাবে পূর্ণ করিয়াও তিনি গাহিতে পারিতেন—

“সার্বক জনম আমার

জন্মেছি এই দেশে”।

# স্মৃতিচিহ্ন

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

৪

ঋণশোধ নাটকের পঞ্চাংকট রূপে নন্দলাল বসু একখানা দৃশ্য এঁকেছিলেন। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের সমুদ্রে শাদা ফেনার ঢেউ। এই ছবিখানা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। শিল্পীর কাছ থেকেই একটুখানি ব্যাখ্যা পেয়ে হঠাৎ যেন আর্টের উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও খানিকটা অস্পষ্টতার কুয়াসা আমার মন থেকে কেটে গেল। শরৎকালের আনন্দ আবগের প্রকাশ এ ছাড়া আর কি হতে পারত ভেবেই পেলাম না। শরৎকালে মাঠে মাঠে সবুজের সমুদ্রে কাশফুলের ঢেউই তো এত দিন বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে দেখে এসেছি। একটি একটি পৃথক গাছ এঁকে তার রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের যে শরৎ দৃশ্য মনকে নাড়া দেয় তা কোনো বিশেষ একটি জিনিস নয়। সে যেন শত কণ্ঠের ঐক্যতান। তা থেকে কোনো একটি সুরকে বেছে বের করতে গেলে সমগ্র রূপের উপর আঘাত হানা হয়। ইংরেজদের শিল্পশাস্ত্রেও Spoiling the forest with too many trees নামক একটি নিন্দাবাক্য প্রচলিত আছে। অর্থ কিছু ভিন্ন হলেও মূল কথাটি এক।

আচার্য নন্দলালের আঁকা এই একখানা মাত্র দৃশ্য আমার জীবনে একটি নতুন আবিষ্কার। কারণ বাংলার শরৎকালের ভাবরূপের প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যে স্ফূর্তি পূর্ণ হয়ে উঠেছে বলা যেতে পারে। নন্দলালের ছবিতে দেখলাম তার অবাবহিত দৃশ্যরূপ। “মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ-ভরঙ্গ প্রবাহের বহু আয়োজন, বিশেষ মুহূর্তে যেমন একটি আঙনের রেখাময় বলকে প্রকাশিত হয়, এ ছবিটিও আমার মনে তেমনি শরৎ আকাশের একটি বিদ্যুৎ-রেখাময় প্রকাশ বলেই প্রতিভাত হয়েছিল।

ঋণশোধ পালা অভিনয় যে রাত্রি শেষ হল, সম্ভবত সেই রাত্রিই রওনা হয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিতাইবিনোদ (নিত্যানন্দবিনোদ) গোস্বামী।

আর ফিরিনি সেখানে ছাত্ররূপে। স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়েছিল যে মনে একটা হতাশার ভাব না এসে পারেনি। আমার সমস্ত উত্তমের মুখে বার বার স্বাস্থ্য এসে বাধা দিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে তখন থাওয়া ছিল আলুর তরকারী, ডাল ও দই বা দুধ। এরকম খেয়ে যে-কোনো স্নাতক স্নাতক হই, কিন্তু এই খাদ্যে স্বাভাবিক রুগ আমি রুগিত হয়ে পড়লাম। এমেরিটন হাইজোকোর ইনজেকশন তখন খুব ডাক্তারজন-প্রিয় ছিল, কিন্তু তার সাধ্য কি ভাণ্ডাকে জোড়া দেয়? “ভাণ্ডারে জোড়া দেবে সে কিসের মস্তুরে?”

বাড়িতে ফিরে উৎসাহহীন ভাবে বসে রইলাম। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়ের কালে ঋণশোধ পালা দেখে এসেছিলাম, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঋণশোধের পালা আর ফিরে এলো না আমার জীবনে।

শান্তিনিকেতনে আর ফেরা হবে না এ চিন্তা আমার কাছে বেদনাময় ছিল। মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম বলা চলে। সম্ভবত গানের সুরে সুরে সমস্ত শান্তিনিকেতন পরিমণ্ডলের সঙ্গে আমি বাঁধা পড়েছিলাম। গান আমি গাই না। নীরব কবির মতোই আমি হয়তো নীরব গায়ক—অর্থাৎ কবিও নই, গায়কও নই, কিন্তু ও দুয়ের প্রভাব আমার জীবনে একটু বেশি।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এমন ভাবে বাইরে কোথায়ও শুনি নি তার আগে। যেটুকু শুনেছি তা যৎসামান্য। বিদ্যাসাগর কলেজ ইষ্টেলে তৎকালে প্রচলিত দু-চারটি গান হ’—এক জনের মুখে শুনেছি, তার অধিকাংশই প্রার্থনা সঙ্গীত। ফকিরচাঁদ মিত্র ট্রীটে বিমলকৃষ্ণ ঘোষ গাইত মাঝে মাঝে। তখনকার দিনের প্রচলিত গান অমল ধবল পালে লেগেছে, মহারাজ একি সাজে, আমার মাথা নত ক’রে দাও হে তোমার, আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, তোমার অসীমে, তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে, মন্দিরে মম, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রাজপুত্রোত্তে বাজায় বাঁশি, শুধু তোমার বাণী নয় গো, প্রভৃতি গান চলত বেশি। আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি, আজি বারি বরে—প্রভৃতি প্রকৃতি সঙ্গীতও তখন চলতি ছিল।

মাঝে মাঝে এ সব গান শুনেছি শৌখিন গায়কের অগুট কণ্ঠে। পরবর্তী কালের বৈচিত্র্য এবং বহু মার্জিত কণ্ঠে গাওয়ার মোহবিভারী সৌন্দর্য তাতে ছিল না। এ স্বাদ প্রথম পেলাম শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায়।

এখান থেকে চলে আসবার সময় এই সঙ্গীতময় আবহাওয়ায় যেটুকু রেশ বহন ক’রে নিয়ে এলাম তার ক্রিয়া তখন বুঝতে পারিনি।

কিন্তু পরে বোঝা গেল তা আমার সমস্ত সন্তান ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে গাঁরা সঙ্গীত মনে করেন না, তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। কুটি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রকাব্য কাব্য নয়, এমন কথা অনেক ভুললোক তো এক কালে বলতেন। তাঁরা অনেকে পণ্ডিত ছিলেন। এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলতেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কান নেই। এ নিয়ে অনেক কাল ধরেই বাগবিতণ্ডা চলেছিল এবং রবীন্দ্রছন্দের ব্যাখ্যায় আমার পিতাও যোগ দিয়েছিলেন (ভারতী ১৯০১, 'বঙ্গভাষা' ১৯০১)। আমি পরে এ সব লেখা পড়েছি। কিন্তু এতে প্রতিপক্ষের মত বদলায় নি।

গাঁরা কাব্য ভালবাসেন এবং সঙ্গীত ভালবাসেন তাঁদের কাব্য-সঙ্গীত ভাল না লাগবার তেজ নেই। বাংলাদেশে প্রচুর কাব্য-সঙ্গীতের কথা হয়েছে এবং সে সব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কথার যে কি কথার-অতীত-আবেদন, তা কেবল কথার বাহুবলই আমাদের জনরসে করতে পারেন। যথার্থ কথা যথার্থ সুরের বাহুনে আমাদের মনে এসে পৌঁছয় সহজে। এর এমনই ক্ষমতা যে প্রতি সাধারণ অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনায়াসে একটি যোগ ঘটে যায়, আমরা এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের সঙ্গে সেই মুহূর্তে 'কমিউন' করতে থাকি। সঙ্গীতের এই 'কথা' সঙ্গীতের প্রধান কথা নয়। এ 'কথা' ভাবে সমার্থক। প্রকৃত সঙ্গীতে কথা বচ, ভাবটি বড়। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও কথা তার পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত করে ভাবে পবিত্র। কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও ভাবের গভীরতায় পৌঁছনো সম্ভব। শুধু সুর, বিশুদ্ধ বস্তু-সঙ্গীতের আবেদন, প্রোফাউণ্ড হতে পারে। যেমন ছজন প্রেমিকের মধ্যে গভীরতম ভাবের জানান প্রদান হতে পারে সম্পূর্ণ নীরব থেকে, শুধু হাতে হাত রেখে। কিন্তু প্রেম প্রকাশের এই নীরব বীতিই যদি একমাত্র প্রতি হত তা হলে প্রেম বেশি দিন টিকত না সম্ভবত।

ভারতীয় অনেক রাগই প্রোফাউণ্ড। আশ্চর্য সৃষ্টি। সামান্য কথার আশ্রয়ে, অনেক সময় অর্থহীন কথার আশ্রয়ে, তা দাঁড়ায়। কাব্য কথা সেখানে অবাস্তব।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এ থেকে স্বতন্ত্র, যদিও সম্পূর্ণ নয়। এখানে কারোব ব্যাপ্তি ও গভীরতা এত বেশি যে কারোকেই সুরের ভিতর দিয়ে অবিকতর প্রোফাউণ্ড করা হয়েছে। এতে বৈচিত্র্য আপনা থেকেই বেড়ে গেছে। কম্পোজার রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত সুরের আশ্রয়ে তাঁর গানের কথা গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশে গেছে। এর কোথায়ও তুলনা হয় না। অধিকাংশ ভারতীয় রাগের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার অলঙ্কার-সর্বস্বতা-বজ্রিত সবল সহজ আবেদন নিয়ে। সুরের অতি অলঙ্কার এতে চলে না। সবলতাও যে আটের একটি বিশিষ্ট ধর্ম সেটি আধুনিকযুগে স্বীকার্য। এটি মানলে এবং বিশ্বাস করলে তবেই এদিকে আকর্ষণ বাড়তে পারে। অবশ্য তা শিক্ষাসাপেক্ষ। সুরের সঙ্গে সুরের মিশ্রণ মানা সহজ, কিন্তু সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় আর একটি মিশ্রণকে, আর একটি সৃষ্টি বলে মানা, অতি-অলঙ্কার প্রিয়দের পক্ষে সম্ভবত কঠিন।

ক্রাসিকাল সঙ্গীতের পরিবেশে বাল্যকাল কেটেছে। তার মূল্য আমার কাছে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের

আবেদন আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক। ক্রাসিকাল সঙ্গীত যেমন যে-কোনো কণ্ঠে শুধু সঙ্গীত ব্যাকরণ টিক রেখে চললেই চল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত তা হয় না। এখানে এর আর এক বৈশিষ্ট্য। সে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার ভাল লাগে, উপযুক্ত কণ্ঠে গীত সে সবে ভিতর দিয়ে আমি অনেক গভীর বেদনায় গভীর সাধনা লাভ করেছি; কত দূর কত কাছে এসে পড়েছে; অসময়ের মধ্যে আমার সকল সোমার বিলুপ্তি ঘটেছে, কোনো দিন বাস্তবপূর্ণা সম্ভব মনে হয়নি, তা পেয়েছি; বেঁচে থাকার নতুন সার্থকতা লাভ করেছি, অনেক মানসিক মৃত্যুর পরে জন্মাস্তর লাভ করেছি।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশি ভালবাসি একান্তে শুনে, আসরে নয়। সের্গ শ্রীমতী কবিকা, শ্রীমতী সুরিয়ার উপর চাপ পড়েছে মাঝে মাঝে। কবিকার কণ্ঠে একদিন সুনাম প্রেমাসুর আত্মীয় সঙ্গে, আমার ঘরে বসে। তিনি আনন্দের বুড়ো না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি তাঁর চরিত্রতা আমার চেয়েও বেশি। তিনি সেদিন কবিকার কণ্ঠে 'কপে তোমার ভোলাব না' শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আর কেউ না থাকলে বুড়োদার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা আলোচনা করে অথবা তা থেকে কাব্যংশ পড়ে এক একটি বেল কাটিয়েছি।

কথায় কথায় ১৯৫৬ পর্যন্ত ঘুরে বাঙা গেল। ইতিমধ্যে ১৯২২ অনেক ঘটনা নিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে।

আমাদের দেশের বাড়িতে এই সময় এমন একটি লোকের আবির্ভাব ঘটে গাঁকে নিয়ে কয়েকটি দিন বেশ উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল।

আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গী হিসেবে কলকাতা থেকে নরেন নাগ নামক এক ব্যক্তি আসেন। আত্মীয় বাবেন পদ্মা নদীর ওপারে পারনা জেলার একটি গ্রামে। মাঝপথে আমাদের বাড়িতে দু'এক দিনের বিশ্রাম।

এই নরেন নাগের চেহারাটি খুব মজ্জিত নয়। কেমন যেন একটি সাধারণ অশিক্ষিতের মতন চালচলন। পাতলা চেহারা, তামাটে রং, ঘাড়ের দিকে চুল চাঁড়া, কপালে একগোছা চুল ঝুলে পড়েছে। মুখে পান এবং বিড়ি। বাই হোক, তাঁর সঙ্গে মৌখিক একটি কি দুটি কথা বলেই আমার কর্তব্য শেষ করেছি। বাড়ি থেকে একটুকুণ বেরিয়েছিলাম। দশটায় ফিরে এসে শুনি মেয়েদের মহলে হাত দেখা ও টোটকা গুণ ব্যবস্থা করা নিয়ে তিনি বড়ই ব্যস্ত। আমি শুনে বেশ একটু বিরক্ত বোধ করলাম।



নরেন নাগের গণ্ডকাঁরি

কিন্তু বাইরের মেয়েদের মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে গণংকার এসেছেন, ওষুধ ব'লে দেন। হুজুর স্তনে প্রথম ছুটে এলো হরেন্দ্রকুমার রায়। তখন সে শাস্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে এসেছে। অতি-সাধুতার জন্ত সে বিবেক বাঁচিয়ে কোথায়ও বেশি দিন কাজ করতে পারে না। যখন নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন উগ্র হয়ে ওঠে তখনই কাজের সন্ধানে বেরায়, এবং কান্স পেলে কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়।

সে এসে নরেন নাগকে ধ'রে বসল কয়েকটি টোটকা ওষুধ লিখে দিতে হবে। কাগজ পেজিল নিয়ে বসল সে। নরেন নাগ ওষুধ বলে যেতে লাগলেন। বললেন অজীর্ণের ওষুধ লিখুন। সেটি লেখা হলে সর্দিকাসির ওষুধ লিখুন—এই ভাবে চার পাঁচটি টোটকা লেখা হয়ে গেলে তিনি অন্ত্রের নাম বাদ দিয়ে বললেন এইবার আপনার অন্ত্রেরটি লিখুন ব'লে একটি টোটকা নাম বললেন এবং সেটি লেখা হ'লে বললেন, উপায় লিখুন অর্শ।

হরেন অর্শে ভুগছিল এবং নরেন ও হরেন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব আমি একটু ধাঁধায় প'ড়ে গেলাম।

হরেনই দ্রুত প্রচার করল কথাটা, এবং দ্রুত ভিড় বাড়তে লাগল আমাদের বাড়িতে। প্রফুল্লর পিতা যোগেন্দ্রকুমার এসেন। তাঁর পাশে ব'সে দেখলাম নরেন নাগ তাঁর মেহনদু বরাবর একবার হাত বুলিয়ে বললেন আপনার অন্ত্র সব লিখুন। যোগেন্দ্রকুমার নিজে ডাক্তার, লিখলেন সব। প্রত্যেকটি মিলে গেল। তিনি আমার চেয়েও সন্দেহ বাতীকগন্ত ছিলেন, কিন্তু তিনিও যখন বিস্মিত হলেন, তখন আমি রীতিমতো ভাবতে শুরু করেছি। এর পূর্ব থেকে নরেন নাগ প্রত্যেকের হাত ধ'রে তার মনের কথা এবং যাবতীয় খবর বলতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের বাড়ি প্রায় গীঠস্থান হয়ে উঠল।

নরেন নাগের একটি পদ্ধতি কিন্তু আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হল। সেটি তাঁর লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি। লিখিত প্রশ্ন ভাঁজ করা অবস্থায় প্রশ্নকারীর হাতের মুঠায় থাকে, তারপর সেই ভাঁজকরা কাগজখণ্ড নরেন নাগ নিজে চেয়ে নিয়ে তাঁর হাতের মধ্যে রাখেন এবং হু' একটি প্রক্রিয়া করেন, তাতে কোন রহস্যজনক উপায়ে প্রশ্নগুলো তাঁর জানা হয়ে যায়। তার উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে প্রশ্নকারীর মুঠার মধ্যে কোনো টাটকা ফুলের টুকরো পাওয়া যায়। এই ফুলের টুকরো মাছলিষ্ঠে পূরে ব্যবহার করতে বলা হয়।

কিন্তু এটি যে একটি উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না। সবই ভোজবাজি। কিন্তু অস্ত্রটির কোনো ভৌতিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না। সেটি সত্যি আমার বুদ্ধির অতীত।

তিন মাইল দূর থেকে শশী মালাকর এলো। এসে ভিড় ঠেলে নরেন নাগের কাছে গিয়ে বলল, “বাবু আমার একটি কথা আছে।” নরেন নাগ বললেন “কি কথা বল।” শশী বলল কথাটা তার বোঁ সম্পর্কে। “বোঁকে ডাক।” শশী বলল, “বাবু বোঁ তো আসেনি।” তখন নরেন নাগ বললেন, “তার ব্যবহারের কোনো জিনিস নিয়ে এসো, শাড়ী আনলেই হবে।”

শশী মালাকর চলে গেল।

ইতিমধ্যে লোকের পর লোক, অবিবাহিত ধারায় আসছে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল তিনটের। খেয়ে উঠেও বিরাম নেই। শশী ফিরে এলো বিকেলে। বোঁ-এর শাড়ী নিয়ে এসেছে। নরেন নাগ ভাঁজ করা শাড়ীখানা হু'হাতের মুঠায় চেপে ধরেই বললেন, “তোমার বোঁ পাগল।”

ঘটনাটা আমরা জানতাম না। শশী স্বীকার করল, হু'দাস্ত পাগল। তার পর নরেন নাগ পাগল সারার ব্যবস্থাপত্র দিলেন।

কাগজে লেখা প্রশ্নোত্তর চলছিল শুধুই সাক্ষর লোকের সঙ্গে, তাদের সংখ্যার চেয়ে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। স্ততরাঃ হাত ধ'রে অথবা পিঠে হাত বুলিয়েই বলতে হচ্ছিল অধিকাংশ স্থলে। আমি আর সব ভুলে খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম কোথায়ও কোনো কাকি আছে কি না। কারো সম্পর্কে কিছু বলা, অতি সাধারণ ভাবে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় হলে সে রকম গণনাবিভার কোনো দামই নেই। কিন্তু নরেন নাগের এ পদ্ধতিতে কোথায়ও কোনো ক্রেটি খুঁজে পেলাম না। কারণ সবার ক্ষেত্রেই তাদের সব চেয়ে জরুরি কথাগুলোই তিনি বলতে লাগলেন। অনেকেরই তা শুনে চমকে যাচ্ছিলেন।

নরেন নাগের চরিত্রের আর একটি দিক আছে। সর্বদা তাঁর সঙ্গে লেগে থেকে সেটি প্রথম দ্বিই আবিষ্কার করেছিলাম। সেটি হচ্ছে তাঁর ধাপ্পার দিক। অকারণ মিছে কথা বলা। গণংকার রূপে একটি পয়সা নেওয়া গুরু নিষেধ আছে, অথচ অজ্ঞ ভাবে ধাপ্পা দিয়ে হু' আনা এক আনা নেওয়ার মধ্যে আমি কোনো ভুল দেখিনি। ভেবেছি, যে বিদ্যা তিনি জানেন, তাতে তিনি সহজে ধনী হতে পারতেন, কিন্তু তার বিকল্পে এই হু'-চার আনার ধাপ্পা নিতাস্তই অসম্ভব।

চন্দনা নদীর পারে বোয়ালিয়া গ্রামের প্রাচীন সাহা পরিবারের ধারণা তাঁদের পূর্বপুরুষ অনেক টাকা মাটিতে পুঁতে রেখে গেছেন কিন্তু প্রকাণ্ড স্থান জুড়ে বাড়ি, তার কোন অংশে তা আছে তা তাঁরা জানেন না। এখন একমাত্র ভরসা নরেন নাগ। একদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে শুনি আমার মামা বাড়ির বড় একটি ঘরে তাঁরা সব এসে নরেন নাগের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। পরামর্শের বিষয়টিও তখনই শুনলাম।

গুণে বলে দেওয়ার ক্ষমতা যে নরেন নাগের অসাধারণ, এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। অতএব কোথায় টাকা পোতা আছে সেটি বলা আর এমন কঠিন কি। অর্থাৎ আমার বিচার বুদ্ধির একটি অংশ ইতিমধ্যেই নরেন নাগের ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়েছে।

গুণুধনের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে শুনেই আমার মনে হল বিনা শর্তে দেওয়া উচিত নয়। প্রাপ্ত টাকার একটি বিশেষ অংশ স্থানীয় স্কুলে দান করলে তবেই সন্ধান দেওয়া হবে, এ রকম একটা শর্ত ক'রে নেওয়া দরকার। কিন্তু এ কথাটা এখন তাঁকে বলি কি উপায়ে। ছুটে গেলাম মামা বাড়িতে। গিয়ে দেখি বিরাট আসর। তার মধ্যে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হল। আমি চোখ মুখের ভাব এমন করলাম যেন কিছুই জানি না এখানে কি হচ্ছে, এমনি ভাবে নিতাস্ত হাস্য ভাবে নরেন নাগকে বললাম—“নরেন বাবু, সামান্য একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে একটু উঠবেন?”



নরেন নাগ বললেন—“এখন তেঁা গুঁা সম্ভব নয়, দেখছেন তেঁা চেয়ে।” বঁলেই তিনি আমার ডান হাতখানা খপ করে ধঁরে সেকেণ্ড তিনেক কাঁপাতে লাগলেন। তার পর হাত ছেড়ে দিয়ে পেন্সিলের সাহায্যে একটুকরো কাগজে গোপনে আমাকে লিখে জানানলেন—“পরিমল বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শর্ত না করে এঁদের আগেই কিছু বলব না।”

এই কথাটিই তাঁকে বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতের ভিতর দিয়ে তা তাঁর মনে পৌঁছল কি করে তা আমি জানি না।

একদিকে এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে—অন্যদিকের হু এক আনার দাঙ্গা, ক্ষমার চোখেই দেখলাম।

আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা বলি। চন্দনা নদীর পারে মোহনপুর গ্রামের পোসেনের বাড়িতে নরেন নাগকে নিয়ে বাওয়া হয়েছে দুপুরে। এদিকে আমাদের বাড়ির জনতা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়েছে, তাদের অর্ধঘণ্টা বাড়াচ্ছে, ঘণ্টা হুইসের মধ্যে কিরে আসার কথা, কিন্তু চার ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

আমি অগত্যা নিজেকে গেলাম তাঁকে ধঁরে আনতে। গিয়ে এক রকম জোর করে তাঁকে কেড়ে নিয়ে এলাম অন্ধর মহল থেকে। বাটরে আসতেই এক মুসলমান যুবক হস্তদস্ত হয়ে নরেন নাগের গতিরোধ করে ঠাঁড়াল, বলল, “বাবু আমার কথাটা একটু বঁলে যেতেই হবে।” নরেন নাগ বললেন এখন আর সময় নেই। আমিও তাই বললাম। তখন সে প্রায় কঁদে ফেলল। নরেন নাগ তার হাতখানা চেপে ধঁরে একটু কাঁপিয়ে বললেন “ও! তোমার বোঁ সঁরে পড়েছে—এত নিয়ে?” বঁলে দুহাতে একটা পরিমাণ দেখালেন। যুবক বলল “ঐ বাবু। এখন কি করি?”

নরেন নাগ বললেন “এনায়েৎ—

যুবক বলল, “ঐ বাবু, সে শালাও আসত।”

নরেন নাগ যুবককে আশ্বস্ত করলেন, “ভর নেই, বোঁ আবার কিরে আসবে।”

কোনো দিক দিয়েই ভেবে গেলাম না এটি কি করে সম্ভব। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছি—বলেন না ঠিক কিছু। কামাখ্যায় শেখা বলেন। কিন্তু যেখানেই শেখা হোক, এ রকম ক্ষমতা মানুষের কি করে লাভ হয় এ এক মহা রহস্য, আজও আমি এব কোনো ব্যাখ্যা খঁজে পাই না।

কলকাতার তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল সম্ভবত এর তিন চার বছর পরে। কিরণকুমার ছিল আমার সঙ্গে সেদিন, এসপ্লানেডে ট্রামে উঠতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁর ঠিকানা নিলাম। কিরণ ও আমি একদিন গেলাম তাঁর কাছে, চিংপুর রোডের কাছে কোনো ঠিকানায়। দেখা হল, কিরণের হাত ধঁরে তার বিষয়ে কিছু বলতে যেতেই গলা থেকে অনেকখানি রক্ত বমন করলেন মোয়ের উপর। উদ্বেগে সিদ্ধ হঁল না। বললেন গুঁি তাঁর সাধনার ফলে ঘটেছে। কি সাধনার ফলে জানি না। ঘরে দারিদ্র্যের চিহ্ন, অপরিচ্ছন্ন চারদিক। কিন্তু এ রক্ত কিসের রক্ত? পেটের না ফুসফুসের? —একটু ভীত ভাবে উঠে এলাম; নরেন নাগের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

নরেন নাগের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে আমার একটা লাভ হয়েছিল। আগে যে সব জিনিস হয় না ধারণা ছিল, এবং

তা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতাম, এর পর থেকে সে জোর কমে গেল। শুধু এ বিষয়ে নয়, সব বিষয়ে। আমি যা সত্য বঁলে জানি, তার বাটরে সত্য থাকতেও পারে এমনি একটা মনোভাব গড়ে উঠল ক্রমে। অর্থাৎ মনের এক গৌড়ামি থেকে আর এক গৌড়ামিতে যাওয়াই হচ্ছে মনের স্বভাব। এর মাঝামাঝি আরও একটি পথ আছে বঁলে ক্রমে বিশ্বাস হল—এবং সে পথই নিরাপদ এটিও বুঝলাম। তাই আজও এটা হয় না, বা গুঁা অসম্ভব, এমন কথা বলতে আটকায়। বলি হতেও পারে, জানি না, তবে আমার নিজের এই বিশ্বাস, বা আমি নিজেকে এর বেশি ভাবতেও পারি না।

আমার অবিলম্বে আর কিছু কর্তব্য নেই, শুধু বাড়িতে বসে আছি এটি আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল। পড়াশোনার পথে চলব না মনে মনে স্থির করেছিলাম, কিন্তু তা না করলে ব্যবসা করা উচিত। সে সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ মনে মনে খুব বড় হয়ে উঠেছিল। চাকরি করব না, ব্যবসা করব। কিন্তু কিসের? সেইটি ঠিক হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। মাসের পর মাস যায় বিষয় নির্বাচন হয় না।

বাবা ইতিপূর্বে আমার চলার পথে কখনো বাধা দেননি, এইবার তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন কিছু না ভেবে আগে এম-এ ডিগ্রীটা নাও, তারপর যা হয় ভেবো।

পড়াশোনার বিরুদ্ধে মনটা প্রায় স্থির করেই কলেজি, এমন সময় এ প্রস্তাবটা হঠাৎ খারাপ লাগল। মনে মনে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করেছি। আমার আদর্শ প্রফুল্লচন্দ্র, আমি বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার হতে দেব না এই পণ। তাই বললাম, এম-এ পাস করে লাভ কি? আমি ব্যবসা করব। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের কথাটাও প্রকাশ করলাম। বাবা বললেন, প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং অনেকগুলো ডিগ্রীর অধিকারী, তাই ডিগ্রীর মোহ তাঁর নেই, তুমিও এম-এ পাস কর, তারপর যা হয় করো, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে তোমার যুক্তি তখন শোনা যাবে।



শান্তিনিকেতনে শরতের ছুটির গানের কবি রবীন্দ্রনাথ

প্রকৃতপক্ষে যে নিজের ভাল ভাল ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে তবে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বাঙালী যুবকদের মন ভাঙাচ্ছেন এ সত্যটি ইঠাৎ চমক লাগল। এ বকম যুক্তি মনে আসেনি। এ পথে ভাবতে গিয়ে অনেক দূর চলে এলাম। যে ব্যক্তি ডিগ্রীধারী, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বলার অধিকার তাঁর থাকবে না তো কার থাকবে? যিনি মন্তপান করেন, মদের বিরুদ্ধে তাঁর কথাই গ্রাহ্য, যিনি চ'পান করেন, চা পান না বিষ পান বলার অধিকার তাঁরই। অতএব এম-এ ডিগ্রী খারাপ কি না, এম-এ পাস না ক'রে আমি বুঝব কি ক'রে। রাজি হয়ে গোলাম বাবার প্রস্তাবে। তা ভিন্ন বাবার ইচ্ছা এই প্রথম পালন করব ভেবে মন প্রসন্ন হল।

অর্থাৎ এম-এ ক্লাসেই আবার ভর্তি হব। ইংরেজী বই অধিকাংশই কেনা ছিল, অতএব ইংরেজীতে ভর্তি হওয়াই মোটামুটি ঠিক করলাম। কিন্তু নতুন ক'রেই যখন পড়তে হবে তখন নতুন কোনো বিষয়ে নিলে কেমন হয় এ প্রশ্নও জাগল মনে। নানা বিষয়ে আকর্ষণ অনুভব করি মনে মনে। যে জিনিস বাড়ি ব'সে নিজে নিজে পড়া অনুবিধাজনক, এ বকম একটি বিষয় পড়ার কথাও ভাবলাম। মনশ্চক্ষে প্রথম ভেসে উঠল অ্যানথ্রপোলজি। বিষয়টি নতুন, এবং আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক বোধ হল এবং দু'-তিন দিন নানা ভাবে চিন্তা ক'রে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টিই পড়ব ঠিক ক'রে ফেললাম। ইংরেজী যেটুকু পড়েছি তাতে ঘরে ব'সে বাকী বই নিশ্চয় পড়তে পারব কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের সকল অঙ্গ নিজে নিজে পড়ার অনুবিধে। অতএব অ্যানথ্রপোলজি।

টাকা নিয়ে চল এলাম কলকাতায়, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হব—স্নদীর্ঘ আড়াই বছর পরে।

সব ঠিক, এমন সময় যাকে বলে 'মান প্রপোজেশন, গড ডিস্পোজেশন'—মামুষ যা আয়োজন করে, ঈশ্বর তা ভেঙে দেন, তাই



এম্পায়ার থিয়েটারে বিসর্জন অভিনয়ে জয়সিং ও অপর্ণা

ঘটল। মালমহের ঈশ্বরলাল কুণ্ড ছিল আমার পূর্ব সহপাঠী, তার সঙ্গে দেখা হতেই সে খ'রে বসল, ভর্তি হয়ে টাকা ও সময় নষ্ট করার দরকার নেই। তিন মাস পরে পরীক্ষা, বি-এ পাসের পর তিন বছর হয়ে গেল, অতএব নন-কলিজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় বাধা নেই।

ঈশ্বরলাল উকিল হওয়ার জন্ত আইন পড়ছিল, তার ঐ সঙ্গে একটি এম-এ ডিগ্রীর দরকার ছিল। সেজ্ঞা সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ দেওয়ার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। আমারও ডিগ্রী নেবারই প্রয়োজন ছিল কিন্তু তবু আমি এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে বললাম—সে একেবারে অসম্ভব, আমি অ্যানথ্রপোলজির জন্ত তৈরি হয়ে এসেছি। ঈশ্বরলাল বলল, সে খুব ভাল কথা, সেজ্ঞা আগামী বছর ভর্তি হলেও চলবে, আগে বিনা খরচে বাংলায় পাস ক'রে নাও, বই সব আমার, একসঙ্গে পড়া যাবে।

ঈশ্বর স্যাটার্নের ভূমিকার নেমে আমাকে ক্রমাগত বোঝাতে লাগল, তার নিজের একবেলার পড়া নষ্ট ক'রে। এবং শেষ পর্যন্ত ভজিয়ে ফেলল। মাত্র তিন মাস সময় এবং বাংলার সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটি ভাষা নতুন ক'রে শিখতে হবে! কিন্তু এ বিষয়ে সে আমাকে কিছু ভাবতেই দিল না আর। সে থাকত বিজ্ঞাসাগর হষ্টেলে সম্ভবতঃ তখন প্রফেস্টে রূপে বাস করত, ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমি কোথায় থাকব সে হল এক সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে কোনো পিজি হষ্টেলে থাকা চলত হয় তো, কিন্তু এ অবস্থায় কি করা যায়। বিজ্ঞাসাগর হষ্টেলে ঈশ্বরলালের গেট হয়ে থাকা তখন চলল না, সীট খালি ছিল না। দিনের বেলা হষ্টেলে কাটানো যায়, কিন্তু রাত্রি বাস তখন স্থানান্তরে সম্ভব ছিল না।

তখন মনে পড়ল হরেন্দ্রকুমারের কথা। সে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে থেকে তাঁর বাজারের কাজ করে। তার কাছে গিয়েছি দু-একবার, সে বলল এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে ভূমি থাকতে পার। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতেই তিনি সহজে সম্মতি দিলেন। ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠিকানা—বিশ্ববিখ্যাত ঠিকানা। সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই বাঁয়ের দিকের ঘর। বড় ইজি-চেয়ার ছিল একখানা সে ঘরে। সেইখানায় আমি ঘুমোতাম। খাটে থাকত হরেন্দ্রকুমার।

দিনের বেলা হষ্টেলে গিয়ে পড়তাম, রাত্রে ঘিরে শুধু ঘুমো না, পড়তেও হ'ত কিছু, বতটা পারা যায়। ক্রমে পড়া ভাল লাগতে লাগল। পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলির ইতিহাস মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। এত অল্প সময়ে তিনটি নতুন ভাষাসহ এতগুলো বই প'ড়ে আটটি পেপারে পরীক্ষা দিতে হবে, সেজ্ঞা মনোযোগকে চাবুক মেরে, চোখের-পাশ-টাকা গাড়িটানা ঘোড়ার মতো narrow angle ক'রে নিলাম—মনের দৃষ্টি যাতে ইতশ্চেষ্টঃ বিক্ষিপ্ত না হয়।

এই বাড়িতেই কিছুদিনের মধ্যে এম্পায়ারে অভিনীত বিসর্জন নাটকের রিহাসাল শুরু হল। অভিনয় হয়েছিল অগষ্টের (১৯২৩) কোনো তারিখে। রিহাসাল চলত আমার মাথার উপরে কোনো ঘরে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বকেলে হষ্টেলে যেতাম, সব দিন যাওয়া ঘটত না। রিহাসালের আড়ম্বরের মধ্যেও মনোযোগ খুব বেশি বিক্ষিপ্ত হয়নি, কেননা ততদিনে পড়ার সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছি। মাঝে মাঝে মানসিক ক্ষণ বিরামের

মুহুর্তে,—এবং যখন রিহাসালের সম্মিলিত ধ্বনি আর শোনা যায় না,—তখন কবিকণ্ঠের একছত্র দুছত্র গানের সুর ভাঁজা প্রায় স্তন্যে পেতাম। এই ভাবে তিনি মনে আসা সুরের আভাসকে রূপায়িত করতেন এবং তার সঙ্গে কথা জুড়ে গান রচনা করতেন। এক একটা সুর গাইছেন, পছন্দ হচ্ছে না, আবার কিছু বদলিয়ে গাইছেন। এইভাবে চলত সর্বক্ষণ। মাঝে মাঝে গলাটা পরিষ্কার করে নিতেন, তার আওয়াজও খুব জোর ছিল।

ক্রমে বিসর্জনের অভিনয় এবং আমার পরীক্ষা, দুই-ই আসন্ন হয়ে এলো। ভীষণ লোভ অভিনয় দেখব, অথচ তখন নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। দেখব না-ই ঠিক করলাম। মনকে যাকে বলে একেবারে বেঁধে ফেলা, তাই করলাম।

তারপর অভিনয়ের দিন এলো, বিকেলে সবাই এম্পায়ার থিয়েটারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাচ্ছেন—সবই লক্ষ্য করছি। ঠিক এমনি সময় পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভূমিকম্পে টলতে লাগল। আবার প্রশ্ন জাগল দেখব কি দেখব না। না দেখলে মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব, দেখলে কম করেও দিন সাতেক লাগবে এর প্রভাব কাটাতে। নাটকখানি ভাল ভাবে পড়া ছিল, তাই জানতাম তার অভিনয়রূপ আমাকে কি ভাবে বিচলিত করবে। তাই ভয়।

কলকাতার থিয়েটার দেখছি প্রথম আসবার পর থেকেই। ১৯১২ কিংবা ১৩ থেকে। বাল্যকালে প্রথম বলিদান নাটক দেখেছি বেশ মনে আছে। দানোবাবু দুলালচাঁদ সেজেছিলেন। গিরিশ ঘোষের অভিনয় আমি দেখিনি। ছাত্রাবস্থায় কোনো অভিনয়ই বাদ যায়নি। নিয়মিত সিনেমা দেখেছি ১৯২২ থেকে।

বলা চলে, অভিনয় দেখার ঝোঁকটা একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। তাই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আর হল না। সবাই চলে যাওয়ার পর কবি যখন গাড়িতে উঠে পড়েছেন তখন হঠাৎ মনে হল না দেখলে অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না! দিশাহারা হয়ে কবিকেই অর্ধাটানের মতো জিজ্ঞাসা করে বললাম এখন টিকিট পাওয়া যাবে কি না। তিনি বললেন আমি তো ঠিক বলতে পারব না, তুমি চলে যাও থিয়েটারে, সেখানে গিয়ে, খোঁজ কর। আমি তখন বিভ্রান্ত। প্রতিজ্ঞা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার আনন্দের প্রথম ইনস্পিরেশনেই নিবৃত্তিভার প্রকাশ।

কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলাম এম্পায়ার থিয়েটারে এবং বিসর্জন দেখলাম। যা ভয় করেছিলাম তাই হল। এমন শ্রদ্ধা এবং তৃপ্তি নিয়ে অভিনয় আমি কমই দেখেছি। যা পাব আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। সবটা অভিনয় আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহ আর দিনেন্দ্রনাথের রূপতি। তার উপর সাহানা দেবীর অতগুলি গান—এম-এ পাঠ্যপুস্তকগুলিকে লজ্জায় সঙ্কুচিত করল।

রাজসিংহ বেশী রবীন্দ্রনাথকে দেখে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে না করছিলাম। অপর্ণার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সময়ে জয়সিংহের উক্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ভিতর দিয়ে তা দীর্ঘ মনে হয়নি। শেষ দৃশ্য রোমাঞ্চকর। বিচলিত হয়েছিলাম। সে বয়সে অনেক কিছুতেই বিচলিত হওয়ার জগৎ প্রস্তুত ছিলাম।

নির্দিষ্ট কয়েক মাসের বিরামহীন পড়ায় এই একটি ছেদ পড়ল,

এবং তা ছাড়াও এক বছর বিয়েতে দেশে যেতে হয়েছিল। ফলে পড়া আরম্ভ করতে হল আবার নতুন উত্তমে। দিনে রাতে মোট প্রায় ১৬ ঘণ্টা।

এরই মধ্যে একটি পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে হল। বাবা পারসিক ভাষা শেখার পর সাদির পন্দনামা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপিখানা আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিলেন, তাঁর কথা যেন 'রবিবাবু'কে শ্রবণ করিয়ে দিই এবং তাঁর এই নতুন উত্তমের কথা তাঁকে বলি।

একদিন সন্ধ্যোগ পেলাম দেখা করার। দোতলায় তিনি তখন একা ছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন বাবার সম্পর্কে। আগেই বলেছি বাবা পোতাজিয়া স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন—এবং পোতাজিয়া ছিল সাহজাদপুর থানায়। এই সাহজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা নতুন করে বলবার দরকার নেই। এই অঞ্চলের ভূগোল সম্পর্কে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন। হুড়োয়াগর নদীর অবস্থা এখন কেমন, বর্ষায় কেমন সব ডুবে যায়, এ সব বেশ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ এই স্থানের সঙ্গে বাঁধা আছে, তাই এই কৌতূহল। আমার পিতার কথা বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করলেন, এবং তিনি সে দিন তাঁকে শাস্তিনিকেতনে ইংরেজী পড়াবার ভার দিতে চেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গ আমি গত মাঘ মাসের কিস্তিতে উল্লেখ করেছি।

পন্দনামা বইয়ের বাংলায় কি নাম দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি পাণ্ডুলিপির কয়েকখানা পাতা উটে-উটে দেখে নিলেন একটুখানি, এবং বললেন, একে নীতিপত্র বলতে পার। বই ছাপা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। এ নামই রাখা হয়েছিল।

এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ার ধরন সম্পর্কে কথা উঠল। কি কি বই পড়া হয় এবং কেমন ভাবে হয়, তাও তিনি একে একে জেনে নিলেন। তিনি একখানি বিশেষ বইয়ের কথা শুনে এমন বিচলিত হয়ে উঠলেন যে আমার নিজেকে সে সময় অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে লাগল। তিনি দুবার জিজ্ঞাসা করলেন—এ বই এম-এ তে পড়ানো হয়?—মনে হল যেন বলতে বলতে মুখচোখ একটু লাল হয়ে উঠল, (ক্রেমে কিংবা লজ্জায়, জানি না) তবে তখনই সামলে নিলেন এবং আগের মতোই শাস্তভাবে বলতে লাগলেন, স্কুলের পরীক্ষার সঙ্গে তোমাদের এম-এ পরীক্ষার কোনোই পার্থক্য নেই। মোট মুখস্থ করে এম-এ পাস করা যায় শুনে অবাক হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একদিন অল্প এক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে একই রকম বিচলিত হতে দেখেছি মনে পড়ল। সেটি ১৯৩৭ সালে



দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয় সারিতে ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলার পরীক্ষার্থীবৃন্দ

চন্দননগরে কবির হাউস বোটের মধ্যে। শ্রীঅমল হোম আর আমি সেখানে ছিলাম, অল্প কেউ তখনও এসে পৌঁছন নি। কোনো একটি বিশেষ রচনা সম্পর্কে তিনি সে সময় কোভ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যিক শান্তিভঙ্গ হবে আশঙ্কায় কোনোটিরই নাম প্রকাশ করা গেল না।

অবশেষে এম-এ পরীক্ষা এসে পড়ল। কয়েকদিনের জ্ঞান বিভ্রাসাগর হাট্টেলে একটি সীট সংগ্রহ করা গেল। তাতে বেশ অসুবিধে হল। হাট্টেলে আসার সময়টুকু বেঁচে গেল।

আমাদের সময়ে বাংলা পরীক্ষার যে আর্টটি পেপার ছিল সেই আর্টটি পেপারের প্রত্যেকটিই ইংরেজীতে লেখা চলত খুশি মতো। বাংলাতে লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমি সাতটি পেপার ইংরেজীতে লিখেছিলাম। বাংলায় পরীক্ষার্থী খুব বেশি ছিল না। সিনেট হলে প্রথম যিনি বসেছেন, আর সবাই তাঁর পর পর পিছনে। সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ডান্নাকুলার সব এক সঙ্গে। আমাদের বা পাশে ইংরেজী পরীক্ষার্থীরাও ঠিক ঐ ভাবে। একে বলা হয় single file বা Indian file। পরীক্ষা-গৃহে আচার্য ব্রজেননাথ শীলকে আমাদের পাশ দিয়ে কয়েক দিন যেতে দেখেছি।

আমাদের ফাইলের অগ্রভাগে শ্রীমান প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আমি—একজন বাদে সর্বশেষ। অর্থাৎ আমার পিছনে মাত্র একজন, কিন্তু

আমার সম্মুখের সীটটি শূন্য, পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত। ফিসফাস চলেছিল মল্ল নয়, কিন্তু আমার কোনোই উপায় ছিল না, আমার সম্মুখ আসন শূন্য। পিছনে যিনি ছিলেন তিনি নির্বিকার। বরঞ্চ তিনি কিছু অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলেন অগতাবে। আমার বা পাশের ইংরেজীর ছেলেরা কেউ কেউ চাপা গলায় আমার কাছে হু একটা শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন। কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধে ঘটাতে লাগলেন আমার পিছনের পরীক্ষার্থী। তিনি মিনিট পনেরো লিখেই গুন গুন করে সুর ভাঁজতে লাগলেন প্রত্যহ। তিন দিন সহ্য করে চতুর্থ দিন তাঁকে বললাম, আপনি তো মশায় খুব ক্ষমতাবান পুস্তক, গান গাইতে গাইতে লিখতে পারেন।

তিনি বললেন, আমি তো লিখি না।

সে কেমন কথা?

বললেন, আমি ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষার্থী, কিন্তু আমার লেখবার কিছুই নেই।

কেন?

পড়াশোনা আদৌ করি নি, ক্লাসে একমাত্র পরীক্ষার্থী আমি। অধ্যাপকের অমুরোধে পরীক্ষা দিচ্ছি।

অতঃপর তিনি যা বললেন, তা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক এবং তাঁর অধ্যাপকের পক্ষে ককণ। সে কথা প্রকাশ করে বলবার নয়।

[ক্রমশঃ]

### কুস্ককর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে : মহাত্মা অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে স্মৃতির অতীতের ঘনাককার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ববাণী যেন ঞ্জতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শূন্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী যুগ্ম অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে যুগ্মদেহের শিখিলপ্রায় অস্থিমাসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অক্ষ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তির ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুস্ককর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ



## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১৩

৩ জুলাই ১৯০১

ও

বন্ধু,

আমার কল্পার প্রতি তোমার আশীর্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষরসহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ক্ষুদ্রস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহদগুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামিগৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিয়া বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্ট্রিশ্যান প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্ত তোমার নব আবিষ্কার সংক্ষেপে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে দিয়াছিলাম—পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে—দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই—তখন ইলেক্ট্রিশ্যান দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সে কথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অজ্ঞাত সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জন্ত আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্দ্দানি ও আমেরিকায় যাইবার কোন প্রকার স্বেচ্ছা করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘকাল যুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার  
ঐরবীন্দ্রনাথ

১৪

২৫ জুলাই [ ১৯০১ ]

ও

বন্ধু,

তোমার কল্প কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার

নিষ্কৃতি নাই; সেজ্ঞ যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। এ কথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থ-সঙ্কট সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না—কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি বাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্তব্যের অমুরোক্ষে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে।—তুমি যদি ফার্লে' না পাও তবে একবার এখানে আসিও। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে বাত্মা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব—না যদি পাই, তবে, তুমি তোমার কার্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্তমান যুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না—তুমি বাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়ী-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে—সেদিনের জন্ত ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিবে।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্মানি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কল্পাকে ইতিমধ্যে স্বামিগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা আছে। হই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

১৫

( অগষ্ট ১৯০১ )

ও

বন্ধু,

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, স্মরণ্য স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহদয় অনুরাগে



আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কণ্ঠ সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জঙ্গ দেশে ফিরিয়া এসো—তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিকাররূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিতাপ ধরাইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি প্রদর্শিত হইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে নীচ দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি। তোমার ববি

১৬

[ অগষ্ট ১১-১ ]

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে—এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্বে সান্ত্বিত্য তোমার ছবি ছাপিবার জঙ্গ সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গুপু ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটাই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না—কারণ, চুরি করিকে অনেক ভদ্রলোক সন্দোহ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামাস্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম, না, কণ্ঠ; ধ্যান, না, জ্ঞান; বিজ্ঞা, না, উত্তম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিজ্ঞান্য খুলিবার জঙ্গ বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসর মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-স্পর্শ থাকিবে না—ধনা দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিজ্ঞা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বাধ-চেষ্টা এবং আভ্যন্তর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারও মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিজ্ঞার আমাদের কাহাকেও স্বার্থ কল্পনাসী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরজপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতার আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্তে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে আসে তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

বিশ শতাব্দীতে নৈবেত্তের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেত্তকে আমি আমার অন্তঃস্থ বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেত্ত বাহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন—আমি উহা হইতে লোকজ্ঞতি বা লোকনিন্দার কোন দাবী রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম, আমার “মুক্তির উপায়” নামক ছোট গল্পটি তর্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল—বস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। ইঁহা আমার মধ্যমা কস্তা রেংকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা, তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রীর উপর হোমিওপ্যাথিক চুড়া চড়াইবার জঙ্গ অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই—তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার ববি

১৭

[ সেপ্টেম্বর ১১-১ ]

বন্ধু,

আজ মিস্ নোবলের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার-ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবহের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃত, নির্জন, ধানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জঙ্গ অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি, এখানে একটি বোর্ডিং বিজ্ঞান্য স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটিন্দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মাহুত করিবার চেষ্টা আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ণচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ-বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশ্রুতি মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাঁহাব লোভ এখন আমার মনে নাই—কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা করিয়া আসিবার জঙ্গ মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সাকুলার বোন্ডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের বোলের আশ্বাদন সর্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জঙ্গ তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলেণ্ডে যাঁহাব চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধু যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্বে জানিতাম না।

তোমার ববি

১৮

[অক্টোবর বা নভেম্বর] ১১.০১

ও

আগরতলা  
কার্তিক ১৩০৮

বন্ধু,

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় ছুট-এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উদ্ধার হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য কার্য সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্বদাই ধৈর্য্য-সম্বন্ধে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কর্তব্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিও। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জগাই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদেরিগকে বিধি। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া কিছুই কিরিয়া চাহে না। মহারাজের সন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে স্বীকৃতি করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই, তিনি তোমার স্বর্ণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উত্তম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।

তোমার

১১

রবি

[এপ্রিল ১১.০২]

ও

বন্ধু,

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটািয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয় সবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে

উপভূক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশাস হইতাম না—তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

পঞ্চ কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল—নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে—তোমার সেই বক্তৃতাভাষণ আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

ইউরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিও—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিও না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্যন্তরীণ জয়-ভোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নিষ্কলনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে, তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে—বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্র্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে কুটারের মধ্যে যুগচর্কে যে বসিল সেটাই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল হেতু জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আব কাহারো হাতে দেন নাট—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন ব্রিঙ্ক পবিত্র প্রভাতে প্রাচীনান করিয়া কানায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রস্ত লইয়া বিপুলছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিগণ তোমার জয়ধ্বজ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পূণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবিভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শুল্ক প্রাস্তর এবং উদার আকাশ ভূমিত বক্ষের ছায় বাকুল প্রসারিত বাহুর ছায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্বী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউন, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের ক্রান্তির অবকাশ, আমাদের ধানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদেরিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা স্বতন্ত্র, তাহা নির্বাক, তাহা নীর, তাহা দিগন্তর, তাহা শাস্ত—তাহাকে বলীর বাহ ও ক্ষমতাশালীর স্পর্শ স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থির নিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্ত মনে সন্তোষের সহিত প্রসন্ন মুখে ইহারই বিরলভরণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষ আর ক্রক্ষেপ করিবে না—তাহার দিক্কারে আর কর্ণপাত করিবে না—তাহার কাছ হইতে যে বর্বর রক্ত বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃত্ত হইতে কালিদাসের শিরীন পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

২০

[মে ১১.০২]

ও

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ

হঠাৎ কলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখি? সেখানে থাক এবং যেমন করিয়াছি হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্রে হউক, তুমি নিজেকেও বার্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্তৃকে হঠাৎ মান্যগানে নিরর্থক করিবে কে? সীজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভাবতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য তোমাকে তোমার কর্তৃক মগ্নে অনার্যাসে রক্ষা করুক। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাক্ষু্য তোমাকে তোমার মনঃ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভাবতবর্ষের অশ্রুমেঘের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভূতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুগ্ধ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে—সে-অগ্নি তুমি পাঠিগ্ৰাহ্য তাত্ত্বি তুমি সঙ্গে লইয়া বাইতে পারিবে না—তাত্ত্বি ভাবতবর্ষের হৃদয়গাহের স্বায়ী করিয়া বাইতে হইবে; বিদেশী আনন্দগিকে জ্ঞানের অগ্নি সেটুকু দেয়, তাত্ত্বি অপেক্ষা ঢের বেশী ঘোঁরা দিয়া থাকে—তাত্ত্বিতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়—আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভাবতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাতারো মনে নাট—আর একবার আমাদের গুরু বদীতে আরোহণ করিতে হইবে—নামিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভাবতবর্ষের প্রাচ্যবীর্যের বটচ্ছায়ায় সেই বদী-অধিকারোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। মৈত্র-সামন্ত, ঐশ্বর্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাদের বিচ্যুত করে না। আমি মাসের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেনার স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রাইয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

২১

২০ জুন ১১-০২

৪

৬ই আষাঢ় ১৩-০১

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

৬

আষাঢ় আসিয়াছে—কিন্তু আষাঢ়ের সেই চিরন্তন নব ঘনঘটা এবার এখানে দেখা দিল না। আমরা সেই জন্ত হী করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারি দিকে অব্যবহিত প্রান্তর—কোথাও দৃষ্টির কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাঙ্গল এমন আর নাই—এইখানেই জয়দেব বিপুলজ্বলে তমালবনে বর্ষা রাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় কোশ—চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষার সময় এক বার তোমাকে প্রেরণ করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি—বহুতা করি,

লিপি, হাসকাস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি—এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমন করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই! এমন করিয়া কে আমাদেরকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে? এক একবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি—সব কাজকর্ম ফেলিয়া মুখোমুখি করিয়া বসি—হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না—আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক—কেবলি ঘুরিতেছে—ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম—মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে, তাহার পরিণাম কোথায়? এই জন্তই ভগবান বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোন মতে বাহির হইবার জন্ত এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষ-ঘূর্ণিতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। আমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারা ব্লকিয়া উঠিয়াছে—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র—নক্ষত্রচক্র, মৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবনচক্র—এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেইখানকার জন্ত দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভাষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুগানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখোমুখি করিয়া বসিলে জগৎচক্রের ঘর্ষণশব্দ কিছুক্ষণের জন্ত যেন শোনা যায় না—তখন লাভমতি স্নেহঃস্নেহ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণের জন্ত তুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান দীর্ঘজীব্যতার সময় এই সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন জয়ভেরীর বাজাই বাজ, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক।

তুমি জম্মণি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিও। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস—তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জালিয়া কেদারা টানিয়া বসা বাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিভাগলয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিথিবীর জন্ত আসিয়াছে। ছেলটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনাত লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রভা তাহাকে এক পেয়লা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহা কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে ইহা যদি তোমার আশঙ্কার বিষয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহা যথাবিহিত প্রতিকার করিও।\*

তোমার রবি

\* বিশ্বভারতীর সৌজন্তে।

# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

যত বড় জাঁদবেল মানুষই হোন, সোবিয়ত দেশ খোড়াই কোয়ার করবে যতক্ষণ না কোন কর্মিক সংঘ পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে। একলার খাতির নেই—এক গলার অনেকের কথা বলুন, তবে স্তনবে। যত রকম পেশা থাকতে পারে, সব পেশার লোক এক এক যুনিয়ন গড়ে বসে আছে। তারাই আসল। যুনিয়নগুলোকে হাত করে নিন, সারা সোবিয়ত দেশ তবে আপনার মুঠোর ভিতর।

যুনিয়নের মস্ত বড় অফিসে চলেছি হুপরের খানাপিনার পর। মস্কো শহরের সীমানা বেষ্টে নতুন যুনিভার্সিটি-পাড়ার, লেনিন-পাহাড়ের দিকে। নামটা গোলমালে—অল যুনিয়ানস সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড-যুনিয়ানস (All Unions' Central Council of Trade Unions)। উঠানে পা দিয়েই চোখের মণি গর্ত থেকে ঠিকরে বেরকার জোগাড়। মশাদে একজনে বলেও উঠলেন, গুর বাবা, এই হল ট্রেড-যুনিয়ানের বাড়ি—রাষ্ট্রপতি-ভবন নয়? যুনিয়ন-অফিস বলতে আমরা বুঝি, নিচু-ছাত ঘটবটে অন্ধকার ভাপসা গন্ধ-ওঠা ঘরের মধ্যে হাতল-ভাঙা খান দুই চেয়ার ও নড়বড়ে টেবিল। চেয়ার ও মেজের উপরে মানুষ কয়েকটি গ্রন্থেয়াল ভর্তি আরঙলা। আর এখানে কী কাণ্ড!

চারতলায় উঠে গেলাম লিফটে। নানান বিভাগ—অগুস্তি ঘর। বকবক তকতক করছে। আসবাবপত্র একেবারে হাল ফাসানের—বসে বসে কাজ করার মধ্যে যতখানি সুখ নিতে পারা যায়। সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সোবিয়ত ট্রেড-যুনিয়ন জনসাধারণেরও সংস্থা। বেকার নেই, সক্ষম মানুষ মাত্রই কাজ পেয়েছে—যে কেউ তাদের মেসার হতে পারে। কারখানায় কর্মিক, অফিসের কেরানি, কারিগরি ও উঁচু ক্লাসের ছাত্র—সবাই। জাতিধর্মের বাছবিচার নেই। ইস্কুলের মাস্টার, খনির শ্রমিক, বইয়ের লেখক, গাড়ির ড্রাইভার—সকলের আলাদা আলাদা যুনিয়ন, ইচ্ছে করলে যে কেউ মেসার হতে পারেন নিজ নিজ যুনিয়নের।

সমস্ত যুনিয়ন থেকে মেসার বাছাই করে নিয়ে আবার এক সংস্থা গড়ে, তার নাম স্ত্রীম ট্রেড-যুনিয়ন। ওদের ভিতরে ভোট নিয়ে হয় সেন্ট্রাল-কাউন্সিল। সকলের বেশি ক্ষমতা এই কাউন্সিলের—তাবৎ ট্রেড-যুনিয়ানের মধ্যে যোগাযোগ সাধন হল এদের বড় কাজ।

সরকারি ও আধা-সরকারি যাবতীয় ইলেকসনে ট্রেড-যুনিয়নগুলোর বিস্তার প্রভাব। অগুস্তি মেসার। কর্মিকদের ভাতডালের ব্যবস্থা করেই দায়খালাস নয়, কড়া নজর থাকে, কর্মিকরা যাতে বোল আনা মানুষ হয়ে জীবন কাটায়—শুধুমাত্র কাজের যন্ত্র না হয়ে ওঠে। এই কাউন্সিলের ব্যবস্থায় সাড়ে ন' হাজার সংস্কৃতি-ভবন (Palace of

Culture) চসছে। তা ছাড়া ছোটখাট ক্লাব—গুণতিতে দাঁড়াবে সাতানব্বই হাজার। কর্মিক ও তার পরিবারের হরেক রকম খেলাধুলা পড়াশুনা ও স্ক্রুতিফার্তির ব্যবস্থা। ক্লাবে এসে তারা ছবি আঁকে, ফোটো তোলে, দরজির কাজ শেখে, তাস-দাবা খেলে, থিয়েটার করে, সিনেমা দেখে। গুণীজ্ঞানীরা এসে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে যান। প্রতি ক্লাবের সঙ্গেই শিশুকেন্দ্র—ছেলেপুলেদের শিক্ষা শরীর-চর্চা ও আমোদের ব্যবস্থা সেখানে। তেরো হাজার লাইব্রেরি চালায় কাউন্সিল। তাছাড়া সরকারি ও স্থল-কলেজের লাইব্রেরি আলাদা তো আছেই। লাইব্রেরির সমর ফিটলারের দল বিশ্বর জায়গা দখল করে নিয়েছিল, অনেক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছে তখন।

লড়াইয়ে বাড়ি ভেঙে চুবুয়ার করেছিল, এখন দেদার বাড়ি বানাচ্ছে মানুষদের বসবাসের জন্য। যার সেমন দরকার, ঘরবাড়ি ঠিক করে দেওয়ার কাজও ট্রেড-যুনিয়নের। মাইনে-করা যুনিয়নের ডাক্তার—কর্মিকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুফতে তারা রোগী দেখে বেড়ায়। যুনিয়নের ইনস্পেক্টররা—পাকা লোক দেশে দেশে এই কাজে দেয়—কড়া চোখে তদারক করে বেড়ান, কর্মিকদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটছে কিনা কোথাও। প্রায় হাতে-মাথা-কাটার ক্ষমতা ওঁদের—দরকার হলে ফাস্ট্রির কাজকর্ম থামিয়ে দিয়ে মামলা আনতে পারেন কর্মিকর্তাদের বিরুদ্ধে। দৌকরটি সামলানোর স্তম্ভ এমন কি সরাসরি নিজ হাতে নিয়ে নিতেও পারেন। কর্মিকরা গোলমাল না করে, সেটাও দেখেন ওঁরা; গুণগোল জমে ওঁরবার আগেভাগে মিটমাটের ব্যবস্থা করেন যুনিয়ানের লোক ও কর্মিকর্তাদের লোক এক জায়গায় এনে বসিয়ে। ওভারটাইম কাজ করবার নিয়ম নেই। কিন্তু জরুরি ব্যাপারে কখনো কখনো বিশেষ জরুম। আসে তখনও ইনস্পেক্টর নজর রাখবেন, কর্মিকদের শরীর পায়প না হয়ে পড়ে। পেন্সন পায় সকল কর্মিক—পুরুষের বাট আর মেয়েব পঞ্চান বয়স হলে। কলার খনিতে যারা কাজ করে তাদের পেন্সন অনেক আগে। পেন্সন পেলেই যে কাজ ছাড়বেন, তার কোন মানে নেই। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চাকরি চািলিয়ে যথারীতি মাইনে নেবেন, আবার পেন্সনের টাকাও আসবে।

অক্ষমতার পেন্সন আছে। শরীর হঠাৎ অপটু হয়ে পড়লে পথে বসতে হবে না। সংসার-পোষণের দায়বদ্ধি থাকলে পুরো মাইনে পাবেন কাজকর্ম না করেও। অল্পখা মাইনের চার ভাগের তিন ভাগ। ভারী কাজ করতে পারছেন না কিন্তু হালকা কাজের শক্তি আছে এমন এমন অবস্থায় মাইনের অর্ধেক দেবে; বাকিটা আপনি খেটেখুটে রোজগার করুন। চাকরি পচিশ বছর পূরলে মাস্টারমশায়রা পেন্সন পাবে—শক্তি থাকলে চাকরিও চািলিয়ে যাবেন পেন্সনের সঙ্গে। সম্মান-প্রসবের সমর মেয়ে-কর্মিকরা যাবতীয়

খরচখরচা পায়। এবং সাতাত্তর দিনের ছুটি। কোন কর্মিকের ধন শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে; তার জন্ত বলকারক দামি খাদ্য চাই। কিংবা একটা ছেলে ধন পড়াশুনার কৃতিত্ব দেখিয়েছে, বৃত্তি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। যুনিয়ান আলাদা ফাও জমিয়ে রেখেছে—এই সব বাড়তি ব্যবস্থার জন্ত।

তেরো হাজার স্থানিটোরিয়ান ও বিশামহান আছে ইউনিয়ন ধুলোর তাঁরে। পাতাড়ের উপরে সমুদ্রের কিনারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার। কর্মিকরা দেখানো মুফতে থাকতে পায়। একমাস থাকবে—তার মধ্যে কারখানার ছুটি মেলে আঁঠো দিনের; দোমাসে ইনস্পেক্টর ফাও থেকে বাকি বারো দিনের মাইনে দিয়ে দেয়। কর্মিকের স্বাস্থ্য ও আনন্দের জন্ত নানারকম চেষ্টা—তার ফলে ঈশপান বেড়ে সমৃদ্ধি উঠলে উঠছে। জিনিষপত্রের দাম কমছে দিনকে দিন, জার কর্মিকের মাইনে বাড়ছে। কর্মিকের পরিবার খুব বড় হলে সেখানে বিশেষ ভাতা। ছেলপুলের মধ্যে স্কুল-কলেজ ও যুনিভার্সিটির ছাত্র থাকলেও বেশি টাকা। জাতীয় আয়ের পুরোপুরি সমস্ত ভাগ জনসাধারণের কাছে ফিরে আসবে, এই হল আর্থিক ব্যবস্থা গুণের।

যুনিয়নের চাঁদা মাইনের শতকরা এক ভাগ। ছাত্রের বৃত্তিরও অমনি শতকরা এক ভাগ দেয়; বৃত্তি না পেলে পঞ্চাশ কোপেক। কর্মিকদের মধ্যে মেসাব শতকরা নিরানব্বই; ছাত্রদের মধ্যে নব্বই।

ধর্মঘটের কথা কখনো তো শুনিবে আপনাদের দেশে। কড়া আইন আছে নাকি?

কার বিপক্ষে করবে বলুন ধর্মঘট? মালিক বলে আলাদা কোন দল নেই নিজেরাই সব। ধর্মঘট নিজেরদের বিরুদ্ধে? সোবিয়েত দেশটাই হল এক সুবৃহৎ পরিবার। কত রকম সমস্যা ওঠে, তেমনি সমাধানও করে নেয় নিজেরা বুঝসমঝ করে। চাকরি বাওয়া খুব কঠিন একশেষ; অতি-বড় অপরাধ করলে ফলে জেয়ে চাকরি যায়। শোনক না থাকায় তিন্ততার কারণ ঘটে না কোন সময়।

ছুটলাম ওগান থেকে শব্দরর ভিতর দিকে। আর ছুটো-স্তিনটে দিন—এর মধ্যে বতসূর দেখে নেওয়া যায়। বস্তকড় প্রচিষ্টান—গর্কি ইনষ্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচারস। ডিরেক্টর হলেন আনিসিমভ, চৌনে গাব সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সোবিয়েত-দলের নেতা হয়ে চৌনে গিয়েছিলেন। সে কথা মনে আছে কি আর এত দিন পরে—বিধা ভরে সোভিয়েতের মারফতে শুধালাম : মনে পড়ে আরছা রকমের কিছু? গড়গড় করে একগালা জবাব দিয়ে চললেন, সোভিয়েত ইংরেজি করে দিল : মনে পড়বে না কি, সাহিটিয়ে বহুতার কমপিটিসন হল তোমার সঙ্গে। জিত তোমারই—হাততালির চোট কানের পর্দা ছেঁড়ে তোমার বহুতার পরে। আমি নানা করে উঠি : আজে না, ডাহা মিথ্যে বলা হচ্ছে। তোমার বহুতার এমন হাততালি, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে বৃত্তির হোড়ে সৃষ্টিসংসার লগুভও করে দিল। 'চৌনে দেখে এলাম' বইয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আছে। পাকে-চক্রে আমিও তখন ভারতীয় দলের কর্তা হয়ে পড়েছি। কিন্তু আগেভাগে বানানো নিতান্তই কাগজে-লেখা বহুতা—বাহাঘুরি কারো নেই। না আমার, না আনিসিমভের।

আনিসিমভ তারপরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন : মনে নেই যে বলছ, দেখে বাও এদিকে এসে।—এসো।

অশুভি বইয়ের তাক। একটার সামনে পাড় করালেন। শিকিনে একগালা বই দিয়েছিলাম। তার একটাও অজ্ঞ কোথাও দিয়েছেন বলে তো মনে হয় না। নিজের ইনষ্টিটিউটে সাজিয়ে রেখেছেন। রেখেছেন কেমন জায়গায় ভাবতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাংলার লেখক আমরা তাহলে মোটামুটি দু-জন—রবীন্দ্রনাথ এবং এই অধম। আপনারা দৃষ্টি-ছাটি করেন, আর এত দূরে কী পশার জমিয়ে আছি ডাবুন একবার। যার হিসার বলে গুড়ে মরুন। ইতিমধ্যে অনেক দিন কেটেছে আরও অনেকে নিশ্চয় ছুটে পড়েছেন সেখানে। বেশ দ্রব্য ছিলাম নিরালায় কবিগুরু পদপ্রাপ্ত, এখন ভিড় ভরে গেছে।

গর্কির নামে প্রতিষ্ঠিত—গর্কি-সম্পর্কীয় বত-কিছু এই এক জায়গায় এনে রাখছে। হরেক পাণ্ডুলিপি একটা ঘরে—জানালা নেই ভারী দরজা, দেয়াল ডবল পুরু। হাতের কাছে টুকরোটাকরা যে কাগজ পেয়েছেন তার উপরে গর্কি কলম চালিয়েছেন। আবার চোড়া মাজিনে গোটা গোটা অক্ষরের পাণ্ডুলিপিও দেখছি। পরের পাণ্ডুলিপিও বন্ধ করে দেখে কাটকুট করে দিতেন—এমনি শত শত রয়েছে। চিঠিপত্রের সংগ্রহ—চেকভকে লেখা চিঠি, চেকভ যে সব উত্তর দিয়েছেন; বিপ্লবী গ্রামজী কুম্বর্ষার চিঠি, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইউরোপের এখান-ওখান থেকে গ্রামজী চিঠি দিতেন গর্কিকে।

গর্কির জিনিষপত্র শুধু নয়—সাহিত্যের গবেষণাগার। জাতবেজাত ভুলে হুনিয়ার তাবৎ সাহিত্য এই আখড়ায় জমায়েত হবে—গর্কির সেই মনোবাসনা। ইনষ্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচারস নামকরণটা গর্কিরই। বিশ্বভারতীর আদর্শ নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্ম ভবত্যেক নীড়ম্'—এখানেও সেই এক বস্তু। তিরিশ ভল্যুমে গর্কির বাবতীয় বই বেরুচ্ছে এই বছরের মধ্যেই। আর এক ভল্যুমে হবে গর্কির চিঠি। তিন লাগ করে ছাপছে আপাতত।

ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে বৃহৎ পাঁচ ভল্যুমে। ক্রাসি ও জর্ন সাহিত্যের ইতিহাসও তৈরি হচ্ছে। সোবিয়েতে বতস্তলো ভাষা চলিত, প্রতিটি ভাষা এ সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, প্রতিটি সাহিত্যের ইতিহাস লিখছে। বেশি নজর অবশ্য রুশ-ভাষা সম্পর্কে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের পুরানো রূপকথাও নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে সম্প্রতি।

( ২৭ )

ক্রেমলিনে চলেছি। কত শত বার গেছি সামনে দিয়ে, আজকে ভিতরে বাব। রেড-কোয়ার্টারের সামনে সদর গেট—ইতর লোক আমাদের ঐ পথে ঢুকতে মানা। বিস্তর কড়াকড়ি। ভিতরে ঢুকও সর্বত্র চলাফেরা করতে দেবে না। লেনিন যেখানে থাকতেন, হাল আমাদের কর্তারা থাকেন বেসিকটায়—দূর থেকে নজর তুলে যা দেখতে পান। অনেকটা পথ ঘুরে মস্কো-নদীর ধারে এসে পড়েছি। ক্রেমলিন নদীর উপরে, নদীর কিনারে ছোটখাট এক দুর্গ। তখন কেউ ভেবেছে, এত বিশাল হয়ে উঠবে কালক্রমে—এত খাতির, এমন নামডাক!



সাত পাহাড়ের উপরে মস্কো শহর। যে পাহাড় তার মধ্যে সকলের উঁচু, ক্রেমলিন সেখানে। শহর পত্তনের একেবারে গোড়ায় ক্রেমলিন তাকে ঘিরে দোকানপাট ব্যাপারবাণিজ্য ও লোকবসতিতে শহর ক্রমশ জন্মে উঠল। ছোট্ট এক দুর্গ—বারংবার চেহারা পাগটে আঁড়কে অভিনব ও বিরাটকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোবিয়েত-সরকারের মূল বাঁটি; যত কিছু শলাপবামর্শ বিচার-বিবেচনা এখানে বসে হয়। ভারি ভারি রাজনৈতিক সভা এখানে—আমাদের পণ্ডিতজীকে নিয়েও হয়েছে। টানা উঁচু পাঁচিল বিস্তর ঘরবাড়ি মাথা তুলে আছে, ভিতরে আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় গির্জা, পাঁচিলের উপর থেকে লম্বা লম্বা চূড়া উঠে গেছে চূড়ায় লাল-স্তার—এই হল ক্রেমলিন। মস্কো শহর, তাৎসৌবিয়েত দেশ এবং নিখিল ভূমণ দৃষ্ট তুলেতাকিয়ে আছে বহুশতাব্দী ক্রেমলিনের নিকে। পিরাট স্বাপত্য—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর বড় হয়েছে।

বড় বড় শিল্পীর মূল্যবান অঙ্কন ছবি—আর বহু বিচিত্র শিল্প-ভাণ্ডার, ঐতিহাসিক বস্তুর নিপুল সংগ্রহ। ক্রেমলিনের ভিতরে অরুজেনারা প্যালাটা—এ দেশের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। তাৎসৌ ক্রশশিল্পের, বিকাশ ও ক্রমোন্নতি এই একটা জায়গা থেকে মালুম হবে।—খাতব ও কুটিরশিল্প, হাতের কাজ, কাঠের কাজ, সোনারূপোর কাজ বিশেষ করে।

ঐতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পরীতির কত রসবদল হয়েছে, নিতান্ত উল্লাসী সোকারও নজরে না পড়ে উপায় নেই। এগারো শতক থেকে এই বিশ শতক—সাতশ’ বছরের ধারাবাহতা ছবির মতন দেখবেন। রাজ্য-রাজপুত্র রাজবধু-রাজকন্যা সামন্ত-সেনানীদের যাবতীয় বিলাসভরণ ও শিল্পসম্পত্তি সোবিয়েত আমলে এইখানে এনে জমা করেছে।

পিটার দ্য গ্রেটের তৈরি এই মিউজিয়াম। অস্বাভাবিক এক লিঙ্ক জার ও সেনানী-সামন্তর। সোল কিলোগ্রাম ওজননের ভারী অস্ত্রও আছে। রকমারি শিরদ্বাগ। বক্ষোভূষণ মণিমুক্তাখচিত। বিচিত্র কারুকর্মের কলস—সোল শতকের। তলোয়ার—পিটার দ্য গ্রেট ভারতীয় তলোয়ার ও ছোরা ব্যবহার করতেন, সেগুলো। তলোয়ারের বিচিত্র খাঁশ। নানা রকম যুদ্ধের বাজনা সেকালকার। ঘোড়ার বর্ষ, মানুষের বর্ষ। পনের-সোল শতকের বাসনকোশন। সোনার খালা। সোনা ও রূপার হরেক পাত্র, নাম বলতে পারব না। একটা পাত্রে সোনার ওজন পাঁচ সের হবে অস্বস্ত। হাতির দাঁতের কোঁটা। সোনা ও মণিমুক্তাখচিত কোঁটা। ঘড়িই বা কত রকমের; কাঁঠর ঘড়ি—প্রিটুকু মাত্র ধাতুর। আর এক ঘড়ি—আকারে বিশাল; মণিমাণিক্যে বোঁদের আভা বেরোর; ঘটা বাজলে ঈগল পাখি মুক্কা ফেলে দেয় মুখ থেকে; দরজা খুলে যায়; যে ক’টা বাজল, সেই অক্ষর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। পিটার দ্য গ্রেটের মন্তপাত্র, পোশাক। মণিমুক্তা-গাঁথা কত রকমের পোশাক—একটা পোশাকের ওজন প্রায় তিরিশ সের, এই গায়ে দিয়ে চলাফেরা করতেন। সোনার তৈরি মস্তবড় বাইবেল-কেস। বাইবেলের খাপ একটা-দুটো নয়, অনেক। রাজমুকুট, অভিব্যেকের জিনিষপত্র। হাতির দাঁতের সিংহাসন; মণিমুক্তা-বিজড়িত সিংহাসন। পিটারের বাপ রোমানভের সিংহাসন—চারটে হাতি, চতুর্দিকে, আর বিস্তর কারুকর্ম। সিংহাসনটা তৈরি হয়েছিল ভারতে, পারশ্বের বণিকেরা এনে উপহার দিলেন।

ঘোড়ার রাজকীয় সাজ, ঘোড়ার গায়ে দেবার পালকের কবল। সতের ও আঠার শতকের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি—নানা জায়গা থেকে উপহার এসেছিল এসব। শীতের বরফের উপর দিয়ে নিয়ে যাবার প্লেনগাড়ি। রাণী এলিজাবেথের শীতকালের গাড়ি—বাইশ ঘোড়ার টানত, পিটারবার্গ থেকে মস্কো পৌঁছতে লাগত তিন দিন। দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের গাড়ি, ফ্রান্সে তৈরি, ষাটভা ভায়ে স্ত্রী দেওয়ার দরুণ গাড়ি দুলাতে দুলাতে চলে।

সারা বেসান্ত দেখে শেষ করতে পারি নে। কত আর টুকব? কাস্ত হয়ে এক সময়ে ভাল ছেড়ে দিতে হয়।

বলেছি তো, ক্রেমলিনের ভিতরে খাসা খাসা গির্জা। খুব ভার-জারিনা তাঁদের ছেলেপুলে উজির-নাজির পুরুত-পাণ্ডা ধর্মকর্ম করতেন—অতএব অতিশয় বাহারের ক্যাথিড্রাল ক্রুশের যীশু ও মা মেরীর নামে। উসপেনস্কি ক্যাথিড্রালের ১৪৭৯ অঙ্কে পত্তন। বলগোভেন্সে-নস্কি ১৪৪৯ অঙ্কে এবং আর্ক এঞ্জেল ১৫০৯ অঙ্কে বানানো। এদের স্বাপত্য ও দেয়াল-ছবিগুলোর একবার নজর বুলিয়ে তাৎসৌ হয়ে আসুন। আর্ক এঞ্জেলের সাতশ শতক আশ্চর্য ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শিল্পীরা খেটেখুটে উদ্ধারকর্ম গ্রাণ শেষ করে এনেছেন।

তারপরে দেখুন ঢালাইয়ের কারুকর্ম। জারের কামান—কাঁসার কাছাকাছি একরকম মিশ্রধাতুতে তৈরি (১৫৩৬ অঙ্ক)। কারুকর্মে ভরা, বিরাট চেহারা, ওজনে চুরাশিশ টন। পাঁচ মিটার চৌত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা। বড় বড় শেল পাঁচশ মিটার অবধি যেতে পারে। তাহারের আদমশ ঠেকানার স্তম্ভ বানানো। কিন্তু শেষ অবধি এ কামান ব্যবহারের দরকার হয়নি।

পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের একটা আগে লেখেছি চীনের মহাপ্রাচীর। আর একটা এই এখানে—দৈন্ত্যাকার ঘটা। সেড় হল ছয় মিটার বাট সেন্টিমিটার, ওজন দু-শ টন। তুনিয়ার এর জুড়ি নেই। জারের ঘটা—গ্রানাইট বেলীর উপর রেখেছে, উপরে জারের ছবি। রূপা-তামা ইত্যাদি নানান ধাতু মিশিয়ে তৈরি। কারিগরের নাম আইভান মোটোরিন ও তার ছেলে মিখাইল। ১৭৩৩-৩৫ অঙ্কে এখানে এই ক্রেমলিনের ভিতরে তৈরি। ঢালাই হয়ে গেলে ঘনামাজার স্তম্ভ ক্রেমের উপর তোলা হল। সেখানে কারুকর্ম চসতে লাগল। ১৭৩৭ অঙ্কে মস্কোর ভগ্নাবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটা আত্মন বিঘম গরম হল; কাঁঠর ফ্রেমও পুড়ে ছাই। ঘটা পড়ল গিয়ে এক নালায় মধ্যে—মস্কো-নদীর জলে ভরতি সেই নালা। গরমে-ঠাণ্ডায় ঘটা ফেটে চৌচির। একটা টুকরো আলাদা হয়ে পড়ল, তার ওজন সাড়ে এগারো টন। পুরো একশ বছর ঐ নালায় পড়েছিল, ১৮৩৯ অঙ্কে তুলে নিয়ে পাথরের বেদি গেঁথে তার উপর রেখেছে। টুকরোটা পাশে।

আজকে আমার বহুতা। বিলাসবেলা, ভোকস অফিস। সাংস্কৃতিক দলের হয়ে এসেছি—ঘোরাফেরা এবং খানাপিনা করে গেলেই হল না, ট্যান্স দিয়ে বাও। সাংস্কৃতিক বচন শোনাও কিছু। ভাতের ডুমাই নাকি? পণ্ডিতের যুগে স্যাংক্রিটিক হয়ে আপডম-বাগডম

লিখলে শুধু চলে না, বলতেও হয় দেবার। জেবেছিলাম, বলব, আধুনিক বাংলা উপভাস নিয়ে। গতিক বুঝে বিষয় পালটেছি—‘গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব’।

কেমন বলছি। বাংলা সাহিত্য নিয়ে আপনাতা জাঁক করেন। জাঁক করবার বস্তুই বটে! বহু সাধনের জীবনসাধনায় মহাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। শবর রাখেন, বাহিরের কেউ আপনাদের পৌছে না? এটি রাশিয়াতেই দেখলেন গল্প-সংকলনের ব্যাপারে। ভারত-পাকিস্তানের গল্প বাছাই হল, তার মধ্যে বাংলা ভাষার একটি গল্প নেই—বাঙালির আছে মাত্র একটি, ভগানী ভট্টাচার্য। ওখানকার সাহিত্য-দিকপালদেরই প্রশ্ন: ঠাকুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও মরে গেছে নাকি? বুঝুন। মুশকিল হয়েছে, বাংলার কেউ ইংরেজিতে লেখেন না। লিখতেই বা যাবেন কেন? এমন স্বচ্ছ নমনীয় ভাষা আমাদের, মনের গুঢ় ভাবরঙ্গ ভাষায় এঁকে অবাধে প্রকাশ করতে পারি। হচ্ছ ও তাই। আর ওদিকে দেখুন, তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর লেখকেরাও শুধুমাত্র ইংরেজি লেখার শুণে আন্তর্জাতিক বাজারে কেঁটবিঠ হয়ে বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম। শুধু এই সোণিরেত দেশের ব্যাপার নয়, তামাম ইউরোপে চক্কোর দিয়ে এসেছি—অল্প পরে কা কথা, শব্দচন্দ্রের নামটাও জানেন না ইয়া-ইয়া সাহিত্য-ধুরন্ধরেরা। তুমিয়া আজ ছোট হয়ে একেবারে ঘরের উঠানে এসে বসল—সেদিকে চোখ-কান বুঁজে থাকবেন কত দিন?

তা খোলাখুলিই বলি, বন্ধুতার এটি যে নতুন বিষয়টি নিয়েছি, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যেন চোখ-রাঙানি এর ভিতর। বাপু তে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলে থাক, লাওয়ার্ত দিয়ে এনে যন্ত্রাশক্তি করছ সেই বাবদে—কিন্তু বাঙালি জাতের মন পাবে না বাংলা-সাহিত্যের অসহসা করো যদি। বাঙালির বড় গর্ব তার সাহিত্য নিয়ে। প্রাণ যন্ত্র দিয়েছে বাঙালি, পৃথিবীর কোন তল্লাটে বা কপনো ঘটেনি।

গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—পূর্বাঙ্গের একটা ইতিহাস ঠাঁড় করানো কঠিন ব্যাপার। বিশ্বের কাঠগড় পোড়ানো আশঙ্ক। দূর বিদেশে দোরাব্রির মধ্যে অবসর কোথায় তেমন? আর বন্ধুতার প্রয়োজনে ফরমাস মতো বইপত্র কে এনে দেবে জুটবে? শ্রোতারও সব সেবা মানুষ এখানকার। তবে সুবিধা আছে। জানাখণী তাঁরা যতই হোন, বাংলা সাহিত্যের কিছু জানেন না—নীরঞ্জন অধিকার দৃষ্টির সামনে। অতএব স্রীমুখে বা উচ্চারণ করব তাই তো বেদবাক্য ওদের কাছে। আপনাদের সামনে হলে—ওরে বাবা, কপাল ঘাম দেখা দিত, উঁ-খাঁ করতাম বিশ বার—কাঠগড়ায় যেন খুঁনি আসামি। মস্তো শহরে কিসের পরোয়া? ভাগ্যক্রমে পাণ্ডিত্য দেখবার একটুকু মওকা এসে গেছে, আপনারা উচ্চবাচ্য করবেন না এই নিয়ে।

একেবারে গোড়া ধরে শুরু করা গেল—চণাপদ থেকে, বাংলা সাহিত্যের যা প্রথম নিদর্শন। সাধনার এক বিশেষ ধারা নিয়ে কবিতা—সে ধারা গণসমাজেই। গণমানুষের অগণ্য জীবনচিত্র—জাল ফেলে মাছ-ধরা, হরিণ-শিকার, ডোম-চণ্ডাল-শবরের ঘরবাড়ি, অমুরাগ-বিরাগ গীতিকাব্যের মধ্যে বিজলী-চমক দিচ্ছে।

তুর্ক-বিজয়ের কথা হল। রাজনীতিক বিপর্যয় সন্দেহ নেই, কিন্তু

ধীরা শাসন করতেন, ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরা সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। সংস্কৃত সাহিত্য এতাবৎ উঁচু শ্রেণীর একচেটিয়া ছিল, সেই সাহিত্য লৌকিক রূপ পেতে লাগল। রামায়ণ-ভাগবত-বাংলা সাহিত্য তার ফলে লাভবান হয়েছে। সমাজের মাধ্যম থেকে মহাত্মার সর্ববোধ্য সহজ রূপ নিয়ে হাটে মাঠে বাটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; উন্নত সংস্কৃতির ফটক খুলে গেল গণমানুষের সামনে। তেমনি আবার বিশ্বের লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক আখ্যান মাজিত সাহিত্যিক রূপ পেয়ে গেল বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে। মানুষের কথার ভরা এই কাব্যগুলা। দেবতারও আছেন বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিত্যন্ত যত্রোয়া সম্পর্ক তাঁদের। স্ত্রীর সঙ্গে কোন্মল, আধিপত্য-বিস্তারের জন্ত ছলাকলা, পেটের দারে অতি সাধারণ বৃত্তি-গ্রহণ—মঙ্গল-কাব্যে মানুষ-দেবতার ভেদ নেই।

দীন-চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করা গেল—‘শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ মানুষের উপর কেউ নেই, দেবতারও নন—মানুষের মহিমা ঘোষণা করলেন বাংলার কবি। কুন্তিবাসী রামায়ণ বাম্বীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ মাত্র নয়, বাংলার কবির মনের রঙে রাঙানো অনুপম সৃষ্টি। অনেক উপাখ্যান আছে, বাম্বীকির রামায়ণে যার নামগন্ধ নেই। অথোধ্যা আমাদের বাংলা দেশেরই কোন এক জনপদ—রান-লক্ষণ-সীতা যেন বাঙালি তরুণ ছেলেমেয়ে। জনজীবনে কুন্তিবাসী রামায়ণের বিশেষ প্রভাব। বাংলার কুমারী মেয়ে কাননা করছে, সীতার মতন সতী হই, রামের মতন পতি পাই, দশরথের মতন স্বত্তর পাই, লক্ষ্মণের মতন দেবর পাই...

মওকা পেয়েছি, সহজে ছেড়ে দেব ওদের? বস্তুর বাগাড়ম্বর করে তো চৈতন্যযুগে পৌছানো গেল। নবীন গণতান্ত্রিকতার প্রাবন বাংলা সাহিত্যে। চিরকালের কবির অতীতকেই মনোমত করে আঁকেন, এঁরা কিন্তু পুণের বহুনির্মিত পাপময় কলিযুগকে প্রণাম জানালেন—‘প্রণাম কলিযুগ সর্বযুগ সার।’ সকল মানুষেরই অমেয় মূল্য স্বীকার করা হল—‘মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজ’।

মাইকেল মধুসূদনের প্রায় সমস্ত বই লেনিন লাইব্রেরিতে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি কবির মধ্যে মাইকেলকে জানে এরা। বোধ করি শুধুমাত্র তাঁকেই। মাইকেল ধরে নবীন বাংলা সাহিত্যের কথা শুরু করলাম। বাংলা-সাহিত্য কালের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে, সেই জন্তে এই সাহিত্য জনমনে এমন জীবন্ত। তখনকার দিনের সামাজিক ইতিহাসে ফরাসি-বিপ্লবের অতুল প্রভাব—মাইকেলের সাহিত্য-কর্মেও তার প্রেরণা দেখতে পাচ্ছি। ‘মেঘনাদবধে’ কবি রামায়ণের কাহিনী কালের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন—পুরানো নৈতিক মান একেবারে পালটে গেল। অনাচারী ঐশ্বর্যশালী রাবণ কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। ‘বীরঙ্গনা কাব্যের’ নায়িকারও চিরকালের রীতিনীতি মেনে নিতে পারছে না—বিদ্রোহিনী তারা। কাব্যের বহিরঙ্গও বিদ্রোহের ছাপ। পুরানো পদ্ধতির পন্থাগ্রস্তি ছেদন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল কাব্যলক্ষ্মীর শৃঙ্খল মোচন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। যুরোপীয় সংস্কৃতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, বঙ্কিমের সাহিত্যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ভারতের সাধনার পাদপীঠ যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—বঙ্কিম-সাহিত্যের এই

হল মর্যকথা। 'আনন্দমঠ' নামে উপজ্ঞানের একটা গান 'বন্দে মাতরম্'। বিপ্লবভূমি এই রাশিয়ায় হাজার হাজার তরণ-তরুণী প্রাণ দিয়েছে মানুষের মুক্তি-সাধনায়। আমার ভারতবর্ষও তেমনি বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জ্ঞা। বিশেষ করে বাংলা দেশে। ফুলের মতো বাংলার ছেলেমেয়েরা কারাগারে স্বাধীনতার নির্বাসনে কঁাসির মধ্যে গুলির মুখে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে মন্ত্রের মহিমা দান করলেন তাঁরা। 'বন্দে মাতরম্' সর্বভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত হয়ে উঠল।

বাংলার প্রথম কৃষক-অভ্যুত্থান নীলবিদ্রোহে। ষোল শোষক দলের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র চাষীরা রুখে দাঁড়াল। দীনবন্ধু এই নিয়ে নাটক লিখলেন—নীলদর্পণ। আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হল এই নাটকে। নীলকরের অত্যাচার দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ অবধি ব্যবসা গুটিয়ে দেশে পালাতে হল নীলকরদের।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু-চার কথাই কি বলা যায়? তাঁর সৃষ্টি দেশের সঙ্গীর্ণ গণ্ডিতে আটক হয়ে থাকেনি, বিশ্বমানবের সঙ্গে তিনি জাতীয় মানবের আত্মীয়তা সাধন কবলেন। বিজ্ঞানের দ্বায় দূর বলে কিছু নেই আজ হুনিয়ায়। সব মানুষের মধ্যে চেনা-পরিচয়, রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কে সকলের যোগাযোগ। এই বিশ্বজনীনতার এক বিচিত্র উপলব্ধি এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতের চিরন্তন সৌভাগ্য ও শান্তির বাণী প্রচার করলেন।

শব্দচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের কথা বলে ইতি করা গেল। বহুতা বড় হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া আর এগুলো বিপদ আছে। বইটাই কিছু নেই হাতের কাছে—ভ্রম বশে হয়তো বা স্রষ্টা ঈশ্বর কারো নাম বাদ পড়ে গেল, টের পেলে গেয়ে ফেলবেন তাঁরা আমরা। উপসংহারে এসে পড়েছি : বাংলা দেশ আজ খণ্ডিত, নানা সমস্যায় জর্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তবু কিন্তু বঙ্গের উন্নয়ন খণ্ডেরই জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের অতুল প্রভাব। বাঙালির কাছে অল্পের মতোই বাংলা সাহিত্যের আবগুক। বঙ্গভাষীর সংখ্যা ভারতের মধ্যে অনেক কম হয়ে গেছে কিন্তু বাংলা বইয়ের বিক্রি ভারতীয় কোন ভাষার চেয়ে কম নয়। কলম মাত্র উপজীবিকা অনেক লেখকের ; পাঠকেরাই তাঁদের পোষণ করেন।

নিজের বুক ঠুকে বলি, দেখছেন এই অধীনকে। পাঠকেরাই খাওয়ান পরান। চেহারা দেখে কি মনে হয়—খুব খারাপ খাওয়ান না তাঁরা, কি বলেন ?

হাসির ভোড়ে ঘর ফেটে যায়। কিঞ্চিৎ গায়ে-পাত্রে আছি

কি না, সেটা দেখিয়ে পাঠকদের মহিমা-কীর্তন হল। রোগা ডিপডিপে লেখকও আছেন—ঐ আসবে তাঁরা থাকলে মুশকিল হয়ে পড়ত।

পাকিস্তানের কথা উঠল। বাংলার তিন ভাগের দু'ভাগ পাকিস্তানে। রাজনৈতিক খড়গ মাটি আলাদা করে দিয়েছে, মানুষকে পারেনি। পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গিন একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষার জ্ঞা তরুণেরা প্রাণ দিলেন, রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ভালবাসা লিখে গেলেন। দেশে দেশে স্বাধীনতা ও ধর্মের জ্ঞা বহু জনে প্রাণ দান করেছেন। কিন্তু বাংলা চাই বলতে বলতে মাতৃভাষার জ্ঞা প্রাণ দেওয়া প্রথম এই পূর্ব-বাংলায় দেখা গেল। সকল বাঙালির তাঁরা প্রণম্য।

মোটামুটি এই হল বক্তব্য। সেই যে আমার ভাই—মাতুল ডানিয়েলচুক—রুশে তর্জমা করে বৃথিয়ে দিল। আপনারা হলে কত দূর-ছাই করতেন—ওরা কি বৃথল খোদায় মালুম—কীকি দিয়ে কিছু তারিখ কুড়িয়ে নেওয়া গেল। আমার পরে হীরেন মুখুজ্জে মশায়—তিনিও বাংলা সাহিত্য নিয়ে বলবেন। তিনি ছিলেন না, অল্প কোন কাজে বেরিয়েছিলেন, বহুতা শেষ হবার মুখে এসে পড়লেন। ছিলেন না ভাগ্যিস—গণ্ডিত মানুষ, অতুলন বস্তু। তাঁর সামনে কথাই সবত না মুখ দিয়ে। কামারের কাছে হুঁচ চুরি চলে না। কোন সভায় একদিন বলেছিলাম বাংলা সাহিত্য হুনিয়ার এক সেরা সাহিত্য। হীরেননাথ চুপি চুপি সমঝে দিলেন, হুনিয়া অবধি টানেন কেন, বড় বাড়াবাড়ি, গোটা ভারত ধরেই না হয় বলুন। আমি বলি, গতিক দেখছেন—হুনিয়ায় কেউ তো পৌছে না আমাদের। সাহিত্যকে আকাশে তুলে দিয়ে চলে যাই—ওরা খানিকটা বাদসাদ দিয়ে নিচ্ছে, যত দিন যাবে নানতে নামতে আকাশ থেকে ক্রমশ ধরালোকে পৌছেবে। এখনকার মতো পাতালের তলে আশা করি মুখ খুঁড়ে পড়বে না আবার। হীরেননাথ আন্দাজে ধরেছেন, কীপিয়েছি খুব আভ্যুত্থানও। শুরু করলেন তাই নিয়ে : আমার বন্ধু বোস মশায় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে বাড়িয়ে বলেছেন হয়তো—তা হলেও বঙ্গ সাহিত্য—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইরেজিতে বললেন। সে বহুতা টুকে আনি নি, টোকা অসম্ভব। অপকূপ বাচনভঙ্গি, খরশ্রোতে ছুটে চলেছে। লেগায় তারকিছুই বোঝা যায় না—কানে শুনেতে হয়, চোখের উপর দেখতে হয়। সেই অপরাধে দূর বিদেশের অজ্ঞাত পরিবেশে দুই বাঙালি ভ্রমরা প্রাণ ডরে বাংলা সাহিত্যের গুণগান করলাম। [ক্রমশঃ]

"জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিশ্বস্তির অঙ্ককারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে বা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে, তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

# চরজন

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ মহামান্য বিচারপতিরূপে ভূতপূর্ব বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ]

আইনের ক্ষেত্রে গৌরবের সঙ্গে ফসল ফলিয়েও শিক্ষার উর্বর ভূমিতেও সমান গৌরবের সঙ্গে পড়েছে বীজের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন সেই স্বর্গীয় সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে বখা—শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অমৃতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ক'টি নামের সঙ্গে আর একজন কীতিমান পুরুষের নামও অনাগ্রাসে যুক্ত করা যায়। আইনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্ধান্তদানে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টায় যিনি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের অধিকারী—তঁার নাম শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

বীরভূম জেলার কিরণহর গ্রামে শম্ভুনাথের জন্ম। স্বীয় মাতামহ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার (গঙ্গোপাধ্যায়) মহাশয়ের নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ে করেন প্রথম পাঠগ্রহণ। এর পর আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তাঁকে পাওয়া যায়, তারই মধ্যে একটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন শম্ভুনাথেরই পিতৃদেব স্বর্গীয় বিন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পাধ্যামৌ জেলা স্কুল থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে এলেন মহাবিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে পরিচিত হতে। প্রথমে পড়তে থাকেন ডাফ কলেজে (স্ট্রিট

চার্চস কলেজ), তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে। যেখান থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পায়ের মাধ্যমেটিকস্‌ও প্রথম শ্রেণীর প্রথম জন হয়ে এম-এ পরীক্ষায় হলেন সম্মানে উত্তীর্ণ। তার পর শুরু হ'ল কর্ম-জীবনের। জামহাঠ' স্ট্রীট অঞ্চলে একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল সেদিন। সেই বিদ্যালয়ে অল্পশাল্য শিক্ষাদানের তার পোলেন শম্ভুনাথ মাসিক পনেরো টাকা বেতনের বিনিময়ে। এই সময়েই স্ট্রিট চার্চস কলেজে অল্পশাল্যের বক্তার পদ গ্রহণ করেন তিন মাসের জুগে, পরে আরও একটি বছর তাঁকে সেই পদে থাকতে হয়। এই সময়ে তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শম্ভুনাথ। অধ্যক্ষ তাঁকে সিনিয়র প্রোফেসরের নিয়োগপত্র দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরেই এডিনবরা থেকে ঐ পদে নিযুক্ত হয়ে এক ভদ্রশাসকের আগমন ঘটে। পদভাগপত্র পেশ করে শম্ভুনাথ চলে গেলেন বর্ধমান আইন-বাবসারে আত্মনিয়োগ করতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (এরই মধ্যে আইন পরীক্ষাতেও শম্ভুনাথ সম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন)। কিন্তু বর্ধমান শম্ভুনাথকে ধরে রাখতে পারল না, সেখানকার পরিবেশ শম্ভুনাথের মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। চলে এলেন কলকাতায়। হাইকোর্টে একালতি শুরু করলেন, সেই সময়েই মাসিক একশো পঁচিশ টাকা বেতনে রিপণ কলেজে গণিতশাস্ত্রের বক্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ইংল্যান্ড যেতে হয় প্রিন্সি কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত একটি মামলার ব্যাপারে। সেইখানে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার বলে গণ্য হন। রিপণ কলেজও তাঁকে আইনের অধ্যাপকের নিয়োগপত্র দেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের দায়িত্ব ভার থেকে অব্যাহতি নেন শম্ভুনাথ। ব্যারিষ্টারীর চাপে তিনি বাধ্য হন অধ্যাপনা ছাড়তে, নয় তো অধ্যাপক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী। পশার চমৎকার জমতে থাকে। আইনজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি তাঁর ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে দূরান্তরে। এঁর জেরা করার অদ্ভুত ক্ষমতা আকৃষ্ট করেছিল বহু বিচারককে। সংগঠিত আইনজ্ঞদের। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিচারপতিরূপে বিচারপতিরূপে একদা ঘোষিত হল শম্ভুনাথের নাম। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গৌরবোজ্জ্বল কর্মমুখর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বিচারপতি শম্ভুনাথ। উপাচার্য হিসাবে নানা দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করে গেছেন শম্ভুনাথ। তাঁর অবসর গ্রহণোপলক্ষে তাঁর প্রতি অপরিমিত অমুভূতি বাক্য করেছিলেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ও স্বর্গীয় ডাঃ মেঘনাদ সাহা। এগারো জন উপাচার্যের অধীনে



শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজ করে শত্ননাথ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ (ভূতপূর্ব পৌরপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য) বলেছেন যে শত্ননাথের কর্ম-সাক্ষ্য কারোর থেকে কম নয় বরং বেশী। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি সম্মানজনক এল-এল-ডি উপাধি লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উপাচার্যের প্রাপ্য মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনের একটি কপর্দকও শত্ননাথ গ্রহণ করেন নি, যত দিন তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। শত্ননাথের নিজস্ব গ্রন্থাগার একটি ছিল। প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের। সেই সমগ্র গ্রন্থাগারটি তিনি উপহার দিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল এড সোসাইটিকে। ভারত সরকার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিন লক্ষ টাকা সাহায্য পেতেন। উপাচার্য শত্ননাথের প্রচেষ্টায় তার অল্প তিন থেকে বোলোর পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যের বিভাগগুলির পরিবর্ধন ও উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা তাঁর জর্নৈক পূর্বসূরীর দ্বারা সাধিত হয়েছিল কিন্তু সেই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সফলতা দেখা গেল শত্ননাথ যখন উপাচার্যের আসনে সমাসীন। ঐ বিভাগগুলির বর্তমান রূপের জন্তে দায়ী শত্ননাথ।

ভারতবরেণ্য আইনবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডক্টর রাধাবিনোদ পাল শত্ননাথের অবসর গ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্য বলেছেন—“This retirement will indeed be a great loss to the cause of higher education in West Bengal. For the last few years he was our centre of hope, not because of his being the centre of power in the University, but because of his wisdom. It will indeed be doing an ill-service to the reputation of an eminent lawyer, a splendid judge and an erudite Vice-Chancellor if I make any attempt here to make an estimate of the breadth of Dr. Banerjee's intelligent outlook and practical wisdom. He was indeed a lawyer who had mastered the technical learning of the law without being mastered by it.”

বিচারপতির আসন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শত্ননাথকে দেখা গেল ইনকাম-ট্যাক্স ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্যরূপে। স্বপ্রিয় কোর্টের ইন্তাহারে প্রাসঙ্গিক আইন সমূহ অচল ঘোষিত হওয়ায় এই ট্রাইব্যুনালের অস্তিত্বও শেষ হয়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কার্য নির্বাহক সমিতির সভাপতিরূপেও ইনি কয়েক বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজ কল্যাণ সমিতি ও বঙ্গীয় ক্রম-গণনিক সংস্থারও একজন সভ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবিধান সভায়ও ইনি একজন মনোনীত সদস্য (এম-এল-সি)।

শত্ননাথের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা স্বয়মামরী দেবীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। নিরহংকারিতা ও ধর্মানুশীলনের জন্তে ইনিও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

অসাধারণ মেধা ও প্রচুর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে জীবনের সিঁড়ি তিনি ধাপে ধাপে উঠে এসে আজ পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের মধ্যে

অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছেন। মেধা ও পরিশ্রম তাঁকে দিয়েছে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ নির্দেশ। অধ্যবসায় ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে নিয়ে গেছে প্রগতির মধুময় পথে। মানবতায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ তাঁর অন্তর। গত বছর যখন স্বগ্রামে পদার্পণ করেন শত্ননাথ তখন তাঁর সখ্যনা-সভায় আশে-পাশের গ্রাম মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার লোকের উপস্থিতি ঘটেছিল সেখানে। শত্ননাথের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের স্বীকৃতি তার মধ্যেই নিহিত নেই কি?

সমাজ-কল্যাণ সমিতির সভ্যরূপে গত বছরের অগাষ্ট মাসে ইনি বোম্বাই ও পুণার সমাজকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে বোবা, কালা, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাপিগ্রস্ত প্রমুখ অসহায় নরনারীর প্রতি পরিচর্যাগুলি পরিদর্শন করেন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলার অন্তর্গত এলাকাগুলিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শত্ননাথকে এক রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করেছেন। এই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে এবং অল্পকালের মধ্যেই যথাস্থানে প্রেরিত হবে। ইনি প্রথমে একটি কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও গাছ-পালা বিজ্ঞান বিষয়ক মহাবিদ্যালয়ের প্রবর্তন সমর্থন করেছেন, অবশ্য এর পরে আরও কয়েকটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দরলী শত্ননাথের অপরিমিত দান দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ লক্ষ নাগরিকের উপকারে আসছে, তাঁর একক দানে গড়ে উঠছে অনেকের ভবিষ্যৎ, অনেকের আশাহত জীবনে উজ্জ্বলতার ছোঁয়া লাগছে তাঁর অবদানে, তাই দিয়েই গড়ে উঠছে তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার বিজয়তোরণ, খোদিত হচ্ছে সাক্ষ্যের প্রস্তর, ফলক, আকাশকে আলিঙ্গন করছে সিন্ধির গৌরব-মীনার।

### শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

[ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ভারতীয় লোকসভার সদস্য ]

বেদ, বিদ্যা ও বিনয়—এই তিন ‘ব’ দিয়ে যার সৃষ্টি সেও আর এক ‘ব’, তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। জগতের মঙ্গল তাঁদের কামনা, মানুষের কল্যাণ কামনাই তাঁদের ব্রত, বিশ্বমানবাত্মার হিতসাধনেই তাঁদের আনন্দ। বাঙলার এই পুজনীয় ব্রাহ্মণকুলের গৌরবাবাহার পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিত পরলোকগত কালীকিঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায়। কালীকিঙ্করের যখন আঠারো বছর বয়স সেই সময় তিনি কলকাতায় এসে বসতি শুরু করেন। রেলগাড়ী তখন ছিল না—পায়ে হেঁটেই কলকাতায় আসেন কালীকিঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত।

১৯-১ সালের জ্যৈষ্ঠয়ারী মাসে কলকাতাতেই কালীকিঙ্করের পুত্র চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকার-স্বত্রেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, পিতার বিজ্ঞানরসিক পরিপূর্ণভাবে দেখা দিল পুত্রের মধ্যে। প্রথমে পাঠশালায় তারপর বৈদ্যাক্ষর-কেশরী শিবনারায়ণ শিরোমণির টোলে, তারপর বাঙলার প্রথম বোর্ডিং স্কুল এরিয়ান ইন্সটিটিউশানে (বর্তমানে সারদাচরণ এরিয়ান) পাঠগ্রহণ করে ১৯১৭ সালে উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা



পরীক্ষায়। টোলে শিক্ষাগ্রহণ কালে চপলাকান্ত মুখস্থ করে ফেলেন সমগ্র অমরকোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পারদর্শী চপলাকান্তের সম্যক পরিচয় হয়েছিল কুমারসমুদ্র ও উদয়মচরিতের সঙ্গে। প্রবেশিকা পরীক্ষান্তেই আরও এনেছেন বাম্মীকির রামায়ণকে। কলেজ-জীবনে পানিনি সম্বন্ধে পাঠ নেন পণ্ডিত চন্দ্রকান্ট নিশের কাছে।

১৯২১ সাল। বি-এ পড়ছেন চপলাকান্ত। পরাবীনতার জ্বালা শূঁতের নমন বিঁকেত মাথা দেখেই গায়ে। সেদিন সেই জ্বালা নিবারণ করতে সব চেয়ে আগ্রহ নিয়ে এসেছিল দেশের তরুণ সম্প্রদায়। তাকোণের মত প্রতীক এ যুগের অভিমত স্তম্ভচন্দ্র তখন জয় করেছেন দেশের চিত্ত, জাতীয় ভাগ্যাকাশে সেদিন পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ফুটেছেন কবি-পরি রবীন্দ্রনাথ, অন্তরের পুষ্পভূত সৌন্দর্য নিয়ে ভারতমাতা। মতিময় রূপ-কল্পনায় বিভোর হয়ে আছেন সাহিত্যাত্মক অবলোকনাথ, পদগদ্য ইংরেজদের স্বভাবস্বলভ অসৌজস্যতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে তাদের বিরত করে চলেছেন পুণ্ডরীক আশুতোষ, পরম প্রাচুর্যে সৌমিত বেড়াঙ্কাল ভেদ করে স্বা-পুণ্ডরীকতার হাত ধরে নিখিল মানবের পাশে এসে দাঁড়াছেন যুগ-কর্ষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাংবাদিকতার ধারা-সৃষ্টি করেছেন প্রাতঃস্বপ্নায় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই ১৯২১ সাল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের একটি স্মরণীয় বৎসর, ঠিক এমনই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আরিষভ হল এক ব্যক্তির। তাঁর নাম স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সাহিত্য ক্ষেত্রে এক জন শশস্বী পুরুষ স্বর্গত গান্ধীর আহ্বান থেকে চপলাকান্তও রাখতে পারলেন না নিজেকে দূরে সরিয়ে। কাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। পাঠ গ্রহণের হ'ল সাময়িক বিরতি। ১৯২২ সালে দেহবল্য করলেন পণ্ডিত কালীকান্দ্য। এই সময় পূর্ববঙ্গের বহু জেলা পরিভ্রমণ করেন চপলাকান্ত। বাঙলাদেশের মাটিতে মাটিতে ছড়িয়ে আছে মোহনীয় মাধুর্ষ, বাঙলার আকাশ-বাতাস-জল-স্থল-লসনা প্রত্যেকের মধ্যেই পুষ্পভূত রয়েছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, বাঙলার প্রতিটি ধূলিকণায় মাথানো আছে পরম ভট্টারকদের পবিত্র পদরঞ্জ। বাঙলাদেশ দেখতে লাগলেন তারই উত্তরকালের এক যশ-মণ্ডিত পুত্র চপলাকান্ত।

১৯২৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চপলাকান্ত, এ দিকে সাংবাদিক জীবনে রও হয়েছেন সূত্রপাত। ১৯২৫ সালে ফরোয়ার্ড পত্রিকায় শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগ দিয়েছেন চপলাকান্ত। ১৯৩০ সালে আইন পরীক্ষায় ও ১৯৪১ সালে বাঙলায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন চপলাকান্ত। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করলেন চপলাকান্ত। আইন ব্যবসায় শুরু করার প্রথমাবস্থাতেই তাতে ছেদ



শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

পড়লো। মালবাজীর অগ্নিনায়ককে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। ১৯৩৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চপলাকান্ত। সে সময় আনন্দবাজার সম্পাদন করতেন আদর্শ সাংবাদিক স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহোদয়। ১৯৪৪ সালে চপলাকান্তের নাম ঘোষিত হ'ল আনন্দবাজারের সম্পাদকরূপে। এ ছাড়া 'নিউ এরা' নামক একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক ও চপলাকান্ত সম্পাদনা করেছেন কিছু কাল।

সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ পূর্বাভূই বিবৃত করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মূল ধারা—চপলাকান্ত তাঁদেরই অন্যতম, প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি আনয়ন করেছেন তার বর্তমানের রূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ও সিন্ডিকেটের ইনি একজন সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তাঁর অক্ষয় কীতি এখানকার সাংবাদিকতার বিভাগটিকে একটি পৃথক ফ্যাকাল্টিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা। এই সাধু প্রচেষ্টার পূর্ণরূপায়ণ নবগঠিত সিনেটের দ্বারা সম্ভব হবে। এই বিভাগটির প্রথম অবস্থা থেকেই চপলাকান্ত এর সঙ্গে যুক্ত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকল্পে পৃথিবীর বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন চপলাকান্ত। জার্মানী, ফ্রান্স, মিশর, গ্রেট ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, ক্যানাডা ও এশিয়ার জাম, কম্বোজ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন চপলাকান্ত। গ্রন্থকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সুপরিব্যাপ্ত। কংগ্রেস ইন এজলিউশান, কংগ্রেস সংগঠনে বাঙলার দান, ইংরাজীতে ব্যাডক্লিক রোয়েদাদে বিচার, ভ্রমণ কাহিনী দক্ষিণ-ভারতে এবং কাব্যগ্রন্থ শেষ বসন্তে প্রমুখ গ্রন্থগুলির রচয়িতা তিনি। সুইজারল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ইনি যুক্ত, নয়াদিল্লীর নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক-সঙ্ঘ নিখিল ভারত বার্তাজীবী সঙ্ঘ, ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক সংস্কৃত পরিষদ পাটনার নিখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি একজন সভা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ইনি সম্পাদক। কলকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের ইনি সভাপতি। কবিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রবাসের সঙ্গেও এঁর সংযোগ বিস্তারিত। বর্তমান বছরে ভারতীয় লোকসভায় সভ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন চপলাকান্ত। পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে চপলাকান্ত অনুভব করেছেন যে ভারতের সাংবাদিকতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বিদেশের দরবারে। আমরা ওদের থেকে ছোট তো নই-ই বরং বড়ই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পেশা হিসাবে যারা সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়, অভিজ্ঞ সাংবাদিক চপলাকান্ত জানান যে, দায়িত্ববোধ ও বিচারবুদ্ধি এজগতের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু, তা যাদের আছে তাদের আগমনই এজগতের পক্ষে কল্যাণকর। স্বাধীন ভারতে সাংবাদিকতার যতটা উন্নতি হওয়া উচিত চপলাকান্তের অভিমতে তা মোটেই হয় নি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, কর্মব্যস্ত চপলাকান্তের সমীপে আগমন হতে থাকে দর্শনার্থীদের, আর স্বার্থপরদের মত তাঁকে আটকে রাখা যায় না। নব্রত্নতার প্রতিমূর্তি, যুগভাবী চপলাকান্তের কাছে বিদায় গ্রহণ করি। এসে দাঁড়াই প্রশস্ত রাজপথে, এক-পা, দু-পা

করে শুরু করি যাত্রা, সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে থাকি আমার গন্তব্য অভিমুখে।

### শ্রীমনীশ ঘটক (যুবনাথ)

[স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্য-শিল্পী]

জীবন সম্পর্কে নির্বিচার ঔদাসীণ্যই শিল্পীকে বে-পরোয়া করে।

ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের হেলাফেলার অন্ত থাকে না। প্রতিভার প্রদীপে তেল-স্নাতের প্রাচুর্য সবেও শিল্পীর চিরন্তন খেয়াসৌপনায় নিজেকে নিঃশেষে শিখাইন করে, বঞ্চিত হয় কাল ও সমাজ। শিল্পিজীবনে এইটাই বোধ হয় চরম ট্রাজেডী।

এই ট্রাজেডীর অলস্ত স্বাক্ষর যুবনাথে।

আকস্মিক সাহিত্যের আকাশে তাঁর আবির্ভাব, বিদ্রোহের বাঁকা তলোয়ার হাতে। অথচ পরিচালনার সংযমের দৃঢ়তা, আবার আকস্মিকতার ছড়াছড়ি তাঁর জীবনে।

বাংলা সাহিত্যে তখন প্রবল আলোড়ন। প্রথর রবিরশ্মির প্রভাবমুক্ত হবার সীমাহীন বাসনা নিয়ে একদল তরুণ স্রষ্টার তপশ্যায় রত। ধর্মে ও আচরণে পৃথক হয়েও স্বভাবে এক ছিলেন অনেকটা ইয়ং বেঙ্গলের উত্তরসূরী। যুবনাথ এদের একজন।

যুবনাথ সাহিত্যে ছদ্মনাম—আসল নাম মনীশ ঘটক। ১৯০২ খৃঃ ১ই ফেব্রুয়ারী পাবনা জেলার নতুন ভারেকা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারী কর্মবাপদেশে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায়। কৈশোর পিতার সঙ্গে সঙ্গেই কাটে। পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-কর্ণফুলীর তীরে তীরে পড়েছে তাদের ছাউনি। খাল বিল নদী নালায় ভরা শ্রামল পূর্ববঙ্গ ও রুক্ষ শুষ্ক তাপদগ্ধ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মনীশ বাবু ছেলেবেলা থেকে ঘুরে বেড়িয়েছেন—এর মধ্যে কোনটির প্রভাব তাঁর কবি প্রতিভার উল্লেখের কারণ ও সহায়ক সেটা বলা দুঃসাধ্য। কারণ তাঁর সামাজিক কাব্যজীবনের মূল সুর বিদ্রোহের বজ্রনাদ ভরা। যা কিছু অগ্নায় অসত্য বা নিছক বঞ্চনা ও অশোভন দানত—তাঁর নির্মম বাঁকা তলোয়ারে সে সব রক্ষা পায়নি। অথচ অস্ত্রে আছে এক অনির্বচনীয় প্রেমের সুর। যা বাস্তবকে সূন্দর করে, শোভন করে, মধুর করে। যা বিপ্লবী ক্রিষ্ট ও হতচেতন মনে জীবনের বলিষ্ঠ আশা আকাঙ্ক্ষা জোড়াক। স্তব্ধতা কল্পনায় তিনি বারি-ঝর-ঝর শ্রাবণ মেঘের অভিসারী—ব্যঙ্গনায় রৌদ্রদগ্ধ আকাশের মতো নির্মম। প্রগলভ ভাবানুভূতির প্রশ্রয় আদৌ তিনি দেননি। কল্পনা ও ব্যঙ্গনার এই বিপরীতমুখী সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাব্যে ও জীবনে।

১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এবং সেখান থেকে বিএ পাশ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু। সহাধ্যায়ী বিজয় সেনগুপ্ত সহ ১৯২৩-২৪ সালে মনীশ বাবু কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। এবং যুবনাথ ছদ্মনাম গ্রহণ করেন!

মুখ্যতঃ কবি হিসাবেই মনীশ বাবুর পরিচয়। যদিও তাঁর “ভূখা ভগবান” নামক ছোট গল্প তৎকালীন পাঠক সমাজের প্রভূত অভিনন্দন লাভ করেছিল এবং সিগনেট প্রেস সংকলিত Modern Bengali short stories এ তাঁর গল্প স্থান পেয়েছে। তবুও মনীশ বাবু

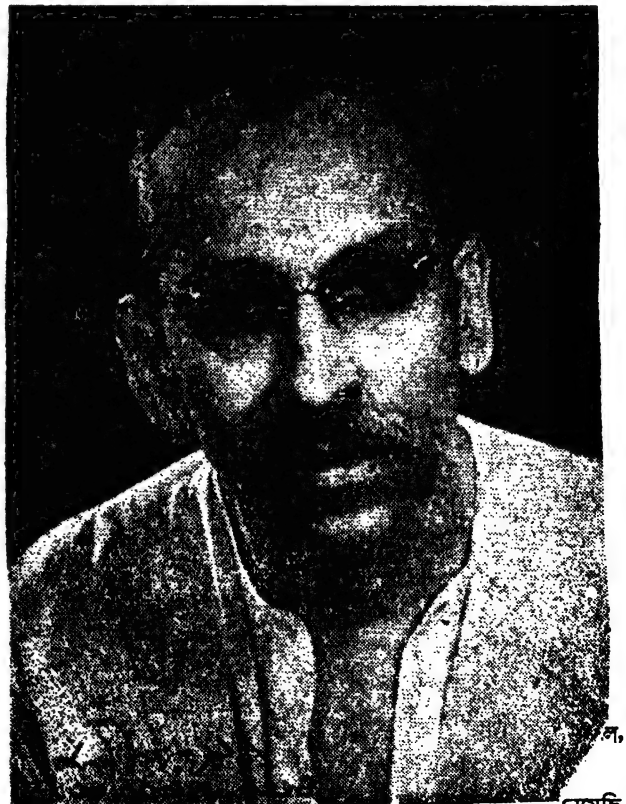
নিজেকে কবি হিসাবে পরিচিত করতে চান। ১৯৩৫-৪০ পর্যন্ত প্রধানত তাঁর একটানা কাব্য পরিচয়। এই সময় ‘বিপ্লবান্তরী’ ‘কবিতা’ ‘প্রবাসী’ ‘পরিচয়’ প্রভৃতি পত্রিকার তিনি লেখকগোষ্ঠীর একজন।

অজিত চক্রবর্তী এবং বোম্বাই প্রবাসী ইকনমিক উইকলির সম্পাদক শ্রীশচীন চৌধুরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে তাঁরা মনীশ বাবুকে কাব্যচর্চায় প্রবুদ্ধ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীবৃন্দদেব বসু ও শ্রীশ্রীধর দত্তের উৎসাহ ও উদ্বোধনায় তাঁর কাব্যজীবনের বিকাশ শুরু হয়। ১৯৪০ এ শ্রীমন্দল বসু অঙ্কিত নামচিরসহ তাঁর প্রথম কবিতার ষট শিলালিপি প্রকাশিত হয়।

শিলালিপি প্রেমের কবিতায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা কাব্য পরিচয়’ সিগনেটের ‘বাংলা কবিতার সংকলন’ বৃন্দদেব বসুর ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ আবু সয়ীদ আউদুব সংকলিত পচিশ বছরের প্রেমের কবিতা ইত্যাদি গ্রন্থে মনীশ বাবুর কবিতা স্থান পেয়েছে, ১৯৫৫এর মাসিক বহুমতীতে তাঁর কাব্য জীবনের অগ্রতম দুটি কবিতা “বেয়ালিশ ইঞ্চি ছাতির তলার বেয়ালিশ হাজার জানোয়ার” ও “ওমিক আন্দামান” প্রকাশিত হবার পর—কাব্যচর্চায় ছেদ পড়ে।

১৯২৭ খৃঃ আরকর বিভাগে তাঁর কর্মজীবন শুরু। চাকুরি জীবনে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। স্বভাবের গভীরে স্তম্ভ বিদ্রোহী সত্তা তাঁর কর্মজীবনকে ব্যক্তিগত নিরাপদ হতে দেয়নি।

পারিবারিক জীবনটিও তাঁর শিল্প ও সাহিত্যের পরিবেশে স্নিগ্ধ, নৈনন্দিন জীবনের ঘরে-বাইরে তার ছোঁওয়া সম্পৃষ্ট—এ বিষয়ে বহু



নেমেছি  
ন তো

শ্রীমনীশ ঘটক

শিল্পীর চেয়ে তিনি ভাগ্যবান। সহধর্মিণী ধরিত্রীদেবী জয়শ্রীযুগের স্নলেখিকা। জ্যেষ্ঠাকল্পা শ্রীমতী মহাশেতা ভট্টাচার্য অধুনা বহু সাহিত্যের অন্ততম লেখিকা। দ্বিতীয় কল্পা শাশ্বতী মিতুল ঘটক নামে Eve's weekly (বোম্বাই) কাগজের শিল্প নির্দেশিকা; সফল মঞ্চ ও চিত্রনাট্যের রচয়িতা বিজ্ঞান ভট্টাচার্য তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা।

চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণান্তে মনোশ বাবু বর্তমানে বহরমপুরের নিভৃত কুটির বসবাস করছেন। প্রবন্ধ-পাঠ্যমুদ্রাগ; অথচ লেখার বিষয়ে দারুণ ঔদাসীন্য। হয়তো প্রচণ্ড আত্মবিশ্লেষণই তাঁর নিয়মিত রচনার আসল প্রতিবন্ধক। এ প্রশ্ন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মনোশ বাবুর ললাট মাঝে মাঝে রেখায়িত করে।

সাময়িক ব্রতচ্যুত যুবনাথের সাহিত্যচর্চায় পূর্ণহৃদ পড়েনি। কাব্যলক্ষ্মীর সুরঝংকার আজও তাঁকে আকুল করে তোলে। আবার বঙ্গ-সাহিত্যের রাজপথে বোড়সওয়ারের ভূমিকায় চাবুক হাতে তাকে দেখা যাবে—এই বহু প্রত্যাশিত আশ্বাসই তিনি দিয়েছেন,—আবার তিনি বলবেন :—

কশাও চাবুক কশাও বোড়সওয়ার

হাতে থাক খোলা ভাস্পা সে তলোয়ার।

বিজলী-ঝলক ঝলসাক ইম্পাতে।

পুড়ে ছিঁড়ে যাক কালোরাতে সাথে সাথে।

সবল পেঙ্গি কি গাহিয়া ওঠে না গাথা।

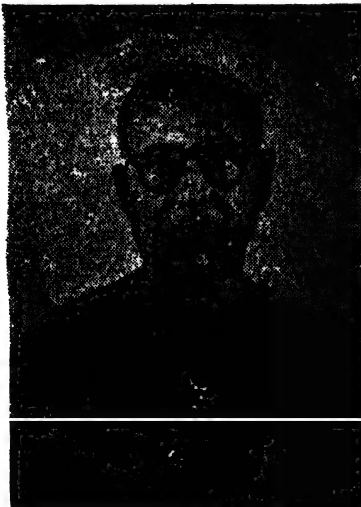
আঙুন জলে না শুকু আঁখির কোণে

কলিজার খুনে ফোয়ারার হাহাকার ?

### জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

[ সমাজসেবী ও বেন্টিং-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা ]

১৮৮১ সালে শ্রীলাহিড়ী হুগলী জিলার অন্ততম মহকুমা সহর শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়সে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বহরমপুরে আসিয়া স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এস-সি পাশ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এসসি ক্লাসে যোগদান করেন এবং ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় বিপ্লবী দলের নির্দেশে ১৯১০ সালে তাঁহাকে আমেরিকা যাত্রা করিতে চাপ পশ্চিমধ্যে জাপানে ব্যবসায়িক বিহারী বন্দ্র প্রমুখ প্রথমানের সহিত তিনি



জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

কিছুকাল অতিবাহিত করেন। আমেরিকা মহাদেশে পৌছাইয়া তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী অকলস্‌ তারতীয় বিপ্লবী-সংস্থা প্রসিদ্ধ “গদর পার্টি”র নেতাদের সহিত সংযোগ-স্থাপনা করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। ১৯১৩ সালে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করিয়া যখন তিনি উক্ত শিক্ষা-নিকেতনে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণামূলক কার্যে লিপ্ত ছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাসমরের রক্তদ্রাওব আরম্ভ হইয়া যায়। এই স্রবোগে ভারতে বিদেশী শাসকদের চরম আঘাত হানিবার জন্ত স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্যরা প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময় ইউরোপীয় শাখার নির্দেশে জিতেন্দ্রনাথকে জাৰ্মানী অভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। বালিনে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজেকে পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী জাৰ্মান নাগরিকরূপে পরিচয় দেন এবং পূর্বে ব্যবস্থানুযায়ী “ধনসামগ্রিক কার্যে বিক্ষোভক স্রব্যের ব্যবহার-বিধি ও প্রয়োগ-কৌশল” নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করিতে থাকেন। কয়েক মাস পরে জাৰ্মান সরকারের সাহায্যে গোপনে আমেরিকা হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দলের নির্দেশে শ্রীলাহিড়ী স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কুখ্যাত তিন আইনে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া ইংরাজ সরকার একটি জাহাজ জাহাজ আটক করেন এবং অপরটি হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বালেশ্বরের সন্নিকটে অস্ত্রশস্ত্র নামাইবার সময় বিপ্লবীদের সহিত সরকার পক্ষের এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হয়। উহাতে বিখ্যাত বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলে নিহত হন, দলনেতা ‘বাঘাযতীন’ সাজ্জাতিকরূপে আহত হন এবং মনোরঞ্জন ও নীরেন ধৃত হন। স্রুপ্রচেষ্টার এইরূপ বিপর্যয় এবং চার জন সহকর্মীর এইরূপ পরিণতি কারাভাস্তরে অবস্থিত অসহায় জিতেন্দ্রনাথকে অতিশয় বিচলিত করিয়া তোলে। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে শ্রীলাহিড়ী মুক্ত হইয়া আসেন। তৎপরে তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার মাধ্যমে বিদেশী শাসন ও শোষণ বন্ধের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বিদেশী স্রব্য বয়স্কট উপলক্ষ্যে তখন ভারতবর্ষে নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। অনুসন্ধিৎসু জিতেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে শিল্পায়নের অপরিহার্য অঙ্গ বেন্টিং এর প্রচুর চাহিদা বিদেশ হইতে আমদানীর মাধ্যমে মিটান হইয়া থাকে। ফলে, দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। তজ্জন্ত রাসায়নিক জিতেন্দ্রনাথ স্বচেষ্টায় শ্রীরামপুরে ভারতের প্রথম বেন্টিং শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। উহা পরিচালনায় বহু বাধা বিপত্তি আসা সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা জিতেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক অধ্যবসায় বর্তমানে উহা বাংলা তথা ভারতের নিজস্ব শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এবং প্রায় দেড় হাজার পরিবার প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর “ভারত-ছাড়” আন্দোলনে জড়িত সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হইলে জিতেন্দ্রনাথ উহার প্রতিবাদ করেন। ফলে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখেন। ১৯৪৫ সালে মুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্র হইতে বিধান সভায় এবং ১৯৫৭ সালে উহার লোকসভা কেন্দ্র হইতে এম. পি নির্বাচিত হন।

# বাজায় বাজায়



উদয়ভানু

উপলব্ধিগতী গঙ্গার জলকল্লোলের একটা অক্ষুট শব্দ যেন কখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁর জললে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। পূর্ণ শুভ্রতিথির জ্যোৎস্না-আলোর জল্লোর দুর্ভেদ আঁধার ঘোচে না। অরণ্যচারী পশুর উজ্জল চোখ সহসা আলোর ঝিলিক তুলে অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিক আগে ঢেঁড়া পিঠাছে তাঁর বাসিন্দারা; কাছাকাছি কোথায় হয়তো বাঘের ভয় দেখা দিয়েছে। ফেউ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়া পিটে পিটে গ্রামের মানুষকে সাবধানী নিশানা শোনানো হয়েছে। রাত্রি গভীর হওয়ার ফেউয়ের ডাক থেমেছে এখন। বাঘ পালিয়েছে বনের মধ্যে।

বাঘ না বাঘিনী! কুমারবাহাদুরের সংঘত মনটা মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; চোখের রাশ আগলা হয় থেকে থেকে। প্রথম দেখায় যেন দেখতে পেয়েছেন কাশীশঙ্কর, এ মেয়ের মুখে যেন সম্রাজ্ঞীর লক্ষণ। এই ঘোর বিপদের রাতেও তার চোখে যেন ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন নেই।

—সদাঁর, দেবী কত আর?

কথার সুরে ভ্রমকি দিলেন কুমারবাহাদুর। সারা বজ্রার লোকজন সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলো সহসা। সবুর সহ হয় না কাশীশঙ্করের। মুখ থেকে কথা খঁসলে আর যেন স্থির থাকতে পারেন না। বজ্রার শব্দ গতি, তাঁর থেকে মধ্যগঙ্গার ভাসতে ভাসতে একটি প্রহর হয়তো উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সূক্ষ্ম অশ্বারোহী কুমারবাহাদুর, বিদ্যাতের মত দ্রুততম বেগে ঘোড়া ছোঁটাতে পারেন। হঠাৎ যেন এক দৈবপ্রেরণায় তিনি চকল হয়েছেন অতিমাত্রায়, তাঁর পেশীবহল দীর্ঘমেহে খুশীর জোয়ার নাচতে থাকে যেন। কি এক পণরক্ষার কাঠি ফুটেছে স্বপ্ন চিবুকে। মাঝে মাঝেই চিবুক স্পর্শ করছেন। চিন্তায় আকুল চোখে রহস্যময় চাঁটনি ফুটে আছে।

বজ্রার কাঠের পাটাতনে খটাখট আঘাতের শব্দ ওঠে। হাল আর দাঁড় তোলাপাড়া করছে মাঝিরা। সদাঁরও চেঁচিয়ে উঠলো। বললে,—দেবী নাই হজুর!

হলুদ-ছোপানো কাপড়ে মানিয়েছে বটে আনন্দকুমারীকে। মাথায় সামান্য ঘোমটা দিয়ে কাপড়ের আঁচল এঁটেসেঁটে কোমরে জড়িয়েছে। ভিজ়ে চুলের বোঝা এলিয়ে দিয়েছে পিঠে। ডুব-সাঁতারের কষ্টে এখনও যেন থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠছে।

পানের ডাবেরটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—ইচ্ছা হয়তো দু'টা একটা পান—

কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। আয়েসের হাসি হেসে দু'টি

তাম্বুলমাথা পান মুখে দেয় চৌধুরাণী। বলে,—মহাশয়ের আসল পরিচয়টা শুনা হয় নাই এখনও।

মশালের আলোর আর একবার দেখলেন কাশীশঙ্কর। চৌধুরাণীর মুখখানি দেখতে দেখতে বললেন,—আমি তেমন কেউ খ্যাতিমান নই। পরিচয়টা আপাতত গোপন থাক।

এক থলি টাকা পেয়েছে মাঝি-সদাঁর। হাতে হাতে পেয়েছে শালুর থলি, ভারী ওজনের। রাতের আবেশে তন্দ্রা-নামা চোখে ঘুমের বদলে উৎসুকতা ফুটেছে। ঘুমন্ত মাঝিদের লাথি মেয়ে মেয়ে ঠেলে তুলছে। যারা ক্লান্তি আর ঘুমের ঘোরে উঠতে চায় না, তাদের চোখের সামনে লাল শালুর থলি ধরছে।

জগমোহন লেঠেল মুখ উঁচিয়ে বললে,—কুমারবাহাদুর, মাংসটা সিদ্ধ হ'তে আরও একটুক বিলম্ব হবে।

তিনটি চুল্লীতে ভাত, ক্ষীর আর মাংস চেপেছে। কাঠের আগুন জ্বলছে লেলিহান শিখা ছড়িয়ে। গন্ধে গন্ধে আশেপাশে শিয়ালের দল এসে জুটেছে। ঘোড়ার মধ্যে লুকিয়ে গৌক চাটছে লোভে লোভে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—একটা আটসেরী ছাগ সিদ্ধ হ'তে রাত্রি কাবার হবে না কি? চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। ভাত আর দুধটা নেমেছে কি বলতে পারো?

—এখনই নামবে হজুর! জগমোহন লেঠেলও কথা বলে ভয়ে ভয়ে। মালিককে দেখলে তাব সকল শক্তি যেন উবে যায় দেহ থেকে। এত দাপট কোথায় অদৃশ্য হয়।

—যাও যাও, চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। কথা বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কুমারবাহাদুর। বজ্রার ছাদে পায়চারী করতে থাকেন। আনন্দকুমারীর উদ্দেশে বললেন,—তোমার পিতার সঙ্গে কোথায় দেখা হয় বলতে পারো?

কয়েক মুহূর্ত স্থির ব'সে থেকে চৌধুরাণী। সভয়ে মিহি কণ্ঠে বললে,—কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?

আপন মনে হাসতে থাকেন কাশীশঙ্কর। তাঁর মনে কি এক ভাবের উদয় হয় যেন। পায়চারী থামিয়ে হাসি লুকিয়ে বললেন,—বিপদের ভয় নাই কিছু, প্রয়োজন আমার ব্যক্তিগত।

মুখের পাণ আর তাম্বুল বিশ্বাদ লেগেছিল যেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথাটি শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেললো আনন্দকুমারী। বললে,—বাবামশাই হুতালুটি থেকে ফিরে আসেন তো দেখা হবে।

অল্প হাসির জের টেনে কাশীশঙ্কর বললেন,—ব্যবসায় নেমেছি আমি। চৌধুরীমশাই যদি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন তো আমাদের মত মানুষ ধন্য হয়ে যায়।

নব্রমিষ্টি হাসি হাসলো চৌধুরাণী। আনত চোখে বললে,—  
আপনারা রাজা বাদশাহ, আপনাদের কাছে বাবামশাই তো নেহাৎ  
নগ্ন।

কৌতূহলী হাসি চাপলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—তত্ত্ব-সিঁহাসন  
নাই তথাপি রাজা বাদশাহ !

আনন্দকুমারী বললে,—মহাশয় যদি পরিচয় গোপন করেন আমি  
আর কি বলতে পারি ? বিদ্যাবাসিনী শুনেছি রাজার মেয়ে।  
আপনি তো বাজকন্ঠার সহোদর ?

কুগ্রিম গান্ধীধ্বজ সঙ্গ মুখে তজ্জনী চেপে কালীশঙ্কর বললেন,—  
চুপ ! কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। মান্দারনের বাসিন্দা আমার  
পরিচয় জ্ঞাত হ'লে কাথা উদ্ধার হবে না। কথা বলতে বলতে  
খানিক খেমে আমার বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, তোমাকে একটা  
কাজে নিযুক্ত করতে চাই।

যুক্তকর বৃকে ঢেকিয়ে চৌধুরাণী বললে,—ছকুম করুন জাঁহাপনা।  
সামর্থ্যে যদি কুলায় আমি পেছপাও হবো না।

—না না, পরিহাস নয় আনন্দকুমারী ! কথা বলতে বলতে  
আবার পায়চারী করতে থাকেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—তোমার  
দ্বারা কাজ উদ্ধার হয় তো রক্তপাত হয় না আর। তোমার উদ্দেশ্যটা  
এখন ব্যক্ত কর, তুমি কি স্বগৃহে যেতে চাও ?

—না না জাঁহাপনা, গৃহে আর ঠাই হবে না আমার।  
চৌধুরাণীর মুগের হাসি মিলিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। বলে,—  
আমার মা ঠাকরুণ আর কি আমার মুখ দেখবেন ?

—তবে তোমার গন্তব্য কোথায় তাই বল।

ঈষৎ বিষয়ের সঙ্গে কালীশঙ্কর শুধালেন।

—মান্দারণেই ফিরবো আমি। তবে গৃহে আর ফিরবো না।

—কে আশ্রয় দেবে ? সাগ্রহে বললেন কুমারবাহাদুর।

আনন্দকুমারী শুরু হয়ে যায় ; মুখে কথা ফোটে না। আকাশের  
চাঁদের দিকে সলাজ চোপ তুললো। চন্দ্রকান্তকে মনে পড়লো।  
একবার তাঁর কাছে শেষ-আশ্রয় চাইতে দোষ কি ? চৌধুরাণীর  
সুপ্ত মনে সহসা প্রতিহিংসার জ্বালা ধরে যেন। ঘোর বিপদের মধ্যে  
ঠেলে ফেলে দিয়ে মৃত্যু আর সমাজের ভয়ে পালিয়েছেন চন্দ্রকান্ত।  
ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফণা তুলে একবার তাঁকে দংশাবে না আনন্দকুমারী !  
কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মত চৌধুরাণী বললে,—দেখা যাক, কে আশ্রয়  
দেয় ! মরি কি বাঁচি।

কালীশঙ্কর বললেন,—আমি যে এখন তোমার সাহায্যপ্রার্থী।  
কাথা উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত কে তোমাকে মুক্তি দিবে ?

ইদিক-সিঁদিক দেখলো চৌধুরাণী। স্তিমিতকণ্ঠে বললে,—যদি  
বলি একটা আশ্রয় না হয় মহাশয় আপনিই দেন ? আমার দ্বারা  
কোন উপকার হয় তো আদেশ অবগুই পালন করবো।

পায়চারী খামিয়ে কেমন যেন নিকটে এগিয়ে আসেন কালীশঙ্কর।  
আনন্দকুমারীর কাছে এসে বললেন,—বিদ্যাবাসিনীকে চাই আমি।  
কুসুমারের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করতে চাই। বিদ্যাকে  
পাই তো তোমাকেও আশ্রয় দিতে পারি।

খিল খিল শব্দে হঠাৎ হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে  
হাসতে বললে,—আশুত্ব হলাম কুমারবাহাদুর ! আশার আলো দেখতে  
পেলাম।

স্নেহের সুরে কালীশঙ্কর বললেন,—বিদ্য আর তুমি একত্রেই  
থাকতে পারো মৃত্যুভূমিতে, আপত্তি হবে না কারও। কিন্তু তুমি  
চৌধুরীর মেয়ে, তুমি কোন্ হুণ্ডে অন্তের ঘরে বাস করবে ?

চৌধুরাণী হেসে হেসে বলে,—মান্দারণে ঠাই না পাই তো  
মৃত্যুভূমিতে যাবো আমি। আপনাদের চরণে থাকবো। যাই  
হোক, মনে হয় আপনি এখন খুবই বিচলিত। স্থির হোন আপনি,  
উদ্দেশ্য আপনার সফল হবেই। আমি সাহায্য করবো সাধ্যমত।

আসনে বসলেন কুমারবাহাদুর। পাণের ডাবর থেকে ক'টা পাণ  
তুলে মুখে দিলেন। বললেন,—এতক্ষণ আমি স্বস্তি বোধ করছি।  
মান্দারণের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। অজ্ঞাত স্থান থেকে  
একজন বন্দীকে মুক্ত করা সহজ কর্ম নয়।

—তাই বলি, আপনি এত ব্যস্ত হন কেন ?

—আর ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই ! তোমার সহায়তা পেয়েছি,  
আর কিছু চাই না আমি।

—আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর হাত থেকে। আমি  
কখনও ভুলতে পারি না উপকারীকে।—এই পৃথিবীতে কে কাকে  
রক্ষা করে ?

বজ্রার ছাদের সিঁড়িতে জগমোহন দেখা দেয়। বলে,—ছকুম,  
বজ্রা জলে ভাসিয়ে দিক তবে ?

কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ। একটা কথা একশো দফায়  
বলতে পারি না আর।

এক-খলি টাকা পেয়েছে মাঝির দল। এই ঘোর নিশীথে নৈশ  
অভিযানে তাদের উৎসাহের অভাব হয় না। মাঝির দলকে গাঁজা  
খাইয়ে দিয়েছে জগমোহন লেটেল। তামাকের কলকয়ে গাঁজা ভঁরে  
ভঁরে খাইয়েছে।

বজ্রা জলে ভাসলো প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে। তীর থেকে গভীর  
জলে ডুপতেই চৌধুরাণী বললে,—কুমারবাহাদুর, একটা যদি প্রশ্ন  
করি, উত্তর দিবেন কি ?

—আলবৎ দেবো। কথা বলতে বলতে একটি তাকিয়া টেনে  
নিয়ে ঠেস দিয়ে বসলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—আমার জীবনে  
গোপনীয় কিছুই নাই।

সম্মতি পেয়ে ইদিক সিঁদিক দেখতে থাকে চৌধুরাণী। ফিস-ফিস  
কথা বললে,—মহাশয় কি বিবাত করছেন ?

হঠাৎ অট্টহাসি হাসলেন কালীশঙ্কর। হাসতে হাসতে বললেন,—  
আজ নয়, বহুকাল পূর্বেই এই গর্হিত কাজটা সমাধা করেছি।  
আমার একটি কণ্ঠা আছে, তার নাম বনলতা, বনবালা, বনমুন্দরী।

মনে মনে আহত হ'লেও মুখে শুধু হাসি ফোটায় আনন্দকুমারী।  
বলে,—বনলতার মা কোথায় আছেন এখন ?

—মৃত্যুভূমিতেই আছেন। আমার পিত্রালয়ে।

—তাঁর নাম কি ?

ইতস্তত বোধ করেন যেন কুমারবাহাদুর। খানিক খেমে  
বললেন,—তাঁর নাম মহাশ্বেতা। আমি নাম দিয়েছি রাত্রাণী।

আঘাতটা বৃকে লাগে যেন। চৌধুরাণী অপলক চোখে তাকিয়ে  
থাকে আকাশের দিকে। অক্ষুটকণ্ঠে বললে,—তাঁর সিন্দূর অক্ষয়  
হোক। তিনি খুবই ভাগ্যবতী।



—ঈশ্বর জানেন। আমি ভাগ্যগণনা জানি না।

কেমন যেন আশাহতের মত একদৃষ্টে চেয়ে আছে আনন্দকুমারী। তার মনের সকল আনন্দ আর উৎসাহ যেন দপ করে নিবে যায়।

ভাসমান মেঘের আড়ালে কখন লুকিয়েছে পূর্ণাকার চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো যেন ক্ষীণপ্রভ হয়ে আছে। কাশীশঙ্কর একবার লক্ষ্য করলেন আলো-আঁধারিতে। দেখলেন চৌধুরাণীর উজ্জ্বল চোখ দু'টিও যেন নিশ্চল হ'তে থাকে। তার মুখের হাসির আভাস অদৃশ্য হয়।

বজ্রা গজেন্দ্রগমনে নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে। জলে হালের আঘাতের ছপাছপ শব্দ ওঠে। একসঙ্গে অনেকগুলি হাল চলেছে।

চোখ নামালো চৌধুরাণী। কোমরে জড়ানো শাড়ীর বেটন খুলে আঁচল টেনে পিঠে ফেললো। বললে,—বিন্ধ্যবাসিনী যদি ফিরতে না চায়?

ক্রয়ুগল কুণ্ঠিত হয় কাশীশঙ্করের। বললেন,—তবে তো রাজমাতার জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। আমিই বা তাঁকে মুখ দেখাবো কোন লক্ষ্যায়?

কেমন যেন হতাশার হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। বললে,—বিন্ধ্যবাসিনী নারী। নারীজাতি স্বামীর ঘর ত্যাগ করে না সহজে। তবে আশার কথা এই, বিন্ধ্য স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আছে।

—আমরাও তাই জানি। কুমারবাহাদুর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। বললেন,—বিন্ধ্যকে আমার সহ যেতেই হবে।

—আর আমাকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হবে! ঈশ্বর কক্ষ সুরে বলে চৌধুরাণী।

—না, না, সে কি কথা! তোমারও একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে বৈ কি। কুমারবাহাদুর চোখ পাকিয়ে বললেন। বললেন,—তোমার মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

—দেখা যাক কি হয়, ভেসে যাই না ডাঙ্গায় উঠি। কথার শেষে সহাস্তে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে—আমি যবে যাই, আপনি বিশ্রাম করুন কুমারবাহাদুর!

কাশীশঙ্কর দেখলেন, নবমৌবনা মেয়েটি ঠিক সাধারণ মেয়ের মত নয়। তার কথা আর হাবে-ভাবে ফুটে ওঠে এক ব্যক্তিত্ব—যা সচরাচর দেখা যায় না! তার রূপ-বৈচিত্র্য চক্ষুকে যেন প্রলুব্ধ করে! তার চালচলনে অভিজাত্য প্রকাশ পায়!

—আনন্দকুমারী! কুমারবাহাদুর ডাকলেন নাতিউচ্চকণ্ঠে। একটা কথা আছে। মুখে হাসি মাগিয়ে সিঁড়িতে দেখা দেয় চৌধুরাণী। সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বুক চিতিয়ে বলে,—কুমারবাহাদুর, আমি এসেছি।

—নিকটে আইস। কথাটি গোপন, সরবে ব্যক্ত করা যায় না। কথার শেষে চোখ-ইশারায় ডাক দেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তুমি কি খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত?

বজ্রার ছাদে উঠে কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি গিয়ে আবার বসলো আনন্দকুমারী। বললে,—আপনার অনুমান ঠিক। সত্যিই আমি ক্লান্ত। নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে।

—রাত্রির আহারটা তবে সেয়ে নাও। কাশীশঙ্কর কথা বলতে

বলতে আবার আসনপিঁড়িতে বসলেন তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে। বললেন,—আহারান্তে নিদ্রাই সুখকর।

একটু হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি অভুক্ত থাকবেন আর আমি রাক্ষসীর মত গোগ্রাসে গিলতে বসবো? তা হয় না কুমারবাহাদুর!

নৈকট্যের আবেগে বিমুগ্ধ হয়েছেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তবে তুমি আর আমি একত্রে আহারে বসতে পারি। কিন্তু আরও খানিক সময় উত্তীর্ণ হোক। ক্ষুধার তত তীব্রতা বোধ করছি না ঠিক এখনই।

—কথাটি ব্যক্ত করুন। গোপন কথাটি কি, তাই শুনি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একটি তাকিয়া টেনে নেয়। দেহটা ঈশৎ এলিয়ে দেয়।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমাদের শাস্ত্রে গান্ধর্ব বিবাহটা কি, তুমি কি জ্ঞাত আছো?

এ পাশে ও পাশে মাথা ছলিয়ে আনন্দকুমারী বললে,—আমি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নই কুমারবাহাদুর, মার্জনা করবেন।

নিরাশ হ'লেন কাশীশঙ্কর। মৃদু গম্ভীর সুরে বললেন,—গান্ধর্ব বিবাহে জাতবৈধম্য রক্ষা হয় না।

খিল-খিল শব্দে আবার হাসি ধরলো চৌধুরাণী। হাসতে হাসতে বললে,—আপনার এ চিন্তা কেন তাই প্রশ্ন করি।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর। তার পর বলেন,—তোমার জন্ম আনন্দকুমারী।

হাসি থামে না। চৌধুরাণীর হাসির শব্দ নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসতে হাসতে বললে,—বিবাহে আর কুচি নেই কুমারবাহাদুর! পুঙ্খভ্রাতার প্রতি আমার ঘৃণার শেষ নাই।

ঠিক এই ধরনের স্পষ্টোক্তি শোনার অভ্যাস নেই কুমারবাহাদুরের। তিনি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন। কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না।

আনন্দকুমারী আবার বললে,—আমার কথায় আপনি কি আহত হ'য়েছেন?

হাঁ না কিছুই বললেন না কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ মেলে বসে থাকলেন নিশ্চুপ।

চৌধুরাণী আবার সহাস্তে বললে,—কুমারবাহাদুর, প্রসঙ্গটা এখন চাপা থাক। চলুন আগে আহার শেষ করি। আমাদের থাওয়ার পাত্র সাজিয়েছে নীচের ঘরে।

কাশীশঙ্করের মুখের আকৃতির কোন বিকার দেখা যায় না। কেবল একটা গান্ধার্য প্রচ্ছন্ন হয়ে ফুটে আছে। তিনি শুধু বললেন,—তাই চল, আনন্দকুমারী।

বললেন কিন্তু ফরাস ত্যাগ করে উঠলেন না কুমারবাহাদুর। তিনি সংযমের পক্ষপাতী। পদখলন ক'কে বলে তিনি জানেন না। কিন্তু আজ এই জ্যোৎস্নার রাতে কেমন যেন স্থির থাকতে পারলেন না কিছুতেই। মোহময়ী আনন্দকুমারীকে মুখ ফসকে ব'লে ফেললেন কথাগুলি। কাজটা কি গর্হিত হয়েছে, ভাবতে থাকলেন মনে মনে।

—কৈ, আহন। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একখানি হাত আগিয়ে ধ'রলো।

কাশীশঙ্কর সেই নয়ম হাত ধরলেন নিজের হাতে। ধ'রেই উঠলেন তিনি। আনন্দকুমারীর মুখপানে তাকিয়ে ঈর্ষ হাসলেন যেন। খুশীর হাসি। রাত্রি তখন বেশ গভীরতর হয়েছে।

অঁথ জল থেকে ঘোঁপে উঠেছে আনন্দকুমারী, তবুও তার ভয়ের কাঁপুনি ধরে থেকে থেকে। ম্যাালেটকে যতবার মনে পড়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। ম্যাালেট শিল্পী, বিদ্বান আর বৈজ্ঞানিক হ'লে কি হবে, তার অপহরণের স্পৃহা যেন ভয়াবহ। তার পৈশাচিক নালসা—ভাবতে ভাবতে আনন্দকুমারী কেমন যেন স্থির হয়ে যায়। সিঁড়ি-মধ্যপথে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকল যন্ত্রের মত।

কাশীশঙ্কর বললেন,—শরীরগতিক কি ভাল নয় তোমার ?

চৌধুরাণীর চোখের দৃষ্টিও থমকে থাকে। কুমারবাহাদুর দেখলেন মশালের আলোয়, আনন্দকুমারীর অনিন্দ্য মুখকান্তি যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি এক অত্যাচারের ক্রেশে যেন জর্জরিত হয়েছে। কায়-ক্লেশের চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে মুখে।

আঁচলে মুখ মুছলো চৌধুরাণী। কাশীশঙ্করের চোখের বিক্ষারিত চাউনি বেশীক্ষণ যেন দেখা যায় না। চোখ নামিয়ে নেয় আনন্দকুমারী। ক্ষীণকণ্ঠে বলে,—কুমারবাহাদুর, আমার ভয় হচ্ছে যে !

হঠাৎ কোথা থেকে এক রাশ ভয় এসে আক্রমণ করে বনিক-কন্ডাকে। ম্যাালেটের সঙ্গে একত্রে দিন আর রাত্রি কাটিয়ে আজ নির্ভয়ের রাজ্যে এসে ত্রাসের হাত থেকে যেন রেহাই পায় না। অদৃষ্ট ভয়ের করাল ছায়া দেখতে পায় যেন।

—আমি থাকতে ভয় পাওয়ার কারণ কি ? কুমারবাহাদুর চুপি চুপি কথা বললেন, কথা যাতে অন্তের কানে না যায়।

—আমার কোন দোষ নেই, ম্যাালেট জোর করলে। আমাকে তার বজরায় তুললে ! মুখে আঁচল চেপে কান্নার স্রবে হঠাৎ বললে চৌধুরাণী।

—তুমি চঞ্চল হও কেন এত ! কে তোমার কাছে জবাবদিহি চায় ? কাশীশঙ্কর বললেন হাসতে হাসতে। বললেন,—রাত্রি গভীর হয়েছে আনন্দকুমারী। ক্ষুধার আলায় ঝঠর ঝলছে।

—আহারে বসুন কুমারবাহাদুর। আমার তরে আপনি কষ্টভোগ করবেন কেন ?

—আমাকে কি তুমি পশু ঠাওরাও ? সহাস্ত্রে শুধালেন কাশীশঙ্কর। আনন্দকুমারীর টোলখাওয়া চিবুক তুলে ধরলেন।

খানিক অপলক তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী। হৃদোন্মত্ত কথায় শুনে অবুয়ের মত যেমন তাকায় মানুষ, ঠিক সেই ধরণের অবাক চোখ যেন। সহসা দুই চোখ বন্ধ করলে সে। নতজানুতে ব'সে পড়লো কাশীশঙ্করের পদতলে। জলভরা চোখ তুলে বললে,—আপনি দেবতার চেয়ে বেশী আমার কাছে, আপনি যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মরণের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন।

—রক্ষা করেন তিনি, মানুষ তো ছার ! আবার কথা বলতে বলতে হাসলেন কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখিয়ে দিলেন, লুকিয়ে-থাকা রক্ষাকর্তাকে, ঈশ্বরকে। চৌধুরাণীর একখানি হাত ধরলেন স্নেহে। বললেন,—আহারে বসতে চল'। অন্ন আর মাংস শীতল হ'লে বিশ্বাদ লাগবে। আমিও ক্ষুধার্ত।

—ক্ষমা করবেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে,—চলুন আপনি ; আমিও যাচ্ছি।

নীচের ঘরে এসে আবার বিস্মিত হয় সে। হু'খানি আসন প'ড়েছে পাশাপাশি। আহার্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন খানসমা রামপাখা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। রঙীন লঠন ঝলছে বজরার মধ্যে। ছাঁকা কাঁসার বাসনের সোনা-আঁল ঠিকরোচ্ছে।

চৌধুরাণীর চোখের বিস্ময় দেখে হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন কুমারবাহাদুর। হাসতে হাসতে বললেন—আমার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়েছো তুমি ! কথার শেষে আবার উচ্চতর কণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন,—একটা ছাগ আমি গোটাই খাই। অবাক হও কেন ?

সত্যিই এক গামলা মাংস দেওয়া হয়েছে কাশীশঙ্করের আসনের সমুখে। খালায় যেন পর্বতপ্রমাণ ভাত, গোবিন্দভোগ চালের।

কুমারবাহাদুর আসনে বসলেন। গণ্ডুয়ের জল ঢাললেন হাতে। আনন্দকুমারীও সলজ্জায় বসলো পাশের আসনে। পাশের ঘরে চোখ পড়লো সহসা। চৌধুরাণী দেখলো কক্ষের দুই পাশে পৃথক দু'টি শয্যা রচিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয় চৌধুরাণী। কাশীশঙ্কর দেখতে পান না কিছুই—তিনি তখন মুদিত চোখে গণ্ডুয়ের মস্ত বলছেন।

গঙ্গার বুক থেকে এক বলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আনন্দের কপালে যেন শত শত চুমা খেতে থাকে। [ক্রমশঃ]

“সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এক সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোন সুবিধার জন্তে নয়, সম্মানের জন্তে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্তে। মানুষের সেই প্রকাশ-তত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নব যুগের উদ্বোধন করে আমরা জয়যুক্ত হব।”

—রবীন্দ্রনাথ



[ ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, থাম ও  
বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]

অন্যদিনে  
—ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়



ওয়ার্ড লেক (শিলাং)  
—উষাপদ চৌধুরী





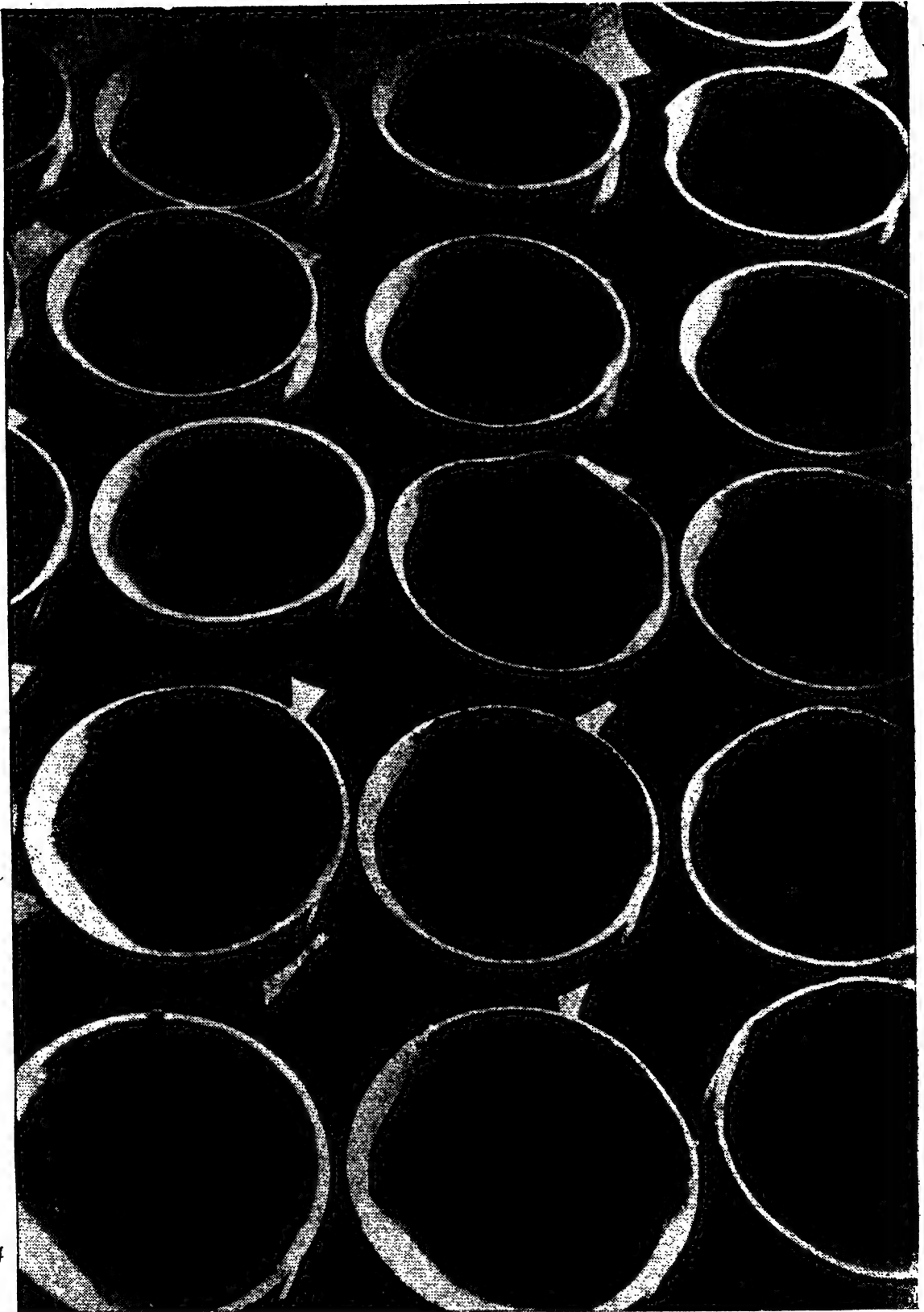
মার্বল-রক

—ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জল-ফল্লোল

—রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়





মৃৎপাত্র

—ব্রথোন রায়





ওড়নার আড়ালে

—কান্তি ভাই (সাব্বিত্রী) :

# ছবি কথাসাধারণের

ত্রিবিদ্যকশঙ্কর সেন

“তুমি তোমাদের ছবি টবি বুঝিনে ভাই—”

এ অতি সাধারণ কথা, সাধারণ লোক অর্থাৎ ধার্মিক কখনো ছবি আঁকেন না বা ছবি দেখেন না তাঁদের মুখ থেকে প্রায়ই শুনে পাওয়া যায়। এই মতবাদের নিচের প্রচ্ছন্ন ভাবটি যেন ছবি দেখতে পারা—ছবি আঁকতে পারার মতই একটা বিশেষ প্রতিভার বস্তু, যা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। এ ঠিক যে, ছবি আঁকতে হলে এবং ভাল ছবি আঁকতে হলে বহু পরিশ্রম ও বহুদিনকার শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন; কিন্তু ছবি দেখতে পারা অনেক সহজ—যার জ্ঞান প্রয়োজন হয় কিছুটা বিদ্যুৎ চিত্তবৃত্তি ও কিঞ্চিৎ কৃতিবোধ। অবশ্য কৃতির তারতম্যের উপরে বিচারের সুক্ষতা নির্ভর করে এবং তা’ও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, তবে সাধারণ ভাবে যে কোন লোকই ছবি দেখতে শিখতে পারেন এবং ছবি দেখে যথেষ্ট আনন্দও সঞ্চয় করতে পারেন, যা থেকে কি না তিনি শুধু অন্ধ অজ্ঞানতা ও উত্তমের অভাবজনিতই বঞ্চিত।

ছবি কি? শিল্পকলার একটি বিভাগ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে কলারাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

- ১। চিত্র
- ২। ভাস্কর্য
- ৩। সঙ্গীত
- ৪। নৃত্য

যদিও শিল্পের আধুনিক সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং মানুষের সব রকম বৃত্তিকেই শিল্প পর্যায়ের ফেলা হয়, যেমন মোটর গাড়ী চালানো একটা ‘আর্ট’, বই বাঁধানোও একটা ‘আর্ট’—এক কথায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই ‘আর্ট’। কথাতা কিন্তু খুব মিথ্যাও নয় এবং এতে হাস্যবোধ কিছু নেই, তবে সে কথা বাদ দিয়ে বিস্তৃত সাহিত্যের মত বিস্তৃত শিল্প বলতে আমরা ঐ চারটিই বুঝি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের ধারণা অবশ্য অভিনয়ও একটা আর্ট এবং নৃত্য ও সঙ্গীতকে আর্টের দলে নিতে হলে তাকেও নিতে হয়। শাস্ত্রকাররা এত বুদ্ধিমান হয়ে অভিনয়কে কেন আর্টের পর্যায় থেকে বাদ দিলেন, কথাতা বুঝতে পারিনি।

যাই হোক, শিল্পকলার এই বিশেষ ভাগে কার কি গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যায়, চিত্র হচ্ছে বর্ণ-শিল্প, একটি সমতল ক্ষেত্রের উপরে প্রলেপের সাহায্যে কোন বস্তু বা কোন দৃশ্যপটের সাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা—তাতে দৃষ্টি স্তর (Dimensions) আছে, তৃতীয়টি নেই।

ভাস্কর্য—আকার শিল্প, তাতে বর্ণের কারবার নেই কিন্তু আকৃতি আছে এবং তিনটি স্তরই এতে বর্তমান। ভাস্কর্যে রং-এর ব্যবহার চলতে পারে বটে, তবে না হলেও ক্ষতি নেই এবং প্রায়ই ভাস্কর্য এই কারণে হয় এক রঙ।

সঙ্গীত—শব্দশিল্প, শব্দকে নানা তানে লয়ে, মীড়ে গমকে সাজিয়ে রস সৃষ্টি করা। সে ক্ষতিশিল্প, দৃশ্যশিল্প নয়।

নৃত্য—গতিশিল্প, দেহকে নানা ভাবে আন্দোলিত করে ছন্দ সৃষ্টি করা। সঙ্গীতশিল্পও এর সঙ্গে সঙ্গিষ্ট, সে দৃষ্টি ও ক্ষতিশিল্প দুইই।

অভিনয়—ভাবশিল্প, কথা ও ভঙ্গ চালনা দ্বারা কোন ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। এর সঙ্গে সঙ্গিষ্ট সঙ্গীত ও নৃত্য দুইই। সেও ক্ষতি ও দৃষ্টি শিল্প।

কোন সূত্র অতীতে মানব জীবনে শিল্প বা চিত্রশিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল তার সঠিক হিসেব নেই। তবে এ ধারা যে দিকে দিকে দেশে দেশে মানুষের ভেতরে বিকাশলাভ করেছিল তার বহু নিদর্শনই সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়ে গ্যাছে। আবার দেশে দেশে কালে কালে চিত্রের ধারাও বদলে যায় যা কি না ছবি দেখতে না আরম্ভ করা পর্যন্ত বোঝাই যায় না। একবার এক টুকু চর্চা করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, শুধু দেশে দেশে বা কালে কালেই এর বিভেদ হয় না, এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও এর বিভেদ হয়ে থাকে। সাইথিয়ান, ইজিপ্সিয়ান প্রভৃতি অনেক শিল্পধারাই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে। বর্তমান কালে সারা পৃথিবী-ব্যাপী যে ধারা চলছে তাকে স্থল ভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। যথা—

ইউরোপীয়ান স্থল।

আর্যাবিক ও পার্শীয়ান স্থল।

ইণ্ডিয়ান স্থল।

চায়নোজ স্থল।

‘স্থল’ কথাটার অর্থ হলো এক একটি ধারা। একবার ছবি কথায় আরম্ভ করলেই এদের ভেতরকার তর্কাতর্ক বোঝতে পারা যায়। এদের সবারই বিষয়বস্তু এক, সাধারণ প্রকৃতি, আকাশ, গাছপালা, মানুষ, পশু-পক্ষী, সাপ-মাছ, পোকা-মাকড়, সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়, দিন-রাত্রি, বর্ষা-বসন্ত-শীত অর্থাৎ যা কিছুই প্রতিদিন দেখতে পাই আমাদের চোখের সামনে। দেব-দেবী, পবী-হরী, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোঁকসের কাল্পনিক ছবিও অবশ্য আছে। অথচ সারা পৃথিবীর অন্ধন-রীতি বিভিন্ন। চীন দেশের ছবি দেখে চীনে মানুষের চোখ মুখ বা অঙ্গ সজ্জা দেখেই তা বুঝতে হয়না, ছবির আঙ্গিক দেখলেই তা বোঝা যায়।

পার্শীয়ান বা আর্যাবিক ছবিও তাই। তাদের কাজ অতি সুন্দর এবং সে বিশেষ ধারা বুঝতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনই কষ্ট হয় না, কারণ ভারতবর্ষে ইংরেজ আসবার আগে সে ধারা অত্যন্ত চলেছিল। মুসলমান নরপতি এবং আরব ও পারস্যের জনসাধারণ সে ধারা নিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে।

ইউরোপীয়ান শিল্পধারাই বর্তমানে পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষিত হয় এবং তারাই পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে। তা’ বলে তাকে শ্রেষ্ঠতার আসন দেওয়া ভুল। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা বলে কোন বস্তু নেই ও একটা দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। তবে ইউরোপীয়ান শিল্পধারা যে একটা অত্যন্ত ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই সকল লোকের ভেতরেই তার কিছু না কিছু চর্চা হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপীয়ান শিল্পের বিশেষ বিশেষ এই বাস্তবতা যাকে বলে Photographic approach.

ভারতীয় চিত্রকলা বলতে অনেক ব্যাপক ধারা বোঝায়। ভারতবর্ষ বহু দিন ধরে বহু বিভিন্ন জাতির অধীনতা-পাশে বদ্ধ থাকায় ভারতীয় শিল্পধারার উপরে বিভিন্ন ধারার বহু প্রভাবপাত হয়েছে। এমন বোঝা করি আর কোন দেশেই হয়নি। উপরন্তু আমরা এ দেশের বাসিন্দা হওয়ায় গণমানবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিল্পশক্তির স্ফূর্তি-প্রভেদ সহজেই ধরতে পারি। যেমন জাখা যায় রাজপুত বা কাংড়া স্থলে। এই দুই স্থলেরই উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষে মোগল ও পার্শ্বীয় রাজত্বের সময়, তাই তাদের দুয়েরই ধারার উপরে মোগল এবং পার্শ্বীয় চিত্রধারার প্রভাব অত্যন্ত বেশী রকম পড়েছে। ভারতীয় স্থল বলতে মারা ভারতবাসী বিভিন্ন কালের বিভিন্ন স্থল দেখতে পাওয়া যায়। স্বদূর অতীতে ভারতবর্ষে ছিল এক শিল্পধারা যার নিদর্শন রয়ে গ্যাছে অজন্তা-এলোরায়। এই শিল্পধারাই প্রভাব রয়েছে সিন্ধুরে সিগিরিয়া, অম্বুদাধাপুর, কাণ্ডী প্রভৃতি স্থানে। এঁরা পর্বত গায়ে পাথর কেটে গুহ বা গুফা নির্মাণ করে' তার দেয়াল ও ছাত চিত্রণ করেন, কাগজ বা কাপড়ে আঁকা কোন চিত্রের নিদর্শন এঁরা রেখে যাননি।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে চিত্রশিল্পের বিশেষ এক একটি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশে আছে 'পট'। এই পটশিল্প বিকাশলাভ করেছিল মন্দিরের ধারে ধারে। এই পটের সৃষ্টিকর্তার ছিলেন শিল্পী পরিবার। বাসার সবাই আঁকতেন ছবি, অনেক সময় ছবিতে 'শ্রমভেদ' বা Division of labour ও অবলম্বন করা হতো। তা' এই রকম, বাড়ীতে হয়তো 'শেখ স্পর্শ' বা Finishing touch দিতো ওস্তাদ বাড়ীর কর্তা যিনি বহু দিন ধরে বহু ছবি এঁকে উচ্চাঙ্গের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর পক্ষে কাগজের প্রদেপ তৈরী করা বা এমন কি ছবির নক্সা বা ড্রইং করাও সময়ের অপব্যয়। তাই বাসার আর সবাই যার যেদিকে হাত তাই ঠিক করে দিত আর শেষে গৃহকর্তা তাঁর শেষ ওস্তাদি লাগিয়ে দিতেন তাতে। তাঁদের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁরা নিত্য নূতন ছবি আঁকতেন না। তাঁরা প্রায়ই আঁকতেন দেব-দেবীর ছবি, সেই জগৎ বাঁধা বরা নক্সা তাঁদের প্রস্তুতই থাকতো। মন্দিরের কাছেই বাজারে বা মেলায় যে লোক সমাগম, হতো তাঁরাই ছিল তাঁদের খরিদার। ঐ এবং রেখা দুয়েরই কারবার ছিল তাতে। উড়িয়ায় ছবি বিকাশলাভ করে বেশী বইয়ের মলাটে এবং ভেতরকার চিত্রকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গেও বাঙালার পটের বেশ সাদৃশ্য আছে।

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাসার একটি ধারা বিকাশলাভ করে তা' একেবারেই দক্ষিণী। এদের অনেক নিদর্শন রয়েছে মন্দির-গাত্রে দেয়াল-চিত্রে। এই ধারাই ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্য ও মালাবারে প্রবেশ করে। তবে সেখানে গিয়ে মালাবারবাসীদের হাতে একটু ভিন্ন ধারা প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণে আর একটি যে বিশেষ ধারা বিকাশলাভ করেছিল, তাকে বলা হয় 'তাম্রের স্থল'। এঁরা ছবিতে সোনা রূপের পাত প্রবাল এমন কি হীরে মণিযুক্তা পর্যন্ত ব্যবহার করতেন। তা ছবির ভিতরে বিশেষ পদ্ধতিতে আটকে দেওয়া হতো। সে সব ছবি শৈলীতে না হলেও বস্তবায়নে হতো অত্যন্ত মূল্যবান।

এমনি ধারা হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বিহার, গাড়হোয়াল, সকলেরই একটা বিশেষ বিশেষ ধারা

ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই এখনও রয়েছে। এমন কি, কোল, ভীল, সাঁওতাল, টোডা, পুন্ডাইয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও এদেরও ধারার একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ বেশ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ শৈলী ছাড়াও বিষয়বস্তুর ভেতরেও নানা জিনিষ জাখবার আছে যা ছবি জাখা আরম্ভ না করা পর্যন্ত বোঝা যায় না। পূর্বের দিনের ছবির বিশেষ বিষয় ছিল দেব-দেবী, পুরাণ-রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা নিয়ে ছবি। রাজা-রাজার আলক্ষে ও তাদের দরবার যুদ্ধ বা শীকার কাহিনী লিখেও ছবি আঁকা হতো। চায়াভূমি, দোকান পাট রাস্তা-বাটের ছবি প্রায় ছিলই না। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছিল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, চন্দ্রালোকিত রাত্রি, বিদ্যুৎ-বিনীর্ণ বর্ষা, পুষ্পভারাক্রান্ত বসন্ত, এরা বর্ষা ও বসন্তের বিপুল ও স্তম্ভর রূপ-সম্ভার শিল্পীর মনকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছিল।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়। আর ঐ হিমালয় চীনের দক্ষিণে। হিমালয়বাসী মানুষদের দেখে মনে হয় চীনজাতি হিমালয়কে বহু বেশী সঙ্গ করছে, ভারতবাসী তাব কিছুই করেনি। নেপালী, ভূটানী, তিব্বতি এঁরা সবাই মঙ্গোলীয়ান জাতি, চীনও তাই। তাই সর্বদাই তাদের চেহারা ও কৃষ্টিতে মিল। সেই কারণেই ঐ সব দেশের শিল্পধারায়ও চীনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে যদিও এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বুদ্ধের ছবিই এদের দেশে বেশী মেলে তবু কালী, হর্গা, শিব, কৃষ্ণ, যম বা রাম-রাবণ, অর্জুন, ভীম, দুর্ধাধনের ছবিও এদের দেশে অনেক পাওয়া যায়। মণিপুরীরাও মঙ্গোলীয়ান জাতি এবং মণিপুরের শিল্পধারাও এদেরই গা-বেঁধা।

এই হলো মোটামুটি ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার বিবরণ—প্রদেশে প্রদেশে—অতীতে। বর্তমানে কোন কোন জায়গায়, ধারার পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু সব জায়গাতেই তা হয়নি। আবার কোথাও কোথাও নূতন ধারাও চুকেছে, পুরোনো ধারাও মরবার মত হয়ে বেঁচে আছে। ইংরেজ এদেশে আসবার পর এদেশের শিল্পের দরবারে একটা নূতন ধারা ঢোকে তা একেবারে বিলেতী। সেই সময় অনেক শিল্পীই সেই ধারা শিখতে থাকেন কেউ বা ব্যক্তিগত সাহেব গুজর কাছে, কেউ বা সন্ত-প্রতিষ্ঠিত আর্ট-স্থলে। সেই আমল থেকে বহু ভারতীয় শিল্পী বিলেতী ধারার চর্চা করেছেন এবং এখনও করছেন। এঁদের অনেকের নামই প্রকৃত মেধা থাকলেও বিজ্ঞানের অভাবে জনসাধারণের মন থেকে মুছে গ্যাছে। তবুও অনেক শিল্পীই রয়েছেন কালের কাছে ধীরে অমর আসন পেয়েছেন। হু' একজনের নাম করতে হলে বলতে হয় ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-পরিবারের রাজা রবি বর্মা, মহারাষ্ট্রের মিঃ এম. ভি. ধুরন্ধর, বোম্বের মাহাত্রে, বাংলা দেশে শিল্পাচার্য স্বর্গীয় বামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী ইত্যাদি। গুরু অবনীন্দ্রনাথ 'বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং' প্রবর্তন করবার আগে পাশ্চাত্য ধারায় অতি সূক্ষ্ম 'অয়েল পেইন্টিং' করতেন। আলেখ্য-চিত্রে তিনি ছিলেন অতি সূক্ষ্ম কারিগর। রাজা রবি বর্মা ও অবনীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ ভাবে বাঙালার লোকের ধারণা রবি বর্মা অবনীন্দ্রনাথের পূর্বতন। এ ধারণার কারণ রবি বর্মা অল্প বয়সে যুত্মাযুখে পতিত হন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। পরবর্তী কালেও দেশের লোক অবনীন্দ্রনাথকে নূতন সৃষ্টি দিতে দেখেছে যখন রবি বর্মার শুধু পুরোনো 'প্রিন্ট' ছাড়া আর কিছুই

দখতে পায়নি। রবি বর্ষা একবার কলকাতা এসে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু হুংখের বিষয় যে, এই দুই মনীষীর সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেনি।

এঁদের পরবর্তী কালে ষাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পপথ অবলম্বন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রবি বর্ষার সুযোগ্য ভ্রাতা রাজা রাজা বর্ষা, বোম্বাইয়ের মিঃ বোশী, পাঞ্জাবে মিঃ ঠাকুর সিং, বাঙলা দেশে স্বর্গীয় ভবানীচরণ লাহা, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু প্রভৃতি। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এদের কাঁকরই উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ এখনও দেশে তৈরী হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন 'বেঙ্গল স্কুল'। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পধারার অতি সুদক্ষ কারিগর ছিলেন। তাঁর স্ক্রু ছিলেন কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই, বি, হাভেল। অধ্যক্ষ হাভেল ভারতবর্ষ গুরে এখানকার যে শিল্প-সম্পদ দেখলেন, তাতে তাঁর চিন্তাধারা একেবারে ঘুরে গেল। তিনি পাশ্চাত্য ধারা বাদ দিয়েও প্রাচ্য রীতিতে ছাত্রদের ছবি আঁকাতে চাইলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শিষ্য এবং সর্বাধিক রসজ্ঞ শিষ্য। তাঁর অকুরন্ত আর অনবন্ত দান বিশ্বয়কর। অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বাঙলা দেশে সত্তর মিউজিয়াম তৈরী হওয়া উচিত।

অবনীন্দ্রনাথ বেঙ্গল স্কুল তৈরী করে তাঁর পাশ্চাত্য পদ্ধতির জ্ঞান ও ভারতীয় পদ্ধতির প্রাণ ছবির ভেতরে ঢোকালেন আর তাতে সম্বোজনা করলেন জাপানী ধূয়ে দেওয়া বা wash। তাঁর প্রথম যুগের ষাঁরা ছাত্র, তাঁদের সকলের ছবিই যদিও এই পদ্ধতিতে আঁকা, তবু প্রত্যেকের ছবির ভেতরেই বিশেষ ব্যক্তিজিটি একটু দেখলেই ধরা পড়ে। এঁদের দলে নাম করতে হলে বলতে হয় নন্দলাল, চাণ্ডাই, উকিঙ্গ, হালদার, ক্ষিতীন মজুমদার প্রভৃতি।

বাংলার পটের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পটের পটভূমিকার আর একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। এঁরও শিক্ষা আরম্ভ হয় পাশ্চাত্য ধারার কলকাতা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে। তার পর তিনি বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং ধারা প্রভাবান্বিত হন, এবং সেই ধরণে wash এর ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। সেই পদ্ধতিতে যখন তিনি সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করছেন এমন সময় হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন বহুদিন উপেক্ষিত বাংলার পট এবং পটুয়াদের, এবং সেই প্রাচীন পটকে তাঁর পাশ্চাত্য শিল্পের ও বেঙ্গল স্কুলের জ্ঞানের ভিত্তিতে ঢেলে আরম্ভ করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রথম প্রথম এঁকে অত্যন্ত বিরোধিতা সহ করতে হয়েছিল কিন্তু দেশবাসী তার মহতী প্রচেষ্টার মর্যাদা বুঝতে পারে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে এবং বর্তমানে তিনি এই পট চিত্র নিয়েই রয়েছেন। যামিনীবাবুর পট ঠিক বাঙলার প্রাচীন পট নয়, তবু সেও পট এবং বাঙলার শিল্প-সাধারণ একটি বিশেষ দান।

আর একটি ধারার প্রবর্তন করেন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, তা' বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিশ্রণ। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর কণ্ঠক্ষেত্র বাঙলার বাইরে হওয়াতে তাঁর ধারা বাংলার শিল্পরাজ্যে বেশী প্রভাবপাত করেনি।

বাংলার পটুয়াদের মধ্যে সামান্ত কয়েক ঘর মাত্র বেঁচে আছে, কলকাতায় ও কলকাতার আশে পাশে। তেমনি সামান্ত কয়েক ঘর

মাত্র শিল্পী বেঁচে আছে তাজোর জেলায় ষাঁরা এখনও তাজোর পেইন্টিং করেন। কিন্তু আনুস্ক্য না থাকায় তাঁদের সৃষ্টিতে অতীতের সে জমক ও জৌলুস নেই এবং বহুদিনের অনাদরে আঙ্গিক ও অত্যন্ত হ্রাস হয়ে পড়েছে। মাদ্রাস একটি লোকও নেই। রাজপুতানা বা কাঙড়ার অবস্থাও তাই। তবে চাক্র শিল্পের ভারতীয় বিশেষ পদ্ধতিটি যা খেলেও ভারতবর্ষের কাকশিল্প প্রায়ই বেঁচে আছে যার ভেতরে ভারতীয় প্রাণধারার যথেষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলও বর্তমানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আধুনিক শিল্পীদের ভেতরে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী নেই। তারা বহু দলে বিভক্ত, তবে মনে হয় বেশীর ভাগই করাসী 'ইমপ্রেশনিজম্' এবং আরও অনেক 'ইজম্' এরই পক্ষপাতী। তাঁরা সবাই বর্তমানে নানা ধারা নিয়ে চলেছেন। সহসা লোকের চোখে এ পরিস্থিতিকে ভাঙ্গন বলে মনে হতে পারে কিন্তু এ যে নব যুগের গড়নেরই পূর্বভাস নয়, এ কথাও বলা কঠিন।

মোটের ওপর জাখা গেল শিল্প-কলা কোন একটা বিশেষ ধারায় বা বিশেষ জায়গায় ঠাঁড়িয়ে নেই, যদিও গোড়াগড়ি সব দেশেই তার একটা চারিত্রিক বিশেষত্ব রয়েছে। সাধারণ ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার আভাস্তরীণ তফাৎ বিচার করতে গেলে বলতে হয় পাশ্চাত্য শিল্পকলা বাস্তবতামূলক বা 'রিয়ালিস্টিক'। আরও সহজ করে বলতে হলে বলতে হয় পাশ্চাত্য শিল্পকলা সজ্জামূলক বা 'ডেকোরিটিভ'। প্রায়ই অদীক্ষিতের কাছ থেকে এই প্রশ্ন শোনা যায় যে, তোমাদের ছবির চোখ হাত পা ও-রকম লম্বা কেন, কোমর অত স্ক্রু বা কাঁধ অত মোটা কেন? তার উত্তরে বলতে হয় ওটা জোর 'একসেনচুয়েশন' (accentuation)। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা কথাবার্তা বলি তখন যদিও আমাদের সেই সময়কার মানসিক পরিস্থিতির উপরে তার প্রকাশ ভেদ হয় 'তবু সেটা ততটা লক্ষণীয় নয় যতটা যখন আমাদের সেই সংলাপই বলতে হয় রঙ্গমঞ্চে বা রূপালি পঙ্কায় উঠে। একটা বিশেষ অবস্থাকে বিশেষ ভাবে বোঝান। ভারতীয় চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যও তাই। সেই শিল্পীরা—আমরা সহজ চোখে প্রকৃতিকে যা দেখি তার চাইতেও একটু এগিয়ে শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে জোর দিয়ে বা জোর কমিয়ে দিয়ে শিল্পীর মানসলোকের রূপ সৃষ্টি করেছেন বা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই রীতিই ফুটিয়েছেন দৃশ্যপট ও আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারেই। এ কথা—যতক্ষণ ছবি জাখা আরম্ভ না করা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই হ্রাসজনক হয় না। তার পরেও একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই উৎকৃষ্ট নয় এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই নিকৃষ্ট নয়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই উৎকৃষ্ট নয় এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই নিকৃষ্ট নয়। রসের বিচারে পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। হু' পক্ষেরই ওস্তাদ এবং হু' পক্ষেরই হাতুড়ের দল আছে। তবে কোন পক্ষের কোনটি উৎকৃষ্ট বা কোনটি নিকৃষ্ট কাজ, তা বুঝতে অনেক সময় ও অনেক চর্চার প্রয়োজন হয় এবং তা বোঝবার পরও অনেক ক্ষেত্রেই তা' সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও দর্শকবৈ ব্যক্তিগত কচির ইসারা মাত্র। বহু দিনের পরিশ্রমে, বহু চর্চায় জাগ্রত সেই রুচিবোধই ছবি জাখার প্রধানতম আনন্দ ও এই সুদীর্ঘ সাধনার সত্যকার পুরস্কার।

# ববীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

## ৮খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু ববীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদ্বয় ১৮৬১ সাল বাঙলা দেশে, বাঙলা সাহিত্যে ও ঠাকুর-পরিবারে একটি স্বর্ণীয় বৎসর। এ বৎসর বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের অবতারণাকে বাঙলার গুণিসম্প্রদায় প্রকাশ্য ভাবে বরণ করিয়া লন। ছোড়াসাঁকোতে ঠাকুর-বাড়ির পার্শ্ববর্তী সিংহ-বাড়িতে বিজ্ঞোঃসাহিনী সভার উদ্বোধনে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বঙ্গভাবতীর পূজারিবৃন্দ বঙ্গসাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের অভ্যুদয়ের অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদনকে বাঙলা কান্যে নবধারা অমিত্রাক্ষর চন্দ্র প্রকরণ আনয়নের জন্ত প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন।

বিরাট পুরুষ ববীন্দ্রনাথ কেন, যে কোনো জীবনীই ইতিহাস, সে কারণ কবিগুরু জন্মের অব্যবহিত পূর্বের, জন্মের সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরের সময়ে দেশে যাগা যাগা প্রধান ঘটনা ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে, তাহাও কিছুটা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাহার মধ্যে তদানীন্তন সমাজ বলিতে দেশের লোকের জীবন-যাত্রার দারা, দেশের আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যাগা ঘটয়াছিল, তাহাও পরিতে ইষ্টবে এবং সে কারণ দেশের প্রধান প্রধান ব্যাপারের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে যে যে বৎসর তন্মধ্যে ১৮৬১ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই আইন সংক্রান্ত বিষয় কিছুটা হইল এই যে, ১৮৬১ সালে একতা সূত্র একটি ব্যাপারে দৃঢ়তর হয়। সরকার বিচারপ্রণালীর আমল পরিবর্তন করেন। এতদিন বিচার কাধ দুই প্রকার স্বতন্ত্র প্রণালীতে নিম্পন্ন হইতেছিল, সমগ্র ভারতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কাধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারীর দ্বারা নিম্পন্ন হইত এবং তাহার শেষ নিম্পত্তির জন্ত (আপিলে) কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল আদালতের ভাষা প্রথমে উর্দু পরে বাঙলা হইয়াছিল। এই দুই আদালতের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রতি কান্টনিলে আপিল হইত। মুসলমান আমল হইতে কোম্পানির আমল পর্যন্ত এদেশে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, বিচারকাধে তাহাই গ্রহণ করা হইত। কেবল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের জন্ত তিনটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার বিচারক বিলাত হইতে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই নিযুক্ত হইয়া আসিতেন এবং তাহার বিলাতি Equity এবং Common Law অনুসারে বিচারকাধ নিম্পন্ন করিতেন। ১৮৬১ সালে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে এই দুই প্রকার বিচারালয় রহিত করিয়া একমাত্র হাই কোর্ট উচ্চতম আদালতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে একটি আদিম বিভাগ

(Original jurisdiction) এবং একটি আপিল-বিভাগ (Appellate jurisdiction) থাকিবে এবং তাহাতেই কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে ও প্রদেশগুলির সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকাধ একই আইনের দ্বারাই নিম্পন্ন হইবে। হাই কোর্টে বিচারক পদে বিলাতি ব্যারিষ্টার, সিলভিয়ান এবং ভারতীয় ব্যবহারজীবী বিলাত হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া নিযুক্ত হইবেন ও হাই কোর্টগুলি ভারত গভর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। তদনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লেটার্স পেটেন্টের দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্ট ১৮৬১ সালে গঠিত হয় এবং রাজা রানমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী উকিল, রমাপ্রসাদ রায় প্রথম ভারতীয় বিচারক মনোনীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাই কোর্টে যখন ১৮৬২ সালে কাজ আরম্ভ হইল তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের অল্পতম প্রধান উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাই কোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারক বা পিউনি জজ নিযুক্ত হইলেন। ইনি কান্সারী ব্রাক্স হইলেও বাঙলা দেশবাসী হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতীও বঙ্গ সাহিত্যে পরিচিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ও পিতা শম্ভুনাথের জ্যায় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন।

পাঞ্জাব হইতে বাঙলা—উত্তর ভারতের জন্ত একটি সর্বাঙ্গ আদালত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং গমনাগমনের সুযোগ বর্ধিত হওয়ায় কলিকাতায় সকল প্রদেশ হইতে অধিকতর সংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল ও সকল প্রদেশবাসীর সহিত বাঙালীর হৃদয়তা বৃদ্ধির সুযোগ হইল। একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবারও বীজ বপন হইল এবং কালে ইহাতেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৬১ সালে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরের বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের বলাভ্যায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্ত তিনি বিলাত যান ও তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাই কোর্টে ব্যারিষ্টারী কাধ আরম্ভ করেন। এই ১৮৬১ সালে বাঙলার আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের উজ্জাগাতা ও বহু তথ্যবস্তুর আবিষ্কার আচার্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি (Constitution) কী ভাবে হওয়া উচিত—তাহার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেশে ও বিদেশে মনীষীবৃন্দের নিকট যিনি যশস্বী ও বরণীয় হইয়াছিলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় (পার্ক সার্কার্স) অধিবেশনের সভাপতি, এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পরলোকগত





# লক্ষ্মীবিলাস

কেশ তৈল

\*  
এম. এল. বসুমতী কোং প্রাইভেট লি:  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

পণ্ডিত, তিলিলাল নেহরুও এই ১৮৬১ সালে কবির সহিত একই দিনে জন্ম। স্ততরাং দেখা যায় একই বৎসরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা কাব্যে, বিজ্ঞানে ও রাষ্ট্রনীতিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জ্ঞান তিনটি প্রতিভাশালী পুরুষের সৃষ্টি করেন। ভারত-গগনে যুগপৎ 'Three stars of the first magnitude on the ascendant'-এর সমানেশ। আনানের ধর্মজগতে নবপ্রাণ সঞ্চারকল্পে কিছুকাল পূর্বে মহাসাদক পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্তাবিকভাবে হয়। ১৮৬১ সালেই (বা: ১২৬৮) ভাগো দেখা ঘটিল তিনি লোকচিত্তার্থে বাঙলার পঞ্চবটী মূলে 'পরমহংসদেব' রূপে প্রকট হইয়াছেন। ক্রমে তাঁহার বশিষ্ঠাট্টা সাগরপারের পশ্চিমাঞ্চল প্রান্ত পর্বন্ত আলোকিত করিল।

প্রত্যক্ষ শুধু ১৮৬১ সালের কথা বলিতেছিলাম। কবিশঙ্কর প্রাক জন্মকালে ও জন্মের অব্যবহিত পূর্বের সময়ে দেশের পটভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই দশ বৎসর একটা যুগসন্ধি বলিলে অত্যাধিক নয় না। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলা দেশে, তিন্দু সমাজে এবং বাঙলা সাহিত্যে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে, ঠাকুর-পরিবারের চিন্তাধারার ও জীবনযাত্রার উপরেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৮৬০ খৃঃ নীলকর বিষয়দংশন-কাতর প্রজানিকর ক্ষেত্রকরণ কেনচিত পথিকের' হৃদয়কল্পন শ্রুতুমার সাহিত্যের মধ্য দিয়া ঢাকার রামচন্দ্র ভৌমিকের দ্বারা প্রকাশিত হইল। রচয়িতার নাম না থাকিলেও নীলদর্পণখানির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত আর একটা বিশেষ মূল্য আছে। নীলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইঙ্গা সহায়তা করিয়াছিল এবং সে হিসাবে ইঙ্গা ইংরাজি সাহিত্যে দাসপ্রথার বিরোধী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ গদ্য 'Uncle Tom's Cabin'-এর সহিত সর্বথা তুলনায়। পরে প্রকাশ পায় ডাক-বিভাগের পরিদর্শক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'অভিন্ন স্তম্ভদ' স্রববি দীনবন্ধু মিত্র, যিনি পরে একজন স্তম্ভ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, এই পুস্তকের জনক। কিন্তু ইহার অল্পবাদ করিয়া পাদরি লং সাহেব স্বজাতির বিরোধভাজন হন ও তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজের উচ্চতম আদালত কর্তৃক ইংরাজ-সম্রাটের কুংসা প্রচারের জ্ঞান হাজার টাকা অর্থদণ্ডে ও এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তদন্তেই আদালতে ঐ টাকা দাখিল করিয়া দিয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন।

এই সময়েই স্মপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার মর্ড্যান্ট ওয়েল্‌স্ বিচারাসন হইতে বাঙালী জাতির প্রতি যে সকল কটুক্তি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন, বাঙালী তাহা নতমস্তকে সহ্য করিয়া লয় নাই। বিচারকের এই সকল কটুক্তির প্রতিবাদের জ্ঞান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা বাহাদুর সার), কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কলিকাতার নেতৃবৃন্দ রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে অগ্রণী করিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা করেন। এই জনসভায় বাঙালীর সচেতন আত্মসম্মান বোধের প্রমাণ পাইয়া, আমরা হতুমু ভাষায় বলি "নাটমন্দিরস্থ পাথরের গরুড়েরাও ডানা মেলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।" ফলে টেকচাঁদেব পিসার মুষ্টিযোগ "নারকেল খুড়ি ও ঠনঠনের নিমকির" প্রয়োগ না করিয়াও ওয়েল্‌সের মুখরোগ সারিয়া গেল। "ওয়েল্‌স একে হইলেন।" বসন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই নামে "বেওয়ারিশ লুচির ময়দা" বাঙলা ভাষায় ঘরোয়া কথাবার্তায় 'তদানীন্তন কলিকাতার সমাজের কতকগুলি নক্সা আঁকিয়া "এই এক নতুন" বলিয়া বাঙলার রসপিপাস্তদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা যেমন অভূতপূর্ব তেমনই আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে।

বাঙালী এই সময়ে আর একটি ঘটনায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে কলিকাতার ইংরাজের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় মার্শাল ল প্রচারের জ্ঞান বড়লাট ক্যানিং-এর নিকট বারবার জ্ঞে করিতে লাগিল। কিন্তু লর্ড ক্যানিং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর (পরে মহারাজা), রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কিছুতেই মার্শাল ল প্রচারের সম্মতি দিলেন না। ইংরেজ সম্প্রদায় বিদ্রূপ করিয়া ক্যানিং-এর নাম দিলেন 'দয়ার অবতার' (Clemency Canning) এবং তাঁহার বিদায়কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অসম্মত হইলেন। বাঙালী নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ১৮৬২ সালে একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লেডী ক্যানিং-এর মৃত্যু হওয়ায় বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার সন্মদয়তা ও সহানুভূতির কথা চিরদিন জাগরক রাখিবার জ্ঞান বাঙালী তাহার দৈনন্দিন গৃহস্থালীর মধ্যে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। চিরপ্রচলিত ছানাবড়া পরিবর্তিত আকারে লেডী ক্যানিং নামে মিষ্টান্ন-সমাজে স্থান পাইল এবং পরে তাহাই লেডীকেনি নামে বাঙলার শহরে ও পল্লীগামে সর্বত্র পরিচিত।

সিপাহী-বিপ্লবের পর কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়া ভারত রাণী ভিক্টোরিয়ার খাস রাজত্বের অংশীভূত হইল। বড়লাট তখন হইতে বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া ভারতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় এবং রেলপথের ও টেলিগ্রাফের বিস্তারে, কারণ ১৮৫৭ সালে মোটে আসানসোল পর্যন্ত রেলপথ হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রকৃষ্ট যোগ হওয়ায় দ্রুত-ব্যবধান, বহু সময়ক্ষেপ এবং গমনাগমনের যোরতর বাধা অপসারিত হওয়ায় প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতাবোধের সঞ্চার হয়। তখন কলিকাতা হইতে হাওড়ায় নৌকায় পারাপার হইত। বহু বৎসর পরে ১৮৭৩ খৃঃ সার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি ভাসমান হাওড়া পোল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগসাধন করেন। এই বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভূভিক-পীড়িতের সাহায্যের জ্ঞান কলিকাতার নেতৃবৃন্দ টাউন হলে সভা করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভূভিক-পীড়িতের সাহায্য দানে সফলকাম হইলেন।

এদিকে সে যুগে যেমন নানা ঘটনাস্রোতে পুরুষদের নানা উন্নতি হইতে লাগিল, দেশের মাতৃজাতিও যে অন্ধকার গহবরে নিশ্চেষ্ট ভাবে কালতিপাত করিতেন তাহা নহে। মহর্ষি পিতামহ রামমণি ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহর্ষির মধ্যমা পিসী এবং লেখকের বৃদ্ধা প্রপিতামহী রাসবিলাসী দেবীর একখানি পুঁথি হইতে জানা যায় মহিলা শিক্ষিকার বাড়ীর মেয়েদের স্তাবিকলীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা

দিতেন। আমার খুলপিভামহ গোকুলনাথ বলিতেন যে তাঁহার পিতামহী উক্ত রাসবিলাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর দুই তিন বৎসর মেয়েদের সংস্কৃত শিখিতে হইত। ১৮৫০ সালের ৬ই নভেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতা শিমুলিয়া পল্লীতে একটি নারীশিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি সমারোহের সঙ্গিত স্থাপন করা হয়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের অনেকের উপস্থিতিতে একটি অশোক গাছের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিকটে ভিত্তি প্রস্তর অমুষ্ঠানপূর্বক প্রোথিত করেন ও বাট্‌ন (Bethune) অশোক গাছের পাশে ছিঁড়িয়া ভূস্বামীর নিকট হইতে জমি ও ভিতের দখল লন। ভূমিখণ্ডটি দান করেন পাথুরিয়াঘাটার স্বর্ষকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তদানীন্তন আইন-সচিব মাননীয় জন ইলিয়ট ডিংকওয়াটার বীটন (পূর্বোক্ত) বাঙলা ভাষায় স্ত্রী-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিদ্যালয়ের নাম বাট্‌ন স্কুল ও পরে বীট্‌ন কলেজ হয় কিন্তু সেদিন বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছিল “সিন্ধু স্কুল”। স্ত্রীশিক্ষার জগৎ আগ্রহযুক্ত যে সকল তরুণদের চেষ্টায় যত্ন ও অর্থে ইহা ‘উত্তর, তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন অন্যতম। নারীশিক্ষার প্রত্যক্ষস্বরূপ অশোকতরু স্থাপন দক্ষিণারঞ্জনের সৌন্দর্য বোধ উদ্ভূত করিয়া (Aesthetic consciousness) ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালংকার ইহার স্বপক্ষে ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। “সংবাদ ভাস্করের” সম্পাদক ‘জুড়ন্তে ভট্টাচার্য’ গৌরীশংকর তর্কবাগীশও ইহার বিশেষ পোষকতা করেন। মদনমোহন স্বীয় দুই কন্যাকে শিক্ষার্থে এখানে প্রেরণ করেন ও স্বয়ং শিক্ষকতার ভার অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করেন। এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ‘বর্ণ পরিচয়ের’ পূর্বে মদনমোহনের ‘শিশুশিক্ষা’ গ্রন্থাবলী রচনার হেতু এই নবস্থাপিত বিদ্যালয়টি। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৫১ হইতে এই বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ। অভিজাত সম্প্রদায় মুসলিম প্রভাবে তখনো ঘোর পর্দানিশীল ও ইহার বিরোধী ছিলেন।

ইহার নব পূর্বেও কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। অনেকগুলি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ও বালিকাদের পণ্ডিতা লওয়ার ব্যবস্থা হয়, যাহা স্কুল কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। স্যার এডওয়ার্ড রায়ান প্রভৃতি স্বল্পীম কোর্টের বিচারপতিরা ও কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এই কমিটির সভা ছিলেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ও পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দন ঠাকুর বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করিতেন। উমানন্দনের বাড়ির সামনে বালিকাদের ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিবার একটি স্থান ছিল। এককালে নারীশিক্ষায় উৎসাহ দান মানসে রাধাকান্ত “স্বীক্ষা” নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন যদ্বি তিনি সনাতনপন্থী দলের ছিলেন।

মহাত্মা বাট্‌ন বিদ্যালয়ে বালিকাদের যাতায়াতের জগৎ কয়েকটি গাড়ী ও বোড়া দান করেন এবং তাঁহার চরম ইচ্ছাপত্রে বা উইলে তাঁহার অছিদের প্রতি নির্দেশ দিয়া যান :—

I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta now intended to be used and occupied as a Female School to the E. I. Co. and their successors and

assign FOR EVER with my request that they will endow the said institution as a Female School in perpetuity and honourably connect therewith the name of Babu Dakshina Ranjan Mukerjee in honourable testimony of his great exertion in the cause.

ছাত্রীদের জগৎ বিদ্যালয়ের গাড়ীগুলির গায়ে লেখা থাকিত কন্যাপোষ পালনায় শিক্ষানীয়াতি যত্নঃ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যা ও কনিষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বাট্‌ন স্কুলে পাঠার্থে প্রেরণ করেন। তিনি তথাকার শিক্ষার সম্পূর্ণ পোষকতা করেন তথাপি বাইবেল-ঘটিত শিক্ষার কোনো উৎপাত ছিল না বলিয়া।

নানাদিক দিয়া এইরূপে জাতির নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তখন অনেকগুলি কবি ছিলেন যাহারা বঙ্গীয় ভাষাজননীকে নানা ভাবে সেবা করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। মাইকেল মধুসূদন তৎকালীন নবীন কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—  
If I am to doff my cap to any modern Bengali poet, it must be to the author of Swapna-prayan and to nobody else.

কিন্তু নবজাগ্রত জাতির সকল প্রকার আশা ও বেদনাকে জাতীয় ভাষায় উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন এক জন শক্তিমান বাণীর বরপুত্রের অভাব দেশমাতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন ও প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। ভগবান সে প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন।

কালমোহিনী কল্প-বিধায়িনী পূর্ণেন্দ্রনিধাননার গৌরসুন্দর ললটিফলকে বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালটি (ইং ১৮৬১) শুভ শিশুসোম লেখাবৎ প্রতিভাত হইবে। তাহার অঙ্কে শোভমান নবজাত শিশুটির কর্ণধূলিতে স্বয়ং ভারত জননী যে আশীর্বাদী কুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচী ও প্রতীচী দিগ্‌মণ্ডল সমকালে আলোকিত হইল। কলিকাতা মহানগরীর মুখমণ্ডল, তথাকার ঠাকুর বংশের মুখছবি, বঙ্গের স্বধী সমাজের মুখাবিষ্ক এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

“রাত্রিদিবা ঋরিছে সোচনবারি

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত হে তোমারি—”

সেই পরাধীনতাপাশ বেষ্টিতা, অজ্ঞতার তামস বাস্পাচ্ছাদিতা জননী ভারতের বদনকরুণ ও যুগপৎ নবালোকে নবস্ত্রী ধারণ করিল। সেই নাতিবৃহৎ আগন্তকের প্রাণধারণ লীলায়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মৃত্ত বিশ্বজননীর অপার করুণা ও আনন্দের আবির্ভাব বিশ্ববাসীর গোচরে আসিয়াছে। সেই নবজাতকের পদবর্তীকালের অমৃতবাণী দ্বারা আমরা অনুভূতি কথঞ্চিৎ প্রকাশ করি—

“একবিন্দু নয়নের জল

কালের কপোলতলে শুভ সমুজ্জল—”

এবং সেই ১২৬৮ সালটিও তাহার সঙ্গিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত মানবকটি চিরদিন আমাদের ও ভাবী বংশধরদের স্মরণ পথের শরণী আলোকিত করিতে থাকিবে।

বালাকর্ণছটায় তাহার প্রকাশ বালা, কৈশোর, যুবসন্ধির মধ্য দিয়া শিক্ষা, দীক্ষায়, প্রতিভার ফলে কোরক-রবীন্দ্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিত দলবিকাশ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র, মহর্ষি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 'বড় বাড়ীর' 'ছোটাবু' বিশ্ববরণ্য ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ সোমবার ৭ই মে ১৮৩১ মঙ্গলবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে, মৌনরাশিতে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম সাধারণত ৬ই মে সোমবার বরা হয় কিন্তু তাঁহার জন্ম হয় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, সূত্রগাং ৭ই মে মঙ্গলবার হইবে। এই ১৮৩১ সালে ঋষিকান্যাসের ঋণ শোধ করিয়া যে আয় হইল তৎসারা মহর্ষি সংসারযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করিলেন এবং যে উজ্জ্বল আভ্যন্তর ইঙ্গিত দেখা দিল তাহা বর্ষচক্রের আবর্তনে শশিকলার মতো দিন দিন বাড়িয়া যাঠিতে লাগিল, পক্ষভেদে দর্শকের দৃষ্টিপথে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। প্রতিভা সংযোগে তাহার ব্রিদ্ধ কিরণ বা দীপ্তির সমৃদ্ধি দৈববশে কবিজন্যের অবলোকন করা ঘটে নাই বটে কিন্তু ক্ষয়হীন পূর্ণচন্দ্রোদয় কবিজনক যে জীবিতকালে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহা পিতাপুত্রের এবং বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ঋষিকান্যাসের আমলের নানা অন্তর্ধান ও ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই বেবেঙ্গপরিবারের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপ্রণালী সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে। মহর্ষি সকল দিকে বায় সংকোচ করিয়া ভ্রমণ ও দৃষ্টিবাদের সাহায্যের ব্যবস্থা ঠিক রাখিয়াছিলেন। যে জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ও উৎসব-পরম্পরার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পরিচিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তাহার স্রবোগ ঘটে নাই। তিনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলের মতোই বর্ধিত ও আত্মোন্নতির পথে পরিচালিত হন ও তাহা সাধন করিবার অকুণ্ডল পরিবেশ সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহুদিন পুস্তকের মধ্যে এবং নিজের অসামান্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অধ্যয়নে ব্যাপ্ত থাকিতে হইয়াছিল।

বাড়ীর পাঠশালাতে পরিবারস্থ অগ্রাঙ্গ বালকদের সহিত গুরুমহাশয়ের নিকট বালক রবির নিয়মিত লিখন-পঠনের সূত্রপাত হয়, তবে তাহার পূর্বেই অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পূর্বেই তাঁহার বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ হয়।

তখন ঠাকুরদের সকলের বাড়িতেই একটি করিয়া পাঠশালা থাকিত। বাড়ীর প্রতিবেশীদের সন্তানেরাও একত্রে সেই পাঠশালায় পড়িত। চাঃ বৎসর হইলেই বালককে অগ্রজদের সহিত পাঠশালায় যাঠিতে হইত এবং সেখানে বসিয়া থাকা অভ্যাস করিতে হইত। গুরুমহাশয়ের বলিতেন আগে "আসনভুক্তি" হউক, পরে লেখাপড়া হইবে। বালক গুরুমহাশয়ের অবাধ বেত্রচালনা দেখিয়া ও তর্জন গর্জন শুনিয়া গুরুর প্রতি ভয়ই অর্জন করিত কিন্তু অগ্রাঙ্গ বালকদের পাঠ্যবৃত্তি শুনিয়া মুখে মুখে কিছু কিছু শিখিত। পরে পঞ্চম বর্ষে বালকের হাতে খড়ি দিয়া তাহার রীতিমত বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ হইত। রবীন্দ্রনাথ আসন হ্রস্ব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিবাস বর্ধমান জেলা।

পাঠশালায় বিজ্ঞানাত্মক ভাষা হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে শৈশব কালেই তাঁহার সাহিত্য-রসাস্বাদন আরম্ভ হয়। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তখন পুরা 'দাস রাজহ'। (জীবনমুখতি দ্রঃ)। ছেলেদের দোহ-কটির জন্ত চাকরদের ইট হাতে করিয়া পাড়াইয়া থাকিতে ও অগ্রাঙ্গ শাস্তিভোগ করিতে হইত। আর তাহারাও ছেলেদের নানাবিধ উপায়ে শাসন করিত ও যাহাতে কোনোকপ অগ্রাঙ্গ আচরণ না করে তজ্জন কড়া নজর রাখিত। সেকালে বিস্তর বাঙালী ভৃত্য পাওয়া যাঠিত, পরে যাহাদের অধিকাংশ স্থান হিন্দুস্থানী ও উড়িয়াতে অধিকার করিয়াছে। কচিং বাঙালী খানসামা দেখা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'ঈশ্বর' নামে যে তাঁহাদের চাকর ছিল, সে সন্ধ্যায় ছেলেদের হটগোল নিবারণের জন্ত তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত শুনাইত। অগ্রাঙ্গ চাকররাও সেখানে আসিয়া বসিত। কবি একটু বড় হইয়া নিজেই পড়িতেন, তাহারা শুনিত, তখন আর ঈশ্বরকে পড়িতে হইত না। পাঠশালার পাঠ্য কিন্তু অতি অল্পই ছিল, যাহাদের মধ্যে চাঁপকায়েক ও রামায়ণই প্রধান। ১২৭৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকা হইল না। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নর্মাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন, যেখানে তিনি ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তখন এই বিজ্ঞানসিটি চিম্পুর রোডের উপর পাথরেঘাটা স্ট্রীটের ঠিক সম্মুখে গ্রামসাল মল্লিকের বাড়িতে অবস্থিত ছিল।

কবির প্রাণে সহজাত অন্তঃসলিলা ফুল্লর জায় একটা সুর বহিয়া যাঠিত। প্রথম ভাগে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরে প্রথম বংকার উঠিল। ঈশ্বর যখন রামায়ণ পড়িত তখন সেই সুর বংকৃত হইত। কিশোরী চাটুয্যের পাঁচালীর গানে সেই সুর বংকৃত হইত। উল্লিখিত করিয়া তুলিত। এই সুর বাঁহার প্রাণে ভাগে, তাঁহার গায়ক ও কবি হওয়া আশ্চর্য নয় তবে গানটা সহজেই আসে, অল্পশ্রম ও সাধনা সাপেক্ষ, কবি হওয়া ভাগ্যের কথা, কবির জন্মান, প্রস্তুত তন না। তখন বাড়িতে গানের হাওয়া চারিদিকেই বহিতেছিল। নাট্যাভিনয়ে গানের মহলার গানের চর্চা চলিত। প্রসিদ্ধ গায়ক যজ্ঞভট্ট (যদুনাথ ভট্টাচার্য) তখন তাঁহাদের বাড়ির বেতনভোগী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বাড়ীর সকলে গানের চর্চা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্ত রামমোহনের নিযুক্ত গায়ক ভাট্টায়াগল কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর নাম তখন শহরে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর গুণপনা সকলকেই আকৃষ্ট করিতেছিল। এমন কি, ১৮৭২ সালে যখন বাঙালীর সাধারণ রক্তক্ষয় জাণাঙ্গাল থিয়েটার বীডন স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো বিষ্ণু রক্তক্ষয়ের ভিতর হইতে গান গাহিতেন। তথায় প্রথম নাটক নীলদর্পণের অভিনয়কালে নটগুরু গিরিশচন্দ্র সাধারণ রক্তাঙ্গে দোগদান করেন নাই। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় এবং পেশাদারী নট জীবন তখনো তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল এবং 'ব্যবসা' হিসাবে জাণাঙ্গাল থিয়েটারের সাফল্য তিনি সন্দেহান ছিলেন। তাই, ঐ অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একটি বাঙ্গ কবিতা মহাকবি গিরিশচন্দ্র রচনা করেন—

তাতে পূর্ণ অর্ধ-ইন্দু কিরণ, সিঁদুর মাখা মোতির হার

\* \* \*

কিবা ধর্মক্ষেত্রে স্থান,  
অলঙ্কারে “বিষ্ণু” করে গান,  
অবিনাশী মুনিখ্যি করছে বসে ধ্যান,  
সবাই মিলে ডেকে বলে ‘দীনবন্ধু’ করো পার।

মিলে যত চাধা করে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।

স্থানমাহাত্ম্যো হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার ‘নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর’ নীর্বক পুস্তিকার (অর্ধেন্দুর মৃত্যুতে, ১১০১) একস্থানে লিখিয়াছেন—“গানের শ্লেষ ছিল—স্থানমাহাত্ম্যো হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।” এই অর্ধ-ইন্দু প্রসিদ্ধ নট হান্তরসিক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি (মুখোপাধ্যায়), জ্ঞানজ্ঞান থিয়েটারের সহসম্পাদক ও নাট্যপরিচালক ছিলেন। বিষ্ণু প্রসিদ্ধ আগমনী ও বিজয়ার গান এবং ব্রহ্মসংগীত ব্যতীত কলাবতী মার্গ ও অন্যান্য গান গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈকুণ্ঠানায় একাধিকবার শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্রের পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী। বিষ্ণু ১১ বৎসর বয়স হইতে ৭৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বেতনের তিনচতুর্থাংশ কমিয়া যাওয়াতেও, ৬৭ বৎসর একাদিক্রমে জ্ঞানসমাজের গায়কের কার্য করিয়াছেন। ১৮৩০—১৮১৭ একটি দিনও তিনি সমাজে অহুপস্থিত হন নাই। ১৯০১ সালে ৮২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় দিকে যখন

ঐ সব আসরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তখন দূরে থাকিয়া সকল গানের রসের আন্বাদনের সুযোগ ছিল। কাজেই গান গাওয়া তাঁহার সহজেই আয়ত্ত হইল। আর কবিতা রচনা করার সুযোগ একরূপ অনাছতই আসিয়া জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের খুলতাতভদ্রীর পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কবির অপেক্ষা বয়সে বড়। ইহার পুত্র শিল্পী শ্রীমান যামিনীপ্রকাশ। কবির বয়স যখন ছয় সাত বৎসর তখন জ্যোতিপ্রকাশ বাউল! শেষ করিয়া ইংরেজি পড়িতেন। তিনি একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিবার প্রণালী শিখাইয়া দিলেন ও জোর করিয়া কয়েক ছত্র লিখাইয়াও লইলেন। রবীন্দ্রনাথ পয়ার বাঁধিতে শিখিলেন। তখন পত্র লেখার চর্চা আরম্ভ হইল। কবি যখন নর্মাল স্কুলের ছাত্র তখন তাঁহার পত্র রচনার কথা পণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। একদিন উক্ত স্কুলের শিক্ষক তৎকালীন প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তক “প্রাণী বৃত্তাস্ত্রের” লেখক সাতকড়ি দত্ত নিম্নের দুই ছত্র কবিতার পরে কী লেখা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই

বরষা ভরসা দিল আর ভর নাই।

বালক-রবি মুহূর্ত্ত মাত্র চূপ করিয়া থাকিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে

এখন তাহারা স্নেহে জলক্রীড়া করে।

[ক্রমশঃ।



**সমুজ্জ্বল মুখশ্রী**

নিয়মিত “বোরোলীন”  
ব্যবহারে আপনার  
তনুজী দিন দিন উজ্জ্বল  
ও কমনীয় হয়ে উঠবে।  
মুখশ্রীর কোমলতা  
ও সজীবতা বজায় থাকবে  
এর প্রান পর্শা স্নিগ্ধ সুরাস  
আপনার মনে আবেগময়  
অনুভূতি এনে দেবে।

পরিবেশক:- জি, দত্ত, এণ্ড কোং  
১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

**বোরোলীন**  
উচ্চাঙ্গের ফেসক্রিম

সকল ঔসনার্থ ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়



# কল্যাণ-বিলাস

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

## দশম সর্গ

বৎসগণ, তোমাদের সকলের বিশেষরূপে জেনে রাখা উচিত...  
প্রত্যেকের এই মায়াকৃতি। কিন্তু দেখো, ভুলেও যেন  
সেগুলির সেবা ক'বে বোসো না। যারা বিদ্বান তাঁরাই কেবলমাত্র  
কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কামনা করেন... ধর্মাত্মগুণ কলাকলাপ। ১  
“ধর্মাত্মগুণ” কলাগুলি অগ্ন্যস্ত্র কলাবিভাগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান।  
সেগুলি হচ্ছে :—

- (১) সর্বভূতে দয়া,
- (২) পরোপকার,
- (৩) দান,
- (৪) ক্ষমা,
- (৫) অননুয়া,
- (৬) সত্য,
- (৭) আলোভ,
- ও (৮) প্রেমমত্ততা। ২

“অর্থাত্মগুণ” কলাগুলি হচ্ছে :—

- (১) নিত্য উপান-শীলতা,
- (২) নিয়ম-পরীক্ষান,
- (৩) ক্রিয়া-জ্ঞান,
- (৪) স্থান-তাগ,
- (৫) পটুতা,
- (৬) অনুভবেগ,
- ও (৭) জ্ঞানোক্তদের উপর অবিশ্বাস। ৩

“কামাত্মগুণ” কলাগুলি হচ্ছে :—

- (১) পোষাকের পারিপাট্য,
  - (২) স্নান-স্বাচ্ছন্দ্যতা,
  - (৩) চাকরতা,
  - (৪) গুণাংকর,
  - (৫) নানাবিধ শৃঙ্খলাদি সীমা,
  - ও (৬) প্রিয় বা প্রেমসৌখিন চিত্তজ্ঞান। ৪
- “মোক্ষাত্মগুণ” কলাগুলি হচ্ছে :—
- (১) বিবেক-রতি,
  - (২) প্রশান্তি,

- (৩) তৃষ্ণাক্ষয়,
- (৪) সম্ভোগ,
- (৫) সঙ্গ-তাগ,
- (৬) পরমাত্মায় নিজের জীবাত্মার বিলীয়মানতা,
- ও (৭) পরম-প্রকাশ। ৫

এই হোলো ধর্মাদি চতুষ্টয় কলা ' সর্বসাকুল্যে বত্রিশটি হোলো  
এদের ক্রমবিভাগ। সংসারকে ধার! কাকি দিতে চান, সেই  
বিদ্বানদিগের এগুলি বিজ্ঞা। ৬

পাঁচটি রয়েছে “সুখাত্মগুণ” কলা। যথা :—

- (১) মাংস-স্ব-তাগ,
- (২) প্রিয়বাদিত্ব,
- (৩) সুধীরতা,
- (৪) অক্রোধ,
- ও (৫) বৈরাগ্য।

এই সুখাত্মগুণ কলাগুলি কিন্তু মানুষ ব্যবহার করে পরার্থে, স্বার্থে  
নয়। ৭

সাতটি রয়েছে “শীলাত্মগুণ” কলা।

- (১) সংসঙ্গ,
- (২) কামজয়,
- (৩) শুচিতা,
- (৪) গুরু-সেবা,
- (৫) সদাচার,
- (৬) নিখিল প্রতিজ্ঞান,

ও (৭) যশোলিপ্সা। ৮

“প্রভাবাত্মগুণ” কলা সত্তেরটি, যথা :—

- (১) তেজঃ,
- (২) সত্ত্ব,
- (৩) বুদ্ধি,
- (৪) ব্যবসায়,
- (৫) নীতি,
- (৬) ইঙ্গিত-জ্ঞান,
- (৭) প্রগল্ভতা,
- (৮) স্ব-সহায়,

- (৯) কৃতজ্ঞতা,
- (১০) মন্ত্র-রক্ষণ,
- (১১) ত্যাগ,
- (১২) অমুরাগ,
- (১৩) প্রতিপত্তি,
- (১৪) মিত্রার্জন,
- (১৫) অনুশাস্তা,
- (১৬) সপ্রতিভতা,
- ও (১৭) আশ্রিতজন-বাৎসল্য। ১-১০

তিনটি রয়েছে “মানানুগ” কলা। এগুলি মনের জীবন।  
যথা :—

- (১) মৌনতা,
- (২) অচাপল্য,
- ও (৩) অভিজ্ঞা।

যারা বিদগ্ধ তাঁদের উচিত... এই চতুষ্টয় কলাগুলিকে স্বগতঃ  
প্রয়োগ করা। ১১

আরও দশটি কলা রয়েছে, সেগুলিকে বলা হয়... “ভেষজ,”  
অর্থাৎ যে রোগের যে ঔষধ। যথা—

- (১) শক্তিমত্তের বিরুদ্ধাচরণ,
- (২) বা শক্তিমত্তকে প্রণতি,
- (৩) বলোদয় হলেই বৈবর্তাচরণ,
- (৪) আর্তের প্রতি ধর্ষাচরণ,
- (৫) হুংখে ধৈর্য-ধারণ
- (৬) স্নেহে উথলে না ওঠা,
- (৭) ঐশ্বর্যের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে সংবিভাগ করণ,
- (৮) সং-বিষয়ে সোহাগ,
- (৯) মন্ত্র-সংশয় উপস্থিত হলে প্রজ্ঞার বিকীরণ,
- ও (১০) নিশ্চিনীয় সমস্ত ব্যাপারেই পরাভুগতা। ১২-১৩

বৎসগণ, সর্বশেষ আমি তোমাদের শোনাব কতকগুলি সার-কথা।  
সর্বলোকের এই সংসারে এটি বাণীগুলি সার-তর। বৎসগণ,

- (১) যত রকমের সত্য রয়েছে তার মধ্যে গুরু বাক্যটিকেই সার  
বলে জেনো।
- (২) সমস্ত কার্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম হচ্ছে গো-ব্রাহ্মণদেবতার পূজা।
- (৩) অত্যুৎকট পাপগুলির মধ্যে লোভ শ্রেষ্ঠ।
- (৪) যা কিছু উপতাপ জন্মায় তাদের মধ্যে ‘ক্রোধ’ শ্রেষ্ঠ।
- (৫) গুণীদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান শ্রেষ্ঠ।
- (৬) বিপুলবিস্তারিতবের চেয়ে যশস্বিতা বড়।
- (৭) উৎকট হুংখগুলির মধ্যে ‘সেবা’ই সার হুংখ।
- (৮) যত রকমের নাগপাশ রয়েছে তাদের মধ্যে ‘জাশা’  
অতুলনীয়তম।

(৯) যতরকমের ধনরত্ন রয়েছে, তাদের মধ্যে দান-ধনই শ্রেষ্ঠ।  
(১০) সেই প্রদেশগুলিকেই স্নেহের বঁলে জেনো, যেখানে  
নেই শত্রুর উপদ্রব।

- (১১) ভিক্ষার চেয়ে অধিক মানসানিকর আর কিছু নেই।
- (১২) দাবিদ্রের চেয়ে বড় অকল্যাণ... নেই।

- (১৩) ধর্মই সংসার—পথিকের শ্রেষ্ঠ পাথর।
- (১৪) একমাত্র সত্য-ই পবিত্র করে তোলে স্তম্ভপথ।
- (১৫) বিলাসাদি ব্যসন... শ্রেষ্ঠ রোগ।
- (১৬) গৃহ সন্মুখি নাশ করতে আলমই সেরা।
- (১৭) যা কিছু স্নানীয়, তাদের মধ্যে নিঃস্পৃহতার স্থান  
সবার উপরে।

- (১৮) মধুরেরও মধুর হচ্ছে প্রিয়বচন।
- (১৯) নয়নে সব চেয়ে আঁধার ঘনায় দর্প।
- (২০) সবার চেয়ে বড় উপহাসাস্পদ হয়েছেন ‘দস্ত’।
- (২১) যত প্রকারের স্তুতি-দেখছে, তাদের মধ্যে অদ্বোহই  
সব চেয়ে বিদগ্ধ।

(২২) যতরকমের বরণীয় অমুঠান বা নিয়ম রয়েছে তাদের  
মধ্যে অচাপল্যই বরণীয়।

(২৩) অনেক কিছুই অপ্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু পৈতৃক্যের  
দোসর নেই।

(২৪) নৃশংস কর্মগুলির মধ্যে মানুষকে ভাতে-মারা (বুড়িচ্ছেদ)  
অধিতীয়।

- (২৫) পুণ্যরাশির মধ্যে কাকন্য শ্রেষ্ঠ।
- (২৬) পুরুষের চিহ্নগুলির মধ্যে কৃতজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ।

(২৭) যত রকমের মোহানুগ প্রজ্ঞা রয়েছে, তাদের মধ্যে  
মায়ী শ্রেষ্ঠ।

(২৮) যে কারণগুলি নরকে নিয়ে যায় মানুষকে, তাদের  
মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রধানতম।

- (২৯) ঈগ-চোরদের মধ্যে শ্রীমদন শ্রেষ্ঠ।
- (৩০) জ্ঞানভেদের ব্যাপারে স্ত্রী-বাক্যই প্রবল।

(৩১) যে মানুষ ক্রুর সেই-ই আসল চাঁড়াল।  
(৩২) কলিযুগে যে সব অবতার প্রকট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে  
ঐন্দ্রজালিক শ্রেষ্ঠ অবতার।

- (৩৩) শাস্ত্রই অনবত্ত মণি-প্রদীপ।
- (৩৪) উপদেশই অনবত্ত মঙ্গল স্থান।

(৩৫) ক্রেশের গণনার বার্ককোর স্থান সর্বাগ্রে।  
(৩৬) মৃহু-তুল্য যত রকমের হুংখ-ভোগ রয়েছে সেগুলির  
মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে চিররোগিণী!

(৩৭) বিধম বিধগুলির মধ্যে স্নেহই শ্রেষ্ঠ বিধ।  
(৩৮) কুষ্ঠ বিসপাদির অপেক্ষা বেজাব ভালবাসা সাংঘাতিক।

(৩৯) ভাষ্যই গৃহের পরম ধন।  
(৪০) পরলোকবন্ধুদের মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

(৪১) সতস্র শালোর চেয়ে শত্রু সাংঘাতিক।  
(৪২) হুস্পৃহই কুল-স্বংসের শ্রেষ্ঠ কারণ।

(৪৩) রমণীদের শ্রেষ্ঠ বহন্য হচ্ছে ঘোবন।  
(৪৪) মোতন বেণ্ডুবার চেয়ে রূপ বড়।

(৪৫) সতস্র রাজ্য লাভের চেয়ে সন্তান বড়।  
(৪৬) সম্রাটের সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে সংসঙ্গ সানন্দব।

(৪৭) শোষণকাবাদের মধ্যে চিস্তাব চেয়ে দড় কেউ নেই।  
(৪৮) কোটবাগ্নির মত দাতন ছড়াতে বিদ্রোহ অদ্বিতীয়।

(৪৯) বিশ্বাস বা প্রণয়ের সার হচ্ছে মৈত্রী।

(৫০) যত রকমের মতর্ষ ভোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে নির্ভয়গাই শ্রেষ্ঠ।

(৫১) যত রকমের ব্যাধি রয়েছে, সঙ্কোচ তাদের মধ্যে উৎকর্ষ।

(৫২) কোটিসোম মত নির্জলা অন্ধকূপ আর নেই।

(৫৩) যত রকমের নির্মালি রয়েছে, তাদের মধ্যে সরলতার স্থান আদিত।

(৫৪) বিনয়ের তুলি রত্নমুকুট নেই।

(৫৫) তর্গাসনগুলির রাজা হচ্ছেন দ্যুতক্রীড়া।

(৫৬) মরুভূমির পিণাচদের চেয়েও সাংঘাতিক হচ্ছে।

...স্বীকৃতি। ১৪—২৭

(৫৭) ক্যাগিট শ্রেষ্ঠ মণিবলয়।

(৫৮) জ্ঞতিই উজ্জ্বলতম কর্ণভূষণ।

(৫৯) গল-মৈত্রীর চেয়ে চপলতর আর কিছু নেই।

(৬০) অনেক প্রশাসন নৃষা হয়ে যায়, কিন্তু তর্জনের সেবা ব্যর্থ হবেই।

(৬১) মোক্ষমুখই শ্রেষ্ঠ উদ্ভাস।

(৬২) প্রিয়দর্শনই অমৃতগুটি করে।

(৬৩) শ্রেষ্ঠ লভা হচ্ছে ব্রহ্মরতি।

(৬৪) সঙ্কনের বিবেকনাশ করতে চলে মূর্খসভা বসায়।

(৬৫) সফল যত মতীকৃত রয়েছেন, তাদের মধ্যে কুলীনেরাই শ্রেষ্ঠ।

(৬৬) সত্যযুগের অপতারদের চেয়েও সৌভাগ্যই জেনে রেখে কাম্য।

(৬৭) রাজদরবার সব চেয়ে খুল শঙ্কাস্থল।

(৬৮) স্বভাবকোটিল্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রমণীস্থলয়।

(৬৯) জুতির যোগ্য যা কিছু রয়েছে, তাদের মধ্যে ঐচ্ছিতাই সব চেয়ে স্তবনীয়।

(৭০) চন্দ্রনাড়ি অনুপলপনের চেয়ে গুণরাগ শ্রেষ্ঠ।

(৭১) শোকের জন্ম দিতে কণ্ঠাই পটায়সী।

(৭২) নির্বোধই অনুকম্পার শ্রেষ্ঠ পাত্র।

(৭৩) ধনদৌলতই আসল সৌভাগ্য।

(৭৪) কীর্তির মুখ্য মূল হচ্ছে জনস্বীকৃতি।

(৭৫) মত্তের চেয়ে বড় ভালবেতাল-নেই।

(৭৬) এক গজ আড়ের যে সব ধন-কুবের রয়েছে, তাঁদের শিকারই বেশী উপকারী।

(৭৭) স্বাস্থ্যকর যা কিছু হতে পারে, তাদের মধ্যে মানসিক শান্তিই শ্রেষ্ঠ।

(৭৮) বিভিন্ন তীর্থ-সেবার চেয়ে আশ্বরতি মঙ্গলের।

(৭৯) নিষ্ফলাদের মধ্যে কৃপণ শ্রেষ্ঠ।

(৮০) সবচেয়ে বড় আশান হচ্ছে-সংসারের আচার-বিবর্তিত মায়া।

(৮১) জায়-বুদ্ধিই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ বক্ষা।

(৮২) ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ প্রতাপী।

(৮৩) ঈশ্বা-ই শ্রেষ্ঠ যক্ষা।

(৮৪) অপবশের মত কুস্থানে-মরণ আর নেই।

(৮৫) মাতাই মঙ্গল্য মহোত্তমা।

(৮৬) পুণ্যোৎসব উপদেশ ইত্যাদির চেয়ে পিতাই মহত্তর।

(৮৭) তীক্ষ্ণতর যত রকমের কাজ রয়েছে, তাদের মধ্যে খুন-খারাপিই শ্রেষ্ঠ।

(৮৮) শাপিত খড়্গের চেয়েও বিচ্ছেদ সাংঘাতিক।

(৮৯) প্রণামই উত্তম চোব-অহঙ্কারের বা ক্রোধের।

(৯০) যত রকমের কষ্ট-ভিক্ষা আছে, তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের জোড়া নেই।

(৯১) পৃষ্ঠিকরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 'মান'।

(৯২) কীর্তিই সংসার বীরদের শ্রেষ্ঠ সার।

(৯৩) শ্রেষ্ঠ নীতি হচ্ছে 'প্রভুভক্তি'।

(৯৪) সৌখ্যের যত রকমের বাঁধি রয়েছে, তাদের মধ্যে যুদ্ধে নিধনই সৌখ্যের শ্রেষ্ঠ বাঁধি।

(৯৫) বিনয়ের মত কল্যাণ আর নেই।

(৯৬) অগ্নিমাধি সর্ব সিদ্ধির চেয়ে উৎসাহ বড় জিনিষ।

(৯৭) পরম প্রার্থিবগুলির মধ্যে পুণ্যই শ্রেষ্ঠ।

(৯৮) পরম প্রকাশ গুলির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

(৯৯) সংসারে মানুষের কাছে অল্প-মানুষ নগণ্য। কীর্তিই ধন।

১৪—৩৮

আর বসংগণ, জেনে রেখো, এই কলা-বিজ্ঞাগুলিকে আয়ত্ত করে যিনি কুশলী হয়ে ওঠেন, তিনিই অর্থের সৃষ্টি ও অর্জনতত্ত্বে বিজ্ঞানী হন, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ হন। সর্ববর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণের মত। ৩৯

নানান রকমের কলা রয়েছে। তারা শুভও আনে, অন্ততও আনে। কিন্তু এই যে, একশটি সারগর্ভ বাক্য তোমাদের শোনালেন, জেনে রেখো, সেগুলিকে যিনি বিচারমূলে ব্যবহার করবেন, তিনিই দর্শন পাবেন লক্ষ্যের। লক্ষ্যদেবীর প্রয়োজন সর্বকালেই প্রত্যক্ষ। ৪০

\* \* \*

এই পর্যন্ত ব'লে শ্রীমহাদেব থামলেন। তারপরে আচার্য্যের স্বাধীন-স্বত্ব অনুষ্ঠান করে বিদায় দিলেন শিষ্যদের। ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন নিজের মন্দিরে।

তখন অস্ত গেছেন চাঁদ।

নক্ষত্রের ফুল ফুটে উঠছে রাত্রির ওড়নায়। ৪১

এই 'কলা-বিলাস'—

নানান আসরের খেলা দেখায় ;

অধরেতে মুচকি হাসির চাঁপা কোটার ;

এবং লোকজনকে উপদেশ দেয় ;

যেন সে একটি প্রেমিক রতন।

যাঁর মধুর আলাপে রয়েছে বিচিত্র একটি আবেদন। ৪২

"স্কেন্দ্রের" প্রতিভা-সাগর থেকে উগ্ঠিত হয়েছে এই কলা-বিলাস।

সেই বিলাস, হিম-রশ্মি চন্দ্রদেবের মত, নিখিলের মনে নিত্য দান

করুক আনন্দ-এই তাঁর প্রার্থনা। ৪৩

ইতি কলাবিলাসে সকল কলা নিরূপণ নাম দশমঃ সর্গঃ।

# শ্রীমতী আর্ভের এর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

## শেষ কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারী মার্গরিভের ছেলে হয়। ওর মা বাড়ী ছিলেন না। জেনারেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন অসুস্থ এক পুরোনো বান্ধবীর বাড়ী, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। মার্গরিং জোর করেই ওর মাকে পাঠিয়েছিল, নয়ত ভদ্রমহিলা যেতে চাইছিলেন না। বিকেল চারটে নাগাদ যন্ত্রণা শুরু হয়। ওর স্বামী কি লিখছিল বৈঠকখানায়। পাশেই ও বসে বুনছিল। কয়েক মিনিট বাদে ও সোফায় শুয়ে পড়ল। স্বামী তাড়াগাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল, “কি, কি হল?”

“কিছু না গো, বড় ক্লান্ত লাগছে।”

ও উঠে এসে বসল স্ত্রীর পাশে। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও ও তা ঢাকতে চেষ্টা করছিল। হুজনে হাত ধরাধরি করে বসে রইল নীরবে।

“লুই”, শেষ পর্যন্ত ও বলল, “আমি ওপরে যাচ্ছি, শরীরটা কেমন যেন করছে।”

উঠে দাঁড়াল ও। ঘরটা যেন ওর চারিদিকে ঘুরতে লাগল। টপ করে ও বসে পড়ল।

“লুই, বড় দুর্বল লাগছে!”

ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে লুই একটা কোচ শুইয়ে দিল আন্তে আন্তে। “তুমি নড়ো না যেন, লক্ষ্মীটি, তোমার মাকে আমি ডাকতে যাচ্ছি, আর ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি।”

ও বেরিয়ে গিয়ে তেরেসকে পাঠিয়ে দিল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে দাঁটাই ওর পোষাক পরিচ্ছদ খুলতে লাগল।

“আজই না তেরেস? বাছা আজ আসছে?”

“হ্যাঁ, থুর্কুদি।”

তেরেস ওকে ড্রেসিং গাউন দিতে গেলে ও হেসে বলল, “সব চেয়ে ভালটা যে তেরেস, এখুনি লোকজন আসবে।”

পোনে এক ঘণ্টা কেটে গেল, ব্যথা বেড়েই চলল। ওর চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। বি গেল গাম্‌জল আনতে। দুই হাতে মুখ ঢেকে ও জানালার ধারে বসেছিল; স্বামী এসে চুকল; ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখল, ও কাঁদছে।

“বোঁরা! এত কম বয়সে এই কষ্ট!” ওর কপালে চুমা দিয়ে ও বলে উঠল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা... যন্ত্রণা হচ্ছে খুব বেশী?”

ওকে আশ্বস্ত করবার জ্ঞান হাসতে চেষ্টা করে মার্গরিং জবাব দিল, “না গো, সামান্য ব্যথা!” কিন্তু ও ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে দেখে মার্গরিং বলল, “এ ব্যথা সবই ভুলে যাব গো যখন কোল-জুড়ো ঘন আসবে। এত বড় পুরুষের বদলে যন্ত্রণা সহ্যেই হবে!”

স্বামীর হাত ধরে গিয়ে ধীরে ধীরে ও শুয়ে পড়ল। ঢ় ঢ় করে ছটা বাজল। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। লুই ছটফট করতে লাগল ডাক্তারের দেবী দেখে। ও উঠছে দেখে মার্গরিং জড়িয়ে ধরল ওকে যন্ত্রণার ঘোরে।

“যেও না লুই, একা বড় ভয় করছে, যেও না গো!”

“চুপ কর লক্ষ্মীটি, একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর!”

হাঁটু গেড়ে ও বসে পড়ল বিছানার পাশে, স্ত্রীর মাথা কাঁধে রেখে। মার্গরিভের চাপা নিশ্বাস, অনর্গল অশ্রু—এসব দেখে বোঝা যাচ্ছিল কী যন্ত্রণা ওর হচ্ছে। সাতটা বাজল; স্নানার্থ এক নিশ্বাস ফেলেই ও অজ্ঞান হয়ে গেল; প্রসব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় বাড়ীর দরজায় এসে থামল একটা গাড়ী। ওর মা এলেন। ফেব্রার পাখিই ওঁর কাছে খবর পৌঁছেছে। উনি ঘরে ঢুকতে কাপ্তেন উঠে দাঁড়াল, স্ত্রীর মাথা বালিশের ওপর রেখে ওঁর কাছে গিয়ে সংক্ষেপে বলল, “দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে; ছেলে হয়েছে।”—তারপর বেরিয়ে গেল। ওর মার সঙ্গে সঙ্গে তেরেস এল; দশ মিনিট বাদে এলেন ডাক্তার; পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেন সব কথা খুলে বলল ওঁকে।

“ওর মা এখন ওর কাছে আছেন”, ও বলল শেষে।

ঘরের দরজা খুলে গেল। মাদাম আর্ভের ডাকতে এলেন মঁসিয়ঁ শাঁতোকে, “আম্রন ডাক্তার বাবু, খাসা নাহস-মুহস ছেলে হয়েছে।”

লুই আর ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে ও চোখ বুজে শুয়ে ছিল। ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। আধ ‘ঘণ্টা চেষ্টার পর ও চোখ খুলতেই প্রথম তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওকে আশ্বস্ত করবার জ্ঞান হাসল মার্গরিং। কপাল চূষন করে ওর স্বামী হাত রাখল ওর হাতে।

“বাচ্চাটা কেমন আছে গো?” চুপি চুপি মার্গরিং প্রশ্ন করল। মাদাম আর্ভের লুইয়ের হাতে ছেলে দিতেই লুই তাকে রাখল প্রশ্রুতির বুকে। মার্গরিং বহুকণ চেয়ে রইল তার দিকে; ওর মুখে ফুটে উঠল বিজয়িনীর হাসি। “ওগো, এই দেখ আমাদের সন্তান!” তারপর অপূর্ব হাসি হেসে বলল, “কি গো, ছেলে যে বাপের হামি চায়!”

লুই বসে মাকে আর ছেলেকে আদর করল।

“ভগবান আমাদের স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল করুন, তিনিই তাদের রক্ষা করুন সর্বদা!”

ডাক্তার ওর হাতে এক গ্লাস পানীয় দিয়ে বললেন, পোয়াতীকে সবটা খাইয়ে দিতে।

মার্গরিং উঠে বসতে চেষ্টা করল।

“না মা শুয়ে থাক, এখনো তুমি বড় দুর্বল, ‘হাঁ হাঁ’ করে উঠলেন

ডাক্তার শাঁতো।—দুস থেকে গানিকটা খেয়ে ও স্বামীকে বলল,  
“আর পারছি না।”

“কিন্তু এটুকু যে খেতেই হবে।”

অমনি মার্গরিৎ চ্যুক দিয়ে খেয়ে নিল সবটা।

“যত পার খাওয়া-দাওয়া কর হে”, ডাক্তার বললেন, “তা নয়ত  
নতুন মাছবটির খাওয়ার জোগাড় হবে কোথা থেকে? এমন গুণ্ডা  
ছেলে অল্পে শাস্ত হবে না, একথা বলে রাখলাম।”

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন লুইয়ের সঙ্গে।

“কেমন দেখলেন?” লুই বাস্ত হয়ে উঠল।

উত্তরে ডাক্তার ছোট একটা শীস দিলেন।

“বলুন মিসিয়া শাঁতো”, লুই অধীর হয়ে জানতে চাইল।

ডাক্তার ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

“সবুজ বন্ধু, দৈব ধর। মার্গরিৎের জন্ম থেকেই আমি ওকে  
দেখছি; ভেতরে ভেতরে ওর স্বাস্থ্য খুবই ভালো। এটা একটা  
আশার কথা। কিন্তু ওর বয়স সাতেরো বছরও হয়েছে কি না সন্দেহ।  
এটা ভাল-মন্দ দুই-ই; ওর এগনও মা হবার বয়স হয় নি। কিন্তু  
ওর তাকণোর জোর আছে। এসময়ে অসুখ ও দৌর্বল্যের সাথে লড়াই  
জিতে ও বেরিয়ে আসতে পারবে মনে হয়। ওর স্বাস্থ্য কি এখনো  
আগের মতই অটুট আছে?”

“আনাদের বিয়ের আগে গত এপ্রিল মাসে ওর যে অসুখ হয়েছিল,  
তাতে ও অনেকটা রোগী ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর মে মাসে  
আমাদের বিয়ে হয়।”

“হা, হা তখনো ও পুরোপুরি সেরে ওঠে নি।”

গানিকক্ষণ মিসিয়া শাঁতো আঙনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু শীস  
দিলেন।

“আচ্ছা, বিয়ের পর আর অসুখ হয়নি, না?”

“উঁহ, হবার খালি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।”

ডাক্তারের কালো প্রথর চোখ দুটি লুইয়ের বিষণ্ণ মুখে কিছু  
খুঁজছিল। “বাবড়ার কিছু নেই হে, ওর বয়স অল্প, সেরে উঠবেই।”  
বলে তারপর শ্বেতাদ কণ্ঠে বললেন, “ভয় পেরোনা বন্ধু, ঘাবড়াছ  
কেন? এ-বয়সে কোন বাবা কাছেরই হার মানেন না লোকে—এ  
আমার স্থির বিশ্বাস।”

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন। মার্গরিৎ দরজার দিকে চেয়ে স্বামী আসছে  
দেখে হাসল। “কোথায় গিয়েছিলে গো? বস এখানে!”

বিছানাতেই একটু ভায়গা করে দিল ও; লুই বসল।

“কি সন্দেহ দেখতে হয়েছে ছেলেটা?” মার্গরিৎ বলল।

স্বামীর হাত নিয়ে বাচ্চাটার হাতের উপর রাখল মার্গরিৎ।  
“কি নয়ম না? তেমনি মোটা-সোটা। মা বলছিল দেখে ছ’মাসের  
ছেলে মনে হয়; ওর চোখ দুটি কিন্তু হুবহু তোমার মত হয়েছে।  
অমনি স্বচ্ছ, অমনি গভীর; কিন্তু ছেলে সহজে চোখ খোলেন না।  
ওর চুলগুলো কেমন বলত?”

“ঠিক তোমারই চুলের মত কচকচে কালো,” উত্তর দিল লুই।

“হঁ, আর সবই তোমার মত হয়েছে।”

“খালি আমার প্রশংসাই করবে নাকি গো?” হুটু গলায় লুই  
জানতে চাইল।

“আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না গো; মাকে জিজ্ঞাসা

কর না। আচ্ছা মা, ছেলেটা ঠিক লুইয়ের মত দেখতে হয়েছে  
না?”

“উঁহ, এখন বেশী কথা না বলাই ভাল, মিসিয়া শাঁতো বাধা  
দিলেন, “একটু ঘুমিয়ে নাও বাচ্চা। বঁ সোয়ার।”

বাচ্চাটা হঠাৎ ককিয়ে উঠল, মার্গরিৎ ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের দিকে  
তাকাল, “বোধ হয় খিদে পেয়েছে ডাক্তার বাবু!”

“বেশ ত, দুধ দাও।”

লজ্জায় গৌরবে লাল হয়ে উঠল মার্গরিৎ। “কিন্তু ঘন ঘন ওকে  
জাগিও না দুধ খাওয়ার জগ্ন, তা হলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ  
হবে।”

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। সব কটা বাতি নিভিয়ে দেওয়া  
হল। ছোট্ট একটা টেমি আর চিমণীর আলো ঘরে ছিল। ছেলেটার  
দিকে পরম আনন্দে মা তাকিয়ে রইল। অব্যক্ত এক স্তব্ধ ওর সমস্ত  
বস্তু ছলকে উঠল সারা গালে, যখন বাচ্চাটা মোটা ঠোঁট দুটি দিয়ে  
টিপে ধরল ওর স্তনাগ্র, ওর স্বামী পাশে বসে হাসছিল মিটি মিটি।  
বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ল। দুধে-মাগা শানা কটি মুখ থেকে মাড়ন্ত  
আলগা হয়ে পড়ল। এমন সময় জেনারেল মেয়ের কাছে এলেন।

“কি রে মার্গো, আজ সন্ধ্যা থেকে আমি তাহলে দাদামশাই  
হলাম?” বললেন উনি। লুই তাড়াহাড়ি উঠে দেখে ওকে মানা  
করলেন উনি, “বস বাবাজী!” মেয়েকে চুমা দিলেন কপালে।

“ভগবান তোকে রক্ষা করবেন”, বলতে বলতে ওঁর গলা ভারী  
হয়ে উঠল। তার পর বসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন লাগছে মা?  
বড় দুর্বল না?”

“সামান্য!” বলেই ঠোট ফুলিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, “কই বাবা,  
এক বারও তোমার নাটিকে দেখতে চাইলে না ত?”

“আমার নাতি!” জেনারেল এমন ভান করলেন, যেন আকাশ  
থেকে পড়ছেন, “উঃ এর মধ্যেই দাদামশাই হয়ে গেলাম! এমন  
জানলে শ্রীমানের সঙ্গে মার্গোর বিয়ে দিতাম না। ষাট বছরে পা  
দেবার ত এখনো কত দেবী! দেখতে দেখতে কতাদাহ হয়ে যাব  
এ ভাবে চললে!”

প্রাণ খুলে হাসতে লাগল মার্গরিৎ। সেই উজ্জ্বল হাসিতে সবারই  
বুক ভরে উঠল। মার্গরিৎ ওর স্বামীকে তিনটে বাতি জ্বালাতে বলল  
যাতে করে বাবা ভাল করে ছেলের মুখ দেখতে পান।

দাদামশাই বহুকক্ষণ চেয়ে রইলেন নাতির দিকে। যৌবনের কথ  
তার মনে পড়ল যখন প্রথম তিনি কোলে নিয়েছিলেন তাঁর খুকিকে  
চোখের সামনে ভেসে উঠল মশাবী-খাতানো বিছানাটার ছবি। অতি  
স্নেহের সাথে উনি বাচ্চাটার কপালে চুমা দিলেন।

“আজ আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তোর জন্মের কথা। কিব  
তোর মা এত দুর্বল ছিলেন না, অবশ্য ওঁর বয়সও এত অল্প ছিল ন  
তখন।”

“কত ছিল বাবা?”

“পঁচিশ বছর।”

“তা হলে তো লুইয়ের চেয়েও বড় ছিলেন?”

“ওর কত হল? ১৮৪০ থেকে ১৮৬২? বাইশ বছর মাত্র!

তার পর বললেন, “আজ তোর জন্মদিন ত খুকি?”

“তাই ত লুই, ভুলেই গেছিলাম।”



“তাতে কি, জন্মদিনে কি খাসা উপহারটা দিলি বলত?”—ওর মুখে হাসি ধরে না।

“হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় উপহার জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়” বলে লুই ওর গমস্তা ছেলেকে আদর করল।

মার্গরিৎ স্বামীর হস্ত চুম্বন করল। তারপর খানিক বাদে প্রশ্ন করল, “লুই, ঠাকুরমার কাছে তার করা হয়েছে?”

“বাস্তব হস না মা, আমি এখনি তার করেই ফিরছি!” কাস্পেন সাহেবের কি অল্প দিকে মন দেবার মত অবস্থা ছিল?—কিন্তু তোর এখন বিশ্বাসের প্রয়োজন। কাল কথাবার্তা হবে। শুভরাত্রি মা। ভালকরে গমিয়ে নে!” বলে উনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে সবার আগে ও জেগে উঠল। লুই সারারাত ঘুমুতে পারেনি। শরীর খারাপের জ্ঞান নয়, উদ্বেগে। বিছানার দিকে পেছন ফিরে ও দাঁড়িয়ে ছিল চিমনীটার সামনে। নিজেরই করনার নেশায় ও বৃন্দ হয়ে ছিল, এমন সময় কানে এল রমণীয় সেই ডাক, “লুই!”

ও ঘুরে দাঁড়াল। মার্গরিৎ ওর দিকে পূর্ণ আস্থাভরা ডাগর দু’টি চোখ মেলে চেয়ে ছিল। মাতৃহের হ্রাস্তি বিকীর্ণ হচ্ছিল ওর সারা মুখে। লুই এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

“লুই তুমি ঘুমাও নি?”

“না, আমার ঘুমের দরকার নেই গো!”

“কে বলল নেই? যদি এভাবে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হও, মুষ্টিলে পড়বে।”

“তাত হল, তুমি কেমন আছ?”

“ডাগনের মত সুস্থ গো, আর অত্যন্ত সুখী!”

স্বামীর হাত নিয়ে খেলতে খেলতে ওর চোখে পড়ল বিয়ের আংটিটা। ও হাসল, “যখন তোমার ওটা পরিয়েছিলাম, তখন মনে যে কত দ্বন্দ্ব ছিল!”

“আর আজ?”

ও স্বামীর হাতের উপর নীরবে মাথা রাখল। “আজ আমি সবচেয়ে সুখী, প্রিয়!”

ওদের আদরে ছেলেটার ঘুম ভেঙে যেতেই সে কিছু খুঁজতে লাগল। লুই বুঝতে পেরে মশারী ফেলে দিল, খুলে দিল একটা জানলা। ফিরে এসে দেখল মার্গরিৎ ওকে দুখ খাওয়াচ্ছে।

“ছোঁড়াটার খিদে পেয়েছে দারুণ!” হেসে জানাল মার্গরিৎ।

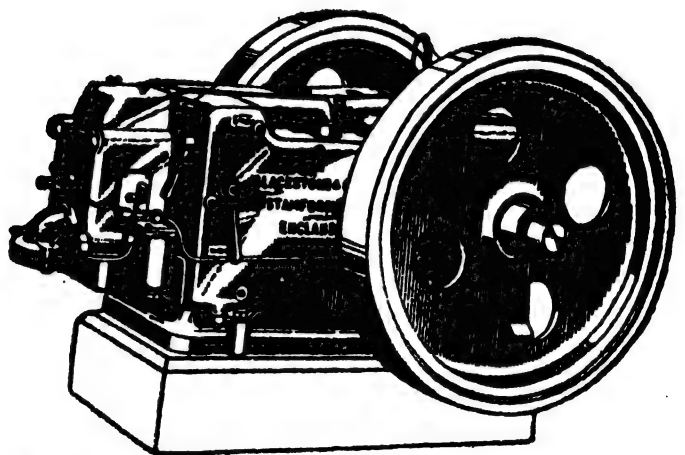
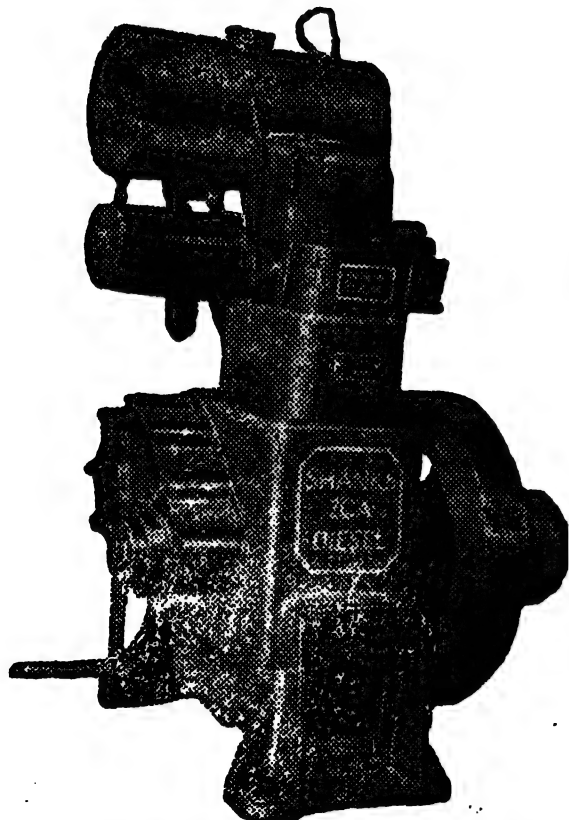
“খিদে ত না, একেবারে রাফসের মত গিলছে। ওর দাঁত থাকলে মাকেও খেয়ে ফেলত বোধ হয়”, ঠাটা করল লুই।

ছেলেটা আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বাপের দিকে তাকাল, যেন একটু হাসল।

“দেখছ লুই, এত গাল-মন্দ খেয়েও তোমার দিকে চেয়ে হাসছে, কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নেই! ছেলের মত ছেলে!”

“মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী দুখ খায় না গো?” লুই হেসে জিজ্ঞাসা করল।

“তা কি করে জানব? এই ত সবে একটা হল। না বাপু, ছেলেই ভাল।”



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকার্য্য দেখের অন্ন ও প্রাণ এবং আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিট্টার, ব্লাকষ্টোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং সেট, শ্রাঙ্কস্ ডিজেল ইঞ্জিন, শ্রাঙ্কস পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, দ্বিতল কলিকাতা-১

ফোন :- ২২-৫৭৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবহার্য্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

“আমারো সেই মত, কিন্তু আসছে বার, বছর খানেকের মধ্যেই জন নেবে ছোট্ট একটি খুকি,—ঠিক তোমার মত দেখতে।”

“বছর খানেকের মধ্যে?” ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল ওর মুখে। অল্পক্ষণ পরে ও আশ্চর্য ভাবে বলল, “আমার স্বপ্নের কথা?”

“তোমার স্বপ্ন? পাগলি কোথাকার! স্বপ্নের কথা কেউ বিশ্বাস করে?” বলে ওর গাল টিপে দিল।

মার্গরিং তবু বিবম ভাবে মাথা নাড়ল, “আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমার এই স্বপ্ন যে অল্প রকম।”

“কিন্তু আর তো ভয়ের কিছু নেই। প্রসবের সময়টাই আশঙ্কাজনক। তুমি সর্গোরবে পুরস্কার হাতে বেরিয়ে এসেছো সে-পরীক্ষা থেকে।” বলে ও ছেলের মাথায় হাত রাখল।

“তোমার কি মনে হয় সব বিপদ কেটে গেছে লুই?” আশায় আনন্দে ওর চোখ হলে উঠল।

“নিঃসন্দেহে, মার্গরিং।”

লুই-এর কথা ও পরম বিশ্বাসে মেনে নিল বড় আশঙ্কিত হইল।

“লুই বাইবেল থেকে কিছু পড়ে শোনাও না!” ও আবদারের সুরে বলল।

না ভেবেচিন্তে বইটা খুলেই ও পড়তে শুরু করল যা প্রথম চোখে পড়ল। সেটি ১১৪ নম্বরের স্তোত্র :—

—“ভগবানকে আমি ভালবাসি; তিনি আমার জীর্ণকণ্ঠ গুনতে পাবেন।

—“তিনি আমার প্রার্থনা গুনছেন; সাগর জীবন ধরে প্রতিদিন তাঁকে আমি স্মরণ করব।

—“মৃত্যুর ব্যথা আমায় ঘিরে ধরেছে; কবরের ভীতি আমায় আকুল করে তুলেছে।

—“অপরিসীম যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমি, ডেকেছি তোমায় হে ভগবান!

—“ভগবান আমার আত্মাকে মুক্তি দাও; তুমি, তুমি ভগবান করুণাময়, স্রব্ধিকারক; তুমি দয়াময়।

—“ভগবান সন্তানদের রক্ষা করেন; বড় অবজ্ঞা সহ করেছি, তাই তিনিই আমায় উদ্ধার করেছেন।

—“হে আত্মা, স্বীয় শাস্তি লোকে প্রবেশ কর, ভগবান তোমায় সব কিছু দান করেছেন।

—“তিনি মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন আমার আত্মাকে, অশ্রু মুছে দিয়েছেন আমার নয়নের, সর্ব পতন থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন।

—“এই মরলোকে আমি তাঁরই প্রীতার্থে বেঁচে থাকব।”

ওর পড়া শেষ হলে মার্গরিং আঙুলিতে লাগল, “মৃত্যুর ব্যথা আমায় ঘিরে ধরেছে—ভগবানকে আমি স্মরণ করেছি। ভগবান, আমার আত্মাকে উদ্ধার কর।” তারপর ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল ধীরে ধীরে, “চিরন্তন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন; তিনি আমাদের একেও দেখবেন, না গো?”

“হ্যা গো!”

সারাদিন ও বেশ হাসি-খুসী ছিল। ১৬ তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ ও ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে ও ঘুমুচ্ছে দেখে পরে আসবেন বলে চলে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ সেই সময় ও জেগে উঠে শক্তিত হয়ে তাকাতো লাগল।

“কি হল মা?”

“ভয়!” ও বলল দারুণ বিচলিত ভাবে। ওর হুই চোখে অস্বাভাবিক একটা ছায়া।

“ভয়?” ডাক্তার হেসে উঠলেন, “হ্যা, হ্যা! ভয় কিসের মা? ও স্বামীর কাঁধে হাত রাখল। “বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি, না লুই?”

“হ্যা গো!”

“আবার সেই স্বপ্ন দেখেছি গো,” অসম্ভব শক্তিত ওর চাউনি।

“হো, হো! স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ বাছা?” ডাক্তার বললেন “তোমার ছেলে যদি জানে তার মা এমন ভীতু, কি ভাববে বলত! এই নাও, এটুকু খেয়ে নাও দেখি,” বলে এক কাপ দুধ এগিয়ে দিলেন ওর মার হাত থেকে নিয়ে। এক চুমুকে ও সবটা খেয়ে নিল।

“এখন ভাল লাগছে না?” বলে ডাক্তার উপদেশ দিলেন।

“এই সব খারাপ চিন্তাগুলো দূর করে দাও মা; এতদূর্বল অবস্থায় ভয় পাওয়া ঠিক নয়; এমন যে কত দেখলাম—প্রথম মা হয়ে সব এই রকম নানা উদ্ভট চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে; ভালো করে ঘুমাও মা-মণি, বঁ সোয়ার!”

লুই ওর সাথেই বেরিয়ে গেল, জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে ডাক্তার মাথা নাড়লেন, “অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে; রাতে জ্বরটা বাড়বে; এক দাগ ওষুধ দিও।”

“আর আশা নেই ডাক্তারবাবু?” নীচু নীরস গলায় কান্থেন জানতে চাইল।

“উঁহু, সে-কথা বলছি না, হয়ত ভাল হয়ে যাবে, অসম্ভব কিছু নয়; কিন্তু যা ভয় করছিলাম, ঠিক তাই হল: জ্বরটা!”

উনি নীচে গিয়েই দ্রুতপদে উঠে এলেন; দেখলেন সিঁড়ির রেলিং-এ মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে লুই। অন্তরঙ্গের মত উনি ওর পিঠে হাত রাখলেন; লুই চমকে উঠল; শুঁকে দেখে বলল, “ওঃ, আপনি।”

“আমি বলতে এলাম যে ও যেন বাচ্চাটাকে আর দুধ না খাওয়ায়; একটি দুধ—মা পাঠাচ্ছি; নয়ত বাচ্চাও অসুখে পড়বে। সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হবে, ও যেন বিপদের বিন্দুমাত্র আভাস না পায়। তবে ও একদম জেগে পড়বে।”

তারপর লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, “আর ম’সিয়্য, এভাবে ঘুমুড়ে পড়ো না; ভয়ের বিশেষ কিছুই দেখছি না। শতকরা, পাঁচটি মৃত্যুও হয় না এসব কেস-এ। জ্বরটা একটু মুক্ছিলজনক বটে, কিন্তু কোন্ অসুখটা না শুনি? আচ্ছা বাবা আসি; বঁ সোয়ার।”

লুই প্রস্তুতির ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মা মেয়েতে কথা হচ্ছিল। ওর স্নান কপোলে লেগেছে গাঢ় লালের ছোপ, আর চোখদুটো চকচক করছে; দারুণ আবেগের সঙ্গে ও কথা বলছিল, নীচু গলার অবশ্য, কারণ পাশেই ওর ঘুমন্ত শিশু। স্বামীকে আসতে দেখে ও তারদিকে ফিরে তাকাল।

“মার্গরিং!”

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ও ইশারা করল যে বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে। লুই হেসে ওর পাশে গিয়ে বসল।—

“জগো, কথা একটু কম বললেই পারতে এসময়ে; ক্লান্ত হয়ে পড়বে যে, শরীর খারাপ হবে।”

এমন সময় তেরেস এল ; দরজাটা কাঁচ করে উঠতেই বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে গেল।

“দেখলি তেরেস, তুই বাছার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি!” একটু থমকের সুরে ও বলল। তার পর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চপল হাসিতে মুখের হয়ে বলল, “বাবু আমার হয় ঘুমবেন, নয় খাবেন ; আলসে কোখাকার !”

ও ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে ওর তপ্ত হাতে হাত রাখল লুই।

“সুনছ, ওকে দুধ দিও না।”

সবিস্ময়ে চেয়ে মার্গরিৎ প্রশ্ন করল, “কেন ?”

“তোমার অন্ন স্বর হয়েছে কি না, তাই স্বরের বোরে ওকে যদি দুধ দাও, ওর শরীর খারাপ হবে। স্বর ছাড়লেই আবার খেতে দিও, কেমন ?”

শাস্ত উৎকল্ল কণ্ঠেই কথা কটি লুই বলল। কিন্তু ওর বুক ফেটে যেতে লাগল যখন দেখল কেমন ভাবে মার্গরিৎ করুণ দৃষ্টিতে একমনে সুনছে ওর কথা।

“বোচারা !” বলে সখেদে ও চোখ বন্ধ করল। পরে বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে ছ’কোঁটা জল তার মুখের ওপর পড়ল ; তাড়াতাড়ি সেটা মুছে দিলেও ওর স্বামীর চোখ তা এড়ায় নি” সে সন্নেহে বালিকা-বধূর মাথায় হাত রাখল। খানিক বাদেই ও চোখ তুলে চাইল। এমন ভাব দেখাল যেন পরম শাস্তিতে বিশ্রাম করছে।

“কিন্তু বাচ্চাটার খাবার কি হবে ?”

“ম’সিয়া শাঁতো এখনি দাই পাঠাবেন বলে গেলেন।” লুই ও জুড়ে দিল, “তু-তিন দিনের ব্যাপার।”

সারা সন্ধ্যা স্বরের বোরে কাটল ; তবু মুখে টু’ শব্দটি নেই। ও প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, ওর যন্ত্রণা দেখে স্বামী যেন উদ্বিগ্ন না হয়।

দাই এলে মার্গরিৎ তাকে ভাল করে দেখল। মার্গরিৎের চেনা লোক, তার রিকার ; বড় ভাল মানুষ। তিন ছেলের মা। মার্গরিৎ ওর হাতে টান দিল, “আচ্ছা তোমার দুধ ভাল ত বাছা, বলকারক বেশ, না ?”

“আজ্ঞে, মাদাম, তুমি ত আমার বড় ছেলে দুটিকে দেখেছ—কেমন বগা-গগা। ছোটটিও ওই ধরণের। বছর খানেক বয়স হল, লোকে দেখে ভাবে হুই বছরের ছেলে। জানিত, এর আগে এ কাজ আমি করিনি ; কিন্তু মা, ডাক্তার বাবু ওদিকে যখন গেলেন দুধ-মার খোঁজে, আর জানালেন যে তোমার ছেলের জন্ম দরকার, আগুপিছু না ভেবেই আমি এগিয়ে গেছি : ‘ডাক্তার বাবু আমার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, গায়েও কম জোর ধরি না। আমায় নেনেন ?’ উনি তখন রাজী, ‘হ্যাঁ, তার রিকার, তুমি বড় ভাল মানুষ’, উনি বললেন, কিন্তু আমি বাধা দিচ্ছি, ‘মনে নেই ডাক্তারবাবু, উনিই ত একবার আমার গিওমকে রক্ক করেছিলেন ও ডুবে যাচ্ছিল যখন ?’

মার্গরিৎ চাবী বোয়ের দিকে চেয়ে দেখল, ও বাড়নের খুঁটে চোখ মুছল।

“বাচ্চাটাকে দেখাবে মা ?”

ওর হাতে ছেলে দেবার সময় হাজার রকম আবোল-তাবোল উপদেশ দিল মার্গরিৎ। ছেলেকে কি ভাবে বড় করতে হয় তার

বিবরণ অনভিজ্ঞ বালিকার মুখে শুনে দাই ত তেঁসে বাঁচে না। মার্গরিৎ স্বামীর সঙ্গে বসে দেখছিল ওর বাচ্চার খাওয়া। বছরুখ ধরে দাইয়ের বৃকের দুধ খেয়ে ছেলেটা তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল, মার্গরিৎের চোখ জলে ভেসে গেল। ওর স্বামী ওর মুখ তুলে নিয়ে চুমা যখন দিলে, মার্গরিৎ তার হাত ধরে নিরাশার সুরে বলল, “দেখো, আমি যখন থাকব না, বাচ্চাটা আমায় একদম ভুলে যাবে !”

সারারাত ঘুমতে পারল না ও, শেষে অনুরোধ করল ওর বাচ্চার বিছানা ওর বিছানার ধারে এনে রাখতে। লুই ভেবেছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই একটা কোচের ওপর শুয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিচ্ছিল, আর এক ভাবে তাকিয়েছিল ওর স্ত্রীর দিকে। মার্গরিৎ তার ছেলের দিকে বুকে কি দেখছিল, লুইয়ের দীর্ঘশ্বাসে ও ফিরে তাকাতেই লুই প্রশ্ন করল।

“কি গো তুমি এখনও ঘুমও নি ? করছ কি ?”

“ছেলেটাকে দেখছি।”

“এখন ঘুমিয়ে নিলেই ভাল করতে, ছেলেকে দিনের বেলায় দেখতে !”

“কিন্তু তার আগেই যদি মরে যাই ?” আশ্চর্য ভাবে মার্গরিৎ ফিস ফিস বলল।

“পাগলী কোখাকার,” লুই এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, “দিনরাত তুমি খালি মৃত্যু চিন্তাই করবে ?”

“জান না তোমায় ছেড়ে যেতে কী কষ্টই হচ্ছে, নবাগত অতিথিকেও ছাড়তে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু—”

“তবু কি ? কে তোমায় যেতে দিচ্ছে ? ভগবান ? আমার হাত থেকে যমরাজ স্বয়ং এসেও তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না মার্গো !” দুচন্দ্রে ও দাঁত চেপে বলল, কল্পিত ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করল মার্গরিৎের ওষ্ঠ। শূন্য দৃষ্টিতে মার্গরিৎ হাসল।

“লুই, প্রিয়তম !” ওর কপালের চুলগুলি সরাতে সরাতে আবেশের সুরে মার্গরিৎ ডাকল।

লুই উঠে ওকে ঘূমের ওষুধ দিল।

স্বপ্ন পুরোপুরি না ছাড়লেও ১৭ তারিখ সকালে ওকে অনেক সুস্থ লাগল। ডাক্তার যখন এলেন, ও তার স্বাভাবিক হাসিতে তাঁকে আপ্যায়িত করল। প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আজ ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারবে কি না। ডাক্তার হাসলেন।

“তুমি মা বড় অধীর হয়ে উঠেছ দেখছি ; আগে নাড়ী দেখি তার পর ছেলের কথা।—বাঃ বাহ বেশ বুঝেছেন ওর কথা হচ্ছে,” বলে বাচ্চাটাকে উনি আদর করলেন। মার্গরিৎের নাড়ী দেখে উনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

“তোমার স্বর এখনও ছাড়েনি মা ; ছেলেকে এ অবস্থায় দুধ খাওয়ান ঠিক হবে না।” রোগিণীর ভাব পরিবর্তন দেখে উনি সান্ত্বনা দিলেন, “সেরে ওঠ মা, তারপর স্বত খুসী দুধ পাইও, কেমন ?”

“তা আর আমার ভাগ্যে নেই ডাক্তারবাবু !” ওর মুখে অদ্ভুত করুণ হাসি গেলে গেল। শিশুর কপালে মুখ রেখে ও বলল, “ভগবান তোকে দেখবে বাপ, তোরা বাবা থাকবে, কিন্তু মা থাকবে না রে, মা থাকবে না !”

ফিরে তাকাতেই যখন দেখল ওর স্বামী মুখ অজ্ঞানিক ঘুরিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত করতে, তাড়াতাড়ি মার্গরিৎ জোর

করে হেসে বলল, “আমি বড় বাড়াবাড়ি করছি না গো ? একটুখানি স্বপ্ন হয়েছে আর ধরে রেখেছি যে আমি মরতে বসেছি !” লুইয়ের কাঁধে ও হাত রাখল।

“নাও বাপু তুমিই ত এখানে কালো প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটছ ; আমারগুলো কত সহজে তাড়িয়ে দিলাম দেখত ? কেন কষ্ট পাচ্ছ ? আমি মরব না লুই, মরতে চাই না। হল ত ? আচ্ছা, মঁসিয়া শাঁতো, এত অল্প বয়সে, এমন খাশা স্বাস্থ্য থাকলে কেউ কখনো সামান্য স্বপ্নে মরতে পারে ?”

“মোটের না, মোটের না। তোমার দেখে বড় আশ্চর্য হলো মা ; সব সময় প্রকৃত থাকতে চেষ্টা কর ; কালকেই তা হলে স্বপ্ন ছেড়ে যাবে !”

আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বিকাল চারটে নাগাদ স্বপ্ন বাড়ল ; ওর বাবা এসে দেখলেন প্রলাপ শুরু হয়েছে।

“বাবা, বস এখানে !” সামনের ঘরের দেখিয়ে ও বলল, “আমি সেরে উঠব, না বাবা ? আর একটু সেবে উঠলেই আমরা দক্ষিণ দেশে যাব, নীসে।”

তাবপন স্বামীকে বলল, “সেই ছোট বাড়াটা আমার ভাড়া নেব, কেমন ? সেখানেই ত আমাদের নতুন অতিথির কথা প্রথম আলোচনা করি আমরা। আমার সব ত নীসে ? বল না গো ?”

চাঁদ দারুণ শব্দ আর ও উঠিয়ে উঠল,

“কই ? ও কই ? আমার ভেলে আমার ঘিরিয়ে দাও !” বিছানায় ও উঠে বসল।

“এই ত তোমার ছেলে, তোমার পাশেই রয়েছে ; কেন মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ ?” ওকে শুইয়ে দিয়ে লুই ছেলেকে রাখল ওর পাশেই।

“বাছারে, ঘুমিয়ে পড়েছে গো”, বলল ও জামার বোতাম খুলতে গেল। লুই মস্তপর্ণে বাধা দিল।

“মার্গো, ডাক্তার তোমায় মানা করে গেছেন না ওকে ছুৎ দিতে ?”

“কেন ?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মার্গরিৎ, কারণ জ্বরের ঘোরে ওর কিছুই মনে ছিল না।

“তোমার যে অসুখ করেছে।”

“অসুখ ?” ও চমকে উঠল।

“হ্যাঁ, গো।”

“তেনন বাড়াবাড়ি নয়, না প্রিয় ? সেরে উঠব এখন। বলত লুই, শীগগির আমি সেরে উঠব, তাই না ?—কাল ?” ব্যাভাৱা করে ও প্রসন্ন করল।

“হ্যাঁ—হু একটার বেশী কথা লুই বলতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হয়েছিল ; তিনি এলেন।

“ডাক্তারবাবু, আমি মরতে চাই না, আমি সেরে উঠব। লুইয়েরও তাই মত ; ও সত্যি কথাই বলে।”

মঁসিয়া শাঁতো ওর নান্দী দেখলেন।

“কেমন দেখছেন ? আমার স্বপ্ন তেনন নেই, না ?”

“সামান্য আছে ; তোমার এখন ঘুমতে চেষ্টা করা উচিত মা, একটা ঘুমের ওষুধ দেব।”

“তা হলেই ঘুম হবে ?”

“হ্যাঁ, মা।”

“সারারাত ?”

“নিশ্চয়ই !”

“আর সকালে উঠে দেখব সেরে গেছি, না ?”

“একদম সেরে উঠবে না, তবে দেখবে অনেক তাজা লাগছে শরীরটা।”

উনি প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন ; ওষুধের দোকানে লোক গেল ; ও ওষুধ গেল ; তন্দ্রা এল ; ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বামী আর মঁসিয়া শাঁতো ওর পাশে বসে রইলেন। ওর বাবা আর মাও ছিলেন। দম নিতে ওর যেন কষ্ট হচ্ছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লেও ও ছটফট করতে লাগল বিছানার ওপর। সবাই চুপ করে বসে রইলেন। খবরের কাগজ হাতে মঁসিয়া শাঁতো বসেছিলেন, ঘন ঘন তির্যক দৃষ্টিতে রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। ওর মা ছেলটাকে দোল দিচ্ছিলেন, বাপ কাতর নয়নে চেয়ে ছিলেন প্রাণতুল্য কন্ডার দিকে, তাঁর একমাত্র সন্তানের দিকে। ওর স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন, তার মুখ অব্যক্ত যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠেছে। নতজানু হয়ে ও বসেছিল স্বীয় শয্যার পাশে, থেকে থেকে ক্লান্তিতে, অবগাদে মাথাটা নামিয়ে রাখছিল তার বালিশে। হাতের মুঠোয় ধরা ছোট তপ্ত হাতটি ও থেকে থেকে চুমায় ভরে দিচ্ছিল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে মার্গরিৎ স্বামীর হাতে ওই ভাবে হাত রেখেই শুয়েছিল। সকাল প্রায় ছটা নাগাদ, যখন পূনের আকাশ সাদা হয়ে এল, মার্গরিৎ চোখ খুলে উঠে বসল।

“লুই কই ? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না ত ?” লুই যে ওকে ধরে বসেছিল, তা ও বুঝতে পারেনি।

লুই তাড়াহাড়ি মারে বসল।

“এই ত বন্ধু, কোথায় ছিলে ?” শিশুসুলভ হাসিতে ও ঝলমল করে উঠল। শীর্ণ দুটি হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল মার্গরিৎ। তার পর আবার শুয়ে পড়ল বিফারিত নেত্রে।

“লুই, ছেলটো কই ?”

বহুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মার্গরিৎ তার মুখে চুমা দিল।

“বাছারে, ঘুমিয়ে আছিস ? যাবার বেলা ভেবেছিলাম তোর স্বচ্ছ চোখ দুটি দেখে যাব। যাক, ক্ষোভ নেই সেক্ষেত্রে। ওকে দোলনায় শুইয়ে দাও গো ! দেখ যেন জেগে না ওঠে।”

কান্টেন ছেলেকে দোলনায় রেখে এলে, তরুণ পিতার হাত দুটি চেপে ধরল মার্গরিৎ পরম স্নেহে।

“বন্ধু, বড় অন্ধকার, আর একটু কাছে এস, আরো কাছে, আরো !” দারুণ আবেগে জড়িয়ে ধরল ও স্বামীর হাত।

“উঃ, বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত,” ও বিড় বিড় করে বলল, “কি ঘুমটাই পাচ্ছ, প্রিয়, প্রিয়তম, এ ঘুমের আগে আমায় টেনে নাও, বুকে টেনে নাও।”

লুই ওকে বুকে টেনে নিল।

“ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।” মার্গরিৎ বলল।

ঘুমের আগে ছোট বেলা থেকেই এ প্রার্থনা ও করে এসেছে। ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ঠোট দুটো ঈষৎ কঁক হয়ে গেল, সেখান দিয়ে উড়ে গেল ওর স্তনিস্রব্দ আত্মা ভগবানের বিশাল সন্তার পানে, আর মার্গরিৎ আচ্ছন্ন হয়ে রইল পৃথিবীর ঘমে।

# মঁাৱা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁৱা সব সময় লাইফবয় দিৱে স্নান

খেলাধুলা কৰা স্বাস্থ্যৰ পক্ষে খুবই দৰকাৰ—কিন্তু খেলাধুলাই বলুন বা কাজকৰ্মই বলুন ধূলোময়লাৰ ছোৱাচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লাৰ থাকে ৰোগেৰ বীজাণু যাৰ থেকে সবলময়ে আমাদেৱ শৰীৰেৰ নানাবিধ ক্ষতি হতে পাৰে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুৱে সাফ কৰে এবং স্বাস্থ্যকে সুৰক্ষিত ৰাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান কৰলে আপনাৰ ক্লান্তি দূৰ হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ৰৱৰে বোধ কৰবেন। প্ৰত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান কৰুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনাৰ স্বাস্থ্যকে ৰক্ষা কৰুন।







[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মুখের মুহূর্তগুলি আসে আর যখন...নিবিড় করে ধরতে গিয়ে  
শুধু তার বেশটুকু নিয়েই শান্ত হোতে হয়।

আমারও যাবার মুহূর্তটি ঘনিষে এলো এক অব্যক্ত ঘটনায়।  
এক অকৃতজ্ঞ স্বপ্নপরিচিতকে সাহায্যের বিনিময়ে পেলাম জুয়াচুরীর  
অপবাদ। বিতৃষ্ণায় ফ্লোরেন্স ছাড়তে বাধ্য হোলান।

কিন্তু যাবার আগে টেরেসার কাছে না গিয়ে পারলাম না।  
আর বিদায় মুহূর্তে আমাদের অশ্রুসঞ্জল নিবিড় আলিঙ্গন ওর স্বামী  
বেচারার চোখে যে সর্বেকুল ফুটিয়েছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি রোমে। আমার কাছে কার্ডিভাল  
পাসিয়োনের নামেও একটি পরিচয়-পত্র ছিলো। সেখানে নিয়ে  
আমি স্নেহ করতে গেলাম ওর সঙ্গে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে  
আমার নিজের মুখ থেকে আমার পল্লায়নের কাহিনী শুনতে  
চাইলেন।

—“কিন্তু সে যে বিখ্যাত কাহিনী”, সবিনয়ে জানালাম।

—“ভালোই তো, আমি শুনেছি তুমি বঙ্গ কইতে বেশ  
ভালো পারো।”

—“কিন্তু তাহলে আমি বরং এই মেয়ের উপর বসেই বসি।”

—“না, না, তা কি হয়? তোমার অমন দামী জামাকাপড়!”

এক জন ভৃত্তা একটি টুল এনে হাজির করলো। না আছে  
তার হাতল, না আছে ঠোঁটের দেবার জায়গা। প্রচণ্ড বিরক্তি আর  
অসন্তোষে বলে উঠলাম। যতদূর সম্ভব তাড়াহাড়ি আর দায়সার  
গোছের করে গল্পটি বঙ্গলাম পনেরো মিনিটের ভিতর।

—“তোমার বলার চেয়ে লেখার ভঙ্গী ভালো।”

—“আরাম করে না বসলে আমার কথা বলার জুত হয় না।”

—“কেন, এখানে তুমি আরাম পাচ্ছ না?”

—“না, বিশেষ করে আপনার এই টুলটা।”

—“তুমি তোমার স্বাচ্ছন্দ্যটাই বুঝি পছন্দ করো?”

—“তা’ করি।”

—“এই নাও প্রিন্স ইওজেনের অস্বাভাবিক উপলক্ষে আমার  
ভাষণ...এটা তোমাকে উপহার দিলাম। আশা করছি আমার  
লাভিনে কোন খুঁত পাবে না। হ্যাঁ, কাল দশটার সময় মহাশয়  
পোপ তোমাকে দর্শন দেবেন।”

বিদায়ের ইঙ্গিত বুঝে উঠে এলাম।

আমি পোপকে আগে জানতাম যখন তিনি পাহুয়াতে সামান্য  
একজন বিশপ ছিলেন। ওঁর পবিত্র পাহুকার পবিত্রতম ক্রশচিহ্নকে  
চুষন করতই উনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আর আমার

সবিনয় নিবেদনের উত্তরে জানতে চাইলেন—রোমে উনি আমার জন্তে  
কী করতে পারেন।

—“এটুকু ব্যবস্থা করার চেষ্টা করন, যাতে আমি নিরাপদে  
ভেনিসে ফিরে যেতে পারি।”

—“আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে রাজদূতের সঙ্গে আলোচনা করে  
তোমাকে তাঁর মত জানাবো।”

এরপর কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনার দর্শনের  
সময় উত্তীর্ণ হোল আমি বিদায় নিলাম।

কিছুদিন পরে রোম থেকে চলে যাবার সময় আর এক বার  
পোপের দর্শনপ্রার্থী হোলাম। উদ্বেগ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কি না  
জানা। অবশ্য আমাকে উনি এমন সন্তদয়তার অভ্যর্থনা করলেন  
যে আমি প্রায় অভিভূত। গদগদ চিত্তে জানালাম ভগবানের মূর্ত  
প্রতীক—পৃথিবীতে উনি ছাড়া আর কে? যে কোনো খৃষ্টানের  
জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসব ওঁর দর্শন—সবচেয়ে বড় কামনা ওঁর  
সঙ্গে।...গর্ভোজল মুখের শিত প্রসন্ন হাসিটুকু আমার চোখ এড়ায়নি।  
একটি ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে ভেনিস, পাহুয়া আর প্যারিসের গল্প  
করতে লাগলেন। খুব আগ্রহ দেখলাম ওঁর ঐ সব জায়গা ঘুরে  
কান্ডাতে। সব আলাপ আলোচনার শেষে আবার আমার প্রার্থনাটির  
কথা শ্রবণ করিয়ে দিলাম...অতি বিনীত ভাবে। উত্তরে তিনি  
আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—“ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর বঙ্গ।  
আমার প্রার্থনার চেয়ে তাঁর করুণার শক্তি অনেক বেশী।”

আর দু’টি দিন ছিলাম রোমে। তারপর কোন খেলার বশে  
সোজা পাড়ি দিলাম টুরিণে।

## দশম পরিচ্ছেদ

কাউট এ, বি’র সঙ্গে পরিচয় হয় কাউট বোরোমিওর বাড়ীতে।  
আর প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোক আমাকে কী যে পেয়ে বসলেন  
জানি না। প্রায় দুবেলাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো করতেনই,  
মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে টাকাও ধার নিতেন...অবশ্য একদিন  
মনের আবেগে আমার কাছে স্বীকার করে ফেললেন যে, আমি  
না থাকলে ওঁকে না খেয়ে মরতে হতো। সম্প্রতি এমন অর্থাভাব  
চলেছে। উনি স্পেনে কাজ করতেন, বিয়েও করেছেন ওখানে।  
ওঁর সহধর্মিণী?...ওঁর মতে একটি বিছানো...বয়স এই পঁচিশ কি  
ছাশিশ। ভদ্রলোক আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন মিলানে  
ওঁর বাড়ীতে কিছুদিন থাকার জন্য। প্রত্যাখ্যান করাই উচিত  
ছিলো আমার, যখন ভেনেছি পরিবারে সচ্ছন্দ্যের অভাব...কিন্তু

স্বভাবের ধর্ম—সে যাবে কোথায়? ঐ স্পেনীয় বিদ্যালয়খানটিকে একবার প্রত্যক্ষ করবো না?—চিঠি পড়েছি যে...টুকরো টুকরো কথার ফুলকি চমক জাগায় মনে...ছবি এঁকেছি ইংরেজ মেয়ের বোধশক্তি, স্পেনের নিবিড় অনুভূতি আর ফ্রান্সের লাভণ্য আর মাধুর্য্যে গড়া সেই বিদ্যালয়খানা।

বিস্ত হায় রে কপাল—যোগফল মিললো না বরাত্তে। দেখতে মন্দ না, নেহাৎ ছোটোখাটো গড়ন আর তেমনি গম্ভীর। আমাকে যাবার আগে চিঠিতে জানিয়েছিলেন হুঁটুকরো তাকোতা কিনে নিয়ে যেতে। ওখানে পৌঁছে তাঁকে যখন জানালাম যে হুকুম তামিল হয়েছে, তখন মাত্র একটা শুষ্ক ধন্বাদ জানিয়ে বললেন, ওঁর পুরুত ঠাকুরকে বলবেন আমাকে দামটা দিয়ে দেবে। খেতে বসে কাউন্ট এ. বি উজ্জ্বলিত কিন্তু শ্রীমতীকে দেখলাম দারুণ গম্ভীর, মাঝে মাঝে আমাদের হাতকোতুকের উত্তরে একটু মৃদুহাসির প্রভাস্তর। খাবারের থালা থেকে একটি বারও চোখ তুলতে দেখলাম না—অথচ প্রতিটি খাতের অসংখ্য ক্রটি ধরে অজস্র বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম পুরুত ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। অবশ্য এই ঠাঁকে একটা কথা বলে রাখা ভালো—ইতালীতে প্রায় প্রতি বাড়ীতেই একটি করে পুরুত ঠাকুরের খুবই চলন। গৃহস্থের কাছেই তাদের খাওয়া শোওয়া সব চলে, বদলে বরকন্নার হাজার খুঁটিনাটির দায়িত্বও তাদেরই ঘাড়। এ বাড়ীর পুরুত ঠাকুরটি কাছেই একটা গীর্জায় ভোরবেলা প্রার্থনা করতে যান—ফিরে এসে সারাদিন সমস্ত সংসারটি চালাতে হয়, সেই সঙ্গে কর্তৃত্বটিরও হাজারো ফরমাস।

খাবার পর কাউন্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘর অবধি গেলেন—জ্যেষ্ঠ নীরস ব্যবহারে বিব্রত, লজ্জিতও বটে, তবে আশ্বাসও দিলেন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে মাধুর্য্যের সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই।

সে যাক। আপাততঃ বাড়ীর সেরা ঘরটি পেয়ে মনটা খুসী। বাড়ীর আসল অবস্থা সত্যিই অভাবগ্রস্ত। বাসনপত্র মাটির, দাগলাগা টেবল-ঢাকা,—রাঁধুনী, বি, সবই একটি মেয়ে, পরিচ্ছদও জীর্ণ। আমার ফরাসী পরিচারক ফ্লেয়ারমও তো তার শোবার আস্তানা দেখে ভেবেই আকুল—ছোটো, নোঁরা, অন্ধকার খুপারী একটা।

ভোরবেলা বিছানা থেকে ওঠার আয়োজন করতে যাচ্ছি, এমন সময় পুরুত ঠাকুরের প্রবেশ। আমাকে অনুরোধ করলেন যে কর্ত্তী জিজ্ঞাসা করলে আমি যেন বলি যে পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে আমি তিন শ' ফ্রাঙ্ক ঐ তাকোতার দাম হিসাবে পেয়েছি। আমার ভো চকু স্থির।

—“একজন পুরোহিত হোয়ে আপনি আমাকে মিথ্যা বলবার জন্তে অনুরোধ করেছেন? আশ্চর্য্য! নাঃ বলতে হলে সত্যি কথাই বলবো”—

—“আপনি তাহলে গিন্নীমাকে চেনেন না মশায়...আর এ বাড়ীর ধারাও কিছু জানেন না দেখছি। বেশ, আমি কর্ত্তার সঙ্গেই কথা বলবো তাহলে।”

পুরুত ঠাকুরের মত কাউন্টকে দেখলাম শ্রীমতীর মেজাজের ভয়ে সলা শঙ্কিত। জ্যেষ্ঠ মিথ্যা দস্ত বাঁচাবার জন্তে আমাদের মধ্যে দামটা ঠিক হয়ে গেছে বলতে রাজী হলেন।

ঘরে বসে কতকগুলো চিঠিপত্র লিখছি। দরজা ঠেলে ঢুকলেন স্বামি-স্ত্রী—তাদের একজন পারিবারিক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয়

করতে। ভদ্রলোকের নাম মার্শিস ক্রলুৎসি, প্রায় আমারই সমবয়সী। অভিবাদন জানিয়ে বললেন আমার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য এড়াতে চান না—তাছাড়া এই ঘরখানিতেই একমাত্র আশ্রন রাখার ব্যবস্থা, তার আরাম থেকে বঞ্চিতও হোতে চাননা। ফ্লেয়ারমও ইতিমধ্যে আমার বাস্মাত্মা খুলে জামাকাপড় জিনিষপত্র সব বের করে ফেলেছিলো—ফ্লেয়ারমও প্রায় সবকটাই স্ত্রীপীকৃত। তারমধ্যে মার্শিস কাউন্টসকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ছোটো একটা পুতুলের মত নিজের হাঁটুর উপর বসিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলাম কাউন্টসের মুখ রাঙা হোয়ে উঠেছে—জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

—“যথেষ্ট বয়স তো হয়েছে...তবু শিখলেন না আমাদের মত মহিলাদের সঙ্গে মান রেখে কি করে চলতে হয়?”

—“ঠিক কথা কাউন্টস। মাগ্ন কবি বলেই তো আপনাকে ঠাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসতে পারি নি”—

তার পর জামাকাপড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোনো মহিলাকে আশা করছি কি না?

—“নাঃ, তবে আশা আছে, মিলানে এমন একটির সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই, যাকে এগুলি উপহার দিতে পারবো”—

সেদিন রাত্রে আহাৰ্য্য থেকে শুরু করে আহাৰ্য্য-পান্ধুলি, মদ এমন কি টেবিল-ঢাকাগুলি অবধি এলো ওই ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে। খেতে বসেও লক্ষ্য করলাম, মার্শিস অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন কাউন্টসের ক্রম গাঙ্গীর্ষ্যের ক্রটি শোষণাবার জন্তে। খাবার পর সকলে মিলে গেলাম অপেরা দেখতে—সুখবর মিললো সেখানে টেরেসার দর্শন পেলাম। ঠিক করলাম শীগগিরই যাবো ওর সঙ্গে দেখা করতে।

ভোরবেলা ফ্লেয়ারমও এসে খবর দিলে, একটি মেয়ে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। সম্মতি পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো দীর্ঘাকী স্ত্রী লাভণ্যময়ী একটি তরুণী, আরেদন জানালো আমার জামাকাপড় কাচা আর সেলাই-কোঁড়াই ইত্যাদি করার ভার নেবার জন্তে। ভারী ভালো লাগলো ওকে,—“কোথায় থাকো তুমি?”

—“এই বাড়ীরই নীচের তলায় আমার মা-বাবার সঙ্গে।”

—“তোমার নাম?”

—“জেনোবিয়া।”

—“বাঃ! রূপের মতো নামটিও মিষ্টি। তোমার করপল্লবে চূদন জানাতে পারি?”

—“না, তা' আর হয় না, এ করপল্লব আগেই অধিকৃত। এখনকার কাণ্ডিভালের শেষেই একজন দর্জির সঙ্গে আমার পরিণয় স্থির।”

—“কেমন দেখতে তোমার ভাবী স্বামীটি? সুন্দর?...বেশ ভালো রোজগারে তো?”

—“না, না, কোনোটাই নয়...শুধু নিজের একটি বাড়ী, হবে এই আশাতে বিয়ে করছি।”

—“খুব ভালো বলেছো। ভারী খুশী হলাম শুনে। আমার যে তাকে দেবার মতোও কিছু কাজ আছে—যাও, গিয়ে ধরে নিয়ে এসো।”

আমার সজ্জা সমাপন হোতে না হোতেই জেনোবিয়া তার হবু

বরকে ধরে নিয়ে এসে হাজির। ছোটখাটো মানুষটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন।

—“এই সে, আপনিই এটি মিষ্টি মেয়েটিকে নিয়ে করছেন?”

—“আজ্ঞে হাঁ! মশায়! আর দিন দশেক পরেই বিয়েটা হবে।”

—“দিন দশেক, কেন? কালই বা নয় কেন?”

—“উঃ আপনার এত তাড়া?”

—“নিশ্চয়ই, অন্ততঃ আপনার জায়গায় আমি তাই-ই করতাম। বাক, এই গিকটা দেখুন। কাল বলনাচে যাবার জন্তে একটা ‘ডোমিনো’ করে দিতে হবে। তার জন্তে এই রইলো দশ সেকুইন—আপনার রসিদের টাকা হিসেবে।”

লোকটা তো আশ্চর্যে আটখানা হয়ে চলে গেলো। একটু পরেই আমিও মিলানে টেরেসার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কেন জানি না টেরেসার প্রতি আমার একটা অতি কোমল মমতা ভরা ভালবাসা বরাবরই ছিলো...দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেটা বরং না কমে বেড়েই চলেছিলো।

আনন্দে অধীর হয়ে টেরেসা আমাকে স্বাগত জানালো। অপ্ৰত্যাশিত ভাবে আমার দেখা হওয়ার আনন্দে আবেগে ও ভালো করে কথাই বলতে পারছিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রথমেই জানালো ও আর ওর স্বামীর সঙ্গে থাকে না। অসহ্য হয়ে উঠছে স্বামীর সঙ্গে। টেরেসা অনগ্র স্বামীকে অর্থ সাহায্য করে, তবে এক সপ্তে যে, তাকে রোমেই থাকতে হবে। সিজারো এসেছে ওর সঙ্গে মিলানে। টেরেসা কথা বলে যাচ্ছিল আর আমি মনে মনে বিশ্লেষণ করছিলাম আমার নিজের অনুভূতি। আজ আঠারো বছর ধরে টেরেসার প্রতি আমার ভালোবাসা কোথাও মলিন কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি...কিন্তু আজ আমার মনের গঠন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে একটির উদ্দেশ্যেই সর্বস্ব অঞ্জলি দিয়ে শূণ্য হোতে আর পারে না। মনের বেরীতে একমুখিতার মেরে পুজায় সে নারাজ।

সেদিন বাড়ী ফিরে থাবার টেবিলে দেখলাম কাউন্টেনের মেজাজটা বেশ খুশী খুশী...এমন কি আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে রহস্ত করে বললেন—

—“সারাটা দিন কাটলো কোথায় জানি না ভেবেছেন? কিন্তু শ্রীমতীর যে একটি শ্রীমান আছেন, আপনার এত ঘন ঘন যাতায়াতে তিনি না সরে পড়েন।”

—“সরলেই সেই শূণ্য জায়গা পূর্ণ করবো।”

—“আপনার উপহারে যারা বিগলিত হয়ে পড়ে, তাদের কাছেই শুধু আপনি দাসত্ব স্বীকার করেন।”

—“ঠিক বলেছেন, পারতপক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করি না...কারণ দেখেছি এই পদ্মাটি অবলম্বন করলে আর কিছুতেই হতাশ হতে হবে না।”

“কিন্তু আপনার বান্ধবীটির মনের খবর জানান বসে মনে হচ্ছে না তো...অতান্ত অর্থলোভী ছাড়া আর কেউ পারে গ্রেপ্সির সঙ্গিনী হতে?”

নিঃশব্দে শুনে গেলাম। ইঙ্গিতেও প্রকাশ করলাম না যে আমার স্বাধীনতায় গ্রেপ্সির ব্যাধিই থাকে...প্রকাশ করলাম না আমার নিশ্চিন্ত সুখ যে টেরেসা শক্তিমানের হাতেই আশ্রয় পেয়েছে...

সেখানে সকলে মিলে প্রথম এক জুয়ার আড্ডার পরে একটা

অপেরা দেখতে গেলাম। সবচেয়ে হুশোর কিছু বেশী টাকা হয়েছিলাম আমি। বেচারী কাউন্টের আমার চেয়েও বেশী হুঃখ হোলো তাইতো। ঠুকে হার হার করতে দেখে মনে মনে হাসলাম...ওঁর স্ত্রী যাকে ঘৃণা করেন সেই গ্রেপ্সির কাছেই আমার হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক জমা আছে। আমার অর্থক্ষতির বহরে বিগলিত হৃদয়ে কাউন্টেন এসে জিজ্ঞাসা করলেন টাকার প্রয়োজনে আমি আমার দামী লোমের পোষাকটা বেচবো কি না। প্রায় হাজার সেকুইন দাম হবে ওটার উনি শুনেছেন।

—“ক্ষমা করবেন, ওটা ছাড়া অন্য কিছু বেচেতে পারি, ওটি কিছুতেই বেচবো না।”

—“মার্শিসু জিলাংসি ওটা উপহারের জন্ত কিনতে চান।”

—“ওঁকে বলবেন আমার মাপ করতে।”

আর কোনো কথা বললেন না, যদিও কিছু একটু বিচলিত দেখলাম ওঁকে। সেখানে অপেরা থেকে ফেরার পথে টেরেসার সঙ্গে দেখা হোলো। জিজ্ঞাসা করলাম গ্রেপ্সির কথা সত্যি কি না। উত্তরে টেরেসা জানালে গ্রেপ্সির সঙ্গে ওর নিছক বন্ধুর সম্পর্ক। টেরেসা নিজে এখন রীতিমত ধনী, সে চার সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকতে। কারো আশ্রয়ে নয়। ভালো লাগলো ওর এই মনোভাব।

পরদিন রাতে কাউন্টেন আমার গাড়ীতেই থিয়েটারে যাবার অনুরোধ জানালেন। খুব খুশী হয়ে রাজী হলাম। কিন্তু কে জানতো পরে এমন প্রহসন ঘটবে? গাড়ী চলতেই ওঁর পাশে বসে ওঁকে জানালাম ঐ লোমের পোষাকটা আমি এখনি ওঁকে উপহার দিতে পারি বিনিময়ে শুধু একটু অনুগ্রহ বর্ণনা...

—“আমাকে অপমান করছেন?” আশ্চর্যের ফুলকি ঝরতে লাগলো, “আশ্চর্য, আপনার মত লোকও ভদ্রবরের মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না।”

—“কিন্তু মহাশয়া ভুল করছেন মুখুন্ডায়, প্রশংসার অপমান কিছু নেই। বেশ, যদি বড় বাড়াবাড়িই করে থাকি ক্ষমা করুন। আর ঐ পোষাকটি পরে আমাকে একটু খুশী করুন।”

—“যদি আপনাকে ভালোবাসতাম তাহলে ক্ষমার প্রশ্ন উঠতো। আর আপনার স্থূল ব্যবহারে আমার কাছে আপনি ক্রমেই অশ্রীতিকর হোয়ে উঠছেন।”

—“আমার স্বভাবটা সবসময় মেজাজের উপর নির্ভর করে। খুব মোলোয়েম ভাবে স্তুতি করতে দেখলেই আপনার ভালো লাগবে তো?”

—“আপনার স্বভাব কিরকম তা জানবার জন্তে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনাকে আমি গ্রাসাই করি না।”

—“এখানে আমাদের মিল আছে দেখছি। আমি আপনাকে কোনো দিনই গ্রাস করিনি, করি না।”

—“তা’ সঙ্গেও আমার পিছনে হাজার সেকুইন খরচ করতে যাচ্ছিলেন?” তীক্ষ্ণ শ্রোতের হাসি কাউন্টেনের।

—“ভালোবাসার খাতিরে নয়, আপনাকে নীচু করবার জন্তে, আপনার ঐ বিরাট আত্মজ্ঞপিতায় যা’ দেবার জন্তে।”

কি উত্তর আসতো জানি না, কিন্তু বরাবরকমে সেই মুহূর্তেই গাড়ীটা থিয়েটারে এসে থামলো, আমি গেলাম জুয়ার আড্ডার আর কাউন্টেন সোজা বল্লের দিকে। সে রাতে প্রচণ্ড হার

হোলো আমার। ফেরার পথে আবার কাউন্টসের সঙ্গে থিটিমিটি বাধলো—

—“আজ রাতে অনেক টাকা হেরেছেন সুনলাম... বেশ হয়েছে, খুব খুশী হয়েছে। মার্শিস হাজার সেকুইন দিতে রাজী আপনাকে ঐ পোষাকটার জন্তে। বেচতে পারেন এখনও, বরাত খুলে যাবে।”

—“আপনার বরাতও খুলে যেতে পারে তো। ওটা লাভ হবে কেমন—আপনার জন্তেই যে উনি কিনতে চেয়েছেন সেটা আমি জানি।”

—“হয়তো।”

—“না, অত সহজে আপনি ওটা পাচ্ছেন না। ওটা পাবার একমাত্র উপায় আমার কথায় রাজী হওয়া। না হলে আপনাদের টাকার জন্তে আমার খোড়াই কেয়ার।”

—“আপনার ঐ পোষাকের জন্তেও আমার ঘম হচ্ছে না।”

এই রকম স্তম্ভুর বাক্য বিনিময় করতে করতে আমরা বাড়ী পৌঁছলাম। কাউন্ট আমার ঘরে এসে চুকলেন আমাকে একটু বোঝাতে। আমার জুয়ায় হেরে যাওয়াটা ঠিক লাগে বেশী।

—“ত্রিলংসি আপনাকে হাজার সেকুইন দিতে রাজী। তাতেও তো আপনার খানিকটা আয় হবে।”

—“ঐ লোমের পোষাকটার জন্তে? ওটা তো আপনার দ্বীকে আমি বিনা পরসায় দিতে রাজী। কিন্তু আমার কাছ থেকে উনি নেবেন না।”

—“অবাক কাণ্ড মশাই! অথচ বলতে কি পোষাকটার জন্তেও ক্ষেপে উঠছে। নিশ্চয়ই আপনি ওর আত্মসম্মানে যা' দিয়েছেন কোনো সময়। আমার উপদেশ নিন ওটা, ত্রিলংসিকে বেচে ফেলুন।”

—“ভেবে দেখবো, কাল আপনাকে সঠিক জানাবো।”

ভোরে উঠেই গ্রেপ্লির কাছে গেলাম। হাজার সেকুইন বার করে আনলাম ব্যাক থেকে। আর গ্রেপ্লিকে জানালাম এ সম্বন্ধে কাউন্ট কিছু না জানাতে। বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম কাউন্ট আমার ঘরে আগুনের ধারটিতে বসে অপেক্ষা করছেন।

—“কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? আমার দ্বী আপনার উপর ভরসার রোগে আছে অথচ কিছুতেই কারণটা খুলে বলছে না—”

—“কারণটা আর কিছুই নয়। ওই লোমের পোষাকটা আর কারো হাত থেকে ঠেকে আমি নিতে দেবোনা, আমার হাত থেকে ছাড়া। উনিও নেবেন না। কিন্তু এতে ভরসার রাগের কী আছে?”

—“হুঃ শ্রেফ বোকামি ছাড়া কিছু নয়। শুধুন আমার কথা, আপনার ধরণ দেখে মনে হয় টাকা আপনার হাতের ময়লা...এরকম মন হওয়া খুবই ভালো। তবে কি না ঐ টাকাটা পেলে আমি বড় খুশী হতাম। বন্ধুত্বের খাতিরে ওসব আত্মসম্মান ছাড়ুন মশাই... মার্শিস এর কাছ থেকে হাজার সেকুইন নিয়ে আমাকে ধার দিয়ে ফেলুন”—

ওর কথায় প্রবল হাসির দমকে আমার বিবম খাবার বোগাড়। বেচারি কাউন্ট অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে গেলেন। আমি ঠেকে হুঁহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম অবস্থা একটু ভালোভরা কঠেই।

—“বেচবো, কথা দিলাম ত্রিলংসিকেই বেচবো ওই পোষাকটা।

কিন্তু টাকাটা আপনাকে ধার দেবোনা। ওটা দান করবো আপনার দ্বীকে। কিন্তু মনে রাখবেন তাঁকে সহজ নম্র শোভন হতে হবে— এই সর্ভে। বুঝতে পেরেছেন তো? এখন এই ভাবে ব্যবস্থা করতে পারেন”—

—“তাই দেখি”—বলে বেচারি কাউন্ট বিদায় নিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় অপেরাতে ত্রিলংসির সঙ্গে দেখা করলাম। সে বললে,—“সুনলাম আপনি নাকি ওই লোমের পোষাকটা আমাকে বিক্রি করতে রাজী হয়েছেন। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আপনি যখন বলবেন তখন আপনাকে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেবো”—

—“কাল সকালেই আপনি লোক পাঠাতে পারেন পোষাকটা নিয়ে যাবার জন্তে।”

পরদিনই সকালেই ওর লোক এলো। এসে এত আলোচিত পোষাকটি নিয়ে গেল। দুপুরে উনি নিজেরই এলেন আমাদের সঙ্গে একত্রে খাবার জন্তে। তার আগে প্রচুর স্তম্ভিত আত্মীয় পাঠিয়েছিলেন। খাবার টেবিলে রীতিমত আড়ম্বর সত্কারে বাজাটি রেখে তার থেকে পোষাকটি বের করে গরীবত আনন্দে ওই দর্পিতা স্পেনীয় মহিলাটিকে উপহার দিলেন। আর তিনি ধন্যবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আর ভদ্রলোক এমন ভাবে হাসতে লাগলেন যে, এসব ব্যাপারে তিনি অতি অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ বলে বসলেন যে কাউন্টের যদি সত্যিই বুদ্ধিমত্তা হ'ল তবে ঐ পোষাকটি আবার বিক্রী করে ফেলবেন—কারণ সবাই জানে যে অত দামী পোষাক কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি ওঁদের নেই। কথটা অত্যন্ত ঞ্জতিকটু সঙ্গহ নেই—তাই এবার ধন্যবাদের বদলে কটুকাটবোর বর্ষণ শুরু হলো। শেষে রাগের আলায় কাউন্টের বসলেন যে মার্শিস এত বড় বোকা যে এমন উপহার দিলে যা তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এই বড়ের মধ্যেই একটা প্রতিবেশিনীর আগমন হলো। ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর ছড়ানো বহুমূল্য পোষাকটির দিকে নজর পড়লো তাঁর—

—“ভারী চমৎকার তো। আমার কিনতে ইচ্ছে করছে।”

—“ওটা বিক্রী করে দেবার জন্তে কেনা হয়নি”—কক্ষ উত্তর কাউন্টসের।

ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে মহিলাটি তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ কথাবাণীর পর তিনি বিদায় নিলেই আবার সেই চাপা আক্রোশের বিকোরণ শুরু হলো। কাউন্টসের সক্রোধ কুংসিত বাক্যবাণের উত্তরে ত্রিলংসিও তীব্র, তীব্রতম স্বেবে তাঁকে বিধতে লাগলেন...কিন্তু ওর প্রত্যেকটি স্তম্ভিত স্বেবেতরা বাক্যবাণই আশ্চর্য্য ভদ্রমানার খাপে ঢাকা...শেষকালে বিপর্যস্ত ক্লান্ত অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়ে কাউন্টের সোজা চলে গেলেন শব্দ্যর আশ্রয়ে শয়ন কক্ষের অভিমুখে।

ত্রিলংসি আমার হাতে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক হুঁজে দিয়ে উঠে চলে গেলেন। সবাই চলে গেলে কাউন্ট আমাকে ধীরে ধীরে বললেন যে, যদি আমার হাতে সময় থাকে আমি যেন ওর দ্বীকে একটু সঙ্গ দিই কারণ ওরও হাতে কয়েকটা জরুরী কাজ রয়েছে।

—“দেখুন আমার পকেটে হাজার সেকুইন রয়েছে, যদি কাউন্টের একটুও বুঝদার হন তবে সব টাকাটা ঠেকে দিয়ে আসবো”—

উঠ ঘরে গিয়ে ত্রিলসির দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি বেখে ব্যাক থেকে আনা নোটের তাড়াটি পকেটে পুরলাম। ছেলেমানুষি ছাড়া কি? দেখাতে চাইলাম কারো টাকাতাই আমি নির্ভর করি না, আমার নিজের ব্যেথট আছে।

দেখলাম কাউন্টেন শয্যালীনা। তাঁর একপাশে বসে অত্যন্ত কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম শারীরিক সুস্থতা সবক্কে, বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সবক্কে, হ'একটা মন্তব্যও করলাম।

—“আপনি বাইরে বেরোননি? ঘরোয়া পোষাক পরে রয়েছেন? চুলগুলোও আঁচড়ানো নেই?”

—“সম্ভব হ'লে আপনার সঙ্গেই সময় কাটাবো ভাবছি,” আমার উত্তর।

“আপনার জুয়ার আড্ডা ছেড়ে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাটা মাটি করবেন?”

—“আমনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা হেরেছি তার উপর আজ মার্শিসএব কাছ থেকে যা পাওয়া গেল সেটাও আর খোঁয়াতে রাজী নই...আমার হাত থেকে তো আর নিলেন না...”

—“অত টাকা হাতছাড়া করা সহজ?”

—“হাতছাড়া নয়, আমি তো আপনাকেই দিতে চেয়েছিলাম। সে যাক, বড় ঠাণ্ডা আসছে, দরজাটা বন্ধ করে দেবো কি?”

—“নাঃ, আমার খোলাই ভালো লাগছে—গোলা থাক।”

—“তাহলে মাদাম, এখান থেকেই বিনায় নিতে হোলো। আমার ঘরের আঙনের ধারটি অনেক বেশী লোভনীয়।”

—“আপনি লোকটা খুবই খারাপ তবুও বসতে পারেন কিছুক্ষণ কারণ মন লাগছে না সময়টা।”

কি জানি কেন মনটা কেমন অজ্ঞানসত্তা আর বিশ্বাস হোয়ে গিয়েছিলো—পোষাকটা নিয়ে এত কচকচিতে আসার সময় ঘরে দেখে এসেছি...জেনোবিয়ার মিষ্টি হাসি ভরা স্তন্যর মুখখানি ঝুঁকে পড়ে আমার জামা সেলাই করছে...তার সেই মুখখানি মনে পড়তে? কি জানি কিছুতেই ঢাকতে পারিনি নিজের অস্বাচ্ছন্দ্য, সাড়া দিতে পারিনি সহজ শোভন ভাবে...কি জানি কতখানি আঘাত করলাম দর্পিতা রমণীর আত্মগর্বে...

আমার নীরস ব্যবহার ঠেকে কতখানি গভীরে ব্যথা দিয়েছে তা শুধু মেয়েরাই বলতে পারবে...জানি না কোন দুঃখই আমাকে দিয়ে বলালে,—“আমার দোষ নেই মাদাম, আপনার সৌন্দর্য আমাকে একটুও আকর্ষণ করতে পারছে না...এই রইলো পনেরো হাজার ক্রাঙ্ক আপনাকে সাধনা দিতে...আমি চললাম”—

টেবিলের উপর নোটগুলি রেখে সোজা বেরিয়ে এলাম। অজ্ঞান, অপ্রীতিকর সবই বুঝছিলাম কিন্তু কে যেন জোর করে অমন করালে আমাকে।

কিন্তু পরদিন খাবার টেবিলে কাউন্টেনের ব্যবহারে আমি অবাক, অমুতপ্ত, লজ্জিত। যেমন মধুর, তেমন ভদ্র তেমন শোভন সবত। বিবেকের দংশন-জালা সহ্য করলাম...কেন রাত্রে অমন করে অপমান করেছি। যেমনি ঠেকে একা পেলাম তখনি অমুতপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করলাম কাল রাত্রে অমন দুর্বৃত্তের মত ব্যবহারের জন্য ঠর আমাকে ধুপা করা উচিত।

—“দুর্বৃত্ত আপনি? বরং উণ্টোটাই আমি ভেবেছি, আমি

তো আপনার কাছে রীতিমত কৃতজ্ঞ...ভাবতেই পারি না আপনার এ আত্মগঞ্জনা কেন?”

আমি ঠর হাতখানি ধরে ধীরে ধীরে আমার গুটের কাছে আনতেই হঠাৎ উনি ঝুঁকে পড়ে আমার গালের উপর চুমো খেলেন... আমি তখন লজ্জায় রাঙা, অল্পতাপে দিশাহারা...

সেরাত্রে অপেরাতে মুখোশ পরে ‘বল’ এর ব্যবস্থা ছিলো। আমি এমন ভাবে সেজেছিলাম যে, ভাবলাম কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আমার নশির কোঁটা, ঘড়ি, এমন কি মণিবাগটাও বদলে ফেলেছিলাম। আর মণিবাগটাতে ছিলো প্রায় সাতশ’ সেকুইন। জুয়ার আড্ডায় সর্বস্ব তো খোয়ালো একঘণ্টার মধ্যেই। সবাই আশা করেছিলো এবার নিরস্ত হবো। কিন্তু আর এক পকেট থেকে আর একটা ব্যাগ বার করে আবার খেলতে শুরু করলাম—এবার বরাত খুললো, একেবারে দুহাজার আটশ’ ছাপ্পান্ন সেকুইন জিতলাম।

সেদিন বাকী সময়টুকু নাচ, গান আর হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে। কারণ তারপরই সাই মিলে যেতে হবে জেনোবিয়ার বিবাহোৎসবে যোগ দিতে। আমাদের সঙ্গে ত্রিলসিও গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ীতে ওদের বিবাহের ভোজসভা আমরা সবাই গান গেয়ে আবৃত্তি করে মুখর করে তুললাম। প্রচুর আহার্যের আয়োজন, সবার অলঙ্কার ভোজসভার ব্যয়ভারটা আমিই বহন করেছিলাম। বহু গ্রাম্য-সুন্দরীর আবির্ভাব হোয়েছিলো, কিন্তু স্ত্রীময়ী বধুবোশিনী জেনোবিয়ার সঙ্গে আমি একমুহূর্তও ছাড়িনি। উৎসব যখন চরমে তখন উৎসব-মত অবস্থায় সবাই টেবিল ছেড়ে উঠ পার্শ্ববর্তী সঙ্গে আলিঙ্গন আদান প্রদান করতে লাগলো...আমি আড়চোখে দেখে নিলাম বরবেশী বিহবল দর্জিটির চুপনে কাউন্টেনের মুখখানি বিরক্তি আর রাগে টকটক করছে...

বিবাহের শেষে জেনোবিয়াকে আমার গাড়ীতেই তুলে নিলাম... ওর সন্ত স্বামীর সাগ্রহ সম্মতিতে।

\* \* \* \*

পরদিন রাত্রে আবার গেলাম অপেরাতে। জুয়া খেলাতেই কাটতো সন্ধ্যাটা কিন্তু হঠাৎ দেখা হোয়ে গেলো সিজারোর সঙ্গে। আমার সিজারিনো? দুটি ঘণ্টা ওর সঙ্গে আলাপে কাটলো... কি মন-ভরা সময়টুকু। ওর মনের সব কথা আমার কাছে উজাড় করে দিলে। বারবার অনুবোধ করলে আমি যেন ওর হোয়ে টেরেসার সঙ্গে আলোচনা করি। ব্যাপারটা কিছুই নয়...ওর সাধ নাবিক হবার, ওর নিশ্চিত ধারণা যে ওর মা যদি ওকে আপাততঃ প্রয়োজন মত টাকা দিয়ে সাহায্য করে ওর ভবিষ্যৎ ও নিজে গড়ে তুলবে। আমি কথা দিলাম টেরেসাকে রাজী করাবো। সেদিন রাত্রে ওর সঙ্গে একসঙ্গেই খেললাম। বাড়ী এসে সোজা বিছানায়। পরদিনও সারাদিন ঘর থেকে আর বেরোইনি। শুনলাম কাউন্ট গেছেন সান এঞ্জেলোতে। মাদাম একা আছেন। সাধারণ ভদ্রতারোধেই রাত্রে খাবারের পর মাদামের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, খাবার টেবিলে যোগ দিতে না পারার জন্য ক্ষমাও চাইলাম। কাউন্টেনের ব্যবহার আশ্চর্য সৌজন্তে ভরা। জানালেন ওর বাড়ীতে আমার কোনো লৌকিকতার প্রয়োজন নেই, যেমন খুশী তেমনি ভাবে থাকতে



পারি। কিন্তু আমার মনে হোলো ভিতরে ভিতরে কোনো প্যাচ খেলছেন। কারণ ঠর মুখের কেমন এক মোহময় হাসির আভাস... অমন হাসি শুধু সেই মেয়েরাই হাসতে পারে, যাদের মনে জলছে প্রতিহিংসার অনিবার্য শিখা। আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে আমার দিকে নশ্চির কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন এক টিপ নেবার জন্তে। নিজেও নিলেন একটিপ।

—“কিন্তু মাদাম এটা কি বলুন তো? এ তো ঠিক নশ্চির নয়?”

—“না, একরকম গুঁড়ো, মাথা ধরার পক্ষে অব্যর্থ। তবে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে নিলেই।”

আমি কি রকম অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। জোর করে হেসে বললাম, “আমার মাথার রোগ নেই, তাছাড়া নাক দিয়ে রক্ত পড়টা আমার একটুও ভালো লাগবে না।”

—“ভয় নেই বেশী রক্ত ঝরবে না।” তখনও সেই মোহময় হাসির টুকরো হোটের কোণার—কিন্তু রক্ত ঝরবেই এটা ঠিক।”

বলতে না বলতেই হুজনে একদিকে চাব পাঁচবার ঘেঁটে ফেললাম— চ করে এককোঁটা রক্ত আমার নাক থেকে পড়লো আমার হাতের উপর। কাউন্টেন্স একটা রূপার বাটি নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

—“সব্রে আসুন কাছে, আমারও নাক থেকে রক্ত পড়ছে।” কাউন্টেন্স বললেন, হুজনে কাছাকাছি এগিয়ে এসে বাটির উপর ঝুঁকে পড়লাম। হুজনার নাক থেকেই বাটিতে রক্ত ঝরতে লাগলো। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই থেমেও গেল। তখন অগা আন একটা পাত্র আনিয়া ঠাণ্ডা তরলে ধুয়ে ফেললাম।

—“আমাদের রক্তের এট মিলন আমাদের হুজনার মনে গভীর দরদ জাগাবে, হয়ত এমন নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করবে যার নিচ্ছেদ মৃত্যুর আগে নেই,”—কাউন্টেন্স ধীরে ধীরে বললেন।

আমি ঠর কথাই বিশেষ মন দিইনি। আমি একটু গুঁড়ো চাইলাম কিন্তু উনি কিছুতেই দিতে রাজী হোলেন না আর নামটাও বললেন না কোনো মতে। শুধু বললেন ঠর এক বন্ধু ঠকে দিয়েছে। আমি তখনি লেরোলান একজন ওয়ুব-প্রভেতার খোঁজে। একজনকে খুঁজে পেলাম। গুঁড়োটোর পূর্ব বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কি হোত পারে, কিন্তু কোনো সহজতর ভাষায় দূরের কথা আমার চেয়ে বেশী জানেন বলে মনে হোলো না। বাড়ী ফিরে ভাবাক্রান্ত মনে বিছানায় গিয়ে শুলাম। নানা ভাবে চিন্তা করতে করতে মনে হোলো মাদাম স্পেনের মেয়ে—তাঁর উপর যতই ভাল এখন দেখান, অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই... অতএব—

পরদিন ক্লোরাম ও একসময় এসে জানালে যে একজন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—কিছু কথা বলতে চায়। আমি কিছু সাতায়া দিয়ে ভাগিয়ে দিতে

বললাম। কিন্তু সন্ন্যাসী এক-পর্যায় সাহায্য চায় না, কেবল আমার সঙ্গে একা দেখা করতে চায়। গেলাম দেখা করতে। লোকটি বেশ বৃদ্ধ। ঈষৎ নীচু হোয়ে অভিবাচন জানিয়ে একটা নীচু টুল এগিয়ে দিলাম। কিন্তু সে ওসব গ্রাহ্যই না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলো।

—“মশায়, আমি যা বলবো মন দিয়ে শুনবেন। আমার সাবধান করায় আপনি কান না দিলে, আপনার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। আমার কথা সমস্তটা শোনা হোলে আমি যা বলবো ঠিক তাই করবেন। কিন্তু একটি প্রশ্নও আমাকে করবেন না— কারণ কোনো কথাই আমি উত্তর দেবোনা। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে আমার এই নীরবতা বিশ্বস্ত ভাবে বিশ্বাসের মর্যাদা দেবার জন্তেই! আমার প্রতিজ্ঞায় আমার কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ আপনাকে খুঁজে বার করার মধ্যে আমার কোনো স্বার্থই নেই। আমি নিজেই বাধা হচ্ছি আপনাকে জানাতে। আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনার জীবন-দেবতাই আমাকে দিয়ে আপনার মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বর আপনাকে তাগ করেননি। এখন বলুন আমার কথায় আপনার মনে বিশ্বাস হওয়াও সাড়া জাগছে। কি না, আমার সব কথা আপনি বিশ্বাস করে শুনবেন কি না।”

—“নিশ্চিত থাকুন মহাত্মন, আপনার প্রতিটি কথাই আমি মন দিয়ে শ্রদ্ধাভরেই শুনবো। বলুন—আপনার কথা শুধু সাড়া জাগায়নি, মারা মন ছেয়ে এক অভ্যাস আশঙ্কাও জাগিয়ে তুলেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনার উপদেশ মানবো—যদি অবশ্য আত্মসম্মানে ‘না’ না লাগে, আর সাধারণ বুদ্ধির অগম্য না হয়”—

—“খুব ভালো। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, এ ব্যাপারটার কলাকল যাঁই হোক না কেন, আমাকে তার মধ্যে টানতে পাবেন না, আর আমার সম্বন্ধে কারো কাছে একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না। আমাকে চেনেন তাও বলবেন না, চেনেন না তাও জানাবেন না। কেমন, রাজী?”

ফোন ৩৪-০০০৩

সর্বস্বত্ব সম্মতি  
সুন্দর আলোকায়

একমাত্র  
গিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুতকারক

গুরুজী

কে. এল. সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি, বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—“খুব। প্রতিজ্ঞা করছি কথা রাখবো। কিন্তু এবার শুরু করুন। কৌতূহল যে অসহ্য হোয়ে উঠছে”—

—“আজ তুমি আপনি একবারে একা অমুক পার্কের সামনে অমুক রাস্তায় অমুক নম্বরের বাড়ীতে চুকবেন। তিন তলায় উঠে গিয়ে বা দিকের দরজায় বোতাম টিপবেন। সে দরজা খুলতে আসবে তাকে বলবেন যে আপনি মাদাম—কে চান। আপনার তারপর বাড়ী চুকতে কোনো বাধাই হবেনা—মনে হয় আপনার নামও বোধহয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। যদিই জিজ্ঞাসা করে বাহ্যিক বাজে একটা নাম বলবেন। যখন মাদাম—এর সঙ্গে দেখা হবে তখন খুব ভদ্র আর সংযতভাবে আলাপচারী করবেন—চেষ্টা করবেন তার বিশ্বাস অর্জন করতে। মহিলাটি গরীব, তাকে দু'চারটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না—তাহলেই তাকে জর করা সহজ হবে। তখন তাকে বলবেন যে, কাল রাতে একজন চাকর এসে একটি চিঠি আর একটি ছোটো বোতল যা দিয়ে গেছে—সেই বোতলটি না নিয়ে আপনি বাড়ী থেকে নড়বেন না। মহিলাটি রাজী না হওয়া অবধি ছাড়বেন না কিন্তু সাবধান বেশী গোলমাল চোঁচামেচি না হয়। তাকে ঘর থেকে বেরোতে কিছা কাউকে ডাকতে যেতে দেবেন না। দরকার হলে বলবেন যদি বোতলটা আপনাকে দিয়ে দেয় তাহলে অপরপক্ষ যা টাকা দেবে তার দু'গুণ বেশী টাকা আপনি দেবেন। ভয় নেই, টাকার অঙ্ক এমন কিছু বেশী নয়—কিন্তু আপনার স্বাধীনতা অনেক বেশী মূল্যবান। বাস, আর কিছুই আমার বলবার নেই। এখন কথা দিন আমার কথা আপনি ঠিক ঠিক রাখবেন?”

—“বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই রাখবো। আমার জীবন-দেবতা সত্যিই আপনার মত মহানুভবকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—সবকিছু থেকে ত্রাণের উদ্দেশ্যে।”

—“তাঁই হোক, ঠিকর হোমাকে আশীর্বাদ করুন”—

সন্ধ্যাসীম ওই অন্ধৃত আঁধারে কাহিনীতে কিন্তু আমার একটুও হাসি পেল না। কেন জানিনা আমার মনের কোণে কোথাও একখানি ছোটো পুস্পাধারের মেঘ আছে, হাজার আলোর ঝড়েও তা' সরেনা...। তাছাড়া সন্ধ্যাসীম চেহারাটাও বিশ্বাসযোগ্য, দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত সাংপ্রতিভ।

ঠিকানা-লেখা কাগজটা নিলাম আর দুটো ছোটো পিস্তলও পকেটে ভরলাম। তারপর সেই রক্তাক্ত-কুটির সন্ধানে যাত্রা করলাম। ক্লয়ারম'ওকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিছু দূরে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সোজা সেইখানে গেলাম।

এক অতি কুংসিত-দর্শনা বৃদ্ধার সামনে শেষ পর্যন্ত হাজির হলাম। তার হাতে হুটি সেকুইন দিতেই সে খনখনে গলায় বলে উঠলো যে সে জানে আমি প্রেমে পড়েছি, জানে যে নিজের শেষেই আমি নিজে অস্ত্রী আর আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেও সে পারবে। এই ধরণের কথায় মনে হোলো এ নিশ্চয়ই বাতুলকরী ডাইনী ধরণের স্ত্রীলোক। কিন্তু আমি যেই বললাম যে সেই ছোটো বোতলটি না পেলে আমি এক পাও নড়বো না, তখন তার মুখখানা

কী বীভৎস আর ভয়ঙ্কর হোয়ে উঠলো ধারণা করা যায় না। ধরধর করে কাঁপতে কাঁপতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে—তৎক্ষণাৎ আমি আমার পকেট-ছুরিটি বার করে ওর মাথার উপর তুলে ধরলাম। আর সেই অবস্থায়ই যেই বললাম অপরপক্ষের চেয়ে দু'গুণ টাকা বেশী দেবো সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত বিকোভ শাস্ত হোয়ে গেল।

—“আমি ছয় সেকুইন হারালাম, কিন্তু আপনি যখন সব জানবেন খুশীমনেই ওর দু'গুণ টাকা আমাকে দেবেন। কারণ এবার আমি আপনাকে চিনতে পারছি।”

—“কে আমি?”...

—“জিয়াকোমো ক্যাসানোভা দি ভেনেসিয়ান।”

তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে বারোটি সেকুইন বার করে টেবিলের উপর রাখলাম। দেখলাম খুশীতে বৃদ্ধার চোখে জল এসে গেছে।

—“আপনার জীবন হানি করতে চাইনি তবে প্রবল ভাবে প্রেমে পড়িয়ে প্রচণ্ড দুঃখ ভোগ করতে চেয়েছিলাম।”

—“খুলে বলুন সব কথা।”

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো ঘরে গিয়ে চুকলাম—বিচিত্র অদ্ভুত সব জিনিষে ঘরখানি ভরা—নানা আকারের নানা ধরণের শিশি বোতল, নানা রঙের পাথর, ধাতু, নখ—বিভিন্ন প্রাণীর, সাঁড়াশী, উলুন আর রাশীকৃত বীভৎস মূর্তি।

—“এই আপনার বোতল।”

—“এতে কি রয়েছে?”

—“আপনার আর কাউন্টসের রক্ত একসঙ্গে মেশানো আছে। এই লেখটা পড়ুন, বুঝতে পারবেন।”

এতক্ষণে বৃদ্ধলান ব্যাপারখানা কি। আজ অবাক লাগে ভাবতে সেদিন সেই মুহূর্তে কেন উজ্জকণ্ঠে হোসে উঠিনি। বরং তার বদলে ওই অতি শয়তানী স্পেনিয়ার্ডটার কথা মনে করে আমার চুলগুলো খাড়া হোয়ে উঠেছিলো...আর বিন্দু বিন্দু ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিলো।

—“এই রক্ত দিয়ে আপনি কি করতেন?”

—“আপনার সর্বাঙ্গে মাথাভাম। কেমন করে দেখবেন এই দেখুন।”

এই বলে একটা দু'ফুট লম্বা বাঁক টেনে এনে টেবিলের উপর রাখলো। তার পর একটু রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে বাঁক ডালাটি খুলে ধরলো। আমি খুঁকে পড়তেই দেখি আর হাত লম্বা একটা মোমের তৈরী নয় মূর্তি উপড় করে শোরানো...আর...আজ এ কি! তার পিঠের উপর পরিষ্কার করে লেখা আমার নাম।

কিন্তু কি অপটু কাঁচা হাতে কুংসিত অদ্ভুত-দর্শন হোয়ে মূর্তিটি! তবে আমার চেহারার আদলটা মোটাটুটি এনেছে। কি কয়েকটি জায়গা এত সামঞ্জস্যহীন, বিকৃত ভাবে গড়া হোয়েছে যে ও বেচপ সন্ডের মত মূর্তিটি আমার ভাবতেই আমি হো হো করে চিচি হেসে উঠলাম—

[ ক্রমশঃ ]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

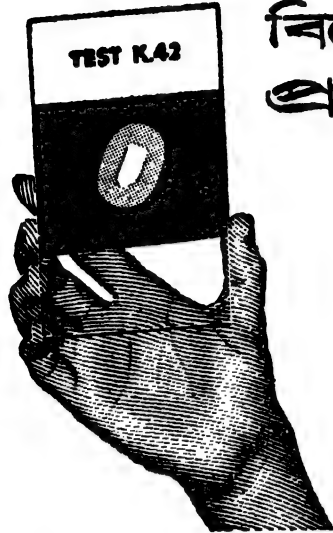
[ মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]

# দেখুন!

দস্তাক্কর নিবারণে

বিশেষ

প্রতিরোধক !



## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দস্তাক্করী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের ঘাটীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিট-গম্ভী স্মীতল আশ্বাদ।

লক্ষ্য করুন, কাগাটি  
বরাবর কত স্থিতি।

৫৫ ১৭৪ A



জেফি ম্যানার্স এণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ  
রেজিস্টার্ড বাবহারকারী

# সিন্ধু পারে

শ্রীনিবাসদত্ত দাশগুপ্ত

তিন

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই বা হাতি ঘরখানি—সেখা খুবই

পছন্দ হয় আমাদের। পাশাপাশি দু'খানি খাটে ধবধবে  
বিছানা—রঙীন মিকের লেপ দিয়ে ঢাকা। শোবার ঘরের উপযুক্ত  
জসারণ টেবিল ও অজ্ঞাত আসবাবপত্রও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

চন্দ্রনাথ বলল, “তাহলে আমাদের জিনিষ নিয়ে আসি?”

মহিলাটি চেয়ে বললে, “বেশ ত। একটু রাত হয়েছে, আমার  
লোকজন এখন নেই, নইলে আমিই জিনিষ আনিতে দিতাম।”

একটু সম্বন্ধ ভাবে শুধালাম, “কত করে আমাদের দিতে হবে?”

মহিলাটি বলল, “দৈনিক ১০ শিলিং ৬ পেনি মাথা-পিছু—ব্রেড  
ও ফ্লেকফ্লাই (অর্থাৎ রাহে থাকা ও সবালের চা-ভলখাবার)।”

বুলা! শুনে দু'কটা কঁপে উঠল। আমি যখন বিলেতে আসি  
জখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, তাই আমার আসার বিস্তারিত ব্যবস্থার  
কথা হয়ত তোমার ঠিক জানা নাই, কিংবা জানলেও মনে নাই।  
তোমার মনে আছে কি না জানি না—আমার বিলেত আসার দানার  
মত ছিল না। তার কারণ বাবার শরীর ভাল যাচ্ছিল না এবং ঠিক  
সে সময় টাকা-পয়সার দিক দিয়ে আমাদের অবস্থা যে খুব সঙ্কট ছিল,  
এমন কথা বলা যায় না। যদিও অত বড় ভূমিদারী আমাদের, তবুও  
তার আদায়পত্র ছিল মুকন্দদাসের হাতে—তিনি নানান দু'তোয় টাকা  
পাঠাতে গোলমাল করছিলেন, দাদা কি বাবা দেশে গিয়ে কখনও  
ভূমিদারী কিছু দেখেন নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাবা ও দাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক  
হয়েছিল যে, মাসে মাসে ২৫০ টাকা করে আমাদের পাঠান হবে এবং  
আমি যেমন করেই তোক তার মধ্যে চালিয়ে নেব। আসার আগে  
কলকাতায় যে মাড়োয়ারী হাসপাতালে আমি কাজ করছিলাম, তাদের  
সঙ্গে লেখাপড়া হয়েছিল যে, আমি এ দেশ থেকে বছর দু'এর মধ্যে  
পাশ করে ফিরে গেলে, আমাকে বেশী মাইনের একটা ভাল চাকুরী ত'  
দেবেই। অদিকন্তু আমার আসা-যাওয়ার খরচাও তারা দেবে। কারণ  
যে সময় আমি আসি, তার বছর দুই পরে সেই হাসপাতালেই  
আমার উপরওয়াল একটি বড় ডাক্তারের চাকুরী খালি হওয়ার  
কথা ছিল। বিলেত থেকে পাশ করে ফিরে না গেলে এমনি  
সে চাকুরী হওয়ার আমার কোনও আশা ছিল না। কেন না,  
সে সময় আমার চেয়ে আগে পাশ করা আরও দু'জন ডাক্তার  
সেই হাসপাতালেই কাজ করছিলেন। তাই সব দিক বিবেচনা করে  
বাবার কথাগুই দাদা শেষ পর্যন্ত মত দিয়ে দু' বছরের জন্য ঐ টাকাটা  
মাসে মাসে পাঠাতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু যদি সাড়ে বারো শিলিং করে বোজ দিতে হয় শুধু রাহে  
থাকা এবং সকালবেগার চা-ভলখাবারের জন্য, তাহলে শেষ পর্যন্ত  
আমি পাঁড়ার কোথায়?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চন্দ্রনাথকে বললাম, “এদের দাবী  
বড় বেশী।”

চন্দ্রনাথ বলল, “জানি রাতটা ত থাকি। সকালে খুঁজলে এর  
চেয়ে সম্ভার ঢের জায়গা পাওয়া যাবে।”

ট্যান্ডি থেকে জিনিষ-পত্র নিয়ে দু'জনে উপরে আমাদের ঘরটিতে  
রাখলাম। চন্দ্রনাথকে বললাম, “তুমি একটু গুছিয়ে নাও—আমি  
ঘরে আসি।”

চন্দ্রনাথ বলল, “কোথায়?”

বললাম ঘাট ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। সুরেশের সঙ্গে দেখা করে  
তাকে নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীটা দেখিয়ে দি। কাল সকালবেলা  
তাকে না পোলে, একলা কোথায় সম্ভার ঘর খুঁজব?

চন্দ্রনাথ বলল, “তোমার শরীরের ক্ষমতাকে বাতাহরী দি। এর  
পরেও আবার বেরবে?”

শরীরের ক্ষমতার পিছনে যে আমার মনের একান্ত দুর্বলতা  
রয়েছে সে কথা চন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা না করে ছুটলাম আবার  
সিঁড়ি দিয়ে। চন্দ্রনাথ দরজার কাছে এসে শুধাল, “কিছু খাবে না?”

তাই ত? খাওয়ার কথাটা ত একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম! জঠাং  
বুঝতে পারলাম—সত্যিই দারুণ গিদে পেয়েছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই  
চন্দ্রনাথকে বললাম, “ফিরে আসি। তারপর যা হয় কিছু খাবো।”

চন্দ্রনাথ বলল “পাবে কোথায়? এ দেশে রাহে খাওয়ার সময়  
পার হবে গেছে বলে মনে হচ্ছে।”

ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় পৌনে আটটা বাজে।  
সাড়ে আটটার ভিক্টোরিয়ায় ফোকটোনের দ্বিতীয় ট্রেন এসে  
পৌছবার কথা। চন্দ্রনাথকে “সে যা হয় হবে।” বলে দ্বিতীয়  
কথার অপেক্ষা না করে বাইরে এসে ট্যান্ডিতে উঠ বসলাম।  
ট্যান্ডিকে আগেই দাঁড়াতে বলে গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য,  
এতক্ষণ পর্যন্ত ঘোরাব দরুণ ট্যান্ডি ভাড়া জিনিষ নামাবার সময়  
চন্দ্রনাথই ট্যান্ডি-ডাইভারকে দিয়ে গিয়েছিল।

\* \* \* \*

আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এসে হাজির হলাম।  
ট্যান্ডি বিদেয় করে দিয়ে ঠিক প্র্যাটকস্টি খুঁজে নিয়ে চুকে দেখি  
সুরেশ—প্র্যাটকস্টি পাগচারী করছে। রোগা লম্বা চেহারা—  
গায়ের রং অত্যন্ত কালো, তাই তাকে খুঁজে পেতে দেরি হল না।  
কাছে গিয়ে প্রায় সুরেশকে ভড়িয়ে ধরলাম। সুরেশ আমাকে  
দেখে অবাক হয়ে গেল—ট্রেন ত' এখনও আসেনি।

বিস্তারিত সব সুরেশকে বললাম। বললাম, “চল আমাদের  
হোটলে যাওয়া যাক।” সুরেশ বলল “চল”।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে সুরেশ বলল, “ট্যান্ডিতে যাবে  
না বাসে?”

মনে মনে আর পরস্পর খরচ করে ট্যান্ডি চড়ার বাসনা আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু বাসে যাওয়ার কথা সুরেশকে বলতে একটু লজ্জা হলো। এখান থেকে দূর ত কম নয়।

বললাম, “চলো। ট্যান্ডিতেই যাই।”

সুরেশ বলল, “সেই ভাল। সোজা বাস এখান থেকে আছে কি না জানি না। তাহলে আবার রাস্তায় পুলিশমানকে গিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়।”

হুজুনে ট্যান্ডি নিয়ে আবার রওয়ানা হলাম এবং আমার নির্দেশ মত খানিক দূর পরে ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—২৭ নং বেডফোর্ড স্ট্রীটে।

কিন্তু এ কি! বাড়ীটা একই অল্পবয়স্ক বলে মনে হচ্ছে না! সে বাড়ীর রঙটা রাঙে কাল ধাপের বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু এ বাড়ীর রঙটা যেন একই বেশী লালচে; বাইরের গড়ন অবশ্য একই ধরণের—সেই রেলিংয়েরা, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ফুটপাথ থেকে উঠে গিয়েছে। ভাবলাম—আমার দেখার ভুল।

ট্যান্ডি-ড্রাইভারকে বিদেহ করে দিয়ে আমরা উঠে গিয়ে সন্দের নরজায় কড়া নাড়লাম। কিন্তু কৈ?—বাইরের সেই ‘লিনকলন হল হোটেল’ লেগাটা ত নেই। এ কি সব ভৌতিক কাণ্ড!

তনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একটি বৃদ্ধা মহিলা সন্দের দরজাটি ঈষৎ খুলে একটু বিবস্ত্র ভাবেই শুধাল, “কি চাই?”

জিজ্ঞাসা করলাম “এটা কি লিনকলন হল হোটেল?” জোরে জোরে দুবার “না-না” বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে আমাদের মুখের সামনে দরজা দিল বন্ধ করে। ফ্যাল ফ্যাল করে সুরেশের মুখের দিকে তাকালাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুরেশ বলল, “তুমি নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করেছ।”

বললাম “চন্দ্রনাথ বলল—বেডফোর্ড স্ট্রীট। আমি নিজেকে দেখলাম ২৭ নং।”

সুরেশ একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি করা যাবে?” সুরেশ বলল, “লিনকলন হল হোটেল বললে না?”

বললাম, “তাই ত মনে আছে।”

বলল, “চল, একজন পুলিশমানকে জিজ্ঞাসা করা যাক। এদেশের পুলিশমানরা আশ্চর্য! সব খবর রাখে।”

সত্যিই আশ্চর্য্য এদেশের পুলিশ। এর পর কত বার কত সমস্তার অতি সহজ সমাধান মিলেছে এদের কাছে। সমস্ত লণ্ডন সহরটি যেন তাদের নখাণ্ডে—কোথায় কোন রাস্তার কি ভাবে যেতে হবে, কোথায় গেলে কি পাওয়া যাবে, ঠিক পড়া মুখস্থ বলার মতন অতি সহজে বলে দেয় এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে। সাধারণতঃ ছ’ ফুটের উপর লম্বা; কালো পোষাক পরা মাথায় কাল উঁচু টুপি—গভীর ধীর পদক্ষেপে রাস্তার মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন এদের জাগ্রত দৃষ্টির প্রভাবেই সমস্ত সহরটা চলছে সঙ্গত শান্তির পথে।

চললাম হুজুনে ফুটপাথ ধরে। সুরেশ বলল, “চল কোনও একটা বড় রাস্তার মোড়ে গেলেই পুলিশ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে পেয়ে যেতে পারি—নজর রেখো।”

আমার মুখে তখন আর কথা নাই—চলেছি হুজুনে। খানিকটা গিয়ে বড় কোনও রাস্তা নয়—একটা ছোট রাস্তার মোড়ের কাছে, অল্প দিকের ফুটপাথ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলেছে এক জন পুলিশমান। সুরেশ তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে পুলিশমানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও সঙ্গে গেলাম।

সুরেশ শুধাল, “কমা করবেন। লিনকলন হল হোটেলটি কোথায় বলতে পারেন?”

পুলিশমান বলল, “লিনকলন হল হোটেল? কি ঠিকানা?”

সুরেশ বলল “আমাদের জানা ছিল—২৭ নং বেডফোর্ড স্ট্রীট। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি সেটা নয়।”

পুলিশমান বলল “নিশ্চয়ই ভুল করেছে। তাহলে হয় নিউ বেডফোর্ড স্ট্রীট, কিংবা বেডফোর্ড প্লেস, কিংবা আপার বেডফোর্ড প্লেস—এর কোথাও একটা হবে। এইগুলি সব আপনাদের খবর নিতে হয়।”

কোথা দিয়ে কি ভাবে এ সব রাস্তায় যেতে হয় সুরেশ বিস্তারিত সব জেনে নিতে লাগল। সে সব কথা আমার সুনবার ইচ্ছা সঙ্গেও আমার কানে যেন কিছুই ঢুকল না।

হঠাৎ সুরেশের কথায় যেন চমক ভাঙ্গল। সুরেশ বলল, “চল ট্যান্ডি নেওয়া যাক।—বাসে এ সব জায়গায় যাওয়ার ঠিক সুবিধা হবে না। আর এটিবেই বা কত?”

যন্ত্রচালিতের মত বললাম, “চল।” আরও বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে ট্যান্ডি পাওয়া গেল। কোথায় গেলে ট্যান্ডি পাওয়া যাবে এ সব খবরও সুরেশ পুলিশমানের কাছে নিয়েছিল।

আবার চলল ট্যান্ডি। কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল—কিছুই খেয়াল করিনি তখন। সুরেশ একবার ট্যান্ডিতে জিজ্ঞাসা করেছিল—“যথেষ্ট টাকা কড়ি সঙ্গে আছে ত? আমার কাছে কিন্তু বিশেষ কিছু নাই।” উত্তর দিয়েছিলাম “কিছু আছে।” আশ্চর্য্য আট পাউণ্ড অর্থাৎ শতখানেক টাকা তখন পকেটে ছিল বোধ হয়।

ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—আর একটা বাড়ীর সামনে। আগেই বলেছি—সবই এক রকমের বাড়ী। ট্যান্ডির ডানাল দিয়ে রঙটা কালো ধরণেরই মনে হল। একটু সেন উৎসাহ হল মনে। সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম—“কোথায় এলাম?”

সুরেশ বলল, “২৭ নং নিউ বেডফোর্ড স্ট্রীট।”

বললাম, “তুমি নেমে দেখ। আমি আর নামব না।”

সুরেশ “আচ্ছা” বলে ট্যান্ডি থেকে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আমাকে বলল, “এখানেও নয়।”

“তা হলে?” শুধু এই কথাটি আমার মুখ দিয়ে কোনও রকমে যেন বেরুল।

সুরেশ শুধাল, “আচ্ছা—সেঙ্গীয়ার হাট থেকে সেখানে গিয়েছিলে না? কতক্ষণ লেগেছিল যেতে—মনে আছে?”

বললাম, “বেশীক্ষণ নয়।”

সুরেশ বাইরে ট্যান্ডি-ড্রাইভারের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বললে।

তার পর ট্যান্ডিতে এসে উঠে বসল। চলল ট্যান্ডি।

সুরেশ বলল, “বোধ হয় বেডফোর্ড প্লেস হবে। ট্যান্ডি-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম। এ দেশের ট্যান্ডি-ড্রাইভাররা সব রাস্তা চেনে এবং শুধু রাস্তার নাম ও নম্বরটা বলে দিলেই ঠিক গিয়ে পৌঁছায়।”



সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুরেশকে শুধায়, “বদি না পাওয়া যায় ত কি হবে?”

সুরেশ বলল, “অত ভাবছ কেন? যদি না পাই রাসেল কোয়ারে আমার এক বন্ধু আছে—এক বোর্ডিং-হাউসে থাকে। তাদের ওখানে যাবও খালি আছে—আমি খবর নিয়েছি। তবে জায়গাটা তত ভাল নয়—সেখানে তোমাকে রাতের মত তুলে দিয়ে, কাল সকালে এসে যা হয় করা যাবে।”

শুধায়, “তুমি থাক কোথায়?”

বললে, “আর্লস কোর্ট—সে এখান থেকে অনেক দূর।”

শুধায়, “সেখানে জায়গা নেই?”

সুরেশ শুধু একটি কথায় জবাব দিল, “না।”

ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—২৭ নং বেডফোর্ড প্রেসে। কিন্তু এটাও লিনকলন হোটেলে নয়।

সুরেশ বলল, “আর কত ট্যান্ডি-ভাড়া দেবে? আপার বেডফোর্ড প্রেসে এখান থেকে বেশী দূর নয়। চল হেঁটেই যাওয়া যাক।”

“চল।” বলে গাড়ী থেকে নেমে ট্যান্ডি-ড্রাইভারকে বিদেয় করে দিল। সুরেশের প্রাণে সে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল—আপার বেডফোর্ড প্রেসটা কোন দিকে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একবার মাথার উপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম—অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ—একটিও তারা দেখা গেল না। হায় রে! কেন জানি না বুক ছাপিয়ে জল এল চোখে। কোনও রকমে সামলে নিলাম। হঠাৎ একটা হাওয়ার সমস্ত শরীর উল্লস কাঁটা দিয়ে কেঁপে—বুঝলাম কি অসম্ভব শীত!

সুরেশ বলল, “জোরে জোরে চল,—নৈলে ঠাণ্ডায় জমে যাবে।”

কিন্তু দু’পা এগিয়েই বৃষ্টিতে পাবলাম—আমার শরীর আর নিজেকে বইতে একবারেই রাজী নয়। ফুটপাথে শুয়ে পড়তে পারলেও বেন আমি ধাঁচি। মনের না শরীরের—কোনটার স্ফূর্তি যে তখন বড় হয়ে উঠছে সে বিচার করার শক্তিটুকুও নাই।

যাই হোক, তবুও চললাম। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার পাশে একটি ছোট ভোজনাগার—ই-রাস্তাতে থাকে বলে ‘কাফে’ চোখে পড়ল। চারিদিকে শার্প জাঁটা উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক আলোতে ভিতরটা উজ্জ্বলিত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অনেক ই-বেজ পুরুষ ও মহিলা ভিতরে পান আগার করছিল।

সুরেশকে বললাম, “কিছু চা খেয়ে নিলে হত না?”

সুরেশ শুধাল “তুমি ডিনার (সন্ধ্যা ভোজন) খাওনি বুঝি?”

বললাম “না।”

সুরেশ বলল, “চল, আগে বাড়ীটা দেখে নি, তারপর এসে না হয় কিছু খেয়ে নেবে।”

শুধায়, “খোলা থাকবে?”

সুরেশ বলল “এ কাকেশুলে প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকে।”

চললাম—বেশ খানিকটা হীটলাম। ২৭ নং আপার বেডফোর্ড প্রেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি দিয়ে ৩৪ ধাপ উপরে উঠলাম। চমকে উঠলাম—সদর দরজার পাশে লেখা রয়েছে—লিনকলন হল হোটেল। বুল! অকুল সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যেতে যেতে হাত বাড়িয়ে পেলাম কুল।

সুরেশ শুধাল, “ল্যাচ-কী আন নি?”

জিজ্ঞাসা করলাম, “সেটা আবার কি?”

সুরেশ একটু হেসে বলল, “বাড়ির সদর দরজার চাবি। বাসা নিলেই সদর দরজার চাবি এরা একটা দেয়।”

বললাম, “না।”

সুরেশ কড়া নাড়ল। সেই মহিলাটি এসে দরজা খুলে দিল। একটু হেসে আমাকে বলল—“আপনি ল্যাচ-কী না নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন—তাই আমি জেগে বসে আছি আপনার জন্য।”

সুরেশ বলল, “অসংখ্য ধন্যবাদ!”

উপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথের উপর মনে মনে যে একটু রাগ হয়েছিল—সেটা এতক্ষণ টের পাই নি। কেন সে ‘আপার বেডফোর্ড প্রেস’ না বলে শুধু বেডফোর্ড স্ট্রীট বলেছিল? তাকে বেশ মিষ্টি করে দু-কথা শুনিতে দেব, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই রকম একটা সঙ্কল্প করে নিলাম মনে।

উপরে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি চন্দ্রনাথ একটা বিছানায় বেশ লেপ মুড়ি দিয়ে অব্যাহত ঘুমুচ্ছে। কাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম “চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ! ওঠ। সুরেশ এসেছে।”

চন্দ্রনাথ একবার আঃ, বলে বিছানার উপর খানিকটা উঠে বসে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইল। তার পরই আবার শুয়ে পড়ল—অল্প দিকে মুখ ফিরিয়ে।

সুরেশ বলল, “থাক ডেকে না। ও এখন অব্যাহত ঘুমুচ্ছে।”

পাশেই আমার বিছানা পাতা—একটা বৈজ্ঞানিক শক্তিতে যেন আমার শরীরটাকে টানছে সেই দিকে। সুরেশ ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। প্রসাধন-টেলির কাছে দাঁড়িয়ে সুরেশ বলল, “এই যে, তোমার জন্ম চারখানা স্যাণ্ডউইচ এখানে ঢাকা দেওয়া আছে। জলও ঘরে আছে দেখছি।”

সুরেশ চন্দ্রনাথের উপর রাগ জ্বল হয়ে কৃতজ্ঞতার মন পেল ভরে।

সুরেশ বলল, “আমি একখানা খাই—কি বল?”

বলতেই হল, “আচ্ছা!”

সুরেশ একখানা স্যাণ্ডউইচ বেশ উপভোগের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। খেয়ে—জল খেয়ে বলল, “আমি এবার চলি—টিউবে আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।”

বললাম, “আচ্ছা!—কাল সকালে এসো কিন্তু।”

সুরেশ বলল, “হ্যাঁ! কিন্তু এগারটার আগে আসতে পারব না। ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসতে হবে ত!”

বললাম, “এগারোটা—অত দেরী করবে?”

সুরেশ বলল, “তার আগে হয়ে উঠবে না, অনেক দূর যে এখান থেকে।”

সুরেশ চলে গেল। আমি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত গেলাম। সুরেশ বলল, “তোমাকে আর নামতে হবে না।”

বললাম, “না ভাই! আর পাচ্ছি না।”

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে, কি আকর্ষণে জানি না, প্রথমেই চাইলাম বিছানার দিকে। কোনও রকমে পরিহিত কাপড়-চোপড় কতকটা খুলে ফেলে সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়—লেপের নীচে।

বিছানার পাশেই তারে ঝুলছে আলো নেবাবার কলটি। নিবিয়েও দিলাম।

শুয়ে মনে হল—তাই ত খাওয়া হল না। কিন্তু উঠি উঠি করেও উঠবার শক্তি পেলাম না। ভাবলাম—একটু জিরিয়ে নি। কিন্তু কখন যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম—নিজেই জানি না।

### চার

বুলা! ধৈর্য ধরো। লগুন আমার প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা একটু বিস্তারিত করেই লিখলাম—পড়তে পড়তে ধৈর্য হারিয়ে না; কেন না তার একটু প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। পরে প্রায় মাসাধিক কাল যে একটা অবসাদগ্রস্ত হতাশ মন নিয়ে আমি এই দূর বিদেশে কাটিয়েছি—ভাবলে এখনও ভয় পাই। এখন মনে হয়—প্রথম রাতে একটি অবশ মনের উপর ঐ রকম দিশেহারা যাত-প্রতিঘাতে মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আনন্দের পথটি আমি যেন কিছুদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমি যখন চলে আসি, তুমি তখন ছেলেমানুষ। কাজেই আমার চরিত্রের বিশেষ কিছুই তোমার জানা নাই। শুধু জানতে—মেজনা আড্ডাবাজ লোক—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই বেনীর ভাগ সময় কাটান। কিন্তু আমার মনের পরিচয় কিছুই তুমি পাওনি। এক কথায় শুধু এইটুকু এখন বলে রাখি—সে যুগে আমার মনটা ছিল একটা হালকা রঙ্গিন বেলুনের মতন—যে দিক দিয়ে

হাওয়া বইত সেই দিকেই মহা আনন্দে অনার্যাসে ভেসে চলে যেত মনভরা আবেগ নিয়ে—এক সামান্য একটু আঘাতেই ফেটে পড়ে যেত ধূলীয়, আর যেন কোনও দিনই উঠবে না। হয়ত বলবে—এ ত অতি দুর্বল মনের পরিচয় হল। হয়ত তাই। কিন্তু ঐ রকম মন দিয়েই যে তৈরী করেছেন আমাকে বিধাতা। সেটা ভুললে ত চলেবে না।

এইবার আমার কাহিনীটি শুরু করি। পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙল, তখন বেলা ১টা বেজে গেছে। চন্দ্রনাথই আমাকে ডাকল, “বিকাশ, ওঠ। ওঠ। আর দেরী করলে, সকালের খাবার খেতে পাবে না। ব্রেকফাস্ট তৈরী বলে দরজার ধাক্কা দিয়ে গেছে। ওদের সকালের খাবারের জন্য একটা সময়ের নিয়ম আছে।”

চন্দ্রনাথও তখন বিছানার শুয়ে—লেপে ঢাকা। আমি আপাদ-মস্তক লেপটিকে ভাল করে জড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে শুধালাম।

“কটা পর্যন্ত এরা খাবার দেয়?”

চন্দ্রনাথ বলল, “ষট্টি মনে পড়ে—বোধ হয় সাড়ে নটা বলেছিল। নটা দশ হলো।”

বললাম “তুমি ওঠ না আগে। একটু ত’ স্নানের ঘর।”

আমাদের ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন একটা স্নান ইত্যাদির ঘর ছিল।

চন্দ্রনাথ বলল—“আমার ত দেরী হবে না—তোমারই তৈরী হতে দেরী হয়। তুমিই আগে ওঠ।”



## সুনিপুণ স্বর্ণশিল্পী ও মনিকার ..... গিনি ম্যানসন

জুয়েলার্স

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনিম্যান” \* ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহ :

ষড়বাবুর বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান রোড, বাগীচবাড়ী, ফোন : ৪৬-১৪২৫

উঃ “না।” বলে পাশ ফিরে ওঠলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, “না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।”

একটু পরে ওয়ে ওয়ে খাটের শব্দে বুঝলাম—চন্দ্রনাথই আগে উঠল।

বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথের প্রচণ্ড শব্দায় চমকে ঘুম ভাঙ্গল। বললে, “এই বার উঠে পড়। আর দেবী করো না। আমি স্নানের টবে গরম জল ভরে রেখে এসেছি—সটান গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়, নীত কেটে যাবে।”

কোনও রকমে বিছানায় উঠে বসলাম। কিন্তু এ কি—কি প্রচণ্ড শীত! এ যেন ধারণারও অভ্যুত। ঘরের চারিদিকের জানালার শাসি জাঁটা, গায়ে যথেষ্ট কাপড়-জামা আছে—কিন্তু তবুও বসেই যেন বরফ হয়ে জমে গেলাম। কোনও রকমে উপরের লেপটা টেনে গায়ে নিলান জড়িয়ে। বললাম, “এত শীতে উঠব কি করে?”

চন্দ্রনাথ বলল, “জোব করে উঠে পড়, নৈলে হবে না।”

উঠি উঠি করে কিছুক্ষণ কাটল। কতকটা আশ্রয় করতে পারবে যদি বলি—আমাদের দেশের পৌষ মাসের দাক্ষিণ শীতের রাতে হিম ঝাণ্ডা জলে স্নান করবার জ্ঞান নাহলে হলে নামার ঠিক আগেই যে রকম ‘মনের অবস্থা’ হয় কতকটা সেই রকম হয়েছিল আমার। বাঁই হোক, শেষ পর্যন্ত, আজও স্পষ্ট মনে আছে, লেপটাকে জড়িয়ে নিয়ে স্নানের ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে, লেপটিকে মেঝের ফেলে দিয়ে কোনও রকমে স্নানের টবের গরম জলের মধ্যে ঢুকে যেন বাঁচলাম। চন্দ্রনাথ এক-টব গরম জল ভরে রেখে এসেছিল—যতটা গায়ে নয়।

আমাদের তৈরী হতে হতে প্রায় পৌনে দশটা হয়ে গেল। ঘর ছেড়ে হুঁজনে নেমে এলাম নীচে। এক তলায় সিঁড়ির গোড়ায় একটি সাদা পোশাকপরা তরুণীর সঙ্গে দেখা হলো—সিঁড়ির কাপেট পরিষ্কার করছে—বোধ হয় বাড়ার ঝি। আমাদের দেখে একটু হেসে বললে, “সুপ্রভাত!”

চন্দ্রনাথ বলল, “সুপ্রভাত!” তার পর শুধাল, “ব্রেকফাস্ট কোথায় খেতে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?”

একটু হেসে মহিলাটি চন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। বললে, “ব্রেকফাস্ট ত আর খেতে পাওয়া যাবে না। ব্রেকফাস্ট ত উঠে গেছে!”

জিজ্ঞাসা করলাম “তার মানে?”

মহিলাটি বললে “সাদে নটা পর্যন্ত যে ব্রেকফাস্ট।”

চন্দ্রনাথ বললে, “তা হোক। আমরা সঠিক জানতাম না। গৃহকর্ত্তী কোথায়?”

বললে, “নীচে নেমে যান—সামনেই ব্রেকফাস্ট খাওয়ার ঘর—সেইখানেই আছেন।”

নীচে মানে—এক তলায়ও নীচে। আগেই বলেছি—রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে ওদের একতলার সদর দরজা। সাধারণতঃ অনেক বাড়ীতে রাস্তারও নীচে আর একতলা থাকে, যাকে ইংরাজীতে ওরা বেগমেন্ট বলে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িই ঘুরে নেমে গিয়েছে সেখানে। এই সব সেই দিনই প্রথম শিখলাম।

নীচে নেমে গিয়ে সামনেই খাওয়ার ঘর। দরজা ঠেলে ঢুকলাম। দেখলাম—এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম।

বেশ বড় ঘর—ছোট ছোট অনেকগুলি টেবিল এক তার পাশে দু’খানি কিংবা চারখানি চেয়ার চারি দিকে সাজান। প্রত্যেক টেবিলে খবরবে সাদা চাদর পাতি ও একটি করে ফুলদানীতে ফুল দেওয়া রয়েছে। প্রত্যেক চেয়ারের সামনে টেবিলে ছুরী কাঁটা চামচ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এরই একটি টেবিলে এক কোণে গৃহকর্ত্তী ভদ্রমহিলা বসে থাকছেন।

এবার আমিই প্রথম বললাম “সুপ্রভাত!”

ভদ্রমহিলা একটু হেসে “সুপ্রভাত” জানাল আমাদের।

চন্দ্রনাথ শুধাল, “আমাদের জ্ঞান কি ব্রেকফাস্ট নেই?”

মহিলাটি বলল “আপনাদের অবস্থা দেবী হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা বোধ হয় সঠিক জানতেন না। তাই আপনাদের জ্ঞান আমি কিছু খাবার রেখে দিয়েছি। বঙ্গুন।”

বললাম, “অনেক ধন্যবাদ!”

আমরা একটি টেবিলে বসলাম। একটু পরে সাদা পোশাকপরা একটা ঝি আমাদের টেবিলে হুঁজনের মত চা, টোট, মাপন আদিসহ হাট ডিম, মারমালেড প্রভৃতি সাজিয়ে দিয়ে গেল।

\* \* \* \*

খাওয়ার পর আমরা একতলায় উঠে এলাম। একতলায় উঠে এসে বাঁ-হাতি একটি দরজা দিয়ে একটা বেশ বড় ঘরে ঢুকলাম—এটি বাড়ীর সাধারণ বসবার ঘর। ঘরে বেশ পুরু কাপেট পাতি এবং ছোট-বড় অনেকগুলি গদিজাঁটা কোচ চারি দিকে সাজানো। মাঝখানে একটি নীচু গোল টেবিলের উপর দু’তিনখানি খবরের কাগজ ও বিলেতি মাসিক বা সাপ্তাহিক কতকগুলি পত্রিকা ছড়ান রয়েছে। ঘরের এক পাশে দেওয়ালের গায়ে বাহার করে গাঁথা আশুন জালাবার উলুন—গনগনে কয়লার আশুন জ্বলছে। এ ঘরটির সন্ধান খাওয়ার ঘরে গৃহকর্ত্তীই আমাদের দিয়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় এগারটা বাজে—ঘরে অল্প কোনও লোক দেখলাম না। হুঁজনে গিয়ে আশুনের ধারে হুঁটি কৌচে বসলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, “বসে কি হবে। চল বেরুই।”

বললাম, “চিনি না, শুনি না—যাব কোথায়?”

চন্দ্রনাথ বলল, “একটি থাকার পাকা ঘর ঠিক করতে হবে ত?”

বললাম, “সুরেশ আসুক।” ঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম—“এখনই এসে পড়বে।”

চন্দ্রনাথ বলল, “তাহলে তুমি সুরেশের জ্ঞান অপেক্ষা কর আমি ঘরে আসি।”

শুধালাম, “একলা? কোথায়?”

বললে, “মেজদার সেই বজুর কাছে, মেজদার চিঠি আছে আমার সঙ্গে। তিনি কাছাকাছিই থাকেন। এর পরে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি সাদে এগারটার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।”

বললাম, “কোথায়?”

চন্দ্রনাথ বলল, “মার্গমন্ট রোড—টেভিষ্টক স্কয়ারের কাছে। বেশী দূর নয়। কাল রাতেই আমি গৃহকর্ত্তীর কাছে সব খবর নিয়েছি।”

শুধালাম, “একলা চিনে যেতে পারবে?”

বলল, “তা আর পারব না? পথে জিজ্ঞাসা করে নেব।” এই বলে চন্দ্রনাথ উঠে পড়ল।

শুধালাম, “তা আমি কি তোমার জন্ত অপেক্ষা করব?”

চন্দ্রনাথ বলল, “স্বপ্নে এলে তুমি বরং তার সঙ্গে বেরিয়ে দু-চার জায়গা দেখে এসো। আমিও দেখি। তার পর বিকেলে চা-এর সময় পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করব।”

এই বলে চন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে বসে—চাইলাম জানালায় দিকে। উঃ—বাইরে কি কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা অন্ধকার! চাঁদ চমকে উঠল। এ কি! মনটা এত ভারি কেন?—এতক্ষণ ঠিক যেন টের পাটিনি—ক্রমেই যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। কাল রাত্রেই সেই অকুলে কূল পাওয়ার অবলম্বনটি আজ আর নাই, কখন যেন ভাত থেকে আবার গেছে খসে। তোমাদের মুখগুলি এক এক করে মনে করতে লাগলাম। মনে পড়ল সেই আমাদের দেখেব শীতকালের সকাল বেলায় পরিষ্কার সোনালী রোদটুকু। এ আমি কোথায় এলাম! সাত সমুদ্র তের নদীর পারে—অন্ধকার এই কারা-গহবরে—কি পাপের শাস্তিতে হল আমার নির্দাসন? একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে একটু অশ্রুমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এমন সময় ঘরে একটি পূর্বদেশীয় যুবক এসে ঢুকল। ছোট-পাট মানুষটি—গায়ের রং কালো—কিন্তু বেশ ফিটফাট, ইংরেজী পোষাক পরিধানে। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—মুখে একটি বেশ নম্র ভঙ্গুর ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে “সুপ্রভাত! বড়ই খারাপ দিনটা আজ।” তার পর আঙনের যত কাছে সম্ভব একটি কোঁচে বসে একটি পত্রিকা নিল টেনে। খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে দুটো কথা বলার ইচ্ছে হ’ল।

শুধালাম, “আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?”

বলল, “ভারতবর্ষের সিংহল দেশ থেকে। আপনি?”

বললাম “আমিও ভারতবর্ষের বাংলা দেশ থেকে আসছি।”

আর কোনও কথা বলল না। লোকটি কথাবার্তা খুব কম বলে দেখছি। আমিই আবার কথা বললাম—“তা এই হোটেলেরেই থাকেন বুঝি?”

বললে “আপাততঃ। কাছাকাছি দু’-তিনটে ঘর দেখেছি—দু’-এক দিনের মধ্যেই উঠে যাবো।”

শুধালাম, “কবে দেশ থেকে এসেছেন?”

বললে “তা, প্রায় ছ’মাস হলো। এত দিন লণ্ডনের বাইরে একটি চমৎকার বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু আদা-বাওয়াল অনেকটা করে সময় নষ্ট হয় বলে—এবার লণ্ডন সহরের ভিতরেই থাকব। কাজের অসুবিধা হয় অত দূরে থাকলে।” শুধালাম—“আপনি কি কোনও কাজ করেন, না লেখাপড়া করেন?”

বললে “আমি ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। আপনি?”

এতক্ষণে একটা প্রশ্ন করাতে যেন বাঁচলাম। আমিই ত টেনে টেনে কথা চালাচ্ছিলাম এতক্ষণ।

বললাম, “আমি ডাক্তারী পড়তে দেশ থেকে সরে এসেছি।”

‘ও!’ বলে আবার চূপ করে গেল। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন করার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না। শুধালাম, “সস্তায় থাকার ভাল জায়গা আপনার সন্ধান আছে?”

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল। শুধাল, “লণ্ডনের

বাইরে কোনও সার্বার্দে (সম্মিলিত বসবাসের পল্লী) থাকলে আপনার অসুবিধা হবে?”

বললাম “না—সে ত খুব ভাল হয়।”

লণ্ডনের বাইরে—হয়ত কীকায়—হয়ত সেখানে আকাশ গাছ-পালা দেখতে পাওয়া যাবে—মনটা একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই বিরাট দৈত্যের গহবর থেকে হয়ত পাব একটু মুক্তি।

বললে “সুন্দর একটি জায়গা আছে এবং বেশ সস্তা। আমি সেইখানেই ছিলাম। চেয়ারিং ক্রশ-ষ্টেশন থেকে ট্রেনে যেতে হয়, আর ষটা তিন কোয়ার্টার লাগে। এলটাম পার্ক জায়গাটির নাম। ১৪ নং গ্রীণহোম রোডে মিসেস ব্লেক বলে একটি ভদ্রমহিলা বাস করেন—তিনিই অতিথি রাখেন। মাত্র দু’ গিনি করে সপ্তাহে—বেড ব্রেকফাস্ট এবং সন্ধ্যাবেলায় সাপার (হালকা ধরণের সন্ধ্যা ভোজন) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাস্তিপূর্ণ জায়গাটি।”

স্বপ্নে ঘরে ঢুকল। উঠে দাঁড়িয়ে স্বপ্নেশকে বললাম, “স্বপ্নেশ, চল। এখনই যেতে হবে।”

স্বপ্নেশ শুধাল “কোথায়?”

বললাম “এলটাম পার্কে। চেয়ারিং ক্রশ-ষ্টেশন থেকে যেতে হয়। এই ভদ্রলোকটি সন্ধান দিলেন—থাকার খুব ভাল জায়গা আছে।”

স্বপ্নেশ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করে বিস্তারিত জেনে নিল। আমি ও স্বপ্নেশ রওয়ানা হলো—এলটাম পার্ক অভিমুখে।

লিনকলন হল হোটেল থেকে বাসে চেয়ারিং ক্রশ-ষ্টেশনে এসে, ট্রেন ধরে যখন এলটাম পার্ক-ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হবে। ষ্টেশনটি নীচুতে—খানিকটা উপরে উঠে গিয়ে এলটাম পার্ক পল্লী। আমি ও স্বপ্নেশ উপরে উঠে গিয়ে রাস্তার কাঁড়ালাম।

সত্যি চোখ জুড়িয়ে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তার দু’ধারে ঠিক একই ধরণের ছোট ছোট দোতলা বাড়ীগুলি, সামনে একটি করে ছোট বাগান, বাগানের সামনে রাস্তার ধারে একটি করে লোহার ছোট গেট এবং একটি সরু রাস্তা সেই গেট থেকে বাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সবই ঠিক কম-বেশী একই ধাঁচে তৈরী—যেন একই দিনে কোনও একজন কারিগর সমস্ত বাড়ীগুলি তৈরী করে রেখেছে।

দিনটা অবশ্য মেঘলা ছিল—কিন্তু এখানে সেই লণ্ডনের অন্ধকার কুয়াশা নাই। বাড়ীগুলির কীকে কীকে রাস্তার ওধারে তরঙ্গায়িত মাঠের পর মাঠ—তার ঘন সবুজ রঙটা সত্যিই আমার বৃক্কের ওপর যেন একটা শীতল প্রলেপ লাগিয়ে দিল। আমি একদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

স্বপ্নেশ বলল, “ওহে চল, কোথাও মধ্যাহ্ন ভোজনটি সেরে নেওয়া যাক। বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।”

স্বপ্নেশ বলল, “এ দূরে রাস্তার ও পাশে একটা ক্যাফে আছে বলে মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক।”

হুঁজনে গেলাম সেই দিকে; সত্যিই ক্যাফে। একতলার সামনের ঘরটার খানকয়েক ছুঁড়ান টেবিল রয়েছে, পাশে চেয়ার। পাঁচ-সাত জন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা বিভিন্ন টেবিলে বসে আছে। আমরাও একটা টেবিল দখল করলাম।

স্বপ্নেশই খাবার আনতে বলল। খেলাম—স্নাথ চপ (অর্থাৎ সিদ্ধ করে ভাজা খানিকটা কচি ভেড়ার মাংস) সঙ্গে কিছু সিদ্ধ বাঁধাকপি ইত্যাদি তর-তরকারী, দু’ টুকরো করে ক্রটি ও মাখন

এবং পরে জ্ঞান ইত্যাদি দিয়ে তৈরী খানিকটা পুড়ি। এক কাপ করে চা-ও খেতেছিলাম। মোটের উপর আনন্দে খবচ হল আট শিলি সাত পেনি; বলা বাত্য় খরচটা আমিই দিয়েছিলাম—যখন টাকা নিতে এল, স্বদেশ ছিল জানালা দিয়ে অল্পমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে।

১৪নং গাশ তোন বোডের সামনে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন ছুঁটো বেজে গেছে। কাফে থেকে বেরিয়ে এক জন পুলিশমানকে স্বদেশ রাস্তার খবর বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল এবং পুলিশমানও অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল ঠিক। বলেছিল, “সোজা চলে যান বায়ে দ্বিতীয় রাস্তা নেবেন এবং তার পর খানিকটা গিয়ে ডাইনের তৃতীয় রাস্তা হচ্ছে গাশ তোন বোড।”

রাস্তার দু'ধারে ঠিক সেট একটি ধাঁড়ের বাড়ী। খবোস না থাকলে চ্যাং ঠিক বাড়ীটি চিনে বার করা কঠিন। আমরা নম্বর দেখে বাড়ীটা খুঁজে নিলাম।

সামনের সড়ক লোচাপ গেটিটা খুলে, বাগানের রাস্তা বেয়ে আমরা সদর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে দিলেন—একটি মহিলা। ইনিই মিসেস ব্লেক।

ভদ্রমহিলাকে দেখেই আমরা ভাল লাগল। বয়স ঠিক আন্দাজ করা কঠিন, তবে মধ্যবয়সী—একমাথা চুল তিনে খোঁপা করে আঁচড়ান এবং একটি কালো জাল দিয়ে চুলগুলি ঢাকা। চোখে চশমা এবং চশমার আড়াল থেকে চোখ দুটির একটি শ্রদ্ধা মুহূর্তসমিত মুগধানি সব সময়েই শুধু যে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাই নয়, মুগধানিতে একটা সহানুভূতি ভরা দাক্ষিণ্যের পবিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর ছোটগাট মানুষটি—কিন্তু পবিত্র গড়নের সামন্তগুণ দৃষ্টি এড়ায় না। কথার-বার্তার ধরণে-ধারনে সব সময়ই একটা উৎকৃষ্ট চম্পকতা যেন সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে।

দরজাটি খুলে মুহূর্তেই বললেন, “সুপ্রভাত।”

স্বদেশ বলল, “আপনার এখানে ঘর থালি আছে শুনেছি। আমার এই বন্ধুটি সবে ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। এর থাকবার জায়গা হবে কি?”

মহিলাটি দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন, “ভিতরে আসুন।”

ভিতরে গিয়ে দেখলাম—সেই একই ধরণের বাড়ী—সামনেই দোতলার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে এবং ডাইনেরটি খাবার ঘর এক বায়েরটি বসবার ঘর। লগুনের বাড়ীগুলির সঙ্গে তফাৎ এই যে, এ বাড়ীগুলি একটু ছোটখাট ধরণের এবং একতলারও নীচে, ওরা থাকে বেসমেন্ট বলে—তা এসব বাড়ীতে নাই।

দোতলার শোবার ঘর দেখাবার জন্ত মহিলাটি আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা অবশ্য বিশেষ বড় নয়, তবে বেশ খটখটে এবং রাস্তার দিকে বেশ বড় একটা জানালা এবং খাট বিছানা প্রসাদন টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্রও ভাল। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন না হলেও কাছেই স্নান ইত্যাদির ঘর। মহিলাটি বললেন যে, “এটি শোবার ঘর এবং নীচে খাবার ঘরই বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।”

তিনি আরও বললেন—“নীচের বসবার ঘরটি নিবিবিলি ব্যবহারে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। কেন না, আমার বাড়ীতে ত লোকজন বেশী নেই—মাত্র আর একটি জাপানী ভদ্রলোক

থাকেন। তিনি ভোরে বেরিয়ে যান আর রাত্রে ফেরেন। তাঁর সঙ্গে আপনার প্রায় দেখাই হবে না।”

শুধালাম, “আমার আর একটি বন্ধু আছেন। তাঁর থাকবার কোনও ব্যবস্থা হতে পারে?”

মিসেস ব্লেক একটু ভেবে বললেন, “আপাতত নয়; তবে কিছু দিন পরে ব্যবস্থা করতে পারব বলে মনে হয়।”

খাবার এবং বসবার ঘরটি দেখবার জন্ত নীচে নেমে এলাম। রাস্তার দিকে জানালা রয়েছে—ঘরটিও ভাল। একটি বড় টেবিলের চার পাশে লাল গদি-আঁটা চেয়ার এবং ঘরের কোণে একটি লাল গদির কোঁচও রয়েছে। মেঝে বেষ লাল পুরু কার্পেট পাতা। কার্পেট অবশ্য এ-দেশের বাড়ীতে প্রায় সর্বত্রই থাকে—এখানে আমার শোবার ঘরটিতেও ছিল।

স্বদেশের দিকে তাকিয়ে বললাম, “কি করব?”

স্বদেশ বলল, “একুনিই ঠিক করে ফেল। সব দিক দিয়ে এমন সুবিধের জায়গা পাবে কোথায়?”

বললাম “কিন্তু চন্দ্রনাথ—”

বলল, “অত ভাবতে গেলে আর এ দেশে থাকা যায় না। এমন জায়গা ছেড়ে দিলে আর পাবে না। পরে না হয় চন্দ্রনাথ আসবে।”

আসলে কথাটা আমারও মনের কথা। সব দেখে শুনে আমার মন যেন জায়গাটিকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছে, কিছুতে ছাড়তে রাজী নয়।

মুখে বললাম, “তাই হোক।”

মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হলো।

শুধাধেন, “কবে আসবেন?”

বললাম, “আজই। আমি এখনই গিয়ে জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে আসছি।”

মহিলাটি দেবাজের ভিতর থেকে একটি কাগজ বার করে বললেন, “গন্ধাব দিকে চেয়ারিং ক্রশ থেকে অনেকগুলি গাড়ী আছে। কখন আপনার আমার সুবিধে হবে?”

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, “এই ধরন ছ’টা আন্দাজ।”

মহিলাটি বললেন, “ভাল কথা। ছ’টায়ই একটা গাড়ী আছে এবং তার পরেই ছ’টা কুড়ি মিনিটে। এই দুটির একটায় এলেই ঠিক হবে। আমি ইতিমধ্যে আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে দেব। রাত্রে এসে খাবার খাবেন ত?”

বললাম, “হ্যাঁ।”

বললেন, “বেশ ভাল কথা।”

\* \* \* \*

লিনকলন হল হোটেলে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে চারটা বাজে। স্বদেশ চেয়ারিং ক্রশ স্টেশন থেকেই বিদেয় নিয়েছিল—কি কাজ আছে। কত নম্বর বাসে গিয়ে কোথায় নেমে লিনকলন হল হোটেলে যেতে হবে বিস্তারিত আমাকে বুঝিয়ে বলে দিয়ে গিয়েছিল।

বাসে আসতে আসতেই বুঝতে পেরেছিলাম, যদিও মনের মধ্যে বাড়ীটা ঠিক হওয়ার দরুন একটা স্বস্তির হাওয়া বইছে কিন্তু একটা কাঁটা ফুটে আছে মনে। এই স্বস্তির হাওয়াতে কাঁটার ব্যথাটি থেকে থেকে খসখস করে লাগতে লাগল—তাই ত। চন্দ্রনাথকে যে ঠকান হল, তাকে বাদ দিয়ে স্বার্থপরের মতন নিজের বাসাটি নিলাম ঠিক করে!



হোটেল চুকে বাইরে বসবার ঘরটিতে গেলাম, চন্দ্রনাথ হয়ত এখানেই অপেক্ষা করছে। ছিলও তাই। চন্দ্রনাথকে দেখে নিজেকে একটু অপ্রস্তুত মনে হতে লাগল—যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছি তার কাছে।

চন্দ্রনাথ শুধাল, “কি খবর? এত দেরী?” শুধালাম “তোমার খবর কি?”

চন্দ্রনাথ বলল, “আমি ত তোমার জন্ত অপেক্ষা করে বসে আছি। আমি এইবার যাব।”

শুধালাম, “কোথায়?”

চন্দ্রনাথ বলল “বেশী দূর নয়—কাছাকাছি—টরিস্টন স্টোয়ারে। আমার মেজদার বন্ধু একটি ঘর আমার জন্ত আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। কাজেই আমাকে যেতেই হল। আর ঘরটিও চমৎকার—বড় ঘর, সুন্দর আসবাব-পত্র—জানাল দিয়ে স্টোয়ার দেখা যাচ্ছে। বাড়ীওয়ালী ভদ্রমহিলাটি খুব ভাল। সস্তাও বেশ। বেড ও ব্রেকফাস্ট সস্তাহে তিন গিনি।

চন্দ্রনাথ এতগুলি কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেললে খানিকটা যেন কৈফিয়তের মতন। একটা জোর স্বস্তির নিশ্বাসে আমার মনের কাঁটাটা গেল খসে। একটা কপট অভিমানের সুরে বললাম, “আর আমার কি দশা হবে?”

চন্দ্রনাথ বলল, “তুমিও চল আমার সঙ্গে। আমারই বাড়ীর কাছাকাছি দুটো ঘর আমি দেখে এসেছি তোমার জন্ত। বেশ ভাল ঘর। একটু বেশী—সস্তাহে সাড়ে তিন গিনি করে বেড ও ব্রেকফাস্ট। লগুন সহরের ভিতরে ঐ রকমই বাড়ীর মাপকাঠি। আমার বাড়ীর মহিলাটি মেজদার জানা-শোনা কি না—তাঁই বোধ হয় অন্য সস্তায় দিয়েছেন।”

মুখে কপট গাভীর্ঘ্য মানিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

চন্দ্রনাথ শুধাল, “তা, তুমি এতক্ষণ করলে কি?”

আর কপট গাভীর্ঘ্য রাখা চলল না। বললাম, “আমিও একটা ঘর ঠিক করে এসেছি।”

“ও!” বলে চন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠল। তারও বুকে বোধ হয় বইল একটা স্বস্তির হাওয়া।

\* \* \*

লিনকলন হল হোটেলের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিবে, আমার জিনিষপত্র হুঁড়িয়ে নিয়ে যখন সদর দরজা গুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন সজ্জা আর নয়, অন্ধকার রাত্রি—ঘড়িতে সময় সাড়ে পাঁচটা। সামনেই রাস্তার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার আমার কাছ থেকে জিনিষগুলি নিয়ে ট্যাক্সিতে সাজিয়ে রাখতে লাগল। চন্দ্রনাথ আগেই চলে গিয়েছে।

সদর সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েই দেখতে গেলাম, সকাগবেলার সেই সিঁতলবাসী যুবকটি ফুটপাথ দিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে—সঙ্গে একটি বিদেশী তরুণী। তরুণীটি যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হোটেল পর্যন্ত উঠে এলো না—ফুটপাথেই বাড়ীর বেলিং-এর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, অন্ধকারে নিজেকে একটু আড়াল করে। যুবকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমার সঙ্গে দেখা।

তাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে, তারই নির্দেশ মত বাড়ী ঠিক করেছি এবং বাড়ীটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

যুবকটি বলল, “ভালই থাকবেন। মহিলাটি খুবই যত্ন করেন। এখুঁই যাচ্ছেন বুঝি?”

বললাম “হ্যাঁ।”

করমন্দন করে বিদায় সন্ধান জানিয়ে সে হোটেলের মধ্যে চুকে গেল—কিন্তু তরুণীটি সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে—বোধ হয় সিঁতলবাসীর অপেক্ষায়। রাস্তার গায়েল আলো আমাদের সদর সিঁড়ির উপরে খানিকটা এসে পড়েছে কিন্তু তরুণীটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটি অন্ধকার, তাই তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমার মধ্যে তার অঙ্গলাবশ্যের মাধুর্য সহজেই পড়ল চোখে। হয়ত কিছুই আমার চোখে পড়ত না যদি না হঠাৎ আমি অসুভব কবিতাম যে তরুণীটি অন্ধকারের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে অসামান্য উজ্জ্বল হুঁটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখ-মুখ যেন বিদ্যুৎ-বাণে বিদ্ধ করছে। কখন যে সেই দৃষ্টিবাণ আমার নয়ন ভেদ করে অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল—ওঁর পাইনি। কিন্তু ট্যাক্সি করে লগুনের বুকের উপর দিয়ে যেতে যেতে আমার অন্ধকার বুকের মধ্যে সেই হুঁটো চোখ, হুঁটি প্রদীপশিখার মতন জ্বলতে লাগল অনেকক্ষণ!

[ক্রমশঃ।



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এমবি  
গ্রাম-ক্যালঅপটিকো • ৪৫ নং আম্বহার্স্ট স্ট্রীট • কলিকাতা - ৯



## পঞ্চ ত পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১১

অন্ধকার শাল গাছের নিচে সাইকেল হাতে নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুঃখ চোখ বিস্ফারিত করে ভুতুবাবু দেখেছে আর দরদর করে দামছে।

তারই দোকানের এক ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে একটা। সেই আলোর দেখা যাচ্ছে পাটিয়ার ওপর বসে আছে লোকটা আর ক্রমাগত পাইপ টানছে। পাইপ নিবে যাচ্ছে মানে মানে। দেশলাই ছেলে পাইপ ধরাচ্ছে আগার। তার আভায় চকচকে মুখ লাল দেখাচ্ছে থেকে থেকে। ভুতু বাবু চোখ জানে, সে লালিমা সুরাসিক্ত।

ভুতু বাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর দেখে চোয় চোয়। মনে হয় তারই দোকানে বাসা নিয়েছে এক মূর্তিমান বিলুপিকা। মড়াইয়ের বাতাসে গাছের পাতা মড়মড়িয়ে ওঠে। ভুতুবাবুর কানের ভিতর দিয়ে একটা অজ্ঞাত শব্দটির স্রোত পা বেয়ে নামতে থাকে।

রাতের পর রাত কাটিয়েছে দোকানে, কখনো এমন হয়নি।

শলাট জ্বলে উঠল নিবস্ত্র পাইপের মুখে। তেলতেলে লাল মুখ চুলুচুলু টুসটিয়ে দেখানো আবার। দোর গোড়ায় মেঝেতে দ্বিতীয় মূর্তি। অন্ধকারের মতই কালো আর থমথমে। ক্রমাগত মদ গিলছে সেও। ঘরের টিমটিমে আলোর বাইরের দিকে বিরাট একটা ছায়া পড়েছে তার। সেই ছায়ায় নড়াচড়া দেখে ভুতুবাবু বুঝতে পারে, থেকে থেকে বোতল উবুড় করে গলায় ঢালা হচ্ছে।

পর পর চারদিন... ভুতু বাবু ভয়ে কাঠ। আরো এগারো দিন বাকি।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল এখনো যেন ঠাণ্ডর করতে পারছে না। কেন রাজি হল? টাকার লোভে। এক পাজা নোট যখন লোকটা নাড়তে লাগল তার চোখের সামনে, ভুতুবাবুর পায়ের নিচে মাটি ছিল। একেবারে গোল আর স্থির হয়ে গিয়েছিল তার গোল গোল দুই চোখ। নাকের ডগায় টাকার বাতাস লেগে গোটা শরীরটাই সিঁড়ি সিঁড়ি করে উঠছিল। তবু টাকার লোভেই শুধু রাজি হয়নি। রাজি হয়েছে ভয়ে। অজ্ঞাত ভয়ে। কি করে যেন বুঝেছিল, রাজি না হলে তার দোকানের পাট বরাবরকার মত ভুলতে হবে এখন থেকে। লোকটা তার নাকের ডগায় টাকা হুলিয়েছে মতামতের

প্রত্যাশায় নয়। মুখ বন্ধ করার জন্ত আর কোঁড়ুল দমন করার জন্ত। টাকার দোলানিতে সেটা সম্ভব না হলে আরো উপায় আছে হাতে। সে উপায়টিও আড়ে আড়ে দেখেছে ভুতুবাবু, উপলব্ধি করেছে।

নোটের তাড়া ছিল রণবীর ঘোষের হাতে আর ডাবডেবে মড়া চোখে নির্নিমেয়ে চেয়েছিল হোপুন।

কেউ তারা ভয় দেখায়নি। তবু ভয় পেয়েছিল ভুতু বাবু। রণবীর ঘোষের হাতে টাকা আছে, টাকার না হলে হোপুন আছে। একবার টাকার দিকে তাকাও। তারপরে হোপুনের দিকে। ওই ঠাণ্ডা মড়া চোখের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর চোখোচোখি করার সাধ হবে না। চেয়ে থাকো টাকার দিকে। নাকের ডগায় টাকার বাতাস মিষ্টি লাগবে। টাকা নাড়ার ফরফর শব্দটা মিষ্টি লাগবে কানে। বিহ্বল হাত বাড়িয়ে টাকা নাও তারপর। মড়া চোখের দিকে তাকিও না আর।

হাত বাড়িয়ে টাকাই নিয়েছে ভুতু বাবু।

কিন্তু ওই টাকাই অসম্ভব কারণ, ভয়ের কারণ, বিলুপিকার কারণ। এত টাকা না পেলে অত ভাবত না ভুতু বাবু, অত ভয়ও পেত না। অত টাকা পেয়েছে বলেই গোলমেলে ঠেকছে সব কিছু। গোলমেলে ঠেকছে বলেই ভাবছে। আর যত ভাবছে তত ভয় বাড়ছে।

হু'দিনের মধ্যে সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল ভুতু বাবুর চোখের সামনে। অথচ ব্যাপার সামান্য। গোড়ায় গোড়ায় তো টাকা নিয়ে হু'পাচজনের এক একটা দলকে এমন ঘর ছেড়ে দিয়েছে কতবার। বিদেশে বেঘোরে এসে পড়েছে। রাতে মাথা গাঁজার আস্তানা নেই। টাকা ফেলো, থাকো একরাত হু'রাত। ভুতু বাবু অল্প ঘরে সব পুরে তালাবন্ধ করে সাইকেল ঠাঙিয়ে চলে যাবে চৌদ্দ মাইল দূরে নিজের বাড়ি। ভাঙা কাচের আলমারি, তেলচিটে আসবাব পত্র বা ব্যবহার করা হাঁড়ি কড়াই চুরি করার জন্ত অতটাকা দিয়ে দল বেঁধে বাড়ি বাস করতে আসবে না কেউ ভুললোক সেজে। সু'দেখে লোক চিনতে পারে ভুতু বাবু। তাছাড়া ছুটকো চুরির ভয়ও নেই কিছু। আদিবাসীরা আর বাই হোক, চুরি শেখেনি।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাই অসম্ভব ভ্রাস সঞ্চার করেছে ভুতু বাবুর মনে। পনের দিনের জন্ত তার দ্বিতীয় ঘরটি দখল করেছে রণবীর ঘোষ। দিন নয়, শুধু রাতের জন্ত। মড়াই ছেড়ে চলে যাচ্ছে বরাবরকার মত। দিনকতক থাকা দরকার এখনো। পাটনারের সঙ্গে বনছে না বলেই এই ব্যবস্থা নাকি। পনের রাত্রির জন্ত হলেও যে কোনদিন চলে যেতে পারে।

কিন্তু পনের রাত্রির জন্ত অত টাকা কেন? এর পনের ভাগের এক ভাগ হলেও তো ভুতু বাবু রাজি হয়ে যেত। অত টাকা কেন আর অত থমথমে গোপনতা কেন? সেই গোপনতার সঙ্গী এই মড়া চোখো লোকটা কেন?

দোকানের শুষ্ক থেকেই হোপুনকে ঢেনে ভুতু বাবু। তার আনুষ্ঠানিক কীর্তিকলাপ জানে। মনে মনে সমীহ করে। কিন্তু এরকম ভয় কখনো করেনি। কিছু দিন ধরেই লোকটার কথা ভাবছিল ভুতু বাবু। বিগত ক'টা দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে নীরব যোগাযোগ ঘটেছে বার কতক।

নিরিবিলিতে ফস ফস করে আনকোরা নোট বার করেছে দু'টো তিনটে করে। মুখ ফুটে কখনো বলেনি বিশেষ কিছু। সামান্য

ইঙ্গিতে ভুতু বাবু বুঝে নিয়েছে। হাড়িয়া বা পচাই নয়, খাঁটি বিলিতি চাই। হাড়িয়া, পচাই তো ওদের ঘরে সর্বদাই মজুত থাকে। ওর মুখের দিকে চেয়েই ভুতু বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারে, লেবেল আঁটা বিলিতির স্বাদ লোকটা ভালো করেই জেনেছে।

ভুতু বাবু কি এই ব্যবসা করে না কি? মোটে না। বিশ মাইল দূরে শহরের দোকান সকলের জন্তেই খোলা। তুমি গেলে তুমিও নিয়ে আসতে পারো। কিন্তু তোমার যাওয়ার ফুরসত নেই বা সঙ্গতি নেই। আমি এনে দিই তোমার হয়ে। বোতলের দাম নিই আর পরিশ্রমের দাম নিই। বাস, বিবেকের কাছে পরিষ্কার ভুতু বাবু। যার দরকার, যেমন করে হোক আনবেই সে, ভুতু বাবু উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু তা বলে হোপুন! হোপুনের জন্ত! ভুতু বাবু অবাক। অবশ্য এ অর্থের যোগানদার কে ভুতু বাবু অচিরে জেনেছে। কিন্তু জেনে বিষয় চতুঃপাশ বেড়েছে। তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি কিছু। জিজ্ঞাসা করবে কাকে। লোকটার বোবা চাল-চলনের ব্যতিক্রম নেই কিছুমাত্র। বরং আরো শাস্ত আরো নিস্ত্রাণ মনে হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই জমাট কালো পাথর মূর্তি যে ভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সে এক অস্বস্তি। ভুতু বাবু জিনিস এনে দিয়ে খালি।

তার পর সরাসরি এই ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব, নাকের ডগায় রণবার ঘোষের টাক! নোলানো এবং সেই সঙ্গে হোপুন! ভুতু বাবু ভড়কে গেছে, ভাবনাচিন্তার অবকাশ বড় পায় নি।

দূরে শাল গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে ভুতু বাবুর। যেতে পাবেন বাঁচ। কিন্তু পা যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়তেও পারছে না।

সন্ধ্যা হতে না হতে মড়াইয়ের হটগোল খেমে যায়। কর্মচারীরা ওপরে উঠে যায়। আদিবাসীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের দিকে ছোট্ট হাড়িয়ার টানে। ভিনদেশি কুলীকামিনের আস্তানা এদিকে নয়। একটু রাত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভুতু বাবুর দোকানের আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন বড় থাকে না। রাত আটটা বাজতে না বাজতে দু'দশ ঘর বাধা খন্ডের রাতের খাবার উপরে চলে যায় শেষ বাবের ট্রাকে। তার পরেই রাত্রির স্তব্ধতা। ধীরেস্থে তখন দোকান গোটাবার ব্যবস্থা করে ভুতু বাবু। আর ছোকরা কর্মচারী ছোট্ট সঙ্গে গল্পগজব করে।

কিন্তু হুঁদিন ধরে রাতের খাবার উপরে পাঠিয়েই ওদের বিদায় দিতে হচ্ছে। একটা ঘর তালাবদ্ধ করে ফেলে হুঁহু প্রতীক্ষা। জিপে করে রণবার ঘোষ আসে এক সময়। বাক্যব্যয় না করে সাইকেল নিয়ে প্রস্থান করে ভুতু বাবু। দূরে অন্ধকারে শাল গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় তার পর। খাটিয়ায় বসে পাইপ ধরায় রণবার ঘোষ। ক্রমাগত পাইপ টানে। পাইপ নিবে যায়। দেশলাই ঝেলে ধরায় আবার। পিচ্ছিল লালিমায় চকচকিয়ে ওঠে গোটা মুখ।

সাইকেল-হাতে ভুতু বাবু দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্পন্দের মত। কতক্ষণ ঠিক নেই।

তার পরে, অনেক পরে স্নান গতিতে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসে হোপুন। পুঞ্জীভূত খানিকটা নিটোল অন্ধকারের মত।

ভুতু বাবু জানে, অর্থ দিয়ে সহজে কেনা যায় না ওদের। কিন্তু মদের বশ প্রায় সকলেই।

সমস্ত রাত তা বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না এভাবে। কতদূর যেতে হবে ঠিক নেই। গোলগাল দেহ সম্বন্ধে সাইকেল চেপে অনায়াসে চলে যাওয়া অভ্যাস আছে। কিন্তু ক'দিন ধরে শরীরটা যেন কাঠ। নড়তে-চড়তে সঙ্কট।

আরো এক রাত। একই ব্যাপার দেখল ভুতু বাবু।

সিমেন্ট ভেজাল সংক্রান্ত সমস্ত অঘটন জানে। প্রথমে ভাবল, সেই ব্যাপারেরই প্রতিশোধের চক্রান্ত কিছু। কিন্তু ভুতু বাবু নির্বোধ নয়। হঠাৎ মনে হল, তা নয়। একেবারেই নয় তা। আর কেউ না জাম্বুক, ভুতু বাবু তো জানে ঘর দখলের কথা। জানে যখন, ওখানে মাঝামাঝি কিছু সংঘটনের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া প্রতিশোধ নিতে হলে এভাবে ঘর দখলের দরকারই বা কি? তাহলে কি? তাহলে কেন?

ভুতু বাবুর গোল চোখে পলক পড়ে না প্রায়। দম বন্ধ করে ভাবতে থাকে। তাহলে এমন কিছু, যার জন্ত ঘর দরকার। এমনি নির্জনে, এমনি গোপনে। কোনো একজনের আসার প্রতীক্ষা। কেউ একজন আসবে।

...যেই হোক সে, পুরুষ মানুষ নয়।

একটা রোমাঞ্চকর উদ্বেজনা হঠাৎ যেন চান্স হয়ে উঠল ভুতু বাবু। সঙ্গে সঙ্গে এক উজ্জ্বল চপল মেয়ের মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে বরণা। ভারী ভাব দেখেছে এই লোকটার সঙ্গে। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘোরে জিপে করে। মেয়েটাকে ভালো মনে হয়নি কোন দিন। তবু, খুশি ছিল মনে মনে। দোকানের খন্ডের বাড়িয়েছে অনেক। একবার এসে চা খেতে বসলে টানে টানে অনেক আসে।

কিন্তু তা বলে এই ব্যাপার! খালি হয়ে উঠতে লাগল ভুতু বাবু। কিন্তু সেই সঙ্গে এক ধরনের নির্ভর উৎসাহও উপলব্ধি করেছে যেন। পরিবেশটা নিজের দোকান ঘর না হলে...

কিন্তু সহসা যেন বিদ্যাতের ঘায়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল আবার। সমস্ত চেতনাস্রব বৃষ্টি পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক নিমেষে। দেহের সব রক্ত জল।

...তাই যদি হবে, সঙ্গে এ তেন অনুচরটি কেন? এই চক্রান্ত কেন? মদে এই হৃদয় লোকটাকে বশীভূত করা কেন?

দর দর করে ঘাম ঝরতে লাগল ভুতু বাবুর। সাইকেলটা পড়ে যাবার মত হল হাত থেকে। রণবার ঘোষের চালচলন অনেক দিন লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করছে। এবারে সব বুঝেছে ভুতু বাবু। সব জেনেছে। বরণা চ্যাটার্জী নয়। আর কেউ, যে যেচ্ছায় আসবে না। জোর করে আনা হবে। সেই জন্তেই এই চক্রান্ত। সেই জন্তেই হোপুন। সেই জন্তেই তাকে মদ গেলানো।

সাইকেল নিয়ে টলতে টলতে প্রস্থান করল ভুতু বাবু।

মনে মনে একধার থেকে জরুরী কল্পনা করে চলেছে সন্ধান। এক একবার এক একটা যুক্তির জাল বুনছে। কিন্তু খানিক বাদেই সেটা জোরালো লাগছে না তেমন। আবার ভাবছে। কোন অভ্যুত্থানেই জুতসই লাগছে না খুব।

মাসির চিঠি এসেছে। মাসতুতো বোনের বিয়ে। অবিলম্বে তাকে যেতে হবে। বিয়ের প্রায় মাসখানেক দেরি এখনো। কিন্তু

মাসির জোর তাগিদ, ওর বাবা যেন পত্রপাঠ দুই একদিনের ছুটি নিয়ে ওকে রেখে আসে। সাধনা বেশ বুঝছে, একবার গিয়ে পড়লে হুঁতিন মাসের ধাক্কা।

বেরোবার আগে অবনী বাবু চিঠি পড়ে গেছেন। ফিরে এসে যা হয় ভেবে ঠিক করবেন বলেছেন। সাধনা খুব জানে বাবাও রেখে আসতেই চাইবে। কারণ মড়াইয়ে এসে পর্যন্ত আর একবারও যায়নি। তাইতেই মাসি ক্ষুব্ধ মনে মনে।

সাধনা যাবে হো নিশ্চয়ই। এত দিনে সেই মাসতুত বোনের বিয়ে। আনন্দও কম নয়। মেয়ে দেখা নিয়ে সেই হুঁহুবারের বিভ্রাট। বোনের বদলে ওকেই নিতে চেয়েছিল। রাগে আর সঙ্কোচে ওর সেট কেঁদে ফেলার উপক্রম! মনে পড়লে এখন কিন্তু খারাপ লাগে না খুব। বরং কেমন যেন খুশির আমেজ লাগে একটু।

সাধনার যেতে আপত্তি নেই। হুঁচার দিনের জঙ্ক গিয়ে তৈ-ছল্লোড় করে আসার আগ্রহই বরং যোল আনা। কিন্তু ওই হুঁচারদিনের জঙ্ক। সময় সময়কালে বাবার সঙ্গে যাবে আর বাবার সঙ্গে ফিরে আসবে। কিন্তু মাসি দূরের কথা, বাবাও রাজি হবে না তাতে। ওই জগ্গেই রাগ হয় বাবার ওপর। লিখে দিলেই হয়, সাধনা না থাকলে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে—অরো কত কি অসুবিধে। কিন্তু সে বেলার ঠিক উন্টো বলবে। যেন ওর কোন দরকারই নেই। তা ছাড়া ও না থাকলে ছোকরা চাকরটার হাতে সন্দেহের কি হাল হবে তাই বা কে জানে? আসলে মড়াই ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটাই যে প্রায় ৩:৫০, ভিতরে ভিতরে ওর সে অস্বস্তিও কম নয়।

বাটরে কড়া নাড়ার শব্দ। বিম্বিত হল সাধনা, এই ভরা দুপুরে আবাব কে! কঠিন শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে।—মা-লক্ষ্মী আছেন না কি, আমি ভূত।

‘তাড়া’তাড়ি এসে দরজা খুলে দিল সাধনা। খুশি হয়ে বলল, কি ব্যাপার, আসুন, ভিতরে আসুন—এতকাল বাদে সন্দেহের কথা মনে পড়ল বুনি?

‘ভূত’ বাবুর ঘামে-ভেঙ্গা ফোলা গাল অমায়িক হাসিতে টসটসে দেখালো। কাপড়ের খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে কাঠের চেয়ারে বসে বড় একটা দম নিল।—আসতে তো মন চায়, সময় পাই কোথা মা-লক্ষ্মী, আপনাদের আশীর্বাদে দোকান ছেড়ে নড়তেই পারিনে মোটে। তা ভালো আছেন তো?—ক’দিন দেখিনি, দোকানেও তেমন লোকজন নেই এখন, ভাবলাম এই কঁাকে টুক করে মা-লক্ষ্মীকে দেখে আসি একবার।

হুঁচোখ গোল করে মা-লক্ষ্মী দর্শনে মন দিল ভূত বাবু। হাসি চেপে সাধনা পাশের ঘর থেকে একখানা হাতপাখা এনে তার হাতে দিয়ে অদূরে বসল।

ভূত বাবুর হাতে পাখা নড়তে লাগল আর মুখে কথা বরতে লাগল। এসোমেলো কথা। রাজের কথা। গৌরুর প্রসঙ্গ তুললই না মোটে। সাধনার মনে হল, শুধু দর্শনাভিলাষে আসিনি লোকটা, কিছু দর্শনতত্ত্বালোচনার বাসনাও উঠেছে। কথার তোড়ের মাঝখানে ঠ্যাং খেমে যাচ্ছে এক একবার, দেখছে ওকে নিরীক্ষণ করে, আবাব সচেতন হয়ে যে কোন একটা প্রসঙ্গ ধরে নতুন করে দর্শন পথ পাড়ি দিচ্ছে একটা। সাধনা মনে মনে অবাক হল

একটু। শ্রোতা পলে ভূত বাবু বস্তা ভালো জানে। কিন্তু সে বহুতায় সব সময়েই আত্মগত বা স্বার্থগত সুর থাকে একটা। কিন্তু আজ প্রায় দুর্বোধ্য লাগছে। সাধনা শুনেছে মন দিয়ে, সেটা বোঝাবার জগ্গেই মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছে একটু আর সর্কোতুকে চেয়ে আছে।

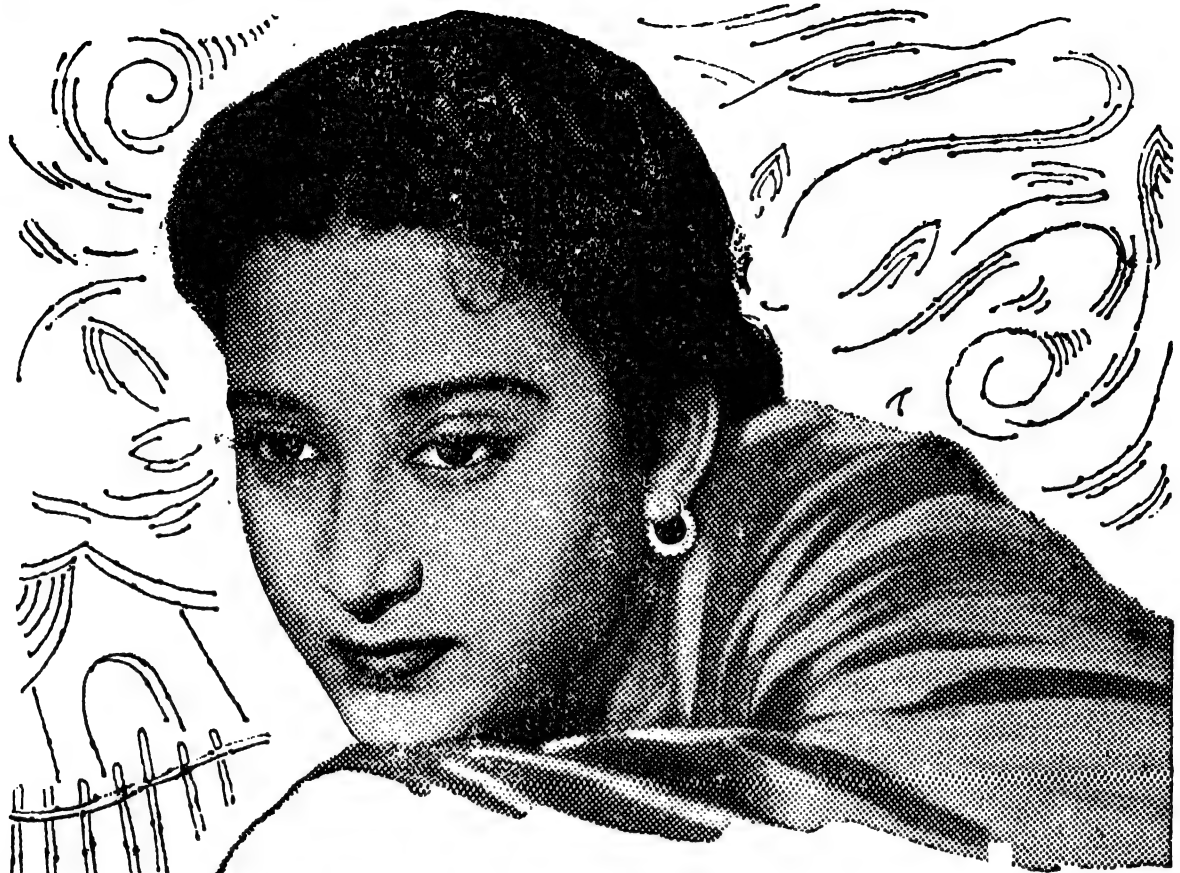
হাতপাখা হাঁটুর ওপর রেখে ভূত বাবু অনর্গল বলে চলেছে। এবারের প্রসঙ্গ বোধ হয় আবহাওয়াগত।—বেজায় গরম পড়েছে, আবাব এ সময়ে প্রচণ্ড জলও হয়ে গেল বার দুই। জল হয়ে গেল অথচ গরম কমল না। আকাশ সারাক্ষণ মেঘে ধম ধম, ওদিকে বাতাসের দেখা নেই। মড়াইয়ের সমস্ত বাতাস যেন পাহাড়ের ভিতরে গিয়ে দাঁিয়েছে। মড়াইয়ে সবই উন্টোপাণ্টা ব্যাপার এখন। কখন যে কি হবে কিছু ঠিক নেই। কিছু একটা হবেই এ বছরটা, আকাশের দিকে চাইলেই বোঝা যায় কিছু হবে। মা-লক্ষ্মীর কি মনে হয়, হবে না কিছু?

জবাব এড়িয়ে সাধনা হাসে তেমনি।

—মড়াইয়ের মানুষগুলোও কেমন যেন উন্টোপাণ্টা রাস্তায় চলেছে এখন। মা-লক্ষ্মী কি সেটা লক্ষ্য করেছে? করে নি তো? কিন্তু ভূত লক্ষ্য করেছে। ভূত দোকান নিয়ে পড়ে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু। বাতাস শুঁকে হালচাল বলে দিতে পারে। না, মানুষগুলোও এখন সোজা রাস্তায় চলেছে না ঠিক। সবাই নয়, কেউ কেউ। শরীরের কোথাও একটা ফুসকুড়ি হলে গোটা দেহে যন্ত্রণা। তেমনি কেউ কেউ সোজা পথে না চললে সমস্ত পথটাই ঘুলোতে কতক্ষণ! দুনিয়ায় ভালো পড়ে আছে, মন্দ পড়ে আছে। যার সঙ্গে যার যোগ, তেমনি হবে। ওই যোগটুকু না হলে ভালো মন্দ কোনোটারই কোন লাম নেই। তীর আর ধনুক আলাদা আলাদা পড়ে থাকলে তার পাশ দিয়ে হরিণ লাফিয়ে বেড়াবে—ও হুঁটা একসঙ্গে হলে তবেই না কিছু ঘটতে পারে!

সাধনার হাঁপ ধবে যাচ্ছে প্রায়, আর উপমার বহরে বিক্ষুব্ধিত হয়ে উঠেছে থেকে থেকে।

—ওই অতবড় মেঘটার গায়ে হাওয়া লাগছে না বলেই না গরমে সেক! আবাব তেমন হাওয়া লাগলে প্রলয় হতে কতক্ষণ? যেমন যোগ তেমনি। কথার ঠোঁকে ভূত বাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে প্রায়।—শুকনো মড়াইয়ে ভালো যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই ভালো হতে চলেছে। অমনি ভালো যোগাযোগ হলেই নিশ্চিন্দ। কিন্তু না বলে? উন্টো হলে? তখন? তখন সমঝে চলা ছাড়া আর উপায় কি? উন্টো যোগাযোগ কি হচ্ছে না? খুব হচ্ছে। যার সঙ্গে যার মেলার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। যার সঙ্গে যার মেশার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। ওই যেমন ধরুন সাঁওতাল মাঁঝির ওই আধখ্যাপা ছেলোটা আমাদের কটাঁটির ঘোষাবাবুর সঙ্গে এসে ভিড়েছে। ঘোষাবাবুর পরসায় মদ গেলে, তার জিপে করে ঘুরে বেড়ায় আর সকাল সন্ধ্যা গুজগুজ করে। আমি নিন্দে কী কছি না, মা-লক্ষ্মী হুঁজনে আলাদা আলাদা থাকলে নিন্দেই বা কি আর ভয়ের বা কি! কিন্তু হুঁজনে একসঙ্গে হয়েছে বলেই না মেয়েদের বশত দুর্ভাবনা! সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির এখন তাদের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে হলেই দশবার ভাবতে হবে। ঝড় এলে তার আর সময় অসময় কি, সব সময়েই সমঝে চলতে হয়। অবশ্য



## সবিতা চ্যাটার্জী

বলেন “আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এমন একটি বিস্কন্ধ, শুভ্র সাবান!”

সবিতা এখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শুধু তাঁর অভিনয় নয়, তাঁর সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব লাবণ্যও চিত্রাশোদীদের মুগ্ধ করেছে। এই লাবণ্যের যত্ন তিনি নেন মোলায়েম লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে। আপনিও বিস্কন্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন। সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্তে ঝড় সাইজের সাবান কিনুন।



লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান



দশ পনের দিনের মধ্যেই ঘোষাবাবু চলে যাচ্ছে মড়াই ছেড়ে। কিন্তু দশ পনের দিনই বা কি কম কথা! কখন কার বরাতে অভিষাপ লাগে ঠিক কি। প! বাড়িয়ে অভিষাপ কুড়োনের থেকে ঘর-বন্দী হয়ে থাকি ভালো। ভালো নয় মা-লক্ষ্মী? আপনিই বলুন—অভিষাপের ভয় 'কে না করে, অভিষাপের ভয়ে স্বয়ং অমন লক্ষ্মী ঠাকরুনকেই বলে সমুদ্রবের গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, হুঁঃ...!

মস্ত একটা দম নিল ভূতু বাবু। জ্বোরে জ্বোরে হাতপাখা চালানো কিছুক্ষণ। ঘামে জ্ববজবে হয়ে গেছে থলথলে মুখ।

কার অভিষাপে বা কোন অভিষাপের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে বন্দিনী দশা ঘটেছিল লক্ষ্মী ঠাকরুনের, ভূতু বাবু যেমন জানে, সাধনাও তেমনিই জানে প্রায়। কিন্তু সবটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পন্দ কাঠ একেবারে। কি বলতে চায় বা কি বলতে এসেছে আর অস্পষ্ট নয় একটুও। স্থান কাল ভুলে নিম্চে নেড়ে সাধনা চেয়ে রইল ভূতু বাবুর মুখের দিকে।

ভূতু বাবু হাসতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।—যাক, অনেক গল্প করা গেল মা-লক্ষ্মী। মন খুলে দু'টো কথা বলি তার জো আছে, দোকানের ভাবনা ভেবেই অস্থির। তা'বলে গল্প করতে বসলে ভূতুর মনে মুখে আগল নেই, যা ভাববে তাই বলবে। চলি এবার মা-লক্ষ্মী, ওই ভূত দু'টো এতক্ষণে কি দিয়ে কি করছে ঠিক নেই—ভালো করে গেলাস না ধুয়েই হয়তো চা দিয়ে বসছে কাউকে...।

খপ খপ চরণে তর তর করে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ভূতু বাবু। এবারের ঘাম সরাটা কায়িক পরিশ্রমের দরুণ। কিন্তু তা সবেও সারা মুখে একটা প্রসন্নতার তৃপ্তি।

গোটা হুপিগুটাই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে সাধনার। লক্ষ্মী নয়, ঘৃণা নয়। অসুভাষিতা। সেটা গেল একসময়। ভূতু বাবুর কথাগুলো তলিয়ে দেখতে লাগল আবার। আরো স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল। বরাবরই ভয় করতো হোপুনকে। কিন্তু সে ভয়ের মধ্যে আর বাট থাক, অবিশ্বাস ছিল না। দুর্দোষ্যতার বিশ্বাস ছিল, সত্যের সত্যতা ছিল। ওই কালো মূর্তিতে কালিমার আভাস-মাত্র দেখে নি কখনো। কিন্তু আজ এক মুহূর্তে সব বিশ্বাস, সব সন্ত্রম এক নয় পঙ্খিলতার স্পর্শে একেবারে বিকৃত হয়ে গেল বৃষ্টি। জিপে রণবীর ঘোষের পাশে তোপনের সেই নিশ্চল পাষণ মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। শুধু ভূতু বাবু কেন, সাধনাও দেখেছে। শিউরে উঠল হঠাৎ। মড়াইয়ের গহ্বরে বা স্মরণীয় অপরাহ্ন রোমধ্বনের পরিবেশে লোকটার সেই বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণের মধ্যে আজ যেন বিভীষিকা দেখতে পেল।

কিন্তু সেদিনই আর এক ব্যাপার ঘটে গেল। সাধনা আরো বিহ্বল, আরো বিভ্রান্ত।

বিকলে পাগল সর্দার এসে হাজির। চান্দমণি নিখোঁজ হবার পরে এতদিনের মধ্যে এই প্রথম পদার্পণ। চিন্তা ভাবনা স্থগিত দেখে সাধনা 'হুগিয়ে এলো। কিন্তু খুশির অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠতে পারল না আগের মত।

খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সর্দারই কুশল প্রশ্ন করল প্রথম, তু ভালো আছিস দিদিয়া?

—ভালো আছি সর্দার। তুমি ভালো তো? এসো ভিতরে এসো।

সর্দার দাওয়ায় এসে বসল। অদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝাড়িয়ে রইল সাধনা। দেখেছে। আরো শীর্ণ আরো শুকনো দেখাচ্ছে লোকটাকে। বারাক্যের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কিন্তু সব থেকে আগে চোখে পড়ে একটা কর্কশ রুম্মতা। কোটরাগত দুই চোখে খরখরে অসহিষ্ণুতা কেমন। চোখে চোখ রাখাও সহজ নয় খুব।

—উবাসির বাবু ঘরে নাই?

—এখনো ফেরেন নি। তুমি কাজ থেকে এলে?

সর্দার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজে যায়নি আজ। অল্প দিন বা অল্প সময় হলে সাধনা এই নিয়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করত বা অনুযোগ করত। কিন্তু ভূতু বাবু ওকে বোঝা করে দিয়ে গেছে একেবারে। চূপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হল, পাগল সর্দার এতদিন বাদে হঠাৎ এমনি আসেনি, কিছু যেন বলবে বলবে করছে।

—তু ব'স দিদিয়া, ঝাড়িন থাকলি কেনে।

সাধনা দেয়াল ঘেঁষে বসল উবুড় হয়ে। দেয়ালে ঠেস দিল ভাবপর।

সর্দার আবার বলল, তুর সভতে হু'টো কথা ছেল।

হু'টো ছেড়ে আস্তে ধীরে অনেক কথাই বলতে লাগল তারপর। অনেকটা নিজের মনে। সাধনা চূপ চাপ চেয়ে আছে! শুনছে। আর অবাক হচ্ছে। ভূতু বাবুর গোড়ার দিকের বক্তৃতার মত এও প্রায় দার্শনিক গোছের শোনাচ্ছে। তবে অত হু'রিয়ে বা রেখে ঢেকে বলতে জানে না। বা বলে, মোটামুটি সোজা এক স্পষ্ট।—কত যুগ বাদে মড়াইয়ে পুণির যুগ এসেছে। সেই পুণিতে শুকনো মড়াইয়ে জল হবে। কিন্তু সেই পুণির সঙ্গে কিছু পাপও এসেছে। 'মুনিবের মূর্তিতে' পাপ এসেছে। পুণিকে 'খুঁতো' করে দেবার মতলব আঁটছে। গোটা 'গেরামে' সে পাপের হলুকা লেগেছে, গোটা মড়াইয়ে সে পাপের 'ছেঁয়া' পড়েছে। কিন্তু ওরা 'ধন্য' মানে 'শান্ত' মানে! যত 'ভেষণ' যত 'পেচণ্ড' হোক সে পাপ, তার 'পিত্তবিধেন' হবেই, 'মিত্তা' হবেই। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ হু'সিয়ার থাকা দরকার। খুব দরকার। নইলে 'অনখ' হতে পারে, 'হুগগতি' হতে পারে। পাগল সর্দার সেই জন্তেই এসেছে, দিদিয়াকে সাবধান করতে এসেছে। হোপুন বলেছে। হোপুন কখনো বাজে কথা বলে না।—'তু আতবিরেতে একা কুখাও যাস না দিদিয়া, দিন হুকুরেও না। ও পাপ বড় সায়না, চি-লোকের দিকে তার লজর।' পাপ 'নেবারণ' হয়ে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার সকলে হেসে খেলে বেড়াবে। পাপের 'আশয়' আর ক'দিন 'ভগমানের কোধে' সে ছাড়বার হবেই হবে।

অল্পচ একটানা বলে গেল পাগল সর্দার। ঠাণ্ডা একটা যান্ত্রিক বেশ খানিকক্ষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সাধনা। সচকিত হয়ে তাকালো তারপর। হোপুন বলেছে! হোপুন সাবধান করেছে! সাধনা ঠিক শুনল কি? ঠিক বুঝল কি? সে সে নিজের চোখে দেখেছে তার বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণ! নিজের চোখে দেখেছে তাকে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে! তাছাড়া ভূতু বাবুও দেখেছে। অনেক কিছুই দেখেছে। পরোক্ষে ওই লোকটার ত্রাসই ভূতু বাবু বিশেষ করে ছড়িয়ে রেখে গেছে সাধনার মনে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা হল না কিছু। বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই রইল শুধু। কেমন করে যেন উপলব্ধি করে নিল, ওই লোকটার সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের আঁচ দাঁড় দাঁড় করে জ্বলে উঠবে পাগল সর্দারের সমস্ত ভিতরটা। শোনামাত্র মরিয়া হয়ে ছুটবে ভূত বাবুর কাছে, ছুটবে হোপুনের কাছে। হোপুন হুঁহু'বার প্রাণ দিয়েছে ওকে, ওর সম্বন্ধ হবে কি করে? মেয়ে হারিয়ে আরো নিবিড় করে পেয়েছে ওকে, কেমন করে হবে সম্বন্ধ?

কিন্তু হোপুনই বা সর্দারকে বলতে গেল কেন? সর্দারের মুখ দিয়ে দিদিয়াকে সাবধান করতে গেল কেন?

ছলনা? চাতুরী? বড়বন্দ?

সামান্য বোবা। পাগল সর্দার উঠলে বাঁচে এখন। নিঃসঙ্গ হতে পারলে বাঁচে। হোপুনের প্রস্তুতি বড় নয় এখানে। বড় যেটা, তার লজ্জা আব ধিক্কার অপরিসীম।

কেন এসেছিল ভূত বাবু?

ওকে সাবধান করতে।

কেন এসেছে পাগল সর্দার?

ওকে সাবধান করতে।

হুঁজনের কেউই ওর কথা বলেনি বিশেষ করে। সাধারণ ভাবে বলেছে। সাধারণ ভয়ের কথাই বলেছে। সে ভয় মড়াইয়ের সব মেয়েরই। কিন্তু এরই মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিতটুকু অপ্রচ্ছন্ন নয়। সামান্য বুঝতে পারে কাকে নিয়ে হুঁজনেরই ভয় এদের। অস্ত্রাখ্য ভূত বাবুর মত মানুষ দোকান ফেলে আসত না। পাগল সর্দারের বৃকে আগার এক মেয়ে হারানোর ঝড় উঠত না।

চোখে চোখ পড়তেই নিজের অজ্ঞাতে হঠাৎ হুঁচোখ যেন ছল করে উঠল সামান্য।

সর্দার চলে গেল।

সামান্য উঠল এক সময়। সমস্ত দেহে বিবাক্ত জ্বালা। অশুচি স্পর্শ। দাঁড়ায় সামনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। দেয়ালের ওধারে আকাশ দেখা যাচ্ছে এক ফালি। আকাশ নয়, আকাশ ঢাকা ঘন মেঘ খানিকটা। হঠাৎ মনে হল, চাঁদমণির জীবনেই বীভৎস শকুনির ছায়া পড়েনি শুধু। সমস্ত মড়াইয়ের ওপর পড়েছে। ওর ওপরেও। ঘন মেঘের তলা থেকে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা যেন ঠিকবে বেরুতে চাইছে খানিকটা জারগা জুড়ে। দগদগে একটা ঘাসের মত লাগছে দেখতে।

রাজিতে বাবার কাছে সরাসরি প্রস্তাব করল, কালই মাসির বাড়ি যাবে, তাকে রেখে আসতে হবে।

অবনী বাবু অবাক। মুখের দিকে চেয়ে একবারও মনে হল না বোনের বিয়ের আনন্দে বাবার জন্ত মন নেচে উঠছে। বললেন, বেশ তো বাবু'খন, এত তাড়া কিসের, বিয়ের তো এখনো ঢের দাঁর।

—না বাবা, যাব ঠিক করেছি কালই যাব, তুমি রেখে এসো আমাকে। কতকাল যাইনে, মাসি কি ভাববে, মাসি কি ভাবছে ঠিক নেই, এর পর দেরি করলে কথা শুনতে হবে। ক'দিন আগে যাওয়াই ভালো।

মেয়ের এ ধরনের স্তমতি বিশ্বাসের কারণ। মুখের দিকে চেয়ে বুকে উঠলেন না ঠিক। কিন্তু এই একবেলার মধ্যে ওর মনে বিশেষ

কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে সম্প্রতি। কিছু একটা যাতনা যেন চেপে আছে। তবু জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভরসা পেলেন না খুব। ওর যাওয়া নিয়ে তাঁরই বরং একটা দুর্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলেন যেতে চাইবে না সহজে। গেলেও থাকতে চাইবে না সহজে। বাবার জন্ত বাস্তব হয়েছে যখন, মতিগতি বদলাবার আগে রাজি হওয়াই ভালো। তবু বললেন, আগে যাওয়া তো ভালই, কিন্তু কালই কি করে হয়, আপিস থেকে ছুটি নিতে হবে তো, পরন্তু যাস।

—না বাবা না, প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সামান্য, যাব তো কালই যাব নইলে যাবই না বলে দিলাম। ভারী তো একদিনের ছুটি, ও তুমি কাল সকালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসো।

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো। বাবার জিজ্ঞাসা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত হচ্ছিল। ভিতর থেকে একটা উদ্ভগত কান্না যেন ঢেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সকলের ওপর ক্ষোভ, সকলের ওপর অভিমান। যেতে চায় না তবু যেতে হবে বলে। কারো ওপর ভরসা করে এখানে থাকতে পারছে না বলে।

রাত্রির মধ্যেই গোছগাছ করল সব। নিজের নয়, যিনি থাকবেন এখানে তাঁর। ওর বাবার। বাস্তব বিছানা জামা কাপড় মায় কুকার পর্যন্ত। নিজের ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত নয় তার বাবা। থেকে থেকে তবু টন টন করে উঠছে সামান্য ভিতরটা। ভয়ে সব ফেলে ছাড়িয়ে এভাবে তাকে এখান থেকে পালাতে হচ্ছে বলে।

পরদিন সকাল থেকেই মনে মনে একটা আশা পোষণ করছিল সামান্য। বাবার মুখে নরেন বাবু তাদের যাবার কথা শুনবে। শুনে একবার আসবে। সেই যে গেছে আর আসেনি। সাত আট দিন হয়ে গেল। লজ্জার সীমা পরিসীমা ছিল না এক'দিন। সেদিনের কথা যখনই মনে হয়েছে, লাল হয়ে উঠছে। কি করে এর পরে ভ্রমলোককে মুখ দেখাবে ভেবে পায়নি। কিন্তু আজ ভাবছে অস্ত্র কথা। আশ্রুক। পারতে সামান্য কথাই বলবে না। ওকে যেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ আর অভিমান তার ওপরেই বেশি যেন। কথা বলবে না। কথার জবাব দেবে না। তবু আশা করছে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আরো এক জনকে। চিৎ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিকে।

ছোকরা চাকরকে দশ বার করে স্তম্ভরীর সম্বন্ধে আর বাড়ির সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই বাবার কাছ থেকে সে খবর পাবে সেকথাও বার বার করে সমঝে দিচ্ছিল। এমন সময় বাবা ফিরলেন।

সঙ্গে আর কেউ না।

এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে ষ্টেশান। সেখান থেকে ট্রেন। ষ্টেশান পর্যন্ত ট্রাকে যাবে। আপিসের ট্রাক নিয়েই এসেছেন অবনী বাবু।

ট্রাক মেন কোয়ার্টারে পড়তেই স্তম্ভরতা বিসর্জন দিয়ে উন্মুক্ত নেত্রে চার দিকে তাকালো সামান্য। নিচে নামছে ট্রাক। মুড়াই দেখা যায়। মড়াইয়ের কর্মশ্রোত দেখা যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা কান্না যেন গুমে উঠতে লাগল ভিতরে ভিতরে। ইচ্ছে হল চিংকার করে বলে ওঠ, ট্রাক থামাতে বলো বাবা, আমি যাব না!

নিশ্চল বসে রইল মূর্তির মত।

ওই ভূত বাবুর দোকান। দেখা যাচ্ছে গোলাগাল লোকটা

বসে আছে কাশ বাস সামনে নিয়ে। সাগ্রহে সাধনা আবার তাকালো সেদিকে। ঠীক খামিরে তার সঙ্গে অন্তত দেখা করবে একটি বার। দেখা করে বলবে, ভুতু বাবু, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ভুতু বাবুর টাকার লোভ। ভুতু বাবুর দোকানে সব কিছুর দাম বেশি। কিন্তু সাধনার মনে হল, ভুতু বাবু ভানী আপন লোক তার। এই মুহূর্তে এত আপন বৃষ্টি আর কেউ নয়। তার মা-লক্ষ্মী ডাকটা আর একবার শুনে গেলে হয় না।

ঠীক ভুতু বাবুর দোকান ছাড়িয়ে গেল।

সাধনার মনে হল আর কিছুই থাকল না। নিজের অজ্ঞাতে চোখে জল এসেছে কখন টের পারিনি। বাবার কথায় সচকিত হল। অনেকক্ষণ ধরেই নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন তিনি।—কি হল বল দেখি? এবারে সাত তাড়া গাড়ি কে তোকে আসতে বলেছিল?

সাধনা বাইরের দিকে ঘুরে বসল প্রায়।

—না যাস তো বল, গাড়ি নোয়াতে বলি।

সাধনা ঘাড় নাড়ল, না—!

—এটুকু তো পথ এখান থেকে, ভালো না লাগলে চল আসতে কতক্ষণ! ক'টা দিন আর, বিয়েটা হয়ে গেলে যখনই লিখবি আমি গিয়ে নিয়ে আসব'খন—মন খারাপের কি আছে।

ভিন্নে চোখেও সাধনা বাবার দিকে ফিরে না চেয়ে পারলো না। ঠিক এই মুহূর্তে এই সাধনাটুকুই মস্ত সখল বেন।

সকালে দোকানে এসে ভুতু বাবুর চক্ষুস্থির। ঘরের দরজা ধাঁকরা খোলা। লোক নেই। সমস্ত ঘর জলে জলময়। জলে কাদায় সপসপ করছে মেঝে। জলের ডামের মুখ খোলা, ড্রাম প্রায় খালি। ত্রস্ত চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে নিল ভুতু বাবু। আসবাব-পত্র তচনচ হয়ে আছে। কিন্তু যায়নি কিছু, সবই আছে। এমন কি খোলা দরজার গায় তালচাটবিও ঠিকঠাক ঝুলছে। কিন্তু ঘরের দুর্দশা দেখে রাগে দুঃখে ভুতু বাবুর চোখে জল আসার উপক্রম। নিশ্চয় ওই দু'জনের একজন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন যে অজ্ঞানকে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে হয়েছে মাথায়।

নিজের মনে সমানে গালাগাল দিয়ে চলল ভুতু বাবু। সাতপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল দু'জনেরই। আর কক্ষণে ঘর ছাড়বে না, এই শেষ। মিয়াদ শেষ হতে এখনো সাত আটদিন বাকি। এই সাত আটদিনের টাকা সে ফেরত দেবে। ওই মরাচোখো ডাকাতটাকে বলতে পারবে না কিছু। বলা নিরাপদও নয়। কিন্তু রণবীর ঘোষকে বলবেই। বলবে আর টাকা ফেরত দেবে। দু'তিনটে দিন নিশ্চিন্তে ঘুমতে পেরেছিল ভুতু বাবু। সাধনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকেই আর চিন্তা ভাবনা ছিল না। গাছতলার অন্ধকারে ঝাড়িয়ে আর দেখেওনি মাতাল দুটো কি করছে না করছে। মনে মনে ভেবেছে, ওরকম মোটা টাকা পেলে পনের দিন ছেড়ে এখন আরো পনের দিনের জন্ত ছেড়ে দিতে পারে ঘর। কারণ, আসল উদ্দেশ্যে ওদের ছাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আবার? মিয়াদ বাড়ানো ঘরের কথা, এই বাকি সাতদিনও দেবে না সে থাকতে। ওরকম মাতালের পাল্লায় পড়লে সর্বস্বান্ত হতে কতক্ষণ!

ঘর-দোর সংস্কার হল। দৈনন্দিন দোকানপার্ব। সকাল গেল, দুপুর গড়ালো, বিকেল পেকল। সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি। উজ্জতা কমছে ভুতু বাবুর। কড়া কথা বলতে গেলে কি হতে কি হবে কে জানে। বরং বৃষ্টিয়ে স্নজিয়ে বলবে রণবীর ঘোষকে। আর যেন দোকান পাট খোলা রেখে দু'জনেই চলে না যায় ওরকম। আর, ঘরের দরবস্থা না করে। তবু যত রাত বাড়ছে তত অস্বস্তি বাড়ছে। ছোকরা চাকর দুটোকে আজ আর আগে ছাড়েনি। বৃষ্টিয়ে বলতে গেলেও অনর্থ বাধবে কি না বিশ্বাস কি!

রাত বাড়ছে। মড়াই নিশ্চক নিখুম আবার। কিন্তু দু'জনের একজনেরও দেখা নেই। না রণবীর ঘোষের, না হোপুনের। কি করবে ভুতু বাবু বুঝে উঠছে না। কখন চৌদ্দ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে বাড়ি যাবে এরপর। চাকর দুটোকেই বা আর কতক্ষণ ধরে রাখবে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ওরা। ঝিমুনি আসছে ভুতু বাবুরও। সমস্ত দিনের পবিত্রম আর ক্রান্তি।

হঠাৎ উঠে বসে দু'চোখ রণভাতে লাগল ভুতু বাবু। বিশ্বয়, বিজয়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল চারদিকে। না ঠিকই দেখছে। সকাল হয়েছে। পাখি ডাকছে দূরে মুবগী ডাকছে কোথায়। চাকর দুটো মেঝেতে পড়েই ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

কি কাণ্ড! খাটিয়া থেকে নেমে ভুতু বাবু গজগজ করতে লাগল আবার। চাকর দু'জনকে ডেকে তুলল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কেউ না আসার দরুন মনে মনে খুশি হবে কি হবে না ঠিক বুঝে উঠছে না।

সেদিন রাত্রিতেও এলো না কেউ। তার পরদিন শুনল, রণবীর ঘোষ পাততাড়ি গুটিয়েছে মড়াই থেকে। যে কোনদিন চলে যেতে পারে শুনেছিল। তবু যথার্থ গেছে জেনে ভুতু বাবু খুশিতে আটখানা। আর ঘর ছাড়তে হবে না, টাকাও ফেরত দিতে হবে না।

একদিন একদিন করে দেড়মাস কেটে গেল মাসির বাড়িতে।

যত খারাপ লাগবে ভেবেছিল সাধনা, প্রথম প্রথম তত খারাপ লাগেনি। এক আচমকা ত্রাসের বিভীষিকা থেকে ঢালা নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে দিনকতক বরং হাঁফ ফেলে বেঁচেছিল। তাছাড়া হঠাৎ সে এসে পড়ায় বিয়ে বাড়িও জমে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই।

বিয়ে মেয়ের মাসভূতো বোনের মুখ খুলেছে আরো। এখন আর আভাসে ইঙ্গিতে ঠাটা নয়। সাধনাকে একলা পেয়ে সোজাসজি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার সেই নরেন বাবুর খবর কি সামুদি?

আগের মত সাধনা আর ভেতরে ভেতরে উতাক্ত হয়নি এতটুকু। বরং হাসিঠাট্টার এদিকটাকে যেন মেনে নিয়েছে খুশি মনে। উন্টে টিপ্তরী কেটেছে, সে খোজ্রে তোর দরকার কি, তুই বরং তোর গঙ্গারাম বাবুর খোজ খবরটা ভালো করে নেওরা শেষ কর আগে।

ভাবী জামাইয়ের নাম শুনেছে গঙ্গাপদ।

তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি শান্ত হয়েছে আবার। মাসভূত বোন স্বস্তরবাড়ি চলে গেছে। দিন কাটছে একটা দুটো করে। এবারে যেন একটু একটু করে হাঁপিয়ে উঠছে সাধনা।

অবনী বাবু আগেও একদিন এসেছিলেন। বিয়ের দিনও এসেছেন। কিন্তু খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তেমন পায়নি সাধনা। তবু এরই মধ্যে পাঁচবার করে স্নানরীর খোজ

## সবাই জানেন -



# ব্রুক বন্ড চা

বেশী লোকে খান !

ব্রুক বন্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

করেছে। বাবার শ্রমিথে অন্তঃকরণের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। পাগল সর্দার, ভূহু বাবু, এমন কি নিধুরামের প্রসঙ্গও তুলেছে। কিন্তু তারপর বোবা।

বাবার চিঠিপত্র পায়। মোটামুটি সংবাদও। কিন্তু তাতে মন ভরে না। মড়াইয়ের পাহাড় ধূসর মেঘের মত দেখা যায় এখান থেকেও। চেয়ে থাকে। মড়াই যেন ডাকছে তাকে। ক্রমাগত ডাকছে।

সুন্দরী কি করছে এখন? ভরা দুপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই থিমুচ্ছে নিশ্চয়। ছোকরাটার হাতে ওর কি হাল হয়েছে কে জানে? বাবাকে কীকি দিতে আর কি ১০০ পাগল সর্দার কি জানে ও চলে এসেছে? আর ভূহু বাবু? নরেন বাবু জানেই ১০০ কিন্তু কি ভাবছে? আর যদি ফিরে নাঠি যায় সাধনা ওখানে, তাহলে? তাহলে কি নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে না? কিন্তু সংগোপনে চেষ্টা করছে অনুভব করতে ১০০ আর সেই ভদ্রলোক? চিফ ইঞ্জিনিয়ার? সে কি টের পেয়েছে ও ওখানে নেই? মড়াইয়ে সেই থেকে আর দেখা যায় নি শুকে, লক্ষ্য করেছে? করে থাকলেও বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না নিশ্চয়ই। ইচ্ছে থাকলেও করবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দেরীকে বাধবে। ভারী তো মানুষ খুব চিনেছে সাধনা ১০০ তবে নরেন বাবুর কাছে জেনে থাকতে পারে বা নিধুর মুখেও শুনতে পারে। সচকিত হয়ে ভাবনার লাগাম থামিয়ে নিজেকেই চোখ রাঙায় এক এক সময়। কি লাভ এসব জেনে? হেসেও ফেলে আবার নিজের মনেই। লাভ-লোকসান আবার কি? জানতে ইচ্ছে করেছে তো করছে, বাস—

অবনী বাবু আবার একদিন এলেন মেয়েকে দেখতে। বিয়ে-বাড়ি এখন একদম কীকা। বাবাকে এবার অনেকটাই নিরিবিলি পেল সাধনা।

—সেই ভেজাল সিমেন্টের কি হল বাবা, সব মিটে গেছে?

জ্ঞাববে অবনী বাবু জানালেন, গোলযোগের সম্ভাবনা বরং বেড়েছে। কলকাতা থেকে বেসরকারী কমিটি আসবে ডাম দেখতে। তারা ডাম দেখবে আর সেই সঙ্গে সিমেন্টের বাপারও ফয়েসলা করে যাবে। এই সব কিছুর তলায় তলায় ঘোঁস-চাকলানার কারসাজি কিছু আছে বলেই অবনী বাবুর ধারণা। অবগত করে পৃথক আসবে কমিটি ঠিক নেই কিছু।

বাবার মুখের ওপর সাধনার হুঁ চোখ ঘূবে এলো এক চক্কর।—ওই কণ্ট্রিয়ারা এবারে খুব উঠে-পড়ে লেগেছে বুঝি?

—তা লাগবেই তো, যার যোগানে স্বার্থ। ওদের একজন এখানে আছে আর একজন তো সেই সব কাণ্ড করে কবেই গা ঢাকা দিয়েছে। সাধনা অবাক। কাণ্ড করে! কই সে তো কিছুই জানে না! বাবার মুখের ওপর আর একপ্রস্থ বিচরণ করে স্থির হল হুঁ চোখ। যত্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, হুঁজনের কে আছে ওখানে?

—ঘোষের ওই পাটনারা—বিজ্ঞেন চাকলাদার।

সম্ভরণে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল যেন। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল আবার, আর ওই লোকটা কি করে গেছে বলছিলেন...?

একটু থমকে গেলেন অবনী বাবু। বিব্রত মুখে তাকালেন

মেয়ের দিকে। খেয়াল হল সাধনা আগেই মাসির বাড়ি চলে এসেছিল বটে...জানার কথা নয়। হুঁ চার কথায় সমাচার যা বললেন শুনে কিছুক্ষণের জগ্ন সাধনার বাহুজ্ঞান লোপ পেল যেন। রণবীর ঘোষ মড়াই ছেড়ে গেছে সেও প্রায় মাস দেড়েক হল, সাধনা চলে আসার পরেই। ঠিক তার তিন দিন বাদে আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে বরণা নিখোঁজ হয়েছে। আজ পৃথক তার কোন খবর নেই। মড়াইয়ে এই নিয়ে মন্দ গুণ্ডগোল হয়নি। কলকাতায়ও খোঁজখবর করা হয়েছে অনেক। হুঁজনের কারোই পাতা মেলেনি। এমন কি বিজ্ঞেন চাকলাদারও রণবীর ঘোষের কোন হৃদিস দিতে পারেনি। হয়ত বা জেনেও ইচ্ছে করেই পেরেনি।

আশ্বস্ত হওয়া মাত্র সাধনা চলে এলো বাবার সমুখ থেকে। যা শুনল হুঁখের কথা, লজ্জার কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর ভিতরের একটা কালো ত্রাসও যেন অপগত। লোকটা বিদায় হয়েছে। আর হয়ত মড়াইয়ে আসবেও না। বরণার জগ্ন হুঁখ করবে? করা উচিত। কিন্তু হুঁখ হচ্ছে না ও তার কি করবে? বরং হঠাৎ এক মুক্তির আনন্দ উপছে উঠছে। সেটা গোপন করার জগ্নই বাবার কাছ থেকে চলে আসা। দেড় মাস মড়াই ছেড়ে এসেছে। দেড় মাস? দেড় বছর। দেড় যুগ।

পরদিন বাবার সঙ্গে মড়াইয়ে রওনা হল সে। মাসি অবাক, বাবা অবাক। প্রথম বারেও যেমন কেউ ধরে রাখতে পারেনি শুকে, এবারেও কারো নিবেধ বা অনুরোধে কান দিল না।

...মড়াই!

দূর থেকে চোখে পড়ামাত্র উজ্জল আনন্দে ট্রাকের ধারে ঝুঁকে পড়ল প্রায়! ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল ভিতরটা বোবা শূন্যায় ভরে উঠছে। আজ তার উন্টো। এত আনন্দ ধরছে না। নির্নিমেবে দেখছে। এই দেড় মাসের পরিবর্তন যাচাই করে নিচ্ছে। এ স্থিতি সমারোহে দেড় মাস দেড় পলকের মতই। তার ওপর শুনেছিল, অসময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ার দরুণও কাজ কর্মে ছন্দ পড়েছে। তবু যাও হয়েছে তাই উপলব্ধি করার একাগ্রতায় উগ্রুথ হয়ে উঠল যেন। পারলে আজই একবার মড়াইয়ে নামে। কিন্তু বাবা তাহলে দেবেখন। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ কৌতুকে বাবাকে একবার দেখে নিল।

আপিস কোয়ার্টারস।

উন্মুক্ত চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সাধনা। কিন্তু এই ভরা দুপুরে 'কে আর বাইরে বসে আছে? ওই দূরে কোণের ঘরটা একজনের। আর উঠানের এদিকে আর একটা আর একজনের। ঘরে বসে কাজ করছে না মড়াইয়ে নেমেছে কে জানে। মনে মনে লজ্জা পেল একটু। ভিতরে ভিতরে ভাবছে কি না, সে যে এসেছে যদি ওই হুঁজনের একুনি জানানো যেত।

ভূহু বাবুর দোকান।

—বাবা, ট্রাক থামাতে বলো একবারটি। এই, থামাও একটু! নিজেই বলে উঠল ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে। অবনী বাবু কিছু বলার বা বোঝার আগেই ট্রাক থামল এবং সাধনা নেমে পড়ল।



—তুমি ট্রাক নিয়ে বাড়ি চলে যাও বাবা, আমি আসছি একটু বাসেই।

অন্তর্ধান। অবনী বাবু দেখলেন, মড়াইয়ের প্রথম আসার আগে যা ছিল, রাতারাতি তার থেকেও বেশ মেয়ের বয়েস কমে গেছে অনেক।

মা-লক্ষ্মী!

খালি গায়ে কাঠের কাশ বাল্লের সামনে বসে ঝিমুচ্ছিলেন ভুতু বাবু। সহসা চোখের সামনে তার আবির্ভাবে বিস্ময় আর আনন্দে উদ্ভাসিত। ঠাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল সাধুনা।

—এসো মা-লক্ষ্মী, এগো। জিব কাটল, আশ্রন মা-লক্ষ্মী আশ্রন—বসুন—কবে এলেন?

সাধুনা হাঁকা জবাব দিল, এখনো ভালো করে আসিনি, ট্রাক থেকে এখানে নেমে পড়েছি।

উঠে ভুতু বাবু একমাত্র টিনের চেয়ারটা ঝেড়েমুছে বসতে দিল। —ভুতুর ভাগা, বসুন মা-লক্ষ্মী ওরে এই ছোঁড়ারা, চা কর না ভালো করে, বেশ করে সাবানজলে গেলাস ধুয়ে নিস আগে।

হুকুম দিয়ে হাঠ বনেন কাশ বাল্লের সামনে সমাসীন হল আবার, আপনি ছিলেন না এতদিন গোটা মড়াই অন্ধকার।

সাধুনা মুখ টিপে হাসছে তেমনি। কোনদিনই খারাপ লাগেনি, আজ তো কথাই নেই।

—বোনের বিয়ে হল?

মাথা নাড়ল।

মাসির বাড়ি এবং বোনের বিয়ের খবরাখবর নিতে লাগল ভুতু বাবু, সংক্ষেপে একটা ফিরিস্তি দিয়ে সাধুনা জিজ্ঞাসা করল, তার পর এখানকার সব খবর বলুন।

পা গুটিয়ে আট সাঁট হয়ে বসল ভুতু বাবু।—খবর খুব ভালো মা-লক্ষ্মী, কিছু গুণ্ডগোল নেই আর, খালি জল বিষ্টি একটু বেশি হচ্ছে এই যা। এদিক ওদিক চেয়ে কঠোর একেবারে সম নামিয়ে আনল হঠাৎ, সেই যে সেই বলেছিলাম মা-লক্ষ্মী মনে আছে? আপদ বিদেয় হয়েছে একেবারে, আর আসতে হচ্ছে না বাছাধনকে... যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গা ঢাকা—তিন দিন বাদেই ওদিকে আর এক মেয়েও মড়াই থেকে একেবারে যেন উবে গেল—চাঁটার্জী সাহেবের সেই মেয়েটা মা-লক্ষ্মী—সাঁট ছিল আগের থেকেই, বুঝলেন না?

সাধুনা বুঝেছে আগাই। বুঝে চায়ের পেয়ালায় মনোনিবেশ করেছে।

তেমনি নিচু গলায় সোংসাহে বলে গেলেন ভুতু বাবু, সে এক হৈ—হলুহলু ব্যাপার মা-লক্ষ্মী, ওই তো শরীর ভঙ্গ মহিলার, নড়তে চড়তে কষ্ট, তায় আবার সেজেগুজে থাকেন অষ্টপ্রহর—তা কোথায় গেল

—কিন্তু—

কিছুটা নিরাস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা বা যার—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নহারী নিকৃষ্ট সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ বাতে কোন সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোবদিত অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং




একবদ্য

শ্রদ্ধার চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আখ্যার ভাস্কর্য  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

এস, সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৩৪-৩১৪০, - দুর্গা-কুমারী দণ্ডিকার, গ্রাম-গিনিমাট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ • কলিকাতা-১২

সাজপোষাক কোথায় কি—দিনে সাত বার করে ওই দেহ নিয়ে ওপর নিচ করা—থাকে দেখেন তার কাছেই কি কাল্লা—কি কাল্লা—আমার মেয়েকে খুঁজে বার করে দাও তোমরা—তা খুঁজতে কি বাকি ছিল কোথাও, কোলকাতায় পর্যন্ত গোক খোঁজা করা হয়েছে—ভ্রম মহিলার কথা ভাবলে রীতিমত কষ্ট হয় এখন।

মুখের দিকে চেয়ে কষ্টের কোন লক্ষণ দেখল না সাব্বনা। মহিলা, অর্থাৎ, ঝর্ণার মায়ের দুঃখ ওর মনেও যে রেখাপাত করল খুব, তাও নয়।

বাড়ি ফিরেই সুলন্দী-দর্শনে গোয়াল ঘরে ঢুকল সর্দারগে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল আগে। অনেক দিনের অদর্শনের পর যা যেমন করে ছেলেকে দেখে। গায়ে পিঠি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাথা নেড়ে সিং হুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল গোকটা। সাব্বনার মনে হল, আনন্দ করছে আর সেই সঙ্গে অভিমানও জানাচ্ছে।

পরদিন কথায় কথায় বাবার মুখে শুনল, নরেন বাবু নেই এখানে, আপিসের কি কাজে কলকাতায় গেছে পাঁচ সাত দিনের জন্য। ভালো লাগল না। এক দিনে ওর আসাটাই খানিকটা পুরানো হয়ে যাবে।

দুপুরে বাইরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সাব্বনা মড়াইয়ের উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। এরই প্রতীক্ষায় ছিল। দিনটাও ভালো। মেঘলা, ছায়া ছায়া।

কাল লক্ষ্য করেনি। কিন্তু উপর থেকে আজ মড়াইয়ের দিকে চোখ পড়তেই অবাক। পরিবর্তন হয়েছে বই কি। মড়াইয়ের এক দিকের রূপ বদলে গেছে একেবারে। মাটির দেয়ালের ওদিকটা। সেই কোন তলায় পড়েছিল নোঙরা হুঁচর হাত আবর্জনা-গোলা জল। তাকালেও গা যিন যিন করত। সেই জল কি করে এরই মধ্যে ওই বিশাল উঁচু মাটির দেয়ালের প্রায় আধাআধি উঠে এসেছে। আর সেখান থেকে পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায়, জল আর জল। বর্ষার লাল জল। গাঢ়-গৈরিক। থকথকে অপরিষ্কৃত, তবু অপক্লপ। মেঘলা আকাশ, ধূসর পাহাড়, আর পারিপার্শ্বিক সাজের সঙ্গে ঠিক যেমনটি মেলে।

চোখে পলক পড়ে না সাব্বনার। এতবড় সাময়িক মাটির দেয়াল তোলার অর্থ এখন বুঝে।

মড়াই। সাব্বনা নেমে এলো। আগের মত তর তর করে নয়। জলে জলে পিছল হয়ে আছে। নিচে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাস, সেই মুক্তি আর সেই রোমাঞ্চ। গঠন-সমারোহের পরিবর্তন কিছু চোখে পড়ে না বটে, তবু তফাৎ কিছু উপলব্ধি করা যায়। কাজের তাদ্রা বেড়েছে, নির্বিষ্টতা বেড়েছে, আবহাওয়ার একটা অলক্ষ্য তাগিদে ইঙ্গিত। সম্ভবত জলের দকন। যতক্ষণ আকাশ সদয়, যতটা পারো এগিয়ে যাও। তুচ্ছ কুঁচকে সাব্বনা আকাশের দিকে তাকালো একবার ১০০-এখনই এই, ভরা বরষায় কি হবে কে জানে?

এ 'ছাড়াও তফাৎ কিছু দেখছে। হাজার লোক কর্মরত। ক'জনকে আর বিচ্ছিন্ন করে চেন। কিন্তু ওর অনুপস্থিতি যেন সকলেই অনুভব করছিল। যেখান দিয়ে পাশ কাটালো সেখানেই মানুষগুলোর চোখে নীরব অভ্যর্থনার আভাস দেখল। খুশিতে আনন্দে ভরে ভরে উঠতে লাগল সাব্বনা। ওর যাওয়াও সার্থক, ফিরে আসাও সার্থক।

নিজের হাতে কাজ করে না পাগল সর্দার, কাজের ভদারক করে। তাই করছিল। দূর থেকে সাব্বনাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল। সাব্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে আসতে সর্দারের ঘামে ভেজা কালো মুখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে।

সাব্বনাও হাসছে। কি দেখছে সর্দার?

—তুকে ১০০-তেমনি জবাব দিল সর্দার, তু চলে যেয়েছিলি কেনে দিদিয়া?

—বাঃ রে, বোনের বিয়ে, যাব না? বলল বটে, কিন্তু ওর খুঁশিভরা চোখের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। স্পষ্ট বলছে যেন, বোনের বিয়ে আর কতদিন ধরে হয় বাবু, তোর ওর লেগেছিলি দিদিয়া। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেমন ছিলে বলো সর্দার—

—ভালো ছেলাম। ভালো থাকার ছোটখাট একটা ফিরিস্তি দিল সর্দার। আজকাল আর কাজে কামাই করছে না। তবে জলের জন্য মাঝে মাঝে আপনি কামাই হয়ে যায়। নয়তো রোজ আসে। অনুযোগ করল, বাবার আগে দিদিয়ার ওকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে তার সুলন্দীর এত কষ্ট হত না। জানার পরে অবশ্য প্রায়ই গিয়ে সে সুলন্দীর দেখা শুনা করে এসেছে, ইত্যাদি—

সাব্বনা বাবার মুখে শুনেছে সে কথা। কৃতজ্ঞ নেত্রে তাকালো তার দিকে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল সর্দার, হাতা প্রশ্ন করল, উবাসীর বাবু তুর বিয়া কবে দিবে?

দিনে দুপুরে এই পরিবেশে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনলে কার না হাসি পায়। সাব্বনা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, দিলে কি হবে? একেবারে তো চলে যাব এখান থেকে!

সর্দার মাথা নাড়ল, তা বটে। সত্যতাটুকু উপলব্ধি করল যেন। বিব্রত ছায়া নামল মুখে। আর তখনই ভিতরের দৃষ্টি মানুষটাকে যেন দেখতে পেল সাব্বনা। রিক্ততা দেখতে পেল। ওকে দেখে যত খুশি হোক, যত ভালো আছে বলুক, এক নিঃসীম বেদনার জ্বালা মানুষটাকে বরাবরকার মত আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে চাঁদমণি। পাগল সর্দার বরাবরকার মতই বুড়িয়ে গেছে।

সর্দারের দৌসরটিকেও দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সাব্বনা। সেদিন নয়, পরদিন। কোদাল দিয়ে পাহাড়ের গা-ঘেঁষা মস্ত একটা পাথরের তলা থেকে মাটি সরাজে। ওর আশে পাশে আরো অবশ্য কাজ করছে কেউ কেউ। তবু মনে হয়, চার পাশে একটা রূঢ় বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি টেনে দিয়ে নির্ভম একাগ্রতায় ওই অটল পাথরটার সঙ্গে যুঝতে নেমেছে। চোখে চোখ পড়তে সাব্বনা দ্রুত প্রস্থান করল সেখান থেকে। পিছন ফিরে তাকালো না একবারও ১০০ ভাবছে। স্বর্ণণার নিখোঁজ হওয়ার ষড়যন্ত্রে সত্যিই কি এই লোকটাও জড়িত? বিশ্বাস হয় না যেন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু ফিরে তাকাতে আবার, এমন সাহসও নেই।

পা থেমে গেল।

অদূরে ওই প্রেসার-গেট সংলগ্ন ব্লকের দিকে এগোচ্ছে তিন চারটি লোক। একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। ওকে দেখেছে। সকলেই দেখেছে। এখানে এলে দেখা হবেই জানে ১০০

গত কালই আশা করেছিল। সংগোপন প্রত্যাশায় হুঁচোখ সজাগ ছিল আজও।

দলছাড়া হয়ে ভ্রমলোক এদিকেই আসছে। বাকি ক'জন কাজের দিকে এগোচ্ছে। সাধনা না দেখার ভান করল প্রথম। কিন্তু সেও এক বিড়ম্বনা। ঠাঁড়িয়ে পায়ে করে আঁচড় কাটিতে লাগল আথলোকা পাথুরে বালিতে, আর হাসতে লাগল সোজা-সজি তাকিয়ে। এই বরু সহজ।

কাছে এসে বাদল গাঙ্গুলি হাসিমুখে বলল, পরশু এসেছ সুনাম? খবর রাখে। নিধুর মুখে স্নেহে বোধ হয়। নিধু কাল এসেছিল। খুশির লালিমার সাধনা তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

—আজ এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম দেখা হবে, ঠিক ভেবেছিলাম দেখা।

সাধারণ ভাষা কথা। কিন্তু তাইতেই লাল। এ রকম ভেবেছিল জানলে সাধনা আসতই না কখনো। সে কথা আর বলে কি করে। চুপ করে থাকাও কাজের কথা নয়। বলল, ভেবেছিলাম এই দেড় মাসে কত কি না জানি হয়ে গেছে, এসে দেখি যেমন কে তেমনি, কিছুই হয়নি।

শাদা কথায়, কি-ই বা এমন কাজের লোক আপনারা!

বাদল গাঙ্গুলি প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চুপ চাপ দেখল একটু। ডায়ের বাপারে ওর এই আগ্রহের কারণ কিছুটা জানে এখন। জলবরা এক সন্ধ্যায় নরেন আর সে বসেছিল কোরাটারে। সেদিন কেমন মনে পড়েছিল ওর কথা। পর পর অনেক দিন সেখনি বলেই হয়ত। কথায় কথায় তখন স্তনেছিল। আভাসে অহুমানো নরেন যতটুকু জানত।

ছয় গাঙ্গুর্থে প্রায় কৈকিগুং দেবার মত করেই জবাব দিল, তুমি ছিলে না এখানে, যার যেমন খুশি কীকি দিয়েছে।

হেসে ফেলল। এ প্রশংসা নিজের কাছেই প্রায় বিশ্বাসের কারণ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সঙ্গী অফিসার ক'জন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর কিছু না বলে ফিরে চলল।

উৎফুল্ল চোখে সেদিকে চেয়ে সাধনা ঠাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাগার দুঃখ স্তনেছিল, জল বুটীর ব্যাঘাতে ভ্রমলোকের নাকি মেজাজ বিগড়ে আছে। তার ওপর বেসরকারী কমিটি আসছে কাজ দেখতে আর সিমেন্টের ফরেন্সলা করতে, সে উদ্বেগও কম নয়। এই সেড়মাসে বেশ শুকনোই দেখাচ্ছিল ভ্রমলোককে। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে ওকে দেখে অল্প সকলের মত এরও চোখে মুখে সেই খুশির অভ্যর্থনা উপলব্ধি করেছে সাধনা।

বাড়ির উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে দিল। দেরি হয়ে গেছে। হোক গে—তৃপ্ত, প্রসন্ন। এই কর্মপরিসরের প্রতি একান্ত অহুভুতির আশ্বাসন একটা। অপরিণীত মমতা। বেশ হত, এই মানুষদের মত সেও যদি কাজে লাগতে পারত কিছু। বেশ হত, পুরুষ মানুষ হলে। এ সময়ে ডায়ের ভালো মন্দ নিয়ে ভাবতে পারত, আলোচনা করতে পারতো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও।

—খেং! সপ্রগলভ লজ্জার সমস্ত মুখে যেন আবার লাগল এক প্রশ্ন।

...পুরুষ মানুষ হলে কেউ আমলই দিত না ওকে।

দিন দুই গেছে আরো।

কোন কাজে মন বসছিল না সাধনার। সন্ধ্যা পার হতে চলল। খানিক আগে বাড়ি ফিরেছে আর ঘুরে ফিরে ঝরনার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটাই ভাবছে।

মেন কোরাটারসুএর এক পাথরের আড়ালে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। প্রসাধন পারিপাট্য নেই, শিথিল বেশাবাস। ভারী মুখে বিষন্ন কালছে ছাপ। উদাসীন বিষাদে এই দুনিয়ার প্রতিকূলতার কথাই ভাবছিলেন বোধ হয়। একেবারে সামনাসামনি পড়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল সাধনা।

পালিয়ে আসত। কিন্তু মহিলার অপ্রসন্ন দুই চোখ যেন কাচগোকার মত আটকে ফেলল ওকে। মনে হল, ঠাণ্ডা ইশারায় ডাকছেন। পায়ে পায়ে কাছে আসতে আবার খানিক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ওকে। পরে সাক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

বলল। সে যে ছিল না এখানে সেটা এঁরও অগোচর নয় জেনে অবাক।

আর একদফা উষ্ণ পর্যবেক্ষণ। ঠিক ওকে নয় যেন। ওর ভিতর দিয়ে এই বয়সের সকল মেয়ের ওপর বিরূপ ভ্রুকুটি একটা। কিন্তু কঠোর বদলে গেল হঠাৎ। মুখভাবও। গলা নামিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবার আগে ঝরনার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল একদিনও?

কাল নরম  
মসুন  
কেশের  
জন্য



কেএমপি  
ক্রয়ও  
নারিকেল তৈল

২৫ পি: ১৫ পি:  
২৫ পি: ৫ পি:  
আপান জিনে  
পাওয়া যায়



পারিভ্রমি হিন্দু অয়েল মিলস  
মেন্ডুয়া বাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-৭

চট করে জবাব দিলে উঠতে পারেনি সাহুনা। শেষ দেখা হয়েছিল তুতু বাবুর হোটেল। সাহুনাকে দেখে এবং একটু পরেই রণবীর শেখকে দেখে ব্যঙ্গ কৌতুকে বললমলিয়ে উঠেছিল যে দিন। তার পর আর জানবে কি করে, সাহুনা নিজেই পালিয়ে এসেছিল।

জবাব শুনে মিসেস চাটাঙ্গী বিস্মিত। তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল? করে? কেন? আমাকে বলেনি...

কান্নার মত শোনালো প্রায়। কিন্তু সামলে নিলেন। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার ক্ষোভে দ্বিগুণ বিরক্ত। মুখ ঘুরিয়ে রুট মনযোগে ওপরের আকাশ-পেঁগা পাঠাড় দেখতে লাগলেন তিনি।

সেই থেকে মনটা ভারী হয়ে আছে সাহুনার। ভদ্রমহিলা যেমনই হোন, মেয়ের ভালো ছাড়া মন্দ তো কখনো চাননি বরং একটু বেশি ভালো চাইতেন বলেই অমন করতেন।

বাউরের ঘরে বাবার সঙ্গে আরো একজনের সাদা পোয়ে খুশিতে খড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সাহুনা। কিন্তু যত খুশি ততো লজ্জা। যত আনন্দ ততো সঙ্কোচ। হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত। দাঁওয়া ছেড়ে দূরে গিয়ে ঢুকল তাড়াতাড়ি।

বারা ডাকলেন, কই রে সাহুনা, নরেন এসেছে।

এসেছে তো জানে। কিন্তু যায় কি করে। সেই থেকে প্রতীক্ষাও করছে মনে মনে। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ানো দায়।

নরেনই সহজ করে দিল ওর আসাটা। অবনৌ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে জানান দিল, দেড় মাসে মাসির কাছে রান্নাঘরের নতুন কি শিখে এলে হাতে কলমে পরীক্ষা চাই—একটু এদিক ওদিক হলেই গোলা।

আগের দিনের একটা সুর কানে লাগছে। এ ঘরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল সাহুনা। এতদিন পরে সাক্ষাতের আনন্দ থেকেও মানুষটাকে দেখে নেওয়ার কৌতূহল বেশি।

নরেনের দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল দু'চার মুহূর্ত। তারপর হালকা অহুশাসনের সুরে জিজ্ঞাসা করল, যা বললাম কানে গেলো?

সাহুনা জবাব দিল না। দেখছে তেমনি। হাসছেও।

অবনৌ বাবু মেয়ের দিক টেনে ঠাটা করলেন, কানে গেলেই বা করবে কি, এই দেড় মাসের মধ্যে দেড় দিনও কি ও মড়াই ছেড়ে ছিল ভারো নাকি!

হাসি চেপে ভ্রূঙ্গি করে বাবার দিকে তাকালো সাহুনা। নরেন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে দাবী প্রত্যাহার করে নিল যেন। বলল, ভ্রা বটে, এতবড় হুশিচস্তার বোঝা মাথায, গেলেও বা নিশ্চিস্তে থাকে কি করে।

আবারও দৃষ্টি বিনিময়। দেখাটাই শেষ হয়নি যেন সাহুনার। মুহূর্ত হাসি, সর্কোতুক নিরীক্ষণ।

অবনৌ বাবু উঠে এলেন। আপিসের পোষাক বদলে হাতমুখ ধোবেন। নরেন সামনের দিকে ঝুঁকে এলো তৎক্ষণাৎ। গলা নামিয়ে বলল, এতদিন দেখা নেই দেখে ভালোমাসি মাসি এবার হাতের মুঠোয় পোয়ে বোনবিকেও একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে তবো ছাড়বেন।

হাসি স্পষ্টতর হল। শাদা দাঁতের আভাসও দেখা গেল প্রায়। কিন্তু তবু কথা বলবেই না সাহুনা।

নরেন সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রাখল আবার। হালছাড়া গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার, চিড়িয়াখানার জীব ঠাণ্ডালাে নাকি আমাকে?

নিরীক্ষণের কৌতুকগল্পনা শেষ হল এতক্ষণে। সাহুনা জোরেই হেসে উঠল।

[ ক্রমশঃ ]

### ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরোধক ব্যবস্থা

'ফ্লু' বা ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ছড়িয়ে পড়তে পারে ব্যাপক ভাবে। সেজন্য বিশেষ রকম সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ বা চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাধি নিরোধের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা অনুসরণে পরামর্শ দিয়ে আসছেন, সেগুলো মোটামুটি এইরূপ :—(১) স্বাস্থ্য-রক্ষার সাধারণ নিয়মগুলো পালন ও কর্তব্যক্ষম থাকা ; (২) আলো-হাওয়াযুক্ত গৃহে কাজকর্ম ও শয়ন ; (৩) সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি বন্ধ জায়গার অনুষ্ঠান এবং সভা-সমিতি বর্জন ; (৪) গায়ে অতিরিক্ত তাপ বা শৈত্য না লাগান ; (৫) ট্রাম, বাস, ট্রেন প্রভৃতিতে ভ্রমণ কালে অতিরিক্ত ভীড় এড়িয়ে চলা ; (৬) লবণ জলে ঘন ঘন নাসিকা ধোতকরণ ; (৭) হাঁচি ও কাশির সময় নাকে ও মুখে ক্রমাল বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ব্যবহার ; (৮) অপরের তোয়ালে, গ্লাস বা প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার না করা ; (৯) রোগ নিবারক বা প্রতিরোধক টীকা গ্রহণ ; (১০) রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে প্রেরণ কিংবা গৃহে পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা ; (১১) যথাসম্ভব শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং (১২) রোগীর ব্যবহৃত বস্তাদি জীবাণুমুক্ত করা এবং বাসনপত্রও নিয়মিত ভাবে শোধিতকরণ।

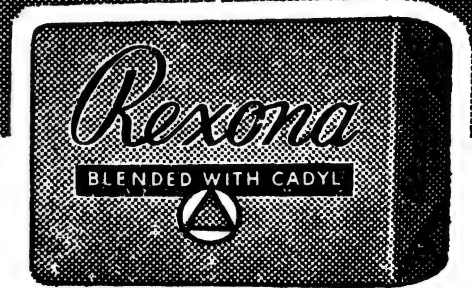


ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেঙ্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেঙ্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ হকের স্বাস্থ্যের  
জগ্রে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেঙ্সোনা প্রাইভেট লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

RP. 148-X52-BQ



# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বালিগঞ্জের ট্রাম থেকে নেমে কেঁট মোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। এই বাড়ীতেই সে এসেছিল দিন দশেক আগে ছেলে-চাপা-দেওয়া ফোর্ড গাড়ীর অঙ্গসরণ করে। আজ তার রুম চুল, কালী-বসা চোখ, ময়লা কাপড় দেখে বাড়ীর কর্তা সম্ভ্রম হ'ন, আপনার শাল ভাল আছে ?

কেঁট স্তান হাসে। ভ্রল্লোক উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে বলুন ?

—না, এখনও মারা যায় নি।

—তবে কি—

কথা শেষ করতে না দিয়ে কতকগুলো প্রেসক্রিপশন কেঁট পকেট থেকে বার করে দেয়। বলা বাহুল্য, এগুলি গৌরীর ভাইয়ের। ভ্রল্লোক হাতে নিয়ে খুলেও দেখেন না, বলেন, এ আর আমি কি দেখব ? আপনি এত দিন আসেন নি কেন ? আমার স্ত্রী বোজ্জই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন।

—মিছিমিছি এসে আর কি হবে, কিছুই তো বোঝা যায়নি। ডাক্তাররা বলছেন 'অপারেশন' করলে হয়ত বাঁচতে পারে। তাই—

—আমরা কি করতে পারি বলুন ?

—অন্ততঃ শ'খানেক টাকা এখুন্নি চাই।

—বহুন। এনে দিচ্ছি।

ভ্রল্লোক ওপরে চলে গেলেন। একটু পরে শুধু টাকা নয়, সঙ্গে চাকরের হাতে সিঁদাড়া, মিষ্টির প্লেটে নিয়ে এলেন।—আমার স্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন, খেয়ে নিন।

কেঁট হাত জোড় করে বলে, মাফ করবেন, খাবার মত মনের অবস্থা আমার এখন নেই।

ভ্রল্লোক জোর করেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কিছু খাননি, যা পারেন—

কেঁট কথার উত্তর না দিয়ে একটা সম্ভ্রম জল দিয়ে গিলে ফেলে।

—কেমন থাকে একটু জানাবেন, বিশেষ চিন্তিত রইলাম।

কেঁট সম্ভ্রতি জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। কেঁট কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট না করে সোজা টালীগঞ্জে চলে আসে। সম্ভ্রম বস্তীর বিবাদের ছায়া পড়ছে। ছেলোটর অবস্থা খারাপ, কেঁট তা সকালেই দেখে গিয়েছিল, টাকার দরকার না থাকলে হয়ত সে এখান থেকে বার হ'ত না। ওদিকে গিয়েছিল বলেই যদি দরকার হয় তবে শ্যামলকে খবর পাঠায়, তার পর টাকার যোগাড় করে বস্তীতে ফিরেছে। গৌরীর ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে, ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে ছেলোট মারা যায়নি, তবে আর বেশীকণ নয়, হাঁপরের মত শ্বাস-টানছে। এমনি ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা যত্নের সঙ্গে বোবাণড়া চম্কে, তারপর সব শেষ।

গৌরীর বুকফাটা কান্না, অজ্ঞদের লোকসেখানো চোখের জল,

বয়ঃকোষ্ঠদের অহেতুক ব্যস্ততা কেঁটকে এতটুকু বিচলিত করে না। বস্তীরই একটা যুবককে ডেকে সে একান্তে পরামর্শ করে।

—ছেলোটর সংকালের কি হবে ?

—জানি না, গৌরীকে জিজ্ঞেস করব ?

—কোন ব্যবস্থা কি হয়েছে ?

—কে করবে, ওদের তো কেউ নেই।

—যদি টাকা দিই, তুমি একটা খাটিয়া কিনে আনবে ?

—দিন, কাছেই মড়াপোড়ানর খাট পাওয়া যায়, আমি এখনই নিয়ে আসছি।

যুবকটি চলে যায়। কেঁট জমিদার-বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। বিরজিকর কান্না তার অসহ লাগে। কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না, শ্যামলের ডাকে ফিরে তাকায়। মদনকে নিয়ে সে এসে হাজির হয়েছে। শ্যামল নিজেকে থেকেই বলে, ঠিকানা খুঁজে পেতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে কেঁটদা', সেই কখন থেকে ঘুরি।

—আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ এলি না কেন।

—এই আমার বন্ধু, মদন—

কেঁট মদনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কথা শ্যামলের কাছে অনেক শুনেছি, আজ হু'জনে এসেছ ভালই হয়েছে।

মদন হেসে বলে, কত দিন থেকে আপনার কাছে আসব ভাবছি—

—জানি। কেঁট একটু থেমে বলে, এখন এক বার আশানে যেতে হবে একটা ছেলেকে পোড়াতে।

শ্যামল কৌতুহল প্রকাশ করে, কে কেঁটদা' ?

—এই বস্তীরই একটা ছেলে, একটু আগে মারা গেছে।

—তোমরা গিয়ে কয়েকটা জিনিষ কিনে আন, আমি বলে দিচ্ছি।

কেঁট বস্তীর ভেতর চলে যায়। মদন সেই দিকে তাকিয়ে বলে, কেঁটদা' এত গম্ভীর লোক না কি ?

—সব রকম এ্যাকটি ওর জানা আছে।

—কি ব্যাপার বল তো ?

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

হু'জনে ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক দেখে। কেঁট এক বুচ্ ভ্রল্লোককে নিয়ে ফিরে আসে।

—পশ্চিম মশাই, আপনি এই ছেলে হু'টিকে একটু বুঝিয়ে দিন কি কি জিনিষ আনতে হবে।

পশ্চিম মশাই বললেন, আমি বক এসেব সংগেই যাচ্ছি, বে কয়টি জিনিষ না আনলেই নয়, নিয়ে আসব।

—বস্তী থেকে বেরতে প্রায় সন্ধ্যা হবে গেল। বত তাড়াতাড়ি সম্ভ্রম সব রকম ব্যবস্থাই কেঁট করেছিল, কিন্তু গৌরীর কাছ থেকে

তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে আসতেই যা দেবী হ'ল। গৌরী ছোট মেয়ের মত হাউমাউ করে কাঁদছে, আমার যে আর কেউ রইল না গো, আমি আর একলা কিসের জন্তে বেঁচে থাকব? কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে না পড়লে কেউদের বেরুতে বোধ হয় আরও দেবী হয়ে যেত। সংজ্ঞাহীন গৌরীকে পণ্ডিত মশাইয়ের জিম্মায় রেখে কেউরা খাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কাঁধ দিচ্ছে মাত্র চার জন। সামনে কেউ আর রাজেন, বস্তীর সেই যুবকটি। মদন আর শ্রামল পিছন দিকে। মদন আগে অনেক বার কাঁধ দিয়েছে, থেকে থেকে চোঁচায়, বল হরি, হরিবোল।

খানিক দূর গিয়ে শ্রামল কাঁধ বদলায়, নাঃ, হালকি আছে।

মদন উত্তর দেয়, সেই জন্তেই তো বেছে বেছে খাট নিয়েছি, যাতে না কাঁধে লাগে।

—আমি কিন্তু আগে শ্রামনে বাইনি।

—আমি অনেক বার গিয়েছি। এই তো সেদিন এক বুড়ীকে নিমতলায় নিয়ে গেলাম, খুব ধুমধাম হ'ল। খৈ ছড়াচ্ছে, পরসা ছড়াচ্ছে, ভিখারীদের খুব মজা।

মদন বলে, বাড়ী ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে বাবে।

—কেন? শ্রামল জিজ্ঞেস করে।

—শ্রামনে পৌঁছে খালি চুল্লী পাওয়া, কাঠের বোগাড়, অনেক সময় লাগবে।

কেউ শুধু বললে, শ্রামনে পৌঁছে দিয়ে তোমরা বাড়ী চলে যেও, বাকী সব কাজ আমি করে নেব।

যদিও কেউ বলেছিল শ্রামলদের চলে যেতে কিন্তু মৃতদেহে আগুন না ধরা অবধি তারা শ্রামনে ছিল। পাঁচ-ছটা চুল্লী অলছে অন্ধকারের মধ্যে, সে-ও এক দৃশ্য!

শ্রামল এক সময় চুপি চুপি মদনকে বলে, কৈ আমার তো ভয় করছে না!

—ভয় করবে কেন?

—কি রকম যেন মনে হ'ত, শ্রামনে এলে ভয় করে।

—চল, এইবার কেটে পড়ি।

শ্রামল এগিয়ে গিয়ে কেউর কাছে এসে দাঁড়ায়, কেউদা', আমরা এবার বাই?

কেউ পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে শ্রামলকে দেয়, তোরা চলে যা, কাল কিবা পরন্তু আমার সংগে অনন্ত কেবিনে দেখা করিস, মদন তুমিও এস।

তারা চলে যায়। কেউ আর রাজেন অনেকক্ষণ বসে থাকে। সব কাজ শেষ করে বস্তীতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। কেউ রাস্তায় পাঁড়িয়ে রাজেনকে অহুর্দোধ করে, আমি আর ভেতরে যাব না। দেখে এস তো আর কোন দরকার আছে কি না।

রাজেন চলে গেলে কেউ সামনের চাদের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা কেনে। সারা দিনের অনিয়মের পর গরম চা খেতে গিয়ে কেমন যেন গা হুলিয়ে ওঠে। একটু পরেই রাজেন ফিরে এসে খবর দেয়, এখন আর কিছু দরকার নেই, গৌরীর কাছে বস্তীর অস্ত্র মেয়েরা আছে। অনেকক্ষণ কেঁদে এখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেউ সেখান থেকে হেঁটে এসে মোড়ের মাথার বাস ধরে।

সারা রাত কেউ ঘুমতে পারে না। কি একটা অস্বাভাবিক বৃষ্টি তার করে বয়েছে। বার বার যে কথা মনে পড়ছে তা হোল গৌরীর নিঃসহায় কান্না। গৌরী একা, এই বিরাট পৃথিবীতে তার অপন্যার বলতে কেউ নেই। ঠিক এ ধরণের কোন চরিত্রের সংগে কেউর পরিচয় ছিল না। হয়তো গল্পে পড়েছে কিবা কারো কাছে শুনেছে, কিন্তু নিজের জীবনে এ অভিজ্ঞতা তার বিচিত্র মনে হয়।

ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ছাদে গিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়।

দূর আকাশে একটা তারা খসে পড়ে। সেই দিকে তাকিয়ে কেউর আরেক কথা মনে হয়। তার নিজের বলতে কে আছে? এ বিরাট পৃথিবীতে সে-ও তো একা, আত্মীয়-স্বজন কারো কথাই আজ তার মনে পড়ে না। এই ছাদের নীচেই শুয়ে আছে দাদা, বৌদি, অথচ কতখানি ব্যবধান! শ্রামাও আজ-কাল ওপরে আসতে পারে না। জানলায়, দরজায় তার নিষেধের পর্দা টাঙ্গানো রয়েছে। এ চিন্তার শেষ কোথায়?

কেউর হঠাৎ মনে হয় গৌরী তার চেয়ে স্নেহী। তার কেউ নেই বলে সে একা, কিন্তু কেউর সবাই আছে, তবু সে একা। গৌরীর চেয়ে আরও বেশী একা।

কেমন জানা নেই, এ চিন্তা তার মনে শাস্তি এনে দিল, নিজেকে তার অনেক হালকা মনে হয়। ঘরে এসে বিছানার ওপরে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনন্ত কেবিনে যে আসে আশু বাবু তাকেই জিজ্ঞেস করেন, কেউর কোন খবর জান?

বেশীর ভাগ লোকই বলে, তারা কিছু জানে না। শ্রামল অবগত বলেছিল, কেউদা'র সংগে শ্রামনে গিয়েছিলাম।

—কবে?

—এই তো ক'দিন আগে, একটা ছেলেকে পোড়াতো।

প্রভাত দূর থেকে মন্ডব্য করে, কেউকে আবার এ রোগে ধরল কেন?

আশু বাবু বলেন, তা কেন, দরকারের সময় ও তো বরাবরই কাঁধ দেয়।

—কি জানি, আমার ও-সব ভাল লাগে না। নিজের বাড়ীর লোককেই পুড়িয়ে অস্থির, ভাষ ওপর পাড়ার লোক?

—সবাই এর মত ভোঁ আর সমান নয়?

প্রভাত আর তর্ক করার সময় পায় না। ছারামকের সম্পাদককে দেখে ব্যস্ত হয়ে তার সংগে আলোচনা স্তব্ধ করে, সত্যি বলছ পুলিশ গোলমাল করবে?

—তাই তো শুনেছি, ও লেখাটা ছাপানো ঠিক হয়নি।

—তুমিই তো জোর করে বললে লিখতে।

—ভালোম দেশী বিক্রী হবে। হলও তাই, প্রায় পাঁচ শ' কপি বেশী কেটেছে। কিন্তু আচ্ছ! ক্যাসাদে ফেলেছে!

—এমন কি অশ্লীল হল?

সম্পাদক ব্যাক্যার মুখে বলে, শ্লীল-অশ্লীলের কি আর বাঁধা মাপকাটি আছে, যখন যা খেয়াল চাপে—

—আগেও তো একবার নোটিশ পাঠিয়েছিল?

—সে প্রায় হ'বছর আগে। গোসারতও কম দিতে হয়নি, পাচশো টাকা।

—তারপর ?

—কাগজের নাম পার্টালাম, এখন আবার ধরেছে। সম্পাদক, প্রকাশক হওয়ার এই বিপদ। তোমাদের আর কি, লিখেই খালাস।

—কি করবে ঠিক করেছে ?

—টাকা-কড়ি কিছুই নেই। যদি বলে, হয় জেলে যাও নয় জরিমানা এত টাকা, অগত্যা জেলেই যেতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রভাত জিজ্ঞেস করে, বৌদিকে বলেছেন ?

—বলে লাভ নেই, ওর গায়ে যা কিছু গয়না ছিল সবই সেকরার দোকানে বাঁধা আছে।

সম্পাদককে খুবই বিমর্ষ দেখায়। আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচবার কোন পথই পাথর না।

উন্মাদ দিয়ে প্রভাত বলে, যাবড়িয়ো না, দেখি আমি কি করতে পারি। শেষ পর্যন্ত কারুর কাছে না পাই, বেলারানীকে এক বার বলে দেখব। আমাদের কাগজটা ও সত্যি ভালবাসে।

ইতিমধ্যে কেবিনে হৈ-টৈ করার লোকেরা এসে গেছে, সকলেই কেঁটার সাক্ষরদ। বিত্ত চেষ্টায় বলে, কেঁটার' এই সময় খুব মারলো ? এদিকে রাঘব বোয়ালের কাছে উঠতে বসতে মুখ-খিঁচুনী খাছি।

ভোঁতন বলে, রাঘব বোয়ালের আর দোষ কি, ওর পরসায় এত দিন নেচেছ কুঁদেছ, এখন ভোটের যা রেজাল্ট।

—সত্যি, কি হ'ল বল তো ? যত্নর পবর বেরিয়েছে সবই অন্তরা জিতছে।

—কেঁটার' ওস্তাদ লোক, টাইম মাসিক কেটে পড়েছে।

—কি আশ্চর্য ! বাড়ীতে গেলে পাওয়া যায় না, ভোরবেলা বেরিয়ে যায় আর অনেক রাতে ফেরে। বিত্ত মস্তব্য করে, কেঁটার'র জন্তে হা-পিাতোশ করলে তো চলবে না, চল রাঘব বোয়ালকে যা হোক কিছু বলে আসি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে সায় দেয়, চল, যা আছে বরাতে।

বিভাববনের কাছে এসে শ্রামল দেখে, ছেলেরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে চোঁচামেচি করছে, ভেতরে ঢুকছে না। মদন সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আরেক জন ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। শ্রামলকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, তুই এসে পড়েছিস, খুব ভাল হয়েছে। আমি ভাবছিলাম তোরই কাছে যাব।

—ব্যাপার কি, স্থূল হবে না ?

—ষ্ট্রাইক !

—কেন ?

—কে জানে ! সকালে এসেই সুনলাম ক্লাশে যেতে হবে না, ষ্ট্রাইক করতে হবে। ব্যস—

—বাজকাল বেশ এমন এমন ছুটি পাওয়া যায়।

—চল আমরা কেটে পড়ি। এই যে চুণীলাল, এর বাড়ী যাব বলেছি, তুই চুণীলালকে চিনিস না ? চুণীলাল মদনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলে, স্থূল দেখছি।

—ফার্ট' ক্লাশে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভাল, প্রত্যেক বছর পাশ করে। আমরা ফার্ট ক্লাশ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়তাম—কথা

বলতে বলতে তারা তিন জনে এগুতে থাকে। চুণীলালের বাড়ী বেশী দূরে নয়, দুটো রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিতে হয়।

বেশ বড় বাড়ী, দুটো ঘর পেরিয়ে চুণীলালের পড়ার জায়গা। চুণীলাল বলে, এইটি আমার রাজস্ব, এখানে পড়ি, শুই, সব কিছু করি।

শ্রামল তারিফ করে, ক'টা ছেলে এমন নিজস্ব ঘর পায়, আমার তো দেখেই লোভ লাগছে। সকলে এক সঙ্গে ছোট খাটটার ওপরই বসে পড়ে। মদন চুণীলালকে বলে, এই শ্রামলের কথাই আমি বলছিলাম। ওর হাতে অনেক সময় আছে, তোমাদের কি কাজের দরকার ?

চুণীলাল শ্রামলের দিকে তাকায়, তাহলে তো খুব ভাল হয়। সারা দিন স্থূল থেকে, তার পর পড়া করতে হয়, তাই বেশী সময় পাই না, যদি তোমার সুবিধে থাকে—

—শ্রামল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের সুবিধে ?

—দেশের কাজ করার।

—দেশ !

—হ্যাঁ, চোখ বুজে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না, দেশের জন্তে ভাবতে হবে। অত্যা-অত্যাচারের বিরুদ্ধে—

শ্রামল থামিয়ে দেয়, কার অত্যাচার ?

—সে কি আর এক দিনে বোঝান যায় ? আমাদের অফিসে এস, দেবেনদা' সব বুঝিয়ে দেবেন।

—দেবেনদা' কে ?

—আমাদের নেতা, এরকম লোক আমি দু'টি দেখিনি। খুব বড় পণ্ডিত, দেশের জন্তে জেলে গেছেন কত।

মদন এতক্ষণে কথা বলে, আমি আর শ্রামল তোমার সঙ্গে এক দিন যাব।

—এক দিন কেন ? আজই চল না।

শ্রামল হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমরা কি কাজ কর ?

চুণীলাল বিজ্ঞের হাসি হাসে, সে কি এক রকম, হাজারটা কাজ আছে। এই যে ষ্ট্রাইক, সে তো আমাদেরই কাজ।

—তাই না কি ?

—কোন স্থূল আজ হবে না। সকাল থেকে আমাদের দল চলে গেছে, তোমাকেও এসব কাজ করতে হবে।

—এতে আমি রাজী আছি।

—আমাদের দাবী যদি না মানা হয়, তাহলে এই দলে এমন একদল ছেলে আছে যারা নিম্নে কলকাতার সহর লণ্ডনও কে সব কিছু বন্ধ করে দিতে পারে।

মদন ও শ্রামল সবিস্ময়ে চুণীলালের কথা শোনে, তার বন্ধু আর দলের চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ।

ঐ ক'দিন যে কেঁটকে কেউ খুঁজে পায়নি, বলা বাহুল্য, তা প্রধান কারণ গৌরী। সংসারে অভিজ্ঞ কেঁট ভাল করেই বুঝেছি গৌরীর মন থেকে লজ্জা, ভয়, সংকোচ সরিয়ে দিতে না পারা তাকে সহজ করে তোলা সম্ভব নয়। সেই জন্তেই রোজ কেঁট তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, কথার কোশলে ফেলে-আসা দিনের কথা জে নিয়েছে এবং তারই কাকে এই গোলমালে হুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাই নেওয়ার জন্তে নিজের যুক্তিকে গৌরীর মনে বহুমূল করার চেষ্টা

করেছে। বার বার সে বলেছে, অত কীদলে চলে না, নিজেকে না দেখলে কে তোমায় দেখবে?

গৌরী কান্নায় ভেসে পড়ে, আর যে পারছি না।

—পারতে হবেই।

—আপনি ভাবতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে বাবা, মা, ভাই, বাড়ী-ঘর—

কেউ নীচু গলায় বলে, জানি তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু বাঁচতে তো হবে।

গৌরী উদাস চোখে অল্প দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, আর ইচ্ছে নেই।

—ও কথাই কোন মানে হয় না।

—কার জন্তে বাঁচব?

—নিজের জন্তে।

গৌরী উত্তর খুঁজে পায় না, নীরবে মাথা নাড়ে।

কেউ ধমকে ওঠে, যদি মরতেই চাও তো চটপট মর, গঙ্গায় অনেক জল আছে।

একথা বলেই কেউ চলে এসেছিল! কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে সে বুঝতে পারে অজ্ঞার করেছে। গৌরীর সব আশা ভেসে গেছে, তার উপর অযথা এতখানি কঠোর হওয়া উচিত হয়নি। কিরে এসে দেখে, গৌরী সেইখানেই বসে আছে। কেউকে দেখে কাতর কণ্ঠে বলে, আমায় কিছু পরসাদ দেবেন, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

কেউ পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়।

—আপনি আমার জন্তে এত করলেন, জানি না—

—শোধ দিতে পারবে কি না ভাবছ? হাতে পরসাদ থাকলে বার দরকার তাকে দিই, ফেরৎ পাব বলে নয়।

—শরীরটা খারাপ লাগছে, এখন আমি আসি।

কেউ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বোঝে সত্যিই সে অসুস্থ। বলে, এতক্ষণ বাড়ী যাওনি কেন?

—আপনাকে না বলে কি করে যাব, তা ছাড়া হাতে একটাও পরসাদ ছিল না।

—তুমি ভেবেছিলে আমি ফিরে আসব।

গৌরী এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলতে চলতে বলে, ই্যা।

—কেন?

—তা জানি না।

পরদিন সকালে গৌরী কেউ মন্থমেণ্টের অদূরে গৌরীর সঙ্গে বসে আলুকাবলী খাচ্ছিল। দিনের আলো নিবে গেছে, দূরে এসপ্লানেড, বিজ্ঞাপনের ঝকঝক আলো, ট্রাম-বাস, কত রকম লোক। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেউ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, এত বড় সহরে তোমার থাকার একটা জায়গা হবে না?

গৌরী খুব আস্তে উত্তর দেয়, এত দিন তো হয়নি।

—তুমি চেষ্টা করনি।

—করেছি।

—কি?

—ক'লকাতায় পৌঁছে আমি আর আমার ভাই ওই টালীগঞ্জের

## রুগ্ন অবস্থায় বেশী : ... ট বার্লি দেওয়া হয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

① রুগ্ন অবস্থায় বা রোগভোগের পর খুব সহজে হজম হ'য়ে শরীরে পুষ্টি যোগায়।

② একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ন'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বার্লিশস্তের সবটুকু পুষ্টি-বর্ধক গুণই বজায় থাকে।

③ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীলকরা কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাটি ও টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

# পিউরিটি

৪৫

ভারতে এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

বিনামূল্যে

পুষ্টিকাটির জন্ত লিখুন :—অ্যাটল্যান্টিস (ইন্সট) লিমিটেড (ইংল্যান্ড-এ সংগঠিত)  
ডিপার্টমেন্ট, এফ বি-পি-২, পোঃ বক্স ২০০২, কলিকাতা-১৩



বস্ত্রীতে থাকার জায়গা পেলাম সে-ও শুধু পণ্ডিত মশাইয়ের জন্তে। বস্ত্রীর সামনে যে পাকা দালান দেখেছেন, ওটা এক জমিদারের। উনি পণ্ডিত মশাইকে খুব শ্রদ্ধা করেন। ক'লকাতায় এসে পণ্ডিত মশাই ওদের বাড়ী উঠতেন। আমরা যখন নিঃস্ব অবস্থায় এখানে এলাম, উনি দয়া করে নিজের জমিতে এই বস্ত্রীটি করে দেন। আমরা সাত-আট ঘর লোক থাকি সবাই এক গায়ের। আগে ভাড়া নিতেন না, এখন—

কেউ বাবা দিয়ে বলে, আমি তা শুনতে চাই না, তুমি নিজেকে চেষ্টা করো ?

—তাই তো বলছি। থাকবার জায়গা পেলাম, কিন্তু হাতে এক পরমাণু নেই। ভাইটা এসেই অস্বখে পড়ল, কি দুর্ভাবনা ! কাজের জন্তে বাড়ী বাড়ী ঘুরছি, কিছুই পাইনি।

—কেন ?

—কে আমার রাখবে ? কি পারি আমি, না শিখেছি লেখাপড়া, না আছে ভারী কাজ করার শক্তি।

—সেলাইএর কাজ জান না ?

—জানি। কাউকে করে দিলে খুসী হয়, কিন্তু পরমাণু দেয় না।

—ঘরের কাজ ?

—কে আমার জামিন হবে ? উটকো লোক কেউ রাখতে চায় না।

—কোথাও কাজ পাওনি ?

হু-এক জায়গায় পেরেছি। বারা ভূতের মত খাটিয়ে নেয় আর শাসের শেষে ছুতো খুঁজে তাড়িয়ে দেয়, মাইনে দেয় না। তখন অত টাকার দরকার,—

গৌরী থেকে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করে, তার পর ?

—ভিক্ষে শুরু করলাম, ভাইয়ের চিকিৎসা তাতে যা হয় হত। এমনই বরাত, হল একেবারে রাজরোগ। কেউ কোন উত্তর দেয় না। গৌরী নিজের মনে বলে, ভিক্ষেই বা আজকাল ক'জন দেয়, আর দেবেই বা কত জনকে। এত ভিকিরি।

—তোমার মত ভিকিরিকে কেউ ভিক্ষে দেয় না—

গৌরী কেউর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন ?

—তুমি তো চোখ তুলে ভিক্ষে চাও না।

—মানে ?

—যদি বাবুদের চোখে চোখ রেখে ভিক্ষে চাইতে, তারা দিত।

গৌরী বিস্মিত হয়, আপনি কি বলছেন ?

—সত্যি কথা, এক বর্ণ বানিয়ে বলছি না। দয়া করে কেউ ভিক্ষে দেয় না, খুসী হয়ে দেয়।

—আপনি ?

—আমার কথা ছেড়ে দাও, এক দিন জানতে পারবে। তবে যা বলছি শুনে রাখ। চোখ তুলে চললে এ সহরে থাকবার তুমি অনেক জায়গা পাবে, বেশ ভাল ভাবে থাকবার। নইলে না খেয়ে মরতে হবে।

গৌরী কি বলতে যায়, কেউ থামিয়ে দিয়ে বলে, আর দেবী কোর না, বাড়ী যাও।

এ এসেই শেষ কিন্তু এখানেই হল না। পরদিনই সকালবেলা কেউর সঙ্গে দেখা হতেই গৌরী ঐ একই কথার অবতারণা করে।

—কাল আপনি যা বললেন আমি এখনও বুঝতে পারিনি।

—এখনও ভোলনি সে কথা ? আস্তে আস্তে বুঝে ফেলবে।

—আপনি আমার কি করতে বলেন ?

কেউ তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি যা বলব তাই করবে ?

—তা ছাড়া আর কি করব ?

—আমার সঙ্গে দোকানে চল, কয়েকটা জামা-কাপড় কিনে নাও।

—জামা-কাপড় ?

—তোমার কাপড়-চোপড় বড় ময়লা, একসঙ্গে ঘুরলে লোকে তাকায়।

—কিন্তু আপনার কাছ থেকে কি করে নেব, বস্ত্রীর লোকেরা কি ভাবে ?

—কি আবার ভাবে, সবাইকে বোল কেউদা' দিয়েছে।

গৌরীর চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, কেউদা', সত্যি আপনাকে কেউদা' বলে ডাকবে ?

—নয়ত কি কেউদা বলে ডাকবে ভেবেছিলে ?

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি, আপনি যে কি বলেন ?

—চল, দোকানে যাওয়া বাক।

রাস্তায় চলতে চলতে রেকিউজিসের ফুটপাথের দোকান থেকে ওরা শাড়ী-ব্লাউজ কেনে। গৌরী প্রথমেই বলে'দিয়েছিল, দু'টি মিলের শাড়ী ছাড়া আর কিছু কিনবে না। কেউ কথার অন্তথা করে নি, গৌরীর পছন্দমত নীল আর হলদে রঙের ছাপা শাড়ী কিনে দেয়।

—ব্লাউজ কিনবে না ?

—আমার আছে।

—আর কি নেবে ?

গৌরী একটু ইতস্ততঃ করে বলে, বরং একটা সারা—

—নাও না।

দোকান থেকে বেরিয়ে কেউ বলে, বিকেলে নিশ্চয় করে নীল শাড়ী পরে এস।

গৌরী সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আজ প্রায় চার দিন বাদে দুপুরবেলা কেউ অনন্ত কেবিনে এল। বিশেষ কোন লোক ছিল না, আস্ত বাবু চেয়ারে বসে চুলছিলেন। কেউর গলা শুনে চমকে উঠে, চোখ কচলে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বল তো ? থাকো-থাকো আজকাল কোথায় উপে যাও পাত্তা পাওয়া যায় না !

সে কথার উত্তর না দিয়ে কেউ আস্ত বাবুর কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়ে, বড্ড ক্ষিপে পেরেছে, চটপট খাবার দিতে বলুন।

—কি আনবে ?

—ডিম ভাজা, কুটি মাখন আর যদি চপ থাকে—পেট ভরে খাব।

আস্ত বাবু অর্ডার দিতে রান্নাঘরে চলে যান। ফিরে এসে কেউর পিঠ চাপড়ে বলেন, সত্যিই আশ্চর্য লাগছে, এরকম হাসিখুসী ভাব তো তোমার অনেক দিন দেখি নি ?

—কেন, আমি কি চিরকাল হা-ভাশ করেই বেড়াব, বলিহারি বুঝি।



—এ বুড়োকে কীকি দিতে পারবে না, কি হয়েছে বল।

—আপনার কি মনে হয়?

আশু বাবু ভেবে নিয়ে বলেন, হয়তো কোথাও পাকা চাকরী পেয়েছে।

—ঠিক ধরেছেন। পাকা চাকরী, তবে মাইনে দেয় না। বাকু গে, এদিকের খবর বলুন।

আশু বাবু এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন, এবার ব্যস্ত হয়ে বলেন, সর্বনাশ হয়েছে, রাঘব বোয়াল কাং—

—সে তো জানি, হেরে গেছে। তাতে কি হোল?

—এর পরও জিজ্ঞেস করছ কি হ'ল? ভদ্রলোক রোগে আশুনা, হোঁড়াগুলোকে বা তা বলে গালমন্দ দিয়েছেন।

কেউর মুখ ধমধম করে, কি বলেছে?

—বিশেষ করে তোমার উপর রাগ, ওর টাকা নষ্ট করেছে, ওর নাম ডুবিয়েছ তোমরা—

—সে গাধাগুলো কিছু বলতে পারলো না!

—কি বলবে, জান তো তুমি ছাড়া ওরা এক পা চলতে পারে না।

কেউ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, খাবার রেখে দিতে বলুন, আমি রাঘব বোয়ালের সাথে দেখা করে আসি।

আশু বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এত তাড়া কিসের? না খেয়ে যেও না।

কিন্তু কেউ ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে, ও কত বড় শয়তান আমি দেখতে চাই।

রাঘব বোয়ালের বাড়ী বাবার পথে কেউর সঙ্গে ভৌতনদের দেখা হয়ে গেল, তারা অনেকেই রকে বসে আড্ডা মারছিল। ভৌতন বলে, কেউদা, এত দিন কোথায় ছিলে, আমরা যে গুরুখোঁজা করছি।

কেউ সে কথাই জবাব দেয় না, গম্ভীর গলায় বলে, আমার সঙ্গে আস।

—কোথায়?

—রাঘব বোয়ালের বাড়ী।

—ওরে বাপসু। সেদিন বা অপমান করেছে, আর ও-মুখে হজি না।

—এত ভয় কেন, আর আমার সঙ্গে।

ভৌতন রোগে বলে, তুমিই আমাদের নাচিয়ে দিয়ে কেটে পড়লে, আর বত অপমান সহ্যে হ'ল—

—তোরা কি মানুষ, বেশ কবে শুনিরে দিয়ে আসতে পারলি না?

আর কেউ আপত্তি করে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউর সঙ্গে যেতে হয়। আজ কিন্তু দারোয়ান গেট ছেড়ে দেয় না, বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, কিস্কা মাঙতা?

কেউ খিঁচিয়ে ওঠে, কাঁকে চাই জান না, রাঘব বোয়ালকে, তোমার বাবু।

দারোয়ান আর বাধা দেবার সাহস পায় না। কেউর মেজাজ দেখে বাবুকে খবর দিতে চলে যায়।

কেউরা এসে বসবার ঘরে জমা হয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না, আসন্ন বাড়ির পূর্ব মুহূর্তের মত ধমধম করছে। কেউর চোখমুখ কালি, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে।

রাঘব বোয়ালের চিংকার শোনা যায়, কাছে বসুন দিয়া।

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, ও লোক বাং নেহি ওনা, জবরদস্তি—

তার পরেই সিঁড়িতে পট পট করে চটির আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে রাঘব বোয়াল দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢোকেন, কি চাই?

কেউ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, কৈফিয়ত!

রাঘব বোয়াল হতভম্ব হয়ে যান, কৈফিয়ত কিসের?

—এদের কাছে আপনি কি বলেছেন?

—কেন, ওরা বলেনি?

—আপনার মুখ থেকে শুনেতে চাই। বুঝতে পারছি না ওরা বাড়িরে বলছে কি না।

রাঘব বোয়ালের আর বৈধ্য থাকে না, বলেন, ওরকম চড়া গলায় আমার সামনে কথা বোল না।

—কেন, আমি কি আপনার চাকর?

—শাট—আপু।

—ইউ শাট—আপু।

সমস্ত ঘর-স্বত্ব সবাই শিউরে ওঠে। ভৌতনাবা ভয় পায়, তারা জানে রোগে গেলে কেউর মাথার ঠিক থাকে না। তেমনি ভয় পায় রাঘব বোয়ালের বাড়ীর লোকেরা যারা এর মধ্যে এসে জড় হয়েছে ঘরে, বারান্দায়। তারা জানে, মুখের ওপর কথা রাঘব বোয়াল কোন দিন বরদাস্ত করতে পারে না। অসহ্য রাগে রাঘব বোয়ালের কান লাগ হয়ে ওঠে, তোমাদের আমি পুলিশে দেব, শয়তান। টাকা চুরি করেছে?

—তাকে থামিয়ে কেউ চিংকার করে বলে, টাকা চুরি আমরা করিনি। তুমি করেছে, এত বড় বাড়ী, গাড়ী, সব লোক ঠকিয়ে। আমরা চোর হলে তুমি ডাকাত।

—কি! রাঘব বোয়ালের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

তুমি প্রত্যেক দিন লোক ঠকাও, আমরা ঠকার তোমাকে?

রাঘব বোয়ালের বড় ছেলে কেউর কাছে এগিয়ে আসে, বাজে গোলমাল বাড়ীর ভেতর করবেন না, রোজ এসে যে টাকা নিয়ে গেছেন তার কি করেছেন জবাব দিন।

—ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ করেছে। কে জানত আপনার বাবাকে? চার দিকে তার নাম ছড়িয়ে দিয়েছি, এতগুলো মিটিং ডেকেছি, নিজের চোখেই তো দেখেছেন।

—এত করলেন কিন্তু বাজে ভোট পড়ল না কেন?

—দেশের লোক আর গাধা নেই বলে। তারা মানুষ চিনতে শিখেছে। ভোট দিয়েছে এক জন প্রফেসারকে, সে এত বিজ্ঞাপনও দেয়নি, লোক ভোলাবার চেষ্টাও করেনি।

রাঘব বোয়াল আর চুপ থাকতে পারেন না, ঠাঁক দেন, দারোয়ান, রঘু পাঁড়ে—

—দারোয়ানদের বাবাও আমাদের কিছু করতে পারবে না। তবে কেন হেরেছেন, আসল কারণটা জেনে নিন, আমাদের দোষ নয়, নিজেরই দোষ। এত দিন ধরে যে সব নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করেছেন তারাই চাবুক মারলে এবার আপনাকে।

একথা বলেই কেউ নিজের দলকে ডাক দেয়, চলে এস সবাই।

ভৌতনরা এতক্ষণ কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সংকেত পেয়ে কেউর সঙ্গে হুড়মুড় করে বেরবে আসে। হতবাক রাঘব বোয়াল নির্দ্বন্দ্ব

আফ্রোশে চেয়ারে বসে পড়েন। চাকর, দারোয়ানদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ছেলেকে বলেন, ওদের সব কাজে বেতে বল, আর ডাক্তারকে এক বার খবর দে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কেঁঠ দেখে গৌরী ঝাঁড়িয়ে আছে, পরনে তার সকালের কেনা সেট নীল শাড়ী।

—তুমি অনেকক্ষণ এসেছ ?

—আমি ঘণ্টার ওপর।

—একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম।

—জানি কি হয়েছে, আমি বেশ এখানে ঝাঁড়িয়ে কত ক'কি দেখছিলাম।

—নতুন শাড়ী পরে বেশ দেখাচ্ছে।

গৌরী চুপ করে থাকে।

—চল একটু বেড়িয়ে আসি।

কেঁঠ গৌরীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। সাহেবী পাড়ায় বড় বড় দোকানের সামনে, যেখানে আলোর মেলা, সেখান দিয়ে হাঁটতে হুঁজনেরই ভাল লাগে। কত রকম জিনিষ, রং-বেরং-এর মূল্যবান সামগ্রী। এক সময় কেঁঠ বলে, কত দামী দামী জিনিষ দেখছ ?

—বেশ সুন্দর।

—ঐ শাড়ীগুলো দাম জান ?

—কত ?

—একশ' দেড়শ', দুশ'।

—বা বা ! কারা পারে ?

—যাদের অনেক টাকা আছে।

গৌরী কেঁঠের দিকে তাকায়।

—তাই ত, অনেক দূর হেঁটে এসেছি। বাড়ীতে রান্না করেছ ?

—না, গিয়ে করব।

—চল, বরং কোন দোকানে ঢুকে খেয়ে নেওয়া যাক।

মিষ্টির দোকানে ঢুকে ওরা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসে। গৌরী বলে, বা, কি সুন্দর জায়গা ! এতটুকু ঘর, পাখা ঘুরছে, পাখরের টেবিল—দোকানের ছোঁড়া চাকর এসে জিজ্ঞেস করে, কি আনব বাবু ?

কেঁঠর বা মনে এসে হুঁচকি বকম খাবার বলে দেয়। গৌরীর মন অনেক দিন বাদে বেশ হালকা হয়ে যায়। হুঁজনে নানা রকম গল্প করে। গৌরী জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ীর কথা যে বলবেন বলেছিলেন ?

কেঁঠ হাসে, হ্যাঁ, আমার একটা বাড়ী আছে—

—বলুন—

—ওই তো বললাম, এখনও ভাগ হয়নি। হ'লে আমার হবে নীচে একখানা ঘর, ওপরে একটা, এক ফালি ছাদ

—তা নয়, বাড়ীতে কে আছেন ?

—কেউ নেই।

—সেদিন যে বলছিলেন আমার কথা ?

—ও আমার ভাইঝি।

—তবে কেউ নেই বললেন কেন ?

—ওকে আর আমার কাছে আসতে দেয় না।

—কে ?

—দাদা-বৌদি।

—দাদা-বৌদির কথা তো বলেন নি ?

—ওদের ভাল লাগে না।

—কেন ?

—বড় টাকা, আনা, পয়সার লোক। মনটা এতটুকু ছোট, কেঁঠ আঙ্গুল দিয়ে পরিমাণ দেখায়। ইতিমধ্যে খাবার এসে পড়ায় এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। হুঁজনেরই বেশ খিদে পেয়েছিল, তাই ভাল করে খাবারের সম্বাবহার করে। কচুরী, সিঙ্গাড়া, আরও হুঁবার আনিয়ে নিতে হয়।

খাওয়া শেষ হলে দাম চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, জোরে বৃষ্টি নামার আগে ট্রামে করে তোমাকে পৌঁছে দিই।

গৌরী জোরে হাঁটতে থাকে। ট্রামে বেশী ভীড় ছিল না, সামনের দিকে খালি সিটে হুঁজনে পাশাপাশি বসে। গৌরী বলে, আজও কিন্তু কাজের কথা হল না।

—সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কত দিন আপনি এরকম টাকা দেবেন ?

—ষত দিন তোমার দরকার।

টালীগঞ্জের কাছে এসে ট্রাম থামে, বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। হুঁজনে নেমে দৌড়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে ঝাঁড়ায়।

—উঃ, কি বড় বড় বৃষ্টিব ঝাঁটা !

—তোমার জামা-কাপড় যে একেবারে ভিজ্ঞে গেছে।

—আপনি বুঝি শুকনো আছেন ?

—আমার তো ভয় নেই, ভেজা অভ্যাস আছে। দেখ, তোমার আবার শর না হয়।

—আমরা বাঙালদেশের লোক, জলেই মানুষ। ঐ যে ট্রাম আসছে, আপনি চলে যান।

—বেশ, তুমি তাহলে বাড়ীতে যাও।

কেঁঠ ট্রাম-ষ্টপেজে আসে। সেখানে রাজেনের সঙ্গে দেখা, একেবারে ভিজ্ঞে গেছেন যে কেঁঠ বাবু।

—হঠাৎ বৃষ্টি এল।

—গৌরী কোথায় গেল ?

—বাড়ী গেছে।

প্রথম ট্রামটা এক রকম না থেমেই চলে যায়। অগত্যা কেঁঠ ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়ে রাজেনের সঙ্গে আলোচনা করে। রাজেন জিজ্ঞেস করে, আপনারা তো ভবানীপুরে মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন, না ?

—হ্যাঁ, তুমি ও-পাড়ায় ছিলে বুঝি ?

—বাজারের কাছেই ছিলাম, দেখলাম আপনারা ঢুকলেন।

—তুমি এলে না কেন ?

—কাজ ছিল। কিন্তু শাড়ী কিনতে আপনি ঠকে গেছেন।

—কেন ?

—ও দোকানগুলোতে দামের ঠিক থাকে না। আরও আট আনা, দশ আনা কমে পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় ট্রাম এসে পড়ে।

—আজ চলি ভাই, আর এক দিন আসব।

কেঁঠ ট্রামে উঠে পড়ে।

[ ক্রমশঃ ]



এই শিশুটির জন্য এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না

কারণ সে

# ল্যাক্টোজেন

খেয়ে পুষ্ট

LG/G/18

সিলোন রেডিয়ে থেকে 'ল্যাক্টোজেন' হিন্দী  
প্রোগ্রামে বীণা রায়ের কথা শুন।

রবিবার...রাত্রি ৭টা-৪৫ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা এবং  
বুধসপ্ততিবার...রাত্রি ৮টা-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি  
৮টা-৪৫ মিঃ।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

18

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসল্‌স অর্ডাটস ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পোষ্ট বক্স নং ৩৯০ পোষ্ট বক্স নং ৩১৫ পোষ্ট বক্স নং ১৮০  
কলিকাতা বোম্বে বার্মা

'F'

# তমসী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## জরাসন্ধ

এক জনের সংসার, জিনিষপত্রের বাস্তব্য নেই। যেটুকু ছিল,

তাও দরাক্ত ভাবে বিলিয়ে ছাড়িয়ে খুব সঙ্কিশ্ত হয়ে গেল।

চোপে পড়বার মত বইল শুধু, একটা বড় আকারের প্যাকিং কেস। তার মধ্যে ভর্তি বই। কিন্তু জিনিষ ছাঁটাটাই যতই সহজ হোক, মানুষ ছাঁটাটাই একটু কঠিন হয়ে পড়াল। বনমালীকে দেশে যেতে হবে। কিন্তু মনিবকে একা ছেড়ে দেওয়া তার একেবারেই ইচ্ছা নয়। তাকে রাজী করাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবতোষের পরিকল্পনা কিছু অদল-বদল করতে হল। নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার আগে কিছু দিন তার বিক্রমপুরের গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। অনেক দিন মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। কয়েক মাস আগে এখানে এক বার এসেছিলেন সুলোচনা দেবী। বাড়ি ফেলে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয়নি। ছেলেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখেন, কিন্তু যাবার জন্তে কোনো দিন পীড়াপীড়ি করেন নি। চেটে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'বেদিন ওর ইচ্ছা হবে আপনিই আসবে। ভালো আছে, এইটুকু জানলেই আমার হল।' সে খবরটা অবগত নিয়মিত জানিয়ে থাকে দেবতোষ। সংসারে তারও তো ঐ এক মা। শুধু বনমালীকে এড়ানো নয়, ক'টা দিন মায়ের কাছে গিয়ে থাকবার জন্তে তার নিজের গরজও কম ছিল না।

খাসবিলের দেশ। ষ্টীমার-ট্রেন থেকে পঁচিশ মাইল নৌকা-পথ। সকালে রওনা দিয়ে বাড়ির ঘাটে পৌঁছতে বেলা প্রায় শেষ। সুলোচনা দেবী একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। উঠানে ধান শুকোচ্ছিল, পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছিল রাধুর মা। দাদাবাবুকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিতেই ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এসে বললেন, ছা রে, একটা খবর দিতেও পারিস নি? সারা দিন পেটে একদানা ভাত পড়েনি। দুটো চাল ফুটিয়ে নামাতে যে সঙ্কট হয়ে যাবে।

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললে, কেন, দুপুরবেলা যা বেঁধেছিলে, তুজনে মিলে সব বুঝি চোঁড়ে-মুছে খেয়েছ? পাত্রে কিছু নেই?

—শোনো, ছেলের কথা! আমি কি জানি, তুই আসবি?

রাধুর মা বলল, বাড়িতে তো ভাত রয়েছে, মা! ডাল-সরকারী যা আছে, দাদাবাবুর হয়ে যাবে।

—সে তো যাবে। কিন্তু সেই ও বেলার শুকনো আলো চালের ভাত খেতে পারবে কেন? তুই যা, দুটো চাল ধুয়ে আন।

—কিন্তু দরকার নেই মা, বাধা দিয়ে বলল দেবতোষ, যা

আছে, তাই দাও। কত কাল তোমার 'দলা' খাইনি মনে করতে পার?

সুলোচনা হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না। ভাবলেন, কী বলে পাগল ছেলে! তাঁর মনে নেই? এই তো সেদিনের কথা, ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের পাতের ভাত-সরকারী না পেলে ছেলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসত। শুধু পাতের হলেই চলবে না। মেখে ডেলা পাকিরে রাখতে হবে। শুকনো শুকনো করে মাখা সেই 'দলা'ই ছিল দেবতোষের কাছে অমৃত। শেষ কণাটি পর্যন্ত খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলত। অথচ অন্তের হাতের অনেক বেশী উপাদেয় রান্না তার মুখে রুচত না।

খালের ঘাটে স্বান সেয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় কাঁটাল কাঠের পিঁড়ির উপর এসে বসলো দেবতোষ। সেই আগের দিনের মত সুলোচনা ভাত মেখে মেখে তুলে দিলেন তার পাতের উপর। দেবতোষ পরম ভূপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, আমি যে আসবো, তুমি নিশ্চয়ই জানতে, মা! যা যা ভালবাসি, সবই তো বেঁধেছ। মোচার ঘট, খোড়ছেঁচকি, কুমড়োর ডগা দিয়ে মটর ডাল, কুলের অখল—কোনটাই বাদ পড়েনি।

সুলোচনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কী করে জানবো, বাবা? যিনি সব জানেন, এ তাঁরই কাজ। তিনিই হয়তো আমার হাত দিয়ে এই জিনিষ ক'টা রাঁধিয়ে রেখেছেন তোমার জন্তে।

গ্রামের সঙ্গে দেবতোষের আঠশষ নাড়ির যোগ। কিন্তু এবার তার কোথায় যেন একটা বাঁধন শিখিল হয়ে গেছে। হুঁদিন যেতে না যেতেই সেটা মা'র চোখেও ধরা পড়ল। দেখলেন, ছেলে তেমনি মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি খোঁজ-খবর নেয়, অস্থখে বিষখে ডাকতে এলে যায়, যা করবার করে। তবু বোঝা যায়, এ সব শুধু অভ্যাসের টান, এ সবের মধ্যে মন কোথাও নীড় বাঁধতে পারছে না, হয়তো আশ্রয় খুঁজে ফিরছে অল্প কোনোখানে।

হ্যাঁ রে, দেবু, বনমালী ভালো আছে তো? একদিন প্রশ্ন করলেন সুলোচনা।

হ্যাঁ, মা, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে আর আমাকে ফিরতে হবে না। চার মাসের ছুটি নিয়েছি।

সুলোচনার মুখে হঠাৎ হৃষ্টিক্তার ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু

ছেলেকে তা জানতে দিলেন না, অল্প কথা পাড়লেন, মহেশ কি ওখানেই আছে না বদলি হয়ে গেছে?

—ওখানেই আছেন।

—তার ছেলে দু'টি?

—তারো তো ওখানে থাকে না! কোলকাতার বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে।

—ওখানে আর কার কাছে থাকবে? বলে নিখাস কেসলেন সুলোচনা। আহা! ঐ রকম মানুষ, তার কপাল দ্বাধ।

সুলোচনা চলে যাচ্ছিলেন। দেবতোষ কী একটা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ করছেন দেখে ফিরে দাঁড়ালেন, কিছু বলবি?

—বলছিলাম, এবার একটু ঘরে আসি।

—কোথায় যেতে চাস?

—প্রথম কিছু দিন কোলকাতা। তারপর, ভাবছি এক বার দক্ষিণ দিকে বেরাবো। তুমিও চলে না?

সুলোচনা কোনো দিন বাড়ি ছেড়ে নড়তে চান না। দেবতোষ দু'চার বার চেষ্টা করেছে তীর্থের নাম করে মাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু ঠর মুখে ঐ এক কথা—‘এই শ্বশুরের ভিটেই আমার সব চেয়ে বড় তীর্থ, বাবা! এখানে যদি তোখ বৃজতে পারি, আর তোর হাতের একটু আঙুন পাই, তাহলে আর কিছুই চাই না,’ আজও সেই কথা বলেই দেবতোষের এই ঘরে আসার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিতে পারতেন। কিন্তু এই ক’দিন তার মুখের দিকে চেয়ে সহজেই বুঝতে পেরেছেন, তাঁর এই আত্মভোলা ছেলেটির উদার নিলিপ্ত মনের কোণে এমন কোনো দাগ লেগেছে, যেখানে মায়ের হাতের একটুখানি স্পর্শ তার একান্ত প্রয়োজন। কে জানে, হয়তো সেই জন্তেই সে সকলের আগে মায়ের কাছেই ছুটে এসেছে। সুলোচনা ছেলের জন্তে কিছু দিন অন্তত তাঁর শ্বশুরের ভিটার মায়া ত্যাগ করা দরকার।

কর্তাদের আমল থেকে কলকাতার গুদের একটা এজমালি বাসা রয়ে গেছে। দেবতোষের জ্যাঠাতুতো ভাই মহীতোষ সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। দোতলার এক পাশে খান তিনেক ঘর, রান্নাবর ইত্যাদি নিয়ে একটা অংশ সুলোচনা নিজের জন্তে রেখে দিয়েছেন। আপাততঃ সেইখানে গিয়ে গুঠাই স্থির হল।

এই তো সে দিনের কথা। হেনা মনে মনে স্থির করেছিল, এ জেল তাকে ছাড়তে হবে। সে অনুরোধ জানাবার আগে জেলের সাহেবের কাছে কী বলবে, কতটুকু বলবে, তা-ও সে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখছিল। কমলার প্রণের উত্তরে জানিয়েছিল, নিজের কাছ থেকে পালাতে চাই। তার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনার স্রোত এমন জায়গায় তাকে নিয়ে এল, যেখানে আর পালাবার প্রয়োজন রইল না। যাকে উপলক্ষ করে সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তিনিই নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, সমস্ত ভয়-ভাবনা-সমস্ত হাত থেকে তাকে চিরদিনের তরে মুক্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই মুক্তিই কি সে চেয়েছিল? শৃঙ্খলা তো মুক্তি নয়? এ যেন ‘প্রতিদিন তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। এক দিন সে বন্ধন থেকে পালাতে চেয়েছিল, আজ এই নিরাপত্তা রিস্কতা থেকে পালাতে চায়। আজকার প্রয়োজন যেন আরো বেশী। জেনানা ফাটকের এই ক্ষুদ্র বেটনীর

মধ্যে প্রতিটি ছোট-বড় পরিচিত বস্তু তাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে যেতে হবে, এখানে তোমার জায়গা নেই। জেলের সাহেব তাকে স্নেহ করেন। কিন্তু তার অন্তরের এই অর্থহীন ব্যাকুলতা তিনি বুঝতে চাইলেও সে বোঝাবে কেমন করে? এই বিব বৃকে করে কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় সে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কী উত্তর দেবে যখন জানতে চাইবেন, কী তোমার কষ্ট? কিসের জন্তে তুমি চলে যেতে চাও?

এমনি যখন তার মনের অবস্থা, তখন এক দিন সকালবেলা শ্রীলা এসে জানাল, জেলের সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হেনার হঠাৎ মনে হল, তিনি বোধ হয় অন্তর্দ্বামী। তার মনের ডাক শুনতে পেয়েছেন। শ্রীলা বলল, তৈরি থাকিস। চারটার সময় উনি আফিসে এলেই নিয়ে যাবো।

পথে যেতে যেতে হেনার পা দু'টো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বুকের ভিতরে দুধ-দুধ করছে কিসের যেন আশঙ্কা। কেন ডেকেছেন, আপনি কিছু জানেন মাসীমা? শুধু মূহু স্বরে জিজ্ঞাসা করল শ্রীলাকে।

শ্রীলা হেসে ফেলল, ভয় নেই। কীসি দেবেন না তোকে।

একটা কি ফাইল দেখছিলেন তালুকদার। গুদের সাড়া পেয়ে চোখ তুললেন। শ্রীলা সেলাম করে বলল, আমি তাহলে যাই বাবা। খাটনিটা বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওকে নিয়ে যাবো। জেলের বাবু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। দু'-তিন মিনিট পরে ফাইলটা

কর্মিকমতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



• কল্লো প্রস্তুত  
• স্ট্রিমে সেকা  
• মেশিনে প্যাক  
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি  
ও সর্বত্র ব্রহ্ম করিতে

আর্য্য বেকুরি অ্যান্ড কনফেকশনারী  
কলিকতা - ২৯



বন্ধ করে ফিটা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, হ্যাঁ ; তোমাকে ডেকেছিলাম ; একটা কাজ করতে হবে।

হেনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তালুকদার বললেন, ভাবছিলাম, মেয়েদের কিছু উল্লের কাজ শেখালে কেমন হয় ? এই যেমন ধর—মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, মাকনার এসব যদি বুনেতে শেখে, জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা করে খাবার সংস্থান হতে পারে।

হেনা ঘাড় নেড়ে জানাল, এ বিষয়ে সে একমত।

—শেখাবার ভারটা তোমাকে দিতে চাই।

—আমি পারবো কি ? বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল হেনা।

—কেন পারবে না ? আমি তো তোমার হাতের কাজ দেখেছি।

হেনা মাথা নত করল। হাতের কাজের প্রমাণটা স্মৃশীলা লুকিয়ে রাখতে চাইলেও জেলের সাহেবের কাছে গোপন নেই, এটুকু জানতে পেরে লজ্জিত হল। তালুকদার বললেন, জেলের সিপাইরা সরকারী খরচায় একটা করে জারসি পেয়ে থাকে। সেগুলো আমাদের কিনতে হয়। ওর কিছুটাও যদি তোমরা বুনে দিতে পার, অনেক পয়সা বাঁচে। ঐ দিয়েই বয়ঃ সূত্র কর। গোড়ার দিকে একটু-আধটু খারাপ হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

এ বিষয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা হল। জারসি বুনেতে কত উল লাগে, কত নম্বর কাঁটা চাই, কাজটা ভালমত শিখতে কতটা সময় লাগবে, মাসে কতগুলো করে তৈরী হবার সম্ভাবনা—এই সব এবং আনুমানিক ব্যাপারে এই মেয়েটির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সেটা প্রকাশ করবার দক্ষতা দেখে তালুকদার বিস্মিত হলেন। এই জাতীয় কাজে নারীরাগিয়ে ওকে দিয়ে যে শুধু ডাল ভাঙানো হয়েছে, সে কথা ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলেন। শেষের দিকে বললেন, তুমি তাহলে তোমার ছাত্রীর দল ঠিক করে ফেল। একটু বুদ্ধিগুহি আছে, শিখবার আগ্রহ আছে, অন্ততঃ বছর ধানেক থাকবে, এই ধরণের গুটি পাঁচ-ছয় মেয়ে হলেই কাজ শুরু করা চলেবে। কী বল ?

হেনা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, শেখাবার ভার আমি নিলাম, শ্রম ! সাধ্যমত চেষ্টা করবো। কিন্তু লোক ঠিক করবার কাজটা আমাকে নিতে বলবেন না।

এ বিষয়ে ওর আপত্তিটা যে অযৌক্তিক নয়, বুঝতে পারলেন তালুকদার। বললেন, বেশ তাই হবে। ওটা আমি নিজেই এক সময়ে গিয়ে করে দিয়ে আসবো।

দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্মৃশীলার আসতে বোধ হয় দেরি হবে। ততক্ষণে তুমি বয়ঃ এ বারান্দায় গিয়ে একটু বসো। বলে আবার একটা ফাইল টেনে নিলেন।

মিনিট দুই পরে তাকিয়ে দেখলেন, হেনা তেমনি কাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হল, কী যেন বলবার আছে, অথচ বলতে পারছে না। কিছু বলতে চাও ? কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার। হেনা চক্কল হয়ে উঠল। চোখে-মুখে দেখা দিল অস্বস্তির রেখা। হুঁ-একবার ইতস্ততঃ করে হঠাৎ বেরিয়ে এল, ব্যাকুল কণ্ঠ—আমি যে এখানে আর থাকতে পারছি না।

—কেন ? সবসময়ে প্রশ্ন করলেন জেলের সাহেব।

—আপনি তো সবই জানেন। যে কারণে, যেমন করে ওঁকে চলে যেতে হল, তার পর আমি এখানে মুখ দেখাই কেমন করে ?

মহেশ বাবুর বিষয় কেটে গেল। যে কাঁটি কথা শুনলেন, তারই

ভিতরকার বেদনাটুকু অনুভব করে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। হেনা যেন আপন মনে বলতে লাগল, এত দুঃখ দিলাম। সব বুখা হল। এত করে বার হাত থেকে বাঁচাতে চাইলাম, সেই হুঁ-এই আর অপমানই সার হল। আমারই জন্তে সকলের কাছে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

—তুমি ভুল করছ হেনা, দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন তালুকদার। তাকে কারো কাছেই মাথা হেঁট করতে হয় নি। অপমান বা অমর্যাদা নিয়েও সে যায় নি। নিন্দুকের হুঁ-এই তাকে ম্পর্শ করে নি। যে যাই বলুক, আমার এই কথাটা তুমি নিঃসন্দেহে মনে নিতে পার।

হেনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই দৃঢ় কণ্ঠের মাধ্যমে যেন সে খুঁজে পেল এক পরম আশ্বাস। তালুকদার জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখেই মৃদু-কোমল স্বরে বললেন, দুঃখ দেবার কথা বলছিলে। কিন্তু দুঃখ তো তুমি শুধু দাওনি, পেয়েছ তার অনেক বেশী। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

হেনার চোখের কোল দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। হুঁ-টি জলধারা যখন গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে এল, তা-ও মুছবার চেষ্টা করল না। সেই অশ্রু-লাঙ্ঘিত মুখখানার দিকে ফগকাল তাকিয়ে থেকে তালুকদার আবার বললেন, তোমার সব কথা আমি জানি না। হয়তো এমন কিছু আছে তোমার জীবনে, যার জন্তে নিজের হাতে নিজেকে আঘাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কী সে কারণ, সে প্রশ্ন তুলবো না। একটা কথা শুধু বলতে চাই। যেছায়া যে-পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলে, সেদিকে আর ফিরে তাকিও না। তাতে শুধু কষ্টই পাবে আর কোনো ফল হবে না।

হেনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। তালুকদার বললেন, আমার এই কথাগুলো হয়তো সাধু-সন্ন্যাসীর উপদেশ কিংবা পাদবির সাজেবের সার্মনের মত শোনাজে। তবু এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। মেয়েমানুষ বলে জন্মেছে বলে শুধু ওই সংসারের ডাকেই সাড়া দিতে হবে, আর তা না হলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, একথা যারা বলেন, তাঁরা মেয়েমানুষকে শুধু মেয়ে বলে দেখেন, মানুষ বলে দেখেন না। ঘরকন্নার বাইরেও যে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে, তার দাবীও কারো চেয়ে ছোট নয়। তার ডাক যদি শুনতে পাও, তাহলে যা পাওনি কিংবা পেয়েও নাওনি, তার জন্তে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না।

হেনার আঘাত উজ্জ্বল চোখের উপর থেকে যেন একটা আবরণ উঠে গেল। তৃপ্ত কণ্ঠে বলল, না, না। আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বড্ড ছটফট করছিল মনটা। তাই আপনাদের কাছে ছুটে এসেছিলাম। না, আমি আর কোথাও যেতে চাই না। এখানেই থাকবো। মাঝে মাঝে এসে কাঁড়াতে পারবো আপনার পায়ের কাছটিকে, তার পর—বলে হঠাৎ থেমে গেল।

তালুকদার মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে বললেন, কী বলছিলে বল।

—বলছিলাম, এই জেলের মেয়াদ তো এক দিন শেষ হবে। সে কথা যখনই মনে পড়েছে, ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছে। কোথায় যাবো ? কোথাও গিয়ে কাঁড়াবো, এমন জায়গা তো আমার নেই।

আজ আর সে ভয় নেই। আপনার কাছে এসে মনে হল, জায়গা আছে। একটু আশ্রয়ের ভাবনা আমাদের ভাবতে হবে না।

আপনার অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলেন জেলের সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন। হেনা লক্ষ্য করল, কিন্তু বুঝতে পারল না। বিস্ময়ে কুণ্ঠায় নির্বাক হয়ে রইল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন তালুকদার, তোমার ঐ 'আশ্রয়' কথাটা শুনে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমারই মত আরেক জন—না; সে কথা এখন থাক। হ্যাঁ; তোমার কথা আমি ভেবে দেখছি। সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম, তুমি এলে আমার কাছে তোমার টিকেট নিয়ে, তখন থেকেই ভেবেছি। সেদিন কী বলেছিলাম, তোমার হয়তো মনে আছে।

—সে কথা একটি দিনের তরেও ভুলিনি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হেনা। আপনি বলেছিলেন, তোমার কথা যেমন শুনলাম, আমার একটা কথাও তেমনি তোমাকে শুনতে হবে।

—হ্যাঁ। আজও তার সবটুকু বলবার সময় আসেনি। শুধু জেনে রেখো, এখানকার কাজ শেষ হলোই তোমার ছুটি নেই। তোমাকে আমার দরকার হবে।

হেনা উল্লসিত হয়ে উঠল, আমি তার জন্তে তৈরি হয়ে আছি। কিন্তু—কুণ্ঠিত সুরে বলল, আমি পারবো কি?

—কেন পারবে না? নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিও না। তাহলেই পারবে।

—আপনার দয়ার সে বিশ্বাস হয়তো এক দিন ফিরে পাবো, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল হেনা, কিন্তু ভয় হয়, যে-কাজ আপনি আমাকে দিতে চাইছেন, তার অধিকার বোধ হয় আমার নেই?

—কেন?

—তাহলে, আমার সব কথা আপনাকে শুনতে হবে।

—কী তোমার সব কথা?

—আমার জীবনের যত কিছু পাপ, যত কিছু অগ্নায়, ছেলেবেলা থেকে যে দুঃখ দিয়েছি এবং পেয়েছি, যত বন্ধনা সয়েছি, সব আমি আপনার পায়ের কাছে নাবিয়ে দেবো। তার পরও যদি মনে করেন, আমি অযোগ্য নই, আপনার দেওয়া কাজের অধিকার আজও হারিয়ে ফেলিনি, আপনার সব আদেশ আমি মাথায় পেতে নেবো।

—বেশ, তাই হবে। এক-রাশ দ্বিধা-সংশয়ের বেড়ি পারে বেঁধে কাজে নামা যায় না। মনের মধ্যে খটকা যখন দেখা দিয়েছে, সে জট খুলে ফেলাই ভালো। শুনবো তোমার সব কথা। ওই যে তোমার এসকট এসে গেছে। সুবিধা মত আরেক দিন এসো।

সুশীলা ঘরে ঢুকল একেবারে হস্তদস্ত হয়ে। দীর্ঘ বিলম্বের জন্তে একগাদা কৈফিয়ত স্তব্ধ করতেই মাঝপথে বাধা পড়ল। জেলের সাহেব বললেন, চার-পাঁচ দিন পরে বিকেলের দিকে আর এক বার ওকে আনতে হবে। তার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যেও।

আজ্ঞা, হজুর, সেলাম করে বলল জমাদারী। কৈফিয়তের হাত থেকে এত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাবে, একেবারেই আশা করেনি।

তালুকদার উঠে দাঁড়ালেন। হেনা এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল তাঁর পায়ের কাছে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সুশীলার সঙ্গে।

দেয়াল-বাড়ির দিকে তাকিয়ে উনিও বাইরে যাবার জন্তে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় বিরাট হাঁক-ডাক করে মহাবল সি এসে হাজির। সঙ্গে জন দুই সিপাই আর এক দল কয়েদী। একটা জোয়ান লোককে হৃদিক থেকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে হৃজন মেট। গায়ের জামাটা ছিঁড়ে গেছে। চুল উসুকা-খুসুকা। চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আঁশ। জেলের সাহেব জিজ্ঞাসা-দৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাইতেই সে বুক ঠুকে সেলাম জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে অভিযোগ পেশ করল, কাম নেহি করতা হয়। ফিন্ মোটকো ভি গালি দিয়া।

লোকটাও উত্তেজিত ভাবে চোঁচিয়ে উঠল, আমাকে মেরেছে হজুর! এই দেখুন—বলে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পিঠের উপর, বাহুর পাশে চওড়া দাগ। কোথাও কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

—কে মেরেছে? প্রশ্ন করলেন জলর।

—ঐ মেট, বলে একটা অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে মারল পাশের এক জন মেটের দিকে।

—মেরেছ ওকে? মেটকে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার।

—কাজ করে না। তাই বলতে গিয়েছিলাম। মা-বোন তুলে গালাগাল দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল সিপাই বাবুকে।

—তার পর?

মেট নিরুত্তর। জেলের সাহেব প্রশ্ন করলেন, মেরেছ কি না জানতে চাইছি। মেট এক বার জমাদার এক বার সিপাইদের মুখের দিকে চেয়ে বিড়-বিড় করে বলল, একটা থাপ্পড় মেরেছি হজুর।

সকলের অজ্ঞাতে জেলের সাহেবের ওষ্ঠের কোণে একটি মুগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেই চিরন্তন "এক থাপ্পড়।" জেলের ডিসিপ্লিন রক্ষার প্রাথমিক ভার যাদের উপর সেই সব সর্দার-কয়েদীর নাম মেট। কেতাবী নামটা বেশ গাল-ভরা কনভিক্ট ওভারসিয়ার। তাদের পোষাকের প্রধান অঙ্গ একটি চামড়ার বেল্ট, তার সঙ্গে লাগানো পিতলের চাপরাশ। কারণে, অকারণে এই বস্তুটি তারা শাসন-দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

সে সন্ধ্যাে প্রশ্ন করলে প্রশ্নারটা অস্বীকার করে না, তাজিল্য ভরে উত্তর দেয়, মেরেছি এক থাপ্পড়। যদি জানতে চান, দাগ হল কেমন করে, সহুত্তর পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

রাউণ্ডে যাওয়া বন্ধ রেখে জেলের আবার তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন। মহাবল সি চুকল তার বাদী, আসামী, সাক্ষী-সাবুদের দল-বল নিয়ে।

[ক্রমশঃ।

# ব্যক্তি রামেন্দ্রচন্দ্র

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

৩

রামেন্দ্রচন্দ্র প্রস্তাব তুললেন—কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবার বয়স পঞ্চাশ হতে চলেছে, তাঁকে বাঙলার সাহিত্যসেবীদের পক্ষ হতে মানপত্র দেওয়া উচিত। আমি মনে করছি সাহিত্য পরিষৎ এতে অগণী হবেন। এই শুনেই বাঙলার এক শ্রেণীর সাহিত্যিকরা রামেন্দ্র বাবুর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন—রবীন্দ্রনাথ কী এমন করেচেন বাঙলার সাহিত্যের জন্ত, যাতে তাঁকে সম্মান দিতে হবে? শুনেই বললেন রামেন্দ্র বাবু—যুগশ্রদ্ধীদেরকে এমনি অনেক লাঞ্ছনা সহ করতে হয়। অনেক দিন আগে বুঝেছিলেন রামেন্দ্রচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ এক জন হবেন বিশ্বের মধ্যে। সেই জন্ত নিতান্ত বজু হলেও বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদানের কথা। কারও কথায় কান না দিয়ে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হতে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন। বিরুদ্ধবাদীদেরকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাই লিখলাম—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মশায়কে রামেন্দ্রচন্দ্র যে চিঠি দিয়েছিলেন—আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। রবীন্দ্র সার্বজনীন বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন-পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র রবীন্দ্র বাবুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছে মাত্র। কোনরূপ রাজ্য অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দাবী করেন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া চিরকাল মতভেদ আছে ও থাকিবে। সে বিষয়ে পরিষদ কোন মত দিয়া ষ্টুতা দেখাইবে না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও কম নয়; সে বিষয়ে মতবৈধ নাই। কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা পরিষদের অঙ্গায় অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে।

এই ধারা পত্রে মর্মে মর্মে দেশবাসীকে বোঝাইয়া দিলেন। কবিকে সম্মান দেওয়া অপরাধ হয় নাই। আরও লিখলেন—এই কাজে এমন কিছু টাকাও খরচ হয়নি পরিষদের পক্ষে। যার জন্ত দেশের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। সাধারণের টাকা খরচ হইলেও অবশ্য আমাকে তাহার জবাবদিহি করিতে হইত। কিন্তু জানা উচিত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতায় আসিলে তাঁহার যথোচিত সন্মতি করিয়াছিলেন পরিষদ। পরিষদের স্থাপনকর্তা ওরমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকেও সন্মতি করা হইয়াছিল। বিদেশী সাহেব একবার পরিষদে আসিলেও তাঁহারও যথেষ্ট সন্মতি হইয়াছিল। বিভাগসংগে বহুযন্ত্রের লাইব্রেরি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙালীর দুই গালে চূণ-কালি মাখাইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন পরিষদ মধ্যে পড়িয়া ওই লাইব্রেরিট রক্ষা করিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখাইয়া পরিষদ কিছু অঙ্গায় করে নাই।

এই ভাবে অনেক চিঠি লিখে রামেন্দ্র বাবুকে বহু কশাঘাত সহ করতে হয়েছিল। তবু তিনি বিশ্বকবিকে উপেক্ষা করতে পারেন

নাই। বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এক কালে বিশ্ববাসীর মধ্যে এক জন সেরা মানুষ হবেন। হলেনও তাই। পেলেন নোবেল প্রাইজ। তখন বিশ্বকবিকে দেশের লোক সম্মান দিতে গেলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বলেছিলেন—আমি যদি আজ বিদেশ হতে নোবেল প্রাইজ না পেতাম, তাহলে ত আপনারা চিনতেই পারতেন না।

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামেন্দ্র বাবুর সহপাঠী। তাঁর বাড়ী ছিল বহুবাজারে। তিনি জ্যোতিষী বিজ্ঞায় একজন পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। অনেক টাকা খরচ করে বহু বই আনিয়াছিলেন কান্টার ড্রাবিড ইত্যাদি দেশ হতে। তাঁর বিজ্ঞার পরিচয় পেয়ে অনেক জজ, উকিল, মোক্তার, সাবজজ, ডাক্তার এসে বাড়ী ভর্তি করে রাখতেন। গাড়ী, ঘোড়া, মটর দাঁড়িয়েই থাকতো।

সেই হরিমোহন বাবু প্রায়ই আসতেন রামেন্দ্র বাবুর বাসায় আলোচনা করতে। নানা আলোচনার পর রামেন্দ্র বাবু শুধু হাসতেন তাঁর কথা শুনে। নানারূপ জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলতেন, আমি অনেক পড়ে এ শাস্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারিনি। হয় তো এক দিন ঠিকই ছিল। মনে হয় মুসলমান যুগে লুপ্ত হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শাস্ত্র। তুমি ভাল ভাবে আরও পড়ে, তখন বুঝতে পারবে। তুমি ত শুধু ব্যবসাদার নও যে পরয়া পেলে খুশী থাকবে? এই ভাবে কথা হতো বন্ধুর সাথে। ন’দশ বছর পর এক দিন হরিমোহন বাবু এসে বললেন রামেন্দ্র বাবুকে, এতো দিন পরিশ্রম করে রামেন্দ্র, বুঝলাম তোমার কথাই ঠিক। কতক মিললেও বুঝলাম সম্পূর্ণ নয় শাস্ত্র।

তখন আরম্ভ করলেন রামেন্দ্র বাবু—তোমার আক্ষেপ করবার নাই। এটা ত একটা শাস্ত্র বটে। এক দিন এক জন মহাপুরুষ এসে নিশ্চয়ই একে সম্পূর্ণ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, তুমিই বা সেই মহাপুরুষ। যে ভাবে আরম্ভ করেছিল।

তখন হরিমোহন বাবু হেসে অস্থির। আমি কী ক্ষি-য়ুনি? আমার এমন বিজ্ঞা নাই একটা শাস্ত্র উদ্ধার করি। তুমিই পারো রামেন্দ্র, যদি ইচ্ছা করে। রামেন্দ্র বাবু শুনে কেবল হাসতে লাগলেন।

রামেন্দ্র বাবু পূজার ছুটিতে আর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসতেনই। তখন যেন একটা শিক্ষিত লোকের মেলা বসে যেতো জেমো নুতন বাড়ীতে। ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, মাষ্টার, পণ্ডিতে বোঝাই থাকতো নুতন বাড়ী। কান্টার ইঙ্কলের মাষ্টার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় সে সময় উপস্থিত থাকতেন। তাঁকে রামেন্দ্র বাবু বললেন—তুমি লেখো ত দেবিন, আমি বলে যাই। তিনি লিখতেন এমন সময় রাম বাবু বললেন ছি দেবিন! ঘটিকা বানানে দীর্ঘ ঈকার দিলে। সেই একটা দিনের একটা কথা হতে শিক্ষা করে নিলেন দেবিন বাবু। সেই হতে গিলে খেতে লাগলেন বানান। এখনও তিনি বেঁচে আছেন। ওই অঞ্চলের মধ্যে এক জন বড় পণ্ডিত, বাংলা ভাষায়।

ইংরাজি মতে শিক্ষা দেখে রামেন্দ্র বাবু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, কী শিক্ষা হয় আমাদের বুঝি না। একটা কী ছুটো পাশ করে এলে ছেলে, তাকে তার মা কি বাবা জিজ্ঞাসা করলে—হা রে! পঁচিশ টাকা সোনার ভরি হলে আড়াই আনার সোনার গহনা করে এলাম, কী? দেবো বাবা বল? তখন শুনতে পারো—ও সব আমাদের পড়া হয় না। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি আমার বাড়ীটা মেপে দে ত বাবা, সে বলবে আপনি অন্তের কাছে যান। হা রে, ছুটো পাশ করে এলে কী শিখে এলি বল ত? নিরুত্তর।

আমার জানা ছিল, কেউ তখনকার দিনে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে এ ধারা কথা বলতো না। সে সমাজের সব কাজ করবার মত শিক্ষা নিয়ে আসতো। এখন অর্থশ্রদ্ধ ক'রে এসে এ কী শিক্ষা! এ সবার মূল হচ্ছে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করেতেই সব মেধা বুদ্ধি শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজের কিছু হচ্ছে না।

তৎকালীন লর্ড সাহেব লর্ড রোলাওয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণের সময়ে স্পষ্ট বলেছিলেন—রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালীর একটা স্মরণ চিত্র এঁকেছেন। সেই চিত্র দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। সকলেরই সেই ভাব অবলম্বন করে চলা উচিত। শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি কাজের মত বিভা না থাকিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই না।

জেমো কান্দীর বড় বাবু রামেন্দ্রসুন্দর এতো দিন কলকাতায় থেকে এলেন, একটু যদি কলকাতার চান থাকে কথায়! বেশভূষায় সেই পাড়াগাঁয়ের ভাব। কলকাতার বন্ধু-বান্ধব তাঁর বলতেন—হা রে রাম! এখনও তোর রাড়ের ভাষা ভাব গেল না! হুঃশিঃ হয়ে বলতেন—তা হলে ত আমার মৃত্যু সেই দিন। আমি মধুরপুছখারী হবো বলতে চাও? যখন ডাক দিয়েচেন দেশের বড় বাবু তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই হাজির। তখন ইংরাজি উনিশ শ' পাঁচ কী ছয় সাল। দেখতে গেলে দেশের লোক আমাদের বড় বাবু শুধু পণ্ডিতই নন, তিনি আমাদের একজন স্বদেশী দেশহিতৈষীও। তিনি সকলকে ডেকে বললেন—তোমরা বিদেশী কাপড় আর পরবে না। বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করবে না। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে বল আমাদের স্বদেশী জিনিষ যত খারাপই হোক, তাই আমরা ব্যবহার করবো।

এমন করেও ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না বুঝে রামেন্দ্র বাবু তাঁর ছোট কন্যাকে দিয়ে পাড়া প্রতিবেশী সকল মেয়ে-ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন নিজের বাড়ীতে। তাঁরা সকলে এলে পাঠ করালেন—রামেন্দ্র বাবুর লেখা বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। মুগ্ধ হয়ে শুনলেন সকল ছেলে-মেয়েতে। একটা উদ্দীপনা দেখা গেল সারা গ্রামে।

তখন সমস্ত গ্রামের অধিবাসীকে নিয়ে গেলেন কালী মাতার অঙ্গনে। সহস্র সহস্র গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো—আজ থেকে আমরা বিলাতি কাপড় পরবো না। বিলাতি জিনিষ কিনবো না, আজ থেকে হিন্দু-মুসলমান আমরা ভাই ভাই। এক হয়ে মিলে মিশে থাকবো আমরা। আজও মনে পড়ে তিরিশে আশ্বিন কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে ঐ দিন বাড়লার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়েছিলেন। ঐ দিন আবার বাংলায় অচলা অর্চিতা হলেন। বাংলার হাট-মাঠ জুড়ে বসলেন।

রামেন্দ্র বাবুর কী যে আনন্দ বলার নয়। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

যেন রামেন্দ্র বাবুর নিজের মনের কথা। সাথে জানকী বাবু বলেছিলেন—রামেন্দ্র বাবু ভারতকে ভালবাসতেন কতকটা ভারত ভারত বলিয়াই, কিন্তু আরও ভালবাসতেন ভারত তাঁহার নিজের বলিয়াই। ভারতের যা কিছু—তাঁহার আকাশ মৃত্তিকা তাঁহার উদাস প্রান্তর, তাঁহার হিমালয়, তাঁহার ভাগীরথী, তাঁহার কথা, তাঁহার কবি ও দার্শনিক সবচেয়েই গৌরব অনুভব ক'রতেন। তাঁর ভারত বাণ্যীকি বুদ্ধির ভারত। যে কালের প্রভাবে নিমজ্জিত হ'লো, ঐই যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন। রামেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সব দেশসেবার জন্ম।

রামেন্দ্র বাবু নিজে সহস্র বার স্বীকার ক'রে গেছেন, তিনি অন্তরে অন্তরে স্বদেশী। এই বীজ বপন করে গেছেন তাঁর পিতা যখন তাঁর বয়স অষ্টম বর্ষ।

একখান মাত্র বই হ'তে রামেন্দ্র বাবু পরিচিত স্বদেশী হিসাবে। তিনি শুধু দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশসেবক। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষাকে স্বীকার করাতে ইউনিভারসিটির পক্ষ হতে। শেষকালে দেখেও গিয়েছেন।

প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রে গেছেন নিজের বিপণ কলেজকে হাতে তুলে না দেওয়ার জন্য গবর্নমেন্টকে। এ জন্য সামান্য ভাগ স্বীকার ক'রতে হয়নি রামেন্দ্র বাবুকে। কত বার বলে গেছেন রামেন্দ্র বাবু, বাহন হতেই হবে আমার বাংলা ভাষা। আমি না খেতে পেলেও কখন গবর্নমেন্টের চাকরী নেবো না। হাজার হ' হাজার টাকা দিলেও গবর্নমেন্টের গোলামী ক'রবো না।

## ৪

পেড্‌লার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের প্রফেসার ও গুণগ্রাহী। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে ডাকিয়ে বললেন—তোমার একটা চাকরী স্থির ক'রেছি মতীপুরে, তুমি ওখানে যাও, নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে। গবর্নমেন্টের চাকরী বুঝতো না? একটু চিন্তা করে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আপনাকে বাড়ী থেকে এসে পরামর্শ ক'রে উত্তর দেবো।

হ' তিন দিন পরে বাড়ী থেকে এসে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর—আমার মায়ের মত পাওয়া গেল না। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বিরক্ত হয়ে সাহেব বললেন, তোমার মত হল না বল। তুমি কি দুশ্চিন্তাপ্রাপ্ত শিশু? মায়ের মত করাতে পারলে না! তবে কি না সার! আমার মত ছিলো না অতো দূর দেশে চাকরী করতে। চমকে উঠে বললেন সাহেব—দূর দেশ! জানো আমি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে চাকরী ক'রতে এসেছি। তুমি আমার চেয়ে কতো ছোট জানো? তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—আমরা ঘরবেঁগা বাঙালী। আমরা বাংলা ছেড়ে কোথাও চাকরী করতে পারবো না। তখন হাসতে লাগলেন পেড্‌লার সাহেব।

হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে যখন মালব্যের ডাক এলো, তুমি এখানে চাকরী করবে এসো। হাজার টাকা মাহিনা দেবো, খাওয়া-খাওয়ার কোন খরচা লাগবে না।

বাড়ীর সকলে এ খবর পেয়ে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। চারশো টাকার মাহিনায় এক পয়সা বাঁচেন না, তা ছাড়া বড় বাবুর মা বুঝা, তাঁর গন্ধান্নানও হবে, যদি শেষই সেখানে হয় তো কথাই নাই।

সকলে একত্রিত হয়ে স্থির করলেন রামেন্দ্রকে বলা যাক। সে মত করে কি না দেখা যাক। মা সন্ডে বলতে গিয়ে শুনে পেলেন ছেলের কাছে—মা! তোমরা বল ত আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমাকে একেবারে কানীতে রেখে আসতে হবে। চাও ত আমাকে নিয়ে চল। এ কথা শুনে সকলেই নিরুত্তর।

কাশিমবাজারের মহারাজা রামেন্দ্র বাবুকে বললেন, আপনাকে আমার কৃষ্ণনাথ কলেজে কাজ নিতে হবে। কলকাতার চেয়ে মাইনে বেশী দেবো। তাও বাড়ীর কাছে হবে, আমাকে মত দিন।

অনেক ভেবে রামেন্দ্র বাবু বললেন, আমি কলকাতার সুধী সমাজ ছেড়ে সাহিত্য পরিষদ ত্যাগ করে কোথাও থাকতে পারবো না। আমাকে মাপ করুন মহারাজ!

বাড়ীর লোক বুঝলো রামেন্দ্র নাড়া পৌতা আছে কলকাতায়, সে কলকাতা ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবে না। এমন সুবিধাও ছাড়লে রাম! একটু যদি বোম্বো বাড়ীর এতো কাছে চাকরী!

১৯০৩ সালে কৃষ্ণকমল বাবু ছয় মাসের ছুটি নিলে, রামেন্দ্র বাবু বিপণ কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অস্থায়ী। তারপর কৃষ্ণকমল বাবু আর সোগ দিতে পারেন নি। কলেজে তখন স্থায়ী অধ্যক্ষ হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। আইন এবং আর্ট পড়ান হ'তো বিপণ কলেজে। সকল বিভাগেরই অধ্যক্ষ হ'লেন রামেন্দ্রসুন্দর। তখন মাত্র নয়শো ছাত্র পড়ে কলেজে। রামেন্দ্রসুন্দর চিন্তা করে দেখলেন—একা আমার সকল বিভাগ দেখা সম্ভব হবে না। তখন তিনি জনকীনাথকে ল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

এই বিষয়েও কী কম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরকে! তদানীন্তন ডিরেক্টার পেড্‌লার সাহেব এলেন কলেজ পরিদর্শন করতে। তিনি ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরী দেখে হুঁথ প্রকাশ করলেন এতো দৈন্য কলেজের!

তখন সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী বললেন, রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অনেক বিজ্ঞানের বই আছে, তাতে ছেলেরা অনেক সুবিধা পায়। শুনেই সাহেব বললেন রামেন্দ্র বাবু ত বিপণ কলেজ নয়। আমি অনুমতি দিতে পারি না বি-এস-সি খুলিবার।

তারপর ভাইস্‌চ্যান্সেলার হলেন স্যার আন্তোভ। তিনি দেখতে পাঠালেন বিপণ কলেজ, পি. কে. সেনকে দিয়ে। দেখে এসে পরামর্শ আরম্ভ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর, পি. কে. সেন, স্যার আন্তোভ ও সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী। স্যার আন্তোভ বলতে চান রামেন্দ্র, তোমরা ভুল ক'রো না। এখন গবর্ণমেন্ট নিজে ল কলেজ খুলতে চান। তোমরা কি গবর্ণমেন্টের সাথে লড়াই ক'রে পেরে উঠবে?

তখন রামেন্দ্র বাবু উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠলেন, এ জীবনই ত সংগ্রাম। দেখাই যাক না। আত্মহত্যা নীতি আমি পছন্দ করি না। শুনে সকলেই বুকলেন। রামেন্দ্রসুন্দর সহজে ছাড়বেন না। তার পর সুরেন্দ্র বাবু ট্রাস্টী গঠন ক'রলেন সার রাসবিহারী, লর্ড সিংহ, রাব বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে নিয়ে। সেক্রেটারী হ'লেন রামেন্দ্রসুন্দর।

তার পর থেকেই প্রবল ঝড় ব'য়ে গেল রামেন্দ্রসুন্দরের মাথার উপর দিয়ে। তাঁর জায়নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, হুঁবাব

সাহসের জন্তাই রক্ষা পেলো বিপণ কলেজ। রামেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রলেই ব'লতেন—এ ভগবানের দয়া। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে এ কলেজ রক্ষা পেতো না।

প্রতিজ্ঞা ক'রলেন রামেন্দ্রসুন্দর—এ কলেজকে বি. এস-সি, পর্যায়ে তুলতেই হ'বে। আট-দশ বছর গবর্ণমেন্টের সাথে লড়াই ক'রে বি. এস-সি পড়াবার অনুমতি পেলো গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে। এই সময় কী দুঃসহ যাতনা ভোগ ক'রেছিলেন ত্রিবেদী মহাশয়, বলার নয়।

এক দিন এক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে ব'লেছিলেন—আমি এ কলেজকে এতো ভালবাসি, আমার নিজের মনে ক'রে। তা ছাড়া সুরেন্দ্র বাবু যুক্ত আছেন ব'লে আরও। তিনি যে একমাত্র প্রতীক স্বাধীনতা-যুদ্ধের।

কলেজের নিয়ম পঞ্চাশ মিনিট পড়াবার। জ্ঞান থাকতো না রামেন্দ্র বাবুর, পড়িয়েই চ'লেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেও মনে পড়িয়ে দিলে ব'লতেন—এ আমার নিজের ছেলেদেরকে পড়াচ্ছি, সময় দেখে কী পড়ান সম্ভব?

আর একটা কথা, রামেন্দ্র বাবু ভালবাসতেন ছেলেদেরকে যেন বাড়ীর ছেলে। ছাত্ররা এসে ব'লতো রাবেন্দ্র বাবুকে, সার আমরা খেলবো অল্প কলেজের সাথে। তখনই তিনি পরিহাস ক'রে তাদেরকে ব'লতেন—পারবি ত? হাঁ সার, আমরা নিশ্চয় ব'লছি পারবো। দেখিস যেন আমার মুখ হাসাস নে। পারি যদি কী দেবেন সার? আমি তোদেরকে খাওয়াব। আর যায় কোথা! ছাত্রদের দল হাসতে হাসতে চলে গেল। জয়লাভ ক'রে এলে রামেন্দ্র বাবুর কী খুসী। যেন তাঁর ছাত্ররা ভারত জয় ক'রে এসেছে। তখনই হুকুম পাঠিয়ে দিলেন শ্রী ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে—আজ এখনই একশ' জন ছাত্র আমাদের বাড়ীতে খাবে। ইন্দুপ্রভা দেবীও লগে গেলেন আয়োজনে। ছাত্ররা প্রচুর আহ্বার করে গেছে কত দিন। এ যেন রামেন্দ্র বাবুর নিত্যকর্ম ছিল।

হোষ্টলে ছাত্রদের বিবাদ হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। সুপারিন্টেনডেন্ট কিছুতেই মিটাতে পারেন না। রামেন্দ্র বাবু শুনে ভার দিলেন আর একজন ছাত্রদরদী ভ্রমোদয়কে। তিনিও অক্ষম হলেন। তখন রামেন্দ্র বাবু নিজেই ভার নিলেন। সকল ছাত্রকে ডাকিয়ে বললেন—সতরই অগ্রহায়ণ আমি তোমাদের অভিযোগ শুনবো। এ ক'দিন তোমাদেরকে শাস্ত ভাবে থাকতে হবে। আর একটা কথা—সেদিন আমি তোমাদের সাথে একসঙ্গে খাবো। কী যোগাড় করো দেখবো।

শুনেই ছাত্ররা আত্মহত্যা ক'রতে চান। অধ্যক্ষ আমাদের সাথে খাবেন! তাঁকে ভাল করে খাওয়াতে হবে। সে যোগাড়ই সকল বিভেদ ভুলে সকলে এক হয়ে খাটতে লাগলো।

ঠিক সময়ে রামেন্দ্র বাবু বললেন—ব্রাহ্মণ পেটুক মানুষ, তোমরা জানো ত? তারা এলে ছাঁদা নেয়—তখন হেসে ছাত্ররা বাধা দিয়ে বলল—আপনাকে আমরা জানি সার! আপনি কেমন ছাঁদা নেওয়া বায়ুন, তা-ও জানি।

তখন হেসে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আমার সাথে দৌহিত্রাও আসবে সব, হবে তো? ছাত্ররা খুসীর ধূমে বলে—হুঁ-তিনটে ছেলে আনবেন তার জন্তে এত বলচেন? হুঁ-তিন শো লোকের আয়োজন করেছি আমরা।



সন্ধ্যা আটটার পর রামেন্দ্র বাবু খেতে গিয়ে বসলেন—যে সব ছাত্রদেরকে ছোট জাতি বলে ঘৃণা করে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা, তাঁদেরই পাশে দৌতিব্রতেরকেও বসালেন সেই সব ছাত্রদের পাশেই। অতো বড় ব্রাহ্মণকে ওই সব জাতির পাশে বসে খেতে দেখে ছাত্ররা বিস্মিত। যা নিয়ে এতো দিন এতো বিরোধ চলে এসেছে, একদিনের একটা ঘটনায় তার মূলোচ্ছেদ! খেতে খেতে তিনি কেবল বলেন গল্পছলে—জাতি সৃষ্টি করেছে আমাদের অজ্ঞানতা। আমাদের পরাধীন দেশে একটা কাজ চাই তো। তখন জ্যাস্ত খড়োর গঙ্গাঘাড়া করাতো! এ-ও তাই। দেশ যখন স্বাধীন হতে থাকবে তখন এই জাতিভেদ সাপের খোসার মত আপনি ঝরে পড়বে। এ সব শিখবে তোমাদের মত লেখাপড়া ছাত্রদের কাছ হতেই সমাজ।

খাওয়া দাওয়া পর সকল ছাত্র এক হয়ে জমা চাইল রামেন্দ্র বাবুর কাছে। বললো—আমরা তুল করেছি সার! আপনি আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছেন সার!

বিপণ কলেজের যখন ঘর তৈয়ারী হ'য়ে উঠে গল নতুন বাড়ীতে, তখন অধ্যক্ষের জন্ত একটা পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হ'লো। তা'ছাড়া ইউনিভারসিটিরও এই মত।

তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন তার হ'য়ে—আমাকে একঘরে করবেন কেন আপনারা? আপনাদের সাথে থাকলে কী অসুবিধা আমার? কেউ উত্তর দিতে পারেন না তখন।

আমি চাই একটা কলেজ ম্যাগাজিন বার করতে। তার জন্ত তার দিলেন প্রফেসরদের মধ্যে এক জনকে। এর নাম দিলেন বিপণ-কলেজ পত্রিকা। সকল প্রফেসরকেই উৎসাহ দিতেন লিখবার জন্ত। কখনও নিজের ভাবে ভাবিত ক'রে নিরুৎসাহ করতেন না প্রফেসরদিগকে। স্বাধীন ভাবে সকলকে লিখবার সুরোগ দিতেন। এই সময়েই বের হয় ক্ষেত্র বাবুর "অভয়ের কথা।" এই বই পড়ে খুশী কতো রামেন্দ্র বাবুর। আরও উৎসাহ দেওয়াতে হ'ল এক খান বই লিখে অমর হয়ে আছেন ক্ষেত্র বাবু।

রামেন্দ্র বাবু এলেই প্রফেসরদের মধ্যে উৎসাহের একটা বান ডেকে যেতো। ভাবতেন, এবার কিছু না কিছু সুনতে পাবো। তিনি এসেই আরম্ভ করতেন গ্রীক সভ্যতা থেকে শুরু করে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের বিবরণ। কোন দিন বা বৈদিক যজ্ঞ, কোন দিন বৌদ্ধদর্শন। কখনও বা বৈষ্ণব দশ তন্ত্র। একটা আনন্দ-হিরোল বইতো। যেন একটা বিরাট খনি মাটি থেকে তুলিয়ে নিতে পারলেই হয়, সোনা না হয় হীরে।

এই সময় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বলতেন—আমি রামেন্দ্র বাবুকে খুব বড় একজন পণ্ডিত বলে কেবল চিন্তাম। তাঁর সাথে দেখাও হতো কোন সভা-সমিতিতে। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাও সুনতাম। কিন্তু এমন ভাবে প্রাণ খুলে মেলাবার সময় হয়নি। এখন

দেখচি আমাদের আত্মীয়ের চেয়ে বড়। এখন আমি তাঁর ব্যবহারে অভিজ্ঞ।

দেখচি রামেন্দ্র বাবু দর্শন ও বিজ্ঞান ভালবাসেন বলি! সেট বই কেবল আনাইতেন না। নাটক নভেলও আনাইতেন সকলের মনোরঞ্জনের জন্ত।

রামেন্দ্রশুন্দর অধ্যাপক-সম্মান স্থাপন করলেন বিপণ কলেজে। এর মধ্যে প্রাচীন নবীন বলে কোন প্রভেদ থাকলো না। তিনি এসে উৎসাহ দিতেন, আর বলাতেন ছাত্রদেরকে—স্বাধীন হবার শিক্ষা দিন। তারা যেন জগতের কাছে বলতে পারে আমরা পরাধীন নই।

তখন একটা হৈ-হৈ ব্যাপার স্তম্ভাঘ বোসকে নিয়ে সারা বাংলায়। ওটন সাহেবকে নিয়ে সকলেই প্রায় বলে—এটা ছাত্রদের খুবই অগ্রায় শিক্ষকদের উপর। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—ও সব ছেলে যে মানবে না পরাধীনতা, ও সুনবে কেন অগ্রায়! সইবে কেন বাঁধাধরা নিয়ম!

৫

এক সময় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন—আমার মত ভট্টাচার্য বামুন ত নয় রামেন্দ্র? ও বামুনির রাম, বেদের ইন্দ্র, কালির ভারতচন্দ্রের সুন্দর। ওর সঙ্গে আমার তুলনা? আমি তো ফলারে পেটো-ঝাড়া একজন বামুন। জ্ঞানে-বিজ্ঞায় ক'জন রামের মত আছে বল দেখি!

জ্ঞানবুদ্ধ ব্রাহ্মণ মুক্ত কণ্ঠে নিজের কথা বলে গেলেন। তার পর ভূয়সী প্রশংসা করলেন রামেন্দ্র বাবুর।

এক সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদের উপর বিরক্ত হয়ে সাহিত্য পরিষদ ত্যাগ করলেন। তখন সকলেই ভাবলেন


ফোন ৪২  
৩৪-৪৯২

G.V

বিবাহে ষোড়শ দানের  
আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

গিনি ভবন

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলি: ১২



ব্রাঞ্চ ৪-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬  
(রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

অন্তো বড় পণ্ডিত একজন ত্যাগ করলেন সাহিত্য পরিষদকে ! ব্যাপার কী ! কোন সন্ধান জানতে না পেরে প্রশ্ন করলেন রামেন্দ্র বাবুকে । তিনি বললেন—বলবো কী ছাই ! নূতন নূতন লোকের মত সস্থ করতে পারচেন না । সকলে একমত হয়ে সাদা দেবে এ কেমন কথা । নিজের মতবাদ বিসর্জন দেবে এ-ও কী হয় ! তাহলে কী শাস্ত্রী মহাশয়কে আর পাবেন না সাহিত্য পরিষদ ? তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন, এখন আমাকে বোঝাতে হবে ।

কিছু দিন বিরাগ থাকার পর শাস্ত্রী মহাশয় একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রমাকল্পদ্রুম রামেন্দ্র বাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এটা সাহিত্য পরিষদকে দেবে ।

তখন রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন, এতো ভালবাসেন যখন সাহিত্য পরিষদকে, তবে বিরাগ কেন ?

—আমি লোকের কথা সঠিতে পারি না, তখন হেসে পণ্ডিতবরকে বললেন—কথা শুনেতে হবে । এরা যে নতুন যুগের মানুষ । এ ধারা আলোচনা হওয়ার পর আবার তিনি যোগ দিলেন সাহিত্য পরিষদে ।

প্রায় শাস্ত্রী মহাশয়কে বললেন—আমরা কাজ করতে এসেছি করে যাবো । আমরা নামের পদের আকাজক্ষী নই । কোন দিনও কোন পদের জ্ঞান আমরা আকাজক্ষা করবো না । সমস্ত জীবন সাহিত্য সাধনা করে যাবো—তাই হয় । আমার মত লোককে ওরা সম্পাদকের ভার দিলো না, কাঁকে আর দেবে বল ত ? হেসে বললেন—হয় তো আমার ও ভার বহন করার শক্তি নাই ভেবেচেন ।

তেজস্বী ব্রাহ্মণ তখন বললেন—তাই বলে অজ্ঞানের তোবামোদী করতে হবে ? তাও হয় বহুজনের মতের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয় । রামচন্দ্রকেও এই রকম ভাবে রঞ্জন করতে হয়েছিল প্রজাসাধারণকে ।—তোমাকে পারবার উপায় নাই রাম ! আমি ত রাম নই ।

এর অনেক দিন আগের কথা । অক্ষয় সরকার তখন নবজীবনের সম্পাদক । তাঁর সাথে একটু পরিচয় ছিল রামেন্দ্র বাবুর । তখন রামেন্দ্র বাবুর পাঠ্যজীবন । একটু-আধটু লেখারও সখ ছিল । তিনি গিয়ে অনেক আলোচনা করতেন লেখার বিষয় নিয়ে । কেমন ভাবে লিখতে হয় তাও বলে দিতেন । এক রকম বলতে গেলে তিনিই গুরু রামেন্দ্রসুন্দরের । এ সব আলোচনা রামেন্দ্র বাবুর প্রথম কলেজ চুকেই ।

বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রথম মনে হলো এবার লিখতে হবে । এতো লজ্জা যে নাম দেবারও সাহস হয় না । লেখা পাঠিয়ে দিলেন নবজীবনে । ভয়ে ভয়ে থাকেন লেখা বের হয় কি না । বের হলো বেনামীতে নয় স্বনামে । এই প্রথম হাতে-খড়ি বলতে হয় ।

সরকার মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবগম্ভীর ভাষা যতদূর বদলে হয় বের করলেন । রামেন্দ্র বাবু ভেবে পান না—আমার নাম পেলেন কী করে ! তার পর মনে এলো একবার যাদের লেখা দেখেচেন তাদের নাম-খাম ভুল হয় না ।

তখন রামেন্দ্র বাবুকে পেয়ে বসেছিল কালীপ্রসন্ন বাবুর ভাব-গম্ভীর ভাষা । তিনিই বললেন নিজে—এই ভাব কাটিতে আমার অনেক দিন লেগেছিল । ভাবভ্যাম এ ভাষা ছাড়া ভাব প্রকাশ

করা যায় না । অনেক চেষ্টার পর আমার জ্ঞান হলো, নিজের ভাষা না হলে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না । সেই থেকে রামেন্দ্র বাবু কখন অমুদ্রণ করেন নি জীবনে । তখন বুঝলেন, কেন অক্ষয় বাবু কেটে কুটে ভাষা বদলে বের করতেন ।

তার পর স্বধীশ্রনাথ ঠাকুর বার করলেন সাধনা । তখন রামেন্দ্র বাবু আকাশ-পাতাল নামে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিলেন । সেই প্রবন্ধ বের হওয়ার পর রামেন্দ্র বাবুর উৎসাহ হলো লিখবার । তখন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে দিলেন । সমস্ত কয়টাই বের হতে লাগলো সাধনায় ।

তখন আর একটা মাসিক বের হলো জন্মভূমি, বঙ্গবাসী অফিস থেকে । ফটোগ্রাফ বলে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি দিলেন । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বের করলেন ‘দাসী’ বলে এক মাসিক পত্র । তিনি চেয়ে পাঠালেন প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুকে । খুসী ধরে না রামেন্দ্র বাবুর—এখন আমাকে চাইতে লেগেছে গো । আমিও এক জন লেখক হলাম । পর পর কয়েকটিই পাঠিয়ে দিলেন ‘দাসী’র সম্পাদক রামানন্দ বাবুর নিকট ।

তারপর বের হলো এক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সাহিত্য । এটা বের করলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি । তিনি বলে রাখলেন—রামেন্দ্র বাবু ! তোমার লেখা আর অল্প কাগজে দেওয়া হবে না, আজ থেকে তুমি আমার ।

কী করেন রামেন্দ্র বাবু, যত সব লেখা দিতে হয় সমাজপতির কাগজ সাহিত্যকে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, আনি বেসান্ট, সামাজিক বাধি ও তার প্রতিকার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের জয়, সত্য, আত্মার অবিনাশিতা, মাধ্যাকর্ষণ, অমঙ্গলের উৎপত্তি, মায়াপুরী, এই ধারা সর্বজননন্দিত বহু প্রবন্ধ সাহিত্যের কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে ।

তখন রামেন্দ্র বাবুর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে । তাঁর প্রবন্ধ পাবার জ্ঞান সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক উন্মুখ হয়ে আছেন । যদি কেউ কোন প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুর কাছে থেকে নিয়েচেন, কী রাগ সমাজপতি মহাশয়ের ! তিন চারটে প্রবন্ধ লিখে তবে রাগ ভাঙতে হত রামেন্দ্র বাবুকে ।

তের শো দশ সালে রামেন্দ্র বাবু ‘জিজ্ঞাসা’ নামে একখানা বই বের করলেন । তাতে কয়েকটা প্রবন্ধ আছে ‘স্বখ না দুঃখ’, ‘সত্য’, ‘জগতের অস্তিত্ব’, ‘আত্মার অবিনাশিতা’, ‘মাধ্যাকর্ষণ’, ‘এক না দুই’, ‘অমঙ্গলের উৎপত্তি’, ‘বর্ণতত্ত্ব’, ‘পঞ্চভূত’, ‘উত্তাপের অপচয়’, ‘ফলিত জ্যোতিষ’, ‘নিয়মের রাজত্ব’, আরও দু’চারটে প্রবন্ধ জুড়ে ।

বই যখন রামেন্দ্র বাবুর হাতে পড়লো তখন খুশী ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলেন—কোথায় আমার স্বর্গগত পিতা ! যিনি আমার ভিতরে স্বাধীনতার বীজ বুনছিলেন । একমাত্র তাঁরই আশীর্বাদে আমি মরুভূমি অতিক্রম করে চলেছি । পিপাসায় আমার কণ্ঠস্থান শুকুপ্রায় । কবে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে দেব ! চোখে জল পড়তে লাগলো । ইন্দুপ্রভা দেবী এসে বললেন—তোমার বই না কি ছাপিয়ে এনেচো ? কৈ একখানা দাও না ? তখনই একখানা বই হাতে নিয়ে দেখেন, স্বামীর চোখে জল । তুমি কাঁদচো কেন ? দুঃখে নয় ভাবাবেশে । আনন্দের দিনে আমার বাবাকে মনে পড়লো । আচ্ছা তুমি এতো লিখলো বোঝা যায়

না কেন? রামেন্দ্র বাবু বললেন, বাঃ, আর কেও না বুঝুক তুমি ত বোঝো আমার বই।—বুঝি না ছাই। তুমি থাকো, বুঝিয়ে দাও তবে।—না-না; ভুল ব'লচো কত সময় তুমি ব'লো এই জায়গাটা কেমন লাগচে। সত্য ব'লচি কেমন যেন সে স্থানটা বুঝাতে পারিনি। ভুলই লিখেছিলাম। বাবা ইচ্ছলে যেতে দিতে ভালবাসতেন না। তুমিও পড়ালে না, আমি আবার মানুষ! কাঁকে বই পাঠাচ্ছে নাম লিখলে যে—ওঁর নাম জানবে না। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা। আমারও ব'লতে পারো বড় দাদা।

সেই 'জিজ্ঞাসা' বইখানা পেয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই এনে চক্কা দেবো তাঁর কণ্ঠা ও তাঁর মাকে শোনাতে লাগলেন।

“শান্তিনিকেতন, ১-ই অগ্রহায়ণ।

সাহিত্য পরিষদের ঝুটো রত্নাবলীর শির-স্থানীয় একমাত্র সারস্বত বহুমানাম্পদ ত্রিবেদী মহাশয়!

আপনার পুস্তক পাইয়া পরম লাভ বলিয়া মনে করিলাম। ‘জিজ্ঞাসার’ প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া যেরূপ আনন্দ রস অনুভব করিলাম তাহাতে কৌতুহল জাগিয়া উঠিয়াছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আরও কয়েকটা পাতা পাঠ করিলাম; ইচ্ছা এক দৌড়ে শেষ পৃষ্ঠার কূলে উপনীত হই। কোমর বাধিয়া পড়িলাম। কিন্তু আর পারিয়া উঠি না, মনের খেদে পুস্তকখানি বন্ধ করিলাম। আমার পুস্তকখানি হু’ দিনের উপাদেয় খোরাক হইবে। ভোজন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিব না। যতখানি পড়িলাম অকৃত্রিম সত্য বলিয়া মনে হইল, সমস্তই মর্ম্মস্পর্শী। পাঠ সমাপ্ত হইলে আমার বাহা বলিবার কথা তাহা কোন মত ভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

আপনার ‘গুণানুরক্ত  
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র শুনেই স্ত্রী ইন্দুপ্রভা প্রশ্ন করলেন—তোমার সাধের সাহিত্য পরিষদের লোকদেরকে ঝুটো বললেন কেন? তখন হেসে অস্থির রামেন্দ্রসুন্দর। বললেন, তোমার সমাজপতি হওয়া উচিত ছিল। তোমার মত সমালোচক ত দেখিনি মেয়েদের মধ্যে!—তা হবে না! অতো বড় লোক লিখলেন কেন বলতে হবে? তখনও হাসি ছাড়েনি রামেন্দ্র। আমাদের বাড়িবার জন্ত, বুঝলেন না?

রামেন্দ্র বাবুর ‘জিজ্ঞাসা’ পড়ে খুবই ভাল লেগেছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের। কয়েক দিন পরই আর একখানি চিঠি লিখে অস্থির খবর নিয়ে চিঠি দিলেন।

তখন শুয়ে আছেন রামেন্দ্র বাবু বিছানায়। আর সকলেই আছেন বাড়ীর লোক। এমন সময় পিণ্ডন এসে চিঠি দিয়ে গেল। রামেন্দ্র বাবু বললেন তাঁর কণ্ঠা চক্কা, তোর মাকে এনে এই চিঠি খানা পড়।

“শান্তিনিকেতন, ১লা পৌষ,

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়, ‘জিজ্ঞাসার’ আমি হৃদ চার পাঁচ অধ্যায় পড়িয়াছি। আপনার গ্রন্থখানি জিনিষট! খুব ভাল—বিশেষতঃ আমার মত একেজো লোকের পক্ষে। কিন্তু সকল পাঠকের পক্ষে তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ বিজ্ঞানজ্ঞের অবোধ ছাত্রের তাহা পড়িলে খুব সংসারের আবেশে পড়িয়া হাবুডু খাইয়া তাহাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে। চন্দ্রের ওপরি কেউ চক্ষে দেখে নাই, অতএব চন্দ্রের ওপরি সহিত এপিঠের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা মম্বোর জ্ঞানাতীত। এ কথাটা আপনি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি কথা আপনার প্রতি বক্তব্য আছে। আন্তোপান্ত পাঠ করিয়া আপনার নিকট ভাসিব, এখন না। কিন্তু আপনার শরীরটার আন্ত আরোগ্য প্রয়োজনীয়। তাহার পর অল্প কথা। আপনি ভাল আছেন শুনিলে আরও মনের কথা জানাইব।

আপনার গুণানুরক্ত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

চক্কা, এক বার তোর মাকে জিজ্ঞেস কর তো, কী অজ্ঞার দেখলেন কোথায়?

তখন ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন ঠিকই ত লিখেছেন। তবে আমাদের মত লোক তোমার লেখা পড়ে হাবুডু খাবে।

তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—দেখ, তোর মা ঠিক ধরতে পারে কি না! আমি কোন লেখা তোর মাকে না দেখিয়ে কাগজে বের করি না।

চক্কা, তোর বাবাকে বলে নভেল লেখাতে পারিস্ নে। তা হ'লে অনেক লোকে পড়তো। আর একটা কাজের মতো কাজও হ'তো।

তখন রামেন্দ্র বাবু উচ্চ হাস্যের প্রোতে ঘর ভরে উঠলো।

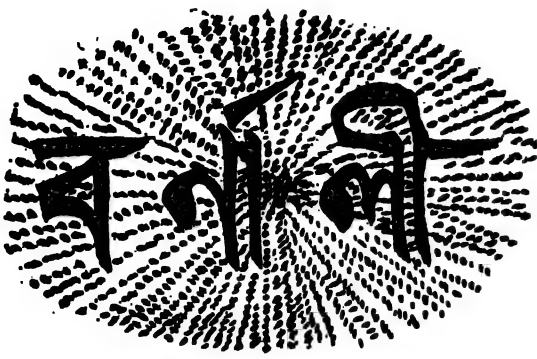
[ক্রমশঃ।

## যক্ষা ব্যাধির নয়া প্রতিবেদক

মহুয়াজীবনের পক্ষে যক্ষা ব্যাধি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রয়াস ও গবেষণার অন্ত নেই। সফলও এর ভেতর পাওয়া গেছে প্রচুর, এইটি স্বীকার করতেই হবে অসংকোচে। অন্ততঃ এককালে যে বলা হ'ত ‘যার হয়েছে যক্ষা, তার নেই রক্ষা’, এ যুগে কথাটি হুবহু সত্য বলা চলে না। এ ব্যাধি নিরাময়ের জন্ত এর ভেতর বহু ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র বের হয়েছে এক আরও বের করার জন্তে অব্যাহত উত্তম চলেছে বিশ্বের নানা যায়গায়, বিভিন্ন গবেষণাগারে।

যক্ষা ব্যাধির প্রতিবেদক টীকা হিসাবে বি, সি, জি, আজ অনেক

দেশেই চালু। সম্প্রতি বহু গবেষণাস্তে আর একটি নতুন প্রতিবেদক ঔষধ বের করেছেন ডাবলিনের আইরিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল। জন্তর উপর এই ঔষধের কার্যকারিতা—বা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের ডিবেক্টর ডাঃ ভিনসেন্ট পার্সি সে সকল বিস্তারিত ঘোষণা করেছেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে। ঔষধটি ডাবলিন ডাগ (লেবোরেটরি লেবেল বি ৬৬৩) নামেই এখন পর্যন্ত পরিচিত। যক্ষার আক্রমণ প্রতিরোধে মহুয়া-শরীরে এর প্রয়োগ যদি ঠিক ভাবে হয়, তবে দ্রুত এর নিশ্চিত সাড়া পাওয়া যাবে—আইরিশ আবিষ্কারক সন্থাটি এ বিশ্বাস ও দাবী রাখেন।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর্ব ]

## মূলধা দাশগুপ্তা

মঞ্জু উপরে উঠে এসে দিদিকে ও-ভাবে চোখে হাত-ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে দেখে একটু পি-টেপা ভাবতে কাঁছে এগিয়ে এসে মোরীর চোখের নীচে হাত ছোঁয়াল।

—এ কি হচ্ছে? মোরী ঠেলে দিল মঞ্জুর হাতটা।

—অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নি, তাই দেখছিলাম তুই কাঁদছিস কি না।

—কাঁদব কেন? ভুরু বোরালো মোরী।

—কাঁদবি কেন? কারণটা আমি কি করে বলব? কেন যে এক এক সময় ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে, তার কারণ মানুষ নিজেই বুঝে উঠতে পারে না; তা পারে বলবো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—তোর কি মনে হয়?

—আমার কি মনে হয়? আন্দাজ করতে বলছিস? ঠিক না হলে মাথার বাড়িটাড়ি মেরে বসবি না তো?

—না।

একটু ভাববার ভঙ্গি করে মঞ্জু। তার পর বলে—নামটা সুন্দর, ভাবছি নামের প্রভাবটা হয়ত চরিত্রে কিছু আছে। তা মন্দ কি। প্রেমিক মানুষ, ভালো তো।

—প্রেমিকদের মেকির কারবারই চালাতে হয় বেশী। অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল মোরী।

—দেখ দিদি, বাড়াবাড়ি করিস নে। যার সঙ্গে আজ বাদে কাল বিয়ে—

—ঈ তার জগাই। নইলে ভাবনাটা ছিল কি। এই পরিচয় তো শেষ হয়ে যেত আজই।

—বাঁচালি! এখন শেষ হয়ে যায় নি তাহলে! একটা স্বস্তির নিশ্বাস টানার ভাব করে বসে পড়ে মঞ্জু। মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে তাকায় আকাশের দিকে।

চান্দটা তখন উঠে এসেছে একেবারে মাথার উপর কিন্তু আলোটা তার আঁখি আগের মত স্পষ্ট নেই। হাওয়ায়-ওড়া পাতলা মেঘ ভেসে ভেসে এসে ঢেকে ফেলেছে তাকে। আর সে তারই এক-কাক ও-কাক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচা করছে কেবল তার উজ্জ্বল রূপটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে। রূপ দেখার তৃষ্ণার চাইতে রূপের নিজেকে দেখার তৃষ্ণাটা যে একটুও কম প্রবল নয়, যেন তারই একটা দৃষ্টান্ত চলছে আকাশেও।

চেয়ারে মাথা রেখে মঞ্জুকে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে মোরী বলে—হঠাৎ যেন তুই বড্ড ভাবনায় পড়ে গেলি মনে হচ্ছে?

—তোর কি উপায় হবে তাই ভাবছি।

—আমার উপায় ভাবছিস! হেসেই ফেলল মোরী। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে মনের চাপা ভাবটাও যেন গেল অনেকটা ওর হালকা হয়ে। তা স্থির করতে পারলি কিছু?

—স্থির করা ব্যাপারটা কোন সময়ই তেমন কিছু কঠিন নয়। বিশেষ করে তোর বেলা তো নয়ই। কঠিন হলো যে স্থির করার নিয়ে পৌছানোর পথ মেলা নিয়ে।

—অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তার ধারণাটা এমন পরিষ্কার যে, উপায় খুঁজতে একটুও অন্ধকার হাতড়াতে হয়নি। ঠেকে গেছিস সেই উপায়ে গিয়ে উপস্থিত হওয়া নিয়ে। পথটা খুঁই দুর্গম বুঝি?

—দুর্গম বলে কোন শব্দ নেই মঞ্জুর অধিধানে। পথই নেই। নির্ভরে সঙ্গে দেওয়া যায় এমনি পাত্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু কোন পথ নেই যে গিয়ে উপস্থিত হবো প্রস্তাবটা নিয়ে।

—কেন তোর আগেই অপর কেউ গিয়ে প্রস্তাবটা করে ফেলেছে? চোখ মিটমিট করল মোরী।

—না। যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও তাঁর জগত উপযুক্ত কণ্ঠা বানিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই একটা তুচ্ছ কারণ তৈরী করে অবিবাহিতই রেখে দিয়েছেন।

এই বার সত্যিই কৌতূহল বোধ করে মোরী।—নামটা বল তো? দেখি প্রস্তাবটা নিজেই গিয়ে করে উঠতে পারি কি না।

—বললাম যে, তার উপায় নেই।

—বেশ, উপায় না থাকে প্রস্তাবটা না হয় নাই-করা গেল। পরিচয়টা জানতে বাধা কি?

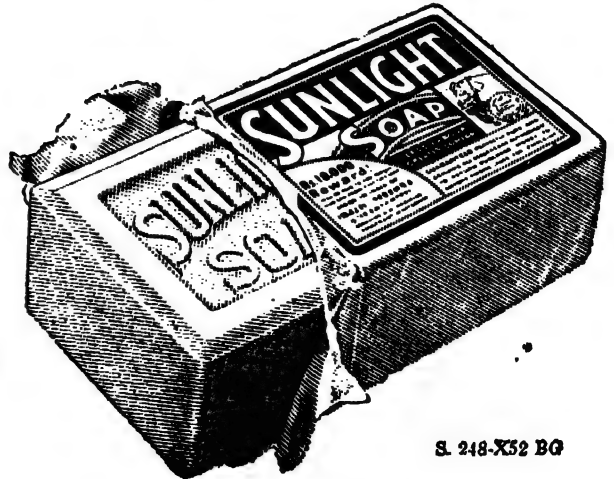
পরিচয় কি দেবে মঞ্জু! ও কি কোন বাস্তব লোকের কথা বলছে? মঞ্জু জানে, যোগাযোগ বইখানা দিদির কাছে ধর্মগ্রন্থ বিশেষ, বিপ্রদাস ওর কাছে আদর্শ পুরুষ, কুমু ওর মন খারাপের অধুষ। মনের তুফান থামাতে কুমু চোখ বুজে আবৃত্তি করত “প্রিয়ঃ প্রিয়য়ার্হসি দেব সোচম্” মঞ্জু দেখেছে মোরী মেলে ধরে বসে কুমুকে। বলে, যে শ্রদ্ধা দিয়ে কুমুকে তার সৃষ্টিকর্তা গড়েছেন আমাদের গড়বার সময় আমাদের সৃষ্টিকর্তাও নিশ্চয়ই তার কিছুটাও অন্তত দিয়ে গড়েছেন। আর বিপ্রদাস—মোরীর কাছে নাকি ও নামটার সঙ্গে তিনটা ছবি জড়ানো। তার প্রথমটা হলো, দীর্ঘমেহ এক বলিষ্ঠ পুরুষ ঘোড়াটাকে নিজ মরজি মত চলতে দিয়ে ক্লান্ত দেহে বসে আছেন। বিবর দৃষ্টি তাঁর দিগন্তে মেলা। মন ভারাক্রান্ত প্রিয়তম বোনের ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তায়। আর তার বিতায়টা হলো, স্বামীর হাতে বোনের লালনায় স্থির থাকতে না পেরে অসুস্থ শরীর নিয়েও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। গায়ের সাঁল মোটা চান্দরটা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর মাটিতে। গেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—‘আর কুমু আমার কাছে আয়।’ আর তার তৃতীয় আইটেমের ছবিটা বলতে তো মোরী দস্তরমতো অভিভূত হয়েই পড়ে—স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে কুমু। আর হয়ত দেখা হবে না। আর হয়ত ওকে এখানে আসতে দেবে না। বোনকে তার জীবনের সকল অমিলের সকল বেগবরের পরপারে পৌছে দিয়ে আসতে বসলেন, তখনও ভোর হয়নি। তখনও আলো:

# দেখুন! অন্ধেকটি সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!



সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা  
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।





ফোটেনি, বোনের হাতে তুলে দিলেন একটি নিজে তুলে নিলেন একটি এসরাজ। বললেন 'আর দু'জনে মিলে বাজাই।' দিদির চোখে মুখে তখন একটা আলো খেলছে। যদিও মঞ্জুর কাছে বিপ্রদাসের রূপটা একমাত্র দাদা। এছাড়া আর কোন চেহারায় ও তাঁকে ভাবতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে কেন জানি তাঁকেই মনে পড়ে গেছে মঞ্জুর দিদির উপযুক্ত পাত্র হিসাবে। মৌরীর পাত্রের পরিচয় জানতে চাওয়ার জবাবে ধীরে ধীরে বলে—কুমুর দাদা।

বিস্ময়ে ভুরু ঘোরাগ মৌরী—কুমুর দাদা—সে আবার কে?

—কুমুর দাদা, সে আবার কে? কুমু আর বিপ্রদাসের সঙ্গে তোকে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না কি?

—হা ভগবান! মানুষকে এ ভাবেও নিরাশ করতে হয়? ভেবেছিলাম নাম-ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একেবারে গোলাপ-কুঁড়ির মালা হাতে গিয়ে দাঁড়াব সামনে। তার পরও ফিরিয়ে দিতে পারেন এমন পুরুষই হন তো তাঁরই মন জয় করব, এই হবে আমার সাধনা।

—দুঃখ ত এই। এমন পাত্র থেকেও নেই। বিজ্ঞানী আর ডাক্তার আজ-কাল কত পারে আবার যেমন কিছুই পারে না, জীবন দিতে পারে না—লেখকদেরও সেই এক অবস্থা। সৃষ্টি করতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই বলছি, মনের বিচরণ ক্ষেত্র মেঘ-লোক থেকে মর্ত্যলোকে নাড়িয়ে আত্মন মহাশয়া। প্রথম প্রথম শক্ত ঠেকবে কিন্তু সেটাই সত্য। কেতাবী জগতে মন যেমন সচল, সেই তেমন অচল। ও-জগতের নায়ক নিয়ে জীবন চলে না।

বৌদি মুখে অপ্রসন্নতা শরীরে রান্নাঘরের পেয়াজ-বসন্ত মাস-মসলার এক সমিশ্রিত গন্ধ নিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো।—তোমরা ভাই এখানে একটা কলি-বেল-টেল গোছের কিছু লাগিয়ে নাও বাপু! খবর দিতে নিতে ডাকতে এত বার বার উঃ-নাচ করতে আমি পারিনি।

সত্যি, সুন্দরন আসবাব পর থেকে আজ বিশ্রাম একটুও মেলেনি অমিতার। হঠাৎ কবে ওবেলা কিছুই করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সেটা পুথিয়ে নেওয়া হচ্ছে বাস্তব আয়োজনে। নিয়ে আসা হয়েছে ছোট পিসিকে। ছোট পিসি নিয়ে এসেছেন তার রান্নার লোকটিকে, যে না কি তিনহাজারী পিসেমশাইয়ের পদস্থ অতিথিসের সদাই সামলাতে অভ্যস্ত। মুগগী-মটন-ডিম-বিস্কিট-পেশ্তা-বাদাম-পেশোয়ারী চাল—অবও কত দেশী বিদেশী আয়োজন ঘরময় ছড়ানো। মাঝখানে ছোট পিসি এক শান্তিনিকেতনী মোড়ায় চেপে বসে তদারক করছেন। সাধা কি অমিতা সে ঘর থেকে বেরায়। এটা হয়েছে তো ওটা করো। ওটা হয়েছে তো সেটা করো। বেচাৱীর অনভ্যস্ত কোমর সঁজা কটকট করছিল। চোখ ফেটে আসছিল জল। মঞ্জু ওকে হাত ধরে টেনে ওর চেয়ারটায় বসিয়ে দিলে। অমিতা বসে কিন্তু মুখে বলে—খাঁক, আমার আর বসে কাজ নেই। ছোট পিসির খদ্-ধগা মুখ আরো থম থমে উঠবে। তার অপরকে বলব কি। হোমার দাদাটিই মানুষ! জুতো মচ-মচ করে রান্নাঘর থেকে আমার ডেকে নিয়ে এলেন—আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই। হোমরা দু'জন ছাড়ে, আমি রান্নাঘরে আর সুন্দরন বসবার ঘরে একা। যেন তোমাদের ছাড়ে থাকার, আমার রান্নাঘরে থাকার আর সুন্দরন বাবর এক! থাকার কারণ, আমার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। তুমি

এই কিছুক্ষণ আগেই না চা করে নিয়ে এলে? কি করে জানব আমি, তোমরা কখন ছাড়ে এসেছ?

—এই না জানাটাকেই দাদা অপরাধ মনে করেছেন। মঞ্জু বলে।

—রান্নাঘর থেকে পা দূরের কথা, মুখটা পর্যন্ত বার করে ঠাণ্ডা হতে ফুরানত দিচ্ছে না। এদিকের খবর জানব কি করে?

—সেটা আবার দাদা জানেন না। তাই সব সময় সব ঘটনা জানবার জন্ত অপেক্ষা করতে হয় না, ম্যানেজ করতে জানতে হয়। তা জানবে না কেবল 'কি অজ্ঞার' বলে উঠবে বেগে। এসেছ তো নিশ্চয়ই এক পশলা ঝগড়া করে?

—এসেছিই তো।

—জানি।

—তুমি হলেও করতে।

—পাগল!

—করতে না? মিথ্যে মিথ্যে দোষ খাড়ে চাপিয়ে রাগ দেখালে চূপ করে থাকতে?

—আচ্ছা, সে যাক। কিন্তু দাদা যখন বললেন—'সুন্দরন একা কেন' তখন তুমি জবাব দিলে না কেন? 'তার এখন একটু একা থাকা দরকার তাই।'

স্বামীর সম্বন্ধে নালিশ তুলে গেল অমিতা। কেন, তার একা থাকা দরকার কেন?

মৌরী রাগত ভাবে চোখ টিপল মঞ্জুকে। মঞ্জু তা দেখেও দেখল না।—ঠিক তোমার এই জিজ্ঞাসাটা এই ভাবে দাদাও করতেন। আর তখন তুমি আঁচল ঘুরিয়ে চলে আসতে আসতে বলতে, 'তা নিয়ে তোমার প্রয়োজন নেই।' দাদা তোমার কাণ্ডজ্ঞান অভাবের কথা ভুলে গিয়ে ভাবতেন, 'কি হলো।' আর সে অবসরে তুমি ভজলোকদের খোঁজে পড়তে বেরিয়ে। এসে দেখতে, সত্যি তার একা থাকার প্রয়োজন আছে কি নেই। থাকে তো চলে গেলে। না থাকে তো বসতে কাছে। বাস হয়ে গেল। কিছু ম্যানেজ করতে জান না, কেবল ঝগড়া আর রাগারাগি, রাগারাগি আর ঝগড়া।

—ও সব মুখেই বলা যার। খাড়ে পড়লে তখন দেখা যাবে। মৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে—হোক না আগে, তার পর বুঝবে বিয়েতে কত মধু।

মৌরী বলে—জোড়ার জোড়ার তোমাদের দেখছি, স্বান্টা এর মিঠা না কথা, বোকাটা কি নিজের জিভের জন্ত তুলে রেখেছি?

মাখা দোলল মঞ্জু।—এ বাপু তোমাদের পিঁপড়ের মধু খাওয়ার পরিণতি দিয়ে মধুর বাটিটাকে গালাগাল দেওয়া।

বিস্ময়ে চোখ বড় করে মৌরী।—বাপারটা কি রে! ভূতের মুখে রামনামের মত কানে ঠেকছে যে। তুই না কি বিয়েই করবিনে! যদি এমন মধু ভরা, তবে বিয়েতে তোর এত বিরাগ কেন?

—বিরাগ? কি বলে! বিয়ে আমি করব না। তার কাণ, মধুর পাত্রটা জীবনে আমাদের না হলেও চলে কিন্তু য হুণপাত্রটি জীবন ধারণের পক্ষে কেবল অপরিহার্যই নয়, যেটা সব স্বাদের মূল আর যাব অভাবে আজ আমাদের জীবনের সব স্বাদ এমন বিশ্বাদের পথ্যায় গিয়ে ঠেকেছে আমি বেরুবে সেই হুণপাত্রটির আশ্রয়ে—কিন্তু তার দেৱী আছে। বর্তমানে

আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি নির্ভয়ে বিশ্রাম কর বৌদি! রাত্রির পরিচালন থেকে পরিবেশন সব ভার আমার। ভয়ভর করে নামতে নামতে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁটার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া ভাবে মুখোমুখি অবস্থার ঠাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। জয়দেব বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নিজেই ওপরে উঠে আসছিল।—সুদর্শনকে একা বসিয়ে রেখে তোরা সবসময় অমন ছাদে গিয়ে বসে আছিস কেন?

—আমরা না থাকলেই বুঝি একা হলো?

—আমরা বসে বসে গল্প করলে ভারি ভালো সময় কাটবে তার। নইলে বসতে কি?

মঞ্জু জানে কথাটা সত্য নয়। এই সন্ধ্যার সময়টা ঘরে বসে থাকতে জয়দেবের বিষম আপত্তি। এটা তার তাস খেলবার সময়। তাসটাই নেশা, তাতে খেলাটা তিন তাসের, এ সময়টা তাকে কোন মতেই আটকে রাখা যায় না বাড়ীতে—গেলে আজ অন্ততঃ সে বাড়ী থাকতই। এতক্ষণে কবে সে চলে যেত। কিন্তু বাড়ীর প্রতি কর্তব্যটাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে সব সময় চলা যায় না—অবশি তাতেও আপত্তি ছিল না তার। আপত্তিটা বাড়ীর এবং তা এমন কম জোরালো নয় যে অনায়াসে অবহেলা করা চলে। সুদর্শনকে একা দেখে দু-একবার ঘরে ঢুকে দু-চারটা কথা বলেছে, বসেছে আবার উঠে এসেছে আবার গেছে। তার পর আমিতাকে উপরে ডেকে ত্যক্ততা প্রকাশ করেছে—তবু কারু দেখা নেই। এ ভাবে যেতেও পারছিল না বসতেও পারছিল না। এবার সে হাঁটা দিল। কিন্তু ক'পা গিয়েই ঘরে এসে ডাকল মঞ্জুকে, এই মঞ্জু শোন। মঞ্জু এলে নীচু গলায় বলল—কুড়িটা টাকা দে না। কালকেই দিয়ে দেবো। ঐ যে সেদিন দিয়েছিলি ঠিক কথা মতো আজ সকালে তোকে দিয়ে দিয়েছি না?

হাসল মঞ্জু। তা দিচ্ছি। কিন্তু সকালে নিয়ে সন্ধ্যায় আবার নেওয়ারকে কি ঠিকমত দিয়ে দেওয়া বলে? টাকা এনে দিল মঞ্জু। আজ রাত করো না দাদা!

—না না। আজ তাড়াতাড়িই আসব। জয়দেব হাঁটা দিল।

মঞ্জু এসে অতি সাবধানে এবার উঁকি দিল বসবার ঘরে। দেখল সুদর্শন চোখের দু'কোণায় ভাঁজ ফেলে বসে সিগারেট টানছে। চোখের ভাঁজ চিন্তা করছে বলে, না হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার জন্ত বৃথল না মঞ্জু। ঢুকবে—একটু ভাবল ও। না আগে এক বার রাত্রিরটা হয়ে আসতে হয়। বৌদিকে নির্ভাবনায় বসে থাকতে বলে এসেছে যে।

ঘরখানা যা সেজেছে পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি আর ইলশে-বেগুন ঝোল রান্নার ঘর তো নয়, যেন এটা বড় হোটেলের বাবুচিখানা। ছোট পিসির চাকর কানাইলাল ধবধবে পাজামা আর হাউই সার্ট পরে এমন মুখে হাত চালিয়ে যাচ্ছে যে, এমনি রাত্রিরে এমন আয়োজনে অভ্যস্ত নয়। শুধু মনিবের খাতির কোন মতে কাজটা উত্তরে দিয়ে যাচ্ছে। আর ওদের রান্না তার হাতে থালা প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে না তো যেন সবিনয়ে বড় সাহেবের হাতে ফাইল পত্র তুলে দিচ্ছে। হেসে উঠল মঞ্জু। সবাই মুখ তুলে ভাকাল ওর দিকে। ছোট

পিসি কোলের উপর প্লেট নিয়ে পেন্সা-বাদাম বাছছিলেন। চোখের রিমলেস চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে মঞ্জুর দিকে চাইলেন। মুখে অসন্তোষ—তোমরা দুজনে নাকি ছাদে গিয়ে বসে আছ?

—অতিথির সামনে বসে কেবল কথা বললেই কি আপ্যায়ন বেশী ভালো করা হয়? একা থাকতে দিতে হয় তাকেও। এবার যাবো।

পেন্সাবাদামের খোসা বেড়ে ওঠে ঠাঁড়ালো ছোট পিসি।—ছেলে যে এমন এককথায় থাকল—আমার আশ্চর্যই লাগছে। তোমরা জান না আমি তো জানি, কত বড়গরের ছেলে আর কি ভাবে থেকে অভ্যস্ত সে। যদিও পিসিমার দিকে তাকিয়েই ছোট পিসি কথাগুলো বললেন তবু মঞ্জুর বুঝতে কষ্ট হলো না উদ্বেগটা সেই। ছোটপিসির ধারণা ওরা দু'বোনে পাত্র অনুযায়ী যতটা খাতির যতটা সমীহ দেখানো উচিত তা দেখাচ্ছে না। ওদের ব্যবহারটা হচ্ছে সাধারণ।—ওঁদের লঙ্কায়ের বাড়ীর যে এলাহি কাণ্ডকারখানার কথা শুনেছি ওঁর মুখে—ছিলেন তো গিয়ে কয় দিন। শুধু ওর জন্তই এ—থেকে গেলেন ছোট পিসি। বোধ হয় তারও বাজল। কারণ বহু বার বহু প্রকারে তিনি বুঝিয়েছেন সম্বন্ধ শুধু মাত্র তাদের জন্ত।

হী জানে মঞ্জুর এ সম্বন্ধ পিসেমশাইয়ের খাতির। পিসেমশাই আর পাত্রের ব্যবসায়ী বাবার সঙ্গে কোথা দিয়ে যেন একটা স্বার্থের জট পাকিয়ে গেছে আর তারই ফল এটা। এ সম্বন্ধ হবার পর ছোট পিসির বুক চিরে একাধিক বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটি মেয়ের জন্ত। তবু একথা সত্য, এ বিষয়ে তারই জন্ত। মঞ্জু পিসিমার এই সাময়িক খেমে যাওয়ার কীকৎ রঙনা হলো।—আমি যাচ্ছি বসবার ঘরে। কিছু করবার হলে ডেকো। বৌদিকে আমি সুদর্শন বাবুর শোবার ঘরটা যে ঘরে হবে সেটা ঠিক করতে দিয়ে এসেছি।

ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিল মঞ্জু। বাড়ী থেকে ডানলোপী তোরক বালিশ আনতে গাড়ী পাঠাতে হবে তো। বাহুদেব উঠে ঠাঁড়ালো।—আমি যাচ্ছি। তার উৎসাহের কারণ ভালো মিষ্টি খোঁজ, সে গাড়ীটা নিয়ে ঘুরতে পারবে। সমস্ত দিন আজ সে এই করছে। তার ধারণা, এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই। বিজ্ঞাটা শেখাতে বললে বলে, এও মস্ত আর্ট। আর্ট যেমন বলে শেখানো যায় না—এত তেমনি। প্রতিভা থাকা চাই।

মঞ্জু এলো বসবার ঘরে। সুদর্শন ঠিক তেমনি ভাবে বসে সিগারেট টানছে। সামনের এসেটো ছাই আর আদেক-খাওয়া সিগারেটে ঠেসে গেছে। মঞ্জুকে দেখে সিগারেটের ছাইটা আঙ্গুলের টোকায় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—আহুন।

বসল মঞ্জু। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। একটু অপেক্ষা করল। তার পর জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—মেঘ করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে বেশ, কোথাও বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছে।

সুদর্শন তাকিয়ে বইল ওর দিকে। কিন্তু কথা বলল না কিছু।

মনে মনে মাথা নাড়ল মঞ্জু। তখন মোরার কাছে অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ ক্ষমা চেয়ে ফেরতে গেলেও ব্যক্তিগত অমন সহজে হাত-জোড় করার নয়।



## মানবেন্দ্র পাল

এক-খাদ্য রজনীগন্ধা কলোজ ষ্ট্রীট থেকে কিনে নিল রেখা।

এটা অবশ্য উপরি। তাস্তাং পেয়াল হল। ভাবল মন্দ না। আজ বিছানার কাছে নিশেদে রজনীগন্ধা যখন আলো করে থাকবে তখন সেটা আলোয় ওরা হুঁ-হুন অন্ধকার সিঁড়ি অতিক্রম করে ফিরে যাবে সুদূর অতীতে। আজকের রাতটা তো জেগে থাকবার রাত। আজ আর কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না ওকে। ভালোই হয়েছে, কাল রবিবার। কাজেই শনিবারের একটা রাত জাগলে কিছুই হবে না।

আবার ট্রামে উঠল রেখা। ও অফিস থেকে ফেরবার আগেই সমস্ত গুছিয়ে ফেলতে হবে।

প্রতি বছর এই দিনটিতে জোর কমপিটিশান চলে। কেউ কম যায় না। তবে রেখা হারেনি। বরঞ্চ অবনীই হেরেছে দু-এক বার।

বাড়ি এসেই অবনীকুমার দেখে এক অভূত ব্যাপার! সমস্ত ঘরটা নিখুঁত ভাবে সাজানো। সাজানো অবশ্যই প্রত্যেক দিনই থাকে কিন্তু এ দিনটার মনে হয় সারা দুপুর ধরে রেখা পরিশ্রম করছে। খাট আলমারী টেনিস চেয়ার এমন কি বুক-শেলফটা পর্যন্ত পান পরিবর্তন করেছে। বহুবে এটা একটা দিন রেখা এক বার করে সব সরিয়ে নড়িয়ে রাখে। এক বছরের একঘেয়েমিকে এমনি ভাবে এই বিশেষ দিনটিতে রেখা বদলে নেবান চেষ্টা করে।

ঘরে ঢুকেই অবনী সব বুঝতে পারে। এমনি লজ্জার অপরাধে মাথা ঝেঁট হয়ে যায়।

অফিসের কাপড় তখনো ছাড়া হয়নি, এমন কি ফ্যানটা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়নি, বিখিত বিমূর্ত অপরাধী অবনীকুমারকে ঠিক এটা মুহূর্তে চকিত করে দিয়ে পর্দা সরিয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় রেখা।

মুখের ওপর চক-চক করছে এক টুকরো হাসি। হুঁচোখে অভিমান ভরা জল। কোনো রকমে একটা খান বাড়িয়ে দিয়ে বলে—সার, আপনকা একটা চিঠি হয়।

এই বলে অবনীর হাতে কোনো রকমে খামটা গুঁজে দিয়ে রেখা দ্রুত পাশিয়ে যায়।

খান খোলবার আর দরকার হয় না। সেই মুহূর্তেই অবনীর সব মনে পড়ে। আবার এক বাব বিবেকের লেশন বুকখানা আলিয়ে দেয়। মনে মনে ভোঁবে ইস! কাঁ হুল! এ মুখ নিয়ে রেখার কাছে দাঁড়াবে কা করে?

খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ে।

—আজ আমাদের বিয়ের দিন। তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

বিশ্ববস্ত সেই একটা। তবু রোমাক আছে, তবু সামান্য এই ছুটি লাইনের জন্তেই আজ অবনীকুমারের নিদ্রাকণ পরাজয়।

বিয়ের অনেক পূর্বে থেকেই রেখার সঙ্গে অবনীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। চিঠিপত্রও চলত নিয়মিত। তারপর ক্রমে ক্রমে ওরা ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। কিন্তু চিঠি লেখাটা বন্ধ করে নি। এটা রেখারই তাগিদ। ও বলে—চিঠি লেখার ভেতর একটা রোমাস আছে। তাহাড়া যখন আমরা ছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে—যখন কোনো ক্রমেই আমাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না, তখন বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করেছে এই পত্র-দূত। আজ দিন ফিরেছে বলে কি একে বান দেব?

সেই থেকে এমন কি বিয়ের পরও নিয়ম হল, অন্তত এই বিয়ের দিনটিতে ওরা পরস্পর পরস্পরকে এই একই বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দেবে। একট দিনে একই পিওন একই বাড়িতে দুটি নীল খামে-ভরা চিঠি বিলি করে দিয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম রেখাট মনে করিয়ে দিত। মুখে কিছু বলত না। ঘুম থেকে উঠেই একটি প্রণাম।

অবনীকুমার শশবস্ত হয়ে উঠত—আরে আরে, কাঁ ব্যাপার!

—কাঁ ব্যাপার মনে নেই?

বুদ্ধিমান অবনীকুমারের মনে পড়ে যেত। তাড়াতাড়ি বলতো ও তাই তো!

—আমার চিঠি লিখেছ?

—চিঠি!

—তাও ভুলে গেছ? বেশ আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি না পাই তো, জন্মের মতো আড়ি।

অবনীকুমার আর বিছানার স্তরে থাকে না। তাড়াতাড়ি উঠে কোনো রকমে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ে পোষ্টাফিসের উদ্দেশে। ওখানেই একটা চিঠি লিখে পোষ্ট করে দেবে।

কিন্তু এর পর আর রেখা মনে করিয়ে দিত না। যত পুরনো হচ্ছিল ওরা, তত যেন অবনী কেমন ঢিলে হয়ে পড়ছিল। ঢিলে হয়ে পড়ছিল ঘরে; তেমন করে রেখার সঙ্গে গল্প করে না, তেমন করে কথায় কথায় বলে না—চলো বেড়িয়ে আসি। যেটুকু কথা হয়, তা শুধু অফিস নিয়েই। কেমন করে উন্নততর গ্রেডে যাবে, সেই চিন্তাতেই অবনী যেন বিভোর।

রেখার এটা ভালো লাগত না। তাই অভিমান বাড়ত দ্বিগুণ। ঠিক করলে, বিয়ের দিনের কথা আর মনে করিয়ে দেবে না।

দেয়ও না আর।

বেচারী অবনীকুমার প্রথম প্রথম কয়েক বার ভুলে গিয়ে লজ্জিত বেদনায় প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে, আর কখনো ভুল করবে না। সেই থেকে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার পেয়েই অবনীকুমার বিয়ের দিনটিকে চিহ্নিত করে রাখত।

এতে অবশ্য অবনীকুমারের আর ভুল হয়নি। ভুল হয়নি মানেই হার হয়নি। রেখা মনে মনে সুখী হত। কিন্তু স্বামীকে এই বিশেষ দিনটিতে চমকে দেবার জন্তে মনে মনে নানারকম ফন্দি ও আঁটত। এবং প্রতিবারই ভাবত—আজ যদি ওর 'চিঠি' না আসে, যদি ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে—

কিন্তু অবনীকুমারের আর ভুল হয় না।

ট্রাম চলছে। লেডিজ সাটটার এক পাশে রজনীগন্ধার ঝাড়টি সম্পূর্ণে নিয়ে রেখা তাকিয়ে আছে ফুটপাথের দিকে। মনটা বড়ো প্রফুল্ল। অনেক দিনের অনেক কথা সব ভিড় করে আসে। কিন্তু

না, এখন থাক। সে সব কথা আলোচনা হবে আজ রাত্তিরে।  
সারা রাত ধরে।

ফুল কেনাটা হল এবাব উপরি। এব আগে কোনো বছর ফুল  
কেনার কথাটা মনে হয়নি। ঘর-দোর শুছিরেছে, পবিত্র করবেছে,  
অবনীকুমারের মনের মতো খাবার তৈরি করে রেখেছে, একমাত্র কত্থা  
চিল্লকে স্বামীর কোল থেকে বাব বার নিজের কাছে টেনে নিয়ে  
অজ্ঞপ্ত বার আদর করবেছে। তাকপব বিকেলের ডাকে হুঁজনের চিঠি  
এলে, হুঁজনেই অপরিণীত কোঁতলে পড়ে কেলেছে। কিন্তু ফুলের  
কথা মনে হয়নি কাবও। অবনীকুমার শাড়ী কিনে এনেছে সেদিন,  
কিন্তু ফুল আনবাব কথা মনে পড়েনি।

মনে পড়ল এবাব বেখাব। হঠাৎই মনে পড়ল। দশ বছর  
আগে একদিন এক ভীক স্বরূপ যুবক তার কাছে ফুল নিয়ে এসেছিল।  
সেদিনটা রেখার বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কিন্তু সেই মানুষটা ব সঙ্গ  
আজকের মানুষটার তফাত যে অনেক।

সে আব ফুল নিয়ে এল না কোনো দিন।

বাড়ি এসে পৌঁছল যখন রেখা তখন পাঁচটা বাজছে। যদিও  
আজ শনিবার, তবু অবনীকুমারের ফিবেতে সেই সাড়ে পাঁচটা। অফিস আর  
অফিস। অফিসের চেয়ে বড়ো বেন আব কিছু নেই।

ঘরে ঢুকতেই চিল্ল ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মাকে।

—কী সুন্দর ফুল!

—তোর বাবা আসেনি?

চিল্ল বলে—না, বাবা আসেনি, তবে বাবার নামে গুঁটা  
চিঠি এসেছে। বলে তখনই চিল্ল ছুটে গিয়ে একটা নীল খাম  
এনে দিল।

রেখা দেখল এটা গুঁই চিঠি। কিন্তু—

কিন্তু তার নামে তো চিঠি এল না। জিজ্ঞাস করলে—হ্যাঁ রে,  
আর কোনো চিঠি আসেনি?

চিল্ল বেন মায়ের হুঁখটা বুঝতে পারল। বিমর্ষ ভাবে মাথা নেড়ে  
বলে—না ভো!

রেখার চোখ ছুটো মুহুর্তে কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যে  
আনন্দের দীপটি এককণ ধরে তার মনের গভীরে আলোময় করে  
রেখেছিল, এই মুহুর্তে কে বেন সেটা হুঁ দিয়ে নিবিরে দিলে।

কিন্তু তাও মুহুর্তের জন্তে। পরক্ষণেই রেখার দুই চোখ চকচক  
করে উঠল। পাতলা ঠোঁটের ওপর দাঁতের কামড় বসিয়ে কী বেন  
ভাবল। তার পর গভীর ভাবে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, হয়তো এখুনি  
আজকের এত আয়োজন তছনছ করে ফেলবে, কুচিরে ফেলবে  
মজলীসকার পাগড়ি।

কী জানি, রেখার মত বয়েস বাড়ছে তত বেন বাড়ছে অভিমানে।  
একটুতেই বেন ভেঙে পড়ে—গলে যায়, কিছুতেই স্তনতে চায় না  
অবনীকুমার কোনো কথা। কেবলই মনে হয়, সে মানুষটা বেন  
আর নেই—সেই রোমাণ্টিক পুরুষটা বেন দূরে সরে যাচ্ছে—বহু  
দূরে।

কিন্তু অশান্তি সে দিন ঘটল না। অবনীকুমার এল একটু  
পরেই। হাসিখুশি মুখ। তবু বেন কোথায় একটু অপ্রস্তুতের  
ভাব। হাতে একটা নতুন-কেনা কাপড়ের মোড়ক। ঘরে

চুকেই চিল্লকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে জিগ্যাস করলে—  
তোর মা কোথায় বে?

চিল্ল নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তার পর নিচু  
গলায় বললে—মায়ের মন খুব খারাপ।

অবনীকুমার চমকে উঠল। বললে—কেন?

—বোধ হয় মায়ের নামে চিঠি আসেনি অনেক দিন, তাই।

চিল্ল একটু খেমে আবার বললে—আজ একটু আগেই খবর নিচ্ছিল  
চিঠি আছে কি না—ওই যা—বলতে ভুলে গিয়েছি, তোমার নামে বে  
একটা চিঠি এসেছে।

এই বলে চিল্ল এক-ছুটে চিঠিখানা আনতে গেল। অবনীকুমার  
সেই স্তবগো জামাব পকেট থেকে একটা মুখ-খাঁটা ঠিকানা-লেখা  
খাম বের করে টেবিলে রেখে দিলে। যথানিয়মে রেখাকে চিঠি  
আজ সকালেই লিখে বেখেছিল কিন্তু পোষ্ট কবতে ভুলে গিয়েছিল  
বেমানুষ।

মনে মনে অবনীকুমার তাই কত্থাকে অজ্ঞপ্ত ধন্তবাদ জানালে—  
ঠিক সময়ে চিঠির কথা ভুলেছিল।

মিটমাট হয়ে গেল। মনোমালিন্যটা আব হল না। খাম  
দেখেই বেখাব মনের গ্লানি দূর হয়ে গেল। লক্ষ্য করবার সময়  
গেল না, খামে পোষ্টাফিসের ষ্ট্যাম্প আছে কি না।

বেশ কেটে গেল সেদিনের সন্ধ্যাটা। স্বামি-স্ত্রী আর ঐ দশ  
বছরের কত্থা চিল্ল। হাসি-গল্প আব খাওয়া।

চিল্ল অবনীকুমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—আজ আব সন্ধ্যার সময়  
তুমি বেরোতে পারবে না বাবা!

অবনীকুমার হাসল একটু। বললে—আচ্ছা, তাই হবে।

চিল্ল এবার মায়ের কোল ঘেঁষে এসে পাঁড়ালো। বললে—মা,  
আমার জন্মদিন কবে?

—জন্মদিন! রেখা বেন চমকে উঠল।

চমকবার মতো ব্যাপার তো কিছু নয়। অত্যন্ত সাধারণ  
একটি শিশুজনের জিজ্ঞাসা।

কিন্তু রেখার মনে হল, যদিও চিল্লর এক বছর বয়েস  
থেকেই জন্মদিন নিয়মিত ভাবে উদ্‌যাপন করে আসা হচ্ছে তবু  
এই প্রথম চিল্ল নিজে জিগ্যাস করে জানতে চাইল, জন্মদিন  
কবে?

রেখা বেন কেমন খিত্তিরে গিয়েছিল। অবনীকুমারের লক্ষ্য  
এড়ায়নি। বললে,—কী হল এমন চূপ করে গেলে?

রেখা বেন কোন দূর জগৎ থেকে ফিরে এল। শুকনো গলায়  
বলে—চিল্লর জন্মদিন—

অবনীকুমার তখন মেয়েকে ডাকল নিজের কাছে। বললে—  
এসো মা, আমি বলে দিচ্ছি।

চিল্ল মায়ের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে বাপের কোলে উঠে বসল।

অবনীকুমার ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বললে—আজ হচ্ছে  
ইংরিজির কত তারিখ? কুড়ি না? বিশ? জুলাই আমাদের  
বিয়ের দিন, আর তেইশে আগষ্ট হচ্ছে তোমার জন্মদিন। তা হলে  
বল দেখি আর ক'দিন বাকি রইল?

অবনীকুমার আদর করে মেয়ের গালে একটা চুমু দিতে বাচ্ছিল,  
কিন্তু নেওয়া হল না। মুখ তুলে সামনে তাকাতে হল। রেখা বীরে

বীরে উঠে চলে বাচ্ছে।' অতঃপর মুখখানা এই মুহূর্তে যেন কেমন কালো হয়ে উঠেছে।

অবনীকুমার ভাবল একবার ডাকে, কিন্তু জানে, ডাকলে ত বেথা এখন আব আসবে না। ওর সেই পুরনো জায়গায় অনেক দিন পব আজ আবার নতুন করে আঘাত লেগেছে। এখন ওকে শুধু শুধু ডাকা মানেই চিম্ব টনক নড়ানো। এখুনি হাজার রকম প্রশ্ন কবে বসবে,—মাগেব কী হয়েছে বাবা? মা চলে গেল কেন? মাগেব মুখটা অমন শুকনো কেন? বলো না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিল অবনীকুমার। না, ডেকে দবকাব নেই। বেথা একটু একলা থাকুক। আর চিম্ব—তার মনটাকেও প্রকুল রাখা দবকাব। ও এখন শিশু। ওব মনে যেন আঁচড়াটী না পড়ে।

শ্রাবণের বাড়ি। বাইবে ঘন অন্ধকার। ঝুপ-ঝুপ কবে বৃষ্টি পড়ছে।

এ একটা দুর্লভ বাত। চিম্ব বালিশে মুখ ওঁজো ঘুমোচ্ছে অকাতবে। এ পাশে অবনীকুমার আব বেথা। কাবও মুখে কথা নেই। অবনীকুমারও তো প্রস্তুত ছিল তাব জন্তে। কিন্তু—

কিন্তু বেথা দিবে যেন কী ভাব গেল। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে চিম্ব কী যেন বলে ফেলেছিল। কে জানত তাব প্রতিক্রিয়া গড়াবে এত দূর।

অবনীকুমার কিন্তু জানে। জানে বলেই ও-ও আজ কথা বলছে না, ঘাঁটাচ্ছে না বেথাকে। একটু আদব কবলেই যে বেথার মন কিরে বাবে এমন তবল মন যে নয়। ও মনকে আয়ত্ত করা বড়ো জটিল।

জানলা দিয়ে কীটা-কীটা বৃষ্টির ছাট আসছিল। অবনী বললে একবার—জানলাটা বন্ধ করে দেব? বেথা উত্তর দিল না। মাথার কাছে অন্ধকারে সেই বজ্রনিগকার ঝাড়—যেন আলোর কোয়ার। সেই আলোর পথ বেথে বেথে কত সর্পিল সিঁড়ি অতিক্রম করে বেথা তখন পেছিয়ে চলেছে। চলেছে কোন স্রুৎ অতীতে।

বারো বছর আগেব কথা। সে তো বড়ো কম দিন না! বারো বছর আগে এই অবনীকুমার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। যৌবনেব মাতাল বক্ত তখন খুঁটেছে সর্বাস্ত্র—চণ্ডা কপাল। দীর্ঘ স্ত্রীময় দেহ—বুকভরা সাহস।

এক দিন বেথার সঙ্গে এক অসঙ্গ দ্বিপ্ত্রহবে লুডো খেলতে খেলতে চট কবে নিজের পাকা ঘুঁটিটা বেথাব ঘুঁটির সামনে এগিয়ে গিল।

বেথা একটু চমকে পুলকিত হয়ে গভীর আগ্রহে ছুঁটাটা খোলেব মধ্যে নাড়তে লাগল, যেন অবধারিত তিন পড়ে। তিন পড়লেই খাওয়া।

অবনীকুমার তেমে বললে—খুব সাহস আমাব না?

চৌট টিপে একটু হাসল বেথা। চাপা স্বরে বললে,—সাহস নয় দুঃসাহস।

এই সামান্য একটি কথাব কিন্তু তাৎপর্য ছিল গভীর। আগের দিন বিকেলেও অবনীকুমার এসেছিল বেথাদের বাড়ি। কলকাতাব পরিবেশ। নিজেদের বাড়িতে লোকের অভাব নেই। তাছাড়া অল্প ভাড়াটেও রয়েছে। যদের সামনে দিয়েই সবাই বাতায়ত

করে। তবু তারই মাঝে কেমন করে যে অবনীকুমার কয়েকটা মুহূর্তেব জন্তে বেথাকে টেনে নিয়েছিল, তা যেন কিছুতেই ভাবা যায় না।

উনিশ বছরবে বেথা তখন ধরধর করে কাঁপছিল।

—ছাড়া ছাড়া, কী সর্বনাশ।

বেথা ছাড়তে বললে এটে কিন্তু ততক্ষণে চোখ তার বুজে এসেছে।

অবনীকুমার ছাড়ল বটে, কিন্তু তখুনি না। বেথার পাগুবর্ষ চৌট ছুঁটির ওপর আর একবার তৃপ্ত দৃষ্টি মেলে বললে, কেমন জন্ম?

ততক্ষণে বেথা সামলে নিয়েছে। এক বাব যব থেকে বেরিয়ে দেখে এল। না কেউ নেই।

আবাব এসে ঢুকল ঘরে। অবনী তখন অগ্রমনস্কের ভাণ কবে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। বেথা এসে দাঁড়ালো পাশে।

—আমাব ধুব সাহস না? অবনী গভীর ভাবে তাকালো একবার।

বেথা বললে—সাহস নব দুঃসাহস।

—কেন?

—কেন জিগ্যেস করছ? যদি ধবা পড়তাম তাহলে কী সর্বনাশ হত ভাবতে পাব?

সর্বনাশেব কথা কোনো পুরুষই ভেবে এগোর না। যারা ভাবতে যায় তারা এগোতে পারে না। যারা এগোতে চায় তারা বৃকের মধ্যে মশালের আগুন জালিয়ে এগোয়—সে আগুনের তাপে মেয়েদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার গুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারা সেই আগুনের শিখাটুকু নিজেদের বৃকের গোপন গহবরে লুকিয়ে রেখে মর আনন্দ পায়। সে মৃত্যুর মতো পুলক বৃষ্টি আর কিছু নেই।

বেথা এমনি ভাবে দিনে দিনে তিলে তিলে হরছিল। হবছিল আব এক বিচিত্র আনন্দে তার সমস্ত স্বয়টুকু ভরে উঠছিল।

কিন্তু এ সুখ চিবদিন রইল না। বেথার মা-বাবা ক্রমশঃ লক্ষ্য কবলেন অবনীর ওপর বেথাব একটা কেমন দুর্বোধ্য আকর্ষণ গড়ে উঠছে। এটা তাঁদের ভালো লাগল না। বিশেষ বেথার সঙ্কলতা। বেথা যে তাঁদের বড়ো আদরের, বড়ো গর্বের মেয়ে।

অবনীর ওপর ওঁদের কোনো মোহ ছিল না। ছোটোটি স্ত্রী শিক্ষিত লোভনীয় বটে—কিন্তু—ব্রাহ্মণ নয়। এমন কোনো দায় তাঁদের উপস্থিত হয়নি যাব জন্তে বেথাব মতো মৈত্রেয়কে এই পাত্রেরই হাতে তুলে দিতে হবে। এখনো সময় আছে অনেক—এব বেথার সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করবাব মতো সস্তাবনাও বখেট। সব ভেবে তাই অকস্মাৎ এক দিন অবনীকুমারের ওপর নোটিশ পড়ল। ও যেন আব এ বাড়ি না আসে কখনো।

এ কথা বেথা জানতে পারেনি প্রথমে। যখন জানল, তখন পাখবের মূর্তিব মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু নষ্ট করবার মতো সময় নেই। এখনো পাশেব ঘরে ও বসে আছে একা। এতক্ষণ নিশ্চয়ই চলে যেত, কিন্তু যে বাড়িতে এত দিনের এত ঝগড়া আসা সে বাড়ি থেকে চিবদিনেব মতো চলে যাবাব আগে একবার কি সে বাড়ির সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা করে বাবে না?





টেক তো টেক  
নট টেক নট টেক...

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খন্দের ধরবার জন্ত তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্ত হাত নেড়ে বলেন “টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি” অর্থাৎ জিনিষ কিছন বা না কিছন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু খোঁড়েল খন্দেরও নাকি ঝায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্তে দোকানে গিয়ে শেষে ঘটনাক্রমে পয়ে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খন্দেরকে বেরতে দেখা গেছে।

আবার খন্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরোনো ধরনেরও পুরনো প্যাটার্নের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিতাই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চানু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরনের খন্দের জমাছেন যারা নতুন ধরনের জিনিষ দেখলেই তা কিনে বাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরনের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং মতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিকতেও পারে না কারণ খন্দের

বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং হাতী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াটার ড্রাগ বা অত্যাস্চর্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। বিঃ অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটি বি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুকিল। তাই রোজকার জন্ত নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়; বা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্তে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রাসাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি কিছন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

রেখা তা বুঝেছিল, তাই কোনো রকমে চোখের জল লুকিয়ে নিজের পড়ার বইগুলোর মধ্যে থেকে কী একটা বই টেনে নিল, ওই অল্পসময়টুকুর মধ্যেই এক টুকরো কাগজে কী যেন লিখল খস-খস করে। তারপর বেরিয়ে এল।

ক্রম পায়ে এগোচ্ছিল ও পাশের বাবান্নার দিকে—মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। ভূক কুঁচকে বললেন—একটু রান্নাঘরে এসো না।

রেখা কিরে পঁড়ালো, চোখ হুঁটো লাল হয়ে উঠেছে। কান্না-জড়ানো স্বরে বললে—আসছি।

মা বিচলিত হলেন না। বললেন—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

এবার আর রেখা কিবে পঁড়ালো না বললে—ও ঘরে অবনীদা' রয়েছে, ওর একটা বই কেবল দিয়ে আসছি।

ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল রেখা। অবনীর চোখের দিকে তাকাবার মতো মনের জোর তাব ছিল না। কোনো বকমে বইটা একটু খুলে চিঠিটা দেখিয়ে দিয়ে অবনীর হাতে সবশুদ্ধ সমর্পণ করে রেখা চলে গেল।

অবনী একবার তাবল এখনি সেও উঠে চলে যায় ; কিন্তু দৃষ্টিকটু বলে বসে রইল। বসে রইল আরও আশার—যদি রেখার মা আসেন। যদি লজ্জিত হয়ে বলেন—ওর কথায় তুমি কিছু মনে করো না বাবা, তুমি যেমন আস, তেমনি এসো।

কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেল, তবু কেউ এল না। তখন অবনীর মনে আর একটা দুরাশা জেগে উঠল, তাবল, রেখা হয়তো আর একবার আসবে।

নির্মিমেব চোখে অবনী তাকিয়ে রইল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ। এই অসময়ে কোথা থেকে বাতাস ঘরে এসে ঢুকল। দূরে শুল্ক টিলাইয়ের ওপর ঢাকাটা সেই বাতাসে উড়তে লাগল।

সে মুহূর্তে অবনীর মনে হল, এত বড়ো শুল্কতা বুঝি জীবনে তার কখনো আসেনি।

\* \* \* \*

আজকের আকাশটাও তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। তবে জুলাই মাস। মেঘটা অকস্মিক নয়।

অবনী এক বাব পাশ কিরে শুলো। না, রেখাও ঘুমোর নি—কপালের ওপর হাতটা ফেলে বেখেছে। যেন তার মুখটা দেখতে না পায় কেউ।

দীর্ঘ বারো বছর আগে সেদিন বেলা বারোটার সময় রেখাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই অবনী চিঠিখানা পড়লে। মাত্র হু-তিন লাইনের চিঠি—এমনি সর্বনাশ যে হবে তা আমি অনুমান করেছিলাম। হাক্ এর জন্তে হু-খ করি না তোমার ঠিকানাটা আমার জানা আছে। আমি তোমার প্রতি মঙ্গলবারে চিঠি লিখব। সে চিঠি তুমি ঠিক পাবে বুধবারে। আর তুমি লিখো শুক্রবারে যেন চিঠি পৌঁছয় ঠিক শনিবারে। আমি প্রতি শনিবার বিকেলে পিওনের জন্তে পথ চেয়ে থাকব।

তাই হল। প্রতি বুধবার আর শনিবার হুদিক থেকে হুটি ব্যাকুল হৃদয়ের আন্তরিকতা নিঃশব্দে সবার অগোচরে দুই প্রতীক-কান্তর প্রশরীর কাছে এসে পৌঁছতে লাগল।

চিঠির পর চিঠি জমতে লাগল। প্রতিটি চিঠি শুধিয়ে তুলে রাখে। তুলে রাখে জিম্ফ্রাকারের একটা শুল্ক টিনে। সেটি আবার লুকনো থাকে তার গবম কাপড়ের ট্রাঙ্কেব নীচে।

এমনি করে একটির পর একটি মাস কেটে গেল, কেটে গেল একটি বছর।

এখন আর শুধু চিঠি নয়—এখন নিত্য দেখা হওয়া। দেখা হওয়াতেও মন ভরে না, আবও নিবিড় হতে চায়। কত নির্জন বিকেলে ওরা গিয়ে বসেছে মাঠে। কত সন্ধ্যা ট্যান্সীতে চড়ে বেড়িয়েছে নিরুদ্দেশেব পথে।

তবু তৃষ্ণা মেটে না। অথবা প্রশ্নের স্বভাবই এই। প্রশ্নে একটুখানি হাতের স্পর্শ—আঙুলে আঙুলে হোঁওয়া ; প্রশ্নর আর স্তবোগ গেলে সেই স্পর্শকান্তর মনটুকুই আবার সর্বগ্রাসী সোতে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন তার দাবী মিটোনোও বত কঠিন—না মিটোনোও তত বিভবনা।

বিশেষ বেধা—সে যে আবার স্বাদ পেয়েছিল এক বার পুরুষের বুকের উত্তাপের।

এক দিন এই নিয়ে আলিপুর রোডের খালের ধারে বসে এদের মধ্যে বেশ এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেল।

অবনীর সোভটা যেন একটু বেশি বেড়ে উঠছিল। কিছু দিন ধরে একটা অন্তায় জিদ অবনীকে যেন ছেলেমানুষের মতো পেয়ে বসেছে। বিকেলে দেখা হলেই অবনী বাঁকা চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলবে—তা হলে এবার রাজি ?

—কী ? না জানার ভাণ করে রেখা যেন অন্তমনস্ক ভাবে জিগোস করে।

—কী, জান না ? অবনী হাসে।

রেখা লজ্জায় কথা বলে না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

—আচ্ছা বেশ, কাছে এসো কানে কানে বলি।

রেখা তাড়াতাড়ি সরে বসে,—কী যে করো এই খোলা জায়গায়। কেউ যখন দেখবে—

—দেবি, হুঃসাহস না থাকলে চল'ত জিনিস মেলে না।

—বেধা হেসে বলে—বাক আর হুঃসাহস দেখিয়ে কাজ নেই। এক বার হুঃসাহসের ফলটা তো দেখেছ ? এবার পুলিশের হাতে যেতে হবে। অবনী উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

রেখা একটা চিমাটি কাটল। বললে—হুঃসাহসের ক্ষেত্রটা সব সময়েই লুডোর বোর্ড নয় জেনো।

অবনী বললে—তা জানি, কিন্তু আমার প্রাপ্যটা লুডোর বোর্ডের নীচে চাপা দিও না, সোহাই !

এবার রেখা অবনীকে বৃহৎ একটা ঠেলা দিলে। বললে,—কী বাজে বকছ। ছেলেমানুষ হচ্ছ দিন দিন ?

অবনী হাসল আবার। বললে দেবি, পুরুষদের এই ছেলে-মানুষটির সোভেই তোমাদের মতো চরিত্রবতী মেয়েদেরও বুকের রক্ত চকল হয়ে ওঠে। হয় না কি ?

কথা শেষ করে অবনী আন্তে করে রেখার গিঠের ওপর হাতটা রাখল। রেখা সে স্পর্শটুকু সন্নিবে দেয়নি।

সেই যে সন্নিবে দিল না, সেইটেই হল রেখার পরম সম্মতি। অবনী লাকিয়ে উঠল। তা হলে কালই ?

—এত ব্যস্ত কেন, বিয়েটা হোক না। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে, এর তো হান্সা নেই।

—তা নেই, বিয়ের পরের বউ আর বিয়ের আগের প্রিয়া এ দুটোর যে তফাত অনেক। আমি প্রিয়াকে পরিপূর্ণ ভাবে পেয়ে যথুকে বরণ করতে চাই রেখা!

রেখা 'না' বলতে পারেনি।

তার পর এল সেই দিনটি। ওর ঘরে সেদিন কেউ ছিল না। চাকরটাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল দুপুর বেলাতেই। সেদিন বেলা তিনটের সময় ও এল। রেখা এত কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়় যাবে।

অবনীর হাতটাও কাঁপছিল। সেটা বোঝা গেল যখন ও চাবি দিয়ে তালা খুলছিল।

তবু তালা খোলা হল। ঘরে ঢুকেই রেখা যেন থমকে গেল। এ কোথায় এল? ধবধব করছে বিছানার চাদর—হুটি বালিশ। মাথার কাছে টিপাইয়ের ওপর পেতলের কলসীতে রজনীগন্ধার ঝাড়।

পরস্পর একবার চোখোচোখী হল। রেখা অমনি মুখটা নামিয়ে নিল। এরই মধ্যে ওর মুখটা রাঙিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে অবনী ফ্যানটা খুলে দিল।

সে সন্ধ্যায় রেখা বাড়ি ফিরল সেই রজনীগন্ধার ঝাড়টি বৃকে করে। মনটি তার আজ ভরে আছে কানায় কানায়।

মা জিগেস করলে—ফুল কোথায় পেলি রে?

মেয়ে বললে—আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, সে দিয়েছে।

\* \* \*

এই সেই রজনীগন্ধা। অন্ধকার রাতে এই ফুলেরই আলোয় পথ দেখে দেখে রেখা চলে গিয়েছিল অনেক দূর। এবার যেন চমক ভাঙল। বাইরে বুড়ি খেমেছে। পাশে শুয়ে রয়েছে সেই হরস্রু অবনীকুমার।

বুঝিয়ে পড়েছে কি? বোধ হয়, না।

শেষ পর্বস্ত রেখার মা-বাবাকেই এগিয়ে আসতে হল অবনীর জন্তে। রেখার বাবা হাত জোড় করে বললেন অবনীকে—দয়া করো। এ প্রার্থনার দরকার ছিল না। তার আগেই ওরা বিয়ের দিন স্থির করে ফেলেছিল। এবং যথাদিনেই রেখার বাবা যথানিয়মে মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীর হাতে।

সবই হল, কিন্তু হল সংক্ষেপে। অবনী বা রেখার ভাত্তে কোনো আক্ষেপ ছিল না। তারা তখন পরিপূর্ণ।

বিয়ে হল এদের বিশেষ জুলাই, কিন্তু চিহ্ন জন্মালো সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ বিয়ের মোটে পাঁচ মাস পরে।

তা জ্বাক, তবু এদের আনন্দের সীমা নেই। ফুটফুটে মেয়েটি নিখুঁত গড়ল।

রেখা বলে—এ কার মতো হয়েছে বলো তো?

অবনী বলে—আমার মতো, তাতে আর সন্দেহ কি?

—ইস। উনি যেন এত সুন্দর! এ হয়েছে ঠিক আমার মতো, নর রে চিহ্ন?

এই বলে যুগান্ত শিশুর মুখে বাবো বাবো চুপ দেয়।

বিয়ের পর একটা দিনও অবনী খুঁতখুঁত বাঁধন। রেখাও না। তবু নাতনী হয়েছে খবর পেলেই রেখার মা সেই রাতে প্রাণ

খুলে আশীর্বাদ করে চিঠি লিপ্সেন। সে চিঠির শেষ কটা লাইন এই—

—পোষ মাসে পোষলক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে। তাকে দেখবার জন্তে আমার মন ছুটকট করছে। কিন্তু নিয়ে যাবে কে? উনি তো বাতে পশু। আমি কলকাতার পথঘাট ভালো চিনি না। তবু আমার পেটের মেয়ের মেয়ে, তাকে দেখবার জন্তে আমাকেই যেতে হবে।

এ চিঠি লিখলেন রেখার মা বারোই পোষ রাত্তিরে। অল্প অল্প চিঠির মতো রেখা এ চিঠিখানাও তুলে রাখলে যত্ন করে। তবে সেই ক্রিমক্রাকারের বাঞ্ছা নয়।

অর্থাৎ সে চিঠিগুলো তার নিজস্ব। ভবিষ্যতে অনেক নির্জন মুহূর্তে অবনীর সে সব দিনের চিঠিগুলো পড়বে, কিন্তু পড়াতে পারবে না কাউকে। আর এ চিঠিখানা—এর মূল্য আলাদা। বড়ো হলো একদিন রেখাই তুলে দেবে চিহ্নর হাতে। বলবে—তোর জন্মদিনে এই হল প্রথম আশীর্বাদ তোরা দিদিমার।

দিদিমা হয়তো তখন এ জগতের পাট চুকিয়ে চলে গিয়ে থাকবেন। চিহ্ন সেদিন সেই চিঠি হাতে করে কি কণকালের জন্তেও তার দিদিমাকে মনে করবে না?

যাক সে কথা। মনে করবে কি করবে না, সে এখন বহুদূরের কথা। কিন্তু তার আগেই দেখা দিল আর এক গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার কথা রেখার মনে কোনো দিনই আসেনি। প্রথম মনে করালো ঐ অবনীকুমার।

চিহ্নর সে বার তিন বছর পূর্ণ হল। প্রতিবারের মতো এবারও স্বামি-স্ত্রীতেই মনের আনন্দে শিশুর জন্মোৎসব পালন করলে। কিন্তু সেই রাতেই অবনীকুমার হঠাৎ তুললে একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব।

প্রথমে অবনীকুমার কোনো কথাই বলে নি। কেমন গভীর হয়ে ছিল। —রেখা মৃদু ঠেলা দিয়ে বললে—কী হল? হঠাৎ এত গভীর! অবনী তবু চুপ।

রেখা আবার খোঁচালো—কী হল?

অবনী ধীরে ধীরে বললে—মেয়ে বড়ো হচ্ছে।

খিল-খিল করে হেসে উঠল রেখা—এ আর নতুন কথা কি? এখন থেকেই মেয়ের জন্তে পাত্র দেখো।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাপ্তে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিংওয়ার সেন্টার

৩৩, একতালিমা রোড, কলিকাতা-১৯

অবনী সে ঠাটা তুলল না। বললে—ওর জন্মদিনের তারিখটা বদলাতে হবে।

বেথা ঠিক বুঝতে পারল না। আশ্চর্য হওয়াব স্বরে বললে—কেন?

—কেন বুঝতে পাবছ না? মেয়ে বখন বড়ো হবে, তখন নিজের জন্মদিনের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মবে যাবে না? তাছাড়া আমাদেরই কি কম লজ্জা? মেয়ে তখন কী চোখে দেখবে তার বাপ-মাকে? কী ভাববে, কল্পনা কবতে পারবে?

বেথা বোবা হয়ে গেল। এ দিকটা তো সে ভাবে নি।

অবনী বলছে তখন—মেয়েবা যতো বড়োই হোক মায়েব চেয়ে বড়ো আদর্শ তাদের জীবনে নেই। তুমি আমি মেয়ের সামনে সেদিন কী আদর্শ তুলে ধরব বেথা?

বেথা তখনো চুপ। এক সময়ে ফিস-ফিস করে উঠল—যেন আর কি তিন বছরের মেয়েব কানে না যায়। বললে—তবে উপায়?

উপায় এখনো আছে। চিহ্ন বড়ো হবার আগেই নয় বদলে দিতে হবে আমাদের বিয়ের দিন, মিথ্যে করে বলতে হবে, আমাদের বিয়ে ঐ বছর জুলাই মাসে হয়নি, হয়েছে একটা বছর আগে।

বেথা শিউরে উঠল। বললে—না না, তা হয় না, বিয়ের দিন লুকনো যায় না। ও দিনকে আমি হারাতে পারব না।

—তা হলে চিহ্নর জন্ম-তারিখটা বদলে দিতে হয়। এখন থেকে আর সাতাশে ডিসেম্বর ওর জন্মদিন করা হবে না। কবতে গেলে হিসেব মতো আবও ক'টা মাস শিফিরে দিতে হবে।

বেথা এবার উত্তব দিল না। শুধু অবনীর হাতখানা নিজের বুকের তুলে নিয়ে বকের কাছে টেনে আনল।

পরের বছর চিহ্নর জন্মদিন পাগন করা ডিসেম্বরে হল না। ইচ্ছে করেই অবনীকুমার কঠোর হয়ে রইল—এক বারও বেথাব কাছে তুলল না চিহ্নর কথা।

বেথাও কথা ভোলে নি। মনে মনে সেও বুঝেছে, অবনীই ঠিক। ও বুদ্ধিমান পুত্র—দৃবদৃষ্টি আছে। আজ না হয় চিহ্ন ছোটো—কিন্তু যেদিন সে বড়ো হবে—যেদিন নিজের জন্মদিনে নিজের বন্ধুদের ডেকে নিয়ে আসবাব ইচ্ছে করবে, সেদিন? সেদিন মা-বাপের বুকের দিকে তাকিয়ে তার কি লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে না?

তখন এক এক সময় বেথার কেমন রাগ হত অবনীর ওপর। মনে হত এ সমস্তার জন্তে তো ওই দায়ী। বিয়ে হওয়া তো পালিয়ে বাছিল না।

তবু নিরানন্দ এ বছরের এই সাতাশে ডিসেম্বরও বেথা চুপি চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে চিহ্নর জন্তে কিনে দিলে একটা ঝক।

এমনি ভাবে চলল আবও ক'বছর। বেশ চলছিল। বছরে ছ'দিন বড়ো আনন্দের। বিশেষ জুলাই আর—আর চিহ্ন নতুন জন্ম-তারিখ খুঁজেই আগষ্ট।

এ ছ'-সাত বছরে বেথাব বেশ সয়ে গিয়েছিল। প্রতি বছর কেবল জন্মদিন উপলক্ষে চিহ্নর হুঁ'বার পাওনা হত। এক বার হত সাড়ম্বরে। আর একবার হত অভ্যস্ত গোপনে। সে পাওনা এক মেয়ে আর মা ছাড়া আর কেউ জানত না। তবু রকে চিহ্ন হেলেনাহু, সে কিছু জিগ্যাস করে না। সে পেয়েই খুশি।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল এই বার। আজ প্রায় দশ বছর বয়সের কাছাকাছি এসে মা-বাপের বিয়ের দিনের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সহসা প্রশ্ন করল—মা আমার জন্মদিন কবে?

আজ এই বীতনিত্র রাত্রিশেষে বেথার সমস্ত বুকখানা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাবল চৈচিরে ওঠে,—হতভাগী মেয়ে, ও কথা আমায় জিগ্যাস করা কেন?

কিন্তু না, তুল করে চিহ্ন তাকে জিগ্যাস করলেও অবনী তুল করে নি। ওর জবাব অবনী নিজেই দিয়েছে।

ঠিক এব পর থেকে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন এসে গেল বেথার সঙ্গারে।

দিন কাটতে লাগল। হাসি-খুশি গল্প বেড়ানো। কিন্তু সে বিশেষ জুলাই আর এল না। বেথা ইচ্ছে করে তুলতে লাগল। তুলতে লাগল তাদের অতীত ইতিহাস,—সত্যি ভোলা যায় না, তাই নির্মম পরিহাসে উপেক্ষা করতে লাগল তাদের বিয়ের দিনটিকে। কী চূর্ণি হয়েছিল সেদিন, পারে নি বিয়ের দিনটিকে বদল করতে, তার বদলে সঙ্কল্পে অস্বীকার করে গেল ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখটিকে। আজ এই দীর্ঘদিন পরে মনে হয় বেথার, মা হয়ে কী করে পেবেছিল সেদিন এত বড়ো নির্মম হতে?

আজ তাই ঘুগায় লজ্জায় সকোচে বেথা তুলতে বসল তার অতীতকে।

বিয়ের দিনটা ঠিক আসে, কিন্তু তেমন ভাবে বেথা আর অবনীকে প্রণাম করে না। পিওন ঠিক ঐ দিনেই হয়তো চিঠি দিয়ে যায়, কিন্তু সে চিঠিব কোনোটিই আজ আর অবনী কিংবা বেথার লেখা নয়। চুপচাপ—নিখুম মনমরা বিবাহ-বাংসরিক একটার পর একটা আসে আর চলে যায়।

অবনী সব বোঝে। কিন্তু একটি কথাও বলে না। শুধু মাঝে মাঝে জিগ্যাস করে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়া মেয়ে চিহ্ন—আচ্ছা মা, আগে তোমাদের বিয়ের দিনে যেমন আনন্দ হত, এখন তেমন হয় না কেন?

বেথার মুখে এক টুকরো মান হাসি ফুটে ওঠে। বলে,—মন বদলে যায় যে।

—কিন্তু দেখো, আমার জন্মদিনের বেলায় তোমাদের মন আবার এমনি ভাবে রদলে না যায়। এবার আমার কয়েক জন বন্ধুকে বলতেই হবে। মা—

বেথা যেন চমকে উঠল।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

বেথা বলে—শরীরটা ভালো যাচ্ছে না রে। ভাবছি, তোর বিয়ে ঐ একটা দিনে যেতে পাবলে বাঁচতাম।

চিহ্ন মুখ লাল করে ক্রত চলে যায় পড়ার ঘরে।

কিন্তু সমস্তা আরও আছে। আগষ্ট মাসের জন্মতারিখটার জন্তে সমস্তা নয়, সমস্তা সেই পুরনো ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখটার জন্তে। বেথা আজও চুপি চুপি যে ঐ দিনটার মেরেকে কিছু দেয়। এখন আর ঝক নয়, এখন শাভী।

চিহ্ন অবাক হয়ে বখন জিগ্যাস করে—তুমি প্রত্যেক বছর এই সময় একটা করে শাড়ী দাও কেন মা? তখন বেথা লজ্জায় ফোটে

সকোচে আর দাঁড়াতে পারে না। বিম্বিত চিহ্নকে অভিজ্ঞত করে দিয়ে রেখা যেন ছুটে পালিয়ে যায়।

অবশেষে অল্প বারের মতো এবারও তেইশে আগষ্ট এল। চিহ্ন এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পুরনো অনেকাই চলে গেল। রেখার মা মারা গেছেন, বাবা গেছেন তার আগেই। দিদিমার জন্তে চিহ্নর মনটা মাঝে মাঝে বড়ো খারাপ করে। কী জানি কেমন করে যেন বড় ভালোবেসে ফেলেছিল বুড়াকে। আজ তাই জন্মদিনের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে মনে চিহ্ন প্রণাম করল তার দিদিমাকে।

বাড়িতে আজ বেশ হৈ-চৈ। খুব ঘট করে এবার অবনী মেয়ের জন্মোৎসব পালন করছে। বছরে তো আনন্দ করবার এই একটি মাত্র দিন। বাইরের লোক খাওয়ার কথাটা অবশ্য রেখাই পেড়েছিল। ইচ্ছে ছিল, জন কতক কলেজের বন্ধুকে খাওয়াবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাড়ার কয়েক জনও বাদ পড়ল না।

বধাসময়ের মেয়েরা এসে পড়ল। চিহ্ন স্নান করেছে কোন সকালে। কপালের ওপরে ছোট সিঁদুরের কঁটাটিকে ঘিরে অসংখ্য চন্দনের বিন্দু।

বন্ধুরা এসে ঘিরে ফেলল। চিহ্ন ওদের হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

কত গল্প, কত গান, কত হাসি, কত ঠাট্টা। কিন্তু চিহ্নর বেশিক্ষণ এ ধরনের হালকা আনন্দ ভালো লাগে না। এক সময়ে সে অল্প কথা পাড়ল। তার ছেলেবেলার কথা—মা-বাবার বিবাহ-বার্ষিকীর আবছা মধুর স্মৃতি, আর দিদিমার কথা।

দিদিমার কথা বলতে বলতে ওর চোখে জল আসত। কী ভালোই না বাসত তাকে। কিন্তু বেশি বেতে পারত না ওখানে। বাবা যেন পছন্দ করতেন না। কেন করতেন না কে জানে?

—আমার দিদিমার কোটো দেখবি?

আগ্রহ না থাকলেও ভ্রাতার খাতিরে সম্মতি জানালো মেয়েরা।

চিহ্ন বললে—দাঁড়া, মায়ের কাছ থেকে ট্রাক্টের চাবিটা আনি। একটি মাত্র কোটো যা ক'রে এনেছিলাম। এখনো মামাতো ভাই-বোনেরা দেখলেই কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই লুকিয়ে রেখেছি মায়ের ট্রাক্টে। এই বলে উৎফুল্ল চঞ্চলতার চিহ্ন এক রকম ছুটে ছুটেই গেল রান্নাঘরে।—মা, তোমার ট্রাক্টের চাবিটা একবার লাও না?

বড় ব্যস্ত ছিল রেখা। কথা বলবার সময় পর্যন্ত নেই। কোনো রকমে আঁচল থেকে বনাৎ করে চাবিটা ফেলে দিল।

আন্তে আন্তে ট্রাক্টা খুলল চিহ্ন। সেকালের ভারী ট্রাক্ট। এই ট্রাক্টা অনেক দিন অনেক বার অনেক নির্জন বিওহরে চিহ্ন খুলেছে। খুলতেই কেমন একটা ধূলোর গন্ধ আসে। বহুকালের পুরনো স্মৃতিজড়ানো সেই ট্রাক্টের গহবরে অতি সন্তর্পণে চিহ্ন একবার হাত দেয়, যেন কারা ঘর্মিয়ে রয়েছে। আজও তেমনি করে ট্রাক্ট খুলে। কিন্তু মনটা অল্প দিনের মতো শান্ত ছিল না। ও-ঘরে বন্ধুরা বসে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি পুরনো গরম জামাগুলো সরতে লাগল। এক সময়ে বেরোল একটা বড়ো ক্রিমক্যাকারের বান্ন—ভালো করে স্নতো দিয়ে

বাঁধা। লুকিয়ে একটু হাসল চিহ্ন। ওর ভেতরে কী আছে, চিহ্ন তা জানে। লোভ সামলাতে পারে নি এক দিন। খুলে ফেলেছিল। হুঁ-একটা চিঠির প্রথম হুঁ-এক লাইন পড়েই কানের হুঁ পাশ লাগ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেই যে টিন বন্ধ করেছিল আর খোলে নি।

দিদিমার ফোটোটা ছিল পাশেই। চিহ্ন সেটা তুলে নিল। তুলে নিতে গিয়েই লক্ষ্য পড়ল ট্রাক্টের খোপে আরও কতকগুলো পুরনো চিঠি। এগুলো তো এর আগে লক্ষ্য পড়ে নি।

পুরনো চিঠির একটা আকর্ষণ আছে। চিহ্নর কাছে। একটা পোষ্টকার্ড তুলে নিল।

—এ যে দিদিমার লেখা!

পোষ্টকার্ডটা উন্টে সাল-তারিখগুলো দেখবার চেষ্টা করল। পুরনো চিঠি। কিন্তু চিঠিতে কোথাও সাল উল্লেখ নেই। শুধু তারিখটা আছে। বারোই পৌষ।

এক নিখাসে চিঠিখানা পড়ে ফেলল চিহ্ন। কিন্তু—কিন্তু ঠিক যেন বুঝতে পারল না।

কা'কে লেখা?

আবার ভালো করে ঠিকানাটা পড়ল।

না, মাকেই তো লেখা।

কিন্তু—

কিন্তু এ কোন মেয়ের কথা লিখেছিলেন দিদিমা?

আবার পড়ল—আবার পড়ল চিঠিখানা। মাথাটা কি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে? এ কোন মেয়ে?

চিঠির শেষটুকু পড়বার জন্তে চিহ্ন চিঠিখানা একেবারে চোখের সামনে এনে ধরল।

না, লেখা তো পরিষ্কার, পড়তে কোনো অসুবিধে নেই?

—পৌষ মাসে পৌষ-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে। তাকে দেখবার জন্তে আমার মন ছটকুট করছে। কিন্তু আমায় নিয়ে যাবে কে? উনি তো বাতে পঙ্কু। আমি কলকাতার পথ-ঘাট ভালো চিনি না। তবু আমার পেটের মেয়ের মেয়ে, তাকে দেখবার জন্তে আমাকেই যেতে হবে।

খরখর করে চিহ্নর হাতটা কঁপে উঠল। মাথাটা যেন কেমন করছে।

সেই অবস্থাতেই ছুটে গেল মায়ের কাছে।

—মা!

সে কণ্ঠস্বরে ভীত-ভ্রান্ত-চকিত স্বরে রেখা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

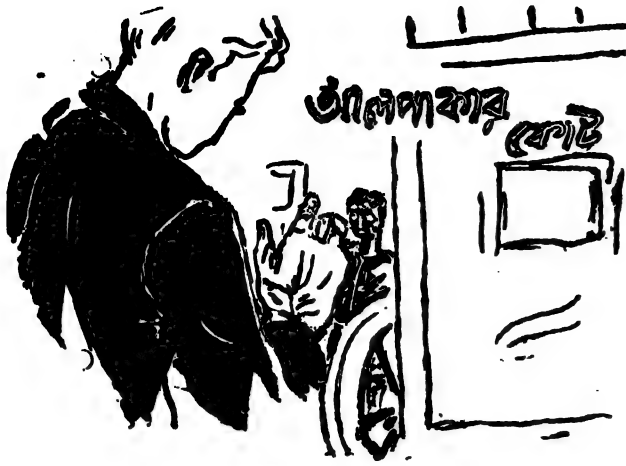
কিছু জিগ্যেস করবার আগেই চিহ্ন সেই চিঠিখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কান্না-জড়ানো ব্যাবুল স্বরে বললে—আমার যে আরও একটা বোন ছিল, তার কথা তো আমায় কোনো দিন বলে নি?

বলতে বলতে চিহ্ন ছুটে গিয়ে মায়ের বুক মুখ লুকিয়ে হুঁপিয়ে উঠল।

রেখার পাতলা টোট হুঁটা একবার কঁপে উঠল।

কিন্তু না, সে আরও সাবধানী, আরও কঠোর। টোটের ওপর দাঁতের কামড় বসিয়ে সে কেবল নিজেকে সংযত রাখবার জন্তে চেষ্টা করতে লাগল।





## শ্রীঅবিনাশ সাহা

**বোশেখ মাস।** বাড়ীতে বিয়ের ধুম লেগেছে। হাট-বাজারের  
অস্ত্র নেই। বিরাট ফর্দ নিয়ে নকুলচন্দ্র ঢাকা ছোটো  
হাতে সময় খুঁট কয়। আজই বাজার নিয়ে ফিরে আসা চাই।

বেলা এগারোটা। সূর্য যেন আঙন ছড়াচ্ছে। মাথার ওপর  
ধান রাখলে ফুটে পই হয়। নকুলচন্দ্রের ওষ্ঠাগত প্রাণ। একে  
থলথলে বিরাট দেহ—তার ওপর আবার ঘটি-ঘটি জল ঝাওয়া।  
ভুঁড়ি নয় তো, তেল-ভর্তি খুঁদে জালাই একটা পেটের ওপর ঝুলছে।  
সব চেয়ে বিপদে ফেলেছে নকুলচন্দ্রকে কালো কুচকুচে লোমগুলো।  
অবিরত হল কোটাচ্ছে যেন গায়ে।

মেল ট্রেনে এসে নামে নকুলচন্দ্র। প্র্যাটফরম লোকজনে গমগম  
করছে। কুলি, ফেরিওয়াল, পানিওয়ালার দৌঁদাদৌঁড়ির বিরাম  
নেই। সবচেয়ে যোড়গাড়ির গাড়োয়ানরাই আছে ভাল। ওত  
পেতে এক একটি খেঁকশেয়ালই যেন শিকার ধরতে ব্যস্ত। বাত্মীদের  
কেউ একজন পাদানীতে পা বাড়িয়েছে কি ছুটে গিয়ে ছেঁকে ধরছে।  
অবশ্য বাত্মীরা তাতে কেউ বেজার হচ্ছে না। আদর আপ্যায়নে  
খুশীর হাসিই খেলে কারো কারো ঠোঁটের কোণে। কেউ ডাকে,  
আইয়েন বড় মিঞা। কেউ বা মাহারাজের বদলে মাহারাজ সম্বোধন  
করেই আর একজনকে খুশী করতে চায়। আর একজন হয়তো  
জিজ্ঞেস করে, কোন হানে বাইবেন—দিগ্বাজার? উঠেন না বি,  
এ্যাক মিনিটে পৌঁচাইয়া দেই। রফটের চাকা (রবারের চাকা)  
মালুম বি পাইবেন না...

নকুলচন্দ্র কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে ব্যস্ত ভাবেই  
প্র্যাটফরমে নামে। হাতে গোটা কয়েক রেশন ব্যাগ ও ছোট একটা  
এটাচি কেস। যাবে নবাবপুর হয়ে চকবাজার। জায়গায় জায়গায়  
নেমে হাট-বাজার করতে হবে। অবশ্য খালি হাত-পা থাকলে একুশি  
গাড়ি-যোড়ার দরকার ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিরুপায়—ট্যাক্সের  
কড়ি গুণ্ডা কতক গচ্ছা দিতেই হবে। সব দিক ভেবে-চিন্তে একখানা  
গাড়ি নিতেই মনস্থির করে নকুলচন্দ্র। তবে শহরে ও নতুন নয়।  
ঢাকার গাড়োয়ানদের বিলক্ষণ জানা আছে। মুখে ওরা বাই বলুক,  
অচক্ষে না দেখে কিছুতেই গাড়িতে উঠছে না।

গাড়োয়ান মাঝেই কোন না কোন বাত্মীর পেছু নিয়েছে। কিন্তু  
নকুলচন্দ্রকে ছেঁকে ধরেছে একযোগে চার-পাঁচ জন। ওর আঙল-  
ভর্তি সোনার আঁটিগুলোই হয়তো সকলকে বেশী করে আকৃষ্ট করছে।

হাতের বিছে কবচ-জোড়ার-জৌলুসও কম নয়। সূর্যকিরণে নবগ্রহের  
নয়টি রত্ন জল-জল করছে। অসহ্য গরমে মটকার পাঞ্জাবীটা অনেকক্ষণ  
গা থেকে খুলে কাঁধের ওপর ফেলেছে নকুলচন্দ্র। পুরোনো হলো  
ওটার একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। ওরা হয়তো সকলেই ওকে  
জমিদার আর নয়তো তালুকদার ঠাউরিয়েছে। তা বা ভাবে ভাবুক।  
ও কাঁকেও কিছু বলবে না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে একটু খাতির হয়  
পেলে ক্ষতি কি!—কারো কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুশীর  
আমেজেই সকলের সঙ্গে প্র্যাটফরমের বাইরে চলে আসে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে  
খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সারবন্দী গাড়িগুলোকে। না, বরাত আজ  
ওসমান গাড়োয়ানেরই ভাল। নকুলচন্দ্র অল্প কারো কথায় কান না  
দিয়ে ওসমানকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করে।

ওসমান তো মহা খুশী। খোদা মেহেরবান। বাক, হুঁদিন পরে  
আজ তাহলে এক জন খানদানী সোয়ারীই পাওয়া গেলো। ভাড়ার  
কথা তাই সোজাসজি না বলে রেওয়াজ মতো বিনয়ে ফেটে পড়ে,  
আপনাগ চরণের ধূলা বাইড়াবি খাই মাহারাজ, আপনাগ লগে  
আবার নর ভাও করণ লাগব নাকি? ওঠেন না, মোন বা চায়  
দিয়েন।

ওসমান বিনয়ে যতই গলে পড়ুক না নকুলচন্দ্র ওতে ভোলে না।  
সরাসরিই আবার বলে, না না মিঞা, ওসব মোন চাওয়া-চাওয়ি কাম  
নাই। বা নিবা সোজা কও।

আরে! বার কয়েক বিনয় প্রকাশের পর সোজা কথায় ভাড়া  
নগদ পাঁচ সিকে ঠিক হলো ওসমানের আবদার শেষ পর্যন্ত থেকেই  
যায়।—সাইদের সময় ওঠেন ত বি গাড়িতে। এক দিনের কাম  
নাকি! খুশী অইলে আর কিছু দিয়েন যোড়ারে খাইবার।

না না, আর কিছু পাইবা না। বাইবা ত তড়াতড়ি নও এলা,  
নকুলচন্দ্র দৃঢ় থেকেই বক্তব্য শেষ করে।

যোড়া জুড়তে জুড়তে ওসমান একটু অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠেই  
জবাব দেয়, ইডা কে কইলেন মাহারাজ বাবু না? অজ্ঞায় বি কিছু  
কইলে পায়ের ধনে জোতা (জুতো) খুঁলা মারেন না।

জবাবে নকুলচন্দ্র মুখে কিছু না বলে হাসতে হাসতেই গাড়িতে  
ওঠে। ওসমান যোড়ার পিঠে চাবুক কবে নবাবপুরের পথ ধরে।

দেখতে দেখতে গাড়ি নবাবপুরে এসে পড়ে। বা ফুটের মোড়ের  
ঐ সাদা বাড়িটাতেই মুল্লুজী সিক্কার আপিস। ফর্দে এক নম্বর  
মোহিনী বিড়ি হুঁবাণ্ডিল রয়েছে। আড়তদার অপেক্ষা খোদ আপিস  
থেকে নেওয়ারই প্রেয়ঃ। ঝাঁটি আর তাজা জিনিষ। নকুলচন্দ্র  
জানাল দিয়ে গলা বাড়িয়ে বখাছানে গাড়ি বাঁধতে বলে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান লাগাম কবে ঝাঁড় করার গাড়ি।  
কিন্তু মুন্সিল হচ্ছে, ওত কাজের বাজার করতে এসে গোড়াতেই ধোঁরা  
কেনা চলে না। হিসেব মতো পাঁচ আনার সিদ্ধিই আগে কিনতে  
হয়। সিদ্ধিতে সিদ্ধি লাভ। না, কষ্ট বাই কেন হোক না, শাস্ত্রীর  
বিধি অবহেলা করা চলেবে না। সিদ্ধির দোকান অবশ্য গলির শেষ  
সীমান্তে। গাড়ি অতো ভেতরে যাবে না। গরমে পানে ঝেঁটেই  
বেতে হবে। তা হোক, তবু গাফিলতি করে অমঙ্গল ঘটানো চলবে  
না। কত আদরের পাঁচী। অতটুকু থেকে এত বড়টা হয়েছে।  
বলতে গেলে যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। না না, বিধি মতোই  
কাজ হোক। নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে সোজা সিদ্ধির ধোঁজেই  
বণ্ডনা হয়। গরমে স্বাস্থ্য পিচ গলে কাই হয়ে আছে।

পা পড়তেই সমস্ত শরীরটা ঝাঁক দিয়ে ওঠে। হয়তো কোসকাট ফুটে পায়ের তলায়। কিন্তু কি আর করা যাবে? হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁদ্ধি পাঁচ আনার কিনে কোন রকমে মুলজী সিক্কার আপিসে এসে ঢোকে। থপ করে বসে পড়ে হেলান দেওয়া বড় বেঞ্চটার ওপরে। ভাগ্যগুণে সেলসম্যানের নজরে পড়তেও দেয়ী হয় না। তত্ৰলোক প্রথমেই কোন কাজ কারবারের কথা না জিজ্ঞেস করে বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয়। আদর আপ্যায়নে নকুলচন্দ্র আশাতীত খুশী হয়। ওর বোধ হয় একটা বিড়ির তেষ্ঠাই পেরেছিল। কৌটার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা বিড়ি ধরিয়েই খানিক দম নিতে থাকে।

সেলসম্যানও তার প্রাথমিক কর্তব্য শেষ করে অল্প দিকে মন দেয়। না, নকুলচন্দ্র এখন অনেকটা সুস্থ। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করাই এখন বিধেয়। হাতের পোড়া বিড়িটা বখাছানে নিক্ষেপ করে নিজের আঁর্জি পেশ করে।

সেলসম্যান মনোযোগ দিয়েই ওর কথাগুলো শোনে এবং কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে বেশ ভল ভাবেই জবাব দেয়, পাঁচ হাজারের কমে তো এখানে বিক্রি নেই বাবু সাহেব! আপনি এজেন্টের কাছ থেকে নেবেন।

নকুলচন্দ্রের উত্তর দেহ খানিকটা শীতল হয়ে এসেছিল। মুহূর্তে আবার গরম হয়ে ওঠে। বলে কি বেটা! পাঁচ হাজারের কমে বিক্রি নেই! হাটে বাজারে দোকানদার যে এক পয়সার বিড়িও উপষাচক হয়ে বেচে থাকে। গৃহস্থের পক্ষে এক সঙ্গে এক হাজার বিড়ি কেনা কি কম হলো! কোথাকার লাট বেলাট এসেছে বেটার! নকুলচন্দ্র কাছা ঝেড়ে বেক ছেড়ে উঠে পড়ে। কাজ নেই পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনতে এসে লোকের পায়ে তেল নাখাবার। ট্যাকে কড়ি থাকলে বিড়ির অভাব হবে না... তেতে-পুড়ে আপিসে ঢুকেছিল তেতেপুড়েই বেরিয়ে আসতে উদ্ধত হয়।

সেলসম্যান ওর হাবভাব বুঝে কি বেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নকুলচন্দ্র সে সুযোগ দেয় না। মুখের উপরেই কড়া করে শুনিতে দেয়, কাম নাই মশর আপনার চলাইনা কথা শুনবার। পয়সা থাকলে বিড়ি অনেক পায়ুনে... রাগে গজ গজ করতে করতেই আপিস থেকে নেমে এসে গাড়ীতে উঠতে যায়।

ওসমান কোচবাজের ওপর বসে সবই লক্ষ্য করছিল। সহানুভূতির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কি অইল মাহারাজ, বিড়ি আনলেন না?

আনু ম কোনহান খনে। হালারা (শালারা) যে মাথার কিরা দিয়া বইচে, পাঁচ হাজারের কম বেচব না! —সক্কাখেই উত্তর করে নকুলচন্দ্র।

মনে মনে হাসি পেলেও ওসমান সমতা রেখেই সাধনা দেয়, কিরেনে বি গেচিলেন হালা ভাইটাগ (ভাটিয়া) কাছে! অগ বিড়ি অগ খনে কম দামেই পাইবেন নে চকে।

নকুলচন্দ্র বলে, হ, তাই নও। পাঁচ হাজারের কমে বেচব না ছা কতা হালারা সাইন বোর্ডে লেইকা থইলেই ত পারে।

ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক চাপাতে চাপাতে বলে, বুচচেন না ক্যান, মাইনবেরে পেরাসিনে করাই হালাগ কাম।

নকুলচন্দ্র আর কথা বাড়ায় না। একটা সীটে বসে আর একটা সীটের ওপর পা তুলে দিয়ে কিঞ্চি আরাম করতে থাকে।

ওসমানের প্রাণেও বোধ হয় সহসা খুশীর হাওয়া লাগে। চড়া রোদেও প্রাণ খুলে গান ধরে, আমি বন ফুল গো...

নকুলচন্দ্রের সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপ নেই। শুভ কাজের সঙলা করতে এসে প্রথমেই বাধা পেলো। শালা ভাটিয়ার কাছে না গেলেই ছিল ভাল। মনটা অবিরতই খুঁত-খুঁত করতে থাকে। গাড়ি বড় জোর হাত পঞ্চাশেক এগিয়েছে আবার দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চোঁচাতে থাকে, আরে রাখ রাখ, ঐ বড় কাপড়ের দোকানটার সামনে লাগাও।

ওসমান গান থামিয়ে চলতি ঘোড়ার মুখে লাগাম কবে গাড়ির গতি রোধ করে। নকুলচন্দ্রের নির্দেশ মতো শাহী ষ্টোর্সের সামনে নিয়েই গাড়ি দাঁড় করায়।

নকুলচন্দ্র মাতা ঢাকেখরীর উদ্দেশ্যে বার কয়েক কপালে হাত ঠুকে ধীরে স্বস্থেই গাড়ি থেকে নামে। দোকানের সেলসম্যান মুহূর্তে ছুটে আসে গাড়ির কাছে। সবিনয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। পান সিগারেট যোগে আপ্যায়নেও জট হয় না।

নকুলচন্দ্র প্রথমে ভাবে সিগারেট খাবে না। কে জানে, এখানেও সঙলা হবে কি না। জাঁকজমক তো এদের আরো বেশী। কি বলতে কি বলবে তার ঠিক কি! —একটা পান মুখে দিলেও সিগারেট ধরাতে দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু না, এরা রীতিমতো তত্ৰলোক। চাইলে আধ গজ কাপড়ও এরা কেটে বিক্রি করতে রাজী। শালা ভাটিয়ার মতো অতো ফুটনি নেই। কথার কথার মনের খুশীতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। উন্টিয়ে পাঁটিয়ে কাপড়ের জমি পরীক্ষা করে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়েই একখানা বেনারসী শাড়ী গন্ত করে। বড় পছন্দসই শাড়ী পাওয়া গেছে। এ ঝ পাঁচকে মানাবে ভাল। কুটুমের কাছেও খাতির পাওয়া যাবে। খুশীতে গদগদ হয়েই শাড়ীর বাস্টটা বগলে ফেলে গাড়িতে এসে ওঠে নকুলচন্দ্র। আর একটা সিগারেট হাতে করে এনেছিল। গাড়ি ছাড়লে ধরিয়ে মৌজ করতে থাকে।

গাড়ি বাংলা বাজারের পাথে চলেছে। হয়তো পঞ্চাশ গজও হবে না। নকুলচন্দ্র আবার চোঁচাতে শুরু করে।

ওসমান চলতি ঘোড়ার মুখে আবার লাগাম কবে মাঝ রাস্তাতেই গাড়ি দাঁড় করায়। বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কিছু ফালাইয়া আইলেন নাকি মাহারাজ?

আরে না মিঞা, কিছু ফালাইয়া আহি নাই। শাড়ীর ই রু চলব না। মনেই আছিল না শুভ কাজে আসমানী রু চলব না। তড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাও, হাতের সিগারেট রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে অস্থির হয়ে ওঠে নকুলচন্দ্র।

মুখে চুমু খাওয়ার মতো আওয়াজ তুলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ঘোরাতে বাধ্য হয় ওসমান। ইচ্ছে করে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেয়-গেঁয়ো ভুতটাকে। কিন্তু পারে না।

শাড়ীর রুটা এখনো ঠিক অপছন্দ নয় নকুলচন্দ্রের। কিন্তু হলো কি হবে; পাঁচটির মা যে মুখে বাঁটা মারবে। পই-পই করে বেচারী লাল শাড়ীর কথা বলে দিয়েছে। কেন যে এ রুটা তখন পছন্দ হলো! শালা ভাটিয়াই মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে... গাড়ি ঘোরাতে কিঞ্চি দেয়ী হচ্ছিল ওসমানের—নকুলচন্দ্র ঝেটে পড়ে, আরে এই মিঞা কখন গাড়ি চালাইচ? এককণ লাগে গাড়ি ঘুরাইতে?

কি যে কনু মাহারাজ ! ঘোড়াব বি তো আব কলেব জান না যে বুঠাম টিগুম আব ঘবব। একটু সবুর কবেন।—এই হালা ঘোড়াব পো, মাহাবাজ বি রাগ করবার নৈচে হোনচ না (তনহিস রে)। লাগামে টান দিয়ে কবে এক চাবুকেব যা মাবে।

দেখতে দেখতে গাড়ি আবাব শাড়ী ট্রোসেব দবজায় এসে লাগে। সেলসম্যানও আবাব এসে অভ্যর্থনা জানায়। কিঞ্চ নকুলচন্দ্র হাসতে পারে না। শুকনো মুখেই শাড়ীর বাস্ফাটা হাতে কবে গাড়ি থেকে নামে। খানিক ইতস্তত ববে সন্ধ্যােব সঙ্গেই আবদাব জানায়, এই শাড়ীটা দয়া কইনা একটু বদলাইয়া দেওয়ন লাগব।

সেলসম্যান নয়তো যেন বসেব ভিয়েন। আফ্রাদে ডগমগ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাণ্টা বিনয় প্রকাশ কবে, আরে হাব সেইগা এত দিক করবার নৈচেন ক্যান। আপনাগ দোকান, একবার ছাইডা দশ বার বদলাইয়া নেন না।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্রের গোমড়া মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধায় আবার একটা সিগারেট ধবায়। হাসতে হাসতেই বলে, এই শাড়ীই, ইডার বদলে একটা লাল বড়ের জ্ঞান।

ইস, এই ত ঠেকাইচেন মাহাবাজ। ইয়াব জুড়ি ত লাল রঙেব বি অইব না। কিছু বাড়ন লাগব। তবে জমিন বিও জাদা সবম অইব। নকুলচন্দ্রের আবদাবে সেলসম্যান উত্তর কবে।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে। বলছে কি বোটা। পকাশ টাকাত্তেই ত চক্ষু ছানাবড়া। আবাব আবো বাড়ন লাগব।—কিন্তু কি আর করা যায়, চাইলে তো আর দাম ফেরৎ পাওয়া যাবে না। অগত্যা দেখতেই হবে।—অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড কাং করে সম্মতি জানায় নকুলচন্দ্র।

আরে, এক লম্বা বানাবসৌ বাস্ফা লইয়া আর, নকুলচন্দ্রের সম্মতিতে খুশী হয়ে যোগানদারের উদ্দেশ্যে ঠাঁক ছাড়ে সেলসম্যান।

চোখেব পলক পড়তে না পড়তে বাস্ফা এনে হাজির কাদ যোগানদাব। সেলসম্যান বাস্ফেব ডাগা খুলে উজ্জ্বল জানায় ল্যান মাহারাজ, এক লম্বা বানাবসৌ। পাকা ব সাচ্চা জবি।

গোটা বাস্ফেব মধ্যে মাত্র একখানাই লাল বড়ের শাড়ী আছে। নকুলচন্দ্র শাড়ীখানি টেনে নিয়ে ভাঁজের মধ্যে হাত গলিয়ে জমি পবীকা কবতে থাকে।

সেলসম্যান স্তবোধ বৃক্ণে আবাব উজ্জ্বল জানায়, ইয়াব আর জমিন পবথ কবন লাগব না মাহাবাজ। ইচ্ছা কবলে জল বি বাইল্লা আনবার পাববেন। ব জবিব জেল্লার কয়নাব (কনে) বি রোশনাই বাডব ভামাট বি খুশী অইব। চক্ষু বইজা লইয়া যান।

জামাই খুশী হবে কি না পবের কথা। কিন্তু নকুলচন্দ্র নিজেই খুশী হতে পারে না। বিচাব কবে দেখলে আগের শাড়ীখানাই ঢের ভাল। বোটা বাগে পেয়ে খাবাপ জিনিবকেই ভাল বলে চালাতে চাচ্ছে। বত শালা চোটাব কাববার সেলসম্যানের উজ্জ্বল কান জবার নী দিয়ে মনে মনেই ইতস্তত কবতে থাকে নকুলচন্দ্র।

সেলসম্যান অবস্থা বৃক্ণে আবাব উসকাতে থাকে, তামাম ঢাকা শব ঘুরলে ইবকম শাড়ী মিলব না মাহারাজ ! দেখছেন না, লাটেব মদে এই একটা বি খালি লাল শাড়ী।

কথা শুনে নকুলচন্দ্রের ইচ্ছা হয় পাণ্টা মোটা কথা তনিরে দেয়। কিন্তু পারে না। দায় বধন ওর নিজের তখন মুখ বৃক্ণে সব তনত্রেই

হবে। মনেব ভাব মনেই চাপা দিয়ে সন্ধ্যােব সঙ্গেই মস্তব্য কবে, আগের শাড়ীখানাই আমাব মনে ধবে। ইখানা—

মুখেব কথা শেব কবতে পাবে না নকুলচন্দ্র। সেলসম্যান হুঁচোখ বিফাবিত করে প্রতিবাদ কবে, আইজা আপন কন কি মাহাবাজ। বৈক্রে বৈক্রে ঘইবা আপনাব বি চক্ষেব ঠিক নাই। ইডা অইল এক লম্বা আসল চিজ। এব লাগে আপনে বৃটা মাগেব জানপচান কববার চান ?

নকুলচন্দ্র এবাব ফুঁসে উঠতেই যাচ্ছিল, কান বকমে আত্মসম্বরণ করে। সবিনয়েই শুধাণ, আইচ্ছা কন, কত দেওয়ন লাগব ?

না না, দামেব কথা আব আপনবে কেমনে কই। চিজ বিই বখন আপনাব পছন্দ হয় নাই, কৃত্রিম স্মোভেব সঙ্গেই উত্তর কবে সেলসম্যান। বলতে বলতে আবাব একটা সিগারেট আব দেশলাইটা এগিয়ে দেয়।

হাজাব হলেও নকুলচন্দ্র লোভ সম্বরণ কবতে পাবে না।

সিগারেটটা ধরিয়ে আবাব শুধাণ, সময় নাই, তড়াতিডি কন কি দেওয়ন লাগব ?

না না, আমি কিছু কইবার চাই না। ইনসাব কইবা আপনেই বি যা হয় জ্ঞান।

আবে ধৃততব, খালি খালি কতা বাডান। আপনাব জিনিব আপনে না কইলে নিবাব পাক্রম নাকি ?

আইচ্ছা বনাব (বোনী) সময়ে দব ভাঙয়েব কাম নাই। আব দউশগা (দশটা) টেক জ্ঞান।

হাতেব সিগারেটটায় জোবে একটা টান দিয়েছিল নকুলচন্দ্র, উত্তর শুনে মনে হয় মাথা ঘূবে পড়ে যাবে। শালা কুটি বলে কি। কোথায় দশ টাকা কম হবে তা না আবো দশ টাকা বেশী। না, বাজাব করতে আসাই আজ ভুল হয়েছে।—হাতেব সিগারেট হাতেই থাকে, নকুলচন্দ্র আর নকুলচন্দ্রের ভেতবে নেই।

সেলসম্যান সমতা বেখেই যোগানদারের উদ্দেশ্যে বলে, এই, এইডা বাস্ফেব মদে ভাল কইবা বাইল্লা দে।

নকুলচন্দ্র আব স্থিৰ থাকতে পাবে না। তড়াতিডি বাধা দেয়, না, এত দবে নিবাব পাক্রম না। ঐ সমান সমান কবেন।

আপনে কন কি। তাহলে কিছু দেওয়ন লাগব না। আগের টেকাও ফেরৎ লিয়া যান শাড়ী বিও অমনিই নিবা যান।

মস্তব্য শুনে নকুলচন্দ্র মনে মনে ভাবে, সে ত তোমবা কতই দেবে চোটার দল। মুখেই কেবল লপ্চপানি।—প্রত্যুত্তবে বলে, অমনি নিয়ু কন কি। পাঁচ টেকা কম করেন।

বনাব সময় দবভাও কববেন না। দেবাব হয় দশ টাকাত জ্ঞান নয়ত অমনিই লইয়া যান।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। নকুলচন্দ্র বোঝে আব কথা বাডালে অনর্থক অপদস্থই হতে হবে। চোটার একটা কানা কডিও মাপ করবে না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে দশ টাকাব একখানা নোট ছুড়ে দিয়েই মস্তব্য কবে, নেন আপনাগ মোন যা চায়।

সেলসম্যান বোধ হয় এবাব বিবেকে যা খায়। হাসতে হাসতেই একটা টাকা ফেরৎ দিয়ে—মস্তব্য কবে নেন, কি আব করব। আপনে বখন অসচ্ছট হন। কিনা (কেনা) দামে বি দিলাম।

নকুলচন্দ্র হাঁ হাঁ কিছু না বলে মুখ ভাব করেই শাড়ীর বাস্ফাট

হাতে করে গাড়িতে এসে ওঠে। মনে মনে গালাগালি দেয়, নে শালাবা ভগ ঘাটের কড়ি। আব কোন দিন যদি এ মুখো হই...

মুখ বুজেই নকুলচন্দ্র চলেতে চায়, কিন্তু ওসমান ছাড়ে না। কাটা ঘারে হুণের ছিটা দেয়, কি অইল মাহাবাজ, শাভী বি—বদলাইলেন?

হ্যা, খোঁজে তোমাব কি কাম মিএ? সেলসমানেব সঙ্গে না পেরে ওসমানের ওপরেই ফেটে পড়ে নকুলচন্দ্র।

কিন্তু ওসমান দমে না। আপন ঢঙে পুনবায় ভেঁচি কাটে, না, এমনই জিগাই আব কি। আশনাব মুখখান বি ত শুকাইয়া বলদেব পাচাব মতন দেখাটাব নৈচে—

এই মিএ, মুখ সামলাইয়া কতা কইও, নকুলচন্দ্র তেড়ে ওঠে। চটন কান মাহাবাজ, বৈছে কি মাথায় বি কিছু ঠিক আচে না কি? কোনহানে যামু কন?

নকুলচন্দ্র গলাব স্বব গম্ভীর করে উঠব করে, বাংলা বাজাব লও।

গাড়ি ঘুঁবেব আওয়াজ তুলে বাংলা বাজাবর দিকেই ছুটে থাকে। ওসমান ঘোড়াব পিঠে চাবুক কসে আবাব গান ধবে, আমি বন ফল গো—

গাড়িব ভেতবে নকুলচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। শাড়ীর বাজটা খাল ডাক ছোড় বান্ধতে ঠোঁট কবে। ইস শানা বনমাশ, গালে খাপ্রদ মবে টাকাডলা নেড়ে নিলে। পাঁচাব মা এখন এ শাভী টান মোবে ফেলে না দিল হন—

গাড়ি বাবা বাজাবর সামান্য প্রায় ছাড়িয়ে চলে। কিন্তু নকুলচন্দ্রের কোন সাড়া-শব্দ নেই। বেগতিক দেখে ওসমান সহসা ঘোড়াব মুখে লাগাম কসে শ্রোষেব সঙ্গে প্রশ্ন কবে, বাংলা বাজাব বি ছাড়াই চললেন মাহাবাজ, বাটবেন কোনহানে?

ওসমানের তাড়াব সহসা যেন সন্ধিৎ কিবে পায় নকুলচন্দ্র। তাড়াহাতি দবজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আবো বাথ বাথ মিএ! আগে কইবাব পাবনি না। চন্দ্রা প্রেসে লও।

হ্যা ত বি ফানাইয়া অট্টলম মশর, ওসমানের কণ্ঠে বিদ্রব্ধি স্বব।

তাথ কি ককম? ঐহানেই যাওয়ন লাগব।

হ, আপনে ত বি কইগাই খালাস। আমার পেরাসিনিডা বাবা জাচে?

আবে নও নও মিএ। কতা বাডাইয় না, এতক্ষণ চইলা বাটবাব পাবতা।

ইস, হাওয়াই জাজে উঠচেন নাকি মাহাবাজ?

বেকায়দায় পড়ে নকুলচন্দ্র আব হ' থা কবে না।

ওসমান গজ-গজ কবতে কবতেই গাড়ি ঘোবাতে থাকে। যথাবতি চন্দ্রা প্রেসেব ফটকে এনে পৌঁড় কবায়।

নকুলচন্দ্র আব বিলুমান দেবী কবে না। তাড়াহাতি পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বাব কবে প্রেসেব ভেতবে ছোটে।

না, সব বেটাই দেখছি সমান। কত বাব দুটাকা দিয়ে প্রোগ্রাম ছাপিয়ে নিয়ে গেছি। আজ বেটা কিছুতেই তিন টাকার কমে নাজী নয়। তাও আবাব ডাকে পাঠাবাব খরচা আলাদা দিতে হবে। ঢাকার কুটি আর কাঁকে বলে। স্বযোগ পেলেই পকেট কাঁক কববে। পাটার কপালে বে কি আছে ভগবানই জানেন!

বিরক্ত হয়ে নকুলচন্দ্র তিন টাকাতই বাজী হয়ে যায়। নগদ দুটাকা অগ্রিম জমা দিয়ে উঠে পড়ে।

ওসমান আবাব গাড়ি ঠাকাত ঠাকাত নির্দেশ মতো বাবর বাজাবেব পুনের মুখে এনে পৌঁড় কবায়। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। এখনো ঢেব সওয়া বাকী। ব্যস্তসমস্ত হুগেই নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নামতে বাচ্ছিল, ওসমান বাধা দেয়। কোচবার থেকে লাফ দিয়ে নেমে আবদাব জোড়ে, ঘোড়াব বি জল খাটব মাহাবাজ, কিছু ছাড়েন।

নকুলচন্দ্রের মেজাজটা স্বভাবতই ভাল নেই। ওসমানের আবদাবে ফুঁসে ওঠে, কিছু ছাড়ুম মানে?

কইলাম ত মশর, ঘোড়াব বি জল খাটব, ওসমানের কণ্ঠেও কর্কশতা খান-খান হসে ঝবে পড়ে।

নকুলচন্দ্র কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে বিশ্বাস প্রকাশ কবে, কি জানি মিএ, কোন দিন ত কিছু দেই নাই।

জান নাই এখন বি জান। ডব নাই, ভোগা দিয়া কিছু নিমু না। মাইনবেবে জিগাইলেই পাইবেন।

আরে চাই না মিএ। কেউরে জিগাইবাব। এই নেও, বলতে বলতে ক্রমাল খুলে একটা আনি ওসমানের হাতে দিতে বায় নকুলচন্দ্র।

ওসমান চোখ কপালে তুলে ফুঁসে ওঠে, ভিক্ষা জান নাকি মশর। চাইর পরসায় বি ত ঘোড়াব জিবাব ভিজব না।

না ভিজলে আমি কি ককম? ইয়াব বেশী আমি কিছু দিবাব পাকম না। তোমার লগে কিছু কতা আছিল নাকি?

কতা আবাব কি থাকব মশর। জিগাস না মাইনবেবে। এই খলিল মিএ, অদূরেই খলিল গাভোয়ান গাড়ি ঠাকিয়ে বাচ্ছিল, তাব উদ্দেশ্যে চোঁচাতে থাকে ওসমান।

নকুলচন্দ্র কাঁপবে পড়ে। না, সব দিক দিয়েই জ্বালাতন শুরু হয়েছে আজ। নিজের কপালে নিজেই কবাবাত কবে ওসমানকে বাধা দেয়, এই মিএ। কাম নাই কেউরে ডাইকা, এই নেও, আবাব ক্রমাল খুলে আব একটা আনি হাতে ওঁজে দিতে বায়।

ওসমান পৌঁও বুঝে আবাব কোপ মাবে, কি তামসা কববার নৈচেন মশর। আব না জান এউগা স্ত্রিকি বি ত দিবেন (একটা সিকি)! ঘোড়াব খাইব সঙ্গে বি হার মাহত। আপনাব আক্ল কি?

আক্ল তুমি ভাল কইনাই দিলা মিএ। আব আক্লের কতা মুখে আইন না। এই নেও, পিণ্ডি গিল গা, রাগের মাথায় আবো হ' আনা পরসায় বাব করে দেয় নকুলচন্দ্র।

পরসায় চার আনা পেয়ে ওসমানের ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দেয়। নকুলচন্দ্রের কড়া কথার কোন জবাব না দিয়ে সোজা পাশেব একটা সরাইখানায় গিয়ে ঢোকে। বাবার সময় ঘোড়া ছুটোর মুখে ছোলা ভিজানো আর বাসের টিন ছুটো বেঁধে দিয়ে বায়।

ওসমান আর ঘোড়া দুটো তবু এতক্ষণ পরে একটা ঠাপ ছাড়বার অবসর পায়। কিন্তু নকুলচন্দ্রের আজ কুখা-কুখা বলে কিছুই নেই। বিকেল ছুটার গাড়িতে কিয়তে না পারলে অনেক রাত হয়ে বাবে। সামনে কুখপক্ষের ঘন অন্ধকার। রাস্তায় সাপ-খোপের ভয়ও কম নয়। তাড়াহাতি নেমে কেনাকাটার মন দেয়। এক লম্বায় পাঁচ সের ঢাকাই বলসাবান সোয়া সেব, স্বগন্ধি আনারুখী তামাক,

এক কুড়ি কড়ে ও পাঁচ হাজার টিকে কিনে ফেলে। নির্দেশ মতো স্টেরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ছাদে চাপিয়ে দেয়।

দেখে দেখে ওসমানের গায়ে আলা ধরে। নতুন রং-পালিশ হয়েছে গাড়িখানায়। এই সমস্ত ছাইপাশ চাপিয়ে শেষটায় না লাগ ধরিয়ে দেয়। গৈয়ো ভূত কোথাকার! ঘোড়ার গাড়ি না করে মোবের গাড়ি করলেই হতো ১০০ কিস্তি মুখে কিছু বলতে পারে না। এইমাত্র নগদ চার আনা পরিসা ফাউ বাগিয়েছে, একটু চমক-লজ্জা তো আছে! নকুলচন্দ্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে মুখ টিপে হাসতেই থাকে। গৈয়োটা শেষটায় না তামাম ঢাকা শহরখানা ছাদের ওপর চাপিয়ে দেয় ১০০ বা হোক, ভগবানকে ধন্যবাদ! মিনিট কুড়ি পঁচিশের ভেতরেই বাবুবাজারের পাট মিটে যায়। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গাড়িতে এসে বসে। সন্মুখের খালি সীটটার ওপর পা তুলে দিয়ে একটু আরাম করতে থাকে।

ওসমানও খানিকটা চান্সা হয়ে—মনের আনন্দেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে। এবার চকবাজার। নকুলচন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে, এখানেই বাজার শেষ।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে চকবাজারের ছোট কাটরার সামনে এসে লাগে। অবসর দেহেও কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার হয় নকুলচন্দ্রের। মনের খুশীতেই গিয়ে ঢোকে কাটরার ভেতরে। সারা দোকান খোঁজ খোঁজ। কিন্তু না, কোপাও নিজের গায়ের মাপে একটা আলপাকার কোট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দাম কম-বেশী যাই হোক—অত্যাশ্চর্য সওয়া এক রকম করে প্রায় সবই হয়ে গেছে। শুধু মিলছে না এই কোটটা। অথচ না হলে চলেই বা কি করে? পাঁটার স্বস্তর তো শুনেছি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে জনকয়েক সন্ত্রাস্ত বরষাজীই আসবে। নিজের বলতে তো একটাও ভাল জামা নেই। কোটটা হলে মানরক্ষা হতো। তা ছাড়া এই উপলক্ষে কেনা হলেই হল, নয়তো কবে আর আসছে শুধু একটা কোট কিনতে? এক দোকানদার না করে তো নকুলচন্দ্র আর এক দোকানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখানে বিফল হয়ে আবার আর এক দোকানে, না, কেউ দিতে পারছে না

ওর মনমতো কোট। সবাই বপু দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। বেটাদের যেন ঠাট্টার পাত্র আমি। অর্ডার দিলে তো গায়ের দর্জিকে দিয়েও করিয়ে নিতে পারি রে হতচ্ছাড়ার দল। তবে আর তোদের দোরগোড়ার ধনী দেবো কেন? সে সময় নেই বলেই না তোদের দোরে দোরে ঘুরছি। অতো চোখ-টেপাটেপি কিসের? এত বড় তো দোকান সাজিয়ে বসেছিস, লজ্জা করে না, একটা কোট বার করতে পারছিস নে? কেন, জীবনে কি আমার মতো বপু কারো দেখিসনি নাকি! ১০০ নকুলচন্দ্র ঘুরে ঘুরে অস্থির হয়ে ওঠে। সারা গা দিয়ে অঝোরে ঘাম বরছে। লোমগুলো ভিজ্জে জবজবে। ভালুকের মতোই দেখাচ্ছে হয়তো। বেটারা তাই হয়তো অতো হাসছে। জামাটা গায়ে দিলে অবশ্য হয়। কিন্তু না, এখন আর সে উপায় নেই। হতচ্ছাড়ার বা ভাবছে ভাবুক। ওদের দিকে না তাকালেই হলো। সারা কাটরা ঘুরে শেষটায় ব্যর্থ হয়েই গাড়ির দিকে ফিরে আসে নকুলচন্দ্র।

ওসমান কোচবাজার ওপর বসে একটা বিড়ি ফুঁকছিল, নকুলচন্দ্রকে দেখে বিষয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, খালি হাতে আইলেন মাহারাজ! কিছু আনলেন না!

নকুলচন্দ্র বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দেয়, কি আনুম মিঞা! ভোমগ তামাম কাটরা ঘুরে একটা আলপাকার কোট পাইলাম না।

ওসমান ততোধিক বিষয়ের সঙ্গে পাণ্টা প্রশ্ন করে, আলপাকার কোট পাইলেন না! কার গায়ের?

কার গায়ের আবার নিজের লেইগাই চাইচিলাম।

আপনার লেইগা আলপাকার কোট? কন কি মাহারাজ! আপনার তামাম গায়ে না আলপাকার রইচে, চাউরগা (চারটে) বুতাম বি খালি লটকাইয়া লন না, বাহারের কোট অইবে নে।

ওসমানের রসিকতায় রেগে উঠেই বাচ্ছিল নকুলচন্দ্র কিন্তু কি জানি কেন ফিক করে হেসে ফেলে। নিজের গায়ের দিকে তাকিয়ে শেষটায় মটকার পাঞ্জাবাটাই চড়িয়ে নেয়।

গাড়ি রেল-স্টেশনের পথে উল্কাবাসে ছুটতে থাকে।

## এরা আর ওরা

রমলা দেবী

ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা

ওদের সুরে সুর মিলিয়ে বলা

ভালবাসার নিয়ম যেনে চলা

এদের আজও হল না।

ওদের কথা বুঝবে না ত এরা

এদের কথাও শুনবে না ত ওরা

এক নিয়মে ওঁটা বসা ঘোরা

এদের ওদের হল না।

চিরকালই চলল হানাহানি

খামল নাক' মিথ্যা কানাকানি

জীবন নিয়ে করে টানাটানি

ওদের সাথে এরা।

এরা, ওরা, মিলবে হায় কবে

পরস্পরে আপন করে লবে

কবে এদের বিবাদ মিটে যাবে

মিলবে এরা ওরা।



# মৌলিকতার, নির্ভরতার ও আত্মনিষ্ঠতার

★★

জিনি গোল্ড জুয়েলারী সোসাইটি



**প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়**  
এও ভান্স  
স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলি ১২

ফোন ৩৪ : ১৭৬১ • গ্রাম • প্রিলিঙ্কনেড

ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি - রাজবিহারী এডিনিউ

কলিকাতা-২৯ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬

ব্রাঞ্চ - ডহামশেদপুর

ফোন : ডহামশেদপুর - ৮৫৮

শ্রী ১২৪ পুণ্ড্রিক চিলনা ১২৪. ১২৪/১ বঙ্গবাজার স্ট্রীট. কলিকাতা-১২ (বঙ্গবাজার স্ট্রীট) (শ্রী ১২৪)

# ফরাসী বিপ্লবকালের একটি প্রেমের কাহিনী

শ্রী অমিয়কুমার ঘোষ-রায়

ফরাসী বিপ্লবের বক্তৃত্ত্ব শ্রোত্রে দু'টি নিম্নলিখিত বক্তব্য ধাবা এসে মিশেছিল, দু'টি বৃক্ষমকল প্রস্তুতিত হওয়াব আগেই ছিন্নদল হয়ে রক্তের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল, তাব কথা অনেকই জানেন না। ঐতিহাসিকগণ এবটিব কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা কবলেও আবেকটিকে উপেক্ষা কবে গেছেন। কাবণ সেটটিতে বিপ্লবের আত্মন বিশেষ ছিল না—ছিল প্রেমাঙ্গাদব ভক্ত আত্মবিসর্জন। সেই কাহিনীই এখানে বিবৃত কবনো।

নব্বাঁশব মেরী এান শার্লট কর্তে জ্ঞ আত্মগুকে ফরাসী বিপ্লবের জোয়ান অব তাঁক বলা হয়। সাধারণ চাণীব ঘবে তাঁব জন্ম—যদিও পূর্বপুরুষের মধ্যে অনেকে রাজনীতিক, শাসক এবং যোদ্ধা ছিলেন।

শৈশবে শার্লট কনভেন্টে পড়াশুনা করেন। তাঁর পর কাকীমাব কাছে থাকা বালে ভেন্টের পুটোর্ক ও অনেকের সেখা পড়েন। তখনই তিনি দেশপ্রানব অধ্যাপনা লাভ করেন।

ফরাসী বিপ্লব আত্ম হওয়ার সময় তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। রাজনৈতিক মতবাদ তিনি ছিলেন 'গির্বাণ্ডক্ট'—যাদের বামা ছিল শাস্তি ও সাম্য। কিন্তু 'মাইটেন্ট' দলের প্রাধান্তে সেই সময় প্যাবিসে বিপুল বক্তব্য শ্রোত বয় চলছিল।

সোঁডা লুইসের পর (১৭৯৩ খৃঃ) তাবা অসংখ্য লোকের গিলোটিন অর্থাৎ শাস্ত্রভব কবে। কায়েনে বসে শার্লট প্যাবিসের সব খবরই পেতেন। সেই সময়ই মাইটেন্ট দলের একজন প্রধান নেতা জীন পল ম্যাবন্টের প্রতি তাঁব প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে। তাকে হত্যা কবে দেশকে বাঁচাতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি প্যাবিসে আসেন।

ম্যাবন্টের দর্শনপ্রাণী হয়ে তাকে লিখলেন—“তানি এইমাত্র কায়েনে থেকে এলাম। জগৎস্থানের খবরব জ্ঞ নিশ্চয়ই তাৎপর্শ্য উৎসব? এক ঘটাব মধ্যেই আপনাব সঙ্গে দেখা কবনো ও তাপনাকে এমন অবস্থায় উপনীত কবনো, যাতে খালেক প্রভূত উপকাব হ’।”

কিন্তু সাধ্যং মঞ্জব হল না। শার্লট আবার লিখলেন, তা’ও ব্যর্থ হ’ল। তখন তিনি নিশ্চই এক দিন ম্যাবন্টের বাড়িতে গেলেন। সেখান আববদ্বাদব জানালেন যে, মাইটেন্ট দলের শত্রুদের চাবা আক্রান্ত হয়ে তিনি ম্যাবন্টের তাম্রসপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। কিন্তু ভবুও বন্ধাব তাকে চুবতে দিল না।

সেই সময় ম্যাবন্ট উৎকট চম্বাবাগে আক্রান্ত হয়ে কব্বল দিয়ে সমস্ত শবীব জড়িয়ে এবটা চবে শুয়েছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি শার্লটকে ভিতরে আসতে বললেন। বকের কাছে ছোঁবা চেপে শার্লট ভিতরে ঢুকলেন।

শার্লট ম্যাবন্টকে বললেন, “কায়েনে ভয়ানক উত্তেজনা চলছে। গির্বাণ্ডক্টনা কি যেন যত্নব্ব কবছে।”

ম্যাবন্ট বললেন, “যেতে দাও ওদের, হু’এক দিনেব মধ্যেই সবগুলিকে গিলোটিন কবছি।”

উত্তেজিত শার্লট কথা শেষ হওয়াব আগেই ম্যাবন্টের বকে ছোঁবা বসিয়ে দিয়েছেন। ম্যাবন্টের চাঁৎকাবে পাশের ঘব থেকে দু'টি মেয়ে দৌড়ে এসে শার্লটকে ধব ফেললো। শার্লট পালাবাব প্রার কোন চেষ্টাই কবেন নি।

টাইবুতালে বিচাব আবস্ত হ’ল.....

—“তোমাব কি বলবাব আছে?”

—“তু এই যে, আমি সফল হয়েছি।”

—“কে তোমাকে দিয়ে এ কাজ করাল?”

—“আমাব হৃদয়।”

—“ম্যাবন্ট তোমাব উপব কোন অজ্ঞায় কবেছিলেন?”

—“ও একটা পত, ত্রাভাকে ছাবখাব কবে দিচ্ছি।”

—“বিস্ত ওকে মেবে তুমি কাব উপকাব কনলে?”

—“লক্ষ লক্ষ লোকের।”

—“কি ভেবেছ, দেশে আব ম্যাবন্ট নেই?”

—“এব পরিণাম দেখে সবাই শিক্ষা পাব।”

শার্লটের প্রাণলগ্নেব আদেশ হ’ল।

আদম লাক্স নামে একজন জাঞ্চাণ-ছাত্র প্যাবিসে থেকে পড়তেন উৎসব হয়ে এক দিন তিনি শার্লটের বিচাব দেখতে গেলেন।

আসামাব কাঠগড়ায় শার্লট ঠাঁড়িয়। তাব নবম সোনালী চুলে নব্বান চাণীব একটি সাদা টুপি। বাদামী বয়েব চোব দু'টি বিষল, শাস্ত-গভাব চাউনি। সমস্ত অবগাব স্বর্গাব আত্মজতিব ভাব।

মুগ্ধ আদম কোটি থেকে আববেশ টলতে টলতে বাড়ী ফিলেন। তাব সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ কবেছেন শার্লটকে।

শুধু আব এবটি বাব তিনি শার্লটকে দেখেছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ ১৭ই জুলাই সন্ধ্যাব এবটু আগে শার্লটকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা দিন সমস্ত আবাব ছিল মেঘচ্ছন্ন। কিন্তু যখন শার্লট গিলোটিনের বাঁছ এসে ঠাঁড়াতন, তখন হঠাৎ মেঘের কাক দিয়ে গোধূলিব এক টুকরো বিহল আভা এসে শার্লটের গায়ে পড়লো—অন্তগামী সূর্যের শেষ আন বিদায়গানী মহান্ আত্মটিকে বরণ কবে নিতে। শার্লটের মহীয়সী মূর্তি সেই স্বর্গাব আভাব বজ্রিত হয়ে ধীবে ধীবে এসে গিলোটিনে মাথা বাথলো।

ধাবালো খড়্গটি পড়াব আগে আনমনে শার্লট বলেন, “আমাব কর্তব্যই প্রধান, আব সব কিছুই নয়।”

আদম লাক্স বধ্যভূমি থেকে বধ্যব মত বেরিয় এলেন। তাব চোখে ভাসতে লাগল, সেই স্বর্গাব আভাব মণ্ডিত শার্লটের মহীয়সী মূর্তি—যাকে ভানবেসে তিনি ধন্য হলেছেন। শার্লট তাব প্রণয়ের কথা জেনেও যায় নি—এমন কি, আদম লাক্সকে তিনি কোন দিন দেখেনও নি, তাতে একটুকুও তংব নেই আদমের। তিনি সেই দেবীকে ভাববেসেই ধন্য হয়েছেন। তাব জ্ঞ একটা মহৎ কিছু তাগ কবাব অদম্য ইচ্ছায় অস্থিব হয়ে উঠলেন আদম। তাঁব এমন কিছু নেই, বা সেই দেবীক কাছে নিবেদন কবা যায়। ঠাঁ, আছে—তাঁব নিম্নলক্ষ জীবন। তাই তিনি সেবেন।

আদম লাক্স শার্লটের বিচাবেব নিন্দা কবে একটি প্রচাবপত্র লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বন্দী কবে বাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব অভিযোগ আনা হ’ল। তাঁকে বলা হ’ল যে, ভুল স্বীকাব কবে যদি তিনি জাঞ্চাণীতে ফিবে চলে যান, তবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

উদ্ধীপ্ত স্তবে আদম উত্তব দিলেন—“যত দিন আমাব প্রাণ থাকবে, তত দিন আমি এ অজ্ঞায় বিচাবেব প্রতিবাদ কববো।” তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ’ল।

হাসিমুখে আদম লাক্স গিলোটিনে মাথা বাথলেন। শার্লটের রক্তচিহ্ন তখনও গিলোটিন থেকে মুছে যায় নি।

“দেবি আমাব! এবটু ঠাঁড়াও, আমি আসছি।” শাপিত খড়্গ নেমে এল.....

হুটি বক্তব্য ধাবা একসঙ্গে মিলে গেল। তাঁদের আত্মাও কি মিলে নি?

## আকাশ-জয়ের ঐতিহাসিক বাণীয়াৰ কৰ্মতৎপৰতাৰ কাহিনী

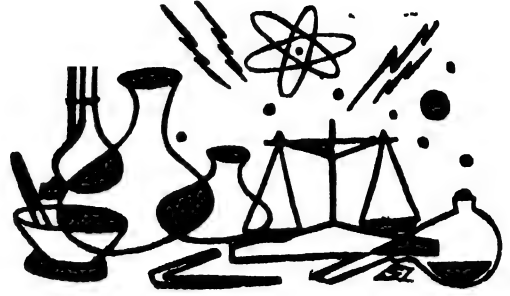
এতিয়া দিন প্ৰচাৰিত হয়নি। আমবা শুধু জানতাম যে, বাণীয়া 'উচ্চাকাশেৰ গবেষণাৰ পৃথিবীৰ কোন বাহুৰে চেষ্টাই পেছিয়ে পড়ে নেই, কিন্তু সঠিক ভাব তাৰা যে কি পৰীক্ষা কৰছে এবং সেই গবেষণামূলক পৰীক্ষাৰ ফলাফল যে কি, তাৰ জ্ঞান থেকে বিশ্বজগৎ একেবাবেই বঞ্চিত ছিল। প্ৰত্যেক দেশেৰ বিজ্ঞানীরাই উপলব্ধি কৰতেন, বাণীয়া এই গবেষণাৰ নীচৰ দৰ্শকেৰ ভূমিকা কিছুতেই নিচে পাবে না। কাৰণ, মহাকাশে ক্ষমতাৰ প্ৰসাৰেৰ সঙ্গে সঙ্গে যে কোন দেশেৰ সৈন্ত বিভাগেৰ শক্তি বৰ্ধনবৎ একটা যোগাযোগ আছে। সমুদ্র-বিজ্ঞানীৰা মনে কৰেন, সৰ্বপ্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰে যে-বাৰ্ট্ৰ ঐ উপগ্ৰহে সৈন্তস্থাপন এবং তৎসঙ্গে গুপ্তচৰ প্ৰেৰণেৰ আয়োজন কৰতে পাববে, সেই এই বিধে সৰ্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বলে পৰিগণিত হবে। তাই মহাশূন্তেৰ গবেষণাৰ সোভিয়েত বাৰ্ট্ৰ পেছিয়ে নেই,—আমেৰিকাৰ সঙ্গে সমান তাৰে প্ৰতিযোগিতা চলাচ্ছে। বাণীয়া কি কৰছে, তাৰ কিছু স'বাদ সম্প্ৰতি প্ৰকাশিত তথ্যে, তাই আজ পাঠকদেৰ পৰিবেশন কৰবো। নিৰপেক্ষ মন্তৱেৰে অনুমান, উচ্চাকাশেৰ গবেষণাৰ আমেৰিকা বা বাণীয়াৰ ভূলনাৰ ইউৰোপেৰ অজ্ঞাত বাৰ্ট্ৰ অনেক পেছিয়ে আছে।

মাত্ৰ কয়েক মাস আগে প্যাপিচে কলেজ ডফ এৰোনটিক্স-এতে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে, সোভিয়েত বিজ্ঞানী দন বকেটেৰ সহায়তায় 'তাদেৰ উদ্ভাৱিত নান' প্ৰকাৰ যন্ত্ৰপাতিৰ সাহায্যে 'উচ্চাকাশেৰ বিষয়ে যে গবেষণা কৰেচেন, তাৰ কিছু ফলাফল প্ৰকাশ কৰেন। এই সমস্ত গবেষণা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্ৰায় ৭০ মাইল উচ্চাকাশেৰ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য বিজ্ঞানী-মতনকে সববহাৰ কৰতে সক্ষম হ'বছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীৰা উচ্চাকাশেৰ ঐ অঞ্চলে বকেটেৰ সাহায্যে কয়েকটি কুকুবকে প্ৰেৰণ কৰেন। আকাশেৰ ঐ মুক্ত পৰিবেশে অবস্থান কৰাৰ ফলে কুকুবগুলিৰ দেহত ক্ষতিকাবক কোন ফলাফলই পৰিলক্ষিত হয়নি।

একটি বহুতাব বাণীয়াৰ বিজ্ঞানী ডাঃ পোলোসকত 'তাদেৰ গবেষণাৰ বিষয়বস্তু পৰ্যালোচনা কৰেন। উচ্চাকাশ পৰ্যবেক্ষণেৰ যন্ত্ৰাদি ছোট ছোট মজবুত বাজ্বেৰ মধ্যে স্থাপন কৰে বকেটেৰ সাহায্যে উচ্চাকাশে প্ৰেৰণ কৰা হ'বছিল। বকেটেই 'তাদেৰ মহাশূন্তে পৰিত্যাগ কৰে; তাৰ পৰ তাৰা প্যাবান্ডটে সাহায্যে নেমে আসে পৃথিবীৰ মাটিতে। মহাকাশেৰ পৰিভ্ৰমণেৰ স্বল্প সনসেৰ মধ্যেই স্বয়ংক্ৰিয় কাৰ্য্য-ক্ষমতাৰ মাধ্যমে ঐ যন্ত্ৰ নানা প্ৰকাৰ মূল্যবান তথ্য স'গ্ৰহ কৰে নেয়। ঘটনাক্ৰমে প্যাবান্ডট যদি না গোলো, তাহলেও তথ্যাবলী সমেত যন্ত্ৰেৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বাব কোনই আশঙ্কা নেই। যন্ত্ৰাদিৰ আগাব সমুহ এতিয়াই মজবুত যে, বিনা প্যাবান্ডটে পৃথিবীৰ বৃকে এসে থাক্কা খেলেও 'তাদেৰ বিলম্বমাত্ৰ ক্ষতি হয় না।

এক একাটি বকেটেৰ নাকেৰ ডগাৰ লাগিছে একজোড়া কৰে বাজ্ৰ মহাকাশে পাঠান হ'বছিল। বাজ্ৰগুলি লম্বায় প্ৰায় সাড়ে ৬ ফুট, চওড়ায় প্ৰায় ১৩ ইঞ্চি আৰু ওজনে ৬ মণেৰও বেৰী। প্ৰত্যেকটি বাজ্ৰ দু'টি কৰে কক্ষে বিভক্ত,—একটি কক্ষ বাতাস-নিৰাবক এবং চতুৰ্দ্ধিকে কক্ষ এবং অপৰটি মহাশূন্তেৰ পৰিবেশেৰ সঙ্গে যোগাযোগ বাধাবাৰ জন্তু উন্মুক্ত। বাতাস-নিৰাবক কক্ষটিত থাকে বাটাৰী, ঘড়ি, ক্যামেৰা এবং মোটৰ সমেত বিভিন্ন প্ৰকাৰ বৈজ্যতিক যন্ত্ৰপাতি, তথ্যাবলী স'গ্ৰহেৰ জন্তু উন্মুক্ত কক্ষটিত রাখা হয় থাৰ্মোমিটাৰ,

## বিজ্ঞানবাহী



### পক্ষধৰ মিশ্ৰ

ম্যানোমিটাৰ, বাতাসেৰ নমুনা স'গ্ৰহেৰ জন্তু কাচেৰ আধাৰ ইত্যাদি। কক্ষগুলি যুক্ত থাকে প্যাবান্ডটেৰ সঙ্গে, উপযুক্ত সময়ে প্যাবান্ডট খুলে গিয়ে 'তাদেৰ পৃথিবীতে অবতৰণ কৰতে সহায়তা কৰে। বকেটেৰ সাহায্যে মহাশূন্তে পৌছাবাব পৰ যন্ত্ৰপাতি সমেত বাজ্ৰগুলিকে মোটৰেৰ সহায়তায় বকেটেৰ কাছ থেকে সৰিয়ে নিয়ে যাওৱা হয়। কাৰণ, বকেটেৰ উপস্থিতি তথ্যাবলী স'গ্ৰহেৰ ব্যাপাৰে যন্ত্ৰসমূহেৰ উপৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰতে পাবে। মহাকাশে বাতাসেৰ গতিবেগ পৰিমাণ কৰবাব জন্তু বিভিন্ন উচ্চতায় পৰ পৰ পাঁচটি শোঁয়া-উৎপাদনকাৰী বোমা ফাটান হয়। শোঁয়াৰ কণিকাগুলিৰ ব্যাস এক মাইক্ৰনেৰ অৰ্দ্ধেক এবং 'তাদেৰ ব্যৱহাৰেৰ সমতা খুবই কম। কেবল ৫০ মাইলেৰ উৰ্দ্ধে তাৰা খুব তাড়াতাড়ি নীচেৰ দিকে নামতে থাকে। বাই হোক, দেখা গিয়েছে মহাকাশেৰ ঐ উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত বাতাসেৰ পৰিমাণ কম হোলেও গতিবেগ বেশ বেৰী। গৰমকালে বাতাস পূৰ্ব থেকে পশ্চিমে এবং শীতকাল উত্তৰ থেকে দক্ষিণে প্ৰবাহিত হয়।

মহোৰ সন্নিহিতে অবস্থিত এৰোমেডিক্যাল গবেষণা-কেন্দ্ৰেৰ প্ৰধান ডাঃ পোকবোসকি 'তাব ভাষণে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৭০-৮০ মাইল উৰুতে, মহাকাশেৰ পৰিবেশ জীৱদেহেৰ উপৰ কি প্ৰনাৰ বিস্তাৰ কৰতে পাবে, তাই আলোচনা কৰেন। এই গবেষণাৰ ফলে মানুহেৰ আকাশ-জয়েৰ পৰিকল্পনা স্বাধাৰিত হ'বে। ডাঃ পোকবোসকি জানান, বকেটে পৰিভ্ৰমণেৰ ফলে উচ্চাকাশেৰ পৰিবেশ জীৱদেহেৰ সৰ্বপ্ৰকাৰ কাৰ্য্যকলাপেৰ উপৰ বিশ্লেৰ সৃষ্টি কৰতে পাবে, তাই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান পৰীক্ষামূদক ভাবে অজ্ঞান না কৰে, এবং সেই স্থানে দেহগত সৰ্বপ্ৰকাৰ জীৱনক্ৰিয়াৰ নিৰাপত্তাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা না কৰে মহাকাশে যাতাৱ চেষ্টা মোটেই যুক্তিযুক্ত হ'বে না। মানুহ পৃথিবীতে বসে বসে মহাকাশে মানবদেহেৰ নিৰাপত্তাৰ যে সব ব্যৱস্থা অবলম্বনেৰ পৰিকল্পনা কৰছে, তা সবই আত্মমানিক।

বাণীয়াৰ বিজ্ঞানীৰা কুকুৰেৰ সহায়তায় 'তাদেৰ এই গবেষণা পৰিচালনা কৰেন। প্ৰথমে 'তাব কয়েকটি কুকুবকে গৰমকাল বাতাস ও পৰিবেশেৰ সঙ্গে স'যোগশূন্ত, কক্ষ টিউবৰ মাৰা পূৰে বকেটেৰ সাহায্যে মহাকাশে প্ৰেৰণ কৰেন। প্ৰত্যেকটি টিউবেৰ মধ্যেই বাতাস পৰিশোধক, উত্তাপ ও তাপ পৰিমাণক যন্ত্ৰাদি এবং তৎসঙ্গে প্ৰাণীদেৰ দেহেৰ উত্তাপ, বক্তচাপ, নাডাৰ স্পন্দন, ও নিশ্বাস-প্ৰশ্বাসেৰ গতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰকাৰ তথ্যাবলী স'গ্ৰহেৰও আয়োজন সম্পূৰ্ণ ছিল। দ্বিতীয় বাবে কুকুবগুলিকে গোল টিউবেৰ মধ্যে কৰে

রকেটের সাহায্যে উচ্চাকাশে প্রবেশ করা হয়। এইবার তাই মহাশূন্যে ব্যবহার্য কবাব জন্ত বিশেষ ভাবে নিৰ্ম্মিত পোষাকের ছাবা আবৃত ছিল। তাদের দেহের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং বিভিন্ন তথ্যাবলী স গভীর নানা প্রকার যন্ত্রপাতি, উন্নত পবীক্ষণেই নানা ভাবে কৃত্রিমভাবে মহাশূন্যের বিভিন্ন উচ্চতায় এবং গতিবেগের মধ্যে পবীক্ষামূলক কার্য ছেড়ে দিলে, পরিবেশে প্যাবাস্টেটের মহাশূন্য পৃথিবীপৃষ্ঠে নিম্ন আসা হয়। কণীক বিজ্ঞানীর মতে এই পবীক্ষার ফলাফল খুবই আশা প্রদ, কৃষ্ণদেব অচেতন না করেও এই কঠিন পবীক্ষার মধ্যে প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, তাদের উল্লেখযোগ্য কোনই ক্ষতি হয়নি। এই গবেষণার ফলে আশা করা যায়, মাল্লুস ৭০-৮০ মাইল উচ্চাকাশের পরিবেশে নিজেদের নিবাসিতাব বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারবে। ডাঃ পোকনোসক্সি বহুতাব উপসাহারে আশা পকাশ করেন যে সমগ্র দেশের বিজ্ঞানীমণ্ডলের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সমবেত প্রচেষ্টায়

মাল্লুসের শূন্যজয়ের স্বপ্ন একদিন না একদিন বাস্তব রূপ পশিগ্রহণ কববেই।

বাশিয়ার প্রাতিনিধিদের উপস্থিতি এবং তাঁদের বহুতাব বিষয়বস্তু, উপস্থিত বিজ্ঞানিবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার কবেছিল। কিন্তু সম্মেলনে তাঁদের আলোচনায় বিদেশী বিজ্ঞানীর মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত হতে পারেন নি, তাঁদের অভিজ্ঞতা, বাশিয়ার বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার সমস্ত দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কবতে সক্ষম হননি। কি ধরণের বকেটে যন্ত্রপাতি এবং কুকুবকে মহাশূন্যে পাঠান হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। গত বছর ফোপেনহেগেনের একটি সম্মেলনে বাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বছর মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টার কথা উল্লেখ কবেছিলেন কিন্তু ডাঃ পোলোসকডের বহুতাব বোঝা যায় না, তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি সমূহ এই কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত হবে কি না। যাই হোক বাশিয়ার বিজ্ঞানীদের ব্যবহার্য অত্যন্ত বহুতাব ছিল।

## হুগ্ধের সেতু

( Thomas Hood-এর বিখ্যাত “Bridge of Sighs” কবিতার সঙ্গত অনুবাদ )

জীবনে বাতাব শুই ব্রাহ্মণ তেমনি অভাগী এটি আবে,  
মরণের কোলে পেয়েছে শাস্তি একটি কথাও শোনে নি কারো।  
কোন্ সে বিধা এ গড়িচ্ছিলে এত সন্দেহ কোমল কবে—  
নাও তুলে নাও দেহখানি তাব শুধু দেহখানি যতন ভবে।  
সিদ্ধ বসন শব্দচ্ছাদন ঝাবে ঝাবে পাণ্ড নদীর জল,  
আয় তুলে নিই বুকে কবে তাব ঘুমা কবে আব কি মন বল ?  
শুধু নিশ্বাস ছাড়ো না তাহলে যদি কিছু জান বিবাদ কি নে,  
তাই নিজে এসে মাল্লুসের মত দেখে এ জীবন-মরণ বিবে।  
সে কে ছিল আব কি ছিল সে কথা সে পিটার আব আজিকে নশ,  
শুধু চেয়ে দেখে একটি নারাব কি হঠাৎ সাং জীবনময়।  
অতীত দিনের কলঙ্ক তব সম্রাট শাসন মানে নি বুঝি—  
সে কথা জানাব নদীর ধারাব মরণ মাধুরী পেয়েছে খুঁজি।  
বিশ্বমহাতাব একটি অংশ ধর সেব মাগে পেয়েছে ছুটি,  
থাক দোষ তাব তব শেষ বার মুছে দাও গাব ওঠে দুটি।  
জলে-বোশা না মাথা-ভরা চূন বানন এলাগে লুটায় পাণ্ড,  
দাও তুলে দাও শুধু কবাব সাহায্যে মনের মতন কবে।  
তাকে দিয়ে দাও অনুমান আব আলোচনা শুধু হল মুগব,  
বাবে বাবে শু প্রসন্ন ঘনাব কোথা তাব দেশ কোথায় ঘর।  
মা তাব কোথায় কে গো তাব পিতা ভাই-বোন তাব কেহ কি ছিল ?  
তারো চেয়ে দাও আপনাব জন নারাব সে ধন কোথায় গেল ?  
দেখ সবে এসে মাঝে যাই থাক এই ধনীক মমতা নাই,  
লক্ষ জনাব নৃগব-হুয়াব শুধু একজন পেল না ঠাই।  
তুল সব ভরা অন্ধ আঁধার জিঁড়ে পাণ্ড গেছে বাঁধন গত,  
পিতা-মাতা আব ভাই-বোন স্নেহ সে সব স্বপন হয়েছ গত।  
ঐবতাবা সম প্রেমের সে শিশু লুটায়োছে তাব ধূলির তলে,  
শেষে গিরাছেন বিবাহা তিনিও নাবব নয়ন অজ্ঞজলে।

নির্জন তাব অন্ধ-জীবন বন্ধ হুয়াব বিজন বাতি—  
দাঁড়িয়েছে এসে তটিনী তাব কারো জল সেথা হাজাব বাতি।  
শীতের হাওয়ায় কাঁপন জাগাব তব তাব মনে ভাগ নি ভয়,  
অন্ধ শীতল ওঠে কারো জল এমন আপন কেহ ত নয়।  
পিছে দেয়ে আসে কঠিন শাসন উদ্ভাদিনীর জীবন ভাবে—  
এখন তাহাবে বাঁচাতে যে পাবে সে শুধু মরণ এমন কবে।  
নাবব গজন তে মহামরণ বহুতাব-কাগে হু বাহ ঘিবে,  
নিজে যাও মোবে সেথা যতনব শুধু এ ধাবব সোনারা ছেড়ে।  
‘মনি কবিল হু’ বাহ বাডায়ে কাঁপ দিন নারী আকুতাস,  
তুতিন তটিনী কাঁপে খব-খব উঠ আব পাণ্ড চলে যেথায়।  
তাবি দুই কুলে লেবে দেখ সবে কে আজ মাল্লুস দাঁড়াও এসে,  
কবিও গজন পান কোনা তাই সে-জলে মাল্লুস গিয়াছে ভেসে।  
আব কথা নশ তুলে নাও তাবে অস্তি সবতন নাববে ধীবে,  
বিবাহা যাহাবে গড়িচ্ছিলে এত সন্দেহ কোমল কবে।  
মরণ-শীতল সোনার অন্ধ যতন তাহাবে টানিলা নাও,  
মাল্লুসের দেশ ছেড়ে চলে যাও তাহাবে মাল্লুস সাহায্যে দাও।  
জল-কাল মাগা চোখ দুটি তাব মবে যেন তব বয়েছে চেয়ে—  
কিছু তাব ছাশ হুসাহসেব কিছু তাব ভরা হতাশা দিয়ে,  
কিছু তাব কারো অন্ধ নিখতি কিছু তাব ভরা শূন্যতাবে,  
সব মিলে ওঠে তাকদুটি চেয়ে আছে দূব ভবিষ্যতে।  
ধ্বংস তাহাব হুগ্ধের ভাবে লোক-নিশ্বাস ছিন্নছাড়া—  
জীবন-আলাব মকড়মি মাগে হাবায়েছে তাব জীবনধাব।  
বন্ধ কব গো অন্ধ নয়ন কি আব হবে গো এমন চেয়ে,  
হাত দুটি শুধু বাধ এক সাথে প্রার্থনা তাব থাক সে গেয়ে।  
এ জীবনে মোব যত তুল-লোব প্রতিটি বিন্দু আমাবি সে যে,  
শুধু এ জীবন গড়েছেন যিনি তাঁবি পদতলে চলিছ নিজে।

অনুবাদক—বীরেন্দ্রকুমার রায়।

## আপনাদের সঙ্গে কারবার করেই আমাদের আনন্দ...

আপনাদের আমরা আরও ভাল করে জানতে চাই। সেইজন্তেই আমাদের বিশেষ মার্কেট রিসার্চ বিভাগ আপনাদের পছন্দ অপছন্দ, কি কারণে আপনারা কোন কোন জিনিষ কেনেন আবার কি কারণেই কেনেন না—এসব সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। আমাদের প্রতিনিধিরা সারা ভারতবর্ষের ঘুরে বেড়ান—বড় সহরে, মধ্যস্থল সহরে, গ্রামে নানাবর্ণের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করেন এবং এইভাবে আপনাদের নিত্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজন ও রুচির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এই তথ্য অনুসন্ধান চালানো হয় বলেই আমরা রিসেলার মত নতুন জিনিষ বাজারে ছাড়তে পারি বা কোন চলতি জিনিষ বদলাতে পারি—যেমন ধরন আমরা বদলেছি লাল টয়লেট সাবানের হৃগন্ধ।

আমাদের তৈরী অনেকগুলি জিনিষই আপনাদের পরিচিত এবং আমাদের প্রতিনিধিদের তৈরী রিপোর্টগুলিতে আপনাদের খবর আছে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছে শুধু রিপোর্টের সংখ্যা আর তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন... আপনাদের সঙ্গেই আমাদের কারবার। আপনাদের প্রয়োজন যেটাতে, বাধ্য দামে উৎকৃষ্ট জিনিষ দিয়ে আপনাদের সন্তুষ্টি সাধনে, আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই।



দেশের সেবার

হিন্দুস্থান লিভার







# বিবেকানন্দ স্টোত্র

স্মরণি মিত্র

১৫

পুতুল-পুজার এই গুসঙ্গে আজ  
পরিব্রাজক স্বামিজীর  
একটা ঘটনা যদি বোলি,  
হয়তো হাসি হ'বে কাজ। ১

স্বামিজী তখন  
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী।  
দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে কোরে  
জলে-বোদ্ধুরে  
ভারতের নানাদেশ  
ঘুরে ঘুরে শেষে  
এসেছেন আলোর দেশে।  
আলোর রাজ্যের দেওয়ান সায়েব  
মেজর শ্রীরামচন্দ্র এই  
তৌল্লমেধা, দীপ্তদেহী  
নিরাকাম সাধুকে দেখেই  
শ্রদ্ধায় অভিভূত হন,  
তারপর বাক্যলাপ,  
তারপর গৃহে আমন্ত্রণ।

স্বামিজীর দিবা প্রতিভার  
বিমুগ্ধ হোয়ে,  
বিপুল আশায়

দেওয়ান সায়েব  
মনে এক নিশাপ ফলী আঁটেন  
দেওয়ান ভাবেন—  
এইকাকে যদি তিনি  
রাজ্যের রাজাকে ডাকেন,  
স্বামিজীর সান্নিধ্যে  
যদি তাঁকে টেনে আনা যায়,  
ইংরিজীভাবাপন্ন মহাবাহাদুর  
মনোভাব ঘুরে বাবে ঠিক।

রাজকাজে উদাসীন  
মহারাজ মঙ্গল সিং  
সে-সময়ে বাইরে ছিলেন।  
এমন সময়  
দেওয়ানের কাছ থেকে  
মহারাজ পত্র পেলেন,  
লোভনীয় ছোটো এক লাইন—

“A great Sadhu  
With a stupendous knowledge  
of English

Is here.” ২

অর্থাৎ—‘মহারাজ

আমার বাড়িতে আজ  
পদধূলি দিন একবার।’

দেওয়ানের চিঠি পেয়ে  
মহারাজ আনন্দ পান,  
কেন না রাজ্যের  
দারুণ শিক্ষাভিমান,  
তার ওপর  
বিলিতি মেজাজ।  
রাজা তাড়াতাড়ি  
স্বামিজীর সন্ধান  
পা বাড়ান দেওয়ানের বাড়ি।

তারপর স্বামিজীকে পেয়ে,  
খুঁটানী নীতিবাদ  
একরাশ পেটে পুরে থেয়ে  
বিরুদ্ধ ভঙ্গীতে  
মহারাজ বোললেন স্নেহ,—

১। ঘটনাটা The life of Swami Vivekananda  
(by his eastern and western disciples) থেকে  
নেওয়া।

২। “একজন সাধু এখানে এসেছেন। ইংরিজীতে তাঁর অগ  
পাণ্ডিত্য।”

"I have no faith  
In idol-worship.  
What is going  
To be my fate ?"<sup>৩</sup>

প্রশ্নের স্থর শুনে  
স্বামিজীর এই মনে হয়,—  
জ্ঞানার্জনের পূর্বা  
প্রশ্নের মূল-স্তর নয়।  
বোঝা গ্যালো বেশ,  
এতে আছে সে-যুগের  
মূর্তি-পূজার প্রতি  
ধার-করা ছাঁদি বিষেব।

হাই হোক,  
স্বামিজী কি কম ?  
স্বামিজী জানেন  
কোন পথে কতো দূর  
নিরে গেলে তাঁর  
শিকারের ছুটে যাবে দম।  
—“সে কি কথা মহারাজ মঙ্গল সি !”

স্বামিজী হাসেন,—  
“Surely  
You are joking !”<sup>৪</sup>

শিক্ষিত মহারাজ  
তবু অবিচল,  
কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে কথা বাড়ালেন,—  
“No Swamiji,  
Not at all !  
You see,  
I really cannot worship  
Wood, earth, stone and metal  
Like other people.  
Does this mean  
That I shall fare  
Worse  
In the life hereafter ?”<sup>৫</sup>

৩। “মূর্তি-পূজাতে আমার বিশ্বাস নেই, তা আমার দশাটা  
কি হবে ?”

৪। “আপনি নিশ্চয়ই রহস্য কোবছেন।”

৫। “না স্বামিজী, মোটেই তা নয়। দেখুন, বাস্তবিকই আমি  
অন্য লোকের মতো কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর পূজা কোরতে  
পারি না। এতে কি আমার পরজন্মে অধোগতি হবে ?”

আলোয়ার রাজ্যের মতো অধিবাসী  
আসলে কৃষ্ণ-ভক্ত সব,  
মূর্তি-পূজার বিশ্বাসী।  
তারা ভাবে—আজ  
স্বামিজীর দৌলতে  
যদি মহারাজ  
পুতুল-পূজার প্রতি  
প্রতিশ্রুতি হন, তবে  
আলোয়ার রাজ্যের  
সকলেই ওঁর খুশি হবে।

এমন সময়  
স্বামিজী সটান  
একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটান !

ঘটনাটা এই,—  
দেয়ালে একটা ফটো টাঙানো দেখেই  
স্বামিজী চকিতে  
বোললেন—ফটোখানা তাঁর হাতে দিজে  
ছবিটা রাজার,  
তবুও প্রশ্ন তাঁর নাটকীয় ঠাটে,—  
“আচ্ছা, বলো তো দেখি  
এ-ছবিটা কার ?”

দেওয়ান জবাব দান,—

“আমাদেরই মহারাজজীর,  
এ তাঁরই প্রতীক।”

হঠাৎ আদেশ আসে মেঘমস্তক রবে,—  
“Spit upon it !”<sup>৬</sup>

স্বামিজীর কথা শুনে  
সভাসদ ভয়ে স্তম্ভিত !

নিঃস্বল সাধুটির  
এত বড়ো দুঃসাহস কিসে,  
রাজার সামনে বলে যাতে—  
“থুতু ক্যালো তাঁর ছবিটাতে !”

মনে মনে ভাবেন দেওয়ান—  
আজ বুঝি স্বামিজীর  
যায গদর্দান !

সন্ন্যাসী তবু বেপরোয়া,  
রাজসভা শিহরিত কোরে  
স্বামিজীর দারুণ তাগিদ—

৬। “এতে থুতু ফেলুন।”

"Any one of you  
May spit upon it."

বিশ্বয়ে হতবাক্ সব,  
নিম্মাণ ছবি যেন চিত্রশালার !  
—"What is it  
But a piece of paper ?"

এদিকে দেওয়ান  
ভয়ে আর বিশ্বয়ে  
রাজার মুখের দিকে চান !  
সন্ন্যাসী-অভিধির  
আজ বুঝি ষায় গর্দান !

তবুও না-ছোড় বান্দা  
স্বামিজীর জিদ,—  
"Spit upon it !  
I say  
Spit upon it !"

\* \* \*  
সকলে বজ্রাহত যেন !  
মনে মনে ভাবে—  
গাল কেটে কুমোরকে  
সেচ্ছায় ডেকে আনা কেন !

তার পর রীতিমতো যেমে,  
প্রকাণ্ড কক্ষের  
দুঃসহ স্বরূপতা ভেঙ্গে,  
কোনোমতে ঢোক্ গিলে  
দেওয়ানজী বোললেন শুধু,—  
"What ! Swamiji !  
What are you asking me  
to do ?  
This is the likeness  
Of our Maharaja !  
How can I do such a thing ?"

৭। "আপনাদের মধ্যে যে কেউ হোফ্ এসে এই ছবিটাতে  
থুতু ফেলুন।"

৮। (কেউই এগিয়ে এলো না দেখে স্বামিজী বোললেন)  
"এ কি ? এটা তো এক খণ্ড কাগজ মাত্র।"

৯। "ছবিটার ওপর থুতু ফেলুন, আমি বোলছি ফেলুন।"

১০। "স্বামিজী, আপনি এ কি আদেশ কোরছেন ? এটা  
হচ্ছে আমাদের মহারাজজীর প্রতিকৃতি ! এর ওপর থুতু ফেলি  
কি করে ?"

শিকারীর কৌশলে  
সমুদ্র-উপকূলে  
এসে গ্যাছে বনের হরিণ !

সশব্দে ছুটে এলো বাণ,—  
"ওকি কথা বলেন দেওয়ান ?  
যতোই বা-হোক,  
এটা তো একটা শুধু টুকরো কাগজ,  
ছবিটা তো সত্যিই মহারাজ নন ;  
রক্ত-মাংস এতে আছে কি রাজার ?  
আছে তাঁর প্রাণ-স্পন্দন ?  
তবু কেন এত সঙ্কোচ ?  
কেন একে এত সত্ৰম ?"

\* \* \*

"Be it so,  
But the Maharaja  
Is not bodily present  
In this photograph.  
This is only  
A piece of paper.  
It does not contain  
His bones and flesh and blood.  
It does not speak or behave  
Or move in any way  
As docs the Maharaja.  
And yet  
All of you  
Refuse to spit upon it,—  
Because..." ১১

এতক্ষণ পরে  
দেওয়ান ও সকলের  
প্রাণ এলো ধড়ে,  
পরিচিত বন্ধুকে  
ফিরে পেলো স্বামিজীর স্বরে ;  
মুখ থেকে থংসে পড়ে মেঘের মুখোশ।

"...Because  
You see in this photo  
The shadow of the Maharaja's form.

১১। "তা হোক, তাই বলে এই ক্ষণেতে মহারাজজী তো  
আর সশরীরে উপস্থিত নেই। এটা তো এক টুকরো কাগজ মাত্র।  
এতে না আছে তাঁর অস্থি, না আছে তাঁর রক্ত-মাংস, না আছে  
তাঁর কথাবার্তা, না আছে তাঁর চাল-চলন। তা সবেও এতে থুতু  
ফেলতে আপনারা নারাজ, কেননা..."

Indeed

In spitting upon it,

You feel

That you insult your master,

The prince himself." ১২

\* \* \* \*

সমস্ত দেখে শুনে

রাজা তো অবাক !

প্রতীক-পূজার

এমন সরস ব্যাখ্যা

শোনেননি আর ।

সায়েবি শিক্ষাভিমান

ধীরে ধীরে খ'সে পড়ে তাঁর,

মুখে-চোখে জাখা জায়

বিশ্বাসের স্নিগ্ধ আমেজ ।

\* \* \* \*

এবার স্বামিজী

স্বয়ং রাজার দিকে ফিরে বোললেন,—

"See, your Highness,

Though

This is not you in one sense,

In another sense

It is you.

That was why

Your devoted servants

Were so perplexed

When I asked them

To spit upon it.

It has a shadow of you ;

It brings you

Into their minds.

One glance at it

Makes them

To see you in it !

Therefore

They look upon it

With as much respect

As they do upon your own person." ১৩

১২। "কেননা, এই ফটোতে আপনারা মহারাজের সাদৃশ্য, তাঁর ছায়াটা দেখতে পাচ্ছেন। তাই সত্যিই এর ওপর খুঁত ফালার কথা ভাবতে গেলোই মনে হোচ্ছে—এতে আপনারা প্রভু, সবার মহারাজকেই অসম্মান করা হবে।"

১৩। "দেখুন মহারাজ, এক হিসেবে এছবিটা যদিও আপনি নন, আর এক হিসেবে দেখতে গেলে এছবিটা আপনিই। সেইজন্মেই

## প্রাণতোষ ঘটকের লেখা

প্রাণতোষ ঘটক...বাঙলা সাহিত্যে পুরাতন ও পরিচিত, কিন্তু উপজ্ঞাসে বিষয়বস্তুর নূতনত্বে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখকের 'আকাশ-পাতাল' ও 'মুক্তাভঙ্গ' পতনোন্মুখ বাঙালী আভিজাত্যের কাহিনী। এই ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ কাহিনী-রচনার সাহস আগেকার মানুষের ছিল না। যেখানে একটু এদিক-ওদিক হইলে সাহিত্য পণগ্রাহ্যিতে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে মাত্রা বজায় রাখিয়া চলায় বিশ্বয় আছে।...পারফর্মেল প্রশংসনীয়। শ্রীমান প্রাণতোষ অধিকন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে পুরাতন 'কলকাতার পথঘাট'-এর হৃদয় দিয়া ও আভিধানিক 'রত্নমালা' পুনঃস্থাপিত করিয়া পণ্ডিতজনকেও বিম্বিত করিয়াছেন। 'কলকাতার পথঘাটে' প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক পুরাতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।—'বিশ্বকর বই' প্রসঙ্গে সংবাদ-সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৬৪।

\* \* \* \*

"এতাবৎকাল অতীত কলকাতার ওপর যেসব প্রবন্ধ ও পুস্তিকা বেরিয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের হাতে সেগুলো ঘোরা-ফেরা করে না। যারা কোতুলকী তারা হয় তো গ্রাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে এসব বইয়ের পাতা ওন্টাবে। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ বাংলা ভাষার পরিবেশন করার ভার প্রাণতোষ ঘটক সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন। এজগৎ তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়।... একত্রিশটি রাস্তার ইতিবৃত্ত শুনিয়াছেন প্রাণতোষ ঘটক। নানা মৌলিক গ্রন্থ থেকে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথ্য সাজানো এবং সরস বর্ণনায় তাঁকে শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে। তিনি গল্প-উপজ্ঞাস লেখেন। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটের ঐতিহ্য ও সহজ পরিচয় রচনায় তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবী করতে পারে।"—দেশ।

\* \* \* \*

আকাশ-পাতাল—( দুই খণ্ডে সমাপ্ত ) ১ম পাঁচ টাকা। ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। মুক্তাভঙ্গ—পাঁচ টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। কলকাতার পথ-ঘাট—তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। রত্নমালা ( সমার্থাভিধান )—আড়াই টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা ৭। বাসকসজ্জিকা—চার টাকা। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা-১২। খেলাঘর—চার টাকা। সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৭।

॥ যন্ত্রস্থ ॥

মুঠো মুঠো কুয়াশা—আড়াই টাকা। সাহিত্য ভারতী, কলিকাতা-৭। মনোহারী—আড়াই টাকা। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, কলিকাতা-৭।

প্রতীক-পূজার  
এ একই রহস্য,  
এ একই সুর।

"Thus it is  
With the devotees  
Who worship stone  
And metal images of Gods." ১৪

\* \* \*  
এতক্ষণে মহারাজ  
বুঝেছেন নিজের গলদ,  
মন থেকে সরে গ্যাছে  
স শয়ের সিন্ধু অবরোধ,  
মনের গভীরে  
আচমকা এসে গ্যাছে  
বিশ্বাসের স্নেহোত্তপ্ত বোধ।

"It is because  
An image  
Brings to their minds  
Their Ishta,  
Or some special form  
And attributes of the Divinity,  
And helps them to concentrate,  
That the devotees  
Worship God in an image.  
They do not worship the stone  
Or the metal as such." ১৫

"মহাবাজ,  
বহু দেশ কোরেছি ভ্রমণ,  
কোথাও দেখিনি আমি  
গুড়ী বা শ্রমণ  
পাথরের উপাসক কেউ,

এতে খুঁজু ফেলতে বলায় আপনাব অন্তরকৃত কর্মচারীরা অতোখানি  
দাবড়ে গিয়েছিলেন। ছবিটা আপনাবই ছায়া, এটা দেখে  
আপনারই কথা তাঁদের মনে পড়ে যায়। একবার এ-ছবিখানা  
দেখলেই, এর মধ্যে আপনাকেই তাঁরা দেখতে পান। সেই  
কাৰণেই আপনাকে যেমন তাঁরা মাস্ত ব'বেন, আপনাব এ-ছবিটাকেও  
তাঁরা ঠিক সেইববমই মাস্ত কোবে থাকেন।"

১৪। "লঙ্কণ্ড পাথর বা ধাতুনির্মিত দেব-দেবীর মূর্তিকে এই  
চোখেই দ্ৰাখেন।"

১৫। "যেহু মূর্তি লঙ্ককে তাব ইষ্ট-দেবতাব কথা স্মরণ  
কোবিয়ে দায়। কিণা ঈশবব কোনো বিশেষ আকাব বা গুণব  
কথা মনে কোবিয়ে দায় এব মনকে একাগ্র করবার সহায়ত' কবে,  
সেই ক্ষেত্রেই তাণ প্রতীকব মাধ্যমে ঈশবব পূজা কবে। তাহা  
পাথর বা ধাতুর উপাসক নয়।"

কাউকে দেখিনি আমি  
পূজা দিতে ধাতুর উদ্দেশে।"

"I have travelled to many places,  
But nowhere have I found  
A single Hindu  
Worshipping an image,  
Saying,  
'O Stone ! I worship Thee !  
O Metal ! Be merciful to me' !" ১৬

\* \* \*  
"কটোটা আপনি নন,  
তবু এটা দেখে  
আপনাকে মনে প'ড়ে যায়,  
পাথর দেবতা নয়,  
দেবতাব মূর্তিকে জাগায়।"

"Everyone is worshipping,  
O Maharaja,  
The same one God  
Who is the Supreme Spirit,  
The Soul of Pure Knowledge.  
And God appears to all  
Even  
According to their understanding  
And their representation of Him." ১৭

\* \* \*  
শেষ হোলো স্বামিজীর কথা,  
ঠিক বেন শেষ হোলো গান।  
মনে হোলো বেন,  
জেনাব আশে-পাশে  
স্ববের আবেশ রেখে  
খেমে গ্যালো চাচ'-অর্গান।

\* \* \*  
নব-জাত বিশ্বাসে বীতিমতো বিহ্বল হোয়ে,  
বিশুদ্ধ প্রসন্ন্য দুটো চোখ তরলিত কোয়ে,  
নিজেকে ফুলেব মতো নিবেদন কোবে তাঁর পায়  
বোললেন মহল সিং—

১৬। "আমি বহুদেশ ভ্রমণ কোরেছি, কিন্তু কোথাও কোনো  
হিন্দুকে মূর্তি-পূজা কোরতে গিয়ে বোলতে শুনিনি,—'হে প্রসন্ন্য,  
আমি তোমাব পূজা কবি। হে ধাতু, তুমি আমাব প্রতি  
সম্মত হও!"

১৭। "মহাবাজ, সকলশেই সেই একই পবমাস্তাব, কিন্তু জ্ঞানব  
আগাব সেই পবব্রহ্মসত্তারই পূজা কোবে থাকে, এব তিনিও ভক্তব  
ভাব এব আকাংক্ষা অনুবায়ী সকলকে দর্শন দ্বান।"



"Heretofore

I did not understand its meaning !

You have opened my eyes !

But

What will be my fate ?

Have mercy on me." ১৮

অজ্ঞসিক্ত আবেদন এটা,  
ব্যাকুলিত প্রাণের বিলাপ !  
এটা হোলো সত্যিই  
মঙ্গল-বুদ্ধির  
নতমুখী সলজ্জ ত্রাস !

\* \* \*  
কৃপার আবেগে স্নিগ্ধ হোয়ে  
স্বামিজী এবার  
মমতামখিত স্ববে  
প্রার্থীর অন্তরে  
প্রাপ্তির পিপাসা জাগান ।—

"O prince,  
None but God  
Can be merciful to one,  
And He is ever-merciful !  
Pray to Him.  
He will show His mercy  
Unto you !" ১৯

১৬

অবিস্তি রাজা, ২০  
তোমাকে কটাক্ষ কোরে এটা বলা নয়,  
তোমার উদার দৃষ্টি  
অতোখানি হয়নিকো স্নান ;  
—এটা আমি বোলছি তাঁদের,

তোমারই মতামত

পরবর্তী ব্রাহ্মনোতা ধীর

পুতুল-পুজোর নামে

প্রচণ্ড বিভীষিকা ধান ! ২১

[ ক্রমশঃ ।

২১। রাজা রামমোহনকে কেবলমাত্র মূর্তি-পুজোর বিরোধী বোললে, তাঁর উদারতা, বিশেষত্ব এবং গৌরবকে ধ্বংস করা হবে। মূর্তিপূজা-বিরোধী, একেশ্বরবাদী কিংবা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী হওয়া সম্বন্ধে তিনি প্রতীক-পুজোকে কোনোদিন অশাস্ত্রীয় বোলে নির্দেশ করেন নি। রাজা কিছুটা মূর্তি-পুজোর রহস্য বুঝতেন। তিনি একথাও বোলেছেন,—“ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তভ্রম হয়। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।” তাই অধিকারীভেদে প্রতীক-পুজোর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার কোরে গ্যাছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনোভাব পরবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারকদের চেয়ে অনেক বেশি উদার এবং সংস্কারমুক্ত।

মহর্ষি, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার বা বিভাসাগর—সকলেই মূর্তিপুজোতে সম্পূর্ণ অনাস্থ। প্রকাশ কোরে গ্যাছেন ; অথচ কেউই মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো যুক্তি ত্যাগে পারেন নি।

মহর্ষি প্রতীক-পুজোর বিরুদ্ধে নিছক প্রতিবাদই কোরে গ্যাছেন, রাজার মতো শাস্ত্র, যুক্তি বা লোকব্যবহারেব দিক থেকে আলোচনা কোরে এ-বিষয়ে নোতুন কিছু বোলে যাননি। তাঁরই অনুগামী রাজনারায়ণ বাবুও মূর্তি-পুজোর বিরুদ্ধতা কোরেছেন বিশেষ কোনো যুক্তি না-দেখিয়েই।

প্রত্যক্ষবাদী অক্ষয়কুমার শ্রেণীভেদে মূর্তি-পুজোকে একপ্রকার নিরাধিকারীর ধর্ম বলে সঙ্গীর্ণমনে স্বীকার কোবলেও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এর অগ্রপযোগিতা প্রমাণ কোরে একে বর্জন কোরেছেন। বিভাসাগর মশাইএরও ঐ একই যুক্তি—যা নিরাকার চৈতন্যরূপ তা কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোতে পারে না, আর মূর্তি হোচ্ছে আকার-বিশিষ্ট এবং জড়। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর মূর্তি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ; কাজেই ঈশ্বর মূর্তি হোতে পারেন না বা ঈশ্বরেরও মূর্তি হোতে পারে না।

বুদ্ধির এই সিদ্ধান্ত হয়তো আমাদেরও মনে নিতে হোতো, যদি না পরবর্তীকালে সমন্বয়যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ কোরতেন, সাধনার দ্বারা প্রতিমাকে জাগ্রত না কোরতেন।

সংস্কার-যুগে একমাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তাঁর ধর্ম-জীবনের শেষ স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হোয়ে মূর্তি-পুজোর রূপক ব্যাখ্যা কোরে গ্যাছেন এবং তা ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত বোলে স্বীকার কোরতেও পেছ-পা হননি।

এই সব দিক থেকে বিচার কোরলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রামমোহন-পন্থীর প্রচুর পরিমাণে রামমোহন থেকে বিপথগামী।

১৮। “এতদিন আমি মূর্তি-পুজোর অর্থই বুঝতে পারিনি ! আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন ! কিন্তু আমার কি দশা হবে স্বামিজী ? আপনি আমার কৃপা করুন।”

১৯। “মহারাজ, এক পরমাত্মা ছাড়া কেউ কাউকেই করুণা কোরতে পারে না, আর তিনি হোচ্ছেন সর্বদাই করুণাময় ! তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে কৃপা কোরবেন।”

২০। রাজা রামমোহন রায়।

“Institutions do not make men, any more than organisations make life ; and even the ideal university . . . will be a superior piece of mechanism unless each student strives after the ideal of the scholar.”  
— T. H. Huxley.



নীলকণ্ঠ

পাঁচিশ

টলিউড থেকে শুধু আকৃষ্ট নিয়ে ফিরেছি, একথা লিখলে ভুল হবে। টলিউডে বিস্ময়ও আছে। বিস্ময় : মঞ্জরী দেবী। যে কোনও উপস্থাসের চেয়ে অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অলৌকিক নয়। অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন মঞ্জরী, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে যে নাটক তার সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না তাঁর অভিনীত কোনও ছবির কাহিনীরই। রাজপথ থেকে রাজতন্ত্রে নয় ; সে ইতিহাস পুনরাবৃত্তিতে হাস্তাকর হয়ে গেছে। পাক থেকে পশ্চিমে ; সমাজ পরিত্যক্ত জীবনের অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে আরেক দিন শুধু সমাজপতিদের নয়, সমস্ত সমাজের স্বীকৃতি আদায়ের মধ্যে ঘটনার উপান-পতন রোমাঞ্চকর। মেয়েমানুষ থেকে বমণীতে এই রূপান্তর আরব্যোপস্থাসের চেয়েও আশ্চর্য্য ! গরীব থেকে শুধু বড়লোক মাত্র হয় নি মঞ্জরী ; যে-সমাজ তার পিতাকে করেছে সমাজপতি অথচ তাকে করেছে সমাজচ্যুত, সে-সমাজকে ক্ষমা করে নি সে ; মৌন অভিমান নয় ; স্বীকৃতি আদায় করে করেছে মুখের প্রতিবাদ। সমাজের পরিচয়পত্রে যোগ করেছে নূতন বর্ণপরিচয়। টলিউডের নরকে অনেক অধঃপতিতা পতিতা হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের চোখের জল টলিউডের মাটিতে পড়ে শুকিয়ে যায় নি ; তার ভিতর টলিয়েছে। সর্ব নিম্নস্তরের পতিতা হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের সঙ্গে পরিণীতা। মেয়েদের নিয়ে ছেলেখেলায় আমরা শুধু পুরুষের হাসিই দেখেছি ; কোনও মেয়ের অটহাসি দেখি নি। মঞ্জরী এই সমাজের মুখের ওপর প্রচণ্ড ব্যঙ্গের সেই মুখের অটহাসি।

মঞ্জরীবালা কেমন করে মঞ্জরী দেবীতে উত্তীর্ণ হলো সেই

অভিজ্ঞতাই টলিউডের রক্ততীর্থে আমার একমাত্র লাভ। সেই জীবন-নাট্য এখানে উপস্থাসের মত সাজিয়ে দিলাম। জীবনের সত্যকে উপস্থাসের আঙ্গিকে ভঙ্গ দিতে যেটুকু কল্পনার অঙ্গন মাখানো দরকার সেইটুকু দিয়েছি বলেই একে কাহিনী বলছি, না হলে একে সত্য ঘটনা বলেই আখ্যায়িত করতাম। কিন্তু নিখাদ সোনার যেমন অলঙ্কার অসম্ভব, তেমন নিছক সত্যকথনে রিপোর্ট হয়, সাহিত্য হয় না। তাই সত্যের ভিতের ওপর এ-হচ্ছে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রিত ইমারত।

একটি কথা ; এ-কাহিনী একজন চিত্রাভিনেত্রীর জীবনী মাত্র নয় ; সেই জীবনকে উপলক্ষ্য করে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছি আমি যে, পদ্ম দিয়েই মানুষ চিরকাল পূজা দেবে ; পঙ্কের খবর নেবে না সে কোন দিন ; কিন্তু যে লিখবে তার কাছে পদ্মের চেয়ে পঙ্কের দাম কম নয় ; পঙ্কে জন্মায় বলেই পদ্ম,—পদ্ম। শুধু পদ্মের গন্ধে মানুষের মন উগ্ননা হতে পারে কিন্তু সত্যকে পাবে না সে ; শুধু পঙ্কের বর্ণনায় পুলিশের ডায়েরী হতে পারে, সাহিত্য অসম্ভব। পঙ্কে জন্মানোর বেদনার সঙ্গে পদ্ম হয়ে একদিন ফুটে ওঠার আশাই সাহিত্যের একমাত্র দাবী ; পঙ্কের সঙ্গে যেটুকু পঙ্ক জড়ানো, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনও ততটুকুই জড়ানো ; তার বেশী নয় ; তার কমও নয়।

ট্রাম ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে মঞ্জরী আঁচলে-বাঁধা পরসাগুলো গুলে। কি হবে গিয়ে। একবার তার মনে হোল। কি হবে গিয়ে ফিরে যাই, সে ভাবলো। মনে মনে সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, এ অসম্ভব, মাঝের থেকে এই হুঁটো টাকাও আস্ত থাকবে না। আঁচলে হাত দিয়ে টাকা দুটো আরেক বার স্পর্শ করতেই আরো ভয় হল। হুঁটো আস্ত রূপের টাকা। গত সপ্তাহে হলু বাবু হুঁদিন পর পর তার ঘরে আসে নি। অনেক সাহস আর উপায়হীন হয়ে তবে সে খন্ডের জুটিয়েছিল। হুঁটি কলেজ বাবু। তাদেরই একজন বোধ হয় কলেজের মাইনে থেকেই হবে, এই হুঁটি টাকা দিয়ে যায়। হলু বাবু জানলে ?

এটা কি টালিগঞ্জের ট্রাম ? মঞ্জরী এতক্ষণে পাশের লোকটিকে ভালো করে দেখলে। কল্লিণীবালায় দালালটার মত চেহারা, অবিকল কালো, নাড়ুব-হুড়ুব। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী, পায়ে কালো চটি, হাতে ওটা কি ? কল্লিণীবালায় দালালের হাতে কখনো দেখে নি। হ্যাঁ টালিগঞ্জের গাড়ী। কোথায় বাবে ? মঞ্জরী জবাব দিলে না ; প্রথমে গাড়ীটার উঠ পড়লো ; ভাড়া বেশী, সে জানে ; তবুও। লোকটার পেছন পেছন এসে উঠলো। মঞ্জরী আঁচ করলে, লোকটা চিনে ফেলেছে, সে কোথাকার। না হলে মেয়েছেলেকে নিশ্চয় আপনি করে ডাকত।

হলু বাবু জানলে ? আরেক বার ভাবতেই একটু ভয় পেলো মঞ্জরী। তারপর মনে মনেই বোধ হয় সাহস সঞ্চয় কোরবার জন্তেই হবে বললে : ও জাহুক। বাটটা টাকা দেবে ; তাও আজ পাঁচ টাকা কাল দশ টাকা করে। এর দিকে তাকালে, ওর সঙ্গে কথা বললে অভিমান ; হুঁদিন অন্তর সন্দেহ। মঞ্জরী এবার স্পষ্ট করে বলে দেবে : সে পারবে না।

ট্রাম আর বাবে না। বাঁচার মধ্যে চুকছে। মঞ্জরী নেমে পড়ল, আর সেই লোকটি। লোকটা এতক্ষণ লেডিজ সীটের পেছনেই বসেছিল। মঞ্জরী খেয়াল করে নি।

এখানে কোথায় যাবে ?

কোথায় যাবে। তা ছাই মঞ্জরীই কি ভালো করে জানে ? গোকুলের ওপর তার রাগ হোল ভীষণ। কত বার মঞ্জরী তাকে বলেছে ঠিকানাটা। একটু কাগজে লিখে দিতে, না, ট্রাম যার পর আর যাবে না, সেইখানে নেমে যে কোন রিক্সওয়ালাকে বললেই হবে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হয় যেখানে, সেখানে নিয়ে যেতে ; বাস !

আচ্ছা এখানে কোথায় বায়োস্কোপ ?

বুঝেছি, কিন্তু কোন ষ্টুডিওতে যাবে ? ওস্ত না কবি ?

ক—কবি !

এতক্ষণ বলনি কেন ? কার কাছে যাবে ?

রাখাল বাবু, রাখাল দত্ত গো ! 'গো' কথাটা মঞ্জরী এখানে লাগাতে চায় নি কিন্তু তবুও মুগ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওঃ, স্ত্রীর কাছে ! একষ্ট্রার জন্তে ! তা, তার জন্ত আর ঠেকে বিরক্ত করে কেন ?

গোকুল যে তাই বললে।

গোকুল কে ? ওঃ ! বুঝেছি, গোকুল ত' ষ্টুডিওর কুলি। আমার এসিষ্টেন্ট ! চলো রাখাল বাবুর কাছে আমিই নিয়ে যাচ্ছি। গোকুলের নাম কোরবারই দরকার নেই সেখানে, বুঝেছ ?

মঞ্জরী চূপ করে বসল ; মনে মনে বলল, আমরা বেগারা সকলের সব কথাই চট করে বুঝে নিই। শুধু নিজের মন নিজেরা বুঝিনে, কেন কে জানে !

একখানি রিক্সা নিলে লোকটা। কাজ না হলেও ভাড়াটা বোধ হয় বাঁচলো ; মঞ্জরী একটুখানি খুসীই হল। পানের দোকানে থেকে শিস দিলে এক জন। এক জন চেঁচালে : কোথায় চললেন স্ত্রীর ? রিক্সা থেকে নেমে মঞ্জরীই ভাড়া দিলে।

আজ তার শরীর খারাপ, শরীর ভালো না থাকলে কোনও পুরুষ মানুষই কোনও মেয়ে মানুষের জগ্গেই একটি কড়ি বার করতেও রাজী নয়।

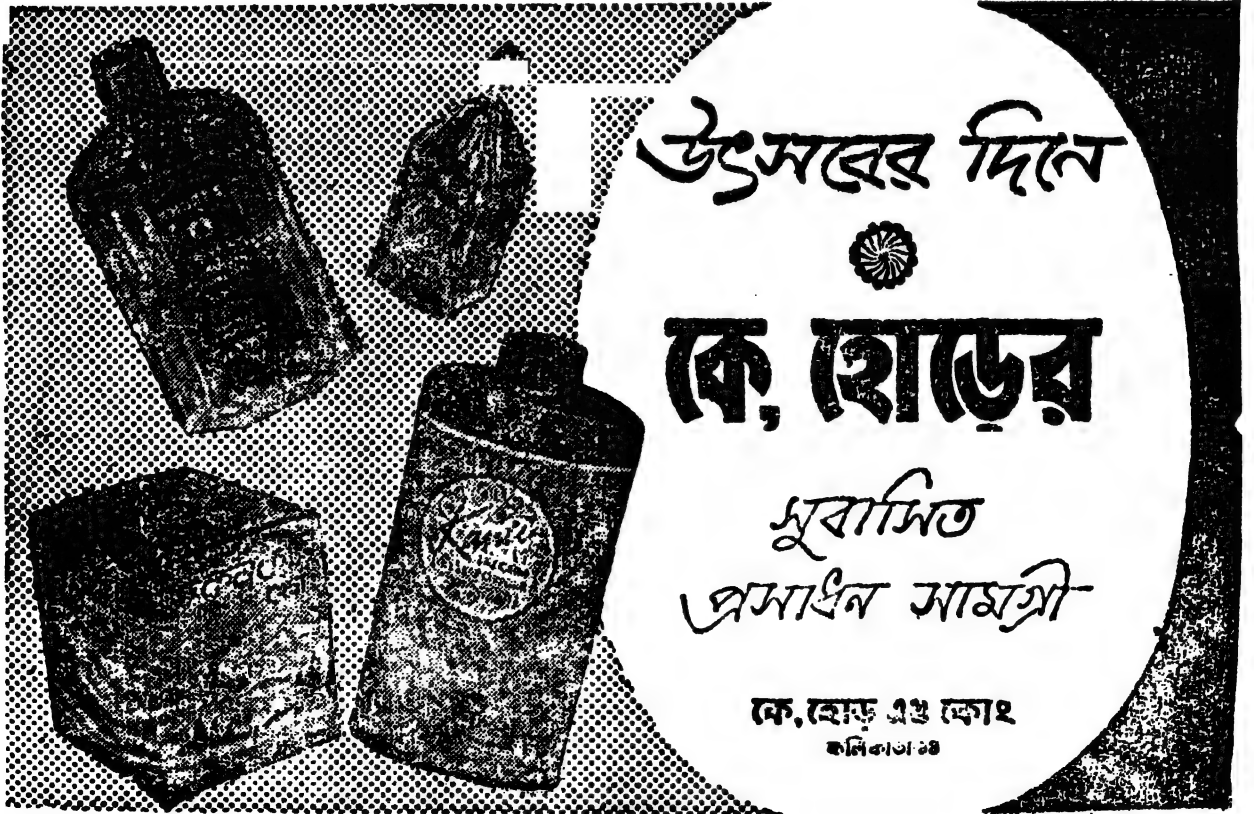
তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সে জানে, এই হল দম্বল।

গেটের ওপর বৃত্তাকারে লেখা : কবি ফিফ্‌থস্ সাউণ্ড ষ্টুডিও। এক জন মিস্ট্রীই হবে হয়তো। বললে মঞ্জরীর সঙ্গে লোকটাকে : কি লাটুমাণিক, এতক্ষণে সময় হোল ? যাও, কর্তা ভেতরে বেগে ফায়ার ! চাকরী বোধ হয় আজ গেলো তোমার।

লে লে তুই চূপ কর। আমার চাকরী কে খায় রে ? লম্বা স্ক এক ফালি রাস্তা পার হয়ে মঞ্জরী যে ঘরটায় এসে ঢুকলো, অত উঁচু, অত বড় আর অত নিস্তরূ ঘর সে আর আগে দেখেনি। আর কি গরম হ্যা, দম বন্ধ হয়ে এলো প্রায় মঞ্জরীর।

ঘরে চার-পাঁচটি লোক। সবাই বোবা। কেউ কথা কয় না ; খন্দের বাচানো নজরে মঞ্জরী এক বলক কটাক্ষ ঘুরিয়ে আনলো সকলের মুখের ওপর দিয়ে। বুঝতে পারলে এরা সবাই একজনের জন্তে অপেক্ষা করেছিলো কিন্তু সে মঞ্জরীর জন্তে নয়।

বহু দিন আগে একবার ব্যারাকপুর-এর এক বাগান-বাড়ীতে



উৎসবের দিনে

কি. হোডের

মুবাদিত

প্রমাণন সামগ্রী

কে. হোড এন্ড কোং

কলিকতা-২৪

গিয়েছিল, তার দিদির সঙ্গে। তখন তার বয়স বেশী নয়। ঠিক সেই বাগান-বাড়ীর মতই না কিন্তু ঠিকিও। সহরের কাছেই, কিন্তু সহর থেকে যেন অনেক দূরে। পরিত্যক্ত প্রাসাদের মত মনে হয়। ছ'চারটি লোক, তাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এটা যেন এক দিন কোন প্রাচীন রাজার রাজপুরী ছিলো। সৈন্ত-সামন্ত সব বেরিয়ে পড়েছে, যুদ্ধ করতে আর ফিরে আসে নি। সেই সব ফেরারী ফৌজদের যাদের কোন দিন এরা দেখে নি, তাদেরই কল্পিত জীবনের আখ্যান নিয়ে মনগড়া রূপ দেওয়ার ছেলে-ভুলানো খেলা জন্মাবার চেষ্টায় অলস ক'টি লোক অলসতর করনায় মশগুল। ফুটির ঠাণ্ডা আবহাওয়া কাজের আসরে। যা এদের প্রচেষ্টার মতই নিশ্চয়। কলের পুতুল দম দিয়ে দিলে তবে চলে, না হলে অচল।

ঘরের মাথায় জমেছে বুল, ভুতের মত দেখায় অন্ধকার কোণে কোণে। সে বুল ঝেড়ে পরিষ্কার করবার দায় নেই কারুর; দায়িত্বও নেই। নোহুন যারা আসে এখানে, তাদেরই চোখে পড়ে শুধু। পুরোনোরা মেনে নিয়েছে এই জঙ্গলকে; যেমন মেনে নিয়েছে এই ঘরে তার আর লাঠি আর ক্যামেরা আর মাটিক, অভিনেতা আর অভিনেত্রী; বাইরের উঁচু আসনে পায়রাদের বক-বকম কখনও খামে কখনও খামে না, ভেতরে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের সংলাপ বলে যাওয়ার মত কেউ কান দেয় না তাতে, খেমে গেলেই তবে সচেতন হয়, না হলে নয়।

কিন্তু আজ রবিবার তাই, না হলে মঞ্জরী এখনও জানে না এই নিশ্চয় প্রাসাদে প্রাণ সঞ্চার হয় মুহূর্তে। লোকজন, কথাবার্তা হৈ-হৈ, যেন কি হচ্ছে, যেন কি হবে, এই এক সম্ভাবনায় কাঁপতে থাকে। এমন কি সে বকম স্রুটি; হলে এই ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হয়, বাংলা দেশের কোন পাড়াগাঁয়ে ঢুকেছি; মাটির ঘর, মেঠো বাস্তা, গাঁয়ের লোক : চোখ-ভুটো বগড়ে নিয়ে তবে আপনি বুঝবেন : স্রুটি চলছে।

আজ রবিবার, তাই মনে হচ্ছে যেন কোনও বাড়ীতে বিরে শেষ হয়ে গেছে কাল। অলস মধুর মুহূর্ত বাসি ফাসির গন্ধে একটু বুঝি উন্নয়ন উল্লাসও করে।

মঞ্জরীর সম্বন্ধ কিরে এলো রাখাল বাবুর প্রবন্ধে। বিনোদ তোমায় পাঠিয়েছে এখানে ?

হ্যাঁ, মঞ্জরী ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে আনলে একখানা চিঠি।

রাখাল দুষ্ট এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ালেন চশমার জন্তে। পেলেন না। বিরক্তিতে ক্রুদ্ধন করলেন তিনি। চিঠিখানা খুলতেই খেয়াল হল চশমা তাঁর চোখেই আছে।

এর আগে প্লে করেছো সব করে কখনো ?

না।

ভালো ভালো সিনেমা দেখ তুমি ?

না।

কোন স্রুটি; দেখেছ কোনও ছবির এর আগে ?

না।

তোমার ছবি তোলা আছে একখানাও ?

না।

ঠিক আছে। মস্তব্য করলেন পরিচালক। মঞ্জরী এবং ঘরের আর সব লোক বুঝে নিল ঠিক নেই।

তুমি ঐ মাঝখানটায় গিয়ে কাঁড়াও দেখি।

মঞ্জরী উঠে গেলো হতাশ ভঙ্গীতে। কিন্তু কাঁড়ালো ঠিক যেমন ভাবে বললেন রাখাল বাবু, ঠিক অবিকল সেই ভাবে। কাঁড়ালো অভ্যেস তার অনেক দিনের।

মুখটা তোলো, আরও একটু বা দিকে, না, না ডান দিকে নয় বা দিকে, ঐ তারাতার দিকে তাকাও; হ্যাঁ ঠিক আছে।

একটা ছোট আওয়াজ হতে মঞ্জরী মুখ ফেরালে।

নাও আরেকখানা ষ্টিল নাও হে। আরেক বার মুখ তোলো ত'!

তুমি বাংলা পড়তে পারো ?

হ্যাঁ। মঞ্জরী এতক্ষণে একটা 'হ্যাঁ' বলতে পেরে অবাক হলো।

একজন লোক এসে তার হাতে একখানি লম্বা বড় কাগজ দিলে।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা পরিষ্কার। পড়তে কষ্ট হবে না ;

মঞ্জরী ভগবানকে ধন্যবাদ জানালে।

ওতে কল্পিত যে কথাগুলো লেছে সেই কথাগুলো শুধু তুমি বলবে। পুরুষের ডায়ালগ তোমার বলবার দরকার নেই।

মঞ্জরী পড়লে, এত দেরী হল কেন নাথ ?

একটু খামলে তারপর। পুরুষের কথাগুলো তার বলবার নয় কিন্তু পড়ে দেখলে এর উত্তর সেই লোকটির বলবার কথা লেখা রয়েছে ; তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই দেরী হয়ে যায় কল্পিত !

কি মিথ্যে কথা ! মঞ্জরী ভাবলে সে যুগে ব্যাটাছেলেগুলো বানিয়ে বানিয়ে মেয়ে মানুষের কাছে মিথ্যে বলে খুসী হত। হুলু বাবুও ত দেরী হলে মঞ্জরীকে আজও অমনি মিথ্যে বলে ; কিন্তু এ কি, কল্পিত যেন বিশ্বাস করেছে সেই কথা। কল্পিত বলছে :

আমি সামান্য নারী ; রাজকাজে ব্যস্ত থেকেও তুমি আমার ভোলো না নাথ ?

মঞ্জরী কিন্তু জানে, হুলু বাবুর সব মিথ্যে। মঞ্জরীর ভালবাসার মতই মেকি। মঞ্জরী অবশ্য ভুলে গেলো যে হুলু বাবুর কথার জবাবে তাকেও অমনি মিথ্যে বলতে হতো। মঞ্জরী শুধু মনে মনে বললে, কল্পিত তুমি বোকা। ভীষণ বোকা।

মঞ্জরী এসে বসতেই দেখলে এক কাপ চা ; কিন্তু পেরালায়। তেঁটা পেরেছিল, কিন্তু বাটি হলেই যেন ভালো হতো। চায়ের পুরো স্বাদটা সে পেত। প্লেটে ঢেলে ঢেলে মঞ্জরী চাটুকু খেলে ভরে ভরে।

কাঁকে দিয়ে খবর দিলে তুমি পাবে ?

গোকুল বাবু আমার জায়গা জানে।

গোকুল ? বেশ দু'দিন তিন দিনের মধ্যেই তুমি খবর পাবে।

ঘর থেকে বেরোতেই রিক্সার আসা সেই লোকটাকে দেখা যায়।

আমিই খবর দিয়ে আসব তোমায় ; যেই পাব সেই তোমার ওখানে যাব ; জায়গাটা কোথায় ? রূপটান...

মঞ্জরীর এবারে রাগ হল। সে তাকাতেই লোকটা বললে : থাক থাক। গোকুলের কাছেই জেনে নেব।

শ্রোতের মধ্যে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে : একাজ মঞ্জরীকে দিয়ে হবে না।

অসম্ভব, এ ত কাঁড়াতেই জানে না।

একে আবার বিনোদ বাবু জোটাতে কোথা থেকে ? একেবারে বাজারে মেয়েছেলে !

আরে, সোনার বাবার সেই মেয়েটাই ত ! ভীষণ কালো বলে

পেচি মঞ্জরী বলে ডাকি। একটা বোন আছে। আপন নয়, মাজোরারী একটা বাবু রেখেছে সেটাকে।

নুপেন শুই এর বাবা; এই পেচি মঞ্জরীর।

নুপেন শুই? লরেন্টা স্তান্ডার্সের বড়বাবু।

হ্যাঁ। আমরা ঠাট্টা করতাম কার মেয়ে বলে; নুপেন আর মহাদেব চাটুজ্যে দু'জনেই যেত কি না সোনার বাবার কাছে। তবে ও নুপেনেরই মেয়ে, নুপেনের মুখ বসানো একেবারে।

ছোটখাটো পাট হতে পারে।

রাখাল দত্ত একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। একেই নেব। মেয়েটার কিছু নেই, সব করে নিতে হবে। শুধু camera face আছে অসম্ভব। গোকুল পরন্তু দিনই কাগজপত্র নিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আসবে। যারা দাঁড়িয়ে উঠছিল তারা বসে পড়লো চেয়ারে।

ছবির দফা হয়ে গেল। সবাই বললে কিন্তু মনে মনে; রাখাল দত্তের সামনে বলবার সাহসে কুলোয় না কারুর। শুধু একজন আপত্তি ছুঁড়ে মারলো সোজা।

কি পাবলিসিটি একে দেব? প্রশ্ন করল মি: গাঙ্গুলী।

এত কাল বা সকলকে দিয়ে এসেছেন; অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত তরুণী।

এ ত' তরুণীই নয়, অভিজাতও কোন জন্মে নয়।

এত দিন পাবলিসিটি করবার পরেও একথা বলতে পারলেন আপনি?

যাদের আমরা অভিজাত বলি, তরুণী বলে চালাই, তারা সবাই খাঁটি? রাখাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে মি: গাঙ্গুলী বললেন: কিন্তু পিটুনিগোলাকে দুধ বলে চালাবার দিন গেলো বলে।

এবারেই তো আপনার বাহাতুরী দেখা যাবে। এবারে যোল আনা খাওয়ান পাবলিককে, দুধের ভেট্টা তাতেই মিটেবে।

তথ্য! মি: গাঙ্গুলী ফিরে এলো তাঁর স্বধর্ম্মে। আমার ডিক্টনারী বলে, মালিকের যে ঘোড়া রেসে দৌড়াচ্ছে সে ঘোড়া হলেও তাকেই back করা salesman-এর কাজ।

তাই করুন, আর জেনে রাখুন, এ-ঘোড়া dark horse কিন্তু খোঁড়া নয়। সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর মঞ্জরী ফিরে এলো তার ঘরে। খানিকটা হতাশা আর অনেক ক্লান্তি নিয়ে।

এসে দেখলে হলু বাবু খাটে শুয়ে বই ওল্টাচ্ছে। দিন কাল তোমার ফিরে গেলো কিন্তু, কি বলো মঞ্জরী? গরীবকে মনে রাখবে ত? হলু বাবু ঢ় বদলেছে।

কি বলছেন? মঞ্জরীর হতাশা জিজ্ঞাসায় হলু বাবু আঁচ করলে তখন আশাজনক যেন কিছু ঘটনি মঞ্জরীর ভাগ্যে, মনটা একটু স্তী হল। যাক। হয়ত আরোও কিছু দিন মঞ্জরী তারই থাকবে।

গোকুল বলছিল কি না তুমি ফিরে নামছ। ভালো! ভালো! ফিল্মটার মঞ্জরী না কি অভিনেত্রী কুলরাণী, কোনটা তোমার ভালো লাগছে স্তন্যে রাণী?

দিনের বেলাতেই হলু বাবু চড়িয়ে এসেছে তা হলে।

হ্যাঁ ভালো কথা। ইনক্রিমেন্ট হয়েছে অফিসে। তোমাকেও কিছুটা অংশ দেব তার; তোমাকে শুধু কথাতাই খুসী করে এসেছি; এবারে কাজেও প্রমাণ পাবে তার।

আপনি বসুন একটু; আমি আসছি।

কাপড় নিয়ে নেমে গেল নীচতলার মঞ্জরী। নীচের তলার ঘরের মেঝের রুম্বিরী ছেলেটা শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ছোঁড়া ওঠে। বলতে বলতে মঞ্জরী দেখলে হাতে একটা কাগজ গৌজা। হাত থেকে সেটা খসিয়ে নিয়ে দেখলে ছাপা হাণ্ডবিল।

ফেলে দিতে গিয়ে চোখ পড়ল 'পতিতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন'। ঘোষণাটা একটি আবেদন। পাড়ার লোকের কাছে কয়েকটি পতিতার পাড়ার যুবকদের নৈতিক উন্নতির বাধ্যতাবোধ এখানে ঘর নিয়ে আছে। সমাজের মঙ্গলের মুখ চেয়ে এদের উচ্ছেদ করা দরকার, তার জন্তেই পাড়ার সকলের পক্ষ থেকে মাতাকরদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে হাণ্ডবিল মারফৎ।

কে কে সই করেছে দেখা যাক। মঞ্জরী স্বাক্ষরগুলির ওপর নজর নামিয়ে আনল। প্রথম নামটি পড়তেই তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল স্বস্থান থেকে মুখের কাছে। বড় বড় টাইপে সন্মুখিত স্বাক্ষর হুলাল চাঁদ দত্ত।

চানের ঘরে ঢুকে চান করলে না মঞ্জরী।

গত পাঁচ বছর ধরে হলু বাবুর বাঁধা সে। এক-আধবার লুকিয়ে অস্ত্র খন্ডের মঞ্জরী বসিয়েছে বাধ্য হয়ে। সে জন্তেও দায়ী হলু বাবুই। প্রয়োজনমত টাকাও তাকে দেয় নি হলু বাবু। শুধু শরীর পাতাই সার হয়েছে মঞ্জরীর। জাত তার জন্ম থেকেই গেছে কিন্তু পেট ভরেনি মাসের দশ দিন। আর সেই হলু বাবু প্রতিদিন উচ্ছেদ কামনা করছে তার। কিন্তু মঞ্জরী যে এই পথে এসেছে এ কি তার নিজের ইচ্ছে? ভালো লাগে তার দিনের পর দিন শরীর দিয়ে রোজগার করতে? কেউ যদি তাকে বিয়ে করত সে কি কোন গেরব বধুর চেয়ে কম ভালোবাসতো তার স্বামীকে? হলু বাবু ত বিয়ে করেও চরিত্র ঠিক রাখতে পারে নি। কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে? সে যে বেষ্ঠার মেয়ে, এর পর মঞ্জরীর কি কোনও হাত আছে? কিন্তু তার বাবা কালও তো ভ্রাতৃলোক সমাজের সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবেন। অথচ তার মেয়ের মেশবার উপায় নেই কোথাও। অল্পের জন্তে শরীর দেওয়া ছাড়া কোনও গতান্তর নেই। ছবির এই কাজটা সে পায় না? [ক্রমশ:]

শিক্ষক যেখানে বক্তা, ছাত্র শুধু শ্রোতা; শিক্ষক যেখানে দাতা, ছাত্র শুধু গ্রহীতা,—সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের হাতি'; শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। সে সর্বদাই নিজেকে অক্ষম ও দুর্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখে।

—স্বামী বিবেকানন্দ



## ছোটদের আসর



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। টাঙ্গাওয়ালা বলে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে'। গোখলিয়ার মোড়ে সারি-সারি টাঙ্গা দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে—আইয়ে বাবু আইয়ে। শেয়ারে লোক চড়ায়। কংক্রিটের রাস্তার ওপর দিয়ে কপ-কপ শব্দ করে বোড়া চলে, টমটমের মতন ঘণ্টা বাজে টাঙ্গাওয়ালায় পায়ের চাপে। হাতের চাবুকের লাঠিটা চলন্ত চাকায় ঠেকিয়ে কটাকট শব্দ করে সে বলে যায়।—বাঁচো ভাইয়া, বাঁচো শেঠ, বাঁচো সাইকেল—কপ-কপ কপাকপ, বোড়া চলে।

পার হয়ে যায় গণেশমহল্লা, রামাপুরা, সোনারপুরা, ভেলুপুরা, কেদার, হরিশ্চন্দ্র, শিবালয়, দুর্গাবাড়ী—রাণীভবানীর মন্দির। ওধার থেকে কামাচ্ছার রাস্তা এসে মেশে, সঙ্কটমোচনে মহাবীরের মন্দির ও মনোরম বাগান। পুরোন পানওলাটা টেঁচিয়ে ওঠে 'জয় সিরারাম' বছরের পর বছর নাকি থাকে পায় তাকে ডেকে—লঙ্কার পাওয়া যায় পঞ্চক্রাশীর পথ, তীর্থযাত্রী কান্ধী, পরিক্রমা সারে এই পথে—সামনে জেগে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেরুয়া রঙের প্রধান ফটক, যেন ধ্যানগম্ভীর।

তার পর পিচঢালা রাস্তার দু'ধারে, কোথাও নিম, কোথাও বাবলা, কোথাও কুষ্কুড়া, কোথাও পলাশ গাছের সারি—প্রাসাদের পর প্রাসাদ—মাথায় মাথায় মন্দিরচূড়া—বাণীনিকেতন, একটার পর

একটা আয়ুর্বেদ কলেজ, আর্টস কলেজ, সার্বজন কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিরাট লাইব্রেরী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্টেল, খেলার মাঠ, সমস্ত গেরুয়া রঙের, যেন একটা আলাদা রাজ্য কাঁটাতার দিয়ে বেঁধে, গঙ্গা থেকে কাছে, শহর থেকে দূরে।

প্রোফেসর কোয়ার্টার্স, ছোট ছোট বাগানওলা দোতলা বাড়িগুলি পাশাপাশি ঝিক-ঝিক করছে, একটিতে বাঘার দাদা থাকে, ও উঠলো মীরাকে নিয়ে। অতিথি যেন এখানে প্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত নয়। যখন কেউ আসবে, গরম গরম হালুয়া, কিংবা লুচি আর আলু-পটোলের তরকারি, এ আর বলতে হয় না। দোতলার ঢাকা বারান্দা থেকে বিস্তীর্ণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় মাইলের পর মাইল জুড়ে যেন স্বপ্ন সার্থক করেছে একটি লোকের—নাম যার মদনমোহন মালবী। রাজা-মহারাজা থেকে সাধারণ লোকের কাছ থেকে ভিক্ষার বুলি ভরে নিয়ে মালবাজী রচনা করেছেন সর্বস্বত্বতীর্থ পরিকল্পনা! পাশাপাশি বাড়ী মিত্রবাবুর, ডোগার সিংএর, পান্ডামবেকরের, বোশীজীর, মৈত্রমশায়ের। নাগবাবুর, শান্তজীর, ভাটনগরের, সুরেন্দ্রনাথের। ছাত্রছাত্রীও সারা ভারতের। স্তবকে স্তবকে কুষ্কুড়া ফুটেছে রাস্তা যেন আলো ক'রে, আকাশে বকের পালকের মতন সাদা মেঘের ঝুপ, সাইকেল-বিক্রম, মোটর, বাস, টাঙ্গা একা দেখা যায়, সিনেমার ছবির মতন দূরে চলে যাচ্ছে—অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

তবু এর চেয়ে নালন্দা বড়ো ছিল। সেখানে থাকত দশ হাজার ছাত্র।

তবু এর চেয়ে আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সারা পৃথিবীর মনীষীর কাছে। কেন? কিসের জন্তে?

কারণ, সেখানকার শিক্ষার ধারা ইংরেজের অল্পকরণে নয়, ক্ষয়িদের অহুসরণে। সনাতন ভারতবর্ষের নিজস্ব পথে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির পরিকল্পনায়। তাই পৃথিবীর দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সেখানে মাথা নীচু করে নতুন কিছু শিখতে আসে, শেখতে নয়। সেখানে এণ্ড্রু পিয়ার্সনকে ভারতীয় হতে হয়।

এখানে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, সম্ভ্রান্ত আর শিক্ষিত, সবাই অধ্যাপক। এমন কোথায় পাওয়া যায়? মিত্রমশাইয়ের মেয়ে গুরুমুখ সিংএর পুত্রবধূকে বলছে—তুমরা স্বামী কেয়া করতে পারতা ছায়, পড়তে পারতা ছায় না চাকরী করতে পারতা ছায়? অর্থাৎ তোমার স্বামী কি করে? এখনো পড়ছে, না চাকরী করছে? গুরুমুখ সিংএর পুত্রবধূ এ হিন্দী বোঝে না। তবু বলে এই বাংলায় কালিজমে এখনো পড়ছে, নাকরী করতে পড়া খতম হোবে তোবে তো। কি কারোবার করে কুছু ঠিক আছে বেহেন?

সব বাড়ীর সামনে যেমন ফুলের বাগান, তেমনি রঙীন ফুলের মতন সাজসজ্জা সব। মাদ্রাজী মেয়েদের নাকে হীরে, কানে হীরে, কত দূব থেকে জলজল করে, গুজরাটীদের রঙীন শাড়ী, বাঙালী মেয়ের পাশি শাড়ীর মতন কাপড় পরার ধরণ। সর্বস্বত্বতীর্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এই ঘুরিয়ে কাপড় পরা। নকল করে ভাটিয়ারা, পান্ডাবীরা, ইউ-পির

# রত্নবেদী

ত্ৰিপ্রতাতকিরণ বসু

মেয়ের। বাঙালী মেয়েরা দক্ষিণী মেয়েদের মতন খোঁপায় মালা জড়ায়। এ যেন অস্ত্র রাজ্য! এখানে মূৰ্খ কেউ নেই, এখানে প্রাদেশিকতা নেই। এখানে শুধু সহযোগিতা, এই হিন্দু বিশ্ববিজ্ঞানব্দের প্রোফেসর কোয়ার্টার্সে।

রেলের থার্ড ক্লাস কামরায় এক বাঙালী ছোকরা চলেছিলো, পান খেয়ে জর্দ। খেয়ে পীচ ফেলেছে জানলা লক্ষ্য করে, হাওয়ায় সে পীচ উড়ে এসে পশ্চিমী ভদ্রলোকের রাজহাঁসের মতন সাদা খন্ডের চাদরে লাগলো। ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলো। বাঙালী যুবক, দেখলে, চলেছে তো থার্ড ক্লাসে, তার আবার এমন মেজাজ! না হয় আসাবখানে পানের ছোপ একটু লেগেই গেছে সাদা চাদরে! কী এমন মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? এমন করলে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে হয়।

ছেলেটি প্রশ্ন করলে—উদ্ধৃত প্রশ্ন—কে তুমি লার্টসাহেব?

জবাব হল—আমি কে জানলে তুমি চমকে যাবে—ভদ্রলোকের শাস্ত্র উত্তর।

তবু ছেলেটি জেদ করে—আরে ভাইয়া বোলো না, কোন হায়া তুমি? বাতাও না কেনা নাম? কাঁহা কা নবাব খাজা খা?

নাম হমারা মদনমোহন মালবী।

তখন ক্ষমা চাওয়ার পালা। কুণ্ঠিত হওয়ার পালা। মদনমোহন মালবী ইংরেজ রাজত্বেই গভর্ণমেন্টের সন্ধান। সারা দেশের সন্ধান।

মালবীজী যুঁবে বেড়াতেন ছেলেদের মধ্যে—তোমরা ভালো হও, বড়ো হও বলে। তোমাদের জন্তে গঙ্গা থেকে কাছে শহর থেকে দূরে পাঠগৃহ করে দিয়েছি, অধ্যয়ন নিয়ে থাকো। সংযম অভ্যাস করো।

কে শোনে কার কথা? সন্ধ্যা হতেই সারি সারি সাইকেল চললো শহরের দিকে—বিলাসের শহর কাশীর দিকে—হাজার হাজার সাইকেল, কে তাদের গতিবোধ করে?

সিনেমা দেখে, সরবৎ খেয়ে, নানা রকম আমোদ করে, মারামারি করে, ক্লাস্ত যুবশক্তি ফিরলো হঠাৎ—যার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

চুকলো তারা পাঁচিল টপকে, চুকলো তারা জানলার গরাদে ভেঙে।

সুপারিস্টেণ্ডেন্ট দরজা পাহারা দিতে এসে জলের কুঁজো ছোঁড়া দেখলে তার মাথার কাছ ঘেঁষে।

রাগ না করে মালবীজী বোঝালেন—তোমরা আগামী কালের ভরসা। আমি আশা করব, এ রকম কাজ তোমরা আর করবে না।

গরমের ছুটি এসে গেল। হঠাৎলের ঘরে ঘরে পাখা চালিয়ে আলো জ্বলে রেখে ছেলেরা যে-যার দেশে চলে গেল—দু' মাস ধরে পাখা চলতে আর জ্বলতে লাগলো—পাখা-কী আর লাইট-কী দেয় না কি তারা? ছুটির সময়ে লোক না থাকুক, কারেন্ট খরচ হোক।

গাঙ্গী এসে বললেন, এমন রাজপ্রাসাদের মতন জাহাজের মতন বিরাট হটেল করার কি দরকার? এখানে থেকে পড়ে ছেলেরা কি তাদের খড়ের কুটারে, খোলার চালের ঘরে, টিনের চালার মধ্যে ফিরে যেতে পারবে? ইংরেজের ইউনিভার্সিটির মতনই ত লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে এখানে? লাভ কি তাতে?

মালবীজী বলতেন, ইংরেজের বা কিছু ভালো তারা নিক, সনাতন ভারতের বা কিছু ভালো, তাও গ্রহণ করুক।

একজন বাঙালী প্রোফেসরকে ছেলেরা ভাড়াতে চায়, পড়ানো

ভালো হয় না বলে। ছেলেমেয়েরা মিছিল করতে লাগলো—চলবে না, চলবে না। বাঙালী ছেলেমেয়েরাও যোগ দিলো। বাঙালী অধ্যাপকদেরও সমর্থন ছিল।

অবাঙালী মালবীজী সেই বাঙালী প্রোফেসরকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তিনি প্রায়োপবেশন শুরু করলেন। চলে গেলেন বিদ্যাচলে ডাকবাংলোয়—যে বিদ্যাচল পাড়াভালা আর্টস কলেজের ছাদে উঠলে দেখা যায়।

ছেলেদের শুভবুদ্ধি জাগলো না। বাঙালী প্রোফেসরকে চলে যেতে হল অবাঙালীকে চেয়ার ছেড়ে। মালবীজী হেরে গেলেন। হেরে গেলেও তাঁর প্রেম রেখে গেলেন এখানকার মাটিতে মাটিতে, যে মাটিতে এক দিন চারশো গ্রাম দাঁড়িয়েছিলো।

সেই সৌম্য শাস্ত্র সুন্দর বৃদ্ধ মালবীজীর কত কথাই মীরা শুনলো। দেশের জন্তে, জাতির জন্তে, ধর্মের জন্তে, আত্মসম্মানের জন্তে, যিনি এত চিন্তা করেছেন, সেই মালবীজীর জীবনের কত কথাই মীরা শুনলো ক'দিন ধরে। কাশী প্রথম দেখা যায় যে-ব্রীজ থেকে, আজ তার নাম মালবীজী ব্রীজ।

গেকুয়া রঙের প্রাসাদগুলি ছককাটা জমির ওপর সুন্দর ভাবে সাজানো—প্রত্যেকটির মাথায় মন্দির—যেন কোনো বাণীতীর্থ, পথিক দেখলেই চিনতে পারে, যে পথিক পঞ্চকোশীর পথে চলে যাব ক্লাস্তপদে, যে-পথিক গঙ্গার বুকে নৌকো ভাসিয়ে যায় চূণার পথে, মির্জাপুরের পথে, গাজিপুরের পথে।

ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে, সারি সারি মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় পেতলের কলসে সূর্য্যরশ্মি ছড়িয়ে।

আবার সেই কথা উঠলো। এখানকার অবাঙালী প্রোফেসররা বললেন—শাস্তিনিকেতন আরো বড়ো, আরো মহান—ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-শিল্প ও কাব্যধারার সঙ্গে পৃথিবীর মিলন নিত্য ঘটাজে বলে—তার আশ্রুকুঞ্জ, তার শালবীথি, তার খোয়াই, যনের ঐশ্বর্য্যে নয়—ভাবের ঐশ্বর্য্যে গর্ভিত শাস্তিনিকেতন বলে,—

হেথায় সবাই হবে মিলিবারে

আনত শিরে।

সেই শ্রীনিকেতন শাস্তিনিকেতন মীরা এখনো দেখে নি, কিন্তু শুনেছে—তার আহ্বান দেশে দেশে সাড়া জাগায়, সাগরের এপারে ওপারে।

বাঘা দেখে এসেছে। বললে, বাংলা দেশের এমন পরিচ্ছন্ন রূপ কোথাও দেখি নি, যেমন শাস্তিনিকেতনে। প্রকৃতি এমন মিষ্টি কোথাও নয়, যেমন শাস্তিনিকেতনে। আশ্রুকুঞ্জ, শালবীথি, সিংহসদন, কলাভবন, শ্রামলী, উত্তরায়ণ, খোয়াই, তিন-চার মাইল জায়গা জুড়ে মহাকবির করনায় রূপ দেবার প্রচেষ্টা—যার চোখ আছে, সেই দেখে অবাক হবে।

কিন্তু দেখে নি কত লোক। দেখতে চায় না কত লোক। নিশ্চয় করে কত লোক! তারা এই বাংলা দেশেরই।

এক দিকে হিন্দু বিশ্ববিজ্ঞানব্দের রাজপ্রাসাদের মতন বৃহৎ অট্টালিকাগুলি, জাহাজের মতন হটেলগুলি, আর এক দিকে বিশ্বভারতীর কাদামাটির কুটারগুলি, আর কিছু কিছু সাধারণ বাড়ী কি করে-তুলনা হবে? মীরা ভেবেই পেলো না।

তবু এখানকার অজস্র আলোর আলোকিত রাতগুলি, নৃকচূড়া

আর বাবলা গাছের মাথায় সোনালী আলোর সকালবেলাগুলি মীরার ভালোই লাগলো।

সোজা সোজা রাস্তা পড়ে আছে, যত দূর ইচ্ছে, তুমি যোও।  
সুন্দর সুন্দর বাগান আছে এখানে এখানে সেখানে।

কিন্তু ঝাঁড়ও আছে। কাশী সহরেই অসংখ্য ঝাঁড়, শিবের বাহন, তোমার গলা থেকে ফুলের মালা কামড়ে খেয়ে নিলেও তুমি কিছু বলতে পারবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে তাদের আরো অত্যাচার।

ঝাঁড় যদি তোমায় তাড়া করে, তুমি একটা ইটও মারতে পাবে না। শুধু তোমায় ছুঁতে হবে। ঝাঁড়গুলো তেমনি পাজী, মানুষ—বিশেষতঃ মেয়েমানুষ দেখলেই তাড়া করবে। তুমি যদি কোনো গাছের পাশে লুকিয়ে পড়ো, সে চার ধার ঘুরে-ফিরে তোমায় খুঁজবে আর হাঁক পাড়বে গাঁক্ গাঁক্ গাঁক্।

তারার যার-তার ফসলের ক্ষেতে নেমে যত ইচ্ছে ফসল খাবে। কেউ কিছু বলতে পাবে না।

সুতরাং পথে বেরোলেই তোমায় লক্ষ্য করতে হবে কোন্ দিকে কোন্ ঝাঁড়টা দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেলেই তোমায় অল্প পথ ধরতে হবে। বারো গ্রাহ্য করে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাঁড় তাদের তাড়াও করে না। জ্ঞানপাপী ঝাঁড়!

তবু এখানকার নির্বন্ধাট জীবনযাত্রা মীরার ভালো লাগলো না। সকাল থেকে অধ্যাপকরা পড়াতে চ'লে যান আমি কলেজ, সায়াল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আয়ুর্বেদ কলেজ, কৃষি কলেজ। ছেলেমেয়েরা একটা টাঙ্গা বাসে স্কুলে চ'লে যায়। তখন মেয়েদের রাজস্ব। বাড়ালী, বিহারী, গুজরাটী, সিদ্ধী, মারাঠী, মাল্ভাজী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া মেয়েদের আলাপ-পরিচয়, বেড়ানো। বিকেলে প্রোফেসররা ফিরলে সেজে-গুজে মেয়েদের পথে পথে বেরিয়ে পড়া। দিগন্ত এখানে অব্যবহিত, স্বাধীনতা এখানে প্রচুর, কিন্তু একঘেরে। বৈচিত্র্য নেই কোনো।

বৈচিত্র্যের মধ্যে পোষ্টমাস্টারবাবু মারা গেল ক'দিনের সেপ্টিক-জ্বরে। ছেলেপুলে ছিল না। দেশ থেকে ভাইরা এসে পড়লো, জীবনে বারো খোঁজ নেয়নি। বৌদিকে নিয়ে গেলো দেশে, সঙ্গে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা। খবর এলো কে খুন ক'রে রেখে গেছে পোষ্টমাস্টারের জীকে। সকলে বললো, আহা, তাই সে এখান থেকে বেতে চায় নি!

এ সব পুরোন খবর। আগের দিনের কথা! মীরা আজ চায় লড়াই। শাস্ত জীবনযাত্রা নয়। এতে আনন্দ নেই। বাহাদুরী নেই। নিজের পরিবার প্রতিপালন করতে মানুষ পরের কথা ভাবছে না, এ যেন কেমন!

ছেলেকে মানুষ করছে, সে ছেলে বড়ো হ'য়ে বাপকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে অল্প বাড়ীতে। সংসার চালানোর এই ত' সুখ! এই বয়সেই ও বুঝতে পেরেছে, জীবনের গতি ঠিক করে নিতে হবে ছোটবেলাতেই। কি ক'রে ঐতিক ক'রে নিতে হবে? বুঝিবে। আজ সারা দেশে যে এত অসাম্য, তার কারণ কি? অশিক্ষা আর কুশিক্ষা।

কোনোই শিক্ষা যে পেলো না, সে জানলো না, ভালো কি আর মন্দ কি। আর যে আসল শিক্ষা পেলো না, সে বাজে হয়ে গেল। বিশ-এ পাশ এক-এ পাশ করেও মানুষ কেন মানুষকে ঠকাচ্ছে? ঠকাচ্ছে এইজন্তে যে তার শিক্ষা ঈশ্বরবিহীন শিক্ষা। ওপরজা

একজন আর্চেন বিনি পাশপাশের বিচারে শাস্তি আর শাস্তি দেন, তাঁর অস্তিত্ব এখনকার শিক্ষা স্বীকার করে না। স্বীকার না করলেও কাজ হয়ে যায়।

এ আলোচনা শুধু বুড়াদের জন্তে নয়, ছোটদের জন্তেও। তাই অহল্যাবাসি ঘাটে ভাগবত-কথা শুনতে সে বসলো মন দিয়ে। কথক ঠাকুর বলছিলেন, পৃথিবীর সকলেই সুখ চায়। বাড়ী, টাকা, জমিজমা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাঁটি, আমোদ-প্রমোদ, সবই কিন্তু পাবার পর পুরোন হয়ে যায়। আর তাতে সুখ হয় না। তখন নতুন জিনিস খোঁজে।

যে সুখ কখনো ম্লান হয় না, সে সুখ পাওয়া যায় বিনি চির-আনন্দময়, তাঁকে পেল। তাঁকে কি করে পাওয়া যায়? ভালো কাজের মধ্য দিয়ে। ভক্তিতে।

চকলা লক্ষ্মী তাঁর বৃকে বাস করেন, তাই তাঁর নাম শ্রীনিবাস। শ্রীধর। সত্যভামা মনে করেছিলেন তাঁকে পেয়েছে, তাই ওজন করা হল দাঁড়িপাল্লায় তুলে। রাশি রাশি অলঙ্কার, স্বর্ণমুদ্রা আর মূল্যবান বস্ত্র এক দিকে। আর এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ। কিছুতেই সমান হয় না। শেষ পর্যন্ত একটি তুলসীপাতা চন্দন মাখিয়ে রাখা হল, শ্রীকৃষ্ণের পাল্লা হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেল।

ঋষিরা কার কথা বলেছে? বেদে, উপনিষদে, পুরাণে কার কথা? বেদেরও আগে যে মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা ছিল, অনেক উঁচু, তা কাদের? অনার্যদের। অনার্যদের মধ্যে পড়ে কারা? বাড়ালী, গুজরাটী, মারাঠী, মাল্ভাজী। আর্যদের আগেও তারা সভ্য ছিল। তাই এদের মধ্যে আহা-বিহারে এত মিল। পরে এলো আর্য। রাজপুত, শিখদের পূর্বপুরুষ। তান্ত্রিকপুত্র আর রাজা শশাঙ্ক অনার্যযুগের সভ্যতায় উজ্জ্বল। তন্ত্র আর কালী আর শিব নিয়ে বাড়ালী প্রথম উপাসনা শুরু করেছে।

তার পর পার্শ্বসারথি শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বাড়ালীর স্নেহপ্রবণ মন নড়ুগোপাল, গোপীজনের কেশীবদন আর রাধাকে নিজস্ব ক'রে নিয়েছে। কালীদমন কংসবধ পর্যন্ত তার। তার পর মথুরার রাজা যখন দ্বারকায় গেলেন—মীরাম্ম-গিরিধারী—ভজনের মধ্য দিয়ে বাড়ালী তাঁকে নিয়েছে, তীর্থযাত্রার নিয়েছে, কিন্তু রাস খুলন দোলযাত্রার শিখিপাথা মাথায় মদনমোহনের মতন নেয়নি।

সেই ভগবানের দিকে মন চালিয়ে দিতে হবে গঙ্গার স্রোতের মতন। বা কখনো ঝামে না।

কথকঠাকুরের এ-সব কথা ছোটদের বোঝবার নয়। বাবরা করতে লাগলো বাড়ী ঘাবার জন্তে। কীদতে লাগলো ক্ষিদে পেয়েছে বলে। মীরার বয়সী আরো কয়েকটি মেয়ে ছিলো। তারা শুনছিলো, বুঝুক না বুঝুক। বাড়ালী মেয়ে ছোটবেলা থেকেই ধর্মকথা শুনতে চায়। সিনেমার মতন এর আকর্ষণ না থাকুক, তবু এই সব কথা তাদের ভালো লাগে। ত্রুতকথার মতন। এপারে ঘাটে ঘাটে আলো জ্বলে উঠেছে, ওপার ঘন অন্ধকার। নদীতে নৌকা চলেছে। ঘাটের ওপর বাড়িতে সাতটা বাজছে। ওরা কথা শুনে যাচ্ছে। কথক বলে যাচ্ছে।

গঙ্গা সোজা সমুদ্রে যায়। যমুনা সোজা যায় না, সে গঙ্গার এসে পড়ে যমুনার শাখানদীরা, যমুনার হারকণ তাদের স্রোত পাঠায়। সেই সব পাহাড়ী নদীর বৃকে পাহাড়ী ঋণা বিবির ক'রে রয়ে পড়ে,

তারিও বলে, আমাদের জল সাগরে পৌঁছে দাও। উল্লী নদী বরাকরে পড়েছে, বরাকর দামোদরে, দামোদর গঙ্গায়, গঙ্গা সকলের জল সমুদ্রে পৌঁছে দিচ্ছে।

ভগবানের দিকে মন এর-ওর-তার মায়ফং পাঠালে হবে না, তোমাকে সোজা যেতে হবে। নিয়মে বাঁধা তাঁর রাজ্য। বিশ্বাস রাখলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বলেছেন ঝাঁরা, তাঁরা মহাপুরুষ। পরমহংসদেব মিথ্যে কথা বলার লোক নন, বুদ্ধদেব নন, খ্রীষ্টচৈতন্য নন, খ্রীষ্টাবিশ্ব নন। গীতাঞ্জলির গানগুলি মিথ্যে নয়। বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, গান্ধী বাজ্রে কথা বলতে আসেননি। রাজরাণী মীরা বুখাই রাজ্য ছেড়ে চলে যাননি।

বুদ্ধাবনের সনাতন গোশ্বামী সিন্ধুপুত্র, তিনি পাথরের গোপাল পূজা করেন। সেই গোপাল একদিন ব'লে বসুলেন পায়স খাব।

সনাতন বললেন, পায়স কি ক'রে দোব ঠাকুর? দুধ চাই, চিনি চাই, ভালো চাল চাই। মাধুকরী—মানে ভিক্ষে ক'রে এই কটা মোটা চাল পেয়েছি, তাই রেঁধে দিয়ে তোমায় ভোগ দিই। পায়সের বায়না আজ কোরা না। পায়স যদি খেতে চাও, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে।

ভাত চড়াবার আগেই কোন ধনী মিথে পাঠিয়ে দিলে পরমান্নের উপকরণ। এটা কি নিতান্তই গল্প?

তিনিই তাঁর ব্যবস্থা ক'রে নেন। তুমি যখন বলো, দেবোত্তর ক'রে গেলুম, ঠাকুরের নিত্যসেবা হবে, সে দেবোত্তর থাকে না। ঠাকুর অভুক্ত থাকেন। মন্দির ভেঙে যায়। কত ভাঙা শিবমন্দির সারা দেশ জুড়ে।

কথক বলে, ঠাকুর কি বিগ্রহের মধ্যে? না। বিশ্বাসে। ভক্তিতে। দুর্গামূর্তি ভাঙতে এলে মাথা ভেঙে দেবে, কিন্তু নিজে দেবে জলে বিসর্জন।

জগন্নাথের গোল গোল চোখে হুঁটো হাতে কি এমন রূপ ছিল যে চৈতন্যদেবের মতন মহাজ্ঞানী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন? তিনি যা দেখেছিলেন, সে চোখ কি আমাদের আছে? নীলাচল পার হ'য়ে নীল আকাশ পার হ'য়ে নীলসমুদ্র পার হ'য়ে কি মহাপ্রভুর জগন্নাথ গ্রহে গ্রহে ছড়িয়ে পড়েন নি? কথক ঠাকুরের প্রশ্ন।

রত্নবেদীর দেশের লোক মীরার চোখে জল। কাশী শহর জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে ফটা বাজতে থাকে। কথক ঠাকুর ব'লে চলে—আপনারা একটি ছুটি পয়সা কেউ দেন, কেউ দেন না। একজন ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার এর চেয়ে কম কথা খরচ করে অনেক বেশী রোজগার করে। তার জন্তে আমার দুঃখ নেই। ওপথে শাস্তি নেই। এপথে আছে, সেই আমার সাধনা। ব্রাহ্মণ নির্লোভ হবে। ব্রাহ্মণ দশ দিনে অশোচ পালন করে ব'লে আপনারা বলেন, নিজে সুবিধা দেখেছে, কিন্তু শাস্ত্রকাররা যে বিধান দিয়ে গেছেন সাধারণ লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের চতুর্গুণ করতে হবে ব্রাহ্মণকে, সে বিষয়ে কথা বলেন না কেন? যাক্, আমার কাজ আমাকে করে যেতেই হবে। এতরূপ ধরে এই লোকটা যে বকবক করলো—এত চৈতল্যে, তার ফলে সারা রাত হয়ত আমার ঘুমই হবে না, জেগে কাটাতে হবে তবু আসছে কাল বিকেল হলোই আবার আমার শ্রীমদভাগবত নিয়ে এখানে এসে বসতে হবে। কিনে আনছে হবে নিজের পয়সার ফুলের মালা গলায় পরবার জন্তে।

ইতিমধ্যে একজন ভাবের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেছলো। বস্করণ কথা চললো, তত্ত্বরূপ তার ভাব আর হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। যেই কথা খামলো অমনি সে উঠে বসলো। ধনস্তান্ধিতে তার ধৃতি সাঁট ছিঁড়ে গেছে, পকেটের পয়সা ছড়িয়ে পড়েছে। খুব জোরান লোকটা, কিন্তু ধর্মের স্মরণ কথা শুনলে তার মনটা কেমন অবণ হয়ে যায়, কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যায় কিটের মতন। কিন্তু অল্প কোনো সময়ে এমন হয় না। মীরা অবাঁক হয়ে যায়।

কথক ঠাকুর উঠতে সকলে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করলো—মেয়েপুরুষ সকলে। কিন্তু কেউ পয়সা দিলো না। মীরার নেই তাই। থাকলে সে দশ টাকা দিয়ে বসত। এত গরীব, কিন্তু মুখে কি স্মরণ হারি। কত শাস্তি এ'র মনে, মীরা ভাবে।

কথক ঠাকুর ব'লে চলে—God-less educations. ঈশ্বর-বিহীন শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের ক্ষতি করছে। বাচ্চাদের শেখাতে হবে—

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

রয়েছ নয়নে নয়নে।

জীবনে তোমারে খুঁজিয়া ঘিরেছি

রয়েছ জীবনে জীবনে।

তাদের শেখাতে হবে—

জীবে সেবা করে যেই জন,

সেই জন পুজিছে ঈশ্বর।

ঘুম থেকে উঠে তাদের গাইতে হবে—

বিমল প্রভাতে মিশি একো সাথে

বিশ্বনাথে করো প্রণাম।

উদিল কনক রবি রক্তিম রাগে,

বিহঙ্গ গাহে গান, আনন্দে জাগে,

তুমি মানব নব অম্বরাগে

পবিত্র নাম তাঁর করে যে গান।

বাঘা—জেলখাটা বাঘা। দেশ যখন স্বাধীন হয়নি, তখন তাদের ক' ভাইয়ের করনা ছিল, জননী জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচন করতে হবে। এক চিন্তা, এক ধ্যান।

ইংরেজ চলে যাবার আগে সে জেলে ছিল। নিতান্ত কিশোর তখন।

ইংরেজ চলে যাবার পর দেখলে দেশের যুবকদের সামনে আর কোনো লক্ষ্য নেই। আর কোনো দায় নেই। বুকের রক্ত দেবাব আর কোনো ব্রত নেই।

হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী সিনেমা, নানা হোটেলের নানাম রকম খাওয়া, নানা ধরনের নানা দামের জুতো-জামা, চুলের কায়দা, চশমার বাহার, খেলার খবর, পয়সা ওড়ানো,—এই হল যুবকদের চর্চা। মেয়েরাও বাদ গেল না। ইংরেজ চলে যাবার পর ইংরেজী শেখার আগ্রহ আর চেষ্টা ক'মে গেল, ইংরেজী গোবাক ইংরেজী কায়দার মান বাড়লো।

তরুণের সাহস, তরুণের শক্তি, তরুণের ত্যাগ, তরুণের বীরত্ব একেবারে মিলিয়ে গিয়ে রইলো শুধু ফাজলামি। তখন বাঘাদের দলের হাতে অনেক অস্ত্র, হাতবোমা থেকে রিভলবার পর্যন্ত। পড়তে লাগলো ইঞ্জিনিয়ারিং, করতে লাগলো ডাক্তারি—বড় লোকের টাকা

কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্তে—যেমন রত্নাথ বাবু ছিলো রূপডাকাত।

বাঙালীটোলার ও থাকে। কিন্তু দল ওদের মছেদারিতে—চৌক পার হ'য়ে বিশ্ববরগঞ্জ পার হ'য়ে রাজবাটের পথে মছেদারিতে।

ও বলে জীবনের মহিমা হল লড়াইয়ের মধ্যে। বিনিময়ের মধ্যে আরাম-কেন্দারায় শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে নয়। মাথার ওপর জৈষ্ঠের কড়া রোদ, আনাড়ের প্রবল বুড়ি ব'রে পড়ুক, বড় আগুক, তুফান উঠুক, ফিরব না, যখন যাত্রা হল সুরু।

অভাব না হ'লে যিনি অভাব পূরণ করেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। বিপদ না এলে যিনি বিপদমোচন, তাঁকে চেনা যায় না। দীন না হ'লে দীনবন্ধুকে বোঝা যায় না। হতভাগ্য যে, সে কখন অভাব হবে সেই হতভাগ্য কখনো আরাম করতে পারলো না, ঈশ্বরে বিশ্বাস আনতে পারলো না, মানুষের খোসামোদ ক'রে, অসাধু পথ ধ'রে অজ্ঞায় ক'রে শুধু টাকা রোজগারের প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে পাপের বোঝা দুঃখের বোঝাই বাড়ালো, মা নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, বন্ধু নয়, প্রতিবেশী নয়, আত্মীয় নয়, পর নয়—কারুর জন্তেই মাথা ঘামালো না—সে শুধু স্বপ্ন থেকে, আনন্দ থেকে, শাস্তি থেকে, তৃপ্তি থেকে দূর থেকে দূরে যেতে লাগলো। সে যেদিন পৃথিবী থেকে সরে গেল, কারুর কোনো ক্ষতি হল না। কেউ তাকে মনে রাখলো না। এই রকম লোকই হাজার হাজার কোটি কোটি। তাদের মধ্যেও রত্নাকাত মনে রাখবার মতন রত্নাথ বাবু, দুঃখীর দুঃখে যার মন কাঁদত, অত্যাচারীর অহঙ্কার যে চূর্ণ করার ক্ষমতা রাখত।

বাগার এই সব কথা মীরা শুণ্ড শুনত না, গিলত। তার মনে হত, সত্যি, কত জজ ব্যারিষ্টার রাজ্যপাল ফ্রোড়পতি ত এলো গেলো, কে বা তাদের গ্রাহ্য করলো? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আশানন্দ ঢেঁকি—যিনি ঢেঁকি দিয়ে ডাকাত মেরেছেন ব'লে সম্মানের উপাধি পেয়েছিলেন ঢেঁকি, তাঁর কথা শুণ্ড শাস্তিপুর গুপ্তিপাড়া কেন, সারা বাংলার লোক আজো মনে করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে। কবিরাজ বলেছেন আশানন্দকে আধপেটা খে খেতে, সকাল ন'টার মধ্যে—সন্দিভাব হয়েছে যখন। বিকেল ৩টের সময়ে ঐ পথে যেতে কবিরাজের নজরে পড়লো, একজন খে ভেজে ভেজে দিচ্ছে, আশানন্দ দুধে ফেসে যাচ্ছেন। কবিরাজ বললেন, এ কি মশাই, সকাল ন'টার যে খেতে বলে গেছি।

সকাল ন'টার ত বসেছি। কিন্তু আধপেটা যে কিছুতেই হচ্ছে না।

বাখা বলে, জানো মীরা, সব জানতে হবে, পৃথিবীতে যা জানবার আছে। বিজ্ঞানের যত কথা, দর্শনের যত কথা। পাশ ক'রে পণ্ডিত হয় না, অজ্ঞপ্র এই প'ড়ে আর জানে আর অভিজ্ঞতায়, মানুষ বড়ো পণ্ডিত হয়। তার প্রমাণ শবৎস্র। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। প্রমাণ ক্রীতদাস ঈশপ, যার গল্প কথামালা। বন্ধিমচন্দ্রের মতন বি-এ পাশ ত দেশভরা, কিন্তু বলে মাতব্ব কে বলতে পারলো? মাইকেলের মতন ব্যারিষ্টারের কি অভাব আছে? কিন্তু মেঘনাদবধ তারা শোনাতে পেরেছে? আমরা আদার ব্যাপারী। কিন্তু জাহাজের খবরেও আমাদের দরকার আছে। একটা জাহাজ তৈরী করতে কত ইম্পাত দরকার হয় জানো?

কত? মীরা বলে।

চার হাজার টন। সাতাশ মণে এক টন মনে রেখো। ঐ ইম্পাতে তিনশো মালগাড়ী হ'য়ে যায়। আট লক্ষ পেরেক গজাল আর খিল চাই। দোতলা বাড়ীর মতন উঁচু একটা জাহাজে পাঁচ ছ' মাইল লম্বা ইলেকট্রিক তার লাগে। মাল যা ধরে একটা জাহাজে, তা পাঁচশো মাল গাড়ীর মাল। যে কল চালায় জাহাজকে, তা রেলের ছ'টা ইঞ্জিনের সমান। যা তৈরী করতে হাজার হাজার শ্রমিক আর লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে, যার নৌবিভাগের কর্মচারী আমদানী করতে হয়, হুর্ভদ স্বাস্থ্য আর কঠিন পরীক্ষার পর—তা ধ্বংস হয়ে যায় একটি টর্পেডোর ঘায়ে—আশ্চর্য্য মনে হয় না? সেই টর্পেডো আসে ডুবোজাহাজ থেকে। সেই ডুবোজাহাজে জলের তলায় কোথায় আছে বস্ত্র ধরা পড়বে। মাথা ঘামিয়ে এত আবিষ্কার যখন ইংলণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, রাশিয়া জাপান করেছে, তখন আমরা ভালো ইংরেজী বলতে শিখে বেশী মাইনের কাজ করাকেই জীবনের সার ব'লে বুঝেছি, আর এখনো তা ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না, তাই আমার ভারতবর্ষ আজো অনেক অনেক পশ্চাতে। আড়াই হাজার মাইল লম্বা ভারতের উপকূল। তেরো শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে আমরা যে জাহাজ ছেড়েছি সে রকম জাহাজ ইংরেজও তখন তৈরী করতে পারেনি। আজকের তরুণরা দলে দলে সমুদ্র রক্ষায় যাচ্ছে না। ক্লাবে আড্ডা মারছে।

মীরা বলে, কি করা যাবে বাঘাদা? পথ তো খোলা নেই!

পথ খোলা থাকে না। পথ ক'রে নিতে হয়। ঋষিদের আজন্মে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যেত জীবনকে তৈরী করবার জন্তে। সেইখান থেকে শিখত আয়ুর্বেদ, লতাপাতার গুণাগুণ, মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ তৈরী। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যেত ধর্ম্মবিজ্ঞা শব্দবিজ্ঞা শিখতে গুরুর আশ্রমে। পথ তারা ক'রে নিয়েছিলো। সেদিন কাঠের জাহাজ তৈরী করে দেশে দেশে পাড়ি দিয়েছে, পাহাড়ে পাহাড়ে পথ করেছে, গুহার গুহার ছবি এঁকেছে, আকাশছোঁয়া মন্দির করেছে, সমুদ্র থেকে শাঁখ এনে তুলসীতলায় বাজিয়েছে, কাবুল থেকে জাকরণ এনে গোলাও বেঁধে খেয়েছে।

আর আজ? বাস-ট্রামের পা-দানীতে কোনো রকমে একটা পা চুকিয়ে দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে অকিস চলেছে। এক পা হাঁটতে পারে না। পাথের না দিয়ে পথ পার হবার বিত্তেটা বেশ শিখেছে। তাই না?

কচুরিগলির কচুরি, ঠাঠেরিবাঝারের বাগন, বিশ্বনাথের গলির মালাই, দশাশ্বমেধের গোল গোল ছাতা, সন্ধ্যার আরতি, মানুষের ভিড়—কান্ধী নিত্যানতুন। পাঁড়ে হাউলি, চুপি চোকি, মদনপুরা—পাড়ার নামগুলিও নতুন নতুন। ভূগোলহিতার গণনা, কালভৈরবের ডোর, বীরেশ্বরের দোরধরা, সন্ধ্যার পূজা—বৃদ্ধদের এখানে কত কাজ। বাড়ী ছেড়ে কান্ধীতে চলে আসা মানে সংসারই ত্যাগ করা। মণিকর্ণকায় শেষ কাজ হ'য়ে গেলে যেন নিশ্চিন্ত। কান্ধীবাস করতে এসেছে যে সব প্রবীণারা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার ভারী ভালো লাগে। ওরা বিশ্বনাথের পায়ে চলে এসেছে। ওদের আর মায়া নেই।



# আলোকচিত্র

... এ সন্দের প্রহুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি শ্বেতপ্রস্তর-মূর্তির আলোকচিত্র মন্দিত  
হয়েছে। মূর্তির নাম 'পুরুষ ও প্রকৃতি'। আলোকচিত্রটি  
কলক দত্ত গৃহীত।

সাজঘর

—বাসন্তী দোদ



গহীদ-স্মৃতি (পাটনা)

—অক্ষয় চক্রবর্তী





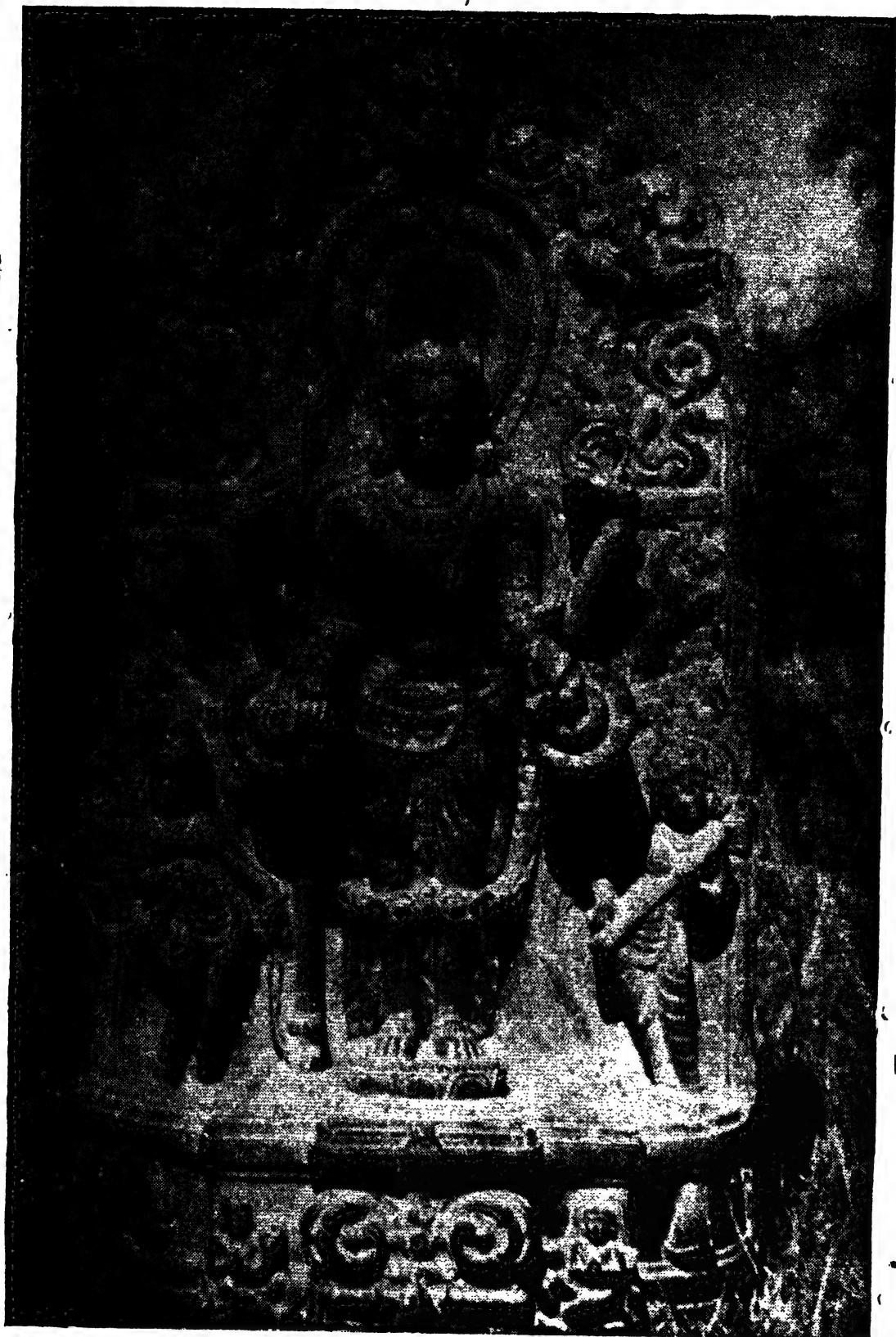
ব্যালান্স

—দেবপ্রিয় দে

দারুণ অগ্নিবাহণে

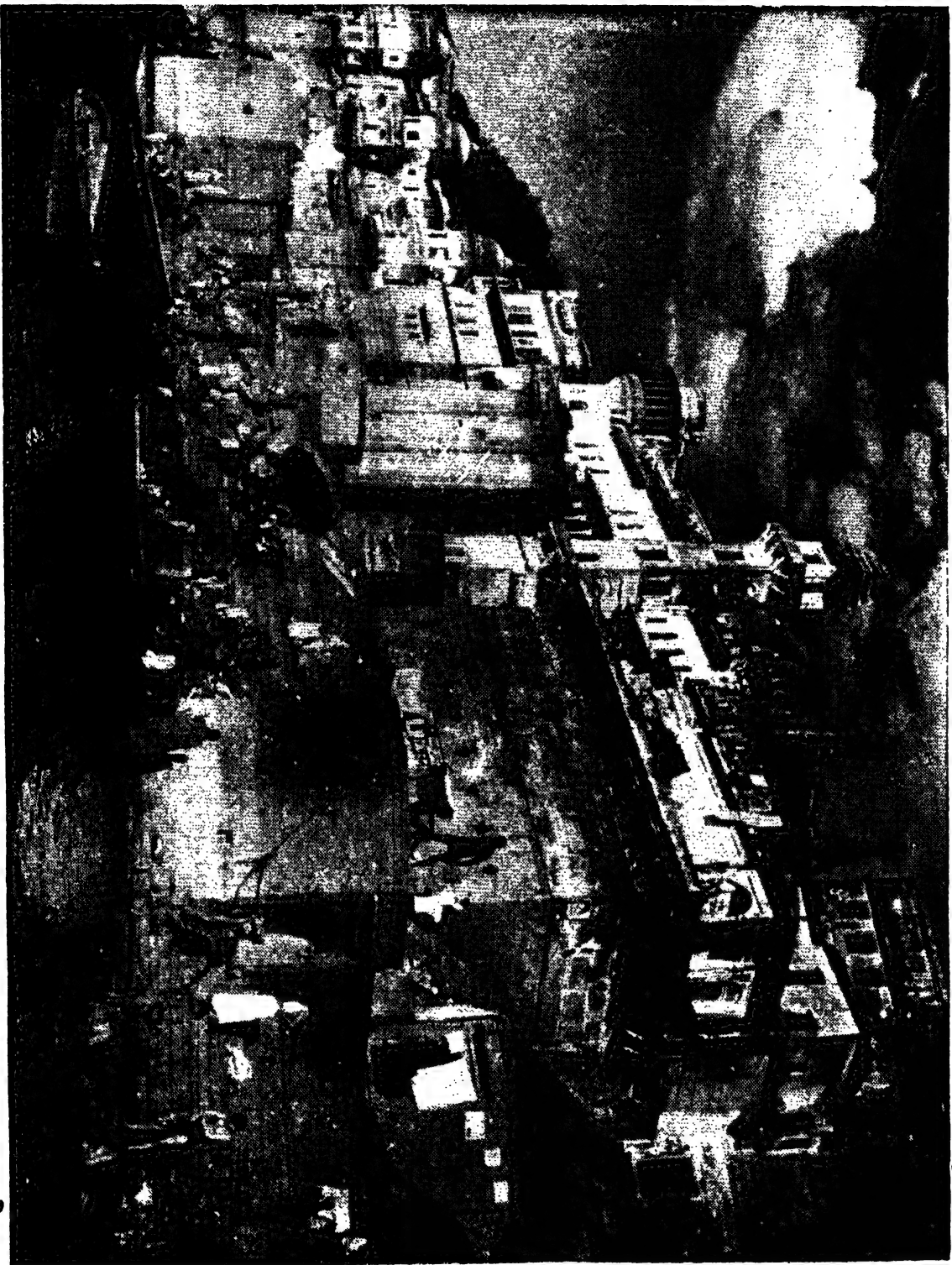
—সুকমল ভট্টাচার্য





শ্রীবিষ্ণুমূর্তি (গৌড়, মালদহ)

—মানব দত্ত



কলীর ঘাট

বাংলা দেশের, মহারাষ্ট্রের, মাদ্রাজের, গুজরাটের কোন দূর দূর গ্রাম থেকে বিষবারা কবে এখানে চলে এসেছে, কাকুর ঢাকা আসে, কাকুর আসে না, কাকুর ছেলে পাঠায়, কাকুর পাঠায় না, অল্পপূর্ণার রাজত্বের অভাব কাকুরই হয় না। শিবের ত্রিশূলের ওপর যে বারাগসী, তা হাজার হাজার বছর ধরে পুণ্যলোভী মানুষের মনে শেষ শান্তি বিলিয়ে এসেছে।

কিন্তু মীরা এখানে থাকতে আসেনি। সমুদ্রকূলে তার জন্ম, সমুদ্রতীরে সে মাহুয়, সমুদ্রের মতনই চঞ্চল। অনেক দিন এক জায়গায় থাকবার মেয়ে সে নয়।

কীথির পিসিমাকে বললে, দিদা, এবার কোথায় যাবেন?

তুই কি ফিরে যাবি তাদের কাছে? যারা আর তোকে চায় না, শুধু মুখ ঘুটে সে কথা বলতে পারছে না?

আমার লরেটোর পড়া যে শেষ হয়নি। সেটা কি ওরা শেষ করতে দেবে না? যদি ওরা আমার চলে যেতেই বলে, তাহলে আমি বলব, আমার খুন্সের পড়াটা শেষ করতে দাও। মাঝপথে আমি যে অগাধ জলে পড়ে যাব। একথা আমার শুনবে না, এত নিষ্ঠুর কি ওরা হবে?

পিসিমা বলেন, কি জানি বাবু! ওদের মন ওরাই জানে!

মীরা বলে, জানেন দিদা, আপনার সঙ্গে কাশীতে এসে বাঘাদাঁকে দেখে আমার এই লাভ হল যে, গরীব হ'য়ে যাবার ভয় আর রইলো না, কথায় যে বলে, জীবনের রণক্ষেত্রে তার দেখা পেলাম। আমি এবার লড়াই করব। আমি ভয় আর করব না। ভয় মান'ই পাপ, এখন বুঝছি। [ক্রমশঃ]

## জলকন্যা

### হাজ ফ্রিশিয়ান হ্যাণ্ডারসন

বিশাল বড়ো সমুদ্রের মধ্যে অনেক, অনেক দূরে—জল যেখানে অপরাধিতার মতো নীল আর ফটিকের মতো স্বচ্ছ, যেখানটা এতোই গভীর যে, হাজারটি গেটের উঁচু গম্বুজ পর পর সাজালেও উপর থেকে একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে,—সেখানে সাগর-রাজার দেশ।

তোমরা বুঝি ভেবেছিলে, জলের নিচে বালি ছাড়া কিছু নেই? তা নয়, মোটেই তা নয়। অপরূপ সুন্দর সেখানকার গাছপালা, এতো হালকা তার ডালপালা যে, জল একটু কেঁপে উঠলে কি তার নেচে উঠলো খিরখিরিয়ে—আচমকা দেখলে তাদের জীবন্তই মনে হয়। ডালের কীক দিয়ে দিয়ে কতো রকমের ছোটো-বড়ো মাছ ছুটোছুটি করে বেড়ায়—ঠিক যেমন আমাদের গাছে গাছে ওড়ে পাখির ব্যাক।

জল যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানে সাগর-রাজার প্রাসাদ। দেয়ালগুলো তার প্রবালের, উঁচু জানলাগুলো পাল্লা-বসানো, আর শম্ভের কাজ করা ডেউ খেলানো ছাঁচ, ডেউয়ের দোলায় দোলায় এই খুলে, এই বুজছে। কী যে সুন্দর লাগে দেখতে, প্রতিটি শম্ভের বৃকে রকমকে উজ্জ্বল একটি মুকুট, তার যে কোনো একটি পেলে ওপরকার দেশের যে কোনো রাজা ধস্ত হ'য়ে যাব!

সাগর-রাজার স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন; তাঁর বৃড়ি মা বয়সসার দেখেন। এই বৃড়ির বুদ্ধিভক্তি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু

সাগর-সমাজে তাঁরই যে সবচেয়ে বড়ো ঘর, এ নিয়ে বেজায় দেমাক তাঁর। তাঁর লেজের কি না বারোটা ঝিলুক বসানো, সেইটেই বড়ো ঘরের মার্কা—অন্যদের বড়ো জোর ছুঁটা। এ ছাড়া তাঁর আর সবই ভালো, সবার মুখেই তাঁর সখ্যাতি। রাজার ছয় মেয়ে, ছ'টি ফুটফুটে ছোটো রাজকন্যা; বৃড়ি তাঁর নাতনীদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। সবাই তারা সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর হ'লো একেবারে ছোটোটি। তার গায়ের রঙ গোলাপের পাণ্ডির মতো নরম, সমুদ্রের মতোই নীল তার চোখ; অবশিষ্ট অঙ্গ সব জলকন্যার মতো তারও পা নেই, পায়ের দিকটায় মাছের মতো লম্বা ল্যাজ—তা কী কোমল আর কতো উজ্জ্বল!

সমস্ত দিন মেয়েরা প্রাসাদের বড়ো বড়ো ঘরে খেলা করে; সেখানে চার দিকের দেয়ালে ফোটে নানা রঙের হরেক রকম সুন্দর ফুল। পাল্লার জানালাগুলি একটু খুলেলে কি মাছেরা সাঁতরে এলো ঘরে, যেমন আমাদের জানলা দিয়ে চড়ুই পাখি উড়ে আসে। কিন্তু মাছদের সাহস চড়ুইপাখির চেয়ে অনেক বেশি; তারা সোজা রাজকন্যার কাছে এসে গা ঘেঁষে খেলা করে, গায় তাদের হাত থেকে, আদর করলে আর যেতেই চায় না, গায়ের সঙ্গে লেগে ঘুরে বেড়ায়।

প্রাসাদের সুস্থখে মস্ত বাগান ভ'রে গাছের সারি, কোনোটো আঙনের মতো লাল, কোনোটো মেঘের মতো গাঢ়-নীল; গাছের ফল সোনালি রঙে ঝলোমলো; জলজলে সূর্যের মতো উজ্জ্বল গাছের ফুল। আমাদের বাগান হয় মাটিতে; ওদের বাগান বালিতে, উজ্জ্বল নীল রঙের বালি, গন্ধক-জ্বালা আঙনের মতো নীল। সমস্তটার উপর অদ্ভুত সুন্দর একটা নীল রঙের ছোপ; সেখানে গেলে মনে হবে যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছি, আকাশ মাথার উপরে, আকাশ পায়ের নিচে—সমুদ্রের তলায় যে আছি তা মনেই হবে না। জল যখন শান্ত, তখন সূর্য তাকিয়ে থাকে যেন বেগুনি রঙের একটা প্রকাণ্ড ফুল; তার ভরা পেয়লা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন উপচে পড়ছে।

বাগানের একেক অংশ একেক রাজকন্যার দখলে; সেখানে তারা যার যা খুশি করে। এক জন তার বাগান সাজিয়েছে তিমির চেহারা করে; আরেক জনেরটা ঠিক জলকন্যার মতো; কিন্তু সবচেয়ে ছোটো কন্যার যেটা সেটা একেবারে সূর্যের মতো গোল; আর সূর্যটা তার চোখে কি না লাল দেখাতো—সেই জন্তে তার ফুলগুলোও সব টকটকে লাল রঙের; এই মেয়েটি কিছুটা অদ্ভুত গোছের, ভারি চুপচাপ, একা বসে বসে কী যেন ভাবে। হয়তো এক দিন উপরে এক জাহাজ ডুবেছে; তাঁর নানারকম রঙচঙে সুন্দর জিনিস নিয়ে যেতেছে তার বোনেরা; কিন্তু শিশু-কোলে-করা খেত পাথরের একটি বালকমূর্তি ছাড়া এই মেয়ে আর কিছু চায় না। মূর্তিটি নিয়ে সে তার বাগানে রাখলো; রোপণ করলে তার পাশে একটি লাল ফুলের গাছ। গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলো, তার লম্বা ডাল ঘুরে পড়লো মাটির উপর—সেখানে চির-চঞ্চল বেগুনি রঙের ছায়ার যেন ডালে মূলে জড়াজড়ি।

এই জলকন্যা সবচেয়ে ভালোবাসতো মাহুয়দের কথা শুনতে, সমুদ্রের উপরে বাদের দেশ। ঠাকুমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব গল্প শুনতো সে; জাহাজের আর মাহুয়ের আর ডাডার প্রাণীর যতো গল্প তিনি জানতেন সব। ওখানকার ফুলে নাকি গন্ধ আছে,



কী ভালো লাগতো তার একথা শুনে, তাদের সমুদ্রের ফুলগুলো তো সব গন্ধহীন, ওখানকার বনের রঙ সবুজ, আর তার ডালপালার মাছ যতো ছুটে ছুটে বেড়ায়, সব নানা রঙের, আর কী মিষ্টি গলায় গান করে তারা ! ঠাকুরা মনে অবশিষ্ট ছিলো পাখিদের কথা, কিন্তু বলবার সময় মাছই বলেছিলেন : নাতনীরা তো আর কখনো পাখি ডাখেনি, বললে কি কিছু বুঝতো তারা ?

গল্প শেষ ক'রে ঠাকুরা বলতেন : তোমাদের যখন পনেরো বছর বয়েস হবে তখন তোমরা উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে ; পাহাড়ের কাঁকে ব'সে চাঁদের আলোয়, দেখবে জাহাজ যাচ্ছে, বুঝবে কাঁকে বলে শহর, আর কাঁকে বলে মানুষ ।

পরের বছর সবচেয়ে বড়োটির বয়েস পনেরো বছর হ'লো । অল্প সব বোনেরা—আহা বোচরীরা ! মেজোটি বড়োটির এক বছরের ছোটো, সেজোটি মেজোর ছোটো এক বছরের ; এমন ক'রে-ক'বে সবচেয়ে ছোটোটির কপালে আরো পাঁচ-পাঁচ বছর ব'সে থাকি ! পাঁচ বছর পরে আসবে সেই শুভদিন, সে-ও উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে, দেখতে পারবে উপরকার পৃথিবীর সব কাণ্ড । যা-ই হোক, বড়োটির যখন বাবার সময় হ'লো, সে কথা দিলে, ফিরে এসে বোনেরদের কাছে সব গল্প বলবে ; বড়ো ঠাকুরা বিশেষ কিছু বলতেই পারেন না, আর তারা যে কতো জানতে চায় তার তো কোনো ইয়ত্তাই নেই !

কিন্তু ছেলেবয়েসের এই বাধা থেকে ছাড়া পাবার আগ্রহ সবচেয়ে ছোটোটির মতো আর কাকরই তেমন তীব্র ছিলো না । সবচেয়ে বেশি দেরি তারই—আর চূপচাপ একা ব'সে কী ভাবে সে ! কতো রাত খোলা-জানলা দিয়ে স্বচ্ছ নীল জলের দিকে সে তাকিয়ে থেকেছে, চার দিকে মাছেরা ছুটোছুটি ক'রে খেলা করছে ; দেখেছে সে সূর্য আর চাঁদ, জানে তারার আলো, উপরে কেমন দেখায়, তার চেয়ে হয়তো অনেকটা বড়ো, অনেকটা উজ্জ্বল । যদি হঠাৎ কালোছায়া পড়েছে—একটা ভিঁমি বুঝি, না কি মানুষের বোঝাই একটা জাহাজ ভেসে চ'লে গেলো । সে-সব মানুষ স্বপ্নেও ভাবলে না যে তাদের অনেক, অনেক নিচে ছোটো এক জলকন্ডা জাহাজের হালের দিকে ব্যাকুল আগ্রহ দিয়েছে লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে ।

তার পর সেই দিন এলো, যার কথা বলছিলুম, বড়ো মেয়েটির বয়েস হ'লো পনেরো, উঠলো সে সমুদ্রের উপরে ।

৬:, ফিরে এসে তার সে কী হাজার গল্প । সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার চাঁদের আলোর বালির উপর ব'সে মস্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, সেখানে তারার মতো বিকমিক কতো আলো আর কতো গান-বাজনা । দূর থেকে সে শুনেছে মানুষের আর গাড়ির আওয়াজ, দেখেছে গির্জার উঁচু গম্বুজ, শুনেছে ঘণ্টার শব্দ, আর ওখানে যেতে পারবে না ব'লেই ও-সব জিনিষের জন্তে তার আরো বেশি মন-কেমন করছে ।

এ-সব গল্প শুনতে শুনতে ছোটোটির নিশ্বাস পড়ে না । এর পর রাত্রে তার খোলা জানলার যখন সে দাঁড়ায়, জলের ভিতর দিয়ে উপরে তাকিয়ে সে সেই বিরাট শব্দময় শহরের কথা ভাবতে ভাবতে এমন ভয় হয় যার যে, তার মনে হয়, সে বুঝি গির্জার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ।

পরের বছর দ্বিতীয় বোনটি গেলো ছাড়া । সে যখন ভেসে

উঠলো সমুদ্রের উপর, সূর্য তখন অস্ত বায়-বায়, আর তা দেখে এতো ভালো লাগলো তার যে, সে ফিরে এসে বললে, জলের ওপরে থাকিছু তার চোখে পড়েছে, এতো সুন্দর আর কিছুই নয় ।

—সমস্ত আকাশ একেবারে সোনার সোনা, সে ফিরে এসে বললে ।—আর মেঘগুলো কী যে সুন্দর তা আমি ব'লে দেখাতে পারবো না—এই লাল, এই বেগুনি, এই কাজল-কালো, ভেসে মিলিয়ে গেলো আমার মাথার উপর দিয়ে । কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি উড়ে এলো জলের উপর দিয়ে এক-ঝাঁক রূপোলি রাজহাঁস, ঠিক যেখানে সূর্য নেমে এসেছে । আমি তাকিয়ে রইলুম তাদের দিকে, সূর্য অস্ত গেলো ; সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আর মেঘের ধারে-ধারে যে গোলাপি আভা, তা-ও গেলো আস্তে-আস্তে মিলিয়ে ।

তৃতীয় বোনের ওপরে যাবার সময় হ'লো । সব চেয়ে বেশি সাহস তারই, সে চললো এক নদীর শ্রোত ধরে । নদীর দু-ধারে ছোটো-ছোটো সবুজ পাহাড় ; সেখানে গাছ-পালা, সেখানে আঁড়ুর-ক্ষেত, কাঁকে-কাঁকে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ । সে শুনলো পাখির গান ; আর সূর্যের তাপে তার মুখ প্রায় পুড়ে যাবার মতো হ'লো, থেকে-থেকে তাই সে জলে ডুব দিয়ে নিলে । এক জায়গায় একদল ছেলেমেয়ে লাফালাফি ক'রে স্নান করছে ; তার খুব ইচ্ছে হ'লো ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলে, কিন্তু ওরা তাকে দেখেই ছুটে পালালো বিহম ভয় পেয়ে, আর ছোটো কালো একটা জানোয়ার তাকে দেখে এমন যেউ-যেউ করতে লাগলো যে অগত্যা সে-ও ভয় পেয়ে ফিরে এলো সমুদ্রে । তবু সে ভুলতে পারে না সেই সবুজ বন, আর ঘন-নীল পাহাড় ; আর ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলোই বা কী, পাখনা নেই, তবু কেমন নির্ভয়ে নদীতে সাঁতার বেড়ায় !

চতুর্থ বোনটির অতো সাহস হ'লো না, সে খোলা সমুদ্রেই রইলো, ফিরে এসে বললে, অতো সুন্দর আর কিছুই হ'তে পারে না শালা পাল-তোলা জাহাজ দূর দিয়ে ভেসে গেছে, এতো দূরে সে মনে হচ্ছে যেন একঝাঁক গাড়িচলি ; জলে খেলা করছে ফুঁতবা-শুস্তকের দল ; বিরাট ভিঁমি এক নিশ্বাসে হাজারটা ফোঁস ফুলে দিয়েছে আকাশে ।

পরের বছর পঞ্চম বোনটির পনেরো বছর হ'লো । তার জন্মদিন পড়লো শীতকালে ; সমুদ্রের তখন সবুজ রঙ, প্রকাণ্ড সব বরফের পাহাড় জলে ভাসছে । সে বললে, সেগুলো যুক্তোর মতো শালা দেখতে—অবশিষ্ট মানুষের দেশের গির্জাগুলোর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো । এদই এক পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে সে বাতাসে তার চুল দিলে খুলে, জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পাল তুলে দিয়ে যতো শীগগির পারলো ছুটে পালালো ।

সন্ধ্যাবেলার সমস্ত আকাশটা পালে-পালে ভ'রে গেলো ; বরফের বিরাট পাহাড়গুলো এই উঠছে, এই ডুবছে, নীল-লালচে একটা আভার উঠছে বিকমিকিয়ে ; আর মেঘ হিঁড়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো, গুমগুম ক'রে গড়িয়ে চললো বাজের আওয়াজ ; আর তক্ষুণি নামানো হ'লো সব জাহাজের পাল, সবাই সেখানে ভেঙে জড়োসড়ো ; শুধু রাজকন্ডা চূপচাপ ব'সে শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকলো বাঁকানো বিদ্যুতের দিকে ।

এরা সকলেই প্রথম বার উঠে নানা রকম নতুন সুন্দর জিনিষ

সেখো গেলো মুহূর্ত হ'য়ে, কিন্তু সেনতুনের মোহ শীগগিরই কেটে গেলো, কিছু দিনের মধ্যেই উপরের পৃথিবীর চাইতে নিজের বাড়িই তাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করলো : আর কোথাও কি সব-কিছু এমন মনের মতো পাওয়া যায় ?

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ বোন হাতে হাত রেখে গভীর জল থেকে উঠে আসতো। অপরাপ তাদের কণ্ঠস্বর, এমন কোনো মানুষের হয় না। ঝড়ের আগে-আগে জাহাজের সামনে দিয়ে তারা যেতো গাঁওয়ে—গান গাইতো মধুর স্বরে। সে গান যেন বলতো,—জলের নিচে আমাদের কী যে আনন্দ তা কি দেখবে না ? ওগো নাবিক, ভয় ক'রো না ; এসো, নিচে নেমে এসো আমাদের কাছে।

নাবিকরা অবশ্য সে-কথা বুঝতে পারতো না ; তারা ভাবতো, ঐশ্বর্য 'বুঝি শুধু জলের শিব ; এমনি ক'রে তারা সমুদ্রের লুকোনো ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আসতো : কেন-না, জাহাজ ডুবলে সবাই তো মরবে, মার মৃত মানুষ ছাড়া সাগর-রাজের প্রাসাদে কেউ কখনো ঢোকেনি।

পাঁচ বোন যখন সন্ধ্যাবেলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে, ছোটোটি ব'সে মাছে তার বাবার প্রাসাদে, একা শুকু হ'য়ে মুখ উঁচু ক'রে তাকিয়ে। দাঁদতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু জলকক্কা তা কঁাদতে পারে না ! সেই জন্তে যখন তাদের মন-খারাপ হয়, মানুষের মেয়েদের চাইতে ততো বেশি যে কষ্ট পায় তারা, তার অন্ত নেই !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবে,—কবে হবে আমার পনেরো বছর ! আমি ঠিক জানি, উপরের পৃথিবী আর সেখানকার মানুষদের নালো খুবই লাগবে আমার। শেষ পর্যন্ত এতো আশার সেই ময় এলো।

ঠাকু'মা বললেন, নে, এবার তোর পালা। আর, তাকে তার বোনদের মতো ক'রে সাজিয়ে দিই,—ব'লে তিনি তার চুলে ডালেন শাদা শাপলার মালা, আধখানা মুক্তো দিয়ে তৈরি তার এককটা পাপড়ি ; তার পর আটটা বড়ো-বড়ো ঝিল্লুককে হুকুম বলেন তার ল্যাজের সঙ্গে লাগতে—তাতে বোঝা বাবে সে কতো ডো ঘরের মেয়ে।

বড়ো অনুবিধে লাগে এতে,—ছোটো রাজকক্কা আপত্তি করলে। সুন্দর দেখাতে হ'লে এক-আধটু অনুবিধে গারে না মাথলে না,—হেসে বললেন ঠাকু'মা।

এতো জাঁক-জমক কিন্তু রাজকক্কার মোটেই পছন্দ হ'লো না ; খার তারি মুকুটটা বদলে তার বাগানের লাল ফুল পরতে পারলে। খুশি হ'তো, তাতে তাকে মানাতোও ঢের ভালো। কিন্তু সে তস পেলো না ; ঠাকু'মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের উপর এসে উঠলো সে, ফেনার মতো পাতলা।

যখন জলের উপর জীবনে প্রথম সে দেখা দিলে, সুখী ঠিক পশ্চিমে নেমে গেছে। মেঘেরা ঝলছে লাল-সোনালি আলোর, কান্টারা ফুটেছে আকাশের পশ্চিমে, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, তার সমুদ্রটা মস্ত একটা আয়নার মতো নিশ্চল প'ড়ে। ভিনটে গুলওয়াল এক জাহাজ ঠাণ্ডা জলের উপর চূপ ক'রে শুয়ে ; একটি লাল শুধু তুলে দেওয়া, সেটাও কিন্তু নড়ছে না, হাওয়ার বেশি জোর ই। নাবিকেরা সিঁড়িতে চূপচাপ ব'সে। ডেক থেকে আসছে ন-বাজনার শব্দ। তার পর অন্ধকার হ'লো, হঠাৎ একসঙ্গে জারটি আলো জ্বলে উঠলো জাহাজে, উড়লো অগুস্তি নিশেন।

ছোটো জলকক্কা কাপ্তেনের ঘরের কাছে গেলো সাঁতরে। জাহাজটা জলের দোলানির সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে ওঠা-নামা করছে ; এক বার সে উঁকি মেয়ে কাচের জানলা দিয়ে তাকালো। ভিতরে অনেক জমকালো পোশাক-পরা মানুষ ; তাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র। খুব অল্প বয়েস তার, বড়ো জোর বোল-সতেরো ; বড়ো-বড়ো কালো তার চোখ। তারই জন্মদিনের উৎসব আজ। নাবিকেরা ডেকের উপর নাচছে, আর রাজপুত্র তাদের সামনে বেরিয়ে আসতেই একশো হাউই লাফিয়ে উঠলো আকাশে, রাত হ'য়ে গেলো দিন। জলকক্কা তাতে এতোই ভয় পেলে যে খানিকক্ষণ সে চূপ ক'রে রইলো জলে ডুবে।

আবার যখন সে তার ছোটো মাথাটি তুললো, তার মনে হ'লো যেন আকাশের সব তারা তার গায়ের উপর ঝ'রে পড়ছে। এমন অগ্নিবর্ণ আর কখনো সে দেখে নি ; সে কখনো শোনেও নি এমন আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের আছে ! তাকে ঘিরে ঘুরছে যেন বড়ো-বড়ো সুখী, হাওয়ায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে জলজলে মাছ, আর সমুদ্রের শান্ত জলে পড়ছে তার পরিষ্কার ছায়া। জাহাজে এতো আলো যে সব স্পষ্ট দেখা যায়। কী সুখী এই রাজপুত্র, কী সুখী ! সে নাবিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলো, একটু হাসি-ঠাট্টা করলো তাদের সঙ্গে, এদিকে গানের মধুর স্বরগুলো রাজির নীরবতার গেলো মিলিয়ে।

রাত বাড়লো ; কিন্তু এই জাহাজ আর এই সুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। ডেউয়ের দোলা-লাগা কেবিনের ফুটো দিয়ে সে তাকিয়েই রইলো। নিচে জল ফেনিয়ে উঠছে, জাহাজ বুঝি ছাড়লো। ঐ তো তুলে দিয়েছে পাল, উঁচু হ'য়ে উঠছে ডেউ, হাতির শুঁড়ের মতো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো, দূর থেকে শোনা গেলো বাজের আওয়াজ।

নাবিকেরা বেই দেখতে পেলে ঝড় আসছে, অমনি তারা আবার নামিয়ে দিলে পাল। ঝড়ের সমুদ্রে মস্ত জাহাজটা হাঙ্কা এতোটুকু নৌকোর মতো হুলছিলো ; ডেউগুলো অসম্ভব উঁচু হ'য়ে উঠে জাহাজের উপর দিয়ে গেলো গড়িয়ে—একবার সে নিচে ডুবে যায়, এক বার সে মাথা তুলে ওঠে।

এ-সব ব্যাপারে জলকক্কার অবশ্য খুবই মজা লাগলো, কিন্তু নাবিকদের সবাই একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো। জাহাজ গেলো ফেটে, মোটা মান্ডলগুলো ডেউয়ের দাপটে পড়লো ঘুরে, জোরে জল চুকতে লাগলো। জাহাজ একটুখানি এদিক-ওদিক হুললো, তার পর বড়ো মান্ডলটা বাঁশের কক্ষির মতো গেলো ভেঙে ; জাহাজ উল্টিয়ে গিয়ে জলে ভ'রে উঠলো। জলকক্কা এতক্ষণে নাবিকদের বিপদ বুঝতে পারলে ; কেন না, ভাঙা জাহাজের মোটা মোটা কাঠ ডেউয়ে ডেউয়ে ভেসে পাছে তার গায়েই লাগে, সেই জন্ত তাকেও সাবধান হ'তে হ'লো।

কিন্তু ঠিক তখন একেবারে ঝুলকালো অন্ধকার হ'য়ে এলো, চোখে আর কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই ভয়ঙ্কর এক বিদ্যুতের চমকে সে সমস্তটা ভাঙা জাহাজ দেখতে পেলো। জাহাজ যেই তলিয়ে গেলো জলের নিচে, তার চোখ খুঁজলো রাজপুত্রকে। প্রথমটা সে খুঁশিই হ'লো : ভাবলো, এখন তো সে আমার বাড়িতেই আসবে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়লো যে, জলের নিচে তো মানুষ বাঁচে

না ; কাজে কাজেই রাজপুত্র যদি বা কথাত্তা তার প্রাসাদে ঢোকে, চুকবে যত মাছুব হ'য়েই।

না-নু-না, রাজপুত্র মরবে না, মরবে না। নিজের বিপদের কথা ভুলে ভাড়াচোরা টুকরোর ভিতর দিয়ে সে সাঁতরে গেলো, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলো রাজপুত্রকে। সে একেবারে তখন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, অতি কষ্টে জলের উপর রেখেছে মাথা তুলে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে চোখ বুজেছিলো—নিশ্চয়ই ডুবে মরতো, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে জলকক্কা এসে তাকে বাঁচাতো। সে তাকে দু'হাতে জলের উপর তুলে ধরলো, স্রোতে ভেসে চললো দু'জনে।

সকালের দিকে থামলো ঝড়, ঠাণ্ডা হ'লো সমুদ্র, কিন্তু জাহাজটার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না। সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য উঠলো আংনের মত, তার আলোর রাজপুত্রের গালের আভা ফিরে এলো যেন। কিন্তু চোখ তার তখনো বোজা। রাজকক্কা তার উঁচু কপালে চুমু খেলো, মুখ থেকে সরিয়ে দিলে ভিজে চুল। সে যেন তার বাগানের খেতপাথরের মূর্তির মতোই দেখতে। সে আরেক বার চুমু খেয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলে, রাজপুত্র যেন শীগগির ভালো হ'য়ে ওঠে।

তার পর তার চোখে পড়লো শুকনো ডাঙা, পাহাড়গুলো বরফে চিকমিকিয়ে উঠেছে। পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে চলেছে সবুজ বন আর বনে ঢোকবার মুখে একটা মঠ কি গির্জা—কী যে, ঠিক বোঝা গেলো না। ঢোকবার পথটির দু'ধারে সারি সারি খেজুর, পাশের বাগানে লেবু গাছের ভিড়। এখানে ছোটো একটি উপসাগর, জল গভীর হ'লেও শান্ত, পাহাড়ের শুকনো শক্ত বালি। এখানে ভেসে এসে লাগলো জলকক্কা মরো-মরো রাজপুত্রকে নিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে তাকে শোরালো গরম বালুতে, সূর্যের দিকে ফেরালো তার মুখ।

গির্জায় ঘণ্টা বাজলো ঢং-ঢং ক'রে, একদল মেয়ে বাগানে এলো বেড়াতে। জলকক্কা তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে কতকগুলো পাথরের পেছনে লুকোলো, ফেনায় ঢাকলো মাথা, তাতে তার ছোটো মুখটি আর কেউ দেখতেই পেলো না। কিন্তু আড়ালে থেকে সে চোখ রাখলো রাজপুত্রেরই উপর।

একটু পরেই এক জন মেয়ে এগিয়ে এলো। রাজপুত্রকে দেখে সে যেন ভয় পেয়েই গেলো, সে মনে করলে ও মরে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছুটে গিয়ে তার বোনদের ডেকে আনলে। জলকক্কা দেখলে, রাজপুত্র তাজা হ'য়ে উঠেছে, মেয়েরা সব তার মুখের উপর মুখ নিচু ক'রে হাসছে। কিন্তু রাজপুত্র চোখ মেলে অবস্থি তাকে খুঁজলো না ; সে তো আর জানে না, কে তাকে বাঁচিয়েছে। আর তাকে যখন গির্জার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো, এতো মন-খারাপ লাগলো জলকক্কার যে, সে তফুশি বুগ করে জলে ডুব দিয়ে ফিরে গেলো তার বাবার প্রাসাদে।

ফিরে এসে সে যেন আগের চেয়েও বেশি শান্ত, বেশি চুপচাপ হ'য়ে গেলো। বোনরা জিজ্ঞেস করলে, সে ওপরের পৃথিবীতে কী-কী দেখে এলো, কোনো জবাব দিলে না সে।

যেখানে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিলো, সেখানে কতো সন্ধ্যায় সে গিয়ে উঠতো। সে দেখতো, পাহাড়ের বরফ গলছে, বাগানে পেকে উঠেছে ফল ; কিন্তু রাজপুত্রকে কখনো দেখতো না, স্নান মুখে ফিরে যেতো সমুদ্রের তলায়। বাগানে বসে রাজপুত্রের মতো দেখতে সেই পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ে উঠলো তার একমাত্র আনন্দ। ফুলগুলোর জন্তে তার আর মমতা নেই ; বিপুল প্রচুরতায় বেড়ে উঠে তারা সিঁড়িগুলো ছেয়ে ফেললো, তাদের লম্বা লম্বা পাতাগুলো গাছের ডালে ডালে এমন করে জড়িয়ে ফেললে যে, সমস্ত বাগান যেন একটি কুঞ্জবন হ'য়ে গেলো।

তার পর সে তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারলে না। গোপনে কথটা বললে এক বোনকে, সে বললে অস্ত্র বোনেদের, তারা বললে তাদের কোনো কোনো বন্ধুকে। তাদের মধ্যে এক জলকক্কা রাজপুত্রের কথা শুনেই বুঝতে পারলে : জাহাজের উত্থব সে দেখেছিলো নিজের চোখে ; রাজপুত্র কোন্ দেশের, কে সেখানকার রাজা, সব জ্ঞান ছিলো তার।

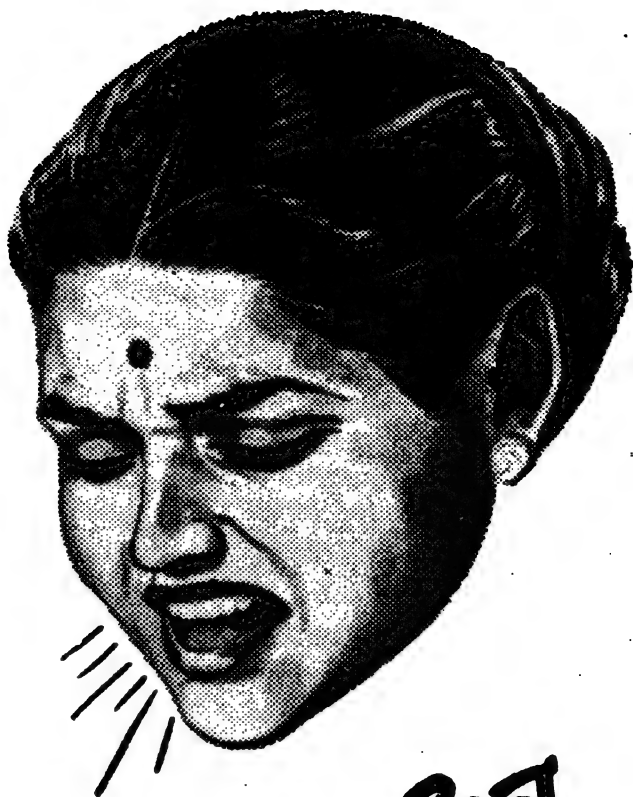
আর বোন—ব'লে জলকক্কারা তাকে জড়িয়ে ধরলো। একসঙ্গে হাতে হাত ধ'রে তারা ভেসে উঠলো ঠিক সেই রাজপুত্রের প্রাসাদের সামনে।  
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## ছোট মেয়ে বাগী সলিল মিত্র

ছোট মেয়ে কচি সোনা নাম রেখেছি বাগী,  
গিলি খিলি হাসিটি তার মিষ্টি বড় জানি।  
ফুলের বনে একলা মনে কতই খেলা করে,  
সোহাগ ভ'রে লতা-পাতা জড়িয়ে বুকে ধরে।  
কয় সে কথা চুপি চুপি ফুলের কানে কানে,  
গোপনতার কি সেই কথা ঐ তো শুধু জানো।  
রাশি রাশি মিষ্টি হাসি বাগীর চোখে-মুখে,  
নয়ন ভ'রে দেগলে পরে জড়িয়ে ধরি বুকে !  
চুপিমাড়ে বলি তার 'বাগী-বাগী মোর—  
সফলতায় ভ'রে উঠুক জীবনখানি তোরা !'

কালির  
মূল কারণ দূর  
করুন



**সিরোলিন**  
খান

নিরাপদ  
পারিবারিক  
ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কালি  
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কালির মূল কারণ হুটে-  
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

# খেলাধুলা

## টেনিস

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ৭১তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ৩৫টি দেশের বহু কীর্তিমান খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার খেলোয়াড়দের জয়জয়কার! এই দুই দেশের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা পাঁচটি বিষয়ের বিজয়ী ও বিজিতের পুরস্কারগুলি লাভ করেছেন। পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন অষ্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান খেলোয়াড় লুই হোড। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় হোডের এটিই শেষ খেলা। কারণ, তিনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। উইম্বলডনে পেশাদার খেলোয়াড়দের মন নেই। লুই হোড পর পর দু'বছর উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। মহিলা বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার নিগ্রো টেনিস-পটীয়সী মিস. এ্যালথিয়া গিবসন।

সিঙ্গেলস ফাইনাল (পুরুষদের)

লুই হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ সেটে এ্যাসলে প্যারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গেলস ফাইনাল (মহিলাদের)

মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-২ সেটে মিস গার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল (পুরুষদের)

গার্ডনার মুল্লর ও বাজপেটা (আমেরিকা) ৮-১০, ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে লুই হোড ও নীল ফ্রেজারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল (মহিলাদের)

মিস এ্যালথিয়া গিবসন ও মিস ডার্লিন হোড (আমেরিকা) ৬-১ ও ৬-২ সেটে মিসেস থেলমা লং ও মিসেস মেরী হটনকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

মার্লিন রোজ (অষ্ট্রেলিয়া) ও মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) ও এ্যালথিয়া গিবসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

## ক্রিকেট

টেস্ট-ক্রিকেট মাঠে ইংলও ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট-ম্যাচ মরীমাসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

পিটার মে'টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত করেন। শেষ পর্যন্ত ইংলও দল প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৬১১ রান সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ২৫৮ রান করেন।

৬১১ রান পিছনে রেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ব্যাট করতে নামেন। কিন্তু খেলার মধ্যে বৃষ্টি নামায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের মনের

ভ্রাসের সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত ৩৭২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হল 'ফলো অন' করতে বাধ্য হল। কিন্তু 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে উদীয়মান খেলোয়াড় কোলী-স্মিথ ও ডেনিস এ্যাটকিনসন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজ দলকে পরাজয়ের হাত হতে রক্ষা করেন। ৩৩৭ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

ইংলও—প্রথম ইনিংস—৬১১ (৩ উইঃ ডিক্রে:)—গ্রেভনি ২৫৮, রিচার্ডসন ১২৬, মে ১-৪, কলিন কাউড্রে ৫৫, ডেরিক রিচার্ডসন ৩৩, গডফ্রে ইভাস ২৬, কোলী স্মিথ ৬১ রানে ২ উইঃ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৭২ (ওয়েল নট আউট ১২১, সেবাস ৪৭, আর কানহাই ৪২, এভারটন উইকস ৩৩, এফ, টুয়ান ৬৩ রানে ৫ উইঃ ও লেকার ১০১ রানে ৩ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৩৩৭ (কোলী স্মিথ ১৬৮, গগার্ড ৬১, এ্যাটকিনসন ৪৬, আর কানহাই ২৮, ষ্ট্যাকাম ১১৮ রানে ৫ উইঃ টুয়ান ৮০ রানে ৪ উইঃ)

ইংলও—দ্বিতীয় ইনিংস—৬৪ (১ উইঃ)।

[ অমীমাসিত ]

লীডস মাঠে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৫ রানে পরাজিত হওয়ায় ইংলও দল বাবার জয়ের গৌরব অর্জন করল। 'লীডস' মাঠের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচকে 'লো স্কোরিং' ম্যান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন খেলোয়াড়ই সেঞ্চুরি লাভ করতে পারেন নি। তা ছাড়া পাঁচ দিনের টেস্ট আড়াই দিনে সমাপ্ত হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১৪২ (আর কানহাই ৪৭০, ওয়ালকট ৩৮, ফ্রাঙ্ক ওয়েল ২১, লোডার ৩৬ রানে ৬ উইঃ লেকার ২৪ রানে ২ উইঃ ও টুয়ান ৩৩ রানে ২ উইঃ)।

ইংলও—প্রথম ইনিংস—২৭১ (পিটার মে ৬১, কাউড্রে ৬৮, শেফার্ড ৬৮, টম গ্রেভনি ২২, ওয়েল ৬১ রানে ৭ উইঃ গিলক্রিষ্ট ৭১ রানে ২ উইঃ)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৩২ (ওয়ালকট ৬৫, সেবাস ২১, লোডার ৫০ রানে ৩ উইঃ টুয়ান ৪২ রানে ২ উইঃ লক ৬ রানে ১ উইঃ)।

[ ইংলও এক ইনিংস ও ৫ রানে বিজয়ী ]

## ফুটবল

কলকাতার ফুটবল মাঠের দর্শকদের উজ্জ্বল আচরণের ঘটনা এমন নয়রূপে দেখা দিয়েছে এবং এই খেলার ব্যাপারে কত নিরীহ ব্যক্তি অকারণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার নাগরিক জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। গত ১৫ই জুলাই মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের পান্টা লীগের খেলার এই মর্যাদাসিক ঘটনা ঘটেছে। সামান্য ফুটবল



খেলাকে কেন্দ্র করে অবাধ মারামারি, ধর্ষতলা ও চৌরঙ্গী এলাকার দোকানপাট ও ট্রামবাস বন্ধ হওয়ার সাধারণ নাগরিকের মনে উদ্বেগের স্রষ্টি হয়। পুলিশের হস্তান্তরের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে যুগান্তরের মন্তব্যের উপর পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। “কলিকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা উপলক্ষে যে লজ্জাজনক মারপিট ও গণ্ডগোল দেখা দেয়, তাহা শান্তিকামী সহরবাসী মাত্রকেই উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে একদা এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিত। বহুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া শুধু অনভিপ্রেত নয়, ইহার পরিণামও আশঙ্কাজনক। কাজেই গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই বিষয়টি সম্বন্ধে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া দরকার। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক নামাঙ্কিত ক্লাবের অস্তিত্ব থাকার ফলেই অনেক সময় অসুস্থ রেবারেখি ও পাল্লাপাল্লি দেখা দেয় এবং তাহা হইতেই শেষ পর্যন্ত অহুৎসাহীরা হাঙ্গামা স্রষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং এই শ্রেণীর নামকরণ বজায় রাখা ঠিক কি না গভর্ণমেন্ট সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নাম পরিবর্তনের দ্বারা কিছু

সুফল হইতে পারে। কিন্তু আসল পরিবর্তন দরকার মনোবৃত্তির। খেলা সূস্থ মানসিকতার জিনিষ—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহা যেখানে হিসা, আক্রোশ ও মারপিটে পর্যাবসিত হয়, সেখানেই বৃদ্ধিতে হবে পিছনে সেই সূস্থ মনোভাবটি নাই, যা খেলোয়াড়ী আদর্শরূপে সর্বদেশে স্বীকৃত। সেই মনোভাব কেবলমাত্র নামের অদলবদলেই রূপান্তরিত হবে কি?”

সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা লীগ খেলার আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করলেও লীগ প্রায় সমাপ্তির মুখে।

কোন অর্ঘটন না ঘটলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করার কোনও বাধা ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মহামেডান অপেক্ষা তিন পয়েন্ট বেশী নষ্ট করে একই অবস্থায় আছে।

পাকেচকে এবারে লীগ প্রতিযোগিতায় নামা বন্ধ আছে। এর ফলে প্রতি ডিভিশনে একটা করে দল বাড়ল। এর ফলে বহু খেলা বেড়ে গেল। একে তো নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলা শেষ হয় না, তার পর রেলগেজান বন্ধ হওয়ায় যে সমস্তার উদ্ভব হোল আই, এক, এ কর্তৃপক্ষ কি সে কথাটা একটি বার ভেবেছিলেন?

## বিস্মৃত দিনের কবিতা

বন্দে আলী মিয়া

নৈশ্খত মেঘের ঘটা—রক্তচীন গহন তিমির  
একটি কামনা-বিহগ মোর মনে রচিতেছে নীড়—  
নিশীথ রৌদ্রের দাহে পুড়ে গেল স্মরক আকাশ  
বসুধার বৃকের মাঝারে গুমরায় ক্ষুণ্ণিত নিশাস।

নাগিনীর বিববাস্পে নীল হলো মাধবী জীবন  
আমার দিনের প্রান্তে ঢেয়ে আছে তুহিত নয়ন ;  
তোমার মদির পাত্রে উজ্জ্বলিত একটি আবেগ  
শিহরায় ঘূমের মন্তন প্রেমহীন বিরস উদ্বেগ।

বাসকশস্যার পার্শ্বে পুষ্পলোভী মধুপের ভিড়  
আমার ঘুমন্ত বৃকে নাচে তাই অশান্ত কুধির ;  
বিস্মৃত দিনের গান ফুরাইয়া গেছে কবে হায়  
তাহার পরশ আছে পরীদের দুইটি পাখায়।

দিনের ঈশান কোণে আলিতেছে অঁাখির প্রদীপ  
উদয়তারারা হেথা ফেলে গেছে প্রভাতের টিপ।  
প্রবাল দীপের বৃকে জেগে আছে রাতের বিলাস  
আজি কি ফিরিবে পাখী ছিঁড়ি তার বন্ধন-পাশ ?

সিঁদু-শকুনি আজ খুঁজে ফেরে মানস সবিতা  
হারারে গিয়েছে কোথা পুরাতন একটি কবিতা !  
তাহার বেদনা বাজে প্রভাতের বিদম্ব তারায়  
আমার ক্ষুণ্ণিত মন পিছু পানে ফিরে ফিরে চায়।



## কাচ-শিল্পের অগ্রগতি

**কাচ** আর কাঞ্চনের মূল্যমান কখনই এক নয় সত্যি, কিন্তু তা হলেও আধুনিক জগতে কাচ একটি অপরিহার্য পদার্থ এবং সেদিক থেকে এর মূল্যও অনস্বীকার্য। নেহাৎ ইনকো বা ভল্লুর জিনিস বলে কাচ আর অবজ্ঞাত নয়, মানুষের নানা প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে ঘরে ঘরে আজ চলেছে তার দুর্কার অভিধান। এমনি হয়ে উঠেছে—কাচ তথা কাচ-নির্মিত দ্রব্য-সামগ্রী না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেন চলে না। কাচের শিশি, বোতল, টিউব, নল, সার্শি, আর্শি,—এ সব ত আছেই, কাচের গ্লাস, কাচের বাসন, কাচের চুড়ি, কাচের আলমারী—সর্বত্রই কাচ। দূরবীক্ষণ, অতীবীক্ষণ, ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধাঙ্গির বিভিন্ন সরঞ্জামও কাচ অপরিহার্য ভাবে চাই। এই যান্ত্রিক যুগে লৌহের চেয়ে কাচের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কম কিসে? এইটিকে 'কাচের যুগ' বলতেও নিশ্চয়ই আপত্তি থাকতে পারে না। কাচের জিনিস না হলে আজ যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ অচল। দেখে স্বতঃই মনে হয়, এ যুগে কাচ কাঞ্চনের গৌরব বা সমকক্ষতা দাবী করবার মতোই সাহস সক্ষম করছে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ কাচকে কেন্দ্র করে একটি উন্নত ধরণের শিল্প গড়ে তুলবার সুপরিকল্পিত প্রয়াস আরম্ভ হয়। গত ৪০-বৎসরকাল মধ্যে এর যে অগ্রগতি হয়েছে, এক কথায় উহাকে 'বৈপ্লবিক' বলে আখ্যাত করা চলে। বস্তুত: আজ শুধু বহির্ভাগেই নয়, ভারতের অভ্যন্তরেও কাচ একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। কোন অতীতে একটি ফিনিসীয় বণিক দল সিরিয়ার সমুদ্রোপকূলে রত্ননাকাধাকালে কাচ জিনিসটিকে আবিষ্কার করেন। আগুনের তাপে আলকালি নামক দ্রব্য পদার্থের সঙ্গে বালুকা ও ছাই মিশ্রিত হয়ে সেদিন যখন এইট সৃষ্টি হ'ল, তখন বিশ্বের অবধি ছিল না। এমনি ভাবে কাচের আবির্ভাবের পর কাচ ও কাচ-শিল্পের উন্নতির প্রয়াস চলে যুগে যুগে এবং আজ সমগ্র বিশ্বে, এমন কি ভারতেও এর সাফল্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

নিত্য ব্যবহারের উপযোগী কাচের জিনিস এবং চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক কাচ দ্রব্য তৈরীর জন্তে এ দেশে বহু বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসের উৎপাদন প্রণালী বিভিন্ন ধরণের এবং সকলই এখন সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-অনুমোদিত। এই শিল্পের উন্নতির জন্ত শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে গবেষণাও চলেছে প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা মহানগরীতে জাতীয় সরকারের অর্থায়নক্রমে ও পরিকল্পনামুযায়ী কাচশিল্প সংক্রান্ত একটি বিরাট

গবেষণা-মন্ডির স্থাপিত হয়েছে এবং এইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে ঠিক ৭ বছর পূর্বে ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে। এই কয় বছরের ভেতরই আলোচ্য গবেষণা-সংস্থাটি (সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট) নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রচুর কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে।

এদেশে কাচশিল্পের প্রসার ও অগ্রগতির সূচনাকাল চিহ্নিত করতে হলে চল যেতে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোতে। ১৯১৪ সালে প্রয়োজনের তাগিদে সারা ভারতে তিনটি বড় রকমের কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রমেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা-নয়া কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া অবধি (১৯৪৭) এই সংখ্যা প্রায় একশত হয়ে দাঁড়ায়। কাচের এই কারখানাগুলোর পাশাপাশি কতকগুলো সংশ্লিষ্ট কারখানা বা পরস্পর নির্ভরশীল কারখানাও গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র চুড়ি তৈরীর কারখানাই হচ্ছে প্রায় ১৫টি। বর্তমানে ভারতে মোট গ্লাস ওয়াক্স বা কাচের কারখানা দাঁড়িয়েছে ১৩০টির উপর—এর মধ্যে এক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই রয়েছে প্রায় ৩০টি কারখানা।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার। উল্লিখিতরূপে কারখানা। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাচ প্রস্তুত প্রণালীরও পরিবর্তন হ'য় চলেছে দিন দিন। সাধারণত: কাচ একটি ভল্লুর পদার্থ কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে এটি অভিন্ন এমন কি বস্তুর জায় নমনীয় কাচের আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে। কাচ ও কাচশিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কাচ প্রস্তুত প্রণালী পরিবর্তনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। পূর্বে যুগের সাহায্যে হাওয়া দিয়ে কাচ গলানো হতো, আজ সেখানে হয়েছে স্বয়ংক্রিয়-বস্ত্রপাতির হাজিরা; পণ্ড ফার্নেস-এর জায়গায় দেখা দিয়েছে 'ট্যাক ফার্নেস'। পঞ্চাশের এই শিল্প উৎপাদনের ব্যাপারে সরাসরি আগুনের স্থলে বর্তমানে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে একেবারে গ্যাসের।

অভিন্ন কাচ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প ও শিল্পজাত পণ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে আশ্চর্য্য বকম। অসংখ্য বহু মূল্যবান জিনিসের জায় সেন্ট্রাল গ্লাস পাম্প, কনট্রোল পাইপ, বল বেরাফিক গজ প্রভৃতিও আজ তৈরী হচ্ছে কাচেই। কাচশিল্প সংস্থার রিপোর্টে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে—বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন লোহা ও রবার, তেমনি আধুনিক শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে কাচেরই জয়যাত্রা। বস্তুত: ভারতীয় কাচশিল্প কাচ ও কাচের রকমারী জিনিসের একটি মোটা চাহিদা এক্ষণে মিটিয়ে চলেছে। উৎপাদনের পরিমাণ থেকেও ভারতীয় কাচশিল্পের এই অগ্রগতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৮৭ হাজার ১৮০ টন, সেখানে ১৯৫৫ সালেই উহা হয়ে দাঁড়ায়,

সোয়া লক্ষ টনের উপর। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে উক্ত পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে এবং এর মূল্যও ৪ কোটি টাকার বেশী ছাড়া কম নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ১১৬০-৬১ সালের শেষাংশে মধ্য উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে একেবারে দুই লক্ষ টন এবং সেভাবে নানাবিধ অনুবিধা সম্বন্ধে কারখানায় কারখানায় কাজও এগিয়ে চলেছে।

জীবিকার মান উন্নয়নের সঙ্গে কাচশিল্পের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, এইটি সহজেই অনুমেয়। এই উপমহাদেশে এ শিল্পটির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ ভাবে এই কারণে যে, এর জন্য যে কাঁচা মাল প্রয়োজন, অর্থাৎ বালুকা, চুন, চূণাপাথর ইত্যাদির সরবরাহ এখানে অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান। কাচ ও কাচশিল্পের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনও এইটি স্বীকার না করে পারেননি। কমিশন স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন—কাচজাত পণ্যের উপর বহু শিল্প নির্ভরশীল এবং এদিক থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে কাচশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। কাচ ও কাচশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারত এখনও অবধি অবশ্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেনি। এর জন্য সরকারী মনোযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা আরও ব্যাপক আকারে প্রয়োজন। প্রাপ্ত একটি হিসাবে দেখা যায়—১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশ থেকে যে পরিমাণ কাচদ্রব্য আমদানী করা হয়, তার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। এই সময় ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায় মোটামুটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচের জিনিস। সারা ভারতে এই শিল্পক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার; তন্মধ্যে প্রায় ৬ হাজার কর্মীই কাজ করে চলেছে এই খণ্ডিত পশ্চিম-বঙ্গ। যত দিন যাবে, কাচ ও কাচশিল্প ততই প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করবে, এইটি আজ নিঃসংশয়ে বলা যায়।

## হাঙ্গরের চামড়া থেকে শিল্প-সম্ভার

বিজ্ঞান-সম্ভার আশীর্বাদে কত তুচ্ছ বা পরিত্যক্ত জিনিস বহুমূল্য শিল্প ও সম্পদে পরিণত হচ্ছে, বলবার নয়। সামুদ্রিক ভয়াবহ জীব হাঙ্গর—অতীত কালে মানুষের শত্রু হিসাবেই এইটি ছিল প্রধানতঃ গণ্য। বলতে কি, মানুষের কাছে এর তেমন কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় নি সেদিনে। গবেষণা চল বহুরের পর বছর—যুগের পর যুগ। তার পর ধরা পড়ে গেলো এক দিন—গভীর সমুদ্রের এ বৃহদাকার মংত্রটি মানুষের সুখ ও স্বাস্থ্যের উপকরণ যোগাতে পারে প্রচুর।

জলজ জীব হাঙ্গর স্থলের অধিবাসী মানুষের কাছে কি ভাবে লাগতে পারে? আধুনিক কালের একটি মস্ত আবিষ্কার—হাঙ্গরের গায়ে যে শিরীয় কাগজের মত অমৃশ্য বস্তু বা ছাল থাকে সেইটি খুবই মূল্যবান। দেখা গেলো স্পষ্টই—এইটিকে ঠিক মত ট্যানিং বা শোধিত করে চমৎকার স্থায়ীত্বসম্পন্ন চামড়া তৈরী করা যায় এবং সেই চামড়া থেকে গড় তোলো চলে নানা প্রয়োজনীয় শিল্প-সম্ভার। অবশ্য কাঠ ও অজ্ঞাত কয়েকটি জিনিস পালিশ বা মসৃণ করার কাজে হাঙ্গরের গাত্র-বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বহু দিন কিন্তু যেদিন থেকে এইটি 'লেদার' বা শোধিত চামড়ার রূপ গ্রহণ করলো, সেদিন হাঙ্গর মানুষের পবন শত্রু হলেও শেষ অবধি শত্রু হিসাবে ঘৃণা ও পরিত্যাজ্য হয়ে থাকলো না।

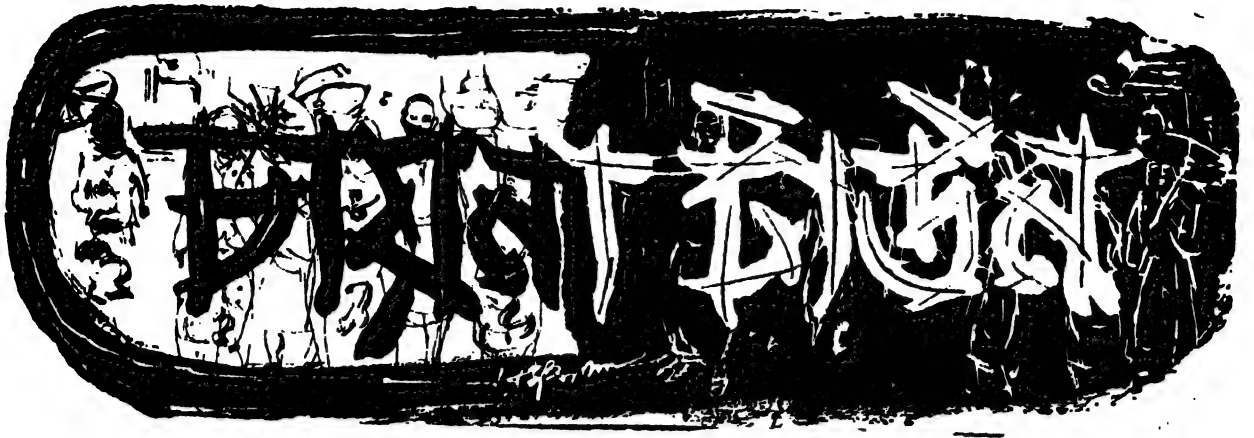
হাঙ্গরের বস্তু বা গাত্রাবরণ থেকে শোধিত চর্ম তৈরীর কয়েকটি বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে পশ্চিমী দেশগুলোতে। নিউজার্কের

(আমেরিকা) একটি প্রকাণ্ড কারখানা থেকে (ওশেনলেদার কর্পোরেশন) গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য শোধিত চামড়া তৈরী হয়েছে। যত দূর জানা যায়, হাঙ্গরের 'স্পিনীজ' বা প্রজাতি একটা ছোটো মাত্র নয়—প্রায় দুই শতাধিক। এদের সব কয়টির ছাল থেকেই আবার শোধিত চামড়া হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, মাত্র ১০।১২টি 'স্পিনীজ' বা প্রজাতি চামড়া তৈরীর পক্ষে উপযোগী।

একটু আগেই বলা হ'ল—ভয়াবহ জীব হাঙ্গরের বিস্তার 'স্পিনীজ' বা প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে যে কয়টি বিশেষ ভাবে চামড়া তৈরীর কাজে আসে, সেগুলোর চলতি নাম—'টাইগার', 'লিওপার্ড', 'ডাক্সি', 'ব্রাউন', 'সার্ক', 'সেগুবার', 'ব্ল্যাক টিপ', 'ম্যাকারেল', 'হাম্যার হেড', 'স-ফিশ', 'নাস', 'জাপানোস রে' ও মরোক্কো শার্ক। হাঙ্গর ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় রেখেই কিংবা ডকে এনে গাত্র-বস্তুটি ছাড়িয়ে ফেলা হয়। তার পর সমুদ্রের জলে ভাল রকম ধুয়ে এতে লুণ মিশিয়ে রেখে দিতে হয় অন্ততঃ চার কি পাঁচ দিন। পরিশেষে ছাল সব ভাঁজ ভাঁজ করে জাহাজ যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন চর্ম-শোধন কারখানায়।

বিশ্বের জলরাশিতে অবশ্য একই সংখ্যার হাঙ্গর পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ হাঙ্গরের বস্তু আমদানী হয়ে থাকে সেমি-উপকাল সমুদ্র এলাকা থেকে। যেমন ম্যাক্সিকো উপসাগর, ম্যাক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চল, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগরের জলে বহু হাঙ্গর পাওয়া যায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পাইন দ্বীপেও অসংখ্য হাঙ্গর ধরা পড়ে আসছে এ যাবৎ। ফ্লোরিডার জলরাশি হাঙ্গরে ভর্তি এবং সেজন্য পূর্বোক্ত ওশেন লেদার কর্পোরেশন সম্প্রতি ফ্লো-এর ইয়োর্টে একটি হাঙ্গর শিকার কেন্দ্র পর্যায়স্বত্ব স্থাপন করেছেন। বিশেষ ধরনের জাল বা বর্শা দিয়ে হাঙ্গর ধরার প্রথা অনেক কালের। এছাড়াও আধুনিক যুগে কয়েকটি নয়া পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে হাঙ্গর শিকারের।

মানুষ আজ হাঙ্গরের দেহের প্রতিটি অংশ একটি না একটি কাজে লাগাচ্ছে বা লাগাবার চেষ্টা করছে। এদের 'লিভার' বা যকুৎ-এ খাত্তপ্রাণ 'ক' যথেষ্ট পরিমাণ আছে বলে ক্যামিকাল বা রাসায়নিক কোম্পানীগুলোর দিক থেকে এর চাহিদা খুবই বেশী। কতক শ্রেণীর হাঙ্গরের ডানায় চীনাাদের একটি চমৎকার খাবার তৈরী হয়। হাঙ্গরের মাংসবহুল অংশটি অজ্ঞাত কয়েকটি ক্ষুদ্র এক প্রকার প্রধান খাত্ত। এই সামুদ্রিক জীবটির দেহ-কাঠামোতে আসলে কোন হাড় নেই। কাজেই গায়ে ছালটা ছাড়িয়ে নিলে বাকী অংশটি সহজেই একাকার হয়ে যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাররূপেও ব্যবহৃত হয়। বাজারে হাঙ্গরের পাতের মূল্যও নিশ্চয়ই কম বলা চলে না। এ থেকে নানা ডিজাইনের মনোরম অলঙ্কার তৈরী হচ্ছে আজ-কাল। হাঙ্গরের চামড়ায় শিশুদের জন্যে ভাল ভাল পাদুকা হয় এবং বড়দের জুতোরও উপরিভাগটা তৈরী হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এই চামড়া থেকে আজ বহু কাজের জিনিস নিষ্কৃত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প কারখানায়। লগেজ, কোমরবন্ধ, পোর্টফোলিও, পকেট-বই, সিগারেট-কেস, হাতবড়ির বাগ ও রকমারী ক্রীড়াসামগ্রী থেকে আরম্ভ করে কত বিচিত্র শিল্পসম্ভারই না হাঙ্গরের মূল্যবান চামড়াছাত্ত। বিজ্ঞানীদের দাবী—মানুষের কাছে এই জলজ প্রাণীটির অবদান নানা কারণে ব্যর্থ হবার নয় কখনই।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফে: চে: শিরা: যখন তার সোনার-বাঁধানো দাঁতে একটুগানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “জেনী, আমার বিয়ে করবে?” জেনী করবে না, কথাটি সোজামুজি বলতে বলতেও বললো না।

জেনী ভাললো, চে: শিরা:কে যদি সে নিজেকে নাকচ করে দেয় তাহলে বড়ো ভাট চিয়েন চাং-এর সঙ্গে একটা কলহ অনিবার্য—কারণ প্রথমত চে: শিরা:এর কাছ থেকে কিছু অর্ডার পায় চিয়েন চাং, দ্বিতীয়ত চে: শিরা:এর বোন টি: লিং-এর সঙ্গে তার কিছু ভবিষ্যতের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। তাই নিজের থেকে কোনো কথা বলতে চাইলো না সে।

তুম্বু বললো, “চে: শিরা:, আমবা পশ্চিম দেশের মেয়েদের মতো নই যে, নিজেকে বিয়ে নিজেরা ঠিক করবো। আমাদের পরিবার খুব রক্ষণশীল। তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করো। তিনি যা বলবেন তাই হবে।”

চে: শিরা: যখন বড়ো ওয়াঙ-এর কাছে গিয়ে বললে, বড়ো ওয়াঙ-এর মনে তার তিরিশ বছর আগেকার চায়না টাউনের গুণ্ডা-সর্দারের প্রবৃত্তিগুলো হঠাৎ চেগে উঠলো। কিন্তু তিরিশ বছর আগেকার ওয়াঙ আর এই ওয়াঙ-এ অনেক তফাৎ! কার্টার চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে হাতের মালা ঘুরিয়ে চললো বড়ো ওয়াঙ।

তারপর আন্তে আন্তে বললো, “চে: শিরা:, ক্যান্টনের ফে: কশের একজন যোগ্য সম্ভানের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পেয়ে ফুকিয়েনের ওয়াঙবংশ ধন ও সম্মানিত হোলো। ওয়াংবংশের মেয়ে ফে: কশের ছেলের পায়ের নখের ধূলো হবাব যোগ্যতাও নেই।

“আমি যদি যোগ্য মনে করি,—” বলে উঠলো অধৈর্য চে: শিরা:।

“আমায় বলতে দাও,” বড়ো ওয়াং বাধা দিয়ে বললো, “আমি কি বলছিলাম চানো? আমি বলছিলাম ফে: কশের লোকেরা খুব উদার। তাই তুমি জেনীকে দেখে করুণানুত হয়ে এই প্রস্তাব করেছো। হয়তো পরে এই আকস্মিক করুণার জন্তে তোমার অজুশোচনা হতে পারে। সুতরাং বুঝা চঞ্চল না হয়ে তুমি ভালো করে ভেবে দেখ।”

“আমি ভালো করেই ভেবে দেখেছি,” চে: শিরা: উত্তর দিলো।

“এত তাড়াহড়ো করবার কিছু নেই,” বললো বড়ো ওয়াঙ,

তুমি জেনীকে স্বীকৃতি গ্রহণ করতে চাও, তখন আমার এসে বোলো। আমি তখন জেনীর ভবিষ্যৎ সুখের জন্তে তার বাবা হিসেবে যা যা করা কর্তব্য মনে করবো, তাই করবো।”

“কিন্তু—”

“আমি যা বলেছি, এর বেশী কিছু এখন আর বলতে চাই না,” বড়ো ওয়াঙ শেষ করলো। “তবে তুমি আমার ছেলের বন্ধু। সুতরাং ছেলের বন্ধুর মতো এ বাড়িতে যাওয়া-আসা করবে। ছেলের বন্ধুর মতোই সবার সঙ্গে মিশবে। সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথাবার্তা হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন,” বলে চক্ষু নিমীলিত করলো বড়ো ওয়াঙ।

ফে: চে: শিরা:কে উঠ পড়তে হোলো। আড়াল থেকে জেনী আর মিনি এদের কথাবার্তা সবই শুনতে পেয়েছিলো।

জেনী খুশি হয়েছিলো খুব। আর মিনি তো হেসে খন। “ওল্ড ন্যান ভাষণ চালাক”, মিনি হেসে বলেছিলো। জেনী হেসে মিনির হাতে চিমটি কাটলো।

মিনি হাসতে হাসতে বলতো, “এবার একদিন তোমার বাঙালী বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।”

জেনী যেদিন দিলীপকে প্রথম এ বাড়িতে নিয়ে এলো সেদিন বাড়িতে বাইরের লোক কেউ ছিলো না। মিনি খুব খুশি হয়ে তাড়াহাড়ি চায়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

দিলীপের মুখে নিভুল ইংরেজি শুনে সুং-চাং খুব বিমুগ্ধ। তার উপর যখন শুনলো সে খুব ভালো ওয়ল্‌জিটিংবাগ জানে আর তখন তার উপর সুং-চাংএর শ্রদ্ধার আর সীমা রইলো না।

বললো, “তুমি তো অল্প বাঙালী ছেলেদের মতো নও? তুমি কোন কোন জায়গায় যাও নাচের রাত্রিতে? তোমায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!”

দিলীপ উত্তর দিলো, “আমি কিন্তু তোমায় দেখেছি। পরশু দিনও তুমি গোল্ডেন স্পিয়ারে ছিলে। আমার যত্নের মনে পড়ে তুমি রোজার সঙ্গে নাচছিলে।”

“রোজীকে তুমি চেনো?” সুং-চাং জিজ্ঞেস করলো।

“রোজীকে ঠিক চিনি না, তবে রোজীর বড়ো বোন অলগাকে খুব ভালো করে চিনি।”

# এই নামগুলোর উপর নির্ভর করুন

সব সময় এই তালিকার নামগুলো যে কোম্পানী  
কোম্পানীর তৈরী বনস্পতি কিনবেন

আমের উন্নয়ন	উন্নয়ন
অনুত বনস্পতি কোঃ লিঃ	গোয়েন্দা অ্যামের
অনুতলর হুয়ার মিলস লিঃ	গোয়েন্দা
বোয়ার অয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ	কনসল
বি বোয়ার বনস্পতি	কনসল
ভারত বনস্পতি প্রোডাক্টস লিঃ	গেডিও
ভবনর ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লিঃ	প্রভাত
ব্রহ্মা ততালানাকর আইটেম লিঃ	বিটি
ডি-সি-এম বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস	পলকট
ইউ এমিগাটিক কোঃ (ইণ্ডিয়া) আইটেম লিঃ	ওক
ইউ কোই হুড প্রোডাক্টস লিঃ	গণোকা
পপেল ক্লাওয়ার মিলস কোঃ লিঃ	গাই কোমিটি
হিন্দুস্তান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ	হুই
হিন্দুস্তান লিভার লিঃ	লোচন
ইন্ডিয়ান ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লিঃ	লারন
জগদীশ ইণ্ডাস্ট্রিজ আইটেম লিঃ	অরুণ
কাথিয়াবাড় ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	— —
কুব্জ প্রোডাক্টস লিঃ	কুব্জ
মার্গারিট এন্ড রিকাইনড অয়েল কোঃ আইটেম লিঃ	অকর্ণ
মেক্স রেমিক্যাল এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোঃ লিঃ	কাম্বল
মোদি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ	কোমিটি
মাইসোর ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্টস লিঃ	গান্ধী
পালানপুর ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লিঃ	বটল
গোদাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	হুই
এস-জি ভেজিটেবল প্রোডাক্টস	মোপল
সো হোমিট হুড প্রোডাক্ট কোঃ লিঃ	মেক্স
সোমাইকা বনস্পতি প্রোডাক্টস লিঃ	সোমাইকা
মডিক অয়েল মিলস কোঃ লিঃ	মেক্স
টাটা অয়েল মিলস কোঃ লিঃ	পকাও
ডুমতরা ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	ডুমার
ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লিঃ	প্রভাত
ভেজিটেবল ভিটামিন হুড কোঃ আইটেম লিঃ	ভিটামিন
জেরিয়ার ইণ্ডিয়া ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লিঃ	গান ক্লাওয়ার

—পরিচিত প্রস্তুতকারীর

বনস্পতিই সবসময়

দোখ কিনুন।

স্বাস্থ্যপ্রদ ও শক্তিদায়ী বনস্পতি দিয়ে সবরকম  
রাগাবাঙ্গা করা বুদ্ধির কাজ—কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধির কাজ  
প্রস্তুতকারীর নামটি দেখে নেওয়া !  
বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোনও সদস্য  
কর্তৃক প্রস্তুত বনস্পতি কিনলে জানবেন যে এই  
বনস্পতি কঠিন সরকারী আইন অনুযায়ী সরকারী  
ভান্ডারখানের নিয়মাবলী কারখানার তৈরী।  
এসব কারখানার হাত না লাগিয়ে বনস্পতি তৈরী  
ও সীলকরা টিনে প্যাক করা হয়, বাতে  
চাটকা ও বিগড় থাকে।

বনস্পতি  
গিন্নীদের পরম বন্ধু

প্রচারক :  
বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স  
এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া





রোজীর দিদি অলগা তাকে চেনে, বাস, এর বেশী পরিচয় আর দরকার নেই।

কিন্তু চিয়েন চাং অতো সহজ ভাবে নিতে পারলো না দিলীপকে। খুব ভামুলি সৌজন্তে সাধারণ হুঁ-চারটা কথাবার্তা ছাড়া বিশেষ কিছুই বলছিলো না সে। তা ছাড়া দিলীপকে দেখে এমন কিছু অর্থবান বলে তার মনে হোলো না এবং অর্থবান নয়, এরকম বিদেশীর উপর তার আগ্রহ খুবই কম।

সেই হুঁ-চারটা কথাবার্তার ঝাঁকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কিসের ব্যবসা করো?”

“যা সামনে আসে, যার থেকে দুটো পয়সা হয়, তাই করি।” দিলীপ উত্তর দিয়ে, “কোনো বিশেষ লাইন আমার নেই।”

“এখন কিসের ব্যবসা করছে?” জিজ্ঞেস করলো চিয়েন চাং।

“স্ক্র্যাপ।”

“স্ক্র্যাপ?” চিয়েন চাং দ্ব্যর্থকৃষ্ণিত করলো, “স্ক্র্যাপ বেচবার চেষ্টা করছে? বুঝি? বাজারে তো এখন ক্রেতা বেশী নেই!”

দিলীপ একটু তেমে উত্তর দিলো, “না, বেশী নেই। তবে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমার হাতে একটি পাটি আছে, ওরা চিনছে! আমার সন্ধানে যা ছিলো তা ওদের দিয়েছি। তবে তাতে কলোয়নি। আমার আরো কিছু লাগবে।”

“তাঁই নাকি?” লক্ষিয়ে উঠলো চিয়েন-চাং। তার হাতে একটি পাটি আছে যা স্ক্র্যাপ বেচবার চেষ্টা করছে। এমন সুযোগ নাকি উঁচু করে অবতলা করলে বৃদ্ধমানের কাজ হবে না, সে ভাবলো।

মিনিট পোনেবোর মধ্যে সে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে গল্প করতে লাগলো দিলীপের সঙ্গে। মিনিট পচিশের মধ্যে তাকে প্রিন্সেসএ মন্তপান করবার আমন্ত্রণ জানালো। তার পর দিন দিলীপের অফিসে গিয়ে দেখা করলো। ব্যবসার কথাবার্তা পাড়লো।

তিন দিনের মধ্যে সেন-সেন চুকে গেল। কিছু অর্থ রোজগার করলো চিয়েন-চাং। আর লক্ষ্য করলো যে বাজারে দিলীপের অসংখ্য যোগাযোগ। তবে যে পরিমাণ দূর্ততা থাকলে এই যোগাযোগ-গুলো কাজে লাগানো যায়, দিলীপের সেটা নেই বলেই সে খুব বেশী কিছু করতে পারছে না।

এ লোককে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না, স্থির করলো চিয়েন চাং।

জেনীর বাপার জেনী বুঝবে, চেং-শিয়াং বুঝবে, সে ভাবলো, আর যে হেতু চেং-শিয়াং অত্যন্ত ধনবান লোক, তার উপর স্বজাতি, সুতরাং জেনী যে শেষ পর্যন্ত দিলীপের মোহ কাটিয়ে চেং-শিয়াং-এর উপরই মনোনিবেশ করবে তাতে চিয়েন-চাং-এর কোনো সন্দেহ রইলো না। যদি চেং-শিয়াং জেনীর মন জয় করতে না পারে, সে চেং-শিয়াং-এর দোষ। চিয়েন চাং তাকে বাড়িতে নিয়ে জেনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, ভাব করবার সুযোগ করে দিয়েছে, এর বেশী আর কী করতে পারে? জেনী যদি দিলীপকে বেশী পছন্দ করে, চিয়েন চাং তাতে বাধা দেওয়ার কে?

সুতরাং জেনীদের বাড়িতে দিলীপের নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু হোলো আর সেখানে আলাপ হোলো হাশিম সুলেমান, জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, মা মিল চি, মাবেল রবিনসন, হেনরি লরেন্স প্রভৃতি চিয়েন চাং জেনী মিনিসের অন্তান্ত বন্ধুদের সঙ্গে।

মাঝখানে কয়েক দিন জেনীদের বাড়িতে বায়নি চেং শিয়াং। এক দিন সেন্টিয়াল এভিনিউ দিয়ে গাড়ি ঠাকিয়ে যেতে যেতে দেখলো ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মিনি আর আহ কিম। ফুটপাথের পাশে সে গাড়ি থামালো, ইচ্ছে তার জেনীর খবর একবার মিনিকে জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু মিনি কোনো কথা বললো না, শুধু একটু নড় করে হেঁটে চলে গেল।

চেং শিয়াং লক্ষ্য করলো যে মিনি আর আহ কিম দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা অর্থহীন হাসি হাসলো। সেই হাসি চেং শিয়াং-এর ভালো লাগলো না।

মিনি যে তাকে এড়িয়ে চলে সেটা সে যে লক্ষ্য করেনি তা নয়, তবে আগে এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে। তার লক্ষ্য জেনী। জেনীর বোন মিনি বাড়িতে তার সামনে বেরোলো কি বেরোলো না সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে তার মনে হয়নি কোনো দিন।

কিন্তু আহ কিম-এর সামনে মিনির এই তাচ্ছিল্য তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সে জানে, আহ কিম মাও-তসে-তুওর সমর্থক, আহ কিম কলকাতার এক প্রগতিশীল চীনা যুবক সমিতির সেক্রেটারি, সেই সমিতির কাধকলাপ বানচাল করে দেওয়ার জন্তে যাদের মারফতে জাতীয়তাবাদী অর্থবান চীনাদের টাকা খরচা করা হচ্ছে, যে চেং শিয়াং তাদেরই একজন।

সুতরাং আহ কিমের সামনে মিনির এই ব্যবহারে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলো। ঠাঁতে ঠাঁত ঘষে সে ভাবলো, আচ্ছা, এর শোধ আমি নেবো। এমন শিক্ষা দেবো মিনিকে।

কয়েক দিন গাড়ি নিয়ে সে আহ-কিমের লগ্নির কিছু দূরে ঠাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো। কিন্তু একা পাওয়া যায় না মিনিকে। সে এতব্যক দিনই বেরোর আহ-কিম-এর সঙ্গে। আহ-কিম তাকে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। দিন সাত আট পরে এক দিন দেখলো মিনি কাজের শেষে একাই বেরোচ্ছে।

খুব কাজের চাপ ছিলো সেদিন, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মিনি দোকান থেকে বেরোলো—আর আহ-কিম বেরোনোর ফুরসতই পেলো না।

ক্লান্ত পদক্ষেপে বেটিক্স স্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে পথ চলছিলো মিনি ওয়াঙ। এমন সময় ফুটপাথের পাশে চেং শিয়াং-এর গাড়ি এসে ব্রেক কবলো।

গাড়ির ভেতর থেকে চেং শিয়াং ডেকে বললো “গাড়ির ভেতর এসো। তোমাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।”

সেদিন মিনি খুব ক্লান্ত। চেং শিয়াংকে যতোই অপছন্দ করুক সে, তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার এই আমন্ত্রণ তার প্রত্যাখ্যান করবার ইচ্ছে হোলো না।

এটুকু পথ, মিনিট পাঁচেক লাগবে, কী আর ক্ষতি তাতে—মিনি ভাবলো।

একটু ভ্রমতার হাসি হেসে সে গাড়িতে চেং-শিয়াং-এর পাশে এসে বসলো। চেং-শিয়াং গাড়ি ঠাকিয়ে নিলো এসপ্লানেডের দিকে। মিনি একটু অবাক হয়ে চোখ তুলে চেং-শিয়াং-এর দিকে তাকালো।

“লিওস স্ট্রীটের একটা দোকানে সামান্য একটা কাজ আছে,” চেং-শিয়াং বললো, “সেটা চট করে সেরে নি। হুঁ মিনিট লাগবে।

তোমার সময় নষ্ট হবে না। হেঁটে যেতে তোমার যত্নশীল লাগতো, তার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছে যাবো।”

মিনি আস্তে আস্তে বললো, “লিগুসে স্ট্রীটে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমার এখানে নামিয়ে দিলেই ভালো হয়।”

চে শিয়াং হাসলো, বললো, “আমাকে ভয় কিসের মিনি! আমি তোমার ভাবী ভগিনীপতি। তোমায় লিগুসে স্ট্রীটে না নিয়ে যদি রেড রোডের এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ বসে গল্প করি, তাতে কোনো দোষ হয় না, কেউ কিছু বলবেও না।”

শুনে মিনি চুপ করে রইলো। তার পর মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো নিজের মনে।

সেই হাসি অবলোকন করে চে শিয়াং পুলকিত হলো। স্ত্রী-চরিত্র সঙ্ক্ষে তার নিজের জ্ঞান এবং বেকানো মেয়ে আকর্ষণ করবার মতো তার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব সঙ্ক্ষে তার আস্থা বেড়ে গেল।

খুব খুশি হয়ে বললো, “মিনি, তুমি একটি স্পোর্ট। তোমার দিদির চাইতে অনেক বেশী।”

এসপ্লানেডের মোড়ে লাল আলো। চে শিয়াং গাড়ি থামলো। ডান দিক থেকে একটি ট্যাক্সি এসে তার সামনে আড় ভাবে দাঁড়ালো।

খুব বিরক্ত হয়ে সেদিকে তাকালো চে শিয়াং। শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের উপর তার ভীষণ রাগ। কিন্তু গাড়ির আরোহীদের দিকে তাকালে তার রাগ জল হয়ে গেল। দুটি পকবিশাখরা পাঞ্জাবী মেয়ে সেখানে বসে।

তার পর মনের খুশিতে মিনির দিকে ফিরে কি যেন একটা বলতে গিয়ে দেখে, সীট খালি। মিনি নেই। দরজা খোলা।

ওদিকে তাকিয়ে দেখে, রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে হন-হন করে বেন্টক স্ট্রীটের দিকে ফিরে যাচ্ছে মিনি ওয়াঙ।

লাল আলো হলদে হোলো, তার পর সবুজ হোলো।

পেছন থেকে অগ্নি গাড়িগুলো অর্ধেক হয়ে হর্ণ দিচ্ছে।

নিরুপায় চে শিয়াং তাড়াতাড়ি সামনের দিকে খুঁকে দরজাটা ঢেঁলে বন্ধ করে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো চৌরঙ্গির দিকে।

তার আরো রাগ হোলো মিনির উপর। ভাবলো, নাঃ, মনিকে যতোটা ভালোমানুষ ভেবেছিলাম, ততোটা নয়।

তার পরদিন সে আবার গাড়ি নিয়ে গেল আহ-কিম-এর লগ্নির সামনে। সেদিন মনিকে পেলো না। সে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই মিনি চলে গেছে। তার পরদিন আবার গেল।

সেদিনও মনিকে ধরা হোলো না। কারণ সে আর আহ-কিম-একসঙ্গেই বেরোলো দোকান থেকে।

চে শিয়াং সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার ছেলে নয়। সে আবার গেল পরদিন। সেদিন সন্ধ্যোগ পেলো। দেখলো তিনি আহ-কিম-এর দোকান থেকে একলা বেরিয়ে আসছে।

মিনি খানিকটা এগিয়ে যেতেই চে-শিয়াং গাড়িটা নিয়ে গিয়ে ফুটপাথের পাশে দাঁড় করালো। তারপর ডাকলো “মিনি!”

মিনি ওয়াঙ তার ডাকে সাড়া দেবে কিনা সে সঙ্ক্ষে একটু সন্দেহ ছিলো চে শিয়াং-এর মনে।

কিন্তু অবাক হোলো যখন দেখলো, মিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে আস্তে তার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো।

চে শিয়াং অবাক হোলো, খুশিও হোলো। বললো, “সেদিন তুমি আহ-” না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেলো মিনি! আমি খুব হতবাক হয়েছিলাম।”

মিনি কোনো উত্তর দিলো না।

“কোথায় যাচ্ছে? বাড়ি? এসো, গাড়ির ভেতর উঠে এসো। তোমায় পৌঁছে দিই।”

মিনির উত্তর এলো না। কিন্তু পেছন থেকে কাঁধের উপর টোকা পড়লো।

ফিরে তাকিয়ে চে শিয়াং দেখে, আহ কিম এসে দাঁড়িয়েছে, গাড়ি অগ্নি পাশে।

আহ, কিম বললো, “বন্ধু, দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা তুলবার পর বোনকে জোর করে গাড়িতে তুলে রেড রোডে হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করাটা খুব সমর্থনযোগ্য নয়, দিনের পর দিন তার অপেক্ষায় দোকানের কাছে গাড়ি এনে দাঁড় করালোও ভালো কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমান লোক। আশা করি এ প্রচেষ্টা ছেড়ে দেবে। যদি ছেড়ে না দাও নানারকম অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে পারে। আমাকে তো চেনো। এবার যেতে পারো।”

চে শিয়াং ভাবলো, গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘুরি বসিয়ে দিই আহ, কিমের চোয়ালে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়লো কাছেই ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে আরো চার-পাঁচজন চীনেম্যান। তাদের সে চেনে। আহ, কিমের দলের লোক তারা। তাদের ঘাঁটানো খুব নিরাপদ নয়।

চে শিয়াং আর কোনো কথা না বলে গাড়িতে ষ্টাট দিলো। মিনি ওয়াঙ আহ, কিমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আহ, কিম হাসলো মিনির দিকে তাকিয়ে।

চে শিয়াং গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো। খানিকটা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো আহ, কিম আর মিনি হাত ধরাধরি করে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মিনির উপর রাগ তুলে গেল সে।

সমস্ত আকোশ এখন গিয়ে পড়লো আহ-কিমের উপর। একটা রাজনৈতিক উম্মা তার অনেক দিন থেকেই ছিলো। সেটা এখন ব্যক্তিগত জিহ্বাসার পরিণত হোলো। মনে মনে একটা সাংঘাতিক সংকল্প করলো সে।

তারপর বেন্টক স্ট্রীটের ট্রাফিকের ভিড়ে মিশে গেল।

এর পর জেনীদের বাড়ি যেতে বেশ খানিকটা নৈতিক সাহস সঞ্চয় করতে হোলো যে চে শিয়াংকে। ব্যাপারটা ওদের বাড়িতে জানাজানি হবে, সেই সম্ভাবনা তাকে বিচলিত করলো।

অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন টিংলিকে সঙ্গে নিয়েই ওয়াঙদের বাড়ি এসে উপস্থিত হোলো চে শিয়াং। টিংলিকে আনলো এই ভেবে যে, সে সঙ্গে থাকলে ওয়াঙেরা তার উপর যতো বিরস্কষ্ট হোক না, সেটা আরেক জন মহিলার সামনে প্রকাশ করবে না। তাছাড়া চিয়েন চাং বীতিমতো উল্লসিতই হবে।

ওয়াঙদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে স্ত্রী চাং চিয়েন চাং-এর কাছে খুব সাদর অভ্যর্থনাই পেলো যে চে শিয়াং। ওয়াং বার বার জিজ্ঞেস করলো, এদিন তার দেখা নেই কেন?

নানা কাজে ব্যস্ত ছিলো সে—জানালো চে শিয়াং।

জেনী খুব স্তম্ভতার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো টি-লিং-এর সঙ্গে।

চে শিয়াং খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো মিনিও এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। খুব সহজ ভাবে কথাবার্তা বলছে, এমন কি তার সঙ্গেও, যেন কোনো দিনই কিছু হয়নি।

একটু নিশ্চিন্ত হোলো চে শিয়াং।

এমন সময় এসে উপস্থিত হোলো দিলীপ। আর সঙ্গে সঙ্গে চে শিয়াং একটি ভাবান্তর লক্ষ্য করলো জেনীর মুখে, যেটা অনুধাবন করা তার মতো বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।

যথার্থি তার সঙ্গে আর টি-লিং-এর সঙ্গে দিলীপের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এমনি লোকটাকে চে শিয়াং-এর খারাপ লাগলো না, কিন্তু যতো বার মনে পড়লো দিলীপকে দেখা মাত্রই জেনীর চোখ-মুখ ঝলমলো হয়ে ওঠা, ততোবারই একটা সন্দেহের ছল বিঁধতে লাগলো তার মনে।

এক কাকে চিয়েন চাংকে জিজ্ঞেস করলো, “লোকটা কে?”

চিয়েন চাং খুব সতর্কতার সঙ্গে সহজ ভাবে উত্তর দিলো, “ক্যানিং ষ্ট্রীটে ব্যবসা করে।”

“তোমার বন্ধু?”

“বন্ধু নয়, চেনা।”

“নিশ্চয়ই খুব ভালো বকম চেনা, তা নইলে বিদেশী লোক, তোমাদের বাড়িতে এত যাওয়া-আসা?”

“খুব যাওয়া-আসা নেই,” চিয়েন চাং উত্তর দিলো, “মাঝে মাঝে আসে, এই পর্যন্ত। এলে কি করবো, তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। এটা দেশের দেশ। তবে হী ইজ নাইস ফেলো।”

চিয়েন চাংকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না চে শিয়াং।

একটু পরে সুরোগ পেতে ওর ভাই স্নং চাংকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “স্নং চাং, এই দিলীপ লোকটা কে?”

স্নং চাং অতো সজাগ নয়, চিয়েন চাং-এর মতো।

বললো, “দিলীপ? সে জেনীর বন্ধু। চমৎকার লোক, খুব ভালো ওয়ল্জ জানে।”

“ওকে এখানে কে এনেছে? চিয়েন চাং?”

“না, চিয়েন চাং ওকে একটু পছন্দ করে না,” স্নং চাং উত্তর দিলো, “ওকে জেনী এনেছে।”

বাস। ফেং চে শিয়াং যা জানবার জেনে গেল।

“জেনী এনেছে? জেনী? জেনী তাহলে দিলীপের সঙ্গেই ভাব

করছে।—এবার একটু একটু করে উত্তপ্ত হতে শুরু করলো চে শিয়াং।—জেনী? জেনী ওয়াও? একটা চীনে মেয়ে? তার সঙ্গে ভাব একজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে? কেন? কলকাতার চীনে সমাজে ছেলে নেই?”

কিন্তু বেশী ভাবপ্রবণ চে শিয়াং নয়। অত্যন্ত পরিকল্পনাপ্রবণ তার মন। জেনীর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সে দিলীপের সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলো।—নিশ্চয়ই সে খুব বড়ো ঘর বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নয়, চে শিয়াং ভাবলো, তাই যদি হতো সে কোনো বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতো এদিকে। চীনে মেয়ের উপর সে যখন আকৃষ্ট হতে পেরেছে তখন সে নিশ্চয়ই সে ধরনের বখাটে ফিরীজি-মন বাঙ্গালী ছেলে যারা এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, চীনা, গোয়ানীজ এদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে বেড়ায়। নাঃ, এর ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না, স্থির করলো চে শিয়াং।

খুব হাসিমুখে আবার ওদের মধ্যে গিয়ে বসলো সে। মন খুলে নানানরকম গল্প কাঁদলো সবার সঙ্গে, বিশেষ করে দিলীপের সঙ্গে। দিলীপের মুখ দেখে মনে হোলো তারও বেশ লাগছে চে শিয়াংকে। টি-লিংও খুব সহজ হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। দিলীপ এমনি বেশ রসিক লোক! নানারকম চুটকি গল্প বলতে ওস্তাদ; তার মুখে নানারকম সব গল্প শুনে প্রচুর হাসলো সবাই, যতো না হাসবার, তার চাইতে বেশী হাসলো ফেং চে শিয়াং আর তার বোন টি-লিং।

কিছুক্ষণ পর টি-লিং বললো, “এবার তাকে যেতে হবে। ফেং চে শিয়াং উঠে দাঁড়ালো। তারপর দিলীপকে বললো, “তুমিও যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে? তোমায় তাহলে বাড়িতে নামিয়ে আসতে পারি।”

“না, ধন্যবাদ, আমি আরো কিছুক্ষণ আছি,” দিলীপ উত্তর দিলো।

তখন ফেং চে শিয়াং বললো, “কাল সন্ধ্যাবেলা কী করছো?”

যদি কোনো কাজ না থাকে তো আমাদের বাড়ি এসো। একসঙ্গে এসে একটু ড্রিং করা যাবে।”

দিলীপ সানন্দে রাজী হলো। এ ধরনের আমন্ত্রণ সে কখনো প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু বিধগ্ন হোলো জেনীর মুখ। আর আতঙ্ক জাগলো চিয়েন চাং-এর চোখে, যখন শুনলো টি-লিং বলছে, “দিলীপ, আমি কিন্তু বসে থাকবো তোমার জন্তে।”

তার পরদিন দিলীপ গেল চে-শিয়াং-এর স্ক্যাটে।

গিয়ে দেখলো, চে শিয়াং নেই। কি একটা কাজে যেন বাইরে গেছে। আসতে একটু দেরি হবে, দিলীপকে বসতে বলে গেছে।

বাড়িতে টি-লিং একা, সে মিষ্টি হেসে দিলীপকে ভেতরে নিয়ে বসালো।

[ ক্রমশঃ ]

“The painter's mind must of necessity enter into nature's mind in order to act as an interpreter between nature and art, it must be able to expound the causes of the manifestations of her laws....”

—Leonardo Da Vinci.



লিলি  
বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ  
ও  
স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ঠাকুরের ভবিষ্যৎ কল্পপট্টা যিনি চালনা করবেন, ভবিষ্যৎ সন্তানদের গিনি প্রেরণা দেবেন, পৃথিবী থেকে বিদার নেবার আগে তাঁকে তাঁরই সন্তানদের হাতে সাঁপে দেবার যেন স্বেচ্ছা হয়ছিল ঐ দীর্ঘ রোগশয্যাটিতে শুয়ে। এই সুদীর্ঘ রোগশয্যাই তাঁকে সাহায্য করেছিল সারদা দেবীর প্রকৃত রূপটি ভক্তদের চোখে ফুটিয়ে তুলতে, তাঁর লুক্কায়িত জীবন থেকে সর্বসমক্ষে তাঁকে টেনে আনতে। নতুবা নহবৎখানার বেড়ার আড়ালে ঐ অপরিচরিত ছোট কুঠুরীখানাতে যে ভাবে তিনি আত্মগোপন করে থাকবার প্রয়াস পেতেন, ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁর কথা কেউ জানতেও পারতো না।

আজকের সাংগতি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও মন্দির, তাই বাজটুকু নিহিত ছিল ঐ দীর্ঘ রোগভোগ জনিত ঠাকুরের কষ্টবিশ্রম সমভাবে চেষ্টিত উন্মুখ ভক্ত সন্তান কয়েকটি এবং সারদা দেবীকে এই অবসরে এক নিবিড় শ্রদ্ধার নিগড়ে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে।

আজ ভগবান পরমহংসদেব সগরায় বর্তমান নেই, এবং সারদা দেবীও তাঁর নখর দেহে জীবিতা নেই। কিন্তু যে মহান শিক্ষা তাঁদের জীবনানন্দে রয়ে গেছে, আজকের দিনে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন তারই ঘরে ঘরে প্রচার ও তারই আলোচনা। আমাদের পতনোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করার অপর কোন অস্ত্র নেই।

সাবনা দেবীর শিক্ষা ছিল 'মাংস খনন অপবের ক্রটি দেখে তখনই সে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে। অস্ত্রের দোষ দেখে তার লাভ কি হয়? শুধু নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করে শুধু সে নিজেই। অস্ত্রের দোষ দেখতে দেখতে তাদের দোষ ছাড়া পরে আর কিছুই তার চোখে পড়তে চায় না।'

সত্যি সত্যিই এ বাণী, এ উপদেশ, সারদা দেবীর কেবলমাত্র মৌখিক

ছিল না। অস্ত্র দিয়ে নিজেও তিনি তা পালন করতেন। তিনি নিজে অপরের দোষ বড় একটা দেখতে পেতেন না। দেবমন্দিরে প্রার্থনাকালে তিনি বলতেন, তাঁর চোখে যেন কারুর দোষ-ক্রটি না পড়ে। সত্য সত্যিই তাঁর এ প্রার্থনা বিফলে যেতো না।

আজ সমস্ত ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্যস্মৃতির আয়োজন চলছে। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনানন্দে যে দেবীশক্তির বিকাশ ঘটেছিল তা দেশের ও দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত উদ্ধাম নরনারীকে স্নিগ্ধ মাহুমন্দ্রে দীক্ষিত করার প্রয়োজন এসেছে।

আমরা ভারতবাসীরা সেই মায়েরই সন্তান হয়ে দেশের যে পবিত্র আদর্শকে হারাতে বসেছি, তা কি তাঁর জীবনকাহিনী আলোচনা করলে আবার ফিরে পাবো না? ভারতীয় নারী আজ পরানুকরণের ফলে পাশ্চাত্য উগ্র স্বাধীনতার মোহে তাদের বিলাস-ব্যসনের আকর্ষণে পথভ্রষ্ট হতে চলেছে, আপন গৃহ সংসারের শান্তির আশ্রয় যে ধর্ম ও সংস্কৃতি, তাকে ভুলতে বসেছে! ভারতের যা কিছু নিজস্ব সম্পদ তাকে অবহেলা করে শান্তিনাশক অনিত্য অসার বস্তুর পিছনে অলস আত্মনের মুখে পতঙ্গের মতই হুঁকার আকর্ষণে ছুটে চলেছে।

আমরা হয়তো ভাবতে পারি, পরম শ্রদ্ধেয়া সারদা দেবী অনন্তসাধারণ হয়েই জন্মেছিলেন। তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তা ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকলে আত্ম-প্রবঞ্চনাই হবে।

সারদা দেবীর জীবনের প্রারম্ভ থেকে অবসান পর্যন্ত আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—তিনি সাধারণের চেয়েও সাধারণ ছিলেন। অতি সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম; সাধারণ ভাবে জীবনযাপন, সাধারণের সাথে মেলামেশা বা সঙ্গ। তাঁর অশন বসন ভূষণ সবই সাধারণ। অসাধারণের কিছুই দেখা যায় না। কেবলমাত্র ত্যাগ নৈঃস্বর্তা ক্ষমা সেবাপরায়ণতা এবং অপরিচরিত স্নেহশীলতা ও কর্তব্য-নিষ্ঠার দ্বারাই তিনি অসাধারণে পৌছতে পেরেছিলেন।

কাজেই অসাধারণের মোহ বর্জন করে প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র-ঐর্ষ্যে ও চরিত্রমাধুর্যের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে ধনী-নিধনী ও ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলে শত গৌরবের মধ্যেও নিজেকে পরাধীন বোধ না করে শত দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেকে দুঃখী বোধ না করে নির্লিপ্ত শান্ত ও তুষ্ট ভাবে চলার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাধারণ থেকে অসাধারণে পৌছবার মূল তথ্য। আর মানব থেকে দেবত্ব আরোহণের পথ। সেই পথেরই নির্দেশ আমরা পাই পরম-আরাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মধ্যে। নতুবা তাঁর মধ্যে আমাদের মত কী-ই না সাধারণ ছিল?

আগেই বলা হ'ল, কত সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম, কত সাধারণ কর্তব্যে তিনি অভ্যস্ত। যে কোন আনন্দে আনন্দ প্রকাশ, দুঃখে দুঃখবোধ; স্নেহে বিগলিতা ভাব, অজ্ঞানে কঠোরতা, সবই তাঁর সাধারণের মত। অতি সাধারণের মতই স্বামিসন্দর্শনে তিনি ব্যাকুলিতা, স্বামিসেবার পুলকিতা। আবার পালিতা কল্যাণী বাবু প্রতি অমুখিতা ও স্নেহ প্রকাশেও দেখতে পাই তিনি কত সাধারণ!

সারদা মায়ের আশৈশব জীবনযাপন এতই আমাদের সর্বসাধারণের মত সাধারণ যে, তিনি যেন আমাদেরই সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে আছেন। তাঁকে আমরা বেদীতে বসিয়ে পরম



প্রভুর পাত্রী বলে গৃহীত করতাই শুধু চাই না, আমরা তাঁকে অন্তরের অন্তরতম রূপটিতেই মেন পাই। অন্তরতম ভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করার সুযোগ পেয়েই আমরা বিচার করতে পারি, কিসে তিনি সব কিছুতেই আমাদের মত এত সাধারণ হয়েও দেবীপদবাচ্য হয়ে এমন অসাধারণত্ব পৌছতে পেরেছিলেন?

এই বিচারে প্রথমেই চোখে পড়ে, সাধারণের মত স্বামিসন্দর্শনে ব্যাকুলিতা হলেও সাধারণের মত স্বার্থসম্পর্কযুক্ত হয়ে স্বামীকে একান্ত নিজস্ব করে অধিকার করতে তিনি কখনো উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। স্বামী তাঁর প্রিয়তম ছিলেন বটে, তাঁর অন্তরের অন্তরতম ধ্যানের দেবতা পরম ইষ্টদেব ছিলেন। তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন তাঁর সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান, তাঁরই ধ্যান, তাঁরই চিন্তা, সারদা দেবীর জীবনে অমুক্ষণের সাথী ছিল। স্বামীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলা, তাঁরই ভাবে ভাবিত হওয়া, তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বামীকে সেবা করা, কাছে পেতে চাওয়া, স্ত্রীলোক হিসাবে তাঁর আত্মনিক কামনা হলেও সে অধিকারকে তিনি অনায়াসে অপরের হাতে তুলে দিয়ে হঠাৎচিন্তে থাকতে পারতেন। এসব ক্ষেত্রেই তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের এক ধাপে উঠতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃই ছিল তাঁর 'অনুগ্রহম্ সুখম্'। যা কিছু পাবার তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল তার অনায়ে

কখনোই তাঁকে মনের প্রকল্পতা হারাতে বা অপরকে দারী করতে শোনা যায়নি। স্বকৃত পুণ্যার্জনে প্রাপ্তি এবং পুণ্যের অভাবে হারানো এই বিচারে তিনি তুষ্ট হ'তেন।

কল্পা, ভগিনী স্ত্রী ও মাতৃরূপে নারীর যে কয়টি মহিমাময়ী রূপ আমরা জানি, অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্য থেকে আপনি ব্যক্তিগত চারিত্রিক মহিমায় ও অপরিমিত মনোবলে তিনি সে সব কয়টিতেই কি ভাবে অসাধারণ পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা দেখছি। সাধারণের মত বিন্দুমাত্র স্বার্থগন্ধও তাঁকে তাঁর কোন একটি রূপেই সাধারণ গণ্ডিতে আটকে রাখতে পারেনি। এই ছিল তাঁর অসাধারণত্ব পৌছবার মূল মন্ত্র।

সারদা দেবী ছিলেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি। তার সঙ্গে সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও করুণা তাঁকে এক অপূরণ রূপ দিয়ে মানুষের মনে ভগবতীর আসনে স্থান দিয়েছিল। ভারতীয় নারীশক্তির আদর্শই তাঁর জীবনখাতার পাতায় পাতায় ভরা।

পৃথিবীতে তো অনেক সাম্রাজ্যবাহী রাজ্যশাসন করে শ্রবণীয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অশিক্ষিতা লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী দারিদ্র্যপিষ্ঠা পল্লীরমণী সারদা দেবীর তুলনা হয় না। সেই সব মহৎকুলশীলোদ্ভবা রাজারা সকলেই শ্রবণীয়া সন্দেহ নাই কিন্তু

## মনের কথা

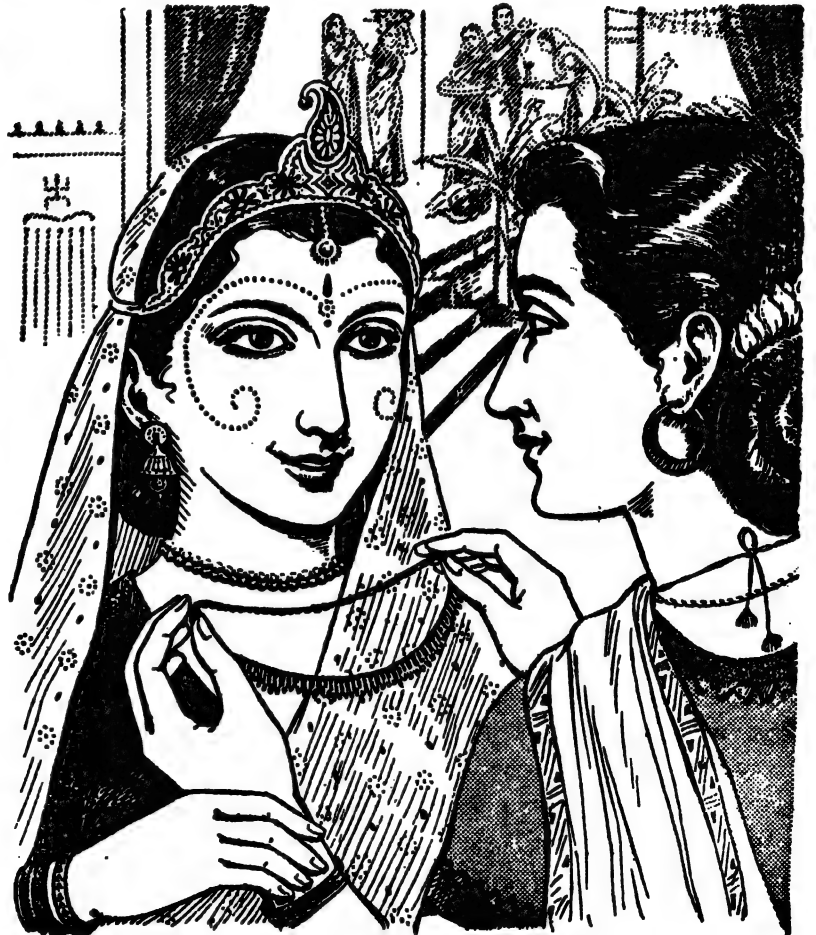
"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের ক্রটিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই ধুলী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিলি সানার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-অলংকার  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



আমাদের মা সারদা দেবী শুধু স্ববীয়াই ন'ন, তিনি সকলের স্ববীয়া, বন্দনীয়া, বরণীয়া ও নমস্তা।

তাঁরা অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করে, ঐশ্বর্যবিলাসে প্রতিপালিতা হয়ে, স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করে, প্রজাবটে ঐশ্বর্যে প্রজাদেব প্রতিপালন করে গৌরব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সাবদা দেবী সম্পূর্ণ ভিন্ন পবিত্রত্বিত্তে জন্মগ্রহণ করে দাক্ষিণ্যত্বে পিষ্টা হয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে বেখেও একমাত্র উদার হৃদয় বিশ্বপ্রম সেবাপ্রায়ণতা ও আত্মবিলোপে চরম পবাকাস্তা দেখিয়ে অগণিত লোকের মর্দসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

দাবিদ্যাপিষ্টা লজ্জাশীলা একটি পল্লীবালিকা, মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে যে সেবা ও আত্মদানের ব্রত নিয়ে দক্ষিণেশ্বর স্বামীব কাছে এসেছিলেন, উত্তরকালে দেবীকপে সর্বাঙ্গিত হয়েও সে সেবাব্রত থেকে বিলুপ্তমাত্রও বিচ্যুত হ'ননি। তাঁকে আমবা শেষজীবন পর্যন্ত অভিমানশূন্য আত্মোৎসর্গীকৃত সেবানিবতা জগজ্জননী ব্রত অপাধিব স্নেহে প্রেমে ধনী নির্ধনী উচ্চ নীচ নিকরিশেষে সমজ্ঞানে ব্যবহাব করে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হতে দেখতে পাই, 'তা পৃথিবীর সকল রাজমহিবীর রাজসম্মানকেও ছাড়িয়ে যায়।

আগন অন্তবেব ঐশ্বর্য সাবদা দেবী কথনা প্রচাব কবেননি। বরু সঙ্কোচ ও দৈন্তের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হ'তেন। আশুন যেমন ছাইচাপা থাকে না, তেমনি তাঁর মহিমাও লুকিয়ে থাকেনি। আপনি ফুটে বর হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভক্তহৃদয় ছাড়িবও সর্বসাধারণের মধ্যে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আধুনিক উগ্রস্বাধীনতার যুগে সাবদা দেবীর পবিত্র জীবন কাহিনী বহুল ও ব্যাপক প্রচার হ'লে আমবা ভাবতীয়া নাবী ব্রহ্মে পাবি যে, স্বাধীনতার বা প্রকৃত রূপ তা কোনকালেও কোন আবরণেই ঢাকা থাকেনি ও থাকতে পারে না। তথাকথিত চরম পবাব'ন ও কুসংস্কারপূর্ণ গৌড়ামীর যুগে অবশেষেব আড়ালেও শ্রীশ্রীসাবদা দেবীর যে স্বাধীন স্বতন্ত্র রূপখানি আমাদের চোখে পড়ে, সাবা বিশ্ব তা অমুকরণীয় ও আকাঙ্ক্ষনীয়।

সাবদা দেবীকে লড়াই করে এ ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করতে হয়নি। অন্তবেব ঐশ্বর্যের সাথে ধর্মের মহান বন্ধনই তাঁকে দেশকালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এ স্বাধীন রূপখানি দিয়েছিল। এ স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা আজকের যুগের প্রগতি যুগের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা থেকে সম্পূর্ণই পৃথক। তাতে কোন উগ্রতার লেশমাত্র নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠাব কোন চেষ্টা নাই, সবল মত প্রকাশেরও কোন দাবী নাই। তাতে আছে শুধু সত্য সত্য প্রাণবন্ত একটি গতি, ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গীকৃত নিপুণ সেবা, পবন পবিত্র বিশ্ব-মাতৃস্নেহ এবং অপূর্ব ত্যাগ, ক্রমাধিকার ও পবদোষদর্শিতাব একান্ত অভাব। সর্বোপরি নিবহৃদয় ও নিবভিমানযুক্ত একটি দীনভাব।

সাবদা দেবী তাঁর অমর জীবন যাপন করে আগত অনাগত সকলের জন্য তাঁর সবল অনাড়ম্বর ও শিক্ষাতথ্যপূর্ণ জীবনযাপন কাহিনী ও অমর বাণী বেখে ২০শে জুলাই ১৯২০, বাংলা ৪ঠা শ্রাবণ ২৩২৭ সনের মঙ্গলবার তাঁর নববদেহ ত্যাগ করে ভগবান রামকৃষ্ণের সঙ্গে চির-মিলিতা হ'ন।

জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তিম-বাণী ছিল 'যদি মনের শাস্তি

কাম্য হয়, অন্তবেব দোষানুদর্শন হ'য়ে না। বরু নিজের দোষ দেখো। গোটা পৃথিবীকে আপন করতে দেখো। এখানে কেউ পব নয়, এই পৃথিবী তোমাদেরই একান্ত নিজের।'

তাঁর বাণী এমনই উদার ও বিশাল যে, এ ব্রহ্মেব সকলশ্রেণী সমভাবে শরণ নিতে পারে। এখানে নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা আচাব নানা ধর্ম বা নানা বিচাবের কোন জায়গা নাই। খালি আছে সব কিছুকে মিলিয়ে এক মহামানবতা। এক স্বর্গীয় অকুণ্ঠ প্রেমসমুদ্র। যাব অবগাহনে সন্ত মুক্তি সন্নিহিত। যাব লক্ষ্য মোক্ষ। কর্তব্য—সেবা। বন্ধন—ধর্ম।

শেষ

বর্ষণান্তে

রাণী দেবী

যেমে গেছে বর্ষণ গগনীর গর্জন,  
থমথমে পল্লব সিক্ত।  
সুন্দর স্বনন সন স্নাত্ত প্রভঞ্জন,  
এলো অবশেষে নিশীথিনী নীপবনে,  
চুবি কবে নিখিলেব গুপ্তন।  
মঞ্জীর চরণে মৃদু মৃদু গমনে,  
এলো এ'কে আঁখিকোণে অঙ্গন।  
হেসে ওঠে চন্দ্রমা লজ্জিত হ'লো অমা,  
জন্তে লুকালো যত কালিমা।  
পুঞ্জিত কালো মেঘে অধব ছিল ঢেকে,  
চকিতে খচিত হলো নীলিমা।  
বিশ্বমে দেখি চেয়ে বিশ্ব আলোব ছেয়ে,  
গলানো রূপোব যেন বজ্রা।  
বলয়ল তরঙ্গল কিরণে সমুজ্জল,  
সজল যুধিকা হলো ধ্বজা।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

স্মৃতিতাব একঘেয়ে বাঁধাধবা জীবনের মাঝে হঠাৎ এলো বিচিত্র ভাবের বড়। অসীমেব আবির্ভাব তাব জীবনে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বোমাধকর।

চৈত্রের মধুর সন্ধ্যাকাল। নিজের ঘরে বসে স্মৃতিতা তানপুর্বাতে শ্রব দিয়ে বসন্তবাগেব আলাপ শুরু করেছেন। সামনে তাব সঙ্গীত-শিক্ষক ওস্তাদ আনোয়ার খাঁ উপবিষ্ট। করবীও উপস্থিত ছিলো সেখানে, স্মৃতিতাব গান শেষ হলে তারটা শুরু হবে।

কোনো খবর না দিয়েই অসীম প্রবেশ করলো ঘরে। স্মৃতিতা হঠাৎ ওকে দেখে গান থামিয়ে দেয়, বসে থাকে মুখ নীচু করে...

শুধু তানপুরার বুক জাগিয়ে রাখে সুরের মৃদু ঝঙ্কার। যেত গোলাপের মত ওর দুটো গণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো লজ্জাকর আভা।

করবী উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্তে বলে—কি সৌভাগ্য! আশ্রন, আশ্রন!...ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

অসীম সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট ধরায়। তার পর বলে, গান থামালে কেন স্মৃতি? বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তোমার গান, ভারি চমৎকার লাগছিলো, আমাকে দেখলে গান থেমে যাবে জানলে, বাইরেই থাকতাম।

তরুণ ওস্তাদ আনোয়ার, একটা বক কটাক্ষ নিক্ষেপ করে দেখলো এ বাড়ীর নতুন আগন্তুককে। তার পর ছাত্রীর দিকে চেয়ে বলে,—আজ-কাল গানে আপনার মোটেই মনোযোগ নেই স্মৃতি দেবি! এ রকম গাফিলতি যদি আপনি করেন তো আমি কি করতে পারি? আপনার দিদিমাকে কৈফিয়ত তো আমাকেই দিতে হবে?

মৃদু হেসে সে কথার জবাব দেয় করবী,—ওর দোষ নেই ওস্তাদজী! মনটা একেই খারাপ ছিল, তার ওপর ওর বাবা চলে যাওয়াতে আরো বিমনা হয়ে গেছে। আরো দু-চার দিন যেতে দিন, আরো সব ঠিক হয়ে যাবে। নে মিতা, গানটা শেষ কর্।

আবার গান শুরু করলো স্মৃতি। কিন্তু হারানো সুরকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারলো না। বারে বারে সুরের ছন্দপতন ঘটতে লাগলো।

বড় অবস্থি বোধ করছিলো সে। অসীমের শাণিত ছুরির মত চোখ দুটো দিয়ে তপ্ত আভা যেন ঠিকরে পড়ছিলো ওর মুখের ওপর। কোনো রকমে সে গান শেষ করে তানপুরাটা নামিয়ে রাখল। করবী সেটি তুলে নিয়ে গানের জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বসলো।

অসীম স্মৃতির দিকে চেয়ে বললো—তোমার চেহারা দেখছি ভারি খারাপ হয়ে গেছে মিতা, অসুখ-বিসুখ করেনি তো? তোমার বাবা তোমার তত্ত্বাবধানের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন, সে কাজ তো এখন থেকে আমাদেরই করতে হবে।

স্মৃতি মৃদু কণ্ঠে বলে—আমি ভালোই আছি।

অসীম উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বলে—এসো না, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি মিতা! বেশ মেঘলা দিনটা আছে। বাইরের হাওয়া-বাতাস লাগলে শরীর মন দুটোই তাজা হবে। দিন-রাত বাড়ীতে আবদ্ধ থাকলে ও-দুটো জড়ভাবাপন্ন হয়ে যায়।

চোখ তুলে চায় স্মৃতি অসীমের দিকে। কি ছিলো ওর চোখ দুটোতে? বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব! পুরুষের আকর্ষণ?

অসীম আবার ডাকে—দেবী কোরো না মিতা, চলে এস।

সে ডাকে ছিলো আদেশের সুর। সে আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি স্মৃতির ছিল না। ঠ্যা, মনে মনে সে-ও চাইছিলো, বাড়ীর অবাস্তিত্ব সঙ্গ ও আবহাওয়া থেকে কিছুটা সময় পালিয়ে থাকতে।

চট করে শাড়ীটা পান্টে নাও মিতা!

কুণ্ঠিত পদে দু-চার পা অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায় স্মৃতি, নিজের শাড়ীর আঁচলটা ধরে নাড়া-চাড়া করে। শাড়ী পান্টাবে? না থাক, দিদিমা গেছেন মার্কেটে; যদি ফিরে আসেন তাহলে? এতটা হুসহাস দেখানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—কি হল? কাপড় ছাড়বে না? বেশ তো, কোনো প্রয়োজন নেই। বেশ চমৎকার আসামানী শাড়ী তো রয়েছে তোমার পরনে, এতেই মানিয়েছে তোমাকে বিভীষিকা। এসো, আর দেবী নয়। করবীর দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করে অসীমের সঙ্গে বেরিয়ে যাব স্মৃতি।

করবীর বিস্ময়িত দৃষ্টি ছিলো ওদের গতিপথ পানে। ব্যর্থতার ঘানি বৃকের ভেতর গুমরে উঠছিলো, পরাজয়ের হতাশা চোখে-মুখে!

সমস্ত রাগ নিক্ষেপ করলো মায়ের ওপর। সেই কোন দুপুরে যে বেরিয়েছেন, বাড়ী ফেরবার নামটিও নেই! তিনি স্মৃতি খাকলে, মিতা ওকে কলা দেখিয়ে একলা অমন করে কি যেতে পারতো অসীমের সঙ্গে?

—আর মিতাই বা কি ধরণের বেহায়া মেয়ে? হলেই বা সন্দামের কাকা! বয়সে তো এমন কিছু বড় নয়? একবার তু করে ডাকলেই কি ছুটে যেতে হয়? বোকা মেয়েটার কবে যে একটু বুদ্ধি-সুস্থি হবে!

কাটা ঘায়ে ওর আবার মূগ ছিটিয়ে দিলো ওস্তাদ আনোয়ার ঝাঁ। —আর মিথ্যে বসে থেকে লাভ কি করবী দেবি! গান আরম্ভ করুন। কিছু মনে করবেন না; বলছি যে স্মৃতি দেবী হঠাৎ ওর সঙ্গে বাইরে গেলেন, ব্যাপারটা যেন ভালো ঠেকলো না আমার চোখে। মানে আপনাকেও তো সঙ্গে নেওয়া যেতো।

আহতা ফণিনীর মত কৌস করে উঠলো করবী।—আপনি আমাকে কি এতই অপদার্থ ভাবেন ওস্তাদজী? যে একবার তু করে ডাক দিলেই আমি ছুটে যেতাম ওদের সঙ্গে? নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে মিতার; সে বিষয়ে আর আমাদের মতামত প্রকাশ করা অবাস্তব।

তানপুরায় মনোযোগ দেয় করবী। কিন্তু সেটাও যেন আজ বিগড়েছে। সুরটা যেন কেমন বেতাল। সব সমস্তার মীমাংসা করলেন মায়ী দেবী। চট-পট চটির শব্দ তুলে, সগুদা-করা এক বোঝা জিনিষ নিয়ে ঘরে ঢুকে, ইঁফাতে ইঁফাতে সোফায় বসে পড়লেন।

মাখন, জেলি, কেক, বিস্কুট, চকোলেট তার সঙ্গে স্নো, পাউডার, আরো কত কি, একটির পর একটি ব্যাগ থেকে বার করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—মিতা কোথায় যে কবি? ডাক তো তাকে। আহা বাপ চলে গিয়ে মেয়েটা বড় মনমরা হয়ে গেছে।

ঠোট উটে জবাব দেয় করবী—সে একটু সাদ্কা ভ্রমণে বেরিয়েছে, অসীম বাবুর সঙ্গে।

—ও মা, সে কি কথা গো? দিদিমা বিশ্বাসে গালে হাত দেন।

—আর তুই তো বাছা মরা মানুষ নোস, ওকে একলা যেতে দিলি কেন তার সঙ্গে? নিজেও যেতে পারলি না? শুভোকে আর কত শেখাবো বাছা?

ছিলোইঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় করবী। ভিত্তি কণ্ঠে বলে, তোমরা সকলেই আমাকে কি ভেবেছো বল তো মা? আমার রূপ নেই বলে কি আত্মসম্মান বলেও কিছু নেই? অসীম বাবু মিতাকে ডাকলেন সঙ্গে যাবার জন্তে; আমার সঙ্গে একটা কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করলেন না! আর আমি কি না যেতে যাবো তার সঙ্গে? কেন? কিসের জন্ত এত হীনতা প্রদীকার করবো, বলতে পারো?

তুমুল ঝড়ের পূর্ব নিশানা দেখে উঠে দাঁড়ায় ওস্তাদ আনোয়ার। মায়! দেবীকে নমস্কার জানিয়ে দ্রুত পদে পালায় ঘর থেকে। শীকার হস্তচ্যুত হওয়াতে মায়! দেবীও বৈধ্ব্য হারিয়েছিলেন, চিৎকার করে বললেন—কিসের জন্তে জানো না?—এত দিন ধরে বড়লোকের বাড়ীর পার্টিতে, জলসায় তোমাকে নিয়ে কত ঘোরাঘুরি করলাম; বাড়ীতে কত ছেলে ধরে নিয়ে এসে মুঠো-মুঠো পরের টাকা খরচা করে চায়ের মজলিশ বসলাম।

স্মৃতির নাম করে এক গণ্ডা মাঠার রেখেছি নাচে, গানে, সব বিষয়ে তোকে এরিষ্টোক্রট করে তোলবার জন্তে! সব কি আমার ভ্রমে ঘি ঢালা হল? আজ পর্যন্ত তার ফল দেখা দূরে থাকুক একটা কুঁড়িরও নাম-গন্ধ নেই?

ছি! ছি! কি ঘেলা! কি ঘেলা! রাগে মুখমণ্ডল তাঁর রক্তিমবর্ণ! খাসপ্রখাসের গতি অস্বাভাবিক, ঘম্মাক্ত কলেবর।

চৈচামেটি স্তনে অনিল কখন এসে দাঁড়িয়েছিলো ঘরে, নিঃশব্দে স্তনছিলো মায়ের প্রলাপোক্তিগুলো। শাস্তকণ্ঠ বলে সে,—আহা এত চৈচামেটি করছো কেন মা?

দোষটা কি করবির? সে তো চেহারাটা পেয়েছে তোমারই মত! তাকে ঘষে-মেজে, নাচিয়ে গাইয়ে তো একটা অপরূপ কিছু করতে পারবে না। বড়দির ছিলো বাবার মত রূপ, সেজন্ত তাকে বড়লোকের বাড়ী বিয়ে দিতে বেগ পেতে হয়নি! সব মেয়েরই সে ঐরকম ঘরে বিয়ে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই?

আমাকে বলো না—কত পাত্তর চাই তোমার? আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অনেক পাওয়া যাবে। ও সব রাজা-উজির, জজ-ব্যারিষ্টার জুটবে না, ওর জন্তে আর মাথা ঘামিও না।

মায়! দেবীর স্রোতবহ্নিতে যেন ঘুতাহতি পড়লো! কোমরে হাত দিয়ে, সপ্তমে কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন—বটে! কত হাতি গেলো তল, এখন ফড়ি বলে আমার এক হাঁটু জল!

এই আজ থেকে আমি চুপ করলাম, দেখি তোমাদের ভাই-বোনের দৌড়টা। জামাইয়ের পরসায় নবাবী আর কত দিন চলবে? এবারে আসছে তার আসল মালিক। নিজেরা চরে খুঁটে খেতে শেখো। আমি তো ঢের করলাম—ঘটে কিছু বৃদ্ধি ছিলো, বড় বড় ঘরের সঙ্গে মেলামেশা করবার মত ক্ষমতা আর শিক্ষা ছিল, তাই রাজ-হালে রাখতে পেরেছিলাম তোমাদের। বাপ তো রেখে গিয়েছিলো অষ্টরজা। সম্বলের মধ্যে তো ঐ বাড়ীখানি। তা জামাইটাকে এত চেষ্টা করলাম বেশে আনবার, সে কি আমার সুখের জন্তে ঐ পোড়াকপালীটা যদি ঠিক মত আমার কথা-মনে চলতো, তবে সোমনাথ তো কোন ছার—স্বয়ং বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙিয়ে আমি ছাড়তুম। হুঁচর দিন চেষ্টা করে উনি দিলেন রণে ভঙ্গ! তার পর কোথায় ক্লাব কোথায় লেক—যতো সব হাবাতে ঘরের ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে দিন-রাত হৈচৈ করে বেড়াতে লাগলেন! তা পারলি একটা কই-কাঁতলা গোছের কিছু গাঁথতে? তাহলে বুঝতুম কামতাতা।

জোড়হাত করে কারাভরা গলায় বলে করবী!—চুপ করো মা, ঢের বলেছো এবারে থামো! জামাই বাবুর পরসায় রাজভোগ আর আমার দরকার নেই; নাচ-গানও আজ থেকে আমার শেষ হল।

সোহাই তোমার মা! আর আমার জন্তে তুমি ভেবো না! আমার নিজের উপায় আমি নিজেই করতে পারবো। আরো জেনে রাখো,—তোমার ঐ কই-কাঁতলা ধরার পদ্ধতিটাকে আমি বুঝা করি। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না...হবে না...ঝড়ের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো করবী!

অনিল বিশ্বম্ভর! হুঁচোখ মার দিকে মেলে দিয়ে বললো—আজ তুমি এ সব কি বলছো মা? বাবা কি রেখে গেছেন, কিসে দিন চলছে আমাদের, সে কথা কি কোন দিন জানতে দিয়েছে। আমাদের? আর জামাই বাবুর বাড়ীতেই বা কেন আমাদের এনেছে? এত বিলাসিতা করবার শিক্ষা তো তোমার কাছেই পেয়েছি আমরা। আমাদের অবস্থামাফিক্ চাল-চলন কেন শেখাও নি আমাদের? কাক হয়ে মনুরপুচ্ছ ধারণের এ বিভ্রম্না ভোগ কেন?

যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে। লেখাপড়া যখন শিখেছি পেট চালাবার উপায় একটা হবেই। রাগের মাথায় সত্যি কথাগুলো বলে ফেলে আজ উপকারই করলে আমাদের। চকল পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনিল।

আয়েফগিরির অগ্ন্যুৎপাত শেষ হয়েছে। এবার ভয় আর তখুজল ফরমের পালা।

সোফায় বসে নিজের হঠকারিতার জন্ত নিজেকে বারংবার থিক্কার দিলেন মায়! দেবী। অমৃতাপ-ভয়ে রোদান্ত অন্তর। হুঁচোখে নেমেছে তন্তু অশ্রুধারা।

হায়! হঠাৎ এক নিবৃদ্ধিতার পরিচর দিলেন তিনি? এমন বৈধ্ব্যচ্যুতি এর আগে তো আর কখনও ঘটেনি তাঁর জীবনে?

কত বাধা-বিপত্তি, কড়-ঝাপটা তো বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। অসৌম্য বৈধ্ব্য, অধ্যবসায় বলে বরাবর জীবনযুদ্ধে জয়মাল্যই তো এসেছে তাঁর ভাগ্যে?

তা-না হলে, বিলম্বতকরং বড় ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে একটা পশারহীন উকিলের সঙ্গে ঘর করা কি সাধারণ কথা? কত বৃদ্ধি খাটিয়ে তবে বাইরের পালিশটা বজায় রাখতে হয়েছিলো—সেজন্তেই তো এক পরসায় জমানো সম্ভব হয়নি—বিলিতি কেতাহরন্ত সমাজে তা না হলে আনাগোণা করা সম্ভব হতো?—বাইরের তাঁকজমক দেখে তারা কখনও বুঝতে পেরেছে যে মানুষটার মাসের আয় সাত আট শোর বেশী নয়?

এর ওপর আবার কর্তা গিয়ে তাও যখন বন্ধ হয়ে গেলো; তেতলার ফ্ল্যাট থেকে, বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে কি লজ্জায় ছিলেন ক'টা বছর। তবুতো তখন বড় মেয়ের গোপন সাহায্য ছিলো,—কিন্তু সেই অনাযুখো বিধাতা পুরুষ যে তাঁর একটু স্বখ দেখলেই বুক চড়চড়িয়ে মরেন, তা-নাহলে, কি-ই বা এমন হয়েছিলো তার? বছর বছর পাড়ার মেয়ে বোঁগুলো বিরোচ্ছে; সব তো ঠিক বজায় আছে? আবার এত ঐশ্বর্য্য এত যত্নের মধ্যে থেকেও বাছা আমার রেহাই গেলো না!

—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন মায়! দেবী।

—এত কষ্টের পর,—জামাইয়ের বাড়ীতে একটা বছর বা হোক একটু স্বস্তিতে কেটেছে! ছেলেটাকে মানুষ করতে পেরেছেন,—কিন্তু ঐ অলুকুণে মেয়েটা? কম মাথা খেলিয়ে পরিভ্রম করত হচ্ছে ওর জন্তে? তার কিছু বুঝলো না? শুধু অবস্থা গোপন করার জন্তে সোবের ভাগী করে গেলো তাঁকে! নির্দোষ,—আহাম্মক আর ক'কে বলে?

সন্ধ্যা সমাগমে, বিলাসচকল কলকাতা মহানগরী। অসীমের গাড়ী ছুটে চলেছে। চৌরঙ্গী, রেড রোড, ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে দু'চার পাক ঘোরাফেরা করবার পর সে বললো—এবারে কোথায় যাবে মিতা?

—আমি তো রাস্তা-ঘাট চিনি না,—চলুন যেখানে হয়, যুহুঁয়ে জবাব দেয় স্মৃতি।

—ঠিক আছে—চলো আমার ক্লাবে যাই।

গাড়ীখানা বেন উড়ে চলেছে। স্মৃতি শঙ্কিত চিন্তে জড়োসড়ো হয়ে বসবার চেষ্টা করে,—বারে বারে ওর গায়ে লাগছে অসীমের হাতের যুহু ধাক্কা। [ক্রমশঃ]

## রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু

### ইন্দ্রাণী বসু

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে মহান রূপে দেখেছিলেন। মৃত্যুর মহিমা তিনি কত ভাবে তাঁর কাব্যের ভিতর যে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। জন্ম হলোই মৃত্যু অবশ্যস্বাবী। জন্ম ও মৃত্যু একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মৃত্যুর অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবী এত সুন্দর মনে হ'ত কি না সন্দেহ!

আমরা সাধারণ লোকে মৃত্যুভয়ে সর্বদাই কাতর। কিন্তু গুরুদেব মরণকে উদ্বেগ করে বড় কাব্যই যে রচনা করে গেছেন!

আমরা আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোককাতর হয়ে ক্রন্দন করি। কিন্তু কবি বলেছেন,—

“নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বুখা শোকে  
নয়নাঙ্গপার।

ছিলে যারা রোষভরে বুখা এত দিন পরে  
করিছ মার্জনা।”

আমরা মৃত্যুর রূপ কল্পনা করার সময় তার ভয়াল ভয়ঙ্কর বৃত্তির কথাই সর্বাগ্রে ভাবি। কিন্তু কবিগুরু ‘মরণ’ কবিতাটি থেকে তাঁর দেখা মৃত্যুর রূপ দেখি অন্ত ভাবে।

“মরণ রে

তু'হ মম শ্রামসমান।

মেঘবরণ তুম, মেঘ জটাজুট,

রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,

তাপবিমোচন করুণকোর তব

মৃত্যু অমৃত করে দান।”

গুরুদেব এখানে মেঘবরণ মৃত্যুর ভিতরেই তাপবিমোচনকারী, অমৃতদাতা মৃত্যুকে দেখেছেন।

মৃত্যুই যে শান্তি, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে কত দূর চিন্তাশক্তি, কত দূর মনের জোর থাকা প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। আমরা কবির এই চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই “মৃত্যুর পরে” এই কবিতাটিতে। এখানে কবি বলেছেন,—

“আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুলভ্রান্তি  
সব গেছে চুকে।”

মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যায়, এ প্রশ্ন আমাদের সকলের মনেই কখনও না কখনও জাগে। কিন্তু আমরা নিজেরা কখনও

উত্তর দিই নিজেদের সাধনা দিতে পারি না। কিন্তু কবির মনেও যখন এই প্রশ্ন জেগেছিলো তখন বলেছেন,—

“বুখা তারে প্রশ্ন করি, বুখা তার পারে ধরি  
বুখা মরি কেনে—

খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে, কোন অঞ্চলের তলে  
নিয়েরে সে বেধে।”

তারপরেই আবার নিজের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন,—

“পলকে বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুখা যায়  
সে যে অনন্তের।”

এই যে বোঝার ক্ষমতা এ কত দূর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তবে সম্ভব, এটা আমরা সকলে একটু তলিয়ে দেখলেই হৃদয়ঙ্গম করব।

কিন্তু এত জ্ঞানী ব্যক্তিও এক জায়গায় তাঁর ভীতির কথা বলে গেছেন। মৃত্যুকে এক সময় তিনিও ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতেও তাঁর সময় লাগে নি। তিনি বলেছিলেন,—

“মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে  
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।”

এই একই কবিতাতে আবার ভুল ভাঙ্গার কথা বলেছেন শেষে,—

“স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে  
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।”

সবশেষে আমার মত মরণভয়ে ভীত সকলকে তাঁর আশার বাণী শুনিতে শেষ করছি—

“চিন্তা-আসন দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে  
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—  
মর্মে জাগারে দিবে প্রাণ।

## আজ এই সন্ধ্যায়

### অনুজ্ঞা দেবী

আজ এই সন্ধ্যায়

আমরা দু'জনে হাতে হাত রাখি বসিলাম ঘাসের পরে,

দিগন্তের অসীম সীমায়

আমাদের কথাই স্থল্লিখনে লিখে দিল কে যেন

ইন্দ্রধনু ঝিলিক-হানা অন্ধরে।

আমার অনুভূতির নায়িকা বাতাসের শিহরণ নিয়ে

তুমু চেয়ে রইল

সেই দিগন্তের পানে।

বাঁধনের ভীতি নেই, চিরধৈর্যক্ষমালীল প্রান্তর

ভরে উঠছে গানে।

তবু তার অন্তর কেন কাঁপে :

কেন নিরাশার মগ্ন জপে।

মনে হয় আকাশের বাণী

তেপলা ওই কাচের বখে চড়ে

কিছু বলে যায় ওর কানে, যে কথা ও জানত না :

বড় কি পেয়েছ ব্যথা? হে সখি,

চাও কি সাধনা?



# সাহিত্য পরিচয়

## লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক

পাঠক-পাঠিকা হুততো লক্ষ্য ক'বে থাকবেন, আমাদের দেশের স্বাধীনপত্রে দেশের গুণীজনদের জন্মবার্ষিকী অপেক্ষা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সংবাদই অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাঙালী জাতি সম্মান দেপায় মৃতদের এবং জীবিতদের প্রতি কোন নজর দেয় না। এক কথাও সত্য যে, আমাদের মধ্যে কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বিদেশীরা সম্মানে ভূষিত না করা পর্যন্ত আমরা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় নি, বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের মধ্যে তাঁদের নিম্ন পর্যায়ের নামাতে চেষ্টা ক'রেছি। প্রমাণস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা যায়। নোবেল পুরস্কার লাভের পর বঙ্গদেশবাসীর দৃষ্টি পড়ে কবির প্রতি—যেজন্ত তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। বর্তমানেও বাঙালী জাতির এই মজাগত অভ্যাসটির কোন পরিবর্তন হয়েছে, তেমন কথা আমরা বলতে চাই না। হুঃখের বিষয়, সম্প্রতি হুঁজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্মতিথি পালনের আমন্ত্রণপত্রে দেখলাম, আহ্বানকারীরা লেখকদের পুত্র-কন্যাগণ ছাড়া অগ্র কেউ নয়। লেখকদের বংশধরদের নামের পরিবর্তে প্রকাশকদের নাম দেখতে পাওয়া গেলে আমরা হুঃখিত হ'তাম না। আরও সুখী হ'তাম, কোন সংশ্লিষ্ট নামের বদলে তৃতীয় জনদের নাম দেখলে। বাই হোক, হুঁজন বিখ্যাত লেখকের পুত্র-কন্যারা তবু কর্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, প্রকাশকরা এমন ক্ষেত্রে কেন নীরব থাকেন? উক্ত হুঁজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্যতীত বর্তমান বাঙালী সাহিত্যে আরও অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন—বাঁদের জন্মতিথি পালন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু, তাঁদের গুণাবলিগণ যে-কোন কারণে তিথিপালনে উত্তোগী হ'তে পারেন না, সেই হেতু তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই বিস্মৃত ও অনাদৃত থাকবেন—এই যুক্তি অর্থহীন। আমাদের দেশবাসীর স্বক্ষে দোষ চাপালেও কোন লাভ হবে না, আমরা জানি। 'বাঙালী আত্মতোলা জাতি' কথাটি তা হ'লে প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'তে পায় না। কিন্তু প্রকাশকদের দায়িত্ব থাকবে না কেন? প্রকাশক দিনের পর দিন বাঁদের লেখকে পণ্য করছেন এবং হুঁ পয়সা করে তুলছেন, তাঁদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি দান করুন—আমরা সবিনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি। বিদেশের প্রকাশকরা অগ্র দৃষ্টিকোণে দেখে লেখকদের। লেখকদের প্রচারের আর লেখকদের জীবনের রাগার চেষ্টা তাঁদের অনগ্রসাধারণ। আমরা যে অল্পান্ত লেখকটিকে আমাদের ব্যবসা-বিপণির সদর দরজার শীর্ষে বসিয়ে থাকি সন্মান, তাঁর নাম শ্রীগণেশ। এমন প্রচেষ্টায় আমাদের ব্যবসাবুদ্ধি বা বাণিজ্য-লাভের লোভ প্রমাণিত হয়—ভক্তির

নামগন্ধ থাকে কি না, সেটি প্রমাণ-সাপেক্ষ। গণেশ লিখে চলেছেন অবিরাম। প্রকাশকদের তাঁকে 'রহালটি' দিতে হয় না একটি কপর্দকও। কিন্তু আসলে বাঁরা লিখছেন এবং প্রকাশকদের ব্যবসাকে চালু রেখেছেন, তাঁদের দান দিতে হয় কিছু কিছু। আমরা বলি, এই আর্থিক দেনা-পাওনার সম্পর্ক থাকলেও শুধু মাত্র টাকা দিয়েই প্রকাশকদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আধুনিক যুগের প্রকাশকদের কর্তব্য এত সামান্য সীমায় আবদ্ধ নয়। বটলার যুগের সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটের 'কেতাবপাটির' যুগ তুলনা করা চলে না। প্রকাশকরা যেমন মন থেকে চেয়ে থাকেন লেখকদের লেখার উত্তরোত্তর উন্নতি হোক, তেমন লেখকরা যদি অন্তর থেকে কামনা করেন, প্রকাশকদের মনোবৃত্তির উন্নতিটা যেন অবনতির দিকে না নামে।

বিদেশের প্রকাশকদের কর্তব্য গানার মড়ায় ভিন্ন ভিন্ন লেখকের বইয়ের বিজ্ঞাপন একসঙ্গে সাজিয়ে দিয়েই শেষ হয়ে যায় না। ওরা চায় লেখকরা বেঁচে থাকুক, এবং লেখকরা বাঁচলে তবেই লেখা বাঁচতে পারে। আমাদের দেশে যেমন লেখকের লেখাকে ক্যাপিটাল ক'ন হয়, ওদেশে লেখকদের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে। লেখক মাত্র লিখেই খালাস পায়, অজ্ঞাত কাজকর্ম বা প্রচারের জন্ত সাহায্য করবে প্রকাশকরা। আসল কথা, বিদেশী লেখকদের প্রচারের যা কায়দা-কানুন তা আমরা এখনও কল্পনা করতে পারবো না। অনেকে হুততো অস্বীকার করবেন না, আমাদের দেশের কত শত প্রথম শ্রেণীর লেখক-লেখিকা কেবলমাত্র যথার্থ প্রচারের অভাবে অকাল-মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ ওদেশে পুরানো ও বিখ্যাত লেখকদের বই এখনও সমান হারে বিক্রী হচ্ছে প্রকাশকদের গুণপণ্য। লেখকদের জন্মতিথি পালনের প্রসঙ্গে এত কথা লেখার কারণ, জন্ম-মৃত্যু-মুত্তি-উৎসব পালনের রেওয়াজ প্রবর্তিত হোক আর না হোক, প্রকাশকরা এখনও যদি ওয়াকিবহাল না হন, তবে লেখকদের শুধু মৃত্যুতিথিই তাঁদের প্রত্যেক দিনের অবশ্য পালনীয় কাজ হয়ে দাঁড়াতে বেশী দেরী হবে না।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### সম্পূর্ণক

আজকের দিনে পরিমল গোস্বামীর একটি নির্দিষ্ট আসন আছে সাহিত্যের দরবারে। সাহিত্যের এমন একটি দিক—যে দিকের একমাত্র দিকপাল বর্তমানে পরিমল গোস্বামী। তাঁর নানা স্থানে রচিত রচনাগুলি একত্রে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে সম্পূর্ণক।

নামকরণটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহুসমীতে প্রকাশিত বহু রচনাও এই গ্রন্থেব শোভাবুদ্ধি কবছে। পবিসল গোহামাব চিন্তাশক্তির প্রাবল্য, তাঁব পদচযনেব বৈশিষ্ট্য ও বসসৃষ্টিব কুশলতা প্রত্যেক সাহিত্য-পাঠকেব আদবেব বস্ত। এই গ্রন্থটি বহুল ডানে পাঠকগণ কর্তৃক সধর্ষিত হোক—এই আশাই আমবা বাখি। মিত্র ও বোব, ১০ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ কবেছেন শ্রীভানু বাব। দাম—তিন টাকা মাত্র।

### আকাশ ও মৃত্তিকা

দীর্ঘ দিন ধরে উপজ্ঞাসাদি বচনা কবে বাঙলাব সাহিত্য-ভাণ্ডাবেক ধাবা ভবিবে তুলেছেন তাঁদেব মধ্যে সবোজ্জকুমাব বাবচৌধুরীব নাম উল্লেখনীয়। উপজ্ঞাসেব মধ্যে ইনি বাঙলা দেশকে ফুটিবে তুলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে সাধারণ বাঙালী জীবনেব ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনাবল্ল দৈনন্দিন বাবহারিক জীবনেব ছাপ স্পর্ষিফুট। চারিত্রগুলিও বৈশিষ্ট্যে উজ্জল। সবোজ্জকুমাবেব গ্রন্থগুলিব মধ্যে ঐটিও একটি উল্লেখযোগ্য সযোজন। সাসিক প্রেস, ৩১এ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ কবেছেন শ্রীনাবায়ণ সেনগুপ্ত। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

### সুরের গুরু ববীন্দ্রনাথ

মানুষেব জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকাব কবে আ'ছ সঙ্গীত। ববীন্দ্রনাথব গান তো বাঙলাব কোমাগাব সখিত এক অপূর্ব বহু-সম্ভাব। বাঙালীব মানস মনব চেতনা জেগেছে ববীন্দ্রনাথেব গানে। সত্যোজ্জনাথেব ভাবায় তিনি গানেব বাজা। শুধু কথাস নয়, -এব মধ্যেও তিনি এনেছেন এক অভিনব নতুনত্ব। ববীন্দ্রনাথেব গানেব স্তব তাঁব নিজস্বতাবই পবিচায়ক। স্তবেব ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথেব অবদান এক মহার্ঘ বত্বকপে বাঙালীব মনেব মণিকুটিমে জমা হয়ে বইল। ববীন্দ্র-স্তব নিয়ে এখানে আলোচনা কবেছেন তাঁবই ভাবধাবায় অমুপ্রাণিত বাঙলাব এক বিদগ্ধ-সন্তান শ্রদ্ধেয় ডব্বি কালিদাস নাগ। শুধু তাই নয়, স্তবেব দববাবে ববীন্দ্রনাথেব গুরুত্বও ইনি এখানে প্রতিষ্ঠা কবেছেন। তাঁব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বসগ্রাহী নহলে যথেষ্ট সমাদব লাভ কবেব সম্ভেব নেই। গানেব বাজা ববীন্দ্রনাথেব গান সযুদ্ধ তথ্যপূর্ণ আলোচনা অনেক অনুসন্ধিস্ত ব্যক্তিবও চিন্তবল্লন কবতে সমর্থ হবে বলে আশা বাখি। বুক-ব্যাঙ্ক, ৫ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ কবেছেন শ্রীসুধা'ণ্ড বস্ত্রী। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

### কাজের কথা

জীবনেব বঙ্গভূমিতে বিশ্ববিজ্ঞালয়েব ছাপ প্রযোজনীয় বস্ত হতে পাবে, তবে একমাত্র নয়। বিজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য ছাড়া মানুষকে মনুষ্য-সমাজেব যোগ্য আসন দেওয়া বায় না, এ-ও যেমনই ঠিক তেমনই বিজ্ঞা-শিক্ষাব সঙ্গে তাকে বিনয় সৌজন্ততা শিষ্টাচাব প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুণগুলিও আয়ত্তাবধীনে আনতে হবে। মানুষকে বিনয়-গুণ, সৌজন্ত-বোধও বড হতে অনকগণানি সহায়তা কবে, এ কথা যে কোন পণ্ডিতমাত্রই স্বীকাব করবেন। এই সত্যেব প্রচাববাগী আলোচ্য গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানি বহু বিদগ্ধজনেব প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছ। কয়েকটি কাহিনী এর সঙ্গে সন্নিবেশিত কবে গ্রন্থটিকে আরও উপভোগ্য কবে তুলেছেন লেখক শ্রীআততোব বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান যুগে বিশেষ

কবে উদীয়মানদেব জীবনে এই গ্রন্থ আলোকপাত ককক। এই কামনাই কবি। জ্ঞানানাল হাউস, ১৬ শিবপুর রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশ কবেছেন শ্রীমতী উষা দাস। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

### পূর্বরাগের ইতিহাস

অজকালেব মধ্যে যে ক'জন শক্তিমান লেখকেব সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁদেব মধ্যে ববীন্দ্রনাথ দাশেব নাম উল্লেখযোগ্য। বচনা-চাতুর্থে, পটভূমিকা-নিবাতনে ববীন্দ্রনাথেব বৃত্তিষেব পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে ঐটি একটি নাটক ছিল, নিউ এম্পায়ার মঞ্চেও এই নাটকেব অভিনয় হয়ে গেছে। বর্তমানে সেই নাটকটিকে উপজ্ঞাসাকাবে প্রকাশ কবা হয়েছে। সহজ ভাবে বিবয়বস্তুর বিকাশেব জন্তে এই গ্রন্থটি পাঠকেব কাছে সমাদব লাভ কবেব। সহলি চবিত্রটি সৃষ্টি কবে স্ত্রীবৃন্দেব প্রশংসা ভাজন হবেন ববীন্দ্রনাথ দাশ। ক্যালকাটা বুক স্টোর প্রাইভেট লি: ৮১ মহাত্মা গান্ধী বোড থেকে প্রকাশ কবেছেন শ্রীজ্ঞাতিপ্রসাদ বস্ত। দাম তিন টাকা মাত্র।

### রক্তকমল

একশো বছব আগেকাব স্বাবীনতা-সংগ্রামকে কেন্দ্র কবে লেখা অনেকগুলি গল্পেব স'কলন গ্রন্থবপে দেখা দিয়েছে স্পর্ষবিচিত সাহিত্যিক গাজেন্দ্রকুমাব মিত্রেব 'রক্তকমল'। নামকরণেই বোধ হয় বোঝা যায়, গ্রন্থটিব ভিতবেব সম্ভাব সযুদ্ধে। আজকেব দিনে শতবর্ষ আগেব সেই গৌববয় অভিযান নতুন কবে মানুষেব মনে প্রেবণা যোগাবে। আশাব কথা। মানুষেব মনে আজকেব দিনে ইতিহাস-চেতনা নতুনতব এক রূপ নিচ্ছে, বিশেষ কবে স্বাধীনতা-সংগ্রামেব ইতিহাসেব আবেদন তো অগণনীয়। সেই ইতিহাসকে কেন্দ্র কবে সাহিত্যসৃষ্টি কবে গজেন্দ্রকুমাব ইতিহাসেবও যেমনই প্রচাব ও প্রসায কবেছেন, তেমনই গল্প সাহিত্যকেও বরেছেন সমভাব পুষ্ট। গজেন্দ্রকুমাবেব বচনা সযুদ্ধে নতুন কবে বলবাব কিছুই নেই, তবে তাঁব বচনার পটভূমিকা নির্দান সবিষেব প্রশংসাব দাবী বাখে। গজেন্দ্রকুমাবেব বচনায় স্থান কাল-পাঠ্যগুলিব স্থান স্থানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁব সচনাব বলাগে। এই গ্রন্থেব বক্তল প্রচাব আমবা কামনা কবি। প্রান্তিস্তান--এস, সি, সবকাব যাও সনসু প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

### মাটকোঠা

প্রাহোক মানুষেব জীবনেই এমন একটি লগ্ন আসে, যাব আহ্বানে চিবাচবিত গুণী-টানা জীবনেব পথ পবিবর্তন হয়। জীবনেব ভবিষ্যৎ ইতিহাস বচনা হয় সেই এবটিমাত্র ঘটনাকেই কেন্দ্র কবে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত কবে গেছেন লেখক অভিনেতা প্রশান্ত চৌধুরী। 'শান্তি' চবিত্রটিব মধ্যে এই উক্তি যেন প্রফুটিত হয়ে উঠেছে। শুকদেব চবিত্রটিও বিশেষধেব দাবী বাখে। লেখকেব বচনাভঙ্গী ভালো। নারীর মনেব ঘাত-প্রতিঘাত যা শান্তিব মধ্যে দিয়ে ফোটানোব প্রাচষ্ঠা হয়েছে সেই চেষ্টায় লেখক সফল হয়েছেন বলা যায়। অভ্যাদয় প্রকাশ মন্দিব, ৬ বকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ কবেছেন শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী। দাম তিন টাকা মাত্র।



## চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত

শিপ্রা দত্ত

পল্লীর লোকসঙ্গীত, যা ছিল একদিন পল্লীর সম্পদ—পল্লীর গর্ব, তা আজ লুপ্তপ্রায়। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ পল্লীবাসীর সরল জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি এই লোকসঙ্গীত। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় পল্লীবাসীর সরলতা, গভীর উদ্দোপনা ও অমূল্য স্মৃতি। দেশী ভাষায়, নিজস্ব ভঙ্গীতে পল্লীবাসীরা গেয়ে গেছে গান। কে, কবে, কোথায়, কোন সালে এই সব গীত রচনা করেছে তা আজ অজ্ঞাত। কিন্তু সেই শিল্পীর গানেই বস্তুত হয়েছে সমস্ত পল্লীর মুহূর্ত—তার চন্দ্রে চন্দ্রে ধ্বনিত হয়েছে পল্লীর বেদনা—তার সুরে অল্পবিশ্রিত হয়েছে নিরাশার মধ্যে আশার সম্ভাবনা। বাস্তব জগতের কঠোর আঘাতের মধ্যেও সুন্দরের স্বপ্ন রচনা করে তারা এই গানের সুরে। ভাবের আবেগে সুরের বন্ধনের মাধুরীতে অশ্রুকের জন্ত তারা ভুলে যায় তাদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবনের ক্রেশের ব্যথা। আশার বশিষ্ঠে উদ্ভাসিত হয় পল্লীবাসীদের মানসাকাশে। তাদের জীবন্ত হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ জাগে। এই লোকসঙ্গীত তাদের অতীত গৌরব—বর্তমানের আনন্দের উৎস—ভবিষ্যতের আলোর নিশানা। তাদের অজ্ঞ অন্তরের মুক রাগিণীর মুহূর্তে যে অনন্তসলিলা ফসল বয়ে চলেছে—তা একান্ত ভাবে তাদের বস্তুতাত্ত্বিক ও মানসিক উৎসাহের প্রয়োজনের দাবী মিটাবার জন্তই রচিত হয়েছে।

দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রক্রিয়ার প্রায়ের এই সাংস্কৃতিক গাথা—যা গ্রামবাসীর একান্ত নিজের সম্পদ—তা আজ আমরা হারাতে বসেছি। তাই আজ এই লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতে অনেক গ্রামই বিচরণ করতে হয়। আগের মত গ্রামের এই আনন্দ-উৎস আর অনায়াসলভ্য নয়।

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামের চাষী ও মজুরদের করেকটা দুঃখ-শ্রম্ভার গান সম্বন্ধে আজ লিখছি। একটি গানে পেয়েছে—

“আঁরা চাউগাঁইরা চাষা,

হালচই, রোয়া কুই, ইয়ান আঁরার পেশা।

আঁরা পত্তর কামই করি খাই,

কনু হাশার মোরারত, ন বাই।

আঁরা চাউগাঁইরা চাষা,

হালচই, রোয়া কুই, ইয়ান আঁরার পেশা।

আঁরার বড় বড় মাছন হাশে,

ঠ্যাঙ্গে লাখি মারে।

আঁরা চাউগাঁইরা চাষা।”

এই গানের মধ্য দিয়ে অবহেলিত, লালিত, দুঃখী চাষার হৃদয়-বিদারক অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

দিনমজুরদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে আর একটি গানে,—

“দেশের খোষখোর, আর কোষকোর যত আছে,  
সব জায়ন্তে মরা।

বেয়ানে মৃত্যু উড়ি পরর কামত, বাই।

হারাদিন মজুরি করি, দিনর বেতন ন পাইলাম,

আজুয়া দিত, ন পারঙ্গম তোরে,

দশ টেক্যার নোট নাইরে ভাঙ্গরা।

বাড়ীত, বাই ভাত কিদি খাইম?

বেয়ানে খাই যে মরিচ ভঙা,

বিয়ালে কি খাইয়ম?

আবার ভাই, চইলের লাই বাতে,

বোঁ যে শাড়ী লাই করগে যে ইসারা।

কাওড়ের দোরানে গিই, হই গোলাম বেহোশ।

পিছদি আছিল গরাকটা, আস্তে দিয়ে পোচ।

বখন পিচ মিক্যা কিরি চাইলাম,

কয় যে চোয়ার মাইরঙ্গম তোরে ইতার।

খাপটা মারি, বাড়াই ধরি কি কইলাম ভাই,

পইট্যা খানা গিই, উগ্যান মোওন্দমা দিলামে জোটাই।”

এই ভাবে সারা দিন পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদের প্রতি যে অবিচার করা হয় ও দেশের সর্বত্র যে অসাম্যতা দেখা দিয়েছে— তাই এখানে ফুটে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গরীব কৃষক ও মজুরদের কি ভাবে অগ্রসহান হ’তে বঞ্চিত করেছে—তারই মর্মস্পন্দ কাহিনী শোনা যায় এই গানে—

“বারা বাঁধুনীর কওলা খাইয়ে হাটে বাটে জিঁও দিঁও,

ধানের কল হইরে।

ফাংগ মধ্যে এক গোলা ধান খায়, তার বউএ সারাদিন

পাড়া বেড়াইত, যায়।

পাড়াভূমি আসি বউএ হরহরাই চাইল উন চড়াই দিয়ে,  
কুলাং লই চাইল ঝারিবার লাই, হুয়া তিত্তা পটকাইত্তা মা'রগ্যো,  
তুস কুয়া গিয়ে ধাই।

কুলাং করি দিয়েছে চাইল, মাফিবার লাই কি রইয়ে।  
গরম পানি লাইগ্যো চাইলের গায়,  
কিছু চাইল ফেনের হুগে গিয়ে উংরাইয়ে,  
তলের গুণ তো পোড়া লাইগ্যো, মাঝের গুণ কচাল হইয়ে।

কবির কল্পনাতে মোহন বাঁশী কয়,  
পাকিস্তানে বাগা বাঁধুনির বংশ ধাইকত্যা ন।  
বউ এর ঝিয়ের সুখের লাই ভাগুরীর দয়া হইয়ে।"

কালবাজারের এবং কলকারখানার প্রসঙ্গনে গরীব দুঃখী মজুরদের  
জীবনের শোচনীয় পরিণতি মূর্ত হয়ে ফুটেছে এই গানে—

"দেশের হাইল চাইল কিছু দেখানি?  
গরীবের করবল্যা মইদান ঠয়র পাইওনি।  
দেশের মাজে বুড়াটুড়া যারা আফিন খায়,  
মাজে মাজে মালদারগ্যা কয়,  
মোটোও আফিন নাই।  
আবার দশ টে'রা দি এক তোলা পাই।  
এই বিচার কেও করেনি।

(গরীবে) গোলায় ধান কলত, ডসাই খায়।  
বারাবান্দনী মরি যার,  
হিক্যা ফিরি কনে চায়।  
এক সের চাইল আঠা আনা পইসা,  
কোন দিন কিন্তনি (গরীবে)?"

কালবাজারের স্বাতি, দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণতি ও যুদ্ধের  
মুচনার যে কষ্টোলের প্রবর্তন হয়েছিল—তার জন্ত মাছুষের যে চরম  
লাঞ্ছনা, গল্পনা সম্বন্ধে হয়েচে—সেই দুঃখের কাহিনী প্রথিত  
হয়েছে বাংলার সরল চাষাদের গানের ছন্দে—

"দারুণ বিধিরে আর কত দেখাবি জগতে,  
কেও বস্ত্রে সোণার খটত, কেও পড়ি রয় কালাতে।  
ছেলে মেয়ের আদর গেল, দেখি মা'বর দুর্ভিক্ষে।  
সাধু স্রক্ষী চোর হইল কনটলও উপলক্ষে।  
বড় কাঠিন মানীর পক্ষে, কনটলের মাল আনিতে।  
তেল কিনিতে বোতল ভাঙ্গে, চাইল কিনিতে পকেট বার,  
ভাগুরত, চাইল ন থাকক, সাদা জামা ধাইলে গায়,  
বিক্রমে বল্যে তারে, চাইল দিয়েম ন খাইত।"

এক দিকে যেমন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে কল কারখানার  
প্রবর্তনার চাষা মজুরদের চরম দুর্দশা হয়েছে—তেমনি অনেক মজুরের  
অসহন্য হইয়াছে। সেই উপলক্ষে এই গান রচিত হয়েছে—

"পেপার মিলের আশ্রয় কারখানা রে—চন্দ্রখোনা,  
রাঙ্গামাটার এলেকাতে পাকিস্তানের গবরমেণ্টে,  
পাহাড় কাড়ি কিছু বার না।  
পাকিস্তানের দয়া হইল, কারখানা খুলি দিল।  
গরীব লোকের অভাব বার না,  
লাখে লাখে লোক আসি,  
কাজ পাইয়া হইল খুশী।

দ্বীপুত্র আর ভাতে মরে না।  
পেপার মিলের কারবার ভারী,  
রাইজ জঙ্গেতে ইলেক্টারী,  
বাঁধ দিয়ে যে নদীর বিছধানার।  
দীর্ঘকাল আর জন্মের মল্লিক,  
তারার বুকে গরীবের দুখ।  
ডেলি বেতন বাকী রাখো না।"

অভাব অনটনে দুঃখী চাষী নিজের সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারের  
অভাব দূর করার চেষ্টা করছে, তার মর্মান্তিক কাহিনী—

"আয়ার ঘোয়ানী গেলগই ত্রাশ ছাড়ি,  
এই হুনিয়ার আলা আঁই সহিত ন পাড়ি।  
জাউ খেচুরী পাইয়স বলি, নংগলখানাং যাই,  
তারার হগগলে পাইল খেচুরী, আঁর তালাস নাই।  
'এতক্ষণে কিল্যাই আইয়ম, তোর লাই নাই আর খেচুরী।'  
কনটল দাইডগ্যার ঘরং গেলাম কইরতাম তার খেচমত;  
দারুণী পেটের লাই বলি, ন চাইলাম ইজ্জত।  
আঁর মনে ন লয় বুজ,  
পোয়া উগ্যা মইরগ্যো, ঝি'র পোয়াউয়া ফুলি হইয়ে তুজ।  
পেটের রোগং গেল গই বাহু, বুকত ছেল মারি;  
অনরে পাড়াইল্যা মা বইন, ইজ্জতে ধাইক্য।  
আতিক্যা বিপদে পইলে খোদারে ডাইক্য।"

## সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

## মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই স্বাভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দার্শ-  
নিকের অভি-  
জ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভাগিকার  
লিখুন

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এম্বল্যান্ড ইস্ট, কলিকাতা - ১

রাষ্ট্রবিভাগের পর বহু চাষা মজুর এ দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়াতে গেছে ।  
কিন্তু যেসব গরীব দুঃখীরা আজও পাকিস্তানে আছে,—সাধিহীন  
এ দেশে বাস করার কৈফিয়ত তারা দিচ্ছে—

“আঁর বাড়ীঘর কারে দিতাম ?

আঁরে ক্যান ভুতে পাইয়ে হিন্দুস্থান বাইতাম ।

আ্যাডে আছে দুয়া খেওন গাই,

উগ্যার দুখে খরচ চলে,

আর উগ্যার দুখ খাই ।

লোকের কথা হনি হিন্দুস্থান বাই,

ছাড়ে গেলে কি খাইতাম ?

আ্যাডে আছে, খেতে তরকারী,

ফটর ভরা মাছ আছে ।

ভাই, স্তখে খাটত পারি ।

আটা, কটা, ছাউ খেচরী,

কিউলাই পাই জ্ঞান হারাইতাম ।

যারা হেন্দুস্থান গিইয়ে,

স্বরাজের আলোমনদোনে, জায়েন হারাইয়ে ।

লোকের কথার ভাব না বুঝি,

কিউলাই দুখে বারনাইয়া গাইতাম ।”

সর্বস্বারা চাষা মজুরদের উষ্ম মরুজীবনে যে প্রেমের মন্ডাকিনী  
ধারা বয়ে যায়—তারও ছিটেকোটা পাওয়া যায় তাদের স্নয়ের  
মুহূর্ত্তনয় । কোকিলের প্রথম কাকলীতে প্রেমিকার চকল মনের  
প্রতিচ্ছবি মুর্ত্ত হয়ে ফুটেছে এই গানে—

“এই বছর নতুন কুইলায় ডাক ছারে,

অমন পরাণ বিদরে ;

কুইলা কালা শব্দ ভালো নানানু ভেটা জানে ।

গাছের আগাত পাতার হেরত বইরা কুহরে

অই মোর পরাণ বিদরে ।”

কোকিলের ডাক বিরহিণীকে কি ভাবে প্রভাবিত করে তারই একটি  
গান শুনুন—

“কাউরা কালা কুইলা বালা,

আঁখির পুতলি কালা,

আর ও কালা অঙ্গের নিশানা ।

ওরে কালরূপে জগতজোয়ারে অ বঁধুয়া ।

মনর শান্তি অইস না

তোর জালায় আর পরাণ তো বাঁচে না ।”

চাটগাঁর কোন মজুর অল্প দেশীয় যুবতীর মোহে পড়ে—প্রেমে  
পাগল হ’য়ে,—সে স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হ’ল । সেই প্রেমের কল্পধারা  
প্রবাহিত হয়েছে এই গানে—

“মনরে ধখ্য মানে নারে দান,

• দিলরে আঁর ধখ্য মানে না ।

চাটিয়া ছাড়াইল মোরে পরোজান সোনা

পরোজান রাস্তা দিয়া যায় ।

ফির ফির শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ায় ।

তার চোখের বিজলী, মন করে দেবালা ।

পরোজানের গামছা বর উম,

বুকত রাইয়লে বুক জুড়ায় চোখত আরে ঘুম ।

তার ঠাণ্ডর কৰ্তা ছইনলে উটে পরাণে মুরহ না ।

পরোজানের মাথার কালাচুল ।

যান মেঘর পিছে হাজার পক্ষীপ করে জুল জুল ।

তার চোখডাকে ইসারায়, হাতে করে মানা ।

তার হাতত, বাজু, পশত জোরা মল,

তার বুকত, নয়নের বরণা, মুখত করে ছল ।

ওতার মুখর কতা কনে চার দাদা

দিল যদি যায় জানা ।”

বিরহী প্রেমিক নিজেকে প্রিয়াহারী মজলুর সঙ্গে কল্পনা করেছে—

“তোয়ার প্রেমে দেবালী অইয়া,

ঘুড়ির আমি মজলু অইয়া ।

তোয়ার নামে তসবী লই,

জুইপ্যাম মালা নীরবে বই ।

বিনা স্ততায় গাইখাম মালা,

পরাই দিয়ম বন্ধুর গলার ।”

বর্মান্দেশ চট্টগ্রামবাসীদের একটি বিরাট কর্ণক্ষেত্র । মজুরশ্রেণীর  
অনেক চট্টগ্রামবাসী সেখানে গিয়ে বর্মান্দেশ রমণীর প্রেমের জালে আবদ্ধ  
হ’য়ে নিজের স্ত্রীপুত্রের কথা বিস্মৃত হয় । কোন কুহকিনীর কুহকে  
তার স্বামী তাকে ভুলেছে—এই গানে বিরহিণী স্ত্রীর বেই করুণ  
কান্না ধ্বনিত হয়েছে—

“রস্তা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে

সদাদিলে মোর দাগ লাগাই ।

এমন রসের কালে কার সোয়ামী খরত নাই ?

ছোডোকালে বিয়া দিলরে

মা বাপের চোখে ছাই,

আরে রক্তম বাই ভুলি রলি

কনু হতীনের ছরাপাই ।”

বর্মান্দেশ রমণীদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়ার চাটগাঁর বহু শ্রমিক  
মজুরদের সুখের নৌ ভেঙে গেছে । চট্টগ্রাম নদীপ্রধান দেশ ।  
বিশেষ করে সমুদ্রের উপকণ্ঠে এই দেশটি অবস্থিত বলে এই দেশের  
মজুরশ্রেণী নাবিক হিসাবে সমস্ত ভারত ও পাকিস্তানে বিখ্যাত ।  
চাটগাঁর নৌকার চালককে বা মাঝিকে “সাম্পানওয়াল” বলে ।  
নিশীথ কালে সাম্পানের মাঝির প্রিয়তমা তার প্রিয়তমের বিরহে  
গাইছে—

“অ ভাই, চাঁদমুখে মধুর হাঁসি ।

দেবালা বানাইলি সাম্পানের মাঝি ।

বাহার মারি যারগে সাম্পানরে ।

ন মানে উজান ভাডি ।

কুতুবদিয়ার পাছিমধারে সাম্পানজালায় ঘর ।

লাল বসটা তুলি দিয়ে সাম্পানর উজর ।

অ ভাই চাঁদমুখে মধুর হাঁসি

দেবাইলা বানাইলি মোরে সাম্পানর মাঝি ।”

কেবলমাত্র দুঃখ-দুর্দশা বা প্রেমের গান নয় । নানা ব্রত ও  
সামাজিক গীত নানা পরীক্ষণীতে শোনা যায় ।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চাবারা ক্ষেত চাব করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে  
পড়েছে । একবিলু মেঘও আকাশের বুকে নেই । দেবতা বিমুখ ।



শুক ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে মেঘরাণীর কাছে চাষারা দল বেঁধে বুট  
কামনা করছে—

“আয়রে মেঘরাণী মেঘ ধুই ধুই পেলা পানি।

কলাতলে গলা গলা—

কচুবন ডুবাই ফেলা।

হালা তারা তের ভাই,

নল ডুবাইত পানী নাই।

কাল মেঘ, ধলা মেঘ তারা সোদর ভাই।

অইন কোনাদি বর পেলাইদে, ভিজি অরত যাই।”

আবার অতিবৃষ্টি হ'লেও তার জন্ত চাষীরা আবেদন জানায়।  
বসুমতীর স্নেহস্পর্শে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে। প্রতি আষাঢ়ের  
সাত তারিখে বসুমতীকে ভোগ দেয় চাষারা। সমস্ত চাষীরা  
বসুমতীকে ভোগ দেওয়ার পর গলবস্ত্রে সবার মঙ্গলার্থে এই গান  
গেয়ে থাকে—

“বর বর বর বসুমতীর বর

লটকাই লটকাই ধর।

পাড়াপড়শীর ভাগ্যে ধর।

অতিথ পথিকের ভাগ্যে ধর।

বসুমতীর বর।”

সমস্ত বিশ্ববাসীর হিতার্থে বর প্রার্থনা একমাত্র সরল, দরিত্র  
চাষাদের পক্ষেই সম্ভব। যারা নিজেদের প্রতি বিন্দু বস্তু ক্ষরিত করে  
বিশ্ববাসীকে বাঁচিয়ে রাখছে—প্রতিদানে পাচ্ছে অবহেলা, অপমান ও  
অবিচার। ঢেঁকিতে চাল ভাঙ্গবার সময় তাদের একত্রে কণ্ঠের  
শ্রম লাগব করবার জন্তও—তারা ঢেঁকি জীবনের একটি চমৎকার গান  
রচনা করেছে।

বিবাহানুষ্ঠান বাঙ্গালীজাতির বৈশিষ্ট্য। এই বিবাহকে উপলক্ষ্য  
করে, নূতন বৈবাহিকাকে উপলক্ষ্য করে, কনে সাজানোকে ও বর  
সাজানোকে উপলক্ষ্য করে বহু গীত আছে। এমন কি, বিবাহ  
উপলক্ষে যে সব স্ত্রীআচার আছে প্রতিটিকে উপলক্ষ্য করেই  
গান গাওয়া হয়। স্থান সঙ্কলতা বশতঃ বিশদভাবে সেই সব গান  
আপনাদের কাছে পরিবেশন করা গেল না। তন্মধ্যে একটি গান  
মাত্র দিচ্ছি। কনেকে স্বস্তরবাড়ীতে বাজনা বাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে  
তারই দৃশ্য—

“দয়াল বড় মিশর বি

জোরকারা বাজাইয়া যারগৈ

বারইপারা দিই।

বারইপারার মাইয়া পোয়া থিয়াই উঁঅসা চায়।

জোরকারার ধমকে ভইনউন চমকি আছাড় খায়।”

কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসব নয়। জীবনখেলা সঙ্গ হলে এ তরী  
ধন হৃত্যর শমন পেয়ে পরপারে যাবার জন্ত যাত্রা করে—তাকে  
উপলক্ষ্য করেও অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে।

“দিন ফুরাইল

সইলা অইল

পথর সখল লইলা কি ?

ওখর যারা

ভেয়াগ গন্ধি

ধঅন পরিব তরাভরি।

ন গেলে তে বাকি নিব,

মোটা রছি গলাত দি।

পেয়ালা বারা আছে খারা,

সমন লই পিছদি।

দিন ফুরাইল সইলা অইল

পথর সখল লইলা কি ?”

মুসাফিরকে মহাযাত্রায় যেতে হ'বে। ষোল হাত ঘরে যার  
কুলায় নাই—তাকে সোয়া হাত কবরের মধ্যে বাস ক'রতে হবে—

“মুসাফির জঙ্গী তালাশ গর।

ডাক দিলে চলি যাবি কত কঅয়ের ভিতর।

ষোল হাতা বাশর ঘর ন কুলাইল জনমভর।

পাঁচ পাহাত্যা মাটির ঘর,

যাইবি এগাশ্বর।

মুসাফির জঙ্গী তালাশ গর।”

এই সব শ্রমিকদের গানে এমন সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুর ধ্বনিত  
হয়েছে—যা তাদের গভীর চিন্তাশীলতা ও মননশক্তি পরিচায়ক।  
শিঙিবিরহীণী অভাগী কস্তার হৃদয়বিদারক গান, ছেলেভুলানো ছড়া,  
হিন্দু মুসলিমের নানা ব্রত পার্বণের গান, তাছাড়াও চান্দ, ফুল, পাখী,  
বর্ষার ধারা প্রভৃতি ছোটখাট নানা বিষয়কে অবলম্বন করে পল্লীসঙ্গীত  
আছে। এই রকম বহু লোকসঙ্গীত এখনও পল্লীর নিভৃত আনন্দের  
উৎস্বরূপ রয়েছে। যদিও ব্যাকরণ, ছন্দ, ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে  
এসব সঙ্গীতে অনেক ত্রুটি পাওয়া যায়। তবু এই সব গানের মধ্যে  
ফুটে উঠছে আমাদের দেশের নিপীড়িত, লাঞ্চিত, হুঃখী পরিজনদের  
দৈনন্দিন জীবন কাহিনী। তাদের মানসাকাশে যে ভাবের উৎস  
জেগেছে—তাকেই সুরের মাধ্যমে রূপ দিয়েছে। এই ত্রুটিবহুল  
ছড়াগুলি চাটগাঁর শ্রমিক-সমাজের অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র। এই  
ছড়ার প্রতিবিশ্ব হুঃখ শ্রমিক সমাজের যে মনোবাক্সের পরিচয় আমরা  
পাই—তা হ'তে অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে সুরযোগ, সুরবিধা  
পেলে এদের মধ্য হতেও গড়ে উঠত সর্গহারাাদের কবির দল। যে সব  
বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি  
লাভ করেছে—সেই প্রতিটি বিষয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে চাটগাঁর চাষী-  
মজুরদের গানে। এত সাধারণ ভাষায়, স্বাভাবিক সুরে—যে এত বড়  
বিষয়ে গান রচনা করা সম্ভব একমাত্র এরাই তা দেখালো, এটাই  
তাদের বৈশিষ্ট্য। পল্লীমায়ের মণিকোঠায় এই সব হুঃখীদের গানের  
মধ্যে এমনিতর কত মণিমাণিক্য লুকিয়ে আছে তা কে জানে ?  
কিন্তু গভীরতা ও সরলতার ভিত্তিতে বিচার করে এই সব গান যে  
কোনও সাহিত্য-বাসরে একটু আশ্রয়ের আশা করতে পারে। চাটগাঁর  
পল্লীসঙ্গীতে হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজের গান অনুরণিত হয়েছে।  
এক সমাজের প্রভাব যে অন্য সমাজে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে—  
তাও প্রকাশ পায় এই সব গানের মধ্য দিয়ে। কেবলমাত্র মজুরদের  
হুঃখের কাহিনী নয়,—তাদের সুখ, হুঃখ, হর্ষ, বিবাদ, প্রেম, বিরহ  
প্রকাশ পেয়েছে এই সব গানে। স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষার সঙ্গে শুদ্ধ  
ভাষার সংমিশ্রণও দেখা যায় এই সব গানে। ভাষা ও ভাবের  
অসামঞ্জস্যতার দরুণ যদিও সাহিত্যের আসরে এই সব গানের স্থান  
নাই—তবু সহজ ও সরলতার দাবীতে সাহিত্যাকাশের কোন কোণে  
একটু স্থান হয়ত এরা পেতে পারে।

## রেকর্ড-পরিচয়

‘হিজ্, মাষ্টার্স ভয়েস’ ও ‘কলম্বিয়া’র প্রকাশিত রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

### হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82750—শ্রীমতী স্ত্রীতীতি ঘোষ প্রতীভাময়ী শিল্পীর কণ্ঠে হুঁখানি কীর্তন “আজি গোবুল নগরে” ও “রূপ লাগি আঁখি কুরে”—দয়দী প্রকাশনায় মুদ্রিত।

N 82751—সুবীর সেনের গাওয়া হুঁখানি আধুনিক গান “এতো সুর আর এতো গান” এবং “তোমার হাসি লুকিয়ে হাসে”—সঙ্গীত-পিপাসুদের তৃপ্তি দেবে।

N 82752—কুমারী শ্রীলা সেন “দোলে দোলে বে চাঁদ” ও “তোমার কাছে তো কোন দিন আমি”—আধুনিক গান হুঁখানি জনচিহ্নজয়ী হবে।

N 87544—মাউথ অর্গানে ‘পিয়লা’ ও ‘বারিশ’ চিত্রে দুটি জনপ্রিয় সুর বাজিয়েছেন শিল্পী মিলন গুপ্ত।

### কলম্বিয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিগণ শ্রীযুত পঙ্কজ-কুমার মল্লিকের পরিচালনায় হুঁখানি নাটিকা ‘ধরার মেয়ে’ GE 24845 হইতে GE 24847 এবং ‘অনিবার্য দীপ’ GE 24848 হইতে GE 24850 রেকর্ডে প্রকাশ করেছেন। জনকল্যাণকর এই সেট দু’টি সকলেরই ভাল লাগবে।

GE 24857—পান্নালাল ভট্টাচার্য “তোমার মতন আমিও তো” ও “আশার খেলা এই জীবনে”—শিল্পীর দক্ষকণ্ঠে আধুনিক কালের হুঁখানি আধুনিক গান।

GE 24858—কুমারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় “মলয় আসিরা ক’রে গেছে কানে” ও “সে কেন দেখা দিল রে”—নবাগতা শিল্পী ৬ডি, এল. রায়ের হুঁখানি গানের অর্থা সাজিয়েছেন সার্থকরূপে।

GE 24859—কুমারী নির্মলা মিশ্র “ধূসর গোধূলি আকাশের” এবং “মনে আমার ফাঙন এলো”—হুঁখানি আধুনিক গানে সঙ্গীত-রসিকদের শ্রীতি অর্জনে সক্ষম হবেন এই নবাগতা শিল্পী।

GE 30366—রেকর্ডে ‘তাদের ঘর’ বাণীচিত্রের হুঁখানি গান “আমার গানে সুর ছিল” ও “আলিহু মিছে দীপ”—গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন মজুমদার।

GE 30367—‘তাদের ঘর’ চিত্রের অঙ্ক হুঁখানি গান “শুভে ডানা মেলে” ও “নীরবে বত কথা”—প্রথমখানি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়খানি গেয়েছেন কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন মজুমদার।

GE 30368—‘সুরের পরশে’ বাণীচিত্রের “আমার বে বীণা” ও “আমি নীল পরী”—গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

এ ছাড়াও লোকরঞ্জন শাখার জনকল্যাণকর গানগুলি শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ের পরিচালনায় GE 24851 হইতে GE 24856 রেকর্ডে প্রচারিত হয়েছে। শতীন গুপ্ত, যুগল চক্রবর্তী, ভ্রামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, বিজেন মুখোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সুরেন চক্রবর্তী, শ্রীতি সেনগুপ্তা, পূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,

কানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিগণ এই রেকর্ডগুলিকে তাঁদের মধুর কণ্ঠে সজীবিত করে তুলেছেন।

## আমার কথা (৩১)

### দুর্গা সেন

শুধু বাঙলা নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষার গানে সুরের মারাজাল সৃষ্টি করে যে ক’জন বাঙালী সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সুরকার দুর্গা সেনের নাম অন্যতমেরূপে করা যায়। বাঙলা দেশের অতুলনীয় সঙ্গীত সম্পদের আবাদ এঁরা গ্রহণ তো করেছেনই, উপরন্তু বিভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীতের রসও এঁরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছেন।

আহীরিটোলার মথুরামোহন সেনের বংশে এঁর জন্ম হয় ১৯২০ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে। বাবা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সেন নিজে ছিলেন গায়ক ও কাসীমবাজার রাজবাটী প্রমুখ বহু উল্লেখযোগ্য স্থানে এঁর গায়কের খ্যাতি ছিল প্রচুর। দুর্গাদাসও বাল্যকালে বাবার কাছেই সঙ্গীতের পাঠ নেন। কুমার রাধাপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃদেবের তিরোহানে দুর্গাদাস দিশাহারা হয়ে পড়েন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও হয় যথেষ্ট ব্যাহত। গানের নেশা তখন প্রভাব বিস্তার করেছে পূর্ণমাত্রায়। কয়েকটি টিউশানী করতে থাকেন। এই সময় অনেক বাধা-বিপত্তির পর ইনি ওস্তাদ জমীন্দার খাঁর ছাত্র বরাহনগরবাসী স্বর্গীয় ভোলানাথ দের সম্পর্কে আসেন ও তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাহানশাহ, রেকর্ড কোম্পানী কলকাতায় শাখা সৃষ্টি করলে ইনি নিজের ছাত্রী শ্রীমতী বিভা সেন সহ একটি দ্বৈতকণ্ঠের গান রেকর্ড করেন। দুর্গাদাসের জীবনে এই প্রথম রেকর্ড। এই সময়ে প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সুরকার কমল দাশগুপ্তের অগ্রজ ৬বিমল দাশগুপ্ত। ব্রডকাষ্ট রেকর্ড কোম্পানী কলকাতায় শাখা খুললে, সেখানে প্রধান শিক্ষক হলেন বিমল দাশগুপ্ত, সেখানে তাঁর সহকারী হলেন দুর্গাদাস। এখানকার কর্মসচিব ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি গানে সুরযোজনা করেন দুর্গাদাস। সেই প্রথম সুরকাররূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা। এর কিছুকাল পরেই বিমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়।

ব্যব-বাহুল্যের জন্য রেকর্ড কোম্পানী কলকাতার শাখা তুলে দিতে বাধ্য হলেন। এর পর সেনোয়ার সঙ্গীত-শিক্ষকের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন। তার পর হিন্দুস্থানের সি, সি, সাহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ সাহা ‘মেলোডি’ প্রতিষ্ঠা করলে, তার সঙ্গেও যোগদান করেন, মেলোডির রেকর্ডিং হোত হিন্দুস্থানেই। তার পর হিন্দুস্থানেই পুরোপুরি ভাবে যোগদান। এখানে কাজ করার সময় পরলোকগত সুর-সাধক অনুপম ঘটকের সম্পর্কে আসেন ও এক নতুন জীবনের সোনার কাঠির স্পর্শ অনুভব করেন। পরলোকগত প্রেমখোশর বড়ুয়া মহাশয়ের বাড়ীর ঠুঁড়িওতে তখন তেলেগু বিশ্রানারায়ণ ও হিন্দী টার্কান কী বেটা তোলা হচ্ছে। পরিচালক ছিলেন স্বর্ধাক্ষয় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও রূপ, কে, শোবে। উভয় ছবিই সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অনুপম। তাঁর সহকারী হলেন দুর্গাদাস। তার পর চাঁ সক্রান্ত একটি প্রচারচিত্রে নিজে সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রচারচিত্রটির পরিচালক ছিলেন ভারতের এক সর্বদায়

সন্তান শ্রদ্ধের মনোবী বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র চলচ্চিত্র জগতের এক অবিচ্ছেদ্য পুরুষ শ্রীনিরঞ্জন পাল মহাশয়। এই জাতীয় পর পর চারণানি ছবির সঙ্গীতে সুরারোপ করেন দুর্গাদাস।

এঁর প্রথম সঙ্গীত পরিচালিত পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি 'আত্মা' (তেলেগু ভাষায় গৃহীত)। পরিচালনায় ছিলেন নিরঞ্জন পাল। পাল মহাশয় পরে এই ছবিখানির বাঙলা ভাষাতেও রূপ দেন, তাতেও সঙ্গীতের তার পান দুর্গাদাস এবং বাঙালী দর্শকের কাছ থেকে পান প্রচুর অভিনন্দন। ছবিটির নাম ছিল 'শুকতার' (১৯৪০ খৃঃ), এই ছবিতে এঁর সহকারী রূপে দেখা গিয়েছিল স্বখ্যাত সুরকার রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। পাল মহাশয়ের পরবর্তী ছবি 'ব্রাহ্মণ-কস্তা'—সঙ্গীত পরিচালক দুর্গাদাসের সহকারিত্ব করেছিলেন সুরকার গোপেন মল্লিক। স্বর্গীয় সঙ্গীত-সাধক সুধীরলাল চক্রবর্তীও কঠিনানের সুযোগ এই ছবিতেই সর্বপ্রথম পান। এর পর ভীষ্ম, ধাত্রীদেবতা, পোখের পুত্র, পথের সাথী, সঞ্চালী, ইঞ্জনাথ, আঁখি, অসমাপ্ত ইত্যাদি চিত্রেও সুরকারের দায়িত্বভার এঁর উপরেও অর্পিত ছিল। 'স্বামীর ঘর' ছবিটিতে এঁর সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন সুরজ্ঞ কালীপদ সেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সুরকার হিসেবে দুর্গাদাস নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেন। আকাশবাণী ও মঞ্চের সঙ্গেও এঁর নিবিড় যোগ। ১৯৪২ সালে 'নাট্য-ভারতী'তে (বর্তমানের গ্রেস সিনেমা) 'হুই পুরুষ' নাটকে সঙ্গীত পরিচালকরূপে যোগদান। নাট্য-ভারতীতে পথের ডাক, রঙমহলে নিষ্কৃতি, চাঁদবিবি, জীবন সংগ্রাম, মিনার্ভা শ্রীমতী, কালো টাকা, পিতা-পুত্র, সারথি শ্রীকৃষ্ণ, দেবত্র, মহানায়ক শশাঙ্ক, ঠাঁয়ে শকুন্তলা, জাতিচ্যুত, স্বর্ষমহল, াজ্ঞনর্তকী, জামলী, পরিতীতা প্রভৃতি নাটকেও সুরের পবন বুলিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে বহু জন-অভিনিমিত ঠাঁয়ে অভিনীত 'শ্রীকান্ত' নাটকটিতেও সুর দিয়েছেন দুর্গা সেন।

বিভিন্ন ভাষায় ইনি যত গান রেকর্ড করেছেন, তার সংখ্যা আজ অবধি প্রায় হাজারের কাছাকাছি হবে। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীতে সঙ্গীত-শিল্পী থাকাকালীন যে সমস্ত খ্যাতিমান শিল্পীদের ইনি পাঠ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে—স্বর্গীয় কুন্দলাল সারগল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেন মুখোপাধ্যায় ও চৌধুরী,

সমবেশ রায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জামল মিত্র, রবীন্দ্র মজুমদার, অসিতবরণ, প্রমোত্তনানারায়ণ, অপবেশ লাহিড়ী, সত্য চৌধুরী, স্বর্গীয় সুধীরলাল চক্রবর্তী, গৌরীকেশ্বর ভট্টাচার্য, তপনকুমার, অখিলবকু, স্বর্গীয় মৃণালকান্তি ঘোষ, দিলীপ সরকার, ভবানীচরণ দাস, শচীন গুপ্ত, বেচু দত্ত, সুধীন চট্টোপাধ্যায় (আকাশবাণী), পান্নালাল ভট্টাচার্য, বিমলভূষণ, সি. এইচ. আত্মা, এন. এল. পুরী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী মজুমদার, ভারতী বসু, বাঁশরী লাহিড়ী, সার্বিকী ঘোষ, গায়ত্রী বসু, বেলা মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, রত্না গুপ্তা (পরিচালক হেমেন গুপ্তের জ্যেষ্ঠ), কুসুম গোস্বামী, বাধারানী দেবী, বাণী ঘোষাল, গৌরা মিত্র, রমা মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতোপাসক দুর্গাদাস সেনের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল খেলাধুলায়, সঁতার কাটার তাঁর ভাষণ সব। ভ্রমণের মধ্যেও তিনি গেয়ে থাকেন অপার আনন্দ।



দুর্গা সেন

## মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

### ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজি: ডাকে .....২৪,  
বাণ্যাসিক " " .....১২,  
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজি: ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়).....২২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

### ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সভাক ১৫,  
বাণ্যাসিক সভাক .....৭।।

প্রতি সংখ্যা ১।।

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা-রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৪।।

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১।।

বাণ্যাসিক " " .....১০।।

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " .....১৪।।

# রঙ্গপট



## লোকমাগ্ন তিলক : প্রামাণ্য ছায়াচিত্র

লোকমাগ্ন তিলকের জীবনী অবলম্বন করে ভারত সরকার একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে সারা ভারতকে তা উপহার দিয়েছেন।

দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার অবসানকল্পে ভারতের সন্তানদের অবদানের ইতিহাসে লোকমাগ্নের একটি বিরাট আসন সংরক্ষিত। লোকমাগ্নের নেতৃত্বে সেদিনকার ভারতবর্ষ পেয়েছিল একটি সত্যিকারের পথের নিশানা। সাংবাদিক তিলকের নিভীক লেখনী সেদিন গঠন করেছিল ভারতের জনমত। শুধু তাই নয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে ভারতের রাজনীতিক গগনে ঐ পশ্চিম ভারতেই যে সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্বের ফলস্বরূপ তিলকের নেতৃত্ব ও আদর্শ অনেক উঁচুদের এক সূক্ষ্মপ্রস্থ। তিলক ভারতে সত্যিকারের প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, ভারতের বৃক্ক নির্জীবতা ও ক্লৈবোর প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়ার জন্য কোন বিদেশী শক্তি তাঁকে নিযুক্ত করবার মত স্পর্ধা প্রকাশ করতে পারেনি। 'মহাত্মা'-আখ্যার উপযুক্ততম অধিকারী তিলকের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।

আমাদের বর্তমান বক্তব্য এই চিত্রটির নির্মাতাদের প্রতি। তিলকের জীবনী উপহার দিয়ে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। তবে একটা কথা উল্লেখ করি। ছবিতে যখন তিলকের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক ঘটনাগুলোও দেখানো হ'ল—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডও দেখানো হ'ল—সেই সময় রবীন্দ্রনাথের নাইট-হুড ত্যাগ ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ভারতের নব রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের অবদান এই অকৃতজ্ঞের দল এক অকৃতজ্ঞ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভারত সরকার অস্বীকার করলেও মহাকাল তা চিরদিনই স্বীকার করে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে কবি-রবির জন্মদিন সরকারী ছুটির দিন বলে গণ্য করা হয় না অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ভারতভাষী' আখ্যা পেয়েছে সে কবিতার নাম বঙ্গভাষী হয়নি। তিলকের সমকালীন অনেক ঘটনাই দেখানো হয়েছে বা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্বীকার করব না—বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দের ঐতিহ্যবাহী স্থানলাভ করেছে—জালিয়ানওয়ালাবাগও দেখানো হ'ল অথচ রবীন্দ্রনাথ নেই—আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই দেশবন্ধুও অল্পপস্থিত। এ তাঁদের ইচ্ছাপূর্বক বাদ দেওয়া ছাড়া আর কি হতে

পারে? পরিশেষে নির্মাতাবৃন্দকে এইটুকুই বলি যে অকৃতজ্ঞতার আর নিলঙ্কারও সীমা আছে একটা।

## কাঁচামিঠে

বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার চিত্রজগতও সমানভাবেই পুষ্ট হয়েছে জ্যোতির্ষ্য রায়ের কল্যাণে। স্বসাহিত্যিক জ্যোতির্ষ্য রায়ের লেখনীগ্রহৃত উদয়ের পথে ও অল্পকাল আগে প্রদর্শিত তাঁরই লেখনীগ্রহৃত ও পরিচালিত কাহিনী 'টাকা-আনা-পাই' চিত্রলোকে বিশ্বায়ের সঞ্চার করেছিল। তাঁর বর্তমান অবদান 'কাঁচামিঠে'। দুটি তরুণ ও দুটি তরুণীকে মুখ্যত: কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। একটি ঘর ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে এদের চরিত্রের ও কর্মধারার বিকাশ। এদের অল্পবয়সের হালকা দুঃস্মর, নরম মনের আদান-প্রদান, অপরিপক্ব চিত্তের যাত-প্রতিযাত, ভাবধারা-বিনিময় গল্পের প্রধান উপদ্রব্য ও যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। কাঁচুকুতু থেরে, হাসতে হাসতে বাঙলাছবির দর্শকবৃন্দ যখন হাসির ছবি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন সেই সম্বন্ধে কাঁচামিঠের মত হাসির ছবি তাঁদের বিরক্তিকে পরিণত করবে তৃপ্তিতে। বদলে দেবে স্বাদ। ছবিটি হাসিরই ছবি অথচ কাঁচুকুতু দিয়ে হাসানোর প্রচেষ্টা এতে এতটুকু নেই—বরং স্বচ্ছতা ও সাবলীলতায় এ ভরপুর।

প্রধানাংশে দেখা দিয়েছেন রবীন মজুমদার, অরুণকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ। এঁরা চরিত্র-চতুষ্টিয়ে যথাযোগ্য রূপদান করতে কৃতকার্য হয়েছেন। অরুণ-সাবিত্রীর বাবার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রীর প্রণয়কাস্মিকপে জীবন বন্ধ, ভৃত্য-বৈশী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীনের পাণিপ্রাথিনীরূপে বিনতা রায় ও ছবি বিশ্বাসের সহধর্মিণীর ভূমিকায় রেণুকা রায়ের অভিনয় অপরিণাম প্রশংসার দাবী রাখে। এ ছাড়া অভিনয়শ্রেণী আছেন মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায়, তুঙ্গসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবরূপ হালদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, শুক্লা দাস প্রভৃতি। সুস্থর ঘোষের চিত্রগ্রহণ ও রাজেন সরকারের সঙ্গীত-পরিচালনাও ভাল লাগবে। সবার শেষে, জ্যোতির্ষ্য বাবুকে সর্বাঙ্গীন অভিনন্দন জানিয়ে এবং পূর্বাহ্নে তাঁর আগামী অবদানগুলির সাফল্য কামনা করে বলি কাঁচামিঠে ভাল ছবি হয়েছে একথাও যেমনই সত্যি, তেমনই কাঁচামিঠে যে টাকা-আনা-পাইএর ধারে-কাছেও যৌবনে পারে নি একথাও অনস্বীকার্য।

## মমতা

বাঙলা দেশের সমাজজীবনে সংসার আসনটি খুব নিরাপদ নয়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর যেমনই মাথার ভূষণ হয় আবার সতীন-পোর সংসার হিসেবে অপরের চোখে তাকে মোটেই ভাল দেখায় না। অবশ্য এরও যে ব্যতিক্রম নেই এমন কথা বলা যায় না। বাস্তব কেন্দ্রেও দেখছি, কোন এক সংসার তাঁর সতীনপোকে যে চোখে দেখতেন বোধ করি তাঁর সেই স্নেহ তাঁর নিজের সন্তানও পায় নি। শোবোক্ত-পর্ধ্যায়ের কোন এক সংসারে কেন্দ্র করে 'মমতা'র কাহিনী রচিত। মমতা স্বামী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেল তার চার মাসের মাতৃহারা সপত্নীকৃতাকে। কিছুকাল পরে দেখা গেল সে কালা ও বোবা, সকলে ধারণা করল সংসার বিধ-দৃষ্টিতে শিশুর এই পরিণতি। মমতার ব্যথা কিন্তু আর কেউ বুঝল না, সে চাইল মুলে দিয়ে রাখার মুখে 'মা' কোটাতো স্বামী প্রত্যাশ

এবার বেঁকে বসল। তাঁর সম্মানবোধ তাকে টেনে রাখল, ফলে রাধাকে নিয়ে মমতার গৃহভাগ, তাকে খুসে ভর্তি করা, অশেষ যত্নে তার মুখে কথা ফোটানো, প্রতাপের আগমন, ভুল বোকাবুধি পরে রাধার মুখে 'মা' শুনে প্রতাপের অভিমানে বিসর্জন ও মধুর মিলন। এই জাতীয় অভিনব বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়ে তাকে সর্বজন সমক্ষে উপস্থাপিত করার প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কয়েকটি ভুলত্রুটি ছবিটির সাক্ষ্যে অনেকখানি কুঠারাঘাত করেছে। বাঙালী-সমাজে স্ত্রীর মৃত্যুতেও সাধারণতঃ এক বছর কালাশৌচ পালন করা হয়, এখানে দেখলুম লক্ষ্মীর মৃত্যুর চার মাস পরেই প্রতাপ মমতাকে বিবাহ করেছে, বাপা সত্যিই কালো কি না পরীক্ষা করার জন্যে প্রতাপ যখন চীৎকার করে 'রাধা-রাধা' করে ডেকে জিনিষ-পত্র ভাঙতে আরম্ভ করল বাড়ীর আর কেউ সেখানে উপস্থিত হ'ল না। মাতিনের সমস্ত টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কতাদের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া করলেন ভাগ্য মানায় সত্যি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেটা কতটা সম্ভব—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ নেই কি? সুবীরের তার বাবাকে বিশেষ মনে পড়ে না—পরে শুনলুম সে পিতৃবিয়োগের

পরই মাষ্টারী করতে শুরু করে। উপরিউক্ত উক্তিগুলি পরস্পর-বিরোধী নয় কি? যে ছেলে মাষ্টারী করতে পারে তার বাবাকে মনে রাখার মত সে সময়ে তার যথেষ্ট ব্যয়স হয়েছে। সুবীরের ঘরে যেখানে স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গাঙ্গীর মূর্তি বসানো আছে সেখানে কি কোন বঙ্গ সন্তানের মূর্তি বসানো যেত না? যে ঘটনার উল্লেখ করে সেই মূর্তি দেখানো হয়েছে সেই ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভাসাগর, রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি কি সেখানে খাপ খেত না? ভারতের রাজধানীসহ সমস্ত প্রদেশগুলিতে বাঙালী মনীষীরা কতটুকু সম্মান আজ পাচ্ছেন? বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে বাঙালার অসংখ্য যুগমানবদের উপেক্ষা করার মত অমার্জনীয় অপরাধ আর নেই। আর একটি ভয়ানক ভুল চোখে পড়ে—যেদিন প্রতাপ রাধাকে পরীক্ষা করেছে সেদিনও দেখি, সে শিশু পনের দিনই জন্মতিথির আসরে তাকে দেখি যে একটি রাতেই তার ব্যয়স প্রায় বছর তিনেক বেড়ে গেছে। বাঃ আশ্চর্য!

অভিনয়ে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন বেবী রাধা। মুক ও বধিরের অভিনয় করার সঙ্গেই সমস্তই চোখে মুখে রাধা যে একটি বিরাট শক্ততা ফুটিয়ে তুলেছে তাতে

বিশ্বের নিষ্ঠুর শিক্ষামূলক চিত্র  
আপনাদের প্রিয় চিত্রগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষা



এ. ডি. এম. চিত্র  
**হামপনছিক ডালকে**  
(সঙ্গীত-সমৃদ্ধ চিত্রশারী শিক্ষামূলক চিত্র)

সুসংগত প্রযোজক  
এন. দত্ত • সদাসিবজি রায় কবি • সন্তোষী •

—ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটস পরিবেশিত—



তার ভবিষ্যৎ শিল্পীজীবনের ঔজ্জ্বল্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পরেই প্রশংসা পাবেন দীপক ও অরুণ্যকী মুখোপাধ্যায়। পরস্পর বিরোধী দুই চরিত্রের পাশাপাশি সংস্থাপন উভয়েরই প্রতিভা ক্রমের সহায়ক হয়ে উঠছে। এঁদের সঙ্গেই যুগ্ম দের নামও উল্লেখনীয়। তিনিও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বোম্বাইয়ের বলরাজ সাহনী এই প্রথম বাঙলায় অভিনয় করলেন! অভিনয় তিনি ভালই করেছেন, তবে তাঁর অভিনয় মনে দাগ রাখতে সক্ষম হয় না। এ ছাড়া রূপায়ণে আছেন অমর মল্লিক, ডাঃ হরেন, জহর রায়, নবদীপ হালদার, ছবি বোম্বাল, তপতী বোম্ব, অপর্ণা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেবা দেবী, আশা দেবী, মারা ভট্টাচার্য, শান্তা দেবী প্রভৃতি। মমতার শেষ দৃশ্যটি প্রত্যেকটি দর্শককে অভিভূত করে তুলবে সন্দেহ নেই।

### বসন্তবাহার

ছায়াছবির মধ্যে দিয়ে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়ে যে কটি ছবি এসেছে তাদের মধ্যে বিকাশ রায়ের প্রয়াস যেমনি মত ও তেমনই সার্থক, এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ কবছে বসন্তবাহার। সঙ্গীতের রস-আনন্দনাভিলাষী দর্শক সাধারণকে পরম পরিভূক্তির খোরাক জুগিয়েছে বসন্তবাহার। সুর, তান, রাগের মোহনীয় ইন্দ্রজাল বিস্তার করে বিমুগ্ধ করে রাখে দর্শক সাধারণকে সঙ্গীতধর্মী এই চিত্রটি। গানের ছবি হিসাবে বসন্তবাহার অতুলনীয় ঠিকই তবে গান বাদ দিয়ে বসন্তবাহারের সমালোচনা করলে পূর্বোক্ত মতটি ঠিক পোষণ করা যায় না। কাহিনীকার অনিলবরণ ঘোষ বয়েসে তরুণ, তাঁর লেখার স্নিগ্ধতা আছে, আছে আন্তরিকতা। তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের আমরা সাফল্য কামনা করি। কাহিনীর প্রথমার্ধ বেশ একরকম বায় তারপরই শুরু হয় মিনিটে মিনিটে অতি নাটকীয়তা। আবেগের প্রাবল্য নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে সহায়কও যেমনই আবার নাটকের গভীরতাকে হত্যা করে এই অতি আবেগ প্রবণতা। শেষের দিকের ঘটনাগুলিকে খাপছাড়া বললেও অত্যাঙ্ক হয় না। তরুণ সঙ্গীতসাধক জয়ন্ত মুখু হয় মুন্নাবাইয়ের গানে, সে তাঁর শিষ্যত্ব নেয় কিন্তু তাঁর কাছে পায় কথার কথার আঘাত, অবজ্ঞা ও অপমান। তাঁর মেয়ে লতার সঙ্গে জয়ন্তের হয় মন বিনিময়। মুন্না লতার বিয়ের ঠিক করে এক কুমারবাহারের সঙ্গে। জয়ন্ত যিরে আসে এদিকে লতাও কুমার বাহারের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়ে ও নিজের পিতৃ পরিচয় পেয়ে সকলে মিলে চলে আসে নিজেদের দেশে। মুন্নারও জীবনের ধারা যায় বদলে। বাঈজী হয়ে যায় গৃহস্থ-গৃহিণী। এদিকে লতার স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের গায়েহলুদের মণ্ডপ ত্যাগ করে যায় জয়ন্ত, সঙ্গে সঙ্গে করে দেশত্যাগ, লতাকে সে খুঁজে বেড়ায়। নানা ঘটনার পরে মাগের মৃত্যুর পর লতা বখন চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন সেই সময় ঘটনাচক্রে জয়ন্তের সঙ্গে লতার হয় পুনর্মিলন। নিজের বিয়ে ভেঙে গৃহত্যাগ করল জয়ন্ত তারপর তার বাবার সন্ধে পরিচালক নীরব। অর্থাৎ জয়ন্তের এই গৃহত্যাগ তার পরিবারে কি ফল প্রসব করল সে সন্ধে কিছুই জানা গেল না। শিয়ারীলাল চরিত্রটি ভাল সন্দেহ নেই, তবে নতুনদের কোন ছাপ নেই কারণ এই। জাতীয় চরিত্র এর আগে

আরও দু'একজন স্বনামধন্য পূর্বসূরীদের লেখনীতে আবির্ভূত হয়েছে তবু পরিবেশের গুণে চরিত্রটি বড় ভাল লাগে। যে কুমার দু'দিন বাদে জামাই হতে যাচ্ছে মুন্নার তখনও তাকে 'আপনি-আজ্ঞে' করা ভাল লাগে কি? চিঠি লিখে জয়ন্ত চাকরকে দিচ্ছে—তুমু চিঠিটিই—তা খামে ঠিকানা লেখা বা তা জোড়া বা তাতে ডাকটিকিট লাগানো কি চাকরের দ্বারা হবে? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মারা ভট্টাচার্যের চরিত্র দুটি অনাবশ্যক সৃষ্টি মাত্র। ও চরিত্র দুটি কাঁচিছাঁটা করলে কোন ক্ষতি হোত বলে মনে হয় না।

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন বিকাশ রায়। ধরতে গেলে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে ছবির গায়ে সত্যিকারের বসন্তের ছোঁয়া লাগল। বড় দরদ দিয়ে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তারপরই প্রশংসা পাবেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুন্নাবাইএর দস্ত, আত্মগরিমা আবার লক্ষ্মীর অর্থদৈন্ত, বাঙালী-সুলভ সহজ রূপটি সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনন্দন যোগ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। নায়ক বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় জড় না হলেও স্বাভাবিক নয়, স্বতঃস্ফূর্ত নয়, স্বচ্ছ নয় তবে স্থানে স্থানে তাঁর শক্তির আভাস পাওয়া যায়। প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে দর্শককে মাতিয়ে তোলেন অপর্ণা দেবী, পাহাড়ী সাক্ষাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও শ্রাম লাহার অভিনয়ও প্রশংসনীয়, বহুদিন বাদে প্রতাপ মুখোপাধ্যায়কে দেখা গেল। কণ্ঠশিল্পীর কণ্ঠের সঙ্গে চমৎকার ভাবে গুঠ মিলিয়েছেন প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। শ্রীলা চট্টোপাধ্যায় (ওরফে সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়) এখনও স্বাভাবিকতাকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি, তবে তাঁর সজ্জাবনা প্রশস্ত। এ ছাড়া রূপায়ণে আছেন—শ্রীপতি চৌধুরী, সৌরেন বোম্ব, শ্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, ভানু রায়, অম্বুশীলা, সীতা সেনগুপ্তা, গুলা দাস, নিতাননী দেবী, সন্ধ্যা দেবী, মারা ভট্টাচার্য, আশা দেবী প্রভৃতি। এ ছবিতে ভারতের বহু বরণ্য সুরসাধকের সমন্বয় ঘটেছে, সে কথা কারোরই অবিস্মৃত নেই। প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে। প্রশংসার দাবী করতে পারেন চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত। আবার বলি গানের ছবি হিসেবে বসন্তবাহার অতুলনীয় এবং এই ছবি উপহার দেওয়ার জন্তে বিকাশ রায় নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্থ।

### রত্নপট প্রসঙ্গে

সঙ্গীত-সাধক দিলীপকুমার সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-জগতেও একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ। দিলীপকুমারের দরদভরা কণ্ঠ, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিভিন্ন ভাষার তাঁর অনায়াস অধিকার বাঙলায় গৌরবেরই বস্তু। চলচ্চিত্রে এবারে তাঁকে প্রথম দেখা যাবে সুধীরবন্ধু পরিচালিত 'মাধুর' চিত্রে। দিলীপকুমারের পরিচালনার এই ছবিতে ধনঞ্জয়, সভীনাথ, গোবিন্দগোপাল, ধীরেন বসু, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শোনা যাবে। পর্দায় দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাক্ষাল, ইন্দ্রনাথ, গুকারনাথ, দেবদাসী অম্বুতা গুপ্তা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা বাগ, সুখিকা চক্রবর্তী প্রমুখ

ভিন্ন-শিল্পীদের। \* \* \* ভারতের চলচ্চিত্রলোকের অগ্ৰতম শ্রেষ্ঠ দ্বি-নীতীন বসু বর্তমানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'কে ধীর রূপ দিতে ব্যস্ত। হরিপ্রসন্ন দাশ সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন। গগতা বীতা রায় সহ অভিনয়শাশে আছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায় বসন্ত ধুরা, অসিতবরণ, উৎপল দত্ত, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী প্রভৃতি। \* \* মহাকবি মধুসূদনের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা 'বুড়ো শালিকের ড়ে রোঁ'কে চিত্রায়িত অবস্থায় শীঘ্রই দেখা যাবে, সেট ঙ এই ছবিতে দেখা যাবে জীবন বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, সুনী লাহিড়ী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সুনী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, আবতী দা, অমিতা বসু, রাজলক্ষী প্রভৃতিদের। \* \* \* কমল ঙ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'ভগো সুনছো'র ভূমিকালিপিতে আছেন হর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অতুলকুমার, ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রাম লাহা, ডাঃ হরেন, দ্বা দেবী, মঞ্জু দে, শোভা সেন, জয়শ্রী সেন, মলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্লা দাস প্রমুখ শিল্পীগণ। ক্যামেরা ও সুরের ভার পেয়েছেন ঙাক্রমে অনিল গুপ্ত ও বাগচি। \* \* \* খ্যাতিমান কবি বিমল ঙ্যায়ের 'মুখোস' কাহিনীটি চিত্রায়িত হচ্ছে মাহু সেনের পরিচালনায়। র দিচ্ছেন তরুণ শিল্পী শ্রামল মিত্র। বিভূতি চক্রবর্তী বোঝাচ্ছেন ঙ্যায়ের হাতল। চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন—ছবি বিশ্বাস, কানু ঙ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঙু দে, অপর্ণা দেবী ও নবাগতা বাসবী প্রমুখ শিল্পীরা। \* \* \* ঙকনিষ্ঠতম পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি 'জন্মাস্ত্র' তে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ, র্নলকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বীবেন চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ক্রুদ্ধতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালক-জীবনের আমরা সর্বাদীন ঙমনা করি। ছবিট প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী রেখা দেবী মহাশয়।

## চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

### হাস্যকৌতুক অভিনেতা শ্রীজহর রায়

হাস্যকৌতুক অভিনেতা হিসেবে শ্রীজহর রায় একটি বিশিষ্ট স্থান ঙ্গীকার করে আছেন আজকের দিনের বাংলা মঞ্চ ও চিত্রজগতে। গতি্য এক অদ্ভুত শিল্পী ইনি, যখন তখন হাসি ও আনন্দের উপাদান ঙষ্টিতে তাঁর এতটুকু বাধে না। এক কালের সিরিয়াস অভিনেতা কি ভাবে নিজেকে কমেডিয়ান করে তুললেন, সে অবিগ্গি জানবার ঙ্যাপার। কিন্তু কমেডিয়ান জহর রায়কে আমরা যখন পেলুম— তখন বিস্মিত না হ'য়ে পারলুম না। অভিনয়-কলার একটা নোতুন ঙিক যেন খুলে গেল আমাদের সম্মুখে।

এরই মধ্যে এই স্বনামধন্য শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো আমার ঙীরই বাসকক্ষে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা—তাঁর অভিমত জানা। আলোচনা আরম্ভ হলো, আমার এক একটি প্রশ্নের উপর চলল তাঁর উত্তর।

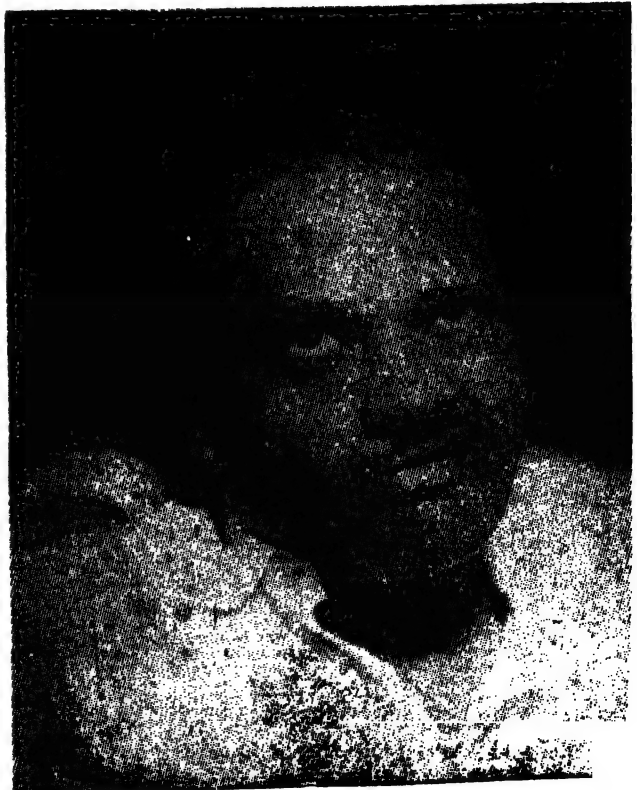
১৯৪৬ সালের 'পূর্বরাগ' ছবিতে বটেশ্বরের ভূমিকায় আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ, বললেন শ্রীজহর রায় ধীরে ধীরে আমার প্রথম

প্রশ্নের উত্তরে।—"কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, বলা হয় তো একটু করিন। তবে তপন সিং পরিচালিত 'উপহার' ছবিতে ভোলায় চরিত্রে অভিনয় করে আমার খুব ভাল লেগেছে এটিটা না বলে পারবো না। এর একটা প্রধান কারণ ভোলা চরিত্রটিতে আমার মনের গোঁরাক খুঁজে পেয়েছিলাম। অল্প সব ছবিতে সাধারণতঃ মনের সঙ্গে মিলিয়ে ওমনটি পাওয়া যায় না। ফলে অভিনয় করে আশাহুরূপ তৃপ্তি সব সময় পাওয়া যায় না।"

চলচ্চিত্র জগতে যোগদানে প্রথম প্রেরণা পান আপনি কোথায় এবং এতে যোগদানের কারণ কি? ধীর কঠেই উত্তর করলেন শ্রীজহর—"অভিনয় করবার প্রেরণা পাই ছোটবেলাতেই এবং সে আমার বাবার কাছ। বাবা চলচ্চিত্রের নির্বাক ঙ্গে অভিনয় করতেন এবং বঙ্গমঞ্চেরও তিনি ছিলেন একজন কুশলী অভিনেতা। বাবার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে আমিও অভিনেতা হ'বো, যোগ দেব চলচ্চিত্রে। এ লাইনে আসবার গোড়াকার কথা হিসেবে এইমাত্র বলতে পারি। এতে যোগদানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি মনে আনার কখনই উঠেনি বা ছিল না। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পরও সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে আমার কোনই পরিবর্তন আসেনি, এটুকুও বলতে পারি।"

এর পর আমার প্রশ্ন থাকলো সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কণ্ঠস্বটী কি? এবং আপনার কোন বিশেষ হবি আছে কি না?

শ্রীরায় উত্তর করলেন—"দৈনন্দিন কণ্ঠস্বটীর মধ্যে খুব একটা



শ্রীজহর রায়

নোহুনই নেই। স্যুটি থাকলে সকাল ৯টার মধ্যে ছুঁড়িওতে বেরিয়ে যাই। স্যুটি শেষে বাড়ী ফিরে বইপত্র পড়ি। যেদিন স্যুটি থাকলো না সে দিন আর কাজ কি? ঘরে বসে শুধু পড়াশুনো। ভাল ইংরেজী ছবির সম্ভান পেলে দেখতে যাই। থিয়েটারে যেদিন অভিনয় থাকে সেদিনগুলোতে স্যুটি সেবেই সেখানে চলে যাই।”

হবি বলতে কোনটাকে বলবো, শ্রীজহর বলে চলেন। “পুঁথি পুস্তক পড়তে আমার বেশ ভাল লাগে এবং এই নিয়ে আমি অনেক সময় কাটাট, এট মাত্র বললুম। humour ও satire নিয়ে যে সব বই deal করে, সেগুলো আমার কাছে খুবই প্রিয়। পত্রপত্রিকাও আমি পড়ে থাকি নিয়মিত। এর ভেতর নাম করতে পারি সাপ্তাহিক দেশ ও মাসিক বসুমতী। দৈনিক পত্রিকা প্রায় সবগুলিই আমি পড়ে থাকি। খেলার দিকেও আমার একটা ঝোঁক আছে। ফুটবল ও ক্রিকেট আমার খুব প্রিয় এবং খুল ও কলেজ জীবন থেকে এ আমি গেলে আসছি।”

—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন?

শ্রীনাথের কাছে স্পষ্ট উত্তর—“প্রথমেই চাই স্পন্দন চেতনা। শিল্পীর চোখ-মুখ expressive হওয়া অত্যাবশ্যক। আর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে স্মৃতি ও অনুপম বাচনভঙ্গী। টাইপ চরিত্রে অভিনয় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এর জন্য পড়াশুনোও থাকা চাই প্রচুর। সহজ কথায় প্রতিষ্ঠাকামী শিল্পীকে জান সফল করতে হবে বহু বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে।” আমার পরবর্তী প্রশ্ন—ভাল ছবি তৈরী করতে হলে কি করা প্রয়োজন?

—“ভাল ছবির জন্য ভাল গল্প চাই, এটিই আমি প্রথমেই বলবো। বিশেষ ভাবে আবও চাই গল্পাচারী চরিত্র নির্বাচন। সফল পরিচালক হলে এক কাজট কঠিন হবার নয়। নোহুন দৃষ্টিভঙ্গী

কালের চাহিদা অনুযায়ী গল্প নির্বাচন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রযোজকদের কচি ও দৃষ্টিভঙ্গী দরকার হলে না পাটালে চলবে না। দেশ ও সমাজের চাহিদাও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ছবি নির্মিত হওয়া সমীচীন। সবচেয়ে বড় কাজ যে ছবি হবে সেটি সকলের বোধগম্য হওয়া দরকার। এ জন্য যদি কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের ও প্রয়োজন হয়, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ছবির উৎকর্ষসাধন করতে হলে প্রযোজকদের উচিত হবে শক্তিশালী পরিচালকদের উৎসাহ দান।”

—চলচ্চিত্রে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

—“শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বত বেশী এ লাইনে যোগদান করবেন, ততই এ শিল্পের নিশ্চিত উন্নতি, এটি সহজেই বলা যায়। যোগদান বলতে নিছক এ লাইনে আসাই নয়, সঙ্গে থাকতে হবে অব্যাহত সাধনা ও সজীব শিল্পমন।”

আলোচনা ক্রমে অনেকটা এগিয়ে চললো। এবারে আমি জানতে চাইলুম শ্রীনাথের কাছে—সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণাই বা কি?

শ্রীনাথ দুটো প্রশ্নে উত্তর করলেন, “সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান বহু উঁচুতে। এর মাধ্যমে চলিত অবস্থা-বাবস্থার অনেক কিছু সম্পাদ করা চলে। এজন্য satirical ছবি বিশেষ ভাবে গড়ে তোলা দরকার, অন্ততঃ আমার এই অভিমত। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ও আশাবাদ, তবে সরকারকে এজন্য কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে চলচ্চিত্রের ক্রমান্বিত না হয়ে পারে না। স্তরের বিষয়, আজকাল ভাল ছবি তৈরী করবার একটা tendency এসেছে এবং সরকারও নিজ অর্থ-বায় হু-একটি ছবি করছেন।”

শেষ পর্ধ্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবনই বা কি ভাবে কাটাতে চান?

অত্যন্ত সহজ গলায় উত্তর করলেন জহর দাস—“বিশালা আমার ক্ষমতা হলেও পাটনাতে কাটে আমার খুল ও কলেজ-জীবন। পড়াশুনো শেষ করে প্রথমে আমি ব্যবসায়িক প্রবেশ করি। মনে মনে ছিলাম অভিনয়-জগতে যেমন করেই হোক আসবো। কিন্তু প্রথমেই যোগ্য মেলে নি। এ ভাবে কিছুকাল কাটাবার পর এক দিন ১৯৪৪ সালের কথা। তখন আমার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল, এ লাইনে আসবই এবং প্রতিষ্ঠাও অর্জন করবো। প্রথমে আমি serious অভিনয় করতুম কিন্তু যখন বুঝলুম যে, এ ভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে বিলম্ব হবে তখন comedian হিসেবেই অভিনয় আরম্ভ করি। এ লাইনে স্থায়ী আসন পাবার প্রথম পর্ধ্যায়ে ধীরে আমাকে ধীরে ধীরে সাহায্য করেছেন, তাঁদের ভেতর রয়েছেন অভিনেতা ও চিত্রোপাধ্যায়, পরিচালক অর্দেন্দু মুখার্জী ও বিমল রায় এবং পর্ধ্যায়ে তপন সিংহ। এঁদের উৎসাহ ও প্রেরণায় তখন শিল্পীজীবন গড়ে উঠেছে, এ কথা আমি অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করছি। এখন অবধি আমার জীবনের পরিচয় এইমাত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয় করে এখনই কিছু বলা চলে না। তবে শিল্পী আশা শিল্পী হিসেবেই আমি কাটাতে চাইব বাকী জীবনটা।”



১৪৮ থিয়েটারে প্রীকান্ত নাটকে জহর গাঙ্গুলী

প্রীতিভাজনে

‘মাসিক বসুমতীর’ বিগত সংখ্যায় আমার জীবন-কথা সম্পর্কে যে সচিত্র বিবরণী বাহির হয়েছে, তার জগ্ন সম্পাদক হিসাবে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই জীবনকথার যিনি লেখক তাঁহাকে আমার প্রগাঢ় সাধুবাদ জানাবেন, লেখাটির ভিতর দরদ ও প্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ‘মাসিক বসুমতীর’ সঙ্গে প্রথম তরুণ বয়স হইতে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগসূত্র নানা দিক দিয়ে, সেই প্রীতির সম্পর্ক আরও গাঢ় হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেখাটির ভিতর অনবধানতা বশত: কিছু ভুল (বোধ হয় ছাপার ভুল) আছে। পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করিলে বাধিত হইব। যেমন যুগান্তর ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৪৭ নহে এবং ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ৬ মাসের পরেই আমার নাম সম্পাদক হিসাবে ঘোষিত হয়—১৯৪৮ সালে নহে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ বছরের মধ্যেই আমি সহকারী সম্পাদক (Asstt. Editor) পদ লাভ করিয়াছিলাম, ১২ বছরের মধ্যে নহে।

ভবিষ্যৎ reference’এর জগ্ন তারিখের দিক দিয়া এই ভুল সংশোধন বাঞ্ছনীয়। যদিও নিজের কথা উল্লেখ করা শিষ্টাচার-সম্মত নয়, তবু কোঁহুলী পাঠকদের জগ্ন আরও ছুটি কথা লিখিলে সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। যেমন বক্তা হিসাবে আমার জনপ্রিয়তা। এই কমিউনিষ্ট-অকমিউনিষ্ট দেশ সহ সারা পৃথিবী পরিক্রমা। আধুনিক বাঙ্গলার সম্পাদকদের মধ্যে আমিই প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা দুনিয়ার বৃহত্তম অংশ পরিভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। বাঙ্গালা কাগজের একজন সম্পাদকের পক্ষে ওই স্বেচ্ছা লাভ সম্ভবত: উল্লেখযোগ্য। আপনি যাহা ভালো বিবেচনা করেন, করিবেন। পুনরায় আমার প্রীতি ও ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি। ইতি আপনাদের শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

### এম্পায়ার স্ট্রেট বিল্ডিং প্রসঙ্গে প্রতিবাদ

আপনার সম্পাদনায় ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসের “মাসিক বসুমতী”র যে সংখ্যাটি বাহির করেছেন তার ৩৭০ পাতায় শ্রীদেবব্রত ঘোষ মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধ ‘এম্পায়ার স্ট্রেট বিল্ডিং’ তার চতুর্থ লাইনে ঘোষ মহাশয় জানাচ্ছেন “বাড়ীটি ১৪১০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা।” অথচ সুরকুমার সরকার বি-এ মহাশয় লিখিত ও মডার্ন বুক এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত “বুক অব নলেজ” নামক বই-এ ৪৪ পাতায় দেখছি লেখক জানাচ্ছেন, “সর্বসমেত এই বাড়ীতে ৭৫ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১০০০ ফুট,” ইহার কোনটি ঠিক বলিয়া জানিব? আপনার মতামত পেলে সত্য বোঝা যাবে আশা করি। মডার্ন বুক এজেন্সীকেও চিঠি দিলাম তাঁদের মতামতের জগ্ন। এই বইটি একটি পাঠ্যপুস্তক এটা আপনি নিশ্চয় জানেন, সেইজগ্নই আমার আগ্রহ বেশী—ছাত্রকে কি ভুল পড়ানো হবে কলিকাতা সহরে বাস কোরে? অধিক বাহুল্য। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।—অনিল মুখার্জী

### পত্রিকা-সমালোচনা

প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়, ধর্মালোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মাসিক বসুমতী নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ একজন সাধারণ পাঠকের তরফ থেকে। জরাসন্ধের

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



‘তামসী’ ভালো লাগছে। লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে এই লেখাটি। ‘লৌহকপাটের’ লেখক বাংলাসাহিত্যে পাকা হয়ে রইলেন। ‘রাজার রাজ্য’ অনেক দিন থেকে চললেও লেখাটির প্রতি আকর্ষণ সমানই আছে। সেটা বোধ হয় ভাষার গুণ ও চরিত্র চিত্রণে বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বলেই। পরিমল গোস্বামীর ‘স্মৃতিচিত্রণ’ বেশ লাগছে। স্তম্ভি মিত্রের জীবনী-কবিতা ‘বিবেকানন্দ স্তোত্র’ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুগপ্রয়োজন ও উনবিংশ শতাব্দী শীর্ষক অংশটি Original। রামমোহন সঙ্ঘে তাঁর মন্তব্য—‘তুমি নির্ধাত John the Baptist’ বা ঠাকুরের আবির্ভাব সঙ্ঘে “ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কেন বোললে না থলে তুমি”—বিদগ্ধজনকে চিন্তার খোঁরাক ছুঁগিয়েছে। শ্রীমালতী গুহ-রায়ের ‘শ্রীশ্রীসারদা দেবী’কে ‘অঙ্গন-প্রাঙ্গণে’ সৌম্যবদ না রেখে সাধারণ ভাবে পরিবেশিত হতে দিতে বাধা কি? —সৌরেন বসু। কলিকাতা—১৭

মাসিক বসুমতীর রুচিসম্মত প্রকাশের জগ্ন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। “রাজার রাজ্য” লেখক উদয়ভানুকে তাঁর চমৎকার লেখার জগ্ন ধন্যবাদ। অজ্ঞ ও প্রত্যহর লেখক “নৌকর”কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। তিনি যে আদর্শের জগ্ন ইহা লিখিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। মাসিক বসুমতীর অগ্নাঙ্ক লেখাগুলোও বর্তমানে সন্দর হইতেছে, তাহার জগ্নও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি লেখক সমেত আপনাকেও। আশীষকুমার ঘোষ, I. S. W. Colony বার্পুর আসানসোল।

কিনতে চাই

১৩৬৩ সালের চৈত্র সংখ্যা বসুমতী—শ্রীসিদ্ধমণি বড়ুয়া। পোতা শালকোচা, জেলা—গোয়ালপাড়া, আসাম।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা বসুমতী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কেরা, সংখ্যাটুড়া, পোঃ জামপুর, জেলা—বাঁকুড়া।

১৩৫৭ সালের শ্রাবণ, ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা অথবা ১৩৬২ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার বিনিময়ে ১৩৫৫ সালের কার্তিক ও ১৩৫৬ সালের মাঘ সংখ্যা বসুমতী—শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় C/o বান্ধব পাঠাগার, পোঃ ও গ্রাম শান্ত্রীগ্রাম, জেলা—বর্ধমান।

বেচেতে চাই

১৩৬১, ৬২ ও ৬৩ সালের সম্পূর্ণ মাসিক বসুমতী বাধান ও পোলা অবস্থায় আছে। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১ টাকা। শ্রীজীবন চক্রবর্তী, চক্রবর্তী অপটিকাল কোম্পানী, ১০ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

১৩৫৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ও ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যা বেচেতে চাই; ১৩৫৮ সালের মাঘ সংখ্যা বসুমতী আমার প্রয়োজন। ১৩৫৮ সালের ফাল্গুন কিংবা চৈত্র সংখ্যার বিনিময়ে ১৩৫৮ সালের মাঘ সংখ্যা দিতে পারি—শ্রীহিমন্তুরঞ্জন দে, পোঃ বালিসাই, জেলা—মেদিনীপুর।

১৩৬০ হইতে ১৩৬৩ সাল, ১৩৬৬-১৩৪১, ১৩৫১-১৩৫৫, ১৩৫৮-১৩৬০ সালের বসুমতী—শ্রীসুধীকুমার মিত্র; ১১সি নেপাল ভট্টাচার্য সেন, কালোবাট, কলিকাতা-২৬।

১৩৫৫ সালের কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন একটি করে মাসিক বসুমতী আছে। প্রতি সংখ্যা ১১০ দেড় টাকা মূল্যে ডাক খরচ সমেত।—শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বোরহাট, গোলপুকুর জেলা—বর্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর গ্রাহক মূল্য বাবদ আপনার ১৬৭৭৫৭ তারিখের পরমত ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। শ্রীমতী মেনকাশঙ্করী দেবী—Lalpur, Behar.

বালা দেশের সব খবর জানার জন্ত মাসিক বসুমতী নিয়মিত পড়তে চাই। এক বছরের জন্য গ্রাহক করবেন।—Miss Mahasveta Dutt. Sholapur.

১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে মাসিক বসুমতীর টাকা বাবদ ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া রাখিত করিবেন।—Punnyarani Das. Assam.

I am remitting herewith my subscription for monthly Basumati for the period from Asar to Agrahayan. kindly ensure proper delivery of my copy. Thanking you.—Leela Ghose. Deputy Superintendent. C/o. Asstt. Collector, Centra. Execisc, Jubalpur.

আমাদের মাসিক বসুমতীর আষাঢ় '৬৪ থেকে মাঘ '৬৪ পর্যন্ত টাকা ১০৭ পাঠাইলাম। শীগ্গিরি আষাঢ় সংখ্যা পাওয়ার আশায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।—শ্রীমতী চাঁপারানী মণ্ডল, মেদিনীপুর।

Sending Rupees fifteen only being the annual subscription of 'Masik Basumati' from Asarh number. Please instruct your despatch department to write the address properly—Sm. Anita Samanta. Hazaribagh.

আমার বার্ষিক মূল্য ১৫৭ টাকা M. O. করিয়া পাঠাইলাম। আষাঢ় সংখ্যা হইতে "মাসিক বসুমতী" পাঠাইবেন। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন। বরভপু, বর্ধমান।

মাসিক বসুমতী ছ' মাসের সডাক মূল্যস্বরূপ ৭১০ পাঠাইতেছি। আমার টাকা চৈত্র মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে। যদি সম্ভব হয় ওরা বৈশাখ হইতে বই পাঠাইবেন নতুবা আগামী মাস হইতে পাঠাইবেন।—মুক্তি মুখার্জী। জবলপুর।

Herewith sending Rs. 7.50 in advance for half-yearly subscription of 'Masik Basumati', kindly acknowledge and arrange to send the magazine from this month onwards. 'Thanking you.—Sm. Sulekha Roy. Bombay.

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্রিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধ করা যেন এক দুর্ভাগ্যবোধ বহনেন সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, ব্রহ্ম আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্য স্মৃতি আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থালাস। প্রদত্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে থুশী হবেন, সপ্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উল্লেখ্যোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে কে-কোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।





মাসিক বসুমতী ॥  
ভাঙ্গ, ১৩৬৪

(দেশী পট)

লক্ষ্মীত্রী  
- মণীষাচরণ বিশ্বাস অঙ্কিত





# মাসিক বসুমতী

১৬শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৪

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

## কহামৃত

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে, জন্মাবধি আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল।

যে কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী বালক-বালিকা বধন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি, সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীরলভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে বাওয়া বাইবে না। এই জন্মই যে কোন মত, যে কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্কে দুর্বল করিয়া ফেল, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, বাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, বাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকল প্রকার বিকৃত

মস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব, আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসের অন্বেষণ করায়, আমি সেই প্রশ্নালীগুলিকে পছন্দ করি না। কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি বৃথামাত্র।

শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ—এই সব না হইলে দেশের উন্নতি কি করিয়া হইবে? সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে কিছু হইবার জো নাই। পুণ্য, ইতিহাস, গৃহকাণ্ড, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্মপ্রাণ ও নীতিপ্রাণ করিতে হইবে। সত্যদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপ্রাণতা হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। মেয়েদের তোমরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) করিয়া তুলিয়াছ। রাম, রাম! এই কি তোমাদের শিক্ষার ফল হইল? মেয়েদের আগে তুলিতে হইবে, mass-কে (আপামহ সাধারণকে) জাগাইতে হইবে, তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# এলবার্ট আইনস্টাইন

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

জার্মান শাসিত পঁচ বছরের কয় ছেলের মন ভোলানোর জন্তে পিতা নাবিকের দিগদর্শন যন্ত্র নিয়ে এলেন। ছেলে প্রথমে অগমন্য ভাবে যথুটি নাড়াচাড়া করলো। তার পর যন্ত্রের কাঁটার কাগ-কলাপ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কোন অদৃশ্য শক্তি একে আকর্ষণ করছে? এই অনুসন্ধিৎসাই কি বালকের মনে ভবিষ্যতে জগদ্ধিখ্যাত বিজ্ঞানী হবার প্রেরণা দিল?

এই বালকই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ এলবার্ট আইনস্টাইন। ছেলে বয়সেই এর স্বভাব ছিল অজ্ঞা বালকের চেয়ে ভিন্ন রকমের। খেলাধুলায় তেমন মন দিল না। কল্পনাপ্রিয় লাঞ্ছন ছেলেটি একটি অগমন্য হয়ে দূরে বেড়াতে এবং পাখী, ফুল ও নৈসর্গিক শোভা দেখতে ভালবাসতো।

জার্মানির দক্ষিণ প্রান্তে বাভারিয়া প্রদেশের উল্ম নগরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ আইনস্টাইনের জন্ম হয়। আইনস্টাইনের এক বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা উল্ম পরিভ্রাণ করে মিউনিক সহরে এসে সপরিবারে বসবাস করেন। হোল বছর বয়স পর্যন্ত আইনস্টাইনের এখানেই কাটো।

আইনস্টাইনের অনুসন্ধিৎস মন ছেলেবেলা থেকেই বয়োজ্যেষ্ঠদের নানারূপ প্রশ্ন করতো। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্যস্থল ছিল পিতৃব্য জ্যাকব। জ্যাকব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন এবং এক পরিবারেই বাস করতেন। তিনিই ভ্রাতৃপুত্রের জীবন গঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ছেলেটি ভৌতিক কাহিনী বা আজগুবি গল্পের চেয়ে অঙ্কের বই পড়তেই বেশী ভালবাসতো। তাই এই বিষয়ে অজ্ঞা ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, অজ্ঞা বিষয়ে পড়ায় তেমন মন ছিল না।

আইনস্টাইনের পিতা ছিলেন সাহিত্যপ্রিয়। দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা তিনি পরিবারের সকলকে শীলার, গ্যোটে প্রভৃতি জার্মান গদ্যকারদের বই পড়ে শানাতেন। মাতা ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়া। পিতা ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে কোন দিন অস্থগুস্থিত থাকলে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সঙ্গীত-চর্চাতেই কাটতো। ছেলেবেলায় আইনস্টাইনকে বেহালা শেখানো হয়। অবসর বিনোদনের জন্তে তিনি বেহালা বাজাতেন, তাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতেন। এই ভাবে আইনস্টাইন ছেলেবেলায় পরিবারের তিন ব্যক্তির নিকট তিন বিষয়ে উৎসাহিত হতে লাগলেন—পিতার নিকট সাহিত্যে, মাতার নিকট সঙ্গীতে এবং পিতৃব্যের নিকট গণিতে ও বিজ্ঞানে।

ছয় বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলে যাওয়াই ছিল ভয়াবহ ব্যাপার! সেকালের জার্মান স্কুলের আইন-কাহন ছিল খুবই কড়া, সেনাদলের মত। শিক্ষকেরাও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। স্কুলের পড়া মুখস্থ করতে হতো। জিজ্ঞাসিত হলে আড়িড়ে দিতে হতো, না হলে চুপচাপ বসে থাকবার নিয়ম ছিল। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হলে বেড়াঘাত চলতো। আইনস্টাইনের ভাবপ্রবণ জিজ্ঞাসন-মন এরূপ আইন

কিছুতেই সায় দিল না। তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। মনে হতো বেন স্কুলটা একটা গোলামখানা। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ইহুদী। তাছাড়া খেলাধুলা করতেন না বলে অজ্ঞা ছেলেদের প্রিয় ছিলেন না। কাজেই স্কুলে একাকী নিজের মনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। স্কুলের পরে বাড়ী এসে ম্নেশীল পিতামাতার কাছে শান্তি পেতেন।

দশ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ ক'রে তিনি মিউনিকের লুইৎপোল্ড জিমনেসিয়ামে ভর্তি হন। এই জিমনেসিয়াম-গুলি হাইস্কুলের অনুরূপ, সেখানে আট বছর প'ড়ে ডিপ্লোমা পেলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়।

শান্ত, উদাসীন ছেলেটি স্কুলের শিক্ষকদের নিকট খুবই রহস্যময় হয়েছিলেন; এমন কি, তাঁরা একে নিয়ে অনেক সময় বিব্রত হতেন। ইনি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে কাঁচা ছিলেন। যে বিষয় তাঁর ভাল লাগতো না, সে বিষয় তাঁকে শেখানো মুশ্বিল হতো। কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি গণিতশাস্ত্রে এত ব্যাপন্ন হয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও শিক্ষকতা করতে পারতেন। অঙ্ক বিষয়ে তিনি প্রশ্রবাণে শিক্ষকদের জর্জরিত করতেন। তাঁরা সব প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে হতবুদ্ধি হতেন। এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনাব উল্লেখ করা যেতে পারে: একদিন স্কুলের ঘণ্টার পরে একটি শিক্ষক আইনস্টাইনকে একান্তে ডেকে বললেন, “এলবার্ট, তুমি ক্লাশে আমাকে এত প্রশ্ন কর যে, আমি সব উত্তর দিতে পারি না। বোধ হয় কেউ পারবে না। এতে আমাকে অপদস্থ হতে হয়।”

“তার, আমি এ জন্তে দুঃখিত, কিন্তু আমি জানতে চাই”—

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৃথিবীর সবাই তোমার এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে আর অপদস্থ করো না। ক্লাশে আমাকে আর প্রশ্ন করো না।”

এ সময় জার্মানির সামরিক শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যুবকেরা সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া গৌরবজনক মনে করতো। আইনস্টাইনের সৈন্যদল সম্বন্ধে যথেষ্ট ভীতি ছিল। এমন কি, স্কুলের ছেলেরা যখন সৈন্য সেজে খেলা করতো, তিনি দূরে সরে থাকতেন। তাঁর মনে হতো, তাঁকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হলে তিনি আর বাঁচবেন না। এই জন্তে তিনি পিতামাতাকে অনুরোধ করেন, জার্মানী ছেড়ে অগ দেশে যেয়ে বসবাস করবার জন্তে।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতার ব্যবসা খারাপ চলছিল। পিতা ঠিক করলেন যে, ইটালির মিলান সহরে যেয়ে আবার নতুন করে কারবার শুরু করবেন। শুনে আইনস্টাইন খুবই আনন্দিত হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে, তাঁকে এই মিউনিক সহরে একাই থাকতে হবে স্কুলের পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা নিয়ে বাবার জন্তে, তখন তিনি একেবারে দমে গেলেন। জীবনে এই প্রথম তাঁকে একা বোর্ডিং-এ থাকতে হলো। গৃহের সুখ-শান্তিও আর রইলো না। তিনি খুবই বিষণ্ণ হলেন। তারপর পালাবার এক মতলব করলেন।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে অস্ত্রের অজুহাতে মিউনিক ত্যাগ করে মিলানে যেয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলেন।

মিলান সহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে ছ'মাস নির্বন্ধাটে কাটালো। কিন্তু এ ভাবে ত আর জীবন বাবে না। তাঁকে একটা কিছু করতেই হবে। বিশেষতঃ পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুণ তাঁর সাহায্যের উপর আর বিশেষ নির্ভর করা চলবে না। তাঁর বরাবরের ইচ্ছা, সারা জীবন পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র নিয়েই কাটাবেন। কিন্তু মুশ্লিল হলো, তিনি ডিপ্লোমা পাবার আগেই পালিয়ে এসেছেন। কাজেই সুইজারল্যান্ডে জুরিক নগরের সুইস ফেডার্যাল পলিটেকনিক স্কুলের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু ডিপ্লোমা না থাকার দরুণ ভর্তি হবার জন্তে পরীক্ষা দিতে হলো। সাহিত্যে, প্রাণবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান তিনি অকৃতকার্ণ হলেন। তখন তাঁকে উপদেশ দেওয়া হলো, আরাউ নগরের নিয়ন্ত্রণ থেকে ঐ বিষয়গুলি আয়ত্ত করে আসতে!

আইনষ্টাইন আরাউতে নতুন জীবন পেলেন। এই পার্বত্য দেশের নৈসর্গিক শোভা ছিল অপূর্ণ। স্কুলের পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ, ছেলেরাও মিত্রভাবাপন্ন। আরাউ স্কুলের অধ্যক্ষ, প্রফেসর উইনটেলার, ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর পড়াশুনায় অনেক সাহায্য করেন। অধ্যক্ষের বাড়িতে কয়েকটি বিদেশী ছেলের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা ছিল। আইনষ্টাইনেরও ওখানেই থাকবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যক্ষের পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর হৃদয়তা হলো। পরে উইনটেলারের এক ছেলে আইনষ্টাইনের বোন মাজাকে বিয়ে করেন।

দশ মাসের মধ্যেই আরাউ স্কুলের পাঠ শেষ করে আইনষ্টাইন জুরিকের সুইস ফেডার্যাল পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। এবার ভর্তি হবার সময় আর পরীক্ষা দিতে হলো না। এত দিনে আইনষ্টাইনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো। বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবার প্রবেশ-পথ এবার উন্মুক্ত। পলিটেকনিক স্কুলের নিকটে অবস্থিত জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঐ সময়ে শিক্ষার কেন্দ্র। পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষার্থী সেখানে বিজ্ঞানজ্ঞানের জন্তে সমবেত হতো। এ সময়ে অবস্থাসম্পন্ন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতেন। তাতেই কায়রুশে দিন চলতো। নীচের ক্লাশের ছেলে পড়িয়েও কিছু রোজগার হতো। অবশেষে চার বছর পর, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পলিটেকনিক স্কুলের পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা পেলেন।

আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যের উপর আর নির্ভর করা চলে না। এবার কাজকর্মের অনুসন্ধান চলতে লাগলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোন চাকরি পাওয়া সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে ছেলে পড়িয়ে কিংবা অস্থায়ী কোন কাজ করে সামান্য কিছু রোজগার হতে লাগলো। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। জীবনের এই দিনগুলিই সবচেয়ে দুঃখের। সামান্য পরিচ্ছদ, তাও আবার ছিল। কখনও খরচাহার, কখনও বা অনাহার।

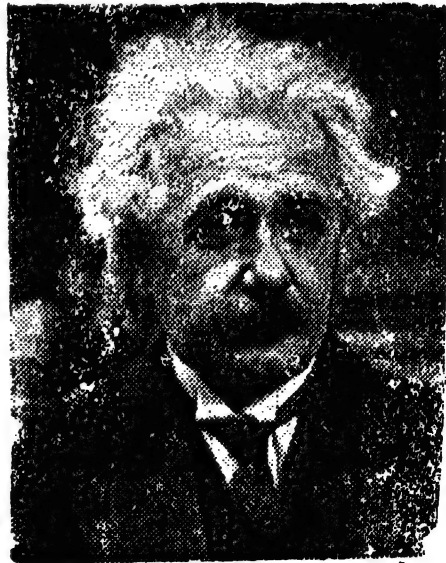
অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক বন্ধুর সুপারিশে বার্ন সহরের পেটেন্ট অফিসে একটি স্থায়ী চাকরি জুটলো। যদিও মাইনে বেশী নয়, তা হলেও এতেই কোন রকমে খাওয়া-পরা চলে যেত। পূর্বেই তিনি সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হয়েছিলেন। এখানকার কাজ শিখে নিতে বেশী সময় লাগে নি। যে কাজ করতে অস্ত্রের ছ'মাস ঘটা লাগতো, সে কাজ তিনি তিন ঘণ্টাতেই করে দিতেন। এতে সুবিধা হলো

এই যে, বাকি সময়টা তিনি তাঁর প্রিয় গণিতশাস্ত্রে মনোনিবেশ করতে পারতেন। অবশ্য এ কাজটা আড়ালেই করতে হতো। উদ্বর্তন কর্মচারীর পায়ের শব্দ পেলে অস্ত্রের খাতা টেবিলের দেয়ালে লুকিয়ে রেখে অফিসের কাজের ভাগ করতে হতো। এই ভাবে তাঁর যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে গবেষণা অগ্রসর হতে লাগলো, যা পরে সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত ও স্তম্ভিত করেছিল এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নতুন রূপ দিয়েছিল।

এ চাকরিকে তিনি "মুটির কাজ" বলতেন। কারণ এ কাজ করা তাঁর পক্ষে ছিল সহজসাধ্য এবং আয়ও ছিল পরিমিত। কিন্তু এতে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ কাজের ফাঁকে তাঁর প্রিয় অঙ্ক-শাস্ত্রে নিযুক্ত থাকতে পারতেন। এর পর তাঁর জীবনে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর পর সংঘটিত হয়। পলিটেকনিক স্কুলের সহপাঠিনী মাইলভা মারিংসকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিয়ে করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছেলে এসবার্টের জন্ম হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বৎসর অর্থাৎ আইনষ্টাইনের ছাত্রবয়সের বয়সে, আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পেটেন্ট অফিসের কাজের ফাঁকে তিনি গণিতের এই জটিল গণনাসম্বন্ধীয় মতবাদটি নিয়ে তিন বছর বাবং ব্যাপৃত ছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কখনও গবেষণাগারে নিজ হাতে পরীক্ষা করেন নি। অন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার খবর রাখতেন। সেই থেকে গণনা করে ঐ সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি খুব অধ্যয়নশীল ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সব রকম বই-ই প্রচুর পড়তেন। তিনি এ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করতেন।

তাঁর মতবাদ প্রচারিত হবার পর বৈজ্ঞানিক-সমাজে এ বিষয়ে আলোচনা সুরু হলো। তখনও তিনি অপরিচিত। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে, তিনি পেটেন্ট অফিসের একজন সামান্য কেয়ারী মাত্র, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গীষ্ট নন। এতে সবাই বিস্মিত হলেন। এর পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অধ্যাপক হবার জন্তে আহ্বান করা হয়। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রথমে রাজী হন নি। এ চাকরিই ভাল, কারণ কাজের অবসরে অধ্যয়ন করবার অনেক সময়



এসবার্ট আইনষ্টাইন



পাওয়া যায়। পরন্তু অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলে অধ্যাপনার জন্তে অনেক সময় অতিবাহিত করতে হবে। তাঁর নাম কেনার আকাঙ্ক্ষা কখনই ছিল না। শান্তিতে থেকে নিজের প্রিয় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকতে পারলেই স্তব্ধী হবেন।

কিন্তু এগন আর পেটেন্ট অফিসে কাজ করা চলে না। বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্থান নেওয়া দরকার। অতঃপর জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পরোচনায় তিনি বার্ষিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক ভাবে অধ্যাপনা করতে রাজী হলেন। অবশেষে ১১০১ খৃষ্টাব্দে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বক্তৃতা করতে যেতেন। ১১১১ খৃষ্টাব্দে প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক বেতনে নিযুক্ত হলেন। যে-সব ছেলে শিখতে ইচ্ছুক তাদের তিনি সাহায্য করতেন। অনেক সময় ক্লাশের পড়া বেখে দিয়ে নিজের গবেষণার বিষয় ছেলেদের নিকট ব্যাখ্যা করতেন। এক বছর পর আইনষ্টাইন তাঁর প্রাক্তন বিদ্যালয় সুইস ফেডারাল পলিটেকনিকে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি পাণ্ডিত্যের জন্তে বিখ্যাত হয়েছেন, কাজেই পুরনো বিদ্যালয়ে এসে খুব সম্মান পেলেন। বক্তৃতা দেবার সময় খুব ভিড় হতো; খুব কৌতুক মনে হতো যখন পক্ষকেশ গর্ভিত পুরানা শিক্ষকেরা তাঁর উচ্চপদ ও পাণ্ডিত্যের জন্তে খুব নীচু হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতেন।

এখনও তিনি আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু মুশ্কিল হলো যে, শিক্ষকতা করবার দক্ষণ তাঁর নিজের কাজের ব্যাঘাত হতো। শীঘ্রই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর এই বিষয় দূর করলেন। জার্মানির বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ম্যাক্স প্রান্স ও ওয়ালাটার নার্গেট, জুরিকে এসে আইনষ্টাইনকে অনুরোধ করলেন, বার্লিনের প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভ্য হয়ে কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষতা করবার জন্তে। এখানে তাঁকে কেবল গবেষণা করতে হবে, অধ্যাপনা করতে হবে না। ইচ্ছা হলে বক্তৃতা দিতে পারেন। কাজটি অতি সম্মানের, বেতনও অনেক বেশী। দুই বছর পলিটেকনিকে চাকরি করবার পর ১১১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিনের কাজে যোগদান করেন। তিনি একাই বার্লিনে গেলেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো। দুই ছেলে তাদের মায়ের কাছেই রইলো।

বার্লিনে আইনষ্টাইনের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তাঁরাই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু তিনি যেতেন অগ্রত, এক পিতৃব্যের বাড়ীতে। পিতৃব্যের এক মেয়ে ছিল, নাম এলসা! মেয়েটি বিধবা, তাঁর দুই কন্যা। মিউনিকে ছেলেবেলায় তিনি এলসার সঙ্গে খেলা করেছেন। দু'জনের স্নেহতা ছিল। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে এলসার সঙ্গে আইনষ্টাইনের বিয়ে হয়। মেয়ে দুটিও তাঁদের সঙ্গেই বাস করতো। আইনষ্টাইন মেয়ে দু'টিকে নিজের মেয়ের মত মনে করতেন। এলসা স্বামীর সমস্ত দারিদ্র্য গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন একাধারে গৃহিণী, মাতা, রন্ধনকারিণী, সচিব ও রক্ষক। স্বামীর সব খাবার তিনি নিজে হাতেই রান্না করতেন। স্বামী পড়ার ঘরে ঢুকলে কাউকে কোন গোলমাল করতে দিতেন না। মেহাং কাজ না থাকলে কোন দর্শক দেখা করতে পারতো না। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য হাতের কাছে গুছিয়ে দিতেন। বাইরে বার হবার সময় পকেটে টাকা দিয়ে বার বার মনে করিয়ে দিতেন। সব চেয়ে মজা হতো

সাবান নিয়ে। স্নানের এক দাড়ি কামানোর দুই রকম সাবান স্নানের ঘরে রাখলে পাছে অশ্রমনস্ক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ স্বামীর হিসাবে ভুল হয়, সেজন্তে এ রকম সাবানই রাখা হতো, যাতে দুই কাজই চলে।

১১১৪ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইনের বার্লিনে আগমনের কয়েক মাস পরেই, প্রথম মহামুগ্ধ স্তব্ধ হলো। শান্তিপ্রিয় আইনষ্টাইন এতে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মোটেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। কিন্তু তিনি একাই বা কি করবেন? কাজেই তাঁর গবেষণায় আরও গভীর মনোনিবেশ করলেন। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হলো। পৃথিবীর খুব কম লোকই তাঁর মতবাদ বুঝতে পারে। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ সব বোধগম্য হয় না। চরম অনুমান সত্ত্বে গাণিতিকটা ধারণা করা যায় মাত্র। আপেক্ষিক-তত্ত্ব থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে :

• আলো সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই এর চেয়ে দ্রুত চলতে পারে না। আলো প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে। আলোর গতির কখনও কোন পরিবর্তন হয় না।

ঘড়ির গতি অনুসারে ঘড়ির কলের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি ঘড়িটি রকেটের জায় একটি চলন্ত বাহনে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে বাহনটি যত দ্রুত চলতে থাকবে ঘড়ির কলও তত আস্তে স্পন্দিত হবে। সাধারণ অবস্থায় এক ঘণ্টা বাজতে যে সময় লাগবে, ঘড়ির স্পন্দন আস্তে হওয়ার দরুন এক ঘণ্টা বাজতে আরও বেশী সময় দরকার হবে। বাহনের ভিতরে স্থিত ঘড়ির সঙ্গে বাইরে সাধারণ অবস্থায় স্থিত কোন ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করলে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। যদি ঘড়ির বেগ আলোর বেগের সমান হয়, তাহলে ঘড়ির কলের স্পন্দন থেমে যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান প্রচলিত মতবাদ অনুসারে পদার্থ এবং শক্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। পরস্পরের কোন সাদৃশ্য নেই। শক্তির কোন ওজন বা ভর নেই। এক গ্রাম জল গরম করলে জলের উষ্ণতার ও তাপের পরিমাণের পরিবর্তন হবে। কিন্তু গ্রাসের মোট জলের ওজনের কোন তারতম্য হবে না। কিন্তু আপেক্ষিক-তত্ত্ব অনুসারে শক্তি এবং পদার্থ দুটি বিভিন্ন সত্তা নয়, পরন্তু মতাজাগতিক একই সত্তা এ দু'টি ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়। এই বিপ্লবাত্মক মতবাদ অনুসারে প্রমাণিত হলো যে, পদার্থ অপরিবর্তনীয়, পরন্তু ঘনীভূত শক্তি; অপর পক্ষে শক্তি হলো প্রবাহমান পদার্থ। বস্তুকে শক্তিতে এবং শক্তিকে বস্তুতে পরিবর্তন করা সম্ভব। আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক সূত্র অনুসারে এই পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়। সামান্য বস্তুতে প্রচুর শক্তি লুক্কায়িত রয়েছে। কাঠ, খড়, রবার, সোনা, লোহা প্রভৃতি যে কোন পদার্থের সম্পূর্ণ এক গ্রাম বস্তু ধ্বংস করে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আড়াই কোটি কিলোগ্রাম ঘণ্টা শক্তির সমান হবে। তিন হাজার টন কয়লা পোড়ালে অনুরূপ শক্তি পাওয়া যায়। এক গ্রাম জল উত্তপ্ত করলে মোট জলের ওজনের এত সামান্য বৃদ্ধি পাবে যে, কোন সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন তুলাদেও ওজন করা সম্ভব হবে না। এক হাজার টন জল সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত করতে যে পরিমাণ তাপের দরকার, তার ওজন হবে মাত্র এক গ্রামের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। এই সূত্র থেকেই পারমাণবিক শক্তিকে অ্যাটম বোমা তৈরীর কাজে নিয়োগ করবার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

বস্তুর ওজন ও আয়তন তার বেগের উপর নির্ভর করে। বস্তুর গতিবেগ যত বেশী হবে তার ওজনও তত বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আয়তন তত কমে যাবে। বস্তু যদি আলোর বেগের অর্ধেক গতিতে চলে, তাহলে তার আয়তন শতাংশের প্রায় পনের ভাগ সঙ্কুচিত হবে। যন্ত্রের যাহায্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের গতি বৃদ্ধি ক'রে দেখা গেছে যে, যখন তাদের গতিবেগ প্রায় আলোর বেগের সমান হয় তখন তাদের ভর যথাক্রমে ৬০০ গুণ এবং শতাংশের ৩০ ভাগ বেশী হয়।

তারার আলো যখন সূর্যের ধার ঘেঁসে পৃথিবীতে আসে তখন আলোর রশ্মি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে খানিকটা বেঁকে যায়, একেবারে সোজা আসে না। পূর্বে ছুটি তারা যে অবস্থায় দেখা যেত, আলো বেঁকে গেলে তাদের অবস্থান সন্ধ্যাে ভ্রান্ত ধারণা হবে। মনে হবে, যেন তারা স্থান পরিবর্তন করেছে, হয়তো পরস্পরের আরও নিকটে এসেছে অথবা দূর স'রে গেছে। কিন্তু মুশ্কল হলো যে, এরূপ তখনই সম্ভব হবে যখন সূর্য পৃথিবী এবং তারার মাঝখানে থাকবে, অর্থাৎ দিনের বেলায়। কিন্তু দিনের বেলায় প্রথমে রোদে তারা দেখা যায় না। আইনস্টাইন প্রস্তাব করলেন যে, সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হলে দিনের বেলায় তারা দেখা যাবে। আইনস্টাইনের এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর বাতর্ঘ্য প্রমাণ করার জন্তে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরা খুব ব্যস্ত হলেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বিখ্যাত পরীক্ষা করার জন্তে ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটি ছ'টি বৈজ্ঞানিক দল পাঠালেন, একটি প্রেজিঙ্গে এবং আর একটি আফ্রিকাতে। তাঁরা শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণের সময় তারার অবস্থান সন্ধ্যাে আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। পরে ঐ সকল চিত্র থেকে হিসাব করে দেখা গেল যে, আইনস্টাইনের গণনা একেবারে নির্ভুল।

আইনস্টাইনের সহকর্মীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, এখন আপনার তত্ত্ব নির্ভুল প্রমাণ হওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি মুখ থেকে তানাকের পাঠ্যপত্র সপিয়ে রেখে একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার ত প্রমাণের কোন দরকার ছিল না। তাদের প্রমাণের দরকার ছিল তাড়াই পেল। এই ভাবে তিনি বিশ্ববিশ্রুত হলেন। খুব কম লোকই তাঁর তত্ত্ব সন্ধ্যাে ধারণা করতে পারলো। তাহলেও তাঁর খ্যাতি জনসাধারণে প্রচারিত হলো। এই নির্জনতাপ্রিয় লোকটি চার দিক থেকে উত্খত হতে লাগলেন। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই বহু চিঠিপত্র পেতে লাগলেন; ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক, হস্তলিপি-সংগ্রাহক প্রভৃতি বহু লোক তাঁকে বিরক্ত করতে লাগলো। হিমিউড থেকে তাঁর চলচ্চিত্র নেওয়ার জন্তে প্রচুর টাকা দিতে চাইলো। এই সব দেখে-শুনে আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, পৃথিবীর লোক উন্মত্ত হয়েছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানীর বিখ্যাত লেখক, চিত্রকর, বিজ্ঞানী, প্রাক্তর প্রভৃতি বিরানন্দই জন বিদ্বান ব্যক্তি মিলে, একটি ঘোষণাপত্রে প্রচার করলেন, জার্মানী যুদ্ধ করছে আত্মরক্ষা করার জন্তে। কাজেই জার্মানী নির্দোষ। ঘোষণাপত্রটি আইনস্টাইনের নিকট আনা হয়েছিল সই করার জন্তে। কিন্তু ওই শান্তিগিষ্ঠ

ভদ্রলোকটি সই করতে অস্বীকার ক'রে বললেন, যুদ্ধ যখন আরম্ভই হয়েছে তখন কে দোষী এবং কে নির্দোষী, এ সন্ধ্যাে বাদামুবাদ না করে, পৃথিবীর সকল জাতি এক হয়ে শান্তির ব্যবস্থা করাই এখন যুক্তিযুক্ত। এরূপ উক্তি আইনস্টাইনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হলো। নেহাং তিনি স্ট্রাইজারল্যান্ডের নাগরিক বলে বিশ্বাসঘাতক আপত্তি থেকে অব্যাহতি পেলেন। তাহলেও তাঁকে অনেক কটাক্ষ সহ করতে হয়েছিল।

অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে পরিপাটি থাকবার অভ্যাস করানো যেত না। ঢিলা পায়জামা, পুরনো কোট এবং তামাকের পাইপই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তিনি ছিলেন অতি সদাশয় ব্যক্তি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের উপকার করার জন্তে অধিকতর সময় নিয়োগ করতেন এবং অস্ত্রের দুঃখে সহানুভূতি দেখাতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি প্রথমা স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। প্রথমা স্ত্রী আইনস্টাইনের কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য পেতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি পৃথিবীর সব দেশেই ভ্রমণ করতে লাগলেন—ইংল্যান্ডে, দক্ষিণ-আমেরিকায়, জাপানে, প্যালেস্টাইনে, স্পেনে ও যুক্তরাষ্ট্রে। কেবল বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা উপলক্ষেই যেতেন না, মাতৃভূমির যুগসমৃদ্ধি সন্ধ্যাে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ভ্রমণে যান ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে, ইহুদীদের নেতা উইজম্যানের প্ররোচনার। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্তে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকাবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে। এখানে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে অনাভাব প্রভৃতির জন্তে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সঙ্গীন হচ্ছিল। হুবার্টদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময়ে হিটলার ব্রাউন সাট ষ্ট্রটপার নামে দল গঠন করেন। পরে এই দলই নাসিস নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হাজার হাজার লোক এই দলে যোগদান করে। এদের কার্যকলাপ ছিল ভীতিপ্রদর্শক। ইহুদা-বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হিটলারের দল ছিল আইনস্টাইনের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষী। তিনি অনেক ভীতিপ্রদর্শক চিঠিপত্র পেতেন, কিন্তু এ সব কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। বিপদ ক্রমেই ঘনির্বে এল। ডাঃ ওয়ালটার রথেনো যুদ্ধের সময় পাণ্ড এবং যুদ্ধোপকরণ সৈন্তদলের নিকট পরিবহন সন্ধ্যাে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এই সময় জার্মানীর পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে এ কাজে নিয়োগ করাতে হিটলারের দল ক্ষিপ্ত হলো। কারণ তিনি ছিলেন ইহুদী। একদিন অফিসে যাবার সময় তাঁকে রাস্তার উপরে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন আইনস্টাইনের বিশেষ বন্ধু। আইনস্টাইন এ ব্যাপারে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্তে তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে বিদেশে গেলেই স্ত্রী নিশ্চিন্ত হতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্সের শাখা-কমিটি অব ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন, স্থাপিত হলে তাঁকে ঐ কমিটির সভ্য করা

হয়। শাস্তি স্থাপনের জন্তে পৃথিবীর বিদ্বজ্জনদের একত্রিত করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। সভাদর মধ্যে ম্যাডাম ক্যুরী, রবার্ট মিলিকান ও লরেঞ্জ ছিলেন। এঁরা সবাই আইনষ্টাইনের বিশেষ বন্ধু।

যখন আইনষ্টাইন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নার্সিং যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিতে গেলেন, তখন জার্মানিতে নাসিস দল প্রবল-পরাক্রান্ত। আইনষ্টাইনের প্রতি নাসিসদের বিশেষ আক্রোশ। তিনি মনস্থ করলেন যে, জার্মানিতে আর ফিরবেন না। বেলজিয়ামে যেয়ে বসবাস করলেন। বেলজিয়ামে যাবার পথে খবর পেলেন, তাঁর বালিনের বাঁড়ায় তন্ন তন্ন করে গোঁজা হয়েছে নারায়ক অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান। তাঁর ব্যাক্সের সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বেলজিয়ামে এসেই ফ্রিশিয়ান অ্যাকাডেমিতে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। জার্মানির এত কাছে বেলজিয়ামেও তিনি নিরাপদ নন। ইতিমধ্যে নাসিসরা তাঁর মাথার জন্তে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে। শুধু তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, তিনি জানতেন না তাঁর মাথার এত দাম। তাঁকে ইউরোপ পরিত্যাগ করে যাবার জন্তে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছিল। অবশেষে তিনি রাজী হলেন। প্রথমে লন্ডনে, পরে যুক্তরাষ্ট্রে সতর্ক পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরের মাঝামাঝি তিনি নিউইয়র্কে পৌছেন। নিউইয়র্ক থেকে সোজা প্রিন্সটনে চলে যান। সেখানে ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড ষ্টাডির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহাবিত এবং তাদের দুঃখকষ্টে সহানুভূতিসম্পন্ন। এই জ্ঞানতপস্বী তাঁর ভাবেই বিভোর হয়ে থাকতেন। যতটা সম্ভব অস্ত্রের সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন। সামাজিক রাতি-নাতিতে তিনি বিড়খিত না হলেই খুশী হতেন। তিনি মান-সম্মান, টাকা-পয়সা, সাজ-পোশাক সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। নিঃশব্দে সেখাপড়া করতে এবং অবসর সময়ে বেহালা বাজাতে পারলেই সবচেয়ে সুখী হতেন।

জার্মানির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগলো। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাইনল্যান্ড এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানী অধিকার করলো। আইনষ্টাইন প্রথমে যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন যে, ওই নৃশংসতা ও হত্যা নিবারণ করতে হলে বলপ্রয়োগ অনিবার্য। আর এ-ও জানতেন, যে দেশ যত বেশী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবে সেই দেশই পরিণামে জয়ী হবে। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ইতিমধ্যে মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের বিভাজন দ্বারা প্রচুর শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার এক মাস পূর্বে, তিনি বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক পত্রে জানালেন যে, ইউরেনিয়ামের বিভাজন দ্বারা প্রচণ্ড শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শক্তি হয়তো ভিন্নজাতীয় অতি শক্তিশালী বোমা তৈরী করতে নিয়োগ করা যেতে পারে। একপ সম্ভব হলে, এ জাতীয় একটি বোমার ধ্বংস করবার ক্ষমতা হবে বিস্তারিত। অতএব এদেশের সরকারকে এ সম্বন্ধে

অবহিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সাবধান-বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে খুব ক্ষিপ্ততার সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিজ্ঞানীদের একত্রিত করলেন, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্তে। অবশ্য আইনষ্টাইন অ্যাটম বোমা তৈরীর ব্যাপারে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার নাগরিক হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সটনের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য অবসর গ্রহণের পরও গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তখনও আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আপেক্ষিকতাবাদের তৃতীয় পর্যায় প্রচার করা হলো। তিন বছর পর এই পর্যায়ই সংশোধিত করে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট হিরোসিমাতে প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি অনুভব করলেন যে, এ ভাবে পারমাণবিক শক্তিকে অপব্যবহার করলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি ইমার্জেন্সি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্যই হলো জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, নতুন উদ্ভাবিত শক্তি খুবই প্রচণ্ড। একে ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করলে বিপজ্জনক অবস্থা হবে। আইনষ্টাইন বিশেষ করে বললেন, বিবদমান দেশসমূহ ভবিষ্যতে পরস্পরের প্রতি এই শক্তি প্রয়োগ করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই মনুষ্যজাতির নিরাপত্তার জন্তে জনমত গঠন করতে হবে। পৃথিবীতে সব লোকেরই বাস বরবার অধিকার আছে। পরস্পর হানাহানি না করে যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সহনশীল হয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি মানুষের উপকারে নিয়োগ করে, তাহলে ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল এই মহামানবের দেহাবসান হয়। বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম পর্যন্ত, পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে অসীম বিশ্ব পর্যন্ত একটি ভিন্ন রূপ মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত দ্রুত পরিবর্তন আর কখনও সম্ভব হয়নি। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই নয়, মানুষের অনুসন্ধিৎসাই বিশ্বপ্রকৃতির দুর্দোষ রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদই বিজ্ঞানীদের বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বর্তমান মতবাদ উদ্ভাবিত করতে সাহায্য করেছে।

বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। গুণাবাসী মানুষ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার যে অগ্রগতি, তা সম্ভব হয়েছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার জন্তেই। কিন্তু এই অগ্রগতি সমগ্র মনুষ্যজাতির মনোবার ফলে হয়নি। খুব কম লোকই উচ্চভাবসম্পন্ন। অতিপ্রতিভাশালী কয়েক জন মহাপুরুষই মনুষ্যজাতির চিন্তনায়ক। তাঁরাই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে অনির্বচনীয় অব্যক্ত প্রকৃতির গভীর রহস্যের রূপায়ণ করেন এবং মানুষের ভাবধারাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

# ভূমিকম্প

ঐশ্বরীকেশ রায়

**মেনিন** গ্রীসের ভূমিকম্পে ধনজনের যে অপরিমিত ক্ষতির বিবরণ সংবাদপত্রে ঘোষিত হ'ল, সে কি কোন দৈব দুর্ঘটনা বা আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপদ? পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে এই যে কম্পন মাঝে-মাঝে অনুভব করা যায়, এ কি কেবল বিধির বিধান বলেই আত্মহুঁট থাকতে হবে? ধরিত্রীর ধারক সহস্রকণা বাসুকী চঞ্চল হলে ভূমিকম্প হয়, কল্পনাবিলাসীরা এ কল্পনা কি যুক্তিসহ? গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বায়ুপূর্ণ গহ্বরের বলী বায়ুর মুক্তি প্রচেষ্টাই ভূমিকম্পের কারণ। অনুসন্ধিৎসু মানুষ এই সকল যুক্তিহীন কাহিনীর পরিবর্তে চায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমিকম্পের কাণ্ডকারখানা নির্ণয় করতে, উদ্ঘাটন করতে চায় এর প্রকৃত রহস্য।

ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণের গভীরতা চল্লিশ মাইল। নানা জাতীয় শিলার সমন্বয়ে এই বহিঃস্বক গঠিত। রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু, তুষার প্রভৃতির নানা ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের এই শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়িত শিলার পললরূপে সঞ্চয়, ভূ-সংকোচ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিপাত সতত স্রৃষ্টালে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। ভূমিকম্পও এইরূপ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। আপাত দৃষ্টিতে ভূ-পৃষ্ঠ নিশ্চল বা নিষ্পন্দ মনে হলেও সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাত, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, জলপ্রপাতের জলরাশির সবেগে নিয়ে পতন, যানবাহনের দ্রুত গমনাগমন, এমন কি বায়ুমণ্ডলে বায়ুচাপের পরিবর্তনও ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে অবিরত যে মুহূর্তে কম্পন অনুভূত হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও ভূ-কম্পলিপি যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন কারণে বিস্তৃত স্থানব্যাপী ভূ-পৃষ্ঠের মুহূর্তে বা তীব্র যে কম্পন তার উৎস ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এক তাকেই আমরা সাধারণতঃ ভূমিকম্প বলি। স্থলভাগের জায় সমুদ্রগর্ভেও ভূমিকম্প বিরল নয়।

ধাতু-নির্মিত যটোর কোন স্থানে আঘাত করলে যটোর বহির্দেশে এক প্রকার তরঙ্গায়িত স্পন্দন অনুভব করা যায়; জলে কোন ভারী ভিনিশ পড়লেও এইরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণ স্থিতিস্থাপক বলে কোনরূপ আঘাতে সেখানেও কম্পন অনুভব করা যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন কারণে আলোড়িত হলে স্থানবিশেষে কম্পন জনিত তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে যে স্পন্দনের সৃষ্টি করে তাকেই ভূমিকম্প বলে। ধাতু বা জলে তরঙ্গ সৃষ্টি হলে যেমন তার অংশগুলি স্থানচ্যুত হয় না, ভূমিকম্পের সময়েও সেইরূপ শিলার অংশগুলি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে না, তরঙ্গের ব্যাপ্তিতে মাত্র কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের ক্রিয়াস্থল ভূ-পৃষ্ঠ, কিন্তু স্পন্দনের সূচনা হয় ভূগর্ভে, অনধিক ত্রিশ মাইল গভীরতার মধ্যে। কয়েক বৎসর পূর্বে ৪০ মাইল গভীর স্থানেও স্পন্দনের সূচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই উৎপত্তিস্থলকে বলে ভূকম্পনকেন্দ্র (Seismic focus) এক ভূত্বকের বহির্দেশে অবস্থিত কেন্দ্রের ঠিক উপরিস্থিত স্থানকে উপকেন্দ্র (Epicentre) বলে। ভূকম্পন-কেন্দ্র, ভূপৃষ্ঠ থেকে তার গভীরতা এবং উপকেন্দ্র ভূকম্পলিপি যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্পের প্রধান কারণ বলে মনে হলেও বস্তুতঃ দেখা যায়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যত অধিক হয়,

ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এবং গুরুত্বও তত কমে যায়। আগ্নেয়গিরি-প্রধান স্থানসমূহে শিলাস্তরের অপটু নিবন্ধন সেই অঞ্চলে স্বভাবতঃ ভূমিকম্প বেশী হয়। এইরূপ ভূমিকম্পের প্রবলতাও দূরপ্রসারী হয় না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ ও সম্রাজ্ঞার মধ্যবর্তী ক্রাকাতোয়ার এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপানের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ফেবলমাত্র নিকটবর্তী স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল; কিন্তু এইরূপ ভূমিকম্পের প্রবলতা সাধারণতঃ কমই হয়। এমন কি অনেক সময় কোন কম্পনই অনুভব করা যায় না। মার্টিনিক দ্বীপে মঁ পেল (Mont Pelée) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সক্রিয় হলে অতি সামান্য কম্পনই অনুভব করা গিয়েছিল। এরূপ বহু অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূপৃষ্ঠে কোন স্পন্দনই অনুভূত হয় না। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিলাউয়াতে প্রতিষ্ঠিত ভূকম্পলিপি যন্ত্রে সময় সময় মাসে কয়েক শত স্থানীয় কম্পন ধরা পড়লেও, আগ্নেয়গিরি সে-সময় নিষ্ক্রিয় থাকে; সেজন্য এরূপ ভূমিকম্পের সম্ভাব্য কারণ মনে হয়, ভূগর্ভে ম্যাগমা নামক গলিত ধাতু ও দ্রব গ্যাসীয় পদার্থে পরিপূর্ণ একপ্রকার শিলার সঞ্চরণ। ইহা ব্যতীত, আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হবার পূর্বে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প, বিবিধ বায়বীয় পদার্থ, গলিত লাতা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে চেষ্টা করে, তার ফলেও ভূত্বকের কিয়দংশ আন্দোলিত হয়; অবশ্য এক্ষেত্রেও তীব্রতা ও ব্যাপকতা কমই হয়। জাপানে এ বিষয়ে বহু গবেষণার পর স্থির হয়েছে যে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের মধ্যে নিগূঢ় কোন সম্বন্ধ বর্তমান নাই।

ম্যাগমার সঞ্চরণ বা ভূগর্ভের চাপ থেকে বিভিন্ন পদার্থের মুক্তি-প্রচেষ্টা স্থানীয় ভূমিকম্পের কারণ হলেও, ভূমিকম্পের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই। তবে বিভিন্ন কারণের মধ্যে ভূত্বকের ভাঁজ ও স্তম্ভচ্যুতি, ভূসংকোচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্তম্ভচ্যুতির দ্বারাই প্রধানতঃ তীব্র ও ব্যাপক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আরও লক্ষ্য করেছেন যে, শীতকালে এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভূমিকম্প বেশী হয়, অবশ্য এর কারণ এখনও অজ্ঞাত। আবার নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর যে স্থানবিশেষে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাও দেখা গেছে; যেমন, জাপানে প্রবল ভূমিকম্প হয় তের বছর অন্তর। সেজন্য এক বা একাধিক কোন শক্তি ভূমিকম্পের মূলে কার্যকরী হয় তা এখনও নির্ণয় করা যায় নাই।

অস্বাভাবিক ভাবে বিপর্যস্ত, কৃষ্ণিত ও চ্যুতিযুক্ত পাললশিলা-স্তরের স্বাভাবিক অবস্থায় আসবার বহু বর্ষব্যাপী চেষ্টায় কোন স্তর ধ্বংস গেলেও প্রবল ভূমিকম্প হয়। সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টিপাত, তুষার, হিমবাহ প্রভৃতির দীর্ঘকালের ক্রিয়ার ফলে পাছাড়-পর্বতের উপরিভাগের শিলাস্তর ক্রমশঃ শিথিল হয়। এই অবস্থায় সেই স্তর ঢালের দিকে কাঁচ হয়ে থাকলে অভিকর্ষ তাকে অবিরত নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করতে থাকে, ফলে স্তরটি একদিন চ্যুত নিয়গামী হ'লে তার পতনজনিত ধাক্কায় হয় ভূমিকম্প। এইরূপ ভূমিপাতের ফলে যেমন ভূমিকম্প হয়, তেমনি আবার ভূমিকম্প হলেও ভূমিপাত হতে দেখা যায়। ভূমিপাতের ফলে যে ভূমিকম্প হয়, পৃথিবীর বহিরাবরণ মাত্র তাতে স্পন্দিত হয় এবং তাও খুব

প্রবল ভাবে নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এত জগা বিশেষ কোন চাকলাই লক্ষিত হয় না। উত্তর-আমেরিকার রকি, ইউরোপের আল্পস, ভারতবর্ষের হিমালয় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিপাত বিবল নয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৫শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং পাহাড়ে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাক্সাবে ভূমিপাতের জগা সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বিরাট ভূমিরস্ত্রূপের পতনেও এইরূপ ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল মনে হলেও অভ্যন্তর খুবই উত্তপ্ত। তাপবিকিরণ করে পৃথিবী ধীরে ধীরে সংকুচিত হওয়ায় প্রবল চাপে কোথাও সমুদ্র এবং কোথাও পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক হোমস বলেন, ভূগর্ভে রেডিয়ো (Radio active) পদার্থ থাকায় পৃথিবীর শীতল হওয়া সম্ভব নয়; আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত পদার্থের পরিচলন-শ্রোত হ্রদ ভঙ্গরে আন্তর্ভূমিক (Longitudinal) চাপ দেওয়ায় ভাঁজবিশিষ্ট পর্বতের সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলান্তর অবিরত ক্ষয় হয়ে ক্ষয়িত অংশ জলস্রোতে সমুদ্রগর্ভে নীত হয় এবং বহু বছর ধরে স্তরে স্তরে পাললিক শিলারূপে সেখানে সঞ্চিত হয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কোন শক্তির ক্রিয়ার সঞ্চিত উর্ধ্বগামী হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এমন করেই পৃথিবীতে জল ও স্থলের একটা সাম্য অবস্থা বক্ষিত হয়ে আসছে।

হিমালয়ের গঠনপ্রণালী ও তার শিলান্তরে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ জীবাশ্মরূপে পেয়ে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হিমালয়ের উপাদান যে পাললিকশিলা তা একসময়ে সমুদ্রগর্ভেই ছিল। উত্তর-দক্ষিণে পার্বত্যপের ক্রিয়ায় সেই শিলান্তর ভাঁজ হয়ে উর্ধ্ব-উর্ধ্ব পৃথিবীর সর্গোচ্চ পর্বত বলে গণ্য হয়েছে। ইউরোপের আল্পস পর্বত হিমালয়ের মত পাললিকশিলায় গঠিত ভাঁজবিশিষ্ট পর্বত। পাললিক শিলান্তরের এই যে ভাঁজ, এর তুলনা করা চলে, হুঁপাশে চাপ দেওয়া বই, সতরঞ্চ বা কাপেটে যে ভাঁজ পড়ে তার সঙ্গে। এমনি ভাবে ভাঁজ পাওয়ার জগ্রে স্তরগুলি ক্রমশঃ হ্রদ হয় আর ভগ্ন হয়ে স্থানচ্যুত হয়। ভূত্বকের কৃষ্ণিত, বিপর্যস্ত ও চ্যুতি (Fault)-যুক্ত এই সকল স্তরের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসে চ্যুতির পার্শ্বস্থ ভূভাগ সরে গেলে ভূমিতে যে তার ধাক্কা লাগে, তারই স্পন্দন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসে এবং প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়। অনেক সময় এইরূপ চ্যুতি ভূত্বকের এত গভীর প্রদেশে সংঘটিত হয় যে, তার স্পন্দন আমরা ভূপৃষ্ঠে আদৌ অনুভব করি না। চ্যুতির ফলে ভূমিকম্প হলেও, চ্যুতির চাক্ষুষ প্রমাণ এইজগা অনেক সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। চ্যুতির সহিত ভূমিকম্পের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তার সাক্ষ্য দেয় আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কয়েকটি ভূমিকম্প; তার মধ্যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্তানের, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আসামের এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কোয়টোর ভূমিকম্প প্রধান। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে যে ভূমিকম্প হয়, ভূতত্ত্ববিদগণ তার অগ্নি এক কারণও অনুমান করেন। তাঁরা বলেন, হিমালয়ের শিলান্তর বৃষ্টিপাতের দ্বারা ক্ষয় পেয়ে সিঙ্ক-গভীর শ্রোতে পলিরূপে বাহিত হয়ে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয় এবং তাতে যে বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়, তারই ক্রিয়াতে উক্ত স্থানে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। ইহা ব্যতীত তাঁরা আরও মনে করেন যে,

ক্রমবর্ধনশীল হিমালয়ের গঠনকাণ্ড এখনও অব্যাহত গতিতে চলেছে, তাই হিমালয় ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এখনও ভূমিকম্প হয়।

স্থলের জায় সমুদ্রগর্ভেও ভূমিকম্প হয় এবং ইহা Tsunami নামে সর্বত্র পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরগর্ভেই অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বলে দেখা গেছে। তবে আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি ও উত্তর-দক্ষিণে একটি ভূকম্পপ্রবণ স্থান আছে। সমুদ্রবক্ষে 'Tsunami'-র ক্রিয়া তেমন তীব্র ভাবে অনুভূত না হলেও, উপকূলে এর ধ্বংসাত্মক কল্পনাটীত! ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে, ১৭০৩ ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে 'Tsunami' সৃষ্ট তরঙ্গে ভেসে গিয়ে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। সমুদ্রগর্ভে ভূমিকম্প হলে সমুদ্র-কূলে যে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তার উচ্চতা ৪০ ফুট, বিস্তার ১০০ থেকে ১০০ মাইল পর্যন্ত এবং গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৫০০ মাইল হয় অর্থাৎ একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে মাত্র বার ঘণ্টায়। অনেক তীব্র ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সমুদ্রগর্ভে ৩০০০ ফুট সমুদ্রগর্ভের শিলাস্তরে চ্যুতি দেখা গেছে।

বুটশ বৈজ্ঞানিক ডব্লু মিলনে জাপানে পান্থবিজ্ঞা অধ্যাপনার সময় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে ভূকম্পলিপি বস্তুর আবিষ্কার করেন, তার এখন এত উন্নতি হয়েছে যে, তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের অতি সামান্য কম্পন — যা আমরা অনুভব করতে পারি না, তাও লিপিবদ্ধ হয়। অবশ্য এর পরে আরও কয়েক প্রকার ভূকম্পলিপি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আরব সাগরে বড়ের ফলে চেউয়ের ধাক্কা ভূপৃষ্ঠের যে স্পন্দন বহু দূরবর্তী বোম্বাই-এর কোলার মানমন্দিরের ভূকম্পলিপি যন্ত্রে ধরা পড়ে, তাতে সমুদ্রগামী জাহাজের অধ্যাক্ষগণ পূর্ণাঙ্গ সাবধান হতে পারেন। এ বস্তুর সাহায্যে ভূকম্প-তরঙ্গের প্রকৃতি থেকে আমরা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, কেন্দ্রের গভীরতা, পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা এবং কম্পনের তীব্রতার সন্ধান পাই। কম্পনের তীব্রতা অনুসারে ঋণ থেকে অতি তীব্র পর্যন্ত তার দশটি বিভিন্ন শ্রেণীনির্ণয় করা হয়েছে। এসব তথ্য জানবার জগ্রে পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দিরে ভূকম্পলিপি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এত তথ্য জেনেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার মত শাস্ত্র বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু আজও অর্জন করতে পারেন নি। কোন জাপানী প্রাণিতত্ত্ববিদ না কি লক্ষ্য করেছেন যে, সমুদ্রজাত এক প্রকার মাছ ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠে। এ যদি সত্য হয়, তা হলে পূর্ণাঙ্গ সাবধান হলে অনেক বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য মাছের উপর ভবিষ্যদ্বাণী করবার ভার দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট নন। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাভাস জানানোর মত অতি সূক্ষ্ম উপায় আবিষ্কৃত হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে বছরে যে খাট হাজার ভূমিকম্প হয় তার মধ্যে প্রায় ২৫০টি বেশ বড়।

জলের চেউ-এর মত ভূমিকম্পের তরঙ্গও কেন্দ্রের চারি দিকে প্রায় উপবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে, বাধা পেলে জলের চেউ-এর মত এরা পথও পরিবর্তন করে। ভূমিকম্প-তরঙ্গ তিন প্রকারের; মুখ্য (Primary) বা অগুঁড়ো তরঙ্গ (Longitudinal wave) সেকেন্ডে ৫\*৪ মাইল বেগে এবং গৌণ (Secondary) বা ত্রিধক তরঙ্গ (Transverse wave) মুখ্যের প্রায় অর্ধেক (সেকেন্ডে ৩ মাইল) বেগে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়ে যায়, তৃতীয় একপ্রকার তরঙ্গ (Surface wave) পৃথিবীর বহিরাবরণের উপর দিয়ে যায়। এই



সকল গতিবেগের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ভূকম্পলিপি যন্ত্র ও ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়, আর তীব্রতার দ্বারা উপকেন্দ্র স্থির করা হয়। অবশ্য ১৮০০ মাইল গভীরতা পর্যন্ত প্রাথমিক ও গোণ তরঙ্গ যত গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে তাদের গতিবেগও তত বাড়ে। প্রথম দুই প্রকার তরঙ্গের গতিবেগের পার্থক্য থাকায় উৎপত্তিস্থল থেকে উভয় তরঙ্গ উপরে একই স্থানে আসতে সময়ের যে তারতম্য হয়, তা থেকে কেন্দ্রের অবস্থান জানা যায়। প্রাথমিক তরঙ্গ কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোনরূপ পদার্থের ভিতর দিয়ে এবং গোণ তরঙ্গ কেবল কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়েই যেতে পারে। কিন্তু ভূ-অভ্যন্তরে ১৮০০ মাইলের পর ২৩০০ মাইল লৌহ ও নিকেলের স্তর। তা হলে কি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূকেন্দ্রের চারদিকে উক্ত বিশাল স্থানটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ? কেহ কেহ বলেন, এত নীচে পৃথিবীর যে বিরাট চাপ (প্রতি বর্গইঞ্চিতে দু'লক্ষ মণ) পড়ে, তাতে কোন পদার্থ বায়বীয় তো নয়ই, এমন কি তরল আকারেও থাকতে পারে না; কঠিন যে নয় তা' গোণ তরঙ্গের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে ঐ স্থানের উপাদানের অবস্থা অর্ধ-তরল হওয়া অসম্ভব নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এই অঞ্চলের উপাদানের অবস্থা সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই।

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কখনও ভূমিকম্প হয় নাই; তবে ভূ-সংস্পর্শে চ্যুতিযুক্ত দুর্বল শিলাস্তরবিশিষ্ট স্থানেই ভূমিকম্প বেগী হয়। এ-সকল স্থানকে দুটি কটিবন্ধের আকারে কল্পনা করে ভূতত্ত্ববিদগণ তাদের নাম দিয়েছেন “প্রকম্পন কটিবন্ধ” (Seismic Belt), একটি কটিবন্ধ উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্ব অর্থাৎ বকি ও এণ্ডিজের পার্বত্য অঞ্চল, এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে এবং অপরটি ভূমধ্যসাগর, আলপস পর্বত, ককেশাস পর্বত ও হিমালয় পর্বতের উপর দিয়ে কিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। কটিবন্ধ দুটির অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত পর্বতের গঠন-কার্য এখনও শেষ হয় নি, তাদের নিকটবর্তী প্রদেশগুলি ভূমিকম্পপ্রবণ। ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে কোন প্রকম্পন কটিবন্ধ না থাকার এই কারণ অন্তর্নিহিত হয় যে, ওখানকার মহাসাগরীয় (Continental shelf)\* গৌণে ধীরে অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু সমুদ্রে নেমে গেছে; আর উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে এবং এশিয়ার পূর্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থানে মহাসাগরীয় নাই বললেই চলে; বিশেষতঃ চিলে (Chile) ও জাপানের অনতিদূরেই প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এত অধিক, যে আটলান্টিক মহাসাগরের কোন স্থানই তত গভীর নয়। প্রথমোক্ত কটিবন্ধটি ও প্রশান্ত মহাসাগরের “আগ্নেয় মেখলা” (Fiery ring of the Pacific)-র অবস্থান তুলনা করলে দেখা যায় যে উভয়েই প্রায় একই স্থানের উপর দিয়ে বিস্তৃত এবং এতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অল্পদূরকার পরস্পর

নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কিছ্র তা নয়, উৎপত্তির কারণস্বরূপ উভয়েই ভূতত্ত্বের দুর্বলতার সংযোগ নেয়।

সাধারণতঃ ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত পদার্থের স্থানচ্যুতি হয়; আসলে কিছ্র তা' নয়। ভূতত্ত্ব স্বভাবতঃই খুব স্থিতিস্থাপক, এর ভিতর দিয়ে তরঙ্গ প্রবাহিত হবার সময় তরঙ্গের প্রবাহপথে অবস্থিত শিলার কণাগুলি অতি সামান্য ভাবে স্থানচ্যুত হলেও ইহার উপরিভাগের আলগা সকল পদার্থ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এমন কি, কখন কখন কয়েক ফুট দূরেও নিক্ষিপ্ত হয়। সামান্য পরীক্ষার দ্বারা এ ব্যাপারটি অনেকটা পরিষ্কার হয়; কার্টের একটি টেবিলের উপর পাথর রেখে যদি টেবিলের উপর জোরে আঘাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, পাথরের টুকরাগুলিও সংগে সংগে স্থানচ্যুত হয়ে লাফিয়ে উঠছে কিছ্র টেবিলের কার্টের কণাগুলির কোনরূপ স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না। ঠিক এই ভাবেই ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর উপরিভাগের ঘর-বাড়ি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির স্বাভাবিক অবস্থার বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ভূমিকম্পের তরঙ্গে শিলাস্তর অতিক্রম করবার সময় স্পন্দনের জগা তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে যে সংকোচন ও প্রসারণের উৎপত্তি হয়, তারই ফলে আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহের বহু ক্ষতি সাধিত হয়, কোন কোন প্রস্রবনের জলধারা শুক্ক হয় আবার কানোও বা জলধারার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এমন কি অনেক সময় নতুন প্রস্রবনের সৃষ্টিও হয়; নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে নতুন প্রবাহপথে নদী প্রবাহিত হয়। ভূতত্ত্ব ফাটল আর বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়ে তার থেকে বালিমিশ্রিত জল উৎক্ষিপ্ত হয়; বালির বাঁধ অতীতের ভূমিকম্পের সাক্ষ্য দেয়।

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও, এর ভয়াবহ ধ্বংসালী মানব-মনকে অভিভূত করে। ভূমিকম্পের ফলে কত স্তম্ভক জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে, কত লোকের অকালমৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা নাই। পূর্বাধিকৃত বিহারের ভূমিকম্প এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আসামের ভূমিকম্পকে একটা খণ্ডপ্রলয়ের সংগে তুলনা করা চলে। বিহারের ভূমিকম্প বাংলা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এর প্রকোপে বিপর্যস্ত হয়েছিল। ভূগর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত জল, কাদা, বালি শস্তক্ষেত্র পূর্ণ করে তাকে অল্পক্ষণের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে; আর বহু নগর কম্পনের তীব্রতায় ধ্বংসস্থাপে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণতঃ ভূমিকম্পের কম্পন কয়েক সেকেন্ড মাত্র অন্তর্ভুক্ত হলেও, এক্ষেত্রে তা তিন চার মিনিট ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর টোকিওর ভূমিকম্পে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় এবং টোকিও উপসাগরের তলদেশ ২০০ ফুট উচ্চে উঠে যায়; কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভূমিকম্পে কছ উপসাগরের উপকূল অনেকখানি নেমে যায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আলাস্কার Yakutat Bay-র প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পে উপকূলের অংশবিশেষ প্রায় ৫০ ফুট উর্ধ্বে উঠে এক নতুন জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের আঘাতে মাত্র ৩০ সেকেন্ডে নিউজিল্যান্ডের নেপিয়ার শহর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নিশ্চিহ্ন হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে আনাতোলিয়ার ভূমিকম্পে প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বহু পরিবর্তন সাধনকারী আসামের ভূমিকম্প এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসালীতার এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে,

\* মহাসাগরীয়—মহাদেশের উপকূলভাগ কিছুদূর পর্যন্ত ঢালু ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়া পরে সোজা নামিয়াছে। এই ঢালু অংশকে মহাসাগরীয় বলে। এখানকার জলের গভীরতা ৬০০ ফুটের অধিক হয় না।

# ছেঁড়া জীবনের সূতা

( অপ্রকাশিত )

শিবনাথ শাস্ত্রী

ঠাকুর, ঠাকুর, দিন হল অবসান,  
তোমা হাতে করে দিব মোরে ?  
এক গতি, এক মতি করে হবে প্রাণ,  
পড়িব না আর মোচবোরে ?

ছিল শক্তি, ছিল কাজ, এসে গেল দুই,  
এছিলাম তুমি আর আমি,  
দিবা-অস্ত পদ-প্রান্তে আপনারে খুঁট,  
দেলিও না তে সন্দর-স্বামী !

থাটিরা থাটিরা দিন শ্রান্ত-শ্রান্ত-দেহে  
অপরাধে যথা কুবীজন,  
হাত-পা ছড়িয়ে বাসে আপনার গেহে  
ভুলে যায় শ্রম-উপার্জন ।

তেমনি তোমার পদে হাত-পা ছড়িয়ে  
বসিবারে দিও দিবা শেষে,  
নিরপি ও প্রেমমুখ পরাণ ছুড়িয়ে,  
ভুলে যাই জীবনের ক্রেশে ।

ছেঁড়া জীবনের সূতা এগন শুছাই  
ঝার দিয়ে বসি নিজ ঘরে,  
ঝুটায় বাহির দৃষ্টি তোমা পানে চাই  
সত্যরূপ দেখি গো অন্তরে ।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ক্রিয়ার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মরুসদৃশ ভূমি শস্তগ্রামলা হয়েছে, সমুদ্রে নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বংসকারী এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এর প্রকোপ থেকে জ্ঞান পাবার কি কোন উপায় নাই? ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচের ( Long Beach ) ভূমিকম্পে বহু সুরম্য অটালিকা নষ্ট হওয়ার বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন, ইম্পাক্টের কাঠামো ( Frame ) আর কংক্রিট ( Concrete ) দিয়ে তৈরী বাড়ীর বিশেষ কোন ক্ষতিই ভূমিকম্প আর করতে পারে নি। ভূমিকম্পপ্রবণ জাপানে ঐ রীতিতে গৃহাদি নির্মাণ করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। কলিকাতা এবং অগ্নাগ্র নগরেও বর্তমানে গৃহাদি নির্মাণ কার্ণে ইম্পাক্টের কাঠামো ও কংক্রিটের ব্যবহার প্রচুর ভাবে হচ্ছে। মনে হয়, এরূপ প্রণালীতে নির্মিত গৃহের আর কোন বিশেষ ক্ষতি ভূমিকম্প করতে পারবে না। ফলে অনেক ধন-স্বন নাশের আশংকা থেকে সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

পূর্ণ-আলোচিত ভূমিকম্প জনিত তৃতীয় প্রকার তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা স্থলভাগের শিলা অপেক্ষা সমুদ্রগর্ভের শিলার মধ্য দিয়ে দ্রুততর বেগে গমন করতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার এক ভূমিকম্পের উক্ত তৃতীয় প্রকার তরঙ্গ যে বেগে নিউইয়র্ক গেছল, তার চেয়ে অধিকতর বেগে জাপান এসেছিল। এই সিদ্ধান্ত এর থেকে করা যায় যে, স্থলভাগের অধিকাংশ শিলা গ্রানাইট ও সমুদ্রগর্ভ রচিত হয়েছে

বাসাল্ট শিলায় এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের শিলার উপাদান এক নয়। মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গের গতিবেগ কেন্দ্র থেকে কৌণিক দূরত্বের অনুসারে বর্ধিত হয়ে থাকে।

কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠে তরঙ্গের প্রতি সেকেন্ডে গতিবেগ (মাইল)  
আধাতপ্রাপ্ত হানের কৌণিক  
দূরত্ব  
মুখ্য তরঙ্গ  
গৌণ তরঙ্গ

৬.৮

৩.৭

১০

৭.৯

১৮০০ মাইলের অধিক গভীরতায় মুখ্য তরঙ্গের এই ৮ মাইল গতিবেগ হঠাৎ ৫ মাইলে নামে এবং গৌণের গতিবেগ খুব মৃদু হয়ে আসে। আরো গভীরতর প্রদেশে মুখ্য তরঙ্গ আলোকরশ্মির ধর্ম অনুসারে ( Refracted ) হয়; ফলে ১০.৪° কৌণিক দূরত্বের পর কোন স্পন্দনই অনুভব করা যায় না। ভূমিকম্প-তরঙ্গের এই সকল আচরণ থেকে সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৪৪০০ মাইল ব্যাসের যে স্তর তার অবস্থা ১৮০০ মাইল পুরু আবরণের অবস্থার সমান নয় এবং ঐ আবরণেরও ৭৫০ মাইল অবশিষ্টাংশের সমপর্দায়ে নাই। ভূমিকম্পের তরঙ্গের দ্বারা এইরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অনেক তথ্য জানা যায়।

# স্মৃতিচিহ্ন

পরিমল গোস্বামী

তৃতীয় পর্ব

১

পরীক্ষার ফল ভালই হল এবং কেমন ক'রে হল তা আমি আজও জানি না। কোন প্রশ্ন কি ভাবে লিখলে এম-এ পরীক্ষক খুশি হবেন জানা ছিল না, বিষয়ের ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত বললেই হয়। কোনো বিশেষ শ্রেণীতে পাস করার লোভও ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ প্রথম শ্রেণীই পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা এবং শেষ পরীক্ষা দুইয়েতেই প্রথম শ্রেণী হল, আশ্চর্য্যের পক্ষে ঘটনাটা মন্দ নয়। আমাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছিলেন জামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জীবনেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম সম্মান পেয়ে গেছেন স্বদেশের কাছ থেকে।

হাই হোক আমার আবার সমস্যা দেখা দিল, পরবর্তী কর্তব্য কি? শাস্তিনিকেতনের শিক্ষায় ছেদ পড়ায় মনে দুঃখ ছিল। সেখানে তো আর ফেরা হল না, অথচ দেখি চিত্রাংকন শিক্ষার বাসনাটাই আবার একটু একটু ক'রে মাথা তুলছে।

পুনরায় কলকাতাতেই চলে এলাম।

এবং এসেই সোজা সরকারী আর্টস্কুলে গিয়ে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের কাছে মনোবাসনা প্রকাশ করলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার বক্তব্য ছিল আধুনিক রীতিতে কিছু স্রবধে করতে পারব কি না, অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য তেল। তিনি বললেন যে রীতিতে কাজ করেছ তা ছেড়ে এখনই অন্য রীতিতে যাওয়া সম্ভব হবে না, আগেরটি ভুলতে কিছু সময় লাগবে, অতএব প্রাচ্য পদ্ধতির জসেই লেগে থাক, তেলের আশা ছাড়। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেই কথাই বললেন। অর্থাৎ অয়েল পেইন্টিং চলবে না।

অগত্যা তাই। আমার শিক্ষক হলেন হেড মাষ্টার ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা। আমাকে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে নেওয়া হল। ঈশ্বরীপ্রসাদ আমাকে অতিরিক্ত খাতির করতে আরম্ভ করলেন। আমার প্রতি সেই পক্ষপাত বৃদ্ধির স্বেচ্ছা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। তিনি প্রথমেই আমাকে সম্মানিত করলেন তাঁর ডানপাশে আমার জন্য একটি পৃথক আসনের ব্যবস্থা ক'রে। খুব কাছে বসালেন।

তারপর আমাকে তাঁর হাতের কাজ দেখাতে লাগলেন। তিন তখন বাইরের কোনো মহারাজার অর্ডারি একটি মিনিয়েচার পেইন্টিং করছিলেন আইভরির উপর। বললেন একমাত্র এতেই পয়সা, তোমাকে এ কাজ শিখিয়ে দেব। তারপর আমাকে মিউজিয়ামের আর্ট-গ্যালারিতে নিয়ে রাজপুত পেইন্টিং-এর পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন মোটামুটিভাবে এবং একখানা ছবি দিয়ে বললেন এখানা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কপি কর। নিজ হাতে কপি করতে করতে তবে একটা পদ্ধতি আয়ত্ত হয়, বুঝতে স্রবধে হয়। কিছুদিন এ কাজ করতে হবে তোমাকে। সে ছবিখানার একটি কপি করেছিলাম, তাতে অস্ত্রান্ত রঙের সঙ্গে সোনা রঙও ছিল। কপিখানা এখনও অবিকৃত আছে।

স্কুল ছুটির পর প্রায় প্রতিদিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং হালুয়া খাওয়াতেন। তাঁর পুত্রের (রামেশ্বর বর্মা) অনেকগুলি পেইন্টিং তাঁর ঘরে টাঙানো ছিল, দেখাঙ্গেন। তাঁর নিজের আঁকা ভারতীয় রাগ রাগিণীর কল্পিতরূপ করেকথানি ছিল। সে ছবিগুলো আমার ভাল লাগেনি।



ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা তাঁর মিনিয়েচার পেইন্টিং দেখাচ্ছেন

এরপর মাসখানেক তাঁর নিতান্ত অসুস্থ হয়ে চলার পর তিনি আমাকে আরও বেশি খাতির করতে লাগলেন এবং এই সময় তিনি তাঁর সবচেয়ে গোপন কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করলেন। এ কথা ছিল তাঁর মনে মনে। হয় তো কাউকে কখনও বলতে পারেননি, তাই অন্যকে বলতে পেরে তিনি নিজের ঘাড় থেকে বেন একটা বড় বোঝা নামিয়ে ফেললেন।

তাঁর একান্ত ইচ্ছে আমি আর্টস্কুল ছেড়ে দিই। বললেন, “এখানে কিছুই হয় না। এখানে থেকে যারা পাস করে বেরোয় তারা মাথা খুঁড়েও ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি পায় না।” তারপর একটু চাপা গলায় একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে অজ্ঞাত ছাত্রদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—“ঐ যে দেখছ ওদের, ওরা সবাই র‍্যাফেল হতে এসেছে এখানে। কি রকম র‍্যাফেল শুনবে? এক র‍্যাফেল গম ভাতার কল খুলে ক’রে থাকে। আর এক র‍্যাফেল এক অফিসের কেবানি হয়েছে। এখানে পড়লে তুমি ঐ রকম র‍্যাফেল হবে। রাঙ্গি আছে?”

আমি ততশয় হয়ে পড়ি। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “আমার মতো যদি মিনিমেটারের কাজ শেখ তা হলে এতে কিছু সুবিধে হতে পারে। যদি স্কুলে টিকে থাক তা হলে আমি শিখিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে বলি না থাকতে, তুমি এ পথ ছাড়া।”

ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রতিদিন আমাকে সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং কানে এতে মন্ত্র দিতেন। ক্রমে তাঁর কথার তাৎপর্য স্বদয়ঙ্গম করলাম, বুঝলাম তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। কারণ সেই ১৯২৪ সালে শিল্পীর কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না, তার প্রমাণও পেলাম চার পাঁচ বছর পরে এক বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। ত্রিশ টাকা বেতনের একজন শিল্পীর দরকার হয়েছিল, আবেদনপত্র এসেছিল প্রচুর। সেও আবার ছবি আঁকার কাজ করতে নয়, ফোটোগ্রাফের এনলার্জমেন্ট ফিনিশিং-এর কাজে। অনেক শিল্পীই তখন নিজের চেষ্টায় এই বিজ্ঞা শিখে নিয়েছিলেন অনাহারে যত্নে হাত থেকে বাঁচার জন্য।

ঈশ্বরীপ্রসাদ আমার প্রকৃত হিতৈষীর কাজ করলেন।

আবার শহর থেকে গ্রামে। এখানে কাজ কিছুই নেই, তবু এ পরিবেশ নিতান্ত আপনায়। রতনদিয়া গ্রামের পরিবেশ।

পদ্মার ভাঙনে যখন কালপালি ষ্টেশন রতনদিয়ার সীমানার উঠে এলো তখন থেকে এ গ্রামের দাম বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। জায়গাটি পাইকপাড়ার সিংহ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক সম্ভবত ১৯১৭ সালে সাহেববংশী অরুণকুমার সিংহকে দেখেছিলাম রতনদিয়া কাছারীতে : ততদিনে রতনদিয়া গ্রামে প্রকাণ্ড বাজার বসে গেছে এবং বর্ষার চন্দনা বিদেশী বহু নোকো ভরা বন্দরে পরিণত হয়েছে। এ বন্দরের স্থায়িত্ব বছরে প্রায় চার মাস, তার পর নদী শুকিয়ে যায়, তখন আর নোকো চলে না।

বাজার ও বন্দর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে। আগে এ অঞ্চলটি ছিল চাষের ক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের অঞ্চল। শ্রাশানও ছিল এই দিকে। ষ্টেশন থেকে চন্দনানদী পর্যন্ত শড়ক তৈরি হল বণিকদের অন্ত। দূরত্ব সিকি মাইল মাত্র। গ্রামের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ হল আর একটি শড়কে। তার পাশে প্রকাণ্ড মসুদঘর তৈরি হল, আর হল অতি সুন্দর একটি খেলার মাঠ। দৈনিক বাজারও

আরও খুব বেড়ে গেল। সব রকম মাছ, তরিতরকারী দুধ, বেলা আটটা থেকে একটা পর্যন্ত বিক্রির বিয়াম নেই। কি শস্তা সব জিনিস, কি স্বাদু এবং টাটকা।

বাজার ও গ্রাম—মাঝখানে একটি পথ। এতবড় বাজার কিন্তু তান্তে গ্রামের শান্তি কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি। বর্তমানের বিচারে এ গ্রামকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলা চলে। অথচ কারো মনে কোনো বিঘ্নেই কোনো আতঙ্ক নেই। গৃহসংলগ্ন জমিতে তরিতরকারী, ফলের গাছে ফল, আম কাঁঠাল ইত্যাদি—সবই অরক্ষিত, খোলা পড়ে আছে। আসবাবপত্র খোলা বৈঠকখানায় পড়ে আছে, কোনো দিন কিছু চুরি হয় না। সিঁদেল চোরের আবির্ভাব বছরে একবার হয় কি না সম্ভেহ। মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে নদীতে স্নান করতে যায়। কোনো দিন কোনো অবাস্থিত ঘটনা ঘটেছে এমন শোনা যায় নি।

রতনদিয়া গ্রামটি পূর্ব পরিকল্পিত একটি সুন্দর ছোট উপনিবেশের মতো। এ গ্রামে যদিও সবাই হিন্দু, কিন্তু চারদিকের সমস্ত গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মিশ্র বাস। সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। সাধারণ মুসলমানেরা সবাই প্রায় কৃষিজীবী। তারা দৈনিক বাজারে দুধ তরিতরকারী বিক্রি করে নগদ পয়সা উপায় করে। তা দিয়ে মাছ কেনে। সবাই নিজ নিজ অদৃষ্ট মেনে নিয়ে তৃপ্ত। তারা ইংরেজ রাজত্বের খোঁজ রাখে না, তারা সবাই ঈশ্বরের রাজত্ব বাস করে। বড় বড় ব্যাপারে জীবন মরণ সমস্রায় তারা ঈশ্বরের বিচার মেনে চলে। কারো বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ নেই। তাদের মুখের দিকে চাইলে বহু কালের অভ্যস্ত একটি আশ্চর্যভোলা সরলতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান যে সামাজিক ভাবে পৃথক, তা ভাল হোক মন্দ হোক, সবাইই অভ্যাস হয়ে গেছে। এ নিয়ে কেউ কারো সীমানার অধিকার প্রবেশের কথা চিন্তা করে না।

এদের মাঝখানে বাস করার মতো ভূমি আর নেই। গ্রাম্য জীবনের আর একটি বড় আশ্রয় হচ্ছে এখানে ঘড়ি না হলেও চলে। এ পরিবেশ স্থায়ীভাবে ছাড়ব এ কল্পনা ভাল লাগেনি কখনো। এ ব্যাপারটি মনের সজ্ঞান পরিকল্পনাজাত নয়। খুব সম্ভব মনের দিক দিয়ে একটি বিরোধহীন পরিবেশ আমার পছন্দ বসেই।

স্থায়ীভাবে গ্রাম ছাড়া নয়, স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকলে ক্ষতি কি, এই প্রশ্নটিই মনে বড় হয়ে দেখা দিল। সম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবন। এখানে তখন মাসে দশ পনেরো টাকা একটি পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। অধিকাংশ পরিবার পাঁচ ছ টাকায় চলে।

আমার এম-এ ডিগ্রীর ভবিষ্যৎ মূল্য ডিগ্রী পাবার পরই ভুলে গিয়েছি। গ্রামে বসে ডিগ্রীর কথা মনে পড়ার হেতুও নেই কিছু। গ্রামের ঐশ্বর্য দ্রুত লোপ পাচ্ছে, কিন্তু তবু তার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গি পরিচয়, সে পরিচয় ভুলতে হবে এ কল্পনা বেদনা দায়ক কিন্তু ডিগ্রীর কথা ভুলে যেতে কিছু মাত্র দুঃখই বোধ হল না।

স্থির করলাম গ্রাম ছেড়ে কোথায়ও যাব না।

মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তুললাম। বাড়ির সলগ্ন জমিতে নানা গাছ লাগাতে লাগলাম, নানা জাতীয় আমের কলম এবং নতুন ধরনের নারকল গাছ কলকাতা থেকে রেল পার্সেলে আনিতে নিলাম। কোদাল এবং কুড়ুলের সঙ্গে পরিচয় বাড়ল। মাটি কোপানো এবং বড় বড় গাছ কাটাতেও পটু হই বাড়ল।

ইতিমধ্যে আমার মামাশুভ্রের ভাগ্নে উপেন্দ্রনাথ বাগচী এসে প্রস্তাব করল রতনদিয়া বাজারে ডিসপেনসারি খুললে কেমন হয়। বড় ডাক্তারখানা ছিল না গ্রামে। বাজারে তখন এক মাত্র ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাক, কুমারখালি থেকে এসেছেন সেখানে। উপেনের ডিসপেনসারি জানা ছিল, চিকিৎসা ব্যাপারেও তার জনপ্রিয়তা ছিল। আর আমার ওষুধ তৈরিতে ছিল তাঁর আকর্ষণ। বাল্যকাল থেকে নানা ওষুধ খেয়ে আসছি। প্রেসক্রিপশনের ওষুধ আমি বরাবর নিজেই তৈরি করে নিতাম, অতএব নানা জাতীয় মেজার গ্রাস ও ব্যালান্স সহ আমার ব্যক্তিগত ডিসপেনসারিটি তখন প্রায় পনেরো সোল বছরের প্রাচীন। বাল্যকাল থেকে এ কাজে আমার ষোপাক্ষিত নৈপুণ্য। অতএব প্রস্তাবটি খুবই মনের মতো হল। উপেন নাকো করে তার বাড়ি থেকে অনেক ওষুধ এবং আলমারি নিয়ে এলো। বাজারে একগানা বড় ঘর ভাড়া নেওয়া হল মাসে পাঁচ টাকা। অতিরিক্ত মূল ধন লাগল মাত্র ছশ টাকা, সেটি আমি দিলাম।

বেশ উৎসাহ জাগল। 'ডিগনিটি অফ লেবার' কথাটিতে তখন মনে পুলক খেলে যেত। তত্পরি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতটি সর্দা চোখের সামনে। দোকান বেশ জমে উঠল। পাইকের খুচরো সব রকম বিক্রি। প্রথম দিকে আমি নিজ হাতে ডিসপেন্সিং-এর ভার নিলাম। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার প্রায় সকল ওষুধের মাত্রা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। ওষুধের পার্সেল আসত রেল। ষ্টেশন থেকে ডিসপেন্সারি পথস্থ পথের দৈর্ঘ্য হাঁটা-পথে প্রায় দশ মিনিট। একদিন একটি বাস আমি নিজে মাথায় করে নিয়ে এলান খুব গর্বের সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য ছিল পাঁচজনকে দেখানো যে সাধারণ মজুর বা পারে আমিও তা পারি। শ্রমের সম্মান ওরাই একা পাবে কেন। আদর্শবাদের চূড়ান্ত!

বলা বাহুল্য, এতে নিন্দা রটে গেল। আমি এই নিন্দারই অপেক্ষা করছিলাম। মনের উৎসাহ আরও তাঁর হয়ে উঠল। সব দিকেই সম্ভার বর্জন করেছি যতটা সম্ভব। এটি তার মধোকার একটি। নিন্দা ঝটল প্রায় সানাজিক ভাবে। সমাজের কিছু পরিচর দেওয়া থাক।

পল্লীসমাজ অবশ্য সর্বত্রই এক। কয়েকজন আত্মচিহ্নিত নেতা সর্বত্রই আছেন এবং তাঁদের দাপট কম নয়। এতদিনে এঁরা আর নেই সম্ভবত। রতনদিয়া গ্রাম এ থেকে মুক্ত ছিল বরাবর। গ্রামটি অনেক দিক থেকেই ছিল আধুনিক। কিন্তু পল্লীসমাজ একটি মাত্র গ্রামে সোনারদ্বা থাকে না, আশে পাশে অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি সমাজ এবং এ সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রধান। শ্রদ্ধ বা বিবাহ কাজে সঙ্গতি থাকলে সমাজস্বত্ব নিমন্ত্রণ করাট রীতি। এই নিমন্ত্রণ কয়েক রকমের আছে। যথা (১) সমাজস্বত্ব জ্যৈষ্ঠ-পুরুষ মিলিয়ে, (২) সমাজস্বত্ব, কিন্তু শুধু পুরুষদের (৩) শুধু স্বগ্রামের জ্যৈষ্ঠ-পুরুষ মিলিয়ে, অথবা (৪) স্বগ্রামের শুধু পুরুষদের। কোনো উপলক্ষে যখন সমাজস্বত্ব সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় তখন আড়ালে বসে সমাজপতি তাঁর শাস্ত্রোপাঙ্গ নিয়ে নিমন্ত্রণকারার কোনো একটা খুঁত বের করার চেষ্টা করেন, অবশ্য পূর্বে থেকেই যদি তাকে জব্দ করার উদ্দেশ্য থাকে। প্রয়োজন বোধে খুঁতের অভাব হয় না। তখন সবাই মিলে নিমন্ত্রণকারীর অজ্ঞাতসারে জোট পাকাত থাকে এবং ভোজনের সময় উপস্থিত হওয়া সম্ভব যদি দেখা যায় নিমন্ত্রিতরা কেউ আসছেন না, তখন বোঝা যায় কিছু ঘটেছে।

এমনি হয়েছিল আমার বিবাহ সময়ে। আমার কাকা থাকতেন অগ্রদূত, তাঁর বিবাহ হয়েছিল এমন পরিবারে যেখানে বিধবা বিবাহ বা ঐ জাতীয় কোনো গুরুতর কলঙ্ক ছিল। কাকা সপরিবারে এসেছিলেন বিবাহ উপলক্ষে। অতএব মহা সুযোগ। রতনদিয়ার লোকেরদের কারো এ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু ভিন্ন গ্রামের সমাজপতি জোট পাকাত লাগলেন। তিনি ভয় দেখিয়ে বহু নিমন্ত্রিতকে আটকে রাখলেন। বেলা গড়িয়ে যায় এবং তাঁদের আশা প্রায় ছেড়েই দেওয়া হয়েছে, এমন সময় দেখা গেল একে একে আসছেন সবাই। শেষ মুহূর্তের এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে পারা গেল না। পরে বোঝা গেল, এর মূলে 'উদারতা'। ভাল ভাল মিষ্টানের আয়োজনের কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই জাতীয় বিরোধিতাকে কখনো ভয় করি নি আমি, এক পাশ্চাত্য এঁদের বিজ্ঞপ করার তখন উৎসাহবোধ করেছি। একটি ঘটনা বলি। মুরগীর মাংস খাওয়া সে-যুগে নিষিদ্ধ ছিল, বিশেষতঃ প্রকাণ্ড। কিন্তু আমাদের বাড়িতে রান্নাঘরেই মুরগীর মাংস বরাবর রান্না হয়েছে, অবশ্য নিয়মিত মুরগীর মাংস খাওয়ার গরজ ছিল না কারোই। আমরা এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে ডাক্তার কার্তিক বসাকের বাড়িতেও সবাই মিলে খাওয়া হত। এক দিন কথাটা খুব প্রচার হয়ে পড়ল এবং নদীর ওপারে অবস্থিত সমাজপতির কানেও পৌঁছল। তিনি এই উপলক্ষে আমার বৈঠক বসাত লাগলেন, খবর এলো। এ কথা শোনামাত্র আমরা তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানা ছিল এই রকম :

মহাশয়, আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মণ সম্মানগণ গত রাতে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাকের বাড়িতে অতিশয় তৃপ্তি সহকারে তিনটি পুষ্ঠি মুরগীর মাংস ভক্ষণ করেছি। রান্না অতি উপাদেয় হয়েছিল।

এ চিঠির নীচে আমরা প্রায় দশ জন সই করেছিলাম। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছেছিল, কিন্তু এর পর সব ঠাণ্ডা। সে আজ কত দিনের কথা—তেরিশ বছর হবে। তখন কিঞ্চিৎ দাম্পত্য ছিল, মনে কিছু উগ্রতা ছিল, তাই এখন যা অত্যন্ত কঠোর মনে হয়, তারই বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করেছি। আহত মস্তক সাপের মতোই তাকে মাটিতে পড়ে ধুকতে দেখেছি। কি বেদনাময় সে দৃশ্য! অনিবার্যকে বোধ করবার উপায় নেই, অথচ অনিবার্যকে গ্রহণ করবারও ক্ষমতা নেই। নির্বোধ, কর্মবিমূগ, স্বয়ং যাবতীয় পাপ-কাজে লিপ্ত, সমাজপতিদের এই দ্রবস্থা নিজ চোখে দেখেছি। দূর কালের পটে



গ্রামের সরলপ্রাণ চাণীরা



দেখলে বোঝা যায়, আমাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। মৃতপ্রারকে আঘাত করাটা বাড়াবাড়ি।

কিন্তু আরও একটি বড় ভিনিস এতদিন লক্ষ্য করিনি। রতনদিয়া গ্রামে এতদিন আমাদের ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মধ্যে যে স্তরের আলাপ আলোচনা নেলায়েণা এবং ত্রিভািকলাপ চলত, ইতিমধ্যে তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের দলের সবাই প্রায় পরস্পর বিজ্ঞিত হয়ে পড়েছি, বন্ধুরা সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী ধাপের যারা অবশিষ্ট রইল তারা না পারল লেখাপড়া শিখতে, না পারল মার্জিত হতে। তারা রতনদিয়ার আজিজাতোর ভাঙনের তলায় চাপা পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদ অতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। শিক্ষাবিজ্ঞিত গ্রাম্য ছেলে তারা আমাদের বোঝে না, আমবাও তাদের বুঝি না। তারা উগ্র, এবং সম্পূর্ণ শালীনতাবিজ্ঞিত।

এইটি স্বদয়ঙ্গম ক'বে ভয় পেয়ে গোলাম। এদের মধ্যে থেকে কিছু করা বিপজ্জনক। যতই গ্রাম্য ভব কল্পনা করি না কেন সেটি ইয়েজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মনের রোমাটিক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়— এই নিষ্ঠুর সত্যটি মনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সভয়ে আবার পল্লীদিগন্ত দেখার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম।

এব পরেও ছ'মাস বছর নানা পরীক্ষার পথে চলেছি, অভিজ্ঞতাও লাভ হচ্ছে বিবিধ। লিখন বুত্তই যে শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করতে হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরবর্তী কয়েক বছরের অনেক কিছুই কোনটা আগে কোনটা পরে ঘটেছে তা এখন আর মনে করতে পারি না, কেননা এ সবের কোনোটিই জীবনের মোড় ঘোরায়নি।

এর মধ্যে বছরখানেক গভর্নেন্ট কমান্ডার্স ইনসটিটিউটে পড়েছি। কিছু একটা করা দরকার। চাকরি যদি করতেই হয় তবে স্টেনোগ্রাফি ভাল এমন উপদেশ দিয়েছিলেন অনেকে। সাধারণ ভাবেই খুব দ্রুত লেখার অভ্যাস ছিল আমার, কপিং পেন্সিলের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকের বক্তৃতা লিখেছি অনেক দিন। অতএব শটহাণ্ডে সফল হব এমন বিশ্বাস ছিল। প্রিন্সিপ্যাল সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন বাবার সহপাঠী এবং পরিচিত। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে অভ্যর্থনার বদলে তিরস্কার আরম্ভ করলেন। বললেন বহুস পার ক'রে এ লাইনে এলে কেন? সরকারী চাকরির মনোনয়ন তো অনেকটা আমার হাতেই, সাত শ' আট শ' টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে অনেকে। তোমার এখন সে পথ বন্ধ। এখন পাস করলে হয়তো কোনো মার্চান্ট অফিসে দুশো টাকার চাকরি করবে, কিন্তু কানে আসবে লাখ লাখ টাকার আলোচনা। ভাল লাগবে না সে কাজ।

দুঃখ হল খুবই। তবু ভর্তি হলাম। স্কুলটি ছিল বোবাজার স্ট্রীটে। এক বছর পড়লাম সেখানে। দেবেন দত্ত ট্রেনোগ্রাফি শেখাতেন পিটম্যান পদ্ধতিতে। প্রথম বছর শেষে পরীক্ষা দিলাম মিনিটে ৮০ শব্দ (অফিশিয়ালি), আসলে ১০০ শব্দ ডিকটেট করা হয়েছিল দেবেনবাবু' নিজেই বলেছিলেন। টাইপরাইটারে ব'সে এর প্রত্যেকটি শব্দই নির্ভুলভাবে ট্রান্সক্রাইব করেছিলাম। ইয়েজী বা বাংলা বানান সম্পর্কে নিষ্ঠা ছিল একটু বেশি মাত্রায়, এবং আমাদের যুগের অনেকেরই এটি ছিল বিশেষত্ব। তাই পরীক্ষা ভালই হল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অধিকাংশই ছিল ম্যাট্রিকুলেট।

শটহাণ্ড পড়ার সময় এই শকারুগ চিহ্নের সংক্ষিপ্ত লিখন পদ্ধতিটি খুব ভাল লেগেছিল। তখন মনে হত এটি আগে শেখা থাকলে সকল অধ্যাপকের বক্তৃতা আগাগোড়া লিখে নেওয়ার কত সুবিধে হত। তখন অধ্যাপকদের বক্তৃতা আগাগোড়া লিখে রাখবার মতোই ছিল।

পরীক্ষা দেবার পর আর স্কুলের সীমানায় বাইনি, শটহাণ্ডের প্রতি এবং স্টেনোগ্রাফির চাকরির প্রতি মনে বিভ্রাৎ জেগে উঠল। অনেকদিন পরে এক সহপাঠীর মুখে শুনেছিলাম পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞান কিছু প্রাইজও ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলের সীমানায় পুনরায় যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

এই কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। ঘনিষ্ঠতা আগেই ছিল, কিন্তু এবারে গলায় গলায় ভাব হল। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল আইন অমান্য ক'রে চলার দিক দিয়ে আমাদের দুজনের চরিত্রে অনেকখানি মিল ছিল। দু'জনেই অনিয়মিত এবং এলোমেলো। বলাই এ বিষয়ে আমার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী বেশি! এ সময়ে কয়েক মাস বা কয়েক বছর একই সঙ্গে কাটিয়েছি। একবার এক ঘরেও। বলাইয়ের নাওয়া খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই নিয়মও নেই, হয়তো দশ পনেরো দিন পর এক দিন স্নান হল। চুলে চিরুনির স্পর্শ নেই, জুতোয় কালি নেই।

একবার পটুয়াটোলা লেনের এক মেসে ছিলাম। কেন ছিলাম তা আর এখন মনে নেই। সেখানে আমার পূর্বকার সহপাঠী বন্ধু শিবচরণ মৈত্র থাকত। বলাইয়ের ভাই ভোলানাথ এখানে কিছুদিন ছিল মনে হয়। সেই সূত্রে বলাই এখানে আসত। শিবের ঘর হয় একবার, অরের পরে অল্প পথা দরকার। বলাই সম্ভবত শিবকে ওষুধ দিয়েছিল, অতএব বলাইয়ের খেয়াল হল মেসের ভাত তো ভাল নয়, ভাল ভাত কারো বাড়ি থেকে ভিক্ষে ক'রে আনা যায় না? বলাই তৎক্ষণাৎ মেস থেকে একখানা থালা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভাত ভিক্ষের উদ্দেশ্যে।

বলাইয়ের কঠোর, চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল দুর্বীর। সব সময়েই তা ধাবালো, তা সব বাধা কেটে এগিয়ে চলে এবং তা চমকপ্রদ রূপে চিত্তহারী। পনেরো মিনিটের মধ্যে বলাই প্রকাণ্ড একখানা থালায় শুধু ভাত নয়, অনেকগুলো বাটিতে সাজানো ঝোল ডাল ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির। সেই থালাখানার নিচে মেসের থালাখানা লজ্জায় মাথা ঢেকে আছে।

বলাই এক অপরিচিতের বাড়িতে চুকে সোজা গিয়ে বলল "এক বন্ধু আজ অল্প পথ্য করবে, মেসের ভাত অথাত, তাই ভাল ভাত ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি, সম্ভব হলে এই থালায় কিছু ভাল ভাত দিন।" একেবারে সোজা কথার সোজা প্রস্তাব, প্রস্তাবে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দীনতা নেই। বীদের কাছে ভাত চাওয়া হল, সম্ভবত তাঁরা এই রকম চাওয়ার সরলতা এবং এর মধ্যকার নতুনত্ব দেখে এমন মুগ্ধ হলেন যে তাঁদের নিজেদের থালা-বাটিতে সব সাজিয়ে বলাইয়ের হাতে তুলে দিলেন, ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

বলাই ছিল এমনি খেয়ালি ও গুরুজ্ঞানাল। কলকাতার মতো বহুদূর বাড়িতে প্রবেশ ও ভাত ভিক্ষে পাওয়া যায় কিনা তার পরীক্ষা-বাসনা একমাত্র বলাইয়ের পক্ষেই সম্ভব। এবং শুধু এটি নয়,

আরও অনেক ঘটনা বার প্রত্যেকটি চমকপ্রদ, এবং একটা আর একটা থেকে স্বতন্ত্র।

ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে কডলিভার তেল অদ্ভুত তখন খুব প্রিয় ছিল। বলাইকে এই তেল কিছুকাল খেতে হয়েছিল নিউমোনিয়া আক্রমণ থেকে উঠে। বোতল ধরে মুখে ঢালত যতটা সম্ভব। সে সময় আমরা মির্জাপুর স্ট্রীট ও হারিসন রোডের সংযোগ স্থলের ত্রিকোণাকার বাড়িতে থাকি। ওটির নাম ইস্টারজাশভাল বোড়ি। এখানে আরও ডাক্তারি ছাত্র থাকত, তার মধ্যে অমিয়কুমার। সেন আমাদের অস্ত্রবন্দ ছিল। এই অমিয় সেনকেও বলাইয়ের মতোই মাঝে মাঝে বোতল ধরে কডলিভার তেল মুখে ঢালতে দেখেছি। শেষে আমিও এরকম অভ্যাস করেছিলাম। কডলিভার তেলের বোতল দেখলেই এরা লোভ সামলাতে পারত না।

এই সময় অমিয় সেনের বিয়ে। ডাক্তারি ছাত্র, অতএব বলাইয়ের খেয়াল হল বিয়েতে সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হবে এক বোতল কডলিভার তেল। কারণ এতে কীকি নেই, সম্পূর্ণ সারবান এবং মৌলিকতায় আর সব উপহারকে হার মানাবে। তখন আমাদের কারো কাছেই উদ্ধৃত পয়সা বিশেষ কিছু থাকত না, খরচ সম্পর্কে আমরা সর্বদা বেহিসেবী। বলাই ঠিক করল উপহারের জন্ত বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার তেল কিনবে এক বোতল, দাম কম, সম্ভবত দেড় টাকার নিচে। সেটি খাঁটি নওয়েজিয়ান তেল, এখানে বোতলে পোরা। ডি জন্স কডলিভারও খুব চলত তখন, সেটি বিদেশী।

কেনার সময় আমি সঙ্গে ছিলাম। আমাদের বোড়ি হাউসের নিচে বি-বোসের দোকান। বলাই বেঙ্গল কেমিক্যালের তেল কিনে এক বোতল। সেখানে বাইরের এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তিনি হঠাৎ বঙ্গল বসলেন, “কিনছেন যদি, তা হলে আর দেশী কিনছেন কেন?” এরকম ধারণা তখন অনেকেরই ছিল, বিদেশী নামের উপর অতি বিশ্বাস। কিন্তু বলাই একথা শুনে মুহূর্তে সেই ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তখন তার মস্তিষ্কের তর্ক, এবং কৌতুক কেন্দ্র যুগপৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে সামনের বেঞ্চের উপর একগানা পা তুলে দিয়ে সামনে একটু বঁকে দৃষ্ট ভঙ্গিতে বলতে লাগল, “আমার এই স্বাস্থ্য দেখছেন? ওজন বারো টন। কিন্তু আগে আমি ছিলাম কংকাল। শুধু বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার অয়েল খেয়ে এই স্বাস্থ্য হয়েছে আমার। অতএব আপনি যত ইচ্ছে চেষ্টা, চেষ্টায়ে গলা দিয়ে রক্ত বার করুন, তবু আপনার কথা আমি মানতে রাজি নই।”

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বোকার মতো বসে রইলেন।

সমস্তই খেয়ালের মাথায়, কোনোটিই পূর্ণ-পরিকল্পিত নয়। যেমন, একদিন অমিয় সেনের বিয়ের পর মহাশয়টির হঠাৎ একটি সুযোগ পাওয়া গেল। আমরা হঠাৎ হুপরে খাওয়া দাওয়ার পর আবিষ্কার করি সজ্জা বিবাহিত অমিয়কুমার তার স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠি আরম্ভ করে শেষ হবার আগেই কলেজে চলে গেছে। চিঠিখানা বলাই তার চিঠির প্যাড খুলে আবিষ্কার করল।

আমি তখন সেই চিঠি নিয়ে বাকীটুকু লিখলাম। অমিয়কুমারের লেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে এই ভাবে লিখলাম—

“সে যা হোক, আমি তোমাদের বাড়িতে যেতে চাই, কিন্তু যেতে যেতে বড় লজ্জা হয়। তোমরা যদি ওখান থেকে যেতে লেগ, তা হলেই যেতে পারি। লিখবে তো?—ইতি” তারপর এ চিঠি খামে বন্ধ করে তার উপর অমিয়র স্ত্রীর নাম ও ঠিকানা লেখা হল। অমিয়র খন্তরবাড়ি ওখান থেকে হাটাপথে তিন মিনিটেরও কম পথ। মির্জাপুর স্ট্রীটের উপর।

আমি অস্ত্রের হাতের লেখা স্মরণ নকল করতে পারতাম, যার লেখা সেও ধরতে পারত না অনেক সময়। যাই হোক, এ চিঠি পৌঁছে দেবার ভার নিল বলাই। সে হাটুর উপর কাপড় তুলে, কতুয়া গায়ে, খালি পায়ে, এবং চুলগুলো আরও অবিকল ক’রে, অমিয়র খন্তরবাড়ি চলে গেল এবং কড়া নেড়ে গ্রাম্য উচ্চারণে গিয়ে বলল “অমিয় দাদাবাবু নতুন দিদিমণিকে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন।”

ঘটনাটা ঘটেছিল সম্ভবত বেলা একটায়। তার পর আমরা বিকেলে বেরিয়ে যাই এবং এ চিঠির পরিণাম কি ঘটল তা জানবার জন্ত সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসি। এসে দেখি অমিয় গুম হয়ে ঘরে বসে আছে, আমাদের দেখামাত্র একখানা চিঠি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল এই নাও তোমাদের চিঠির উত্তর।

অমিয়কুমার মিষ্টস্বভাবের মানুষ। কারো উপর চটতে দেখিনি কখনো, আমাদের উপরেও চটেছিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছিল। নতুন জামাই চিঠি দিয়েছে, অতএব তাতে খন্তর বাড়ির সবাই অধিকার—চিঠির কথা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার খন্তরবাড়ির সবাই একে একে অমিয়কে নিয়ে যাবার জন্ত এসেছেন। অমিয়র খন্তরও এসে গেছেন একবার।

একটি নিষ্ঠুর কৌতুক সন্দেহ নেই। বলাই যে কি পরিমাণ খেয়ালি তার আরও দৃষ্টান্ত আছে। একদিন অমিয়র অনুপস্থিতিতে



ডিসপেন্সিং ঘরে

তার টেবিলের ল্যাম্প থেকে চিমনিটা খুলে নিয়ে টেবিলের উপর ভেঙে রাখল। আমিও কিছু সহযোগিতা করলাম এ কাজে। আঙুলের সঙ্গে ফমাল জড়িয়ে ধুলো আর তলে নিশিয়ে বকবকে বিছনার চানরটির উপরে বিড়ালের পদচিহ্ন এঁকে দিলাম কয়েকটি। কাজটি খুব নিখুঁত হয়েছিল। অমিয় ফিরে এসে কোনো অদৃশ্য বিড়ালের উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ণন করতে লাগল।

একদিন অপরাহ্নে চর্যাং খেদাল হল কলকাতার বাইরে কোথায়ও ঘুরে আসা বাক। বলাই আমি ও শিব মৈত্র অবিলম্বে চলে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। পকেটে আমাদের উদ্ভূত পরমা কোনো সময়েই বেশি থাকত না, সেদিনও ছিল না। সবার সব পরমা একত্র করে বলাইয়ের হাতে দিলাম। বলাই সে পরমা বুকিং ক্লার্কের সম্মুখে ঢেলে দিয়ে বলল, “দাদা, তিনখানা রিটার্ন টিকিট দিন।”

“কোথাকার?”

“তিতো বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি দাদা, যে-কোনো স্টেশনের দিন, আটপাের না কিছু।”

বুকিং ক্লার্ক খুব কৌতুক অনুভব করলেন এ কথায়, এবং পরমা হিসেব করে তিনখানা কাঁচরাপাড়া রিটার্ন টিকিট দিলেন।

ট্রেনের মধ্যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনিও কাঁচরাপাড়া যাবেন। বলাই তাঁর সঙ্গে খুব ভাল জমিয়ে নিল, এবং তাঁকে দাদা বলতে আরম্ভ করল। বলাই ক্রমে প্রস্তাব করল তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৌদির হাতের রান্না পেয়ে তবে অন্ন কথা। ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। তিনি যতই প্রসঙ্গটা অন্তর্দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেন কলাই ততই তাঁর সম্পর্কে এবং বৌদির সম্পর্কে আলাপ করতে থাকে। অবশেষে কাঁচরাপাড়া পৌছানোর পরও যখন আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলাম তখন তিনি যতবকম ভাবে সম্ভব আমাদের নিকরসাৎ করতে লাগলেন। বললেন, “রাত্রি বেশি হলে ফেরবার আর গাড়ি পাবেন না, আপনাদের ভীষণ কষ্ট হবে, আপনারা সত্যিই আসবেন না, আমার বাড়ি এখান থেকে চার মাইল”—ইত্যাদি।



বলাই ভাত ভিলে ক'রে নিয়ে এলো

আমরা শুধুই একটু ‘মজা’ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে মাইলখানেক গিয়েছিলাম।

ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডিং বলাই, আমি ও বলাইয়ের দূরসম্পর্কীয় এক ভাই (সিন্ধুধর বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি ঘরে বাস করতাম। সে ঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুধর পড়ত মেডিক্যাল স্কুলে। পড়াশোনায় তার খুব মিঠা ছিল। বলাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল তার অপরিমীম। তার পড়ার সুবিধে হবে এই উদ্দেশ্যে বলাই মেডিক্যাল কলেজ থেকে মানুষের ব্রেন, ফুসফুস ছংশিও প্রভৃতি কি ভাবে সংগ্রহ করে এনেছিল জানি না। সেগুলো পৃথক পৃথক মাটির ইঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত, ইঁড়িগুলো থাকত তক্তাপোষের নিচে। তিনখানা তক্তাপোষের মাঝখানে বড় একটা সতরঞ্চি পাঁতা ছিল—এইখানে ব'লে ব্রেন বা ফুসফুস বা ছংশিও কাটা হত এবং সিন্ধুধরকে এ সবের অ্যানাটমি বোঝানো হত। সেই সতরঞ্চির উপর একটি কুকার ছিল, তাতে প্রায়ই মাঁস রান্না হত। একদিকে মানুষের ফুসফুস কাটা হচ্ছে অন্যদিকে পাঁটার মাঁস রান্না হচ্ছে। সতরঞ্চির উপর মাঁসখানেকের ধুলো জমে আছে, কখনো তারই উপর শুয়ে পড়েছে বলাই। মানুষের সেই সব দেহাঙ্গ ইঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ ডুবত না, তার ফলে সেই সব অংশ কিছুদিনের মধ্যেই পাচে উঠে ঘর দুর্গন্ধে ভরে তুলত। কিন্তু সবাই নির্বিকার। তার মধ্যেই খাওয়া শৌণ্ডা সবই স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

আমারও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে একটি ফুসফুস কাটা হচ্ছিল। ফুসফুসের ভিতরটা এই প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম। ফুসফুসের গুণ্ডিত অংশের গায়ে ছোট-বড় নানা রকম চোহরার কয়লায় মতো কালো এক একটা অংশ, কেউ বেন সে-সব জায়গায় ভূষার ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। ও-সব অংশের নাম সুনলাম কার্ণাইজড অংশ, অত্যধিক ধূমপানে বা ধোঁয়া নাকে টানার ফলে ফুসফুসে এই রকম এক একটা এলাকা কালো হয়ে যায়।

কাটাকাটির কাজ শেষ হবার পর আসল বিপদ। বলাই একদিন বাত হুটায় উঠে কাটা ফুসফুস খবরের কাগজে জড়িয়ে গোপনে পথের রেফিউজ বিনের মধ্যে ফেলে এলো। বলল, যদি পুলিশে ধরে, তা হলে বিপদ। বলবে, নরহত্যা করেছে। প্রমাণ করতে হবে, করি নি। ততদিনে শাস্তির চূড়ান্ত।

থিয়েটার দেখা অনেক দিন থেকেই একটি বড় নেশা ছিল। বলাইও নিয়মিত দেখত। কিন্তু আমাদের হাতে উদ্ভূত পরমা কোনো সময়েই বেশি থাকত ব'লে মনে পড়ে না। মাসের শেষ দিকে কোনো বন্ধু এলে তাকে শোষণ ক'রে একেবারে গজভুক্ত কপিথবং ক'রে ছেড়ে দেওয়া হত। সাহেবগঞ্জ থেকে প্রবোধ এলে তার উপরেই আক্রমণটা বেশি হত। প্রবোধ ছিল অত্যন্ত বন্ধুৎসল, সে আমাদের জন্ত খরচ ক'রে ভুগ্ন হত, এটি জানা ছিল ব'লেই আমাদের কোনো সঙ্কোচ হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম থিয়েটারে অথবা সিনেমায়। একটি পরমা হাতে থাকতে তাকে ছাড়া হত না। সে যখন সাহেবগঞ্জে ফিরে যেত, তখনকার অবস্থা বলাইয়ের ভাষায় : প্রবোধদার পকেট আমরা একেবারে খালি ক'রে ফেলতাম, শেষে তাঁর যাবার সময় অজ্ঞ কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পরমা ধার ক'রে দিতাম, সে ধার প্রবোধদারই শোধ করতেন বলা বাহুল্য। প্রবোধদার যাবার সময়

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা পোষাক ! দাড়ি কামানোর পয়সাও থাকত না।—বলাই এ গল্প তখন অনেককে শুনিয়েছে।

প্রবোধ ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সেন্টিমেন্টাল। কোনো বিরোধীরা নাটক তার সঙ্গে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। মনোমোহন থিয়েটারে ‘প্রফুল্ল’ অভিনয়ে প্রবোধ, বলাই ও আমি গিয়েছিলাম। প্রবোধ কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন কাঁদতে আরম্ভ করল যে, তা ঠেকানো দুঃসাধ্য। সে উঠে যাবেই। কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে, এবং রওনা হয়, আমরা দু’দিক থেকে তার হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একটু পরেই আবার নশীলক দুঃখের দৃশ্য আরম্ভ হয়, আবার প্রবোধের সেখানে বসে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জোর করে চলে যেতে চায়। বলে পয়সাও খরচ করব এবং এত দুঃখ সহ্য করব, এ আমি পারব না। আবার তাকে ঠাণ্ডা করি, আবার সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে।

দানি বাবুর পরে প্রবোধকে কাঁদতে লাগলেন শিশিরকুমার ভাড়াড়ি তাঁর সীতা নাটকে। কিন্তু তত দিনে প্রবোধ থিয়েটারে বসে কাল্লার মাধুর্ষ হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছে, কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবার চেষ্টা করেনি।

থিয়েটারে দুঃখের দৃশ্য দেখে কাঁদি কেন এবং পয়সা খরচ করে

কাঁদি কেন, এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি আজও মেলেনি। আরিষ্টটল থেকে অজ্ঞাবধি এ চেষ্টা হয়ে আসছে, অনেক উত্তরই ভাল লাগে কিন্তু সম্পূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু এ বিগয়ে সবাই একমত যে ট্রাজেডি দেখতে আমরা পছন্দ করি—তা-সে *Katharsis* হোক বা না হোক, অথবা যে অর্থেই হোক। কিন্তু প্রবোধ যখন বলেছিল “পয়সাও খরচ করব এবং কাঁদবও, এ আমি পারব না”—তখন অন্তত সে মুহূর্তের জন্য আরিষ্টটল একটু দূরে সরে ছিলেন, এ দৃশ্যটি দেখতে পাননি।

বলাইয়ের খেয়ালের মৌসিকতা বলাইকে একটি অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত করেছিল। আরও দু’জন খেয়ালি ব্যক্তির সংশ্রবে এসে বলাইয়ের চরিত্র আরও খুলেছিল। সে দু’জন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস বহুমল্লিক। প্রথম জন বলাইয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয় জন তার সহপাঠী। খেয়াল বিষয়ে এ দু’জনকেই বলাইয়ের বড়দা বলা চলে। এঁদের কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে আর একটি ছোট ঘটনা বলি।

একদিন বলাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হল কোনো একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে পথে এসে দাঁড়াল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি পদম্ভ্রমত মতো যুবককে ডেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ফেলল; দু’জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা চলেছিল কিছুকাল। [ক্রমশঃ।

## ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে

### উপাধায় ব্রহ্মবান্ধব

বেদান্ত বলেন, জগৎটা একান্ত ভাবে মায়া। এই মায়ার কাঁদে পড়িয়া জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহারই জন্য মানুষের বন্ধন ও দ্বিবিধ দুঃখের নরক-বন্ত্রণা সহ্য করা। এই মায়াই জগতের মত ফিরিঙ্গির এই শাসনটাও একটা মায়া, একটা প্রকাণ্ড কাল্পনিকতা! ইহার পুলিশ-প্রহরী, কাজী-কারাগার, ইহার দ্বীপান্তর কাঁসি! ইংরেজের পেয়াদ-পাটিক, হাঁক-ডাক শাসনের শাসনিক যত হাঁক-ডাক, ফিরিঙ্গির লাট-বেলট এইতে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যাপ্ত সর্বস্ব কিছুই ভ্রান্তি। যেদিন আমাদের আত্মানুভূতি হইবে, আমাদের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিব আর সেই আত্মানুভূতির স্বারাজ্যভূমি হইতে আমরা বলিব, ইংরেজ নাই—সেদিন ইংরেজ থাকিবে না! উহার রক্তিম রাগের স্পর্শে তমিস্রা রজনীর আঁধার যেমন নিমেষে লোপ পাইয়া যায়, ইংরেজের রাজ্য-সাম্রাজ্য, তাহার শিক্ষা-সভ্যতার বাড়াবাড়ি ও হুড়াহুড়ি নিমেষে অন্তহিত হইয়া যাইবে! ফিরিঙ্গির যা কিছু বাঁধন-ছাঁদনএর অস্তিত্ব কেবল আমাদের মূঢ়তায়, এ দেশী লোকের ভ্রান্তিতে। ফিরিঙ্গির প্রেমে আমরা মজিয়া আছি বলিয়া তাহাদের আটকাটকা বাধিয়া রাখিয়া দিয়াছি। তাহাদের শিক্ষা চলিতেছে আমাদের প্রেমে, ঐ স্নেহ শাসনকে আমরাই আমাদের অনুরাগ-আকর্ষণ দিয়া বর্তাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আর নয়, মুক্তির দিন আসিয়াছে। এই ফিরিঙ্গির প্রেমের ডোর ছিন্ন করিয়া স্বাধীনিকতার ভাগীরথী প্রবাহে অবগাহন করিয়া আমাদের একবার বেদান্ত মন্ত্রে বলিতে হইবে—ব্রহ্মবান্ধব, আমরা ব্রহ্ম! আমরা ঋষিমুনির সন্তান! আমরা শ্রীকৃষ্ণের উত্তরাধিকার। আমাদের শোণিত সংশ্রবে রহিয়াছে প্রতাপ শিবাজীর শোণিত সম্পর্ক। আমাদের অধীন রাখে কে! আমরা মুক্ত স্বরাট!

‘সন্ধ্যা’, ১৩১৪ : রাজস্রোহ মামলায় অভিযুক্ত।

# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

বলসইতে এত পালা দেখলাম, মস্কো আট থিয়েটারে একদিন যাওয়া তো উচিত। কিন্তু দেশে কেবাব জন্ম পা বাড়িয়ে আছেন, প্রস্তাব কারো কানে ঢোকে না। শেষ পর্বস্ত মোটামোট পাঁচজন হলান আমরা। আর দোভাগিগী ইরা—ইরেজী করে বুঝিয়ে দেবার জন্ম। পালা হল উষ্ণ হৃদি (warm heart) আমরা আসার আগে কালিদাসের নাটক হয়ে গেছে। সময় নেই যে রয়ে সয়ে কোন ভাল পালা দেখে যাব এখানে।

হলে ঢুকে রাগ হচ্ছে। আন্তন চেকভের মতো গুণী নিজে গড়ে তুললেন—জগৎজোড়া নাম—যে বস্তু এই? হালফিল আমাদের কলকাতার থিয়েটার বা দাঁড়াচ্ছে, ভাল বই খাণ্ডন নয় এর চেয়ে। সিনসিনারি অংশ-মরি কিছু নয়। বলসই থিয়েটার তো চোখ ধাঁধিয়ে মাথা খাণ্ডন করে দিয়েছে। এখানে ভেবেছিলাম না জানি আরও কি দেখতে পাব! শুরুতেই মুসড়ে পড়েছি তাই।

প্রেমের গল্প। হাসি রহস্যও খুব। উনিশ শতকের পরিবেশ। এর মধ্যে একটা সিনে কিছু বাহ্যিক দেখলাম। জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকো চড়ে কাছারি বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ির নিচে নদী। উঠলেন বাবু সতর্ক হয়ে, জুতোয় জলকাদা না লাগে। ছেড়ে দিল নৌকা, গান বাজনা ও কৃতিফাতির ব্যাপার আছে, সেই সব শুরু হয়ে গেল। চলছে, চলছে—ঘর বাড়ি গির্জা মাঠ গাছপালা পার হয়ে চলছে, অবশেষে কাছারি বাড়ির ঘাটে এসে লাগল। জমিদার সদলবলে নেমে পড়লেন। নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হলমুখ আমরাও চলছিলাম যেন। এখন কাছারি বাড়ি পৌঁছে সেখানকার কাজকর্ম দেখছি।

ব্যাপারগাটা বুঝলেন? নৌকো একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে, স্টেজের উপর দর্শকের দৃষ্টির উপর থেকে, তা ছাড়া যাবেই বা কোথা? পিছনের পর্দা ফুরে যাচ্ছিল এ তাৎ। পর্দায় আঁকা গির্জা ঘর বাড়ি গাছপালা প্রভৃতি। আলোর কারসাজি তার উপর। নৌকার ভিতর গান বাজনার সমারোহ এবং জীবন্ত অভিনয়—সমস্ত মিলিয়ে দৃষ্টবিন্দু ঘটায় দর্শকের। রেলগাড়িতে চড়ে হঠাৎ যেমন দেখেন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামগুলো সামনের দিক থেকে পিছনমুখো চলছে, এখানেও সেই বস্তু দেখালে উল্টো রকম প্রত্যয় কেন না হবে!

অভিনয় যত এগোচ্ছে, মালুম হচ্ছে বলসইর সঙ্গে তথ্য কোথায় এই থিয়েটারের। বলসইতে সিনসিনারি আলো সাজ পোশাকের বাহার—এক টিকিটে যুগপৎ অভিনয় ও ম্যাজিক দেখে নিচ্ছেন; এবং পালা-বিশেষে সার্কাসও। মস্কো আট থিয়েটারে শুধু মাত্র একটি বস্তু—অভিনয়। আমাদের থিয়েটারে প্রমট করায় রেওয়াজ—গানের এক একটা কলি যেমন হু-বার করে গায়, থিয়েটারেও ঠিক তাই। একবার উইংসের অন্তরাল থেকে প্রমটর বশায়ের আকৃতি তনহি; দ্বিতীয়বার স্টেজের বহির্দেশে অভিনেতার। তখন ইউরোপ

চষে বেড়িয়েছি বলতে পারেন—প্রায়ই তো পয়লা সারির সিটে বসে থিয়েটার দেখেছি—প্রমট শুনে শুনে বলার রেওয়াজ ওদের নেই। টোটেব মুখস্থও নয়, নাট্যকারের লিখিত বস্তু অন্তরের ভিতর থেকে পুরোপুরি নিজ বস্তু হয়ে বেরিয়ে আসে। সাজ হবার এই হালকা নাটক, ভুবনময় হাঁক ডাক করবার কিছু নয়—কিন্তু প্রাণঢালা কী অভিনয়ই করছে প্রতি জন!

ইরা আমার ঠিক আগের সিটে। পাত্র-পাত্রী কে কী বলছে, অঙ্ককারে কানের কাছে মুহু গুল্লনে ইংরেজি করে যাচ্ছে। বিরক্তি লাগে, চটে যাই। আঃ, থাম দিকি তুমি! নয়তো উঠে ওধারে গিয়ে বোসো ওদের যদি প্রয়োজন থাকে।

কথা বুঝলেন?

না। কিন্তু সমস্ত বুঝতে পারছি।

সত্যি কথা, অভিনয়ের মধ্যে যে কত সামান্য ব্যাপার আজকের আসরে বুঝতে পারছি। নাগিকা সেজেছে ঐ যে নেয়েটা, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স কিন্তু মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সর্বত্র দিয়ে ওর অভিনয়। চোখ বুঁজে আজও যেন অভিনয়ের ছবিটা দেখতে পাই। মনের গুঁড় লোকে যত রকম ভাবের আনাগোনা, মূর্ততম দর্শকের কাছেও অবলীলাক্রমে সমস্ত যেন মেলে ধরছে। মস্কো আট থিয়েটারের দেশজোড়া নাম এমনি হয়নি।

২৮

মস্কোর জিনিষ কিনতে যাওয়া রকমারি। যা কিনবেন, কিউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায়। অথচ দেশে আপনারা সব রয়েছেন, স্যুভেনির ছোটো-একটা না নিয়ে এলে কেমন হয়? পুরো বেলা দাঁড়িয়ে জিনিস কিনবেন সত্যি সত্যি ঐ একটা কিনা ছোটো—এক কিউ শেষ করে অন্য কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন, অধিক কি করে হবে বলুন। আমাদের বটুক-দা'র বুদ্ধি করলে হয়, বিলে মাছ ধরতে গেলাম। হোগলাবন ও জলকাদার ভিতর দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলা। এক জায়গায় যা হবার হল, যাও তখন অজ্ঞানে। মস্কোরই এই সওদা করার ব্যাপার। বটুক-দা খানিকটা চেষ্টা চরিত্র করে শেষে দেখি ডাডার উঠে খেজুর গুড়ি চশান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়েছেন। ও বটুক-দা, খালি খালুই ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বাড়ির লোকে বলবে কি? বটুক-দা জবাব দিলেন, খালি কেন হবে ভাই? হাট হুয়ে যাব, হাট থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে বলব ধরে এনেছি। বিরক্ত হয়ে আমরাও এক একবার ভাবছি তাই: হুতোয়, কাবুলে গিয়ে কিবা একেবারে পাস দিলি থেকেই যা-হোক কিছু নিয়ে নিলে তো হয়। এত ঝামেলা করি কেন? কিন্তু বটুক-দা'র গল্পেব উপসংহার মনে পড়ে যায়। হাটে পৌঁছুতে বড় দেরি হল, সব মাছ উঠে গেছে, এক ডালিতে ইলিশ আছে গোটা কয়েক। তাই সই—নির্ভীক বটুক-দা বাড়ি গিয়ে হরতো বলেছিলেন, ইলিশ মাছই ধরেছেন



ছিপে। বটুক-দাঁর বাড়ির ঠোঁট অত্যন্ত ভাল মানুষ, এক কথায় মেনে নিয়ে বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। আপনারা যে তা নন। এমনই তো চোখ টেপাটুপি করেন, সোবিয়েতে ঘোরা চাট্টি কথা কিনা! লিলুয়া কি বিরাটের কারো বাড়ি, লুকিয়ে থেকে চুপি-চুপি সোবিয়েতের বই কেঁদে নিয়েছে দেখগে। মস্কোর মার্ক্স-মারা জিনিষ ক্যাসমেয়ো সহ নয়ন স্মৃতি ধরে দিলেও কতবার আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবেন।

আমাদের এক টাকার ওদের চুরাশি কোপেক। রুবলের (অর্থাৎ এক-শ কোপেক) দাম দাঁড়াল তবে এক টাকা তিন আনার মতো। এই রুবল যেন খোলামকুচি ওদের কাছে। মস্কোর ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে ফুল ফোটে বড় কম। এস্তার কাগজের ফুল বানায় ফুল দেওয়ার নেওয়ার সুখ পাবার জন্য। সুখের ব্যাপারে শোকের ব্যাপারে কাগজের ফুলের ছয়লাপ। আসল গাছের গোলাপ প্রতিটির দাম হল তিন রুবল অর্থাৎ সাড়ে তিন টাকার উপর। কিনতেন? সাধারণ জুতো এক জোড়া দেড়-শ হু-শ রুবলের কম নয়। ওভারকোট হাজার দেড় হাজার। খাবার জিনিষ সস্তা সেই তুলনায়। আলুর সের বারো আনার মতো। রুটির পাউণ্ডও বারো আনা।

দর শুনে আমরা থ হয়ে যাই, আর ওরা কি কাণ্ড করছে কেনা-কাটার জন্য। ক্যামেরা গ্রামোফোন রেকর্ড, ঘড়ির দোকানে কিউ। এক মস্কো শহরেই দশ লক্ষ ঘড়ি কাবার হয়ে গেল এক সপ্তাহে। আরও যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না। গুম অর্থাৎ সর্বস্বত্ব বিপণিকে চুকেছি—রথের মেলার মতো মানুষ ঠেলে পারা যায় না। ছোট ছোট দোকানে চুকে দেখেছি—এমন কি বইয়ের দোকান? যেখানে পাঠ্যপুস্তকের মরশুমটা বাদ দিয়ে লোক জন নাক ডেকে ঘুমায়। অবস্থার ইতর বিশেষ নেই কোনখানে। টাকা পকেটে থেকে যেন সব কামড়ায়, খবচ করে নিশ্চিন্ত হয়।

কেনই বা হবে না বলুন ভবিষ্যতের ভাবনা যখন নেই। হেসে পূলে চাকরিবাকরি অসুখ বিস্ময়, বৃড়ো বয়সের ব্যবস্থা—সকল দায় সরকারের। সাধারণ মানুষ কাজ করবে, খাবে বেড়াবে, আমোদ স্মৃতি করবে—বাস। ফালতু টাকা কিসের দায়ে রাখতে হবে? জিনিষ পত্রের দর বেশি, রোজগারও তেমনি অনেক বেশি। ইস্কুল-মাস্টার মশায়ের কথাই ধরুন। চাকরিতে ঢোকেন আট শ রুবলে; ঐশ-শ রুবল অবধি মাইনে ওঠে। চার ঘণ্টার খাটনি—অল্প ঠিকে পড়িয়ে (প্রাইভেট টাইশানি নয়) উপরি রোজগার হয়। আরও আছে। এদেশে এবং মাস্টার মশায়েরই শুধু আয়, জ্বী, রাঁধা বাড়ি করেন ঘর সংসার দেখেন। এখানে দ্বারও পৃথক আয় আছে। মেয়ে পুরুষ কাজ সকলেরই। শুধু মাত্র কমিকের বেলা নয়, সর্বক্ষেত্রেই। পারিবারিক আয় তা হলে কত বেড়ে গেল বিবেচনা করুন। এক পয়সা সঞ্চয় করবে না, দোকানে দোকানে তাই এমনি মছব।

খানা পিনা অন্তে আজকে আবার ইউনিয়ন অব রাইটসে বাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই একটি মাত্র ইউনিয়ন, যার সভ্য তাবৎ লেখকেরা। রাশিয়া বলে নয়—সোবিয়েতে যতগুলো গণতন্ত্র সর্বশেষের সকল লেখক। বিপুল প্রভাব অতএব। সাহিত্যিক বলতে বা কিছু বোঝেন, সমস্ত ইউনিয়নের তাঁবে। শাখা আছে নানা শহরে। গণতন্ত্রগুলো দরকারে মাসিক নিজ দেশে আলাদা কনফারেন্স করে; তাদের কর্মকর্তাও আলাদা কিন্তু মাথার উপরে আছে ইউনিয়ন।

কাজকর্মের অবধি নেই। বিভিন্ন দপ্তরে সমস্ত ভাগ করা আছে। যতগুলো দপ্তর সোবিয়েত দেশে প্রতিটির জন্য আলাদা এক এক দপ্তর। পৃথিবীর সেরা ভাষা ও সাহিত্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগে জন্য পৃথক দপ্তর আছে। গ্লাভুক ডানিয়েলচুকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সে হল বৈদেশিক দপ্তরের লোক। খাটছে—অগুস্তি লোক একদল ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আছে, চীনা সাহিত্য পরে একদল, ইংলও ফ্রান্স আমেরিকার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা করে আর একদল। আলোচনার বৈঠক বসে প্রায়ই। বিদেশ থেকে বিস্তার বই আসে; কর্মীরা পড়ে শুনে যে সব বইয়ের তারিফ করে, সেগুলোর অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়। কোন কোন বই ছেপে বেতবে, কোনটা বাতিল হবে ইউনিয়নই তার বিচারের মালিক।

বিদেশের লেখকদের দাওয়াত দিয়ে আনি ইউনিয়নের তরফ থেকে। আমাদের লেখকরাও বাহিরে যান। অতিথি পেলে বড় খুশি হই আমরা। শুধু যে বন্ধুরাই আসেন এমন নয়। অনেকে এসে তর্কাতর্কি গালিগালাজ করেন। শেষটা বুঝসময় হয়। পরস্পরের সাহিত্য আরও ভাল করে বোঝা যায় লেখকদের যাতায়াতে সাহিত্যের ঘর বাতে জাতির আত্মার দাবি পাই, মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিবিড়তম হয়।

\* \* \* \*

ইউনিয়ানের বড়কর্তা কেউ হবেন, মুখপাত্র হয়ে যিনি সব বলছেন। বললেন, দেয়ালে পোষ্টার দেখছ ঐ? কংগ্রেস হচ্ছে—লেখকদের কংগ্রেস। অনেক বছর পরে হচ্ছে। ব্যবস্থা লেখক-সমিতির। বিপুল তোড়জোড় চলছে। আমাদের যত গণতন্ত্র, সব জায়গায় লেখকরা কনফারেন্স করছেন আসন্ন কংগ্রেস সম্পর্কে। সোবিয়েতের তাবৎ অঞ্চল থেকে লেখকরা আসবেন। বাইরের বড় বড় অনেক লেখককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

ভারতের কাকে কাকে করলেন?

কিবাণ চন্দর তো আছেনই। আব্বাস এবং আরও কে কে যেন—বাংলার কেউ নেই, নিশ্চিন্ত হলাম। বলি নিমন্ত্রণের লিষ্ট কিভাবে আপনারা ঠিক করেন বলুন দিকি।

সহস্র মেনে না, আমতা-আমতা করছেন: বাঁদের নাম সঙ্গে আছে, সোবিয়েতের মানুষ বাঁদের বই টাই পড়ে তাঁদের কথা থেকে ঠিকঠাক করতে হয়।

সে জানি, গোণাগুণতি কয়েকটা নাম জানা আছে। নাম জানিয়ে রেখেছেন সেই মহাশয়েরা শুধুমাত্র লেখা নয়—শতধিক অল্প ক্রিয়া-কৌশলে। আন্তর্জাতিক বাবতীয় ব্যাপারে ঘুরে ফিরে ডাক আসে তাঁদের।

বাংলা সাহিত্য বলে এক বস্তু ছিল—সত্যি সত্যি কি বিশ্বাস করেন, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ডা-ও লোপ হয়ে গেছে একেবারে?

কোন রকমই সে খবর আসে না, কি করা যাবে?

দোষ আমাদেরই, অন্তের উপর রাগ করে কি করব? রবীন্দ্রনাথের পর আর তো কেউ নজর মেলে বাইরের পানে তাকালাম না—পূর্বের শেষ প্রান্তে নানা সঙ্কট নিয়ে আছি পড়ে খণ্ডিত অবহেলিত একটি জাত। বিদেশের খাতির-আহ্বান এবং টাকটাকা-সিকেটার যে সুযোগ আসে। ভারতের দারপথ বধে এবং ভারতের রাজধানী দিল্লি অচিরে সমস্ত ভাগাভাগি করে নেন।

এই লেখক কংগ্রেসেরই ব্যাপার। ওঁরা একটা নাটক চেয়েছিলেন যাতে ভারতীয় জীবন-চিত্র আছে। নাটকটা কণ্ঠে তর্জনা করে

নিয়ে কংগ্রেসের ধনীজ্ঞানীদের মধ্যে অভিনয় করলেন। এমন-কি ব্যাপার—ভাগনে ছোঁড়া নাটকে হাত মশ্ন করছে,—খবরটা দিলি পৌছানোর ওয়াস্তা—সঙ্গে সঙ্গে নাটক চলে এলো। বাইরের কাকপক্ষী কেউ জানল না। হীরেন মুখার্জি মশায়ের মুখে শোনা, ওঁরা হকচকিয়ে যাচ্ছেন। আমরা চেয়েছিলাম ভারতীয় জীবনের সত্যিকার ছবি থাকবে যে নাটকে। এর ঘটনা! স্থল মস্তো লগুন কিংবা প্যারি হলেও বোমানান হয় না। অথচ এসে গেছে ভারত থেকে। বাস্তব করাও চলবে না। পোড়া বাংলা সাহিত্যে এই এই হাল আমলেও ভাল ভাল দেশি নাটক লেগা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি—জোরদার মাতুল কোথায়, যথাসময়ে যথাস্থানে বস্তুটা বিনি গুঁজে দেবেন?

কৃশ-সাহিত্য সন্দেহে যে কথা আজ অনেকের মনে ঘরে করে তাই উঠে পড়ে।

ইউনিয়ন এত সব ব্যবস্থা করলেন, লেখকদের এখন সচ্ছলতা—কিন্তু ভাল সাহিত্য হচ্ছে কই তেমন?

হচ্ছে বই কি! খবর রাখেন না তেমন আপনারা—

সে তো বটেই। ভিন্ন দেশের পুরোপুরি খবর রাখা সোজা নয়। আগেও তো এই ছিল। তবু সাহিত্য নিজের জোরে বিদেশের ঘরে ঘরে বিদেশির মনে মনে আপন করে নিত। তেমন সব দিকপাল সাহিত্যিকার কোথায় আজকের দিনে?

ভদ্রলোক বললেন, দেশের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা বিবেচনা করুন। বিপ্লবের পর থেকে চলছেই। ঘরের শত্রু বাইরের শত্রু। তারপরে মহাযুদ্ধ গেল বাব ধকল বোল আনা এখনো কাটানো যায়নি, দেখতে পাচ্ছেন! সাহিত্য হল শান্তির ফসল—ক'টা দিন আমরা শান্তিতে থাকতে পেলান বলুন!

আর এক কারণ, লেখকের স্বাধীনতা নেই। ছাঁচে ফেলে সাহিত্য ফলাবার অভিল্যায়।

চমকে ওঠেন তিনি : কে বলল?

আপনিই তো। কোন বই ছাপা হবে না হবে, এখান থেকে ঠিক করে দেন। কেউ অতএব এমন লিখবে না, কর্তাদের বা পছন্দসই নয়। যে কথাগুলো কর্তৃপক্ষ সকলকে শোনাতে চান, তারই সাহিত্য বানানো হচ্ছে। স্বাধীন সহজ সাহিত্য গড়ে উঠছে না।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, এও দেখুন—মিছে বদনাম দিচ্ছেন। কর্তা কেন হতে যাব? আমরাও তো লেখক। ইউনিয়ন লেখকদেরই—সমস্ত লেখক মিলে মিশে গড়েছে। আর এই যদি নিয়ন্ত্রণ বলেন, এ ভিনিষ সকল দেশেই আছে।

আমাদের নেই। আমরা সব-কিছু লিখতে পারি। দেশে ইচ্ছা মতো বই বের করি—কারো পছন্দ-অপছন্দের দার দারি নে।

কিন্তু অপছন্দ হলে ছাপা বই বাজেরাপ্ত হয়ে যায়। পরিশ্রম অর্থব্যয় সমস্ত অকারণ। একই পদ্ধতির রকমফের। পাঠকের কাছে পৌছানো অসুচিত মনে হলে আমাদের ইউনিয়ন আগেভাগে বন্ধ কবে, আপনাদের সরকার বন্ধ করে ছাপা হয়ে যাবার পর। কোনটা ভাল, বিবেচনা করে বলুন এইবার। ছাপানোর পরে, না ছাপানোর আগে?

ক'টা বই বা বাজেরাপ্ত হয় ভারতে? কালে ভদ্রে কথাটিং।

এখানেও ঠিক তাই। বাস্তব পাণ্ডুলিপি নিতান্তই গোণাশুণতি।

শুধু দুটো ব্যাপার আমরা লিখতে দিইনে—লড়াই বাধানো আর ধনতন্ত্রে কিংবা যাওয়া। বাকি সব কিছু লেখা চলে। সমাজ তন্ত্রের নিশা চলবে না, কিন্তু রাষ্ট্রের মাতব্বরদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারো।

বলতে লাগলেন, শত্রুর রটায় আমরা নাকি সমালোচনা চাইনে। ডাঙা মিথ্যা। সমালোচনা ছাড়া এগুলো যায় না, দোষ ত্রুটির শোধন হয় না—একটা শিশুও জানে। এমন কি পাঠকদেরও আমরা ডেকে আনি আচ্ছা রকম সমালোচনা যাতে হয়। পাঠকে লেখকে মিলে মিশে দোষত্রুণের বিচার করেন। লেখক ক্রমশ ত্রুটিশূন্য হয়ে ওঠেন পাঠকদের তাড়নায়। শুধুমাত্র পাঠকরাও কনফারেন্স করে বইয়ের সম্পর্কে মতামত দেন। প্রত্যেকটি লাইব্রেরি ক্লাব কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন এমন কি ইস্কুল কলেজের ভিতরে পাঠক কনফারেন্সের ব্যবস্থা আছে। এই যে কংগ্রেস হবে, ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সবাই তাতে যোগ দেবেন। সারা অঞ্চলের লেখকরা দেখবেন পাবেন, যাদের জন্ত লিখে যাবেন তাঁরা। নিরক্ষরতা নেই বলে বইয়ের বিঘ্ন চাহিদা। সাধারণ বই পনের-বিশ হাজার এক গল্প উপন্যাস হলে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ ছাপা হয় এডিসানে। এত মানুষকে প্রভাবিত করছে, লেখকের কি বিরাট দায়িত্ব বিবেচনা করুন। খামাল অতএব হতেই হবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপির বিচার করি আমরা লেখকরাই, ধুরন্ধর রাজনীতিকরা এর ভিতরে নেই। আমাদের ভুল হলে, উপরে বোর্ড আছে, সেখানে পুনর্বিচার হতে পারে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাত বছরে নতুন বই সাড়ে ন'হাজার বেরিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী হবে—গত বিশ বছরের যাবতীয় বই দেখানো হবে সেখানে। সোবিয়েতের বই ভিন্ন দেশে যত বেরিয়েছে, তা-ও থাকবে। গর্বের 'মা' উনত্রিশটা ভাষায় তর্জমা হয়েছে একশ তিন রকমে। ভুবনপ্রিয় বই আরও অনেক আছে।

কাজ নেই। যথা ইচ্ছা ঘরে বেড়ানো, দোকানে চুঁ মেতে সম্ভব হলে কিছু কেনাকাটা করা। ভোকস আজ রাত্রে বিদ্যোভোজ দিচ্ছেন।

বিস্তর জাঁদরেল ব্যক্তি এসে জমেছেন। আমাদের রাষ্ট্রকে, পি, এস, মেননকেও ডেকেছে। এমন গতিক, মাঝে মাঝে ভুল হয়ে হায় বিদেশ-বির্ভূয়ে আছি আমরা। ভোজের মধ্যে জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে—এর পাশে গিয়ে বসলাম খানিক, চলে এলো আমার পাশে। আছি মাত্র কালকের দিনটা, ত পরে কে কোথায়? কথাবার্তা বেদনায় জড়িয়ে যাচ্ছে—আর নে হবে না হয় তো এ জীবনে! মানুষ বড় ভাল, মানুষে মানুষে তবু নেই—দূরের মানুষ কত সামান্য সময়ে একেবারে আপন হয়ে যায়।

মেনন বক্তৃতায় জমিয়ে তুলেছেন : এই ভারতীয়দের নেনা শুনে লগুনের এক কাগজে লিখল, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে যে জমাচ্ছে ( Russia is wooing India )। আরো বাপু, যে জমানো কি—মিলন তো হয়েই গেছে শান্তির মধ্যে ( They have already been wedded in peace )। কথা কেমন রসিয়ে ব? মেনন, যেখানে যান দিব্যি এক হাসিখুশির আবহাওয়া বানিয়ে তোলে।

বাঙালি ক'জনের কাল রাত্রে বিনয় রায়ের বাড়ি গাও আমাদের বরাদ্দ ভোজ—গুজরাটি ভাষাদের আগেই হয়ে গে

গাউ-খলি থেকে সড় ধরে-আনা জীবিত মৎস্যের ঝোল খাওয়াবেন, বিনয় কথা দিয়েছেন। মন্ডো শহরে শেষ খাওয়া—খানাপিনা সেবে এসে ঐ রাতেই প্লেন ধরবে। ছিমছাম ছোট ফ্লাটে স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা ছেলেটি নিয়ে দিবাি আছেন। অজু বলে ডাকে ছেলেটিকে—এমন মিষ্টি ছেলে! লহমার মধ্যে ভাব জমে গেল। বিস্তর সম্পদ অজুর। মন্ডো শহরে পেলনার একজিবিসন আছে কি না জানতে চান? একজিবিসনে কি দেখবেন, অজুর যা আছে আনতে বলুন না। বলতেও হবে না—বয়ে বয়ে নিজেই জেইদের সামনে জড় করছে। বাজারে যত রকম খেলনা পাওয়া যায় সমস্ত—ওর বাইরে একটাও নেই। বিনয় আর জয়া দেবী দু'জনেরই চাকরি, অহরহ কাজে ব্যস্ত। ছেলে কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে পড়ে—সেখানে থাকতে হয়। শনিবার বিকালে মা-বাপের কাছে আসে, সোমবার ভোরবেলা চলে যায়। বাংলা শেখে বাড়িতে, ইস্কুলে রাশিয়ান। আমাদের সামনে কিছুতে রাশিয়ান বলবে না অজু। সবাই আমরা এতদিনে পাঁচটা দশটা কণ-কথা শিখেছি—সকলে মিলে একটা পুরো প্রশ্ন দাঁড় করানো গেল। আমাদের এত কষ্টের রাশিয়ান প্রশ্ন—হুটু অজু তারও জবাব দিয়ে দিল বাংলায়।

এ ছেলের তাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া চাটি কথা নয়। মোটের উঠে হুঁশ হ'ল দেবি হয়ে গেছে বিবম। জোরে চালাও—বাঁধা ছাঁদা এখনো কিছু বাকি। সেই কাজ সাধা করে হোটেল থেকে একুশি এরোডোম ছুটেতে হবে। সহযাত্রীরা আমাদের না দেখে ইতিমধ্যেই বকাবকি লাগিয়েছেন হয়তো। দোষ দিইনে। মন্ডো এরোডোম, বুঝতে পারছেন, বিশ মাইলের দাখা শহর থেকে! প্লেন ছাড়বে ঠিক সাড়ে বারোটায়। জোরে চালাও গাড়ি, আরও জোরে—

রবি ভাড়াড়ি তিন ঘণ্টার উপর হোটেলে বসে আছেন, চলে যাবার আগে একটুকু দেখা হয় বদি। দেশের মানুষ পেলসে কী যে করেন ওঁরা সব! কথাবার্তার ফুরসৎ নেই—তিনিই লেগে পড়ে স্ট্রাটকেসে মালপত্র ঠেসে টানাটানি করে সেগুলো বাইরে এনে ফেললেন। আরও কত জনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আছি, মন খুলে হুটো কথা বলতে পারলাম না যাবার বেলা। এরোডোম অবশি চলল জনকয়েক, প্লেনে বসনা করে দিয়ে ফিরে আসবে।

কী কাণ্ড! বারোটো বেজে গেছে, সাড়ে বারো হয়ে এলো—বসেই আছি, প্লেনের কর্তাদের সাড়া শব্দ নেই। পল ঘুরে এসে বলল, থাক বসে যেমন আছে : দেবি হবে। একটা বেজে গেল, ওরা বোধ হয় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছে। দেখে এসো তো ভাই আর একবার!

পল আবার উঠল। অনেকক্ষণ দেবি করে এসে বলে, ওঠো—হুগাঁ হুগাঁ!

পল বলে, ওদিকে নয়—হোটেলে ফিরতে হবে। আবহাওয়া খারাপ, রাতে প্লেন ছাড়বে না।

রাত ঝিমঝিম করছে। হুর্ভোগটা ভাবুন একবার হাড়-কাঁপানো শীতে আবার এখন সেই বিপদ নাইল। রাস্তার কদাচিৎ একটা হুটো গাড়ি, দু'জন একজন মানুষ।

হোটেলে জোরালো আলোগুলো প্রায় সব নেভানো। করিডরে এখানে একটা ওখানে একটা—কায়ক্লেশে পথ খুঁজ চলা যায়। নিশুতি হয়ে গেছে। দোতলার অফিস ঘরে মেট্রন মেয়েটা দেখছি ফাইল ও খাতাপত্রের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে কাজ করছে।

এতগুলো জুতোর আওয়াজে চমকে মুখ তোলো। দেখে হেসে ফেলল : এ কি, তোমরা যে আবার?

সকালবেলা যাব। আবহাওয়া ভাল হলে খবর পাঠাবে।

মুশকিলে ফেললে। কি করি এখন বলো দিকি—

মুসকিল সামলাবার জগ্ন হাসিমুখেই ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আমাদের বিছানাপত্রে তুলে দিয়েছে এর মধ্যে। সকালবেলা ঘরগুলো ভাল করে ধুয়ে বীজাণু মুক্ত করে নতুন বিছানা পাতবে নব আগন্তুকদের জগ্ন। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কোথায় মানুষ জন, কোথায় কি, ডেকে তোল সকলকে—যেমন যেমন ছিল, ঠিক করে দিক।

ভোর বেলা উঠতে হবে—রাতের আর কতটুকুই বা আছে?—উদ্বিগ্নে ঘুম হল না। সাড়ে ছটায় পোশাক পরে তৈরি। সাতটায় ঘর থেকে বেরিয়ে পাক দিয়ে এলাম এদিক-সেদিক। মানুষজন দেখি না, অন্ধকার থম থম করছে। আটটার সময় হৈ-হৈ পড়ল—খবর এসে গেছে, ব্রেক ফাষ্ট গেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। প্লেন ছাড়ল এবারে সত্যি। বেলা দশটা—কিন্তু আকাশ অন্ধকার, কুয়াশায় ঢাকা এই তো দম্বর এখানকার। কাল হুপুরবেলাটা উজ্জ্বল রোদ দেখেছিলাম এক বলক। আরও একটা দিন, মনে পড়ছে। এত দিন কাটিয়েছি মন্ডোর, তার মধ্যে মোটামুটি এই দুই দিন।

## ২৯

যে-পথে এসেছিলাম, সেই পুরানো পথ ধরেই বাড়ি যাচ্ছি। হুপুরের পানি আখচুবিনক্ষে। রাতটা তাসথন্দে কাটাব। কাল দিনমানে সীমান্তের তেরমেস হয়ে কাবুল। ফিরছিও হুটো দল হয়ে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে প্লেন পরের ক্ষেপে এসে পিছনের দল নেবে।

আখচুবিনক্ষে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াই। বৃষ্টি-বাদলা হয়ে গেছে খুব, কাঁচা গ্যাংয়ে জল-কাদায় ভর্তি। ওর মধ্যে নামি কোথায়? ওরাও বলছে, রশ্তন—রশ্তন—। বাস এসে দাঁড়াল প্লেনের দরজার গায়ে—সিঁড়ি থেকে বাসের গহ্বরে। অফিস-বাড়ি আধ মাইলের উপর এই জায়গা থেকে। কাদা-জল ছিটাতে ছিটাতে বাস সেখানে পৌছে দিল। এবা খানাপিনা অস্ত্রে ফিরিয়ে আনল প্লেনে।

এই শুধু নয়, মজা আছে আরও। যথারীতি দরজা এঁটে দিয়ে প্লেন তো ছাড়ল। দৌড়ছে ভীর বেগে—এমনি দৌড়তে দৌড়তে হুশ করে উঠে পড়বে তো আকাশে। কিন্তু খানিকটা গিয়ে আর এগোয় না। এমন তো ভাবার কথা নয়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। দেখবার কি আছে—চতুর্দিকে কাদা-জল, আমাদের গায়ে বিলের ধানক্ষেতে আঘাট মাসে চাষ দিয়ে যে রকমটা করে রাখে। ইঞ্জিন তার পরে হঠাৎ বন্ধ করে দিল। নিঃশব্দ। গতিক কিছু বুঝতে পারি নে—আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাই। পাটলট খোপ থেকে বেরিয়ে এলো।

কি হল মশাই?

কানায় চাকা বসে গেছে।

পাড়াগায়ে গরুর গাড়ির চাকা এমনি বসে যায় কানায় মধ্যে। গাড়োয়ান ও চড়ন্দারেরা, এবা কখনো বা পাশের ভূইক্ষেতের চাষীদের ডেকে সকলে মিলে ঠেলাঠেলি করে তুলে দেয়। চাকা মারা বলে এই প্রণালীকে। কাছাকিস্তানে প্রান্তরের কাদায় নেনে, দেখুন বা, আমাদেরও চাকা মাঝে মাঝে বলে।

দরজা খুলে পাইলট ও অস্ত্র অফিসারেরা টপাটপ লাকিয়ে পড়ে অফিসঘরের দিকে গেল। তার পরে দেখি, বিস্তর লোক মিলে বড় বড় দুই লোহার পাত বয়ে আনছে। চাকার ঠিক সামনে কাদার উপরে সেই পাত দুটো পেতে দিল। পাইলটেরা উঠে এসে আবার কাঁট দিয়েছে। প্রপেলার ঘুরছে দ্রুত বেগে, ঘোরতর আওয়াজ করছে। অবশেষে নড়ল প্লেন; কাদা থেকে চাকা বেরিয়ে লোহার উপরে উঠল। আর কি—বেশি কাদার জায়গাটা পার হয়ে এসে, ছুটে ছুটে উপরে উঠে পড়ল। তবে তো বোঝা যাচ্ছে, হামেশাই এই কাণ্ড ঘটে তোমাদের এখানে। নয় তো প্রকাণ্ড লোহার পাত এরোডোমে এনে মজুত রেখেছে কি জ্ঞান ?

মস্কো থেকে তাসখন্দ বারো ঘণ্টার পথ। দুই জায়গায় সময়ের ফারাক তিন ঘণ্টা। একটা রাতে ঠিক হিসাব মতোই তাসখন্দে নেমেছি জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটেছে, যেন দিনমান। দিগ্‌ব্যাপ্ত মার্শের উপর ছড়িয়ে পড়া এমন পরিষ্কার জ্যোৎস্না কতদিন দেখিনি! অনেকবারের আসা যাওয়ায় জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে, মাতব্বর বাঁরা অভ্যর্থনায় আসেন তাঁদের নাম অবধি বলতে পারি। আজকে এসেছেন জন চারেক মাত্র। বলছেন, এরোডোমের রেস্টোরাঁর ব্যবস্থা আছে বামেলা আগে চুকিয়ে নিন।

সে ভাল। শহরে পৌঁছে ডিনারে বসতে বসতে রাত পুইয়ে যেত। কিন্তু বাইরে এসে দেখি, গাড়ি একটাও নেই। মতলব কি গো? জামাইয়ের সেই গল্প। বিস্তর দিন শব্দরবাক্তি পড়ে থাকায় ধনঞ্জয়কে শেখটা পিটুনি খেয়ে সরতে হল। আমাদের সেই গতিক। ভরা পেটে এখন পায়ে হাঁটাতে নাকি অতদূরের শহর অবধি ?

না, জায়গা এবার এখানেই—এরোডোমের একেবারে কাছে, রাস্তাটা পার হয়ে গিয়েছি। অসমাপ্ত বাড়ি, রাস্তার পূর্গার লাকিয়ে উঠানে পৌঁছতে হয়। দালানে ঢালাও বিছানা করেছে, পাটগায়ের বিয়েবাড়ি বরষাঙ্গারের জ্ঞান যেমন করে। বাকগে, একটা রান্না মোটে—ক-ঘণ্টাই বা আছে এই রাত্রির।

এখনো কিছু রুবেল আছে ট্যাকে। সোমানা পার হয়ে গেলেই ক্রবলের নোটগুলো পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া কি কাজে আসবে। অতএব প্রথম প্রান্তঃকৃত্য, যে বস্ত্র চোখের সামনে পড়বে কিনে ফেলে ট্যাক খালি করা। দোকানের-খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ঐ শহর অবধি গিয়েছি। গাড়ি নিয়ে ছুটেছে সেই অবধি। কী কাণ্ড, প্লেনে ঢুকতে হবে এখনই। শীতকাল এসে পড়েছে, হিন্দুকুশ বেলাবেলি পাড়ি দিতে হবে। তেরমেস রীতিরকার মতে একটুখানি আম্বুদরিয়ায় এসেছি। বিদায় মোবিয়েত ভূমি! অন্ধকার পাতাল নয়, দিবাধার স্বর্গও নয়—আমার আপনার মতোই মাহুবেরা হাসি অশ্রুর লক্ষকোটি সসার করছে, বড় আপন করে পেয়েছি তাদের। বিদায়, বিদায়!

কাবুল। ক্রাবুল হোটেলের নতুন ব্লক খুলে দিয়েছে, এবারে জায়গায় অমুবিধা হল না। গুপ্ত মুখ্জেরা আছেন বহাল তব্বিতে অতএব আড্ডা দিই, নিমন্ত্রণ খাই এবং অ্যাধাসির জীপে ঘোরাঘুরি করি। পরের দিন দিল্লির প্লেন ছাড়বার দিন নয়। উত্তম, বাবুর বাসা দেখে আসা গেল। প্রশস্ত দুই চেনার গাছ সিংহাসনের মতন।

উপরে উঠে যেতে হয়। স্রাড়া পাহাড়ের নিচে সম্রাট বাবুরের কবরখানা—টালি ছাওয়া ছাউন, সস্তা চুনকাম করা দেয়াল। অদূরে পুরানো কেল্লার চিহ্ন। খেত পাথরে নতুন মসজিদ বানাচ্ছে পাশে।

তার পরের দিনও যাবে না প্লেন। আবহাওয়া খারাপ। উত্তম। নেতাজি কোথায় এসে লুকিয়ে ছিলেন, জায়গাটা তবে দেখে আসি। বাজার—ভারতীয়দের বিস্তর দোকানপাট। তারপরে এক ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢুকেছি। গলির মাথায় সর্কীর্ণ এক বাড়ি দেখিয়ে দিল। রণচক্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলবেন, ঐখানে থেকে তার আয়োজন হচ্ছিল।

তার পরের দিন লটবহর নিয়ে এরোডোমে হাজির হয়েছি। বলে, ফিরে চলে যান। সুলেমান রেজ পথ ছাড়ে নি এখনো। অতি উত্তম। ক্যামেরা ও ঘড়ি এখানে অনেক সস্তা ভারতের মতো কড়া ডিউটি নেই বলে। বাজার হুঁড়ে পছন্দ করা ঝাক। কিন্তু ঘরমুখো মন এখন—সহযাত্রী অনেকে ছফার ছাড়লেন সুলেমানের যতক্ষণ না ভাল খবর আসে—রইলাম এইখানে চেপে বসে। তা সে দিন হোক, মাস হোক, চাই কি বছর হোক পুরো। হোটেলের আর ফিরছি।

ঘণ্টা দুয়েক বিচার-বিবেচনার পর হুকুম এলো : ঢুকে পড় তাহলে প্লেনে।

উত্তম কথা। দেখা যাক সেই অবধি গিয়ে। না হয় ফিরে আসব। হোটেল আর যাচ্ছে কোথা ?

ছোট এক কোঁটা আমাদের প্লেন। আকাশব্যাপ্ত সুলেমান অদৃশ্য মুঠোর ভিতর নিয়ে উপরে-নিচে ডাইনে-বামে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখছে, কোন সব চিহ্ন রয়েছে এই কোঁটার ভিতর। ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তার পর ? কোঁতুহলের অবসানে মুচড়ে হুমড়ে ছুঁড়ে দেবে কোন তুবার শ্বশ্বে ? আমাদের চিহ্ন মাত্র রইল না, এবং তৎসহ খাতা ভরতি এই যত আশ্রু নিয়ে বাচ্ছি পাঠককুল বিমর্দনের জ্ঞান।

কিন্তু কিছুই হয়নি, সে তো টের পাচ্ছেন। কিন্তু কিন্তু শর নৈকম্প করে নাজেহাল করেছে আপনাদের। সফাদর জং এরোডোমে উপর থেকে সভরে দেখছি—ডুয়ুল হৈ-হল্লা, দাস্তা বেধেছে সম্ভবত কোন-কিছু ব্যাপার নিয়ে। দরজা খুলে মালুম হল, অভ্যর্থনায় জ্ঞান এসেছেন। ভাই ব্রাদার সব দল জুটিয়ে এসেছেন, নানান সমিতি থেকেও এসেছে। গর মধ্যে আমার চেনা কেউ নেই বটে, কিন্তু সমিতির ভো ছাড়বে না, তারা পাইকারি হারে মালা দেবে। বেঁটে মাহুব দলপতিক নিয়ে ইতিমধ্যেই এমন ব্যস্ত—স্বপীকৃত মালার থেকে নিচে জুতো স্নান এক জোড়া পা বেরিয়েছে, বোঝার ক্রান্তিতে পা দুটো গুটিগুটি এগুচ্ছে। সেনাপতি যেন দিখিয়ে বেরিয়েছিলেন—কাবুল থেকে মেকসাগর অবধি বিজয় করে ফিরলেন। অথচ জানেন আপনারা, জুতোর তলার ধুলো মাটিও লাগতে দেয় নি ওরা। কোন বাহাদুরির ফলে মাগ্যতান, বুকতে পারি না। এক মহিলা নামলেন; তিনি দিল্লিরই—রক্ষে নেই, তোড়া ও মালা উঁচিয়ে চতুর্দিক থেকে রে-রে করে ছুটেছে। টুক করে আমি লাইন ছেড়ে জনতার ভিতরে ঢুকে গেলাম—প্লেনে আসি নি, সন্দর্ভনার দলের যেন আমি। তার পরে কাক বুকে আরও কিছু শিখিয়ে কাকটমসের আঙগড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

# চারুজন

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

[ বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন-বিশারদ ]

“আমার মনে হয় যে ছন্দাঙ্গ কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা তাল-লয় মিশ্রিত সঙ্গীত-মুচ্ছনার সহিত যেথাকিত শিল্পকলার যেন গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে—বর্ষণ-মুখর এক সন্ধ্যায় তাঁহার নিহৃত প্রকোষ্ঠে আমায় জানালেন ভারতের অগ্রতম শক্তিমান চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

ঢাকা জিলা বিক্রমপুর পরগণা নিবাসী শ্রীবসু ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের সৌন্দর্য্যবোধ ও চিত্রকলাভ্রুগ এবং স্নেহময়ী জননীর উৎসাহ পাঠরত বালকের মনে রেগাঙ্কনে প্রেরণা দেয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ হইতে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্তি হন। এক বৎসর পরে উচ্চ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৯১৩ সালে রণদাচরণ গুপ্তের জুবিলী আর্ট একাডেমীতে প্রবেশ করেন। শ্রীবসু মনে করেন যে তাঁহার পরলোকগতা মাতার অদৃশ্য আশীর্বাদে ক্ষুদ্র বোধ হয় তাঁহার এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯১৬ সালে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে চলিয়া আসেন এবং শিল্পকলা অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বনামধন্য শিল্পী ঙ্গামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন এবং ১৯১৮ সালে গ্রাজুয়েট পদবী প্রাপ্ত হন। এই সময় শ্রীতেমেন্দ্র মজুমদার, যোগেশ শীল, সত্যীশ সিংহ, যামিনী রায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি আর্ট স্কুলে প্রথম একটি বাহ্যিক-চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং ১৯২১ সালে ৩৬বানীচরণ লাল, তার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও অধ্যক্ষ পাশি ব্রাউনের সহায়তায় উহাকে তিনি “সোসাইটি অব ফাইন আর্টস” সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী-সভ্যে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৩ সালে শ্রী বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার তার আন্তত্বের মুখোপাধ্যায় উক্ত সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে বিদেশী দর্শকদের প্রগাঢ় অমুগাণ ও ভারতীয় দর্শকদের নির্লিপ্ততা তার আন্তত্বের মনকে অতিশয় ব্যথিত করে ও অতুলচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন।

শ্রী বসুর অঙ্কনে ও সংগঠনে সঙ্গঠ হইয়া ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সর্বপ্রথম “গুরুপ্রসন্ন ঘোষ” বৃত্তি দেন এবং উহা দ্বারা তিনি লণ্ডন য়য়েল একাডেমীতে দুই বৎসর (১৯২৪—২৬) শিক্ষালাভ করেন। অবসর সময়ে তিনি ইউরোপের প্রসিদ্ধ চিত্রশালা সমূহ পরিদর্শন করেন।

ভারতে ফিরিয়া অতুলচন্দ্র কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে

যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে ভারত সরকারের সুপারিশ ক্রমে লণ্ডনে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও কুইন মেরীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের জ্ঞান প্রেরিত হন। পরবৎসর দেশে ফিরিয়া লুপ্ত ফাইন আর্টস সোসাইটি পুনরুদ্ধারের জ্ঞান বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ১৯৩৩ সালে মহারাজা তার প্রজ্ঞোৎকৃষ্ট ঠাকুর প্রভৃতির সহায়তায় গ্র্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্বোধন করেন। এই সময় তিনি নিজস্ব চিত্রশালায় অঙ্কনে রত থাকেন এবং “তিব্বতী মেয়ে” “সন্ন্যাসী” এবং ছোট ছোট প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রগুলি জনসমাদর লাভ করে। প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁহার পারদর্শিতা বহুজন-স্বীকৃত। তন্মধ্যে তার আন্তত্বের মুখোপাধ্যায়ের “বেঙ্গল টাইগার” নামে প্রতিকৃতি আজ সর্বজনবিদিত। কিছুকাল যাবৎ তিনি লোকসভা ও রাজ্য বিধান-সভার জ্ঞান চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিকৃতি অঙ্কনে ব্যাপ্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ময়ূবজ্জ মহারাজা ও মতিবাবল রাজার জ্ঞান অনেকগুলি চিত্রাঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত “শতবাধিকী (১৮৫৭—১৯৫৭)” ও “বাসীর রাণী” ডাকটিকিট দ্বয়ের চিত্র তাঁহারই পরিকল্পিত।

আমার প্রশ্নের উত্তরে অতুলচন্দ্র বলেন যে, স্থিতিভাণ্ডারের রূপসায়র হইতে চয়ন করিয়া যে অঙ্কন প্রধানতঃ তাহাই প্রাচ্য-দেশীয় পরোক্ষধর্মী চিত্রকলা এবং ইহার মধ্যে আসেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় প্রভৃতি—তার সৌম্যবন্ধ পরিধি, দৃষ্টস্থান, কাল ও নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মরুমূর্ত্তগুলিকে অমর করিয়া রাখার জ্ঞান যে রূপায়ণ উহাই মুখ্যতঃ পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষধর্মী চিত্রাঙ্কন। ইহার মধ্যে পড়েন সত্যীশ সিংহ, বসন্ত গাঙ্গুলী,



শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু



মাখন দত্তগুপ্ত, জয়মল আবেদীন প্রভৃতি। তাঁহার গুরুজন, বন্ধুজন ও গুণিজ্ঞান তাঁহাকে বঙ্গতাত্ত্বিক শিল্পী আখ্যা দিলেও একাগ্র সাধনায় তিনি উচ্চাৰ মৰ্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

কথা প্রসঙ্গে তিনি শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর বহুমুখী কর্মপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার সহধর্মিণীর সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাধীনতার দশম বার্ষিক উৎসবে সম্প্রতি (১৯৫৭) প্রাদেশিক কংগ্রেস অতুলচন্দ্রকে এক বিশেষ সভায় সম্বর্ধনা করেন।

### অধ্যাপক ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার

[ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ]

রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় যে স্বল্প কয়েক জন বাঙালী ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে বিজ্ঞান-জগতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন,—অধ্যাপক ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার তাঁদের অন্যতম। বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছে—এখনও তিনি পরিপূর্ণ ভাবে কর্মময় জীবন যাপন করছেন। বিজ্ঞান কলেজে যান,—দৌতলার রসায়ন বিভাগের পাশের বারান্দায় প্রায়ই দেখতে পাবেন এই প্রধান অধ্যাপককে।—মুখে সর্বদাই সিগারেট, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করছেন বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান-জগতের কর্মধারার আর অনর্গল ধূমপান করছেন। অনেক দিন আগে তাঁর এই ধূমপান করা নিয়ে একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। অধ্যাপক সরকার, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র,—আচার্য্য রায় ধূমপান করা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। অধ্যাপক সরকার তখন প্যারিস থেকে ফিরেছেন,—অত্যন্ত ধূমপান করেন, কি করে যেন কথাটা আচার্য্যদেবের কানে গিয়ে পৌঁছলো। আচার্য্যদেব তো বিশ্বাসই করেন না,—“নাঃ এ হতেই পারে না।

পুলিন আমার ভারী ভালো ছেলে—সে সিগারেট খেতেই পারে না।” যাই হোক, কত দিন গুজব অবিখ্যাস করা যায়? একদিন দুপুরবেলা আচার্য্যদেব নিজেই হঠাৎ এলেন অধ্যাপক সরকারের ঘরে, দেখা বাক ছেলেটা করছে কি? এদিকে তখন ডক্টর সরকার সবেমাত্র একটা চুরুট ধরিয়ে মনের আনন্দে ধোঁয়া ছেড়েছেন,—হঠাৎ সামনে দেখেন আচার্য্যদেব। কোন

রকমে চুরুট ফেলে, নিবিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠেন। আচার্য্যদেব তো রেগেই আছেন,—“ছেলেদের সাহেবীয়া না শেখা হয়েছে। ধোঁয়াই যদি গিলতে চাও—বিড়ি খেতে পার না? দেশের পরমা দেশে থাকে।” অধ্যাপক সরকার তখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

অধ্যাপক সরকার ১৮৯৫ সালের ২২শে নবেম্বর কোলকাতায় তাঁর দাদামশায়ের ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাস সোনারপুরে—ঠাকুরদা ছিলেন জমিদার। পিতা ঊষস্তুকুমার সরকার ছিলেন আইনব্যবসায়ী। আইনব্যবসা করতেন তমলুকে;—তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও অগ্নাশ্রম জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তাঁর বাবা স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। মা—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এখনও তমলুকে বাস করছেন—বয়স তাঁর ৮২ বৎসর।

অধ্যাপক সরকার বাল্যাশিক্ষা লাভ করেন তমলুক হামিল্টন স্কুলে। ১৯০৯ সালে শেখ এন্ট্রিস পরীক্ষায় পাশ করে পনের টাকা জলপানি লাভ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বোস, জ্ঞান মুখার্জী আর জ্ঞান ঘোষ। জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, মেঘনাদ সাহা আর ডাঃ সরকার এক মেসে এবং হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে বহুদিন বাস করেছিলেন। কিছুদিন ডাঃ সাহা আর ডাঃ সরকার এক ঘরে বাস করতেন। কলেজ-জীবনে অধ্যাপক সরকার ছিলেন একজন বড় স্পোর্টসম্যান। Y. M. C. A. এর স্পোর্টসে সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানও তিনি একবার লাভ করেছিলেন। বিকেলবেলা ফুটবল খেলে, তাবপর ব্যায়াম করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেই রাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন,—রাতে প্রায়ই খাওয়া আর তাঁর হতো না। বন্ধু-বান্ধবরাও কেউ ডাকতে যেত না—দারপ ঘুমের ঘোরে তিনি বড় হাত-পা ছুঁড়তেন, তাতে সকলেই বিরক্ত হতো।

অধ্যাপক সরকারের ভাষায়—“কেবল মেঘনাদই আমাকে জোর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। ডাকতে এসে সে কত দিনই কিল-বুঁসি খেয়েছে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। আবার মেঘনাদও আমায় কম আলাতন করে নি। ও ঘুম থেকে উঠতো খুব ভোরে—তার পর চিংকার করে এক ঘণ্টা জাগ্রাণ ভাষা পড়তো। ওঃ, সে কি কষ্ট,—কিছুতেই আমি ঘুমোতে পারতাম না। রাগ করে মাঝে মাঝে উঠে জোর করে আলো নিবিয়ে দিতাম।” ১৯১৩ সালে বি, এস-সি, রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ পাশ করে তিনি এম, এস-সি ক্লাসে যোগ দেন এবং ১৯১৬ সালে এম, এস-সি পাশ করেন। অন্তস্থ থাকায় এক বছর তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পাশ করার পরেই ১৯১৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯১৭ থেকে ১৯৫৭ এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি অধ্যাপক হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ গ্রহণ করে ফ্রান্স বাত্রা করেন। সেখানে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রির গবেষণাগারে অধ্যাপক উরবার অধীনে গবেষণা করে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ফ্রান্সের গ্রেট ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী,



পুলিনবিহারী সরকার

এর সম্মান খুবই বেশী। অধ্যাপক উরবার গবেষণাগারে তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গ্যাডোলিনিয়াম আর ইউরোপিয়াম এই দুই মৌলিকের প্রতিনির্গত। এই মৌলিক ধাতুদ্বয় খুবই হুম্মাশ্য, —অধ্যাপক উরবার গবেষণাগারে গ্যাডোলিনিয়াম মাত্র ৮ গ্রাম ছিল। এতো কম বস্তু নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। অধ্যাপক সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এটো কাজ সম্পন্ন করেন এবং ৩০৮-টি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করার পর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ গ্যাডোলিনিয়াম পুনরায় পরিশুদ্ধ করে বিশুদ্ধ মৌলিক ধাতুটি অধ্যাপক উরবারকে ফেরত দেন। অধ্যাপক উরবার তাঁর এই কৃতিত্বের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

ক্লাস থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে এসে তিনি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোম্ব-অধ্যাপক এবং ১৯৫২ সালে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। গবেষণামূলক শতাধিক প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে অধ্যাপক সরকারের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

অধ্যাপক সরকার বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান অকুশল সমিতির আজীবন সদস্য ও ক্রাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের সভ্য। ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতির আসনও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও ছাত্রবৎসল। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত, —ছুটিতে প্রায়ই সব কাজ ফেলে তিনি তমলুকে চলে যান, বুঝা মার কাছে কয়েক দিন কাটাবার ক্ষমতা। তমলুকেরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত। এই সলানন্দময় বৈজ্ঞানিক দীর্ঘজীবন সাত করে ভারতবর্ষের রসায়ন-বিজ্ঞানের শিক্ষাধারা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধতর করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

### শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

[ খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার ও প্রসিদ্ধ জনসেবক ]

সুনিপুণ তর্ককুশলতা, স্মৃতিস্তম্ভ মেধা, স্থির যুক্তি সম্বল করে যে সকল ধুরন্ধর আইনবিদরা পথের প্রান্তভাগে পৌঁছে হাসিমুখে করমর্দন করেছেন খ্যাতির সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে বিনা আয়াসেই আমরা নাম উল্লেখ করতে পারি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের। আইনে স্পৃহা তাঁর পৈত্রিক। পিতৃদেব স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন একজন য্যাটর্নী, তা ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রধান কর্ম-সচিবের ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির একজন সভ্যের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। ভারতের আইন-জগতের একজন বরগীর সম্ভান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য পরলোকগত ডাঃ শ্রী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নাম কারোরই অজানা নয়। শঙ্করপ্রসাদ এঁর দৌহিত্র। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শঙ্করপ্রসাদের জন্ম। প্রথমে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ পরে হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৪ সালে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই-এস-সি করলেন পাশ (১৯৩৮) ফিশ (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ) থেকে বি-এ। তারপর বিলাত

যাত্রা। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটি কলেজে ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হলেন শঙ্করপ্রসাদ। ল-ট্রাইপস নিয়ে বি-এ পাশ করলেন। বিলেতের ছাত্রজীবন শঙ্করপ্রসাদের নানা কৃতিত্বের সমুচ্ছল। সেখানে নানা সংকর্মে বাঙালীর তথা ভারতের স্বাধীনতা উচ্ছল থেকে উচ্ছলতর করে এসেছেন। শুধু মাত্র গিরে তথাকথিত ভালো ছেলেদের মত গ্রন্থ অধ্যয়নের মধ্যেই তিনি নিজেকে সেখানে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, সেদিনকার নিজের ভারতীয় সর্বভাষা মিলিয়ে দিয়েছেন উদ্ভাসের সঙ্গে। কেবল জে অক্সফোর্ড আন্তর্জাতিক ছাত্র-কংগ্রেসে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩১), লণ্ডনের স্বরাজ হাউসের ও গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় ছাত্রসংস্থার ইনি ছিলেন প্রধান কর্ম-নির্বাহক, ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির ছিলেন একজন সভ্য, কেমব্রিজের মজলিসের ইনি ছিলেন সভাপতি, গ্রাসগো (১৯৪২) ও নিউকাসল-অন-টাইন (১৯৪৩) এ অক্সফোর্ড ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শঙ্করপ্রসাদ। নানাবিধ অপকর্ম করে বড়লাট পদ থেকে লর্ড লিনলিথগো অবসর গ্রহণ করে এখান থেকে ফিরে গেলে সেখানে ডিক্টোরিয়া ফোর্সনে ভারতীয় ছাত্ররা তাঁকে যে কুৎসাতাকা প্রদর্শন করে, তাদের মধ্যে ইনিও ছিলেন অন্ততম। বার্মিংহামেও তারক-সচিব কুখ্যাত এমারির অপকীর্তির জন্তে এঁদেরই প্রচেষ্টার এক বিরাট প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। বেরালিশের আন্দোলন সমর্থন মানসে শঙ্করপ্রসাদের কৃতিত্ব বিস্তারিত। বিশ্ববরো রাজনীতিক জীকুস মেননের সঙ্গে ইণ্ডিয়া লীগে ইনি কাজ করে এসেছেন। লিঙ্কন ইন থেকে ১৯৪৩ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন ও ভারতে ফিরে আসেন ১৯৪৪ সালে। ব্যারিস্টারী শুরু করেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে আই-এন-এ আন্দোলনে যে বিরাট ছাত্রদল গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন



শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

ব্যারিষ্টার শঙ্করপ্রসাদ। বঙ্গবাসী কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও ইনি অধ্যাপনা করেছেন।

বঙ্গবাসী কলেজের বাণিজ্য-শিক্ষার্থী সম্ভার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজ সম্ভার সভাপতি এবং আইন-কলেজ পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের পদও গ্রহণ করা অলঙ্কৃত হয়েছিল। পরলোকগত বিশিষ্ট বিচারী বঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি থাকা কালে ইনি মধ্য কলকাতার জেলা কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর সহকারিত্ব করেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর নাম যুক্ত। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার একজন সদস্যরূপে গণা হন। সাম্প্রতিক দলের সভা হয়ে নব্বাটান পরিদর্শন করেন (১৯৫৪), পশ্চিমবঙ্গের বিচার, শাসন, ভূমি সঞ্চার ও আইনবিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন (জুন ১৯৫৬)। মন্ত্রী শঙ্করপ্রসাদের কর্মসমূহ, জনহিতকর প্রচেষ্টা, অনমনীয় কর্মোজম, যেমনটি প্রশংসার্য, তেমনই গৌরবমণ্ডিত। একজন মন্ত্রী যে মানুষেরই প্রতিনিধি এই মহোদয় মর্যাদাপূর্ণ করেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ এবং তাঁর মর্যাদা নিজেও বিস্ময়ের কারণে বোধ করেন নি। মন্ত্রী থাকাকালীন সরকার পক্ষে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উদ্যোগে নানা স্থানে পরে স্থনীতি দমনের প্রচেষ্টা তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। কাংক্ষান-শূণ্য সরকার গণন বঙ্গ-বিভাগ সংযুক্তির জন্য উঠ-পড়ে লেগেছিলেন কংগ্রেসী শঙ্করপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়েছিলেন সেই প্রচেষ্টায়। রাজ্য পুনর্গঠনের প্রসঙ্গ, বঙ্গ-বিভাগ সংযুক্তির প্রস্তাবে, ট্রান্স আন্দোলন ও শিক্ষক পদবী, ভূমি সঞ্চার আইনে যে পরিবর্তন তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা সগজনিবন্ধিত। এত আর্থীয়েষী, যা চিত্র পুরা মন্ত্রী, তিন পোয়া মন্ত্রী ও আধাসেরী মন্ত্রী দলে তিনিই ছিলেন একমাত্র জন, যিনি সচিব দেশ ও দেশের জগতে ভেবেছিলেন কিছু করেছিলেন ও কিছু এবং করতে চেয়েছিলেন আরও কিছু, তিনিই একমাত্র জন যার নেতৃত্ব বাংলায় অন্যায়ের মেনে নিতে পারত এবং তাতে সফলত ফসত এ কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা যায়। প্রার্থনা কবি, তাঁর আরও কাজ সম্পূর্ণ করতে আবার একদিন তাঁর আবির্ভাব হবে তাঁর যথার্থোগ্য স্থানে, তাঁর আসন আজ শূন্যই আছে, তিনিই আবার তা একদিন করবেন পূর্ণ।

বাস্তবিক জীবনে শঙ্করপ্রসাদ বিবাহ করেছেন ভারতের এক ধুরন্ধর আইনজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ফাউন্ডেশন জেনারেল স্তার ক্রীষ্ণাঃমোহন বসুর একমাত্র কন্যাকে। তিনি সীমন্তী অলকা মিত্র। আমার প্রশ্ন, আইনজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা সাধ করতে গেলে কি বিশেষ গুণ থাকার প্রয়োজন—উত্তর দেন—পরীক্ষার জগৎ সব সময় প্রস্তুত হবে, একবার মক্কেলের কাছে আবার বিচারকের কাছে, এই পরীক্ষা দেওয়া দৈনন্দিন ব্যাপার। আর বিশেষ ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে দক্ষতা থাকা দরকার, যেমন সাহিত্যে, মনোভেদে, বিজ্ঞানে, যন্ত্র-বিজ্ঞানে, শিল্পে। কারণ এই জাতীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে যদি মামলা উপস্থাপিত হয় আর আপনি সে বিষয়ে যদি অনভিজ্ঞ হন তা হলে লড়বেনই বা কেমন করে আর জেরা করবেনই বা কি করে? জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর আইনের দরবারে ভারতের স্থান কোথায়? আয়ত দৃষ্টি মেলে ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—সর্বোচ্চ, তারপর

বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—আর কেন তা জানেন—তাঁর প্রধান কারণ বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্গত বলেই—হিমালয়কে অতিক্রম করে আজ অবধি যেমন কোন পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি, তেমনই সারা বিশ্বে এমন কোন আইনশাস্ত্র যে শ্রেষ্ঠতায় এ বিষয়ে কলকাতাকে অতিক্রম করে গেছে।

### শ্রীরণদেব চৌধুরী

[ সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিষ্টার ]

পাবনা জেলার হরিপুরের চৌধুরীগোষ্ঠীর খ্যাতি বহুদূর-বিস্তৃত।

এই কালের দুর্গাদাস চৌধুরী-স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি বহুমুখের সমসাময়িক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দুর্গাদাসের সম্ভান-সৌভাগ্য অতুলনীয়। তাঁহার সাতটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। ইহাদের সকলেই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। দুর্গাদাসের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত আন্তঃভাষ চৌধুরী ছিলেন নামকরা ব্যারিষ্টার; পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। দুর্গাদাসের তৃতীয় পুত্র কুমুদনাথ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত শিকারী। 'সমুদ্রপত্র' এর সম্পাদক বিখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ছিলেন দুর্গাদাসের চতুর্থ পুত্র। দুর্গাদাসের পঞ্চম পুত্র স্বরূপ চৌধুরী ছিলেন খ্যাতনামা আই, এস, এস অফিসার। কর্ণেল মনুখনাথ চৌধুরী আই, এম, এস ছিলেন দুর্গাদাসের ষষ্ঠ পুত্র। মনুখনাথ মাদ্রাজের প্রথম ভারতীয় সার্জেন জেনারেল হইয়াছিলেন। চলচ্চিত্রাভিনয়ে প্রখ্যাতনামা শিল্পী দেবিকারীণী ইহার কন্যা। দুর্গাদাসের সপ্তম পুত্র ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী 'এ. এন চৌধুরী' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি বিখ্যাত ভাওয়াল মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের পুত্রদের ভাওয়াল মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র ইনিই বর্তমানে জীবিত আছেন। বাংলা মায়ের মতো একমাত্র ইনিই বর্তমানে জীবিত আছেন। বাংলা মায়ের মতো একমাত্র ইনিই বর্তমানে জীবিত আছেন। দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী একজন নামকরা লেখিকা ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী' তে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। 'পূর্বকথা' নামক পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের কনিষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী দেবী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা।

দুর্গাদাসের দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে. চৌধুরী এই নামেই প্রসিদ্ধ) ছিলেন অনন্তসাধারণ। ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক Calcutta Weekly Notes এর ইনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস, হিন্দুস্থান ইন্ডিওরেস, গাশনাল ইন্ডিওরেস প্রমুখ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক যুবককে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় ইনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণ সাধনই ইহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বহু স্বদেশী মামলা ইনি বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করিয়াছিলেন। লোকমাতা বাঙ্গালার তিলকের মামলায় ইনি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বোধাই যান। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সর্বশুদ্ধ প্রবর্তনের প্রতিবাদের ইনি সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে বলিয়া ইনি

শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। National Council of Education এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ইনি অন্যতম ছিলেন।

রাজনীতি ব্যাপারে শ্রাব সুরেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। যোগেশচন্দ্রের কর্মশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সুরেন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রকে আপন জন করিয়া লইবার জ্ঞান আগ্রহ অনুভব করেন। ইহারই ফলে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা সরসীবালা দেবীর সহিত যোগেশচন্দ্রের স্ত্রু পরিণয় হয়। সরসীবালা দেবী বর্তমানে জীবিত আছেন। যোগেশচন্দ্র ও সরসীবালার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব চৌধুরী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বেরিলির Electric Supply Corporation-এর সমস্ত বস্তুপাতি স্থাপন ও অগ্নাজ্ঞ সমস্ত কাজ একাই করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি অকালে পরলোকগমন করেন। ইহার একটি পুত্র আছে—তাঁহার নাম জনদেব। যোগেশচন্দ্র ও সরসীবালার দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা অজিতা ছিলেন Union Public Service Commission-এর বর্তমান সভ্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। ইহাদের কনিষ্ঠা কন্যা অমিতা আর, জি, কব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী যোগেশচন্দ্র ও সরসীবালার দ্বিতীয় পুত্র রণদেব চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আলিপু বস্ত্রশিল্প হাউসে অবস্থিত পাবলিক স্কুলে রণদেবের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা হইতে তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। পরে হিন্দু স্কুল হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় কমপালসারি ও অ্যাডভান্সাল ম্যাথামেটিক্স এবং মেকানিক্স এট তিনটি বিষয়ে তিনি শতকরা অশীর বেশী নম্বর পান। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে রণদেব ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আই, এস, সি এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ব্যারিষ্টারি পড়িবার জ্ঞান বিলাত গমন করিলেন। রণদেব ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে Grays Inn-এ যোগদান করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রণদেব কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় রণদেব আইন ব্যবসারে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। Constitutional Law এবং Companies' Act-এ তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত। এই দুইটি বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ হাইকোর্টে যে সমস্ত বড় বড় মামলা হয় সেই সব মামলায় বালী বা প্রতিবাদী কোন না কোন পক্ষ সমর্থন করিবার জ্ঞান তাঁহার নিকট অনুরোধ আসে। অক্লান্তকর্মী রণদেব এই সমস্ত মামলা পরিচালনা করিবার জ্ঞান কলিকাতা হইতে সুলীম কোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ইষ্ট পাঞ্জাব হাইকোর্ট, পাটনা হাইকোর্ট, আসাম হাইকোর্ট, উড়িষ্যা হাইকোর্ট, জব্বলপুর হাইকোর্ট, বম্বে হাইকোর্টে ও অগ্নাজ্ঞ হাইকোর্টে গমন করেন। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে Pakistan Industrial & Finance Corporation-এর অফিসের Corporation-এর সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মিলিত সংযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত Limited Company পরিচালনা সম্বন্ধে আইনগত উপদেশ দিবার জ্ঞান রণদেব করাচী গমন করেন।

বিহার সরকার Indian Copper Corporation-এর Kayanite-এর খনিগুলি দখল করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে পাটনা হাইকোর্টে যে মামলা হয় তাহাতে রণদেব Indian Copper Corporation-এর পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলার বিচার দায়িত্ব হারিয়া যান। রণদেবের আইন বিষয়ক নৈপুণ্যের ফলে আসাম হাইকোর্টে Assam Revenue Tribunal যে ultra vires তাহা প্রমাণিত হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টে এর ফুলবোকে রণদেব Evacuee Properties Act-এর আইনগত অসঙ্গতি প্রদর্শন করেন। ব্যাঙ্কের মামলায় moratorium সম্বন্ধে নতুন পথের প্রদর্শন করেন রণদেব।

সুরেন্দ্রনাথের যোগা নৌহির রণদেবের স্বদেশপ্রেম বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যদানের জ্ঞান রণদেব অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান হইতে দলে দলে বাস্তুহারা আসিতে আরম্ভ করিলে এই সব বাস্তুহারাদের সাহায্য করিবার জ্ঞান বাস্তুহারা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতির সহিত রণদেব সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমিতির অর্থসংগ্ৰহের জ্ঞান তিনি বহু স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ভদ্রগাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী শ্রীমতী মৌরা দেবীর সহিত রণদেবের বিবাহ হয়।

শিক্ষাবিস্তারের রণদেবের উৎসাহ অপরিমিত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। রণদেব বর্তমানে Calcutta Weekly Notes-এর সম্পাদক। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি Supreme Court Appeals নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশের সময় হইতেই এই পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক। খেলাধুলার রণদেব বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেন। ছাত্রাবস্থায় ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার ইনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাব প্রেসিডেন্ট, মোহনবাগান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট।



শ্রীরণদেব চৌধুরী

# রাজাধি রাজাধি



উদয়ভানু

কি আজকের রাত জাগিয়ে বেগেছে রাজপুত্রের প্রতিটি মহলকে।

ফিসফিস শুধন, গোপন পদধ্বনি, চোরাচাঙ্গের চাপা শব্দ ভাসাভাসি করছে। ঘবে ঘবে আলো জ্বলছে এখনও। চাঁদোয়া থেকে কুলানো বেলাগারী সর্গনের রঙীন আলোর আলি দেখা যায় অনেক দূর থেকে। ঘুম নেই কাবও চোখে, জাগরণের পালা চলে তাই। কি একটি দুর্ঘটনার কথা বাতাসের ভায়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক মহল থেকে অত্র মহলে। কৌতূহলের ব্যাকুল দৃষ্টি ফুটেছে সকলের চোখে। তবুও নাকি ঘটনা গোপন করতে সকলেই সচেষ্ট। রাজপুত্রের বাইরে যেন কথা না ছড়ায়। পল্লীর আর সমাজের কেউ যেন না জানে। ব্যাকরণেরও টের না পায়।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে অনেক ভাবাত্তার পর তিনি আশ্বস্ত হন। মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন,—ইচ্ছাবরী হ'তে যাব হয়েছি শোঁচামুখার! দেখা যাক দাড়া শুনে কি বিচার করে।

অস্ত্রাঙ্গ রাতে স্নান-গল্গার মুখাভূতিতে দেগতে পাওয়া যায় রাজবাণীর। পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন যেন। সদরের রঙমহল থেকে রাজা অন্ধরে কিরে আসেন কি অবস্থায় কে জানে? আগেভাগে কিছুই বলা যায় না, রাজাবাহাদুর অদ্বিজ্ঞানে কি অজ্ঞানে কিরবেন।

বাণীদের মুখেও আজ লুকানো হাসির ঝিলিক খেলে যেন। মুখে আঁচল চাপতে হয়, হাসি লুকাতে হয়। সকলের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছেন বড়বাণী উমাবাণী। চোব ধরা পড়েছে, কিন্তু উমাবাণী চোবের অপরাধ অস্বীকার করতে চান।

অন্ধরের দাসী আর পরিচারিকাব দল চোর ধরেছে। অন্ধরের পিছনে পুকুরধারে সচল ছায়ামূর্তি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরবে চিংকার করতে লেগে গিয়েছিল তারা। যুগল ছায়ামূর্তি পুকুরতীরে, গন্ধবাজ ফুলের গাছেব আড়ালে।

পূর্ণিমার আর দেবী নেই। তাই চাঁদের আলোয় নিখিঁদিক উদ্ভাসিত আঁধার। আকাশে অগুণ্টি ভাব, কম্পমান শিগায় ঝিকঝিক জ্বলছে। সোনালী চুমকিগা আকাশের চন্দ্রাতপ যেন। চাঁদের চতুর্দিকে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই আজকের তরাবজনীতে লোকচক্ষু এড়তে পারলো না চোবের দল। ধরা পড়লো দাসীদের চোখে। ভূত-প্রেতের আশঙ্কায় হৈ-হল্লা তুললো তারা। সত্যিকার মানুষ না ছায়ামূর্তি সঠিক ঠাওরাতে পারলো না যেন প্রথম দেখায়।

দাসীদের সভয় চিংকারে যে যেখানে থাকে সম্ভব হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত ধৃত দুই চোরকে দেগতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সলাজে মুখ লুকায় দাসীরা। কারও মুখে আর কথা জোঁগায় না। কেউ কেউ বললে,—ও হরি, এ যে দেখছি আমাদের শিবানী আর শশিনাথ! যি আর আশুন এক হ'লে আর কি রক্ষে আছে!

শশিনাথ লজ্জায় মুখ নত করে। শুধু শিবানী যেন বেপরোয়া। ভয়ভরের বালাই নেই যেন। ধরা পড়েছে, তবুও বুক চিড়িয়ে আছে নির্ভয়ে। মিটিমিটি হাসছে।

দাসীদের একজন বললে,—রাজবাড়ীতে কুলদেবী আছেন, ইষ্টমূর্তি আছেন। এখানে এই অনাচার কি সহ হবে কারও! এই বেলেলাপনা!

শিবানী ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু শশিনাথ মুক্তি পায় না। তাকে যিরে এক বাহু রচিত হয় যেন দাসীদের। শশিনাথ আনত মুখে কসে থাকে পুকুরঘাটের এক পৈঠায়। সে যেন নৃক আর বধির। হাজার কথাতোও রা কাড়ে না।

দাসীরা বলে,—রাজামণ্ডর যা বিচার করবেন তাই হবে। দাড়া এমনিতে ছাড়বো না।

শশিনাথের বুক হুক হুক করে। লজ্জায় মুখ নৈশীতে পারেন না। পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে নিশ্চুপ বসে থাকে।

সাজের ঘটা দেখে কে শিবানীর! লাল রঙের শাড়ীতে বেশ দেখায় তাকে, বিয়ের কনের মত। খোঁপায় ক'টা চাঁপাফুল দিয়েছে। আঁটসাঁট শাড়ীতে গাছ-কোমর বেঁধেছে। কপালে সিঁহুর-টিপ আর পায়ে আলতা বাড়িয়েছে। শশিনাথ বলেছিল তাকে লাল শাড়ী পরতে।

যদিও বিধি বাম হয়। লোক জানাজানিতে লজ্জার সীমা থাকে না। শশিনাথ যেন কাঁপতে থাকে ভয়ে ভয়ে।

কেবল উমাবাণী ওদের পক্ষ নেন। দাসীদের প্রতি কষ্ট হন। কোপ প্রকাশ করেন। তাদের ধমকানি দেন। বলেন,—শশিনাথকে ছেড়ে দাও তোমরা। আর বাই হোক, শশিনাথ চোব নয়।

দাসীরা বলে,—সেই আশাতেই রাত বেরাতে অন্ধরের পুকুরধারে এসেছে। ভাঁড়ার থেকে কি চুরি করতো কেউ বলতে পারে! বড়বাণী ভাসনার স্ববে বললেন,—ছি ছি, তোমাদের পাগের ভোগ আর কি। যার যেমন মনের বাসনা সে সেই বকম চিন্তা করে।

শশিনাথ ভাঁড়ার লুঠতে আসবে কোন্‌ ভূগে? দাসীরা বললে,—তাইতো ভাব জন্মিয়েছে শিবানীর সঙ্গে। পাচার



করে শিবানী আর চুরি করে শশিনাথ। দেশে তার অভাবী সংসার।  
চুরি না করলে শশীর চলবে কোথা থেকে ?

সদরের রঙমহল থেকে কালীশঙ্কর যখন পাকীতে ফিরলেন তখন রাত্রি বেশ ঘন হয়েছে। গুলাব আতরের সুগন্ধি ভাসিয়ে আসেন রাজা। বৈশাখের তপ্ততা স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিলেন যেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের গাছে গাছে শাখা আর পাতা স্থির অকম্প হয়ে আছে। বাতাস আর চলছে না হঠাৎ। রাজার পাকী অন্দরে পৌঁছতেই রাজমাতার পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় তাঁকে।

—বিলাসবাসিনী দেবী একবার সাক্ষাৎ চান রাজাবাহাদুর !

কথা শুনে কেমন যেন জড়কণ্ঠে বললেন,—কেন ? এ-হেন সময় ?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে তিনি স্বয়ং আপনার মহলে আসতে পারেন, যদি হুকুম করেন তবেই।

—এবমন্ত। তাই হোক। আমি এখন পদচারণায় অক্ষম। মাতৃদেবী যেন ক্ষমা করেন।

কথার শেষে আবার চোখ বন্ধ করলেন রাজা। পাকীমধ্যে জরিদার তাকিয়ায় এলিয়ে পড়লেন। সোনায় পাতে মোড়া একটি থেলো হুঁকা ধরিয়ে দেন খানসমা, রাজার হাতে। অথবা তামাকের গন্ধে মিশে যায় গুলাবী আতরের সৌগন্ধ।

একজন অবলা নাকি আঙ্গ রাতের মত রঙমহলে এসেছিল। প্রতিবেশিনী একজন, গৃহস্থকন্ডা। রাজার পেয়ারের খোসামুদেরা কোথা থেকে তাকে যে আনে, কেউ বলতে পারে না। যৌবনগোপিতা দর থেকেছিল রাজার কাছে। ব'লেছিল,—হাতে হাতে টাকা না পাওয়া যায়তো কিসের আশে এসেছি ?

সহাস্ত্রে কালীশঙ্কর ব'লেছিলেন,—কত টাকা ? এক লক্ষ না কি ?

গৃহস্থের মেয়ে সদস্তে বলে—আমাদের কি দরদারি মানায় ? যা দেবেন তাই হাত পেতে নেবো। তবে আগাম টাকাটা চাই। আমরা অভাবী, তাইতো এই কুপথে এসেছি।

কেমন যেন অবিশ্বাসের আভাস শোনা যায় তার কথায়। আশ্চর্যের সুর যেন। তাই অসহ্য ঠেকে রাজাবাহাদুরের কাছে। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—অভাব যখন প্রকট তোমার, তখন হাতে ভিক্ষাপাত্র দেখি না কেন ?

—অভাবী, তাই পাত্র পর্যন্ত জোটে না। এই দুই হাতই আমাদের পাত্র। এইতো হাত পেতেছি রাজাজী !

কথার শেষে দুই হাত পাতলো সে ভিক্ষাপাত্রের মত। চোখে করুণদৃষ্টি ফুটলো।

তো তো শব্দে সহসা হাসলেন রাজাবাহাদুর। হাসতে হাসতে বললেন,—এই লও ভিক্ষা, যাও বিদেয় হও।

কথা বলতে বলতে এক মুঠো মোহর সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—দেওয়ানজী এই শূয়ারের বাচ্চীকে ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। খানিক থেমে বললেন,—পারেন তো এর দুই গালে দফলোহার দু'টা ছাপ দিয়ে দেন। দাগী থাক, লোকে চিনবে তবে।

—মার্জনা করবেন রাজাজী ! গুটীতা ধরবেন না। অভাবের তাড়নায় স্বভাবটা নষ্ট হয়েছে। কাতর সুরের কথা ভাসে রঙমহলে।

কালীশঙ্কর আলবোলায় শটকা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিয়ে বললেন,—অধিক কথার কোন প্রয়োজন দেখি না। বিদায় লও এখন। এই মুহূর্তেই।

মোসায়েবের দল ভেঙে পড়লো যেন। হতাশ চোখে চেয়ে থাকলো। ভেবেছিল দালালী পাবে রাজার কাছ থেকে। মার্চে মারা গেল তাদের প্রাণ্য অর্থ।

দেওয়ানজী এসে গরীবতার হাত ধ'রে টেনে তুলে নিয়ে যান। বলেন,—ছোটলোকের মেয়ে তুমি, তাই কথার আকটাক নাই। বা খুশী 'তাই বল'। টাকা আর মোহর আমাদের রাজার কাছে পাথরের মুড়ির সামিল।

—তা আমি জানি দেওয়ানজী !

—তবে যা পেরেছো কুড়িয়ে বাড়িয়ে নাও। বিলম্ব কর না। আমার সহ চল। তোমার ভাগ্য ভাল যে রাজা তোমাকে সহজে বিদায় দিয়েছেন। কথা বলতে বলতে দেওয়ানজী যেন ক্রোধে কাঁপছেন থেকে থেকে।

—আমার অঙ্গ স্পর্শ করবেন না দেওয়ানজী ! ছেড়ে দিন। আমার পা আছে, আমিই যাচ্ছি।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—দেওয়ানজী বুড়া হয়েছেন, তাই বোধ করি মনে ধ'রছে না তোমার। দেওয়ানজী !

—বলেন রাজাবাহাদুর।

—একটা জোয়ান পাইকের হাতে ওকে ন'পে দেন দেওয়ানজী ! সিংহের গজ্ঞন যেন রাজার ক্রুদ্ধকণ্ঠে ! হেলান দেহ তুলে বীরাসনে বস'লেন। বললেন,—ষত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! আমার মুসলমিন সিপাইরা কেউ বাহিরে আছে ?

—ক'জন আছে কাছেই। রঙমহলের দুয়ার আগলে আছে। দেওয়ানজী ভয়ের সুরে বলেন। কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হকচকিয়ে ওঠেন।

হু'হাতে সজোর তালি ঠুকলেন কালীশঙ্কর। ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হেসে ব'ললেন,—তবে তো ঠিক আছে।

মোসায়েবরা ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। খেয়ালী রাজা কি ইচ্ছা হয় কে জানে ! হয়তো এখনই যা হয় একটা শাস্তি দিয়ে দেবেন। কিংবা গারদে পুরে রাখতে হুকুম দেবেন।

কালীশঙ্কর হেসে হেসে বিক্রপের সুরে বললেন,—ওকে দিয়ে দেওয়া তো একটা সিপাইএর কাছে। ভোরের আলো ফুটলে ছেড়ে দেবে।

মোসায়েবরা বললে সম্মুখে,—ম'রে যাবে ছুজুর !

—তাই যাক ! আবার কুঁহ হাসি হাসলেন রাজা বাহাদুর। বললেন,—ওকে অর্থ দিয়েছি, তবে আর বিনিময়টা বাদ যায় কেন ?

একজন মোসায়েব বললে,—মুখ' নারী রাজাবাহাদুর, অপরাধ ধাণ্য করবেন না।

—মুখের জ্ঞান হোক। কালীশঙ্কর সহাস্ত্রে বললেন,—দেওয়ানজী, ওকে তাগ করুন। সিপাইদের একটাকে ডাকুন। অধিকক্ষণ আমি আর নাই রঙমহলে। অন্দরে যেতে চাই।

তথাস্ত।

কথার শেষে দেওয়ানজী বৃহৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

গর্বিণী নারী ক্রোধে যেন ক্রুদ্ধ থেকে থেকে। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। কোমরে হাত। হিষ্ট্র দেহভঙ্গিমা। হঠাৎ কথা বললে সে। ভুরু বাঁকিয়ে বললে,—চাই না আমার টাকা। আমাকে স্নেহে দিন।

হো-তো শব্দে হেসে উঠলেন রাজা। তাঁর উর্ধ্ববপু হাসির তোড়ে নেচে নেচে উঠলো। স্নেহপাথরের খালিতে সাজানো নীলাভ মিনাকাজের রূপার পানপাত্র। হাসতে হাসতে পিয়লায় মদিরা ঢালতে থাকেন। টাইটলুর পাত্র মুখে তুলে আর একবার রোষদৃষ্টিতে দেখলেন ঐ সাহসিনীকে। একজন মোসায়ের বলল,—রাজাবাহাদুর, আপনি সিংহের সমান, একটা মুখিক বৈ তো নয় ওটা! তবে আর কেন?

চূপ কর লেগেদপ! তোদের তো ঘরে শাক-সজ্জনা, বাত্বিরে যত বাবুয়ানা! কালীশঙ্কর ধনকে ধমকে বললেন। মুখে টলটল পাত্র তুললেন।

একজন তুর্কী সিপাই এসে সেলাম হুঁকে দাঁড়ালো। কটি থেকে খুলছে বাঁকা তরোয়ার।

পাত্র নামিয়ে রেশমী ক্রমালে মুখ মুছতে মুছতে কালীশঙ্কর বললেন,—দেওয়ানজী, টাকা আমি ফেরৎ লাবো না। যা দিই তা আর ফেরৎ লই না আমি। মদানী সেয়েটার কোন কথার ঠিক নাই। একবার চায়, আবার তৎক্ষণাৎ চায় না। বিপরীত কথা কয়।

দেওয়ানজী বললেন,—সত্যি রাজাবাহাদুর, বড়ই যেন দেমাকী।

পানপাত্র শেষ করলেন কালীশঙ্কর। আবার মুখ মুছলেন রেশমী ক্রমালে। বললেন,—দেওয়ানজী, সিপাইকে বাৎলে দিন। ওদের বিদায় করেন। আমিও উঠি।

বাতাস নেই আজ। গুমোট গরমে রাজা যন্ত্রাজ্ঞা হয়ে উঠছেন। হুঁপাশ থেকে বিচিত্রবর্ণের রামপাখা চলছে তবু।

খতমত গেয়ে যায় মোসায়েরের দল। একে অন্তের মুখপানে তাকায়।

রেশমী ক্রমালে গুলাবী আতর মাখানো। রঙমহলের জানালায় ভিজ্জে খসখসের পদ্মা। কালীশঙ্কর আর কোন দিকে দৃকপাত করলেন না। মহল থেকে বেরিয়ে পাকীতে উঠলেন।

মহেশনাথের কানেও কথা উঠলো। সেজের আলো আলিয়ে পরম ভক্তিবরে রামায়ণ পাঠ করছিলেন তিনি, আপন কক্ষে। কৃতিবাসী রামায়ণের পুঁথি সুর ও ছন্দে পড়ছিলেন। সেজের উজ্জ্বল আলোয় তবুও এক রাশ কালো, কিছুতেই যেন চোখে দেখা যায় না। নিরেট কাজলের মূর্তি যেন মহেশনাথের—শুধু তাঁর চক্ষু আর বস্ত্রের শুভবর্ণ চোখে পড়ে। কপালের মাঝে সিঁদুরের লাল টপ্পা। শিখায় একটা জবাফুল।

শিবানী আর শশিনাথ অন্ধরের পুঙ্খরত্নের রাতের অন্ধকারে মনের কথা বলাবলি করতে এক হয়েছিল—দেখতে পেয়েছে দাসী আর পরিচারিকার দল।

মহেশনাথ বললেন আপন মনে,—হুঁটাকেই বিভাড়িত করা হোক। শিবানীর মুখদর্শন করতে চাই না আমি। শশিনাথকে মনে

ধরেছে তার, শশীর দোষ কি! আমাকে আর শুনাও কেন এই সকল কুখ্যা! আমার সহ হয় না, ক্রোধের আলা ধরে। জ্ঞান থাকে না আর।

মহুরার মত একজন দাসী অদৃষ্টে থেকে কথা বলে। ফিসফিসিয়ে বলে,—শিবানী কুল'মজাতে চায়। লোকের কাছে মুখ দেখাবে সে কি ভরসায়?

মহেশনাথের মুখাকৃতি আরও যেন বীভৎস হয়ে যায়। মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বিকলাঙ্গ দেহ কাঁপছে খরখরিয়ে। খানিক নিস্তব্ধ থেকে মহেশনাথ বললেন,—তবে শশী যদি শিবানীর পাণিগ্রহণ করে, আমার কিছু বলার নাই। শিবানী তবু পাত্রস্থ হয়।

দাসী আড়ালে থেকে বললে,—শশিনাথ যদি তাতে একমত না হয়?

বিকট সুরে হাসলেন মহেশনাথ। তাঁর ছায়া চক্কল হয় হাসির বেগে। ক্রুর হাসি হেসে বললেন,—শশিনাথের মৃত্যুভয় নাই! আমি তাকে রেহাই দেবো না। স্বহস্তে খুন করবো। শিবানীর সম্মুখেই।

দাসীর কথা নয়, অজ্ঞ এক নারীকণ্ঠ বাহির থেকে কথা বলে। মিহি-মিষ্ট কণ্ঠে। বলে,—শিবানীর দোষ নাই। আমরা শশিনাথের সঙ্গে শিবানীর বিবাহ দেবো।

রামায়ণ থেকে চোখ তুললেন মহেশনাথ। নরমসুরে বললেন,—কে কথা বলে? বড়রাণী কি?

—হী মতেশ ঠাকুরপো! আমিই সেই অভাগী।

—প্রণাম লও বড়রাণী! যা মন চায় তেমন ব্যবস্থা কর', আমি সম্মত আছি এ বিবাহে। শিবানীর পাত্র মেলা হুঁকর।

—এই বিবাহে তুমি সম্মত আছে? কি? উমারাণী মৃত্যুকে শুধালেন।

মহেশনাথ বললেন,—হী সম্মত আছি, তবে অনাচারের প্রশ্রয় দিতে চাহি না। বিবাহ হয় হোক।

—তাই হবে।

মহেশনাথের মৌখিক সম্মতি শুনে উমারাণী যেন ছুটতে থাকলেন।

কেন কে জানে, মহেশনাথ অট্টহাসি ধরলেন হঠাৎ। হাসতে হাসতে স্বগত করলেন—নারী আর পুরুষের মিলন অনস্বীকার্য বড়রাণী! কেবল সাবধান হও, আমাদের মুখে যেন চূণ-কালি না পড়ে। কলঙ্ক রটনা যেন না হয়। রাজমাতা আর রাজাবাহাদুর যেমন বলবেন তেমন হবে।

উমারাণী ছুটে পালিয়েছেন। গেছেন বিলাসবাসিনীর মহলে।

রাজমাতা বললেন,—শশিনাথকে গ্রহণ করতে হবে শিবানীকে। নয়তো তার বিপদ হবে। রাজাকে বলবো উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

—আমায়ও এই এক কথা। বড়রাণী বললেন ইতি-উতি দেখে। বললেন,—এ সুযোগ হেলায় হারালে আর ফিরে আসবে না রাজমাতা! শিবানীর বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে।

—আমিও তাই বলি। বিলাসবাসিনী বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে। বললেন,—দেখি কালীশঙ্কর কি বলে।

সর্বমঙ্গলা আর সর্বজয়া দুয়োরে দেখা দেন। সর্বমঙ্গলা বললেন,—রাজা তাঁর মহলে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন।

চুপি চুপি রাজমাতা বললেন,—নেশার ঘোর নাই তো মেজ আর ছোটরাণী? সাদা চোখে কথা বলবে তো?

সর্বজয়া বললেন,—মনে তো হয় না। রাজা কোন্‌ সহজ ভাবেই আছেন।

—তবে আর ভাবনা কেন? চল' তোমাদের সঙ্গে যাই। আমাকে তোমরা ধ'রে নে চল। কথা বলতে বলতে পালঙ ছেড়ে উঠলেন রাজমাতা।

খাস-কামবায় সোনার কেদারায় রাজা ব'সে আছেন।

উমারাগী তাঁর মাথায় গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন গোলাবপাশ থেকে। বললেন,—রাজমাতা আসছেন এখনই।

—কেন?

—শিবানী আর শশিনাথের কথা জানাতে আসছেন। তারা হুঁজনে অন্দরের পুকুরতীরে একত্রে ধরা পড়েছে। দাসীরা দেখতে পেয়ে চোর-ডাকাত ব'লে ভুল করেছে। রাজবাড়ীতে জানতে আর বাকী নাই কারও।

উমারাগীর ক্ষীণকণ্ঠি বাহুবেষ্টনে ধ'রলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—তোমার অভিপ্রায়টা কি তাই শুনি?

পানিক স্তব্ধ থাকেন বড়রাণী। ভেবে ভেবে বললেন,—হুঁজনেব বিয়েতে আমার সায় আছে। আপনি সেই মত ব্যবস্থা করেন। তা যদি না হয় হুঁটোকে বিদায় করেন রাজগৃহ হ'তে। যা ইচ্ছা হয় করুক ওরা। শিবানীকে পাত্রস্থ করলে লোকলজ্জা থেকে বাঁচা যায়।

—কালীশঙ্করের জগ্ন অপেক্ষা করবে না? আগে সে আসুক।

রাজা কথা বলতে বলতে হুঁখানা লবণ-ঠিকরি মুখে দিলেন। ক্ষুধা অনুভব করছেন তিনি। আকর্ষ মন্তপানের পর ক্ষুধার্ত হয়েছেন যেন।

উমারাগী বললেন,—বিলম্ব হ'লে শশিনাথ হাতছাড়া হ'তে পারে। কিছু অর্থ দিয়ে হুঁজনকে রাজগৃহ ত্যাগ করতে আদেশ দেন। বলেন, শশিনাথ তার পিত্রালয়ে ল'য়ে যাক শিবানীকে।

—পরে যদি মেয়েটাকে ত্যাগ করে শশিনাথ? সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়?

—শিবানীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

—তবে তোমার কথাই থাক। শশী তাকে ল'য়ে যাক।

কালীশঙ্করের সম্মতি পেয়ে খুশী হাসি হাসলেন বড়রাণী। বললেন,—ঐ রাজমাতা আসছেন ভুলীতে। আপনার বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে দেন তবে।

—কালীশঙ্কর যদি কিছু মনে করেন? রাজাবাহাদুর আলবোলায় নল মুখে তুলে বললেন জড়িতকণ্ঠে।

উমারাগী বললেন,—তাঁকে রাজী করানোর ভার আমার 'পরে দিন। আপনি অবিচলিত থাকেন, এই অনুরোধ।

কথার শেষে উমারাগী রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আবার

ছুটলেন যেন। নেশার মুখে বেশ সুবাদ লাগে যেন লবণ-ঠিকরি। আরও ক'খানা মুখে তুললেন কালীশঙ্কর।

গঙ্গার বৃকে চাঁদের ছায়া—জলপ্রবাহে ঝিলমিলি খেলে। তরল সোনা যেন গঙ্গার জল। কালীশঙ্করের স্রবহং বজরা মত্তরগতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তীরভূমিতে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে এখানে সেখানে। হোমকুণ্ড জ্বলছে তান্ত্রিকদের। যেন চিতা জ্বলছে ঋশানে!

আহার শেষে আবার বজ্রার ছাদে উঠলেন কালীশঙ্কর। মুখশুদ্ধি চিবাতে চিবাতে। চর্ক্যা-চোষ্য-লেহ-পেয় আহার করেছেন কুমারবাহাদুর। মেজাজ খুশী হয়ে গেছে ভগ্নিকর সুখাণ্ডে। জ্যোৎস্নাধবল ফরাসে বসলেন তাকিয়া টেনে নিয়ে। বললেন,—খানসমা, আনন্দকুমারীকে বল' সে-ও ছাদে আসুক।

হঠাৎ যেন একখানি অনিন্দ্যহন্দর মুখকাস্তি ভাসলো কুমারের মানসপটে। রাতরাণীকে মনে পড়লো তাঁর। মহাশোকাহে। সহধর্মিণীর কথা ভাসলো যেন কর্ণকুহরে।

চৌধুরাগী এসে ব'সলো ফরাসের এক পাশে। বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত না হয়।

আনন্দনা কালীশঙ্কর বললেন—দেখো, চৌধুরীর মেয়ে, তুমি তো আমার সহোদরার বান্ধবী।

—ঐ তাইতো। পান চিবানো স্থগিত রেখে আনন্দকুমারী ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললে।

—তবে তুমি তো আমারও ভগিনীতুল্যা।

—ঐ তাইতো। আবার বললে আনন্দকুমারী। রাতের অনাবিল হাওয়ায় তার আলুলায়িত কক্ষ কেশ উড়ছে। আঁচলও উড়ছে।

—তুমি কি নিদ্রায় কাতর হয়েছো?

—না না, আদর্শেই নয়। মান্দারণে যতক্ষণ না পৌঁছাই ততক্ষণ আমার নিদ্রা নাই চোখে।

—আমারও তদ্রূপ। তাই বলি, গল্পগুজবে রাত্রিনী অতিবাহিত করা যাক।

—বেশ কথা। আপনার যেমন অভিরুচি।

হেসে হেসে কথা বলে আনন্দকুমারী। আকাশে চোখ তোলে একবার। তার দীর্ঘ দুই চোখে আকাশের আর পূর্ণচাঁদের প্রতিচ্ছায়া গেলে।

—চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমাকে। চৌধুরাগী, আমাকে ক্ষমা করবে?

—কেন কুমারবাহাদুর? এমন কথা বলেন কেন?

—আমি হয়তো অসংযত হয়েছিলাম তোমার প্রতি।

খিল-খিল শব্দে হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—কৈ? কখন? আমার তো মনে পড়ে না?

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কুমারবাহাদুর। আকাশের চাঁদসম রাতরাণীর মুখখানি যেন যখন তখন চোখে ভাসছে। চক্ষু মুদ্রিত করলেই সেই মানসীকে দেখতে পাওয়া যায় যেন। তাঁর মধুমিষ্ট

কথা কানে ভাসে যেন। মহাশেষে যেন কানে কানে কথা বলছেন কুমারের।

কুমারবাহাদুর বললেন,—মান্দারনের গল্প বল' তুমি। আমি শুনি।

মুহূ-মন্দ হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি আগে শূতাহুটির গল্প শোনান। তারপর আমি বলবো।

—বেশ কথা। কাশীশঙ্কর বললেন ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে। বললেন,—শূতাহুটিতে আমাদের তিন পুরুষের বসবাস।

রাত্রির হাওয়ার গতি অবাধ। শৌ-শৌ শব্দে বাতাস চলেছে। তাঁরের গাছ-গাছড়ার চাঞ্চল্যের একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে মধ্যগঙ্গায়। যেন শত শত লোক একসঙ্গে কথা বলছে!

মাঝিরা সোংসাহে হাল টেনে চলেছে! তবুও বজ্রার গতি

ধীর। চৌধুরাণী একবার লক্ষ্য করলো; আকাশের চাঁদ যেন তাদের সহযাত্রী। বজ্রার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ এগিয়ে চলেছে আকাশপথে। একজোড়া রাত্রির পাখী কর্কশ সুরে ডাকতে ডাকতে বজ্রার ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যায় তীব্রগতিতে। গঙ্গার এক তীর থেকে অল্প তীরে চললো উড়তে উড়তে। চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখা যায়—একজোড়া লক্ষ্মীপেঁচা।

অভাসমত তাদের উদ্দেশে চৌধুরাণী একটা নমস্কার ঠুকলো। কাশীশঙ্কর থামলেন না। শূতাহুটির কাহিনী কি এক কথায় শেষ হয়? কুমারবাহাদুরের কথা একাগ্রচিত্তে শুনতে থাকে চৌধুরাণী। যদিও রাতের নিশ্চল বাতাসে তার ঘুম-ঘুম পায়। চক্ষু জড়িয়ে আসে। মনে মনে নিজালম্ব ত্যাগ করে আনন্দকুমারী। সাগ্রহে শোনে কুমারবাহাদুরের কথা। চোখে তন্দ্রার ঘোর উপেক্ষা করে সে। [ক্রমশঃ।

## অক্ষুট

### বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আসন্ন-কোণে ঐ যে অলস বীণা,  
ঐকাতানে দিচ্ছে না কেউ ঘা  
কেউ তোলে না সুর।  
শুধু নিজের বৃকে স্তব্ধ আছে যা  
তাইতেই ভরপুর।  
যায় না বোঝা... বাজল কিছু কি না!

কল্পনাসে কান পেতে তাই শুনি—  
ভাবছে কি ও? ভুলেছে সব মন!  
জাগে না ঢেউ, যন্ত্রণা আর ধূংখ-পীড়া যত  
এই পৃথিবীর সকল প্রয়োজন  
হোঁয় না ওকে, পড়ে আছে অহল্যারই মত।  
তবু... হাওয়ার তারে একটি করে গুণি—

দৈব'থনের অশ্রুত স্বাক্ষর।  
গাছের মাথা কাঁপছে পাখীর গানে।  
স্বপ্ন মৃদু কম্প বর্ণন কার!  
ফুটল কি প্রেম অঘটনের টানে?



ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা  
ও বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]



মেঘ-মল্লার

—ইপন মল্লিক

গুণ-টানা

—গোবিন্দলাল দাস

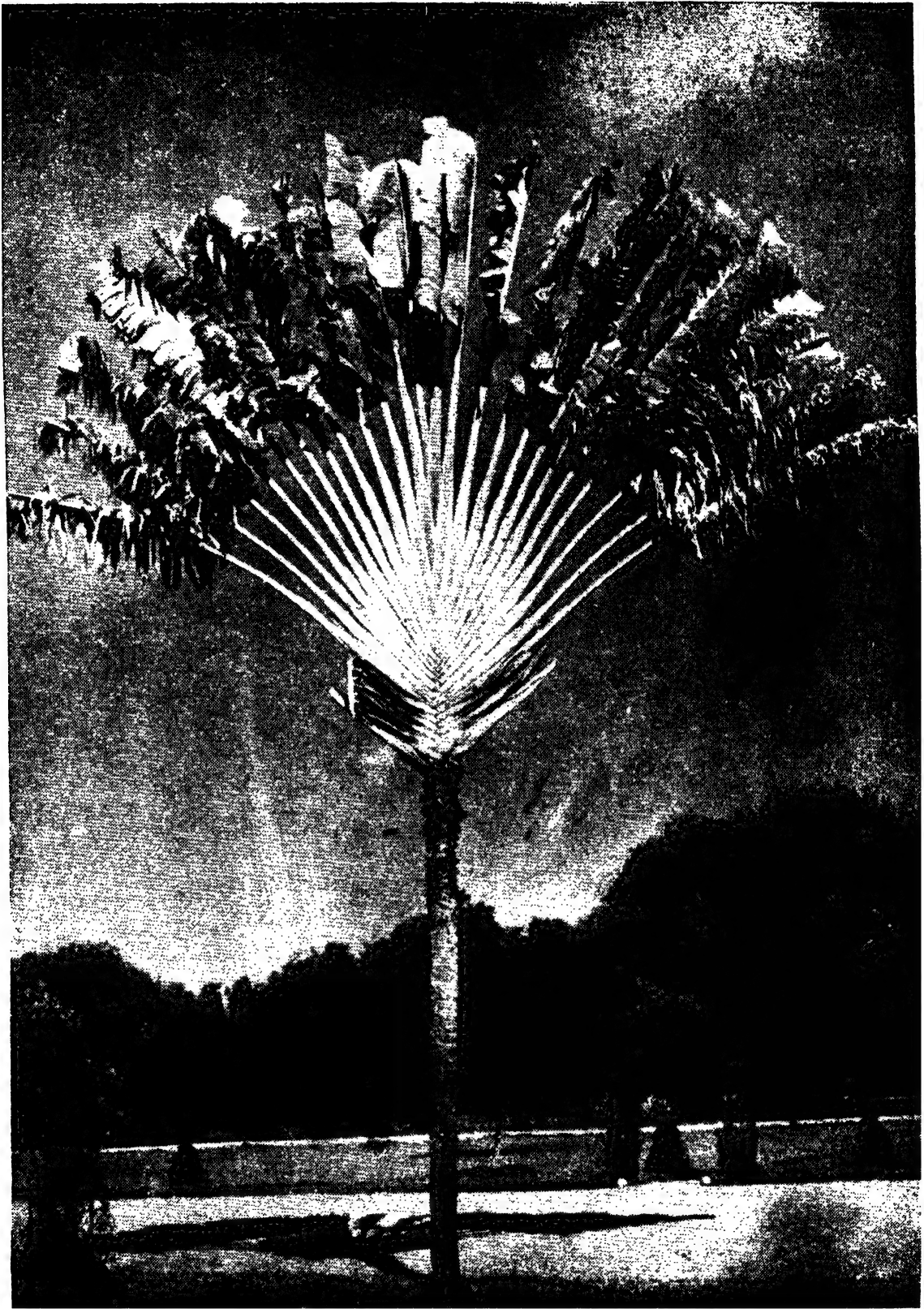






বিদেশী পাখী ( জালিপুর চিড়িয়াখানা )

—মধুসূদন সুখোপাধ্যায়



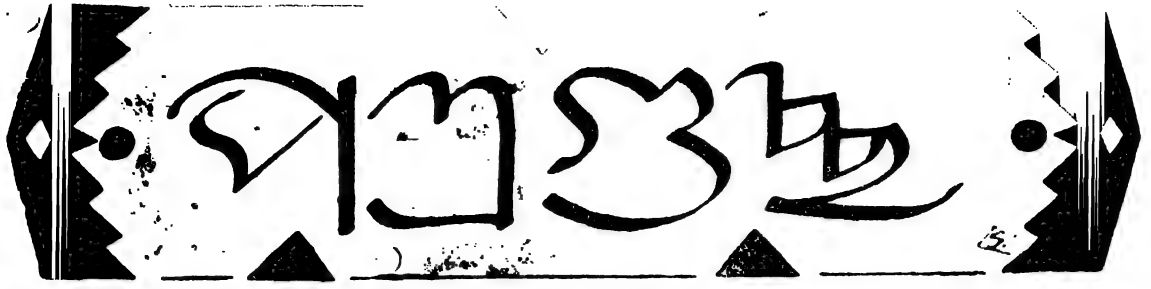
দ্যোভলার্স পাম

--নিমাইচাঁদ শীল



ପଦ୍ମିନୀ

— ରତନ ଦାଶଶତ୍ରୁଂ



## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১২

৩০ জুন ১৯০৩

৪

Thomson House

১৫ই আষাঢ়

১৩১-

বন্ধু,

বেণুকার সশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাঠিয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ত্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌছিলাম সেদিন তাহার যোগীপ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিগাই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া তোমিয়োপাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে—কাশি কম, স্বর কম, পেটের অস্বস্তি কম—বিশেষ প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে—বুকের ব্যথা নাই—বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা করিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে—আশা করিতেছি ঐ ঠাকুরাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জ্ঞান আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখন হইতে তাহার সংস্কার সর্গাতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই—সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে—কবে যাঁহাতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে ধাঁড় করাইয়া দাও—ইহাকে তোমাদের জ্ঞানিষ বলিয়াই মনে করিও। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিষ হইতেছে—তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইতেছে। নূতন যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্তব্য স্থির করিয়া দাও—ছেলেদের খাওয়া দাওয়া এক চরিত্র পরিদর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও—অধ্যাপনের নিয়ম বাধিয়া দাও—নহিলে এই সময়ে মাথপথে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে আর শৃঙ্খলা স্থাপনা কঠিন হইবে—বিদ্যালয়ের বদনাম হইবে এক বর্তমান অগতঃতার অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অনুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন হইতে পারিবে না। কুস্তবাবু সপরিবারে আছেন দিনযাত্রি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে—অনেক নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ ঠিক জানি না—তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ অন্তরন করে তবে

আফেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিও না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সহর ডাকাইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো। বেণুকারে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাসুশ্রীয়া করিতে হইতেছে—চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প—এইজন্য মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না—তাহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরও অনেক খাটাইব। এ বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যতক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘূমানো উচিত ছিল কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব?

তোমার রবি

২৩

[ অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০৫? ]

৪

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতার—আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মূলভূমি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি। এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি—পুরা বেতন পাইলাম কি না সে হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই—এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এই জ্ঞান প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অজায় নয়—এক সেটা মঞ্জুর করিতে দেশের লোকের সিকি পরস্যা খরচ নাই—সম্মান-সম্বন্ধনার জ্ঞান অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোর কিছুমাত্র দুপগত নাই—ছেলেবেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভালবাসিয়াছি—আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না পাও। ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি—ক্ষুধা এখনো মেটে নাই।

বৌঠানকে নমস্কার দিবে।

তোমার রবি

২৪

[ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৯৫৮ ]

৫

শিলাইদহ

বন্ধু

তোমার চিঠি পাঠিয়া বিশেষ সাধুনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপে ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার চক্ষু বোধ হয় আমি যখনই আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনই আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুঃখের মুক্তি ঘরে ও বাহিরে আত্মকাল এমনই সুপরিখুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত অতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাট।

এবারকার কংগ্রেসের বক্তৃৎদের কথা ত শুনিয়াছিই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষানোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা গানের উপর দুই দলে মিলিয়াই যুগের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া ভুলিবার বতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করবে। কিছুদিন হইতে গবর্নমেন্টের হাতে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিউশনের সময় নাই—যেটুকু উদ্ভাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজদের ঘরে আশুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া “বন্ধে মাতরম্” কাগজে স্বাধীনতার অভ্যন্তরপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না। এখন কেবল অল্প পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশ দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ কাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্নমেন্টের প্রাচীর-বাতাসে কাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বস। আমাদিগকে নষ্ট কাঁবার জ্ঞান আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্জিও নয় কিচেনবেলও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা “বন্ধে মাতরম্” মানি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিস্যা করিতে পারিব।

শরৎ বর্ষ দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি রান্না থাইয়া এক বৌঠাকুরাণীর শাড়িপা শিখরুণ্ডি দেখিয়া ভাবি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালানোর উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেকনিকাল বিভাগ খুলিব। ধন্যপাল আমাকে গোটা কতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কুখি-ব্যাপারের বস্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি বখাৰ্খ

কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজারখানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই, তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshop এর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাঠিলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

বখীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহার সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য, তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে—নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। বৌঠাকুরকে আমার কথাটা শ্রবণ করাইয়া দিও—সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার ববি

২৫

[ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১০ ]

বা জ্যৈষ্ঠ ১৯১৩ ]

508 W. High Street  
Urbana, Illinois U. S. A.

৫

বন্ধু,

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন স্তর কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইটা আপনাই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব, একথা মনে করিয়া আসি নাই—যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গঞ্জে তর্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্তের জ্ঞান মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে—বিশেষত ইংরেজি ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অস্বস্তি নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে—তাহাতে আমার বিশেষ ভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে—অনেকে বাংলা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা স্তম্ভফল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো যুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্মতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া কুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে, কি করিব ভাবিয়া



পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা আছে। সেখানে ম্যাকমিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জমা করিয়াছি—সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে—যতই আদর অভ্যর্থনা পাই না কেন—মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি—দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানকার অব্যবহৃত আকাশ অপরাধান্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে—সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অস্বাভাবিক হইবে তাই এই আবর্তের মধ্যে ধূসর বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি, দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার  
বন্ধু

২৬

১৭ মে ১৯১৩

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.  
Ludgate Circus, London.  
15 May. 1913

বন্ধু,

তোমার বন্ধু Mrs. Boole-এর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উৎসুক প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশী পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার বুদ্ধিশক্তি সজীব! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার গুণানে লইয়া গিয়াছিলেন। এতমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত স্বপ্নের হইত। এদিকে আমার বোপ করি ফিরিবার সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির চানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানদের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে—এক অধিক দিন দূরে থাকা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় “চিত্র”র ইংরেজি অনুবাদ পাঠ্য শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। পাঁচবিশ খিরেটারে আমার “ডাকঘর” নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

তবু এই খ্যাতি-প্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন টিকিতেছে না। একটুগানি নিঃশব্দের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। হস্তের কাজগুলো কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি, তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক দিতে তোমার বাধাবিঘ্ন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অনেকটা পরিচয় পাইব, এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার বন্ধু

২৭

[ ১৪ এপ্রিল ১৯১৪ ]

ও

শান্তিনিকেতন

[ ১ বৈশাখ ১৩২১ ]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—“শিবাস্তে পশ্বানঃ সন্তঃ।” আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়যাত্রা বহন করে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত করবে, তুমি বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই করছি—এতদিন ধরে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুলেছ মহাকাশের স্তরনী বোঝাই করে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার করে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোচেন্ডাইলের সঙ্গে আলাপ করে এসো। তিনি ত খুশি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌছা সংবাদ তাঁকে দিয়ে।

বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সম্ভাবণ জানিয়ে।

তোমার বন্ধু

২৮

[ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬ ]

ও

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে গেলে স্ত্রীধা হ'ত, কেননা, সেখানে তাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড পরপাকের মধ্যে পড়ে গেছি যে, কিছুই ভাববার অবকাশ নেই—কেবলই আমাকে টানটানি ছেঁড়াছেড়ি করে দৌল নিয়ে চলেতে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াবার জো নেই—বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অন্তত মার্চ মাস পশ্চাত্ত আমাকে এই ঘূর্ণির চানে সূত্র থেকে সূত্রে পরিণে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হয়ে বসবার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্ডিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা হলে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হলে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে, এই কথা মনে দটল। এতদিন যা তোমার সম্বন্ধের মধ্যে ছিল আজকে তার সস্তির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একজার সম্বন্ধ নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সম্বন্ধ। তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলে। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে বাবে—তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে। কত বার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিসের সৃষ্টি করেছি—তার উপরে অজস্র টাকা ব্যয় করেও তাদের বাচিয়ে তুলতে পারিনি। কেবলমাত্র অভ্যর্থনা দিয়ে ত কোনো সভ্য বস্তু আমরা স্বজন করতে পারিমে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সভ্য সাধনা—

এর মধ্যে যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ—তুমি যে মজ্জহী ঋষির মত তোমার মজ্জকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্তে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা পীড়িয়ে তোমার মানসপদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করচ। তোমার মস্তকের গুণে, তোমার তপস্যার বলে—দেবী সেই আসনে অটল হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।

দেশে ফেরবার জন্তে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কত দিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম উজ্জ্বল লালিমে মত ঘুরে বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

২১

[ অক্টোবর ৭, ১৯১৭ ]

৬

কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল—এখন ডাঙন ধরা স্তব্ধ হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দা প'ড়ে গেছে—ভাল ক'রে শুনতে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করবার জন্তে তাকে ঠেলাঠেলি করতে হয়। ডাক্তার বলচে, একেবারে চূপচাপ ক'রে থাকতে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্তে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে—সর্বদা নিজের কাছে কাছে একজন একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অভ্যস্ত খায়াপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কনগ্রেসের সময় একটা কিছু বলব'র জন্তে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা করব—এখনকার মত সুগভীর নিষ্কর্ষণ্যতা মধ্যে ভুব মাখব। কোনো নূতন ব্যয়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শাস্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক করচি—সেখানে বিজ্ঞানস্নেহ ছুটি—কেউ লোকজন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চলবে না। কানটা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ হ'বে—না যদি হয় তা হ'লে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি হোর বৈশা নে রে

আমি আর বাইতে পারলেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা নেই। তোমাদের লেকচারের জন্তে করে তৈরী হ'ব তা বলতে পারিনে—বোধ হয় এখন থেকে কঠব্যকে সঙ্গীত ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্ধারণ ক'রে নিতে হবে—এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করব—যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি।

৩০

১ জানুয়ারি ১৯১৯

৬

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম হ্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগছেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেছেন—কিন্তু সুকেশীর জন্তে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতন্ত্র পাঁচন খাইয়ে আসচি। ছেলেদের অনেকেই ছুটির মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যু-শয্যা থেকে এসেছে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে—কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটনি এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে—এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচকনের গুণ হয়েছে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল—সে সম্পূর্ণ নিভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করতে পারত। ঠিক বর্তমানে সে রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি—কেবল মাঝে মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে—সেই পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিটা আমার ছুটির দরবার। আমার দ্বারা যতটা হতে পারে নানা রকমে তা করেচি, এখন অল্পদের জন্তে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেছে। নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্তে কথা ক'বে এইটাই হচ্ছে আবশ্যক—নিজের পালাটিকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে টেনে রাখাটাই ভুল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫।

তোমার রবি

৩১

২৪ নভেম্বর ১৯২১

৬

বন্ধু,

তোমার “অব্যক্ত”র অনেক লেখাই আমার পূর্ব-পরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে, যদিও বিজ্ঞানবাহীকেই তুমি তোমার স্মরণার্থী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮।\*

তোমার রবি।

\* বিশ্বভারতীর সৌজন্তে।

“যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পোলে না আজন্ম, তার চোখের জ্ঞানজ্ঞান-শলাকা ঘায়ে ঘায়ে ক্ষইয়ে ফেলেলেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পোলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোন গুরু উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অজ্ঞানেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।” —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহা অপেক্ষা এক বৎসরের

বড় ভাগিনেয় সভাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে একই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা পরিদর্শনের ভার কবির তৃতীয় অগ্রজ সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর ছিল। হেমেন্দ্রনাথ ছেলের ভালো করিয়া মাভাষা বাঙলা পড়াইয়া সংস্কৃত ও ইংরেজি আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই বাঙলা শিক্ষার কবির যে অশেষ উপকার হইয়াছিল তাহা বলিতেই হইবে। হেমেন্দ্রনাথ বালকদিগকে নানাবিধ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রসিদ্ধ বাঙালী কুস্তিগীর অশু গুহের গুরু হীরা সিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখিতে হইত। তাহার পরে বাঙলা সাহিত্য, মুদ্রবোধ ব্যাকরণ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল অধ্যয়ন, তারপরে স্কুল। বাড়ী আসিয়াই চিত্র অংকন ও জিমনাস্টিক, সন্ধ্যার পরে সংস্কৃত ও ইংরেজি। রবিবারেও ছুটি ছিল না, ওস্তাদের নিকট (বিশু চক্রবর্তী প্রভৃতি) সংগীতচর্চা এবং বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান-মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে সস্তরণ শিক্ষাও অভ্যাস করিতে হইত। ইহা ছিল হিসাবের মতো, হিসাবের বাহিরে ছিল, মাঝে মাঝে সোভানাথ তত্ত্বাবধানের নিকট প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের যে ‘কংকাল’ আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, সে কোন কংকাল জানি না; তবে তাহা গ্রথিত হইয়া একটা কংকাল তাঁহাদের বাড়ীর “পড়িবার ঘরের” দেওয়ালে আঁখিত ছিল, তাহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্থিবিজ্ঞা শিখিতে হইত ও বহু দিন কবি জ্যোতিষশাস্ত্র ফলিত ও গণিত উভয়ই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আদর্শ ও গোমিওপাখিঃও তিনি যথেষ্ট দখল অধিকার করিয়াছিলেন। তখন সকল মহাস্থ পত্রিকার বাহিরে মহলে বালকদের জন্য সতন্ত্র একটি পড়িবার ঘর থাকিত, তাহাতে বোলানো ব্রাকসেট, মানচিত্র ও ছাটি দ্বারা থাকিত (‘Terrestrial & Celestial’) অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মানচিত্রাঙ্কিত। বাড়ীর লোকে ঐ ঘরকে “ইস্কুল ঘর” বলিত।

কবি যখন ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার সভাপাত্র বরোজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সভাপ্রসাদ একদিন মহর্ষির কাছে একখানা বই চাহিতে গিয়া এমন সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাতে তাঁহার আর কিছুদিন নম্নাঙ্গ স্কুলে পড়িতে থাকিলে হইতো বা ক্রমে বিস্তৃত সংস্কৃত ভাষার কথাবার্তা কহিবেন, এই আশংকাত্তেই মহর্ষি তাঁহাদের বাঙলা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন। সভাপ্রসাদের সাধুভাষা প্রয়োগের কারণও ছিল। মহর্ষির সকল জিনিষ বেশ সুনির্দিষ্ট ও নথ্যবদ্ধ হওয়াই অভিপ্রেত ছিল। আচরণ, শোভা ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি পূর্বে উপদেশ দিতেন ও কাথাস্তে কিরূপ হইল তাহার বর্ণনা লইতেন, ব্যতিক্রমে বিরুদ্ধ হইতেন। এই শিক্ষার ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠাঙ্গজ হিজেন্দ্রনাথ ভাষার এলোমেলো ব্যবহারে ও অব্যর্থ প্রয়োগে বড়ই অসম্মত হইতেন। হিমালয় ভ্রমণান্তে যদি দেবেন্দ্র যখন বাড়ী আসিতেন তখন বাড়ীময় একটা সাড়া পড়িয়া বাইত (শিল্পিগুরু ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথের ‘বায়ো’ দ্রঃ)। সে সময় যেমন ধূতির সহিত ঘোবজা (চাদর) না থাকিলে পরিচ্ছদ ভ্রোচিৎ হইত না, সেইরূপ ইজের ও পাংহারির উপর জোকা না থাকিলে, এবং বাহিরে বাইতে হইলে টুপি ও শুভ্রতালো লপেটা জুতা পরিচ্ছদে অপরিহার্য ছিল যেমন একালে ট্রাউজারের সহিত বুক-গোলা কোট পরিলে কামিজ

# রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

## ৮-খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলাবের সহিত দিনে টাই ও অপরাহ্ন হইতে বো পরা সভ্যতামুখারী অপরিহায। মহর্ষি-পরিবারের পুরুষেরা বাড়ীতে সাধারণত ধূতির বদলে ইজের পরিতেন কিন্তু ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে ও সামাজিক অমুখানে ধূতি অবশ্যই পরিতে হইত ও এই নিয়ম সকল ঠাকুর বাড়ীতেই ছিল। মহর্ষির নিকট বাইবার সময় সকলেই মুখের পান ফেলিয়া বাইতেন। অন্ধরে রবীন্দ্র-জননী মহর্ষির আহারের তত্ত্বাবধানের জন্য পাকশালায় বাইতেন। কাজেই সভাপ্রসাদের মনে একটা দারুণ সন্ত্রাসের ভাব জাগিয়াছিল, বইচাহিতে গিয়া ভাষাতে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এইবার রবীন্দ্রনাথের রাতিমতো ইংরেজি পড়া আরম্ভ হইল। প্রথমে তিনি ‘বেঙ্গল য়াকারডেমি’ নামক একটি ফিরিস্তীপ্রধান স্কুলে ভর্তি হইলেন। সেখানে ইংরেজি বা ল্যাটিন বিজ্ঞার সহিত স্কুল-পাঠানো বিজ্ঞা যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল।

২৫-এ মার্চ ১২৭৯ ইং ১৮৭৩ মালে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের উপনয়ন মহর্ষি-প্রবর্তিত অমুখান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। মহর্ষি কেবলমাত্র সাণিট্রী-দীক্ষা পুত্রদের কর্তে দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ বিশেষ বহু সহকারী শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামমোহনের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথেরও বাঙলা দেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণ বিকৃতবোধে মনঃপূত ছিল না। তিনি আনন্দচন্দ্র বেনোস্তবাসীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ বোধ ও বোদান্ত পুত্রদের শিক্ষা দেন। ভট্টাচার্য বি-এ পাশ করিয়া ইংরেজিতে দূতবিজ্ঞ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজিও পড়াইতেন। মহর্ষি বেদাঙ্গ ও অপরাহ্নজ্ঞা অর্জন পুত্রদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরাবিজ্ঞার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। উপনয়নের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সহিত নিত্য গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন। ইহাই তাঁহার ধর্মজীবনের ও সাধনার সূত্রপাত। তাঁহার তরুণ মনে পূর্ব-স্মৃতির ফলে শ্রদ্ধার মত সঙ্গরই অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং পিতার দৃষ্টান্তে ও বাক্যে তিনি নিশ্চয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমন কি, অল্পবয়সে ভয় পাইলে অকুণ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া গায়ত্রীমন্ত্রজপে সে ভয় দূর করিতেন। সাংসারিক হৃৎকণ্ঠ দুঃখোগ ইষ্টমন্ত্রে মনোনিবেশ পূরক সে-হৃৎ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই বিশ্বাস তাঁহার ভক্তিমান পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

এইবার একবার কবিকে মহর্ষির সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। ভ্রমণকালটা বেশ একটু লম্বা রকমের হইয়াছিল। ইতিপূর্বে একবার মাত্র কবি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। ডেবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের কিছুদিন পানিহাটির এক বাগানবাড়িতে (ছাত্রাবাসের) আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এবার মহর্ষি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদে গিয়াছিলেন। প্রথমে কয়েক

দিন শান্তিনিকেতনে থাকিয়া তাঁহার পরে সাত্বেগঞ্জ, দানাপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিন কাটাষ্টা অমৃতসরে এক মাস থাকেন। সেখানে গুরুদ্বারা ও স্তবর্ণমন্দির এবং জাতিভেদশূন্য শিক্ষকের তথায় দিব্যরাত্রি আর্পিত, ভক্তনগর ও আরাধনা মতর্ষির মনে দৃঢ় রেখাপাত করে। সেইরূপ বঙ্গদেশে একটি স্থান বা আশ্রম স্থাপিত দেখিতে তিনি উৎসুক ছিলেন কিন্তু সম্যক কায়ে পবিত্র করিতে পারেন নাই। তথা হইতে 'ডালহাউসি পাঠাড়ে তাঁহার বক্রেটাশিখরে পৌঁছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত সঙ্গে সঙ্গে কিছু গণিত আর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। মতর্ষি স্বয়ং তাঁহাকে পড়াইতেন।

চার মাস বাদে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মতর্ষির একখানা পত্র ( হিন্দালয় বক্রেটাশিখর ১৪ই আষাঢ় ১৭১০-শক ) হইতে জানা যায় "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পরম্পরক পত্রের নিকট পাঠাইয়াছি, তাঁহার প্রযুগ্ম-এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুখকরূপে জানিতে পারিয়াছ।" ঐ জীবন্ত লিপিটি তাঁহার অমৃতচর কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় কলিকাতায় ইতিপূর্বে আসিয়া পৌঁছায়। কলিকাতায় দিবিয়া রবীন্দ্রনাথকে আবার সেই বেঙ্গল য়াকাতমেতেই পাঠাতে হইল কিন্তু যে স্বাধীনতার স্বাদ পাঠিয়াছে যে বন্ধন মানিতে চায় না। দীর্ঘকাল বন্ধন দশার থাকিয়া পক্ষু না হইলে পিঞ্জরযুক্ত বিহঙ্গমকে ধরিয়া খানিয়া পুনরায় পিঞ্জরে ভরিয়া দিলে সে পলাইতে চায়। রবীন্দ্রনাথ স্থল হইতে নিঃশ্রুত পলায়ন আরম্ভ করিলেন। অভিজ্ঞাবকগণ সে কথা বুঝিয়া তাঁহাকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সেট জেলিয়াস্ কলেজিয়েট স্কুলে পাঠাইলেন।

১৮৮১ সালের ১৫এ ফাল্গুন চৌদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিদগেগ হয়। ঐ সময় তাঁহার তত্ত্বাবধানেই তাব গ্রহণ করেন তাঁহার বৌঠাকুরাণী জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কালিন্দী দেবী। ইনি কলিকাতার গায়কান্দা সংগীতরসিক জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ও শিক্ষার গুণে একজন সিদ্ধশী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তৎকালীন যুগসাহিত্যপ্রবর্তক ও পরে রবীন্দ্রনাথের বৈরাগিক কবি-শ্রুত বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা ইহার প্রিয় থাকায় ইনি কবিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ইহার স্বহস্তে প্রস্তুত আসন পাঠিয়া বিহারীলাল "মাথের আসন" লেখেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের কবিতার আদর্শে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। ইনি সাহিত্য ও সংগীতানুরাগী মাত্র ছিলেন না, স্বামীর উপদেশে অধ্যাপকগণ বিজ্ঞান নিপুণ হইয়াছিলেন। কলিকাতার ও চন্দ্রনগরের রাস্তাপথে বিচরণকালে এই অস্বাভাবিক দম্পতি তাঁহাদের সমুদয় সামাজিকতার গুণে বহু সমান্ত প্রাচীনপন্থীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নতুন স্কুলে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের আচরণের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল না। বাপার বুঝিয়া কতৃপক্ষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুলে বাগুয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এত দিনে রবীন্দ্রনাথের মনস্বামনা পূর্ণ হইল, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার গৃহশিক্ষকেরা তাঁহার অগ্ন্যজ্ঞ বিষয়ে পড়াওনা সত্বে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শেক্ষপিয়রের ম্যাক্বেথ প্রভৃতি তাঁহাকে পড়াইতেন ও তাঁহাকে অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিতেন। ম্যাক্বেথের কবিকৃত অনুবাদ পরবর্তীকালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের

স্কুলে পড়া এই পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ তখনকার এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিলেন না। তখনকার ফোর্থ ক্লাসেই ইতি হইল। কিন্তু এ বয়সে তিনি অল্পপক্ষে কতটুকু লাভ করিয়াছিলেন দেখা যাক। সেই চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সেই অতি সামান্য ইংরাজি, অল্প সংস্কৃত, অল্প জ্যোতিষ, সামান্য অস্থি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞা তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন যাহা ধর্মব্যয়ের মধ্যেই নয় কিন্তু মাতৃভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল।

তখন বাড়লা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে অতি অল্পই তাঁহার অপঠিত ছিল। বৈষ্ণব কবিতা ও মহাজন পদাবলীর (রামপ্রসাদের রচনাবলী সমেত) প্রতি শিক্ষিত বাড়ালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার একটি স্কন্দের সংস্করণ বাহির করেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তাহা সাগ্রহে পাঠ করেন ও বিজ্ঞাপতি চণ্ডিদাস অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎব্যতীত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহের' পুরাতন কয়েক খণ্ড এক প্রতি মাসে প্রকাশিত 'জ্ঞানানুর ও প্রব্রিথ' 'অবোধবন্ধু', 'বঙ্গদর্শন' কবির মনের আহার যোগাইত। ইহা ভিন্ন সেই সুর—যে সুর প্রাণে বাজিয়া বাজিয়া তাঁহাকে পরীক্ষার প্রতি বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল—সেই সুরই তাঁহাকে শিখাইল সংগীত, আর শিখাইল কবিতা রচনা।

গুণেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'নব নাটকের' মহলা দিবার সময় বাড়ির বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া তাহার সংগীত-লহরী আনন্দ করিতেন। বালক রবি সংগী শিখিতেন পাঁচালী দলগঠনকামী পিতৃ-অমৃতচর কিশোরীর নিকট, পিতৃ-বন্ধু বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের নিকট, অগ্রজ জ্যোতি দাদার (নতুন দাদা) নিকট অনিয়মিত ভাবে জড়ীড়ার ছলে, আর বেতনভোগী ওস্তাদের নিকট। তাঁহার উপর বড় দাদা হারমোনিয়াম ও অর্গ্যান বাজাইতেন, জ্যোতি দাদা পিয়ানো ও বাজান, কত লোক গান করে—ইহাতে নানা ঠিক হইতে সংগীতে মাফলালাভ অপরিহার্য। স্বভাবত সুরকঠ রবীন্দ্রনাথকে সকলেই গাহিতে বলিতেন, তিনিও তাহাতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার গান শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে বাড়ীর মাঝোৎসবে গায়কদের সহিত গানে যোগদান করিতেন। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে মোলা বকসু প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদের গতিবিধি ছিল। সিপাহী-বিল্লবের পর লখনউএর নবাব ওয়াজেদ আলি শা সপরিবারে সপারিষদ ও চিড়িয়াখানাসহ কলিকাতার অপর পারে মেটিয়াবুরুজে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার আশ্রিত বড়ে মিঞা, ছোট মিঞা প্রভৃতি সংগীতবিদগণ এবং চিকিৎসক হাকিমগণ কলিকাতার অভিজাত সমাজে বিশেষ সমাদরের সহিত আহূত হইতেন। মার্গসংগীতের মজলিশে প্রায় সকল বড়লোকের বৈঠকখানাই সরগরম ছিল।

রবীন্দ্রনাথের এক দিকে যেমন স্কুল-পালানো বিজ্ঞা অগ্রসর হইতেছিল, অন্য দিকে তেমনই সংগীতবিজ্ঞাবিদদের এড়াইয়া চলার সাধনার অনুশীলনও চলিতেছিল। বিখ্যাত সংগীতশিল্পী বহু ভট্টের ইচ্ছা ছিল যে সুরকঠ রবীন্দ্রনাথ যেন কানাড়া রাগিণীতে তাঁহার ঘব এবং নাম বজায় রাখেন। সেদিকে বহু ভট্টের সকল চেষ্টা কিরূপে তিনি এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, সে কৌতুককর কবিকাহিনী আমরা কবির নিজের মুখে একাধিক বার শুনিয়াছি। আর কবিতা রচনা? কাগজে, প্লেটে কবিতা রচনা

অবিরাম চলিতেছিল—যদিও তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী কবিদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যদিও ছন্দবদ্ধের কঠোর নিয়ম পদ্ধতি মনোমত ভাঙিয়া গড়িয়া লইতে বালক কবি তখনো পারেন নাই। ললিত পদবিজ্ঞাস, রচনা-মাধুর্য ও ভাষার প্রগাঢ় দখল অবধান করিয়াও কেহই কিন্তু বালকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উচ্চাশা পোষণ করেন নাই। স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সাধারণ মানদণ্ডে তাঁহার গৌরবতার অনেক কমিয়া গেল।

বড় দিদি সৌদামিনী দেবী হতাশা জানাইলেন—“রবির কিছুই হইল না” বলিয়া। কেহ কেহ অনুযোগ করিলেন, গুরুজনেরা তাঁহাকে তিরস্কার করা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। কেবল একজন তাঁহার আশা ছাড়িলেন না—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জ্যেষ্ঠ করিয়া রবিকে কোনো কাজ করানো যায় না, ইহাই তাঁহার প্রকৃতি। বত দিন তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ জরদস্তি করিয়া চালাইয়া লইবার পন্থাগুলি অনুসৃত হইতেছিল, তত দিন তাঁহার মন ছিল বেড়া ভাঙার দিকে; এমন স্বাধীনতা পাটয়া তিনি সাহিত্যের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যে অন্তঃপ্রেরণা তাঁহাকে কার্যে ব্রতী করিতে চাহিত, স্বল্প মন তাঁহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে বলিত, যে সব বিষয় জানিবার জ্ঞান, পড়িবার জ্ঞান তাঁহার আকুল আগ্রহ জন্মিত, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে সেসবের সামান্যই সন্ধান থাকায়, তথায় উপস্থিতির বাধাতায় সে সবই নষ্ট করিয়া দিত। ফল হইত এদিক ওদিক দুদিকের কোনোটা হইত না। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিল। এখন ইচ্ছামতো পঠন, ভ্রমণ সবই হইতে লাগিল; তবে মাষ্টার পণ্ডিত এখনো ছিল। এই সময়ে মেট্রোপলিট্যান ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্ট বঙ্কনাথ দে ও ঐ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শ্রী রামসর্ষ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

রামসর্ষ পণ্ডিত মহাশয় সেকালের নিয়মানুযায়ী শকুন্তলা প্রভৃতি নির্দিষ্ট কাব্য পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদ্ভট শ্লোক ও কোঁতুকজনক অনেক সংস্কৃত শ্লোকও ছাত্রকে মুখে মুখে শিখাইতেন। সে পরিচয় কবি ‘রাজা ও রাণী’তে দিয়াছেন। রাজা বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথোপকথনের মধ্যে দেবদত্ত প্রথমে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক শুরু করিতেই রাজা বাণা দেওয়ায় দেবদত্ত রতন করিয়া বলিলেন—

অনুস্বর ধনুঃধর নহে, মহারাজ,

কেবল টকাব মাত্র! হে বীর পুরুষ,

ভয় নাই! ভালো, আমি ভাষায় বলিব।

সংস্কৃতের ললিত বঙ্গানুবাদের জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা প্রসিক। রবীন্দ্রনাথও অসাধারণ সৃষ্টিনৈপুণ্যের অধিকারী যেমন, অনুবাদেও ভ্রাতাদের স্থায় তেমন অনগ্রসার্যণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বাহ্যিক কিছু পরিচয় বিক্রমের ভয়স্থান মূল সংস্কৃত বাক্যটি নিয়ে দিলাম—

শাস্ত্রঃ সৃষ্টিস্তিমমপি প্রতিচিন্তনীয়ঃ

স্বাধিতোহপি নৃপতিঃ পবিশঙ্কনীয়ঃ।

স্বাস্ত্রে স্থিতাপি রমণী পরিরক্ষণীয়া

শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কুতো বশিস্কম্।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “নবরত্নমালা” গ্রন্থে সরিষেশিত কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের রচনা রবীন্দ্রনাথকৃত ছন্দে অনুবাদ দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের ‘বাল্যকথা’ হইতে জানা যায় যে, যখন ‘নবনাটক’ গণেশ ও গুণেশের উত্তোগে ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত

হয় তখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার পণ্ডিতমণ্ডলীর নামসম্বলিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি নাট্যমঞ্চের শিরোভূষণ হইয়াছিল—

ধ্বস্তবিস্কপণকামরসিঃশঙ্কঃ

বেতালভট্টঘটকপর্বকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভাঃ

বহ্নানি বৈ বরকচির্নব বিক্রমশ্চ।

রবীন্দ্রনাথ বহুদিন সংসারে নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুধেশ্বর শিশুকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনিই জননীর ছোট ছেলে বলিয়া অত্যন্ত মাতুলস্নেহভাজন ছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বছরের রবিকে বাখিয়া মায়ের লোকান্তর গমনে রবির লালন-পালনের ভাব তাঁহার বড়দিক্কে লইতে হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের দরুণ সংসারের সহিত নিজের সংস্পর্শের কথা স্মরণ করিয়া পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, তিনি তখন সংসারে শেওলার মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। স্মরণ্য তিনি বহু মধ্য থাকিয়াও একা। এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থাই তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিয়াছিল। সঙ্গীতীন রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতির সহিত স্নাততাস্থাপনে যত্ববান হইয়াছিলেন, তেমনি পুস্তককেই সঙ্গী করিয়া পাঠে অধ্যবসায়ী ছিলেন। এই সকল কারণই তাঁহাকে নিজের রচনার মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিবার পথে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কিন্তু কেবল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনই একজন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ইহা ভগবৎ-কৃপা ও অলৌকিক প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। তাই কবি বলিয়াছেন যে ‘কবিতা ও লাজ’ ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের বাহির করা যায় না।

কবিতা রচনা চলিতে লাগিল। হোক তাহারা মাত্র উচ্ছ্বাসের আবেগ, হোক তাহারা কল্পনায় অপরিষ্কৃত প্রতিকৃতি, হোক তাহারা কাল্পনিক ছাত্রমুষ্টি, ভাবের বাহন ভাষার উপর কবির অধিকার স্বতই বর্ধিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের পারমাখিক কবিতা তিনিয়া মহর্ষি হাসিয়াছিলেন। ভারতমাতা সখদায় কবিতায় ‘নিকটের’ সহিত ‘শকটের’ মিল গুণেন্দ্রনাথ কোনো ক্রমেই মঞ্জুর করিতে না পারিয়া হাসির ঝড়ে কোন্ অজানা পথে সে শকট উড়াইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও কবির রচনা সমান ভাবে চলিতেছিল ও তিনি ক্রমশঃ বে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন তাহার পরিমাণ যে কত তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই—বতকণ-না জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সর্বোজ্জ্বলা’ নাটকের প্রক সংশোধনের সময়ে (১৮৭৫ সাল) রবীন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া জ্বররত পালনের দৃশ্বে জ্যোতিরিন্দ্র-লিখিত গল্প বক্তৃতার স্থানে একটি গীত সন্নিবেশ করিয়া দৃশ্যটির গাঢ়তা ও সামঞ্জস্য বক্ষা করিয়াছিলেন। গীতটি রবীন্দ্রনাথের অতি অল্প বয়সেই ও অত্যল্প সময়ে রচিত—

জল্ জল্ চিতা দ্বিধ্বং দ্বিধ্বং

পরাণ সর্পিণে বিদগা বালা।

ইহার পর রবিকে জৈয়দা (জ্যোতিদাদা) নিজের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। অতঃপর জৈয়দা পিয়ানো বাজাইয়া হিন্দী সুর ভাঙিয়া নানাবকন গৎ প্রস্তুত করিতেন। সেট সময়ে তাঁহার বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনে দুই পার্শ্বে বসিয়া সেট সকল গতের সুরে গান বাণিতেন; ইহাবই কালে জ্যোতিরিন্দ্রের



‘মানময়ী’ (পরে পুনর্নামকরণে নামে প্রকাশিত) গীতিনাট্যের সৃষ্টি। জ্যোতিবিন্দুনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও গানের ক্ষেত্রে কতকগুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। ইহাদের এত গান রচনার পদ্ধতিটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণত আগে গানের কথা রচিত হয়, পরে তাহাতে সুর সংযোগ হয়, ইহারা উল্টা দিকে আবর্ত করিলেন। আগে গং বা সুর প্রস্তুত হইত, তাবপর সেই সুরের উপযোগী ভাষা রচনা করিয়া গান রচিত হইত। সুনির্মাণ, ইহাই পশ্চিম-ভারতের অনুমোদিত প্রথা।

এইটাই ছিল ঠাকুরবাড়ীতে পরিবর্তনের যুগ। মর্ষি নিজে স্বাদেশিকতার অগ্রপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই সকলেই সেই ভাবে ভাবাম্বিত হইতেন। মর্ষি মাতৃভাষারও শ্রদ্ধা সাধনে বহুশীল ছিলেন। একবার তাঁহার কোনো আশ্রয় তাঁহাকে ইংরেজিতে পত্র দেওয়ার মতবি সেই পত্রখানি অপঠিত অবস্থায় ফেরৎ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—যে কোনো দেশের দুই জন লোক যখন এক জায়গায় জড়ো হয়, উপস্থিত থাকে, তখন তাহারা মাতৃভাষাতেই কথা কয়। স্বজাতীয়কে পর লিখিতে প্রত্যেক দেশবাসী মাতৃভাষা ব্যবহার করে। বাঙালী আশ্রয় বাঙ্গালীকে চিঠি দিবে অবশ্যই বাঙালী এবং তদানীন্তন পবাহুকরণকারী ‘চৈতন্য’ যখন স্বয়ং আশ্রয়কে ইংরেজিতে পত্র লিখিতেন, তখন সে সপান পাঠিলে মর্ষি দুঃখিত হইতেন। বেশভূষায়, সাহিত্যে, গানে, নাট্যে, চিত্রে, ধর্মে স্বাদেশিকতা ভিত্তি করিয়া সর্বপ্রকারে নানারূপ পরিবর্তন চলিতেছিল। ‘জ্যাণ্ডাল নবগোপাল’ নামে খ্যাত নবগোপাল মিত্র বাঙ্গালার বসুমতী পত্রিকার বাস্তবে পরিণত করিবার নিমিত্ত যে ‘চৈতন্য’ (পরে নাম হয় হিন্দু মেলা) স্থাপিত করিয়া স্বদেশী শিল্পে নূতন প্রাণ জাগাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠাকুরবাড়ী সর্বতোভাবে তাহার সহায়তা করিতেছিল। সকল অর্থহীন ও প্রতিষ্ঠানের নামের সহিতই ‘জ্যাণ্ডাল’ (জাতীয়) আখ্যা প্রদান করতেন বলিয়া লোক তাঁহাকে ‘জ্যাণ্ডাল নবগোপাল’ বলিত। আর তিনি পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের সংঘবদ্ধ করিয়া জিম্জিমাটিক চর্চায় আগ্রহ করিয়াছিলেন ও সর্বদা বহুভাষা ব্যায়ামের উপযোগিতা বোঝা করিতেন। তাই তাঁহাকে Father of physical culture in Bengal বলিত। বাঙালীর কর্তৃৎ স্বা-পুরুষ মিলিত বাঙ্গালী খেলাধুলার সাহায্যে তিনি সার্বসং দল গঠন করেন, সেসকল তাঁহাকে বাঙালী সার্বসং প্রবর্তক বলা চলে। তিনি একটি অশ্বশালা রাখিয়া বোড়ায় চড়া শিবিরের ‘স্টাডিং স্কুয়’ করেন। সেখানে বিলাত যাত্রার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্বশালায় অভ্যাস করেন। নবগোপাল পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি স্টাডিসেন্স অফিসাররূপে বহু দিন কার্য করিয়াছিলেন।

এদিকে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদামিনী দেবী বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সায়া, শেমিজ, জ্যাকেট প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্গ মহিলার বেশভূষার মনোহর পরিবর্তন আনয়ন করিতেছিলেন। আবার ওদিকে ‘নবনাটকের’ অভিনয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাবে অভিনেতাদের পোশাক পরাইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ করান, সেই ভাবেই পোশাক পরিধানের যেওয়াজ বাঙালীর ক্রমে ক্রমে বাঙালী পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া যায়।

জ্যোতিবিন্দুনাথ দৃঢ়কারে যুগান্তের আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন যুগের মাথখানে আসিয়া পড়ায় তাঁহার ক্ষমতা ও শিক্ষা হইতেছিল নানা বকমে। এই সময়ে তাঁহার

রচনা শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত ‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবিশ্ব’ এবং বিহারীলালের ‘অবোধবন্ধু’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার গজ রচনা ‘ব্রহ্মনামোহিনী প্রতিভার সমালোচনা’ ও ‘জ্ঞানাকুর’ প্রথম বাতির হইয়াছিল। জ্ঞানাকুরে যে বোণা বাজিয়াছিল তাহা আর বন্ধ হইল না, তাহা মধুগুহর হইয়া থাকত। ইহার পরেই জ্যোতিবিন্দুর পত্রিকার দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ‘ভারতী’ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন ইহাও লেখকদের এক জন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র বোলে। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাদবধ সমালোচনা’ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ সমালোচকের সহিত একমত না হওয়ায় পাদটীকার নানাবিধ মন্তব্য করেন। ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের অব্যাহতি হয় নাই। বোম্বেনাথ চূড়ামণি একটি স্বতন্ত্র পত্রিকায় (ভারতী ও মেঘনাদবধ) প্রতিবাদ ও আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরে জীবন ১২৮৪ হইতে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ, বাইশটি কবিতা, ছয়টি সমালোচনা, প্রথম উপজ্ঞাস ‘করুণার’ কিয়দংশ, ‘জিয়ারী’ নামক বড় গল্প ও ‘কবিকাহিনী’ কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা মিত্র ঐ পত্রিকায় ‘সম্পাদকীয় বৈঠক’-এ তাঁহার অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। কবির পুস্তকাকারে মুদ্রিত প্রথম রচনা মধ্যম্বে কেহ বলেন ‘কাল মুগ্ধা’ গীতিনাট্য, কেহ বলেন ‘বনফুল’ কাব্য উপজ্ঞাস, কিন্তু কবি নিজে বলিতেন যে যখন তিনি অমেরাবাদে তাঁহার মেজদাদ সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রথম বৎসরের ভারতী হইতে ‘কবিকাহিনী’ পুনর্মুদ্রিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ১২৮৫ সালের কথা। পুস্তকাকারে মুদ্রিত ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ইহার পূর্বে কবির ‘দ্বুতরাষ্ট্র বিলাপ’ কবিতা চৈতন্যের প্রকাশ সভায় তাঁহার মেজদাদ সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয় এবং চৈতন্যের উপহাররূপে আর একটি লম্বা কবিতা তাঁহার নামে মুদ্রিত হইয়া বিতরণিত হয়। কবির প্রথম উপজ্ঞাস ‘করুণা’ কোনো দিন সম্পূর্ণ না হওয়ায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় পুস্তক ‘বনফুল’ ১২৮৬ সালে ‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবিশ্ব’ (রাজসাহা) হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ জ্ঞান, সোমেন্দ্র বিকৃত-মস্তিক ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার একটি গীত নিয়ে উদ্বৃত্ত করিয়া দিলাম—

ললিত আড়ালকা

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার

তবঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার।

অসীমের ভাব বত

হৃদয়ে আনিবে তত

ক্ষুদ্র ভূগটির মত দেখিবে সঁসার।

কম বড় বয়ে যাবে

হৃদয় অটল হবে

কি ভয় কি ভয় তবে ?

অতিক্রমি দুঃখ-শোক

অনন্ত অনন্ত লোক

নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।

সত্যেন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্য ভাবধারার মধ্যে বর্ধিত হইয়া ও সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া স্নেহাভিষিক্ত থাকায় তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রথম উন্মেষ ও কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার রচনাবলীকে এক প্রকার পারিবারিক সাহিত্য বলা চলিতে পারে। এই প্রতিভা বিকাশের দ্বিতীয় স্তর পরে দেখানো হইতেছে। [ ক্রমশঃ।

# তামসী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জ্বরাসক্ত

ক'দিন পরে সকালের ডাক দেখতে গিয়ে একটু আশ্চর্যই হলেন

তালুকদার। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তাঁর বড় একটা থাকে না।

আজ একেবারে একসঙ্গে দু'খানা। একখানা লিখেছেন দেবতোষ—কোলকাতায় এসে আস্তানা নিয়েছি। ক'দিনের মধ্যেই দক্ষিণাত্য অভিযান শুরু করবো, এই বকম সন্দিগ্ধ আছে। শুধু পুরী ওয়ালটেরার নয়, মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম পক্ষিতীর্থম, চাই কি বামেশ্বরম পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারি, মা-ও হয়তো সঙ্গে যাবেন। অর্থাৎ দস্তরমত তীর্থ পরিক্রমা। কবে ফিরবো, জানি না। মা আপনার কথা প্রায়ই বলেন—ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিখানা পড়ে চিন্তার ছায়া পড়ল মহেশের মুখে। খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তার পর প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন।

দিন চারেক পরে সকালের দিকে ওদের বাসায় যখন পৌঁছলেন তালুকদার, দেবতোষ ঘরেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, ধাপারটা কি বলুন তো দাদা! পর পর দু'খানা চিঠি! তালুকদার বললেন, একখানায় ভরসা হল না। যদি হঠাৎ ফসুকে যায়? একটা জ্বরী কাজে বেরোতে হবে তোমাকে নিয়ে। তোমার তীর্থযাত্রা হয়তো দু-চারদিন পেছিয়ে যেতে পারে।

দেবতোষ কিছু বলবার আগেই সুলোচনা এসে পড়লেন। এইমাত্র পূজার ঘর থেকে বেরিয়েছেন। শাস্ত সমাহিত মুখখানার উপর একটি শুচিস্ত্র তন্নয়তা তখনো যেন লেগে রয়েছে। মহেশ উঠে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, বসো বাবা, আগে তোমার খাবারটা নিয়ে আসি। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। দেখি হবে না। তালুকদার বললেন, খাবারটা এখন থাক মা! ওটা বরং ফিরে এসে ধীর-স্থস্থ হবে। তার আগে, অনুমতি করেন তো আপনার এই ছেলেটিকে একটু খাটিয়ে নিয়ে আসি।

—সেজ্ঞে আবার অনুমতি কিসের বাবা? তুমি বড় ভাই; দরকার হলে ওর কান ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে বলতে হবে কেন?

দেবতোষ গভীর ভাবে বললেন, ধরতে হলে বাঁ কানটা ধরবেন, দাদা!

—কেন, ডানটা কি অপরাধ করল?

—ওটা মা আর নিতাই পণ্ডিত মশাই দু'জনে মিলে এত টেনেছেন যে আঠারো বছরেও তার ব্যথা মরেনি।

মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

বেরোবার মুখে সুলোচনা বললেন, তুমি কোথায় উঠেছ, মহেশ?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে তালুকদার বললেন, যেখানেই উঠি, ছপুরবেলা মায়ের প্রসাদ পেয়ে তবে যাবো। সেজ্ঞে ভাববেন না।

সুলোচনা খুসী হয়ে বললেন, কিন্তু ফিরতে যেন অনেক দেরি করে ফেলো না।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। শিয়ালদ ষ্টেশনে বেলে চড়ে ওরা নামলেন এসে বেলঘরিয়ায়। সেগান থেকে রিক্সা নিয়ে খানিক বাদে গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়লেন। খুলে দিল একটা চকিশ-পঁচিশ বছরের বিধবা মেয়ে। ওঁরা ভিতরে ঢুকতেই প্রণাম করে মহেশের পায়ের ধূলো নিল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে শাস্তি?

—জ্বরটা একভাবেই চলছে।

—চলো, দেখে আসি।

পাশেই একখানা ছোট ঘর। তক্তাপোলের উপর একটি মেয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে। বয়স বোধ হয় সাতাশ, আটাশ। রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ। মাথার কাছে বসে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। পায়ের দিকটায় একখানা টুলের উপর বসে একজন বয়ীসদা। মহেশ বাবুকে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল এক ছোট মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ডাক্তার কুগীর দিকে তাকিয়েছিলেন; মহেশ ইরাজিতে বললেন, এই মেয়েটির চিকিৎসার ভার তোমাকে নিতে হবে, দেবতোষ! এই জ্ঞেই তোমাকে নিয়ে আসা। কই, উমা কোথায় গেল?

—এই যে, বাই, বলে এগিয়ে এল সেই বিধবা মেয়েটি।

তালুকদার বললেন, ইনি ডাক্তার। যা জিজ্ঞেস টিক্তস করেন, সব বুঝিয়ে দাও। এখন থেকে উনিই ওকে দেখবেন। তুমি তা হলে যা দেখবার দেখে নাও দেবতোষ! তার পর কথা হবে। আমি ওদিকে আছি।

রোগিণীকে মোটামুটি পরীক্ষা করবার পর ডাক্তারকে ভিতরের দিকের বারান্দায় মহেশ বাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একটা মোড়ার উপর তিনি বসে আছেন, আর তাঁর সামনে দেয়ালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটটি নানা বয়সের মেয়ে। সকলের

পরনেই মোটা তাঁতের নাড়ি, আর তাঁত-বোনা ছিটের তৈরি জামা। পাশে একটা খালি নোড়া পড়েছিল। তার উপর দেবতাকে বলতে বলে মত্রে প্রার্থনা করলেন, কেমন দেখলে তোমার কণী?

—টাইফয়েড বলতে মনে হচ্ছে। একটা প্লাইড না নিয়ে ঠিক বলতে পারছি নে। আগে জানলে ও সব সরঞ্জাম নিয়েই যেত।

—আমার কি সে সব পেয়ালা ছিল?

উমা বলল, আনান্দেব ডাক্তার বাবুকে খবর দিলে রক্ত নেবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন।

—তিনি এখনো রক্ত নেননি? একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো দেবতায়।

—না। বলে গেছেন, অগা ডাক্তার এসে রক্ত নিতে চাইলে, যা কিছু দরকার পাঠিয়ে দেবেন।

তালুকদার বললেন, তিনি হচ্ছেন তোমিও। তোমাদের এই সব রক্তাক্তির মধ্যে নেই।

—তিনিই বুঝি দেখছিলেন? জানতে চাইলেন দেবতায়। তালুকদার বললেন, হ্যাঁ। তাঁর গুণে বিশেষ কাজ হল না দেখে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই খবর পেয়েই তো তোমাকে নিয়ে এসাম।

তোমিও ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল। তালুকদার বললেন, ততক্ষণ চল, তোমাকে সবটা ঘিরিয়ে নিয়ে আসি।

বারান্দার কোলে উঠান। তার ধার ঘেঁসে একখানা লম্বা ধরণের টিনের চালা। এক দিকে খান চাবেক তাঁত আর তার সরঞ্জাম, আর এক দিকে দুটো সেলাই-এর কল। কোণের দিকে উল বোনার সরঞ্জাম। তাঁতগুলোতে টানা চড়ানো। লোয়ালে, গামছা বিছানার চাদর, আর একটাতে মনে হল সাড়ী। মেশিন দুটোতে আটকে আছে আধ-সেলাই জামা। দেখে বোঝা যায় সব গুলোতেই কাজ চলছিল। বার করছিল, এই মাত্র ঐ পেছে। পাঁচিলের ধারে একটা ছোট চালায় দুটা ঢেঁকি। একটা ও ধান ভানা হচ্ছে। তার সামনে গোব-নিকানো আগুনার বসে একটি বুড়ী ডালের বাড়ি দিচ্ছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। একটি মেয়ে কানে কানে কী বলতেই আনন্দে কলরব করে উঠল, কৈ, কৈ, আমার বাবা কোথায়? আগ কত দিন দেখিনি। মেয়েটি আবার ফিস-ফিস করে কি বলল। বুড়ী খুঁী হয়ে বুকে পড়ল আগের কাজে।

খিড়কির দরজা পার হয়ে ওঁরা পড়লেন গিয়ে বাগানে। কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিঘে তিনেক ভূমি। ছোট ছোট গুট করে শাক-সবজির চাষ হচ্ছে। বেগুন কুমড়া, লাউ-এর মাটা। একখানা ক্ষেতে দুটি মেয়ে পুঁই-এর চারা লাগাচ্ছে।

তালুকদার চলতে চলতে দু-একটা কথা বলছিলেন। দেবতায় শুধু দেখছিলেন বিষয়বিমুগ্ন চোখ মেলে। বারান্দার ফিরে এসে বসতেই উমা একখানা খালি উপর দু'গেলাস ডাবের জল নিয়ে ধরল ওঁদের সামনে।

তালুকদার বললেন, তোমাদের নতুন গাছের ডাব বুঝি?

—হ্যাঁ এই প্রথম পাড়া হল।

—কাকে দিয়ে পাড়ালে?

উমা জবাব দিল না। দেবতায় লক্ষ্য করলেন, লজ্জা-হাসিতে

তার মুখখানা ভরে উঠেছে। বোঝা গেল, কাজটি সে নিজেই করেছে, কিংবা ওর মত কাজকে দিয়ে করিয়েছে। যে মেয়েটি কণীর মাথায় হাওয়া করছিল বেরিয়ে এসে বলল, শাস্তিদি' আপনাকে একবার ডাকছে, কাকাবাবু।

তালুকদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, চল যাচ্ছি।

ওঁরা দুজনেই উঠে এলেন। কাছে এসে দাঁড়াতেই কম্পিত হাতখানা ধীরে ধীরে খাটের পাশ দিয়ে নানিয়ে দিল শাস্তি। মহেশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, থাক থাক। অশুখের মধ্যে কি প্রণাম করতে আছে? আমি এমনই তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তাড়াহাড়ি সেরে ওঁরা।

শাস্তি ফীপ কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, আমি আর বাঁচবো না, কাকাবাবু!

—পাগল! তাহলে এদের দেখবে কে? এই তো ডাক্তার বলছেন, ভয় পাবার মত কিছুই হয়নি। শুধু অতিরিক্ত খেটে আর অনিয়ম করে করে গই অশুখ ডেকে এনছ।

শাস্তি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। অতি কণ্ঠে হাতখানা কপালে ঠিকিয়ে কী একটা বলতে গেল। দেবতায় এগিয়ে এসে হাতটা ধরে ফেললেন, থাক আর কথা বলবেন না। নিয়মিত গুণ পত্র খেলে ক'দিনেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

শাস্তির চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

কিরবাব পথে পাশাপাশি বিজয় বসে দু'জনেই অনেকক্ষণ নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে রইলেন। ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে প্রথম মৌন ভঙ্গ করলেন তালুকদার। বললেন, মেয়েটাকে টেনে তুলতে সময় লাগবে। কি বল?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

—তাহলে? তোমার তীর্থ যে সিকের উঠল।

দেবতায় হেসে উঠলেন।

—ও কি, হাসলে যে?

—হাসবার কথা যে, দাদা! এত দিন কোনো কাজেই তে' আপনার লাগিনি। কখনো লাগতে পারি, সে আশাও কোনো কালে ছিল না। আজ যদি হঠাৎ সে সুযোগ এসে থাকে, তার চেয়ে তীর্থের নাম করে টো-টো করে বোরাটাই কি আমায় বড় হল?

—শুধু তোমার কথা নয়, মার কথাও ভাবছি।

—মা তো যাচ্ছিলেন শুধু আমাকে আগলাবার জগে।

—কি রকম?

—কি জানি? ওঁর হঠাৎ মনে হল আমাকে এবার কাছে কাছে রাখা দরকার।

মহেশ ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ডাক্তার মুহু হেসে বললেন, আমার বে' একটা কাজ চলে গেল, এতে বোধ হ' উনি খুশীই হবেন। আমাকে নিয়ে আজ-কাল ওঁর বেজায় ভাবনা বলে জোরে হেসে উঠলেন।

তালুকদার যোগ দিলেন না। চিন্তিত মুখে মাথা নে' বললেন হ'।

গেলের কামরায় একদম ভিড় নেই। হ' জনে আবার গি' বললেন পাশাপাশি। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক'দি আছেন তো?

—কেন? আর থাকবার দরকারটা কি?

—আমার দিক থেকে কোনো দরকার নেই। পেশেন্ট আমি একলাই সামলাতে পারবো। Blood reportটা যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে পাওয়া যায়, কাল সকালেই আবার যেতে হবে। আশ্রমের নাম-টাম তো দেখলাম না। বাড়িটা আবার চিনতে পারবো তো?

—আশ্রম কা'কে বলছ?

—তবে কা' দেপে? এলাম? তোম-টোম জাতীর কিছু? ইংরেজিতে বাক্যে তোম বলে, 'আশ্রম' হল তাই বালা নাম।

—না তোমও নয়, আশ্রমও নয়। বলতে পার আশ্রয়। ওরা সব Ex-Convicts.

—Ex-Convicts! ডাক্তারের চোখ দু'টো বিষয়ে বিস্তৃত হল।

—হ্যাঁ। তোমার আমার মত ভদ্রঘরেই ওদের জন্ম। সেটাইনেই মাহুষ। তার পর একদিন ছিটকে এসে পড়ল জেলখানায়। কিন্তু জান তো, আমাদের দেশে বারো মেয়েমানুষ হয়ে জন্মায়, তারা যদি কোনো কারণে এক বার ঘরের বাইরে এসে পড়ে, সে আর ফিরে যেতে পারে না। সেরোবার বাস্তব আছে, চুকবার দরজা নেই। ওরাও তাই আর ঘরে ফিরতে পারেনি। যে গিয়েছিল সেও জায়গা পায়নি। এমন আরো কত আছে! কে তার খোঁজ রাখে?

শেষের কাঁটি কথায় কেমন একটা উদাস সুর লেগে বইল। পাড়ার বাইরে রৌদ্রলীলা মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তালুকদার। ডাক্তার একটি ফুর্স কর্তে বললেন, এদের কথা তো কোনো দিন বলেন নি, দাদা!

—তখন কোনো উপলক্ষ হয়নি। আর, বলবার মত আছেই বা কা? তবে এবার যখন তোনাকে এম মধ্যে আসতে হল, তখন শুনেব বৈ কি? সব কথাই বলবো।

তালুকদার যে মেসটাতে উঠছিলেন, দেবতায় নিজে গিয়ে সেখানে থেকে ঠর বিছানা আর স্টকেসটা নিয়ে এলেন। কোনো আপত্তি শুনলেন না। দোতলার বারান্দায় একটি সম্মুখ পাট-ভাড়া মন্তরক্ষি বিড়িয়ে বেঁধেছিলেন স্ত্রীলোচনা। তার উপরে দু'টি খালর দেওয়া তাকিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর হুঁজনে সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠলেন, এঃ মস্ত ভুল হয়ে গেছে দাদা! আপনার সিগারেট তো আনা হয়নি?

তালুকদার পকেটে হাত দিয়ে বললেন, তোমার ভরসা করে তো আসিনি, যে ভয় দেখাচ্ছ। আমার সবল আমার সাথেই থাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ধোঁয়ার রস তো পেলে না, ভায়া! এম কা বস্তু, জানবে কেনন করে?—বলে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। ডাক্তার কা একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর মনে হল সেই হিংস্রলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যেন তাইই মধ্যে উনি নিবিষ্ট হয়ে গেছেন। এমন করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। তা'পর গলাটা এক বার পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তালুকদার, আজ থেকে তের বছর আগেকার কথা। নতুন প্রমোশন পেয়েছি—ডেপুটি থেকে পুরোপুরি জেলার। ছোটখাটো একটা জায়গায় থাকতে পারো, এই আশাই করেছিলাম। হঠাৎ দু'ম করে বদলি করে দিল একটা মস্ত বড় ফার্স্ট ক্লাস ডিস্ট্রিক্ট জেলে, সেখানে বস্কাট লেগেই আছে। বড় দায়িত্ব পেলাম। সরকারের উপর কৃতজ্ঞ হবার কথা।

কিন্তু আমার হল প্রাণান্ত। সারা দিনরাত খেটে কুল পাই না। যখন বাসায় ফিরি, দেখে সাড় নেই, মন থাকে খিচড়ে। ঘরে মীরা একা। তার সঙ্গে কোন দিন হুঁ একটা কথা হয়, কোনো দিন হয় না। ছেলে দুটো ছোট ছোট। তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না। বাইরে স্বস্তি নেই, ঘরে শান্তি নেই। এমন করে দিন যায়। এমন সময় এক দিন জেলে একটি নতুন কয়েদীর আমদানি হল। মেয়েমানুষ। কিন্তু গেটে এসে যখন দাঁড়াল, মনে হল এক বলক হলন্ত আঙন। আঙনের অনেক রূপ। কখনো সে তুলসীতলার সন্ধানীপ, কখনো দেওয়ালির আলোকমালা, কখনো আবার সর্গদাসী দাবানল। মেয়েমানুষের রূপটাও বোধ হয় অগ্নিধর্মী। কেউ মঙ্গল-প্রদীপ, কেউ আলোয়া কেউ বা প্রণয়ের মণাল। এই মেয়েটাকে বোধ হয় শেষের দলে ফেলা চলে। নাম কল্যাণী। কিন্তু ঘরে বাইরে অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই সে দিয়ে যায়নি। সে দোষ অবিস্তি তার নয়। দোষ যদি কারো হয়ে থাকে, সে তার বিধাতার, যিনি সেই হতভাগীর সর্বাঙ্গে অসহ্য রূপের শিখা ছালিয়ে এমন ঘরে এমন পরিবেশে তাকে পাঠিয়ে দিলেন; যেখানে ঐটাই হল তার অভিযাপ। কে জানে এটা তাঁর খেয়াল না কৌতুক!

নিভান্ত পাড়াগাঁয়ে গরীবের ঘরে জন্ম। তার এক প্রতিবেশীর কাছে শুনেছি, বছর দশেক বয়স হতেই ওর বাপ-মা ওর ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ করে দিলেন। তাকে দেখলেই নাকি পাড়ার ছেলে-বুড়োর মাথা ঘুরে যেত। তার পর স্কুল হল বিয়ের চেষ্টা। ভালো ঘর জুটবে কা? ঝারাই দেখতে আসে ভর পেয়ে যায় ঐ রূপ দেখে। পাড়ার গিন্নীরা বলাবলি করতেন, মেয়েমানুষের অত রূপ ভালো নয়। ওদের কপালে দুঃখ আছে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। এক জন ইংরেজ কবি পৃথিবীশুদ্ধ স্মরণী নারীদের সম্বন্ধে ঐ বকম একটা মন্তব্য করে গেছেন। যাক সে কথা। শেষ পর্যন্ত কল্যাণীর বর জুটল। অনেক দূরে ঐ বকম এক পাড়াগাঁয়ে। কনের বয়স পনেরো মৌলো। বর তিরিশ-বত্রিশ। গ্রামের হাটখোলায় একটা মুদি দোকান আগলায়, কোনো বকমে সম্ভার চলে।

বিয়ের পরে দেখা গেল, বর বেচারী দোকান ফেলে বাড়িতেই ঘু-ঘুর করছে। অভিভাবকেরা প্রমাদ গণলেন। পাড়ার হুঁ-চারজন মুকুরি গোছের লোক পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে দিনেশে পাঠাও চাকরি করতে। তাদের গায়ে আঙনের আঁচ লেগেছিল। মতকুমা সহরে চাকরিও একটা জুটিয়ে দিলেন তাদের মধ্যে কে এক জন। তার পর স্কুল হল নানা বকম পতঙ্গের আনাগোনা। বৌ পুকুরে নাইতে গেলে সেখানে ছিপ ফেলবার হিড়িক পড়ে; মন্দিরে গেলে সেদিন গ্রামশুদ্ধ লোকের ভক্তি উথলে ওঠে। অন্ধকার রাতে ঘরের পেছনে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়; বাসন মাজতে গেলে গায়ে এসে পড়ে উড়ো চিঠি। স্বস্তর-শান্ত্রী জানতে পারলেন, এবং সব কিছুর জন্তে বোকেই দায়ী হতে হল। স্বামী বেচারী মাঝে মাঝে আসে। শোনে সবই। কিন্তু সে নিকৃপায়। কোন এক মুকুরির কাছে পাড়তে গিয়েছিল কথাটা। ধনক পেয়ে চলে গেল চাকরিস্থলে।

এদিকে যত দিন যায়, বৌএর দিকে আর তাকানো যায় না। পেট ভরে ডাল-ভাতও জোটে না, তবু কঁপে-কুলে উঠছে স্বাস্থ্যের জোয়ার। একটি শিশু যদি আসত ওর কোলে, হয়তো ওরই মধ্যে দেখা দিত একটুখানি তাঁটার টান। কিন্তু তার কোনো

লক্ষণ নেই। পতঙ্গের দল বেড়েই চলেছে। তারই মধ্যে একটি একেবারে সোজানুজি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বসল। অর্থাৎ গভীর রাতে ঝাঁপের বেড়া কেটে চুকে পড়ল ওর শোবার ঘরে। গায়ে হাত দিতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে উঠল না, চোঁচামিচি করে লোক জড়ো করবার চেষ্টাও করল না। বালিশের নিচে থাকত একটা ধারালো কাটা। আস্তে আস্তে উঠে অন্ধকারে বসিয়ে দিল কোপ। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার আর একটা ভারী জ্বিনিস পড়ে যাবার শব্দ। এই টুকুই তার মনে আছে। তার পর কী হল সে জানে না। জানাবার মত অবস্থা যখন হল, চোখ খুলতেই দেখল বরোন্দার এক কোণে পড়ে আছে, জ্বব জ্বব করছে চুলের বোঝা, আর চারদিকে গিজগিজ করছে লোক। পড়মড় করে উঠে বসতেই চোখে পড়ল উঠানের এক কোণে পড়ে আছে একটা লাশ। কাঁধের আঁকেকটা নেমে গেছে, গলাটা ঝুলে পড়েছে এক পাশে, তবু চিনতে কষ্ট হল না। প্রবীণ ব্যক্তি, গ্রাম্য সম্পর্কে ভাস্কর হন কল্যাণীর।

তার পর যা হয়ে থাকে। খানা, পুলিশ, উকিল মোক্তার, হাকিম, আদালত, শেষ পর্যন্ত আমার জেলখানা। দেবতোগ আপত্তি জানানেন কিন্তু এ কেস-এ তো তার জেল হবার কথা নয়। সে যে মেয়ে; খুন যদি করে থাকে আত্মরক্ষার জন্তেই করেছে।

তালুকদার বললেন, তুমি তো বলছ আত্মরক্ষা, সাক্ষীরা তা বলল কই? গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তির দল বেঁধে হলপ করে বলে এল, মেয়েটার চরিত্র খারাপ। নিয়মিত খদ্দের ছিল জন কতক; ভাস্কর ছিলেন পথের কাঁটা, তাই তাদেরই একজনের সঙ্গে সড় করে বোচারাকে ডাকিয়ে এনে খুন করেছে। হাকিমও বোধ হয় আগুন দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। তাই ছেড়েও দিলেন না কীসি দীপাস্তবও দিলেন না। ৩২৬ ধারায় দু'বছর জেল দিয়ে শাস্তি আর কুড় ছুটাই বজায় রাখলেন।

জেলে আসবার পরদিন সে নিজেকে তুকে গেল ঢেঁকিশালে। ভদ্রঘরের রূপসী তরুণী; সেলাই টেলাই গোছের একটা নরম কাজ দিতে চেয়েছিলাম। রাজী হল না। বলে বসল, ও সব করতে গেলে গতির থাকবে কেন? ফিরে গিয়ে আবার তো সেই ঢেঁকিই ধরতে হবে। কিন্তু জেল থেকে ফিরবার পর ঢেঁকি-ঘরটাও যে খালি পাওয়া যায় না, সে কথা তখনো জানতে পারেনি কল্যাণী।

ষত দিন জেলে ছিল, খোঁজ-খবর কেউ নেয়নি। চিঠিও দেয়নি, দেখা করতেও আসেনি। যেদিন খালাস হল, খোঁজকী, পথখরচ আর ক্লড মার্টিন ফাণ্ড থেকে সামান্য কিছু বখসিস দিয়ে একটি মেয়েছেলের সঙ্গে ওকে স্বস্তরবাড়িতেই পাঠিয়ে দিলাম। এসকট ওকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল।

তার দিন তিনেক পর রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরছি। দেখলাম সদর দরজার পাশে অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম কে? মাথা তুলে বলল, আমি কল্যাণী।

—তুমি এখানে?

—কোথায় যাবো! ওরা ঘরে নিল না, মেয়ে-ঘরে তাড়িয়ে দিল।

—বাপের বাড়ি গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম। মা নেই; বাবা রাখতে চাইলেন না।

তার পর যা বলল, তার মানে, আশ্রয় দিতে রাজী ছিল অনেকেই, পাঁড়াপীড়িও করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু সে যে কী আশ্রয় সেটা বুঝতে পেরে সেখানে আর দাঁড়ায়নি।

ওকে নীচে বসতে বলে উপরে গেলাম। মৌর্য ক'দিন থেকে ঘরে ভুগছিল। সেই দিনই ছুটো পথ্য পেয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আবার নেমে এসাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম হাঁড়িতে সামান্য কিছু ভাত-তরকারী পড়ে আছে। তাই বেড়ে দিতে বললাম। কল্যাণী যেন তৈরি হয়েই ছিল। বলবার অপেক্ষাও রাখল না। খাওয়ার ধরণ দেখে চাকরটারও বুঝতে অসুবিধা হল না যে অন্ততঃ দু'দিন কোথাও কিছু জোটেনি। তার পর চাকরকে সিপাইদের গারদে শুতে পাঠিয়ে, তারই ঘরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সদর বন্ধ করে উপরে উঠে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই মৌর্যকে সব খুলে বললাম। সে খানিকটা চূপ করে থেকে শুধু বলল, আমাকে এক বার ডাকলেই পারতে।

বললাম, বড্ড গুমোচ্ছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করিনি।

নিচে এসে দেখলাম কল্যাণী এরই মধ্যে স্নান সেরে এক রাশ ভিজ্জ চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেছে, যেন এ বাড়িতে সে নতুন আসে নি; এটাই তার নিজের সংসার। আমাকে দেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল একটু দাঁড়ান, দাদা! অর্থাৎ সঞ্চও একটা পাতিয়ে ফেলেছে রাতারাতি। আমি ফিরে দাঁড়াতেই এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বললাম, কী হল? হঠাৎ প্রণাম করছ যে? তেমনি মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনি যে ক'টা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে একখানা কাপড় কিনেছি। নতুন কাপড় পরে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়।

এবার নজরে পড়ল, তার পরনে একখানা লালপেড়ে নতুন সাড়ী। বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এসব কী করছ তুমি?

—কী সব! বলে মুখ তুলে তাকাল।

রান্নাঘরের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছিল। সেই দিকটার আঙ্গুল দেখলাম। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, বাঃ, আমি থাকতে ও বাঁধবে কেন? ব্যাটা ছেলে রান্নার কী জানে! “ব্যাটা-ছেলে,” মানে আমার চাকরটি দেখলাম বেজায় খুসী। নিজের অধিকার সানন্দে ছেড়ে দিয়ে দিদিমণির ফাইফরমাজ খাটতেই ব্যস্ত।

কল্যাণী বলে উঠল, বৌদি কোথায়, দাদা? শুনলাম, তাঁর অসুখ। ওপরে যেতে পারি? আর কেউ নেই তো? চাকরকে দিয়েই ওকে উপরে পাঠিয়ে দিলাম। তার আগে ওর স্বামীর আঃ বাপের ঠিকানাটা জেনে নিলাম। ও হেসে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী হবে? চিঠি লিখবেন তো? ওরা কেউ আসবে না।

দু'দিনও লাগল না। আমার সংসারের সব ভার চলে গেছে কল্যাণীর হাতে। এমন অনায়াসে যে আমরা কেউ জানতে পারলাম না। ছেলে ছটাকে শিখিয়ে দিল, আমি তোমাদের পিসী এক দিনের মধ্যে তারা ওর ছাওটা হয়ে গেল। তাদের খাওয়াতে পরানো, ইস্কাপে পাঠানো, মৌর্যের সেবা-স্বস্তি ওষুধ-পথ্য, তা উপরে রান্নাবান্না—সারা দিন যেন চরকির মত ঘুরছে। এ বার উপর থেকে নিচে, আবার নিচে থেকে উপরে। দিনে-রা:



দুবেলাই আমার ফিরতে দেয়ি হয়। মীরাকে তার আগেই খাইয়ে দেয়। কোনো আপত্তি শোনে না। তার পর আমি এলে খালা সাজিয়ে ধরে দেয়, পাখা নিয়ে সামনে বসে। কোন জিনিষ ফেলে রাখবার উপায় নেই।

কিছু আশুন চাপা থাকে না। তাকে বেঁধেও রাখা যায় না। পতঙ্গ মহলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুরুষ নয়, এক ধরণের স্ত্রী-পতঙ্গ। যে সব শুভাকাঙ্ক্ষিনী প্রতিবেশিনীর দল নিতান্ত দুঃসময়েও কোনো দিন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ান নি, তাঁরা এসে যখন তখন ভিড় করতে লাগলেন। আমার কুয়া স্ত্রীর জন্তে তাদের দরদ উথলে উঠল। কত উপদেশ, কত শাস্ত্রবচন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপলক্ষ্য ঐ একটি। একদিন বিকেলে আফিসে বেরোচ্ছি, মৌরার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এল, একজন বয়সী মহিলা বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন, জান তো মা, যি আর আশুন পাশাপাশি থাকলে প্রলয় ঘটতে কতক্ষণ! এখন শত্রু না হলে পরে আর কৈদেও কুল পাবে না।

সব শুনলাম, সব দেখলাম। মৌরার মুখে হাসি নেই, চোখে কিসের যেন ছায়া। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওয়ুধ, পথ্য বহু আত্তি, কোনো কাজে লাগছে না। এদিকে কল্যাণীর কথাই ঠিক হল। তার পিতৃকূল এবং শশুরকূল কোনো দিক থেকেই কেউ উচ্চবাচ্য করল না। যে-সব বেসকু-হোম বা অবলা আশ্রম-টাশ্রমের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করেছিলাম, বার বার লেখালেখি করেও কারও কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। কল্যাণীর মামলা চলবার সময় একজন স্থানীয় সাপ্তাহিক কাগজের তরুণ সম্পাদক তার বীরত্বের প্রশংসা করে তিন-কলম ছালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার শরণ নিলাম। তিনি একবার ওকে নেগতে চাইলেন, সাংবাদিক পরিভাষার বার নাম ইনটারভিউ। উদ্দেশ্য বোধ হয় যাচাই করা, কল্পনার বীরঙ্গনার সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি! কল্যাণীর সঙ্গে সম্পাদক মশায়ের যোগাযোগ ঘটরে দিলাম। তার পর তিনি এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ প্রার্থনা শুরু করলেন যে কল্যাণীকে আর তার সামনে বেরোতে রাজী করানো গেল না।

মৌরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত ওর কোনো ব্যবস্থা হল কিনা। কিছু দিন থেকে প্রশ্নটা বড় ঘন ঘন আসতে লাগল। একদিন সবে আফিস থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছি। শুকনো মুখে এসে বলল, কল্যাণীর কিছু করতে পারলে? আফিসের কতগুলো ব্যাপারে মনটা তিক্ত হয়েছিল। কড়া জবাব বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, দেখছই তো কোনো চেষ্টাই বাকী রাখছি না। একটা জায়গা টায়গা না পেলে দাড় ধরে রাস্তায় তো বের করে দেওয়া যায় না?

মৌরা ক্রান্ত চোখ তুলে শুধু একবার তাকাল। তারপর নিশ্চেষ্টে চলে গেল নিজের ঘরে।

এই কয়েক দিন পারের ঘটনা। বরাবর নিয়ম ছিল আমার রাতের খাবারটা উপরে আমার শোবার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকত। বাড়ি ফিরবার পর, শুষ্ক থাকলে মৌরা এসে খালা-বাটিগুলো শুছিয়ে টুছিয়ে দিত, আর অসুস্থ থাকলে আমি নিজেরই নিয়ে খুয়ে খেয়ে নিতাম। কল্যাণী এসে সব উন্টে দিল। অপেক্ষা করে থাকত, কখন আমি ফিরি। আর ঠিক তখনই ওর কড়ায় যি পড়ত এবং

লুচি ছাড়ার শব্দ পেতাম। অল্প সব উপকরণ আগে থেকেই সাজিয়ে রাখত। আমার হাত-পা ধোওয়া শেষ হতে না হতেই দেখতাম খালা নিয়ে উপরে উঠে আসছে। অনেক দিন আপত্তি জানিয়ে বলেছি, খাবারটা এখানে রেখে দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার। কষ্ট করে বসে থাকবার দরকার কি? লুচিগুলোও তো আগেই ভেজে রাখা চলে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, না, তা চলে না। খালাটা আসনের সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলত, আপনি তো জানেন, এতে আমার কষ্ট হয় না। এক কথা আর কত বার বলবো?

নিম্নল জেনে ও নিয়ে আর কথা-কাটাকাটি করিনি। ঐ ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিলাম। সেদিনও নিঃশব্দে খেয়ে নিছিলাম। রাত এগারটা বেজে গেছে। কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। উঠে মুখ ধুতে যাবো; চৌকাঠ পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ বলে উঠল ধরা গলায়, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কী করেছি? থমকে দাঁড়ালাম। দীর্ঘায়ত ঘন-পল্লব দুটো কালো চোখের তারা একভাবে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কিছু একটা বলা দরকার। বলতেও যাচ্ছিলাম। কল্যাণী বসে পড়ে হুঁহাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে বরষাব করে কৈদে ফেলল, আপনার পারে পড়ি আমাকে এক পাশে পড়ে থাকতে দিন। আপনারদের ছেড়ে, বাকী নীককে ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।

পা ছাড়তে চায় না। নীচু হয়ে বা হাতে গুর কাঁধের পাশটা ধরে সরবার চেষ্টা করে বললাম, এসব কী পাগলামি হচ্ছে। ওঠা, আজই তো আর যাচ্ছ না কোথাও।

হঠাৎ একবারে কানের কাছে ফেটে পড়ল তীক্ষ্ণ স্বর—নীচে যাও কল্যাণী। চমকে উঠলাম। ওর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কল্যাণীও তাড়াহাড়ি উঠে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। অসম্ভব চোখ মেলে সেদিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে ফিরে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মৌরা, এই জন্তাই বুঝি কোথাও গুর জায়গা হয় না?

সিঁড়িতে ওর পারের শব্দ তখনো মিলিয়ে যায়নি। চাপা ভাসনার সুরে বললাম, মৌরা! মৌরা ক্রক্ষেপও করল না। ঠিক সেই সুরেই আবার বলল, আর একটুখানি সবুজ করতে পারলে না? আমি আর ক'দিন।

ভীষণ উত্তেজনার দুর্ল শব্দীয় থরথর করে কাঁপছিল। মনে হল এখনই পড়ে যাবে। এগিয়ে দবতে গেলাম। ছিটকে সরে গেল। তারপর কোনো রকমে টলতে টলতে ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে রাতটা আমার কাটল সবটাই প্রায় পাগলামী করে, কখনো বারান্দায় কখনো ছাদের উপর। ভোরের দিকে একটু গড়িয়ে নিয়ে যখন নিচে নামলাম, ঢাকের এনে খবর দিল, কল্যাণী নেই। বৃক্কের ভিতর কেমন একটা দাক্ষা লাগল। তাবপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ ভালোই হল। এতদিন ধরে আমি যে সমস্তা মেটাতে পারিনি, সে নিজেরই তার সমাধান করে দিয়ে গেছে। আফিসে বেরোচ্ছি; ঐ চাকরটাই একখানা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে এল। বলল, রান্নাঘরের তাকের উপর

পাওয়া গেছে। উপরে কাঁচা মেয়েলি হাতের পেন্সিলে লেখা—  
বৌদিদি! একবার ইচ্ছা হল, দেখি কী লিখে রেখে গেছে।  
কিন্তু হাতটা বাড়াতে গিয়েও খেমে গেলাম। বললাম, তোর মা  
কাছে দিয়ে আস। সে চিঠিতে কি ছিল, আজও আমি জানি না।

আফিসে যাবার পরেই কানে গেল দলে দলে সিপাহীরা ওকে  
খুঁজতে বেরিয়েছে। কে বললে খুঁজতে? তারও জবাব পেলাম  
হাবিলদারের কাছে, মাঠেই কাঁচা তুম।

খোঁজ পাওয়া গেল পরদিন বিকাল বেলা। জেল থেকে খানিকটা  
দূরে কান্দের একটা বাগান। তার ভিতর দিকে একটা এঁদো পুকুর।  
সেইখানে।

তুমি তো একটু-আপটু সান্ধ্যচার্য্য করে থাকো, ডাক্তার! আমি  
ভাট ও রসে বঞ্চিত। শুনেছি, তোমাদের কারিগর শত কঠোর নাকি  
মৃত্যুর মতীমা কীর্তন করে গেছেন। মরণ বড় সুন্দর; শীতল কোল  
পেতে সে তপস্বিনীকে আশ্রয় দেয়, এমন সব ভালো ভালো কথা তাদের  
বইতে লেগা আছে। তারা কী দেখেছেন জানি না। কিন্তু মৃত্যু যে  
কত ভয়ঙ্কর, কত কুসংস্কৃত সেদিন আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।  
বিশ্ব বিধাতার অনুগ্রহে সৃষ্টি এই যে নারীর রূপ মৃত্যুর স্পর্শে তার কি  
বীভৎস বিকৃতি লাগে! তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কতগুলো  
ডোম ধরাধরি করে কল্যাণীর দেহটা আমার বাড়ীর সামনে এনে  
নামাল। উপর থেকে নারীর চোখে গড়তে পারে সে খেয়াল হয়নি।  
হঠাৎ তার চিংকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম যে সকাল হয়ে গেছে।  
ডাক্তার এল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর স্ত্রান ফিরে এল। কিন্তু  
কাঁপুনি দিয়ে এল স্বর। মাঝে মাঝে ভীত রক্তাক্ত চোখ মেলে তাকায়  
আর চমকে চমকে ওঠে।

সেই শুরু। তার পর চলল একটানা ব্যথ চিকিৎসার পালা।  
ছোট বড় কত ডাক্তার দেখলেন। গুণের খালি শিশিতে ঘরের  
তাক লোপাই হল। ফুঁড়ে ফুঁড়ে হাতে পায়ে আর জায়গা  
রইল না। তবু রোগ ধরা দিল না। তার পর এলেন এক  
কবিরাজ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় চার রকম গুণ  
আর কটমট অধুপান ঢালালেন কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত তিনিও  
হাল ছাড়লেন।

আমি বুঝেছিলাম, মীরাকে বাঁচাতে হলে সকলের আগে ঐ বাড়ি  
আর তার অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে ওকে সরাতে হবে। কিন্তু বদলির  
জন্তে বার বার করণ আবেদন জানিয়েও কর্তাদের মন ভেজাতে  
পারি নি। তার পর বহু চেষ্টায় পেলাম ছুটি। ওকে নিয়ে বেরিয়ে  
পড়লাম। শিমুলতলায় কয়েক মাস কাটিয়ে ছুটির শেষে জয়েন  
করলাম খুলনায়। নদীর পারে দোতলা বাড়ি। চওড়া খোলা  
বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঠিক সামনেই দেখা যেত বিশাল ভৈরব  
আর তার ওপারে সুপারি, নারকেল, আম, কাঁালের বাগানে-ঘেরা  
গ্রাম। সেখানেই পড়ে থাকত দিনের বেশির ভাগ। একদিন বলল,  
গুগো, শোনো, এ জায়গাটা আমার বড় ভালো লেগেছে। এখানে  
আমাদের কিছু দিন রাখবে তো?

আমি পাশে বসে তার রক্তশূন্য শীর্ণ হাতখানা আমার হাতের  
মধ্যে নিয়ে বললাম, রাখবে বৈ কি? অনেক দিন রাখবে। এবার  
তুমি চটপট ভালো হয়ে ওঠো দিকিন। মীরা একটা নিশ্বাস কেলে  
চুষ করে রইল। এ যে শুধু ছলনা, সেও জানত, আমিও জানতাম।

আর কিছু দিন যেতেই বারান্দায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বিছানা  
থেকে তোলা বারণ। জানালার ধার বেসে খাট পাতা। তারই  
উপরে শুয়ে শুয়ে সারা দিন কাটে। যখনই সময় পাই, পাশে এসে  
বসি। সেদিনও শিয়রের কাছে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত  
বুলিয়ে দিছিলাম। রাত বোধ হয় দশটা। ছেলেরা পাশের ঘরে  
ঘুমোচ্ছে। মীরা শুয়ে আছে চোখ বুজে। একটা হাত শিথিল  
ভাবে পড়ে আছে আমার কোলের ওপর। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে  
গেল। তার পর আস্তে আস্তে চোখ খুলল। মিনিট কয়েক আমার  
মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমার মাথাটা তুলে ধরে একটু  
বসিয়ে দাও না? আর শুয়ে থাকতে পারছি না। কোনো  
রকম নড়াচড়া ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু ওর মুখের দিকে  
চেয়ে না বলতে পারলাম না। পিঠের মাছে গোটাকয়েক  
বালিশ দিয়ে হালকা দেহটা একটুখানি উপরের দিকে তুলে দিলাম।  
আবার কিছুক্ষণ তেমনি তাকিয়ে থেকে বলল, একটা কাজ করবে?  
সিন্দুক খুলে আমার গয়নার বাস্কাটা এনে দাও না? বাধা দিয়ে  
বললাম, একটু ঘুমোও দেখি। এত রাতে গয়না দিয়ে কী হবে?  
মীরা চিরদিন ভারী শাস্ত, ভারী অনুগত। শুধু মনে নেওয়াই ছিল  
তার স্বভাব। অনেক দিন ভুগে ভুবে আজ-কাল তার ধৈর্যের বাঁধ  
ভেঙ্গে পড়ছিল। কথায় কথায় বিরক্ত হয়ে উঠত। বলল, আঃ, তোমার  
সঙ্গে আর বকতে পারি না। বলছি, নিয়ে এসো না বাস্কাটা?  
আর আপত্তি না করে এনে দিলাম। ওর আঁচল থেকে চাবি নিয়ে  
ডালটাও খুলে দিলাম ওর সামনে। অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে  
রইল।

বড়লোকের মেয়ে। বিয়ের সময় অনেক টাকার গয়না  
দিয়েছিলেন ওর বাবা। ওর কাজ ছিল মাঝে মাঝে সেগুলো ভাঙ্গা  
আর নতুন করে গড়ানো। কিন্তু ঐ পধস্তই। প্রাণ ধরে গায়ে  
তুলত না একখানাও। তাই নিয়ে একদিন কত অল্পযোগ করেছি।  
হেসে বলত আমার বড় লজ্জা করে। কখনো বলত, কী হবে  
সঙ সেজে। আর কি সে বয়স আছে? একবার বড় রাগারাগি  
করেছিলাম এই নিয়ে। ও তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। কোন এক  
জমিদারের বাড়ি নেমস্তল। আমাকেও যেতে হবে। হাতে একসেট  
সোনার চুড়ি আর গলায় একটা সাধারণ নেকলেস পরে বেরিয়ে এল।  
আমার মেজাজ গেল চড়ে। জিদ ধরলাম, জড়োয়া পরে না এলে  
আমি কিছুতেই যাবো না। এর পরে আর না পরে পারল না।  
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অন্ধকারে হঠাৎ আমার গা বেসে দাঁড়িয়ে  
ফিস-ফিস করে বলল, আমার সব চেয়ে বড় অলঙ্কার সে আমার  
সঙ্গেই চলল, সেটা বোঝো না? আর গয়না দিয়ে কী হবে?  
সেই রাতটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। বললাম, এ সব তো  
চিরদিন বাজিয়ে রয়ে গেল। আজ পরবে দুখানা? এসো না পরিয়ে  
দিই?

দূর—বলে আবার হাসল সেই সলজ্জ হাসি। তারপর বলল,  
ঐ নেকলেসটা আর ঐ বালাজোড়াটা দাও তো আমার হাতে।  
তাই দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে ও-ছোট আবার আমার হাতে  
কিরিয়ে দিয়ে বলল, আলাদা করে রাখো। আমার বীক নীক  
বখন বো আসবে, আমি তো থাকবো না; এই দিয়ে তুমি তাদের  
মুখ দেখো।

তুমি তো জান, ডাক্তার, চিরদিনই আমি কাঠখোটা মানুষ। চোখের জলটল আমার আসে না। সেদিন কিন্তু দুটো চোখ আমার ঝাপসা হয়ে উঠল। বললাম, তুমি চলে যাবে, আর বীক নীকর বোঁ দেখাবার জন্তে পড়ে থাকবো আমি একা? সে অভিলাপ আমাকে দিও না, মীরা! মীরা আর কিছু বলল না। দেখলাম, তারও হ'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কৌচাচর খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। একটু শান্ত হবার পর বলল, আর বাকী গয়নাগুলো আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম।

চমকে উঠে তাকালাম ওর মুখের দিকে। এ কী বলছে মীরা! ও যখন থাকবে না, ওর ঐ গয়না দিয়ে আমি আর একজনকে সাজাতে বসবো? যাবার সময় এই আঘাতটাই কি রেখেছিল আমার জন্তে! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মীরা বোধ হয় বুঝতে পারল আমার মনের কথা। হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়ে বলল, তুমি রাগ করছ! শোনোই না কি বলছি? তুমি যা ভাবছ, আমি তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারি না। ওগো, এতদিনেও কি তোমাকে চিনতে পারিনি?

আমি ভাড়াভাড়ি বলে উঠলাম, না, না। আমি কিছুই ভাবছি না মীরা! বল, তুমি কী বলবে।

মীরা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, এ গয়না তো তোমাকে এমনি এমনি দিচ্ছি না! এ রইল আমার জরিমানা। যে অপরাধ তোমার কাছে করেছি, এ শুধু তার একটুখানি দণ্ড।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এর কী উত্তর দেবো, বল? আমার চেয়ে কে বেশী জানে, এই যে আজ সে নিতান্ত অসময়ে মৃত্যুর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, এর মূলে এমন কিছুই নেই, তোমাদের শত্রু যাকে বলে ব্যাধি। এর পেছনে আছে শুধু একটা রাত আর তাকে আশ্রয় করে একটি মেয়ের মরণাহত বীভৎস রূপ। আমার দু'কোঁটা সান্দনা আর দুটো স্তোক বাক্য সেখানে কী করতে পারে! তবু বললাম, আমার কাছে তো তুমি কোনো অপরাধ করনি, মীরা! যদি কিছু করে থাকো, সে শুধু একটা ভুল। ঐ অবস্থায় সব মেয়েই তা করত।

তার জন্তে তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। মন থেকে সব দাগ তুমি মুছে ফেলে দাও।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার মাথাটা আমার কাঁধের উপর নামিয়ে দিয়ে বলল, ওগো, আমি জানতাম, যাবার আগে তোমার ক্ষমা আমি পাবোই। কিন্তু, তুমি ক্ষমা করেছ বলেই তো আমার অপরাধ মুছে না। তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথাটা রাখো। আমার শেষ সাধটুকু পূর্ণ করতে দাও। বললাম, বেশ দাও তোমার গয়না কিন্তু তুমিই যদি না রইলে, তোমার এই সোনার তাল দিয়ে আমি কি করবো? মীরা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। দেহের সবটুকু তার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে সেই নিবিড় সান্নিধ্যটুকু যেন শেষবাবের মত অনুভব করতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ সেই ভাবে কাটিয়ে আশ্চর্য করণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, ঐ অভাগী মেয়েটা, যে শুধু শত্রুতাই করে গেল আমার সঙ্গে, ওর মত যারা বিনা দোষে জেলে আসে, তার পর বেরিয়ে গিয়ে সংসারে কোথাও ঠাই পায় না, পার শুধু লাঞ্ছনা, এইগুলো দিয়ে তাদের একটা উপায় ক'রো। এক কোঁটা আশ্রয়ের অভাবে আর কেউ যেন অমন করে প্রাণটা না দেয়। বলেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আমার বুকের উপর। আমি বাধা দিলাম না। এই কান্নার তার প্রয়োজন ছিল। আরো কিছুক্ষণ পরে বুকের গুরুভার যখন একটু হালকা হয়েছে, আন্তে আন্তে তুলে নিয়ে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরে কাতর স্বরে বলল, বল, আমার কথা রাখবে?

ওর কক্ষ চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, রাখবো। এটার তুমি দ্বন্দ্বোও।

মীরার বস্ত্রহীন পাণ্ডুর মুখের উপর একটি পূর্ণ তৃপ্তির আভা ফুটে উঠল। অস্পষ্ট আলোতেও সেটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

মাসখানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল!

[ক্রমশঃ।

## ক্ষণ-লিখন

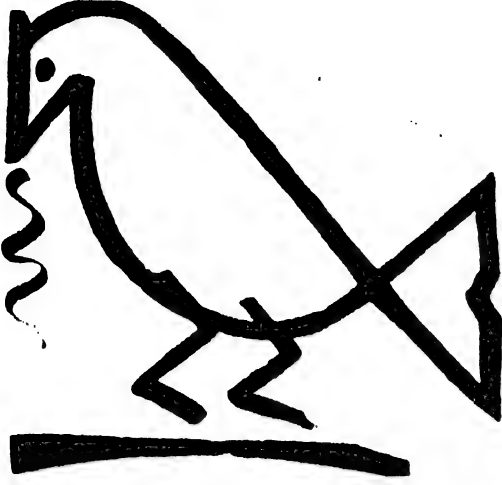
### নিজন দে-চৌধুরী

সর্বদা শক্তিত থাকি! কেবলি সশয় জাগে, যদি  
এই দিন-রাত্রি ভাঁবে জীবনের মধুর ব্যঞ্জন  
দিয়ে সে কবিতা লিগি, মুহূর্তের আনন্দ-বেদনা  
মূর্ত হয় যার ছন্দে—স্বপ্ন-সাধ-আশা-আকাংক্ষা

স্বর্ণাক্ষরে সারাক্ষণ যে হৃদয়-ভাব্য লিগি, তার  
সকলি তারায় যদি? কোনো দিন আচমকা হাওয়ার  
যদি কোনো অসাবধানে দক্ষিণের জানলা ছুটি খুলে  
সব পাণ্ডুলিপি যদি অকস্মাৎ ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়?

যায় তো। রোজই তো যায়। এই মেষ-বিস্তীর্ণ আকাশে  
কত কাব্য লেখা হয়। বৈশাখের দীর্ঘ হাফাকার  
যে আনে, আবার সেই নব্রত্ন-হাতে অশান্ত কান্নার  
শ্রাবণে অক্ষর গ্লোক লিখে রাখে। রামধনু-রঙীন  
সন্তপদী মুছে ফের বেদনার বিচিত্র বিভাসে  
আবার আকাশে আঁকে আনন্দের আশ্চর্য আশ্বিন।

## ছোটদের আসর



[ পূর্ণ-প্রকাশিতের পর ]

বাঁধা ওর নৌদির কাছে নিয়ে গেল মীরাকে। সুরমা তার নাম। বাঁধালীটোলায়ই এক বাড়ির চার তলার ঘরে সুরমা থাকে। জ্ঞানলার ধারে দাঁড়ালে নৌচে—অনেক নৌচে গঙ্গা দেখা যায়, গঙ্গাই ত বাস্তা থেকে তিন তলার সমান নৌচে।

বাড়ীতে পাথরের দেওয়াল, পাথরের সিঁড়ি, এত পাথর কাশীতে এসেছিলো কোথা থেকে? কত কাল ধরে এত পাথর এমনি দাঁড়িয়ে আছে। কাশীতে না কি কখনো ভূমিকম্প হয় না। শিবের বিশ্লেষ ওপর কাশী। সেই বিশ্লে এক বার নড়ে উঠেছিলো কলিযুগের পাপে। ভূমিকম্প এক বার হয়েছিলো কাশীতে। কাশীতে যারা জীবন কাটিয়ে দিতে এসেছিলো, সেদিন তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

আর এক বার ভয় পেয়েছিলো। সুরমা গল্প করে,—বোসো ভাই, বলি সেদিনকার কথা। এলো বেরিবেরি, পা ফোলে আর হাঁটু খারাপ হয়। মনতে লাগলো বাঁধাগীরা, যারা সর্বের তেল খাং। হিন্দুস্থানীদের কিছু হল না। সেদিন যে সব বুড়ো-বুড়ি কাশীতেই প্রাণ দেবে বলে এসেছে—মণিকর্ণিকার ঘাটে ছাই হয়ে গিয়ে শিবলোকে যাবে বলে এখানে অপেক্ষা করছে, তারা দলে দলে পালালো।

প্রাণের মায়া এমনি জিনিস! সে প্রাণ দিতে এসেছে, সেই প্রাণ নিয়েই তারা কাশীর মতন তীর্থ ছেড়ে দেশের দিকে চলে গেল।

শুধু তারাই বইলো, যারা বিশ্বাস করে—কাশীর গঙ্গার ধারে শেষ নিশ্বাস শাস্তি আছে। সেই মুচির মতন, যে বিশ্বাস করত, গঙ্গা স্নান করলে পাপ কেটে যায়। সে গল্প জানো ত?

মীরা বললে—জানি না বৌদি! বলুন না।

সকাল বেলায় চার তলার ঘরে মিটে রোদে কার না গল্প শুনতে ভালো লাগে? বাঁধাদা' চলে গেছে। মীরা একলাই যেতে পারবে। বৌদি এক হাতে লুচি বেলে নিয়ে কড়ায় দিতে দিতে গল্প বলতে লাগলো।

গঙ্গার ধারে এক কুঠরোগী, যাকে দেখছে তাকে বলছে—ওগো, তোমাদের মধ্যে কে নিষ্পাপ আছ, আমার ছুঁয়ে দাও। দিলে আমি সেরে যাব।

কে দেবে? সকলেই ত জানে পাপী তারা। রোগী বললে, পাপ তো সব তোমাদের কেটে গেছে। আজ চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করে আসছ। আর কি পাপ আছে?

তাই বুঝি হয়? গঙ্গাস্নান করতে হয়, করতে এসেছে। রেলে ধীমারে, নৌকোর ভিড় করে হুজুগে মেতে চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করলো। করলো বলেই কি সব পাপ চলে গেল? অত বিশ্বাস কি আছে? সেই ভরসায় কুঠরোগীর গায়ে কি হাত দেওয়া যায়? কিন্তু মুচি শুনল বললে, তুমি ঠিক বলেছ। দাঁড়াও আমি গঙ্গাস্নান করে এসে তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি। ও মা, সে বেই এসে গায়ে হাত দিলো, রোগী একেবারে সেরে গেল। সে রোগী আর কেউ নন, স্বয়ং মহাদেব। মুচিকে এমন সব জিনিস দিলেন, যাতে তার মনে চিরশান্তি এলো। শাস্তিই ত লোকে খোঁজে? টাকা বলো, কড়ি বলো, বাড়ী বলো, জমি বলো, ছেলে বলো, মেয়ে বলো, মান বলো, প্রতিপত্তি বলো—লোকে এই সব চায়, যাতে মনে শান্তি আসে। শান্তি যার আছে, তার কুঁড়েঘরে থেকেও সুখ। শাস্তি যার নেই, তার অট্টালিকা থেকেও দুঃখ। সেদিন চম্পালাল বলে এক মাদোয়ারী মারা গেল, যার কোটি কোটি টাকা। মারা যাবার সময়ে আমাদের ডাক্তার বাবুকে বলে গেল—টাকা যেন কান্নার না থাকে, ছেলে-মেয়ে-জামাই সবাই চাইছে, সে যেন শীগগির মারা যায়। ভাইয়ের চার দিক থেকে ছুটে এলো ঘটা করে চিকিৎসা করে জীবন শেষ করে দিতে।

ইতিমধ্যে লুচি ভাজা হয়ে গেছে, ফুলো-ফুলো লুচির সঙ্গে আলুর ছেঁচকি দিয়ে খালা এগিয়ে দিলো সুরমা মীরার সামনে—খাও ভাই, বলে।

মীরা বলে, বৌদি, আমার জন্তে করছিলেন বুঝি? আমি বুঝতেও পারি নি। আমি তো এইমাত্র জল খেয়ে এলুম বাঁধাল'র বাড়ী।

জল খেয়ে, এসেছো, এবার লুচি যোগ করে জলযোগ করো।

আহা, জল মানে বুঝি জল? বৌদি কি বাংলা ভুলে গেলেন ইউ-পিতে থেকে?

সেই গৌর? সুরমা হেসে বলে। করে এসেছি বাংলা দেশ থেকে বৌ হয়ে কাশীতে। তোমার দাদা এখানে জ্যোতিষী ছিলেন—ভুণ্ড চর্চা করতেন। গণেশ মহরায় মন্ত বাড়ী নিয়ে থাকতেন। হঠাৎ এক দিন বললেন আমার একটা বিবম কাঁড়া আসছে, হয়তো

# বত্স বেদী

ত্ৰিপ্রভাতকিরণ বসু

কাটবে না। তিন তলায় ঠাকুরঘরে মা কালীর পায়ের কাছে ভালো করে তেল দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বলে রেখে এসো। সন্ধ্যাটা বড়ো করে দিয়ে। সারা দিন জ্বলা চাই। যদি নিবে যায়, আমাকে এসে বোলো। সারা দিন লক্ষ্য রেখো যেন তেল থাকে।

তার পর? মীরা বলে।

বারে বার আমি যাই। দেখে আসি। দুপুর বেলা হঠাৎ উনি বলেন, আমার বুকটা কেমন করছে, একটু মালিশ ক'রে দাও। তর্পিন তেল মালিশ করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল। উনি বলেন, এবার দেখে এসো। প্রদীপ বোধ হয় নিবে গেছে।

গিয়ে দেখি ভাই, প্রদীপ নিবে গেছে। তেল আছে, তবু নিবে গেছে। এসে দেখি উনি—

প্রতিমা চোখে আঁচল দেয়। মীরার চোখেও জল।

আপনি খুব অসুবিধার পড়লেন?

অসুবিধা ব'লে? মুখ্য আমাদের আর কি উপায় আছে বলা রাঁধুনীগিরি ছাড়া? ঐ বাড়ীরই এক আশে এক ইস্কুল-ইনস্পেক্টর ভাড়া থাকতেন, তাঁর স্ত্রী আমাকে মেয়ের মতন টেনে নিলেন। রান্নাভার দিলেন আর আমার দিন চ'লে যায় এমন মাইনের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এখনো তাঁদের ওখানে কাজ করি। আজ তাঁরা বিদ্যাচলে গেছেন, তাই আমাকে সকালবেলায় পেলে।

রাঁধুনীগিরি? বাংলাদেশের মূর্থ মেয়েদের এ ছাড়া আর কি কোনো উপায় নেই?

না ভাই, আর কোনো উপায় নেই। আমার মাসভূঁই নাল ছিলেন মস্ত যাকুর। আশ্চর্য্য তাঁর গেলা। সেই দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন, তখন আমার মাসীমা রাঁধুনী আর বৌদি বাসন মাজা কিয়ের কাজ নিলেন। বামুনের মেয়ে বলে কেউ কোনো দয়া দেখালো না। আহা, বৌদি তার বাপের কত আদরের মেয়ে ছিলো, তিন ছেলের পর এক মেয়ে—কোথায় কি হয়ে গেল সব!

মীরা বলে, দেশ স্বাধীন হ'য়ে গেছে। এখন তো অল্প রকম হবে!

কই হয় ভাই! স্বাধীনতার উৎসবে আলো জ্বলে, বাজী পোড়ে, তবু পরমা অভাবে ছেলেরা স্কুল থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হয়, চিকিৎসা অভাবে কত লোকে ঢিককয় হয়ে থাকে। কত লোক আজ কাজ না ক'রেও টাকা পায়। আর কত লোক কাজ চায়, কাজও পায় না, টাকাও পায় না। এ রকম সমস্তা যত দিন থাকবে, তত দিন স্বাধীনতার আলো-বাজী-মেলা-মিছিল সব বিলী মনে হবে। এই কাশীতে এক দিন এমন দিন ছিলো, যখন আট আনার বাজার করলে একটা মুটে ঝুঁতে হত। মুটের ভাড়াও ছিল এক পয়সা। ঘর ভাড়া দিন এক পয়সা। ষি দিন এক পয়সা। সেই দিন না ফিরলে আমরা স্বাধীনতার মানে বুঝতে পারব না।

থেয়ে উঠে মীরা হাত ধুয়ে এসে আবার বসলো। জানলার সন্ধ্যা সন্ধ্যা গবাদের কাছে দুটো বীদর উঁকি মারছিলো, ওদের অত্যাচারে চতুর্দিকে শিক লাগাতে হয়েছে—মারা একটা বেলুন নিয়ে তেড়ে গেল। ও দুটো ভেঁচি কেটে নেমে গেল। আবার টে-টে, নীচের বারান্দা থেকে কার শাড়ী নিয়ে পালাচ্ছে।

মুখ বাড়িয়ে মীরা দেখে আহা রে, নতুন শাড়ী! ও মা!

ও বাড়ীর ছাদে উঠে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো শাড়ীটা টুকরো টুকরো ক'রে।

গুলী করে মারতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু উপায় নেই, শ্রীরামের অমুচর সব। মহাবীরের শিষ্যসেবক।

মীরা বলে, বৌদি গাঁদের কাছে আছেন, তাঁরা কেমন?

তাঁরা ভারী মজার লোক। ইন্সপেক্টর বাবু চিরদিন বেহারে কাজ ক'রে এসেছেন, ভাগলপুর মুন্সেফ, মোতিহারী, ধারভাঙ্গা, মজফরপুর। কাশীতে এলেন ষিটাদার ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে। ধর্মকন্ধ্য ক'রে দিন কাটিয়ে দেবেন এই চিন্তা। সারা দিন মন্দিরে মন্দিরে গঙ্গার ধারে ধারে কাটিয়ে আসেন। বাড়ীতেও ধ্যান-ধারণা শুধু-গুজো নিয়ে থাকেন। ভাবা আরামে দিন কাটে স্বামি-স্ত্রীর। তার পর শুরু হল যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা?

ঐ যন্ত্রণা। স্বামীর খাওয়া হ'য়ে গেছে, স্ত্রী ভাতের খালাটি নিয়ে বসেছেন, এলো ছ'গাড়ী লোক—পিসিমা আমরা এসেছি।

এসেছে তো কৃতার্থ করেছে। সেই ভাতের খালা ওদের এগিয়ে দিয়ে তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি ভাত নিয়ে চ'লে আসছিলাম, আমাকেও ঢুকতে হল গুঁর সঙ্গে। ভাবা উত্তনে আঙন দেওয়া। আবার রাগা চড়ানো।

এ প্রায় প্রতি দিন।

মাসীমা এসেছি। মানাবাবু এসেছি। দাধু এসেছি। তাউই মশাই মাউইমা এসেছি।

একদল যায় তো আর এক দল আসে। হৈ-হৈ হাসির হুল্লোড় রাত বারোটা অবধি। পূজোপাঠ সব শিকয়ে উঠলো। ভদ্রলোক যা পোতন পান সব খরচ হ'য়ে যায়, ধার হয়; তবু কাশীতে বাড়ী করে থাকার খেসারৎ দিতে হয়। যেখানে বত আত্মীয় আছে এই সুযোগে কাশীবাস ক'রে নিতে চায়।

শেষটা অতিষ্ঠ হয়ে উনি বাড়ী বদলালেন। গণেশমহল্লা থেকে চলে গেলেন কামাছার। কাউকে ঠিকানা দিলেন না।

ক'দিন খুব আরামে কাটলো।

এক দিন দুপুরবেলা হঠাৎ—জ্যোতামশাই, আপনি এখানে এসে উঠছেন? উঃ কি কষ্ট যে হয়েছে আপনার বাড়ী খুঁজতে!

আজ্ঞা মীরা, তুমিই বলে, কি রকম মনে হয়? ভালো মানুষ গুঁরা, কাউকে কিছু বলতে পারেন না, আমরাই বলতে ইচ্ছে করে, কাশীতে কি হোটেল নেই? ধর্মশালাও তো খোলা আছে। কালীবাড়ীতেও থাকা যায়। মরতে এখানে কেন?

চ'লে গেলেন বুলানাল, চ'লে গেলেন শিবালয়, গেলেন লক্ষা—সেখান থেকে আবার ৬বিশনাথ দূর হয় ব'লে এলেন পাঁড়হাউলি কিন্তু অতিথির গুঁকে ছাড়লো না, ঠিক আবিষ্কার করলো আর পাত বার ক'রে বলতে লাগলো, বারে বারে বাড়ী বদলান কেন? এই তো আজ কর্তী গিন্নী বিদ্যাচলে গেছেন বাসে ক'রে—এক দল এসে দরজা গোড়ার মাল পত্র রেখে ঠিক অপেক্ষা করছে, রাতে কিংগেই দরজা খুলে ঢুকবে। শুধু কি ঢোকা? বলে, মাছ খাব, মাংস খাব, মামলেট খাব, বা গুঁর বাড়ীতে ঢোকে না।

মীরার হাসি পায়, কী অত্যাচার! স্ত্রীমাকে ওর ভালো লাগলো। কী সন্দেহ মুখখানি স্ত্রীমার!



মীরার সঙ্গে ও রাস্তায় নেমে এলো। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে। বলে, আমরা আগেকার লোক, গায়ে কিছু একটা না জড়িয়ে রাস্তায় বেরোতে পারি না। আর মাথার কাপড় সব সময়ে থাকে। দেখো সব চলেছে খোঁপা দেখিয়ে খ্যাং-খ্যাং করে, কি রকম বেহারী দেখায়!

মীরা বলে, আর ওরা ভাবে বৌদি, আপনারা জ্বলী।

সে তো চিঁড়িয়াখানায় বান্দররা ভাবে মানুষগুলো কী অসভ্য।

এখন কে বান্দর, কে মানুষ বিচার করবে কে বৌদি?

বড় রাস্তায় বড় বড় ঘড়া মাথায় নিয়ে গোয়ালারা ঐবিখনাথের দূধ নিয়ে চলেছে বোয়াম বোয়াম শব্দ করে। লোকে পথ ছেড়ে দেয়। কী শক্তি ওদের গায়ে! এত ভারী ঘড়া কাঁধে করা কি চাটখানি কথা? ঐবিখনাথের স্নান হবে এই ঘড়া ঘড়া দূধ দিয়ে। চরণামৃত হিসাবে লোকে পাবে! মীরা মনে করে—এ কথা ভাবতে নেই, দেশের কত ছেলে এক কৌটা দূধ পাচ্ছে না, আর ঐবিখনাথের পূজা হচ্ছে ঘড়া-ঘড়া খাঁটি দূধ দিয়ে! পাণ্ডাদের বলতে গেলে, তারা মারতে আসবে। তেমন ক'রে ভাবতে শেখেনি ব'লে—সোমনাথের মন্দির লুঠ হয় বারে বারে। কিন্তু ছোট ছেলেও জানে আসল সোমনাথের গায়ে হাত দেয়—এমন সাধ্য কোনো মানুষের নেই; মন্দির ভেঙে মসজিদ ভেঙে মানুষকে অপমান করা হয়, নিজেকে ছোট করা হয়, ভগবানের কিছুই করা যায় না। তাই বিখনাথ-জগন্নাথ-সোমনাথরা মানুষের হাতেই আবার ফিরে আসেন। কালাপাহাড়রা, গজনীর মানুষের ম'রে যায়। ভগবান হাসিমুখে জেগে থাকেন। যেমন রাজস্ব ফিরে আসে, ক্লাইভ, উমিচাঁদ, মীরজাফর চিরদিনের মতন ম'রে যায়—চিরদিন ধ'রে লোকের মুখে মুখে অভিশাপ পায়। কাকুর বলবার সাহস থাকে না—আমি আমি মীরজাফর উমিচাঁদ জগৎ শত্রুর বংশধর। রাজশক্তি একদিন স্পীকা তব্বের অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা স্মৃতিস্তম্ভ তোলে, ময়দানে আবুর্ক ডাঙ্করের অশ্বারোহী মূর্তি দাঁড় করায় তাদের, যারা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ দমন করেছিলো—তাদের নামে রাস্তা পার্ক তৈরী করে, যারা তাদের শাস্তি দিয়েছে যারা নিজের দেশে স্বরাজ চেয়েছিলো। তার পর চাকা ঘুরে যায়। মূর্তি স্মৃতিস্তম্ভ নাম বিলুপ্ত হয়, যারা এক দিন দণ্ডিত হয়েছিলো, তারা পায় বীরের স্থান।

বাঘার কাছে শুনে শুনে মীরা আজ-কাল এমনি ভাবনা ভাবতে শিখেছে। তবু দেখে, তারাই উন্নতি করে, জীবনে সুখী হয়,—অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখলে যা মনে হয়—যারা দেশের কথা ভাবে না। যারা বলে না—

ও আমার দেশের মাটি তোমার

পায়েই ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বমন্ডীর বিশ্বমাসের

আঁচল পাতা।

বলে না,

যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক,

আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

তোমার চরণ করব স্মরণ

আমি কখনো ধর ধরব না মা!

মানের আশে দেশ বিদেশে

যে মরে সে মরুক ঘুরে

তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা

তুলতে সে যে পারব না মা!

সেদিন তুলসীদাসের সাধনক্ষেত্রে বাঘা বলছিলো দেশান্তরবোধের গান রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভারতবর্ষে আর কেউ লেখেনি। হয় তো পৃথিবীতেও কেউ লেখেনি! তাঁর গান যত লোককে প্রেরণা যুগিয়েছে, এমন আর কারুর নয়। শুধু দেশপ্রেমের কথাই বা কেন? জীবনের পথে চলার কথা। এসো মীরা, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা গান শেখো—

যদি দুঃখে দহিতে হয়,

তবু মিথ্যা কথ্য নয়।

যদি দৈন্ত বহিতে হয়,

তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।

যদি দণ্ড সহিতে হয়,

তবু মিথ্যা বাক্য নয়।

জয় জয় সত্যের জয়।

আবার বলে,

যদি দুঃখে দহিতে হয়,

তবু অসত্য কথ্য নয়।

যদি দৈন্ত বহিতে হয়,

তবু অসত্য চিন্তা নয়।

যদি দণ্ড সহিতে হয়,

তবু অসত্য বাক্য নয়।

জয় জয় মঙ্গলময়।

হাওয়ার সে সুর অসিঘাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিলো।

এমন সময়—

রত্নপতি রাঘব রাজারাম।

পতিত পাবন সিয়ারাম।

বলতে বলতে একদল লোক আসতে ওরা উঠলো।

কাঁথির পিসিমা বলেন, কেমন লাগছে মীরা এখানে?

খাঁচার পাখীর যেমন লাগে মুক্ত আকাশ দিলা। ঝর্ণার যে লাগে পাহাড়ের কোল। ছিলাম বাগানের কোয়ারা, কল টিপ খোঁ হ'ত, হয়েছি বনের ঝর্ণা, নিজের আনন্দে ব'য়ে চলেছি।

কিন্তু এরকম তো চলবে না। এক বার তো ফিরতে হবে বাড়ির কাছে ছিলি, তাদের মতামতটা তো জানা দরকার। তারা হয় খবরই নেয় না, সমানে তো খরচের টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে ওে জন্তে। সাত-আট মাস ধ'রে!

যেদিন টাকা পাঠানো বন্ধ করবে, সেদিন ভাবা যাবে। ও এখন আমি রামনগর চল্লুম বাবাদার'র বাড়ীর সকলের সঙ্গে।

মীরা ভাবে কানীতে এসেছিলেন শঙ্কবাচার্য এসেছিলেন শ্রীচৈত এসেছিলেন বুদ্ধদেব। নতুন ধর্ম ঝাঁরই প্রচার করেছেন, তাঁকে কানীতে আসতে হয়েছে। এই জন্তেই হয়তো কংগ্রেস হিন্দুর ভালো লাগে।

বাঘার বোন স্মৃতি কিন্তু একটা মজার কথা বললো নৌকার ও বেতে। বিভাসাগর মশাই কানীতে এসে ঐবিখনাথ ঐঅন্ন

দেখেন নি। বলেছিলেন—আমার বাবা আর মা-ই তো বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা। কী অসাধারণ মনের জোর দেখো! পারে কেউ?

বাঘার দাঁত বললেন, এসেছিলেন নেপালের রাজা ত্রিভুবন রাণীদের নিয়ে। বিশ্বনাথের মন্দিরে সেদিন সকালে আর কেউ ঢুকতে পারনি, ওরাই প্রাণ ভরে পূজা করেছিলো। কিন্তু জংবাহাত্তর রাণার চর ছিলো পাহারা দিয়ে। যাতে রাজার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কথাবার্তা না হয়।

মীরা বলে, সে কি? রাণা ত মন্ত্রী। রাজার চেয়ে মন্ত্রী বড়ো! এ কোন্ দেশী কথা?

এক দিন নেপালে রাজার চেয়ে মন্ত্রীরাই বড়ো ছিল। রাজার প্রাসাদে প্রহরী থাকত পাহারা দেবার জন্যে, রাজা যাতে না পালিয়ে যেতে পারে। বাইরের কোনো লোক যেন রাজার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে। এমনি কেটেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আশী লক্ষ নেপালী প্রজাকে মূৰ্খ রেখে, রাজাকে নজরবন্দী করে, মন্ত্রীরা পুরুষাত্মকে রাজকোষের বেশী ভাগ অর্থ লুটে-পুটে নিয়েছে। হিমালয়ের পাহাড়ের উঁচু চূড়া ঘেরা নৌচ উপত্যকায় কাঠিয়ু শহর দিনের পর দিন এই অনাচার সহ করেছে। ইংরেজ গভর্নমেন্ট সার দিয়েছে। তার পর—

তারপর?

রামনগরের রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের দিকে চেয়ে মীরা শেখটা শুনতে চাইলো।

তার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল—তখন এক জন ইংরেজ লেডি ডাক্তারকে রাজা ডেকে পাঠালো রাণীর চিকিৎসার জন্যে। তার মারফত খবর পাঠালো হিন্দুস্থান সরকারকে। তার পর ৭৬ দিন মদলবলে এখানে পালিয়ে এলো। রাণীদের সে দিন কী বাগ!

তারপর?

তার পর স্বাধীন নেপালের স্বাধীন নরপতি ত্রিভুবন বিদ্যে গেল নেপালে রাজশক্তি নিয়ে মন্ত্রীদের শক্তি হরণ করে। জংবাহাত্তরেরা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাঙালী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বে নেপালে বুদ্ধের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নেপাল সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠলো। একটা কথা জেনো মীরা, ইংরেজ সুবিধামত ইতিহাস বিকৃত করেছে, কিন্তু গ্রীকরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে নিজের নীচতা, পরাজয়, কিছু গোপন করেনি—আর ভারতের মহত্ত্ব উদারতা সমস্ত প্রকাশ করেছে। পুত্র বারম্ব, চন্দ্রগুপ্তের পৌর্য—গ্রীকরাই জানিয়ে গেছে, আর কেউ নয়। তারা না জানালে আমরা জানতেই পারতুম না। চন্দ্রগুপ্ত নাটকও সৃষ্টি হত না। ঐতিহাসিক হবে সকলের উদ্ধে। দিপাহীবিদ্রোহ নয়—বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ—এ কথা চাপা পড়ে গেছে ঐতিহাসিকের সঙ্কীর্ণতায়। অবশ্য, ইতিহাস লেখাও অতি কঠিন কাজ। এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে। হঠাৎ তাঁর জানলার সামনে একটা ঘুটনা ঘটলো, কি করে ঘটলো তিনি নিজের চোখে সব দেখলেন। তার পর যে সব লোক ঠাড়িয়েছিলো, বারো প্রত্যক্ষদর্শী, অর্থাৎ নিজের চোখে সব দেখেছে, তারা এক একজন এক এক রকম কাহিনী বললো—কান্নার সঙ্গে কান্নার মিললো না। তখন ঐতিহাসিক ভারতের দিনের আলোর একটা ঘটনা নিজের চোখে পরিষ্কার দেখেও এখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের

মুখে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ শোনা যায়, তখন হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস কত বিকৃত হয়ে গেছে সহজেই ভাবা যেতে পারে। অতএব থাক ইতিহাস রচনা।

রামনগরের ঘাটে ব্যাসকাশী দেখতে তখন অনেক যাত্রী এসে গেছে। ছায়াময় ব্যাসকাশী, সেখানে মরলে গাধা হয়, সেও ভালো লাগছে কলকাতার রেজিপার্কের বন্দিজীবনের চেয়ে। [ক্রমশঃ।

## জলকন্ঠা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

### হান্স ক্রিশ্চিয়ান হ্যাগারসন

বাক্যকে সোনালি পাথরের প্রাসাদ, শ্বেতপাথরের উঁচু সিঁড়ির ধাপ সোজা সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। মাথায় সোনার গম্বুজ; বিরাট থামগুলোর কঁাকে কঁাকে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলে সত্যিকার মানুষ বলেই মনে হয়। উঁচু জানলাগুলো পরিষ্কার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, মথমলের পূর্ণা-ঝুলানো বিশাল ঘর, দেয়ালে জমকালো ছবি। সাগর-রাজার মেয়েদের পক্ষে এমন অপকল্প দৃশ্য দেখা মস্ত একটা ক্ষুধার বাপার; সব চেয়ে বড়ো একটা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখলো, মাঝখানে এক ফোয়ারা খেলছে, তার জল উঠছে পিচকির মতো উপরের বকমকে গম্বুজ পর্যন্ত; কঁাক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলকিয়ে পড়ে নাচছে জলে, চিকচিক করছে চার দিকের সুন্দর গাছপালা।

এখন জলকন্ঠা জানলো কোথায় থাকে তার প্রিয় রাজপুত্র। এখন থেকে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যায়। সাহস করে বাড়ির যতোটা কাছাকাছি সে যায়, অতোটা আর কোনো বোন যায় না। শ্বেতপাথরের বারান্দার তলা দিয়ে যে ছোটো খাল গেছে, এক দিন সে তা দিয়েও সাঁতরে গেলো খানিকটে। এখানে, উজ্জল জ্যোৎস্নার রাত্রে বঁসে বঁসে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র তো তাকে দেখতে পায় না, সে জানে নিজে সে একা-একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখনো রাজপুত্র বেড়াতে বেরোর রঙ-করা শৌখিন নৌকোর, উপরে গুড়ে নানা রঙের নিশান। জলকন্ঠা লুকিয়ে থাকে পাড়ের সবুজ বাঁশ-বনে, কান পেতে শোনে তার কথা; তার কপোলি ঘোমটা মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়, তার খশখশানি নৌকোর কেউ যদি শোনে তো মনে করে বুঝি একটা বুনো হাঁসের ডানা-ঝাপটানি কেঁপে গেছে।

কোনো-কোনো রাত্রে জেলেরা মশালের আলোয় মাছ ধরে; রাজপুত্রের কথাই বলাবলি করে তারা, কতো তার মহৎ কীর্তি। সে-সব কথা শুনতে-শুনতে জলকন্ঠার মন সুখে ভরে উঠে; ডেউয়ের লড়াই করে সেই-ই তো তাকে বাঁচিয়েছিলো, আর সে শুয়েছিলো তার হাতের উপর অরণ্য মাথা রেখে—কিন্তু সে তো তা জানে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

শেষে সব মানুষই জলকন্ঠার প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। আচ্ছা, সে যদি মানুষ হতো। কতো বড়ো মানুষের পৃথিবী, সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ করে তারা উড়ে যায়, মেঘ-মাদানো পাহাড়ের চূড়ার বেয়ে ওঠে; আর তাদের বন-জঙ্গল ধুঁ-ধুঁ কতো দূর চলে গেছে, অতো দূর জলকন্ঠার চোখ যায় না।

অনেক জিনিষের মানে সে বুঝতে চায়, কিন্তু তার বোনেরা ভালো করে জবাব দিতে পারে না। যেতে হোলো আবার তাকে বড়ো ঠাকুরার কাছে—তিনি তো সমুদ্রের ওপরের দেশের অনেক খবর রাখেন।

যে সব দেশের মানুষ ভূমি মরে না, তার কি চিরকাল বাঁচে? আমরা যারা সমুদ্রের তলায় থাকি—আমাদের মতো তারাও মরে না?

ঠাকুরা উত্তর দিলেন, মরে বৈ কি। আমাদের মতো মরতে হবে তাদেরও, তাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক ছোটো। আমরা বাঁচি তিনশো বছর, তার পর মরে সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে ভেসে বেড়াই। অবশ্য আত্মা নেই আমাদের, সেই পুনর্জন্ম। এক বার কেটে-ফেলা ঘাসের মতো আমরাও চিরকালের মতো বাঁচি শুকিয়ে। কিন্তু মানুষের বেলায় শরীর দুটো হ'য়ে গেলেও আত্মা বেঁচে থাকে; আমরা যেমন মানুষের শরীর-দেহের জন্তে জল থেকে উঠি, তারা ওঠে উর-আকাশের অন্ধার-অপকর্ণ বাজ্যের দিক, যাকে তারা বলে স্বর্গ—আমরা তা দেখতে পারিনে।

আমাদের আত্মা নেই কেন? ছোটো জলকণা জিজ্ঞেস করলে, আমি তো অনায়াসে তিনশো বছরের আয়ু ছেড়ে দিতে পারি, যদি একদিনের জন্তেও মানুষ হ'য়ে বাঁচতে পাঠি, যদি পাই স্বর্গের সেই বাড়ির খোঁজ।

ঠাকুরা বললেন, এসব কথা ভুলেও মনে আনিস নে। ঢের ভালো আছি আমরাই; কতো বেশি দিন বাঁচি, কতো সুখে থাকি।

একদিন তো মরতেই হবে; তারপর সমুদ্র আমাকে ফেনার মতো অবিশ্রান্ত আছড়াবে, চূর্ণনার করে ভেঙে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়, আর কখনো মাথা তুলে উঠবে না সমুদ্রের গান, কখনো দেখবে না সুন্দর ফুলগুলো, আর এই উজ্জল সূর্য। আচ্ছা, ঠাকুরা, অমর আত্মা কি পাওয়া যায় না কিছুতেই?

পাগল! এ অবিশ্বাসি কথা যে যদি কোনো মানুষ তোকে এতো ভালোবাসে যে তার বাবা-মার চেয়েও তুই প্রিয় হ'য়ে উঠিস, যদি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোকেই চায়, আর বিয়ের মন্ত্র পড়ে শপথ করে বলে যে চিরকাল তোকেই ভালোবাসবে সে; তা হ'লে অবিশ্বাসি তার আত্মা উড়ে আসবে তোর মধ্যে, মানুষের সার্থকতা তুই জানবি। কিন্তু তা কি কখনো হ'তে পারে? আমাদের চোখে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ যেটা, সেই ল্যাঙ্গটাই তো তাদের চোখে পরম কুৎসিত, তারা তাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। শরীরের সঙ্গে হুঁটো বিদঘুটে খুঁটি না থাকলে নাকি ওদের চোখে সুন্দর দেখায় না—যাকে ওরা বলে পা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলকণা নিজের শরীরের দিকে তাকালো: এমন সুন্দর, এমন নরম—কিন্তু এ তো একটা শাঁসওয়ালা ল্যাঙ্গ।

ঠাকুরা বললেন, সুখী তো আমরাই। তিন শো বছর আমরা হেসে-খেলি, লাফিয়ে-সাঁতার বেড়াবো—সেটা অনেক কাল—তার পর মরবো নিশ্চিন্ত হ'য়ে। আজ রাত্রি সভায় একটা নাচ আছে যে।

ঠাকুরা যে নাচের কথা বললেন, অমন জমকালো ব্যাপার পৃথিবীতে অবিশ্বাসি কখনো দেখা যায়নি; সভার দেখালগুলো সব ফটিকের, যেমন পুক তেমনই স্বচ্ছ; তাদের গায়ে মাংস-সার

হাজার-হাজার শব্দ বসানো, কোনোটার গোলাপি রঙ, ঘাসের মতো সবুজ আবার কোনোটা; কিন্তু সবগুলোরই ভিতর থেকে তীব্র আলো বেরিয়ে আসছে, তাতে সমস্তটা ঘর আলোর আলোময়। স্বচ্ছ দেওয়াল ছাড়িয়ে তাদের আলো জলেও অনেক দূর গিয়ে পড়েছে; তাতে ঝলমল করে উঠছে লাখ-লাখ মাছের আঁশ—কোনোটা লাল, কোনোটা বেগুনি, কোনোটা সোনালি কি রূপোলি, একটা ছোটো, একটা-বা বড়ো।

সভার মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল একটা শ্রোত, তারই উপর নাচছে দলে-দলে জলপুরুষ আর জলকণা, তাদেরই নিজেরদের অপরূপ কণ্ঠস্বরের তালে-তালে অমন মধুর নাচের ভঙ্গি পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় নি। তারই মধ্যে ছোটো রাজকণাটির গলায় যেন সুরের ফোঁরারা, তেমন তো আর কারো নয়। হাততালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালে সবাই।

এতে সে থুশিই হ'লো। সমুদ্রে কি পৃথিবীতে তার চেয়ে অপরূপ স্বর কোনোখানেই নেই, এ সে ভালো ক'রেই জানে। একটু পরেই সে উপরকার পৃথিবীর কথা ভাবতে লাগলো; সুন্দর রাজপুরুষ ভুলতে পারে না সে, তার যে অমর আত্মা নেই, এ-দুঃখ সামলাতে পারে না সে। পিতার প্রাসাদ থেকে সে পালিয়ে এলো; ভিতরে যখন ব'য়ে চলেছে উৎসবের শ্রোত, তার ছোটো উপেক্ষিত বাগানে গিয়ে বসে রইলো সে চুপ করে।

আচমকা সে শুনলে, শিঙার ফুঁদে শব্দ জলের উপর দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেলো। মনে-মনে সে বললে, এই বুঝি সে বেকলো শিকারে—যাকে আমি বাবা-মার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সব সময় ভাবি যার কথা, যার মধ্যে আমার জীবনের সব আনন্দ জন্মে রয়েছে। সব, সব বিপদ আমি নেবো—তাকে যদি পাই, আর পাই সেই সঙ্গে অমর আত্মা। আমার বোনেরা নাচুক রাজ-ভায়; আমি যাবো সেই ডাইনীর কাছেই—চিরকাল তাকে নিদারুণ ভয় ক'রেই এসেছি—কিন্তু এখন সে ছাড়া আমার তো উপায় নেই আর।

গেলো সে বাগান ছেড়ে; ফেনিয়ে-ওঠা যে-বর্ণি ছাড়িয়ে ডাইনীর বাসা, গিয়ে দাঁড়ালো তার ধারে। এ-পথে সে আরো কখনো আসেনি। এ-পথে ফোটে না ফুল, মাড়াতে হয় না সাগর-ঘাস, সবুজ ছাঙলা, পার হ'য়ে আসতে হ'লো ধু-ধু ধূসর বালুরাশি, তার ফেনিয়ে-বোরা বর্ণিজল। রেলগাড়ীর চাকার মতো কৌশ-কৌশ-ক'রে হুহুছে সেখানকার জল-বা-কিছু কাছে পায়, টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় অতল পাতালে। এই ভীষণ জায়গা দিয়েই যেতে হ'লো তাকে ডাইনীর দেশে, যাবার আর পথ নেই যে। তারপর পেরোতে হ'লো একটা ডোবা, লিকলিকে পিছল কান্দাগুলো টগবগ করে ফুটছে, ডাইনী এটাকে নাকি বলে তার খেলার মাঠ। এর পরে একটু বনের মধ্যে তার বাসা—বাসাখানাও অদৃশ্য!

চার দিকে যতো গাছ-আর ঝোপঝাড় সব ফণিমন্সার জাত। সেন লক্ষ্মণও একেকটা সাপ ফণা উঁচু করে দাঁড়িয়ে; ডালগুলো ঠিক লম্বা লিকলিকে হাতের মতো, আঙুলগুলো জ্যাস্ত পোকা; মূল থেকে মাথা পয্যন্ত প্রতি অঙ্গ সমস্ত দিক নড়ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। বা-কিছু তারা ধরে, এমন ক'রেই আঁকড়ে ধরে যে জন্মেও আর সে-সব ছাড়ানো যায় না।

এই ভীষণ বনের দিকে তাকিয়ে ছোট্টা জলকণা চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে রইলো। ভয়ে টিপটিপ করতে লাগলো তার বুক। নিশ্চয়ই সে তখন ফিরে যেতো, যদি না তার মনে পড়তে রাজপুত্রের কথা—আর অমরতা! কথাটা ভেবে তার সাহস বেশ বেড়ে গেলো। সে বেঁধে নিলে তার লম্বা চুল; যাতে ফণিমনসার আটকে না যায়; বৃকের উপর হাত দু'টি চেপে ধরে মাড়ের মতো দ্রুতবেগে জলের ভেতর দিয়ে শৌঁ করে চলে গেলো সে; পেরিয়ে এলো বিদ্যুৎ গাছগুলো, খামকাই তারা তার পিছনে ব্যগ্র হাত বাড়ালে।

এটা অবশিষ্ট সে লক্ষ্য না করে পারলে না যে প্রত্যেকটি গাছের মূর্ধার মধ্যে কিছু-না-কিছু আঁকড়ে ধরা, হাজার ছোট ছোট হাত লোতার বেড়ির মতো শক্ত হয়ে চেপে রয়েছে। সমুদ্রে ডুব মরে কতো মানুষ এই পাতালে তলিয়ে গেছে; তাদের সাদা-সাদা কঙ্কাল এই ফণিমনসার মূর্ধার মধ্যে থেকে বিকট দাঁত বার করে হাসছে। তার জড়িয়ে রয়েছে ডাঙার জন্তদের কড়ো-কতো মুণ্ড, বৃকের পাঁজর, আর আশ্র কঙ্কাল! নানা জিনিসের মধ্যে এক জলকণাও দেখা গেলো; তাকে তারা আঁকড়ে ধরে গলা টিপে মেরেছে। কী ভীষণ দৃশ্য বেচারি ছোট্টা রাজকণার চোখের স্তম্ভে!

যাই হোক, এই আতঙ্কের বনের ভিতর দিয়ে সে নিবিষ্টে তো পার হ'লো। তারপর পিছল কাদা-ভরা একটা জায়গা; মস্ত মোটা মোটা শামুকরা সেখানে শুভ্র শুভ্র করে বড়াজে, আর তারই মাঝখানে ডাইনীর বাড়ি—যত দুর্ভাগা জাহাজ ডুবে মরেছে, তাদের হাড় দিয়ে তৈরি। এখানে ব'সে ডাইনী কুজিৎ একটা কোলাবাড়কে আদর করছিলো, আমরা যেমন পোরা পাখিকে আদর করি। বিকট মোটা মোটা শামুকগুলোকে সে পায়রা বলে ডাকে—তারা তার সারা গায়ে অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে বেড়ায়।

ডাইনী বললে, কী চাও তুমি আমার কাছে তা আমি জানি। তুমি একটা আস্ত বোকা, কিন্তু তুমি যা চাও তা-ই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ানক বিপদে পড়বে তুমি—ওগো ফুটফুট রাজকণা, একথা তোমাকে আগেই বলে রাখছি। জাহাজ তোমার পছন্দ হচ্ছে না—এই তো? চাও তুমি তার বদলে মানুষের মতো দু'টো ঠাঙ—এই তো? তা-হ'লে রাজপুত্র তোমাকে ভালোবাসবেন, তুমি পাবে অমর আত্মা। তা-ই নয় কি? একথা বলে ডাইনী এতো টেচিরে তেঁসে উঠলো যে তার পোরা শামুক বাউগুলো চমকে লাফিয়ে তার সারা গা থেকে ঝরে পড়লো।

ঠিক সময়েই তুমি এসেছো,—ডাইনী বলতে লাগলো। যদি স্বর্গাস্তরের পরে আসতে তা-হ'লে আর এক বছরের মধ্যেও তোমার জন্ত কিছু করবার সাধি আমার থাকতো না। তোমাকে দেব খানিকটে মন্ত্র-পড়া জল, তা নিয়ে তুমি সাঁতরে ডাঙায় যাবে, তীবে ব'সে সেটা খাবে। অমনি তোমার লাজ খ'সে পড়বে, গজিয়ে উঠবে লম্বা দু'টো কাঠি, মানুষের আনন্দেব পা। কিন্তু মনে রেখো—ভীষণ লাগবে, দারুণ কষ্ট পাবে; মনে হবে তোমার শরীরের ভেতর দিয়ে কেউ গারালো একটা ছুরি চালিয়ে গেলো। এই কপাস্তরের পর যে-যে দেখবে তোমাকে, সে-ই বলে উঠবে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা। থাকবে তোমার ভঙ্গির লাবণ্য, এতো হালকা পা কোনো নর্তকীর নয়; কিন্তু প্রতি বার পা ফেলতে তোমার অসহ্য যন্ত্রণা হবে—হাঁটছে যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে, রক্ত

পড়বে শ্রোতের মতো। পারবে তুমি এতো কষ্ট সহ্য করতে? যদি পারো, তাহলেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।

পারবো, পারবো, ক্রীণস্বরে বললে রাজকণা। মনে পড়লো তার রাজপুত্রকে, এতো দুঃখে তাকেই তো পাবে সে—আর পাবে অমর আত্মা।

ডাইনি বলতে লাগলো,—ভেবে থাকো—একবার মানুষ হয়েছে কি আর কোনো দিন জলকণা হ'তে পারবে না। পারবে না কখনো বোনের কাছ ফিরতে, যেতে পারবে না বাপের বাড়ি—আর যদি এমন হয় যে রাজপুত্র তোমাকে এমন একান্ত ভালোবাসলো না যে তোমার জন্ত সে বাবা-মাকে ছাড়তেও প্রস্তুত হ'তে পারে, যদি তুমি তার সমস্ত ভাবনায় আর প্রার্থনায় জড়িয়ে যেতে না পারো, যদি না বিশপের মন্ত্রে তোমাদের বিয়ে হয়—তাহ'লে যে অমরতা তুমি চাও তা কখনো পাবে না, কখনো না। যে রাতে রাজপুত্র অগ্ন একজনকে বিয়ে করবে, সে রাত্রি ভোর হ'তেই তোমার মৃত্যু। দুঃখে তখন চুরমার হ'য়ে যাবে তোমার বুক, সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে তাসবে তুমি।

মুহূর্তের মতো ম্লানমুখে জলকণা বললে, তবু, তবু আমি সাহস করবো।

আরেকটা কথা। আমাকেও তোমার কিছু দিতে হবে তো—এতো কাণ্ড করা কি সহজ কথা! সমুদ্রের তলার তোমাদের সকলের কণ্ঠই মধুর, তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর তোমার কণ্ঠ। তাই দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবে ভেবেছো তো? কিন্তু তোমার এই কণ্ঠস্বই আমি চাই। তোমার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো জিনিস, তাই এই মন্ত্র পড়া জলের দাম; নিজের রক্ত মিশিয়ে সেটা তৈরি করবো আমি—খোলা তলোয়ারের মতো ধার হবে তো তার সেই জগ্গেই।

জলকণা বললে, আমার কণ্ঠই যদি কেড়ে নিলে তো আমার আর রইলো কী? কী দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবো।

রইলো তোমার অঙ্গের লাবণ্য, থাকলো তোমার ভঙ্গির স্ত্রী, তোমার কথা ভরা দৃষ্টি। এসব জিনিস মানুষের তরল চিত্তকে মুগ্ধ করা সহজই হবে। বেশ! সাহসে কুলোবে তো? জিভ বার করো—ওটা কেটে নিয়ে আমি নিজে রাখবো। মন্ত্র পড়া জলের এই দাম।

তবে তাই হোক। বললে জলকণা।

ডাইনী তখন ফুটন্ত কড়াইতে সেই বিধ তৈরি করতে লাগলো। আগে সে কড়াইটা বাউ-শামুক দিয়ে বেশ ভালো করে মুছে নিলে, বললে, বিস্তৃত ভাবে সব করতে হয়। তারপর তার বৃকে একটু আঁচড় কাটলো, কালো-কালো রক্ত গড়িয়ে পড়লো কড়াই গলানো আলকাতরার মতো। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মশলা ঢালা হ'লো। তারপর কড়াই থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দোঁগা উঠতে লাগলো এমন বিকট বীভৎস মৃত্তিতে যে দেখলে ভয়ে মুছ'া যেতে হয়। তার ভেতর থেকে আবার কঁকানি গোড়ানির আঁড়াজ আসছে—অনেকটা কুমীরের কান্নার মতো। অনেকক্ষণ পরে মন্ত্র-পড়া জল পাকিয়ার জলের মতোই টলটলে দেখা গেলো—তৈরি হয়েছে।

ডাইনী বললে জলকণাকে,—তবে, এই নাও। সঙ্গে সঙ্গে তাব জিভটা টেনে কেটে ফেললো। কোবা হ'য়ে গেলো ছোট্টা

জলকন্ডা—না পারে সে কথা বলতে, না পারে গাইতে। বাবার সময় ডাইনা বলে দিলে, ‘যদি ফণিমনসারা তোমাদ্বক ধরতে আসে, এই জলের একটুখানি ছিটিয়ে’ দিয়ে—তাদের ডানাগুলি হাজার টুকরে’ হ’য়ে ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু এ উপদেশের কোনোই দরকার ছিলো না। চকচকে শিশিটা তার হাতে তারার মতো ঝলমল করছে—তাই দেখেই ভয়ে ম’বে গেলো ফণিমনসারা। ‘পার হ’য়ে এলো সে ভীষণ বন, পার হ’য়ে এলো ডোবা, ছাড়িয়ে এলো ফেনিয়ে ঘোরা চরকি-জল।

এইবার সে বাবার প্রাসাদের দিকে তাকালো। নিবে গেছে সভার আলো, সবাই ঘুমিয়েছে। ভিতরে সে কেমন ক’বে যাবে—গেলে তো কোনো কথাই বলতে পারবে না? শেষবারের মতো ছেড়ে যেতে হ’চ্ছে এই বাড়ি—কষ্টে তার বুক প্রায় গেলো ভেঙে। লুকিয়ে সে গেলো বাগানে, প্রতি বোনের কুঞ্জ থেকে একটি ক’বে ফুল নিলে ছিঁড়ে নিজেরই হাতে, চুমো খেলো অনেক বার; তারপর ঘন-নাল জলের ভিতর দিয়ে ভেসে উঠলো সে উপরের পৃথিবীতে।

তখনো সূর্য ঝরনি। রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌছিয়ে পরিচিত শালা সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এলো। আকাশে তখনো চাঁদ জ্বলছে; ছোট্টো জলকন্ডা শিশিতে ভরা মস্ত-পড়া জল ঢেলে দিলে গলায়। ধারালো ছুরির মতো সেটা যেন তার ভিতরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে গেলো, মুছিত হ’য়ে পড়ল সে। সূর্য ঝরার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙলো তার মজ্জা, সমস্ত শরীর অসহ যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। যাক, পুড়ে যাক। তবু তো সে পেলো তার এতো আরাধনার ফল, দেখতে পেলো অপরূপ রাজপুত্রকে ঠিক তার সামনে, বাত্রির মতো কালো চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে। লজ্জা পেয়ে নিজের চোখ সে নামিয়ে নিলে। এ কী! কোথায় তার নাহের মতো লাজ? কোমল মন্থন হুঁটি পা নেমে এসেছে যে! কিন্তু কোনো আবরণ নেই তার; বুখাই সে চেষ্টা করলে তার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢাকতে।

রাজপুত্র জিজ্ঞাস করলে, সে কে, কী ক’রেই বা এখানে এলো! উত্তরে সে তার উজ্জ্বল-নাল চোখ দুটো বড়ো ক’রে মেলে তাকালো, একটু হাসলো—হায়, সে তো কথা বলতে পারে না। রাজপুত্র তাকে হাতে ধ’রে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলো। ডাইনা ঠিকই বলেছিলো: তার এমন লাগলো যেন গোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সেকষ্টটা অনারাসেই সে সহ্য করলে, এগিয়ে গেলো সে দখিণী হাওয়ার মতো হালকা পায়ে; যে দেখলো তাকে সেই অবাক হ’লো তার লম্বুনীলার লাষণ্য দেখে।

প্রাসাদে ঢুকলো সে, তার জগ্গ আনা হ’লো বেশমের আর মশলিনের বাহারে কাপড়; সেখানে যারা থাকে, তার মতো সুন্দর কেউ নয়—কিন্তু সে না পারে কথা বলতে, না পারে গান পাইতে। রাজা-রাণী আর রাজপুত্রের সামনে রাজ গান করে কয়েক জন দাসী, তাদের বেশমি কাপড়ে সোনালি বুটি তোলো; তাদের মধ্যে একজনের পরিষ্কার সুন্দর গলা শুনে রাজপুত্র খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাতে জলকন্ডার মনে বড়ো কষ্ট হ’লো; সে তো জানে এর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর ছিলো তার গান। সে ভাবতো, হায় রে, তার জন্মে যে আমি আমার অমন কষ্টস্বর চিরকালের মতো খুইয়ে বসেছি, তা তো সে জানেই না।

দাসীরা নাচতে শুরু করলো। তখন উঠলো আমাদের জলকন্ডা; লীলায়িত শুভ্র দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মুহু ভঙ্গিতে যেন হাওয়ার সে ভেসে বেড়াতে লাগলো। প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে উঠলো তার অঙ্গের নিখুঁত লাবণ্যের ছন্দ; তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে-কথা ঝলমল করে উঠলো তা দাসীদের গানের চাইতে অনেক নিবিড় হ’য়ে মর্মে গিয়ে বাজলো।

সকলেই মুগ্ধ হ’লো, সবচেয়ে মুগ্ধ হলো রাজপুত্র। সে তাকে ডাকলে আমার কুড়িয়ে পাওয়া সোনা। বার-বার নাচলো সে, যদিও প্রতিটি পা ফেলতে অসহ যন্ত্রণা হ’লো তার। রাজপুত্র বলে দিলে সে সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে; তারই পাশের ঘরে মখমলের বালিশে মশলিনের বিছনা পাতা হ’লো জলকন্ডার।

রাজপুত্র তাকে পুরুষের পোশাক তৈরি করিয়ে দিলে; ঘোড়ায় চড়ে সে যখন বেরোবে, এই বাড়িয়ে-পাওয়াও যাবে তার সঙ্গে। এক সঙ্গে কতো সুগন্ধি বনে তারা বেড়ালো, সবুজ ডালপালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলো কাঁধ, নতুন পাতার ঘনতার মধ্যে লুকোনো পাখিদের গানের জলশায় কী ফুটি। উঠলো জলকন্ডা তার সঙ্গে খাড়া পাহাড়, নরম পা ফেটে রক্ত বেরলো, অমনি অমুচরের ছুটে এলো ধী-ধী ক’রে। কিন্তু একটু মুচকি ভেসে উঠলো রাজপুত্রের সঙ্গে আরো উঁচুতে; সেখানে দেখা যায় মেঘেরা পায়ের নিচে হেসে-খেলে গড়াগড়ি যাচ্ছে; ছুটছে এ-ওর পিছনে, যেন একঝাঁক পাখি দেশান্তরে চলেছে উড়ে।

রাত্রি, প্রাসাদের সবাই যখন ঘুমে বিভোর, জলকন্ডা পাখরের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে এসে জলে পা ডুবিয়ে ব’সে থাকে। তখন তার মনে পড়ে জলের নিচে তার প্রিয়জনদের।

একদিন রাত্রি, তখন সে সিঁড়িতে ব’সে পা ধুচ্ছে, তার বোনেরা সাঁতরে এলো সেখানটায়, একসঙ্গে, হাতে হাত ধ’রে, গান গাইতে গািতে। কী করণ সে-গান! সে ডাকলে তাদের; বোনেরা তাকে দেখেই চিনতে পারলে; সে চলে আসায় তাদের বাড়িতে কতো হুখ সে-কথা তাকে না-ব’লে পারলে না। এর পর থেকে বোনেরা রাজ্য রাত্রেই আসে। একবার সঙ্গে ক’রে বড়ো ঠাকুমাকেও নিয়ে এসেছিলো—অনেক দিন জলের উপরকার দেশটি দেখেননি তিনি। একদিন সাগর-রাজাও এলেন, মাথায় তাঁর সোনার মুকুট; কিন্তু এরা হুজুন ডাঙার খুব কাছে জিড়তে সাহস পেলেন না, মেয়ের সঙ্গে তাই কোনো কথাই বলা হ’লো না।

এদিকে ছোট্টো জলকন্ডাটি ক্রমেই রাজপুত্রের বেশি প্রিয় হ’য়ে উঠছে। কিন্তু তার কাছে সে কুড়িয়ে-পাওয়া সোনাই, তার বেশি কিছু নয় সে; ফুটফুটে মিষ্টি খুমুশি—তাকে বিয়ে করবার কথা তার মাথায়ই এলো না কখনো। কিন্তু বিয়ে না করলে কী ক’রে পারে সে অমর আত্মা? বিয়ে তাকে করতেই হবে—নয়তো কেনা হ’য়ে যাবে সে, ছুটতে হবে তাকে চিরকাল, সমুদ্রের অশান্ত ঢেউয়ের ধাক্কা স’য়ে-স’য়ে।

রাজপুত্র যখন তাকে বকে নিয়ে আদর করেন, তার চোখ যেন জিজ্ঞাস করে, তুমি কি আর-সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসো না আমাকে?

রাজপুত্র বলেন, সবচেয়ে তোমাকেই তো ভালোবাসি—তোমার মতো ভালো আর কে? তুমিও তো আমাকে কম ভালোবাসো না?



একবার একটি মেয়েকে পলকে দেখেছিলেম, আর বোধ হয় কখনোই দেখবো না—তুমি অনেকটা তার মতোই। ছিলেম একবার এক জাহাজে, তুবলো জাহাজ, ডেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে ঠকলেন গিরে তারে এক গির্জের ধারে, সেখানে একদল মেয়ে পূজো-অর্চনা নিয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটি কুড়িয়ে পেলো আমাকে, প্রাণ বাঁচালো আমার। একবার শুধু তাকে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তার ছবি আমার মস্তিষ্কে আঁকা হয়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবো না। কিন্তু সে তো দেবতার সেবিকা, কাঁ করে পাবো তাকে? তুমি তার মতোই দেখতে, সেইজন্যই বুঝি এসেছো আমাকে সাহায্য দিতে? আমাকে কখনো ছেড়ে যাবো না।

জলকণ্ঠা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, হয় যে, সে তো জানে না আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম! দরস্ত ডেউগুলোর উপর দিয়ে তাকে তুলে ধরে নিয়ে গিয়েছিলুম বনের মধ্যে সেই গির্জের ধারে; বসেছিলুম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে—একুণি কেউ এসে পড়বে, এই আশায়। তারপর দেখলেন সেই সুন্দর মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে—তাকেই সে ভালোবাসে আমার চোয় বেশি! সে আরেক বার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, জলকণ্ঠা তো কাঁদতে পারে না। সে-মেরে নাকি দেবতার সেবিকা, মন্দির ছেড়ে কখনো আসতে পারবে না, আর তো! তাদের দেখা হবে না। আমি আছি সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে, রোজ তাকে দেখি; আমি তাকে ভালোবাসবো, সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করবো তাকেই।

এদিকে রাজ-অমাত্যরা বলাবলি করে, প্রতিবেশী রাজ্যের মেয়ের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের তো বিয়ে। মন্ত জাহাজ সাফ্রানো হচ্ছে সেই জগেই। সকলকে জানানো হয়েছে তিনি দেশভ্রমণে বেরোচ্ছেন, আসলে কিন্তু যাচ্ছেন রাজকণ্ঠাকে আনতে, লোকজন সৈন্ত-সামন্ত বিস্তর যাবে সঙ্গে। এসব কথা শুনে জলকণ্ঠা মুচকি হাসে; রাজপুত্রের মনের আসল ভাবখানা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

একদিন রাজপুত্র তাকে বললে, আমাকে তো যেতে হচ্ছে। সুন্দরী রাজকণ্ঠাকে দেখতে যেতেই হবে আমাকে, আমার মা-বাবার ইচ্ছে তাই। কিন্তু সেই মেয়েকে বিয়ে করে যবে আনতেই হবে—এমন কোনো জোর তাঁরা করবেন না। অবশি আমার পক্ষে তাকে ভালোবাসাও অসম্ভব; গির্জের সেই মেয়ের মতো তুমি দেখতে ব'লে কি আর সে-ও তেমন হবে? যদি বিয়ে করতেই হবে, বরং তোমাকেই করবো—আমার কুড়িয়ে-পাওয়া সোনা, যুখে কথা নেই, চোখ-ভরা কথা। এই ব'লে সে তার চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে একটু আদর করলে; সঙ্গে-সঙ্গে জলকণ্ঠার মন মানুষের সার্থকতা আর অমর আনন্দের মধুর স্বপ্নে নোনা দিয়ে উঠলো।

জমকালো জাহাজে চড়ে প্রতিবেশী রাজ্যের দেশে যেদিন যাত্রা, সেদিন রাজপুত্র বললে জলকণ্ঠাকে, জাহাজে তার পাশে দাঁড়িয়ে, 'সোনা আমার, সমুদ্রে তোমার ভর করে না তো?' তারপর বললে, 'বড়ে সমুদ্রে কেমন পাগল হয়ে উঠে। জলের নিচে থাকে কতো অদ্ভুত মাছ, কতো আশ্চর্য জিনিস বা ভুবুরিরা দেখে।'

জলকণ্ঠা একটু হাসলো এসব কথা শুনে। সমুদ্রের তলায় কী আছে না আছে তা কি আর তার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর কোনো মানুষ?

রাতে চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাহাজের সবাই ঘুমিয়ে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে ব'সে থাকলো। জাহাজ চলছে সমুদ্রকে চিরে, জল উঠে ফেনিয়ে। সেদিকে তাকাতেতাকাতে তার মনে হ'লো। সে যেন তার বাবার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার ঠাকুমার রূপোলি মুকুট। তারপর দেখলো তার বোনরা জল থেকে উঠে আসছে, ভারি স্নান তাদের মুখ, হাত বাঁড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে। সে হাসলো তাদের দিকে তাকিয়ে; সে যেমনটি চেয়েছিলো ঠিক তেমনটি সব ঘটছে, এই কথা তাদের বোঝাতে যাবে, এমন সময় সেখানে এসে পড়লো একজন খালাশি। তাকে দেখেই বোনরা হঠাৎ এমন ভুব দিলে জলের মধ্যে যে, খালাশি ছোকরা মনে করলে জলের উপর সে শুধু ফেনাই দেখছিলো—আর কিছু নয়।

পরের দিন সকালে জাহাজ চুকলো রাজধানীর বন্দরে। বাজলো শঙ্খ, বাজলো জয়ঢাক, সেনা-সামন্ত মিছিল করে গেলো শহরের ভিতর দিয়ে, উড়লো নিশেন, চললো বলসানো সড়িন উঁচিয়ে তুরুক সোয়াব। রোজই নতুন-নতুন আমোদ, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া লেগেই আছে। কিন্তু রাজকণ্ঠা তখন সেখানে নেই, তাকে পাঠানো হয়েছে নূরের দেশে লেখাপড়া শিখতে, রাজবংশের সবরকম গুণপনা সেখানে সে আয়ত্ত্ব করছে। কিছুদিন পরে, সে ফিরলো দেশে।

এই আশ্চর্য রাজকণ্ঠাকে দেখতে ছোটো জলকণ্ঠা কিছু উৎসুকই ছিলো,—যখন দেখলো স্বাকার করতে বাধ্য হ'লো,—সুন্দরী বটে, এতো সুন্দর কোনো মেয়ে সে কখনো দেখেনি।

রাজকণ্ঠার গায়ের চামড়া এমন শাদা আর নরম যে তার ভিতর দিয়ে নীল শিরাগুলো যেন স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে; বাঁকা তুরুর নিচে ঝকঝক করছে কালো একজোড়া চোখ।

এ যে সে-ই! রাজপুত্র ব'লে উঠলো তাকে দেখেই। এই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো—মড়ার মতো যখন পড়েছিলুম সমুদ্রের ধারে! সলজ্জ বধুকে সে নিলে কাছে টেনে। তারপর কুড়িয়ে-পাওয়া বাবা জলকণ্ঠাকে বললে, আজ আমার সুখের সীমা নেই। যা আমি আশা করতে সাহস পাইনি, তাই হয়েছে। আমার সুখে তুমিও কি আজ সুখী হবে না?—আশে-পাশের সকলের মধ্যে তুমিই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো।

বাবা জলকণ্ঠা হুখে একবার রাজপুত্রের হাত চেপে ধরলে। এখনই ভেঙে যাচ্ছে তার বুক; যদিও সেই বিয়ের রাত এখনো ভোর হয়নি, আসেনি তার মরণের দিন।

আবার গির্জের বাজলো ঘণ্টা, দূতেরা বেরুলো শহরের পথে-পথে আসন্ন বিবাহের ঘোষণা নিয়ে। বেদীতে জললো রূপোর প্রদীপে স্তগন্ধি আগুন, বিশপ সোনার ধূপতিতে ধূনা দিলে, বর-বধু হাতে হাত রাখলো, উচ্চারিত হ'লো বিবাহের পবিত্র মন্ত্র।

ছোটো জলকণ্ঠা পরেছে আজ রেশমের আর সোনার কাপড়, রাজকণ্ঠার গুড়নাব আঁচল ধরে পিছনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না দেখছিলো সে এই শুভ অমুঠান, না শুনেছিলো গুরুগম্ভীর বিয়ের বাজনা। শুধু সে ভাবছিলো তার আসন্ন অবসানের কথা; তার মনে হ'লো পৃথিবী ও স্বর্গ দুই-ই সে হারালো!

সেই সন্ধ্যাভেই বর-বধু জাহাজে পেলো বিরে।

কামান, হাওয়ার উড়লো পংপং নিশেন, আর জাহাজের খোলা ছাদে সোনালি কাপড়ের অপরূপ শামিয়ানার তলার কিংবাবের নরম জাকিম পাতা হ'লো,—বর-বধু রাত্রে সেখানে শোবে। অমূল্য হাওয়া উঠলো; নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ হালকা ছন্দে চললো তলে-তলে।

অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাশি-রাশি রঙিন আলো ঘ'লে উঠলো, ছাদের উপর শুক হ'লো নাচ। জীবনে প্রথম বার সমুদ্র থেকে মাথা তুলে যে-দৃশ্য সে দেখেছিলো জলকক্সার তা মনে প'ড়ে গেলো। এ দৃশ্যও তেমনি জমকালো—তাকেও যোগ দিতে হ'লো নাচে, জাহাজের তক্তার উপর পাখির মত হালকা পায়ে সে ঘরে বেড়াতে লাগলো। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো সবাই : এতো সুন্দর সে-ও কখনো নাচে নি। ভীষণ লাগলো তার ছোটো দু'টি পায়ে; কিন্তু সে-কষ্ট যেন তার আজ লাগলোই না—অনেক বেশি কষ্ট যে তার মনে ?

আজকের পরে সে আর তাকে দেখবে না—যার জন্তে সে ছেড়ে এসেছে বাড়ি-ঘর, মা বাবা হারিয়েছে তার মধুর কণ্ঠস্বর, রোজ মনেছে অসহ্য যন্ত্রণা—আর সেই মানুষটি এক কঁটা সন্দেহও করে না তার জন্তেই তো সে এতো সব করছে ! আজই শেষ ! এর পরে সে আর নিশ্বাসে সেই বাতাস টানবে না যে-বাতাসে তার প্রিয়তমের জীবন ; আর দেখবে না ঘন-নীল সমুদ্র, তারায় ছাওয়া আকাশ। আসছে চিরন্তন রাত্রি—সেখানে আর কোনো ভাবনা নেই, কোনো স্বপ্ন সেই। জাহাজের উপর ব'য়ে চলেছে কৃত্রিম শ্রোত ; সে-ও দুপুর রাত পর্যন্ত সকলের সঙ্গে হাসলো, নাচলো—মনের মধ্যে তার নিঃশেষ হ'য়ে-বাওয়া মৃত্যুর ভাবনা। তারপর রাজপুত্র গেলো তার সুন্দর বধুকে নিয়ে জমকালো শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করতে।

এখন সব চূপচাপ ; হাল ধ'রে একা একজন মাল্লা ঠাঁড়িয়ে। জাহাজের সিঁড়িতে শাদা হাত দু'টি হেলান দিয়ে ঠাঁড়িয়ে পূবের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। কখন ভোর হবে ? সূর্যের প্রথম আলোর রেখাই তো তার মৃত্যুর তলোয়ার। তার বোনের জল থেকে এলো উঠে, মৃত্যুর মতো স্নান তাদের মুখ ; এতো সুন্দর লম্বা চুল তাদের ছিলো, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফুরফুর ক'রে উড়তো—এখন আর নেই।

কী হ'লো চুল ?

'চুল দিয়েছি আমরা ডাইনাকে,'—তারা বললে। 'বাত্তে তোকে মরতে না হয়, বাত্তু সে তোমার জন্তে কিছু করে। ডাইনী দিয়েছে এই ছুরিটা তোমার জন্তে, এই নে। স্ব'ধ্য উঠবার আগেই এই ছুরিটা তোকে রাজপুত্রের বুকে দিতে হবে বসিয়ে ; যেই তার গরম রক্তের কঁটাটা তোমার পায়ের উপর পড়বে, অমনি আবার তোমার লাজ হ'য়ে যাবে। আবার তুই হবি জলকক্সা, সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে যাবার আগে বাঁচতে পারবি তিনশো বছর। ঈগগিরি কর ঈগগিরি ! সূর্যোদয়ের আগে হয় সে মরবে, নয় মরবি তুই ! বুড়ো ঠাকুমা আমাদের রোজই কাঁদে তোমার জন্তে,—কাঁদতে-কাঁদতে চোখ তাঁর অন্ধ হ'য়ে গেছে, মাথার চুল সব প'ড়ে গেছে—যেমন গেছে আমাদের চুল ডাইনীর কাঁচিতে। মেয়ে ফ্যাল, মেয়ে ফ্যাল রাজপুত্রকে, তারপর আর আমাদের কাছে। একুশি ! একুশি ! দেখছিসনে পূবের আকাশে গোলাপি আভা, স্ব'ধ্য উঠলো ব'লে। স্ব'ধ্য উঠলেই ভো ভোর

শেষ, সব শেষ ! এই ব'লে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা মিলিয়ে গেলো।

বর-বধু যেখানে শুয়ে, ছোটো জলকক্সা তার সোনালি পর্দা সরিয়ে চুকলো ; তাকিয়ে দেখলো রাজপুত্রকে, চুন্ন খেলো তার কপালে ; তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো আলো প্রতি মুহূর্তেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। রাজপুত্র ঘুমের মধ্যে অস্ফুট স্বরে কী বললে—তার বধুর নাম ; তার স্বপ্ন সে দেখছে, শুধু তারই—এদিকে জলকক্সার হাতে কাঁপছে সেই সর্বশেষ ছুরি !

হঠাৎ সে ঘুরে ফেলে দিলে মৃত্যুর সেই ধারালো জিহবা ; অলস লাল ডেউগুলো লাফিয়ে উঠলো সব দিকে ; ডেউয়ের উপর দিয়ে নেচে চললো যেন এক পাগলি মেয়ে, মুকুট তার টাটকা রক্তে ছোপানো। তার প্রিয়তম রাজপুত্রের দিকে শেষবার যে-চোখ মেলে জলকক্সা তাকালো তা ক্রমেই স্থির, ঘোলাটে হ'য়ে এলো। তারপর সে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে, ঠিক বৃষ্টিতে পারলে সে, তার শরীর আন্তে-আন্তে ফেনা হ'য়ে গ'লে যাচ্ছে।

জলের বিছানা থেকে উঠলো স্ব'ধ্য। এমন কোমল উষ্ণ হ'য়ে আলোর পাগড়িগুলো পড়লো তার সাঁরা গায়ে যে, জলকক্সা প্রায় বুঝতেই পারলে না যে সে মরেছে। এখনো সে দেখছে জ্যোতির্ময় স্ব'ধ্যকে, তার মাথার উপর ভাসছে হাজার-হাজার স্বচ্ছ সুন্দর মূর্তি ! এখনো তার চোখে ভেসে উঠছে জাহাজের পাল, রাতানো উবার আলোর নাচ ! মাথার উপরে সেই অশরীরী জীবনের কণ্ঠস্বরে ক'রে পড়ছে সুর—তা এমনি মধুর, এমনি কোমল যে মানুষের কানে সে-শব্দ ধরাই পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে না মানুষের চোখে তাদের মূর্তি। তাকে ঘিরে তারা ঘুরে-ঘুরে উড়ে বেড়ালো,—যদিও পাখা তাদের নেই—নিজদের লব্ধা ইচ্ছার বেগে তাদের ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষটায় জলকক্সা দেখলো যে তার শরীরও ওদের মতো হালকা হ'য়ে যাচ্ছে ; মনে হ'লো কে যেন তাকে সমুদ্রের ফেনা থেকে আন্তে-আন্তে ঠেলে তুলছে উপরের দিকে। কোথায় আমি ? যাচ্ছি কোথায় ? সে জিজ্ঞেস করলে। তার কণ্ঠস্বর বেরলো, শোনালো ঠিক ঐ আকাশকক্সাদের মতো। সে শব্দ অলৌকিক, শান্ত, স্নিগ্ধ ! তার মধুর কোমলতা অন্তরের গহনতলে নিবিড় হ'য়ে ক'রে পড়লো।

আকাশকক্সাদের একজন বললে, তুমি যে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছো ! আজ হ'তে তুমিও যে আকাশকক্সা ! জলকক্সার অমর আত্মা নেই ; কোনো মানুষের ভালোবাসা গেলে তার আত্মা অমর হ'য়ে ওঠে ! তার অনন্ত জীবন নির্ভর করে অপরের উপর। অমর আত্মা আকাশকক্সাদেরও নেই। আমরা তা অর্জন করি নিজদের ভালো কাজের জোরে। আমরা উড়ে যাই গরম দেশে ; যেখানে পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বিবাক্ত হাওয়ার কাপটায় ধুকছে। আমাদের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসে হাওয়ার বিষ চ'লে যায়, তাদের প্রাণ বাঁচে। বাতাসের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে যাই ঠাণ্ডা হাওয়া, তাকে সুরভিত ক'রে তুলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ ; এমনি ক'রে সমস্ত পৃথিবীতে বিলিয়ে যাই স্বাস্থ্য আর আনন্দ। তিনশো বছর ধ'রে এনি সূর্যোদয় জোরে আমরা অমরতা লাভ করি—মানুষের চিরন্তন সার্থকতার আশীর্বাদ হ'ই। আর তুমি ছোটো জলকক্সা—তুমি তোমার প্রাণপণ ক'রে রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছো ; স্বপ্নের প্রেরণায় মানুষের প্রেমের জন্তে

এতো করেছে, এতো চুংখ পেলে আমাদের মতো মানুষের সেবায়—এখন আমি অপরাধ এত নিয়ে ইস্ট এসেছি পরিচালিত আকাশে; এখন তিনশো বছর ধরে সুকাজ করলে আমার আত্মা লাভ করতে পারবে।

ছোট্ট জলকন্ডা স্থানের দিকে বাড়িয়ে দিলে তার আলোক-উজ্জ্বল দৃষ্টি, তার সরল কোমল হৃদি স্বচ্ছ দীপল বাহু; তারপর জীবনে প্রথম বার জলে ভিজে উঠলো তার চোখ।

এদিকে জাহাজে দবাতি উঠছে জেগে, আবার শুরু হয়েছে উৎসব। সে দেখলো রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে ব'সে আছে; তাকে খুঁজে না পেয়ে তাদের মন বড়ো খারাপ; ম্লান মুখে তারা তাকিয়ে আছে নিচু মুখে চেউয়ের ফেনার দিকে—যেন তাবা জানে ঐ সমুদ্রের চেউয়ের মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে সে। অদৃশ্য হ'য়ে জলকন্ডা রাজপুত্রের কপালে চুমু দিলে, হাসলে তার দিকে তাকিয়ে; তারপর আকাশ-কন্ডাদের সঙ্গে উড়ে মিলিয়ে গেলো জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে-বাওয়া গোলাপি মেঘের মধ্যে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে গেলো দিগন্ত ছাড়িয়ে।

সমাপ্ত

## একটি চমকপ্রদ ম্যাজিক

যাহুকের এ, সি, সরকার

মুগ্ধ এক বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হয়েছেন দর্শকবৃন্দ।

এখানেই দেখানো হবে ম্যাজিক। আরম্ভ হতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী, তবুও এরই মধ্যে হলের অর্ধেক ভরে গেছে দর্শকে। এদের মধ্যে আবার কচি-কাচার সংখ্যাই বেশী। কচি-কাচারাই যাহুর খেলা দেখী পছন্দ করে কি না, তাই। প্রদর্শনী আরম্ভ করার সময় যখন হ'ল তখন তো ঘরে তিলধারণের স্থানটুকুও নাই। হলের প্রায় বারো আনা অংশ ভরে গেছে কচি-কাচার দলে। তবুও টু' শকটি শোনা যাচ্ছে না—সবাই চুপচাপ। কথাটা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না তো? না হবারই তো কথা। বন্ধুদের সঙ্গে যখন তোমরা একত্র এক জায়গাতে থাকো, তখন তো তোমাদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে চারি দিক। চাই কি হু'—এক হাত ঝগড়া মারামারি হাতাহাতি হলোই বা কে আটকায়! যে ঘটনাটার কথা বলছি সেটা এ দেশের নয় বিলাতের। ওদের শৃঙ্খলাবোধ ও সৌজন্য আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ। নিয়মানুবর্তিতা তাদের মজাগত। যাক সে কথা। এখন যা বলছিলাম। যথাসময়ে খেলা দেখানো আরম্ভ করলাম। হু'—তিনটে খুব চমকপ্রদ খেলা দেখানোর পরে আরম্ভ করলাম একটি অপেক্ষাকৃত ছোট খেলা। দর্শকদের সামনে একটা টেবিলের উপরে আমি রাখলাম তিন বকমের তিনটি মুদ্রা—একটি হাফক্রাউন (আড়াই শিলিং) একটি দুই শিলিং ও একটি এক শিলিং। খেলাটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে হু'জন দর্শককে পাতারাক্ষরপ সঙ্গে নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার অনুপস্থিতি কালে এক জন দর্শক তার আসন ছেড়ে উঠে এসে তার পছন্দ মতন যে কোনও একটি মুদ্রা তুলে নিয়ে মুঠো করে ধরে রাখলো, আর মনে মনে একশ' বার ঐ মুদ্রাটির

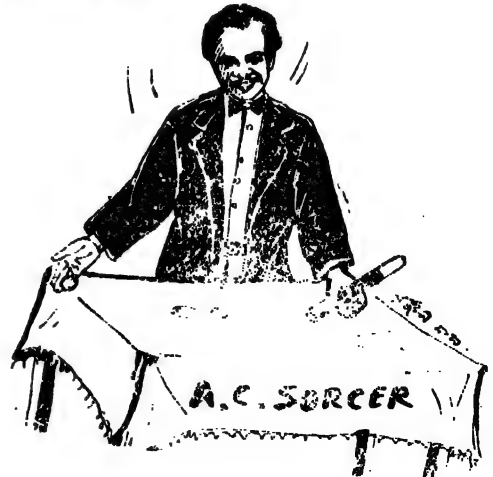
তিনশো বছর পরে : আমাদের মান স্বর্গরাজ্য,—সে বললে।

একজা কাল কাল বললে, তারা এসেও যেতে পারি। সে সব মানুষের বাড়িতে ছোট্ট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ভেতর অদৃশ্য হ'য়ে আমরা উড়ে যাই; আর যখন আমরা দেখতে পাই একটি ভালো ডেকে, যে তার মা-বাবার বুকে, যথ উজ্জ্বল করেছে, তাদের নেতের পুঙ্খল হ'য়ে টাট্টিয়েছে, তখনই ইশ্বর আমাদের এই প্রতীক্ষার সময়টা কাটিয়ে দেন। শিশুরা কেউ জানে না যে আমরা ঘরে-ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছি; জানে না তাদের ভালো কাজে খুশি হ'য়ে আমরা একবার হাসলেই তিনশো বছর থেকে একটা বছর ক'মে যায়। কিন্তু যখন আমরা দেখি বদমেজাজি হুঠু ছেলে, মনের ক্রোধে আমরা কাঁদি, আর আমাদের প্রতি অশ্রুবিন্দু আমাদের প্রতীক্ষার সময় একদিন ক'রে বাড়িয়ে দেয়।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাম করে মুঠো খুলে মুদ্রাটিকে আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে আমাকে ডাকলো। আমি ঘরে ফিরে এলাম; চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটি 'মুদ্রা এক' এক বার হাতে তুলে নিয়ে পছন্দ-করা মুদ্রাটি সবাইকে যখন দেখালাম তখন তো সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

শোন এবার খেলাটার কৌশল। একটা মুদ্রাকে কিছুক্ষণ হাতের মুঠোর মধ্যে রাখলে শরীরের উত্তাপে তা বেশ গরম হয়ে যায়—এ তো তোমরা দেখেছই। শীতকালে বা শীতের দেশে এই প্রক্রিয়া হয় আরও ভাল। টেবিলের উপরে পড়ে-থাকা মুদ্রাতে আর কিছুক্ষণ মুঠো করে রাখা মুদ্রাতে যে তাপমাত্রার পার্থক্য এ অনুভব করেই চেনা যায় ঠিক মুদ্রাটি।



# এক মুঠো আকাশ

পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

যদিও প্রভাত সম্পাদককে ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা জোগাড় করে দেবে বলে, কিন্তু কোথাও তেমন সুরিষে করে উঠতে পারে না। তাই 'সবুজ ঘাসের' ট্রেড-শো দেখতে এসে বেলারাগীর সঙ্গে দেখা হতেই সে ঐ কথার অবতারণা করে।

—আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

বেলারাগী হেসে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? আবার প্রস্তোত্তর না কি?

—না, আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে।

—কি হয়েছে?

প্রভাত আমতা-আমতা করে, মানে একটু মুঞ্চিল হয়েছে, সম্পাদকের নামে ওয়্যাবেট এসেছে। হয় জেল নয় ফাইন।

—হঠাৎ!

—হঠাৎ আর কি, একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ওরা বলছে অশ্লীল। বেলারাগী অবাক হয়, এমন লেখা ছাপালেন কেন?

—আমি তো আর ছাপাই নি, সব ঐ সম্পাদকের কাজ। একেবারে আকাট মুখ্য ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছে—

—তাই তো ভাবনার কথা!

প্রভাত আস্তে আস্তে বলে, প্রায় পাঁচশো টাকার দরকার। জানেনই তো কাগজের অবস্থা, কোথা থেকে যে এত টাকা দেবে—

—পাঁচশো! সে তো অনেক টাকা! এক কাজ করুন, চাঁদ তুলুন। আমি দশ টাকা দেব অখন। প্রভাত আর এ বিষয়ে কথা বলার উৎসাহ পায় না। বেলারাগী নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে।

—'সবুজ ঘাস' কেমন লাগল?

—তেমন সুরিষের হয়নি।

তখনও অনুষ্ঠান শেষ হয়নি। বেলারাগী বলে, চলুন, আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি। ভাঁড় ভাঙলে বড় দেরী হবে।

—চলুন।

বেলারাগী এগিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে আনে। আলাপ করিয়ে দেয়, ইনি বিনোদ রায়, অভিনেতা, প্রযোজক, আরও অনেক কিছু। আর ইনি প্রভাত বাবু বই লেখেন।

কথা বলতে বলতে তারা নীচে নেমে আসে, কণ্ঠকর্তাদের সঙ্গে ছুঁ-চারটে মুখের কথা হয়। বেলারাগী সকলকেই বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বলে গাড়ীতে উঠে পড়ে। বিনোদের বড় গাড়ী, নিজে চালায়। 'সামনের সিটেই তিন জনে বসে পড়ে।

বাড়ী পৌঁছে বেলারাগী প্রভাতকে ছাড়ল না। বললে, আসুন, আমাদের সঙ্গে। কফি খেয়ে যাবেন।

তারা তিন জনে বসবার ঘরে এসে বসে। প্রভাত ভালো করে বিনোদের দিকে তাকিয়ে দেখে। স্ত্রী চেহারা, সিন্ধুর পাঞ্জাবী, দারী কৌচান মুণ্ডি। হাতে সিগারেটের টিন, চোখে বন্ধুবর-চশমা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, আপনি কোন ছবিতে কাজ করছেন? বিনোদ উত্তর দেয়, ছবিতে বেশী কাজ করি না, থিয়েটারে অভিনয় করি।

—কোন থিয়েটারে?

—এ্যামেচার।

—ওঃ।

—বেলার জন্তে এবার ফিল্ম লাইনে নামছি

—কোন বইতে?

—নিয়তির পরিহাস।

—কায় লেখা?

বেলারাগী উত্তর দেয়, লেখকের নাম প্রভাত বাবু।

প্রভাত বিস্মিত হয়, তার মানে?

—আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমি প্রডাকসান করবো।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে।

—তারই প্রথম বই আপনাকে লিখতে হবে।

আনন্দে প্রভাতের চোখ-মুখ নেচে ওঠে, এতক্ষণ বলেননি একথা, নাম কে ঠিক করলে?

—আমি।

—চমৎকার নাম দিয়েছেন, পোষ্টার পড়লেই লোকের ভিড় হবে।

—খুব ভালো করে লিখতে হবে প্রভাত বাবু!

—কিন্তু প্রটটা তো এখনও বলেন না?

বেলারাগী মিষ্টি করে হাসে, পরে বলবো। এখন থেকে প্রায়ই আসতে হবে আপনাকে, সিনারিও লেখা তো সোজা কথা নয়।

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, একেবারে ফার্ট' ক্লাস করে দেবো। তা ছাড়া হাতে সময়ও অনেক, পত্রিকাই যখন উঠে গেল।

বিনোদ এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, কক্ষির শেয়ালায় শেব চুমুক দিয়ে বলে, বেলা, তোমার সঙ্গে দরকারী কথাটা সেরে নিই।

বেলারাগী উত্তর দেয়, তাড়া কি, হবে এখন।

প্রভাত বোঝে, তারই জন্তে এরা কথা বলতে পারছে না। উঠে পাড়িয়ে বিদায় চায়, আমায় মাপ করবেন, এবার চলি।

—এখন উঠবেন?

—আজ চলি, কাল বরং আসবো, বলে প্রভাত নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিনোদ উঠে গিয়ে বেলারাগীর সঙ্গে এক সোফার বসে।

—কই, এ ভদ্রলোকের কথা তো আগে বলনি?

—বেলারাগী অন্তমনস্ক ভাবে বলে, মনে ছিল না। দেখা হতে ভাবলাম একে দিয়ে লেখালেই হবে।

—টাকা নেবে তো?

—কত আর, শ'তিনেক টাকা।



# লক্ষ্মীবিলাস

কেশ ও তেল

এম. এল. বসু স্ন্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯



—মার ?

—আবার কি। লোকটি ভাল, তবে বুদ্ধি কম। দেখলেই তো বুঝতে পারো—

—আশ্চর্য্য, সবাইকেই তুমি বোকা মনে কর ?

বেলাবাণী কুনলাবার পুনরাবৃত্তি করে এগে।

—কি দরকারী কথা বলছিলে

—আমার কত ঢাকা নিতে চলে ?

—যা বলেছিলে—

—ঠিক তো, তার বেশী কিছু দিতে পারব না।

বেলাবাণী হাসে, দিলেও নেবে না। যত কমে সম্ভব বই তুলতে হবে, দেখাও গো বাজার ?

—পরিচালক ঠিক করেও ?

—প্রমোদ।

—প্রমোদ ? কি বলছে, ও সে একবারে আনাড়ী।

—ভাঙে কি হয়েছে, বাড়ি মাত শোয় পুরো মই ! চল্লিশ দিনের মামলা।

—একটু রিফ্রি হয়ে যাচ্ছে। বিনোদ বইবার হয়ে দস্তুরা করে।

—মোটেই না। লোকটি আসলে প্রলোভনীয়। দেখতে, পরিচালকেও নয়, লেখকেও নয়।

বিনোদ কি বলতে যাচ্ছিল, বেলাবাণী থামিয়ে দিয়ে বলে, ওপরে চল বিনোদ ! হয়ে গেল, আমি চান করে নিই।

বেলাবাণীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রভাত হাটবার রাস্তা ভাঙতে চলে। নিজেকে তার খুব হাকা মনে হয়। এক দিন বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সিনেমার গল্প লেখার প্রাণ পেয়ে বেলাবাণীকে মনে মনে পশুবাদ আনায়। এই প্রথমবার অকর্ণাকে না জানিয়ে বাড়ী ফিরতে তার ইচ্ছে করে না। অকর্ণা প্রভাতের ছাত্রী, প্রাইভেটে তিন বার মাস্ট্রিক ফেল করে এ বছর পাশ করেছে। আগের ছ' বছর অল্প মাষ্টার ছিল, বার বার ফেল করায় তাদের বাড়িয়ে প্রভাতকে আনা হয়। আশ্চর্য্য প্রভাতের কপাল, অকর্ণা পাশ করল। এমন কি, থার্ড ডিভিশানে নয়, সেকেন্ড ডিভিশানে। অকর্ণার বাবা বলেছিলেন, আপনার বাচ্চাবী আছে, অকর্ণা সে পাশ করবে আমি ভাবিনি, তাই ত গিয়ে সব সম্বন্ধ করছিলাম, প্রভাত অমায়িক হেসে উত্তর দিয়েছিল, মেয়ে আপনার খুব শার্প, ঠিক কোচিং পায়নি বলেই—তা তো বুঝতেই পারছি। বাই হোক, ও বত দিন পড়াশুনা করবে আগুনকে তার নিতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রভাত এ কথায় সম্মতি দিয়েছিল। অকর্ণা সকালে কলেজে পড়ে, বিকেলে প্রভাতের বাড়ী।

আজ প্রভাত যখন অকর্ণার বাড়ীতে গেল, তখন তার হাতী বাজে। কীভাবে তার কলম হাতীতে পড়ল, সেটাও জানে না।

পাঠের পরে কলম হাতীতে পড়ল, সেটাও জানে না। কলম হাতীতে পড়ল, সেটাও জানে না। কলম হাতীতে পড়ল, সেটাও জানে না।

—কস, একটা খবর আছে।

—কিসের ?

—আমার গল্প সিনেমার উঠবে।

—সত্যি, কোন গল্প ?

—নিয়তির পরিহাস।

অকর্ণা হাততাসি দেয়, কি মজা, আমাদের পাশ দেবেন তো ? সবাই গিয়ে ছবি দেখে আসব। বাবা এমনতে ছবি দেখে না, কিন্তু আপনার বই হলে নিশ্চয় বাবে। বাই, মাকে বলে আসি।

প্রভাত বাবা দেয়, আঁহা বোস না, সব কথা শোন।

অকর্ণা বসে পড়ে, তাই তো আপনার কথাই শুনিছি না, এবার বলুন।

—আজই সকালে ঠিক হ'ল, প্রথমেই তোমাকে খবর দিতে এলাম।

অকর্ণা কপট রাগের ভাণ করে বলে, আমাকে দেবেন না তো কা'কে দেবেন শুনি ? আপনার সেই পৈদীকে ?

—আহা, তার কথা আনছে কেন ?

—একশ' বার আনব। আমি বরাবর দেখেছি আমার সংগে কথা বলতে গেলেই আপনার পৈদীর কথা মনে পড়ে, তার মত চালাকে ছাত্রী আন পান নি। কিন্তু 'আহা', কিসের মমর আপনাকে একটা চিঠিও লিখ না !

প্রভাত মনে মনে বিরক্ত হয়, কি কথা বলতে এলাম আর তুমি কি শুরু করলে বল ত ?

অকর্ণা প্রভাতের মুখটা দেখে নিয়ে বলে, রাগ করেছেন বুঝি ? আজ্ঞা, আর একটি কথাও বলব না। এবার বলুন—

—তোমাকে বেলাবাণীর কথা বলেছিলাম, ওরাই বই তুলছে। আমার লেগা উনি খুব ভালবাসেন কি না, তাই আমাকে দিয়েই—

অকর্ণা এতক্ষণ কোন কথাই শোনে নি, হঠাৎ প্রভাতকে থামিয়ে কিজেস করে, একটা কথা বলব ?

—কি কথা ?

—রাগ করবেন না ?

—বল না ?

—বেলাবাণীর বচা খুব ফর্সা ? ছবিতে যেমন দেখায় ?

—না, গ্রামবর্ণ।

—ওঁব বা গালে একটা 'বিউটি স্পট' আছে না ?

প্রভাত আবার বিরক্ত হয়, আমি অত দেখি নি।

অকর্ণা হাসে, চোখে-মুখে তার হুইম-ভরা, হ্যাঁ, দেখেন নি আবার। আমার কাছে অত সাধু সাজতে হবে না।

—কি মুন্সিল, যা বলি তাই নিয়েই বগড়া—

—বগড়া তো করি নি। আমাকে এক দিন বেলাবাণীর কাছে নিয়ে চলুন না ?

—সেখানে কি করবে ?

—এক বাক্যের মতামত করে আসব, কলেজের মেয়েরা সব অবাক হয়ে থাকবে।

অকর্ণা বিস্ময় প্রকাশ করে, আশ্চর্য্য লোকে, এসেনই বা কেন, বসছেনই বা কেন ?

প্রভাত গজগজ করে, বললেই বা শুনেছে কে ? আমি চললাম।

অরুণা ধমকে ওঠে, যান দেখি কেমন যেতে পারেন? বন্ধন ঐ চেয়ারে, আমি মিষ্টি জল নিয়ে আসছি।

—আমার দেবী হয়ে যাবে।

—হোক গো, কি এমন রাজকায্য পড়ে আছে শুনি? যতক্ষণ না আসছি, পত্রিকাটা পড়ুন।

অরুণা আদেশ জারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রভাত ভালমানুষের মত বসে পত্রিকার পাতা ওটাতে থাকে।

চুণীলাল শ্রামলের সঙ্গে দেবেনদার আলাপ করিয়ে দেবার পর থেকে শ্রামল প্রায়ই দেবেনদার বাড়ী যায়। বিদ্রিগপুত্রের এক প্রাস্তে হু'খানা ঘর নিয়ে ওঁর বাসা। দেবেনদারকে শ্রামলের অন্তত লাগে। দেশের জন্তে উনি অনেক ত্যাগ করেছেন, সে সব কথা বলতে বলতে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার কত সময় ছেলেমানুষের মত কঁদে ফেলেন। শ্রামল চুপটি করে শোনে। সেদিনও তিনি বলছিলেন, লেখাপড়া কর শ্রামল, ভাল করে লেখাপড়া কর। জ্ঞান না হলে কোন কাজ করা যায় না।

শ্রামল কোন কথা বলে না, জানে দেবেনদার শুধু বলতেই ভালবাসেন।

—আমরা কলেজ ছেড়েছি অসহযোগ আন্দোলনের সময়, কিন্তু পড়া ছাড়িনি। জেলে কি বইয়ের সব সময় এন্টার বই পড়েছি, দেশী, বিদেশী, বা পোয়েছি। এখনও কত কবিতা আমার মুখস্থ। একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু জ্বল করেছি, সারা জীবন ধরেই জ্বল করলাম। দেশের জন্তে সব ছেড়েছি, বাড়ী, ঘর, সমাজ, কিন্তু কি লাভ হল?

শ্রামল আস্তে আস্তে বলে, কেন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাদের মত লোক না থাকলে—দেবেনদার হাসেন, স্বাধীনতা তো কাগজ-কলমে। বাদ্যের জন্তে প্রাণপণ করে খাটলাম তাদের কিছুই হল না! না পেল তারা খেতে, না শিখল তারা লেখাপড়া—

—হবে আস্তে আস্তে—

—আর হবে, বিশ্বাস হারিয়েছি। যে পার্টির জন্তে হাজার হাজার যুবক সেদিন প্রাণ দিয়েছে আজ সে পার্টির কি অবস্থা! এক জনও সত্যিকারের মানুষ সেখানে নেই। যারা কোন দিন দেশের কথা ভাবেনি, এতটুকু ত্যাগ করেনি, সে দিনকার সবচেয়ে বড় স্বার্থপর যারা তারাই টাকার জোরে আজ পার্টির হোমড়া-চামড়া হয়ে বসেছে! আমাদের মত লোকের সেখানে স্থান নেই।

কথা বলতে বলতে দেবেনদার চোখ-খুঁচ লাল হয়ে ওঠে, উত্তরজার চেটিয়ে ওঠেন, কোঙ্গো যাবে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এত বড় মিথ্যা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। শ্রামল এসব কথার কিছুই বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে জানে দেবেনদার যা কিছু বলেন, তার পেছনে লুফোন আছে একটি আগাত পাওয়া ব্যর্থিত ক্ষমতা। যার বিদ্রিগপুত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সমস্র বলে, দেবেনদার—

—আমি, ঐ বন্ধন খানেক ভাবব।

বাইরে থেকে কান্নাকাতি নেমে শ্রামলের নমন হয়েছিল লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কাছে এসে আলাপ হস্ত তার মন বদলে যায়। উত্তর-বন্ধনতার এক অর্থাত গলিতে তার আস্তানা। শুধু-গায়

লুদী পরে বসে থাকে। মাথার চুল এত পাতলা যে কালো টাক পরিষ্কার দেখা যায়। নামের সঙ্গে চেহারার অবিকল মিল। পা দিয়ে জল গড়ালে কালীর মতই দেখায়। শ্রামল দরজায় কড়া নাড়তে কালী নিজে এসে দরজা খোলে, এস ভেতরে। দরজা বন্ধ করে শ্রামলকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। ছোট ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। মাতুরের ওপর বসে শ্রামলের হাতে হাত-পাখাটা ধরিয়ে দেয়, বড় গরম, একটু হাওয়া কর।

শ্রামল এ ধরনের আতিথ্যে বিস্মিত হলেও, কালীর কথামত তাকে বাতাস করে। কালী পালক দিয়ে কানে সুড়ঙ্গুড়ি দিতে দিতে চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে, বয়স কত?

—গোল।

—বারা-মা কত দিন মারা গেছেন?

প্রশ্ন শুনে শ্রামল চমকে ওঠে। তবু উত্তর দেয়, মা মারা গেছেন ছোটবেলায়, বারা আছেন।

—ভাই-বোন অনেকগুলি বুঝি?

—আমি একা।

কালী এক চোখ খুলে দেখে, এ লাইনে ক'দিন?

শ্রামল ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, এই পার্টিতে?

—পার্টি-ফাটি নয়, এখন কি করছ?

—কিছুই করি না।

কালী হ'হাত দিয়ে মুখটা রগড়ায়, কি পারো?

শ্রামল আশ্চর্য্য হয়, কি রকম বলুন?

—পকেট মারতে পার?

শ্রামল শুদ্ধ হয়ে যায়, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, চেষ্টা করিনি।

—মিথ্যা কথা বলতে পারো?

শ্রামল এবার সহজ গলায় উত্তর দেয়, পারি।

কালী এবার হ'চোখ খুলে ভাল করে তাকায়, হঠাৎ শ্যামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ, তুই ঠিক পারবি।

কালীর কাছে বাহবা পেয়ে সলজ্জ হাসিতে শ্যামলের মুখ ভরে ওঠে। কালী জিজ্ঞেস করে, বড় বড় বাড়ীর সামনে পেতলের নেম-প্লেট থাকে দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কাল ছটো খুলে আনবি। আমার কাছে তালিম নিতে হলে প্রথমে নছরাণা দিতে হয়।

—কাল কখন আসব?

—এই সময়েই, শ্যামল চলে যাচ্ছিল, কালী ডেকে বলে, স্কু-ডাইভার আছে?

—না।

—ঐ কোণ থেকে ছটো নিয়ে যা।

শ্যামল যত্ন নিয়ে কালীর বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

শ্যামল মনটা তাকে থেকে থেকে আবার কেঁদে শব্দটা ভাবি। সারা শরীরে বাঘা-জা-অকৃতি অনেকগুলো উপসর্গ এক সঙ্গে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সকলের চাইতে বড় দরকারের সময় হাতের কাছে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেবার লোক নেই বলে। তবু এবই মধ্যে

বাপ-মায়ের নিবেদন অগ্রাহ্য করে শ্যামা এসেছিল। ঘুম ভাঙতে কেঁটে দেখে, বার্লির গেলান নিয়ে শ্যামা বলেছে, কাকু, এটা খেয়ে নাও।

কেটে সে কথা না শুনে প্রব্রুত করে, ওপরে এসেছিল যে, বাবা বকবে না?

—বাবা নেই, অফিসে গেছেন।

—এখন ক'টা বাজে?

—দুটো বেজে গেছে। কষ্ট হচ্ছে কাকু?

কেটে চিন্তিত মুখে বলে, ওপরে এসে ভাল করিস নি, তোর বাবা শুনেলে বকবে, নীচে যা—

—তোমার যে স্বপ্ন হয়েছে কাকু, ডাক্তার বাবুকে খবর পাঠাব?

—না, আর এক দিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয় যাবে, তুই এখন যা।

শ্যামা কেঁটের কথা মত বার্লির গেলান রেখে নীচে চলে গেল বটে কিন্তু সুযোগ পেলেই ওপরে এসেছে, দরকারী জিনিষপত্র কাকার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে।

এই মধ্যে এক দিন বিপত্তির সৃষ্টি হল, শ্যামার ছোট ভাই দিদির ওপর রেগে বাবাকে বলে দিলে, বাবা, দিদি তোমার কথা শোনে না, খালি খালি ওপরে যায়।

বলরাম সবে অফিস থেকে ফিরছিল, কথা শুনেই মাথায় তার আগুন জ্বলে ওঠে, ডাক দিলিকে।

শ্যামা আসতেই বলরাম সজোরে কান মলে দেয়, বাঁদর মেয়ে, ওপরে কি করতে যাও?

শ্যামা খতমত খেয়ে যায়, চোখের জল সামলে ধরাগলায় বলে, কাকুর অন্ত্র করছে—

বলরাম চাঁৎকার করে ওঠে, বেশ হয়েছে। ও মরুক, বাঁচুক, তোর তাতে কি? ওপরে যেতে বারণ করেছি বাস, আর কোন কথা শুনেতে চাই না।

চৌমাটি শুনে শ্যামার মা ছুটে এসেছিলেন, আহা! একটু বার্লি দিয়ে এসেছে তা অত মারধোর করার কি আছে?

—মেয়েকে অমন আত্মা দিও না, বাপের অবাধ্য হওয়া—

শ্যামার মা স্বর পাণ্টায়, আর তাকেও বলি মেয়ে, নিজের বাপকে তো চিনিস, গোলমাল করিস কেন?

—এর পর থেকে আমি সব কিছুই জন্তো তোমাকে দায়ী করব, কোন রকম জ্বাকামী আমি পছন্দ করি না।

বলরাম গজ-গজ করতে করতে ককতলায় চলে যায়।

—ঠিক এই সময় শ্যামল এসে দরজা ঠেলে। শ্যামার মা বললেন, খোকা, দেখ ত কে এল?

খোকন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, শ্যামার মা চেঁচিয়ে বলে, জিজ্ঞেস কর কা'কে চাইছেন।

খোকনের পুনরুজ্জীবিত আগাই শ্যামল উত্তর দেয়, কেটেদা' আছেন?

খোকন বলে, ওপরে।

শ্যামল দরজা পার হয়ে উঠানে এসে কাঁড়ায়, শ্যামা বলে ফেলে, কাকুর যে স্বপ্ন।

—এক বার বলুন আমি দেখা করতে চাই, আমার নাম শ্যামল।

সঙ্গে সঙ্গে কেটেদা গলা শোনা যায়, ওপরে এস শ্যামল। আমি শুয়ে আছি।

শ্যামল ওপরে উঠে গিয়ে কেটেদার বিছানার একধারে বসে পড়ে, কত দিন স্বপ্ন হয়েছে কেটেদা'?

—ক'দিনই তো—

—আমরা তাই ভাবছি, আপনি আসছেন না কেন। এখন কত স্বপ্ন?

—বেশী নয়, কাল-পরশ খুব বেড়েছিল। দুর্বল করে দিয়েছে বেশ,—কেটে বার্লিসে ভর দিয়ে উঠে বসে, শ্যামল জ্বাখ তো বাইরে ছাদে বোধ হয় জল আছে, আর ঐ গামছাটা দাও, মুখটা ধুয়ে ফেলি।

মুখ ধুয়ে কেটে অনেকটা শ্রম বোধ করে। দুটো বিস্কুট আর বার্লি খেয়ে বলে, বেশ ভালো লাগছে এখন।

শ্যামল নিজের থেকেই বলে, টাকার দরকার আছে কেটেদা'?

—কেন?

—আপনার ভাগের অনেকগুলো টাকা আমার কাছে রয়েছে।

—দরকার হলে পরে নেব।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, জানেন প্রভাতদা'র বই ছবিতে উঠছে?

—প্রভাতের? আমাদের প্রভাত?

—হ্যাঁ।

—কি বই?

—নামটা ভুলে গেছি। খুব শক্ত নাম।

—ভাল কথা, প্রভাতের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি।

—বেলারানী পার্ট করবে।

—তাই না কি?

—খুব ভীড় হবে, না কেটেদা'?

—ভাল বই হলে হবে নিশ্চয়।

কেটেদার সঙ্গে শ্যামলের অনেক কথা হয়, কিন্তু সে কালী বা দেবেনদা'র বিষয় কিছুই বলে না। কথার কাঁকে এক সময় জিজ্ঞেস করে, আপনি কবে থেকে বেরুতে পারবেন মনে হচ্ছে?

—কাল কিংবা পরশু।

—আমি অনন্ত কেবিনে থাকব, যদি আপনাকে না পাই এখানে এসে খবর নেব।

—সেই ভাল, আন্তদা'কে আমার কথা বোল।

—আন্তদা'ই তো আমাকে পাঠালেন, আপনি না গেলে আন্তদা'র মন খারাপ হয়ে যায়।

—আন্তদা' বড় ভাল লোক।

—আমি তাহলে এখন আসি কেটেদা', শ্যামল নীচে নেমে যায়।

ক'দিন থেকেই মদন বড় একলা পড়ে গেছে। শ্যামল আজ-কাল আর আগের মত আসে না। স্থল পালিয়ে পার্কে, কিংবা আড্ডাসংঘের বৈঠকে যেমন শ্যামলের সঙ্গে আগে দেখা হত, দৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটিনাটি আলোচনা হত, এখন আর তা সম্ভব হয় না। সব সময়ই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শ্যামল বলে, চলি ভাই, দেবেনদা'র কাছে যেতে হবে।

মদন কত সময় বিরক্ত হয়ে বলেছে, কি দেবেনদা' দেবেনদা' করিস, এ যে কেটেদা'র বাড়ী হয়ে উঠল।

—এ অল্প ব্যাপার, না মিশলে বুঝবি না।

—আমি একলা একলা কি করব?

—কি আবার করবি, ইচ্ছুল যাবি। বাড়ীর কাজ করবি, গলায় সোনার হার পরে বসে থাকবি।

—ক'দিন ছবি দেখিনি, চল না একটা—

—বলছি তো সময় নেই, দেবেনদা' ছাড়া কালীর কাছে তালিম নিতে হবে।

—কালীকে নাম ধরে ডাকিসু?

—দাদা বললে চটে যায়।

—জাহান্নমে যা, আমার কি, পরে ভুগবি।

শ্রামল একথা গ্রাহ্য করে না। আড্ডাসংঘের অল্প কারো সঙ্গে মদনের তেমন বনে না। শ্রামলের পরে মাত্র এক জন যাকে সে ভালবাসে, সে মমুদা'। আজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় মমুদা'র সংগে দেখা, দু'-তিন দিন না কামানোর ফলে মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা পাঞ্জাবী। মদনকে দেখে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

—কোথাও যাইনি, এমনি।

—বস তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।

মদন বোঝে মমুদা' এতক্ষণ কথা বলার লোক খুঁজছিল, তাকে পেয়ে সত্যি খুসী হয়েছে, বলে, মমুদা' আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—শরীরের আর দোষ কি ভাই, কত আর সহিবে।

—আপনি একটুতে বড় মুমড়ে পড়েন, কি এমন হয়েছে বলুন তো?

—তুমি জান না মদন, নন্দিতার বাবা পরশু আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। নন্দিতাকে লেখা আমার চিঠি দেখিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, পুলিশে নালিশ করবেন বলে।

—সে কি, তার পর?

—আমাকে বললেন, তুমি কেন এসব চিঠি দাও, আমার মেয়ে কখনও তোমায় লিখেছে? আমি কিছু উত্তর দিইনি। পুলিশেও যদি দেয়। আমি কোন দিন বলব না যে নন্দিতাও চিঠি দেয়।

—কিন্তু উনি কি করে চিঠিটা পেলেন?

—জানি না। কোন দিন জানতে চাইবোও না, যদি না নন্দিতা নিজেকে থেকে বলে।

ঠিক এই সময় নন্দিতা এসে তাদের বাড়ীর দোতলার ছোট বেলিও ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মমুদা'র দিকে পেছন ফিরে মদনের সংগে কথা বলছিল, তাই মদন ইসারা করে।

মমুদা', ওই যে—

মমুদা' ফিরে তাকিয়ে নিম্পলক দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে চেষ্টে থাকে। মদন মাথা হেট করে, মাঝে মাঝে, আড়চোখে মমুদা'র দিকে তাকায়, দেখে তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, হঠাৎ মমুদা' তার পিঠ চাপড়ে বলে, চল মদন, তোমাকে কিছু খাওয়াই।

মদন বুঝতে না পেয়ে বারান্দাটার দিকে দেখে, নন্দিতা চলে গেছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার মমুদা'?

—নন্দিতা আমায় সত্যিই ভালবাসে, তার কোন সন্দেহ নেই।

—কি করে বুঝলেন?

মমুদা' কথার উত্তর না দিয়ে মদনের হাতটা ধরে এগিয়ে চলে।

কেউ যদিও শ্রামলকে বলেছিল স্নহ হয়েই অনন্ত কেবিনে আসবে, কিন্তু পরদিন বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়ে সোজা গেল টালীগঞ্জের বস্তিতে গৌরীর কাছে। একদিন বার বার তার গৌরীর কথা মনে পড়েছে, অসুখের মধ্যে এমন অসহায় অবস্থায় না পড়লে সে যেমন করে হোক একটা খবর পাঠাতো। ট্রাম-ষ্টপেজ থেকে হেঁটে গৌরীদের বস্তি পর্যন্ত যেতে কেঁঠর বেশ কষ্ট হয়। দু' জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেয়।

বস্তির মুখে একটা ছোট ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে?

—আছে বোধ হয়, বলে ছেলেটি চলে গেল। কেঁঠে অবাক হয়, আগেও ছেলেটিকে দেখেছে, কেঁঠে আসলে সে লাফাতে লাফাতে গিয়ে গৌরীকে ডেকে আনত। এক বৃদ্ধ দাওয়ার ওপর বসে ছ'কো টানছিলেন, কেঁঠে তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে?

বৃদ্ধ ব্যাজার মুখে উত্তর দেন, কি করে জানব, কলকাতার সহরে দেখছি সোমখ মেয়েরা ঘরে থাকে না।

এ ধরণের উত্তর কেঁঠে আশা করেনি, গৌরীর ভাইকে পোড়াতো বাওয়ার পর থেকে এ বস্তির সকলেই তাকে ভালবাসতো, এলেই ছুটো কথা বলতো। আজ হঠাৎ যেন সব পাল্টে গেল। আর কোন কথা না বলে কেঁঠে সোজা গৌরীর ঘরের সামনে এসে হাজির হল। দরজা খোলা, গৌরী সেলাই করছিল, কেঁঠেকে দেখে চমকে ওঠে, কেঁঠেদা'—

—কি হয়েছে গৌরী, ওরকম করছ কেন?

গৌরী কোন কথা বলতে পারে না, দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

—কি হয়েছে গৌরী, আজ সব কেমন অদ্ভুত লাগছে! কেউ ভাল করে কথা বলছে না, তুমি কাঁদছ? গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, এত দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

—বাড়ীতে।

—ওঃ, গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—কি ভাবছ?

—ভাবিনি। তবে আজ এলেন কেন?

—তাতে কোন দোষ হয়েছে?

—আপনি বাড়ী যান। গৌরী উজ্জ্বলিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেঁঠে আন্তে আন্তে বলে, সেদিন রাত্রিতে বুড়িতে ভিজে খুব অসুস্থ হয়েছিল, এত দিন বিছানায় পড়েছিলাম, বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে পারিনি। আজ প্রথম বেরিয়েই তোমার খবর নিতে এসেছি। একটু থেমে বলে, এখনও বেশ দুর্বল, পা কাঁপছে।

গৌরীর প্রত্যক্ষণে খেয়াল হয় এখনও সে কেঁঠেকে বসতে বলেনি। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলে, এইখানে বসুন।

কেঁঠে গৌরীর পরিত্যক্ত জায়গায় বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে থেকেই কেঁঠে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে, বল?

—বলব, পরে।

—কখন?

—এখানে নয়, সবাই কান পেতে আছে।

—কি বলছো ?

গৌরী চার দিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলে, ঠিকই বলছি, আমাকে আপনাকে নিয়ে—কথা উঠছে ?

—সী, রাজেন লালিয়েছে ।

—রাজেন ? কেউ শুনে যায়, ঠিক বলছো ?

—স অনেক কথা, আমি না কি ভালো মেয়ে নই, আপনার সঙ্গে,—গৌরী স্ববাক্য করে কেঁদে ফেলে, কেউ শুন গলায় প্রশ্ন করে, তুমিও কি চাও আমি চলে যাই ?

সে কথার সোজা উত্তর না দিয়ে গৌরী বলে, আমার যে ঘর কেউ নেই !

—নরকর বলে আমার সঙ্গে যাবে ?

গৌরী মুখ তুলে তাকায়, কোথায় ?

—জানি না, তবে চেষ্টা করব যাতে তুমি পৌঁছতে পারো ।

গৌরী চুপ করে থাকে ।

—কি বল ?

—হ্যাঁ কি বলা যায় ?

—আমি চললাম, তুমি ভেবে-চিন্তে জানিও ।

কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, গৌরী ছুঁকরে কেঁদে ওঠে, এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না কেউনা । কেউ সংঘত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি শান্ত হয়ে ভালো, যা ভালো বুঝবে, আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব ।

আর কথা না বাড়িয়ে কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে । মুখোমুখি রাজেনের সঙ্গে দেখা, প্রত্যক্ষ সে বাইরে ঠাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল । রাজেন থেকিয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষ কি ফুসফুস দেওয়া হচ্ছিল ?

কেউর কান লাগ হয়ে যায় । তবু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে, সবই তো শুনেছো ।

—ছি ছি, ভদ্রলোক ভেবেছিলাম, কেউদা বলে ডেকেছিলাম, শেখে কি না—

—কি ?

—একটা অসহায় মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে—

—বাজে বোক না, খাবড়ে মুখ লাল করে দেব ।

রাজেন ছেড়ে কথা বলার পার নয়, গৈচিয়ে ওঠে, কার কাছে মেজাজ গরম করছেন, আপনার মত কলকাত্তাই বাবু টের দেখেছি । পেটে এক, মুখে এক—

রাগে কেউ কাঁপছিল । ঠাস করে রাজেনের গালে এক চড় মারে । আচমকা আঘাতে রাজেন প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই বাঘের মত কেউর ওপর লাফিয়ে পড়ে । শরীর দুর্বল না থাকলে কেউ হয়ত কিছুক্ষণ যুঝতে পারত । কিন্তু বলিষ্ঠ রাজেন তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে অমানুষিক প্রহার করতে থাকে । ইতিমধ্যে চারদিক লোক জমা হয়ে গেছে, ভীড়ের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়, ছেড়ে দে রাজেন, মরে যাবে । কেউ বললে, নাক কেটে যে রক্ত পড়ছে, পুলিশ হাস্যময় পড়বি নাকি ? সকলই হৈ-হৈ করছে, গৌরী কোন কথা না বলে এক পাঞ্জি জল নিয়ে সেখানে ছুটে আসে । রাজেন ততক্ষণে কেউকে ছেড়ে উঠে ঠাঁড়িয়ে ঠাঁতে ঠাঁত ঢেপে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে । গৌরী বিনা ভূমিকায় কেউর মাথার কাছে বসে জল দিয়ে

তার মুখের রক্ত ধুয়ে দেয় । গৌরী ভয় পেয়েছিল, বোধ হয় কেউ অজান হয়ে গেছে, কিন্তু তার গজ্ঞানী শুনে একটু আশস্ত হয় । কেউ বিড়-বিড় করে বলে, শরীরটা দুর্বল, তাই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, এর শোপ আমি নেব ।

রাজেন চীৎকার করে ওঠে, কানে কানে কি বলা হচ্ছে ?

কেউর বদলে গৌরীই উত্তর দেয়, রাজেনদা, তুমি যবে যাও । ভদ্রলোক অশ্রুত ।

রাজেন ফলে ওঠে, ভদ্রলোক না চান্নার ! ওর হয়ে আর তোমায় দালালী করতে হবে না ।

—কেন মিথো কথা বাড়ানো, জানো তো সবই । উনি তো আমাদের কোন মন্দ করেন নি ?

—ভাল-মন্দ কি তোমার কাছে শিখতে হবে, না তোমার ঐ বাবুর কাছে ?

গৌরী প্রত্যক্ষ পর্যাপ্ত সংঘত ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এবার তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কথা বলতে শিখবে তো আমার কাছে এসো । যা তা বলতে তোমার মুখে বাধে না ?

—যা তা আবার কি ? যা সত্যি, তাই বলেছি । অত ঢালাঢালি কিসের ? বোজ একসঙ্গে বেড়াচ্ছে, শাড়ী কিনছো, জামা কিনছো, কত খুঁচি করছো, আমরা কচি খোকা—

অপমানে গৌরীর মুখ কালো হয়ে যায় । ছি, ছি, কি বোঝা, কি নোরা মন তোমার ?

এবার অসহায় ভাবে সে অল্পদের দিকে ফিরে তাকায়, কিন্তু কার কাছে এতটুকু সহ্যহুঁত পায় না । বুকেরা বললেন, রাজেন তো অন্ময় বলে নি । তুমি আমাদের জাতি-কল্যাণ, তোমার ভাল-মন্দ দেখা আমাদের কর্তব্য ।

বুকেরা বললেন, ঢাং-ঢাং করে নেচে বেড়ানেন, তার ওপর চোখা-চোখা বুলি কে সহ্য করবে ?

যুবকেরা বললে, রাজেন ঠিক করেছে, আরও দু' ঘা দিলে হতভাগা আর অল্প মেয়েদের ওপর নজর দিত না ।

পণ্ডিত মণাই রায় দিলেন, জীবনে সংঘের দাম অনেক গৌরী, বয়স হলে বুঝতে পারবে ।

চাপা কান্নায় গৌরীর দম বন্ধ হয়ে আসে, অসহায় ভাবে কেউর দিকে তাকায় ।

কেউ তখন উঠে বসেছে । ক্লান্ত স্বরে গৌরীকে বলে, একটা গাড়ী ডেকে দেবে, বাড়ী যাব ।

রাজেন থিঁচিয়ে ওঠে, নিজের পা নেই, যাও না । ও কি করবে—

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলে, চলুন আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব ।

কেউর কোন কথা বলার আগেই রাজেনের দল শাসিয়ে ওঠে, মনে রেখো, ওর সংগে গেলে আর এখানে ঢুকতে পারবে না ।

কেউ গৌরীর কাঁধে একটা হাত রেখে সকলকে শুনিয়ে বলে, চল গৌরী, এ নরকে তোমায় এক রাত্রিও ফেসে রেখে আমি শাস্তি পাব না ।

গৌরী যন্ত্রণালিভার মত কেউর সঙ্গে বস্তু ছেড়ে বেরিয়ে আসে । পেছনে রাজেনের দল তখনও শাসিয়ে যাচ্ছে ।



হুঁজনে টাক্সীতে পাশাপাশি বসে, কেউ কথা বলে না। হুঁজনের মনের মধ্যেই তোলপাড় করছে, গৌরী ভাবছে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। অল্প কদিনের পরিচিত কেঁঠোর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সে আত্মীয়তার সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে চলে এসেছে। কে বলতে পারে এই নতুন পথের শেষ কোথায়? কেঁঠর চোখের সামনে ভাসছে সেই অপ্রীতিকর বস্তির ঘটনা, সমস্ত শরীর-মন তার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এত দুর্বল যে কোন কিছু চিন্তা করারও শক্তি তার নেই। তাই টাক্সী-ড্রাইভার যখন জিজ্ঞেস করলে, কোন দিকে যাবে, কেঁঠর শুধু বাড়ীর রাস্তাটা বলে দিয়ে চুপ করে রইল। সারা পথ সে গৌরীকে কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু বাড়ীর মোড়ে এসে বলেছিল, এখানে নামো রিক্সা নিতে হবে।

গৌরী তার নির্দেশ মত রিক্সায় চেপে বসে।

রিক্সা এসে বাড়ীর দরজায় থামলে কেঁঠর নেমে ঠেলা দিয়ে দেখে দরজা খোলা রয়েছে। ভেতরে কাছাকাছি কেউ ছিল না। কেঁঠর গৌরীকে নিয়ে লব্ পায়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গৌরী আড়ষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, কেঁঠর ক্লান্ত স্বরে বলে, আমি আর পারছি না গৌরী, একটু শুয়ে পড়ি।

কেঁঠর সত্যি সত্যি বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। গৌরী একক্ষণে তার অদ্ভুত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। নাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জীবনের এ কি বিরাট পরিবর্তন! এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কেঁঠর সংগে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে তা সে কিছুক্ষণ আগেও কল্পনা করতে পারেনি। চুপ করে কেঁঠর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, 'দৈখে যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, ঘরে কোন ওষুধ নেই? যুঁহু স্বরে কেঁঠর উত্তর দেয়, দেখ তো ওই ছোট বাগ্গটায় 'এনাসিন' আছে কি না—

গৌরী বাগ্গটাই কেঁঠর কাছে নিয়ে আসে, হুঁটো বড়ী সংগ্রহ করে কেঁঠর কোন রকমে গিলে ফেলে আবার শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষিপে-ভেঁঠর কাতর গৌরী কেঁঠর নাথার কাছে বসে থাকে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে অবশিষ্ট গ্রামা কেঁঠর খাবার ওপরে দিয়ে আসবার জন্তে ছটফট করছিল। বাবা বেরিয়ে যেতেই আর সময় নষ্ট না করে থালা নিয়ে সোজা ওপরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে, কাকু, দরজা খোল, খাবার এনেছি।

কেঁঠর তখন ঘমে অচেতন। গৌরী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। গ্রামা বার বার দরজায় আঘাত করেও উত্তর না পেয়ে বিচলিত হয়। তার ভাবনা হয় কেঁঠর নিশ্চয় শরীর খুব বেশী খারাপ হয়েছে, তাই ছুটে গিয়ে ছাদের দিকের জানালায় খড়খড়ি তুলে ভেতরে উঁকি মারে। গৌরী খড়খড়ি খোলার শব্দ চমকে উঠে দাঁড়ায়। কাকার ঘরে এই অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখে গ্রামার বিশ্বাসের সীমা থাকে না। কিন্তু কাকার মাথায় জলপটি দেখে তার স্থির বিশ্বাস হয় কেঁঠর বেহুঁস হয়ে পড়েছে। চিন্তিত মুখে গ্রামা নীচে নেমে আসে। মা জিজ্ঞেস করেন, কি রে খাবারের থালা ফিরিয়ে আনলি যে?

—কাকার খুব অসুখ,

—তাই নাকি, ডাক্তার ডাকতে বললে?

গ্রামা আস্তে আস্তে বলে, আমার সঙ্গে কথা হয়নি,

—তাহলে?

গ্রামা মার কাছে সব খুলে বলে, জিজ্ঞেস করে, এখন কি করি মা? মার শক্তার চেয়ে কোঁহুল বেড়ে যায়, বলেন, চল আমিও দেখে আসি।

গ্রামার মা মেয়ের পিছু পিছু উপরে এসে খড়খড়ি তুলে দেখেন, কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই কেঁঠর শিয়বে এক জন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা বসে আছে, ঘরের দরজা বন্ধ।

কেঁঠর দাদা বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছে এ খবর পেয়ে তেলে-বেগুন ছলে উল্লেন, ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ সব কি?

—তোমার সবটাকে চোঁচামিচি করা চাই।

—তবে কি মুখ বুজে সব সহ করব?

—এ সব কেলেকারী ব্যাপার পাড়ায় জানাজানি হওয়াও তো ভাল নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো।—এর আমি হেস্টেনেস্ট করে ছাড়বো। তোমায় বলে দিলাম, আর কোন কথা শুনছি না।

বলরাম বেগে উঠানে পায়চারী করতে থাকে। গ্রামার মা বুঝিয়ে বলে, এখন শোবে চল, সকালে উঠে যা হয় কোর।

স্ত্রীর এ যুক্তি বলরামের অপছন্দ হয় না, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

গভীর রাতে কেঁঠর ঘুম ভাঙে। শরীরে আর আগের মত যন্ত্রণা নেই, তবে খুব দুর্বল। কোন রকমে উঠে ঘরের আলো জ্বালে। গৌরী মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ায়, খোলা হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করে দেয়।

হাজার রকম চিন্তা তাকে চেপে ধরে। গৌরীকে নিয়ে কি করবে সে? কোথায় যাবে, কোথায় রাখবে? কিছুই ভেবে পায় না। একমাত্র ভরসা সকাল বেলা আশুদা' কি প্রভাত যদি সাহায্য করে।

কেঁঠর হঠাৎ পেয়াল হয় তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, আবার ঘরে ফিরে আসে। গৌরী ঘুম ভেঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কেঁঠকে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন?

—ভালো। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

গৌরী উত্তর দেয় না, কেঁঠর ঘরের কোণ থেকে থানিকটা মিয়োনো বিস্কুট বার করে আনে, গৌরীর হাতে থানিকটা দিয়ে বলে, খাও।

গৌরী আস্তে আস্তে বলে, আপনি যখন ঘুমচ্ছিলেন, কে এসে দরজা ঠেলছিল—

—শোপ হয় গ্রামা।

—তার পর কাকা খড়খড়ি খুলে দেখছিল, হ'বার।

কেঁঠরোয়ে দাদা-বৌদি নিশ্চয় খবর পেয়েছে। হঠাৎ বলে, গৌরী, ভোরে উঠেই আমরা বেরিয়ে যাব।

তখনও ভোরের আলো পরিষ্কার হয়ে ফোটেনি, কেঁঠর গৌরীকে নিয়ে নীচে নেমে সম্ভরণে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। সমস্ত পাড়াটাই ঘমে অচেতন। সদর রাস্তায় ভিস্তিরা জ্বল দিচ্ছে। নিজেদের পাড়াটা ভাড়াভাড়ি পেরিয়ে নোড়ে এসে রিক্সা নিয়ে প্রভাতের বাড়ার দিকেই যায়।

গলিব মধ্যে হুঁখানা ঘর নিয়ে প্রভাত থাকে। কেঁঠর অনেক থাকাখাচি করার পর প্রভাত ব্যাকার মুখে দরজা খুলে দেয়।

কেউ, তুই! এত দিন বাদে কেউকে চঠাৎ এ ভাবে দেখে আশ্চর্য হয়, জিজ্ঞাস করে, এ সময়, ব্যাপার কি?

কেউ কোন কথাই জবাব না দিয়ে বলে, গৌরীকে এনেছি, ঘরে ডেকে নিয়ে আস।

—গৌরী কে?

—যেই তোকে সে পরে বলছি, তুই বিজ্ঞা থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে আস।

প্রভাত আর বিকলিত না করে গৌরীকে আপ্যায়িত করে, আগুন, বাড়ীর দরজার এসে বিজ্ঞাতে বসে থাকবেন না কি?

গৌরী কথামত ভেতরে যায়। কেউ বিজ্ঞা ছেড়ে দিয়ে চট করে মোড়ের দোকান থেকে কচুরী-সিদ্ধাড়া, মিষ্টি কিনে আনে।

প্রভাত বেগে বলে, এ কি, আমার বাড়ীতে এসে খাবার কিনে আনলি, তোমার সব বান্ধবী—

কেউ সে কথাই কান না দিয়ে বলে, অনেক দরকারী কথা আছে, তোমার পুনর্দর্শন চাই।

—বল।

—একটু পরে, তুই আগে গৌরীর হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে।

বাড়ীতে প্রভাত একা থাকে, তাই কোন রকমই অনুবিধে ছিল না। গৌরীকে কলবর দেখিয়ে দিয়ে প্রভাত বাইরের ঘরে এসে কেউকে জিজ্ঞাস করে, কি ব্যাপার বল তো?

—সে অনেক কথা, পুরো একটা উপহাস।

—বল তো তনি?

কেউ খুব সংক্ষেপে বলে যায়, গৌরীর সঙ্গে আপ্যায়িত থেকে শুরু করে কালকের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সব ভার নেওয়া পূর্ণাঙ্গ, সমস্ত কথা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, এখন কি করবি ঠিক করেছিস?

—তাই তো ভাবছি।

—মেয়েটাকে বের করে আনলি কেন, ভালবাসিস?

—সেটা ভাববার সময় পেলাম কই, বোধ হয় বাগেব মাথায়।

—বিয়ে করবি?

—যদি কোন উপায় না থাকে।

—এ ছাড়া আর উপায় কি? এত অল্প বয়সের মেয়েকে কি সাধারণ কাজ দিতে কেউ রাজী হবে? আর কি করবেই বা। সমাজের মধ্যে বাঁচতে হলে বিয়ে করতে হবে।

কেউ চিন্তিত মুখে বলে, তুই তো আমার অবস্থা জানিস, এখন কি করে বিয়ে করবো?

—এখন না হয়, দু'দিন পরে।

—তা পারি, বাড়ী ভাগ হয়ে গেলে। তাও মাস তিনেক তো বটেই, এ ক'টা দিন কি করি?

—ঘর নিয়ে কোথাও গুকে রাখ, তার পর যা হয়—

কেউ বাধ্যদিয়ে বলে, ঘর পাওয়াও তো মুশকিল, অনেক কথা উঠবে, এখনও তো বিয়ে হয়নি।

—সে জায়গা আমি ঠিক করে দিতে পারি, যদি তোমাদের আপত্তি না হয়।

—কোথায়?

—বেহালার কাছে, পিনাকীদের একটা ঘর খালি আছে।

—কোন পিনাকী?

—ফোটোগ্রাফার, আমাদের কাগজের কভারের ছবিগুলো তো

সবই ওর তোলা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিগুলো তো দেখি একই মেয়ের নানা রকম ভঙ্গী—

প্রভাত সায় দেয়, সেই মেয়েটার সঙ্গেই থাকে।

—ওর বউ?

—না, বিয়ে করায় ছেলে পিনাকী নয়।

—তবে?

—এই রকম হাফ-গেরস্ত থেকেই কাটিয়ে দেবে।

গৌরীকে প্রভাতের বাড়ীতেই অপেক্ষা করতে বলে কেউ বাসা দেখতে বেরিয়ে পড়ে। সহরের এক প্রান্তে ছোট্ট হলদে রঙের দোতলা বাড়ী। বাড়ীওয়ালার উপরে থাকে, নৌচটা ভাড়া দেয়। ঘর দেখে কেউ সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে, খুসী হয়ে প্রভাতকে বলে, একলা থাকার ভয় নেই অথচ সব আলাদা ব্যবস্থা। এ বেশ ভালোই ত'ল। [ ক্রমশঃ। ]

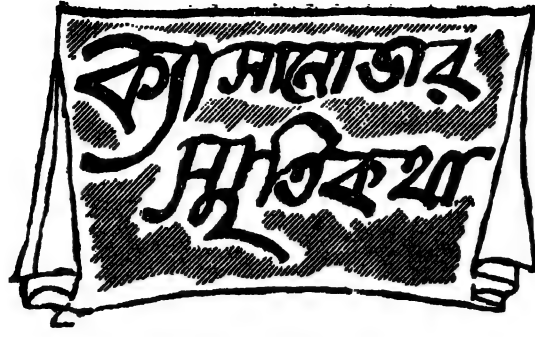
## এক প্রত্যয়

### সন্তোষ চক্রবর্তী

স্বপ্নের শরীর থেকে ভয় আর বিচ্ছেদের জ্ঞান  
বলে গেলো : 'যতই-না থুঁকে ফেরো সীমানার তীরে,  
আকাঙ্ক্ষার ব্যগ্র সুর, সন্ধ্যার বিষমতা শ্রান,  
অধুনা পাবে না তাকে—পল্লবিনী সেই সংগিনীরে।'

তার নাম কুস্কলি এখনো স্মরণে আকুলিত,  
এবার স্বপ্নত উক্তি : তাহার আবেশ তুলে নিয়ে  
স্মৃতির চেতনা-ভরা এই মন আশায় নিহিত—  
পাঁচটি ঋতুর পর আবারো সে রঙ-তুলি দিয়ে।

হৃদয়ে বসন্ত এঁকে আসবেই : স্বপ্নের শরীর  
ভয়ের বদলে গল্প এনে দেখে নিটোল হৃদি।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

হাসছেন? বেশ বেশ, হাসুন বত খুসী, ডাইনী বিড়-বিড় করে বলতে লাগলো—কিন্তু ওই মোমের মূর্তিটিকে যদি রক্তে ধুয়ে দিতাম তবে আপনার কি সর্সনাশ হতো দেখতেন। ও-সব মস্তুর-তস্তুর আমি ছাড়া এ তল্লাটে জানে আর কেউ? একটা মস্তুর পড়ে যদি ওই মূর্তিটাকে আবার আগুনে ফেলতাম, তাহলে তো সর্সনাশের কিছু আর বাকী থাকতো না।

—হুম, কিন্তু আপাতত তো এটা আমার অধিকারে। এই রইলো আপনার বারো সেকুইন। এবার একটু আগুন জ্বালান, এই বিকট মূর্তিটাকে পোড়াই—আর ওই বোতলের রক্তটা জানলা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিই।

বৃদ্ধা হাঁক ছেড়ে বাঁচলো, মনে হলো মূর্তিটাকে গলিয়ে ফেলাতে। ও ভয় পেয়েছিল বিষম। ভেবেছিলো বৃদ্ধি ওগুলো আমি বাইরে নিয়ে যাবো ওর শরতানীর প্রমাণস্বরূপ। এইবারে আত্মহানো আটখানা হোয়ে বলতে লাগলো, আমি ইচ্ছা সাক্ষাৎ দেবদূত, আমার মত এমন সং এমন উদার দেখা যায় না—সঙ্গে সঙ্গে মিনতিও করলো, যাতে যা কিছু হোয়েছে কারো কাছে আমি না বলি। প্রতিজ্ঞা করলাম—না, কাউন্টসও জানবে না বিন্দু-বিসর্গও। তখন ডাইনীটা আরও বারো সেকুইন চেয়ে বসলো—কি ব্যাপার? না তাহলে মস্তুরের জোরে ওই কাউন্টসকেই আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াবে। আমি স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম আমি তার জন্তে একটুও গ্রাহ্য করি না। সেই সঙ্গে একথাও বললাম, ভালোয় ভালোয় এইবেলা ওই জঘন্য ব্যবসা ছেড়ে দিতে, না হলে শীগগিরই ধনে-প্রাণে ডুবতে হবে।

এতগুলো টাকা গেলো বটে কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুরের কথা বর্ণে বর্ণে মানার জন্তে একটুও অহুতাপ করিনি। সন্ন্যাসীটির কেমন বেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, আমার একটা অমঙ্গল ঘটবে বলে। খুব সম্ভব চাকর-বাকরের মধ্যে কেউ যে হয়ত ডাইনীর কাছে ওই রক্তটা দিতে গিয়েছিল তাকেই জেরা করে কিছু জেনেছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক করেছিলাম কাউন্টসের ওই মতলব যে পুরোপুরি কাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে একথা কোন দিনই তাঁকে জানতে দেবো না। তাই আমার ব্যবহার আরও কোমল, নম্র আর পিনাক্ত করে আনলাম। অবশ্য আমার সৌভাগ্য ডাইনীর মস্তুরেই কাউন্টসের একবারে অন্ধ বিশ্বাস ছিলো—কারণ তা' না হলে আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জ্বালা মিটানো আমার কাছে কঠোর জন্তে গুণ্ডা ভাড়া করতেও পিছপাও হতো না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি ইচ্ছে করেই এক দিন ঠেকে একটা চমৎকার সৌগীন

উপহার দিয়ে ঠর হাত দুটি চুবন করে বললাম,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার উপর আপনি এত রেগে গেছেন যে আমাকে খুন করবার জন্তে গুণ্ডা ভাড়া করেছেন।

বলতে না বলতেই লক্ষ্য করলাম ঠর মুখ টকটকে লাল হোয়ে উঠলো কিন্তু চট করে সামলে নিলেন নিজেকে। চলে আসবার সময় দেখলাম, বেশ ভারাক্রান্ত মনে বসে রয়েছেন। ভালো কি মন্দ করেছিলাম, জানি না কিন্তু তার পর থেকেই কাউন্টসের ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। এক দিনের জন্তেও এতটুকু ক্রটি আর ঘটতে দেখিনি কোথাও।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

এবার ইংল্যান্ডের পথে। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন; মনের তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ছে শ্মৃতির ঢেউ, একের পর এক।

কি আশ্চর্য্য ভাবেই না মনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত করে করে যায় হেনরিয়েরটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কি অভাবনীয়রূপে আসে ওর চকিত স্পর্শ! মনে পড়ে—

এক মঙ্গলবারের সকালে ফ্লোরান্সের এসে বলে, এক জন সাধু খুঁজছেন। আবার সাধু? ভাবতে না ভাবতেই আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই সাধুর বেশে এসে হাজির। আমাকে দেখেই উজ্জ্বল আবেগে আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলে। ওর উজ্জ্বলে বিরক্তই হলাম। কারণ চিরকালের বাউঙলে এই ভাইকে কোনো দিনই আমি দেখতে পারতাম না ওর উজ্জ্বল, অসংবত স্বভাবের জন্তে। তাছাড়া গত দশ বৎসর ধরে কোনো খোঁজই রাখিনি। ভালো করে চেয়ে দেখলাম হেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়, ক্লান্ত শীর্ণ অপরিচ্ছন্ন চেহারা, ভিখারীরও অধম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ঠিকানা পেলে কোথায়? জানালেন, ম্যাসিয়ে ব্রাগাদিনের কাছে।

—সে কি! তুমি তাঁকে আমার ভাই বলে পরিচয় দিয়েছো? শিউরে উঠলাম আমি।

—নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, আমি যেম তোমার জীবন্ত প্রতীক।

—তোমার মতো ওই আহম্মুক জড়ভরত চেহারাটাকে?।

—তিনি তা' ভাবেননি। আমি যে তাঁর সঙ্গেই থেলাম।

—ওই পোষাকে? আমার মাথা হেঁট করিয়ে ছেড়েছে।

—তিনি আমাকে এখানে আসার ভাড়াটাও দিয়েছেন।

—হুম। তাহলে সত্যিই ভিখারী হোয়েছো। কিন্তু এখন

আমার কাছে কি চাও শুনি? সোজানজি বলে রাখছি, আমার ষাণ্ডা কিছু হবে না। যা বলবার, চলো তোমার সরাইখানাতেই গিয়েই

বলবে চলে, এখানে নয়। আর সাবধান, আমার চাকর-বাকরের কাছে আমার ভাই বলে পরিচয় দিও না।

এবার আমার ভাই জানালে সে একা নয়, সাধুগিরি করা সবেও প্রেমে পড়ে একটি তরুণীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার পিতৃ-গৃহ থেকে তাকে তুলিয়ে এনেছে—তাই ভেনিসে ফিরে যাবার সাহস নেই। এত দূর অধঃপতনও হয়েছে তাহলে! মনে মনে ভাবলাম, তাহলেও একবার দেখেই আসা যাক ব্যাপারটা।

উজ্জ্বল গ্রামলী, লীলাঙ্গী, অত্যন্ত সপ্রতিভ অথচ অপকণ্ঠ শ্রীময়ী তরুণী। আমাকে দেখেই তাঁর তাঁর স্ববে প্রসন্ন কবলেন,—আপনিই বুঝি এই মিথ্যাবাদীটার ভাই হ'ন? ওই জোড়োরা যে আমার সন্নিধান করেছে?

মেয়েটির বক্তব্য স্থির হোলে শুনলাম। আমার শ্রীমান ভাতা মেয়েটিকে একটাব পর একটা মিথ্যা সাজানো ভীততা দিয়ে ঘরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এখান থেকে সেখান করে। একটি পরমা সম্বল নেই। আজ যদি আমার দেখা না পেতো তবে কাল থেকে মেয়েটিকে রাস্তার রাস্তায় ভিক্ষা করতে হতো। দুঃশয়, অপমান, হতাশায় বন্ধনায় পাগল হয়ে উঠেছে মেয়েটি। ওর মথাস রিষ বিক্রা করে নিয়েছে আমার শ্রীমান ভাতা। মেয়েটি কাতর অনুরোধ জানালে আমাকে, ওকে নিরাপদে ভেনিসে পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে। আর আমার ভাইএর লিখিত অঙ্গীকার-পত্র—বিবাহের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে। সেটা যেন আমি আঙনে পুড়িয়ে ফেলি। ওই জুয়ারচোর বদমায়েশের সান্নিধ্য আর এক মুহূর্তও সহ করতে চার না মেয়েটি। আমার সামনে দুটি মুণ্ড—হাঁটুর মধ্যে মাথা ধুঁজে দুই হাত জড়ো করে অপরাধীর নীরবতায় আমার ভাই নিভীক, তেজোদন্ত স্পষ্ট—প্রকৃত ভেনিসের মেয়ের মুখ। ভালো লাগলো আমার। দায় আর দায়িত্ব বোঝার মত ভাণ্য রইলো না আর। ওকে নিরাপদে পিতৃগৃহের স্নেহনাড়ে পৌঁছে দেওয়া একটুও কঠিন নয় জানতাম, তাই সহজেই এবার বললাম, আমি তোমাকে কোনো বিশ্বাসী সন্দেহমহিলায় সঙ্গে ভেনিসে পাঠানোর সব ভার নিগাম।

—মনে রেখো, মনে রেখো, তুমি কিন্তু শপথ করেছো আমার প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবে, বুকেছো? মনে রেখো সেটা—বলতে বলতে যেই আমার ভাই ওর দিকে এগোলো সেই মুহূর্তেই ওই কোমল পেলব হাতের প্রচণ্ড কানমলা থেয়ে শ্রীমান কঁাদো-কঁাদো হোয়ে পিছিয়ে এলেন।

—বাঃ, তুমি তো দেখছি একটি গুনে বিজু, আমি বললাম মেয়েটিকে—আমার ভাইএর এত লাঞ্ছনা ভোগ তো তামাকে ভালোবাসে বলই না?

—সেটা তো আমার অপরাধ নয়—তাছাড়া আমার কাছে কানমলা পাওয়াও এই প্রথম নয় ওর—

বাঃ রে মেয়ে!

—কিন্তু সাধুর গায়ে হাত তোলার জন্তে তোমাকে একঘরে করেছিলো মনে আছে?—কঁোস করে উঠলো আমার ভাই।

—ভাণী বসেই গিয়েছিলো কিন্তু ফেব বকবক করলেই আবার কানমলা খাবে।

—চুপ করো, চুপ করো, একটু শান্ত হও। তোমার জিনিষপত্র

ওহিয়ে নাও। চলো আমার সঙ্গে। তোমার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই বলে ভাইয়ের হাতে সবস্বত্ব বিশটি সেকুইন দিয়ে ওকে চলে যেতে বললাম। হাতে টাকা পেয়েই শ্রীমান সন্তুষ্ট।

মেয়েটির নাম মার্কেলিনা। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। আমার কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস, স্বন্দর সজ্জা আর ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়ে কোটা ফুলের মত সজীব হোয়ে উঠলো মার্কেলিনা। হাসিতে, কৌতুকে, ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে ওর সহজ মাধুরী উপছে উঠলো।

কয়েক দিন পর মার্কেলিনাকে নিয়েই আমি মার্সেলস-এ একটা বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। উৎসব শেষে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমি ঠিক করেছিলাম, একটু সুবিধা পেলেই মার্কেলিনাকে ভেনিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। যাই হোক, আমাদের গাড়ী বেশ কিছুদূর এসেই বিগড়ে গেল। না সারিয়ে আর এগোবার উপায় নেই। পথের দু'ধারে কোনো বাড়ীও নেই। একটি মাত্র স্বন্দর বাড়ী দেখা যাচ্ছিল, একটু দূরে মস্ত বাগানের মধ্যে। দু'ধারে উঁচু গাছের সারি দেওয়া লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে বাড়ীটার ফটক অবধি। কোনো উপায় না দেখে ক্লেয়ারমতকে পাঠালাম ওই বাড়ীটায়—কাছাকাছি কোনো মিস্ত্রী পাওয়া যাবে কি না এই সব জেনে আসতে।

একটু পরেই ও ফিরে এলো, সঙ্গে দু'জন পরিচারক। তারা আমাকে অভিভাদন করে অত্যন্ত নম্রভাবে জানালে যে, তাদের উপর আদেশ হয়েছিল, গাড়ীটা নেবামতের ব্যবস্থা করার আর আমাদের এই সময়টুকুর জগ্গে ওই বাড়ীটিতে আতিথ্য নিতে অনুরোধ জানাবার। উপায়ান্তর ছিল না। জিনিষপত্র সবই আমার বিশ্বস্ত ক্লেয়ারমত-এর জিম্মায় রেখে মার্কেলিনাকে নিয়ে এগোলাম। বাড়ীর ফটকের কাছে আসতেই দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে, ওঁদের পিছনে তিন জন মহিলা। ভদ্রলোক দু'জন বার বার বলতে লাগলেন, নাদামের অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর অত্যন্ত আনন্দ হোয়েছে আমরা আতিথ্য স্বীকার করতে। তা ছাড়া আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য উনি সর্বদাই উৎসুক, আমরা যেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করি। আমি বিনীত ভঙ্গীতে গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশ্যে অভিভাদন আর ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আশা করি বৈশীক্ষণ ওঁদের উপর অগ্রাচার করতে হবে না। গৃহকর্ত্রী লীলায়িত ভঙ্গীতে অভিভাদন করলেন। কিন্তু ওঁর মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ ওড়নাতে সমস্ত মুখটা এমন ভাবে ঢাকা ছিলো যে একটু অংশও দেখা গেল না। আমার পাশেই মার্কেলিনার লাবণ্যভরা মুখখানি পূর্ণ বিকশিত; মুখের চার পাশে অবাধ্য চুলগুলি সাপের ফণার মত ঢেউ তুলে উড়ছে, কোনো আবরণের বালাই নেই। ওঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, মার্কেলিনা আমার মেয়ে কি না? আমি বললাম ও আমার সম্পর্কিতা বোন, আমরা দু'জনই ভেনিসের লোক। আমাদের কথার মাঝখানে একটা মস্ত স্প্যানিয়েল কুকুর তাঁর মত ভিতর থেকে ছুটে এলো; নাদাম ওকে তাড়াতাড়ি ধরতে গিয়ে হোচট থেয়ে পড়ে গেলেন। যেই ওর সহচরী ওঁকে ধরে তুললে, উনি বললেন, ভালো করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, ভীষণ ভাব পাটা মচকে গেছে। ওঁকে ধরে ওর ঘরে নিয়ে গেল, যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহচরীটি ফিরে এসে খবর দিলে যে, ওর পাটা

দেখতে দেখতে ফুলে উঠছে, উনি বিছানায় শুয়ে আছেন আর সেখানেই আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

শয়নাগারে প্রবেশ করেও ঠর মুখচন্দ্রিমা দর্শনের সৌভাগ্য হোলো না, তবু দুঃখিত ভাবে স্বীকার করলাম, ঠর এই দুর্ঘটনার জন্তে আমিই দায়ী। পরিষ্কার স্বচ্ছ ইতালীয় ভাষায় উনি জানালেন, আমাদের অতিথি হিসাবে পাওয়ার আনন্দের কাছে ওই ব্যথা নিতান্তই তুচ্ছ।

—মাদাম, আমার দেশের ভাষা এত চমৎকার বলেন আপনি? নিশ্চয়ই আপনি ভেনিসে ছিলেন?

—তা নয়। তবে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন ভেনিসেই অধিবাসী।

এই সময় একজন পরিচারক এসে জানালো, বেশ কয়েক ঘণ্টা দেয়ী হবে গাড়ীটা মেরামত করতে। মাদাম অমুখোশ জানালেন, রাত্রিটাও তাহলে এখানেই কাটাতে। কৃতজ্ঞ ভাবেই সম্মতি জানালাম।

রাত্রে খাবার টেবিলে সারাক্ষণ অনর্গল ইতালীয় ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! এক মুহূর্তের জন্তেও ঠর মুখ দেখতে পেলাম না। আর পরিচয়? তা-ও সাহসের অভাবে খোলাখুলি জানা হোলো না।

নিজের আয়োজনের সময় মার্কোলিনা জানালে, মাদামের কাছেই ও রাতে শোবে; এ দু'জনার সখীও ওই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ নিবিড় হয়ে উঠছে দেখলাম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই যাবার জন্ত বেরিয়ে পড়লাম।

প্রাতরাশের ব্যবস্থা গাড়ীতেই করবো ঠিক করলাম। বিদায় নেবার আগে গৃহকর্ত্রীর দর্শন চাইলাম—মিললো না। তখনও তাঁর সজ্জা ও প্রসাধন হয়নি, সে অবস্থায় উনি বাইরে আসতে লজ্জিত। তবে তার জন্তে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন আর পাঠালেন অমুখোশ—যখনই যাবো এ পথ দিয়ে, একা হোক, সবাক্বে হোক, ঠর কাছে যেন আতিথ্য স্বীকার করি। দেখা না হওয়াতে মনে মনে বিরক্ত হলাম বৈ কি! কিন্তু প্রকাজে শিষ্টতার কোনো ক্রটি ঘটেনি। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আবার মার্কোলিনা আর আমার যাত্রা শুরু হোলো।

পথে মার্কোলিনাকে প্রশ্ন করলাম, কেমন দেখতে ওই মাদামকে? তরুণী না বৃদ্ধা? রূপশী না কুংসিত?

—এক কথায় মনোহারিণী। কি অপূর্ণ সৌন্দর্য্য ঠর, আপনাকে কি বলবো? বয়স তো তেত্রিশ বছর বললেন। হ্যা দেখুন দেখুন, আমাকে ভালেবেসে কি দিয়েছেন—

বহুমূল্য হীরার আংটি দেখলাম ঠর প্রসারিত আঙুলে। কিন্তু কেন আমার কাছে সারাক্ষণ ওড়নাতে মুখ ঢেকে রইলেন—এক মুহূর্তের জন্তেও ঠকে দেখতে দিলেন না। তার কি কাণ, বার বার প্রশ্ন করেও মার্কোলিনার কাছে কোনো সহস্তর পেলাম না। তার বদলে ম'সিয়ে কুয়োরিনি ভেনিসের যিনি রাজহুত তাঁর কাছে যে ওর মামা মাতিও বসে কাজ করে সেই সব অবাস্তব প্রসঙ্গ তুলে আমার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যাবার বায়না জুড়ে দিলো। শুধু ঠকে থামাবার জন্তেই ওর সব কথায় সায় দিয়ে গেলাম।

স্বপ্নান্তের পর আমরা অভিনোতে পৌছলাম। ওখানে একটা সহাইখানাতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হোলো। দু'জনে ঘরে বসে

## সমুজ্জ্বল মুখশ্রী

নিয়মিত "বোরোলীন"

ব্যবহারে আপনার

তনুশ্রী দিন দিন উজ্জ্বল

ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

মুখশ্রীর কোমলতা

ও সজীবতা বজায় থাকবে

এর প্রান পর্দা স্নিগ্ধ সুবাস

আপনার মনে আবেগময়

অনুভূতি এনে দেবে।

পরিবেশক:- জি, দত্ত, এণ্ড কোং

১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



**বোরোলীন**  
উচ্চাঙ্গের ফেসক্রিম

সকল ঔসনার্থ ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়



এমন সময় মার্কোলিনা তাঁৎ বললে,—আমরা তো অভিনেত্রী—এতে পৌছে গেছি। যাক তাহলে মানামের কাছে যা প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলাম তা পূরণ করবার সময় হলো। হ্যাঁ, উনি এখানে না পৌছানো অবধি আপনাকে কিছু বলতে বাধা করে দিয়েছিলেন, এমন কি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছিলেন।

—আরে সত্যি! বেশ মজার ব্যাপার তো? বলো বলো তারপর?...

—উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। এতক্ষণ চিঠি আটকে রাখার জন্যে রাগ করবেন না তো আমার উপর?

—পাগল হোয়েছো? তুমি একজনর কথা বেখেছো, তা'তে আমি রাগ করবো? কিন্তু চিঠিটা কই, বার কর তাড়াতাড়ি—

—দাঁড়ান—এই বলে একতড়া কাগজ বের করে ও বাছতে বসলো।

—ওঃ এটা আমার জন্মের সার্টিফিকেট।

—জানি তুমি ১৭৪৩ সালে জন্মেছ।

—আর একটা তো দেখছি আমার সত্যতার সার্টিফিকেট।

—রাখো রাখো ওসব, পরে কাজে লাগবে। এখন আসল চিঠিটাই বার কর না?

—আশা করি হারাইনি।

—ঈশ্বর না করুন—কৌতুহলে আর অসমা আশ্রয়ে আমার তখন আশ্বহারা অবস্থা।

—এই যে পেয়েছি—আরে না তো! এতো আপনার ভায়েক লেখা ক'টি কবিতা।

—চুলোয় যাক কবিতা, পুড়িয়ে ফালো ও সব আগুনে। আমার চিঠিটা কোথায় বাব করো আগে।

—ওঃ ভগবান! এই—এই যে পেয়েছি!

ওর হাত থেকে খামটা একরকম ছিনিয়ে নিলাম। খান খান কোনো ঠিকানা নেই। খামটা ছিঁড়তে গিয়ে আমার আঙ্গুলগুলো প্রবল উত্তেজনায় থবথব করে কাঁপতে লাগলো। সীলটা ভেঙে ফেলতেই দেখলাম, নামের জায়গায় লেখা—

“আমার মাঝে জীবনের মহত্তম পুরুষকে।”

এ কি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য যে তখনও বাঁকী। সাপ পৃষ্ঠার একটি কোণে লেখা—

‘হেনরিগেট’—আব একটি অক্ষরও নয়।

স্পষ্ট, স্বচ্ছ সেই চিরপরিচিত লিখনভঙ্গী! আমারই হেনরিগেটের—কোনো ভুল কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে। এব সেই অভিন্ন ইঙ্গিতময় বচন-বিক্রাস—স্মৃতির পটে যে স্বাক্ষর আছে শেষ বিদায়ের দিনে সেই শেষ শেষ লিপি! একটামাত্র কথা ‘বিদায়’—সমস্ত না বলা কথাকে মর্মে করে তুলেছিলো।

আমার হেনরিগেট! বাব বিচ্ছেদ স্তব্ধ কালের প্রলেপে এতটুকু স্থান হয়নি। দিনে দিনে আমার সমস্ত সত্য ও মিশে গিয়েছে গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে। ওকে পাওয়ার চেয়ে ওকে হারিয়েই ওকে নিবিড় করে পেয়েছিলাম।

কিন্তু হেনরিগেট, পাকলে তুমি এত নিষ্ঠুর হতে? তুমি দেখেছিলে, তুমি চিনেছিলে তবু তুমি ধবা দিলে না? তাই বৃষ্টি অবশেষে আদ্যে অপরিচিত হোয়েই বইলো? কিন্তু পাবলো

তুমি হেনরিগেট? কেন ভয় পেয়েছিলে কি? দীর্ঘকালের বাতায় প্রথম যৌবনের লাভণ্য কিছু স্থান হয়েছে বলে? যোলো বছর আগে যে তরুণ তোমার মাধুর্য-সরোবরে ডুব দিয়েছিলো, তার সেই মুগ্ধ প্রেম আজও তো তেমনি আছে। তুমি সুখী হোয়েছো—শুধু কথাটি তোমার মুখে শোনার আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করলে—তুমি এত নিষ্ঠুর কেনন করে হোলো হেনরিগেট? আমাকে আজও ভালোবাসো কি না এ প্রশ্ন তোমায় আমি করতাম না—আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য নই। মহিমময়ী, মাধুর্যময়ী প্রিয়া আমার কালই তোমার কাছে ফিরে যাবো আমি। তুমিই তো বলেছো তোমার দরজা আমার কাছে চিরদিন খোলা।

ওকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে কত কথাই না বলছিলাম। কিন্তু সখিত ফিরে পেলান মার্কোলিনার বিখ্যিত বিষম দৃষ্টিতে। খেয়াল হোলো মন চাটলেই ওর কাছে যাবার, উপায় আমার নেই। কারণ, জানি আমি ও চাপ্র না আমাদের দেখা হোক—ওর ইচ্ছার মূল্য আমাকে দিতেই হবে—সেইখানেই তো আমার প্রেম সার্থক। তবু সেই একই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, মৃত্যুর আগে আব একটামাত্র শুধু ওর দর্শন প্রার্থনা করবো।

মার্কোলিনা সভয়ে বলে উঠলো,—কি কাণ্ড বলুন তো মিসিয়ে? আপনার চেহারা দেখে তো আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেছি। একবারে সাদা ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে মুখ—একটি কথাও বলছেন না—কউস্টেম আপনাকে চিনতেন শুনলাম, কিন্তু ওর নাম শুনে আপনার যে এমন দশা হবে বুঝতে পারিনি।

—কে বললে তোমাকে আমরা বন্ধু ছিলাম?

—কউস্টেমই বললেন। তাছাড়াও আমাকে বললেন, যদি জানেন সুখী হতে চাও তবে ওর সঙ্গে কখনও ভাগ কোরো না। হার রে, উনি কি আর জানেন যে আমাকে দেশে পাঠাবার সব ব্যবস্থা আপনার করা হোয়ে গেছে? আমি কিন্তু তখনই সন্দেহ করেছিলাম আপনার হৃৎকণার মধ্যে বেশ নিবিড় প্রেমই ছিলো—আজ অনেক দিন হোলো কি?

—সোলো, সত্যবো বছর হবে।

—ওঃ তাহলে নিশ্চয়ই তখন খুবই কম বয়স ছিলো ওর—কিন্তু আজ ওর যে আশ্চর্য পাগল-করা রূপ এব চেয়ে সৌন্দর্য তখন নিশ্চয়ই ছিল না—

—মার্কোলিনা লোহাই তোমার—আব সোলো না—

—আপনাকে কাছে পেয়েও হারলাম—আমার কপালে এ সুখ জুটলো না।

—মার্কোলিনা, তুমি চিরস্বামী হবে—তোমার সময়সী কেউ তোমার জীবনে নিশ্চয়ই আসবে, তার ভালোবাসা তোমাকে ঘিরে রাখবে চিরদিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কোলিনার বাবার সুযোগ এলো। লণ্ডনের ভেনিশীয় রাজকৃত মিসিয়ে কুইরিনির সঙ্গে এক দিন খিয়েটারে সাক্ষাৎ হোলো। প্রথম পরিচয়ের পর এক দিন কুইরিনি আমদের আমন্ত্রণ জানালেন। আব তাঁর বাড়ীর ভোজসভায় তাঁর মার্কোলিনার মামার সঙ্গে ওর নাটকীয় পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ।

মিসিয়ে কুইরিনিই মার্কোলিনার পিতৃগৃহে পৌছানোর সব ভার নিলেন। তার মামাই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তাছাড়া মিসিয়ে



## নিম্মি

তার হকের যত্ন নেন লাক্স টয়লেট সাবানের  
সাহায্যে “এর শুভ্রতাই পরিচয়  
দেয় এটি বিশুদ্ধ।” তিনি বলেন

সুন্দরী নিম্মি ভারতীয় চলচ্চিত্রে  
ভাবাবেগ পূর্ণ ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।  
তার চোখ দুইটি অপূর্ব স্মরণ এবং  
তার কোমল ফুলের পাঁপড়ির মত লাবণ্যও  
মনোমুগ্ধকর। শুভ্র এবং বিশুদ্ধ লাক্স  
টয়লেট সাবানের সাহায্যে তিনি তার লাবণ্যের  
যত্ন নেন—এটি একটি মোসারেম, অগন্ধ  
সৌন্দর্য সাবান।

নিম্মি এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠের  
সুন্দরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন—বিশুদ্ধ,  
শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান নিয়মিত ব্যবহার করেন!

লাক্স

টয়লেট সাবান



চি ত্র-ভা র কা দে র সৌ ন্দ র্য সা বা ন

কুইরিনি মাণাম ভেনারেল্লা নামে একটি বিখ্যাত মহিলাকে মার্কোলিনার সঙ্গিনী হিসাবে পাঠালেন।

যাক, আমি নিশ্চিত। কিন্তু মার্কোলিনার বিচ্ছেদও আমাকে এমন তীব্র ভাবে কাতর করবে, বুঝতে পারিনি। ওকে বিদায় দিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বতর্কণ কেনেছি। শেষে ক্লান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় পুরো একটি দিন ঘুমের শেষে দেখলাম, সেই-মনে আবার সন্তোষ প্রায় উঠেছি। আশা আর আনন্দে মনের ক্ষুধিত্তে ইংলণ্ডে বাবার আয়োজন শুরু করলাম।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইংল্যান্ড!

নিদেশী যেদিন প্রথম পা দেয় ইংল্যান্ডের মাটিতে, সেদিন প্রথমেই তাকে কাঠমসের পীড়নায়ক অত্যাচারের কবলে পড়তে হয়। আরও হয় কণ্ঠচাবীদের কড় গর্পোদ্ধত আচরণে। ইংরেজ আইন মেনে চলবে কঠোর নিষ্ঠায়। তার জগৎ কর্কশ, অমাজিত, দাষ্টিক আচরণেও দ্বিগা করবে না, বিশেষ করে কণ্ঠচাবীরা—ফরাসীরা জানে, কেমন কর্তৃত্বের সঙ্গে মেশাতে হয় ভদ্রতা আর আত্মবিক্রমের সহজ সুর।

ইংল্যান্ডের মাটিতে পা নিয়ে আমার মনকে প্রথম আকৃষ্ট করে ওর পচ্ছিন্নতা। সারা দেশটাই যেন সৌন্দর্য্যে, প্রাচুর্য্যে আর পরিচ্ছন্নতায় ঝল-ঝল করছে। আর সবচেয়ে বেশী ভালো লাগলো কাগজের নোট। এক টুকরো কাগজের বিনিময়ে সব পাওয়া যায়, সব দেওয়া হয়! লণ্ডন, ডোভার, ক্যান্টারবেরী।

প্রত্যেকটি শহরই আমাকে মুগ্ধ করলো। প্রথমে অবশ্য লণ্ডনই স্থায়ী আশ্রয় পাঠলাম। কিন্তু নতুনর মোহ কাটবার পর থেকে কেমন বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ কাটিতে লাগলো দিনগুলি।

লর্ড পেমব্রোক আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন ‘টার ট্যাভার্ন’ হোটেলে খেতে—তাহলে নাকি আমি লণ্ডনের সেরা সুন্দরীদের দর্শন পাবো! কথামত গিয়েছিলাম। হোটেল-মালিকের সঙ্গে পরিচিত হোয়ে খুশীও হোয়েছিলাম। লর্ড পেমব্রোক-এর কথা জানাতে তিনি বললেন, ঠিক ওরকম ভাবে নয় তবে আমি যদি একত্রে আহবের জগৎ একটি সঙ্গিনী খুঁজি—তাহলে শুধু মুখ কুটে এক বার জানালেই চলেবে। এই বলে তিনি গয়েটার ডেকে বললেন, একটা মেয়ে ধরে আনতে—এমন ভাবে যেন বললেন যে, একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে আর তো। কিন্তু যেটি এলেন, তাঁকে দেখেই তো আমি মুচ্ছা যাবার জোগাড়। তাড়াতাড়ি একটা শিলিং দিয়ে বিদায় করলাম। কিন্তু হা হতোহম্মি! পর পর যে কয়টি নমুনা এলেন, তাঁদের প্রত্যেকের রূপেই আমি অস্থির। শেষ অবধি ছেড়ে দে মা কেন্দ্রে বাঁচি অবস্থা—বললাম, আমি একাই থাকছি, দয়া করে আর কষ্ট করবেন না।

সেদিন বাড়া এসে ভাবী একটা অভিনব পস্থা মনে এলো। পরিচারিকাকে ডেকে বললাম, আমার বাড়ার তিনতলাটা ভাড়া দেবো, তাহলে আর এমন নিঃসঙ্গ কাটিতে হবে না আর তার জন্তে ওর বা বাড়তি কাজ হবে, সে সবের দরুন সন্তোষে আধ-গিণি করে তাকে দেবো। পরদিনই ওকে দিয়ে জানলায় নোটিশ টাঙালাম :—

এই বাড়ার তিনতলাটি আসবাবপত্র দ্বারা সম্বলিত অবস্থায় ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া অল্প—প্রার্থী তরুণী; একক এবং নির্বাক

হওয়া চাই। ইংরাজী ও ফরাসী কথোপকথনেও অভ্যস্ত। এবং কোনো দর্শনপ্রার্থীই প্রবেশ নিষেধ।

বুঝা পরিচারিকারি তো এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখে হাসতে হাসতে দন বন্ধ হবার যোগাড়। আমি বললাম,—হাসছো কেন বাছা? তুমি কি ভাবা, কেউ ঘর নিতে আসবে না?

—ঠিক তার উল্টো। সারা দিন-রাত কি ভীড় হয় দেখবেন। যাক সে, ফ্যানী ঠাকাত্তে পারবে।

—খুব বেশী হবে কি? ইংরেজী আর ফরাসী দুটো ভাষার কথা লিখেছি সে।

—আগা! এমন বিজ্ঞাপন পড়ার জন্তেই কত ভীড় হয় দেখুন।

সে কথা সত্যি। এক বার নোটিশটা না পড়ে কেউ যায় না। দ্বিতীয় দিন আমার নিগ্রো ভৃত্য জারবি আমাকে দেখালে হু-ছুতো খবরের কাগজে কি ভাবে আমার বিজ্ঞাপনটা ফলাও করেছে।

—ভদ্রলোকটির কচিকান্ন আছে আর আমোদপ্রিয় তো বটেই। কারণ, উনি যে চান তাঁর শুধু তরুণী হলেই চলবে না, একলা ইওয়াই চাই, আবার নিরুদ্ভাব! তাছাড়া তাঁর কাছে কোনো সাক্ষাৎকারীর প্রবেশ নিষেধ—অর্থাৎ ভদ্রলোক নিজেরই তাঁকে সর্বদা সঙ্গ দেবেন। তবে ভয়ের কথা, যদি তরুণীটি রাতে ঘুমোবার সময়েই শুধু বাড়ী ফেরেন? কিংবা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে? আর যদি সাক্ষাৎকারী হিসেবে বাড়ীওয়ারও প্রবেশ নিষেধ করেন!

একথা মানতেই হবে, ইংরেজী দৈনিকগুলিই ছুনিয়ার সেরা পত্রিকা। যা কিছু ঘটে তা’ নিয়ে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা চলে পত্রিকা মারফৎ। যে দেশে লোকেরা স্বাধীন ভাবে বলতে আর স্বাধীন ভাবে লিখতে পারে সে দেশের মানুষই তো আসল সুখী।

যাই হোক, দশ দিন ধরে প্রায় শ’খানেক তরুণীকে প্রত্যাখ্যান করার পর এগারো দিনের দিন যখন খেতে বসেছি, এমন সময় একটি তরুণী এলো। সোজা আমার খাবার ঘরেই। বয়স মনে হোলো বিশ থেকে চব্বিশের ভিতর। দীঘল, তরু, স্তম্ভাম দেহ—অত্যন্ত মাজিত, বাহুল্যহীন কচিপূর্ণ পরিচ্ছদ—শাস্ত, গম্ভীর ঈষৎ গর্কিত মুখশ্রী—আর ঘন মেঘের মত কালো চুল।

সুন্দর সংঘত ভঙ্গীতে আমাকে অভিযান জানাতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমাকে অমুরোধ জানালে আমি যেন খাওয়া ছেড়ে না উঠি। ওর কঠোর আর বলার ভঙ্গীতে বোঝা গেল, বেশ বন্দী ঘরাণা ঘরের মেয়ে। আমার সঙ্গে কিছু খেতে অমুরোধ করায় এমন সহজ মধুর ভঙ্গীতে প্রত্যাখ্যান জানালে যে, আমি মুগ্ধ প্রায় গেলাম। মেয়েটি এসেই ফরাসী ভাষায় কথা শুরু করেছিলো, পরে কথায় কথায় অতি সুন্দর আর নির্ভুল ভাবে ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে লাগলো। মেয়েটি জানালো আমার সব বকম সন্তেই ও রাজী। আমিও রাজী হোয়েছিলাম, ওকে দেখার আর কথা শোনার পর থেকেই।

—সমস্ত তিনতলাটা দেওয়া আমার পক্ষে বড় বেশী হয়ে পড়বে। যদিও আপনি সস্তা ভাড়ার কথাই বিজ্ঞাপনে দিয়েছেন, তবুও থাকার জগৎ সন্তোষে হু’শিলিং-এর বেশী খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে। ওই তাড়াই আমিও ঠিক করেছিলাম। আপনি কিছু ভাববেন না। আমার পরিচারিকাই আপনার বাজার করা কাপড় খোওয়া ইত্যাদি সব কিছু কাজ করে দেবে।

—অনেক ধন্যবাদ! তাহলে খুব সুবিধা হবে আমার। আমার পরিচারিকাকে তাহলে জবাব দেবো। কারণ সে বড় পয়সা চুরি করে। আমার আয়ের পক্ষে সেটা বেশ মারাত্মক হোয়ে পড়ে। আমি বরং আপনার লোকটিকে সপ্তাহে ছ'পেনী করে দেবো। বলতে লজ্জা করে কিন্তু বেশী খরচ করার সাধ্য নেই আমার।

—কিছুমাত্র সন্কোচ করবেন না। আপনি যদি এক পেনী দেন তো আমার রাঁধুনীকেও রোজ এক পেনী দামের খাবার আপনাকে দিতে বলবো। রান্না নিয়ে আপনি বুঝা ভাববেন না। আর তাছাড়া রাঁধুনী যা আপনাকে দিয়ে যাবে, যত খাবারই হোক সবই নেবেন দ্বিধা না করে। কারণ আমার বলা আছে রোজ চার জনের মত রান্না করতে অথচ খেতে আমি একা। আপনি এক পেনী দিলে সেটাই ওর পুরোপুরি লাভ। কিছু মনে করবেন না আপনি এতে।

—কি আর বলবো, আপনার এ উদারতা আমি কখনো ভুলবো না।

সব ব্যবস্থা হোয়ে গেলো। মেয়েটি চলে গেলো জিনিষপত্র সব নিয়ে আসতে। এসেছিলো যখন তখন ওর মুখখানা ছিলো পাণ্ডুর রান—যাবার সময় দেখলাম রক্তিম আভাসে উজ্জ্বল। ওর নাম কুমারী পলিন।

পরিচারিকার মারফৎ পলিনের সব খবরই কানে আসতো। শোবার ঘর ছাড়া বেশবাস পরিবর্তনের জন্তে ছোটো একখানি ঘর বেছে নিয়েছে, চাকর-বাকরদের চেয়েও ছোটো ঘরখানা। এমনি পানীয় হিসাবে জল ছাড়া কিছুই খায় না। সকালে ছোটো একটুকরো রুটি শুধু আর দুপুরে স্থাপ, এর সঙ্গে আর একটিমাত্র ডিম সে যাই হোক না কেন।

এসব শুনে তখন পরিচারিকাকে শিখিয়ে দিলাম পুরো প্রদোশ ওকে দিতে আর ভানান্তে, এ বাড়ীর নিয়মই সব ঘরে পুরো প্রান্তরাশ পাঠানো—না হলে আমি ভীষণ দুঃখিত হবো। একখানি চিঠিও লিখেছিলাম ভালো একটা ঘর বেছে নেবার অনুরোধ জানিয়ে। আর সবশেষে ক্রেরামতকে পাঠিলাম সাফাং প্রার্থনা করে। প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো। ঘরে গিয়ে দেখি বেশ কয়েকখানি বই টেবিলের উপর স্তূলীকৃত, তাছাড়া অল্প সব নিন্তা ব্যবহাধ্য জিনিসের টুকিটাকি—যা দেখলেই দারিদ্র্যের কথাই মনে হয়। আমি যেতেই পলিন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালে।

—কি করে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো!

—আপনার সঙ্গ দিয়ে—অন্তত খাবার সময়টায়। একা খেতে পেলেই গোয়াসে গিলি, ফলে শরীরও ভেঙে পড়ে। যদি কিছু মনে না করেন আপনি আমার সঙ্গে খেতে এলে আমার পক্ষে খুবই ভালো হয়। অবশ্য তার জন্ত আপনাকে বিন্দুমাত্রও অন্তবিধা ভোগ করতে হবে না কোন দিক দিয়েই—

—তাই হবে, কিন্তু খুব যে মনোরম সঙ্গ পাবেন তা' মনে হয় না।

সেদিন আরও অনেক কথাই হোলো। কথায় কথায় কানলাম, পলিন ইংরেজ নয়, বাইরের থেকে এসেছে। অথচ ছোটো থেকেই ইংরেজী কথা বলতেই অভ্যস্ত। ক্রমেই ওর মধুর অথচ সযত ব্যবহার ওর শাস্ত্র-শ্রী আমার মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছিলো বৃদ্ধতম। আর ওর কথায়-বার্তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হোয়েছিলো ও রীতিমত অভিজাত-বংশীয়া। এক দিন আরও ঘনিষ্ঠ প্রসঙ্গ করে বললাম পলিনকে,—আপনি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ।

—মাতুলের বাড়ি পেয়েছেন আপনি?

—না। তবে অনুভব করতে পারি বৈ কি?

—আপনার স্বামী? তার সঙ্গে এ বিচ্ছেদ কেন?

—তিনি অনেক দূরে থাকেন। বিচ্ছেদ নয়—কিন্তু দোহাই আপনার, আর প্রশ্ন করবেন না।

—একটা কথার অন্ততঃ জবাব দিন—এখান থেকে যখন চলে যাবেন—সে যাওয়া কি স্বামীর সঙ্গে মিলবার আশায়?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি ইংল্যান্ড ছেড়ে যাবার আগে আপনাকে ছেড়ে যাবো না। এই স্তব্ধ-সমৃদ্ধিতে ভরা ছোটো দ্বীপটি ছেড়ে যাবো শুধু আরও সুখী হবার আশাতেই—মামার প্রিয়তমের সঙ্গ পেলে।

একটা প্রবল বেদনার অনুভূতিতে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো—আর থাকতে না পেরে আবেগে বন্ধকঠেই বলে উঠলাম,—আর আমি পড়ে থাকবো পিছনে—হতভাগ্যের মতো! পলিন, পলিন আজ স্বীকার করছি আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, প্রকাশ করিনি শুধু তোমার অসন্তোষের ভয়ে।

—চুপ করুন, শাস্ত হোন—আমার কোনো অধিকার নেই আপনার কথা শোনবার—আমার সাধ্যও নেই আপনাকে বাধা দেবার—আমার অনুরোধ শুধু রাখুন। তা না হলে কালই আমাকে চলে যেতে হবে এবাড়ী ছেড়ে; সেটা যে আরও কষ্টদায়ক হোয়ে উঠবে।

—তোমার কথাই শিরোধার্য পলিন! থাক ও প্রসঙ্গ—তোমার বইগুলি আমাকে দেখাবে? তোমার ওই মহৎ স্রুতমার মনের পিপাসা কি দিয়ে মেটাও, জানতে ইচ্ছে করে।

—নিশ্চয়ই দেখাবো। কিন্তু দেখলে হতাশ হবেন বলে রাখছি। পলিন দেখালো ইংরাজীতে মিলটন, ইতালীয়তে আরিয়োস্তো, ফরাসীতেও কিছু সংখ্যক আর বাকী সব পর্ন্তগীজ্ঞে।

—তোমার এত চমৎকার সংগ্রহ! কিন্তু বেশী ভাগই পর্ন্তগীজ্ঞ ভাষায় কেন?

—আমি পর্ন্তগীজ্ঞের মধ্যে বলে।

—বল কি! তুমি পর্ন্তগীজ্ঞ? আমি ভেবেছিলাম, ইতালীয়—আশ্চর্য! এই বয়সে পাঁচটা ভাষা দখল করেছো? স্পেনীয় ভাষাও জানো নিশ্চয়ই?

—জানি বৈ কি। পাশাপাশি থাকার দরুণ ওঁরা আপন হোতেই শেখা হোয়ে যায়।

—পলিন, তোমার পরিচয় আমি সত্যিই জানতে চাই। হ্যাঁ, জানবার অধিকার আমি রাখি। আর তোমার বিশ্বাস রাখার অধিকারও আমি রাখি। তুমি আমার জানাও পলিন, তোমার সত্য পরিচয়, তোমার জীবনের অতীত কাহিনী—

—জানি আমি। বলবো আপনাকে—সব কিছুই বলবো—পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই বলবো—কিন্তু গোপন করবো না। আমি জানি, আপনি ভালোবাসেন আমাকে—আমার অনিষ্ট আপনার দ্বারা কখনই সম্ভব হবে না।

—এই সব পাণ্ডুলিপি কিসের?

—আমারই জীবন-কাহিনী। আশুন আপনাকে পড়ে শোনাই সব।

এক হতভাগ্য কাউন্টের একমাত্র কন্যা আমি। ছোটো ছিলাম তখন—সেই সময় রাজাকে, হত্যা করার বড়স্বামী দল ধরা পড়ে

তাদের সঙ্গেই অভিযুক্ত করে বাবারও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জানি না সত্যিই বাবা অপরাধী ছিলেন কি না—রাজসভায় কারো গোপন হিসা আর বিবেকের কবলে পড়ে প্রাণ দিলেন।

মা আমার আশ্রমে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেখানে এক জন মঠবাসিনী ছিলেন আমার নিজের মাসী। আমিও সেই আশ্রমেই ছিলাম, প্রায় আঠারো বছর বয়স অবধি। অন্যত্র যা কিছু শিক্ষা, সব সেখানেই। ইচ্ছা ছিলো, যত দিন না পিয়ে হয় তত দিন ওখানেই থাকবো আশ্রমের সুন্দর সম্মত পরিবেশে—তা ছাড়া আমার মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী মাসীকে আমি বড় ভালবাসতাম।

কিন্তু দাদামশায় নিয়ে গেলেন আমাকে আঠারো বছর বয়সেই। বাবার সম্পূর্ণ রাজস্বকান থেকে বাক্য্যাপ্ত করা হয় নি। তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তখন আমিই। এক দূরসম্পর্কীয়া আশ্রয়ী, মাকুঁইস জ্ঞ প্রভৃৎ বাড়াতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। তাঁর বাড়ীর অন্ধকোঠা পায় আমার জন্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া এক জন শিক্ষিতা অভিভাবকীয়া দাদী রাখা হয়েছিলো—যি, চাকর আর অজ্ঞান বড় পরিজনই আমার পরিচর্যার জন্ত ছিলো বটে কিন্তু আসল কর্তা দেখলাম আমার খাতাটি—যাই হোক, বরাতপ্রণে ওর স্বভাবটা ভালোই ছিলো।

কিন্তু আসল বিপদ শুরু হলো বছর খানেক পরে। এক দিন দাদামশায় এসে জানালেন, এক কাউন্ট আমাকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করতে চান—তাঁর উপযুক্ত পুত্র মাদ্রিদ থেকে সব ফিরেছে—আর এই বিবাহ আমাদের সমস্ত অভিজাত সমাজে বাতিমত আনন্দের সাড়া জাগাবে—এমন কি, রাজা আর রাজ-পরিবারেরও সমগ্র সম্মতি আছে এতে।

—কিন্তু দাদামশায়, আমি তাঁদের স্মৃতি করতে পারবো কি ?

—খুব পারবি রে পাখলী! আর ও-বিষয়ে তোকে একদম মাথা ঘামাতে হবেই না।

—কিন্তু দাদামশাই—মাথা ঘামাতে হবে না বললে চলবে না ; আগে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই।

—বিয়ের আগে এক বার আলাপ হবে বৈ কি। তবে তার জন্তে বিয়ের কিছু এদিক-ওদিক হবে না, সে সব আগেই যা ঠিক হবার হোয়ে গেছে।

আশ্চর্য্য! যাকে মন দিতে পারি নি, তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে অন্ধব মতো ? না, কখনই এ হোতে পারে না। সম্পূর্ণ অজানা, অপরিচিতের নাগপাশে নিজেকে এমন ব্যক্তিত্বহীন জড় পুতুলের মত জড়াতে দেবো না—দেবো না। খাতীকে বললাম সব। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো যুক্তি দেবার সাহসও নেই ওর। তখন গেলাম আমার সন্ন্যাসিনী স্নেহময়ী মাসীর কাছে। সব শুনে উনিও বললেন, কাউন্টকে আমার ভালো লাগা উচিত, তবে বিয়ে জিনিষটাই হলো একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা—তা ছাড়াও ব্রেজিলের রাজকুমারীর প্রিয়পাত্র ওই কাউন্ট—এ বিয়ের সম্বন্ধ উনিই করেছেন।

হতাশায় ভেঙে পড়ি নি। শেষ অবধি কি হয়, পরিচয়ের প্রথম অমুভূতি কেমন হয়, জানবার জন্ত দীর্ঘ ভাবেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরিচয় ঘটতে দেবী হলো না। বিবাহ উৎসব-সমাবেশে

পরস্পর পরিচিত হলাম। আমি নিশ্চন্দ্রে সারাক্ষণ শুধু লক্ষ্য করছিলাম কাউন্টকে। গভীর মনোযোগে শুনছিলাম তার প্রতিটি কথা। কিন্তু প্রথমেই মনে হোয়েছিলো, এর কাছে আত্মনিবেদন কখনও করবো না—কখনও করতে পারবো না—কিছুতেই না। এই অতি প্রগলভ, পরচর্য্যকারী, আত্মভর্য্য নির্ভর লোকটিকে স্বামিষে বরণ করতে হবে ? সাধারণ ভদ্রহাজনারও অভাব যার, সর্বসমক্ষে নিজের গুণগান করতে এতটুকু যার সঙ্গাচ হয় না, এমনি মূর্খ যে, হাক্ক রসিকতা আর কাল্পনিক বীরত্ব কাহিনীই যার একমাত্র বাগ-সম্বল, তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা যায় ? তার সঙ্গে কখনও কি মুহূর্তের জন্তেও কামা ? তা ছাড়া চোপ ছুটিকেও নিরাশ করেছিল ওর কুংসিত রূপ !

মনের এই তীব্র সমালোচনা মনেই ছিলো। বাইরে শান্ত, নম্র, মসৃণ ব্যবহারে কোথাও তার চিহ্ন কুটে উঠতে দিইনি। কিন্তু আমার এই অতি সম্মত, অতি ভদ্র ব্যবহারের ফলেই আশা করেছিলাম ওই অতি উচ্ছসিত, অতি প্রগলভ কাউন্ট আমাকে মনোনীত করতে চাইবেন না।

ঐ হতোহম্মি! দিন আটেক যেতে না যেতেই দাদামশায় জানালেন, তাঁরা পিতা-পুত্রে আমাকে একটি দিন নির্দিষ্ট করবার অনুরোধ জানিয়েছেন—বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করবার জন্তে। বিবাহের চুক্তিপত্রে না আমার মৃত্যুর পরোয়ানায় ?

এই হৃদয়ে আমার একমাত্র আশ্রয় মাসীর কাছ ছুটলাম। মাসী জানালেন উনিও দেগেছেন কাউন্টকে—ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উনি ভাবতেও পারেন না। কিন্তু ওরা এমন ভয়ানক প্রকৃতির লোক যে, ছলে বলে কৌশলে সম্মতি আনায় করতে পিছুপাও হবে না। মাসীও কথায় আমি একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়লাম—আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্তেই বিদ্রোহ ঢমকের মত একটা অদ্ভুত মতলব আমার মনের মধ্যে খেলে গেলো। তখনি বাড়ী চলে এলাম। এসেই কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম মাকুঁইস জ্ঞ পম্বালকে, যিনি আমার হতভাগ্য পিতাকে বন্দী করেন—যিনি আমার পিতার মৃত্যুর জন্তে দায়ী—সেই কার্য্য নিষ্ঠুর প্রকৃতির মাহুগাটিকে। সমস্ত ঘটনা ঠেকে খুলে জানালাম—উপসংহারে লিখলাম আমার এমন সহায়তীনা অনাথা অবস্থার জন্ত উনিই তো দায়ী। ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আজ আমার দায়িত্ব না নিলে—আমি আজ ওর আশ্রয়প্রার্থিনী—আমাকে ব্রেজিলের রাজকুমারীর বোধবুদ্ধি থেকে বন্ধা করুন আর মনোমত স্বামী নির্বাচনে অধিকার দিন।

চরম উত্তেজনা আর কোঁকের মাধ্যম লিখে পাঠিয়েছিলাম—আমার ধারণা ছিল না লোকটির কঠোর হৃদয়ের আড়ালে কোথাও এতটুকু করুণার কোমলতা আছে। তবু আশার একটু ক্ষীণ শিখা জ্বলছিলো মনে, আমার ভাষা আর লিপির অভিনবত্ব কি একটু সাড়া জাগবে না ? তার বিচারের দাবিতে পিতার জীবন নাশ করে কন্ডার জাঘা দাবী কি প্রত্যাগ্যান করবেন ?

হৃদয়ে পরে আশাতীত ভাবে এলো উত্তর। না, লিপির মারফৎ নয়। লোকের মারফৎ। তিনি বললেন, মাকুঁইস তাঁকে গোপনে পাঠিয়েছেন আমাকে জানাতে যে—আমি যেন জানাই এই বিবাহে আমার মতামত স্থির করতে পারছি না, যতক্ষণ ব্রেজিলের রাজকুমারীর সম্মতির কোনো নিতুল বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই। এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে উনি মনে করেন। আর বিশেষ কারণে কিছুই লিখে



জানানো সম্ভব নয় বলেই তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়েছেন। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আগন্তুকটি চলে গেলেন। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর অপরাধ সৌন্দর্য্য শুধু আমার দৃষ্ট নয়, আমার সমস্ত মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গেল। সত্ত্ব মুক্তি-লাভের আশায় আর আকস্মিক স্মরণের আবির্ভাবে আমার মনের সে সময়ের অবস্থা বর্ণনার অতীত! কে জানতো সেই তাঁর মধুর অনুভবের কেন্দ্রে অপেক্ষা করছে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ?

এর পর থেকে আমি যখনই সেখানে গেছি, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। খুবই আশ্চর্য্য! গীজ্ঞার গেছি, থিয়েটারে গেছি। কোনো উদ্ভাসে উৎসবে গেছি, কি পরিচিতদের কোনো ভোজ-সভাতে, সেখানেই গেছি ওকে দেখেছি। আর যখনই গাড়ী থেকে নামতে বা উঠতে গেছি পেয়েছি ওর প্রসারিত হাতখানির নির্ভর। আকস্মিকতা করে অভ্যাসে দাঁড়ালো—বিশ্রম করে সহজ হোয়ে উঠলো জানি না! কিন্তু ডের পেলাম আর একটি জিনিষ—ধরা পড়লাম আপন মনের কাছে। যদি কোনো দিন ওকে দেখতে না পেতাম, সমস্ত দর্শনীয় হোয়ে উঠতো বিশ্বাস—জীবন মনে হতো অর্থহীন।

আমার জীবনের ধুমকেতু সেই কাউন্টের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো, দাদানশাই কিংবা তাঁর এই আত্মীয়টির বাড়ীতে কিন্তু আর একদিনও সেই পুরানো কথা উঠেনি।

এক দিন সকালবেলা স্নানান্তে পেলাম, আমার পরিচারিকার ঘরে সম্পূর্ণ অগাধরূপে গলাব আঁড়াই। কে এসেছে জানবার জন্তে গিয়ে দেখি, প্রচুর লেস নিয়ে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে—আমাকে দেখেই অত্যন্ত সধর্মের সঙ্গে নমস্কার জানালে। লেসগুলোর দিকে এক বার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এমন কিছু ভালো নয়। তরুণীটি জানালে, পরদিন অনেক ভালো জিনিষ নিয়ে আসবে। ওর কথা শুনেই গিয়ে ওর দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম। কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আমার সমস্ত মন জুড়ে যে, তরুণের অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ভাসছে, তার সঙ্গে এই তরুণীর! কি করে সম্ভব? আমার দৃষ্টবিশ্রম? না তরুণীটি আরও দাঁখাদী তার চেয়ে—ভাবতে ভাবতে তরুণীটি কখন চলে গেল খেয়াল করিনি। পরিচারিকাকে প্রশ্ন করতে ও বললে, আগে কখনো দেখিনি মেয়েটিকে।

পরদিন ঠিক সেই সময় ছোটো বেতর বুড়ি ভরে লেস নিয়ে সে হাজির। ওকে আমার নিজের ঘরে ডেকে আনলাম। তার পর কথা বলতে শুরু করলে ওকে আমার দিকে চাইতে বললাম—পূর্বদৃষ্টিতে ও চাইলে আমার মুখের দিকে—কোনো সন্দেহ রইলো না আর। কিন্তু মনের প্রবল উত্তেজনায় একটি কথাও বলতে পারলাম না। তাছাড়া পরিচারিকাটির সামনে কোনো অবাস্তবিক পবিত্রতার সৃষ্টি করা ঠিক নয়। ওকে বললাম আমার টাকার ছোটো খলিটা নিয়ে আসতে। সেট ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখনি ছদ্মবেশী লেসওয়ালী আমার পায়ে উপর এসে পড়লো!

—আমার ভাগ্য আপনার হাতে—আমি বুঝছি আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন।

—গ্যা, ঠিকই চিনেছি কিন্তু আমি ভাবছি আপনি কি পাগল?

—গ্যা পাগলই হোয়েছি—শুধু ভালোবেসে—আমি আপনাকে—

—চুপ, উঠে পড়ুন, আমার পরিচারিকা এখন এসে পড়বে।

—সে জানে—তাকে টাকা দিয়ে হাত করেছি।

—কি! এত দূর সাহস?

সে উঠে দাঁড়ালো। তখনি দেখলাম পরিচারিকাটি মুচুকি হাসতে হাসতে টাকগুলি গুণতে গুণতে ঘরে ঢুকছে। লেসগুলি জড়ো করে বুড়িতে তুলে একটু মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে ও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে ওই দুর্ধীনতা পরিচারিকাকেও বার করে দেওয়াই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু আমি ভাবলাম, কিছু না জানার ভাণ করে থাকারি শেষঃ; তাতে অন্ততঃ মান বাঁচবে।

দিনের পর দিন চলে গেলো। পনেরোটি সন্ধ্যা দিন। এক দিনও আর দেখিনি সেই তরুণ ছদ্মবেশীকে। নিজের কাছে নিজেই লক্ষ্য পেলাম নিজের মনের চেহারা দেখে—সারা দিন-রাত আমার কাঁচছে শুধু স্বপ্ন দেখে। সারা মন—চিন্তা আমার ভরে গেছে এমন গভীর বিষমতায়? শুধু ওর নামটুকু জানবার জন্তে কি ব্যাকুল! পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতাম—কিন্তু ওর উপর কেমন বিতৃষ্ণা আর সন্দেহও এসে গিয়েছিলো।

তবু বটলো না ধৈর্যের বাঁধ—মন মানলো না সংঘের অনুশাসন।

এক দিন প্রসাধন করতে করতে নিতান্তই যেন হেলাভরে জিজ্ঞাসা করলাম। সেট লেস-ওয়ালী আর আসিনি?

পরিচারিকাটি ধূর্তও কম নয়। আমার ছলনা ও ঠিকই ধরেছে। বললে, ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভয়েই আর আসতে সাহস করে না।

—ছদ্মবেশ আমি ধরে ফেলেছি। কিন্তু আমি অধিক হচ্ছি যে, তুমি এক জন পুরুষ জেনেও সমস্ত লুকিয়েছিলে আমার কাছে?

—আপনি অসম্ভব হবেন আমি ভাবিনি। আমি ওকে চিনতাম।

—কে তুমি?

—কঁতে ছ আল। আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। কারণ, মাস চারেক আগে কি প্রয়োজনে উনি যে এসেছিলেন আপনার কাছে?

—তবে যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম লেস-ওয়ালীকে চেনো কি না, তখন কেন মিথ্যা বলেছিলে?

—কমা করুন। শুধু আপনি অপ্রস্তুত হবেন বলে। আমিও এই গোপন ব্যাপারে আছি জানলে আপনি রাগ করবেন বলে।

ওর এই স্বাভাবিক সত্য ব্যাখ্যাতে আমি খুশী হলাম। তাছাড়া আরও খুশী হলাম জেনে আমার কুমারী মনের প্রথম নৈবেদ্য তাড়ালে অপারো নিবেদিত হয়নি। আমি শুনেছিলাম, তরুণ কঁতে ছ আল—এর নাম বহু ক্ষেত্রে—বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে। কিন্তু এখন সম্পন্নহীন। তবু মাকুইস পমবালের মত প্রবল প্রতাপশালীর অধীনে পদস্থ কন্ডচারী সে—ভবিষ্যৎ উন্নতি তো সহজলভ্য তার। আর আমি তো আছি—ভাবতেই সমস্ত চিন্তাধারায় কেমন কেমন যেন স্তব্ধের আবেশ লাগলো। তার অভাব মেটাতে বিদ্রোহ আমাকেই নির্দিষ্ট করেছেন—ভাবতেও মধুর—মধুর কল্পনাতে আবার মুহূর্তগুলি ভরে উঠলো আকাশ-কুসুম চয়নে—কিন্তু যাকে অমন করে বিদ্রোহ দিয়েছি—সে কি আর ফিরবে?

আমার গোপন কথাটি সে তো জানে না? সে কি আসবে?

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

# ব্যক্তিত্বে রামেন্দ্রচন্দ্র

শ্রী অজয়েন্দ্রনারায়ণ রায়

৬

রামেন্দ্র বাবু নিজের প্রশংসা শুনে মর্থাহত হ'তেন। তখন সে প্রসঙ্গ পরিহার ক'রতে চেষ্টা ক'রতেন। ব'লতেন, স্তব-স্তুতি শুনার জন্ত ত অনেক দেব-দেবী রয়েছেন, এসব আমার কাছে কেন?

তখন তাঁদের জবাব ছিল, আপনিও ত' মানুষ নন সার! আপনি দেবতার চেয়ে কম কা?

হুঃ ক'রে বলতেন—আমি মানুষ; আমি এক জন পরাধীন দেশের জীব।

পরের গুণকীর্তনে যেমনি আবার তিনি ছিলেন পঙ্খযুগ। যখন রামেন্দ্রচন্দ্রকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র ভ'য়ে বিজ্ঞাসাগর উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব ক'রলেন, তখন তিনি বার বার নিষেধ ক'রে ব'লেছিলেন—এ উপাধি দেবেন না আমাকে, এ নেবার যোগ্যতা বাঙলা দেশে মাত্র এক জনেরই আছে। আমার মনে হয়, সারা ভারতের মধ্যে এক জনেরই অধিকার আছে বিজ্ঞাসাগর হবার।

আপনি নিজেকেই বা কম মনে ক'রতেন কেন? তাঁর হাজার গুণ থাকলেও তিনি কাঁ আপনার মত বেদবিৎ?

শুনেই কানে আঙুল দিলেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু—ও কথা শুনবো না আপনাদের। উনি যে ছিলেন স্বাধীনচেতা, আমাদের এই পরাধীন দেশে। যা' কেও কখনও ব'লতে সাহস করেননি, তাই তিনিই—একমাত্র তিনিই ব'লতে পারতেন মুখের উপর স্পষ্ট। তাতে গভর্ণমেন্টের বড় কঠোরাই রাগ করুন, আর দেশের সমাজপতিরাই রাগ করুন। কাঁও খাতির রাখতেন না অত্যাচারের প্রতিবাদে স্পষ্ট কথা ব'লতে। কতো সময় হুঃ ক'রতে শুনেছি সেই মহাপুরুষকে—এতো অশিক্ষিত দেশ আমাদের, এ দেশের জাতির ঘম ভাঙতে কত শতাব্দী যাবে কে জানে?

রামেন্দ্র বাবুকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর দান গ্রহণ ক'রতে হ'লো বটে, কিন্তু তিনি ব'লেছিলেন—এ দান আমি মাথা পেতে নিলাম, আর মাথার উপরেই রাখবো বত দিন বাঁচবো; দেশের লোকের সামনে বের ক'রবো না কোন দিন।

এক বার রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সার গুরুদাস বাবুর তর্ক-বিতর্ক হ'লো কয়েকটা বিষয় নিয়ে সিনেটে। বাপার অতি সামান্য; কিন্তু স্থিরবুদ্ধি গুরুদাস বাবু বড় ক'রে দেখলেন সে বিষয়কে। সব শুনে রামেন্দ্র বাবু কেবল হাসলেন।

পরের দিন রামেন্দ্র বাবু বই নিয়ে পড়ছেন, বেলা তখন আটটা। চাকরে এসে খবর দিলো জজ সাহেবের গাড়ী এসেছে। তিনি ব'ললেন—নিয়ে এসোগে। যখনই দেখলেন জজ সাহেব আর কেও নন, গুরুদাস বাবু, তখন কী ক'রবেন ঠিক পান না। এত দূর ব্যস্ত হ'তে তাঁকে দেখা যায় না। গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ে ধুলো নিলেন। সার গুরুদাস বললেন—আমারই ভুল হ'য়েছিল রামেন্দ্র! পরে বুঝে দেখলাম; তোমারই কথা ঠিক। তুমি ক'তো বড়

তখনই বুঝলাম, যখন কথার প্রতিবাদ না ক'রে কেবল হাসলে। আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন? কী প্রয়োজন ছিল আপনার আমার বাড়ী আসার?

গুরুদাস বাবু বাড়ীর পরই রামেন্দ্র বাবু গেলেন তাঁর বাড়ী। অতি বিনয় বচনে গুরুদাস বাবুকে বললেন—আমাকে চাবুক মারার কী প্রয়োজন ছিল সার! হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইলেন রামেন্দ্র বাবু, তা ছাড়া পায়ে ধুলোও নিলেন। তখন নির্বাক ব্রাহ্মণের মুখ থেকে বের হ'লো—তোমার জয় হোক রামেন্দ্র!

রামেন্দ্রচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। কোন গুণী লোকের অসময় উপস্থিত হলে তিনি চিন্তা করতেন—কেমন ভাবে তাঁর উপকার করা যায়। কায়ম মনসা বাচা যেমন ভাবেই হোক, তাঁর দিক থেকে কোন ত্রুটি হতো না।

শুনলেন রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ সেন মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন নিজের বাড়ীতে। সংবাদ পেয়েই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। বললেন নিজের স্ত্রী ও মাকে—তোমরা কিছু কিছু করে চীরা তুলিয়ে আমার হাতে দাও, আমি দেবো এক জন গুণীমানুষকে।

সকলেই একমত হয়ে টাকা তোলাতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, চক্ষুসার সঙ্গে কিছু নেবো না, সে ছেলেমানুষ। শুনেই রামেন্দ্রচন্দ্র বললেন—কেন নেবে না? তার বিয়ে হয়েছে, একটা মেয়েও হয়েছে। মনে করবে তার মেয়ের একটা জামা কিনে দিলাম। প্রথম হতে শিক্ষা দাও অশ্রময় হলে মানুষকে দিতে হয়। কেন তার হয়ে তুমিই দাও—বললেন স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী। হেসে বললেন—আমি পারি কিন্তু ওকে দিতে শেখাব। এখন থেকেই শিখুক।

দীনেশ বাবুর নিজের হাতের লেখা হতেই তুললাম—“কুমিল্লার রাণীর দীঘির পাড়ে একটা খোড়ো ঘরে—আমি রোগশয্যায় পড়ে বড় কষ্টে সময় যাপন করছিলাম। ডাক্তারগণ বলেছিলেন, আমি ভাল হব না। এই নিদারুণ চিত্র ভবিষ্যতের সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যু কামনা করিতেছিলাম। শীতের প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সারা রাত্রি অনিদ্রা ও নৈরাশ্রের পরে এক দিন আমি মানসিক উৎকর্ষা দূর করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময় ডাকপিণ্ডন আসিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র আমার হাতে দিয়ে গেল, পত্রখানি রামেন্দ্র বাবুর। আমি তখনও তাঁহাকে দেখি নাই; কিন্তু এই অদৃষ্ট-ব্যক্তির আশ্বাসবাণী আমার নিকট যেন অদৃষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘটা দূর করিয়া মুহূর্তের জন্ত স্বর্গের জ্যোতি দেখা দিল। তার পর কলিকাতায় আসিলাম, তখন শয্যাপার্শ্বে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়াছি। তিনি আমার সে সময় দুঃবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। প্রায় আসিয়া বলিতেন অমুক অতো টাকা দিয়াছেন। তাঁহারই জন্ত শ্রীযুক্ত নাটোরের কুমারকে পাইলাম। লালগোলার রাজাবাহাদুরকে পাইলাম। কোন্ কোন্ স্রষ্টা ব্যক্তি আমার মানিক



স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বৃত্তি করিয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ পাইলাম। সুখের সময় তেমন ভাবে কখনও পাই নাই। কিন্তু দুঃখের দিনে তাঁহার গভীর স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়াছি।”

তারা প্রসন্ন ও শুভ এক জন ছাত্র রামেন্দ্রচন্দ্রের। তার অভাব জানতে পেরে তাকে নিজ বাড়ীতে রেখে পড়িয়েছিলেন। নিজের ভাই কিংবা ছেলের চেয়ে তাকে কম ভালবাসতেন না। শেষ জীবনে তারা প্রসন্ন বাবুও কম উপকার করেন নি—এই পরিবারভুক্ত জনের।

রামেন্দ্রচন্দ্র বসে রয়েছেন নিজের কামরায়, এমন সময় এক জন ছাত্র এসে হাজির! তার নাম জিজ্ঞাসা করায় বললেন—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কী চাও তুমি? আমি সার! আপনার কাছে দিনকতক দর্শন শাস্ত্র পড়তে চাই। খুব খুশী হয়ে বললেন রামেন্দ্র বাবু—এমন কথা কারও মুখে শুনিনি। আমি খুব আনন্দ সহকারে তোমাকে পড়াব। সেই দিন থেকেই যোগেশ বাবুকে বিজ্ঞান দান করতে লাগলেন। একে নিজের পড়া, কলেজে যাওয়া, তা ছাড়া সাহিত্য-পরিচয় ত আচ্ছন্ন। যোগেশ বাবু এলে তাঁর আহার-নিদ্রা থাকতো না। স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী বলতেন, তাঁর দেবর দুর্গাদাস বাবুকে—এ ছেলে ত তোমার দাদাকে না মেয়ে ছাড়বে না। কে শোনে সে কথা! এলেই তাঁকে পড়াবেন। কখন কখন হেসে বলতেন—ও ছেলে এলে আমারও আলোচনা হয়। ভাই দুর্গাদাস বাবুকে নিবেদন করে বলে দিলেন—ওকে যেন কিছু বলা না হয়। ওর যত দিন ইচ্ছে পড়ে যাক।

কয়েক দিনই একটা ছোকরা এসে রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—এ দেখ, এ ছেলোটা আমার বাড়ীর পাশে কেবল ঘুরে ঘুরে আসে, তাকার ঝিদের উপর। রামেন্দ্র বাবু একটু চেয়ে থেক বললেন স্ত্রীকে—হয় তো আমাদেরকে বলতে পারে না, তাই ঝিদের দিকে চেয়ে থাকে। হ্যা! তুমি কি না! ছুঁড়ি ঝি, তাদের দিকে চাইবে না?

একথা শুনেই ডাকলেন ছেলেটিকে। কী নাম তোমার? আমার নাম হুজুর—ব্রহ্মেন্দ্রনাথ বোথ। আমাদেরকে হুজুর হুজুর বলতে নাই। কী বলে ডাকবে তাহলে? কেন সার বলবে। এই দিকে ঘোরা-ফেরা করো, কী দরকার বলো? আমি সার একটু লেখাপড়া শিখেছি কিন্তু কোন কাজ জুটতে পারাচেন। চাখের কাজও শিখিনি। এখন আমি অনাহারে আছি সার! একটা কাজের জগে সার আপনার কাছে ঘোরা-ফেরা করছি। আপনি অতি মহৎ লোক বলে। এই পথান্ত বলে সেই ছোকরা কানতে লাগলো রামেন্দ্র বাবুর পায়ের উপর পড়ে।

অতীত দুঃখে রামেন্দ্র বাবু বললেন স্ত্রীকে, দেখ গো দেশের অবস্থা। আমার কাছে এসেছ খাবার সংস্থানে? আমি এক জন শিক্ষক দরিদ্র মাননীয় আমার দ্বারা কী কাজ হবে? তবুও পা ছাড়তে চায় না। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—তুমি পা ছাড়ো। তোমার একটা ব্যবস্থা করবে। তুমি এখন খাওয়া যাও বাড়ীর ভিতরে।

ইন্দুপ্রভা তখন মুন্সিলে পড়লেন। একে কেনা চাল, তাতে কলকাতার মত জায়গা—হ্যাঁ গা! দিনের পর দিন যে ছেলোটা খেয়েই চলেছে, একটা ব্যবস্থা কর। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন স্ত্রীকে তুমি রাজার মেয়ে নও? একটা ছেলের খাওয়া দেখচো।

আমাদের বাবার বাড়ীতে যে নিজের জমির চাল। কথা শেষ না হতেই স্বামী বললেন—এখানে যে আমার রক্ত জল করা চাল। এই চালই খাওয়াতে হবে।

এক দিন কিছু খরচ দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আরও পড়গে। আর কিছু দিন পড়ার পর আবার তাঁকে এসে বললো, আমার একটা চাকরীর বোগাড় দেখে দিন সার! তখন রবীন্দ্রনাথকে লিখে শিলাইদহে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিলেন।

পুজোর ছুটিতে রামেন্দ্রচন্দ্র বাড়ী গিয়েছেন। এমন সময় ধনা বাউরী এসে ধরলো, আমার ছেলেপুলে নাই হুজুর! কাপড়-চোপড় একেবারে নাই। পুজোর ক’দিন কেউ কাজ দেবে না। আমি খাওয়া অভাবে মরে যাবো হুজুর! এ স্বর তাঁর মত বিধ্বলো রামেন্দ্রচন্দ্রের কানে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ধনা কাকা! দেখি কী করতে পারি।

‘তখনই বের হলেন রামেন্দ্র বাবু ভিক্ষার ঝুলি হাতে। অজস্র কাপড় ও কয়েক মণ চাউল বোগাড় হলো। তখন তিনি বস্ত্র বিতরণ ক’লে জেমোতে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এর কাজ ছিল পুজোর সময় কেউ যেন জেমো অঞ্চলে অনাহারে না থাকে। কেউ যেন কাপড় না পাওয়া হয়। যত গরীবই হোক না সে।

গরীব দুঃখী ও বয়সে বড় হলে একটা সম্বন্ধ ধরে ডাকতেন রামেন্দ্র বাবু। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এ যে আমার মা-বাবার শিক্ষা।

বীরভূম জেলার মহম্মদ ইসমাইল বাবু রামেন্দ্র বাবু একজন ছাত্র। লগুন কিডস সহরে অর্থের অভাবে খুবই বিপন্ন হয়ে রামেন্দ্র বাবুকে একখান চিঠি দিলেন। পর পেয়েই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্ত্রীর কাছে থেকে হাওলাত নিয়ে তিন শত টাকা পাঠালেন। সেই টাকা পেয়ে মহম্মদ ইসমাইল রামেন্দ্রচন্দ্রকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি দিলাম।

My Dear Gurudev !

With proper regards I acknowledge the receipt of kind aid of Rupees 300/- it has come to me in time of need. Had it been a week latter, I would have been in most disgraceful condition. I left unpaid, the cost of apparatus of other laboratory, expenses for the last session of the College closes next saturday altogether till the middle of September. It is needless to mention that I owe you life-long debt, you are good enough to say that I owe you no thanks, but it is beyond me to thank you sufficiently for the kindness shown to me. I shall then reverence you as my Guru of one who is like my own father. \* \* \*

I remain Sir,  
Your ever grateful pupil,  
Sd/ M. Ismail.

কেও কোন কাজের জ্ঞান রামেন্দ্র বাবুর কাছে এসেই হয়। তিনি সার্টিফিকেট দিয়েই আছেন। কেও যে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেই বলতেন—আমার দ্বারা যদি একটা লোকেরও উপকার হয়।

ঐ ধারা জ্ঞানী লোক রামেন্দ্রস্বামীর একটু যদি নিজের সম্বন্ধে হুঁস আছে! কেও না ডাকলে খাওয়া-নাওয়া নাই। কেও জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—ক! তোমরা ত কেও বলো নাই মানের জ্ঞান? স্ত্রী ইন্দুপ্রভা বলতেন রেতের সুরে—কে অত বড় মানুষকে বলবে বার বার। তোমার কী প্রয়োজন থাকে না দ্বান-আহারে? হেসে বলতেন—এটা যে তোমাদের নিত্যকর্মের মত আমাকে নাওয়া-খাওয়ান। সেট জ্ঞান এ ভাবনাটা তোমাদের উপর ছেড়ে রেখেছি। আহা! না হয় তাই ছেড়ে দিলে। রাস্তা দেখে চল না কেন? আমরা কী তখনও তোমাকে ধরে নিয়ে যাবো? কত বার রাস্তার পা মচকায় বল দেখি। কী হাসির কথা! সেদিন এক জন মহিলা তোমাকে ধরে আনলে, দেখেছো কী তাকে?

আনলেন বটে, আমি তাঁকে দেখিনি।—তুমি কী লক্ষণ, কখন কোন মেয়েছিলেন মুখ দেখো না। হাসতে লাগলেন রামেন্দ্র বাবু। স্ত্রী বললেন সেদিন পাশের বাড়ীর বন্ধুকে দেখাতে চাইলাম তুমি মুখ ফিরিয়ে বসলে। যখন তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলাম তোমার তখন চোখ বুজলে। দেখলে কী তোমার মনুষ্য খোওয়া যেতো, না তোমার ছাত্রের জ্ঞানতে পারতো। ঠিক করে বলতে হবে! তখন রামেন্দ্র বাবুর হাসিতে ভরা মুখ, কথা নাই মুখে, এক দিন সকলে মিলে পরামর্শ করলো—আজ আমার মরণ দান এসেছেন ঠিক শুদ্ধ নিয়ে থিয়েটারে যেতে হবে। দাদার কথা কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ প্রস্তাব করতে গিয়েই শুনলেন—তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলো না মধ্যম ভঙ্গুর! আমি সেতে পবরো না।—রাম বাবু! ওঁতেও অনেক জ্ঞানের কথা আছে, তোমাকে সেতে হবে, চল। আর কথা না বাড়িয়ে হাসতে লাগলেন রামেন্দ্র বাবু।—তোমার ঐ হাসিকে বড় ভয় করে রাম বাবু! তুমি না তসে একটু অনুমতি দাও। তখনও সেই হাসি। তখন পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। জোরের সাথে বললেন, তোমার কেবল ভয় ছাত্রের দেখবে বলে। ভয় করতে হবে না চল চল।

তখন মুখ খুললো রামেন্দ্র বাবুর, তুমি ঠিকই কথা বলেছো। ঐ ধারা ভয় আছে বলেই ত আমাদেরকে মানুষ্য হতে হয়।

যখন রামেন্দ্র বাবুর কণ্ঠা মারা গেছে তখন তিনি সদর ঘরে বসে আকাশ-পাতাল কী ভাবছেন। ভাই দুর্গাদাস ঘুমিয়ে পড়েছেন, মুখ ঢাকা দিয়ে, তাঁরই পাশে। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, তুমি নাকি খুব কাতর হয়েছো কণ্ঠার যাওয়াতে? মুখ না তুলতেই হুঁচকার কোঁটা চোখের জল পড়লো রামেন্দ্র বাবুর। সে কথা বারিয়ে নিয়ে বললেন সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, শুনে রুগেছেন কে মুখ ঢাকা দিয়ে?

শুনই বললেন, ও আমার ভাই দুর্গাদাস; না না ও আমার বাবা, আমার বন্ধু। আমাকে দেখতে না পেলে ও ভেবে আকুল হয়। এই যে আমার চোখের জল পড়লো, ও ভাই আমার জেগে থাকলে মুছিয়ে নিতো নিজের কাপড় দিয়ে। এই যে আমার কণ্ঠা মরার ভাগ নিয়ে আমাকে কাঁদতে দেয় না! ও ভাই আমার অন্ধের বউ, এই অপটু দেখে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সুরেন্দ্র বাবু খামিয়ে দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বুকে গেলেন রামেন্দ্র বাবুর কী ধারা ভাতুপ্রেম!

রামেন্দ্র বাবুরা তিন ভাই। এক জন খুঁড়তুলো ভাই ছিলেন। কেও কোন দিন বুকেতে পারেনি নীলকমল বাবু রামেন্দ্র বাবুর নিজের সহোদর ভাই নন।

নতুন বাড়ীর পাশেই আছে ধর্মরাজতলা, সেখানে আনিয়েছেন নীলকমল বাবু শ্রীশ্রীসাধু-বাবাকে। তাঁর প্রধান আশ্রম মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণখণ্ড গ্রামে। এতো প্রবল তাঁর মাহাত্ম্য যে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে থাকতোই। নানা মহাপ্রদেহ শুনতো। তাঁর এতো গুণ যে কয়েকটা জেলার লোক তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না।

তখন রামেন্দ্র বাবু বাড়ীতে আছেন। তাঁর কাছে স্থধী সঙ্কলন আমার বিরাম নাই। তিনি তখনই হয়ে থাকেন নিজের অধ্যয়নে। কে বলবে তাঁকে নিজের তপস্যা ছেড়ে সাধু-মহাত্ম্যর কাছে যেতে? ভাই নীলকমলের খুব ইচ্ছা—দাদা এক বার আসেন সাধু-বাবার কাছে। তা হলে আরও প্রকট হন জ্ঞানগম্ভীর সাধু-বাবা। নিজে সাহস করে বলতে পারেন না। ধরলেন তাঁর বৌদিকে। ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন—ভাই! তোমার দাদা ত সাধুদেরকে দেখতে পারেন না, কী বলবো ভাই!

এক বার দেখা করতেই হবে বৌদি! আপনার পায়ে ধরে বলছি। কী আর করেন। বড়বাবুকে ধরলেন তাঁর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা—হ্যাঁ গা শুনছো। সাধু-বাবা এসেছেন তোমাদের বাড়ীতে একরকম, তাঁর সাথে এখনও দেখা করোনি?

ওর জ্ঞান ত আমার ভাই-ই রয়েছে। আমার আমি কেন?—তুমি গেলে ত কোন অপরাধ হবে না। তুমিই যাও না একবার?

কেন—আমার ভাই কী তোমাকে ওকালতি দিয়েছে?

—যদি বলেই থাকে, এমন অগাধ কি করেছে?

—আমি যেতে রাজি আছি। তুমি যদি কয়েকটা কথার জবাব দাও।

বল, আমি ঠিক বলবো।

আচ্ছা সাধু-বাবা হাত দেখেন নাকি?

না।

উনি মাছলী দেন কি না?

না।

তবে আমি যেতে রাজি আছি; নীলকমলকে খবর দাও। নীল বাবুর খুশী হবে না সংবাদ পেয়ে। সাধু-বাবাকে বলে একটা সময় স্থির করা হলো। যথাসময়ে রামেন্দ্র বাবু এসে উপস্থিত হলেন। জেমো কান্দীর লোকে আসতে সেদিন বাকী ছিল না।

ধর্মভগ্নার ঘরে ঢুকলে বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেও ঢুকতে পেলো না। রামেন্দ্র বাবু গিয়েই প্রশ্নাম করে প্রশ্ন করলেন—বাবা! আপনি কী হাত দেখেন না?

ঈশ্বর তসে বললেন—দেখি বাবা! এ বিজ্ঞে আমি আয়ত্ত করেছিলাম কি না।

—এ বিজ্ঞা কী আপনি সম্পূর্ণ আছে, বিশ্বাস করেন?

—শিখেছি মাত্র। ও-সব চর্চা করি নাই।

—আপনি কি পয়সা নেন লোক এলে?



—আমি নিজে টাকা-পয়সা ছুঁই না। কেও ইচ্ছা করে দিলে ফিরিয়ে দিই না।

—কী করেন ?

—আশ্রম-খরচে ব্যয় হয়। সাধু-সঙ্গের সেবার লেগে যায়।

—আপনি কি গুণ দেন বাবা ?

—কবিরাজী অনেক দিন শিখেছিলাম, যদি কাজে লাগে আপনাদের। সেই জন্ত সেই মতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি।

—এতে আপনার কী উপকার হয় ?

তখন হেসে বললেন সাধু-বাবা—আমি যে অল্প গ্রহণ করছি আপনাদের। কিছু 'ত' সৈকল শোধ করা চাই।

রামেন্দ্রসুন্দর খুসী হয়ে বললেন—আপনি অকপটে সব বললেন, সেই জন্ত খুব আনন্দিত ছলাম।

সাধু-বাবা স্থির দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলেন রামেন্দ্রসুন্দরকে—আপনি কী সাধু-মোহান্তর উপর তত সজ্ঞান ?

—কে বললে আপনাকে ?

—কেন, আপনার অনেক লেখা থেকে দেখতে পাঠি, আপনি বলেছেন যেন সাধুদেরকে পলাতক। নিজের বঙ্কট না ব'য়ে এই ধারা আনন্দ করে।

হেসে রামেন্দ্র বাবু বললেন—বলেই যদি থাকি, 'ভুল করেছি কি ?' কিন্তু আমি বলি না রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে। তাঁদের এক শিষ্য 'ত' জগতের সামনে আমাদের ভারতকে তুলে ধরেছেন। এই আমি চাই, আপনাদের কাছে থেকে। যুগ্ম ভারতকে জাগিয়ে তুলুন। বৃণ্য জাতিভেদ প্রথা সমাজ থেকে মুছে ফেলে দিন। তা হলেই আমার ভারত আবার জেগে উঠবে। কৈ ! তা এ দেখতে পাঠি না ! প্রতি যুগে যুগে দেখে আসছি, একজন মহাপুরুষ এসে সমাজের যে কয় জন মাথা তাঁদেরকে নিজীব ক'রে চাপে বাচ্ছেন। আপনারা নাকি বলেন—আপনাদের মধ্যে রাজনীতির ঝড় নাই। সমাজ যে আপনাদের কাছে থেকেই শিখতে চান। এক দিন আসবে, সে দিনের আর বিলম্ব নাই, আপনাদের ভিতর হ'তে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, তিনি আমার পরাধীন ভাবতকে মুক্ত করবেন।

স্থির চোখে ব'সে ব'সে শুনলেন রামেন্দ্র বাবুর কথা। কথা উঠলেই বলতেন এমন তেজস্বী প্রশ্ন আমি এদেশে কাউকে দেখিনি। রামেন্দ্র বাবু একজন মহা তপস্বী।

বি. এ. পাশ করে এসেই রামেন্দ্রসুন্দর পিতামহের সব পুরাতন পুস্তক বার ক'রে পড়তে লাগলেন।

হু' মাস অধ্যয়ন ক'রে বুঝলেন, কী এতো দিন পড়লেন। আমাদের ঘরের বই পড়ে থাকতে এতো দিন ঝুটো কাচের কারবার করেই জীবন শেষ ক'রতে চলছি ! এই মনে হতেই একটা দিক্কার এলো মনে। তখন থেকেই বেদের দিকে দৃষ্টি পড়লো।

একটু বুঝে নেবেন বেদ, এমন পণ্ডিত নাই দেশে। তখন নিজ থেকে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে মনের মত উত্তর পান না। নিজের মনের কাছে ডেকে ডেকে প্রশ্ন করেন—আমাকে শিখিয়ে দাও দেব ! তোমার দিকে চেয়ে আছি ; তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি দেব ! তুমি কৃপা করো।

হয়তো কোন পিতৃপুরুষ কৃপা করে থাকবেন। তিনি ভাল ভাবে বেদ জেনে তখন লিপিতে আরম্ভ করলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

একদিন জাপানের এক পণ্ডিত এসে ভারতের সকল পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন—কার কাছে গেলে ভারতের আদি শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারবো ? সকলেই একবাক্যে কলেন—সে পণ্ডিত রামেন্দ্র-সুন্দর। তখন এলেন রামেন্দ্র বাবুর কাছে। এসেই অল্প পণ্ডিতদের বলার সাথে তাঁর সব মিলে গেল। দেখলেন এক জন জ্ঞানগম্ভীর মনোপ্রফুল্ল এক ঋষিকে।

কিমুরা সাহেব বললেন—আমি বেদবিজ্ঞা শিক্ষা করতে চাই।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমি নিজেই জানি না আপনাকে শেখাব কী ? কিছু দিন পর কিমুরা সাহেব এসে বসে রয়েছেন ; রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন—কী চাই সাহেব ? শ্রিত হেসে কিমুরা সাহেব বললেন—কিছু না, আপনাকে দেখতে এসেছি। এখানকার লোকের মন খারাপ হ'লে হিমালয় যায় দেখতে, তাই আমার আসা।

আপনার কী অসুখ হয়েছিল ? কিছু দিন দেখিনি।

—না হ'লে অটিন মাস আমার না আসা হয় ?

রামেন্দ্র বাবু বললেন—এবার আমি বেদ একটু একটু বুঝেছি, হয় তো আপনাকে বোঝাতে পারবো।

সেই আরম্ভ হ'লো বেদ পড়ান। শিষ্যের সাথে গুরুর আলোচনা। দিন নাই রাত্রি নাই, আলোচনার আর বিরাম নাই। কী মধুর আশ্বাদন বলার নাই।

কিমুরা বলে গেছেন—আমি ভারতের ঋষির সন্ধান করেছি। সাহেব একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর গুরুকে—আপনার এত রাগ কেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞার উপর ?

ভুল বুঝত তাহলে। বিজ্ঞার উপর আমার রাগ হতেই পারে না। তবে আমার দেশের শিক্ষা ওদের চেয়ে ঢের ভাল। এ বলাতে রাগ বুঝবেন না। আমার মত হাজার রামেন্দ্রসুন্দর হাজার হাজার বছর পরমায় নিয়ে এসে এ দেশের বিজ্ঞার কথা মাত্র শেষ করতে পারবে না। এ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। ভেবে পাই না, কী পণ্ডিত ছিলেন ঐ মুনি-ঋষিগণ।

মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রশ্নাম করলেন। তখন চোখে জল রামেন্দ্র বাবুর। বললেন—ওরা বলুক না কেন, ওদের জ্ঞানের সীমা নাই। আমি মাথা পেতে শুনবো। কিন্তু তুলনা করে এটা মৃত বলে বর্ণনা করতে গেলে শুনবো না।

[ ক্রমশঃ ]

“সমাজের মনোবজ্ঞন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মস্থিত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গলা দেশে আজ দ্রুত নয়। কাব্যের কুমুদ, বিজ্ঞানের চুবিকারি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাডা লাঠি, ইতিহাসের জাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এক ধর্মের জয়ঢাক—এই সব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।”

—প্রমথ চৌধুরী



ফুলের মত.  
আপনার লাবণ্য রেঙ্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেঙ্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল  
অর্থাৎ ডকের স্বাস্থ্যের রক্তে  
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা  
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে  
বিকশিত করে তুলবে।

**Rexona**  
BLENDED WITH CADYL

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান  
রেঙ্সোনা প্রোপাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত



## প্লোরেন্টাইন্

মোপাসাঁ

মেয়েদের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল; কারণ, ছেলেরদের মধ্যে আলোচনার এ ছাড়া আর কি বিষয় থাকতে পারে? আমাদের মধ্যে এক জন বলল: দাঁড়াও, এ-সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ঘটনা আমার মনে পড়ছে। এই বলে সে তার কাহিনী শুরু করল:

এক এক সময় এক রকমের করুণ ক্লান্তি এসে দেহ-মনকে ভাষণ ভাবে আক্রমণ করে। গতবছরে শীতের এক সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে চুপচাপ বসে আছি,—ঐ রকমের একটা অবসন্নতা এসে আমার জেপে ধরল। মনে হ'ল—এই নিকরুণ ক্লান্তির হাতে আত্মসমর্পণ করে এখানে বসে থাকলে, আমি হরত আত্মহত্যা করে মরব।

কোটটাকে গায়ে চাপিয়ে উদ্বেগজনক অবস্থায় তাই বেঁধে পড়লাম। বুলতানে নেমে এসে ঠাট্টে শুরু করলাম কাকেশুলোর পাণ দিয়ে। তখন বুঝি শুরু হয়েছে; তখন মুখলধারে অবস্থান করি, পথচারীরা একেবারে হস্তদস্ত হয়ে আশে-পাশে আশ্রয় নেবে। ও'ড়িও'ড়ি বুঝি অবিশ্রান্ত ভাবে নেমে এসে জামা-কাপড়ের উপর চক্চকে কঁটায় জমে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ঐ ঝিরঝিরে ধারায় পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন আর্দ্র হয়ে আসে। কাকেশুলোর জনসমাগম তখন নেই বললেই হয়।

এ সময়ে কি করা যায়, ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না। কয়েক ঘণ্টা কাটাবার মত একটা জ্বরগার খোঁজে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এই প্রথম অবিকার করলাম—স-সন্ধ্যায় সময় কাটাবার মত কোন জায়গা সারা পারাতে নেই। শেষে ঠিক করলাম—রূপোপজীবিনীদের ভিড়ের জন্তে যে থিয়েটারটা ব নাম আছে, সমুদ্রটা ওখানে কাটিয়ে আসব।

অত বড় থিয়েটার-হলে দর্শক খুব অল্পই। চেনে, বশন, চল-দাড়ির ছাঁট, টুপি, রঙ—এ সব দেখে ঐ সব দর্শকদের শ্রেণী নির্ধারণ করতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাংস প্রায় একটাও চোখে পড়ে না ওদের মধ্যে। আর, মেয়েগুলো জানাই ত, সেই একই রকমের—সাদাসিঁদে, ভেঙে-পড়া হুয়ে-আসা;—চলার ভঙ্গীটা দ্রুত আর কেন জানি না, একটা নিখুঁত ঘুণা ওদের চোখে-মুখে।

অবসর মৃতিগুলোকে দেখছিলাম,—মস্তণ, নাতিস্থল। মোটা-মোটা শরীরের সঙ্গে শীর্ণ চেহারাও চোখে পড়ে; ধর্মযাজকের ভাঁড়ামি সর্বদা, পাগুলো লম্বা-লম্বা, ঝাঁক। মনে হচ্ছিল,—চড়া দাম হৈকে শেষ অবধি বা' সস্তায় ওরা বিক্রয়, সেটুকুও পাওয়ার ব্যোগ্য ওদের একটারও নয়।

ঠান, ওদেরই মধ্যে একটু ভ্রমগোছের একটা ছোট চেহারা চোখে পড়ল। মেয়েটির বয়স অল্প নয়, তবে চেহারাটা সতেজ, খাপছাড়া, উগ্র। তাকে থামিয়ে, কিছু চিন্তা না করেই পাশবভঙ্গীতে রাত্রের জন্ত দর ঠিক করে ফেললাম। একা-একা ঘরে ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না; তাই ঐ সস্তাদেবের মেয়েটির সঙ্গেই বেছে নিলাম।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। ওর আন্তানী ছিল মার্টারপটের একটা মস্ত বড় বাড়ীতে। সিঁড়িতে গ্যাসের আলো তখন নিবে এসেছে। দিয়াশলাই-এর কাঠির আলোয় হেঁচট খেতে খেতে অস্বাচ্ছন্দ্য মনে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মেয়েটির অনুসরণ করছিলাম। সামনে থেকে তার পোষাকের খসখসানি কানে আসছিল।

পাঁচতলার এসে মেয়েটি থামল। ভিতরের দরজাটা বন্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি কাল অবধি থাকতে চাও?

নিশ্চয়ই; সেই রকমই ত কথাবার্তা হয়েছিল।

না, কিছু মনে কর না, আমি এমনি জানতে চাইছিলাম। একটু দাঁড়াও, আমি একুণি আসছি।

আমাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! হুঁটো দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এল। মনে হ'ল, কার সঙ্গে যেন সে কথা বলছে। আমি একটু বিশ্রিত, বিচলিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম—তবু দেখিয়ে টাকা আদায়ের তালে আছে না কি মেয়েটি? মুঠো আর পেনীগুলো আমার বেশ শক্তই ছিল। মনে মনে বললাম—দেখা যাক কি হয়।

কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা কিছু যেন খুব সতর্ক হয়ে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। তার পর, আর একটা দরজা খোলার শব্দ হল। মনে হ'ল, তখনও কিছু কথাবার্তা কানে আসছে; তবে গলার স্বরটা খুব নীচু।

মেয়েটি ফিরে এল; হাতে একটা জলস্ত বাতি। আমাকে বলল—এবার তুমি ভিতরে আসতে পার।

আত্মীয়তার সুরে বেশ আশ্চর্য হয়েই সে কথাগুলো বলল। আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটা খাবার ঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটা কামরায় পৌঁছলাম। খাবার ঘরটা দেখেই বোঝা যায়, ওখানে খাওয়া-দাওয়া কোন কালেই হয় না। যে ঘরে প্রবেশ করলাম, সেটা এ-রকম মেয়েদের সচরাচর যে-রকম ঘর হয়ে থাকে সেই গোত্রেরই। আসবাবপত্র আছে কিছু, পর্দাগুলো সব লাল; সিঁকের নরম তোষক পাতা—ওপরে সন্দেহজনক কতকগুলো লাললাল দাগ।

মেয়েটি আমার সহজ হয়ে বসতে অনুমতি করল।

সন্দেহের চোখে ঘরটাকে আমি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। অবশ্য, সন্দেহ হবার মত কিছু চোখে পড়ছিল না। মেয়েটি খুব দ্রুত পোষাক খুলে ফেলল। আমি ওভারকোটটা খোলার আগেই দেখি—সে বিছানার চুকে পড়ছে। তার পর সে হাসতে হাসতে বলল—

কি, তোমার আবার কি হল? এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলে কেন? এস, দেয়া কর না।

মেয়েটির দেখানো ওর পাশে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক পরেই কেমন একটা বোকাখি মাথার চাপল; মনে হ'ল—পাখাক পরে এখনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর সেই ভয়ঙ্কর অবসন্নতা আবার আমায় চেপে ধরল। নড়াচড়ার সব শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। নিদারুণ একটা বিরক্তি সত্ত্বেও ঐ পাঁচ জনের ব্যবহার করা বিছানার উপর চূপচাপ শুয়ে রইলাম। থিয়েটার-হলের আলোতে যে কামনার উদ্বেগ হয়েছিল, সেটা যেন হঠাৎ আমার মধ্যে থেকে উবে গেল। দেখলাম, গায়ে-গায়ে শুয়ে আছি। আর পাঁচটারই মত একটা নীচুস্তরের মেয়ের সঙ্গে। তার উদাসীন অভ্যস্ত চুপনে অসুভব করলাম বিশ্রী বিষাদ।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এখানে তুমি কত দিন হ'ল এসেছ?

এই পনেরই জানুয়ারীতে ছ'মাস হবে।

এর আগে তুমি কোথায় ছিলে?

রুজ্জি জ্বীটে। কিন্তু দারওয়ানটা এমন শিছনে লাগল যে ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হ'লাম। এই বলে, তাকে নিয়ে রক্ষীট কি কেল্লাদারী করেছিল, তার একটা মস্ত কাহিনী কৈদে বসল মেয়েটি।

হঠাৎ কান্দেই কি যেন একটা নড়ছে গুনতে পেলাম। প্রথমে মনে হল, কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল, তার পর আস্তে একটা শব্দ গুনলাম। কিন্তু পরিকার কানে এল—কেউ যেন চোয়ার থেকে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসে মেয়েটিকে জোর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম: ও কিসের শব্দ?

শান্ত, অবিচলিত গলায় মেয়েটি বলল—মিছেমিছি তুমি উদ্ভিন্ন হচ্ছ। শব্দটা আসছে আমার প্রতিবেশিনীর ঘর থেকে। চুটো ঘরের মধ্যখানে ময়লা পিন্‌বোর্ডের বাস্ক দিয়ে পাতলা দেওয়াল তোলা হয়েছে। তাই ও-ঘরে শব্দ হ'লে মনে হয় যেন এ-ঘরেতেই কিছু একটা হয়েছে।

আলসেমিটা এমন জোর করে চেপে ধরল যে, বিছানার মধ্যে আবার ঢুকে পড়লাম। কথাবার্তা আবার শুরু হ'ল। এই মেয়েগুলোর সম্পর্কে স্বভাবতই একটু কৌতূহল হয়। কবে যে তারা প্রথম হুঁসাহস করেছিল এই পথে নেমে আসতে! হয়ত, ওদের প্রথম অপরাধের উপর থেকে পর্দাটাকে সরাসরি পারলে অকলঙ্কের অস্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়তেও পারে। হয়ত, নিতান্ত সরলতায় বিগত দিনের লজ্জার ইতিহাস যখন ওরা দ্রুত বলে চলে, তখন ওদের মধ্যেও ভালবাসার মত কিছু চোখে পড়ে যেতেও পারে। এই কৌতূহলের বশেই মেয়েটিকে তাব প্রথম প্রেমিকের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি জানতাম—সে মিথ্যে বলবে। তাই ত'ই বা কি আসে যায়? সব মিথ্যেও কিছু মত্বশর্পী, সত্যি ঘটনাও ত' আবিষ্কার করতে পারি!

মেয়েটিকে বললাম—কই, বললে না তোমার প্রথম প্রেমিক কে ছিল?

লোকটি ছিল একজন দাঁড়িমাখি।

তাই না কি? বল, তার পর কি হ'ল? তুমি তখন থাকতে কোথায়?

আজ্ঞে তখন-এ।

সেখানে কি করতে?

একটা রেস্টোরাঁ'য় কি-গিরি করতাম।

ফ্রেস ওয়াটার সেলরস-এ; চেন না কি তুমি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি; সেই বোনাফাঁয়ের রেস্টোরাঁ' ত'?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।

তা ঐ দাঁড়িমাখিটা তার কাজ গোছাল কি করে?

ওর বিছানা পেতে দিচ্ছিলাম, এমন সময় আমার উপর জবরদস্তি করলে।

হঠাৎ আমার এক বন্ধুর জানা-শুনা এক ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে প্রার্থনা ছিল, আর মেজাজটা ছিল দার্শনিকের। কাজ করতেন একটা বড় হাসপাতালে। কুমারী নায়েদের, আর বারবানিতাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে ছিল দৈনন্দিন। ভবন্বরে, পয়সাওয়াল পুরুষগুলোর হাতে হতভাগা মেয়েগুলো কেমন করে কদর্য শিকার হয়ে ধরা পড়ত,—সে কাহিনী তিনি ভাল করেই জানতেন।

সব ক্ষেত্রেই দেখেছি, ডাক্তার বলতেন, সমগোত্রীয় পুরুষের হাতেই মেয়েদের বিপদ ঘটেছে। এ-সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। নিরপরাধকে দোষস্থি করার অভিযোগে সব সময়ই ধনীদের অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

এটা কিন্তু সত্যি নয়। পুষ্প আহরণ করার প্রবৃত্তি ধনীদের আছে সন্দেহ নেই, তবে সে অনাব্রাত পুষ্প নয়।

আমার সঙ্গিনীর দিকে তাকালাম। হাসতে হাসতে বললাম—বুঝতেই পার, তোমার কাহিনী আমার সবই জানা। তুমি ডাঁড়াছ, দাঁড়িমাখিটা মোটেই তোমার প্রথম প্রেমিক নয়।

না, না, আমি সত্যি বলছি, শপথ করে বলছি।

তোমার কথা সব মিথ্যে।

তুমি বিশ্বাস করছ না; কিন্তু আমি শপথ করছি, আমি সত্যি বলছি।

না, তোমার মিথ্যে কথা রাখ; সত্যি ঘটনাটা কি আমার বলবে?

মেয়েটি যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত, বিস্মিত হয়ে পড়ল। আমি আবার শুরু করলাম—শোন তে, আমি এক জন যাহুকর; সন্ধ্যাহীন বিজ্ঞাও আমার জানা আছে। সত্যিটা লুকোবার চেষ্টা করলে, তোমায় এখনি ঘন পাড়িয়ে ফেলব; তার পর, আসল সত্যিটা সহজেই বেরিয়ে আসবে।

ও-জাতের মেয়েরা যেমন করে থাকে,—মোট ভীত, বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার পর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলল—তুমি কি করে সব বুঝতে পারলে?

উত্তরে বললাম—এবার তোমার সত্যি কথাটা শুরু কর।

আবার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইছ? সেটা তেমন কিছুই নয়। গাঁয়েতে সে বার কি একটা উৎসব ছিল। আলেকজান্ডার বলে এক খানসামা এসেছিল। এসেই লোকটা বাড়ীর মাথা হয়ে উঠল। বাড়ীর সবাইকে, এমন কি কল্‌টাকট্রাকে অবাধি সে লুকুম

করতে শুরু করল; যেন একটা রাজা-টাজা গোহর কেউ হবে। লোকটার বিরাট, স্তম্ভী চেহারা ছিল; আর, উনোনের কাছে তাকে পাওয়াই যেত না। সব-সবুই তার চিংকার শোনা যেত—কই হে, এদিকে কিছু রাখন, ডিম, একটু ভাল মটর দাঁও? বা' চাইবে সব তাকে চটপট দিতে হবে, তা' নইলে রাগ কি! এমন সমস্ত কথা শোনাতে যে লজ্জায় তুমি অধোবদন হয়ে যাবে।

দিনের কাজ শেষ হ'লে, দরজার সামনে বসে লোকটা পাইপ টানত। হাতে একগাদা খালাবাসন নিয়ে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলান দেখে সে বললে—ওহে সন্দ্বি, সল না, লেকের ধারটা ঘুরে আসি; বলি, গ্রামটা এক বার আমার ঘুরিয়ে দেখালে পারতে ত?—এই কথার বোকার মত তার সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। আর লেকের ধার অবধি পৌছতে না পৌছতে আমি কিছু বোঝার আগেই সে আমাকে বশীভূত করে ফেলল। তার পর নটার গাড়ীতে লোকটা চলে গেল। সেই থেকে তাকে আর দেখিনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কাহিনী শেষ হ'ল নাকি?

থতমত গেয়ে মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, আর একটা কথা,—এ লোকটাই ফ্লোরেনটাইনের পিতা।

ফ্লোরেনটাইন আবার কে?

ওটা আমার ছোট্ট ছেলের নাম।

ও, তা বেশ বেশ! তুমি নিশ্চয়ই দাঁড়িমারিটিকে বুঝিয়েছিলে যে সেই তোমার ছেলের পিতা?

হ্যাঁ, বুঝিয়েছিলাম।

টাকাকড়ি ছিল দাঁড়িমারিটার?

ছিল। আর, ফ্লোরেনটাইনের ভরণ-পোষণের জন্য আমার তিনশ' ফ্রাঙ্ক আয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে আমার বেশ মজা লাগছিল। তাকে বললাম—বেশ বলেছ, তে সন্দ্বি; যতটা মনে হয় ততটা কামুক তোমরা ঠিক নও। তা, এখন ফ্লোরেনটাইনের বয়স কত হ'ল?

বার বছর। এই বয়সেই ওকে গিঞ্জিয় নিয়ে যাব।

তা মন্দ নয়। তাহ'লে, সেই থেকে তুমি তোমার বিবেকের সঙ্গে বেসাতি করে আসছ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল—এ ছাড়া আর কি করতে পারি?

হঠাৎ ঘরের এক পাশে জোরে কি একটা শব্দ হ'ল। বিছানা ছেড়ে এক লাফে আমি উঠে পড়লাম। শব্দ শুনে মনে হ'ল—কিছু যেন এফটা পড়ে গিয়ে ওটার চেষ্টা করছে; দেওয়ালের উপর

হাতডানির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বাতিটাকে তখন আমি ধরে ফেলেছি। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আশে-পাশে তাকাতে লাগলাম। মেয়েটি উঠে পড়ে আমার নিরস্ত করার চেষ্টা করে বলল—লম্বীটি, শোন, ও কিছু নয়।

কিন্তু আমি তখন আবিষ্কার করে ফেলেছি, দেওয়ালের কোন দিক থেকে শব্দটা এসেছে। বিছানার মাথার দিকে একটা লুকোন দরজা। এক ঘটিকায় সোজা সেটাকে খুলে ফেললাম। চোখে পড়ল, হতভাগ্য একটা ছোট্ট ছেলের মূর্তি। ছেলেটি তখন কাঁপছে; ভীতি-বিহ্বল চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। রুগ্ন, পাণ্ডুর একটা ছোট্ট চেহারা;—পাশেই খড়-বোঝাই একটা মস্ত চেয়ার; বোধ হয় ওর উপর থেকেই মাটিতে সে পড়ে গিয়েছিল।

আমায় দেখে মায়ের দিকে হাত দু'টি এগিয়ে দিয়ে ছেলেটি কাঁদতে শুরু করল:—সত্যি বলছি মা, আমি কোন দোষ করি নি। ঘুমতে ঘুমতে কখন আমি পড়ে গিয়েছি। আমার বক্বে না ত' তুমি? সত্যি বলছি মা, আমি ইচ্ছে করে কিছু করি নি।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ও কি বলতে চাইছে?

মেয়েটি ভীত, বিব্রত হসে পড়ল। শেষে ভাস্কাগলায় বলল: কি আর বলব বল? ছেলেকে ইস্কুলে দেবার মত পরসারোজগার করতে পারি না। তবুও ত ওকে দেখা দরকার; আলাদা একটা ঘরভাড়া করব তাও পেরে উঠি না। যখন ঘরে কেউ না থাকে তখন ও আমার পাশেই ঘুমতে পায়। আর, কেউ ঘটা কয়েকের জন্তো এলে, ও এই খুপারির মধ্যে চুপচাপ ভালই থাকে। কি করে থাকে, অবশ্য, ও ভালই জানে। আর তোমার মত সারা রাত্রি কেউ থাকতে চাইলে, চেয়ারের উপর সারান্ধ্র ঘুমবার ফলে পেশীগুলো ওর শিথিল হয়ে পড়ে। এর জন্তো ওকেই বা দোষ দিই কি করে? আমার দেখতে ইচ্ছে করে—তোমাকে যদি সারা রাত্রি ঐরকম একটা চেয়ারে ঘুমতে দেওয়া হয়;—দেখতাম, তাহ'লে তোমার গলায় কেমন গান আসত!

মেয়েটি বেগে ঝলে উঠে কাঁদতে লাগল।

শিঙটিও কাঁদল। হতভাগ্য ছেলেটির ভীত চেহারাটা দেখে মায়ী হচ্ছিল। এই অন্ধ, আলোবাতাসহীন খুপারিতে ওর জীবন কাটে! শূন্য বিছানার যেটুকু উত্তাপ মুহূর্তের জন্তো ওর কপালে মাঝে মাঝে জোটে, সেটুকুও জন্তোও সে কত লালসিত!

আমার চোখেও বোধ হয় জল এসে গেল। বাড়ী ফিরে এসে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

অনুবাদিকা—কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য।

“আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাতে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।”

—রবীন্দ্রনাথ





টেক তো টেক  
নট টেক নট টেক...

কোলকাতার নিউ মার্কেট, বাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেলে মাঝরাতেও বাঘের ছু পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্ত তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্ত হাত নেড়ে বলেন “টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি” অর্থাৎ জিনিষ কিছুন বা না কিছুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্তে দোকানে গিয়ে শেষে ঘটনাক্রমে পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেকরতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্নের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিতাই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরনের খদ্দের স্মাছেন যারা নতুন ধরনের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরনের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিকতেও পারে না কারণ খদ্দের

বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে বাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরাজীতে একে বলা হয় ওয়াটার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। বি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটি বি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবদময় পাওয়া মুশ্কিল। তাই রোজকার জন্ত নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়, যা ভাল থিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্তে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়! নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি কিছুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।



## আনাতোল ফ্রান্স

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কথা। ওল্যারি-এর সিনেটোরের (মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী) একমাত্র তরুণ পুত্র অঁজুরিওস্তা ফোলাস্তিকা নামে এক তরুণীকে বিয়ে করতে চাইল। সে-ও তারই মত সিনেটোরের একমাত্র মেয়ে। তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের উৎসবের পর অঁজুরিওস্তা তাকে বাড়ীতে নিয়ে এল এবং একই শয্যায় শুয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু দুঃখে মেয়েটি দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে অঝোৰ ধারায় বঁদতে শুরু করল।

—তোমার দুঃখের কারণ কি? বল আমায়, মিনতি করছি।

সে নীরব হয়ে থাকলে অঁজুরিওস্তা বললে—আমি ভগবানের পুত্র খৃষ্টের নামে তোমার কাছে মিনতি করছি, তোমার দুঃখের কাহিনী সব আমার খুলে বল।

ফোলাস্তিকা মুখ ফিরিয়ে চাইল। যে গভীর দুঃখে আমার অন্তর পূর্ণ, সমস্ত জীবন ভরে চোখের জল ফেলেও তা দূর হবে না। আমি এই ক্ষণে দৈব পবিত্র রাখতে এবং আমার কৃমানীত্বকে খৃষ্টের কাছে নিবেদন করব বলে স্থির করেছিলাম। হায়! দুর্ভাগ্য আমার! তিনি আমায় এমন ভাবে পরিত্যাগ করলেন যে আমি বা চেয়েছিলাম তা করতে পাবলাম না। হায়! জীবনে কেন প্রভাত এসেছিল? স্বর্গের পতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নন্দন কানন আমার উপহার দেবেন তাঁব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি মরণশীল মানুষের পত্নী হয়েছি! যে শিরে আজ শোভা পেত অগ্নান গোলাপের মুকুট, সেখানে রয়েছে সাজান উকিয়ে-মাওয়া গোলাপ!

হায়! জীবনের প্রথম দিনটুকু কেন আমার শেষ দিন হল না? যদি এক কোঁটা দুখ খাবার আগেই আমি মারা যেতাম তাহলে সুখী হতাম। শ্রমহীলা ধাত্রীরা আনন্দের শব্দধারটিকে কত চুপন করত। তুমি যখন তোমার হাত দু'টি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে তখন 'আমি' ভাবতে লাগলাম, পৃথিবী মুক্তির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হাত দু'টি কথা। বলা শেষ হয়ে গেলে সে অঝোৰ ধারায় বঁদতে শুরু করল।

তরুণ যুবকটি তাকে ধীরে বলতে লাগল—ফোলাস্তিকা, আমাদের বাপ-মা ওল্যারি-এর লোকদের ভেতর ধনী এবং উন্নত। আমরা তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁদের বংশ রক্ষা করতে এক বাতে তাঁদের মৃত্যুর পর ধন-সম্পত্তি অপর কোন বাইরের লোক না পায় এই ভয়ে তাঁরা আমাদের মিলন চেয়েছিলেন।

ফোলাস্তিকা জবাব দিল—পৃথিবী কিছুই নয়; ধন-সম্পত্তিও কিছু নয়। এমন কি জীবনও কিছুই নয়। বাঁচা অর্থই মৃত্যুর ভয় অপেক্ষা করা নয় কি? যারা চিরস্থখে আলোয় করে অবগাহন

এক দেবদূতের মত ভগবানকে পাওয়ার আনন্দ বার করে উপভোগ; বাঁচে শুধু তাই।

এই সময়ে করুণায় আত্ম হয়ে অঁজুরিওস্তা বললে—আহা! কি মধুর নির্মল বাণী। শান্ত জীবনের আলো আমার চোখে করছে বলমল।

ফোলাস্তিকা, তুমি যদি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চাও, আমি নির্মল হয়ে থাকব তোমারই পাশে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে চোখের জলের ভেতর হাসি ফুটিয়ে সে জবাব দিল—অঁজুরিওস্তা! মেয়েদের এই রকম কথা দেওয়া ছেলেদের পক্ষে শক্ত। কিন্তু তুমি যদি এমনি কর যাতে আমরা পৃথিবীর মলিনতাকে ছাড়িয়ে বাস করতে পারি, তাহলে আমার স্বামী এবং প্রভু যীশুখৃষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমায় যে উপহার দেবেন তার একটি অংশ তোমায় দেব।

সে হাত দিয়ে ক্রশ-চিহ্ন করে বলল—তোমার ইচ্ছাই আমি পালন করব। তারা পরস্পরের হাত ধরে শুয়ে পড়ল।

অতুলনীয় পবিত্রতা রক্ষা করে তারা একই শয্যায় শুতে লাগল। দশ বৎসর পরীক্ষার পর ফোলাস্তিকা মারা গেল।

তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী উৎসবের পোশাক পরিবে, মুখ অনাবৃত করে, স্তোত্র পাঠ করতে করতে তাকে গীর্জায় নিয়ে আসা হল। সমস্ত লোক তাকে অহুসরণ করল।

ফোলাস্তিকার কাছে নতজানু হয়ে অঁজুরিওস্তা এই বাণীটি উচ্চ করে বললে—প্রভু যীশু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই! তোমার সম্পদকে পবিত্র রাখবার শক্তি তুমিই আমায় দিয়েছিলে।

এই কথায় মৃত্যু তার মৃত্যুশয্যা থেকে উঠল এবং একটু হেসে ধীরে ধীরে বলল—বন্ধু! যা তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করেনি তা কেন বলছ? তার পরই সে আবার চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল।

অঁজুরিওস্তা ও শীগগিরই মৃত্যুকে অহুসরণ করল। "স্যা-আলির" গীর্জার ভেতর ফোলাস্তিকার কাছেই তাকে সমাহিত করা হল। প্রথম রাত্রেই যে-দিন তাকে সমাহিত করা হল সে-দিনই নিষাপ জীব সমাধি থেকে একটি অদ্ভুত গোলাপ গাছ গজিয়ে উঠল। গাছটি তার পুষ্পিত শাখা দিয়ে সমাধি ছটোকে জড়িয়ে রইল। পরদিন সবাই দেখল তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে গোলাপের শাখার দ্বারা। সুখী অঁজুরিওস্তা ও ফোলাস্তিকার এই পবিত্র চিহ্ন জানতে পেয়ে ওল্যারি-এর ধর্মবাক্যের সমাধি ছ'টিকে 'বিশ্বস্ততা'র চিহ্ন বলে সম্মান দিল।

"স্যা-আলির" এবং "নো-পাসিয়া" গীর্জা কর্তৃক খৃষ্টধর্মের প্রচার সম্বন্ধে এই দেশে কয়েক জন অধ্যয়ন পৌত্তলিক ছিল। তাদের ভেতর সিলভানু নামে একজন দেব-দেবীর ফোয়ারাগুলিকে ভক্তি করত। পুরোন গুপ্ত গোছের শাখায় ছবি টাঙ্গিয়ে রাখত এবং সূর্য এবং ফলপ্রদায়িনী দেবীদের প্রতীকস্বরূপ ছোট ছোট মাটির মূর্তি তার আন্তনের পাশে সাজিয়ে রেখেছিল। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে উদ্ভানের দেবতা তার উদ্ভান রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

বৃদ্ধ বয়সে সিলভানু কবিতা লিখত। সে গ্রাম্য এবং শোকের শক্ত ধরণের কবিতা লিখত। সে সুযোগ পেলে প্রাচীন চারণ-কবিতার শ্লোকগুলি স্মৃকোশলে নিজের কবিতার ভেতর ঢুকিয়ে দিত। জনতার সঙ্গে সে-ও খৃষ্টান দম্পত্যের সমাধিস্থান দেখতে গেল। সমাধির ভেতর থেকে যে গোলাপ গাছ ছ'টি উঠেছিল তাই দেখে সে

মুগ্ধ হল। সে ধার্মিক ছিল বলে এই স্বর্গীয় চিহ্নটি বুঝতে পারল।  
এই ব্যাপারটি তার দেবভাক্সের নির্দেশ বলে সে মনে করল এক তার  
একটুও সন্দেহ বইল না যে প্রেমের দেবতা এরো-র ইচ্ছাতেই গোলাপ  
ফুটে উঠেছে।

বেচারী স্কোলাস্তিকা! সে নিজের মনে বলতে লাগল, এখন  
শুধু ছায়া মাত্র—হারানো স্মৃতি এবং ভালোবাসার সময়ের জ্ঞান অনুতাপ  
কবছে। যে গোলাপ গাছ তার সমাধি থেকে উঠেছিল—তা যেন  
স্কোলাস্তিকার হয়ে আমাদের কাছে বলছে : যারা বেঁচে আছ তারা  
ভালোবাসো। সময় থাকতে জীবনের আনন্দকে উপভোগ করবার  
জ্ঞান এই কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয়।

সবল পৌত্তলিক ব্যাপারটা এই রকম মনে করল। এই বিষয়ে

সে একটা শোকের কবিতা লিখেছিল আমি তা 'তারাক'র সাধারণ  
পাঠাগারে একাদশ শতাব্দীর বাইবেলের মলাটের ওপর হঠাৎ পেয়ে  
বাই। তালিকায় লেগা ছিল—মিসেল সাল-সঙ্কলন—এফ, এন  
১৪৩১, ১৭১ বি। পণ্ডিত লোকদের যে মূল্যবান পাঠাটি এত দিন  
নজরে পড়েনি তাতে কম পক্ষে চুরাশীটি পংক্তি পরিচায়  
মেরোভিনজিয়ান হরফে লেখা ছিল—তারিখটা সম্ভবত ছিল সপ্তম  
শতাব্দীর। কবিতাটির শুরু এই ভাবে—

এখন করিছ শোক, চাহিছ ফিরিয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলে যা—  
এক শেষ এই ভাবে—'শ্রদ্ধাঞ্জলির বিবাদময় গানের মোরা জ্বাল  
বুনি।' পাঠোদ্ধার করার পরই সম্পূর্ণ কবিতাটি আমি নিশ্চয়ই  
প্রকাশ করব।

অনুবাদক—শ্রীশুবীরকান্ত গুপ্ত

## রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

একটি দোকানের মৎস্তাধার

পশ্চিমের রাজ্য বোধ চোখ রাঙাচ্ছে পথচারীকে  
খর গ্রীষ্মের পথ-স্বাস্থ্যকে।  
চলতে-চলতে চমকে উঠলুম পাশের দোকানের দিকে তাকিয়ে—  
চোখে ভেসে এল এক সমুদ্রের স্বপ্ন—দিবা-স্বপ্ন—  
হু-হাত কাচের বাস্কে বন্দিনী লাবণ্যের সুনীল প্রতিমা!  
( বিচিত্র কি বিচিত্র গম্ভীর ! )  
সমুদ্রকে বশ করেছে বহু-মিত্র এও কোং ! )

দোকানের সামনে ঝুলছে পুরানো পর্দা  
তার শত ছিদ্র দিয়ে গেলে পড়ছে পড়ন্ত রৌদ্র—  
হু-হাত কাচের আধারে মাছের গায়ে—  
পুচ্ছকে হাল করে পাখনার দাঁড় বেয়ে  
সানন্দে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে হু-হাত সমুদ্রে  
লাল মুড়ির প্রবাল-গুহার মধ্য দিয়ে—  
উঁচু আর নীচুতে এলো-মেলো পথে-পথে  
ঘাসের আর রঙিন গাছের অলি-গলি বেয়ে—  
চিকচিকিয়ে উঠছে যাদের গায়েব সোনা,  
পাখনার লাল আর রান্ধুসে চোখের নীল !  
( বিচিত্র কি বিচিত্র ! )

সমুদ্রকে বাধল শেষে বসন্ত এবং মিত্র ! )  
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অপরাহ্নের রৌদ্রে  
হঠাৎ পড়ল মেঘের ছায়া—  
দূরে উত্তরের কলের চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে গা মিলিয়ে  
উঠল কালো মেঘের ধোঁয়া—  
লিকলিকিয়ে উঠল বিদ্যুতের আঙুন।  
সে আঙনের প্রচণ্ড তাপে আকাশখানা ফেটে গেল বজ্রের গর্জনে।

শব্দে হাওয়া বয়ে গেল ছুরির মতন তীব্র  
ছড়িয়ে গেল গড়িয়ে গেল উম্মাদের মতন  
বিকট আবেগে—

তার পথ নামল বৃষ্টি—শিলাবৃষ্টি।  
বিদ্যুতের আঙুন পুড়ে যাওয়া আকাশের খণ্ড খণ্ড অস্থিকণা  
সে প্রচণ্ড অতর্কিত বজ্রের আক্রমণ থেকে বক্ষা পেতে  
উঠলুম 'দোকানের সিঁড়িতে সেই পুরানো পর্দার পিছনে,  
যেখানে হু-হাত সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে  
লাল-পুচ্ছের অগ্নিপাটের শাড়া লুটিয়ে মৎস্ত-কঙ্কারা—প্রবাল-দীপে  
ক্ষুদে ক্ষুদে তরুণদের স্থির অন্তরালে—অবিচলিত !  
( বিচিত্র কি বিচিত্র ! )  
সমুদ্রকে করল বাছ বসন্ত এবং মিত্র ! )

ঝড় উঠবে না কোনো দিন—কোনো দিন হু-হাতের ঐ সমুদ্রে  
উৎসল হবে না তার তরঙ্গ মেঘের গর্জনে,  
চাঁদ তারার দেশ থেকে নির্বাসিত ঐ সমুদ্রের আকাশে  
জ্যোৎস্নার আলোর মতন হুঁ আঁর ভোবের আলোর মতন রাজ্য !  
সেই স্বপ্নময় আলোর তলে  
ঘুরে বেড়াসে মাছেরা তাদের পাখনার ভর দিয়ে  
নিদ্রাতারা নিশীথের তরঙ্গিত চাপ্পল্যে  
বন্ধিন মুড়ির প্রবাল-গুহার অন্তরালে  
ক্ষুদে লাল-পা তার অলিগলির পথে-পথে বাতার দিয়ে  
আর জীবনের সকল বিক্ষোভের ছালায় বন্ধুসে যাওয়া  
সহরে মানুষদের পুড়ে যাওয়া মন—  
ঐ স্থির সমুদ্রের নীলাভ স্বপ্নের শৈত্যে—জুড়িয়ে যাবে  
হঠাৎ এক আঙন-ঝরা গ্রীষ্মের ঝড়-ওঠা অপরাহ্নে।

( বিচিত্র কি বিচিত্র হায় ! )

বসন্ত এক মিত্র শেষে অপসৃত্য হার মানিয়ে যায় ! )



### ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পার্কের বেঞ্চিটার বসবার মতলবে সজ্জিত এগিয়ে এলো। ক্লান্ত দুপুর। যাদের কাজ নেই তারা শুয়ে, বসে, গড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে। সজ্জিতের কাজ নেই, কিন্তু 'গড়িয়ে বেড়াবার সময় কোথায় তার ?

এত দুপুরেও সমস্ত বেঞ্চিতে মানুষ! কেউ ঠা করে ঘুমুচ্ছে অকাতরে। কেউ বসে বসেই চোখ বুজে বিশ্রাম-স্বপ্ন উপভোগ করছে। কেউ আধ-শোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে অতীতকে মনে মনে রোমন্থন করে চলেছে।

না, কোথাও বসার উপায় নেই! বিশ্রামের আশায় তার মত আরও এত লোক আসবে এই ছোট পার্কটার, সজ্জিত ভাবতে পারেনি।

পার্কটার চার দিক ঘরে অবশেষে ষ্টেশন কোণের বেঞ্চিটার চোগ পড়ল। আধখানা বেঞ্চি পালি। বাকি জায়গাটা এমন এক জনের দখলে যাকে এ সময় এখানে সে কল্পনা করতে পারেনি। এরও কি বিশ্রামের জায়গা মেলেনি কোথাও? তাবট মত গৃহহীন, লক্ষ্মীছাড়ার দলের তো নয় সে।

যাক, ভাববার প্রয়োজন নেই, এগিয়ে গেলো বেঞ্চির কাছে সজ্জিত। দূরে বিলিতি নাম-না-জানা গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সে। কাছে যেতেই উদাস দৃষ্টিতে এক বার তাকিয়ে দেখলো সজ্জিতকে। তার পর যেমন দূর তাকিয়ে ছিলো তেমনিই দূরে তাকিয়ে রইলো।

এক বার একটু ইতস্তত করে বেঞ্চিটার এক কোণে বসে পড়ল সে। বসবার সময় আড়চোখে এক বার তাকালো বেঞ্চিটার শেষ প্রান্তে। না, কোন সাড়া নেই। এক জন পুরুষ যাকে সে কোন দিন দেখেওনি, সে পাশে বসলেও সাড়া নেই মেয়েটির। সজ্জিতকে সে বোধ হয় আমল দিতেই চায় না।

তা না দিক। সজ্জিত বসলো জুত কোরে। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণের জ্ঞান নড়ে-চড়ে বসলো। শব্দ করলো কাশির ছলে। হিল-কয়ে-বাওয়া চটিটাকে বেঞ্চিটার লোহার পায়ায় খবে শব্দ করলো।

—কিছু বলবেন? মেয়েটা সজ্জিতের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো।

সজ্জিত হঠাৎ মেয়েটার প্রশ্নে খতমত খেয়ে গেল। বুকটা একটু কঁপে উঠল। এ রকম হবে, সে আশাও করেনি।

—ম-নাভো! অতি কষ্টে জবাব দিলো। যেন গলা দিয়ে স্বর বার হতে চাইছে না। কে গলাটা টিপে ধরছে তার।

—তবে শব্দ করছিলেন এমনি? এবারে যেন মেয়েটি তার মুখোমুখি ঘরে বসলো।

কোন রকমে ঢৌক গিলে জবাব দিলো—ঠা।

সজ্জিতের মুখের চেতারা দেখে মেয়েটি হেসে ফেললো। এবারে সজ্জিত আরও লজ্জায় পড়ল। মাথাটা হেঁট করে বসে বসে ঘামতে শুরু করল।

—দেখুন, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এটাই যৌবনের ধর্ম। হুঁজনে পাশাপাশি বসে আছি। হুঁজনে গল্প করে নিজেদের সমস্তাগুলো তুলে ধরতে পারি পরস্পরের স্তমুখে। পারি কি না, আপনিই বলুন!

—সমস্তা! কথাটা বলে এতক্ষণে সজ্জিত মেয়েটির মুখের দিকে সহজ ভাবে চেয়ে দেখলো। সাধারণ আর দশটা মেয়ের মত যে সে নয়, ওটা তার কথাতে সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে তার বুদ্ধির ও চিন্তার ছাপ কিছু বোঝা যায়নি তো! হুঁটো জিজ্ঞাসু চোখে কোন শাণিত দৌলতিও তো দেখা যায় না! বোকা-বোকা চাহনি বরং। মুখে ক্লাস্তির কালিমা। যেন অনেক ঝড় ঝাপটা তার সরল চিহ্ন মুখটাকে বার বার আঘাত করে অকালে বুড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

সজ্জিত চুপ করে থাকায় মেয়েটা আবার বললে—সমস্তা নেই আপনার জীবনে? সঙ্কোচের কি আছে বলুন? আলাপ-পরিচয় নেই এই তো? আলাপ-পরিচয় হতে কতক্ষণ লাগে বলুন?

সজ্জিত এর পরও বোকার মত তাকিয়েই রইলো। উপদ্ভাস সে অনেক পড়েছে। উপদ্ভাসের নায়িকাও প্রথম সাক্ষাতে এমন ভাবে কথা বলতে পারে না। অতি আধুনিক নায়িকাও নয়।—আমি তো দারুণ সমস্তায় পড়েছি। মেয়েটিই আবার কথা বললো।

এবারে সহজ হোয়ে এলো সজ্জিত। মেয়েটা প্রথম দিকটার নাটকীয় ভাবে কথা শুরু করলেও এবারে ঘরোয়া কথাবার্তার আসতে চায়। মন্দ কি! দেখা যাক কি তার সমস্তা।

মেয়েটার দিকে আবার তাকালো সজ্জিত। সমস্তার চিন্তার কচি মুখখানা আরও করুণ হোয়ে উঠছে তার।

ছোট ছেলের মত প্রশ্ন করলো সজ্জিত—কি সমস্তা?

মেয়েটা একটু সরে এলো তার দিকে। বললে, আমার নাম মল্লিকা। স্কুল ফাইনালে পাশ করার পর কলেজে পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দাদা আর পড়তে পারলেন না। তাই—

কথাটা শেষ না কোরেই ছেলেমানুষের মত আঁকারের সুরে বললে,—আপনারটা আগে বলুন। ব্যাটা ছেলেরটা আগে বলতে হয়।

কি বলবে সজ্জিত? তারই মত পাখ কার চাকরী খুঁজছে সে। সসারে মা-ভাই-বোন আছে। বাবা নেই। পাঁচটা প্রাণী তারই গলগ্রহ। এক জন আত্মীয়ের বাসায় থাকে, খায় আর তার ছেলে-মেয়ে পড়ায়। ও কাহিনী তো মল্লিকার কাছে বলা হবে না। শুরু করলেই বলবে ও তো জানি। ও সমস্তা তো চিরন্তন। আপাতত যে সমস্তা সেটাই সে জানতে চায়। ও সমস্তা তো একশো

জনের মধ্যে পঁচানব্বই জনের। ও কি বলতে হয়! ও তো তার চোখ-মুখের উদ্বেগ ও কান্দির ছাপে স্পষ্ট ফুটে উঠছে।

সুজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে মল্লিকা নড়েচড়ে বসল।  
বলল—কই বলুন?

—কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমতা আমতা করলো সুজিত।

—বলবার কিছুই নেই বোধ হয়? একটু হাসলো মেয়েটা।

—না, তা নয়। অনেক বলবার আছে কিন্তু কোনটা আগে আর কোনটা পরে বলব, তাই ভাবছি।

আগেগাটা আগে বলবেন। তবে দোহাই, সেই একঘেষে প্যানপ্যানিনি যেন না হয়। ভাইটার স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছে, মাইনে বাকী আছে বলে; মায়ের অন্তর কিছু ডাক্তার দেখাতে পারছি না। বোনটার বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না! বাবার আফিমের নেশা, সরকার আফিমের কোটা কমিয়ে দিয়েছে।

সুজিত এবারে আরও মুগ্ধিলে পড়লো। কি বলবে? জানতে চাইলো সমস্তার কথা। কিন্তু তা শুনতে রাজী নয়। তবে? বলবে কি প্রেমের কাহিনী? আজ পর্যন্ত কোন মেয়েই তার প্রেমে পড়েনি, এমন কি চেয়েও দেখেনি তার দিকে। সেই প্রথম মেয়ে যে তার স্মৃতি একা-একা এমন করে কথা বলছে এবং যার সম্বন্ধে কৌতূহল তার পুরোমাত্রায়।

সুজিত ভাবছে। মেয়েটাও নির্ধাক্। মাথার ওপরের গাছটা থেকে ছুটো লাল ফুল ঝরে পড়লো তাদের মাঝখানে কঁাকা বেশিটার ওপরে। হুঁজুনেই চমকে তাকালো ফুল ছুটির দিকে চেয়ে। তার পর মল্লিকা মুখ খুললো প্রথমে—কই বললেন না তো?

—আপনি বলুন, বেশ ভাল লাগবে। আমার ঠিক আসছে না।

মল্লিকা হুঁমিনিট ভেবে নিলো। তার পর পরিচিতার মত সুজিতের দিকে আরো সরে এসে স্বর করলো তার সমস্তার কথা। বললে—জানেন অভাব-অভিযোগ তো স্থায়ী সমস্তা, সে আপনি আমি আজই দূর করতে পারি না কিন্তু এই অভাবের মধ্যে যে অস্থায়ী শান্তি, ক্ষণেকের আনন্দ সেটা আমরা তো সৃষ্টি করতে পারি?

সুজিত এবারে বুঝতে না পেয়ে বোকার মত চেয়ে বইলো—এই ধরুন না, দুজনে এখন তো খানিকটা পরিচিত পরস্পরের মধ্যে। কোথাও বেড়িয়ে আসি। নয়তো হুঁজুনে একসঙ্গে একটু সিনেমা দেখি, নয়ত কোন রেইংরেটে গিয়ে বসে চা খাই আর গল্প করি। সুজিত বললে—বেশ তো! এ সমস্তার সমাধান এমন কিছু কঠিন নয়। আমি ভাবছিলাম—

—যর-সংসারের কথা—কথা কেড়ে নিয়ে মল্লিকা উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। আপনার সংসারে কি ঘর পৃথক হয়েছে না কি?

এতখানি অন্তরঙ্গতা কি মেয়েদের স্বভাবজাত না মল্লিকার বিশেষ স্মার্টনেশের লক্ষণ? তবু মল্লিকার কথায় সুজিত একটু লাল হয়ে উঠলো। বাড়ি নেড়ে জানালো, না।

—তবে, এমন একটা সময় যখন আপনিও বোকার আর আমিও তাই। পার্কে আমরা কথা বলছি, কেউ শুনেছে না, তবু মনে হচ্ছে অনেক মানুষ আশে-পাশে কান পেতে আছে! তাই না?

কি বলতে গেল সুজিত। মল্লিকা আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ওকে একরকম টেনে তুললো। বললে—চলুন।

—কোথায় যাবেন বেড়াতে?

—না।

—রেইংরেটে?

—তাও না।

—তবে?

কথা বলছে সুজিত কিন্তু বুকটা দুকদুক করছে। ভয়ে বা লজ্জায় নয়। পকেটের অবস্থার কথা ভেবে। খরচটা হবে তারই। সে পুরুষ। আদার ধরেছেন ভদ্রমতিরা। ক্ষণেকের অতিথি যেন।

পার্কটার প্রায় তিন দিক ঘূর্ণে অবশেষে তারা বার হবার পথ পেলো। মল্লিকাই এভাবে গোরালো। সহজ পথ চেনে না ওরা। পুরুষকে বশ করার অস্ত্র হাতে আছে, তাই তার সন্ধ্যাবহার করতে জানে না।

সুজিত চলতে চলতে বুকপকেটটার ওপরে হুঁবার হাত বুলিয়ে নিলো। টিউশনির শেষ পুঁজি পাঁচ টাকার নোটটির অপমৃত্যুর কথা ভেবে ব্যথায় ভরে উঠলো মনটা। মনে হোলো চুণীর কথা। ছেঁড়া, তালি-দেওয়া প্যান্টটা পরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। সমবয়সী বন্ধুদের নতুন জামা-প্যাণ্ট পরতে দেখে হয়ত বাড়ী চলে এসেছে। কিন্তু কাকোও খুঁজে পাচ্ছে না যার কাছে জানাবে তার একটা নতুন প্যান্টের আদার।

কি ভাবছেন বলুন তো? ভাবছেন মল্লিকা কেমন বেহায়া, নয়? কথাটা বলেই আড়চোখে একবার সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে ওর মুখের ভাবটা।

সুজিত বললে না, না, এতে বেহায়া ভাববার কি আছে?

—নেই! চেনা নেই, পরিচয় নেই, তার সঙ্গে—কথাটা শেষ না কোরে খল-গিল করে হেসে উঠলো। হাসি খামিয়ে বললে,—হয়ত কোন দিনই আর আমাদের দেখা হবে না। কখনও এই পার্কে যখন এই রকম দুপুরের সময় আসবেন আর ঐ বেশিটার বসবেন তখন মনে হবে এক প্রগলভা মেয়ের কথা, যার পাল্লার পড়ে—

মল্লিকার কথা কানে বায়নি সুজিতের। মন ওর চলে গিয়েছিল আমবাগানে ঘেরা গ্রামের পোড়া ভাড়া বাড়ীটার ভেতরে; যেখানে একটা এই রকম প্রগলভা মেয়ে কোন দিন ঘবে কেঁড়ালে মানাবে কি না?

—আর ভাবতে হবে না, চলুন আজ সিনেমায় যাওয়া যাক! ভাল বই হচ্ছে সিনেমাটায়।

—সিনেমা? প্রশ্ন করেই থেমে গেল সুজিত। তাদের এই নাটকীয় অভিযানে সিনেমাই ভাল। হয়ত তাদের মতই নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে।

—কেন সিনেমা আপনার ভাল লাগে না বুঝি? আবার আদারের স্বর মল্লিকার গলায়। আর বনিষ্ঠ হবার প্রয়াস। চলতে চলতে কয়েক বারই সুজিতকে ছুঁয়ে গিয়েছে তার পেলব তলু। সেটা নেহাতই পাশাপাশি চলার বেগে। তার বেশী কিছু নয়।

সিনেমা-হলের স্মৃতি এলো তারা। রঙীন প্রজ্ঞাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে মল্লিকার দল। কেউ ছোড়া বেঁধে, কেউ দল বেঁধে। তাদের চার পাশে পুরুষ-মৌমাছির মত এক-আধজন ভক্ত। চার দিকে বিলাতি সেটের উগ্র উদ্ভাদনা। পুরুষের চোখে মোহ সৃষ্টি করার মত আবহাওয়া। এখানে নেই বোকারের সমস্তা, ছেঁড়া শাড়ীটার



বদলে ভাল শাড়ী একটা কেনার তাগিদ, নেই রেশন আনার টাকা জোপাড়ের কথা। এ এক স্বপ্নের রাজ্য বেন! এখানে কেবল খুশী আনন্দ তত্ত্বাবধান আবেশ।

এদিক-ওদিক এক বার তাকিয়ে দেখে নিগো সজ্জিত। না চেনা-মুখ চোখে পড়ে না। তাদের সন্মুখেই একছোড়া দম্পতি টিকিট কিনে হলে চুকলো। বেজায় ভীড়। টিকিট পাওয়া মুখিল। ওরা বোধ হয় বস্ত্রের যাত্রী।

নোটটা পকেট থেকে বার করলে সজ্জিত। তার পর মল্লিকার দিকে চেয়ে বললে—টিকিট পাওয়া বাবে তো?

—তাই তো! এই লম্বা লাইন দিয়ে—মল্লিকাকেও চিন্তিত দেখা গেল। হঠাৎ গুণীতে উদ্ভাসিত মুখখানা কেমন যেন কালো হয়ে এলো।

—দাঁড়াই তো হাটনে, সজ্জিত এগিয়ে গেল হাটনের দিকে।

—না, আমায় দিন, বলিই সম্মতির অপেক্ষা না কোরে সজ্জিতের হাত থেকে নোটখানা একরকম কেড়ে নিয়ে কৌশলের সঙ্গে পাঁচ সিকার ছুঁখানা টিকিট কেটে আনলো মল্লিকা।

—স্বন্দর মুখের জয় সর্বত্র, কি বলুন? মল্লিকা একটু তৃপ্তির হাসি দিয়ে সজ্জিতের কথাব জবাব দিলো।

এবারে সজ্জিত চারি দিকে চেয়ে দেখলো। জয়ের গর্বে বুক ভরে এলো। পাশে ক্ষণেকের চেনা বান্ধবী। থাকে সে জয় করেছে থাকে সে পাশে বসিয়ে আড়াই ঘণ্টা হলের মধ্যে কাটাতে পারবে। যার জন্ত সে একক মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বার বার আশ-পাশ থেকে চ্যাংড়ার দল তাদের দিকে লুক্ক দুষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকবে।

পাশাপাশি বসলো তারা। সত্যি ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে না এক বারও পাঁচটা টাকার কথা। চুনীর কথা। স্বপ্নের রাজ্য। নায়ক রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে চাকরী পেয়েছে। লটারীর টিকিটে টাকা পেয়েছে আর পেয়েছে নায়িকাকে তাঁর অঙ্কলক্ষ্মী হিসাবে। বহু দিনের দেখা স্বপ্ন তাদের সফল হয়েছে!

চাঁদনী রাত, পাশাপাশি তারা বসে। দেহে দেহ লাগিয়ে, মনে মনে। তারা ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে। কেউ তাদের সরতে পারবে না।

সিনেমার নায়ক-নায়িকার গোমাঞ্চল আজ সজ্জিতও অনুভব করছে। আবেশে কোন সময় মল্লিকা তার হাতের ওপর হাত রেখেছে। তার উষ্ণ নরম স্পর্শ তার দেহে শিহরণ জাগিয়েছে। জীবনে এত আনন্দ আছে, এ তো সজ্জিত জানতে পারেনি। তাদের এই অভিনয় তো সিনেমা থেকে কোন অংশ কম নয়? এর শেষ পরিণতি কি সিনেমার নায়ক-নায়িকার মত তাদের বেলায়ও হবে? শুধাবে না কি মল্লিকাকে কানে কানে?

—মল্লিকা!

কই মল্লিকা? এই তো ছিল পাশে। কোথায় গেল? বোধ হয় বাইরে গিয়েছে, আসবে এখনই।

সিনেমা ভেঙে গেল। তবু মল্লিকা এলো না। কোথায় গেল! বাইরে বেরিয়ে এসে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো মল্লিকাকে। মল্লিকা নেই। কিন্তু মল্লিকার কাছে যে তার পাঁচ টাকার নোটটার ফেরৎ টাকা রয়েছে।

মল্লিকাকে সেদিন সজ্জিত আর খুঁজে পায়নি। অনেক দিন পরে হঠাৎ মল্লিকাকে দেখতে পেলো সজ্জিত। তারই মত এক জনের হাত ধরে সিনেমা-হলের দিকে চলেছে।

—কুনছেন?

ওরা থামলো না।

সজ্জিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো। একবারে মল্লিকার যে পাঁচটা গালি ছিলো, সেই দিকে।

—কুনছেন?

মল্লিকার কাছে পড়লো। তাকালো সজ্জিতের দিকে।

—আমায় বলছেন? মল্লিকার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। লুটীও একটু কুঁচকে গেল না!

—হী।

—আপনাকে তো চিনি না!

—চেনেন না? অবাক-বিশ্বাসে চেয়ে রইলো সজ্জিত।

—না।

—ভুল করেছেন। মল্লিকার সঙ্গীট মস্তব্য করলো। তার পর সজ্জিতকে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো। সঙ্গে মল্লিকাও হেসে উঠলো খিল-খিল কোরে। যেমন কোরে পার্কে তার পাশে বেড়াবার সময় হেসেছিল। অবিকল সেই হাসি।

সজ্জিত জোর কোরে যেন চেষ্টা করে বলতে গেল, আমার সেই পাঁচ টাকার ফেরৎ আড়াইটা টাকা? চেষ্টা করে বলতে গেল এখনও চুনীর প্যাট কিনে দিতে পারিনি। প্যাণ্টের টাকা যে আপনার কাছে।

ততক্ষণ ওরা কাউটারের সামনে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে আড়চোখে এক বার সজ্জিতকে দেখলো মল্লিকা। বোধ হয় বুঝতে পারলো সজ্জিতের অবস্থাটা। সজ্জিতের কথাব জবাবে বলতেও চাইলো, চুনীর প্যাট সে টাকার না এলেও, পানির ইতিহাসের নোটটা কেনা হয়েছে তাতে। পানি যে অনেক দিন থেকে মল্লিকাকে বলেছিল, 'দিদি, ইতিহাসের নোটটা আনিস, ওর দাম ইতিহাসের থেকে অনেক কম'। পুষ্টির অভাবে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে-যাওয়া মেয়েটার করুণ মুখখানার দাম কি চুনীর চেয়ে কম?

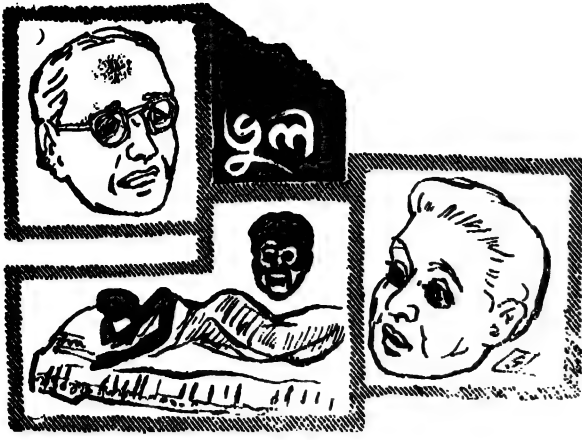
[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]

# যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাখতেই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু বার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে মাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন। এতে আপনার শরীর বরক্ষা করে তুলবে।





### শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অভয় ডাক্তারের। আবছা আঁধার!

কালো মস্ত চোখাণা লোকটির। মুখ ঠিক দেখা যাচ্ছে না, ছয়মণের মতো চোখের। পা টিপে এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে বিছানার দিকে। একটা কিছু কুমতলব রয়েছে, মনে মনে অভয় অনুভব করছে সেটা। বিছানার পাশে এসে লোকটি দাঁড়ালো, চেয়ে দেখলো অভয়ের দিকে। অভয়ের মনে হল এ মুখ তার চেনা, কত বার যেন দেখেছে। কিছুতেই মনে করতে পারলো না। ইচ্ছে হল ছুটে পালায়,—পারলো না, নড়বার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে। ত্রুটি ফুটে উঠলো লোকটির মুখে, মস্ত বড় লোমশ হাত বাড়ালো সে—গেঁটে বড় বড় আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো এগিয়ে আসছে! বাধা দেবার শক্তি নেই, অসহায় চোখে আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো অভয়। গলার উপর এসে একটু থামলো আঙুলগুলো, তার পর গলা টিপে ধরলো। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, সমস্ত শক্তি একত্র করে আঙুল ছাড়াবার চেষ্টা করলো সে, খাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো বিছানায়।

বিলী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো অভয় ডাক্তার। ঘামে সমস্ত শরী। ভিজ়ে গেছে; শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে গলা। আলো ছাগিয়ে বিছানার পাশে চেয়ে ঢাকা-দেওয়া গ্রাসের জল ঢক-ঢক করে পান করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো সে।

দরজা খুলে বাইরের দাওয়ায় বেকির ওপর এসে অভয় ডাক্তার বসলো। ভাদ মাস, জলে ভরে উঠেছে নদী-নালা। গত ক'দিন বৃষ্টি বরষে অবিশ্রাম, জল থই-থই করছে মাঠে, হাওরে, গানক্ষেতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি বরষে বৃষ্টি থেমেছে। ভিজ়া ঘাস, ভিজ়া মাটি, ভিজ়া পাতায় চিক-চিক করছে আলো—চাঁদের আলোও মনে হচ্ছে ভিজ়া। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো অভয়, কৃষ্ণ চতুর্থীর চাঁদ উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপর, চাঁদের গা ঘেঁসে লালচে জ্যোতির্গুণ, হালকা সাদা মেঘ দ্রুত ছুটে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। জ্যোৎস্নাই শুধু ভিজ়া নয়, চাঁদও যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে ঐ ক'দিনের বৃষ্টির ছাঁট লেগে।

ছপ-ছপাং—কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলো অভয় ডাক্তার! বহু দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ। ছপ-ছপাং—ডিঙি বেয়ে কেউ হয়তো যাচ্ছে। ছোট নালা চলে গেছে অভয় ডাক্তারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পশ্চিমের হাওরে। বর্ষাকালে কিছু বুঝবার উপায় নেই, সব জলে ভরে ওঠে—একাকার

হয়ে যায়, দুস্তর হয়ে ওঠে গ্রামের এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীর ব্যবধান। নিস্তব্ধ নিস্তব্ধি রাত চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখছে! অভয় ডাক্তার শুনে লাগলো জলে দাঁড় পড়ার শব্দ, মনে হতে লাগলো একটা তাল আছে এ শব্দের। ক্রমে শব্দ এগিয়ে আসছে, ডাক্তারের মনে হল—এগিয়ে আসছে তার বাড়ীর পাশের নালা ধরে। জলের ওপর দিয়ে ভেসে-আসা বহু দূরের শব্দ—নালা যেখানে জলের ভেতর নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেছে।

ছেলেবেলা থেকে একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিভরা সত্তা বয়ে ফিরছে অভয় ডাক্তার। এক নাম-না-জানা অস্বস্তি, আতঙ্ক কিংবা আর কিছু। থেকে থেকে দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে, টিপ-টিপ করতে থাকে বুক, দেহের ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক শীতল প্রবাহ। তার চলাফেরা আর দশ জনের মতো নয়, একথা সে অনুভব করে এসেছে চিরদিন। তাই এড়িয়ে চলেছে সে সবার সঙ্গ। একটা আশা-আর আশংকার মাঝখানে যেন তার মন নিত্য দুলছে। অনুভব করছে সে ভয়ঙ্কর এক আবির্ভাবের প্রত্যাশা প্রতিনিয়ত তার দেহ-মনে। সে যা জানে না জানতে হবে তাকে সে কথা।

অভয় ডাক্তার বহু দিন শহরে কাটিয়েছে। গ্রামে বাড়ী ছিল, সে বাড়ীর চিহ্নও নেই আজ। মূলবাড়ী আজ যোপ-জঙ্গলে ঢাকা—সাপ-শেয়ালের আস্তানা। এখানে থেকে আজ তিন বছর ডাক্তারী করছে অভয়, মূলবাড়ীর বাইরে ঘর করে আছে সে। একখানা ঘরেই এক পাশে ডাক্তারখানা—আলমারির পর আলমারি ভরা ঔষধপত্র, অপর পাশে তার শয়ন ঘর—এপাশ-ওপাশ টানা বড় বারান্দা সামনের দিকে। ডাক্তারী পাশ করে অভয় ডাক্তার তার পূর্বপুরুষের গ্রামে ফিরে এসেছে। ভালো ছাত্র ছিল সে, বন্ধুরা ভেবেছিল চাকরি করবে,—গ্রামে তাকে ফিরে যেতে দেখে অবাক হয়েছে তারা। গ্রামের লোকও সেদিন অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে, অভয় ডাক্তারের কথা ভুলে গেছে তারা বহু দিন। এ বাড়ীতেই অভয় বলে একটা ছেলে ছিল, সেই ছেলেই যে অভয় ডাক্তার, একখায় বিশ্বাস হয় না তাদের।

ছপ-ছপাং—ক্রমেই এগিয়ে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ। অভয় ডাক্তারের বাড়ীর দিকেই আসছে যেন! হয়তো অভয় ডাক্তারের কাছেই আসছে। চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সাদা হালকা মেঘ দ্রুত,—দাওয়ায় বসে অভয় ডাক্তার সেদিকে চেয়ে দেখছে।

শহরের বাইরে লোকের দিন কাটছে স্নেহ-হৃৎসে, জীবনযাত্রা চিলে,—দিনের পর দিনগুলি আসছে যাচ্ছে, খেয়ালই নেই লোকের। একটি দিন আরেকটি দিনের অনুবৃত্তি! প্রভাত হয়,—কাজকর্মে গল্পেজল্পে, নাওয়া-খাওয়ার দিন কেটে যায়, সন্ধ্যা আসে—ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে থাকে, গ্রামের বুক আঁধার নামে, নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে চার দিক, ঘুমিয়ে পড়ে গ্রাম। ঝিল্লির ঝিঁঝিঁ রবে আঁধার কাঁপে, রাত্রির পাখীর পাখা-ঝটপটানি আর পেচকের কর্কশ আওয়াজে মাঝে মাঝে আঁধার চিড় খায়। আবার প্রভাত আসে—এমনি পুরুষের পর পুরুষের চলে জীবনযাত্রা, বৈচিত্র্যহীন—বৈষম্য নেই একের সঙ্গে অন্যের বিন্দু মাত্র। অভ্যস্ত জীবনপ্রবাহ,—ছেলে যুবক হয়, বৃদ্ধ হয়, তার পর আসে তার ছেলে—জীবন জীবনের অনুবৃত্তি। শক্ততা, হিংসা-দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-কাঁটি, মামলা-মোকদ্দমা,—সবই আছে, যেমন চিরদিন ছিল—বৈচিত্র্য নেই মোটেই। কচি-

কখনো বৈচিত্র্য আসে সে জীবনধারায়, হুঁ-চার বছর মনে রাখে লোকে, তাব পর ভুলে যায়। গতানুগতিক জীবনযাত্রা চলতে থাকে।

অভয় ডাক্তারের বয়স পঁচিশ-ছাশ্বিণ হলেও দেখে মনে হয়, ত্রিশের কম হবে না। লাল গায়ের রঙ, একহারা চোচারা, ছোট মুখে কালো তাঁক চোখ দু'টি কোটর-প্রবিষ্ট, চোখ দু'টির দৃষ্টি সেন ভেতর থেকে ঠিকরে পড়ছে। মুখের ভাব রক্ত গম্বীর, হাসি বা কৌতুক বেন এ মুখের জন্তে নয়। কচিং অদ্ভুত হাসি ভেসে ওঠে সে-মুখে, অসম্ভব করুণ দেখায় সে-হাসি, মুখভাব কাঠিগের, তাতে করে কোন বেশী কম হয় না—হাসি ভাবতে বাস্তবমতো বাধে। অভয় ডাক্তার কথা বড় একটা বলে না, মেধে না কারও সঙ্গে,—রোগ আর ঔষধ ছাড়া কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। রোগায় চলতে অবাক হয়ে লোকে তার দিকে চেয়ে দেখে, কথা বলতে সাহস করে না।

আলো-আঁধারে মেশা সবুজ পাতার ছায়ার গম্বিরে-পড়া গ্রামের উপর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে অভয় ডাক্তার। স্বপ্নের কথা ভুলে গেছে সে। কানে ভেসে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ,—ছপ-ছপাং—বহু দূর থেকে ভেসে আসছে তা'। আকাশ থেকে—ওই হালকা ছুটে-চলা সাদা মেঘের ওপার থেকে বেন ভেসে আসছে সে শব্দ! এফটা গোপন অর্থ আছে এ শব্দের।

একটি বিশেষ দিনের কথা মনে পড়লো অভয় ডাক্তারের। এমনি বর্ষা ছিল সেদিন, জলে ভরে উঠেছিল নদী-নালা।

চৌদ্দ বছর আগে দেখা বাবার মুখ মনে পড়লো তার। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে একটা শীতল প্রবাহ অনুভব করলো সে, কাঁটা দিয়ে উঠলো গা—লোমগুলি সব খাড়া হয়ে উঠলো। কোথায় গিয়েছিলেন তিনি, ফিরতে রাত হয়েছে সে-দিন, কত রাত মনে নেই অভয়ের। ছুটে এসে তিনি বাড়ী ঢুকলেন, অভয়কে বললেন,—পালিয়ে যা অভয়, এফুণি পালিয়ে যা—বা দাঁড়াস নে, এখানে ফিরে আসিস নে আর! ডাকাত—ডাকাত পড়েছে!

তার পর ঘরের কোণে তুলে-রাখা প্রকাণ্ড খাঁড়া হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কি তার কথায় ছিল, অভয় জানে না, কিন্তু তফুণি ছুটে পান্নাতে হবে, এ কথা বুঝেছিল সে—বুঝতে পেরেছিল, এক মুহূর্তও সেখানে তার থাকা চলবে না আর। তার পর কোন্ দিকে সে ছুটছে, সে খেয়াল আর তার ছিল না। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে, বহু লোকের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে! ফিরে তাকালো,—আগুন—আগুন লেগেছে বাড়ীতে। অভয় ফিরলো,—দাঁড়িয়ে ভেবে নিল একটু, তার বাবার নিষেধ। সে মানতে পারলো না, বাড়ীর দিকে ছুটে চললো আবার। ফিরে এসে দেখলো, বাড়ী ঘর-দোর সব জ্বলে গেছে, হল্লা করছে গ্রামবাসীরা চার দিকে জড়ো হয়ে। ডাকাত পড়েছিল, বাড়ী বেগাও করে আগুন লাগিয়েছে। গ্রামের কেউ ভয়ে বেরায় নি, ডাকাতেরা চলে গেছে অনেকক্ষণ। তার বাবাকে আর খুঁজে পায় নি অভয়। কিছু দিন ধরেই বেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ ডাকাতের কথা, ব্যবস্থা করেছিলেন সব কিছু।



সুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার  
**গিনি  
ম্যানসন**

জুয়েলাস

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রান—“গিনিম্যান” • ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহঃ

ষড়বাবুর বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ, ফোন : ৪৬-১৪২৫

বারো বছর বয়সে সেটাই যে অভয় বেরিয়ে গিয়েছিল ফিরে আসে নি, সে আর অনেক দিন। এ ক'বছর বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে, অতিক্রম করতে হয়েছে বহু বাধা, এখানে অবাস্তব সে-সব কথা। ডাক্তারী পাণ করে তিন বছর আগে সে ফিরে এসেছে আবার গ্রামে। গ্রামের লোক তার কথা ভুলে গিয়েছিল, অবাক হয়েছে তারা, আবার তাকে ফিরে আসতে দেখে! মনে মনে হাসলো অভয়,—কি বুঝবে তারা, কেন সে আবার ফিরে এসেছে। এ তিন বছর বসে আছে এখানে সে কিসের প্রতীক্ষার?

মাকে স্বপ্নে যেন সে দেখেছে, বাস্তব নয় সেটা। ছেলেবেলার কথা মনে নেই তার। থাকবে কি করে—বয়স তার মাত্র পাঁচ-ছ' বছর তখন। মাকে মনে করতে পারে না সে, হাফুড় ফিরে—কোন এক কালে তিনি ছিলেন এ কথা মনে পড়ে শুধু, কল্পনার একটা আবছায়া মূর্তি ধরা পড়ে, কোন মতেই স্পষ্ট হবে ওঠে না সেটা। খুব ভয় পেয়েছিল সে এক দিন, তার পর আর মনে নেই। এ ভয়ের সঙ্গে তার মাত্র স্মৃতির কি যোগ, বুঝে উঠতে পারে না অভয় ডাক্তার। তার মায়েব স্মৃতি যেন এই ভয়ের স্মৃতির সঙ্গে মিশে আছে। তার মাকেও এক দিন ডাকাতেরাই না কি মেরে ফেলেছিল। তার বাবাকে সে দেখেছে, গ্রামের কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না, কেমন একা থাকতে ভালোবাসতেন। গ্রামের উত্তর সীমানা অভয় ডাক্তারদের বাড়ী, তাকেও বাড়ী থেকে বড় একটা বেরোতে দিচ্ছেন না তিনি। তখন এর কারণ না বুঝলেও আজ সব বুঝতে পারছে অভয় ডাক্তার—যতই বয়স হয়েছে ততই বুঝতে পেরেছে। মা-বাবা দু'জনেই পর পর ডাকাতের হাতে মরেছেন। একটা কিছু কারণ, একটা কিছু অর্থ থাকবেই এর! টাকা তার বাবার ছিল কিন্তু তার নাগাল-ডাকাতেরা পায় নি—সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না এ ডাকাতের।

কান পেতে এবার শুনলো ডাক্তার, শব্দ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। বাতাস উন্টো বইছে! না, এদিকেই আসছে শব্দ,—বাতাস ফিরতেই এবার স্পষ্ট শুনতে পেলো সে—ছপ-ছপাং—সেখ সবে যেতেই তরল জ্যোৎস্নার প্রাবন নানলো পৃথিবীতে ও শূন্যে, সজ্জা-সজ্জা শুভ্র শাড়ী-পরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে বসে রইলো ডাক্তার।

সকালের কথা মনে পড়লো অভয়ের,—সেও যেন স্বপ্ন, সত্য নয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখ দুটো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তার। অনেক কিছুই আজ বুঝতে পারছে সে।

আজ সকালবেলা, নৌকো নিয়ে লোক এসেছিল মীরপুর থেকে—ভোম্বলের অসুখ, যেতে হবে। লোকের হাতে আগাম টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে ভোম্বল। ভোম্বল শেখ মুসলমান, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। কোন কালেই ছ' মাসের বেশী জেলেব বাইরে থাকে নি সে। লোকে ভয় করে তাকে, জেল থেকে বেরিয়ে এসেই সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। জেলে তাকে যেতেই হবে আবার,—তার নিজের কাক্সের জন্তেও বটে, লোকের জন্তেও বটে। বাইরে তাকে থাকতে দিতে রাজী নয় কেউ। কখন যে তার শনি-দৃষ্টী কার ওপর পড়বে বলা শক্ত, সর্বনাশ তার করবেই সে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘরে আগুন দেওয়া,—এ যেন তার এক কৌতুক। দারোগা, পুলিশ সবাই তাকে চেনে, বাইরে এলে ছ' মাসের ভেতর জেলে তাকে পুবেই তারা। অসংখ্য কৌতুককর গল্প রয়েছে এই ভোম্বল আর তার স্ত্রীকে নিয়ে—সবই অভয় ডাক্তার শুনেছে। লোকের হাতে চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে কত বার ধরা

পড়েছে ভোম্বল, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে তার, মরে গেছে ভেবে ফেলে দিয়েছে লোকে, ওরা চলে যেতেই দিবা সে বেঁচে উঠেছে আবার।

পুলিশের লোকেও মনে মনে ভয় করে এই দাস্তিক অপরাধীটিকে। এক বার আদালতে এক দারোগা ঠাটা করেছিলেন, জেল হওয়ার বলেছিলেন,—ই'দুরটাকে এবার খাঁচায় পুরেছি। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বল উত্তর দিয়েছিল,—ছ'মাস অপেক্ষা করুন দারোগা সায়েব, ই'দুর খাঁচা থেকে বেরোলে সে ভোম্বল শেখ একথা ভুলে যাবে না। ছ'মাস পরে বেরিয়ে গিয়ে এক দিন একা পেয়ে দারোগার কান কেটে দিয়েছিল ভোম্বল। ভোম্বলকে অভয় ডাক্তার কেন, সকলেই চেনে। মাস তিনেক জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, বয়স হয়েছে—এবার মক্কায যাবে ঠিক করেছে সে। অবশ্য কেউ তার একথা বিশ্বাস করেনি। গত পাঁচ বছর যখনই ভোম্বল বাইরে থেকেছে, ঔষধ নেবার ছুতো করে মাঝে মাঝে এসেছে সে অভয়ের ডাক্তারখানায়। ঠাটা করে বলেছে,—ভোম্বলকে তুমি চেনো না ডাক্তার, এক দিন তোমার এই ডাক্তারখানা ভুলে নিয়ে পশ্চিমের হাওরের মাঝখানে বেধে আসবো,—কিবা—শুনছি তুমি ভয় করো না ডাক্তার, ভোম্বলের হাতে যেদিন পড়বে সেদিন কি অবস্থা তোমার হবে ভাবছি। অসম্ভব শোনার না ভোম্বলের মুখে কোন কথাই, মনে করলে সে কি যে করতে পারে না বলা শক্ত। ঔষধ নেওয়াই যে উদ্দেশ্য নয় সেটা বুঝলেও কেন সে আসে, ডাক্তার ভেবে পারনি। কাঁচা-পাকা চুল-নাড়ি, এই কালো শক্তিশালী লোকটার দিকে চেয়ে হেসেছে অভয়, বলেছে,—রোগ হবে, ডাক্তারের হাতে পড়বে, আর সেদিন এই ডাক্তার একটি খোঁচায় কি কাণ্ড যে করে বসবে সে কথাটাও ভেবে দেখো! ভোম্বলকে ভয়ানক বা খুব খারাপ কোন দিনই মনে হয়নি তার।

আজ সকালে অভয় ডাক্তার ভোম্বলকে দেখতে মীরপুর গিয়েছিল। ভোম্বলের অসুখ, হাওয়ায় মাতুর পেতে শুয়ে আছে সে, চার দিক ঘিরে আছে তাঁর বউ ছেলে-মেয়ে। ডাক্তারকে দেখেই চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তার। বউ-ছেলে-মেয়ের দিকে চেয়ে বললো,—তোরা চলে যা, ডাক্তারের সঙ্গে কথা আছে আমার। পাশে রাখা ছোট এক জলচৌকি দেখিয়ে অভয়কে বললো,—বসো ডাক্তার! উঠে গেল সবাই, সেখানে রইলো শুধু অভয় আর ভোম্বল।

ডাক্তার ভোম্বলের পাশে বসে বিছানা থেকে ভোম্বলের ডান হাত ভুলে নিল। হেসে হাত ছাড়িয়ে নিল ভোম্বল,—এ রোগ আমার আর ছাড়বে না ডাক্তার! চিকিৎসার জন্তে তোমাকে ডাকিনি, কথা আছে।

অভয় অবাক হল, কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে ভোম্বলের? বললো,—বলো?

ভোম্বল এবার আর হাসলো না, বললো,—আমি জানি এবার আমি বাঁচবো না। একটা আগ্রহ নিয়ে তাকালো সে ডাক্তারের দিকে—জানো ডাক্তার, এই ভোম্বল কারো ঋণ রাখেনি। একটা ঋণ থেকে গেল, সেটা শোধ করবার আর সময় হল না।

ভোম্বল তাকে কেন এসব বলেছে বুঝতে পারলো না অভয়। জিজ্ঞাসা করলো, কার কাছে?

এ কথার কোন জবাব দিল না ভোম্বল, জিজ্ঞাসা করলো,—তোমার মা-বাবাকে মনে পড়ে?

—মার কথা ঠিক মনে নেই, বাবার কথা মনে আছে।

—ডাকাত তাদের খুন করেছে—মা?



মাথা নেড়ে অভয় বললো,—হ্যাঁ।

—কে সে ডাকাত গুনবে?

অভয়ের মনে হল নিখাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো,—বলো।

—পঞ্চাননপুরের কুঞ্জ বাবুকে চেনো?

—জমিদার?

—হ্যাঁ, তোমার মা-বাবাকে সে হত্যা করেছে।

—অসম্ভব! জ্বোরে বলে উঠলো অভয়। কুঞ্জ বাবুকে চেনে সে। তার চোখের সামনে এক অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছবি ভেসে উঠলো। মাথা নেড়ে অভয় বললো,—এ হতে পারে না!

কঠিন হাসি ভেসে উঠলো ভোম্বলের মুখে,—অসম্ভব নয় ডাক্তার! তোমার মা-বাবাকেই ও শুধু খুন করেনি, খুন করেছে আমার ভাই ডালিম সর্দারকেও। ডালিম আমার বড় ভাই, সে সময় এত বড় জোয়ান ছিল না এ তল্লাটে। কুঞ্জ বাবুকে আজ তুমি যা দেখছো চিরদিন ও তা ছিল না, সেকালের জমিদারদের তুমি জানো না ডাক্তার! খারাপ কাজ আমি অনেক করেছি কিন্তু সব মিসিয়েও ওদের একটা কাজের সমান হবে না। আমাকে অবিশ্বাস করছো? কতকগুলো মিছে কথা বলবার জন্যে ভোম্বল তোমাকে নিয়ে আসেনি। ভোম্বল মিছে বলবে—কি তুমি ভোম্বলের করতে পারো শুনি?

মরতে বসেছে তবু কি দয় লোকটার! অভয় বললো,—বলো।

—বাঁচবে না তাই বলছি। আমার একটা কথাও অবিশ্বাস করো না। সে সময় জমিদারের বড় খারাপ কাজে সাহায্য করেছে

ডালিম সর্দার। যেদিন তোমার মা মারা যান তোমার বাবা বাড়ী ছিলেন না সেদিন। রাত্রে ডাকাত পড়েছিল, কুঞ্জ বাবু নাকি নিজে উপস্থিত ছিল সেখানে। তোমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন কি না বলতে পারবো না, তার লাস পাওয়া গেছে পরদিন।

একটু থামলো ভোম্বল শেখ। রুদ্ধ নিখাস গুনে যাচ্ছে অভয় ডাক্তার, মনে হচ্ছে এ এক উপকথা—সত্য নয়। ভোম্বল আবার বলে চললো,—আমি আমার খেয়াল নিয়ে থাকতাম, ভেতরের কথা সব বলতে পারবো না। যে কারণেই হোক, মুখ ভার করে ডালিম চলে এলো এক দিন। কুঞ্জ বাবু খুব অপমান করে থাকবে। বাড়ী এসে ডালিম বললো,—দেখে নেবো আমি এই জমিদারের বাচ্চাকে। বলা যতো সহজ এদের দেখে নেওয়া তত সহজ নয়। তোমার বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, খাতির করতো তাঁকে সবাই। ডালিম সেদিনই তার সঙ্গে দেখা করলো, পরামর্শ করলো তোমার বাবার সঙ্গে। টের পেয়ে কুঞ্জ বাবু তোমার বাবা আর ডালিম দু'জনকেই খুন করেছে।

ভোম্বল থামলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অভয়। ঝকমক করে উঠলো ভোম্বলের চোখ দু'টি। বললো,—আমি পারলাম না, তুমি এর প্রতিশোধ নিয়ে ডাক্তার!

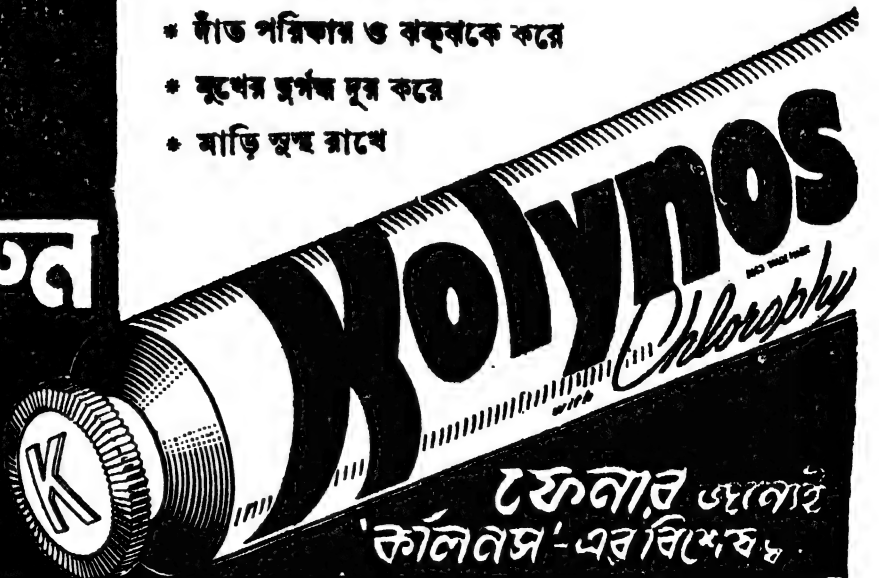
অভয়ের লাল দেহ আরো লাল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি ঠিকরে পড়ছে ভেতর থেকে। বললো,—নেবো। ভেরো না, এর এমন প্রতিশোধ নেবো আমি—কথা শেষ না করে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলো অভয়। সেখানে আর অপেক্ষা না করে উঠে চলে এলো সে।

দাঁতের  
ক্ষয়  
বন্ধ করুন

সক্রিয় কেমোরফিন সলুশন

বিদ্যমান সলুশন ক্যালিনস টুথপেস্ট

- দন্তক্লমী জীবাণু নাশক
- দাঁত পরিষ্কার ও বন্ধ করে
- অধিক দ্রুত দূর করে
- মাড়ি স্থির রাখে



ফেনার জেনারেল  
'ক্যালিনস'-এর বিশেষ

এত দিন যা বুঝতে পারিনি আজ তা সে বুঝতে পারছে।

‘ছপ-ছপাং’—দাঁড়ের আওয়াজ হচ্ছে তার বাড়ীর পাশে, চোখ ফিরিয়ে সেদিকে চেয়ে দেখলো অভয় ডাক্তার।

ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে একটি লোক নামলো। মাঝি নামলো না, বড় নৌকা। কাঁদের নৌকা বুঝতে পারলো না অভয়। লোকটি নেমে তার বাড়ার দিকেই আসছে। অভয় বুঝতে পারলো বাড়াবাড়ি অস্বস্তি করেছে কারো, নইলে এতো রাত্রে তার কাছে লোক আসতো না।

লোকটি দাওয়ার ডাক্তারকে বসে থাকতে দেখে অবাক হল। দাওয়ায় উঠে এলো সে, নমস্কার করে বললো,—পঞ্চাননপুরের জমিদারদের কর্মচারী আমি। কুঞ্জ বাবু মেয়ের অস্বস্তি, আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে। অভয়কে কুঞ্জ বাবুর চিঠি দিন।

অভয়ের মনে হল, এবি জ্ঞাতে ঘের এতক্ষণ এখানে বসে সে অপেক্ষা করছিলো। মুখ তার কঠিন হয়ে উঠলো, জ্বলতে লাগলো চোখ দুটো। হ’-এক কথায় কি হয়েছে জেনে নিল সে, বললো,—দাঁড়ান, এক্ষুণি আমি তৈরি হয়ে আসছি।

ঘরে গিয়ে অভয় দেখলো ঘড়িতে আড়াইটে বেজেছে। একটা হাত-বাগে কতকগুলো ঔষধ পুরে নিল সে, একটা ঔষধ তৈরি করে নিল ইঞ্জেকসন দেবার জন্তে। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কর্মচারীটিকে বললো,—চলুন।

পথে একটি কথাও বললো না অভয়। এতে আশ্চর্য্য হল না কেউ। সবাই জানে ডাক্তারের ধরণই এই। নৌকা চলেছে, ডাক্তার একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সামনের দিকে।

পঞ্চাননপুরে পৌছোতে পাঁচটা বেজে গেল। বাইরের ঘরেই কুঞ্জ বাবু বসে আছেন। তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখলো অভয়। ডাক্তারকে তক্ষুণি ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। এলেন, ফেরবার পথে এদিকে এসে ডাক্তার, কথা আছে।

মেয়েটি বিছানায় পড়ে আছে,—অচেতন নয়, কিম্বিয়ে-পা। অরতপ্ত দেহ—রোগপাপুর মুখ। অভয় বুঝলো, বেশ কিছু দিন রোগে ভুগছে মেয়েটি। বয়স উনিশ-বিশের বেশী হবে বলে মনে হল না। মুখ শুকিয়ে উঠছে—যেন একরাশ বাসী যুঁইফুল। ডাক্তারকে দেখে মরে দাঁড়ালো উৎকলিত আত্মা আর পরিচায়িকা দল। একজন বিছানার পাশে এগিয়ে দিল একগানো চেয়ার। মেয়েটির মুখের দিকে আর তাকালো না অভয়। অত্যন্ত ধীরে সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলো সে। হাতবাগ থেকে তার নাম ছাপানো কাগজ বের করে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো,—নাম?

—রাজেশ্বরী দেবী। কে এক জন উত্তর দিল।

—বয়স?

—বছর কুড়ি হবে।

সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লিখে যেতে লাগলো অভয়। রোগের নাম, ঔষধের নাম সব পরিষ্কার করে লিখলো। একটা শিশিতে কয়েক দাগ ঔষধ দিল খাওয়ার জন্তে। তৈরি করে নিয়ে আসা ঔষধ পুরলো ইঞ্জেকসনের নলিতে, তার পর সাবধানে রক্তবহা নাড়ী বের করে ইঞ্জেকসনের সূঁচ বিঁধলো। যন্ত্রপাশ্চক ঋণ শব্দ করে আবার কিম্বিয়ে পড়লো মেয়েটি। এক অদ্ভুত রুঢ় হাসি ভেসে উঠলো ডাক্তারের মুখে। ইঞ্জেকসনের স্বচ্ছ নলির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত ঔষধ ঠেলে দিল সে সেই নাড়ীর ভেতর। মেয়েটির

দিকে আর তাকিয়ে দেখলো না সে, হাতবাগ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে-ঘর থেকে।

বাইরের ঘরে গিয়ে কুঞ্জ বাবুর মুখোমুখি সে বসলো। কুঞ্জ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন দেখলেন?

ডাক্তার মাথা নেড়ে উত্তর দিল, যেন এক টুকরো কাঠ কথা বলছে,—ভালো নয়।

—কি রোগ?

—লিখে রেখে এসেছি।

—বাঁচবে?

—বলতে পারবো না। ইঞ্জেকসন একটা দিয়েছি, ঔষধও দিয়েছি। দরকার হলে বিকেল বেলা লোক পাঠাবেন।

একটু সময় চুপ করে বসলেন কুঞ্জ বাবু, চোখ-মুখ তাঁর করণ হয়ে উঠলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন,—এ আমার মেয়ের চেয়েও বেশী ডাক্তার, এফে তুমি বাঁচাও। রমেশের ছেলে তুমি, রমেশ আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে বলছি,—আমার সর্বস্ব তোমাকে দেবো, একে বাঁচানো চাই।—ব্যর্থ হুঁচোখ মেলে তিনি ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখলেন।

নির্ধাক বসে আছে অভয়। হুঁচোখ তার চিক-চিক করছে—ভাবাবেগের চিহ্নলেশহীন কঠিন মুখভাব আরো কঠিন হয়ে উঠছে! স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে কুঞ্জ বাবুর দিকে।

অভয়ের সেই কঠিন মুখের ওপর চোখ রেখে কুঞ্জ বাবু বলে যেতে লাগলেন, তাঁরও মুখ কঠিন হয়ে উঠছে তখন। বললেন,—শোন ডাক্তার, নিঃসন্তান স্ত্রী মারা যাবার পর আমি আর বিয়ে করিনি; অথচ আশ্চর্য্য, রাজেশ্বরী কি করে আমার মেয়ে হল, এ প্রশ্ন আজ পষন্ত কাউকে করতে দেখলাম না। ছ’মাসের রাজেশ্বরীকে নিয়ে এসেছিলাম। এক দুর্ঘোষের রাতে ডাকাত পড়েছিল বাড়ীতে, বঁটি হাতে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছুটতে গিয়ে হেঁচট লেগে বঁটি বিঁধে যায়, মার বুক থেকে ছটকে পড়ে ছ’মাসের শিশু মেয়ে। কুড়িয়ে এনে আজ বিশ বছর তাকে আমি মানুষ করেছি। শুধু তাই নয়, তার বাবা বুঝতে পেরেছিল মেয়ে বেঁচে আছে—তাকে হত্যা করেছি আমি।—মিনতিভরা কণ্ঠে কুঞ্জ বাবু এবার বললেন,—এ মেয়ে মারা গেলে আমি বাঁচবো না। একে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। তুমি একে বাঁচাও। মরে যাবো আমি, এ আমি সহ্য করতে পারবো না।

অভয় ডাক্তারের মুখভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, তেমনি নির্ধাক বসে আছে সে। কালো চোখের গভীর দৃষ্টি কুঞ্জ বাবুকে বিঁধছে।

কুঞ্জ বাবু শেষ চেষ্টা করলেন,—একে বাঁচাতেই হবে। রমেশের মেয়ে এ, তোমার বোন।

চমকে উঠলো অভয় ডাক্তার। দেখতে দেখতে লাল মুখ তার সাদা হয়ে উঠলো। উঠ দাঁড়ালো সে, মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বললো,—আগে জানলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম, এ সর্বনাশ হতো না। সময় নেই—আমি বাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভয় ডাক্তার। কি জানলে আর কতো আগে জানলে, সে কথা ঠিক বোঝা গেল না!

সেদিনই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল অভয় ডাক্তার। সৈন্য বিভাগের বড় চাকরি পেয়েছে সে।



বুকের দুই ছাড়াগোর  
অমজা থেকে  
আমায় মুক্তি দিয়েছে

# নেস্টাম

ঘব, গম প্রভৃতি শতচূর্ণের সংমিশ্রণে  
তৈরী আদর্শ শিশু-খাদ্য। নেস্টাম  
শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের পক্ষে  
অপরিহার্য উপাদানগুলো  
অধাপরিমাণে সুগন্ধে স্বাভাবিক-  
ভাবে তাকে পুষ্ট করে।

- রান্না করতে হয় না
- সহজেই মিশে
- পরিপাক যন্ত্র  
সহন করে



নেস্টাম দিয়ে পিঠে, কেক প্রভৃতি নানা উপাদেয়  
খাদ্য তৈরী করা যায়।

বিনামূল্যে পুষ্টিকার অল্প লিখুন :

নেসেল্‌স্‌ প্রডাক্টস্‌ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পোঃ অঃ বক্স ৩১৬, কলিকাতা - পোঃ অঃ বক্স ৩১৬, বোম্বে,

পোঃ অঃ বক্স ১১০, মাদ্রাস



মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

### সেই হার্মোনিয়াম !

মিতার মা হার্মোনিয়ামটা কিনেছিলো শখ করে—মেয়েকে গান শেখাবে বলে। জনশ্রুতি আছে—মিতার মা নিজেরই না কি গানবাজনার খুব শখ ছিলো প্রথম বয়সে—তা সে শখ আর মেটাবার সুযোগ হয়নি। বিয়ে হয়েছিলো নেহাৎ অল্প বয়সে—তার পর শস্তরবাড়িতে পদার্পণ করবার পর থেকে সে পাট চুকে যায় একেবারে। একে তো শস্তরবাড়ির সবাই ভীষণ গোঁড়া, তায় যে খাণ্ডার শাস্ত্রীর পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো, তাতে প্রাণের সবখানি গানের স্বর চোখের জল হয়ে বেরোতো। সুতরাং—

তার পর শস্তর-শাস্ত্রী মদ্যবার পর কলকাতায় এসে যখন নিজের ঘর-সংসার পাতলো মিতার মা, তখন আব বয়স নেই—মিতাই তখন চোদ্দ বছরেরটি। তবু তাতেও দমে না গিয়ে নিজে স্বামীর সঙ্গে ঘরে ঘরে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে একটা উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়াম কিনে আনলো মেয়ের জন্তে। নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধ মেয়ে মধ্যে দিয়ে যদি সার্থক করে তুলতে পারে।

মিতাকে গান শেখাবার জন্তে সপ্তাহে তিন দিন করে মাষ্টার আসতো—আর তিন ঘণ্টা ধরে শিল্পী হবার পবিত্রাধি প্রয়াসে পাশের বাড়িগুলির মাথা ধরিয়ে ছাড়তো মিতা। তবু তার মা অটল আশা অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায় নিয়ে সেই তিন ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতো মেয়ের পাশে। মেয়ের চেয়ে মায়ের সাধনার একাগ্রতাই যেন বেশি। তবে শুধু মিতার মা-ই নয়, আরেক জন একাগ্র শ্রোতাও সমান অধ্যবসায়ের সঙ্গে মিতার পাশে বসে থাকতো সারাক্ষণ। সে আমাদের খুকু।

খুকুর বয়স তখন নয় কি দশ। দিব্যি শাস্ত্র-শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েটি, ছোটবেলা থেকেই ওর গানের দিকে ভীষণ ঝোঁক—এক্কেবারে ছোট বয়সে যখন আর সব বাচ্চারা চুখিকাঠি নিয়ে খেলা করে, তখনই কোথাও রেডিও বেকর্ড বাজলেই ও কান খাড়া করে চুপচাপ শুনতো। দেখে-শুনে ওর বাপ বলতেন—মেয়েটার গানের দিকে টান আছে, একটু বড়ো হলেই ওকে গানের স্থলে ভর্তি করে দেবো। মা মুখঝামটা দিয়ে বলতেন—হ্যাঁ, রেখে দাও তোমার সোহাগের কথা! যার বাপ দেড়শো টাকার কেরাগী আর দেড় ডজন যার পুখি—তার মেয়ে নাচগান যা শিখবে তা জানাই আছে—তা সে স্বয়ং উর্দু এসে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মালো ও।

কথাটা সত্যিই। খুকুর বাবা সদাগরী আপিসের কেরাগী—বিদেশী মালিকের মুনাফার হিসেব কবে কবে চুল পাকিয়ে ফেলতেন—কিন্তু তার দক্ষিণা বিশ বছরে দেড়শো টাকায় পৌঁছেচে। খুকু তাঁর তৃতীয় সন্তান—তার পরেও আছে আর চারটি। তার পর আশ্চর্যজনন জাতিগোষ্ঠী মিলিয়ে পরিবারের আয়তন দেড় ডজনই বটে প্রায়।

সুতরাং খুকুর যতই সহজাত সঙ্গীতপ্রীতি থাক, তার বিকাশ আর পরিপোষণ যে কতটুকু হবে—তা খুকুর মার কথার অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করলো। খুকুর বয়স হলো গান শিখবার—এবং তা ছাড়িয়েও চললো ক্রমে—কিন্তু খুকুর বাপের আর টাকা জুটলো না মেয়েকে একটা যেমন-তেমন হার্মোনিয়াম কিনে দেবার—তা আবার তাকে গানের স্থলে দেওয়া কি গানের মাষ্টার রাখা—সে তো দূরের কথা!

তাই খুকুর আমাদের গতি হলো ঐ পাশের বাড়িতে। যে তিন দিন মাষ্টার আসতো মিতাকে গান শেখাতে—খুকু নিয়মিত হাজিরা দিতো ঠিক। সে সময়ে কোনো কিছুতেই তাকে আর বাড়িতে কেউ ধরে রাখতে পারতো না—এমন কি, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখালেও কাজ হতো না। এই তিন ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে ঐ প্রাণান্তকর চোঁচামেচি শুনতো কি করে ঐটুকু মেয়ে! তাই ভেবে অবাক হবার কথা। তার পর ক্রমশে মুখ মুছতে মুছতে মাষ্টার যখন বিদায় নিতো, তখন খুকু বাড়ি ফিরতো মুগ্ধ আঁধার করে।

একদিন রোববার হুপুরে খুকু পড়া করছিলো বাবার কাছে বসে। এক জায়গায় ছিলো *Reba sings well*—খুকুর পড়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো। বাবা চোখ বুজে শুয়েছিলেন, জিগ্যেস করলেন—কি হলো খুকু? খুকু বই বন্ধ করে রেখে বাবার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার পর খানিকক্ষণ পরে আবদারের স্বরে বললো—একটা কথা বলবো বাবা?

বাবা চোখ মেললেন—এতক্ষণ নিশ্চিন্তে মেয়ের সেবাটুকু উপভোগ করছিলেন। বললেন—কী, মা?

—মিতার মাষ্টারমশাই কী বলেছেন, জানো বাবা? বলেছেন, আমাকেও মিতার সঙ্গে সঙ্গে গান শেখাবেন—অমনি, পয়সা লাগবে না। মিতার মা-ও বলেছেন তাই—তুই এসে মিতার সঙ্গেই গান শিখবি। তোর বাবাকে বলিস একটা হার্মোনিয়াম কিনে দিতে বাড়ীতে অভ্যাস করার জন্তে—তা নইলে তো গান শেখা যায় না। আচ্ছা বাবা, একটা হার্মোনিয়ামের দাম কত? মিতার চেয়েও যদি ছোট আর খারাপ হয়?

তার পর বাবার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো—জানো বাবা, আমি এক পয়সা এক পয়সা করে সাড়ে তিন টাকা জমিয়েছি আমার ফুটো বাগ্গের মধ্যে—সেদিন গুণে দেখলাম! সে-সব টাকা তোমায় দিয়ে দেবো'খন বাবা! আর তার বেশি যা লাগে তুমি দিয়ে'খন—তাহলে একটা হার্মোনিয়াম হবে না, বাবা? মিতারটার চেয়ে ছোট হলেও হবে—তুমি দেখো।

খুকুর বাপ স্তব্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ ছলছলিয়ে এলো তাঁর। হুঁহাত বাড়িয়ে আদরের মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন। তার পর ভারী গলায় বললেন—হবে বৈ কি মা, খুব হবে! তোমার সাড়ে তিন টাকা দিতে হবে না,

হার্মোনিয়াম তোর আমিই কিনে দেব, একটু সবর কর মা—পূজোর বোনাসটা যদি পুরো পাই, আর সব খাচ ফেলে তোর হার্মোনিয়াম আমি আগে কিনবো মা !

থুর্কু আছোদে আটখানা হয়ে বললো—পূজোর সময় দেবে বাবা ? সেই ভালো। আমি আর এবার পূজোয় জামাকাপড় কিছুই চাইবো না বাবা, তুমি দেখো।

আমি থুর্কুর বেকার মাম! বি-এ, পাশ করে কলকাতায় এসে চাকরির চেষ্টা করছি বছর খানেক—দিদির আশ্রয়ে। বাড়ীতে এক বাগা ছাড়া আমার কাছেই কখনো সখনো থুর্কু তার মনের কথা খুলে বলে। ওর হার্মোনিয়ামের শখ আমারও অজানা নয়। ইচ্ছে করতো—একটা হার্মোনিয়াম কিনে দেবো ওকে—দিদির আশ্রয়ে আছি এত দিন। কিন্তু রোজগার বলতে তো একটা টিউশনি—পনেরো টাকা—তার থেকে দশ টাকা দিদির হাতেই তুলে দিই—মাসের শেষে আবার দিদির কাছেই হাত পাতিতে হয়—ত'চার পয়সার জন্তে। একটা যেমন-তেনন হার্মোনিয়ামের দামও শ'খানেক টাকার কাছাকাছি। যদি কখনো চাকরি পাই—তখন ভাববার কথা। কিন্তু তখন কি আর ভাববার সময়ও থাকবে!

বাপে-মেয়েতে যে সময়ে ঐ কথা হচ্ছিলো—আমিও ঘরের কোণে উপস্থিত ছিলাম নিদ্রিতের ভাণ করে। সব ভুললাম। তার পর বাপ ঘুমিয়ে পড়লে মেয়ে যখন বইখাতা গুটিয়ে উঠে যাচ্ছিলো—আমায় জেগে থাকতে দেখে চুপচাপ আমার পাশে এসে বসলো। কিছুক্ষণ এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে শেষে বিনা ভূমিকাতেই বলে ফেললো—আচ্ছা মামা, একটা হার্মোনিয়ামের দাম কত?

বুলাম, ও ছাড়া ওর নাথায় চিন্তাই নেই আর। হেসে বললাম—কত হবে আর! টাকা পাঁচ-সাত বোধ হয়—ঠিক জানি না। তবে সেগুলো বিশেষ ভালো নয়!

থুর্কু বাধা দিয়ে বললো—তা হোকগে, বাজবে তো? তা হলেই ভালো।

আমি দেখলাম—দাম বলে ফেলে বিপদ বাড়িয়েছি। হয়তো কোন দিন আমার পয়সার এক বোঝা নিয়ে এসে হাজির করবে চুপি-চুপি—এই নাও মামা, পাঁচ টাকা যোগাড় করেছি। এবার কিনে এনে দাও—তা হলেই তো গেছি।

সুতরাং তাড়াতাড়ি করে বললাম—কিছু ভেবো না থুর্কু! তোমার বাবা যখন পূজোর সময় কিনে দেবেন বলেছেন—তখন ভালো হার্মোনিয়াম আসবে বিলেত থেকে—মিতারটার চেয়েও ভালো।

থুর্কু আর কিছু না বলে গম্ভীর মুখে উঠে গেলো।

পূজো এলো, যথাসময়ে থুর্কুর বাবা বোনাসও পেলেন। কিন্তু তার অধেকের বেশিই গেলো সহকর্মীদের কাছে দারাদার বছরের দেনা শোধ করতে। আর বাকি যা রইলো, তাতে একটা হার্মোনিয়াম যদিও বা হতো—কিন্তু থুর্কু বাদেও আরো তো ছেলেমেয়ে আত্মীয়-পরিজন রয়েছে—তাদের কথাও ভাবতে হয় তো পূজোর সময়! আর তা ছাড়া, কোনো এক অলস মধ্যাহ্নের তন্দ্রামগ্নর ক্ষণে ছোট মেয়ের কাছে কী অঙ্গীকার করা হয়েছে—তা মনে রাখলে সদাগরী আপিসের কেরানীর চলে না। অঙ্গীকার পূর্ণ করার উপায় নেই বলেই

বেশি করে অঙ্গীকার ভুলতে হয়। সুতরাং থুর্কুর হার্মোনিয়াম আর হলো না।

থুর্কুও কিন্তু তা নিয়ে আর কোনো দিন একটা কথাও বলেনি কারো সঙ্গেই। বাপ-মাও এক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তা দেখে। গরীবের ঘরে ও-সব শখ না থাকাই ভালো। শুধু আমি মাঝে মাঝে থুর্কুর চোখের দিকে যখন চেয়ে দেখেছি—ওর চোখের তাবটি অত্যধিক রকমের কালো মনে হতো—ওর বয়সের তুলনায়।

\* \* \* \*

মায়ের দয়া হয়ে সাত দিন রোগে ভুগে হঠাৎ মারা গেলো মিতা। শোক সামলে উঠে মিতার মা ঠিক করলেন—জায়গা বদলাবেন। জিনিষ-পত্র ঝাঝাঁদা করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে পাড়ার সবার বাড়ীতে দেখা করতে গেলেন। থুর্কুদের বাড়ীতে যখন এলেন—শিচ্ছেন চাকর একটা বাস্তু মাথায় করে চুকলো।

হার্মোনিয়ামের মাধ্যমে মিতা তথা মিতার মার সঙ্গে থুর্কুর খুব হস্ততা জমে গিয়েছিলো। মিতা হঠাৎ মারা যাওয়ায় থুর্কুও কম শোক পায়নি। তার উপর স্নেহপরায়ণা মিতার মা-ও চলে যাচ্ছেন অজ্ঞ। তাই থুর্কু পাড়ার আর সব ছেলেমেয়েদের মতো মাল-বোঝাই গাড়ীর চার-পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের এক অন্ধকার কোণে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

মিতার মা এসে বললেন—চললাম দিদি! হুঁতগা নিয়েই এসেছিলাম, হুঁতগা বয়েই বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু কৈ, থুর্কুকে দেখছি না যে? তাকে ডাকুন।

থুর্কু এলে তার হাত ধরে মিতার মা বললেন—মিতার হার্মোনিয়ামটি আমি থুর্কুকে দিয়ে যাচ্ছি দিদি! যোগা পাড়েই পড়বে—মিতার আস্থা শাস্তি পাবে। নিজের অপূর্ণ সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে মেটাবো বলে কিনেছিলাম ওটা। তা সে স্বপ্ন সফল হলো না, মিতা চলে গেলো। অবিশিষ্ট বেঁচে থাকলেও স্বপ্ন আমার কতটুকু সার্থক হতো জানিনে। তাই আজ এর হাতে তুলে দিলাম হার্মোনিয়ামটা। ওর স্বপ্ন যদি সার্থক হয় তবে আমার স্বপ্নও সার্থক হবে—এই আশা রইলো।

মিতার মার চোখে দু'কোঁটা জল ঝিকমকিয়ে উঠলো। থুর্কুর মা'রও। কেবল থুর্কু নিম্পলক নেত্রে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো হার্মোনিয়ামটার দিকে।

হার্মোনিয়াম পেলো থুর্কু—কিন্তু গান শেখা আর হলো না।

বাব-মার দু'খ ছিল মেয়ের একটা শখ মেটাতে পারছেন না বলে। সেটা যখন মিটেই গেছে ভাগ্যক্রমে, তখন অগ্নিগ্লোর প্রতি আর চিন্তা কী! আর তা ছাড়া দিতে চাইলেই বা দেবার উপায় হচ্ছে কী করে! সুতরাং থুর্কুর গানের মাষ্টারও জুটলো না, গানের স্কুলে ভর্তিও আর হয়ে উঠলো না।

আর নিজে যে চেষ্টা করবে, তারই কি যো আছে একটু? বাড়ীতে চারখানা যদি বা ঘর তো চার চারে ষোলো জন লোক—হার্মোনিয়াম বাজাতে বসবার এক তিল কাঁক কোথাও কি মেলে! তার উপর ছোটা ভাই-বোন বড়ভাইদের হাত থেকে হার্মোনিয়ামটাকে সব সময় ডানা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, নক্ষের ঘনের মতো আগলে বেড়াতে হয়। তার জন্তে অত্যাচারও জোটে কম নয়, তবু সে নির্বিবাদে সহ্য করে সব-কিছু।



মাঝে মাঝে কোনো সন্ধ্যাবেলা—যখন ছেলেমেয়েরা খেলে ফেরেনি, বড়রা তখনো আপিসের পথে, মাসিপিসিরা পাড়া বেড়াতে গেছে—সেই কীকে হয়তো হার্মোনিয়ামটাকে সন্তুর্ণণে বাজ খেকে বার করে বাজাতে বসে থকু। তাও কি নিশ্চিত হবার যো আছে একটু? হয়তো মা সঙ্গে সঙ্গে ঠাঁক দেয়—ওই! মেয়ে গলা সাধতে বসেছেন! ওরে ও থকু, ভাইটাকে একটু ধর না বাপু—এই এখনি সব এসে পড়বে আপিস থেকে—এদিকে চা-জলখাবারও হলো না। আর একটু যে কাজে সাহায্য করবে—তা কেন—দিন-রাত ঐ নিয়েই আছে!—দিসি মেয়ে হয়েছো কি করতে? মাকে সংসারের কাজে একটু সাহায্য করতেও শিখলে না? জন্মেছো গরীবের ঘরে—ওসব বিবিয়ানার সাধ কেন বাপু!

একটানা গজর গজর করে চলে মা। সেদিকে কান না দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সঙ্গীত-সাধনা করবার মতন মনের অবস্থা তখন আর থাকে না। আর সত্যিই তো, মা একলা মায়ুস, কত আর পারে! হার্মোনিয়ামটাকে বাজাবন্দী করে আবার উঠতে হয় থকুকে।

হার্মোনিয়াম হলো—কিন্তু থকুর গান শেখা আর হলো না।

\* \* \*

তার পর সাত আট বছর কেটে গেছে। থকু এখন সত্তেবো বছরে বতরুণী—কালেজে পড়ে। নিজে একটা টিউশনি করে পড়ার খরচ চালায়। থকুর বাবার রিটায়ার করবার সময় এসে গেছে। আয় কিঞ্চিৎ বেড়েছে কিন্তু তার তুলনার অনেক বেশি বেড়েছে সংসারের পরিধি আর জীবনযাত্রার ব্যয়-মাত্রা। দাদা একটা নামমাত্র চাকরি করে। আর মেজদা আই. এ. ফেল করে চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

হার্মোনিয়ামটা বাজাবন্দী হয়ে পড়ে আছে এখনো খাটের তলায় এক কোণে, থকু মাঝে-মাঝে ধুলো ঝাড়বার অছিলায় বার করে দেখে আর দাঁখাস ছাড়ে। ছলছলিয়ে ওঠে তার চোখ।

এমন সময়ে থকুর ছোট ভাইটার অসুখ হলো—মারাত্মক রকম। ডাক্তার বললেন—প্যারাটাইফসেড। সিরিয়াস টার্ন নিয়েছে—ক্লোরোমাইসেটিন দিতে হবে ইমিজিয়েটলি—ফুল কোর্স। নইলে—

গুধুটা তখন নতুন বেরিয়েছে—চারটে কোর্সের দান আউব টি টাকা। বাবা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—অতো টাকা এখন কোথায় পাবো—মাসের শেষ! ধারও যে কারো কাছে পাবো—সে আশা নেই। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই কিছু না কিছু পারে—তার উপর এই হুমলোর বাজার, সবাইই অবস্থা সমান। কি করি!

মা কেঁদে বললেন—আমার যা দু'একগাছি চুড়ি ছিলো তা তো বহুকাল আগেই খেয়েছো—শাঁখা আর নোয়া ছাড়া তো অঙ্গে সোনার দানাও নেই! এখন বাছাকে আমার বাচাই কি করে?

আমি তখনো আছি ঐ পরিবারে। মাঝে একটা চাকরি করতাম, মাস দুই হলো আবার বেকার বসে আছি, ছাঁটাই করে দিয়েছে।

অফিস যাবার সময় থকুর বাবা বললেন—দেখি, যদি পারি যোগাড় করতে—

থকু সেদিন আর কলেজে গেলো না। বসে রইলো ভাইয়ের শিয়রে পাথরের মূর্তির মতন। সন্ধ্যা সাতটার সময় বাবা ফিরলেন শুকনো মুখে। নাঃ, কোথাও হলো না!

মা কেঁদে উঠলেন। ওগো, কী হবে তবে? ডাক্তার যে বলে গেছে আজকের মধ্যে গুধু দেয়া চাই—

থকু চুপচাপ সরে গেলো সেখান থেকে। আধ ঘণ্টাখানেক পরে থকু নিশেফে এসে দাঁড়ালো রক্ত ভাইয়ের শিয়রের কাছে। মা বসে পাখা করছিলেন। এতক্ষণ স্তব্ধ চোখে পাখা নাড়ার দিকে চেয়ে থেকে তার পর ডান হাতটা বাড়িয়ে থকু বললো মূহু অকম্প স্বরে—এই নাও মা, টাকা, গুধু আনতে পাঠাও কাউকে—

মা চমকে উঠে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর এক চোখে আলো, আরেক চোখে অন্ধকার বাসে উঠলো। খানিকক্ষণ স্তম্ভিত মুখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর ভয়ে ভয়ে অশ্পষ্ট গলায় বললেন—টাকা! টাকা তুই কোথায় পেলি?

তার পর মূহু অথচ অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলো থকু—হার্মোনিয়ামটা বাধা দিয়ে এলাম সস্তর টাকায়। মিস্ত্রীদের মীরা একটা হার্মোনিয়াম কিনবো কিনবো করছিলো অনেক দিন থেকে—সেকেগুহাণ্ড, ওল টাকার মধ্যে। তাকেই দিয়ে এলাম। মেয়েটার গানে দরদ আছে—বহু রাগবে জিনিষটা। কিন্তু তুমি আর দেবি কোরো না, গুধু আনতে পাঠাও ডাক্তার বাবুর কাছে।

থকুর মার চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। ধরাগলায় বললেন—হার্মোনিয়ামটা বাধা দিয়ে টাকা আনলি তুই? মিতার মার শেষ সাধের জিনিষ! ও কি আর কোনো দিন ছাড়াতে পারবি তুই? এই অভাবের সংসারে?

এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে চেপে রেখেছিলো থকু। এবার আর পারলো না। তার মিশ-কালো দু'চোখ ছাপিয়ে বর-বর করে জল বয়ে পড়লো। কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললো—না মা, কী দরকার আর ছাড়িয়ে! ও অভিশপ্ত হার্মোনিয়াম!

বারান্দায় বসে শুনিছিলাম আমি সব কথা। থকুর কথার উত্তরে আমি মনে মনে বললাম—না থকু, ও হার্মোনিয়াম অভিশপ্ত নয়! অভিশপ্ত আমাদের জীবন—এই হতভাগ্য মধ্যবিত্তের জীবন। আর অভিশপ্ত—তাদের মানুষের মত বাঁচবার সাধ-আছাদ! 'মানুষ' হয়ে উঠবার আশা-আকাঙ্ক্ষা!



## মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের কড়া শীতের মধ্যে স্নমথর ফিরেট গাড়ীটা যখন ডায়না নদীর শুকনো খাত পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা হব-হব। শীতের সন্ধ্যা পাঁচটা বাজতে না বাজতে এসে পড়ে। ধূলা উড়িয়ে চলেছে স্নমথ। অনেকক্ষণ আমরা চূপ করে বসে আছি। বেশ হিমেল হাওয়া তীরের মত চুকছে ভেতরে। আমি ওভারকোটের কলারটা তুলে কানে ঢাকা দিয়ে বসলাম। মনে মনে নানা রকম এলোমেলো ভাবনা আসছে। সেটাতে মৌতাত জমানর জন্মে একটা সিগ্রেট ধরলাম। স্নমথকেও একটা ধরিয়ে দিতে হল। এবার বেশ এক পাশে হেলে বসে জানলা দিয়ে হাতের কনুই বের করে দিয়ে হাতের চোঁটোটা গালের উপর রেখে মৌতাত করে বসেছি। ইঠাং অনেকক্ষণ পর স্নমথ কথা বলল, এই যে কাঁচা পথটা দেখছিস, বর্ষার সময় এটা থাকে না, এটা টেম্পারারি পথ। তোর ভাগ্যটা যদি ভাল থাকে, তবে ফেব্রার দিন হরিণ দেখতে পারি।

তাই না কি? উংসুক হয়ে বললাম, বোধ হয় জলটল খেতে আসে; এটা ত নদীর শুকনো খাত বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, এটা ডায়না নদীর খাত, বর্ষার সময় কি যে চেহারা হয়, করনা করা যায় না এখন। যে জঙ্গলটা আমরা পেরিয়ে এলাম মনে আছে ত'?

স্নমথর শেষের কথার জবাবে বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়। ওখানে বৃষ্টি বাঘ-টাঘ সব আছে?

বাঘ আছে, গণ্ডার আছে, হাতী আছে। ফেব্রার দিন রাতে ফিরব, চোখে পড়তে পারে; তবে কি জানিস, আজ-কাল এত ট্রাফিক চলে যে, পেট্রোল ডিজেলের গন্ধ ওরা সহ্য করতে না পেরে রাস্তা থেকে অনেক দূরে থাকে।

এ সব রাস্তায় রাত-বিরেতে চলায় বেশ একটা থ্রিলিং আছে, আমি বললাম। স্নমথ সে কথার স্বীকৃতি জানিয়েও আক্ষেপের স্বরে বলল, তবে দশ-পনেরো বছর আগেও যে রকম ছিল আজ-কাল তার শতাংশের একাংশও নেই।

আমি চূপ করে শুনে যাচ্ছি খুব মনোযোগ দিয়ে নয় অবিশিষ্ট, তবে মন লাগছে না। এখান থেকে ভূটানের দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল, উত্তর দিকে যে নীল পাহাড়গুলোয় দৃষ্টি ঠেকে যাচ্ছে এখান থেকেই ভূটানের আরম্ভ। স্নমথ বলে যাচ্ছে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে স্ট্রিয়ারিং-এ হাত রেখে। অন্ধকার ঘন

হয়ে উঠেছে, ফিরেটের হেড লাইট ছেলে দিয়ে আমরা লালমাটি বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর বেশি দূর নয় বোধ করি। ডায়না পার হয়ে এসেছি, আর একটা ছোট নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে চলে এলাম। বহু দিন আগের তৈরী ব্রিজটা আজও ঠিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এ ব্রিজের আকারটা অনেকটা গাড়োয়াল ডিষ্ট্রিক্টের বহু পুরোনো ঝুলন্ত ব্রিজের ধরণের। হ' পাশে চা-বাগান। সমান করে ছাঁটা চা-গাছগুলো, মাঝখানে সোজা পিচের রাস্তা। বেশ লাগছে চলতে। মনটা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। ইঠাং চমকে উঠলাম স্নমথর কথায়।

কি রকম জ্যান্ত গ্র্যাডভেন্ডার? স্নমথ বলল, চল দেখাব। লেখক মানুষ তোরা, একটা গল্প কোঁদে ফেল দিকিনি। আমরা নামটা তার মধ্যে যে ভাবেই হোক স্থান পাবে আশা করি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা গল্পটা কি শুনি?

আরে 'ন এখন কি; বুড়ো নিজের মুখেই বলবে শুনিসু।

আমি বললাম, কি, তোমার শিকারের গল্প না কি?

ইয়েস, শিকার! তা শিকারই বলতে পারিস, আই হু এ্যাডমিট, তবে আমার নয়। নাখা বাকিয়ে জবাব দিল স্নমথ।

ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর আছে তোমার বাগান? দিকি রাত হল।

স্নমথ হাসল, কেন তোর ভয়-টয় করছে না কি?

আরে না না, ভয় কি। একেবারে নাবালক ঠাউরেছ! ছেলেবেলার কথা তুলে গেলে?

দূর, এমনি বললাম, বলল স্নমথ, বোধ হয় খাতের প্রয়োজনটা বেশি অনুভব করছিস। আর অল্পক্ষণ কষ্ট কর, আমরা এসে গেলাম বলে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, সেই বুড়োর কথা—একটু থেমে আবার বলল স্নমথ।

তুই হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবিনে কিন্তু ইট ইজ এ টু ফ্যাক্ট।

খুব মাল্শলাদার বৃষ্টি? বললাম আমি।

একটা কথা সত্যি জানিসু কাহু, আমি নিজেকে দেখে আশ্চর্য হই, ও ব্যাটা বুড়োর ওপর কেন জানিনে রাগ করতে পারিনে। তুই লেখ। আমি হালফ করে বলতে পারি তুই রাগ করতে পারবি না, ওকে শয়তান বলে ভাগিয়ে দিতে পারবি না।

আমি একটু জোরেই বলল, কেন ভাগিয়ে দেব কেন? আগে শোনাই যাক ওর কথা।

তা ঠিক, তবে নিশ্চয় ইউ মাষ্ট ট্রাট, ইউ স্ভড; লিখছিল তাহলে? ওর ভেতর দিয়ে চল্লিশ বছর আগেকার ডুয়ার্সের বাঙালীর ইতিহাস লেখা হবে। তার পর একটু খেমে হেসে শুরু করল স্মৃথ।

‘তাছাড়া বুড়োও খুব মজা পাবে। জানিস কানু, আমার বিশ্বাস, এই ধরনের লোকদের ফিলিস্টা কম, সত্যি পিটি হয়।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে স্মৃথ যেন অনেক দূরে চলে গেল, কি বকম ঔদাসীন্দের আমেজ লাগছে ওর কথায়।

আমাকে আর ভাববার সময় না দিয়ে কাঁচ করে লালমাটি ইন্সপেকসন বাঙালীর সামনে আমাদের গাড়ী এসে থামল। আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—সাতো সাত।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। পূর্বমুখো বাড়ীটার দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটা নদী চলে গিয়েছে। এখন জল নেই বললেই চলে, পাহাড়ী নদী বর্ষায় খরস্রোতা হয়। অসংখ্য মুড়ী পাড় আছে, মাঝখান দিয়ে ঝির-ঝির করে গলে যায় পাড়-ভোবানো জলধারা। নামটা যেন কি বলেছিল স্মৃথ মনে পড়ছে না। ও ঠা! হুমুয়া। চমৎকার ছোট্ট বাড়ীটা, রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচু বলেই বেশি ভাল লাগে দেখতে। ছোট্ট টিলার ওপরে হৃদে রঙের একতলা বাড়ী, চার পাশে রেলিং-বেরা বারান্দা। ঠিক তার নীচেই নানা রঙের মরশুমি ফুল। একটা গাছ উঠেছে পাকিয়ে পাকিয়ে বাঙালীর ছাদে। ডুমডুমার ওপারে আপার তও ফরেষ্ট। নদীর ধারে প্রচুর বীশঝাড় রয়েছে। কোথায় যেন একটা পাখী ডাকছে, কুব-কুব, করে। ঠিক যেন নিয়ন্ত্রণের গ্রামাঞ্চল।

নাঃ, এই ঠাণ্ডায় একটু গরম চা পেটে না পড়লে নয়। ছটা থেকে বসে আছি। স্মৃথর সাড়ে ছটার মধ্যে অফিস বাওয়ার কথা। কি ব্যাপার! উঠতে যাচ্ছিলাম, ভাগা ভাল, সেই এসে হাজির।

সুপ্রভাত! হেসে বললাম, একেবারে তৈরী মনে হচ্ছে? নিশ্চয়। ছটা বেজে গিয়েছে, সে খেয়াল আছে? :হ মনবাহাদুর, মনবাহাদুর!—থাক দিল স্মৃথ।

জী হজুর! প্রিয়দর্শন পাহাড়ী কাগজ এসে উপস্থিত হল।

কুরসি লাও একটো, ওর মায়লা কো ভেজ দো।

ছকুম তামিল হতে দেরি হল না, চেয়ার এবং প্রান্তরারশের জুতা টেবিল এনে সাজিয়ে দিল মনবাহাদুর।

নীল রঙের স্মৃটে বেশ মানিয়েছে স্মৃথকে। শেভি-এর পর সমস্ত নিভিয়ার প্রলেপে মুখখানা সাদা, চক্চকে করে তুলেছে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে মিট-মিট করে হাসতেই ও ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলল।

জাথ কানু, সাহেব-স্রবোর কাছে যেতে হলে প্রেসটিজ অম্বায়াী একটু চাকচিক্য আনিতেই হয়। তবু হোমার মত রাজা-বাদশাহারী শাল ইত্যাদি আমি গায়ে চড়াই নি যে, তুমি আমার সাজের বহর দেখে হাসছ।

আমাদের খাবার-দাবার এসে পড়ল। নাইস! কাল রাতের মুরগীর মাংস, ওমলেট আর পাউরুটিতে কামড় দিয়ে আমরা প্রায় কাপ তিনেক চা খেয়ে ফেললাম। সিগ্রেট ধরিয়ে স্মৃথ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—না, আর বসা ঠিক নয়, ছটা পঁচিশ হয়েছে, এবার উঠি।

তুমি ক’টা ঘর ফিরছ স্মৃথ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সিঁড়ির ধারে থমকে দাঁড়িয়ে বলল সে, এবার উঠে ন।

অল রাইট! কিন্তু জাট ওল্ড-ফুলকে খবর দিতে ভুলো না।

আরে না, না, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর যাতে এসে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা অফিসে গিয়েই করব।

বাস্তব পায়ে নেমে গেল স্মৃথ। ওর ভাবো রঙের ফিফট গাড়ী একটা শব্দ করে বাগানের ফ্যান্টারীর দিকে এগিয়ে চলল।

আর আমি বসে বসে, প্রচুর সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে পরন্ত কলেজ স্ট্রীট থেকে কেনা সমর সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডখানা নিয়ে বসলাম। শালখানা গলা থেকে নামিয়ে বুকের মাঝামাঝি রেখে ইজিচেয়ারের দুই হাতলে হুঁ পা তুলে দিয়ে বইখানায় মনোনিবেশের চেষ্টা করলাম।

খাওয়ার দরুণ হাতে যে তেল লেগেছিল, বেশ করে তোলালেতে ঘসে ঘসে তুলে সশব্দ উদগারে আমরা হুঁজুনেই ঘরখানাকে সচকিত করে তুলেছি। ধীর পায়ে আমরা অপেক্ষমান নেয়ারের খাটিয়ায় শুয়ে লেপ-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চারি দিকে জানলা খোলা, দরজার কাছে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে। ওখানে কার যেন ছায়া পড়ল।

আরে এস এস প্রাণকেষ্ট, তোমার জন্মেই ত অপেক্ষা করে বসে আছি। এই যে ইনি সেই বাবু, স্মৃথ আমার দিকে ইঙ্গিত করল।

প্রাণকেষ্ট প্রসন্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। বেশ পুরুষ্ট চেহারা, বয়স যাই হোক এখনো যে বেশ কিছুক্ষণ কর্মক্ষম থাকবে, বুঝতে সময় লাগে না। ও-আসরে আজ আমি সভাপতি, প্রতি-নমস্কার করে বললাম, বস, মোড়াটা এগিয়ে নিয়ে এস।

এতটা ঘনিষ্ঠতা বোধ হয় ও আশা করে নি আমার কাছে। বেশ একটু সঙ্কচিত সলজ্জ ভাব দেখছি। কি ভাবে আরম্ভ করব বুঝে উঠতে পারছি নে। সমস্ত প্রাণকেষ্টই সমাধান করে দিল, বাবু আপনি না কি আমার নামে গল্প লিখবেন?

তোমার নামে গল্প? আমি কৌতুক করে বললাম, শুনেছি তোমার জীবনের ঘটনাগুলো একেবারে গল্পের মত। সেই সব পুরোনো দিনের কথা বল শুনি।

কিন্তু বাবু, শুধিয়ে ত’ আমি বলতে পারব না?

বেশ ত যে ভাবে পার, বল। আচ্ছা প্রাণকেষ্ট, তুমি লালমাটি বাগানে কত দিন কাজ করছ?

তা বাবু চল্লিশ-বিশাল্লিশ বছর হবে।

তুমি ত’ তাহলে অনেক পুরোনো লোক। তখনকার আর কেউ এখন কাজ করে না?

করে, তবে সে-ও আমার বছর দুইেক পরে এসেছিল।

কে বল ত? স্মৃথ জিজ্ঞেস করল।

এখন যিনি বড়বাবু।

অই সি! বলল স্মৃথ। ঠা দেখো প্রাণকেষ্ট, তুমি বাবু এসব কথা বাদ দাও, যা শোনাবো বলে ঐ বাবুকে ধরে এনেছি, সেইটে শুনিবে দাও।

বুঝলেন বাবু! একটু কেসে আবার আরম্ভ করল প্রাণকেষ্ট, সবাই আমায় ঠাট্টা করে।

কিসের ঠাটা প্রাণকেষ্ট? জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বললাম।

এই বিয়ে-খার ব্যাপার নিয়ে। কেমন উদাসীন শুক-গলায় বলল কথাটা।

কেন? প্রাণকেষ্ট কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল। বার তিনেক বিয়ে করেছি বলে।

সুস্থ থেলে জিজ্ঞেস করল, তিন বার না চার বার?

না বাবু বিয়ে তিন বারই, তবে—একখাটা শেষ না করেই প্রাণকেষ্ট নিজেকে সমর্থন করল। বলল, কি করব বাবু, বাচ্চা-কাজাগুলিকে কে ছাড়ে? নতুন পরিবার এই মাস কয়েক আগে ঘরে এসেছে।

বেশ বেশ, আমি আর সুস্থ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করে জিজ্ঞেস করলাম, তা এটির বয়স কত হবে?

একশ-বাইশের বেশি হবে না।

আমি ত'কমেই কৌতূহলী হয়ে উঠছি। চারটে নারীর সম্পর্কে কেমন করে সে এসেছিল আর কেমন করেই বা একে একে তাদের মধ্যে তিন জন তার জীবন থেকে থেমে পড়ল, এ কাহিনী যেমন যেমন বলেছিল আমি আপনাদের ঠিক সেই ভাবে তার কথাতোই বলবার চেষ্টা করব। জানিনি বিশ্বাস হবে কি না।

বোজ সন্ধ্যাবেলা বাঁশি বাজাতাম পুকুর পাড়ে এক পুরোনো বটগাছের তলায় বসে। সঙ্গীও ছিল দু-চার জন। এক দিন খুব ধমক খেলাম বাপের কাছে। বাপ বলল, কোন কাজকর্ম নেই নচ্ছার,

বাঁশি বাজিয়ে গোপিনীদের মন ভোলাচ্ছ? কুলান্ধার বেরোও—বেরোও বাড়ী থেকে।

আমিও সুরযোগ বুঝে এক দিন মায়ের বাস ভেঙে দু'জোড়া অনন্ত নিয়ে সটকে পড়লাম বাড়ী থেকে, তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে রাতারাতি একেবারে পটুয়াখালি। এখানে-ওখানে দু' মারতে মারতে বছর কয়েক পরে ভাগ্যক্রমে এসে পড়ি এই লালমাটিতে। বুঝতেই পারছেন বাবু, চা-বাগানে কাজ করার ক্ষেত্রে তখন বিজ্ঞের দরকার হত না। শিলিগুড়িতে সারেরবগুলা যগু-গুগু চেহারার লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করত—এই বাবু, কাম করোগ? আমিও চলে এলাম কাম করতে, গাঁয়ের ইস্কুলে চিঠি লেখার বিজ্ঞে অবগত আমার হয়েছিল। কত আর ব্যেস তখন? উনিশ কি কুড়ি হবে বোধ হয়।

তখন এত বাবুও ছিল না, আর এত সব বাড়ী ঘরও হয় নি। সারেরবের কুঠার কাছে আমার এক আন্তানী ছুটল। বেশ আছি, নিজের মনে সারা দিন পড়ে থাকি ফাট্টরীতে। আন্তানায় যেটুকু থাকি রান্না-খাওয়া করতে কেটে যায়। নিজের মনে আছি, কোন ঝামেলা নেই। পাহাড় দেখিনি কখনো, খুব আমোদ লাগছে। সঙ্গী-সাথী ছুটেছে দু'একটা। বাঁশি এখানেও ছাড়িনি, বোজ আসর জমাই ভূমভূমার ধারে বসে। দেখতে দেখতে ভূমভূমায় কল এল। ভূয়ার্সের মারাত্মক সময় বর্ষাকাল এসে গেল। সারা দিন কখনো ঝিপ-ঝিপ, ঝুপ-ঝুপ, কখনো একেবারে গড়গড় করে বৃষ্টি পড়ে, থামবার নামগন্ধ নেই। বাগানে ঘরবার উপায় নেই, জোঁকের উৎপাতে আর রক্তচোষা ডামডিমের ভয়ে। সারের উলিডেন বোড়া



## পিউরিটি বালি শিশুদের এত প্রিয় কেন?

কারণ পিউরিটি বালি

- ১) খাঁটি গরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুরা খুব সহজেই দুধ হজম করতে পারে।
- ২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বালিশস্যের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।
- ৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীলকরা কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাঁটি ও টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

## পিউরিটি

ভারতে এই বালির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

PTY 274

“মায়াদের জানবার কথা”

পুস্তিকাটির জন্ম লিখন :—অ্যাটলান্টিস (ইন্সট) লিমিটেড (ইংল্যান্ড-এ সংগঠিত)

ডিপার্টমেন্ট, এফ বি-পি-৩, পো: বক্স ২০০২, কলিকাতা-১৬

বিনামূল্যে

নিয়ে ছুটে বেড়ায় অহরহ, কে জানে কোন দিকে নদীর পাড় ভাঙছে। বৈকালে জটলা হয় আপিসের বারান্দার, আর দু'দিন, তার পরই নির্ধাৎ জল ঢুকে দক্ষিণ দিকের নতুন চায়াগাছের বাগানে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল সেদিন, কেন মরতে এলাম-এখানে? দু'বছরের মধ্যে বাড়ীর একটা খবর নিইনি, নিজের খবরও দিইনি, মা বেটা হয়ত কৈদে কৈদে অনর্থ করে তুলেছে। দেব একখান চিঠি।

আবার রাতে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি, না শালা, যা চুকিয়ে দিয়েছি যাক। তা'ছাড়া চিঠি পাঠে করব কি করে? ডাকওয়ালা ভ' এখন যেতে পারবে না! বর্ষা কাটুক, তার পর দেখা যাবে। পাশের খাটিয়ায় ধনু সর্দার পুচ্ছে। ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল, কিসের বে গৌ-গৌ আওয়াজ হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। ভয় হতে লাগল, তবে কি সিঁড়ির দরজাটা ভাল করে এঁটে দিইনি? ক্ষমতা হল না যে হারামজাদাকে ডাকি। দু'গা দু'গা বলে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলাম।

ভোরের আলো ঘরে আসতেই মাথার কাছে খাড়া-করা বসুমটা নিয়ে বাইরে এলাম, এসেই মনে হল, রাতে কেন অত ভয় করেছিল। বোধ হয় স্বপন দেখে থাকব। কীতন আর বাট নিয়ে উঠানে নেমে গেলাম। পেছনের কলাবাগানে দেখি এক-হাঁটু জল। কী ব্যাপার? খিড়কীর ছয়োরের নিচে ডুমুয়া এসে পড়েছে।

কুয়োর পাড়ে মুখ ধুয়ে, প্রতিদিনকার কাজ হু'বালতি জল নিয়ে পাকঘরে রাখলাম। খিড়কীর কাছে কতখানি জল মেপে দেখা দরকার, কি জানি আজ রাতে এখানে থাকা বাবে কি না!

খিড়কীর দরজা মানে টিনের হু'খানা পালা তার তলায় শক্ত করে দুটো খেজুর গাছের গুঁড়ি ঠেকান দেওয়া।

বলব কি বাবু, ভগবানের লীলা, জলে মাটি খেয়ে নিরুদ্বে, গুঁড়ি কীকে মানুষ আটকে! কি করব ভেবে পেলাম না, ধনুর দিকে ফাল-ফাল করে তাকাছি। কে জানে প্রাণ আছে কি না। কোথা থেকে ভেসে এসেছে সত্যের-আধার বছরের পাহাড়ী মেয়ে। ধরে তুলতে বৃকের মধ্যে ধক-ধক করে উঠল। কি করব, ঘরে নিয়ে যাব, সেক-তাপ করব, ডাক্তারকে খবর দেব?

দুপুর নাগাদ জ্ঞান হল। হ্যাঁ বাবু, এ গল্প খুব ছোট। বে-হিসাবি মানুষ আমি, কোন কিছুই গুছিয়ে নিতে জানলাম না। খেয়ালের বেশে কখন কি করি তার ঠিক নেই। কাশী আমার কাছে প্রায় দেড় বছর ছিল। কি গায়ের রং! তেমনি চেহারা। আপনারা ত' বাবু অনেক পাহাড়ী সহরে গিয়েছেন, নিশ্চয় দেখেছেন, কেমন গুদের হয় গায়ের রং।

কাশী হাতছাড়া হয়ে গেল আমার নিজেরই দোষে। বানে ভেসে এসেছিল আবার ভেসে গেল। ওরাও ঘরে থাকবার নয় বাবু! এখন আর হুঁখু হয় না! ঐ ডাক্তারই আমার কাল হল। পয়লা নব্বয়ের শয়তান ছোকরা, ওকে ফুলিয়ে নিয়ে গেল। আমি জানতাম না তা নয়, তবে ঠিক ধরতে পারিনি, এতটা করবে তাও বুঝিনি। চার মাস তখন তার গর্তীবস্থা।

অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে প্রাণকেষ্ট, যেন সে নিরাসক্ত ভাবে তার অতীতটাকে দেখছে, যেন এ তার নিজের নয়, আর কারো কথা-আমাদের শোনাচ্ছে।

সায়েরের অর্ডারি মদ আনতে গঞ্জে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে হাতীতে চড়ে যেতে হত। চার দিনের পথ। এর মধ্যেই যে ওরা ভেগে পড়বে এ আমার ধারণায় আসেনি। বেশ মনে আছে, ফিরে এলাম মঙ্গল বার দিন বৈকালে। শাড়ি এনেছিলাম হু'খানা নতুন বাগেরচাটি ধরে, কাচের চুড়ি। সায়েরের কুঠিতে মাল পৌছে দিয়ে বেশ ডগমগ হয়ে আসছি বাড়ীতে, তখনো জানিনে ডাক্তার পালিয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই, ভাবলাম, বুঝি বাইরে কোথাও গিয়েছে। কতক্ষণ হয়ে গেল কেউ আসে না। আমি ক্লাস্ত শরীরে একবার পাকঘর, কুয়োরগা, কলাবাগান, খিড়কী সব ঘরে এলাম। কাশী, কাশী, কত ডাকলাম। না, সাড়া নেই ত'!

প্রাণকেষ্ট এমন গলার স্বর করল, যেন এখনো খুঁজছে!

সন্ধ্যা হল, ধনু এল, রোজকার মত জল তুলে পাকঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু আজ হঠাৎ ও নিজের চা করতে বসল কেন? এ দেড় বছরে ত' করেনি? আমার বৃকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই ডাকলাম—ধনু! ধনু! তুই চা করছিস কেন, কাশী কোথায়?

চা খেতে খেতে সব শুনলাম। বিশ্বাস লাগল চা, গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল যেন, পেটের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। ধনুকে বললাম, আজ চাল-ডাল নিয়ে তুই লাইনে যা। অবাক হয়ে সে তাকাল আমার দিকে, কিছু শুধাল না।

মাথায় খুন চেপে গেল আমার। কি করব? এ-ঘর ও-ঘর খুঁজলাম, না, নিজের কোন জিনিষ রেখে যায়নি। কাচের চুড়িগুলো পটপট করে ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিলাম। উনুনে ভাত চাপান ছিল, টান মেরে ডেকচিটা নামিয়ে নতুন কাপড় হু'খানা গুঁজে দিলাম গনগনে আগুনে। তাতেও মনের জ্বালা মিটল না, হাত-পা নিসপিসু করতে লাগল।

পরে আক্ষেপ হয়েছে, ইস! করকরে চারটে টাকার কাপড় না পোড়ানোই হত। সেই রাতেই মা-বাবাকে বেশি করে মনে পড়তে লাগল। ভুলেই গিয়েছিলাম দেশ-ঘরের কথা। চিঠি লিখলাম, আমি শীগগির যাচ্ছি।

আর দেখি নয়, পরদিনই সায়েরের কাছে ছুটি নিলাম হু'মাসের, বিয়ে করতে দেশে যাব বলে।

প্রথম বৌয়ের কথা শেষ করে থাকির জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছল প্রাণকেষ্ট। হ্যাঁ, বৌ বই কি, এ ছাড়া আর কি বলতে পারি, না হয় নাই বা হল মস্ত পড়ে বিয়ে। তবে যে স্তমথ বলল এদের ফিলিং একেবারেই নেই?

বাট-বাখটি বছরের বুদ্ধের এখনো কি মনে পড়ে উদ্ভত বৌবনের নিফল কামনার সেই কামিনীকে? আশ্চর্য!

আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না ভেবেছিলাম কিন্তু অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করে বসলাম, আজ প্রাণকেষ্ট, আজও কি সেই কাশীকে তোমার স্মরণ আছে?

স্পষ্ট মনে আছে বাবু! এই নতুনটিকে নিয়ে তিনটি পরিবার ত' আমি বিয়ে করলাম, ছেলে-পিলেও আছে। আরও হবে কি না সে ভগবান জানেন! কিন্তু সেই দেড়টা বছর যে আমার কি ভাবে কেটেছিল তার কথা আজও যেন মনে করতে দেশা লাগে। আমার



অত সাধের বাঁশিটা সেদিনই ভেঙ্গে ডুমডুমার জলে ফেলে দিয়েছিল।  
আর কোন দিন বাঁশি বাজাইনি।

বেলা আড়াইটে প্রায় বাজে-বাজে, মনবাহাদুর তিন পেয়লা  
চা এনে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে স্নমথ বলল, এবার তোমার প্রথম  
বিয়ে-করা বৌয়ের কথা বল দিকি প্রাণকেষ্ট! তুমি যে দেখছি সেই  
কাঙ্ক্ষীর জন্তে বুড়ো বয়সে চোখের জল ফেললে? এ্যা কি ব্যাপার!  
—বলে হা হা করে হেসে উঠল।

স্নমথের ঠাট্টায় এবার সত্যি প্রাণকেষ্ট লজ্জিত হল, কি যে বলেন  
এজেন্ট বাবু, চোখের জল কোথায় ফেললাম? আমার দুই সতীন-  
লক্ষ্মী সঙ্গী গিয়েছে তাদের জগ্নই চোখের জল ফেলিনে, আর সে ত—  
তারপর?

বহু দিন পরে বাড়ী পৌঁছলাম। কিন্তু তিষ্ঠুতে পারলাম না,  
মা নারা গিয়েছে আমি নিরুদ্দেশ হবার এক বছরের মধ্যে।  
বাপ দেশে নাই, বৃন্দাবনে। বাঁধন ছিঁড়ে গেল, সব বাঁধন ছিঁড়ে  
গেল দেশের। খুড়ো মশাই কর্তব্য সারলেন পাশের গ্রামের  
মুদুন্দ দাসের সেজ মেয়ে স্নকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে।  
নগদ হুঁশো টাকা আমি নিজেই খরচ করলাম।

প্রাণকেষ্ট নিশ্চিরুপ্রায় একখানা লালচে ফটোগ্রাফ বের করল,  
খবরের কাগজের মোড়ক হলে। বোধ হয় পুরোনো ট্রাকের তুলার  
দিকে ছিল। ছবিখানায় উল্টো পিঠে জং ধরে গিয়েছে।  
নোলক-পর্য এগারো বছরের বৌ স্নকুমারী দেখতে বোধ হয়  
ভালই ছিল। ছবি দেখে প্রাণকেষ্টের হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

বাবু, তখন আমার ডবকা বয়েস, মিথো বলব না, রঙের নেশা  
ধরেছে। তখনকার দিনে ঢুকু-ঢুকু সব জনেরই চলত এখানে।  
গগন বাবুর প্রধান সাক্ষরদ হলো আমি আর মগ্নথ। ভাবি  
এক এক সময়, শ্রায়-অগ্নায় বলে সংসারে দুটো জিনিস যদি থাকে  
আর পাপ করলে অগ্নায় করলেই যদি তার ফল ভোগ করতে হয়,  
তা'হলে ত' আমাদের নিশ্চয় ভোগান্তি হোত। কই কি হল?

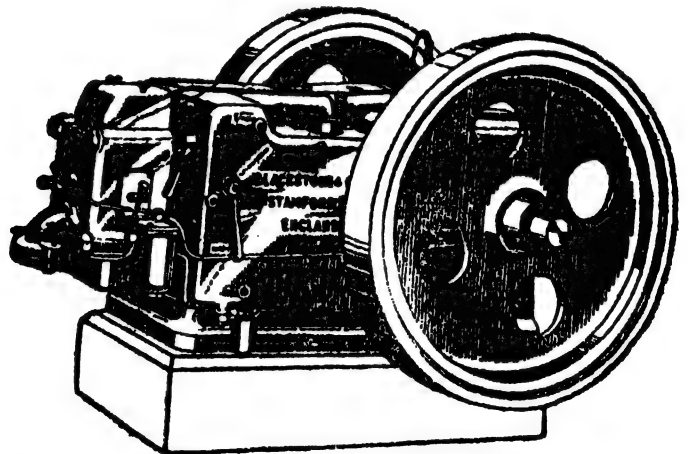
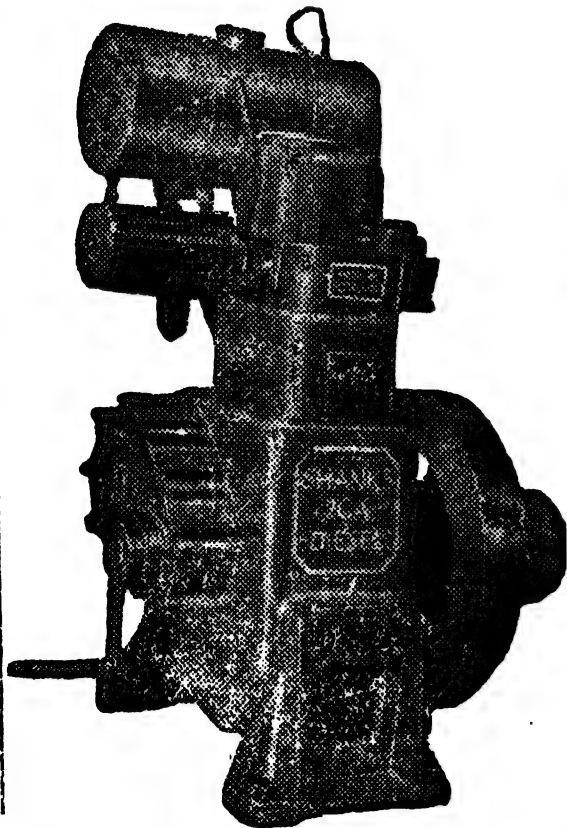
আমরা সায়েবের ভোগের আয়োজন বাড়িয়েছি, তার পুরস্কারও  
নেহাং কম পাঠিনি। তা'ছাড়া বিলাসের উপকরণ সায়েবের  
উচ্ছিষ্ট হলে পর ছিটে-ছাটা আমাদের ভাগে এসেছে, বঞ্চিত হইনি।  
যখন প্রথম বাগানে ঢুকি, মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা, সায়েবের  
কুপায় হল দেড়শ' টাকা। মগ্নথ পেত পঁচাত্তর টাকা, হলো হুঁশ  
টাকা। মগ্নথ বিয়ে করল, গগন বাবু বিয়ে করল। এখন ত  
দিকি ভরা সংসার।

বলে চলে প্রাণকেষ্ট, গরম কালের সন্ধ্যা, বোধ হয় ত্রয়োদশী  
হবে, তাই সন্ধ্যার আকাশ অন্ধকার নয়। তারা ফুটেছে। বারটা  
বোধ হয় শনিবার হবে। কুলী-লাইনে খুব মাদল বাজছে, গগন  
বাবুর বাগানে বসে আছি তিন জনে, উনিই কথাটা পাড়লেন।  
একথা সেকথা হতে হতে।

আজ্ঞা প্রাণকেষ্ট একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমি ত'  
এখানে অভিজ্ঞ লোক?

কি কাজ। খুব নীচু গলায় আলাপ হচ্ছিল আমাদের।

গগন বাবু বলল, সেদিন সায়েবের কথার ভাবে বুঝলাম কুলী



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকার্য দেশের অন্ন ও প্রাণ এবং  
আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিষ্টার, ব্লাকস্টোন  
ডিজেল ইঞ্জিন, লিষ্টার পাম্পিং সেট, শ্রাক্স ডিজেল  
ইঞ্জিন, শ্রাক্স পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :—

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যামিং স্ট্রিট, দ্বিতল কলিকাতা—১

ফোন :—২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবসায়িক সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

কামিন্দেব ওপর অকুচি ধরে গিয়েছে সায়েবের, যদি—ব্যবস্থা করতে পারি আমরা বুঝলে প্রাণকেষ্ট, আমাদের বরাত খুলতে দেবি হবে না।

আমরা তখন সায়েবের স্বাস্থ্য পান করছি তিন জনে। বুঝলেন কি না বাবু! ঝট করে মাথায় বিলিক খেলে গেল।

মন্মথ বসতে লাগল, আমাদের হাতে আপাতত কিছু নেই, ভরসা এক তোমার ওপর।

কুছ পরোয়া নেই। কিন্তু একেবারে নগদ কারবার চাই আমার। কথার খেলাপ না হয়।

ঠিক আছে, গগন বাবু, এবার যদি বিশ্ব, তুমি নাও তবে তার জায়াগ্রাণ্য তুমিই পাবে। কিন্তু আমরা যদি কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারি, তাহলে বখরা হবে তিন জনেব।

সেদিন ঐ পথস্থ। ভাবতে ভাবতে যে বার আস্তানায় চলে এলাম। গগন বাবু কথাবার্তা ঠিক করবে, কাল রবিবার, কি জানি ডাক পড়তেও পারে। মন্মথ আর গগন বাবুর তখন বিয়ে হয়নি। যাক, মওকা যখন পাওয়া গিয়েছে, ধাঁও মারতে ক্ষতি কি?

প্রথমটা খুব কালাকাটি করত স্কুমারী। প্রথম দিন কিছু বুঝতেই পারেনি, আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম কি না। এক রাতে মাত্র এক ঘণ্টার জুড়ে যদি করকরে একশ' টাকার নোট পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সামান্য সময়টুকু একলা বিছানায় কাটাতে আমার আপত্তি নেই।

চাঁৎ আশ্চর্যতায়ের ভাব নিয়ে প্রাণকেষ্ট বলে উঠল, বাবু, আপনারা ভাবছেন উঃ কি পিশাচ! বাবু, টাকাটা কি বড় নয় বলতে চান?

কি জবাব দেব, প্রয়োজনই বা কি প্রাণকেষ্টকে কিছু বলবার? ও যা বলছে বলুক। কি হবে ওকে বলে টাকা বড় কি, কি—

প্রাণকেষ্টের কথায় সচেতন হয়ে উঠলাম, বুঝলেন বাবু, এদিকে এলে মন-মেজাজ তখন অল্প রকম হত। আর হ্যাঁ, একথাও জোর করে বলব আমি, হুয়াস' অঞ্চলে যত বুড়োখুসনা দেখবেন, যে তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আছে, সব ব্যাটা ঘৃণ্য। শুধু বাগান কেন বাবু, এখানকার ক্ষুদ্রে সহরেও ঐ ব্যাপার। আপনি যতই বলুন ওর খুব নাম-ডাক, মানা মানুষ, বড়লোক, সমাজের মুকরির, বড় বড় ব্যবসা তার—আমার চোখকে ঝাঁকি দেওয়া বড় শক্ত! আমি বিশ্বাস করিনে। বলুক দিকি তাদের কেউ, বলুক বুকে হাত দিয়ে, হ্যাঁ নিজের বোঁ-ছেলে-মেয়ে নিয়েই সংভাবে জীবন কাটিয়েছি, বিশ বছর আগে কোন দিন কোন অবস্থাতেই অজ্ঞের সুন্দরী বোয়ের ঘরে ধাক্কা মারিনি। লাখি মেয়ে কাঠের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকিনি। তবে বুঝব হ্যাঁ বুকের পাটা, হ্যাঁ সাজা তার স্বভাবচরিত্র! —কথা বলতে বলতে প্রাণকেষ্ট রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল, গলার রগ ফুলে ফুলে উঠেছে।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, একুশি হয়ত এমন কারো নাম করে বসবে, যাকে আমরা জানি, চিনি—শ্রদ্ধা করে পাঁচ জনে। এ প্রসঙ্গ এখনি বন্ধ করতে হয়।

সুমথ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, আরে ধেংতেরি, অল্প লোকের কথায় কাজ কি? নিজের কীতি বল, তাহলেই যথেষ্ট।

হ্যাঁ বাবু তা ঠিক, অজ্ঞের কথায় কাজ কি।—বলে একেবারে হাত জোড় করে ফেলল প্রাণকেষ্ট। তা দেখুন নতুন বাবু, আপনারা কান্দে এই প্রার্থনা, আমাকে পানও বলে ভাববেন না। আমি ত' বলি, ভগবান, কৃতকর্মের ফল সবাই ভোগ করুক। আমিও বাদ যাব না, তা জানি।

আমি আর সুমথ সমস্বরে বললাম, থাক ও কথা বাদ দাও।

আমি পুরোনো কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বোঁ সকালে এসে তোমায় কিছুই বলল না?

না বাবু, কিছুই বলল না। তখন মনে বেশ সোয়াস্তি হল, এই ত' বাপু পোষ মেনেছ। এখন বুঝতে পারি কেন সে কিছু বলে নি। ঐটুকু মেয়ে, তার মনে কি খেঁজ! এর পরে আরও কয়েক বার তাকে যেতে হয়েছিল, শেষের বার আমি প্রায় শ' তিনেক টাকা পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা কুচবিহার থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললাম। এই বাড়ীতেই তখন নাচ-ঘর ছিল, আমরা হয় ছ' মাস, নয় ত তিন মাসের কড়ারে নিয়ে আসতাম। শুধু সায়েব নয়, আমরা কেউই তার পেসাদ থেকে বঞ্চিত হই নি। নয় বছর উইলিংডনের আঙারে কাজ করেই তার পর এল সেভিল। এক দিনকার ঘটনা বলি।

ঠাটা করে অনেক দিন বাদে একবার বললাম স্কুমারীকে, দেখেন না কি নতুন সায়েবকে?

দুপুর বেলা সে তখন মেয়েকে ভাত মেখে দিচ্ছিল দুধ দিয়ে। ইদানীং আর চূপ করে থাকত না, কথায় কথায় জোর উত্তর করত।

আমার ঐ কথায় খুব রেগে গেল, বলল, কেন বাবুদেরও ত বোঁ আছে, তাদের রঙ কাল বলে বুঝি মান রক্ষে হবে না? আজও মেয়েমানুষ আনতে পার নি নাচঘরে? হুসপ্তা হয়ে গেল সায়েবকে উপোসী রেখেছ! চশমখোর কোথাকার! টাকাটাই সব হল? বলে আমার দিকে কি অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই সে তাকাল!

আবার সেই ভাবে বসে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল। আমি আর খাঁটলাম না। সেদিন খেতে বসে কোন কথাবার্তা হল না; মনটা কেমন হল। বিকেলে মন্মথের সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে গেলাম। লুকিয়ে-চুরিয়ে বুনো শূয়ারটা হরিণটা এখানে যাদের বন্দুক আছে তারা মারে। হয় বিট অফিসারকে নেমস্তম্ভ করতে হয়, নয় ত' টাকা কামাই হলে বখরা দিতে হয়।

ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পাইনি। নিজেই ধরাধরি করে বাজ প্যাটার্ডলো কুয়েতলায় এনে রেখেছিল। মেয়েটাকে কবুল দিয়ে ভালো করে ভড়িয়ে এক পাশে শুইয়ে রেখেছিল, সব সুনলাম গগন বাবুর কাছে। যখন ফিরলাম এগারটার সময়, একটা বুনো শূয়ার মেয়ে নিয়ে দেখি গগন বাবু, ধনু বসে আছে আমগাছটার কাছে। খড়ের চাল, তার চিহ্নমাত্রও নেই। কাঠের ঘর পুড়তে বেশি মেহনত লাগেনি, তখনো গনগন করছে আগুন। এসময় ত' বাতাস থাকে না, শীতকাল, তাই রক্ষে আশে-পাশের বাড়ীতে আগুন ধরেনি। দেখে-শুনে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল, শুধোতে চাইলাম স্কুমারীর কথা, মেয়ের কথা। গলায় স্বর কুটল না। গগন বাবুর দিকে তাকাতেই তিনি আমার কাঁধে হাত

রেখে বললেন, মেয়ে আমার বাড়ীতে আছে, চল আজ ওখানেই থাকবে।

অনেক কষ্টে ফিস-ফিস করে শুখোলাম, আর ?

আর ? আর সব শেষ!

প্রাণকেষ্ট একনাগাড়ে তার দ্বিতীয় কাহিনী শেষ করে দম নিল। যেন সেই, সেই সময়ের মত এখনো স্বর ওর গলা থেকে বেরোতে চাইছে না। জোর করে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বাবু, আমার দোষ নেবেন না, যদি ধূমপানের কিছু পাই তাহলে একটু—

নিশ্চয়, নিশ্চয়! স্তম্ভ খালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরল প্রাণকেষ্টের সামনে, আমিও একটা নিলাম।

আশ্চর্য! এর পরেও কি করে ভাবে প্রাণকেষ্ট ভোগান্তি ওর হয়নি? চল বারান্দায় গিয়ে বস। যাক, আমি প্রস্তাব করলাম। দম বন্ধ করা কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদেরও যেন দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

আঃ খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলাম! প্রাণকেষ্টের কাহিনী ত' এখনো শেষ হল না, হয়ত অনেক বাকি। আমার বারান্দায় জাঁকিয়ে বসে বৈকালিক চা-পর্ব সমাপন করবার বাসনা ছিল কিন্তু স্তম্ভের বিপরীত ইচ্ছা। সে বলল, চল চা খেয়ে একটু ইভনিং ওয়াক্ করে আসি, সারা দিন ঘরে বসে আছি।

তথাস্ত! তাহলে ধড়াচুড়া পরে নিতে হয়।

নিশ্চয়, বলল স্তম্ভ, কিন্তু প্রাণকেষ্ট তুমি ত' গরমের কিছু আনোনি বাবু! স্তম্ভের চোখ সব দিকে।

সঙ্গত হবে কি না চিন্তা না করেই আমি বললাম, চল স্তম্ভ, বেড়াতে বেড়াতে প্রাণকেষ্টের বাড়ীর দিকেই যাওয়া যাক।

তা মন্দ নয়, বলল স্তম্ভ, আমাদের সাফা-ভ্রমণও হবে আর প্রাণকেষ্টের গরম জামাও নেওয়া হবে।

আমি ভাবছিলাম, আজ প্রাণকেষ্ট রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আমাদের গেষ্ট হোক।

এক্সাক্টলি সো! তোমাকে ভাবতে হবে না কান্না, আমি ঠিক করেই রেখেছি।

ঠিক আছে। আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। ফ্যাক্টরীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অনেক বাবুদের ঘর-বাড়ী দেখলাম, কুলকামিনী হ'—এক জনকেও চোখে পড়ল। যাক্ সে সব কথা।

দ্বিতীয় বিবাহ এবং নিরবচ্ছিন্ন অনেক দিন এই জীবিত অবস্থার ন'টি সম্ভানের জন্ম ছাড়া প্রাণকেষ্টের এই সময়টায় কোন বৈচিত্র্য নেই। সাত মাস আগে নবমটির জন্মদান কালে দ্বিতীয় জীবিত মৃত্যু হয়।

তার পরই যথারীতি নাবালকদের লালন-পালন করবার জন্ত প্রাণকেষ্ট তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেছে না কি বাধ্য হয়ে! কিন্তু এখানেই প্রাণকেষ্টের অজ্ঞাতসারে এমন একটি মারাত্মক অপরাধ হয়েছে যে সে না কি কিছুতেই মন থেকে খটকা দূর করতে পারছে না।

কি সেটা?

সত্যি বাবু, বললে পেতায় যাবে না, আমি আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, এ লুকোচুরির মধ্যে আদপেই ছিলাম না। তবে হ্যাঁ বলতে পারেন মরতে তুমি আবার বিয়ে করলে কেন?

কি করব বলুন, ঐ হৃদয়ের বাছীদের জাখে কে? বলবেন, কেন তোমার বড় বড় মেয়েরা আছে। তা আছে কিন্তু তাদের কি নিজের নিজের সংসার নাই?

আমরা অভয় দিয়ে বললাম, না বাবু, তুমি তিনটে কেন আরও বিয়ে কর। আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার মত মানুষের মনেও হঠাৎ অপরাধের ভয় কি করে ঢুকল, সেইটে আমাদের বল!

হ্যাঁ বাবু সেই কথাই ত' বলব, পরামর্শ দেন আমি কি করব। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, এ বয়সে কে আর মেয়ে দেয়? তাই ভেবেছিলাম দুঃস্থ বিধবা-টিধবা যদি পাই তাহলে—আমার ঘরে ভগবানের ইচ্ছায় দুটো ভাতের অভাব ত' নেই। তা ছাড়া মা-মরা কাচাকাচাগুলোকেও মানুষ করবে, আমারও দুটো ভাত-জল করবে।

মনে মনেই বললাম হ', তুমিও ভগবানের ইচ্ছে মান দেখি!

প্রাণকেষ্ট বলে চলে, তা কুলিখানার সদরীকে বলেছিলাম কথাটা। সে আমার গেরামের লোক। আমাকে খবর দিল তার সন্ধান মেয়ে আছে। তবে সে বিধবা নয়, তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছড়ি হয়ে গিয়েছে, মা-বাপের এমন সঙ্গতি নাই যে মেয়েকে পোষে। তা আমি বললাম, মা-বাপ এসে থাকলে আমার কোন আপত্তি নাই। হ্যাঁ বাবু বুঝলেন কি না, আগের পক্ষের সঙ্গে মেয়ের ছাড়াছাড়ি মানে একেবারে ডায়ামিটার হয়ে গিয়েছে।

ডায়ামিটার! সে কি?

স্তম্ভ একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল, এ্যা প্রাণকেষ্ট একেবারে ডায়ামিটার? সেই মেয়েকে তুমি পছন্দ করলে?

—তাতে আর কি বাবু, আগের পক্ষের সঙ্গে যখন কোন সম্বন্ধই নাই। ও, বুঝলাম। ডায়ামিটার অর্থাৎ ডাইভোর্স।

প্রাণকেষ্ট স্তম্ভের হাসির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। যাক্ গে, ফি-ই বা লাভ হবে এই ভুলটুকু শুধরে দিয়ে। তাই আর কিছু বললাম না।

কথা পাকাপাকি হয়ে যায়নি তখনো, বলল প্রাণকেষ্ট, এই গত শ্রাবণ মাসে হঠাৎ এক দিন দুপুরবেলা আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি, এক জন মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে বেলা ছ'টা থেকে। কি ব্যাপার? কারও আসার কথা ছিল না। সে মেয়েই আমাকে শুখোলো, আপনার জগ্গেই কি কুলিখানার সদরী মশাই পাত্রী খোঁজ করেছিলেন?

আমি ত' তাস্তব বনে গেলাম, হ্যাঁ কিন্তু আপনাগা বিশ্বাস করতে চাইবেন না বাবু, সে মেয়ে নিজেই বলল 'আমায় আশ্রয় দিন, মা-বাবাকে বাঁচান দয়া করে।'

একেবারে আমার পায়ে হাত দিতে আস। আমি ত' হা-হা করে উঠলাম। বললাম, বেশ থাক। সত্যি বলছি বাবু ও, ওর মা-বাবা সবাই যদি এমন থাকতে চাইত আমি মানা করতাম না। সে নিজেই বলল, 'না এমনি থাকতে পারিনি, আপনি সত্যি করে আমায় বিয়ে করুন, মা-বাবাকে আসতে আজই চিঠি লিখে দেব, আমি অনেক কষ্ট করে এসেছি, দয়া করে একখানা পোষ্টকার্ড দিতে পারেন।'

আমি ততই অস্বাভাবিক হচ্ছি বাবু, এ মেয়ে তাহলে ত' লেখাপড়া জানা। আজ্ঞা বাবু, আপনারা বলুন, সে ত আমার চেহারা, ঘর-বাড়ী বাচাকাচা সবই নিজের চোখে দেখল। তবে কেন এই বুড়োকে যেচে বিয়ে করবার জন্তে সাধাসাধি করল? আমার বিয়ে করাওতেই

কি অজায় হল? আর এই হুঃস্থ মেয়েটিকে ঘরে ঠাই না দিলেই কি জায় হত? আপনারা বিদ্বান মানুষ, বিচার করে বলুন।

আমি আর স্তমথ জিজ্ঞেস করলাম—কেন এই নিয়ে কি গোলযোগ হয়েছে কিছু?

প্রাণকেষ্ট উত্তর দিল, গা বাবু হয়েছে, কিন্তু বিয়ে যখন করেই ফেলেছি, আর ত ফেলতে পারিনি?

কথা বলতে বলতে আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি।

প্রাণকেষ্টই বলল, ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন বাইরে কলাবাড়ি। এঁটে আমার বাড়ী। চলুন বাবু, গরীবের বাড়ীতে একটু চা খেয়ে আসবেন।

এই ত চা খেয়ে বেরোলাম, এখন আর নয় প্রাণকেষ্ট, আর এক দিন আসা যাবে। তুমি চট করে চাদর-চাঁদর একটা নিয়ে এস। আমরা এখানেই একটু পায়চারি করি—স্তমথ বলল।

প্রাণকেষ্ট চলে গেল।

দুঃখ তোমার প্রাণকেষ্টে ভাই স্তমথ! আমার আশ্চর্য লাগছে। এত বিচিত্র রকমের ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে! কিন্তু সত্যি কি তুমি মনে কর ওর ফীলিং নেই?

আমার ত তাই মনে হয়। নইলে যে মেয়েগুলো ওর জীবন থেকে খসে পড়েছে তাদের জন্তু ওর মনে কোন দাগ নেই কেন?

কে বলল দাগ নেই স্তমথ! আমার ত মনে হয়—

কথা শেষ করতে দিল না, স্তমথ থামিয়ে দিয়ে বলল, জাট ইজ এনাক, ঐ দেখ এসে পড়েছে। চল এবার ফেরা যাক।

প্রাণকেষ্ট অহুযোগ করতে লাগল, আপনারা গেলেন না?

ঠিক আছে, এবার এলে যাব, বললাম আমি।

আর গিয়েছেন, এ স্তমথগটা হারালাম। জানেন বাবু, নতুন বৌ আমায় খুব যত্ন-আন্তি করে।

শেষ ত, ভাল কথা। তবে এটি যে কিছুক্ষণ আগে কি বলছিলেন অপরাধ টপরাধ?

হ্যাঁ সে পাতকের কথা আর বলবেন না। চেহারা যদি দেখতেন তাহলেই বুঝতেন, এ আমাদের ঘরের মেয়ে নয়, ভদ্রলোকের ঘরের।

তা তুমি কি অভদ্র?

না, তা বলছিনে, দোষ আরও গুরুতর। বলি শুনুন। আমি দৃগাক্ষরেও এর বিন্দুবিদগ্ধ জানতাম না। মেয়ের মা-বাবা এল চিঠি পেয়ে। দিন স্থির হল।

সন্ধ্যার লগ্ন। সামাগুই আয়োজন। আমাদেরই হু-চারজন চেনা-জানা লোক উপস্থিত আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে ত

হবে, বিয়ে পড়াবে কে? পুরোহিত কোথায়? মেয়ের বাপ বলল, সে সব ভাবতে হবে না। আমি মনে করলাম, ওদের সঙ্গে যে দুঃজন লোক এসেছে, হবেও বা, তারা কেউ পড়াবে। ছাঁদলা তলার বসেছি, ওর বাপই মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেওয়া। বাবু ওরা বায়ুন!

শেষের কথাটা বলতে বলতে বৃদ্ধ প্রাণকেষ্টের স্বরে আতঙ্কের আভাস ফুটে উঠল। বলল, বিয়ের আগে যদি জানতে পারতাম! সকাল বেলায় বাগানের সকলে যখন কথাটা শুনলো আমায় ত গালমন্দ করতে লাগল। আমি আর কি করব বলুন? বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে। কিন্তু বাবু, মহাপাতকের কাজ করেছি। আমি সাহা হয়ে বামুনের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করলাম! ছি, ছি!

অহুশোচনা শুরু হয়েছে বুড়ার।

তাতে আর কি হয়েছে, আজ-কাল ও-রকম কত হচ্ছে, অনেকেই জাত-ফাত মানে না। এত ভাববার কি আছে? সান্ত্বনা দিয়ে বলল স্তমথ।

না বাবু, আগে যা করেছি, করেছি। সে নিজের এক্তারের মধ্যে ছিল। কিন্তু—আমি ফস করে বলে ফেললাম—তবে বোধ হয় এত দিনে তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ হচ্ছে।

হ্যাঁ কি রকম যেন কষ্ট হয়ে উঠল প্রাণকেষ্ট। পরক্ষণেই আত্মগত ভাবে বলল, ঠিক বলেছেন বাবু, হয়ত তাই। কিন্তু আমি ত ইচ্ছে করে বা জোর করে এ মেয়েকে ঘরে আনিনি, সে আপনি এসেছে, তাতে আমার অজায়টা কি, বিচার করুন।

একটু থেমে আবার আন্তে আন্তে সহজ ভাবে বলল, বুঝলেন বাবু, মা মেয়েকে বলে তুই এ কি করলি? জাত খোয়ালি বলে আমিও কি শেষ বয়েসে ওদের হাঁড়ি হেসেলে খাব? কান্নাকাটি করে; মা ভালোদা রেঁধে খায়। মেয়ে কিন্তু আমায় খুব যত্ন-আন্তি করে।

কথা বলতে বলতে প্রাণকেষ্টের মুখখানা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে, এ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যদিও অন্ধকারের দরুণ মুখখানা ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ওর এই প্রসন্নতা আমাদের দুঃজনকেই বিস্মিত করল।

ওর জীবনের বিচিত্র ঘটনার ভীড়ের কথাই মনে পড়ছিল আমার থেকে থেকে, লালমাটি ছেড়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। ওজা এখন কি কবে সম্ভব বলতে পার স্তমথ, জিজ্ঞেস করলাম আমার দিন গাড়ীতে উঠে, প্রথম জীবনে যে নিজের বৌকে সায়েবের বাড়ী স্বয়ং পৌছে দিয়েছে অম্লান বদনে টাকার লোভে, আজ সে উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করে এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেন?

ওটা প্রেজুডিস ছাড়া কিছু নয়, বয়েস হয়েছে ত!

ওধুই কি তাই? হবেও বা!

## কৃষ্ণ

### শ্রীপ্রজেশকুমার রায়

কৃষ্ণমণ্ডে তুমি কৃষ্ণ,  
অন্ধকারে তুমি কৃষ্ণ,  
কৃষ্ণ তুমি মৃত্যুর গাহিত্তে,—  
সবার অন্তে কৃষ্ণ,  
কৃষ্ণ তুমি সবার আদিত্তে—  
আদি-অন্ত-হারার সুর  
বাজে কৃষ্ণ তোমার বাঁশীতে।

# দেখুন! অন্ধকণী স্যানিটাইট সাবানেই এসব কাজ হয়েছে!

অতিরিক্ত ফেণার দরুণই  
এ সম্ভব হয়



সাঁ ন লাই ট  
সা বা ন

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

S. 249-X52 BG







# পত্র প্য

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১২

নরেন এবং সাধনা দুজনারই ভিতরে ভিতরে কিছু একটা আশপাশ হয়ে গেছে যেন। চিক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে কথায় কথায় একদিন যে অসম্ভব মুখোমুখি হয়েছিল, মনে মনে তার জন্ত দুজনেই কুণ্ঠিত তারা। সেটুকু মুছে ফেলার ব্যগ্রতাও তাই দুজনারই সমান। হাসিমুখি চপলতায় মধ্যে পরস্পরের মনোবন্ধনের স্থল আগ্রহটুকুর প্রকাশ নেই, অসুভাষিত আছে।

সাধনা ভাবে, ভাগ্যে মাসির বাড়ি গিয়েছিল, নইলে কি লজ্জা, কি লজ্জা। ও লজ্জা বৃষ্টি আর জীবনে কাটতে ওঠা যেত না। মনে মনে সঙ্কুচিত নরেনই বেশি। কি না কি কথা একটা, তাই শুনে একেবারে দেউলের মত ওদের বাড়ি থেকে উঠে এসেছিল। নিজের সেই দৈন্তা গুণও বিসম লজ্জার কারণ।

কিন্তু মাসির বাড়ি গিয়েছিল বলে আজ নরেনই মনে মনে খুশি বেশি। এই বাড়িতে আশপাশের দরুনই নয় শুধু। দেউমাসের মেয়েটা বদলেছে অনেক। নতুন সবুজের মত ফিরে উজ্জল হয়ে উঠেছে আবার। গোড়ায় যে মেয়ে নড়াইয়ে এসেছিল তেমনি। বরং তার থেকেও বেশি। মাঝখানে ওই উজ্জল প্রাচীর নারীচতনার কানায় কানায় বাধা পড়ে আসছিল। কান্য তাইই। কিন্তু ওই থেকেই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। সংশয়ও।

কিন্তু সে অধ্যায় একেবারে মুছে গেছে এখন। চতনার বাধ ভেঙেছে। নিজেকে আগলে রাখার কারিগরী ভুলেছে। দেউমাসের শূন্যতা ভরাতে তিনগুণ উপছে উঠেছে। হাসে গল্প করে, হৈ-চৈ করে। রাগালে রাগে, চোখ রাঙালে ডবল চোখ রাঙায়। বেড়াতে বেরোগ দুজনে। পুরানো জায়গায় নতুনের ছোপ লাগে। শাল-মহুরার দিকে যায়, পাহাড়ের দুর্গম কোনো পাথরে ওঠার ভীক চেঁচায় হেসে আটখানা হয় নিজেই, একসঙ্গে চা খেতে আসে ভূতুবাবুর দোকানে। নরেন বাবু কত প্রশংসা করে ভূতুবাবুর, তার কাল্পনিক ফিরিস্তি দেয় গম্ভীর মুখে! লজ্জায় মুখে গলতে থাকে ভূতুবাবু। তাই দেখে হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে নরেনের।

সাধনার আগোচরে নরেন চেয়ে চেয়ে দেখে এক এক সময়। নতুন করে আবার কাঁচা বয়সের বাহু লেগেছে ওর মধ্যে। বা এই মড়াইয়ে আর এই মড়াইয়ের পাহাড়ী পরিবেশেই শুধু মানায়।

বলেও কেলে, ভাগ্যে জায়গাটা এবকম, অল্প কোথাও হলে টি-টি পাড়ে যেত!

নিরীহ মুখে পাণ্টা প্রসন্ন করে সাধনা, খিলী মেয়ে বলত? জবাব না পেয়ে হেসে ওঠে।—আগে বা ছিলুম জানেন না, তততড়িয়ে গাছে উঠতাম বলে মাংসের হাতে কম কিল খেয়েছি!

চেঁচা করলে এখনো পারো বোধ হয় গাছে উঠতে।

না, এখন আর পারিনি, মোটা ধুমসী হয়ে গেছি।

নিজের সম্বন্ধে এমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের আনন্দেই আবার হেসে সারা। কতটা মোটা হয়েছে নরেন পরীক্ষাসূচক চোখে তাই যেন দেখে চেয়ে চেয়ে। তৃপ্ত একটা অসুভাষিত হাসি চাপা দিতে হয় তাকেও।

নরেনের খুশি হওয়ার আরও একটু কারণ আছে। সম্প্রতি অবনী বাবুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছে সে। প্রথম থেকেই এই বাড়িতে তার অব্যাহত আনাগোনা। অবনী বাবু বাড়ি থাকুন আর নাই থাকুন, যখন খুশি এসেছে, যতক্ষণ খুশি থেকেছে। কিন্তু বিবেকের আঁচড় পড়তই একটা ছোট। ভুললোক কিছু ভাবেন কি না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হন কি না কে জানে! কিন্তু নরেনের মন থেকে এখন সে সংশয়ও গেছে। কোন কারণ নেই তবু গেছে। ওর এবারের এই আসা যাওয়া এবং মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় ভুললোকের একটুখানি সন্দেহ প্রশ্রয়ও আছে। কেমন করে নরেন যেন সেটুকু উপলব্ধি করেছে।

অমুকুল অবকাশ পেলে সাধনাকে ও নিজেই হয়ত বলত। উজ্জলতার মুখে ওর বলাটা না হালকা হয়ে ভেসে যায়। সময় আনুক বলবে। সাধনা থামুক, শাস্ত হোক একটু। তখন বলবে। সত্ত অবরোধ ভাঙা তটিনীর সঙ্গে ওর তুলনা চলে এখন।

কিন্তু বেজায় রাগ হয় নরেনের এই অকাল বৃষ্টির ওপর। জলের দরুন ডামের কাজে বিঘ্ন হচ্ছে বলে চিন্তিত হয়ত হয়েছে, কিন্তু রাগ হয়নি কখনো। এ যেন এক গম্ভীরতার অমিল। দিনকতক ছিল বেশ। আবার শুরু হয়েছে। সময় নেই অসময় নেই ঝমঝমিয়ে নামলেই হল। আপিসের পর বর্ষাতি নিয়ে অবগু হাজিরা দিতে পারে। দিচ্ছে না এমনও নয়। কিন্তু সাধনাই হয়ত চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে, এই জলে কি কাণ্ড! কি কাণ্ডের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে জলের ছিটে কাঁটা কোথাও লাগল কি না অবনী বাবুর হাতে সেই পরীক্ষার সঙ্কোচ। তাছাড়া বেড়ানো বন্ধ। দিনকতক ওটাই মস্ত আকর্ষণ ছিল।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশ নির্মল। রোদ উঠেছে। কালভেজা মুখে একপ্রস্থ হাসির মত। দুপুরে রোদ থাকল না বটে, কিন্তু শীতকালের পড়ন্ত আলোর মত ভারী একটা মিষ্টি ছায়া পড়ল সর্বত্র। যে আলো আর যে হাওয়া ঘরকুনো মনকেও বাইরে টেনে আনে।

আপিস ঘরের টেবিলে আঁকার সাজ সরঞ্জাম কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখেই নরেন উঠে পড়ল শেষ পর্বস্ত। অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছে ভেতরটা। বিকেলে আবার শুরু হবে কি না এক প্রশ্নটা কে জানে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আসলে ওই আকাশ, ওই বাতাসই আর এক নিভৃতের দিকে টানছে ওকে।

সরাসরি এসে টাকে চাপল। মেন কোয়ার্টারসএ উঠে টাক ছেড়ে দিল। তার পর পা চালালো জেনারেল কোয়ার্টারসএর দিকে।

বেশিদুর যেতে হল না। যুথোয়ুথি দেখা। সাধনা অবাক।  
কি ব্যাপার, এ সময়ে এদিকে কোথায়?

সব ব্যাপারে ওর এই সহজ বিষয় নরেনের বাস্তবিক নয় খুব।  
ছদ্ম বিষয় হলে বরং খুশি হত। অত্যন্ত হালকা শ্রুতিই জবাব দিল,  
এদিকে অবনী বাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, যাচ্ছিলাম তাঁর  
বাড়ি। তুমি কি সুপারিশানে বেরিয়েছ?

জবাব না দিয়ে সাধনা ভেমনি হালকা করেই পাণ্টা প্রশ্ন করল  
আবার, অবনী বাবু নামে ভদ্রলোকের বাড়ি এখন যাচ্ছেন, আপনি  
নেই?

—আছে। নরেন ঘটা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা। দিনটা  
দেখে ভাবলাম ভদ্রলোকে কতটা হাতে এক পেরোলা চা খেয়ে  
আসি।

হেসে উঠল সাধনা। বলল, হাতের নাগালে ভুতুবাবুর দোকান  
ছাড়িয়ে এ পর্যন্ত আসছিলেন চা খেতে?

যে অবকাশের প্রতীক্ষা মনে মনে, তারই একটা হাতছাড়া হয়ে  
গেল, নরেনও সেটুকু উপলব্ধি করল মনে মনে। আর কিছু না  
হোক, শুধু বলতে পারত, ভুতুবাবুর দোকানে ভুতুবাবু আছে, ওই  
ভদ্রলোকের কজাটি নেই বলেই এত পরিশ্রম আর পণ্ডশ্রম।

বলি বলি করেও বলা হল না। সাধনা তড়বড়িয়ে উঠল, আমি  
কিন্তু এখন আর ফিরছি না, পাঁচ দিন ঘরে বসে দম বন্ধ, সেই সকাল  
থেকে বেরুব বেরব কচ্ছি—ভুতুবাবুর দোকানে চলুন আপনাকে চা  
খাওয়াচ্ছি।

চা আর না হলেও চলে। সানন্দ-প্রত্যাভর্তন এবং সন্তরণ।  
সাধনারও খুশি ধরে না। বলল, চমৎকার দিন করেছে, না? চলুন  
মড়াইয়ে নাবব, চট করে চা খেয়ে নেবেন, আমি ভুতুবাবুর পান্নায়  
পড়ে গেলে ডাকবেন জোর করে। হেসে উঠল।

ভুতুবাবুর দোকানে ঢোকা হল না।

চা-প্রার্থীর ভিড় সেখানে। এ আবহাওয়ায়  
চায়ের অজুহাতে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে।  
ওরা চুকতে পারত। আপ্যায়ন করে ভুতুবাবু  
বসার ব্যবস্থাও করে দিত। কিন্তু আপনি  
টাইমে সঙ্গিনী ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকা  
পদস্থ অফিসারের সঙ্গে না। সাধনাও বোঝে,  
বলে, আপনার কপাল মন্দ আমি কি করব!

জবাব না দিয়ে মন্দ-কপালজনিত  
মুখখানি করে তুলতে চেষ্টা করে নরেন। লোক  
না থাকলেও এ সময় ভুতুবাবুর দোকানে  
গিয়ে চুকতে ভালো লাগত না। এগিয়ে  
চলল। মড়াইয়ে নামাটা আপিসের কাজের  
অন্তর্গত। নৈতিক না হোক বাস্তবিক কৈফিয়ৎ  
আছে।

মড়াইয়ের ধারে এসে সাধনা চ্যালেঞ্জ করল,  
নামুন, কে আগে নামতে পারে দেখি।

নরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, দেখ  
মেয়ে, ভালো হবে না, জলে জলে যা হয়ে  
আছে, পড়লে ভুখন?

সে সম্ভাবনা আছে। তবু ছাড়ার পাত্রী নয় সাধনা। ঠেস  
দিয়ে বলল, আচ্ছা ভীতু আপনি, হাত ধরে নামারো?

নরেন হাত বাড়িয়ে দিল, ধরো না।

সাধনার উৎফুল্ল হৃৎ চোখ মুহূর্তের ভ্রূণ আঁটকে গেল তার মুখের  
ওপর। অনন্তরূপ এক রোমাঞ্চের স্পর্শের মত লাগল নরেনের।  
ততক্ষণে হাঁচার পা নেমে গেছে সাধনা। ফিরে দেখল আবার।  
বলল, তার থেকে হাত পা না ভেঙে আপনি বরং একটা আছাড় খান,  
লোকে দেখুক। নামবেন তো নামুন।

মড়াইয়ের সেই একটানা কর্মশ্রোত। কিন্তু রোজই নতুন মনে  
হয় সাধনার। আজকের দিনটা আরো অদ্ভুত লাগছে। মড়াইয়ের  
গহবরে মেঘলা দিনের সর্বাঙ্গ জড়ানো ঠাণ্ডা বাতাসের ছড়াছড়ি। আর  
সাধনার মন তার থেকেও হালকা।

অনর্গল কথা বলছে। এখানে দাঁড়াচ্ছে, ওটা দেখছে, পাঁচ  
কথা জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেল কি পেল না 'খেয়াল নেই,  
প্রত্যাশাও নেই। মড়াইয়ে নেমেই পাগল সর্দারকে একবার খোঁজ  
অভ্যাস। কাছে দূরে হু চোখ ঘরে এলো আজও। দেখতে পেল  
না। দূরে কোথাও আছে। আজ আর কারো কাছে যাওয়া নয়  
কারো কাছে দাঁড়ানো নয়। মড়াইয়ের বাতাসের মতই হালকা হয়ে  
শুধু ভেসে বেড়ানো।

খেয়াল হতে দেখল, চার্নিং মেশিন চলছে যেখানে সেদিকটায়  
এগোচ্ছ তারা। ও আর এখন রণবীর ঘোষের আওতা নয়। আর  
কোনো কণ্ট্রীস্টারের হাতে গেছে। অদূরে একদল কামিন ঝড়ি  
মাথায় পাথর কুঁচি সরচ্ছে। এরই মধ্যে এক নজর দেখে নিল  
সাধনা। পাঁচ মিশালি বয়সের মেয়ে সব। ওদের দিকে চেয়ে  
চাঁদমণির কথা মনে পড়ে যায় তবু। রণবীর ঘোষের পাশাপাশি  
ওকে দেখে অমনি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে


ফোনঃ  
৩৪-৪২০২

Gv

বিবাহে যৌতুক দানের  
আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিনি ভবন** হুজুর হুশনী  
মাফিকার ও পরামর্শদাতা

১০২, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলিঃ-১২



গ্রাঞ্চঃ-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

(রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

হুঁ চোখে ভয় করছিল একে। আজ অন্তত এসব আর মনে করতে চায়নি সাধনা। কিন্তু চাক্ষুণি ওর মনে লাগ কেটে আছে। না চাইলেও মনে পড়ে।

ছোট নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল। পাশের লোকটা কথাবার্তা বিশেষ বলছে না, সেদিকেও খেয়াল নেই খুব।

চাক্ষুণি মেনিন চলছে না এখন। লোকজনও বিশেষ নেই। কনভেন্সনের শেষ মাথায় অনেক উঁচুতে সেই ঘরের মত জায়গাটার দিকে চোখ গেল। ফ্রেন ওটার স্তবোণ না পেলে ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই যেখানে উঠবেই একদিন ঠিক করেছিল।

মাগ্রেভ বলল, ওখানে উঠি চলুন না ?

—কোথায় ?

—ওই যে উঁচু ঘরের মত, ওখানে।

নরেন বলল, ওখানে উঠতে গেলে পা হড়কে একেবারে বিকল্প দেখতে হবে।

যেন ছোট মেয়ের এক অসহ্য আদ্য নাকচ করে দিল এক কথায়। ভুরু কুঁচকে সাধনা মাটি থেকে কতটা উঁচু হতে পারে এক ওঠাটা একেবারেই অসহ্য কি না তাই দেখতে লাগল।

ওদিকে নরেন দেখছে, মড়াই আজ ছোট বড় অনেক অফিসারকেই টেনেছে। অদূরে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার এক আগও হুঁতিনজনের সঙ্গে চোখোচোখি হল। সাধনাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও একটু, এরাও সব হাওয়া খেতে নামলেন কি না দেখে আসি।

সাধনাও এক নজর দেখে নিল তাঁদের। বিশেষ করে বরণার বাবাকে। কিন্তু এতদূর থেকে মানুষটাকে দেখা যায় এই পর্যন্ত। পায়ে পায়ে নরেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দশ মিনিটও নয়। ফিরল আবার। তাঁরা আর একদিকে চলে গেলেন। কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে সাধনাকে দেখল না কোথাও। বিস্মিত নেত্রে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। মেয়েটা কোথায়।

টুপ করে কাছেই ছোট একটা পড়ল কি। চমকে উঠল নরেন। উপরের দিকে চেয়ে বিমূঢ়। কনভেন্সনের সেই মাথা থেকে সহাস্তে উঁকি দিচ্ছে সাধনা !

নরেন ভয়ে দিশেহারা। চিংকার করে উঠল, ওখানে কি কচ্ছ ?

তুমি চিংকার করে জবাব পাঠালো সাধনা, বিকল্প দেখছি !

—ঐগুগির নেমে এসো ! যথার্থ বেগে গেছে।

—ঐগুগির উঠে আসুন ! বেপরোয়া জবাব।

—কি দস্তি মেয়েরে বাবা ! তুমি নামবে কি না ?

—আগনি উঠবেন কি না ?

হতাশ হুগে হাল ছাড়ল নরেন। কাঁধের কোটটা আছড়ে মাটিতে ফেলল সে। ভয়ে হুশিয়ার যেমে উঠছে। কিন্তু চকিতে আরো একটা ভয়ের কথা মনে হল। এই খাড়া সিঁড়ি ধরে ওঠা যত সহজ নামা ততো নয়। ওটার থেকেও নামার সময় বিপদের সম্ভাবনা দ্বিগুণ। ওর কথা শুনে সাধনা যে নেমে আসতে চেষ্টা করেনি বলা। তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিল ফ্রেন-কেজ লাগানোর ব্যবস্থা করতে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তারপর। ওপর থেকে সাধনা হাসতে লাগল প্রচুর।

একুনি নানতে হয়ে, তাড়াতাড়ি চারদিক দেখায় মন দিল সে। হুঁচোখ যেন ছড়িয়ে গেল। বিকল্প না হোক অপকল্প বটেই। এত উঁচু থেকে কাছাকাছি বেঁধাবৈবি দেখাচ্ছে এতবড় সৃষ্টি। ওপরে আকাশ। নিচে বিজ্ঞান-পথে যুগ-যুগান্তের সাধনার বিচিত্ররূপ। সেই মহিমার সামনে হঠাৎ যেন একেবারে শুক হয়ে গেল সাধনা।

এত উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু দেখার দিকে খুব মন ছিল না। নইলে দেখত, একটা মেয়ে কোথায় উঠছে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে নিচের অনেকেই। আর মড়াইয়ের গহ্বরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছে চিক ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিও। দেখছে না ঠিক, শাড়ির আভাসে বুঝতে পারছে শুধু হুঁসাইসিকা কে।

কোনরকমে ওপরে উঠে জিব বার করে হাঁপাতে লাগল নরেন। তাই দেখে আর একদফা হেসে উঠল সাধনা। নরেন ধমকে উঠল, থামো ! আর হাসতে হবে না, এতটুকু ভয় ডর নেই তোমার ?

অন্ত সময় হলে প্রত্যুত্তরে তেমনি করেই কিছু বলত। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার স্তব্ধতার ঘোর কাটেনি এখনো। নিচের দিকেই চোখ গেল আবার। বলল, এতবড় অভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের এক কোঁটা ভয়ের কথা ভাবতেও লজ্জা।

নরেন হাঁ করে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। সেটুকু উপলব্ধি করে সাধনা লজ্জা পেল যেন। বলল, দেখচেন কি ?

—দেখছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ড !

হেসে উঠল সাধনা। দুইই থামা। চলুন।

ফ্রেন-কেজ আসতে দেখে আবারও ছেলেমানুষের মতই খুশি হয়ে উঠল সে। ওতে করে নামবে, ভাবতেও রোমাঞ্চ। হাত ধরে নরেন কেজ এ ওঠালো তাকে। ফ্রেন গুরতে লাগল। যেন বাতাস সাঁতরে চলেছে তারা। সাধনার মনে হল শরীরের রক্ত সব সড়সড়িয়ে পা বেয়ে নামছে।

ছোট কেজ। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। হাতে হাত লাগছে। কাঁধে কাঁধ ঠেকে বাচ্ছে। বাড় ফিরিয়ে চপল আনন্দে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে যখন, ওর নিশ্বাস এসে লাগছে গালে মুখে।

একটা সবল ইচ্ছাকে দ্বিগুণ বলে নরেন ভিতরে ভিতরে নিষ্পেষণ করে রাখল সারাংশ।

কেজ ভূমি স্পর্শ করল।

বিফল আরো এক নিবিড় মুহূর্ত।

কেজ থেকে মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত ধাক্কাও শুরু হুজনেই।

হঠাৎ দূরের একদিকে সামাল সামাল রব উঠল একটা। লোকজন যে ষার কাজ ফেলে উধাশে ছুটল সেই দিকে। চিংকার, চেঁচামেচি, হটগোল। এত লোক ছড়িয়ে ছিল মড়াইয়ে, এমনিতে বোকা যায় না। ওপর থেকেও তড়তড়িয়ে লোক নেমে আসছে।

সম্মিত ফিরতে নরেনও আর একটি কথাও না বলে প্রায় দৌড়েই চলল সেদিকে।

সাধনা সেখানেই দাঁড়িয়ে। মড়াইয়ের এই বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ততা চেনে। এই কোলাহল জানে।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

সাধনা আড়ষ্ট। আর্ন্ত আকুতি। কি হল? কার সর্বনাশ

হল? কিন্তু এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই। যতবার যত দুর্ঘটনার কথা শুনেছে, একই অবস্থা। চোখে দেখা দূরে থাক, নির্ভর কিছু কানে এলেও ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে থেকে থেকে। কিন্তু না দেখুক, নাজানা বা নাশোনা পর্যন্ত শাস্তি নেই।

কি হল? কে গেল? ক'জন গেল?

পিলপিল করে লোক জমছে এখনো। মড়াইয়ের ওদিকটা কালো মাথায় কালো হয়ে গেল। তবু লোক আসছে। হটগোল বাড়ছে।

দুর্ঘটনার বিবরণ জেনে আবার ফিরেও যাচ্ছে কেউ কেউ। পায়ে পায়ে এগলো সাধুনা। জনা দুই লোক ওর সামনা সামনি আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই লোক দুটো বুকল, জানতে চায় কি হয়েছে। তারা জানাল, পাথর চাপা পড়েছে একজন। পেল্লায় পাথর—সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

সাধুনার চোখে বোনা হাস, বোনা শ্রম। অর্থাৎ, কে? আমি দেখছি? আমি চিনি?

—হোপুন। নিজে থেকেই জানাল তারা, জলে জলে ধারের পাথর আলগা হয়েছিল, বোকার মত তারই তলার মাটি কাটছিল লোকটা। সবাই বলছে, ইদানীং মাথা ঠিক ছিল না ওর—ওদের বুড়ো সর্দারটা কপাল হুঁকে বস্তারক্তি করছে একেবারে—

ভিড় সরিয়ে, মরণশাস্তী পাথর নড়িয়ে, দলাপাকানো দেহটা সরিয়ে ফেলার পর এক কঁাকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এসে ওই এক কথাই বলল কুলিবাবু।—নিজের দোষেই গেল শ্রাব লোপা, ওই পাথরের নিচে বসেই তলাকার মাটি সরছিল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি অস্তমনস্বের মত ভাবছিল কিছু। ভাবছিল সেট প্রথম দিনের কথা। বহু স্বজাতি পরিজনের সেই জিনিস্ত বিক্ষোভের জ্বাবে পাখাণ গাঙ্গুলি এই একজনের সামনা-সামনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। সেদিন মড়াই-ঘেরা গোটা পাহাড়টার মতই শক্ত নিটোল মনে হয়েছিল ওকে। আজকের এই শেষ দেখলে কে বলবে একখানিও হাড় ছিল ও দেহে।

ছোটো খাটো এমন দুর্ঘটনা মড়াইয়ে আরো অনেক ঘটেছে। কাজের ভাড়াই সে বিবর্ততা কাটিয়ে ওঠাও শক্ত হয়নি খুব। কিন্তু চারদিকে চেয়ে আজ বাদল গাঙ্গুলির কেমন মনে হল এই একটা অপবাত অজ্ঞানের উজ্জমকে যেন খেঁতলে দিয়ে গেল। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সচেতন হয়ে উঠল তৎক্ষণাত। কুলিবাবুকে আদেশ করল, দোষের কথা পরে হবে, জটলা বন্ধ করে ওদের সব কাজে যেতে বলুন, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর এক মিনিটও নয়!

কিন্তু শুনেছে কে? কাজ যারা করবে তারা ক্রক্ষেপও করল না। বন্ধ জুক হল। অসন্তুষ্ট হল! জাতের অধর্মে লোক মুক্তদেহের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। যারা আছে, তারাও

জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে মূর্তির মত বসে। কুলিবাবুদের মুহু অমুশাসনে কাউকে নড়ানো গেল না। উল্টে এই সময়ে এভাবে কাজের ভাড়া দেওয়াটা প্রায় নির্ভর মনে হল ওদের সকলের কাছে।

সাধুনার কাছেও। অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে কখন। আচ্ছন্নতার বোর কাটেনি। শুক, বিবর্ণ। নিজের অগোচরে দু'চোখ খুঁজছে কাকে। খুঁজছে পাগল সর্দারকে। তাকে দেখল না। দেখল এদের! দেখল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। বেদনাবিহীন মুহূর্তে এ নিস্ত্রাণতা নির্দয় মনে হল শুধু।

চোখে চোখ পড়তে সোজা ফিরে চলল।

দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ অবনী বাবু দুঃখ করলেন। নরেনও অনেক কথা বলল। কিন্তু সাধুনার মুখে কথা নেই একটিও। পাগল সর্দারের কাছে যাব ভেবেছিল। যায়নি। যেতে পারেনি। চান্দমণির অঘটনের পরে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে পারল না। শেষের দিকে সাধুনার মন বিকল হয়ে উঠেছিল হোপুনের উপর। ওর বিসদৃশ আচরণ দেখে ভয় পেয়েছিল। আরো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভুতুবা। কিন্তু...

খমকে গেল। নিজের ভিতরটাই দেখতে চেষ্টা করল যেন। এই কি চেয়েছিল? আর্থ আকৃতিতে শিউরে উঠল প্রায়। না, এ সে চায়নি, কোনদিন চায়নি!

পাগল সর্দারের কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু মজাইয়ে এসেছে পরপর দুদিনই।

সর্দার আসেনি। ওর সঙ্গে আরো বিশ ত্রিশ জন আসেনি। কাজ শুরু হয়েছে আবার। সাধুনার মনে হয়েছে, এই কালো মানুষদের কাজের মধ্যে যেন প্রাণ নেই আর। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসে তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে, কুলিবাবু তাগিদ দিচ্ছে। তাই ওঠা, তাই কাজে লাগা।

তৃতীয় দিন পাগল সর্দার এলো। বাকি সকলেও। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে যেন নতুন করে শোকের ছায়া

ফোন ৩৪-৫০০২

সবকটি সম্মত সুন্দর ভালকার

এক মাত্র গিনি সোনার নিখুঁত গ্রাহ্যতা প্রস্তুত কারক

জুয়েলাস

কে,এল,সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বঙ্গ বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নামল আবার। কাজে ছেদ পড়ে গেল। যারা কাজে লেগেছিল, কাজ ফেলে তারাও আস্তে আস্তে জড় হল এসে।

অদূরে দাঁড়িয়ে চূপচাপ দেখছে সাধুনা। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অসন্তোষ দেখছে। কুলিবাবুদের তাড়া দেওয়া দেখছে। তারা বলছে, যারা কাজ করবে না তারা বাড়ি যাও, যখন কাজ করবে তখন এসো। এখানে এসে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ কী?

সাধুনীর ইচ্ছে হল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বলে, যে লোকটা গেছে সে ওদের গায়ের নীতির ছেলে আর পাগল সর্দারের বৃকের পাল্লার। ওদের এতবড় শোকে এটুকু ব্যতিক্রমে ড্যামের কাজের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ক্ষতি হোক না হোক তাগিদ দিয়ে ফল কিছু হল না। বরং কোভ বাড়ল ওদের। এক জায়গার ভিড় না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাছে দূরে যে যার দাঁড়িয়ে রইল বা বসে রইল চূপচাপ। দূরে একদিকে টহল দিচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সঙ্গে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, আরো কেউ কেউ আছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের চাপা অসহিষ্ণুতা তাঁদের উদ্বেগের কারণ।

পায়ে পায়ে পাগল সর্দারের দিকে এগলো সাধুনা। এ দুদিনে তার ভিতরেও পরিবর্তন এসেছে একটা। উজ্জলতার বদলে আবার সেই অন্তর্মুখি মনের গতি। স্থির, শান্ত, পরিণত।

সর্দার ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে হঠাৎ ডুকরে কঁদে উঠল একেবারে। ওকে আর কখনো কাদতে দেখেনি সাধুনা। মেয়ে হারিয়েও না। বোবা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সাধুনা।

খানিক বাদে শান্ত হল পাগল সর্দার। উবুড় হয়ে হাঁটুর ওপরের আঁধাখানা কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলল। পরে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হোপুন চলে গেল দিদিয়া—!

সাধুনা বলতে পারল না কিছু। একটা সাধুনীর কথাও না। চূপচাপ তার পাশে বসল শুধু। কাছাকাছি বারান্দা ছিল, দূরে সরে গেল আর একটু।

সর্দার আবার বলল, বাবু! সকলে বলতে লেগেছে, হোপুন বোকা ছেল—পাথরের লিচে বসে মাটি কাটতে যেয়েছিল—কিন্তু ক হোপুন মরল ছেল, কুছুতে তার ডর লাগত না!

—আমি জানি সর্দার। একটু থেমে প্রায় মুখোমুখি ঘুরে বসল সাধুনা। কিন্তু তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে আছ কেন? কাজ কচ্ছ না কেন?

মুখ দেখেই বোঝা গেল, এই ব্যাখার মুহূর্তে ওর মুখে অবকম কথা আশা করেনি সর্দার! মুহূর্তের জগ্গ তার চোখে যেন অবিবাসের ছায়া নামল একটা। বলল, তু উদের মতন আমাদেরকে কাজের তাড়া দিস লা দিদিয়া।

—না, ওদের মত দেব না। কিন্তু যে কাজ করতে করতে হোপুন মরে গেল সেই কাজটাই তোমরা বন্ধ করে বসে আছ?

দিদিয়ার এমন শান্ত কণ্ঠস্বর পাগল সর্দার আর শোনে নি কখনো। কিন্তু আজ তার এই ক্ষতর সঙ্গে খানিকটা খেদও মিশে আছে। জবাব দিল, তুবা ভদ্রজন আছিল দিদিয়া, আমাদেরকে হুং তুবা বোঝতে লাড়রি—এই ড্যাম হবে কিন্তু হোপুন আর ফিরবে না—উ চলে গেল—উ মরে গেল—আমাদেরকে হুং তুবা বোঝবি লা দিদিয়া।

চূপচাপ অনেকক্ষণ। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে সাধুনা বলল আবার, হুং না বুঝলে তোমার কাছে এলাম কি করে সর্দার! এই তিন দিন তোমরা কাজ বন্ধ করেছ, এই তিনদিনই হোপুন মরে আছে—তোমরা কাজ শুরু করলেই সে বেঁচে উঠবে। এই ড্যাম হয়ে গেলে চিরকাল বাঁচবে হোপুন, কোনদিন মরবে না। গলা ধরে আসছিল সাধুনীর। একটা উদ্গত অনুভূতি চেপে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল হোপুনের আগে আরো অনেকে এখানে জীবন দিয়েছে—হয়ত আরো দেবে, কিন্তু কেউ তারা মরবে না সর্দার, যতকাল এখান দিয়ে জল যাবে ততকাল বাঁচবে তারা। কাজ করোগে যাও সর্দার।

পায় পায় ফিরে চলল সাধুনা। কিন্তু পাগল সর্দার বিহ্বলের মত দেখছে ওকে। দুচোখ টান করে দেখছে। নিজের জরা সরিয়ে আর মর্মান্বিত বেন্দনা সরিয়ে দেখছে। তার কালো মুখ চকচকে দেখাচ্ছে আবার। নিজের অগোচরেই উঠে দাঁড়াল। তাকালো চারিদিক।

—আই! হুং—কামি ঢালা কানা!

সমস্ত শক্তি উজাড় করা কণ্ঠস্বর। মড়াইয়ের খোলা বাতাস পর্বত গমগমিয়ে উঠল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাছের লোক, দূরের লোক, নাজেহাল কুলিবাবু। সহকর্মী পরিবৃত বাদল গাঙ্গুলিও।

বিকেল। বাবা ফেরেনি এখনো। একটু বাদেই ফিরবে হয়ত। নরেন বাবুও আসতে পারে। কিন্তু ঘরে আর ভালো লাগছে না। বাইরেও লাগবে না জানে। একটা গুমোট ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে সাধুনা অনেকবার। ভাবতে চেষ্টা করেছে। এমন লাগছে কেন? হোপুন মরে গেল হুং? মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে সারাংশই পড়ছে। কিন্তু হুংটার বেন্দনাই নয়। আরো কিছু। আরো কি।

পিছনের দিকের নতুন পাহাড়ী রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে সাধুনা। দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। ছাঁসত বহুরের একটা পাহাড়ী ছেলে আপন মনে খেলছে বেশ। মস্ত একটা স্পুড়ির খোলে দড়ি বেঁধে সড়সড় করে টেনে নিয়ে আসছে। মাথুনের অভাবে বড় বড় গোটাকতক ইঁট পাথর চাপিয়েছে খোলের মধ্যে।

হঠাৎ এই-ই ভালো গেল সাধুনীর। অজ্ঞমনস্ক হতে চেষ্টা করল ওর সঙ্গে সঙ্গে। সহজ হওয়া বা সহজ কিছু করার তাড়না। সোংসাহে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়া, আমি টানছি তোকে।

নিজের হাতে ইঁট পাথর ফেলে দিয়ে বলল, নে, বাস।

দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল তারপর। ছেলেটা হাসতে লাগল হি হি করে। সাধুনাও হাসছে।

বেশিক্ষণ নয়। অদূরের মাথুসটিকে দেখেই হাসি মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে সর্কোতুকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। কাছাকাছি হতে বলল, দুগুটা ভালই লাগছে দেখতে।

সাধুনা থমথমে গম্ভীর। একে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন বিগত ক'টা দিনের এই অস্থিরতা আর অসহিষ্ণুতা। হোপুনের ওই মর্নবাতী মৃত্যুর স্তব্ধতাকে প্রায় অসম্মান করেছে এই



মামুব—এই কলের মামুব। ফস করে জবাব দিল, পরিশ্রম সার্থক হল তাহলে।

এগিয়ে চলল। মুহূর্তের জন্ত থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

—বললাম, আপনার ভালো লাগছে যখন, আমার এ পরিশ্রম করাটা সার্থক হল। পিছন ফিরে তাকিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, এই ছোঁড়া, অত নড়িস কেন? বসে থাক না চুপ করে, দেব উল্টে ফেলে।

দেখল আড় চোখে। মামুবটা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের দিকে। কিন্তু আরো কিছু বলতে চায় সাব্বনা। আরো কিছু বলতে গেলে মন ঠাণ্ডা হয়। এমন কিছু যাতে লোকটার মনে হয় তাকে গ্রাহ্য করে না ও। খাঁয়ের মাথার আর কিছু হাতড়ে না পেয়ে তার কথাই টেনে আনল আবার। বলল, আপনার ভালো লাগলে আপনিও গিয়ে ওখানে বসতে পারেন, আমি স্বচ্ছন্দে টানতে পারি।

এইবার হয়েছে খানিকটা। হুঁচর পা এগিয়ে গেল সাব্বনা। নিজের অভ্রান্তে যেন পা ফেলছে বাদল গাঙ্গুলি। বিষ্ময়ে, কোঁতুকে নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি...ওখানে বসব?

কণ্ঠস্বর বদলে ফেলল সাব্বনা। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, দয়া করে অপরাধ নেবেন না।

অর্থাৎ, আমার যা বলবার বলেছি, এবারে আপনি পথ দেখতে পারেন। কিন্তু পথ দেখার বদলে ওকেই দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। নারী বোনের মহিমা দেখছে। বিব্রত মুখে হাসল একটু, কি ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে সাব্বনা এগোতে লাগল। স্পৃড়ির খোলে বাঁধা দড়িটা হুঁহাতে পিছনে ধরা। সড়-সড় সড়-সড় শব্দ হচ্ছে। ছেলোটা বসে আছে ধ্যান গম্ভীর মুখে। ঢালু পথ, টানতে কষ্ট নেই। আর টানছে সে খেয়ালও নেই বোধ হয়। লোকটার মুখে হাসির আভাস দেখে উক হয়ে উঠছে আবার।

একটু অপেক্ষা করে বাদল গাঙ্গুলি অঙ্গ প্রসঙ্গ তুলল। থাক, তোমাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। সেদিন মড়াইয়ে ওই এলিভেটোরের ওপরে গিয়ে উঠেছিলে কেন?

ঈশং রুদ্ধ কণ্ঠে পাণ্টা প্রশ্ন করল, অজ্ঞান হয়েছে?

—হয়েছে। বিপদ হতে পারত।

—কি বিপদ?

—ওখান থেকে পড়লে তোমার আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

এরকম সুরোগই চাইছিল সাব্বনা। প্রচ্ছন্ন স্নেহে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, না গেলেই বা। ওর একটু পরেই তো পড়েছিল আর একজন, তারও আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু

— কিন্তু —

কিছুটা নিরেস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন কোব জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বাদী নিকৃষ্ট সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোব সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোবদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।


এস, সরকার এণ্ড কোং



অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাজমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০, - হুগুন-কুশলী মণিকার, গ্রাম-গিনিমাট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৬, রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা-১২

কার কতটুকু ক্ষতি হল তাতে? অন্তত, আপনার মনে কতটুকু দাগ পড়ল তার জগে?

বীতরাগের হেতু স্পষ্ট হল এতক্ষণে। মড়াইয়ে বিগত তিন দিনের ঘটনাবলী মনে পড়ল। বিশেষ করে আজ দুপুরের ব্যাপারটা। হাসতে লাগল অন্ন অন্ন।—ওই ব্যাপার!...তোমাকে আজ ওই সর্দার লোকটার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে, কি যেন বলছিলে...কি বলছিলে?

—বলছিলাম, তোমার লোক মরেছে তাতে কি হয়েছে, তাকে তো সরিয়েই ফেলা হয়েছে চোখের সামনে থেকে—এখন বড় সাহেবেদ মেজাজ গরম হবার আগে প্রাত্যাহিক সব কাজে লাগোগে যাও।

বাই বলুক, সদস্যসভা সর্দার কাজে লেগেছে, নিজের চোখে দেখেছে। বাদল গাঙ্গুলি মুহু মুহু হাসছে তেমনি। ব্যাড ফিরিয়ে গকেটকে ডাকালো চুই একবার, দেখল। গরম বলল, বৃষ্টিলাম।

হাস্তার ওপর আঁখিটুকি বড় একটা শুকনো গাছের ডাল পড়ে আছে। খেয়াল না করেই সাহুনা পেরিয়ে গেল সেটা। বাদল গাঙ্গুলিও। দড়ি বাঁধা সুরুরির খোল আটকে যেতে ছেলেটা কাত হয়ে পড়ল। হুঁজনেই ওরা ঘর ঠাড়া। ছেলেটার হাতে লাগল বোধ হয় একটু, হাত ঘবতে ঘবতে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার সারথির দিকে। সাহুনা অপ্রস্তুতের একশেষ। কিন্তু ছেলেটাকে ঘরার অবকাশ পেল না, তার আগেই ছুটে পালালো সে।

বাদল গাঙ্গুলির মজা লাগছে বেশ। নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়। শুকনো ডালটা সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। হুঁচর হাত টেনেই দড়িটা হাত থেকে ফেলে দিল সাহুনা।

—দেখলে?

মুখ তুলে সাহুনা তাকালো শুধু।

—ওই শুকনো ডালটা পথ আটকে ছিল।

—তাতে কী?

—বলছিলাম, এখন ওটা শুধু একটা বিষ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঈশ্বর উত্তপ্ত কর্তে সাহুনা বলে উঠল, তা বলে মানুষও তাই?

—মানুষের শোকটাকে যদি অমনি করে চোখের সামনে ফেলে রেখে দিই, তা হলে তাই।

সন্ধ্যাবে প্রতীবাধ করল, লোকটা মাটি-কাটা কুলি মজুর বলেই গুরুত্ব বলছেন, তব্বলোক হলে বলতেন না।

হুঁচর পা চুপচাপ অগ্রসর হয়ে বাদল গাঙ্গুলি এবারে শাস্ত্রমুখে জবাব দিল, 'আমি নিশ্চয় হলেও বলতাম। ওই লোকটার মত আজ যদি আমিও অমনি থেমে যাই, একবারও চাইব না সকলে মিলে আমার নিয়ে একটা শোকের দেয়াল গড়ে তুলুক।...গাছটা হাতে করে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু শোকটাকে তো আর হাতে করে সরিয়ে ফেলা যায় না—যায় কাজে ডুবে থেকে। কিন্তু তোমার সর্দার সেটা বুঝবে কি করে বলো, বোঝে না বলেই এ সময় কাজের তাগিদটাকে এত নির্ভর বলে মনে করে। হাসল একটু, কিন্তু তুমিও তো দেখছি তার দলেই।

ফিরে ফিরে দেখছিল সাহুনা। মনের সেই গুমোট চাপ এবারে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে, আর কীক বুঝে এবারে রাজ্যের লজ্জা যেন চড়াও করছে ওকে।

একটু এগিয়েই রাস্তাটা যেন কোয়ার্টারসএর দিকে ঘুরে গেছে।

হুঁজনেই ঠাড়া তার। মুখ তুলে সাহুনা হেসেই ফেলল। বলল, আমার মাথাও ওই সর্দারের থেকে বেশি উর্বর নয়।

নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই ভালো লাগছিল বাদল গাঙ্গুলির। মেজাজ প্রসন্ন আরো। বলল, রাগটা একটু পড়েছে দেখছি, যা বলছিলাম শোনো তাহলে—ওই ওপর জায়গায় আর কখনো উঠবে না।

শেষের ছয় অনুশাসনের ভাবনে পাঠী পল্ল কবল, সাহুনা; উঠলে কি করবেন?

—কের উঠলে এই ড্যামে আদাই বন্ধ করে দেব।

সাহুনাও ছাড়ার পাঠী নয়। বলল, এই ড্যাম করা ছেড়ে আপনাকে দিন রাত তাহলে আমাকেই পাহারা দিতে হচ্ছে।

বলেই অস্বস্তির একশেষ। তব্বলোকের হাসিতরা দুই চোখ যেন ওর মুখের ওপর আটকে আছে। সহজ কথার জবাবে হালকা কিছু বলার ঝোঁকেই বলা। অন্তত ভেবে বলেনি। কিন্তু স্তনেই মানুষটা হুঁচোখে পাহারার কাজ শুরু করেছে প্রায়।

আসন্ন সন্ধ্যায় নিজের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাঁচল। আকাশের দিকে একবার চেয়ে কোন কথা না বলে চপল পায়ে সোজা বাড়ির পথ ধরল সে।

বতক্ষণ দেখা গেল ওকে, বাদল গাঙ্গুলি ঠাড়িয়ে। তারপর গন্তব্যপথ ধরল সেও।

অনেকটা এগিয়ে সাহুনা পিছন ফিরে তাকালো একবার। ধীরে স্নেহে এগোতে লাগল তারপর। কিন্তু খুব সচেতন মনে নয়।... ভাবছে আর লজ্জা পাচ্ছে। নিজের ব্যবহারের কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আরো বেশি লজ্জা পাচ্ছে আর কিছু ভেবে। হোপুনের অমন আকস্মিক মৃত্যু মনে দাগ কেটে বসার মতই। কিন্তু সেই মৃত্যুর বেদনা শুধু নয়, এর ওপর আর একটা অসহিষ্ণু ক্ষোভে এমন করে কাটালো কেন এ ক'দিন? কাটালো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সেই ব্যক্তিগত কর্তব্যপরায়ণতা বরদাস্ত করতে পারছিল না বলে, সেই নিশ্চয় রূঢ়তা অসহ্য হয়েছিল বলে।

...চিফ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে আর কেউ হলে এমন হত? সলাজ বিড়ম্বনায় ক্রকুটি করে উঠল মনে মনে, হতই তো! কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে, হত না।

মেজাজ আজ অন্তত মোটেই প্রসন্ন থাকার কথা নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের। ছিলও না। দুপুরে মড়াই থেকে উঠে আপিসে এসেই হেড আপিসের চিঠি পেয়েছে। এক্সপার্ট কমিটি আসার দিনক্ষণের নির্দেশ। মাঝে দিন পনের বাকি।

এক্সপার্ট কমিটি ডায়ের গঠন পরিদর্শন করবেন। আলোচনা করবেন। মতামত জানাবেন।...আর, বোধ-চাকলাদারের সিমেন্ট সত্রাস্ত গোলযোগের ব্যাপারটারও নিষ্পত্তি করে যাবেন।

সরকারী কাজে এই পরিদর্শন নীতি জানা আছে। কিন্তু আন-অফিসিয়াল এক্সপার্ট কমিটির হাতে এই শেষের দায়িত্ব অর্পণ মনঃপূত নয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতা ডিপার্টমেন্টেই ভালো জানে। বাইরের কারো জানার কথা নয়। আর, এক্ষেত্রে এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যস্থতা নিষ্পয়োজন।

বাই হোক, ও গোলযোগের মুখোমুখি ঠাড়ানো আছেই একদিন,

জানেন। নরেনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলেছিল, বিকেলে বাড়ি আসতে, পরামর্শ আছে; কিন্তু একেবারে ভুলে গেছে।

সচরাচর হয় না এমন ভুল। নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা চালিয়েও ঠিক মনে পড়েনি। আপন মনে হাসছে তখনো। রোমন্থন করছে কিছু। মিষ্টি কিছু। আগে এ রকম বিশ্বস্তির আভাস মাত্রে চোখ বাড়িয়ে সচেতন করেছে নিজেকে। সেই নারী-বিষেয়ী বিবরাশ্রয়ীদের শেকল খুলে দিয়েছে। অসহিষ্ণু রোষে মুহূর্তে সে প্রজন্মের দূতকে ছিন্নভিন্ন করেছে তারা। কিন্তু এই এক মেয়ের কাছে ওরা হার মেনেছে। আলোর খারে হারমানা কীটের মত অগোচরে আশ্রয় নিয়েছে। কবে চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেকে জানেন না।

চলতে চলতে একটা অসামান্য কথা ভাবছিল বাদল গাঙ্গুলি। পায় ছেলেমানুষের মতই ভালছিল, এই মেয়েটাকে ওর মা দেখলে নারী ধ্বনি হত।

অকারণেই এইবার নরেনের কথা মনে হল কেমন। ওর সঙ্গে সেই বাপ মেয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা। এ সব কোঁড়ুল প্রকাশ করেনি কখনো। তবু জানে। কিস্তি এতদিনেও কোন সম্ভাবনার আভাস পর্যন্ত পেল না কেন? ভুরু কুঁচুত ভাবতে ভাবতে চলল। বোধ হয় সেটা সম্ভব নয়। সামাজিকতার বাধা আছে হয়ত। এমন কিছু অতি-আধুনিক মানুষ নন অবনো রায়।

নরেনের কথা মনে হতে খেয়াল হল বিকেলে ওকে আসতে বলেছিল। এতক্ষণে এসে বসে আছে হয়ত। তাড়াহাড়ি পা চালায়।

নরেন অপেক্ষা করছিল ঠিকই। গোটা দুই সিগারেট শেষ করে কানকাঠি নিয়ে পড়েছে। প্রতীক্ষা ভালো লাগছে না খুব। এই সময়ে ঠিক এইখানে বসে থাকার কথা নয় তার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো?

একটা চেয়ার টেনে বসল সামনে। হাসির আভাস। কানকাঠি কিছুটা দুর্গমে ঠেলে দিয়েছিল নরেন চৌধুরী। সেটা নিরাপদে ফিরিয়ে এনে তাকালো তার দিকে।—এত দেরি যে?

—তোমার প্রিয় বান্ধবীর জন্তে। প্রসন্ন হাস্তে জবাব দিল, ভয়ানক রাগ আমার ওপর—তুমি বসে আছ ভুলেই গেছি!

চুপচাপ নরেন কান শুড়ুঘড়ির আমেজ উপভোগ করে নিল একটু।—রাগ কেন?

—আমি একটা অত্যাচারী, পান্ডা, তাই। লোকের জগৎ কোন মায়া মমতা নেই, কুলি মজুররা মরে গেলেও কাজ আদায় করে নিই—

নরেন অবাক।—বলল একথা?

—প্রায়। উৎফুল্ল মুখে হেসে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। মেয়েটি সত্যি ভালো ছে, শেষে রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার।

মুখ টিপে হাসছে নরেনও। তবে বাহ্যিক মনোযোগ কানকাঠির দিকেই বেশি। এরকম নির্মেষ সজীবতা আগে আর কবে দেখেছে? অনেক দেখেছে। কলকাতার নেশান বিল্ডার্স লিমিটেডএ দেখেছে। এর থেকে অনেক বেশি দেখেছে। তবে নেশান বিল্ডার্স ছেড়ে আসার পর আর দেখেনি। কানকাঠি পকেটে ফেল সোজা হয়ে



উৎসবের দিনে



কে. হোডের

মুবাচিত  
প্রমাধীন সাক্ষ্য

কে. হোড এণ্ড কোং  
কলিকাতা-১৪

বসল।—সামান্যকে তোমার কমপ্লিমেন্টটা জানিয়ে দেব'খন—আরো খুশি হবে আর আরো লজ্জা পাবে। বাক, এখন এদিকের খবর কি কি বলা।

বস্তুরাজ্যে ফিরে এলো বাদল গাজুলি। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে সামনে রাখল। দিন পনেরের মধ্যেই আসছেন মহারথীরা... কে কে আসছে লেখেনি।

—আসবে তো জানা কখাই।

—কি করা যায় ভাবছি।

—সিমেন্ট কেসের ?

—হ'।

—এ ব্যাপারে তাদের মতলবটা কি না জানলে আগের থেকে তুমি ভেবে কি করবে ?

—মতলব কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন বলল, গেলেও তোমার ভাবনার কিছু সন্ধানে। ঘোব-চাকলাদারের হুঁতোগ বা হবার যথেষ্ট হয়েছে। মাসের পর মাস লোকসান খেয়েছে, অপদস্থ হয়েছে, ঘৃণ দিতে এসে নাজেহাল হয়েছে, তারপর আসল দোষী যে সেও সরে গেছে এখান থেকে—এর পরেও ভাবা যখন স্বভাব তোমার, ভাবো বসে বসে, কি আর করবে।

পরামর্শের জগৎ ডেকেছিল, কিন্তু এরকম নির্বিকার পরামর্শ বাদল গাজুলি আশা করেনি। তবু তেসেই ফেলল সেও। বলল, তোমার উপদেশ মনে রাখতে চেষ্টা করব।

একপাট কমিটি আসার প্রতিলিপি পেয়েছে ঘোব-চাকলাদার ফার্মের দ্বিজন চাকলাদারও। কারণ, এই পরিদর্শনের সঙ্গে সিমেন্ট কেসও জড়িত।

খুশি এবং আশাব্যস্ত হবার কথা।

কিন্তু কর্মজীবনে দ্বিজন চাকলাদার এত অসহায় আর কখনো বোধ করে নি।

তিন মাস হতে চলল পাটিনাপ নিরুদ্দেশ। রণবীর ঘোষের খবর বার্তা দ্বিজন চাকলাদারও যথার্থই জানে না। এই তিন মাসে ক্রমাগত কলকাতা এবং মড়াইয়ে ছোট্টাছুটি করে কালঘাম ছুটেছে। মড়াইয়ের কাজ শেষ হলে রণবীর ঘোষের সঙ্গেও সম্পর্ক বরাবরকার মতই শেষ করে দেবে, জানা কখাই। অনেক হয়েছে, আর নয়। কিন্তু সচল বর্তমানে সামাল দেবে কি করে, ভেবে পাচ্ছে না।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে তার হ' দশ দিন ডুব মেরে থাকাটা নতুন নয়। আগেও এরকম করেছে অনেকবার। ওই সদাঁরের মেয়েটাকে সরানোর পরেই তো নিখোজ হয়েছিল পনের দিন। কিন্তু তিন মাস অভাবনীয়... বিশেষ করে এই সংকটের সময়। এখান থেকে সে যাবার আগেই হাবভাব দেখে বুঝেছিল, কিছু একটা মতলব কাঁদছে। সে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ওই মেয়েটার জগৎ, সঠিক বোঝে নি। এর পর মড়াইয়ে আর আসা সম্ভব নয় তার পক্ষে ঠিকই। এমন কি কলকাতায়ও কিছু দিন তার গা-ঢাকা দিয়ে থাকারই কথা। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাকেও একটা খবর পর্যন্ত

দেবে না, এমন দারিদ্র্যজ্ঞানশূন্যতা ভাবা যায় না। ওই মেয়েটাই উল্টে যাহু করল না কি শেষ পর্যন্ত!

রাগে আর হুচিন্তায় জ্বলছে দ্বিজন চাকলাদার। মনে মনে বুঝেছে হাতের টাকা নিশেষ না হওয়া পর্যন্ত রণবীর ঘোষের আর টিকি দেখা যাবে না। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ঘৃণ দেবার জগৎ আনা সেই তিরিশ হাজার টাকা তার হেপাজতেই ছিল। লোবটা অপচয় করত, কিন্তু টাকা-পয়সার গরমিল করত না কখনো। তাই এদিকটা ভাবে নি দ্বিজন চাকলাদার। মাত্র তিরিশ হাজার নিয়ে সরে আজও পড়বে না। শেষ করে তবে আসবে।

কিন্তু হ' চার দিনের মধ্যেই ছোট্ট মড়াইয়ে আর একটা খবর ছড়ালো।

আর কাটা যায়ে ভুগের ছিটে পড়ল দ্বিজন চাকলাদারের।

খবরটা মহাসমারোহে রাষ্ট্র করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জী। স্বরণার মা।

মায়ের ওপর মেয়ের রাগ পড়েছে এতদিনে। চিঠি লিখেছে।

কোথা থেকে ?

—আর বলা কেন কাণ্ড ! যেখানে যাচ্ছেন আনন্দে আর গর্বে ডগমগিয়ে উঠছেন মহিলা।—একবারে সেই বিলেত থেকে—লগুন থেকে ! বিয়ে ? ও মা বিয়ে করেই তো গেছে ! জামাই মস্ত বিদ্বান, এখানে অবশ্য চাকরীটা তেমন ভালো করত না, কলেজে প্রোফেসরি করত একটা। কিন্তু অত বিদ্বান ক'দিন আর ছাইচাপা থাকবে ? যারা কদর বোঝে, তারাই ডেকে নিয়ে চাকরী দিয়েছে। শুধু তাই ! মেয়েটা পর্যন্ত সেখানে কি একটা চাকরীতে লেগে গেছে। তাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা !

আনন্দে গর্বে মিসেস চ্যাটার্জী হেসে-কঁদে সারা। চেনা মুখ মাত্রই সবিস্তারে স্মরণের জানিয়ে দিলেন। স্বামীর ওপর হুকুমজারী হল, আপিসমুখ লোক যেন অবিলম্বে জানতে পারে খবরটা। শুধু তাই কেন, বেশ ভালো করে একটা পাটিও তো দিতে হবে সকলকে !

মনে মনে বিশ্বাস করল না শুধু হ'জন। স্বরণার বিলেত যাওয়ারটা নয়, প্রোফেসরকে বিয়ে করটা।

একজন ভুতুবাঁবু। অল্প জন দ্বিজন চাকলাদার।

ভুতুবাঁবু হাসল মনে মনে। আর দ্বিজন চাকলাদার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সব ক'টা ব্যাঙ্কে নোটিস দিল, একলার দস্তখতে রণবীর ঘোষ আর যেন এক পরস্যাও না তুলতে পারে। অথবা, তার নির্দেশ ছাড়া কোথাও যেন তাকে টাকা না পাঠানো হয়। রণবীর ঘোষ শেষ কত টাকা তুলেছে না তুলেছে, তারও হিসেব চোরে পাঠালো সে। --বিলেত যদি গিয়েই থাকে, তিরিশ হাজার টাকা হ'জনের পক্ষে বেশি দিন নয় খুব। ক্ষতি যা হয়েছে, হয়েছে—দ্বিজন চাকলাদার এবারে ভালো হাতে শিক্ষা দেবে তাকে।

মড়াইয়ের আকাশে এমন ঘনঘটা এর আগে আর দেখে নি কেউ। ক'টা দিনের জগৎ মাত্র বর্ষণ ছেদ পড়েছিল একটু ! আকাশ আজ যেন এক অদ্ভুত কালোর বড়বস্ত্রে মেতেছে।

মিসেস চ্যাটার্জী অর্ধাং স্বরণার-মায়ের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়েছিল সামান্য। 'ভিন্ন মূর্তি মহিলার'। মেদবহুল দেহে অত

আনন্দোত্তেজনা যেন ধরে না। ওকে ধরে বেঁধে ঝাড়া একঘণ্টা মেয়ের সমাচার শুনিয়েছেন। এই মেয়েটার কাছেই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন একদিন। এটা তারই জের সাধনা বোঝে।

আকাশের অবস্থা দেখিয়ে কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে এসেছে। শুধু সাধনা নয়, ঘরমুখি হয়েছে সবাই। অল্প অল্প বাতাস বইছে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকছে জলদগন্তীর। মেঘের কালো সমস্ত দিনের আলো টেনে নিচ্ছে, শুধে নিচ্ছে যেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ওই মহিলার কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দিকে চলেছে সাধনা। খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পরে ভূতুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। ভূতুবাবুর সবজাস্তা হাসি ভালো লাগেনি সেদিন। আকারে প্রকারে যা বলেছে তাও না। গলা নিচু করে বলেছে, বিলোত যাওয়া আজকাল আর শক্ত কি মা-লক্ষ্মী—গেলেই হল। ...তবে কার সঙ্গে গেছেন সেটাই কথা। অমনি একবার গিয়েছিলাম ঘোষাবাবুর পার্টনার বিজুবাবুর কাছে—ওই দ্বিভুজ চাকলানার মা-লক্ষ্মী। ভদ্রলোক শ্রদ্ধা করেন একটু আধটু ...শুনলাম যা, তাতে তো ভূতুর চক্ষু স্থির!

চক্ষুস্থির থানিক স্থির করে সেটা দেখাল ভূতুবাবু। পরে খন্ডেরের সাড়া পেয়ে উপসহার টেনে দিল চট করে।—তা গেছে যখন গেছেই, যার সঙ্গেই থাক ভালো থাকলেই ভালো, কি বলেন মা-লক্ষ্মী? আমাদের অতশত গোঁজে কাজ কি—

মহিলার সকল দোষ সকল অপ্রিয় আড়ম্বর মন থেকে মুছে গেছে সাধনার। আ-হা, যা ভাবছেন মহিলা, তাই যেন সত্যি হয়। ...ওর এত আনন্দ এত আশা আবার যেন বার্থ হয়ে না যায়। ভূতুবাবুর কথা মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক।

বাড়ি ফিরতে হাঁপ ফেলে বাঁচলেন অবনী বাবু। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বকাবকি করলেন একপ্রস্থ।—এ ঝড় যদি এসে যেত কি হত! কাকপক্ষী বাইরে নেই, অথচ মেয়ের যদি হাঁস থাকত একটুও!

কিন্তু ঝড় এলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। এই এক ঘণ্টা জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে সাধনা। দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘের নিচে মেঘ এসে জমছে। তার নিচে আবার। মাঝে মাঝে শুধু সেই জলদ গুড় গুড় শব্দ একটা। ভয়াল ভয়ঙ্কর, বিরাটের রুদ্র স্রব্ধ মহিমা। ওই পাহাড়, ওই মাটি, ওই গাছপালা, ওই বাতাস—সব এক মহাকর্ষের বেদনাতুর প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, সমাহিত।

সাধনাও।

ঝড় এলো। ঝড় নয়, প্রলয়। কল্লাস্ত।

জানালার বন্ধ করে ঘরের দরজার একটুখানি খুলে বারান্দার ওদিকের দেয়াল ছাড়িয়ে সেই ক্ষমাহীন লীলার দিকে চেয়ে স্থাপুর মত দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের ঝাপটায় দরজা আঁকড়ে আছে, জলের কণা ছুঁচের মত বিঁধছে মুখে। হাঁস নেই সাধনার।

মড়াই বন্ধনের অস্তিম বিদ্রোহ? পাহাড় ভেঙে পড়বে? প্রকৃতি লগুভগু করে দেবে তার আপন সৃষ্টি? ...প্রাণের পরে আজ যেন তার অন্ধ ঈর্ষা। তবু অপরূপ! সমস্ত আকাশে বৃষ্টি অজস্র সিংহের মাতামাতি হানাহানি। তবু অপরূপ। আনুখ্য হতাশ বনস্পতি পড়ছে মুখ খুবড়ে। তবু অপরূপ।

দরজা ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সাধনা। ভরে নয়, ওই বিরাটের স্পর্শে। ওই অপরূপের স্পর্শে। প্রস্তুত বসন, জলকণায় সর্গঙ্গ ভিজ, খোলা চুল উড়ছে। দুনিয়া বলসানো বাজ পড়ল একটা কড় কড় করে। দরজা আঁকড়ে তবু দাঁড়িয়েই আছে তেমনি। নির্দাক, নিষ্পলক, বোবা। কিন্তু ওর ভিতরে বলছে কেউ। বলছে কিছু। আর কাঁপছে থর থর।—থামো, থামো, থামো! আর দেখিও না, আর দেখিও না! আর দেখতে পারিনে! আর সহিতে পারিনে। ওই সর্গঙ্গাসী বিরাটের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে পারিনে! এবারে শাস্ত হও। এবারে প্রসন্ন হও। এবারে স্তব্ধ হও। শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি... হুঁচোখ বুজে এলো সাধনার। নিষ্পন্দ, বিহবল।

[ক্রমশঃ।

## ভগ্নবীণ

### শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ভেঙে গেছে বীণ ছিঁড় গেছে তার,

তবু এ বীণার স্রোণ বন্ধার,

কেন তুলে হাহাকার?

কেন আঁখি-কোণে শুধু অকারণে,

অশ্রু-বাদল বিরহ ব্যথায়

ঝরে পড়ে বার বার?

সুখের স্বপন সোহাগ যতন

গেছে যদি, বাকু, আঁখি-বিমোহন,

হাসি-সাথে বাকু মারা,

শ্রেয় যদি যায় কিবা রহে হায়

পথের ধূলার, বেদনা লুটায়,

কারা বিনে মিছে ছায়া!



# সিন্ধুপারে

শ্রীনিবাসদরজন দাশগুপ্ত

পাঁচ

১৪ নং গ্রীণস্টোম বোড—খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে যখন গিয়ে নিজের বিছানাটিতে শুয়ে পড়লাম—সত্যিই মনটা একটু হালকা বোধ হল। এ রকম হালকা মন অনেক দিন যেন পাইনি।

রাত্রে আহারের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলাম। কুটি মাখন, বড় একখানা মাছ-ভাজা এবং ধবধবে সাপা আলু-সিদ্ধ করে মোলায়েম মশণ ভাবে মাগান। সঙ্গে চা-ও ছিল। সবই বেশ সুখাণ্ড।

খাওয়া দাওয়া সেরে মিসেস ব্লেকের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলাম—সেই খাবার ঘরেই। ঘরের এক পাশে দেওয়ালে আঙুন জ্বালাবার জায়গায় একটি ইলেকট্রিক আঙুন জ্বালায় দরুণ শীতটা কতকটা সহনীয় হয়েছিল। মিসেস ব্লেকই এক রকম আমাকে শুতে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, “আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন—আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।”

বললাম “সত্যি আমি ক্লান্ত।”

চূপচাপ নিবিবিলা বিশ্রামের জগা মনটা তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মিসেস ব্লেকের “উত্তরাধিকার” উত্তরে তাঁকে “উত্তরাধিকার” জানিয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম। গিয়ে কাপড় ছেড়ে স্নান শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে পড়ার একটু পরেই নীচে থেকে টাংটাং পিয়ানোর ধ্বনি কানে এসে বাজতে লাগল। মিসেস ব্লেকই কি পিয়ানো বাজাচ্ছেন? চূপচাপ নিবিবিলা রাত্রে এই বিদেশী পল্লীতে দূর থেকে ভেসে-আসা পিয়ানোর বিদেশী স্বরে মনটা যেন নিজেরই নাগালের বাইরে গেল চলে—একটি অচেনা দেশে!

\* \* \*

সকালবেলা ঘুম ভেঙেই যেন চমকে উঠলাম—এ আমি কোথায়? অজানা, অচেনা, নির্বাসিত দেশে একটা অসহায় আকুল মনোভাবে মনটা যেন উঠল কেঁদে। সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে আমি যে তোমাদেরই নিয়ে ছিলাম—সেই আমার আলোভরা নীল আকাশের বকবকে দেশ, সেই স্বপ্নের মায়া-ভরা মিষ্টি মুখখানির অপরিচীত দরদ।

উঠে ত হবই। কোনও রকমে ভারি মনটাকে টেনে নিয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নীচে নেমে গেলাম। খাবার ঘরে চুকে দেখি—টেবিলের উপর এক পাশে একটি সাপা চাদর পেতে আমার জগা ব্রেকফাস্টের সরঞ্জাম সাজান রয়েছে। পিছনে রান্না-ঘরের দিক থেকে একটা হুন্ডু বিদেশী গানের স্বর কানে ভেসে এলো। মিসেস ব্লেকই গাইছেন বোধ হয়।

মিসেস ব্লেককে কি ভাবে ডেকে খাবার চাইব ভাবছি—এমন

সময় মিসেস ব্লেকট এসে ঘরে ঢুকলেন। আগেই বলেছি—মিসেস ব্লেক খুব দ্রুত চলে-চলেন এবং সেই ভাবেই এসে ঢুকলেন ঘরে।

হেসে আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে শুধালেন—“ঘুম ভাল হয়েছিল ত? অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুলেন।”

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, ৯টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বললাম “হ্যাঁ। আপনি খুব সকাল সকাল ওঠেন বুঝি?”

বললেন “হ্যাঁ। আমি ভোর ৫টা বাজতে না বাজতে উঠে পড়ি। সন্সারের অনেক কাজ করতে হয়। একটা যি অবস্থা আমার আছে। কিন্তু সে ঘটা দুই এর জগা এসে ঘর দোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। বাকি সব কাজই ত আমার।”

এই বলে হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন “বস্তু। এখনই আপনার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসি।”

ঘর থেকে চলে গেলেন। হঠাৎ মনে হল এত বেলা পর্যন্ত ঘুমলে বোধ হয় ভ্রমহিন্সার অশ্রুবিধা হয়, তাই ঐ ভাবে কথাটির ইঙ্গিত দিলেন আমাকে।

ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে সাজিয়ে দিলেন টেবিলে। বিশেষ কিছুই নয়। চা, হুটুকরো কুটি ও মাখন এবং একটি সিদ্ধ ডিম। খেতে অবস্থা ভালই লাগল কিন্তু খাওয়াটা একটু কম-কম মনে হত লাগল।

আমি যখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, মিসেস ব্লেক মাঝে মাঝে ঘরে যাতায়াত করছেন—এটা-ওটা-সেটা নানান কাজে। এক কীকে বললাম, “মিসেস ব্লেক। আপনি এই শীতে অত ভোরে ওঠেন কি করে?”

খিল-খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন “সবই অভ্যেস। বাধা হয়ে এ রকম অভ্যেস করতে হয়।”

শুধালাম, “আমি বেলা করে উঠছি বলে আপনার বিশেষ অশ্রুবিধা হল, না?”

বললেন “না। একদিনে আর কি এসে-যায়। কাল যে আপনি বড় ক্লান্ত ছিলেন। তবে সাধারণতঃ ৮টা থেকে ৯টা ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হলেই আমার শ্রুবিধা হয়।”

বললাম “কাল থেকে তাই হবে।”

বললেন “অনেক ধন্যবাদ।” ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গেলেন।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে সহর অর্থাৎ লণ্ডন অভিমুখে রওয়ানা হলাম—আমার ডাক্তারী পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে।

যাওয়ার সময় মিসেস ব্লেক শুধালেন, “আপনি কখন ফিরে আসবেন? ৬ টার মধ্যে ফিরে আসবেন আশা করি। আমায় সাড়ে ছটায় সাপার খাই।”

বললাম, “তার অনেক আগেই ফিরে আসব। আমার কাজ শেষ হলে লণ্ডনে আমি আর এক মুহূর্তও থাকব না।”

\* \* \*

লগুনের কাজ-কর্ম সেরে ফিরে আসতে আসতে আমার প্রায় পাঁচটা বাজল। লগুনেই মধ্যাহ্নে সামান্য কিছু আহার এবং ডেরারি ক্রশ ঠেঁগনের কাছাকাছি লায়নস্ কর্ণার হাউসে (চাইতাদি জল-যোগের দোকান) চা খেয়ে নিয়েছিলাম।

রাত্রে সাপার খেয়ে মিসেস ব্রেকের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। কথায় কথায় মিসেস ব্রেকের পরিচয়ও কতকটা পাওয়া গেল।

মিসেস ব্রেকের স্বামী বেঁচে আছেন; তিনি সূদূর মেসোপটেমিয়ায় সৈন্য বিভাগে কাজ করেন—ক্যাপটেন ব্রেক। ১৪ নং গ্রাণহোম রোড তাঁদের ১১ বছরের জঙ্গ লোজ নেওয়া বাড়ী। ক্যাপটেন ব্রেক বা মাসোহারী পাঠান তাতে এই বাজারে মিসেস ব্রেকের চানান কঠিন। তাই তিনি হুঁ-একটি ভাড়াটে অতিথি বাড়ীতে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবে বেশী দিনের জঙ্গ নয়। মিসেস ব্রেক আশা করেন যে, বছর খানেকের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বামীর কাছে মেসোপটেমিয়ায় যেতে পারবেন; এবং তখন এ বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে যাবেন চলে।

আমিও তোমাদের বিষয়ে অনেক গল্প করলাম। তোমাদের বিষয়ে কথা বলতে খুব ভাল লেগেছিল—আজও মনে আছে। তখন মিসেস ব্রেক তোমাদের ছবি দেখতে চাইলেন। উপরে শোবার ঘরে গিয়ে স্ট্রটকেশের ভিতর থেকে তোমাদের ছবিগুলি নিয়ে এসে মিসেস ব্রেককে দেখালাম। তিনি খুব আগ্রহ সহকারে সব ছবিগুলি দেখলেন—বিশেষ করে সুধার ছবি। বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, “কি মিষ্টি! কি মিষ্টি চেহার। তারপর একটু তেসে বললেন, “ছবিগুলি আজ আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি আপনার ঘরে সাজিয়ে দেবো। কেমন?”

তেসে বললাম “বেশ ত।”

পরের দিন বিকেলে লগুন থেকে ফিরে এসে দেখি, সত্যিই ছবিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমার শোবার ঘরে সজ্জা করে সাজিয়ে রেখেছেন—দেওয়ালে আঙুন আলাবার উল্লনটির উপর একটি তাক আছে সেইখানে। কেবল সুধার ছবিটি রেখেছেন—আমার প্রসাধন টেবিলের উপর। শুধু তাই নয়, সুধার ছবিটি আবার সাজিয়েছেন ফুল দিয়ে।

\* \* \* \*

মিসেস ব্রেকের বাড়ীতে দিন দশেক কাটল—এই একই ভাবে। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি সহরে চলে যাই, বিকেলে দ্রিদি, সন্ধ্যাবেলা সাপার এক সংস্কাই খাই এবং তারপর বেশ খানিকক্ষণ মিসেস ব্রেকের সঙ্গে গল্প করি কিংবা হয়ত খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

যদিও রাত্রে বাইরে প্রচণ্ড শীত, তবুও মিসেস ব্রেকের প্ররোচনায়ই প্রথম বেড়াতে বেরিয়ে দেখলাম—বেশ ভালই লাগে। গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে গলায় মাফলার জড়িয়ে, মাথায় টুপি দিয়ে, হাতে দস্তানা পরে বাড়ী থেকে বেরিয়েই খানিকটা খুব জোরে হুঁ হুঁ করে হাঁটতে হয়। এবং তারপর শরীরটা একটু গরম হয়ে উঠলেই বাইরের ঠাণ্ডাটি মধুর লাগতে শুরু করে। অবশ্য যদি বাইরে বৃষ্টির উপস্রব না থাকে। কেন না এদেশে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ শীতকালে।

এই দিন দশকের মধ্যে মিসেস ব্রেক মাত্র দুই দিন আমাকে

নিরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিনই বেড়ারাব এমনই একটি সুন্দর জায়গার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—যার কথা আমি জাবন ভুলব না। এই জায়গাটির নামই এলটাম পার্ক, যার নামে এই পর্যাটির নামকরণ হয়েছে। এমন প্রাণজুড়ানো মনোরম স্থান আমি খুব কমই দেখেছি এবং স্থানটির স্খিত আভ্রও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের বাড়ীর পিছন দিকে আর এক সারি একই ধরনের বাড়ী এবং তাব সামনে একটি রাস্তা। সেই রাস্তার ওপাশেই এলটাম পার্ক—খোলা সবুজ মাঠ অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়ে ডেউ খেলিয়ে নেমে গেছে নীচে এবং সেই মাঠের উপর ছড়ান মাঝে মাঝে বড় বড় কয়েকটি গাছ—এইমাত্র। একটা অবশ্য নাতিপ্রশস্ত কালো পায়ে-চলা পথ সেই মাঠটিকে চারি দিকে ঘিরে আছে—সবুজ শাড়ীর কালো পাড়ের মতন এবং এই রাস্তাটির ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি বেঞ্চি পাঁতা—পথিকদের বসে বিশ্রাম করার ঠাই। এই পার্কটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সাধারণত সহরের পার্ক বলতে আমরা যা বুঝি—এটা মোটেই তা নয়। ছোট-বড় ছাটাইকরা নানান বকম গাছের সারি দিয়ে সাজিয়ে, নানান রং-এর ফুলের গয়না পরিয়ে এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকু ক্ষুণ্ণ করার কোনও চেষ্টা হইয়নি বরং স্থানটির স্বাভাবিক মাধুর্যটুকু যাতে সহজেই চোখে পড়ে, সেই দিকে যেন কর্তৃপক্ষের নজর।

এই পার্কটির স্মৃতির সঙ্গে আমার সে যুগের মনের অমৃতত্বের

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



• কলমে প্রস্তুত  
• স্টীমে সঁকা  
• মোসিনে প্যাক  
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি  
ও সন্তোষ রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী  
কলিকাতা - ২০

নিবিড় যোগ—তাই পার্কটির কথা এত করে বললাম। এলটাম পার্কে থাকার সময় আমি নিজেকে এখানে এসে প্রায়ই চূপচাপ একলা ঘুরে বেড়াইতাম—বিশেষতঃ চাঁদের আলোতে। শীতকালের রাত্রি—লোকজন বেশী থাকত না। হুঁ-চাব জোড়া তরুণ-তরুণী হয়ত পাশে বেঞ্চিতে নিজেকে প্রেমের ভাবে বিভোর হয়ে থাকত বসে কিংবা হয়ত ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াত নিজেকে মুহূ কথাবার্তার মধ্যেই তন্ময় করে। অল্প কাউকে কেউ লক্ষ্যও করে না, অল্প কাউকে কেউ যেন চেয়েও দেখে না। তাই নিরিবিলি আপন মনে বেড়াতে কোনও দিন কোন বাধা পাইনি এখানে।

বুলা! আগেই বলেছি, একটা ভারি মন নিয়ে এ দেশের জীবন আমি শুরু করি। সেই প্রথমেই আমার মনের বেলুন যে চূপসে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই তাকে এ দেশের হাওয়ায় ভরিয়ে হাল্কা করে আকাশে ভাসিয়ে তুলতে পাচ্ছিলাম না। এ দেশের হাওয়ায় যে নিজের মনের কোনও খোরাক পাইনি—মনটাকে ভরাই কি দিয়ে? সে যুগে আমার মনের সমস্ত খোরাক ছিল, সেই সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে, সেই নীল আকাশের দেশে তোমাদের ঘরে—একটা উপবাসী মনের মাটিতে এলিয়ে-পড়া ছাড়া উপায়ই বা কি?

তাই বোধ হয় ফুরত্ব পেলেই ছুটে ছুটে আসতাম এলটাম পার্কে, একলা—যেন একটা নেশার ঘোঁকো। এই ঘন সবুজ ঘাসের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় এ দেশটাকে ভুলে খানিকক্ষণ তোমাদের নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতাম—তোমাদের প্রত্যেকের বিষয় ছোট ছোট খুঁটিনাটি কত কথা যে মনে ভেসে ভেসে উঠত, আমার নিজের সে সব জানা ছিল বলে কখনও ভাবি নি। বেশ মনে আছে—কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদের আলোর স্থানটিকে নিয়ে ক্রমে আমার মনে গড়ে উঠত একটা মায়ারাজ্য—না এদেশের না ওদেশের; এবং সেই মায়ারাজ্যে আমি তন্ময় হয়ে ঘুরে বেড়াইতাম তোমাদের সঙ্গে, যেন একটা অপূর্ণ নেশার পুরস্কে। হঠাৎ চমকে উঠলাম—হাতঘড়িতে চেয়ে দেখতাম ১১টা বেজে গেছে—নেশা যেত কেটে, ফলে দিগুণ অবসাদ ভরা মন নিয়ে ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসতাম—১৪ নং গ্রীণহোম রোডে।

\* \* \* \*

মিসেস ব্লেকের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল আরো একটা দিক দিয়ে। মিসেস ব্লেক বিশেষ সঙ্গীতাহুবাগিনী ছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার পর মাঝে মাঝে আনাকে ডেকে নিতেন তাঁর গানবাজনা শোনার জন্য। মিসেস ব্লেকের মনোরঞ্জনর জন্য খানিকটা আমাকে থাকতেই হত, তারপর অন্তরঙ্গতা কাটিয়ে—একটু বেড়িয়ে আসি বলে—পালিয়ে যেতাম এলটাম পার্কে।

বাড়ীতে ঢুকেই ডাইনে খাবার ঘর—বাঁয়ের ঘরটি ছিল মিসেস ব্লেকের গান-বাজনার আসর। এইটাই মিসেস ব্লেকের বসবাস ঘর—মেক্সের মোটা কার্পেট পাখা, দামী আসবাবপত্র সাজান এবং ঘরের কোণে একটি পিয়ানো। ইংরাজী সঙ্গীত সে যুগে আমি কিছুই বুঝতাম না, তবে পিয়ানোর উপর মিসেস ব্লেকের অঙ্গুলি সঞ্চালনের ভঙ্গীতে মনে হত পিয়ানো তিনি ভালই বাজান এবং যখন তিনি গান গাইতেন, গানের সুরটি মাঝে মাঝে কানে মিটই লাগত। ঐ গানের হুঁ—একটি পদের সুর আজও আমার কানে বাজে। যখন তিনি টেনে টেনে গলা কাঁপিয়ে গাইতেন

“Spring is co-o-o-ming—”  
“long long rest  
In your snow-white nest  
—Kiss your mammy—” ইত্যাদি

তখন গলায় সুরের খেলায় মনে হত—ও দেশের মাপকাঠিতে বোধ হয় তিনি ভালই গান! এই সঙ্গে বলে রাখি, ক্রমে তিনি আমাকে ছুটি গানও শিখিয়েছিলেন।

যথা—  
“I passed by your window  
In the cool of the night  
Lilies were watching  
So still and so white  
Oh! I sang softly  
no one was near  
—Good night! God bless you  
my dear.” ইত্যাদি।

গান দুটি মোটামুটি শিখেই আমার মন আকুল হয়ে উঠছিল তোমাদের জন্য—আজও মনে আছে—কবে দেশে গিয়ে তোমাদের এই গান শোনাব। বোধ হয় গান শোনার অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলাম—তোমাদের শোনাব বলে। কিন্তু তোমাদের কোনও দিনই শোনান হল না।

\* \* \* \*

এই দিন দশকের মধ্যে চন্দ্রনাথ এখানে বেড়াতে এসেছিল দু’দিন। প্রথম দিন বিকেলে আমার সঙ্গে এসে ‘চা’ খেয়ে গল্প করে ঘটা দুই থেকে ফিরে গেল। এবং দ্বিতীয় দিন আমারই নেমস্তয়ে বিকেলে এসে, রাত্রের খাবার খেয়ে, এলবাম পার্কে বেড়িয়ে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়েছিল এবং সেদিন মিসেস ব্লেকও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়াই নি যে, চন্দ্রনাথকে মিসেস ব্লেকের বিশেষ ভাল লেগেছিল। চন্দ্রনাথেরও সবই খুব পছন্দ হয়ে গেল—স্থানটি, বাড়ীটি এবং মিসেস ব্লেককেও।

রাত্রে খেতে বসে মিসেস ব্লেককে বললাম, “আমার এই বন্ধুটির জন্য আপনাকে একটা ঘর দিতেই হবে, মিসেস ব্লেক!”

মিসেস ব্লেক তৎক্ষণাৎ সহাস্তে উত্তর দিলেন “নিশ্চয়ই দেবো। এ মাসটা যাক—(চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে) ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই আপনি আসতে পারেন, যদি অবশ্য এ বাড়ী আপনার পছন্দ হয়।”

বললাম, ঘরের যদি আপনার অনুবিধা হয়, আমার ঘরে আর একটা ছোট খাট ঘর বাবে—আমরা দু’জনেই না হয় এক ঘরেই থাকব।

চন্দ্রনাথ বলল “আমি রাজী আছি। আমারও এ বাড়ী খুব ভালই লেগেছে।” এ কথা অবশ্য চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আগেই হয়েছিল।

মিসেস ব্লেক বললেন “না না, তাহলে মিঃ বাগটার (চন্দ্রনাথের) কষ্ট হবে। আমি আমার শোবার ঘরই ছেড়ে দেব।”

তখন একটু অবাক হলাম—নিজে শোবার ঘর দেবেন ছেড়ে!

আগ্রহ ত কম নয়! মিসেস ব্রেকের শোবার ঘর দোতালায়, আমার ঠিক পাশেই বেশ বড় ঘর, এবং আমার ঘরের চেয়ে অনেক ভাল খাট-বিছানা প্রভৃতি আসবাবপত্রের সাজান। আমার ঘরে একটা কিন্তু মিসেস ব্রেকের শোবার ঘরে দুটো বড় বড় জানালা!

বললাম, “তা হলে আপনার?”

বললেন, “আমার জন্ম ভাববেন না। পিছনে একটা ছোট ঘর আছে—আমার থাকার পক্ষে যথেষ্ট হবে।”

চন্দ্রনাথ অনেক ধনুবাদ দিয়ে কথা পাকা করে নিল। আমার সঙ্গে বে ব্যবস্থা, সব ঠিক সেই ব্যবস্থাই হলো—এমন কি সেনাও সপ্তাহে দু গিনি।

আরও একটু অবাধ হলাম, যখন রাত দশটা পর্যন্ত এলটাম পার্কে বেড়িয়ে মিসেস ব্রেক আমাদের সঙ্গে না ছেড়ে টেনশন পর্যন্ত এলেন—চন্দ্রনাথকে টেনে তুলে দিতে। ওখান থেকে টেনশনটির দূরত্ব নেহাৎ কম নয়—বোধ হয় প্রায় এক মাইল হবে।

রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে মিসেস ব্রেক বললেন—“চমৎকার আপনার এই বন্ধুটি! স্থির, ধীর—স্বন্দর কথাবার্তী।”

বললাম, “ওকে আপনার এত পছন্দ হয়েছে কেনে খুবই খুশী হয়েছি। ওই ত এ দেশে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।”

বললেন, “এ রকম বন্ধু পাওয়াতে আপনি ভাগ্যবান।”

মাথায় বোধ হয় একটু দুই বুদ্ধি এলো। বললাম “হ্যাঁ, বাইরের ভাগা কিছু কিছু আমার আছে অস্বীকার করি না। কিন্তু আসল ভাগটি আমার নেই।”

একটু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধালেন “কি রকম?”

বললাম, “এই ধরন না, আপনার বাড়ীতে বাস করার সুবিধা পেয়েছি, আপনি আমাকে কত যত্ন করেন—সবই আমার ভাগ্য। কিন্তু আসলের বেলায় দেখি কীকি।”

বললেন, “এখনও বুঝতে পারি নি।”

বললাম, “আপনার পছন্দসই মানুষটি হওয়ার ভাগ্য চন্দ্রনাথের হ’দিনেই হল—আমার এত দিন থেকেও হল না।”

হেসে বললেন “আপনি ভয়ানক হিংস্রক প্রকৃতির লোক ত!”

বললাম, “হিংসার কারণ ঘটলেই লোকের হিংসা হয়।”

বললেন, “আপনি অবাধ করলেন।”

বললাম, “কেন?”

হেসে বললেন, “আপনার মনটি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে একখানি মিষ্টি মুখের কাছে বাঁধা—এ দেশের কিছুই আপনার মনটিকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না—সেইটুকুই ত এতদিন লক্ষ্য করে এসেছি।”

বললাম, “তাই বলে এ দেশ সামান্য দানাপানি দিয়ে আমাকে অসুখ করে রাখবে—সেটাই বা সহ্যেতে পারি কৈ?”

গিল-গিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, “আপনি ভয়ানক হই।”

\* \* \* \*

মিসেস ব্রেকের বাড়ীতে দিন দশেক থাকার পর এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে আমার অবসাদ ভরা ভারি মন একটা বিশ্বাসে উঠল। সেই কথাই এইবার বলি। [ক্রমশঃ।

# বহুমুত্র

## আরোগ্য হয়

প্রজাবের সঙ্গে অভিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমুত্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকা ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গীণ অবস্থায় কারবাস্কল, কৌড়া, মোচা ছানি পড়া এবং অন্ত্রাশ্র জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন ইনুনি মতে দুর্লভ ভেবজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার ক’রে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রজাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অধিক সেরে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জন্ম লিখুন। ৫০টি বটিকার এক শিশির নাম ৬৬০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাণ্ডল ফ্রী। নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## বার্তাম্বর

(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

পার্ক স্ট্রীটে কোনো একটি ক্লাবে,—অসীমের পাশের সোফায়  
আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলো সন্মিতা।

কত বকমারী ফ্যানসান-দুঃস্বপ্ন ছেলে-মেয়ের ভিড় এখানে। এদের  
চলনে, বলনে নেই কোনো জড়তা। এদের ভেতর থেকে ছুঁচোর-ন  
বিদগ্ধসমাজের কেঁপে-ঠিকের সঙ্গে সন্মিতার আলাপ করিয়ে দিলো  
অসীম।

এর মধ্যে ছিলেন একজন ববীষসী মহিলা। উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের  
রং; আঁটসাঁট গড়ন, মুখখানি বেশ লাবণ্যে ঢালাই।

পরিবানে তাঁর দুঃ-গরদের খান, শালা সিকের ব্লাউস—হাতে  
বাঁচুরের চামড়ার শালা ভ্যানিটিব্যাগ, পায়ে হাইহিল শাদা জুতো।  
চালচলনে সবজাত্যার ভার সুস্পষ্ট।

—তিনি এনে পাশের সোফাটি দখল করে বসে জিজ্ঞাসা  
করলেন—অসীম, এ মেয়েটি কে? আগে দেখেছি বলে  
তো মনে পড়ছে না?

—হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে জবাব দেয় অসীম। আমার  
দাদার বন্ধু সোমনাথ ত্রিবেদীর কন্যা সন্মিতা ত্রিবেদী। ঠা,  
এর রাঁবে পদাৰ্পণ, আজই প্রথম!

—সন্মিতার দিকে ফিরে বলে—এস মিতা, তোমার আলাপ  
করিয়ে দিই মাসীমার সঙ্গে—ইনি বিখ্যাত আর্টিষ্ট স্বর্গীয় তারানাথ  
বসুজীর স্ত্রী ইন্দিরা বসুজী। নাচে, গানে, শিল্পকলার অদ্ভুত  
দক্ষতা এঁর! এঁর অলকাপুরীতে অনেক ছেলে-মেয়ে নাচ-গান  
শিখে বিখ্যাত হয়েছে।

আচারলক শিকাগো রাতে জনসমাজে প্রচারিত হয়, দেশ-  
বিদেশে ওর ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ শিল্পরূপে পরিচিত হয়, সেজন্তে  
নায়ে নায়ে কম্পিটিশন জলসার আয়োজনও করা হয় এঁর  
বাবস্থাপনায়।

যুহু যুহু ভাসেন মাসীমা! সিঁহুর-রং ঠোঁট দুটি কঁকে  
শালা নার্কলের মত চক্চকে দাঁতের সারি চিকমিকিয়ে ওঠে!  
কৌতুক ভরে বলেন তিনি—আঃ, তুমি যে সেই আগেকার চারুণদের  
মত আমার শ্রুগগান শুরু করলে অসীম! নিজের উপলব্ধি  
দিয়েই সেটা ওকে বোঝবার সুযোগ দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত  
নয় কি? আজকালকার এই বিজ্ঞান-সর্বস্ব যুগের মাদ্রাস চার,  
সব কাজের পেছনেই থাকবে একটা অকাটা যুক্তি—তবেই তবে  
সেটা গ্রহণযোগ্য, তার থেকেই জন্মাবে বিশ্বাস, নিতনত্ব,  
গুরুত্ব, না সে সব শু ক্রমেই বুঝতে শিখবে।

—আজ্ঞা এখন তোমার কি কি শিক্ষা চলছে, শুনি তো মা?

সন্মিতা জবাব দিতে পারে না। এত বকমারী মাদ্রাসের  
বিঃদে সে এর আগে আর কখনও আসেনি, ওর যেন কেমন  
ভয় ভয় করছিলো।

অসীম বোঝে ওর অবস্থাটা। জবাব সেই দেয়,—বাড়ীতেই  
শেখা সব ওর। আগে শুনেছি বেশ ভালো নাচতো, তবে এখন  
সে সব ছেড়ে দিয়েছে। গানের গলা চমৎকার, আর পিয়ানো,  
গীটার এই-আজ-কাল যেটা চলছে, সে সব শিক্ষাও চলছে ওর।

আঁকার ওপরও বেশ দখল আছে, কালকটা গার্লস কলেজে  
পড়ে, আসছে বছরে বি, এ, দেবে! তবে বাইরের সোসাইটিতে  
হেনম যাতায়াত, মেলামেশা নেই কি না, সেজন্তে ঐ সোসাইটির  
অভাবটা রয়ে গেছে।

মনোবোগ দিয়ে সব শুনে মিহি গলায় সম্ভবা প্রকাশ করেন  
মাসীমা। খুব ভালো কথা। অল্পবিস্তর সব শিক্ষাই আছে  
এর ভেতর; খালি একটু কালচাদের পালিশ দিয়ে নিলে,  
চমৎকার হবে এ মেয়ে! তুমি আমার অলকাপুরীতে এসো  
মা, তোমাকে আমি—মানে আমি, তৈরী করবো। আই মাঠ  
মেক্ এ জেম্ অফ ইউ!

দিদিমাকে বোলবো আপনার কথা। শুককণ্ঠে জবাব দেয়  
সন্মিতা।

মহাব্যস্ত ভাবে বলেন মাসীমা—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তাঁকে  
বলবে বৈ কি! তাঁর মত নেবে বৈ কি! আমি আজই  
তোমাকে আসতে বলছি না, তবে কি জানো? তোমার দিক  
দিয়েও ইচ্ছার প্রাবল্যটা থাকা চাই মা, তবেই ঠিক কালের  
সঙ্গে তাল রেখে চলবার যোগ্যতা অঙ্কন করবে।

ঐ যে দেখছো, ফোরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো, এখন শুরু হবে  
ওর নাচ। ওটি আমারই হাতের তৈরি একটি জুয়েল; সিনেমায়  
এখন ওর কত নাম! ছবির পদ্যই নিশ্চয়ই দেখেছো ওকে—মনে  
পড়ছে না? তোমাদের শুকতার সেন গো!

—সিনেমা? বাংলা বই দিদিমা পছন্দ করেন না কি না, তাই  
দেখা হয় না আমার।

মিন-মিন করে সন্মিতার কণ্ঠস্বর। ফ্যানের তলায় বসেও  
বিনবিনিয়মে ঘামতে থাকে সে। অবাক চোখে চেয়ে থাকে—অপ্  
ফ্রোবের ওপর নৃত্যরতা লাগুময়ী শুকতারার দিকে।



সে নিজেও নাচতে শিখেছিলো বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এ নাচের তুলনা হয় না। কিন্তু নাচের পোশাকটা বিস্তী! এত লোকের ভিড়ে চোখ-ধাঁধানো বলমলে নিওন লাইটের মাঝে তারি লজ্জা করে ওর। বিমুগ্ধ দর্শকদের উজ্জ্বলিত সাধুবাদের মাঝে শুকতারার নাচ শেষ হল।

উঠে দাঁড়ালেন মাসীমা। স্মিতার হাতটা ধরে আকর্ষণ করে বললেন—এসো আমার সঙ্গে। অসীম, তুমিও এসো।

পাশের একটি নির্জন কক্ষে তিনি ওদের নিয়ে বসলেন। বরষা ছুটলো তাঁর অর্ডার মত খাতসস্তার আনতে।

এক বলক মিষ্টি হাওয়ার মত, মূল্যবান প্রসাধনীর স্ববাস ছড়িয়ে নৃত্য-ভঙ্গিমায় ছুটে গেলো শুকতারার সেন।

চটুল কণ্ঠস্বর তার জলতরঙ্গের মত বেজে উঠলো—হালো, অসীম যে! ক্লাবে কি অরুচি ধরে গেলো?

আরে না, না। এই বৈবয়িক গগুগোল নিয়ে কিছু দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম কি না! সহ্যে জবাব দেয় অসীম।

—আজ আমরা একটি নতুন মেয়েকে পেলান, আমাদের অলকাপুত্রী জগা। এর ভবিষ্যৎ উজ্জল বলেই মনে হয় আমার। এর নাম স্মিতা ত্রিবেদী। আর এর পরিচর তো তোমাকে একটু আগেই দিয়েছি স্মিতা। ছাঁজনের যোগাযোগ ঘটালেন মাসীমা! নমস্কার-বিনিময় শেষ করে—

স্মিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় শুকতারার, কোঁচক ভরে নজর বোলায় ওর সর্বাঙ্গে। তারপর মিষ্টি হাসি বক্সপলার মত ঠোঁটে মাখিয়ে নিয়ে বলে—আপনি যে একটি জিনিয়স, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ আমি। কেন না, মাসীমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, ধারণা তেমনি নিঃসূঁল! আপনার সৌভাগ্য সঙ্গলাভের সৌভাগ্য মাঝে মাঝে হবে আশা করি। কি বলো অসীম?

এমন সূঁহুভাষায় আত্মপ্রশংসা শোনারই অনভাস্তা স্মিতা। কি যে জবাব দেবে ওর কথার, হঠাৎ কিছু ভেবে পায় না। ফ্রতহালে সুর হযেছে ওর বক্সপলন। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে উঠেছে। শুককণ্ঠ বলে সে, আমি—আমি অতি সাধারণ, এবার কিন্তু আমি বাড়া যাবো, দিদিমা হয়তো ভাবছেন!

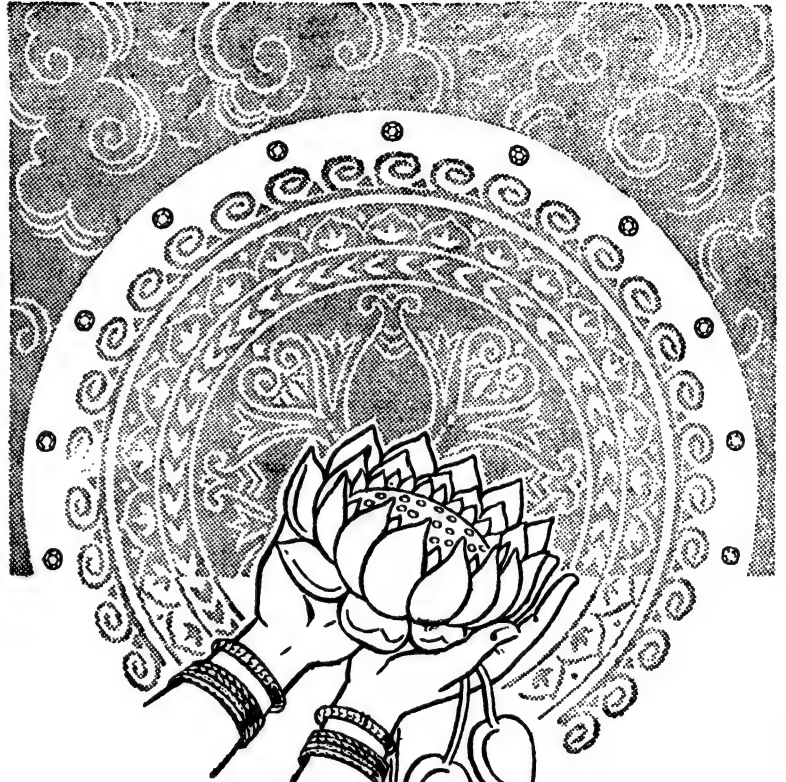
উজ্জ্বলিত হাসির বড় বয়ে গেলো ওর কথায়। মাসীমা ওর পিঠে যুহ যুহ ঢাপড় দিতে দিতে বলেন—আমি নিজে গিয়ে তোমাকে পৌছে দেব মিঠা!

মাসীমাব অর্ডার মত পাবারের ফ্লেট গেলো। কাপ, গ্লিস, বোতল দ্বাস সবই গেলো। ডিসে সাজানো মার্টিন চপ, শাওউটচ, পোটটো-চিপস আর কেব্। তার সঙ্গে শালাড আর ফিস ফ্রাই!

—খেয়ে নাও মা! স্মিতাকে অহুদোব কদেন মাসীমা।

—শুধু একটু কেব দিন আমায়, এসব আমি খাবো না, শব্দটা ভালো লাগছে না।

ত্রিমুণ্ডির স্মিষ্ট বাক্যাত্যুলায় শেষ পর্যন্ত স্মিতার আপত্তি টিকলো না! অতি কষ্টে গিলতে লাগলো পাবারগুলো,—যেমন করে রোগী গুহ্ব গেলে ডাক্তারের হাতুড়ায়।



মুখার্জীর গহনা  
শুদ্ধ ও সুন্দর

মুখার্জী  
জুয়েলার্স



বহুবাড়ার মার্কেট, কলিকাতা-১২ ফোন-৩৪-৪৮১০

শুকতারার আর অসীমের হাতে ফেনিল তরল পানীয়-পূর্ণ কাচের গেলাস। খাতের কঁকে কঁকে ওনা চুমুক দিচ্ছে ওতে। সুমিতা মাঝে মাঝে মুখ তুলে চার ওদিক দিকে—ভয় আর বিষয় দুটি চোখে ওর !

মাসীমা বোমেন ওর মনের কথা। নিজের গ্লাসটি সরিয়ে রেখে, দুটি পাত্রে কফি ঢাললেন, একটি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে অপরটি নিজে গৃহণ করলেন।

নিজের মনিবকে জাঁটা ঘড়িটার পানে চেয়ে চমকে ওঠে সুমিতা। উঠে দাঁড়িয়ে বাকুল ভাবে বলে—আমি আর এখানে থাকবো না, ওদিকে—

ওর মুগের কথা কেড়ে নিয়ে বলে শুকতারার—দিদিমা ভাবছেন ? তা মিঠা দলৌষ দিদিমার ভাবনাটা কিছু অমূলক নয়—অসীম ! এত রাত হলো—তার পর—তুমি সঙ্গে, ছিপিগোলা সোতার বোতলের মত, হাসিম তরঙ্গ ছিটকে উঠলো শুকতারার কাছে !

মাসীমা মোলায়েম কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে বলেন—আচ্ছা, তোমরা ওর অপর্যাপ্ত বৃত্তে চাইছো না, বেচারী বড় ভালো মেয়ে।

ভালো মেয়েদের ঢাল-ঢলন এই বকনটই হয় কি না। এখুনি আমার সকলেই উঠবে মিঠা, কফিটা খেয়ে নাও।

—হুঙ্-হুঙ্ কম্পিত বক্ষে ওর আদেশ পালন করে সুমিতা।

মাসীমা সুমিতার সঙ্গে চললেন। শুকতারার পা দুটো যেন টপছে—অসীম নিজের বাত্বন্ধনে নেয় ওর একখানি হাত,—বলে,—এসো,—তোমার গাড়ীতে যাবে ? না আমি পৌছে দেব ?

—নিজেকে মুক্ত করে নেয় শুকতারার।—আঁকাবুক বাঁকিয়ে, মদিরোজ্জল দৃষ্টিবাণ তেনে বললো,—থ্যাঙ্ক ইউ এ লট—থ্যাট উইল ম্যানেজ—গুড বাই ! সুমিতা দেবি ! আবার দেখা হলে আশা করি !

একটা ইংরিজি গানের কপি, গুন্-গুন্ করে ভাঁজতে ভাঁজতে, নাচের ভঙ্গিমায় পা ফেলে ফেলে—ওদের আগে আগে এগিয়ে গেলো শুকতারার সেন।

রাত্রি দশটা বেজে গেছে। মাসীমাকে ডাইকমে বসিয়ে দিদিমাকে ডাকতে গেলো সুমিতা।

বাড়ীটার যেন কেমন থমথমে ভাব ! লজ্জায় ভরে ওর সর্কাস যেন কঁপে উঠছে ! নাঃ,—কাজটা ভালো হয়নি ! দাক্ষণ অনুশোচনার ওর মনটা ভরে ওঠে !

—এদিক-ওদিক ঘুরে সে দিদিমার সন্ধান করে। কোথায় দিদিমা ? সে এত রাত করে বাড়ী এলো, কই চিন্তাকুল হয়ে দিদিমা ছুটে এসে, এর কৈফিয়ৎ চাইলেন না তো ? ছোট মাসা, মামা, কৈ ! কাকুর দেখা মিলাছে না যে !

দিদিমার ঘরের পেছনের বারান্দায়, একটি ইজিচেয়ারে মুদিত নেত্র অর্ধশয়ান ভাবে পাড়ছিলেন তিনি !

সুমিতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকবার পর সংকোচ ভর ডাক দেয়, দিদিমা ! মিসেস বঙ্কণ এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে, আপনি একবার যাবেন কি ?

উঠে বসলেন দিদিমা। তাঁর থমথমে অন্ধকার মুখখানি মিতার বক্ষস্পন্দনের মারা আরো বাড়িয়ে দিলো।

—বঙ্কণ ! সে আবার কে ? এত রাত্রে যেতে আলাপ করতে

এলেন, ব্যাপার তো কিছু বৃত্তে পারছি না ? আচ্ছা যাও তুমি, আমি যাচ্ছি।

তাত্তাত্তি বেষ পরিবর্তন ও বৃহৎ প্রসাধন সেরে, চোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে ডাইকমে এলেন দিদিমা।

যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে, বিনীত কণ্ঠে বললেন,—কি সৌভাগ্য আমার ! আপনি এসেছেন আমার সাথে আলাপ করতে ? তা অসীম, তোমাকে পেয়েও বড় খুসি হলাম, না গেয়ে কিছ যাওয়া হবে না, ওরে অ কবি, এদিকে আয়তো মা, দেখ এসে, কে এসেছেন !

মিসেস বঙ্কণ প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেন, আপনি বসুন দিদি, মোটেই ব্যস্ত হবেন না আমাদের জন্তে, এই মাত্র খেয়ে আসছি আমরা।

অসীম দিদিমার পায়ের ধূলা নিয়ে মাখায় ছুঁইয়ে বলে—অলকাপুরীর নাম নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই, তারই প্রতিষ্ঠাতা ও স্বেচ্ছাসেবিকা পরিচালিকা ইনি, মিসেস বঙ্কণ। ওর শিক্ষার পরিকল্পনা যেমন উন্নত, তেমনি স্মৃতিচূর্ণ। আমার ইচ্ছা, সুমিতাকে ওর ছাত্রী করে দিই, অবশ্য আপনার আর মিতার যদি ইচ্ছা থাকে। ওর হাতে তৈরী প্রত্যেকটি মেয়ে, এক একটি জিনিয়স। মিতার ভেতরেও অনেক সঙ্গুণ আছে, সেগুলো ওর সাহচর্যে পরিমার্জিত হয়ে উঠবে।

—তুমি বড় বেশী বলে ফেলছো অসীম ! আমি এমন কিছু অলৌকিক বিদ্যা জানি না, যে কয়লাকে হীরে করতে পারবো। তবে, যে প্রকৃত হীরে, তাকে কালচারের ভেতরে রেখে আরো দ্যুতিময় করাই আমার কাজ। মিতাকে অল্পক্ষণ দেখেই মনে হল ও একটি আসল রত্ন। ওকে পেলে, যোগ্যস্থানে শিক্ষা প্রয়োগ করার একটা সার্থক সৃষ্টির পরিতৃপ্তি ; সেইটাই হবে আমার পরম আনন্দ লাভ।

—খুব ভালো প্রস্তাবই তো করেছেন আপনি, এতে আমার আপত্তির কি আছে ? আর সুমিতার বাবাও অসীমের ওপর তার ভালো-মন্দ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সুনলাম, তখন তার মতামতেরও কিছুটা মূল্য আছে বৈ কি ?

প্রসন্নভরা কণ্ঠে জবাব দেবার চেষ্টা করেন দিদিমা কিন্তু সে স্বরে বেজে ওঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

—তবে মনের গোপন বাসনা চুপি চুপি বলে,—

মন্দ কি ! ঐ ক্লাবে তো কবিকেও ভর্তি করা যেতে পারে। এ্যাব্রিষ্টোকেট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় বাইচান্স একটা কিছু ঘটতে যেতেও তো পারে ?

—আচ্ছা আজ আসি, রাত অনেক হলো, পরে আবার আসবো।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস বঙ্কণ। মোলায়েম হাসির সঙ্গে বললেন—একদিন আশুন না আমার অলকাপুরীতে, মনে হয় ভালো লাগবে আপনার।

—অবশ্যই যাবো, আপনি যখন নিজে এসেছেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। মেয়েদের উন্নতিমূলক শিক্ষার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, নিশ্চয়ই অসীম বসেছে সে কথা আপনাকে ?

অসীমের দিকে প্রস্নহচক দৃষ্টিপাত করলেন দিদিমা, মিসেস বঙ্কণকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে।

অসীমের রূপত্বার্থ চোখ দু'টি তখন স্রমিতার রূপস্রুধা পান করছিলো, সেজন্তে দিদিমার অর্থপূর্ণ কথার জবাব মিললো না তার দিক থেকে—জবাব দিলেন মিসেস বর্ধণ।

আপনার স্মৃতির কথা আমাদের বিদগ্ধ সমাজে কারুর অজানা নেই দিদি! আপনাকে দেখবার, অনেক দিনের বাসনা আজ আমার পূর্ণ হল,—আচ্ছা—নমস্কার, আপনার বিশ্রামের হয় তো ব্যাঘাত করলাম!

আজ্ঞাপ্রশংসায় বিগলিতা দিদিমা, ভাবাবেগ সংবরণ করতে না পেরে, হুঁহাতে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস বর্ধণকে। স্নেহোচ্ছল কণ্ঠ বললেন—ওকি কথা! কত ভাগ্যি আমার আপনার পায়ের ধুলো পড়লো আমার বাড়ীতে!

এর পর কত বার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবো আপনার।

নিজে এগিয়ে গেলেন দিদিমা মিসেস বর্ধণের গাড়ীর কাছে, তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

—স্রমিতা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। ভাবে, যাক বাঁচা গেলো—দিদিমার রাগ পড়েছে তাহলে! কিন্তু ভুল ভাঙলো তার দিদিমার গম্ভীর কণ্ঠের শুনে।

—এ-সব কি মিটা?—নিজেই যদি নিজের দায়িত্ব সব বুঝতে শিখেছ, তবে জামাইয়ের ভাত খেয়ে, তার বাড়ীতে থাকার জামার আর দরকার কি?—সব তো ঠিক করে এসেছো দেখছি! নেহাত সোমনাথ আমাব ওপর তোমার ভার দিয়ে গেছে, তাই না বলে পারছি না, যখন অসীমের সঙ্গে বাইরে গেলে,—তখন সবিকি তোমার সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিলো, সে তোমার নং কাজে সহায়তা করে, তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে,—তোমারও কর্তব্য তার সঙ্গে ঐ রকম প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা—আজকের ব্যাপারে সে মনে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছে!

স্রমিতা দিদিমার মুখের পানে চেয়ে বিস্মিত ভাবে বলে—অসীম বাবু ছোটমাসীর যাবার কথা না বললে, আমি কি করে বলবো দিদিমা? গাড়ী তো আমার নয়!—আর এতে ছোটমাসীর ব্যথা পাবারই বা কি আছে?

সে যখন তার বাঙ্কবীক্ষের সঙ্গে সিনেমায় যায়, বেড়াতে যায়, কৈ আমি তো যাই না, বা এতে কোন হুঃখ বোধও করি না!

—রীতিমত অবাক হয়ে যান দিদিমা, স্রমিতার মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে।

—একি হল? যে কথাই তিনি আজ বলতে যান, সব কথাতেই আজ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় কেন? বোবারও যে বোল ফুটলো দেখছি! লাজুক, ভীড়, মুখচোরা মেয়েটা আজ মুখরা হয়ে উঠলো, কোন্ মন্ত্র বলে? নাঃ, কোথায় যে যেন কি ঘটছে! তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের ভিত্তির কোথায় যেন ফাটল ধরেছে! অদৃষ্টচক্রের পরিবর্তনের ঘর্ষন নিনাদ তিনি আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন!

রোষকিপ্ত পদক্ষেপে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে ক্রুদ্ধ দরোজায় খিল তুলে দিলেন তিনি!

—স্রমিতা বসে রইলো নিশ্চল ভাবে। নিজের উদ্ধত আচরণে, সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলো, দিদিমার মুখের ওপর এমন স্পষ্ট ভাবায় জবাব দেওয়া কেমন করে সম্ভব হলো তার পক্ষে?

অজ্ঞায়? না অজ্ঞায় করেনি সে! চোখের সামনে তার,—

ছোট মাসী, ছোট মামা, দিদিমা, সকলে মনের স্কৃষ্টি আমোদে দিন কাটাচ্ছে আর তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে রুটিন-বাঁধা জীবনের ছকে! নিজেরা হরনয় যাচ্ছেন, থিয়েটার-সিনেমা, ক্লাব আর পার্টিতে; তার ভাগ্যে কচিং ঘটে, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত। বাড়ীতে সাক্ষ্য আসর জমজমাট হয় ওঁদেরই জন্তে; আর ওকে তখন রেখে দেওয়া হয় মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে!

কেন? কেন? ওর অন্তর বলে কি কোনো পদার্থ নেই? আজ যে সে সভ্য সমাজে মিশতে পারে না, নেই তার স্বচ্ছন্দগতি, সাবলীল ভঙ্গিমা, যেমন আজ দেখেছে ক্লাবে অজ্ঞ মেয়েদের মধ্যে? সে কার জন্ত? তার এই জড়তাপূর্ণ, যন্ত্রবৎ জীবনযাত্রার জন্ত দায়ী কে? কিসের জন্ত সে হাসি-খুসি, চঞ্চল চলভার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি? না কিছুমাত্র অজ্ঞায় করেনি সে আজ!

ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে কারুর হাতের খেলার খুঁতুল নয়! তারও নিজস্ব সত্তা বলে কিছু আছে; আর আজ থেকে তার সদব্যবহারও সে করবে।

কিধে ছিলো না, ক্রান্ত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় এলিয়ে দিলো অবসন্ন দেহখানি।

এতক্ষণে মনে উদয় হল দারুণ অভিমান। উদাসী পিতার হৃদয়হীনতা অন্তরে জাগালো স্রমিতার বিক্ষোভের আলোড়ন।

আজ তার নির্ভীক মানবীয় সত্তা, হঠাৎ যেন নিজের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠেছে, পিতার নীরব উপেক্ষার বিচার করতে!

কেন তিনি কষ্টের প্রতি এমন অবহেলা প্রদর্শন করলেন? তার প্রতি কি ছিলো না তাঁর কোনো দায়িত্ব? কোনো কর্তব্য?

শুধু ব্যাঙ্কের টাকা আর বাড়ীই কি তার পাতনা? মাতৃহীনা কষ্টের পক্ষে, পিতার স্নেহছায়া লাভের আশা, এমনই অবাস্তব মনে হল তাঁর কাছে? যে তিনি তার নির্দাসন-দণ্ড দিলেন একটা স্নেহহীন কঠোর, স্বার্থপূর্ণ পরিবেশের মাঝে? যার জন্ত তার জীবনের একটা দিক, একটা মহাশূন্যতায় ভরে আছে? যার জন্তে আজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনপথে, তার সঙ্কোচপূর্ণ পদক্ষেপ?

এক-রাশ জটিল প্রশ্ন ভিড় জমালো, ওর অভিমানাহত অন্তরে।

মনে পড়লো স্রদানকে! হায়! দামোদ! আজ তুমি যদি পাশে থাকতে—জালাময় বিক্ষুব্ধ অন্তরটা আজ বার বার যে তোমাকেই চাইছে!

অসংখ্য সমস্তা-কণ্টকিত জীবনের পথে আমি যে বড় একা! বড় অসহায়, অন্ধকার, চারি ধারে আমার বড় অন্ধকার! [ক্রমশঃ।

## ওমরের সম্বন্ধে দু'টি কথা

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ওমরের কবাইগুলি যেন বহুব্রূ থেকে ভেসে-আসা অশ্রুত স্রবের মূহ গুঞ্জন-ধ্বনি। যৌবনের এক মধুময় দিনে দেখলাম, অজস্র পুষ্প-সম্ভারে পূর্ণ ধরণীর বিচিত্র সম্ভ্রা, পান করলাম যৌবনের রঙীন নেশার পরিপূর্ণ মদিরা, উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগচঞ্চল ব্যাকুলতা ভরা স্বপ্নালু অলস দিন দেখতে দেখতে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। একটি জীবন যেন সত্তাকোটা একটি ফুল, যার পড়ে বাঁধে, আবার

নতুন দিনের আলো দেড়টার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ফুটে উঠবে তার জায়গায়।

ওমরের কাছে এসে এক বাক্সের ঘটনা। জীবনের অস্তিত্ব তিনি একজন্মেই স্বাক্ষর করেন, পরজন্মে নয়। সেট জন্মেই বলেছেন—

“জানন-সুখা শূণ্য হবার আগে

পাত্রপানি নাও ভরে নাও বিবিড় অমৃত্যুতে।”

তিনি এট ফগনমাসকে একটি প্রভাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। \* \* \*

“একটি প্রভাত আসে পিকশিত ফুলের মনন

মরা বাঁচা শুধু এক বেলা

পেরালীর স্তব্ধতার পেলা।”

এই যে আসা-যাওয়া, দিন আর বাস্তব, আলো আর অন্ধকার, এর মধ্যেই বা কি আর শেষেই বা কি?

“বেলা শেষে দূরে চলে যায়

জানো কি কোথায়?”

এ প্রশ্ন তো তাঁর মনেও জেগেছিল?

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

“পথের শেষ কোথায়

কি আছে শেষে?”

গান্ধীও যখন রাজা জনকের সভায় প্রমোত্তর কালে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন ‘এর পর কি আছে?’ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছিলেন— ‘এর পর কি আছে জানতে চাইলে তোমার মস্তক স্ফূটন হবে, আর জানতে দেও না।’ ওমরও সেট প্রশ্ন করেছেন—কিন্তু সমাধানের কোনও ইঙ্গিত দিয়ে দাননি।

জন্মান্তরের প্রতি তাঁর আস্থা নেই, এটা বোঝাত গিয়ে তিনি বলেছেন—

“জীবনের অবসানে নড়িকেরও হয়ে যায় শেষ।”

কিন্তু তারপরেই দেখি—

“আমাদেরও দু’দিন বাদে

নাগতে হবে মাটির শেষে

কে জানে সই তার পথে ফের

এই আসলে আসবে কে সে!”

আমাদের আত্ম হিসাব করা দিনের মত! বাঁধা-ধরা নিয়মে মহাকাল যেন সলা-সলনা হয়ে যাচ্ছে। ফুল ফুটল একটি সুন্দর আলোভরা প্রভাতে, বরষে পড়ল নিশীথে। এট জনস্বার্থী জীবনে যেটুকু আনন্দ করতে পারা সম্ভব, ওমর সেটুকুই নিঃশেষে উপভোগ করতে বলেছেন, কাল প্রভাত হবার পূর্বেই ধ্বংস আনাদের চলে যেতে হবে। তাই কারের ভাবনাগুলো তুলে রাখতে বলেছেন।

যারা কালের ভাবনায় অস্থির, ইহকাল পরকাল কোনও কালেরই কাজ থাকবে তারা হবে না—যথচ অস্থিরতার অন্ত নেই তাদের, তাদের হু’ নোকোয় পা দেওয়া ভাবকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

“মূর্খ তোদের ঈপ্সিত ধন

কোথাও যে নে নাই।”

এটা একটা নিষ্ঠুর সত্য।

এক জীবীর লোককে ওমর বিজ্ঞপের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে।

যারা আকষ্ট পিপাসা নিয়ে পরিপূর্ণ পানপাত্রের কাছ থেকে দূরে থাকবেন তাঁরা ওমরের মতে—

“পূর্ণ করি দাঁও সখি পানপাত্র মোর,

অকুরন্ত হয়ে থাক স্বপনের ঘোর—”

\* \* \*

কিবা—

“থাক সখি পড়ে থাক যত গৃহকাজ

এস এস ছুটে এস আজ

পানপাত্র খরা ভরি নাও,

ফাঙ্কন আঙুন ফেলে দাঁও

শীতের কুহেলী আবরণ।”

\* \* \*

বা—

“ওমর বলে আমার সাথে

বেরিয়ে এস আজকে রাতে

তব্বকথার জটিলতা শাস্ত্রচর্চন তুলে।”

\* \* \*

“দাঁও পিয়লা, প্রিয়া আমার

এই অধরে পূর্ণ করে,

যাক অতীতের অনুতাপ আর

ভবিষ্যতের ভাবনা ম’রে।”

ইত্যাদি শুনে তো রীতিমত বেগে যাবেন।—তাঁদের বহুকালকার অন্ধ সংস্কারোচ্ছন্ন মনে এসব হান্ধা কথা, বা জীবনে একটু ছাতা দেওয়ার অপরাধে কঠোর আত্মতত্ত্বি ব্যবস্থা করেন, তাঁদের জন্মে তিনি বলেছেন— \* \*

“মুগ্ধাঙ্কুরের কণ্ঠ শোনো থাকে,

মূর্খ তোদের একুল ওকুল ছুঁল ঘণীপাকে।”

ধর্মবাজকদের ব্যঙ্গ করে তিনি তৎকালীন সমাজের প্রতি বহু কটাক্ষ করে গেছেন। প্রচলিত ধর্মবিধিতে তাঁর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কি নিগূঢ় ভাবে ফুটে উঠেছিল—তা তাঁর কবাইগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

যথচ তিনি সত্যান্বেষী ছিলেন। আত্মজিজ্ঞাসু ছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী।

তৎকালীন সমাজের ধর্মের কাঠামোর ভিতরের বস্তুকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, কবেছিলেন কাঠামোটাকে। বাহ্যিক আচার-সর্বস্ব মানুষের তেতরের বস্তুকেই তিনি চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যেমন সৌম্য মাঝে অসৌম্য, ওমরের তেমনি সুরা এবং সাকী, এদের তেতরেই তিনি সুফী সম্প্রদায়ের রহস্যময় সাধনপথের রূপ এবং অরূপের ভেত্রে জীবন ভোর করেছেন। তিনি বলেছেন—

“পাঠাইয়াছিহু একদিন

আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন

সুদূর অদৃশ্য লোক যথা—

জানিবারে জীবনের ওপারের হু’—একটি কথা

দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে

ডেকে বলে ধীরে

চেয়ে দেখ স্বামা

স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি।”

ঈশ্বরের কাছে তিনি দয়্য ভিক্ষা করেছেন করুণ ভাবে—

“পাপের মদিরা পান মত্ত মোর দুঃস্বপ্ন হৃদয়

শাস্ত করে দাঁও তারে কুপা দানে ওগো দয়াময়!

ক্ষমা করো যদি আমি করে থাকি কোনও অপরাধ  
ওমর চাহে না কিছু—যাচে শুধু তোমার প্রসাদ।”

কিবা— “ক্ষমা করো—দয়া করো দুর্বলগেরে দেব !

ভ্রান্ত জনে শাস্তি দেওয়া তোমার কি সাজে ?

তুমি যে দয়াল-দাতা, ত্রেহপূর্ণ প্রাণ

অক্ষমের ব্যথা যে গো বুকে তব বাজে !”

এই মিনতিপূর্ণ করুণা-ভিক্ষার পরও কি অবিশ্বাসী বলা চলে ?

তিনি ঈশ্বরের একমুখী বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন—

“সত্য একা বিশ্বব্যাপী সত্য ছাড়া নাই রে কিছু

সেই একেরে কেন্দ্র করে বহুর প্রকাশ হচ্ছে পিছু।’

ঈশ্বর এক, কিন্তু বহুর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

“ছোট বড় নানা রূপে দিকে দিকে বাঁহার বিকাশ

সবার মাঝারে থেকে তবু যিনি সদা অপ্ৰকাশ,

জরা-মৃত্যু যৌবনের বিশ্বজোড়া বিতর্কের মাঝে

এ তো সেই নির্বিকার নিয়ত বিরাজে।”

ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকল্প, তিনি কিছুই করেন না। অথচ তিনিই সত্য। তিনিই জ্ঞেয়—তিনিই জ্ঞাতা, একথা হিন্দুধর্মণও বলেছেন। এইখানে ওমরের সঙ্গে উপনিষদের বাণীর আশ্চর্য মিল দেখা যায়। ঈশ্বরের দেখা পেতে হলে তাঁর জন্তে সর্বস্ব ছাড়তে হবে—তিনিও স্বীকার করেছেন—

“দেখা যদি পেতে চাও তাঁর

ছাড়ো এই অনিত্য সংসার

ছিন্ন করো জীবনের যত কিছু কঠিন বন্ধন !

জগতের শত পাকে বন্ধ জীবগণ

পারে না দেখিতে তাঁরে

বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে

স্বজনের মায়া-মোহ পাশ

না যদি করিতে পার নাশ।”

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— “তোমার প্রকাশ হোক

কুহেলিকা করি উন্মাদিন

স্বর্ঘ্যের মতন”

ওমর বলেছেন—

“ওগো বিশ্বদারী

একমাত্র তুমি তেথা সত্য-পথচারী

খোলা খোলা তব সিংহ-দ্বার

দেখাইয়া দাও আজি

কোথা পাবো সুপথ আমার।”

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল,

শুধু ফিরে চাও হে চকল।”

কিবা—

“চির জনমের বেদনা

ওহে চির জীবনের সাধনা

তোমার আগুন উঠুক হে স্বলে,

কৃপা করিও না দুর্বল বলে

যত তাপ পাঠি সহিবারে চাট

পুড়ে ছাই হোক বাসনা।”

এই ধরনের কবিতার বা গানের সঙ্গে ওমরের একান্ত মিল আছে।

“নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

বয়েছ নয়নে নয়নে।”

গানটির সঙ্গে ওমরের—

“বধির এ কর্ণ হায়,

নাহি পায় পদশব্দ তবু !

আমাদেরই দৃষ্টি-পথে

হেগে আছে অপূর্ণ প্রভাস,

তবু এই অন্ধ আঁখি

রূপ তব দেখিতে না পায়।”

কবিতাটিতে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

আনন্দের মধ্যেই যে ঈশ্বরের প্রকাশ, একথা তিনি সাকী এক সুরার মধ্যে দিয়েই বহু ভাবে ব্যক্ত করেছেন। উপনিষদ বলেছেন—  
আনন্দই ব্রহ্ম। সৎ-চিত্ত-আনন্দই সজ্জের স্বরূপ। আনন্দই সত্য।  
এবং সত্যই আনন্দ—এ কথা তো বহু জ্ঞানীরাও বলে গেছেন।

ওমর বলেছেন—

“ওগো সাকী, নিয়তির তরঙ্গ তাড়নে

জীবন-ভরা যদি হয় কুলহার,

না মেলে আশ্রয় যদি পথশ্রমে হ’লে মোরা সারা,

কিছু নাহি আসে-বার, আমাদের করে

পানপান পূর্ণ যদি থাকে।

সত্য হবে সাথে-সাথে নিশ্চেষ্টিতে

পথ জীবনের সকল বিপাকে।”

ওমরের কাব্যের বহু দিক আলোচনা করার মত বস্তু আছে। রূপ ও অরূপের যে তত্ত্বটি কিন্তু তিনি না বলতে চেয়েছেন তা যোগ-হয় এই—

“ঢালিছে যে সুধা শাখত সাকী

নিখিল পাত্র পরে

কোটি বুদ্ধ উঠিছে ফুটিয়া

ফেরিল সে নির্বাসে।

তোমার আমার মত কত শত

সেই শ্রোতে সদা ভাসে

সাকীর পাত্র পূর্ণ সত্যত

কেউ যায়, কেউ আসে।”

You shall have joy, or you shall have  
power, said God ; you shall not have both.

—Emerson.





## লাক্ষাশিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্ব আজ অনেকখানি এবং এইটিকে কেন্দ্র করে মস্ত শিল্প গড়ে উঠছে এই রাজ্যে। ছারপোকার মত এক প্রকার কাঁচ-নিঃসৃত লালাই হচ্ছে লাক্ষা। অপর দিকে লাক্ষা-কাঁচগুলোর প্রধান খাত পলাশ, কুমুম প্রভৃতি গাছের রস। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তরগুলোতে এ সকল গাছ প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে বলে লাক্ষার চাষ এখানে খুব সহজ। লাক্ষাশিল্পে এই রাজ্যের অগ্রগতির মূল কারণই এইটি বলে বোধ হয় ভুল হবে না।

কিছু দিন আগে পর্যন্তও পশ্চিম-বাংলায় লাক্ষার বার্ষিক গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ৪৫ হাজার মণ। কিন্তু এই উৎপাদনের হার এক্ষণে বেড়ে গেছে বিপুল পরিমাণে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিহারের বিস্তার লাক্ষা উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেই থেকেই এই রাজ্যে এই ফসলের উৎপাদন দ্রুত বেড়ে গেছে। বলতে কি, যেখানে বার্ষিক উৎপাদন ছিল মাত্র ৪৫ হাজার মণ, সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ এরই ভেতর। অপর দিকে পূর্বে যে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদন ছিল ভারতের মোট উৎপাদনের ৪.০৮ শতাংশ, এক্ষণে সেইটি বৃদ্ধি পেয়ে ২২.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎপন্ন লাক্ষা পরিশোধনের জন্য ঝালদা, বলরামপুর, তুলিন, পুরুলিয়া ও আদার বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানাগুলো অবশ্য কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে চালু—যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গালা উৎপাদনের জন্য কলকাতায় সংস্থাপিত হয়েছে দুইটি বড় কারখানা। ভারতে উৎপন্ন লাঠি-লাক্ষার এক-তৃতীয়াংশই এখানে পরিশোধন করে গালায় পরিণত করা হয়। সমগ্র দেশে লাক্ষা পরিশোধনের ৪ শত কারখানা (দেশী) আছে এবং তন্মধ্যে প্রায় ১৬০টি কারখানাই স্থাপিত এই পশ্চিম-বাংলায়। আলোচ্য কারখানাগুলোতে অসংখ্য শ্রমিক কর্মনিযুক্ত রয়েছে, এবং অবিরাম সচেষ্ট রয়েছে জীবিকা নির্বাহের জন্যে।

মানুষের প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য-সামগ্রীতে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে লাক্ষার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ হলেও এর ব্যবহার এখানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এটি অঞ্চলে প্রধানতঃ খেলনা, চুড়ি, স্বর্ণালঙ্কার ও অলঙ্কার পালিসের কাজে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। লাক্ষার বেশী ব্যবহার চলে বানিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড ;

কেন, সমগ্র ভারতে উৎপাদনের তুলনায় লাক্ষার ব্যবহার সামান্য। একটি সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে—উৎপন্ন লাক্ষার মাত্র ৮ শতাংশ ভারতে ব্যবহৃত হয়। শতকরা অবশিষ্ট ৯২ ভাগ লাক্ষাই রপ্তানী হয়ে যায় বুটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, রুশিয়া প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোতে। এতে অবশ্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে প্রচুর। হিসাবে দেখা গেছে—ভারত থেকে বছরে যে লাক্ষা রপ্তানী হয়, তার গড়পড়তা মূল্য প্রায় ১০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

ভারতে লাক্ষা উৎপাদনের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১১,০০,০০০ মণ। তন্মধ্যে রাজ্য হিসেবে উৎপাদনের হার এইরূপ :—বিহার—৪,৫০,৫০০ মণ ; মধ্যপ্রদেশ—২,৭৫,৫০০ মণ ; পশ্চিমবঙ্গ—২,৪৫,০০০ মণ ; উত্তর প্রদেশ—১১,০০০ মণ ; বোম্বাই—৬৫,০০০ ; উড়িষ্যা—১৮,০০০ মণ ; আসাম—১৮,০০০ মণ ; পাঞ্জাব—২,১০০ মণ এবং অন্যান্য রাজ্য ১৮,০০০ মণ। লাক্ষাশিল্পের সাময়িক অগ্রগতির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্বের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার\*সে ব্যবস্থা ও প্রস্তাবগুলো সমাক কার্যকরী করবেন, এইটুকু দাবী নিশ্চয়ই রাখা যায়।

## খাত্ত হিসেবে কাজুবাদাম

যত দূর দেখতে পাওয়া যায়, খাত্ত হিসেবে কাজুবাদামের ব্যবহার এদেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানকার জায় বহির্দেশেও আজকের দিনে এর সমাদর যথেষ্ট এবং বিভিন্ন কেবিন, রেস্তোরাঁ, কফিহাউস প্রভৃতিতে আছে এ সরবরাহের ব্যবস্থা। শুধু একটি সুস্বাদু খাত্ত বলেই কাজুবাদামের উক্ত সমাদর নয়, পরন্তু এইটির জগ্রে এব বিশেষ খাত্তগুণই দায়ী। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্লেষণ মাঝকত কাজুবাদামের ভেতর মানুষ খুঁজে পেয়েছে পর্যাপ্ত খাত্তপ্রাণ বা 'ভিটামিন'।

এই ফলটির গুণাগুণ নিয়ে খাত্তবিজ্ঞানীদের গবেষণা অবশ্য চলে আসছে বহু দিন থেকেই। গবেষণায় খাত্ত হিসেবে এর মূল্য ও পুষ্টিকারিতা ধরা পড়েছে অনেকখানি। খাত্তবিজ্ঞানী তথা খাত্ত-বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন—কাজুবাদামে শতকরা ২১ ভাগ রয়েছে প্রোটিন ও ২২ ভাগ শ্বেতসার পদার্থ এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ বলতে যেটি বুঝায়, সেটি আছে কমপক্ষে শতকরা ৪৭ ভাগ। এ ছাড়া এই শ্রেণীর বাদামের শাঁসে আয়রন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, নিকোটিনিক এসিড, রিবোফ্লাবিন—এ সকল পুষ্টিকর উপাদানগুলোও বিশেষ ভাবে বিদ্যমান।

কাজুবাদামের চাষ আজ-কাল ভারতের বহু জায়গায় হচ্ছে—তবে

এইট বেকী পরিমাণে জন্মে থাকে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতেই। পশ্চিমবঙ্গেও এর চাষ চলেছে বটে কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনও খুবই কম। মাদাজ আর অঙ্ক রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলা-গুলোতে প্রচুর কাজুবাদাম জন্মায় এবং সেখান থেকে এইটি চালান হয়ে আসে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে। কাজুশাঁস তৈরীর ব্যবস্থার জগ্রে দক্ষিণ-ভারতে গড়ে উঠেছে বেশ কতকগুলো কাজু-কারখানা।

বহু বকমারী মুখরোচক ও উপাদেয় খাদ্য আমরা পেয়ে আসছি এই কাজুবাদাম থেকে। এর শাঁস কি কাঁচা কি ভাজা—যে কোন বকমেই খাওয়া যায়, তবে সামান্য মুগ বা চিনি মিশিয়ে নিতে হয় এবং দরকার বোধে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। নানাবিধ আমিষ, নিরামিষ ও মিষ্টি খাবার সজ্জা করার জগ্রেও এই শাঁস ব্যবহার করা হয়। শাঁসটায় তেল দিয়ে ভাজলে অবশ্য ঘরে বেশী দিন রাখা চলে না। কাঁচা অবস্থায় এইটি সাধারণতঃ ভাল থাকে এক বছরেরও বেশী সময়। আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রে খাবার চকোলেট তৈরীতে কাজুশাঁস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কাজুবাদামের শাঁসবিহীন খোসাগুলো থেকেও কতকগুলো স্নাত্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য হয়। বস্তুতঃ, কাজুশাঁসে যেখানে ‘ক’ ও ‘থ’ পাণ্ডপ্রাণ রয়েছে সেখানে কাজুফল বা কাজুবাদামের শাঁসবিহীন খোসায় আছে যথেষ্ট পরিমিত ‘গ’ পাণ্ডপ্রাণ। এইটিকে কত ভাবে কাজে লাগান যায়, সেজ্ঞা এরই ভেতর বহু পরীক্ষা হয়েছে খাদ্য-গবেষণা-সংস্থাগুলোতে এবং পরীক্ষায় সফলও পাওয়া গেছে প্রচুর। মোটের উপর খাদ্য হিসেবে, বিশেষ করে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে কাজুবাদামের মূল্য ও গুরুত্ব এ যুগে আদৌ অস্বীকার করা চলে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখে যদি এর চাষাবাদ আরও বৃদ্ধি করা যায়, তবে প্রভূত কাজেই আসবে এবং এই ব্যাপারে জাতীয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি ও সক্রিয় সহযোগিতা বেশী বরকম না থাকলে নয়।

### চাকুরী থেকে অবসরের বয়ঃসীমা

চাকুরী বা কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের বয়স সক্রান্ত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা আছে প্রায় সকল দেশেই। কোথাও বা ৫৫ বছর; কোথাও ৬০ বছর, আবার কোথাও হয়ত ৬৫ বছর বয়সে এই প্রশ্নটি

এসে দেখা দেয় চাকুরীজীবী, বিশেষ করে সরকারী চাকুরিদেব কাছে। স্বতঃই ধরে লওয়া হয় যে, একটানা দীর্ঘ ২৫।৩০ বছর কাজ করার পর গড়পড়তা মানুষের কর্মক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তি অটুট থাকে না বা থাকতে পারে না। বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়স বেধে দিবার নিয়মটি এসে দাঁড়িয়েছে এই ধারণা বা বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই।

কিন্তু প্রশ্ন এখনও থাকছে—অবসর গ্রহণের উক্ত বয়ঃসীমা নির্ধারণ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের চলিত ব্যবস্থা একান্ত সমীচীন বা প্রয়োজনানুগ কি না? অল্প দেশে যেমনই হোক, গ্রেট ব্রিটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এই নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে। গবেষণার ফাঁকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এরই ভেতর মন্তব্য করেছেন—বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণের বর্তমান নীতি বা রীতিটি অচল। তাঁরা দেখেছেন—৫৫ বা ৬০ বছর বয়সে ধীরে ধীরে বাধ্য হলেন কাজ থেকে অবসর নিতে, তখনও তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট সক্রিয়, স্বাস্থ্য তাঁদের অটুট। তত্পরি দেখা গেছে—কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পরই স্বাস্থ্য তাঁদের ভেঙ্গে পড়ে দ্রুত এবং বিনষ্ট হয়ে যায় ক্রমেই সকল পৌক্ষ ও মনের ক্ষুদ্রি। অবশ্য এ মন্তব্যটি তাঁরা করেছেন—গড়পড়তা সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিয়া বা চাকুরীজীবীদের দিকে তাকিয়ে।

আলোচ্য সমস্যা নিয়ে আমেরিকার লাইফ এক্সটেনশন সার্ভিস ফাউন্ডেশন সে তদন্ত বা পধ্যালোচনা চালিয়েছেন, সেটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। সম্প্রতি ফাউন্ডেশন ৩০টি প্রশ্ন সমন্বিত একটি প্রশ্নমালা ছড়িয়ে দেন ১৫ শত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট। উত্তরদাতারা সকলেই মোটামুটি এই কথাটা বলতে চেয়েছেন—অধিক বয়সেও নিশ্চিন্ত স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি বজায় রাখবার জগ্রে অথচটাই সবচেয়ে বড়। জীবন ধারণের উন্নততর ব্যবস্থা থাকলে ৫৫ বা ৬০ বছর, এমন কি ৬৫ বছর বয়সেও সাধারণ অবস্থায় শরীর ভেঙ্গে পড়ে না কিংবা সহসা কারণ হয় না কর্মক্ষমতা বিলুপ্তির। তারপর অবসর জীবনে কি ভাবে সময় অতিবাহিত তথা সময়ের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে, সেইটিও এ প্রশ্নে ভালরকম বিচার্য। বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা নির্ধারণ কালে এই জরুরী প্রশ্ন কয়টি সম্মুখে রাখলে সিদ্ধান্ত সঠিক হবে অনেকটা, এই দাবীটি রাখা চলে।



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু গুপ্ত  
গ্রাম-ক্যালঅপটিকো • ৪৫নং আমলহাট স্ট্রীট • কলিকাতা-৯



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মূলোখ্য দাশগুপ্ত

মৌরীর

কাছে ওরকম হাটগোড় অবস্থায় মঞ্জু ওকে দেখে ফেললো বলে ততটা নয়। মস্তটা মৌরী শুভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলো বলে—প্রথমটায় কেমন যেন বোকাই বনে গিয়েছিল সুদর্শন। তবু সহজ ভাবটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল সে। মুখে হাসি রেখেই চায়ের কাপটা নিয়েছিল হাত বাড়িয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে ভালোলাগার প্রশংসাসূচক শব্দ করেছিল ‘বাঃ’! দাঁড়িয়ে-থাকা মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

এই ঘটনার পর যে পথটা ধোলা ছিল সুদর্শনের কাছে, সেটা এই—এই সহজ ভাবটা বজায় রাখা বা সম্ভব হলে এটার মাত্রাটা আরো একটু বাড়িয়ে দেওয়া। প্রথম ধাক্কায় করেছিলও সে সেটাই। কিন্তু মঞ্জুর মনে হলো, সুদর্শনের চরিত্রটাই বোল-করা কাগজের মতো; ঘোঁকটাই গোটানোর দিকে। মেলে ধরলেও সময় নেয় না গুটিয়ে যেতে।

অনুপায় মঞ্জু জানালায় দিকে তাকিয়ে বসে রইলো মুখে এমন একটা হাসি। ভাঁজ ফেলে যেন, কোন মজার দৃশ্য ওর দৃষ্টিটাকে বাইরের দিকে আটকে রেখেছে। সুদর্শনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো শুধু ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর অপেক্ষা।

অবশিষ্ট মঞ্জু যে একেবারেই কিছু না দেখছিল বা না শুনছিল তা-ও নয়। রান্নার মিষ্টি গন্ধ গলিপথ পার হয়ে গিয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিল প্রতিবেশীর। ওদের বাড়ী আজ কি ব্যাপার? ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে, নানা রান্নার গন্ধ আসছে। মৌরীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? ছেলে এসেছে। কি করে ছেলে? মশু ডাক্তার! এখনই ‘মস্ত’ হলো কাঁ করে? ডাক্তার আর উকিল চলে পাক না ধরতে মস্ত হয় কখনো? তা ডাক্তারীতে মস্ত না হলেও অবস্থায় এখনই মস্ত বিধাট ধনৌ? এ্যা! তবে বুঝি ভালো? জিভটা সামলে ফেলতে হয় যার। তবে বুঝি আলাপ পরিচয়ের বিয়ে? নয়! ওর পিসেমশাইএর বন্ধুর ছেলে। এবার অন্যটা কস্তার দিকে তাকিয়ে মা কি ভাববেন কে জানে! হয়তো এমন একটি আশ্বাসের খোঁজ করবেন মনে মনে। হয়তো একটি নিঃশ্বাসও চাপাতে হবে। আছে, আছে কি আর না। কিন্তু কোন উপকার করবে তারা—সে আশায় বালি। হয়তো জানতে চাইবেন মা ছেলের বয়স। প্রায় সব জানার পর এবার ‘এতো কে জানেন’ বিরক্তি প্রকাশ করবে মেয়ে। মৌরীর-সৌভাগ্য সম্বন্ধে ধারণাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে মার, ছেলের বয়সটা না জানতে পেরে।

বাড়ীটা কি এতো কাছে? কথা কি তারা চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে বলছিল? না। স্বভাবগুলো মঞ্জুর ভীষণ চেনা।

শ্রাণ্ডলের শব্দ তুলে লম্বা বারান্দা পার হয়ে নীচে নেমে গেল বাসুদেব। আশ্রয় পাওয়া গেল ছোটপিসির পাড়ী বেরিয়ে যাওয়ার। ভারি সুবিধে হয়ে গেছে ছোড়াটা। ছোটপিসি না বললে তার পাড়ী চাইবার সাহস কখনই তো তার হতো না কিন্তু এর সমনেশ, তার ঠৈ, ওর বসকদমের জগা ছোটোছুটি তাকে তো করতেই হতো! মঞ্জুর দৃষ্টিটাকে বাসুদেব শ্রাণ্ডলের শব্দ বাইরে থেকে টেনে এনেছিল বারান্দায়—এবার সেটাকে ঘরে এনে সুদর্শনের দিকে তাকালো সে।

নীরবে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে সুদর্শন হাতের জলন্ত সিগারেটটার দিকে চোখ রেখে।

নাঃ! তার মুখে, ঠোঁটে তার ছুই চোখের কৌচকানো দৃষ্টিতে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, লজ্জা বা অপরাধীর মনোভাব বলে তার অর্ধকিছুতেই করা যায় না। উলটে আরো মনে হচ্ছে, একটা অস্বীকারের চেহারা না দেখানো পর্যন্ত তার আহত আত্মমর্ধ্যাদা যেন কিছুতেই শাস্ত হতে পারছে না। মঞ্জু বুঝলো, কেউ কম যাবে না। যুক্তি দু’পক্ষে করা হবে। ইচ্ছাঃ কেমন যেন একটা আনন্দ আর আত্মীয়তা বোধ করলো মঞ্জু সুদর্শনের প্রতি। মুখের উপর এসে-পড়া অগোছালো চুলগুলো হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বললো—কথা খুঁজে পাচ্ছিনে। কিছু বলুন।

অতি মনোযোগের সঙ্গে হাতের অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ঘাসুটের ভেতর ঠেসে ঠেসে নেবাতো লাগলো সুদর্শন।—আমিও পাচ্ছিনে।

—তবে?

নেবানো সিগারেটটা ঘাসুটের ভেতর ফেলে এবার সোজা হয়ে বসলো সুদর্শন।—শুনি, মেয়েদের নাকি কখনোও কথার অভাব হয় না।

—হী, এবার অনেক কথা বলার মতো একটা বাবস্থা করে ফেলেছেন বাটে! বলতে পারি, বেচারী মেয়েরা কি করবে বলুন। চোখ রান্নানো নেই, ভয় দেখানো নেই, হিসাব চাওয়া নেই—কলঙ্ক দেওয়া নেই—অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে তারা কেবল এই একটা মাত্র ক্ষেত্রে। আয়ত্তেও এসে গেছে এ বিস্তারিত আরো বলতে পারি, বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, শক্তি অপক্ষয়ের এমন একটা পথ খুলে রেখেছিলেন বলেই; নইলে এতো দিতে যে আত্মশক্তি তারা সক্ষম করতো—কিন্তু না। এসব কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের জগা একটা জোরালো প্রতিপক্ষ থাকা চাই। ও, ছোড়া না হলে আমার জমে না। বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদ আছে তো—আছে না? তার চাইতে বলুন এ সময়টা আপনি সাধারণত কি ভাবে কাটান বা কি ভাবে কাটলে আপনার ভালো লাগবে বলে মনে হয়? আমবা দেখি, আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে তা সম্ভব কি না।

—এ সময়টা মানে সন্ধ্যার সময়টা?

—হী।

—আমার সন্ধ্যার আনন্দের আয়োজন?

—সন্ধ্যার আনন্দ বলে কে’ন চিহ্নিত আনন্দ আছে না কি?

—বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদের মতো সময়ভেদে চিহ্নিত আনন্দও আছে বৈ কি।

# সাবধান!

আপনার সর্দি  
বিপজ্জনক হ'তে পারে !

গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে—এই উদ্ভূত  
নিশেষ কার্যকরী মলমটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন!

সর্দির আলা যন্ত্রণা যখন এত সহজে দূর করা যায় তখন  
সর্দিতে কেন ভয়ভেঁক ! শোবার সময় বুকে পিঠে ও গলায়  
ভিকস ভেপোরাব মালিশ করুন... আর সর্দি যেখানে যন্ত্রণা  
দিয়ে, ঠিক সেখানেই আপনি বোদ করবেন বেশ আরাম।  
ভিকস ভেপোরাব যখনই অবস্থায় আপনার সর্দির আলা  
যন্ত্রণা দূর করে... আর ঘুম থেকে উঠেই আপনি আবার  
আগের মতই সুস্থ বোদ করবেন। পরিবারের সকলের  
পক্ষে উপকারী।

ইহা দু'ভাবে সর্দি উপশম করে !



১  
উষ্ণ বাস-  
অবস্থায় সর্দি  
কাজ করে—

ভিকস ভেপোরাব  
থেকে যে শক্তি  
প্রদানের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক  
আপনি বাসের সঙ্গে যতন  
করে গলায় ও নাকে সর্দির  
যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।



২  
উষ্ণ বুকের  
ভিতর দিয়ে  
কাজ করে—

ভিকস ভেপোরাব  
করা মাত্রই উষ্ণ  
ভিতর দিয়ে প্রবেশ  
করে, আপনার বুকে।  
সর্দির বাধা দূর করে।



ভিকস  
ভেপোরাব

বুকে, পিঠে ও গলায় মালিশ করুন !

এখনই ভিকস ভেপোরাব ব্যবহার করুন :

মুতন ছোট ট্রায়াল সাইজ টিন—মাত্র ৪০ নং পঃ ও তড়পরি ট্যাঙ্ক।



চাম দেখা দিতে চাইলেও চামবার মেয়ে মঞ্জু নয়। বললো—  
বেশ তাই।

একটু সময় থাকিয়ে রইলো সুদর্শন মঞ্জুর দিকে। তারপর  
বললো—মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে।

—নিয়ম ?

বান্ধাব-দল নয়।

—ও তো আপনি জানেনই না ! কিন্তু মেয়েদের দর ?

—বান্ধাব-দলের মতো মেয়েদেরও কোন বাধা দর আছে, আমার  
জানা নাই।

বাঃ, তা থাকবে না কেন ? দর অর্থে তো টাকা-পয়সার দরই  
বোঝায় না কেবল। মর্যাদাটাও দর। আর বেশীর দিকে না হোক,  
কমপক্ষে দিকে একটা মারাত্মক নিশ্চয়ই তার আছে—কিন্তু তা যখন  
আপনার জানা নেই, তখন যে এমন আদায় করতে পারে—তাঁই না ?  
আদায় করতে না জানলে তবে তো ঠিকতে হবে দেখছি।

পাখার হাওয়া থেকে আড়াল করে আর একটা সিগারেট ধবালো  
সুদর্শন—জীবনভর মানুষ গিগিতে শিগতে চলে। আমি না হয় এ  
বিশ্তোটা এখানেই শিগবে।

—যে শিক্ষাটা সব প্রথমে হওয়া উচিত, সেটা যে কেন শেষ জীবন  
পর্যন্তও ছেলেদের হয় না, বুঝিয়ে—বলেই হেসে ফেললো মঞ্জু।  
বললো—না এ ঠিক হচ্ছে না। এক সন্ধ্যার অতিথি আপনি।  
যদিও আক্রমণটা আপনার দিক থেকেই আসছে, তবুও হার স্বীকার  
করা উচিত আমাদের। বলেছি তো, আজ এ বাড়ীতে আপনার জন্ম  
অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। দেখবেন আরো, অসম্ভব কিছু  
বললেই তা সম্ভব করে সবাই অসম্ভব খুসী হয়ে উঠবে। বলুন, কি  
ভালো লাগবে আপনার ?

আকাশে যে আরোজনটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল সেটা যেন শেষ  
হলো প্রতক্ষণে। ছাড়লো জোর ঠাণ্ডা বাতাস। উড়তে লাগলো  
জানলা-দরজার পর্দা। বজ্রগন্ধের খোঁপা থেকে বরে পড়লো  
মেঘেতে কিছু ভেজা ফুল। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নরম মিষ্টি গন্ধে  
ছোট্ট ঘরটা উঠলো ভরে। সময় হলো এখন জোরালো বাতিটা  
নিবিয়ে সবুজ বাতিটা আলিয়ে দেবার। কিন্তু তারপর ওর নিজের  
পক্ষে এখানে বসে থাকাটা যে হবে সাদা বাতিটার চাইতেও বেমানান !  
ডেকে আনবে না কি মৌরীকে ?

ছুটে এসে বেডিঙর চাবী ধোরালো অমিতা। কি স্তম্ভের রবীন্দ্র-  
সঙ্গীত হচ্ছে। রেডিওটা খোলানি কেন ?

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,

বেলা হলো মরি লাজে—

মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে অমিতা খুসীতে হাসলো।

পরদার নীচ দিয়ে দেখা গেল আলো পড়ে চকচকিয়ে ওঠা চলমান  
তুটো পা আর শান্তিপূরী ধূতীর গিলে-করা কালো সরিপাড়। 'বার'  
থেকে ফিরলেন যতীন বাবু। প্রতিদিন আরো রাত হয়। আজ  
ওধু স্বাস্থ্য-রক্ষা করে এলেন। নইলে রাতে না হবে ক্ষিদে  
না হবে ঘুম। সুদর্শন চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকালো।  
মঞ্জু বলল—বাবা !

—ও !

কিন্তু যতীন বাবু এসে চুকলেন এ ঘরেই। চোখ দুটো তার

ঈষৎ লাল। মাথার চুল কিছুটা উসকো। কারণ, ঝড়ো বাতাসটা  
তিনি পথেই পেয়েছিলেন।

হাতের সিগারেটটা স্ম্যাস্টের ভেতর ফেলে উঠে দাঁড়ালো সুদর্শন।  
তাকে বসতে বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলেন যতীন বাবু ; আর মঞ্জু  
বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ছাদে মৌরীর কাছে।

তখন বুড়ি পড়া শুরু হয়ে গেছে। মৌরী ওর ইজিচেয়ারটা চিলে-  
কোঠার ভেতর টেনে এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে বুড়ি  
মুচছে শরীর থেকে।

—শ্রীমতী এবার বুঝি চিলেকোঠায় বসে প্রকৃতির বুড়িভেজা রূপ  
দেখবেন ?

—আজ্ঞে হাঁ। তা আপনি কি করতে বসেন শ্রীমতীকে ?

—খামকা ভালমানসী দেখাম নে দিদি ! যেন আমি বললেই  
তুই আমার কথা রাখবি ? আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—  
মান-অপমান লোখটা কেবল তোরই আছে নী আমারও থাকতে  
পারে ?

—হয়েছে কি ?

—এই ভদ্রলোকটি যে আজ এখানে বসে গেলেন, তা কি  
আমার জন্ম ?

—নিশ্চয়ই নয়।

—সন্ধ্যা থেকে ছাই আব আদেক-পাওয়া সিগারেট দিয়ে ছাইদান  
ভরাট করতে করতে যে কথা এবং যার কথা উনি ভাবছেন, তাব  
ভেতর কি আমি আছি ?

—একেবারেই না।

—এ অবস্থায় আমার এঁকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করার কোন মানে  
হয় না, তাতে আমার মান থাকছে ?

—একেবারেই না।

—এখন আমার কি করা উচিত ?

—তাকে বসে বসে ভাবতে দিয়ে, উচিত নিজের কাজে চলে  
যাওয়া।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়লো মঞ্জু।—এই দিদি, এরই ভেতর কি  
ভীষণ আপন ভাবতে শুরু করে দিয়েছিস তুই সুদর্শন বাবুকে ?

বুঝে পেলো না মৌরী ওর কথার কি করে এ মানে হয়।  
বললো—এই মানে হয় আমার কথার ?

—একমাত্র এই মানেটাই হয়।

চটে গেল মৌরী। বেশ হয়তো হয়। বিয়ে ভেঙ্গে ফেলা যখন  
যাচ্ছে না তখন আপন ভাবতে তো হবেই একদিন।

—তা তো হবেই। কিন্তু একদিন নয়, সেটা এখনই শুরু হয়ে  
গেছে—মা গো ! হাসি খামিয়ে দম নিল মঞ্জু। চোখের জল মুছল  
আঁচল দিয়ে। তারপর বললো—তবে আর কেন ভদ্রলোকটিকে সবার  
কাছে অপদস্থ করছিস ? এ তো ঠিক হচ্ছে না। হচ্ছে কি ?  
সবার মনে প্রশ্ন জাগছে না, সমস্ত দিন মেয়ে আমাদের এমন কথা  
বললো, কাছে রইলো। বিশ্বের আগের আশ্রাদে বোকা-বোকা ভাবটা  
কেনন স্তম্ভের মুখের ওপর এসে বাজিল—হঠাৎ কি হলো ! ছাদে  
গিয়ে মেয়ে এমন বসে রয়েছে কেন মুখ ঢেকে ? তিনি বা করেছিলেন  
সবার চোখ বাঁচিয়েই তো করেছিলেন। জবাব দেবার যা তা তুইও  
সবার চোখ বাঁচিয়ে দে।



ভুকু ছুটো কুঁচকে ছোট করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইলো মৌরী।  
মঞ্জু বললো—বল না?

—সব তো তুই বলছিস। শেষটুকুও তুই-ই বল।

—আমি তোকে বলছি, সহজ ভাবে এসে নীচে বসতে এক কথা বলতে। রাজী?

একটু ভাবলো মৌরী। বেশ আসছি। তুই যা।

—আসবি?

—আসবো।

—ঠিক?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক।

নীচে নেমে এলো মঞ্জু। বাবা বসবার ঘরেই আছেন। কথা বলছেন স্বদর্শনের সঙ্গে। কিছুক্ষণের জন্ত স্বদর্শনকে নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। নিজেদের ঘরে চলে এলো মঞ্জু। হাত দিয়ে পরখ করে দেখলো শাড়ীটা—না তেমন ভেজেনি। একুশি এটুকু শুকিয়ে যাবে বাতাসে। বাতি না জ্বলে অন্ধকারের ভেতরই চেয়ারটা টেনে এনে বসল মঞ্জু জানালার কাছে। এটুকুই বাকী ছিল। সমস্ত দিন কথা বলতে পারে ও; বলেও তাই। কিন্তু দিনের ভেতর কিছুটা সময় ওর চাই—অন্তত বা না হলে দিনটায় খুঁত থেকে গেল বলে মনে হয় ওর, তা হলো চুপচাপ বসে কাটাবার মতো কিছুটা নির্জন অবসর। ভাবনার জগৎটাও বড় বিচিত্র ওর। তার চেহারাটা যেন পাঁচ বছরের শিশুর ঘাড়ের একটা ঘাট বছরের বুদ্ধের মাথা। মঞ্জু জানে, প্রকাশে বার করলে ওর সঙ্গে মিলিয়ে ওর চিন্তা-জগতের এই রূপটা মানুষের কাছে বামন আকৃতির ঠেকবে এবং বামনকে মজা উপভোগ করার মতোই মুখ করে তারা তা উপভোগ করবে। তাই অপরের কৌতুক বন্ধ করতে সে নিজেই কৌতুক করে তাদের নিয়ে। কিন্তু যখন ও নিজে ভাবতে বসে—তখন সত্যি ভাবে—গভীর ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে। বড় বড় বিষয়বস্তু তার। যে সব বিষয়বস্তুর শেষে একটা করে নীতি-শব্দ জোড়া থাকে কিন্তু নীতি যেগান থেকে দিনে দিনে সরে যাচ্ছে সহস্র যোজন দূরে।

ওলট-পালট হাওয়া বৃষ্টিটাক নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। দূরের নারিকেল গাছটা তেল-জল না জোটা পাগলা ছেলের মতো বাতাসের সঙ্গে সমান তালে মাথা ওলট-পালট করে স্বান করে মনের আনন্দে। রেডিওটার বেজে চলে সেতার। দু'তিনটা ঘর পার হয়ে আসতে গিয়ে আর বৃষ্টি বাতাসের শব্দে চাপা পড়ে রেডিওর যান্ত্রিক শব্দটা হারিয়ে সে আলাপ-এষর থেকে শোনায় যেন। বাদলা প্রকৃতির আপন নিভৃত আলাপের গুঞ্জন মতো।

রাগা যোগান দেওয়ার কাজ শেষ করে ছোট পিসির অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এসে এবার ইপ ছাড়ে অমিতাও। ব্লাউজ বডিক ভিজে গেছে ঘামে। ভিজে গেছে পেট-কোঁটটা কোমর পর্যন্ত। উঠে দাঁড়ানো মাত্র সে বাম কোঁটার কোঁটার লম্বে আসছে উরু-কোমর বেয়ে। মুখটা দিয়ে বেকছে যেন আগুনের শিব। পরম মুখটাকে ঠাণ্ডা করলো অমিতা বৃষ্টির দিকে উঁচু করে তুলে ধরে বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়ে। তার পর চলল ভিজে শাড়ী পায়ের পাতা থেকে টেনে তুলে ধরে স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে। এবার দরকার তার

## প্রাণতোষ ঘটকের লেখা

প্রাণতোষ ঘটক—বাঙলা সাহিত্যে পুরাতন ও পরিচিত, কিন্তু উপজ্ঞাসে বিষয়বস্তুর নূতনত্বে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখকের 'আকাশ-পাতাল' ও 'মুক্তাভঙ্গ' পতনোন্মুখ বাঙালী আভিজাত্যের কাহিনী। এই ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ কাহিনী-রচনার সাহস আগেকার মানুষের ছিল না। যেখানে একটু এদিক-ওদিক হইলে সাহিত্য পর্যাণ্ডিতে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে মাত্রা বজায় রাখিয়া চলায় বিশ্বয় আছে।... পারফর্মেন্স প্রশংসনীয়। শ্রীমান প্রাণতোষ অধিকন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে পুরাতন 'কলকাতার পথঘাট' এর হিন্দিস দিয়া ও আভিধানিক 'রত্নমালা' পুনর্গঠিত করিয়া পণ্ডিতজনকেও বিস্মিত করিয়াছেন। 'কলকাতার পথঘাটে' প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক পুরাতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।—'বিশ্বকর বই' প্রসঙ্গে সংবাদ-সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৬৪

"এতাব্যবসায় অতীত কলকাতার ওপর যেসব প্রবন্ধ ও পুস্তিকা বেরিয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের হাতে সেগুলো ঘোরা-ফেরা করে না। যারা কৌতুকী তারা হয় তো গ্রাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে এসব বইয়ের পাতা ওঁটাবে। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ বাংলা ভাষার পরিবেশন করার ভার প্রাণতোষ ঘটক সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন। এজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়।... একত্রিশটি রাস্তার ইতিবৃত্ত শুনিয়াছেন প্রাণতোষ ঘটক। নানা মৌলিক গ্রন্থ থেকে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথ্য সাজানো এবং সরস বর্ণনায় তাঁকে শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে। তিনি গল্প-উপজ্ঞাস লেখেন। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটের ঐতিহ্য ও সহজ পরিচয় রচনায় তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবী করতে পারে।"—দেশ।

\* \* \* \* \*

আকাশ-পাতাল—(তুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম পাঁচ টাকা। ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। মুক্তাভঙ্গ—পাঁচ টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। কলকাতার পথ-ঘাট—তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। রত্নমালা (সমার্থাভিধান)—আড়াই টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। বাসকসজ্জিকা—চার টাকা। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা-১২। খেলাঘর—চার টাকা। সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৭।

যন্ত্রস্ব

মুঠো মুঠো কুয়াশা—আড়াই টাকা। সাহিত্য ভারতী, কলিকাতা-৭। মনোহারী—আড়াই টাকা। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, কলিকাতা-৭।

একটি ভালো গ্রানের। শরীর থেকে পেরাজ-রস-কাঁচাডিমের যে গন্ধ বেরুচ্ছে—নাক সিঁটকালো অমিতা, এ গন্ধ দূর করতে একটি আস্ত সাবান শেষ হবে। আর শরীর থেকে ত্যাগেই হবে না কি? নাকে লেগে রয়েছে না গন্ধটা? সেটও উপড় করতে হবে ঠিক শিশিপানেক। অমিতা এমনতেই একটু প্রসাধনপ্রিয়, তাতে পশ্চিমবালের মেয়ে ও—প্রসাধনটা ওদের বন্ধে। তিনটে বাজতে না বাজতে আলতা-সিঁদুর-কাঁচল-লতা নিয়ে বসে পড়ে তাবা। কালো চিঞ্চল করে তোলে চুল সগন্ধি তোলে। গোঁপা ঝেঁপে নানা ছাঁদে। কাঁচল চানে, আলতা পরে, টিপ দেয়। পরে ছুরে-শাড়ী নয়তো নালাখা। তার পর পান খেয়ে চোঁচি দুটি রাঙ্গা করে ভুলে বৈকালিক প্রসাধন শেষে। অমিতার বাবার চারচলন সাতবি-বোঁ। তাই তার প্রসাধন সবগমে আলতা সিঁদুর কাঁচল-লতা বাদ পড়লো কিন্তু ডেসি টেবিল কাপ ভরে উঠলো বিকিতি প্রসাধন। এগনও না বাজল-কি করে সব কিনে কিনে পান। কিন্তু পূব-বাংলার মেয়ে মোঁবা, মঞ্জু। ওদের মাথার গোঁপা নাড়ে ভাঙ্গে—পিঠে আছাড় খায়। তৈলহানি রন্ধ চুলের শুদ্ধ আদেকই ওড়ে মুগের উপর। ছপরের শাড়ী বদল হয়ে ওঠে না সন্ধ্যাপর। অমিতা বলে—ছেলেরা তোমাদের দিকে ভুলেও তাকাবে না।

মঞ্জু বলে—ভুলেও তাকাবে না? কিন্তু নাকালো ভুলবে তো?

—না মুখ ফেরাবে।

—মুখ ফেরাবে। তবে তো অবশিত হতে চড়ে। দাঁড়াও কাল থেকেই ওঠে-পড়ে লাগছি আমি। তোমার চুপ হলুদ—

—চুপ হলুদ! চোখ বড় করে অমিতা।

—এ যে, ছপরে গ্রানের সময় তুমি মাথ—এই নাম যেন কি—নাম যেন কি—মাথা চুলকায় মঞ্জু—এই বৌদি সাহায্য করে না।

—বেসন-হলুদ।

—বেসন-হলুদ—কাল থেকে এ ছুটি আমার চাই। ছেলেরা তাকানোটা আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ওদের দিয়ে কিছু করতে তোলা—এ বিয়ে, কাজ আর তাকানো যাঁচ হোক চেহারাটাটি তুমি বলছো মুখা? তাই স্বীকার। পিসিমা বলেন, যে ঠাকুর যে ফুলে ফুটে।

আর মৌরী? মৌরী মুখ গভীর করে তোলে। এসব কথা তুমি আমার কাছে বলো না বৌদি। আমার গুণ হয় মেয়েজাতটার জ্ঞান।

অমিতা বুঝতে পারে না! ছেলেরা রূপ চার আর তার জ্ঞান মেয়েরা রূপচর্চা করে, এতে দুঃখ হওয়ার, লজ্জা পাওয়ার কি আছে?

—ঠিক তো। মেয়েদের কেন, লজ্জা পাওয়ার থাকে তো আছে ছেলেরাই, কি নলো?

তাই বা কেন থাকবে! অমিতা মঞ্জুর এ কথাও মানতে রাজী নয়। মঞ্জু হাসে। মৌরীর চোঁচের কোণে যে ভাঁজ পড়ে তা সামান্য অতি সামান্য, কিন্তু বাঁকা।

যতই গরমিল থাক, সঙ্গ কিছুটা মিলিয়ে আনেই। অমিতার শরীরষড়ে ঢিলে ভাব এসে গিয়েছিল। গ্রান শেষ করে ঘরে এসে নিঃশব্দে দরজার ছিটকানিটা বন্ধ করে দিল অমিতা। দশ মিনিট অন্তত—দশ-পনেরোটা মিনিট শুয়ে পিঠা টান না কবে ও কিছুতেই পাবছে না। চটপট হাতে প্রসাধন শেষ করে, শাড়ী পালটে আলতো ভাবে হয়ে পড়লো সে বিছানায়। আরামে বুজ্জ এলো অমিতার

হুঁচোখের পাতা, আর সেই বোজা চোখের অন্ধকারে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠলো পানিক আগে দেখা আয়নার ওই চেহারাটা। সন্দেহী ও। ওর রূপ লেগেই মুগ্ধ হয়েছিল জয়দেব। সেদিন ওদের বিয়ে হুঁ পক্ষের অভিবাধকই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ বিয়েটা কাকে করেছে তা নিয়ে নয় জয়দেবের বয়সটা ছিল না বিয়ে করার। একুশ হয়েছিল কি না তার সন্দেহ। আর ওদের তরফের আপত্তির কারণটা ছিল, ওরা বড় লোক। ওর বাবার লক্ষ্য ছিল হয় টাকা—নির্ভরণ আর মুগের বাতন। নয়তো যোগ্যতা। কিন্তু এ ছুটোর কোনটা ছিল না জয়দেবের। সে তখন বি, এস-সি পড়ছিল ওর দাদার সঙ্গে। তবু হুঁ পক্ষের অভিবাধককেই তাদের বিমুখ মুখ ফেরাতে হলো। উজোগ আয়োজন করে বিয়েও দিতে হলো। নতুন অস্তিত্বের জ্ঞান মধ্যাদার আসন প্রস্তুত করে রাখতেই যে হবে। সে আজ সাত-আট বছর আগের কথা। আজ ওদের ছুটি ছেলে-মেয়ে। খাঁক ওরা বার-বার কাছের। ভালোই তো। ছোটদের দৌরাছা ওর পোষায় না। আর জয়দেবের যা রোজগার। এবার ওর চোখে ভেসে উঠলো সন্দেহের চেহারা, তার ভিথি, তার টাকা। পুরোনো কথা নতুন করে আজ মনে ওওয়ার পেছনে কারণটাও অবশিষ্ট এটাই দৌড়ের আগে পিছু হটাব মতো। মৌরীর চোঁচতে ও অনেক বেশী সন্দেহ, অনেক বেশী বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু মৌরীর কাছে ওর চিরকালের জ্ঞান তার হয়ে গেল। বিয়ে করে যে মেয়ে জিতে গেল, সে মেয়ের বাজী জেতা হয়ে গেল সমস্ত জীবনের জ্ঞান। একটা দারুণাস ফেললো অমিতা। অদৃষ্ট! অদৃষ্টে থাকলে কত অসম্ভবের ভেতর পথ কবেই না ভাগ্য এগিয়ে আসে, আর নইলে!

অদৃষ্ট! অদৃষ্টটাই সব। ঠিক এই কথাটা বলছিল কানাইলালও রামকে। রান্না হয়ে গেছে তার। তৈরী রান্না সন্ধিয়ে রেখেছে সে উনানের চার পাশে ঘিরে। চপ-কাটলেট-ফ্রাই রেখেছে ডিম-বিকিটে গড়িয়ে। ভেজে দেওয়া হবে গরম গরম। কাজ শেষ করে ছোট পিসির ছেড়ে-নাওয়া শাস্তিনিকেতনী মোড়টার বসে উনান ভাবে বৃষ্টি দেখছিল সে। তার হাতে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা নিয়ে বসে যে ওর সঙ্গে গল্প জমাবে তখন সাহস রামুর ছিল না। তারা এক হয়েও কোথা দিয়ে যেন তার মনে হচ্ছিল এক নয়। কর্তার পদ-গৌরবের সাপট আগে পড়ে তাদের স্বাদের মুখে আর তার পরই পড়ে তাদের ভৃত্যদের মুখে। ছোট পিসির পরই কানাইলালের মুখেও তা পড়েছিল। রামু সমস্তমুদ্রে বসে সময় কাটাচ্ছিল নৈবেদ্যে ঠুক-ঠুক করে চামচ বাড়িয়ে। কৃতার্থ করে দিলো কানাইলাল তাকে একটু চা খাওয়াতে বলে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে উনানে কেটলী চাপালো রামু। কিন্তু মুখ শুকিয়ে উঠলো। বৌদি বলেন, ওর চা নাকি যাচ্ছেতাই হয়। কানাই এতো এতো সব ভালো ভালো রান্না জানে আর ও চাটুকুও ভালো বানাতে জানে না! তে ভগবান, এ লজ্জা এ অপমান থেকে রক্ষা কোরো। নইলে আজকের মতো বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটাই ওর উরে যাবে। ভালো চা বানাবার জ্ঞান রামু প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে গেলো। অমিতা যে ভাবে চা করে তার সব করলো সে। জল আবার ফুটতেই নামিয়ে ফেললো। চা ঢালবার আগে টিপটাকে উনানে ধরে গরম করলো। চামচ যেনে চা দিল। টিকোজী দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট সময় আদ্য

করলো বসে বসে। কাপ গরমজল দিয়ে ধুয়ে না নিলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় বৌদি প্রতিদিন সে ভুলে যায়। আশ্চর্য্যকরম ভাবে কথাটা আজ মনে পড়ে গেল ঠিক সময়ে। বিলিতি দুধ ঢেলে চামচা দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে এবার বামুর মুখ উঠলো উজ্জ্বল হয়ে। চায়ের সোনালী রঙটাই বলে দিচ্ছে ওর চা আচ্ছা হয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চানচুর ভাজা চিরোতে আর কথা বলতে ইচ্ছে করবেই। এক আধটা কথা বলতে বলতে কথায় জমে উঠলো কানাইলাল। বলার মতো কথা কি ওর কিছু কম—সাহেবের খাওয়া পুরার টাইম। চালচলনের কায়দা। মেমসাহেবের মেজাজ আর মজ্জি। মেমসাহেবের দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে তার রান্নার দক্ষতা, ভালো ভালো মাইনার ডাক আসা পর্য্যন্ত কত বিষয় কত কথা।

—ভালো ভালো মাইনা? তবু সে যায় না। কেন? জানতে না চেয়ে পারে না রান্না।

কারণ আছে—বিশেষ কারণ আছে। বেশী টাকার কাজ ফেলে কি এমনি এমনি এখানে পড়ে রয়েছে? বড় লাভের জগৎ ছোটখাট লাভ ছাড়তে হয়। ভাগ্যের সন্ধানে আছে সে। জানে কি রান্না তার সাহেবের ক্ষমতার কথা?

কত তা' না জানলেও কিছু যে জানে, তা জানালো রান্না।

সে কি জানে, সাহেব বাকি খুসী বিশেষ পাঠাতে পারে—ইংলেণ্ড জার্মানি আমেরিকা? শুধু মাত্র সাহেবের মজ্জি নির্ভর? জানে না? তবে ওর কাছ থেকে জেনে রাখুক রান্না বিশেষ পাঠাবার হঠাৎ-কর্তা হল তার সাহেব। তার দরজায় ধরনা না দিয়ে কার্কা প' বাড়তে হয় না। কত কত ছেলের সে দেখেছে এসে হাত কচলে পীড়িয়ে থাকতে—উপহার দিতে, ভেট দিতে। এমন কি—বিশ্বাস করবে কি রান্না—বাজার করে দিতে, মেমসাহেবের ফরমাস খাটতে?

বেশ তো জানলো, বিশ্বাস করলো রান্না কানাইলালের সাহেবকে খুসী না করে কার্কা বিশেষ ষাওয়ার উপায় নাই। সে সুযোগের জগৎ তার সাহেবের দরজায় ধরনা দিতেই হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কানাইলালের ভাগ্য-অন্যেবণের সম্বন্ধ কি?

—আছে আছে। সেও সেই সুযোগের অপেক্ষাই দিন গুণে আর বাবুর্চি জর্জির কাছে ইত্যবসরে শিখে রাখছে ইংরেজীটা।

ততক্ষণে রান্নার মুখের হাঁর ভেতর দিয়ে সাদা-সাদা দাঁত আর লাল টকটকে জিভটা দেখা যেতে শুরু করেছে।—বিশেষ! বিশেষ সম্বন্ধে রান্না এটুকুই জানে, সেখানে একটা কিছু শিখতে যেতে হয়। কেউ যায় ডাক্তার হতে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। আরো অনেক কিছু আছে নিশ্চয়ই—ও জানে না। কিন্তু কানাইলাল যাবে কি করতে?

ঢোলা পা-জামা-পুরা পা ঝাঁকায় কানাইলাল।

কোন-কোন জিনিষটা শিখতে আর দেখতে বিশেষ না গেলে হয়? পত্রিকা পড়ে কি রান্না? অক্ষর-পরিচয়ইন রান্নার মুখ যে লাল হয়ে উঠলো, সে যে লজ্জায় মুখ নাচু করলো—সে সব লক্ষ্য করে না কানাইলাল।

তার ভেতরটাও তো চকলিই। সে তো বুঝতে পারছে তার বিশেষে বাবার কথাটা রান্নার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। কিন্তু কেন? ঐ তো সেদিন সে শুনেছে সাহেবের একদল সব যাচ্ছে এবার বিশেষের বাজার ঘুরে দেখে আসবার জন্ত। তবে রান্না শিখছেই বা বাবার

প্রয়োজন হবে না কেন? কানাইলালের পাবি কান্না আরো বেড়ে ওঠে। খানাপিনা যা হয়—তার রান্না, তার পরিবেশন, তার টেবিল চেয়ারে কাঁটা-চামচ—খাওয়া-বসা তার কোনটা দেশী? এ সব শিখতে হয় না। রপ্ত হতে হয় না বিদেশী রীতিতে। কত নিরুৎসাহ শেখা সম্ভব এখানে বসে। কিন্তু ভুল হলে সাহেব যায় চটে। একদিন চটে গিয়ে মেমসাহেবকে বলছিলেন—দেও এটাকে বিলেন্ড পাঠিয়ে। শিখে আসুক কি ভাবে ওদেশের 'ইয়োটার' মনিবের স্বত্ব করে। মস্ত মস্ত লোক সব কেমন তাদের ওপর নির্ভর করে দেয় জীবন কাটিয়ে! নইলে ওকে দিয়ে পোষাবে না আমার। অভাবনীয় ভাবেই সুযোগটা এসে গিয়েছিল। বলেও ফেলতো সেদিনই কথাটা। কিন্তু বড় বেগে গিয়েছিলেন সাহেব—রাগের সময় কোন কথা বলতে নেই। একটু থামলো কানাইলাল। তারপর বললো—ওঁরা দেশের সেবা করেন, আমরা ওঁদের সেবা করি। ওঁরা দেশের সেবা করা শিখতে বিদেশ বান, আমরা যাবো ওঁদের সেবা করা শিখতে। ওঁরা বিদেশ থেকে না দেখে না শিখে আসলে দেশের কোন কাজ করতে পারেন না, বিদেশী কাজগুলো আমরা পারবো কি করে?

এতক্ষণে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লো রান্না।

বেশীক্ষণ শুয়ে থাকবার সাহস ছিল না অমিতার। কে জানে ছোটপিসি এখনও রান্না ঘরেই আছেন কি না! তাই যদি থেকে থাকেন তবে তিনি রান্নাঘরে আর ও ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে—না, এতো সাহস না দেখানোই ভালো। উঠে পড়েছিল ও। রান্নাঘরের বারান্দার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো কমিতাকে। কান পেতে শুনলো কানাইলালের কথা। হাসি চেপে সোজা ছাদের দিকে বাড়িল রান্নার আলোয় দেখতে পেলো অন্ধকার ঘরে ভানালার কাছে বসে আছে মঞ্জু। বুড়ীটা শুখন প্রায় ধরে এসেছে। যেটুকু পড়ছে তাতে ঝাপটা ভাব নেই। পিসিমা বাঁটা দিয়ে বুড়ীর জল সরাজেন বারান্দার। মঞ্জুদের ঘরে এসে ঢুকলো অমিতা। বাতি আলিয়ে দিতে হঠাৎ আলোয় হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো মঞ্জু।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলো—মাথায় চিন্তা আছে কি কিছু?

—আপাতত শূন্য।

—তোমার বাপ-দাদাদের যে কথা স্বপ্ন দেখতে সাহস নেই, তোমার ছোটপিসির বাড়ীর ভৃত্য তা ভাবে—এর ভেতর চিন্তা করবার মতো কিছু আছে বলে মনে হয়নি তোমার?

কানাইলালের বলা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। সে তখন বলছে তার বিদেশের লক্ষ্য কি এ বাড়ীর কাজটাই ভেবেছে রান্না। পাগল! তার লক্ষ্য দিল্লী। একবার ঘুরে আসতে পারলো দিল্লী তাকে ডাকবে না, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপানো বোভনীয় সব ডিনার টেবিলের পেছনে এক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না?

যে রান্না কাচের কাপ-ডিস ভেঙ্গে বৌদির কাছে ধমক খেতে খেতে হাসে; দিদিমণিদের বন্ধুদের কাছে চায়ের নামে গরমজল স্নেহ ধরে দিতে গিয়ে ট্রে শুদ্ধ ফেরত আনতে আনতে—'ভক্ত মন মেয়ী মাতার নন্দনে,' গেয়ে ওঠে—ফের ধমক খায়, ফের হাসে—সে রান্নার মন আজ প্রথম ব্যর্থতার হুখে ছেয়ে গেল।

অমিতা যখন ভিজে বারান্দা শুকনো নেকড়া দিয়ে মুছে দেবার জন্ত রামুকে ডাক দিলো, ছাড়া-ছাড়া চেহারায়ে কাছে এসে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলো রামু।

দৃষ্টি-বিনিময় হলো অমিতা আর মঞ্জুর। জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু—কাজটা এক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে রামু? পিসেমশাই-এব মতো একজন সাহেবের খোঁজ আগে করে নিলে হতো না?

হতবাক হয়ে গেল রামু, দিদিমণি বুঝলো কি করে ওর মনের কথা!

—কি, অমন বোকাম মতো চেয়ে রয়েছিস কেন? আগে একজন সাহেবের খোঁজ করে নিলে ভালো হতো না? তিন হাজারী না হোক, নিম্নে দেড়-তুই।

রামুর কাছে তখন মঞ্জুর বোকাম বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠেছে—আপনি কি করে বুঝলো দিদিমণি?

—তোমার মুখের লেখা পড়ে।

—মুখে আবার লেখা পড়ে নাকি! অবিশ্বাসের সঙ্গে হতে দিয়ে মুখটা মুছলো রামু।

—পড়ে না? তুই আমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলিস, বলিস সে ভাবে ছোট পিসির সঙ্গে? ও বাড়ীর কেঁঠর গলা জড়িয়ে ধরে হি-হি করে হাসিস, করিস কখনো সে বকম কানাইলালের সঙ্গে?

—না তো!

—কেন করিস না?

বোকাম মতো তাকিয়ে রইলো রামু, মঞ্জুর দিকে।

—ঐ মুখের লেখা পড়ে। তুইও জানিস সে-লেখা পড়তে। পত্রিকা পড়ার চাইতে এ লেখা পড়া অনেক শক্ত। কানাইলালের চাইতে তুই কিসে কম? ঐ, তার মতো অবশ্যি তোমার সাহেব নেই। তাতে হয়েছে কি—কানাইলালের সাহেব তো আমারই পিসেমশাই—তোমার যাওয়া আটকাবে কে? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বোকা তবে?

বিশ্বাস যে রামু করলো তা নয়, কিন্তু মনের দুঃখ-দুঃখ ভাবটা কেটে গেল। বিশ্বাস—কানাইলালেরই যে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে তারই বা বিশ্বাস কি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো রামু নেকড়া-হাতে, বারান্দা মুছতে।—‘ভজ্ঞ মন মেরী মাতার নন্দনে।’

—আবার। জিতুকাটলো রামু।

বসবার ঘরের উদ্দেশ্যে আসতে আসতে মঞ্জু বললো—বৌদি ভাবছি কি জানো, ভাবছি, কানাইলালের পরিকল্পনাটা দিল্লী পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। হয়তো পরিকল্পনা কমিশনের মেম্বার টোবার হয়ে যেতে পারে।

বসবার ঘরে এসে দেখলো ওরা একটুও গল্পে জমেনি। প্রধান অতিথি যদি গল্পী না হয় তবে গল্প জমবেই বা ক’কে নিয়ে। বাসুদেব এ-টেশন থেকে ও-টেশন পরিয়ে চলেছে রেডিওর চাবী। কখন শব্দ হচ্ছে ঘর-ঘর, কখন বেজে উঠছে বর্ষা কথা বা ইন্দোনেশিয়ার

সংবাদ। যতীন বাবুর সঙ্গে কথা বলছে সুদর্শন সবিনয়ে আক্ষেপে ঐ আর আক্ষেপ না দিয়ে। জয়দেবকে ঘরে না দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলো অমিতার মুখ আর ওদের সঙ্গে মোরীকে না দেখেই হয়তো টোটার কোণে যে চুল পরিমাণ কাঁক ছিল সেটুকুও সেঁটে গেল সুদর্শনের।

বসে অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললো—যুদ্ধটা কড়া হবে ত’পক্ষে।

—যুদ্ধ! কোথায় কড়া যুদ্ধ হবে?

একটা নিশ্বাস টানলো মঞ্জু—কানে কানে কথার জবাবের নয়না এই! রেগে উঠলো সে। কোথায় তা আমি কি করে বলবো। তবে হবে।

—যুদ্ধ, কখনোই আর যুদ্ধ হতে পারে না। রেডিও বন্ধ করে উঠে এলো বাসুদেব।

হেসে ফেললো মঞ্জু। না হবে তো না হবে। যুদ্ধ দিয়ে করবো কি আমি। না আছে একটা ঘোড়া না আছে একটা তলোয়ার। লক্ষ্মীবাঈ হওয়া তো ঘটছে না কপালে।

যতীন বাবুর জন্ত বহুকণ ধরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল সুদর্শনের। চেন মোকার যাকে বলে সুদর্শন তাই। কষ্ট হচ্ছিল তার। হঠাৎ খেয়াস হতেই যতীন বাবু উঠে গেছেন। সিগারেট ধরালো সুদর্শন। তার পর ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে চোখ ছুটো কুঁচকে ছোট করে তাকালো মঞ্জুর দিকে—ঘোড়া আর তলোয়ার পেলেই আপনি বুঝি যুদ্ধে নেবে যেতে পারেন?

—পারি। তবে একটা ঘোড়া আর একটা তলোয়ার দিয়ে তো আর অসংখ্যের সঙ্গে লড়ায়ে পারবো না? একজন লড়লে প্রতিপক্ষও একজন হতে হবে। অসংখ্য দিতে পারেন তো লড়বো অসংখ্যের সঙ্গে।

—লক্ষ্মীবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ হয়েছিলেন ইংরেজের সঙ্গে লড়ে। আপনি লড়বেন কার সঙ্গে?

—লড়বো কার সঙ্গে! লড়বার জন্ত সময় সময় আমি যে দস্তর মতো মানসিক যন্ত্রণা বোধ করি।

—আমি সরবরাহ করবো না হয় আপনাকে ঘোড়া আর তলোয়ার।

সুদর্শনের চোখে ঠাটা-বিদ্রূপ না পরিহাস তাকিয়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করে না মঞ্জু। বলে—উঁহ, আপনার সরবরাহ দিয়ে আমার সংগ্রাম চলবে না। ও তো! ব্যবসায়ীর ব্যবসা—

—এই মঞ্জু, ছোট পিসি—অমিতা! টোটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে মঞ্জুকে চূপ করবার ইশারা করে। সুদর্শন হাতের সিগারেট আবার হ্যাঁসটের ভেতর ফেলে। বাসুদেব উঠে বড় কৌচটা ছোট পিসিকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তিনি বসেন না। আহুমান জানান খাবার টেবিলে আসবার। খাবার সময় নেমে আসতেই হলো মোরীকে। বাবা নিজে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন তাকে। [ক্রমশঃ]

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

কামিস  
মূলকারণ দূর  
করুন



সিরোলিন  
খান

নিরাপদ  
পারিবারিক  
ঔষধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি  
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কাশির মূলকারণ হুট-  
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।





স্মরণি মিত্র

১৭

বিপ্লবী ঋণের আদর্শে মন-প্রাণ ঢেলে,  
মূর্তি-পূজার ঘাড় কেন তুমি সব দৌব ফেলে  
'পূরণ' ও 'তত্ত্ব'কে ধিকৃত কোরে গেলে রাহা ?  
পূরণের যুগটাকে তামসিক কেন বোলে গেলে ? ১

১। সংস্কার-যুগের প্রেরণাই হোচ্ছে ফরাসী-বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবাদীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে সংস্কার-যুগের প্রতিভাবান নেতারা আমাদের পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র, লোকব্যবহার ও ধর্মসাধন পদ্ধতিকে নির্মমভাবে আক্রমণ কোরেছিলেন। রাজা রামমোহনই প্রথম যোদ্ধা। তিনি পৌরাণিক যুগের ঘাড়ে সমস্ত দৌব চাপিয়ে, জাতীয় অবনতির সমস্ত তেতুকে আরোপ কোরে এই পৌরাণিক যুগটাকে জাতীয় জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হোয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, রামমোহনের মতো অতো বড়ো মনোবীণ পূরণধর্মের বিকাশের ধারাটাকে ধ'রতে পারেননি, বৌদ্ধ-যুগের অধঃপতনের পর পৌরাণিক ধর্মের সাধনাস্ত্রে সাময়িক ভাবে যে আবর্জনা এসে জ'মেছিলো, তিনি তাই শুধু দেখেছিলেন ! অবিলম্বে আমাদের এই পৌরাণিক যুগ সর্বন্ধে তাঁর এই অমূল্য সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই একটা ব্যতিক্রম।

তবু পরবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারকদের মতো তিনি ইউরোপীয় সংস্কারকের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হননি, তাঁদের মতো তিনি পৌরাণিক ধর্মকে একেবারে অধম বোলে উড়িয়ে তাননি। পূরণকথিত ধর্মকে তিনি অধঃপতিত যুগের একটা নিম্নস্তরের ধর্ম বোলে স্বীকার কোরে গ্যাছেন। এ-ব্যাপারে তিনি পরবর্তী ব্রাহ্মনেতাদের চেয়ে কিছুটা উদার এক আত্মস্থ।

ঋণের মতবাদ ভারতের পক্ষে কি খাটে ?  
এমনকি ইউরোপ কি ফল ফ'লেছে বোলে তাতে ?  
স্বাধীনতা-সাম্যের ধান্নাটা ধরা প'ড়ে গ্যাছে  
উনিশ-শো-চোদ্দার নৃশংস সংগ্রামটাতে !

বিগত যুগের প্রতি সে-যুগের আধুনিক ঋণ  
সংগ্রাম শেষ কোরে সে নিজেই হোয়েছে হতাশ !  
সাম্যবাদের ভিত্তি কোনোদিন হয়নিকো দৃঢ়,  
স্বাধীনতা-মৈত্রীর স্বপ্নটা হোয়েছে বিনাশ !

যাই হোক, আমাদের পূরণ ও তত্ত্বের যুগ  
ভারতীয় জীবনের সাময়িক তুচ্ছ অস্থখ।  
কাকুর অস্থখ হোলে প্রথমে তো ডাকো ডাক্তার,  
না কি চাও অগ্রিম ঋণানের চিতায় উঠুক ?

অধঃপতিত ঐ পূরণ ও তত্ত্বের দিন  
স্বামিজীর দৃষ্টিতে একেবারে নয় প্রাণহীন।  
ধর্ম-জীবনে তার পঙ্গুতা এসেছিলো ঠিকই,  
তাই বোলে কোনোকালে হয়নি সে মৃত্যু-মলিন।

মূর্তি-পূজার নামে জঞ্জাল জ'মেছিলো বোলে  
মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলে অমূর্তে পাড়ি দেওয়া চলে ?  
চিরাভাস্ত ঐ স্বভাবের ধারাটাকে ফের  
সাগরের মুখ থেকে নিয়ে বাবে গিরিসুহান্তলে ?

তোমার বুদ্ধি থাকে একেবারে দিলো বরবাদ,  
সিদ্ধির গুহা থেকে ঐ শোনে। তার প্রতিবাদ।  
স্বামিজীও আজীবন জ্ঞান-যোগী হওয়া সম্ভব  
এ-ব্যাপারে তাঁর মত চের বেশি অপকৃপাত।

“Those reformers  
Who preach against image-worship,  
Or  
What they denounce as idolatry,—  
To them I say—  
Brothers !...  
A beautiful large edifice,  
The glorious relic  
Of a hoary antiquity  
Has,  
Out of neglect or disuse,  
Fallen into a dilapidated condition ;  
Accumulations of dirt and dust  
May be lying  
Everywhere within it ;  
May be, some portions  
Are tumbling down to the ground.

What will you do to it ?  
Will you take in hand  
The necessary cleansing and repairs  
And thus restore to the old,  
Or  
Will You pull the whole edifice  
Down to the ground  
And seek to build  
Another in its place,  
After a sordid modern plan  
Whose permanence  
Has yet to be established ?”

১৮

চাইলেও পারবে না ; এমন কি বুদ্ধও, যার  
পুতুল-পুজোর প্রতি সবচেয়ে বেশি ধিক্কার,  
মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পরেতে নিজের  
পুজোর পুতুল বোসেছেন সারা এশিয়ার !

পৃথিবীতে দুটো দল প্রতীকের উপাসক নন,  
এক হোলো বুদ্ধের আর যারা পশুর অধম ।  
এ-দু'য়ের মাঝখানে আর যতো মাঝারির দল,  
প্রতীকের প্রয়োজন সকলেরই আছে বেশি-কম ।

সে-হিসেবে পুরাণেই আমাদের বেশি কল্যাণ ।  
এখানে ‘সোহহ’ নয়, আমি দাস, তুমি ভগবান ।  
বাসনাবিবশ মনে বেদান্ত বেদনাদায়ক,  
সহজ ভক্তি-পথে সবচেয়ে কম সৌকসান্ ।

এ পথেও একদিন ‘তুমি-আমি’ একাকার হবে,  
‘দাসোহহ’ মিশে যাবে ‘সোহহ’-এর মহা বৈভবে ।  
তখন হয়তো আর পুরাণের প্রয়োজন নেই,  
তার আগে পুরাণের সোপানটা পার হোতে হবে ।

প্রাপ্তির শেষে গিয়ে তবুও কি তাকে ভুলে যাবো ?  
ছাদে উঠে সিঁড়িকে ভুলে যেতে বাধবেনা ভাবো ?  
পুরাণের ‘দাসোহহ’ ‘সোহহ’-এরই সোপান যখন,  
জ্ঞানের চরমে উঠে ভক্তির মানে খুঁজে পাবো ।

২। “যে সব সংস্কারকেরা মূর্তি-পুজোর বিরুদ্ধে প্রচার কোরে থাকেন, অর্থাৎ পুতুল-পুজো বোলে যার নিন্দে কোরে থাকেন, তাঁদের আমি বোলি,—ভাই...সুন্দর বিরাট একটা বাড়ি, বহুকালের প্রাচীন একটা মহান্ স্মৃতিচিহ্ন অবহেলা এবং অব্যবহারের ফলে আজ পতনোন্মুখ। তুমি তাকে কি কোরতে চাও ? প্রয়োজন মতো পরিষ্কার এবং মেরামত কোরে তাকে তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনবে, না সমস্ত বাড়িটাকেই ভেঙ্গে ফেলে তার বদলে বাজে আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আর একটা বাড়ি তৈরী কোরবে, যার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনো কেউ নিশ্চিত নয় ?”

—The Religion we are born in (Colombo to Almora : Page 408.)

তখন বুঝবো এই পৃথিবীতে আছে যতো ভাব,  
কোনোটাই হয় নয়, কম-বেশি সবেতেই লাভ ;  
‘জ্ঞান’ বা ‘ভক্তি-যোগ’, কেউ কারো বিরুদ্ধ নয়,  
আত্ম-জ্ঞানের পথে সকলেই এক-একটা ধাপ ।

তখন সমস্বয়, তার আগে বুখা কোলাহল !  
মতুয়ার বুদ্ধিটা সিন্ধির অভাবেরই ফল !  
সিদ্ধ সাধকই শুধু এ-কথা বিশেষ কোরে বোঝে—  
রাস্তাটা বড়ো নয়, একাগ্রতাটাই আসল ।

১৯

তুমি কিংবা পরবর্তী ব্রাহ্ম-নেতা যারা  
বুদ্ধিকে নিয়োজিত কোরে  
অরূপের ভিত্তিতে  
নোতুন ধর্মমত গোড়ে  
ধর্ম-সমস্বয় চাও,  
তার এটা কেন তুলে যাও  
বুদ্ধি বা যুক্তিটা  
ধর্মের শেষ কথা নয় ?  
আত্মার অনুভূতিটাই ;  
বিচিত্র বিশ্বের  
ঐক্য-সত্তাটার  
সাক্ষাৎ দর্শন চাই ।  
বুদ্ধির মজুগা নিয়ে  
জ্ঞানকে ভিত্তি কোরে  
মূর্তিকে ছেঁটে বাদ দিয়ে  
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান শাস্ত্রকে যদি  
একেছরের বাদে  
জোর কোরে টেনে এনে কেউ  
নোতুন ধর্মমত করেন হাজির,  
সেটাও সমস্বয়,  
তবে সেটা নিম্নশ্রেণীর । ৩

৩। “He ( Raja Rammohan Roy ) spared no system of idolatry. He directed his able pen in exposing and denouncing in no measured terms the idolatrous prejudices of Hinduism, Mahommedanism and Christianity. But at the same time he culled together passages from these scriptures inculcating Monotheism. Thus he proved a friend and foe to each of the three principal religious systems of the world. An unsparing and throughgoing iconoclast, he yet failed not to extract the simple and saving truth of monotheism from every creed, with a view to lead every religious sect with light of its own religion to abjure idolatry and acknowledge the

উটা হোলো বুদ্ধির,  
সাধনা বা সিদ্ধির নয়।

বুদ্ধির কৌশল  
কেটে যায় বুদ্ধিরই বলে,  
কিন্তু বা' পেলে তুমি  
সদয়ের গিরি-গুহাতলে,  
প্রাপ্তির চরমেতে  
ঐক্যের অমুভূতি যেটা,  
—সে হোলো মৃত্যুতীন,  
হৃদয়ের মতো স্বপ্নজালে।

আসল সময়ে  
বুদ্ধির নিপীড়ন নেই,  
একটা বিশেষ মতে বিশেষ পাথেই  
যুক্তির ধাক্কা তুলে  
সবাইকে টেনে আনা নয়,  
সাধনার জোরে  
'এক'কে বিশেষভাবে অমুভূত কোরে  
অনেকের মাঝখানে  
তাকে পেতে হয়।  
এইভাবে সাধনার শেষে,  
একদিন একেবারে  
প্রাপ্তির চরমেতে এসে  
ব্রহ্মের অমুভূতি পোলে,  
এক আর অনেকের  
মাগিক সামাটা মুছে গেলে  
তখন বুঝবে 'তুমি এই—  
বহুরূপী ব্রহ্মের  
অসত্য বোলে কিছু নেই।  
তখন তোমার  
বিচিত্রতার প্রতি  
বিদ্বেষ থাকবে না আর।  
এই যে সময়  
—এ হোলো বোধির,  
বিচিত্র সাধনার চরমে গিয়েই  
অখণ্ড ঐক্যের অমুভূতি এই।

তোমার সময়ে  
বুদ্ধির কৌশল আছে,  
সাধনালব্ধ এই  
সাক্ষাৎ অমুভূতি নেই।  
তাই জন্মেই  
তোমাদের মতবাদটায়  
বহুরূপী ব্রহ্মের  
বিচিত্র স্বাক্ষর নেই।

তাই জন্মেই  
ব্রহ্মের মর্ত্যাগমন,  
যুগের প্রান্তে এসে  
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের  
সাধনার এত আয়োজন।  
স্বামিজী বলেন,—  
“To proclaim  
And make clear  
The fundamental unity,  
Underlying all religions,  
Was the mission of my Master.  
Other teachers  
Have taught  
Special religions  
Which bear their names,  
But  
This great teacher of the nineteenth

century

Made no claim for himself,  
He left  
Every religion undisturbed  
Because  
He had realised  
That, in reality,  
They are all  
Part and parcel  
Of the one Eternal Religion.”

[ ক্রমশঃ ।

One Supreme. He went through the Hindu, Mahommedan and Christian scriptures with indefatigable perseverance, and set forth the unity of God from the teachings of these books, while he argued away with unsurpassed ingenuity and erudition all doctrines inculcating Polytheism.”

—*The Brahmo Somaj, or Theism in India.*  
(*Indian Mirror*, July 1, 1865) by Keshab Ch. Sen.

“আমার গুরুদেবের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিলো, সমস্ত ধর্মের মূলে যে ঐক্য রয়েছে, তাকে ঘোষণা করা। অসংখ্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করেছেন, সেগুলো তাঁদের নিজস্বের নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্যদের নিজের জন্ত কোনো দাবী রাখেননি। তিনি কোনো ধর্মের ওপরেই হস্তক্ষেপ করেননি, কেননা, তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমস্ত ধর্মই এক সনাতন ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ।”

—*My Master* (page 69)

## ছািবিশ

ঠাণ্ডা জল ঢাললে গায়ে মঞ্জরী, তার সমস্ত ভাবনার গায়ে ঢেলে  
দিলে ঠাণ্ডা জল। ছবির কাজ সে পাবে না। এই  
দেহবেসাতাই তার নির্মম নিয়তি।

আজ আপনি যান, আমার শরীর বইছে না।

তাড়িয়ে দিচ্ছ এখন থেকেই। কিন্তু আজ একটু বেশী রাত  
অন্ধি তোমার কাছে থাকব বলেই এসেছিলাম। কালই আমার  
চলে যেতে হচ্ছে মধুপুর; এক হস্তাণ্ড থাকতে পারলাম না। কালই  
যেতে হবে।

আপনার পায়ে পড়ি হুলুবা; আজ আপনি যান।

হুলুবা; মঞ্জরীকে ভালো করে দেখলো। কি হলো। কি  
হতে পারে। শরীর খারাপ, ক্লান্তি, ওসব বাজে কথা। ওদের  
কখনও ক্লান্তি আসে না। তবুও হুলুবা; বুঝলো, আজ এখানে  
থাকলে মেজাজট খারাপ হবে। আমোদ জমবে না। ভাবানীপুরে  
বাণীর কাছে গেলে কেমন হয়? হুলুবা; উঠলো।

মধুপুর থেকে ফিরে এসে দেখব। আমার কলকাতার মোতাত  
ভেঙ্গে গেছে।

হুলুবা;র মদ খেলেই কাব্য আসে আর গা গুলিয়ে ওঠে মঞ্জরীর।  
একটি কথাও বললে না সে।

নীচের চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে ছেঁড়া কাগজগুলো তুলে নিলে  
হুলুবা; পতিতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন।

নিজের সহ-এর ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলো।

হতাশ হয়ে ওপর দিকে একবার তাকাল হুলুবা;। ঝাঝ  
লাগছিলো প্রায় বাড়ীউল্লীর সঙ্গে।

কি গো ভালো মানুষ? আজ চললে যে এখনই?

আর ভালো লাগে না; ভাবছি এ সব ছেড়ে দেব। হুলুবা;  
কথাগুলো নিজেকেই বললে কিন্তু জ্ঞানদা শুনতে পেল।

ভালো লাগে না কি গো? মঞ্জরী ঝগড়া করেছে?

ঝগড়া? কই না? শরীর খারাপ তার।

শরীর খারাপ? টোট উলটে ভঙ্গী করলে সে। বেস্তার আবার  
শরীর ভালো হয় কবে? হন হন করে জ্ঞানদা চললো মঞ্জরীর  
ঘরের দিকে।

মঞ্জরীর ঘর বন্ধ।

তাই বলো। আশস্ত হল জ্ঞানদা। অস্ত্র বন্দের লুকিয়ে  
রেখেছিল ঘরে। মঞ্জরীর পেটে পেটে এত? হাসিতে বীভৎস  
লগালো প্রোচা জ্ঞানদার বসন্ত-মুগ্ধিত মুখ।

মার না খেয়ে কাল্লা মঞ্জরীর জীবনে এই প্রথম।

ফুলে ফুলে কাদলে মঞ্জরী, আর ভাবলে। এই সমাজের বিরুদ্ধে  
কোনও প্রতিশোধ নেবার নেই। জাগুবিল ছাপিয়ে নয়।  
আবেদন করে নয়, গোপন স্বভঙ্গ দিয়ে সমাজের মধ্যে ঢুকে; বিধ  
হুড়িয়ে। নৃষিত দেহ দিয়ে জড়িয়ে। কলুষিত করে কদর্ঘ কামনায়।  
কিন্তু তার জন্তে চাই টাকা। ছবির কাজটা হয় না?

মঞ্জরীর ইতিহাস আর পাঁচজন বেস্তার চেয়ে তখনও পর্যাপ্ত তেমন  
প্রাথমিকভাবে অসাধারণ কিছু নয়। শুধু বেস্তাদের মত সে  
অজ্ঞাতপিতার সন্তান নয়। তার বাবার নাম নূপেন গুপ্ত।  
লক্ষণী স্ত্রীজ্ঞানদার বড়বাবু। সন্ধ্যার পর ক্লাবে ব্রিজ খেলেন, রাত



## নীলকণ্ঠ

নটায় আসেন মঞ্জরীর মার কাছে। রাত বারোটার বাড়ী ফিরে  
যান। কিন্তু একদিন অস্ত্রের একদিন। যেদিন নূপেন আসেন না,  
সেদিন আসেন মহাদেব চাটুজো। নূপেন আর মহাদেব দুই নকু।  
একই নারীকে শর্যাসঙ্গিনী করতে ঈর্ষা বোধ করেন না, এমন বন্ধু  
বোধ করি বিরল। নূপেনকে মঞ্জরী বাবা বলেই ডাকে, মহাদেবকে  
সোনা-বাবা! মাকে মঞ্জরী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো; তুমি  
বাবাকে বেশী ভালোবাস না, সোনা-বাবাকে? সোনাবালা তার  
জবাব দেয় নি। বলেছিলো বেস্তার কাউকে ভালোবাসতে নেই  
পেঁচি। ব্যবসা নষ্ট হয় তাতে। তুই কাউকে ভালোবাসতে যাগনে।  
আর পুরুষ মানুষের ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষার চেয়েও  
মারাত্মক।

মঞ্জরীও কাউকে ভালোবাসে না। ভালোবাসে গান গাইতে  
শুধু, কিন্তু পাবে না। গানের হাতেখড়ি তার স্বর্ঘ্যমুখী, ইন্দুমুখীর  
কাছে। তারা দুই বোন, দুই বান্ধবী। কিছুদিন ট্যাঙ্গরায়  
তাদের বাড়ীর পাশে মঞ্জরী আর তার মা ছিলো। সেই সময়  
মা রে গা মা সেখেছিলো মঞ্জরী; সে আর কদিন? তার  
পরেই তারা উঠে যায় ভাবানীপুরে। গান শেখা আর এগোয়নি।  
সোনাবালা মঞ্জরীকে বলেছিলো, হুংখ করিস নি পেঁচি, যা নিখেছিস  
তাতেই চলবে। বাবুরা কি আর গান শুনতে আসবে! যা হয়  
একটা কানের কাছে গ্যা-গ্যা করলেই হয়।

বাবুরা হয়ত খুসী হয় কিন্তু মঞ্জরী হয় না। পুরুষমানুষকে না  
হয় ভালোবাসতে নেই কিন্তু গান ভালোবাসলে দোষ কি? গান কি  
পুরুষমানুষের চেয়েও খারাপ। না, খারাপ নয়। খারাপ যদি  
পৃথিবীতে কিছু থাকে সে হল কাউকে না ভালোবাসে দেহ

জাত-বেস্তার মেয়ে হলেও মঞ্জরী মনে এই কথা কেমন করে ভোলপাড় করে সারাদিন, সমস্ত রাত। এত দুর্ভাগ্য নিয়ে সে কেন জন্মালো? কেন? কেন? কেন?

দুপুরবেলায় মঞ্জরী গোছগাছ করে নিল সব।

সোনাবালা জিজ্ঞেস করলে: হুলুবাবু কবে আসবে রে মধুপুর থেকে?

হুলুবাবু আর আসবে না। এসেও আমার কাছে আর নয়।

শোন দু'ড়ির কথা একবার। আসবে না, যাবে কোথায়?

মা ভয় কোরছে। নুপেন গুঁইর এবার পেনসনের সময়। সোনাবালার হুঃসময়। মঞ্জরীই একমাত্র ভদ্রা। তার পেটে যে এমন মেয়ে এলো কি ক'রে, সোনাবালা! তাই অনেক সময় ভাবে। কিন্তু এখন কিছু বলে না;

মঞ্জরীকে সে জানে। একবার বঁকে বসলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। দিদির ওখানে যাচ্ছে, ক'দিন বাদেই ফিরবে। সেই সঙ্গে হুলুবাবুও, চলে যাবে যেমন করে হোক।

মঞ্জরী যখন দিদির বাড়ী গিয়ে উঠলো, তখন দুপুরবেলা। আপন দিদি নয়। মার পুথি। কিন্তু মঞ্জরী ভালোবাসে মার চেয়েও বেশী।

মঞ্জরী দুপুরবেলার আসবে ভাবেনি। ভারি খুঁসি হল বেলারাগী; হুলুবাবু কোথা রে?

থাকতে এলাম আমি; জিজ্ঞেস করছিস হুলুবাবুর কথা?

তুই তো এখন থাকবি ক'দিন; হুলুবাবুকে ছেড়ে দিদির কথা মনে পড়ল তাই ভাবছি!

পরে ভেবো; এখন এটা নাও দিখিনি।

সুটকেশ নিয়ে বেলারাগী উঠলো ওপরে শোবার ঘরে। দুপাশে হুথানা বর ছোট ছোট; মাঝখানে বেলারাগীর খাবার ঘর। এইখানে রতনচাঁদ এসে রাত কাটিয়ে যায়। বেলারাগী একটু স্থল, কিন্তু ক' ফর্সা আর পুরুনামানুষ যা চায় সে তাই। কখনও আপত্তি ক'ব না; কিছুতেই। শরীর খারাপের কথা জানায় না; একবারও বলে না: আজ বাড়ী যাও লক্ষ্মীটি। রতনচাঁদ ছাড়া তাকায় না কারুর দিকে। রতনচাঁদ ছাড়া আর কোনও মানুষ নেই তার। বয়স হয়েছে যা দেখায় তার চেয়ে কম বয়স।

মা কেমন আছে রে?

সেই রকমই ঝগড়া করছে রাত দিন।

তাহলে তুইও সেই রকম আছিস পেঁচি?

আমি কি রকম আছি তা ত দেখতেই পাচ্ছিস।

তুই আরো রোগা হয়ে গেছিস আর...

আর কি বল?

আর এখনও তেমন ভুলো।

কি ক'রে বুঝলি?

বাইরে রিক্সা ঠ-ঠ করছে; পয়সা দিসনি নিশ্চয়?

ঐ রে সত্যিই ত'!

থাম থাম; আমি দিয়ে দিচ্ছি। কত দেব রে?

আগে আট আনা নিত; রোগা হয়ে গেছি যখন বলছিস, তখন ছ' আনাই দে!

বারান্দা থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বেলারাগী বললে: এত হিসেবী

হ'লি কবে থেকে? হুলুবাবুর রস মরে এলো নাকি?

না; আমারই আর ভালো লাগে না দিদি!

ভালো লাগে না? অবাক করলি পেঁচি; এ আবার কার কবে ভালো লেগেছে? অভ্যেস করে নিতে হয়।

এবার অভ্যেস বদল করব।

কি করবি?

জানি না; মঞ্জরী ভাবলে একবার সিনেমার কথাটা বলে; তারপর কি মনে হল, চুপ করে গেল।

কিছু বেলারাগী চুপ করলো না। সেই বলল: খিয়েটায়ে নামবি? ওসব খারাপ। শরীর একেবারে যাবে। পেট ভরবে না। টানা ইাচকার যাবি কেন? আমাকেও বলে, সিনেমা তুলবে, নামতে। আমি বলি, না; ও আমাকে দিয়ে হবে না। হবে না, বলি বটে, কিন্তু হয়, জানি; যারা করে, তাদের ত দেখেছি; আমিও পারি। কিন্তু এই ত বেশ আছি; কি হবে একজন ছেড়ে পাঁচ জনকে নিয়ে?

তুমি সিনেমা দেখ দিদি?

সে কি রে? কালই ত' সন্ধ্যায় গেছলাম রূপ-তরঙ্গ দেখতে। মেয়েটা বেশ করেছে। বড় হুঃখ হোল; মরে গেল শেষে স্বামীর অতোচারে; যাবি একদিন?

হ্যাঁ; চল কালই যাই দিদি!

কাল নয় রে; তুফবার যাবো। কাল লক্ষ্মীপুজো আছে।

লক্ষ্মীপুজো করো নাকি। এতক্ষণে হাসলে মঞ্জরী। তাকিয়ে দেখল এক কোণে একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা ছোট চারপায়ার ওপর। ফুল দিয়ে সাজানো। ধূপদানি শাঁখ বটল; ত্রুটি নেই কিছুতে।

এমনি করে একটু চোখ বন্ধ করে বসি। লক্ষ্মীর দম্যতেই ত' যা কিছু; তাছাড়া পাপের বোঝা না কমুক, একটু কম চেপে বসবে।

তোমার স্বর্গবাস হবে, আর আমার?

তুই ইন্দ্রলোকে থাকবি স্ত্রুখে।

স্বর্গেও হুলুবাবুরা যাবেন তাহলে, মঞ্জরী অবাক হল। সেখানেও মেয়েছেলের জগ্রে স্ত্রুখ-স্ত্রুবিধে সব। সেখানেও খুসী করতে হয় পুরুষদেবতাগুলোকে; তা হলে মরেও শাস্তি নেই।

কি অত আকাশ-পাতাল ভাবছিস রে পেঁচি?

কিছু নয়। ঘুমবো একটু।

নে না; গড়িয়ে নে একটু; আমিও তো শোব।

বেলারাগী যখন থাকতে থাকতে মঞ্জরীকে তুললে ঘুম থেকে, তখন সামনের আর আশের পাশের বাড়ীতে দশ ওয়াট ইলেকট্রিক আলো পুড়ে গেছে। সন্ধ্যার বউনী হয়ে গেছে কাপড়ের দোকানে আর মনোহারী দোকানে। কুন্ডা চাই বলে হেঁকে গেছে অস্ত্রত বার চারেক। আর চান শেষ হয়ে চুল বাঁধা হয়ে গেছে নীলমণি দত্ত লেনের বসন্তসেনার।

ভর সন্ধ্যায় মেয়েমানুষ এমন বেহ'স ঘুমোর নাকি রে পেঁচি?

স্বপ্ন দেখছিলাম দিদি!

কি স্বপ্ন?

দেখছিলাম সকাল হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার, তুই সকাল দেখলি? স্বপ্ন তো আচ্ছা দেখিস তুই?





চাকার আয়না

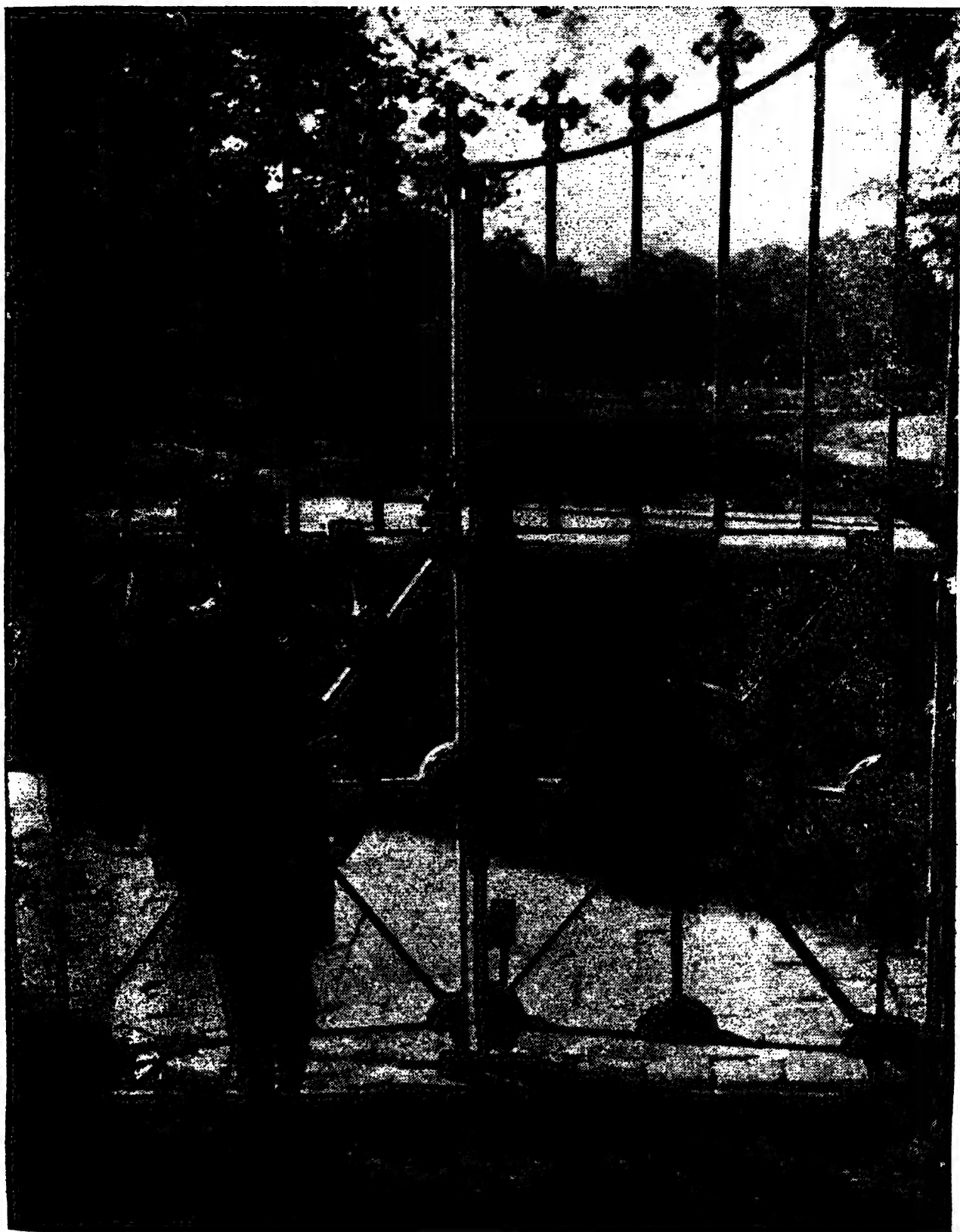
—বৈজনাথ হালদার





মুক্তির আশ্বাদ

—কলক পত্র



বন্দীর ব্যথা

—মহম্মদ মুখোপাধ্যায়



না ; সকাল এখনও সত্যিই হয় নি ; মঞ্জরী হতাশ হল ; সকাল হ'তে এখনও অনেক দেরী।

রাত আটটায় রতনচাঁদ এলো। জামার গলায় হীবের বোতাম লাগিয়ে কুমালে সেট আর পাতলা গাঁফে আর কানের তলায় দামী আতর লাগিয়ে। মঞ্জরী অবাক হল। লোকটার পয়সা আছে কিন্তু দিদিও তো তেমন কিছু গুছিয়ে নিয়েছে বলে মনে হয় না ! তারপর হিসেব করতে মনে পড়লো জাত ব্যবসাদার ; মেয়েছেলের কাছে আসে কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততটুকুর দাম দেয়। বিলোতে আসে না। বাপ-ঠাকুরদার মান রাখতেই আসে। মেয়েছেলে না রাখলে পয়সা রাখা যায় না।

—আমার বোন মঞ্জরী।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ! দেখেই বুঝে নিয়েছি। মুখের কাঁট লব্ধ তোমারই রাণী।

মঞ্জরী মনে মনে হাসলো। বেলারানী তার মার-পেটের বোন নয় কিন্তু বলতে হয়, স্নানভেণ্ড হয়।

আজ কত টাকা ঠাকালে ?

রাম ! রাম ! রতনচাঁদ জিত কাটলো ; হু' পয়সা বেশী নেবো কিন্তু খদ্দেরকে ঠাকাবো না।

মঞ্জরী মেপে মেপে দেখলে রতনচাঁদকে। যেমন করে রতনচাঁদ গুজুন করে দেখে নেয়, সোনা আর হীরে। দেতের থেকেও কথাবার্তায় খুল ; মোক্ষ পাবার পথে চলেছে। অর্থই মোক্ষ। ঘি-তুঘের শরীর আর নিশ্চিন্ত ঘুমের। শুধু চোখ দুটো বলে দিচ্ছে—আদর করতে করতেও বেহিসেবী হয় না রতনচাঁদ। মেয়েছেলের কাছে গিয়ে কথা বলে, মিথের মতই শোনায়। খদ্দেরকে সত্যি বলে না ভুলেও ; কিন্তু সত্যিয়ার চেয়েও খাঁটি শোনায় সে-সব। চোখ দুটোই হু' ফালি ছুরি। ভেতর পর্যন্ত কেটে বসে, বাইরের ঘা শুকিয়ে যায় কিন্তু শুকায় না ভেতরের ছালা। রূপকথার দিনে রাক্ষসের প্রাণ থাকতো পাখীর ছোট বৃকে। অজ্ঞান অরণ্যের বুনা ফলের ভেতর। জলের তলায় অতল পাতালে কুমীরের চোখের মণিতে। আর রতনচাঁদের হৃদয় বুঝি পড়ে আছে টাকার খলিতে। ফাটকার দর ওঠা-নামায়। হীরা, পান্না, জহরতের টুকরে-পড়া ছাতিতে। বেলারানী পূজা করে কার্তিক। রতনচাঁদের উপাস্ত গণেশ। কার্তিকের ময়ূর চলতে চলতে ক্লান্ত হয়। গণেশের মোটর গাড়ী পেট্রল ঢাললে চলে।

গান হোক একখানা। কিন্তু গানের আগে কাজের কথা হোক।

কাজের কথা বলতে গিয়ে থামলো রতনচাঁদ। একবার কটাক্ষ হানলো মঞ্জরীর দিকে।

ওর সামনে বলতে পারো। বেলারানী মঞ্জরীকে উঠে যেতে দিলো না।

হ্যাঁ রাণী, সে দেখেই বুঝে নিয়েছি। কাল বারোটায় লোক আসবে। এই হীরেটা রাখো। পকেট থেকে রতনচাঁদ বার করলে বাস্কাটা।

বাস্কে হাত দিয়ে পরিষ্কার করলে রতনচাঁদ। তার পর বেলারানীর হাতে দিলো। বেলারানী উঠে গেলো সিন্দুক খুলতে।

কি বললে এটা দিয়ে দেব।

আমার লোক আসবে ছপুর বারোটায় ; এসে বোলবে : রতন বাবু, চশমাটা ফেল গেছেন ; দাঁও দেখি।

মনে থাকবে তো ?

এখনও অবিশ্বাস করো ?

রাম ! রাম ! কি যে বলো রাণী ! বিশ্বাস-অবিশ্বাস নেই, বুটো লোকের হাতে না যায় তাই।

এ কি বুটো মাল, যে বুটো লোকের হাতে যাবে !

মঞ্জরী বুঝলে, চোরাকারবারও আছে রতনচাঁদের। হয়ত সেইটেই পয়সার গোপন স্কুডঙ্গ। কিছু বললে না।

এবারে গান হোক একখানা।

আজ মঞ্জরী গাইবে। পেঁচি, গা তো একখানা। বহু দিন ধরে তোর গান শুনি নি। মঞ্জরী কিন্তু আপত্তি করল না। ধরলে তার একখানাই জানা গান।

'বনের পাখী উড়ে গেছে ; মনের পাখী কঁাদে তাই !'

বহু আছা !

বাইরের আকাশে কখন মেঘ জল হয়ে নামলো।

সে-রাতিরে রতনচাঁদ থেকে গেলো। এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী যাওয়া অসম্ভব। গাড়ী ছিলো ; কিন্তু গাড়ী ফেরৎ গেল।

আজ রাতে কাদের সঙ্গে যেন তোমার কথা ছিলো না ?

সে আর হোত নাকি রাণী ? বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে কিছু বাতচিৎ ছিলো। কিন্তু এতো বৃষ্টিতে বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী থেকে বেরোয় না ! বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আবার কি কথা হবে ? ঠকাচ্ছি বুঝি কাউকে ?

শুধু মঞ্জরী দেবি !

দেবি কথাটা কেটে বসে গেলো পেঁচি মঞ্জরীর মনে।

শুধু একবার দিদির কথা ! এতটুকু বিশ্বাস নেই আমাকে, ঠাকাব কেন ?

ফিল্ম বানাচ্ছি একখানা, তুমি ত আর হিরোইন হলে না রাণী ?

আমি হিরোইন হলেও হিরো হবে অল্প লোক, সইতে পারবে ত ?

হা হা হেসে উঠলো রতনচাঁদ, কি যে বলো রাণী !

অনেক রাত্তির পর্যন্ত ঘুম এলো না মঞ্জরীর।

নানা দিক দিয়ে মঞ্জরীর কয়েক বছর ব্যবসায় আজকের দিনটা একটু ব্যতিক্রম। হলুদবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটেনি। কোন খদ্দেরের জন্তেও বাইরে দাঁড়াতে হয়নি। কোন খদ্দেরের কথা তার মনেই হয়নি আজ। এ এক অভিজ্ঞতা কিন্তু তার পরেই সে হিসেব করলো হাতে যা আছে তাতে এক মাস চলবে। সামনের মাসটা কোনও রকমে। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জরী।

আজ তুমি কেমন যেন অল্প মামুষ হয়ে গেছ ?

বেলারানীর কথায় চমকে উঠলো রতনচাঁদ, বলল, কেন ?

তুমি নিজেই ভেবে দেখো।

বুঝতে না দিলেও বেলারানী বুঝলো সবই। আর দোষ দিল বাবে বাবে নিজের কপালের, নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিয়েই তার এ অবস্থা। একটুও হাতে না রেখে এতদিন ধরে সে শুধু দিয়েই এসেছে। অথচ সমস্ত সাধারণ মেয়েরাও জানে যে মেয়ের কাছে সহজেই পুরুষরা সব পায়, ন চাইতেই, যে সিন্দুক খুলে দেয় মনের আর দেহের, সেখানে বেশি দিন আকর্ষণ বাসা বাধে না। রাত্তির মেয়ে মানুষ প্রথম চাওনিতেই বুঝে নেয় কোন ভাড়ানায় ঘরের বউ ফেলে তার কাছে আসে মানুষ। তখন সে টানে কাঁচপোকাকে যেমন টানে



বেঙ্গল ল্যাম্প। পাখীকে যেমন উড্ডীন শক্তি রহিত করে নিয়ে আসে সাপ নিঃশাসে নিঃশাসে একটু একটু করে। আস্তে আস্তে। কিন্তু সাপের চেয়ে যে অনেক সাংঘাতিক সে জানে খেয়ে ফেললেই ফুরিয়ে গেল খেলা। সে আশ্চর্য করে রেখে দেয় শীকারকে। বেলারাগীও যে এ তথ্য জানে না তা নয়, কিন্তু তার বাঁধা মানুষটির জন্তে ভারি দুঃখ হয়। রতনচাঁদের বউকে সে দেখেছে, বেলারাগী তার পাশে দাঁড়াতে পারে না; চেহারায় স্বাস্থ্য, চমকিতেও এমনকি। তাই সে সব দিয়েছিল রতনচাঁদকে, বউয়ের কাছে যা পায়নি রতনচাঁদ বেলারাগী তা দিতে একবারও ঝিগা করেনি, একটুও সময় নেয়নি; বোঝেনি স্বাভাবিক কামনার মৃত্যু আছে, বিকৃত কামনা সমুদ্রের মত অতল আর আকাশের মতই অসীমও সে বুঝি। শুধু পক্ষিতার সে জঘন্ততম, পঙ্ককুণ্ডের চেয়েও দুঃসহ, উগ্ৰতম বিষবাস্পের চেয়েও দুর্গন্ধ। তাই বিকৃত কামনার তাতে দিন-রাত যে দগ্ধ করে রাখতে পারে তার কাছেই মজা খোজে তারা। পরিহাস করতে চায় সহজ পথের অনায়াস আরাম। বেলারাগী রতনচাঁদকে এখনও হারায়নি কিন্তু হারাবে সে জানে, অস্ত্র কোথাও একটুখানি হাতছানি দিলেই ভুলে যাবে রতনচাঁদ। তবুও বেলারাগী প্রথম দিনেও যেমন ধরা দিয়েছিলো আজও তেমনি। এতটুকু ঈর্ষ্যার কারণ হয়নি সে কোন দিন একটুকু ঈর্ষ্যা করেনি কোন দিন। রতনচাঁদ যা নিজে থেকে দিয়েছে তাই নিতে এতটুকু বেজার হয়নি। আভাসে আর উদ্ভিগে জানায়নি তার আরো চাই। পরসূ রেখেছে হিসেবীর মত; কিন্তু যৌবন বিলিয়ে দিয়েছে বেহিসেবীর অরূপোপজীবিনীর মত। আর রতনচাঁদ এখন তার কাছে বত না আসে আরামের জন্তে তার চেয়েও বেশী আসে কারবারের খাতিরে। বাঁকাচোরা কারবারের কারবারি; বাড়ীর নীচের চোরা কুঠুরীর মত ব্যবহার করেছে বেলারাগীকে; রেখে দিয়ে গেছে কোকেন, আর হীরে, চালান করে দেবার আগে অনেক অনেক চোরাই মাল। বেলারাগীর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে তাকে। নির্ভর করে ঠকতে হয়নি আজও। তাই বেলারাগীর ঘর ছেড়ে অস্ত্র দ্বার বাবার চেষ্টা করেনি রতনচাঁদ। কিন্তু বেলারাগীর বড় বড় ব্যবহার ভালো লাগে না রতনচাঁদের। এখানেও সেই খবরদারী। ভিজলে অস্বস্তি করবে। বড় খাটছে রতনচাঁদ; এত ভালো নয়। বড় বেহিসেবী হয়ে পড়েছে নাকি রতনচাঁদ। রতনচাঁদ বিরক্ত হয়, কিন্তু হাসে। বেলারাগী ভাগ্যিস বিয়ে করার মত মেয়ে নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠলে মঞ্জরী।

কলঘরের দিকে এগুলো সে। খিল খুলে বাহিরে বেরুতেই মনে হলো স্যাং করে কে সরে গেলো। কে হতে পারে? দাঁত দিয়ে ঠোঁটের নীচেটা কামড়ে ধরলো। তারপর বাড়তি আঁচলটুকু দিয়ে সারা গা জড়িয়ে সে এগিয়ে চলল। চূপ, ফের কৌস করে উঠলো রতনচাঁদ। তারপর একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিল মঞ্জরীর হাতে। হঠাৎ মঞ্জরী এক হাতে সুইচটা টিপে দিলে; আলো থেকে রতনচাঁদ একটু চোখ সরতেই ধাক্কা দিলে মঞ্জরী আর মেদবহুল রতনচাঁদ কোণে বসানো মস্ত গোলটবের মধ্যে গিয়ে পড়লো। মঞ্জরী দরজা খুলতেই দেখলো বেলারাগী ধাঁকাচ্ছে। কি হয়েছে? কি? বেলারাগীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শাড়ী ঠিক করতে করতে বললে কিছু হয়নি। এই একশো টাকার নোটটা উনি কলঘরে ফেলে গিয়ে নিতে এসেছিলেন।

কলঘরে ছিলাম আমি, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ায় উনি বুঝতে না পেরে ঢুকে পড়েছিলেন। কথাগুলো শুনতে পেয়ে রতনচাঁদের মনে হলো সে বরফ-জলের মধ্যে বসে আছে; তবুও ঘাম হচ্ছে কেন? বেলারাগী যেতে দিলে মঞ্জরীকে আর বুঝলে সবই, তাই কিছুই বললে না। কপাল ভাঙ্গল আজ থেকেই।

পরের দিন সকালে সূর্য উঠে অনেকক্ষণ হামাগুড়ি দেওয়ার পর তবে মঞ্জরীর ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম ভাঙ্গামাত্র কাল রাত্রিবের বিল্লী ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেলো। পড়ে যাওয়ামাত্র সকালের চেহারাটা কালো হয়ে এলো তার চোখের ওপর। মঞ্জরীর এখন হঠাৎ বোধ হচ্ছে কাজটা ভালো হয়নি। বেজার আবার লোক বেলোক কি? আর মঞ্জরী যদি রতন চায় সত্যি-ই জীবনে, তা হলে কিছুক্ষণের জন্তে অস্বস্তি রতনচাঁদের তাকে চাওয়াটাকেও মেনে নিতে হবে বৈ কি। কেন তার এ মতিভ্রম হলো? সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হলুবাবুর ওপর। তার মেজাজই খারাপ করে দিয়ে গেছে হলুবাবু। এক পরসূ দিয়ে যায়নি কিন্তু বেজারবৃত্তির উপর ঘেলা জমিয়ে দিয়ে গেছে। আজ রোজগারের পথ শুধু বন্ধ নয়। রোজগারের প্রবৃত্তির উধাও। কি করবে তবে মঞ্জরী? কি সে করতে পারে? এত অসহায় এর আগে মঞ্জরী আর কখনো এমন ভাবে বোধ করেনি।

চান-চান করে যাবার জন্তে মঞ্জরী তৈরী দেখেও বেলারাগী একটা কথাও কিছু বললে না। কিছুদিন থাকবে বলে কাল যখন মঞ্জরী এলো তার এখানে, বেলারাগী আজ সকালে কিন্তু আর সে ভেবে পেলো না যে সে তখন কেন এত খসী হোয়েছিল। তার এতদিনের মৌচাকে তার নিজেরই একজন যে এমন ভাবে ঢিল মারবে, এ সে ভাবে নি। নিজের একজন। থুঃ। বলেই বেলারাগী মঞ্জরীকে ভাঙ্গা মৌচাকের বোলতার মত বিধতে না পেরে হতাশ ধিক্কার দিলে। সে থুঃ তার নিজের গায়ে ফিরে এলো; আবার দিলে; থুঃ? মন্দ মেয়েছেলে যখন ভালোমানুষী করতে বায় তখন যে সে শুধু ভালোমানুষের মন্দ করে তা নয়, তার নিজের মন্দ করে সবচেয়ে আগে। রাগ হওয়ার কথা বেলারাগীর যে জন্তে, রতনচাঁদের পাত্রী পরিবর্তনের কারণে, বেলারাগী কিন্তু অস্বস্তী হয়নি তাতে; দু'-দিন মঞ্জরীর জন্তে রতনচাঁদ একটু ছুক ছুক করলেও সে জানত, রতনচাঁদ আবার তার দাঁড়ে এসেই বসত। কিন্তু নিজেও ভোলবে না, অস্ত্রকেও বঞ্চিত করব, মঞ্জরীর মনোবৃত্তি বেলারাগীর ভালো লাগলো না। শেকল কেটে পাখী উড়িয়ে দিয়ে কার লাভ হল? কিন্তু বাবার সময় আর থাকতে পারলো না, মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে বেলারাগী কাঁদলে, এ তুই কি করলি পেচি?

মঞ্জরী কিছু বললে না। চূপ করে এক সময়ে সে বেরিয়ে গেলো। নিজের ওই নোংরা জায়গায় ফিরে যেতে বিচ্ছিন্ন লাগছিলো মঞ্জরীর; বাড়ী এসে পৌঁছে তার আরও খারাপ লাগলো। দোতলায় নিজের ঘরে মার সঙ্গে কে যেন কথা বলছে। এ সময়ে আবার কে এলো কাছে। হলুবাবু ফিরে এলো নাকি?

ও মা মঞ্জরী? ভগবান যা করেন, এই ভদ্রবনোক এসেছেন, তুই সেই কোথায় গিয়েছিলি কাজ করবার জন্তে, সেইখান থেকে; তোমার দিদির কাছে গেছে শুনে, এটা তোমার আমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছিলেন। নাও। মঞ্জরী কাগজটা হাতে নিতেই উত্তেজনার তার হৃদপিণ্ড তার ঠোঁটের কাছে লাফিয়ে উঠলো। ভগবান হয়ত তাঃ

দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। সেই করে দাঁও এখানে। লোকটির হাত থেকে কলম নিয়ে মঞ্জরী সেই করলে গোটা গোটা অক্ষরে : মঞ্জরী দেবী ! এ কি মঞ্জরী দেবী কার নাম ? এবারে মঞ্জরী তার কুটিল হাসি হাসলে ; মঞ্জরীবাবা নামটা ভালো নয় ; সিনেমায় আমি 'মঞ্জরী দেবী', এই নামই রাখব ঠিক করেছি। তুমিই এ কাজ পারবে মঞ্জরী। আগেই যখন নামের কথা ভেবেছি, তখন সিনেমাটির হিসেবে তুমি নাম একদিন পাবেই। এই কথাগুলো মনে মনে বললেন ভদ্রলোক আর যে কথা উচ্চকণ্ঠে বললেন তার সারমর্ম ; পরশু থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। টাকা ; নগদ টাকা সে পাবে ; প্রথম মাসের মাইনে আগাম একশো পঁচাত্তর টাকা। আমাদের গাড়ী এসে তোমায় পরশু তুলে নিয়ে যাবে দশটায় তৈরী হয়ে থাকো। এই ক'টি কথা বলে অবশেষে নিষ্কান্ত হন ভদ্রলোক ; চান করার জন্তে পা বাড়ায় মঞ্জরী ; তারপর কী মনে পড়তে খেমে যায় ! মনে পড়ে, সন্ধ্যায় বতনচাঁদের সাবধানবাণী বেলারাগীকে : হীরের আংটিটা যেন ঝুটো লোকের কাছে না যায় এবং বেলারাগীর আশ্বাস—একি ঝুটো মাল যে ঝুটো লোকের কাছে যাবে। এবং তারও আগে বতনচাঁদের নির্দেশ মনে পড়ে, মঞ্জরীর ; ঠিক দুপুর বারোটায় আমার লোক এসে বলবে, কাল রাতে চশমা ফেল গেছেন আমাদের ঘরে... ঠিক আছে ; অশ্রুট আওয়াজ করে মঞ্জরী। তারপর যায় কুন্নিগীর ঘরে ; অবিনাশকে ধরে গিয়ে।

অবিনাশ কুন্নিগীর দালাল কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী, মাঝে মাঝে মঞ্জরীর কাজ করে। অবিনাশকে সব ব্যয়িয়ে পড়িয়ে ঠিকানা বাতলিয়ে মঞ্জরী নিশ্চিন্তে চানের ঘরে ঢোকে। আরেক বাদ কুটিল হাসি আসে তার।

কাল রাতে বাবু যে চশমাটা ফেল গেছেন ?

দাঁড়াও, দাঁড়াও। বেলারাগী তুলেই গেছলো কথাটা। ঘরে এসে চুকে দেখলো ঠিক বারোটা ঘড়িতে। হীর ধর আংটিটা আরেকবার দেখলে।

ফলজলে পাথরটা যেন তার কপালের কালোকে ঠাটা করছে। একটা চশমার খাপের মধ্যে পুরে, চশমার খাপটাকে দিলে লোকটার হাতে, আর ভাবলে বতনচাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি এখানেই শেষ ?

একটু বাদে বেলারাগী খেতে বসবে, আবার দরজায় কড়া নাড়লো কে ! দরজা খুলে দিতেই বেলারাগী শুনলো কাল রাতে বাবু যে চশমাটা ফেল গেছেন ? লোকটি আবার বললে। এই মাত্র একজন এসে ঐ কথা বলে আংটিটা যে নিয়ে গেল।

আংটি ?

আংটি মানে চশমা... চশমাটা নিয়ে গেল যে...

দাঁড়ান আপনি ! বাবু বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন, গিয়ে বলছি।

লোকটি ফেরৎ এলো। হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে। তাতে লেখা, এতদিন কারবারের পর এ জোচ্ছুরী তুমি না করলেই পারতে রাণী ! বতনচাঁদ এই কথা লিখেছে। লিখতে পারলো তাকে। সমস্ত ভুলে বেলারাগী দৌড়ল দুপুরের রাজপথ দিয়ে। দেখলো বতনচাঁদের গাড়ী চলে গেছে অনেকদূর। শুধু ভিজ়ে রাস্তার ওপর চাকার দাগ পড়েছে ; মানুষের চামড়ার ওপর যেমন করে বসে যায় চাবুকের দাগ, ঠিক তেমনি। নিজের কপালে, গায়ে হাত বুলোল বেলারাগী, চাবুকের দাগ নেই কোথাও ; কিন্তু তবুও ভালো করছে কেন ?

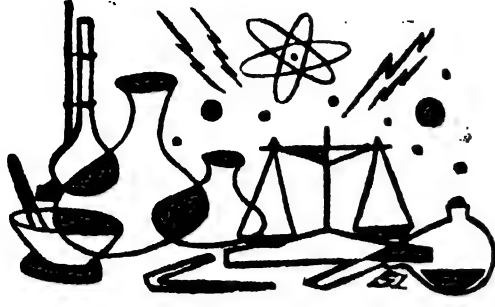
[ ক্রমশঃ ।

## একটি আশ্চর্য মেয়েকে

দেবী রায়

জগতে মেয়ে অনেক তবু তোমার মত কেউ  
পারে না দিতে শাস্তি এই জীবনে কোনোখানে,  
সুদূরপর্যন্ত এ মনে ভালোবাসার ঢেউ  
তোমাকে ছাড়া বিফল তাই বেঁচে থাকার মানে।  
বেদনা এসে ছড়ায় শুধু গভীর অবসাদ,  
এখানে দিন দীর্ঘতায় কেবলি স্বপ্নে স্বপ্নে  
হৃদয় থেকে ফুরিয়ে দেয় ভালোবাসার স্বাদ,  
গভীর ক্ষত সজ্জন করে মনের অন্দরে।  
সোনার চেয়ে অনেক দামী সোনার মত মনে  
অন্ধকার ব্যাপ্ত এই হৃদয়-মরুভূমি  
ফসলহীন হয়েছে শুধু বিফল আয়োজনে  
কেটেছে দিন কেটেছে রাত এবং মৌসুমী  
সুদূর থেকে সুদূরতরো হয়েছে তারপর  
যা কিছু পড়ে রয়েছে তা সব ধূলো-বালির ঝড়।

# বিজ্ঞানবার্তা



পদ্ধতির মিশ্র

অটোমেশনের দিন এগিয়ে আসছে। মানুষের প্রয়োজন যাবে কমে : কলকাবাথানায় যন্ত্র নজর রাখবে যন্ত্রের উপর, কাজকর্ম, উৎপাদন সব কিছুই টমারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে। ক্রমবর্ধমান যন্ত্র-জগৎ-এর ক্ষমতার সীমানা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, সে মানুষের দৈনন্দিন কথঞ্চীতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। গবর পাওয়া গেল, সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মৃৎ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সহায়তায় ঘুম পাড়াবার এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। অনিদ্রায় ভুগছেন অথবা আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়েছে, রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না—তখন এই যন্ত্র আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এই যন্ত্রের উদ্ভাবক, সোভিয়েত ইনস্টিটিউট অফ এন্সপেরিমেন্টাল সার্জিক্যাল এপারেটাস-এর বিজ্ঞানী মিঃ ইউরোহদি জানিয়েছেন যে ঘুমপাড়ানী যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুবই সোজা। একটা রবারের টুপি থাকে, সেটা পরিয়ে দেওয়া হয় মাথায়, টুপিটির সামনে চোখের পাতার কাছে এবং পিছন দিকে যথাক্রমে ইলেকট্রোড থাকে দুটি। এই ইলেকট্রোডের মধ্যে দিয়ে মৃৎ বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চালিত হয় রোগীর মাথায় স্নিগ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। যন্ত্রের সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর আবেশে রোগীর চোখে ঘুম আসে। কেবল ঘুম পাড়িয়েই ঘুম পাড়ানী যন্ত্রের কাজ শেষ হয় না, পাশেই লাগান থাকে একটা পরিমাপক যন্ত্র—আপনি ঘুমোবেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ যন্ত্র আপনার স্রুতির মনস্তাত্ত্বিক পরিমাণ দেখা যাবে।

সমাজের প্রতি বিজ্ঞানের দায়িত্ব প্রতিপালন করবার জন্য গড়ে উঠেছে একটি প্রতিষ্ঠান,—নাম তার সোসাইটি ফর সোসাল রেসপনসিবিলিটি ইন সায়েন্সেস। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞানানুযায়ী সকলেই এর সভ্য হতে পারেন। এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকায়,—সভার ছড়িয়ে আছেন সমগ্র হুনিয়াতে। অধ্যাপক পাউলিং, অধ্যাপক কুলসন প্রভৃতি বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য। স্বয়ং মহামতি আইনষ্টাইনও এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টায় যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সে আজ যুষ্টিমেয় কতিপয় ক্ষমতালিপ্সুর প্ররোচনায় যাত্রা করেছে ধ্বংসের পথে। বিজ্ঞানের এই প্রলয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য সমাজের প্রতি বিজ্ঞানের কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং সেই কর্তব্য পালন করার প্রয়োজন খুবই বেশী। সোসাইটি ফর সোসাল

রেসপনসিবিলিটি ইন সায়েন্সেস এই মহান কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছেন, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাঁদের এই কল্যাণকৃত প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এই সঙ্গে আর একটি আনন্দের সংবাদ পাঠকদের পরিবেশন করছি। খ্যাতনামা রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় ১৯৫৭-১৯৫৮ সালের জন্য সোসাইটি ফর সোসাল রেসপনসিবিলিটি ইন সায়েন্সেস-এর কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক জন ইউব্যাক্স-এর ব্যক্তিগত পত্রে জানতে পারা গেছে অধ্যাপক রায় নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সংবাদ পাওয়া গেল, অস্ট্রেলিয়াতে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের এক প্রতিবেদক আবিষ্কৃত হয়েছে। ‘ইনফ্লু’তে ধারা কাবু হয়েছেন আর ধারা এখনও তার চক্রপাকে মাঝে মাঝে নাজেহাল হচ্ছেন তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে এই প্রতিবেদকের প্রচার কামনা করবেন। অদ্ভুত এই রোগ ইনফ্লুয়েঞ্জা! বিচিত্র এর বীজাণু, এর অবস্থিতি সব ধর-ছোঁয়ার বাইরে। বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক জগতেও, বিজ্ঞানের সর্বক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষ একে আয়ত্তে আনতে পারেনি, তাই অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত প্রতিবেদক ব্যবহারযোগ্য হলে মানব সমাজের যে প্রভূত উপকার হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন কালেও এই রোগ মানব সভ্যতাকে বহু বার বিব্রত করেছে। ফ্লোরেন্সবাসীরা একে ভয় করতো, বলতো এই মহামারীর সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহের যোগাযোগ আছে। যাই থাকুক না কেন, অস্কার রোগের মহামারীর সঙ্গে সাধামতো যুদ্ধ মানুষ করতো কিন্তু এর কাছে সে ছিল একেবারে অসহায়। বিজ্ঞান-গর্ভিত মানুষের নজর এই রোগের প্রতিকারের প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হয়েছে মাঝে কিছু দিন আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৮-১৯১৯ সালে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মহামারী সমগ্র পৃথিবীর উপর তাণ্ডবলীলা চালিয়ে প্রায় দেড় কোটি লোকের মৃত্যুর কারণ হলো, তখনই চিকিৎসা-বিজ্ঞান হয়ে উঠলো তৎপর। মানুষের অস্বাস্থ্যকর প্রধান এই শত্রুর বিনা সমগ্র বিশ্বে স্বস্তি হলো গবেষণা, ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা এক প্রকার ভাইরাস আবিষ্কার করলেন, এর মুরগীর ডিমে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং সহজেই মানুষ বা অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করতে পারে এর একটা প্রতিবেদকও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন; এই প্রতিবেদক ‘এ’ শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে কিছু সময়ের জন্য কার্যকরী হলে অন্য শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জাতে কোন সাহায্যই করতে পারে না। এর ক্রমে ক্রমে ‘বি’ এবং ‘সি’ এই দুই শ্রেণীরও ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে আমরা পরিচয় তা সর্বপ্রথম চীন এবং জাপানে শুরু হয়। এর প্রসার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারলেন, এই রোগে ক্রমে ক্রমে সংক্রমণ বিশ্ব বিপন্ন হবে, তাই প্রতিকারের জন্য আশ্রয় চেষ্টা শুরু করলেন রোগীদের গলা থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে পাঠান হলো জেনেভা ‘ওয়ারলড হেলথ অরগ্যানাইজেশনের’ সদর কার্যালয়ে। ঐ পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে এর প্রতিকার আবিষ্কার করবার পাঠিয়ে দিলেন। জাপান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থান থেকে ভাইরাস সংগৃহীত হয়ে বিমানযোগে তাঁদের কাছে নিয়মিত পাঠান হ

গাগলো। দেখা গেল, এই ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস 'এ' শ্রেণীর, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, 'এ' শ্রেণীর যে প্রতিষেধক ঔষধ পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা এই জীবাণুর উপরে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারলো না। আপনারা প্রসন্ন করতে পারেন, এর কারণ কি? কারণ কিছু দিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে—'এ' শ্রেণীর ভাইরাস কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক বিশেষ ভাইরাসে পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত ভাইরাস সমূহ খুবই স্থায়ী এবং তারা নিজেদের মতো অথবা আবার নতুন কোন ভাইরাসের সৃষ্টি ঘটায়। একটির ব্যবহারের সঙ্গে অপরটির ব্যবহারের ও গুণাগুণের কোনই মিল নেই। বর্তমান সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার যে ভাইরাস আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তা 'এ' শ্রেণীর পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত এক বিশেষ ধরনের অতিক্ষুদ্র বীজাণু।

এই রূপান্তরিত ভাইরাসের সৃষ্টির বিষয়েও বিজ্ঞানীরা যুক্তিজাল বিস্তার করছেন। এই পরিবর্তনের কারণ কি? অনেকের মতে তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহই 'এ' শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের রূপান্তরের একমাত্র কারণ। নির্দিষ্ট ভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়—তবে জগতে যে রকম ব্যাপক ভাবে পরমাণু সংক্রান্ত বিস্ফোরণের পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার তেজস্ক্রিয়তায় পরিবর্তিত এই ভাইরাসের আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয়।

### তার আলেকজান্ডার ফ্রেমিং

পেনিসিলিনের আবিষ্কার: বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তার আলেকজান্ডার ফ্রেমিং-এর জীবন কাহিনী আজ আপনাদের পরিবেশন করছি। পেনিসিলিনের আবিষ্কার বর্তমান কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে—এই যুগ হলো অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সমূহের আবিষ্কারের ফলে বর্তমান কালে অতি সহজেই নিরাময় করা যায়।

বিজ্ঞানী ফ্রেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে এই যুগের সূচনা করেছেন। ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট স্কটল্যান্ডের আয়ারদায়াহে তাঁর জন্ম হয়, লিউডন মুর স্কুল, কিলমারনক অ্যাকাডেমি প্রভৃতি

শিক্ষায়তনে বালাশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি লণ্ডন পলিটেকনিকে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। প্রথম কণ্ঠজীবন তাঁর আরম্ভ হয় এক জাহাজ কোম্পানীতে। চার বছর এই কোম্পানীতে কাজ করার পর তিনি আবার ছাত্র হিসাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট মেরী হাসপিটাল মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করলেন। ১৯০৬ সালে ডাক্তারী পাশ করার পর এ হাসপাতালে বিজ্ঞানী মার এলড্রোথ রাইটের গবেষণাগারেই তাঁর গবেষণা-জীবন শুরু হয়, বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর শিক্ষা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই বিজ্ঞানকর্মী ফ্রেমিং-এর প্রারম্ভিক-গবেষণা জীবনের প্রধান সহায় ছিল। ১৯২১ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জীবাণু-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রেমিং জীবাণু-বিজ্ঞানের বহু শাখাতেই গবেষণা করেছেন,—এই সব বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফলাফল-সমন্বিত রচনার সংখ্যাও অনেক। তিনি জীবাণুনাশক লাইসোজাইমেরও আবিষ্কারী। মানবদেহের রক্তের উপরেও তিনি অনেক গবেষণা করেছেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই পেনিসিলিনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। স্ট্রেফাইলোকক্কাস জীবাণুর বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করার সময় হঠাৎ একদিন জীবাণু-সমন্বিত গবেষণা মাধ্যমের মধ্যে বাতাস থেকে সংক্রামিত হয়ে একটি সবুজ ছত্রাকের সৃষ্টি হয়। দেখা গেল, এই ছত্রাকের চারদিকের জীবাণু কি এক অজানা কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। বিজ্ঞানী অনুমান করলেন, জীবাণুর বিনাশের জন্তু নিশ্চয়ই ঐ ছত্রাকই দায়ী। শুরু হলো গবেষণা, ছত্রাকটির নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটান, আর এরই মধ্যে থেকে পাওয়া গেল জীবাণু-নাশক অত্যাম্ভ্য এক পদার্থ! এই পদার্থের নামকরণ হলো পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্তু বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রেমিং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালের ১১ই মার্চ আকস্মিক ভাবে হৃদরোগে পরলোক গমন করেছেন।

## ● মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য ●

### ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজি: ডাকে .....	২৪
বাণ্যাসিক " " .....	১২
বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা রেজি: ডাকে	
( ভারতীয় মুদ্রায় ) .....	২

টাদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

### ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	১৫
বাণ্যাসিক সডাক .....	৭।।
প্রাপ্ত সংখ্যা ১।০	
বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....	১৫.০
( পাকিস্তানে )	
বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....	২১
বাণ্যাসিক " " " " .....	১০।।০
বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা " " " " .....	১৫.০

# সাহিত্য পরিচয়



## সাহিত্যে দেহবাদ

বাংলা দেশে চিরকাল একদল সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্যের

তথাকথিত সমালোচকদের কাছে তিরস্কৃত হয়ে আসছেন।

সাহিত্যের বাধাপরা রাস্তা অতি কষ্টে ত্যাগ করে যারা বহু বিপদের মধ্যে থেকেও পরাক্রমশালী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন, তাঁদের প্রতি ক্রোধের আর সীমা থাকে না সনাতনপন্থী এই সমালোচকদের। এ ক্ষেত্রে বলতে বাধ্য নেই বা স্বীকার করতে কুঠা নেই, সাহিত্যের সনাতনপন্থে কোন র্রেন্দ বা হ্রানি নেই। কিন্তু বর্তমান যুগের আলোচনাকারীদের সনাতন খোলসেব মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ছুট মনোবৃত্তির পরিচয়। এঁরা হুনিয়ার হাস-হকিয়ৎ জ্ঞানতে পরাশ্রুত, দেশ-বিদেশের আধুনিক সাহিত্যের কোন খোঁজ রাখেন না, চোখে বৈজ্ঞানিক-চশমা পবলেও দৃষ্টি এঁদের সীমাবদ্ধই থাকে—কেবল এক জাতকোষের বশে লেখনী ধারণ করেন এবং ভিত্তিহীন যুক্তি দেখিয়ে গালিবর্ষণ করতে থাকেন অপাঠ্য ভাষায়। সম্প্রতি ইংলৈক সাহিত্য-সমালোচক (!) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিঃ আলোচনা' প্রসঙ্গে দেহবাদের ধূয়া তুলেছেন আবাব। পৌরাণিক নারায়ণ-চক্র সাহায্যে সভ্যদেহ খণ্ড-বিখণ্ড করেন, আলোচ্য লেখকও (শুধু মাত্র নামের অজুহাতে?) লেখনী চালনা করেছেন আধুনিক সাহিত্যের সত্যত্বহানির নজীর দেখিয়ে। স্তম্ভশনচক্র কার্য্যাকরী হওয়ায় নানা তীর্থের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের ভাবতরবর্ষে। মসৌর অসিধারী হয়তো জানেন না, তাঁর অসিতে ধার পড়ে না কতকাল এবং হয়তো জানেন না লৌহযুগের অস্ত্র এ যুগে একেবারেই অচল। খাট হোক, সমালোচকের বক্তব্য : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জন কয়েক সাহিত্যিক দেহবাদকে আশ্রয় করে বড়ই অজ্ঞায় করছেন। সাহিত্যের স্রীলতাহানির রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তে পড়তে তিনি নাকি আদিম অনুভূতিতে শিউরে শিউরে উঠছেন। শুধু মাত্র জন কয়েক লেখকের লেখার ছত্রে ছত্রে তিনি পর্ণগ্রাক্ষির আশ্বাদ পেয়ে তাঁদের নামের একটি 'ব্র্যাক লিষ্ট' পর্য্যাস্ত পেশ করে ফেলেছেন সাহিত্যের দরবারে। দেখা যাক, তালিকাভুক্ত লেখকরা এখন ভয় আর আশঙ্কায় লেখনী ত্যাগ করেন কি করেন না।

আমাদের দেশের শাস্ত্র আর পুরাণ, কাব্য আর মহাকাব্য, এমন কি ভাষাতত্ত্বের অভিধান মনোযোগের সঙ্গে সমালোচক পড়েছেন কি না আমাদের জানা নেই। না-জানি সমালোচকটি এই সকল মহাগ্রন্থ পড়লে হরিনামের নামাবলী ছেড়ে কোথায় পালাবেন! এখানে বিদেশী সাহিত্যের উপমা তুলছি না এইজন্য যে, দেশীতেই যার এই

হুবহু হয়, এক কৌটা বিদেশী পান করলে হয়তো দাঁত-কপাটি লেগে যাবে তাঁর। 'মা কালী' মার্কা, 'মহাশ্বাজী' মার্কা কিংবা 'শনিঠাকুর' এর এক-আধ পাঁচটেই যিনি চোখে সর্পে ফুল দেখেন, তাঁর সমুখে দরাসী কুঁটিয়া, স্বচ্ছ, ভট্টি, বাগান ভড়কা পরা শুধু বিপজ্জনক নয়, অপ্রয়োজনীয়।

দেশ-বিদেশের বর্তমান সাহিত্য পর্য্যালোচনা করলে বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যের আড়িনা থেকে ক্রাকামি আর ভাঁড়ামি বিদায় গ্রহণ করেছে। বৈজ্ঞানিক সেনন বিজ্ঞানের দূরবীণে পৃথিবী দেখছেন তেননই আধুনিক কালের সাহিত্যিকরা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখছেন সমাজ-সচেতন মানুষকে। ইদননীঃ কালের সাহিত্যিকরা বিশ্বাস করেন, সসার-ধর্ম্ম পালনের জগৎ দেখতে যেমন বাতিল করা যায় না, তেমনি মানুষের কাহিনী লেখার মধ্যে মানবদেহকে বাদ দিয়ে শুধু 'গাথা' রচনা করা যায়, সাহিত্য রচিত হয় না। সনাতন কালের বাস্মিকি, বেদবাস, হোমার, দাস্তে, সেক্সপীয়র, কালিদাস থেকে আধুনিক কালের রথী মহারথীরা দেহকে বাদ দিয়ে লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অপ্রচ্ছন্ন ভাবে দেহ-তত্ত্ব উনিয়ছেন। গান্ধীজী পর্য্যাস্ত 'আত্মকথা'য় আত্ম-দেহকে বাদ দিতে পারলেন না। কিন্তু একদা শুধু আমাদের 'কল্লোল'-যুগকে দেহাশ্রয়ী আখ্যা দেওয়া হয়। আবার সেই ধূয়া তুলেছেন আজকালের সমালোচক, আজকের সাহিত্যের বিরুদ্ধে। দেহবাদের পক্ষে যুক্তি দেখানো নিরর্থক আমরা জানি। সমালোচক 'ব্র্যাক লিষ্ট' পেশ করেছেন সাহিত্যের দরবারে, তালিকাভুক্ত লেখকরা নিশ্চয়ই আইনজ্ঞ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে তাঁদের পক্ষের 'কাউন্সেল' নিযুক্ত করবেন। মামলার ফলাফল নির্ভর করবে 'নির্মৌক নৃত্য'র রচয়িতা আমাদের সকল লিটারেরী কমিটির চূড়ামণি বিচারক রাজশেখর বসু'র বিচার-বিবেচনায়। আদালতের বিচারকরা নিরপেক্ষ বিচার করেন, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কোন লাভ হয় না তাঁদের কাছে—দেহবাদী সাহিত্যিকরা রাজশেখরের পুস্তক-প্রকাশকদের ধরাধরি করলে কিছু না হোক দীর্ঘ লিখিত সার্টিফিকেট লাভ করবেন অতি অবগৎ।

সমালোচকটির ব্যথা বা বেদনার কেন্দ্রস্থল যে-কোন পাঠকের কাছেই ধরা পড়ে। ব্র্যাক লিষ্টের লেখকদের বই বাজারে বেশ ভালই বিক্রী হচ্ছে—অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে ফেলেছেন সমালোচক এবং বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রদায়কে এজগৎ দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সমালোচক হয় তো জানেন না, আজকালের পাঠক-পাঠিকা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজাগ ও সচেতন। হরিনামের নামাবলী জড়ানো লেখকদের চেয়ে বাস্তববাদী



লেখকদের বইয়ের চাহিদা শুধু বাঙলা দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই অধিক। দেহবাদের ধূয়া তুলে কি কোন লেখার চাহিদা কমানো যাবে আর এখানে? সমালোচক স্বীকার করবেন না, কিন্তু বর্তমান কালের লেখক এবং পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করেন, দেহকে বাণ দিয়ে সত্যিকার সাহিত্য কেউ কখনও সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ আর উজ্জ্বলতার দিন বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন এই, সমালোচকের কিছু বই বাজারে কি প্রকাশিত হয়েছে? সেই বই কি যথেষ্ট বিক্রীত হচ্ছে না এবং পোষাক কাটছে? তাই যদি হয়, তবে তিনি দেহবাদের রাস্তায় চলতে পারেন। বাঙলার বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকা তবেই গরম কেকের মত তাঁর রচনা গিলতে অচিরং বসে যাবে।

যাই হোক, সমালোচকের যাতে বিন্দুমাত্র জ্ঞানগম্য হয় শুধু মাত্র সেই কারণেই এ-সবলে ডি. এইচ. লরেন্সের লেগার খানিকটা উদ্বৃতি করছি। লরেন্স দেহতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন :—

“Science has a mysterious hatred of beauty, because it doesn't fit in the cause-and-effect

chain. And society has a mysterious hatred of sex, because it perpetually interferes with the nice money-making scheme of social man. So the hatreds made a combine, and sex and beauty are mere propagation appetite.

Now sex and beauty are one thing, like flame and fire. If you hate sex you hate beauty. If you love *living* beauty, you have a reverence for sex. Of course you can love old, dead beauty and hate sex. But to love living beauty you must have a reverence for sex.

Sex and beauty are inseparable, like life and consciousness. And the intelligence which goes with sex and beauty, and arises out of sex and beauty, is intuition. The great disaster of our civilization is the morbid hatred of sex.”

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### রূপতলুদ

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বগত: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চিরদিন লেগা থাকবে সোনার অক্ষরে। সম্পূর্ণ নিজস্বতায় নিয়ে তিনি দেগা দিয়েছিলেন সাহিত্যাকাশে, সমগ্র আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর লেপনীর রশ্মি। ভাবের ব্যঞ্জনায়, চিন্তাধারার অপকল্প প্রকাশভঙ্গিমায় বিভূতিভূষণের জোড়া পাওয়া দুষ্কর। ‘পথের পাঁচালী’-স্রষ্টার বর্তমান গ্রন্থ রূপতলুদ কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন! গল্প-সাহিত্য আজ যে মহামূল্য রত্নসম্ভার সম্বিত তার বহুলাংশ সরবরাহ করে গেছেন বিভূতিভূষণ। এক সরল অনাড়ম্বর ঘটনার দর্পণে অতীত অবলুপ্ত ইতিহাসের সারিবদ্ধ ভাবে প্রতিবিশ্ব-সৃষ্টির যোগ্যে বিভূতিভূষণের দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে আমার ডাক্তারি, বংশেলের বিড়ম্বনা প্রভৃতি গল্পগুলি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। একটি মুগ্ধক রচনা করেছেন বিভূতি-ভায়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান য়াসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড (হারিসন রোড) থেকে প্রকাশ করেছে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দাম—হ’ টাকা মাত্র।

### শ্রেয়সী

সুবোধ ঘোষ বাঙলার সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে তিনি করেছেন পুষ্ট। জীবনের এক নতুন আনন্দ তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। ‘শ্রেয়সী’ তাঁর একটি উপন্যাস। এক প্রাচীন

অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী। কমল বিশ্বাস অবাধ আভিজাত্যে তাঁর যথারীতি পথেই চলতে থাকে। তৎপুত্র অতীনের যুগে হয় প-পরিবর্তন, তাদের আভিজাত্য, বংশগর্ভ এক নতুনতর রূপ নিল। মোড় ঘুরল গরিমার। সেই পথে চলতে থাকল। ঘটনার যাত-প্রতিঘাতে সুবোধ ঘোষ সমগ্র কাহিনীটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অতীন চরিত্রটি আরও সম্যক প্রস্ফুটনে সাহায্য পেয়েছে কেতকী ও কাজরী চরিত্রের মাধ্যমে। এই ছুটি নারীর পৃথক জীবনযাত্রার মধ্যেই বিকশিত হয় অতীনের চরিত্র। শ্রেয়সী পাঠক-পাঠিকার কাছে শ্রেয়: হোক, এই কামনাই করি। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছে শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন। দাম পাঁচ টাকা।

### দ্বীপপুঞ্জ

কথামঞ্জী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের খ্যাতি ছোট গল্পের মহলে অধিক মাত্রায় পরিব্যাপ্ত হলেও উপন্যাসের আসরেও তাঁর আসন জটিল। দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। হরিবংশ নামে এ আগে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে এর অঙ্গসজ্জা বর্তমানোপযোগী করে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। চরিত্রচিত্রণে এর লেখনী প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছে। মানব-মনের অন্তর্দর্শন ভাব-বিনিময় ফুটে উঠেছে এর লেখায়। মুরলী, নবদ্বীপ, মনোরমা, মঙ্গলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রভূত ভাবে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। রিবোণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছে শ্রীকানাইলাল সরকার। দাম সাড়ে চার টাকা।

### পসারিণী

তরুণদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় সমরেশ বসুর নাম একটি নিপুণ লেখনী নিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল সমরেশ বসুর পসারিণী। কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে সমরেশের দরদ ও অহুভূতির চিহ্ন বিজ্ঞমান। একটি আন্তরিকতার সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। গল্পগুলি পাঠকমহলে সমাদর লাভ করুক। এম. সি. সরকার স্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমদ্রায় সরকার। দাম আড়াই টাকা।

### রোমান হলিডে ও অগ্ন্যাশু গল্প

বিদেশী চলচ্চিত্র-কাহিনীগুলি বর্তমানে এক নতুন ধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন চিত্রনির্মাতারা গল্প-প্রধান কাহিনীগুলির দিকেই অধিকমাত্রায় মনোনিবেশ করেছেন। কয়েকটি খ্যাতিলাভ বিদেশী ছবির কাহিনী বাঙলায় অনুবাদ করেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। এই রচনাগুলি ইতঃপূর্বে প্রথমে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হিসেবে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। অনুবাদের মাধ্যমে নানা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করার প্রচেষ্টার জ্ঞাত তিনি ধন্তবাদাই। এই গ্রন্থে রোমান হলিডে, ক্রম হিয়ার টু ইটারনিটি, স্কারামুস, নাইটস অফ দি রাউণ্ড টেবল, সাতিনা, বোয়ারফুট কনটেস্টা, পিকনিক প্রভৃতি ছায়াচিত্রের কাহিনীগুলি পরিবেশিত হয়েছে। সাহিত্য্যামোদী এবং চিত্র্যামোদী এই উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই গ্রন্থপাঠে পরিতৃপ্ত হবেন। এস. রায় স্যাণ্ড কোং, ১৭৬ বিবেকানন্দ রোড থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকমলরঞ্জন রায়। দাম আড়াই টাকা।

### লিলির প্রেম

অনুবাদ-সাহিত্যে বীদের দখল পাঠক-সমাজে স্বীকৃত, তাঁদের মধ্যে লিলির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাট্টার নাম উল্লেখযোগ্য। বহু প্রখ্যাত বিদেশী লেখকদের রচনা বাঙলায় অনুবাদ করে এঁরা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি

অর্জন করেছেন। পূর্ণ প্রশিয়ার লেখক হেরমান স্ভডারমানের 'সড অফ সডম' উপন্যাসটির যে অনুবাদ এঁরা করেছেন লিলির প্রেম নামে সেই অনুবাদ-উপন্যাস জনসমাদর লাভে সমর্থ হবে আশা করা যায়। লিলি চরিত্রটি এঁরা নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চরিত্রটি বড় দরদ দিয়ে ফোটানো হয়েছে। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ জামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমলয়জ্জকুমার সেন। দাম চার টাকা।

### ধৃতরাষ্ট্র

বহু অভিনীত এই নাটকটির খ্যাতি এখন কারোরই অবিদিত নেই। সমাজে যে দুর্নীতির বিষবাস্প চুকেছে এবং তার ফলে সমগ্র সমাজ আজ নিম্নে উঠেছে এবং সেই দুর্নীতি সুনীতির মুখোমুখি নিজেকে আবৃত রেখে চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণস্বরূপ, এই পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। নাট্যকারের কৃতিত্ব ভরপুর। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছ ও প্রশংসনীয়। এই নাটক আজকের দিনে এক বিশেষ আবেদন বহন করে। লেখক—ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর্ট স্যাণ্ড লেটার্স, জবাকুস্তম হাউস, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীরঞ্জন সেন। দাম—স্থলত সংস্করণ দু'টাকা ও শোভন সংস্করণ আড়াই টাকা।

### অনুশীলা

রমাপতি বসুর সাহিত্যিক খ্যাতি আজকের নয়। প্রায় দু'যুগ ধরে বাঙলা সাহিত্যকে তিনি নানা ভাবে পুষ্ট করে আসছেন। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ অনুশীলা। একটি নাটকের ছাত্রী অনুশীলা। তার জীবনে পর পর এল সুবর্ণ, নবীনমাধব ও ইন্দ্রনাল—এই তিন জনের মধ্য দিয়ে অনুশীলার চারিত্রিক বিকাশ ও তার জীবনের গতিপথের ধারা প্রকাশ পায়। লেখকের মনোময় রচনাভঙ্গী ভাল লাগল। ঘটনাগুলি সুরূপায়িত এবং তিনটি পুরুষের তিনটি পৃথক রকমের চরিত্র গঠনও লেখক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।—এস. বানার্জী স্যাণ্ড কোং, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীশ্রীধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন-

এই অগ্রিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকত্ব রক্ষা করা যেন এক দুর্নিবৃত্ত বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বারিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকাৰ্য্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ত সুদৃঢ় আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা ভেদে খণ্ডী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জ্ঞাত লিখন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

# \* \* মৌলিকতায়, নির্ভরতায় ও আত্মনির্ভরতায় \* \*



১৬৭ মি, ১৬৭ মি/১, বহুবাডার স্ট্রীট, কলি ১২  
 ফোন ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম • প্রিলিঙ্কনেড  
 ব্রাঙ্ক : বালিগঞ্জ - ২০০/২/মি - রাজবিহারী এডিনিউ  
 কলিকাতা-২৯ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬  
 ব্রাঙ্ক - ডামামেন্দপুর \* ফোন : ডামামেন্দপুর - ৮৫৮  
 প্রা. প্রা. প্রা. প্রা. প্রা. ১২৪, ১২৪/১ বহুবাডার স্ট্রীট-কলিকাতা-১২ (বহুবাডার স্ট্রীট) (খালী থান)



## ঘেঁটুর গান শ্রীজয়দেব রায়

ঘেঁটুর গান দক্ষিণবঙ্গের অল্পতম বিশিষ্ট গোষ্ঠী-সংগীত।  
ঘণ্টাকর্ণের অপভ্রংশ ঘেঁটু। গল্প আছে যে, ঘণ্টাকর্ণ নামে  
একজন অমর শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিবে না বলিয়া কানে ঘণ্টা বাঁধিয়া  
রাখিত। ঘণ্টাকর্ণকে বাঙ্গ করার ছলে যুগ যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত  
বাঙ্গালী তাকে লইয়া গানের মাধ্যমে উদ্দেশ্যে মাতে।

ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। হাটের মাঝে 'কেলে হাঁড়ী'  
রাখিয়া সর্পস্নানসময়ে তাহা পদাঘাতে ভাঙাই ঘেঁটুপূজা অর্থাৎ ভগবদ্-  
বিষ্ময়ী ঘণ্টাকর্ণের দর্পচূর্ণ করাই এ পূজার মূল উদ্দেশ্য। তাহার  
পূর্বে সারা ফাল্গুন মাস ধরিয়া বালকদল সাজগোজ করিয়া প্রতি  
সন্ধ্যায় গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে  
একজন সাজে ঘেঁটু, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকলে নানা ব্যঙ্গবাণ  
নিষ্ক্ষেপ করে, সে-ও সাধামত গান গাহিয়া সেগুলির জবাব দেয়।

কালের পরিবর্তন হইতেছে—সমাজের মধ্যেও সমাজ-চেতনার ঢেউ  
আসিয়াছে, ঘেঁটুগানের মারফতও দেশের সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যের  
নানা ফিরিস্তি যুক্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক চেতনার দিনে, এ গান  
জাতীয় আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া নবরূপে দেখা দিয়াছিল।

বালকদের মুখে জ্যাঠামি মনে হইলেও এসব গানে নানা উপদেশ,  
নানা ধর্মোক্তা নৈতিকতা প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। পল্লীবাসীদের  
বিশ্বাস—ঘেঁটুপূজা করিলে দাদ, খোস প্রভৃতি চর্মরোগ হয় না, তাই  
চর্মরোগী বালকরাই এ গানের পুরোভাগে অংশ গ্রহণ করে—

আজ আনন্দে ঘেঁটু লয়ে সঙ্গে  
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে যাই।  
মনের আনন্দে দাও গো পূজা  
এমন দিন ত আব হবে নাই।  
খোস চুলকুনা ঘেঁটু দিছিস গায়  
সতী-নারীর বীর পতির পায়।  
বামে দাঁড়ালে সত্যনারী  
পতি বিনা সতীর গতি নাই।

সংক্রান্তির দিনে ঘেঁটুরপূজার আয়োজনে ঘেঁটুর সখীরূপে  
কিশোরী-বেশী কিশোরদল চাঁল-ডা'ল, বাগানের ফুল, দুর্বাঘাস,  
হলুদ প্রভৃতি লইয়া নৈবেদ্য সাজায়। ঘেঁটুর পূজা মানেই কিন্তু ঘেঁটুর

বিবাহ; তাহার জন্ত সীতাপুরের বাসনা নামিকা এক পাত্রীকে  
মনোনীতা করা হয়, তাহার গায়ে-হলুদের আয়োজন হয়, জল  
সইবার ব্যবস্থা হয়—

ঘেঁটুর রাজার জন্তে কনে দেখতে যাই কঁজনা।

সীতাপুরে আছে মেয়ে, নামটি বাসনা।

মেয়ের বয়সের নেই গাছ পাথর

আশীর কম হবে না।

হবে যেটি ঘেঁটুর কনে, কুলোর শুয়ে দুখ খায় দু'বেলা।

জল-সইতে গিয়াও সবাই ঘেঁটুর রূপগুণ লইয়া নানাপ্রকার  
ঠাটা-বিদ্রুপ, হাসাহাসি করিতে লাগিল—

সাধের মালা রইল গাঁথা বরণডালাতে

ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিদ্রুপ হলাম আমরা সবতে।

আ মরি, কি রূপের গঠন, (দেখে) গাঁটা করছে কেমন,

গলা সুরু, মাজা মোটা, টাক ধরেছে মাথাতে।

কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হয়েছে বুকের ছাতি

দাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে।

ক্রমে ক্রমে বাড়লার চিরপরিচিত তর্জার লড়াই শুরু হইল।  
একদল বালক ঠাটা করিয়া নানা প্রশ্ন করিলে ঘেঁটুও তাহার  
জবাবে গান গাহিয়া উত্তর দিতে লাগিল। হরিবিষ্ময়ী অতচি  
ঘেঁটুকে তাহারা জলশুদ্ধ করিয়া লইতে বলিল—

জল শুদ্ধ করিয়া লও, হাত পা তোমার ধোও।

ঘেঁটু পবিত্র হইবার জন্ত হরিগুণ গান করিয়া বলিল—

ভাগ্যমানে কাটাখ পুকুর চণ্ডালে কাটে মাটি।

কুমোরের কলসী, কাঁসারির ঘটি।

জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া

হরিনাম করিলে পরে শুদ্ধ হয় আপন কায়।

(বল হরি হরি, হরি হরি বল রে)

ঘেঁটুগান বাড়ালীর সালতামামি গান। সারা বৎসরের নানা  
ঘটন-অঘটনের ফিরিস্তি-ফর্দ এ সকল গানে থাক। সাধারণতঃ  
এ সকল গান পূর্ববঙ্গের মাগন গানের মতো বালকদলই সমবেত  
ভাবে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গাহিয়া ফিরে।

বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সর্বত্র এবং চব্বিশ-পরগণা, হুগলী  
ও হাওড়া জেলার কোথাও কোথাও ঘেঁটুগানের বিশেষ চলন ছিল।

কোন এক সময়ে ঘরের মেয়েদের জলকষ্ট লাঘব করিবার জন্ত

কোন কৃপণ গৃহস্থ কৃপা খনন করিয়া দিয়াছিল, অকালপক রসিক বালকদল সেই ঘটনা অবলম্বনে গান বাধিয়া গাহিল—

বেঁটু তাই ভাবি মনে ।  
আর তো সহ্য জলের কষ্ট যায় না গো কেনে ।  
গিন্নী বলেন, আর তো আমি জল পাব না পুকুরে ।  
কুলীতে তপ্ত বালি চলতে নারি হুপরে ।  
কর্তা বলেন, লথুবে ।  
যেখানে সস্তা পাবি আন গো ডেকে মজুবে ।  
পচা চাল ঘরে ছিল, সেগুলোর গতি হ'ল ।  
মিষ্টি জল উঠল তবু এঁটেল মাটির গহনে ;  
বেঁটু গো ভাবি তাই মনে ।

গানটির মধ্যে যে শ্লেষাত্মক পরিহাস রস আছে তাহা উপভোগ্য । এমন কি, রামায়ণের দেবচরিত্রগুলিও বালকদের কৌতুক হইতে বাদ পড়ে নাই । শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও নিশ্চয় বাল্যকালে একবার খোস-পাঁচড়ায় ভুগিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত বেঁটুপূজা করিয়া তাঁহারা নিশ্চয় বোগমুক্ত হইয়াছিলেন । এই উপলক্ষে তাহারা রাম-লক্ষ্মণের পুতুল সাজাইয়া পাকীতে চড়াইয়া গান গাহিতে বাহির হয় :—

সে বছরে খোস হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের গায় ।  
হায় হায় হায় !  
সে বছরে খোস হয়েছে লক্ষ্মণের গায় ।  
কৌশল্যা স্তমিত্রা রাণী এরা, কেঁদে কেঁদে পাগালানী  
দশরথ নৃপমণি ভূমিতে লোটার ।  
হায় হায় হায় !

শেষে—

মন্ত্রী বলে—“শোন রাজা কর তুমি বেঁটুর পূজা ।  
আপদ বাল্যই দূরে যাবে সমযজ্ঞা মম মন্ত্রণায় ।”

কোন কোন বেঁটুগানে বেশ কবিত্বও আছে । অবশ্য এ কবিত্বও নাযুলী ধরণের । এই শ্রেণীর গানই অকালপক বালকদের নিকট হইতে সভ্যকবিদের ভব্য আসরে ঠাই পাইয়াছে । এরূপ একটি বেঁটুগানের নিদর্শন—

কি হেরিলেম অপকৃপ বাইতে জলে ।  
ভুবনমোহন কালোরাপ দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে ।  
গলে মণিমুক্তা দোলে পদচিহ্ন বন্ধস্থলে  
যমুনার হুই কূলে আলো কইরে,  
মোহনচূড়া হেলেছে বামে রে, মন মোহিয়ে ।  
দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে ।

বেঁটুগান রাখাল বালকদেরই গান—ফাল্গুন মাসে বেঁটুর পূজা, কিন্তু খোস-পাঁচড়া-দাদের দেবতা বেঁটুর বিজয়াভিযান চলে সারা বৎসর ধরিয়া ; তাই গোষ্ঠের প্রান্তরে আর পুকুরের ঘাটে বেঁটুর জয়গানেরও বিবাহ নাই—

ঐ ডাবর বাজা, ঐ কাঁসর বাজা ।  
এলো এলো দ্বারে বেঁটু রাজা ।  
ধামা বাজা তোরা কুলো বাজা ।  
এলো এলো দ্বারে বেঁটুরাজা ।

এই-ই ঘটাকর্ষণ, ওগো এই-ই ঘটাকর্ষণ  
যেন হেঁড়া ছাত্তা বর্ণ ।  
কাণের ঘণ্টা তোরা বাজা বাজা ।  
কানে ঘণ্টা বাঁধা আমাদের এই  
ব্যাটা বেঁটুরাজা ।

কৃষাণী বালিকাদের কণ্ঠে বেঁটুর গান আর একটি ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে । ফাল্গুন সংক্রান্তির দিন কৃষাণী গৃহস্থ ঘরের বালিকারা দল বাধিয়া চাপান ও উত্তোরের মধ্য দিয়া বেঁটুর গান গাহিয়া থাকে । একদল গান গাহিয়া অহুবোধ জানাইল—

বেশ তো ভাট, বল না সই, সমিতি এই  
তোমার কেমন তাই ।  
দিমিশান্তড়া ভাঙবে তোমার হোক না সমিতি যেমন ।

অপর দল চাপান দিল—

বলি লো, বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল  
ও তার বড় বড় কোয়া ।

বেঁটুর দল জবাব দিল—

খা, ভাই বর—এই ফাল্গুন মাসে,  
কাঁঠাল ফলে বুঝি বাঁশের গাছে ?

অপর দল আবার প্রশ্ন করিল—

বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল ও তার বড় বড় কোয়া।  
মুড়ির সনে গেতে গেলেই ভাল, নয় সব ভোঁয়া ।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোয়াকিনের**



কথা, এটা  
খুবই আভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়াকিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দার্ষ-  
দিনের অভি-  
জতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে ।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার  
অন্ত লিখুন ।

**ডোয়াকিন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ**

শো-রুম :—৮/২, এস্ট্যামেনড ইন্সট, কলিকাতা - ১



কাঁচায় না খায়, ঝোলে ঝোলে, পাকায় না খায় খুলে,  
স্বর্গধারে পৌছে যার ও সে খেলে পায়ে দলে ।

সবাই এক সঙ্গে—

ও দিদি খেলে পায়ে দলে ।

বঁটুর দল এগার নিজেরাই সমস্তার সমাধান করিল

—ওগো দিদি, ও দিদির সই—

এর ভাঙনিটা হচ্ছে মই ;

বোঝো গো সুরে গেয়ো দই—

না বোঝো তো করবে হৈ-চৈ ।

## পূজার নতুন নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82753 ( আধুনিক )—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, “আমার এ গানে” ও “তোমার প্রথম গান প্রথম তারার মতো ।” N 82754 ( আধুনিক )—শ্রীমতী উৎপলা সেন, “তোমার ভুবন হ’তে আমার এ নাম” ও “দোলা দিয়ে যার কে দোলা দিয়ে যার” । N 82755 ( ধর্মমূলক )—শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, “রইল কথা তোমারি নাথ” ও “ওগো নিষ্ঠুর দরদা ! এ কি খেলছো অমুখন ।” N 82756 ( আধুনিক )—মাল্লা দে, “এই ক্ষণটুকু কেন এতো ভাল লাগে” ও “আমি আজ আকাশের মতো একেলা ।” N 82757 ( আধুনিক )—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ঘুম-চুল চুল চাউনি চোখে” ও “ওগো আমার ফোকিল-কালো মেয়ে ।” N 82758 ( আধুনিক )—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, “যে প্রেমের দেখা মেলে” ও “আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি ।” N 82759 ( পল্লীগীতি )—সনৎ সিং, “রথের মেলা বথের মেলা বসেছে” ও “এ ঘোর ঘোর লেগেছে ঘোর” । N 82760 ( আধুনিক )—শ্যামল মিত্র, “এই পথে যায় চলে” ও “সেদিনের সোনাররা সন্ধ্যা ।” N 82761 ( আধুনিক )—আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, “তারাদের চুম্বকি ঝলে আকাশে” ও “আমি আল্পনা এঁকে যাই” । N 82762 ( আধুনিক )—শ্রীমতী সুরপ্রীতি ঘোষ, “গানে গানে আমি যে খুঁজি তোমায়” ও “এই ফুলের দেশে কোন জ্বর এসে ।” N 82763 ( কৌতুক নম্রা )—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী তপতী ঘোষ ( ফিল্ম ), “স্বামী চাই”—দুই খণ্ড । N 82764 ( আধুনিক )—শ্রীমতী গীতা দত্ত ( বায় ), “ঝিরি ঝিরি চৈতালী বাতাসে” ও “কৃষ্ণচূড়া আশ্রন ভুমি ।”

### কলঙ্কিয়া

GE 24860 ( আধুনিক )—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, “ও বন্ধু, এই বকুলবরা শ্রাবণ রাতে” ও “জীবনের নদীতটে ঢেউ ভেঙে পড়ে ।” GE 24861 ( আধুনিক ও পল্লীগীতি )—শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর, “মনে রেখো, মনে রেখো” ও “বঙিলা বাঁশিতে কে ডাকে ।” GE 24862 ( আধুনিক )—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন হাজরিকা, “আঁকা বাঁকা এ পথের হুঁ পাশেই” ও “ওম্ ওম্ ওম্ ওম্ মেঘ এ গরজায় ।” GE 24863 ( আধুনিক )—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, “প্রজাপতি মন আমার” ও “আজ কেন ও চোখে লাজ

কারো নয় গো মা” ও ( শ্রীমা-সংগীত ) “শ্রীমা মা কি আমার কালো ।” GE 24865 ( আধুনিক )—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, “ওগো কৃষ্ণচূড়া, বলো আবার” ও “এ নহে যা চেয়েছি যুগ যুগ ধরে ।” GE 24866 ( আধুনিক )—কুমারী গায়ত্রী বসু, “মেঘ মেঘ মেঘ কত মেঘ করেছে আজ” ও “দূর বনপথে আলোতে ছায়াতে ।” GE 24867 ( আধুনিক )—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, “তোমায় দেখেছি কত রূপে কত বার” ও “এ মন আমার যেন ভ্রমরের সুর হয়ে ।” GE 24868 ( আধুনিক )—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, “ফুল গো, তোমারে ছুঁয়ে বরাবো না ধূলিতে” ও “কুসুম যেমন করে ।” GE 24869 ( আধুনিক )—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, “দোলে দোলে এ দূর বিহঙ্গের পাগুনা” ও “সোনার তরী নয় গো আমার ।” GE 24870 ( ধর্মমূলক )—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, “প্রভাতে উঠিয়া মাতা যশোমতী” ও ( কীর্তন ) “বল না রে সখি, কহ না রে ।”

### চিত্র-গীতি

বসন্ত বাহার—বিকাশ রায় প্রোডাকশনস ( প্রাইভেট ) লিমিটেড, সংগীত পরিচালনা :—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ । N 76057—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অত্মাত্ম, “আঁধারে আমি তোমায়” ও “গগনে গগনে মত্ত ।” N 76058—বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় ( শানাই ), সুর :—বসন্ত বাহার, সুর :—ধুন । GE 30369—প্রস্থান বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, “ললিতা গো বলে দে” ও “বাঁধো ঝুলনা” । GE 30370—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রস্থান বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাঁধো ঝুলনা” ও “বারে বারে ছুটে যাই ।” GE 30371—এ. টি. কানন, “নবীকে দরবার” ও “নবেলি কালী” । GE 25837—অমর সিং বসন্তাল ( প্রায়িওনেট ), সুর :—“আহা বদলা জমানা” ( ‘মিস ইণ্ডিয়া’ ) সুর :—চূপ হো যা ( ‘বন্দী’ ) ।

## আমার কথা ( ৩২ )

### শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়

সাধনারই পরিপূর্ণতার রূপ সিদ্ধি । অকৃত্রিম উত্তম সঙ্গে করে নিয়ে আসে বিজয়ের আশ্বাদ । জয়লক্ষ্মীর বরমালা তাঁদেরই জন্তে নির্ধারিত থাকে ধীর অনমনীয় আন্তরিকার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন সাধনার পথে । খ্যাতিমান স্বরোদবাদের শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে সফলতা এসেছে ফেলে-আসা শ্রমমণ্ডিত দিনগুলির কল্যাণে ।

কলকাতার বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারের কথা বাড়লা দেশে কারোর অজানা নয় । এই পরিবার জন্ম দিয়েছে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে তৎপুত্র প্রথম ভারতীয় বৈমানিক শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে এবং বিখ্যাত কলারসিক স্নাটিনী শ্রী ও. সি. ( অর্ধেককুমার ) গঙ্গোপাধ্যায়কে । এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হেয়ার স্কুলের প্রধানশিক্ষক স্বর্গীয় সুরধনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অনুজ বাড়লার অতীত প্রাচীন তবলাবাদক স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীহীরেন্দ্রকুমার ( হীরু ) গঙ্গোপাধ্যায় । এবং ছয় পুত্রের মধ্যে সিনিয়র তবলাবাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার ( নাটু ) গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যাম

গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কলকাতায় ১৯১১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর আজকের দিনের প্রসিদ্ধ স্বরোদবাদক শ্রীশ্যামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ। বাবা সেতার বাজাতেন চমৎকার। পাঁচ বছর বয়সে সেতারে বাবার কাছে নিলেন দীক্ষা। এদিকে ভর্তি হলেন নর্থ সাবার্বান স্কুলে—স্কুলের পড়ায় মন বসে না, সঙ্গীত দূর থেকে দেয় হাতছানি। প্রাণের পরতে পরতে স্বাক্ষর দেয় সুরের মুহূর্ত। স্কুল থেকে পালাতে শুরু করলেন। তবে এ তথাকথিত স্কুলপালানো নয়। স্কুল পালিয়ে সিনেমার লাইন দেওয়াও নয়, স্কুল পালিয়ে বাড়ী এসে রেওয়াজ করা। স্কুলপালানো অধিকমাত্রায় যখন বেড়ে ওঠে সেই সময় নিজের চোখে-চোখে রাখবার উদ্দেশ্যে বাবা ভর্তি করে নিলেন হেয়ারে। সেখানে বাবার চোখে ধুলো দিতেও কসুর করলেন না। এই ভাবে ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন আই-এ পড়ার পর কলেজী পড়ায় ইতি ও সঙ্গীতের মধ্যে পুরোপুরি আত্মনিমগন।

বাবার কাছে প্রথম পাঠ নেওয়ার পর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর (১৯১৮)। ১৯২৪ সালে কেরামতুল্লার লোকান্তরের দিন পর্যন্ত তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন শ্যামকুমার। ইনি থাকতেন মেছুয়াবাজারের একটি বাড়ীতে। শ্যামবাজার থেকে প্রতি সন্ধ্যায় যন্ত্র নিয়ে সমস্ত জলবাড়ী উপেক্ষা করে পদব্রজে যাতায়াত করতে হত বালক শ্যামকুমারকে। রাত্রি দশটা অবধি ওস্তাদ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে থেতে যেতেন, একবার জেগে দেখতেন না শিক্ষার্থী বালকটির কথা, তার পর রাত আড়াইটে অবধি শেখাতেন, একটু ভুল হলেই অমাব্যয়িক প্রহার। এই সময় শ্যামকুমার প্রভূত সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যম অগ্রজ শ্রীঅমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। ভাতার উন্নতির জন্তে ইনি স্বেচ্ছায় নিজের প্রভূত স্বার্থ হানিস্থখে বিসর্জন দিয়েছেন। এক প্রত্যহ ওস্তাদের বাড়ী তাঁকে নিয়ে যেতেন ও সমানে সেই রাত আড়াইটে অবধি বসে থেকে একে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসতেন। এরূপ মেহ এবং ত্যাগস্বীকার সত্যিই দুর্লভ! কেরামতুল্লার মৃত্যুর পর তাঁরই শিষ্য স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ বসুকে গুরুপদে বরণ করে নিলেন শ্যামকুমার। মন তখন আকৃষ্ট হয়েছে স্বরোদের দিকে, সেতারে মন বসে না। অথচ গুরু তাতে রাজী হন না। একদিন ঘটনাচক্রে পরলোকগত নলিনীনাথ শেঠের বাড়ীতে এঁর হাতের ব্যাঞ্জো শুনে ধীরেন্দ্রনাথ সম্মত হলেন স্বরোদের পাঠ দিতে। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর



শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়

পর শ্যামকুমার গুরু-প্রণাম জানালেন লোকবরেণ্য স্বরসাধক আলাউদ্দীন খাঁকে। এঁর সঙ্গে পরিচিত হতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এঁর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র হীক বাবু এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে শ্যামকুমারের সাধারণ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৭ সালের ৫ই এপ্রিল আকাশবাণীর তৎকালীন একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা শ্রী পি. সি. চৌধুরীর অনুরোধে বিনা পরীক্ষায় বেতারে স্বরোদ বাজান। আজ অবধি কোন ছায়াছবি-সঙ্গীতে ইনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং ভবিষ্যতে ও ভ্রগতে কোনদিন যে যাবেন না, এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যঁর সাধনার সূত্রপাত, আজ তাঁর জীবন ভরে গেছে সার্থকতার সুখমায়। সেই অনুকরণযোগ্য সাধন অনুপ্রাণিত করুক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের, এই কামনাই করি।

... এসবের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দুর্গামূর্তি গঠনের একটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এই মূর্তি ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল কতৃক নির্মিত হয়।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ .

বাড়িতে টি. লিং একা। সে মিষ্টি হেসে দিলীপকে ভেতরে নিয়ে বসালো। জিজ্ঞেস করলো, “তোমায় কি দিতে রি? হুইকি সোডা না বীয়ার?”

“হুইকি. ধন্যবাদ!” দিলীপ বললো।

বেয়ারা এলো ট্রে-তে করে হুইকি আর সোডার বোতল নিয়ে। স্থির বোতলের মুখে সাইফন আঁটা। বেয়ারা একটি ছোটো ব্লে গেলাস রেখে এক পেগ হুইকি ঢেলে তাতে সোডা মিশিয়ে লা। একটি ছোট গেলাসে করে একটুখানি ওয়াইন নিলো টি-লিং।

অত্যন্ত জমকালো ভাবে সাজানো তাদের বসবার ঘর। দেয়ালে টি চীনে স্ক্রোল আর চিয়াং কাই শেকের একটি ছবি ছাড়া বাক্যের কোনো ছাপ নেই। আসবাব পত্র একেবারে পাশ্চাত্য।

টি লিং-ও পরে আছে একটি স্বাট। ওয়াইনের গেলাস তুলে বললো, “টু আওয়ার নিউলি মেড ফ্রেণ্ডশিপ।”

দিলীপও একটু হেসে তার পেনালটি তুললো।

তার পর কিছুক্ষণ আরহাওয়া আলোচনা। বড্ড গরম এখন। ময়রা দার্জিলিং শিলই ভালো। বুষ্টি নামলে ভালো হয়। তবে বুষ্টি হওয়ারটা বাঙ্কনায় নয়। রাস্তায় জল জমে—ইত্যাদি।

আরহাওয়ার আলোচনা শেষ হতে দিলীপ ঘড়িতে দেখলো আট কেটে গেছে।

“চং শিয়াং কখন ফিরবে,” সে জিজ্ঞেস করলো।

“বলে তো গেছে শীগুঁসিরই ফিরবে,” বললো টি লিং, “তোমার যই খুব তাড়া নেই?”

“কিছু না। তবে চং শিয়াং থাকলে আরো জমতো, ওকে র বেশ লাগে।”

“তুখু আমি ঝাকাতে একটুও জমছে না বলতে চাও?” বলে একটু লা টি লিং।

“না, না, তা’ নয়” বলে দিলীপ একটু স্বাট হওয়ার চেষ্টা করলো, লার সান্নিধ্যে আমি একলা থাকলে নিজেকে একটু বোকা-বোকা ব করি।”

টি লিং স্থির দৃষ্টিতে একটুখানি তাকালো দিলীপের দিকে। পর বললো, “এটা নিশ্চয়ই জানো যে চং শিয়াং তোমার বানাবার জন্তেই আমার কাছে একলা ফেলে গেছে।”

দিলীপ অবাক হোলো। “মানে?” জিজ্ঞেস করলো সে। টি লিং চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। আশ্চর্যান্বিত অমূর্ভব করলো দিলীপ। বললো, “আচ্ছা, মেটোর নতুন ছবিটা দেখেছে?”

টি লিং হেসে ফেললো। বললো, “থাক, আর প্রসঙ্গ পাণ্টাতে হবে না। তোমায় বলতে আপত্তি। তোমায় সেদিন দেখেই আমি চিনে নিয়েছি, তুমি বেশ সাদাসিধে। আচ্ছা, একটা কথা আমার বলবে? তুমি জেনীকে ভালোবাসো?”

“এ কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন? আর আমিও বা উত্তর দেবো কেন?” দিলীপ বললো।

“দেখ উত্তর না দিলেও যে আমি কিছু জানবো না তা’তো নয়। সেদিন তোমাকে আর জেনীকে দেখে বুঝে নিয়েছি, আর তোমাদের সম্বন্ধে হুঁয়ারটে কথা কানেও এসেছে। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। তবে আমার যদি বন্ধুর মতো নাও আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি, আর কিছু উপকার আমিও আশা করি তোমার কাছ থেকে।”

“কি রকম?”

“আমি আর চিয়েন চাং হুঁজনে হুঁজনকে খুব ভালোবাসি, সে কথা নিশ্চয়ই জানো না।”

“চিয়েন চাং যে তোমার জন্তে পাগল, সে কথা জেনী আমার বলেছে,” দিলীপ উত্তর দিলো, “তবে তুমি যে চিয়েন চাংকে ভালোবাসো সেটা জানতাম না।”

“চিয়েন চাং-এর জন্তে আমি আরো অনেক বেশী পাগল,” টি লিং যুহু গলায় বললো।

“চিয়েন চাং-এর জন্তে!”

সে কথার উত্তর দিলো না টি লিং, আস্তে আস্তে বললো, “আমি চীনের মেয়ে। স্মৃতরাং ভালোবাসতে পারি আর বিয়ে করতে পারি আমার দেশের ছেলেকেই। আমি কত দিন ধরে আশা করে ছিলাম এমন একটি ছেলের যে একেবারে দেশের মাটির মাখুখ, আমার ভাবের মতো বিদেশী ফুল নয়। হয়তো তেমন ছেলের খোঁজ পেতাম দেশে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার উপায় নেই। আমার ভাই আমার সেখানে যাওয়ার পথ বন্ধ করে রেখেছে। এ দেশে এসে হঠাৎ পেয়ে গেলাম চিয়েন চাংকে।”

“কিন্তু চিয়েন চাং কি তোমাদের দেশের মাটির মানুষ?”

“ওর বাইরের চলন-বলন দেখে ওকে তুমি ভুল বুঝো না। ও একেবারে খাঁটি দেশের ছেলে। ওর যেটুকু বিদেশীয়ানা সেটা আসলে তার বর্তমান পারিপাশ্রিক অবস্থা থেকে পালানোর যে কামনা তার একটা প্রকাশ মাত্র। এই পরিবেশ তার ভালো লাগছে না। সে চীনে ফিরে যাবে না। সে আমেরিকা সম্বন্ধে নানা রকম গল্প শুনেছে, সেটা সোনার দেশ, সেটা স্বপ্নের দেশ, ইত্যাদি। সুতরাং স্থির করেছে সে সেখানেই যাবে। তাই তার এই সাহেবিয়ানা।”

“চানে চল গেলেই পারে,” দিলীপ বললো।

“সেটা সম্ভব নয়।”

“কেন?”

টিং লিং এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। “কাউকে বোলো না, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি,” সে বলে গেল, “আমি খুব চেষ্টা করছি যদি দেশে ফিরে যাওয়া যায়। আর যদি তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি চিয়েন চাংকেও নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।”

“আমায় এসব কথা বলছো কেন?” দিলীপ আন্তে আন্তে জিজ্ঞেস করলো।

“জে শিয়াং তোমায় এখানে কেন এনেছে জানো?” টিং লিং জিজ্ঞেস করলো।

“জে শিয়াং-এর দুর্বলতা আছে জেনীর জন্তে। ভালোবাসা বলবো না, সে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। কারো জন্তে তার দুর্বলতা এলে সে পাগল হয়ে যায় তার জন্তে, তারপর তাকে পেলে পরে তার সমস্ত মোহ কেটে যায়, ফিরেও তাকায় না তা-দিকে। কিন্তু তার জীবনে জেনী হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার ধারণা, জেনী তার তোরাক্তা করে না তোমার জন্তে। তাই তোমায় ভাব করিয়ে দিচ্ছে আমার সঙ্গে।”

দিলীপ অবাক হয়ে তাকালো টিং লিং-এর দিকে।

“এ সব তার কাছে নতুন নয়,” টিং লিং বলে চললো, “তার নিজের কাজ শুছিয়ে নেওয়ার জন্তে আমার চেহারার সাহায্য সে অনেক নিয়েছে। চিয়েন চাংকেও সে আমার কাছে এনে আলাপ করিয়ে দেয় কোনো একটি বিশেষ মতলবে। কিন্তু আমিও যে চিয়েন চাংকে ভালোবাসলাম সেটা জে শিয়াং জানে না। জানলে চিয়েন চাং-এর ক্ষতি হবে। তাই আমি জানতে দিই নি, এমন কি চিয়েন চাংকেও নয়। আমি শুধু এই ভাণ করে বেড়াচ্ছি যে চিয়েন চাংকে আমি খেলিয়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা দিলীপ, কি দুর্ভোগ বোলো তো? লোকে তো শুনি খেলিয়ে বেড়ানোর জন্তে ভালোবাসার ভাণ করে। কিন্তু আমায় করতে হচ্ছে ঠিক তার উল্টো।”

দিলীপ হাসলো।

“তোমায় আমার দরকার,” টিং লিং বললো, “চিয়েন চাং-এর ভালোর জন্তে—যাতে সে কোনো বিপদে না পড়ে—তাকে আমি মাঝে মাঝে দু’একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, যেটা আমার নিজের জানানো সম্ভব নয়। অথচ কাউকে পাচ্ছিলাম না যাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি। আর তোমায় যখন জে শিয়াং নিয়ে এসেছে, আর চাইছে যে কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমার একটা বোগাবোগ থাক, তখন মনে হোলো ঠিক যে সুযোগ চাইছিলাম, সেটা পেয়ে গেলাম।”

“কী সুযোগ?” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

“দেখ, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি,” বললো টিং লিং, “আহ-কিম আর মিনির সঙ্গে আমার একটা বোগাবোগ হওয়া দরকার, সেটা তোমার মারফতই হবে। জে শিয়াং তোমায় আমার কাছে নিয়ে এসেছে তার একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে। সুতরাং তুমি যদি আমার কাছে আসো, আমি যদি তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াই কেউ কোনো রকম সন্দেহ করবে না।”

“জেনৌ করবে।”

“জেনৌকে সব খুলে বলতে পারো। সে কাউকে বলবে না, ‘টিং লিং উত্তর দিলো।’

“চিয়েন চাং সন্দেহ করবে।”

“চিয়েন শুধু ভাববে যে তুমি আমার সম্বন্ধে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছো,” টিং লিং হাসে বললো, “তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তাকে আমি ঠিক সামলে নেবো। উপস্থিত তোমায় একটি কাজ করতে হবে। করবে তো?”

“বলো।”

“আগামী মঙ্গলবার বিকেলবেলা তুমি চিয়েন চাংকে যেমন করেই হোক তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখবে। সিনেমায় হোক, রেস্তোরাঁর হোক, বার-এ হোক, যেখানেই হোক, ওকে আটকে রাখবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।”

“কেন?”

টিং লিং আন্তে আন্তে বললো, “সেদিন জে শিয়াং-এরই একটা কাজে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। আমি চাই না যে সে ও কাজে যায়।”

“কী কাজ?”

“সেটা তোমার জানবার দরকার নেই।”

“একটু যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা,” দিলীপ বললো।

টিং লিং উত্তর দেওয়ার আগেই দরজায় বেল বাজলো।

“জে শিয়াং এসে গেছে,” টিং লিং ব্যস্ত গলায় বললো, “এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। অল্প কথা বলা যাক। কী বলা যায়? হ্যাঁ, পার্ল বাকের বই পড়েছে?”

আবার বেল বাজলো দরজায়।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের বাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিংস সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১২

“আমি গিয়ে খুলে দিই,” দিলীপ উঠতে গেল।

“না, না, বেয়ারা যাবে। বলা, পাল’ বাকের কি কি বই পড়েছে?”

“প্রায় সবই পড়েছি। গুড আর্থ, জাগন সীড, মাদার, পিওনী।—

দরজা খুলে দেওয়ার আওয়াজ এলো।

“গুড আর্থ সিনেমাটা দেখেছো?”

“হ্যাঁ, দু’-তিন বার দেখেছি।”

“পল মুনি অদ্ভুত অভিনয় করেছে, না? লেই পঙ্গপাল আসা দৃশ্যটি? কী সুন্দর”—

একজোড়া জুতো মশমশ করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

“তুমি?” বললো টি লিং।

দিলীপ ফিরে তাকিয়ে দেখলো।

টি লিং-এর ভাই ঙে ঙে শিয়াং নয়, এসেছে চিয়েন চাং।

“ঙে শিয়াং কোথায়,” সে জিজ্ঞেস করলো।

“সে তো বাড়ি নেই,” উত্তর দিলো টি লিং।

চিয়েন চাং-এর মুখটা অন্ধকার হোলো। সে একবার দিলীপের দিকে একবার টি লিং-এর দিকে তাকালো।

“ওর ফিরতে দেবী হবে,” টি লিং গম্ভীর ভাবে বললো।

চিয়েন চাং কোনো উত্তর দিলো না।

“তুমি কাল সকালে এসো। ঙে শিয়াংকে থাকতে বলবো,” বললো টি লিং।

“ভাবছি একটু অপেক্ষা করে যাবো,” চিয়েন চাং বললো।

“অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই চিয়েন চাং,” উত্তর দিলো টি লিং, “ঙে শিয়াং-এর ফিরতে অনেক দেরী হবে।”

চিয়েন চাং আবার হু’জনের দিকে পর পর তাকালো। তার পর বললো, “ও, আচ্ছা।”—বলে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিলো টি লিং-এর বেয়ারা।

দিলীপ কোনো কথা না বলে বসে রইলো চুপ করে। সে ঘরের জানালা রাস্তার উপরেই।

টি লিং স্নান মুখে জানালায় কাছে গিয়ে ঝাঁড়ালো। তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে, যে পথ দিয়ে চলে গেল চিয়েন চাং। পথের বাঁকে সে অদৃশ্য হতে টি লিং ফিরে এলো তার চেয়ারে, আস্তে আস্তে বললো, “বেচারি চিয়েন চাং! আমার উপর রাগ করে চলে গেল। আমি তাকে বসতেও বললাম না।” একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো টি লিং।

“বলেই পারতে” দিলীপ বললো।

“না, ঙে শিয়াং রাগ করতো। সে চায় তুমি এখানে কিছুক্ষণ একলা থাকো। কে জানে হয়তো ঙে শিয়াংকেও সেই আসতে বলেছিলো, যাতে সে এসে তোমায় আর আমায় একলা দেখে।”

“কেন?”

“এও বোঝো না? খবরটা জেনীর কানে তুলে দেওয়ার জন্তে।”

“ও—” দিলীপ এবার বুঝলো।

তারপর অনেকক্ষণ হু’জনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ ঙে শিয়াং-এরও দেখা নেই।

একটি বাহুড় ঘরে ঢুকে হু’-তিন পাক খেয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল।

সামনের বাড়ী থেকে পিয়ানোর সুব ভেসে এল। রাস্তা দিয়ে চানচুরওয়ালারা হেঁকে গেল।

টি-লিং আস্তে আস্তে বললো, “চিয়েন চাং এর আজ রাত্তিরে ঘুম হবে না। এত চঞ্চল সে। একটুও বোঝে না!”

চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর আবার বলে গেল, “আমায় দেখে মনে হয় আমি কী সুখী। এরকম চেহারা এরকম স্বাচ্ছন্দ্য, এরকম উন্নত জীবনযাত্রার মান। কেউ যদি জানতো!”

দিলীপ টি-লিং-এর কাছে তার ছেলেবেলার অনেক গল্প শুনেছিলো সেদিন।

টি-লিং-এর বাবা ছিলেন যুদ্ধের আগে ব্যাঙ্ক অফ চায়নার একজন ডিরেক্টর। খুব পুরোনো অভিজাত বংশ তাদের। চীন সম্রাটদের আমল থেকেই জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগ।

টি লিং-এর মা আমেরিকান। জাপান যখন চীন আক্রমণ করলো টি-লিং তখন বেশ ছোটো, বছর নয়েক বয়েস। ঙে শিয়াংও ছোটো। আর হু’জনেই আমেরিকান, মায়ের সঙ্গে সে বছর শীতকালে তাদের নানকিং ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাপ চিঠি লিখে জানালো যে এখন ফেরার দরকার নেই। পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ওরা তখন নিউইয়র্কে। সেখানকার চায়না টাউনের চীনে সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ওরা স্থলে পড়ে, তাদের বন্ধুবান্ধব সব আমেরিকান। ওর মামার বাড়ির তরফের আত্মীয়স্বজন সব আমেরিকান। চীনে পরিবার হু’-চারটি বাদের সঙ্গে আনাগোনা, তারাও অভিজাত সমাজের—নিউইয়র্কের চীন কন্সাল জেনারেল, ইউনিভার্সিটির একজন চীনে অধ্যাপক, শাহাই থেকে বেড়াতে আসা কয়েক জন চীনে কোটিপতি—এই সব। চীনা, জাপানী, ইংরেজ, আমেরিকান এসব পার্থক্য সে বুঝতো না তখন। বাদের সঙ্গে মিশতো তারা সবাই এতো ভালো যে কোন রকম পার্থক্য বুঝবার শব্দকাশ তখন হয়নি। পার্থক্য বুঝলো একদিন।

মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলো একদিন। একটি দোকানের সামনে গাড়ি রেখে মা ঢুকলো দোকানে। টি লিং গাড়িতে বসে রইলো।

এমন সময় দেখে একটি চীনে ছেলে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এখানে এলো। হাতে তার কতকগুলো চীনা ফানুস। নিউইয়র্কের চায়না টাউনটা কাছেই। হয়তো তাদের দোকান সেখানে। এসব বাড়ির মেয়েরা তৈরি করে। হয়তো বাড়ি থেকে দোকানে মাল নিয়ে যাচ্ছে ছেলোট। টি লিং-এর বড়ো ভালো লাগলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে।

এমন সময় রাস্তার উল্টো দিক থেকে আসছিলো হু’-তিনটি ছেলে। কাছাকাছি আসতে একজন চীনে ছেলোটের দিকে তাকিয়ে বললো, “এই চিঙ্ক—”

চীনে ছেলোট ঝাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, “আমায় বলছো?”

“হ্যাঁ, তোমায় বলছি। তুমি চিঙ্ক—মারামারি করবে?”

ফানুসগুলো এক পাশে নামিয়ে রাখলো ছেলোট। কিন্তু কিছু করার আগেই তার মুখে একটি হুসি বসিয়ে দিলো সেই আমেরিকান ছেলে।

চীনে ছেলোটের চোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু সেও ছাড়বার ছেলে নয়। তবে যতো না দিলো সে, খেলো তার চেয়ে বেশী।



পথচারী কয়েক জন এসে তাড়াতাড়ি খামিয়ে দিলো তাদের। আমেরিকান ছেলেগুলো চলে গেল তাদের পথে। চীনা ছেলেটি চৌটে কুমাল চেপে ধরে ফারুসগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল অন্ধ দিকে। গাড়িতে বসে কন্ধ-নিশ্বাসে তাই দেখলো টিঃ লিং।

ওর মা ফিরে এলো। গাড়িতে চুকে গাড়ি চালিয়ে দিলো বাড়ির দিকে। টিঃ লিং তখনো চুপচাপ।

মা সেটি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো, “কি হোলো ডার্লিং?”

তখন টিঃ লিং আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, “মামি, চিঙ্ক মানে কি?”

ওর মা একটু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে, বললো, “এ কথা তুমি কোথেকে শিখলে?”

“একটু আগে একটি আমেরিকান ছেলেকে শুনলাম একটি চীনা ছেলেকে চিঙ্ক ডাকছে।”

“ও—! ওটা ভালো কথা নয়। কয়েক জন ষ্টুপিড লোক আছে, বারা চীন দেশের লোকদের চিঙ্ক বলে। তবে তুমি যাদের মুখে শুনেছো, ওরা নিশ্চয়ই ওই চীনে ছেলেটির স্বপ্নের বন্ধু।”

“আমি জানি না,” টিঃ লিং বললো, “আমি শুধু দেখলাম যে, চীনে ছেলেটি চলে যাওয়ার সময় তার চৌটে কেটে রক্ত পড়ছে।”

“ও ডিয়ার, ডিয়ার,” বললো চীনে মেয়ে টিঃ লিংএর আমেরিকান জননী, “ওরা কি এত সিলি যে, মারামারি করলো নিজদের মধ্যে। ওই আমেরিকান ছেলেগুলো নিশ্চয়ই খুব ষ্টুপিড। ওরা যে কিছু মনে করে বলেছে তা নয়, বারা খারাপ ছেলে ওরা পথে-ঘাটে মারামারি করে মারামারি করে বেড়ায়, আমেরিকান ছেলে দেখলে হয়তো তাকে আরো খারাপ গালাগাল দিয়ে তার সঙ্গে মারামারি করতো। এ নিয়ে তুমি অতো আপসেট হয়ো না ডার্লিং!”

টিঃ লিং কোনো উত্তর দিলো না।

ওর মা বলে গেল, “আমেরিকানরা চীনাদের কতো ভালোবাসে, জানো? আমাদের দেশে যুদ্ধ বেধেছে আর এখানকার লোকেরা আমাদের দেশের লোকদের জন্তো কতো কি পাঠাচ্ছে,—কতো জামা-কাপড়, কতো খাবার, কতো টাকা। আমি যে সোয়েটার বুনছি দেখছো, সেটাও চাইনীজ বেডকুসের জন্তো। কিছু দিনের মধ্যে একটা প্রেসেশান বার করা হবে চীনা হোলার জন্তো, তুমি-আমি-আমরা সবাই যাবো। দেখবো, আমাদের দেশের কতো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে।”

টিঃ লিং চুপ করে শুনে গেল মায়ের কথাগুলো।

বাড়ি ফিরে টিঃ লিং এক সময় চেঃ শিয়াকেও বলেছিলো পথের ঘটনার কথা।

চেঃ শিয়া তখন সবে জ্বল থেকে বেস-বল খেলে ফিরেছে।

হাতের মাদল্ ফুলিয়ে অন্ধ হাত দিয়ে সেটি অনুভব করে সে বললো, “ওই চীনে ছেলেটি নিশ্চয়ই ভীহু। তাই ওরা ওর পেছনে লেগেছিলো। আমায় কেউ বলতে আসুক না, তখন দেখা যাবে! আর ওরা সব-আজ্ঞে-বাজ্ঞে ছেলে, ওদের পক্ষে এটা সম্ভব। আমাদের বন্ধুরা অগ্রগম্য। পীট, পীভ, অ্যান, এরা কোনোদিন ও বকম বলবে না।”

টিঃ-লিং আস্তে আস্তে বললো, “আমাদের দেশের একটি ছেলেকে যে ওরা রাস্তায় ধরে মারলো সেটা আমার ভালো লাগেনি।”

কুমালে ও বেশবাসে ব্যবহারে  
চিস্তা আমোদিত হয়; ইহার  
সুগন্ধি দীর্ঘস্থায়ী।

**কান্তা**  
অনুগম্য সুরভিসার



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

“ডোন্ট বি সিলি,” চে শিয়া উত্তর দিলো, “ওরা তো একে ধরে মারেনি, ওদের একজন আর এ মারামারি করেছে। কেয়ার ফাইট। কিছু বলবার নেই।”

চে শিয়া এ কথা বলে চলে গিয়েছিলো হাত-মুখ ধুতে।

টিং লিং চূপচাপ বসেছিলো অন্ধকার বারান্দায়।

তার বাপ বার মনে হচ্ছিলো, এখানে চার দিকে আকাশচুম্বী বাড়িগুলো ঘিরে এত নিওন-সাইনের আলো, ওখানে ফিক্-এভিনিউতে হ্রস্ব ট্রাফিক—আর এখন সাংহাইতে, ক্যান্টনে, ফু-চাওতে, আর এখানে সেখানে অসংখ্য শহরে গাঁয়ে বোমা ফেলছে জাপানীরা, আর তার মতো ছোটো ছোটো মেয়েরা মায়ের কোল সঁসে কঁকড়ে বসে আছে।

দিন তিন চার পরে একদিন দেখলো ওর মা খুব ব্যস্ত। সকাল থেকে এখানে সেখানে ফোন করছে। বেকফাষ্ট খেয়ে টিং লিংকে বললো, সাজগোজ কর নাও। এখন বেরোতে হবে।

টিং লিং বললো, “মামি, একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। চলো আমরা ড্যাডির কাছে ফিরে যাই।”

টিং লিং-এর মা একটু স্নান হেসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে বললো, “সে হয় না ডার্লিং। ড্যাডি এখন চুংকিং-এ আছে। সেখানে গেলে আমাদেরও অসুবিধে হবে, ওঁরও অসুবিধে হবে। ওখানে তো তোমার জন্মে স্থল নেই। তোমার ড্যাডি লিখেছে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে, তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন তোমার ড্যাডি এখানে বেড়াতে আসবে। এখান থেকে আমরা সুইজারল্যান্ডে যাবো, তারপর দেশে ফিরে যাবো। আর এখানে আমাদের কতো কাজ। দেশের জন্মে কতো টাকা তুলতে হবে। আমরা তো আজ সেখানেই বাছি।”

নিউইয়র্কের চীনে অঞ্চলে একটি চীনেদের স্থল আছে। মায়ের সঙ্গে টিং লিং গেল সেখানে। চে শিয়াকেও বলা হয়েছিলো, কিন্তু সেদিন ওর এক বন্ধুর গায়ের বাড়িতে পার্টি। সে গেল না।

সেই স্থলে যেতে আরেকটি বড়ো-সড়ো মেয়ে তার হাত ধরে তাকে একটি ঘরে নিয়ে বসালো। সেখানে আরো অনেক মেয়ে—ছোটো বড়ো মাঝারি। সবাই বসে তারা আর রঙিন ক্রেপ কাগজ দিয়ে ফুল বানাচ্ছে।

“তুমি ফুল বানাতে জানো?” জিজ্ঞেস করলো বড়ো মেয়েটি।

“না,” উত্তর দিলো টিং লিং।

“খুব সোজা। বোসো। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।”

কয়েক বার দেখতেই শিখে নিলো টিং লিং। ফুল বানাতে বসে গেল সবার সঙ্গে।

ঘণ্টাখানেক পরে আরেক জন এসে সবাইকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। টিং লিং বিমুগ্ধ হয়ে দেখলো, এক দীর্ঘ প্রেসেশান সারি বেঁধে ঝাঁড়িয়েছে।

এতো চীন দেশের লোক এই নিউইয়র্ক শহরে! টিং লিং অবাক হয়ে ভালো—এত ছেলে, এত মেয়ে তার বয়সী? কী সুন্দর, কী ফুটফুটে দেখতে। শোভাযাত্রীদের মাঝখানে মাঝখানে দীর্ঘ ব্যানার। তাতে নানা রকম প্রোগান চীনা ভাষায় আর ইংরেজিতে লেখা। শোভাযাত্রার এক প্রান্তে বিউগেল বাজাচ্ছে একজন আর ডাম বাজাচ্ছে দু’তিন জন ছেলে।

আর টিং লিং-এর বয়সী ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নিয়েছে

সাজিভরা কাগজের ফুল, নিউইয়র্কের পথচারীদের কাছে সেগুলো বিকোবে।

শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত দেশের জন্মে টাকা তুলবার জন্মে এই প্রেসেশান, এত বড়ো শোভাযাত্রা নাকি বেয়োয় নি অনেক দিন।

কাগজের রিপোর্টারেরা ঘোরাঘুরি করছে চারদিকে। গ্ল্যাশ বালব বলসিয়ে ফোটো তুলছে প্রেস ফটোগ্রাফারেরা।

এক-সাজি কাগজের ফুল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলো টিং লিং-ও।

মামি কোথায়, মামি?—একবার ভাবল সে।

দেখলো তার আমেরিকান মা নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের মধ্যে, আর প্রেস রিপোর্টারদের ডেকে ডেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ওটা-ওটা সেটা।

মায়ের জন্মে খুব গর্ব হোলো টিং লিং-এর, হোক না তার মা আমেরিকান, সে তো এখন চে পরিবারের বো। আর শুধু তার মা কেন, নিউইয়র্কের অনেক চীনের অনেক আমেরিকান বো অসঙ্কোচে এসে যোগ দিয়েছে এই প্রেসেশানে।

একবার শুধু চে শিয়া-এর কথা মনে পড়লো। বেচারি চে শিয়া—ভাবলো টিং লিং—সে জানে না সে কী মিস করলো।

নিউইয়র্কের জুলাই মাসের অমন গরম—একটুও অমুভব করলো না টিং লিং।

গান গাইছে সব ছেলেরা মেয়েরা। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শহরের জনবহুল রাজপথে কাগজের ফুল ফেরি করে বেড়ালো টিং লিং। এমন উত্তেজনা, এমন আনন্দ, তার জীবনে আর কোনোদিন আসেনি।

কেটে গেল আরো কয়েকটা বছর। জার্মানী যুদ্ধে নামলো, পরে নামলো আমেরিকাও। টিং লিং-এর দেশে ফেরা হোলো না কিছুতেই। মাঝখানে একবার কি একটা কাজে নিউইয়র্কে এসেছিলো টিং লিং-এর বাবা। তখন শুধু মাসখানেকের দেখা।

তারপর আরো দু’তিন বছর, যুদ্ধ, খবরের কাগজে নিত্য নতুন হেড লাইন—আর নিউইয়র্কের ফ্যাশান-হ্রস্ব অভিজাত সমাজের হ্রস্ব জীবনযাত্রা। তারই মধ্যে বড়ো হয়ে উঠলো টিং লিং, দৈনন্দিন কাজকর্মের কঁাকে কঁাকে, সবুজ খামল চীনদেশের ঝাপসা স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

কেটে গেল আরো কয়েক মাস। ইউরোপে যুদ্ধ থেমে গেল, বিশ্বজুড়ে জার্মানিতে প্রবেশ করলো ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী আর রুশ সেনাবাহিনী।

নিউ ইয়র্ক সেদিন সন্ধ্যায় আলোয় আলোকময়। রাস্তায় ভিড়। হোটেলের রেষ্টুরায় নাইট ক্লাবে উন্মত্ত নাচের আসর। চারদিকে থাকিতে সিনে শিফনে বেশামিশি।

তারই মধ্যে এক আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে টিং লিং মাঝে মাঝে ভাবছিলো, কবে আমাদের দেশের যুদ্ধও থামবে।

তাও একদিন থামলো। এটম বোমা পড়লো হিরোশিমায়, নাগাসাকিতে, জাপান আত্মসমর্পণ করলো।

মাসখানেক পরে চুংকিং থেকে চিঠি এলো টিং লিং-এর বাবার, —আমি নানকিং বাছি। তোমরা সবাই সেখানে চলে এসো।

[ ক্রমশঃ। ]

ইংরেজ শাসনের যুগ !...

নৈশ আকাশের স্তব্ধতা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেল। এত কোলাহল কেন? কিসের এত হটগোল?—ভারত জেগেছে। বঙ্কিত ভারত, লাক্ষিত ভারত, পদদলিত ভারত জেগেছে। যে ভারতবাসী একদিন ইংরেজের পাশবিক লোভ আর অমানুষিক নীচতার দংশনে জর্জরিত হয়ে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল, তারাই আজ ধূলি-সজ্জা ছেড়েছে—চোখে অলেছে রোষের বহ্নি, মনে জেগেছে বাঁধন ছিন্ন করার ঐকান্তিক স্পৃহা।

এলো বিপ্লব। ভাসিয়ে দিল ভারতের জড়তার ঘুমঘোর—হঠাৎ চোখ মেলে ভারতবাসী দেখলো অলেছে অনল—সারা আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। ও কিসের আগুন? ও যে বিদ্রোহের আগুন! ও লাল রং কিসের? ও তো রং নয়—ও যে রক্ত—অত্যাচারিতের রক্ত, অত্যাচারীর রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেল—রাড়িয়ে দিল কি ভবিষ্যতের উজ্জল দিনের চলার পথ?

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দমনেরও হিড়িক পড়ে যায়—চলে তল্লাসী, চলে নির্যাতন, ফাঁসীর দড়ি থাকে প্রস্তুত, রিভলভার থাকে ভরা। কাটে দিন—কাটে মাস—কাটে বছর। কত বিপ্লবী ধরা পড়ে, কিন্তু বিপ্লব তো মরে না! আরও ছড়িয়ে পড়ে গুপ্ত বিপ্লব—দিকে দিকে। নতুনদের আকর্ষণ করতে নব নব উদ্ভাবিত হয়—আর দরকার হয় জহুরীর চোখ রতন চিনে নিতে। কি এক অদম্য আকর্ষণ প্রতি ঘরের দুয়ার খোলায়, দূরত্বের ব্যবধান ঘোচায়, পরকে করে ভাই। এ তো চুষকের দিকে পেরেকের আকর্ষণ নয়, এ প্রভাতের সোনার আলোর প্রতি নবীন কিশলয়ের আকর্ষণ! যুগ যুগ ধরে যায়—কয় নেই, লয় নেই, তৃপ্তি নেই।

\* \* \* \*

শ্রামল ছায়ায় ঢাকা কত গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ছবির মতন। অস্তুমিত সূর্য্যের আলোকে গৈরিক হয়ে গেছে সমস্ত আকাশ, বনানী, পুকুরের জল। পড়ন্ত বেলা—আস্তে আস্তে কর্ণচঞ্চল হয়ে উঠছে গ্রাম—দু'—একজন লোকও এবার দেখা যায় পথে। তাদের মধ্যে রজনও একজন—চলেছে সে—চোখে উৎসব সন্ধানী দৃষ্টি। বাড়ীগুলো পেছনে পড়ে থাকে, ঘোষেদের পুকুরটার ধার দিয়ে আরও একটু এগিয়ে প্রত্যাশার আবেশে মুখটা উজ্জল হয়ে ওঠে—দাঁড়িয়ে পড়ে সে। একদল ছেলে ফুটবল খেলছে—বিদ্রোহ বেগে ছুটেছে—উত্তেজিত ভাব—পৃথিবীর আর সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে তাদের কাছে। কয়েক জন ছেলে অচেনা—দূর গাঁয়ের নিশ্চয়—মাচ খেলতে এসেছে। এই সন্যোগ নিতেই তো স্থল আর খেলার মাঠে হানা দেওয়া। এত চাঞ্চল্যের মধ্যে কিন্তু তাদের স্থিরভাবে লক্ষ্য করা শক্ত। তবু ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে রজন, বিরাট দায়িত্বের বোঝা তার কাঁধে—আজ নিজের রুচিতে আর দায়িত্বে কোন কিশোরকে দলে টেনে আনতে হবে—উজ্জল সম্ভাবনার ইন্ধন যার মনে। যদি না পারে? যদি ব্যর্থ হয়? শ্রীমন্তদা' কি বলবেন?

খেলা জমে উঠেছে। দর্শক বেশী নেই। যারা আছে তারা সবাই মাঠের ওদিকে—গাছের ছায়ায়। একা রজন এদিকে। একটি ছেলে—বয়সটা অজ্ঞদের তুলনায় কম—পাতলা পাতলা চেহারা ক্ষিপ্তগতিতে বল নিয়ে দৌড়োচ্ছে বিপক্ষের গোলের দিকে—অদ্ভুত কৌশলে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে



প্রয়াসী

—আরও কাছে—গোলপোর্ট এবার তার নাগালের মধ্যে এসে গেল—উত্তেজনায় দর্শকরা চাৎকার করে উঠছে—এক মুহূর্ত—হঠাৎ কি হল—পরক্ষণেই ছেলেটি ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ল রঙ্গনের একটু দূরে—খেলার মাঠের সীমানার বাইরে। রেফারী সিটি দিল—খেলা থামল—চাৎকার উঠল, 'ফাউল ফাউল'। ততক্ষণে রজন ছেলেটার কাছে পৌঁছে গেছে। একবার তাকে দেখে নিয়ে হাত নেড়ে জানালো আর কাউকে আসতে হবে না—খেলা চলুক—ঠিক আছে। রঙ্গনকে দেখে নিশ্চিন্ত হল তারা—রেফারীর হুইশিল শোনা গেল—পেনাল্টি কিং!—নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা—লেগেছে পায়ে—কিন্তু অনেকক্ষণ খেলার আর উত্তেজনায় ক্লাস্তিটাই বেশী প্রবল—লাল হয়ে উঠেছে কচি মুখখানা। পায়ের হাড়ে লেগেছে—মাশিশ করে দিতে দিতে তাকিয়ে দেখলো রজন—একেবারে বাচ্ছা—রাঁটা উজ্জল শ্যাম, একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া অবিস্তৃত চুল—একটু পরে লজ্জিত ভাবে উঠে বসল ছেলেটি—হাতের কনুইটা পড়ে গিয়ে কেটে গেছে—রক্ত-ধুলোয় মাখামাখি—খোয়া দরকার। কুড়ি বছরের রজন ব্যায়াম-করা হাতে অনায়াসে তুলে নিল তাকে কোলে। প্রতিবাদ জানালো ছেলেটি—না না, নামিয়ে দিন, ঠেটেই যাব।

রজন তখন চলতে শুরু করেছে—সন্নেহে হেসে বলল—লজ্জা কি ভাই, দাদা কই বে আমি।

কেন এত স্নেহ? এ কি শুধুই ছোট ছেলের আঘাতের বেদনায়



সহানুভূতি? না কি বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখের মাঝে মিলেছে কোন্  
সন্তানবানাময় ইঙ্গিত?...

যৌবনের পূর্ণবয়সে এসে রঞ্জন তার রক্ত আর ধুলো বুটয়ে দিল।  
তার পর পাশে এসে বসল। গাছপালায় ঢাকা নিজস্ব জায়গাটি—  
এখনই অন্ধকার হয়ে আসছে।

—যন্ত্রণা কমলো? নিস্তরঙ্গতা ভঙ্গ করে রঞ্জন।

—জঁ, বেশী লাগে নি আমার—জবাব দেয় ছেলেটি।

—তুমি খুব সুন্দর পেলো তো! চমৎকার বল কাটাও।

সম্প্রশংস দৃষ্টির সামনে শিশুসুলভ গর্বের সঙ্গে লজ্জা মিশিয়ে মাথা  
নিচু করে ছেলেটি। তার পর আক্ষেপের স্বরে বলে—আর একটু  
হলেই গোল হয়ে যেত। ইন, বাজেনটা এমন চাফা কবলে!

ফুল-ওঠা পাটার দিকে তুঁজনেই তাকায়।

—তুমি আবার বাগে পোনে শোধ নেবে তো?—সকৌতুকে  
প্রশ্ন করে রঞ্জন।

—নাঃ, তা কেন? ও জ্ঞান্য করলেই কি আমাকেও তাই  
করতে হবে? পেলায় প্রতিহাসি কিসেব? হেসে বলে—তা ছাড়া  
ওর সঙ্গে পারবও না আমি।

ওর কথার ধরণে খুশী হয় রঞ্জন। একটু পরে প্রশ্ন করে—  
তোমার নাম কি?

—অশেষ—অশেষ মুখোপাধায়।

—কোন্ গ্রামে বাড়া তোমার ভাই?

—এই গ্রামেই তো, একটু দূরেই বাড়ীটা।

—তাই নাকি? আশ্চর্য্য হয় রঞ্জন, কই তোমায় তো  
কোন দিন দেখিনি? আমার তো এই পাশের গাঁয়েই বাড়ী।

—এখানে আমি নতুন এসছি যে,—বিশাল চোখের উজ্জ্বল  
দৃষ্টি মেলে তাকাল অশেষ—এটা আমার মামার বাড়ী! সুখময়  
বন্দোপাধায় আমার মামা।

—ও, তাই বল! সুখময় কাকার ভাগ্নে তুমি? বেড়াতে  
এসেছা? তোমাদের বাড়ী কোথায়?

স্নান হাঙ্গল অশেষ।

—থাকতাম কলকাতায়, এখন এখানেই থাকি, মাসখানেক হল  
আছি—আমার মা-বাবা মারা গেলেন কি না। এক নিশাসে কথাগুলো  
বলে যায় সে।

একটু অস্বস্তিতে পড়ে চুপ করে থাকে রঞ্জন।

অশেষই প্রশ্ন করে—আপনায় কি বলে ডাকব?

—আমায় রঞ্জনদা বলে ডেকো। তুমি বাদের সঙ্গে খেলছিলে  
তারা সবাই আমায় চেনে। কোন ক্লাশে পড় তুমি?

—ক্লাশ নাইন।

ছেলেটাকে ভাল লেগেছে রঞ্জনর। সাধারণ কথাবার্তার কঁাকে  
কঁাকে আসল কাজে অগতির হবার পথটা ঠিক করে নিয়েছে সে।  
এবার স্তব্ধ করে দিল।

—জানো অশেষ, আমাদের একটা অভিনয়-সম্মত আছে। তুমি  
আসবে তাতে? তাহলে এবার অভিনয়ের পাঠটা তোমায় দিই।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় অশেষ।

—খুব রাজি, কিন্তু আমি অভিনয় করতে পারব কি না, না  
জেনেই যে পাঠ দেবেন বলছেন?

জেরা করার ধরণ দেখে হাসে রঞ্জন—বলে—আমরা দেখলেই  
বুঝতে পারি কে পারবে, না পারবে। আমাদের এক দাদা আছেন,  
তিনিই শেখান, তাঁকে চিনিয়ে দেব তোমায়।

মনে মনে বলে—অভিনয় হয়ে সম্ভবপর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নাই  
পারলে, ইংরেজ-পরখীর সঙ্গে পারবে তো? তাহলেই হবে।

একটু পরে আবার বলে, আমাদের একটা লাইব্রেরীও আছে, বই  
পড়তে ভালোবাস তুমি?

—খুব, উৎসাহে চক-চক করে ওঠে অশেষের চোখ দুটো, খুব  
ভালোবাসি।

চুপ-চাপ যায়। রঞ্জন প্রশ্ন করে—তুমি তাহলে আমাদের কাছে  
আসছ? কবে আসবে বল?

—কালই যাব। রবিবার তো।

অবাক হয় রঞ্জন—অবশ্য এই আশাতেই তার এই শনিবারের  
ছেলেধরার অভিযান, তবু অশেষের আহত পাঁটার দিকে না তাকিয়ে  
পারে না। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে হেসে ওঠে অশেষ।

—পায়ের কথা ভাবছেন বুঝি রঞ্জনদা? ওতে কি? আমি  
না ছেলে। মা বলতেন ছেলেদের অত সহজে কাতর হতে নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে—গ্রামের কোলাহল ক্রমেই আসছে  
কমে—রঞ্জন উঠে পড়ল।

—তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল তুমি সন্ধ্যার আগে যেও,  
কেমন?

গ্রাম আর বাড়ীর পথ বলে দিল রঞ্জন—ওদের বাড়ীটা ছাড়িয়েই  
শ্রীমস্তদা'র বাড়ী—সেখানেই যেতে বলল। অশেষও উঠে দাঁড়ায়—  
অন্ধকারে দেখতে পায় না রঞ্জন, যন্ত্রণায় তার বিশাল চোখ দুটো  
বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে দেয়ও না অশেষ—সোজা হয়েই দাঁড়ায়  
—বলে, তাই যাব।

রবিবার বিকেল। শ্রীমস্তদা'র ঘরে বসে কথা বলছিল রঞ্জন।  
আর সবাইয়ের মত সে-ও শ্রীমস্তদা'কে গুরু মত শ্রদ্ধা করে। তাঁর  
হুনিবার আকর্ষণে বহু ছেলে বিপ্লবমগ্নে দীক্ষিত হয়েছে, রঞ্জনও তাদের  
একজন। তাঁর অজুলি হেলনে তারা প্রাণ দিতে পারে, শ্রীমস্তদা'র  
স্নেহও অপরিমিত। ক্রমেই রঞ্জন ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—  
অশেষ যে তারই মুর্ত্তিমান পরীক্ষা। কেমন হবে অশেষ? যদি সে  
তার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে? কাল অশেষকে যেন ঠিক বুঝতে  
পারেনি সে। বড় বেশী গম্ভীর, বরষের তুলনায়—কিছুতেই অতিরিক্ত  
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না।

হঠাৎ ডাক শোনা যায়—রঞ্জনদা'!

লাফিয়ে ওঠে রঞ্জন—ঐ তো অশেষ,—এসেছে, এস অশেষ, এই  
যে আমি। অবীর আগ্রহে এগিয়ে যায় রঞ্জন আর একটু পরেই ঘরে  
ঢোকে, পেছনে অশেষ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অশেষকে দেখেন শ্রীমস্তদা'—  
সাদা হাফ প্যাট আর সার্ট পরা—রোগা—মাথায় এক মাথা রুক্ষ  
চুল, মুখটা একটু বেশী লাল। কালকের মত ধূলি-ধূসরিত নয়—  
সব মিলিয়ে একটি রূপবান কিশোর। মুহূর্ত্তের জন্ত ধমকে যান  
শ্রীমস্তদা'; এ কি! পলাশ ফুল নয় তো? ততক্ষণে ওরা সামনে এসে  
দাঁড়িয়েছে।

রঞ্জন বলে—অশেষ, ইনিই আমাদের সবার দাদা—শ্রীমস্তদা',  
আজ থেকে তোমারও দাদা।

পর মুহূর্তে কচি নরম হাতে প্রণাম করে অশেষ—শ্রীমন্তদা' তেমনি করেই তাকিয়ে থাকেন অশেষের দিকে, বলেন—এস।

এ অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টি রঞ্জনের সুপরিচিত—তার বুকটা টিপ-টিপ করে। সামনে বসে পড়ে অশেষ—তার কিন্তু লেশমাত্র ভীত ভাব দেখা যায় না—নিভীক উজ্জল চোখে স্পষ্ট করে তাকায় শ্রীমন্তদা'র দিকে—তার চোখে চোখ রেখে। আর সেই কালো চোখের গভীর দৃষ্টির আশ্রমে শ্রীমন্তদা'র সব সন্দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। না পলাশ ফুল এ নয়। এ সে কেয়া। যেমন আছে সৌন্দর্য তেমনি আছে কাঁটার বেড়া! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সহজ হয়ে আলাপ শুরু করেন তিনি।

—তোমার কথা শুনলাম রঞ্জনর কাছে। তুমি অভিমত্না হবে তো? পা কেমন আছে?

—পা মন্দ নয়, অভিমত্না নিশ্চয় হব যদি আমার বোগ্য বিবেচনা করেন।

—বেশ বেশ, তোমাকে বইও দেখাবে রঞ্জন। ওঃ, তোমার পা'টা যে ভীষণ ফুলেছে? কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে এসেছিল অশেষ, ফেটে যাতে না দেখতে পায়। কিন্তু ফোলাটা আরও বেড়ে গেছে জোর করে পথচলার পরিশ্রমে। ধরা পড়ে লজ্জিত ভাবে হেসে বলে।

—ঠাঁ, একটু ফুলেছে—ঠিক হয়ে যাবে।

মুখটা আরও লাল দেখাচ্ছে, লজ্জার না বেদনার কে জানে? আসন্ন কথায় এসে পড়েন শ্রীমন্তদা'। বোঝেন ও খাটি সোনা—একে এখনি কাজে লাগানো যাবে—আশ্রমে পোড়াবার দরকার নেই।

—অশেষ, জান তো ইংরেজ আমাদের কি দুর্গতি করছে, আমাদের সোনার ভায়ত আলিয়ে দিল, আর ভাবে ভাবে ধন যাচ্ছে বিদেশে। যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে—তাদের ওরা জেলে দিচ্ছে, দীপান্তরে পাঠাচ্ছে, কাঁসীকাঠে ঝোলাচ্ছে। তাদের অপরাধ—তারা নিজের দেশে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু বিপ্লবকে সরিয়ে বিপ্লবের আশ্রম নেবানো যায় না ভাই! তাই দেখ, এত বিপদ এত উৎপীড়ন, সব তুলছে করে দলে দলে এই বিপ্লবের আশ্রমে আত্মহুতি দিতে এগিয়ে আসছে কত যুবক, কত কিশোর, কত বালক। শোনার মত কান যদি তোমার থাকে অশেষ, তবে তুমিও শুনতে পাবে—দেশমাতা আমাদের কাতর হয়ে ডাকছেন তাঁর শৃঙ্খল মোচন করতে। তুমি মাড়া দেবে অশেষ? দুঃখিনী মানুষের ডাকে? তোমার মা হারিয়ে গেছেন ঐ আকাশে, তাঁকে তুমি খুঁজে নাও দেশের নাটিতে। পারবে না ভাই?

হারানো মানুষের কথায় যে বেদনার ঝড় ছোট বুকটার উবেল হয়ে ওঠে—বাইরে তা প্রকাশ পায় না। চোখের দৃষ্টিটা শুধু উজ্জল হয়ে ওঠে।

—নিশ্চয় পারব শ্রীমন্তদা'। আমার চিরদিনের স্বপ্ন আমি বিপ্লবী হব। শপথ করছি আজ থেকে ভারতের শৃঙ্খল মোচনই হবে আমার ব্রত।

গভীর তৃপ্তি আর স্নেহে অশেষের মাথায় হাত দিতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকে যায়—আর চমকে ওঠেন শ্রীমন্তদা'—একি গা যে পুড়ে যাচ্ছে, এত স্বর নিয়ে এলে কেন ভাই আজকে?

হাসল অশেষ—হৃস্তির হাসি—আমি যে রঞ্জনদা'কে কথা

দিয়েছিলাম, দাদা আজ আসব। সারা দিনই শুয়েছিলাম—বিকলেও স্বর কমল না যে, তাই নাসীমাকে লুকিয়ে—আর বলতে পারি না। সহসা সব সংসারের বাধ ভেঙে যায়—জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। শ্রীমন্তদা' তাকে ধরে শুইয়ে দেন—অশ্রুট কণ্ঠে বলেন—সাবাস!

চলে পরিচর্যার পালা। ফুলের মত কচি মুখখানা ব্যাথায় স্নান হয়ে গেছে। শ্রীমন্তদা' বলেন—স্বরটা খুবই ছিল। তার ওপর এই জ্বরম পায়ে এতখানি পথ চলে এসেছে, ক্লান্তিতে স্বরটা বেড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য? যতক্ষণ কথা বলেছি বুঝতে দেখনি ওর কোন দৈহিক কষ্ট হচ্ছে! অরের জন্মেই মুখটা অত লাল লাগছিল। অদ্বুত রঞ্জন! হৃ'জনের চোকে কাকি দিল এই এক কৌটা ছেলের পৈধ্য! জ্বরীর চোখ বটে তোর—রতন বার করেছিস।

অশেষের মাথায় হাওয়া করতে করতে অবাক চোখে তাকায় রঞ্জন—শ্রীমন্তদা'কে এত কথা বলতে সে কোন দিন শোনে নি। খুব চাপা লোক। বিশ্বযাধিক্যে নিজের সাক্ষ্যটাও সে অজ্ঞতব করতে পারে না যেন।

কাটল কিছুদিন। ক্রমেই অশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে অভিমত্না বধের মহড়াও চলে। অশেষ খুব স্বন্দর ভাবে লোকের গলার স্বর নকল করতে পারে—মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে। ছেলেবেলা এই গুণের সাহায্যে সে মামাতো বোন শান্তি ও বেণুকে বশ করে ফেলেছিল। এখানেও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এর পরের খিয়েটারটাতে ওকে স্ত্রী-ভূমিকায় নামানোর পরিকল্পনাও হতে লাগলো এখন থেকেই। কিন্তু অশেষের সব চেয়ে বড় গুণ, যে কাজে সে হাত দেয় সূত্ৰভাবে করে। তাই মামীমা যখন বলেন—ওরে, আমি হুঁটা ডুব দিয়ে আসি, ততক্ষণ আচারগুলো একটু দেখিস বাবা, রন্ধরে দিয়েছি।

তখনও যেমন অশেষ বইটি হাতে করে দাঁড়ায় এসে বসে—মামীমা না আসা পর্যন্ত সূত্ৰ ভাবে আচার পাহারা দেয়, তেমনি সূত্ৰ ভাবে শোখে সে বিপ্লবের কাজ—জাঁকায় হাত তার ভাল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুরেশদা' বাদলদা'র সঙ্গে গুপ্তকক্ষে ইস্তাহার আর পোষ্টার আঁকে—সহকর্মীরা শ্রান্ত হলেও ওর ক্লান্তি আসে না। আবার ঠিক তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে সে অভিমত্নার পাঠ করে—বীররস ফোটার—যুদ্ধ করে সমুদ্রতীরে সঙ্গে। তাই প্রথম রাতের অভিনয়ে অভিমত্নার জন্মে ধন্য ধন্য পড়ে গেল আর কলকাতার ছেলে অশেষ





মুগ্ধ-বিশ্বাসে দেখল বাংলা গ্রামের নতুন রূপ। বর্ষায়সীদের চোখের জল আর শুকায় না, কমবয়সীরা বার বার খোঁজ করে—

—কে রে ছেলেটি? নতুন এসেছে গাঁয়ে? কোন্ গ্রামে বাড়ী?

আর বিড়েরা বলেন—বলিহারি, শ্রীমন্ত পাঠ শিখিয়েছ বটে!

অভিনয় শেষে সাজঘরে ভৌড় জমে যায়—এগিয়ে আসেন কাকীমা, পিসিমারা—অবাক চোখে অশেষ দেখে শ্রীমন্তদার প্রতি এদের অসংখ্য ব্রহ্ম-অভিযোগ। অশেষকে কাছে টেনে এনে কেউ বলেন—হ্যাঁরে শ্রীমন্ত, কি বলে এই ছুঁধের ছেলেকে অভিমত্যা সাজালি রে হতভাগা! কেউ বলেন—স্বদেশী করলে কি এমনি পাষণ হতে হয়?

শ্রীমন্তনা হাসেন—আর মনে মনে ভাবেন, দয়া মায়া থাকলে কি করে চলবে? অভিমত্যা পাঠ ছাড়া শুধু অভিনয়, সত্যি যদি ওকে মরতে দিতে হয়, তাহলে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। মহড়া দেবার সময় তাঁর দৃষ্টিতে কি দেখতেন তিনি অশেষের মধ্যে? যখন ওর পাঠ না থাকতো তখনও তিনি লক্ষ্য করতেন ওর নিবিষ্ট মনে অভিনয়রতদের দেখার ভঙ্গী, একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়ায় অশেষ—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটা পা মুড়ে দেওয়ালে রেখে হাত ছুঁটা পেছনে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তেজী ঘোড়ার মত ঘাড়টা একটু বাঁকানো। ভাবতেন ঐ তেজী ঘোড়াটা সামান্য ইঙ্গিতে উদ্ধার বেগে ছুটতে পারবে কি না উধার মকর পথে। কচি মুখের দিকে তাকাবার সময় কোথা বিপ্লবী? দেশের প্রয়োজনে অশেষের মত হাজারটা ছেলেকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবার আদেশ দিতেও কঠিন রূপান্তর হবেন না একটুও।

এ অশেষের এক নতুন অভিজ্ঞতা—এ কি অপরিণীত মাতৃস্নেহ, সীমাহীন মমতা। শুধু পাড়া-প্রতিবেশী নয়, আশ-পাশের গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ আসে—ভাল অভিনয়ের পুরস্কার আর কি, যত্ন করে খাওয়ানো। স্বপ্নাহারী অশেষ খেতে না পারলে কত অনুযোগ—রোগা বলে কত স্নেহ তিরস্কার। আর থাইয়ে শ্রীমন্তদা' পাশে বসে খেতে খেতে ক্ষাপান তাকে।

—তোমার কিছু হবে না, যা দেখছি। ঐ তালপাতার সেপাই হয়েই থাকবি। শুনে রঞ্জনদার হাসে। বাড়ীতেও মামামার বকুনি, মামাতো বোনদের অনুযোগ—

—এ কি অনাচ্ছিষ্ট বাপু, লোকে নেমস্তন্ন করছে বলে ঘরের ছেলে বাড়ীতে কোন সময় দাঁতে কুটো কাটবে না! কি চেহারা হোচ্ছে দিন দিন!

মামা কোলকাতায় চাকরী করেন, তাই তাঁর বকুনিটা আর শুনতে হয় না। শুধু মামাতো বড় ভাই সুনীল তাকে কেমন একটা ঈর্ষার চোখে দেখেন—স্বযোগ পেলেই বকতে শুরু করেন—তাতে স্নেহ নেই, আছে জ্বালা। আজকাল অশেষ আর গ্রাহ্য করে না, শুধু বড়দাকে এড়িয়ে চলে।

তার পর একদিন সব আনন্দের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে শ্রীমন্তদাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল রাজবন্দী হিসাবে। সেই বিদায়ের দিনে দশ-বায়েটা গ্রামের লোক ভেসে পড়ল—সবার চোখে জল। শুধু তরুণ বিপ্লবী দলটির চোখে জলে উঠল আগুন—জিজ্ঞাসার আগুন। তার পর চাক্ষুষ একদিন জড়োলো—কয়েক

বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটল—কত বৈপ্লবিক ডাকাতি হয়ে গেল, কত ইংরেজ অত্যাচারী প্রাণ দিল, তাদের শোখা কত দেশী অফিসারের রক্ত ঝরল। তেমনি আবার গ্রেপ্তার হল কত বিপ্লবী, সাজানো হল কত ষড়যন্ত্র নামলা, জেলের ভেতর কত লাঠিচার্জ, কত গুলী ছোঁড়ার কাহিনী বাতাসে ভেসে এলো, আর বিপ্লবীদের মনের পাতায় রক্ত দিয়ে লেখা হয়ে গেল সেই অত্যাচারীদের নাম—তারা তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে একে একে বিদায় দিতে লাগল। বিশ্বয়ে ইংরেজের উদ্দেশ্যহীন নীল চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—এ কি জাত! কাঁসার দড়ি গলায় পরেও যুবকের মুখের হাসি স্নান হয় না, সহস্র চক্ষুর সম্মুখে কোন অত্যাচারী শাসনকে সামনে থেকে গুলী করে পর মুহূর্তে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে চলে পড়ে কিশোর বালক—বিষের জ্বালায় বিকৃত হয় না মুখ, কচি মুখে লেগে থাকে তৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসি! তাদের সে হাসি যেন শক্তিশালী শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি ব্যঙ্গের ছুরিকাঘাত।

তারই মাঝে অশেষ নিজের নিষ্ঠায় পেয়েছে গুরুদায়িত্ব—শ্রীমন্তদা' নেই—সেই রঞ্জনর ডান হাত। ছ'জনের মধ্যে সৌহার্দ্যও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। হ্যাঁহ্যাঁ পুলিশ এসে গ্রাম তোলপাড় করে অনেক বাড়ী মার্চ করে—কিছুই পায় না। কোথায় লুকোনো থাকতে পারে বাজেয়াপ্ত বিপ্লবাস্ত্রক বই আর রিভলবার, বোমা আর ইস্তাহার—পুলিশী মগজে তা ঢোকে না। এরই মধ্যে অশেষ স্থূল ছেড়েছে। প্রথম দশ জনের একজন হয়ে সম্মানে ম্যাট্রিক পাশ করে চুকেছে কলেজে।

দীর্ঘ দিন পর যখন শ্রীমন্তদা' স্বপ্নে অন্তরীণ হয়ে বাড়ী ফিরলেন, তখন তাঁর প্রথম দিন দেখা তের বছরের অশেষের রোগা চেহারাটা নিত্য ব্যায়াম আর কুচকাওয়াজ-করা 'খাল বছরের অশেষের পেশীর ভাঁজে ভাঁজে মিলিয়ে গেছে। পুরোদমে কাজ শুরু হোল পুলিশকে কাঁকি দিয়ে। আর অল্পদিন পরেই রঞ্জনরা অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেল! অশেষ কিন্তু শ্রীমন্তদা'র সঙ্গে থাকে ছায়ার মতন—ছ'তিন মাস পরে আই, এস, সি পরীক্ষা—বই ছোঁবার সময় নেই। দিনে নতুন ছেলে দলে আনতে শ্রীমন্তদা'কে সাহায্য করে—অভিনয়, খেলা আর বইএর লোভ দেখায়, তাকে যেমন করে একদিন রঞ্জন দেখিয়েছিল। পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে—শ্রীমন্তদা'কে রাতে বাড়ী থাকতে হবে—কিন্তু সারা রাত চলে গুপ্ত অভিনয়—অশেষ থাকে পাশে—দেহরক্ষীর মত। সারা রাত নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে শ্রীমন্তদা' গ্রামে গ্রামে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বেড়ান—চলে আলোচনা, পরামর্শ উপদেশ—অন্ধকারেই কত ছেলে-মেয়েকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেন।

একদিন ছুটিতে মামা এসেছেন বাড়ী—জানিয়ে দিল অশেষ—সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। শুনে মামা' অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তার দিকে—তঁাকে হাতে ধরা, টানতে ভুলে গেছেন—শেষে বোঝালেন—সে কি কথা রে! চোদ্দ বছরে ষ্ট্যাণ্ড করে ম্যাট্রিক পাশ করলি, কত উজ্জল ভবিষ্যৎ তোমার! পরীক্ষা দিবি না কি? কি এমন কাজ তোমার?

তারপর বেগে গেলেন—কুলদ্বার ছেলে। বাপ-মার মুখে চূণকালি দিবি? হি, হি, জয়ার ছেলে হয়ে—তার কত ইচ্ছে ছিল তুই ডাক্তার হবি!



ভিটামিন যুগ

কোলে

**KO**

বিস্কুট

যাঁরা ওলোর বিচার করেন

তাঁরা সকলেই প্রচন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

খিনএরারকট

মেরী

পেটিটব্যুরো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেল্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্টী

মার্ভেলক্রীম

কাফেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

বড়দা' কত ব্যঙ্গ করলেন,—এখন সামলাও আদরের গোপালকে ।  
কুসঙ্গে মিশে এই সব বৃদ্ধি হচ্ছে ! তারি কাজের লোক !

অশেষ অচল অটল । তেমনি বুনো ঘোড়ার মত বিশিষ্ট ভঙ্গীতে  
দাঁড়িয়ে রইল ।

রাত্রে শুয়ে ঘুম আসে না—জানলা দিয়ে এক টুকরো আকাশ  
চোখে পড়ে—একটা উজ্জ্বল তারা জ্বল-জ্বল করছে—অশেষের চোখ  
ছ'টো জ্বালা করে, জলে ভরে যায়—সত্যিই কি সে অব্যোম্য সম্ভান ?  
কানে বাজে মায়ের কথাগুলো—রোজ কাগজ পড়ে শোনাতে  
শোনাতে ; বিপ্লবীদের গল্প বলতে বলতে বলতেন—মানুষের মত  
মানুষ হয়ে বাঁচিসু খোকা, পশুর মত বেঁচে কি লাভ ? খোকা তুই  
বড় হয়ে বিপ্লবী হোস, দেশের লোক তোর নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত  
করবে । পারবি খোকা মৃত্যুভয় জয় করতে ?

আজ কোথায় তার মা ? ঐ কি ? তারা হয়ে ফুটে আছেন ?  
ব্যথায় কি শ্লান তাঁব চোখ ? কৈ তা তো নয় ! ঐ তো উজ্জ্বল  
চোখে হাসির আভাস—হৃদয়ের হাসি । ঐ তো আলোর পথ চেয়ে  
তাঁর আশীষ নেমে এলো ! তার কোন সশয় নেই, সঠিক পথই সে  
বেছে নিয়েছে—হৃদয়ের নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো অশেষ, আর ঠিক  
তখন জানলার ধনিত হ'ল শ্রীমন্তদা'র সঙ্গে ত টুক-টুক । নিঃশব্দ  
পারে অশেষ বেরিয়ে এলো ।

হন হন করে বাড়ী ফিরছিল অশেষ, তখনও রাত আছে । নদীর  
ধারে একটা নতুন বজরা দেখে থমকে দাঁড়ালো গাছের আড়ালে ।  
কার বজরা ? কোথা থেকে এলো ? পুলিশের নয় তো ? তল্লাসী  
করতে—এসেছে ? স্কুমার ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে যে অনেক জিনিষ  
রয়েছে অশেষদের বাড়ীতেও—বলা তো যায় না । ছুটলো অশেষ ।  
স্কুমারকে জাগিয়ে তুলে জানালো সব ।

—চটপট সব সরিয়ে ফেল স্কু, খুব সম্ভব সার্চ করতে এসেছে ।  
আমিও যাই, আমাদের ঘরেও ।

স্কুমার বলে—দূর, তোদের বাড়ী সার্চ করবে না—কোন বার  
তো করে না ।

—না রে, এবার মনে হয় টের পেরেছে, কতদিন আর চাপা  
থাকবে । সেদিন থানার হাজরী দেবার দিন ছিল শ্রীমন্তদা'র, ফেরার  
পথে যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন দাঁতু খুড়ো দেখেছিল ।  
তখনই শ্রীমন্তদা' বলেছিলেন এবার তুই গেলি অশেষ : ও বুড়ো  
এখনি ঠক্কর করে থানায় যাবে । ব্যাটা একটা স্পাই ১০০-বাক্  
তুই প্রস্তুত হ', দেখিস ভুল করে বিহ্বল মত বিপদে ফেলিস নি ।  
ওর জন্মেই তো বঙ্গদা'রা সব ধরা পড়ল ।

বলেই ছুটলো সে । সব ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ল ১০০-আর  
সত্যি সবার সন্ত্রস্তির জড়তা না কাটতেই মদল বলে দারোগা বাবু এসে  
হাজির হলেন ।

—সুনীল বাবু, বাড়ীটা একটু দেখব ।

শুন শুধু মামীমা বা শান্তি আর বেণু নয়, বড়দা' পর্যন্ত ততবাক্ ।  
এ বাড়ীতে স্বদেশী কবে চুকলো ! যাই হোক, কিছুই পাওয়া গেল  
না । শুধু বাজে কাগজের জুপ পড়তে পড়তে তেমন দারোগার মাথা  
উঠল ধরে—অশেষের মুখে ছুটু হাসির বিলিক—গা জলে গেল তাঁর ।  
তাঁরা বেরিয়ে যেতেই বড়দা' রাগে কেটে পড়লেন, মামীমা অনেক  
চোখের জল ফেললেন অশেষকে এই সর্নাশা পথ ছাড়বার অনুরোধ  
জানিয়ে । অশেষ নির্বিকার !—তারপর প্রায় প্রতি মাসেই দারোগা  
বাবুর আগমন হতে লাগল—ব্যাপারটা ক্রমেই গা মওয়া হয়ে দাঁড়াল  
—সবাই মেনে নিল ।

[ আগামীবারে সমাপ্য ।

## আকর্ষণ

### অনুজ্ঞা দেবী

আমাকে সচকিত করে  
বিনীত রজনী আমার সাথে মুখোমুখী হল,  
বলল : শুকতারা আর কোনদিন  
বিদায় নেবেনা,  
সূর্য-প্রহরের প্রথম লগ্ন আর কোনদিন  
প্রথম প্রশ্ন দেবেনা ।

আমার সচকিতভাবে কেটে গেল  
মুহু হেসে বলি : তবে তো তোমার অনেক কাহ্ন ।  
শুন নতারাণি হাসলো । ক্রান্ত তরুণ আয়েস  
ভাংগা আবিলতা এনে  
কালো শাড়ির লম্বা আঁচল বৃকের ওপর  
টেনে দিল । বলল :

তবে গৃহ কথাটি বলি শোন,  
এ পৃথিবীর পুনরুত্থান বিপ্লবের আত্মদে  
আর কোনদিন বাতে না জাগে,  
তারি মহাবত নিয়েছি আমি,  
ধ্বংসের মহরা চলেছে  
সৌরজগতে ।

তুমি যা বলেন

ঠিক যাহা চেয়েছি  
তাই আমি পেয়েছি

আজ্ঞামূলবিত মম ঘন কেশরাশি,  
কামদেব রাণী দেখে হাসে ঈর্ষাহাসি।  
এমনি কেশের রাশি তুমিও পাইবে,  
কে, এম, পির নারিকেল তৈল  
যদি ব্যবহার করিবে।  
জীবনের শুরু হ'তে জীবনের শেষ,  
শুভ্র কভু হ'বেনাকো তব কৃষ্ণ কেশ।

**কে.এম.পি**  
মার্ক।  
**নারিকেল তৈল**



কোন  
৩৪-৩৪১৪

গ্যারান্টি ১০০% খাঁটি

ই পাঃ ১ পাঃ ২ পাঃ ৩ ৫ পাঃ  
'সিল' করা টিনে এখন সর্বত্র  
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক  
পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্  
১নং, মেছুয়া বাজার স্ট্রিট,  
কলিকাতা-৭



# খেলাঘর

## ফুটবল

মহামেদান স্পোর্টিং ক্লাব দীর্ঘ আট বছর পরে লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করায় ক্রীড়ামোদী মাঝেই খুসী হয়েছেন। এবারের লীগে মহামেদান দল অগ্নাগ্ন দলগুলি অপেক্ষা অনেক উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করে লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করেছে। এইবারের লীগ বিজয় মহামেদান স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করল। ইতিপূর্বে একমাত্র ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আট বার লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করেছিল। মহামেদান দল এবার নিয়ে ন'বার লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করল।

এবারের ক'লকাতা মাঠে লীগ খেলাগুলি শেষ হওয়ার পর দেখা গেছে, ক'লকাতার ফুটবল খেলার মান অনেক নিম্নমুখী। খেলোয়াড়দের মধ্যে সে নৈপুণ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

খেলোয়াড়দের এই ব্যর্থতার মূলগত কারণগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধার অভাব। ক'লকাতার বড় বড় ক্লাবগুলি লীগ ও শীল্ড বিজয়ের জন্য বাইরে থেকে প্রতিবছরই খেলোয়াড় আমদানী করেন। শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে ঠিক মত বোঝাপড়া না থাকায় গতোকেই নিজ নিজ দক্ষতা দেখাতে চান। সেইজন্য খেলার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী।

খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। তবুও এই প্রসঙ্গে দু'চারটে কথা বিবেচনা করে দেখার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করি।

খেলোয়াড়রা যখন একেজো হয়ে পড়েন সেই সময় তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করা একরকম দুঃসহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্য যৌবনের অমূল্য সময়, শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষ করে দিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় তাঁর দিকে দৃষ্টিদানের প্রয়োজন আছে বলে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা মনে করেন না। শুধু সেই প্রতিষ্ঠান কেন—আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষের যে যথেষ্ট কর্তব্য আছে, সে কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

প্রতি বছরই 'চারিটি' খেলার ব্যবস্থা হয়। এতে আই, এফ, এ-র বাৎসরিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সমস্ত টাকা ঠিক 'মত' ব্যয় করা হয় না, তার প্রমাণ ১৯৫৬ সালের আই, এফ, এ-র বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

এক কথায় আই, এফ, এ-র হাফ মোট টাকা আসিয়াছে ৪,১৬৮১৬ / ৬ পাউ আর্থ বায় হইয়াছে ২,০০১১২ / ৬ পাউ।

টেলিফোনের জন্য বায় হইয়াছে ২,৪৪২।০ আনা। 'মিনারেল ওয়াটারের' জন্য বায় দেখান হইয়াছে ৩,০৭৭৮/০ আনা। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—যতদূর সম্ভব জানি, চারিটি খেলার পর

খেলোয়াড়রা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া জল পান করেন। কিন্তু আই, এফ, এ-র হিসাবে প্রতিটি চারিটি খেলার আনুমানিক দুই শত টাকার মত 'মিনারেল ওয়াটারের' জন্য খরচ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, এত রঙিন জল পান করিল কে?

তাছাড়া বকশিশ বাবদ খরচ হইয়াছে ১০৬১ টাকা। কিন্তু কাহাদের বকশিশ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই। জনসাধারণের টাকা খেলোয়াড়দের শ্রমে উপার্জিত। তাই এ যথেষ্টাচারের সম্বন্ধে সাধারণের বলার অধিকার আছে। এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি।

খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বলা যায়, আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই চারিটির টাকা হইতে কিছু টাকা স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য করিতে পারেন।

কলকাতা মাঠে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়ে গেছে। আই-এফ এ শীল্ডের ইতিহাসটুকু বলেই এবারের মত ফুটবল খেলার আলোচনা শেষ করব। আগামীবারে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলাগুলি বিস্তৃত আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এবারে বহিরাগত দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দল আছে। সেই সমস্ত দলগুলির মধ্যে কোন দল যদি শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করে তাহলে আশ্চর্য্যবিশিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা শুরু। ১৮৯২ খৃঃ শেষের দিকে ডালহৌসী ক্লাবের সম্পাদক এ, আর, ব্রডিন ও বি, আর, সি লীওসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন, শোভাবাজার ক্লাবের এন, সর্কাধিকারী একটি সভার স্থির করেন 'ট্রেডস কাপ' থেকে আরও বড় করে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন, যাতে স্থানীয় শক্তিশালী দলগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে; তাহলে ভারতীয় ফুটবল খেলার মান অনেক উন্নত হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে আধিক সাহায্য করলেন কুচবিহার ও পাতিয়ালায় মহারাজা, শ্রীর এ, এ, আপকার ও ডালহৌসী ক্লাবের জর্নৈক সদস্য।

আই, এফ, এ-র প্রতিযোগিতার প্রথমবারের খেলা দুটি ভাগে ভাগ করে খেলান হ'ল। একটি বিভাগের খেলা লঙ্কোতে এবং অপর বিভাগের খেলা ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সবসময়ে ১৩টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। লঙ্কো বিভাগে রয়্যাল আইরিশ রেজিমেন্ট এবং ক'লকাতা বিভাগে ফিফথ ওয়েস্টার্ন ডিভিজন আর, এ, জয়লাভ করে ক'লকাতা ডালহৌসী মাঠে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলার রয়্যাল আইরিশ দল জয়লাভ করে সর্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড জয়লাভ করে।



প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান দল ১৯১১ সালে শীর্ষ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে।

ইউরোপ সফর করে এসেছে এবং পোলো খেলায় উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে ভয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে হাওড়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব। সুতরাং আগামী বার থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবকে প্রথম ডিভিসনে খেলতে দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, পর পর তিন বছর হাওড়ার তিনটি টিম দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে প্রথম ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ১৯৫৫ সালে বালী প্রতিভা। ১৯৫৬ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ও ১৯৫৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব।

### প্যারালিম্পিক

কয়েক সপ্তাহ আগে ব্যাংকিংহামশায়ারের ষ্টোক ম্যাণ্ডেভিলে আন্তর্জাতিক প্যারালিম্পিকের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। ব্যারণ জু কুর্বাণিন আধুনিক অলিম্পিকের সৃষ্টি করে খেলাধুলার মাধ্যমে যে মৈত্রী ও সৌভ্রাতের বন্ধন এনে দিয়েছেন, তাঁরই মত অভিশপ্ত বিকলাঙ্গ মুক ও বধিরদের জন্তু ফ্রান্সের আর এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলেন মঁঃ রুবেন্স আলকেস। ষ্টোক ম্যাণ্ডেভিলের হাসপাতালের ক্রীড়াসনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের কয়েক শত প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিজয়ীর তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে আমেরিকা। তারপরই ষ্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতালের স্থান।

জু ভিলে এবার বিশ্ব পোলো প্রতিযোগিতায় এবার ভারত ৫-২ গোলে পরাজিত করেছে 'লেভারসিন' দলকে। 'লেভারসিন' দলে ফ্রান্স, স্পেন ও মেক্সিকোর খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা আছেন।

ভারতীয় পোলো দল যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দল, সে কথা কারো অজানা নেই। ইতিপূর্বে ভারতীয় দল বেসবকারী ভাবে কয়েকবার

### সাঁতার

ইংলিস চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলা সাঁতারু গ্রেটা এণ্ডারসন প্রথম স্থান লাভ করেছেন। মহিলা সাঁতারুর পক্ষে ইতিপূর্বে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব হলেও আজ পর্যন্ত কোন মহিলার পক্ষে প্রথম স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়নি। ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করতে গ্রেটা এণ্ডারসনের সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কেনথ রে ১৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে অতিক্রম করেছেন।

ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনের এবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। মিহির সেন সাড়ে ১৪ ঘণ্টা জলে থেকে সম্ভাব্য স্থানে পৌঁছাতে পারলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আর একজন সাঁতারু হিমাত্রি রায়। দেড় ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর প্রচণ্ড নীতের জন্তু জল থেকে উঠে পড়েন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ-কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ 'যুব-জয়ন্তী' উৎসবে খেলাধুলার আয়োজন করেন। একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে স্বর্গীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির নামাঙ্কিত শীল উপহার দিয়েছেন। খেলাটিতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে।

স্বাধীনতা লাভের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে দুই একজন কীতিমান ক্রীড়াবিদকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক এস, রায়কে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সম্বর্ধনা জানিয়ে একজন প্রকৃত গুণী ব্যক্তিরই সমাদর করেছেন।

## কান্না-ভরা আকাশ

সৈয়দ হোসেন হালিম

আবার জমাট অন্ধকার।  
আকাশ-মাটিতে জমানো বরফ।  
ফিস্ফাস্ আকাশে-বাতাসে,  
বর্ষণের আগে স্থির মৌন প্রস্তুতি—  
বেদনায়-ভেঙে-পড়া শোকাত জননীর  
কান্নার পূর্ব মুহূর্ত।  
অন্ধকার কালো জলে কিরণ ক্ষটিক  
অস্পষ্ট স্বচ্ছতা।

মেঘের ছাদের নীচে বোদ্ধ-শিশুর  
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটার নিখল প্রয়াস  
কাকের দাঁঘল চোখে অদ্ভুত দৃঢ়তা—  
মাগর লজ্জনে হুঃসাহসিক নাবিকের কাঠিন্য়।  
চেনারের ডালে-ডালে হ্রস্ব অস্থিরতা।  
আকাশ-মাটিতে নীরব প্রস্তুতি—  
বরফ গলার পূর্ব মুহূর্ত।  
পানকৌড়ির কালো রঙে হৃদয়ের চৌয়া—

ডুবকাটা পাখীর রঙে দয়িতের নীরব সজ্জাষণ।  
দেশলাই জলার পূর্ব মুহূর্তে  
বাকুদের বোবা কান্না।  
জিরো ডিগ্রিতে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের  
বরফ-গলানো হিট।  
আকাশ-মাটিতে সজল স্নিগ্ধতা—  
শোকাত জননীর কান্নার পর মুহূর্ত।

# রঙ্গপট



## হারানো সুর

যদিও কাহিনীর পটভূমিকার মধ্যে নতুন কিছু নেই। কেন না,

বহুকাল আগে প্রদর্শিত রোনাল্ড ফোলম্যান ও গ্লোরিয়া গারসন অভিনীত ব্যাণ্ডম্যান হাবার্ডস্ট এবং পদ্মক মল্লিক অভিনীত সাদাকালো (?) কেই বাপ দার মনে করিয়ে দেয় হারানো সুরের কাহিনীর মূলমন্ত্র, তবু ছবিটির চিত্রায়নের দিকে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন নির্মাতাবর্গ, সে প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার অধীনে হারানো সুরের চিত্রমালা স্বাধীন দর্শকের সমর্থনলাভ করবেই, এ বিষয়ে আমবা নিশ্চিন্ত। বিশেষজ্ঞদের কাছে জানা যায় যে, হঠাৎ বিশেষ রকমের দুর্ঘটনায় মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতা শিরা-উপশিরাগুলি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সাময়িকভাবে বর্ণবাস্তব হয়ে যায়। যার ফলে আঘাতগস্ত মানুষের মনে শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎই আসন পায় এবং অতীত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। ঠিক অতীতকালীন আবার যদি সে আঘাত প্রাপ্ত হয় তখন সেই শিরা-উপশিরাগুলি আবার স্বস্থানে ফিরে আসে; রোগী তখন আবার অতীতকে মনে করতে পারে কিন্তু এই মধ্যবর্তী অংশ মুছে যায় চিরকালের জগে তার মন থেকে। এটি পটভূমিকার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে হারানো সুরের কাহিনী। কাহিনীর প্রথমার্শ কাহিনীকারের কৃতিত্বের ভাষণ হয়ে উঠেছে। মানসিক চিকিৎসালয়ের কর্মপ্রণালী, গদ্যায়িত করে কাহিনীটিকে মনোরম করে তোলা হয়েছে। চিত্রের গতিও বাধাহীন ভাবে প্রবাহিত। ছবিটির আব একটি প্রবান ধ্রুপদে ছুটি একটি অধ্যায় ছাড়া প্রায় সারা ছবিটিই পরিষ্কার অর্থাৎ কোন অংশ ভ্রূষণো নয়। অর্থাৎ প্রথমোক্ত, প্রত্যেকটি সংলাপ প্যাসেজ অতি সহজসোধ্য, চিত্রনাট্যিকালের কৃতিত্বের ভরপুর। অবশ্য একেবারে দোষকটি নেই বললেও ভুল হবে। যে অলোককে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অলোককে প্রকাশভাবে স্টেশনে নিয়ে এসে বসে তার সাজসজ্জা পরিবর্তন না করিয়েই (পলাশপুরে এসে সে দিবা দাড়ি-গৌরু কামিয়ে সভা-ভবা হয়ে উঠল), পুলিশ সম্বন্ধে বলা কি বেশদোষী—তারপর দেখা গেল স্টেশনটি একটিমাত্র কাঠের পুতুল মার্কা পুলিশ ছাড়া একেবারে লোকশূন্য স্টেশন সম্বন্ধে এ রকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করা সম্ভ

লোকের লক্ষণ বলে মনে হয় না। মোটরের ধাক্কা খেয়ে অলোক উটে পড়ল অথচ যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন দেখলুম সে সম্পূর্ণ অক্ষত। ওরকম ভাবে ধাক্কা খেয়ে যে গড়িয়ে পড়ল তার দেহ কি লোহা দিয়ে তৈরী যে একটু ছুড়ে পর্যন্ত গেল না? মালা অলোকের ভাগ্নী, ওদেরই পরিবারভুক্ত। অথচ তার মা-বাবার কোন সন্ধান নেই, এমন কি তারা মৃত হলেও তাদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই—প্রথম দিকে হাসপাতালে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে উপস্থিত শুভেন মুখোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রটি যদি মালার বাবার চরিত্র বলে ধরে নেওয়াও যায় তা হলে হাসপাতালে অলোককে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি পাগলের বেশে কিন্তু কেন? দুর্ঘটনায় সে শ্রুতিশক্তিটুকুই হারিয়ে ফেলেছে তা ছাড়া আর তার সব ঠিকই আছে। এমন কি তার সংলাপের মধ্যেও পরিচালক উদ্ভাসমূলক কোন সংলাপ জুড়ে দেন নি—চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছে, অথচ তার রূপসজ্জা দেখে মনে হয় সে যেন একটি পাগল—একজন শ্রুতিভ্রষ্ট আর একজন উদ্ভাসে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান যেমন ভয়ানক মারাত্মক রকমের ভুল করেন তাঁরা যারা নজরুল ইসলামের শ্রুতিশক্তির শৃংখলা এবং তদনুবর্তী জড়তা দেখে তাঁকে ‘পাগল’ বলে অভিহিত করেন। এখানেও অলোকের জড়তার জন্তে তাকে পাগল মালিয়ে ঠিক সেই রকম ভুলই করা যায়।

অভিনয়ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সূচিত্রা সেন। বাঙলা দেশ আজ সূচিত্রা সেনকে সত্যি গর্ব করতে পারে, সূচিত্রার অভিনয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, একসময়েই নেই, শুধু তাই নয় এই প্রেমিকা তরুণীরই যে রূপ তিনি একটি ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন আর একটি ছবিতে এ প্রেমিকা তরুণীরই একটি ভিন্নতর রূপ ফুটিয়ে তোলেন এই জন্তেই তিনি আজ জন-গণ-মন-অধিকারিণী। উদাহরণস্বরূপ অগ্নি পরীক্ষা, শাপমোচন, সবার উপরে, সাগরিকা, শিল্পী, হারানো সুর প্রভৃতি ছবিগুলিতে তিনি এক চরিত্রেই অভিনয় করেছেন প্রেমিকা নায়িকার রূপ। কিন্তু সেই একটি রূপই তিনি উপরোক্ত প্রত্যেকটি ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমা। উত্তমকুমারও ভাল অভিনয় করেছেন, তবে সূচিত্রাকে তিনি এখানে অতিক্রম করতে পারেন নি। নবাগতা কাজরী গুহকে একটু সরস হতে হবে, হতে হবে আর একটু কোমল। পাহাড়ী সাম্রাজ্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী তাঁদের নামানুযায়ী অভিনয়ই করেছেন এবং দর্শক সাধারণকে আনন্দই দিয়েছেন। একটি কিশুতকিমাকার ধরণের অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, রোগীর সঙ্গে তাঁর ভ্রূষণহার কাহিনীর দ্বারাই সমর্থিত কিন্তু রোগীর মায়েস সঙ্গে তিনি যে ভাবে সংলাপ বলেছেন তাতে করে তাঁর সম্বন্ধে আগেকার মত ধারণা আর পোষণ করা যায় না, পানিকটা লাফালাফি, নাচানাচি আর দানবীয় অভিব্যক্তির নাম কি অভিনয়? চরম অবিচার করা হয়েছে খ্যাতিমান শিল্পী শুভেন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি, একবার মাত্র চন্দ্রাবতীর পিছনে তাঁকে দাঁড় করিয়ে শুধু একটিমাত্র বাক্য ‘চলুন’— তাঁর মুখে জুড়ে দিয়ে একটাদের মুখ হাসানো হয়েছে। পুস্তিকাক্রমে ভূমিকালিপির মধ্যে তাঁর নামটি অন্তর্ভুক্ত করা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় নি। ছোট ভূমিকায় চমৎকারভাবে সংযত অভিনয় করেছেন শিশির বটব্যাল, একটি দৃষ্টে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন ইরা চক্রবর্তী। সুন্দর অভিনয় করেছেন শ্রাবণী চৌধুরী,

‘রমাদি, আমায় ক্ষমা কর’—সলাপটি তিনি অপূর্বভাবে বলেছেন, এবং ভবিষ্যৎ উজ্জলতায় ভরপুর। এরা ছাড়া অভিনয়্য শ্রী আছেন পারিজাত বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, দীপজ দাস, শ্রীতি মজুমদার, খগেন পাঠিক, মারা রায়, লীনা দেবী প্রভৃতি। অজস্র কর পরিচালিত এই ছবিটির চিত্রনাট্যকার সুরকার ও প্রচার-সচিব যথাক্রমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রমেন চৌধুরী।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

মহামুনি কল্পপের পাঁচজন বংশধরের সময় যট্টে চন্দ্রনাথ ছবিটিতে। কাহিনীকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্রনাট্যকার—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক—কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং নায়ক উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন জহর গদ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাতিট্টা, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, হৃদয়ন মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, সচিত্রা সেন, রেণুকা রায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। \* \* পরসুত্রামের পরশপাথর গল্পটির পরিচালনা ও সুরযাজনার ভার গ্রহণ করেছেন বিশ্বের দরবারে বাঙালি গৌরববোধক পরিচালক ও সুরকার যথাক্রমে সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্কর। রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী রাণীবালা সহ তুলসী চক্রবর্তী, গদ্যপদ বসু, জহর রায়, মণি শ্রীমানী এবং বাঙালি এক অসাধারণ অভিনেতা কানী বন্দ্যোপাধ্যায় \* \* দেবকাকুমারের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে সোনার কাঠি।

অভিনয়ের জগৎ নির্বাচিত হয়েছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, আশীষকুমার, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ভারতী দেবী, তপতী ঘোষ, শ্রীতিধারা মুখোপাধ্যায়, গীতা সিং, শিখা বাগ, শ্রাবণী চৌধুরী, সীমা দত্ত প্রভৃতি। \* \* ছায়াসঙ্গিনীর পর বিজ্ঞাপতি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে অমৃতা ইন্ডির চিত্রকর-পরিচালকরূপে। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বের এই কাহিনীতে সুরারোপ করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণের দায়িত্বগ্রহণ করছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল ইত্যাদি...এর সলাপ রচনা করেছেন সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। \* \* কিশোর কবি ছবিটিতে পরেশ মজুমদারের পরিচালনায় আপনারা দেখতে পাবেন পাহাড়ী সাহাল, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, সাধন সুরকার জহর রায়, শোভা সেন, দেবধানী, অপর্ণা দেবী ও মনোগতা মঞ্জুলিকাংক। বাঙলা দেশের এক ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রতিভাবর কবির জীবনীই এর কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। \* \* বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ‘অভিপাপ’ ছবিটিতে অভিনয় করেছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মঞ্জু দে, শোভা সেন, শ্রীতিধারা মুখোপাধ্যায় ও গীতঞ্জী। \* \* শৈলেশ দেব কাহিনী অবলম্বনে এবং অল্প সুরকারের পরিচালনায় গড়ে উঠেছে বাগদত্তা ছবিটি। এতে অভিনয়্যাংশে আছেন ছবি বিশ্বাস, দীপজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, প্রশান্তকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল্য সাহাল, পদ্মা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী ঘোষ প্রভৃতি স্বনামগত শিল্পিবর্গ।

## আলো চাই

### শ্রীমণ্ডলকান্তি দাশ

মারাদিন কর্মবাস্ত দিনাস্তে। শেষে

দেহমন আচর্য অবশ,

তন্দ্রাতুর অসাড় নিস্তরু ক্রান্ত দুই চোখে

শ্রাবণ-রাত্রির খনশীল বর্ণে, ধূম আসে।

দেহ এলাই নিস্তরু আঁধার বক্ষে

স্নানাতুর আঁগি তার পর কঁাকে কঁাকে,

আমি দেখি যাদাপথে ছেলে আছে সোমাতীন আঁগি

নব জনমের ইশারায় কে যেন আমায় ডাকে।

কখন তন্দ্রালু চোখে অন্ধকার সীমার বাহিরে

অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে খুঁজে ফিরি একটুকু আলো,

অজন্মের কণ্ঠস্বরে জ্বাব আসে আলো নাই আলো নাই

বক্ষা পৃথিবীর বুকে আঁধার অশ্রুসিক্ত সার।

চমকে উঠি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে

কে যেন নোণা রক্তের খাবায়...

বহু ভুঁগা মানুষের হৃৎপিণ্ড ভিনে

বহু চোখে অটহাসি হাসে পাশব পীড়নে।

শশস্র প্রহরী তাই দেখি তারা মোতায়নে রাখে

পথে পথে রক্তলোভী হিংস্র দস্যুরা ঘোরে,

দুর্ভিক্ষ উজাড় ঘরের আনাচে কানাচে

রক্তচক্ষু শিশুদের গলা টিপে পরে।

তবুও অবাধ্য আমার ফলস্ত চোখ

বয়লারের আঙনে বলসে বাগ্মীর কড়া মুখে,

এ কাঁকালো রোদে পোড়া আঁধির কালো পেণীতে

কঠিন শপথ মেঘে তন্দ্রাতুর চোখ ওঠে রক্তে।

অনন্ত আলোর আকাশ তলে

যে আঁধার স্পর্শে করেছ তুমি মোরে স্বপ্নাতুর,

উন্মত্ত চলার পথে আজ জানাই প্রতিবাদ

হে ধরিত্রি! আগামী দিনের মাঝে একটু আলো চাই।



## কাপড়ের কলের চক্র ও চক্রান্ত

“রাজসভায় শীপুথারাক কাপুর জিজ্ঞাসা করেন যে, মিলগুলিতে মজুত কাপড় ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট কম দামে বিক্রয় করিবার কথা গভর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন কি না? কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ঐরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই এবং তিনি মনে করেন যে, গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন না। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর এই উত্তরে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। জনসাধারণ কাপড় কিনিতে পারিল কি পারিল না তাহা লইয়া মাথা ঘামানো হয়ত তাঁহার কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে না। কাপড়ের কলগুলিতে মজুত কাপড় জমিয়া উঠিতেছে। তাহা জমিয়া উঠুক, তাহাতে কি আসে-যায়? একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, মজুত কাপড় খালি করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত সময় (appropriate time) পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। তিনি প্রশ্নটিকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। কাপড়ের কলগুলিতে কাপড় জমিয়া উঠিতেছে। বেশী দামের জন্য লোকে প্রয়োজনীয় কাপড়ও কিনিতে পারিতেছেন না। এই সকল মজুত কাপড় খালি করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত সময় আর কি হইতে পারে? তিনি মনে করেন, বেশী দাম সত্ত্বেও লোকে কাপড় ক্রয় করে (people have gone in for cloth even when the prices are high)। এই উক্তির মধ্যে জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। দাম বেশী হইলে যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় ক্রয় করেন, ঐরূপ লোক অবশ্যই আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরেন, নিতান্ত দামে না ঠেকিলে বেশী দাম দিয়া কাপড় ক্রয় করেন না। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বৎসরে কয়খানা কাপড় পরেন, তাহা তিনি জানেন কি?”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## নিরামিষ ভোজন

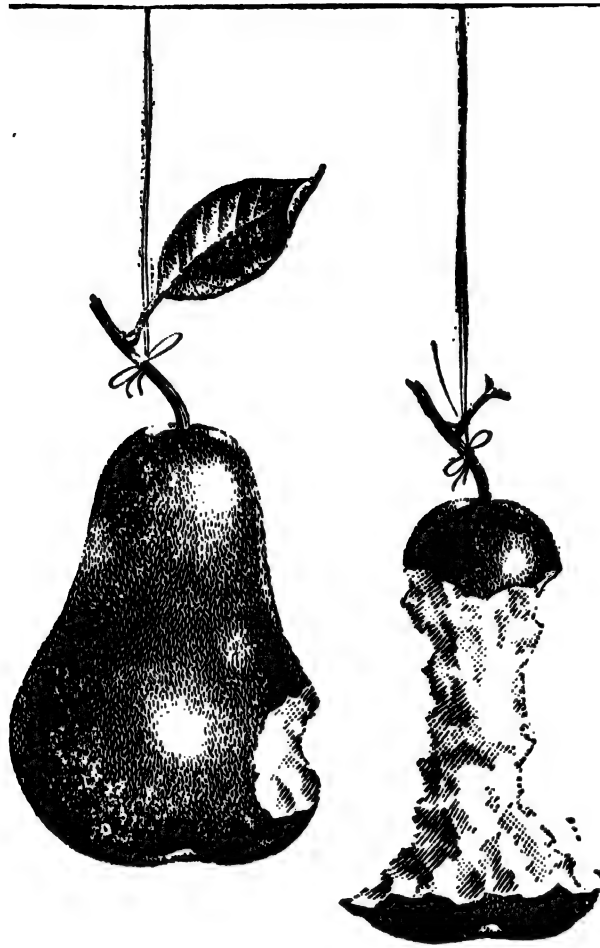
“আগামী নভেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে বিশ্ব নিরামিষাশী সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। লণ্ডনের আন্তর্জাতিক নিরামিষাশী সমিতি, বোম্বাই-এর জীবহিতৈষী লীগ, নিখিল ভারত পশুশল্ক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিরামিষাশী সম্মেলনকে সাক্ষ্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই নাকি

সিংহল, জাপান, কানাডা, মালয়, তিব্বত, ইটালী, ব্রুটন প্রভৃতি পঞ্চাশটি দেশ সম্মেলনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা খুব কম হইবে না। কিন্তু সম্মেলনের পক্ষ হইতে নিরামিষ ভোজনের স্বপক্ষে যে প্রচার কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমিষ ভোজনের ফলে মানুষের রক্ত-বিকৃতি ঘটে, রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি ভীত হইয়া যায় ইত্যাদি না হয় বুঝা গেল। কিন্তু আমিষ ভোজনের ফলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং নিরামিষ ভোজন আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখিয়া যুদ্ধ নিবারণে সাহায্য করে, এই ধরনের কথার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা কঠিন। অবশ্য জীবপ্রীতি ও সাত্বিকতার দিক হইতে নিরামিষ আহারের গুণপনা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। গান্ধীজী, বার্নার্ড শ' প্রভৃতিও এই দলে। তবে জৈব-প্রোটিন আহার ভিন্ন মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সামর্থ্য পুষ্ট হয় না এবং নিম্ন রক্তচাপ ও করোনারী আক্রমণ ইত্যাদির ভয় থাকে, ইহাই বলেন অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সুতরাং প্রশ্নটি লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতবৈধ আছে। হয়ত আলোচ্য সম্মেলনে সমগ্রাব একটা নির্ভরযোগ্য মীমাংসা হইয়া যাইবে।”

—যুগান্তর।

## পাকিস্তানী নির্বাচন

“পাক প্রধান মন্ত্রী শ্রীশ্রাবর্দী বহু ঝামেলার মধ্যেও সময় করিয়া ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ সফরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ : তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়া তাঁহার আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, কৃষক প্রজাপাটির কতককে লইয়া বা ভাগাইয়া ‘কোয়ালিশন’ গঠনের চেষ্টা করিবেন এবং এই শক্তি-বৃদ্ধির উপর ভরসা করিয়া আগামী ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন। আর চেষ্টা করিবেন—পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে জাতীয় আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট) মোলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা লাঘব করিতে—বলা চলে, মোলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা খতম করিতে। মোলানা ভাসানী নাকি মফঃস্বলের জনসাধারণের ইতিমধ্যেই চিত্ত হরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মোলানা ভাসানী সত্যিই শ্রীশ্রাবর্দীর গতিপথে এক কণ্টকস্বরূপ। ঢাকার একটি সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মোলানা ভাসানীকে খতম করিবার যড়যন্ত্রও আছে। তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার কথা বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়া অনেক চিঠিপত্রও নাকি ছাড়া হইয়াছে। মোলানা ভাসানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ঢাকার সম্মেলনে জাতীয় আওয়ামী লীগ নামে একটি দল গঠন করিয়াছেন। এই দলের আহূত সভা-শোভাযাত্রা শ্রীশ্রাবর্দীর আওয়ামী লীগের সমর্থকগণ যেভাবে আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—বিশিষ্ট নেতাদের মাথা ফাটাইয়াছে এবং পরে পূর্ববঙ্গের কোন কোন সহরে উক্ত দলের সভা যেভাবে পণ্ড করা হইয়াছে, তাহা নিছক গুণ্ডামি ভিন্ন কিছু নহে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লীগের নেতৃবর্গ এই সকল রাজনৈতিক গুণ্ডামির নিন্দা করেন নাই। সুতরাং মোলানা ভাসানীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের লোক চিন্তিত হইতেই পারেন। একমাত্র ভরসা—যদি শ্রীশ্রাবর্দী তাঁহার দলের সমর্থকগণকে গুণ্ডামি ও মারামারি হইতে বিরত থাকিতে স্পষ্ট নির্দেশ দান করেন। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ দলের উপর এখনই



## দেখে পরখ-আর চেখে পরখ...

অনেক জিনিষ আছে যা বাইরে থেকে দেখে পরখ করতে গেলে ঠিকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন ফল। বাইরে থেকে দেখে মনে হোল বেশ সরেস, কাটার পর দেখা গেল ভেতরে পোকায় খাওয়া। সেই জন্তে ফল কেনার সময় চেখে পরখ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সাবান বা অস্ত্রাঙ্গ নোড়কের জিনিষ পরখ করা যায় কি করে? এর একটি নিশ্চিত উপায় বুদ্ধিমান দোকানদারদের জানা আছে— তারা দেখেন জিনিষটির নামটি পুরোপুরি বিবাস-যোগ্য কিনা এবং সেটি এমন মার্কীর জিনিষ কিনা যা তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রায় ৭০ বছর ধরে জনসাধারণ হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থাভাবন কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই জিনিষগুলির গুণাগুণের কোন তারতম্য হয়নি। এই জিনিষগুলির ওপর তাঁদের আস্থার আর একটি কারণ, এগুলি বাজারে ছাড়বার আগে আমরা পরখ করে তবেই ছাড়ি।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী আমাদের সব জিনিষের ওপর—কাঁচা

মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত, আমরা পরীক্ষা চালাই। এ ধরনের পরীক্ষা চলে প্রতি সপ্তাহে সংখ্যায় ১২০০। আমরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিই যে এ জিনিষগুলি সব রকম আবহাওয়াতেই চালান এবং মজুদ করা যাবে। আমাদের পরীক্ষাগারে 'কৃত্রিম আবহাওয়া' সৃষ্টি করে আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন আবহাওয়াতে এ জিনিষগুলি কেমন থাকে। আপনারা বাড়ীতে এ জিনিষগুলি যে রকম ব্যবহার করে পরখ করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে এইগুলি পরখ করে দেখে নিই। আমাদের তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—লাইফবর সাবান, ডালডা বনস্পতি, গিবস, এস আর টুথপেস্ট অর্থাৎ সবগুলিই আপনাদের পরিচিত জিনিষ। এই জিনিষগুলির এত সুনাম কারণ এই জিনিষগুলি বিবাস-যোগ্য। কঠিন পরীক্ষা চালানোর পর বাজারে ছাড়ি হয় বলেই এগুলি সর্ব-সাধারণের এত বিবাস অর্জন করতে পেরেছে।



দশের সেবার হিন্দুস্থান লিভার



যেদ্রপ পুরাতন লীগমার্কী আক্রমণ চলিতেছে, তাহাতে আগামী নির্বাচন শাস্তিগুণ ও অবাধ হইবে, ইহা মনে করাই শক্ত। মোলানা ভাসানীর ভরসাই তো অবাধ নির্বাচন !” —আনন্দবাজার পত্রিকা।

### নেতাজীর অসম্মান

“এক দিকে কলিকাতায় আউটরাম মূর্তির জায়গায় নেতাজীর ছবি পুলিশের হাতে লাক্ষিত হইতেছে, হাজার হাজার লোক দাঁড়াইয়া তাহা নির্দিকার চিত্তে দর্শন করিতেছে, আর একদিকে চলিয়াছে তাঁহাকে লইয়া উদ্ভট কল্লনা ও গবেষণা। এক দিকে সবাদপত্রের নেতাজী মূর্তি সত্যাগ্রহের সবাদ ব্রাকআউট করিতেছে, আর একদিকে কতকগুলি লোকের কল্লনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতেছে। ফিল্মে এবং নেতাজী আলোচনার কাল্পনিক কাহিনী যাহারা প্রচার করিয়াছে, নেতাজীর সম্মান তাহারা রাখে নাট। নেতাজী ছিলেন অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁর ধ্যানের আদর্শ। ফিল্মে নাগাপাহাড় ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে, খণ্ডিত ভারতকে আরও খণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক। নেতাজীর আদর্শে গাঁহাদের লেশমাত্র বিশ্বাস আছে তাঁহারা এই ব্যক্তির কাজে তাঁহার সমর্থন কল্লনাও করিতে পারেন না। খেবর বলিতেছেন,—নেতাজী নেপালে ষাঁটি করিয়াছেন। নেপাল কি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলগহে যে, তিনি সেখানে আসিয়া থাকিলে খেবর ছাড়া আর কেহ তাঁহার খবর পায় না? এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, নেতাজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। অথচ তাঁহার মৃত্যুরহস্ত তদন্ত কমিটির সামনে সে উপস্থিত হয় নাই। ইহার কথা লেশমাত্র মূল্য নাই, নেতাজীর নামে কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া খবরের কাগজে নাম ছাপানোই ইহার উদ্দেশ্য। নেতাজী যদি জীবিত থাকেন এবং যদি কোন কারণে এখনও ভারতে আসা বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তবে তাহা লইয়া অলস গবেষণার কি প্রয়োজন? নেতাজীর বইগুলি তো কাহাকেও পড়িতে দেখি না? যে নপুংসকের দল নেতাজীর সম্মান রক্ষার অগ্রসর হয় না, তাঁহার নাম উচ্চারণের অধিকার তাঁহাদের নাই। হেমন্ত বসু, অমর বসু এবং নেতাজীব নূতন ভক্ত প্রফুল্ল ঘোষ এবং জ্যোতি বসুকে খালাস করিয়া একটি শাড়ী ও দুই গাছি প্লাষ্টিকের চুড়ি বেঙ্গল গ্রামিনাল ভলান্টিয়ার বাহিনী পাঠাইয়া দিলে উচিত কাজ হইবে।” —যুগবাণী (কলিকাতা)

### নেহরুজীর আশ্ফালন

“ক্রীনেহরু রাজ্যসভায় খুবই আশ্ফালন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোয়াকে যদি সামরিক আঁতাতের বড় রকমের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামরিক ষাঁটিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টা খুবই গুরুতর হইবে এবং ইহা ভারতের প্রতি অবজ্ঞাজনোচিত কার্য হইবে। ভারত কখনই তাহা বরদাস্ত করিবে না। কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ করিয়াও ক্রীনেহরু বলেন যে, কাশ্মীরে পাকিস্তান যে অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন, ভারত তাহার যথোচিত উত্তর দিবে। আমাদের বিশ্বাস, লোকসভা ও রাজ্যসভার দেশের বহু রাজনীতিবিদ ও বিদ্বানের সমাবেশ ঘটয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে নেহরুজী এই ভাবে আশ্ফালন করিবার স্পর্ধা কি ভাবে রাখেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নেহরুজী যখন বার বার ঘোষণা

করিতেছেন যে, গোয়ায় সামরিক ষাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা বা পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ ভারত সহ্য করিবে না তখন ভারত কি করিবে তাহার প্রকৃত পান্টা জবাব তাহারা নেহরুজীর কাছে চাহেন নাই কেন? বিরোধী দলের ২১৪ ব্যক্তি ছাড়া আর সকলে কি তবে জী হুজুরের দল? কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তান যে অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্র জোটের সহায়তায় কাশ্মীর আক্রমণ করিবে। ভারতের বুকে যে হাজার হাজার পাকিস্তানী গুপ্তচরেরা অবলোকনক্রমে তাহাদের কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে সেই দিন তাহারাও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবে এবং ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। আজ যে সমস্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভারত শাসনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেই দিন তাঁহাদিগকেও যদি রক্তক্ষয় অপূরণ দৃষ্টিতে অবতরণ করিতে দেখি তাহা হইলে আমরা আদৌ বিশ্বাসিত হইব না। পাকিস্তান সরকারও তাহা জানেন। একটি মাত্র ব্যক্তির খামখেয়ালীর জন্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা দেশবাসী কোনদিনই বরদাস্ত করিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।”

—সস্তিকা (কলিকাতা)

### জলাভাবে কৃষকের হাহাকার

“বর্তমান জলাভাবে সর্বত্র কৃষকের হাহাকার শ্রবণ উঠিয়াছে ও কৃষিকার্যে গভীর হতাশাস দেখা দিয়াছে। এ বৎসর অধিক বিলম্বে বৃষ্টি নামায় লোকে কৃষিকার্যে হাত দিয়াছিল। সামান্য কিছু কিছু জমি গভীরাঞ্চলগুলিতে আবাদ হইয়াছে বটে কিন্তু সাম্প্রতিক বৃষ্টির অভাবে প্রায় সর্বত্র কৃষিকার্য ব্যাহত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে আবাদ হইয়াছিল প্রচণ্ড বৌদের তাপে তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। কৃষকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া দিন গুণিতেছে। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ ঘনাইয়া আসে বটে, কিন্তু শরৎকালের জলহারা মেঘের গ্রাস সবই নিষ্ফল হইতেছে ও আদৌ স্রবৃষ্টি হইতেছে না। এ পর্যন্ত বেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে পুষ্করিণীগুলির অধ্ধাংশও পরিপূর্ণ হয় নাই। আণবিক শক্তির তেজস্ক্রিয়া অথবা ধুমকেতু আদির প্রাচুর্ভাবের ফলে যে কারণেই হউক পৃথিবীর অনর্থ ঘনাইয়া আসিতেছে। একে ত’ খাত্তসঙ্কটে দেশ ত্রিয়মাণ তার উপর বিধির বিধানে এদেশবাসীর চরম দুর্গতি দেখা দিতেছে। ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে! আমাদের শ্রমদলকে সেচ ব্যবস্থা না থাকিলেও অবিলম্বে সমুদ্রের লোণা জল বা সমুদ্র হইলে স্ববর্ণরেখার জল কেনেলে প্রবেশ করাইলেও কতকটা উপকার হইতে পারে। কৃষিকার্যে জলাভাবে চারিদিকে বেরূপ দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে স্থানীয় পূর্ত কর্তৃপক্ষের স্ফাষিত ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।” —নীহার (মেদিনীপুর)।

### লাল ফিতার মাহাত্ম্য

“গত বৈশাখ মাসে ভাটপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত মাঝিগ্রাম মৌজায় এক ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২১টি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সরকার হইতে পুড়ে-যাওয়া বাড়ীগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য এককালীন কিছু সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার বন্দোবস্ত

আছে। তাই তাঁহারা ঋণের জন্ত দরখাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কোন ঋণ বা সাহায্য তাঁহারা পাইলেন না। এস, ডি, ও, অফিসে খোঁজ লইয়া জানা যায় যে, সেই দরখাস্তগুলি নাকি কমিশনারের কাছে পাঠানো হইয়াছে। ঋণ বা সাহায্য তাঁহারা কবে পাইবেন বা আদৌ পাইবেন কি না, সে বিষয়ে কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কমিশনারের কাছে আরকলিপি পেশ করিবার উদ্দেশ্যে Case no ও issuing date চান কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট পেন্সন নাকি জানান যে ইহা জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় নহে; এই দুরন্ত বর্গীয় তাঁহারা বর্তমানে অভাবনীয় দুঃস্থতার মধ্যে পড়িয়াছেন। বর্তমানে সাহায্য পাইলে অতি অল্প খরচে তাঁহারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিতেন। নতুবা সম্পূর্ণ দেওয়ান ধসিয়া পড়িলে চতুর্দশ খরচ বেশী হইবে। লাল ফিতায় বাঁধা পড়িয়া এই সমস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গ আর কত দিন দুঃস্থহালা সহ্য করিবেন! সরকার ইহা অগ্রহণ করিবেন কি?"

—বার্তা (দিনাজপুর)।

### দ্রব্যমূল্য

"মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, জেলায় বাজ ও চাউল আছে এবং চালানও আসিয়াছে। তাহা যদি তত তত প্রতিদিন মূল্য বাড়িতেছে কেন? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। সরকার জবাদি নিজে আস্তে নিলে তাহা টিন ও সিমেন্টের পর্যায়ে আসিবে বলিয়া তাহারাও বোধ হয় আশঙ্কা করেন। স্তুরতা টাঙ্কের নাম শুনিয়াই ইউক এবং চালান আসে নাট অজ্ঞাতাতেই ইউক—যে কোন অভিল্য মূল্য বাড়িয়া দিলে বলিবার কেহ নাই। মানুষের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে, স্তুরতা ভাবনার কিছু নাই। শুধু বাড়াইয়া দিলেও দ্রব্যমূল্য বাড়ে না। উপর তলার ধারণা যেখানে এই, সেখানে মানুষের প্রতিকারের সমস্ত পথ রুদ্ধ। সর্বপ্রকার ট্যাক্স বসাইয়া ও তাহা আদায় করিবার অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দ্রব্যমূল্য কমান যায় না। ঘূণের পরিমাণ কত বাড়িয়াছে তাহার হিসাব প্রতিকারের আশা থাকিলে ব্যবসায়ী দিতে পারে কিন্তু তাহা দিলে সে মরিবে এবং ঘৃণহীতাগণ নিশ্চিন্তে ও পরমানন্দে থাকিবে। অপচয়, ঘৃণ, হীনতা, গীড়ন প্রভৃতি বন্ধ করিতে পারিলে এ সকল সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায়। সে পথ বহু দূরে। তাহা করিতে গেলে সময়কালে চাঁদা বা সাহায্য করিবে কাহার?"

—ত্রিশোতা (জলপাইগুড়ি)।

### সংস্কার ?

"কংগ্রেসের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কংগ্রেসকে শ্রদ্ধার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাধু, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কংগ্রেসেরই উপর স্তম্ভ হইয়াছে। জনগণের সেবা করিবার সুযোগ যে প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে যদি সাক্ষা মানুষের অভাব হয়, আদর্শভ্রষ্টের ভীড় জমে, ক্ষমতালোভের উদ্গাদনা দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠান যে গণ-সমর্থন হারাইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেস বলিতে পরাধীন ভারতে জনগণের প্রতিষ্ঠান বুঝাইত। এখন ইহা দল ছাড়া আর কিছুই নহে। একদা এই কংগ্রেসের পতাকাতলে গাঁড়াইয়া দেশবাসী এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

বিকল্পে লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের মানুষ কংগ্রেসে আসিত। পুলিশের বেয়নেটের সম্মুখীন হইতে, নির্ধাতন-লাঞ্ছনকে হাসিমুখে বরণ করিতে এখনকার মত পারমিট সংগ্রহ বা এম, পি, ও এম, এল এ, হইবার জন্ত নয়। কংগ্রেস তখন ছিল ত্যাগ এবং জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। আজ কংগ্রেস তাহার সেই মহান ঐতিহ্য হারাইয়াছে। আজ আদর্শবান বহু মানুষ কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। বাঁহারা কংগ্রেসে থাকিয়া এখনও আদর্শের পূজা করিতেছেন, তাঁহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই অনাস্থার অর্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে। বাঁহারা আদর্শের ধার ধারে না, পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট বলিয়া বাঁহারা পরিচিত, তাহারা এই আজ কংগ্রেস দখল করিতে চলিয়াছে। এই এসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাঁহারা কংগ্রেসের দুর্দীন দেখিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া অল্প দলের ছাপ লইয়া এম, এল, এ, বা এম, পি, হইবার আশার নির্বাচনে নামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গভ নির্বাচনে রাতারাতি রাজনৈতিক গাউন পরিবর্তন করিয়া বড় কংগ্রেসী সাজিয়াছিল। দেশবাসী তাহাদের এই অশরচ্যানির্জিম প্রবেশ দেখে নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গোহারান হারিয়া এখন যথারীতি আত্মসেবার স্বার্থ পালন করিয়া বাইতেছে। ইহারা যে কংগ্রেসের কলঙ্ক, বাঁহারা কংগ্রেস সংস্কারের জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এখনও এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করেন নাই?"

—সমাধান (হুগলী)।



ROY COUSIN & CO.  
4 DALHOUSIE SQUARE  
CALCUTTA-1

Sole Agents for  
COVENTRY WATCHES  
Official Agents for  
OMEGA & TISSOT WATCHES

## আসামের বাঙালী ও বেকার সমস্যা

“আসাম রাজ্যের বেকার সমস্যার প্রতি ইন্দোনী রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আসাম রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাঙালী সমাজের মধ্যেই সর্বাধিক। উদ্বাস্ত বাঙালীদের মধ্যে বর্তমানে এই সমস্যা অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ উদ্বাস্তদের স্বল্প পুনর্বাসনে সাহায্যকল্পে আসাম রাজ্যের স্থানে স্থানে বিভিন্ন শিক্ষালয়ে এবং অগাচ্চ প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত অর্থ সকল ক্ষেত্রে উদ্বাস্তদের স্বার্থে ব্যয়িত হয় না বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। অল্প দিকে আসাম সরকার এখনও সরকারী চাকুরিতে উদ্বাস্তদের নিয়োগে বৈধম্যমূলক বিধান অনুসরণ করিতেছেন। এমন কি, আসামের স্থায়ী অধিবাসী বাঙালীদিগকেও সর্বত্র সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। প্রদত্তঃ উত্তরণগোণা যে, গোঁচাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম হাইকোর্ট, ডিক্রিগড় মেডিকেল কলেজ, আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক কর্মচারী কাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষী প্রায় নাই বলিলেই চলে। আজ কাল আসাম অয়েল কোম্পানী এবং চা-বাগানসমূহেও বাঙালী নিয়োগে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে। আসামে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী বাঙালীদের সংখ্যা যেখানে রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার ন্যূনাতম এক-তৃতীয়াংশ, সেখানে এইরূপ বৈধম্যমূলক আচরণের কোন যুক্তি থাকিতে পারে কি? আমরা এই বিষয়ে রাজ্য কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণক্রমে আন্তঃস্বিচার দাবী করিতেছি।”

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।



যুব-উৎসবে স্কাউট প্রতিনিধি

দমদম বিমান-বাঁটিতে আন্তর্জাতিক মহোৎসবে যোগদানকারী ভারতের একমাত্র স্কাউট প্রতিনিধি উত্তরপাড়ার ত্রিমেসেননাথ মুখোপাধ্যায় ও মোহনবাগানের খ্যাতনামা ত্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায় (বদক); বাঁদার প্রাকালে।

## শরতের আগমনে

“শরৎ কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এ দেশের এক বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের মনোলাভা দৃশ্য—বন উপবন ও শস্যক্ষেত্র আদির শ্রামলিমা, সুস্বিষ্ট জ্যোৎস্নালোক, প্রকৃতির শান্ত সৌম্য মূর্তি প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে এবং ফল ফুল, তরীতরকারী আদির প্রাচুর্য লোকের মনে স্বভাবতঃই আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। তাই বাংলার কবি সময়টাকে শ্রেষ্ঠ ঋতু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এ বৎসর বৃষ্টিকালে বৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হইয়াছে। তরীতরকারী আদিও পর্যাপ্ত উৎপন্ন হইতে পারে নাই, এতদঞ্চলের গৃহ তৈয়ারীর একমাত্র অবলম্বন বাঁশগাছ বৃষ্টির অভাবে তাহাও জমিতে পারে নাই। কৃষিক্ষেত্রগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে শ্রামল রূপ ধারণ করিতে পারিল না। অধিকন্তু এখনও অনেকস্থলে কৃষিকার্য চলিয়াছে জানা যায়। এই অসময়ের চাষে কৃষকের সুফল পাইবার আশা কি? কাজেই শরতের আগমন সুখের হইলেও কি করিয়া লোকের মনে আনন্দের উদ্বেক হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ আজ দেশের সর্বত্র ভবিষ্যতের এক অন্তত ইঙ্গিত দেখা দিয়াছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি এ অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে ও খাণ্ডমূল্য বৃদ্ধিতে লোকে অধিকতর স্ত্রিয়মাণ হইতেছে। তার উপর এ বৎসর প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্যে শরৎ ঋতুর প্রারম্ভেই একরূপ বৃষ্টি নামায় ভরা ভাদরের ভরা নদীতে একটু শরতের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। মাঠ ভরা ধান, বুকভরা আনন্দ সবটাই যেন অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে ও এক হৃদ্বিনের কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় কয়জনই বা শরতের আনন্দ উপভোগ করবে?”

—নীহার (কাঁথি)।

## দেশের অবস্থা ও কর্তৃপক্ষ

“কিছু দিন ধরে কোলকাতার প্রভাবশালী দৈনিক কাগজ কয়েকটি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অভাব-অভিযোগের প্রস্তুত চিত্র প্রকাশ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অঙ্কন করেছেন। মেদিনীপুর জেলার যে অবস্থার সংবাদ আমরা পাই সেটাও ভয়াবহ! তবে ছুঁতগা আমাদের, সে সংবাদটা কোলকাতার কাগজ বহন করে আনছে না। ফলে অবস্থাটা আমরা জানলেও দেশের অনেকে জানেন নি এবং অনেকের মতন সরকারের উপর মহলও এ বিষয়ে অজ্ঞ। মেদিনীপুরের এক বিবাত অঞ্চল জুড়ে আমাদের বে মহকুমা রয়েছে সেখানের অবস্থাটা ভয়াবহ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। দরিদ্রতম দেশ—এই মহকুমা। কল নেই, কারখানা নেই, কোন কুটিরশিল্প নেই, শুষ্ক, রুক্ষ মাটির বুক থেকে যে ফসল কৃষকের ঘরে আসে, তাতে কৃষক-পরিবারের অন্নসংস্থান হয় না, কৃষকের ঘরের চালে ঝড় জোটে না, কৃষকের পালিত গরুর অবস্থাও পরিণতি হয়ে ঝাঁড়ায় শরৎচন্দ্রের “মহেশের” মতন। কেবল গরু নয়, তুষা নিবারণের সামান্য জল সংগ্রহের জন্ত অসংখ্য গ্রামের কুলবৃন্দের অভিযান করতে হয় ২১০ মাইল দূরে। একটি সম্পদ ছিল জঙ্গল। যে সম্পদের সমস্ত রস নিঃসৃত নিত কাঠ-মহাজনের দল। কিন্তু শোষণের যন্ত্র হিসাবে যাদের ব্যবহার করা হতো সংখ্যা তাদের খুব কম নয়। জঙ্গলের কাঠ তারা কাটতো, ঘরের গরুর গাড়ী দিয়ে ট্রেনে চালান করতো, পাড়া বনজ মূল্য সংগ্রহ করে অনেকেই



বাড়ীর সবাইকে আনন্দ দেবার মতো উৎসবদিনের একটি উপহার...

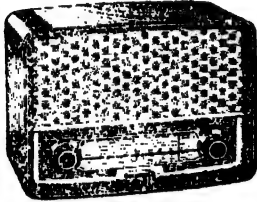
অল-ওয়েভ **গ্যাশনাল-একো** রেডিও

দাম ২০০/- থেকে

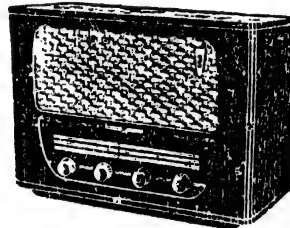


সামনের উৎসবমুখর দিনগুলোয় বাড়ীর সবার  
জন্তে একটি গ্যাশনাল-একো রেডিও সেট  
উপহার দিন—চমৎকার জিনিস, বাড়ীর সবাই  
মিলে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

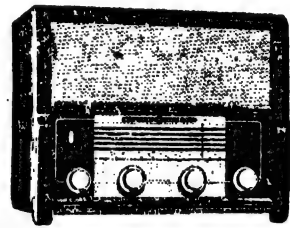
এখানে ছ'টি সুন্দর সুন্দর গ্যাশনাল-একো  
মডেল দেওয়া হল। আরো অনেক রকম  
মডেল আছে — আজই গ্যাশনাল-একো  
ডীলারের কাছে দেখে আসুন।



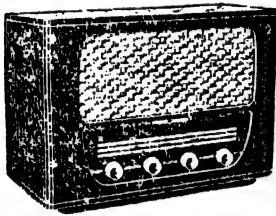
মডেল ২৪১ : ৬ ভোল্ট, এসি/ডিসি'র  
জন্তে ৩ ব্যাণ্ডের সুবিধেময় ২ ব্যাণ্ড সেট।  
৬ ভোল্ট-এর ড্রাই ব্যাটারী সেটও আছে।  
দাম ২০০/- নীট।



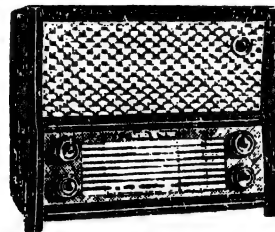
মডেল বি-১০৩ : ৬ ভোল্ট,  
৬ ব্যাণ্ডের ড্রাই ব্যাটারী সেট।  
দাম ৩২৫/- নীট।



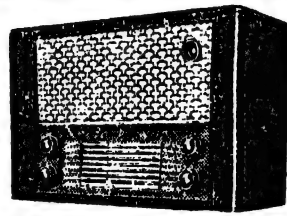
মডেল বি-১১২ : ৬ ভোল্ট, ৬  
ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডসেড ড্রাই ব্যাটারী  
সেট। দাম ৪৭৫/- নীট।



মডেল এ-১০৩ : ৬ ভোল্ট, ৬  
ব্যাণ্ডের সেট। এসি কারেন্টে  
চলে। দাম ৩২৫/- নীট।



মডেল ১৮৭ : ৬ ভোল্ট, ৬ ব্যাণ্ডের  
ব্যাণ্ডসেড রিসিভার এ-১৮৭-এসিতে  
চলে; ইউ ১৮৭ এসি/ডিসি'র জন্তে।  
দাম ৪৭৫/- নীট।



মডেল এ-৩১৭ : ৭ ভোল্ট, ৬ ব্যাণ্ডের  
ব্যাণ্ডসেড সেট, আর, এক টেন টিউ  
বুক, এসির জন্তে। দাম ৫২৫/- নীট।

**গ্যাশনাল-একো রেডিওই**

সেরা—এগুলো।

মনসুনা ইঞ্জু

গ্যাশনাল-একো ডীলার সানন্দে আপনাকে রেডিওগুলো  
বাজিয়ে শোনাবে। ১২ মাসের গ্যারান্টি আছে। স্থানীয়  
কর আলাদা।



জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্স  
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাডান ষ্ট্রিট, কলিকাতা ১০। অপেরা হাউস,  
বোম্বাই ৪। ১/১৮ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬/৭২  
সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর।  
যোগাধিকার কলোনি, চাঁদনী চক, দিল্লী।

নিজেদের অন্ন সংস্থান আর মহাজনের লক্ষ্যসাধনের সহায়তা করতো। জনদের আরতন গেছে কমে। যন্ত্রদানবের কল্যাণে, গল্পের গাড়ী বিশেষ আর ব্যবহার হয় না, ছোট ছোট কুখকের বরে অর্থাগমের প্রধান স্রোতটাই বন্ধ হয়ে গেছে।”

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

## ভ্রমস্বীকার

এই সংখ্যার ‘স্মৃতিচিহ্ন’র এক স্থানে ‘বারো টন’ ছাপা হয়েছে। এটি ‘বারো টোন’ পড়তে হবে।

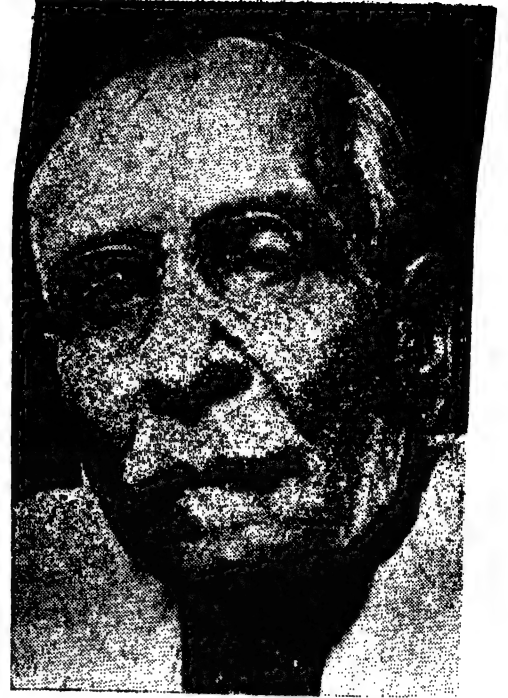
‘পত্রগুচ্ছ’ বিভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত কবিত্ত্বকর স্বাক্ষরনাথ ঠাকুরের পত্র সমূহ ‘বিশ্বভারতী’ থেকে সজ্জাতি প্রকাশিত স্বাক্ষরনাথের ‘চিঠিপত্র’ বই খণ্ড থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রগুলো কবির লেখা আরও অনেক চিঠি আছে। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করলে উক্ত বই খণ্ড পাঠ করতে পারেন। পত্র সমূহ প্রকাশের জন্য ‘বিশ্বভারতী’র সৌজন্য স্বীকার করছি।

## শোক-সংবাদ

গত শনিবার ১৪ই ভাদ্র ৮৩ বছর বয়সে হরিহার বাওরার পথে ট্রেনের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন শ্রীশ্রীস্বামী বিদ্যাসনানন্দগিরি মহারাজ। সংসারাত্মকে এঁর নাম ছিল স্ববীকেশ কাক্সিলাল। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জীবনের প্রথম লয় থেকেই যে মহান সন্তানের দল নিজেদের উৎসর্গিত করেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদেরই অঙ্গতম। আলীপুর বোমার মামলার বাবজীবন উপাস্তর-দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে ইনি ছিলেন অঙ্গতম। পরিণত বয়সে ইনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন ও জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘শিবম্’ পত্রিকাটি বহুদিন তাঁর সম্পাদনার প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যাসনানের তিরোধানের কয়েক দিন পরেই বুধবার ১৮ই ভাদ্র বাঙলাদেশ আর একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিপ্লবীকে হারাল। তিনি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৭৮)। যৌবনের উদ্যোগে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি আত্মত্যাগিত দেন এবং অমরেন্দ্রনাথ তৎসহ অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, স্ববীকেশ প্রমুখ বিপ্লব নায়কদের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি দীর্ঘদিন বন্দীজীবন যাপন করেছেন এবং দেশ-সেবার জন্তে নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করে গেছেন হাসিমুখে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ও বাধ্যক্যবশতঃ সেই সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি কিছুকাল পৌরপ্রতিষ্ঠানের স্নায়সারের কর্মভার গ্রহণ করেন ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-মনোনীত সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক জ্যোতিষী ও সঙ্গীত-বিজ্ঞান পারদর্শী পুলিনবিহারী মিত্র গত ১৭ই শ্রাবণ তাঁহার ৬৮তম বর্ষের চক্রবর্তী লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইরাছিল। তিনি হুই কন্ডা, জামাতা, নাতি-নাতিনী ও অগণিত



পুলিনবিহারী মিত্র

আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। পুলিনবিহারী স্বর্গত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের পুত্র। বাল্যকালে স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুকাল চাকুরী-জীবনে প্রবেশ করেন এবং বাল্যকালের বাহিরে অবস্থান করেন। এই সময় হইতেই তিনি জ্যোতিষবিজ্ঞান চর্চা আদম্ভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি জ্যোতিষবিজ্ঞান ও “ছায়া” বিজ্ঞান বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেন। স্বর্গত মিত্র সাধুর জায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। বহু বৎসর পূর্বে তাঁহার পত্নী-বিরোগ হয়। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন ভক্ত ছিলেন এবং রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শিষ্য ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহারই নির্দেশে তিনি রাখাল মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে পুলিন বাবু ছিলেন নিরহঙ্কার, সদালাপী, মিত্রবৎসল।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচগোপাল মুখোপাধ্যায় ৭ই ভাদ্র শনিবার মাত্র ৪১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কল্লোল-কালিকলমের যুগে এঁর আবির্ভাব এবং শেষ দিন পর্যন্ত এঁর লেখনী সচল ছিল। কয়েকটি উপন্যাস এবং বহু ছোট গল্পে ইনি বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে গেছেন। চলচ্চিত্র জগতেও কাহিনীকার এবং সংলাপকাররূপে ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিছুকাল সহ-সম্পাদকরূপে দৈনিক বঙ্গমতীকে সেবা করে গেছেন, অধুনা ইনি যুগান্তরের অঙ্গতম সহ-সম্পাদক ছিলেন।

## সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, “বঙ্গমতী রোটারী মেসিনে” শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



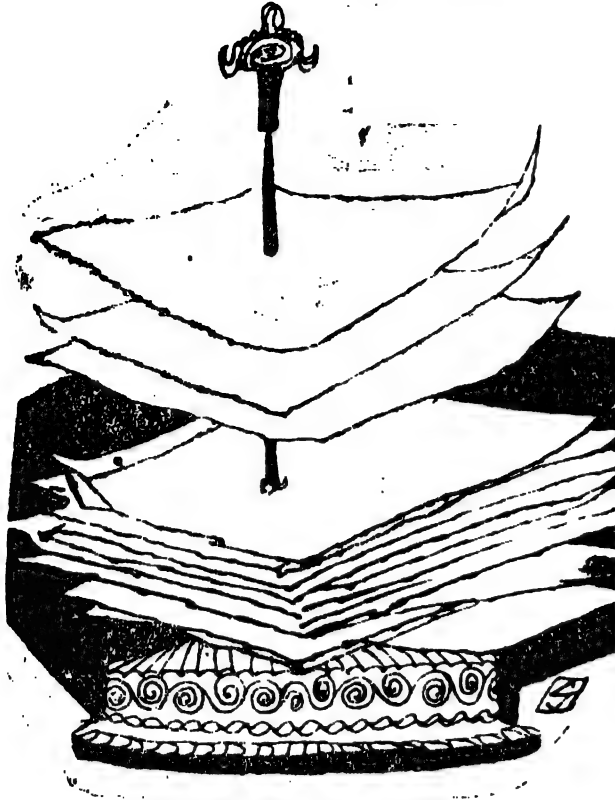
## পুজোর মজা

খোঁকাবাবুর আমদ আর ধরে না।  
নতুন জামাকাপড় পরে পুজোবাড়ীতে  
হাবার জন্তে একেবারে 'রেডী'। বাংলার  
প্রতি ধরেই আজ পুজোর আমোজ  
চলছে, কতো আমোদ, কত মজা হবে  
পুজোর কদিন। অবশ্য সব থেকে আমোদ  
হবে খাওয়া দাওয়ায়। আর একথা  
কে না জানে যে পুষ্টিকর ডালডায়  
তৈরী সব রকম খাবার আর মিষ্টি  
খেতে মুখরোচক আর খরচও  
কম। এবার পুজোর আগনার  
বাড়ীর সব রান্না ডালডায় করুন।



ডালডা মার্কা বনস্পতি

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে

প্রিয় মহাশয়,

আমরা সম্প্রতি একটি Cinema ছবি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম যে ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তুত একটি ডকুমেন্টারী ফিল্মে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস দেখান হইতেছে। এই ইতিহাস ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৫৭ সনের আন্দোলনকে নবজাগৃত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বা মধ্য যুগের ভারতবর্ষের আধিপত্য বক্ষার শেষ সংগ্রাম বলা হইবে কি না, ইহা এখনো ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয়। যাহা হউক, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলিলে তেমন কোনও আপত্তির কথা হইবে না, যেখানে স্বাধীনতা-সংগ্রাম, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, কুমার সিংহের জায় মহাপ্রাণ তেজস্বী বীরগণ ইহার সচিত্র জড়িত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এই ফিল্মে ১৯০৫ সনের বিপুল, বিরাট, অহুলনীয় স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ পথান্ত করা হয় নাই। এই ফিল্মে স্বাধীনতা-সংগ্রামের উৎপত্তি বিরাট পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের কোনও নাম নাই। এই ফিল্ম-প্রণেতাগণ কি মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের কোনও স্থান নাই? বা ভারতবর্ষের আন্দোলন এই ফিল্ম হইতে বাদ পড়িয়াছে। ক্ষুদ্ররাম, কানাইলাল বা যতীন মুখার্জীর জায় বীর বিপ্লবীর এবং বিপ্লব আন্দোলনের আরও অগণিত বীরের কাহাণীও কোনও উল্লেখ নাই। কিম্বা প্রণেতাগণ কি মনে করেন, ইহাদের কাহাণীও অবদান সিপাহী যুদ্ধের সৈনিকদের তুল্য নহে? চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জায় চরম হুঃসাহসিক অভিযান এই ইতিহাসে স্থান পায় নাই, অথচ আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর জায়

অহিংস নেতাও ইহাদের কীর্তিকলাপে সশ্রদ্ধ বিষয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন; এই সকলের কারণ কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? স্বাধীনতা আন্দোলনের এই গৌরবময় ইতিহাসকে কেন ইচ্ছা পূর্বক একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে? আর কারণ যাহাই হউক, ইহা কি সত্যনিষ্ঠা? ভারত গভর্ণমেণ্টের মূলমন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে সত্যমেব জয়তে, কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠার কোনও নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। এই জাতীয় ফিল্ম কাহারা তৈয়ারী করেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসকে বাহারী এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করেন, আমরা তাঁহাদের সাধুবাদ করিতে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কাস পূর্বে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে যে বিখ্যাত কবিতা লেখেন, তাহার মধ্যে আছে—“মরে না মরে না কভু সত্য বাহা, শত শতাব্দীর বিষ্মতির তলে, অপমানে না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে।” আজ এই উপলক্ষে আমাদের ব্যথিত চিত্তে, এই কথাগুলিই বারংবার মনে হইতেছে। শ্রীদেবিনাস রায়। ঢাকুরিয়া। কলিকাতা—৩১।

### পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,

গত আষাঢ় সংখ্যা (১৩৬৪) মাসিক বসুমতীতে আমার লেখা “এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং” শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে প্রাণ সংখ্যা (১৩৬৪) বসুমতীতে শ্রীঅনিল মুখার্জীর প্রতিবাদ-পত্রটি পড়লাম। তিনি লিখেছেন—“গোব মহাশয় জানাচ্ছেন বাড়ীটি ১৪১০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। অথচ শ্রীকুমার সরকার সরকার বি-এ মহাশয় লিখিত ও মর্ডার বুক এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত বুক অফ নলেজ নামক বই-য়ে ৪৪ পাঠ্য দেখছি লেখক জানাচ্ছেন, সর্বসময়ে এই বাড়ীতে ৭৫ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১০০০ ফুট, ইহার কোনটি ঠিক বলিয়া জানিব?” আসলে বাড়ীটি ১৪১০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। যতদূর মনে হয়, আমার পাণ্ডুলিপিতেও তাই লেখা ছিল। ছাপার ভুলে ১৪১০ ফিট হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। “মর্ডার বুক এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত” শ্রীশ্রীকুমার সরকার, বি-এ, মহাশয়ের “বুক অফ নলেজ” বইখানি আমি পড়িনি। সে কারণ বইখানিতে পরিবেশিত তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধেও কিছু লিখতে পারলাম না। তবে অনিল বাবুর অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, আমি বিখ্যাত মার্কিন বাস্তবকার Mr. Paul W. Kearney লিখিত “Atop the world's tallest structure” নামক প্রবন্ধ হতে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। মূল প্রবন্ধটি আমেরিকার “This Week” পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রবন্ধটি “Reader's Digest” (Sept. 1952) পত্রিকায় আবার সাক্ষিপ্তাকারে ছাপা হয়। Mr. Kearney দীর্ঘদিন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কাজেই তাঁর তথ্যগুলি যে নির্ভুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, অনিল বাবুর অনুসন্ধিৎসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁকে আমি কলিকাতায় মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মিস জেন ফেরার ওয়েদার-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করছি। তাহলে তিনি বাড়ীটি সম্বন্ধে আরো অনেক চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শ্রীদেবব্রত ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।

“বিবেকানন্দ স্তোত্র” প্রথম দিকে পড়িই নি; তাঁর কারণ সে সময় বাইরে থেকে ঢেয়ারা দেখে মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয় হুর্ল ছন্দে লেখা শিথিলচিত্ত কোন ভক্তের ভাবোচ্ছাস। আপনার পত্রে কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা প্রশংসা জানাতে লেখাটির প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তারই পরিণাম এই পত্র। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন লেখা দেখলে উৎসাহভরে অগ্রসর হই, কিন্তু বড় দুঃখের প্রত্যাভর্তন ঘটে। কতকগুলি বুদ্ধিহীন ভাষাজ্ঞানহীন ভাবালুর লেখা পড়ে বিতর্ষণ এসে গেছে। মনে হয়েছে, বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এঁদের কাছে এমন বার্থ হোল কি ভাবে? স্বর্ঘ্য তো সকল বস্তুকেই উত্তপ্ত করে—মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত সেই প্রদীপ্ত বিবেকানন্দকে চোখের জলে মাখামাখি করে দেখা অবশ্য একজাতীয় শক্তির কাজ। শক্তি অপহারী সেই সব শক্তিমান লেখকে দেশ ছেয়ে গেছে; তারই মধ্যে শ্রীযুক্ত মিত্রের লেখায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখলুম। দেশে অপবুদ্ধিও আছে। নিজের সম্বন্ধে জীবদেহীর অতিরিক্ত ভারতে নারাজ কিছু স্বেচ্ছুর লোক ইনানী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা করছেন যদ্-মব্বর সঙ্গে এক পাক্তিতে বসিয়ে। এঁরা খিয়োরীর গজকাঠি একটি পেয়েছেন পাশ্চাত্য গুরুর তাক্ত তত্ত্বের জ্ঞান থেকে। তাই দিয়ে মাগছেন, আর বড়র ছোট্টর খুঁজে বৈজ্ঞানিক কোতুল, এবং সত্যকথা গুঁতিলে জানানর অভিমান চরিতার্থ করছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ঘরসংসার সামলে পরের জ্ঞান পাটটাইম ডিলেট করতে অভ্যস্ত মহাপুরুষ নন। তাঁকে বুঝতে যে আন্তিক্যবুদ্ধি ও প্রদ্বাণীলতার প্রয়োজন, তা শ্রীযুক্ত মিত্রের কাছে। শ্রীযুক্ত মিত্রের দৃঢ়তার আমি প্রশংসা করি। তাঁর লেখ পড়ে বোঝা যায়, তিনি পূরোপুরি ভক্ত। ঐ ভক্তির কাঁড়নৌকে তিনি ঘূর্ণা করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যিনি যথার্থ দেবতা মানেন, তাঁর পক্ষেই দেবতার মন্দির নির্মাণের প্রলোভনকে দমন করা সম্ভব। শ্রীযুক্ত মিত্র বিবেকানন্দের সমাধির উপর কথার ভাজমতল নির্মাণ করেন নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে “বিবেকানন্দ স্তোত্র” গীরা প্রথমই সংগ্রহ করবেন, আমি তাঁদের অন্ততম। কেবল ভাল লেখা বলে নয়, শ্রীযুক্ত মিত্র আমাদের একটি বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন বলে। জীবনী লেখার অনেক পদ্ধতি আছে, একটি হোল বাণীর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। মিত্র মহাশয় এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করছেন। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি; বিবেকানন্দ বাণীর বরপুত্র নন, বিবেকানন্দের বাণীর চেয়ে বিবেকানন্দের জীবন অনেক বড়। কিন্তু উপলব্ধিবান পুরুষ বলে, বিবেকানন্দের বাণী চিন্তাসঙ্কলন মাত্র নয়—আত্মসাক্ষাৎকারের দিব্যচেতনা বহন করেছে তাঁর উক্তি। বিবেকানন্দই বিবেকানন্দকে উন্মুক্ত করে গেছেন। আর একজন বিবেকানন্দ না হওয়া পর্য্যন্ত গত বিবেকানন্দকে তাঁর বাণীর আলোকেই বুঝতে হবে। সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক নানা প্রয়োজনে তাঁর বাণীর বহুল ব্যবহার করা হয়েছে, তবু বিবেকানন্দ হিমালির গহন প্রবেশপথের দিশা ও দীপরূপে বিবেকানন্দের ছড়ানো বাণী-মণিখণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়নি এখনো উপযুক্ত রূপে। বিবেকানন্দ জীবনীর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত স্রমণি মিত্র এ বিষয়ে অগ্রণী জীবনীকার। অন্ত কারণ বাদ দিলেও, স্বামীজীর স্মরণিত সটিক বাণী সঙ্কলনরূপে আমার কাছে বিবেকানন্দ-স্তোত্র মহামূল্যবান হইবে থাকবে। সন্নিবেশের কৌশলে বিবেকানন্দকে কবিরূপে প্রতিভাত করেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। বীরবাণীর রচয়িতা

বলে বিবেকানন্দকে কবি বলছি না,—তিনি যা কিছু বলেছেন সত্যের দিব্যালোক ও দিব্যগন্ধময় সে সকলই গন্তব্যায় কথিত হয়ে কি আশ্চর্য্য অভ্যন্তর ছন্দকে অনাগ্রাসে রক্ষা করেছে—শ্রীযুক্ত মিত্র সেগুলিকে কাব্যর বাহ্যাকার দেবার পূর্বে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয়নি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য আমার যা সামান্য পড়া আছে তার থেকে বুঝতে পেরেছি শ্রীযুক্ত মিত্র কি ভাবে তাকে মন্থ করেছেন। তাঁর পরিশ্রমের সৃষ্টি আমাদের কাছে আনন্দের সামগ্রী মাসিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই লেখাটি প্রকাশের জন্য তো বটেই, ইতিপূর্বে নিবেদিতার উচ্চাঙ্গের ফরাসী জীবনীর অনুবাদ প্রকাশের জন্যও বটে। জীবনী কোথা কি ভাবে সাহিত্য হয়, তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে নারায়ণী দেবী অনুবাদ করা লিঙ্গেল রেমর নিবেদিতা। নারায়ণী দেবী শুধু অনুবাদ করেন নি, মরমী অনুভূতিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে বাংলা ভাষা শক্তিকেও প্রমাণ করেছেন। আত্মার মহান সঙ্গীতময় কাহিনীকে নিবেদিতার অনুবাদ আমাদের ভাষায় স্থায়ী আসন পাবে। আমি এবং আমার বন্ধুজনের অনেক গুণ আনন্দের আশ্রয় ঐ অনুবাদ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখব লিখব করেও কিছু মিথে ওঠা সম্ভব হয়নি আলমতবশে, এতে অপরাধ ঘটেছে, কারণ যে কোন স্মৃতির সৃষ্টিকে সঙ্গীতনা জানা পাঠকের পবিত্র দায়িত্ব। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, (বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক) ১ নম্বরপাড়া লেন, কালুন্দিয়া, হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith I am sending Rs. 15/- to you for yearly subscription for Monthly Basumati—Kabita Ghosal, Nirmal Kutir Jamshedpur.

আমিন মাস হইতে এক বৎসরের “মাসিক বসুমতী”র subscription পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সাধনা গাঙ্গুলী। মাননগর, নিউ দিল্লী।

‘মাসিক বসুমতী’ এক বছরের মূল্য বাবদ ১৫ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।—বেলা বাগ্‌চী। এলাহাবাদ।

১৫ আগামী আরও এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চান বাবদ পাঠাইলাম। আশা করি যথাসময়ে বই পাঠাইতে থাকিবেন। Malati Rani Ganguly. গ্রাঃ M 51076, Bombay.

বার্ষিক মূল্য মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা পাঠাইবেন। Sm. S. Bancrjee গ্রাঃ M 51353 Bilaspur.

আপনাদের মাসিক বসুমতী পড়ে কত যে ভাল লাগলো তা আর কি লিখবো। তাই আমি অল্প আবার বাৎসরিক গ্রাহিকা হবার জন্য ৭ টাকা ৫০ নয়া পরমা পাঠালাম। আমাকে আবার শ্রাবণ সংখ্যা থেকে বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রী প্রতিভা দে। শিবসাগর, আসাম।

মাসিক বসুমতীর জন্য ছয় মাসের ৭০ টাকা চান পাঠাইলাম। আমিন সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন। Dolly Pachal. Kadamtalla, Howrah.

Rupees seven 50 n. p. are sent herewith as subscription for Monthly Basumati for the months from Baisak to Aswin for Bengali year 1364. Purnima Sarker. Jabulpur.

# — আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক —

সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ  
অষ্টাদশপর্ক

## কাশীরামদাস-মহাভারত

শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্তী, এম্, এন্-সি-সম্পাদিত  
কলিকাতা-নির্ধারিতালয়ের বঙ্গভাষা-অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার  
সেন, এম্, এ, পি, এইচ, ডি-লিখিত কাশীরামদাসের  
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ভূমিকা-সংবলিত।  
বড় বড় অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। বহু ত্রির্বার-রঞ্জিত চিত্র ও  
চিত্রাকর্ষক প্রচ্ছদপটে সুশোভিত। মূল্য—১৬ টাকা

সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ  
সপ্তকাণ্ড

## কৃত্তিবাস-রামায়ণ

কবিত্বগণ পূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উত্তরাঙ্গর, বি, এ-সম্পাদিত  
(চতুর্থ সংস্করণ)  
বড়-বড় অক্ষরে নিহুঁল ছাপা। উৎকৃষ্ট কাগজে ২৫খানি ত্রির্বার ও  
২৬খানি একবর্ণ তাকটোন চিত্রে সুশোভিত। ইহাই একমাত্র  
সম্পূর্ণ ও সর্বাক্ষয়ন্য বারায়ণ। মূল্য—১২।০

সচিত্র

## শ্রীমদ্ভাগবত

[সমগ্র মূলগ্রন্থের বাঙ্গালায় গম্ভীরবাদ]  
পণ্ডিত-কুলতিলক খাচায়া পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অমূল্য  
অবলম্বনে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব জায়তীর্থ, এম্, এ,  
কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। মূল্য ১৫ টাকা।

## আয়ুর্বেদ-শিক্ষা

(আয়ুর্বেদমতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ)  
(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিত্বগণ কর্তৃক সংলিখিত ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ  
বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক কবিরাজ নলিনীকর সেন, কাব্য-  
ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ মহাশয় কর্তৃক আশ্রিত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত  
সপ্তম সংস্করণ। মূল্য—২০ টাকা।

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান-রচিত

## আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী

সমগ্র অভিব্যক্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সরল বাংলায় লিখিত একমাত্র  
প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৬৪৪ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট আটিক কাগজে মুদ্রিত ও  
৪১খানি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কটো ও ৪খানি ম্যাপসহ  
স্বকল্পিত প্রচ্ছদপটে সুশোভিত। মূল্য—৭।

অনুবাদক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

## পরমপরম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়  
বিবৃত হইয়াছে। মূল্য প্রচ্ছদপটে সুশোভিত ও চারিখানি  
চিত্র-সংবলিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৬ টাকা।

অম্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত

## ভক্তিশোণ

সংশোধিত ১৭শ সংস্করণ। মূল্য—৬ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ অতুলকৃষ্ণ দত্ত এম্-ডি প্রণীত

## হোমিওপ্যাথিক মেট্রিরিয়া মোডকা ও থেরাপিউটিক্স

পরিবর্দ্ধিত পবিশিষ্ট-সংবলিত অভিনব দশম সংস্করণ। প্রত্যেক  
চিকিৎসক, ছাত্র ও গৃহস্থের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাংলা ভাষায়  
লিখিত ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ অল্প কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ।  
উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ২০ টাকা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, এম্-এ প্রণীত

## আশুতোষের ছাত্র-জীবন

গ্রন্থে আলোচিত বাংলার উজ্জ্বল রত্ন আশুতোষের জীবনের এই  
পর্ধ্যায়টি ছাত্র মাত্রেরই আদর্শ-রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। ৭খানি  
চিত্র-শোভিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই। ৮ম সং। মূল্য ২।

রবীন্দ্র ও খান-বিজ্ঞানে বহুদর্শিনী লেখিকা

শ্রীবীণাপাণি দেবী সাহিত্য-সরস্বতীর

পবীক্ষা-সিদ্ধ বহু বহু জাতব্য তথ্যসহ অভিনব পাক-প্রণালী

## মেয়েদের পিকনিক

পবিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২।০ টাকা

— বিশ্বসাহিত্যে নবতম অবদান —

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প

হুড়িখানি একবর্ণ, দ্বিবার ও ত্রিবার চিত্রসহ  
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গল্প, কথক ও রূপকথার গল্প,  
ভূতের গল্প ও ডিটেকটিভ গল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধ।  
নয়নরঞ্জন প্রচ্ছদপটে বিমণ্ডিত—দীর্ঘস্থায়ী  
চমৎকার বাঁধাই। মূল্য—৪ টাকা।

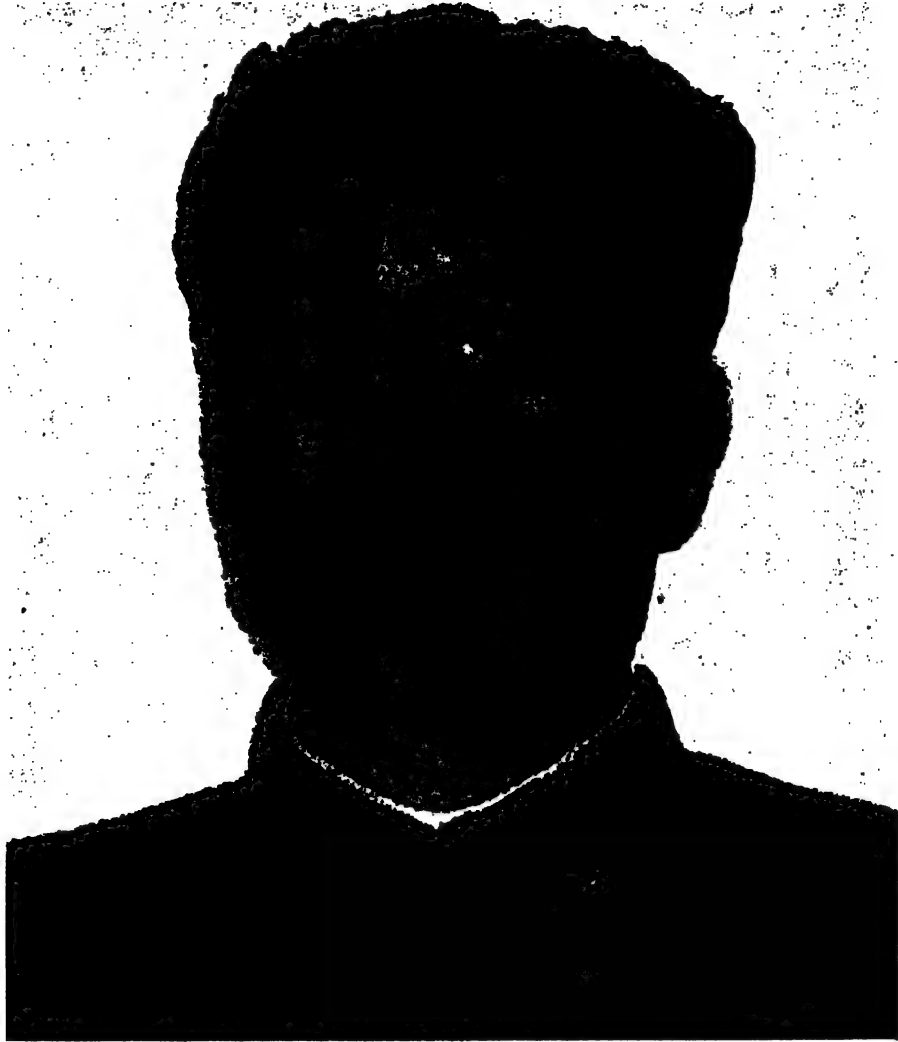
## শিবরামের সেরা গল্প

হুড়িখানি সপ্তদশ চিত্রসহ হস্তরসাত্মক গল্প ও  
নাটকের একত্র সমাবেশে সমৃদ্ধ। নয়নরঞ্জন  
প্রচ্ছদপটে বিমণ্ডিত—দীর্ঘস্থায়ী চমৎকার  
বাঁধাই। মূল্য—৪ টাকা।

## অচিন্ত্যকুমারের সেরা গল্প

অনুবাদক অচিন্ত্যকুমারের বিবিধ শ্রেষ্ঠ গল্প-  
সমূহের একত্র সমাবেশে সমৃদ্ধ। বহু চিত্রে ও  
সুদৃশ প্রচ্ছদপটে সুশোভিত—দীর্ঘস্থায়ী  
চমৎকার বাঁধাই। মূল্য ৪।

চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং-লিঃ—১৫, কলেজ স্টোয়ার, কলিকাতা—১২



( পঞ্চশস্ত্রে রচিত )  
॥ মাসিক বসুমতী ॥  
আধুন, ১৩৬৪

চু এন লাই  
শিল্পী—রথীশচন্দ্র চক্রবর্তী





মতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



# মাসিক বসুমতী

[ প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

৩৬শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৪ ]

## কথামৃত

আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, স্থষ্টির ভার জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নহে— তাহা হইতেই পারে না।...তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অন্তঃকরণের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনামুযায়ী শিত্ত প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ প্রসূত হইয়া আসে না, তাহার স্বকৃৎ অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্মের ফলভোগ করিতে আসে। আমরা জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈবশ্যের উৎপত্তি, ইহাই কথবিধান; আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠন রূপ।...বদি আমি অস্বপ্নী হই, তবে বুদ্ধিতে হইবে আমিই আমাকে অস্বপ্নী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি বদি ইচ্ছা করি তবে সুখীও হইতে পারি। বদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; তাহা হইতে ইহাও বুদ্ধিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি।

জীবাত্মা সকল অন্যাদি অনন্ত, তাহার বস্তুগত: অবিনাশী।

বিতীর্ণত: প্রত্যেক আত্মার সর্ববিধ শক্তি, পবিত্রতা, সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।...প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণিতে— সে বতই দুর্বল বা মন্দ হউক, সে বড়ই হউক, ছোটই হউক—সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে।...সংকৃত আত্মা ও ইন্দ্রজী soul শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাহী। আমরা বাহ্যকে মন বলি, পাশ্চাত্যেরা তাহাকে soul বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে আত্মা সবচে বর্ষাৰ্ধ জ্ঞান কোন কালে ছিল না।...আত্মা মন ও বুদ্ধিশরীর উভয় হইতেই গৃহক; এই বারগাটি মনের মধ্যে পরিভাষ্যভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা বুদ্ধিশরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যে সময় উহা সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ লাভ করে, তখনই উহার আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন উহা স্বাধীন হইয়া যায়— ইচ্ছা করিলে এই মন বা বুদ্ধিশরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পবিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জ্ঞান স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া বাইতে পারে। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব।

—বাবী বিবেকানন্দ

# তরু দত্তের জীবনী ও রচনা

ক্লারিস বাদে

১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে একটা চিঠি পাই—আমার প্রকাশকের মাধ্যমে। এক ভারতীয় তরুণী আমার ‘La femme dans l’ Inde antique’ “প্রাচীন ভারতে নারী” নামে বইটি অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়ে এই চিঠি লেখেন। চিঠির সাথে ছিল একটা বই : সন্দের ইংরেজী কাব্যে অনূদিত ফরাসী কবিতার সংকলন : ‘A Sheaf Gleaned in French Fields.’—একই সাথে পাওয়া এই বই ও চিঠির লেখিকার বয়স অতি অল্প, তা’ সঙ্গেও ইতিমধ্যে তিনি স্বদেশে ও ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। নাম তাঁর তরু দত্ত। কলকাতার এক খৃষ্টান-পরিবারের—মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও স্পণ্ডিত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের মেয়ে ইনি।

ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া এই চিঠিই তরু দত্ত ও আমার মধ্যে যোগাযোগের প্রথম সূত্র। সে সংযোগ নিয়তির বিধানে বড় তাড়াহাড়াই ছিল হল—এই প্রতিভাশালিনীর অকাল মৃত্যুতে। তাঁর লেখা সেই চিঠিগুলি (যা’ কলকাতা থেকে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত পরে প্রকাশ করেন, ‘এ শীফ গ্লান্ড ইন্ ফ্রেন্চ ফিল্ডস’-এর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে), তাঁর মৃত্যুর পর আমার লেখা শোকাচ্ছন্ন পিতার চিঠিগুলি আর তরু দত্তের কবিতার বইয়ের নতুন সংস্করণে সংযোজিত তাঁর সন্ধিস্ত জীবনী থেকে যে তথ্য পেয়েছি, তার সাহায্যে আমার মনের পটে সত্যিকার অসামান্য এক ব্যক্তিত্বের যে কয়েকটি মাত্র রেখা ফুটে উঠেছে, সেই রেখা ক’টি আজ পুনরুদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য।

১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ তরু দত্ত কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে সপরিবারে তাঁর বাবা ইউরোপে আসেন ও চার বছর এখানে কাটান। তরু ও তাঁর দিদি অল্প মাস কয়েক ফ্রান্সের একটি ছাত্রাবাসে থাকেন। তারপর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্স-এ তাঁরা বিশেষ উৎসাহের সাথে যোগ দেন।

তারপর গোবিন্দ বাবু সপরিবারে যখন কলকাতায় ফিরে গেলেন, তখন তিনি তরুকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে দীক্ষা দেন। তাঁর কন্ঠার পাঠ-সহচর্যেই তাঁকে আমরা সর্বদা পাই। চমৎকার একটি পারিবারিক চিত্রে তিনি দেখিয়েছেন মানিকতলা ষ্ট্রীটের পৈতৃক ভবনে কি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা পড়াশুনোর মধ্যেই ডুবে থাকতেন

তরুর এসঙ্গে তাতে তিনি বলেছেন : “ও খুবই পড়তে পারত ; তেমনি তাড়াহাড়াও পড়ত ; কিন্তু পড়ার সময় কোনও হৃদ্বোধ্য অংশ বাদ দিয়ে যাওয়া ওর খাতে সহিত না। নানারকম অভিধান আর শব্দকোষ বেঁটে, শব্দের মানে উদ্ধার ক’রে খাতার তথুনি

লিখে রেখে, তবে শাস্তি। ফলে কঠিন শব্দ বা বাক্যাগুলির মানে এমন সহজে ওর মনে গেঁথে যেত যে যখনই আমাদের মধ্যে কোনও তরু উঠত সংস্কৃত, ফরাসী অথবা জার্মান কোনও প্রয়োগ বা বাক্যাংশ সংক্ষেপে, দশ বারে অস্বস্ত আঁট বার ও-ই জরী হত। এক এক সময় আমার এমন জিদ চেপে যেত যে আমি বলতাম, ‘বেশ ত বাজি রাখা যাক!’ বাজির অঙ্ক ছিল সাধারণত এক টাকা। কিন্তু যখন কেতাব বেঁটে অর্থের সন্ধান মিলত, দেখা যেত ও-ই বাজি মাং করেছে। ও কিন্তু যখন হেরে যেত, বড় মজা লাগত তখন ওকে দেখতে। প্রথমেই প্রাণ খুলে খানিক হেসে নিত, তারপর আমার গালে পড়ত মুহূঁ টোকা, সেই সঙ্গে ওর প্রিয় কবি ব্যারেট ব্রাউনিং-এর হয়ত কয়েকটি লাইন, ‘হায় প্রিয়তম, বয়সে তুমি যে বড়, জানে তুমিই প্রবীণ, আর তুমি, তুমি যে পুরুষ!’—অথবা অন্য কোনও পরিহাস।”

পাণ্ডিত্যের কাছে সানন্দে মাথা নত করতে তরুর বাবা সদা প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি, নিজের কন্ঠার কাছেও তার ব্যতিক্রম হত না। এই সব কথা তাঁর কাছ থেকে বার বার শুনে আমরা চোখে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে তাঁর সন্তান-গৌরবে ধন্য পিতৃরূপ।

তরু দত্তের বাবা মেরেকে ইউরোপীয় শিক্ষার সাথে সাথেই প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলেন,—এখানেই আমরা দেখি ভারতের ওপর—মায় ব্রাহ্মণ ও ইসলাম ধর্মের ওপর—খৃষ্টান সভ্যতার প্রভাব কত স্পন্দর। মসিয়্য গারস্যা ড় তাসির মতে, “ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও পার্সীরা নিজেদের খরচেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইচ্ছুল খোলে, কেবল ছেলেদের নয়, মেয়েদের জন্যও। আজ অবধি এমন তাজ্জব কথা বড় শোনা যায় না।” \*

তরুর কিন্তু ইতিহাসের দিকে তেমন টান ছিল না। একদিন লর্ড ল... (লিটন ?) যখন কলকাতায় এঁদের বাড়ী বেড়াতে যান, তখন অরুর হাতে একটা উপন্যাস দেখে সেটা কেড়ে নিয়ে দুই বোনকে তিনি বলেন, “উপন্যাস বেণী পড়া ভাল নয়। ইতিহাস পড়া দরকার।”—তরু জবাব দেয়, “লর্ড ল... উপন্যাসই আমাদের বেণী ভাল লাগে।”—“কেন?” এই প্রশ্নের জবাবে তরু সপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, “কারণ উপন্যাস হল সত্যি, আর ইতিহাস

\* মসিয়্য গারস্যা ড় তাসি ভারতের নারীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীমতী মেরী কার্পেটারকে তিনি প্রাণে-মনে প্রাণা করতেন ভারতের নারী প্রগতিতে কার্পেটারের অগ্রদূত চেষ্টার জন্য।

কল্পিত" ("Because novels are true, and histories are false.")। এই ভাবে পরিহাসের মাঝেই সে বুঝিয়ে দিল একটা গোটা জাতের—কাব্য-পরায়ণ হিন্দু জাতের—কৃতির দৃষ্টিবিন্দু : ইচ্ছাশাস চাই না, চাই পুণ্য !

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের প্রতি তরুর ছিল গভীর ভালবাসা। আমার লেখা তার ফরাসী একটি চিঠিতে সে বলেছিল, "মাদমোয়াজেল, জানেন না, আমার স্বদেশের, আমার স্বদেশবাসীর প্রতি আপনার অনুরাগ (তার সাক্ষী আপনার বই, সাক্ষী আপনার চিঠি) কি ভাবে আমায় বিচলিত করে তোলে। আমি দৃষ্টকণ্ঠে বলতে পারি, আমাদের মহাকাব্যের যে কোনও নারী-চরিত্র প্রত্যেকের শ্রদ্ধার পাত্রী, প্রত্যেক হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ। সীতার চেয়ে কল্পণ, তাঁর চেয়ে প্রেমময়ী চরিত্র আমায় আর একটা দেখাতে পারেন? আমার ত বিশ্বাস হয় না। সন্ধ্যাবেলা যখন আমার মা আমাদের দেশের প্রচলিত গানগুলি গান, আমার হৃৎ-চোখ জ্বলে ভেসে যায়। দ্বিতীয়বার বনবাসের সময় সীতার বিলাপ, একাকিনী যখন তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দারুণ হতাশা আর ব্যথার মুহূর্ত—এ-দৃশ্য এমনি হৃদয়-বিদারক যে চোখের জল না ফেলে তা' কখনও শোনা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।"—এই চিঠির সাথেই তরু সংস্কৃত থেকে দীর্ঘ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আমায় পাঠিয়েছিল। তাদের স্বল্প পরিসরে যে তেজের পরিচয় পেয়েছিলাম তা' অবিস্মরণীয়! বিষ্ণুপুরাণের দুটি কাহিনী : 'ঐব', আর 'রাজবি ও যুগ'।

আজ্ঞা মায়ের মুখে প্রাচীন কাহিনী শুনে, বাবার কাছে সংস্কৃত পাঠের দীক্ষা পেয়ে তরু দস্তেব কণ্ঠে কি ধ্বনিত হবে শুধু তার দেশেরই বন্দনা? তার কাব্য-প্রতিভার বাহন হবে কি হিন্দুস্তানী? ভারতের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই কি তার বিষয়বস্তু হবে—যেখানে, গহন অরণ্যে স্বয়ং গরিমায় বিরাজিত অগণ্য বিটলী? সেকালের সংস্কৃত কবিদের মত সেও কি হরিণীর চঞ্চল গতিই অনুধাবন করবে একদৃষ্টে, দেখবে জড়োয়াখচিত মোটুশকিদের লাশ? বিশাল বনানীর বুকে, বিলম্বিত জাগ্রোদতলে শুনে কি শুধু কোকিলের কুহ-মাধুর্য? নাগিনীর হিংস্র স্বনন? যুগেন্দ্রের হুঙ্কার? বহু বর্ণের কমলশোভিত দৌঘিতে সে কি শুধু কেলিগুরু বলাকার পানেই তাকিয়ে থাকবে? নিদাঘের সূর্যকিষ্ট পর্বতে পর্বতে ফেনময়ী তরঙ্গিনী তটিনীর চপল মগ্নুখ কি সে বর্ণনা করবে, না কি বর্ণনা করবে উজ্জল নীলকান্ত আলোকে স্নাত চিরভূষারাবৃত হিমালয়ের হীরকচ্ছটা?

না! বায়ীকি ও ব্যাস-উল্লিখিত দৃগাবলী সামনে রেখে আমাদের এই ভারতীয় ঋতান তরুণী ফিরে দাঁড়িয়েছে নিশ্চিন্ত পাশ্চাত্যের পানে, যেখানে প্রাকৃতিক আকর্ষণ অনেক কম, কিন্তু মানুষের বহর অনেক বেশী। তাই, 'বিশেষী তরুণী'র প্রতি কবি শীল-এর উক্তি একটু বদলে নিয়ে ওর কবিতার বইয়ের শেষে ও লিখেছিল, "যে-ফুল, যে-ফল আমি এনেছি, তা আর এক দেশের, আর এক সূর্যের আলোয়, আর এক লাশময়ী প্রকৃতির বুক থেকে চ্যন করা!"

'Ich bringe' Blumen mit und Friichte,  
Gereift an einer andern Flur,

In einen andern Sonnenlichte,  
In einer glücklichen Natur.

(শীল-এর উক্তির প্রথমটা ছিল 'Sie brachte' Blumen...)

আমাদের ফরাসী কবিদের গানগুলি অনুবাদ করতে তরু বড় ভালবাসত; কিন্তু, ইতিপূর্বেই বলেছি, এই ভারতীয় তরুণীটি আকর্ষণীয় ছিল আমাদের সভ্যতার, তাই সে এই গানগুলি হিন্দুস্তানীতে অনুবাদ না করে করল ইংরেজীতে। ফলত, মসিয়্য গারসাঁ দু'তাসির স্বনামধন্য লেখনী মাধ্যমে আমরা ভারতীয় মহিলা কবিদের নামের যে তালিকা পাই, সে-তালিকা বৃদ্ধি না করে তরু অধিকাংশ করল তার আসন ইংল্যান্ডের কবিদের মাঝে।

কিন্তু আমাদের ক্লাসিকাল কবিদের কবিতা অনুবাদ করা এই তরুণী কবির উদ্দেশ্য ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের ধারণা ছিল যে ভাব আবেগ প্রভৃতির উচ্চে স্থান দিতে হবে মননশীলতাকে। কবিতা বলতে তাঁরা বুঝতেন একখণ্ড স্বচ্ছ ফটিক যার সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা স্বচ্ছন্দে পড়া চলবে। কাজেই ঐ শতাব্দীর ফরাসী লেখকরা এই তরুণী কবির চিত্র হরণ করলে পারেন নি। কারণ যে দেশ তাকে জন্ম দিয়েছে, সে-দেশে কবিদের মানেই ভাব, কল্পনা, আবেগ, আর সেখানকার প্রকৃতির মর্ম তা প্রাচুর্য-মণ্ডিত। তরু সত্যিই বাদে প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর কবিকুল। তাঁদের মধ্যেই সে খুঁটে পায় তার স্বদেশবাসীদের অমিষ্ট : হৃদয়ের প্রতিক্রিয়ার তীক্ষ্ণ নটকীয় প্রকাশ, উপমার যথেষ্ট ব্যবহার, বর্ণের বিপুল সমারোহ। মসিয়্য ভিক্টর হুগোর প্রতি তরুর উচ্ছ্বাস দেখে তা' আশ্চর্য হই না। তার কবিতার বইয়ে প্রতিটি কবিতার তলা তারই দেওয়া মন্তব্যে তাই সে সোৎসাহে টেঁচিয়ে উঠেছে : "এক পাণ্টিকায়, ছোট কয়েকটি লাইনের পরিসরে ভিক্টর হুগো সমস্ত মন্তব্য করা সত্যিই ঝুঁট! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অমর তাঁর নাম। শেক্সপীয়ার, মিলটন, বায়রণ, গোথে, শীলর প্রভৃতি সাথে পাশাপাশি তাঁর আসন বহুদিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে কবিদের স্বর্গে।"

যদিও তরু দস্তেব সক্রিয় কল্পনাশক্তি ভিক্টর হুগোকে লামার্তিনের চেয়ে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছিল, তবু তার আধ্যাত্মিক সত্তা দিয়ে সে স্বাকার্য করে নিয়েছিল 'মেদিতাসিয়' ও 'হাথলী' কবির (লামার্তিনের) নৈতিক মহত্ত্ব : "মেজাজে, কল্পনায়, উচ্ছ্বাসে উচ্চভাবে, ঠাইলে—কবির বলতে যা' কিছু বোঝায়—একমাত্র পরিভ্রমতা ছাড়া—সব কিছুতেই তাঁকে ভিক্টর হুগোর কাছে মানত করতে হবে। পরিভ্রমতায় তিনি অনন্ত। তাঁর অমর স্বভাবই আধ্যাত্মিক। সামান্য জননার কোলে বসে যে-শিক্ষা তিনি শৈশবে পেয়েছিলেন, তা' তিনি কখনও ভোলেন নি। জননী তিনি তাই সহস্রবার স্মরণ করেছেন তাঁর লেখনীর সপ্রেম অর্চনায়।"

তারপর মসিয়্য লাপ্রাদ সম্বন্ধে তরু দণ্ড লিখেছে, "লাপ্রাদ আর লামার্তিন হচ্ছেন বর্তমান ফ্রান্সের অতীতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁদের চরিত্রবলী গভীর, পবিত্র, আধ্যাত্মিক। দু-জনেই তাঁদের গর্ভধারিণী কাছে এ-বিষয়ে ঋণী। কারণ উভয়ের জননীই ছিলেন ভক্তিময় প্রার্থন বুদ্ধিমত্তা আর আত্মত্যাগী (Women of prayer, large minded and self-denying)।"

সামার্তিন, ভিক্তর হুগো ও লাত্রাদের সাথে সাথেই তরু দন্তের অমুবাদে ও মন্তব্যে আমরা পাই সমকালীন প্রায় প্রত্যেক পানাসির কবির উল্লেখ ; বেরাজের, লত্রা, ম্যুসে, ভিইনৌ, জীমতী জিরারদ্যা, স্যাং-ব্যড, ব্রিজো, পঁসার, গোতিয়ে, গুত্রা, রবুল, বারিয়ে, ওজিয়ে, বাতিস্বন, লকঁ-জ-সোল, গ্রাম, মাহুয়েল, কোপে, ল্যামোইন, প্রাদম, সুলারী প্রভৃতির।

তরু দন্ত কেবলমাত্র ফরাসী থেকে অনুবাদ করেই কান্ত হয়নি। তার উল্লেখ ছিল ফরাসী লেখিকা হওয়া। যে কয়টি পাণ্ডুলিপি সে রেখে গিয়েছে, তার মধ্যেই একটি মূল ফরাসীতে রচিত উপন্যাস পাওয়া গেছে : 'জীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী'—যা আমরা আজ প্রকাশ করছি আর বার সপ্তকে পরে আরো আলোচনা করব।

তরু দন্ত কেবল আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে ভালই বাসেনি, আমাদের জন্মভূমিকে সে ভালবেসেছিল নিবিড়ভাবে। ফ্রান্সের নিদারুণ দুর্ভোগের ক্ষণে তার এই ভালবাসার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তরু দন্তের বাবা কপি করে আমাদের পাঠিয়েছেন অপ্রকাশিত কয়েকটি হাতে-লেখা-পাতা যার বৃকে এশিয়ার এই দুহিতা, যখন পনেরো বছরও তার বয়স হয়নি, অমর করে রেখেছে আমাদের স্বদেশবাসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী এমন করুণ ভাবে, যা' দেখে কেউ বলবে না যে কোনও ফরাসী নারীর বৃকের কথা তা নয়। তরু তখন লগুনে ছিল। ওর বিদেশ-ভ্রমণের ডায়েরী থেকে—১৮৭১ সালের ২১শে ও ৩০শে জানুয়ারীতে লেখা—একটু তুলে দিই এখানে :—

"২১শে জানুয়ারী, ১৮৭১। লগুন। ৯ সিডনী প্রেস, অনপ্রো কোয়ার।—বহুকাল হল ডায়েরী লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শেষবার যখন এই ডায়েরী হাতে নিই, তারপর থেকে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেছে ফ্রান্সে! হায় রে! ফ্রান্সে কতই না পরিবর্তন ঘটে গেল! কয়েক দিনের জন্তু পারীতে যখন গিয়েছিলাম, কি রূপই তার দেখে এসেছিলাম। কি বাড়ী! কি রাস্তা! কি অপূর্ব সৈন্ত-বাহিনী! আর আজ? সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে! সব নগরীর স্বাধীনতা যে ছিল, আজ তার এক দৈন্ত! যুদ্ধ যখন বেধেছিল, সর্বান্তঃকরণে আমি ফরাসীদের পক্ষই নিয়েছিলাম—তাদের পরাজয় সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও। একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন যুদ্ধ পুরোদমে চলেছে, উপযুগ্যি যখন ফ্রান্স পরাজিত হয়ে চলেছে, তখন ফরাসী সন্ত্রাস্ট সপ্তকে বাবা কি বেন মাকে বলছিলেন—কানে এল। তাঁরের বেগে নীচে গিয়ে স্তনলাম, ফ্রান্স অধিকৃত ১০০-তারপর আরো কত দুঃসংবাদ এল : পারীর বিপ্লব, সন্ত্রাস্ত্রী ও যুববাজের ইংল্যাণ্ডে পলায়ন, সন্ত্রাস্টকে বন্দীরূপে উইলহেমশূহোহের কাছে প্রেরণ, পারীতে জাৰ্গন বর্বরতা, ট্রাস্‌বোর্গে বোমা! বোমার মুখে কি দুর্দশা ওদের! বাড়ী-ঘর গুড়িয়ে গেল। চারিদিকে বহিঃশীলা!...

হায়! হাজার হাজার লোক বৃকের রক্ত দিল তাদের দেশের জন্ত, তবু সে দেশকে পড়তে হল শত্রু-কবলে! এরা কি এমনই পাশে মগ্ন ছিল যে, ভগবানকে এরা চায় নি—যার ফলে এই যোব? না, এদের মাঝেই হাজার হাজার লোক ছিল, আজো আছে, ভগবানই তাদের সখল! ফ্রান্স, হায় ফ্রান্স, কি তোমার পতন! এই নিদারুণ অধঃপতনের পর, এই দৈন্তের শেষে, তুমি কি উঠে দাঁড়াবে না ভগবানের পানে, তাঁর প্রতি গভীর সন্তার অর্থ নিয়ে? আমি প্রার্থনা করি, শাস্তি আশুক, যেমে যাক এই রক্তক্ষরণ।

৩০শে জানুয়ারী। সোমবার। যখন আমরা পোবাক বদলাছিলাম, প্রাতঃরাশের ঘণ্টা বাজল। নীচে গিয়ে আমাদের ইতালীয় চাকরের মুখে স্তনলাম, পারীর পতনের সংবাদ। ১০০-টাইমস্ পত্রিকায় পড়লাম, "কাল জাৰ্গনরা দুর্গগুলি অধিকার করবে।" টেলিগ্রামে এই খবরই পাওয়া গেছে। এতক্ষণে বোধ হয় দুর্গ ওরা অবরোধ করে ফেলেছে। প্রত্যেক রেজিমেন্টের অস্ত্র-শস্ত্র ওরা কেড়ে নেবে ১০০-ফ্রান্স, হায় ফ্রান্স! আমার বৃক থেকে আজ রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

ভারতীয় এক তরুণীর লেখা এই ক'টি পাতায় আমি খুঁজে পেলাম সেই স্মৃতির ব্যথা, সেই বৃক-ফাটা কান্না, সেই প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব, স্বদেশ-প্রেমের সেই স্বতঃস্ফূর্তি—যা এক দিন ঠিক ওই সময়েই আমার বাধ্য করেছিল অখ্যাত এক ডায়েরীর পাতায় আত্ম-প্রকাশ করতে। সত্যিই, এশিয়ার এই তরুণীর বৃকে যে হৃদয় ছিল, তা' আমাদেরই মত যে-কোনও ফরাসী রমণীর। সত্যিই আমাদের সেই দুর্গতির দিনে ঝুরে ঝুরে সেই হৃদয় থেকে আমাদেরই মত নীরবে রক্ত ঝরে পড়েছিল।

তরুর এই ডায়েরীতেই আমরা উল্লেখ পাই তার দিদি অরুর। মনোবৃত্তি ও ক্রটিতে দুই বোন ছিল অভিন্নাঙ্গী। দুই বোনই ঘর-কন্নার খুঁটিনাটির মধ্যেই গভীর অধ্যয়ন ও কাব্য-চর্চার অবকাশ কি ভাবে পেতে হয়, জানত। তরুর প্রতিভার পথ থেকে অরু নিজেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন রাখত, যাতে ছোট বোনের বিকাশের কোনও অসুবিধা না হয়। আমার চোখের সামনে দুই বোনের একটি ফটো মেলা আছে, বার মাঝে দুটি জীবনের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। অরু—সৌম্য, শান্ত, সংযত—বসে আছে; তারই পাশে, প্রেমে, নিবিড়তার অরুকে বেন আজুল করে দাঁড়িয়ে আছে তরু—প্রাণোচ্ছল, অপূর্ব কেশদামমণ্ডিত, কাজল-চোখে আগুনের সুরণ!

অরুরও বাসনা ছিল ফরাসী সাহিত্যের বৌদীতে তার অজলি তর্পণ করবে। তার অনুদিত কবিতার মধ্যে 'The young captive'-ই অল্পতম। এই প্রশস্তি-কাব্য সে আশ্চর্য কৃতিত্বের সাথে অমুবাদ করেছিল। তার রচনা-শৈলী হৃদয় কবি শেনিয়ে-র ফরাসী কবিতাকে স্নান করে দিতে পারত। কবি Coigny-র মত সে-ও বৃথি বলেছিল,—

"এ-সুখ বসন্ত মোর; দেখে যাব নবান্ন-উৎসব ;

\* \* \*

উত্তান-গরিমা-রূপে মোর কাণ্ড 'পরে  
আজ্ঞো শুধু হেরি নব অরুণাভা যবে,  
অখণ্ড দিবস আমি দেখে যেতে চাই।

\* \* \*

মরিতে চাহি না এই জীবন-প্রভাতে!"

১৮৭৬ সালে তরুর কবিতার বই প্রথম প্রকাশ কালে সে লিখেছিল, "এইখানে জানিয়ে রাখি যে A-স্বাক্ষরিত কবিতাগুলি অমুবাদিকার একমাত্র প্রিয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরুর অমুবাদ। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, ১৮৭৪ সালের ২৩শে জুলাই, সে বীভূত চরণভঙ্গে চির-বিশ্রাম লাভ করেছে। ১০০-সে যদি আজ বেঁচে থাকত তবে তার সাহায্যে বইটিকে সমৃদ্ধতর করে তোলা যেত ১০০-ভাষায় বা লেখনীতে



প্রকাশবোগা যত কথা আছে তার মধ্যে সব চেয়ে করুণ হচ্ছে, 'হতে পারত' কথাটি।"

একথা তরু যখন লেখে, তার আগেই সেই ব্যাধির লক্ষণ তার মধ্যে লেখা যায়, যে-রোগের কবলে পড়ে তার দিককে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। ১৮৭৭ সালেই আমার লেখা তার দ্বিতীয় পত্রে সে লিখেছিল, একটি বিশেষ ধরনের কাশি তাকে সর্বদা ভোগাচ্ছে। একদিন সে আমায় জানিয়েছিল, হঠাৎ পারী-তে সে আবার আসছে : তার বাবা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে গুর চিকিৎসা করতে চান। ছুটি সন্তান ইতিপূর্বেই হারানোর পর গুর বাবা তাঁদের শেষ সন্তানটিকে বুখাই যমের নজর থেকে আড়াল করবার চেষ্টা করছিলেন। তরুর শরীর কিন্তু এমন ভেঙে পড়ল যে ইউরোপ যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। ৩০শে জুলাই তরু আমার কাঁপা হাতে লেখে ; "মাদামোয়াজেল, দারুণ অসুখে ভুগলাম। বাবা-মার একান্ত প্রার্থনা ভগবান শুনেছেন, আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠছি। শীঘ্রই আপনাকে বড় করে চিঠি লিখতে পারব আশা করি।"—সমস্ত বুকের রোগেই শেষ অবধি এমনি অলীক আশা রোগীকে ঘিরে রাখে।

আমায় সে আর চিঠি লিখতে পারে নি। তবে অনেক দিন আগে, এক বিবাদভরা মুহূর্তে সে আমায় যে ফরাসী লাইনটি পাঠিয়েছিল, হঠাৎ সেই লাইনটিই সে বারে বারে আবৃত্তি করেছিল শেষ সময়ে।

"অচেনা বঁধু, প্রিয়তমা, বিদায়, মোরে বিদায় দাও।"

তরুকে কোন দিন দেখি নি, তবু ওকে ভালবেসেছি। গুর প্রতিটি চিঠিতেই গুর অন্তরের সরল মাধুর্যের, গুর স্পর্শকাতর মনের, গুর সদাশয়তার পরিচয় আমি পেতাম, যার ফলে ক্রমেই ও আমার নিকটতম আত্মীয়ের মত হয়ে উঠেছিল, আর যার ফলে, ইউরোপীয় খুঁটান সভ্যতায় বড় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, গুর স্বভাবে ভারতীয় নারীর মজাগত ধর্ম আমার চোখে ফুটে ওঠে। তা'ছাড়া মাত্র বাইশ বছর বয়সে আমি যে-ভারতীয় নারীদের আদর্শে অমুপ্রেরিত হয়ে প্রথম বই লিখি, তাঁদেরই একজন বংশধরের হৃদয়ভরা ভালবাসা সাত সাগরের পারে থেকেও কি ক'রে আমি উপেক্ষা করি ?

তরু দত্ত সেরে উঠছে জেনে ওকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। গুর মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম গুর মা ও বাবাকে। 'নংর-দাম দে ভিক্তোয়ার' এর একটি প্রতিমূর্তি আমার ঘরে ছিল। তারই সামনে রাখা একটি তোড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ওকে আমি একটা ফুল পাঠাই। ফুলটি 'আমারাহ'। লালচে পাঁপড়িগুলো এর কখনও শুকিয়ে যায় না। অমরতার প্রতীক। হয় রে ! তরু দত্তের নামে এ উপহার যখন পাঠাই, তার বেশ কয়েক দিন আগেই সে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যায় ! গুর বাবা-মার হাতে পড়বে আমার অভিনন্দন-পত্র, ওরই আরোগ্য-কামনায় লেখা :—

"গত ৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা ও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সেই লোকের পানে—যেখানে বিরহ আর ব্যথার নাম কেউ শোনে নি।" গুর বাবা আমায় লিখে পাঠালেন, "ভগবানের প্রতি গুর বিশ্বাস ছিল অসীম ; এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে এসেছিল গুর সত্তায়। একদিন ও ডাক্তারকে বলেছিল, 'দেখুন, শরীরের অসুস্থ

বস্ত্রগাই আমার চোখ দিয়ে জল টেনে আনে ; তা' নয়ত অন্তর আমার আজ অপরিমিত শান্তিতে মগ্ন। জানি ভগবানই আমার সহায়।'—এমন শান্ত স্বভাবের মেয়ে আমি দেখি নি, আমার এই শেষ সন্তানটির মত। আমার স্ত্রী ও আমি আজ, জীবনের সায়াহ্নে, নিঃসঙ্গ পড়ে আছি শূন্য এই গৃহে যার প্রতিটি কোণ একদিন মুখরিত ছিল আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় তিন সন্তানের কলস্বরে। না, আমাদের ভগবান আছেন,—তিনিই সবার গতি, সব দুঃখে তিনিই সাহায্য। সেদিন আগন্তব্য, যেদিন আমরা সবাই আবার মিলিত হব পরমেশ্বরের চরণতলে চিরদিনের জন্য।

আমায় এই চিঠি লেখার কিছুকাল আগেই তিনি তাঁর কল্পা তরুর জীবনী লেখা শেষ করেন এই ভাবে, "কেন এই তিনটি তরুণ জীবন তাদের বিরাট অশ্রাময় ভবিষ্যতের মায়া কাটিয়ে চলে গেল, আর আমি, পত্নীপ্রায়, পড়ে রইলাম এই শোচনীয় জীবন বাপন করতে ? আমার মনে হয়, এ-সবই প্রস্তুতি—গুরের অনাগত জীবনের জন্য এ-সবের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমন দিন আসবে যখন সব ঝৈয়ালীই পরিষ্কার হয়ে যাবে আমার চোখে। জয় পরমপিতার জয় ! তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক !"

এই স্থির বিশ্বাসের মাঝেই আমরা বুঝি তরু দত্তের জীবনে তার পিতার প্রভাব কত গভীর, আর তাই তাঁর প্রতি আমাদের সম্রদ্ধ চিন্তা স্বতঃই নত হয়।

তরু দত্তের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই 'Calcutta Review' পত্রিকায় তার প্রিয় কবি Gramont থেকে অনূদিত তার আটটি সনেট প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সনেটটি ঐশী করুণার মাহাত্ম্য সূত্রে রচিত। তরু দত্তের ব্যক্তিগত জীবনের শেষ কথা ক'টিই যেন এই সনেটে প্রকট হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম সনেটটির ভাবাবলম্বনে সনেটগুলির তলায় মন্তব্য করা হয়, ভগবানের ভালবাসা পৃথিবীর এই অসুট প্রশ্নটিকে যেন স্বর্গের দিব্য-পরিবেশে ফুটে উঠতে সাহায্য করে।

তরু দত্তের অকাল মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-ক্ষতি হল, তারই প্রসঙ্গে রচিত শ্রদ্ধার্থ দেশ-বিদেশের যত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে পূর্বোক্ত পত্রিকাটি অন্যতম। 'Calcutta Review'-এ লেখা হয়, "তরু দত্ত ইংরেজী লিখতে পারতেন উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজ রমণীর মতই সুরচিসম্পন্ন সুদক্ষ ভঙ্গীতে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কোমল, অন্তরুখী, করুণ-রসাত্মক, গভীর ধর্মভাবাপন্ন, নিকূল্য উৎসাহিত করবার আলোয় সমুজ্জ্বল,—যা বর্তমান শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের মাঝে তাঁর চিরস্থায়ী আসন পেতে রেখেছে।"

ভারত-অমুরাগী খ্যাতনামা ফরাসী পণ্ডিত, পারী-র এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি মিসিয়া গারস্যা ড় তাসি একটি জনসভায় এই ভাবে তরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেন, "গত ৩০শে আগষ্ট, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তরু দত্ত কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারী ; এই বয়সে তাঁর স্বদেশী ভাষা, পবিত্র সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না কেবল, শুদ্ধ ভাবে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী অনর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন। এতে আমরা আশ্চর্য হই না, কারণ ইউরোপাই ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র। সব চেয়ে বড় কথা, যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা ছাত্রাবাসের গভী কাটিয়ে উঠতে পারে না, সেই বয়সেই, আশন

প্রতিভাশীল অল্পান লেখনীনিঃসৃত ইংরেজী কবিতার সঙ্কলন তিনি প্রকাশ করেন। উত্তরকালে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Fields' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, অপূর্ণ ইংরেজী কবিতার অনূদিত কয়েকটি ফরাসী কবিতার সঙ্কলন। এই তরুণী নিজেকে যে খাটি ভারতীয় বলে আমার কাছে ব্যক্ত করেছিল, এ হচ্ছে পরমশ্রদ্ধাপন্ন, পরমপণ্ডিত, কলকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সর্বশেষ সন্তান। গোবিন্দ বাবু ইতিপূর্বেই আর এক গুণবতী কন্যাকে হারিয়েছেন; এ-ও মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যক্ষাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।\*

ভারতের বড় লার্ড লর্ড লিটন-ই প্রথম এগিয়ে যান শোকসন্তপ্ত গোবিন্দ বাবুকে সহানুভূতি জানানতে। ইংল্যান্ডের সাহিত্যে ও রাজনীতিতে বংশানুক্রমে ষাঁদের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই পরিবারের সুযোগ্য সন্তান 'clytemnestre' গ্রন্থের লেখক লর্ড লিটন—নিজের একজন উঁচুদরের কবি—অত বড় ভারতীয় প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিবেদনের সুযোগ্য ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে মরণ থাকতেও পারে যে বিখ্যাত 'Last Days of Pompei' গ্রন্থের Lady Lytton-Bulwer ছিলেন লর্ড লিটনের জননী। জননীর প্রভাব তাঁর চরিত্রের ওপর এমন গভীর রেখাপাত করে যে, কখনও নারীর মাঝে প্রতিভার সন্ধান পলে সমস্মানে সে প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানো ছিল লর্ড লিটনের বৈশিষ্ট্য। এঁরই কাকা লর্ড হেনরি লিটন ফ্রান্সে রাজত্ব ও সাহিত্যিক-রূপে একাধারে জনপ্রিয় হন। ভারতের বড়লার্ড লর্ড লিটনকেই গোবিন্দ বাবু তাই তাঁর কথায় অপ্রকাশিত এই ফরাসী উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন।\*

তরু দত্তের মৃত্যুর পর গোবিন্দ বাবু তাঁর সন্তানদের সাথে পরলোকে পুনর্মিলিত হবার আশার বুক বেঁধে আগ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁর প্রিয় কন্ঠার রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচার করতে। তরু জীবনী-সম্বলিত 'A Sheaf Gleaned in French Fields'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশান্তে তিনি স্থির করেছেন, ফরাসীতে লেখা তরুর উপন্যাসটি ফ্রান্সেই প্রকাশ করবেন। আমি তাই 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী' ফ্রান্সে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি।

তরু দত্তের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে আমি আবেগে অধীর হয়ে পড়ি। লেখাটি আগাগোড়া তার বুড়ো বাবা বসে বসে কপি করে পাঠিয়েছেন : "লিখতে গেলে হাত আমার কাঁপে; ধীরে ধীরে তাই কপি করতে হয়েছে,"—গোবিন্দ বাবু এই বিরাট কাজে হাত দেবার পর আমার জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুস্বন্দ লেখার কোথাও বিলম্বমাত্র রূপে যাবার চিহ্ন পেলাম না। এই কঠোর অথচ দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করবার সময় এক নতুন প্রেরণায় তিনি উবুদ্ধ হয়েছিলেন তা' সহজেই বোঝা যায়; আমার তিনি লিখেছিলেন, "বতরুণ ধূপি করি, মনে হয়, আমি ওর সাথেই কথা বলছি।"

পরিবেশে ও প্রেরণায় 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী' বতই ফরাসী হোক না, বত বার পড়ি, আমার মনে পড়ে যায় আমাদের

দেশের টবে-সাজানো বিদেশী ফুলের কথা : এ-দেশের জল-হাওয়া তাদের মতই সরে যাক, তবু গন্ধ থেকে যায় সুদূর এক ভিন্-দেশের মাটির। ভারতের প্রভাব তেমনি এই উপন্যাসে থেকে গিয়েছে। মার্গরিৎ আর্ভের-এর প্রেমাস্পদ নরহত্যা করে নিজেকে সমাজের চোখে ঘৃণিত করে তুললেও, মার্গরিৎের মনোভাব তার প্রতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল,—এর মধ্যে শুধু বাইবেলের শিক্ষাই মূর্ত হয়ে ওঠে নি। হিন্দু সমাজের সেই রীতির কথাও মরণে আসে। পতি ভাল হোক মন্দ হোক, সং হোক, দুষ্চরিত্র হোক—তবু সে দেবতা! নায়িকার স্বভাব-মাধুর্য ও নম্রতা, প্রত্যেক চরিত্রের স্বচ্ছতা, কবিত্বময় উপমা—সব কিছুই আমাদের বারে বারে ভারতীয় জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবু অনেক ভারতীয় লেখকদের মাঝে প্রাচীন অথচ সহজলভ্য বা' নয়, তা' এই বইয়ে আমরা পাই : স্মৃতি ও সংযম। ইংরেজী জীবনের প্রভাবও এর মাঝে কিছু পাওয়া যায় : পারিবারিক বর্ণনা ও Home-এর নিবিড় আত্মীয়তা।

এই উপন্যাসে আমরা কাব্য থেকে নাটক, নাটক থেকে কাব্য ঘুরে ফিরে আসি। অসাধারণ এর উদ্ভাবনা-শক্তি। ভারতীয় নারীদেরই মত স্বাভাবিক অথচ ফলপ্রসূ ভাবায় মার্গরিৎ আর্ভের-এর প্রতিটি ভাব-পরিবর্তন তরু সহজেই ফুটিয়ে তুলেছে—একাধারে তাক্ষণ্যের নির্মল আনন্দ থেকে প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ, অল্প দিকে সাক্ষী সতীর, নবীন জননার সাংসারিক সুখ থেকে মৃত্যুর দারুণ বেদনা অবধি। মার্গরিৎের দিনপঞ্জীর প্রথম কয়েকটা পাতার আমরা পাই এক পঞ্চদশীকে কেন্দ্র-ক'রে অবচ্ছিন্ন পারিবারিক স্নেহচ্ছায়া; তারপর হৃৎকণ্ঠের রক্ত আবেগে, পূর্ণদীপ্তিতে জেগে-ওঠা নারীর আত্মচেতনা, অব্যক্ত ব্যথায় সে ফিরে ঝাঁড়ায় আশ্রয় পবিত্রিত ক্রুর পানে। ফ্রান্সের পল্লীবালায় ধর্মভীরুতা স্মরণভাবে এঁকেছে তরু দত্ত। মার্গরিৎ আর্ভের-এর চিত্তে ছেলেবেলার কনভেন্টের স্মৃতির কত মূল্য তা জানা যায় ভগিনী ভেরোনিকের মৃত্যুতে তার মনোভাব দেখে; আর তাঁর স্বর্গে অবস্থানের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের মাঝে। পরিণয়ের মঙ্গল-স্বত্রটিও তাই দেবমাতা মেরির চরণতলে উৎসর্গ ক'রে নিজেকে সে ক'রে তোলে তাঁর একান্ত আশ্রয়ের উপযুক্ত। পত্নী ও মাতারূপে সে তাই ভোলে নি প্রেমাবতারের জননীকে।

বহু বার মার্গরিৎ আর্ভের-এর কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এ-ও বৃষ্টি ভারতীয় এক তরুণী আমাদের ফরাসী খুঁটান আওতায় বড় হয়ে উঠেছে। তরু দত্তের চিঠি-পত্র প'ড়ে তার চরিত্র-বৈকল্প নিয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, সেই তরু দত্তের কণ্ঠই যেন থেকে থেকে স্তন্যে পেরেছি মার্গরিৎের কণ্ঠে। এই নায়িকার মধ্যেই বার বার খুঁজে পেয়েছি তরু দত্তের নিরাবরণ কমনীয় সত্যকে, তার হৃদয়ের স্পর্শকাতর ভালবাসাকে, ভগবানের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসকে। শ্রীমতী আর্ভের-এর পিতৃভবনই যেন তরু দত্তের বাসগৃহ। পিতা-মাতা পরিবেষ্টিত মার্গরিৎকে দেখে মনে পড়ে যায় বাবা-মার স্নেহনীড়ে লালিত তরু দত্তের মুখ।

মৃত্যুর ষে-ভাবনা ধীরে ধীরে মার্গরিৎ আর্ভের-এর দিনপঞ্জীতে খনীভূত হয়ে উঠেছে তা' লক্ষণীয়। বোড়শীর মনে প্রথমে জেগেছে বিষয়, মানুষ কি ক'রে নিজের মরণ-কামনা করতে পারে? উদ্দাম যৌবনের সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে, "হায় ভগিনী ভেরোনিক! কতই বা তাঁর বয়স!

\* তরু দত্তের যে কয়টি রচনাবলীর উল্লেখ এ বাবৎ করেছি, তা ছাড়াও তার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মাঝে পাওয়া গেছে কিছু মৌলিক ইংরেজী কবিতা এবং একটি ইংরেজী উপন্যাসের আটটি পরিচ্ছেদ।

এই ত সব ছাবিশ বছর পূর্ণ হয়েছে (মৃত্যু? এত কাছে? পরম-পিতার স্নেহে, আনন্দে মুখর এই গৃহ ছেড়ে যাওয়া? ভগিনী ভেরোনিক পরম সুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। জীবন কি শুধুই তিক্ততার একটানা অভিজ্ঞতা? মাধুর্ষ কি সেখানে নেই?—এ অবধি আমি ব্যথা কি কোন দিন জানতে পারি নি। এই জগৎ...কী সুন্দর!”

কিন্তু গুর ভুল ভাঙতে দেয়ী হয় না। জীবন তার স্বরূপ নিয়ে মার্গরিভের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। মানসিক উদ্বেগের পরেই আসে শারীরিক বর্ণনা: তরু দত্ত বথার্থ বাস্তবিক জীবনের রস দিয়ে তা' ব্যক্ত করেছে। লেখিকার নিজের জীবনের ছায়া ও অন্তরের অন্তিম অভিজ্ঞতা পুরোমাত্রায় উপস্থাসের শেষ অংশটিকে সমাচ্ছন্ন করে তুলেছে মৃত্যু-চিত্তায়। তবু মৃত্যুর সাথে চিরজ্ঞানের ধ্যানই গ্রথিত হয়ে আছে। ভগিনী ভেরোনিকের অন্তিম-শয্যায় যে অমরতার আলো দেখা দিয়েছিল, সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মার্গরিভের শেষ মুহূর্ত, সেই আলোই ভাব্যর হয়ে ওঠে তরু দত্তকে ঘিরে।

মার্গরিভের মাঝে আমরা যদি তরু দত্তের ভাবধারা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অকাল-মৃত্যুর সাদৃশ্য পেয়ে থাকি, সে সাদৃশ্য এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তরু দত্তের জীবনে আসেনি সেই ঝড়, যে ঝড় মার্গরিভের জীবন-কলিকে অকালেই বৃন্তচ্যুত করল। অল্প বয়সেই তরু দত্ত ইহলোক ত্যাগ করে। দাম্পত্যের ও মাতৃহের প্রেম-রসে সে ছিল বঞ্চিত। শুধু তার হৃদয়ের প্রশস্ততাই কল্পনায় তাকে এ ভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। তার মা আর বাবা একমাত্র রয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে—তার সাথে পরলোকে মিলিত হবার পরম-লগ্নের অধীর প্রতীক্ষায়! যদিও তার জীবনের স্মৃতি সবচেয়ে বড় করে আঁকা আছে তার বাবা-মার অন্তরেই, তবু তার সাহিত্যের খ্যাতি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আজ পৌঁছে গেছে। ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে এই বশস্বিনীর গৌরব নিয়ে ইতিমধ্যেই কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। আমি বলতে পারি, ফ্রান্সেও চিরদিন সবাই স্মরণ করবে এই তরুণী বিদেশিনীকে, ফ্রান্সের দীনতম মুহূর্তে আপন ভাবা ও হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যে নিজেকে ফরাসীদের সাথে অভিন্না মনে করেছিল।

অমুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

## আলো আলো চোখে

জয়ন্তী সেন

মেঘ থেকে মেঘ-বেন সিঁড়ির ক' ধাপ  
আকাশের নীল হ্রদে সেখানে আনত  
আলো আলো মুখ কার ছায়া ঘন সোনালী আভার  
চেনা মনে হয় তাকে বিকেলের ঝিলিমিলি রঙে।  
সবুজ টিয়ার টিপ গোখুলির সলাজ কপালে  
ভীকু পায়ে ধাপে ধাপে নীল জলে ছায়ার কাঁপন  
হলুদ আঁচল ওড়ে এলোমেলো পাড়ের জরিভে  
ছুটি তারা ঝিকিমিকি—চোখ ভরা সাঁঝের কাজল।  
দেখেছি কি তারে কড় জীবনের চেনা সরগীতে  
দিনের প্রথর রোদে—তারাহীন রাতের গ্রহরে?  
দিনের রাতের ঋতু পালা করে আসে বার বার  
ক্রমাগত প্রত্যাহের ফুল-ফোটা সাজ করে করে;  
পরিচিত সেই ক্ষণে জীবনের হরেক তাগিদে  
পাথুরে জমির পরে পথ কেটে চলার প্রয়াসে  
স্বপ্নেরা উধাও পাখী—মেঘে তার চিহ্ন পলাতক।  
শুধু গোখুলির ক্ষণে শেষ আলো-কণাটির মত  
ছায়া তার ভাসে মনে মেঘে মেঘে আকাশের নীলে  
পলক স্কুলিক তরে ভালো লাগে ক্ষণিক আভাস  
কবিতার ছুটি কলি ভুলে যাওয়া গানের চরণ  
ইঠাৎ স্মরণে পাওয়া মধুস্মৃতি অনেক কালের  
সে বেন মধুরতর আলো আলো চোখে চেয়ে থাকে  
দিনের ভাটির শেষে তারা-জ্বা হাসিটুকু নিয়ে।

# স্মৃতিচিহ্ন

পরিমল গোস্বামী

বলাইচাঁদ এ সময়ে (১৯২৫-২৬) 'বনকুল' নামে মোটামুটি পাঠকমহলে পরিচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তবু লেখাটা তখন তার নিতান্তই একটা শখের ব্যাপার ছিল, যেমন তখনকার দিনের অধিকাংশ লেখকের ছিল। লেখা যে জীবিকারূপে গ্রহণ করা যায় তা সাধারণ শৌখিন কোনো লেখকেরই তখন মনে আসেনি। পরবর্তী যুগে বনকুল বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছে তার গল্প এবং উপজ্ঞাসে—সবই প্রায় তার নিজের দেখা চরিত্র। দেখার চোখ তার এমনই সজাগ যে খুঁটিনাটি কোনো কিছুই সে চোখে এড়ায় না, এটি বনকুলের লেখার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু এর আরম্ভে বলাই নিজেরই যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে খেয়াল তার ছিল না। খেয়াল না থাকার কারণ বলাই আত্মসচেতন ছিল না। তার নিজের সম্পর্কে কে কি ভাববে বা বলবে তা সে তার অসাধারণ ঔদাসীয়ে অগ্রাহ্য করে চলার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। একটা হৃদান্ত প্রাণশক্তি সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে দুঃসাহসিক বাস্তব সাহায্যে উন্টে দিত। এ বিষয়ে তার মতো দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি! এ দিক দিয়ে সে তার গুরু ভাস্কর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত শিষ্য ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ছেঁড়া ছোকরাই নেই। মাটিতে বসে পড়ত যেখানে সেখানে। চলে চিকিৎসা পড়ত না আসে। মূলো পারে বিছানার স্তরে পড়ত। দাড়ি গজাচ্ছে মুখে, ক্রমেকপ নেই। একটা বৈপ্লবিক স্বাভাব্যতা।

একবার তার ৩নং মিজাপুর স্ট্রিটের মেসে থাকতে এক কস্তার শিতা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। বলাই সোজা বলে দিল, "না আমি এখন বিয়ে করব না।" ভুললোক তবু একবার ঘরে দেখতে অল্পবোধ জানালেন। বলাই তার উত্তরে বলল, "বিয়ে করতে চাইলে কনের নাক ক ইঞ্চি বা চামড়া কেমন তা কখনো দেখব না, দেখি তো ব্রাড স্পিউটাম ইউরিন রিপোর্ট দেখব। বিয়েতে আমার ন্যূনতম শর্ত থাকবে এই যে প্রথমত সে একটি মেয়ে হবে, দ্বিতীয়ত ম্যারিট্রিকুলেশন পাস হবে, এ ভিন্ন চামড়ার রঙ বা নাকমুখের মাপে আমার ইন্টারেস্ট নেই।"

ভুললোক অতঃপর আর আসেননি।

বলাই চরিত্রের আরও একটা দিকের কথা বলা দরকার।

ভাঙার দিকটা বলেছি, গড়ার দিকেও সমান উৎসাহ ছিল। তখনকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে! এক জটাজুটধারী ব্যক্তিকে তখন ট্রামে বা পথে প্রায় দেখা যেত। জটা আজমুলবিশিত, দাড়ি নাভিপ্পর্শী এবং পরনে গৈরিকবাস। চেহারাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। বলাই একদিন লক্ষ্য করল তার চোখের নিচে, গালের যেটুকু স্থান দেখা যায় সেখানে কে যেন চড় মেয়ে আঙুলের চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে, জায়গাটি লাল হয়ে উঠেছে।

বলাই তাঁকে একদিন পথে ধরে বলল, "আপনার মুখে যে ভয়ঙ্কর অশ্রুধের চিহ্ন দেখা দিয়েছে—হয় তো কুষ্ঠ হবে, অবিলম্বে চিকিৎসা করা দরকার। চলুন আপনার বাড়িতে সব ব্যবস্থা করছি।"

গেল তাঁর বাড়িতে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবেশ। গুরুগিরি ব্যবসা। বলাইয়ের প্রস্তাব শুনে প্রায় কেঁদে ফেলেন ভুললোক, বলাই বলেছিল জটা দাড়ি সব কামিয়ে ফেলতে। কিন্তু তিনি বলেন তা হলে শিষ্যবাড়িতে আর মান থাকবে না, ব্যঙ্গ্য মার্জিত হবে। বলাই বলল "ও সব ছাড়ুন, প্রাণে বাঁচতে চান তো এটা কেটে ফেলুন, দাড়ি-গোঁফ কামান।"

অবশেষে তিনি প্রাণভয়ে সব প্রস্তাবেই রাজি হলেন। বলাই একদিন তাঁর রক্ত দিয়ে গেল পরীক্ষা করতে। ভাস্করমান ত্রি-অ্যাকশান পঞ্জিটিত। ইনজেকশন চলল এবং তাঁর অনেকটা উন্নতিও হল। চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করেছিল বলাই। পথের লোক ধরে বন্ধুত্ব করার কথা আগে বলেছি। সে বন্ধুর বাড়িতেও বলাই নিজের খরচ করে মাঝে মাঝে চিকিৎসা করেছে।

ভাস্কর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছিলাম। তিনি ছিলেন হৃদয় ব্যক্তি। এমন চরিত্র সহজে দেখা যায় না। আজকের দিনের পাঠক তাঁকে চেনেন না, কিন্তু বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন শ্রুতিমানের রাজা। তাঁর নয়কের কীট, দশচক্র প্রভৃতি রচনা আলোড়ন জাগিয়েছিল পাঠকসমাজে। কার্টুন ছবি আঁকার তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন। তাঁর অনেক কার্টুন ছবি শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছে, পরে তারতবর্ষেও দেখেছি। বিচিত্রায় তেন ত্যক্তেন ভূজীথা নামক তাঁর সচিত্র হাক্কর জীবনী ধারা পড়েছেন তাঁরা আজও তাঁর কবিতা রচনার ক্ষমতার কথাও মনে রেখেছেন নিশ্চয়।

তিনি কারো ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতা সহ করতে পারতেন না।

এ জন্ত অনেকে তাঁকে ভয় করে চলত। বলাইয়ের মুখে তাঁর সম্পর্কে যে হ' একটি গল্প শুনেছি, তা থেকে তাঁর চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

একবার এক ভদ্রলোক কোনো রোগীর জন্ত বিশেষ একটি ওষাড়ে বেড পাওয়া যাবে কি না জানতে এসেছিলেন বনবিহারী বাবুর কাছে। বনবিহারী বাবু বেশ ভদ্রভাবে তাঁকে বললেন, “এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ ক'রে যাবেন।”

কথাটি শ্রবণবতী ভদ্রলোকের মনের মতো হয়নি, অতএব তিনি পুনরায় অগ্রতর চেষ্টা করতে গেলেন। কিন্তু যার কাছে গেলেন তিনিও পুনরায় ভদ্রলোককে বনবিহারী বাবুর কাছেই নিয়ে এলেন। বনবিহারী বাবু চকিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, “বন্ধু!” খুব আদর ক'রে কাছে বসালেন। তার পর তাঁর হাতের কাজ সেরে দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আগে যেসব কথা বলেছিলেন সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন, “এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ ক'রে যাবেন।” এক কানে ব'লে, ঐ কথাই আর এক কানে বললেন, এক একবার এ কানে আর এক বার ও কানে বলতে লাগলেন। তারপর হুঁচকি জন ছাত্রকে ডেকে বললেন, আমি আর বলতে পারছি না, এবারে এক এক ক'রে তোমরা বলতে থাকো, ইনি কথা সহজে বুঝতে পারেন না, কিন্তু এঁকে বোঝাতেই হবে এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হবে। তোমরা সে ভার নাও।”

ভদ্রলোক প্রথমে হঠাৎ ধারণাই করতে পারেন নি কি ব্যাপার, কারণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত, কিন্তু বখনিই বুঝলেন তখনই লজ্জায় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ ক'রে ক্রম পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন বনবিহারী বাবু আউটডোরের রোগীদর্শক ছিলেন, এমন সময় উপস্থিত রোগীদের ভিড় একই ভদ্রলোক কোনো এক লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ডাক্তারের পরিচয়পত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন বনবিহারী বাবুর কাছে, এবং সেই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, “আমাকে একটু আগে দেখে দিন দয়া ক'রে।”

বনবিহারী বাবু চিঠিখানা দেখেই ছাত্রদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, “ইনি ডাক্তার—এর চিঠি এনেছেন, তোমরা সবাই মিলে এঁকে নিয়ে নাচো, আমিও কাজ শেষ ক'রেই আসছি।”

আগে-আসা রোগীদের ঠেলে কারো চিঠির জোরে স্রবিধে আদায় করতে আসা বনবিহারী বাবু সহ করতে পারেন নি। আর একটি ঘটনায় তাঁর ব্যঙ্গের আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেদিন আমি সঙ্গে ছিলাম। বলাই ও আমি অনেক বার তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। গাড়িতে বেরোলে বনবিহারী বাবু মানিকতলা স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে একটা ড্রোটেল থেকে কাউন্স কাউন্সেট আনিতে নিতেন, আমরা সবাই তার অংশ গ্রহণ করতাম। সেদিন আমরা তিন জনেই নেমে কাছের একটি সাময়িকপত্রের স্টলে দাঁড়িয়ে নতুন কাগজগুলো উন্টেপাল্টে দেখছিলাম। এমন সময় বলাই একখানা ইংরেজী পত্রিকার একখানা পাতা খুলে বনবিহারী বাবুকে দেখিয়ে বলল, “এই দেখুন, এঁরা লিখেছেন, যে-খিয়েটারে বারবনিভারা অভিনয় করে, সে-খিয়েটার কারো দেখা উচিত নয়।”

বনবিহারী বাবু তৎক্ষণাৎ খুঁশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, সত্যি কথা লিখেছে। খিয়েটারে অভিনয় করতে হলে অধিকাংশ সময় ওদের চিন্তা করতে হবে কি ক'রে ভাল আর্টিষ্ট হওয়া যায়, কি ক'রে অভিনয়ে নাম করা যায়, তত্পরি নিজ নিজ ভূমিকা মুখস্থ করতে এবং রিহাসাল দিতে দিন-রাতের অনেকখানি অংশ ওদের নষ্ট হয়ে যাবে—সমাজের এত বড় ক্ষতি সহ্য করা উচিত নয়, কারণ যারা বারবনিভা, তাদের ধর্ম হচ্ছে চকিষ ঘটনা সঙ্গ আলোচনা করা। খিয়েটার করতে গেলে সেই ধর্ম থেকে ওরা যে ভ্রষ্ট হবে, অতএব ওদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

আর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র—শিবদাস বসুমতীক। তার চরিত্রও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি এরকম একটি চরিত্র কল্পনাই করতে পারি নি। তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন হাসিমুখে লড়াই করতে আর আমি দ্বিতীয় কাউকে দেখি নি।

শিবদাস সামান্য স্কুলকার ছিল। মুখখানা গোলগাল শাটের উপর বুকখোলা কোট, ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, মুখে একটু বিষমতার ছাপ, হাসলে সে হাসি শিশুর মতো সরল এবং স্নেহের, হয় তো বা একটুখানি বিষমতার ছোঁয়াচ তাতে ছিল বলেই তা এমন স্নেহের। এমন চরিত্র অথচ মধুর ব্যঙ্গপ্রিয় এবং হুঁটুমি বুদ্ধিতে ভরা। প্রায় সব সময় সে সাইকেলে চড়ে বেড়াত। সে কারো কাছে সামান্য উপকার পেলে তার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করত। উপকারের সম্ভাবনাতো পায়ের ধুলো মাথায় মাখা তার ছিল রীতি। এ বিষয়ে বয়স জাতি বা শ্রেণীভেদ তার কাছে ছিল না। ঝাড়ুদারের পায়ের ধুলো নিয়েছে সে অবলীলাক্রমে। কেউ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে, কেউ চমকে উঠেছে, কেউ সন্দেহ করেছে, কিন্তু প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে শিবদাস যখন সরল হাসিটি হেসে বলত, “আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, আপনার পায়ের ধুলো আমাকে নিতেই হবে, জ্যেষ্ঠ কি না বলুন”—তখনই সন্দেহকারীর সকল সন্দেহ দূর হয়ে যেত, তখন সে পুনরায় তার পায়ের ধুলো নিত।

এক দিন এক বিয়ের প্রীতি উপহার ছেপে নিয়ে আসা হচ্ছিল চিংপুর থেকে। বটতলায় কয়েকটি প্রেস আছে যেখানে অতি অল্প সময়ে ছোটখাটো জিনিস ছাপিয়ে আনা যেত। রবিবারেও কাজ হত সেখানে। এই রকম একটি জরুরি অবস্থায় সেখানেই যাওয়া হয়েছিল। আমরা তিন জন গিয়েছিলাম সেখানে।



“এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ ক'রে যাবেন।”

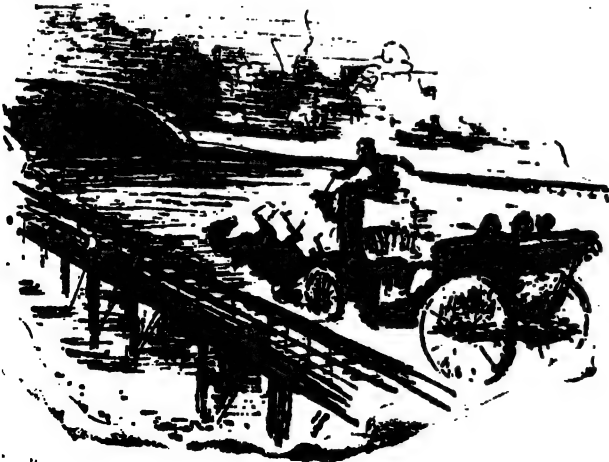


শিবদাস তার বাহনটিকে হাতে ঠেলে টাঙাছিল। দুশ' উপহারের প্যাকেটটা আমাদের কারো হাতে ছিল। এমন সময় বীড়ন ট্রাটে মিনার্ভা থিয়েটারের কাছাকাছি বিপরীত দিকের একটি বাড়ির সঙ্গে সাইকেলটি হেলান দিয়ে রেখে ভিতরের এক হারমোনিয়াম ঘেরামতের দোকানে ঢুকে গিয়ে বলল, "দাদা, এক খণ্ড দড়ি দেবেন? বড় বিপদে পড়েছি।" দোকানী এক খণ্ড দড়ি তার হাতে তুলে দিল। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার পায়ে মাথা ঠকিয়ে প্রণাম করে উঠে পাঁড়াল। উঠে দেখে দোকানী লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে—মুখে ক্ষণিক হুঁচকি "এ কি কাণ্ড, এ কি করেন মশায়।" শিবদাস গম্ভীর ভাবে বলল, "আপনি যে উপকার করলেন তা কল্পন করে বলুন? তা ভিন্ন আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, পুত্রনীয়, আবার আপনার ধুলো দিন।"—শিবদাস গম্ভীর ভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে উপহারের প্যাকেটটি সেই দড়ির সাহায্যে তার সাইকেলের কেবিরারের সঙ্গে বেঁধে নিল।

শিবদাস কোণ্ঠী বিচার শিখেছিল। প্রথম পরীক্ষার সময় সে আপন কোণ্ঠী বিচার করে বুঝতে পারে সে সময় সকল গ্রহই তার প্রতিফল, অতএব পাস করা তার হবে না। এমনি অবস্থায় গুজব জনতে গেল সে সব বিষয়ে পাস করেছে। শুনে মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। তবে কি তার বিচারে তুল হল? সে একে একে প্রত্যেক পরীক্ষকের কাছে যেতে লাগল সভ্য বাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। যেখানে যায় শোনে পাস করেছে। শুধু একজন পরীক্ষক মার্ক বললেন না, এক শুধু তাই নয় তিনি অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন—আইন না মেনে মার্ক জানতে আসাতে তিনি শিবদাসকে তাঁর বিষয়ে ফেল করিয়ে দিলেন।

শিবদাস ফেল করেছে জানতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল—কারণ গণনা মিলে গেছে।

সেটি সম্ভবত ১৯২৫ সাল। শিবদাসের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের কিছুদিন পরেই কোনো একটি ঘটনা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার কিছু মনোভেদ ঘটে, এক এই ব্যাপার নিয়ে কিছু চিঠি লেগালেখি চলে। একদিন শিবদাস আমাদের কাছে প্রস্তাব করল সে সবগুলো চিঠি পড়ে শোনাবে। সে যত চিঠি লিখেছিল তার নকল রেখেছিল।



যোড়া আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

তাই ঠিক হল। অনেক চিঠি, কোথায় পড়া যায়? বলাই বলল, রাতে মরদানে গিয়ে কোনো আলোর নিচে বসে পড়লে বেশ হয়। অগত্যা তাই ঠিক হল। আমরা সেখানে গেলাম রাত বারোটা আন্দাজ সময়ে। টাকা টিল্লিনিসহ সমস্ত চিঠি পড়া শেষ করতে মোট তিন ঘণ্টা লেগেছিল। সে প্রকাণ্ড এক ফাইল। শিবদাস সব বিষয়ে ছিল নিখুঁত।

রাত তিনটের কোথায় বাওয়া যায়? ঠিক হল একটা ফীটন ভাড়া করে সকাল পর্বন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াব। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, শিশিরে বাস ভিজ্জে উঠেছিল। শীত অমৃভব হচ্ছিল বেশ। চা খাওয়া দরকার। আমরা তখন ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ঘুরে চলেছি। শিবদাস হাঁকল চালাও হাওড়া ষ্টেশন। চা খাওয়া দরকার, অতএব হাওড়া ষ্টেশন।

এই অতএবটা আমাদের জাতি। হাওড়া ষ্টেশনের ষ্টল যে রাজিকালে বন্ধ হয়ে যায় সে খেলায় কারোই ছিল না। ষ্টেশনের গাড়ি-বারান্দায় আমাদের ফীটন গিয়ে পাঁড়াল, আমরা নেমে ভিতরে গেলাম। সেখানে এক পুলিশ কনষ্টেবল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। শিবদাস বলল আমরা চা খেতে এসেছি। কনষ্টেবল আমাদের বুঝিয়ে বলল রাতে ষ্টল খোলা থাকে না, চা এখন পাওয়া যাবে না। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতখানা খপ করে ঘুরে হস্তরেখা বিচার করতে লাগল। কি বলেছিল মনে নেই, তবে তার ক'টি সম্ভান তার সংখ্যা বলেছিল এক তা মিলে গিয়েছিল। কনষ্টেবল মহা খুশি, সে বলল "পাঁড়ান চায়ের ব্যবস্থা করাছ"—বলে কোথায় চলে গেল এবং মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো এক চাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনটি মাটির ভাঁড়ে তিনজন সেই চা খেলাম, চায়ে হৃৎকণ্ঠ বদলে ক্ষীর! উপাদেয় লেগেছিল।

এই প্রথম দেখলাম শিবদাস উপকারীর পায়ে ধুলো নিল না, খুব ভারিভাবে চলে গাড়িতে এসে উঠল। গাড়িতে উঠতেই আর একটি কনষ্টেবল এগিয়ে এসে আমাদের খুব খাতিয়া করতে লাগল। শিবদাস দুজনকেই কিছু বখশিস দিতে গেল, তাঁরা বখশিস নিতে অস্বীকার করল। গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। শিবদাস বলল "ঠিক করেছ না নিয়ে—এইটেই আমরা দেখতে এসেছিলাম।" কনষ্টেবলেরা তা শুনে আরও একবার সামরিক ভঙ্গিতে সালাম জানাল।

ফিরতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হাওড়া ব্রিজ তখন ভোরবেলা খুলে দেওয়া হত সপ্তাহে কয়েক দিন। আমরা ব্রিজ পার হওয়ার সময়েই খুলে দেওয়ার সময় হয়েছিল। গাড়ি সব খামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যটা বেজে গেছে। আমাদের কোচম্যান হঠাৎ গাড়ি খুব জোর ছুটিয়ে দিল ব্রিজ খুলতে খুলতেই বাতে পার হয়ে যেতে পারে, নইলে অন্তত যটা দুই দেরি হবে। পার হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু পার হয়েই যোড়া আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। হৈ হৈ ব্যাপার। শিবদাস ভীষণ বেগে গেল কোচম্যানের উপর। আমরা দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম, কারণ গাড়িটা সোজাই পাঁড়িয়ে ছিল। যোড়াকে তুলে দেবার পর গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করল।

সমস্ত রাত বাইরে থাকার কলে আমি সন্নিধ্যে আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল সেজন্য।

শিবদাস কলেজে পড়ার খরচ চালাতো নিজে উপার্জন করে। খুব পরিশ্রম করতে হত, সেজন্য পড়ার বতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার, তা দিতে পারত না। সেজন্য সে প্রথম এম-বি পরীক্ষাতে মেটেরিয়া মেডিক্যাল ফেল করেছিল। সম্ভবত ওষুধের মাত্রা মুখস্থ ছিল না। ছোট একখানি বই তার হাতে দেখেছি, তাতে ওষুধের মাত্রা ছাপা ছিল। সেই বই সে যন্ত্রের মতো মুখস্থ করবে বলে উঠে-পড়ে লাগল। ফেল করে শিবদাস একবারই মাত্র খুশি হয়েছিল, কারণ তাতে ছিল তার কৌশলবিচারের নিতুলতার প্রমাণ। এবারের ফেল করার জন্য সে তৈরি ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল তার অত্যন্ত বেশি। সে ওষুধের মাত্রা এ থেকে জেদ পর্বন্ত মুখস্থ করবেই, যাতে একটিও ভুল না হয়। অর্থাৎ প্রায় চার শ' সাড়ে চার শ' ওষুধের মাত্রা মুখস্থ করতে হবে।

ডোজের বইখানা সে সর্বদা পকেটে নিয়ে ঘুরত। কিন্তু একা একা মুখস্থ করা বড় একঘেয়ে লাগে। কোথায়ও ভুল হলে নিজে বই খুলে বাচাই করতে হয়, তা ভিন্ন ভুল হচ্ছে কি না তা চেক করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। অতএব সে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি কোশল উদ্ভাবন করল। পথে চলতে চলতে শিবদাস হঠাৎ সাইকেল খামিরে কোনো পছন্দসই ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো মাখার নিয়েই বলল, “দাদা, আমি মেডিক্যাল ছাত্র, পরীক্ষার ডোজে ফেল করেছি, আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ বলে বাই, ভুল হলে বলে দেবেন।” মুখে করুণ সরল হাসি। ভদ্রলোক চিন্তা করবারও অবসর পেলেন না যে, তিনি কি করছেন। কিন্তু তাঁর না করে উপায় ছিল না। শিবদাসের বালকোচিত সরল অমুখোষ, অস্তায় কিছু নয়, কিন্তু অভূতপূর্ণ। হয়তো ভদ্রলোক কিছু গর্বও বোধ করলেন।

ঘটনাটির মৌলিকতা লক্ষণীয়।

শিবদাসের মুখস্থ বলা আরম্ভ হয়ে গেল। কিছু পরেই ভদ্রলোক এঁর একটু ভুল হল।

শিবদাস থমকে দাঁড়াল। তা হলে মুখস্থ ঠিক হয়নি। বইখানা ভদ্রলোকের হাত থেকে খপ করে কেড়ে নিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, “হঁল না দাদা, আমি একটি চাম লোদকু”—বলেই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দিল।

শিবদাসের নিজস্ব গড়া কয়েকটি ধ্বজাস্বক শব্দ ছিল। ওর মুখে উচ্চারিত হলে তার বেশ একটি অর্থ ফুটে উঠত। ‘লদকালদকি’ এই রকম একটি শব্দ, মানে চলাচলি, খুব শোনা যেত তার মুখে। “চাম লোদকু” ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ। কখনো নির্বোধ, কখনো কুপণ, কখনো ধূর্ত।

চোরঙ্গী প্রেসের মোড়ে এক প্রহরী পুলিশের পায়ের ধুলো নিয়ে খুব বিনীতভাবে এবং সম্মানে জিজ্ঞাসা করল, “আপকা ইডিরসি কনজেনিট্যাল হায় কি অ্যাকোইয়ার্ড হায়?” কিছুই বুঝতে না পেরে কনষ্টেবল গর্বের সঙ্গে বলল “কনজেনিট্যাল হায়।” শিবদাস বলল “ও! আপ একদম বরন (born) ইডিরট হায়, তা হলে ঠিক আছে, আমি এই গলিতে একটি নিষিদ্ধ কাজ করব আপনি একটু পাহারা দিন” বলে সাইকেলটি তার হাতে দিয়ে বখাকর্তব্য করতে গেল। কনষ্টেবলটি যে অস্তায় নিবারণের জন্য সেখানে ছিল, সেই অস্তায়টিই শিবদাস করল তাকে পাহারা রেখে, এ ওষু শিবদাসের

পকেটই সম্ভব। তার লোক বশ করার বিভা ছিল একেবারে অমোঘ।

এই চরিত্রের অলুকাব্য হয় না। এ তার ব্যক্তিত্বের নিজস্ব রূপ আর পাঁচজনকে ছেড়ে লক্ষ্যীয় হয়ে উঠেছে। তার চেহারার সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে-এ সব উদ্ভট ব্যবহার এমন মানিয়ে গিয়েছিল যে এ সব বাদ দিয়ে তাকে ভাবাই যেত না। সব চেয়ে বড় কথা শিবদাসের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রাণধর্ম ছিল, তেজও ছিল অসাধারণ। তার হাসিটি সব সময় বেদনামণ্ডিত মনে হত, সেজন্য সে একটি বিশেষ চিন্তাকর্ষক চরিত্র ছিল।

দারিদ্র্য ছিল তার প্রথম ছাত্রজীবনে। কিন্তু তা সে দূরতার সঙ্গে জয় করেছিল এক অবস্থা কিরিয়ে ‘ফেলেছিল। তার এম-বি পাস করার পর তার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি, কারণ আমি কিছুদিন কলকাতায় ছিলাম না। হঠাৎ কয়েক বছর পরে একদিন কর্পোরেশন স্ট্রীট ও গ্র্যান্ড স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। ছোট গাড়ি একখানা আমার পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

সে দিকে ফিরে চাইতে না চাইতে গাড়ির চালক শিবদাস খপ করে আমার হাতখানা ধরে তার অভ্যন্তর সরল হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করে ক্রমাগত বাংলায় এম-এ পরীক্ষার পার্শ্যের নাম করে যেতে লাগল এক বলল “এর মধ্যে তোমার কাছে কি কি বই আছে?”

আমি অধিক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। ভুল শুনিছি না তো? কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে তেমনি হেসে বলল, “বাংলায় এম-এ দিচ্ছি।”

খবরটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল শিবদাস-চরিত্রের সঙ্গে এর অসঙ্গতি নেই কিছু, একমাত্র তার পকেটই এম-বি পাস করার পর বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দিতে উৎসাহী হওয়া সম্ভব। পরে শুনেছিলাম সে এম-এ পাস করেছিল। আরও পরে আরও একটি খবরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলাম—শিবদাস মোটর ঘুঁটনায় মারা গেছে। খবরটি বতদূর মনে পড়ে তার ভাইপোর কাছ থেকে শুনেছিলাম।

১৯২৬ সালে যেবারে বলাই এম-বি পরীক্ষা দেবে, সেই বছরেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে যেতে হল সরকারী আইনে। কারণ বলাই বিহার-প্রবাসী বাঙালী, অর্থাৎ বিহারী, অতএব



“আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ বলে বাই।”

বাংলায় পড়া চলবে না। সুতরাং সে কলকাতায় এম-বি হল না, বিহারের এম-বি বি-এস হল। এই সময় ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং-এর অন্ত্যস্ত ডাক্তারি ছাত্রও শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। অভ্যন্তর এলেন এক দল এঞ্জিনিয়ার। আমাদের পুরাতন সহবাসী ছিলেন শ্রীরামপুরের বিড়তি মুখুজে। তিনি খুব আমুদে প্রকৃতির, হৈ হুলা করে খুব জমিয়ে রাখতেন। তিনি ডাক্তারদের মরশুম থেকে শুরু করে এঞ্জিনিয়ারদের মরশুম এবং তার পরবর্তী কালেও ছিলেন। আর একটি রহস্যপূর্ণ চরিত্রের লোক ছিলেন এখানে। তিনি জার্মানি ইলাণ্ড প্রকৃতি ঘুরে এসেছিলেন। কেন, তা আমাদের কাছে ঘুরেছিল, কেননা তিনি ইংরেজী না জার্মানি কিছুই ভাল জানতেন না। কিন্তু তাঁর খুব অধনসার ছিল। মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে জার্মান বা ইংরেজী অভিধান খুলে নিয়ে চিঠি লিখতে বসতেন। একথানা চিঠি শেষ করতে দু'টিমিনিট দিন লাগত। ইংরেজ ও জার্মান ঘেরাঘের চিঠির উৎসর। প্রণয়পত্র সবই। দেখিয়েছিলেন দু' একথানা।

অতুলানন্দ চক্রবর্তী তখন ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং-এর বাসিন্দা। সে এই ভুললোককে ঠাট্টা করে বলত প্রণয়পত্র লেখা যে কারো কাছে এমন নিন্দনিকার ব্যাপার হতে পারে তা তো জানতাম না, আমরা তো জানি ওটি একটি আমন্দের ব্যাপার। এই ভুললোক আমাকে খুব পছন্দ করতেন, কেননা চিঠিলেখার আমি তাঁকে অনেকবার সাহায্য করেছি। ইংরেজ মেয়ের চিঠিগুলো আমাকে দেখাতেন। তাতে তাঁর প্রশংসার লিখছে, "আর কত দিন অপেক্ষা করব, তুমি আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আমি দিন গুনছি।"

ভুললোক যে মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়েছেন তা বুঝতে দেরি হল না। ইনি, লগুনের এক স্কুলের মেয়ে, নাম নেলি, তার সঙ্গে চিঠিতে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সে মেয়েটি অনেকদিন আমাকে চিঠি লিখত পড়াশোনা আর ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে। তার আঁকা জলরঙা একগুচ্ছ ভায়োলেটের ছবিটি খুব সন্মদ হয়েছিল, সে ছবির প্রশংসা করতে কি খুশি!

একদিন এই ভুললোকের সমস্ত গায়ে র্যাশ বেরোল। দারুণ ভয়ের ব্যাপার। তখন ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং ডাক্তার কেউ ছিল না, আমি নিজে থেকে ডেকে আনলাম আর এক বন্ধুকে, তিনি ডাক্তারি ছাত্র। নাম সমরেশ ভট্টাচার্য, নিমতলা ষাট ষ্ট্রিটের বিখ্যাত সার্জন শ্রীশ্রী ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র। সমরেশকে বললাম, ভাই একটা ব্যবস্থা কর, সবাই সন্দেহ করছে ঝল পল্ল হয়েছ। ভয় পাচ্ছে সবাই! সমরেশ একটুখানি দেখেই আমাকে বাইরে এসে গোপনে বলল ঝল নয় বিগ।

সমরেশ পরে এসে তাঁর রক্ত নিয়ে গেল, ভাসারমান রিঅ্যাকশন পজিটিভ। ওষুধের ব্যবস্থা হল, কিন্তু কেন যে রোগী ইনজেকশন ইত্যাদি বিনামূল্যে হওয়া সত্ত্বেও নিতে অস্বীকার করলেন জানি না। তবে জানা গেল ইতিমধ্যে তিনি কোনো এক দৈব ওষুধের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। পরে শুনেছি কেনো এক সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে তিনি গঙ্গিকা আকর্ষণে এবং সন্ন্যাসধর্মে অনেক দূর এগিয়েছেন, গারে ভ্রম মেখে থাকেন। তারও পরে শুনেছি তিনি আর বেঁচে নেই।

ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং থাকতেই আমি ছোট ছোট নজর লিখতে আরম্ভ করি। সে সব ছোটখাটো কাগজে ছাপা হত। বলাইও লিখত। আমাদের দুজনেরই তখন লেখার পরিমাণ ছিল কম। এবং তারও একটা বড় অংশ ছিল ফরমাসেসি বিয়ের উপহার লেখা। বলাইয়ের বিয়েতে আমি নানা নামে একখানা বইয়ের আকারে অনেকগুলো উপহার কবিতা ছাপিয়েছিলাম। নানা ছন্দে লেখা ছিল কবিতাগুলো। ১৯২৬ সালে বিদ্রিয়ার আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়—নাম আর্টের অর্থ; এ প্রবন্ধের কথা আগে একবার বলা হয়েছে। এইই কাঁছাকাছি সময়ের কল্লোলের দিনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিভাবে হয় তা আমার মনে পড়ে না। তাঁর অমুরোধে কল্লোলে দুটি ব্যঙ্গ গল্প লিখেছিলাম। কাজি নজরুল ইসলাম 'নওরোজ' নামক একখানা কাগজ বের করেন, তিনিও আমার একটি ব্যঙ্গ রচনা চেয়েছিলেন। দীর্ঘ ইউরোপ প্রবাসখ্যাত গিরিজা মুখোপাধ্যায় তখন সেণ্টপলস-এর ছাত্র, তিনি দেউটি নামক একখানা মাসিকপত্র বের করেছিলেন। সে কাগজে ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলাম, বলাইও লিখেছিল।

একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ব্যঙ্গ গল্প লিখি ১৯২৬ সালে। সেই আমার প্রথম বড় ব্যঙ্গ গল্প। কোনো বন্ধু সেটি পড়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান মাসিক বস্তুমতীতে। বস্তুমতী (চৈত্র ১৩৩৩) সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছিল, বস্তুমতী সিলতার জুবিলি সংখ্যায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তখনকার সকল ব্যঙ্গ লেখাতেই একটা অপরিপক্বতার ছাপ স্পষ্ট, এবং স্বভাবতই।

লেখা তখনকার দিনে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আনন্দাৎ, উপার্জনস্রোতের কদাপি নয়। লেখা ছাপা হলেই একটা ভূপ্তি। কল্লোলে লিখলেও দিনেশরঞ্জন ভিন্ন কল্লোলগাষ্ঠীর অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত পাঁচ ছ' বৎসর পরে। দিনেশরঞ্জন দাশ ব্যক্তিটি বড়ই সহদয় এবং মনখোলা ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রকৃত শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিছুদিনের মধ্যেই এবং তিনি আমার লেখা পছন্দ করতেন। ফোটোগ্রাফিতে তাঁর আকর্ষণ ছিল, এ বিষয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করেছি অনেক পরে।

ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং-এ এই সময়ের মধ্যে আর একজন অধিবাসীর কথা মনে পড়ে। নাম ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হয়েছেন পরে। এঞ্জিনিয়ার দলের মধ্যে কাশীর তারাচরণ গুইনের কথা আগে মনে পড়ে। তিনি তখন বি-ই পাশ করে রেল চাকরি করতেন, শিয়ালদহের পথে তিনি ছিলেন ডেইলি প্যাসেঞ্জার। তিনি সাহেবী পোষাকে থাকলে কেউ তাঁর সঙ্গে বাংলার কথা বলতে ইতস্তত করত। তাঁর দেহ দীর্ঘ, পেশীবিশ্বাস শ্রাণের মতো। এ দুইয়ের যোগাযোগ বাঙালীর মধ্যে আমি আর দেখিনি। তারাচরণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন এক নিজে গাইতেন। ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং-এ এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গুণী গায়কেরা আসতেন।

তারাচরণ গুইন আমাকে স্বাস্থ্যচর্চায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, আমার মতো কণী সেহেও চড়তে চড়তে ক্রমে পঁচিশটি ডন এবং পঁচিশটি বৈঠকে উঠেছিলাম। আগে স্কুলজীবনে শ্রাণের চেষ্টা একপাণ্ডারের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যচর্চা করেছি। তার কোনো সময় স্থির ছিল না, এক মাত্রাও সাধ্য সীমা ছাড়িয়ে যেত। তবে তারাচরণ

গুটনের শিষ্য গ্রহণ করে পাকস্থলীর কিছু উপকার হয়েছিল, কারণ কিছুকাল ধরে জারক রসসমূহ বর্ষা পরিমাণ নির্গত হয়েছিল তাদের নিজ নিজ গুপ্ত বাস থেকে। এই তারাত্রণ পরে গুনেছিলাম রেওরা রাজ্যের এজিনীয়ার হয়েছেন। কুঙ্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিশেষ সখ্য হয়েছিল, পরে তাকে ভগলী জেলা এজিনীয়ার রূপে দেখেছি।

ইন্টারজাশক্তাল বোর্ডিং-এর ম্যানেজার প্রথমে ছিলেন মাধনবাবু, পরে রবি রক্ষিত। ইনি মণিবাবু নামে পরিচিত। সাইকেলে দূর ভ্রমণ করে খ্যাত হয়েছিলেন, সীতারেও বেশ নাম ছিল। তিনি আমাদের বন্ধুহানীর হয়ে উঠেছিলেন। মাস ছয়েক আগে আ-কটিটবিভারী দাড়ি চুল নিয়ে দেখা করেছিলেন, পরিচয় না পেওয়া পর্যন্ত চিনতে পারিনি। রবি রক্ষিতকে ইতিপূর্বে শেষ দেখেছিলাম ১৯৪৩ সালে এ-জার-পি কর্মরূপে সাইকেলে ছুটতে। তার পরেই এই প্রায় সন্ন্যাসী বেশ।

চেনা-অচেনায় ব্যাপার নিয়ে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই সেগুলো বলে রাখি।

যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪৪-৪৫ এর কোনো এক সময় গ্রে ট্রিটে এক মিলিটারি অফিসারের পাশ কাটিয়ে যেতে তিনি খপ করে আমার হাত ধরে হেসে বললেন, “চিনতে পারেন?” আমি বলি, “না।” তিনি ভীষণ বিস্মিত হয়ে বললেন, “সে কি কথা?—দেখুন ভাল করে ভেবে।”

হু তিন মিনিট কেটে গেল কিছুই মনে পড়ল না। তখন তিনি একটু দমে যাওয়া স্বরে বললেন শরৎদার কথা মনে নেই ইন্টারজাশক্তাল বোর্ডিং-এর?

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। ইন্টারজাশক্তাল বোর্ডিং-এ কিছুকাল আগে আমরা একত্র কাটিয়েছি, এবং তা দুচার দিন মাত্র নয়। আমরা একসঙ্গে অতুলানন্দ, রবি রক্ষিত প্রভৃতি মিলে গ্রুপ করেই তুলিয়েছি। শরৎ সেন এম বি পাস করে আয়ুর্বেদ এবং আইন পড়িয়েছেন। তিনি সবাইই শরৎদা ছিলেন, এই মানুষকে চিনতে পারিনি।

পরে ভেবে দেখেছি এর যুক্তিসঙ্গত কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত তাঁর চমৎকার দুপাটি দাঁতের একটিও মুখে ছিল না, তাঁর গৌরবাস্তি কৃষ্ণ কাস্তিতে পরিণত এবং পোষাক বোল আনা মিলিটারি। তবু এ ঘটনাটি আমাকে খুব ভাবিয়েছিল এবং এই বিষয় নিয়েই ১৯৪৬ সালে “নতুন পরিচয়” নামক একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটি ঐ বছরেই প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। (পরে গল্পটি “মারকে লেজে” বইতে ও শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে।)

আরও একটি মজার ঘটনা। বছর চারেক হয়ে গেল। কর্ণওয়ালিস ট্রিটে ট্রামে উঠেছি। পুরনো গদিহীন ট্রাম। উঠেই ভিতরে প্রবেশ করে ডানদিকে চারজনদের উপযুক্ত যে একটি তণ্ড আসন তারই বাঁ কোণে বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক দীর্ঘ কেশ ও অশ্রুগুণ্ধধারী গৈরিক বসন সন্ন্যাসী উঠে আমার বাঁ পাশে বাইরে অবস্থিত যে আধখানা আসন তাইতে বসলেন। আমাদের দুজনের মাঝখানে ব্যবধান একটিমাত্র জানালা।

ট্রামের কোনো আসনই খালি ছিল না, দু-একজন বাকী পাড়িয়েও

ছিলেন। এমন সময় বাঁ ধারের সেই জানালার পাশ থেকে সেই সন্ন্যাসীর মুখ আমার কানের কাছে বলে উঠল, “এই যে পরিমলবাবু।”

আমি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সেই অচেনা মুখের দিকে।

“আমাকে চিনতে পারছেন না?”

“না। ঠিক মনে হচ্ছে না তো।” লজ্জিতভাবে বলি। হয় তো তিনিও লজ্জিত হচ্ছেন।

তারপর হঠাৎ দুহাতে তাঁর সমস্ত দাড়ি চেপে আড়াল করে মাথাটা বতটা সম্ভব জানালার ভিতর দিয়ে গলিয়ে বললেন, “দেখুন তো এবারে চিনতে পারেন কি না?”

ট্রামের বাকীরা আমার দিকে আমার উত্তরের অগেফার চেয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমি সেই দাড়ি চেপে ধরা মুখও চিনতে না পেয়ে প্রায় যেমে উঠছি। সন্ন্যাসীও দাড়ি থেকে হাত সরান না, আমিও তাঁর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

অবশেষে সন্ন্যাসী হতাশ হয়ে দাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললেন, “আমি—এর দাদা, এবারে চিনতে পারছেন?”

চকিতে মনে পড়ে গেল সব। চেনা উচিত ছিল এতক্ষণ। কিন্তু প্রথমেই তিনি না রূপ যে ভ্রান্তি ঘটেছিল তা আর গেল না সহজে। ট্রাম শূন্য বাকীর কাছে আমি অপরাধী হয়ে রইলাম।

১৯৫৩ সালে আরও একজন পরিচিত পুনিসের লোককে সন্ন্যাসীবেশে দেখলাম যুগান্তর অফিসে। তবে একে চিনতে কষ্ট হয়নি। অনিবার্য পরিবর্তনের পথে চলেছি আমরা। ব্যাপারটা ভুলে থাকি বলেই মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মানুষেরই মনে যে বৈরাগ্য জাগতে থাকে, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু হু-চার জন যে বাইরেও গৈরিকবাস পরেন এবং লম্বা চুল-দাড়ি রেখে বৈরাগ্য ঘোষণা করেন, সেটি নিতান্তই বাহুল্য বলে আমার মনে হয়।

১৯২৬-২৭ এর মধ্যে রাজবাড়ির (ফরিদপুর) রাজা স্বর্ষকুমার রায়ের পুত্র সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি রতনদিয়াতে তাঁর হেড মাষ্টার জৈলোকানাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—অথবা বন্ধু শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসতেন। বৎসরান্তে একবার করে পুজোর মধ্যে তাঁদের প্রাসাদে গিয়ে হাল্দির হতাম। শৌখিন দলের খিয়েটার হত সেখানে। স্থানটি রাজবাড়ি স্টেশন থেকে হু’ মাইল দূরে, লক্ষীকোল নামক জায়গায়।

রাজা স্বর্ষকুমার ছিলেন বরিশালের জমিদার মতিলাল ঘোষ-দস্তিদারের ভগিনীপতি। তিনি স্বর্ষকুমার রায়ের এষ্টেটের এজিকিউটর ছিলেন। তাঁর এক পুত্র রাজবাড়িতে রাজা স্বর্ষকুমার ইনষ্টিটিউশনে পড়ত। সে বখন ম্যা ট্রি কুলেশন পড়ে (১৯২৬) তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয় স্বর্ষকুমারের বাড়িতে। ছেলেটির ছবি আঁকার বেশ হাত ছিল, দেখে



হু’হাতে দাড়ি চেপে ধরে বললেন, দেখুন তো, এবারে চিনতে পারেন কি না?

ভাল লেগেছিল। আমিই বলেছিলাম, একে যেন আর্ট স্কুলে দেওয়া হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তার পর সে গেল মাদ্রাসে দেবীপ্রসাদের ছাত্ররূপে। কালীকঙ্কর ঘোষদত্তিদার এর নাম। শিল্পীরূপে আজ সে সম্মানিত।

অমিদার-সন্তান কালীকঙ্কর খুব বিলাসিতার মধ্যে মাতুষ হয়েচে ভুলজীবনে। হু' মাইল দূরে স্কুলে বেত হাতীতে চড়ে, হাঁটা নিষেধ ছিল। এর মুখে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সম্পর্কে একটামাত্র কথা শুনেই আমি দেবীপ্রসাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কালীকঙ্কর সরকারী আর্ট স্কুলের কোনো গুণগোলে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল আরও অনেকের সঙ্গে; বেরিয়ে এসে সে ভিন্ন প্রদেশের হু' একটি আর্ট স্কুলে, সব কথা প্রকাশ করে, আবেদন করেছিল ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু 'এক্সপেলড' শুনে কেউ রাজি হয়নি। রাজি হলেন একমাত্র দেবীপ্রসাদ। তিনি তখন কলকাতার ছিলেন, কালীকঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। কালীকঙ্কর তার কাজের নমুনা দেখাল, দেবীপ্রসাদ তা পছন্দ করলেন। তারপর বললেন, "তোমাকে নিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি আমার কাজ দেখ, এবং বল, আমার কাজ তোমার পছন্দ হয় কি না। পছন্দ হলে তোমাকে ভর্তি হতে বলব।"

কালীকঙ্কর এ কথার স্তম্ভিত হয়েছিল, কোনো শিক্ষক যে ছাত্রকে এতখানি শ্রদ্ধা করতে পারেন তা তার জানা ছিল না। এ সুবাদ আমার কাছেও নতুন। আত্মকমতার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস থাকলেই তবে এতখানি মানসিক ঔদার্য সম্ভব। কিন্তু এ তো অনেক কাল আগের কথা। চার পাঁচ বছর আগে দেবীপ্রসাদ আমাকে একখানা চিঠিতে প্রসঙ্গত বা লিখেছিলেন তার মর্ম এই যে "কালীকঙ্কর ফাইনাল পরীক্ষা দিলে অবশ্যই ফার্স্ট হ'ত, কিন্তু পাস করলে স্কুল ছেড়ে যেতে হ'বে ভয়ে পরীক্ষাই দিল না সেবাবে। একটি বছর অতিরিক্ত শিখল ব'লে ব'লে। ওর নিষ্ঠা দেখে ওকে মনে মনে গুরুর সম্মান দিয়েছি।"

এ যুগের কোনো শিক্ষকের মুখে এমন কথা ভুল'ভ বৈ কি।

১৯২৫-২৬ থেকে আমি প্রায় প্রতি শনিবারে আজিমগঞ্জে যেতাম প্রবোধের কাছে। পরে বলাই যখন কিছুকাল আজিমগঞ্জের হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরি নিল তখন আজিমগঞ্জের আকর্ষণ বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে একদিন জানা গেল জোড়াসাঁকোর 'নটর পূজা' অভিনয় হবে। এই অভিনয়টি প্রবোধকে বাদ দিয়ে দেখতে

ইচ্ছে হল না, অথচ চিঠি দিয়ে জানানোরও সময় ছিল না, আমি সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে রাত তিনটে আশ্রয় সময় গিয়ে পৌঁছলাম আজিমগঞ্জে। তারপর সেখান থেকে সকাল আটটার রওনা হয়ে বিকেল সাড়ে চারটের কলকাতা এসে পৌঁছলাম। টিকিট বিক্রি হচ্ছিল চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত কার অ্যাণ্ড মহলানবিশের ফুটবল'ও সঙ্গীতযন্ত্রের দোকানে। হাওড়া থেকে সোজা সেখানেই গেলাম আগে। গিয়ে দেখি টিকিট কেনার খুব ভিড় নেই, তাতে খুবই উৎসাহিত হয়ে দোকানে প্রবেশ করেই দুখানা টিকিট কিনে নিয়ে চলে এলাম জোড়াসাঁকোর। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ভিড় দেখে অবাক! ভয় হল, সম্ভবত অনেক দেরি করে ফেলেছি, অতএব দ্রুত পা চালিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই অপ্রত্যাশিত বাধা।

টিকিট পরীক্ষক বললেন, "এ টিকিট চলবে না।"

"কেন?"

"এ তো আগামীকালের টিকিট, তারিখটা পড়ে দেখুন।"

পড়তে জানি না বলা সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃখ হল আগে কেন পড়িনি। এবং আগামী কালের টিকিটই বা কিনলাম কেন? অথবা কার অ্যাণ্ড মহলানবিশই বা তা দিলেন কেন? আমরা তো বলিনি আগামী কালের টিকিট চাই।

টিকিট পরীক্ষক ব্যাপারটা অস্বাভাবিক করলেন। তিনি বললেন "আজকের টিকিট অনেক আগ্রেই সব বিক্রি হয়ে গেছে, তাই বিকালে খাঁরা টিকিট কিনতে গেছেন তাঁরা আগামী কালের টিকিটই কিনতে গেছেন এটি ধরে নেওয়া হয়েছে। কোনো নোটস সেখানে অবশ্যই আপনাদের চোখের সামনে ছিল, আপনারা হয় তো দেখেননি। আপনারা যে আজকের টিকিট ভ্রমে কালকের টিকিট কিনছেন এটি হয় তো তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি, তবু এই বিভ্রাট।"

প্রবোধ ও আমি পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। কাল সকালেই তার ফিরে যাওয়া জরুরি দরকার। মনে হচ্ছিল পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। এত উৎসাহ এত পরিশ্রম সব বুখা।

এমন সময় রথীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠে তাঁকে গিয়ে বললাম—এই ভুল হয়েছে—যেমন করে হোক আজকেই আমাদের দেখার ব্যবস্থা করে দিন। রথীন্দ্রনাথ কথাটি মাত্র না বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দোতলার পাড়িয়ে দেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। যেখানে গিয়ে পাঁড়ালাম, তিন বছর আগে তারই নিচের ঘরে বাস করেছি। অনেকেই পাড়িয়ে দেখছিলেন, তাতে অস্ববিধে হয়নি কিছু। হলেও তা মনে পড়েনি। [ক্রমশঃ]

When we come to the younger generation, however, we realize that 'cosmic consciousness' and 'love of humanity' have really been left out of their composition. They are like a lot of brightly-coloured bits of glass and they only feel just what they bump against, when they're shaken. They make an accidental pattern with other people, and for the rest they know nothing and care nothing.

—D. H. Lawrence



# পত্রাঙ্ক

## মহারাজা শ্যাম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা বিভিন্ন সুবীৰ্ণেন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[ গত বছর ( ১৩৬৩ ) শারদীয়া সংখ্যায় এই পত্রাঙ্কে ভারতের এক স্মরণীয় সন্তান, বাঙলার মুখোজ্জলকারী পুরুষ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কবিবরকে লেখা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মোট প্রায় বিয়াল্লিশখানি অপ্রকাশিত পত্র মুদ্রিত হয়েছিল—দেশের শিক্ষার, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহারাজা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং ঐ সকল জনহিতকর ব্যাপারে তিনি যে একজন অপরিহার্য পুরুষ ছিলেন, তারই পরিচায়ক ঐ চিঠিগুলি বিশেষ ভাবে আঁকুটে করেছিল আমাদের রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের এবং অভিজ্ঞ সমালোচকদের। এ বছরেও মহারাজাকে লেখা ঐ জাতীয় আরও কয়েকখানি অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করা হ'ল। একমাত্র প্রথম চিঠিটি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃপুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ( লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচার-এর ফেলো ) চিঠিটি ব্যতীত প্রত্যেকটি চিঠিই ইংরাজীতে লেখা। এই প্রসঙ্গে চিঠিগুলি প্রকাশ করতে অমুখতি দেওয়ার জন্য মহারাজার পৌত্র বর্তমান মহারাজা পরম বিজ্ঞানসাহী শ্রীযুক্ত প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—স ]

### রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রের পত্র

‘ভাণ্ডার’

৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

৩০ আশ্বিন ১৩১২

পরম পুজনীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণে—

বন্দে মাতরম্

ভাই ভাই এক ঠাই

দেশ নাই, ভেদ নাই

এক দেশ, এক ভগবান

এক জাতি, এক মনপ্রাণ

বিনয়ানবন্ত :

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্যারীচাঁদ মিত্রের পত্র

২১শে মার্চ ১৮৮২

প্রিয় মহারাজা,

আপনার সহিত অল্প প্রভাতে আমার আলাপের বিষয় আমাদের বিশেষ বন্ধু কর্ণেল অলকটকে (১) জানাইয়াছি। সমস্ত সমাচার শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আপনার বৈঠকখানায় বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাওয়া তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কর্ণেল অলকটের বিশেষ ইচ্ছা, যে কক্ষে তাঁহার অবস্থানের ব্যবস্থা হইবে, সেই কক্ষটি যেন সর্বতোভাবে প্রোঢ়

ভাবধারায় সম্ভ্রান্ত করা হয়। পরিপূর্ণ ভারতীয় জীবন বাগন করা ই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ইচ্ছা ঐ কক্ষে যেন টেবিল-চেয়ারের পরিবর্তে তাকিয়া-ফরাসের আয়োজন হয়। সমগ্র কক্ষটিতে যেন একটি পরিষ্কার ভারতীয় বিবাজ করে।

এক্ষণে, তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিয়া দিনটি স্থির করিয়া লইলেই হয়।

আপনাদের

প্যারীচাঁদ মিত্র

রাজনারায়ণ বসুর পত্র

প্রিয়বরেষু,

২২ মার্চ

মহাশয়, আগামী কল্য সন্ধ্যায় আপনার গৃহে যে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে, ঐ অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা আমার পুত্র ও তাঁহার দুই জন স্নহদ পোষণ করেন। সুতরাং অগ্রগৃহপূর্বক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনখানি প্রবেশপত্র আমার ঠিকানায় পাঠাইবার আদেশ দিলে সুখী হইব।

আশা করি স্রুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কালান্তিপাত করিতেছেন।

ইতি

আপনাদের

রাজনারায়ণ বসু

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র

৮ মাদিকতলা

কলিকাতা

১লা জানুয়ারী ১৮১১

প্রিয় যতীন্দ্র,

অভ্যকার নববর্ষের উজ্জ্বল প্রভাতে তোমার সম্মানপ্রাপ্তির বায়ত্ন বহন করিয়া আনিল। তোমার প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই।

১। ভারতে প্রত্যেক দীর্ঘজীবনবাদের আন্দোলনের (খিওসফিট মুভমেন্ট) অগ্রদূত। ভারতপ্রেমিক পুরুষ।

উর্বে, কথাটা বলিয়াই ফেলি, আমি আশা করিয়াছিলাম এ বৎসর তোমাকে 'ব্যারোনেটসি' (২) দেওয়া হইবে। বাহাই হউক, তাহা এ বৎসর হয় তো হইল না তবে প্রার্থনা করি স্বাধীন আগামী কোন এক বৎসরে ঐ সম্মানে তুমি বিভূষিত হইবে।

সাক্ষাতে তোমাকে অভিনন্দন না জানাইয়া কেন যে পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম, সে বিষয়ও আশা করি তোমার অজানা নহে।

তোমাদেরই  
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

### ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পত্র

প্রিয়বরেষু,

বৃহবার

মহাশয়, জীবনী সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ তথ্য প্রেরিত হইল, আপনাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত, অল্পগ্রহপূর্বক উহা একবার পড়িয়া দেখিতে অমরোধ করি। আশা করি উহা গৃহীত হইবে।

আপনাদের  
কেশবচন্দ্র সেন

### সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

মহাবালেশ্বর  
মার্চ ২৭, ১৮৯৫

পরম পুজনীয় কাকামহাশয়,

আমি পুনরায় তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে রাজা রবি বর্মা কলিকাতাতেই গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি দার্জিলিং-এ স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় গমন করিয়াছেন। আমার অল্পমান, আপনি ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে ছিলেন বলিয়া প্রকৃত সংবাদ অবগত হন নাই। বাহাই হউক, আমি পুনরায় রাজাকে পত্রে নির্দেশ দিতেছি আপনার সহিত ভবিষ্যতে সংযোগ স্থাপন করিতে।

এখানে আমি কার্ধ্যোপলক্ষেই আসিয়াছি এবং এখানকার কার্য সমাপ্ত হইলেই সাতারায় ফিরিয়া যাইব, সেখানেও বহু কার্য অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানটি অতীব মনোরম, দার্জিলিং বা সিমলার মত এই স্বাস্থ্যনিবাসটি অত শীতপ্রধান এবং উষ্ণে অবস্থিত নহে। এখানে বাস করিলে প্রচুর আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ভ্রমণ করিবার মত উপযুক্ত স্থানের অভাব নাই। অনেকে পদত্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এখানে স্থায়ী স্বাস্থ্যোদ্ধার করেন। এখানে বাস করিলে পর্বতের ধ্যান-গম্ভীর অপরূপ শোভা প্রাপ্ত মন বিশেষভাবে মাতাইয়া তোলে। প্রকৃতি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া স্থানটিকে নয়নাভিরাম করিয়া তুলিয়াছে। প্রতাপগড়ের দুর্গটিও এর একটি কেন্দ্র হইতে নয়নগোচর হয়—ইহা সেই প্রতাপগড় বথায় মহাবীর শিবাজীর বাঘনখের আক্রমণে আক্ষতাল থাকে বরণ করিতে হইয়াছিল আপন যুত্বকে। এখানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যের পক্ষে

সবিশেষ অমূল্য। আশা করি আপনার বারাগশী-ভ্রমণও আনন্দদায়ক হইয়াছে। ইতি

আপনার স্নেহের  
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

### মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পত্র

পরম স্নেহাস্পদ রাজা বতীন্দ্র,

বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের গত শনিবারের অধিবেশনে ঠাকুর আইনের অধ্যাপনার জন্ত শ্রামাচরণ সরকারকে বাতিল করিয়া ট্রেভলিয়ান মহাশয়ের নিয়োগ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে আশা করি সে সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে।

তোমাকে আমার এ বিষয়ে পত্র লিখিবার হেতু যে আমি জানিতে চাই যে এ সম্পর্কে তুমি কিছু ভাবিয়াছ কি? কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই কি অবশেষে সফল হইবে? শ্রামাচরণ বাঙ্গালী, আমাদের স্বজাতি, তাহার পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাহার অগ্রগমনে সর্বাঙ্গীনভাবে সাধ্যমত সাহায্য করাই আমি বিষয়ে বলিয়া গণ্য করি। আমি এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিয়া লইব না, কর্তৃপক্ষের কার্যের প্রতিবাদ করিব। তাঁহাদের পক্ষপাতপূর্ণ কার্যের সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন, ইহাও নিশ্চয়ই তুমি উপলব্ধি করিয়াছ। তাঁহাদের অবাস্তব কার্য আমি কিছুতেই সমর্থন করিব না, ইহার বিহিত করিবই এবং তজ্জন্ত কোনপ্রকার বাধা-বিপত্তি আমি বিমুদ্রাও গ্রাহ্য করিব না। সত্যের জন্তে যুদ্ধ করিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, সেখানে আমার বিবেক আমার প্রধান সহায় হইবে এবং সেই যুদ্ধে ঐ বিবেকই আমার পরিচালিত করিবে।

পত্রোত্তরে তোমার স্মৃতিস্তিত মতামত জানাইয়া উদ্বিগ্নতা দূর করিও।

অশেষ শুভাকাজ্জী  
রমানাথ ঠাকুর  
৬-শে আগষ্ট ১৮৭৬

### মহেন্দ্রলাল সরকারের পত্র

৫১ শাখারীটোলা,  
কলিকাতা  
২৪এ মে, '৮২

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, অজ্ঞকার প্রভাত সত্যই সর্বতোভাবে বরণীয়। আমাদের মধ্যে সে আপনার 'নাইটহুড অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' রূপী সম্মান প্রাপ্তির সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। আপনাকে সমগ্র অন্তরের সম্রাট ও বিনত অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। অজ্ঞকার স্বধীমণ্ডলীর মধ্যে আপনার স্থান অটুট, আপনার দেশসেবা ভবিষ্যতের সন্তানদের মধ্যে আদর্শরূপ। দেশের অগ্রগতিতে এবং জাগরণে আপনার দান দেশবাসী চিরদিনই স্মরণ করিবে। দেশের ও জাতির বিকাশপথের আপনি এমন একজন অকৃত্রিম সহায়ক বাহার জন্ত সমগ্র দেশ তথা দেশের প্রত্যেকটি সন্তান গর্ব অনুভব করিতে পারে।

প্রদ্বার অবনত  
মহেন্দ্রলাল সরকার

২। 'স্তার' উপাধি বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করার প্রথার অভিজিতি। কোন বাঙালী আজ অবধি ব্যারোনেটসি পান নি। চারজন বোম্বাইয়ের অধিবাসী এই ব্যারোনেটসি পেয়েছেন।

## কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পত্র

চট্টগ্রাম

২৫শে ফেব্রুয়ারী

পরম পূজনীয়েষু,

মহারাজা বাহাদুর, বহুদিন সাফাতের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলাম, চট্টগ্রাম আগমনের ঠিক পূর্বেই মহারাজকুমারের নিকট শুনিলাম যে মহারাজা বাহাদুর বর্তমানে বাগবানসীধায়। আপনার সহিত বর্তমানে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ প্রত্যহ না ঘটিলেও আমি অন্তরে প্রতি নিম্নতই মহারাজের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি। আমার স্বপ্নবাসনে মহারাজের যে কি বিশেষ স্থান সংরক্ষিত আছে তাহা বর্ণনা করিতে এ লেখনী অক্ষম জানিবেন।

ত্রিধ্ব-শান্ত নদীর মোহনীয় গতিধারা ও আমার অতি প্রিয় এই বনভূমির মধ্য দিয়া যেন বঙ্গ জননীকে নবরূপে দেখিতেছি। মা যেন আমার আরো কাছে ক্রমেই আসিতেছেন। আর কোন ক্রমে মনে বসে না, কোথাও বাইতে প্রবৃত্তি হয় না শুধু মাত্র ইচ্ছা হয় বসিয়া বসিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করি, মায়ের এই মহিমময়ী রূপ নয়ন ভরিয়া অবলোকন করি, নয়ন ধরা হউক, হৃদয় পরিতৃপ্ত হউক, জীবন পূর্ণ হউক। ভক্তিনয় প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

স্নেহাকাজী

নবীনচন্দ্র সেন

## সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র

১১ কাঁটাপুকুর স্ট্রেন

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

৩১শে জানুয়ারী ১৯০৭

মহামহিমামিতেষু,

অধীশ্বরের রচিত কয়েকটি সামান্য গ্রন্থ লইয়া মহামহিমামিত মহারাজের দরবারে উপস্থিতি এবং এই নিবেদন যে মহারাজ এই গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিয়া অধীনের আনন্দ বর্ধন করুন।

এই ভক্তি-অর্থ দান প্রসঙ্গে মহারাজার দরবারে নিবেদন যে বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যকারগণ কর্তৃক তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত রচনা সমূহে যে পরিমাণ বিদেশী চরিত্রের ভাব অনুসরণ করিতেছেন—বাচার ফলে তাঁহাদের রচনার পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে—ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং কুফলদায়ী। এই মনোবৃত্তিকে খণ্ডন করিতে চাইলে পুনরায় আমাদের সনাতন ভারতের প্রাচীন সাহিত্যগুলির মনন বিশেষ প্রয়োজনীয়, আবার সেই সব মহান জীবনের প্রভাব আলোকের রশ্মিধারার অবগতন করিয়া তাঁহাদের আলোকে নিজেদের ভরাইয়া তুলিতে হইবে। সেই প্রাচীন ভাবধারাকেই নবরূপ দিয়া দেশ ও দেশের মধ্যে প্রচার করিয়া ভবিষ্যতের সন্তানদের মানসক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথ ধরিলে আমার মনে হয় যে অতীতকার এই পাশ্চাত্য অনুকরণবোধ অভিক্রম করা সম্ভবপর হইবে এবং ত্রুটি বহুলাইরা দিবে। হুঃখের বিষয় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলির প্রতি আমরা উদাসীন, আমাদের পূর্বপুরুষগণের কীর্তিরাশি আমাদের অতিভূত করে না। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল বিরাট শক্তিসম্পন্ন বীরদের এবং মহিমামিতা

পূজনীয় বীরজনাদের কীর্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, বর্তমান যুগের কল্পজন সন্তান সে সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত আছেন? তাঁহাদের জীবনী কল্পজন সন্তানের মধ্যে আলোকপাত করিয়া থাকে? ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ব্যথার বস্তু।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়াই আমি এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছি, জানি না ঈশ্বরের কৃপায় কতদূর সফলকাম হইব। সংস্কৃত এবং প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাহিনীসমূহকে এখনকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মনের মত করিয়া নবরূপে তুলিয়া ধরবার চেষ্টা করিয়াছি বাহাতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য তথা প্রাচীন বাঙালির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। এই ‘রামায়ণী কথা’ আমার দ্বাদশ বৎসরের পরিচয়ের ফল। বাঙালির মূল রামায়ণটিকে আমাদের সমগ্রভাবে আরও জানিতে হইয়াছে। ইংরাজিতে লিখিত পুস্তিকাটি ‘বেহলা’ গল্পেরই বস্ত-সংক্ষেপ। উহা অবশ্য ‘মর্ডার রিভিউ’ হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইন্দোনেশীয়রা এ দেশে আগমন করার বহু পূর্ব হইতে যে আমাদের দেশের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং সে যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল ও সেই সভ্যতা ইন্দোনেশীয় সভ্যতার অপেক্ষা বহুগুণ সমৃদ্ধ এই সত্যই অতীতকার তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এবং এ ধারণাও আমি পোষণ করি যে তরুণ সম্প্রদায় তথা মহিলাদিগের মধ্যেও এই সত্য প্রচারে কোন অন্ত্রাঘেরই আশ্রয় আমি গ্রহণ করি নাই।

বর্তমান যুগে মহিমামিত মহারাজ যে একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ এ সত্যের পুনরুজ্জীবন কোন প্রয়োজন নাই। বিস্তার ক্ষেত্রে, বহুসংখ্যক ক্ষেত্রে, কথ্যে, ক্ষেত্রে, মহারাজের সহিত তুলনীয় এমন কেহ এখন বর্তমান বলিয়া আমার মনে হয় না। বীহার নেতৃত্বে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে, বীহার দাক্ষিণ্যে শত শত চরিত্র বাঁচিবার সংস্থান পাইয়াছে, বীহার প্রেরণার দ্বারা অনেক সংসাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে তাঁহার কীর্তি কাহিনী ব্যক্ত করা আমার কমতা-বহির্ভূত। মহাকাবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত হইতে শুরু করিয়া আধুনিককালেরও বহু অসংখ্য লেখক মহারাজের উৎসাহে সৃষ্টির উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহার ভুলনা নাই। আজও এমন কোন লেখক নাই, তিনি বহু শক্তিমানই হউন না কেন মহারাজের উৎসাহবাহী বিনি অপরিণীত সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া গণ্য করেন না।

অবশেষে অধীনের নিবেদন, গ্রন্থগুলি কৃপাপূর্বক পাঠ করিয়া আর মহামূল্য মতামতে অধীনের সাহিত্য সাধনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। ভক্তিনয় প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধানত  
দীনেশচন্দ্র সেন

প্রেরিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) রামায়ণী কথা

(২) বেহলা

(৩) সুন্দর

(৪) সতী

(৫) ইংরাজী বেহলা

—এ বাইথ অফ স্নেক-গডেন।

## ভোলানাথ চন্দ্রের পত্র

২৬শে জানুয়ারী ১৮৬১

প্রিয়বর বতীজবাবু,

আমার চারখানি পুস্তক আপনাকে এই প্রসঙ্গে পাঠাইবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

আমার এই রচনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ঠাকুর-পরিবারের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম সাহায্য লাভ করিয়াছি, সে বিষয়ে বথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। আপনাদের পরিবারের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পাইলে কি হইত বলা যায় না।

আমার লোকবরণ্য খুল্লভাতের প্রয়াণের পর আপনি তাঁহার স্থানে সমাসীন। তাঁহার কীৰ্ত্তি সমগ্র দেশের গৌরববর্ধক। আপনার নেতৃত্বের আজ বিশেষ প্রয়োজন, আপনার প্রতিভা প্রকাশের লগ্ন ভারদেশে আগত। সারা দেশ আজ আপনার দিকে চাহিয়া আছে। আপন নেতৃত্বে দেশ ও দশকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করুন ও আমাদের আনন্দবর্ধন করুন। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্রের উন্নতিবিধান আজ অত্যাৱশ্যক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও আপনার অবদান গৌরববন্ত স্থাপন করুক। ভারতের সংবাদপত্র কর্মিগণের উপকারার্থে একটি তহবিল সৃষ্টি করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। ভারতের প্রধানতঃ স্বেচ্ছাই সাংবাদিকতা সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়া, প্লবিত করিয়া, বিশ্বস্ত করিয়া যেদিন তুলিবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

হাট্টার মহাশয় এখানকার প্রাচীন পরিবারগুলির ইতিহাস সকলনে ব্যাপৃত, তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আপনার কাছে ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ কয়েকখানি গ্রন্থ চাহিতেছি।

আশা করি সর্বাসীন কুশলে আছেন।

আপনারই

ভোলানাথ চন্দ্র

## ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধির পত্র

মিউনিসিপাল অফিস

হাওড়া

৭ই ডিসেম্বর ১১০৩

শ্রীচরণকমলেশ্বর,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। কিরণবাবুর (৩) বৃত্তসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ইহার পর আপনাকে কোন

৩। মহারাজা বতীজমোহনের মেজ মেয়ে স্বর্গীয়া বরণাবলিনী দেবীর (বালিগঞ্জের ৩১১ মনোহরপুত্র রোডস্থ বিখ্যাত কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বনমালী মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী) ছোট ছেলে। স্বর্গীয় কিরণমালী মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১৮৭২, মৃত্যু ১১০৩। অসাধারণ শক্তিমান ব্যারামবীর। এঁর বীরত্বের কয়েকটি কাহিনী আজও পরিবারের মধ্যে আবেগ ও আশ্রয়ের সঞ্চার করে। সঙ্গীতেও এঁর বথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সে বিষয়ে ৬গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ও সজ্জাদ মহম্মদের নিকট ইনি পাঠগ্রহণ করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে উপেক্ষা ও আঘাতে এই হতভাগ্য যুবকের জীবননাট্যের পারিসমাপ্তি হয়। মৌহিব্রের মৃত্যুতে মহারাজা বিশেষ আত্মত্ব হইয়াছিলেন।

প্রকারে বিরক্ত করা অত্যন্ত রূঢ়তা বিবেচনা করি। কিন্তু বিশেষ কারণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি স্বীয় স্নেহগুণে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কোন সময়ে আপনার সহিত সুস্থভাবে কথা কহিবার অবসর হইবে এই পত্রবাহকের হস্তে একটু লিখিয়া দিলে অত্যন্ত অনুগ্রহীত হইব। ইতি—

সেবক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## বিচারপতি স্থার আশুতোষ চৌধুরীর পত্র

বার লাইব্রেরী

কলিকাতা

১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

প্রথম শ্রদ্ধাশ্রাদ্ধ মহারাজা বাহাদুর,

বড়লাট বাহাদুরের লিভিতে(৪) আমার পরিচায়করূপে আপনার গৌরবমণ্ডিত নামটি উল্লেখ করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারি কি?

আগামী কল্যা কর্মদিবস, উজ্জ্বল বিশেষভাবে ব্যস্ত রহিয়াছি নতুবা নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া স্মৃতি করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

আশুতোষ চৌধুরী

৩০।৫৪ ধর্মতলা

কলিকাতা

২৫শে জুন ১৮৮৮

প্রথম শ্রদ্ধেয় মহারাজা বাহাদুর,

আমার ভাতা বোগেশচন্দ্র চৌধুরী(৫) অনুকূলে মহারাজা হুগাঁচরণ লাহাকে একখানি পরিচয়পত্র দান করার জন্তে আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ এবং তাহার ছাত্রজীবন কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশে আরও কত উন্নতিমূলক দৃষ্টি অবলম্বন করা বাইতে পারে, এই সম্পর্কে সে মহারাজার সহিত আলোচনা করিতে চাহে। গতানুগতিকভাবে সরকারী চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের প্রতি তাহার এই আগ্রহ আশা করি আপনার প্রশংসা লাভে সমর্থ হইবে। এবং এই আশা করিয়াই আপনার দরবারে আমি উপস্থিত।

৪। তৎকালীন বড়লাটেরা মাঝে মাঝে এক মিলনসভা আহ্বান করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হতেন। এখনকার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এই সভায় অভ্যাগতদের সঙ্গে বড়লাটের পরিচয় এ, ডি, সি করাতেন না, করাতেন কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত। এই জাতীয় সম্মিলনীকেই লিভি বলা হতো।

৫। প্রখ্যাত ব্যাবিষ্টার এবং দেশবরণ্য আইনসাংবাদিক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যচার্য প্রবন্ধ চৌধুরীর অগ্রজ। এঁদের গৌরবময় পরিবারের এক একটি খ্যাতিমান সম্ভানের বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয়া ইন্দ্রা দেবী চৌধুরাণীর জীবনীতে (চারজন) মাসিক বসুমতীতে কিছুটা দেওয়া আছে। বোগেশচন্দ্রের পুত্র কৃতী ব্যাবিষ্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী। ১৯৫১ সালে ৮৯ বছর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

আমার বিশ্বাস, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন তাহার উপর আপনার মূল্যবান পরিচয়লিপি আমার অমুজকে সেই উপকার পাইতে যে কি পরিমাণে সাহায্য করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আশা করি গ্রীষ্মের প্রথম দারদাহ আপনার স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। প্রণাম জানিবেন। ইতি

আপনার স্নেহাধীন  
আন্তোব চৌধুরী

বিচারপতি স্মার চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্র

৩ ম্যালবার্ট রোড  
২৭শে

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার মল্লীর ভবনে একটি আপরাহ্নিক চা-চক্রে মিলিত হইলে আনন্দিত হইব। এই আহ্বান আমার পূর্বাভূই করা উচিত ছিল, বিলম্বে আহ্বানের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এবারের চা-চক্রে মহারাজা একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাইবেন, এই প্রীতিসন্মেলনে আমি আনুমানিক দ্বাদশ জনকে আহ্বান জানাইয়াছি, মহারাজা হয় তো সুখী হইবেন এই দ্বাদশ জনের মধ্যে সকলেই বাঙ্গালী, একজনও পশ্চিমা ইংরাজ নন।

আপনাদের  
চন্দ্রমাধব ঘোষ

মহারাজা স্মার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরের পত্র

শোভাবাজার  
২৪শে মে ১৮৮২

প্রিয়বরেষু,

স্মার বতীন্দ্রমোহন, তোমার ঠাঁর অফ ইণ্ডিয়ান নাইটহুড প্রাপ্তিতে পরম আনন্দিত হইলাম। তোমার গৌরবে-সৌরভে সমগ্র বঙ্গ আয়োদিত। তুমি আমার প্রাণভরা অভিনন্দন গ্রহণ কর। আজিকার বঙ্গদেশে তোমার মত বিচক্ষণ তাল্লক্ষী জননায়কের বিশেষ প্রয়োজন। প্রার্থনা করি, স্বীয় নেতৃত্বে দেশ ও জাতিকে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির শীর্ষস্থানে পরিচালিত কর।

ভগবানের চরণে তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

তোমাদের  
নরেন্দ্রকৃষ্ণ

মহারাজা স্মার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পত্র

কাশিমবাজার রাজবাটা  
৩১শে জানুয়ারী ১৮৮৮

পরম ভক্তিজান মহারাজা বাহাদুর,

আপনার ৩০ তারিখের পত্রখানি পাইয়া যে কি পরিমাণ উন্নতি হইলাম তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে বর্ণনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার।

আমার প্রতি মহারাজের সুগভীর ককণা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। স্বতঃপ্রসঙ্গিত হইয়া আমার উন্নতিকল্পে মহারাজা বাহা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্ত মনে

করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অতীতকার সমাজে বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অধীনের যেটুকু আসন স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার জন্তও মহারাজের স্নেহই দায়ী। আমার কিসে উন্নতি হয়, কি ভাবে আমি উপকৃত হই এ বিষয়ে মহারাজের পবিত্র অনাবিল স্নেহ চিরকালের জন্ত এক মহামূল্য রত্ন হিসাবে আমার অন্তরে রক্ষিত হইবে।

আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক আমার নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে, ঐ উপলক্ষে এ গৃহে আপনার পদাধী বিশেষভাবে আশা করি।

আশা করি সর্বদীন কুশলে আছেন।

আপনাদের  
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর পত্র

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিওশন  
১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট

কলিকাতা

২৪শে আগস্ট ১৮৮৫

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, কৃষ্ণদাস স্মৃতিরক্ষা তহবিলের হিসাবাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, অন্ত্যপি তাহার বোলো হাজার ছয় শত আটান্ন টাকা আয়ের অঙ্ক কিন্তু ঐ অঙ্কের মধ্যে মাত্র ছয় হাজার নয় শত তেরো টাকা এ যাবৎ আদায় হইয়াছে।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সহিত আমি আলোচনা করিয়াছি। একান্তবর্তী হিন্দু পরিবার প্রথা সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যবার্ষিক প্রকৃতিতে তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। বাবু আন্তোব মুখোপাধ্যায়(৬) এ বিষয়ে তাঁহার বাহা ধারণা তাহা লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি

মহাশয়ের চির-অনুগত  
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, আগামী কল্যা দিবা দুই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেউলিয়া-বিল সম্পর্কে ম্যাসোসিওশানের পত্রটিও সঙ্গে লইব, কাজে লাগিতে পারে।

চিরানুগত  
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী

রাজকুমার সর্বাধিকারীর পত্র

১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট  
আগস্ট ২২, ১৮৮৮

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে বিষয়টি পার্লামেন্টে উপস্থিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত কাগজটিতে বিস্তারিত বিবরণী পাইবেন। এই বিষয়ে ছোটলাট হয়তো আপনাকে শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে

৬। উত্তরকালের বঙ্গবরণ্য পুরুষসিংহ পুজনীয় স্মার আন্তোব মুখোপাধ্যায়।



তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত জানিয়া লইবেন। আমাদের বক্তব্যটি কিরূপ ভাবে সাজানো হইয়াছিল, সে সম্পর্কেও এই অন্তর্ভুক্ত কাগজটি আপনাকে আলোকপাত করিতে পারিবে।

আমাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের প্রতি শ্রুগন্ধ তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেছে, তাহার সর্বতোভাবে আমাদের প্রচেষ্টা বার্থ করিতে চাহিতেছে, অতএব এবিধ ক্ষেত্রে অতীব সহৃদয়তার সহিত আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। রাজকুমার সর্বাধিকারী

তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের পত্র

১১ চৌরঙ্গী লেন

২রা জাহ্নবীরী ১৮৮৮

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, আপনার অভিনন্দন পত্র পাইয়া ধন্য হইলাম। যে সম্মান আমার উপর বর্ষিত হইয়াছে, আপনার অভিনন্দন তাহা অপেক্ষা কোন অংশ কম নয়।

বিশ্ববরেষু পরিবারের স্বনামধন্য পুরুষ আপনি আপনার শ্রায় তীক্ষ্ণদী নেতার অভিনন্দন পাওয়া ভাগ্যের কথা, এই পত্র আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান বস্তু। আমার প্রতি আপনার অহুভূতির মর্মান্দা রক্ষা যেন করিয়া বাইতে পারি। শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনাদের

গোবিন্দলাল রায়

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র

বাগবাজার

প্রজ্ঞাপদেষু,

২১শে অক্টোবর ১৮১৪

মহারাজা বাহাদুর, আপনার অভিপ্রায় অমুখ্যারী যত্ন বাবুর মাইকেলের জীবনীর নোটের কিয়দংশ আমি পুনর্বার সিখিয়া দিয়াছি এবং পরিষ্কার ভাবে তাহার একটি নকল করিয়াছি। নকলটি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনি পড়িয়া দেখিবেন এবং যদি আরও কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন তাহা করিবেন। যত্ন বাবুর কিঞ্চিৎ টাকা সহযোগে পরে উহা সরাসরি গৌরদাসকে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি যদি অধিক অদল-বদল করেন, তাহা হইলে সমগ্র রচনাটিই আবার সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করিয়া নকল করিতে হইবে এবং গৌরদাসকে পাঠানো হইবে। এ বিষয়ে গৌরদাস আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া আমার প্রাণ বাহির করিবার উপক্রম করিতেছে। যে জীবনী গৌর টাইপ করাইয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে অর্থাৎ পরিশিষ্টে যত্ন বাবুর নোট বাইবে। সুতরাং বাহাতে অন্তই এই রচনা গৌরের হস্তগত হয়, কৃপাপূর্বক সেই অমুখ্যারী ব্যবস্থা করিতে অমুখ্যারী করি। শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

চিরাহুগত আপনাদের

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

পরম পূজনীয়,

বড়লাটের লিভিতে আমার অগ্রজ অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং আমার স্বশ্রেষ্টর বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু রমণীমোহন

চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রদানের জন্য আপনাকে অমুখ্যারী করিতে পারি কি? আপনার নাম যদি আমাদের পরিচয়-প্রদায়ক রূপে গণ্য হয় তাহা হইলে নিজেদের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব।

আপনার স্নেহাধীন

দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমারী সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুরের(৭) পত্র

৩ ন্যাথার্ণার টেরেস

কুইন্স গেট

লণ্ডন

২১শে সেপ্টেম্বর

পরম পূজ্যপাদ কাকামহাশয়,

আপনার স্নেহলিপি এক প্রেরিত ১৫০ পাউণ্ডের আশীর্বাদী আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনার আশীর্বাদী এই ১৫০ পাউণ্ড শিরোধার্য করিয়া গ্রহণ করিলাম। আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে উহা পরিত্রাতার রূপ লইয়া আসিয়াছে, আগামী শীতে উহার সাহায্যেই স্বতন্ত্রাঙ্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিব।

কাকামহাশয়, সুখে-দুঃখে ঘেরা জীবনের অনেকগুলি বৎসর কাটিয়া গেল, আরও স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি কাটিবে—সাক্ষাৎ কখনও ঘটবে কি না জানি না তবে পত্র যতটুকু জানা যায় ততটুকুর জন্যই উদগ্রীব হইয়া থাকি। কলিকাতায় আমার পরমপ্রিয় পরিজনদের আকৃতি কিরূপ, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বা অবসরবিনোদন কি, দৈনন্দিন কর্মসূচী কিরূপ, সেখানকার বাড়ীটি কিরূপ দেখিতে, সেখানকার নর-নারীর জীবনধারা কিরূপ, এই সকল বিষয়ে জানিতে খুবই ইচ্ছা করে, মাঝে মাঝে পরমাত্মীয়দের সম্পর্ক হইতে জন্মের মত দূরে সরিয়া থাকার বেদনা অশ্রু উৎসেক করে। আমার পিতৃদেবের সংগ্রহ হইতে আমার এক পিতৃদেবের আলেখ্য দর্শন করিয়াছি। আমার প্রবল ইচ্ছা, আপনাদেরও প্রতিকৃতি আমার হস্তে আসে। অতঃপর আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করিয়া সুখী করিবেন। বতই দূরে থাকি, আমি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব যে ভারতের পথ-বাট।

৭। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের খুল্লতা ভারতবরেষু আইনবিদ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দ্বিতীয় পক্ষে রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে কমলাকে বিবাহ করে ইল্যাণ্ডে বসবাস করতে থাকেন, এ তথ্য সুবিদিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের এক ছেলে প্রসন্নকুমার ও দুই মেয়ে সত্যেন্দ্রবালা ও নাগেন্দ্রবালা। তিন জনের মধ্যে সত্যেন্দ্রবালাই বেশীদিন জীবিতা ছিলেন। সত্যেন্দ্রবালা বিলেতেই লালিতা-পালিতা একবার মাত্র ভারতে এসেছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহারাজা প্রজ্ঞোতকুমারের অতিথি হয়ে, অবস্থান করেছিলেন বিশ্বখ্যাত ঠাকুর ক্যাসেলে (১১.৩-১০)। এঁর চিঠির পত্রমূল্য যথেষ্ট। হতভাগিনীর ব্যথা বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠছে তাঁর পক্ষে। বিদেশে বাস করেও স্বদেশের জন্তে ব্যাকুলতায়, স্থানবিড়-দেশপ্রেমে, পরিজনদের থেকে দূরে থাকার তীব্র দুঃখে চিঠিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠছে। এঁর চিঠি যে কোন লোকের হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলেবে এ বিশ্বাস রাখি।

নদী-নালা, আকাশ-বাতাস সদাসর্বদাই আমার আহ্বান করে। আমার পিতৃভূমি, আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ, আমার পূর্বপুরুষগণের নীলাক্ষেত্র, আমার জনক-জননীর জন্মস্থান শত শত মনস্থির পদরঞ্জ-ধ্বজ ভারতভূমিকে স্মরণ ইংলাণ্ড হইতে প্রণাম নিবেদন করি।

আপনার এবং পরিবারস্থ সকলের কুশল সংবাদ দিয়া অনুগৃহীতা করিবেন ও আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধজা করিবেন। ইতি

আপনার স্নেহধ্বজা  
সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর  
হোটেল বেলেভু  
মেটন, ফ্রান্স  
২৮শে মার্চ

পরম শ্রদ্ধাঙ্গীকার কাকামহাশয়,

অল্প প্রভাতে আপনার আশীর্বাদে এ স্থলে পৌঁছিয়াছি। গতকাল রাত্রে পাণী ছাড়িয়াছি। রাত্রে ট্রেনে অত্যন্ত শীত অনুভব করিয়াছিলাম এবং তজ্জন্তু কিঞ্চিৎ অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অদ্ভুত আকাশের ঐ প্রভাতসূর্য গতরাত্রের সমস্ত অবসাদের অবসান ঘটাইল। সূর্যের মিষ্ট মধুর তাপবাশি শরীরে শক্তির সঞ্চার করিতেছে। আপনার সাহায্য না পাইলে একপাশে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইত না। আমার মনে হয় এখানে কয়েক সাপ্তাহ অবস্থান করিলে আমার স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে শ্রীসম্পন্ন হইবে। আত্মীয়-বিবর্তিত জীবনের শেষাংশে আপনার করুণা, স্নেহ ও মমতা আমার নিকট এক মতাব রত্ন বিশেষ। ঈশ্বরের নিকট সর্বতোভাবেই আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতে থাকি। আমার বিশেষ বান্ধবী মাননীয় শ্রীমতী হেডমাও এখানে আছে।

আপনি এবারের গ্রীষ্মে কোথায় বাটতেছেন?

আশা করি কুশলে আছেন। আমার ভক্তিনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমার ভাতার সংবাদ জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, তাকে আমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্বাদ জানাতবেন, স্মরণামত সে যদি মাঝে মাঝে পত্র লেখে তো বড়ই আনন্দিত হইব।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী  
সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর

দাদাভাই নৌরজী পত্র

লণ্ডন  
১৪ই ফেব্রুয়ারী  
১৮৫১

প্রিয়বরেণ্য,

মহারাজা, যদিও একযোগে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন বর্তমানে কিছুকালের জন্ত স্থগিত করা হইয়াছে এবং ভারতস্থ ও স্থানীয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অতিমাত্র প্রদান করিয়াছেন তথাপি আমি বিলম্বিত নিরাশ হই নাই। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালীগণকে বিশেষ যুগের চক্ষু দেখেন, শুধু তাহাই নয় তাহাদের কোন কিছুই স্বীকার করিয়া প্রাধান্য দিতে নারাজ। এ বিষয়ে কি কোন প্রতিনিধিগণ সত্যিই অসম্মত? দেশের স্বার্থের জন্ত সংগ্রামের দিন সমাগত, প্রবল সংগ্রাম

করিয়া দেশের স্বত্ব স্বার্থ উদ্ধার করিতে হইবে। আমি যতক্ষণ এখানে আছি আমার সাধারণ সংগ্রাম আমি চালাইয়া যাইব। এখন আপনার ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েশনের সাহায্য পাইলে বড়ই উপকার হয়। ভারতের আজ জাগরণের দিন, অস্বস্ততা ও তামসিকতার বাশ্প দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের ও প্রগতির (নৈতিক ও বাস্তবিক উন্নয়ন) আলোর স্নাত হইয়াছে। তবে সংগ্রাম ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই, সহজ পথে, তাহার স্বার্থ উদ্ধার হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না অন্ততঃ এই স্থানে থাকিয়া আমি তো এই অভিজ্ঞতাই সংস্থ করিয়াছি। ভারতের সাহায্য আমি চাই, তবেই আমার সংগ্রাম সাফল্যভূষিত হইবে। ভারতে আজ যে শক্তির মিছিল চলিয়াছে দূর হইতে তাহা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। ভারতবাসীকে নিজের অভিজ্ঞত করিয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। তাহাদের মনোমত বস্তুগুলি মুখের সামনে ধরিয়া দিয়া তাহাদের অভিজ্ঞত করিয়া তাহাদের ক্লীব করিয়া রাখিতে চায় এই ব্রিটিশ সরকার। আইরিশরা কেমন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইল? তাহারা দলে দলে প্রতিনিধি এখানে প্রেরণ করিয়াছিল সংগ্রামের উদ্দেশ্যে, সে প্রচেষ্টা তো তাহাদের সফল হইয়াছে বলা যায়। অতএব এইখানেই তো আমরা আইরিশ (এবং ইরেজেরও) নিকট হইতে প্রভূত শিক্ষা পাইলাম। অধ্যবসায় ও অবিচলিত নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় আইরিশরা দিয়াছে। গণ করিতে প্রস্তুত আছি, যতদিন না জয়লাভ করিব, থামিব না, ভারতবর্ষ কি এখনও তাহার সম্মানদের প্রেরণ করিবে না?

দাদাভাই নৌরজী

পণ্ডিত বিষ্ণু দিগবরের পত্র

গান্ধী মহাবিজ্ঞান  
১০ই মার্চ ১৯০৫

মহাশয়,

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্ বামী গুজানন্দজীর নির্দেশে স্বতন্ত্র ডাকযোগে আপনাকে একখণ্ড মাসিক 'সঙ্গীত অমৃত পর্ব' প্রেরণ করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্বক পাঠ করিবেন এবং অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মহামূল্য মতামত দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

আমাদের প্রচেষ্টায় মহারাজের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা অতীব শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষা করি।

বিষ্ণু দিগবর  
অধ্যক্ষ

নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফের পত্র

১৬ ভালতলা  
৭ই ফেব্রুয়ারী ১১

প্রিয়বরেণ্য,

মহারাজা বাহাদুর, আপনার 'মহারাজা' উপাধি কশামুক্রমিক রূপে গণ্য হওয়ার আমি যে কি পরিমাণে স্খামুভব করিতেছি তাহা সত্যিই প্রকাশ করা যায় না। আপনার সম্মান সৌরভ সমগ্র দেশকে স্পর্শ করিয়াছে।

আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল সাক্ষাতে গিয়া আপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জানাইয়া আসিব কিন্তু অত্যাধিক শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করিতে না

গারার এই আনন্দোৎসবে যোগদান করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইল না।

এই উপলক্ষে আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করুন, যশ ও শ্রী চিরকালের মত আপনার মধ্যে বিরাজ করুক, আপনার বিরাট জীবন আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আদর্শ সঞ্চার করুক ইহাই প্রার্থনা।

আপনাদের  
আবহর লভিক

রাজা মাধোলালের পত্র

চৌধুরা  
বারাণসী  
১৩ই অক্টোবর ১১০৫

ভক্তিতাজন মহারাজা-সাহেব,

এবারের শীতে আপনি বারাণসী আসিবেন না শুনিয়া বড়ই হতাশিত হইলাম। এই সময় বারাণসী বড়ই স্বাস্থ্যকর জায়গা, একবার আসিলে আপনারও স্বাস্থ্য উদ্ধার হইত, আমাদেরও আনন্দবর্ধন হইত সেই সঙ্গে বারাণসীর শোভা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

ভক্তিতাজন মহারাজা-সাহেব, এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি, কংগ্রেসের প্রদর্শনীকার্যের দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করিয়াছি—এ বিষয়ে আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি? আপনার স্নেহধারা আমার প্রতি চিরকালই প্রবহমান, জীবনের নানা ক্ষেত্রে আপনার নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য ও উপকার পাইয়াছি, সেই জোরেই আমার এই ভিক্ষা, স্নেহের দাবীও বলিতে পারেন। আমি ইহাও জানি, আপনি আমাকে যে সাহায্য করিবেন আর কাহারও নিকট সে সাহায্য আমি পাইব না।

মাধোলাল

চৌধুরা

১লা নভেম্বর ১১০৪

ভক্তিতাজন মহারাজা-সাহেব বাহাদুর,

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট অধিবাসী বিখ্যাত শাস্ত্রী রাজারাম বোদাসের সুযোগ্য পুত্র মাধোরাম বোদাসের সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিবার অনুরোধ প্রদান করুন। ইনি নিজেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক বোম্বাই মহামান্ত্র বিচারাদিকরণের এক ব্যবহারজীবী। আমাদের, হিন্দুদের সন-তারিখের ব্যাপারে যে মতদ্বৈধতা ও গোলযোগ বিজ্ঞমান, তাহার অবসানকল্পে ইহার বর্তমান কলিকাতা গিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাতাভিলাষের উদ্দেশ্য। ইনি নিজেই মহারাজের নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করিবেন। এই সকল সংকর্ষে মহারাজের উৎসাহ অপরিমিত। মহারাজের বিজ্ঞোৎসাহিতার কথাও সুবিদিত। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ঐ সক্রান্ত যে সকল ছাত্রাণ্য গ্রন্থাদি মহারাজের বিরাট গ্রন্থাগারে শোভা পাইতেছে—সেইগুলি ইহাকে অধ্যয়ন করিয়া গবেষণার কাজ চালাবার জন্য অনুরোধ দিয়া আমাদের উভয়কেই কৃতার্থ করেন। মহারাজের এই অনুরোধ রূপ আশীর্বাদ ইহার সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত করিবে, এই বিশ্বাসই আমি করি। আশা করি সর্বদীন কুশলে আছেন।

ভক্তি-অবনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

অনুগ্রহীত  
মাধোলাল

নেপালের প্রধানমন্ত্রী দেব শামসের  
জঙ্গ বাহাদুর রাণার পত্র

থাপাখালি দরবার  
নেপাল

২৩শে মার্চ ১১০১

পরম শ্রদ্ধের মহারাজা,

আমার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিয়োগে আনন্দপ্রকাশ করিয়া আপনি যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহার জন্য সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। যে বিরাট দায়িত্ব আমার উপর জন্ম হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে পালন করিতে আপনার আশীর্বাদই আমাকে সর্বদা প্রেরণা জোগাইবে।

আপনি ভারতবরেণ্য পুরুষ, আপনার আশীর্বাদী পাওয়া আমার স্বাধীনতা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, চরণে নিবেদন এই আশীর্বাদ-ধারা হইতে কখনও বঞ্চিত না হই এবং সকল সময়েই যেন মূল্যবান উপদেশ পাইয়া থাকি—বাহা বিশেষরূপে আমার কাম্য।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার অনুগ্রহীত  
দেবশামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা

শিক্ষাধিকর্তা স্যার য্যালেক্স ক্রফটের পত্র

অফিস অফ দি ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশান  
২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭

প্রিয়বরেণ্য,

মহারাজা, মহারাণীর ছবিলা উপলক্ষে পণ্ডিতদিগকেও উপাধি-দানের এক প্রস্তাব করিয়া পণ্ডিত মহেশচন্দ্র শ্রায়বত আমায় সহিত এক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এখন পণ্ডিতদিগকে সম্মানোপাধি দেওয়া হইবে কি হইবে না কিংবা কিরূপ উপাধি তাঁহাদের দেওয়া বিধেয় এই বিষয়ে আপনি কি মতামত পোষণ করেন তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ উৎসুক। মিঃ এ, পি, ম্যাকডোনাল্ডের ইচ্ছাক্রমে এই উপলক্ষে একদিন (নির্দিষ্ট দিন পরে জানাইব) একটি অধিবেশনের আহ্বান করা হইবে, সেই অধিবেশনে যোগদানের জন্যে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে এবং তৎসহ পণ্ডিত শ্রায়বতকে আপনাকে ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আহ্বান করা হইবে।

আমার অনুরোধ সেই দিন আপনি আসিয়া আপনার স্মৃতিস্তম্ভ অতিমত প্রদানে আমাদের সহায়তা করুন।

আপনাদের

এ. ক্রফট

(য্যালেক্স ক্রফট)

মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরকে

লেখা তিনখানি অপ্রকাশিত পত্র

[মহারাজা বতীন্দ্রমোহনের চার মেয়ে ছিলেন কিন্তু একটিও ছেলে ছিলেন না, এই অপূত্রকতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্তে জননী মহারাজ-মাতা শিবসুন্দরী দেবীর ইচ্ছাক্রমে অনুজ সঙ্গীত-সত্রাট রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের ন'বছরের মেজ ছেলেকে বতীন্দ্রমোহন দত্তক গ্রহণ করেন। এই পুত্রই উত্তরকালের শিল্পপ্রাণ মহারাজা প্রদ্যোতকুমার। আলোকচিত্রায়ণে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিলেতের রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির ইনি প্রথম ভারতীয় সদস্য (১৮৯৮)। কলকাতার শেরিফের আসনও এর দ্বারা হয়েছে অলঙ্কৃত। শিল্পের ও কবিতার প্রতি অনুরাগের জন্য প্রদ্যোতকুমার চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকেন। শিল্পই ছিল তাঁর প্রাণ।

এঁদের বিখ্যাত উত্তানবাটা 'এমারেড বাওয়ার' বা 'স্বকত-কুঞ্জ' নির্মাণ করেছিলেন এঁর পিতামহ পরম পণ্ডিত মহাশয় হরকুমার ঠাকুর কিন্তু তা বিখ্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে প্রজ্যোতকুমারের কল্যাণেই। তাঁর শিল্পবোধের নিদর্শনবাহী এই স্বকত-কুঞ্জ শোভার সৌন্দর্যে নন্দনকাননকেও হার মানাত। কলকাতার শ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এরও প্রতিষ্ঠা ছিলেন তিনি। ১১০২ খৃঃ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লণ্ডনে পিতার প্রতিনিধিত্ব করেন যুবক প্রজ্যোতকুমার; এট উপলক্ষে তাঁর মাসতুতো ভাই (একিক দিয়ে ভাইপো) শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা আছে (বিলাতবাত্রা প্রশস্তি)। বিলেতে প্রজ্যোতকুমার দেখিয়ে এসেছিলেন যে অতিথিপরায়ণ আর বদান্ত কা'কে বলে। এবং সেই ক্ষেত্রে সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়কে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাতৃপোত্র তিনি। প্রজ্যোতকুমারের শিল্পবোধ ও শিল্পপুঞ্জার বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। নীচে তাঁকে লেখা তিনখানি চিঠি সন্নিবেশিত হ'ল। এ চিঠিগুলিও প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়ে তাঁর পুত্র পূর্বোক্ত মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন কৃতজ্ঞতা পাশে আমাদের আরও জড়িয়ে ফেললেন।—স]

ডাঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা

প্রিয়বরেবু,

ডিসেম্বর ৬, ১৯১১

মহারাজা বাহাদুর, রাজকীয় সত্বর্ষনা তহবিলে একশত টাকা দানকারী সদস্যরূপে বিশেষ প্রদর্শনীর দিন শ্যাম্পি থিয়েটারে আমি প্রবেশাধিকার পাইব কি না এ সম্পর্কে এক ছত্র জানাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব (অবশ্য যদি আপনার তরফে কোন অনুবিধা না হয়)।

আমার দেয় মুদ্রা আমি দিয়া দিয়াছি এবং প্রবেশাধিকারের জন্য একটি মায়েলী আবেদনও করিয়াছি; তবে জানি না যে একশত টাকার সদস্যদের তথ্য প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে কি না। সেইজন্যই আপনাকে এই পত্র লেখা।

বিভাগ্যের ছাত্রীদের আমোদ-প্রমোদ উপসমিতির সভাপতিরূপে যে স্বর্ণ পদক পাইবার আমি অধিকারী তাঁহার জন্য মিঃ ডি. কে,

কানিসনকে লিখিব কি? অবশ্য যদি প্রবেশাধিকারই না পাই তবে স্বর্ণপদক আমার কোন কাজেই আসিবে না।

বিস্মৃত করার জন্য কমা প্রার্থনা করি।

আপনাদের

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পত্র

২৬ পটলডাঙ্গা, কলিকাতা

প্রিয় প্রজ্যোতকুমার,

১ই ডিসেম্বর ১৯১১

বিশেষ প্রদর্শনীর উপসমিতির কার্যকরী সভায় আমি একজন সভ্য। মহামহিম সম্রাট ও মহামহিমামিতা সম্রাজ্ঞীর ভারতে আগমন উপলক্ষে এই বিশেষ প্রদর্শনী এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে এবং আমার পুত্র পরিজনদের তুমি কি কি সুযোগ সুবিধা দান করিতে পার, জানাইয়া আনন্দবর্ধন করিও।

তোমাদের

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্র

ভবানীপুর

প্রিয়বরেবু,

রবিবার, ৩রা মে ১৯১১

মহারাজা, চক্ষে ছানি পড়ার জন্য অস্ত্র হস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। অপরাধ মার্জনা করিবেন। চিকিৎসকের উপদেশে যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন ও লিখন বন্ধ রাখিতে হইতেছে।

আগামী মঙ্গলবার ৫ই তারিখে অপরাহ্ন সোরা পাঁচ ঘণ্টিকার অনুগ্রহ করিয়া এখানে একটি চা-চক্রে মিলিত হইলে সুখী হইব। আমি এ উপলক্ষে বিশেষ কাহাকেও বলি নাই, মাত্র হই কিন-জনকে বলিয়াছি, বর্ধমানের মহারাজাকেও বলিয়াছি।

আপনার পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া আছি, সেখানে কি দেখিলেন, সেখানকার পরিবেশিতিকরণ, আজিকার যুগোপযোগী তাহাদের অগ্রগতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই সকল তথ্য পবিবেশন করিয়া সুখী করিবেন।

আপনাদের

চন্দ্রমাধব ঘোষ

## পত্র লেখা

শ্রীমতী বাসবী বসু

জানি আমি আমার চিঠি পৌঁছোবে না তোমার কাছে, যদি বা পাও, তোমার চোখে বন্ধ, ইহার কি দাম আছে? আমার সে যে মধ্যরাতের নীল গগনের উজ্জল তারা, বুকের মাঝের একটি কুসুম, ব্যথায় মলিন ধূলোর বরা। তোমার প্রাণে আবেশ জাগায় কোথায় তেমন গন্ধ গো, তোমার মনে দোলন লাগায় কোথায় পাব সে ছন্দ! নেই কো মাঞ্চল নেই কো হৃদয় ঠিকানাটাও হয়নি জানা, জানি আমি আমার চিঠি কোন কালেই পৌঁছোবে না।

অনেক কথা বলার ছিল বিফল হল সে বাসনা—

জানি জানি আমার চিঠি তোমার হাতে পৌঁছোবে না।

অনেক দিনের অনেক কথা সাজিয়ে দিলাম চিঠির সাজে, রইল ঢাকা, রইল চাপা লেফাটাটার বুকের মাঝে। তবে আবার নম্রা কেটে কি কাজ আছে পত্র লেখার কে দেখেছে বুকের মাঝে আল্পনাটি রক্তরেখায়। স্তম্ভ রাতে তানপুর্বাতে যে গানখানি ঘুমিয়ে ছিল, কোন্ রাগে যে প্রাণ-বাঁধা তার কোন্ জনে বা খবর নিল? দীর্ঘ রাতের প্রহর আমার ঘরের প্রদীপ নিবু-নিবু, মনের কথা জ্বল ছিঁড়ে যায় চিঠি আমার লিখছি তবু।

# চরভব

## মহারানী সূচাক দেবী

(ত্রকানন্দ-তৃষ্ণিতা ও মনুসংস্কৃত-রাজমাতা)

শিক্ষিত ও জ্ঞানার্জন-প্ৰাণী যে বৈচিত্র্যময় মানব-জীবনে নিত্যসাধী তাতা তিসাশী বৎসর বয়সে মহারানী সূচাক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। কারণ, অসুস্থ দেহেও তাঁহার নিয়মিত চিত্তাঙ্কন এবং বিভিন্ন পুস্তক-পত্রিকা পাঠ দৈনন্দিন কর্মধারার অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। এই স্বনামখন্ডা পরহিতব্রতী, মাতৃতুল্যা মহিলার সরল ও সুমধুর ব্যবহার দর্শন-প্রার্থীর মনে এক গভীর রেখাপাত করে।

“নব-বিধান” প্রবর্তক ভারতবরেণ্য মনীষী ত্রকানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা ও চতুর্থ সন্তান সূচাক দেবী ১৮৭৪ সালে কলুটোলা ষ্ট্রীটস্থ দেওয়ান রামকমল সেনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গৃহে বিজ্ঞানভাস করিয়া সাত বৎসর বয়সে তিনি Miss Spiget-এর মিশনারী বিদ্যালয়ে (Church of Scotland) ভর্তি হন। পরে তিনি Victoria Institution-এ বোপদান করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাদীক্ষার বিবরে তিনি খুল্লতাতে উৎকৃষ্টবিহারী সেন ও উপাধ্যায় ঙগৌরগোবিন্দ রায়ের নিকট বথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে ত্রকানন্দের স্বর্গারোহণের পর মাতা জগন্মোহিনী দেবী সন্তান পালনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আদর্শ জননীরূপে প্রতিভাত হন। পাঠ্যাবস্থায় সূচাক দেবী



মহারানী সূচাক দেবী

তদানীন্তন মহিলাসভার (National Ladies' Association) একজন সক্রিয় সদস্য থাকার নানারূপ সমাজসেবার কর্মে নিজেই নিযুক্ত করেন। উহাই পরে All India Womens' Conference (A. I. W. C.) পরিণত হয় এবং মহারানী বিভিন্ন সময়ে উহার সম্পাদিকা ও সভানেত্রীপদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। উহার করাচী অধিবেশনে তিনি প্রথম অলিখিত বক্তৃতা দেন। উহা ব্যতীত বর্তমানে তিনি নিখিল বঙ্গ মহিলাসভা, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, রামকৃষ্ণ মিশন একাডেমী অফ ফাইন আর্টস, বাহাই (ইরাণ) সম্প্রদায় সম্মেলন, রেডক্রস, ভারত মহিলাশ্রম, ব্রাহ্মযুব-সভা প্রভৃতি নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। বারিপাণার শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত “ব্রাহ্ম-মন্দির” মহারানীর আয়ুকুল্যে নিখিঁত হয়।

১১-৪ সালে দেশীয় রাজ্য মনুসংস্কৃত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ডব্ব দেওর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯১০ সালে তিনি মহারাজার সহিত ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তথার তাঁহার জ্যোষ্ঠা ভগিনী মহারানী সুনীতি দেবার স্বামী কুচবিহার মহারাজা পরলোক গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১২ সালে মনুসংস্কৃত মহারাজা রামচন্দ্র দেহত্যাগ করায় তিনি শোকে মুহমান হইয়া পড়েন।

১৯৩২ সালে তাঁহার কন্যা জয়ন্তী দেবীর সহিত নন্দগাঁও মহারাজার বিবাহ হয় এবং পুত্র ব্যারিষ্টার ঐবেন্দ্র দ্বিতীয় মহাসময়ের সময় (১৯৪২ সালে) কটকের সন্নিকটে যুদ্ধার্থে লিপ্ত থাকাকালীন বিমানহর্ষণিনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই মহারানী জানলেন “দাদার স্বামী ও প্রাণ-প্রতিম পুত্রকে হারিয়ে আমার বৈরাগ্যের জীবন চলেছে এখন।” অবশ্য প্রথম হইতেই তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন বাপনে অভ্যস্ত রহিয়াছেন।

পূর্কাকলে দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে নানারূপ জনহিতকর উন্নয়নমূলক কর্মে যে মনুসংস্কৃত সর্কাগ্রগণ্য রাজ্য হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তাতা মহারানী সূচাক দেবীর আগ্রহে এবং ভক্তপূর্ব মহারাজা ঙপূর্ণচন্দ্রের উদ্যোগে ও বর্তমানে মহারাজা প্রতাপচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়। ডক্টর এ. পি. কে. সেন ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী উক্ত রাজ্যের দেওয়ান ও রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতারূপে কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে ত্রকানন্দ কেশবচন্দ্রের সাকুলার বোডহিত “Lily Cottage” এ তদানীন্তন জ্ঞানী, শুণী ও ধার্মিক ব্যক্তির একটি প্রধান মিলন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। তৎকাল সূচাক দেবী মহাবি দেবেজ ঠাকুর, পরমপুণ্ড্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামতি গোখল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির



সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। এই সমস্ত প্রাচীনগ্রন্থীয় নমুনাগুলির সম্বন্ধে কিছু বলার জন্ত অমরোহ করিলেন মহারাণী আমায় জানানেন, “মহাশি আমার দাদার নামকরণ করেছিলেন কল্পচন্দ্র,—ঠাকুর রায়কৃষ্ণদেব ও আমার পিতাঠাকুরকে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি আর আমার ঠাকুরবাবাকে নিজ মায়ের মতন পরমহংসদেব মনে করিতেন,—মহামতি গোখেল মহারাজার মৃত্যুর পর সাধনা দিয়া আমায় বলেছিলেন যে দ্বী-শিক্ষা প্রসারের জন্ত বেন নিজেকে ব্যস্ত রাখি—স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) আমাদের গৃহে ‘নব বৃন্দাবন’ অভিনয়ে ‘ঋষিক’ করেছিলেন আর সাত বৎসরের আমি ও আমার ছোট বোন উহাতে অংশ গ্রহণ করি,—বাগী বিগিন পাল বলতেন যে অনেক কথা বলার আছে—তোমরা আমার বলিয়ে নাও—মৃত্যুর পূর্বদিন সাক্ষাৎ-প্রার্থী আমাকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বললেন—Sword is hanging on me আর আমার হাতের ফুলগুলি তাঁহার বুকের উপর রাখিতে বলেন।” ইহা ছাড়া লেডি অবলা বসু, মিসেস পি, কে, বার, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, মহারাজের ভাগ্যবর ও ডাঃ জামায়েদার মুখার্জি প্রভৃতির সহিত তাঁহার কর্মজীবনে ঘনিষ্ঠতা হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত ‘পণ-প্রথা’ সম্বন্ধে একবার এক আলোচনা সভায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতায় অবস্থানকালীন পূর্ব-পরিচিতা মহারাণী তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ঙসরোজিনী নাইডু তাঁহাকে “মাসীমা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজখবর লইয়া থাকেন।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্রাঙ্কনে অমরাগ থাকায় ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালীন তিনি বহু চিত্রশিল্প সংগ্রহে ও অঙ্কন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁহার অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি বিবিধ প্রদর্শনীতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে তিনি “ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বহুতামালা”র জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরলোকগত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের জন্ত পৃথক দশ হাজার টাকা তৎকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত জীবনের বিভিন্ন সময়ে মহারাণী লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাসমূহ ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত “প্রণতি” পুস্তকে গ্রথিত করা হইয়াছে। প্রথম জীবনে তিনি যে সেবাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন অতাবধি তাহা পূর্ণমাত্রায় দোদীপ্যমান। তাঁহার গুণদানে বহু পরিবার ও প্রতিষ্ঠান আজও উপকৃত হইতেছে। দুই শতাব্দীর সেতু-স্বরূপা এই মহীয়সী মহিলাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিলাম।

### শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস

[ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের  
প্রাক্তন স্নাডমিনিষ্ট্রেটর ]

অনিশ্চিত অবেশণ থেকে স্ননিশ্চিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির সাক্ষ্যময় পথের সেতু হ'ল ঐশ্বর্য, নির্ভা, উত্তম। জীবনের উবালগ্রহের আকাশ ধীরে ধীরে থাকে শ্রমের কালিমায় অপরাহুতের আকাশ তাঁদের কনে ওঠে শক্তির জ্যোতিতে। বাঙলাদেশের এই কর্মীপ্রসন্ন সন্তানদের

নামের তালিকার শীর্ষস্থানেই দেখা দেবে শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাসের নাম। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বাসিন্দা পরলোকগত চন্দ্রশেখর দাসের কনিষ্ঠ পুত্র কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এক মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন অধিকর্তা (স্নাডমিনিষ্ট্রেটর) বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ও বাল্যকালে দু'টি প্রচণ্ড আঘাত জীবনে পান, চার ও সাত বছর বয়সে বথাক্রমে বাবা ও মা দু'জনকেই হারান। জীবনের ইতিহাস-রচনার বোধনবেলায় এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাঁকে সচেতন করে তুলল জীবনবোধের প্রতি। এই আঘাতের তোড়েই তাঁর জীবনের শ্রোতধারা চিরদিন সার্থকতার উপকূলের উপর দিয়েই বয়ে গেছে। পাটনা থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে স্কলারশিপ নিয়ে এক, এ পরীকার উত্তীর্ণ হন গোপেন্দ্রনাথ। কলকাতায় এসে যোগদান করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। গণিতে এম, এ পরীকার প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান করলেন অধিকার। এর পর অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করাকালীন সম্পর্কে আসেন পূর্বব সিংহ পুত্রনীর ডাঃ সার আন্তোব মুখোপাধ্যায়ের। আন্তোব আইনের দিকে আকৃষ্ট করলেন গোপেন্দ্রনাথকে। গোপেন্দ্রনাথের জীবনে আন্তোবের প্রভাব অপরিণীম। অমলিন দীপ্তিতে আন্তোব আজও বিরাজমান গোপেন্দ্রনাথের মনো মন্দিরে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আইন পরীকার প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের একজন আইন ব্যবসায়ীরূপে হলেন গণ্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রহণ করলেন আইন-কলেজের বক্তৃতাভানের দায়িত্বভার। আইনএ স্নাতকোত্তর রিসার্চ স্কলার ছিলেন গোপেন্দ্রনাথ। এক, এ-তে স্কলারশিপ ছাড়াও ছাত্রজীবনের স্বীয় প্রতিভার পরিচায়করূপে লাভ করেছেন ঠাকুর আইন-পদক, পার্শ্বতীচরণ রায় সুবর্ণপদক এবং বিশ্ববিদ্যালয় সুবর্ণ পদক। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন বত



শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস

মামলা, যুক্তি, ভর্তুকি ও জেরার প্রণয়ন নিজেসব আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন কৃতী আইনবিদদের দরবারে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গোপেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিচারবিভাগের অজ্ঞাতম বিচারকের পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই পদে সমাসীন। অবসর গ্রহণের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের স্নাতকমিনিষ্ট্রিটারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে ভারত সরকারের আইন কমিশনের একজন সভ্য বলে হলেন পরিগণিত (১৯৫৫)। আইনে ইনি আর্টিকুলড ক্লার্ক ছিলেন ভারতবরেণ্য আইনজ্ঞ শ্রী রাসবিহারী ঘোষের সুরোগ্য অমুখ ধরকার আইনজ্ঞ শ্রী বিপিনবিহারী ঘোষের। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি লণ্ডন, পারী, রোম, ভিয়েনা, ওস্ট্রিখ, নেপলস, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। ফ্রান্সের শিল্প সম্ভার এঁকে মুগ্ধ করেছে। ওস্ট্রিখে দেখেছেন বহু ভারতীয় সেখানকার ব্যবসায় জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয় হিসেবে এই সমস্ত দেশগুলিতেই যথেষ্ট ভ্রমণ ব্যবসার পেয়েছেন এবং দেখেছেন যে ঐ দেশগুলিতে ভারতের প্রভাব অনতিক্রম্য। ব্যক্তিগত জীবনে বাঙালির এক প্রাচীনায়ী শিক্ষাবিদ হিন্দু স্কুলের স্তম্ভস্বরূপ স্বর্গীয় রসময় মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা মণিমালা মিত্রের পাণিগ্রহণ করেছেন। আজ সন্তরের পাঁচপ্রান্তে এসে ব্যবহারিক কর্মজগতের অন্তরালে এসেছেন গোপেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাই বলে তাঁর এখনকার দিনগুলিও কর্মহীন নয়। সং গ্রন্থাদি পাঠ করে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সমাজ সেবা করে দিন কাটছে গোপেন্দ্রনাথের। তাঁর সভাপতিত্বে এবং দানে বহু প্রতিষ্ঠান পুষ্ট হচ্ছে। নিয়োজিত হচ্ছে তারা সভ্য ও সন্মদের সাধনায় এগিয়ে যাচ্ছে তারা কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে।

### অধ্যাপক ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ খাতনামা গণিতবিজ্ঞানী ]

**খাতনামা গণিতবিজ্ঞানী ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয় ১৮৯৩ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকা জেলার মালাপদিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়রা

ছয় ভাই, ভাইদের মধ্যে তিনিই সকলের বড়। পরলোকগত অমর কথামণী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই খাতনামা বিজ্ঞানীর সহোদর ভাই।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করেছিলেন ঢাকা গভর্ণমেন্ট স্কুলে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁর বরাবরই খুব সুনাম ছিল। ১৯০৮ সালে ঢাকার ঐ স্কুল থেকেই সরকারী বৃত্তি লাভ করে তিনি সসম্মানে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হন। কলেজের শিক্ষা তাঁর আরম্ভ হয় ঢাকায়—ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১০ সালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আই এস সি পাশ করেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছিলেন, আই, এস, সি, পাশ করার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করলেন। ঐ কলেজ থেকেই ১৯১২ সালে গণিতবিজ্ঞানে অনার্স সহযোগে বি, এস, সি, এবং ১৯১৪ সালে গণিতবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর সহিত এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি হিন্দু কলেজ ফাউণ্ডেশন স্কলারশিপও লাভ করেছিলেন।

এম, এস, সি, পাশ করার পর তাঁর প্রকৃত গবেষক-জীবন শুরু হলো। ১৯১৫ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালে নবনির্মিত বিজ্ঞান কলেজের ফলিত গণিত বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে চললো গবেষণা, ক্রমেই গবেষক মহলে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি লাভ করতে লাগলো। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি লাভ করলেন। ঐ বৎসরই অধ্যাপক ডাঃ গণেশপ্রসাদের স্থলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই গুরুদায়িত্ব লাভ করার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর।

ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষক জীবনে ডাঃ গণেশপ্রসাদ এবং সি, ডি, রমণের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। সংঘাতের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গের বিষয়ে তাঁর কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই সময়ে পর পর ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। এই প্রসঙ্গেই তাঁর গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির নাম সেন ব্যালিস্টিক ফনোমিটার। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রথম জীবনের এই কাজ বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ১৯১৮ সালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্যালকুলাস ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যেই তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়ে তাঁদের খ্যাতিকে যথেষ্ট বিস্তৃত করেছে।

১৯২২ সালে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র থেকে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডাক এলো। তিনি ভারত সরকারের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করলেন। শ্রী গিলবার্ট ওয়াকারের আমন্ত্রণ ক্রমেই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ নতুন কাম্বুজে যোগদান করলেন। প্রথমেই তাঁকে কোলাবা এবং আলোবাগ মানমন্দিরের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। এই পদ গ্রহণের পরেই ১৯২৩ সালে লন্ডনে অস্থিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি পদার্থ ও গণিত-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতীয় সমুদ্র সমূহে সাইক্লোনের সৃষ্টি, বৃষ্টি, এবং ধ্বংস বিষয়ে আলোচনা করেন।

নতুন কর্মক্ষেত্রে এসে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা প্রধানতঃ ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হলো। ভূমিকম্প, বিবরক তাঁর মৌলিক গবেষণা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সন্মান লাভ করে। ভারতীয় সাগরসমূহের



সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আবহাওয়া মণ্ডলে গোলবোগের সঙ্গে সংযুক্ত পৃথিবীর মূহুর্তন বিষয়ে তাঁর একটি আলোচনা ১৯২৮ সালে ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশন অফ রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। এর পরে ভূমণ্ডলের মূহুর্তন বিষয়ক তাঁর নিজস্ব মতবাদ তিনি গঠন করেন। ক্রমেই বহু ছাত্র ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিকট গবেষণা করবার সৌভাগ্য লাভের জন্য, তাঁর কাছে সমবেত হতে থাকে। বোম্বাই সরকার এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁকে বোম্বাইয়ের রয়েল ইনস্টিটিউটের অর্ধবৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পদ দিয়ে সম্মানিত করেন। এই সময়েই বহু ছাত্র তাঁর কাছে গবেষণা করে বিজ্ঞানে উক্তরেট উপাধি লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত সরকার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অবজারভেটোরীস নিযুক্ত করেন। ১৯৩৪ সালে এই বিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূপদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক এবং আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবার জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করার পর তিনি পরে আবার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অবজারভেটোরীস নিযুক্ত হন এবং ১৯৫০ সালে ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বাদবপূর্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গণিত-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত নামানোর জন্য তাঁর বিখ্যাত গবেষণা শুরু হয়। মেঘের মধ্যে বড় বড় বেগুনে করে জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সিলভার আয়োডাইড বপন করে, ঠাণ্ডা জল ছড়িয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্য লাভও হয়েছিল।

বর্তমানে এই বিজ্ঞানী বাদবপূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্মানীয় এমেরিটাস অধ্যাপক। লেখাপড়া নিয়েই কাটছে তাঁর শান্ত অবসর জীবন। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশ তাঁর খুবই পছন্দ, তাই প্রায়ই মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছু দিন কাটিয়ে আসেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা এখনও তিনি করছেন,—কয়েকটি বই রচনাতেও হাত দিয়েছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে এই সৌম্য, সহাস্ত্রময়, সদালাপী বিজ্ঞানী ভূপদার্থ ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি ভালো বই লেখার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন।

সারা জীবনে বহু সম্মান এই বিজ্ঞানী পেয়েছেন। অসংখ্য বিদ্বৎমণ্ডলীর তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন; তাঁর উপদেশ ও পরিচালনালারে ধন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম-করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। তিনি ভারতীয় জ্ঞানদায় ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মনোগ্রাফ, পুস্তিকা মিলিয়ে এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণা ও চিন্তামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মধুর ব্যবহার সহজেই সকলকে আকর্ষণ করে। সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল মনের জন্য সকলের কাছেই তিনি অতি প্রিয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সখ হলো ছবি তোলা। নিজের হাতে নানা রকম যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে তিনি এখনও ভালোবাসেন। ভারতের শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর নেতৃত্ব ও মতামতের মূল্য ও প্রয়োজন খুবই বেশী। আমরা এই প্রবন্ধ বিজ্ঞানীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

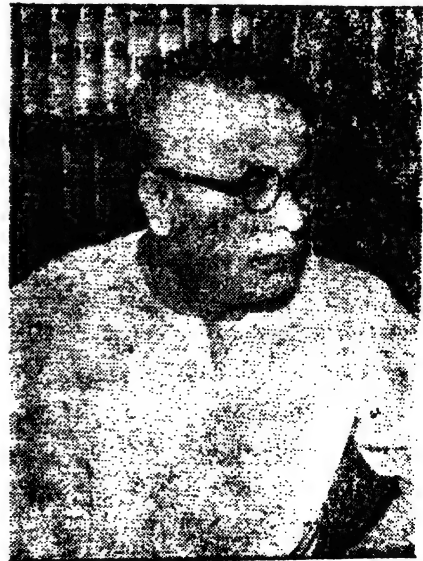
## ডক্টর হেমনাথ সান্যাল

[ ভারত-বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ]

নিখিল ভারতে বর্তমানে যে স্বল্প-সংখ্যক বিখ্যাত আইনবিদদের নাম শ্রুত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যাবিষ্টার ডক্টর হেমনাথ সান্যাল অন্যতম। সাধারণ্যে তিনি “হেম সান্যাল” বা এইচ. এন. সান্যাল নামে সমধিক পরিচিত। স্নদক্ষ তর্কজ্ঞান, স্মৃতিশ্রু মেধা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯০২ সালে শ্রী সান্যাল ঝংপুর জেলার নীলফামারী সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দশম শ্রেণিতে পাঠকালে পিতা জানকীনাথ সান্যাল পরলোকগমন করেন। পর বৎসর তিনি স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে অর্থনীতিতে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট হন। উক্ত বৎসরেই উচ্চ-শিক্ষার্থে তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং ১৯২৫ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি ও আইনে ট্রাইপস গ্রহণ করিয়া London School of Economics এ গবেষণার রত হন। ১৯২৭ সালে তথা হইতে Ph. D ডিগ্রী লাভ করিয়া Inner Temple এ আইন পড়িতে থাকেন। ১৯২৯ সালে ভারতে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। প্রথম দিকে তাঁহাকে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু দৃঢ়চেতা হেমনাথ কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। সেই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাঁহাকে সহকারী (জুনিয়র) হিসাবে পাইতে সচেষ্ট হন। কিছুদিনের মধ্যে হেমনাথ কলিকাতা “দারের” তৎকালীন কার্যে স্বার্থের মূলে আঘাত করিয়া জনপ্রিয় হন।

প্রথম বৎসরে হাইকোর্ট হইতে মাত্র একাদ টাকা আয় হওয়ার



হেমনাথ সান্যাল

বহুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সরকারী শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু ভগবৎ-বিশ্বাসী ও কর্মনিষ্ঠ হেমনাথ অধিকতর আগ্রহে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। জানি না শিক্ষাবিভাগ তাঁহার সহায়তায় কতটা উপরূত হইত কিন্তু আইন-জগৎ যে একজন মুখোজ্জ্বলকারী বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী হইতে বঞ্চিত হইত ইহা ঐক্য সত্য। অগাধ বিত্ত অর্জন করা সম্ভেও শ্রী সান্মাল কলিকাতা বারের প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তির সহিত মধুরালাপে রত থাকেন এবং তিনি বহুদিন হইতে উহার একজন “বেসরকারী নেতা” হিসাবে পরিচিত। সেখানে আজও তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহুবিখ্যাত মামলা পরিচালনা করিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থায় শ্রীসান্মাল নানারূপ ক্রীড়ার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তৎকাল বর্তমানে তিনি কয়েকটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সহায়তায় অল্পবয়স্ক বালকদের নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আইনের দিকপাল হেমনাথের প্রতিটি দর্শনপ্রার্থীর সহিত মিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ আলাপ গুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। আমার সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি একটি “সন্ন্যাসীর কমণ্ডল” দেখাইয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথজীউর মন্দির হইতে নির্গমনকালে আকস্মিক ভাবে এক জটাছুটধারী সাধুপুরুষ তাঁহাকে উহা প্রদান করেন। উহা গ্রহণ করার পরিবারবর্গের প্রচুর আপত্তি উঠে কিন্তু অটল থাকিয়া আজও উহা তিনি সযত্ন রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীসান্মালের ক্ষুদ্র অথচ মনোরম বাসভবনে তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগারে নানা ধরণের পুস্তক দেখিয়া মনে হয় যে, জ্ঞান আহরণের ব্যাকুল আগ্রহে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু অমূল্যস্বত্ব পাঠক উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কর্মপ্রতিভা যে লুক্কায়িত থাকে না—উহা বর্তমান মাসে নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের “অতিরিক্ত সার্জিস্টার জেনারেল”রূপে হেমনাথের নিয়োগ মারফৎ প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরী হইতে তাঁহার কর্মক্ষেত্র সুদূর দিল্লী সহরে অপসারিত হওয়ার শুধু যে ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষতি সাধিত হইবে, তাহাই নহে—আইনের একটি পরিপাটি গ্রন্থশালার বিরাট অংশ শূন্য হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা প্রদেশগত স্বার্থের উচ্ছেদ জাতীয় সরকারের আহ্বানের স্থান হওয়া প্রয়োজন বলিয়া সকলে মনে করেন।

মানব-দরদী হেমনাথের এত জনপ্রিয়তা থাকা সম্ভেও গত সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার পরাজয় দলের সাংগঠনিক ক্রটির জন্য সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা তাঁহার কর্মময় জীবনী-প্রকাশের জন্য আগ্রহান্বিত ও সচেষ্ট হন কিন্তু একজন বিশিষ্ট পুরাতন পাঠক হিসাবে তিনি সানন্দে উহা “মাসিক বহুমতী”তে প্রকাশার্থ উপহার দেন।

বিদায়ক্ষেণে মনে হল যে কর্মদীপ্ত, স্বনামধন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠ, সদানন্দ, অমায়িক ও যুবজনোচিত স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটি আজ দূর-পথের বাত্মী ও আরও উচ্চতর গৌরব-শিখরে উঠিবেন। তাই স্মরণ করিলাম—শিবাস্তে পদ্মনামস্ত।

## ষ্টীমারে

### অবনীকুমার নাগ

এখন অনেক রাত—একটা কি দুটো,  
আমি ডেকে রেলিঙ এ হাতের ওপর  
থুত্‌নি রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।  
ঝিরঝিরে বাতাস এসে আমার মাথায়  
হাত বুলিয়ে দিচ্ছে; আবেশে আরামে আমার  
চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে, আর—  
পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের স্রব্দ অমূল্যব করছি  
সেহের প্রতিটি কণা দিয়ে।

আকাশের ওপরে আলোর মেয়ে কুমারীচাঁদ  
খিটু মিটু করে তাকাচ্ছে আর হাসছে;  
তার ঠোঁটের মুখ থেকে ছল্‌কে ছল্‌কে আলোটা এসে  
মিটু পানের মতো ষ্টীমারের ডেকে, নদীর বুকে,  
আর আমার চোখে যুখে ছড়িয়ে পড়ে  
মনের-ইথারে কত না তরঙ্গ তুলছে।

ষ্টীমারটা বন্ধন ছাড়লো তখন  
হারেমের সহচরীর কারদার্য  
তীর-বাদশাকে নদীর ঢেউ-হাত দিয়ে  
'সেলাম' 'সেলাম' বলে ছলাং ছলাং করে  
আন্তে আন্তে পিছিয়ে এলো।  
আমি ডেকে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম।  
এখন আর ঢেউ নেই। বাঁধা পথে এখন  
ষ্টীমার গন্তব্য স্থলে চলছে আপন-মনে।  
বুকে তার কতো নিদ্রামগ্ন বাত্মী।

এখন ষ্টীমার চলছে আর  
জলে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে  
কতটুকরো, কত খান খান হচ্ছে।  
এই বুঝি ভালো; হয়তো এই-ই বেশ।

তাই ভাবছি :

এমন রাতে আর ঘুমের-কেবিনে  
আমি নাই-বা গেলাম।

# রবীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

৬থ পেন্সনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে রত্নগর্ভা মহীয়সী মহিলা কয়েকটি রত্নের চন্দ্ৰদাত্রী তন্মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন রবীন্দ্রনাথ, সেই পরম শ্রদ্ধেয়া সারদামুন্দরী দেবীকে নানা সাংসারিক ও আর্থিক সকল বড়-বাপটার মধ্য দিয়া পতি-পার্শ্বচারিণী হইয়া চলিতে হইয়াছে। তেজস্বিনী শাওড়ার অবর্তমানে ঐহাকে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ও উৎসব মুখরিত বৃহৎ সংসারের লোকলৌকিকতা, সামাজিকতা ও স্বাভাবিক ভার কঠোররূপে বহন করিতে হয় ও অনতিকাল পরেই দিকপালসম স্বপ্নের তিরোভাবে নানা ঝটিকায় নানাবিধ উদ্বেগ সহিতে হয়, সেই পূজনীয়াকে বীরাদনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরেও প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বামীর প্রব্রজ্যা ও শৈলভ্রমণের মধ্যে অপূর্ব ধীরতার সহিত, কথঞ্চিৎ ভয়শূন্য লইয়া এই মহিলাকে অতগুলি সম্ভান-সম্ভতির শিক্ষা ও পোষণ এবং তাঁহাদের বিবাহাদি ও শিশুপালন প্রভৃতি সকল কার্যেই কল্যাণ সাধনে নিরত থাকিতে হয়। যথাসাধ্য শাস্তিতে ও প্রফুল্লতায় যে গৃহটিকে পূর্ণ রাখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কম কৃতিত্ব নয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক বলও বথেষ্ট ছিল। দুটি ভাষা যেমন না জানিলে প্রত্যেক ভাষার প্রয়োগশক্তির বোধ জন্মায় না এবং সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না, তেমনি রবীন্দ্র-জ্ঞানবীর অজিত সংস্কার ও জ্ঞান শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টাকে পরিপুষ্ট করে। নারীর আদর্শে শুধু স্বামীর সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইলেই হয় না, সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী হওয়া যে বাস্তবীয় এ সংস্কার তাঁহার বাল্য হইতে শেষ দিন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বন্ধন ছিল বলিয়াই ভিতরের শক্তি ও বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কবির বয়স যখন মাত্র চতুর্দশ বৎসর তখন এই মহীয়সী মহিলা কবিজননী ১২৮১ সালে পরলোকগমন করেন। বালক রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগের পর ও মায়ের শেষ অশ্রুস্থতার জন্ত তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বালকের লালন-পালনে তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী দেবীর সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পত্নীরও সাহচর্য ছিল। তৎপরে কবির সেজন্যাদা হেমেন্দ্রনাথের পত্নী নীপময়ী দেবী সংসারের ভার গ্রহণ করেন ও তাঁহার বড়-জা দ্বিজেন্দ্র-পত্নী সর্বমুন্দরী দেবীকে তিনি সাংসারিক কাজ কর্ণে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। কবির মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে বিচারকের পদে সমাসীন থাকায় সত্যেন্দ্র-পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর সহিত আমেদাবাদে থাকিতেন। মাতৃবিয়োগে কবির মনের অবস্থা কী হইয়াছিল তাহা তাঁহার স্থলিখিত রচনার পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানেন।

কিছুকাল পরে কবি আমেদাবাদে তাঁহার মেজদাদার নিকট অবস্থানকালে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার ভাব অবলম্বনে বাঙলা

রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন বশের কিরীট মাথার ধারণ করিয়া বাণীকুলে বিচরণ করিবেন, তখন অনেকেই তাহা বুঝিয়াছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের “কালের প্রভরপটে লিখিব অক্ষর নিজ নাম” —এই গর্বিত বাণী সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে পরে বিশ্ববরণ্য হইয়াছেন তাহা অদৃষ্ট দেবতা তখন নিজ পেটিকার মধ্যেই গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়দের মতে আর মানুষ হইলেন না যেহেতু অর্থকরী বিত্তা তাঁহার আয়ত্ব হইল না ও এই চিন্তায় বিভ্রত হইয়া আত্মীয় সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ব্যারিষ্টার করিবার জন্ত বিলাতে পাঠাইলেন। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেজদাদার সঙ্গে “পুণা” নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী তখন ছেলে মেয়ের সহিত ব্রাইটন অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে আশ্রয় লইলেন ও সেখানকার পাবলিক স্কুলে অর্থাৎ এসেঞ্জীর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন— What a splendid head you have. চোখ মুখের ভাবেই শিক্ষকের মনে আশার সঞ্চার কারণ বুদ্ধির পরীক্ষার তখনো কোনো সুযোগ ঘটে নাই। সে বিদ্যালয়ে থাকিয়া তাঁহার কিছু বিশেষ ফলপ্রসূ শিক্ষালাভ ঘটিল না। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত (পরে ডাঃ স্মার) তাঁহাকে লগুনে লইয়া আসিলেন। ল্যাটিন শিক্ষকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ও বাড়ীতে তিন জন শিক্ষকের নিকট পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লগুন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র হইলেন। কলেজে তাঁহার গুরুদের মধ্যে ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যিকদের অজ্ঞাতম John ও Henry Morley ভ্রাতৃদ্বয়। John Morley পরবর্তীকালে Lord Morley হন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক বার্কায়ের পরিবারে ও আচার্য স্কটের পরিবারে কিছুদিন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ইরোরোপীয় সংগীত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন মানসে বিলাতের তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তাব্বর ব্রাইট ও গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা শুনিতে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পার্লামেন্টের হাউজ অব কমন্স সভার অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন আর সাধারণ ও জাগতিক জ্ঞানবুদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অজ্ঞাতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গ্রন্থপাঠ্যাদিতে রত থাক। তাঁহার অল্প কয়েক মধ্য ছিল। লগুনে অবস্থানকালেই ‘ভবতীতে’ ‘ভগ্ন তরী’ নামক একটি কবিতা ও ‘ইরোরোপ-প্রবাসীর



পত্র, নামে করেকটি পত্র প্রকাশিত হয়। যে পত্র-সাহিত্যের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের এতটা প্রসিদ্ধি, এই তাহার সূত্রপাত। ইয়োরোপ প্রবাসের পত্রে তিনি বিলাত ও ইরাজ জাতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিতেন, সম্পাদক বিজ্ঞেন্দ্রনাথ পাট্টাচার্য তাহার সমালোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আবার তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে বড়দাদার সহিত তাঁহার কিছুদিন উত্তর কাটাকাটি চলিয়াছিল।

লগুনে তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ কবির সহাধ্যায়ী ছিলেন ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ভারতে ফেরেন। মহর্ষির আদেশে দেড় বৎসর পরে কবিকে দেশে ফিরিতে হয়। তাঁহার আর ব্যারিষ্টার হওয়া হইল না। বিলাত প্রবাসের ফলে কবি ইরাজি ভাষা ও গান আয়ত্ত করিলেন। দেশে আসিয়া “বাঙ্গালি প্রতিভা” ও “কাল যুগয়া” রচিত ও অভিনীত হইল। কবি বলিয়াছেন এই রচনার তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে অনুসরণ করিয়াছেন—

“এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী?”

“বিদ্বজ্জন সমাগমের” এক সম্মেলনীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালির ভূমিকা অভিনয় করেন। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে কবি একজন ভালো অভিনেতা। সে অভিনয়ের দশক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বাহাদুরের নাম ‘বঙ্গবাসী’তে প্রকাশিত বিদ্বজ্জন সমাগমের বিবরণিতে পাওয়া যায়। ডাঃ স্ত্রার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনয় দেখিয়া নূতন অভিনেতা কবিকে একটি গানে অভিনয়িত করেন। কবির পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তিতে তাঁহার দেশবাসী কলিকাতা টাউন হল যে প্রকাশ সভা আহ্বান করিয়া কবিকে অভিনয়ন প্রদান করেন, সেই সভায় স্ত্রার গুরুদাস তাঁহার সেই বহুকাল পূর্বে রচিত গানটি পাঠ করিয়াছিলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ধুমারে থেকো না আর

অজ্ঞান ভিমিরে তব স্প্রভাত আয়বার।

উঠেছে নবীন ‘রবি’, নব জগতের ছবি,

বাঙ্গালির প্রতিভা যে দেখাইতে পুনর্বীর।

\* \* \*

“মণিময়” “ধুলিরাশি” খোঁজো বাহা দিবানিশি,

ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

ঠাকুরবাড়ীতে এই ‘বাঙ্গালি প্রতিভার’ বহুবার অভিনয়ে অজ্ঞাত ভূমিকার নটদের পরিবর্তন হইলেও বাঙ্গালি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও দম্ভ্যসদর্পার ছিলেন অক্ষয় মজুমদার একবার ছাড়া। সেবারে অক্ষয় বাবুর স্থলে অবতীর্ণ হন অবনীন্দ্রনাথ। বিদ্বজ্জন সমাগমের শেষ সম্মেলনীতে নাট্যক্ষেত্রে কবি সাধারণের সম্মুখে প্রথম দেখা দিলেও ইহাই তাঁহার প্রথম অভিনয় নয়। ইহার বহু পূর্বে বাড়িতে আত্মীয়দের সম্মুখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘মানময়ীতে’ ‘মদনের’ ভূমিকা (১৮৭৬?), সেজদা হেমেন্দ্রনাথ ইস্ট, ১৮৭৭ (?) সালে ‘বিবাহ উৎসব’ গীতিনাট্যে একটি স্ত্রী-ভূমিকা ও ‘অলৌকবাবু’ প্রহসনে (১৮৭৭) নামভূমিকা অভিনয় করেন। তখন “অলৌকবাবু” নাম ছিল “এমন কর্ম আর করব না।”

ইহার পূর্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ

Committee of Five এর উত্তোগে যে “কৃষ্ণকুমারী” অভিনীত হয় তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। এই Committee of Five বা পঞ্চজন্য সভার সদস্য ছিলেন—(১) গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) বহুকমল যুগোপাধ্যায়, (৪) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং (৫) কৃষ্ণবিহারী সেন। তাহার পর ‘বড়দের দলের’ উত্তোগে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘নবনাটক’ গুণেন্দ্রনাথ প্রমুখের ব্যবস্থাপনায় অভিনীত হয়। ‘মানময়ী’ ‘পুনর্বসন্ত’ নামে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত আকারে জ্যোতিরিন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরে ‘ভারত সংগীত সমাজে’ অভিনীত হয় আর ‘বিবাহ উৎসব’ কোনো দিন মুদ্রিত হয় নাই। ‘অলৌকবাবু’ বাড়ীর অভিনয়ে কবির সহযোগী অভিনেতা ছিলেন ‘সত্যাসিন্দুর’ ভূমিকায় বড়দাদা বিজ্ঞেন্দ্রনাথ।

বিলাত হইতে ফিরিবার পরে বিশ বৎসর বয়সে ‘ভগ্নহৃদয়’ প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রন্থখানির আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই যদিও পরে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য করিয়াছেন—

চলেছে ভেসে কত না আশা তরী অনাদি শ্রোত বেয়ে

কতকালের কুসুম উঠে ভরি’ বরণ ডালি ছেয়ে।

এই পুস্তক প্রকাশের পর ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের নাম হইল “বাঙলার শেলি”। আকাশে বাতাসে তখন ‘রবি বাবু’। কাব্যে আসিল নূতন ছন্দ। ক্রমে ১২৮৮ সালে ‘সন্ধ্যা সংগীত’ প্রকাশিত হয়। গড়ে তখন রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতীতে’ ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ও ‘বোঁঠাকুরাণীর হাট’ লিখিতেছেন। এই সময়েই তাঁহার অননুসরণী সুরের লক্ষণ সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ১২৯০ সালে ‘ভাস্করী ঠাকুরের পদাবলী’ ও ‘প্রভাত সংগীত’ প্রকাশিত হইল।

নবছন্দে নবভাবে বঙ্গসাহিত্য ভরপুর হইয়া উঠিল। পিণ্ডন-বৃদি সমালোচকদল গভীর ভাবে বলিলেন—“এসব অস্পষ্ট, বোকা যায় না এ চলেবে না, এ কাব্য নয়—কাব্যি।” কাব্যের শব্দগুলো কি সবই বাঙলাভাষায়, দেখিলে বাঙলা অভিধানে সবই পাওয়া বাইতে পারিত।

প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে। বাড়িতে বড়দাদা নতুনদাদা জ্যোতিবাবু ছাড়াও কবিকে প্রথম বয়সে উদ্বোধিত করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

বঙ্গসাহিত্যের আর এক নব-জাগরণের প্রভাত-আলোকে কলকঠ বিহঙ্গকুলের কাকলিতে ভারতীকুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল তাহা অগ্রণী ছিলেন “সায়দা-মঙ্গলের” কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাহাতে অনুসরণ করিয়া যে নবীন-রাত্রী সাহিত্যক্ষেত্রে যাত্রারস্ত্র করিয় ছিলেন সেই দলে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, ‘এবা’ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বিহারীলালের জ্যে পুত্র অবিনাশচন্দ্র। এই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথে সহপাঠী, আব্দুলনিবাসী, এম, এ, এবং বি, এল হইয়া এটা হন কিন্তু বাস্তব জগতে আদালতের কচকচানি অপেক্ষা কল্পরং কাব্যরচনা ও চিত্রশিল্প ইহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল জ্যোতিরিন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

অক্ষয় ভাই,

বনের পাখী বনে এসে

গান গায় প্রাণ ঢেলে

তাহার কি কর খাকা আদালত পিঞ্জরে

বসন্তের সহকার

মুক্তবায়ু প্রাণ বার

অবরুদ্ধ কারাগারে সে কি কত মুঞ্জরে ?

তোমার কি সাজে সখা আদালত-পিঞ্জরে ?

ইংরাজি কাব্য ও সাহিত্যে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

বঙ্গসাহিত্যে সরস্বতীর সেবারও তাঁহার লেখনী রসবিকাশে সফলতা লাভ করিয়াছিল। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

অতএব নমো নম

অধম অক্ষমে ক্ষম

ভঙ্গ আমি দিহু ছন্দরূপে

মগধে কলিঙ্গে গোড়ে

কল্পনার ঘোড়দৌড়ে

কে বলে পারিবে তোমা সনে।

যখন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীতে' 'নির্ব্বরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলেন

তখন ঐ পত্রিকাতেই অক্ষয়চন্দ্র নির্ব্বিরণীর প্রাণের ব্যথা লিখিলেন—

\* \* \*

কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,

হ'ল সার অশ্রুঢালা, নিরাশ, মরম জ্বালা

দিবাশিখা কুলু কুলু আকুল বিলাপ।

\* \* \*

অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্য-সহচর। প্রথম বয়সে কবি ইহার সহিত কাব্যশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাষার কাব্য লিখিতে মনস্থ করিয়া 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করিলেন। এই 'ভানুসিংহ' লইয়া একটি কোঁতুকাবহ ঘটনা ঘটয়াছিল। এই সময়ে অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জাহাণীতে ছিলেন। সেখানে তিনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সহিত এদেশের কবিদের তুলনা করিয়া একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে 'ভানুসিংহকে' প্রাচীন পদকর্তা বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন ও এই নিবন্ধ লিখিয়া তিনি 'ডক্টর' উপাধি পান।

'ভানু' যে 'রবির' নামান্তর মাত্র তাহা তখনো প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কোঁতুক রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' তখনো 'নবজীবনে' প্রচারিত হয় নাই।

কবি যখন 'বঙ্গভাষার লেখক-এ' অনুরুদ্ধ হইয়া কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশ লেখেন তখন লেখেন তিনি বঙ্গ মাত্র, যন্ত্রী তাঁহার মধ্য হইতে বহু বিচিত্র স্বর বাহির করিতেছেন। এই ভাবে সারা জীবন কবির সাধনা।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর সাহিত্যসমালোচক কবি প্রিয়নাথ সেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ঘটে। ইয়োরোপের বিখ্যাত গ্রন্থকারদের রচনাবলী প্রিয়নাথের অধীত ছিল। ইনিই প্রথম কবিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্যাধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ ওম্মাকিবহাল তাহার আদর্শ এইখানে। সেই স্মৃতি অতীত হইতে কবি বিশ্বসাহিত্যে সযত্নে চিরদিনই সন্নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় নব প্রকাশিত কোনো গ্রন্থই তাঁহার অনবীত নাই শুধু বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে নয়—শিক্ষাক্ষেত্রের নানা বিভাগে। এইখানে আর একটি জীবন-বন্ধুর প্রভাবের কথা

স্মরণীয়। সে বন্ধু বিশ্ববিজ্ঞত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আচার্য জগদীশের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অল্প-বয়সে হয় এবং সেই হইতেই উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মিলনে উভয়েই পরস্পরের জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানার্চকের সাহচর্যের ফলেই হয়তো কবি প্রাকৃতিক আনন্দের মধ্যেও বাস্তবের বেদনাকে বিমুগ্ধ হন না এবং তাহা কবির বহু রচনার প্রকাশ। এমন কি তাঁহার প্রিয় খড়ু বরবার আনন্দের মধ্যেও তিনি যে পথবাণী গৃহহারার কথা বলিতে ভুলেন নাই তাহাও একদিন কবিকে জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন। আর উভয়ের রাজ্যে প্রাণের সাড়া জীবরাজ্যের মতো কি না তাহার সন্ধানে স্তব্ধ জগদীশচন্দ্র যে একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও কবির উৎসাহ যে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল তাহা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন।

'সন্ধ্যা সংগীত' ও 'প্রভাত সংগীতের' মাঝখানে কবিকে আর একবার বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, ঘটনাসমাবেশের পারিপাট্য ও সমস্তা বিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি রচনাতেই পাওয়া যায়। তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ। কণ্ঠস্বরের নানা বৈচিত্র্য বাহা তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিল তাহা আমাদের দেশে অতি অল্প বাগ্মীরই আছে। প্রবন্ধ পাঠের সময় কবির স্বর মাধুর্য না হারাইয়াও যে গাভীরপূর্ণ গভীর নাদে পরিণত হইতে পারিত তাহা বাহারী শুনে নাই তাঁহার। অনুমান করিতেও পারিবেন না। সে সময়ে তাঁহার সেই মুহূর্ত্ত কণ্ঠস্বর এমন গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিত যে কলিকাতা টাউন হলের মতো স্থানেও বক্তার কথাগুলি হলের অপর প্রান্ত হইতে স্পষ্ট বৃষ্টিতে পারা বাইত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি সাদর আহ্বান পাইয়াছেন এবং সকল দেশেই তাঁহার অসামান্য শক্তি বাগ্মী বিশেষ স্তুত্যাতি লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতেন তাহা হইলে তিনি হয়তো ব্যবহারজীবীরূপে লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন কিন্তু ভাগ্যবিধাতা ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিকে লইয়া যে খেলা খেলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও সেই খেলাই খেলিলেন; মাত্রাজ হইতে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন।

মাত্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবি কাব্যালোচনার ও রচনার মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল পত্র পত্রিকার একটু নাম হইয়াছিল তাহারাই রবীন্দ্রনাথের রচনা বক্ষে ধারণ করিতে যত্ববান ছিল। কবি তখন জ্যোতির্বিদ্রনাথের সহিত এক স্থানেই থাকিতেন, চন্দ্রনগরে মোরান সাহেবের বাগানে, কলিকাতায় সদর স্ট্রীটে, দার্জিলিঙে, সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিদ্রের সহচর ছিলেন। কিছুদিন এইরূপে কাটাওয়া কবি বোম্বাই অঞ্চলে কারোয়ার সত্যেন্দ্রনাথের নিকট চলিয়া গেলেন! এইখানে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিত হয়। 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাত সংগীত' আনন্দের জন্ত, সৌন্দর্যের জন্ত একটা চঞ্চল আবেগময় আকুল আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ মেলে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সসীম অসীমের বন্দ, সসীমও তুচ্ছ নয়—অসীমও পূর্ণ নয়—উভয়ের মিলনেই পূর্ণানন্দ। তাঁহার সকল রচনার উদ্দেশ্য বা নির্দেশ বোধ হয় তাহাই। 'প্রকৃতির

প্রতিশোধের" পর "ছবি ও গান" (১২১০) ও "কড়ি ও কোমল" (১২১২) প্রকাশিত হইল। কড়ি ও কোমল প্রকাশের পর "কাব্য" সমালোচকবল অজ্ঞান হইলেন। কেবল 'রাহ'তে কাব্য হইতে মধু সন্দের বক্তিত হইয়া মক্ষিকার মতো হুঁচকিটা ত্রণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া—

উড়িসনে রে পায়রা কবি, খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা।

তোর বকুবকামি কৌসকৌসানি তাও কবিত্বের ভাব মাখা

তাও ছাপালি গ্রন্থ হ'ল নগদ মূল্য এক টাকা।

বলিয়া গভীর ভাবে উপদেশ দিলেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রচনায় সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক সমালোচনায় চিরদিন নিরস্তর থাকিতেন। কেবল জীবনে একবার মাত্র 'দায়ু ও চায়ু' ইহার ব্যতিক্রম ও পরে তাহাও তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে পরিত্যক্ত।

এই সময়েই (১২১৬ বঙ্গাব্দ) কবির 'রাজা ও রাণী' নাটক প্রকাশিত ও কলিকাতায় বিজিতলায় (বীর-জিতলায়?) অর্থাৎ ধর্মভালা স্ট্রীট ও সারকিউলার রোডের সংযোগস্থলে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অভিনীত হয়। কুমারসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সত্যেন্দ্র-জামাতা—বঙ্গসাহিত্যের অন্ততম দিক্‌পাল, সংস্কৃত ও ফরাসীভাষায় কৃতবিজ্ঞ, "বীরবল" ছদ্মনামে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত স্বনামধন্য প্রথম চৌধুরী।

পর বৎসরে "বিসর্জন" রচিত হয়। পরবর্তী গ্রন্থ "মানসী" বন্ধন প্রকাশিত হয় তখন কবির জীবনে ভাবুকতার আতিশয্য চলিতেছে। কোনো স্থানে নিজের আদর্শের অনুরূপ একটি কবিকুল নির্মাণ করিয়া তিনি নিভৃত্তে দিন যাপন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গাজিপুরে কিছুদিন ছিলেন এবং সেখানে একটি বাড়ীও ক্রয় করেন। "মানসী" অধিকাংশ কবিতা ও 'গোলাপছড়ি' গল্প গাজিপুরে লিখিত। গাজিপুর হইতে কবি ফিরিয়া আসিলেন, কবিকুল আর হইল না। সে বাড়িখানি তাঁহার ভাগিনের অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়কে দান করেন। কলিকাতা হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়। গো-শকটে পেশোয়ার পর্বত দীর্ঘকাল ভ্রমণে বাস্তব হইবার সংকল্প কবি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা হইল না। পিতৃ আদেশে জমিদারী দেখিতে বাইতে হইয়াছিল।

"বালক" জন্মিল "ছবি ও গান" ও "কড়ি ও কোমলের" মাঝখানে ও কবি "মুক্ত" নাটক ও "রাজর্ষি" উপন্যাস, "হেন্সালী নাট্য," "ভ্রমণ বৃত্তান্ত" ও কিছু প্রবন্ধ তাহাতে লেখেন। এই সময়ে কবি যে শিশু সাহিত্যের অবতারণা করিলেন তাহা অপূর্ব অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন। তাহারই পরিণতি আমরা 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' এক 'সে'তে দেখিতে পাই। রাজর্ষির আখ্যান ভাগ লইয়া পরে নাটক রচিত হয় ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের ভাণ্ডার বুদ্ধিকল্পে প্রথম অভিনীত হয়। ছেলে মেয়েদের জন্তই 'বালক' পত্রিকার বোধ হয় সৃষ্টি কিন্তু "বালক" নিজের পারে পঁড়াইতে পারিল না। "ভারতীর" অঁকে ঢলিয়া পড়িল। "ভারতী ও বালক" কিছুকাল একত্র দেখা গেল। অল্পদিন পরে বালকটির

দুর্দশা হইল, সে আহার স্বল্পতায় মৃত্যুরাজ্যে চলিয়া গেল। মৃতবৎস "ভারতী" "সাধনায়" মনোনিবেশ করিলেন।

১২১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপর বহুলভাবে নির্ভর করিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বঙ্গেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদের কর্মশক্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হইয়া 'সাধনা'র প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ। তিনি 'সাধনায়' গল্প পত্রে জুড়ি হাঁকাইয়া দিলেন। 'সাধনার' সময়ে তাঁহার রচনা নানাপ্রকারে বিচিত্র। সাময়িক ইংরাজি পত্রিকা হইতে সার সংকলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, রাজনৈতিক আলোচনা, সমাজতত্ত্ব, গ্রন্থ সমালোচনা, মাসে মাসে কাব্য ও ছোট গল্প প্রভৃতি বিবিধ রচনা 'সাধনায়' প্রকাশিত হইত। একই বৈঠকে নানারূপ বিভিন্ন বিষয় লিখিয়া কেহ যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন ইহা বোধ হয় ইরোরোগীর সাহিত্যক্ষেত্রেও বড় দেখা যায় না। ইহা ভিন্ন সাম্প্রতিক "হিতবাদী" প্রকাশের সহিতও তাঁহার এই সময়ে সম্বন্ধ ঘটে। শুধু লেখা নয়, তিনি "হিতবাদীর" একজন ডিরেক্টরও ছিলেন। "সাধনাতেই" কবির উপদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ "স্বপ্নপ্রয়াণের" চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বাধীন বিকাশে পথের সন্ধান পাইল। যে ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী, তাহারও আরম্ভ "হিতবাদীতে" ও "সাধনায়"। গল্প রচনায় কবির আনন্দ তাঁহার এক পত্রে প্রকাশ—

"গল্প লেখায় কৃতকার্য হ'লে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। ১০০ গল্প লেখার একটা সুখ এই, বাসের কথা লিখব, তারা আমার দিন-রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে। আমার একলা মনের সঙ্গী হবে। বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের উপর বেড়িয়ে বেড়াবে।"

এই সময়ে কবি সাধনার স্তরের মধ্য দিয়া বাইতেছিলেন, এ সময়ের কথা তাঁহার অপর একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"নৌকায় থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল সে প্রত্যহ প্রত্যুষে এক বাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া আমার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া বাইত। আমি সেই ডালটুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম; সমস্ত দিন লিখিতাম। কোনোকপ চিন্তাবিক্ষেপ হইত না, অপরাহ্ন পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক লুচি খাইতাম, তাহার পর বাহিরে 'ইন্ডি' চেরারে শয়ন করিতাম; নৌকা নদীর উপর অশ্রান্তভাবে চলিতে থাকিত। এক sittingএ পঞ্চভূতের ডায়েরি, গল্প, কবিতা অনর্গল লিখিয়া বাইতাম। ক্লান্তি বোধ করিতাম না।"

"পঞ্চভূতের ডায়েরি" আরম্ভ শুভায় ভবতি কিন্তু শেষবন্ধা হয় নাই কারণ—

শেষ দেখা কি ভালো ?

ভেল ফুরিয়ে যাবার আগে

নিভিয়ে যাব আলো।

[ ক্রমশঃ ।

॥ মাসিক বঙ্গমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র

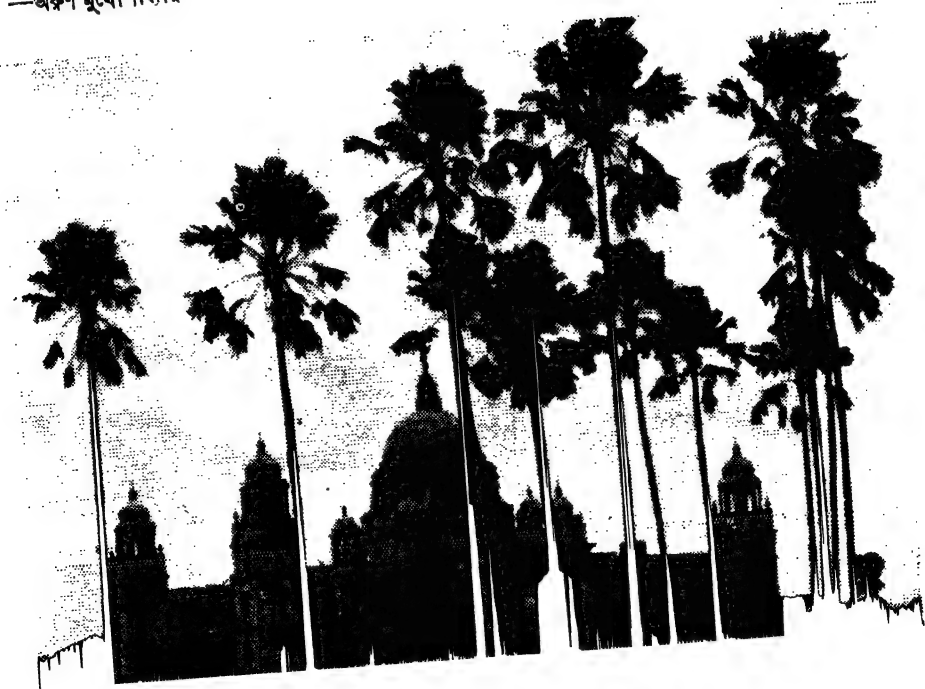


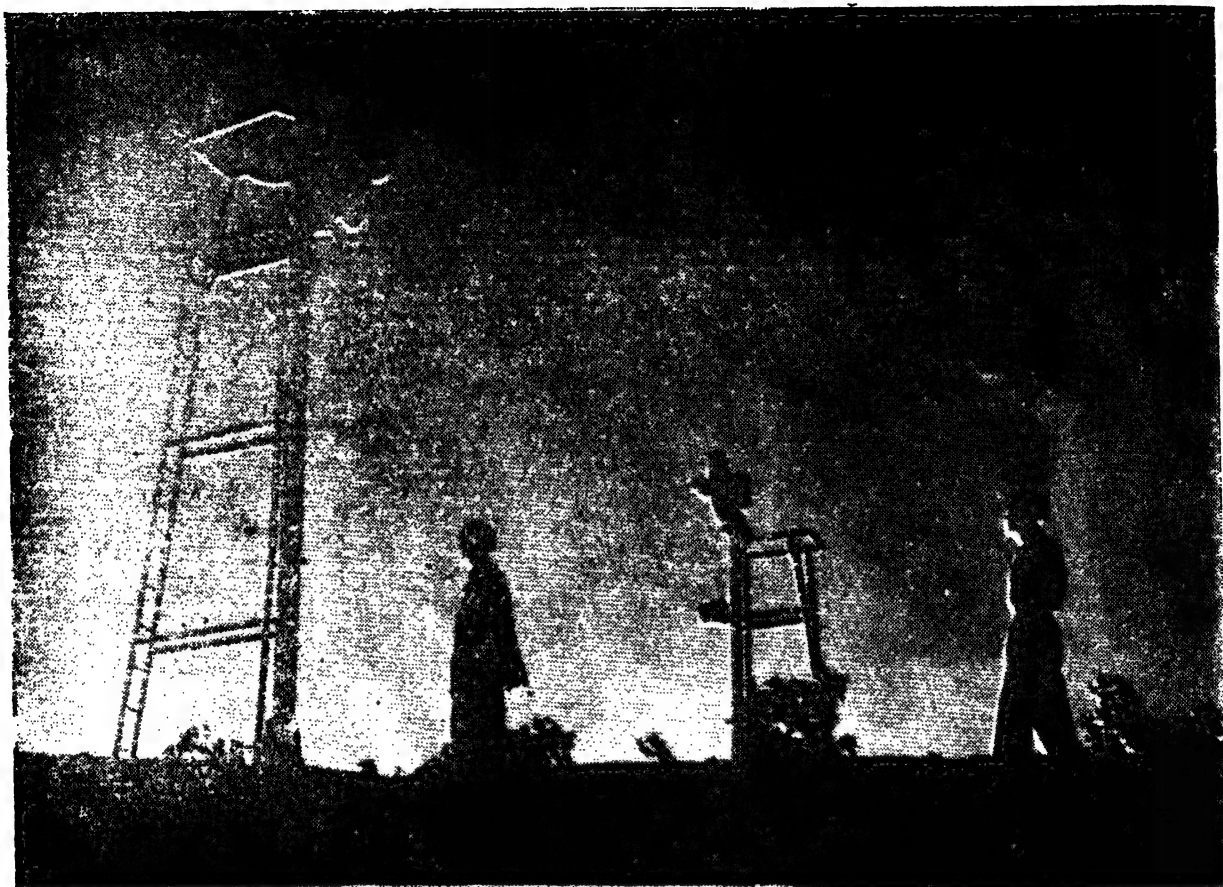
{ ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা  
ও বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না }

ভোরের ভৈরবী  
—রতন দাশগুপ্ত



মহারাগীর স্মৃতি  
—অরুণ মুখোপাধ্যায়



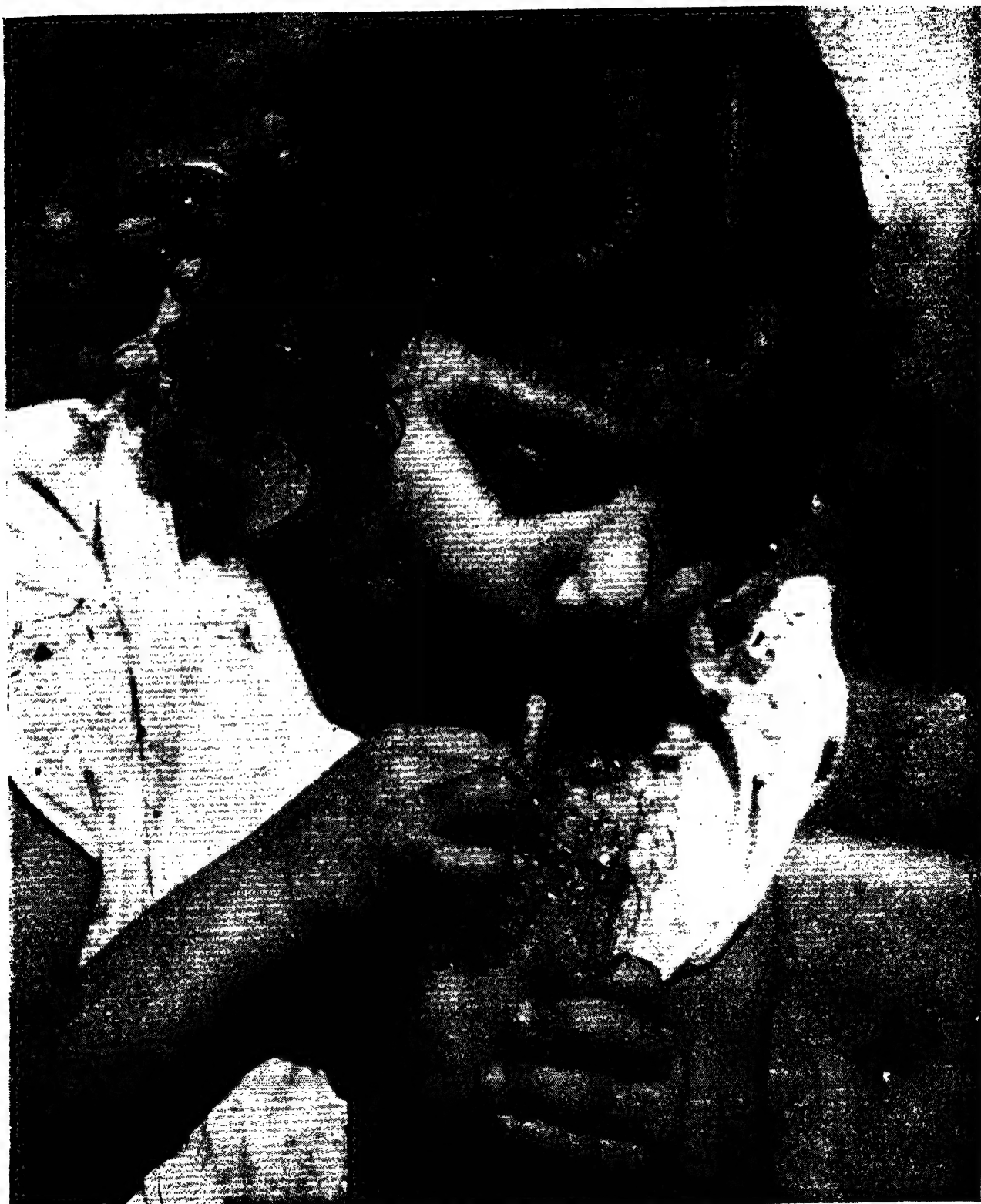


যন্ত্রতন্ত্র  
ঘুমন্ত শিশু

—মোহন চক্রবর্তী  
—ই.মতি শেফালী চট্টোপাধ্যায়









# ও ম র থৈ যা ম

(অপ্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম

মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে,  
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।  
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসসিদ আয় 'কা'বা',  
কি হবে তোর তীর্থে 'কা'বা'র, শান্তি পাবি হৃদয়-তলে।

লয়ে শরাব পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত হ'য়ে,  
জ্ঞান-হারী হই সেই পুলকের তীত্র-ঘোর বেদন স'য়ে।  
কি যেন এক মস্ত্র-বলে যায় ঘ'টে কি অলৌকিক,  
প্রোজ্জল মেরে জ্ঞান গ'লে যায় ঝর্ণা-সম গান ব'য়ে।

এক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের এই ছুনিয়া রে ভাই, মদ ঢালাও!  
কালকে তুমি দেখবে না আর আজ যে জীবন  
দেখতে পাও।

খামখেয়ালীর সৃষ্টি এ ভাই কালের হাতে লুঠের মাল,  
তুমি তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুঠিয়ে দাও।

মদের নেশার পোলাম আমি, সদাই থাকি মুইয়ে শির,  
জীবন আমি পণ রাখি ভাই প্রসাদ পেতে তার হাসির।  
শরাব-ভরা কুঁজোর টুঁটি জাপটে সাকী হস্তে তার  
পাত্রে ঢালে নিষ্ঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির।

আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ ঢোলাই-এর এই দোকান,  
বাঁধা রেখে আত্ম-হৃদয় করি হেলায় শরাব পান।  
আরাম-মুখের কাড়াল নহি, ভয় করি না হৃদ-শায়,  
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের উর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ।

মীন-কুমারী হংসীরে কয়, 'শুকাবে এই বিল যখন  
তোমার-আমার কি হবে ভাই তাই ভেবে মোর  
ব্যাকুল মন।'

মরালী কয়, 'কাবাব যদি হই ছুজানাই তুই-আমি,  
ভাসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তায়  
লাভ তখন?'

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেঘ,  
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরৎ বিবেক জাগে—এক নিমেঘ।  
ছল'ভ এই নিমেঘটুকু ভোগ করে নাও প্রাণভরে,  
এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেঘ।

জ্বলাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওফে ওগো গ্রহের ফের।  
স্বভাব দোষে চিরটাকাল নিষ্ঠুরতার টানছ জের।  
বন্ধ তোমার বিদারিয়া দেখতে যদি এই ধরা  
খুঁজে পেতো ঐ বুকে তার হারা-মণি-মাণিক ঢের।

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পায়  
ধরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরু-ঝড়া প্রায়।  
তারির মাঝে এই হৃদনের খোঁজ রাখি না—ভাবনা নাই,  
যে গত কাল গত, আর যে আগামী কাল আসতে চায়।

শুনছি আমার তমুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,  
পান করে যাই মদিরা তাই শুনছি প্রাণে বেগুর রব।  
ভিক্ত স্বাদের তরে সুরার ক'রো না কেউ তিরস্কার,  
ত্যক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো তিত্তাসব।

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ঝরছে নিতুই রক্তধার  
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের, যন্ত্রণার।  
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আসলি কেন রে অবোধ,  
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার।

আজ আছে তোর হাতের কাছে

আগামী কাল হাতের বার,  
কালের কথা হিসাব ক'রে বাড়াসনে তুই হুঃখ আর।  
স্বর্গ করা ক্ষণিক জীবন—করিসনে তার অপব্যয়,  
বিশ্বাস কি—নিঃশাসন্তর জীবন যে কাল পাবি ধার।

পশুশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর,  
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে ছুঁভাগ্য তোর।  
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই  
আসমানি হাত হ'তে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর।

এই কুঁজো—যা আমার মতন ভোগ করেছে প্রেম দাহন,  
সুন্দরীদের মাথায় থাকি, পেলো খোঁপার পরশন।  
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও,  
পেলো কতই ওষুধের ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গন।

তুমি আমি জম্মিনিকো—যখন শুধু বিরামহীন  
নিশীথিনীর গল। ধ'রে ফিরত হেথায় উজলদিন;  
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো! কাজল আঁখি সুন্দরীর  
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়ত ধুলির অঙ্ক-লীন।

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,  
তাঁর সে কলম দিয়ে—যিনি হুঃখে সুখে নির্বিকার।  
শ্রেফ বোকামৌ, কান্নাকাটি লড়তে যাওয়া তার সাথে,  
বিধির লিখন ললাট-লিপি টলবে না যা জন্মে আর।

ভালো করেই জানি আমি, আছে এক রহস্য-লোক,  
যায় না বলা সকলকে তা ভালোই হোক কি মন্দ হোক।  
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারব না  
থাকি সে কোন গোপনলোকে দেখতে যাহা  
পায় না চোখ।

চলবে না কো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি।  
মোদের আবাস সাফ ক'রে নেয় শেয়ান ঝাড়ুর কারসাজি  
ষেরিয়ে ভাঁটিখানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পীর—  
'অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কা'ল পান করে নে মদ আজি।'

সবকে পারি ফাঁকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,  
খোদার উপর খোদকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।  
তীক্ষ্ণ নৃশ্বর বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনিলাম চাতুর্যের  
মুহুর্তে তাঁ দিল ছিঁড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ।

এই যে ঝড়ান পেয়ালাগুলি নিজ হাতে গড়ল সে  
ফেলবে ভেঙে খেয়াল-খুশীর লীলায় এদের বিনদোব?  
এতগুলি সুষ্ঠু শোভন চটুল আঁখি চন্দ্রমুখ  
প্রীতির ভরে সৃষ্টি ক'রে ক'রবে ধ্বংস ক্রোধ-বশে?

পেয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লীলা ফুলের প্রায়  
ফুরসুং তোর থাকলে, নিয়ে ব'স লীলা-রুখ্ দিলপ্রিয়ায়।  
মউজ করে শরাব পিও, গ্রহের ফেরে হয়ত ভাই  
উণ্টে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ-আসা ঝঙ্কাবায়।

খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?  
হুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা?  
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবী তার তাঁর দয়ার  
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর্ ভোল্ ব্যথা!

ঘেরা-টোপের পর্দা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,  
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।  
এই পৃথিবীর আঁধার বুকে মোদের সবার শেষ আবাস—  
বলতে গেলে ফুরোয় না আর বিষাদ-করণ সেই কথাই।

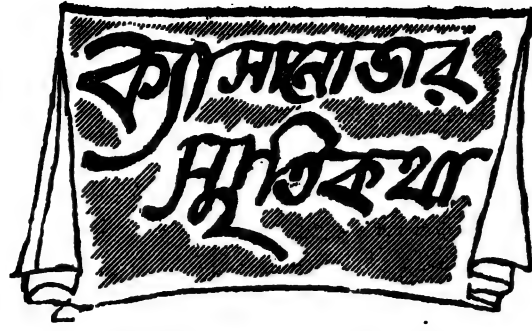
মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায় মাদ্রাসায়  
রাত্রি-দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।  
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের  
ভোলে না এই খোশ-গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

এই ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,  
এই তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলবর—মায়া।  
তিনভাগ জল একভাগ খল এই পৃথিবীর, এ-ও মায়া,  
গোপন প্রকাশ সত্য-মিথ্যা এসব অবাস্তব মায়া।

'ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?' কইল আঁখি স্বপ্নে মোর,  
'আনন্দগুল প্রফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?  
ঘুম মৃত্যুর যমজ-ভ্রাতা তার সাথে ভাব করিসনে,  
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম-ভোর।'

হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্যজয়ী,  
খোদা কি তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবশ্যই।  
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,  
তুই যখন রইবে না কা'ল জানবে কি আর শূন্য বই?

আকাশ যেদিন দীর্ণ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,  
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,  
ভূর আমার দামন ধরে বলব কেঁদে, 'হে নিষ্ঠুর,  
নিরপরাধ মোদের কেন জন্মে আবার মরতে হয়?'



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব তখন এমনি ছলছে মন !

ধরা পড়ে গেছি আপন মনের কাছে—স্বপ্নের দাবীর হুনিবার আকর্ষণে ভেসে গেছে সব যুক্তি-তর্ক আর বিচার-বিবেচনার ছোটো ছোটো আড়াল। বিম্বিত পুলকে স্তব্ধ হোয়ে শুধু অমুভব—মনের কানায় কানায় ভরা জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাস—

সে কি আসবে ?

এমনি সময়ে একদিন আমার পরিচারিকা ঘরে এসে ঢুকলো, চোখে-মুখে খুশী উপছে পড়ছে,—“মাদাম, সেই লেস-ওয়ার্লী আবার এসেছে—তাকে নিয়ে আসবো এখানে ?”

—“তুই কি পাগল হলি ?” প্রচণ্ড বিস্ময়ে আমি চমকে উঠি।

—“বেশ, তবে বিদায় করে দিবে আসি ?”

—“না না, এখানেই নিয়ে এসো, আমি নিজে কথা বলবো ওর সঙ্গে।”

কঠিন হবো, তিরস্কার করবো, অনেক প্রতিজ্ঞাই তো ছিলো—কিন্তু চোখের সামনে ওকে দেখে কোথায় ভেসে গেলো সব—বিধাহীন সঙ্কোচহীন স্পষ্ট ভাবায় শুধু জানালাম আমার ভালোবাসা—নিবেদন করলাম আমার প্রেম—ওক ঘিরেই বা’ মগ্নরিত হোয়ে উঠেছে। আর এ-ও জানালাম—যুথাই এ ভালোবাসা, আমাদের মিলন—স্বপ্ন-পর্যন্ত—শুধু স্বপ্নলোকেই সম্ভব—কোনো আশাই নেই। ও জানালে সম্প্রতি মার্কুইস ওকে একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছেন—কিন্তু যাবার সময় আমাকে পাবার প্রতিশ্রুতি যদি পাথেররূপে না পায় তবে সে বার্থতা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। আমাকে ছাড়া ওর জীবনের কোনো অর্থ, কোনো মূল্যই ওর কাছে নেই। আমাকে অমুরোধ জানালে যেন আমি ওর এখানে আসায় সম্মতি জানাই। আমি তো সম্মতই।

যাত্রা বাইশ বছর বয়েস ওর। আমার চেয়ে মাথায় বুঝি একটু ছোটোই হবে। ছিপছিপে একহারা চেহারা—অপরূপ লাবণ্যভরা—গলার স্বর আরও মিষ্টি—সবে দাড়ির আভাস দেখা দিয়েছে। লেস-ওয়ার্লীর ছদ্মবেশ তাই নিখুঁতই হোতো।

তিনটি মাস কাটলো। সপ্তাহে তিন চার দিন করে না এসে ও পারতো না। বেশীর ভাগ সময়েই আমার পরিচারিকাটি তার অসৌম্য কোহুহল নিয়ে চার পাশে ব্রহ্মণ্য করতো। কিন্তু সে না থাকলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, নিবিড় বিহ্বল মুহূর্তেও ওর আমার প্রতি সম্মান আর সংযমের বিপ্লবাত্মক অভাব হোতো না।

—এমনি শান্ত ভঙ্গ প্রকৃতি ওর। আর এই মার্জিত ক্রটি আর সংযমই আমার ভালোবাসাকে নিবিড়তর করে তুলছিলো।

সিপদের মুহূর্তটিও আকস্মিক ভাবেই এসে পড়লো। হৃ’জনের কেউই এর জ্ঞাত প্রস্তুত ছিলো না। একদিন সকালে ও এলো—হুঁচোখ ভরা জল। আদেশ এসেছে যাত্রা করার—লগুন অভিমুখে ম’সিয়ে জ সা’এর কাছে পত্রবাহকরূপে। এমন কি ফেরোলে ইতিমধ্যেই একটি ছোটো স্ট্রিমার অপেক্ষা করছে ওর জন্তে যতদূর সম্ভব লগুন পৌছবার তাগিদে। দেখলাম, হতাশার তীব্র বেদনার ওর শুধু কণ্ঠই রুদ্ধ হয়নি, স্থিরভাবে চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। ওকে আশা দিতে গিয়ে আমি একটা মতলব ঠিক করে ফেললাম। জানি না, কোথা থেকে মনের এত জোর এত সাহস পেয়েছিলো যে বলে বসলাম আমি ওর সঙ্গেই যাবো ওর পরিচারকের ছদ্মবেশে। কিন্তু তাহাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে—শেষ অবধি হৃ’জনে মিলে ঠিক করলাম যে আমি ওর ছদ্মবেশ নেবো আর ও যাবে আমার সহধর্মিণীর ছদ্মবেশে।

আর ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেই আমরা বিয়ে করি, যদি তাহলে এই পালিয়ে আসার কলঙ্ক মুছে যাবে। ওকে বোঝানোর আর সাহস বোঝানোর জন্তে যুক্তি কিছু কম ছিল না আমার—একটি মেয়ের সম্মতি না থাকলে তাকে নিয়ে কেউ পালাতে পারে না। অতএব ও দোষী কোথায় ? তাহাড়া আমার সম্পত্তির অধিকারী হোতে বাঞ্ছিত তাঁরই প্রিয়পাত্র—এতে মার্কুইস আমাকে শাস্তি তো দেবেনই না বরং খুশী হবেন। আর তত দিন আমার বহুমূল্য গহনা, হীরে জহরৎ তো আছেই।

দিন এসে গেলো। আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে অসুস্থতার ভাণ করে পড়ে রইলাম। তারপর ছোটো একটি ব্যাগে বিশেষ দরকারী কয়েকটি জিনিষ আর গহনার বাস্কাটি ভরে পুরুষের ছদ্মবেশ পরে বাড়ীর পিছনে চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে গেলো। আশ্চর্য্য, কেউ আমাকে চিনতে পারলো না ! এমন কি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময় বেয়ারাটাও চিনলো না ! যাক নিশ্চিন্ত। কিছু দূরেই অপেক্ষা করছিলো ও। হৃ’জনে মিলে জাহাজে গিয়ে উঠলাম—স্বামি-স্ত্রী পরিচয়ে। বিনা বাধার কেটে গেলো যাত্রা করার মুহূর্তটিও। মধ্যরাতের আগে ক্যাপ্টেনেরও দেখা মেলেনি। তিনি সকলে এসে আমাকে জানালেন, তাঁর উপর আদেশ আছে যেন আমার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আমি কঁতে জ আল-কে পরিচয় করলাম আমার স্ত্রী হিসাবে। ক্যাপ্টেন ওকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন।

দিন কাটতে লাগলো স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক গতিতে। চোদ্দ দিনের দিন আমাদের জাহাজ নোঙর ফেললো গ্নিমাউথে। সেখান



থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে কয়েকটা চিঠি এলো। দেখলাম, একটা চিঠি খুব মন দিয়ে পড়ে আমাকে এক পাশে ডেকে আনলেন। তারপর সন্ধ্যার সঙ্গে জানালেন, ওর উপর হুকুম এসেছে মার্কুইসের কাছে থেকে যে একজন তরুণী পণ্ডুগীজ মহিলা এই জাহাজে আছেন; তাঁকে বেন কোথাও নামতে না দেওয়া হয়। আর তিনি নিজেকে তাকে নিয়ে সোজা লিসবনে চলে আসেন যেন—এই হুকুমের অত্থায তাঁর প্রাণদণ্ডও দিতে থিখা করবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব আরও সন্ধ্যার সঙ্গে বললেন, এই জাহাজে একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো মহিলাও তো নেই—অতএব ও যে সত্যিই আমারই স্ত্রী, তার প্রমাণ আমাকে দেখাতে হবে। তা' না হলে আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

—“উনি তো আমারই স্ত্রী”, খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম। “কিন্তু প্রমাণ করবার মত কোনো কাগজপত্রই তো আমাদের সঙ্গে নেই।”

—“হুঃখিত, অত্যন্ত হুঃখিত। ঠেকে তাহলে আমার সঙ্গে লিসবনেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যতদূর সম্ভব সম্মানের সঙ্গেই ঠেকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটাও মার্কুইসের আদেশ।”

—“কিন্তু ক্যাপ্টেন, স্ত্রী তো স্বামীরই সহগামিনী?”

—“মানছি, একশো বার মানছি কিন্তু হুকুম যে মানতেই হবে। আপনিও লিসবনে ফিরে যেতে পাবেন। চাই কি আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছতে পাবেন।”

—“তবে আপনাদের সঙ্গেই বাই না কেন?”

—“সেটা যে হবার নয়। আমার উপর কড়া হুকুম আছে আপনাকে এখানে নামিয়ে দেবার। কিন্তু আমিও ভাবছি, এটা কেমন হোলো যে আপনাকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দেবার কথা মার্কুইস একবারও আপনার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেন নি? বাই হোক, মার্কুইস যে ভদ্রমহিলাটির খোঁজ করছেন তিনি যদি আপনার স্ত্রী না হ'ন, তবে তাঁকে লগুনে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।”

—“আচ্ছা, ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে পারবো কি?”

—“নিশ্চয়ই, তবে আমার সামনে।”

কেবিনে গিয়ে কাউন্ট ‘প্রিয়তমা পত্নী’ সম্বোধন করে সব ঘটনা বললাম—ভয় ছিলো পাছে ও উত্তেজিত হয়ে সব কঁাস করে দেয়—কিন্তু ও ধীরভাবে সব শুনে জানালে, আমাদের হুকুম না মানা ছাড়া আর গতি নেই—তবে আশা আছে শীগগিরই আবার আমরা মিলবো। ক্যাপ্টেনের সামনে কোনো কথাই বলা গেল না, তবু জানিয়ে দিলাম, লগুনে পৌঁছেই আমি মঠবাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীকে চিঠি দেবো—স্বাঃ ও যেন পৌঁছেই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এদিকে আমার গহনার বাজ দামা হীরা, জহরৎসুন্দর ওর কাছেই রয়ে গেলো। চাইতে পারলাম না পাছে ক্যাপ্টেনের সন্দেহ হয় যে ওকে রীতিমত ধনিকতা দেখে আমি ঠকিয়েছি।

ভাগ্যের পায়ে নিজেকে সঁপে দিলাম। যাবার আগে চোখের জলে পরস্পরকে অভিষিক্ত করে আলিঙ্গন করলাম। ক্যাপ্টেনের চোখও শুক ছিল না।

ওকে নিয়ে যাবার পর আমাকে নামতে হোলো একটি মাত্র ব্যাগ সঙ্গে করে—তাইতে শুধু পুরুষের পোষাক, বই, কাগজ-পত্র, একটি

তলোয়ার আর একজোড়া পিস্তল। কাস্টমস-এর হাঙ্গামা চুকিয়ে একটা সরাইখানার এসে ঢুকলাম। মালিকের কাছে জানা গেল লগুনে একটা দল যাচ্ছে, আমি সহজেই সেই দলে ভিড়ে পড়তে পারি। খরচ শুধু একটি ঘোড়ার দাম। মালিকই সেই দলটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভালোই লাগলো তাঁদের। যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু পুঁজি তো নিঃশেষ—তাই হ'ল এক দিন পরেই আরও সস্তার একটি আগ্রয়ে উঠলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন সুন্দর তিনতলা একটি বাড়ীর একটি ঘর নিলাম। বাড়ীওয়ালী শুধু ভদ্র নয় মনটিও ভারী নরম। সহজেই বিশ্বাস করতে পারলাম ঠেকে। অনুরোধ জানালাম আমাকেও মেয়েদের পোষাক কিছু কিনে এনে দিতে—কারণ আর পুরুষের ছদ্মবেশে বাইরে বেরোবার সাহস বা ইচ্ছা দুটোই ছিল না—সম্বল তখন মাত্র পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা—সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। দুদিনের মধ্যেই নিজেকে পেলাম—কঠিন ভাগ্যের মুখোমুখি ঠাঁড়িয়ে সম্বলহীনা একটি তরুণী—যার জানা হোয়ে গেছে সোজা পথে চলতে গেলে ভয় করলে চলবে না।

দশ শিলিং সস্তাহের ভাড়া। তাও বেশী দিন চালানো সম্ভব হোলো না। তাছাড়া আমার প্রতি লোকদের বিশেষ করে যুবকদের কৌতূহল একটু বাড়াবাড়ি বকম উগ্র হোতে লাগলো। শেষ অবধি হাতের আঁটিটা বাড়ীর পাশেই এক বৃক্ষকে বেচে দিলাম—‘দেড়শ’ গিনি পাওয়া গেল। বাড়ীওয়ালীও আমার অবস্থা বুঝে আরও সস্তার একখানা ঘর খোঁজ করছিল। বাইরে গেতে যাবার সক্ষমতা ছিল না বলে একটি পরিচারিকাও জোটাতে হোয়েছিলো—আর সেটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর—ভাবতাম, দুনিয়াশুদ্ধ সবাই বৃষ্টি বড় করে আমাকে ঠকাতে চায়। আসলে একটু-আধটু চুরি লোকজন করেই থাকে কিন্তু বার কাছে দৈনিক এক শিলিং-এর বেশী খরচ করা সম্ভব নয়, তার কাছে ওই একটু চুরিও অনেকখানি গায়ে লাগে। বেশী কিছু খাওয়া ছেড়ে দিলাম। শুধু রুটি আর জল। দিনে দিনে শরীরও হোতে লাগলো শীর্ণ থেকে শীর্ণতর। এমন সময় একদিন আপনার ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়লো—ঢাথে পড়লো বিভিন্ন পত্রিকার আপনার প্রতি কটাক্ষ। স্বভাব বাবে কোথায়? কৌতূহল দমন করা সহজ হোলো না—তারপর তো সবই জানা আপনার—হ্যাঁ, ইতিমধ্যে একটা ঘটনা বলা হয়নি। আমি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছবার দিন তিনেক পরই আমার সন্ন্যাসিনী মাসীকে একটি চিঠি লিখি সব ঘটনা জানিয়ে—স্বাঃ তার সঙ্গে সত্যতার মিনতি জানাই, যাকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছি তাকে রক্ষা করতে, তাকে আশ্রয় দিতে। আরও জানালাম, যত দিন না আমাদের হুঁজনার নিলনের পথে সব বাধা সরে যায় তত দিন লিসবনে ফিরবো না। চিঠিটা প্যারিস দিয়ে মাদ্রিদে পাঠালাম—স্বলপথে এটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। দীর্ঘ তিনটি মাস পরে মাসীর চিঠি পেলাম। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন মহিলাটির পৌছানো খবর মার্কুইসকে দিলে তিনি সোজা আদেশ দেন, তার একটা চিঠি সমেত মহিলাটিকে সন্ন্যাসিনী মাসীর আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে। চিঠিটার মাসীকে লিখে জানিয়েছেন যে তাঁর বোনঝিকে পাঠানো হোলো, এবার মাসী যেন তাকে ঘরে চাবি-বন্ধ করে রেখে দেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার চিঠিটা মাসী আগেই পেয়েছেন। তিনি ওকে নিরাপদেই একেবারে ঘরে বন্ধ

করে রাখলেন যাতে কেউ কিছু টেব না পায়। এদিকে মাকু'ইসকে চিঠি দিলেন, বাকে পাঠানো হয়েছে সে তাঁর বোনঝি নয়, তারই ছদ্মবেশে একটি তরুণ। এখন মাকু'ইস তরুণটিকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করলেই ভালো—কারণ আশ্রমে পুরুষদের বসবাস নিষিদ্ধ।

ইতিমধ্যে কাউন্টের সঙ্গেও মাসী দেখা করেছেন ও মাসীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে আর আমাদের দু'জনারই জগাই ভিক্ষা চেয়েছে ওর স্নেহের আশ্রয়ের—আমার সমস্ত হীরা জহরৎ গহনাগুলিও মাসীর হাতে তুলে দিয়েছে। মাসী ওর সততায় আর স্তম্ভের ব্যবহারে খুব খুসী।

এদিকে মাকু'ইস চিঠি পড়ে নিজেরই চলে এলেন মাসীর কাছে। মাসী তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আশ্রমের সুনাম আর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এখনি একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার, আর সব ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ গোপন থাকা দরকার। কারণ তাঁর নিজের মান-সম্মত ও এর উপর নির্ভর করছে। কাউন্ট যে মাসীকে সব গহনাগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে তাও জানিয়ে দিলেন। মাকু'ইস সব ঘটনাটাই গোপনে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন—তবে উনি যে একটুও রাগ করেন নি তার প্রমাণ মাসীকে সহাস্ত পরিহাসে ওর ভিজ্জাসা—এমন একটি অপকৃপ স্তম্ভের কাস্তি তরুণকে যে তার সম্মান করতে পাঠিয়েছিলেন তার জন্তে মাসী নিশ্চয়ই মাকু'ইসকে ক্ষমা করবেন। বাই হোক, কাউন্টকে সঙ্গে নিয়ে তখন তিনি চলে গেলেন। তারপর থেকে চিঠি লেখার দিন খবর মাসী ওদের আর কোনো খবরই পাননি। ওদিকে সারা লিসবন জুড়ে উল্টোটাটাই রটেছে যে কাউন্ট লগুন আর মাকু'ইস আমার প্রতি কোনো দুর্বলতার জন্তেই আমাকে লুকিয়ে রেখেছেন! এটাও ঠিক, মাকু'ইস আমার সব খবরাখবর রাখার জগা চর নিযুক্ত করেছেন। আর মাসীর কথা মত আমিও তাঁকে লিখেছি যে আমি এখনি লিসবনে ফিরতে রাজী, যদি উনি কথা দেন যে সাধারণ সমক্ষে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ভাবে কাউন্টের সঙ্গে আমার পরিণয় হবে। তাঁ'না হলে ইল্যাগুই আমি সারাজীবন কাটাব—এখানে আর বাই হোক, মুক্ত স্বাধীন জীবনযাত্রায় পদে পদে আইনের বাধা আসবে না।

এখন আমি মাকু'ইসের উত্তরের অপেক্ষা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাকু'ইস আমার সঙ্গে রাজী হবেন আর খুশী হয়েই আমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন। বাবার মৃত্যুর খানিকটা ক্ষতিপূরণ হবে।

\* \* \* \*

—“কি ভাবছো?”

—“কিছু না।”

—“মোটাই কিছু না নয়—ভাবছো যে আমার প্রেমে তুমি মরতে পাগো, তাই না? কিন্তু দিন দিন যে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছো—রাত কাটাচ্ছে নিদ্রাহীন চোখ মেলে, এ কি দেখিনি আমি? নাঃ, যদি সত্যিই আমাকে খুশী দেখতে চাও তবে বেরিয়ে এসো বোড়ায় চড়ে—দিন-রাত এই নিঃশব্দ অলস মুহূর্তগুলোকে কোন মতে পার করে দিলেই কি স্বাস্থ্য থাকে?”

—“পলিন, প্রিয়তমা—তোমার কোনো কথাই তো আমি না রেখে পারি না—কিন্তু ফিরে এসে?”

—“দেখবে আমি কৃতজ্ঞ—দেখবে তোমার আঙারে কচি—রাতের ঘুম—”

—“বাস্ বাস্—একুণি ঘোড়া সাজাতে বলছি।”

শুভ্র কোমল হাতখানিতে চুষনের যুহু স্পর্শ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিস্টনের রাস্তায়। আমাদের দু'জনার পরিচর আজ নিবিড় বন্ধুত্ব পরিণত—কিন্তু আমার পিপাসিত মনের তৃষ্ণা যে শুধু বন্ধুত্ব তৃপ্ত হতে চায় না—স্ক্রক, লুক আকাখার জালা আমার রাতের ঘুম আমার দিনের আনন্দ সব কিছু হরণ করেছে। অথচ পলিন দিনে দিনে ভরে উঠছে অপকৃপ মাধুর্য—কোন অক্ষুণ্ণ লাভের স্রোত—স্রোতে—চিন্তায় বিভোর—ক্রমশঃ ছিল না আশে-পাশে—হঠাৎ কিসের ধাক্কায়? ঘোড়াটা তীব্রবেগে মুখ খুঁড়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে আমিও একেবারে শুল্লো লাফিয়ে উঠে সজ্ঞারে ভূমিগত্যা গ্রহণ করলাম। ঠাণ্ডার ক্ষমতা রইলো না বজ্রপায়—সোভাগ্যক্রমে দেখি, কিস্টনের ডিউকের প্রাসাদের সামনেই পড়েছি। ডিউকের লোকজনের সাহায্যে বাড়ী এলাম গাড়ীতে শুয়ে। বাড়ী এসে বিছানায় শুয়েই ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন—বেশী রকম মচকে গেছে। হাড়-ডাক্তার সবকিছু আমার আশঙ্কা অমূলক। অবশ্য এ-ও জানালেন, হাড় ডাক্তার মন্দ হতো না, তাঁর কৃতিত্ব ফলাবার সুযোগ ঘটত।

এতক্ষণ পলিনের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আশ্চর্য লাগছিলো। সুনাম ও বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এসে হাজির—গভীর উদ্বেজনার সমস্ত মুখখানি রক্তরাঙা—হুট চোখে অমূল্য বস্তু হারিয়ে—

আমার পাশে বসে পড়ে বললে—“শুধু আমার জন্তেই তোমার এই দশা, আমার জেদের ফলেই তোমাকে হাড়ডাক্তার নিদারুণ বজ্রা ভোগ করতে হচ্ছে—”

বলতে বলতে ওর হুট চোখ ছাপিয়ে বর-বর করে জল পড়তে লাগলো—অনুশোচনা আর সমবেদনা? না আরও কিছু?—দেখলাম, ওর মুখখানি মৃতের মত বিবর্ণ, মূর্ছাহতের মত আমার পাশে ঢলে পড়ছিলো—তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললাম।

—“কল্পনাধরী, শোনো শোনো, অত অধীর হোয়ো না, ভাজেনি, শুধু মচকানোর ব্যথা—”

—“সর্বরক্ষা! উঃ কি-চাকরগুলো কি মিথ্যাই না বলতে পারে? আমাকে কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলো! দেখো দেখো, এখনও আমার বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপছে!”

—“পারছি—বুঝতে পারছি—আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়েই পারছি, এই আকস্মিক হৃৎটনা আমার সারা মন যে ভরিয়ে দিলে!”

তৃপ্তি ব্যাকুল হুট অধর দিয়ে ওর রক্তিম কোমল স্মৃতি হুট অধর স্পর্শ করতেই অনুভব করলাম প্রতিদান, এ যে কী প্রাপ্তি, এ যে কী পরম প্রাপ্তি, আমার সমস্ত অ-পরমাণু বন্ধুত্ব হয়ে উঠলো নিবিড় পুলকে।

হাসছে পলিন।

—“হাসছো যে? কেন হাসছো বলতেই হবে।”

—“প্রেমের এই চকিত ছলনায়, যা সব সময় জয়ী হয়। জানো, আমি সেই বড়োটার কাছে গিয়েছিলাম আমার আ-টিট ফিরিয়ে

আনতে। ওটা তোমাকে দেবো, আমার ওই ছোট চিঠিটা সারাজীবন তোমার কাছে থাকবে—

—“পলিন—পলিন, আমার মনটাকে তুমি কি ভাবো বলা তো ? শোনো, ‘সোনার ঢেয়ে সোনামুখের ঢের বেশী দাম বুঝবে সে’—চাই না তোমার তুচ্ছ জ্ঞপন—তোমার প্রেম ঢের বেশী দামী।”

—“আচ্ছা গো আচ্ছা ! আর যদি দুটোই পাও ? শোনো, এখন থেকে আমার বত দিন না ডাক আসে তত দিন আমার হৃৎকেনে থাকবে মধুচন্দ্র-উৎসবমণ্ড দম্পতির মত, কেমন ? শোনো, তুমি নড়বে না এই বিছানা থেকে—আমাদের খাবার এইখানেই দেবে। জানো, এই ক’দিন পাশাপাশি থেকে গোপন প্রেমের স্বপ্নে আমিও ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি আজ ভোরে মনে মনে ভেবেছিলাম ভেঙে দেবো এই ছলনার লুকোচুরি, নিবেদন করবো আপনাকে তোমার ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহুবন্ধনে। স্বতন্ত্র না সেই ‘কাল’ পত্র আসে আমাদের বিচ্ছেদের সূচনা জানিয়ে ততক্ষণ আমি থাকবো তোমার পাশে—”

—“সেই পত্রবাহক রাস্তার চোর-ডাকাতের হাতেও পড়তে পারে !”

—“অত সৌভাগ্য আমাদের বরাতে নেই প্রিয়তম !” চুপ করে ঢেয়ে থাকি পলিনের মুখের দিকে।

পূর্ণগালের সেরা স্তম্ভরী—কোন বনেদী, সস্তাস্ত, অভিজাত পরিবারের শেষ প্রতীক—আজ প্রেমের মাধুর্য্যে অঞ্জলি পূর্ণ করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—ক’টি মুহূর্ত্ত ভরে দিতে রঙের-সে, ছন্দে-সুরে—তার পর মিলিয়ে যাবে এই চকিত বিদ্যুৎলেখা মনের প্রান্ত ভরে দিয়ে ঘন কালো মেঘে—

নিশেষ বেদনায় মন ভরে উঠে।

এই বাড়ীটা ছাড়বো না ঠিক করে ফেললাম। অন্ততঃ বত দিন পলিন এখানে আছে। ও সহজে বাড়ী থেকে বেরোতো না, এক রবিবার উপাসনায় বাওয়া ছাড়া। ওর মনটা ছিলো ভারী ধ্বংসপ্রবণ কিন্তু স্বাধীন চিন্তাও ও কোরতো।

আমি সোজা হুকুম দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে কেউ যেন দেখা করতে না আসে—আমার বাড়ীতে কেউ যেন না ঢোকে। এমন কি ডাক্তার অবধি নয়। সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাকে দেখতে আসার বা খোজ-খবর নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চেয়েছিলাম আমাদের হৃৎকেনার এই কণ-স্বর্গে একটিও বিচ্ছেদের মুহূর্ত্ত যেন না আসে।

মার্ডিনেলোকে লিখেছিলাম, লণ্ডনের সেরা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি শিল্পীকে পাঠাবার জন্তে। একজন ইহুদী শিল্পীকে ও পাঠিয়েছিলো। দুটি ভারী চমৎকার প্রতিকৃতি শিল্পীকে পাঠাবার ওজ্রে। একজন ইহুদী শিল্পীকে ও পাঠিয়েছিলো। দুটি ভারী চমৎকার প্রতিকৃতি শিল্পী এঁকেছিলো। অদ্ভুত সাদৃশ্য এনেছিলো—একেবারে নিখুঁত বলা চলে। আমার প্রতিকৃতিটি একটি আঙুর উপর বাঁধিয়ে পলিনকে উপহার দিলাম। এই একটি মাত্র উপহার পলিন আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলো। দিনের পর দিন চলে গেলো।

প্রতিটি দিন ভরে নিয়ে নব নব স্ফূর্ত্ত—প্রতিটি দিন আমি পেতাম আমার প্রিয়াকে নতুন রূপে—নতুন রহস্যে। আমাদের সারা দিন-রাত যেন একটি বাঁধার স্বাক্ষর—পলিন এক এক দিন অদ্ভুত গুঞ্জে জানাতো—‘কি জানি লিসবন থেকে হয়তো ডাক

কোনো দিনই আসবে না—কোনো দিনই এসে পৌঁছবে না সেই চিঠি।’ স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়ে জাল বুনতাম দুজনে বসে। কাউন্টের কথা পলিনের শুধু স্মৃতিতেই ছিলো—মন থেকে বৃষ্টি নির্ধাসন হয়েছিল তার! তাই ও বলতো, শুধু স্তম্ভর মুখের প্রভাবেই নারীর মন এমন মুগ্ধ কি করে হয় ও বুঝতে পারে না—কখনো বলতো,—“আমার মনে এই বাইরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হোয়ে যে মিলন তাইতে প্রায়ই সূখ আসে না—কণহারা আনন্দের পর নেশাভাঙার জ্বালা থাকে শুধু—”

কিন্তু অবশেষে এলো সেই একদা-বাহিত পত্রখানি। নিবিড় কালো বিচ্ছেদের রেখা আমাদের মাঝখানে টেনে দিয়ে। এমন ভাবে লেগা চিঠিখানি যে ফিরে বাবার সম্বন্ধে কোনো সংশয় কোনো প্রতিবন্ধকতাই টিকতে পারে না। হৃৎখানি চিঠি—একটি মাসীর কাছ থেকে আর একটি মাকু’ইসের। মাকু’ইস জানিয়েছেন, ‘বত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যেতে জলপথে বা স্থলপথে। আর সেখানে পৌঁছালে তাকে তার সমস্ত শৈল্পিক সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে—আর তাদের সম্পূর্ণ আইনসম্মত, লোকাচার সম্মত বিবাহ উৎসবের অনুষ্ঠানে কোনো ক্রটিই ঘটবে না। মাকু’ইস তাকে প্রকৃত ডাচেসের মর্যাদার আর স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্তে দু’হাজার পাউণ্ড ঠাঁলি পাঠিয়েছেন। কিন্তু পলিনের বনিয়াদী মন মাকু’ইসের এই টাকা পাঠানোতে কিছু ক্ষুণ্ণ আর বিরক্ত দেখলাম, ‘উনি কি ভাবেন আমি অর্থকষ্টে পড়েছি?’

পলিন ধনী—পলিন উদার। যখন সত্যিই অর্থভাবে ছিলো, তখনও ওর আঙুটি আমাকে উপহার দেওয়া থেকেই বোঝা যায়। ওর ভরণ-পোষণের সব তার আমার উপর দিতে ও সঙ্কুচিত কৃতিত্ব ছিলো তাই। যদিও ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো আমি ওকে কোনো দিনই ঠকাবো না।

বিদায়ের মুহূর্ত্তটি যখন স্থির হোয়ে যায় তখন কি কল্পন-মস্তুর শ্রান্ত দিনগুলি কাটে! নিবিড় করে কাছে পেয়ে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবার ব্যথায় সমস্ত মন ভোরাকান্ত। হৃৎকেনে বসে থাকি মুখোমুখি, সব বলা যেন শেষ হোয়ে গেছে; কিছু চাওয়া কিছু পাওয়া যেন বাকী নেই। খেতে বসে দুজনেই আনমনে উঠে আসি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শয্যার আশ্রয়ে দু’জনাই কাটে বিনিত্র রজনী

যাবার দিন এলো। আমি ডোভার অবধি ওর সঙ্গে গেলাম। ১২ই আগষ্ট ও বাত্ৰা করলো। সঙ্গে দিলাম আমার বিশ্বাসী ক্লেয়ারমঁতকে। মাস্ত্রিদ অবধি পৌঁছে দিতে পলিনকে। যাবার আগে ওর শেষ কথা—

‘একটি মিনতি রেখো। আমি না ডাকলে কখনো লিসবনে এসো না। না—কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন আছে কি? তুমি বুঝবে আমার মনকে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ করে তুলো না। অগ্রহী চক্স মনে সব কিছু করা যায় কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালোবাসো তুমি কি চাইবে আমার মান, সম্মান, জায়নিষ্ঠা সব ভাসিয়ে দেবার একমাত্র কারণ হোতে? আমি কি স্থির করেছি জানো? দিনরাত মনকে বোঝাবো আমার স্বামী ছিলে তুমি, দুজনার মিলিত দিন কেটে গেছে, আজ আমি বিধবা, আমি লিসবন বাচ্ছি দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্তে।’

কোথায়—কোথায় যেন একটা খনিষ্ঠ মিল রয়েছে এই দু'টি বিচ্ছেদে—আমার জীবনের দু'টি মর্যাদাসিক বিচ্ছেদে। যা আমার সমস্ত সত্তাকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, যার গভীর কৃত সারা জীবনের অশ্রুসিক্তনেও মিলিয়ে যায়নি।

একটি পনেরো বছর আগে হেনরিয়েটার বিদায়ের দিন আর একটি আজ। আশ্চর্য! এই দুটি নারীর চরিত্রে কি আশ্চর্য সাদৃশ্য! শুধু শিক্ষার সাধনা একজনকে আরও বিকশিত হাত্মাচ্ছা, আরও স্বক্টিসম্পন্ন। আরও সংস্কারযুক্ত করে তুলেছে অপারার চেয়ে। পলিনের ছিল আভিজাত্যের গর্ব, ও আরও গভীর, আরও ধর্মপ্রবণ। কিন্তু হেনরিয়েটার চেয়ে বেশী আবেগময়ী। এই দু'টি নারীই আমার জীবন ভরে দিয়েছে সুখ-রস-ধারায়।

কালের প্রলেপে মিলিয়ে গেছে দু'জনেই, যেমন সব কিছু মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বস্তির আবরণও তো মাঝে মাঝে সবে যায়, তখন দেখি হেনরিয়েটার হাসিভরা মধুর মুখখানিই উজ্জ্বলতর হোয়ে ফুটে উঠেছে মনের পটে। কেন তা' আজ বুঝি। যেদিন হেনরিয়েটাকে পেয়েছিলাম সেদিন ছিলাম বাইশ বছরের তরুণ, ছিলো স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন রচনার বয়স। আর পলিন এসেছিলো সাঁইত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মনের কাছে, আজ বেশ বুঝতে পারি বয়সের ছাপ কেমন করে মনের মধ্যে বিচারের দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে তার অকার্য পালকের গতিরোধ করে।

ফিরে এলাম লগুনে। সমস্ত রাত্রি গভীর অবসাদে কাটলো। ভোরবেলা আমার ছোকরা চাকর জারবি ঘরে ঢুকলো গরম চাকালেটের গ্রাস হাতে করে।

—“আপনার পরিচারিকা জানতে চায় সেই বিজ্ঞাপনটা আবার ঝুলিয়ে দিতে হবে কি না”—

—“শয়তানী! ও কথা বললে আমি ওকে খুন করে ফেলবো।”

—“রাগ করবেন না, ও আপনার ভারী অমুগত। আপনাকে অমন কাতর ভাবে মুবড়ে পড়তে দেখেই ও জিজ্ঞাসা করছিলো।”

—“দূর হও! আর বলে রাখছি এ সম্বন্ধে কথা বলা তো দূর, মর্মেও স্থান দেবে না তোমরা”—

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বার্লিন।

লগুন থেকে বার্লিনে চলে এলাম। ক'টা দিনের মাঝে কিছু ঘটনা কিছু বৈচিত্র্য ছিলো বৈ কি। কিন্তু সে কথা থাক। বার্লিনে প্রথম দিন পৌঁছেই দেখা করলাম লর্ড মার্শালের সঙ্গে—তাইয়ের যত্নের পর উনিই এখন লর্ড কেইস। ঠুকে শেষ দেখেছিলাম লগুনে—কটল্যাণ্ড থেকে ফিরছিলেন—সেখানে ওর সম্পত্তি পুনরধিকারের জন্তে গিয়েছিলেন। অবশ্য সেটাও সম্ভব হোয়েছিলো রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জন্তেই।

এই স্মৃতিকথা লেখার সময় উনি বার্লিনে প্রচুর আয়াসে আরামে রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পুরম প্রিয়পাত্র হোয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যদিও রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন না। কারণ সে সময় ওর বয়স আশীর উপর। কিন্তু ওর সরল মধুর প্রকৃতির এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। উনি সাদরে আমাকে আহ্বান জানালেন—কিছুদিন বার্লিনেই থাকার জন্য অমরোধও জানানলেন।

আমি বললাম, স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারি যদি রাজ-অমুগ্ৰহে একটি মনোমত কাজ পাই। কিন্তু আমার হোয়ে রাজার কাছে সুপারিশের জন্য অমরোধ করতে উনি বললেন, তাইতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশী হবে।

—“রাজার ধারণা যে কোনো লোকের চেয়ে মানুষ চেনার ক্ষমতা তাঁর অনেক বেশী। নিজেই তিনি বাচাই করে নিতে ভালোবাসেন। কখনও কখনও যার মধ্যে কেউ কিছুই দেখতে পায় না, তার মধ্যেও অনেক প্রতিভার আবিষ্কার করেন, কখনও ঠিক তার উল্টোটাই ঘটে”—

উনি আমাকে সোজা-সুজি রাজার কাছে চিঠি লিখতে বললেন,—“অবশ্য যখন লিখবে তখন আমার সঙ্গে যে তোমার পরিচয় আছে সে কথাও উল্লেখ করতে পারো। তাহলেই রাজা আমাকে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন—আর বলতে হোল আমি যে তোমার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথাই বলবো, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো”—

—“কিন্তু, মহাশয়, আমি লিখবো সোজা রাজার কাছে—আমার কোনো পরিচয়ই তো তাঁর জানা নেই? আমি তো ভাবতেই পারছি না লেখার কথা?”

—“কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও—কেমন না?”

—“নিশ্চয়ই।”

—“তাই-ই যথেষ্ট, তোমার চিঠিতে ওই ইচ্ছাটাই প্রকাশ করলেই হবে।”

—“রাজা উত্তর দেবেন?”

—“কোনো সম্ভেহ নেই তাইতে। কারণ সবার চিঠির উনি উত্তর দেন। উনি জানিয়ে দেবেন কখন কোথায় তোমার সঙ্গে ওর দেখা করার সুবিধা হবে। আমার কথা শুনে চলো—আর যা কিছু হবে আমাকে জানিও”—

ওর কথা মতই সাদাসিধা ভাষায় সশব্দভাবে একটি চিঠি লিখে পাঠালাম। মাত্র একদিন বাদেই ফ্রেডারিকের সহী করা উত্তর এলো—আমার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে আর জানিয়ে বেলা চারটার সময় সাঁমুচি স্কয়ারে রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোতে পারে।

আমার আনন্দ তখন কল্পনাতীত। উৎসাহের চোটে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই গিয়ে হাজির। খুব সাদামাটা একটা কালো রংয়ের পোষাক পরে। ভিতরে ঢুকে কাউকেই দেখতে পেলাম না। একজন প্রহরী, শাস্ত্রী অবধি না। ছোটো একটা সিঁড়ি দেখে সোজা উঠে গেলাম, সামনেই খোলা দরজা—ঢুকে পড়ে দেখি চিত্রশালা। একজন লোক এগিয়ে এসে আমাকে সংগ্রহগুলি দেখাবেন কি না, জানতে চাইলেন।

—“আমি এখানে শিল্প-সংগ্রহ দেখতে আসিনি। এসেছি রাজার দর্শনার্থী হয়ে—তিনি যে জানিয়েছিলেন বাগানেই থাকবেন”—

—“ঠিক এই মুহূর্তে তো তিনি কজাট-এ বাঁশী বাজাচ্ছেন। আহাবের পর এই-ই তাঁর অবসর বিনোদনের রীতি। রোজই তাই করেন। আচ্ছা, কোনো সময় ঠিক করে দিয়েছিলেন কি?”

—“হ্যাঁ, চারটার সময়—হয়তো ভুলে গেছেন তাহলে।”

—“তিনি কখনোই ভোলেন না। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওর কাজ—আপনি বরং বাগানেই অপেক্ষা করুন”—

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না—দেখলাম উনি আসছেন। সঙ্গে সেক্রেটারী আর একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল কুকুর। যেই আমাদের দেখতে পেলেন অমনি আমার নাম ধরে ডাকলেন মাথার বিশিষ্ট পুরানো টুপীটা খুলে নিয়ে। কি জলদগন্তীর স্বর! ঠিক এমনটিই আমি চেয়েছিলাম।

নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম।

—“কি! কথা বলতে পারেন না আপনি? আপনিই না আমাকে লিখেছিলেন?”

—“হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না, কি বলবো? আমি ভাবতে পারিনি রাজার—আমার সমস্ত অনুভূতি এমন করে আচ্ছন্ন করে দেবে। আমি ভবিষ্যতে বরং প্রস্তুত হয়েই আসবো। লর্ড মার্শালের আমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিলো—”

—“ওহো, উনি আপনাকে চেনেন নাকি? আসুন বেড়াতে বেড়াতে কথা হবে। কি বলতে চেয়েছিলেন আমাকে? আচ্ছা এই বাগানটা কেমন লাগছে বলুন তো?”

ওঁর বাগানের সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইলেন। বলা উচিত ছিলো এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই অজ্ঞতা প্রকাশ! যা’ থাকে বরাতে বলে সোজা বললাম—“চমৎকার!”

—“কিন্তু ভাস’ই-এর বাগান এর চেয়ে অনেক সুন্দর!”

—“তা’ ঠিক কিন্তু সেটা শুধু অজস্র ফোয়ারার জন্তে।”

—“সত্যিই তাই; কিন্তু এখানেও আমার ক্রটি নেই কিছু। জলই নেই এখানে—তিনশ’ হাজার ক্রাউন খরচ করেছি কিছুই হয়নি।”

—“তিনশ’—হাজার ক্রাউন! যদি এত খরচ করা হোয়ে থাকে তবে জল তো প্রচুর পরিমাণে ওঁর কথা”—

—“ওহো! আপনি দেখছি জলের কারিগরিতে বিশেষজ্ঞ!”

বলা উচিত কি ভুল দেখছেন? অসম্ভব করা তো মোটেই সমীচিন নয়। তাই চুপচাপ মাথা হেঁট করে রইলাম—যে অর্থে হ্যাঁ, না, দুই-ই বোঝায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার উনি প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন। তারপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ভেনিসের নৌশক্তি আর সৈন্যসংখ্যা কত? ধাতস্থ হোলাম আমি।

—“বিশটি যুদ্ধজাহাজ আর বহুসংখ্যক নৌকা।”

—“আর স্থলপথে?”

—“সত্তর হাজার সৈন্য। সবাই রাষ্ট্রের প্রজা। সৈনিক থেকে হিসাব করতে গেলে গ্রাম-পিছু একজন লোক”—

—“না আপনার উক্তি ভ্রান্ত। মনে হয় আবার গল্পে আমাকে ভোলাতে চান। তার চেয়ে আপনার কথপ্রথা সর্বাঙ্গ বলাই।”

রাজা-রাজড়ার সঙ্গে এভাবে কথোপকথন আমার এই প্রথম। ওঁর বলার ধরণ হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া, এসব দেখে নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন আমি কোনো ইতালীয় নাটকে অভিনয় করছি—যেখানে একটা কথা ভুল হোয়ে গেলেই দর্শকদের নির্ভর টিটকারী শুরু হবে। যাই হোক, আমি বললাম, কথপ্রথার পুথিগত জ্ঞানের সঙ্গেই আমি পরিচিত।

—“তাই-ই আমি চাই।”

—“তিন রকম কর আছে। একটি ধ্বংসাত্মক, একটি দুর্ভাগ্যক্রমে অতি প্রয়োজনীয় আর একটি নিঃসংশয়ে ভালো। প্রথমটি রাজকর দ্বিতীয়টি যুদ্ধকর, তৃতীয়টি জনপ্রিয় কর।”

—“বেশ, বেশ কিন্তু রাজকরকে ধ্বংসাত্মক বলার অর্থ কি?”

—“প্রজার তহবিল শূন্য করেই তো রাজার কোসাগার পূর্ণ হয়। তাছাড়া এতে যুদ্ধা চালু থাকতে না পারায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।”

—“তবু যুদ্ধকরকে তো প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করছেন?”

—“দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয়—কারণ যুদ্ধ যে সর্বনাশা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি তো রাখতেই হবে—আর তৃতীয় করটির জনপ্রিয়তার কারণ, সেটি জনকল্যাণেই ব্যয়িত হয়, প্রয়োজনীয় জলসেচ, প্রণালী খনন, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন হিতকর কাজে”—

—“হ্যাঁ এ কথাগুলি ঠিকই। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই কালসাবিগিকে চেনেন?”

—“নিশ্চয়ই! আমরা একসঙ্গেই তো ‘জেনোস’ লটারী প্রতিষ্ঠা করি—প্রায় সাত বছর আগে প্যারিসেতে—”

—“কি জানি আপনারদের ঐ ‘জেনোস’ লটারীটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। মনে হয় শ্রেফ জুয়া ছাড়া কিছু নয়। জিতবার স্থির নিশ্চয়তা জানলেও আমি কখনও ওতে যোগ দিতাম না।”

—“ঠিকই বলেছেন। কারণ, জনসাধারণ কখনোই লটারীর পিছনে ছুটতো না যদি না তার আড়ালে ওই ভুয়া নিরাপত্তার লোভটি থাকতো।”

হঠাৎ কথা পালটিয়ে রাজা আমার দিকে চেয়ে বললেন,—“আচ্ছা, আপনি যে অত্যন্ত সুপুরুষ, সেকথা আপনি জানেন?”

—“এও কি সম্ভব যে এতক্ষণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার পর আপনি আমার মধ্যে সব গুণ ছেড়ে শুধু ওই তুচ্ছ রূপটুকুই দেখলেন, যেটা শুধু আপনার দেহরক্ষী নির্বাচনেই প্রয়োজন!”

হেসে ফেললেন রাজা—পরক্ষণেই বললেন,—“লর্ড কেইথ তো চেনেন আপনাকে। আমি তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলবো।”

টুপীটা মাথা থেকে খুলে নিলেন—বুঝলাম বিদায়ের ইঙ্গিত। সঙ্গত অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

তিম-চার দিন পরে লর্ড মার্শাল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, রাজা খুব খুশী আমার সঙ্গে সেদিনের পরিচয়ে, আর আমার জন্তে কাজের চেষ্টাও করবেন, বলেছেন। খুব উৎসুক হোরে রইলাম, কোন কাজের জন্ত ডাক আসে—কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নাই।

এই শ্রুতিকথা লেখার সময়তেই রাজা ফ্রেডারিকের বোন ডাচেস অব ব্লালউইক সন্ধ্যা এসেছিলেন রাজার কাছে। পরের বছরই ফ্রিশিয়ার যুবরাজ ওঁর কন্ঠার পাবিগ্রহণ করেন। ওঁদের আগমন উপলক্ষে রাজা একটি ইতালীয় অপেরা অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। সেখানে সেই উৎসবে রাজাকে আবার দেখলাম—কালো পোষাক, প্রতিটি সেলাইএর উপর সোনার কাজ, কালো সিল্কের মোজা—সব জড়িয়ে কেমন একটা হাতকর মূর্তি—যেন অভিনয়ের ঠাকুরা—প্রতাপশালী সম্রাট নয়। এক বগলে লম্বা টুপী আর এক হাতে বোনের হাতটি ধরে উৎসব-গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রত্যেকেই নির্বাক



হোয়ে চোয়ে রইলো ঠর দিকে—এক বৃদ্ধা ভিন্ন রাজাকে ইউনিফর্ম ছাড়া অস্ত্র কিছু কখনও পরতে দেখেছে কিনা স্বরণেও আনতে পারে না।

রাজার প্রাসাদ দেখেছি—তাই দেখেছি সেখানে অস্ত্র বিরাট সুসজ্জিত কক্ষগুলির সঙ্গে রাজার নিজস্ব শয়নকক্ষটির কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! ছোট্ট একটি ঘর—একধারে পর্দার আড়াল দেওয়া অতি সাধারণ ছোট্ট একটি বিছানা। কোনো পাছকা, কোনো রাত্রিবাস কিছুই নাই, একটি পুরানো রাত্রে পরার টুপী ছাড়া। নীতের সময় ওই টুপীটির উপরই তিনি ঠর বাইরের টুপীটি পরেন। ঘরের একধারে একটি সোফা, তার সামনে একটি টেবিল—কাগজ কলম আর দোয়াতদানীতে সুগীকৃত, আগপোড়া অবস্থার খাতাও কয়েকটি দেখলাম। ওই ঘরখানির পরিচারক জানালে—ওই কাগজপত্র আর খাতাগুলিতে গত যুদ্ধের ইতিহাস লেখা আছে। আকস্মিক ভাবে কয়েকটি খাতা পুড়ে যায়। সম্প্রতি রাজা আর লিখছেন না—তার পরে বোধ হয় অসমাপ্ত লেখাটা আবার ধরেছিলেন। কারণ, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ওটি প্রকাশিত হয়।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কেটে যাবার পর লর্ড কেইথ জানালেন যে, রাজা আমাকে একটি অফিসারের পদে নিযুক্ত করেছেন—সেটি হোলো পমিরেনিয়ান ক্যাডেটদের দলপতি বা শিক্ষক—সম্প্রতি এই ক্যাডেট দলটি খোলা হয়েছে। সংখ্যা মাত্র পনেরো জন ক্যাডেট—দলপতি পাঁচ জন, প্রত্যেকের অধীনে তিন জন ক্যাডেট। আর পারিশ্রমিক ছ'শো ক্রাউন—আহার, ক্যাডেটদের সঙ্গে একই টেনি। আর কাজটা? ক্যাডেটদের সঙ্গে সর্বত্রই থাকা; এমন কি রাজসভাতেও অবশ্য তখন কিতাটিতে বাধা ইউনিফর্ম পরতে হবে। আমাকে এখন মনস্থির করে ফেলতে বলা হয়েছে কাজটা নেওয়া সম্বন্ধে। কারণ বাকী চার জন দলপতি অথবা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে গেছে। আমি লর্ড কেইথকে জানালাম, পরদিন নিশ্চয়ই আমি মতামত জানাবো, আজকের দিনটা চিন্তা করে নিয়ে।

কি অসীম প্রচেষ্টায় প্রবল হাশ্র দমন করে বাড়ী ফিরে এলাম, সে আমিই জানি। কিন্তু আরও বেশী অবাক হোলাম শুনে এই পনেরো জন পমিরেনিয়ান রীতিমত ধনী আর অভিজাত বংশীয়। তিনটি বিরাট হলঘর আসবাবপত্র শুল্ক এবং কয়েকটি

ছোট্ট ছোট্ট সাদা চূণকাম করা শোবার ঘর—শয্যা আর শয্যাধার দুই-ই শোচনীয়! একটা কাঠের টেবিল আর দুটি চেয়ার, বাস! ক্যাডেটরা জোর বারো-তেরো বছর বয়সের হবে। টাইট পোষাক, কক্ষ চূল ছোট্ট করে ছাঁটা, বিশ্রী বোকা-বোকা ভাব আর যন্ত্রের মত ভঙ্গী। তাদের শিক্ষকদের তো প্রথমে ভূতাত্ত্বিকীতেই ফেলেছিলাম—পরিচয় পাবার আগে।

পরদিন সোজা লর্ড কেইথের কাছে গিয়ে সবিস্তারে সব জানালাম—আর সবিনয় নিবেদন করলাম আমার অক্ষমতা। লর্ড কেইথ হাসলেন, শুনে আর স্বীকারও করলেন এ কাজ না নেওয়াই ঠিক। তবে বার্লিন ছেড়ে যাবার আগে রাজাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া উচিত, সে উপদেশও দিলেন। উপদেশ মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হোলো। ফিরে এসে যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম। মন তখন স্থিরই করেছি রাশিয়া যাবার জন্তে। মাসিমে জা ব্রাগানাকে চিঠি দিলাম পিটাসবুর্গের ব্যাঙ্কে জানাতে—বাতে আমাকে প্রতি মাসে খরচ চালাবার মত অর্থ দেওয়া হয়। একটি ভৃত্যও জুটে গিয়েছিলো নাম ল্যাঙ্ঘাট। যাবার আগে আবার গেলাম রাজসকাশে—অত্যন্ত পরিচিতির মতই এগিয়ে এলেন রাজা, প্রশ্ন করলেন পিটাসবুর্গ যাত্রা করছি কবে?

—“পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই—যদি অনুমতি করেন”—

—“বেশ বেশ—মঙ্গল হোক—কিন্তু সেখানে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন? তাছাড়া ওখানের রাণীর কাছে কোনো পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়েছেন?”

—“কিছু না, শুধু এক জন ব্যাঙ্কারের কাছে একটি পরিচিতি-পত্র আছে আমার।”

—“ওটাই আসল দরকার। আচ্ছা ফেরার পথে যদি এখান হয়ে যান তবে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, রাশিয়ার খবর শুনবো।” বিদায়!

—“বিদায়!”

দুই শত ডুকাট সঙ্গে নিয়ে বার্লিন থেকে রওনা হোলাম।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

## দৃষ্টিহীন

(John Milton এর On His Blindness)

হায় কেন এই অকালে আঁধার নেমে  
এলো নয়নের মাঝে, বাণীহারী ভাষা,  
প্রতিভার হোলো অপমৃত্যু, এ জনমে  
বা ছিল মোর দেবানীধি। তবুও তো আশা  
জ্বলে রহে বৃক্কে কহিতে কাহিনী আপন  
কবিতার গানে, ভয়ে মরি পাছে মোর

অক্ষমতা জানে দেবতা বিরূপ হন;  
প্রশ্ন করি, “সেবা যদি চাও হে ঈশ্বর,  
দৃষ্টি তবে কেন নিলে হরে?” হেনকালে  
শুনি, ঈশ্বরের আশ্বাস বাণী, “যে রাজার  
আদেশ পরে নিখিল বিশ্ব ছুটে বলে,  
তুচ্ছ সেবা তাঁর কাছে ক্ষুদ্র মানবের।

যে সহ্য নীরবে তাঁর আঘাত বেদনা  
শ্রেষ্ঠ তারি পূজা সার্থক তার সাধনা।”

—অনুবাদ : তপতী চক্রবর্তী



# পথ ও পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৩

শোকের বাড়ী থেকে শব্দেহ অপসারণের পরেও যেমন মৃত্যুর চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে, ঝড়ের পরে গোটা মড়াইয়ের সেই অবস্থা। সমস্ত প্রাকৃতিক স্বাবরতার একেবারে গোড়ায় নাড়া পড়েছে যেন। পাথরে আর গাছপালার মড়াই ছেয়ে গেছে। রাস্তার অবস্থাও তাই। এতদিনে ও-পারের কুলি-বসতির পাকা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যে ক'টা তাঁবু ছিল, মাটি নিয়েছে। তবে লোকজনের খবর কিছু কানে আসেনি। সময়ে নিরাপদ আগ্রয়ে গিয়ে উঠে থাকবে। সাময়িক অবরোধের ও-ধারে মড়াইয়ের লাল জলে গৃহস্থঘরের আটচালা ভাসছে অনেকগুলো। আর গাছের ভাঙা ভাল। মড়াইয়ের গৈরিক-বোবনে যেন কলঙ্গ লেগেছে।

সম্পূর্ণ দিন কেটে গেল রাস্তা পরিষ্কার করে, মড়াইয়ের গহ্বর থেকে পাথর আর গাছপালা সরিয়ে মোটামুটি কাজের ব্যবস্থার ফিরে আসতে। তার পরের দিন বিধাতা যেন কৃপণ হাতে আলোও পাঠালে একটু, মিষ্টি রোদ চিকচিকিয়ে উঠল। সকাল থেকে কাজের ভাড়া লাগল মড়াইয়ে।

তারপরই অপ্রত্যাশিত আলোড়ন আবার একটা। দূর থেকে, ওই দূর থেকে খবরটা কানাকানি হয়ে এদিকে পাগল সর্দারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগল না খুব। কোদাল শাবল গাঁইতি ফেলে পায়ে পায়ে লোক চলল সেদিকে। ওই দূরে, যেদিকে পাহাড় ঘেঁষে মড়াই বেঁকে গেছে সম্পূর্ণ। যেদিকে আকাশে শকুনি উড়ছে অনেকগুলো সেদিকে। কোড়ুল আর চাপা উত্তেজনা। ক্রমশ বাড়তে লাগল সেটা। কাজ শুরু হবার আগেই 'কাজে ছেদ পড়ল আবার।

আর উত্তেজনায় একেবারে বসে পড়েছে পাগল সর্দার। স্বজাতীয়দের অনেকে দৌড়ে এসেছে ওর কাছে। নিজেনের ভাবায় বলাবলি করেছে কি। তারপর আবার ছুটেছে।

আনন্দে গড়াগড়ি করতে ইচ্ছে বাচ্ছে পাগল সর্দারের। ঠিকমত চেনা বাচ্ছে না বলে খটকা লাগছে ওদের মনে? কিন্তু না দেখেও এতটুকু সংশয় নেই পাগল সর্দারের। সে নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারে লোকটা কে। বলে দিতে পারে ঝড়ে পাথর নড়ে কার বিকৃত শব্দ মড়াইয়ে গড়িয়েছে। শব্দ নয় ঠিক, শব্দ হলে সকলে চিনতে পারত।

কঙ্কালে পরিণত হয়েছে প্রায়। কিন্তু পাগল সর্দার ঠিক বুঝেছে। না দেখেও চিনেছে। তোরাও চিনবি। হাতে হীরের আঙটি নেই দুটো? পোষাক-আসাকের চিহ্ন নেই? নীল চশমা? পাহাড়ে উঠে খোঁজ করগে বা, যেখান থেকে গড়িয়েছে ওটা সেই জায়গাটা খুঁজে বার করগে বা—ঠিক মিলবে কিছু, তোরাও চিনবি ঠিক।

এসব খবর বাতাসে ছড়ায়। কনকর্তারাও সবাই গুরুগম্ভীর মুখে চলেছে সেদিকে। এমন কি দোকান ফেলে আজ ভুতুবাবুও নেমে এসেছে। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভুতুবাবু। গোল চোখ স্থির হয়ে আসছে এক একবার। সেই এক সকালে কেন জলে থৈ থৈ করছিল সমস্ত ঘর, এখন আর সেটা বুঝতে না চাইলেও বুঝতে পারছে। যত পারছে ততো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পাগল সর্দার দেখছে সকলকে। বারাই যাচ্ছে ওদিকে, চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের। দেখগে যাও, বেশ ভালো করে দেখে নাওগে যাও। দেখছে আর তার কালো মুখে গলগলিয়ে হাসি উপছে উঠছে।

সামান্যকে দেখে আনন্দে একেবারে যেন অধীর হয়ে উঠল সে।—দিদিয়া! আঁই রে দিদিয়া! উদ্দিন তুকে বলি নাই হোপুন মরদ ছেল? আখুন দেখে লে রে দিদিয়া, আখুন দেখে লে!

স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি। যেটুকু ছড়িয়েছে আতাসে ইন্ধিতে। সামান্যর কানে গেছে, কিন্তু মাথায় ঠিকমত ঢোকেনি যেন। এখনো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল সর্দারের মুখের দিকে। কিন্তু আজ এই প্রথম এত হাসি এত আনন্দের মধ্যেও সর্দারের মূর্তিটা কেমন যেন কুৎসিত ঠেকল ওর চোখে।

পারলে খেই খেই করে নাচত সর্দার। অনর্গল কত কথা বলল, কত কি বলল ঠিক নেই। সবই হোপুনের প্রশস্তি! ও একটু থামলেই সামান্য বাড়ি ফিরবে ভাবছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে আবার একটা বিশেষ উত্তেজনা দেখা গেল লোকজনের ছুটাছুটি আনাগোণায়।

আবার এক চমকপ্রদ চাক্ষুষ। আবার এক হাড়-কাঁপানো খবর।

লোকজন পাহাড়ে উঠেছিল মৃতের চিহ্ন খুঁজতে। বেশি খুঁজতে হয়নি। পেয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ আবিষ্কারে শুরু সকলে।

আর একটা কঙ্কাল। এটা সম্পূর্ণই কঙ্কাল।

কিন্তু পুরুষের নয়। নারীর। রূপোর গয়না আটকে আছে কিছু, পাশেও পড়ে আছে হুঁ-চারখানা।

কখন, কেমন করে বাড়ি ফিরেছে সামান্য খেয়াল নেই। কেমন করেই বা সর্দারকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে এত পথ হেঁটে, জানে না। সর্দার এক সময়ে হাত ধরে টেনেছিল মনে আছে। সর্দার যন্ত্র-চালিতের মত উঠে এসেছিল তাও মনে আছে। তারপর কখন বাড়ি এসেছে হুঁস নেই।

ভিতরের দাঁওয়ায় বসে আছে সর্দার। সামান্য ঘরে। অবনীবাঁবু ক্রমাগত ঘর-বার করছেন। এ অবস্থায় এভাবে দুজনকে রেখে বেরুতেও পারছেন না। মুখে কেউ সোরগোল না করলেও ওই দুটো কঙ্কালের একটিকে মনে মনে সনাক্ত করেছে সবাই। পুরুষকে। কিন্তু দ্বিতীয়টিই সকলের বিভ্রান্তির কারণ। সঠিক বুঝে ওঠনি

কেউ। অবনীবাবুও না। কিন্তু এদের দুজনকে দেখে অম্মান করেছেন। বুঝেছেন।

সামান্য ইচ্ছে হচ্ছিল দেয়ালে মাথা ঠুকে সচেতন করে নিজে। তার যে এখন অনেক ভেবে দেখার আছে, অনেক কিছু বুঝতে বাকি। রোদ উঠলে যেমন কুয়াশা মিলায়, তেমনি সোজামুজি একবার নিজের ভিতরে তাকাতে পারলেই কিছু একটা প্রহেলিকার যেন অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু তাকাতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না। একটা বোবা নিষ্ক্রিয়তা একেবারে গ্রাস করেছে ওকে।

...এই জগ্গেই আসবে বলেও আর আসেনি চাঁদমণি। সেই রাত্রিতেই হয়ত ধরা পড়েছে। মরণ শানাইছিল যে মানুষটা তার হাতেই ধরা পড়েছে। সে দৃশ্য ভাবতে গিয়ে অব্যক্ত বাথায় একলা ঘরে অসুট আর্তনাদ করে উঠল সামান্য। চাঁদমণির সেই পা-ছোঁয়া স্পর্শ সর্বঙ্গে সিঁড়িসিঁড়িয়ে উঠল।...হয়ত কাঁচপোকায় মত টেনে নিয়ে গেছে, বলির পত্তর মত... সামান্য মনে হল, ওর বুকের হাড়গুলো যেন মটমট করে ভাঙছে কে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বাবে কোথায়? দাঁড়ায় পাগল সর্দার। আস্তে আস্তে বসে পড়ল আবার।

...তারপর কঁাদ পেতেছে হোপুন। সেই প্রলোভনের কঁাদে রণবীর বোথকে আটকেছে। পিচ্ছিল প্রলোভনের কঁাদ উপলব্ধি সামান্য। সর্বঙ্গে কঁটা দিয়ে ওঠে আবার। ওই জগ্গেই জিপে সেই লোকটার পাশে দেখা গেছে তাকে। ওই জগ্গেই মড়াইয়ে আর সেই গোরু-চরা পাহাড়ের নির্জনে হোপুন অমন কবে চেয়ে চেয়ে দেখত ওকে। ওই কঁাদ দেখেই তুতুবাবু ওকে সতর্ক করে দিতে এসেছিল। আর পাগল সর্দার ওকে সতর্ক করতে এসেছিল তো হোপুনেরই ইঙ্গিতে...।

ভিতরে ভিতরে সর্বক'টা উপলব্ধির তার যেন একসঙ্গে সজাগ করে তুলতে চাইল সামান্য। ব্যাকুল আকৃতি।...ওই পামণ-মূর্তি লোকটার নির্মম নৃশংসতাই বড়, না আর কিছু বড়?

চমকে উঠল একেবারে। ঘরের চৌকাসে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি-বিনিময় হতে বলল, আখুন যাইরে দিদিয়া...।

সামান্য অবাক। যেন ছুটো গল্পগুজব করতে এসেছিল, শুধু-হুথের কথা কইতে এসেছিল—বেলা পড়ে আসছে দেখে এখন চলল। সামান্য মাথা নেড়েছিল কি না নিজেই জানে না।

বাইরে এসে মেন কোয়ার্টারস-এর রাস্তা ধরল পাগল সর্দার। কলের পুতুলের মত এগিয়ে চলল সে। মেন কোয়ার্টারস-এর ভিতর দিয়ে, গেট হাউসের পাশ দিয়ে একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়াল। পায়ের নিচে মড়াই। বাঁয়ে শুকনো খটখটে। যেদিকে ডায়াম বাঁধা হচ্ছে। ডাইনে মাটির সেই সাময়িক প্রতিরোধ।

অন্তমনস্তের মত হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে গেল সেটা। আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে থামল একজায়গায়। এখানেও পায়ের নিচে অতলাস্ত মড়াই। কিন্তু এখানে মড়াইভরা জল। লাল জল। লাল বোঁবন। উচ্ছল, কলকল। একাগ্র মনোযোগে পাহাড়বেঁবা ওপারের দিকে দেখতে লাগল পাগল সর্দার।

...কোন জায়গাটা হবে? তখন তো মড়াইয়ে জল ছিল না এককোঁটা। আর কত বছরের কত কালের কথা সেটা।

কিন্তু কোনখানটায় হবে?

কোনখানটায় আজও ঘুমিয়ে আছে চাঁদমণির মা ফুলমণি?

ওই খানটায়?...নাকি ওই খানটায়?

জলের নিচে ঠাণ্ডা করা শক্ত। জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, তার নিচে...

মস্ত শিকারী ছিল পাগল সর্দার। এমন শিকারী হয় না নাকি। কিন্তু শিকার করা ছেড়ে দিল কেন? সকলের বিস্ময়।

ছাড়বে নাই বা কেন। বড় শিকারের পরে ছোট শিকারে হাত ওঠে না মন ওঠে? শেষ যে শিকার করেছে পাগল সর্দার...বাঘ ভালুকও তুচ্ছ। তার পর শিকার ছাড়বে না তো কি!

পাহাড়ীরা ছিল ওদের জাতশত্রু। পাহাড়ের ডগায় থাকত। কীক পোলে এসে লুণ্ঠরাজ্য করে যেত। ওদেরই কাউকে মনে ধরেছিল ফুলমণির! এদেরই কারো সঙ্গে 'ছাত্তই' হয়ে চলে গিয়েছিল! সর্দার তো বনে জঙ্গলে শিকার নিয়ে থাকত বছরের বেশির ভাগ সময়। সে শিকার জলো ঠেকল এর পর। শিকারীরা ধৈর্যের পাহাড় না কি। মিথ্যে নয় বোধ হয়। প্রায় এক বছর ধৈর্য ধরে ছিল পাগল সর্দার, নিবিড় প্রতীকারে স্তব্ধ হয়ে ছিল। শিকার আসবে জানত। বনের হরিণ যোপে ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কতক্ষণ? তার স্বভাবই তাকে টেনে আনে। ফুলমণিই বা পাহাড়ে পাহাড়ে নেচে বেড়ানো ভুলে থাকবে ক'দিন? তার স্বভাবও তাকে টেনে আনবে।

এনেছিল।

বছরের বড় শিকারের উৎসবে বেরিয়েছিল সাঁওতালরা। পাঁচ দিনের দেশময় শিকারোৎসব। ছেলে বুড়ো বোঁটের বোঁটার 'হু-হু' নাগরা পিটিয়ে, 'শরং শরং' বাঁশি ফুঁকে আর 'তুতু' 'তুতু' শাকোয়া বাজিয়ে। কাছে দূরে কে আর না টের পায় ওদের এই শিকার অভিযান। পাঁচ দিন আর কোনো মরদ পুরুষের টিকি দেখা বাবে না দেশে গাঁয়ে।

কিন্তু পাগল সর্দার বায়নি।

...সেও বড় শিকারেরই প্রতীক্ষা করছিল।

সুখী-ডোবা আবছা আলোয় শিকার সেদিন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই ছোট খাড়া পাহাড়টার ডগায়।

এত মন দিয়ে আর কখনো তাঁর ছোঁড়েনি বোধ হয় পাগল সর্দার।

বাণবিন্দু পাখি যেমন উটে পাটে শূন্য থেকে নেমে আসে মাটির দিকে, ওর শিকারও তেমনি লপটে ঝপটে নেমে আসছিল নিচের দিকে। সবটা আসেনি, কাছেই একটা পাথরে আটকে গিয়েছিল। ক্ষিপ্ৰচরণে সর্দার গিয়ে তুলে নিয়েছিল তাকে। শিকার একবার মাত্র চোখ মেলে দেখেছিল তার নির্মম শিকারীকে, তারপর পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছিল। অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপনে বুক করে শিকার নিয়ে নেমে এসেছিল সর্দার। তারপর...

তারপর, ওই জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, আর তার নিচে...

নরেনকে দেখা মাত্র সামান্য ভিতরের গুমোট অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে ওঠার পথ পেল যেন। এক পলক দেখে নিয়ে আলতো প্রশ্ন করল, কবে এলেন?

নরেন অবাক। কবে এলাম কি রকম?

নির্লিপ্ত মুখে সাধনা আবার তাকালো তার দিকে। আপনি কি এখানেই ছিলেন নাকি এ ক'দিন?

জবাব না দিয়ে নরেন হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আরো অবাক সে। এ ঠিক ঠাট্টাও নয়, অনুযোগও নয়। নিরুত্তাপ অভিমানের স্বাক্ষর একটু।

বাদল গাঙ্গুলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যার নরেন এসেছিল। আশা করেছিল, চিক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সাধনা ভুলবে। কিন্তু সাধনা তার দার দিয়েও যায়নি। পরদিনও না। অথচ হোপুনের দুর্ঘটনার পরের সে খমখমে মুখভাব আর ছিল না। বরং খুশিতে উপছে উঠতে দেখেছিল অনেকবার। বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের প্রসঙ্গ সাধনা আগেও সন্তর্পণে পরিহার করেছে। অথচ ভিতরের একটা চাপা আনন্দ চাপতে পারেনি। তাছাড়া আরো অনেক কিছু উপলব্ধি করার ঘটছে অনেকবার। বিশেষ করে মাসির বাড়ি যাওয়ার আগে সেই বিকেলে নরেনের হালকা ইঙ্গিতে অপ্রতিভ লালিমায় ধড়মড়িয়ে উঠে রান্নাঘরে পালানো।

এবারেও সাধনা বলেনি কিছু, বাদল গাঙ্গুলি বলেছে। বলেছে, সাধনার সে কি রাগ তার ওপর। আর রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার নাকি। বাদল গাঙ্গুলির বলার মধ্যেও চিরাচরিত নিষ্পৃহতার অভাবটুকু নরেন লক্ষ্য করেছিল বই কি। মনে হয়েছিল, সেই রাগ আর লজ্জা চিক ইঞ্জিনিয়ারের মরু-রুক্ষ জীবনে ঠাণ্ডা প্রলেপের কাজ করেছে।

তারপর গত চার পাঁচদিন আর আসেনি নরেন। ঝড়, জল—মড়াইয়ে বিপর্যয়ও কম ঘটেনি ক'টা দিনের মধ্যে। আজও শুধু জল হয়নি সকাশ থেকে। তবু আসবে ভাবেনি। কিন্তু বিকেল হতে পারে পারে চলে এসেছে কেমন।

আগে হলে এটুকু অভিমানই দখিন বাতাসের স্পর্শ বলে মনে হত। কিন্তু এ প্রশ্নের যাতনা বিবম। এবারে নরেন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাচ্ছে। দাওয়ার ওপর মোড়ার বসে পড়ে বলল, এ ক'দিন দু'মিয়ে কাটালে নাকি, আকাশের অবস্থা দেখানি?

হুঁ-চার মুহূর্ত অপেক্ষা করে সাধনা আকাশের অবস্থাটা তার মুখ থেকেই আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল যেন। তারপর ঘরে চলে এলো। আধময়লা শাড়ীটা বদলে নিল। আয়নার মাথা আঁচড়ে নিল একটু।

নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় সাধনা। নিঃশেষে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ওই ঝড়টা যেন ওরই বুকের উপর এক অনড় বোকা চাপিয়ে দিয়ে গেল। কি বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘটে যাচ্ছে। হুঃসহ লাগে। ও ভুলতে চায় ওই ঝড়ের কথা। চান্দমন্দির কথা, হোপুনের কথা, পাগল সর্দারের কথা... ওই মানুষদের জীবনের ব্যর্থতা ওকে বুঝি গ্রাস করতে আসছে।

নিজেকে ভুলতে চায়। মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর জীবনে যে নতুন জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারেই আবার ভাসতে চায় সাধনা। বেরিয়ে আসতে চায় এই স্তব্ধতার আবরণ ভেঙে। চেষ্টাও করছে। চেষ্টা করছে সহজ হতে, সহজ হতে।

নরেনের কথা ওর সত্যিই মনে হয়েছে এ ক'দিন। মনে হয়েছে,

ওই লোকটাই পারে এই অসহ গুমোট খান্ খান্ করে ভেঙে দিতে। বিকেলে জল-বুড়ি সবেও প্রতীক্ষা করেছে।

ফিরে এসে বলল, চলুন আর বসতে হবে না, যে বিদ্যুট ছিঁরি আকাশের, এফুনি হয়ত আবার ঝমঝম শুরু হবে।

একটু দেখে নিয়ে নরেন বলল, বেরোলে পরে যদি শুরু হয়?

হয় হবে, আপনাকে আর সে গবেষণা করতে হবে না, চলুন।

বেরিয়ে সেই পিছন দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরল সাধনা।

—এদিকে কোথায়?

—ঘরের বাড়ি। ফিরে তাকালো, ভয় করছে?

ওর দিকে চেয়েই নরেনের আজ হঠাৎ কেমন মনে হল, যে অবকাশের প্রতীক্ষা করছিল এতদিন, আজ সেটা আসবে। যে কথাটা বলি বলি করেছে বলা হয়নি এতদিন, সেটা আজ বলা হবে। এ সংশয়ের থেকে সে অনেক ভালো। জবাব দিল, না তুমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি।

ভালো লাগছে সাধনার। ভালো না লাগিয়ে ছাড়বে না। সেই জোয়ার জীবনে ফিরে যাবে সন্দেহবন্ধ। সাধনা হেসে উঠল। ওই হাসি দিয়ে গোটা পাহাড়ের ওপর থেকে কালো মেঘের কালো ছায়াটা পর্যন্ত দূর করে দেবে যেন। বলল, ভয় না তো কি, এ ক'দিন আসেননি কেন? কি যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার হল একটার পর একটা, দুটো কথা বলারও লোক পাইনে।

—খবর দাওনি কেন? নরেন নিষ্পৃহ।

—এতদিন কোন্‌ গবরটা দিতে হয়েছে মশাই আপনাকে?

—জল-বুড়ি মাথায় করে যাই বলে তুমিই তো কতদিন কত খোঁচা দিয়েছ।

সাধনা বলতে যাচ্ছিল, খোঁচা গেয়েও তো আসতেন। বলল না। এবারের এই না আসার হেতুও কেমন করে যেন উপলব্ধি করেছে। সাধনা আপস করতে চায়। কিন্তু সোজা রাস্তায় নয়। নিজেকে সজাগ করে। বলল, খোঁচা না ছাই, আসলে আপনি আজকাল আর আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

নরেনের ভিতরে প্রশ্নের সাদা জাগছে আবার একটা। সংশয়ের পদাট্টা যেন পাতলা হয়ে আসছে। পাশাপাশি চলার একটা স্পর্শ লাগছে কোথায়। তবু এই সেই প্রতীক্ষিত অবকাশ কি না বুঝে উঠল না। জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল সেও।

—থাক, আর হাসতে হবে না, যে ভাবে ইটছেন এখানেই সজ্জা।

—এটা কি ইটার মত রাস্তা, ঠোঁকর খেতে খেতে গ্রাণ গেল।

সাধনা হেসে ফেলল, এখনো ঠোঁকর খাওয়া অভ্যাস হয়নি? কিন্তু জবাব শোনার আগে চট করে সামলে নিল।—সত্যি বা হয়েছে রাস্তাঘাটের অবস্থা, এক ঝড়ে সব কাত।

পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে নরেন চলেছে। মন বলছে, সময় আসেনি, আসবে। অবকাশ আসেনি, আসবে। আজই আসবে। ধমনীতে একটা উক শ্রোত বইছে ওর। জোর করেই চেষ্টা করল সহজ হতে। বলল, শুধু ঝড় কেন, এই বুড়ীটাও কম ভয়ের নাকি! কোথায় কোথায় বজা হয়েছে খবর এসেছে—এরকম হলে তো হয়েছে আর কি। আপিসে, সারাক্ষণ এই কথা আর এই ভাবনা।

সান্দ্রনা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে তাকালো। এতক্ষণের চেষ্টার মড়াইয়ের উপর থেকে যে অব্যাহিত ছায়াটা সরিয়ে রেখেছিল সেটা যেন বিগুণ হয়ে উঠল আবার। আর সেই পাখা-ভারও। বলে উঠল, চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে তাই ভাবুন গো, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, যান।

হনু হনু করে দু'চার পা' এগিয়ে গেল সে। নরেন প্রথমে অবাক, পরে খুশি। কাছে এসে বলল, তোমার সঙ্গে এলে কি আলোচনা করতে হবে শুনি?

—কোন আলোচনা নয়। শুধু বড় বড় পা ফেলতে হবে আর হাসতে হবে। হাসার নমুনা ওর মুখেই বরল প্রথম।

নরেনের আপত্তি নেই। চলার গতি বাড়ল। দিনের আলো ঘন কালো হয়ে আসছে আরো। কোন দিকে বা কোন পথে চলেছে কারোই হুঁস নেই। কথা অনর্গল সান্দ্রনাই বলছে। আবোল তাবোল কথা। হাসছেও খুব। নরেনেরও হাসার ভূমিকা। কিন্তু কেমন যেন লাগছে। ওকে দেখে আজ হঠাৎ বরনার কথা মনে পড়ছে। কোথায় যেন মিল। থেকে থেকে অন্তর্দৃষ্টি একটা। ওই নারীচাপল্য আর প্রশ্রয় ঠিক তার উদ্দেশ্যে নয়, সে উপলক্ষ্য মাত্র। বরনাও বাইরে থেকে কত জনকে অমন প্রশ্রয় দিয়েছিল। হাসার ভূমিকা নরেনের, কিন্তু হাসি তেমন আসছে না।

সান্দ্রনা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। সামনেই বাকের মুখে সেই বিশাল পাথরের আড়াল। তার ওপাশে বড় পাছ ভেঙে পড়ে আছে একটা। একান্ত নির্জনে এই আড়ালের ওধারে একদিন দেখেছিল দুজনকে। চাঁদমণি আর হোপুনকে। সর্বত্র সিঁড়ি সিঁড়ি করে উঠল কেমন ১০০-অমোঘ আকর্ষণ একটা।

আড়াল পেরিয়ে সেই চাঁদু পাথর। যেখানে ওয়া বসেছিল। বসে আর ছিল কোথায়। চাঁদমণি শুয়েই ছিল প্রায়। আর এর মুখের ওপর, বকের ওপর ঝুঁকেছিল হোপুন। অনেকদিনের একটা বিশ্বস্তবিলগ্ন অস্বস্তি ভিতর থেকে যেন নড়ে চড়ে উঠছে আবার। যেমন উঠেছিল এখানে চাঁদমণি আর হোপুনকে দেখে। যেমন উঠেছিল প্রথম সন্ধ্যায় বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পর রাতের বিনোদন শয্যায়। পাথরটা যেন ইশারায় ডাকছে ওকে। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে না পারার যাতনা বুঝি ওখানে গিয়ে বসলে কমবে একটু। অজ্ঞাত অনড় বোঝাটা হালকা হবে।

পাশের লোকটা যে নির্নিমেমে লক্ষ্য করছে তাকে সে খেয়ালও ছিল না বোধ হয়। লজ্জা পেল, হেসেও উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে থমকেও গেল একটু। চাঁদমণির উজ্জ্বল হাসির মত লাগল যেন নিজের হাসিটা। লাগুক, ও আর পরোয়া করে না। বলল, দেখবেন কি, আর হাঁটে না, চলুন ওই পাথরটার গিয়ে বসি একটু।

চপল পায়ে গিয়ে পাথরটার উপর বসে পড়ল ধূপ করে। চূপচাপ নারীমুখের বর্ণছটা দেখছিল নরেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেও। প্রায় মোহগ্রস্তের মত। বসল পাশে।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে সান্দ্রনা তাকালো একবার। এত কাছে ঘেঁষে বসার মত ছোট নয় পাথরটা। বসেছে তো বসেছে, সান্দ্রনা বেপরোয়া। বলল, কি হল এমন চূপচাপ যে? জায়গাটা বেশ না?

উজ্জ্বল মুখে চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটা বেশ তাই যেন উপলব্ধি করতে লাগল সে। কিন্তু মনে পড়ছে অল্প কথা। প্রথম সন্ধ্যায় সাঁওতালদের বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পথে এর থেকে আরো বড় পাথরে বসেও সেটা বড় মনে হয়নি খুব। আর ওকে নীরব দেখে এই ভ্রমলোকই সেদিন বলেছিলেন, অমন চূপচাপ কেন।

অস্বস্তি আজও। কিন্তু সেদিনের মত অত ভীক অস্বস্তি নয়। নেশার মত। ভ্রমলোক চেয়ে আছে নিম্পলক, উপলব্ধি করেই সান্দ্রনা অল্প দিকে ঘাড় ফেরালো আরো। পড়ো গাছটার দিকে চেয়ে অসুট কণ্ঠে হেসে উঠল, বেচারী গাছটার অবস্থা দেখুন একবার।

তারপর সর্বাঙ্গে শিহরণ একটা।

এক হাত ওর পিঠে, অল্প হাত দিয়ে তার মুখখানি সম্পূর্ণ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল নরেন।

চোখে চোখে, চোখের তারায় তারায় বিনিময়।

বিদ্যুতস্পর্শের মত।

নিমেষে নেশার ঘোর কেটে গেল যেন সান্দ্রনার। চপলতার চিহ্ন মুছে যেতে লাগল। শুকনো খরখরে লাগছে জিবের ডগা, ঠোঁট। সামলে নিয়ে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। নড়েচড়ে সরে বসতে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সবল আকর্ষণে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার বকের ওপর। মুহূর্তের অবকাশ পেল না। দুই ঠোঁট বিনীর্ণ হতে লাগল থেকে থেকে; ঘন, উক, নির্ভম। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অথরের বাধা। দাঁতে লাগছে, জিবে লাগছে।

বাধা দেবে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাইছে বাধা দিতে। কিন্তু সর্বত্র অবশ। ওর হাড়গোড় শুক্কু মটমট কার ভাঙবে নাকি মানুষটা! নিবিড় যাতনা। জামুতে, কটিদেশে, স্তনভারে। দেহ-দেহলীতে ভাঙনের তাণ্ডব। আর পারছে না সান্দ্রনা। বাধা দিতে পারছে না। স্পর্শ-বিহ্বলভায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে ১০০ ঘূমের মত লাগছে। শিথিল হয়ে আসছে সব কিছু। সান্দ্রনা হাল ছেড়ে দিল। এলিয়ে পড়ল। সেই যাতনার মধ্যেও কতকালের, কত যুগের একটা জমাট-বাধা শিশল অবসোধ বুঝি বাষ্প হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অস্তিম বিশ্বস্তির মুহূর্তে আবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল যেন। পাথরচ্যুত হয়ে নরেন মাটিতে বসে পড়ল। সান্দ্রনা বসে পড়ল। সান্দ্রনা উঠে বসল। দাঁড়াল। পা কাঁপছে খরখর। বকের ভিতরে যেন হাতুড়ী পিটছে ঠক ঠক করে। বাতাস নেই। বিশ্রান্ত বেশবাস ঠিক করে নিল। বিস্ফারিত দুই চোখ নরেনের মুখের ওপর। লজ্জা নয়, ভয় নয়, ঘৃণা নয়। রাজ্যের বিময় আর বিভ্রম।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে চলল। পিছনে ফিরে তাকালো না একবারও। তবু উপলব্ধি করল মানুষটা আসছে পিছনে পিছনে! পাঁচ সাত মিনিটের পথ আর। কিন্তু আর ফুরায় না যেন।

শোনো—

পা খেয়ে গেল। থামতে চায়নি তবু নরেন কাছে এসে দাঁড়াল। ধীর, স্থির। বলল, তোমার বাবার সঙ্গে আমি দুই একদিনের মধ্যেই দেখা করব।



দুই চোখে এক বলক আঙন ছড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল সাধনা।

নরেন দাঁড়িয়ে রইল।

সোজা নিজের ঘরে এসে একেবারে শয্যা নিল সাধনা। বাবা বাড়ি নেই। কিন্তু আসবে তো। কি করে মুখ দেখাবে সাধনা। সামনে গিয়ে দাঁড়ানে কেমন করে। রাগে আঙন হয়ে উঠতে চাইছে মানুষটার ওপর। পারছে না বলেই রাগ বাড়ছে, বাতনা বাড়ছে, অস্বস্তি বাড়ছে। উঠে মুখ হাতে জল দিতে গিয়ে একেবারে স্বান করে এলো। কিন্তু গা জুড়ায় না তবু। সেই স্পর্শ-বিহীনতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

বাবা ফিরছে টের পেল এক সময়। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না কিছু। বতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে কাটিয়ে বাতের মত নিশ্চিন্ত হল সাধনা। আরু আর চোখে পাতায় এক করতে পারবে না ভানা কথাই। না পারুক। অনেক বিচার বিবেচনা বাকি। মানুষটার এমন দুঃসাহসের দক্ষন নিজেকে উত্তেজিত করে তোলাই বাকি। কিন্তু একা ঘরে ঠোঁটের জ্বলুনি উপলব্ধি করছে আবার। বিশ্বাসের সেই নির্মম স্পর্শগুলো গ্রাস করতে আসছে আবার। আঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। হঠাৎ কান খাড়া করে নিজের বুকের স্পন্দন শুনে লাগল যেন সাধনা। কিছু একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করতে লাগল। দেহের অন্তস্তলে সেই ভাঙনের সমারোহ মনে পড়তে লাগল। যত ভাবছিল তত যেন ভরেও উঠছিল।

বাবার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সাধনা। দু চোখ বগড়ে নিয়ে দেখল, দিকি বেলা। সাধনা অবাক। কখন ঘুমালো! এমন বিচ্ছিন্ন বন শিগগীর ঘুমিয়েছে বলেও মনে পড়ে না।

কাজের কঁাকে কঁাকে ঘরে-বিরে সেই এক কথাই ভাবছে। বিগত দিনের কথা। ওই একটা দিনের সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খারাপ লাগছে না, বরং হাস্য লাগছে অনেক।

বিশ্বাসের মুহূর্তে ঘম ভেঙে জেগে উঠেছিল। না উঠলে...?

অক্ষুট শব্দ নির্গত হল একটা মুখ দিয়ে। উত্তন থেকে তেলের কড়া নামিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। ফুটন্ত তেলের ছিটায় হাতের কব্জিতে ফোকা পড়ে গেছে। দেখল। বিবেকের জ্বলন্ত ছিটায় অমনি করে দাহ করতে চাইল একজনকে। ভাবতে চেষ্টা করল, ওর অন্তস্তলের এক সংগোপন আশা দম্মার মত উপড়ে ফেলতে চেয়েছে লোকটা। ওর জীবনে আর এক বাস্তবিকতার পরস্কার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। আর একজনের প্রাণা ভাঙারের দিকে হাত বাড়িয়েছে নিরঞ্জন মত।

কিন্তু তবু চোখের সামনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে বড় করে তোলার চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে থেকে থেকে। সেই নিরঞ্জান মানুষটাই তাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বার বার। আর সাধনা রাগ করতে পারছে না বলেই অবাক হচ্ছে। ভালো লাগছে বলেই জলে উঠতে চাইছে। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই অস্বস্তি। নিজের অন্তস্তলে দৃষ্টি ঢালাল সম্ভরণে।

ওর প্রশ্নের আমন্ত্রণ ছিল? আহ্বান ছিল? সরোবে বলে উঠতে চাইল, না, কখনো না!

কিন্তু সমর্থন আসছে না। উন্টে যেন ব্যঙ্গ করছে কেউ, না কি! এতকালের যে জমাটবাঁধা অবরোধ হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এখনো, সে তবে কি? আর তার প্রতি মোহ আছে কোনো? মায়া আছে কিছু?

এত বড় এক বিপর্যয়ের উপলক্ষ যে মানুষ, জীবনে আর তাকে মুখও দেখাবে না বোধ হয়। কিন্তু বাবার কাছে আসবে বলেছিল লোকটা। তিন-চার দিন কেটে গেল। আসে নি। সাধনার জ্বলন্ত চোখে সেদিন এ প্রশ্নাবের জবাব লেখা ছিল বলেই আসে নি বোধ হয়। ঠিক আশাও করছে না। আশুক, না আশুক বলে গেল। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কি একটা অসহিষ্ণুতা চাড়িয়ে উঠছে যেন। উচ্ছ্বাস বাড়ছে। রাগতে পারছিল না, কিন্তু এখন কারণে-অকারণে মেজাজ চড়ছে।

ওর এ ক'দিনের হাবভাব অবনীবাবুর লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু সম্প্রতি চাকরীর ব্যস্ততায় সিঁড়িত তিনি। তিনি কেন, সকলেই। এক্সপার্ট কমিটি এসে গেল বলে। এদিকে আকাশ আর বুড়ির যা অবস্থা, বাইরের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কমিটির সব পরিদর্শন আপিসের ফাইলপত্র খঁটাবাটির মধ্যেই শেব হবে বোধ হয়। অতএব হিসেব-নিকেশ জরুরী-করুরী নথিপত্র সব রেডি রাখো, গোছগাছ করো, আপিস সাজাও। এ ছাড়াও উপরগুলাদের হাবভাব চালচলনে এই কমিটিকে কেন্দ্র করে কেমন একটা শঙ্কার ছায়া নেমেছে। কমিটি এলে প্রতিকূল কিছু ঘটতে পারে যেন। কি, সে আভাস স্পষ্ট নয় কারো কাছে।

অবনীবাবু এই নিয়েই ব্যস্ত ক'টা দিন। সাধনার সঙ্গে যত কথা হয়েছে, তার বেশির ভাগই এই কথা। সাধনা শুনেছে কি শোনেনি, তাও খেয়াল করেন নি। তবু সেদিন কি মনে হল তাঁর। বললেন, নরেন আসেনি এর মধ্যে? আপিসেও দেখিনে বড় একটা... জবাবে যথাসম্ভব নিস্পাহ মুখে সাধনা ঠোট গুটালো শুধু। অর্থাৎ কে জানে, খবর রাখিনে।

একটু খটকা লাগল বোধ হয়। অবনীবাবু খেয়াল করে মেয়ের দিকে তাকালেন এবার। হেসেই বললেন, কি রে, আবার ঝগড়াঝাটি করেছিস বুঝি?

ক্রোধ করে হাসতে হল সাধনাকেও। দিকি পারে এসব এখন। পান্টা অমুযোগে আসল জবাব এড়িয়ে গেল। বলল, তুমি তো দিন-রাত কচি মেয়ের মত ঝগড়া করতেই দেখো আমাকে।

সেদিনই নিজের উত্তোকে নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন অবনীবাবু। ভড়কে গিয়েছিলেন প্রথম। এমন ধীর শাস্ত ওকে আর দেখেননি কখনো। কিন্তু দুই এক কথার পরেই শুনলেন যা, তাতে পারিবারিক প্রসঙ্গ বিবৃত হলেন। ভাবলেন, ওর মুখের এই অবস্থা যখন, রীতিমত হুশিয়ার কারণ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেন চৌধুরী এক্সপার্ট কমিটির প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে আড়াল করেছে।

বাড়ি ফিরেই সাধনাকে বললেন সব। বললেন, এক্সপার্ট কমিটি যে আসছে তার চেয়ারম্যান হলেন বিপুল বাড়রী নামে এক ভদ্রলোক। মন্ত ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত এক ফার্ম-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বাদল গাঙ্গুলি সেখানেই চাকরী করত আগে, এর সঙ্গেই একটা ভরানক গোলযোগের ফলে চাকরী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে।

এত না বললেও চলত, শুধু নাম শুনেই চিন্তা সাধনা।  
বৃথতও। এ ক'দিন বাবার দুশ্চিন্তা দেখেও দেখেনি, বা তার কোনো  
কথা শুনেও শোনেনি। কিন্তু আজকের খবরটা শোনা মাত্র নড়ে চড়ে  
সজাগ হয়ে উঠল। নিজের ভাবনা চিন্তা তলিয়ে গেল সব। আরো  
কিছু শোনার আশায় জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

অবনীবাবু বসে গেলেন, এই জন্তেই ক'দিন ধরে এরকম অবস্থা  
দেখছি অপিসের। নরেন বলল, মতের এতটুকু নড়চড় হলে এখান  
থেকেও সোজা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বসতে পারে বাদল গাঙ্গুলি।  
এমন অদ্ভুত কথা তো আমি শুনি নি কখনো।

এতটা বরদাস্ত হল না সাহুন্যের। বাঁধিয়ে উঠল প্রায়, নরেনবাবুর  
সব্বতাই বাড়াবাড়ি, আমি বলে রাখছি কিছু হবে না—এত সহজে  
যদি সব ভেঙে যেত, দুনিয়ায় তাহলে আর বড় কাজ কিছু হত না।

উত্তেজনায় নিজের ঘরে চলে এলো। কিন্তু উতলা সেও কম  
হয়নি। যা বলে এলো বাবাকে, সেটা তার মনের কথা, আশার  
কথা। কিন্তু শুধু এরই ওপর ভরসা করে সত্যি নিশ্চিন্ত থাকা সহজ  
নয়! নরেনবাবু যা বলেছে, বাবা সেটাকে অদ্ভুত ভেবে অবাক হতে  
পারেন, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটবে অসম্ভব নয় সে শুধু সাহুন্যই  
জানে। যে নাম শুনল, তাঁর সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথা মাত্র  
আপসেরও কোন সম্ভাবনা নেই। ছটকটানি বেড়েই চলল। ইচ্ছে  
হল, এক্ষুনি নরেনবাবুকে ডেকে পাঠায় একবার। কিন্তু সেও  
কোনদিন সম্ভব নয় তার।

আর কোনদিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা থাকলে নরেনের  
পরিবর্তন চোখে পড়ত বাদল গাঙ্গুলির। হেড অপিস থেকে এক্সপার্ট  
কমিটির নামগুলো আসার পর কথাবার্তা দু'চারটে শুধু তার সঙ্গেই  
বলেছে, একটু আধটু পরামর্শও করেছে। কিন্তু মুখের দিকে ভালো  
করে তাকায়নি বোধ হয়।

বাদল গাঙ্গুলির ভিতরে ভিতরে বিষম এক মর্মান্দার লড়াই চলেছে  
স্বাধীন ১০০ এরকম হতে পারে একবারও ভাবেনি। কিন্তু ভাবেনি  
কেন সেটাই আশ্চর্য। বেসরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশিষ্ট কমিটিতে  
বিপুল বাড়রীর আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয়। নেশান বিল্ডার্স-এ থাকতে  
এরকম অনেক কমিটিতে তাঁকে বোগ দিতে দেখেছে।

ভিতরে বাই হোক, বাইরে শান্ত মুখেই প্রতীক্ষা করতে লাগল  
সে। অভ্যর্থনার ভার পড়ল অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর।  
গেট হাউসে থাকবেন তাঁরা। মিটিংয়ের ব্যবস্থাও সেখানকার বড়  
হল-এ হতে পারে। যেমন ইচ্ছে তাঁদের।

যখা দিনে তাঁরা এলেন। বিকেলে নিজের কোয়ার্টার্স-এ এসেই  
বাদল গাঙ্গুলি খবর পেল। অঝোরে জল পড়ছে তখন। এই প্রথম  
বোধ করি জলের ওপর খুশি হল সে। নরেনকে আগেই বলে রেখেছে,  
ডাম পরিদর্শন করানোর ভার তার। একটা গাড়িও মজুত আছে  
তাঁদের জন্য। কিন্তু আজ আর কেউ বাইরে বেরবেন না বোধ হয়।

বসে আছে চুপচাপ। ভিতরে শুকিয়ে আসা ক্ষতর মুখে নতুন  
জ্বালা একটা। বোম-চাকলাদার ফার্মের ওপর আর রাগ নেই একটুও।  
যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। তা ছাড়া অপকর্মের আসল নারক যে তার  
পরিণতি তো স্বচক্ষে দেখেছে। মৃতের পরে অভিযোগ বড় থাকে না  
কারো। তারও নেই। যদিও রণবীর ঘোষের মৃত্যু বিধিবদ্ধ সমর্থন

পায়নি এখনো। অনেকটাই চাপাচাপির মধ্যে আছে, তাবলে  
মড়াইয়ে জানতে বাকি নেই কারো। কিন্তু বোমাপড়া এখন  
আর বোম-চাকলাদার ফার্মের সঙ্গে নয়। বোমাপড়া এক্সপার্ট কমিটির  
সঙ্গে—বিপুল বাড়রীর সঙ্গে। একবার তার বিচার করেছিলেন  
ভদ্রলোক। আবারও তাই করতে এসেছেন বোধ হয়। কমিটির  
আর পাঁচজনও হয়ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সাথ দেবেন। কিন্তু এবারে  
আব সে বিচারের কোন আভাসও বরদাস্ত করবে না।

পরদিনও সকাল থেকেই মাঝে মাঝে জল হচ্ছে, মাঝে মাঝে  
খামছে। এরই মধ্যেই সদলে ডাম পরিদর্শনে বেরলেন কমিটি।  
দেখার আনন্দেই তাঁরা দেখলেন সবকিছু। কখনো সর্কোভুকে  
জানতে চাইলেন এটা সেটা, কখনো বা সপ্রশংস উচ্চাঙ্গ জ্ঞাপন  
করলেন। নরেনের সঙ্গে বারকতক দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে বিপুল  
বাড়রীর। সপ্রতিভ বিনয়ে নরেন ডাম সংক্রান্ত আলোচনাও  
করেছে একটু আধটু। কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের আভাসও ব্যক্ত হয়নি।

বিকেলের দিকে যথানির্দিষ্ট মিটিং বসল গেট হাউস-এ।

বাদল গাঙ্গুলি এলো।

নরেন চোখেরী এমন কি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারও এই যেন  
যথার্থ ইঞ্জিনিয়ারের মতিতে দেখল তাকে। সচেতন। মৃদুগম্ভীর।  
...প্রায় দাম্ভিক।

বিপুল বাড়রী বাদে বাকি সকলেই সকলরবে আপায়ন করলেন।  
নরেন পর্যন্ত আশা করেছিল, অমুপস্থিতির দরুণ সৌজন্যমূলক কিছু  
একটা বলবে। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার ধার দিয়েও গেল না।  
হেসে পাণ্টা অভিবাদন জ্ঞাপন করল সকলের উদ্দেশ্যে। তারপর  
তাকালো চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রীর দিকে।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন বিপুল বাড়রী।  
কংগ্রাচ্যুলাশোনস!

হুই এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। হাত মিলাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।  
থাক ইউ।

চেয়ার টেনে বসল তারপর। সদস্যদের কৌনরকম অনুরোধ  
হচ্ছে কি না খোঁজ নিল। অতি বর্ধার প্রসঙ্গ উঠল। ডাম  
কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করল।

সকলেই প্রশংসা করলেন আর একদফা। বিপুল বাড়রী চুপচাপ  
পাইপ টানতে লাগলেন। বিশেষ ফাইলপত্র সব হাতের কাছে  
এনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও গেলেন না  
কেউ। মুখে মুখে আলোচনা চলল, কি হচ্ছে, কি হবে, আরো কি  
হতে পারে।

সবশেষে বোম-চাকলাদারের সিমেন্ট প্রশংসা। মনে মনে প্রস্তুত  
হয়ে নিল বাদল গাঙ্গুলি। সংক্ষেপে ঘটনা ব্যক্ত করে জানানো, ওই  
ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

কথা উঠল এই নিয়ে। কিন্তু সেরকম ভেবেছিল সেরকম নয়।  
ঘরোয়া আলোচনার মত। সদস্যদের কেউ কেউ বললেন, এতবড়  
কাজে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি।  
এতদিনে ওই ফার্মের ক্ষতি যথেষ্টই হয়েছে। এতবড় ফার্ম, এর  
আগে আর যখন কোনো অভিযোগ নেই, একেবারে বরখাস্ত না  
করে এবারের মত ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।  
বিশেষ করে, এতে কর্তৃকর্তাদেরও কিছুটা গলদ আছে যখন। কত

মাসের সঙ্গে কতটা সিমেন্ট মেশানো হচ্ছে ঠাকের সেটা সব সময় দেখে নেওয়ার কথা।

কথাগুলো কতটা নীতিগত এবং কতটা স্বার্থগত বুঝে উঠল না বাদল গাঙ্গুলি। হাসিমুখেই পাঁচটা জবাব দিল, ঠাক কাজই করেছে, কাউকে অবিশ্বাস করেনি এটাই তাদের গলদ। কিন্তু তাবলে অবিশ্বাসের কাজ যিনি করেছেন তাঁকে বরদাস্ত করবেন কি করে?

প্রতিবাদ কেউ করলেন না। কিন্তু মীমাংসাও এখানেই শেষ হল না। যারা এসেছেন, কেউ তাঁদের মধ্যে ওই ফার্মের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, গলাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বাদল গাঙ্গুলি সেটা বিশ্বাস করে না। নরেনের ধারণা, তদারকক এসে সব কথার একেবারে মুখ বুজে যায় দিয়ে চলে যাওয়া রীতি নয় বলেই কমিটি এই প্রসঙ্গ নিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, মুখে সত নৌজ্ঞ প্রকাশই করুক চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিষ্পত্তি আপ্যায়নে মনে মনে সকলের পক্ষে তুষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকটা সেন নিজের মধ্যেই আলোচনা চলতে লাগল। একজন বললেন, ফার্মের আসল কর্মকর্তা যিনি, তিনি নাকি বহুদিন ধরে নির্বোজ, দুর্ঘটনার তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। অতএব এর পরে আর টানা-ঠেঁড়া করে লাভ কি। তা ছাড়া, হয়ত বা কর্মচারীরাই করেছে এই কাণ্ড, ভুল্লোকেরা হয়ত কিছুই জানেন না।

অনেকেই অনুমোদন করলেন। একেবারে জাবিকার হাত না দিয়ে কড়া ওয়ার্নিং-এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই সাবাস্ত করলেন তাঁরা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মুখভাব বদলাতে লাগল। নরেন চৌধুরী এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দু'জনেরই বেশ অশান্তি বোধ হচ্ছে। বিপুল বাড়ার দিকে তাকালো বাদল গাঙ্গুলি। দেই থেকে পাইপ টানছেন আর নির্বাক শ্রোতার মত শুনেছেন। তাঁর চোখে-মুখে চা'না হাসির আভাস দেখল যেন বাদল গাঙ্গুলি। শাস্ত মুখে সব কর্মকর্তা সদস্যকেই দেখল একবার। পরে স্পষ্ট করে বলল, কিন্তু আমি তাতে রাজি নই।

হালকা আলোচনার অস্বস্তিকর ছন্দ পড়ল একটা। কিন্তু এসেছেন যারা, পদমর্যাদায় সচেতন তাঁরাও কম নয়। হেসেই একজন বললেন, এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন মিঃ গাঙ্গুলি, একটু আধটু ভুল ক্রটি তো লোকে ক্ষমাও করে।

প্রায় টিপ্পনীয় মত শোনা। জবাব দিল, ব্যাপার সামান্য হলে আমি এত সিরিয়াসলি নিতাম না, আশা করি কমিটি সে আস্থা আমার ওপর রাখবেন। ভুল ক্রটি আর চুরি দুটো এক জিনিস নয়। কিন্তু আমার অভিযোগ ওইটুকু চুরির বিরুদ্ধেও নয়। আমার অভিযোগ, যে মনোবৃত্তি আপনাদের ওই ডায়েরি চল্লিশ ফুট চওড়া দেয়ালকে স্বচ্ছন্দে কাঁচকা করে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে। আমার মতে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

সকলেই চূপচাপ। বস্তুতঃ সরকারী আমন্ত্রণে গতানুগতিক পূর্ববেশে আসা, তিস্ততা সৃষ্টি করতে কেউ বড় চান না। কিন্তু বিতর্ক উঠলে বা প্রতিকূলতার আভাস পেলে এ রীতি সব সময় খাটে না। নিজেকে অস্তিত্ব তখন একটু আধটু জাহির করেই থাকেন

তাঁরা। সেই বকমই করলেন একজন। হালকা হেসেই বললেন, ধরুন, আমাদের মতামত যদি অন্তরকম হয়?

—তা হলে আমি ধরে নেব, আপনারা আর কারো ডিসমিসিয়াল আশ্রিত করে যাচ্ছেন।

এরকম একটা জবাব প্রত্যাশা করেননি কেউ। নরেন যেহে উঠতে লাগল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কোনো অছিলায় সরে পড়া যায় কি না ভাবতে লাগলেন। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি। তিলের থেকে তাল হল যেন। একজন প্রবীণ সদস্য বলেই ফেললেন, দিস্ ইজ টু মাচ!

ঠুক ঠুক শব্দ হল। টেবিলে আস্তে আস্তে পাইপ ঠুকছেন চেয়ারম্যান বিপুল বাড়ার। অনেকটা আপন মনেই যেন। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয়, কোথায় যেন রসের আমেজ লেগেছে। ধীরে স্বস্তি বললেন, ওয়েল জেন্টলমেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এবারে আমার কিছু বলা উচিত।

খামলেন আবার। সকলেরই চোখ গেল তাঁর দিকে। বাদল গাঙ্গুলি অশ্রুদিকে ঘাড় ফেরাল।

—ব্যাপারটা হয়ত বা কিছুই নয়, আবার হয়ত বা অনেক কিছুই। কিন্তু আসল কথা, এই ডায়েরি সমস্ত দায়িত্ব ধীর ওপর তিনি এই ফার্মকে বিশ্বাস করেন না, আর সেই অনাস্থা নিয়ে কাজও করতে চান না। চান না। যখন, তখন আমরাই বা বাইরে থেকে এসে এ নিয়ে জোরজবাব দিই কেন? উই হ্যাভ সো মেনি গুড কন্সট্রাক্টরস—সো মেনি ইনডিভি! কাজেই আমার মতে কাজ যিনি করছেন তাঁর ওপরেই এই ফরমস্‌লার ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা এ আলোচনা থেকে বিরত হই—আফটার অল, হোয়েন দি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ ডুইং মাচ এ ম্যাগনিফিসেন্ট জব!

পকেট থেকে শলাই বার করে নির্বিষ্ট চিত্তে আবার পাইপ ধরতে লাগলেন তিনি। কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না কিছু। বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

খবরটা শোনা মাত্র খুশিতে একেবারে উছলে উঠল সান্দ্রনা। ওরই এক মস্ত দুর্ভাবনার আসান যেন। বড় সমস্তা এলে ছোট অনেক সমস্তা যেমন তলিয়ে যায়, একদিন তেমননি নিজের কোন কথা ভাবার অবকাশ পায়নি। কেবল মেনে হয়েছে, কি হবে, কি জানি হবে। ডায়েরি পরিদর্শনে যারা আসছেন তাঁদের মধ্যে একটা নাম অষ্টগ্রহর উতলা করেছে তাকে। তাই প্রথম খবরটা শুনেই আনন্দে আটখানা। বলে উঠল, আমি বলিনি বাবা, এত সহজে গোলমাল কিছু হলেই হল! তোমরা তো ভেবে সারা!

অবনীবার যেমন যেমন শুনে এসেছেন বলতে লাগলেন। অর্থাৎ, কি হল না হল। সান্দ্রনা উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত। বাবা আবার বেরিয়ে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে হল, ঘরে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। দুদিন আগেও ভেবেছে, বাইরে বেরুনা এ জীবনের মতই ঘুচে গেল। কিন্তু এখন আর সে বকম মনে হল না এক বারও। সপ্রগলভ বিশ্বস্তির আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল বারবার। সারাসরি বাড়ি গিয়ে হানা দিলে কেমন হয়? অবাক হবে, আকাশ থেকে পড়বে।...কিন্তু খুশি হবে। পুরুষমানুষকে আর চিনতে

বড় বাকি নেই সাহসনার। এক ভাত টিপলে হাঁড়ির ভাত চেনা যায়।  
পুরুষ সন্নিধান জনিত সঙ্কোচ ভয় ওর গেছে।

তবু বাবে কি বাবে না ঠিক করতই কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল।  
টিপ টিপ জল পড়ছে আবার। ত্রুণ নেত্র সাহসনা আকাশ দেখতে  
লাগল বার বার। আর ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠতে লাগল।  
শেষে কল একটু ধরতেই দরজায় শেকল তুলে দিয়ে সোজা সামনের  
দিকে পা বাড়ালো।

...ডর ভয় সঙ্কোচ গেছে, তবু একজনের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে  
যায় পথে, বিড়ম্বনার একশেষ হবে।...নরেনবাবু। পা খেমে এলো  
সাহসনার। হুঁ, হবে। অসহিষ্ণু চরণে অশস্তি মুছে ফেলতে এগিয়ে  
চলল আবার। দেখা হলে নিজেরই মুখ তুলে তাকাত পারবে না,  
ওর কি!

অন্তমন্বের মত নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি।  
আম চিন্তা নেই, উত্তেজনা নেই। তবু ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। কিছু  
ভাবছে না, ভাবতে চাইছে না। কিন্তু অন্তস্তলে কলকোলাহল  
চলেছে একটা। নিঃসঙ্গ অবকাশে সেটা আরো মুখর হয়ে উঠবে।...  
এর থেকে বিপুল বাড়রী ওর বিরুদ্ধাচরণ করলে খুশি হত বোধ হয়।  
ভুললোক হার মেনে ওর উত্তমের শিগা অনেকটা নিশ্চিন্ত করে  
দিয়েছেন।

ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। আলনায় কোটাটা ফেলে  
সুইচ টিপতেই বিষয়ে স্তব্ধ একেবারে। আরাম কেন্দ্রীয় সমস্ত  
নারীদেহ ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দ কোঠুকে চেয়ে আছে ওরই দিকে।  
আর হাসছে মুহু মুহু...

নীলা।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল বাদল গাঙ্গুলি। সমস্ত ক্লান্তি,  
সমস্ত অবসাদ কেটে গেল। সহজ হল। এই মুহূর্তে অন্তত  
নির্মমভাবে সহজ হতে হবে চকিতে উপলব্ধি করে নিল সেটুকু।

নীলা বলল, বিষম অবাক হয়ে গেলে যে?

টাইটা খুলে বাদল গাঙ্গুলি সামনে এসে দাঁড়াল। জবাব দিল  
না। চোখে চোখ রাখল। তার চোখেও হাসির আভাস এখন।

নীলা হেসে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পারছো তো?

বিছানার একধারে বসল। নিধুকে হাঁক দিয়ে বলল, চা কর।  
পরে তাকালো তার দিকে। বলল, কই আর পারলাম। তারপর,  
তুমি কি মনে করে?

যেন দেখা সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। মনে কোন দাগও নেই ছাপও  
নেই। অন্তত, আগ্রহ কিছু নেই। নীলা জবাব দিল, এলাম বাবার  
সঙ্গে। টেবিলের ওপর নিজের কোটার দিকে চেয়ে তেমনি হাসতে  
লাগল অল্প অল্প।—কেমন আছ?

নীলা এসেছে জানলে ফোটাটা ওখানে থাকত না নিশ্চয়ই।  
বাদল গাঙ্গুলির ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর সামনেই ওই ফোটা আছড়ে ভাঙে।  
বলে, এই পরিণতির অপেক্ষাতেই এটা ছিল এখানে। ক্ষুণ্ণ জবাব  
দিল, ভালো।

—এখানে এসে কি সব গোলযোগের কথা শুনছিলাম, মিটে  
গেছে?

—হ্যাঁ, তোমার বাবা দয়া করে মিটিয়ে দিলেন।

তরল কণ্ঠে হেসে উঠল আবার নীলা। যে বকম হাসত।  
হেসে যেমন করে সমস্ত পরিবেশ নিজের দখলে নিয়ে আসত।  
সকোঠুকে চেয়ে চেয়ে দেখল আবার একটু। বলল, অর্থাৎ, তবু  
তোমার রাগ কোনদিন পড়বে না, এই তো?

—তোমাদের ওপর আমার কোন রাগ নেই তো।

নীলা হাসল না এবার, আবার একটু চেয়ে দেখল শুধু। পরে  
বলল, না থাকারই কথা, আজ যে এভাবে এসেছি সেটাই মস্ত গর্প  
আমার...তবে বাবা খুব অমৃতপ্ত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে উৎসাহ হয়ে উঠছে বাদল গাঙ্গুলি।  
কিন্তু সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই পরাভূত। ঠাণ্ডা জবাব দিল, মরা  
মানুষ অনুতাপ শোনে না।

থমকে গিয়েও আবারও হেসে উঠল নীলা। বলল, এতবড়  
একটা জ্যান্ত জিনিস গড়ে তুলছ, মরা মানুষ কি!

—চিফ ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তুলছে।

নিধু চা দিয়ে গেল। কিন্তু দিয়ে আর বাবে কোথায়? আগেও  
দরজার আড়ালেই ছিল, আবারো সেখানে এসে দাঁড়াতে বলেই  
তাড়াতাড়ি রান্নাবর বন্ধ করতে গেল। ওর মুখের দিকে কেউ  
তাকালে স্পষ্ট দেখত, এই মেয়েটার পুনরাগমন সে একটুও পছন্দ  
করেনি। ফিরে আসতে গিয়েই হুঁপা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল  
নিধুর। বাইরে, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একজন...

দিদিমণি!

সহসা একটা যা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সাহসনা। বাইরের  
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘরে আরাম কেন্দ্রীয় অর্ধশয়ান হাতমুখি  
নারীমূর্তিটি দেখেছে। দেখে চিনেছে। নিম্পন্দ কাঠ হয়ে অন্ধকার  
দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে তারপর।

ঘরের মধ্যে নীলা হাসছে তখন। বলছে, ...আমি কবে যাব না যাব  
সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি যদি আর না-ই যাই, তাহলে?  
জবাব শুনল, তাহলে আমার কাজের কিছুটা ক্ষতি হতে পারে  
এই পর্যন্ত।

তরল হাসি।—তা হলেই বা, তোমার থেকে তোমার কাজটাকে  
কবে আর বড় করে দেখেছি আমি!

অনুরে নিধুর ওপর চোখ পড়ল সাহসনার। সঙ্গে সঙ্গে মনে  
হল, জীবনে এত বড় দৈন্ত আর আসেনি কখনো। যেমন এসেছিল,  
চকিতে আবার প্রস্থান করল তেমনি।

দ্রুত আত্মবিশ্রুত।

মেন কোয়ার্টারস ছাড়িয়ে এসে থামল। একটা পাথরের উপর  
বসল। বসে রইল নিশ্চল মূর্তির মত। অনেকদিন বাদে নরেনবাবুর  
সেই কথাগুলো যেন কানে বাজতে লাগল আবার।—ওর জীবন থেকে  
নীলা সরে গেছে ভালই হয়েছে।...ওই মেয়ে আজও পুরো ওর জীবনের  
সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ, এই নিষ্ঠা সব কিছু  
তচনচ করে ফেলতে।

কঠোর গাভীরে থমথম করতে লাগল সাহসনার সমস্ত মুখ।

কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই। চমকে উঠল একেবারে। নিধু  
সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দিল, লীলা দিদিমণিকে  
গোঁফো হ'উস-এ পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম এদিক দিয়ে একটু ঘুরে যাই...  
তুমি অন্ধকারে একলাটি বসে কেন দিদিমণি?

সাধনা তাঁর দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। তার পর উঠে  
কাঁড়াল। এমনি বসেছিলাম, এগিয়ে দেবে চলে। ছাঁচের পা' গিয়েই  
শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি গিয়েছিলাম বাবুকে বলেছি নাকি ?

নিধু অমানবদনে ঘাড় নাড়ল, বলেনি।

কিন্তু বলেছে। পৌছে দেবার জন্ত নীলা দিদিমণির সঙ্গে  
কোয়ার্টারস-এর বাইরে এসেই চট করে আবার ফিরে গিয়ে বাবুকে  
জানিয়ে এসেছে, ওভারসিয়ার দিদিমণি এসেছিল, এসেই চলে গেছে।  
বাবুর মুগ্ধভাবে অবলোকন করার অবকাশ অবশ্য পায়নি। তখন  
চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু আর একজনের সম্বন্ধে বাবুকে সচেতন  
করার কর্তব্যটা কিছুটা সেন না করে পারেনি নিধুবাবু। নীলা  
দিদিমণিকে পৌছে দিয়ে তারপর জেনারেল কোয়ার্টারস-এর দিকেই  
জুত পা চালিয়েছিল সে। এখানে এমন দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি।

গড় গড় করে বাবুর গুরুত্বপূর্ণ করতে লাগল নিধু। সাবান্ধ  
নীলা দিদিমণির সঙ্গে একটুও ভালো 'ব্যাভার' করেনি তার বাবু।  
সব কথার কড়া কড়া জবাব দিয়েছে। কাল সকালে ডাম দেখাতে  
হবে বলেছিল নীলা দিদিমণি, কিন্তু বাবু 'পঠ' জবাব দিয়েছে, তাঁর  
সময় নেই, অল্প লোক সঙ্গে দেবে দেখাবার জন্ত। নীলা দিদিমণি  
বলেছে, ক'দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতে। বাবু বলেছে  
সময় নেই। নীলা দিদিমণি তর্ক করতে ছাড়েনি, বলেছে সরকারী  
কাজ কারো জগা আটকে থাকে না। ওর বাবু সে কথার জবাব  
পর্যন্ত দেয়নি, ইত্যাদি—

কিন্তু এত বলার পরেও মুখের দিকে চেয়ে নিধুর মনে হল,  
সুপারিশ ঠিক জায়গা মত পৌঁছল না। যতই বলুক, ওর ভিতরেও  
নাড়াচাড়া পড়েছে একটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এবার আস্তে  
আস্তে নিজের দুশ্চিন্তা প্রায় স্বীকারই করল যেন, বাবু তার যত  
কড়া 'ব্যাভারই' করুক, দিনকতক এরকম দেখা সাক্ষাৎ হলে আবার  
সব ভুলে যাবে, বড় জবরদস্তি মেয়ে এই নীলা দিদিমণি—

ঘড়ি ফিরিয়ে এবার কার দিকে তাকালো সাধনা। এতক্ষণ  
শুনছিল চুপচাপ। সন্তপণ আগ্রহে শুনছিল। কিন্তু শোনার  
কিছু নেই আর। তাছাড়া এর পর চুপ করে থাকার বিসদৃশ।  
প্রায় কক্ষকণ্ঠেই বলে উঠল, কি বকছ বকর বকর করে, আর আসতে  
হবে না, এবারে বাড়ি যাও।

নিধু কাঁড়িয়ে পড়ল।

সাধনা এগিয়ে চলল তন হন করে।

মস্ত এক দুর্ভাবনা নিয়ে বসে আছেন অবনীবাবু। কোথায়  
কোথায় বসে আছে, কোন্ কোন্ জায়গা ভেসে গেল, কোথায় কি  
রকম ক্ষতি হয়েছে,—একটু আগে সেই বৃত্তান্ত শুনে এসেছেন  
অবনীবাবু। এই বস্তার ভাবগতিক ভাল নয় মোটেই, মেয়ের কাছে  
সেই দুর্ভাবনার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন তিনি।

কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না সাধনা, বা একটি কথাও বলল না।  
মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

এক বর্ণও কানে ঢোকেনি তার।

রাত্রি। ঘরের আলো নিবানো। জানালার গরাদ ধরে মূর্তির  
মত সাধনা কাঁড়িয়ে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারা নেই  
একটাও। দূরের এক কোণে অন্ধকার ফুড়ে বিদ্যুৎ চিকচিকিয়ে  
উঠছে এক একবার।

ইচ্ছে করেই নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে সাধনা। যে স্মৃতি  
সভয়ে পরিহার করেছে বরাবর, নিজেকে দম্ব করে তাই নিঙড়ে নিয়ে  
আসছে চোখের সামনে।

...ওর মায়ের সেই স্মৃতি।

...শেষের দিকে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়েছিল মায়ের। মাটির  
আগুন অষ্টগ্রহর ধিকি ধিকি বুকে জ্বলছে। বোবা ব্যথার সাধনা  
সেই জ্বলসানো মূর্তি চেয়ে চেয়ে দেখেছে। মা নয়, একখানা জ্বলন্ত  
কঙ্কাল। কাছে যেতে ভয় হত, ছুঁতে ভয় হত। শেষ বুকফাটা  
তৃষ্ণায়ও এক ফোঁটা জল দিতে পারেনি মুখে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে,  
বলেছে, জল তুই কোথা পেলি ?

...জল নেই কোথাও, জল পেলি কোথায় তুই ?

...জল নেই, জল নেই, ও জ্বলন্ত আগুন !

...গলানো আগুন ঢালতে এসেছিল তুই আমার মুখে, অঁ্যা !  
দূর হ' ! দূর হ' আমার সমুখ থেকে ! দূর হ' !

...সেই তৃষ্ণার স্মৃতির ওপর শান্তি সমাধি উঠছিল। মায়াবিনী  
এসেছে তার নিরীষ্টতায় ভাঙন ধরতে।

দিগন্তে মুহূর্তে বিদ্যুৎ জ্বলসে উঠেছে।

[ আগামী বারে শেষ। ]

## শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন-

এই অধিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবীর কাছে  
সামাজিকতা বন্ধ করি যেন এক দুর্ভাবনা বোঝা বহনের সামিল  
হয়ে কাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি,  
স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ  
উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-  
বার্ষিকীতে, নহতো কারণ কোন কৃতকাধাতার আপনি 'মাসিক  
বহুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার  
মিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বহুমতী'। এই উপহারের জন্ত স্মৃতি আবরণের ব্যবস্থা  
আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা।  
প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের।  
আমাদের পাঠক-পাঠিকা স্তেনে ধনী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক  
শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও  
করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে।  
এই বিষয়ে কে কোন জ্ঞাতব্যের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ,  
মাসিক বহুমতী কলিকাতা



# সিন্ধুপারে

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছয়

চন্দ্রনাথ বেরিয়ে যাওয়ার দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা  
খাওয়ার টেবিলে মিসেস ব্লেক বললেন—“কাল একজন অতিথি  
আসছেন আমার বাড়িতে। দিন তিন চার থাকবেন।”

বললাম, “কে অতিথি?”

মিসেস ব্লেক মুগ্ধ হেসে বললেন, “আপনার ধ্যানস্থ মনের ধ্যান  
ভেঙ্গে যদি একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখেন—ভালই লাগবে।”

বললাম, “ধ্যান ভাঙ্গা না ভাঙ্গা নির্ভর করে ধ্যান ভাঙ্গানো  
শক্তির উপরে। তাঁর যদি সে শক্তি থাকে, ধ্যান নিশ্চয়ই ভাঙবে।”

বললেন, “তার সে শক্তি আছে বলেই ত আমার বিশ্বাস। অবশ্য  
অনেক দিন তাকে দেখিনি।”

শুধালাম, “মানুষটি কে?”

বললেন, “আমার ছোট খুঁড়তুতো বোন—নাম ভিভিয়েন মিস  
কার্টিরিজ।”

বললাম, “ও—মিস?”

একটু হেসে বললেন, “কেন—হতাশ হলেন নাকি?”

বললাম, “আমার আর হতাশ হওয়া না হওয়ার কি আছে?”

বললেন, “তা বটে। তবে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ  
পাবেন। এ রকম প্রাণবন্ত মেয়ে খুব কমই দেখেছি।”

শুধালাম, “এমনি বেড়াতে আসছেন বুঝি?”

বললেন, “না। লগুনে একটা কাজের জন্ত দেখা করতে আসছে।  
ত্রিষ্টলে মেয়েটি কাজ করে—লগুনে একটা ভাল চাকুরীর যোগাযোগ  
হয়েছে। তাই আসছে।”

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে যেতে লাগলেন, “আমারই  
বাগের বাড়ী—লিড্‌নীর কাছে উলষ্টন গ্রামে, মেয়েটি সেই গ্রামেই  
মানুষ হয়েছে—একেবারে পাড়াগায়ে ছিল। শুধু চার পাঁচ বছর  
দেখা-শানা নেই—এখন হয়ত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিষ্টলের  
মত সহরে ত আছে অনেক দিন।”

শুধালাম, “হঠাৎ চিঠি পেলেন বুঝি?”

বললেন, “চিঠিপত্র ওর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে চলে। আমি  
অনেক বার ওকে লিখেছি—আমার এখানে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্ত।  
এত দিন হয়ে ওঠেনি। কাজে হুঁচকার দিন ছুটি পেলে গ্রামে মাঁর  
কাছেই বার—মা এখনও বেঁচে কি না।”

শুধালাম, “বাপ বেঁচে নেই?”

বললেন, “না। আমার কাঁকা অনেক দিন মারা গেছেন। একটি  
বড় ভাই অবশ্য আছে, সেই গ্রামের জমিজমা ইত্যাদি দেখাশোনা  
করে। মেয়েটিকে আমি বড় ভালবাসি। প্রথম জীবনেই মেয়েটি  
একটি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল।

শুধালাম, “কি রকম?”

বললেন, “তখন ওর বয়েস কত হবে—সত্তেরো আঠারো। গ্রামের  
একটি ছেলেকে ও ভাবণ ভালবেসেছিল। ছেলেটিও ছিল চমৎকার!  
হুঁজনের বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। এমন সময় এলো যুদ্ধ। ছেলেটি  
যুদ্ধে গেল, আর ফিরল না।”

কেন জানি না, মনে মনে মেয়েটির বর্তমান বয়সের একটা আন্দাজ  
করে নেওয়ার কৌতূহল হল।

শুধালাম, “সে আজ কত দিন হবে?”

বললেন, “বছর সাত-আট হবে।”

খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ব্লেকের গান-বাজনা শুনে একটু  
সকাল সকালই শুতে গেলাম—বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। বিছানার  
শুয়ে সহজেই বুঝতে পারলাম—মেয়েটিকে দেখার সভাই একটা  
কৌতূহল জেগেছে মনে।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মনটা যদিও অল্প দিনের  
মতনই ভারি, তবুও ভারটা আজ বেশ কতকটা সহনীয় বলে মনে  
হচ্ছে—যেন কিসের একটা নতুন আগ্রহে। কিসের আগ্রহ,  
ভেবে বুঝতে কতকটা বেশ সময় লাগল।

\* \* \* \*

সহর থেকে এলটাম পার্কে যখন ফিরে এলাম তখন ঘড়িতে চারটে  
বাজে—বিকেল আর নয়, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শীতকালে এ  
দেশে চারটে বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা হয় স্তর।

এলটাম পার্কের বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ মনে পড়ল—আজ  
বাড়ীতে একটা নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। মেয়েটির কথা  
সকালবেলা অবশ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত দিন একেবারে ভুলেই  
গিয়েছিলাম। সকালবেলা, মেয়েটির চেহারা ধারণ-ধারণ, সবই  
মিসেস ব্লেকের কথার ভিত্তিতে, মনে মনে কল্পনার একটি  
ছবিতে যে গড়ে ওঠেনি—এমনও নয়। জীবনে একটা আঘাত  
পেয়েছে—অতএব বিষয় শাস্ত হুঁটো বড় বড় চোখ, স্থির ধীর সমাহিত  
ধরণ-ধারণ। মিসেস ব্লেক বলেছিলেন—প্রাণবন্ত। অতএব একটা  
ভীষণ বৃদ্ধির দীপ্তি সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। একহারা  
গড়নের পরিণামটি সামঞ্জস্য যে মিসেস ব্লেকের কোন কথার ভিত্তিতে  
মনে জেগেছিল—বলতে পারি না।

বাড়ীর দরজা খুলে বাড়ীতে ঢুকেই দেখি—মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে  
নেমে আসছে, দৌতলা থেকে একতলার। তখন সন্ধ্যা হয়েছে,  
তাই আলো জ্বলছে ঘরে। সিঁড়ির উপরে টাঙ্গানো একটা উজ্জল  
বৈজ্ঞানিক আলোতে মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম—কল্পনায়  
যে ছবি গড়ে উঠেছিল, একেবারেই তা নয়। একহারা মোটেই  
নয়—বেশ স্ট্রপুট লম্বা গড়ন এবং বড় একখানা মুখে হুঁটো অতিরিক্ত  
বড় বড় চোখ, শাস্ত বিষয় ত নয়ই বরং একটা অনাধিল উজ্জল  
চকলতার ভরা। পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা বিশেষতঃ মুখে রং

মাখার বাহার—তাও যেন একটু অতিরিক্ত বলে মনে হল, মনকে আনন্দ দিল না বরং একটু পীড়াই দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই একগাল হেসে বললেন—“আপনি ত মিষ্টার চৌধুরী? শুভসন্ধ্যা!”

বললাম, “হ্যা—শুভসন্ধ্যা! আপনি ত’ মিস্ কার্টারিজ?” হেসে মাথা নাড়িয়ে বললে, “না।”

একটু অবাক হলাম। তবে ইনি কে? মিস কার্টারিজের সঙ্গে বোধ হয় আর কেউ এসেছেন?

ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার গায়ের ওভার-কোটটি ধুলতে আমাকে সাহায্য করে। ওভার-কোটটি আমার হাত থেকে নিয়ে ঝলিয়ে রাখল আলনায়। তারপর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটি ঝেঁষে তেলিরে মুখে একটা চুই হাসি মাখিয়ে বললে, “আমি ভিভিয়েন। কেউ মিস কার্টারিজ বললে ভয়ানক রেগে যাই।”

হেসে বললাম, “ও!”

বললে, “কথাটা মনে থাকে যেন।”

খাওয়ার টেবিলে বসে মেয়েটির অনর্গল কথায় প্রায় যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। এত কথা বলে যে, আর কাউকে কথা বলার সুযোগই দেয় না। ভারতবর্ষের সন্ধে সে না জানে কি? এইটেই বিশেষ করে আমাকে বোঝাবার জন্য যেন উঠে-পড়ে লাগল। অমন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই—চিরবসন্তের দেশ—না শীত না গরম; ভারতবর্ষের লোকদের আপনা থেকেই একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে—তার মাগুনের মুখের দিকে চেয়েই তাদের ভবিষ্যৎ সহজেই বুঝতে পারে। ভারতবর্ষের মেয়েদের নাচ গান, বিশেষতঃ তাদের রং-বেরংএর শাড়ী—আহা কি সুন্দর! ভারতের খাবার বিশেষ করে কারি—আহা যেন অমৃত, জীবনে এত সুখাত্ম সে কখনও খায় নি; সে একবার বাবেই ভারতবর্ষে—ইত্যাদি কথায় আমাকে অভিভূত করে ফেলার কি প্রচেষ্টা!

মিসেস ব্লেক এক কঁকে একটু হেসে বললেন—“ভক্ত ভারতবর্ষের মেয়েদের মুখ বড় মিষ্ট হয়। মিসেস চৌধুরীর ছবি দেখেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।”

মেয়েটি যেন একটু অবাক হয়ে বললেন—“মিসেস চৌধুরী! আপনার বিবাহ হয়েছে না কি?”

একটু দৃঢ়তর বললাম “হ্যা।”

মেয়েটি চুপ করে গেল—বড় জোর মিনিট পাঁচ এর জন্য।

উধালাম—“আপনি ভারতের বিষয় এত খবর পেলেন কি করে?”

বললে—“আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব সে দেশ ঘুরে এসেছে, তাদের কাছে শুনেছি। বইও পড়েছি অনেক। ভারতের বিষয়ে আমার একটা স্বাভাবিক কৌতুহলও আছে।”

বললাম—“ওম খুসী হ’লাম।”

একবার আমার মুখের দিকে কেমন এক রকম করে একটু পরেই তাকিয়ে—যেন মস্ত একটা সত্য ধরে ফেলেছে—এই রকম একটা চাপা হাসিতে চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল করে উধাল—“আপনি নিশ্চয়ই গুপ্ত রাজকুমার।”

অবাক হয়ে উধালাম “তার মানে?”

বিজ্ঞের মত বলল—“আমি জানি, ভারতবর্ষে অনেক বড়

বড় রাজা-মহারাজা আছে—কোটি কোটি টাকা তাদের আয়। তাদের ছেলেরা অনেক সময় সত্য গোপন করে এ দেশে বেড়াতে আসে, এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল করে বুঝে নেওয়ার জন্য। আপনি নিশ্চয়ই তার একজন?”

“তসে শুধালাম—“কি করে বুঝলেন?”

বললে—“তাদের শুনেছি খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়। আপনার যখন এত অল্প বয়সেই বিবাহ হয়েছে—”

বললাম, “তখন আমি নিশ্চয়ই রাজকুমার—এই ত?”

বললে, “তা ছাড়া আপনার চেহারা ধরণ-ধারণের মধ্যেও কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।”

“তসে বললাম—“বাক্, আপনার বিশ্বাস ভাঙাতে চাই না।”

খাওয়া শেষ হয়েছে। মিসেস ব্লেক মুখে শুধু একটা চাপা হাসি মাখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম—“আপনি একটা অজ্ঞায় করে ফেললেন।”

উধাল—“কি রকম?”

বললাম—“আমার এত বড় গোপন সত্যটি মিসেস ব্লেকের সামনে দিলেন প্রকাশ করে—”

বললে—“ও ক্লার। তা ক্লার কাউকে কিছু বলবে না। ও বড় চাপা মেয়ে।”

\* \* \* \*

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ব্লেকের বসবার ঘরে গান-বাজনার আসর বসল। মিসেস ব্লেক একটা সুর বাজাবার পরই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভিভিয়েন খুব ভাল গান গায়। সে খবরটি আপনি এখনও জানেন না মিঃ চৌধুরী!”

বললাম—“বেশ ত। শুনি ওঁর একখানা গান?”

তৎক্ষণাৎ মিস কার্টারিজ পিয়ানোর ধারে গিয়ে দাঁড়াল এক তার গান হল শুরু। অত্যধিক উচ্চকণ্ঠে গলা কাঁপিয়ে সমস্ত গা দুলিয়ে গান গাইতে শুরু করল—অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, ঘর থেকে পালিয়ে যাই। গানটা শেষ হলে যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম।

মিসেস ব্লেক বললেন—“কি রকম লাগল? গলা অদ্ভুত না?”

বললাম—“সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।”

হঠাৎ উঠ দাঁড়ালাম। বললাম—“আপনার যদি আমাকে ক্ষমা করেন—আমি একটু বেড়িয়ে আসি।”

তৎক্ষণাৎ মিস কার্টারিজ বলল, “হ্যা, খুব ভাল কথা। আমিও মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি। সমস্ত দিন বাড়ী বসে বসে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছি।”

সত্যিই মহা বিপদে পড়লাম। এই মহিলাটিকে নিয়ে এলটাম পার্কে বেড়াতে যাওয়ার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু করিই বা কি। মিসেস ব্লেককে বললাম, “আপনিও চলুন।”

গম্ভীর ভাবে বললেন, “না। একটা সুর আজ আমাকে পিয়ানোয় ভাল করে আয়ত্ত করতেই হবে।”

সাধারণতঃ এ রকম গম্ভীর ভাবে কথা মিসেস ব্লেক বলেন না। কি হল? কিছু কি অপরাধ করে ফেলেছি?”

\* \* \*

রাত্তায় বেরিয়ে হুঁ-চাব পা যেতেই মিস কার্টারিজ বললে, “ক্লার! একটু রেগে গেছে।”

শুধালাম—“কেন বলুন ত ? কিছু কি অজ্ঞার হলো ?”

হেসে বললে—“অজ্ঞারটা আপনার নয়, আমার কিংবা হয়ত হুঁজনারই।”

শুধালাম—“কেন ? কি হল ?”

হেসে হেসে বলতে লাগল—“যদিও ওর বয়স খুব বেশী নয় কিন্তু ও ভয়ানক সেকেলে। আধুনিক মেয়েদের মনোভাব চাল-চলন ও যেন বুঝতেই চায় না। ‘তুলে যায় ভগংটা ক্রমেই অনেক এগিয়ে যাচ্ছে।’

শুধালাম—“কি রকম ?”

বলল—“এই রাত্রে এক জন বিবাহিত যুবকের সঙ্গে আমার একলা বেড়াতে বেকনটা ওর ঠিক পছন্দসই হল না।”

শুধালাম—“তা হলে এলেন কেন ?”

বলল—“আমার বয়েই গেল। ওর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে জীবনে আমাকে চলতে হবে না কি ?”

ক্রমে হুঁজনে এসে পড়লাম এলটাম পার্কে। অগমনক ভাবেই হেঁটে চলে এলাম—ভেবে পথ ঠিক করে আসিনি। এতক্ষণ মেয়েটি ফুটপাথের উপর দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলছিল। এলটাম পার্কে চুকতেই হঠাৎ আমার ডান হাতটি টেনে নিয়ে নিজের বাঁ হাতের বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ধরল। হেসে বলল—“এ রকম ভাবে না চললে লোকে ভাববে কি ? ভাববে—হয়ত আমাদের বগড়া হয়েছে।”

বললাম—“ভাবলেই বা কি এসে-যায় ?”

বললে—“সে আমি সহিতে পারব না।”

কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ডান হাতখানা টেনে সরিয়ে নেওয়ার যে ইচ্ছে হয়নি এমন নয়—কেন না, ও ভাবে চলতে একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম মনে। কিন্তু ঐ কাজটুকুর মধ্যে যে রূঢ় ব্যবহার করার শক্তির প্রয়োজন, সত্য কথা বলতে গেলে তা আমার ছিল না। তাই ঐ ভাবেই চলতে হল। চলতে চলতে মেয়েটির অঙ্গের ভরা যৌবনের ঢেউ যে আমার অঙ্গ একেবারেই স্পর্শ করেনি—এমন কথা বলতে পারি না।

চলতে চলতে মেয়েটি শুধাল—“আচ্ছা, একাধিক বিয়েও আপনাদের দেশে চলে। তাই আপনাদের মতন গুপ্ত রাজকুমাররা প্রায়ই ত এদেশে এসে আবার একটা বিয়ে করেন—না ?”

গম্ভীর ভাবে বললাম—“তা তাদের কথা আমি কি করে বলব ?”

একটু যেন বেশী গা ঘেঁষে মাথাটা ঈষৎ আমার মাথার দিকে হেলিয়ে বললে—“আপনি কি দুই! আপনার ঐ মিষ্টি মুখখানির মধ্যে এত হুঁমি লুকিয়ে রাখেন কি করে ?”

বেশীক্ষণ বেড়াইনি। ঠাণ্ডা লাগার ছুতো দিয়ে শীতাই ফিরে এলাম। ফিরে এসে হুঁ-চারটি কথা বলে হুঁজনকেই শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলাম শোবার ঘরে।

বিছানায় শুয়ে পড়ার পর সুধার মিষ্টি মুখখানি আজ যেন বিশেষ করে আমায় পেয়ে বসল—মনটা বড়ই আকুল হল সুধার জন্ত।

সমুদ্রতুল্য মুখশ্রী

নিয়মিত “বোরোলীন” ব্যবহারে আপনার  
তনুশ্রী দিন দিন উজ্জ্বল ও কমনীয়  
হয়ে উঠবে।

মুখশ্রীর কোমলতা ও সজীবতা বজায়  
থাকবে। এর প্রাণস্পর্শী স্নিগ্ধ সুবাস  
আপনার মনে আবেগময় অনুভূতি  
এনে দেবে।

উদ্ভাসের ফেসক্রীম

বোরোলীন

পরিবেশক

জি, দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

সকল ষ্টেশনার্স ও ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।



পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে আর মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো না। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করাতে মিসেস ব্রেক গভীর ভাবে বললেন—“তিনি বিছানায় শুয়ে আরাম করছেন—এখনও ওঠেননি।”

সহরে গিয়ে নিজের কাজকর্ম শেষে সোজা বাড়ী না ফিরে চলে গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ীতে তার সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার জন্য। বিশেষ করে এই মেয়েটির গল্প তাকে বলবার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল মনে।

চন্দ্রনাথ সমস্ত কথা শুনে ত হেসেই অস্তির। তারপর বললে—“দেখো হে গুপ্ত রাজকুমার! এ মেয়েটিকে যেন রাণী বানিয়ে না।”

বললাম—“রাণী বানাব! ওকে দেখলেই ত আমার পালাতে ইচ্ছে করে।”

চন্দ্রনাথ বলল—“ওটাও ভাল লক্ষণ নয়। বেশী বিরাগ অহুরাগেরই হুচনা।”

তারপর বলল—“বাই হোক, ওকে কিন্তু তুমি বেশী আমল দিয়ে না।”

বললাম—“আমি আমল দিই না-কি! এমন গান্ধে-পড়া মেয়েও আমি আমার জীবনে দেখিনি।”

বললে—“জীবনে ক’টা মেয়েই বা দেখেছ? এ দেশে অনেক বকমের মেয়ে দেখতে হবে। তোমাকে ত আমি চিনি—তাই বলি একটু বুঝে চলে।”

নানান কথাবার্তার প্রায় ঘণ্টা হুই চন্দ্রনাথের কাছে কেটে গেল। বাড়ী ফিরে এলাম তখন রাত্রি ছ’টা। বাড়ীতে ঢুকেই প্রথমেই দেখা হলো মেয়েটির সঙ্গে। প্রায় ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে হেসে বলল—“আপনি ত ভীষণ লোক!”

তুলাম—“কেন কি হ’ল?”

বললে—“মানুষকে এত ভাবাতেও পারেন! শুনেছি—সাধারণতঃ আপনি চারটির মধ্যেই ফিরে আসেন, আর আজ ছ’টা বেজে গেল।”

গভীর ভাবে বললাম—“কাজ ছিল।”

সাপার টেবিলে আবার শুরু হল মেয়েটির সেই অনর্গল কথা। আজ অবশ্য বেশীর ভাগ কথাই—থিয়েটার, থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং বিশেষ করে বার বিষয় আমি কিছুই জানি না, অপেরার গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে আলোচনা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে অপেরা গায়িকাদের অনুকরণে কোনও কোনও গানের দু’একটি পদ মেয়েটি খেতে খেতেই হ’ হ’ করে গেয়েও উঠল। সব সময় সব বিষয়ে সব কথায় নিজেকে জাহির করে লোককে মুগ্ধ করার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই মেয়েটির চরিত্রে—সেটা সত্যিই লক্ষ্য করার জিনিষ।

সহসা মেয়েটি প্রস্তাব করে বলল—“কালকের দিনটাও ত আমি আছি। চলুন মিঃ চৌধুরী! কাল একটা থিয়েটার দেখে আসা যাক। উইনডহাম থিয়েটারে সার জিবসি ডুমরিয়র-এর বই আছে।

“এন্ডস ফল”—তুনেছি খুব ভাল।”

আমি হঠাৎ কি উত্তর দেব, ঠিক করতে না পেরে মিসেস ব্রেকের বুকের দিকে তাকালাম।

মিসেস ব্রেক বললেন, “কাল আমার যাওয়াও সম্ভব নয়।”

মেয়েটি তবুও নাছোড়বান্দা, বললে—“আপনি আমাকে নিয়ে চলুন মিঃ চৌধুরী!”

বললাম, “আমারও ত কাল যাওয়া মুশ্কিল।”

মেয়েটি বলল, “বেশ আমি একলাই যাবো। লগুনের ভাল একটা থিয়েটার না দেখে আমি ফিরছি না।”

নানান কথা চলল। কথায় কথায় কি প্রসঙ্গে মনে নাই, মেয়েটি বলল, “আমি ভারতীয় সিঁক ভরানক ভালবাসি। ভারতীয় সিঁকের তুল্য কাপড় ত জগতে দ্বিতীয় নাই। আমার ভারতীয় সিঁকের অনেক পোষাক আছে—এখন ত পরা চলে না। গ্রীষ্মকালে পরি।”

ক্রমে খাওয়া শেষ হল। মিসেস ব্রেক খাওয়ার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে, তুলে রাখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি মুখে একটু চাপা হাসি মাখিয়ে বলল, “ভারতীয় সিঁকের খুব ভাল নাইট ড্রেস (রাত্রে পরে শোবার পোষাক) আছে আমার, আপনাকে দেখাবো। নিশ্চয়ই খুশী হবেন।”

মিসেস ব্রেক ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “গান-বাজনার আসর আজ বসবে, না আপনারা বেড়াতে যাবেন?”

মহা উৎসাহে তৎক্ষণাৎ বললাম, “নিশ্চয়ই গান-বাজনা শুনব। আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।”

বলে যেন বাঁচলাম। থিয়েটারে যাওয়ার অনুরোধ উপেক্ষা করেছি, যদি একটু বেড়িয়ে আসার অনুরোধ আসে—উপেক্ষা করার শক্তি হয়ত পাব না।

\* \* \* \*

পরের দিন সকালবেলা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল—মিনিট পাঁচ-এর জন্য। আমি যখন তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য নীচে নেমে এলাম, দেখি মেয়েটি বেরবার জন্য তৈরী হয়ে সদর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। হেসে বললে, “সুপ্রভাত! আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সিঁড়িতে আপনার পায়ের শব্দ শুনে দাঁড়ালাম।”

বললাম, “ধন্যবাদ! আজ এত সকাল সকাল বেরুচ্ছেন?”

বললে, “হ্যা—আজ অনেক কাজ। কাল সকালেই ত চলে যাবো। এখনই বেরতে হবে, ইতিমধ্যেই আমার দেবী হয়ে গেছে। চলি—কেমন?”

এই বলে দরজার কাছ থেকে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় সন্ধ্যাৰণ জানানোতে চোখে-মুখে কি বকম যেন একটা দুই হাসি মাখিয়ে বললে, “আজ সন্ধ্যাবেলা সাপারে আমি থাকব না। রাত্রে যেন নিশ্চয়ই দেখা হয়।”

এবং কথাগুলি বলেই দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই মিসেস ব্রেক খাবার ঘরে ঢুকলেন ব্রেকফাস্ট নিয়ে।

সুপ্রভাত জানিয়ে বললাম, “মিস কার্টারিজ আজ সন্ধ্যাবেলা সাপারে থাকবেন না বলে গেলেন।”

মিসেস ব্রেক বললেন, “না। উনি আজ সমস্ত দিন লগুনে কাটিয়ে থিয়েটার দেখে রাত্রে বাড়ী ফিরবেন।”

বললাম, “একলাই সত্যি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে গেলেন?”

একটু যেন বিরক্তি-মাখানো স্বরে বললেন, “ওর আবার একলা! লোক ছুটিয়ে নিতে ওর আর কতক্ষণ?”

\* \* \* \*

ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট। মিসেস ব্রেককে 'তত্ত্বাবধি' জানিয়ে শোবার ঘরে এসে লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ একখানা বই পড়ছিলাম। ভাবলাম, এইবার আলো নিবিয়ে চোখ বুজে তোমাদের কথা একটু ভাবি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব।

হঠাৎ দরজায় খুট খুট করে কে যেন বাইরে থেকে অতি সম্ভবপূর্ণে আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঝেঁপে খুলে মুখ বাড়ালো, মিস কার্টিজ। একগাল হেসে চাপা গলায় শুধাল, "আসতে পারি?"

এ দেশের নীতি অনুসারে পুরুষদের শোবার ঘরে পুরুষ থাকলে মেয়েদের ঢোকা অত্যন্ত অজ্ঞায়, বিশেষতঃ পুরুষদের পরিধানে যদি পুরোদস্তুর পোষাক পরা না থাকে। আমার পরিধানে তখন শুয়ে পড়ার পোষাক, তাই উত্তরে আসতে বলিই বা কি করে? কিন্তু মেয়েটি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সটান ঘরে ঢুকে এসে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব দরজাটি ভিতর থেকে দিল বন্ধ করে। এগিয়ে এলো খাটের কাছে, অবাধ হয়ে চেয়ে দেখলাম, পরিধানে প্রায় কোনও বস্ত্রই নাই, কেবল একটা পাংলা সিল্কের পোষাক—তোমরা যাকে সেমিজ বল তাই; অর্থাৎ মেয়েদের শোবার পোষাক। এই পাংলা সেমিজের ভিতর দিয়ে সর্কাসের সাদা ধবধবে রং বৈদ্যুতিক আলোতে ঘন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

সর্কাস হলিমে বললে, "আপনাকে বলেছিলাম ভারতীয় সিল্কের নাইট ড্রেস আপনাকে দেখাব। এই দেখুন। গায়ে পরে যে কি আরাম!"

বললাম, "ভাল।"

বললে, "হাত দিয়ে দেখুন, কি মোলায়েম।"

মেয়েটির এই স্পষ্ট বোঝাপড়ায় আমার শরীর-মন ক্রমেই যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে পোষাকটির একটি কোণ একটু স্পর্শ করে বললাম "হ্যাঁ।"

মেয়েটি বলল, "উঃ, কি শীত, আমি যেন জমে যাচ্ছি। আজ এক বছর সঙ্গে ডিনারে অন্তত চার গ্রাস স্ট্রাম্পেন্‌ খেয়েছি—ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা লাগবে না—কিন্তু তা ত নয়।"

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম—কথা সত্যিই একটু জড়ান। ব্লা! আশ্চর্য্য হলো না। এ দেশের মেয়েরা প্রায় সকলেই কম-বেশী মদ খায়—তাতে কোনও দোষ নেই এ দেশের নীতিতে।

হঠাৎ মিসেস ব্রেকের কথা মনে পড়ল। ছিঃ ছিঃ—তিনি এই অবস্থায় মেয়েটির আমার ঘরে আসার খবর টের পেলে কি মনে করবেন! আমাকে নির্দোষী কখনই ভাববেন না।

শুধালাম, "মিসেস ব্রেক কি শুয়ে পড়েছেন?"

কথায় একটু চাপা রকমের খিল-খিল হাসি মাখিয়ে বলল, "উঃ, ক্ল্যারাকে আপনি এত ভয় করেন? ভয় নেই গো ভয় নেই—অত কাঁচা মেয়ে আমি নই। ক্ল্যারার ঘরের দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে।"

চূপ করে শুয়ে রইলাম কিছু না বলে। হঠাৎ যেন আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না—এই ভাবে বিছানার উপর বসে পড়ল। একটু যেন আন্ধারের সুরে বলল, "আমি যে শীতে মরে যাচ্ছি।"

সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠল—বিদায়ের সময় স্মৃতির সেই সলজ্জ কাতর চাহনিটি।

গম্ভীর ভাবে বললাম, "মিস্ কার্টিজ! আপনি শুতে যান। এ রকম ঠাণ্ডা লাগলে আপনার অন্ত্র খরবে।"

খানিকক্ষণ চূপ করে বসে রইল—কোনও কথা না বলে।

আবার বললাম, "শুতে যান—আর দেবী করবেন না মিস কার্টিজ।"

হঠাৎ যেন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। "কি নির্ভর! কি নির্ভর লোক আপনি?"

এই কথাগুলি বলতে বলতে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাগুলির মধ্যে একটা জড়ান ভাব ছিল—সেটা নেশার না কান্নার, ঠিক বুঝতে পারিনি।

মেয়েটির সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টে নেমে মিসেস ব্রেকের কাছে শুধলাম—মেয়েটি আগেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

শুধালাম, "এত সকালে গেলেন?"

বললেন, "নইলে খিষ্টলে পৌছতে ওর দেবী হয়ে যাবে।"

পরে নিজের মনেই যেন বললেন, "বাঁচা গেল। ওর যে এত পরিবর্তন হয়েছে জানতাম না।" কথাগুলির মধ্যে একটা স্পষ্ট ঘৃণার ভাব প্রকাশ হল।

আশ্চর্য্য! মিসেস ব্রেকের মুখে কথাগুলি শুনে কেন জানি না, মেয়েটির প্রতি কেমন যেন একটা করুণা এলো মনে। মনে পড়ল সেই প্রথম দিন দেখা হতেই ছুটে এসে আমার ওভারকোট খুলে নেওয়ার কথা। বেচারী! সকলকে মুগ্ধ করার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে আবার সকলের বিরাগ ভাজন হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

"মরে না, মরে না কতু সত্য বাহা শত শতাব্দীর

বিশ্বস্তির তলে—

নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির

আঘাতে না টলে।"

—রবীন্দ্রনাথ



# এক মতো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

শ্যামল কালীর কথা মত পরদিনই পেতলের নেমপ্লেট এনে দিয়েছিলো বলে সহজেই কালীর সাক্ষর হয়ে যেতে পেরেছে। 'প্রায়ই শ্যামলের পিঠ চাপড়ে কালী বলে, এ লাইনে খুব হুঁশিয়ার হয়ে' কাজ করবি। তাহলে আর কোন ভয় নেই।

কালীর আড্ডায় অনেকের সঙ্গে শ্যামলের আলাপ হয়েছে, তার সবাই কালীকে ওস্তাদ বলে ডাকে। যেতে-আসতে পায়ের ধুলো নেয়, দেখাদেখি শ্যামলও শিপে ফেলেছে। আজ সে খোলাখুলি কালীকে জিজ্ঞেস করে, ওস্তাদ, আমার কিছু কাজ দেবে না?

কালী খেতে বসেছিল, এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে পাণ্টা প্রস্র করে, কি করবি?

—সে তুমি ঠিক করে দাও। আমি কি বলবো?

—প্রথমে একটা হাক্সা কাজ কর।

—কি রকম?

—একজন ছোঁড়া নিতাই-এর কাছে ক'জন লোক চেয়েছে, তাদের একজামিন বন্ধ করে দিতে হবে।

শ্যামল বিস্মিত হয়, কি করে?

—হাল্লা করতে হবে, আর কি। নিতাই-এর সঙ্গে যাবি, ওরা বলে দেবে।

—এর জন্তে?

কালী তেঁসে ওঠে, টাকা মিলবে বৈ কি। মুকুন্দ-এর কাজ কালী করে না।

হৈ-ঠৈ করে খুল বন্ধ কবো? অভিজ্ঞতা শ্যামলের মধ্যেই আছে কিন্তু ঠিক এ ধরনের টাকা নিয়ে অন্তদের পরীক্ষা করাটা তার কাছে লজ্জা। আগের দিন প্রস্রপত্র কঠিন হয়েছিল, সেট অজুহাতে কয়েক জন সারা বছর কাকি-সেওরা ছেলে, কালীর দলকে ডেকে এনেছে পরীক্ষা লগুতগু করে দেবার জন্তে।

যে খুলের সামনে তারা জড়ো হল, অল্পক্ষণ বাদেই সেখানকার একজন খবর দিয়ে গেল, আপনারা তৈরী থাকবেন। একটু বাদেই কয়েক জন চোঁচামিটি করে বেরিয়ে আসবে, ওদের সঙ্গে আপনারা মিলে যাবেন। ভিতরে ঢুকে খাতা পত্তর—

আর কিছু বলতে হল না। নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই শ্যামলরা তাদের সঙ্গে বোণ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী চীৎকার আর স্লোগান, ছাত্রসংঘ এক হও, আমাদের দাবী মানতে হবে। বারো হলের ভিতর পরীক্ষা দিচ্ছিল, যাতে তাদের অনুবিধে না হয় তাই কর্তৃপক্ষ হলের দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তাইভেই টেলিফোন, মারামারির স্তরপাত। জোর করে ভাড়া করা ছাত্ররা ভিতরে ঢুকে বার, দরোয়ানের ঘুবি মারে, গার্ডের বাধা দিতে এলে তাঁদেরও জামা ছিঁড়ে দেয়, কাগজপত্র কুটিকুট করে। ভারসেরও মাথার কেমন বেন নেশা চেপে বার, সামনে যে ছেলেটি

প্রাণপণ খাতা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল তাকে বলে, উঠে পড়ুন, আর কেন?

ছেলেটি করুণ গলায় বলে, কেন, আমরা পরীক্ষা দেব।

—খুব যে ফার্স্ট বয় এসেছেন, এতগুলো ছেলে পারলো আর তুমি উঠতে পারছো না? শ্যামল এক দোয়ান্ত কালী ছেলেটার গায়ে ঢেলে দেয়। পাশের একটি ছেলে বাধা দিতে এলে শ্যামল তার চোখ থেকে চশমা কেড়ে নিয়ে হলের আরেক কোণে ছুড়ে ফেলে দেয়। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কিছু বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। আবার 'স্লোগান' দিতে দিতে বিজয়ী ছেলেরা জয়োন্মাদে হল ছেড়ে বাস্তার বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার পর শ্যামল কালীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কালী একগাল হেসে বলে, নিতাই-এর কাছে সব শুনেছি, ব্যস, আমার একজামিনে তুই পাশ হয়ে গেছিস।

শ্যামল কালীর পায়ের ধুলো নেয়, ওস্তাদ, যা বলবে আমি ঠিক করে দেব।

কালী একটা দশ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দিয়ে বলে, এট নে। নিতাই ছাড়া আজ সবাই তোদের দলে নতুন ছেলে ছিল, কিন্তু কেউ কম যায় না, খুব হাল্লা করে এসেছে।

কালীর কাছ থেকে বেরিয়ে শ্যামল পকেট থেকে কলম আর ঘড়ি বার করে। আজকের গোলমালের মধ্যে তিনটে কলম আর দুটো ঘড়ি হাত সাফাই করেছে। সে কথা কালীর কাছেও সে চেপে গেছে। বাড়ী ফিরে নিজের বাস্তার মধ্যে সেগুলো রেখে দেয়।

রাত্রে খাবার সময় কথা উঠলো, আজকের গোলমালের বিবর, মামা নেশার বোঁকে বললেন, পরীক্ষা কেউ চায় না। আমি তো বলি, কেন মিথো লেখাপড়া করা—

মামার শালা বটু বাবু খনুখনে গলায় আপত্তি করেন, তোমার যেমন কথা। ছেলেগুলো যে ক্রমশঃ বাদর হচ্ছে। ইচ্ছা থেকেই গুপ্তামী শিখলে বড় হয়ে কি হবে বলতে পারো?

মামা একবার জবাব না দিয়ে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করেন, তোরাও পরীক্ষার সময় এরকম গোলমাল করবি নাকি?

শ্যামল ভাজিল্য ভরে উত্তর দেয়, ও, বারা লেখাপড়া করে না তারাই গোলমাল পাকায়।

—তোমার মত ভাল ছেলেরা নয়, বলে বটু বাবু তির্যক দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকান।

এই ভঙ্গলোকটিকে শ্যামল হ' চক্ষু দেখতে পারে না। বোপা, হাড়গিলে চেহারা। সব বিষয়ে নাক গলানো অভ্যেস। দশ দিনের জন্তে এ বাড়ীতে থাকতে এসে হ'মাসের ওপর রয়ে গেছেন, একই করে থাকেন বলে শ্যামলের অস্বস্তির শেষ নেই।

বটু বাবু আবার বলেন, বই নিয়ে কখনও বসতে তো দেখলাম না!

মামা বাধা দেন, আহা, ও বাড়ীতে আর থাকে কতকণ! ইচ্ছুক করে, কোচি ক্লাশে যাব—

—ভাই বলে বাড়ীতে পড়বে না? আমরাও তো কিছু খাবার ছাত্র ছিলাম না, কোন না কোন সময় বাড়ীতে বই নিয়ে বসতে হয়েছে।

শ্রামলের বিরক্তি ধরে যায়, ইচ্ছে করে বটু বাবুর মুখে একটা সজ্ঞারে ঘুঁষি লাগায়। তবু কোন কথা না বলে খাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে উঠে পড়ে।

বটু বাবু শ্রামলের খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি তোমায় বলছি জগৎ, ছেলেটার মতি-গতি ভাল নয়।

—তোমার সবাইকেই সন্দেহ।

—পরে বুঝবে। গরীবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়।

—ওর বাবাকে চেন না বটু, খুব 'অনেষ্ট' লোক।

—কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই। আজ নয়, একদিন সব বলব। তোমার ছেলেদের মুখ চেয়েও আমার বলা উচিত।

জগৎ বাবু আর কথা বাড়াতো চান না, চল হে রাত হ'ল। হাত ধুয়ে ফেলি।

বাধ্য হয়ে বটু বাবু জগৎ বাবুর অনুসরণ করেন।

প্রভাতকে আজকাল বেলারাণীর বাড়ী প্রায়ই যেতে হয়। কারণ এখনও গল্পটা পুরো লেখা হয়নি। বেলারাণী রোজই শ্রিয়বস্ত বদলায়। তার প্রযোজিত প্রথম ছবিতে নায়িকারূপে সে যাতে সব রকম অভিনয়-প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পায় তেমন হওয়া চাই। প্রভাত ফরমাস মতো খানিকটা করে লিখে নিয়ে যায়। বেলারাণী শুনে বলে, হয়েছে, তবে বড় ফরমাস মত লেখা মনে হচ্ছে।

—বলুন তো একটু অল্প রকম করে দি।

—না না, অল্প রকম করতে হবে না। আর প্রাণ আনতে হবে।

—কোথায়?

—ধরুন যেখানে নায়ক পাগল হয়ে গেল, নায়িকার চরিত্রে আরও 'প্যাথোজ' চাই।

—কি রকম ডায়ালগ চান বলুন?

বেলারাণী হেসে ফেলে, সে আমি কি জানি। খুব করুন, মানে দর্শকের চোখে জল এনে দিতে হবে।

অনেক দিন বেলারাণী কাজে বসিয়ে যায় প্রভাতকে বসিয়ে রেখে, আপনি বসে লিখুন, আমি এখনি আসছি। হয়তো কোন দিন বেলারাণী সত্যিই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, হয়ত কোন দিন আসে না। প্রভাত বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। তবে বেলারাণী না থাকলেও যার সঙ্গে প্রায়ই প্রভাতের দেখা হয় সে হোল বিনোদ। নিজের গরজে সে কথা বিশেষ বলে না, তবে প্রভাত প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়।

আজ প্রভাত বিনোদকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদ বাবু, গল্পটা কি পাড়াবে বলুন তো? বেলারাণী রোজই তো বললে দিচ্ছেন।

বিনোদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, বেলা ঐ রকমই। নিজেই বললে বাচ্ছে তো গল্প।

—ওঁর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের আলাপ?

—হঁ, বখন ও থিয়েটারে নাচতো, তখন থেকে।

—উনি খুব তাড়াতাড়ি নাম করেছেন।

বিনোদ সোফায় গা এলিয়ে দেয়, বলতে গেলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে। তা কম উন্নতি নয়, থিয়েটারের গুণ নাচিয়ে থেকে একেবারে চিত্রতারকা।

—ওঁর সত্যিকারের বয়স কত?

—ভগবান জানেন!

—আপনি জানেন নিশ্চয়?

বিনোদ হাসে, ও জেনে কি লাভ?

বিনোদ উসখুস করতে থাকে, সোফার ওপরই এগাশ ওগাশ ফেরে। নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে, বেলা যে কোথায় গেল আমায় বসিয়ে রেখে!

—এখনি আসবেন বোধ হয়।

—আমি আর পারছি না। চলি। বিনোদ উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে, আপনি আর একলা বসে থেকে কি করবেন, আমার সঙ্গে আসুন।

—কোথায়?

—কোন একটা বারে যাই, চমুন।

বিনোদ গাড়ী করে প্রভাতকে নিয়ে যায় সাহেবপাড়ায় দ্বিতীয় জেণীর চীনে রেস্টোরাঁয়। এখানে খাবার আর পানীয়, দুই-ই পাওয়া যায়। এ ধরনের রেস্টোরাঁয় প্রভাত যে আগে আসেনি তা নয়, তবে খুব স্বচ্ছন্দ অনুভব করে না।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, কি পান করবেন?

—আমি করি না।

—করে দেখুন না, একেবারে বিষ নয়।

—তাহলে হাকা কিছু দিন।

বিনোদ দুটো হুইস্কির অর্ডার দেয়। পান করতে হলে ভাল জিনিষটাই করুন।

হুঁপেগের বেশী খেতে প্রভাতের সাহস হয় না, তাইতেই মাথা ঝিম-ঝিম করে। বিনোদ কিন্তু পাঁচটা পর্যন্ত সোড়া দিয়ে চালিয়ে গেল, তারপর জল মেশানো আরও দুটো। মাংস পেটে পড়তেই নেশা জমে ওঠে। বিনোদের মন খুলে গেছে, বেলারাণীর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, ওর জন্তে কত টাকা নষ্ট করেছি জানেন? হাজার, হাজার। ওকে পেলাম না। আলোয়ার পেছনে ছোটাই সার—

প্রভাতের কোঁতুল হয়, এখনও তো ওর কাছেই আসেন।

—উপায় নেই, কি করবো।

—বেলারাণীকে আপনি ভালবাসেন?

—ভালো আমি কাউকে বাসিনি, নিজেকেও না। এ লাইনে কত দিন আছি জানেন?

কত দিন?

দশ বছর। বাবা মারা যাবার পর থেকে। বাড়ী পেলাম, গাড়ী পেলাম, নগদ টাকা পেলাম। আর কি চাই?

—আপনার মা?

—অনেক আগে মারা গেছেন। দুটো বোন ছিল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

—তার পর ?

বিনোদ হাসতে গিয়ে নেশার ঘোঁকে কেঁদে ফেলে, তার পর আর কি, এই যা দেখছেন, মাতাল।

—আপনার মাথার ওপর আর কেউ ছিল না ?

—আছেন জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাই-মা। তাঁদেরও সম্পত্তি আমিই পাব।

—বলেন কি ?

বিনোদ হো-হো করে হাসে, আশ্চর্য্য হচ্ছেন ! কেন, ভগবানের স্বভাবই এই তেলমাথার তেল ঢালা। যার টাকা আছে তার টাকা হয়, খাবার লোক নেই। যার দরকার নেই, তারই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হয়—

প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, আপনার বাবা কি অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন ?

—তা কম নয়। নিজে রোজগার করেছেন, আমার হুঁ-দাহুঁ সম্পত্তি পেয়েছিলেন, সে-ও অনেক—

—বিয়ে করেননি কেন ?

বিনোদ কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, করেছিলাম।

—তিনি ?

—নেই।

—মারা গেছেন ? কি তার—

বিনোদ এ কথার উত্তর দেয় না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়, বেলারাগী যে ফিল্ম তুলছে তার অর্ধেক টাকা আমার।

—আপনি তো মনই দেন না এ ব্যাপারে।

—ও নষ্ট হবে, আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তবে এতে নামলেন কেন ?

বিনোদ হাসে, বেলায় জন্তে।

প্রভাত বিস্মিত হয়, আপনি সত্যি আশ্চর্য্য লোক !

—আশ্চর্য্য লোক কিছু নয় প্রভাত বাবু, স্রেফ জ্ঞানপাগী। একটু থেমে বলে, আপনি তো লেখক, আমারও লেখার ইচ্ছে আছে—

—আপনি লিখেন নাকি ?

—লিখি না, তবে লিখবো। একখানা বই।

—কি বিষয় ?

বিনোদ আবার হাসে, সে এখন বলব না, তবে লিখবেন, দেবদাসের চাইতেও ভাল বই হবে।

—আপনার বুঝি দেবদাস খুব ভাল লাগে ?

—দেবদাস আমার বাইবেল। একটু থেমে প্রভাতকে প্রশ্ন করে, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন ?

—নিশ্চয়।

—প্রার্থনা করেন ?

—করি।

—তাহলে আমার জন্তে একটি প্রার্থনা করবেন ?

—কি ?

—যেন আমার 'খাইসিস' হয়।

প্রভাত দেখে, বিনোদের চোখের কোণে জল চক্-চক্ করছে। রেস্টোরাঁ থেকে বেরিয়ে বিনোদ প্রভাতকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

প্রায় এক সপ্তাহ বাদে কেঁট অনন্ত কেবিনে এলে, আন্তদা' জড়িয়ে ধরে বললেন, আর তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না। আন্তদা'র দোকানের কথা বুঝি আজ-কাল মনে থাকে না ?

কেঁট হেসে উত্তর দেয়, সব চেয়ে বেশী মনে থাকে আন্তদা', কিন্তু সময় যে পাই না।

—কি এমন রাজকার্য্য করছ তুমি ?

—সে অনেক ব্যাপার। চলুন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করি।

হুঁজনে একান্তে বলে চা খেতে খেতে যে আলোচনা করল, তা হোল কেঁটর বাড়ী ভাগ করা নিয়ে। বলরামের উকীল কেঁটর সঙ্গে দেখা করে তার দাদার মনোভাব জানিয়ে গেছে। অগত্যা কেঁটকেও তৎপর হতে হয়। আন্তদা'কে বলে, আমার একজন উকীল ঠিক করে দিন, যে সব বুঝে নিতে পারবে।

আন্তদা' বলেন, সে আর এমন কি। আমার বড় শালার ছেলে বেশ ভাল উকীল, বল তো তাকেই ঠিক করে দি।

—আপনি বা ভাল বুঝবেন। সব দায়িত্ব আপনার।

—এত দিনে তাহলে বাড়ী ভাগ সত্যি সত্যি হচ্ছে।

—তা ছাড়া উপায় কি ?

—আমি বলি কেঁট, একলা তুমি থাকতে পারবে না।

—দোকান পাব কোথায় ?

—বিয়ে কর।

—কা'কে ?

—কা'কে, তা আমি কি করে বলব ? যাকে তোমার পছন্দ।

—পছন্দ এখনও কাউকে করি নি।

আন্তদা' গলা নামিয়ে বলেন, কেন, গৌরী ?

কেঁট আড়চোখে আন্তদা'র মুখটা দেখে নেয়, তার কথা আপনি কি করে জানলেন ?

আন্তদা' একগাল হেসে উত্তর দেন, আমি সব খবরই রাখি ভায়া !

কেঁটর ইচ্ছে ছিল, এ বিষয়ে আন্তদা'র সঙ্গে আর একটু কথা বলে কিন্তু প্রভাত এসে পড়ায় সে এ প্রসঙ্গ পাশ্চাতে বাধ্য হয়। প্রভাত কেঁটর মাথায় চাট মেরে বলে, তুই কি হয়েছিল বল তো ? তারপর একটা খবর পর্য্যন্ত দিলি না !

—খবর থাকলে তো ?

—'রিয়েলী' তুই একটা যা-তা—

আন্তদা' ইত্যবসরে উঠ পড়েন খন্দেরদের তদারক করতে।

প্রভাত নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, জায়গাটা কি রকম লাগছে ?

—ভালই, কোন গোলমাল নেই।

—যা ভোক, সংসারী হয়ে পড়লি তো ?

—ঘেটুকু না হলো নয়।

—পিনাকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

—হয়েছে, সে রকম কিছু নয়।

—চিন্তার সঙ্গে ?

—কে ?

—পিনাকীর—

—ও হ্যাঁ, গৌরীর সঙ্গে হয়েছে।

—মেয়েটা সত্যি ভাল। ওই হতভাগটার পাল্লার পড়ে এতটুকু শান্তি পেল না। তার পর, কি করবি ঠিক করলি ?



জ্ঞানের সময়  
মনে  
রাখাবন



একশ' বছরের  
ঐতিহ্য,  
বিপ্লবতা এবং  
অপরিবর্তিত  
গুণগুলির জন্য

আজও অম্লমূর্ত

লক্ষ্মীবিলাস  
তৈল

এম. এল. বসু স্যাক্স কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-২

—কিসের কি ?

—গৌরীর ?

—দাদা তো বাড়ী ভাগের ব্যবস্থা করছে। আমিও আন্তদাঁকে উকীল ঠিক করতে বলেছি, খামেলা চুকলেই—

—হ্যাঁ, বেশী দেবী করিস না।

একমুখ পান খেয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গ্রামল আসে, আন্তদাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, শীগ্গিরি ডিম কুটি দিতে বলুন, তাড়া আছে।

—তোমার কেঁটদা' এসেছে যে—

—কই ? গ্রামল পেছন ফিরে কেঁটর দিকে তাকায়। হেসে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আচ্ছা লোক আপনি কেঁটদা', একটা কথাও ঠিক রাখেন না।

—বড় খামেলার মধ্যে ছিলাম।

—আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতেন। আর প্রভাতদা'ও হয়েছেন আপনার জুড়ী, সেদিন বললেন যে টুন্ডিও দেখাতে নিয়ে যাবেন, তার কি হ'ল ?

প্রভাত উত্তর দেয়, এখনও পুরো কাজ শুরু হয়নি, হলে বলব'খন।

—আপনি আর বলেছেন !

—মাস খানেক বাদে খবর নিও।

প্রভাত উঠে গেলে কেঁট গ্রামলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে আমার কত টাকা আছে ?

—প্রায় তিরিশ টাকা।

—বাজকে দিতে পারবে ?

—সঙ্গে তো বেশী নেই, পাঁচ টাকা আছে।

—তাই দাও, বাকীটা আন্তদাঁর কাছে রেখে রেও। আমি নিয়ে নেব।

গ্রামল সম্মতি জানিয়ে পাঁচটা টাকা কেঁটর হাতে দেয়। কেঁট আবার জিজ্ঞেস করে, সিনেমার টিকিট কিছু বিক্রী করলে না কি ?

—না, সময় পাইনি।

—আজ-কাল কি করছ ?

—অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব।

বলেই খাওয়া শেষ করে গ্রামল উঠে পড়ে। কেঁট বসে বসে সিগারেট ধরায়।

নতুন বাসায় এসে গৌরীর ভাল লাগে। এখানকার বিলি ব্যবস্থা, পরিষ্কার ঘর, রান্নার সরঞ্জাম, বা কেঁট কিনে এনেছে, সবই তার মনের মত। মাঝে মাঝে বড়িও বস্তীর কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু পরক্ষণেই কেঁটর উদারতা ও মহত্ত্ব সে কথা ভুলিয়ে দেয়। রাত্রে কেঁট কোনদিনই এখানে থাকে না, নিজের বাড়ী ফিরে যায়। প্রয়োজ্জুন মত সকালে কি দুপুরে আসে। কেঁট না খেলে গৌরী খেতে চায় না বলে দুবেলাই তাকে গৌরীর কাছে খেতে হয়।

গৌরী বলে, বাড়ীতে কে আপনার খাবার নিয়ে বসে আছে ?

—কেউ নেই।

—তবে ?

—আমারও তো কাজ-কর্ম আছে, সময়ের ঠিক থাকে না। দেবী হলে পাছে ভূমি না খাও, এই ভয়ে অনেক সময় কাজ ফেলে আসতে হয়।

—এলেনই বা। গৌরী মুখ নীচু করে বলে, একলা আমি কিছুতেই থাক না—

অগত্যা কেঁটকে সময় করে রোজই আসতে হয়। এ আসার মধ্যে কর্তব্যবোধের চেয়ে আনন্দ ছিল অনেক বেশী। তাই সব কিছু ফেলে রেখে ঠিক সময়ে এসে গৌরীর দরজায় ধাক্কা দিত।

এখানে আসার পর যার সঙ্গে গৌরীর খুব আলাপ হয়েছে সে হোল চিম্মরী, সবাই ডাকে চিম্ম বলে। মেয়েটির রঙ মরলা, কিন্তু মুখশ্রী ভাল। একটু বেশী গায়ে-পড়া। নিজেকে খেকেই এসে গৌরীর সঙ্গে আলাপ করে, আপনারা বুঝি আজ এলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার নাম ?

—গৌরী।

—আমার নাম চিম্ম, সামনের ঘরে থাকি।

গৌরী মাহুর পেতে বসতে দেয়, বসুন।

চিম্ম বসে পড়ে, আমাকে আর অত খাতির করতে হবে না। একবার বসলে আর উঠতেই চাইব না। নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে মেয়েটি। চারদিক তাকিয়ে বলে, এঘরে আমাদের এক বন্ধুরা ছিল, কিছু দিন আগে চলে গেছে।

গৌরী বিশেষ কৌতূহল দেখায় না, তাই বুঝি ?

চিম্ম বলে যায়, কি বরাত মেয়েটার, এক মাস ছিল এখানে অতীত বাবুর সঙ্গে। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, তাই তো চলে গেছে।

—বিয়ের পর চলে গেলেন কেন ? এত বেশ ভাল ঘর।

চিম্ম হাসে, বিয়ে হলে এখানে আর থাকবে কেন ভাই ?

—কেন ?

গৌরীর প্রশ্নে চিম্ম বিস্মিত হয়, বিয়ে করে এখানে কেউ থাকে না কি ?

—আপনারা ?

—আমাদের মত বাড়ির মাখার সিঁদুরই সর্বস্ব, তারাই থাকে।

চিম্মর কোন কথাটাই গৌরীর কাছে পরিষ্কার হয় না। ঠিক এই সময় পিনাকী অন্ত ঘর থেকে ডাক দেওয়ার চিম্ম উঠে পড়ে, বাই ভাই উনি এসেছেন, একমিনিট দেবী হলেন রসাতল করবেন।

এর পর ক'দিনের মধ্যেই চিম্মর সঙ্গে গৌরীর বেশ আলাপ হয়ে যায়। আপনি ভূমির দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তারা 'তুই তুই' করতে শুরু করে। চিম্ম বলে, বাই বলিস, তোর কেঁটদা' লোক ভাল, মুখ খালাপ তো করে না। আমার কৰ্তাটির কাছে একদিন তুই থাকতে পারিস তো কি বলেছি !

—খুব বকেন বুঝি ?

—কি না করেন, তবু মুখ বুজে পড়ে থাকতে হয়। কি আর উপায় বল ?

গৌরী রাগা করছিল। চিম্ম জিজ্ঞেস করে, মাছের খাল করছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ, কেঁটদা' খুব ভালবাসেন।

—হ্যাঁ রে, তোর কেঁটদা' কি করেন ? সারা দুপুরই তো তোর কাছে দেখি।

গৌরী অজমনক ভাবে উত্তর দেয়, জানি না তো !



—এ আবার কি জ্ঞান কথা, যার সঙ্গে আছিস, সে কি করে জানিস না ?

—ওঁদের অবস্থা বেশ ভাল, দোতলা বাড়ী আছে।

—উনিই বলেছেন বৃষ্টি, তুই জানলি কি করে ?

—আমি ওঁদের বাড়ীতে একদিন ছিলাম যে।

—তাই নাকি, তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন ? একটু থেমে বলে, না, তোর কেউদা সত্যিই ভাল লোক।

গৌরী কাজ করতে করতেই উত্তর দেয়, আমি তো বলি দেবতা।

কত দিন কত সময় এ ভাবে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়। কেউর প্রতি গৌরীর এই গভীর বিশ্বাস চিন্তাকে মুগ্ধ করে। অপর পক্ষে চিন্তার বিবিধ প্রশ্ন গৌরীকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই কেউকে খেতে বসিয়ে একদিন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি কাজ করেন ?

এ প্রশ্নে কেউ বিস্মিত হয়। বলে, এ কথা কেন জানতে চাইছ গৌরী ?

—অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কিছুই বলতে পারি না।

কেউ হাসে, ও এই কথা, আচ্ছা পরে বলব'খন।

গৌরীর অকারণ জিদ চেপে যায়, না, আজই বলুন।

—আজ থাক গৌরী, বলছি তো।

বলুন না ?

অগত্যা কেউ বলতে বাধ্য হয়, ব্যবসা করি।

সেদিন মিথ্যে কথা বলে কেউ গৌরীকে শাস্ত করেছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে এই ভেবে শক্তিত হয় যে, একবার যখন গৌরীর মনে কৌতূহলের বীজ উদ্ভূত হয়েছে তখন সব কিছু না জানা অবধি তা কিছুতেই শাস্ত হবে না। তাই প্রথম সন্ধ্যোগ পেয়েই গৌরীকে সে বোঝাতে চেষ্টা করত, গৌরী তোমায় অনেকগুলো কথা বলার আছে যা এখনও বলা হয়নি।

—কি বলুন ?

—মানে, জানি না তুমি কি ভাবে নেবে।

গৌরী চুপ করে থেকে কেউকে কথা বলার সন্ধ্যোগ দেয়।

—আমি ছোটবেলা থেকেই অনেক রকম ভাবি, আজও। দেখ, মানুষ মাত্রেই বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করে। এত রকম যে জিনিষপত্র ব্যবহার করছ সবই মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে তৈরী করেছে। বুদ্ধি যার নেই সে বাঁচতে পারে না। রাস্তায় বত বড় বড় বাড়ী দেখ, গাড়ী দেখ, এ সব কাদের ? যাদের খুব বুদ্ধি। যারা বোকা লোকদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে, তাদের।

গৌরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি বলেছেন, লোককে ঠকালে তো তার শাস্তি হবে ?

—হয় না, সেইটাই তো সব চেয়ে মজার ব্যাপার। যার বত টাকা তার বত খাতির। যখন একবার টাকা হয়ে যায় তখন কেউ ভাবে না, কি করে এত টাকা হল। সব চোর।

—চোর !

কেউ স্নান হাসে, জানি গৌরী, এভাবে ভাবতে গিয়ে তোমার খারাপ লাগবে কিন্তু এ সব সত্যি কথা। গয়লারা দুধে জল মেশায় বলে তোমরা বক, কিন্তু ভেজাল ছাড়া কোন জিনিস কি বাজারে পাও ?

—যেটা খারাপ, কিনব না। দেখে কিনব।

—কি করে দেখে নেবে ? বন্ধ টিনের মধ্যে ভেজাল মাল, ধরবার কি উপায় আছে ? যারা ঠকার, যারা চোর, তাদেরই টাকা, তাদেরই খাতির।

গৌরী নীচু গলায় বলে, তাহলে আমাদের টাকা চাই না।

—বাঁচবে কি করে ?

—ভগবান বাঁচাবেন !

—সে হলে খুব ভাল হত। কিন্তু তোমার ভগবান একেবারে কালা আর কানা। কিছু দেখতে শুনতে পায় না।

গৌরী শিউরে ওঠে, ছি, ছি, অমন করে বলবেন না।

কেউ এবার রেগে যায়, ভগবান বাঁচালো তোমার ভাইকে, তোমাকে ?

—ভাই-এর মারা যাবার ছিল তাই গেছে। কিন্তু আমাকে তো তিনি বাঁচিয়েছেন,, আপনাকে পেলাম কি করে ?

এর পর আর কথা চলে না। কেউ চুপ করে যায়, কিন্তু মনে শাস্তি পায় না। গৌরীকে বোঝাতে না পারলে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। গৌরীও বোঝে, কেউ ঠিক আগের মত সহজ হতে পারছে না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে।

একদিন আগের মত বেড়াতে বেরিয়ে গড়ের মাঠে বসে, গৌরী এ কথাই জিজ্ঞেস করে, আপনার কি হয়েছে কেউদা ?

—কিছু না তো ?

—কি ভাবছেন এতো ?

—ও কিছু না।

—আমাকে বলবেন না ? গৌরীর অভিমান হয়।

কেউ হেসে উত্তর দেয়, রেগে গেলে কেন, বলে লাভ নেই জেনেই বলছি না।

—কি ?

—ভাবছি, তোমার মত যদি সব জিনিষে বিশ্বাস রাখতে পারতাম। যেমন তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো, আমাকে বিশ্বাস করো, সবাইকে বিশ্বাস কর।

—আপনি কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

—না।

—আমাকে ?

কেউকে আবার হার মানতে হয়, তোমার কথা আলাদা।

এইটুকুতেই গৌরী খুসী হয়, আর কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

কেউ গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়, কেন এমন হয়েছে জানো ? ছোটবেলা থেকে কেউ আমায় বিশ্বাস করতো না। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মারা গেলেন। আমার নাম হল অপয়া ছেলে। বড় হতে লাগলাম, কাকুর ভালবাস পেলাম না। একলা মানুষ হতে লাগলাম। ভাবতাম খুব বেশী। লেখাপড়াতেও শ্রদ্ধা করতে পারলাম না, আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি।

গৌরী গলায় দরদ দিয়ে বলে, আপনার বাবা, তিনি ভালবাসতেন না ?

—বোধ হয় না। একটা এ্যাক্সিডেন্টে বাবার পা ভেঙ্গে যাওয়ার কান্ড ছেড়ে দিতে হয়, সেও নাকি আমার দোষ, আমি অপয়া।

—তারপর ?

—দাদা আমার চেয়ে অনেক বড়, চাকরি করতো বাবার আফিসে। সেই সংসার চালাতে লাগলো। কিন্তু আমি দাদাকে হুঁচক দেখতে পারতাম না।

—কেন ?

—ভীষণ বদরাগী লোক। একটু ভুলচুক হলেই আমাকে মারতো। কেউ বাঁচাতে আসতো না। কেউ একদৃষ্টে দূরে থাকিয়ে থেকে বলে যায়, আত্মীয়-স্বজন যারা আসতো, দাদার কাছেই আসত। আমি যে বাড়ীতে আছি কেউ একবারও ভাবতো না। আমার বাড়ী থেকে লোক এসে দাদাকে নিয়ে যেত, আমি থাকতাম একা। বাবা শেষের দিকে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, আমাকেই দেখাশোনা করতে হ'ত।

গৌরী কেঁটকে খামিয়ে দেয়, চলুন, রাত হ'ল।

কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে শাঁড়ায়, চল।

চলতে চলতে কেউ আবার শ্লান হেসে বলে, বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, বাড়ীর অংশ আমি পেতাম না। উইল করলে সবই দাদাকে দিয়ে যেতেন।

—বৌদি আপনার হয়ে কিছু বলতেন না ?

—আমার হয়ে বলবে ? আমাকে বোধ হয় বাড়ীর চাকরের চেয়ে বেশী উঁচুতে কিছু ভাবতো না। স্বার্থপর, তবে ওরও দোষ নেই, যেমন সবাই করছে। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে, ওদের মেয়েটা আমাকে ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারত না। বাপ-মার কাছে কত বকুনী খেয়েছে, মার খেয়েছে, তবু আমার কাছে ছুটে পালিয়ে আসে। এখন শুনি দাদা আমার ওপর রেগে শ্রামার বিয়ের ঠিক করেছেন এক ঘোজবরের সঙ্গে।

গৌরী চমকে ওঠে, সে কি, ওইটুকু মেয়ে !

—কে বুঝবে সে কথা। এক শুলমাষ্টার। হুটো ছেলে বেখে বউ মারা গেছে, তাদের জগেই শ্রামাকে বিয়ে করছে।

আজ এই প্রথম কেউ গৌরীর সঙ্গে নিজের জীবনের কথা খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করে। গৌরীর সমস্ত সহানুভূতি কেউর জন্তে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সে চার কেউর মন থেকে এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করে দিতে।

তাই পরদিন চিম্বর ঘরে গিয়ে সে বলেছিল, সত্যি চিম্ব, কেউদার তুলনা হয় না।

—কেন, আবার কি হল ?

—ছোটবেলা থেকে যে কি কষ্ট পেয়েছেন, শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।

চিম্বকে কথা বলার সময় না দিয়ে গৌরী গত কাল কেউর মুখে যা যা শুনছিল, বর্ণনা করে যায়। কথা শুনতে শুনতে চিম্বর চোখে ঞ্জল ভরে আসে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলে, তুই কখনও ওনার মনে কষ্ট দিস না। গৌরী লজ্জা পেয়ে ঘবে শাঁড়ায়। চিম্বর ঘরে সে বেশী আসেনি, চতুর্দিকে ছড়ানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিম্ব বলে, ছবি দেখবি, বাসু না।

বড় ছোট নানা আকৃতির ছবি চিম্ব গৌরীর সামনে সাজিয়ে দেয়। কত রকম দৃশ্য, কত মেয়ের ছবি।

গৌরী প্রশ্ন করে, এসব কাদের ছবি ?

—বাদের মুখ ছবিতে ভাল ওঠে।

—কি হয় ?

—বিক্রী।

—কোথায় ?

—পত্রিকায়, কাগজের বিজ্ঞাপনে। মলাটে ছাপায়, কখনও ভেতরে। এই দেখ না—

চিম্ব কতকগুলো পুরোন পত্রিকা বাঁধ করে আনে। গৌরী দেখে সব পত্রিকাগুলোর মলাটে চিম্বর ছবি। অনেক রকম ভঙ্গীতে। গৌরী অবাক হয়, এ যে সব তোর ছবি রে ?

—আগে আমার ছবিই বেশী তুলত।

চিম্বর কথায় গৌরীর কেমন খটকা লাগে। জিজ্ঞেস করে, আজকাল তোলে না ?

—কম।

—কেন ?

—আমার চেয়ে অনেক স্থলরীরা ছবি তুলতে ছুটে আসে বলে।

—তোর খারাপ লাগে না ?

চিম্ব দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না।

ঠিক বুঝতে না পেরে গৌরী চিম্বর দিকে তাকায়। চিম্ব মুখ নীচু করে বলে, আর ছবির মোহ নেই।

—কিসের মোহ আছে শুনি ?

—জীবনের।

—মানে ?

—ঘর, সংসার। কিছুই হ'ল না।

বিশ্মিতা গৌরী প্রশ্ন করে, এ তো বেশ ভাল ঘর, নিজের বাড়ী না হলে বুঝি মন ওঠে না ?

—তা বলিনি রে গৌরী, ছেলেপিলে না হলে, সমাজ না থাকলে মেয়েদের জীবনে কোন সুখ নেই।

—ছেলেপিলের কথা জানি না কিন্তু সমাজ চাই না আমি। বিক্রী লোক তারা।

চিম্ব শ্লান হাসে, এখন তাই ভাবছিস, পরে বুঝবি। যদি নিজের ভাল চাসু কেউদারকে বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল, নইলে আমার দশা হবে।

—কেন, তোর বিয়ে হয়নি ?

—পুরুষদের তুই চিনিস না। বের করে আনবার সময় বিয়ে করব, হান করব, ত্যান করব, নানারকম বলে। পরে সব ভুলে যাব।

গৌরী অবাক হয়ে চিম্বর সীঁথির সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সিঁদুর দেখছিস ? ও আমাদের পরতে হয়। মিথ্যে বউ সেজে বসে না থাকলে বাইরেও বেকন যায় না। চিম্ব আর কথা বলতে পারে না, চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। গৌরীও সে কান্নায় ষোগ দেয়। সে চিম্বকে জড়িয়ে ধরে মৃদুধরে বলে, আমি জানতাম না কিন্তু, তাই একথা তুলে তোকে কষ্ট দিলাম।

চিম্ব ধরাগলায় বলে, আমি বলছি গৌরী, বিয়ে করে ফেল। তোর কেউদার ভাল লোক, বোধ হয় রাজি হবে। নইলে পরে সারাজীবন ঞ্জলে-পুড়ে মরবি।

সারা দিন গৌরী এই কথা নিয়ে ভেবেছে। কেউর কাছে

এ প্রসঙ্গ পাড়তে গিয়ে ও লজ্জায় পারেনি। কথায় কথায় বলে, চিহ্ন মেয়েটা খুব ভাল।

কেউ শুনে শুনে সিগারেট টানছিল। জিজ্ঞেস করে, কে চিহ্ন, ঐ পিনাকীর বউ?

হ্যাঁ। পরে নীচু গলায় বলে, জানেন কেউদা', ওদের বিয়ে হয়নি।

—জানি।

—কি করে জানলেন?

—যাদের বিয়ে হয়নি, তারাই এ বাড়ীতে থাকে।

—চিহ্ন তো বিয়ে করতে চায়, ঐ ভুলোকই তো রাজী হচ্ছেন না।

—পরে হুংথ পাবে।

—সত্যি কেউদা', চিহ্ন চায় ছেলোপিলে, ঘরসংসার।

—সব মেয়েই তাই চায়।

গৌরী সহজ গলায় হেসে বলে, কই, আমি তো চাইনি?

—চাইবে।

—কবে?

—আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু।

—তখন কি হবে?

—বিয়ে।

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। কেউ বলে, বিয়ের জন্তেই তো তৈরী হচ্ছি গৌরী! ভেবেছিলাম হু'-এক মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ী ভাগ করা, আলাদা থাকার বিলিবাংহা করা, কিন্তু দেখছি আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

গৌরী চুপ করে থাকে, একটু পরে বলে, আমার জন্তে আপনার অনেক কষ্ট হল, না কেউদা'?

কেউ হাসে, খুব কথা বসতে শিখেছে যে, কে মাঠার, চিহ্ন নাকি?

গৌরী হেসে উঠে পাঁড়ায়, চিহ্ন আপনার খুব ভক্ত।

—অন্ধ ভক্ত, সে তো আমার দেখেনি।

—ওকে ডেকে আনব, বেচারী সব সময় একলা থাকে।

—হবে'খন।

গৌরী আবদার ধরে, না, ডেকে আনি, দেখুন না, খুব ভাল মেয়ে। কেউর ভাল লাগে গৌরীর এই ছেলোবানুসী। হেসে সরসি জানায়।

গৌরী ছুটে গিয়ে চিহ্নকে ধরে আনে। চিহ্ন সবমাত্র গা ধুয়ে কাপড় ছাড়ছিল। গৌরী কোন ওজর-আপত্তি না শুনে টানতে টানতে তাকে কেউর সামনে হাজির করে বলে, এই যে কেউদা', চিহ্ন।

চিহ্ন গৌরীকে কপট রাগের সঙ্গে বলে, তোর আলায় এখানে থাকা যাবে না দেখছি। এরকম টানাটানি করলে মানুষ বাঁচে!

—বাঃ, কেউদা'র সঙ্গে আলাপ করবি না?

কেউ হেসে বলে, তোমার কেউদা' এমন একটা কেউ-কেটা নয় যে সবাইকে এসে আলাপ করতে হবে।

গৌরী ততক্ষণে চিহ্নকে জোর করে মাহুরে বসিয়ে দিয়েছে। চিহ্ন আবহাওয়ারকে পরিচিত করে নেওয়ার জন্তে কেউকে প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে প্রভাত বাবুর খুব আলাপ আছে, না?

—হ্যাঁ, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু।

—আপনি ঠিক দেখা খুব পড়েন বুঝি?

—একটাও পড়িনি। বই পড়া আমার অভ্যাস নেই।

—উনি কিন্তু আপনার কথা খুব বলেন।

—আমিও ওর কথা খুব বলি।

গৌরী বাধা দিয়ে বলে, কই না তো! আপনি তো প্রভাত বাবুর কথা আমার ভেতন কিছু বলেন নি?

—বলার সময় হয়নি।

ধীরে ধীরে এদের গল্পের আসর জমে ওঠে। কেউ দোকান থেকে গরম তেলোভাজা কিনে আনে, চিহ্ন ঘর থেকে মুড়ি আর আচার নিয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলাটা তিন জনেরই খুব আনন্দে কেটে যায়।

শ্রামলের বাড়ীতে থাকতে আর এক মিনিট ভাল লাগে না, বাটু বাবুর আলায় সে অস্থির। ভুলোক সারাক্ষণ বক বক করেন। বিশেষ করে শ্রামলকে ঠুকতে পারলে, তিনি বোধ হয় অপরিমিত আনন্দ পান। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শ্রামলকে তুলে দেন, এই শ্রামল, ওঠ। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শ্রামল সাড়া দিতে চায় না। গায়েব কাপড়টা আরও জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাটু বাবু হার মানার পাত্র নয়। রীতিমত চোঁচাতে শুরু করেন, ছোট ছেলে, এত ঘুম কেন, আমি হু'চক্ষে দেখতে পারি না। সকাল সকাল উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে কোথায় পড়তে বসবে, তা নয়, বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুম। আলাতন বাবা, তেমনি জগৎটা, একটা কথাও যদি ছেলেটাকে বলে!

এর মধ্যে ঘুমোনো অসম্ভব। বিরক্ত হয়ে শ্রামল উঠে মুখ ধুতে চলে যায়।

এ তো! রোজই লেগে আছে। তাছাড়া দেখা হলেই পড়ার কথা।

—কি পড়ছিস দেখাস না কেন? এককালে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম।

শ্রামল মুহূর্তে উত্তর দেয়, আপনি কেন কষ্ট করবেন. কোচি ক্লাশে আমি সব পড়ে নিই।

—আহা বেশী পড়লে তো দোষ নেই, ভালই হবে।

আবার কোন দিন অল্প দিক দিয়ে চোঁকেন, মাথায় অত বড় বড় চুল কেন, খোঁপা বাঁধবি নাকি?

বাইরের লোকের সামনে, সকলে হেসে ওঠে। শ্রামল উত্তর দেয়, চুল কাটার সময় পাইনি।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের বাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

—বাড়ীত সবাই চুল কাটছে আর তোমার সময় হয় না ?  
হরো নাপিতকে ডাকলেই তো হয়—

—আমি নাপিতের কাছে কাটি না।

—তাই তো, চুলের বাহার নষ্ট হয়ে যাবে, কি বল ? শ্রামল বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার পর এই তো সেদিন রাধা, ওর চেয়ে ন'বছরের ছোট মামাত বোনটা বলছিল, শ্রামললা, তুমি সিগারেট বাও ?

—কে বললে ?

—মামা বলছিল।

—বটু মামা, কা'কে বলছিল ?

—বাবাকে। তোমার জামা-কাপড় সিগারেটের গন্ধ, পকেটে দেশলাই থাকে।

রাগে শ্রামল দীতে দীত যবে, বটু বাবু যে রোজ তার জামা কাপড় বেঁটে দেখেন এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সেদিনই রাধার হাতে অনেকগুলো লজ্জেল দিয়ে বলে, রাধা খুব ভালো মেয়ে। বটু মামা আমার নামে কি কি বলে, আমার সব বলে দিস। তাকে আরও লজ্জেল দেব।

আজ সকালে আর এক ব্যাপার নিয়ে বটু বাবুর সঙ্গে তার ঝটখাটি লাগলো। নাওয়া খাওয়া সেয়ে হাতে বই নিয়ে শ্রামল অল্প দিনের চেয়ে সকাল সকালই বার হচ্ছিল। বটু বাবু ডাকলেন, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিস ?

—স্কুলে।

—এখনও তো সাড়ে ন'টা বাজেনি।

—একটু দরকার আছে।

—কোথায় ?

শ্রামলের আর ধৈর্য থাকে না। ফস করে বলে ফেলে, সে খোঁজ্ঞে আপনার দরকার কি ?

বটু বাবু জবাব শুনে রেগে অস্থির, কি, আমার কথাটার উত্তর দেবে না। এমন লাটসাহেব তুমি ?

—তা অত বাজে বকছেন কেন, কি দরকার তাই বলুন না ?

বটু বাবু চাঁৎকার সুর করে দেন, এ বাড়ীতে আমি আর এক মিনিট থাকবো না। যে বাড়ীর ছেলেরা গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না, সেখানে আমি—

রাত্রাঘর থেকে পিসীমা, ওপর থেকে জগৎ বাবু সকলেই ছুটে আসেন। জগৎ বাবু যদিও বোঝেন বটু বাবু অনেক বাড়িয়ে বলছেন তবু বলতে হল, শ্রামল, বড়দের সঙ্গে কখনও এমন ভাবে কথা বলবে না। মাপ চাও। শ্রামলের আত্মসম্মানে লাগে। সত্যিই তো ওর কোন দোষ নেই। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যে তাকে সর্বক্ষণ বিরক্ত করে তার কষ্টে মাপ চাইতে হবে কেন ? চোখ কেটে তার জল বেরিয়ে আসে। জগৎ বাবু আর পিসীমাকে উদ্বেগ করে বলে, আমি তোমাদের কাছে একশো বার মাপ চাইছি যদি কিছু অজ্ঞার করে থাকি, কিন্তু বটুমামার কাছে নয়।

এই বলেই সে বাড়ী থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল, একবারও পেছন দিকে না ফিরে।

বটু বাবু ফোঁড়ন কাটেন, দেখলে ছেলের মেজাজ, তোমাদের গ্রাহ করে, ভাবো ?

জগৎ বাবু শ্রালককে বোঝাতে চেষ্টা করেন, ছোট ছেলে, ওর কথা কি অত মনে করলে চলে ? তুমি বরং আমার কাছেই শোও, বটু বাবু মাথা নাড়েন, না ঐ ঘরেই থাকবো ! ও যে কত বড় শরতান, তা প্রমাণ করে তবে আমার শান্তি।

সকালবেলাই এই অপ্রীতিকর ঘটনার শ্রামলের মন ভারী হয়ে ওঠে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে অল্প দিনের মত বিভ্রান্তবনের কাছাকাছি এক জানাশোনা মনোহারী সোকানে বইগুলো রেখে দেয়, আবার বাড়ী ফেরার পথে নিয়ে যাবে বলে। আজ তার সেবেনদার কাছে যেতে আর ইচ্ছে করে না। অনেক দিন বাদে মদনের কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়ীতে মদন ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে শ্রামল আড্ডা-সংঘের পাথরের ওপর চুপচাপ বসে পড়ে। কালের দিন, স্কুল-কলেজ আর অফিস যাবার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত, তাই আড্ডাসংঘের আসর একেবারে কাঁকা। মদনের বন্ধু বিপিন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। শ্রামলকে দেখে জিজ্ঞেস করে, মদনকে খুঁজছ ?

—হ্যাঁ।

—মহুদার বাড়ীতে আছে।

—তুমি তো ওদিকে যাচ্ছ, ওকে ডেকে দাও না।

খানিক বাদে মদন এল। শ্রামলের কাছে বসে প্রশ্ন করে, হঠাৎ কি মনে করে ?

—এমনি।

—এমনি তো আর তুই আমার কাছে আসিস না ?

—বাড়ীতে আর ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে ?

—সগড়া-ঝাটি। বটু হতভাগা ! ও শালা আর যাবে না।

—বটুমামা ! তা তোর পেছনে লেগেছে কেন ?

কে জানে ! মামা, পিসীমা আমার ভালবাসে। ও সহ করতে পারে না। শ্রামল মদনকে অনেকগুলো ঘটনা বলে সম্প্রতি বটু বাবুর সঙ্গে যা ঘটেছে সব। শুনে মদন বলে, বটু মামা কিন্তু তাকে মুস্থলে ফেলতে পারে।

—আমিও ছেড়ে কথা কইব না, ওর ওস্তাদী বার করব।

—কি করবি ?

—সে দেখিস—

শ্রামল যদিও দস্ত করে বললে বটু বাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবে, মনে মনে সে এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। তবু মদনের সঙ্গে আলাপ করে তার মন অনেক হালকা হয়। কথায় কথায় মহুদার কথা ওঠে। মদন বলে, মহুদার জন্তে সত্যিই কষ্ট হয়। খালি দুঃখের গান করছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

—নন্দিতা কি বলে ?

—সে আর বলবে কি করে, দেখাশোনা সব বন্ধ। দেখ না, বাড়ী জানলা সব বন্ধ, বেকবারও হুকুম নেই।

—তা হলে ?

—তা হলে আর কি। শুধু স্কুলে যায় আর আসে, মহুদার সে সময় অফিস। চিঠিপত্রও লিখতে পারে না। মহুদা' আজ-কাল আড্ডাসংঘেও আসে না।

—ট্র্যাজিডি।

—তুই একটা কাজ করবি ?

—কি ?

—মহুদা'র একটা চিঠি নন্দিতাকে দিতে পারবি ?

—এ আর এমন কি ! সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই।

—নন্দিতা এখন ইন্সুলে যায়। ঠিক সোরা দশটার সময় ও বাড়ী থেকে বেরোয়। সঙ্গে কিছু লোক থাকে।

—দেখি কি করতে পারি। চিঠিটা দে, আজই দিয়ে দিই। আবার কবে আসবে—

মদন শ্রামলকে টেনে তোলে, চল মহুদা'র কাছে, বেচারী খুব খুসী হবে।

পথে যেতে যেতে শ্রামল বলে, মহুদা'কে বলে আমার টাকা দিস কিছু।

—নিশ্চয়ই।

—তুই কিছু মেয়েটাকে ভাল করে দেখিয়ে দিবি। আমি ঠিক চিনি না।

মহুদা' কথা শুনে গলে পড়েন, এ যদি পার শ্রামল, আমি তোমার কেনা চাকর হয়ে থাকব। শ্রামল ও মদন যুগপৎ বলে ওঠে, হি হি, ও কি বলছেন মহুদা' !

মহুদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে শ্রামল আর মদন হাজির হল নন্দিতার স্থলের সামনে। শ্রামল বলে এই স্থল নাকি, এখানে তো আমি প্রায়ই আসি।

—মেয়েদের ইন্সুলে ?

—দূর গাথা। স্থলের সামনেই বই-এর দোকান দেখছিস ? নতুন পুরোন দু'রকম বই-ই বিক্রী করে, আমার খদ্দের।

—ওখানে কি করবি ?

—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

—মানে ?

—পোষ্ট অফিস। দোকানের ওই ছোকরাটার সঙ্গে আমার খুব ভাল আছে। মহুদা'র চিঠিগুলো রেখে যাব, নন্দিতা নিয়ে যাবে। উত্তর হয় তাকে ছাড়বে নয় এখানে দিয়ে যাবে। ওকে কিছু পরশা দিলেই হবে।

মদন উৎসাহিত হয়, বেশ বুদ্ধি করেছিস। ব্যবস্থা করে ফেল, নন্দিতার স্থলে আসার সময় হল।

দোকানের মালিকের বরস কম। শ্রামল বলে, মনে রাখবেন তার নাম নন্দিতা।

ভদ্রলোক হাসেন, এসব মিষ্টি নাম কি আর ভোলা যায় ?

—একটা বইয়ের ভেতর করে দেবেন। অল্প কাকর হাতে বেন না পড়ে, তাহলেই কাণ্ড বাধবে।

—সে বিষয় নিশ্চিত থাকুন, এরকম অনেক করেছি।

টেবিলের ওপর করেখানা দোকানের নামলেখা কটিন পড়ে ছিল। শ্রামল দু'খানা নিয়ে নেয়। চিঠি-পিছু আট আনা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে শ্রামল বেরিয়ে আসে। মদন জিজ্ঞেস করে, হাতে ওগুলো কি রে ?

—কটিনের কাগজ, ঐ দোকানের বিজ্ঞাপন।

—কি করবি ?

—বিলি করবো। তোর কাছে পেন্সিল আছে ?

মদন কলম বার করে দেয়। কটিনের জন্তে লাইনকাটা কাগজে বেধানটার দোকানের নাম লেখা আছে তার কাছে তীর চিহ্ন দিয়ে শ্রামল লেখে, এখানে মহুদা'র চিঠি আছে, আপনার নাম বললেই দিয়ে দেবে।

মদন ঠেলা মারে, ঐ যে নন্দিতা আসছে।

চারটি মেয়ে একসঙ্গে আসছিল। সঙ্গের লোকটি বোধ হয় মোড় পর্যন্ত এসে চলে গেছে। শ্রামল জিজ্ঞেস করে, কোনটা ?

—একবারে ডান দিকে, ঐ যে চুল খোলা, গোলাপী শাড়ী পরা—

—ঠিক আছে, দাঁড়া আমি আসছি।

মদন ফুটপাথে উঠে দাঁড়ায়। শ্রামল সোজা মেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।

—কটিন পেপার, ক্রী কটিন পেপার, বলে শ্রামল একরকম জোর করেই তাদের হাতে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, বাবা, বাবা। এদের জালায় অস্থির।

শ্রামল আসল কাগজটি নন্দিতার দিকে এগিয়ে লেখা কথাগুলোর দিকে আঙ্গুল রেখে বলে, এই যে—

নন্দিতা দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে, সন্তোষ দৃষ্টিতে শ্রামলের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধন্যবাদ জানায়। অল্প মেয়ে তিনটি এগিয়ে গিয়েছিল। তারা পেছন ফিরে তাকাতেই নন্দিতা কটিনটা খাতার তলায় নিয়ে ফ্রন্ট-পায়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মেয়েরা চলে গেলে শ্রামল মদনের কাছে ফিরে ফুটকি চাঙ্গে বলে, কাজ হাসিল।

—সত্যি ! লেখাটা ও পড়েছে ?

শ্রামল হাসে, চোখে চোখে যে কথা হয়ে গেল।

শ্রামলের অনুমান যে মিথ্যে নয় তা তখনই বোঝা গেল। মদন বলে, ঐ দেখ, নন্দিতা দোকানে চুকছে।

—চালাক আছে, অল্প মেয়েদের স্থলে ছেড়ে এসেছে।

নন্দিতা দোকান থেকে চলে যেতেই শ্রামল গিয়ে হাজির হয়। দোকানদার বলে, চিঠিটা নিয়ে গেছে।

—দেখলাম, এসে কি বললে ?

—কি আর বলবে, উঃ আঃ করতে লাগল, আমি নাম জিজ্ঞেস করলাম।

—বই-এর মধ্যে করে দিয়েছেন তো ?

—নিশ্চয়, মেঘদূতের কাব্য।

শ্রামল হেসে ফেলে, আপনি সত্যিই কবি।

ভদ্রলোক অমায়িক হাসেন, ব্যবসাদারও। বই-এর দাম তিন টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

শ্রামল আর মদন মহুদা'র সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। মহুদা'র আনন্দে বিগলিত হয়ে আর সেদিন অফিস গেলেন না। তিন জনে সিনেমা আর রেডিওতে আমোদে কাটাল।

[ ক্রমশঃ ।



# তামস

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ভ্রমাসঙ্গ

কি কেনাকাটা এবং হুঁচার জায়গায় দেখাশোনার দরকার ছিল। সে দিনটা তাতেই গেল। পরদিন ডাক্তার ধরে নিয়ে গেলেন বেলগদিয়ায়। পথে যেতে যেতে বললেন তালুকদার, আজ তো তুমি একাষ্ট আসতে পারতে। আমার দরকার পড়ল কিসে ?

ডাক্তার বললেন, বাঃ, আপনাকে নিয়ে আবার ভালো করে সবটা দেখতে হবে না ? আজ যে চোখ দিয়ে দেখবো, কাল তো তা ছিল না।

রক্ত পরীক্ষার ধরা পড়েছে শাস্তির টাইফয়েড। তার ক্ষত্রে যা কিছু করা দরকার, সে সব সেবে নিয়ে মহেশের সঙ্গে চারদিকটা আবার ঘুরে ঘুরে দেখলেন দেবতোষ। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির গয়নাই কি আপনার একমাত্র সঞ্চয় ?

তালুকদার বললেন, গোড়াতে তাই ছিল। বারো হাজার টাকা পেয়েছিলাম গয়না বিক্রী করে। তারপর আরো কিছু কিছু জুড়াত হয়েছে।

—এক এখনো হচ্ছে।

—না, এখন আর বড় একটা পেরে উঠি না। ছেলে হুঁচোর বোর্ডিং-খরচ। তাছাড়া—বলেই থেমে গেলেন।

দেবতোষ বললেন, তাছাড়া যে আরো হুঁচারটি পোষি আপনার আছে, তার কিছু কিছু খরচ আমিও রাখি।

তালুকদার সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, এখন তো এদের আর পুঁজির দরকার নেই। নিজের খরচ কুলিয়ে বরং কিছু কিছু জমাতেও পারে। তিনটি মেয়ে আর একখানা ভাঁত নিয়ে সুস্থ করেছিলাম। আজ বারোটি মেয়ে কাজ করছে। ওয়ার্কসপটাও তাই বাড়িতে হয়েছে।

মেয়ালের দিকে থাকিয়ে ডাক্তার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির কি কোনো ছবি আছে ?

—না, কোনো দিন ফটোগ্রাফারের সামনে নিতে পারিনি। ঐ এক কথা—আমার বড় লজ্জা করে।

সামনের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে, যেন কোন এক দুর্নিরীক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করে বললেন তালুকদার। কে জানে এটাও হয়তো বিধাতার অভিশ্রাব। তা না হলে মীরা শুধু ছবি হয়েই থাকত আমার কাছে ; এমন করে এখানকার সব কিছুর মধ্যে তাকে পেতাম না।

সেই বুড়ী আজও বড়ি দিচ্ছিল। ঘরতে ঘরতে সেপানটার গিয়ে তালুকদার বললেন, কেমন আছ, পিসী !

বুড়ী একগাল হেসে বলে উঠল, এসেছ বাবা ? কাল ওদের কাছে সুনলাম তুমি চলে গেছ। ভাবলাম, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে ?

—কাল আর সময় হলো না। আজ আবার এলাম।

—বেশ করেছে, বাবা ! তোমার দরাতাই আমরা এতগুলো মেয়েমামুষ দিব্যি খেয়ে-পেরে স্বখে আছি। তা না হলে—

—আমার জন্ম বড়ি রেখেছ তো ?

—বেগছি বৈ কি, বাবা ! উমার কাছে আলাদা ঠোড়ায় করে রাখা আছে। মনে করে নিও, কিন্তু।

—নিশ্চয়ই নেবো। সেবার খেগুলো দিয়েছিলে, হুঁচো চারটে করে এক মাস বসে খেলাম।

বুড়ীর শীর্ণ মুখখানা খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ষ্টেশনের পথে তালুকদার বললেন, যা দেখছি, এই টাইফয়েডের ধাক্কা সামলাতেই তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। ডাক্তার অত্মমনস্ক হয়ে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। বললেন, কী বলছেন ? ছুটি ? আশীর্বাদ করুন দাদা, ছুটি আমার অক্ষয় হোক।

—তার মানে ?

—তার মানে, গোলামি আর করত চাই না। ভাবছি, এরই কোনো একটা গলির মধ্যে একখানা সাইনবোর্ড খুলিয়ে বসে পড়বো।

—ও ত্বরতি ছাড়। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এম-বি'র ছড়াছড়ি। তোমার মত ক্যাম্বেল-ওয়ালকে পুছবে কে ?

নিজেকে দেখিয়ে বলেন, এরকম বিনি পয়সার স্কল দিয়ে তো পেট চলবে না।

—খুব চলবে, দাদা ! হুঁচো তো মোটে পেট। তার খাঁই আর কতটুকু ?

তালুকদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, দেবতোষ ! মেয়েগুলোকে দেখবার চালাবার কেউ নেই। ঐ গুন্ডিই বা হোক করে চালিয়ে নিয়েছে এত দিন। কাজকর দেখাওনা কষ্ট, তবুও

ফুলের মত...  
আপনার লাবণ্য রেঙ্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেঙ্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল  
অর্থাৎ স্বকের স্বাস্থ্যের জন্তে  
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা  
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে  
বিকশিত করে তুলবে।

**Rexona**  
BLENDED WITH CADYL

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান  
রেঙ্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, এম পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

RP. 150-X52 BG

ভার ছিল ওরই উপর। ও যবে থেকে পড়েছে, এখানকার অবস্থা প্রায় অচল। আমি যে এসে মাঝে মাঝে দেখবো, তাও সম্ভব নয়। কাজেই তোমাকে পাওয়া আর হাতে স্বর্গ পাওয়া একই কথা। কিন্তু তাই বলে তোমার মত একটি ছেলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করে এমন একটি তুচ্ছ কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে, তাও আমি হতে দেবো না, ভাই! ও-সব পাগলাম্যে করো না।

দেবতোষ হেসে ফেললেন, কিছু মনে করবেন না দাদা! আপনার কথা শুনে আমাদের আনন্টিমির প্রফেসর ডাক্তার ঘোষের প্রথম লেকচারটা মনে পড়ল। আপনার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কথাটা তিনিও সেদিন অন্ততঃ বার পাঁচেক আউড়েছিলেন। কিন্তু একটা অভ্যস্ত সোজা কথা তিনি হয়তো জানতেন না, আপনি জেনেও চেপে বাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে এই, যা কিছু উজ্জ্বল, তাই সুন্দর নয়। তার চাকচিক্যে চোখ ভুলতে পারে, মন ভোলে না।

তালুকদার সাহেবের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন দেবতোষ, আপনি কী ভাবছেন, আমি জানি। টাকাটা যে ভরানক কামা বস্ত্র, সেটা অস্বীকার করি না। তবে এ-ও জানি, ওটাই সব নয়। হু'-একজন ভাগ্যবান ব্যক্তির খবর আমি রাখি, ডাক্তার হিসেবে যে Career তারা গড়ে তুলেছিলেন, সেটা সত্যিই উজ্জ্বল। সারা জীবন ধরে নেশার ঝাঁকে তারা শুধু ব্যাকের খাতার মোটা মোটা অঙ্কের ডান দিকে শূন্তের পর শূন্ত বোগ করে গেছেন। তারপর শেষ বয়সে যখন মনের পাতার চোখ ফেরালেন, দেখা গেল বাঁ দিকের অঙ্কটা মুছে গেছে, পড়ে আছে শুধু ঐ শূন্তগুলো। কিন্তু আমার শুধু শূন্ত দিয়ে চলাবে না, দাদা! এমন কিছু চাই যাতে মন ভরে।

তালুকদার এখনো কোনো সাড়া দিলেন না দেখে একটু আশ্বাসের সুরে বললেন দেবতোষ, আপনার ভয় নেই। এই মুহূর্তেই কিছু স্থির করে ফেলিনি। তবে হঠাৎ একদিন যদি স্তনতে পান, বন্ধু! আকশোস করে বলছে, মুখ্য ডাক্তার এমন সাধের চাকরিটা রাখতে পারলো না, শুনে যেন চমকে উঠবেন না।

ডাক্তারের কথা শেষ হলে নিশ্বাস ফেলে বললেন তালুকদার, তোমার কপালে দুঃখ আছে, তা বুঝতে পারছি। তবে আপাতত সে কথা ভাবছি না। ভাবছি, জেল-মহলে এত দিন মহেশ তালুকদারের নাম ছিল, 'মেয়েধরা'। অনেক স্ত্রী নাম কুড়িয়েছি। এবার বোধ হয় 'ছেলেধরা', বলেও কীর্তি রেখে যাবো।

ডাক্তার হো-হা করে হেসে উঠলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে দেবতোষকে একটা কী কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন সুলোচনা। তারপর আফ্রিক সেবে বারান্দায় এসে বসলেন মহেশের সামনে। কোনো বকম ভূমিকা না করেই বললেন, আমায় দেবুর একটি বোঁ এনে দাও, বাবা! তুমি ছাড়া এ কাজ আমার আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—বেশ তো মা, আমি খোঁজে রইলাম। এ আর এমন শক্ত কী।

—জানো, মহেশ, এতদিন ওর বিয়ে নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, একজন চাই যে ওর ভার নেবে, ওকে বুঝবে, সব সময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে। মাকে দিয়ে সে কাজ চলে না। তা ছাড়া আমি আর ক'দিন?

—সে কথা বললে কিন্তু বগড়া করবো, মা! ছেলের বিয়ে দিন।

মনের মত একটি বোঁ নিয়ে অনেক দিন ঘর করুন। হু'-চারটি মাতি-নাতনীর মুখ দেখুন। তবে তো আপনার ছুটি।

সুলোচনা হাসলেন, অতোখানি আমি চাই না বাবা! দেবু আমার স্থির হয়ে বসেছে, এখানে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে না, এইটুকু দেখে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।

সুলোচনা উঠে বাচ্ছলেন। মহেশ বললেন, কিন্তু কী বকম মেয়ে আপনার পছন্দ, তা তো বললেন না, মা!

—শোনো কথা! কী বকম আবার। ওর মন থাকে চায়, থাকে গেলে ও সুখী হবে, তাকেই আমার পছন্দ। সে যে মেয়েই হোক, আমার কাছে তার একমাত্র পরিচয় সে আমার দেবতোষের বোঁ। এর বেশী আমার আর কিছু জানবার নেই, বাবা!

ডাক্তারের সঙ্গে মায়ের মুখের আদল অভ্যস্ত স্পষ্ট। সেই দিকে কলকাল চেয়ে থেকে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন তালুকদার, এত দিন দেবতোষকে দেখে আশ্চর্য লাগত। অত বড় একটা দরাজ মন। যত দেখেছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। আজ আর হই না। দেবলাম, ওটা ও মাতৃগর্ভ থেকেই নিয়ে এসেছে।

সুলোচনা লজ্জা পেয়ে যেন স্তনতে পাননি, এমন ভাবে তাদ্ভাতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে ট্রেন। চা'এর আগেই জামা-কাপড়টা স্ট্রটকেসে ভরে নিচ্ছিলেন তালুকদার। একটা লালচে গোছের কাগজ হাতে করে দেবতোষ ঘরে ঢুকলেন। আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে মহেশ বললেন, টেলিগ্রাম এল বুঝি?

—এল নয়; যাবে।

—যাবে!

—হ্যাঁ; এখন না পাঠালে ঠিক সময়ে পৌঁছবে কেন? ছুটি তো আপনার আজকেই শেষ।

মহেশ কাপড় গোছানো বন্ধ করে বসলেন, তোমার মতলবটা কি বল তো ডাক্তার? কাল তো একটা বাজ্ঞে অজুহাত তুলে বাওয়া বন্ধ করল। আজকে আবার কোন্‌ ছল নিয়ে এসেছ?

—দুর্বৃত্তের ছলের অভাব নেই, স্বয়ং বিভাগসাগর মশাই বলে গেছেন। কিন্তু দাদা, আজকের ব্যাপারে আমি শুধু আত্মবিশ্বাস। বিশ্বাস না হয়, বাঁর আজ্ঞা তাঁকেই ডেকে নিয়ে আসছি।

—থাক; তোমাকে আর কষ্ট করে ডাকতে হবে না। আমিই বাচ্ছি। মার সঙ্গে বোঝাপড়ার দরকার হলে আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

ওঁকে আর যেতে হল না। তার আগে সুলোচনাই এসে পড়লেন। ডালাখোলা স্ট্রটকেসটার দিকে চেয়ে দেবতোষকে বললেন, তুই বলিসনি বুঝি?

—বললাম তো। মানছেন কৈ? ওঁর নাকি ভরানক দরকার, না গেলেই নয়।

মহেশ ছদ্ম-গাঙ্গীধের সুরে বললেন, ডাক্তারের আজ্ঞা মানুবকে মরা বলে সাটিকিফিকট দিয়ে থাকে, সবাই জানে। কিন্তু চোখের উপর হাতকে দিন বানিয়ে দেয়, সেটুকু জানতে বাকী ছিল!

সুলোচনা হাসিমুখে বললেন, ঠিক বলেছ, বাবা! ঐ জন্তে ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু জেঁমার কোনো কাজের ক্ষতি হবে না তো?

—কিছু না। আর যদি হয়ও, সে ক্ষতির চেয়ে লাভটাই কি বেশী নয়? আর একটা দিন মায়ের কাছে থাকতে পেলাম।

সুলোচনার মুখখানা মাতৃগৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিঃশব্দে বললেন, কতটুকুই বা থাকতে পার মায়ের কাছে। এসে অবধি ছুটোছুটিতে তো আর বিরাম নেই। এখনি আবার আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবেন, মা?

সুলোচনার মুখের উপর একটুখানি করুণ ছায়ার স্পর্শ লাগল। মুহূর্তকাল নতমুখে থেকে বললেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত সেবুর কাছে সবই শুনলাম। তখন থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার ওদের দেখে আসবো।

—আপনি যাবেন ওদের কাছে! বিষয়ে আনন্দে বেন চৈতরে উঠলেন তালুকদার।

—কেন যাবো না বাবা? আমার মীরা মা বেঁচে থাকলে সেই তো সব করত। সে নেই বলে, তার এই কাজটুকু যাতে কোনো দিকেই অসম্পূর্ণ থেকে না যায়, আজ আমাদের সবাইকে তাই দেখতে হবে।

মহেশ পাঁড়িরে রইলেন অভিভূতের মত। সুলোচনার বৃহৎ আবার শোনা গেল, সেবুকে তাই বলছিলাম, তুমি বা করছ, তার ফলনা হয় না। ঐ আশ্রয়টুকু না পেলে ওরা ভেসে যেত, কিংবা এমন জায়গায় গিয়ে পাঁড়াত, যার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তোমরা পুরুষ মানুষ। বতই দাও, মেয়েদের সব অ-ব মেটালে পার না। খানিকটা থেকে যায়, বা তোমাদের হাতের বাইরে। সেটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ বাবা! আমরা যে রাক্ষসের জাত। আমাদের ক্ষিপে কিছুতেই মিটতে চার না।

মহেশের চোখের ওপর জেগে উঠল অনেক বছর আগেকার একটি রাত। তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। কানে এল তার ব্যাকুল কান্না। হঠাৎ চমকে উঠলেন সুলোচনার কণ্ঠস্বরে। উনি বলে চলেছেন, আমার তো করবার কিছু নেই; সে শক্তিও নেই। তবু আমাকে দেখে যদি ওদের মনে এইটুকু বিশ্বাস জাগে যে ওটা শুধু ইচ্ছুল নয়, আশ্রয় নয়, ভাত-কাপড় আর একটু মাথা শুঁজবার জায়গা—এই দিয়েই তোমরা ওদের ধস্ত করনি, আরো কিছু আছে ঐ ঘর ক'খানির মধ্যে, যাতে মেয়েমানুষের মন ভরে, বা ওরা হুঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে, সেই জন্তেই আমার যাওয়া। যদি না বুঝে থাকে, সেই কথাটাই আমি ওদের বুঝিয়ে দেবো। এইটুকু ছাড়া আমার আর কী করবার আছে?

মহেশ বললেন, মা, আজ বুঝতে পারছি, আপনার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই।

সুলোচনা হেসে বললেন, শোনো ছেলের কথা! কী অপরাধ করলে তুমি?

—ওদের কোনো কথাই আপনাকে বলি নি। হয়তো আজও কিছু না জানিয়েই চলে যেতাম। দেবতাব আমাকে সে-লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে।

—তাতে কোনো অপরাধ হয়নি, বাবা! এ কি বলে বেড়াবার জিনিষ?

—কেন যে বলি নি, আমার সব কথা শুনে হয়তো বুঝতে

পারবেন। একথা আমার মনে হয়েছিল, দেবতাবকে তাই বলছিলাম সেদিন, এই মেয়েগুলোর যে অভাব, সে শুধু অন্ন-বস্ত্রের নয়, শুধু আশ্রয়ের নয়। যে-ঘর ওরা একদিন ছেড়ে এসেছিল, তার পর আর ফিরে পার নি, গিরে দেখেছে দোর বন্ধ, সুখে, দুঃখে, ভক্তি, ভালবাসায় ভরা সেই ঘরের আবাদটুকু যদি ওদের দিতে না পারলাম, তাহলে তো কিছুই হল না! সেই কথা মনে করেই লোক-সম্বর, ইট-কাঠ জড়ো করে আশ্রম বা হোম না বানিয়ে, ছোট একটা গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যে ঐ বাড়িটুকুতে এনে ওদের তুলেছিলাম। মনে মনে এই আশা ছিল, আপনার জনের কাছে জায়গা না পেলেও পরের কাছে, প্রতিবেশীর কাছে মানুষের যে স্বাভাবিক পাওনা, সেটুকু থেকে ওরা বঞ্চিত হবে না। কিন্তু মা, সে আশা আমার সফল হয় নি।

সুলোচনা বললেন, আশাটা তোমার অতিরিক্ত ছিল বলেই সফল হয়নি, বাবা!

—কিন্তু তখনো আমি হাল ছেড়ে দিই নি। আমার হুঁ-একটি আত্মীয়া—নাম বললে, আপনি না চিনলেও দেবতাব চিনবে—আমরা বাকে বলি, সমাজ-কল্যাণ বা সেবাব্রত সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠা আছে। অনাথ-আতুর নিয়ে তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালিয়ে থাকেন। তাদের হুঁ-একজনকে ধরে আমার ঐ বেলঘরিয়ার গলিতে নিয়ে এলাম। মেয়েদের ডেকে এনে বসিয়ে দিলাম ওদের পায়ের কাছে। ওরা অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন। পাণী-তাপী বিশপগামী মানুষের উদ্ধারের জন্তে যে-সব বড় বড় কথা বলে গেছেন মহাপুরুষেরা, তারাই কতকগুলো আওড়ে গেলেন। বখন চলে গেলেন, মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তারা শিখলো হয়তো অনেক কিছু, কিন্তু পেল না কিছুই। তার পরেও তাঁরা এসেছেন। মেয়েরা সম্মত হয়ে উঠেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি না হয়। তারা যে ওদের বিশিষ্ট অতিথি, ওদের আশ্রয়লাভার পরম শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়া।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি এখনো আসেন?

—না, মা! হুঁ-চার বার এসেই এসব ছোটখাট ব্যাপারে নজর দেবার মত উৎসাহ তাঁদের চলে গেল। আমিও বেঁচে গেলাম।

দেবতাব বললেন, আপনি ভুল করেছেন, দাদা! লেগে পড়ে থাকলে ওদের হাত দিয়ে একটা মোটা রকম ডোনেশন-কোনেশন আদায় করতে পারতেন। আর কিছু না হোক, গোটা কয়েক টেকি আর কুলো বাড়ানো যেত, দুটো পয়সা আসত। বাক সে সব বকেয়া কথা। আপাততঃ সব চেয়ে দরকারী কথা হল, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

—আঁা, তাই নাকি! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুলোচনা, বাই, তোমাদের চা নিয়ে আসি। ইস, এত বেলা হয়ে গেছে।

—কিছু বেলা হয়নি মা! চায়ের জন্তেও আমাদের কোনো তাড়া নেই।

—উঁহঁ, ওটা একবচনই রাখুন, দাদা, মাথা নেড়ে বললেন দেবতাব। আটটার সময় চায়ের তাড়া নেই, এতখানি অপবাদ আমাকে অন্তঃ সেবেন না।

মহেশও রীতিমত ভেড়ে উঠলেন, ভাণ ডাক্তার, বেশী খাটিও না,

হাটে ধাড়ি ভেঙ্গে দেখে। বনমালীর রাজ্যে যখন ছিল, কি বকম আটটার সময় চা ফুটত, আমার তো আর জানতে বাকী নেই ভায়া !

সুলোচনা বললেন, বল কী বাবা, এ দিকে তো দেখি বনমালী বলতে অন্তান !

—তা হলে কি হবে ? মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশ দিন বনমালীর ভাঁড়ারে যা ভবানীর রাজ্যে। সকাল আটটার কেটলিতে জল ফুটছে ; হঠাৎ দেখা গেল চা নেই। ছুটল আমার নিধিরামের কাছে। চায়ের সমস্তা মিটল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার এল ছুটে ছুটে। কী ব্যাপার ? হুণ নেই। নাঃ এইখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে তিন দফাও ছুটে হয়। চা করতে হলে চিনিও তো চাই। বলে হেসে উঠলেন। সুলোচনা ব্যথিত সুরে বললেন, তবু ঐ হতভাগটাকে কিছুতেই তাড়াবো না।

দেবতোষ বললেন, ঐর কথা তুমি বিশ্বাস কর, মা ? সব বাড়িয়ে বলছেন।

—বাড়িয়ে বলছি ! আমার সব নোট করা আছে তিসেবের খাতার। দয়া করে বিলটা এখনো পাঠাইনি।

—বিলের কথা যখন তুললেন দাদা, তাহলে বলতে হয়, ওটা এ তরক থেকেও যেতে পারে, এবং তাতে বোধ হয় আমারই লাভ।

—কী রকম ?

—আজ্ঞে, বনমালী যদি নিধিরামের কাছে দশ বার গিয়ে থাকে, নিধিরাম বনমালীর শরণ নিয়েছে অন্ততঃ সতের বার। চাঁটা চিনিটা তো আছেই, মাঝে মাঝে ডাল চড়িয়ে দেখা গেল মুণ নেই।

—মুণ নেই ?

—আজ্ঞে হাঁ, মুণ নেই।

হুঁজনের মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে উঠল। সুলোচনাও মুহু হেসে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন চায়ের জোগাড়।

চাঁপ শেষ হবার পর সুলোচনা বেলঘরিয়া যাবার উদ্ভোগ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় মহেশ কুণ্ঠিত সুরে বললেন, মায়ের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

সুলোচনা ফিরে দাঁড়ালেন।

মহেশ বললেন, বলছিলাম আমি আজ থাকি। আপনি দেবতোষকে নিয়ে যান।

—কেন ! সবিস্ময়ে বলে উঠলেন সুলোচনা।

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন তালুকদার, আমাকে সঙ্গে দেখে ওয়া যদি আপনাকেও আমার সেই বড় বড় আত্মীয়দের দলে ফেলে, সেটা তো আমি কিছুতেই সহিতে পারবো না। অথচ তার জন্তে ওদের দোষ দেয়ারও কিছু নেই। তাই বলছিলাম, আপনি নিজেই যান। আমি থাকি।

কথাগুলো সহজ সুরেই বললেন তালুকদার। কিন্তু তার অন্তনিহিত বেদনটুকু সুলোচনার অন্তর স্পর্শ করল। উত্তরে একটি কথাও বললেন না। শুধু তাঁর বিন্দু চোখ দু'টি অপরূপ কাকল্যে জরে উঠল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি তেমনি নিঃশব্দে দেবতোষের সঙ্গে রিক্সার গিঁথে উঠলেন।

যারা জেল খাটে তাদেরও ছুটি আছে, সপ্তাহান্তে একদিন। কিন্তু যারা জেলের জন্তে খাটে, তাদের ও বালাই নেই। পালপার্শ্বে তাদের ভারী প্রোগ্রাম, রবিবারে বিশেষ কটিন। নিতান্ত দায়ে পড়ে দু'চার দিন যদি বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, মূলতুবি কাজগুলো বসে থাকে ওৎ পেতে, ফিরে এলেই চেপে বসে। বেশ কিছুদিন আর ঘাড় তুলবার অবসর দেয় না।

জেলের সাহেব ফিরে আসবার পর সুশীলা একটু ফুরসত খুঁজছিল তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্তে। কিন্তু দু'টি বেলায় তার ঘরের সামনে দিগে যাবার সময় লক্ষ্য করেছে, হয় তিনি ডুবে আছেন কাগজপত্রের ভূপের মধ্যে, নয় তো তাকে ঘিরে রয়েছে ডেপুটি বা কেরানীবাবুদের দল। দিন পাঁচ ছয় পর বিকাল বেলা ডিউটিতে যাবার পথে হঠাৎ একটু কঁক দেখে চুকে পড়ল একদিন। তালুকদার মুগ্ধ তুলতেই বলল, হেনা একটু আসতে চায়, বাবা ! ক'দিন ধরেই বলছিল, বা ভিড়, আমি আনতে সাহস করিনি।

মহেশের মনে পড়ল, শেষ বেদিন তার সঙ্গে দেখা, হেনাকে কথা দিয়েছিলেন, একদিন তার সব কাহিনী শুনবেন। তার জন্তে সবার হয়তো আছে, কিন্তু মনের একটা প্রস্তুতি দরকার। সুশীলাকে বললেন, আজ তো হয় না। ওকে একটু সময় দিতে হবে। তুমি বরং—বলে ডায়রি খুললেন তারিখটা নির্দিষ্ট করে দেবার জন্তে। সুশীলা বলল, ও বলছিল, ওর বা কথা পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে।

মহেশ ডায়রি বন্ধ করে বললেন, ও, তাহলে এখনই নিয়ে এসো।

হেনা এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তালুকদার বললেন, তোমার সেদিনের কথা আমার মনে আছে। তার জন্তে আরেক দিন ডাকবো। তা ছাড়া আর কিছু বলবে ?

হেনা মাথা নেড়ে মৃদুভাবে উত্তর করল, না, আর কিছু নয়। সেই জন্তেই এসেছি। ভেবে দেখলাম, ওটা আমার বলা হবে না। তালুকদার জিজ্ঞাস্য চোখে তাকালেন। বলতে যাচ্ছিলেন, বেশ তো নাই বা বললে। কিন্তু তার আগেই বলে উঠল হেনা, আপনার কাছে বসে নিজের মুখে স্বচ্ছন্দে বলে যাবো, তেমন কথা তো আমার নয়। এ এমন কথা, যা বলতে গেলে বোধ হয় সব মেয়েমানুষেরই জিভ আটকে যাবে। তবু, না বলেও আমার উপায় নেই। তাই এত অপরাধের পর আর একটা অপরাধ করে বসলাম। বলে আঁচলের আড়াল থেকে একটা বাধানো খাতা বের করে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। তারপর আবার পেছনে সরে গিয়ে বলল, মুখ ফুটে বা বলতে পারিনি, অথচ বা না বলেও আমার স্বস্তি নেই।

লজ্জার মাথা খেয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়েছে এই খাতার পাতায় ; প্রতি মুহূর্তে সে যে কী কঠিন পরীক্ষা, সে শুধু আমিই জানি। কী করবো ? এ ছাড়া যে আমার আর কোনো পথ ছিল না।

খাতাখানা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলতেই জেলের সাহেবের দু'টি চোখে ফুটে উঠল বিষমভরা প্রসঙ্গ চুষ্টি। মানুষের হস্তাক্ষরের সঙ্গে মূল্যের তুলনা এত দিন কবিরাজোচিত করনা বলেই তার ধারণা ছিল। আজ বসে হল, কথাটার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য মন্তব্য থাকে, তা সামান্যই। হেনার কথার কোনো জবাব না দিচ্ছে তিনি



পাতাগুলো উলটে বেতে লাগলেন। হেনা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কি দেখছেন, আমি জানি।

—কী বল তো?

—খাতাটা ঠিক পথ দিয়ে আমার হাতে আসেনি। ওতে আপনার আফিসের ছাপ নেই।

—তাই নাকি! হঁ, তাই তো দেখছি। কিন্তু গেল কী করে?

—তার জন্মে বা কিছু অপরাধ সব আমার। যে শাস্তি দেবেন, খুসী মনে মাথা পেতে নেবো।

—কিন্তু শাস্তিটা তো তোমার একার পাওনা নয়? আর একজনকে পাচ্ছি কোথায়?

“আরেক জন” এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হেনার সমস্ত মুখখানায় হঠাৎ একরাশ আবার ছড়িয়ে গেল। সেইটুকু লুকোবার জন্মে সে নতমুখে ঠাঁড়িয়ে বইল। একথা আর বলা হল না, আপনার অমুখান মিথ্যা। খাতা আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

জেলর সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি খুব ভালো আল্পনা দিতে পার, না?

—আল্পনা! সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল হেনা।

—হ্যাঁ।

—না তো? আল্পনা আমি কোনো দিন দিইনি।

—তা হবে। খাতাটা খুলে সকলের আগে ঐ কথাটাই আমার মনে হয়েছিল।

হেনা নিশ্চয়ই চোখ নামিয়ে নিল। তার স্মরণ লেখার সুখ্যাতি সে আগেও অনেক শুনেছে। কিন্তু এমন সুন্দর করে তা কেউ বলেনি। একটি লাজনত্র আনন্দের স্নিগ্ধ আলোর তার আনত মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল।

সেদিন জেলর সাহেবের সাক্ষ্য আফিস সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে গেল! বাড়ি ফিরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সংক্ষেপে সেয়ে নিয়ে খাতাখানা হাতে করে বসলেন গিয়ে দক্ষিণের বারান্দায়। প্রথম দৃষ্টিতে যে আল্পনার কথা তাঁর মনে হয়েছিল, সেটা এর লিপি-সম্ভার সৌষ্টব। কিন্তু অক্ষরের ফের পার হয়ে বতই ভিতরে চুকলেন তালুকদার, দেখতে পেলেন, ঐ খাতাটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে যে শব্দা, বেদনা, লজ্জা, লাজনার বিচিত্র আলোখা, সে-ও এক ভাগ্যবিভূষিতা বঞ্চিতা নারীর নিভৃত মনের আল্পনা। শেষ পাতাটি বন্ধ শেষ হল, যেমন তেমন করে বলা এই অগোছালো ইন্তন্ত: ছড়ানো কাহিনীগুলো তিনি মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কত কথা সে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। বারে বারে ‘তার ছিঁড়েছে, হারিয়ে গেছে খেই। সেই না-বলা কথার কাঁকটুকু তিনি ভরে দিলেন নিজের ভাবায়, মমতার স্পর্শ দিয়ে জুড়ে দিলেম তার ছিন্নহৃৎ। এমন করে যে-হেনাকে তিনি দেখেননি, বিভিন্ন পটভূমিকার উপর পড়ে-ওঠা তারই একটি অখণ্ড রূপ তাঁর চোখের সমুখে ভেসে উঠল।

হৃদয়স্থ খুঁসুলা নদী আড়িয়ালখাঁ। তার উত্তর পারে খানিকটা জায়গা দিয়ে অনেকগুলো বড় বড় টিনের ঘর। পাশ দিয়ে

চলে গেছে ধুলোর রাস্তা। নগর নয়, সহর নয়, আশে-পাশের লোকেরা বলে গল্প। নামটা কিন্তু ভয়ানক জমকালো— বাহাহুর নগর। হয়ত: কোনো কালে কাছ-ধারে কোথাও সত্যিকার নগর বসিয়ে রাজত্ব করতেন কোনো রাজা কিংবা নবাব বাহাহুর। তার পর একদিন লেলিহান বসনা বিস্তার করে ছুটে এল আড়িয়ালখাঁ। একে একে গ্রাস করল তার সকল কীর্তি। বাবার সময় উপরে বেথে গেল খানিকটা উচ্চিষ্ট— যাকে বলে চর। তারই উপরে গড়ে উঠেছে এই গল্প। দূর-দূরান্তর থেকে পাল তুলে ছুটে আসে বড় বড় সওদাগরী নৌকা, বয়ে আনে কত রকমের পণ্য—তেল, গুড়, লবণ, তামাক, নারকেলের দড়ি, তার সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার নানা চটকদার বিদেশী বিলাস। ফিরবার পথে নিয়ে যায় এ দেশের সব চেয়ে বড় সম্পদ ধান, পাট, সর্ষে, কলাই। এই বাহাহুর নগরের একটা জীর্ণ ভাঙ্গা ঘাটের পাশে, হাট বাজারের কোলাহল থেকে দূরে ঝুরিনামা বটের ছায়ায় হেনা এসে বসত তার দাদার সঙ্গে। গজের পেছনে, নদী থেকে খানিকটা দূরে জড়াজড়ি করে ঠাঁড়িয়ে ছিল একসার টিনের বাড়ি—খানা, তার পাশে ডাকঘর, ডাক্তারখানা, আর একটু তফাতে রেজিষ্ট্রেশন আফিস। ওদের বাবা ছিলেন ঐ ডাকঘরের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার, সদাশিব মিত্র। বিপত্তীক বৃদ্ধ। সংসারে ছুটি মাত্র তাঁর আসক্তি—একটা পুরানো আমলের গড়গড়া, আর এক সেট

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি পাউন্ড ২৪ টী বড় আকারের

- কলমে প্রস্তুত
- স্ট্রোমে পোকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সর্বত্র বন্ধন করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী  
কলিকাতা - ২৯

বৈকুণ্ঠ-সাহিত্য। আকিসের সঙ্গেই বাসা। খানহুয়েক থাকবার ঘর। উপরে 'টিন, মাটির মেঝে, ছাঁচা বাঁশের বেড়া। বড় ঘরটার মাঝখানে পাটিশান। তার এক দিকে থাকতেন তিনি আর এক দিকে হেনা। ছোট ঘরটাতে থাকত তার দাদা। আকিসের কাজটুকু শেষ হলেই তিনি তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতেন। বাঁ হাতে নল, আর ডান হাতে কখনো বিড়াপতি, কখনো চণ্ডীদাস, কখনো বা কুকদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। একাধারে সরকারী পিয়ন এবং বেসরকারী বাহন শব্দ এসে মাঝে মাঝে কলকে পালটে দিত।

মা বখন মারা যান, হেনার বয়স হবে সাত। দাদা তার বার-স্তের বছরের বড়। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার পর পাশের খবর বেরোল। কিন্তু সনতের আর বেরোনো হল না। জড়িয়ে পড়ল ঐ বোনটিকে নিয়ে। সসায়ে স্ত্রীলোক নেই। শুকে খাওয়ানো পানানো, আগলে রাখা, তুলিয়ে রাখা, সব সনতের হাতে। বেশ খানিকটা বড় হবার আগে পর্যন্ত দাদাই তার চুল বেঁধে দিত। বড় হয়ে বখন নিজের বাঁধতে শিখেছে, তখনো ফিতে কাঁটা নিয়ে মাঝে মাঝে তার ঘরে গিয়ে হাজির হত, চুলটা বেঁধে দাও না দাদা! সনত হয়তো তখন পড়াশুনা করছে। তেড়ে উঠে বলতো, পালা। তার পর কোন কোন দিন হঠাৎ গভীর হয়ে যেত। বোনকে কাছে ডেকে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলত, হ্যাং, মার কথা তোর মনে পড়ে?

হেনার চোখ দু'টো ছলছল করে উঠত, মায়ের কথা মনে পড়ে যায়, দাদার হাতের নিবিড় স্পর্শে। মনে মনে বলত, কেমন করে পড়বে? তুমি ছাড়া আর কোনো মাকে তো আমি জানি না?

মেয়েদের একটা মাইনর ইস্যু ছিল ওদের বাড়ির কাছেই। বইখাজা নিয়ে হেনা সেখানে পড়তে যেত। ভালো ছাত্রী বলে তার নাম ছিল। হেড মিস্ট্রেস সুরমা দি খাতির করতেন, স্নেহও করতেন। মাঝে মাঝে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আলাদা করে পড়াতেন। কিন্তু হেনার আগল খুল ছিল তার দাদার ঘর। কত বই ছিল সনতের। বেশীর ভাগ প্রবন্ধ, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, মহাপুরুষ এবং মনোবিশেষ উপদেশ। একটু বখন বড় হয়েছে, মাঝে মাঝে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করত। ভারী ভালো লাগত শ্রীম কথিত কথামৃত, স্বামিজীর বীরবাণী, ভগিনী নিবেদিতার অপূর্ণ জীবনকথা। কী সব সমিতির সভা ছিল তার দাদা। কোথায় কলেজের গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, কোথায় বস্তার তিন হাজার লোকের আশ্রয় নেই, কোথায় হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গেছে একটা গোটা বাজার, খবর পেলেই দাদা আর তার ছ'চারটি বন্ধু ওষু পস্তর চাল কবল ঘাড়ে করে ছুটত। এমন দিন গেছে বখন হয়তো একনাগাড়ে দশ বারো দিন সনত বাড়ি আসেনি। ভারী ভাবনা হত হেনার। কিন্তু বাবা একটি বারও জানিত হাইতেন না তার কী হল। খোঁজ খবর নেবার কথা বলতে গেলে নিঃশাস ফেলে বলতেন, কিছু দরকার নেই, মা! বখন তার সময় হবে, আপনিই আসবে।

মাঝে মাঝে সনতের কোনো কাজ থাকত না। তখন হেনাকে ডেকে নিয়ে পড়াত, কত গল্প বলত দেশবিদেশের। কোনো কোনো দিন বিকালবেলা সঙ্গে করে নিয়ে যেত সেই ভালো বাটে। বাড়িরালবার কুকের উপর দাদা আকারের নৌকার ভিড়। ওপারে

গাছপালার ঘেরা গ্রামের ছবি। হেনা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। একদিন ওদের সামনে দিগে হুঁধারে ঢেউ তুলে চলে বাচ্ছিল একখানা সুদৃশ্য স্ত্রীম লক্ষ। বোধ হয় কোনো পাটের সাহেবের বাহন। হেনা হাত তুলে বলল, ডাখ দাদা, কী সুন্দর স্ত্রীমারখানা!

সনত কী ভাবছিল। গভীর ভাবে বলল, হ্যাঁ, ওটা হল সামনের সিন্। ওর উপটো দিকটা তেমনি কুঞ্জী।

হেনা বুঝতে না পেয়ে ছাঁট জিজ্ঞাস কর্তৃক তুলে ধরল দাদার মুখের উপর। সনত বলল, আমাদের বারোয়ারী তলার দুর্গা-প্রতিমা দেখেছিল তো? কী চমৎকার দেখতে! পেছনে গিয়ে একদিন উঁকি ঘেরে দেখিস।

—কী সেখানে? প্রশ্ন করল হেনা।

—একগাদা দড়ি-দড়া, নোঁরা বাধানি আর ছেঁড়া চট। ওগুলো না হলে প্রতিমা তৈরি হয় না।

—বাঃ, তা হবে কেমন করে?

—ঠিক তেমনি। ঐ যে স্ত্রীমারটা দেখে তোর চোখ বলসে গেল, ওর একটা উল্টো পিঠ আছে। সেখানে রয়েছে আমাদের কয়েক লক্ষ নোঁরা ভালো ঘর আর ছেঁড়া কাঁথা। তার ওপর মুখ খুঁড়ে খাবি খাচ্ছে একপাল কঙ্কাল। তাদের রক্ত আর মাংস দিয়ে তৈরি হয়েছে ঐ ময়ূরপঙ্খী।

এ কথার কী উত্তর দেবে হেনা! এসব বখন বলত, দাদার মুখে ফুটে উঠত কেমন একটা অদ্ভুত হাসি! সে হাসি দেখলে ভয়-ভয় করে, বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

কোনো কোনো দিন বাড়ি ফেরার পথে গজের ঐ সারি সারি টিনের শেডগুলো দেখিয়ে বলত সনত, আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছা করে জানিস হেনা? ঐ টিনগুলো সব আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিই।

হেনা চমকে উঠত। তারপর আশ্চর্য কল্পণ কণ্ঠে বলত সনত, ঐ আপদ যেদিন আসেনি, কী শাস্তিই না ছিল আমাদের খোঁড়ো স্বপ্নে। রোগ নেই, অভাব নেই, দেশ জুড়ে বলমল করছে আনন্দ। এই চেউ টিনের চেউ লেগে সব ভেসে গেল। হেনার ইচ্ছা হত জিজ্ঞাসা করে, কী করে গেল। কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারত না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সনতই আবার তুলত সে কথা।

কিসে গেল জানিস? ঐ পাট। সাহেবরা আর তাদের দিশী ঢেলারা বলে বেড়ার পাট নাকি বাংলার সম্পদ। সম্পদই বটে! ওরই লোভে রাতারাতি কেঁপে উঠল মাহুগুলো। যেখানে বত ছিল ক্ষেত-খামার, ভিটে, ডাল্লা, সব ভেঙ্গে চষে আঁকের মত ছড়িয়ে গেল পাটের বীজ। পাটের বীজ নয়, সর্বনাশের বীজ। দেশের খাদ্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, তার জায়গায় এল গোঁছা-গোঁছা করকরে নতুন নোঁট। তাই দিগে কিনল ফিলাতী ডেউটিন, জাফাণী আলোয়ান, জাপানী ছাতা আর দিশী কুইনাইনের বড়ি। নোটের বাস্তি আর কদিন? ঐ টিনেও আজ টান ধরেছে। গাছতলা ছাড়া আর গতি নেই। তাই বা কোথায়? গাছ তো গেছে সেই প্রথম চোটে।

বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সনত। পাশের একটা আগাছা জমলের দিকে আঁতুল তুলে বলল, তুই দেখিসনি, হেনা! এইখানে ছিল একটা মস্ত বড় কলমের বাগান। ছেলোঁড়েলার

কত দিন আর কুড়োতে এসেছি। কী মিষ্টি আম! আর তেমনি জাম হত ঐ কোণের দিকে একটা গাছে। গোটা অঙ্কলের ছেলে-বুড়ো খেয়ে ছড়িয়ে শেষ করতে পারত না। তারপর একবার গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে দেখি, সব ম্যাজিকের মত উড়ে গেছে। তার জায়গায় লম্বা লম্বা পাট। ঐ যে এঁদো পুকুরটা দেখছিল, ডালিমের রসের মত জল ছিল। পাট পচিয়ে পচিয়ে ওর ঐ দশা। এই তো সেদিনের কথা। আজ পাটও নেই! পড়ে আছে শুধু আশসেওড়া আর শিয়ালকাঁটার বন।

এতক্ষণে প্রশ্ন করল হেনা, আর পাট বুনছে না কেন?

—দর নেই যে। কিন্তু এদিকে খান-চালের বাজার আগুন।

—এবার তাহলে চালের দাম কমবে, না দাদা? খুসী হয়ে বলল হেনা। ঐ বস্ত্রটির চড়া দর যে একটা সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, সেটা বুঝবার বয়স তার অনেক আগেই হয়েছিল। সনত সায় দিল না, তেমনি চিন্তিত মুখেই বলল, তা আর হয় না। এ বড় মজার জিনিষ। একবার চড়ে বসলে আর টেনে নামানো যায় না।

—কেন?

স্বিচ্ছ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে যুহু হেসে বলত সনত, বড় হ; লেখাপড়া শেখ। তারপর নিজেরই বুঝতে পারবি।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল হেনা। ইস্থলে যায় আসে। সঙ্গী, সাথী বলতে ঐ দাদা আর তার লাইব্রেরী। সমবয়সী মেয়েরা খেলাধুলা ছুটোছুটি করে। ও থাকে এক পাশে। ওদের সঙ্গে কোথায় যেন ওর মস্ত বড় অমিল। মনের মধ্যে কিসের যেন অস্থিরতা। চারদিকের অভাব, দৈন্য, রোগ শোক। এর কি কোনো শেষ নেই? আছে বৈ কি? একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন মাহুকের কোনো দুঃখ থাকবে না। কবে কেমন করে আসবে সেদিন, এই তার চিন্তা। মেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলে। আড়ালে ঠাটা-বিক্রপ করে। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। মোটামুটি স্বচ্ছ পরিবারের স্বাভাবিকতা মেয়ে। নিতান্ত ছোটটি নয়। সেকথা তাকে কেউ মনে করিয়ে দেয়নি। নিজের সম্বন্ধে এখনো যেন তার ঘুম ভাঙেনি। নিজের দেহ এবং দেহ-সজ্জার দিকেও চোখ পড়েনি। এমনি সময়ে একদিন ছুটির পরে তার ডাক পড়ল হেড মিস্ট্রেস ইরমাদির ঘরে। দু'-একটা মাহুলি কুশল প্রশ্নের পর তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাড়ি নেই, হেনা?

—হ্যাঁ; আছে তো। এবার পুজোর একটা সুন্দর সাড়ি দিয়েছেন বাবা।

—বাবাকে বলো, আরো সাড়ি কিনে দিতে। কাল থেকে আর ব্রুক পরে এসো না, কেমন?

—কেন? বলেই অকস্মাৎ কিসের লজ্জার হেনার সমস্ত দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। যুহুর্ভের মধ্যে খুলে গেল তার দৃষ্টির আবরণ। এ যেন নিজেকে নিজের আবিষ্কার। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় কেন যে লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেন যে বকুরা গা টেপাটিপি করে নিজেকে মধ্যে, আর তাকে দেখলেই চুপ করে যায়, সব যেন অদ্ভুতভাবে হঠাৎ জলে-ওঠা বিদ্যুৎ-শিখার মত তার চেতনার মধ্যে চমক খেলে গেল।

প্রথম সাড়ি পরে দাদার ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করতই কৃত্রিম বিশ্বের টেচিয়ে উঠল সনত, আরে, হেনা! আমি ভাবছিলাম এ আবার কোন ভয়মহিলা এলেন আমাদের বাড়ি?

—রাও, বলে মাথা নীচু করে পাড়াল হেনা। কুয়াসা-মুক্ত অরুণাভাসের মত তার মুখে সেই লজ্জার স্পর্শটুকু সনতের চোখেও নতুন লাগল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বসল, হঠাৎ আজ পোষ্টামের ঘটনা কেন?

—বাঃ, ঘটনা আবার কিসের? নতুন কাপড় পরলাম, তাই।

—ও-ও, আমি মনে করেছিলাম, এটা বুঝি নোটিশ।

—কিসের নোটিশ! ভ্রু কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল হেনা।

—নোটিশ, মানে, তোমাদের বাড়ী আস পোষাছে না, চললাম এবার নিজের ঘরে।

—তুমি ভারী অসভ্য হয়েছ দাদা! বলেই পালিয়ে গেল নিজের ঘরে।

এই যে নবজন্মের আশ্বাদ এল হেনার মনে, খাতার পাতায় তার একটুখানি আভাস দিয়েই সে চলে গেছে অল্প কথায়! তালুকদার সাহেবের মানস চক্ষে সেই ছবিটি স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তিনি তো জানেন, এ হচ্ছে সেই চিরবহুতময় বয়ঃসন্ধি, যখন নিজেকে দেখে নিজেরই বিশ্ব লাগে। মনে হয়, যেন ঘমিয়েছিলাম, রাতারাতি জেগে উঠে দেখি, আরেক দেশে এসে পড়েছি। যা কিছু দেখছি, তাই রঙীন, তাই স্বপ্নময়। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ অবাক হয়ে দেখে, তাদের সেই কীদাসী চকল, কিশোরী মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেল। তার জায়গায় যে এল তার প্রতি অঙ্গে দেখা দিয়েছে জোয়ারের জাগরণ। শুধু তনুরেখায় নয়, পূর্ণতার নবরূপ এসেছে তার গতিতে, তার চলার ছন্দে, তার কণ্ঠে তার হাব-ভাব লীলায়। যেখানে যেখানে সে বড়ের মত এসে পড়ে না। যখন তখন শোনা যায় না তার উজ্জল হাসির কলধ্বনি। চোখের দিকে তাকালে চকিত লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। একলা বসে ভাবে, কিন্তু ভেবে পায় না কী করবে তার নতুন-পাওয়ার নিজেকে নিয়ে, কোথায় রাখবে তার এই হঠাৎ ভরে ওঠা লাভাণ্যের সম্ভার। নিঃশব্দ ঘরের জানালা দিয়ে স্বপ্নময় দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয় দূরে-দূরান্তরে! কী দেখে সে জানে না। কথায় কথায় সে আনমনা। কারো ডাক শুনে চমকে ওঠে। অকারণে বুক ছাপিয়ে ওঠে উদ্বেল আনন্দে। কখনো বুক ভেঙে আসে অব্যক্ত বেদনায়। কেমন করে জানবে সে, কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে বিদায় নিয়ে গেল তার কৈশোর, স্বপ্নের কানে কানে এসে গেল রোবনের লিপি।

দেহমনের এই রূপান্তর বিশ্ব প্রকৃতির দান। সব মেয়ের জীবনেই আসে। হেনারও এসেছিল। কিন্তু এই নিতান্ত সহজ বস্তুটি যদি কোনো বিশেষ রূপ নিয়ে থাকে তালুকদারের চোখে, তার কারণ, এই মেয়েটির জীবনে এটা শুধু আবির্ভাব মাত্র। এল, কিন্তু প্রত্যাশিত পরিণতির পথ দিয়ে তাকে সার্থকতার নিয়ে গেল না!

[ক্রমশঃ।

[ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## প্রয়াসী

রুখনের নেতৃত্বে একটা ডাকাতি করেছিল অশেষ। শ্রীমন্তদার অধীনে আবও গোটা দুই ডাকাতি করার পর তার স্বপ্ন সফল হল। তাকে নেতা করে শ্রীমন্তদা পাঠালেন খাজনার গাড়ী লুণ্ঠ করতে। প্রান হবে তার নিজস্ব, নিজেরই পড়লে সে সুকুমার আর রমেনকে সঙ্গী হিসাবে নিল। এ বিরাট দাঙ্গার অর্থ সে জানে—যদি কো ভুল হয়, যদি কোন গোপন তথ্য পুলিশের কাছে কঁাস হয়ে যায়, তাহলে শ্রীমন্তদা নিজের হাতে তাকে শাস্তি দেবেন—সে শাস্তি মৃত্যু-দণ্ড পর্যন্ত হতে পারে—কোন স্নেহের দুর্বলতা তাঁকে তাঁর কর্তব্য হতে বিচলিত করতে পারবে না। আশ-পাশের পনেরো-কুড়িটা গ্রামের গভর্ণমেণ্টের খাজনা তুলে নিয়ে যাবে বোড়ার গাড়ীতে। একটুখানি পথ, তারপর ট্রেনে তুলে দেবে। দারিদ্র নিয়ে যাবেন বেশী রেভিনিউ অফিসার তারক সোম—সাংবাদিক লোক একটি। সব টাকা কালেক্ট করে নিজের গ্রামের বাড়ীতে রেখেছেন, সেখান থেকেই রওনা হবেন, সঙ্গে থাকবে দু'জন চৌকীদার আর কোচম্যান রহিম। তারক বাবুদের বাড়ীটা অশেষদের গ্রামের প্রায় আট-দশটা প্রায় ছাড়িয়ে।

কি উপলক্ষ্যে তারক বাবুর বাড়ীতে একটু খাওয়া-দাওয়া ছিল—বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। অবশ্য ভোবের মেলে যাবেন, অনেক সময় আছে—অনুবিধে কিছু নেই। আর পথও সামান্য—তাই দু'দশীদের ভরটাও নেই। বর্ষাকাল আকাশ ভরা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, অল্প ঝুড়ি পড়ছে, বেশ অন্ধকার। অনেক খবর সংগ্রহ করেছে অশেষ। তারই দু'টির ওপর তার প্রান গড়ে উঠল। এক—তারক সোমের সাত মেয়ে পর এক ছেলে—ভীষণ আতুরে। আর রহিমের একটি মাত্র মেয়ে মমতাজ—বুড়ো বাপের কলিজা।

সবর রাস্তাটা চলে গেছে দৈশনে। বোড়ার গাড়ীতে পাঁচ মিনিটের পথ, রাস্তা নাটির রাস্তা—বর্ষায় বেশ জখম হয়েছিল, অশেষ, সুকুমার আর রমেন সজ্জা হতে গা ঢাকা নিয়ে ভারী গোড়ার দিকে ঝপাঝপ কোদাল চালিয়ে গোটা চারেক বিরাট গর্ত করে দিল—কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে গেল। কোদালগুলো রমেন দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে রইল—সুকুমার আর রমেনের পরনে লুঙ্গী, মুখে দাড়ী, খালি গা, কোমরে ভোজালি—যদি প্রয়োজন হয়। এক সময় শোনা গেল বোড়ার খুয়ের শব্দ। অন্ধকারে ঠাণ্ডা করে দেখল ওরা এগিয়ে আসছে, গাড়ীটার

দরজাগুলো বন্ধ, কোচবাক্সে রহিম আর একজন চৌকীদার আর পেছনে একজন। প্রথম গর্তটা পার হতে গিয়ে যে বিরাট কঁাকানি লাগল তাতেই ভেতর থেকে ভারক বাবু চীৎকার করে উঠলেন।

“কি করছিস রে ব্যাটারী? মেয়ে ফেলবি নাকি?”

এরাও ভর পেয়ে গেছে—তার সামনের জলভরা আরও ক'টা গর্ত দেখে আর এগুতে সাহস করলো না। রহিম চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল—“রাস্তা যে বড়ই জখম হইছে কতটা, বোড়া বাতি লাগব, বনের পথে চলি? কি কন?”

—“তাই চল, একটু ঘর হবে, সময়ও আছে।”

এই চাটছিল অশেষরা—একটু সময় না পেলে কি কাজ হয়?

বনের পথে ধীরে ধীরে চলল গাড়ী, অশেষরাও একটু তফাতে থেকে অনুসরণ করতে লাগল। বেশ একটু বখন এগিয়েছে লোকালয় ছাড়িয়ে; ঠাণ্ডা অশেষ ছুটেতে লাগল, একটু পরেই চীৎকার—

—“ও, চাচা, গাড়ী খামাও গো, ও চাচা, বাবুর বাড়ী বড় বিপদ, ও চাচা শুনছো।”

বিস্তিত রহিম গাড়ী খামাল—তারক বাবু দরজা কঁক করে মুখ বাড়ালেন। অশেষ তখন এসে পৌঁছেছে, হাঁফাচ্ছে—মাথার গায়ে চান্দর জড়ানো, মুখ প্রায় দেখা যায় না, সেই পুরোনো ক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়েছে সে—গলার স্বরটা বদলে ফেলেছে।

তারক বাবু প্রশ্ন করলেন—“কি হয়েছে?”

অশেষ হুঁ চোখ কপালে তুলে ফেললো—

—“তুমি তো তারক বাবু, তোমার ছেলের কলেরা হয়েছে যে গো, ধাত ছেড়ে গেছে; তবু বাবা ‘বাবা’ করে হেঁদুচ্ছে। দেখবে তো শীগগির এস।”—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুসে উঠল—প্রশান্তর কলেরা—হতে পারে, দু-একটা হচ্ছে—তাকে খুঁজছে প্রশান্ত। তারক বাবু চঞ্চল হয়ে ওঠেন—তবু প্রশ্ন করেন—“তুই কে, কি করে জানলি?”

অশেষ তড়বড় করে—“আমার বাড়ী তো সেই বর্ধমান, আমার বাবার লোকান আছে যে এই গেরামে, আমি এসেছি তার কাছে। তোমার বাড়ীর যে লোক খবর দিতে এসেছে, সে তো বমি করে পথের ধারে মাটি নেছে—আমি যুঝছি—ডেকে তুলে তোমার খবর দিতে পাঠাল। যাবে তো চল শীগগির, পায়ে হেটেই বাওরা ভাল, যা রাস্তা হয়েছে গাড়ীর থেকে পা চলবে তাড়াতাড়ি।”

খুব সত্যি কথা, এক মুহূর্ত দ্বিধা করেন তারক বাবু—চৌকীদাররা, রহিম সবাই বিশ্বাসী, একবার প্রশান্তকে—ডাক্তারের ব্যবস্থা—“ওরে তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি।” তারক বাবু হনহন করে এগোল, অশেষও সঙ্গে যায়, তারপর খানিকটা গিয়ে—“ও মা গো, পায়ে যে কাঁটা ফুটলো” বলে বাস পড়ে। আবার বলে—

“তুমি ঠাণ্ডিওনি বাবু, ফলে যাও, আমি পরে বাব।” তারক বাবু অদৃষ্ট জন। গাছের আড়াল দিয়ে সুকুমার আর রমেন ততক্ষণে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই সবাইকে চমকে দিয়ে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

“ও বাপজান, তুমি কুখা গেলে গো! আমি যে তোমার লগে আইতাম জীঘায়ে কিছু দেখতে নাতি গো!”

রহিম উঠে পড়ে—“আমার বেটীর গলা না। এই যে বেটা আমি, কাদিস না।” বলেই চৌকীদারদের হতভম্ব করে দিয়ে লাফিয়ে



যুকের দুই হাজারের  
সমস্যা থেকে  
আমার মুক্তি দিয়েছে

# নেস্টাম

যব, গম প্রভৃতি শস্তচূর্ণের সংমিশ্রণে  
তৈরী আদর্শ শিশু-খাদ্য। নেস্টাম  
শিশুর অম-প্রত্যঙ্গ গঠনের পক্ষে  
অপরিহার্য উপাদানগুলো  
ব্যাপরিমাণে হুগিয়ে স্বাভাবিক-  
ভাবে তাকে পুষ্ট করে।

- রান্না করতে হয় না
- সহজেই মিশে
- পরিণাক যন্ত্র  
সবল করে



নেস্টাম দিয়ে পিঠে, কেক প্রভৃতি নানা উপাদেয়  
খাদ্য তৈরী করা যায়।

বিমানমূলের্য পুতিকার ভস্ত লিখুন:

**নেসেল্‌স্ প্রডাক্ট্‌স্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ**

গোঃ অঃ বস্ত ৩১০, কলিকাতা • গোঃ অঃ বস্ত ৩১০, বোম্বে

গোঃ অঃ বস্ত ১৮০, মাদ্রাস



চলে যায়। কি করে যে মেয়ে এখানে আসবে এ প্রশ্নও মনে আসে না তার পিতৃস্নেহের আধিক্যে। আর সেই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে হুঁজন—পলকে বলিষ্ঠ হাতে মালেরিয়া-জরুরিত চৌকীদার দুটোকে মাটিতে শুইয়ে ফেল মুখে কপড় গুঁজে দেয়, বৃকে চেপে বসে ভোজালির কোণ হোঁয়ায় বৃকে। ওদিকে স্নেহ-অঙ্গ পিতার ডাক শোনা যায় দূরে “কোথা গেলি গো বেটা মমতাজ।”—বেটা তখন অশেষ হয়ে গাভার ভেতর—তুলে নিল সিলকবা বাস্কাটা—ছুটতে লাগল বন দিয়ে—একটু দূরে গিয়ে ছইসিল দিল—সঙ্গে সঙ্গে চৌকীদারদের ছেড়ে নৃদি তুলে অঙ্গ হুজনও লাফ দিয়ে পালাল। একটু পরে ব্যাপারটা বৃকে বুখাই চৌকীদাররা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক। রহিম যখন বৃকল মমতাজ সেখানে নেই, তখন বুখাই সে নিশির ডাক ভেবে নিদারুণ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। আর তারক বাবু নিশ্চয় ঘুমন্ত বাড়ার দোর ঠেলিয়ে সবাইকে ডেকে তুলে যখন বৃকলেন সব মিথ্যা, তখন বুখাই দৌড়োলেন গজরাতে গজরাতে—“দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা হতভাগাকে।”

হতভাগারা তখন ভোল পাণ্টে ভদ্রলোক সঙ্গে সাইকেল চালিয়েছে জোর কদমে। শ্রীমন্তদা'র কাছে সিল ভেঙ্গে টাকা হবে গোপা, কাঠের বাস্কা উন্নতের রসদ যোগাবে। কাল-পরসুর মধ্যে আশ-পাশের দশ-বিশটা গ্রামের বাছা-বাছা বাড়ী তোলপাড় করবে পুলিশ কিন্তু কোন নিশানা পাবে না। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তারক বাবুর হবে প্রাণান্ত, চাকরী নিয়ে পড়বে টানাটানি—ভালই হল, এক ঢিলে দুই পাখী বাজিয়াং।

আরও একটা বছর কাটলো। কত গোপন বৈঠক হয়, কত ছেলের ওপর কাজের ভার দেন শ্রীমন্তদা', মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করে তারা—কখনও ফেরে, কখনও ফেরে না। লোলুপ দৃষ্টিতে চেষ্টা থাকে অশেষ, কিন্তু বিপ্লবী দলের ছেলে, বৃক ফাটলেও মুখ ফোটে না। শেষে এক দিন এল বহু প্রতীক্ষিত দিন—কলকাতার দারুণ অত্যাচারী এক সাহেব, শিকার করতে যাচ্ছেন খবর পাওয়া গেল—আনন্দ করতে। অনেক বিপ্লবী তাঁর অত্যাচারে মৃত্যু বরণ করেছে, এবার তাই তাঁর পালা। তার পড়ল অশেবের ওপর, নির্দেশ পাওয়া গেল ধরা কোন মতেই দেবে না। যদি পালাবার সুবিধে না থাকে, বাস্তু হবে না, পকেটে রইল পটাশিয়াম সাইনাইড—হাতে রইল রিভলবার। সহকর্মী চলল গোপাল।

সেই বনে এসে তারা কাঠুরের বেশে আস্তানা গাড়ল। দিন দুই গেল, সব কিছু দেখে-শুনে পথঘাট চিনে নিল ওরা। চিনে নিল লালমুখো সাহেবটাকে—যা ওদের লক্ষ্য। তৃতীয় দিন দুপুরে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। সাহেবের একটা বয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল মাপুনি-আজ্ঞে করে, খাতির দেখিয়ে। তারই কাছে জানা গেল, সাহেবের শরীর খারাপ—শিকারে বাবেন না, অস্ত্রা বাবে। এত বড় সুযোগ আর আসবে না। অশেবরা তৈরী হয়ে রওনা হল—তখন দুপুরবেলা। পোষাক তাদের ছেঁড়া-খোঁড়া, হাঙ্গা ছদ্মবেশ। তাঁবুর দক্ষিণে কিছুটা দূরে একটা পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। গোপাল ইট-পাথর চটে বেঁধে একটা পুঁটলী করে রাখল। তার পর দুই বন্ধু আলিঙ্গনে বদ্ধ হল। অশেব হেসে বলল—“চললুম গোপাল, যদি আর না ফিরি তো এবার

এমনি হেলাভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দেয় বিপ্লবী। তাকে হারিয়ে শুধু গ্রামের ফুটবল টিমের ক্ষতি হবে, আর কিছু না। তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল। গোপালের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে—অশেবহীন খেলার মাঠ, অশেবহীন অভিনয় কল্পনা করা যায় না।—অশেষ তখন পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

তাঁবুর এলাকায় এসে পড়ল অশেষ—অদ্ভুত ভাল সুযোগ—সাহেব বাইরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছেন, সামনে টেবিলে ছইসির বোতল, গেলাস। আর কেউ নেই—চাকরদের তাঁবু থেকে অল্প কোলাহল ভেসে আসছে। সাহেবের কোমরে রিভলবার থাকতে পারে—থাক, ওটুকু ঝুঁকি না নিলে চলবে কেন? অশেষ সামনে এসে দাঁড়াল—পকেট থেকে রিভলবারটা তখন হাতে নিয়েছে—আরও কাছে এগিয়ে গেল; আর মাত্র চার পাঁচ হাতের ব্যবধান—সাহেবের হাতের বইএর ওপর তার ছায়া পড়েছে—চমকে চোখ তুলে তাকালেন সাহেব—আর পরমুহূর্তে টিগার টিপল অশেষ—এক...দুই...তিন...কিছুই করা হল না সাহেবের—চেয়ার থেকে চলে পড়লেন...সামনের টেবিলটাও সেই ধাক্কায় ওন্টাল—ছইসিতে আর রক্তে মিশে গেল। এক নিমেষে চারদিক দেখে নিল অশেষ—রিভলবারের আওয়াজে চাকরদের কোলাহল থেমেছে—এখনি বেরিয়ে ওরা সব বৃকতে পারবে—তার আগেই—বাঁ হাতে পটাশিয়াম সাইনাইডটা ধরে দক্ষিণের পুকুরটার পথে অদৃশ্য হল অশেষ। একটু পরেই পেছনে শুনলো বহু পাসের শব্দ—আর কোলাহল—অশেষ গতিবেগ বাড়ালো—গোপাল গুলোর আওয়াজ হতেই বোঝাটা হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—অশেষ কাছাকাছি আসতেই প্রাণপণ বলে সেটা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলল—তারপর আঁকাবাঁকা বনের পথে অদৃশ্য হল হুজনে। দূর থেকে শুনলো পদশব্দ আর শোনা যায় না—কোলাহল আসছে পুকুরঘাট থেকে—সার্বক প্রচেষ্টা—ভ্রান্ত হয়েছে অনুসরণকারীর দল—ইটের বোঝা ফেলার শব্দে ভেবেছে আততায়ী পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর ভাবনা নেই—ওরা যখন ভুল বৃকতে পারবে, তখন এরা এ তল্লাট ছেড়ে গেছে—ভোল ফেলেছে পাণ্টে।

এর পরেই কিছু গ্রামে ফেরা হবে না—সাহেবের মৃত্যুর আগে অল্পপস্থিতি আর মৃত্যুর পরই উপস্থিতি—সন্দেহ হবে পুলিশের। দুই বন্ধু মাস কয়েক ভাল মানুষের মত দেশ ভ্রমণ করে বেড়ালো। শ্রীমন্তদা'দের সঙ্গে সব সংগ্রহ ছিন্ন—পাছে সন্দেহ হয়। শেষে একদিন ফিরলো। শুনলো শ্রীমন্তদা' কলকাতায়—আজ ফিরবেন। আরও খবর—মাসখানেক আগে জেল থেকে খবর আসে—ইঠাং রক্তনের গ্যালাপিন টাইপের টি, বি, হয়েছে—রক্তনের বাড়ীর লোক, শ্রীমন্তদা' চেষ্টার ক্রটি করেন নি—কিন্তু কিছু হোল না—ক'দিন হল সে চলে গেছে চিরতরে—শেষ ক'দিন সে বার বার অশেবকে দেখতে চেয়েছিল। বজ্রহতের মত দাঁড়িয়ে রইল অশেষ। তারপর বাড়ী ফিরে এলো। শ্রীমন্তদা' ফিরবেন জেনেও সন্ধ্যায় সে ছুটলো না—শুয়ে পড়ল। সহসা বিপ্লবীর কাঠিন্দের আবরণ ভেদ করে সার্বশরীরটা তার কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠলো—বালিশে মুখ ঢেকে অশেব কানতে লাগল—যেমন করে একদিন কেঁদেছিল শৈশবে—রা মারা

দেখতে চেয়েছিলে তুমি... দেখা হল না একটি বারও!—শ্রীমন্তদা' তার পাশে বসে মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন,—“অশেষ!”

চমকে উঠলেও কান্না থামাতে পারল না অশেষ—শ্রীমন্তদা'রই কোলে মুখ লুকালো সে—কান্নার বেগটা গেল বেড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শ্রীমন্তদা' বললেন—“কাদিসনি অশেষ, রজন চল গেল, তার অসমাপ্ত কাজ যে তোকেই সমাপ্ত করতে হবে ভাই! আর রজন-সেতাই গেছে—ও বেঁচে থাকবে চিরকাল—ভারতের শহীদ মানুষ বলে কত সম্মান করবে পূজা করবে। এই তো আমাদের পুরস্কার রে।”

আরও বছর খানেকের মধ্যে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল—অসংখ্য হত্যা আর ডাকাতি—পুলিশ দিশেহারা হয়ে থাকে পেল তাকেই জেলে পুরে ফেলল। তার মধ্যে শ্রীমন্তদা'রও সবাই গেলেন—শুধু অশেষ ও আরও কয়েক জন বাইরে রইল। সব কাজের ভার অশেষ নিজের কাঁধে তুলে নিল এবার। বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার একেবারে উবে গেল। উদ্ধার বেগে সে বাংলা ও বিহারের গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ছুটোছুটি করে শ্রীমন্তদা'র অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার আশ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে অসংখ্য দল গড়ে তুলল—বিপ্লবের বক্সি এতটুকু নিবতে দিল না। পুলিশ এবার তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল—আই, বি, পুলিশের ধ্যানে জ্ঞানে একটি মাত্র নাম—অশেষ মুখোপাধ্যায়—যারা যেখান থেকে পার—যেমন করে পার। পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে

অশেষ—আজ শুনলো পুলিশ—অশেষ মুখোপাধ্যায় অল্পক গ্রামে এসেছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেল আই, বি, অফিসার দলবল নিয়ে ভুঁড়ির ওপর বেন্ট আঁটতে ধাঁসকাঁস করতে করতে ছুটে এলেন, কোথায় কে? অশেষ হয়তো তখন মাঝি সঙ্গে নৌকো ভাসিয়েছে অথবা সাহেব সঙ্গে পাটনার ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় হেলান দিয়ে বসে ওলটাচ্ছে ইংরেজী নভেলের পাতা। পুলিশের ইনট্যালিজেন্সট ব্রাঞ্চকে বুদ্ধির খেলায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল সে।

এর মধ্যে অশেষ খবর পেলো বিয়ে হয়ে গেছে শাস্ত্রির, বেগুর, সুনীলেরও। কোনটোতেই সে থাকেনি। মামীমা কত দুঃখ করেন। কত ছেলেকে বলেন—“ওরে একবার তাকে আসতে বলিস।” তাদের সঙ্গে দেখা হলে কখনও অশেষ শুনতে পায়, কখনও পায় না। শুনতে পেলোও যাবার উপায় নেই—কুজ গৃহের অর্গল সে ভেঙেছে—সারা দেশে তার ঘর, স্নেহনীদের বাধন তো তার জন্ত নয়। একদিন খবর এলো মামা মারা গেছেন। মুহূর্ত্তেই ভক্ত মামীমার জন্ত মনটা হলে ওঠে—আবার কাজের চাপে তুলে যায়। তারপর একদিন শুনলো মামীমার খুব অসুখ। বিপ্লবীর দৈর্ঘ্য বাঁধ ভাঙে—কুজ গৃহকোণ হাতছানি দেয়। রাতের অন্ধকারে গাঢ়াকা দিয়ে হুঁবছর পরে বাড়ী ফিরল অশেষ। খিড়কীর পথে বাড়ী ঢুকে, মামীমার ঘরের দাওয়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে। বোধ হয় সবাই হুমোছে। দাওয়ার সুনীল বসেছিল, প্রসন্ন করল, “কে?”



সুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার  
.....  
**গিনি  
ম্যানসন**  
.....

জুয়েলার্স

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনম্যান” \* ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহ :

খড়বাবুর বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থানি মার্ট, বালীগঞ্জ, ফোন : ৪৬-১৪২৫

বড়ল! প্রমাদ গুলো অশেষ। তবু বলল “বড়ল! আমি, অশেষ।”

অশেষকে বিমূঢ় করে দিয়ে সুনীল সম্মুখে বলল—“অশেষ! আর ভাই, মা তোকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। আর, পাড়িয়ে রইল কেন?”

বড়লার পেছন পেছন অশেষ তজ্জাচ্ছন্ন মামীমার শয্যাপাশে এসে পাড়াল, ডাকল—“মামীমা!”

চমকে চোখ মেলে অশেষকে দেখে হুঁহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঝর-ঝর করে কঁদে ফেললেন মামীমা—“অশেষ! তুই! এত দিনে মনে পড়ল বাবা! কি চেহারা হয়েছে রে! ও সুনীল, বৌমাকে বল ওর ভাস্ক্রে খাবার আনতে।”

অশেষ বলল—“আমার জন্মে ব্যস্ত হতে হবে না মামীমা, তোমার অন্তর তুলে দেখতে এলাম। কিন্তু আমি এসেছি কেউ বেন না টের পায়—পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার।”

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। গ্রামের সবাই দলে দলে দেখা করতে আসতে লাগল—গ্রামের ছেলে এত দিনে বাড়ী ফিরেছে—তার কি না এসে পারে?

তার ফলে পরদিনই এক আই, বি, অফিসার দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন—ঝাড় লোক, নাম শুনেছে অশেষ। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল। মুহূর্তে জেলে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হল অশেষ। তারপর হেসে আহ্বান জানালো—“এই যে আহ্নন মিঃ সেন, সত্যি এত দিন আপনাদের হয়রাণ করার জন্য হুঁগিত আমি। আপনাদের অনেকের প্রমোশন বোধ হয় বন্ধ করে রেখেছি ভাই না? চলুন, আর দেবী কেন? রাজঅতিথি হবার জন্যে প্রস্তুত আমি। দেবী হলে আবার যদি পালাই, আপনার গ্রেড বাড়বার স্বপ্নটি এবারও ভাঙবে কি শেষে?”—

নিবিকার ভাবে কথাগুলো হজম করলেন মিঃ সেন, তারলেন একবার পুরি আমার ডেরায়, তারপর বাছাধনকে দেখাচ্ছি—অশেষের আগমন সবাদের মতই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গ্রেণ্ডারের সবাদটাও। সারা গ্রাম ভেসে পড়ল তাদের বাড়ীতে। অস্থস্থ মামীমা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন—“কেন এলি অশেষ, কেন এলি তুই আমার দেখতে?”

তাকে চাপা গলায় সাঙ্কনা দিল অশেষ—“কেন না মামীমা, ছিঃ, পুলিশের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ কি তোমার সাজে?” তারপর হেসে উঠল—“এই বা কেমন আবদার বাপু, রাজার বাড়ী রাজভোগ খেতে দেবে না একবারও!—দিগন্তব্যাপী হাহাকারের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলল অশেষ—সশস্ত্র পুলিশবেটনার মাঝে। স্কক হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

তুখু সেনের স্বেচ্ছায় নয়, অনেক আই, বি-পুত্রবের সঙ্গেই মোলাকাৎ হল। মিষ্টি কথা—‘বাবা’ ‘বাবা’—অর্থের প্রলোভন—কিছুতেই বধন অশেষ কোথায় তাদের দলের বিভ্রালবার আর ইস্তাহার লুকোনো থাকে এই ‘তুচ্ছ’ কথাটা বলে দিল না, তখন শাস্তিস্বরূপ সম্মুখ সমরে আহ্বান জানালেন তাঁরা—অবশ্য একতরফা—পরখ করে দেখলেন কত শক্ত হতে পারে কুড়ি বছরের ভেতো বাঙ্গালীর হাড়—কত তার সহ-শক্তি। পরীক্ষা দিলও অশেষ—শক্তি ও চৈতন্যের শেষ বিমূঢ়ি ধর না হওয়া অবধি স্থির হয়ে উন্নত মস্তকে

পাড়িয়ে রইল বিভিন্ন রকম অত্যাচারের সামনে, তারপর একসময় সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। খাঁটি ইম্পাত—ভেঙ্গে গেল—তবু মচকালো না। এর পর রাজবন্দী হয়ে অনেক জেলে ঘোরা হল—কোথাও কিন্তু শ্রীমন্তদার সঙ্গে দেখা হল না। কোথাও শোনে এক মাস আগে তিনি বদলী হয়ে গেছেন, কোথাও শোনে মাত্র দুদিন আগে। প্রথম দু’চারদিন খারাপ লাগল—বাইরের কর্ম-চকল জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—কিছুতেই মন বসে না। তারপর এই পরিবেশেই সে অভ্যস্ত হয়ে গেল—এখানকার খেলা, প্যারেড, অভিনয়, হাতে-লেখা পত্রিকা—সবতেই সে অগ্রণী হয়ে এগিয়ে গেল। পরিবর্তে পেল অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অফুরন্ত ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি ও মমতা। কাটতে লাগল দিন। একদিন বড়লার চিঠিতে জানলো মামীমা আর নেই। আজ আর কাল পেল না অশেষের—স্কোভের হাসি হাসল সে—যাক, সবাই তাকে মুক্তি দিয়ে গেল একে একে—কোন বন্ধন আর তার রইল না পৃথিবীতে। আই, বি, পুলিশ নতুন চাল চালতে অনেক বন্দীকে মুক্তি দিল—স্বগৃহে অন্তরীণ করে। অশেষেরও ‘একদিন ছাড়পত্র মিলল—তিন বছর পরে।

গ্রামে পা দিয়েই শুনলো শ্রীমন্তদা বাড়ীতে আছেন। তখন ছুটলো সে। ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল—শ্রীমন্তদার বিশাল দেহটা মিলিয়ে গেছে বিছানার সঙ্গে। আগের মতই নির্মল হেসে আহ্বান জানালেন শ্রীমন্তদা—“আয় অশেষ, আমি জানতাম তুই ছাড়া পোলেই ছুটে আসবি, আর, কত দিন দেখিনি রে তোকে!”

নিশেপ্রে প্রণাম করে পাশে এসে বসল অশেষ। ক্রমে ক্রমে শুনল বিনা সর্গে শ্রীমন্তদাকে মুক্তি দিয়েছে গভর্ণমেন্ট—ওধু একটি নিত্যসঙ্গী দিয়েছে—দুর্যোগ্য রোগ ক্যানসার। অশেষের স্নানাহার বন্ধ হল। শ্রীমন্তদাকে বাঁচাতেই হবে যে। তার ওপর আছে বাপুয়ের কাজ—এতদিনের অল্পপস্থিতির ক্রটি পূরণ করতে হবে। এক মাসেই পুলিশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল—কিন্তু কোন ছুতো পায় না যে গ্রেণ্ডার করবে অশেষকে। অদ্ভুত কৌশলে অশেষ পুলিশের সব সর্গ মেনে চলার ভাগ করতে লাগল। শত চেষ্টাতেও কিন্তু শ্রীমন্তদাকে ধরে রাখা গেল না—মাস তিনেক পর মহাপ্রয়াণ করলেন তিনি। আর তার পরদিনই একটা যড়যন্ত্র মামলার অশেষের নাম চুকিয়ে তাকে হাজতে পুরে পুলিশ আক্রোশ মেটালো। মামলাও একতরফা—কিছুই হল না—অনেক বিপ্লবী বছর সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য কয়েদে ঢুকলো অশেষ। এবার আর রাজবন্দী নয়—তাই খাওয়া-শোওয়ার উপকরণের বাছল্য নেই—শয্যা ছিন্ন, দুর্গন্ধ কবল, পরিধেয় ছোট প্যাণ্ট আর কোর্টা, আহাৰ্য্য ক্ষুদ্র সেক, পুইউঁটার খ্যাট, কাজ—ডাল ভাঙ্গা, হাপর টানা। জীবনের সে অধ্যায়ও একদিন শেষ হল—বাইরে এসে দাঁড়াল অশেষ—কিন্তু মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার আগেই আবার গ্রেণ্ডার—বেথেছে মহাসমর—নিরাপত্তা বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

এমনি করে বিভিন্ন রকম বন্ধনদশার মধ্যে কখন বে কেটে গেল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ন’দশটা বছর—টেরও পেল না অশেষ। কত রকম পরিস্থিতি, কত রকম পরিবেশ, কখনও প্রাচীরবেদা প্রাক্ষণে অবাধ বিচরণ, কখনও স্বগৃহে আবার কখনও অন্ধকোণে গ্রামে অন্তরীণ, আবার কখনও বা মোটা লোহার গরাদেয় ক্ষুদ্র একাকোণে

করেন। বাটরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু খবরের কাগজ মাধ্যমে। কি পরিবর্তন এলো দেশে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাই হইল না তার। তারপর একদিন রণকোলাহল স্তিমিত হয়ে এলো—তারন্তের আকাশ-জাভাসে বাজলো স্বাধীনতার তৈববী মুর—তারই মাঝে একদিন জেলের লৌহকপাট উন্মুক্ত হল—অশেষ এসে ঝাঁড়ল বাইরে—মুক্ত আকাশতলে। একবার পিছন ফিরে তাকান—বন্ধ হয়ে বাজে তার এতদিনের পরিচিত ছোট জগৎ—কারাগার আর সামনে অনন্ত অপরিচয়ের সমুদ্র—কালের হাওয়ার পালটেছে সব কিছু—যে উদ্দাম চক্ৰ যুগের সঙ্গে ছিল তার আশৈশবের মিতালি এ যুগের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই।—অগণিত মানুষ চলেছে শ্রোতের মত আপন আপন কাজে—তাদের কেউ চেনে না অশেষকে—বিপ্লবীদের “বুসেটকে।” কানে বাজল মায়ের কণ্ঠস্বর—“দেশের লোক-তোর নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে।”

সে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল শ্রীমন্তদার গম্ভীর স্বরে—“তারন্তের শহীদ মানুষ বলে কত সন্মান করবে, পূজা করবে। এই তো আগামের পুণ্যস্বর রে।”

—মায়ের পক্ষে এ ভুল করা হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শ্রীমন্তদা? তিনি কত দূরভবিষ্যৎ দেখে জ্ঞান পাততেন, তিনি কি করে এ-ভুল করলেন? সন্ধান?—হঠাৎ তাসি পেল অশেষের। কে চেনে তাদের? ক’জন জানে শ্রীমন্ত চক্রবর্তীর নাম? রঞ্জন মিত্রের নাম ক’জন শুনেছে? ক’জন খবর রাখে রঞ্জনর অসমসাহসিকতার, তীক্ষ্ণবুদ্ধির?—চব্বিশ বছর বয়সে বার জীবন শেষ হয়ে গেল! ক’জন মনে রেখেছে শীর্ণ শ্রীমন্তদার গোগপাত্তর মুখখানা?

জনশ্রোতে গা ভাসাল অশেষ।

তারপর? • আরও কি জিজ্ঞাসা আছে? পাঠক, তোমার সন্তপ্ত কাজের ভীড় থেকে একবার চোখ তুলে জানতে কি তুমি চাইবে কোথায় গেল সেই অশেষ? উজ্জল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দলিত মথিত করে যে গেয়েছিল স্বাধীনতার গান উদাত্ত কণ্ঠে? সে কি শুধু শ্রোতের টানে ভেসে গেল, নাকি পেল কোথাও তীর, আশ্রয়, শান্তিময় গেহ? শুধু অশেষ কেন? তাব মত কত অন্তর

ছেলে ‘জীবন-বৃত্তা পারের ভৃত্য’ করেছিল—তাদের ক’জনকে দাখ তোমার মনে আছে?

অধঃসমাপ্ত ছবিটার পাশে পেনসিলটা রেখে চেয়ারের পিঠে তেলান দিয়ে বসলেন জনৈক পোষ্টার আর বিজ্ঞাপন আর্টিষ্ট—ক্লান্ত দৃষ্টিতে সামনের খোলা ছোট জানলাটা দিয়ে তাকালেন বাইরে। চৈত্র মাস—বিকেল হ’য়ে আসছে। মাঝার ওপর করগেটের চালটা অসম্ভব তেতে আছে—উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ছোট অন্ধকার ঘরখানা। বাইরেও দৃষ্টি প্রসারিত করা শক্ত—বড় বাড়ী, উঁচু চিমনী, কালো সর্পিল ধোয়া—প্রতি পদেই দৃষ্টি যেন হোঁচট খায়। তবু এর কীক দিয়ে, ওর পাশ দিয়ে, তার মাথা দিয়ে কোন বকমে অগ্রসর হতে পারলে চোখে পড়ে এক টুকরো আকাশ—ও! ভুবন্ত সূর্যের আলোর লালে লাল হয়ে গেছে একেবারে। আজকের এই লাল আকাশ মনে পড়িয়ে দেয় আর এক যুগের কথা। সে যুগেও এমন লাল হয়ে উঠেছিল আকাশ—রক্তঝরা লাল। কিন্তু হঠাৎ এ পরিবেশে আসার সার্থকতা কি? একটু সময় করে নিয়ে অশেষকে খুঁজতে বেরিয়েছি কি আমরা? কিন্তু কোথায় অশেষ? কোথায় বাবা বর্তন—মাষ্টারদার উত্তর পুরুষ—বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী? ঐ অধঃসমাপ্ত ছবিটার দিকে তাকালে এক কোণে দেখা যাবে বটে ছোট কবে সই করা আছে—অশেষ মুখোশাধার। তবে কি কিশোর অশেষ যে তাতে অসংখ্য বৈপ্লবিক ইজাহার আঁকত, সেই তাতেই প্রোট অশেষ আঁকছেন সিনেমা, ওয়ুথ আর ফুডের বিজ্ঞাপন—অল্পজলের সংস্থান করতে? কিন্তু নামের মিলই কি সব? চেতনার কি কোন সাদৃশ্য আছে? বিপ্লবী অশেষের বলিষ্ঠ হাতের পেশীগুলোর লেশমাত্রও কি অবশিষ্ট আছে, বিজ্ঞাপন আর্টিষ্ট অশেষের শিরাবল্ল হাতের কীকে? কিশোর অশেষের একমাথা কীকড়া-কীকড়া কালো চুলের এক গাছাও কি মিলবে না এই অকালবুদ্ধ মানুষটার অল্প ক’গাছা পাকা চুলের মাঝে? তবে? তবু সন্তপ্ত গরমিলের মধ্যে একটা মিল চোখে পড়ে—ঐ যে রক্তাক্ত আকাশের পানে নিবদ্ধ হ’টি চোখ—ওরা যে সেই কিশোর অশেষের চোখ—তেমনি বিশাল, গভীর—তেমনি স্বপ্নালু! যদিও স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেছে অনেক দিন। শুধু ঐজ্জ্বল্য এসেছে—কমে—পড়েছে একটা ক্লান্ত আলস্তের আবরণ।

শেষ

## ভালবাসার গোপন কথা

(Blake-এর ‘Love’s Secret’ কবিতার অনুবাদ)

ভালবাসা নীরব মধুর নেইক’ তাহার কোনই ভাষা,  
বাতাস যেমন বয় নীরবে তেমনি তাহার বাওয়া-আসা।  
নিষ্কণ্ড প্রকাশ নিষ্কণ্ট করে কথা দিয়ে বলাই মিছে,  
কথার ভিড়ে হারায় সে যে কথাহারার ধার সে পিছে।  
জন্ম আমার উজাড় করে ভালবাসার কথা বহু,  
বলেছিলাম প্রিয় আমার বারে বারে মনের মত।

প্রিয়া আমার কাঁপল বারেক কিসের ভয়ে সেই ত জানে,  
শুধু জানি রইল না সে চলল কোথায় আপন টানে।  
হঠাৎ দেখি পথিক সে এক এল বিজন পথটি বেয়ে,  
যেমন আসে বিজন বাতাস নীরব মধুর পরশ ছেয়ে।  
কোন কথাই বলে নি সে ভালবাসা চাওয়া-পাওয়ার,  
তবু তাহার নীরব হোঁসায় চলল ভেসে প্রিয়া আমার।

অনুবাদ : বীরেন্দ্রকুমার রায়



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মূললেখা দাশগুপ্তা

মৌরী নিজেই ভাবছিল, এবার না নামলেই নয়। যে স্কোচটুকু বাধা হয়েছিল, সেটুকু কাটিয়ে ওঠা সহজ হতো। মজু বা অমিতা সঙ্গে থাকলেই। তবু উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। এমন সময় এলেন বাবা।

বাবার কাছে মেয়ের এ অসুস্থপস্থিতি কিছুমাত্র বিস্ময়ের ছিল না। মেয়ের স্বভাব তিনি জানেন। নতুন পরিচয় যে সে সহজ করে না, করলেও সে পরিচয় যে তার নতুনের গাঠী ছাড়িয়ে এগোতে চায় না; আর না এগোনো পথান্ত দেখা পাওয়া যে তার কঠিন—এ তিনি ভালো রকমই জানেন। কিন্তু কতবার এই স্বভাবের প্রশ্রয় বতীন বাবু আজ দিলেন না। ডাকটা দিলেন এসে তিনি আদেশের সুরে। অবশি একেবারে নিখাদ নয়। সঙ্গে কিছুটা অস্থিরতার বেশও দিলেন মিশিয়ে—বেটাতে কাজ হয়। না যদি আসে কি করতে পারবেন, কি করতে পারবেন মেয়ে যদি তার আদেশ মান্য না করে? কিছুই না। যদিও বাপ-মায়ের অবস্থাটা প্রায় সর্বত্রই কতকটা এই রকম, তবু বতীন বাবুর ক্ষেত্রটা কিছু আলাদা। পিতার আশ্রয় অনেক পায়না তিনি হারিয়েছেন নিজ দোষে।

আজও মৌরী বাবাকে দেখে পীত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। যদি আর একটু আগে ও নেবে যেতো, তবে বাবার এ আসাটা তো ওকে দেখতে হতো না। কিন্তু এর ভেতর কি দোষের আছে কিছু?

আছে। কেউ এলে তো ওকে ডাকা ছেড়েই দিয়েছেন বাবা। আজ কেন এলেন—কেন না এসে পারলেন না?

ওর আজকের অসুস্থপস্থিতি আর রোজের অসুস্থপস্থিতিটা কি এক? এক নয়, এক নয়। জানে মৌরী রোজের সঙ্গে আজ মিলানো চলে না। পাঁচ জনের ভেতর একজন সে, গিয়ে যদি না বসে, কিছুই যায়-আসে না। যদি বা যায়, মূল্য তার ধরার ভেতর নয়। কিন্তু আজ যে ওর উপস্থিতিটাই অতিথি আপ্যায়নের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, উই যে আজ অতিথিকে খুসী করার প্রধান উপকরণ। আর ঠিক এই জন্ত—এই জন্তই বাবাকে দেখে পীত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো মৌরী—যদি আর একটু আগে ও নেবে যেতো।

এ ছাড়াও কারণ আছে। মেয়েকে ভালো পায়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে বাপ-মায়ের স্বাভাবিক ইচ্ছে। কিন্তু বাবার হ' চোখের ভেতর যে আলো মৌরী এই অন্ধকারের মধ্যেও চকচক করে উঠতে দেখতে পাচ্ছে—তা কেবল খুসার আলো নয়,

আনন্দের আলো নয়; ও জানে এটও লোভ মিশে আছে তার ভেতর। মেয়ের ক'টা বাড়ী ক'টা গাড়ী হলো, সে আঁচলের চারি ডান দিক বা বাঁ দিক করে কত টাকা নাড়াচাড়া করবে, বাবার দৃষ্টি সে সব ছাড়িয়ে চলে গেছে রাজ্যের রাজকোষের দিকে। যে ঘরে মেয়েকে তিনি বিয়ে দিচ্ছেন সেখান থেকে রাজভাণ্ডার ঘরের পথ নয়—অপেক্ষা ওর রঙনা হবার। তার পর? তার পর তো শুধু চল্লিশ স্ত্রীর মন্ত্রটি শিখে নেওয়া আর গাধার পিঠে গিনি মোহর তোলা—লুঠের চাকা লুঠে আনা। এমন কি ধরা পড়লেও মার্জিনাকে ছুটেতে হবে না মুচির খোঁজে—ঘাড়-গর্দান সব ঠিক বায়গায় তো থাকবেই, হয়তো মিলে যাবে শিরোপাও।

কিন্তু তাকে সন্তোষন করার শক্তি তো ওর নেই! নীরবে মৌরী নেবে এলো নাচে। ঢুকলো গিয়ে খাবার ঘরে। ওর দিকে তাকিয়ে অমিতা মুখ টিপে একটু হাসলো। মজু জানালো, স্বাগতম। দুজনেই ভোষণ ব্যস্ত। এক্ষুণি সবাই এসে পড়লো বলে। একজন ঘাসে ঘাসে জল দালে বরফের টুকুরো ফেলে আর একজন চটপট হাতে টেবিলে সাজায় ডিস-প্লেট।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো মৌরী। নিজেদের নিত্যদিনের খাবার ঘরটা যেন নিজেই চিনে উঠতে পারছে না সে। কালো জল-ধরা শিকের জানালায় ঝুলছে সাদা লেশের পরদা। দিনের বেলা হলে যার চেহারাটা দেখতে হতো বস্তীর মেয়ের গায়ে মূল্যবান পোষাক ঝোলার মতো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দেখাচ্ছে শুধু পরদাগুলোই। মাসের সৎদারখা বার্মিস-ওঠা দেওয়ানটা ঢাকা হয়েছে জালি-নেটে। তার ওপর রয়েছে ফুলদানিতে নানা রঙের মরুমুখী ফুল। ফুলদানিতে ফল নানা দেশী বিদেশী। টেবিলে মূল্যবান বিলিতি তিনার সেট আর কাঠগ্লাসের গ্লাস। এক কথায়, লেসে-নেটে ফুলে-ফলে বিলিতি তিনার সেটে কাঠগ্লাসের গায়ে ঠিকরানো হাজার পাওরার আলোতে বলমলে ঘরটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ও যেন উপগ্রাস বর্ণিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের কোন ডাইনিং রুমে এসে দাঁড়িয়েছে।

—তোর জন্ত আর কি করতে পারি আমরা?

যেহে মূল্যবান বা কিছু সব ছোট পিসির বাড়ীথেকে আনা। বা নেই, তা দেখানোর লজ্জার মুখ কালো হয়ে উঠতে চায় মৌরীর। বলে—আর দরকার নেই। এমনিতাই অনেক বেশী করে ফেলছি।

—তবে এবার আমাদের ছুটি। পরিবেশনের ভার তোর—এঁা? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো অমিতাও—হী ভাই তাই—কেমন?

স্বদর্শনকে নিয়ে ঢুকলো এসে সবাই খাবার ঘরে। বিস্ময়ে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল মৌরী, সরে গিয়ে দাঁড়ালো সে জানালার কাছে। আর ও নিজে না তাকিয়েও বুঝলো চেয়ার টেনে বসবার সময় বেশ স্পষ্ট ভাবেই ওর দিকে একবার তাকালো স্বদর্শন।

মাছ-মাংসের ছোঁরাছুঁরি বাঁচিয়ে পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। ছোট পিসি গিয়ে দাঁড়ালেন স্বদর্শনের পাশে গভীর ভারিকী চালে। কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে পোলাউ আর ফ্রাই-ডিস হাতে এসে দাঁড়ালো অমিতা, মজু। সাহায্য করতে লাগলো কানাইলাল। রাবুর মনের ভার কমে গিয়েছিল। সে



বারান্দার রেলিং ধরে পাঁড়িয়ে কোঁতুলের সঙ্গে দেখতে লাগলো স্নানার্থীকে। অভ্যাগত অথবা না উদ্ভব, তা কববার কষ্টপাথর হলো রাস্তার বাড়ীর ব্যবহারটা। বিশেষ করে বাড়ীর কর্তার মুখের চেহারা। বতীন বাবুর দিকে একবার তাকালেই ও বুঝতে পারে অতিথি ধনী না নিধনী। বাহিত, অবাহিত না অতিবাহিত। দুপুরের আয়োজনে ও তেমন ধরে উঠতে পারেনি, এখন মাথা নাড়ছিল মনে মনে—দিসমণির বর মন্ত কেউ। রোমাঞ্চ হয় রাস্তার, যদি কানাইলালের সাহেবের চাইতেও বড় কেউ হয়!

খাওয়া চলতে থাকে, কখনো একথা সে-কথা, কখনো অমিতা মজুর কিছুই না নেওয়ার অসুযোগ, বাবা পিসিমাদের আরো একটু নেওয়ার পীড়াপীড়ি, বাসুদেবের তার নিজের ডিসটার প্রতি স্নানার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিমাণ দেখিয়ে তাকে উৎসাহিত করবার ভেতর দিয়ে। অমিতার অত হাসি কথার ভেতর দিয়েও মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে যায় ওর মনের মেঘ। জয়দেব আজও ঠিক সময় এলো না—এক টেবিলে খেতে বসলো না। সমস্ত দিনের পরিমিত বোধ ও এখনকার অটল গাভীর্ঘ্যের সঙ্গে মৌরী সামঞ্জস্য করে উঠতে পারে না স্নানার্থীর মাঝখানকার ব্যবহারটা। সবার মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে জানালায় হেলো পাঁড়িয়ে থাকে সে। পরদাগুলো কখনো মুহূর্ত বাতাসে দোলে, কখনো জোর বাতাসে ওড়ে। কিছু ঝির-ঝিরে বুড়ি মাথায়-মুখে এসে পড়ে যায় আরাম লাগিয়ে।

—এই দিদি! ধর ধর শীগগির। গেল হাতটা পুড়ে।

চমকে উঠে এগিয়ে এলো মৌরী আর ওর হাতে থালাটা তুলে দিয়ে পাখীর ডানা বাড়ার মতো বাড়তে লাগলো মজুর ওর হাতটা—গেছে, একেবারেই পুড়ে গেছে হাতটা।

অমিতা হেসে উঠলো খিল-খিল করে। ওটা তো বরফ-ঠাণ্ডা মিষ্টির থালা।

কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে মুখে হাওয়া দেয় মজুর আর ওর দিকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে সহজ করে ফেলে মৌরী। বাবা মিষ্টি নেবেন না জানে, তবু প্রথমে গিয়ে পাঁড়ালো সে বতীন বাবুরই কাছে। স্নেহ দৃষ্টিতে বাবা কর্তার দিকে তাকালেন—আমি কি মিষ্টি খাই মা।

মিষ্টি তিনি খান কিন্তু রাতের বেলা নয়। মিষ্টি দেখলে তার ফরাসী-প্রিয় নাক কুঞ্চিত করে।

খাওয়া হয়ে গেলে আর যে কিছুতেই টেবিলে বসে থাকতে পারেন না, সে-কথাটা জানিয়ে অসুখতি নিয়ে উঠে পড়লেন বতীন বাবু। আর স্নানার্থীর কাছে এসে মৌরী পাঁড়ালেই প্লেটের উপর হাত ঢাকা দিল স্নানার্থী।

এগিয়ে এলো অমিতা—এ কি, মিষ্টি নেবেন না?

—আমি মিষ্টি খাইনে।

—তা হয় না। আমাদের মেয়ে প্রথম মিষ্টিহাতে এগিয়ে এসেছে ও কিরিয়ে দিতে পারবেন না।

নীরবে হাতটা ডিসের উপর থেকে সরিয়ে নিল স্নানার্থী।

অমিতার বাধা দূর করতেই হয়ত পিসিমারা চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। যদিও পিছু হটে গিয়েছিল মৌরী, তবু এগিয়ে এসে স্নানার্থীর প্লেটে মিষ্টি দিতে হলো তাকে।

একটা দিলে কেন মৌ! নিজে তুলে এনে মিষ্টি দিলো অমিতা

স্নানার্থীকে। বললো—আর বেজোর চলবে না। একটা তুলে নিয়ে ডিসটা ঠেলে সরিয়ে রাখতে দেখে অমিতা ভরে বললো—খেলেন না তো?

—পারছি নে।

—আমি যে আরো কত পারি—কিন্তু লজ্জা করছে। মাথা চুলকার বাসু।

চটছিল মৌরী অমিতার উপর। বাসুদেবকে দেখা হলো থালা রেখে চলে গেলো সে। ওর বিরক্তি বুঝতে বাকী রইলো না অমিতা মজুর। হাসলো ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

স্নানার্থীর হাতে তোয়ালে তুলে দিচ্ছিল অমিতা—হস্তদত্ত ভাবে ঘরে এসে ঢুকলো জয়দেব। ফরসা জামা-কাপড় তার ছিটে বুড়িতে ভেজা। কালো ঘন চুল আরো চকচকে দেখাচ্ছে জলে ভিজ্ঞে ওঠায়। ক্রমাল দিয়ে ষাড়-মাথা-মুখ মুছতে মুছতে মাগ চাইলো স্নানার্থীর কাছে। মজুর দিকে তাকিয়ে বললো—ঠিক সময়ে এসেছি—তোদের খাওয়া হয়নি তো? যা কিদে পেয়েছে!

ঠোট চেপে পাঁড়িয়ে থাকা অমিতার মুখ দেখলে কে বলবে এতক্ষণ সে এতো হেসেছে, এতো কথা বলেছে।

অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো স্নানার্থী। বললো—ক'টার সময় বাড়ী ফিরলে স্ত্রীদের মুখের হাসি মিলায় না?

হেসে উঠলো জয়দেব। গভীর মুখে জবাব দিলো অমিতা—স্ত্রীদের মুখের হাসিটা মূল্যবান মনে হলে অপরের কাছ থেকে সেটা জেনে নিতে হবে না। আর তা না হলে শত শিথিয়েও লাভ নেই। চলুন। স্নানার্থীকে অনুসরণ করতে বলার ভঙ্গিতে ডেকে বেরিয়ে গেল অমিতা।

দ্বিতীয় বার টেবিল তৈরী হলো। অমিতা আজ অনেক খেটেছে। তাকে বসিয়ে, ছোট পিসিকে ডেকে, মৌরীকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, কানাইলালকে হাতে হাতে সাহায্য করে, পিসিমাকে খাইয়ে ছোট পিসির রঙনা হবার সময় টিফিন কেরীয়ার ভর্তি মিষ্টি বাড়ীর জন্ত গাড়ীতে তুলে দিয়ে—এমন কি আবার বুড়ি নামলে যে ঠাণ্ডাটা পড়বে তাতে একটা চামর গোছের কিছু দরকার হবে, ফের গিয়ে সেটা স্নানার্থীর বিছানায় রেখে এসে মজুর একেবারে তাক লাগিয়ে দিল সবার। অমিতা গলা জড়িয়ে ধরলো মজুর। অনেক ধন্যবাদ ভাই তোমাকে।

ওরা দু'জন বখন শোবার ঘরের উদ্দেশ্যে রঙনা হলো তখন রাত একটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে পত্রিকাপাঠরত জয়দেবের দিকে ফিরিয়ে তাকালো না অমিতা। যদিও ও জানে এ রাত পুত্রিকথরী পাতার চোখ পেতে বসে থাকাটা ওরই পথ চেয়ে বসে থাকা। ঘরে এসে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে সব অপরাধ ক্ষমা করলেও এ অপরাধটা ক্ষমা করে না অমিতা—অস্বস্ত সে রাতটা বুঝা করে দেয়ই সে। আজ রাত অনেক হয়ে গেছে। আজও জয়দেব বসে থাকবে এতটা আশা করেনি সে। যে জন্ত বসেছিল জয়দেব তা হলো অমিতা অর্থাৎ খুসী হলো।

গোলা আলনার কাছে চলে গিয়ে শাড়ী পালটে শরীরে পাউডার

চালে অমিতা—এক দিন জয়দেবের সঙ্গে রাগাঙ্গি হওয়াতে মৌরীদের ঘরে চলে গিয়েছিল সে। মঞ্জু বলেছিল ক'দিন?

অনেক দিন। দেখবো আমার প্রয়োজন হয় কিনা।

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য মৌরী বই-নিবিষ্ট দৃষ্টি তুলে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বই-এ মন দিয়েছিল। সে দৃষ্টির অর্থ না বুঝতে পারার মতো বোকা অমিতা নয়। কলেজে-পড়া মেরে সে-ও। কিন্তু মৌরীর অনেক কথা অনেক ভাবই গায়ে মাখে না সে। প্রয়োজনের কথা বলেছে তো হয়েছে কি। জগৎটাই তো প্রয়োজনের পেছনে ছুটে চলেছে। শত্রু বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে, গাছ আলোর দিকে বাহু মেলে দেয়, বীজ মাটি খোঁজে—প্রয়োজন বলে। চন্দ্র-সূর্য ফুল-ফল-জল; মানুষের প্রতিটি সম্পর্ক—জড় আর জীবজগতের যত চাওয়া কোনটা অপ্রয়োজনের? শুয়ে পড়লো সে। সে শোওয়া অপূর্ণ। ও জানে উপাধানের উপর কি ভাবে খোলা হাতটা রাখলে, খোঁপাটা কতটা এলিয়ে দিলে, পা'র দিকের শাড়ী কতটা তোলা থাকলে, ফরসা ঘাড়-পিঠি বাহুর কতটা লালশাড়ীর কাঁকে কাঁকে দেখা গেলে আকর্ষণের শক্তি জোরালো হয়। ও জানে, কি ভাবে সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষকে মুগ্ধ করতে হয় আর সে জানা প্রয়োগ করতে সক্ষম চোখ করে না একটুও। যুদ্ধ-বিগ্রহ হিংসা-ধ্বংস পুরুষ রূপবতীর জন্য যত করেছে, গুণবতীর আকর্ষণে কি কেউ তাদের তা করতে শুনেছে কোন দিন? ইতিহাসের পাতায় তো দূরের কথা, আজও পুরুষের হাতের সৃষ্টি সাহিত্যের পাতায় কই অমিতা তো রূপবোবনের পায়ে মাথা কোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পার না? গুণের কথা যে তারা এক-আধটু না লেখে তা অবশ্য নয়—সে শুধু নিজস্বের মান রক্ষার জন্য। পড়ে আর দেখে ও স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যত দস্তের কথাই বলুক, মেয়েদের গুণগত অনুৎকর্ষতার প্রতি যত বিজ্ঞপবাণই বর্ষণ করুক—রূপের চাইতে বড় পুরুষের কাছে কিছু নেই। এর চাইতে খাতির তারা আর কিছুকে করে না। এ ছাড়া তার আর কিছু চায় না। থাকলেও পীড়া অমুভব করে,—পীড়ন করে। মৌরীর এ কথাটা সে বিনা আপত্তিতে স্বীকার করে, খনার জিহ্বা কাটা যাবার ভেতর ঐতিহাসিক সত্য না থাক আছে পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সত্য। আর তাদের চাওয়া দিয়ে তৈরী বলেই মেয়েরা গুণের ঘরে জানের ঘরে আজও এমন দেউলে। সমস্ত দিনের অস্বীকারের পর এখন যে স্বীকৃতি স্বামীর কাছে সে পায়, সমস্ত দিনের অপমানের পর যে মান তার এখন মিলবে, সমস্ত দিনের পরাজয়ের পর যে জয় তার এখন তা কিসের? গুণ কি নেই ওর?

অলস ভাবে পাশ ফিরল অমিতা। শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে নিল পাখার হাওয়া। ঘুমিয়ে পড়া অমিতার কোন দায় নেই তা ঠিক করে দেবার। শক্তি কান্ধে এলো জয়দেবের হাতের কাগজ ডাঁজ হবার—এখন যদি রিমঝিম বৃষ্টিটা আবার নামতো।

শোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল মৌরীও। এ ব্যাপারটার বিলাসী সে। একটি শিক অভ্যাস আর একটি শিক শাড়ী—দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ওর। অবস্থার অভ্যাস নয় বরং অবস্থা অতিরিক্ত অভ্যাসই তবু হয়ে গেছে। সমস্ত দিনের দশ বিশ গজ কাপড়ের বোঝা নামিয়ে খালি শরীরে শুধু মাত্র কয়েক ঘুট্টা নরম সিল্ক জড়িয়ে শোয়া—এ যেটুকি আরাম!

কাপড় বদলে সেই আরাম উপভোগ করতে করতে বিছানার উপর বলে চুল বাঁধছিল সে, মঞ্জুকে চুকে দেখে বললো—হলো রাজকাণ্ড পরিদর্শন?

হাত দুটো পেছনের দিকে নিয়ে হাতের তালুর উপর শরীরের ভার রেখে ঝাটে বসলো মঞ্জু। বললো—পিসিমা বলেন, হিমালয়ের উপর ঋষি তপস্বীরা সব যোগাসনে বসে তপস্বী করছেন আর মাঝে মাঝে বলে উঠছেন 'স্বস্তি-স্বস্তি।' আমরা ভালো মন্দ যে কথাটাই বলি যদি তাঁদের সেই স্বস্তিবাক্য তার উপর এসে পড়ে, তবে তা ফলে যায়। ধর যদি তোর এই আমার রাজকাণ্ড পরিদর্শনে বেঞ্চবার কথাটার উপর ঋষিদের সেই 'স্বস্তি' পড়ে গিয়ে থাকে?

—তবে তুই রাজা হবি।

—হঠাৎ হঠাৎ তোরা যে আমার জীবনের কি ভবিষ্যৎ সত্যগুলো বলে ফেলিস, নিজেরাও জানিসনে। কিন্তু রাজা তো আর আজ-কাল হওয়া যায় না—মন্ত্রী।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজে শব্দ করলো মৌরী, হ'।

—আচ্ছা; রাজ্য থাকবে, প্রজা থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, থাকবে সেনা আর সেনাপতি—সবই যদি থাকবে তো রাজা বেচারীরা দোষ করেছিল কি?

—হ'।

—অকর্ম সুরকর্ম যাই হতো, হতো তো মন্ত্রীদেরই পরামর্শে।

—হ'।

—বুঝলি দিদি, এ মন্ত্রীদের চাপকা বুজির চাল—রাজত্ব দখল করার কৌশল। রাজাদের তাড়িয়ে রাজত্ব আর সিংহাসন দখল করেছে ওরা।

—দোহাই তোর মঞ্জু! মাথা ধরেছে এ্যাসপ্রো খেয়েছি।

—নে বাপু ধুমো। উঠে বসে একমাথা জট চুলের ভেতর গায়ের জোরে চিকণী চালাতে চালাতে গুন গুন করে উঠল মঞ্জু—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা

ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,

তোমার কর্ম তুমি কর মা

লোকে বলে করি আমি'—

—তুই কি পাগল হলি? রাত দুটোর সময় 'সকলি তোমারি ইচ্ছা' গাইতে বসলি।

—তাইতো। বৃষ্টি থেমে গেছে। তোর বিছানার এক চান্দর চাঁদের আলো, বাতাসে হালুহালানার মিষ্টি গন্ধ—নির্বাচনটা ঠিক হয়নি। 'মন, বলে চিনি চিনি' এটা গাইবো?

—মঞ্জু, সত্যি বলছি ভীষণ মাথা ধরেছে। অমনুর করলো মৌরী।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইলো না মঞ্জুর। এ-পাপ ও-পাশ করলো অনেকক্ষণ। তারপর কেমন যেন একটা বুকচাপা অস্বস্তি ভাব একেবারে ছটকটিয়ে তুললো ওকে। চেঁচা করলো সহ করতে অনেকক্ষণ কিন্তু পারলো না। ঘুমিয়ে পড়েছিল মৌরী। মঞ্জুর ডাকে ঘুমভাঙ্গা লাল চোখ মেলে উঠে বসলো মৌরী বিছানার উপর। বললো—কি রে?

—বড় খারাপ লাগছে শরীরটা।

দেখু ! অন্ধকণী প্রানলাইট  
সাবানেই এসব কাজ  
হয়েছে!

অতিরিক্ত কেশর দরুণই  
এ সম্ভব হয়



সাঁ ন লাই ট  
সা বা ন

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

৪. ২৬০-২৬১-৪৪

উৎকর্ষিত ভাবে উঠে বাঁতি জ্বলে গিয়ে পাঁড়ালো মৌরী মঞ্জুর কাছে—কেন কি হয়েছে ?

—ভালো লাগছে না।

মৌরী দেখলো, কপালে বিলু বিলু ঘাম জমে উঠছে মঞ্জুর। মুখটার ঢেলে দেওয়া হয়েছে বেন একরাশ কালী। ঠোট দুটো একেবারে সাদা। তাড়াতাড়ি জল এনে মঞ্জুর মুখে মাথায় জলের হাত বুলোতে লাগলো মৌরী। বললো—এতো কাজ করা অভ্যাস আছে নাকি যে সহ্য হবে! বাড়াবাড়ি করতে গেলে এমনি হয়।

হাত দুটো বৃকের ওপর রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকে মঞ্জু। মৌরী ঠাণ্ডা ভেজা হাতটা ওর চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে চালিয়ে বুলোয়। বলে ইস, আঙ্গুন বেরুচ্ছে মাথা থেকে। বেশ কতটা সময় এভাবে কাটবে তারপর জিজ্ঞাসা করে মৌরী, ভালো লাগছে একটু ?

—একটুও না।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো এই ভাবে। পড়ে রইলো মঞ্জু চোখ বুজে। শরীরের ভেতর শক্তপক্ষে মিত্রপক্ষে যে যুদ্ধটা চলছে বেন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সময় দিচ্ছে শাস্তি স্থাপনের! তারপর বেন সেও অংশ গ্রহণ করলো সংগ্রামে। ছুটে গিয়ে বেসিনের ওপর মুখটা বাড়িয়ে ধরলো—তারপর কি পেট-নিংড়ানো বমি! কলের মুখটা চেপে ধরে ঝুঁকি সামলায় মঞ্জু আর মৌরী হাত বুলোয় ওর পিঠে। এমনি হলো আরো ঘন ঘন তিন-চার বার। ভীত কণ্ঠে বললো মঞ্জু—কলেরা-টলেরা মতো কিছু নয়তো রে ?

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো মৌরীর। এতক্ষণ সে জেবেছে, দিনের অসহ্য গরম, খাল তেল মশলার গরম রান্না, অভ্যাস অতিরিক্ত কাজ—সব মিলে এটা হয়েছে। এনার ভয়ে সর্বশরীর মোচড় দিয়ে কি বেন একটা গলা পর্যন্ত উঠে এলো মৌরীরও। সন্ধ্যা বদি তাই হয়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় গুণ্ড! রাতের নির্জন পথটা ভেসে উঠলো চোখের উপর—কোথায় ট্যাক্সি। একটা ফোন তাও পর্যন্ত নেই কোন চেনা বাড়ীতে। দোকানপাট সব বন্ধ—বন্ধ পোষ্ট অফিসের পাবলিক ফোন। আকাশ প্রাস্তর টানা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মুহূর্তে ঝলকে গেলো কথাগুলো মৌরীকে কাঁপিয়ে। মুখে বললো—হাঃ। কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে সময় দেখতে। অসুখে-বিসুখে মাহুবে আগে তো ভোরটাকেই ডাকে। কিন্তু ডাকলেই তো আর সে আসে না—এখনও ভোর হবার বাকী আছে। মঞ্জুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো মৌরী—হুঁ পাগল! ওতে কি শুধু বমি হয়? ভাবিসনে। আমি এক্ষুণি আসছি।

বারান্দা দিয়ে হাঁটা দিল মৌরী। এখানে ওখানে জমে আছে বুড়ির জমা। চাঁদের আলো পড়ে সে জল কোথাও চকচক করছে, কোথাও ধরে আছে সে জল পুরো চাঁদটাকে। টবের ফুল গাছের ছায়া-গুলোকে বারান্দার মেঝের উপর দেখাচ্ছে নিপুণ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবির মতো। জল চাঁদ আলো ছবি—উৎকর্ষিত পদক্ষেপে সব বাড়িয়ে চললো মৌরী।

ছোড়ান দরজা খোলা কেন? নিশ্চয়ই তুলে গেছে বন্ধ করতে। ভালোই হলো—বারান্দার ঘরে গিয়ে হুকলো মৌরী। ছোড়ানকেই আগে তোলা বাক। কিন্তু দরজার সামনেই

পড়লো হতভম্বের মতো পাঁড়িরে। খোলা দরজার কাছে চেয়ারে বসে আছে সুদর্শন। হাতে হলুদ সিগারেট।

উঠে পাঁড়ালো সুদর্শনও। আশ্চর্য্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার? তারপর ওর হতভম্ব ভাব দেখে তুললো ক্র কু করে। বললো—আমি যে এখানে, সেটা জানেন বলেই করছি।

জানেন কিন্তু তুলে গিয়েছিল—উৎকর্ষায় উৎসেগে একবার তুলে গিয়েছিল মৌরী—সুদর্শন, সুদর্শন ডাক্তার, সে এখ সে ছোড়ান ঘরে! তাকে ডাকতে ট্যাক্সি দরকার হবে ফোন লাগবে না। আনন্দে ও যে আবোল তাবোল কথা বললো না সেও অতি সংযত বলে। শুধু একটা হাত দিয়ে একটা হাত চেপে ধরলো। বললো—একটু ভাঙ্গা গলায়ই বললো মঞ্জু হঠাৎ ভীষণ অসহ্য হয়ে পড়েছে। বমি করেছে বার পাঁচ। তাই ডাকতে এসেছিলাম ছোড়ানকে।

—ছোড়ানকে! সে কি ডাক্তার? হাতের সিগারেটটা বাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাঞ্জাবী গায়ে চাপালো সুদর্শন। তারপর জাম হাত দুটোকে ঠেলে উপর দিকে তুলে দিতে দিতে বললো—চলুন। সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে এবার সহজ স্বরে বললো মৌরী—ছোড়ানকে—

বাধা দিলো সুদর্শন। বললো—ডাকবেন ছোড়ানকে কি দরকার। প্রয়োজন না হলে কেন খামকা বাড়ীভেদ লোক ব্যস্ত করে তুলবেন। আগে দেখিই না আমি। কিন্তু মৌরী খমকানো ভাব লক্ষ্য করে পড়লো পাঁড়িরে। চাঁদের আলো ভেতর দিয়ে একটা স্থির দৃষ্টি ফেললো মৌরীর মুখের উপর। তারপর হাসলো একটু। বললো আচ্ছা পাঁড়াছি। আপনি আপনি ছোড়ান বড়দা থাকে হয় ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে।

লাল হয়ে উঠলো মৌরীর মুখ। ‘আসুন’ বলে পা চালাতে সে নিজেকেই ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে একটু সময় মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁড়ি রইলো সুদর্শন। তারপর বসে হাত বাড়িয়ে নিজের হাতে টে নিল মঞ্জুর হাতটা। একবার তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বন্ধ করলো মঞ্জু।

সুদর্শন রোগী দেখে। শিয়রে পাঁড়িয়ে মৌরী সুদর্শনের দে দেখে। কখনো তাকায় তার হাতের দিকে, কখনো তাকায় মুখে দিকে। লক্ষ্য করে সুদর্শনের মুখের চেহারা। সেখানে কে চিন্তার ছায়া পড়ে কি না।

সুদর্শন নাড়ী দেখলো। লম্বা লম্বা আঙ্গুলে শাড়ী কাপড়ে উপর দিয়েই টিপে দেখলো পেটটা। বুক দেখার মত নেই—হাত মঞ্জুর বাঁ দিককার বুক রেখে হাতের চাপে পবন করতে লাগলো হৃদস্পন্দনের মাত্রা। মঞ্জুর নিঃশ্বাস ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হলুদ লাগলো সুদর্শনের হাতের মূল্যবান হীরেটা। মৌরী ওর নিচে বৃকের ধক্ ধক্ শব্দটা বেন কানে শুনতে পেতে লাগলো। ফেরালো সে মঞ্জুর বৃকের ওপর রাখা সুদর্শনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতট উপর থেকে। আর এতক্ষণ ওর হাত-পা অবশ করে দিয়ে যা পড়লো, শুধু হাত শাড়ীর আঁচল ওর গায় জড়ালো। মঞ্জুর আঁচল ডাকে যে ভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল—তাই

ধ্বংসকানো বুকটার উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত চাপা দিল মৌরী।

শেখা শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বদর্শন জানালো— কিছুই নেই ভয় পাওয়ার। ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ওষুধ দিচ্ছি। বেরিয়ে গেল সে।

বুহুত সময় নষ্ট না করে আগে একটা জামা গারে চাপালো মৌরী। তারপর নিরুদ্বেগ মন নিয়ে গিয়ে বসলো মঞ্জুর শিরে। ‘ওষুধ দিচ্ছি’ বলে যে ভাবে বেরিয়ে গেল স্বদর্শন ও বুঝলো ওষুধ তার কাছেই আছে।

কিরে এসে নিজের হাতে ওষুধ খাওয়ালো মঞ্জুর স্বদর্শন। কপাল বাড় কানের পাশ জল দিয়ে দিল বেশ করে ধুইয়ে। ভিক্স-বাওয়া বালিশটা বদল করে দিল মৌরীর খাট থেকে বালিশ তুলে নিয়ে। চোখ তুলে খুঁজে দেখলো ঘরের সুইসবোর্ডটা কোথায়। পাখার শীডটা দিলো বাড়িয়ে। তারপর আবার চেয়ার টেনে মঞ্জুর হাতের নাড়ীতে তিন আঙুলের টিপ রেখে বসলো।

ঠার দাঁড়িয়ে মৌরী। কিন্তু স্বদর্শন না চাইলো তার কাছে কোন সাহায্য না কইলো তার সঙ্গে কোন কথা, না তাকালো একবার তার দিকে। মিনিট দু’তিন পর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর দরকার হবে না। এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। বলেই চলে যাচ্ছিল হঠাৎ দরজার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—কাল সকালে চলে যাবো। আপনি নিশ্চয়ই তখন আসবেন না। বিদায় সস্তাবণটা এখানেই জানিয়ে যাচ্ছি, নমস্কার!

আবার নিজেকে ভালো লাগিয়ে গেলো স্বদর্শন। আর ভালো লাগিয়ে দিয়ে বাওয়ারটা দিয়ে বাওয়ার চাইতেও বেশী নিয়ে বাওয়া। ওর মনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল স্বদর্শন একেবারে তার ঘর পর্যন্ত। আর তার বেতের চেয়ার টেনে বসা, তার সিগারেট ধরানো তার চোখ ছোট করে ধোঁয়া ছেড়ে চলার সঙ্গী হয়ে যে মৌরী আছে এ কথা জানতে পারলে স্বদর্শনের পক্ষে শাস্ত ভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলা হয়তো সম্ভব হতো না।

শেষ রাতের আবহা অন্ধকারের দিক থেকে দৃষ্টি কিরিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিম্বিত হয়ে গেল মৌরী। রোগা চোখ দুটোয় ভরে মঞ্জুর তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। ঘুমোঁস নি?

—ভাতার ‘ঘুমিয়ে পড়েছে’ না ‘ঘুমিয়ে পড়বে’ কোনটা বলে গেলেন?

ঘুমের ওষুধ দিয়েছে স্বদর্শন। পড়বে বলে গেলেও পড়াটা ঠিকিয়ে রাখতে পারছিল না মঞ্জুর। হাত পা আসছিল অবশ হয়ে। চোখের পাতা দুটো হয়ে উঠছিল শীশের মতো ভারী। তবু ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না ওর। সেয়ে উঠে ভারি ভালো লাগছিল। ভালো লাগছিল শেষ রাতের হাওয়া আর ফুলের ভেসে আসা গন্ধ। ভালো লাগছিল, শাড়ীর কচিকলাপাতা রুটার মতো

ভালো লাগার নয়র হয়ে আসা মৌরীর মুখটা। ও জোর করে চোখ খুলে রাখছিল, কথা বলছিল। বললো আহা, অসুখটা যদি আমার না হয়ে তোর হতো। ভাতার রোগী দেখে কি আনন্দটাই না পেতেন?

—আচ্ছা তোর জন্তই না এই মাত্র ছুটে গিয়ে ভাতার ডেকে নিয়ে এলাম।

—তা আমি কি করবো অসুখ সেয়ে গেলো? যত্নে হাসার মতো হাসলো মঞ্জুর আবার অসুখ করবো—কিন্তু আর পারলো না, চোখের পাতা দুটো বেন নিজ থেকেই এক হয়ে গেল ওর। বাতি নিবিয়ে দিল মৌরী।

পরের দিন। স্বদর্শনের ট্যান্সি ছেড়ে দিতেই সামনে দাঁড়ানো রায়কে প্রচণ্ড ভাবে ধমকে উঠলেন বতীন বাবু—উরুক, পাঁচ বের করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?

করকরে একটা দশ টাকার নোট বকশিশ দিয়ে গেছে ওকে স্বদর্শন। চালে চলনে মেজাজে কানাইলালের সাহেবের চাইতে বড় দরের মনে হচ্ছিল রায়ের স্বদর্শনকে। এ বাড়ীরই তো জামাই কানাইলালের সাহেব। একটা আন্তো টাকা কোন দিন ওর জাগ্যে বকশিশ মেলেনি। হাউই সার্ট আর চিলে পাজামা পরিয়ে মনে মনে প্রায় নিজেকে দিদিমণির সঙ্গে লক্ষ্মী রওনা করিয়ে দিয়েছে আর সেই খুসীই মুখে ফুটে উঠছে—চমকে উঠলো রায় অথবা হৃদয়বাহরে। কাঁদো-কাঁদো মুখে চলে গেল সে ভেতরে।

বুঝলো সবাই—জয়দেব বাবুদেব অমিতা। তারাও চলে গেল একে একে। বতীন বাবু পায়চারী করতে লাগলেন এদিক ওদিক। রাতে ডাকতে গিয়ে মেয়ের মুখের যে চেহারা দেখেছিলেন লক্ষ্মীর মাথা খেয়ে আর তাকে ডাকতে যেতে পারেননি তিনি। কিন্তু এতো-গুলো লোকের ভেতর এ বুদ্ধিটা কার হলো না!

হয়েছিল। সবার হয়েছিল। পিসিমা পারেন নাই যে কারণে বতীন বাবু পারেন নাই। আর সবাই এসেছিল কিরে।

ওষুধের ঘুম। অটৈতন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল মঞ্জুর। জেসে উঠে যখন তুললো, রেগে বললো—বাড়াবাড়ির একটা মাত্রা আছে।

—সে মাত্রা সবাই ছাড়াচ্ছে বলেই আমি ভারসাম্য রক্ষা করছি।

—দোহাই দিদি খাম। যা তোকে কি মাত্রাটানাটাই হাতে-খড়ির সময় শিখিয়েছিলেন।

—হী, মাত্রাবোঝটাই সৌন্দর্যবোধের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ।

আর কি বলতে পারে ও? ও কি বলতে পারে, চুলের ভেতর হাত ঢালাতে ঢালাতে শেষ রাতের অস্পষ্ট আলোর এক আকাশভারা পেছনে রেখে স্বদর্শন যে বিদায় সস্তাবণ ওকে জানিয়ে গেছে সে ছবিটার উপর দিনের চড়া ছবি ও চাপাতে চায় না। যে সুবইকু কাল রাতে বাঁধা হয়েছে চার না তাতে হাত ছোঁতুম্ভে—বদি হিঁড়ে বার।

[ক্রমশঃ]

### কর্মব্যোগ কি?

‘সর্বভূতে হরির সেবা—জীব-জন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে মাম চায় না, বশ চায় না, মরবার পর বর্গ চায় না, বাসের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উল্টে কোনও উপকার চায় না, একপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার বখার্ব নিকাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ নিকাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মব্যোগ। এই কর্মব্যোগও ঈশ্বর লাভের একটি পথ।’

—ঐশ্বর্যবতীকসেব





সুমণি মিত্র

২০

আচ্ছা বলতো রাজা—

ধর্ম-জীবনে

প্রতীক-পূজারী কারা নন ?

\*Superstition

Is a great enemy of man,

But

Bigotry is worse.

Why does a Christian

Go to church ?

Why is the Cross holy ?

Why is the face

Turned towards the sky

In prayer ?

Why are there

So many images

In the Catholic Church ?

Why are there

So many images

In the minds of the Protestants

When they pray ?

My brethren,

We can no more

Think about anything

Without a mental image,

'Than we can live  
Without breathing.'<sup>১</sup>

২১

ঈশ্বর নিরাকার মুখে বললেও

আমরা সবাই

ধর্ম-জীবনটোতে

প্রতীকের সাহায্য চাই।

'হিন্দু হিন্দেন' যেটা সম্মানে করে

মূর্খেরা করে না-জেনেই !

খৃষ্টান, মুসলিম, ইহুদী বা বৌদ্ধই হোক,

ইরাণী বা পারসীক,

সকলেই প্রতীকোপাসক।

ইহুদীর মন্দিরে থাকে কেন 'আর্ক' ?

এক জোড়া ডানাওলা দেবদূত আর

'ঈশ্বরাদেশ' কেন রক্ষিত তাতে ?

খৃষ্টান কেন তাতে বাইবেল রাখে ?

ক্যাথলিক-পন্থী বা গ্রীক-খৃষ্টান,

বীতর মূর্তিটাকে

সবচেয়ে কেন আঁকড়ান ?

প্রোটেষ্ট্যান্টও কেন

'সর্বব্যাপী'টিকে

ব্যক্তিবিশেষরূপে চান ?

কেন চার্চ 'সক্রেড' ?

বাইবেল কেন পূজো থান ?

আজও কেন এশিয়ার

পাঁচ হাত মাটি খুঁড়ে

সোনার বুদ্ধদের পান ?

পার্সী বা ইরাণীরা

আগুনের পূজো করে কেন ?

মুসলমানই বা কেন

নামাজের সময়েতে

তীর্থ 'কাবা'র দিকে চান ?

'কাবা'র ও-মসজিদে

'কুফপাথরে' কেন

১। "কুরআনের মাহুকের শব্দ বটে, কিন্তু তার চেয়েও 'সাম্প্রতিক' শব্দ হচ্ছে—সকীর্ণতা। আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপীই হন, তা'হলে খৃষ্টান 'চার্টে' বান কেন ? কেন তাঁরা 'ক্রস'কে এত পবিত্র মনে করেন ? প্রার্থনার সময় কি জেলে তাঁরা আকাশের দিকে তাকান ? ক্যাথলিকদের ধর্মমন্দিরে এত মূর্তি স্থান পেলে কেন ? প্রার্থনা কালে প্রোটেষ্ট্যান্টদের মনে এত ভাবময়ী মূর্তির আবর্তন হয় কেন ? ভাই, বিনা নিঃশ্বাসে যেমন আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব, সেই রকম মূর্তিবিশেষের সাহায্য বিনা আমাদের পক্ষে কোনো কিছু চিন্তা করাটাই সম্ভব নয়।"

—The Chicago Addresses. (page 14).

মুসলমানেরা চুন্ন খান?  
'জিম্মিন্' থেকে কেন  
এক ঘটি জল তুলে  
পাপ থেকে নিষ্কৃতি চান?  
অন্ডায় নত হোয়ে  
ফকীরের কবরেতে  
কেন তবে প্রদীপ জ্বালান?

\* \* \*  
অতএব মূর্খ 'brethren',  
"It is vain  
To preach  
Against the use of symbols  
And  
Why should we  
Preach against them?—  
We are all born idolaters,  
And idolatry is good,  
Because  
It is in the nature of man."<sup>২</sup>

\* \* \*  
তাই দেখি আজ,  
আধুনিক ইউরোপী  
উগ্র প্রোটেষ্ট্যান্ট, বীরা  
প্রতীকের বিরুদ্ধে  
সর্বদা দাগেন কামান,  
ধর্ম-জীবনে তাঁরা  
'অগাস্ত্' ও 'কোয়্তে'র  
সাক্ষাৎ চালা বোনে বান্ন।  
স্বধর্ম-বিচ্যুত  
'অজ্ঞেয়বাদী' তাঁরা,  
সর্বদা 'এথিক্' আঙড়ান্।

২২

তাই বোলে বোলুছিনা—বতোদিন পারো  
মূর্তির ছায়াতলে ক'বে ঘুম মারো,  
প'ড়ে থাকো প্রতীকের অচলায়তনে,  
'চরৈবেতি'র ঐ মন্তব্য ছাড়ো।

"It is very good  
To be born in a church,  
But it is very bad  
To die in a church."

২। "প্রতীকের বিরুদ্ধে প্রচার করা বুধা আর কেনই বা তা' কোরবো? আমরা সবাই আজন্ম মূর্তিপূজারী, আর মূর্তি-পূজা কল্যাণকর, কেন না এটা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে।"

—Bhakti or Devotion. (Complete works, vol II, page 39)

It is very good  
To be born  
Within the limits  
Of some certain forms  
That help  
The little plant of spirituality,  
But  
If a man dies  
Within the bounds  
Of these forms,  
It shows  
That he has not grown,  
That  
There has been  
No development  
Of the soul."<sup>৩</sup>

২৩

ছোটো দল প্রতীকের উপাসক নন,  
পরমহংস আর বারা নরাধম।  
এ-দুয়ের মাঝখানে আর সকলের  
প্রতীকের প্রয়োজন আছে বেশি-কম।  
পরমহংস,—তিনি প্রতীকের পার।  
ছাদে উঠে প্রয়োজন নেই সিঁড়িটার।  
ছাদে যে চায় না যেতে চায় না সে সিঁড়ি,  
মূর্তি চায় না তাই মূর্খ, গৌয়ার।  
"Two sorts of persons  
Never require any image—  
The human animal  
Who never thinks of any religion,  
And the perfected being  
Who has passed  
Through these stages.  
Between these two points  
All of us require  
Some sort of ideal,  
Outside and inside."<sup>৪</sup>

৩। "চারে জন্মানো ভালো কিন্তু সেখানে মরাটা অত্যন্ত খারাপ। কোনো বিশেষ বিশেষ মূর্তি—বারা আধ্যাত্মিকতার চারা-গাছটাকে জীবন ধারণে সাহায্য করে—তাদের মধ্যে জন্ম নেওয়া ভালো, কিন্তু তাদের বন্ধনের মধ্যে যদি মৃত্যু হয়, তা'হলে বুঝতে হবে সে বাড়েনি, তার আত্মার কোনো উন্নতিই হয়নি।"

—Realisation and its methods ( page 83 )

৪। "দু'ধাকের লোকেরা কখনোই প্রকৃতি-পূজা করেনা—এক চোখে নরাধম, বারা ধর্ম সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, আর হোচ্ছেন বিভ্রান্তা—এই সব অবস্থাকে বারা পেরিয়ে এসেছেন। এই দুটো ধাকের মাঝখানে আমরা বারা আছি, তাদের সকলেরই কোনো না কোনো আদর্শ চাই, তা সে বাইরেই হোক আর মনেই হোক।"

—Addresses on Bhakti-Yoga. (Complete works, vol IV, page 45)

২৪

পরমহংস আর পাবও ছাড়া  
প্রতীকের শত্রুতা কোরে থাকে যারা,  
তাদের দেখতে হবে কল্পনার চোখে ;  
মূৰ্খ, বাচাল আর অসত্য তারা ।

বহুদিন সূত্রেতে যাচ্ছেনা মন,  
জড়ের ওপরে টান রয়েছে যখন,  
অপরের সাহায্য চাই বতোদিন,  
ততোদিন প্রতীকের আছে প্রয়োজন ।

যতোই বলোনা কেন—‘তিনি নিরাকার,’  
‘সর্বব্যাপী’ আর ‘অসীম-অপার,’  
ওটা হোলো বড়োদের গালাগালি শুনে  
ছেলেরা যেমন বলে—‘পাজী-নছার ।’

মানাই বোঝেনা তার, তবু বলা চাই ;  
ইচ্ছেটা—রাতারাতি ঢাঙ্গা হোয়ে বাই ।  
ধর কি বাক্যের বাটি-চকড়ি ?  
অনুভূতিহীন হুটো শুকনো কথাই ?

বুদ্ধির বোল-চাল কলেক্টেই কাটে,  
বিকোয়না আধ্যাত্মিকতার হাটে ।  
বিল্ডেতে হোতে পারো ‘মাইন্ট এভারেস্ট’,  
হয়তো বামন তুমি নিজেকে জানাতে ।

‘বিধাতা সর্বব্যাপী’ বলাটাই সার,  
ব্যাপ্তির কতোটুকু ধারণা তোমার ?  
যতোই বলোনা বুখে তবলার বোল,  
সেবোল হাতেতে আনা দুক্ল ব্যাপার ।

আচ্ছা, ভাবোতো দেখি অসীমের কথা ;  
এখনি পরখ করো অসীম মূঢ়তা ।  
অসীম বোলতে তুমি বোঝেনা কিছুই,  
কিংবা যা বোঝো সেটা তার উণ্টোটা ।

অসীম বোলতে তুমি ভাবো খুব জোর  
সুনীল আকাশ আর সবুজ সাগর ।  
আকাশ ও সমুদ্র—হুটোই প্রতীক,  
তবে ওরা ঢোকে কেন মনের ভেতর ?

তাও তাকে তোমার ঐ দৃষ্টিসীমার  
সীমাবদ্ধ কোরে নিয়ে তবে ভাষা যায় ।  
বোধাতীত অসীমকে ভাবতে গেলেই  
অসীম সসীম হনু বোধের সীমায় ।

একসেরা-খটিতে কি বেশি দুধ ধরে ?  
ছ’সের ধরাতে গেলে পাঁচসের পড়ে ।  
মন বা বুদ্ধি বলো, একসেরা-খটি ;

একসেরা খেলে, চৈতন্য চৈতন্যের ঐ

অতএব অসীমকে জেনে বা না-জেনে  
সীমাবদ্ধ করো তাকে বুদ্ধির ‘ক্রেমে’ ।  
বুদ্ধিটা কোনোদিনই অনন্ত নয়,  
কিছুটা ছুটেই ব্যাটা মরে যেমেযেমে ।

বাই হোক, এখানে সে-প্রসঙ্গ থাকু,  
কেন ওরা আসে মনে তাই ভাবা থাকু ।  
অসীমের প্রসঙ্গে কেন আসে ঐ  
আকাশ ও সাগরের জোড়া কটোগ্রাফ ?

প্রতীকের মাধ্যমে কেন তাকে চাও ?  
সাগরের সাহায্য কেন নিতে যাও ?  
ও-ছুটোকে মন থেকে বাদ দিলে কেন  
থাকেনাকো অসীমের কোনো চিন্তাও ?

মনেতে বিশেষ কোনো ভাব আসে বেই,  
অমনি প্রতীক আসে সেই নিমেষেই ।  
কিংবা প্রতীক দেখে মনে প’ড়ে যায়  
একটা বিশেষ ভাব, ভাবি সেইটেই ।

পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র দেখে  
অসীমের চিন্তাটা গুঠে মন থেকে,  
কিংবা অনন্তের প্রসঙ্গ হোলে  
সমুদ্র ছুটে আসে সেই পুরী থেকে ।

অতএব কেউ যদি নিজেকে ভাবে  
প্রতীকের মাধ্যমে অসীমকে ভাবে,  
‘কাবার পাথরে’ আর ‘ব্রহ্ম’তেই হোক,  
সসীমেই অসীমের গণ্ডটা পাবে ।

‘নিরাকার ব্রহ্ম’র মোক্তার তাই  
অসীমকে চান ধারা প্রতীক ছাড়াই,  
এখন প্রশ্ন এই—তারা কাকে চান ?  
ব্রহ্মকে সত্যি, না প্রতিষ্ঠাটাই ?

বোলুন সত্যি কোরে তাঁরা কাকে চান ?  
সত্যকে সত্যি, না নিজেকে নাম ?  
প্রথমের প্রার্থীরা মুখরতাহীন,  
দ্বিতীয়ের প্রার্থীই তর্ক বাধান ।

হিন্দুতো বোলছেন প্রতীকটা ঐশ্বর্য,  
প্রতীকের মাধ্যমে ‘ব্রহ্ম’কে চেরো ।  
প্রতীকের উপাসনা বোলে কিছু নেই,  
‘ব্রহ্ম’ই উপাস্ত, ‘ব্রহ্ম’ই ঘোর । ৫

৫। ‘প্রতীকোপাসনা’র অর্থ কি ? প্রতীক শব্দের অর্থ  
হোচ্ছে—বাটের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনার অর্থ—  
ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, বা একাংশে কিংবা  
অনেকাংশে ‘ব্রহ্ম’র খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয় । ভগবান রাধাকৃষ্ণ  
তাঁর ব্রহ্মহৃদ-ভাষ্যে বোলেছেন—‘অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যংহুসন্ধানম ।’  
অর্থঃ ‘তারা নয়’ এবং কখনো ব্রহ্মদৃষ্টি কোরে ব্রহ্মের অনুসন্ধানকেই

সবই তো ব্রহ্ম, তবু সেই সত্যকে  
সবেতে ত্যাগ আর ত্যাগে একটাকে।  
প্রতীক পূজার মানে আর কিছু নয়,  
ব্রহ্ম-দৃষ্টি দিয়ে ত্যাগ একটাকে।

এ-ভাবে ব্রহ্মবোধ জেগে যাবে যেই,  
তখন আর প্রতীকের প্রয়োজন নেই।  
ব্রহ্ম-দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তখন  
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সব কিছুতেই।

প্রতীকোপাসনা বলে।” (ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম শ্লোকের রামানুজভাষ্য।) ভগবান শঙ্করাচার্য বোলছেন—“মনো ব্রহ্মত্বোপাসীতেত্যাধ্যাত্মম্। অখারিদ্ভৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মত্বোপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।” অর্থাৎ “মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কোরবে, এটা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম—এটা আখির্দৈবিক। (মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মের বিনিময়ে উপাসনা কোরতে হবে।) এইরূপ, আদিত্যই ব্রহ্ম, এই আদেশ। ‘যিনি নামকে ব্রহ্ম মনে করেন’—সেই সব স্থলে প্রতীকোপাসনা সর্বক্ষেপে উপস্থিত হয়।”—(ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৪র্থ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য।)

প্রতীকোপাসনার ফলটা কে জানে? প্রতীক, না ব্রহ্ম? শঙ্করাচার্য বোলছেন—“আদিত্যাহোপাসনেপি ব্রহ্মেব দাশতি। ঈদৃশ চাক্র ব্রহ্ম উপাস্তব্ধ প্রতীকেষু তদুপাধ্যায়োপগং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণুনোম্।” অর্থাৎ “আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই তান্, কারণ তিনি সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদি দৃষ্টি আরোপ কোরতে হয়, সেইরকম প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ কোরতে হয়, স্তবরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হচ্ছে বৃত্তে হবে।”—(ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম শ্লোকের শঙ্করভাষ্য।)

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীকোপাসনা প্রসঙ্গে বোলছেন,—  
“One thing, therefore, has to be carefully borne in mind. If, as it may happen in some cases, the highly philosophic ideal, the supreme Brahman, is dragged down by Pratika-worship to the level of the Pratika, and the Pratika itself is taken to be the Atman of the worshipper, or his Antaryamin, the worshipper gets entirely misled, as no Pratika can really be the Atman of the worshipper. But where Brahman Himself is the object of worship, and the Pratika stands only as a substitute or a suggestion there of, that is to say, where, through the Pratika the Omnipresent Brahman is worshipped—the pratika itself being idealised into the cause of all, the Brahman—the worship is positively beneficial; nay, it is absolutely necessary for all mankind, until they have all got beyond the primary or preparatory state of the mind in regard to worsoip.”

—Worship of substitutes and images. ( Bhakti-Yoga, page 55 )

ষিঠীরহিত সেই মহাসত্তার  
কেউ যদি কোনোদিন এক হোয়ে যায়,  
তখন পূজার কথা ওঠেনাকো আর।  
কে কাকে চাইবে বলা, কে থাকে যে চায়?

পূজাদিতে অন্ততঃ হৃদয় তো চাই?  
একা হোলে ওঠেনাকো পূজা কথাটাই।  
তোমার ও ব্রহ্মের ভেদ মুছে গেলে,  
ধ্যাতা-ধ্যায় এক হোলে, তুমি তো একাই।

২৫

এ হেন ব্রহ্মবোধ হোয়ে থাকে যার,  
সেই শুধু পৃথিবীতে প্রতীকের পার।  
নিজের ও ব্রহ্মের সীমা মুছে দিয়ে  
ব্রহ্মরূপেতে জে তোলে ছংকার।

তখন সে গর্জয়—থাকো কার পাতে,  
আমি ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে?  
প্রতীক বা প্রতিমার এইটুকু দাম,  
আমাতে জাগিয়ে জায় এই ‘আমি’টাকে।

যা কিছু শক্তি—সে তো নয় প্রতিমার,  
অনন্ত শক্তির আমিই আধার।  
শক্তিটা থাকেনাকো ‘পান্টিং ব্যাগে’,  
যতোই মার্ক্‌স্‌ বঁচি তাতে ‘বক্সার’।

প্রতীক প্রতিমা বলা, তারা সকলে  
আত্মিক ব্যায়ামের ‘পান্টিং থলে’।  
খুঁট, বুদ্ধদেব—সকলেই তাই,  
তারা যে মহান্—সে তো আমি বোলি বোলে।

\*  
“Christs and Buddhas  
Are  
Simply occasions  
Upon which  
To objectify  
Our own inner powers.  
We really  
Answer our own prayers.”\*

\*  
অতএব বলে যারা গোঁড়া খুঁটান—  
খুঁটই পৃথিবীকে কোরেছেন জাগ,  
তারা আর বাইহোক, মহান্ধা নয়,  
মানুষের শক্তিকে করে অপমান।

\*  
“It is blasphemy  
To think

৬। “খুঁট ও বুদ্ধেরা শুধু বাইরের অবলম্বন। আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে এই সব অবলম্বনে আমরা আরোপ কোরে থাকি মাত্র। আসলে আমরাই আমাদের প্রার্থনার জবাব দিই।”  
—Inspired Talks (page 167),

That  
If Jesus had never been born,  
Humanity  
Would not have been saved.  
It is horrible  
To thus forget  
The divinity in human nature,  
A divinity  
'That must come out.'<sup>৭</sup>

তখন সে গর্জায়—চাইগোটা কাকে,  
আমি ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে ?  
খুঁজি বুদ্ধ বলো—একজোড়া ডেউ  
'আমি' রূপ উত্তাল সমুদ্রটাকে ।  
\* \* \*

"Never forget  
The glory of human nature.  
We are the greatest God  
That ever was  
Or ever will be.  
Christs and Buddhas  
Are but waves  
On the boundless ocean  
Which I am."<sup>৮</sup>

বুদ্ধ বা খৃষ্টের এইটুকু দাম,  
তাদের কেন্দ্র কোরে হই পালোয়ান ।  
আমার ভেতরে যদি শক্তি না-থাকে,  
বুদ্ধের সাধ্য কি আমার জাগান্ ।

২৬

তাও যদি হয়, তবে সেটা কিছু কম ?  
প্রতীক-পুজোটা তাই নয়কো অধম ।  
সুপ্ত ব্রহ্মটাকে জাগাতে গেলেই  
সকলেরই প্রতীকের আছে প্রসোজন ।

তাই যিনি ব্রহ্মতে তোয়েছেন লীন,  
প্রতীকেরও প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসাম ।  
এম-এ-পাণ-মাটির 'ইনকার্ণাট ক্লাসে'  
বলেন না—A-B-C-D মূল্যবাহান ।

৭। "যদি না জন্মাতেন, তবে মানুষজাতটার উদ্ধারই  
হতোনা—এরকম মনে করা দারুণ নাস্তিকতা । মানুষের স্বভাবে  
যে দেবত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে এভাবে ভুলে যাওয়াটা অতি  
মারাত্মক কথা । ঐ দেবত্ব কোনো না কোনো সময়ে প্রকাশিত  
হবেই হবে"—Inspired Talks (page 167).

৮। "মানুষের স্বভাবে যে মহত্ব রয়েছে—তাকে কখনো  
ভুলোনা । ভুল বা ভবিষ্যতে আমাদেরও চোখে প্রকট হইবে কেউ  
হবনি, কখনো হবেনও না । আমরা সেই অনন্ত সমুদ্র—বৃষ্টি ও  
বুড়েরা ভারী ভরসে মাছ !" —Inspired Talks (page 167).

তাই তিনি একথাও বোলে যান এসে—  
প্রতীক-পুজোও ঐ একই উদ্দেশ্যে,  
সকলেই একদিন ব্রহ্মকে পাবে,  
কেউ আগে, কেউ পরে, কেউ সব-শেষে ।

"The range of idols  
Is  
From wood and stone  
To Jesus and Buddha,  
But  
We must have idols."<sup>৯</sup>

ব্রহ্ম-বিশুদ্ধতা এসে গ্যাছে বার,  
আর কি সে অন্তকে করে বিচার ?  
বাচ্চারা সাধু ভাবে জোচ্চোরদেরও,  
জোচ্চুরি-বৃত্তি যে মনে নেই তার ।

চরম ব্রহ্মজ্ঞানে মন্দটা নেই,  
মন্দটা বড়ো জোর কন্ ভালোতেই ।  
আলোর অভাব নয় ঘনাক্ষার,  
তকাইটা কন্ আলো বেশি আলোতেই ।  
\* \* \*

"This is  
One of the great points  
To be remembered,  
That  
Those who worship God  
Through ceremonials  
And forms  
However crude  
We may think them,  
Are not in error.  
It is the journey  
From truth to truth,  
From lower truth  
To higher truth.

Darkness is less light ;  
Evil is less good ;  
Impurity is less purity." ১০ [ ক্রমশঃ ।

৯। "কাঠ পাথরের পুজো থেকে শুরু কোরে যীশু-বুদ্ধের পুজো  
পর্যন্ত সবই প্রাতিমা-পুজো, কিন্তু মৃত্তিকে আমাদের আঁকড়াতেই  
হবে ।"

—Inspired Talks (page 72).

১০। "এটা বিশেষ কোরে মনে রাখতে হবে—যারা নানারকম  
ক্রিয়াপাণ্ডা কোরে ভগবানের পুজো করে, আমরা তাদের যতোই  
অনুপযোগী মনে করি না কেন, তারা আসলে ভ্রান্ত নয় । কারণ,  
মানুষ নিম্নতর সত্তা থেকে উচ্চতর সত্তা আবিষ্কার কোরে থাকে ।  
অজ্ঞানত্ব শব্দে একজন চরম—কম আলো . মন্দ বোলতে—কম  
ভালো ; অল্প ব্রহ্মত্ব বোলতে—অল্প পরিত্রা ।"

—Practical Vedanta. (page 45)



# সবাই জামেন -



এই জামাই  
অন্য যে কোন মার্ক  
চায়ের চেয়ে  
**ব্রুক বণ্ড  
চা**  
বেশী লোকে খায় !



# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## রাধা-চরিত্রের বিবর্তন

শ্রীমতী শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক

এক অপূর্ণ প্রেমকান্তিনী এবং তাঁদের যুগ্মজীবনের বিচিত্র লীলা। সমুদ্রগামী নদীর তুবারসমাচ্ছন্ন উৎসযুগ হতে তার চরম পরিণতি মহাসমুদ্রে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত যেমন উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন, এই তিনটি ধারা দেখা যায়, ঠিক অমুরূপ ভাবে বৈষ্ণব কবিতার নারিকা শ্রীরাধাচরিত্রেও নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দর্শন হতে তাঁর সঙ্গে একান্ত হওয়া পর্য্যন্ত তিনটি ক্রম দেখা যায়। শ্রীরাধার চরিত্রে মুখা, মধ্য এবং প্রগলভা—এই তিনটি ধারার ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়েছে যথাক্রমে পূর্বরাগ, অভিষার, মান, মিলন, আক্ষেপানুরাগ, প্রেমবৈচিত্র্য, মাথুর এবং ভাবসম্মিলন বিবরক পদগুলির মধ্য দিয়ে।

কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ রাধার অন্তরে প্রলয় বয়ে এনেছে। এর পর থেকে রাধার চিত্র এক স্থানেই স্থির হয়ে নেই। তাঁর চিত্র গতিশীল—অন্তরের অস্থিরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম রাধা কেবলমাত্র কৃষ্ণের দর্শনেই নিজেকে পরম সুখী মনে করতেন কিন্তু তাতেও সে মনের কঁাক ভরে ওঠে না—মন আরও নিবিড় আরও গভীর ভাবে পেতে চায় তার প্রিয়জনকে। প্রেমের ধর্মই হয়ত এই। তাই কেবল অঙ্গের পরশেই রাধার অন্তরের দাবী মেটে না—তাঁর তৃষ্ণার্ত হৃদয় হাহাকার করে বলে—দাও, আরো দাও। সেইজন্য অবশেষে দেখা যায়, রাধা তাঁর সমস্ত সর্বকোট কাটিয়ে, সমাজ-সংসারের বাধা অতিক্রম করে এই “আরো কিছু”র সন্ধানে অভিষার যাত্রার পদক্ষেপ করেছেন।

যে পূর্বরাগ কৃষ্ণের নামরূপ প্রবশেই রাধার মনে সঞ্চারিত হয়েছে তা ক্রমশঃ সাক্ষাৎ বা চিত্র দর্শনের মধ্য দিয়ে গভীরতা লাভ করেছে। রাধার গৃহকর্মে মন নেই—এখন তিনি :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিলে তিলে আইসে যায়  
মন উজাটন নিঃশ্বাস সঘন কদম্ব কান্দে চায়।

রাধার জীবনে কৃষ্ণের অপরিহার্যতা যে কত গভীর, তা গুনতে পাই তাঁর একটি উক্তিতে :

হাথক দরপণ মাথক ফুল।  
নয়নক অঙ্গন মুখক তায়ুল।  
হৃদয় হৃদয়গমদ গীমক হার।  
দেহক সরবস গেহক সার।  
পাখীক পাখ মৌনক পানি।  
জীবক জীবন হাম এঁছে জানি।

কিন্তু এত নিবিড় নৈকট্য অমূল্যব করেও কৃষ্ণের বিরাট রহস্যের তত্ত্ব রাধা বুঝতে পারেন না। তাঁর পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে না পেয়ে রাধার অন্তরে মাঝে মাঝে এক চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। এখন তাঁর অন্তর অঙ্গে সুখী নয়, কারণ তিনি জানেন—ভূমৈব সুখম্। মিলনের আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হয়ে উঠছে, দেহজ কামনা ততই লুপ্ত হয়ে দেহাতীত বাসনার অরূপলোকে রাধার মন যাত্রা করেছে। তাই তাঁর সাধনা দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত, ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়াতীত।

রাধা জানেন যে বত দিন তাঁর মধ্যে অহংবোধ জাগ্রত থাকবে, তত দিন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ মিলনের সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি একদিন আপন যৌবনধর্ম, সমাজ সংসার, বংশমর্যাদা সবই পরিত্যাগ করে অভিষারে যাত্রা করলেন। আকাশে মেঘের ঘনঘোর ষটা, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক আর বজ্রপাত—কর্মমাস্ত্র, কণ্টকাকীর্ণ অতি দীর্ঘ পথ—কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারল না। তাঁর পাখির কামনা-বাসনার সীমা মুছে গিয়ে দেখা দিয়েছে আত্মার বিপ্লবিকরণ—তাই পথের কোন কণ্টাই তিনি কাতরা নন। কারণ তিনি যে ইতিপূর্বেই ঘরের কোণে বসে সাধনা করেছেন :

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল  
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি  
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল  
চলতহি অঙ্গুলি চাপি—

যাতে তাঁর এই অভিষার সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। রাধার এই অভিষার লোকোত্তরতার স্পর্শ লাভ করেছে। এর কারণস্বরূপ কবিত্বের ভাবায় বলা যায় :

তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে, আনন্দের নব নব পর্য্যায়।  
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে  
নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রালোকে।  
নিত্যই সে একা। সে-ই একান্ত বিরহী  
সে অভিষারিকা তারই জয়।  
আনন্দে সে চলেছে কঁটা মাড়িয়ে।  
সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ।  
সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীকার বাঁশী  
স্বর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে  
বাহিতের আহ্বান আর অভিষারিকার চলা  
পদে পদে মিলেছে একতানে।  
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে  
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রত্যহ সাক্ষাৎ হোতে লাগল—রাধা আকর্ষিত হয়ে সেই বিবাহুত পান করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রেম নিত্যনূতন

রূপে আত্মদান করলেন কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হোল না।  
তাই রাধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন :

কত মধু বামিনী                      রক্তসে গোঁয়ারছ  
না বুঝন কৈছন কেল।  
লাখ লাখ যুগ                      হিয়ে হিয়ে রাখছ  
তবু হিয়া ছুড়ন না গেল।

কিন্তু রাধার প্রেম-অভিধানের এখানেই শেষ নয়, বরং আরম্ভ। কারণ, “অহেরিব” গতি: প্রেম: স্বভাবো কুটিল ভবেৎ।” এই প্রেম ভক্তির জ্ঞান রঙ্গ, বিচিত্র বিভঙ্গ। তাই কৃষ্ণ যখন রাধার কুঞ্জে না এসে অপর কুঞ্জে যান, তখন দেখি রাধার অভিমানিনী রূপ। অল্পতপ্ত কৃষ্ণ এসে রাধার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করেছেন কিন্তু রাধা তাঁর তাঁর অভিমান বশত: তিরস্কার করে কৃষ্ণকে বিদায় দিয়েছেন অথচ পরমুহুর্তেই তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতরা। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ বহুবল্লভ কিন্তু তবুও তাঁর হৃদয় মানে না, তিনি একাই কৃষ্ণের সান্নিধ্যকে নিবিড় করে উপভোগ করতে চান। মিলনের মধ্যেও রাধা বিরহের স্তর স্তরে পান। কৃষ্ণকে হারাবার ভয়ে তাঁর অন্তর এক অজ্ঞান ব্যাঘাত ভরে থাকে। কৃষ্ণের দেখা না পেলে রাধার কাছে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলে মনে হয়, আবার মিলনের পর সন্দেশ হয়: যা পেলাম তা কি সত্য? যে প্রেমের জগৎ অসাধ্য সাধন তিনি করেছেন, আজ পর্যন্ত তার স্বরূপ ত’ তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন না অথচ এই প্রেমেরই দারুণ শ্রোতোবেগে রাধা তাঁর ব্যক্তিত্বের তটভূমি থেকে ঝলিত হয়ে অসহায় শৈবালের মত মহাসমুদ্রে দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর এই যাত্রা সীমা থেকে অসীমের প্রতিই যাত্রা। এর মধ্যে স্থিতি নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কৃষ্ণকে পেতেও না পাওয়ার বেদনা যে কত গভীর! রাধার কাতর উক্তির মধ্য দিয়ে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়:

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিছ  
অনলে পুড়িয়া গেল।  
অমিয়া সাগরে দিনান করিতে  
সকলি গরল ভেল।

রাধাচরিত্রের পরিবর্তমান ধারাটি লক্ষ্যীয়। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রাধার আত্মবোধ ধূলিলুপ্তিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর হৃদয়ে আজ কৃষ্ণের আরতি। কৃষ্ণের অধিষ্ঠান এবং কৃষ্ণের সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে! তাই রাধা বলেন:

বঁধু কি আর বলিব আমি  
জীবনে মরণে জনমে জনমে  
প্রাণনাথ হৈও তুমি।

এত দিন হৃৎকের তরঙ্গাবাতে তাঁর চিত্ত আন্দোলিত হয়ে কতবিকৃত হয়েছে। নানা হৃৎ-কণ্ঠের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে ঐক্যপ্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। তিনি বলেন:

শীতল বলিয়া শরণ লইছ  
ও হৃটি কমল পার।

এখানে রাধা প্রগলভা—যুদ্ধা নন। জীবনের বিভিন্ন যাত-প্রতিযাতের মধ্য দিয়ে তাঁর বখেট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, রাধার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাঁর সমস্ত স্বাধীনতা

চাওয়া-পাওয়া দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। নানা অশান্তির পর শান্তির সমুদ্রে অবগাহন করে শান্ত রাধা বলেন:

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।  
দেহ মন আদি                      তোমারে সঁপেছি  
কূলশীল জাতি মান।

আজ রাধা-কৃষ্ণকে “সো বহুবল্লভ কাম” জেনেও হৃৎক করেন না— তাঁর সাধনা বৈত সাধনা থেকে অবৈত সাধনায় উপনীত হতে চলেছে। পূর্বের মিলনের মধ্যেও বিরহের যে আভাস তিনি পেয়েছিলেন, তা সত্যতা লাভ করল সেদিন, যেদিন অকুর এসে কৃষ্ণকে মধুরায় নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ বিনা রাধার জীবন-জগৎ শূন্যতায় ভেঙে উঠল। তাঁর অন্তর কৃষ্ণের বিরহে হাহাকার করে উঠল:

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।

শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।

তাঁর পূর্বের চাপা ক্রন্দন আজ এক মহাক্রন্দনে পরিণত হয়েছে। যে কৃষ্ণকে লাভ করে রাধার একদিন মানের অবধি ছিল না, তৃপ্তির সীমা ছিল না, সেই কৃষ্ণকে হারিয়ে তাঁর বেদনা অসীম শূন্যতায় পর্যাবসিত হয়েছে। বর্ষার বারিপাতের সঙ্গে রাধার মন তাই গেয়ে চলেছে:

এ সখি হামার হৃৎকের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর

মাই ভাঙ্গর

শূন্য মন্দির মোর।

কৃষ্ণ হয়ত আবার এক দিন ফিরে আসবেন কিন্তু রাধার তাতে কি লাভ? কারণ বাদ:

অকুর তপন তাপে যদি জ্বরব

কি করব বারিধ মেহে।

এ নব যৌবন বিবহে গোঁড়ায়ব

কি করব সো পিয়া লেহে।

বিরহের দশ দশা রাধার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল—কিন্তু এই জ্বালা তাঁকে বেশী দিন সহিতে হোল না—কৃষ্ণ অবশেষে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এবার তাঁদের যে মিলন ঘটল, তা হয়-গৌরীর মিলন-অপেক্ষাও নিবিড় এবং গভীর। কৃষ্ণের আগমনবার্তা শুনে রাধা বললেন:

পিয়া বব আওব এ মধু গেহে

মঙ্গল বতহঁ করব নিজ দেহে।

বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে

ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।

কারণ তিনি জানেন যে সাধকের দেহই মঙ্গল আচারের স্থান—“The humanbody is the highest temple of God।” এখন কোকিলের কুজন, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, যুহুমল মলয় বাচ্চের স্নিগ্ধ কিরণে তাঁর অন্তর বিবহানলে জ্বলে ওঠে না—তিনি আনন্দে অধীর হয়ে বলেন:

সোই কোকিল অব

লাখ লাখ ডাকউ

লাখ উদয় কর চন্দা।

পাঁচ বাণ অব

লাখ বাণ হোউ

মলয় পবন বহ মন্দা।

কৃষ্ণের সঙ্গে এই মহামিলন—ডাকলিলনে রাধার আর বিচ্ছেদের

আশঙ্কা নেই। তাঁর এট আত্মনিবেদন আর কিছুই নয়—“সীমা হতে চার অসীমের মাঝে তারা” এই সংসার ক্ষণস্থায়ী এবং অসার জেনে রাধা তাঁই চিরস্থায়ী শাখত কৃষ্ণের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করেছেন—এমন কি, নিজের দেহের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করে তিনি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছেন :

মাধব বহুত মিনতি করি তোয় ।

দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পণু

দয়া করি ছোড়বি মোয় ।

সর্বশেষ স্তরে এসে রাধার উপলব্ধি হয়েছে—সোহন নয়—তত্ত্বমসি—কৃষ্ণই সেই পরমপুরুষ। এখানেই তাঁর দ্বৈত সাধনা অদ্বৈত সাধনার সর্ব শেষ সোপানে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

রাধার পরিভাষা শুরু হয়েছে পাংখ পাংখ। মান আক্ষেপ মিলন বিরতির নিত্যলীলার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র ক্রমেই বিকশিত হোয়ে উঠেছে। তাঁর মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্ভা রূপের মধ্যেও কত চিত্র—কৃষ্ণের রূপদর্শনে ও গুণশ্রবণে হৃদয়ের যে আকস্মিকতার উদ্বোধন, নিখিল রসায়নের আনন্দসমুদ্রে তাঁর ধ্যানশীলতা—এই ভাবেই সমগ্র বৈকুণ্ঠ কবিতার মধ্যে নানা চিত্র-বিচিত্রের মাধ্যমে রাধার চরিত্র উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

অসীম হতে বিচ্ছিন্ন রাধার অসীমের প্রতি যে সীমাতীন পিপাসা রয়েছে, তার একমাত্র নিবৃত্তি অসীমেই। পার্শ্বত্যাগ নদী বখন তার নামরূপ হারিয়ে মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্রে পরিণত হয়। নদীর সমস্ত সত্তার মিশ্রণ ঘটে সমুদ্রের বিরাট সত্তার মধ্যে। এই মিশ্রণে বিড় নেই—আছে একত্ব। রাধা এবং কৃষ্ণের মিলন—সীমা এবং অসীমেরই মিলন। কারণ কৃষ্ণ যে অসীম এবং অনন্তেরই প্রতীক। রাধা কেবল তাঁর চলার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজে পাননি—তিনি আপন সত্তাকে যেদিন কৃষ্ণের মহাসত্তায় বিলুপ্ত করে দিতে পারলেন, সেদিনই এল তাঁর সুখ, তাঁর শান্তি, তাঁর তৃপ্তি। এই প্রসঙ্গে মরমোরা সাধকের যে উক্তি কত গভীর এবং ব্যাপক, তার পরিচয় নতুন করে পাওয়া গেল :—

“In this highest stage the soul is united to God without means, it sinks into the vast darkness of the God head.”

## কাল আসছে

[ একটি জনপ্রিয় ইংরাজী সঙ্গীতের অনুবাদ ]

### শমিতা গুপ্ত

গুগো মোর প্রিয় দিন হবে অবসান

‘কালকের’ নেই দেবী ;

নতুন তপন আনিবে রোমন ধারা

আভাস জাগিছে তারি ।

ও রাডা অথরে হাসি নাহি দেখা দেবে,

ও কালো নয়নে নাহি বলকিবে আশা,

আমি যে জেনেছি গুগো মম প্রিয়তম

মোর রহিবে না, কাল তব ভালোবাসা ।

দিন হল শেষ ‘কালকের’ হল শুরু

সামনের দিন সকাল রয়েছে অজানা

তোমার স্পর্শ সহজেই মোরে বলে

ভালোবাসা তব শুধুই মিথ্যা ছিলনা ।

চিরদিন শুধু তোমারেই ভালোবাসিব

যত দিন তারা আকাশেতে দেবে আলো

প্রতিদিন শুধু এই আশা লয়ে থাকিব

একদিন তুমি সত্যি বাসিবে ভালো ।

## তুচ্ছ

### দীপালী বিশ্বাস

ক্লান্ত বিকাশের ঠাণ্ডা হয়ে আসা উত্তাপ কেমন যেন লুটিয়ে পড়েছে খোলা জানালার কাচের সার্সির গায়ে, ঘরের সিমেন্ট-প্লা মেজোতে, এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা বিছানার চাদরে আর পুরানো বৃষ্টিভেজা দেয়ালটার কোণে—যেখানে ক’দিনের অবিরাম বর্ষণে ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে জল পড়ে পড়ে ধুয়ে গিয়েছে ময়লাগুলো। বৃষ্টির জল ঘরের মাঝখানে টেনে-আনা খাটখানার ওপর অলস মৌনতার বসে আছি আমি। নিবিষ্ট হয়ে দেখছি আমার মনটাকে। ব্যাকুল বিদ্রোহে সে বেরিয়ে গেল স্ব-ইচ্ছায় আর তারই আকুলতা যেন আমি দেখছি। দেখছি আর ভাবছি।

কত কাজ—অনেক হিসাব-নিকাশ লিখতে হবে, অনেক রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে, আবার অনেক কড়া হিসাব-নিকাশ একটু কালির আঁচড়ের অপেক্ষায় জমে আছে। অফিসের সঙ্গেই আমার ঘর—অফিসকে তাই দিতে হয়েছে অনেক শ্রমের মুহূর্ত। সারাদিনের অনেক চিন্তা, সন্ধ্যারাতের অনেক প্রসন্নতা হারিয়ে যায় অতর্কিতে কাজের প্রয়োজনে। মেনে নিতে হয় সে কোলাহল। কিন্তু সহসা এক একটা দিন আসে, যেদিন অকারণ ব্যথায় ভরে ওঠে সারা অন্তর—সেদিন আর মেনে নেওয়ার দিন নয় এমনই করে আকুল মনকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা শুধু।

আজ তাই হয়েছে। ওই তো দেখছি আমি আমারই মনটাকে—কেমন করে বারে বারেই অসহায় আতর্জন উড়ে পড়ছে ওখানটায়। যেখানে আমগাছটার কালচে সবুজ পাতার ওপর দিয়ে জানলার মধ্য দিয়ে ঘরের মাঝখানটার থম্কে দাঁড়ান রোদ্দুরটা একটু হঠাৎ বৈরাগ্যের সঙ্গে চিক্‌চিক্‌ করছে। তার ওপাশে পড়ে রয়েছে আমারই এক জোড়া খড়ম, বারে বারে যেন কেঁদে ফিরছে সেই কাঁঠের নিশ্চারণ রূপের কাছে। আর আমি দেখছি, দেখছি আর ভাবছি।

ভাবছি? কই না! ভাবছি না তো? ভাবতে চাই কিন্তু পারছি না। কেন, কেন, কেন?

কীসের শব্দ দরজায়? কে? কে যেন দাঁড়িয়ে দরজার ওপাশে—গলাটাকে সহজ করে জিজ্ঞাসা করি, কে? দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে দাঁড়াল একটি মেয়ে। এসেছে প্রয়োজনের কথা নিয়ে। অস্ত্রমনস্ক ভাবে কী যেন বললাম। বলতে বলতে, শুনতে শুনতে এমনই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে মেশিনের মতন উত্তর দিয়ে বাই। নিজের অজান্তসারেই বলি অনেক কাজের কথা। কথা সেরে চলে গেল মেয়েটি। কিন্তু মনটা আজ ঘুরে-ফিরে কেবলি ওই একটুখানি বিকিমিকির চার পাশে কেঁদে ফিরছে।

এখন বেলা কত? সাড়ে চারটা হবে বোধ হয়। হাতখড়িটার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত স্নায়ুগুলো বেন অবশ হয়ে গিয়েছে। অফিস থেকে এক মুহূর্তের জন্ত ঘরে এসেছিলাম আর তাতেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনার কথা কাগজে উঠবে না, পাঠকে পড়বে না—কেউ একটু সময় করে বলবে না—“আগা রে”। আমার অন্তর শুধু জানল, বিধাতার সৌন্দর্যলোকে অসংখ্যের মধ্যে আজ একটি দীপ্তি নিবে গেল বড় অসহায়, করুণ ভাবে।

“আসব?” একটা প্রশ্ন ভেসে এল। “এসো”—ভাল করে চোখ মেলে তাকাতেও বেন চাই না ঠিক এই মুহূর্তে। তবু ফিরে দেখলাম একরাশ কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ওই কাজের মানুষ। তাগিদের ওপর তাগিদ দিতে থাকে সে। প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন। না, এখনই তাকে দেখে দিতে হবে ওগুলো—হ্যাঁ এখনই, আজই, এই ক্ষণেই। অভ্যাসে হাতটা বাড়াই। কলমের আঁচড়ে নামের একটা মিছিল এলোমেলো হয়ে বয়ে চলতে লাগল। সে পালা শেষ হোল। হায় রে শুধু ভুলের দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টার একটা প্রয়োজনচক্রে বেঁধে দিয়েছি—সেই অবিরাম একটানা চক্রে ঘুরে চলেছি আমি।

সেই ছককাটা একঘেয়ে দিনের মধ্যে হঠাৎ বেন একটা অপরিচিত মুহূর্ত এসে সব তোলপাড় করে দিল। আগা রে—ওই তো, কতটুকুই বা প্রাণ, কিন্তু কী ব্যাকুল তৃষ্ণা ছিল তার বাঁচার।

মনটা গুলুগুন্ করে ফিরছে। কেবলই সেই সারাদিনের অকারণে বাড়ানো কাজের কথায় ভরে উঠছে। নিত্যদিনের মতন আজও ভোরে কুঁজোটা থেকে জল নিতে যেয়ে হঠাৎই চোখ পড়েছিল ওটার ওপর। কোথা থেকে এল কি জানি! দেয়ালের ঘোলা রংয়ের ওপর বসে একটা প্রজাপতি। গিরিমাটির লালচে আভা আর তারই হালকা গভীর রঙ্গের মিশ্রণে সুন্দর পাখা দুটি অদ্ভুত সুন্দর। ভোরবেলার প্রসঙ্গ আলোয় স্নিগ্ধ এক সৌন্দর্যের ছবি। রূপসুষ্ঠির নিপুণতার এক অগ্নান উদাহরণ। কী জানি কি খেয়াল হোল—একটু ধবতে ইচ্ছা কোবল। দক্ষিণের বারান্দার পাম গাছগুলির কাঁক দিয়ে আসা বাতাসের দোলায় কাঁপন ধরেছিল তার মেলে দেওয়া হালকা পাখায়। আনন্দের একটু স্পর্শ, আশ্চর্য্য সুন্দরের একটু আমেজের লোভ ভোরবেলার শান্ত মনটাকে পেয়ে বসেছিল। তাই হাত বাড়িয়েছিলাম।

উঃ, ভাবতেই কেমন জানি অবাক লাগে! মনটা ভাবছে, ওই

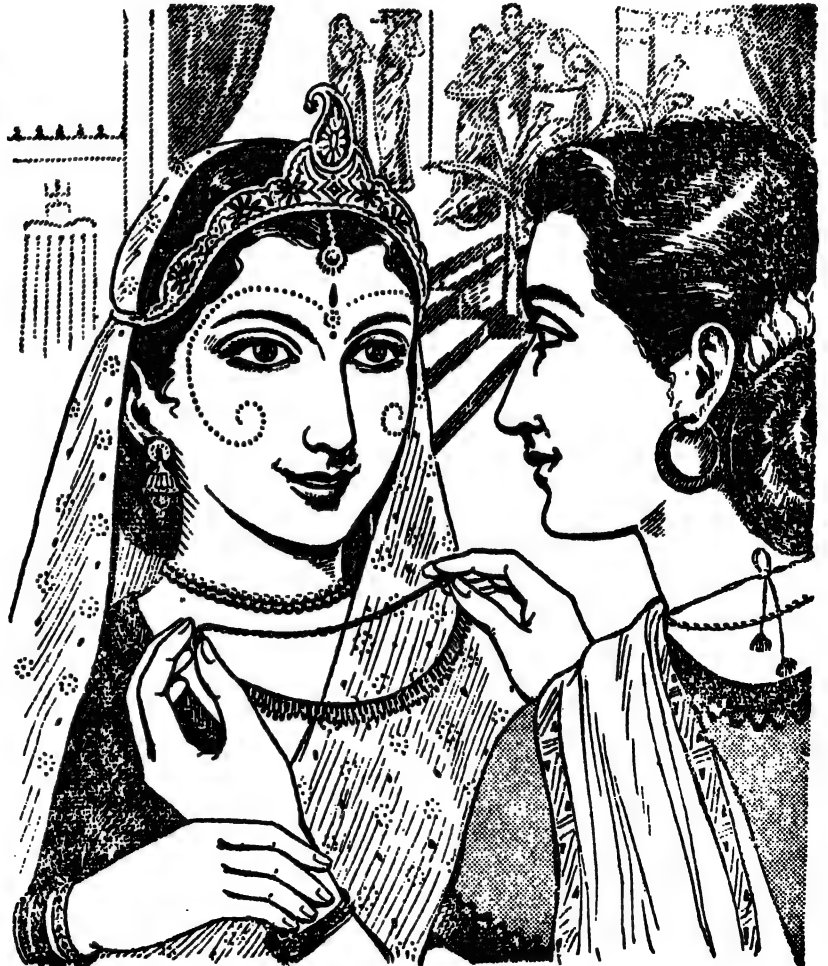
## মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”  
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স  
বিরাজেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,  
যনের যন্ত হচ্ছে, —এসেও পৌছেছে  
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও  
দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিলি সোনার গহনা নির্মাতা ও রত্ন-১  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০





তো দেখছি আমি ও কাঁদছে, টপ টপ করে—জল নয় তার বাথার বৈরাগী হুং করে পড়ছে মাটির সঙ্গে লেপটে-বাওয়া ডানা ছুটি ওপরে। তখন কি জানতাম, এমন করে বাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই-ই, এমন করেই এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে বিলুপ্ত করে দেব? এ কি নিয়তির পরিহাস! ও যেন সাগরদিন অপেক্ষা করেছে এই পরিহাসটুকুকে আরও মর্যাস্তিক করার জন্য।

কি বলছিলাম যেন? হাত বাড়িয়েছিলাম, নয়? স্পর্শ একটু করতেই ছটফট করে উঠে ওটা নেতিয়ে পড়লো কেমন যেন। আলতো করে ধরে জলের কুঁজোটার কাছে ছেড়ে দিতেই উড়ে যেয়ে বসলো সেটার গায়ে। আর আশ্চর্য! সৌন্দর্যের যেন হাট বসলো। কুঁজোটার রাজ্যমাটি রঙ্গের সঙ্গে তার দুই-রাজ্য গেকুরা মাটির বিকিমিকি যেন সৃষ্টি তারের এক স্বপ্নময় স্থান তুলল। এ জগতের সঙ্গে কষ্ট আমার তো কোন সম্পর্ক নেই? আমি তো হিসাব-জগতের মানুষ। স্বাভাবিকের কাল কালি আর মাঝে মাঝে মোটা মোটা লাল লাইন দেখাট আমার অভ্যাস—সেই রঙই আমার বুদ্ধি অভ্যাস। কিন্তু এই যুদ্ধতার মায়ার আজ আমার বোধ যেন একটা ধাক্কা খেল। অনেকক্ষণ, ই্যা অনেকক্ষণ সেই শূন্যতা আমি প্রাণ মন ভরে পান করেছিলাম। বস্তুক্ষণ না বেলা উঠেছে, ঘরের কাজ করে যে মেয়েটি সে এসে না ডেকেছে ততক্ষণ আজ আমার মনটার শূন্য হয়ে আসা পাত্র মেলে ধরেছিলাম ওই আনন্দ পানে। সচেতন হয়ে উঠে সাবধান করেছিলাম মেয়েটিকে, ওটা যেন না নাড়াচাড়া হয়, থাক ওখানে।

তার পর ব্যস্ত ছিলাম অল্প দিনের মতই নানা কাজে। কিন্তু বখনই অবসর পেয়েছি একটু গাড়িয়ে দেখেছি সে দৃশ্য, বস্তু দেখেছি তত যুক্ত হয়েছি। হুঃ হুঃ হুঃ ভাবলে, ওই তো মনটা ছটফট করছে বেদনার, ভাবছে আমি যদি শিল্পী হতাম। রঙ্গে রেখার ধরে রাখতাম সেই ছবিটি—বা চেতন মনের স্তর থেকে বিদায় নেবে একদিন।

কিন্তু হায় রে নিয়তি! বিকালে হঠাৎ খুব জরুরি ভাগিদে দ্রুত পদে এসেই চাবিটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম অফিসে, হঠাৎ সেই এক কালি রোদের শীর্ষ দেহের ওপর কী যেন খিলিক দিয়ে উঠল। ভাল করে দেখেই চমকে গেলাম। খড়মের তলায় নিঃশব্দে শব্দ হয়ে গেল সৌন্দর্যের একটা শিশির-বিন্দু। একটু শব্দ না, একটু প্রতিবাদ না। নিঃশব্দ, মহান, শাস্তি।

উঃ, আর ভাবতে পারছি না। ওই তো একেবারে মিশে গিয়েছে সিমেন্টের কর্কশ মেঝেতে। মনে হচ্ছে, কে যেন ওখানে, ওই মেঝেতে এঁকে রেখেছে একটা রঙ্গের ছবি-প্রজাপতি। একটু বিকৃত হয়নি, একটু স্থান হয়নি, একটুও পরিবর্তন হয়নি।

কাঠের সিঁড়িতে গুনতে পাচ্ছি পায়ে শব্দ। ক্রমেই জোরে আসছে শব্দটা। বোধ হয় পাঁচটা বেজে গিয়েছে, তাই কর্মীরা চলেছে নিজের জায়গায়।

কিন্তু আমার মন? সে তো ওই কেবলই অসহায়ের মতন তার সেই ছবি-স্মৃতির চার পাশে গুণ্ণনিয়ে ফিরছে। ভাবছে—পয়ম আদরে বাকে ধরে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, সে এমনই করে কোঁতুক করে চলে গেল কেন?

অহাটা বড় মুহূর্তে পড়লো আজ। অহংকার করেছিলাম ওই ক্ষুদ্র প্রাণটিকে ধরে রাখার, লোভ হয়েছিল রং সরে, ঘুরে ফিরে সে দৃশ্য দেখার। তাই বোধ হয় এমনই করে শিক্ষা হোল। কোন সাক্ষ্যই যেন খুঁজে পাচ্ছি না এই অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুর হৃৎকৃত্তির। মিঠে আলোর খিরখিরে বাতাসে ভোবের বেলা যে স্নেহের তার বেঁধেছিলাম তা এমনই করে ব্যথার মীড় টেনে ছিঁড়ে গেল কেন?

হায় রে নিয়তি! আমিই শেষ করে মুছে দিলাম সেই কল্পনাময়রকে, বাকে প্রাণপণে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম তাকেই বিসর্জন দিলাম ব্যথার সমুদ্রে।

কিন্তু এও তো সেই অহংকারের কথা। আমি কে? কী বা আমার ক্ষমতা? মনে পড়লো সেই ইচ্ছা-সমর্পণের বাণী—“হুয়া হুয়াকেশ হুদিস্তেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”

মনটা কখন চূপচাপ হয়ে গিয়েছে। গুনগুনানি বন্ধ করে স্থির শুরু হয়েছে। হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল আবছা হয়ে এসেছে জায়গাটা। রোদের সোনাটুকু কখন মুছে গিয়েছে আর সেই ছবিও আবছা অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাইরে বারান্দার ধামে ধামে শোনা যাচ্ছে পায়ের ডানা ঝটপট, ফিরে এসেছে ওরা ওদের নীড়ে, নিশ্চিন্ত আরামের পক্ষছায়ে। জানলার বাইরে আকাশের মেঘলা নীল রং আর সেই আমগাছটার ঘন কালো আভাস ধীরে ধীরে এক অপক্লেশের রাজধরবারের দ্বার উন্মুক্ত করছে।

হারিয়ে যাবে কি সংসারের শত সহস্র লক্ষ প্রয়োজনের পাকে ফেরা জীবনের মাঝখানে আজকের এই পাওয়া আনন্দটুকু আর তা হারানোর বেদনা? হয়তো বা ভুলেই যাব! ভুলে যাব? না, তা হয় না—

“অল্প মনে চলি পথে

ভুলিলে কি ফুল, ভুলিলে কি তারা?

তবুও তাহার

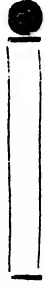
প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু করে স্তম্ভুর

ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।”

জীবনের হৃদয় বন্ধুর চলার পথে ওই মনটা বখনই কাড়াল হয়ে উঠবে তখনই আজকের দিনটি যে অমৃতসঞ্চয় রেখে গেল তাই দেবে আবার নূতন আলো, নূতন আশা, নব উদ্যপনা। এই তুচ্ছ একটি মুহূর্ত বিবৃত হয়ে রইলো আমার জীবনে, অন্তরের অন্তরতম লোকের মণিকোঠায়।

সাগরদিনের শত কাজ পড়ে রয়েছে। মনটাকে কিরিয়ে এনে উঠে পড়ি এবার। সন্ধ্যার আঁধার শব্দ মিলিয়ে গেল, রেণটুকুও গেল প্রায়। ক্রান্ত দেহ আর ফিরে পাওয়া শ্রান্ত আবিষ্ট মন নিয়ে উঠলাম—আর নয়।

তবুও ঘরের বাইরে পা দিয়ে আবার তাকালাম সেই অলিখিত হৃৎকৃত্তির দিকে—না, কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। না দেখা বাক, তবুও এ কর্ণিকার স্মৃতিতে রইলো তার রঙ্গীন স্বপ্ন। সে আছে, সে রইলো, সে থাকবে।



## স্মৃতিস্মরণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

দিদিমার ডাকে চমকে ওঠে স্মৃতি। কত বেলা হয়েছে!

সোনালী বোদের ঝিলমিল ওর বকের পালকের মত শাদা বিছানার চাদরে।—সেই ওর দিকে চেয়ে কৌতুকভর হাসছে বাসন্তী প্রভাত।

—তোমার গীটারের মাঠার অনেকক্ষণ এসেছেন মিতা, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

দিদিমার মুখের পানে একবার সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে; বলে স্মৃতি,—এই যে, এখনি আসছি দিদিমা!

কাল রাতের ঝড়ের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখতে পায় না সে মুখমণ্ডলে!

মাঠার মশাইয়ের নির্দেশমত গীটারের বুকে সুরের খেলা জাগায় স্মৃতি, কিন্তু সে আজ বড় অগম্য।

মাত্র এক দিনের ব্যবধানে! কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একটা বিগট ড্রাম্পন ওর মনের সকল বৃত্তিগুলোকে ধরে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে! সে আজ নিজের সম্বন্ধে যেন বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে।

ছোটমাসী কই? সে তো এলো না আজ গীটার শিখতে?

কানে এলো দিদিমার কণ্ঠস্বর—অ, ঝবি, ঝবি! মাঠার মশাই কতক্ষণ বসে থাকবেন?—বেয়ারা, বেয়ারা,—আরে দিদিমণি কাঁহা?—কি? বাহার গিয়া?—এবারে তাঁর কণ্ঠস্বর সন্তোষে চড়লো, —বলি এই সাত সকালে কোথায় চরতে গেছেন তিনি? কিছু বলে গেছেন কি? ওঃ! আমি সে একটা মানুষ বাড়ীতে আছি, সে কথা বুঝি আজকাল আর কারুর মনে থাকে না? বাড়ীতে দেখছি স্বচ্ছাচারিতার বড় বইতে স্তব্ধ করেছে!

অনিল চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়িয়ে বললো, —কি হয়েছে মা? এত চোঁচো কেন?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ড! বলি দল বেঁধে সব আমার পেছনে লেগেছো কেন, বলতে পারো?

—তোমার ছোট ভগিনী এই সাত সকালে গেলেন কোথায়?—কোন সম্পত্তি রোজগার করতে?

—সম্পত্তি রোজগার করা অত সহজ ব্যাপার নয় মা!—তবে, কাল ঝবি একটা গানের টিউনানীর কথা বলছিলো,—আমার মনে হয়...হয়তো সেখানেই গেছে।

—এতও কপালে ছিলো? আমার পেটের মেয়ে করবে টিউনানী?—কেন আমি কি ভিকিরি? ওর বাপ কি কিছু রেখে বান নি? যে ওকে পেটের ভাত জ্বোটাতে হবে টিউনানী করে?

দিদিমার কণ্ঠস্বরে কান্নার পূর্বভাস।

স্মৃতি গীটার খামিরে বলে,—আজ এট পদাস্ত থাক মাঠার মশাই!

সে উঠ আসে বাইরের বাতান্নার!

অনিল সহান্তে বলে তখন—অত রাগ করছো কেন মা? তুমিই তো কাল বললে; বাবা তেমন কিছু রেখে বাননি! কাজ করলে আজকালকার দিনে মোটেই মান খরচা হয় না। যার যেমন বিজ্ঞে, সেইটুকু কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করলে পরিণামে একটা সফল লাভ অবশ্যই হয়, আমিও তো ক'জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছি, দেখো না, খুব শীগগির একটা যোগাড় হয়ে যাবে। পরের পরসায় বড়মানুষী করার চেয়ে, নিজের উপার্জনের যুগ-ভ্রাতের সম্মান অনেক বেশী মা!

এবারে মায়া দেবীর চোখে জল আসে। ফুক কণ্ঠে বললেন তিনি—কাল রাগের মাথায় কখন কি যে বলেছি, সেইটেই সত্যি হল তোমাদের কাছে? আর এত কাল তোমাদের সুরের স্বভেদে যে রক্ত-মাস জল করলাম, সে সব এতই মিথ্যে হয়ে গেছে যে কোনো কিছু করার আগে আমার একটা মতামত নেবারও প্রয়োজন মনে কর না তোমরা?

বেশ ভালো কথা—আমিও দেখে নেব, তোমাদের দৌড় কতখানি! অতই সোজা যদি হতো উপার্জনের পথটা, তাহলে দেশে বেকার বলে আর কোনো পদার্থ থাকতো না; সবাই রাতারাতি কাজের মানুষ হয়ে উঠতো!

ভুল বুঝো না মা! কাল রাগের মাথায় সব কথা বলে আমাদের ভালোই করেছো, চোখ খুলে দিয়েছো মা! আমি বলছি দেখো, এর ফল ভালোই হবে।

আর শোনার দৈর্ঘ্য ছিলো না মায়ের; পদশব্দে মৈদিনী কম্পিত করে, নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি। স্নানমুখে বলে স্মৃতি, তোমরা সবাই মিলে কি আরস্ত করেছো ছোটমাসী? থাক, এ নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না মিহু! তার চেয়ে ভালো খবর দিতে পারি, আগে কি খাওয়াবি বল?

—কি খাবে তাই বলো? ডিমের চাউ চাউ, মোগলাই পরোটা? কমলা পুড়ি? রসগোল্লার মালাই? কাশ্মীরী ঘুগুনী, লাহোরী বালুসাই, পাঞ্জাবী পায়স। বলো আরো কিছু?

আর নয়, আর নয়, বাব্বা, খেতেই চেয়েছি, তা বলে কাঁসি তো যাচ্ছি না!

এই যে, নে। লগুন থেকে চিটি এসেছে তোরা। একখানি সুদৃশ্য নীলাভ খাম স্মৃতির হাতে দিলো অনিল।

চিঠিখানা নিতে গিয়ে ছোটমাসীর মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে মিতা। দেখতে পায়, ওর চোখে, ঘোঁটের কাঁকে, চাপা হাসি খেলছে! নিটোল কপোল দুটি ওর পাকা টোমটোর মত হঠাৎ রক্তিমবর্ণ হয়ে ওঠে, কানের পাশে ঘাড়ের ওপর, মুহূর্তে অশ্রুভব করে।

এর নাম কি প্লক শিহরণ? ভেবে পায় না।

নিজের ঘরে, দুফ-দুফ বক্ষে প্রবেশ করে স্মৃতি! সোফার ওপর বসলো পাখাটা জ্বোরে চালিয়ে দিয়ে। খামখানি দেখলো—বার বার। ওর প্লক ভারে অবনত চোখ দুটি থেকে যেন পবিত্র প্রেমের স্নিক্ত ধারা ঝরে পড়ছিলো খামখানির ওপর।

সুদাম! ওর দামোদা! তার চিঠি! গত রাত্রেই তো তার সারা মন-প্রাণ চাইছিলো সুদামকে, ওর আর্তস্বর কি সেই স্বদূর সাগরপারে পৌঁছেছিলো? শুনতে পেয়েছিলো সে? তাই পাঠিয়েছে। তার স্নেহসিক্ত অন্তর্বাণী?

সন্তর্পণে চিঠিখানি খাম থেকে বার করে পড়তে থাকে সুমিতা!

“কি করছে এখন মিতা? সর্বক্ষণ অবাধ্য মনটা ছুটে চলেছে তোমার পানে! কিছুতেই যে তাকে পাঠাবিষয়ে নিযুক্ত করতে পারছি না! শুনতে পাচ্ছি তোমার গীটারের সুরমুর্ছনা! তোমাব গানের সুর যেন ছড়ানো এখানকার আকাশ-বাতাসে!

অচেনা পরিজন আর অজানা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বোধ হয় বেশ কিছু দিন সময় লাগবে।

মন খারাপ করে থেকে না লক্ষ্মী! দিদিমা, মাসী, মামা, তুমি নিজেকে—সব ভালো তো? তোমার খরগোশ আর পাখীগুলো? নিরাপদে আছে তো?

শরীর আমার ভালোই আছে, আমার জন্তে তুমি কিছুমাত্র ভেবে না!

টেলিগ্রামে পৌঁছোনো খবর, কাকা নিশ্চয়ই জানিয়েছেন তোমাদের? তারপর নিজেকে একটু স্থিতি করে নিয়ে, তোমাকে আর মাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কত—কত বার লুকিয়ে চোখের জল ঝাঁচলে মুছছো মিতা? না রাণী, মনকে স্থির করো, মাত্র তিনটে বছরের ব্যবধান, তার পর সারা জীবন থাকবো তোমার পাশে—আর একটা দিনও কোথাও যাবো না তোমাকে ছেড়ে।

খুব তাড়াহাড়াড়ি জবাব চাই কিন্তু। তোমার হাতের স্পর্শ-লাগা করেকটি ছত্র, সে যে এই স্বদূর সাগর-পারে, আত্মপরিজনহীন দেশে, আমার একমাত্র সাহায্য। তাই তার জন্তে চলবে আমার আকুল প্রতীক্ষা। আমার অন্তহীন স্নেহ-অনুরাগ পাঠালেম মিতা।

ইতি—দামোদা”

—কি রে মিতা, এখনো বসে আছিস, কলজ নেই তোর? কার চিঠি রে? হৃদয়ভূমিতে ঘরে প্রবেশ করে করবী। মুখে-চোখে ক্লাস্তির ছাঁপ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—সুদাম, মা-নে—দামোদার চিঠি। কেমন জড়িয়ে যায় সুমিতার টোঁটের ভাব। আবিবের ছোপ লাগে গালে।

—ও, তাই বুঝি! তাই গৌকে এত স্নন্দর দেখাচ্ছে, খুশীর আলোর ঝলমল করছে মুখখানা।

—আঃ, একটু আস্তে! দিদিমা শুনতে পাবেন যে! তার পর করবীর গলাটা এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলে সুমিতা—আমার ওপর রাগ করেছো ছোট মাসী? কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে ফেলে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিলো না। তবে অসীম বাবু—

ওকে বাধা দিয়ে বলে করবী—দূর পাগলী, রাগ করবো কেন? আমি কি তোর বডিগার্ড নাকি যে যখন যেখানে যাবি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দৌড়োতে হবে? খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে করবী, সুমিতাও বোগ দেয় ওর হাসিতে।

—বলি এসবের মানে কি, জানতে চাই আমি। দিদিমার গুণগুণ্ডীর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে ওরা দু'জন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের

মত, থমথমে অন্ধকার মুখে ওদের সামনে আবির্ভূত হলেন মাসী দেবী।

—কি জানতে চাইছো মা? আমার টিউসানীর কথা? আগে কিছু ঠিক ছিলো না, তাই বলিনি। আজই সকালে পেলাম চাকরীটা কি না। শ্রীহর্গা মিলের প্রোপ্রাইটার ধনপতি ক্ষেত্রীর মেয়েকে বাংলা গান শেখাতে হবে। গীটারও শিখবে। কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আজ গিয়েছিলাম সেখানে। এসেছে আরো অনেকে, তবে আমার বরাতেরই লেগে গেলো চাকরীটা। মাইনে ভালোই, এখন একশো করে দেবে, পরে যোগ্যতা বুঝে বাড়াবে।

—বাঃ, চমৎকার! বাড়ালী ছেড়ে এবার ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারীর দরজায় ধর্না দাওগে, লজ্জা হলো না ও-কথা আমার শোনতে? সমাজে আর মুখ দেখাবার পথ রাখলে না আমার! এতও ছিলো এ পোড়া বরাত! চোখে আঁচল চাপা দেন মাসী দেবী।

—ভুল করছো মা! মুখ লুকিয়ে রাখবার মত কোনো ব্যাপার ঘটেনি এতে। শিক্ষাদান করার কাজে, লজ্জার চেয়ে গৌরবের মাত্রাই বেশী, এই আমার ধারণা। আর ঝোড়ো পাতার মত এলোমেলো জীবন যাপন করার মাঝেই বা আছে কোন সার্থকতা? তবু কাজের মধ্যে থাকলে জীবনের একটা পথনির্দেশ পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় করবী মাসীর দিকে। দু' হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি খুব ভালো মনে আমার সম্মতি দাও মা গো! তা না হলে আমার কিছুই হবে না। তোমায় দুঃখ দিতে আমি পারবো না, তবে একটা বাসনা জেগেছিলো মনে, সুরযোগও মিললো কিন্তু তোমার মত না পেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

—না, বাধা আমি আর কাউকে দেবো না। সকলকারই ভালো-মন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে, যে যার পথ বেছে নেবার শক্তিরও অভাব নেই, তখন আমি কেন মাঝপথে বাধার সৃষ্টি করি? করবীর হাত ছাড়িয়ে অবসর গদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করলেন তিনি।

খোলা চিঠিখানি হাতে নিয়ে নিশ্চল ভাবে বসেছিলো সুমিতা। মনে এলোমেলো প্রশ্ন। ছোট মাসী চাকরী করবে? কেন? রাতারাতি সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কেমন সব এলোমেলো। বিশ্বয়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, তুমি হঠাৎ চাকরী করতে গেলে কেন ছোট মাসী? আর দিদিমাও যেন আজ বড় বেশী উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এমন কোনো ক্রটি আমার দিক থেকে ঘটেছে, বার জন্তে এই সব গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে। আমার বড্ড খারাপ লাগছে ছোট মাসী; তুমি আমাকে খুলে বলো কারণটা।

—আরে না, না, একেবারে কিছুটি ঘটেনি। জীবনটা বড় একেঘেয়ে লাগছিলো, হয় দিনরাত বাড়ীতে বসে থাকা, নয় বাইরে হৈ-হুল্লোড় করা, লেখাপড়ার তো বালাই নেই। কত দিন আর ভালো লাগে এসব? তাই একটা নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবার চেষ্টায় আছি, এই হলো ব্যাপার। আর মার কথা? যত দিন না তাঁর এই রূপসী বিদূষী কনিষ্ঠা কুমারীর জন্তে কোনো এক রাজপুত্র প্রণয়মাল্য নিয়ে না আসবেন, ঠিক তত দিন ওঁর মেজাজও অমনি হাই টেম্পার হয়ে থাকবে। তাই তো বলি, আমাকে হুকুম দাও না, তোমার গোবর-গণেশ ছোট জামাইকে তার গর্ভ থেকে চুলের খুঁটি ধরে, ধুতরার মালা গলায় দিয়ে একুণি এনে পিঁড়ের পাঁড় করিয়ে

দেখি ; দেখি ঠর পেলাদি কস্তুর মালা বদল হয় কি না । দুজনেই হসে উঠলো । থাক বাজে কথা । হ্যাঁ বে, সুদাম কি লিখেছে ? ভালো আছে তো ? শুধায় করবী ।

—পড়েই দেখো না, সলজ্জ হাসি হেসে সুদামের চিঠিটা করবীর হাতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালায় সুমিতা ।

ধনপতি ক্ষেত্রি বাড়িতে যায় করবী গান শেখাতে । সুমিতা যায় অলকাপুরীতে নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে । আর অনিল যায় ধনপতি ক্ষেত্রির ঠুঁড়িতে । ক্ষেত্রি নহন বই বসন্তসেনাতে রায়কের পাট পেয়েছে সে, নারিকা শুকতারা । একেবারে প্রথমেই রায়কের ভূমিকাটি অবগত অলকাপুরীর মাসীমার সুপারিশে পেয়েছে অনিল ।

—ওর ইটালিয়ান টাইপের মুখাকৃতি আর চটপটে চলন, বলন, অল্প সময়ের মধ্যেই মাসীমার অন্তরকে জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলো ।

মাসীমার স্নানজরে পড়লে সে ছেলেমেয়ের উন্নতির পথ, কুসুমাস্তরীণ এ রকম একটা জনরব আছে । শুকতারা, আরো কয়েকটি অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়ে এর অলস প্রমাণ । অনিলের বেলায়ও সে প্রবাদ

বাঁকাটি নিম্পল হয়নি । হাস তিনেক ধরে সুমিতারও শিক্ষার পরিমার্জনা চলেছে মাসীমার হাতে ।

—নাচের গঠন আছে তোমার, শিক্ষাও কিছু আছে, তবে বড় সেকলে ধরণ । ভাব-ব্যঞ্জনাগান । নাচের তাপের সঙ্গে চাই অর্থময় ইঙ্গিত । পায়ের ছন্দে করমুদ্রায় ফুটিয়ে তুলতে হবে অন্তরের আবেদন । তবেই সেই নাচ হবে উচ্চস্তরের আর্ট ।

অলকাপুরীর সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে সুমিতাকে পাশে বসিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন মাসীমা । নিবিষ্টচিত্তে মূল্যবান শিক্ষাগুলো গ্রহণ করেছিলো সুমিতা ।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র আলপনা । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্র্যাকেটে নানা রং-এর দেশী-বিলাতি পুষ্পগুচ্ছ । অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার ফটো তার মাঝে মাঝে ! আরো অনেক শিক্ষার্থীর ভিড় সে কক্ষে । নাচের মহড়া শুরু হলো অর্কেস্ট্রার সঙ্গে ।

শুকতারার বসন্তসেনার বিশেষ নৃত্যকলা প্রথমে আরম্ভ হলো । বসন্তসেনার সঙ্গে নাচের অংশ গ্রহণ করলো, সখীবেশধারী আরো পনেরোটি মেয়ে ! চোখধাঁধানো নিভন লাইটের তলায়, হাল্কা রং-এর নাইলনের সূক্ষ্ম শাড়ী, জরিব কাঁচুলি, পাতলা ওড়না, আর ফুলের অঙ্গভরণে সজ্জিতা বসন্তসেনা আর তার সখীদের নৃত্যের ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত হলো বিচিত্র লাস্যভঙ্গি ।

— কিন্তু —

কিছুটা বিরেস করিয়া কতকটা সম্ভা মূল্যে বিক্রয় করা বা যায়—এমন কোন জিনিষ বিরল । বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নহারী বিকট সম্ভা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায় । আমাদের চিরাচরিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ হাতে কোম সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে ।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোমদিক অভাব ঘটে না । তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি ।

এস, সরকার এণ্ড কোং



প্রবন্ধ

অলঙ্কার চিত্রকলা  
এলোরার তাক্ষর্য  
আগ্রার তাজমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

এস সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৩৪-৩১৪০, - দুর্গেশ-কুমারী ঈশিকার-গ্রাম-গিনিয়াট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৮, রাসবিহারী এভিনিউ-কলিকাতা-১২

বিশ্ব-বিবুদ্ধ চিন্তে ওদের পানে চেয়েছিলো সুমিতা ! আড়চোখে তার মুখ দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করে, গর্বের হাসি হাসছিলেন মাসীমা।

চুপি চুপি বললেন শুকে—ওদের চেয়েও অপূর্ণ করে গড়ে তুলবে তোমার মিতা ! গানের গলাটিও তোমার ভারি মিষ্টি, তবে উচ্চারণ চাই আরেকটু বিস্তৃত, আর ছোট ছোট গিটকিরীগুলো আরেকটু স্পষ্ট আর সুস্বাদু হওয়া চাই।

খুব শীগগির তৈরী হতে হবে তোমায়। খানিক আগে তোমার সঙ্গে ধীর পরিচয় করিয়ে দিলাম ? ঐ যে, বিলুপ্ত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে অনিরুদ্ধ বসু ? ওর বাড়ীতে হবে একটা বড় রকমের পাটি !

অভিজ্ঞাত সমাজের গণ্যমান্য পুরুষ আর মহিলারা আসবেন সেখানে। সেদিন ওখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার ভার মিসেস বাসু আমার ওপরই দিয়েছেন কি না, তোমার নাচ হবে সেদিনের প্রোগ্রামের প্রধান আকর্ষণ।

কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগে মাসীমার কথায়, সুমিতার অন্তরে ! পাখানের বুকে যেন লাগে প্রাণের দোলা। সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে ওর গোলাপ পাণ্ডির মতো গুঁঠপাত্তে। স্বপ্ন পাখীর মত সুন্দর চোখ দু'টি পুলকাবেশে নত হয়ে আসে !

লোলুপ দৃষ্টি দ্বারা সে সৌন্দর্য্যমুগ্ধা লেহন করছিলো অসীম হালদার। মায়া দেবী মাঝে দু'চার দিন এসেছেন সুমিতার সঙ্গে, তবে প্রত্যহ আসা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। অতবড় সঙ্গারটার সব দায়িত্ব তো একা তাঁকেই বহন করতে হয়। সেজন্তে অসীমকেই রোজ সন্ধ্যায় সুমিতার সঙ্গে আসতে হয়। আজ কয়েকটি বিশেষ ধরণের নৃত্যের মহড়া হবে শুনে এসেছেন তিনি। মাননীয় ও মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট আসন প্রদর্শন করে, গল্প জমিয়েছেন মিসেস বাসুর সঙ্গে। মন কিন্তু তাঁর সুস্থ ছিলো না। অনুশোচনার কাঁটাগুলো যন্ত্রণা দিচ্ছে মাঝে মাঝে। মেয়েদের উন্নত শিক্ষালাভের কি চমৎকার জায়গা ! হুঁজুগা মেয়েটা এসব ছেড়ে গেলো কি না গানের মাষ্টারী করতে ? যদি আসতো এখানে হালপ করে বলতে পারেন তিনি, সুপার একটি নিশ্চয়ই যোগাড় হতো এখানে।

আহা, কি সব চাঁদের টুকরোর মত ছেলের দল ঘোরাফেরা করছে এখানে ! ওদের হালচাল দেখলে যে কেউ মালুম করতে পারবে যে এরা সব পাঁচ, দশ হাজারী মাসিক আয় করণেওলা ঘরের ছেলে।

কি দুঃখিতই না হয়েছিলো সেদিন তাঁর ; মেয়েকে করলেন অবধা তিরস্কার। সেই কৃতকর্মের ফলভোগ করা ছাড়া উপায় কি এখন ?

বাক, ছেলেরা সব একটা হিরোর পাটাই পেয়েছে ! উন্নতিও করবে জ্ঞান কথা !

মানসচক্ষে তিনি দেখতে লাগলেন, সুসজ্জিত হালফাসানের একখানি বাড়ী, অসীমের মত প্রকাণ্ড একখানা সাদা বৃহৎ গাড়ী ! ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকা ! ব্যস, এর বেশী আর কিছু চান না তিনি।

কত লোক আসছে তাঁর বাড়ীতে, ছেলের দর্শনপ্রার্থী হয়ে, কিন্তু দেখা তারা পায় না, অত সহজে কি আর দেখা জোলে ? সময় কোথা তার ? বড় বড় কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে

চলেছে কনট্রাক্ট ! দিন-রাত এ ইন্ডিও থেকে ও ইন্ডিওতে ছুটোছুটি ! নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না বাছা ! তার পর নিজের ইন্ডিও, নিজের কোম্পানী অসম্ভব নয়। ব্যথার ক্ষতটার ওপর সাধনার প্রলেপ দেন মায়া দেবী।

চঞ্চল পায়ে এগিয়ে চলেছে সময়ের মুহূর্তগুলো। কেটে গেছে আরো কয়েকটি মাস।

সুমিতার সমস্ত সত্তাগুলো ভেঙে-চুরে, নতুন ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে লেগেছেন অলকাপুরীর মাসীমা।

সে আর আগেকার ভীক, লাজনগ্ৰা, স্বল্পভাবিণী সুমিতা নয় ;—তার অন্তরে যেন শতাব্দীর নিদ্রার ভড়তা কাটিয়ে জেগে উঠেছে এক প্রাণচঞ্চলা নারী !

শুধু একাদশীর অসম্পূর্ণ চন্দ্রকলা আজ হাত্রে, লাত্রে, চঞ্চলতায়, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে বিকাশিত হয়েছে !

সুদাম ছিলো জীবনে তার ধীর, স্থির, পবিত্র, কামনাহীন, শেতকমলস্বরূপ ! দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত পবিত্র নিখাল্যস্বরূপ ! তার নিফল্য স্বপ্ন মনে আনে আধ্যাত্মিক ভাবের সুস্থ অমুভূতি—দিব্য পরশ !

জাগে না নারীর চঞ্চলতা ! সোনার কাঠির স্পর্শে নারীর কামনাময় ইন্দ্রিয়গুলোকে সে যেন করে দেয় নিদ্রাতুর ! শুধু জাগিয়ে রাখে এক অতি মানবীয় সত্তাকে, শুদ্ধ প্রেমের হোমানল-শিখাকে !

অসীম ঠিক তার বিপরীত ! সে যেন একটি দুরন্ত বড় ; দাবানল ! যেন অলস্ত বিস্ময়সেব প্রতীক ! সুমিতার মনে ছড়িয়ে দিয়েছে তন্তুলাভা ! সৃষ্টি করেছে প্রবল সংঘাত। দুরন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তার স্বপ্নসৌধখানি।

তার দানবীয় ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার আকর্ষণে সুমিতার জীবনে জেগে উঠেছে এক শাশ্বত কামনাময়ী নারী ! সে শুধু কল্পনার সৌন্দর্য্য পানে আর তৃপ্ত হয় না, সে এখন পরিপূর্ণ বাস্তববাদী ! জগৎকে দেখবার, উপভোগ করবার জন্ত লাভ করেছে সে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী !

শুন-শুন করে গানের কলি একটি ভাঁজতে ভাঁজতে সুমিতা টেনে নিয়ে বসলো তার চিঠির কাগজের সুদৃশ্য প্যাডখানি। সুদামের তৃতীয় চিঠিখানি এসেছে, দিন সাতেক হয়ে গেলো, ক'দিন নাচের বিহাসাঁলে বড় ব্যস্ত থাকায় জবাব লেখার সময় পায়নি !

আজ আর না লিখলেই নয় ! আজ আর কোনো কাজ নয়, শুধু-শুধু সুদামের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেবে তার নতুন ভাবপূর্ণ অন্তরের আবেগভরা পুলকগীতি ! পরম অমুরাগ ভরে লিখতে শুরু করলো সে।  
‘—দামীদা’ !

এবারের চিঠিতে পাঠাচ্ছি কত নতুন খবর ! যখন তোমার অনুপস্থিতির বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মনটা,—সেই সময়ে। পেলাম মনের অবসন্নতা দূর করবার একটি চমৎকার উপায়।

অলকাপুরীর নাম তুমি শুনেছো কি না জানি না, সেখানে নিয়মিত নাচগানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে !

এবারে কিন্তু পরীক্ষাটা আর দেওয়া হ'ল না,—কি জানি কেন পড়ায় মোটে মন বসে না ! রাগ করছো না তো ?



হাঝে হাঝে মনটা যে কত উতলা হয় তোমার জন্তে, সে বসুণা তো লিখে জানাবার নয়।

কত দিন যে দেখিনি তোমায়, শুনিনি তোমার কবিতা, আশ্চর্য লাগে,—এত দিন তোমাকে ছেড়ে এখনও কেমন করে আমি বেঁচে আছি, দামীদা!”

বাইরের বারান্দায় মসৃ-মসৃ ছুতোর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অসীমের অধৈর্য্য কঠম্বর।

—মিতা! প্রস্তুত আছো তো? সময় কিন্তু বেশী নেই।

অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানি প্যাডের ভেতর লুকিয়ে ফেলে মিতা।

—এ কি এখোনো বসে আছো? হুটায় যে মিসেস বাসুর বাড়ীতে পাঠি! তোমার জন্তে অপেক্ষা করছেন মাসীমা! ভুলে গেছো নাকি সব? মোটে দুটো দিন দেখা হয়নি, এতেই এত ভুল, না জানি দু’মাস দেখা না হলে তুমি কি করবে? হয়তো চিন্তেই পারবে না!

আজ সারা দিন সুদামের কথাই ভেবেছে সে। তার চিন্তা সত্যি ওকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো অজ্ঞান প্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় সব ব্যাপারকে! সে যে সঙ্কল্প করেছিলো আজকের মনোরম সন্ধ্যাটি সুদামের ধ্যানে ভরিয়ে দেবে—

—শরীরটা কেমন ভালো ঠেকছে না, আজকের প্রোগ্রামে আমাকে বাদ দেওয়া যায় না? মৃদুস্বরে বলে মিতা।

—কি আশ্চর্য্য! তাই আবার হয় না কি? তুমি যে এখন অলকাপুরীর সেরা মেয়ে গো! আজকের প্রোগ্রামের লাইফ যে তুমি! শরীর খারাপ? ও-সব কিছু না—নাও ওঠো, ওঠো,—

—ওর দুই হাত চেপে ধরে অসীম, নিজের লোহার সাঁড়ানীর মত কঠিন দুই হাতে। তারপর এক ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে নামিয়ে ঝাঁড় করিয়ে দেয় মেয়ের ওপর।

কেমন শির-শির করে সুমিতার সর্বাঙ্গ। বিম্ব বিম্ব করে মাথাটা। সম্মোহিত রোগীর মত, ভীতিপূর্ণ বিক্ষাণিত দৃষ্টি মেলে চোখে, থাকে অসীমের শাপিত ছুটির ফলার মত চক্চকে চোখের পানে।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ! উল্লাসের হাসিতে সারা দেহটি কাঁপিয়ে বললো অসীম।—কি দেখছো অমন করে? বাও, তৈরী হয়ে নাও

শীগগির! তখনও দু’টি মজার প্রবল দৃশ্য চলেছে সুমিতার অন্তরে! সভ্যতার পালিশ করা, সামাজিক মন ওকে ডেকে নিয়ে চললো পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করবার জন্তে।

—আর অন্তরের গভীর অতলে অবচেতন মনটা যেন ভায়, ভায়, করে উঠলো, কোন অজানা আশঙ্কার আবছায়া দর্শন কোরে। একটা নিগূঢ় বেদনার নিম্পেষণে গুমরে কেঁদে উঠলো সে।

খানিক বাদেই বেশ পরিবর্তন করে ফিরে এলো সুমিতা।

—ওয়াগুণ ফুল!!! কি অপূরণ মানিয়েছে তোমার লাল শাড়ীতে। এবার গলায় আর হাতে পরো কিছু লাল আভরণ।

নত দৃষ্টিতে একটু চিন্তা করে বললো সুমিতা—চুণির গহনার সেটটা আমার দিদিমার সিন্দুকে আছে, তিনি এখন বাড়ী নেই, তবে লাল জেড পাথরের গয়না আছে, গুতে যদি চলে।

—আলবৎ চলবে! বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মনোমুগ্ধকর রূপ তোমার—এর ওপর অতি সামান্য আভরণও অসামান্য হয়ে উঠবে।

আজ আর সুমিতা লাল হয়ে ওঠে না, ক’মাস ধরে অবিরাম রূপের স্ততিবাদ শুনেছে সে, ওটা এখন সয়ে গেছে।

ফেসি টেবিলের ডায়ার খুলে লাল জেড পাথরের অতি প্রিয় গহনার সেটটি বার করে পরলো সে।

মধুর স্মৃতির মৃদু শিহরণ এক বলক পূবালী বাতাসের মত ছোঁয়া দিয়ে গেলো ওর সর্বাঙ্গে। বছর দুয়েক আগে ঐ হলুদে লাল পাথরের গহনার সেটটি, দার্জিলিং থেকে এনে ওকে উপহার দিয়েছিলো সুদাম।

—অলকাপুরীতে যখন ওরা পৌঁছোলো, তখন ছ’টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি।

—অধৈর্য্যভাবে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠে পড়েন মাসীমা।

ইস, এত লেট তোমাদের? সেখানে ষ্টেজ সাজানো এখনো বাকি, শিল্পীরা কে এলো না এলো, আরো কত প্রয়োজন থাকতে পারে, সব গেলো এলোমেলো হয়ে। টাইমের ছকে পা ফেলে চলবার অভ্যাস কসো তোমরা, তা না হলে আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ সমাজে নিজেদের খাপ খাটিয়ে চলতে অসুবিধা ভোগ করবে।

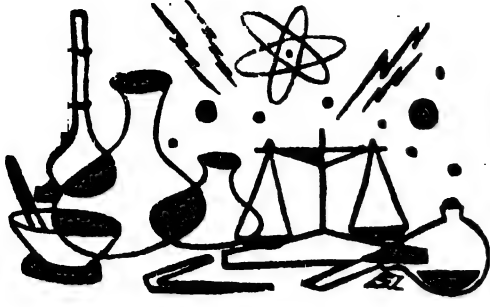
[ক্রমশঃ।



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এমবি  
গ্রাম-ক্যালঅপটিকো • ৪৫নং আমলহাট স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

# বিজ্ঞানবার্তা



পঞ্চধর মিশ্র

আবজ্ঞানার মূল্য বিষয়ে অনেক আলোচনাই আপনারা শুনেছেন। একজনের কাছে যা আবজ্ঞানা—আর একজনের কাছে হয়তো তা নয়। আজকে যাকে আবজ্ঞানা গণ্য করে আমরা ফেলে দিচ্ছি, আগামী কাল তা থেকেই মানবসভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক কোন বস্তু আবিষ্কার হতে পারে। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানেই তাদের বস্তু সমূহের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অনাবশ্যক বস্তু আবজ্ঞানাস্বরূপ জমে যায়, এদের অপসারণ অথবা উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়। সহরের মধ্যে একে ফেলে দেওয়া যায় না, তাহলে নাগরিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে আর সহরের বাইরে পাঠানও এক বিরাট সমস্যা! পরমাণু শক্তি ব্যবহারের যুগে এই সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠবে; তাই বিজ্ঞানী মহল খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। পরমাণু চুল্লী ব্যবহারের পর যে তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা পাওয়া যাবে তাকে কি করে অপসারণ করা যাবে? এই আবজ্ঞানা সহরের মধ্যে রাখাও নিরাপদ নয় আবার সহরের বাইরে ফেলাও বিপজ্জনক। এই আবজ্ঞানা থেকে সর্বদাই মারাত্মক রশ্মিসমূহ নির্গত হবে, যা জীব অথবা উদ্ভিদদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এই আবজ্ঞানা নিয়ে মানুষ করবে কি?—পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই একে পরিত্যাগ করা নিরাপদ নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, একে কংক্রিটের এক বিরাট বাস্তবের মধ্যে পুরে, চারদিক বন্ধ করে সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে ফেলে দেওয়া হোক, কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, না এতে খুব সুবিধা হবে না,—দুর্ভটনায় যদি কোন রকমে বায়ু একবার ভেসে যায় তাহলে সমুদ্র তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা বিপন্ন হবে। তাহলে করা হবে কি? এই সব বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিচ্ছেন, তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা সমূহকে রকেটে করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। একবার যদি এদের পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পৃথিবী এর দায়বদ্ধ হতে পারে। এরা মহাশূন্যে যথেষ্টভাবে ঘূরে বেড়াক, পৃথিবীর মানুষকে বিরক্ত না করলেই হোল।

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জন ককক্রফট এই বিষয়ে অল্প ভাবে চিন্তা করছেন। তাঁর চিন্তা, অস্ত্রান্ত বহু আবজ্ঞানার মতো পরমাণু চুল্লীর এই আবজ্ঞানাকেই বা কাজে লাগান যাবে না কেন? শিল্পবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই আবজ্ঞানাকে উপযুক্ত কাজে লাগান গেলে মানব-সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবে। বিজ্ঞানী ককক্রফট, রেডিওলজির ব্রিটিশ কনকারেন্সে এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

গত ১৯৫১ সাল থেকেই আমেরিকার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পরমাণু চুল্লীর তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা সমূহকে কাজে লাগাবার জন্য গবেষণা করছেন, ককক্রফটের বক্তৃতায় এই শ্রেণীর গবেষণার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিজ্ঞানী ককক্রফট জানান, এই তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানার ব্যবহারে প্রাথমিক শিল্পে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে; প্রাথমিক সমূহের মধ্যে পলিইথিলিনের চাহিদা পৃথিবীতে খুবই বেশী, এর দাম যাবে অনেক কমে। তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা থেকে যে গ্যাসীয় রশ্মি নির্গত হয় তার সহায়তায় ইথিলিনকে দলবদ্ধ করে অতি সহজেই পলিইথিলিন উৎপাদন করা সম্ভব। স্যার জন ককক্রফট হিসাব করে দেখান যে, ইথিলিন থেকে প্রায় এক টন পলিইথিলিন প্রস্তুত করার জন্য মাত্র ১০০ কুরী তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োজন হয়। আগামী ৮ বছরে কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেনেই প্রায় ২ টন তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা জড় হবে; ২ টন তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা কোটি কোটি কুরী সরবরাহ করতে সক্ষম, তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এই শক্তি প্রাথমিক উৎপাদন শিল্পে কি বিরাট পরিবর্তন আনতে পারবে!

কেবলমাত্র প্রাথমিক শিল্পেই নয়, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের উপস্থিতি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম। অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর এই রশ্মিসমূহের বিশেষ প্রভাব আছে। বিদ্যুৎশক্তি ও আলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আনতে পারে, তাই এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের দু'টি প্রশাখা। একটি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি এবং অন্যটি ফটোকেমিস্ট্রি। আজকের দিনে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব পরিলক্ষিত এবং তার ব্যবহারিক দিক উন্মুক্ত হওয়ায়, বিজ্ঞানের আর একটি নতুন প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে,—তার নাম রেডিওকেমিস্ট্রি। এই বিভাগে নিত্য ঘটছে নতুন আবিষ্কার। বিজ্ঞানের এই বিভাগের সহায়তায়ই শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই পরমাণু চুল্লীর ভিতর বাতাস থেকে সার প্রস্তুত করা হবে। বাতাসকে চুকিয়ে দেওয়া হবে পরমাণু চুল্লী 'এ্যাটমিক পাউলের' মধ্যে, বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে প্রাপ্ত অপখ্যাপ্ত শক্তি,—রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের ঘটাবে মিলন। পাওয়া যাবে নাইট্রিক অক্সাইড, এর থেকেই প্রস্তুত করা হবে বিভিন্ন নাইট্রেট। এই 'নাইট্রেট সারে'র তেজস্ক্রিয়তা খুবই কম, নিরাপদে জমিতে ব্যবহার করা চলে।

যাই হোক, আবার পরমাণু চুল্লীর আবজ্ঞানার ব্যবহারের কথায় ফিরে আসা যাক। কেবলমাত্র শিল্পক্ষেত্রে নয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহারের চেষ্টা শুরু হয়েছে। সস্ত্রি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস হিসাবে পরমাণু চুল্লীর আবজ্ঞানা ব্যবহার করে সফল পেয়েছেন। ক্যান্সারব্যাধির উইগ্লেস ওয়ার্কাস ব্যবহৃত পরমাণু চুল্লীর আবজ্ঞানা, লণ্ডনের রয়েল মার্গাডেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র স্থাপন করে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করছেন। অনেক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীই আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে এই তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানার সহায়তায় মানুষ খুব সাকল্যের সঙ্গে যুগ করতে পারবে।

পক্ষধর মিশ্রকে আবার কলম ধামাতে হলো। বিজ্ঞান বার্তা লেখার সময়েই কাগজওয়ালা দিয়ে গেল সকালবেলার খবর কাগজ। প্রথম পাতায় বড় বড় হেড লাইন—সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কল্পনা করা যায় না। এই সাফল্য বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। মানুষের বহু যুগের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার সার্থক রূপ। জ্ঞানতাম, এই বংসরই আমেরিকা এবং রাশিয়া মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা করবে—কিন্তু তার সাফল্য সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলের প্রচেষ্টার কিছু সংবাদ আমরা পাচ্ছিলাম, কিন্তু রাশিয়া ছিলো একেবারেই নীরব। নীরব বিজ্ঞানীমহলই সর্বপ্রথম মহাশূন্য ভ্রমের দ্বারা আঘাত করলেন। বিস্তারিত সংবাদ পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করবো, এবার কেবল সফল বিজ্ঞানী দলকে বিজ্ঞান সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

### কার্ল ফ্রেডারিক গাউস

সর্বকালের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিজ্ঞানী জোহান কার্ল ফ্রেডারিক গাউস ১৭৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল ব্রানসউইকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন অভ্যস্ত দরিদ্র শ্রমজীবী—সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতার জগ্ন তিনি অত্যন্ত কম বয়সেই গাউসকে বোজকাবের জগ্ন কোন কৰ্মপ্রতিষ্ঠানে চুকিস দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গাউসের মা ছিলেন একেবারে অল্প প্রকৃতির মহিলা—তার আশা, গাউস লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। প্রকৃতপক্ষে মার চেষ্টায়ই মাত্র সাত বছর বয়সে ছোট গাউস স্থলে যোগদান করার সুযোগ পান।

দশ বছর বয়সের সময় গাউস অঙ্কের ক্লাসে উঠলেন। অঙ্কের প্রথম দিনেই তিনি মাঠার মশাইকে একটি অঙ্ক কষার মাধ্যমে চমৎকৃত করেছিলেন। ঘটনাটা তাহলে বলি শুনুন, মাঠার মশাই এসে বোর্ডে একটা বিরাট এরিথমেটিকাস প্রোগ্রামের অঙ্ক দিয়ে জাঁকিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। মন্তব্য আর কি, ছেলেবা চেষ্টা করুক আর তার মধ্যে আমি একটু জিরিয়ে নিই। বিরাট ঐ অঙ্কের পাল্লায় পড়ে ছেলেদের ভো মাথা খারাপ হবার অবস্থা। হঠাৎ গাউস উঠে এসে প্লেটটা মাঠার মশায়ের ডেবিলে রেখে তাঁকে বিরক্ত করলো! ব্যাপার কি?—মাঠার মশাই প্লেট দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন!—প্লেটের উপর কেবল অঙ্কের উত্তরটা লেখা রয়েছে। শব্দ অঙ্কটা একেবারে মনে মনেই করেছে গাউস—কোন কিছুই সাহায্য না নিয়ে! মাঠার মশাই বুঝলেন, এ ছেলে সহজ ছেলে নয়; এর মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। নিজের পয়সায় গাউসকে তিনি অঙ্কের বই আর খাতা কিনে দিলেন, প্রাথমিক গণিতের সীমানা পার হতে গাউসের বেশী দিন লাগলো না। স্থলের সমস্ত শিক্ষকেবাই গাউসের শিক্ষালাভ করার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। স্থলের শিক্ষক বারটেলসের গণিতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল—তিনি এবার গাউসের সঙ্গে একত্রে গণিতচর্চা করতে আরম্ভ করলেন। গণিত-বিজ্ঞানের চর্চায় গাউসের অসামান্য

ক্ষমতার কথা ব্রানসউইকের ডিউকের কানে উঠলো, তিনি জ্ঞানী আর গুণী ব্যক্তিদের প্রতিভার একজন মন্তবড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রতিভাশালী বাগক গাউসের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা শুনে তিনি নিজে তার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে বাঁজী হলেন। মায়ের অনুপ্রেরণা সঞ্চল করে, ডিউকের শুভেচ্ছা ও রূপায় গাউসের শিক্ষার্থী জীবন এগিয়ে চললো। ১৭৯২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি ভর্তি হলেন কলেজে, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় তিনি উচ্চ পাটীগণিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। ১৭৯৯ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে হেমস্টেট বিদ্যালয় থেকে তিনি গণিতবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই “Disquisitiones Arithmetical (Arithmetical Researches)” নামক একপানি পুস্তক প্রকাশ করে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ ভাবে পরিচিত হলেন। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি—অনেক সমালোচকের মতে এই পুস্তকখানিই তাঁর গবেষক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

ব্রানসউইকের ডিউক কার্ল উইলহেম ফার্ডিনান্ড এই বিজ্ঞানীর আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করার জগ্ন একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। গাউস এবার অ্যাপ্টোনসি, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় মনোযোগ দিলেন, তখন জর্নেক বিজ্ঞানী গ্রহাণুপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র অংশ আবিষ্কার করে তাকে নাম দিয়েছেন ‘সিরাস’। আবিষ্কারের মতে ‘সিরাস’ আর একটি গ্রহ। কিন্তু আবিষ্কারের পবেই সিরাস গেল হারিয়ে, তার কক্ষপথ নির্ণয় করতে না পারলে ‘সিরাস’কে আর পাওয়া যাবে না, কেবলমাত্র হিসাব করে এর কক্ষপথ নির্ণয় করা অতি কঠিন কাজ। গাউস একে সম্ভব করলেন, অজস্র হিসাব-নিকাশ করে আবিষ্কার করলেন ‘সিরাসের’ কক্ষপথ। অবশেষে সিরাসকে গাউস-নির্দিষ্ট পথে পাওয়া গেল। বিজ্ঞানী গাউসের অবদান গণিত-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে—গুণমুখ্য বিজ্ঞানীমহলে তাঁকে প্রিন্স অফ ম্যাথমেটিকস আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

নেপোলিয়ন যখন জাৰ্মানী আক্রমণ করেন, তখন গাউস ছিলেন গৌটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালক। গাউস রাজস্বোপে পড়লেন এবং তাকে ২০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হলো। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাপলাসের রূপায় তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পান।

গাউস ১৯০৫ সালে এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেন, প্রথম পত্নীর পরলোক গমনের পর শিশু-সন্তানদের রক্ষাবেক্ষণের জগ্ন তাঁকে আবার বিবাহ করতে হয়। সাহিত্য ও ভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, অনেকগুলি ভাষা তিনি জানতেন, এমন কি এক সময় সংস্কৃতও আয়ত্ত করতে চেষ্টা শুরু করেছিলেন, প্রিন্স অফ ম্যাথমেটিকস গাউস, জীবনে কতো যে সম্মান লাভ করেছিলেন তার শেষ নেই—সমগ্র হুনিয়ার গণিত-বিজ্ঞানীমহল তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে গিয়েছিল। গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে আকিমিডিস এবং নিউটনের সঙ্গে এক আসন দেওয়া হয়। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন।

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]

# খেলা ঘেলা

আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা এখনও শেষ হয়নি। এমন এক অবস্থার এসে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত শীল্ডের খেলা শেষ হবে কি না সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে।

এবারের শীল্ডের ফাইনালে এক পিকে বেগুয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে এবং অপর দিকে মহামেডান স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সেমিফাইনালে উঠে বসে আছে।

ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান দলের খেলার নিশ্চিত দিন ধাৰ্য হওয়া সম্ভবও খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি—তারও নানান কারণ আছে। এক দিকে সাধারণ মানুষের জীবনবাহ্যি স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সংগ্রাম—আর সেইজন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনার পুলিশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না এবং বিনা পুলিশে কোন গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্ভব হবে না বলেই খেলা বন্ধ আছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, আবার কলকাতা মাঠে খেলার মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। এবারের শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার মহামেডান স্পোর্টিং ও জর্জটেলিগ্রাফ দলের খেলার। কিন্তু এ অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দর্শক বা সমর্থকরা একটুও দায়ী নন। প্রথম এবং প্রধানরূপে দায়ী করা যায় রেফারীকে এবং তারপর কয়েক জন খেলোয়াড়কে।

ইতিপূর্বে কলকাতা মাঠের ফুটবল নিয়ে নানান রকম উচ্ছ্বাল ঘটনা ঘটে গেছে। দিনের আলোয় ক্লাবের তাঁবু তখনই, পুলিশের সম্মুখে রেফারীকে প্রহার, সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন দেশে পুলিশকে কাঁচুনে গ্যাস ও লাঠি চালাতে হয়েছে। কিন্তু গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা সমস্ত ঘটনাকে স্মান করে দিয়ে কলঙ্কমণ্ডিত ঘটনায় কলঙ্কের মোটা কালির রেখা টেনে দিয়েছে।

সেদিনের খেলার মাত্র মিনিট দু'-তিন বাকি এমন সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি সংগ্রাম। মহামেডান দলের একজন খেলোয়াড় টেলিগ্রাফ দলের একজন খেলোয়াড়ের উপর অহেতুক আক্রমণ করেন, অপর দিকে অপর একজন টেলিগ্রাফ দলের খেলোয়াড় মহামেডান দলের খেলোয়াড়ের ব্যবহারের পান্টা জবাব দেন। শেষ পর্যন্ত দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ সময়ে রেফারী নিশ্চূপ হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, বিনি সাধারণ ফাউল করার জন্যে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁর মত রেফারী এ সময়ে প্রথমে নিশ্চূপ হয়েছিলেন! তারপর হাতাহাতি থেকে লাথিলাথি পর্যন্ত পৌঁছবার সময় তিনি পুলিশ ডাকেন। ইতিপূর্বে মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলার মহামেডান দলের একজন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গা করেন অথচ রেফারী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ দোষী খেলোয়াড়কে দুদিনের জন্য 'সাসপেন্ড' করেছিলেন। রেফারীর নানান ভুলের জন্য এ বছরের অনেক খেলাতেই অনেক গোলবোশ হয়েছে। খেলোয়াড়দের অখেলাোড়ী মনোভাবের জন্য

আই, এফ, এ তথা সেই খেলোয়াড় যে ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত সেখান থেকে যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, তেমনই রেফারীর ভুল খেলা পরিচালনার জন্য আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, ইতিপূর্বে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যার বিরুদ্ধে খুব গুরুতব শাস্তি অবলম্বন করা উচিত ছিল কিন্তু আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই বলুন আর গুরুপাতিত্বই বলুন, যার জন্যে তেমন কোন শাস্তি অবলম্বন করেন নি।

জর্জ টেলিগ্রাফ ও মহামেডান দলের খেলা দোষ-ত্রুটি নিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সম্পাদকের কাছ থেকে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদপত্র গ্রহণ করেন নি। কারণ, আধ ঘণ্টা সময় অতিক্রম হয়ে গেছে বলে আইনের দোহাই দেওয়া হয়েছে। আধ ঘণ্টা সময় অতিক্রম হওয়ার জন্যে টেলিগ্রাফ দলের সম্পাদক যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তা আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নি। অথচ চারিটি ম্যাচের খেলা অমৌমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময় খেলানোর কোন নজির ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। অথচ অতিরিক্ত সময় খেলার জন্যে টেলিগ্রাফ দলের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। এখন প্রশ্ন হল, সুরিধা ব্যাং আইনের দোহাই পাড়া আর কত দিন চলবে? আইন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত মনে করি।

যত দিন পর্যন্ত ক্রোমৌ স্বার্থের অবসান না ঘটবে, তত দিন পর্যন্ত বাংলার খেলাধুলার কোন রকম উন্নতি আশা করা যায় না। অথচ দেশে 'স্পোর্টস বিল' পাশ হয়েছে কিন্তু তা এখনও কেন কার্যকরী হচ্ছে না, তার কোন সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

## একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভি সোসাইটির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এবারে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্য-নাটকটি অভিনয় করেছেন, ও প্রতি বছরেই এ'র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এরূপ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবারে 'ঋতুরঙ্গ' দর্শকদের অধিক আনন্দ দিলেও সঁাতারের যে সমস্ত কোশল বেজলা, কালিয়াদমনে যে নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল, এবারে কিন্তু ঠিক ততটা পায়নি। তবে ঋতুরঙ্গের যড়ঋতুর বর্ণনা, প্রকৃতির বিচিত্রলীলা বাংলার শ্রেষ্ঠ কথক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টের মুখ থেকে ও রবীন্দ্র-সংগীতের মাধ্যমে যে কাব্যময় রূপটি ফুটে উঠেছিল, তা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। এদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাংবাদিক এবং সাংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'প্রকুল সরকার কাপের' ফাইনাল খেলার 'জনসেবক' পত্রিকা 'স্বাধীনতা'কে ১—০ গোলে পরাজিত করেছে।

'জুডউইল মিশনে' আমেরিকার তিন জন টেনিস খেলোয়াড় এসেছিলেন। কার্বলিন কাশের প্রণায় বাংলা দলের সঙ্গে এবং

পরের দিন ইনভিটেসন খেলা খেলেন। তাঁদের খেলায় নৈপুণ্য আছে, মারের চটক আছে কিন্তু হুংখের বিষয়, তাঁরা ঠিক 'গুডউইল মিশনে' খেলার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। তাঁরা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্তে জীড়ামোদী মাত্রই হুংখিত। তাঁরা শিষ্টাচার মেনে চলেন নি।

### সাঁতার

আজাদ হিন্দ, বাগে সম্প্রতি অহুষ্ঠিত জাশানালা সুইমিং এসোসিয়েশনের তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া আরও সাত জন সাঁতারু বাংলার পুরানো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

নতুন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে পঞ্চদশবর্ষীয় স্থলছাত্র -বেণু তালুকদার ২ মিনি ৫৩.৪ সেকেন্ডে অতিক্রম করেছেন। ইতিপূর্বে সার্ভিস দলের সাঁতারু সামুসের খাঁর রেকর্ড ছিল ৩ মিনি ০.৪ সেকেন্ড। মেয়েদের ১০০ মিটার চিং-সাঁতারে বোম্বাইয়ের ডলি নাজিরকে পরাজিত করেছেন সন্ধ্যা চন্দ্র। সময় ১ মিনি ৩৩.৪ সেকেন্ড। বুক-সাঁতারে ডলি নাজির তার পুরানো রেকর্ড ১ মিনি ৩৭.৬ সেকেন্ডে পরিবর্তে ১ মিনি ৩৭ সেকেন্ডে অতিক্রম করেছেন। পি, কে, ঠাকুরের ডাইভিং যেমন দর্শকদের আনন্দ দান করেন তেমনি ৮ বছরের বালক জীকান্তি দত্ত সুন্দর ডাইভিং দেখিয়ে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। জীমান কান্তি জাশানালা সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য।

## রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

রক্তচক্ষু "STOP"

লালবাজার স্ট্রীট ও ড্যালহাউসি ইন্ট্র—

ঠিক মোড়েই এক কানা দৈত্য।

তার এক চোখ রাঙিয়ে বলল—“খামো”।

অমনি খেমে গেল ট্রাম তার বৃকের ঘড়ঘড়ানি তুলে,  
হিস হিস করে গর্জাতে লাগল ধাড়ী আর বাচ্চা বাস,  
নীরবে ঝিমিয়ে পড়া বোগীর মতন প্রাইভেট কারগুলি  
স্থির হ'য়ে গেল।

তাদের বৃকে-বাড়ে-কোলে ছিল যে মানুষের জনতা

তারাও স্থির হ'য়ে গেল পরম নিকুৎসুক হ'য়ে—

ছলল না তাদের কানের হুল আর মাকড়ি,

ফাইল ফিতে আর পাগড়ি

স্বার্ট আর শাড়ী, ধূতি আর পাক্কামা—

কেউ বার করল বই—কেউ বা চিঠি

যেন অনন্তকাল ধরে ঐ রক্তচক্ষু 'Stop'

তার চোখ রাঙিয়ে বলবে খামো।

আহা—যদি সত্যিই বলতে পারতো—“খামো,

চিরকাল এমন ভাবে ব'লো না

এমনি উল্লুখাসে জীবনকে পিবে ফাইলের চাপে,

এমন করে চোখের দ্যুতি নিবিয়ে দিয়েো না

বৈদ্যুতিক বাতির কড়া আলোর তলে

চ'লো না এমন ক'রে বৃত্তির চাপে প্রবৃত্তিকে মেয়ে।”

কিন্তু ও তা বলবে না—ঐ একচোখো দৈত্য

মাথায় ওর লোহার টুপি—

ও কি ক'রে দেখবে উপরের নীলাকাশকে

কি ক'রে দেখবে পিছন ফিরে লালদীঘির জলে সূর্যাস্তের সোনাকে,

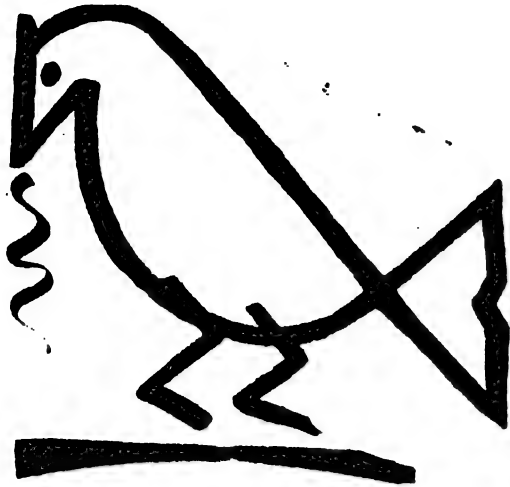
কি ক'রেই বা তনবে অন্ধকারে—কুরুপক্ষে—

ঘড়ি-ঘরের নিশীথ রাজের শাসন

মস্ত লাল চাদের চোখ-রাডানো—“খামো”।



# ছোটদের আসর



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ব্যাসকানীতে দুর্গার মন্দির। অপূর্ব তার শিল্প দেখালে  
দেয়ালে, দরজায় অলিঙ্গ গবাক্ষে। মনোরম উত্তান  
ফুলের গাছে ফুলের গাছে আলো-ছায়ায়। সেখানে এক সন্ন্যাসী।  
পাঞ্জাবি-পর্যায় শান্তিপূরে শ্রুতি-পর্যায় সন্ন্যাসী। বললেন, জানো—  
কেবলি জানো। পৃথিবীতে জানবার জিনিষের অন্ত নেই।

মীরা তো জানতেই চায়। ব'লে গেল তাঁর সামনে।

জানো গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন সূর্যের চারি পাশে  
পৃথিবী আর সাত গ্রহের ঘূর্ণন। পণ্ডিতরা পুরোহিতরা প্রতিবাদ  
করলো। এমন অশাস্ত্রীয় মিথ্যে কথা বলতে আছে নাকি! যোমের  
বিচারসভায় গ্যালিলিওকে স্বীকার করতে হল পৃথিবী ঘুরছে না।  
বেশ একজন ভূগোল শিক্ষক বলেছিলেন—পৃথিবী ঘোরে না। ঘুরলে  
তোরা আবার বাড়ে পড়তিসু, আরি তোদের বাড়ে পড়তিসু। ফুল  
ইন্সপেক্টর বাইরে পাড়িয়ে তনছিলেন। বললে—পৃথিবী ঘোরে না?  
এ সব কি শেখাচ্ছেন? পৃথিবী ঘোরে না?

মাঠের বললে, ঘোরে। দশ টাকার ঘোরে না। মাইনে মাসে  
দশ টাকা, তাতে পৃথিবী ঘোরানোর কথা শেখানো বার না। দশ  
টাকার চূণকামের ইয়র্কি whitewash হয় না limewash হয়।

তার মাইনে বাড়লো।

গ্যালিলিও পিসা শহরে একটা ঝোলানো বাতির জোলাসি লক্ষ্য

করছিলেন। নিজের নাকী টিপে তার গতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন  
এদিকে বৃত্তাকার থাকে, ওদিকে ভ্রমকণ থাকে। ডাইনে বৃত্তটা ওঠে,  
বামে ভ্রমকণ ওঠে। এই থেকে আবিষ্কার হল ঘড়ির পেণ্ডুলাম।  
সময়কে বাঁধা হল। গ্যালিলিও যখন মারা মেলেন তখন আর একটি  
বৈজ্ঞানিকের জন্ম হল, আপেল পড়া দেখে যিনি ভাবতে বসেছিলেন,  
আপেল আকাশে উড়লো না, পাশে গেল না, মাটিতে পড়লো কেন?  
বেরোল—মাধ্যাকর্ষণ। সেই নিউটন এত অল্পমনস্ক ছিলেন, যে এক  
ডল্লোককে নেমস্তন্ন করে খাওয়ানোর কথা ভুলেই গেলেন। সে  
লোকটা অপেক্ষা করে করে রেগে নিজের খাওয়ানো খেলেই, নিউটনের  
ডিশও শেষ করলো। নিউটন খাবার ঘরে এসে বললেন, আমি  
ভেবেছিলুম এখনো খাইনি। ডিশ দেখে মনে পড়লো আমার  
খাওয়া হয়ে গেছে।

কী মজার লোক! মীরা বলে।

আরো জানো—জ্যাক্সিস বেকন খুব উঁচু ধরণের লেখক ছিলেন।  
তাঁর পদমর্যাদা এত বেশী ছিলো যে, তিনি নাটক লিখতেন নিজের  
নামে নয়—কারণ সে যুগে নাটক লেখাটা হালকা ধরণের কাজ ব'লে  
লোকে মনে করত। লোকে বলে, সেই সব নাটক সেক্সপীয়ারের নামে  
চলে গেছে। যে কোনো দিনই লেখাপড়া শিখলো না, থিয়েটারের  
ঘোড়ার সহিস হয়ে কাটালো, সেই সেক্সপীয়ার কখনো এমন পণ্ডিতী  
ভাষা লিখতে পারে?

আরো জানো ফ্যারাডে ইলেক্ট্রিক লাইট আবিষ্কার করলেন,  
তাঁর সহকর্মী হামফ্রি ডেভি কয়লাগনির আলো বার করে হলেন  
'তর'। আর ইটালীর গ্যালভানি যে তার বার করলেন তার নাম  
গালভানাইজড।

আরো জানো—পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত ছবি হচ্ছে মোনা  
লিসা। এঁকেছেন লিওনার্দো ডা ভিন্সি। একটি রূপসী মেয়ের মুখে  
চাপা হাসি। সে রকমটি আজো অবধি কেউ কোটাতে পারলো না।  
যে যেটি এই ছবির মডেল হয়েছিলো—সে একজন অফিসারের  
কুতীর পক্ষের স্ত্রী। অনেকক্ষণ থাকতে হত বলে একদল  
লোক তাকে বাজনা শোনাতো, তবে ছবি জাঁক হত, যে ছবি  
অবধ।

তু খুজেই যাও, কত কি ভাববার। সেই সব কথা আবার  
অনুগ্রহ জানাও। জ্ঞান বাড়ুক।

আচ্ছা, লোকে আপনাকে ঠাকুর বলে কেন? আপনি ত  
মরণশীল মানুষ? মীরা প্রশ্ন করে।

ব'লে তাদের তৃপ্তি হয়, তাই বলে।

বেশন খোকাকে খোকন বলে মায়ের  
আনন্দ। আমাকে রাফস বললেও আমি  
চটব না, বেশন খোকাকে ভূত বললেও  
সে চটে না। মনটা রাখতে হবে  
হুনিয়ার খোকনের মতন।

দিনে একবার তুমি স্থির হয়ে  
কোথাও বসবে। একবার তাঁকে ডাকবে  
বাকি তুমি ভগবান মনে করো—  
তিনি কৃষ্ণই হোন, রামকৃষ্ণই হোন। মনে  
বল পাবে। যদি কোনো পরমা বাঁচাতে  
পারো, একটা বাস্তব রাখবে। কোনোদিন



ঐপ্রভাকর বসু

ঠাকুরই কাজে কিবা কোনো হুংখীর কাজে লাগবে। এর নাম ইষ্টবৃত্তি। এ বৃত্তিতে তোমার মঙ্গল হবে।

রামনগরের রাজ্যের বাড়ী সাধারণকে দেখতে দেওয়া হয়। কেন হয়? হয় এইজন্তে যে বাড়ী দেখতেও লোকে এ পারে আসবে। নৌকোওলা কিছু পাবে, এ দিকের জিনিসপত্র বিক্রি হবে, ঠাকুরদেবতা পূজা পাবে, নইলে এ ব্যাসকাশীতে লোকে আসবে কেন? বরোদার রাজপ্রাসাদও খোলা হয় সাধারণের কাছে। নইলে কি দুখে লোকে বরোদার মতন জায়গায় নাববে? সব কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে ভগবানও কিছু করেন না। তিনিও তাঁর দৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তা মঙ্গলময় দেখতে চান। যদি শিশুর মতন তাঁর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারো, তাহলে তুমি বা চাও তাই পাবে।

সে তো ভারতেই পারি না।

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, খালি তোমার জানবার চেষ্টা করতে হবে, পৃথিবীতে এত জিনিস জানবার আছে, এক জীবনে জেনে শেষ করা যায় না।

আপনি তো কত জানেন!

জানতে জানতে জানানোর হ'য়ে গেছি।

সন্ন্যাসী বলে চলেন—খালি পড়ে বাও, যেখানে যা পড়বার পাবে ছাড়বে না। হঠাৎ তোমার চোখে কোনো প্রবন্ধ বা ভ্রমণকাহিনী বা উপজ্ঞাস এমন পড়ে যাবে যা শেষ করে তোমার মনে হবে, এটা যদি না পড়তে পেতে, তোমার জীবন বৃথা হ'য়ে যেত। পাবে অনেক জ্ঞান, অশেষ উৎসাহ, অনেক সাহসনা, অনেক প্রেরণা। বিশেষ করে বড়ো বড়ো লোকের কাহিনী পড়লে অনেক শিক্ষা পাবে। যেমন ধরো—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। বিলেত গিয়ে তিনি ব্যারিষ্টার হ'য়েছিলেন বলে পৈত্রিক বাড়ী তাঁকে ছাড়তে হয়েছিলো। সাহেবপাড়ায় তিনি বাসা নিয়েছিলেন। আর হয়েছিলেন মস্ত বড়ো ব্যারিষ্টার। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি তিনি। তখন তিনি উমেশচন্দ্র নন, ডব্লিউ সি ব্যানার্জী কিন্তু মায়ের কাছে উমেশ। রাজ মণিকতলা ষ্ট্রীটে জুড়িগাড়ী চড়ে তিনি আসতেন, তখন মোটর আসেনি এদেশে। সেই গাড়ী দূরে রেখে পায়ে হেঁটে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে ডাকতেন 'মা'। মা সদরে এসে ঠাড়ালে তিনি প্রণাম করতেন। মা বলেন, তোর গাড়ী র'য়েছে, পায়ে হেঁটে আসিস কেন বাবা? ছেলে বলে, তোমার সামনে আসব গাড়ী ধাক্কা দিয়ে চাল দেখিয়ে? যাড়ে তো আমার একটাই মাথা! অত সাহস হবে কি করে? সেই রাস্তার নাম এখন তাঁর নামে। কিন্তু ক'জন মনে রাখে সেই কুতূহী মাতৃভক্ত ছেলের কথা? ক'জন মনে রাখে চায়?

মীরার শুনে শুনে ক্লান্তি আসে না। আরো শুনে ইচ্ছা করে। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা তাড়া দেয়। তাদের সকলের এসব কথা শোনার আগ্রহ নেই। বাজে কথা বলেই মনে করে সব। তারা ভাবে, জেনে কি হবে? জেনে কিছু লাভ আছে?

সুন্ন্যাসী বাচ্ছিলো এক বড়োলোকের বাড়ীতে সেলাই দেখাতে। মীরা এসে পড়লো। ওকেও সঙ্গে নিলো। চৌখাখার চৌধুরীসের বাড়ী। কি প্রকাণ্ড বাড়ী! কি সাহেবী কারাগার! কে বেন এ বাড়ীতে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আছে। এদের বাড়ীর বৌ কিন্তু

সেহসাহের নয়, নন্দরা সেহসাহের। তারা ইংরেজীতে আর হিন্দীতে কথা বলে। বাংলা বলে না। ভূরে কাপড়পরা বোটি ব্লাউস বড়ির 'কাটি' শিখতে লাগলো। আর এদিক ওদিক চেয়ে নিজের হুংখের কথা বলতে লাগলো। বাড়ীর বড়ো ছেলের বৌ ও, কিন্তু ওর অসুখ হলো কেউ দেখে না। রাত্রে কুটি আর বেতনভাজা খায়। তাই কত দিন ওর নন্দরা খেয়ে বসে থাকে। ওকে উপাস করে থাকতে হয়। মীরা ভাবে এর নাম বড়োলোক! এর নাম এত টাকা! বাড়ীর প্রথম বৌ যেখানে এত কষ্ট পাচ্ছে সেখানে শাক্তী নন্দ সেহসাহেরী করে বেড়ায় কি করে? সাহস এতোই অমাহুব হয়?

নন্দরা এলো। তাদের কথা কি মিটি! মীরাকে জড়িয়ে ধরে বললে—ই কোন্ হৈ? কিংনা লাভলি। মুণ্টা ভারী মিটি তো! কি থানা দিতে পারি তোমার বোলো।

কিছু খাব না মীরা বলে।

কেনো? সাহেববাড়ীর খানা বলে ভয় হোচ্ছে?

মীরার ইচ্ছা হল বলে, এর চেয়ে বড়ো সাহেববাড়ী আমি দেখে এসেছি। সে কলকাতার সাহেববাড়ী, এ তো হাজার হলেও কাশীর সাহেববাড়ী, যেখানে সাহেবিয়ানা বেমানান। ভালো হোটেল নেই, ভালো ক্লাব নেই।—মুখে কিছু কিচ বলে না। গৈরো মেয়ে সেজেই চুপ করে বসে থাকে।

চৌখাখার এই প্রকাণ্ড বাড়ী, তার চারধারে প্রকাণ্ড বাগান, এখানে কাশী শহরের আরতির ষট্ঠাধনি আসে কিন্তু মুণ্ডুনার গছ আসে না। এত বড়ো তীর্থে এ প্রাসাদ বেন বেমানান! স্বাধীন ভারতে এ লোকগুলো যেমন বেমানান!

বাংলা সেদিন এক নতুন কথা বললো—আমরা হু'শো বছরের পরাধীন নই, পরাধীন অনেক আগে থেকে। হিন্দুসাহারা যদি এক হয়ে থাকতে পারত, তাহলে হিন্দুসাহা তাদেরই থাকত, বাংলা এখানকার আদিম অধিবাসী। কবি বলেছেন—

সে তার থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিদ্ধনদী

আসিতে কি পারিত যবন?

ভুর্কা, মোগল, পাঠান বাইরের লোক। এদেশে বতদিন তারা রাজত্ব করেছে, ভারতীরেরা—বাদের নাম মুসলমানরাই দিয়েছিলো 'হিন্দু' তারা প্রকাই ছিল। সিরাজুদ্দৌলার আরল পর্যন্ত প্রকাই ছিল, রাজা নয়। স্তত্রর সিরাজুদ্দৌলার রাজত্ব বাওয়ার নাম বাংলার স্বাধীনতা বাওয়া নয়। বাঙালী ঐতিহাসিক বাঙালী নাট্যকাররা কি করে এমন বাজে কথা লিখতে পারলো ভেবে অবাক হতে হয়! শিবরা, রাজপুত্ররা, মারাঠীরা, বাঙালীরা বিদ্রোহ করেছে কাদের বিরুদ্ধে? গুরুগোবিন্দ সিং, বাজীরাও, প্রতাপাদিত্য বে পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্তে লড়াই করেছিলেন, তাকে অস্বীকার করব কি করে? আমাদের মাতৃভাষাকে প্রকা করতে শিখিয়ে গেছে—ইংরেজ মার্শম্যান, ইংরেজ করী। ইংরেজের আমলেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী পৃথিবী-বিস্থাত লোকদের জয় হয়েছে, বা কোনো শতাব্দীতে হয়নি। মুসলমান আমলে তো নয়ই। ইংরেজ আমাদের শিখিয়ে গেছে কথার দায়, স্ববসারে লম্বুতা, পূর্বপথকে প্রকা, যেয়েদের সম্মান। ইংরেজ দেখিয়ে গেছে নিজের দেশের পোষাক কি করে ব্যবহার করতে হয়, কি করে

স্বতন্ত্র থাকতে হয়, কি ভাবে জীবন ভোগ করতে হয়। ইংরেজের গুণ আমরা কিছুই নিলাম না, শুধু গালাগালিই দিলাম। বিবেকানন্দ বার বার বলে গেছেন—ইংরেজের ভালোটা নে। ওদের কাছে অনেক শেখবার আছে। এক একজন ইংরেজ প্রায় দেবতাদের কাছাকাছি।

তোমার ভক্তির আতিশয্য যে দেখছি বাবা দা'!

ভক্তি হবে না? আমার কাকা হাইকোর্টের রেজিষ্টার কলেট সাহেবের গল্প করেন। বিয়ে থা করেন নি। নিশেকে দান করেন। কে কোথায় গরীব কেরাণী আছে, চুপি চুপি এসে দাঁড়ালেই হ'ল। কুড়ি পঞ্চাশ একশো। কাকা একবার কি মামলায় দেবী হ'তে কলেট সাহেবকে কড়া চিঠি লিখেছিলেন। তারপর একদিন নিজের দরকারে কাছে বেতে কলেট সাহেব সব ভুলে গিয়ে কাকার উপকার করলেন। পারবে কোন বাঙালী এ কাজ করতে? ধারণায় আনতে পারবে? ইংরেজ আমলে কলেট সাহেব 'জয়হিন্দ' শুনে কৃত্রিম রাগ দেখাতেন। নিজেরই বাবার সময়ে বলে গেলেন 'জয়হিন্দ'। কত লোক যে তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছিলো বলবার নয়। কিন্তু চলে যাবার সময়ে তারাই দেখা অবধি করলো না! তিনি মনে করতেন, সমস্ত অফিসে তাঁর ছেলেরা কাজ করছে। কেউ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মারামারি ক'রে ট্রাম ডিপোয় আটকে আছে, খবর পেয়ে তিনি নিজের মোটরে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। অথচ সামান্য একজন কেরাণী সে। এর নাম ইংরেজ। একজন সাধারণ ইংরেজের সমান সাধারণ ভারতবাসী নয়—অসাধারণ ষাঁর, তাঁরাই। ইংরেজের সাহস, ইংরেজের সত্যতা—নেতাজীর, জীঅরবিন্দের, তিলকের, দাদাভাই নৌরজীর। মহামানব বিজ্ঞানাগরের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের। সাধারণ কোনো লোকের মধ্যে ইংরেজের গুণ দেখতে পাবে না। ইংরেজ এত বড়ো।

সেই ইংরেজ দেশের ছেলের জেলে দিয়েছে, কাঁদাকাঠি লটকেছে।

তা পেয়েছে এ দেশী গোয়েন্দা এ দেশী পুলিশের জন্তে। তার যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত, ধরতে পারত কোনো সাহেব তাদের কোনো দিন? এ দেশী গোয়েন্দা, এ দেশী পুলিশ শুধু নেতাজীর বাগ্মীর সময়ে জেনেও চুপ ক'রেছিলো, তাই ইংরেজ পারলো না তাঁর পথ আটকাতে। ইংরেজ রাজঘে দেশী পুলিশ সেই প্রথম ভালো কাজ করেছে। কতকটা বিবেকের তাড়নার, কতকটা প্রাণের ভয়ে। সেদিনকার সি আই ডি-রা স্বাধীনতা দেবী ক'রে দিয়েছিলো। নেতাজী বাবের বলতেন, ইংরেজের কুকুর।

দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেছে বাবা দা, এখন তোমার কি কাজ?

আমরা হলাম বাংলা মায়ের দামাল ছেলে। কবিতায় বাবের বলা হয়—জর্দম দুর্বীর। কবি বলেছেন—

দুর্বীরেরে রক্ষা করো,

দুর্বীরেরে হানো—

আমরা সেই দলের।

আমরা শিকার সম্পূর্ণ হব, সাহসে অটুট থাকব। আমাদের কাজ বিধাতার হাতে। কখন কোথায় আমাদের দরকার হয়, কে জানে? বোঁদ আর বৈষ্ণবদের শান্তির মন্ত্রের সঙ্কীর্ণতের মূল্য আছে—দেশ বখন শান্ত। অশান্তি বখন আসবে তখন কালীমন্ত্র—অস্ত্র

নিরে দাঁড়াতে হবে। তখন শিবাজীর ভাগোয়া বাণী—গৈরিক পতাকা—হয় হয় মহাদেও। রাজপুতের আজ কি কোনো সাড়া পাওয়া যায়, হল্লীঘাটের যুদ্ধ মেবার পাহাড়ের যুদ্ধ বারা করেছিল। কান্দীর, বোধপুর, বিকানীর থেকে বারা কারবার করতে আসে, হাওড়ার পোলের এপার থেকে কলকাতার তিন ভাগ আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীতে ছেয়ে ফেললে—তারা মাড়োয়ারী। রাজপুতানার রাজপুত কই? রাজস্থানের কাহিনী যে ইংরেজ টড লিখে গেল, সে-সব কি কারবারেই চাপা পড়বে? পাঞ্জাবীদের মধ্যে শেষ লাল লজপত রায়। তার পর কারা? হয় টাঞ্জিঙা নয় বড় চাকুরে দামোদর ভ্যালিতে কারখানায়। সাহস বীরত্ব মারামারি জাগিয়ে রেখেছে বাঙালী। আমি উত্তর-পশ্চিমের সেই বাঙালী, এখানে লাঠি না চালালে থাকা যায় না। কালই বেহারী গয়লা আর মুসলমান তাঁতীদের সঙ্গে হুঁ মুখো বগড়া করতে হয়েছে লাঠি চালিয়ে, এখানকার জনকতক বাঙালীর। আমাদেরই জিত হয়েছে। কারণ আমরা এই কথা বার বার আঙড়াই—

আমি ভয় করব না ভয় করব না।

হুঁবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।

তরীখানা বাইতে গেলে

মাঝে মাঝে তুফান মেলে,

তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে

কান্নাকাটি ধরব না।

ওরা এসব কবির বাণী জানে না। ওরা শোনেনি—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়,

দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব হুং ভয়।

আমাদের মতন পদে পদে আর কেউ বলতে পারে না—তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ মঙ্গলময় স্বামী!

বাঘার দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার শ্রদ্ধা জাগে। এই রোগা ছিপছিপে চেহারা, মনে হয় এক চড়ে কাং হয়ে বাবে, কিন্তু কী সাহস মনে?

আর কী লাঠি চালানোর কোঁশল! দেখেছে সে—বিদ্যুতের মতন লাঠি চলে ওর হাতে।

আর ছুরি একটা আছে, বোতাম টিপে দিলে পেটের মধ্যে সোজা চলে যায় এদিক থেকে ওদিক। ঐ ছুরিতে নাকি কত বদমাই লোক খুন হয়েছে।

নীচে থাকেন মহারাজ। পর্যবসিট বহুর বয়সে আড়াইমণি মুক্ত ভাঁজেন। তিনি বললেন—মীরাবাদী, আপ, হিন্দী কেঁও নেি বোল্‌তী হায়?

বাবা জবাব দিলে, হিন্দী কি আবার একটা ভাষা?

মহারাজ বলেন, সে কি বাবুজী, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাদী কবীরের ভাষা, ভাষা নয়?

এইটে আপনার ভুল ধারণা মহারাজ! সুরদাসের গান ভ্রমণও ভাষার, মীরাবাদীর রাজস্থানীতে, তুলসীদাসের কোশলী : অবোধীতে, আর কশাইয়ের ছেলে কবীরের গান খিচুড়ি ভাষার—মিল্লীর চলতি ভাষা, ব্রজবুলি আর অবোধী মিশিয়ে। কোনটাকে হিন্দী বলা যায় না। হিন্দীর এতে গৌরব করবার কিছু নেই হিন্দীতে খাড়িবোলী চলে, তা দেখুণো বছরের বেশী পুরোন নয়

হিন্দী শিখতে হলে, আগে লিঙ্গভঙ্গ তুলে দিতে হবে। রাস্তা হল পুলিঙ্গ, সড়ক হল স্ত্রীলিঙ্গ, কাগজ পুলিঙ্গ, কিতাব স্ত্রীলিঙ্গ, পুলিশ, দাড়ি, গৌফ স্ত্রীলিঙ্গ। অদ্ভুত! আসল হিন্দী আসল বাংলার মতন—বাংলা দেশকা সুন্দর ভাষা শ্রবণ কর্ণনেমে হৃদয় পুলকিত হোতা ছায়। শান্তিনিকেতনকা আত্মকুঞ্জমে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকা সভাধিবেশন অঙ্গণীয় হো রহা।

মহারাজ হাসতে থাকেন।

এতই জানবার আছে পৃথিবীতে! মীরার মনে হয়।

সেদিন ওরা এলাহাবাদ গেল, তোরে মোটরে চড়ে। কানীর বিখ্যাত ল্যাণ্ডা আমের বাগান, সবুজ দৃশ্যে চোখ ভরে যায়। বাঁধা বললে, সবুজের দিকে নীলের দিকে বতই চেয়ে থাকবে—চোখ ভালো থাকবে।

মনে পড়লো মীরার নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার বৃষ্টি তাই অন্ত ভালো লাগত।

আর প্রভাতের প্রথম কিরণ আলটোভায়োলেটে ভর্তি, শরীরের পক্ষে উপকারী। সকালের সোনালী রোদ নির্দ্বন্দ্ব নীল আকাশে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘ—বেখানে বাস খায়ছে সেখানে বনে বনে পাখীর ডাক, চওড়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড গীচ ঢালা চকচকে—কী সুন্দর লাগে সব তুলে শুধু চেয়ে থাকতে!

লাল সাদা অনেকগুলো বকবকে ব্রীজ পার হয়ে এলাহাবাদ শহর ছাড়িয়ে গিয়ে প্রয়াগ ঘাট—নৌকায় করে অনেকটা গিয়ে গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন—নীল জল সাদা জল মিশ খাচ্ছে না, দুটো নদীর মাঝখান অথচ ভুব-জল নেই—চারিধারে ধূ ধূ করছে চড়া মাঘবেলা-কুস্তম্বলা বসে, পুরানো দুর্গ অক্ষয় বট, হু হু হাওয়া।

পূণ্য হয় না বলে স্বাস্থ্যের উপকার হয় বললে কে আস্ত এখানে? এই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নদী আর নদীর চরে. আসত কি হাজার হাজার বাকী? এমন অপূর্ণ দৃশ্যের মহিমা যে বোঝে, সেও আসত না। জানত না।

কোন প্রাচীন কাল থেকে দেশের মুনি-ঋষিরা মানুষকে কোশলে ভালো ভালো জায়গার টেনে আনবার ফন্সী করেছেন।

আর সাধারণ মানুষ বাড়ীভাগ জমিভাগ নিয়ে দলাদলি মারামারি করেছে এই ভেবে যে চিরদিন তারা থাকবে। কোথায় চলে গেছে সব, কার জমি কে ভোগ করছে, কার বাড়ী কবে ভেঙে গেছে, কিন্তু মানুষের হিংসাকুটিল হাসি আর চক্রান্ত কলপনায় ভেসে এসেছে, শান্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই।

দেশ থেকে দেশে এই ছুটে বেড়ানোর মধ্যে ভগবানের যে ইচ্ছিত, ছোটো মেরোটর তাই ধরবার চেষ্টা দেখে স্থলির দেবতা হয়ত মিটি মিটি হাসেন। একদিন ঝড়ের রাতে সমুদ্রের তীরে বাকে তিনি পৃথিবীতে এনেছেন তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

তাই অল্পকুট উৎসবে ওর উৎসাহের সীমা নেই। ভিড়? হোকগে ভিড়। ও বাবেই। স্বেচ্ছাসেবকরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, পাণ্ডারা যেমে উঠছে, মেয়ে-পুরুষ কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, এই সিঁড়িতে গুঠা, আবার নীচে নামো—ডাইনে বাও, বাঁয়ে ফেরো, বিশ্বনাথের রাজবেশ কী সুন্দর চোখ দুটি! অল্পপূর্ণার মিঠাইয়ের মন্দির খবে খবে সাজানো, দোতলার জালের মধ্যে সোনার বিরাট মূর্তি, অল্প দিচ্ছেন মা।

নারদ এটি বলিয়েছিলো। হিমালয়কে বললে, তুমি কানীতে

এসেছো মেয়েকে দেখতে? তোমার মেয়ের জাত নেই। ঋশানের শিবকে বিয়ে করেছে বলে কেউ তার হাতে খাবে না। তুমি লুকিয়ে থাকো। মা এসে দেখলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁর বাবা। বাড়ীতে বাবে না? না মা তোর তো জাত নেই। কেউ তোর হাতে খায় না শুনেছি।

এই কথা? মহাদেবকে বললেন—ঋগের দেবতাদের নেমস্তন্ন করো, আমি ভাত খাওয়াব। নেমস্তন্ন করে কে তেত্রিশকোটি দেবতাকে? নারদ পারে তার ঢেঁকির এরোপ্সেনে চড়ে। কথায় বলে 'নারদের নেমস্তন্ন।' ত্রিভুবন এসে হাজির। সবাই তৃপ্তি করে অল্প নিলে, শেষটা নারদও বসে গেল।

হিমালয় বেরিয়ে এসে বললে, তবে না কি আমার মেয়ের জাত নেই?

অল্পকুট, অল্পের পাহাড়, হ'য়ে গেছে অল্পকোট মুখে মুখে। সারা ভারতবর্ষ এসে হাজির বারাগসীতে। ভিড় দেখে দেবতার স'রে পড়েছেন।

টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে—এবার তোমায় আসতে হ'বে, নইলে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে।

মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলো খাঁচার পাখী। আবার গিয়ে বেনিপার্ক বন্দী হবে?

যেতে হবে সেই অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার মধ্যে? অল্পপূর্ণার কানীতে নিত্য উৎসব ফেলে রেখে মেকী সভ্যতার কলকাতায়? বেখানে মানুষ প্রাণ খুলে সত্যি কথা বলে না? সেখানকার লোকেরা ভাবে—

কাল হল কলি।

কলির মতন চলি।

বাঁধা বললে, যেতে বধন লিখেছে, তখন যেতে হবে। হাল-চাল দেখে এসো গুণানকার। নইলে তোমার পথ আমি ঠিক করে রেখেছি।

পড়ে থাকবে মালবীরা ব্রীজের নীচে উজ্জয়িনী গঙ্গা, ঘাটের পর ঘাট, মন্দিরের পর মন্দির, মালবীজীর বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গা আর এক্সার টুনটুন, ফেরাওয়ালিনীদের মিষ্টি কথা—ফুল, ফল, ধূপ, চন্দন হর হর ব্যোম ব্যোম?

মীরা ভাবে, আমরা বলতে পারি না, লেখকরা কেমন শুধিয়ে মনের কথা টেনে আনেন তাঁদের কলমের মুখে—পশ্চিমের আকাশ সোনায় সোনায় ভরা, তার নীচে মন্দিরায় বেণারস, বিকেলের মিলিয়ে আসা আলোর মিলিয়ে যাচ্ছে, নীল গঙ্গা রূপায় মতন দেখায়, ট্রেণের কামরায় আলো জ্বলে—চোখের আড়ালে চলে যায় কানী, আসে মোগলসরাইয়ের মঠ, আসে অন্ধকার, আবার আলো—ট্রেন—কানীর খেলনা নিয়ে ফেরিঙলারা, প্র্যাক্টিস ভরে—মন কেমন করে—ভাষণ মন কেমন করে। কোনো জায়গার জন্তে যে মানুষের মন কেমন করে, কে তা জানত? কাঁথির পিসিরা বলেন—করে।

কানীর মাটির পুতুলগুলো তিনি ব্রীজ থেকে গঙ্গার ফেলে দিয়ে এসেছেন। কানীর মাটি নিয়ে যেতে নেই, সোনা চুরি করা হয়।

[ ক্রমশঃ ]

## ডাকঘরের ইতিহাস

শ্রীসুধাংশু কুমার গুপ্ত

আজ তোমরা দুয়ের বন্ধুর সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করতে পারো

চিঠিপত্রের সাহায্যে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এই সহজ কাজটি ছিল পরম দুঃসাধ্য। আদিম যুগে—মামুষ যখন চিঠিপত্র লিখতে শেখেনি, তখন অপরকে কোন সংবাদ দিতে হলে এমন কোন বস্তু পাঠাতে হত যার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত হতে পারে। বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরও এই প্রতীক (symbols) ব্যবহারের রীতি মামুষ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সে এই প্রতীক খোদাই করতে শিখলে পাথর, কাঠ ও হাড়ের উপর। আরও কিছুকাল গত হলে সে রঙের সাহায্যে এই প্রতীক আঁকতে শুরু করলে পশুর চামড়া, গাছের ছাল ও পাতার উপর। এ থেকে সৃষ্টি হল চিত্রলিখনের—বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে মামুষের মনের বিভিন্ন কামনা ও অনুভূতি অভিব্যক্ত হতে লাগল।

পত্রলিখনের পদ্ধতি যদিও আবিষ্কৃত হয় খৃষ্টের জন্মের বহু শতক বৎসর পূর্বে, তবু একথা ঠিকই যে, খৃষ্টপূর্ব বর্ষ শতাব্দীর পূর্বে পত্র প্রেরণের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা কল্পিত হয়নি। পত্র প্রেরণের প্রয়োজন হলে ভৃত্যের সাহায্য নেওয়া হত আর বাদ্যের ভৃত্যের অভাব তাদের পক্ষে বন্ধুবান্ধবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খৃষ্টপূর্ব বর্ষ শতাব্দীতে পারস্যেরাই সর্বপ্রথম ডাকের প্রবর্তন করে। পত্র লেখা হত মাটি, পাথর বা কোন ধাতুর উপর, আর এই পত্র পাঠানো হত অখারোহী কর্মচারীর সাহায্যে। এর জন্মে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ষাঁটি ছিল আর প্রত্যেক ষাঁটিতেই অখারোহী থাকত মোতায়েন।

ঐতিহাসিকরা বলেন, ব্যাবিলনেও এই ধরনের ডাকের ব্যবস্থা ছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে। কিন্তু উত্তর দেশেই ডাক ব্যবস্থার হত কেবলমাত্র সরকারী কাজে। এর পর অনেক কাল ডাক-ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তবে যে সব অঞ্চলে ঘোড়ার পিঠে বাতায়ানত করা অসম্ভব সেখানে ঘোড়ার পরিবর্তে উটের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ডাক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে রোমান সম্রাটের আমলে। সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় করার জন্য রাজ্য-কর্মচারীরা ডাকের উৎকর্ষ সাধনে মনোবোগী হল। পার্চমেণ্ট বা প্যাপিরাসে-লেখা চিঠিপত্র সম্রাজ্যের সর্বত্র বার্তাবাহক পারদা, ঘোড়া ও জাহাজের সাহায্যে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ডাকের এই সুবিধা ছিল জনসাধারণের অনবিগম্য, তাদের তখনও নির্ভর করতে হত ক্রীতদাস বা দুয়ের বাস্তা পথটকের উপর।

এর পর ডাকের উন্নতির চেষ্টা করেন ক্রিস্টের সম্রাট শাল'মেন। রোমান সম্রাটদের মত তিনিও ঘোড়াসওয়ার নিযুক্ত করেন ডাক বহনের জন্য।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের নানা দেশে ডাকের প্রচলন হয় বটে, কিন্তু ক্রাশ ছাড়া আর কোন দেশেই জনসাধারণ এই ডাক ব্যবহার করতে পারত না। ক্রাশে ডাক সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ডাকে চিঠি পাঠানো ছিল এক ব্যয়সাধ্য যে অধিকাংশ লোকই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারত না।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের আর সকল দেশেই ডাকের

প্রবর্তন হয় আর এই সময় জনসাধারণও ডাক ব্যবহারের সুযোগ পায়। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয় এবং ডাকঘরও প্রতিষ্ঠিত হয় নানান স্থানে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্রাশে চিঠি যেরিষ্টারী করার রীতি প্রচলিত হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এক আন্তঃনাগরিক ডাকের প্রতিষ্ঠা হয় প্যারিসে। শহরের প্রধান প্রধান স্থানে ডাকবাগ্ন রাখার ব্যবস্থা হয় এবং ডাকটিকিটও প্রচলিত হয়।

ডাক ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে পেনি পোষ্টের প্রচলন হয়। শোনা যায়, অল্প মাত্রে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা হওয়ার লোকের চিঠি লেখার আগ্রহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সমগ্র ইংলণ্ডের ডাকঘরগুলিতে বত কর্মচারী ছিল তার চাইতেও বেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে হয় কেবলমাত্র লণ্ডনের ডাকঘরে। ডাকের এই জনপ্রিয়তার ফলে কিছুকাল পরেই ডাকের কর্তৃক গভর্ণমেণ্টের অধীনে চলে যায়।

কিন্তু ডাকের ব্যবস্থা হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাকের গতি ছিল অতি মন্থর, ঘণ্টার চার মাইলের বেশী তার বাবার শক্তি ছিল না। কাজেই ডাকের গতি বৃদ্ধি করার জন্য শেখটা অখারোহী বার্তাবাহক নিযুক্ত হয় আর এই ব্যবস্থার ফলে ডাকের সমাদর উত্তরোত্তর বাড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষ্টেজকোচের প্রবর্তনের সঙ্গে ডাকের গতি অনেকটা বাড়ল বটে, কিন্তু ডাকবিভাগের কর্মচারী পুরানো পদ্ধতি ত্যাগ করে এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিতে আগ্রহ দেখালেন না। পূর্বের মত তারা হরকরার সাহায্যেই চিঠি পাঠাতে লাগলেন। ফলে জনসাধারণ আইন অমান্য করে ষ্টেজকোচে চিঠি পাঠাতে লাগল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক পাঠাবার জন্য ইংলণ্ডের সর্বত্র নিয়মিত কোচ সার্ভিসের ব্যবস্থা হল আর এই বৎসরই ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও ইংলণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুস্তক ও সংবাদপত্রের প্রসার বৃদ্ধির ফলে শিকার বিস্তার ঘটে, ফলে জনসাধারণের লেখার আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন স্টীমার ও রেলপথের প্রবর্তন হয় তখন ডাকের ব্যবহার আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়।

ইয়োরোপে যখন ডাক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন আমেরিকাতেও ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। আমেরিকার ডাকের প্রথম প্রচলন হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। প্রথম উপনিবেশিকের দল এখানে আসার পর কিছুকাল পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একই উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামে চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য বেতনভোগী হরকরা ছিল, কিন্তু দূরবর্তী স্থানে চিঠি পাঠাতে হলে বণিক বা পথটকদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইংলণ্ডে চিঠি পাঠাতে হলে জাহাজের কাপ্তানের হাতে চিঠি জিন্মা করে দিতে হত।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের গভর্ণর লাভলেস উপনিবেশগুলিতে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। নিউইয়র্ক ও বোষ্টনের মধ্যে রাসে একবার যাতে চিঠি বিলি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন। কিছুকাল পরে কিল্যাডেলফিয়ার একটি



আপিস খোলা হয় দেশী ও বিদেশী ডাক পরিচালিত করার জন্য। ঐ সময় ডাক পাঠানো হয় হরকরার সাহায্যে আর ঐ সব হরকরার বেশীর ভাগই ছিল রেড ইণ্ডিয়ান।

ডাকের ইতিহাসে আমেরিকায় এক নবযুগের সূত্রপাত হয় ১৬১২ খৃষ্টাব্দে যখন টমাস নীল উত্তর আমেরিকায় মেল সার্ভিস স্থাপনের অল্পমতি পান। বিভিন্ন উপনিবেশের ডাকের জন্য দেয় চাঁদার পরিমাণ নির্দিষ্ট হল। নীল এবং ইংলণ্ডের ডাক-বিভাগের কর্তারা জ্যাকব হামিলটন নামে এক ভ্রমলোককে আমেরিকায় পোস্টমাষ্টার জেনারেলের পদে বহাল করলেন। অধিকাংশ উপনিবেশের জন্যই সাপ্তাহিক ডাকের ব্যবস্থা হল আর ডাক পৌছতে বাতৈ বিলম্ব না হয় তার জন্য অস্বাভাবিক ডাকবাহক নিযুক্ত হল। ডাকের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাক-পরিচালনার বহু ইংলণ্ড কিনে নিলে।

তখন আমেরিকায় ডাকবাহকের কাজ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তা-বাট বা ছিল শীতকালে তা বরফে ও বৃষ্টিতে দুর্গম হয়ে উঠত। পথে দস্যুর ভয় ছিল। সেতু ছিল কম, বেশীর ভাগ নদীই সাঁতারে পার হতে হত। কাজেই চিঠিপত্র পৌছতে সময় লাগত খুব বেশী, কখনও বা চিঠিপত্র পথেই নষ্ট হয়ে যেত।

ঐ সমস্ত অসুবিধার জন্য ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস নিজস্ব একটি ডাক-বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন আর ফলমাউথ থেকে সাতার্না পর্যন্ত অনেকগুলি ডাকঘর শৈল্পী হল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকায় ডাক বহনের কাজে সকল রকমের যানই নিয়োজিত হল। ক্যানো, স্টেজকোচ, ষ্টীমবোট, রেলগাড়ী—যেখানে যেটার সুবিধা সেইটারই ব্যবহার নির্দিষ্ট হল। তবে এতেও জনসাধারণের অসুবিধা একেবারে দূর হল না। ইয়োরোপের অনুকরণে আমেরিকাতেও তখন চিঠির পাঠা শুণ্ডি করে মাণ্ডল ধাৰ্য্য হত, ওজন বাই হোক না কেন। আর মাণ্ডলও ছিল খুব বেশী। স্বল্পবিস্তার সামর্থ্যের বাইরে। ত্রিশ মাইল ব্যাসের মধ্যে চিঠি পাঠাতে হলে মাণ্ডল দিতে হত দশ সেট। অনেক আন্দোলনের ফলে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট এক আইন জারি করে মাণ্ডলের হার কমিয়ে দিলেন।

আমাদের দেশে ডাকের প্রচলন হয় বঙ্গকাল পূর্বে। হিন্দু রাজাদের আমলে বেতনভোগী বার্তাবাহক ছিল। কপোতের সাহায্যে কখনও কখনও চুব্বর্তী অঞ্চলে পত্রাদি পাঠানো হত। সম্রাট অশোক রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য ডাকের উন্নতির সাধন করেছিলেন বলে শোনা যায়। মুসলমান আমলে সম্রাট শের শাহের সময় ডাকের সংস্কার হয়। শের শাহও বোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তবে ইংরেজ আমলেই ডাক যে এদেশে হনপ্রিয় হয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। লর্ড ডালহৌসির সময় ডাকবিভাগের আমূল সংস্কার হয়। ডাকটিকিটের প্রচলন হওয়ায় জনসাধারণ অল্প-ব্যয়ে সৎসার প্রেরণের সুযোগ লাভ করে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আজ যে ডাকের কত সুবিধা হয়েছে তা বলা নিম্নরোজন। তোমরা জানো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পরে এদেশে বিমান ডাকেরও প্রবর্তন হয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই এদেশ

থেকে বিমানে ডাক যাচ্ছে দেশ-বিদেশে। ইরানী, এদেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যেও বিমানে ডাক বিলির ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আর বোম্বাইএর চিঠির জন্য দীর্ঘ তিন দিন অপেক্ষা করতে হয় না, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠি হাতে এসে পৌছয়।

## গল্প হলেও সত্যি

### ঐতিহ্যরঞ্জন বিশ্বাস

**কিছু দিন আগের কথা বলছি।** ইংরেজ রাজত্ব তখন আমাদের দেশে প্রবোধে চলছে। দেশ শাসনের নামে ওয়া যেমন শোষণ করছিল, তেমনি আমাদের দেশের অনেক জমিদারও প্রজাদের ওপর অকথা অত্যাচার করছিলেন।

খুলনা জেলায় অল্পতর জমিদার রায়সাহেব কালী বাবুও এমনি একজন ছিলেন। সামান্য একটু মনোমালিন্যের জন্য তাঁর দ্বীকে পর্যন্ত খুন করে ফেললেন তিনি। তার কিছুদিন পর নিষ্ঠুরভাবে তাঁর সাত জন পড়শী প্রজাকে গুলাবিদ্ধ করে হত্যা করলেন। ‘একতাই বল’ এই ভেবে গ্রামের সবাই মিলে আদালতে মামলা দায়ের করলেন কালী বাবুর বিরুদ্ধে। বছর ছয়েক মামলা চলার পর আদালত রায় দিল। শোনা গেল কালী বাবুর কীসির হুকুম হয়েছে। কালী বাবুর বাবা তখন জীবিত। পুত্রের কীসি হবে শুনে মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু সে চিন্তা মাত্র দু’-তিন দিন স্থায়ী হল। কালী বাবুর বাবা হাজার দশেক টাকা নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। গেলেন এক খ্যাতিমান ব্যারিষ্টারের কাছে। তাঁর পরামর্শানুযায়ী কালী বাবুর বাবা আপীল করলেন। অতঃপর ব্যারিষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করলেন তিনি। চুক্তিতে ঠিক হ’ল কালী বাবুর প্রাণদণ্ড রদ করতে পারলে কালী বাবুর সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্যমুদ্রা ব্যারিষ্টার মশাইকে দেওয়া হবে। আর তা’ না পারলে ব্যারিষ্টার মশাই এক কর্দমকণ্ঠে গ্রহণ করবেন না।

শেষ বায়ে কোর্ট যখন রায় দিল, তখন দেখা গেল, কালী বাবু মোটেই দোষী নন। এক টাকা জরিমানাও দিতে হল না তাঁকে। কালী বাবুর বাবা ব্যারিষ্টার মশাইয়ের কৃত্তিভের জন্তে পূর্ণ-চুক্তি অনুযায়ী কালী বাবুর সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে দিলেন। কিন্তু অজান্তে ভাবে কালী বাবুকে বাঁচান হয়েছে। এইজন্য ব্যারিষ্টার মশাই প্রাপ্য সমস্ত অর্থ স্থানীয় হাসপাতালে দান করে দিলেন। কে জানো এই সাধু ও দানশীল ব্যারিষ্টার? ইনি হচ্ছেন আমাদের পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আমরা চিরকাল পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে স্মরণ করে চলব। তাঁর স্মৃতি হবে আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথর।

## বুদ্ধগয়া

### শ্রীবলাইকৃষ্ণ সরকার

**বিগত বছরে অর্থাৎ ১১৫৬ সালে ভগবান বুদ্ধের ২৫০০ তম** মহাপরিনির্বাণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। বছরের গোড়া থেকেই এ উৎসব শুরু হয়েছিল আর তার উদ্‌যাপন হলো বছর শেষ হওয়ার আগে আগে। এই বিশেষ বছরে তাই বৃদ্ধশরণে উৎসব হয়ে আমরা ক’জন ঠিক করলাম বুদ্ধগয়া দর্শনে বাব। হিন্দু ও

বৌদ্ধদের অজ্ঞাতম তীর্থ এই বুদ্ধগয়া। আমরা তখন হাজারীবাগ রোডে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছি। সেখান থেকেই একদিন সকালে খাওয়া দাওয়া শেষে রওনা হওয়া গেল গয়া প্যাসেঞ্জারে হাজারীবাগ রোড থেকে গয়া বেশীদূর নয়। ২ ঘণ্টা, ২½ ঘণ্টার পথ আমরা চার জন বন্ধু মিলে বেশ আরামেই দেখতে দেখতে চললাম রাস্তার যেতে যেতে তিনটি টানেল ও ধানুয়ার জঙ্গল পড়লো দুয়ারে নিবিড় বন, মাঝখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। বেশ লাগছিল আরও অনেকগুলো ট্রেন যেগুলো অজ্ঞানির জন্তে বিখ্যাত—পার হয়ে আমরা যখন গয়া পৌছলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। ট্রেন থেকে নেমেই আমরা গেলাম বাসস্টাণ্ডে। কিন্তু বাস পাওয়া গেল না, তিনটার বাস ছেড়ে চলে গিয়েছে। সুতরাং একটা টাক্সাওয়ালার সঙ্গে রফা হোল। সে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে বুদ্ধগয়া ব্রিগে আনবে। কারণ হাতে সময় খুব কম। টাক্সা ৩০মিনিটই টাক্সাওয়ালার ঘোড়ার চাবুক লাগাল। ঘোড়ার হাড়জিরজিরে চেহারা হলে কি হবে! ছুটেতে লাগল একেবারে রেসের ঘোড়ার মত। টাক্সাওয়ালারও ছিল বেশ আয়ুসে লোক। রাস্তায় যেতে যেতে নানান গল্প করতে লাগলো। গয়া থেকে বুদ্ধগয়া। সুন্দর পিচালা পথ। ফল্গু নদীর ধারে ধারে প্রায় ৭ মাইল। ইতিহাস-বিজ্ঞত ফল্গু নদী। এরই তীরে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধ লাভ হয়েছিল। এরই তীরে গয়ায় বুদ্ধমন্দিরে হিন্দুর পিতৃভূষণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমাদের বাঁ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে ফল্গু নদী। ডান দিকে ক্ষেত-খামার আর মাঠ। রাস্তার দুপাশে গাছের সারি। আমরা তারই ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। বেলা প্রায় চারটার সময় আমরা বোধগয়া অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায় পৌছলাম। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল মন্দিরের বিরাট চূড়া। ওপরের দিকটা ক্রমশঃ ছুঁচলো হয়ে গিয়েছে। এই সময় সরকারের তরফ থেকে মন্দিরের সংস্কারের মেরামতের কাজ হচ্ছিল।

টাক্সা থেকে নেমে আমাদের খানিকটা উঁচু জায়গায় উঠতে হোল। তারপর বাঁদিকে বাঁকতেই দেখা গেল বুদ্ধদেবের বিশাল মন্দির। একটা বড় পুষ্করিণীর মত নীচু জায়গায় মন্দিরটির অবস্থিতি। এক পাশের সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নামলাম। জায়গাটিতে সুন্দরভাবে বাগান করা ও চমৎকার সাজান। আমরা এগিয়ে চললাম। ডানদিকেই বিরাট কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জুতো খুলে মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে হয়। মন্দিরের মূল অভ্যন্তরে উঁচু পাখরের বেদীর ওপর ভগবান বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্তি। বোগাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। মূর্তির দু'অনেকটা কাঁচা সোনার মত। এই বুদ্ধমূর্তি বহুবার অপসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শোনা যায়, পূর্বে আরো যে সব বুদ্ধমূর্তি ছিল—সে সবই স্তব্ধনির্মিত ছিল। বুদ্ধদেবের সেই মহিমাযুক্ত মূর্তি দর্শন ও প্রণাম করে আমরা বাইরে এলাম। বহির্দ্বারের কাছে একটি টেবিলে মতামত লেখার খাতা রয়েছে। আমরা সেই খাতার পাতার লিখলাম—“বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি।”

এর পর ওপরে অর্থাৎ বিত্তলে উঠলাম। বিত্তলের চাতালের চার কোণে মহাচূড়ার অনুকরণে চারটি স্তূপাকার মন্দির রয়েছে। নানান ভাষাধর্ম ভরা। প্রত্যেকটি চূড়ার এবং মন্দিরের দেওয়ালের পায়ে পায়ে ঘণ্টার আকৃতির মধ্যে যে কত অসংখ্য স্তূপ স্তূপ বুদ্ধমূর্তি

রয়েছে যে তার হিসেব নেই। মাঝখানের চূড়াটি প্রায় ১৮০ ফিট উঁচু। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৩০ ফিট আর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৬ ফিট বিস্তৃত।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে পরম পবিত্র অশ্বপু গাছ বোধিগুম্ব। এই বোধিবৃক্ষের তলেই গৌতম বুদ্ধ লাভ করেন। বিশ্বের মানব-কল্যাণের জন্তে সত্য উপলব্ধি এই তরুমূলেই হয়েছিল। উত্তরকালে ভগবান বুদ্ধ এই প্রেরণাতেই সত্য, অহিংসা, সংযমের কথা প্রচার করে গেছেন। মানুষকে দুঃখ-কষ্ট, ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে মহানির্বাণের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এই বুদ্ধটি যদিও সেই আদি-বুদ্ধ নয়—তার বংশধর। তবু আমরা তার কয়েকটি পবিত্র পত্র অতি সম্বদ্ধ সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম।

মূল মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণের মধ্যেই তারাদেবী ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্তি আছে। আমরা সে সব দর্শন করে মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলাম। সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে। এর নাম মুচকুল হ্রদ। গল্প আছে যে, এই হ্রদের কাছে বসে এক সময় বুদ্ধদেব যখন ধ্যান করছেন—তখন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সময় নাগরাজ মুচকুল ঠিক বায়বীয় মত বুদ্ধদেবের দেহে নিজ ফণা বিস্তার করে প্রভুকে আচ্ছাদিত করে রাখে ও ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বুদ্ধদেবকে রক্ষা করে।

বুদ্ধদেবের মন্দির পরিদ্রুম করে আমরা রাস্তায় বের হয়ে এলাম। পাশেই তিব্বতীয় বৌদ্ধ মঠ, চৈনিক বিহার ও বিড়লার মন্দির প্রভৃতি আমরা এসবও ঘুরে দেখলাম। ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছে। অস্তগাম্য সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে বুদ্ধমন্দিরের চূড়ায়। আমরা এবার ফিরে বাবো। যতই দূরে বাই পিছন ফিরে বার বার দেখি—বুদ্ধদেবের পুণ্যমন্দির তার শীর্ষ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে মুক্তির বাণী বিবোধিত করতে বিরাজ করছে কল্পযাবন শাস্ত্র সৌম্যকে অন্তরে ধারণ করে। আমরা সে দিনের শেষ বেলায় আবার স্মরণ করলাম অমৃত মন্ত্র—“বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি।”

## হাই জাম্প

### হাল ক্রিস্চান অ্যাণ্ডারসন

তিন বন্ধু। মাছি, কড়ি আর ব্যাঙ। খুব ভাব তিন জনে। তিন জনে নিজেদের ভেতর বললে—“এসো না ভাই, আমরা একটা হাই জাম্পের প্রতিযোগিতা করি। দেখা যাক কে বেশী লাফাতে পারে।”

সবাই বললে—“তা বেশ! তা বেশ!”

সারা দুনিয়াতে খবর চলে গেল মাছি, কড়ি আর ব্যাঙ হাই জাম্প দেবে। ভোমরা সবাই এসো—দেখো। এমন সুযোগ কেউ হারিয়ে না।

সমস্ত কিছু তোড়জোড় করতে করতে এলো সত্যিকারের লাফানোর দিন।

দেশের রাজা এসেছেন প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করতে—প্রাইজ দিতে।

হৈ-হৈ-বৈ-বৈ ব্যাপার।

সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন শ্রোতাদের—“সব চেয়ে উঁচুতে যে লাফাতে পারবে তার সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবো।”

এই কথা না শুনে মাছি, ফড়িং আর ব্যাঙ তো আনন্দে গদগদ। আনন্দে ভেসে যাবার জোগাড়। রাজা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে সিংহাসনে বসলেন।

প্রথমে মাছি এলো। রাজা ও দর্শকদের নমস্কার করলো। করবেই তো—ও যে খানদানি। মাছির বেশ নরম স্বভাব। মাছির ভেতর কোন চপলতা নেই।

মাছির পর এলো ফড়িং। ফড়িং তো ফড়িং-ই। নামও যেমন কাঙ্ক্ষণ তেমন। ট্যাং-ট্যাং করতে করতে এলো। নমস্কারও করলো না। যাই হোক, ফড়িং পরেছিল ভারী সুন্দর সবুজ রংয়ের পোষাক। সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু তাকে। সবুজ রঙটা ফড়িং খুব ভালবাসে। তা ছাড়া ও রঙটা ওদের “ক্যামিফ্লেজ”।

এবারে এলো ব্যাঙ মশায়। থপ, থপ, করে সভার মাঝে এলো। মুখে কথা নেই। শুধু ডাঃ-ডাঃ করে একদিকে দেখছে, ওদিকে দেখছে।

রাজা মশার বললেন—“প্রতিযোগীরা সবাই উপস্থিত। আর বাজ্ঞে কাজে সময় নষ্ট না করে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেওয়া যাক।”

রাজা মশায়ের কথা মতো হাই জাম্প শুরু হোল।

প্রথমে লাফাচ্ছে মাছি। মাছি এতো উঁচুতে লাফালে যে কেউ তাকে দেখতেই পেলো না যে সে কত উঁচুতে উঠেছে। হাওয়ার সঙ্গে মাছি মিশে গেছে। অতএব মাছি বাতিল হয়ে গেল।

এবারে এলো ফড়িংয়ের পালা। ফড়িং লাফালে। লাফালে তো লাফালে একেবারে রাজার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। রাজা তো বেগেই আঙুন। লোক-লস্করবা ফড়িংকে এই মারে তো এই মারে। রাজা মশায় এগিয়ে এসে তো ফড়িংকে লোক লস্করদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। ফড়িং কান্ডে কান্ডে সভা থেকে বেরিয়ে গেল। কপাল ভাল যে প্রাণে মরেনি।

যাক। এবারে এলেন ব্যাঙ মশায়। ব্যাঙ মশায় এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। মুখে রা সরে না। ব্যাঙ মশায় তো একেই দেখতে কেমন বোকা-বোকা। তারপর এই সব ব্যাপার দেখে আরো কেমন যেন বেশী বোকা হয়ে গেছে। ও মনে মনে বললে—“দরকার নেই বাব! লাফিয়ে। লাফাতে গিয়ে কি

বাপের দেওয়া প্রাণটা হারাবো? থাক বাবা, ধীরে ছেলে ধীরেই ফিরে যাওয়া যাক। বত সব সুরে থাকতে ভুলে কিলোন ব্যাপার।”

রাজার কুকুর ব্যাঙের হাবভাব দেখে বললে—“আমার মনে হয়, ব্যাঙ কেমন যেন একটু ভড়কে গেছে, তা ছাড়া ওর শরীরটা তেমন বিশেষ ভাল নয় বোধ হয়—” বলেই দু’বার হাঁচলে।

কুকুরের এই কথা না শুনে ব্যাঙ তো বেগেই আঙুন। “কি, আমার অপমান? ঠাঁড়াও দেখাচ্ছি”—বলেই ব্যাঙ মশায় দিলেন পাশ থেকে লাফ। লাফ দিয়ে তো ব্যাঙ মশায় পড়লো রাজকুমারীর কোলের ওপর। রাজকুমারী বসেছিল রাজার পাশের সিংহাসনে।

ব্যাঙ মশায়কে মেয়ের কোলে না দেখে রাজামশায় বললেন—“পৃথিবীতে আমার মেয়ের থেকে কোন উঁচু জিনিষ বা বস্তু নেই। তাই যে আমার মেয়ের মাথা পর্যন্ত লাফাতে পেরেছে সেই এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে বলে আমি মনে করি। বুদ্ধিমান ছাড়া এই জিনিষ কেউ জানে না। তাই আমি ব্যাঙের বুদ্ধির প্রশংসা করছি। ব্যাঙ সত্যিই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ।”

রাজা শেষকালে নিজের কথা মতো ব্যাঙের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

মাছি বললে ফড়িংকে—“দেখ, ভাই, আমি সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছি প্রথম হতে পারলাম না। সবই কপাল ভাই, সবই কপাল। আমি পাতলা আর ছিপছিপে বলে কেউ দেখতেই শেলো না যে, আমি কত উঁচুতে উঠেছি। জগতে আজকাল নিবৃত্তিতারই জয়। বোকাদেরই রাজত্ব।”

এই দুঃখের জ্বালায় মাছি পররাষ্ট্র বিভাগে চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে গেল। পরে শোনা গেল যে মাছিকে বিদেশীরা মেরে ফেলেছে।

ফড়িংও তাই ভাবছে—“কি অদ্ভুত এই জগত।” আর মনে মনে মাছির কথাগুলোই আঙড়াতে লাগলো—“হ্যাঁ এই পৃথিবীতে গোবর গণেশদেরই জয়-জয়কার। এই পৃথিবীটা নিবৃত্তি মাংসপিণ্ডের জন্তে।” তারপর সে গাইতে লাগলো তার বিখ্যাত বেদনা-বিদুর গান—কিটর—কিট—কিটর—কিট।

ফড়িংয়ের কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি এই মহাসত্যকে। কিন্তু আমার ছোট বন্ধুরা জেনে রাখো, ছাপার অক্ষরে যদিও পড়ছো এই মহাসত্যকে, তবুও ভেবো না যে সব সময়ই এই ব্যাপার সত্যি।

অমুবাদক—দেবানীষ চট্টোপাধ্যায়

## ● মাসিক বঙ্গমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে.....২৪

বাৎসরিক “ ” .....১২

বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ).....২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রের অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সভাক ১৫

“ ” বাৎসরিক সভাক .....১১।

প্রাপ্ত সংখ্যা ১।

বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৮।

( পাকিস্তানে )

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১

বাৎসরিক “ ” .....১০।

বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা “ ” .....১৮।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

চীনের অন্তর্বিপ্লব শেষ হবার পর বখন নতুন সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হোলো টি লিং-এর তখন উনিশ বছর বয়েস, ফে চে শিয়াং-এর চক্ৰিশ। তদ্বিনে ওদের মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। চে শিয়াং একটা বড়ো চাকরি করতো কুওমিনটাং সরকারে। নানকিং-এর নাম বদলে গোলো পিকিং। চিয়াং সরকারের বিশ্বস্ত বারা সবাই চলে এলো ফরমোসায়। সেই সঙ্গে গেল চে শিয়াং আর টি লিং। টি লিং থেকে যেতে চেয়েছিলো। চে শিয়াং রাজী হয়নি।

কিন্তু ফরমোসায় এসে চে শিয়াং বেশী দিন চাকরি করেনি! সেখান থেকে সায়গন হয়ে ব্যাংককে এসে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা শুরু করলো। সেখানেও থাকলো না বেশী দিন। ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন, তারপর এখন কলকাতায়।

“এ ভাবে আর ভালো লাগে না,” টি লিং বললো দিলীপকে, “আমার কাজ শুধু দানার সংসার গুছিয়ে রাখা আর দানার সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক হাদের তাদের কারো কারো সঙ্গে একটা সামাজিকতার যোগাযোগ বজায় রাখা।”

“কাউকে বিয়ে করে নিজের একটা সংসার পাতলেই পারতে,” দিলীপ বললো।

“চে শিয়াং সেটা চায় না।”

“চিয়েন চাং-এর সঙ্গে তোমার যে বাখামাখি, সেটা যদি জানতে পারো?”

“চিয়েন চাং-এর ক্ষতি হবে তাতে। আমার অবস্থা কিছু বলবে না।”

মঙ্গলবার সকাল থেকেই কি রকম একটু অস্বাভাবিক বোধ করছিলো দিলীপ। কি একটা যেন কাজের ভার আছে তার উপর। অথচ মনে পড়ছে না কিছুতেই।

বিকেলবেলা হঠাৎ মনে পড়লো।

টি লিং তাকে বলেছিলো চিয়েন চাংকে যে কয়েই হোক মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে সঙ্গে রাখতে। চে শিয়াং-এর সঙ্গে কোথায় যেন বাবার কথা আছে তার—সেটা যেন সন্দেহ হতে দেওয়া না হয়

দিলীপ তক্ষুণি চলে এলো ওয়াংদের বাড়ি।

যে ঢুকতেই জেনীর সঙ্গে দেখা। মুখ তার শুকনো।

“চিয়েন চাং কোথায়,” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

“কি ব্যাপার বলো তো,” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“কেন?”

“ঘটাধানেক আগে একবার আই-কিম এসে খোঁজ করলো চিয়েন চাং কোথায়। কিছুক্ষণ আগে এসে খোঁজ করলো চে শিয়াং। এখন তুমি। সবাই হঠাৎ তার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন?”

“আমি এমনি খোঁজ করছিলাম,” দিলীপ সহজ হবার চেষ্টা করে বললো। “ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তাই ভাবলাম, আজ সন্ধ্যাবেলা ওর সঙ্গে একটু আড্ডা দেবো। সে কোথায়?”

জেনী একটু চুপ করে রইলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলো তো?”

“কিসের ব্যাপার?”

“চিয়েন চাং সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে টি লিং-এর খুব নিজে করলো। বললো, মেয়েটি নাকি ভালো নয়। ওর অনেক ব্যাপার সে জানতে পেরেছে। ওর সঙ্গে নাকি ভাব অনেকেরই, তবে কারো সঙ্গে খুব বেশী দিন নয়। ওর কথা শুনে মনে হোলো, টি লিং-এর কোনো বাবহারে সে মনে আঘাত পেয়েছে। ও টি লিংকে তো ভালোবাসতো খুব।”

দিলীপ একটু অবাক হোলো। তার পর হাসলো খুব। হেসে বললো, “আচ্ছা পাগল! কি ব্যাপার জানো? সেদিন চে শিয়াং আমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছিলো মনে আছে তো? গিয়ে দেখি, চে শিয়াং নেই, আমার বসতে বলে গেছে, বাড়িতে শুধু টি লিং একা। টি লিং-এর সঙ্গে বসে বখন গল্প করছি, এমন সময় চিয়েন চাং এসে উপস্থিত। সে-ও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে চেয়েছিলো কিছুক্ষণ। কিন্তু টি লিং তাকে বসতে বললো না। তাকে চলে আসতে হোলো। তাই বোধ হয় রাগ করেছে তাই উপর।”

“তুমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছো, না?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

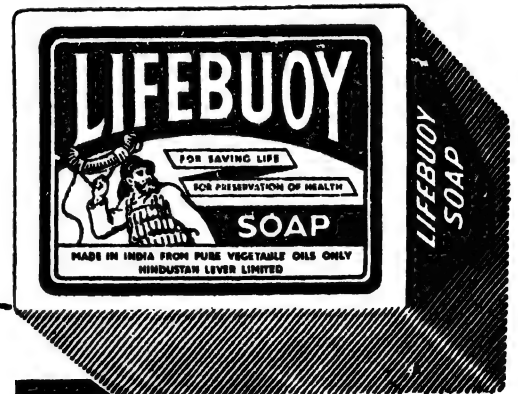
# যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময়

## লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন!



শিশুদের পক্ষে ময়লা হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বেশিক্ষণ ময়লা অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কারণ, ময়লায় রোগের বীজাণু থাকে যার থেকে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

লাইফবয় সাবান ময়লা-জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন।





“এ রকম একটা কিছু আমি আঁচ করছিলাম। কারণ, চিয়েন চাং আমার কাছে খানিকক্ষণ তোমার নিলেকও করেছিলো। সে বলছিলো, তুমিও নাকি লোক ভালো নও আর এটা-ওটা-সেটা।”

দিলীপ হাসলো।

স্নান হাসি হাসলো জেনীও। বললো, “তোমার তো আমি চিনি দিলীপ। এ-সব যে কেঁ জে শিয়াং-এর কল্পি, সে আমি খানিকটা বুঝতে পারছি।”

দিলীপ জেনীর হাত ধরলো, বললো, “জেনী!”

“কি?”

“তুমি আমার বিশ্বাস করো?”

“বিশ্বাস না করলে কি এত কথা বলতাম?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“জি লিং সেদিন আমার কি বলেছিলো, জানতে চাও?”

“না।”

“তবু শোনো। জামলে তুমিও খুশি হবে, চিয়েন চাং-ও খুশি হবে। তবে এখন কাউকে কিছু বোলো না। জি লিং বলছিলো সে চিয়েন চাং-কেই বিয়ে করবে, কিন্তু এখন সে কথা কাউকে জানতে দিতে চায় না। কারণ কেঁ জে শিয়াং শুনলে ভীষণ রাগ করবে, এমন কি, সে চিয়েন চাং-এর ক্ষতিও করবার চেষ্টা করতে পারে।”

জেনী একটু অবাক হোলো। বললো, “এত কথা তো জানতাম না। জে শিয়াং-এর সঙ্গে দাদার যে মাখামাখি, তাতে দাদার ক্ষতি হতে পারে সে আমরাও বুঝতে পারছিলাম, আহ-কিমও সেদিন বলছিলো। তবে জি লিং যে দাদাকে এত ভালোবাসে সে কথা তো জানতে পারিনি কোনো দিন?”

“আজ চিয়েন চাং-এর কোথায় যেন বাওয়ার কথা আছে কেঁ জে শিয়াং-এর সঙ্গে। জি লিং আমার পাঠিয়েছে, আমি যেন তার আগেই চিয়েন চাংকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসি, যাতে কেঁ শিয়াং এসে চিয়েন চাংকে না পায়।”

জেনী একটু অবাক হয়ে তাকালো দিলীপের দিকে। বললো, “ও, সে জন্তাই কেঁ শিয়াং এসে দাদার খোঁজ করছিলো?”

“চিয়েন চাং কোথায়?”

জেনী একটু চুপ করে থেকে বললো, “দাদা একটু কলকাতার বাইরে গেছে। বলছে এখন কাউকে কিছু না বলতে।”

“কলকাতার বাইরে গেছে?” দিলীপ অবাক হোলো, কবে গেছে?”

“কাল সকাল বেলা।”

“কোথায় গেছে?”

“তা তো বলে যার নি। শুধু একটি স্ট্রাকেল আর হোল্ডঅল নিয়ে গেছে।”

“কবে ফিরবে?”

“তা তো বলে যার নি? মনে হোলো কয়েক দিন দেরী হবে। তা নইলে গরম স্ট্রট সবগুলো নিয়ে যেতো না।”

দিলীপ চুপ করে বসে রইলো। ভেবে পেলো না কি করবে—এখানে বসে জেনীর সঙ্গে গল্প করবে, না জেনীকে নিয়ে বেরোবে, কিংবা একবার দেখা করে আসবে জি লিং-এর সঙ্গে।

জেনী চা করে দিলো। বাইরে বিকল ছুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে

এলো আন্তে আন্তে। বাইরে একটি গাড়ি এসে থামলো। একটু পরে ঘরে এসে ঢুকলো কেঁ জে শিয়াং।

দিলীপ আর জেনীকে একসঙ্গে একলা ঘরে দেখে তার মুখে যে রকম ডাব ফুটে উঠবে বলে এরা আশা করছিলো, সে রকম কিছু দেখা গেল না জে শিয়াং-এর মুখে।

তাকে দেখে মনে হোলো সে যেন খুব ক্লান্ত, খুব উৎকণ্ঠিত। সে জিজ্ঞেস করলো, “চিয়েন চাং কোথায়?”

“বেরিয়েছে,” জেনী বললো।

“কখন ফিরবে?”

“কিছু বলে যার নি তো?”

“কোথায় গেছে জানো?”

“না, জানি না।”

জে শিয়াং ঠোট কাঁপড়ে কি যেন ভাবলো।

“এক কাপ চা দেবে,” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“না। আমার বসবার সময় নেই,” জে শিয়াং উত্তর দিলো, “চিয়েন চাং যদি ছ’টা মধ্যে ফেরে তো বোলো আমি তার জন্তে অপেক্ষা করবো, সে যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কোথায় দেখা করতে হবে সে জানে।”

“আর যদি ছ’টার মধ্যে না ফেরে?”

“তা’ হলে—তা’ হলে—,” তবু কুঁচকে জে শিয়াং একটু ভাবলো, ভেবে বললো, “তা’ হলে আজ আর আমার সঙ্গে দেখা করে দরকার নেই। আমিই এসে ওর সঙ্গে দেখা করবো কাল কিংবা পরশু।”

জে শিয়াং চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ হুঁজুনেই। তারপর দিলীপ হঠাৎ বললো, “জেনী, ভাবছি আর বেশী দিন অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।”

জেনী বুঝতে পারলো না। চোখ তুলে তাকালো দিলীপের দিকে।

দিলীপ বলে গেল, “সামনে হুণ্ডার যদি দিন ঠিক করতে চাই তোমার বাবা কি আপত্তি করবেন?”

“কিসের দিন?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“বিয়ের দিন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো।”

জেনী তার চেয়ার থেকে উঠে এসে দিলীপের চেয়ারের হাতলের উপর বসলো। বসে দিলীপের কাঁধে হাত রেখে বললো, “দিলীপ, তুমি সত্যিই এত সিরিয়াস?”

“সিরিয়াস না তো কি ছেলেখেলা?”

“দিলীপ, ভালো করে ভেবে দেখ—আমার বিয়ে না করে হয়তো তোমাদের নিজের জাতের মেয়ে বিয়ে করলে অনেক সুখী হবে তুমি।”

“না জেনী, তোমার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, আর কাউকে বিয়ে করবোও না। অবশি তুমি যদি না চাও!”

“না, না, দিলীপ, ও কথা বোলো না, তুমি তো জানো, আমিও তোমার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।”

“তা হলে সামনের হুণ্ডার গিয়ে বিয়েটা সেবে আসি।”

জেনী আন্তে আন্তে বললো, “বেশ, তুমি যদি চাও তো তাই

হবে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "দিলীপ, আমার ভয় করছে।"

"কেন?" দিলীপ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"না, হাসি নয়। জে শিয়াকে তুমি চেনো না।"

"তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?"

"সে আমার বিয়ে করতে চায়, জানো তো?"

"কি হয়েছে তাতে?"

"সে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করে?"

দিলীপ হাসতে শুরু করলো! বললো, "আমার কি ক্ষতি করবে সে?"

জেনী আর কিছু বললো না।

দিলীপ খড়ি দেখলো। তার পর উঠে পড়লো।

"কোথায় যাচ্ছে?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"একবার টিং লিং-এর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"কেন?"

"তাকে একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার যে চিয়েন চাং কলকাতায় নেই। স্ততরাং সে একটু নিশ্চিত হতে পারে।"

টিং লিং বাইরের ঘরে বসেছিলো চুপচাপ। দিলীপকে দেখে কোন কথা বললো না। হাত দিয়ে শুধু চেয়ার দেখিয়ে দিলো। দিলীপ চেয়ার টেনে বসতে জামার ভিতর থেকে একটি চিঠি বার করে দিলো দিলীপের হাতে।

"কার চিঠি?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"পড়ে দেখ।"

চিঠি ইংরেজিতে লেখা। দিলীপ দেখলো, চিঠির নিচে চিয়েন চাং-এর সই।

ডায়েরি টি লিং—সে লিখেছে—তুমি যখন এ চিঠি পাবে, আমি ততক্ষণে বন্ধ পৌঁছে গেছি। আমি সেদিন রাত্রে তোমায় একথাই জানাতে গিয়েছিলাম যে আমার পাসপোর্ট আর ভিসা হয়ে গেছে। একটা চাকরীর ব্যবস্থাও হয়ে গেছে নিউইয়র্কে। টাকাকড়ি বা ষোঁগাড় করার দরকার ছিলো, তা-ও হয়ে গেছে। আমি জানাতে গিয়েছিলাম তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে—না কি আমি আগে চলে যাবো, তুমি পরে আসবে। তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেলাম তাতে মনে হোলো জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আর নেই। সেদিন একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো সে ব্যাংকক থেকে এসেছে, তোমাদের চেনে, তার কাছ থেকে তোমার কথা অনেক শুনলাম। তাই ভাবলাম তোমার কাছ থেকে কিছু আশা না করাই ভালো। তুমি তোমার মতো সুখে থাকো। আমি আমার নতুন জীবন শুরু করি বিদেশে গিয়ে। বন্ধ থেকে প্লেন ধরে আমেরিকায় যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।—চিয়েন চাং।

দিলীপ চোখ তুলে দেখলো টি লিং-এর চোখ জলে ভাসছে।

যেই ডাকে চিঠি এসেছিলো টি লিং এর কাছে সেই ডাকে বুড়ো ওয়ান্ডার কাছো চিয়েন চাং-এর চিঠি এসেছিলো।



নিম্নমিত

**নিম্ন**

ব্যবহার করুন!

শাল্যকাল থেকে নিম টুথ পেইন্ট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেইন্ট-এ নিমের সহজাত সকল গুণাবলী সম্মিলিত তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্রোরোফিলও আছে। ইহা দন্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চল ও সুরভিত করে।

অগ্ৰাণ্য টুথ পেইন্ট অপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির

উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী

সমন্বিত নিম টুথ পেইন্ট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে

সমুজ্জল।



দ্রি কালকাটা কমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২০

বুড়ো ওয়াং প্রথমে মনে মনে একবার চিঠিটা পড়ে নিলো।  
 জেনী, মিনি আর স্ত্রী চাং একটু দূরে পাড়িয়ে বসে চুপ করে।  
 চিঠি পড়ে ওয়াং হঠাৎ মিনিট চোখ বুজে চুপ করে বসে বসে বসে।  
 তার পর ছেলে-মেয়েদের কাছে ডেকে খুব নিচু গলায় চিয়েন চাং-এর  
 চিঠি পড়ে শোনালো।

মিনি চুপ করে বসে বসে নির্বিকার ভাবে। জেনীর চোখ জলে  
 ভরে উঠলো। একটু খুশি-খুশি দেখালো স্ত্রী চাংকে।

“জীবনের এই ধারা,” ওয়াং বললো, “ছেলে-মেয়েরা ছড়িয়ে পড়বে  
 জৈন-বিসেশে, নতুন করে নতুন পরিবারের গোড়া পত্তন করবে।  
 ওয়াংদের খুঁজে পাবে হাংকাও, ফুকিয়েনে, হংকং। ওয়াংদের পাবে  
 ব্যাংকক, সাইগন, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুরে, খুঁজে পাবে জাকার্তার  
 রেজুন। এ ভাবে ছড়াতে ছড়াতে আমরা এসেছি কলকাতায়।  
 এবার একজন চললো আমেরিকায়। সে সুখী হোক, দেশী বা বিদেশী  
 বাক্যে খুশি বিয়ে করে ওয়াংদের বংশ বিস্তার করুক। ওয়াং পূর্ব-  
 পুরুষদের আত্মার কল্যাণ হোক।”

একটু চুপ করে বসে বসে ওয়াং। তার পর বললো, “বে যেখানে  
 খুশি থাক, আমি একটুও হুংখিত হবো না। আমি শুধু  
 চাই যে আমার ছেলেমেয়েদের অন্তত একজন ফুকিয়েনে ফিরে যাক।”

আবার চক্ষু নিম্নীলিত করলো বুড়ো ওয়াং। জেনী, মিনি,  
 স্ত্রী চাং আন্তে আন্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে স্ত্রী চাং বললো, “চিয়েন চাং আমেরিকা যাচ্ছে,  
 ভালোই হলো। আমিও থাকবো না। রোজী বলছে তার ইণ্ডিয়া  
 ভালো লাগে না, সে তার হোম ইন্ডিয়াও চলে যাবে। আমিও চলে  
 যাবো তার সঙ্গে।”

মিনি গম্ভীর ভাবে বললো, “রোজী তো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।  
 ওর হোম ইণ্ডিয়া। সে ইন্ডিয়াও গিয়ে কি করবে?”

“না, ওর হোম ইন্ডিয়াও, ওর পূর্বপুরুষ সেখানে থেকে এদেশে  
 এসেছে, ওদেশে ওর অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে।”

মিনি বললো, “আমি কিন্তু ফুকিয়েনে চলে যাবো। আহ-কিমও  
 যাবে। আমাদের মধ্যে তাই কথা হয়ে আছে।”

“সবাই যার যেখানে খুশি যাবে,” জেনী চোখের জল মুছে বললো,  
 “কিন্তু চিয়েন চাং যদি তোমাদের মতো এত খুশি মনে যেতে পারতো,  
 আমার হুংখ করার কিছু থাকতো না। সে কিন্তু অনেক হুংখ নিয়ে  
 এদেশ ছেড়ে গেল।”

মিনি আর স্ত্রী চাং চুপ করে বসে বসে।

জেনী আন্তে আন্তে বলে গেল, “বে যেখানে খুশি যাও, আমি  
 কিন্তু কলকাতা ছেড়ে এক পাও নড়ছি না। এদেশে শেষ পর্যন্ত  
 আমি আছি আর বুড়ো ওয়াং আছে।”

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, “তোমার বোন মিনি  
 যদি আহ-কিমকে বিয়ে করে চীনে ফিরে যায়, ওদের সঙ্গে তোমার  
 বাবাকেও পাঠিয়ে দিতে পারো।”

“কেন?”

“স্ত্রী চাংও এখানে থাকবে না, তুমি আর আমি মিলে বে  
 সসার পাতবো সেটা চায়না টাউনে নিশ্চয়ই নয়—বুড়ো ওয়াং-এর  
 কি এখানে একা-একা ভালো লাগবে?”

ওনে জেনী একটু দাঁত মেসেছিলো, বলেছিলো, “বাবা কলকাতা  
 ছেড়ে নড়বে না।”

“কেন?”

“সে অনেক কথা। ফেং-হং-মিং এর নাম ওনেছো?”

“ফেং হং মিং? হ্যাঁ আহ-ওং একদিন বলেছিলো কিছু কিছু।  
 এককালে তো সে ছিলো চায়না টাউনের রাজা—।”

“হ্যাঁ। সে-ই প্রথম বাবাকে কলকাতার নিয়ে আসে। সে  
 আঠারোশো ছিয়ানকুই সালের কথা।”

বুড়ো ওয়াং জন্মেছিলো ফুকিয়েনে, তাদের পৈত্রিক ধামার  
 বাড়িতে। সে সময় তাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, কিন্তু  
 সে একটু বুড়ো হতে না হতেই বাপ মারা গেল, খুড়োরা  
 ‘জমাজমি’ বা ছিলো হাত করে বাড়ি থেকে বার করে দিলো  
 ওয়াংকে।

ফেং-হং-মিং যখন ওয়াংকে প্রথম দেখলো তখন তার বয়স  
 কুড়ি কি একুশ। হাংকাওর কুখ্যাত পাড়ার গুণ্ডামি করে  
 বেড়ায়।

ফেং-হং-মিং-এর মাথার উপর তখনো চীন সরকার পুরস্কার ঘোষণা  
 করে নি। দক্ষিণ-চীন-সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে সে তখনো স্বচ্ছন্দ  
 ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার জাক আছে কয়েকটি, সমুদ্রে  
 ডাকাতি করে বেড়ায়। খবরটা সরকারী ভাবে কারো জানা নেই,  
 এমন জানে সবাই। তাই ভয় করে, সমীহ করে ফেং-হং-মিংকে।  
 সিঙ্গাপুর, রেজুন, কলকাতার চায়না টাউনগুলোতে তার অপ্রতিহত  
 প্রতাপ, বিশেষ করে কলকাতায়।

হাংকাও-এর এক জুয়ার আড্ডার ওয়াং ফেং-হং-মিং-এর এক  
 অনুচরকে ধরে ঠ্যাঙালো। অন্ত লোকদের হাতে হয়তো তক্ষুণি ছুরি  
 খেতো ওয়াং, কিন্তু সেদিন ফেং-হং-মিং স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলো  
 বলে সে বেঁচে গেল। সেই বাঁচিয়ে দিলো তাকে, কারণ একটু অবাক  
 হয়েছিলো সে। ফেং-হং-মিং-এর অনুচরকে ধরে ঠ্যাঙার হাংকাওও  
 এমন সাহস কার? তাকে ডেকে হুঁচকার কথা জিজ্ঞেস করতেই  
 জানলো সে ফুকিয়েনের ওয়াং।

ফেং-হং-মিং চিনতো অন্ত এক ওয়াংকে।

জিজ্ঞেস করলো, “অমুক ওয়াং তোমার কে হয়?”

“আমার বাবা।”

“তোমার বাবা?” অবাক হলো ফেং-হং-মিং। তার মানে  
 স্ত্রী-লি তোমার মা?

“হ্যাঁ।”

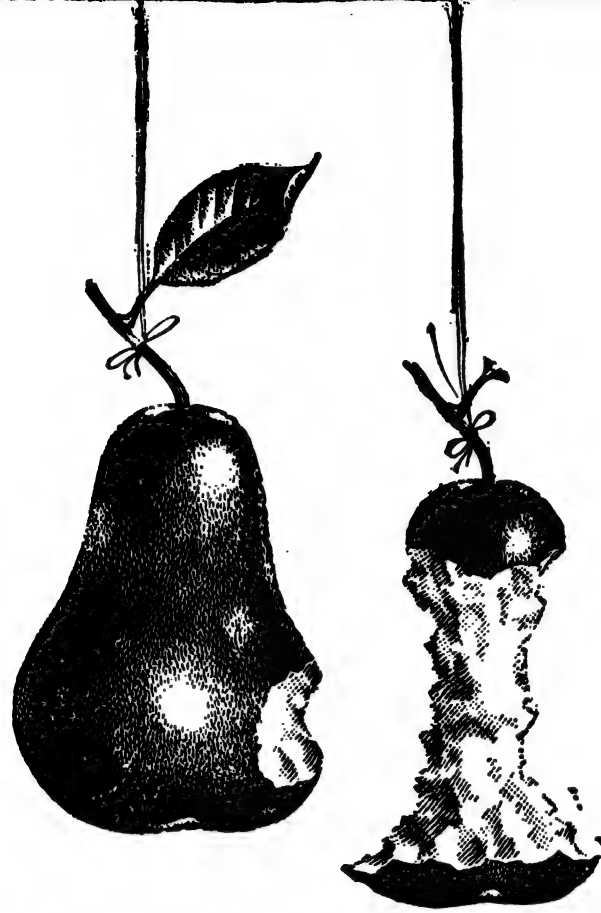
“আরে এতক্ষণ বলা নি কেন? তুমি জানো স্ত্রী-লি’র বোন  
 তাই-লি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী?”

“হ্যাঁ—।”

“তবে চুপ করে আছো কেন? তুমি আমার নিকট-আত্মীয়।”

“আমার আরো নিকট-আত্মীয় আমার কাকারা,” ওয়াং উত্তর  
 দিলো, “ওদের কাছ থেকে বা ব্যবহার পেয়েছি, তার পর থেকে  
 আমি আত্মীয় দেখলে ভয় পাই।”

ফেং-হং-মিং তাকিয়ে দেখলো ওয়াং-এর দিকে। তারপর হো  
 হো করে হেসে ফেললো।



## দেখে পরখ-আর দেখে পরখ...

অনেক জিনিষ আছে যা বাইরে থেকে দেখে পরখ করতে গেলে ঠিকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন ফল। বাইরে থেকে দেখে মনে হোল বেশ সরেস, কাটার পর দেখা গেল ভেতরে পোকায় খাওয়া। সেই ক্ষেত্রে ফল কেনার সময় দেখে পরখ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সাবান বা অস্ত্রান্ত মোড়কের জিনিষ পরখ করা যার কি করে? এর একটি নিশ্চিত উপায় বুদ্ধিমান দোকানদারদের জানা আছে— তাঁরা দেখেন জিনিষটির নামটি পুরোপুরি বিবাস-যোগ্য কিনা এবং সেটি এমন মার্কার জিনিষ কিনা যা তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রায় ৭০ বছর ধরে জনসাধারণ হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থা বাস্তব কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই জিনিষগুলির গুণাগুণের কোন তারতম্য হয়নি। এই জিনিষগুলির ওপর তাঁদের আস্থার আর একটি কারণ, এগুলি বাজারে ছাড়বার আগে আমরা পরখ করে তবেই ছাড়ি।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী আমাদের সব জিনিষের ওপর—কাঁচা

মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত, আমরা পরীক্ষা চালাই। এ ধরনের পরীক্ষা চলে প্রতি সপ্তাহে সংখ্যায় ১২০০। আমরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিই যে এ জিনিষগুলি সব রকম আবহাওয়াতেই চালান এবং মজুদ করা যাবে। আমাদের পরীক্ষাগারে 'কৃত্রিম আবহাওয়া' সৃষ্টি করে আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন আবহাওয়াতে এ জিনিষগুলি কেমন থাকে। আপনারা বাড়িতে এ জিনিষগুলি যে রকম ব্যবহার করে পরখ করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে এইগুলি পরখ করে দেখে নিই। আমাদের তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—লাইফবর সাবান, ডালডা বনস্পতি, গিবস, এস আর টুথপেস্ট অর্থাৎ সবগুলিই আপনাদের পরিচিত জিনিষ। এই জিনিষগুলির এত সুনাম কারণ এই জিনিষগুলি বিবাস-যোগ্য। কঠিন পরীক্ষা চালানোর পর বাজারে ছাড়ি হয় বলেই এগুলি সর্ব-সাধারণের এত বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।



## দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 5-X52 BG

বললো, “দেখ বৎস, হাতের সব আঙ্গুল সমান নয়, উইলো গাছের সব পাতা সমান নয়, তেমনি সব মানুষ সমান নয়। আমি যে তোমার সত্যিকারের হিতৈষী আত্মীয় সেটা বুঝবার সুযোগ দিতে রাজী আছি তোমার। তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে ?

...ওয়াং ফেং-হুং-মিং’এর সঙ্গে কলকাতায় চলে এলো। সেটা আঠারো শো ছিয়ানকুই সালে, তার বয়স তখন কুড়ি।

সেই অল্প বয়েসেই সে ফেং-হুং-মিং-এর ডান হাত হয়ে উঠলো।

আপিং কোকেনের চোরা ব্যবসা, ডাকাতি গুণ্ডামি রাহাজানি, এমন কোনো কুকাঙ্ক্ষ নেই বা ওয়াং করতো না।

এই পর্বস্ত বলে জেনী খামলো। তাকালো দিলীপের মুখের দিকে। তারপর বললো, “দিলীপ, এই আমার বাবার আসল পরিচয়।”

দিলীপ জেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সহজ হাসি হাসলো।

“এসব অনেক দিন আগেকার কথা,” জেনী বলে গেল, “অনেকেরই মনে নেই, আমরাও আর কাউকে বলি না। কিন্তু আমার মনে হোলো তোমার বলা দরকার। তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও, সুতরাং আমরা কি, সে কথা তোমার ভালো ভাবেই জেনে নেওয়া দরকার। একথা শুনে তুমি যদি তোমার মত পাল্টে ফেল, ‘আমি একটুও হুমখিত হবো না।’

দিলীপ হাসলো। বললো, “জেনী, পঞ্চাশ বছর আগে তোমার বাবা কি ছিলেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি জানি বুড়ো ওয়াকে, সে খুব ভালো লোক। আমি জানি হুইং মেয়ে জেনীকে, সেও খুব ভালো।”

জেনীর ছোটো ছোটো চোখ দুটো জলে ভরে এলো, মাথা নিচু করলো সে।

“তারপর ?” জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

“আমাদের সখ্যকে আরো কিছু জানতে চাও বুঝি ?”

“না, না, সে ভাবে আমি কিছু জানতে চাই না,” দিলীপ বললো, “আমার গল্প শুনে ভালো লাগে। বিশেষ করে এ ধরনের রোমাঞ্চকর গল্প। তোমার বাবা কলকাতায় এসে ফেং-হুং-মিং’এর ডান হাত হয়ে উঠলেন। তারপর ?”

ফেং-হুং-মিং-কে যদি বলা হয় চায়না টাউনের রাজা, বিবি আমেলিয়ার মেয়ে রেবেকা বিবিকে বলা যেতো চায়না টাউনের রাণী। রুপের জৌলীস তার বিবি আমেলিয়ার মতোই। তার খ্যাতি কলকাতার নানাজাতের অভিজাত মধুকরদের মধ্যে বিস্তৃত। বিবি আমেলিয়া লেনে রেবেকা বিবির বৈঠকখানায় পায়ে ধুলো দিতো না, এমন রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার পাওয়া যেতো না সে-সময়।

সে-সময় আশেপাশে অনেক বাড়ি ছিলো তার নিজেরই, তাতে থাকতো শুধু নানা রকম মেয়ে, বাদের খুঁজে-পেতে নিরে আসতো, অনেক সময় অনেক মেয়ে নিরে আসতো ফেং-হুং-মিং’এর দল, নিরে আসতো

বাংলার বাইরে থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে। আর এসবকে কেন্দ্র করেই রেবেকা বিবি আর ফেং-হুং-মিং’এর মানা রকম অসামাজিক, অনৈতিক, বেআইনী ব্যবসা। কিন্তু কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস করতো না। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ চুকতো না এ অঞ্চলে। এরাই ছিলো এ অঞ্চলের আইন। আর রেবেকা বিবির পৃষ্ঠপোষক ছিলো অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ। পরে বঙ্গার যুদ্ধের সময় ফেং-হুং-মিং ইংরেজদের সাহায্য করেছিলো বলে তাকেও বাঁচাতো না ইংরেজ সরকার।

এদের মধ্যে এসে ওয়াং বেশ ভালোই ছিলো। অভাব নেই, দুর্ভাবনা নেই। এ অঞ্চলের এক জুতো ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে সে সসারও পেতেছিলো।

উনিশ শো চব্বিশে তার ছেলে চিয়েন চাং’এর জন্ম হোলো।

তার পরের বছরে ওয়াং-এর জীবনের একটি নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হোলো।

ওয়াং ফেং-হুং-মিং’এর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলো আঠারো শো ছিয়ানকুই সালে। তার বছর দু’য়েক পরে ফেং-হুং-মিং’এর ওরসে রেবেকা-বিবির একটি মেয়ে হোলো।

মেয়েটিকে চোখের সামনেই বড়ো হতে দেখেছে ওয়াং। মেয়েটির বারো বছর বয়স হতে না হতে রেবেকা-বিবি তাকে লক্ষ্যে পাঠিয়ে দিলো নিজের এক আত্মীয়র কাছে।

ওয়াং শুনলো যে রেবেকা-বিবি মেয়েকে এ রকম পরিবেশের মধ্যে রাখতে চায় না। তাই তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সে পড়া-শুনো করবে, গান-বাজনা শিখবে—বিশেষ করে গানে তার ভীষণ ঝোঁক।

রেবেকা-বিবি প্রায়ই লক্ষ্যে গিয়ে মেয়ের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে আসতো। আর মাঝে মাঝে যেতো ফেং-হুং-মিং।

তারপর মেয়েটিকে ওয়াং অনেক দিন দেখেনি। কি তার নাম তাও জানতো না।

ফেং-হুং-মিং উনিশ শো বিশ সালে একবার কুমালারামপুর কি একটা কাজের উপলক্ষে গিয়েছিল, সেখান থেকে আর ফিরলো না। একদিন সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো এক কুখ্যাত অঞ্চলের রাস্তার ধারে। কারা তাকে গুলী করে মেরে ফেলে রেখেছিলো।

তারপর রেবেকা-বিবিও আর কলকাতায় থাকে নি। সে চলে গেল লক্ষ্যে মেয়ের কাছে। এখানকার বা কিছু দেখাশোনা করবার সবই করতো ওয়াং।

বছর পাঁচেক পরে, চিয়েন চাং-এর বখন আট ন’মাস বয়স রেবেকা-বিবি কলকাতায় ফিরে এলো। তখন তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেয়েকেও। সেই বারো বছরের মেয়ের তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বয়স। আঙনের মতো রূপ। আর অদ্ভুত গানের গলা। নামও নিয়েছে নতুন ঝাঁচের—জুলেখা বাঈ।

রেবেকা-বিবি ওয়াকে ডাকিয়ে এনে বললো, “এবার তোমার একে দেখাশোনা করতে হবে।”

[ ক্রমশঃ ।



\*\*  
 ଭୋଜନଶାଳା, ବିଭବଶାଳା ଓ ଘାଟିଶାଳା  
 \*\*



জিনি গোল্ড ডুয়েলারী স্পোর্টস



१७९ मि, १७९ मि/१, ४२ बाडाहू इलाहाबाद, मल्लि २२

কোন ৩৪-১৭৬১-গ্রাম-খিলিমান্ডা

ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি - রাস্তাবিশারী এডিনিউ

**ବଳିବ୍ରାତା-୨୯ • ମୋନ : ୫୬-୫୫୬୬**

## ব্রাহ্ম - ডায়মন্ডপুর

থোন : ডাহাশোদপুর - ৮৫৮

শ্রী. অমল প্রসাদ মিস্ত্রী ১২৪. ১২৪/১ বঙ্গবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-১২ (কলকাতা) (খালী থাকে)



নীলকণ্ঠ

সাতাশ

প্রথম দিন ত্যাগি থেকে ফিরে মঞ্জরী মনে মনে হিসেব করল।

টাকার নয় ; কাজের ! আসল কিংবে অভিনয়ের চেয়ে, বা তাকে ভালো করতে হবে, তা হল ডিরেক্টর আর প্রোডিউসরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। সেটা মঞ্জরী পারবে।

বড় পরিচালকের ধন্য দিতে হবে এখন থেকেই। প্রথম ত্যাগি এর দিনে তার চেয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ হয়েছে ; সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোকের সঙ্গে ; শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। শ্রীকৃষ্ণ নত তার কিগারের প্রশংসা করে বলেছেন তালিম দেওয়া দরকার। তালিম দেবার জন্তে মঞ্জরী একদিন তাকে আসতে বলেছে। আরেকটি কাজ আছে পরন্তু। প্রথমদিন প্রোডিউসার আসতে পারে নি। পরবর্ত্তদিন আসবে। তার সঙ্গে গাড়ীতে বেরবে মঞ্জরী চা খেতে।

সেই পরন্তু এলো আজ এই মাত্র। অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। আধ অন্ধকার। লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে, যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্দে তবুও দুঃসময় নয় আজ ; ভাগ্যের মই বেয়ে জীবনে সাফল্যের চূড়োর উঠবার প্রথম ধাপে আজ পা দেবে মঞ্জরী। তার প্রথম পা এগিয়ে দেবে। আজ মঞ্জরীর সুসময়।

রাখালবাবুর গাড়ী এলো বলে। প্রোডিউসার বসে থাকবে রতনচাঁদের একটা ফ্লাটে তার জন্তে ; প্রোডিউসারকে মেজাজে রাখতে পারলে একশো পঁচাত্তর টাকা মাইনের চালিয়ে নিতে আটকাবে না একটুও।

চাষি দিয়ে আলমারী খুলে বিলিতি পাউডারের একটি মাত্র সাককে রক্ষিত কেটোটা বায় করা মাজ্জই গাড়ীর হর্ণ এলো বানে।

হুই হাতে চালিয়ে সেরে নিলে অর্ধসমাপ্ত প্রসাধন, তারপর গাড়ীতে রাখাল দত্তের পাশে এসে উঠল মঞ্জরী। রাখাল দত্ত বেতে বেতে শুধু বললেন, এই তোমার চাল মঞ্জরী। গাড়ী এসে বেখানে থামলো সেটা একটি বিরাট বাড়ী। তারই দোতলার একটা ঘরে মঞ্জরীকে বসিয়ে রাখালবাবু ভেতরে গেলেন।

এই আমাদের নোতুন হিরোইন মঞ্জরী। পর্দা ঠেলে রাখাল দত্ত যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে মঞ্জরী যতটা থমকালো, এই মুহূর্ত্তে এখানে বাজ পড়লেও সে হতবিহ্বল হত না অত বেশি। কিন্তু যাকে দেখে মড়ার মত সাদা হয়ে গেল মঞ্জরীর মুখ মুহূর্ত্তের জন্তে, সে কিন্তু একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

মিষ্টি হেসে প্রোডিউসার রতনচাঁদ শুধু বলল : নমস্কার মঞ্জরী দেবী !

প্রথম যে কথা মঞ্জরীর মনে হলো তা আর কিছু নয় শুধু এই : রতনচাঁদকে চোঁবাচায় ফেলে দেওয়ার শোধ এবার সে নেবে। কিন্তু রতনচাঁদ ভয়লোক। রতনচাঁদ ব্যবসাদার। সে ওসব কিছুই করলে না। শুধু বললে : তারপর দিদির কি খবর ? কেঁপে উঠলো মঞ্জরী দেবী মনে মনে ; মুখে বললে, ভালো নয়। কেনো ? রতনচাঁদ তাহলে অবাক হতে জানে। কেন, তাও জানেন না। মঞ্জরীর আন্তে আন্তে সাহস বাড়ছে। ওঃ ওসব বাত ছেড়ে দাও মঞ্জরী, ও তোমার দিদি ভুলেই গেছে। আবার হামিও ভুলে যাবো। নাও চা খাও দেখি এখন। চা দিয়ে গেল বেয়ারা। এদিকে এসে বোস না। চা খেতে খেতে শুনলো মঞ্জরী। কিন্তু মঞ্জরী গেলো না ; বরং রতনচাঁদ এসে বোসলো। বসেই বাড়ীর কথা শুধাতে লাগলো ; কোথায় থাকে মঞ্জরী, কে কে আছে তার। কটা ঘর নিয়ে থাকে সে, প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিল বটে মঞ্জরী, তারপরই বুঝলে। রতনচাঁদ আরেকটা চোঁবাকুঁড়ি খুঁজছে ; মালপত্তর সরিয়ে রাখবার জন্তে। মঞ্জরী হাসলো। চোর জানে না সে গাঁটকাটার জিন্মায় জিনিষ রাখতে চাইছে। রতনচাঁদ হাসলে। গাঁটকাটা ধরতে পারেনি যে চোরের নজর সব সময় বোঁচকার দিকেই। আঁটিটা যে মঞ্জরী ছাড়া আর কেউ সরাতে পারে না, বেলারাণীকে জোঁচোর বললেও, রতনচাঁদ জানে তা। চোর কে, রতনচাঁদ বেলারাণীর কথা মোটের ওনেই বুঝেছে ; কিন্তু তখনও মাথায় বড্ড গরম আর শরীর ছিলো সেই পরিমাণ ঠাণ্ড। ভাবনাকে কাজে গড়িয়ে নিতে একটু দেয়ী করেছিলো মাড়বার তনয় আর গাঁটকাটা এসেছিলো ঠিক তখনই। বহুৎ আচ্ছা বলেছিলো রতনচাঁদ নেপাথ্যের নায়িকাকে ; যেমন করে নাকি বলে ওঠে গান বিলাসী শ্রোতার বাণ্ডিল ওস্তাদ বখন তানের খেলা দেখায়। যেমন করে মঞ্জরী শক দিয়েছিলো বড় রতনচাঁদকে। 'খেলোয়াড় আছে', মনে মনে সেলাম করেছিলো রতনচাঁদ, কুনিশ করেছিলো অনেকবার। তবে ওস্তাদেরও ওস্তাদ আছে, ঠাকুরেরও ঠাকুর। স্নদে আসলে তুলে নেবে দাম, মান খোয়াবার খেসারৎ শুদ্ধ। কিন্তু এন্টুনি নয়। আগে মুরগীটা একটু মোটা হোক তার পর একদিন জুং মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা যাবে মনের আরামে, হাতের স্তখে।

রতনচাঁদ বাঁকী নামিয়ে দিয়ে গেল বখন তখন মঞ্জরীর বাড়ীর দরজায়, একটি কি দুটি মেয়ে তখনও, হতভাষ পথিক সে যে আমি বলবার অপেক্ষায় গাড়িয়ে। ওপরের ঘরে মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে বললে বেলারাণী : রাস কমেছিল। মঞ্জরী বললে না। রতনচাঁদের কি

খবর? মঞ্জরী এ প্রশ্ন কেন যে করলে, সে তা জানে না। রাগ পড়লেই আবার আসবে; রতনচাঁদ আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না। দিদি তাহলে এখনও নিশ্চিন্ত আছে। মঞ্জরী আর কিছু বললে না; কিন্তু বেলারাগী জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

গিয়েছিলাম কাজে, রাস্তায় দেখা হলু বাবুর সঙ্গে, দেবী করে দিলে। মঞ্জরী মিথ্যে কথা বলে, না ভেবেই। দুজনেই চুপ করে গেল হঠাৎ। মঞ্জরীর মা এসে বললেন, কি তোরা চুপচাপ বসে কেন, খা।

মঞ্জরীর কানে সে কথা গেল না। সে ভাবলে দিদিটা কিন্তু বোকা। বেলারাগীর কানে কোন কোন কথা গেল না। সে ভাবতে লাগল: মঞ্জরীটা কি মিছে কথা বলে আজকাল। হলু বাবু আজ দিন কয়েক হোল বেলারাগীর কাছে যেতে আরম্ভ করেছে; বেলারাগীকে হলু বাবু কালই বলেছে: না মঞ্জরীর যুগ সে এ জীবনে আর দেখবে না।

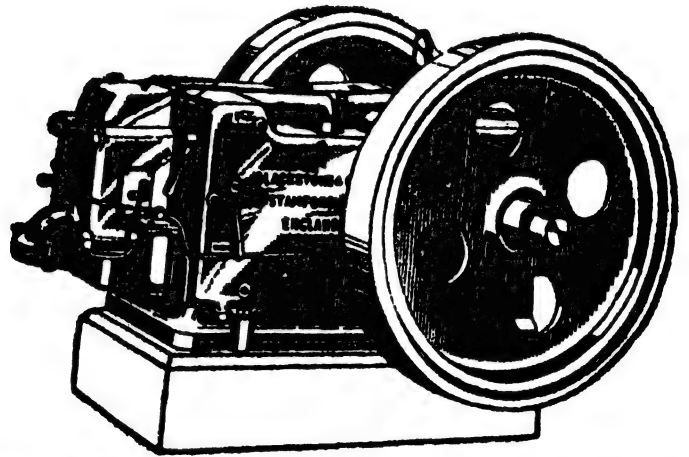
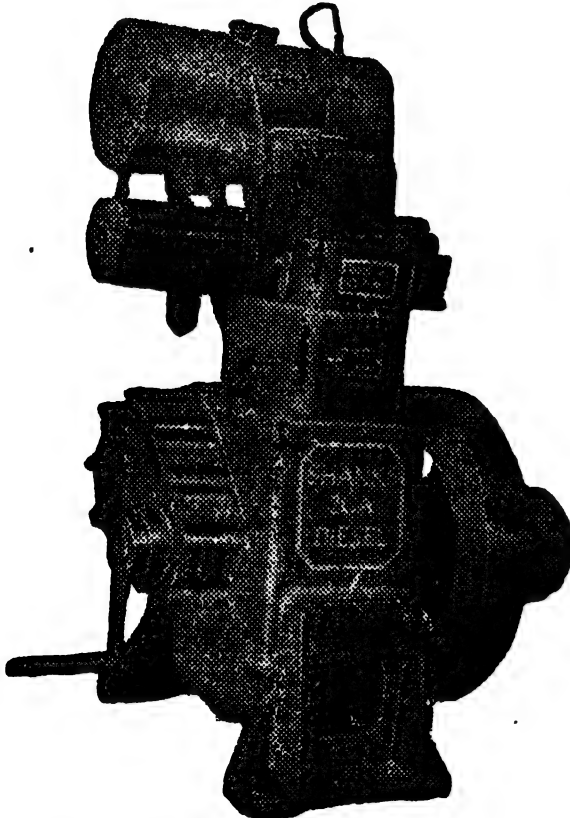
### আটাশ

প্রথম ছবি বাজারে বেরলো, সে-ছবি তেমন জুতের হলো না; কিন্তু সবাই একবাক্যে স্বীকার কোরল মঞ্জরী বলে এই নতুন মেয়েটার হবে। সেদিন যারা হালকা ভাবে বলেছিলো কথাটা তারা আজ সবাই আঙুল কামড়াচ্ছে; হলো ত' বটেই; তবে এতদূর হলো যে সেদিন যারা পিঠ চাপড়িয়েছিলো আজ তারা সবাই মঞ্জরীর কুপাপ্রার্থী; এতটা নিশ্চয়ই তারা চায় নি। এতটা হবে জানলে

তারা কিছুই চাইতো না; চাইতো আরম্ভেই মঞ্জরীকে দাবিয়ে দিতে; প্রথম দৃষ্টি হতো যবনিকা পতন!

প্রথম ছবি মুক্তি পাবার পর মঞ্জরী প্রশংসা পেলো বটে; কিন্তু কাজ পেলো না। কাগজে তার ছবি ছাপা হলো বটে; কিন্তু নতুন কোনও কণ্ট্রাইট সই হলো না; প্রশংসায় মন ভরে; মানুষের পেট ভরে না। মঞ্জরী শঙ্কিত হলো। ইতিমধ্যে সে উঠে এসেছে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ায়; মা আছে পুরানো বাড়ীতে। শুধু ছবির ওপর ভরসা করে এসেছে বললে মঞ্জরী মিথ্যে বলবে; কিন্তু শুধু লোকের ওপর নির্ভর করেও মঞ্জরী আর বসে নেই। সে লোক সাম্প্রতিক বড়লোক হলেও; ছবি তার চাই-ই। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে গরু-ছাগল-মেষ মাঝে বাঘের বা হয়, সমাজের সর্ব ঘৃণ্য স্তরের মেয়েমানুষ যখন ছবির নায়িকা হয় তখন তারও হয় তাই। বহু লোকের ডাক আসে তার জীবনে; এক লোকের কাছে আর বাঁধা থাকতে চায় না সে; আর এ-ডাক শুধু উপভোগের দুল আহ্বান নয়; এর পেছনে আছে মেয়েমানুষের দেহের অতীত, শিল্পীর অস্তিত্বের প্রতি অভিনন্দনের স্পর্শ। ছবিতে নামবার পরই মঞ্জরীর মনে হয়েছে, হয়ত দেহ-বেসামিতি তার নির্ভর নিয়তি নয়!

এরই মধ্যে প্রথম ছবির নায়ক এসেছে দুপুর বেলায় তার নতুন বাড়ীতে। এমন সময় দরজায় টুক-টুক করে আওয়াজ করেছে কে? এমন সময়ে কে হতে পারে? ধড়াস করে উঠেছে মঞ্জরীর বুক। দরজা খুলে থাকে দেখেছে তাকে দেখে অনেকক্ষণ কথা সরে নি মঞ্জরীর—



অর চাই, এ্যাপ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকার্য দেশের অর ও এ্যাপ এবং আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিটল, ব্রাকটোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিটল পাম্পিং সেট, অ্যান্ডস ডিজেল ইঞ্জিন, অ্যান্ডস পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্:—

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রিট, দিওল কলিকাতা—১

ফোন:—২২-৫২৭৫

বিঃদ্রঃ—টিব ইঞ্জিন, বয়লাস, ইলেক্ট্রিক মোটর, ভারবাহী, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

যুখে। তার দরজার দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত, বার একটা কথার crowd scene-এর মধ্যে হতে পারে লক্ষ-লক্ষ টাকার ছবির নায়িকা। মঞ্জরী চূপ করে গেলেও ভেতরে সে বসেছিলো, তার প্রথম ছবির নায়ক সে কিন্তু চূপ করে থাকে নি; চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছে শ্রীকৃষ্ণ দত্তকে? 'শ্র' না কি?

যাবড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত; লজ্জায় পড়েছেন। কিন্তু দুহুর্ভকাল মাত্র। অভিনেতা চরিত্রে তিনি এতকাল চলেছেন; অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করবার জন্তে তাঁর চেয়ে তৈরী কে? ভিতরে ঢুকে, নাকে ক্রমাল চাপা দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছেন; অল্প কিছু ভাববেন না; এ মেয়েটি বড় দুঃখী, আমার দেখে মনে হয়েছিলো, এর হবে। তাই, একটু তালিম-টালিম দিয়ে দিলে যদি উন্নতি করতে পারে, তারই জন্তে আসা।

উঠে পড়েছিলো ছবির নায়ক; যাবার আগে বলেছিলো: তাই দিন শ্র, তালিমই দিন, আমি এখন চলি।

'শ্র' শুধু তালিমই দিলেন না; 'শ্র' তহলোক; কাজও দিলেন। মস্ত বড়ো কাজ। উপনায়িকার। কিন্তু 'শ্র'-এর আশীর্বাদ পেলে নায়িকার চেয়ে উপনায়িকারই বাজি মারবার আসা বেশী; মঞ্জরী স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তর ছবির নাম কালিদাস। মঞ্জরী তাতে যে ভূমিকাটি পেলো সে হচ্ছে কালিদাসের inspiration অনুসূয়া। মঞ্জরীর অভিনেত্রী জীবনের সর্বোত্তম সুযোগ। সেই সুযোগ প্রায় নিজে থেকে পায়ে ধৌটে এল মঞ্জরীর দরজায়। এক এল আশ্চর্য ক্রম। সবাই অবাক হল। ঈর্ষান্বিত হল মঞ্জরীর সৌভাগ্যে। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করল না। এর আগেও বহুবার আনকোরা মেয়েকে প্রথম নিয়ে একটি ছবিতেই রাতারাতি তাকে ঠাঁর বানিয়ে তোলায় পরিচয় দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রথম নয়। মাটি থেকে মাত্র পাঁচটি আঙুলের সাহায্যে যেমন মূর্তি গড়ে তোলে কেঁঠনগরের পুতুল-শিল্পীরা। দেখে অবাক হতে হয়। ধরতে সময় নেয় অনেকক্ষণ, এ মাটির মূর্তি না প্রাণের পুতলী:

কিন্তু মঞ্জরী মাটি নয়; মেয়েমানুষ। যেমন তেমন মাটি থেকেই তেমন তেমন শিল্পী বানিয়ে তোলে মূর্তি। তাদের হাতে পুতুল থেকে জন্ম নেয় প্রতিমা। কিন্তু মানুষকে শিল্পী করতে শুধু শ্রষ্টারই সব দায়িত্ব যে, যার ভেতর থেকে নবজন্ম হবে শিল্পের তারও তাগিদ থাকা চাই সৃষ্টির। এবং সৃষ্টির এই বেদনা যে নিজের বুকে বয়ে বয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে পায় সুবিপুল আনন্দ সেই শিল্পী। এই বেদনার সঙ্গে কোনও যন্ত্রণারই তুলনা অসম্ভব। ক্রয়ক্রম দারিদ্র্য অথবা অগ্নিবর্ষ ক্রোধ এ দুয়েরই নিদাক্ষণ যন্ত্রণা। সৃষ্টির বেদনা? সে দুর্বহ। ধুবই। এ পৃথিবীতে একমাত্র মাতৃকের মহিমার বেদনার সঙ্গেই তার বা কিছু মিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বদুর্ভাগ্য পর্বন্ত মাতৃহৃদয়ের যে হাহাকার সেই হচ্ছে শিল্পীর ক্রন্দন। সৃষ্টি হচ্ছে শিল্পীর সন্তান। এবং সন্তান জন্মের পূর্ব প্রতিভারই প্রতিজ্ঞা,—আর নয়। এ যন্ত্রণা, এই বেদনা, এই হাহাকার, এই কান্না যেনে নেওড়া,—আর নয়। আর প্রতিভারই

প্রতিজ্ঞা ভগ্নেই প্রতিজ্ঞার—পূর্তি। শিল্পীরও তাই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় মুক্তি। কিন্তু মুক্তি নয়। আবার নবতর সৃষ্টির জন্য প্রস্তুতি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তর কাছে গিয়ে মঞ্জরীর সত্যি সত্যি নবজন্ম হল। আরেক পৃথিবীতে পৌঁছল মঞ্জরী। অভিনয়ের নতুন অর্থ সেখানে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, ফল হয়ে দেখা দেয়। সে পৃথিবীতে পদার্পণের আগে পর্বন্ত মঞ্জরীর মনে অভিনয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কলের পুতুলের মত কেবলমাত্র পুঁথির কথা প্রাণহীন আউড়ে বাওয়া। সে জানত এতেই বুঝি হয়। মাত্র এইটুকুই তার কাছে সবাই চায়। এবং তাই শক্ত মনে হয় নি অভিনেত্রী জীবন, অসম্ভব মনে হয় নি ফিল্মে প্লে করা। সেই স্বপ্নের ভূমি পায়ের তলা থেকে সরে গেল শ্রীকৃষ্ণ দত্তর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। দাঁড়ানো মাত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত হাসলেন। মঞ্জরীকে সেই হাসিই বলে দিল যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পর্বন্ত এখনও শেখেনি সে।

হাসলেন, কিন্তু ক্রকৃৎন করলেন না শ্রীকৃষ্ণ। বরং মঞ্জরী যে অভিনয় সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, এতে বরং খুসীই হলেন। দড়কচড়া মেয়ে বাওয়ার চেয়ে কাঁচাই ভালো। নরম মাটিকেই গড়ে পিটে নেওয়া যায়। শক্ত মাটি ভেঙ্গে তাকে আবার নরম করে নিয়ে গড়ায় মেহনত অনেক বেশী। মঞ্জরী পোষায় না। মঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মন্ত্র দিলেন। অভিনয়ের ইষ্টমন্ত্র।

সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে নবজন্ম হল মঞ্জরীর। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত বললেন, অভিনয়শিল্পী ব্যক্তিগত জীবনে কি, মহীয়সী মহিলা অথবা কলঙ্কিনী কুলটা সে প্রশ্ন মানুষের, জীবনদেবতার নয়। এমন কি শিল্পী পুরুষ না মহিলা, এ জিজ্ঞাসাও অবাস্তব। শিল্পীর কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, সেক্স নেই। সে শিল্পী,—এই তার একমাত্র পরিচয়। শিল্পী হিসেবে সে সার্থক কি না তাই হচ্ছে তার চরম বিচার। মানুষ হিসাবে সে কি তা নিয়ে বার মাথা ব্যথা তার নাম সমাজ, শিল্প নয়।

মঞ্জরীর ভয় ছিল সে অশিক্ষিত। তাকে অভয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। বললেন, লেখাপড়া করে লোকে পণ্ডিত হয়, শ্রষ্টা হয় না। পণ্ডিত হবার জন্ত চাই প্রতিজ্ঞা। শ্রষ্টা হবার জন্ত প্রতিভা। প্রতিজ্ঞা করতে হয়। প্রতিভা নিয়ে জন্মতে হয়। যারা সৃষ্টি করবার জন্ত জন্মায় তারা সৃষ্টি করেই খালাস। সেই সৃষ্টির অঙ্গে অর্থের আভরণ পরানোর জন্তই প্রয়োজন হয় পণ্ডিতের। সৃষ্টির জন্ত শিল্পী, ব্যাখ্যার জন্ত পণ্ডিত। এক জনের প্রেরণা রস, আরেকজনের বিচার। অভিনয় কেমন করে করতে হয় সে সম্বন্ধে যে বই লেখে সে সব জানে শুধু অভিনয় করতে জানে না। যে অভিনয় করে সে কেমন করে অভিনয় করে তা হয়ত জানে না কিন্তু অভিনয় সেই করে।

শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আরও বলেছিলেন। বলেছিলেন মঞ্জরী যখন অভিনয় করছে না টুডিঙর ফোরে তখনও সে অভিনয় করছে। জাগরণে এবং নিদ্রায়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যে অভিনয় করছে না সে নয় অভিনেত্রী। অভিনয় শুধু ধারণার নয়, ব্যানের বন্ধ। অজ্ঞানের চোখ থেকে যেমন সব সবে গিয়ে জেগেছিল শুধু পাখীর চোখটুকু তাঁর ছোঁড়ার মুহূর্তে তেমনি অভিনেত্রীকে শুধু জগত বিবৃত হলেই চলবে না, তাকে আত্মবিস্তৃতও হতে হবে।

আত্মবিশ্বস্তই হলো মঞ্জরী। অতীতবিশ্বস্ত হল সে। হুছে  
গেল ভবিষ্যৎ। বর্তমান বিশ্বস্ত হল, অস্তিত্ববিহীন। সত্তা বিসর্জিত।  
শুধু জেগে রইল অভিনীত চরিত্রের রূপকল্প। চলে গেল কালিদাসের  
কালে। উজ্জয়িনীর দ্বারপ্রান্তে উজ্জীবিত হল মঞ্জরী। সে যে  
পতিতা, সে যে পেটের দায়ে অভিনয় করতে এসেছে তা ভুলে যেতে  
তার না হল ভয়, না হল দেবী। শুধু তাই নয়। খ্যাতি, অর্থ,

নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা কিছুই কথা রইল না তার মনে। মনে রইল না  
সে মঞ্জরী। মনে হল না শুধু, প্রত্যয় হল সে অনন্য। পৃথিবীর  
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবির প্রেরণা। মঞ্জরী নয়। কালিদাসের সে  
কবিতা। গানের, আলোর, আনন্দের প্রতীকিত মঞ্জরী! ধন্য হল।  
কৃতকৃতার্থ হল। সার্থক হল।

[ক্রমশঃ]

## একটি গ্রীসীয় পাত্রে প্রশান্তি

জন কীটস্

[ John Keats-এর Ode on a Grecian Urn কবিতার অনুবাদ ]

আজ্ঞো তুমি নিরুদ্বেগ বিশ্রামের বধু—অচুম্বিতা,  
স্বকল্প ও বিলম্বিত সময়ের পালিত সন্তান,  
জানো প্রাম্য জীবনের ইতিবৃত্ত, পুষ্পিত কথার, শুচিস্মিতা,  
ব্যাখ্যা করো, আমাদের কবিতার চেয়ে বার মিষ্টতর মান :  
তোমার আকৃতি ঘিরে পড়লো এ কাহিনী কার !  
দেবতার, অথবা কি মানুষের, কিংবা উভয়ের,  
সুন্দরী টেম্পীতে কিংবা আর্কেডীয় উপত্যকার ?  
এ কোন মানুষ এরা অথবা দেবতা ? কুমারীরা অনিচ্ছুক ? আর  
কী উদ্দাম পশ্চাৎদান ? কী প্রচেষ্টা এ-পলায়নের ?  
কেমন বাঁশি ও একতার বাজে ? কী তীব্রতা আনন্দ-বস্ত্রায় ?

শ্রুত সঙ্গীতের লয় মধুর, কিন্তু বা শ্রুত নয়  
আরো স্রমধুর : তবে কোমল বাঁশির বেজে যাও ;  
কানের তৃপ্তিতে নয়, অনুভবে আরো প্রেমময়  
শব্দহীন গান গেয়ে আত্মকে জাগাও  
তরুণতলে স্রমের যুবক, ছেড়ে দিতে পারো না তুমি তো  
তোমার সঙ্গীত, ওই গাছেরাও নয় হবে না তো কোনো দিন ;  
কখনো পাবে না তুমি চুম্বনের সুযোগ তো সাহসী প্রণয়ী,  
যদিও জয়ের কাছাকাছি—তবু, হয়ো না হুঃখিত ;  
বিবর্ণ হবে না সে তো, যদিও তোমার ভাগ্য রয়ে যাবে দীন,  
তুমি চিরকাল প্রেম দিয়ে যাবে, আর সেও হবে রূপময়ী।

আহা সুখী, সুখী সেই শাখাযাও ! বাদের পাতারা  
ঝরে না, এবং বারো কোনো দিন বসন্তকে দেয় না বিদায় ;  
আর সুখী সঙ্গত-নায়ক ক্লাস্তিহারা,  
চিরদিন বাঁশি বার নূতন-নূতন গান গায় ;  
আরো সুখী সে প্রেমিক ! আরো কী সুখের প্রেম তার !  
বা চির সতেজ উষ্ণ চির তৃষ্ণনের,  
অনন্ত আগ্রহ নিয়ে যা হবে অন্তান ;  
বহুউর্ষে মানুষের সেই কামনার—  
বা আনে সুতীত হুঃখ তৃপ্তি-ক্লাস্তি ডের,  
উত্তপ্ত ললাট আর বিস্তৃত রসনা—অবদান।

বলি উপহার দিতে কারা এরা আসে ?  
পল্লব-আচ্ছত কোন বেরোতে হে তুমি পুরোধার,  
নিরে চলো গো-বৎসারে, সে কালো তুলেছে নীলাকাশে,  
বেশম-মহুণ দেহপার্শ্ব মাগ্যে বিভূষিত তার ?  
কোন ক্ষুদ্র নগর—নদীর তীরে অথবা কি সাগর কিনারে,  
অথবা পর্বতশীর্ষে নির্মিত শাস্তির দুর্গ নিয়ে,  
আজ এই জনতার থেকে রিস্ত এমন পবিত্র এই ভোরে ?  
আর ক্ষুদ্র হে শহর, তোমার সরণিগুলি হবে একেবারে  
নিষ্কল, এবং কেউ বলবে না ঘরে ফিরে গিয়ে  
কেন তুমি জনহীন, বাঁধা কোন নিয়মের ডোরে।

গ্রীসীয় গঠন ! আহা স্রমের আকৃতি ! সূচিস্রবণ  
মর্মের মানব-মানবী সুসজ্জিত,  
আরণ্য শাখার, আর পায়ের তলার স্রম বন ;  
স্বকল্প তুমি করো ভাস্ত আমাদের—আকুল চিন্তার নিমজ্জিত  
অনাদি অনন্তকাল যেমন বিভাস্ত করে ; শাস্ত প্রাম্যকথা !  
পুরাতন যুগ এই-বংশ ধ্বংস করে দিলে কত  
তখনো থাকবে তুমি অংশীদার আরেক হুঃখিত জনতার।  
মানুষের বন্ধু হয়ে, বাদের বলবে তুমি তবু  
“সৌন্দর্যই সত্য, আর সত্যই সৌন্দর্য”—নিশ্চয়তা  
এ সবই বা জানো এ পৃথিবীতে, এবং বা তোমার জানার।

অনুবাদ—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়



# মিসেস ডায়ার্স

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

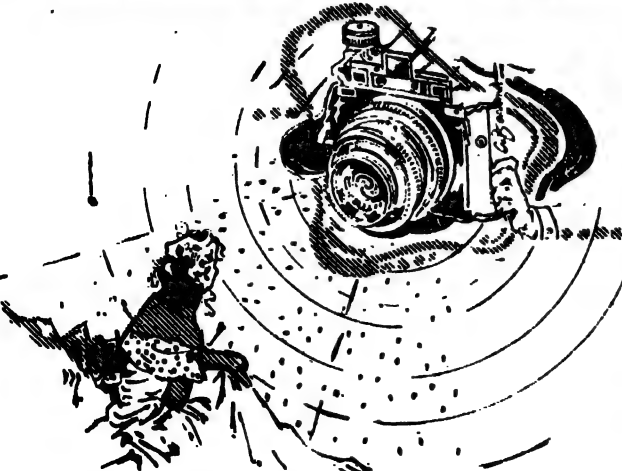
মিসেস ডায়ার্স জাতে হাঙ্গেরীয়ান কিন্তু আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করে এখন আবার বাস করতে এসেছে এডিনবরায়। শিল্পী—ছবি আঁকে ভালই। এডিনবরায় প্রথম যখন বাই তখনই আলাপ হয় নেলসেন মহুমেন্টের নীচে। একটু আলো পেতেই ক্যামেরা খুলে ছবি তুলেছিলাম—ক্যামেরার মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে তার দেহবল্লরী। মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কি বেন আঁকছে। আমি কোত্থলের বশে এগিয়ে বাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—ভারী সুন্দর। তুলির টানে ধরা পড়েছে। পেছন ফিরে তাকায় ডায়ার্স। নিজে থেকেই আলাপ শুরু করে হাসতে হাসতে। বোধ হয় বিদেশিনী, তাই সন্ধাচের বালাই নেই।

সুনেছি, বাঘাবর জীবন নিয়েই পথ চলেছে মিসেস ডায়ার্স। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই বিশেষ নেই। থাকার মধ্যে আছে প্রচুর অর্থ আর শিল্পী হবার অদম্য স্মৃধা। বিয়ে হয়েছিল ফিলেডেলফিয়ায়, কিন্তু হনিয়ুন থেকেই পালিয়ে আসে মিঃ ডায়ার্সের কুৎসিত আকাঙ্ক্ষার ভয় এড়াতে। সুদীর্ঘ দশ বছর চলে গেছে। পত্রালাপ পর্যন্ত নেই—বিবাহ বিচ্ছেদও হয়নি। মিঃ ডায়ার্স যে অনুরক্ত জীবনের মধ্য দিয়ে পাথের সংগ্রহ করে চলেছে—সে খবরও অজানা নেই। কিন্তু সৌন্দর্য্য-সন্ধানী চোখ তার আকাশের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আছে—নীচের ভাব বিনিময়ের শেষে তার ভিত্তিতে ভালবাসার সোপান গড়ার আশায়।

বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁচু কিং আর্থার সীটটা চোখে পড়ে। ঘরের মধ্যে ছবির পর ছবি—অচেতনকে চেতনা দেবার আশ্রয় প্রচেষ্টা।

মিসেস ডায়ার্স প্রশ্ন করে—তুমি কি সব কিছু মনে করতে পার ?

তাকিয়েছিলাম তারই আঁকা এক ছবির দিকে। অর্থ হ্রবোধ্য।



এক নয়মূর্ত্তির ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এক টুকরো মেঘ—বিরাট আকার ধারণ করার প্রয়াস। দূরে এক ছোট পাখী উড়ে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। পায়ের কাছে হুই কুকুরে এক টুকরো হাড় নিয়ে খেলা করছে।

প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরাই। উত্তর দিই—পারি যেটা মনে রাখতে চাই।

—আর ভুলে যাওয়ার ব্যাপার ?

—ঠিক তাই যেটা ভুলে যেতে চাই সেটাই ভুলে যাই।

—মাহুঘের বেলাতেও।

—সেটা তো আরও সহজ।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু সেই সহজ ব্যাপারটাকে এত বছরেও আয়ত্ত করে উঠতে পারলাম না। অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে দোর জানালা বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে থাকব। না থাকলে কোন শব্দ—না কোন কোলাহল। দেখব তার মধ্যে কি সৌন্দর্য্য আছে।

কথার মোড় ফিরিয়ে দিই অল্প কথায়।

—এখানে কত দিন আছ ?

—তারিখ নিয়ে চলার অভ্যাস নেই তবে মোটামুটি এক বছর।

—যে আশা নিয়ে এসেছিলে তা নিশ্চয়ই মিটেছে ?

—তোমার কি মনে হয়।

—আমার মনে হয় এডিনবরা তোমায় নিরাশ করেনি।

—এক মুহূর্ত্তের জন্তও নয়। এমন কি জেনারেল পোষ্টাকিসের সামনে নিলজ্জ মাংসলোলুপ মাহুঘ আর সেই সঙ্গে মেয়েদের ব্যবসার দরাদরীর দৃষ্টও নয়। জান আমি ভালবাসি—বিচ্ছিন্ন জীবন, আঁকাবাঁকা কাঁটা ভরা পথ, লাল মেঘ, শীতের ঝড়।

পুরান দিনের এক ঘটনার কথা বলে।

নিউঅ্যাংলিন্ডে থাকার সময় ঘটে।

সমুদ্রের ধারে ছবি আঁকতে আঁকতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। তবু ওঠার ইচ্ছা ছিল না। স্বপ্নালোকেই তুলি বুকে নিয়ে শুয়েছিল বালির ওপর। পরনে ছিল স্বচ্ছ এক সাধারণ পোষাক—শুধু সভ্যতার আইনকে কঁাকী দেওয়ার জন্ত।

পাশে একজন এসে দাঁড়ায়—

সিগারেটের আগুন শেষ হয়ে গিয়েছিল—তাই খোঁজ করছিল কাঠির।

দিশাললাই তুলে দেয় তার হাতে...

হাত চেপে ধরে—আগন্তকের হাতের চাপে কিসের বেন মাদকতা।

এ যে সেই চিরন্তন ইঙ্গিত।

মিসেস ডায়ার্স হাসতে হাসতে বলে—থাক আর পতঙ্গটা শক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে না। আনন্দ তাতে বড় একক হয়ে পড়ে।

লোকটার চলার পথে থমক এনে দেয় কথার চাবুক।

—আনন্দের ভাগী আমাদেরও করে নাও।

এ রকম অভ্যর্থনা লোকটার জীবনে কোন দিনই আসেনি—সাহস তাই নিবে এসেছিল এর পর। চারিদিকে আর কেউ নেই—সাড়াশব্দও মেলে না। ডায়ার্স অগ্রসর হয়—অথচ তখন কুমারী...

সেই কঠিন বালুর বুকেই শোণিতপাত হয়—

ধন্যবাদ দেয় চুবনের ছোঁয়ার...

নারী বলে—ধন্যবাদ তো আমারই দেওয়া উচিত। বিনা আমন্ত্রণেই এই সুখী করার জন্ত।

সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়।

উত্তর আসে—না, মনের আনন্দ এখনও এ জায়গাটাকে ঘিরে আছে। এর মধ্যে এখান থেকে বাবার ইচ্ছা নেই।

চলে যায় সে—বাবার আগে হাতে গুঁজে দিতে চায় অপমানের চিহ্ন, ভলায়ের কাগজ।

গ্রহণ করে না। শুধু বলে—যদি মনে রাখতে চাও তবু খোঁজ রেখ। মাতৃ পালন করার সময় আমার নেই। তখন দিও তোমারই আনা প্রাণকে।

কাহিনীর শেষে মিসেস ডায়ার্স উঠে টেবিলের ধারে যায়।

বলে—সাধারণ লোকের ধারণা, জীবনে সুখ শান্তি পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমি তা বিশ্বাস করি না। এটা অবশ্য সত্য যে সুখ জিনিষটা ত্বনকো কাচের খেলনার মত, যেটা নিয়ে খেলা করে পুরুষ-নারী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। হৃৎজনের দৃষ্টি যদি একই দিকে না থাকে বা হৃৎজনের আকর্ষণ যদি সমান না হয় তবে সেটা কোন অসতর্ক মুহূর্তে নীচে পড়ে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে। তাই বলে ভাগ্যের ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে সুখ আর আসবেই না কোন দিন। অত্যাঁহ অনাচার বাই বলুক অস্ত্রেরা, সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকলে পথ চলতে হবে ঠিক মাতালের মত। মাতাল হবার আনন্দই যে একেবারে আলাদা। এত উগ্র ভাবে পরিস্ফুট হয় সব কিছু সে অনেক সময় অনুভব করার শক্তি পর্যাপ্ত যায় হারিয়ে। স্বপ্ন সুখ মনকে তৃপ্ত তো করেই না বরং কুণ্ঠা বাড়ায়! আনন্দ রোজকার ব্যবহৃত জিনিষ নয়—আনন্দে এর তীব্রতা না থাকলে এই ব্যবধানকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আর সেজন্তই ভাগ্য অতৃপ্তিকে চাপা দিতে পারে না।

মিসেস ডায়ার্স-এর অনেক শিল্পই প্রকাশিত হয় পত্রিকা ও কাগজে। বেশ সুনামও আছে শিল্প-জগতে। তার গুণগ্রাহী দলের অভাব নেই। তারা বাধা মানে না—ভীড় করে প্রায়ই তার বাড়ীতে, যদিও তার দেখা পাওয়া ভার। অনেকেই আসে শিল্পীর সৌন্দর্য দেখতে তার বেশভূষার অসলয় ব্যবহারের কীক দিয়ে আর অনেক আসে শিল্পীর সত্যকার মর্যাদা দিতে। ভিন্ন পথ হলেও উইক্রেমে জায়গা দেওয়া যায় না। মাত্র দু-একজন নীচের তলা থেকে তার অঙ্কনশালায় প্রবেশের অনুমতি পায়। বাড়ীতে দেখা শোনার জন্ত আছে ডিক্-রোজ রাস্তে চলে যায় খাওয়া দাওয়ার পর।

সেদিনও চলে গেল যথাসময়ে। আমার গিয়ে বসি আগুনের ধারে। রেডিও অতি যত্নসহ গানের সুর শুনিতে চলে।

আমি প্রশ্ন করি—শিল্প সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

—শিল্প আমার মতে খামখেয়াল মাত্র। সমাজে এর কি দান সেটা তোমরাই জান বেশি—শিল্পী বহুক্ষেত্রেই সমাজের কথা ভেবে কিছু সৃষ্টি করে না। নগ্ন এক মেয়ের বিশেষ ভঙ্গীমা শিল্প হতে পারে কিন্তু সমাজের কথা ভাবলে কখনই সে শিল্প সৃষ্টি হত না। সমাজের নিয়মমাসিক চলাফেরা করা তার স্বভাব নয়। শিল্পী মাত্রই অনাচারী গোপনে গোপনে—কথাটা তোমাদের কিন্তু অসত্য নয় কিন্তু কেন জান? শিল্প শিল্পীর জীবনের একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে, স্বপ্ন দেখে সে শিল্পেরই নানান বর্ণ দিয়ে। যখন সে শিল্পের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসে, তা সে যত সামান্য সময়ের জন্তও হোক না, সে চায় সব পিপাসা মেটাতে। অথচ সাধারণ আনন্দ আর তৃপ্তি মেটাতে পারে না। আনন্দও তাই বহু ক্ষেত্রেই বিকৃত অথবা অসাধারণ হয়ে পড়ে। আনন্দের সময়টুকু সে কখনই সমাজের মধ্যে ব্যয় করতে চায় না।

নীচের দরজা থেকে কলিং বেলের আওয়াজ আমাদের টেনে আনে বাস্তবতার মাঝে। মিসেস ডায়ার্স চলে যায়। আমি চোখ বন্ধ করে তার কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।

মনে হয় কত যুগ পার হয়ে যায়—তবু তার দেখা নেই।

গুঁঠার কথা ভাবছি, কানে ভেসে আসে চীৎকার—

—আমি আজ থাকবই থাকব।

পরক্ষণেই মিসেস ডায়ার্স-এর অনুবোধ—তোমার কোন দিন তো ফেরাইনি, তবে আজ আমার কথা রাখবে না কেন?

—আমি এখানে আসি তোমার কথা রাখব বলে নয়।

—তবু।

—তুমি যাবে, না, তোমায় জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

অস্থির ভাবে উঠে পড়ি। এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি—আবার শুনতে পাই মিসেস ডায়ার্স এর কণ্ঠস্বর—তোমার সঙ্গে জোর করে আমি পারব না আর তুমি কোন কিছু বুঝবেও না। একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি।

রূপ শিল্প হল জাতিস্বর্গ!



রাজলক্ষ্মী শিল্প মন্দির

ফোন-৩৪-৩৮৫২ • ১০১, বহুবাজার স্ট্রিট • কলিকাতা-৩২ •

বড়ের বেগে আসে আমার কাছে।

হাত ধরে বলে—তুমি আমার সবকে কি ভাবছ জানি না কিন্তু অন্ততঃ ঘটাখানেকের জন্ত আমার কমা কর। আমি এসে তোমার সব কিছু বলব। এটুকু দয়া আমার কর।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার চলে যায়।

আমি কয়েকটা বই টেনে নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করি। কোন এক বই থেকে একটা কাগজ মাটিতে পড়ে যায়। কোতুলক বশে পড়ে ফেলি—

“প্রিয় মিসেস ডায়ার্স,

তোমার কথামত খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মিসেস ম্যাকমিলান বন্ধার ভূগছে কিন্তু তাহলেও তোমার ভয় নেই। আমি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছি এবং ডাক্তারের উপদেশ মত চললে বাছার দেখে ঐ বীজ সঞ্চারিত হবার কোন কারণই থাকবে না। তার ওপর ম্যাকমিলান পরিবারে তোমার মেয়ে যে ভাগভাবেই মানুষ হবে সে আশাসও আমি দিতে পারি। বাই হোক এ বিষয়ে তোমার মতামত শোনার অপেক্ষার রইলাম।”

আমেরিকা থেকে চিঠিটা এসেছে গত মাসে, হয় তো এর উত্তরও এত দিনে চলে গেছে বখাছানে।

মিসেস ডায়ার্স-এর জীবনের আর একটা দিক ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে এল রাতের অতিথির আগমনোদ্যেগ। শিল্পীর শিল্প-জীবন ভুলে তার অন্তরঙ্গ দেখার চেষ্টা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইচ্ছা করেই বইটা খুলে রেখে দিই পাশে আর তার ওপর চাপা দিই চিঠিটা।

ঘুমাবার ভাণ করলেও শেষে ঘুমিয়েই পড়ি।

করলা ভান্সার শব্দে ঘুম ভাঙে—মিসেস ডায়ার্স হাঁটু গেড়ে এসে আগুন টিক করছিল।

আমি পা টেনে নিয়ে বসতেই বলে তোমার ঠাণ্ডার রাখার জন্ত ভয়ানক লজ্জিত। কিন্তু নিজেও তো কয়েকটা টুকরো করলা দিতে পারতে।

বলি আমার ভেমন শীত করছে না।

—সত্যি হবেও বা। আমি এই মাত্র ঘান করলাম বলেই হয়তো আমার এত শীত বোধ হচ্ছে।

বিষয়ের স্তরে প্রৱ করি, এত রাতে ঘান করলে!

দেখি পাশ থেকে বই ও চিঠিটা অন্তহিত হয়েছে।

মিসেস ডায়ার্স বলে চল শোবে চল। আমার আর ঘুমাবার ইচ্ছা নেই। বতরুণ পারি তোমার সঙ্গে গল্প করা বাবে।

ঘুমাবার ইচ্ছা আমারও ঠিক ছিল না। তাই শোবার ঘরেই নরক করে মিসেস ডায়ার্স তার কাহিনী।

স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসলেও আদিম ক্ষুধার ডাক ভুলতে পারিনি। বতই শিল্প নিয়ে সাধনা করি দেখের তত্ত্বীতে সময় সময় শিহরণ আসে আর তখন শিল্প দিয়ে মনকে তুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্রয়োজন হয় নরনারীর সাময়িক আনন্দ প্রচেষ্টা।

সৌন্দর্য আছে কিন্তু সন্ধান হারিয়ে পথে গিয়ে ঝাঁড়াতে পারি না বা ক্লাবে খোঁজ করতে চাই না। মডেলদের ব্যবহার করতাম তাই নিজের খেয়াল মেটাতে। আপত্তি তো উঠতোই না বরু শিল্পীর

মন্ডারজনে তারা নিজেকে ধস্ত মনে করত। বিপদ হলো অনেক সময়ই। কয়েক বার বাতায়ান্তের পর কেউ কেউ আসত দাবী নিয়ে আমার প্রয়োজনেরও বাইরে। না চাইলেও তাদের সম্ভাব্য বিবাদে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হত—ভয়ে, কিংবা লোকলজ্জার হাত এড়াতে। এই দাবীর হাত এড়ানোর জন্ত বহুবারই আমার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে, এমনকি অর্থ দিয়ে পুরণের চেষ্টাও কম করিনি।

প্রৱ করি এভাবে জীবনটাকে ছেঁদ না করে আবার বিয়ে করছ না কেন?

—বহু বার ভেবেছি সে কথা কিন্তু আটকে গেছি সম্ভানের কথা ভেবে। মাতৃশ চাইনি কোন দিনই আর মায়ের স্নেহটা সবটাই গেছে শিল্পের দিকে। আর গোপন করার কিছু নেই—তুমি চিঠিটা পড়েছ। এই মিলনের বিষয় ফল আমি রোধ করব কি ভাবে। তাই আশ্রমে ওদের পালন করা ভিন্ন উপায় থাকে না। মিসেস নাম থাকার কলে হাসপাতালে স্থান পেতে অন্তর্বিধা হয় না কেবল ভাবনা হয় যখন সময় আসে সেই শিশুর শিক্ষার। অনেকেই আশ্রম থেকে ঐসব শিশুদের পোষ্য হিসাবে নেয় কিন্তু দায়িত্ব এড়ানোর জন্ত সেখানে আমার সম্ভানকে ছেড়ে দিতে পারি না। প্রথমবারে আমার এক শিক্ষা হয়। চমৎকার ফুটফুটে ছেলে—আমারি এক চেনা বান্দবী তাকে নেওয়ার জন্ত আমার অনুরোধ করে। রাজী হলাম সহজেই। অথচ একবছরের মধ্যেই ছেলেটি মারা যায়। ডাক্তারী রিপোর্টে জানলাম সহজ মৃত্যু নয় সেটা। নিজের দুর্বলতা না থাকলে সেই ধনীদেব বিরুদ্ধেই কেস করতাম।

তারপর থেকে স্থির করেছি, না জেনে শুনে আর কখনই কাউকে দেব না।

বিয়ের মধ্য দিয়ে কোন সম্ভান হলে এইভাবে তাকে বিলিয়ে দেওয়ার আইনের দিক দিয়ে অনেক বিপদ আছে। তার ওপর ঐ যে বললাম চিরন্তন এ কামনা আমার নেই অথচ স্বামিবে! দাবীর কাছে মনের বিরুদ্ধেও আমার অনেক কিছু মেনে নিয়ে হবে।

এসব কথা জানার পর আমার ঘৃণা করবে জানি—সেখ কিংবা বাবে দুঃখের মত স্মৃতি নিয়ে। তোমরা আইন বাঁচিয়ে চল, আইনের ভয়ে কিংবা আইন রচায় আদর্শে। তোমরা আমাদের নৃত্তিকে সম্মান দিলেও—শিল্পীর সমাদর কর না সব সময়। আমর অবশ্য সেজন্ত ক্ষোভ করি না তবে এইটুকু প্রার্থনা—যদি ভুলে না বাও তবে মনে রেখ, সমাজের বাইরে থাকতে চাই বলেই সমাজের রীতি-নীতি আমাদের বেধে রাখতে পারে না।

কথার উত্তর না দিয়ে শুয়ে থাকি। অন্ধকারে দেখতে পাই না তার মুখ। আন্টেরগিরির গহবরের মধ্যকার লাভার মধ্যে—আলামরী ক্ষুধারূপী গলিত খাতুর সঙ্গেও অমূল্য সম্পদ থাকে বিচারের মন থাকা চাই।

মিসেস ডায়ার্স-এর কথা বন্ধ হয় না।

—সত্যিই এডিনবরা এবার ছাড়তে হবে। দুঃখ হ' আলেকের জন্ত। ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ওকে আমিই নিয়ে আছি মডেলের কাছে। অথচ আমারই আকর্ষণে ধরা দিল আলেক

# আলোকচিত্র

তিন সঙ্গী

—অর্থাৎ বসু

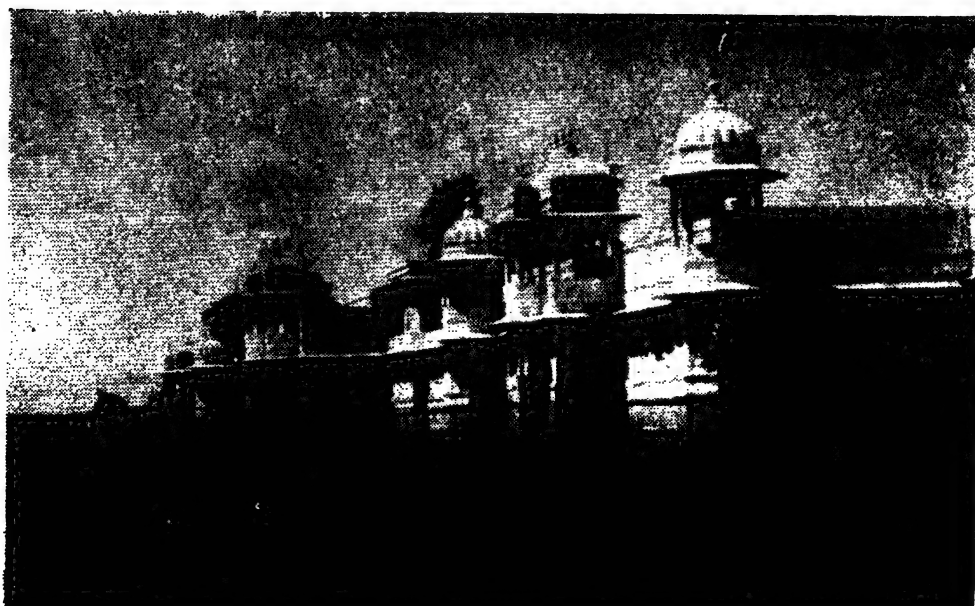


দলমাদল (বিষ্ণুপুর)

—অম্বীলা দেবী

লেক (উদয়পুর)

—মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

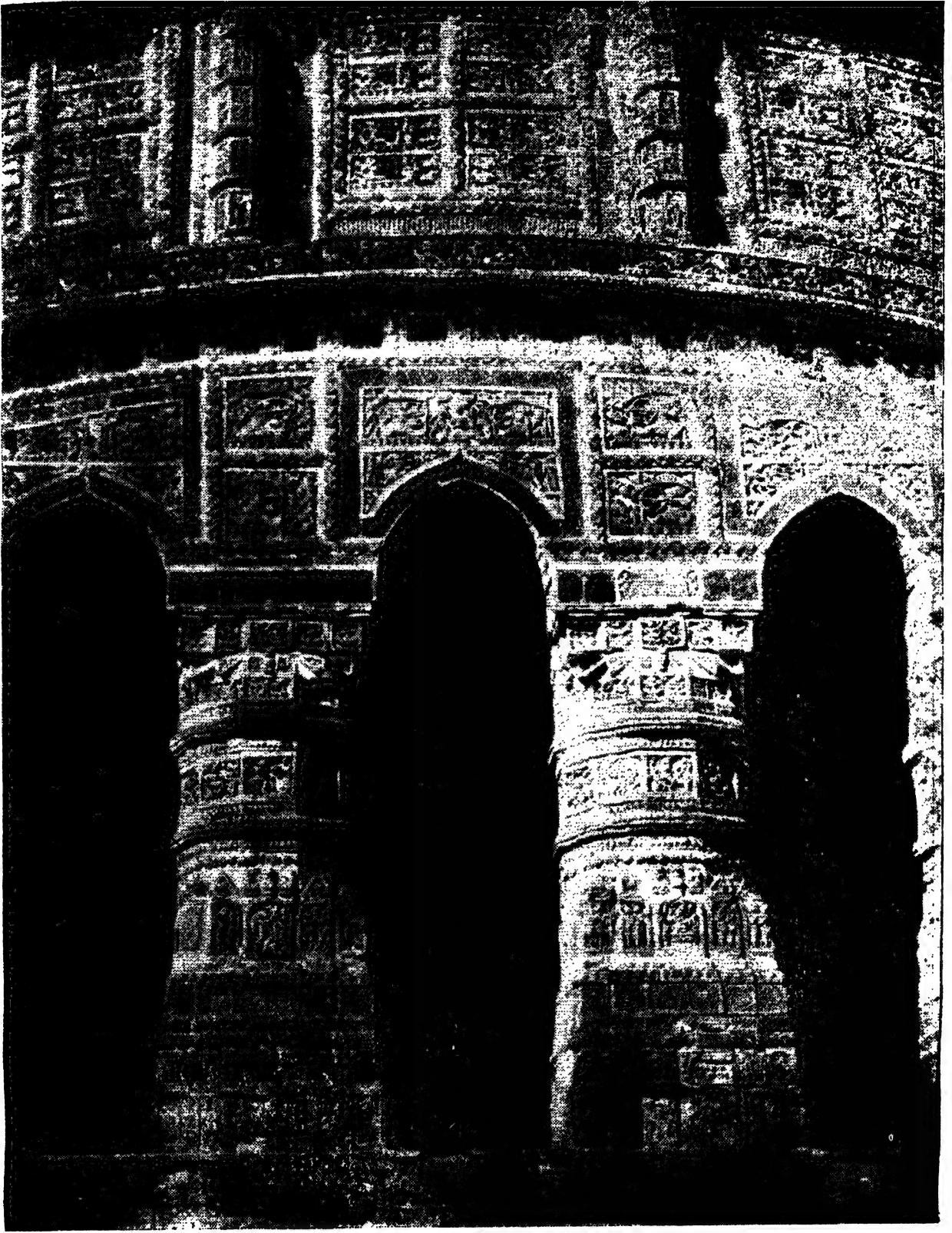




শকভীরু

—বীণা সন্ন্যাস





জোড় বাংলা ( বিষ্ণুপুর )

—তুলসীদাস সিংহ



অবশিষ্ট

—বাতি ভাই

থাকতে না পেরে একদিন তার মনের কথাও বলে। বিয়ে করতে প্রস্তুত আছে তাও স্বীকার করে। অথচ কত ছোট, বয়েসে এমন কি মনের দিক থেকেও। শেষে একদিন স্বার্থের জন্য তাকে নিয়ে আসি বাড়িতে। আবাদ পায় প্রথম। চকল হয়ে ওঠে অথচ আমার প্রয়োজন গেছে মিটে। তার আবেদন প্রতি বারেই অগ্রাহ্য হতে দেখে তুল পথ ধরে। দেখি তাকে অল্প ভায়গার অল্প ভাবে। ফেরাবার মত প্রলোভন আমার নেই। এখন হয়ে পড়েছে অমায়িক। নারীও ওর কাছে খেলনা। প্রেমের মর্যাদার কথা ভুলে গেছে একেবারেই। আজও এসেছিল ও উন্নততা নিয়ে। সেখানে নীতিকথায় শাস্ত হ'বে না কেনেই তাড়াতে পারিনি। অথচ নিবেদনের পর কি প্রশান্ত উদার মৃতি! এখন যদি দেখ ভাবতেই পারবে না কয়েক ঘণ্টা আগে সে এমন ভাবে মনুষ্যত্ব ভুলে পশুর মত কামময় হয়ে উঠেছিল।

বাধা দিই—তোমার বিছানায় শুয়ে রইল আলেক আর তুমি এখানে।

—তুমি ভাবছ কি ভাববে লম ভেন্সে আমার দেখতে না পোলে। দৈনিক সম্পর্ক শুধু যেখানে সেখানে ওসব ভাবনা আসবে কি করে। ভয় নেই, লম ভেন্সে আপনা থেকেই আলেক চলে যাবে বাইরে। তা সে বত রাত্রেই হোক না কেন। পড়ে থাকবে কাগজে লেখা দুটো কথা—ধন্যবাদ প্রিয়।

—একটা কথার সত্যি জবাব দেবে।

—জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

—কখনও কাউকে ভালবেসেছ?

—হ্যাঁ, আমার শিল্পকে।

—মানুষের মধ্যে?

—ঠিক জানা নেই, তবে আলেকের জন্য কিছুটা চিন্তা করি। বড় দুর্বল চিন্তা, কাউকে অবলম্বন না পেলে পথ চলার কষ্টতা নেই ওর।

—ওটা ভালবাসা নয়, সহানুভূতি। ভালবাসা থাকলে তার অবিশ্বাসের কোন কাজ করতে পারতে না তুমি।

—তাই যদি বল তবে স্বীকার করব মানুষকে ভালবাসিনি কোন দিনই।

—শেষ জীবনের অবলম্বন কি হবে?

—কেন শিল্প।

—পারবে শেষ জীবন পর্যন্ত তুলি ধরতে?

—শিল্প সৃষ্টি করার শক্তি শেষ হলেই কি শিল্পীর মরণ হয়? শিল্পজগত থেকে সে বিদায় নিতে পারে কিন্তু তবু তার দান করার কিছু আছে সাধনার ঐশ্বর্য দিয়ে। অবশ্য সে বাঁচার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তবু মরণে আমার বড় ভয় যতক্ষণ না সে মরণ আসে সৌন্দর্যময়ী হয়ে। অপেক্ষা করে থাকব সেই দিনের জন্য।

সারা রাত ধরেই হয়তো 'মিসেস ডায়ার্স' কথা বলে গেছে। আমি শুনেতে পাইনি সব। কথা শেষ হবার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি।



উৎসবের দিনে

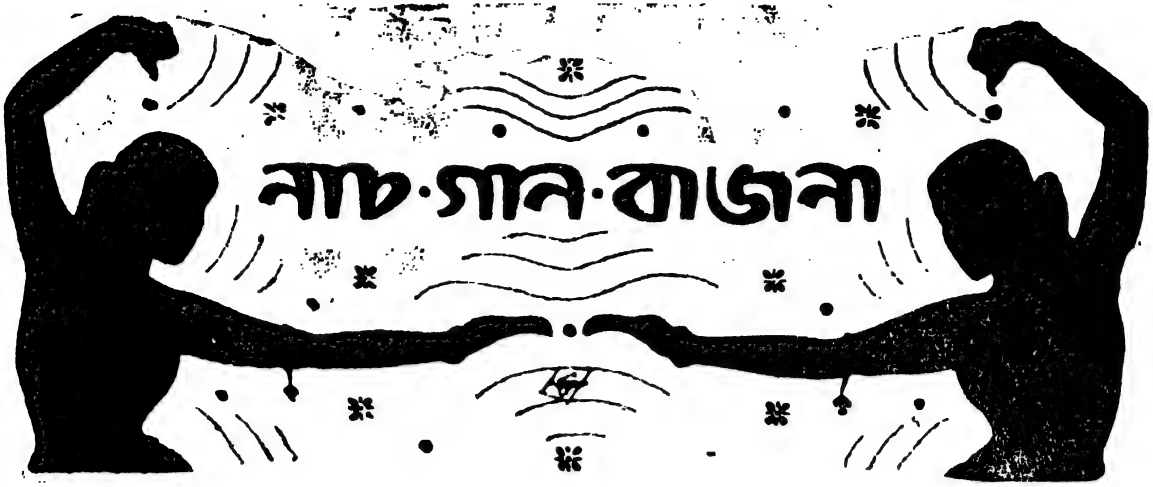
কে. হোডের

মুখামিত

প্রসাধন সামগ্রী

কে. হোড এণ্ড কোং

কলিকাতা-২৪



## ভাটুর গান

শ্রীমন্দরগোপাল ঘোষ

ভাটুর গান আর ঘেঁটুর গান পশ্চিম-বাংলার বহু প্রচলিত লোক-সঙ্গীত। এই দুই প্রকার গানকেই লোকসঙ্গীতে একটি ভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু ভাটুর গান যেন একান্তই বীরভূমি জনগণের নিজস্ব। পূর্ববাংলার জারিগান—শারিগানের মত এই ভাটুর গানেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের প্রথম হ'তে স্তব্ধ ক'রে সারা ভাদ্র মাসই এ গান চলে থাকে। "ভাটু মা"-এর পূজাকে উপলক্ষ ক'রে এ অঞ্চলের বাগ্‌দী-হাড়ী-ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভাটু মায়ের পুতলাকৃতি প্রতিমাকে সঙ্গে নিয়ে লোকেশ্বরের দরজায় দরজায় এ গান ক'রে থাকে! সঙ্গে নর্তকীবেশী একজন পুরুষ থাকে। সে যখন নাচে তখনই বিশেষ বিশেষ সুরে এই ভাটুগান পাওয়া হয়।

এই ভাটুমা কে বা কোথা হ'তে এই 'ভাটু মা'র পূজার প্রসঙ্গ হ'ল এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নাই। বিখ্যাত গ্রন্থ "Hasting's Encyclopaedia of Religion & Ethics" এর "Bagdi" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে :—

"They also parade the Effigy of a female saint named Bhadu who is said to have been daughter of the Raja of Puchet and who died a virgin for the good of the people. Her worship consists of songs and wild dances in which men and women and children take part.—( vide Vol 11 p p 328. )

উল্লিখিত বিবরণ থেকে আমরা পাই ভাটু Puchet-এর রাজার কন্যা; যিনি লোকের মঙ্গলের জন্য আজীবন কুমারী ছিলেন। এর সঙ্গে ভাটু সম্পর্কীয় প্রচলিত গল্পেরও কিছু মিল আছে। প্রচলিত গল্পে আছে—মানভূমের রাজার একমাত্র কন্যা ভাটুমণি। কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই। কন্যা ক্রুদ্ধপ্রমে মাতোয়ারা। বিয়ে করতে চায় না। এই ভাবে কুমারী অবস্থাতেই অকালে তার মৃত্যু হয়। রাজা কন্যাশোকে পাগল হ'য়ে বান। পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কন্যার মৃত্যুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অধীনস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ভাটুর পূজার প্রচলন

প্রচলিত ভাটুগানেও এই মানভূমের রাজার উল্লেখ আছে।  
গানের মধ্যে আছে :—

"এল ভাটু কোথা হ'তে, কে পারে ভাই সন্ধান দিতে।

তুনেছিলাম মানভূমেতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয়।"

আরও একটা গানে আছে :—

"ভাটু আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে,"

ইত্যাদি।

এইটাই ভাটুর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ। আরও একটা কারণে এই মতবাদটি পুষ্ট হ'য়েছে। মানভূমের আদিবাসী "ওরাও"দের মধ্যে ভাটুপূজার অমুরূপ এক উৎসব দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, বীরভূমির এই লোকসঙ্গীতির উৎস সন্ধান বাংলা প্রত্যন্তপ্রদেশ স্তব্ধ মানভূম পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

বীরভূম এবং বীরভূমের সীমান্তবর্তী বর্ধমানের অংশবিশেষেই ভাটুগান সমধিক প্রচলিত। সুতরাং পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলেই ভাটুর গানের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলার শ্রাবণ মাসের মধ্যেই ধাত্রোপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। ভাদ্র মাসে বাগ্‌দী-হাড়ী প্রভৃতি শ্রেণীর কৃষি-শ্রমিকদের প্রচুর অবসর। বর্ধার ক্লাস্তি অপনোদন-প্রয়াসী এই কৃষি-শ্রমিকেরাই ভাটুপূজা তথা ভাটুগানের সৃষ্টি ও প্রচলন ক'রেছে "ভাটু মা" বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতা শ্রেণীতে পড়ে না। এমন কি, মঙ্গলকাব্যের যুগেও ভাটুর কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। যদিও ভাটুগানকে কোন কোন অঞ্চলে ভাটু-মঙ্গল বলে উল্লেখ করা হয়। ভাদ্র মাসকে চলতি কথায় বলে "ভাটুর" মাস। এই "ভাটুর" মাসে এই উৎসব হয় বলেই একে বলা হয় ভাটুর গান বা ভাটুগান। সারা ভাদ্র মাস পান ও উৎসবের শেষে সংক্রান্তির দিন বথারীতি অধিবাসের পর বিসর্জন হয়। এই বিসর্জন উৎসবের আবার বৈশিষ্ট্য আছে। একসঙ্গে অনেকগুলি ভাটুর গানের দল একস্থানে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে সেখানে কবিগান, তজ্জার মত গানের পালা চলে। উপস্থিত শ্রোতা সাধারণ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের বিচার করে।

ওরাওদের মধ্যে অমুরূপ উৎসবের প্রচলন দেখিয়েই ভাটুগান মানভূমের সৃষ্টি বলে মনে করবার কারণ নাই। ওরাওরাও বাগ্‌দী-হাড়ীদের মত অনগ্রসর নিম্ন শ্রেণীর জাতি। কাজেই বাংলার এই ভাটু উৎসবের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় বিশেষ ক'রে যখন এতে আদিরসাত্মক অন্নীলতার গন্ধ আছে।

প্রচলিত প্রবাদগল্প থেকেই ভাড়াগানের কবির গান লিখেছেন এবং Hastings সাহেব সেই সমস্ত প্রবাদ ও গান থেকেই তাঁর প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করে থাকবেন। যাই হোক, ভাড়াগানের মৌলিকতা নিয়ে বর্তমান রচনার কলেবর বৃদ্ধি অব্যাহত।

বাংলার লোকসঙ্গীতের এই শীর্ষধারাটি কিন্তু আজও প্রবহমান। প্রত্যেক বছরেই কিছু কিছু নতুন গান পূর্বের গানের ধারাকে পুষ্ট করে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাড়াগানের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হয়। পূর্বের বাগদী-হাড়া প্রভৃতি শ্রেণী নানাবিধে অনগ্রসর ছিল, তখন ভাড়াগানও একটি বিশেষ ভঙ্গীতে রচিত ও গীত হত। বৈচিত্রহীনভাবে একই গান বছরের পর বছর একই সুরে চলে আসত। যেমন :—

(১) চল ভাড়া চল, ম্যাগে এল জল,

জামাকাপড় ভিজ্জে গাল...।”

(২) “আমার ভাড়া, সোনার বাড়া, হাতে সোনার গজনা।”

(৩) “ভাড়া বাবে কলকা-আ-তা-আ।” ইত্যাদি।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে নিয়ন্ত্রণের সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাড়াগানেরও পরিবর্তন এসেছে। এই যুগের ভাড়াগানের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে তাদের পরিচয়ের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে এইরূপ কয়েকটি ভাড়া গান আলোচনা করা হচ্ছে।

‘৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলায় অঙ্গচ্ছেদ ঘটল। এটা ভাড়ার গানের শিল্পিসমাজ ঠিকমত গ্রহণ করতে পারল না। এই দুঃখ-বেদের কথা ফুটে উঠল তাদের ভাড়াগানে :—

“দুখের কথা বলব কারে ওগো ভাড়া।

সোনার বাংলা ভাগ করিল কোন হতভাগা।

মুসলমানরা পাকিস্তানে, তাড়াল ভাই ভগিনীগণে,

বাস্তহার্য কেঁদে সারা, দুঃখের নাই মা সীমা।

এই বাস্তহার্যদের দুঃখে ভাড়াগানের কবির বিচলিত হয়েছিল। নিজের বাস্তবতা থেকে উৎখাত হয়ে লক্ষ-লক্ষ বাস্তহার্য ভাই যখন অসহায় নিরাশ্রয় ভাবে কলকাতার পথে পথে, হাওড়া শিয়ালদহ রাস্তাফরমে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কঙ্গচ্যুত নক্ষত্রের মত ছুটে বেড়াচ্ছিল তখন তাদের প্রতি কার না করুণা জেগেছিল? তাদের বেদনার সুর ভাড়াগানেও ছুটে ছুটে উৎসারিত হয়েছে :—

“(ভাড়া) বাংলাদেশের কাঙাল ছেলে

রয় কত উপবাসে।

পরনেতে নাইক টেনা

মরে কত আপশোবে

পেট ভরে সব পায় না খেতে

বাস করে এই বাংলাদেশে

(হা) তাদের বিনাশে মারতে আসে

প্রবল প্রতাপ পুলিশে

আরও আছে :—

“কত কত অগণিত বাস্তহার্য দল।

খালিপেটে পথে পথে ফেলছে চোখের জল।”

সরকারী পুনর্বাসন নীতিরও কঠোর সমালোচনা পাওয়া যায়।

বেতিয়া—আলমামান—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা তাদের কথায়

বাস্তহার্যদের পরিহাসের সুগরিকল্পিত গ্রহণ। সরকারের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ভাড়া-এর শরণ নিয়ে বলা হয়েছে :—

“ভাড়া ভূমি মন্ত্রী হয়ে কব পুনর্বাসন।”

এখনকার মন্ত্রীদের মত

তাদের ক’র না নির্বাসন।

এর পরেই এল স্বাধীনতার দ্বিতীয় অভিশাপ “লেভি” বা “কর্ডন” প্রথা। পল্লী অঞ্চলে জনমন বিক্ষুব্ধ হ’ল। আর সেই বিক্ষোভ এসে সাড়া দিল ভাড়ার গানে :—

“আয় মা ভাড়া, আয় মা ঘরে হেরে তোরে প্রাণ ছুড়াই।

যা ছিল ধান দেশের সরকার

“লেভি”তে সব করলে উজাড়

কি খেয়ে যে বছর যাবে, মনে হ’ল ভাবনা তাই।

দেশের লোকের যখন এই অবস্থা তখনই কলকাতার ট্রাম কোম্পানী ভাড়া বাড়াল। সে কথা পল্লীর লোকদেরও অবদিত রইল না। কলকাতার “এক পয়সা-আন্দোলন” এ সহায়ত্ব দেথিয়ে ভাড়া গানের সুরেও এই অহেতুক মূল্যায়ন বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ’ল :—

“কলকাতাতে ট্রামের ভাড়া,

বাড়িয়ে দিলে ভরার।

লাগিয়ে লেঠা, লাঠিপেটা,

কতই যে খুন ঘটল চায়।”

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই আভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বছরের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার  
জ্ঞান লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এসম্প্যান্ডেড ইস্ট, কলিকাতা - ১



বাংলা মায়ের বাবা ছেলে জামাপ্রসাদের রহস্যজনক অপ্রত্যাশিত মৃত্যু স্বাধীনোত্তর বাংলার এক বিশেষ ঘটনা। সারা ভারত যখন জামাপ্রসাদের শোকে মুহমান, বাংলার নিম্ন শ্রেণীর এই শিল্পীদের বুকও তখন এ বেদনা বেজেছিল নিদাক্ষণ ভাবে। তাদের কাছেও এটা ছিল অপ্রত্যাশিত :—

“কে সাধিল ভাহু সাথে বাবু  
সাধ ক’রে কাশ্মীর ঘরে  
এল না জামাপ্রসাদ।

\* \* \* \*

বল ভাহু কেমন ক’রে  
মায়ের প্রাণে ধৈর্য ধরে...।

গোয়া-অভিযান আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিদেশী-কবলিত গোয়া প্রভৃতিকে ভোগতত্ত্বিকর আন্দোলনে তখন ভারতের আকাশ-বাতাস ঢংল। দেশমাগ্য নেতাদের নেতৃত্বে দলে দলে স্বৈচ্ছাসেবকের দল গোয়া প্রবেশ করছে। বাংলার ঘরের ছেলে “চাকুদা” (ত্রিদিব চৌধুরী, এম. পি.) তখন গোয়া প্রবেশ করতে কৃতসঙ্কল্প। সে কথা পল্লীবাসীদের কানে কানে প্রচারিত হল। মনে মনে শুভপ্রচেষ্টা অভিনন্দিত হ’ল। ভাহুগানের কথাশিল্পী লিখলেন :—

“গোয়া চল, গোয়া চল,  
চল ভাহু গোয়া।  
জাতীয় পতাকা হাতে  
চল ভাহু গোয়া।

তুমি যদি না যাবে মা।  
ভারতের মান রবে না।

হ’রে ভারত ললনা (ভাহু)

যাবে কি মান খোওয়া।  
চল ভাহু গোয়া।”

আঞ্চলিক দুঃখ-হৃদয়শার কথাও ভাহুর গানে ফুটে ওঠে। সেচ-পরিকল্পনায় মাহুয়ের সুখসুবিধার সঙ্গে দুঃখও এসেছে। নতুন পরিকল্পনার অসং বিভাগীয়-কর্মচারীদের কর্মশৈথিল্যে লোকের নানা দুঃখ ঘটেছে। সময়মত জল না দেওয়া, অর্থের বিনিময়ে কুপাদানে পক্ষপাতিত্ব এবং সময়ে অতিরিক্ত জল সরবরাহের দোষে শত শত লোকের ঘর বাড়ী মাঠ ফসল ভেসে গিয়েছে। অসং এই কর্মচারীদের দোষে সরকার পল্লার জনগণের কাছে অপ্রিয় হ’তে চলেছে। এই সব উল্লেখ সাম্প্রতিক ভাহুগানে দেখা যায় :—

“কে ক্যানল আনলে ভাহু দেশে গো ?

ও মা মেসানজোরের জলের তোড়ে  
ঘর-বাড়ী যায় ভেসে গো।

খাল কেটে কুমার আনা  
ম্যান্দির মা ছিল জানা  
এ বে খাল কেটে মা কি এনেছে  
দেখে বাও মা এসে গো।

বার আছে ভাহু টাকা কড়ি  
সেই জল পায় তাড়াহাড়ি  
“ওভারসিরর বাবু” নীচু ছেড়ে  
উঁচু দিয়ে, জল দেয় মা হেসে গো।

ট্যাসকো দিয়ে ক্যানল বাবু  
ধমক খাই মা ঠেসে গো,  
তবু সময়মত ক্ষেতে দিতে  
আমরা জল পাই না শেষে গো।  
কে ক্যানল আনলে ভাহু দেশে গো।”

জারিগান সারিগান ও অজ্ঞাত পল্লীগীতির মত ভাহুর গানেও রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব এসে পড়েছে। ভাহুমণি যেন কৃষ্ণবিরহিণী রাধা। কৃষ্ণপ্রমমূলক অনেক ভাহুগান প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে কয়েকটির অংশবিশেষ উল্লেখ করছি :—

- (১) “সোহাগিনী ভাহুমণি, জামগরবের গরবিনী,  
প্রেমতরঙ্গের তরঙ্গিনী চিন্তামণি রে।  
ছিল ভাহু বিন্দাবনে, গোপনে নিকুঞ্জ বনে,  
মনে পড়ল এত দিনে তাই এল ফিরে।”
- (২) “ভাহু আমার রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রমে পাগলিনী।
- (৩) “(ও সে) ভূলায় রূপে কালোসানো  
অজানা তার কিছু নয়।”
- (৪) “তুমি যে প্রেমতরঙ্গিনী,  
কৃষ্ণভাবের-ভাবিনী, ওগো ভাহুমণি।”

এই সমস্ত নানা দিক আলোচনা করলে বাংলার পল্লীসংস্কৃতির সঙ্গে ভাহুগানের নিবিড় যোগটি ধরা পড়ে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত ব’লে ভাহুগানের কথাতে কিছুটা অলীলতা দোষ থাকে, অপটু হাতের লেখা ব’লে স্থানে স্থানে ছন্দপতন ঘটে। কিন্তু বিশেষ সুরে গাইবার সময় সে ছন্দপতন কানে বাজে না। ভাহুগানের কবির প্রাচীন যুগের চারণদের মত গানের মধ্যে দিয়ে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশ স্বত্বকে সজাগ ক’রে দেয়। এদিক দিয়ে তাদের দান কম নয়। ’৪২ এর আন্দোলনের সময় রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ না ক’রলে বোধ হয় প্রবন্ধের অঙ্গহানি ঘটবে। দেশনেতাগণ তখন বিদেশী শাসকের কারাকান্দ। তখন ভাহুর গান বার হ’ল :—

“হার কি নতুন শাসন এল ভারতে।  
বিনাদোষে হার পুলিশে আসে গুলী চালাতে ॥  
কারাগারে বন্দীর সব হায কি কটে কাটে দিন ;  
অনশনে দিনে দিনে হয় যে তাদের তমু ক্ষীণ।

কারাগারে বন্দীর প্রাণে দাঁও হে ভাহু শান্তিবারি  
কংসকণ ধ্বংস কর প্রকাশ হও স্বরূপেতে ॥”

স্বপ্নের কথা, লোকসঙ্গীতের এই ধারাটি সভ্যতার চোরাবালিতে আজও হারিয়ে যায় নাই। বছর বছর ভাহুর আগমন ঘটছে, সারা ভাহুমাস পূজা পাওয়ার পর আবার বছরের মত তার বিসর্জন হচ্ছে। বাওয়ার সময় পল্লীকবি ভাহুমণিকে বার বার ব’লে দিচ্ছে :—

“এসো ভাহু বছর বছর সোনার বাংলাদেশে।  
ক’রো আবার রসভঙ্গ কে ছাড়তে চায় তোমার সঙ্গ  
এবার বিদেয় দিতে সবার দিবে নরনজলে তাসে ॥”

## আমার কথা (৩৩)

## শ্রীপ্যারীকৃষ্ণ পাল

ভারতমাতার মহিমাষিতা রূপ বহুলাংশে প্রতিভাত হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে, আবার ভারতীয় সঙ্গীতও নানাতাবে পুষ্ট হয়েছে তার লোকসঙ্গীতের কল্যাণে। আজকের দিনের নগর-সঙ্গীতের তুলনায় এর অবদান ও ঐতিহ্য আরও বিরাট। কবে যে এর জন্ম হয়েছিল তার তারিখ খুঁজে বার করতে ইতিহাস আজও অপারগ। ভারতের সেই সুবর্ণমণ্ডিত দিনগুলিতে এদের প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। নরনারীর জীবনে মাখানো ছিল সেদিন সঙ্গীতের একটি মধুর প্রলেপ।

সেই স্বর্ণযুগেই বাঙলার কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের লেখনী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল চণ্ডীমঙ্গল। প্রত্যেক বাঙালীর পরমপ্রিয় গ্রন্থ। সেদিনকার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করল সঙ্গীতজ্ঞদের কল্যাণে। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল-এর কাহিনী বাঙলার ঘরে ঘরে পরিচিত হ'ল 'চণ্ডীর গান' নামে। এর গায়কদের মধ্যে আজকের দিনে একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ শ্রীপ্যারীকৃষ্ণ পাল।

বর্ধমানের রাণীগঞ্জবাজার অঞ্চলের স্বর্গীয় রাজনারায়ণ পালের পৌত্র ও স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পালের পুত্র শ্রীপ্যারীকৃষ্ণ পাল ১২১৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মেছেনই সঙ্গীতের আবেষ্টনীর মধ্যে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছেন পিতৃ-পিতামহের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা। ছকে-বাঁধা বিজ্ঞানবাদের শিক্ষা ধরে রাখতে পারল না প্যারীকৃষ্ণকে; কাজ চালানোর মত বিজ্ঞা আয়ত্তে আনলেন প্যারীকৃষ্ণ। তার পরেই সঙ্গীতে করলেন পুরোপুরি ভাবে আত্মনিয়োগ। সেই জীবন আজও অযাচিত। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন, বাহুল্যের বাগাই নেই, নেই আত্ম-নির্মানের প্রচেষ্টা। খাঁটি বাঙলা দেশের জীবনধারা। প্রথমে বাবার সম্প্রদায়ে গান গেয়ে এসেছেন, বর্তমানে নিজেই সেই সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে সমাসীন। শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহার মেলা ছাড়া কলকাতায় পূজ্যপাদ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বটকৃষ্ণ পাল, চকদাশির ললিতমোহন সিংহরায় প্রভৃতি আরও অনেকের গৃহেই গান শুনিয়েছেন প্যারীকৃষ্ণ। তা ছাড়া বর্তমানে প্রত্যেকটি দেবীপক্ষের প্রথম নটি দিন প্রত্যহ অপরাহ্নে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে (১২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৬) তাঁর পৌত্র মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায়—সম্প্রদায় প্যারীকৃষ্ণ গান শুনিতে থাকেন।

চণ্ডীর গান প্রসঙ্গে প্যারীকৃষ্ণের কাছে বা জানা গেল, মোটামুটি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল গীত হতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির সমগ্রাংশ মুকুন্দরামের রচনা, তবে গানের সময় বিভিন্ন গায়ক নিজেদের সুবিধে অমুবারী বিভিন্ন সলাপ বোগ করে নিয়েছেন—এই সলাপগুলি মুকুন্দরামের নয়। চণ্ডীমঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত বলা—(১) দেবখণ্ড, (২) ব্যাধখণ্ড, (৩)

বনিকখণ্ড। প্রথম খণ্ডে সতী ও তাঁর দেহভাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কালকেতু ও কুল্লরার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে চিত্রিত আছে, শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী।

সত্তরোত্তীর্ণ প্যারীকৃষ্ণকে বলি—তোমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বল, আজন্ম বার মধ্যে ভূবে রইলে আজ একান্তরে পা দিয়ে সে সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা তুমি সঞ্চয় করলে?—“খুব খারাপ বাবু, খুব খারাপ—কি আর বলব, আপনারা সবই তো দেখেছেন—এ সব গানের এখন আর কদর নেই বাবু, এখন আর কদর নেই—আমাদের ছেলেবেলার কি দিনই সব দেখেছি বাবু, এই সব বাড়ীতে তখন কি সমারোহের সঙ্গে গান গেয়ে গেছি। আমরা তো এখন বোঝা হয়ে বেঁচে আছি।”

ভারতে অবাক লাগে যে, একটি মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন, অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে কি আকাশ-পাতাল ওলোট-পালোট! ঠিকই বলেছেন প্যারীকৃষ্ণ—নতুন যুগের নতুন ডেউ আসছে হুঁয়ার বেগে—বিগত যুগের ধিতিয়ে পড়া জলস্রোতের কোন আবেদনই তাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু তবু—তবু বা পুরোনো বা প্রাচীন তা কখনই আজকের দিনে আর অবলুপ্ত হতে পারে না—তা বেঁচে থাকবে সংস্কৃতির ইতিহাসের জোরে। লোকের মুখে হয়তো আর শোনা বাবে না কিন্তু মনের দেওয়ালে কান পাতলে নিশ্চয় শোনা বাবে তার ভিতরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই “কুল্লরা বললেন...”।



ROY COUSIN & CO.  
4, DALHOUSIE SQUARE  
CALCUTTA-1

Sole Agents for  
COVENTRY WATCHES  
Official Agents for  
OMEGA & TISSOT WATCHES



## পারিবারিক বাজেটের প্রশ্ন

‘খণ্ড কৃতা যুতং পিবেৎ’ বলে যেমন একটি কথা আছে, তেমনি ‘আয় বুঝে ব্যয় কর’—এইটিও একটি মন্ত দাবী। প্রথমতঃ সমাজ ব্যবস্থার কারণেই আমাদের জীবনযাত্রা অনিশ্চিত এবং অনিশ্চিত বলেই বাজেটের অর্থাৎ হিসাব করে দিন চলার প্রশ্নটি উঠে। এর বিপক্ষেও যে কঠিন যুক্তি দেখান হয় না, এমন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বাজেট বা আয়ব্যয়কের ধার ধারেন না, এখনও সমাজে এমন লোক বা পরিবারের সংখ্যাই বেশী।

বিশেষতঃ কিছু পারিবারিক বাজেট প্রসঙ্গটি নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলেছে চিন্তাশীল মহলে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে এমন কি জনমত আহ্বান করা হয়েছিল সংবাদপত্র মারফত। তাতে দেখা গেছে—প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে ছয়টি পরিবারেই আগে থেকে আয়ানুযায়ী ব্যয়ের কোন বাজেট থাকে না কিংবা সাধারণ ভাবে জমা-খরচটা পর্যাপ্ত রাখবার ব্যবস্থা নেই। দশটির ভেতর মাত্র তিনটি পরিবার বাজেট করে জীবনযাত্রার ব্যয় নিরীক্ষা করেন এবং অবশিষ্ট একটি পরিবার চেষ্টা করেও বাজেট রেখে চলতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন—উপরের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কোনটি ঠিক অর্থাৎ আদর্শ পরিবারের সংজ্ঞা দাবী করতে পারে কারা? পারিবারিক বাজেট রাখা কি আসলো ভাল, না এই ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে আয়ের উপরই শুধু চাপ পড়ে এবং সময়ই অপচয় হয়? পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে, সেগুলো একে একে এই ভাবে বলা যায়।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে প্রথম যুক্তি—এতে অবস্থা বা প্রয়োজনানুসারে ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচা যায় এবং মানুষকে ইহা করে তোলে মিতব্যয়ী। সর্বাবস্থায় দায় বা ঋণমুক্ত থাকবার জন্তও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এইটি একটি প্রকৃত ব্যবস্থা। একে ফুল প্রমাণিত করার চেষ্টায় অপর পক্ষ যুক্তি দেখান—পারিবারিক বাজেট করে চললেই আশাহীন মিতব্যয়ী হওয়া যায় না। পরন্তু আয় বুঝে বারো ব্যয় করতে অভ্যস্ত নয়, খরচের বাজেট করা তাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব। আর হারা আয় অনুপাতে ব্যয় করতে বদ্ধপরিকর, বাজেট বরাদ্দ না করেও তাদের চলে। আসলে জীবনযাত্রা নির্বাহে যে জিনিসটি চাই, সে হচ্ছে ইচ্ছা-শক্তি, সংযম ও সাধারণ জ্ঞান (কমনসেন্স)।

বাজেট রেখে চলার সমর্থনে দ্বিতীয় যুক্তি—এই ব্যবস্থার বড়রকম

নজরে থাকে এবং তার জন্ত আবশ্যিক প্রস্তুতিরও সুযোগ হয়। আরও সোজা ভাষায় বলা চলে, অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকাতা আলাদা করে রাখা যায় এতে আগে থেকেই এক পরে প্রয়োজনের মুহূর্তে হঠাৎ কোন দুশ্চিন্তা বা অসুবিধার পড়তে হয় না। এইখানেও বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তিস্বরূপ বলবেন—বাস্তবিকতা-সর্বস্ব বর্তমানকে অস্বীকার করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিয়েই বাজেটের যতকিছু কারিগরী। অথচ কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ জরুরী অবস্থা সত্যি এসে গেলে বাজেটের অঙ্ক ধরে কোন কাজ হয় না, পরন্তু অন্ততঃ তখনকার মত বাজেট নিরর্থক বলেই গণ্য হয়।

দ্বিতীয় যুক্তি—সুপরিচালিত ও সৃষ্টিমূলক ভাবে বাজেট তৈরী হলে আর্থিক বিরোধ, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা হ্রাস পায় কিংবা আদৌ থাকে না। নিজের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজে সব সময় সম্যক সচেতন থাকা যায়, সুতরাং চলবার জন্ত অত্যধিক মাথা ঘামাবার প্রশ্ন এতে প্রায় থাকে না। প্রতিপক্ষের কর্তে তৎক্ষণাৎ যুক্তি শোনা যাবে—বাজেট করে চলতে গেলেই বরং উদ্বেগ ও অশান্তি সারাক্ষণ মন জুড়ে থাকে, হিসাবের খুঁটিনাটির বাইরে যেসব স্বস্তির সুযোগ এতদূর থেকে উঠতে নেই। এমন কি, এই অবস্থিত রীতি অনুসরণের ফলে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয় এবং মনের অমিলও দেখা দেয়। কারণ খরচের ব্যাপারে প্রত্যেকেরই হাত-পা থাকে কঠিনভাবে বাঁধা।

চতুর্থ যুক্তি বা বাজেটের সমর্থনে উপস্থিত করা হয়—এই রীতি বা ব্যবস্থায় ছোটো উপায়ে অথবা অর্থব্যয় নিরোধ হতে পারে। প্রথমতঃ, এতে অর্জিত অর্থের কোথায় অপচয় হচ্ছে, সেইটি ধরবার সুযোগ হয় এবং তখন সেই ছিদ্রপথ রুদ্ধও করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, আগে থেকে নির্দিষ্ট খাতে অর্থ-বরাদ্দ থাকায় ইচ্ছার তাগিদে হঠাৎ কিছু ক্রয় করতে বাওরা কঠিন হয়। এই যুক্তি বারো মানতে চায় না, তাদের বক্তব্য—বাজেট রাখতে যেসব সখ করেও ইচ্ছা মাত্র কোন পণ্য বা আসবাব ক্রয়ের সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে উঠাতে সব সময়ই একটা পরিকল্পনা করে কেনা-কাটার দাবী থাকে এবং ধরা-বাঁধা স্বতন্ত্র ভেতর থেকে নিরানন্দ ভাবে দিনাতিপাত করতে হয়। অথচ আগে না ভেবে যখন তখন একটা কিছু খরচ করার মধ্যেই তৃপ্তি ও আনন্দ সবচেয়ে বেশী।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে পঞ্চম যুক্তি—বাজেট করে চলবার অভ্যাস করলে উপভোগের জন্ত কোন কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেইটি আপনি বাছাই হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই পন্থায় চাহিদা মেটাবার জন্ত পূর্ব থেকেই অর্থ আলাদা করে

ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় প্রধানতঃ এর মারফতই। বিপক্ষদের কণ্ঠে অমনি যুক্তি উঠে—প্রয়োজনের বাইরে ক্রয় করার ফলেই যে সব সময় আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়, এ কথা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার দরুণই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গোলযোগের উদ্ভব হয়ে থাকে। অধিকাংশ লোকই যে কষ্ট পায়, সে টাকা পয়সা নেই বলেই, পারিবারিক বাজেটের ভায়ে কোন একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ না করার দরুণই নয়।

বাজেট ব্যবস্থার অনুকূলে যষ্ঠ যুক্তি যেটি প্রদর্শন করা হয়—এই পদ্ধতি অনুসরণে তরুণদের পক্ষে টাকা-পয়সার সঠিক মূল্য উপলব্ধির সুবিধা হয়—এই নিয়ে সহসা ছিনিমিনি খেলাতে সাহস হয় না। ব্যয়ের খাত নিয়ন্ত্রণের জন্য এইটি সংসার জীবনের অন্ততঃ প্রথম ধাপে অবশ্য চাই। আর্থিক সমস্যাগুলোকে কোন না কোন ভাবে মিটিবার বাস্তব এই থেকে পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তে জীবনপথে এগিয়ে বাওয়া চলে। প্রতিপক্ষের পরিচায় যুক্তি—বাধ্যতামূলক বাজেটে টাকা-পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ বন্ধ হলেও তরুণ মনে এর প্রতিক্রিয়া অল্প ভাবে না হয়ে পারে না। জীবনান্তেই তাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য এতে অনিবার্যরূপে সীমিত হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য উত্তম ও অধ্যবসায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যায়।

স্বপক্ষে আরও একটি (সপ্তম) দৃঢ় যুক্তি দেখান হয়—পারিবারিক বাজেট বা আয়-ব্যয়ক বাথলে নিজের সম্বল কখন কি আছে না আছে কিংবা ব্যক্তি, সংসার স পরিবারের দায়-দেনা সত্তি কত, এটিটি স্পষ্টভাবে বঝবার ও জানবার অবকাশ মিলে। সেক্ষেত্রে অর্থ ভ্রাণ চাকিত্র হওবার কারণ থাকে না, বরং অর্থের উপর নিজেরই স্বাভাবিক কর্তৃত্ব এসে যায় পুরোমাত্রায়। এর বিপক্ষেও সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি হাজির করা হয়ে থাকে—আলোচ্য ব্যবস্থার পাতার পর পাতা হিসাবের অঙ্কে ভর্তি করা হয় বটে কিন্তু আসলে দৈনন্দিন ব্যয় যা হ'বার তসুই যায়, বাজেটের উপর নির্ভর করে সচবাচর এ চলে না। আর হিসাবের প্রস্তুতিকেই যদি বড় করে দেখবার প্রয়োজন হয়, তা হলে খরচের যুহুর্ন্তেই অন্য়াদাসে সেইটি করা যায়।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে-বিপক্ষে এটিটি বাথার প্রয়োজন—অপ্রয়োজন সম্পর্কে আরও নানা যুক্তিরই অবতারণা করা যেতে পারে। কিন্তু এই থেকে কোন একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছান কিংবা এক কথায় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া স্বভাবতঃই কঠিন। এইটুকু মাত্র আবারও বলা চলে—বর্তমান সমাজ-কাঠামোতে আয় যেখানে সীমাবদ্ধ এবং ব্যয়খাতের যেখানে শেষ নেই, সেখানে হিসেবী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? বাজেটই বলা হোক কি জমা-খরচই বলা হোক—একটা কিছু নথি রেখে চললে সাধারণ পরিবারের পক্ষে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।

# মাবধান!

আপনার সর্দি  
বিপজ্জনক হ'তে পারে!

গুরুতর আকার ধারণ করার  
পূর্বেই—এই উত্তম শক্তিশালী  
মালিশটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন!

ছ'ভাবে সর্দি দূর করে



১ ইহা নাকের  
মধ্য দিয়ে  
কাজ করে  
ভিকস ভেপোরাবের  
শক্তিশালী গন্ধ  
আঁগনি খাসের সঙ্গে  
গ্রহণ করে গলায়  
ও নাকের সর্দির  
যন্ত্রণা দূর করতে  
পারেন।



২ ইহা হকের  
ভিতর দিয়ে  
কাজ করে—  
ভিকস ভেপো-  
রাব মালিশ করলে  
উহা হকের ভিতর  
দিয়ে প্রবেশ করে  
আপনার বুকের  
সর্দির ব্যথা দূর  
করে।



ভিকস ভেপোরাব  
বুকে, গলা ও পিঠে মালিশ করুন!



327A-B

## ভারতে গোলমরিচের উৎপাদন

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গোলমরিচ প্রধানতঃ একটি মশলা হিসাবেই গণ্য, কিন্তু সাধারণতঃ মশলার যেমন উপকারিতা বলতে কিছু নেই, গোলমরিচটা ঠিক সে পথেই পড়ে না। দ্রব্যগুণের বিচারে গোলমরিচের একটি স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে এবং কতকগুলো ক্ষেত্রে এইটি সত্যি উপকারী। সেজ্ঞা দেশীয় ঔষধাদির প্রকরণে এর ব্যবহার দেখা যায় এবং অল্প সব মশলার তুলনায় এটা দামীও বটে।

গোলমরিচের উৎপাদনের দিক থেকে আজিকার ভারত কিছু মোটেই পিছিয়ে নয়। পরন্তু এই পণ্য উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান এখন দ্বিতীয়। বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গোলমরিচ উৎপন্ন হয় ইন্দোনেশিয়ায়, সম্প্রতি ভারতের গোলমরিচ ফলন সম্পর্কে একটি সরকারী হিসাব পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে এখানে উৎপন্ন গোলমরিচের পরিমাণ হচ্ছে ৩২ হাজার টন। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরেও (১৯৫৫-৫৬ সাল) প্রায় একই পরিমাণ গোলমরিচ উৎপাদিত হয়। তিন বছর আগে ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রদত্ত সরকারী হিসাবেরই জানা যায়—উক্ত আর্থিক বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট ফলন হয়েছিল ২৬ হাজার টন। অপর দিকে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক গোলমরিচ উৎপন্ন হয় কেবল রাজ্যে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা চলে—ভারতে যে পরিমাণ গোলমরিচ হয়ে থাকে, তার সবটাই এখানে ব্যবহৃত হয় না। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে মোট ব্যয় হয় ৮ হাজার টন গোলমরিচ। বাকী যেটা থেকে যায়, তা প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। এই খাতেও ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকেন অনেক। বিগত বর্ষে (১৯৫৬-৫৭ সাল) এখান থেকে মোট ১৪৮৪০ টন গোলমরিচ রপ্তানী করা হয়েছে। সরকারী হিসাব থেকে এ-ও জানা যায়—১৯৫৫-৫৬ সাল এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে রপ্তানীকৃত ভারতীয় এই পণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩,৯২৭ ও ১৪,৭৭৮ টন।

ভারত থেকে সাধারণতঃ গোলমরিচ রপ্তানী হয়ে যায় চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পূর্ব-জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই কয়টি দেশে ১১ হাজার টন গোলমরিচ প্রেরিত হয়েছে এবং মূল্য বাবদ পাওয়া গেছে ৩০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়া নিয়েছে ৫১৭ টন এবং পোল্যান্ড ২১৫ টন। বছর কয়েক হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নও ভারত থেকে গোলমরিচ আমদানী শুরু করেছে। সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে এই পণ্যটি প্রেরিত হয়েছে ৩,১৫৫ টন। ১৯৫৬-৫৭ সাল অর্থাৎ বিগত বর্ষেও রপ্তানী করে রপ্তানী হয়ে গেছে প্রচুর গোলমরিচ।

ভারতে গোলমরিচ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে আরও বেশীরকম। বেসরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও সরকারী দৃষ্টি এই দিকে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৬ হাজার টন গোলমরিচ ফলনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী ও

সরকারী উভয় পাশাপাশি চসলে এই লক্ষ্য পূরণ হবে, এইটুকু অনায়াসে বলতে পারা যায়।

## নোট মুদ্রণে বুটেন

কারেন্সী বা ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ ব্যাপারে ব্রিটিশ অবদান কখনই অস্বীকার করা চলে না। বিশ্বের বহু স্বাধীন দেশে আজও বুটেন থেকে বরকারী নোট ছাপা হয়ে যায়। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ মুখাপেকী কতকগুলো রাষ্ট্র অবশ্য নিজস্ব তত্ত্বাবধানেই নোট তৈরী করেছে, কিন্তু তাতেও নোট মুদ্রণে বুটেন যে মান ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে, সেটি কেউ প্রায় অতিক্রম করতে পারেনি।

নোট ছাপিয়ে দেবার জন্য তিনটি বৃহৎ ব্রিটিশ মুদ্রণ-সংস্থা (সিকিউরিটি প্রিন্টার্স) বিশ্বের নানা দেশ থেকে অর্ডার গ্রহণ করে থাকেন। এই মুদ্রাসংস্থাগুলোর নাম যথাক্রমে—ব্রাডবেরী উইলকিনসন, ওয়াটারলো এণ্ড সন্স এবং জ-স-রিউ। গত বৎসর প্রথমোক্ত ফার্গটি (ব্রাডবেরী উইলকিনসন) একমাত্র পারস্তের মেশগাস ব্যাঙ্কের নিকট থেকেই ৪ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের নোট মুদ্রণের অর্ডার পেয়েছিল। যতদূর জানা যায়, এই মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের তৈরী কারেন্সী নোট আজ চালু রয়েছে প্রায় ২৫টি দেশে। বলতে কি, প্রতি বছরই এর নিউ ম্যালডাল কারখানায় লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক নোট যত্নসহকারে মুদ্রিত হয় এবং সেখান থেকে ঐগুলো অর্ডার অনুযায়ী এক একটি দেশে রপ্তানী হয়ে যায়।

ব্রিটিশ ফার্মসমূহে বিভিন্ন ধাপে নানা বিশেষজ্ঞের হাত ছুঁয়ে অর্ডারী নোট সকল তৈরী হয়। কোথাও হয়ত জল ছাপের কাজ হল, কোথাও হল ডিজাইন অনুসারে রঙের কাজ, আবার কোথাও বা হল নোটের উপরকার লেখাগুলোর কারিগরী। শেষ অবধি ষ্টিল প্লেট তৈরী করে উভয় দিকে মুদ্রণ সম্পন্ন হলে নোটের উপর ক্রমিক নম্বর দেবার পালা আসে। মাঝে আরও একটি কাজ হয়ে যায় এবং সেটি হচ্ছে নোট প্রচারের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির অবিকল স্বাক্ষর মুদ্রণ। নির্দিষ্ট কাগজের লম্বা নীচে অসংখ্য নোট একটি সঙ্গে ছাপা হয় এবং সবশেষে কাজ হল সেগুলো ঠিক ভাবে কাটা ও নোটের বিভিন্ন মূল্যমান অনুযায়ী তাড়া বেঁধে নেওয়া। এর পর এক একটি প্যাকেট শীলমোহর করে যে ব্যাঙ্কের অর্ডারী নোট, সেখানে যথানিয়মে পাঠিয়ে দেওয়া।

সূচনা থেকে পূর্ণাঙ্গ নোট তৈরী হয়ে বার হওয়ার সুদূর পর্যন্ত প্রতি স্তরেই চলে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। কোথাও সত্যি কোন ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণ-বিভাট হয়ে পড়লো কি না, এইটি তন্ন তন্ন করে না দেখলেই নয়। ব্রাডবেরী উইলকিনসন নামীয় ফার্গটিতে এই পরীক্ষা কার্যেই নিযুক্ত আছে বহু তরুণী সমেত প্রায় এক সহস্র কর্মী। সুবৃহৎ নোট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানটি থেকে শুধু কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোটই নয়, ডাকটিকিট, চেক, বণ্ড, শেয়ার সার্টিফিকেট, রাজস্ব টিকিট, পাসপোর্ট, মোটর লাইসেন্স প্রভৃতিও মুদ্রিত হয়ে অহরহ বাইরে রপ্তানী হয়ে বাচ্ছে। বুটেনবাসীরা সেজ্ঞাই গর্বসহকারে এই দাবীটি করতে ছাড়েনা—‘আমরা অর্থ তৈরী করে দিই, আর খরচ করে বিশ্ববাসী।’





মীনা কুমারী তাঁর স্বকের যত্ন নেন  
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে “এটি এত  
সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!” তিনি বলেন

বিশোগান্ত করণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী  
মীনা কুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জন-  
প্রিয় চিত্র তারকাদের অন্ততম।  
তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন,  
তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—গুটিংয়ের  
সময় গরম আর্কল্যাম্পের তাতেও তাঁর  
ত্বক থাকে মসৃন ও লাবণ্যময়! অবশ্য  
লাবণ্যের বহু নেওয়ার একটি গোপন  
উপায় তাঁর জানা আছে। “আমি  
সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট  
সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি  
অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।”  
নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি  
দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার  
ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে  
উঠছে!



কমাল  
আমরোহীর ‘পাকীজা’  
চিত্রের তারকা

লাক্স টয়লেট সাবান  
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য সাবান



# সাহিত্য পরিচয়



## সর্বভারত লেখক-সম্মেলনের সম্ভাবনা

সংবাদপত্রে অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, সম্প্রতি এক

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের উদ্যোগ ও আয়োজন চলেছে। আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সাহিত্য-রসপিপাসুদের কাছে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও ভাবার লড়াই চলেছে। এমন কি এই বস্তু রক্তারক্তি ও খুনোখুনির পর্যায়ে নেমেছে। তত্বপূরি দিল্লী-সরকারের নেক-নজরের স্বাক্ষরপত্রটিতে এক প্রদেশ অত্র প্রদেশের প্রতি হিংসা প্রকাশ করছে। কংগ্রেস হাই কমান্ডের সৃষ্টি হিন্দী-অভিযানের বিষয় ফল প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেজন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির আত্মবিকাশের পথ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের মাতৃভাষা আমাদের ভুলে যেতে হবে—কেন না হিন্দী নাকি কঙ্গালসারি, ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই। যদিও হালে ত্রীনব্ব্ব ও অবধা—হিন্দী-আন্দোলনের ক্ষুদ্র বিরক্তি প্রশ্ন করছেন। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আকৃতি এখন এই, তখন ভারতীয় সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রাক-ঘোষণার আমরা উল্লসিত হবো, অধিক কথা কি? বাই হোক পাঠক-পাঠিকা স্বরণ রাখবেন, আমাদের দেশে 'সম্মেলন' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আমাদের জনগণের সঙ্গে বে-বে বিষয়ের কোন যোগাযোগ নেই, সেই-সেই গুরু-গতীর ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সম্মেলন হওয়াই যেন এক প্রচলিত রীতি।

কিছুকাল আগেও শীতের মরুতমে কলকাতায় নানাবিধ 'সিরিয়াস' সম্মেলনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ছিল। ধর্মচক্রের মহামণ্ডল, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আমীরী জলসা, প্রগতিপন্থীদের সৌখীন সমাবেশ, ক্লাব ও অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক রঙ্গাভিনয়, প্রভৃতি অস্থায়ী বন্ধিও সম্মেলনের নামেই চলে যায়। শোনা যায়, কোন কোন সম্মেলন আবার 'ক্লজড ডোর' অর্থে রুদ্ধদ্বারকে হয় নাকি এই কলকাতায়।

তবুও আমরা আশা পোষণ করবো সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন সার্থক হোক। কেন না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদে কারণে হয়তো আমরা ভুলে গেছি, ভারতীয় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীদের মধ্যে সেযুগে যেন এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ও মৈত্রী ছিল—বর্তমানে যেটি আমরা পুরোপুরি হারিয়েছি। দেশের আর বিদেশের দল-বৈদ্যের এতটা 'ডিয়েট' প্রভাব তখন দেশের মসজিদবাদের প্রতি বর্তায়নি। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীমাত্রকেই পুতুল

প্রতিভা আর বিকশিত হবে না। কিন্তু আমরা হয়তো মানতে চাইবো না, মহান আদর্শের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আসল সৃষ্টিকার্য্য বাহত হচ্ছে অনেকের। রাজনীতির সঙ্গে তালে তাল রাখতে রাখতে স্বর বেতালা হয়ে পড়ে—আমাদের কানেই বা শুধু বাজে না। এখানে উল্লেখ করলে অজায় হবে না, রাজনীতির রাজরোগে ভুগে ভুগে বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক অকালমৃত্যু বরণ করেছেন দেশে-বিদেশে।

আমাদের সাহিত্যেও রাজনীতিপ্রিয়তা আছে। নীলদর্পণ, পথের দাবী সৃষ্টি হয়েছিল সত্যিকার দেশাত্মবোধের তাগিদে। কিন্তু আমরা যদি বিদেশ থেকে এই দেশাত্মবোধকে আমদানী করতে চাই এবং তাকে পণ্য করে ব্যবসা কেঁদে বসতে চাই, জাতীয়তাবাদী পাঠকগোষ্ঠী মেনে নেবেন কি? তত্বপূরি রাজনীতির উৎকর্ষের ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে বিভাগ আর বিরোধের প্রাচীর-রচনা তো অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সর্বোপরি লাভ বলা যায়, সরকারী কুপাদুষ্টি, যদি লাভ করা যায়। বৃত্তি, পুরস্কার, স্বর্ণপদক আর উপাধিভূষণের নিশ্চিত ব্যবস্থা জানবেন। সাহিত্যিক শিল্পী আর বৈজ্ঞানিকদের এখন তাই লাভ কিছু নেই, প্রলোভন নানাপ্রকার। সুতরাং আমাদের দেশের এখন এই অবস্থা বা দুরবস্থা, তখন একটি সর্বভারতীয় লেখক-সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারে সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন এই—আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্যক্ষেত্রে ক'জন সাহিত্যিক আছেন—বাঁরা জয়ধ্বজা ধরে সম্মেলনে হাজিরা দেবেন! আমাদের সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কতকগুলি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টিযোগ্য তাও বিবেচ্য। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র আছে এক মাত্র বাঙলা ভাষার। একারণেই বাঙলা সাহিত্যে আজ নয়, অনেক আগেই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে ভাষার মাহাত্ম্য। তাই আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষা বাঁর এখনও বৈয়াকরণিক পদ্ধতিতে রচিত করতে পারলেন না তাঁর সাহিত্যের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করবেন কোন্ লজ্জায়?

তবুও আমরা বলি, শতক বাধা, হাজার দলাদলি আর নির্ধ পক্ষপাতিত্বের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন হোক এ কলকাতার বৃকে। আমাদের সেই আগের দিনের প্রীতির শুভসম্পর্কে আবার আমরা স্বরণ করি সকল দলাদলির উর্দে থেকে। ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে অশান্তির জাল যদি ছিন্ন হয় পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে! এই সম্মেলনে

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## সাহিত্য পাঠের ভূমিকা

গুরু অধ্যাপনার ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্য সৃষ্টি, প্রবন্ধ রচনা, সমালোচনার ক্ষেত্রেও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রতিভা সর্বজনবিদিত। উপরোক্ত গ্রন্থটি তাঁর আলোচনা ও সমালোচনার প্রতিভার ছাপ বহন করেছে। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং শুধু তাই নয়, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি প্রভৃতির সঙ্গেও সাহিত্যের যোগ অবিচ্ছেদ্য এবং সেই জন্মেই সকল কালের সাহিত্যের মধ্যে স্বভাবতঃই যে এদের ছাপও পড়তে বাধ্য এই ভিত্তিতে সুবোধচন্দ্রের আলোচনা রূপলাভ করেছে। সুবোধচন্দ্রের মূল্যবান সমালোচনা পাঠ করে আগ্রহান্বিত ও রসগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ লাভ করবেন। বিশ্বভারতী, ৬৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরিনিবাহারী সেন। দাম আট আনা মাত্র।

## সোবিয়েতের দেশে দেশে

বাঙলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী রচনার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের দেশে বিশ্বর পর্যটক আজ নেই, কিন্তু দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতি মিশনের রূপায় ইন্দোনীং অনেক গুণীজনই বিদেশগামী হচ্ছেন এবং ফিরে এসেই সবিস্তার ফতোয়া জারী করছেন। নিজ নিজ দৃষ্টিতে বিদেশকে বর্ণনা করছেন, কিছু বা পক্ষপাতিত্বে। কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যিকের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত অধুনা এক প্রকার দুর্লভ বস্তু। অলেখকের বোজনামচা আর সুলেখকের বর্ণনাবিজ্ঞানসে বহুবিধ পার্থক্য। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার মনোজ বসুর লেখায় শেখোক্ত গুণপণা সুপ্রচুর! তাঁর রচিত 'সোবিয়েতের দেশে দেশে'র সঙ্গে বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই। এই বৃত্তান্ত সম্প্রতি সুন্দর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই রচনা প্রকাশার্থে বখন নির্বাচন করেছি তখন অধিক প্রশংসা অবগুই করতে পারি। কিন্তু বিশেষতঃ মনোজ বসুর রচনা আমরা পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়েছি বিবিধ কারণে। তিনি সুসাহিত্যিক। তাঁর রচনা আন্তরিকতায় ভরপুর। ছলনা কাকে বলে তিনি জানেন না। আবার কৃতজ্ঞতায় কিংকর্তব্য হারিয়ে অতি-প্রশংসায় বুধরও হন না। অধিকন্তু তাঁর বাচনভঙ্গীর সরলতায় ও লেখার সুলভিতায় ভ্রমণকাহিনীকে সত্যিকার সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। মনোজ বসুর লেখা পাঠে যেন দেশ দেখার দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। অসংখ্য আলোকচিত্র বইটির অঙ্গতম আকর্ষণ। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

## বাঙলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন অধিকার করে আছে নাটক। কাব্য, প্রবন্ধ, ছোট গল্পের মত দীর্ঘকাল ধরে নাটকও বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে আসছে যথেষ্ট পরিমাণে। বহু খ্যাতনামা নাট্যকার মহাকবির সন্ধান পর্যন্ত পেয়ে গেছেন জাতির কাছে। বহু সুশ্রোতীন পৌরানিক গ্রন্থে অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বাঙলা নাটকের তথ্য রাজার গোড়াই বৃগ থেকে কীরোরপ্রসাদের

নাটক পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে নাট্যাংশাহী এবং নাট্যাঙ্গুরাগী মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠে পরিভূক্তি ও জ্ঞান দুইই লাভ করবেন। এই জাতীয় সং এবং জ্ঞানপ্রসূ গ্রন্থ উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে লেখক ধন্যবাদের দাবী করতে পারেন। দীর্ঘ গ্রন্থটিতে লেখকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। একটি আটত্রিশ পাতার দীর্ঘতম সমালোচনা লিখেছেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক অধ্যাপক বৈজ্ঞান্য শীল। মহাজাতি প্রকাশক, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমহীতোষ বসু। দাম আট টাকা মাত্র।

## তারার তিন জন

বাঙলা দেশের সুখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র সেনের নাম কারো অজানা নয়। তাঁর "শতাব্দী" অনেকেরই চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি ছোট ছোট গল্পের সংকলন। বালক ও কিশোরদের উপযোগী মোট বারোটি গল্প। গল্পগুলি নিজস্বতায় সমৃদ্ধ। রমেশচন্দ্রের দরদ ও অহুত্বভিত্তি কয়েকটি গল্প জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিতু হাকিম, বিন্দি, আফিসের কাপড়, সাদা ঘোড়া, রাজার জন্মদিন, তারার তিন জন প্রমুখ গল্পগুলি পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস রাখা যায়। প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী, ৫ ঞ্চামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন এস, চক্রবর্তী। দাম দু'টাকা মাত্র।

## রাত্রি

সাহিত্যিক আশু চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি একদিন পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমানে তাঁর এই উপন্যাসটি প্রকাশ লাভ করেছে। মুখ্য চরিত্র হৈমন্তী। দু'টি বিপরীত জীবনধারার সম্মুখীন সে। স্বামী সমীরণ রাজনৈতিক কর্মী। ধূমকেতুর মত তাদের সংসারে আবির্ভূত হয় পুরন্দর, অনেক কিছুই সে চায়, আবার দেবদূতের মত সেই সংসারেই এসে পড়ে অঙ্গন। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে লেখকের প্রতিভায়। প্রতিটি চরিত্রের ভিতরকার কথা নিঙড়ে বের করেছেন লেখক। ভিন্নধর্মী চরিত্রগুলির সম্মেলনে কাহিনীর গতি মনোরম হয়ে উঠেছে। শ্রীকালী পাবলিশিং হাউস, ৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ সিংহরায়। দাম ত্রয় টাকা আট আনা মাত্র।

## রাজনীতি

রাধানাথ সিংহ লেখার জগতে নবাগত হলেও তাঁর রচনার উৎকর্ষতা এবং গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসার দাবী করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গমূলক এবং চিন্তাগর্ভী ছোট ছোট কয়েকটি প্রবন্ধ ও রম্যরচনা স্থান পেয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থটিতে। সমাজে, মানুষের জীবনে যে বহুবিধ উপান পতন সৃচিত হয় তা যে এমনই হয় না তার পিছনেও থাকে একটি পটভূমিকা, এই পটভূমিকাতেই রচনাগুলি রচিত। ছাব্বিশটি রচনার মধ্যে কয়েকটি রচনা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করে যে রচয়িতার চিন্তাধারা অসার নয়। ৫ ধর্মজলা রোড, পোঃ বেলেড় বট, হাওড়া থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী চিত্রা সিংহ। দাম দু'টাকা মাত্র।

### ইঠযোগ প্রণালী

মানুষের স্বাস্থ্য যোগাসন দ্বারা কি ভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয় আলোচনা আজ রীতিমত ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ দেশে কেন বিদেশের বহু সাহিত্যিকই আজ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন। ইঠযোগের চর্চা ভারতে নতুন নয়, বহু প্রাচীন গ্রন্থ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। স্বাস্থ্য গঠনের প্রধান সহায়ক এই বিভ্রাট সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ব্যক্তি অনেকেই আছেন তাঁদের কৌতূহল নিবারণে এই গ্রন্থ সক্ষম হবে। ইঠযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন এই গ্রন্থের মুখ্য আকর্ষণ। কয়েকটি চিত্রও এর শোভাবর্ধন করেছে। এই সংগ্রহের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক কালীমোহন দেবশর্মা। তারাগীন্দ্র দাস য্যাগু সন, ৮২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীবিষ্ণুনাথ দাস। দাম তিন টাকা আট আনা মাত্র।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি স্তম্ভ (কিশোরদের উপযোগী) আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি লেখনীর প্রখরতায়, প্রঞ্জল বর্ণনাগুণে, সহজভাবে মূল বক্তব্য প্রস্তুতি করার জন্যে পাঠকচিহ্ন জন্মে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থগুলি—(১) প্রফুল্লরঞ্জন বসু-বায়ের ইউরোপের গান্ধী ডাঃ য্যালবার্ট উইটজার (প্রকাশিকা শ্রীমতী গায়ত্রী বসু, শৈবলিনী কুটার, সম্ভোষপুর, কলকাতা—৩২, দাম ১'৫০ ন. প.) (২) স্ববি দাসের ছোটদের ভিক্টর হিউগো (প্রকাশক অরুণকান্তি পাল, নবভারতী, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, দাম এক টাকা চার আনা) এবং (৩) কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের কিশোর (প্রকাশক কুড়রাম ভট্টাচার্য ও লেখক, রামকৃষ্ণ প্রকাশনী, ৩৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট, দাম দেড় টাকা মাত্র)

এই প্রসঙ্গে দুটি শিশুসাহিত্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করি। এদের মূল উদ্ভব বিদেশে। এই দুইখানি গ্রন্থও রচনা কুশলতায় সমৃদ্ধ।

শিশুমনে এরা সহজেই প্রভাব বিস্তার করবে ছন্দস্বরূপী ভাব বর্ণনার কল্যাণে। এই গ্রন্থ দুটি—(১) বিজ্ঞানবনের নিরালা ঘরে। রচনা—লরা ইন্সপলস ওয়াইল্ডার, অনুবাদ—হিমাংকুমার ঘোষ। প্রকাশক যতীন্দ্রনাথ দাস, পরিচয় পাবলিশার্স, ১৭৫-এ পার্ক ষ্ট্রীট দাম—এক টাকা আট আনা মাত্র এবং (২) কুশদেশের উপকথা। রচনা—আলেক্সেই তলস্তয় অনুবাদ—লীনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইষ্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম—হুঁ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

### য়্যাণ্টিবায়োটিক

( বিশ্ববিজ্ঞান-সংগ্রহ )

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার এঁদের মূল্য লক্ষ্য। এই সমন্বয়কারদের মধ্যে বর্তমানে বিজ্ঞান-সাহিত্যকার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ অনায়াসে করা যায়। নানা প্রকার ব্যাধি প্রাণিদেহ যখন বিপর্যস্ত করে তুলছিল সেই সময় বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ দেখা দিয়েছিল য্যাণ্টিবায়োটিক। স্বভাবতই সেই সম্পর্কে মানব সাধারণের আগ্রহ জাগবে। এই গ্রন্থে সেই সকল আগ্রহ প্রশমিত হবে। এতে য্যাণ্টোবায়োটিকের আবিষ্কার তার উৎস, তার প্রক্রিয়া, তার ইতিহাস সমূহ স্তনিপুণভাবে বর্ণনা করে গেছেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শক্তিশালী রচনা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার কল্যাণসাধন করবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। দাম আট আনা মাত্র।

## সিগারেট

মৈত্রেয়ী দত্ত-চৌধুরী

তুমি দাহ নিয়ে বৃকে,

তুমি নিয়ে আগুনের প্রচণ্ড প্রদাহ,

ত্ববিতের মুখে লাল আগুনে রেখার তুমি হলো;

আলাময়ী কোন ভাবা বলা,

পুঞ্জীভূত ঘোঁয়ার ঘোঁয়ার।

তোমার ভেতরে তুমি দাহ,

তবু এনে দাও প্রাণে

অভুত নেশার প্রবাহ !

জীবনের স্বপ্নসম ছুটে-চলা প্রদীপ্ত নেশায়,

সমস্ত চেতনা ঘিরে নামে এক রঙ্গীন আবশ,

তবু তার কতটুকু আর ?

কতটুকু ত্বকার রেশ ?

'এগুট্টে'র বৃকে তার মুহূর্ত্ত প্রয়াণের তাই

তবু অশ্রুশেষ।



স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪



# জন্মদিনে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দ্বি-ত্রিংশ বৎসর আজ পূর্ণ জন্মদিনে ।  
সখা-সখী-শুভী-ভক্ত শুভাৰ্থী সকলে  
জানায় সাদর সম্ভাষণ হাসিমুখে :  
“ফিরিয়া ফিরিয়া যেন আসে এই দিন  
বর্ষে বর্ষে ল’য়ে তাঁর শুভ আশীর্বাদ ।”

জন্মদিন আসে ফিরে স্নেহের উৎসবে,  
আনন্দের সম্বোধনে বন্ধু-বান্ধবী,  
দাক্ষিণ্যের দানে তব হে দাতা বরন,  
আরো যেন সৌন্দর্য-গভীর ছন্দে—আরো  
ত্রিধৃতায় কমনীয়, প্রত্যয়ে নির্মল—  
প্রাণের বন্ধুর পথ করিয়া মস্তক—  
তোমারি আশীর্বে । বর্ষ পরে বর্ষ যার  
ঋতুচক্রে—দিনে দিনে আনি’ নব নব  
আশ্চর্য উপলব্ধির অক্ষুর সম্ভার  
কভু স্মৃখে, হৃৎখে কভু । দিনে দিনে পাই  
সঙ্গ তব নিত্যসাথী !—কখনো আঁধারে  
আশাভঙ্গ বেদনার, কখনো আলোকে  
স্বর্গক মঞ্জুল চেতনার মঞ্জরণে ।  
কখনো নিরাশা পথে নামে নব আশা,  
কখনো উচ্ছল লগ্নে ঘনায় বাদল,  
প্রতি ছন্দে তবু তব অলক্ষ্য করুণা  
প্রাণের প্রত্যক্ষ তটে আসে ঢেউ তুলে ।

জীবনে আমরা চিনি প্রাপ্তির দক্ষিণা  
জন্ম-উত্তমর্গ মন প্রতি অমূল্য  
দিনান্তে গণনা করে লাভ-ক্ষতি ভায় ।  
কুপণ কুসৌদজীবী প্রতি পাতে ফেলে  
অঙ্ক—কোথা কি পেয়েছে দিন-আবর্তনে  
কোন মূল্য বিনিময়ে । দেখেও দেখে না  
আমাদের অন্ধ নেত্র—শ্রেষ্ঠ দান তব  
ছুসে অচিহ্নিত পথে । জীবন-দেবতা ।  
নহে মর্ত্য স্বভাব তো স্বভাব তোমার ।  
তোমার দানের সুর ছন্দ-ইন্দ্রজালে  
উষরে পল্লব-দোল ঢুলায় পলকে,  
জাগায় পাবাণ-ভাঙা নিব্বর নিমেষে,  
কাঁটায় কুমুদবাণী, নিশীথে অহ্না,  
নিষ্কল-বীথ দেয় ভাসারে সহসা  
অনির্ণয় উজ্জ্বলের আনন্দ-প্রাবনে,

পর্যাব-ভালে আঁকি’ নব জয়টাকা,  
ক্ষতিবুকে অক্ষতির উজ্জাসি’ আভাস !

এক হাতে হানি’ নথ আঘাত তোমার  
অন্য হাতে দাও বর আশার অতীত !  
শৈশবেই মাতৃহারা করি’ এসেছিলে  
পিতারূপে—একাধারে জনক-জননী,  
ভরসাথী, উপদেষ্টা, শাসক, বান্ধব ।  
যৌবনে সংসার স্রুত হ’তে ছিন্ন করি’  
সুদূর প্রবাসে এলে ধরি’ গুরুরূপ,  
পিতারও অধিক স্নেহে করিয়া লালন  
দিলে অভিনব জন্ম—দীক্ষা ইষ্টনামে :  
সংশয়ে দেখারে পথ, পরম দিশারি,  
ভিমিরাক্ষ নয়ন করিলে উন্মীলন  
গাহি ঘুম-জাগানিয়া অলোক সঙ্গীত ।  
সহসা আরাধ্য গুরু—তিরোধানে যবে  
নিরাশার অজ্ঞধারে পুছিলাম : “কোথা  
আশা তার গুরু যার নাই আর ?” এলে  
দিতে দীপ্ততর দিশা দেবদূতীরূপে :  
( অপকূপ লীলা ! ) শিষ্যা হ’য়ে দিলে দেখা,  
দিন পরে দিন দিলে “পরম প্রসাদ”  
সমাধির মাধ্যমে তাহার ! তরী যবে  
ভাঙা হাল, ছেঁড়া পাল মজ্জমান—হ’ল  
দুরন্ত ঝটিকা মল্লশাস্ত্র বরে তব :  
শাস্ত্রের বন্দর দিশা মিলিল অকূলে !  
শিষ্যরূপে চেয়েছিল যে শরণ—নিল  
কাণ্ডারীর রূপ যেন তোমার ইঞ্জিতে !  
অজ্ঞহীন সেবা-ভক্তি অবদানে তার  
শিখাল ভক্তির মর্ম, চাহি’ উপদেশ  
বিনম্র প্রণামে—দিল দীক্ষা দীনতার ।  
একান্ত নির্ভায় তার, গুরুরূপে যেন,  
দেখাল সে—নিষ্ঠা বিনা পরমপ্রাপ্তির  
মিলে না মিলে না দিশা । দিনে দিনে নাথ,  
নব নব ইন্দ্রজাল উজ্জাসিয়া তার  
সমাধি-মাধ্যমে ভূমি গাহিলে : “কুপাল  
ঐতি কুপার্থীবে করুণায় রহে বেরি,  
নিষ্ঠা নব পরীক্ষায় প্রাণের মনের  
স্বপ্ন-শক্তি-উদ্বোধন তরে দেয় তারে  
হৃৎখ শোক ভাপ ।” বাহা ছিল এতদিন

জনজ্ঞতি—চাক্ষুসের অধ্যায়ে বাড়িল  
নব অমৃতব রঙে—স্বপ্নের অতীত  
ভরসার বাণী হ'য়ে জ্ঞাতিলক তার  
মস্তমান গীতিগুচ্ছে! "অঘটন-যুগ  
গত চিরতরে"—নহে সত্য এ রটনা,  
এ কথা করিলে তুমি ঘোষণা আপনি,  
জাগালে প্রত্যয় নব অপার লীলার  
তোমার হে কারুণিক, গাহিয়া তোমার  
বৃন্দাবন—মুরলীর মূর্ছনায় বেন :  
"বে চায় অন্তরে দিশা পরম শরণে,  
প্রতি বাধা হ'বে তার সহায় জীবনে,  
অভিশাপ হবে বর, আঘাত জাগাবে  
অন্তর্জ্যোতি, মরুপথ হাসিবে কুস্মনে।"

কুতর্কবিলাস মাঝে ভুলি যে আমার।  
এ-বাণী তোমার তাই বুঝি মেঘছায়  
প্রত্যয়ের নীলাকাশে ক্ষণে ক্ষণে? বুঝি  
তাই আসে অতর্কিতে ঘাত-প্রতিঘাত,  
মিলন মন্দিরে নামে বিরহের ছায়া,  
শঙ্করনি মাঝে শঙ্কা দেয় হানা, কাটে  
নৃত্যে তাল, গতি ক্ষুণ্ণ হয় বাধা বাঁধে,  
মন্দির যুহুর্তে আসে শোণিত-সংঘাত,  
অবেলায় নামে সন্ধ্যা, বিজয়ে বিভ্রম!  
কেন ভুল হয় বার বার—দেখিয়াও  
দেখি না তো, শুনিয়াও চাই না শুনিতে!  
মন সাথে বাদ যবে প্রাণ দিতে চার,  
কেন যে—জানি না আজো! কতটুকু জানি  
জীবন-নাট্যের তব শেষাক্ষের বাণী  
হে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহানাট্যকার!

আমি শুধু জানি বন্ধু, যা আমি পেয়েছি  
পথের পাথেরূপে কুপায় তোমার :  
পেয়েছি প্রত্যয় তুমি আছ এ জগতে,  
জেনেছি—আমার গানে তুমিই চাহিছ  
ঝংকারিতে আপনার অসীম আকৃতি।  
জল আছে তাই জাগে জলের পিপাসা ;  
অমৃত তৃষ্ণারে তাই করেছি বরণ  
লভিতে অমৃত-উৎস, সরল নির্ভরে  
বিন্দু করে আবাহন সিদ্ধুরে হৃদয়ে।

জানি তাই—তুমি আছ ঘেরিয়া আমাকে  
বৃকের নিঃশাস রূপে প্রাণের মণ্ডলে,  
সঙ্গীতে সুরের রূপে জ্ঞতির পুলকে,  
চরণ ঠমকরূপে পথের চলায়,  
আলোছায়া-রূপে জীবনের তীর্থপথে।  
করুণা প্রতিমা তব অন্তর মন্দিরে  
ছড়ায় কিরণ তার আনন্দ-প্রাবনে।  
তারি সে আলোকে দেখি—তুমি আছ প্রতি  
স্বাধীন সঙ্ঘাষণে স্বদেশে বিদেশে।  
তোমারি দৃষ্টির বরদানে হেরি নাথ  
অল্লান চাহনি তব প্রতি পরিচিত  
নয়নের স্নেহালোকে। যেথা যত গান  
ওঠে বেজে—আনে বহি' তোমারি ঝংকার  
অন্তরাল হ'তে ধারে ধরাও অঝোরে  
হে চিরপ্রণয় উৎস। প্রাণের স্পন্দনে,  
শক্তির গৌরবে বিরহের বেদনায়,  
মিলনের রাসনুতো, হাসির উল্লাসে,  
অজ্ঞের ব্যথাহরণে! অশ্রাস্ত চিন্তায়—  
প্রতি ক্ষুরণেই হেরি তোমারি বিকাশ,  
প্রতি কণ্ঠে তব গান জাগে, প্রতি বৃকে  
তুমিই বুনিছ স্বপ্ন পুষ্পিতে জাগরে  
প্রেমের কমলরূপে।

যত দিন যায়  
ক্ষয় ক্ষতি ভুলি বন্ধু, তোমারি বাণির  
বৃন্দাবন-মুরলী ডাকে। শুনেছে তোমার  
সে আহ্বান একবার যে পথিক সে কি  
পারে আর দিতে সাড়া উচ্ছলি সোনার  
হরিনের মায়ানুতো? সে যে নাথ, তার  
জেনেছে জীবনে : প্রতি হুঃখ ব্যথা মাঝে  
করুণার বাঁশি তব বাজে হৃদয়ের  
মধুবনে ; জানে সে সে—তারি মধুরিমা  
প্রিয়জন কলকণ্ঠে হয় অন্দিত।  
তুমি করো অলক্ষ্যে যে-সঙ্ঘাষণ, তারি  
ঝংকার তাহার। তোলে—কত ব্যথামাঝে  
ধরিয়ে সাধনা, কত আনন্দ-উৎসবে  
অঙ্ক-স্নেহ-প্রীতি সুরে মধু মূর্ছনায়।  
তুমি রাজো প্রতি নর্যে কর্ণে—এ সত্যেরে  
সে যে জানে, তাই দেখে আবির্ভাব তব ;

# দ্বীবা প্রো

কমল আননের  
কোমল প্রাণবান



মীনার

আরো ৪টি সামগ্রী  
• ব্ল-নাইট সেন্ট ..  
• ট্যালকাম পাউডার  
• কেস পাউডার  
• কুমকুম।

কভু শ্রীমণ্ডিনী উবা কপোল-সিন্দুরে  
সলজ্জ আভায়, কভু বসন্ত পঞ্চমী  
প্রভাতী হোলি খেলায়, প্রাণের রসোচ্ছ্বাসে,  
কভু মধ্যাহ্নের দীপ্যমান অভ্যুপানে,  
কভু সন্ধ্যা ময়ূরের নিবল চিতায়,  
কভু লক্ষ নক্ষত্রের আরতি-লগনে  
দৃষ্টি যবে পরিপূর্ণ স্বর্গমোদন মাঝে  
লবে এক অনির্বচনীয় ধ্যানদিশা  
কৃতান্তলিবলনায় ।

আজ জন্মদিনে

এ-প্রার্থনা শ্রীচরণে : চেতনা আমার  
ভরসম যেন অনন্তের প্রেমে তব  
নীলাবর পানে মেলে প্রতি শাপা তার,  
জাগরে স্বপনে সুখে দুঃখে, নিবেদিয়া  
প্রতি বিকশন সম্ভাবনা—যারা রাজে  
আফোটা কুঁড়ির রূপে, আধজাগা আলো  
শিহরণরূপে, আধ-পাওয়া অন্তর্লীন  
সুগন্ধ-সঙ্কেত-রূপে : যা কিছু আমার  
আপন বলিয়া জানি—পারি বহু যেন  
সংগিতে চরণে তব সম্পূর্ণ প্রণামে,  
যত ভাবাহীন কৃতজ্ঞতা রাজে মনে  
লভি তব বরাভয়—করুণার দান  
পুণিমা বিকাশ তার জীবন-সন্ধ্যায়  
পারি যেন সাধিত তোমার অভিষেকে  
প্রবাহীন সর্বহীন সর্বনিবেদনে ।  
জাহ্নলে লক্ষ্যের মুখে চলিব বহ্নভ,

কাঁটাবনে অন্ধকারে হেরিয়া কণী  
মণির আলোকে পথ—সর্ববাধা দলি' ।  
প্রসাদে তোমার নিত্য হে মহামুভব !  
যে-অনন্ত-অভীপ্সার প্রথম প্রদীপ  
অলেছিলে তব স্নিগ্ধ আশিস শিখায়  
আমার শৈশব প্রাণাধারে যেন তার  
কৃতজ্ঞ আরতি পারি রাখিতে জ্বালায়ে  
আমার প্রতিটি দীপে : যেন পারি নাথ  
আমার প্রতিটি আশাভঙ্গ বেদনারে  
দহিয়া রূপান্তরিতে সমবেদনায়  
তাপ যত করি' আলো পারি সঞ্চারিতে  
শক্রমিত্র উদাসীন সবার মঙ্গলে—  
আনন্দে নিরভিমান, গৌরবে গভীর ।  
আজ জন্মদিনে বহু জাগে এ প্রার্থনা  
উজ্জ্বল অন্তরে : আমি দাস, তুমি প্রভু  
এ কথা স্মরণে যেন থাকে নিত্য-যত  
ভক্তির প্রণাম পাই—যেন মনে রাখি  
সে অর্ঘ্য আমার নাই লেশ অধিকার :  
অস্তর মন্দিরে অভিমান পুরোহিত  
কোনো ছলে যেন নাথ, না করে হরণ  
দেবোদ্ভিষ্ট উপচার । যত বিষ-বাধা  
আসে তীর্থ-পথে দিনে দিনে—করে যেন  
লক্ষ্য-স্পৃহা গাঢ়তর—নির্ঘল নিটোল  
প্রণতির অঙ্গীকারে অকুণ্ঠ অন্নান  
অহৈতুকী প্রেমোজ্জ্বল আত্মসমর্পণে ।

পূণা, ২২শে জাহ্নয়ারী, ১৯৫৭

## ছুটির গান

অনুজ্ঞা দেবী

প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে  
গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে  
বাথার বকুল কী বলেছে তাই ভেবে  
বল না হৃদয় আজকে তোমায় কী দেবে ।

গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে  
স্বর্ঘ্যুখী হাওয়ার দোলায় বুক ভাঙে  
প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে  
সরমপ্রিয় কোন্ সে বধূর মুখ রাঙে ।

প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে  
আমার হৃদয় কোন্ সুরে আজ আখ্যাসে  
গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে  
কার পরশে জাগবে সে কোন্ বিষাসে ।

কাশির  
মূলকারণ দূর  
করুন



সিরোলিন  
খান

নিরাপদ  
পারিবারিক  
ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি  
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কাশির মূলকারণ হুট-  
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

এবমাত্র ডিস্ট্রিবিউটাস :—  
ডলটাল লিমিটেড

# রঙ্গপট



## অভয়ের বিয়ে

খাগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনাকৃত দ্বিতীয়বার দেখা দিল অভয়ের বিয়ে। এক জ্যাঠামশাইয়ের এক ভাবা মার্কী ভাইপো অভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এস-সি পাশ করে কিন্তু মানুষ হয় না, জ্যাঠামশাইয়েব অতিরিক্ত সাবধানতায় সে শুধু বই-খাতাই চিনেছে, বহির্জগত সংক্ষেপে তার কোন ধারণাই নেই। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর সেই যখন সংসারের মালিক হল তখন তো তুরীয় অবস্থা। জ্যাঠামশাই তাঁর পেছান মার্কী ভাইপোকে জন্তো বন্ধুকণা মায়াকে পাত্রী নির্বাচিত করে গেলেন। মায়া শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা—তার সম্পর্কে এসে অভয়কে সীতিমত বিব্রত ও



শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রমাখ" এর একটি দৃশ্যে মলিনা দেবী ও সুরচন্দ্র সেন

লজ্জিত হতে হয়—মায়ার পাণিপ্রার্থী অজয়। এই চক্রের মধ্যে দিয়ে মায়া ও তার পিসতুতো বোন সরমার কল্যাণে জড়তা ঘোচে অভয়ের ও পরে অভয়ের সঙ্গেই মায়ার বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।—ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শুধু গ্রন্থকারই নন, একজন অভিজ্ঞ আইনবিদও, (অর্থাৎ যুক্তি নিয়ে বাদের অহোরাত্র কারবার) তাঁর হাত দিয়ে এরকম যুক্তিহীন অন্তঃসারশূন্য এবং অদ্ভুত কাহিনী কি করে বেবোল তা বোঝাই যায় না। অভয়কে হস্তান্তর করতে গিয়ে লেখক নিজেকেই যে আগাগোড়া হস্তান্তর করে গেছেন এটা কি তিনি বুঝতে পারেন নি! জ্যাঠামশাইয়ের আদরে অভয় লোকের সঙ্গে মেশে না তাঁর চোখে-চোখেই থাকে—বেশ তো, বাস্তবজগতে এর বহু উদাহরণ আছে এ কথা স্বীকার করা যায় না, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ছেলেরা লাঞ্ছক হয় ও-রকম বীর হয় না, ঘরকুনো হয় ঠিকই কিন্তু ওই রকম উল্লুক হয় কি? তার হাজার গুণা স্মৃতি-পরা বন্ধুকে সে দেখছে আর নিজে ওই রকম সজ্ঞের মত স্মৃতি পরে হুহুমান সাজছে—এ কি বিশ্বাসযোগ্য? অভয় নিজেও যথেষ্ট ধনী, তার বাড়ী প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ—কান্তিবাবুর বাড়ীর প্রাচুর্য দেখে ভড়কানো তার পক্ষে শোভা পায় না। বেবী ট্যান্সির কি তখন প্রচলন ছিল? লক্ষ্যেতে যে সব পথের ছবি তোলা হয়েছে—রাস্তাগুলি কীকা কেন? উত্তর প্রদেশের রাজধানীর রাজপথে লোক চলাচল নেই। মায়া ও সরমা তো দেখছি বাড়ীর মধ্যেও বেশ দামী জর্জেটের সাড়ী পরেই ঘুরে বেড়ায়। আর একটি অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ল অভয়ের বাড়ী। বাইরে থেকে মনে হয় এ ঘর একটি হানাবাড়ী—ভাড়া, জীর্ণ অথচ ভিতরে চাকচিক্যের বস্ত্রাধার—ঝকঝকে, তকতকে, সাজানো, গোছানো এ কি ডিটেকটিভ গল্প নু কি? কান্তিবাবুর মত একজন বিচক্ষণ লোক অজয় বলল বলেই যথাসর্বস্ব বন্ধক দিয়ে বসলেন? কিন্তু সরমার চরিত্রটি আদর্শ বলে ধরে নিতে পারে, সরমার ত্যাগ সংঘম শ্রদ্ধার বস্তু।

অভিনয়ে উত্তমকুমার যে পরিমাণ ছেলেমানুষী করেছেন তার জন্তে তাঁকে আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী করব না,—চরিত্রটি যেভাবে বর্ণিত আছে তিনি সেই রূপটি সেই ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন শুধু—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যে তাঁর এখনকার অভিনয়-প্রতিভা শুধু বাঙলাদেশ কেন সারা ভারতের গর্বের বস্তু। বিকাশ রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর হয়েছে। প্রণতি ঘোষের অভিনয় সংযত এবং সাবলীল। ছবি বিশ্বাস জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সম্ভোব সিংহ এবং শোভা সেন শক্তির পরিচর্যই দিয়েছেন। অন্ত্রাঙ্গাণে আছেন—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, তুলসী চক্র, প্রীতি মজুমদার, ধীরাজ দাস, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুরকুমার দাশগুপ্ত, আলোক-চিত্রে বিত্ত চক্রবর্তী এবং সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়।

## ওগো গুনছ

উপরোক্ত ছবিটি সম্বন্ধে কোন কিছু বলার আগে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা জানাই এর কাহিনীকার সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক সাংবাদিক পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে—যাঁর কাহিনী অবলম্বন করে এম, কে, জির এই বর্তমান প্রচেষ্টা রূপলাভ করল—তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এম, কে, জি কর্তৃপক্ষ ছবির আরম্ভে একটি প্লেট জুড়ে



দিয়েও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না—মহুখাথবোধের চমৎকার উদাহরণ! আপিসের বড়বাবু মনোহর স্ত্রী ললিতাকে নিয়ে বেশ সুখী, আপিসে মহিলা-সহকারী মানসীকে সে বোনের চোখে দেখে—তাকে পৌছে দেয় নিজের বাড়ীতে—ললিতার কানে কথাটা ওঠে অন্তরকম ভাবে। অশান্তির সূত্রপাত ললিতাও ওই আপিসে ঢোকে একটি পদে সমাসীন হয়ে। তারপর নানারকম হাঙ্গর ঘটনায় মধ্যে দিয়ে পুনর্মিলন এবং মানসীর সঙ্গে উভয়মিলন ঘটে আপিসের মালিক বোস মশায়ের স্থালকের। এই স্থালকটিকে দেখতে পাচ্ছি ভগিনীপতির আপিসে সে একরকম বেপরোয়া হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিস দিচ্ছে, টেবিলে শুয়ে পড়ছে, গানের সুর ভাঁজছে, ভগিনীপতিরই হোক আর বাবারই হোক, কোন আপিসের মধ্যে এ জিনিষ কখনো সম্ভব? নিমন্ত্রিত অতিথিদের সরবতের মধ্যে সিদ্ধি খাওয়ানোর কৌতুক থাকতে পারে। কিন্তু ভদ্রতা বা শালীনতা থাকে না তবে—হয় না কি—তা বলছি না—হয় নিশ্চয়ই হয়—হয় কোথায়—হয় একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বলে কিন্তু যেখানে ব্যাপক নিমন্ত্রণ সেখানে বিশেষ করে কোন শিক্ষিত সমাজে এ জিনিষ অসম্ভব। যে চিঠি নিয়ে ললিতা লঙ্কাকাণ্ড বাধালে সেটাই বা কি করে হয়? ললিতার মত মেয়ে সে তার স্বামীর হাতের লেখা চেনে না—একবার সে খতিয়ে দেখবে না যে কার হাতের লেখা দেখে সে ঐ লঙ্কাকাণ্ড বাধাচ্ছে? সবার শেষে মনোহর-ললিতা স্বামি-স্ত্রী বলেই যখন বোস মশায়ের সামনে পরিচিত হয়ে গেল তখনও ভ্রমভী বসু সন্দেশের চোখেই স্বামীকে দেখে এসেছেন—এটা না হলেই ভালো হোত। তখনও ঐ সন্দেশের চোখে দেখে আসায় একটু রসহানি ঘটে না কি? অভিনয়ক্ষেত্রে প্রায় সব শিল্পীই সুরনিপুণ ভাবে স্ব স্ব চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্পকুমার, অতনুসুন্দর, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, গ্রাম লাভা, নবরূপ হালদার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, মঞ্জু দে, শোভা সেন, পদ্মা দেবী জয়ন্তী সেন, বাণী গাঙ্গুলী, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিকা ঘোষ, ছবি রায়, গুল্লা দাস, ইরা চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীরা অভিনয়

গম্যোপাধ্যায়; সঙ্গীত ও ক্যামেরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে অনিল বাগচী ও গুপ্ত।

### আমি বড় হব

বেশ কিছুকাল বাদে চলচ্চিত্র জগতে দেখা দিলেন শৈলজ্ঞানন্দ। বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে শৈলজ্ঞানন্দের অবদানের বিরাট স্বাক্ষর নতুন করে বলার কিছু নেই—চিত্রজগতও নানাভাবে একদিন পৃষ্ঠ হয়েছে তাঁর কলাপে। শৈলজ্ঞানন্দই বোধ করি প্রথমজন যিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাঙলাদেশের আভ্যন্তরীণ রূপকে ফুটিয়ে তোলেন সর্বসাধারণের সামনে। বাঙলা দেশের, ভিতর বাড়ীর খবরাখবর বোধ হয় তাঁর আগের আর কোন পরিচালকের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং



অভিনব সংলাপ যোজনায় তাঁর কুশলতা সর্জনবিদিত। তাঁর পরিচালিত বর্তমান ছবিটির কাহিনী রচনায় তাঁর আবেগাশ্রয়ী মনই ধরা পড়েছে। “আমি বড় হব”র ভিত্তি-প্রস্তরই খোদিত হয়েছে আবেগ ও আদর্শকে কেন্দ্র করে। দয়াময় স্ন-উপার্জনে অক্ষম, কখনো মেয়ের বিয়ে, কখনো ছেলের পৈতে এই জাতীয় ভাঁওতা দিয়ে সে উপার্জন করে—তার বড় ছেলে দেবনাথ বিধবা জালিকার কাছে থেকে সত্যিকারের মানুষের মতই মানুষ হচ্ছে, দয়াময় তাকে কেড়ে নিতে চায়—জালিকা ঐ বাপের কাছে কিছুতেই তাকে দিতে চায় না। ছেলে রাগিগঞ্জে এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে থেকে পরীক্ষা দেয়—সেখানে সে যথেষ্ট অর্থাৎ হয়ে ওঠে তারপর ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ নানা ঘটনার পর দেবনাথের সঙ্গে ব্যবসায়ী-কন্যা অমলার শুভ-মিলন এবং সকলের সঙ্গে সকলেরই আনন্দময় মিলন ও মধুময় পরিসমাপ্তি। ছবিটিতে দেখলুম পথের প্রাণাঙ্গই বেশী, অনেক কিছু ঘটনা পথেই ঘটেছে কিন্তু আশ্চর্য লাগল পথগুলিকে কঁাকা কঁাকা দেগে, পশ্চাৎপটগুলি যে কুত্রিম তা সহজে ধরা যায়। একটা কথা বলব যে ছবিটি সর্জন-উপভোগ ঠিকই এবং দর্শক সাধারণকে আনন্দও দেয় যথেষ্ট কিন্তু তবু বলব যে ছবিটি এখনকার দিনের উপযোগী নয়, এ ছবি যুগস্থলভ দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় অন্ততঃ পনেরো বছর পিছিয়ে আছে।

অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন বশবী অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষ অভিনেতাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আসন সংগ্রহ করে নিয়েছেন কালী বন্দ্যো—দয়াময়ের চরিত্র তাঁকে সেই আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। অপূর্ণ সংবেদনশীল অভিনয়ে দর্শকমন আকৃষ্ট করে তোলেন শোভা সেন। জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় পরম স্বয়ংগ্রাহী এবং মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিজু এবং হামিদ আমরা প্রশংসাই করব এবং সেই সঙ্গে দু’জনকেই বলব নিজেদের অভিনয় প্রতিভা আরও উন্নততর করে তুলতে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গৌর শী, বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সরযুলা দেবী, অর্পণা দেবী, বছকাল পরে শেফালিকা দেবী নৈপুণ্যের পরিচয়ই দিয়েছেন। এ ছাড়া অভিনয়শ্রেণী আছেন জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, গোবুল মুখোপাধ্যায়, মনি শ্রীমানী, শামল, বাবু প্রভৃতি। ছবির পুস্তিকাটি যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে বলি যে বইটিতে অনেক শিল্পীরই নামোল্লেখ নেই। যেমন বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেখর চট্টোপাধ্যায়, গোবুল মুখোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়—এ অনবধানতা ক্ষমা করা যায় না, সমগ্র বইটিতে শিল্পীর নামটাই বা পড়ে গেল, এ কি? ভবিষ্যতে এ বিষয়ে এঁদের সজাগ থাকতে অনুরোধ করি।

## রূপট প্রসঙ্গে

১৩৬২ সালের বসুমতীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রবোধ সান্নালের উপন্যাস। নাম যার ‘পুষ্পধনু’। পুষ্পধনু বর্তমানে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে। এতে রূপ দিচ্ছে উত্তমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অন্নর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণাথী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ এবং নবাগতা মিস বারবা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাজেন সরকার। \* \* \* পৌরাণিক ছবি পরিচালনায় ফণী বর্ষার খ্যাতি সুবিদিত। বর্তমানে ইনি “দাতা কণ” নামক একটি পৌরাণিক ছবির পরিচালনকা ব্যাপৃত। ধীরেন দেব ক্যামেরায় ধরা পড়বেন কমল মিত্র, নীতি মুখোপাধ্যায়, মোহন দোহাল, অসীমকুমার, অরুণপ্রকাশ, মিহি ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুবি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ তিলক, মালিনা দেবী, দান্তি রায়, তপ ঘোষ, অর্পণা দেবী ও নবাগতা অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ। \* \* \* ‘বিভাস্ত’ ছবিটি পরিচালনা করছেন ঐ মুখোপাধ্যায়। এর চরিত্রগুলি ফুটে উঠছে পাহাড়ী সান্নাল, ক বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, আসিতবরণ, আশীষকুমার, সাবি চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী ঘোষের অভিনয়ে। \* \* \* দিল্লী মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেছেন ‘জন্মার্থ’ ছবিখানি। এই ছবি আলোকচিত্রের দায়িত্বভার সম্পন্ন করেছেন ধীরেন দে। এতে দে যাবে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্নাল, বসন্ত চৌধুরী, অল্পকুমার প্রেমাস্ত বসু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হ লাহা, শ্রীমান্ বিজু, শ্রীমান্ বাবুয়া, মালিনা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, মণিকা ঘোষ, রাজলক্ষ্মী নিভাননাকে। একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে বিপিন গুপ্তকে। \* \* \* খগেন রায়ের রচিত ও পরিচালিত ‘দ্বিচক্র’ ছবিটিতে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্নাল, রবীন্দ্র মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অতুলকুমার, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুরত বসু, রেণুকা এবং কাজরী গুহ ও আরো অনেকে।

.. এসব প্রচুদপট ..

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভুবনেশ্বর মন্দিরের ত্রীশ্রীগণেশ-মূর্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র ত্রীপরিতোষ শিল্প কলেক্টর গম্ভীর।



বিস্মের পর থেকে  
এ-পর্যন্ত  
এঁকে ৭,৩০০ বার  
রান্না করতে  
হয়েছে

প্রত্যেক বুদ্ধিমতী গৃহিণীই জানেন,  
বনস্পতির রান্না খেতে সুস্বাদু, কর্মশক্তি  
যোগায় অথচ এতে খরচা কম পড়ে।

ঘরকন্নায় ব্যস্ত বউ ও মায়াদের বনস্পতির প্রতি অসীম  
কৃতজ্ঞতা, কেননা বনস্পতির জনোই তাঁরা কম খরচায়  
পুষ্টিকর খাবার রান্নাতে পারেন।

বাড়ীর গিন্নীর দায়িত্ব কত—ছু'বেলা রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার  
রাখা, আবার ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো দেওয়া—সবই  
তাকে করতে হয়। সারাদিন এভাবে খেটেও সবাইকে হাসিমুখে  
আদর যত্ন করতে হলে তাঁর প্রচুর কর্মশক্তির দরকার।

প্রত্যেক গিন্নীরই পরম বন্ধু

বুদ্ধিমতী গিন্নীরা জানেন যে দৈনিক খাবার থেকেই তাঁরা বেশির  
ভাগ কর্মশক্তি পান। তাই তাঁরা প্রচুর পরিমাণে স্নেহপদার্থ  
দিয়ে ঘরের খাবার তৈরীর দিকে নজর রাখেন। কেননা

স্নেহপদার্থ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' হজমে সহায়তা করে, রক্ত  
ও অস্থি-বিস্তৃষ্ণ কাছে যে'বতে দেয়না এবং সত্যিকার কর্মশক্তি  
যোগায়। গিন্নীরা অনেকেই বনস্পতি দিয়ে রান্নার পক্ষপাতী।  
তাঁরা জানেন, বনস্পতি খাঁটি ও পুষ্টিকর এবং এর প্রতি আউন্সে  
৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' রয়েছে। এতে খরচা  
কম। পয়সার সাশ্রয় হয় ব'লে অজ্ঞাত স্বাস্থ্যপ্রদ জিনিষ  
খাওয়ার সুযোগও পাওয়া যায়। এজন্তেই বনস্পতি গিন্নীদের  
পরমবন্ধু ব'লে পরিচিত—আর আপনিও সেইজন্তেই সবরকম  
রান্নাবান্নায় এই খাঁটি উত্তম স্নেহ ব্যবহার করেন।

বনস্পতি  
গৃহিণীদের পরম বন্ধু



# বাজার বাজার

উদয়ভানু

রাম-মশালের জোরালো আলোয় বজ্রার ছাদ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। চলন্ত বজরা, দ্রুতগতিতে উত্তরপথে এগিয়ে চলেছে। মশালের চতুর্দিকে পতঙ্গ উড়ছে, মৃত্যুর সম্মুখীন। শুক্লারজনী, অল্প অল্প মেঘের মাঝে মধ্যমণির মত চন্দ্রসভা বসেছে যেন। বৃহৎ গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল সৌরাকাশে। অগণিত নক্ষত্র, কোনটি স্থির, কোনটি দপ দপ জ্বলছে ধুকধুকির মত, থরথর কাঁপনে। গঙ্গার অস্ত্র তীরে, অনেক দূরের আকাশ থেকে হঠাৎ একটি তারা খসে পড়লো প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তীব্রগতি উদ্ধাপাত দেখে মনে মনে গন্ধপুষ্পের নাম বলে আনন্দকুমারী। কেমন যেন শঙ্কাকুল চাউনি ফুটেছে চৌধুরাণীর চোখে। মনে মনে বলতে থাকে,—জাতী, চম্পক, সেউতী, মাধবী, কেতকী, পাকুল, বকুল—

কাশীশঙ্করের দৃষ্টি গঙ্গার এক তীরে প্রসারিত। তিনি যেন সবিশেষ চিন্তাময়। চক্ষু উন্মুক্ত, কিন্তু যেন দৃষ্টিশক্তিহীন। তীরে ঘন বনাঞ্চল, দিনমানোও আঁধার দেখায়। মনে হয় যেন অন্ধকারের প্রাচীর, সমস্তে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুর পথ আগলে। কুমারবাহাদুর হয়তো ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবে আছেন। রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনী কি তবে চিরজন্মের মত স্বামিগৃহ ত্যাগ করবে! অসহায়ের মত একা-একা দিন কাটাবে! শয্যায় একাকিনী হবে!

—কুমারবাহাদুর, গড়ম্বন্দ্রাণে এখন রক্তারক্তি চলেছে, তা কি জানেন?

বন্ধাকলে আঙুল জড়াতে জড়াতে হঠাৎ যেন কথা বললে আনন্দকুমারী। একবার লজ্জাভরা চোখ তুলে তাকালো ভীত দৃষ্টিতে। বললে,—মাম্বাণে খুনোখুনি চলেছে।

ধীরে ধীরে আসনপিড়িতে বসলেন কাশীশঙ্কর। সোনালী জরিদার তাকিয়া তুলে নিলেন কোলে। কপালে কয়েকটি ক্ষণপ্রকাশ রেখা ফুটলো তাঁর। কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—হী চৌধুরাণী, আমার তা অজ্ঞাত নয়। আমি জানি। খানিক থেমে আবার বললেন,—সমগ্র বঙ্গদেশেই এই রক্তপাত চলেছে। ব্রাহ্মণবর্গ বৌদ্ধ-তন্ত্রকে নির্মূল করতে বন্ধপরিকর। বুদ্ধের নাম লুপ্ত করতে চায়।

ঈহং হাসলো আনন্দকুমারী। ঘ্রান হাসির সঙ্গে নিরবকণ্ঠে বললে,—কেবল ব্রাহ্মণ নয়, হিন্দুমাত্রই বুদ্ধের নামে ক্ষিপ্ত হয়। শ্রমণ দেখলেই অস্ত্র ধরে।

বাকীনা ললাটরেখা সরল হয় না। কাশীশঙ্কর বললেন,—মাম্বাণে বৌদ্ধ জনসংখ্যা কত?

—আমার সঠিক জানা নাই কুমারবাহাদুর! তবে বেশ কিছু

কথা বলে আনন্দকুমারী। চোখের পলক তোলে না। আঁখি-তারার যেন নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ।

কাশীশঙ্কর মুহূ হাসলেন। বললেন,—ত্যাগ আর ভোগের দন্দযুদ্ধ আর কি!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো আনন্দকুমারী। বললে,—তবে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই।

কৌতূহলের সঙ্গে কুমারবাহাদুর বললেন,—কেন? তুমি কি হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়?

অপ্রতিভ সুরে চৌধুরাণী বলে,—না না, পরিহাস করবেন না। বুদ্ধভরা শ্বাস নেয় সে। কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকে। তারপর বলে,—আমার পিতাকে হুই দলেই মানে। তিনি নাকি পক্ষপাতশূন্য। হুই মতেরই পূজা করেন।

বজ্রার গতি উত্তরোত্তর যেন বেগময় হয়। হাল টানার জলজ ধ্বনি আরও যেন ঘন ঘন শোনা যায়। দড়ির বাঁধন আর হালকাঠের ঘর্ষাঘষিতে কাঁচ-কাঁচ শব্দ ভাসে গঙ্গার বুকে।

কাশীশঙ্কর দু'দিকের তীর দেখতে থাকেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। কালো আকাশে বিরল তারার মত তামস-তারের এখানে-সেখানে ছাড়া ছাড়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তপস্তার হোমানল জ্বলছে। তাই, হয়তো মাঝে মাঝে বাতাসে দ্বতাহতির গন্ধ ভাসছে। দম্ভ চন্দ্রন কাঠের তীব্র সৌরভ আসছে। মঙ্গলফলের আশায় পূজাবস্ত্র চলেছে। সাধক আর সাধিকারা সিঁদ্বিলাভ করছে।

—চৌধুরীমশায় বিচক্ষণ মানুষ, তাই তাঁর পরমতসহিষ্ণুতা আছে। কাশীশঙ্কর বললেন তীর থেকে চোখ ফিরিয়ে। বললেন,—বসিন্ দেশে যদাচার: পারম্পর্য্য বিধীয়তে।

আনন্দকুমারী বললে,—ভিক্ষু আর শ্রমণরা দলে দলে বাড়লা ত্যাগ করছে। পুঁথি পাচার করছে তিব্বতে না কোথায়।

—মাম্বাণে আমি অপরিচিত। কুমারবাহাদুর বললেন চাপা সুরে। বললেন,—আমার প্রতি যদি কোণ পড়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের? কেন না আমরা বোম শান্ত। শক্তিতত্ত্বের পূজা করি, উপবীত ধারণ করেছি।

আনন্দকুমারী আনত দৃষ্টি তুললো। সগর্বে ও সহাস্তে বললে,—এই চৌধুরাণী আপনাব সহচরী থাকতে বৌদ্ধতান্ত্রিকরা ততটা সাহসী হবে না।

খানিক ভাবালু চোখে তাকিয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর। ধীরে ধীরে বললেন,—আগ্নেয়ান্ন ব্যবহার করে কি বৌদ্ধরা?

তাচ্ছিল্যের মুহূ হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। হাসির জের টেনে বললে,—না না, কখনো নয়। খণ্ড গ আঁর ভরবারি জোড়ের সজ্জা।

—তবে আমি ভীত নই। কাশীশঙ্কর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। বললেন,—আমার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমি একাই শতকে আক্রমণকারীকে পরাস্ত করতে পারি।

প্রতিকূল প্রবাহে বজ্রার গতি মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হয়। মাঝির দল যেন হিমসিম খায় হাস টেনে টেনে, তবুও থামে না। লক্ষ্যে না পৌঁছে তারা যেন ক্ষান্ত হবে না।

মনের সঙ্গেপনে আতঙ্ক জাগে থেকে থেকে। আনন্দকুমারী নিউরে নিউরে ওঠে। ম্যাগনেটকে মনে পড়ে যখন তখন। কি দুর্দান্ত হুঃসাহস তার! তার উদ্দেশ্য অসং, ম্যাগনেট নারীমাংসলোভী। চৌধুরাণী এক অব্যক্তিতেই ইচ্ছা-অনলে নিজেকে বিসর্জন দিতে চায় না। এখন মনে পড়লে সজ্জার অধোবদন হয় আনন্দকুমারী। ভয়ানক চোখে চেয়ে থাকে। ম্যাগনেটকে এখন কাছে পাওয়া যায় তো চৌধুরাণী সমুচিত শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু কোথায় ম্যাগনেট! সে এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে।

পবিত্র গঙ্গাধারার আশ্রিতা, তবুও যেন মনের কলুষ-কালি ধোত হয় না। আনন্দকুমারী এক সুপ্ত জ্বালায় জ্বলতে থাকে কণে কণে। মনে মনে ভাবে, এই দেহ দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আর দোষমুক্ত হবে না।

—তুমি কোথায় যাবে চৌধুরাণী? সাগ্রহে শুধোলেন কুমার-বাহাদুর। বললেন,—তুমি কি স্বপ্নে যেতে চাও? সেখানে কি আশ্রয় মিলবে?

—ঈশ্বর জানেন কুমারবাহাদুর! হতাশ সুরে বললেন চৌধুরাণী। বললেন,—আমার অপরাধ কি তাই বলেন। আমি তো তখন নিরুপায়। ম্যাগনেটকে প্রতিরোধ করি, সে সামর্থ্য কোথায়।

—আমি বুঝি অহমানে, তোমার অবস্থাটা করুণা করতে পারি! হেসে হেসে কাশীশঙ্কর বললেন। বললেন,—তোমার পিতামাতা কি তোমার জন্ত তাঁদের সংস্কার ত্যাগ করতে পারবেন।

—জানি না কুমারবাহাদুর। তবে আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি চৌধুরাণী-গৃহের কুপা-প্রার্থী নই। চৌধুরাণী দীপ্তকণ্ঠে কথা বলে যেন। বলে,—মান্দারপে আমার এক পরিচিত ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি নিশ্চয়ই দয়াকরবেন। তাঁর চরণে ঠাই দেবেন।

—কে সেই ভাগ্যবান? কাশীশঙ্কর বললেন জিজ্ঞাসুর সুরে। বললেন,—তিনি অবশ্যই একজন সজ্জন! উদার মনোবৃত্তির মানুষ।

—হঁ। সজ্জন, তবে জানি না বর্তমানে কি তাঁর অভিলাষ। তাঁর মতের পরিবর্তন হবে কি না তাও জানি না।

কি যেন বলতে চাইছেন কুমারবাহাদুর, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। ইতস্ততঃ বোধ করছেন হয়তো। তবুও বললেন,—চৌধুরাণী, তুমি যদি আমাদের সহ স্ত্রীভাষ্যে বাও, ক্ষতি কি! বিদ্যা আর তুমি একত্রে থাকতে পারো দুই সহোদরার মত।

—আপনার প্রস্তাব খুবই সুখকর। এ জন্ত কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। আনন্দকুমারী কেমন যেন কাতর সুরে বললে। বললে,—তবে অস্ত্রের সংসারে গলগ্রহ হ'তে চাই না আমি। আমার জন্ত অশান্তির আগুন জ্বলবে না কি। আপনাদের পুরনারীরা আমাকে কি চক্ষে দেখবেন কে জানে!

কাশীশঙ্কর মিহিকণ্ঠে বললেন,—তোমার ঈপ্সিত জন যদি তোমাকে গ্রহণ না করেন?

মানহাসির অক্ষুট আঁতাস দেখা দেয় আনন্দকুমারীর মুখে। হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। বললে,—তবে আর উপায় কি! মান্দারপে আমাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে থাকতে হবে। ভিক্ষারীকে সকলেই কুপা করবে।

মুখে কথা যোগায় না কুমারবাহাদুরের। তিনি নিচুপ ব'সে থাকেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন যেন তিনি। বজ্রার আলো-উজ্জ্বল ছাদে এক নৈশক বিবাক্ত করে। চৌধুরাণী আনত চোখে আঁচলের পাক দেয় আঙুলে। পাক দেয় আর খুলে ফেলে। তার চোখে ঘূমের আবেশ ফুটেছে। ক্লান্তি আর বিনিদ্রার জড়তা।

পূর্ণিমা আসন্ন, তাই রাত্রির আকাশে গ্রহাণুপুঞ্জের ছড়াছড়ি। দূরদিগন্তে সোনালী ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে। কাশীশঙ্কর উল্লসিত চোখে দেখেন, নীরব সাক্ষীর মত সংখ্যাতীত আকাশ-তারার, মিটি-মিটি দেখছে যেন। আর হাসছে কৈপে কৈপে। মধ্যরাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে উড়ু উড়ু। আনন্দকুমারীর কপালে কক্ষকুন্তল থেকে থেকে চকল হয় নির্মল হাওয়ায়।

সর্দার-মাঝির হঠাৎ কথায় চৌধুরাণী যেন একবার চমকে উঠলো। আনত চোখ তুললো।

মাঝি হঠাৎ সরবে বললে,—রাজামশায়, বজ্রা গঙ্গা ছেড়ে আমোদর নদীতে যাবে ভোরের আগেই।

প্রসন্ন হাসি হাসলেন কুমারবাহাদুর। সহান্তে বললেন,—সর্দারজী, তুমিই এখন আমাদের রক্ষাকর্তা। সমুচিত পুরস্কার দেবো তোমাকে।

মাঝি বললে,—হৃদয় গুমিয়ে লেন রাজামশায়। রাত ফুরতে বিলম্ব আছে এখনও।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমার চক্ষু থেকে নিদ্রা দেবী পলারন করেছেন। নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে। বিদ্যাবাসিনীকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হ'তে পারি না।

সলাঙ্গ চাউনি তুললো আনন্দকুমারী। আঁচল ত্যাগ করে বললে চুপি চুপি,—বিদ্যার জন্ত বৃথা চিন্তিত হবেন না, আমি বতর্কণ আছি। আমার সাহায্যে বিদ্যাকে পাওয়া যাবে জানবেন।

বুকে যেন বল পান কাশীশঙ্কর। মনে সাহস। বললেন,—তবে হৃদয় নিদ্রা ভোগ করা যাক। খানিক থেমে আবার বললেন,—আনন্দকুমারী, তুমি তোমার নির্দিষ্ট শয্যা য়াও, আমি ছাদেই থাকি। প্রহরী হই তোমার।

—আপনি যেমন বলেন তাই হোক।

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে উঠে পাড়ালো চৌধুরাণী। কেমন যেন বিদগ্ধ-চোখে কুমারবাহাদুরকে দেখলো করেক মুহূর্ত। বললে,—আপনি তবে বিশ্রাম করেন, আমি নিচে বাই।

—হঁ। বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের উভয়ের। কাশীশঙ্কর সানন্দে বললেন। বললেন,—নির্ভয়ে নিদ্রা বেও তুমি, বিধা নাই কিছু।

—প্রণাম কুমারবাহাদুর! মৌখিক প্রণতি জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বজ্রার পাটাতনে নামতে থাকে আনন্দকুমারী। একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ ক'রলো সে। কাশীশঙ্করের চোখে স্বপ্নের জড়িমা ছড়িয়ে দিয়ে গেল যেন।



জড়পুতুলের মত চুপচাপ ব'সে থাকেন কুমারবাহাদুর। আনন্দ সমুখে নাই, খেয়াল হয় না যেন। তাঁর মনে হয়, চৌধুরাণী এখনও যেন পূর্ববৎ ব'সে আছে নতদৃষ্টিতে। অদৃষ্ট হয়েছে সে, চোখের আড়ালে গেছে—তবুও যেন চোখে ভাসছে তার দেহ-অবয়ব। কর্ণকূহবে ভাসছে তার মধুমিষ্ট কথার সুর। মদিরার নেশার মত কুমারের চোখে যেন রূপের নেশা ধরে।

রাত্রি সান্ধি-স্বপ্নপ্রহর। নদীর হুই তাঁরে বিল্লী ডাকছে অবিরাম। এক কক্ষ থেকে অল্প কক্ষে দৃষ্টি যায় চৌধুরাণীর। বিম্বিত স্থিরনেত্রে কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোকের প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। সেই কক্ষে রাশি রাশি অস্ত্র। তীর, তরবারি, খড়গ, ভল্ল, বশা, বর্শ, ঢাল আর শৃঙ্খল। কয়েকটি ধনুক কক্ষের এক কোণে সঞ্চিত।

অস্ত্রের আড়ৎ যেন। ক্ষণ দীপালোকে চাকচিক্য খেলে লৌহসারে। আপন ধারে হাসছে তারা।

দেহ টলটলারমান। বজ্রার বেগ দ্রুত। আনন্দকুমারী আর ক্ষণমাত্র ঈড়িতে পারে না, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। শয্যার পাশে রূপার জলপাত্র। পানের ডিবা। গন্ধসার। চৌধুরাণী তার শরীরে যেন বাখা অনুভব করে, অনভ্যাস জল-সাঁতারের অঙ্গ-সঞ্চালনে। কক্ষে সে একা, পুরুষ-চোখের চাউনি নেই এখানে। লজ্জা নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝার শেষে শান্ত-প্রকৃতির মত সে এখন। ম্যালটে যেন ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে। অশান্তির তৃফান। চৌধুরাণীর ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রেছে সে। মান্দারণে ফিরে মুখ দেখাবে সে কি লজ্জার। কোথায় ঠাই হয় কে জানে, ঘরে না পথে।

তপ্ত অক্ষর হুঁটি ধারা নামলো আনন্দের আঁখিপ্রান্ত থেকে। অতি হুৎবে যেন চোখ ফেটে জল বরলো সহসা। কিন্তু, এক বিধাতা জানেন, চিলের মত ছেঁ। মেয়ে ম্যালটেই তাকে হরণ ক'রেছিল। সে নিরুপায়, অসহায়ের মত আশ্রয়ান ক'রেছে। হয়তো বা মৃত্যুভয়ে।

বজ্রা হুলে হুলে উঠলো কার যেন পদাঘাতে। কে হয়তো চলাফেলা করছে যেন একদিকের পাটাতনে। কুমারবাহাদুরকে একা পেয়ে জগমোহন লেঠেল ছাদে উঠেছে।

নিশীত-নদীর জল থেকে চোখ ফিরালেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—কে?

—আপনার দাস কুমারবাহাদুর। জগমোহন একটু যেন চাপা সুরে সাড়া দেয়।

—কিছু বক্তব্য আছে? কাশীশঙ্কর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—ঐ, কথা আছে হজুর! জগমোহন ব'সে পড়লো ফরাসের এক কিতাবার। কুমারের একখানি পা টেনে নেয়। বলে,—পদসেবা করি কুমারবাহাদুর।

অনিচ্ছার সঙ্গে যেন কাশীশঙ্কর বলেন,—চলাফেরা নাই, শরীর-যন্ত্র বিকল হ'তে চায়। গ্রন্থিসমূহ কেমন যেন বেদনা অনুভব করি।

দুই সন্ধ্যা হাতের পেশনে কুমারের পদসেবা করতে থাকে জগমোহন। পা টিপে দেয় সবজনে। হাত চালায় আর কথা বলে,—হজুর, আমাদের মেয়ে উদ্বার না হওয়া শুক চৌধুরীর মেয়েকে যেন ছেড়ে না দেন। এই মেয়েটা সবই জানে।

স্থিরবুদ্ধিশালিনী। সেও আমাদের এক প্রকার কথা দিয়েছে, বিদ্যাকে রক্ষা করবে বিপদ থেকে।

—কথা দিয়েছে মেয়েটা? আরেক বার শুধার জগমোহন, সহাস্তে।

কুমারবাহাদুর বললেন,—ঐ, কথা দিয়েছে। তবে চৌধুরীকন্ডাও বিপদগ্রস্ত। সে-ও যাতে রক্ষা পায় তজ্জন্ত আমিও সচেষ্ট হবো।

—সমাজপতিদের অমাত্য করা যাবে কি! জগমোহন সন্দেহের সুরে বলে। হাত চালায় আর কথা বলে। বললে,—চৌধুরীর মেয়েকে ঘরে বন্দি না নেয়!

—দেখা যাক। কাশীশঙ্কর কথার মধ্যপথে যেন থামলেন। তারপর কি ভেবে আবার বললেন মৃদুহাসির সঙ্গে,—আনন্দকুমারীর মনের মানুষ আছে মান্দারণে, কথার কথার জেনেছি আমি। শুনেছি সেটা একটা টুলো পাণ্ডিত। জাতে ব্রাহ্মণ।

—তবে আর চিন্তা নাই আমার। জগমোহন চিন্তিত হয়ে থাকে যেন। বলে,—আমি ঠাওরেছি মেয়েটাকে হয়তো আপনিই—

—ছি ছি! তোমার বুদ্ধিস্বস্তি লুপ্ত হয়েছে না কি? কুমারবাহাদুর ঈষৎ চোখ পাকিয়ে বললেন। বললেন,—আমি বিবাহিত, যোগ্যপত্নী আছে আমার সংসারে। অল্প নারীতে আসক্ত হওয়ার কোন কারণ নাই আমার। এমন কথা শোনামাত্র আমার গৃহিণী মহাশ্বেতা হয়তো দেহত্যাগ করবেন।

—তা বটে। তা বটে। জগমোহন বললে ফিসফিস কথা। বললে,—তবে হজুর, মেয়েটার চোখে আমি লোভ দেখতে পেরেছি। আমরা জেতে ছোট হ'তে পারি, চোখের দৃষ্টিতো হজুর ছোট নয়। আপনার প্রতি চৌধুরীর মেয়ের—

মৃদুমন্দ হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—চুপ! চুপ! বাতাসে কথা ভাসে। কি কথা কার ফাণে যায় কে বলতে পারে।

ফিসফিসিয়ে বললে জগমোহন, পদসেবার ক্ষণেক বিরত হয়ে। বললে,—সত্য বলুন কুমারবাহাদুর, আমার অনুমান মিথ্যা কি না?

আবার হাসলেন কুমারবাহাদুর। অশ্রুট, অল্প হাসি। বললেন,—চৌধুরীকন্ডাকে আমিও পরীক্ষা করেছি, তার মন জেনেছি। মেয়েটার প্রকৃতি সরল, স্বভাব কিঞ্চিৎ চঞ্চল।

জগমোহন কথা বলতে ইতস্ততঃ করে। বলে,—হজুর, আপনি কি চৌধুরীর মেয়েকে আপনার চরণে ঠাই দেবেন?

এপাশে ওপাশে মাথা হুলিয়ে কাশীশঙ্কর বললেন,—না, না। তোমার ধারণা ঠিক নয়। আনন্দকুমারী আমাদের সহ মান্দারণে যাবে। ততঃপর আমাদের করণীয় কিছু নাই। তার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো জগমোহন। চিন্তাভুক্তির প্রসন্নতা ফুটলো মুখে। তার শরীরের সমস্ত পেশীসমূহ যেন জেগে উঠতে থাকে। বন্ধ বিস্তারিত চক্ষু ফুটে ওঠে। আর কোন কথা বলে না, পদসেবার কাজে লাগে হৃষ্টচিত্ত।

কুমারবাহাদুরের চোখে মনোভাব আবেশ! আব যেন জেগে ব'সে থাকতে পারেন না। তাঁর বিশাল চোখ দু'টি মুদ্রিত হয় ধীরে ধীরে। তন্ত্রাজড়িত কুমারের মুখে কথা শোনা যায় মিহি সুরে কাশীশঙ্কর বললেন,—যদি নিজামুদ্বাহই, স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বেই আমাদের

—যেমন হুকুম হবে হজুর। জগমোহন সোৎসাহে কুমারের দেহ মর্দন করতে করতে বললে।

ঘুম-জড়ানো সুরে কাশীশঙ্কর বললেন,—তোমার দৈহিক শক্তি দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে না কি! ঠিক মনে হয় আনাব দেহে যেন হাত বুলাও তুমি। দলাই মলাই করবে কোথায়, তা নয়।

পরাজয়ের হাসি হাসলো জগমোহন। বললে,—সে কি কথা হজুর! আমার দেহে বত শক্তি আছে সেই জোরেই তো সেবা করছি।

কাশীশঙ্কর বললেন,—তবুও আমার বোধ হয় না কেন? বোঝাই যায় না।

—মাজ্জনা করেন কুমারবাহাদুর, আমার আর শক্তি নাই। জগমোহন সলজ্জায় বললে। বললে,—আপনার দেহ লোহার তুল্য হজুর!

হয়তো নিজায় ডুবে গেছেন কাশীশঙ্কর। তবুও হেসে হেসে কথা বললেন ঘুম-জড়ানো সুরে। বললেন,—শরীরচর্চা ত্যাগ করি নাই আমি। সপ্তাহে ক'টা দিন এখনও মল্লভূমিতে যাই। ক'টা পাশোয়ানের সহ লড়াই করিতে হয়।

—আমি তা জানি কুমারবাহাদুর। জগমোহন পরাস্ত ভঙ্গীতে বললে,—আপনার দেহের গঠন দেখলেই ধরা যায়।

লেটেল জগমোহনের কথা কানে যায় কি না যায়। কাশীশঙ্করের নাসিকা গর্জ্জাতে থাকে সহসা। তিনি গভীর নিজায় ডুবে যান ক্ষণিকের মধ্যে।

নীচের কক্ষে একজনের চোখে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। সে আনন্দকুমারী। দুহ্মকেননিত শয্যায় শুয়ে চৌধুরাণী তবুও জেগে থাকে। জ্যোৎস্না-ধবল আকাশে চোখ তুলে চেয়ে থাকে। বজ্রার জ্বালনা উদ্ভুক্ত। দাঁড়ী-মাঝিদের হাল টানার শব্দটা যেন প্রকট হয়ে ক'ন বাজে। দড়ি আর বাঁশের সঘর্ষের ক্যাচ ক্যাচ শব্দ।

আনন্দকুমারী বিপণ্ডিত, তবুও মাঝে মাঝে তার বক দুক দুক করে। অজ-প্রত্যর্গ হিমশীতল হয়। সমাজের ভয়, সমাজপতিদের রোষদৃষ্টি আর শাস্তি-শাসন, আত্মজনের কটুভক্তি—চৌধুরাণীর চোখের চাউনি স্থির হবে থাকে আকাশে। আশঙ্কার থিকি-থিকি আগুন জ্বলে যেন বক্ষমাঝে। ভয় ভয় করে—যদি সমাজ স্থান না দেয়। অগ্নি-পরীক্ষার বাচিয়ে নিক সমাজ, সেই ভাল হয়। চৌধুরাণী রাজী আছে। আপত্তি জানাবে না কখনও।

চন্দ্রকান্ত ব্রাহ্মণের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হয় আনন্দকুমারী। তাঁর প্রতি কি এক জাতকোষে প্রতিহিংসা গ্রহণের স্পর্শ লাগে যেন মনে।

বজ্রার গতিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকুমারীর বক্ষস্পন্দনও যেন দ্রুততর হ'তে থাকে। হৃচ্চিন্তা নিজাকে গ্রাস করে। কটকটীন শয্যা, তবু ঘুম নেই চোখে।

দৈহিক ক্লান্তিতে শুধু নিশ্চুপ সে। স্বরবোগের পর যেমন দেহ ঝিমিয়ে থাকে।

মাঝি আর মাল্লাদের হেঁচা হেঁচা কথা, জলে ভালচাপনার ছপাছপ শব্দ, দুই ভৌরভূমিতে বিল্লার ডাকাডাকি—গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত রূপ দেখেও ভীতা হয় যেন আনন্দকুমারী।

নাসিকা গর্জ্জনের কণকাল পরেই জগমোহন কুমারবাহাদুরের পদসেবায় বিরত হয়। পাছে তাঁর ঘুমের বাঘাত হয় সেজন্ত পা টিপে টিপে ছাদ থেকে নীচে নামলো সে। কোঁতুলের বশে একবার সন্ধানী-চোখে দেখলো বজ্রার কক্ষমধ্যে। আলিত দীপালোকে দেখলো যে, শুভ্র শয্যায় কে যেন রাশি রাশি খেতপুষ্প ঢেলেছে। শয্যায় শয়ানা চৌধুরাণী যেন এক স্থির-শোভা। দেখতে দেখতে জগমোহনের মত কঠিন মাত্রায় চোখ ফিরাতে পারে না। জ্ঞানশূন্য বিষুদ্ধের মত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

আনন্দকুমারী নিদ্রা বায়নি। নিম্নলিখিত চক্ষে গাঢ় চিন্তায় কি যেন ভাবছে। গভীর রাত্রির মত তার চিন্তারশিও মস্তিকে ঘনীভূত হ'তে থাকে। বিনিদ্রায় ও মুদিত চক্ষে নিজের অবস্থা চিন্তা করে হয়তো। বুকে হয়তো তার আহ্নান জ্বলছে। ভয় আর ভাবনার সর্বাক রোমাক্ষিত হয়ে আছে।

সিঁড়ির ধাপে ব'সে পড়লো জগমোহন। ঘুমে তার চক্ষু আর মুক্ত থাকতে চায় না। তার দৃষ্টিতে হুটে উঠেছে জঙ্গলাকর্ণ বিরল বসতির গড়-মান্দারণ। হু' কুল প্রাবিত খরশ্রোতা আমোদর নদীর তীরে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গতোষণ দণ্ডায়মান। দুর্গের পাদমূল নদীর গর্ভে নিমজ্জিত। কিন্তু দুর্গ না কি জনশূন্য—পত্নী আর পক্ষীর আবাসে পরিণত। দুর্গ-প্রাচীরে বট আর অশপের চারা, বস্ত্র আগাছার আন্তরণ। দুর্গতোষণ ভয় হওয়ায় দুর্গের রূপ যেন আরও ভীতিপ্রদ দেখায়। পরিত্যক্ত বাস্তবহুমুহু শৃগাল আর কুকুরের আত্মনা।

ফোন ৩৪-৫০০২

সবকিছু সম্মত  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
গিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাস  
কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স KLS  
১৬৭ বি. বঙ্গ বাজার ফ্রীট • কলিকাতা-১২

কিন্তু মান্দারগ-বাসিনী বিদ্যাবাসিনী যেন ভয়লেশহীন।

যে-দেশে মনুষ্যের বাস দিনে দিনে লুপ্ত হ'তে চলেছে, সেখানে রাজকুমারী পরম নিশ্চিন্ততার কালাতিপাত করেছেন। তিনি যেন হিংস্র পতকে পরোয়া করেন না, সর্প-বিষকে ভয় করেন না, দ্রবুত দম্ভানবকেও মানেন না।

তিনিও জাগরুক। তাঁরও চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। জাঙ্ঘ্যমান বাতির আলো তাঁর দুই পাশে। সমুখেও একটি বাতি জ্বলছে।

যু্য নামে না চোখে; তাই রাজকুমারী লিখনকার্যে ব্যাপৃত। তাঁর হাতে লেখনী। একাগ্রচিত্তে বিদ্যাবাসিনী শাস্ত্রপুঁথি নকল করছেন পাতার পর পাতা। শুভ্র তুলট কাগজ ক্ষণমধ্যে কৃষ্ণকালির আধারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জলন্ত বাতির আশপাশে কৌটপতঙ্গের জটলা। অগ্নিদগ্ধ হ'তে চার উড়ন্ত কীট। আগুনের দাহিকায় আত্ম-বিসর্জন দিতে চায়।

—রাজকুমারী!

নিশেধ রাত্রির মৌনতা সহসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু রাজকুমারী একাগ্র মনোনিবেশ টুটলো না। বিদ্যাবাসিনী পূর্ববৎ লিখনকার্যেই রত থাকেন।

আহ্বানকারী পুনরায় ধারকণ্ঠে ডাকলো,—রাজকুমারী!

এই গহন রাতে এই ভয়পুরীতে কোন প্রেতাঙ্ক বা ব্যতীত কে আর কথা বলবে! তাও পুরুষকণ্ঠের সম্ভ্রান্ত আহ্বান।

বিদ্যাবাসিনী ধারণা করেন হয়তো পাঠানপ্রহরী প্রহরার কাজে কাস্ত হয়ে অন্ধরে এসেছে, কিছু বস্তুব্য আছে তার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের কর্ণেদ্বয়কে অবিশ্বাস করেন। পাঠানের কণ্ঠস্বর কি এতই ঞ্জতিমধুর! পাঠানের কথার স্রব কর্ণকণ্ঠ, কণ্ঠ যেন গর্দভনিমিত্ত।

রাজকুমারী তিলমাত্র বিচলিত হন না। লেখনীও থামে না। যদিও মনে মনে আশঙ্কিত হতে থাকেন। পরিচারিকা অস্ত্র ঘরে ঘোর নিজামদার।

আবার ডাক শোনা যায়।—রাজকুমারী!

—কে? বিক্ষোভিত চোখের প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে বিদ্যাবাসিনী বললেন,—কে তুমি? পরিচয় না জানা পর্য্যন্ত সাড়া দিতে পারি না।

কক্ষের বাহিরে অদৃশ্য কে যেন, কথা বলছে অপরিচিত স্রবে। আবার তার কথা শোনা যায়। সে বলে,—রাজকুমারী, আমি চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্ত! অক্ষুটে এই নামটি সবিস্ময়ে উচ্চারণ করেন বিদ্যাবাসিনী। মসাপাত্রে লেখনী স্থাপিত করে পরিধেয় বস্ত্র বিজ্ঞপ্ত করেন উদ্ভ্রসে। কেমন যেন সঙ্গজ্ঞার আসন ত্যাগ করলেন। মাথায় শুঠন টেনে উঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে বললেন—আপনি এই অসময়ে কেন আবার কষ্ট করলেন? কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি?

—হাঁ, তা আছে বৈ কি। চন্দ্রকান্ত অন্ধকারেই থাকেন, কথা বলেন। আত্ম-প্রকাশ করেন না আলোর আভার! বললেন,—

শুনলাম, বাঙলার নবাবের সন্নীপে একজন দূতকে পাঠিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত হয়তো পথশ্রমে শ্রান্ত। শানিক খেমে আবার বললেন,— তাঁর কত্মাহরণের বড়ঘন্টে আপনাদের ও আমার নামও যুক্ত করেছেন।

—আমার দুর্ভাগ্য আর কি!

অবিজ্ঞপ্ত বস্ত্র ঠিকঠাক করতে করতে কথা বললেন রাজকুমারী, বিষয় কণ্ঠে। বললেন,—আমার অপরাধ কি তাই শুনি?

—তা আমার অজ্ঞাত। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে বললেন। অন্ধকারে থেকেই বললেন,—মিথ্যা অভিযোগ লিখানো হয়েছে কোতোয়ালে। নগররক্ষক শুনা যায় হিন্দুবিদ্বেষী, তজ্জন্মই ভয়। বর্তমানে নগররক্ষকের কার্যে একজন মুগলকে নিযুক্ত করেছেন বঙ্গের নবাব।

—আমি তো নিরুপায়। বললেন রাজকুমারী, কাঁপা-কাঁপা স্রবে। বললেন,—বাই হোক, এখন রক্ষা পাওয়ার কি উপায় তাই বলুন। আত্মহত্যায় কি রেহাই পাওয়া যাবে?

চন্দ্রকান্ত আর কথা বললেন না। দর-দালানে দাঁড়িয়ে থাকেন অপরাধীর মত।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি কক্ষে প্রবেশ করুন। আমার অমুরোধ, দ্বিধার কিছু নাই।

—বিনা অমুমতিতে কক্ষ-প্রবেশে সাহসী হই না। চন্দ্রকান্ত ক্রান্ত স্রবে বললেন। কথার শেষে দ্বারে দেখা দিলেন। রাজকুমারী আড়নয়নে দেখলেন, ব্রাহ্মণ সত্যই পথশ্রান্ত। ভয়ের আবেগ তার মুখাবয়বে। চোখে চিন্তাকুল চাউনি।

শুঠন ঈষৎ টেনে কথা বলেন বিদ্যাবাসিনী। বললেন,—বা সত্য তা কি মিথ্যা হয়? ভিত্তিহীন অভিযোগের মূল্য কি?

—নগররক্ষক সজ্জন নয়। যেকোন অছিলায় আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। বিপদে ঠেলতে পারে। তাই বৃত্ত আশঙ্কা আমার। কথা বলতে বলতে চন্দ্রকান্তের শ্বাস রুদ্ধ হয় যেন।

যৌবন টলমল করছে। সৌন্দর্য্য প্রভাপ্রাচুর্য্যে প্রসীপ্ত মূর্তি রাজকুমারী। যদিও অবহেলা ও অনাসক্তিতে বিদ্যাবাসিনীর রূপ বর্তমানে কিঞ্চিৎ স্তান। চূর্ণ অলকগুচ্ছে আবৃত রাজকুমারী মুখখানি চন্দ্রকান্তের নজরে পড়ে না। কি যেন লজ্জায় বিদ্যাবাসিনী অলকগুচ্ছ বক্ষপরে নামিয়ে দিলেন।

—আমার মুড়াই মঙ্গলের। স্বগতঃ করলেন রাজকুমারী, সকাহরে।—বুখা বিড়ম্বনা আর সহ হয় না। অকারণ দোষারোপ আমার প্রতি কেন?

—কিকর্তব্য রাজকুমারী? চন্দ্রকান্ত মুহূর্তে শুধোলেন। আমি বলি এই গ্রাম ত্যাগ করাই উচিত।

—বিচারবোধ নাই আর আমার। মুড়া ছাড়া গতি দেখি না। কথা বলতে বলতে বিদ্যাবাসিনী আঁখিগ্রাস্ত জাঁচলে মুছলেন! বললেন,—সপ্তগ্রামে এই সকল ভিত্তিহীন স্বেদ বায় তো আপদের অস্ত্র থাকবে না। তিনি আর রক্ষা রাখবেন না।

চোখাচোখি হ'তেই ইশারায় ডাকলেন চন্দ্রকান্ত। মুখে যেন তার অমুরোধের ভঙ্গিমা। তাঁর আহ্বান-ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়া

ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। রাজকন্ডার মুখে-চোখে যেন সন্মোহিতার ভাবাবেগ।

চন্দ্রকান্ত দুঃখের হাসি হাসলেন যেন। রাজকুমারী কাছে আসতেই সজ্ঞাসে ইদিক-সিদিক দেখলেন যেন। তারপর বিদ্যাবাসিনীর একখানি নখর-নরম হাত নিজ করে ধারণ করলেন। ফিস-ফিস বললেন—আমার সহ আইস। কথায় কথায় পরিচায়িকা যদি জাগ্রত হয়!

—কোথায় যাবো? আবেশ-আকুল কণ্ঠে বললেন রাজকন্ডা। বললেন,—মরণের পথে কি?

ক্ষীণ হাসির সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বললেন,—না। এখানে বাতির আলো, পার্বকক্ষ অন্ধকার।

কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ সেই আঁধার ঘরে প্রবেশ করলেন। রাজকুমারীও বন্দিণীর মত তাঁকে অনুসরণ করলেন। ব্রাহ্মণ আবার বললেন,—উবার আলো ফুটুক, তারপর যা হয় একটা স্থির করা যাবে।

বিদ্যাবাসিনীর আত্মজ্ঞান যেন লোপ পেয়েছে। মুখের কথা হারিয়েছেন। চন্দ্রকান্তের করচাশে তাঁর হাত পিষ্ট হতে থাকে।

কন্ডাসে ও ভরে ভরে রাজকন্ডা বললেন,—আমি ভীতা হই, পরিচায়িকা যদি সহসা জেগে ওঠে।

চন্দ্রকান্তের আকর্ষণ যেন তাঁদের মতই। তিনি রাজকন্ডার অস্ত্র হাতও নিজ হস্তে ধারণ করলেন। চুপি চুপি বললেন,—আমার দুঃসাহস মার্জ্জনীয়। শত বিপদেও কেন যে আমার মানস চক্ষু প্রবোধ মানে না কি জানি! অসংঘম আজ আমার মনকে অধিকার করেছে।

রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনী যেন নীরব নিম্পন্দ। দ্রুত দ্রুত বন্ধ, ঘন ঘন শ্বাসপতন হয় সশব্দে। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে একবার ইচ্ছা হয়, এই কক্ষ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, এই মুহূর্তে। পদচারণায় সচেত হন রাজকুমারী, কিন্তু তাঁর গতি বাধা পায়। দিব্যজ্ঞান লুপ্ত হলেও অনুভবে বোধেন, তিনি যেন কার বাহুপাশে আবদ্ধ।

বৈশাখী-রাতের এলোমেলো মত্ত-বাতাস চলেছে বাইরে, শনশনিয়ে। রাত্রির নিশ্চলতায় আমোদবোধের প্রবাহধ্বনি ভেসে আসছে। শুভ্রাতিথির চন্দ্রাকর্ষণে নদী যেন আজ উজ্জগামী। তাঁদের দিকে মাথা তুলছে জলকল্লোল। প্রগলভার খিল-খিল হাসির মত জলের ধারা সশব্দে এগিয়ে চলেছে।

মুক্তির আশায় বিদ্যাবাসিনী আরেকবার যেন উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাহুবন্ধন কত যে কঠোর! বুধা চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকন্ডা। অনুমানে বুঝলেন, মুক্তি নেই। পুরুষের কাছে নারীর মুক্তি কোথায়? [ক্রমশঃ।

### গৃহবিচ্ছেদ ও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট

“গৃহবিচ্ছেদ যে নিতান্ত নৈসর্গিক তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়াও সহজ কর্তব্য নহে। সমুদায় পরিবার প্রায় সঙ্গুণসম্পন্ন হয় না; পরিবারের মধ্যে কেহ বা ভাল, কেহ বা মন্দ। ভাল-মন্দে মূল্যের রূপ মিল হয় না; মন্দে মন্দে কখনই মিল হয় না। কখনও কখনও গুণবানদিগেরও পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যেহেতু, গুণ নানা প্রকার, কেহ বা এক গুণের সাতিশর পক্ষপাতী হইয়া অল্প গুণের বংশরোনাস্তি ঘেঁষ করে, কেহ বা অল্পবিদ্বিষ্ট গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তখন তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, যে সকল পিতা-মাতা সন্মান ও সমাদরের উপযুক্ত, তাহাদিগের পুরস্কারও হইয়া থাকে। যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া জায়াভ্রমগত পথে চলিতে পারেন, তাহাকে কেহ কখনও ঘৃণা বা অনাদর করে না।”

“সাংসারিকশ্রেণী অনেক প্রকার দুঃখ ও কষ্ট আছে। কতকগুলি লোক ভৃত্যের অধীন। ভৃত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সকল কার্যের ভার দেন, ভৃত্য বাহা করে তাহাই হয়। কতকগুলি লোককে ধনবান জ্ঞাতি-কুটুম্বের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। তাহারা সেই জ্ঞাতি-কুটুম্বকে সন্তুষ্ট করিতেও পারেন না, কষ্ট ও বিরক্ত করিতেও তাহাদিগের সাহস হয় না। এমন অনেক স্বামী আছেন তাহারা কেবল হুকুম খাটাইতে চাহেন, এমন অনেক পত্নী আছেন তাহারা স্বামীর একটি কথাও গ্রাহ করেন না। এই ভূমণ্ডলে অনায়াসেই লোকের মন্দ করা যায়, কিন্তু ভাল করা সহজ কর্তব্য নয়। একজনের সুবুদ্ধিতে ও সঙ্গুণে অনেকে সুখী হইতে পারে না, কিন্তু একজনের মূর্খতাদোষে ও পাশে অনেকেই অসুখী ও বিবম দুরবস্থাপন্ন হইয়া উঠে।—তারানন্দর তর্করত্ন অনুদিত জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ “রাসেলাস” গ্রন্থ হইতে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২৫এ ভাদ্র, সর্বৎ ১১১৪।

# সৈয়দা হার্ডওয়ার

স্পেনসার স্মরণ দত্ত

হা। কখনও কোরব না, পণ করেছিলাম, তাই ক'রতে হোল।

বিয়ে নয়—চাকরী। আমাদের দেশের আইবুড়ো ছেলেরা পণ করে বিয়ে কোরব না। কিন্তু লগুনে এসে পণ করে বসলাম যে চাকরী কোরব না। কিন্তু চাকরী করতে হোল। নতুন আর কি? পণ করি সকলে। পণ ভাঙিও সকলে।

ভারত সরকারের ষ্টালিং তত্ত্ববিদ্যে ঘটিতি। বিলেতে টাকা আনাতে যথেষ্ট তাগাদা দেখা দিল। ভাবলাম—ভালই হোল। দেশের টাকা তো অনেক গরুচ করলাম। এবারে কিছু উপার্জন করি।

ব্যাবিষ্টারী পড়ছিলাম—তানে 'বার' করছিলাম। টাইপটা জানা ছিল। কাজ পেলাম অতি সহজেই। এত সহজে কিন্তু এদেশে সকলের কাজ ভোটে না।

বিলিতি অফিস। এর আগে কিছু ইংরেজের সংগে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু তা ত দানা বাঁধেনি। ভাবলাম হয়তো নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু এক মাস কাজ হবার পরেও কোন অভিজ্ঞতাই হোল না। আলাপ হোল না বিশেষ। ইংরেজ জাত বড় 'কোভ'।

'সামার' এসে গেল—বহু প্রত্যাশিত 'সামার'। এরা যেমন ক্রিসমাসের জন্ম দিন গোণে, তেমনি দিন গোণে 'সামার-হলিডের' জন্ম। হ' সপ্তাহ লম্বা ছুটি। এরা তখন সকলে বেরিয়ে পড়বে। আর কোথাও না যাক লগুনের কাছাকাছি, আইল অফ ওয়াইট বাবেই, যেমন কোলকাতার লোকেরা পূজোর ছুটিতে মধুপুর বেড়াতে যায়। যে ব্রকে কাজ করতাম, সেই ব্রকেই অল্প এক ঘরে সামার হলিডের জন্ম লোকোভাব হওয়ায় আমার কাজ বদল হোল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে।

লেসলি থার্ডেডের সংগে এখানেই আলাপ। আমাদের ঘরটা



বেশ বড়। ছ'টা বড় বড় টেবল পাতি। আর সেই ঘরেরই এক কোণে পার্টিসান দেওয়া ছোট জায়গার সুইচ-বোর্ড। লেসলি টেলিফোন অপারেটর। ঘরের আর এক প্রান্তে টাইপরাইটার নিয়ে কাজ করে যাই। অল্প লোকের আলোচনা মাঝে মাঝে শুনি। মাঝে মাঝে শুনি না। ওরা কাজ করে। কাজের কাকে কখনও গল্প করে, হাসাঠাটা করে। আমি তাতে যোগ দিই না, লেসলিও দেয় না। এইখানেই আমাদের দু'জনের মিল।

এ ঘরে আনাব প্রথম দিনই—লাকের একটু আগে আমার মনিব ডাকলো, বললাম, কা' ব্যাপার?

তোমাকে লাঞ্চ আওয়ারে এক ঘণ্টা সুইচবোর্ডে বসতে হবে—যখন মি: থার্ডেড থাকবে না।

কিন্তু আমি যে টেলিফোনের কিছু বুঝি না, ভয়ে ভয়ে বললাম।

ও খুব সোজা ব্যাপার। তোমাকে মি: থার্ডেড বুঝিয়ে দেবে—আর এ কাজ তোমারই, এ ঘরে যে টাইপিষ্ট থাকে এটা তার কাজ।

কোনও মতামত প্রকাশ করলাম না। কারণ লাভ নেই তাতে। কাজের প্রসঙ্গে থার্ডেডের সংগে আলাপ হোল। এবং প্রথম আলাপে অবাক হলাম—ওর কথা শুনে। মৌখিক আলাপের পরই লেসলি বললে—তোমার উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় তুমি বিদেশী। কা' টিনেটের কোথায় তোমার বাড়ী? নিজের গায়ের রং-এর দিকে তাকালাম। ভাবলাম রসিকতা করছে না তো? এ আবার কেমন রসিকতা? কিন্তু ইঠাং কোণের দিকে নজর পড়লো। সাদা লাঠি। এ দেশের অন্ধ বা যারা প্রায় অন্ধ—তারা ব্যবহার করে। ঐ সাদা লাঠিই তাদের চিনিয়ে দেয়। বুঝলাম—লেসলি প্রায় অন্ধ, ওর প্রস্থের উত্তরে বললাম—আমি পূব দেশের লোক—ভারতীয়।

লেসলি আর কিছু প্রশ্ন কোরল না। আমাকে কাজ বুঝাতে লাগলো। কিছুই বুঝলাম না। এবং সেটা আমার দোষে নয়। ওর দোষে। ভাল করে কাজ বুঝাতেই পারলো না। একটু পরেই সাদা-লাঠি হাতে নিয়ে ম্যাক পরে বেরিয়ে গেল। আমি বসলাম সুইচবোর্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা ব্রকের লোক ভেঙে পড়লো আমাদের ঘরে।

হৈ-চৈ—সকলেরই এক কথা। টেলিফোন বিভ্রাট। কে দশ মিনিট লাইন চেয়ে পাচ্ছে না—কে মিনিট্টী অফ হেলথের সংগে জরুরী আলোচনা করছিল—হ'বার তার লাইন কাটা গেছে এই সব। সামনের চেয়ারে বসে থাকা ইছদী মেয়ে মিস ফ্রিডেনবার্গ উঠে বললে—মি: বোস নতুন লোক। আজই প্রথম।—সকলে হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি বসে ঘামতে লাগলাম। একটু পরেই লেসলি আসতে আমি গেলাম লাঞ্চ খেতে।

দুই

লেসলির চেহারায় কোন স্বকীয়তা নেই। বয়সও অল্পমান করা যায় না। ওর সংগে আলাপ করার আগ্রহ মোটেই ছিল না। কিন্তু আলাপ হয়ে গেল। আমার 'অক্সিফ্যাল আওয়ার' পাকা চাকুরীদের চেয়ে সপ্তাহে এক ঘণ্টা বেশী। আমার কাজ পাকা নয়—এ জন্ম সোম থেকে বৃহস্পতি প্রতিদিন পনের মিনিট বেশী থাকতে হয়। লেসলিও থাকে এই সময়ে। টেলিফোন অপারেটরের এক ঘণ্টা বেশী।

বিভিন্ন সপ্তাহের শেষে একদিন পাঁচটার সময় আমার বেনোবার



# দেখুন!



দস্তক্কর নিবারণে  
বিশেষ  
প্রতিরোধক!

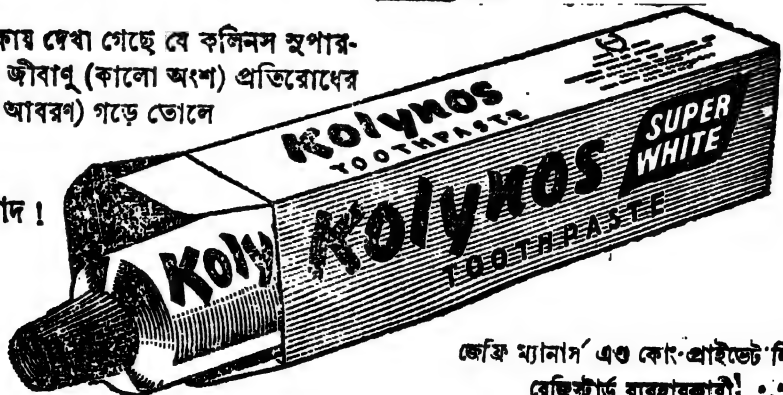


## কলিনস সুপার হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দস্তক্করী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে

পেপারমিন্ট-গন্ধী সুশীতল আনন্দ!



গন্ধ্য করুন, ক্যাপটি  
ধরবার কত সুবিধে।

৩৫৫ ১৯৫৯

জেনি ম্যানাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
বেজিংগার্ড ব্যবহারকারী

প্রয়োজন হোল। ছুটি আমার সওয়া পাঁচে। ভাবলাম লাক আওয়ারের পরে 'বসের' অনুমতি নিয়ে রাখবো। কিন্তু কপাল দোষে লাক আওয়ারের পরে 'বস' আর ঘরে এলো না। পাঁচটা বাজার আগে আগেই ঘরের আর সকলে বেরিয়ে যায়। সামার-টাইম। ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে অফিসের বাবু বাতাস সজ্জব স্থানের আলো পায়। এরা এক মুহূর্ত ঘরে থাকে না। চক্ষের নিমিষে নগর মথুরা। আমিও প্রায় এদের সঙ্গে আগেই 'চায়ারিং' বলে বেরিয়ে এলাম। তার পরদিন সকালে লেসলি আসার আগে আগেই আমাকে বললে—ভাল হয়েছে, তুমি মি: কার্ণার আসার আগে এসেছ।

কেন, 'বস' কি কোনও কিছু রেখে গেছে? বললাম।

তুমি গতকাল বেরোবার আগে আগেই মি: কার্ণার ঘরে এসে তোমার খোঁজ করে। আমি বলেছি তোমার বাড়ীতে একজন অনুস্থ। এই 'কল' পেয়ে তুমি চলে গেছ। আজ সেটা ম্যানেজ কোর।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি—মি: খারগুড, কৃতজ্ঞতার আগে বললাম। 'ডাটস্ অল্ রাইট, ডাটস্ অল্-রাইট' লেসলি দু বার বললে।

কাজ ছিলো না সেদিন খুব বেশী। আস্তে আস্তে টাইপ করছিলাম। কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা। লেসলির কথা। ঘরের পশ্চিম কোণে কাচের পাটিসান করা ওর বসার জায়গা। কাচের মধ্যে দিয়ে ওকে দেখা যায়। সোনালী চুল সাধারণের তুলনায় একটু বড়ই। অবিভক্ত। কলারটা আধময়লা। স্যুটটাও অতি সাধারণ। কিন্তু ভাবলাম—না লেসলি অতি সাধারণ ইংরেজ নয়। দরদ আছে ওর। নয়তো কি দরকার ছিল ওর আমার জন্ত মিথো বসার? আমার ভারতীয় প্রবৃত্তি আমাকে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ করালে।

এর পর প্রতিদিনই পাঁচটার সময় যখন আর সকলে চলে যেত তখন আমি উঠে আসতাম—আমার জায়গা ছেড়ে, লেসলির পাটিসান দেওয়া জায়গার পাশে একটা ছোট আয়না ঝুলান আছে। কেশ-বিভ্রাস করার সময়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতাম। ওর কবে চোখ খারাপ হয়েছে—এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কি না এই সব। লেসলিও আমাকে প্রশ্ন করতো। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মাথুলী প্রশ্ন। পনের মিনিট মাত্র আমাদের সময়। কি আর বেশী আলোচনা হবে? তাছাড়া—সব দিন সময়ও হোত না। আজ হয়তো আমি ব্যস্ত, বলে লেসলি।

ইংরেজদের সম্বন্ধে একটা কথা শুনেছিলাম—'ইফ ইউ ক্যান ব্রেক দি আইস ইট ইজ অল্ রাইট' আমার ঘরে যে আলোচনার 'গুপ' ছিল আমার অজান্তসারেই সে বরফ গলে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে আমি এদের একজন হয়ে গেলাম। কাজের অবসরে যে টুকটাকি আলোচনা হোত আমি তাতে যোগ দিতাম। কিন্তু লেসলি এই সমাজ ছাড়া হয়ে রইলো। মাঝে মাঝে দেখতাম—কখন যে ওর জায়গা ছেড়ে গেছে জানি না। সুইচবোর্ডের কাঁটাগুলো বায়ে বায়ে আঘাত করে করে ঘরের লোকদের সচেতন করতো। আমাদের মধ্যে কেউ তখন উঠে আসতো সুইচবোর্ডে—আর লেসলি সম্বন্ধে মন্তব্য হোত।

অবাক কাণ্ড, ও যে কখন ঘর ছেড়ে গেছে কেউ জানি না।

ওর পা—মাছের পা নয়। হাঁটে ঠিক বেড়ালের মত নিঃশব্দে, এদের মন্তব্য শুনতাম, আবার এক এক দিন আমি সারও দিতাম।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে। আমার চাকরীর মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে। একদিন হঠাৎ অফিসে 'ইসাবেল'ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইসাবেল আমার বন্ধু হিমাত্রিশেখরের স্প্যানিস বান্দবী। তবে লগুন অনেক বছর ধরে থেকে প্রায় ইংরেজই হয়ে গেছে।

তুমি এখানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—ইসাবেল বললে। অবশ্য লেসলি আমাদের ব'লেছিল যে ওদের ঘরে একজন ভারতীয় এসেছে। আমি কিন্তু তখন জ্ঞানতাম না যে সে হচ্ছে তুমি।

তুমি বুঝি এখানে কাজ কর, জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ আমি নর্থ ব্লকে টাইপ পুর্লে কাজ করি। লেসলি আমাদের কাছে প্রায় আসে। আচ্ছা চলি—

ইসাবেল চলে গেল। সেদিন বিকেলে আমি লেসলিকে ইসাবেলদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ আমি ওদের ঘরে বাই মি: বোস! লেসলি বললে। আমি বড় নিঃসঙ্গ। আমার কথা কেউই ভাবে না। এমন কি এই ঘরেই বা আলোচনা হয়—আমি তার বাইরে পড়ে থাকি।

লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো—এই ঘরে আমাদের আলোচনার কোনও দিনই লেসলিকে দেখিনি যোগ দিতে। আমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবু ব্যাপারটা সহজ করার জন্ত বললাম—ঘরে কি-ই বা আলোচনা হয় বোলো। কে আর তাতে বিশেষ যোগ দেয়। আর তাছাড়া তোমার কাজ জনসাধারণের সঙ্গে। জনসাধারণকে তুমি অফিস সম্বন্ধে প্রথম খবর দাও। তোমার এই বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ সব সময়ে ব্যস্ত থাকা কাজ নিয়ে কিছু আলোচনার যোগ দেওয়ার সম্ভব নয়।

জানি মি: বোস, আমি বাইরের লোকের সঙ্গে 'ফার্ট' লিখ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন আমার এত নিঃসঙ্গ তা তোমরা বুঝবে না। তোমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলায় আমার কি আনন্দ—তা তোমরা জানতেও চাও না। আমার চোখ গারাপ—সিনেমা দেখা চলে না। থিয়েটারে ভাল সীটে বসার আমার সামর্থ নেই, ইচ্ছে মত খাবার উপায়ও নেই আমার—ডায়াবিটিস ক্রমী আমি। তার ওপরে আমাকে সাধ্যাতিক্রম সক্ষম করতে হয়—আমার কথা না বলাই ভালো।

লেসলি এর বেশী সেদিন আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু আমি আমার আচরণে লজ্জিত হলাম। এই লোকটা আমার সম্বন্ধে ভেবে একদিন—মনিবের কাছে মিথ্যে বলেছে। অথচ এর কথা আমি কোন দিন ভেবে দেখিনি। ভাববার চেষ্টাও করিনি। আজ ওর কথা ভাবলাম। আমাদের ঘরে থেকে ঘর-ছাড়া লেসলি হয়তো কিছু পরিবর্তনের জন্ত ইসাবেলদের টাইপ-পুর্লে যায়। সেখানে হয়তো সহানুভূতিসম্পন্ন ওরা কোনও প্রশ্ন করে। আমি নিজেও তো ওকে অফিসের পরে কোনও কফি-কর্ণারে একদিন ডাকতে পারতাম। কিন্তু আমিও ডাকিনি। আজ আর ডাকা চলে না। বড় দেবী হয়ে গেছে।

এর পরের দিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দেখলাম লেসলি নিঃশব্দে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, ও ইসাবেলদের টাইপ পুর্লে যাচ্ছে। হঠাৎ ওর অনুপস্থিতি আবিষ্কার করলে মিস ফ্রিডেনবার্গ। কান্ডবিনিবন্ধিত কণ্ঠে টাংকার শুনলাম—'দি ক্যাট ইজ আউট এগেন' হাত ফিরিয়ে মি: কার্ণার দেখলো। 'সুইচবোর্ড' মন্তব্য



বাড়ীর সবাইকে আনন্দ দেবার মতো উৎসবদিনের একটি উপহার...

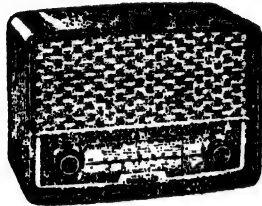
অল-ওয়েভ **ল্যাম্বাল-একো** রেডিও

দাম ২০০/- থেকে

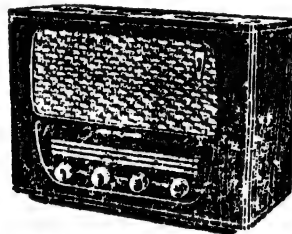


সামনের উৎসবমুখর দিনগুলোয় বাড়ীর সবার জন্তে একটি ল্যাম্বাল-একো রেডিও সেট উপহার দিন—চমৎকার জিনিস, বাড়ীর সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

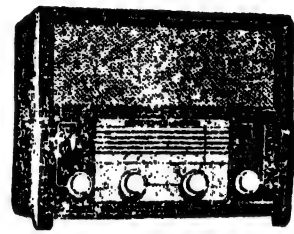
এখানে ছ'টি সুন্দর সুন্দর ল্যাম্বাল-একো মডেল দেখা হল। আরো অনেক রকম মডেল আছে—আজই ল্যাম্বাল-একো ডীলারের কাছে দেখে আসুন।



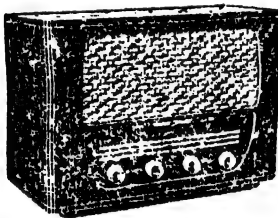
মডেল ২৪১ : ৫ তালু, এসি/ডিসি'র জন্ত ৬ ব্যাণ্ডের সুবিশেষ ২ ব্যাণ্ড সেট। ৫ তালু-এর ড্রাই ব্যাটারী সেটও আছে। দাম ২০০/- নীট।



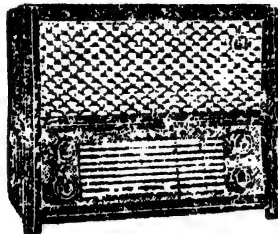
মডেল বি-১০৩ : ৫ তালু, ৬ ব্যাণ্ডের ড্রাই ব্যাটারী সেট। দাম ২২৫/- নীট।



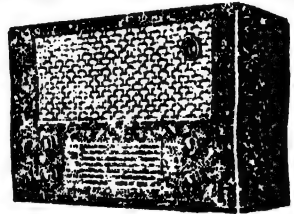
মডেল বি-১১২ : ৬ তালু, ৬ ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডস্ট্রেক ড্রাই ব্যাটারী সেট। দাম ৪৭৫/- নীট।



মডেল এ-১০৩ : ৫ তালু, ৬ ব্যাণ্ডের সেট। এসি কারেন্টে চলে। দাম ৩২৫/- নীট।



মডেল ১০১১ : ৬ তালু, ৬ ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডস্ট্রেক রিসিভার এ-১০১-এসিটে চলে; ইউ ১০১ এসি/ডিসি'র জন্ত। দাম ৪৭৫/- নীট।



মডেল এ-৩১১ : ৭ তালু, ৬ ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডস্ট্রেক সেট, আর, এক ট্রেন টিউন বুক, এসির জন্ত। দাম ৫২৫/- নীট।

**ল্যাম্বাল-একো রেডিওই**

সেরা—এগুলো



ল্যাম্বাল-একো ডীলার সানন্দে আপনাকে রেডিওগুলো বাজিয়ে শোনাবে। ১২ মাসের গ্যারান্টি আছে। স্থানীয় কর আলাদা।



**জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড**

৩ ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা ১০। অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪। ১/১৮ মডিফি রোড, মাদ্রাজ। ৩৩/৭২ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর। যোগাযোগ কলকাতা, চান্দনী চক, দিল্লী।

হোল। খারগুডকে নিয়ে আর চলে না। গত সপ্তাহে দু' দিন কামাই করবে—তারপর ত্রয়দম ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া এদের চাকরীতে রাখা দায়। কেন যে এদের রেখেছে জানি না—

মিস ফ্রিডেনবার্গও মন্তব্য করলে—জানি না বাপু। ও যেন সর্বদাই বিমিয়ে আছে। কথা বলবে একেবারে সুরে, আমার 'কাজিন' তো জগ্মাক! সে অনেক হাসি-খুসী। 'লাইফ'ক 'এনজয়' করাও একটা 'আট'।

মি: জনসন বললে—আমি জানি ও কোথায় যায়। নর্থব্রকের টাইপিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে—এই কাকি দিয়েই ইংরেজ জাতটা ভুবতে বসেছে—

লেসলি এর মধ্যে ফিরে এসেছিল। মি: কার্ণার তাকে বললে যে তার জানান না দিয়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সুইচবোর্ডে যদি কল আসে—আর বাইরের লোক যদি সাড়া না পায় তাহলে অফিসের বদনাম। লেসলি কোনও কথা না বলে চেয়ারে বসলো।

আজ আমি এদের স্বদয়হীনতা সম্বন্ধে ভাবলাম। কিন্তু এও ভাবলাম যে, এদের মতামত অর্থোক্তিক কি না। লেসলি সম্বন্ধে এরা সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে—কিন্তু লেসলির নিয়মিত অনুপস্থিতি এদের কাজের অনুরোধ করা। লেসলি যদি কোনও দিন না আসে তাহলে এদেরই একজনকে সুইচবোর্ডে বসতে হবে—আর সে কাজ খুব উপভোগ্য নয়। হয়তো দু'-একদিন এ কাজ করা চলে। কিন্তু তার বেশী নয়। স্বদয় দিয়ে বিচার করলে এ সবার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এ প্রশ্ন আসবেই। ইংরেজ জাত স্বদয় বোঝে—বান্ধবীর—প্রিয়তার—বধুর। আর কাকুর নয়। সবচেয়ে বড় কথা হোল এ দেশ বোবনের জগৎ—স্বাচ্ছন্দ্যের জগৎ—উপভোগের জগৎ—। যাগ পিছিয়ে আছে তাদের জগৎ এরা ঠাঁড়াবে না—তাদের জগৎ নিজেরই বক্তিত করবে না। তাদের কথা ব্যাধি ভাববে না—ভাববে সমষ্টি ষ্টেট। লেসলির জগৎ যদি এরা নিয়মিত অনুপস্থিতি নিতে না চায় তাহলে এদের দোষ দেওয়া চলে না।

ছুটি হোয়ে গেল। আমরা দু'জনে রইলাম। আর সকলে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। আজ লেসলি আমার টেবলে এসে।—তুনলে এদের কথা। আমি কি ইসকুলের ছেলে যে যখন বাইরে যাব হাত তুলে অনুমতি চাইবো।

ঠিক সেইরকম ঠাঁড়ালো নাকি?

হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিক সেই রকমই ঠাঁড়ালো। কিন্তু কিছুই বলার নেই।

তিন হপ্তাহ বাদে আমার হলিডে। তখন বিশ্রাম পাও পনের দিনের মতো। কিন্তু জানো—এই কয়েক বছর আগেও আমি হলিডের জগৎ এতটা ব্যস্ত হতাম না। তখন অফিসে অনেক আনন্দে ছিলাম। এই ঘরে তখন কার্ণার থাকতো না—থাকতো 'রিডন'। কাজের মাঝে যে গল্প হয়—আমিও যোগ দিতাম তখন। আমার তো বিশেষ বন্ধু-বান্ধব নেই, তাই অফিসের এই আলোচনার যথেষ্ট আনন্দ পেতাম।

তোমার বাড়ীতে কি কেউ নেই যে তোমার সঙ্গে দু' দণ্ড কথা বলে?

না মি: বোস, আমার মত লোকের সঙ্গে দু' দণ্ড বসে গল্প করবে এমন লোক আমার বাড়ীতে নেই। আমি একলা মানুষ ভাবেরা সব

আলাদা থাকে। যা নেই অনেক দিন। বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার বিয়ে করেছে। আমার খোঁজও রাখে না। আমিও রাখি না। কখন রাখার সময় বসে? দেখেছো তো কি তাড়াতাড়ি দিন কাটে এসেছে! তবে আমার খোঁজ নেয় আমার এক বোন। তার খুব ইচ্ছে যে আমি তার সংসারে থাকি কর্ণওয়ালে। কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তার সংসারে কেন বোঝা হই?

ঠিক কথা। আমরা যতক্ষণ কর্কম ততদিনই কাজ করা উচিত। তোমার মতের সঙ্গে আমি একমত—বললাম।

পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধোবার জন্ত উঠলাম। ক্লিক ক্লিক করে সুইচবোর্ডের কাঁটাটা আঘাত করতে শুরু করলে অসময়ে। খারগুড সেদিকে বগুনা হোল টেবল ছেড়ে। এই কুড়ি মিনিট কোন কলই আসেনি। প্রথম কল হলো অসময়ে—পাঁচটা কুড়ি:১৫। জনল্যাম ও বলছে, মে ফেরার নট নট—

## তিন

সমস্তটা তাহলে বড় হয়ে ঠাঁড়ালো—আমার মনে হয় অফিসের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। কত দিন আর এমনি করে চালাই। পার্সলেন ডিপার্টমেন্টকে একটা কিছু করতেই হবে—মি: কার্ণার বললে।

সুইচবোর্ড আর সুইচবোর্ড—জনসন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সুইচবোর্ড মিস ফ্রিডেনবার্গ বসে। সে প্রশ্ন করলো—খারগুড এখন কেমন আছে। জান আছে কি?

আমি কি হাসপিটালে এ খবর নেব?

না খবর নিয়ে কি হবে? 'হেয়ারেজ' যার ইচ্ছে তার সম্বন্ধে কেন ঘন ঘন খবর নেওয়া—

চুপ করে বসে তনছি। দু'দিন আগে লেসলি অফিস থেকেই ছুটি নিয়ে হাসপাতালে যার 'চেক আপের' জন্ত। প্রত্যেক দু'মাস অন্তর ও চেক-আপ করাতো, এবারে সময় হয়নি। কিন্তু শরীর ভাল না থাকার দরুণ আগে থেকেই ছুটি নিয়ে চলে গেল। এ বিষয়ে এ দেশ বড় ভাল। মন্তব্য না করেই ছুটি দেবে। লেসলি হাসপাতাল থেকে চেক-আপ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। ব্রেন-হেমরেজ হচ্ছিল।

আমার ঠাকুমা কিন্তু ব্রেন হেমরেজের পরে অনেক দিন বেঁচে ছিল। শুধু এক অগ পড়ে যার মিস ফ্রিডেনবার্গ সুইচবোর্ড থেকে হঠাৎ বললে।

আমার শাওড়ারও কিন্তু তাই, মি: জনসন বললে আমার বউ সব সময়ে একসাইটেড, তাকে যত বলি কে শোনে কার কথা। কে জানে একটা কিছু না হয়।

সেদিন চুপচাপ কেটে গেল। বিশেষ আলোচনা হলো না। এর পরের দিন আমার টেবলের সামনে মি: কার্ণার যখন একটা কপি খ্যাটার দিচ্ছিলো তখন মিস ফ্রিডেনবার্গ খবর দিলো। আগের দিন সন্ধ্যা সাতটার লেসলি মায়া গেছে। পাশের টেবলে জনসন আর ফ্রেড ওদের হলিডে প্ল্যান করছিল। মন্তব্য করলে—'গুডর ওন্ড খারগুড'—

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গেলাম। ঘরের সকলের মুখের দিকে

তাকালাম। ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই। শুধু মিস ফ্রিডেনবার্গের মুখে কালো ছায়া পড়েছে দেখলাম। ভাবলাম—আমরা আমরা—তোমরা তোমরাই।

লেসলির মৃত্যুর পরে দু'দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে আর কোনও আলোচনা হয়নি। আবার আলোচনা সুনলাম। ফিউচারালের।

তাহলে কর্ণওয়ালেই 'ফিউচারাল' হবে?—হ্যাঁ কর্ণওয়ালেই হবে সাত দিন পরে।

সাত দিন পরে? ওকে রাখবে কোথায় এই গরমে? 'রেড চেম্বারে' সাত দিন মলম টলম মাখিয়ে রাখা হবে। তারপর ওকে কর্ণওয়ালে গুর বোনের কাছে পাঠান হবে। সেখানেই ফিউচারাল—

ককিনের জন্ত তো মালার ব্যবস্থা করতে হবে—হ্যাঁ সে আর বলতে।

আলোচনা স্থগিত হওয়ার জানতে পারলাম না মালার কি ব্যবস্থা হচ্ছে। বিকেলের দিকে স্ট্রাইচবোর্ডে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। সামনে পিন আপ করা বিভিন্ন ছবি—পার্টিশানে লাগান। হলিডে মেকাররা বিভিন্ন জায়গা থেকে লেসলিকে ছবি পাঠিয়েছে। যত্ন করে ও তা পার্টিশানে লাগিয়ে রেখেছে। ম্যাডিসনের সেই সিনিগুরিটার নৃত্যপরায়ণা ছবি নতুন করে আবার দেখলাম। ঝ তার চটে গেছে। অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে এসেছে সিনিগুরিটার চোখের লাল রং, চোখের মেঘ্র ভাষা! খারগুডের খুব প্রিয় ছবি আমাকে একাধিক বার প্রদর্শন করেছে সে এর সম্বন্ধে।

মিস বোস আমরা 'খারগুডের' একটা 'ফিউচারালে' মালা পাঠাব। তুমি কি কিছু 'কন্ট্রিবিউট' করবে? কার্ণার বললে।

ফিরে এসলাম অল্প জগতে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলে কার্ণারের হাত থেকে কাগজটা নিলাম—এক টাকার অঙ্ক বসিয়ে নাম সই করে দিলাম। তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে হাফ ক্রাউন বের করলাম। প্রায় দু' টাকা।

না না না। অত দিতে হবে না। আমরা সকলে এক শিলিং দেড় শিলিং করে দিয়েছি।

কিন্তু আমি যে কাগজে লিখে নামসই করে ফেলেছি—বললাম। দেখ মিস বোস তিন পাউণ্ডে একটা মোটামুটি ভাল মালা হয়ে যায়। আর আমরা হিসেব করে দেখেছি যে এই এক শিলিং এই তিন পাউণ্ডে উঠে আসে। কেন মিছিমিছি তুমি বেশী পরসা দেবে। আড়াই শিলিং কেটে এক শিলিং বসিয়ে দাও। এই নাও তোমার চেক।

দেড় শিলিং ফেরৎ পেলাম। কিন্তু আমি আজও ভেবে উঠিনি যে এরা কি স্তব্ধহীন না বাস্তববর্মা! আমাদের সমাজে আমরা এমন অবস্থায় কখনও পরসার হিসেব করি না। সবচেয়ে বড় কথা যে আমি তখন লেসলির জায়গার ব'সে। তার ককিনের মালার জন্ত

পরসা দিচ্ছি আর আমার মনিব জীবিতের হিতার্থে মৃতের অঙ্ক বসালে।

দিন সকলেরই কাটে। একজন যে আমাদের ঘর থেকে চিরদিনের মত চলে গেছে—ক'দিনের মধ্যে আমরা তা ভুলে গেলাম। পার্স'নেল ডিপার্টমেন্ট থেকে এবারে এক তরুণীকে পাঠিয়েছে—স্ট্রাইচবোর্ডে। এলী—তার নাম। বড়ই চটুলা—সদালাপী। আমাদের ঘরের আবহাওয়া যেন বদলে গেল। পশ্চিম দিকের কাচের পার্টিশানে রং-বেরঙের মেলা বসলো—বেখানে আগে দেখা যেত শুধু 'গ্রে'। সাদা লাঠির বদলে এলো জাপানী রঙীন হাত পাখা। এলী তা কতরকম করে ঘুরিয়ে হাওয়া খাবে! জায়গা ছেড়ে এলী এর গুর টেবলে আসে। হেসে কথা বলে। আমরা সকলে খুসী। আমার সম্বন্ধেও দেখলাম গুর বেশ আগ্রহ। ভাবলাম মেয়েটাকে ইণ্ডিয়ান রেস্টোরারী নিয়ে গেলে কেমন হয়। অথবা কোনও ভারতীয় ছবি দেখাতে—'ক্যালো'তে। বৈজয়ন্তীমালার 'নগিন' আসছে সামনের বুধবারে। ওকে আগে থেকে নেমস্তন্ত্র করে রাখি।

সেদিন বুধবার। আজ এলী আমার সঙ্গে সিনেমার বাবে। মনটা বড় খুসী। বিকেল চারটের সময় মিস কার্ণার কয়েকটা ম্যাটার দিয়ে বললেন—এগুলো জরুরী, আজই হওয়া চাই।

টাইপ করতে করতে একটা চিঠিতে এসে থেমে গেলাম। মিস কার্ণারের লেখা চিঠি—মিসেস সিম্পসনকে। লেসলির বোন মিসেস সিম্পসন। চিঠির ভাবার্থ এই—প্রিয় মিসেস সিম্পসন—তোমার ভাই মিস খারগুডের মৃত্যুতে আমি এবং আমার সহকর্মীরা অত্যন্ত মর্মান্বিত। মিস খারগুড তার দৈনিক অন্তঃস্থতা সম্বন্ধে যে সদা হাতময় মুখে আমাদের সঙ্গে প্রতিদিন কাজ করেছে তা আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছি। তার শেষ কাজের সময় উপস্থিত না থাকার জন্য দুঃখিত। আমাদের মন তার সংগেই থাকবে। তার আত্মার সঙ্গতি হোক। ইতি—

চিঠি টাইপ করতে গিয়ে ব'সে রইলাম। আঙুল যেন নড়তে চাইলো না। ভাবলাম লেসলি খারগুড ব'লে একজন এই ঘরে ছিলো আমাদেরই একজন হয়ে। আজ সে ইতিহাস হয়ে গেছে।

তোমার চিঠি এখনো শেষ হলো না। কি ভাবছ অমন আকাশ পানে তাকিয়ে—দেখলাম এলী এসে দাঁড়িয়েছে। আজ না আমাদের সিনেমার বাবার দিন। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছ—তোমরা ভারতীয়রা বড় ভাবুক—কি এত ভাবতে পারো?

ঘড়ির কাঁটা গোঁশে পাঁচটার ঘরে। বললাম—কে বললে ভুলে গেছি। আমি এই দিনটার জন্ত চেয়ে ব'সেছিলাম। এটাই শেষ চিঠি এলী। ভাবলাম আমিও কি সাহেব হয়ে গেছি? তারপর টাইপরাইটারে দ্রুত আঙুল বুসিয়ে গেলাম "Dear Mrs. Simpson—"

### পল্লীবাস

যে সব অবস্থায় পল্লীবাস এমন ক্রেশকর কমিয়া তুলিরাছে তাহা দূর হইলেই পল্লীবাস আবার সুখকর হইতে পারে। পল্লীর জম্বাল যদি সাফ হয়, জলকষ্ট যদি সারে, নালানন্দমাগুলি পরিষ্কার হইয়া বর্বার জল যদি নামিয়া যায়, ম্যালেরিয়া দূর হয়, বগড়া-ঝাটি কমিয়া সামাজিক সৌন্দর্য যদি বাড়ে, তবেই পল্লীবাস আবার সুখকর হইতে পারে।

—হালক (মাসিক) আখিন, ১৩২২।





## গৃহ-সমস্যা

“কলিকাতার গৃহ-সমস্যা যে কত জটিল হইয়া উঠিয়াছে, ইম্প্রভমেট ট্রাস্টের ২৪টি ফ্ল্যাটের জন্ত দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহের ভীড় হইতেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা চলে। ২৪টি মাত্র ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হইবে। কিন্তু দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহের জন্ত গত ২১শে ও ২৪শে অক্টোবর সি আই টি অফিসের সম্মুখে কয়েক হাজার নয়নারী লাইন দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে সারা রাতও নাকি লাইনে দাঁড়াইয়া ছিলেন দরখাস্তের ফর্ম পাইবার আশায়। ইম্প্রভমেট ট্রাস্টের উদ্দেশ্যে ইদানীং কিছু কিছু বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তাহা নিতান্তই অল্প। শ্রমিকদের জন্ত গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সরকারী তরফ হইতে এ-পর্যন্ত বতটুকু উত্তোগ দেখা গিয়াছে, স্বল্প আরবিশিষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ত গৃহনির্মাণে এখনও তাহা দেখা যায় নাই। গৃহ-সমস্যা আজও জটিল থাকিবার ইহাই অজ্ঞতম কারণ।” —দৈনিক বহুমতী

## মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্বেচ্ছাচার

“স্কুলগুলি খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হইতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ যে সাকুলারিটি পাইবেন তাহাতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে:—“১৯৫৮ সালে স্কুলের সেসান এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ হইবে। সুতরাং এ বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে লইলেই চলিবে। মার্চের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে।” অক্টোবরের শেষে সাকুলারি পাইয়া স্কুলের পরিচালকগণ কিরূপে উল্লিখিত ব্যবস্থা কার্যে প্রবর্তন করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এতদিনের প্রচলিত রীতি অনুসারে নবেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ সমাপ্ত হইয়া যায়, বড়দিনের ছুটির পূর্বেই ফল ঘোষণা করিয়া ক্লাস প্রমোশন দেওয়া হয়। পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হুপাইতে হয়। পুজার ছুটির মধ্যেই এই কাজগুলি শেষ করিয়া রাখা হয়। এক স্কুল খুলিবার কয়েক দিন পরেই পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এতদিন যখন এ বিষয়ে স্কুলসমূহের নিকট কোন নির্দেশ দেন নাই, তখন স্কুলসমূহ নিশ্চয়ই প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী ব্যবহারীত প্রস্তুত হইয়াছে। এখন সহসা এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইলে সকল স্কুল বা অনেক স্কুলই বিপদে পড়িয়া যাইবেন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। তাহা ছাড়া ছাত্রগণের দিক হইতেও একটা বিশেষ বিবেচ্য দিক আছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পুরোনো

এক বৎসরের পড়া তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের মার্চ মাস পর্বন্ত বসাইয়া রাখিলে আরও তিন মাসেরও বেশী সময় তাহাদিগকে পুরাতনের বোঝা বহিয়া চলিতে হইবে। ইহাতে ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালক, অভিভাবক সকলেই অন্তর্বিধা ভোগ করিবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে পরিবর্তন ঘটাইতে চাহিতেছেন, সে পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে তাহার নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।” —আনন্দবাজার পত্রিকা।

## ভারত সরকারের ভিক্ষাবৃত্তি

“যেদূর অবস্থার মধ্যে ভারত সরকার এবং শিল্পপতিগণ কর্তৃক সংগ্রহের জন্ত অভিযান শুরু করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ পরিণতি অনিবার্য। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এই ধরনের আর্থিক সেনদেন নির্ভর করে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সম্ভাবজনক ধারণার উপর। ঋণ গ্রহণকারী নির্দিষ্ট কিস্তি মত টাকা শোধ দিতে পারিবে কি না, কিংবা মূলধন নিরাপদ থাকিবে কি না, সে সম্পর্কে উত্তমর্ণের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সন্দোহের উদ্বেক হইলে তাহারা পিছাইয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে কেহ ঋণপ্রার্থী হইলে মহাজন যে রকম সতর্কতা অবলম্বন করেন, কোন জাতি ঋণপ্রার্থী হইলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। এই সহজ, সত্য কথাটা স্মরণ থাকিলে বিদেশ হইতে কর্জ ও মূলধন সংগ্রহের চেষ্টায় নৈরাশ্রের কারণটা বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থের অভাবে ভারতের বৈবয়িক অবস্থা বাস্তবিকই যদি টলায়মান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিদেশীরা কর্জ দিবে কি ভরসায়? তাহারা তো দয়া স্বর্ষ করিতে বসে নাই! ঋণ গ্রহণকারীর যোগ্যতা নির্ভর করে বৈবয়িক ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার উপর। এই ব্যাপারে ক্রমাগত গাফিলতীর দ্বারা ভারত সরকারই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ও আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জাতি গঠনের কাজে লগ্নীর জন্ত বাধ্যবাধকতা বলবৎ করিলে বৈবয়িক ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠিত। আর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে বিদেশী লগ্নীকারীদের মনে আশ্রাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু ক্রমাগত অবহেলা দ্বারা সরকার সে সুরোগ নষ্ট করিয়াছেন। এখনও তাহাদের পক্ষে নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের জন্ত বৈদেশিক ‘মুজার প্রয়োজন আছে সত্য। কিন্তু উহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নির্ভর করে বৈবয়িক বিনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার এবং দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সঞ্চয় সদ্যবহারের উপর। এই উদ্দেশ্যে জাতির সর্বশক্তি নিয়োগ না করিলে মাত্র কাঁহুনি গাহিয়া কিংবা প্রচুর হুমকি দিয়া বিদেশীদিগের সহযোগিতা লাভ করা অসম্ভব।” —বুগান্ডার।

## পি, ডব্লিউ ডি'র কৃপা

“সংবাদ পাওয়া যায় যে, পি, ডব্লিউ, ডি নাকি স্থানীয় কণ্ট্রীয়াগণকে কাজ দিতে খুব আগ্রহশীল নহেন। পি, ডব্লিউ, ডি'র কাজ টেণ্ডার আহ্বান দ্বারা বন্ধন করা হয়। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডার গ্রহণ করায়ই রীতি। সংবাদে প্রকাশ, ক্ষেত্র বিশেষে নিম্ন-মূল্যের টেণ্ডারও নাকি অগ্রাহ্য করা হয়। টেণ্ডার গ্রহণ বিষয়ে ভালমন্দ বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রাজ্যের আর্থিক



ভিটামিন মুক্ত

কোলে  
KOL  
বিস্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই প্রহর করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

খিনএরাকট

মেরী

পেটিটবাবো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্‌টী

মার্ভেলক্রীম

কাফেনায়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্থানীয় কণ্ট্রোলারদের মধ্যে অনেকে উদ্বাস্ত ও আছেন। স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়াও সরকারের কর্তব্যের মধ্যে রহিয়াছে। ত্রিপুরায় সড়ক নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটতেছে। ইহার জন্য কণ্ট্রোলারদের দায়ী করা চলে না। সরকারের গলদ ঘূর না করিয়া কেবল স্থানীয় কণ্ট্রোলার উচ্ছেদ দ্বারা শি. ডব্লিউ. ডি'র কাজ অগ্রসর হইতে পারে না।

—সেবক (আগরতলা)

### আমরা ভারতবাসীরা

“স্বাধীনতা লাভের সময় ইংরাজের নিকট হইতে যে টাকা পাইয়াছিলাম তা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছি এই দশ বৎসরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাত দিয়া। আজ, যে পরিকল্পনায় অধিকাংশ টাকা ‘ন দেবায় ন ধর্যায়’ উড়িয়া বাইতেছে। হাতে কলমে তাহা ধরা পড়িয়াও এই খেয়াল ছাড়ার মত সুবুদ্ধি কি আমাদের হইবে না? যখন দেশে অসাধু লোকের সংখ্যাই অগণিত তখন টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা কি ঠিক? আজ অর্থমন্ত্রী মহাশয় দেশ-বিদেশে ছুটিয়াছেন ‘ঋণ দেহি ঋণ দেহি’ বুলি লইয়া। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারক ত্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী এখন ঋণ করিয়া নাস্তানাবুদ না হইয়া এ কার্য রদবদল করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কে শোনে তা।”

—জঙ্গীপুর সন্বাদ।

### দোকান-শ্রমিকদের হৃদশা

“এত দিন আমাদের জাতীয় সরকার লগ আমলের একটি পক্ষপাতভূত আইনের ডুগডুগী বাজাইয়া বাহবা নিঃখিলেন। কারণ ছিল দোকানীরা ঘুণা লজ্জা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত। কোনক্রমে যদি আদালতে হাজির করা হইত তখনই নানা রকমট এড়াইবার জন্য বিচারকের নিকট ‘কম্বার’ মানিয়া লইত। কিন্তু সম্প্রতি কতিপয় আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দোকানীরা দল বাঁধিয়া ‘ও চাঁদা তুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনকারী আইন এবং নিয়মাবলীর ছিন্ন অন্বেষণে ও সুওয়াল-জবাবের মারপ্যাচ পদে পদে সরকারপক্ষকে পরাস্ত ও হেনস্তা করিয়া কিস্তিমাং করিতেছে। হুংগ ও পরিতাপের বিষয় এই সকল ক্রটি সংশোধনের জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন ফল আজ পর্যন্ত হয় নাই। কবে যে হইবে উহার হদিসও পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। বলিতে চাই নিয়মাবলীর মধ্যে সাপ্তাহিক নোটিশ এক নির্দেশ আছে যে, সাপ্তাহিক বন্ধ সম্পর্কে ইচ্ছা করিলে তিন মাস অন্তর বদল করা চলিবে। অথচ এইরূপ সাপ্তাহিক বন্ধের নোটিশ হাজার হাজার দোকানে তিন মাস পর পুনরায় বদল করিয়া লওয়া হয় নাই। বন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ আদালতে উপস্থিত হইলে—আসামী পক্ষের উকীল নানা অবাস্তব কথার সৃষ্টি করিয়া বলেন—‘আমার মজেলের নোটিশ তিন মাস অতীত হইয়াছে। অতএব এই অভিযোগ টিকিতে পারে না, কিন্তু তিন মাস পর কোন নোটিশ বদল না করার বিষয়ে কোন অভিযোগ আদালতে পেশ করা হয় নাই এবং নিয়মাবলীতে এমন কোন ধারা সন্নিবেশিত করা হয় নাই বাহার দ্বারা নোটিশ পরিবর্তন না করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হইবে। প্রিজিলেজ লিড ও সিক লিড সম্পর্কে আইনে যে নির্দেশ আছে ঐ সম্পর্কে নিয়মাবলীর

পরিবর্তন না হওয়ার ও খাতিপক্ষ দেখান ব্যবস্থা না থাকার প্রমিকেরা তাহাদের ভাষা পাওনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে। এইভাবে দোকান আইনের আরও যে সকল ক্রটি বিদ্যমান এই সকল বিষয়ে সরকারের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অবগত আছেন। কিন্তু কি কারণে বা কোন পক্ষের ইচ্ছাকৃত দীর্ঘস্থায়ীতায় আইনটি এইভাবে জড়ভরত হইয়া পড়িয়া আছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতি কি ঘটবে তাহা জানিতে না পারিয়া দোকান শ্রমিকেরা হতাশ হইয়া পড়িতেছে।

—দোকান শ্রমিক (কলিকাতা)।

### সরকারী গাড়ী কাহার সম্পত্তি?

“সাময়িক জৌলুস আর অগণিত মানুষের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছি। মাথার উপরে চন্দ্রালোকিত রাত্রি, পায়ে নীচে বালুরঘাটের ধূলিধূসরাকর্ণ রাস্তা; সর্কীয় রাস্তাগুলি মানুষের প্রবাহে উপচে পড়েছে। ঠেলাঠেলি কোরে এগোতে হচ্ছে, সহসা পেছন থেকে বেঞ্জে-উঠা মোটরের তীব্র হর্ণের আওয়াজে চমকে উঠে জমে-ওঠা ভিড় রাস্তার হুঁধারে সরে গিয়ে ভিড়কে আরো নিবিড় কোরে তুললে; মাঝখান দিয়ে ব্যস্তভাবে একটি গাড়ী বেরিয়ে এগিয়ে চললো। কোভুহলী পথিক লক্ষ্য কোরে দেখলো গাড়ীটির নম্বর W G O 54. মনের ভেতরে স্বাভাবিক গুঞ্জন উঠলো; গাড়ীটি কার? খোজ নিলে জানবেন উল্লিখিত গাড়ীটি সরকারী টাকার সরকারী কাজের জন্য ক্রীত। ব্যবস্থত হচ্ছে প্রতিমাদর্শনের জন্য। দেখছেন কারা? কোন বিশেষ ব্যক্তির পরিবার পরিজন। কে যেন প্রশ্ন করলো তেল জোগাচ্ছে কে? ভিড়ের মধ্য থেকে একটি মস্তব্য বাতাসে মিশে গেল—ভূতে। আমি অবশ্য এ মস্তব্যে বিশ্বাস রাখিনি। একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে চললে দেখতে পেতেন; কোন গুজোমগুপের সামনে আরোহী-আরোহিণীদের ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে যে গাড়ী, তার নম্বর W G O 45 পাশ দিয়ে বিদ্যাহেগে যেটা বেরিয়ে গেল তার নম্বর W B D 9455 অথবা দেখতে না চাইলেও চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো যেটা; তার নম্বর W B D 6927. এ দেখে আপনি যে কোন মস্তব্য করতে পারেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন হোল; সত্যি কি গাড়ীগুলি ব্যবস্থত হোয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তবে তা কি লগ, বুক Entry করা হয়েছিল?”

—বার্ডা (বালুরঘাট)

### সমবায়, কৃষক ও ধানের দাম

“ধান চালের দাম কমিয়াছে। আউস এবং আখিরা-ধান গুঠার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। মণকরা প্রায় তিন টাকা ধানের দাম কমিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিজ্র জন-সাধারণ একটু শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। জনসাধারণ পরিকল্পনার প্রচারের ধোঁকাবাজী অপেক্ষা সামান্য মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থাটা ভাল বোধে। কিন্তু সরকার ভাত-কাপড়ের বাজারে আগুন লাগাইয়া দিয়া পরিকল্পনার দোহাই দিয়া সমস্ত চাপা দিতে চান। ধানের দাম কমা শুভ লক্ষণ। ধান চালের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় তেল মুগ ইত্যাদির দাম কমিলে সাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণের জীবনবাত্রা হুঁবিহু হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্থির ভাবে দেখিতে গেলে ধান চালের এই মূল্য হ্রাসে আনন্দের চেয়ে আতঙ্কিত বেশী হইতে হয়। কমল সামান্যই উঠিয়াছে। হুংহ চাবীর দল সামান্য কমলের মোটা

অংশ বিক্রয় করিয়া দীর্ঘকালের অভাব মিটাইতে চাহিতেছে। বর্তমান মূল্য হ্রাস যদি বাজারের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কমে তবে আনন্দের কথা। ধান-চালের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্ত জিনিষ পত্রের দাম কমিতে বাধ্য। কিন্তু আতঙ্কিত হইতেছি এইজন্য যে কাপড়, হুণ, তেল, ডামাক, খোল ইত্যাদি চাষীদের অতিআবশ্যকীয় জ্রাব্যগুলির দাম কমিবার কোন লক্ষণ নাই, কোন আয়োজন নাই, কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি সরকারী কর্ণধারদের কোন প্রতিজ্ঞা (মিথ্যা হইলেও) নাই। —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)

### পার্টির অভ্যন্তরে চরম জবরদস্তি

“ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির হুগলী জেলা কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীশিশির গাঙ্গুলীকে পার্টি হইতে বহিষ্কার করার সংবাদ জানা গিয়াছে। বোর্ডে কেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহার সম্পাদকরূপে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া ও শ্রমিকদের দাবীর সনদ প্রদান এক কম্যুনিষ্ট পার্টির বাহিরের কোন ব্যক্তির নিকট ভূতৈক বিশিষ্ট পার্টি সভ্যের তহবিল তত্ত্বাবধানে রাখা কঠোর কানুন প্রকাশ শ্রীগাঙ্গুলীকে পার্টি হইতে বহিষ্কারের অন্তিম কারণ, এরূপ জানা গিয়াছে। শ্রীগাঙ্গুলীকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে কম্যুনিষ্ট পার্টির মহেশ লোক্যাল কমিটির বিশিষ্ট কয়েকজন সন্যস্ত পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নিকট এক খোলা চিঠিতে উক্ত পদত্যাগের সংবাদ জানাইয়াছেন এবং উহা প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র সমূহে পাঠাইয়াছেন। পার্টি নেতৃত্বের জঘন্য ও অগণতান্ত্রিক কার্য-কলাপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা আর একবার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিল। যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কথা কথায় কিরূপ ভীম বোলার চলে তাহা কাহারও অজানা নয়। —বর্ধমান।

### দাঁওমারা পরিকল্পনা

“জলের চোর কারবারের চরমতম নিদর্শন মাইনন বাঁধে জল আটক। এই জল আটকের ফলে বিস্তীর্ণ ক্যানাল এলাকার জল দেওয়া বাইতেছে না। একটিমাত্র ক্ষেত্রে একটি দাঁড় কাটাঁইবার আবেদনে একজন সরকারী কর্ণচারী কিছু প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিজ্ঞার মত ইহা নিফল না হইলে হয়। ফসলবৃদ্ধি, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, ভাণ্ডার এন্ড টেনশান সার্ভিস কত কি—পর পর কংগ্রেসী ‘দাঁওমারা’ পরিকল্পনার অন্ত নাই। বরং ও গুজরার নগরী পরিকল্পনার কত অপব্যয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সেচের ব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল। বাংলা দেশে গড়ে ৫৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দেশে তৈরী সামান্য পাম্প যাহা হয়, কোটি কোটি টাকার বিদেশে তৈরী যন্ত্রপাতি আনিয়া সে কাজ হইতেছে না। বিদেশী ডলার ও বিলাতী মুদ্রা এই ভাবে অপব্যয় করিয়া—আজ সামান্য পাম্প পর্যন্ত চাষীকে দেওয়া যায় না। এমন কি সরকারী দপ্তরে ও মন্ত্রীদের মহলে সামান্যতম উৎসর্গ পর্যন্ত নাই। দেশের বিরাট সম্ভাবনাকে এই ভাবে নিষিদ্ধ নিহত করা প্রকারান্তরে দেশদ্রোহ। সঙ্গে সঙ্গে চীনের সংবাদ পড়ুন।—এড় লক্ষ সরকারী কর্ণচারীকে মাঠে নামানো হইয়াছে। দেশের প্রতি এরূপ মমতা, এরূপ একান্ত মনোভাবের সামান্যটুকুও কি এ দেশের শাসন ব্যবস্থার পাওয়া বাইবে না? —নূতন পত্রিকা (বর্ধমান)

### কংগ্রেসের ডামালা

“কথায় বলে ‘খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুন, কাল করলে এঁড়ে গোক কিলে।’ নেহেরু সরকারের পরিকল্পনাগুলিই হয়েছে কাল। এর দ্বারা জনসাধারণের অবস্থা উন্নত হওয়া তো দূরে থাকুক, তাদের জীবন ক্রমশই হ্রাস হওয়ায় উঠছে। পরিকল্পনার খরচ তোলার জন্য পরিকল্পনার নামে সরকার কেবলই ট্যাক্সের পর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে চলেছেন। তার ওপর এই পরিকল্পনাগুলির জন্যই খটছে মুদ্রাস্ফীতি। তার ফলেই আজ এমন অস্বিমূল্য হওয়ায় উঠছে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য সফল বলা হয়েছিল এর দ্বারা ভারত খাদ্য স্বরাসম্পূর্ণ হবে। পেট ভরে খেতে পারার আশায় হাড়ভাঙা খেটে না খেয়ে জনসাধারণ ট্যাক্স যুগিয়েছে। সে টাকা জলে গেছে। ‘অধিক শত উৎপাদন কর’ বোলে শ্রোগান দিয়ে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তবু খাদ্যভাব দূর হয়নি, এখনও বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেছেন ‘ভাত কম খাও, না হলে ডায়াবেটিস হবে।’ ভেতো বাঙ্গালী, তার চোখপুচ্ছ ভাত খেয়ে এলো, ডায়াবেটিস হোল না। আর আজ ডাঃ রায় নতুন খিওরি খাড়া করছেন। দেখা যাচ্ছে ১ম পরিকল্পনা ব্যর্থই হয়েছে। ২য় পরিকল্পনার ঘোষিত লক্ষ্য ভারতকে শিল্পে উন্নত করা ও তার মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা। তার জন্য আবার ট্যাক্স বসানো হোল। কিন্তু এক পা না এগোতে এখন শোনা যাচ্ছে কর্তারা বলছেন ‘উঁহ, বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, আরও বহু লক্ষ লোক বেকার হওয়া পড়বে।’ অবস্থার উন্নতির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। শুধু বেঁচে থাকাই বেন আজ সাধারণ মানুষের পক্ষে অভিশাপ হয়ে পড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রাণ নয়, প্রাণের নামে তামাসা। —সাধারণজ্ঞা (শিবপুর)

### খোলাখুলি কালোবাজার

“সংশোধনী সেটেলমেন্টে আপত্তির দায় বা স্বাধিনির নকল লওয়া জেলা সদর হইতে মহকুমার বিভিন্ন সার্কেল অফিসে আসার জন-সাধারণের কতকটা সুবিধা হইয়াছে সত্য কিন্তু এরূপ দরখাস্তের ফরম পাওয়া মুশ্কিল হইয়াছে। অথচ ঐ ফরমে ১০ হুই আনার কোর্টফি ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত না করিলে সে দরখাস্ত অচল হয়। প্রকাশ উহা সরকারের ৫৫৭০ নং বিক্রয়যোগ্য ফরম, অল্প কেহ ছাপাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু উহা কোথা হইতে যে সরবরাহ হয় তাহাও কেহ সঠিক বলে না। ফলে যে সব ভোগার উহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহার মধ্যে লাভ করিতেছে। যেমন এই তমলুকে এরূপ ফরম একটি ১০ চারি আনা মহিষাদলে ১০ আনা এবং পাঁশকুড়ায় নাকি ১০ দশ আনার কমে পাওয়া যায় না। সরকার যে নকলের দরখাস্ত লইতে মোট ১০ হুই আনা ফি ধার্য করিয়াছেন তাহার ফরমে এই চোরাকারবার নিশ্চয়ই বাহ্যিক নতে, তবে কেন বা কাহার দোষে এইরূপ অবতন ঘটতেছে তাহা কে দেখিবে? —প্রদীপ (তমলুক)

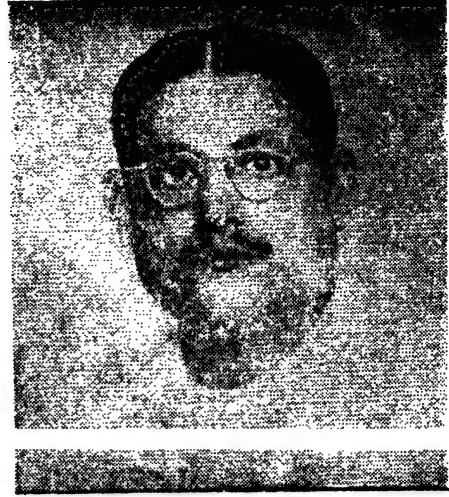
### রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা

“সংবিধান রচনার সময় সত্ত্ব স্বাধীনতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন্‌ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, সে দিকটি ভাল ভাবে আলোচনা না করিয়াই তাড়াতাড়ি হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াটা যে কত বড় ভুল হইয়াছে, দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তাহা স্পষ্ট ধরা

পড়িয়া গিয়াছে। ভাষা কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পরই দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই চৈতন্যোদয় হইয়াছে—কি সর্বনাশ! হিন্দী চালু করিবার অত্যাংসাৎ ইহার করিতে চলিল কি? ভারতের ভাষা সংস্কৃতি সংহতি—সব কিছুই যে মূলোচ্ছেদ করিয়া হিন্দী-ওয়ালারা দেশের বহু কষ্টাঙ্কিত স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া তুলিতে ভৎপর। বিপদটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন ডাঃ শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ভাষা কমিশনের ইনিও অল্পতম সদস্য ছিলেন, কিন্তু ভারতের কল্যাণ বুদ্ধিই তাঁহাকে সব শিয়ালের এক রা করিতে দেয় নাই। তিনি দেশপ্রাণতায় প্রবৃত্ত হইয়াই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের কাহুস কাঁসাইয়া দিয়া দেশবাসীকে সজাগ সতর্ক হইবার জন্য আকুল আহ্বান জানাইয়া দিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। —পল্লীবাসী (কালনা)।

### শোক-সংবাদ

আমরা বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, গত ৫ই অক্টোবর ৬পুরীধামে উত্তরপাড়ার তারকনাথ মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মহালয়ার দিন ৬পুরীধামে বায়ু পরিবর্তনাস্তে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইং ১৮৯৮, ৫ই বৈশাখ, ১৩০৫ সালে উত্তরপাড়া রাজবাটিতে, উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি.এস.আই, এম.এ. বি.এল মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বিপ্লবীযুগের মিছরী বাবু) এর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে ৬তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৪ বৎসর বয়সে মাতৃহীন ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ৬তারকনাথ তাঁহার ভারত-বিখ্যাত পিতামহ রাজা প্যারীমোহনের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইয়া এম.এস.সি অধ্যয়ন-কালেই তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ অল্প বয়সেই ৬তারকনাথ তাঁর পিতামহের আত্মকৃত্যে ৬তার স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬তার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মনীষীগণের দিনের পর দিন সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন, এবং অচিরেই তৎকালীন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে যে অল্প কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত ধর্মীর সন্তান বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে ভাষার থাকিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুরের ৬কুমার তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, কালীমবাজারের মহারাজা ৬শ্রীচন্দ্র নন্দী, নাড়াঙ্গোলের ৬কুমার দেবেন্দ্রলাল ধান, সহিবপুরের কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়-এর নাম স্মরণ করা বাইতে পারে এবং উত্তরপাড়ার ৬তারকনাথ উক্ত দলের আরেক জন ছিলেন। পরে হুগলী জিলাবোর্ডের প্রায় ৩০ বৎসর সহ-সভাপতি ও সভাপতি বাংলার দুই বার মন্ত্রীরূপে এবং জীবনের আরও বহুক্ষেত্রে ৬তারকনাথ জাতিকে সেবা করিবার অধিকার অর্জন করিয়া হুগলী জিলা তথা বাংলার একজন নেতৃস্থানীয় ভূম্যধিকারী ও রাজনীতিবিদরূপে খ্যাতিমান হন। ময়মনসিংহের প্রান্তঃস্বরণীয় মহারাজা শশীকান্তের আমন্ত্রণে ময়মনসিংহ জিলা জমিদার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ৬তারকনাথ। স্বরাজ্য দল গঠনের সময় দেশবন্ধু ও নেতাজীর সান্নিধ্যবশত ৬তারকনাথ বহুবিধ ক্ষেত্রে দেশের সেবা



### তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

করিয়া থাকেন এবং উত্তরপাড়ার 'রাজেন্দ্র-ভবন' তৎকালীন বাংলার সকল মনীষী ও রাজনীতিবিদগণের আগমনস্থল হইয়া উঠে। হুগলী জিলা বজা, ছুড়িফাদি ত্রাণকার্থে ৬তারকনাথের অবদান হুগলী জিলাবাসী আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকে। দেবানন্দপুরে শব্দচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির সভাপতির পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত থাকেন ৬তারকনাথ। তাঁহার তিন কন্যা শ্রীমতী অমিয়া, অসীমা ও অগ্নিমা দেবী; পত্নী ও তিন ভ্রাতা শ্রীলোকনাথ, শ্রীঅমরনাথ ও শ্রীচন্দ্রনাথ বর্তমান। ৬তারকনাথ সি.আই.ই ও এম.বি.ই উপাধি ভূষিত ছিলেন ও ডেপুটি পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'শাস্ত্র-বিশারদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

বিগত যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বসন্তকুমার লাগিড়ী এম.এ. ব্যারিষ্টার য্যাট ল' গত ২১শে আশ্বিন তাঁর অশীতিতম জন্মদিনের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বদেশী যুগে জাতীয় শিল্প প্রসারে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। অধুনালুপ্ত বেঙ্গল জ্ঞানানাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ইনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদেও ইনি কিছুকাল সমাসীন ছিলেন। ব্যবসায় জগতেও একদিন এঁর বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল।

বশোহর নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্যসেবী অবলাকান্ত মজুমদার গত ১১শে আশ্বিন ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। নাট্যকাররূপেও ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বশোহরের স্থানী-সমাজে এঁর একটি বিশেষ আসন সংরক্ষিত ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গিরিশ-অধ্যাপক এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষায় গ্রন্থপ্রকাশক সমিতির সম্পাদক স্রসাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ রায় ৬১ বছর বয়সে গত মহাষ্টমীর দিন ১৫ই আশ্বিন পরলোকগমন করেছেন। সমালোচকরূপেও এঁর খ্যাতি ছিল। ইনি কয়েকটি গ্রন্থের গ্রন্থকার ছিলেন।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক



## মাসিক বসুমতীর প্রচার-আধিক্য

Editor-in-Chief, "Thank" you for printing our letter offering "used" magazines to your readers. The response was overwhelming and far beyond our capacity to supply at this moment. However, please assure your readers, for us, that while it may take a little time, every person who wrote for the magazines, will ultimately receive them. Please accept our thanks for your co-operation. Sincerely, H. P. Box 329, Ansonia Station, New York, 23, N. Y. U.S.A.

### পত্রিকা সমালোচনা

বন্ধুবর, আমার সম্বোধন দেখে হয়তো বেশ বিস্মিত হচ্ছেন। ভাবছেন, বার সঙ্গে কোন দিনের পরিচয় নেই, সে কি সাহসে বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে! আপনার অহুমান সত্যি হ'লেও আপনি হয়তো জানেন না, আপনার পত্রিকার সঙ্গে আমার গত সাত বছরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মাসিক বসুমতী আমার দিন-রাত্রির সঙ্গী। আপনাদের পত্রিকা মারফৎ আমি যা পেয়েছি, তুলনা তার নাট। তাই নিবিড় বন্ধনের আবেগে বন্ধুত্বের দাবী ক'রে থাকি তো অত্যাঁয় এমন কিছু নিশ্চয়ই হবে না। কাগজের সম্পাদক হিসাবে আপনি আমার এবং আমাদের সংসারের সকলের সম্বন্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার সাহিত্য-লেখার সঙ্গে আমরা যথেষ্ট পরিচিত। আপনার প্রত্যেকটি বই সংগ্রহ করেছি, এমন কি অভিগান 'রত্নালা' এবং 'কলকাতার পথঘাট'। বিশেষতঃ এই দু'টি বই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বোঝা। এ বছরের শারদীয়া যুগান্তরে আপনার অমূল্য একটি ছোটগল্প পডলাম—'আশার আলো'। বাঙলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের টেকনিকের গল্প আমি ইতিপূর্বে কখনও পড়িনি। আশা করি, অত্যাঁয় সাহিত্যিকদের এই গল্প অনুপ্রেরণা যোগাবে। মানব সমাজের এক সঙ্কটজনক সমস্যাটিকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন, যদিও দুঃসাহসের পরিচয়ই যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মেয়ের 'আশার আলো' পড়া উচিত, অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।

আপনার পত্রিকাও প্রসঙ্গ আলোচনা করছি। মাসিক বসুমতী সময়ে পাওয়া না গেলে আমি যেন দিশাহারা হই। কাগজটি হাতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রথম অবগতপাঠ্য—পত্রিকার শেষের সাময়িক প্রসঙ্গ। এই বিভাগটিতে আমি দূরবাসিনী বঙ্গ-সুলনা বাঙলা দেশের হাল আমাদের একটি সামগ্রিক রূপ চোখের সম্মুখে দেখতে পাই। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে আপনাদের নির্বাচন ও উদ্ধৃতি যথোপযুক্ততায় পরিবর্তিত হয়। আশা করি, আমার মত আরও অনেকেই দূরে থেকেও বাঙলা দেশের ছবি দেখার আনন্দ পেয়ে থাকেন। তাবপরেই আমি পত্রিকার আদি অন্ত তন্ন তন্ন খুঁজতে থাকি—ক'জন মহিলা লিখেছেন এবং কি কি লিখেছেন। আপনি হয়তো অবহীকার করবেন না, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান কত বেশী। এখন যে ক'জন খ্যাতির শিখরে বসে আছেন, তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাঁদের লেখাও উন্নতির দিকে না এগিয়ে বরং অবনতির দিকে এগিয়ে যেতে দেখছি। এর কারণ আমার অহুমান, বর্ধা শিকার অভাব কিংবা উচ্চশিক্ষার বালাই না থাকা। বিদেশী লেখিকাদের জ্ঞানের পরিধি আমাদের মত সীমাবদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতা এবং উৎকর্ষতা কোন দিকেই দোষ খুঁজে পাওয়া

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



যায় না। বন্ধুবরের চার দেওয়ালে থেকে লিখতে হয়। ক'জন খ্যাতিমানদের লেখা প'ড়ে শেষ পর্যন্ত হাত সন্ধান করা যায় না।

মাসিক বসুমতীতে বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সত্যিই বেশ কয়েক জন লেখিকা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। জানি না, কলকাতার পাঠক-পাঠিকা তাঁদের লেখা প'ড়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জীজীমায়ের জীবনী, মাসতী গুহ-রায়ের লেখা। আগেও আমরা একজন লেখিকার 'নিবেদিতা' পড়বার সৌভাগ্য লাভ করেছি—হরবান্দিকা নারায়ণী দেবী। এই দুই লেখিকার জগৎ আমি দস্তুরমত গর্ববোধ করি এবং এঁদের প্রচারের জগৎ বার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই পড়তে বলি। (সঙ্গেপনে জানিয়ে রাখি, নারায়ণী আর মালতী দেবী এই ব্যবধে আমাকে কি 'কমিশন' দিচ্ছেন?) কবি উমা দেবীর 'রাজধানীর পথে পথে' কবিতাকে লিরিকের পর্যায়ে ফেলা যায় নিশ্চয়ই। কলকাতা সহরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এঁকে চলেছেন কবি—যা দেখছেন তাঁর চোখে। উমা দেবীর দৃষ্টির বিস্তার অসীম, তাঁর ভাষা-মাধুরী সুধার পরিপূর্ণ। অঙ্গন ও প্রান্তরে আপনাদের প্রতি মাসেই বহু মহিলার লেখা ছেপে থাকেন—যেজন আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভের স্রোত-উদ্ভূত। এই বিভাগে প্রত্যেকটি লেখাই যে সুখপাঠ্য হয় তা নয়, তবে গুণগণ্য পরিচয় যথেষ্ট থাকে। বর্তমানে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'ক্যাসানোভার স্মৃতি কথা', একজন মহিলা অনুবাদ করেছেন বাঙলা ভাষায় কল্পনাতীত নয় কি? এই বিশেষ 'আত্ম-জীবনী' পৃথিবীর সাহিত্যে বিখ্যাত ভিন্ন ভিন্ন কারণে। শান্তা বসু দক্ষতা ও সংবোধন সঙ্গে ক্যাসানোভাকে বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে যেন চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অনুবাদিকার অন্ত একটি

লেখা আমরা কিছুকাল আগে বসুমতীতেই পড়েছি। বিখ্যাত কবীর লেখিকা ভেরা প্যাশেভার কি একটি বই, নাম আমার সঠিক মনে পড়ছে না। 'ক্যাসানোভা'র অনুবাদে বাঙলা সাহিত্য লাভবান হবে। আবার অনেকদিন পরে 'মিত্রা'র লেখিকা সুলেখা, দাশগুপ্তার 'বর্ণালী' উপহার পেয়েছি। বর্ণালী শুরুতেই আমাদের দৃষ্টি ও মনকে আকৃষ্ট করেছে। এই লেখিকার লিখনভঙ্গী বেশ উন্নত। বারি দেবীর গল্প আমরা কয়েকটি পড়েছি। 'বাতিঘর' কিংবা পুরানো ঠাইলে লিখিত, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ও গল্পাংশ প্রশংসার যোগ্য। আরও কয়েক জনের লেখা উল্লেখ করা যায়, চিঠির আকার তাতে আর রকম হয় না। জয়ন্তী সেন কবিতা বেশ ভালই লিখছেন। তাঁর লেখা ক'মাস দেখছি না কেন? জয়ন্তী সেনের কবিতার ভাষা ও ছন্দ বেশ স্বদয়প্রসূ। সবশেষে আমার নিবেদন, মহিলা লেখিকাদের আরও সন্ধান দিক বসুমতী। শোনা যায় সাহিত্যের পাঠিকাই নাকি সংখ্যার অধিকতর, কিন্তু লেখিকাদের প্রাণতৃপ্তির কম কেন? নমস্কার ইতি—কৃষ্ণ সান্তাল। বিজয় নগর, নই দেউলী।

চার জন

আমরা মাসিক বসুমতীতে বিখ্যাত বাঙালীদের জীবনকথা পড়ে খুব আনন্দ পাই। আপনি আমাদের যুবকদের সামনে এই সব মহৎ লোকদের জীবনী প্রকাশ করে খুব মহৎ কাজ করছেন। তজ্জগৎ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই সম্পর্কে আমাদের ধৃতীয় সমাজের দুই জন ব্যক্তির কথা আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে তাঁদের বিষয় প্রকাশ করতে কৃতার্থ অনুভব করব। (১) আচার্য্য স্বর্ধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, তিনি ১৯১১ সালে মোহনবাগানের খেলোয়াড় ছিলেন। বিষ্ণুপুর শিক্ষাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। আজীবন সমাজ সেবা করেছেন, বাঙালীর কৃতী সন্তান, ধৃতীয়ান সমাজের উত্তর ভারত যুক্ত মণ্ডলীর অবৈতনিক প্রধান আচার্য্য। তাঁর বয়স ৭৩ এখন, তবুও সারা উত্তর ভারতে পরিভ্রমণ করেন এই কার্য্য উপলক্ষে। শিক্ষাত্রতী হিসাবে তাঁর অবদান অপরিমেয়। (২) দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা পরে জানাব আপনাকে। ইনি শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস। ইতি—সতীশ নন্দ। Y. M. C. A., College St. Cal—12.

[ আপনি এই দুই কৃতী ব্যক্তির জীবনী 'চারজন' এর জন্ত লিখে পাঠিয়ে দিন।—স ]

আপনার সুপ্রসিদ্ধ মাসিকে "বাঙালী পরিচিতি (চারজন)" নিয়মিত পাঠ করি। কিন্তু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের উল্লেখ উহার মধ্যে কেন নাই বৃষ্টিতে পারিলাম না। ইনি ১৯১৫ সালে ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম. এ পাশ করেন। ইহার সহপাঠীদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও প্রাক্তন উপাচার্য্য উক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকীর্তীধর চক্রবর্তী, বিচারপতি শ্রীসেব্রত মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীপাচকড়ি সরকার, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার, শিক্ষাবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ উক্ত সনৎকুমার বসু ইত্যাদি।—শ্রীমহারাগী সরকার। ব্যারাকপুর।

[ আপনি এই কৃতী ব্যক্তির জীবনী লিখে দিন, অনুগ্রহে।—স ]

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Sending herewith subscription for one year.  
Dr. F. Chrestien. P. O. Barharwa. Santal  
Pargana.

আখিন ১৩৬৪ সংখ্যা হইতে এক বৎসরের চাঁদ পাঠাইলাম।  
—সবিতা চক্রবর্তী। c/o P. K. Chakrabarti, I.A.S.  
Belvedere Estate. Cal-27.

Please put my name as one of your subscribers. Sending Rs. 24/- for one year. —Mrs. Shyamali Guhathakurata. 41. Farleigh Ave. se-19. Singapore.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের মূল্য বাবদ পনেরো টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন।—শ্রীমতী তিলোত্তমা দাস-মহাপাত্র। Jamirapalgarh. Midnapur.

ছয় মাসের পত্রিকার মূল্যের দক্ষণ সাড়ে সাত টাকা পাঠাচ্ছি।  
—কল্পনা বসু। Manivilla. Nougongj. Assam.

বার্ষিক চাঁদ পনেরো টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন। —দীপ্তি দত্ত-বায়। C, 85. Vinay Nagar. New Delhi.

I am sending subs. for M. Basumati as usual.  
—Gouri Biswas. Gauhati.

Being subs. for one year, please acknowledge.  
—Mrs. L. P. Devi Barwah. Borhat Tea Estate.  
N. E. Rly. Upper Assam.

পত্রিকার মূল্য বাবদ টাকা পাঠাইতেছি। প্রাপ্তি জানাইবেন।  
—মিস অণিমা ঝায়। হাজারিবাগ। বিহার।

Sending my annual subs. for one year.  
—Aparajita Ghose. Berhampur Main Rd.  
Mursidabad. West Bengal.

Sending Rs. 15/- being the yearly subs. for  
M. Basumati. —R. N. Sikdar. Carron Tea Estate.

Annual subs. for M. Basumati. Kindly acknowledge.  
—Hd. Master, D. N. High school.  
Konjahgarh. Orissa.

মাসিক বসুমতীর বাকী চাঁদ ৭১০ পাঠাইলাম। বাৎসরিক চাঁদ পূরা জমা হইল। R.K. Ghosh. Jabulpur.

গ্রাহক মূল্য ১৫৮ টাকা পাঠাইতেছি। দয়া করিয়া পূর্ববৎ আপনাদের পত্রিকা পাইলে বাধিত হইব।—স্নেহলতা সেন, রাসবিহারী এভিনিউ। কলিকাতা।

Sending Rs. 7.50 for the subscription of your  
Monthly Basumati for six months.—Kanika  
Dutta, Kalahandi, Orissa.

আবার সংখ্যা থেকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। চাঁদ বাবদ ৭১০ টাকা পাঠালাম। দয়া করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।  
—Bani Chakravorty, Sabarmati, Ahmedabad.

১৫৮ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। গ্রাহিকা করে সুখী কোরবেন।—অরুণা চক্রবর্তী, গোহাটি, আসাম।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদ ১৫৮ টাকা এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আখিন হইতে আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া নিয়মিত 'মাসিক বসুমতী' পাঠাইবেন।—Niharika Choudhury, Rajasthan.

আমার নমস্কার গ্রহণ কোরবেন। ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে 'বসুমতী' পাঠাবেন দয়া করে। ছ' মাসের চাঁদ পাঠালাম।—Sabita Devi, Azamgarh.











